"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

পঞ্চম বর্ষ ॥ তৃতীয় খণ্ড ॥ ২৬ সংখ্যা — ৩৮ সংখ্যা
শুক্রবার, ১৯ কার্তিক, ১৩৭২ — শুক্রবার, ১৪ মাঘ, ১৩৭২
Friday, 5th November, 1965—Friday, 28th January, 1966.

লেখক **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

লেখক					বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ ম ॥					
শ্রীমিহির আচার্য	...	...	...	...	লগন (গল্প) ১১৭;
শ্রীমিহির বসু	...	...	...	...	লাল গ্রহ মঙ্গল (আলোচনা) ১৮৯;
শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়	...	...	...	...	চৈত্র (কবিতা) ৭৪৪;
॥ র ॥					
শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়	...	...	...	...	প্রলয় রাতের বহ্নিশিখা (গল্প) ৩৯১;
শ্রীরবি চক্রবর্তী	...	...	...	...	আমেরিকার হেমন্ত (আলোচনা)৬১;
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	...	...	সৌরজগতের নতুন আগন্তুক (আলোচনা) ৩৩;
শ্রীরমেশ বসু	...	...	...	...	চেক চলচ্চিত্র উৎসব (আলোচনা) ৭৭৬;
শ্রীরাখী ঘোষ	...	...	...	...	যীশুখৃষ্ট দেখতে কেমন ছিলেন (আলোচনা) ৬৭১;
শ্রীরাম বসু	...	...	...	...	স্থির দেবদারু (কবিতা) ৪৮৮;
॥ ল ॥					
শ্রীলীলা মজুমদার	...	...	...	...	সবুজ (গল্প) ৩২৯;
শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য	...	...	...	...	প্রেম ও পাথর (গল্প) ১৫;
॥ শ ॥					
শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	...	...	...	...	যদি মনে পড়ে (বড় গল্প) ৭৫৫, ৮৩১, ৯৫৫, ১০৪৩;
শ্রীশামসুর রহমান	...	...	...	...	সময় (কবিতা) ৬৪৪;
শ্রীশিশিরকুমার দাশ	...	...	...	...	ট্রেন থেকে (কবিতা) ৮৮;
শ্রীশীলভদ্র	...	...	...	...	অধিকন্তু ৬২, ১৩৮, ২২৬, ২৭০, ৩৮৬, ৪৫৬, ৫১২, ৭৩২, ৭৯০, ৮৯০, ৯৪৮, ১০৩৪;
শ্রীশুভঙ্কর	...	...	...	...	বিজ্ঞানের কথা ১৩৯, ৩৩৩, ৪৬১, ৮৭১;
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	...	...	...	শ্রীমান-শ্রীমতী (উপন্যাস) ৫৯, ১৩৫, ২২৭, ২৯১, ৩৭৩, ৪৫৩, ৫৪৫, ৭০৭;
॥ স ॥					
শ্রীসজল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	...	...	বাঁশি (কবিতা) ৮৮;
শ্রীসমদর্শী	...	...	...	...	দেশে-বিদেশে ৩১৯, ৪৭৯, ৭৩৩, ৮৯৪, ১১৫২;
শ্রীসমর বসু	...	...	...	...	বিশ্বের প্রথম দিগ্বিজয়ী পালোয়ান (আলোচনা) ৩৮১;
শ্রীসমরসেট মম	...	...	...	...	ভারত : ১১৩৮;
শ্রীসত্যব্রত দে	...	...	...	...	জাতীয় প্রতিরক্ষায় বাঙালী (আলোচনা) ৫৭২;
শ্রীসত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী	...	...	...	...	পশ্চিমবঙ্গ পরিচিতি (আলোচনা) ৫৭৫;
শ্রীসমীরণ মুখোপাধ্যায়	...	...	...	...	বিধ্বস্ত বন্দরে যেতে (কবিতা) ৭৪৪;
শ্রীসাংবাদিক	...	...	...	...	পাকিস্তানী প্রাইজ কোর্ট (আলোচনা) ১৫৬;
শ্রীসুধা বসু	...	...	...	...	বিস্মৃত শিল্পী নরেন্দ্রনাথ (আলোচনা) ১৭৪;
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার	...	...	...	...	সৈকত নগরী দীঘা (আলোচনা) ৬৩৬;
শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	...	...	পশ্চিম বাংলায় ভ্রমণ (আলোচনা) ৬৩১;
শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	...	...	...	...	আকাশে যে আলো দেয় (কবিতা) ৯৮৬;
শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	...	...	...	...	ক্রান্তিকাল (কবিতা) ৪০৮;
শ্রীসুশীল রায়	...	...	...	...	একটি জীবন (গল্প) ৯৮৭;
শ্রীসুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	...	...	...	গানের জলসা ৪২, ১২৩, ২০২, ২৮০, ৩৬৩, ৪৪৪, ৬৯৮, ৭৭৮, ৯৩৯, ১০২০;
শ্রীসুশ্রুত	...	...	...	...	আরোগ্য ৬৮, ১৪১, ২১৮, ২৯০, ৩৯০, ৭২৮, ৮৮২;
সুরেশচন্দ্র সাহা	...	...	...	...	অস্ট্রেলিয়ার ডেয়ারী ফার্মে বিপ্লবযুগ (আলোচনা) ৭৯১;
×	×	×			সম্পাদকীয় ৫, ৮৫, ১৬৫, ২৪৫, ৩২৫, ৪০৫, ৪৮৫, ৫৬৫, ৬৬১, ৭৪১, ৮২১, ৯০১, ৯৮১;
শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়	...	...	...	...	বাংলার পাখী (আলোচনা)৮৬৬;
শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত	...	...	...	...	নেতাজীর চরিত্রের আর এক দিক (আলোচনা)১০০৮;
॥ হ ॥					
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র	...	...	...	...	সংক্রান্তি (কবিতা) ৯৮৬;
শ্রীহিমানীশ গোস্বামী	...	...	...	...	নিজের পায়ে (গল্প) ৪৮৯;
॥ ক্ষ ॥					
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়	...	...	...	...	পশ্চিমবঙ্গের খেলাধূলা (আলোচনা) ৬৫৫;

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৭শ সংখ্যা
মূল্য

Friday 11th November, 1966 শুক্রবার, ২৫শে কার্তিক, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীধ্রুব রায়

চিঠিপত্র

খৃষ্টবাণীর বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ তারিখে "অমৃতে" প্রকাশিত "খৃষ্টবাণীর বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে" শীর্ষক একটি পত্রে শ্রীসত্যবন্ধু ঘোষ দস্তিদার মহাশয় যীশু খৃষ্টের একটি বাণীর প্রচলিত অনুবাদের পরিবর্তে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন :—

"পর্বত শিখরের সংকীর্ণ গুহায় উটের প্রবেশলাভ যদিও বা ঘটে একজন ধনী ব্যক্তি কখনোই ভগবানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।" তাঁর মতে "Eye of a needle" এর প্রচলিত অনুবাদ "সূচের ছিদ্র" অপেক্ষা "পর্বতশিখরে অবস্থিত গুহা" এইরূপ ব্যাখ্যা অধিকতর সমীচীন। পত্রলেখক মহাশয় আরও বলেছেন যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করবাবু "সূচের ছিদ্রের" ব্যাখ্যাটাই গ্রহণ করেছেন।

পত্রলেখক মহাশয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণ করবার পূর্বে এই বিষয়ে পণ্ডিতবর্গ উক্ত বাণী সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করেছেন তার একটি সমীক্ষা দেওয়া বিধেয় মনে করি।

যীশু খৃষ্টের উপরোক্ত বাণীটি এইরূপ :—

'It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God'.'

উক্ত বাণীটি New Testament -এর অন্তর্গত Matthew's Gospel বা সাধু মথি বা ম্যাথু লিখিত সুসমাচার-এর Chapter 19 Verse 24 এবং St.Mark's Gospel বা সাধু মার্ক লিখিত সুসমাচার-এর Chapter 10 Verse 25-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, New Testament গ্রীক ভাষায় সর্বপ্রথমে লিখিত হয়েছিল। উক্ত বাণীটির Vulgate বা ল্যাটিন সংস্করণ এইরূপ :—

"Facilius est Camelum per foreman acus transire, quam dinitem intrere in regnem Caelorum".

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং Shakespeare উক্ত উক্তির নিম্নলিখিত প্রয়োগ করে গিয়েছেন :—

"It is as hard to come as far a camel
To thread the postern of a small needle's eye.
Richard—II, Act-V, Scene 5.

এর পরে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে Charles Fitz-Geffrey তাঁর "Elisa" নামক গ্রন্থে উপরোক্ত উক্তির নিম্নলিখিত প্রয়োগ করেছেন :—

"He had learned also how to make the camell passe through the needles eye, namely by Casting off the bunch on the back".

বাইবেল সাহিত্যের টীকাকারদের মধ্যে যীশুখৃষ্টের উপরোক্ত বাণীটির তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ মতানৈক্য দেখা যায়। Mr. Origen এবং Mr. Theophylact মনে করেন যে, গ্রীকভাবাপন্ন ইহুদীরা প্রাচীন 'Camelos' গ্রীক শব্দটিকে Cable (জাহাজের রজ্জু) অথবা Camel (উট) এই দুই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এই সম্পর্কে St. Anselem -এর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে

"At Jerusalem there was a certain gate, called the needle's gate, through which a camel could not pass but upon its bended knees and after its burden had been taken off; and so the richman should not be able to pass along the narrow way that leads to life till he had put off the burden of sin and of riches, that is, by ceasing to love them" (— Gloss apud S. Anselem in Catena Aurea Vol-I, Page-670, Oxford translation — 1841).

তার তাৎপর্য, জেরুসালেমের একটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের নিকট উটকে তার বোঝা নামিয়ে হাঁটু গেড়ে যেতে হত। সেইরূপ অর্থ ও পাপের বোঝা ত্যাগ করবার পরেই ধনী লোক ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। Mr. William S. Walsh তাঁর Handy Book of Literery Curiosities নামক গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"Shakespeare construed the passage in St. Anselem's sense when he said", It is as hard.... ....needle's eye — Richard—II, Act—V, Scene 5".

অর্থাৎ Walsh সাহেবের মতে Shakespeare St. Anselem এর ব্যাখ্যার মতন "eye of a needle" এর ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের মনে হয় Charles Fitz-Geffrey সাহেবও Shakespeare এর অনুরূপ ব্যাখ্যা করে গেছেন।

Mr. Brenur তাঁর Dictionary of Phrase and fable এর ৩৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :—

"There is no need to suppose that by 'the eye of a needle' — intended the small arched entrance through the wall of a city, nor is there any evidence that such a gateway had any such name in Biblical times".

Brewer সাহেবের মতে "eye of a needle"-এর অর্থে খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন এবং বাইবেলের যুগে ঐরূপ প্রবেশদ্বারের উক্ত প্রকার সংজ্ঞার কোনও প্রমাণ নেই। তাঁর মতে তা একটি Proverb বা প্রবচনের অন্তর্গত।

Mr. Stevenson তাঁর Book of Proverbs, Maxims and familiar phresis -এর ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"This is a paraphrase of a proverb which is common in various forms throughout the east-in fact in all the countries familiar with the camel.

"To let a camel go through the hole of a needle" (Hebrew).

"Can a camel pass through the eye of a needle" (Tamil)'.

Stevenson সাহেবের মতে "Eye of a needle" এই শব্দসমষ্টি প্রাচ্যদেশে তথা উট প্রাণীর সঙ্গে পরিচিত সমস্ত দেশের প্রচলিত প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রণিধানযোগ্য যে, যীশুখৃষ্ট প্রাচ্য দেশের অন্তর্গত জুডিয়ার উপকূলে তাঁর ভক্তবৃন্দকে উক্ত উপদেশবাণী বিতরণ করছিলেন। St. Mathew's Gospel-এর অন্তর্গত ২৩তম অধ্যায় ২৪ সংখ্যক Verse-এ অনুরূপ আর একটি প্রাচ্যদেশীয় প্রবচনের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় :

"Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel".

Mr. William S. Walsh তাঁর Handy Book of Literery Curiosities শীর্ষক পুস্তকের ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :—

"Taking the saying in its most literal sense, it is scarcely more hyperbolical than that other utterances of our Lord, strain at a gnat, swallow a camel". In any event Christ was only making use of a proverbial expression, the comparison of any difficulty with that of a camel or an elephant passing through the eye of a needle, being a familiar simile to oriental hearers".

Walsh সাহেবের মতে প্রাচ্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সুপরিচিত উপমার সাহায্যে একটি দুরূহ কার্য সম্পাদনের বিষয় বুঝাবার জন্য যীশুখৃষ্ট উক্ত প্রবচনের অবতারণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তা অতিশয়োক্তির নামান্তর।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের সাম্প্রতিক সুসংস্কৃত ইংরাজী বাইবেলের St. Mathew's Gospel ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক Argyle (আরগাইল) লিখেছেন (Cambridge Bible Commentaryat Page 146)

"The camel was the largest beast of burden known in Palestine. This is no doubt a proverbial saying. Note again the oriented tone of exageration. It must not be explained away by understanding the Greek 'Camilos as a ship's Cable (hence in some late Mss. the spelling 'Camelos' which means 'a rope') or the Greek word for 'eye of a needle' or meaning a narrow gorge or gate".

উপরোক্ত মতামত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আধুনিক বাইবেল সাহিত্যের পণ্ডিতদের মতে যীশুখৃষ্টের বাণীটি প্রাচ্যদেশীয় প্রবচনকে অবলম্বন করে রয়েছে এবং "eye of a needle" এর আভিধানিক অর্থ "পর্বতশিখরে অবস্থিত গুহা" এইরূপ ব্যাখ্যা করবার কোনও যৌক্তিকতা নেই। একটি দুরূহ কার্য বুঝাবার জন্য উপরোক্ত অতিশয়োক্তির অবতারণা করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত উক্তিটির প্রথমাংশের প্রচলিত বাংলা অনুবাদ ভুল হয় নি এবং রবীন্দ্রনাথ ও শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করবাবু "Eye of a needle" এর "সূচের ছিদ্র" এইরূপ ব্যাখ্যা করে কোনও প্রমাদে পতিত হন নি।

বিনীত—গৌরীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা।

ইস্পাতের নামে রক্তপাত

অন্ধ্র প্রদেশে সম্প্রতি যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে তাতে সকলেই উদ্বেগ বোধ করবেন। সমাজের তলায় তলায় হিংসা, ক্রোধ আর অপরিণামদর্শিতা কীভাবে তার জাল বিস্তার করেছে সপ্তাহব্যাপী লঙ্কাকাণ্ড তার একটা হদিশ দিয়েছে। বিষয়টা একটি দূরবর্তী প্রস্তাব নিয়ে। পঞ্চম ইস্পাত কারখানা কোথায় স্থাপিত হবে এবং আদৌ হবে কিনা ওটা বিচার করবেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা। ইস্পাত উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য অতি প্রয়োজনীয়। ভারত সরকার ইতিমধ্যে তিনটি ইস্পাত কারখানা তৈরী করেছেন বিদেশী সহযোগিতায়। মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর এবং ওড়িষ্যার রাউরকেল্লায় এই কারখানাগুলি স্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ একটি কারখানা অনেক টালবাহানার পর সর্বশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় বিহারের বোকারোতে স্থাপনের সিদ্ধান্ত পাকা হয়েছে। তবে তার নির্মাণকার্য এখনো আরম্ভ হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে তার নির্মাণকার্য ও উৎপাদন সুরু হবার আশা আছে।

শুধুমাত্র নিজস্ব অর্থে ও সঙ্গতিতে একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা তৈরী করার ক্ষমতা আমাদের নেই। থাকলেও তার জন্য টান পড়বে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে। সুতরাং ইস্পাত কারখানা চাই বললেই তা রাতারাতি তৈরী করা যায় না। ভারত সরকারের হাতে, দুঃখের বিষয়, কোনো আলাদীনের প্রদীপ নেই। কিন্তু সেকথা শোনে কে? বোঝেই বা কে? অনগ্রসর দেশে ইস্পাত কারখানা হল অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্টেটাস্-সিম্বল, মর্যাদার কুলচিহ্ন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্প-সমৃদ্ধি সমস্তরের নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। শিল্পের কতকগুলি নিজস্ব লজিক আছে। তা অনুসরণ না করলে পড়তা পড়ে না। এবং একথাও কেবল পুঁথি-পড়া বিপ্লবীরাই বিশ্বাস করতে চাইবেন যে, ইস্পাত কারখানা তৈরী হলেই অনগ্রসর অঞ্চলের লোকদের কর্মসংস্থান হ'বে, তাদের হাতে টাকা আসবে। তা যদি হ'ত তাহলে বিহারের ছোট নাগপুরের আদিবাসী এবং অন্যান্য অধিবাসীরা তো সবচেয়ে অগ্রসর শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হতেন। অদক্ষ শ্রমিক জুগিয়ে কোনো অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পয়লা সারিতে যেতে পারে না। আর, ইস্পাত কারখানার আসল কর্মগুলি অদক্ষ শ্রমিক দ্বারা কখনো নিষ্পন্ন হয় না। তার জন্য অত্যন্ত দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ কারিগর, ইনজিনিয়ার এবং প্রয়োগবিদ দরকার। বলা বাহুল্য, যেখানে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হবে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যেই হাজারে হাজারে দক্ষ শ্রমিক মিলবে না। তাকে নিয়ে আসতে হবে অন্য জায়গা থেকে। তাই অন্ধ্রের দক্ষ শ্রমিক, ইনজিনিয়ার বা কারিগর বিশাখাপত্তনমের অ-জাত ইস্পাত কারখানার আশায় বসে নেই। তাঁরা তিনটি ইস্পাত কারখানায় যথাসাধ্য কাজ নিশ্চয়ই পেয়েছেন, চতুর্থ কারখানাতেও অন্ধ্রের দক্ষ শ্রমিকদের জন্য দরজা খোলা থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশাখপত্তনমে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবীতে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেছে। অন্তত কুড়িজন অন্ধ্রবাসী এর জন্য পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিয়েছে। সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে প্রচুর। আইন ও শৃংখলা পর্যুদস্ত হয়েছে হামলাবাজদের অপরিণামদর্শিতায়।

বিশাখপত্তনম যে ইস্পাত কারখানার পক্ষে একটি উত্তম স্থান এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। ইঙ্গ-মার্কিন কনসর্টিয়াম পঞ্চম ইস্পাত কারখানার জন্য অন্ধ্রের বিশাখপত্তনম এবং মহীশূরের হসপেট সম্পর্কে সুপারিশ করেছে। কিন্তু অবিলম্বে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্ভব নয় অর্থসঙ্গতির অভাবে, এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত। একথা প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রায় ১১ শো কোটি টাকা ইস্পাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এ টাকা প্রয়োজন হবে বর্তমান কারখানাগুলির সম্প্রসারণ এবং বোকারো কারখানার পত্তনী ব্যয়-বাবদ। তাই সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও অবিলম্বে পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের মতো অর্থ তাদের হাতে নেই। এই কথাগুলি উন্মত্ত জনসাধারণকে বোঝায় কে? তা ছাড়া সরকারী সম্পত্তির ওপর হামলা করে, রেলস্টেশন আক্রমণ করে এবং আইন ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে এ ধরণের দাবী আদায়ের পদ্ধতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির এই প্রয়াস বন্ধ করতে না পারলে আমাদের বিপদ আরও বাড়বে। অঞ্চল বিশেষের প্রতি পক্ষপাত বা অনুগ্রহ প্রদর্শন কোনো সুস্থ অর্থনীতি নয়, সুস্থ রাজনীতিও নয়। ভারতবর্ষের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণই কাম্য। এই নীতি অনুসারেই প্রতি পরিকল্পনার বিন্যাস করা হচ্ছে। অন্ধ্রবাসীদের ন্যায্য প্রাপ্য তাঁরা অবশ্যই পাবেন। তাঁদের উপেক্ষা করলে সেই ভুল সংশোধনের জন্য সারা দেশই এগিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকের হাতের পুতুল হয়ে এভাবে উন্মত্ত আচরণ করলে ইস্পাত তৈরী হবে না, শুধু কতকগুলি মূল্যবান প্রাণ বিনষ্ট হয়ে আমাদের দুঃখ ও দুর্গতির বোঝাই ভারী করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও আমাদের অনুরোধ যে, পরিকল্পনা রূপায়ণের সময়ে যেন তাঁরা দেশের সমস্ত অঞ্চলের দিকে সম্যক দৃষ্টি রাখেন এবং অনগ্রসর এলাকার প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের সাধ্যায়ত্ত কোনো প্রচেষ্টারই যেন সামান্যতম ত্রুটি না হয়। আর, বিশাখপত্তনম্ যে ইস্পাত কারখানার পক্ষে উপযুক্ত স্থান এবং ভবিষ্যতে তার বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিবেচিত হবে, একথা স্পষ্ট করে বলতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধা কোথায়?

বিচিত্র চরিত্র

কুলদা ঠাকুরদা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

দ্বৈপায়ন হ্রদ মজে এসেছে বৎস। তালপুকুরের পাড় ন্যাড়া হলেও তালগাছের গোড়াগুলো আছে; সাগরদীঘি মজে এসে ঘটি না ডুবলেও ছেঁচে তুলে জল গণ্ডূষে মিলতে পারে; কিন্তু কলিকালে ছাই ফেলে ফেলে দ্বৈপায়ন হ্রদকে মাঠ করে তুলেছে। ওখানে আর দুর্যোধন লুকোবার জায়গা পাবে না। ঠেলে মুখ গুঁজতে গেলে মুখে ছাই লাগবে। তার থেকে বলি কি—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মিটমাট করে ফেল। খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবরূপী জনার্দন যেখানে সহায়, 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'—মিটিয়ে নাও হে, মিটিয়ে নাও।

কথাগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌরাণিক উপমার প্রচুর গন্ধ উঠলেও এই ইংরিজী ইন্টেলেকচুয়েলিজমের যুগেও কথাগুলি অচল নয় বলেই আমার ধারণা।

কথাগুলি আমাদের গ্রামের প্রাচীন কালের বিশিষ্ট একটি ব্যক্তির কথা। কুলদাপ্রসাদ সরকার মশায়ের কথা। আমার ঠাকুরদা হতেন। গতবার যতীনকাকার কথা বলেছি। যতীনকাকার পিতা কুলদাপ্রসাদ সরকার। সুপুরুষ, সুপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি; টিকালো বাঁকা নাক, যাকে বলে 'খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল' তাই; পাতলা ঠোঁট, পুরো দাঁত আমি দেখি নি তবু প্রিয়দর্শন বলেই মনে হয়েছিল আমার। কোঁচানো কাপড় পরতেন; শক্ত হাতের কফ, ডবল ব্রেস্ট কামিজ পরতেন, সাদা দেহের চামড়া অত্যন্ত মসৃণ ছিল, মাথার চুল পারিপাটি করে আঁচড়ানো, পায়ে সেলিম শু বা অ্যালবার্ট শু পরে কুলদাবাবু ঢুকতেন সরকার পাড়ার দুর্গাবাড়ীতে। পিছনে চাকরের কাঁধে থাকত ক্যাশ বাক্স। কম্বল ও গড়গড়া নিয়ে আর একজন তাঁর অনুসরণ করত; না, আরও আসবাব থাকত। চকচকে মাজা জলভরা গাড়ু এবং তার উপর ভাঁজকরা ভিজে গামছা।

কম্বলের রঙটা হত সাদা। সাদা রঙের কম্বল পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু কুলদাবাবু সাদা রঙের কম্বল ছাড়া ব্যবহার করতেন না; এবং সে কম্বলখানির রঙ কখনও ময়লা দেখাত না।

এই বিবরণের মধ্যে একটি কালকে এবং সেই কালের পটভূমির উপর একটি বিশেষ মানুষকে এক নজরে চিনতে কষ্ট হয় না। চেনা যায়। তবুও চেনা হল না বা যায় না। কারণ কুলদাবাবুর মধ্যে এমন একজন বিচিত্র বিশিষ্ট জন লুকিয়ে থাকতেন বা থেকেছেন যাঁকে বোঝা বা চেনা অত্যন্ত শক্ত এবং যিনি কদাচিৎ আকস্মিকভাবে বারেকের জন্য বাইরে এসে আবার গিয়ে আত্মগোপন করেছেন বা নিজের আসনে বসেছেন।

সেই মানুষটিকে এমনি দুর্লভক্ষণে বা ঘটনা উপলক্ষে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই কথাই বলব।

নামে আমরা জমিদার ছিলাম, আসলে ছিলাম মধ্যবিত্ত। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত। উচ্চ-মধ্যবিত্তদেরও নিচে। হাজার কয়েক টাকা আয়ের, (সে পাঁচ হাজারের নিচেই) জমিদারি, তার সঙ্গে চাষের জমি। একশো বিঘে, দুশো বিঘে, সে ক্ষেত্র বিশেষে পাঁচশো বিঘে পর্যন্ত। কুলদাবাবু সরকার বংশের সন্তান; সরকার বংশ মুসলমান আমল থেকে বিত্তবান, অন্তত ভূসম্পত্তিবান বংশ, আলিবর্দি খাঁর আমলের ছাড়পত্র ছিল। ১৯২৮।২৯ সাল পর্যন্ত আমরা তাঁকে দেখেছি; সজ্ঞানে একরকম সুস্থ শরীরেই প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুরে গিয়েছিলেন দেহত্যাগের জন্য এবং তাঁর যে মৃত্যু ঘটেছিল, তাকে মৃত্যু বলে না, দেহত্যাগই বলে।

কুলদাবাবুর চরিত্রে নাটকীয় গুণ বা দোষ যাই বলুন পাঠক, তাই ছিল, তিনি গল্পের চরিত্র নন, উপন্যাসেও তাঁকে খুব ভাল ফোটান যায় না, তিনি নাটকের চরিত্র। নায়ক নন কিন্তু নায়কের পাশে বা পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

প্রথমেই কথার নমুনা হিসেবে তাঁর যে কথাকটি উদ্ধৃত করেছি, সে কথাকটি গ্রামে চলিত আছে বলেই মনে আছে; আমাদের গ্রামে দুই জমিদারবাড়ীর প্রাধান্য নিয়ে বিরোধ বেধেছিল এক সময়। এবং সে যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘকাল; কিন্তু যুদ্ধটা ছিল অসম পক্ষের যুদ্ধ। এক পক্ষ অতি প্রবল, তাঁরা শুধু জমিদার নন, ব্যবসাদার এবং জমিদার একসঙ্গে। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। অপর পক্ষে যিনি, তিনি তাঁদের জ্ঞাতি কিন্তু তাঁরাই প্রাচীন। আয়পয় সামান্যই হাজার পাঁচ-সাত টাকা কি হাজার নয়-দশ। তার সঙ্গে প্রচুর চাষের জমি। অনেক দীঘি, সরোবর, বাগানও তাঁদের। এই বিরোধের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার আহমদ শাহ আই-সি-এস ব্যবসাদারের প্রতি সদয় হলেন, তাঁর অর্থের জন্য। শোনা যায় কয়েক দফাই তিনি আমাদের গ্রামে এসে ফিরে যাবার সময় তাঁর কোটের পকেট অতিরিক্ত ভারে ও চাপে ফাঁসিয়ে শেষে দুই হাতে চেপে ধরে কোন রকমে ফিরে গেছেন। এই মামলা মিটমাট করে দেবার জন্যই কুলদাবাবু দুর্বল পক্ষের মালিককে ওই কথা বলেছিলেন।

"বৎস দুর্যোধন (ওঁকে তিনি মহামানী দুর্যোধন বলতেন) দ্বৈপায়ন হ্রদ মজে এসেছে, ছাই ফেলে ফেলে মজিয়ে দিয়েছে বাবা বাসন মেজে। ওখানে আত্মগোপনও করা চলবে না। কোন রকমে ঠেলে-ঠুলে মুখ গুঁজতে গেলে মুখে ছাই লাগবে। তার ওপর ম্যাজিস্ট্রেটরূপী জনার্দন ওপক্ষে।

তার থেকে বলি মিটিয়ে ফেল। মিটিয়ে ফেল।"

মিটমাটের আসর থেকে যাঁকে তিনি দুর্যোধন বলতেন, তিনি রাগ করে কটু কথা বলে উঠে চলে এসেছিলেন বলে রুক্ষ তিরস্কার করে বলেছিলেন—এ যে অংগদ রাববায় করে এলে হে!

দুর্যোধনই বলি, দুর্যোধন বলেছিলেন —তাহলে মাথার মুকুটই ছিনিয়ে এনেছি বলো কুলুকাকা।

কুলদাবাবু বলেছিলেন—তা এনেছ হয় তো। কিন্তু তাতে তোমার লাঙ্গুলটা খুব বড় হয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাবা। রাবণের দশ মুণ্ডু, কুড়ি হাত দেখে লোকে ভয় পেলেও হাতজোড় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অংগদের ল্যাজ যত বড়ই হোক, দেখলে লোকে উলো লে-লে করে চেলা হাতে দৌড়োয়!

—হাঁ কাকা, হনুমানের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-বেশী রাবণের মামা কালনেমির দেখা হয়েছিল গন্ধমাদন আনার সময়, তখন কালনেমিও মহাবীরকে বাঁদর বলে ঠাট্টা করেছিল।

—করে থাকলে মিথ্যে বলেনি, আর মরেও তার আপশোষ হয় নাই, বুঝেছ, অন্তত বাঁদরের রাজত্বে বাস করার দুর্ভোগ থেকে বেঁচেছিল কালনেমি।

এই হল কুলদাবাবুর দেখন-সারি অর্থাৎ মানুষটার চেহারা। সুপুরুষ, পরিচ্ছন্ন, সুরসিক তবে প্রগলভ। না, আরও আছে, কুলদাবাবু বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণব মানুষ ছিলেন; বাড়ীতে দুর্গোৎসব ছিল, কালী পুজো ছিল, জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং অন্যান্য সকলে শাক্ত ছিলেন; দুর্দান্ত শাক্ত ছিলেন কিন্তু কুলদাবাবু ছিলেন বৈষ্ণব। পদাবলী ছিল তাঁর কন্ঠস্থ এবং নিজে ছিলেন সুকণ্ঠ পারংগম গায়ক। কীর্তনের আসরে প্রথম সারিতে প্রথমেই তিনি বসতেন এবং কীর্তনের মূল গায়েন তাঁকে পেয়ে উৎসাহিত হয়ে তান ছেড়ে দিতেন — বঁধু-য়া-আ-আ-আ-আ। আ-আ-আ!

কুলদাবাবু চোখ দুটি বন্ধ করে নিবিষ্ট মনে শুনতেন।

—বঁ-ধু-য়া আ-আ-আ।

কি-আর-কহিব তো-রে।

আহা! অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া

বঁধু রহিতে দিলি-না-ঘরে।

বঁধুয়া আ-আ-আ-আ—।

কুলদাবাবুর নাকটি স্ফুরিত হতে থাকত। তালের মধ্যে ছেদ এলেই তিনি বলতেন—ছোট-ভাই ছোট করে। ছোট করে। পুরানো কালে বীরভূম অঞ্চলের মনোহরশাহী চালের কীর্তন গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কীর্তন গাওনার মধ্যে মাঝেমাঝে মূলগায়েন ডান হাতের তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল জুড়ে হাঁটু গেড়ে বসে রসিকসমাজের মুখের কাছে আঙুলের মুদ্রা তুলে অত্যন্ত মিহি সুরে, গলা চেপে মিহি সুরে গানের কলিটি গাইতেন। কুলদাবাবু সেইভাবে সেই মিহি সুরে গাইতে নির্দেশ দিয়ে বলতেন—ছোট ভাই, ছোট করে।

বসে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আঙুলে ঠিক অনুরূপ মুদ্রা করে অত্যন্ত মিহি সুরে গানটি ধরে দিতেন—

আ-হা কি আর বলিব তো-রে—

বঁধুয়া আ-আ-আ।

তোরে বলব কি বল?

কোন কথা তোর ধরবে মনে—

ও তোর ঢুকবে কানে? বলব কি বল?

কি আর বলিব তোরে?

অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া

রহিতে দিলি না ঘরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ভাবাবিষ্ট হতেন, নিজে গাইতে-গাইতে বা অন্যের গান শুনতে-শুনতে বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন—ওহো হো-হো। আহা হা-হা হা!

চোখ থেকে জলের ধারাও বইত।

কীর্তন-দলে খোল বাজিয়ের একটা বড় ভূমিকা ছিল সেকালে, মধ্যে মধ্যে সে এসে পড়ত মাঝখানে এবং মুখে বোল আউড়ে সেই বোল খোলের বাজনায় তুলে শোনাতো এবং লাফাতো ও নাচত। মাথা নড়ত।

ধা কেটে তেরে কিটে—

কুলদাবাবুরও মাথা তার সঙ্গে নড়ত। সমানে নড়ে চলত। বন্দনাপর্ব শেষ করে সমাপ্তির ধা শব্দ খোলে তুলে খুলে খোলের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত।

দর্শকেরা সাধুবাদ দিত। সে সাধুবাদ সর্বাগ্রে উচ্চারিত হত কুলদাবাবুর মুখ থেকে।

—বাঃ বাঃ বাঃ। বাহবা, বাহবা, বাহবা। —বাবা আমার রে। বলিহারি, বলিহারি, বলিহারি!

খুলে আবার হাঁটু গেড়ে বসে খোলে মাথা ঠেকাতো! কুলদাবাবুর ডান হাত প্রসারিত হয়ে খুলের পিঠের উপর পড়ত। বলতেন — জিতা রহো, জিতা রহো। সোনা দিয়ে হাতখানা বাঁধিয়ে দিতে হয়! বলিহারি, বলিহারি!

আবার দুর্গাপুজোর সময় নবমীর দিন মানতের বলির সময় বেশ বড় এবং বুড়ো পাঁঠা বলি দেওয়ার জন্য জেতাদারকে বাহবা দিয়ে বলতেন, সাবাস-সাবাস-সাবাস, বাহাদুর বেটাছেলে। হ্যাঁ, কব্জির জোর আছে। বলিহারি বলিহারি বলিহারি!

আবার গ্রামের কোন ছেলে ভাল ফল করলে তাকে সর্বসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে মানিক রে, মানিক, সাগরছেঁচা মানিক রে আমার। দীর্ঘায়ু হও — বাংলার মুখ উজ্জ্বল কর। বলে আশীর্বাদ করতেন।

কোথাও মিষ্টতার অভাব ছিল না। কৃত্রিমতাও ছিল না। কিন্তু সমস্তকিছুর মধ্যেই যেন কোথাও এমন কিছু ছিল—যা সমস্তটুকুকেই এ্যামপ্লিফাই করার মত উচ্চনাদী করে তুলত। যার জন্য লোকে অন্তরে অন্তরে একটা ব্যঙ্গের ভাব পোষণ করত। এটাকে হিসেব করে বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমি, আমার মনে হয়েছে এর মধ্যে দুটো দিক থেকে একটি চিরন্তন মানুষের মন কাজ করেছে।

একটি হল — পুরাতনের প্রগলভতায় গরীবের বক্র ব্যঙ্গ এবং অবজ্ঞা, অপরটি হল — যার অবস্থা পড়ে এসেছে তার অতীতমহিমার উঁচু মাথার জন্য নবীন অবস্থা গৌরবের অবজ্ঞা। এছাড়া আরও একটু কিছু ছিল যেটা প্রত্যেকের কাছেই খানিকটা অসহনীয় করে তুলত, মনে হত—বড় বেশী বলছেন। বড্ড লাউড। সে প্রশংসাতেও বটে নিন্দাতেও বটে, উল্লাসেও বটে — এমনকি বিষণ্ণ মানস প্রকাশেও যেন খানিকটা অতিরঞ্জন হয়ে যেত তাঁর। আবার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হত যে, এই ছাড়া এই মানুষটির ভূমিকা এই সংসাররঙ্গমঞ্চে স্বাভাবিক বা সম্পূর্ণ হত না।

সমাজের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে তিনি অগ্রগামী হয়ে গিয়ে হাজির হতেন।

যে কোন ক্রিয়াকর্মে তিনি এসে হাজির হতেন। বিষাদের ক্ষেত্র হলে বাইরে থেকেই শোনা যেত তাঁর বেদনার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ —ওঃ—ওঃ—ঘোর কলি, ঘোর কলি; কলি পরিপূর্ণ হতে চলেছে — নইলে এমন অবিচার ভগবানের রাজ্যে! পিতা থাকতে পুত্রের মৃত্যু; মাতা সধবা থাকতে কন্যা বিধবা — ওঃ! ওঃ! কি বলব? আমাদের বন্ধ বয়স—। ওঃ! অথবা এ প্রাক্তন। প্রাক্তন। অথবা এ জন্মের পিতার শত্রু ছিল ও গতজন্মে এ জন্মে শোধ নিয়ে গেল!

আনন্দের ক্ষেত্র হলে — ডাকতে ডাকতে ঘর ঢুকতেন — কই হে—কই! ওহে গৃহস্বামী—! কোথায় হে! মিষ্টান্ন আনো হে—মিষ্টান্ন আনো, ইতরজন বলতে চাও বল। মিষ্টান্ন আনো!

এ হল ভূমিকা।

এরপর আরম্ভ হত সমালোচনা, যার মধ্য থেকে অতিশয় কিছুর উত্তাপ বা কাঁটা যেন মানুষের গায়ে বিঁধত।

(আগামীবার সমাপ্ত)

আলেখ্য ॥

বিষ্ণু দে

মৃত্যু
সর্বদাই দুঃসংবাদ।

বিশেষত তার,
যে আপনজনের আর চেনার জানার
সকলের মনে গড়েছিল ঘনিষ্ঠ প্রতিমা,
কল্যাণীর লাবণ্যে যে এনেছিল চোখের দেখার
বা ঘন্টা আধেক কথা নিবিষ্ট শোনার,
শুধু দুচার মিনিট তাকানোর অনন্ত প্রসাদ,
যার চোখে গঙ্গা পদ্মা খুঁজেছিল সীমা
আর ধলেশ্বরী দিয়েছিল ঢাকাই শাড়ীতে
সৌন্দর্যের সংযত বাহার।

দশপ্রহরণধারিণীর আশ্বিনের আকাশই কি
এঁকেছিল তার ললাটের লালিত্যে সিঁদুর?
ভিন্ন ভিন্ন তবু প্রতিমুহূর্তের ধরণধারণে তার
অসাধারণত্ব ছিল সহজে কঠিনে, সাধারণে;
বাড়ীতে, নিভৃতে, বারান্দার সংক্ষিপ্ত বাগানে,
অল্পস্বল্প বাইরের ডাকে, সামাজিকতায়, সমাজের কাজে,
সমিতিতে, মাঠের সভায়।

মনে পড়ে প্রায় গৌণ কারণে, বা অকারণে স্বাভাবিক
স্মিত হাসি-মুখ, কিংবা কারণেই
প্রতিবাদী রাগে, উত্তেজিত দুঃখের বিদ্যুতে
হঠাৎ মেঘের রূপান্তর
যেন প্রবল বর্ষায় মানবিক গন্ধরাজ ঝুঁকে পড়ে আরক্ত জবায়।

আর তার অনুকম্পা,
যেন সকলেই তার ভাই চম্পা বিশ্বময়,
সহমর্মী ছিল সকলের।
আজ নেই সে ঘরণী, নেই তার
ঘরের বাইরের প্রশান্ত সংহত দাক্ষিণ্যের হাওয়া।
ইদানীং সে বলত সে কখনও-ই হবে না প্রবাসী—
প্রাণধারণের দুঃখে দেশের দশের বুভুক্ষিত তৃষ্ণাখিন্ন
অবসাদে হতাশায় যতই না হোক মর্মাহত।

তাই বুঝি মৃত্যু?
হয়তো বা যুক্তিযুক্ত, হয়তো বা বাংলায় প্রত্যাশিত ঘরে ঘরে।

তবু দুঃসংবাদ।
অন্তত চৈতন্যে আমাদের, যারা তাকে চিনেছিল।
সেই বুঝি রেখে গেছে এই উত্তীর্ণ প্রতীক
দগ্ধ ছিন্ন শতশত প্রান্তরে প্রান্তরে
আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত জীবনে প্রত্যাশী বিষাদ?

আঁকো তবে সে আলেখ্য উজ্জীবিত স্মৃতির সাহসে
[illegible] লক্ষ ॥

আচার্য দীনেশচন্দ্র: স্বপ্ন ও সাধনা

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

১৯১০ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যরূপে তিনখানা বই অনুমোদিত হয়েছিল—যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'অহল্যাবাঈ', দীনেশচন্দ্র সেনের 'সতী' ও চন্দ্রনাথ বসুর 'সাবিত্রীতত্ত্ব'। সে-সময়ে পরম আগ্রহের সংগে সতীর কাহিনীটি পাঠ করেছিলাম এবং গ্রন্থের প্রারম্ভেই ভৃগু প্রজাপতির গৃহে যে মহাযজ্ঞ ও নিমন্ত্রণ-সভার বর্ণনা আছে, আমার অন্তরে তা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। দীনেশবাবু একস্থানে লিখেছেন—'বৃষের মূর্তি কতকটা শিবের ন্যায় শান্ত',—এই বাক্যটি কি জানি কেন আমার বালক-মনে গ্রথিত হয়েছিল। দীনেশবাবু অবশ্য তাঁর গ্রন্থে মহাভাগবত পুরাণে উক্ত দশমহাবিদ্যার কাহিনীটি বর্জন করেছেন, নতুবা সে-কাহিনীও হয়তো আমার মনে গভীর রেখাপাত কোরতো। তবে সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে শিবের উন্মাদ-নৃত্য ও পৃথিবীর রক্ষার জন্যে বিষ্ণু কর্তৃক চক্রের সাহায্যে সতীর অঙ্গচ্ছেদন—পৌরাণিক কাহিনীর এই অংশটিও আমার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

তারপর একদিন আমার কোনো সহাধ্যায়ী আমায় বলেছিল—দীনেশবাবুর 'বেহুলা' বইখানি 'সতী'র চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। তখন আমাদের বিচার-বুদ্ধি অপরিপক্ক, কিন্তু বন্ধুর কথায় 'বেহুলা' বইখানি পড়ে ফেল্লাম। সত্যি 'সতী'র উপাখ্যানের চাইতে 'বেহুলার' উপাখ্যান তখন আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো। পরম শৈব চাঁদসদাগরের চরিত্রটিও বেশ আকর্ষণীয় মনে হোলো। দীনেশবাবুর গ্রন্থে মনসামঙ্গল কাব্য থেকে যে-সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা' বিনা প্রযত্নেই মুখস্থ হয়ে গেল। অবশ্য দীনেশবাবু যে চাঁদসদাগরকে আচার্য শঙ্করের অনুবর্তী বৈদান্তিকে পরিণত করে তুলেছিলেন, তা বুঝবার মতো বয়স তখনো হয়নি। তবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাঁদসদাগরের চরিত্রের মধ্যে যে একটা মানবতার দিকও আছে, গ্রন্থকার সে-কথা আমাদের বিস্মৃত হতে দেননি।

এর পরে পড়েছিলুম তাঁর 'জড়ভরত' এবং সেই কাহিনী পাঠ করে ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ মনে জাগ্রত হয়েছিল, সবচেয়ে ভালো লেগেছিল 'জড়ভরতের' ভূমিকা। সেই ভূমিকার মধ্যে ভক্ত দীনেশচন্দ্রের একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। সনাতন ভারতবর্ষের প্রতি দীনেশচন্দ্রের শ্রদ্ধাবোধ কত গভীর ছিল, এই ভূমিকার ছত্রে ছত্রে তার নিদর্শন রয়েছে। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

'নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দের কথা বিশেষভাবে ভারতের সামগ্রী।

'ভিন্ন দেশের লোকেরা সে কথার মর্ম বুঝুক আর না বুঝুক—আমাদের দেশে রাজা হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সেই কথার ভাবুক। এই ভাব বুঝিলে ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার দৈন্য আমাদের চক্ষে ঘুচিয়া যাইবে। মনে হইবে ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেবমন্দির। এখানে দিবারাত্র পূজার কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিতেছে। কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ বিল্বপত্র ও তুলসীদাম চয়ন করিতেছে, কেহ সংকল্প করিয়া লক্ষ নাম জপ করিতেছে, কেহ নৈবেদ্য সজ্জা করিতেছে, ঘরে ঘরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদি লইয়া যেরূপ বিব্রত, তাঁহার সেবা এবং পরিচর্যার জন্য বরং তাহাকে বেশী ভাবিতে হয়। ভগবানকে এরূপ গৃহের গণ্ডীতে আনিয়া অপরিহার্য অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে আর কোথায় দেখা যায়? কোটি কোটি কণ্ঠের 'মা' 'মা' শব্দ, কোটি কোটি হস্তের পুষ্পাঞ্জলি জগন্মাতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইতেছে। এখানে প্রস্তরখণ্ড, মৃন্ময় স্তূপ, অশ্বত্থ বৃক্ষ সকলই ঠাকুরের প্রকাশ বুঝাইতেছে।'

একালের অনেক পণ্ডিতম্মন্য লেখক দীনেশবাবুর উক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাসের অতিরেক বা আতিশয্য দেখতে পাবেন। কিন্তু যে-অনুভূতির গভীরতা থেকে উপরি-উদ্ধৃত উক্তি উৎসারিত হয়েছে, তাই তাঁর ভাষাকে প্রদান করেছে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

দীনেশচন্দ্রের রচনার একটা প্রধান গুণ আন্তরিকতা। এই জন্যেই তাঁর রচনা সহজে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। তাঁর আর একটি গুণ গল্প বলার সরস ভঙ্গী। যেখানে তিনি ঐতিহাসিকের দুরূহ ব্রত গ্রহণ করেছেন, সেখানেও তিনি প্রধানত কবি ও কথাশিল্পী। সর্বোপরি তিনি বাংলার ঐতিহ্য তথা ভারতের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক, যদিও তাঁর স্বদেশপ্রেম বিপ্লবাত্মক কর্মের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। এই সকল কারণে বাল্যকালেই তাঁর রচনার প্রতি, বিশেষত তাঁর পৌরাণিক উপন্যাসগুলির প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম।

দীনেশচন্দ্রের পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ 'পৌরাণিকী' নামে মুদ্রিত হয়েছে। এতে বেহুলা, জড়ভরত, সতী, ফুল্লরা, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজের কাহিনী একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে।

'বেহুলা'র ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

'স্বদেশের পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাঁহাদের কোনও সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কি প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিবেন কি ভরসায়?'

এ স্বদেশপ্রেমিক ও শ্রদ্ধাবান দীনেশচন্দ্রের উক্তি। তাঁর সাহিত্যসাধনার মূল প্রেরণাই ছিল এই স্বদেশপ্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ,
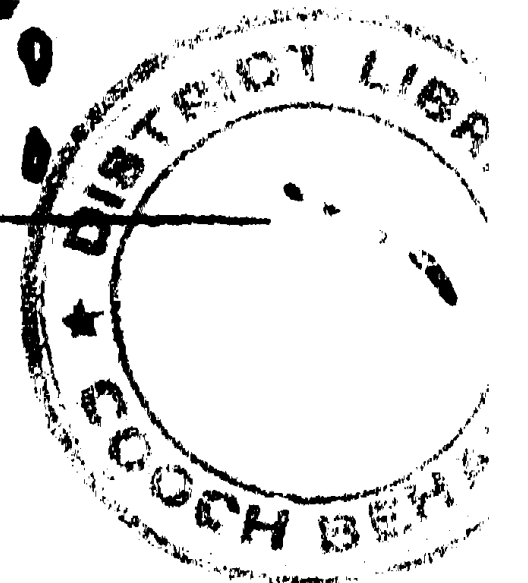
আর সেই জন্যেই তিনি ভারতের সনাতন গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্যের দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'সতী'র ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন, তা আজও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

'আমাদের সর্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্তমানের উপযোগী সমাজ-গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইব।...সেই পরিচয়স্থাপনের চেষ্টা কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি শিল্প সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রবন্ধের বিষয় হওয়া উচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে এই লক্ষ্যই আমার সামান্য লেখনীকে প্রেরণা দান করিয়াছে।'

দীনেশচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যে ছিল বাঙ্গালীসুলভ ভাবপ্রবণতা। এ-বিষয়ে তিনি যেন ছিলেন কবি নবীনচন্দ্রের সগোত্র। 'বেহুলা'র ভূমিকা থেকে এই ভাব-প্রবণতার নিদর্শন দিচ্ছি।

'আমি প্রাচীন পুঁথিতে বেহুলার কাহিনী পড়িয়া সেই স্বামি-বিরহ-বিধুরা আশ্চর্য-সাধনা-তৎপরা, একান্ত বিপন্না অথচ নির্ভীকহৃদয়া সাধ্বীর উদ্দেশ্যে নির্জনে কত অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাল্মীকির অঙ্কিত সীতা-চরিত্রের ন্যায় বেহুলার চিত্রও আমার ভক্তির অর্ঘ্য দ্বারা মানসপটে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছি।' ...পরিশেষে তিনি বলেছেন—

'হিন্দু গৃহিণীর প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানে যদি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেও সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই আমার চেষ্টা সার্থক মনে করিব।'

দেখা যাচ্ছে, ভারতের নারীজাতির প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল 'বেহুলা'র উপাখ্যান রচনার মূলে। আর এটাই ছিল 'সতীর' আখ্যান রচনারও মূল প্রেরণা।

'মনসামঙ্গল' অবলম্বনে যেমন দীনেশ-চন্দ্র বেহুলার কাহিনী লিখেছেন, তেমনি 'অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি' মুকুন্দ-রামের 'কবিকঙ্কণ চন্ডী' অবলম্বনে তিনি কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী লিখেছেন।

দীনেশচন্দ্রের রচিত আর দুটি আখ্যায়িকা আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—একটি হচ্ছে ধরাদ্রোণ, আর একটি কুশধ্বজ। এই দুটি আখ্যায়িকা নির্বাচনের মূলে প্রেরণা হচ্ছে ভক্তি ও আত্মসমর্পণের মহিমাকীর্তন। ধরাদ্রোণের 'ত্র্যম্বকশরণ' একালের অনেক কপট, বিষয়লোলুপ, তথা-কথিত ভক্তের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

'ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে এক পথে পরস্পরের হাত ধরিয়া যায় না, যেখানে তাহা হয়, সেখানে মুক্তি। অধিকাংশ সময়ে ভক্তি কর্মকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং অভ্যাসবশতঃ ভক্ত কুকর্মে লিপ্ত থাকিয়া হেয় হইয়া পড়েন।'

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—যে-ভক্ত কুকর্মে লিপ্ত হন, তিনি কি যথার্থ ভক্ত? ধরা ও দ্রোণ উভয়েই ছিলেন যথার্থ ভক্ত, এই জন্যেই তাঁরা ভগবানের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন।

আমরা দীনেশচন্দ্রের রচিত যে-ছয়টি উপাখ্যানের কথা বললাম, তা ছাড়াও তিনি কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই সব আখ্যায়িকা সে-সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত কৃষ্ণলীলার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। এই আকর্ষণের মূলে ছিল দীনেশচন্দ্রের গল্প বলার সরস ভঙ্গি। এই বইগুলির নাম হচ্ছে—(১) মুক্তাচুরি (২) শ্যামলী-খোজা (৩) কানুপরিবাদ (৪) রাগরঙ্গ (৫) রাখালের রাজগী ও (৬) সুবল সখার কান্ড। সুপণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখেছিলেন—

'এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি নব্যশিক্ষিত সমাজের সগৌরব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।'

দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা' শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নয়, বহু সহৃদয় পাঠকেরও সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছে। এই গ্রন্থে লেখক তাঁর সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্রের আলোচনা করেছেন এবং আর্ষ রামায়ণ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কবি সত্যই বলেছেন—পূর্বে তাঁদের (রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রসমূহের) প্রতি আমাদের যে-ভাবটি ছিল, এই গ্রন্থ-পাঠে তা ঘনীভূত এবং অনেকাংশে নবীভূত হয়েছে। দীনেশবাবু যে একাধারে চিত্রকর ও শব্দের যাদুকর, এই গ্রন্থপাঠে তা' বোঝা যায়। বাস্তবিক, রামায়ণী কথা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের মনকে বর্তমান দ্বন্দ্বকোলাহলময় জগৎ থেকে মহাকাব্যের স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়।

'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমা-লোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। * যথার্থ সমা-লোচনা পূজা—সমালোচক পূজারী পুরো-হিত—তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

'ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়া-ছেন। * আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, রামায়ণের দ্বারা ভারত-বর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।'

দীনেশচন্দ্রের 'রামায়ণী কথা'র চরিত্র-বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

...'অবস্থার দারুণ নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি দুই-একটি অধীর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন শিলা, কি পাদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া পর্বতরাজের মহত্ত্ব তুচ্ছ করা দুইই একবিধ। পল্লবগ্রাহী পাঠকগণ রাম-চরিত্রের তদ্রূপ সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্মীক-অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত—এ-চিত্রে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়।'

এটা হচ্ছে আর্যদৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন— 'আর্ষ রামায়ণ নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে।' কৃত্তিবাসী বা তুলসী-দাসী রামায়ণের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু ভরতের চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

'রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র।' এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও কৌশল্যার সকল কর্ম বা সকল উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। এখানে দীনেশচন্দ্র যেন আধুনিক সমা-লোচকের উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন। কিন্তু একটি কথা আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে ভরতের সমগ্র চরিত্র বিবৃত করেননি, তার প্রয়োজনও হয়নি। ভরত যদিও রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ-ধর্ম পালন করেছিলেন, তথাপি তাঁর কখনো ভ্রম-প্রমাদ ঘটেছিল কিনা, তা' আমরা জানি না, তিনি আদর্শ পতি বা আদর্শ পিতা ছিলেন কিনা, মহর্ষি তা'ও আমাদের জানতে দেননি। যাঁর জীবন বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত, এমন একজন মহামানবের পরিকল্পনাই জেগেছিল মহর্ষির মনে। সে মহামানব হচ্ছেন 'অনিল-অনল-সূর্য-ইন্দু-ইন্দ্র-উপেন্দ্র সমান'। এই মহামানব সম্পর্কেই দেবর্ষি বলেছিলেন—

'সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে স্থৈর্যে চ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ
প্রিয়দর্শনঃ।।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যেহপ্যনুপমঃ সদা'।।

'গাম্ভীর্যে সমুদ্রসম, স্থৈর্যে যিনি গিরি হিমবান, বীর্যেতে বিষ্ণুর সম, সৌন্দর্যতে চন্দ্রের সমান। কালাগ্নি-সদৃশ ক্রোধে, পৃথিবীর তুল্য ক্ষমাগুণে, কুবেরের সম ত্যাগে, অনুপম সত্য-সংরক্ষণে'। * ইত্যাদি

দীনেশচন্দ্র-সম্পর্কে একটি কথা সর্বদাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। তিনি ছিলেন প্রধানত ভক্ত, কবি ও ভাবুক, প্রাচীন সাহিত্যের মাধুর্য তিনি প্রথমে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করতেন এবং পরে আবেগ-মিশ্রিত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করতেন। এখানেই একালের প্রায় সকল সমালোচকের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের গুরুতর পার্থক্য। এ যুগের সমালোচকদের সম্পর্কে তিনিও বলতে পারতেন—

'মরম না জানে কবিত্ব বাখানে
এমন আছয়ে যারা,
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা'।

আমরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে সাহিত্য-বিচারে যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণের একটা মূল্য আছে কিন্তু এক্ষেত্রে ভক্তের শ্রদ্ধা ও আবেগ-মিশ্রিত নিন্দা-প্রশংসা যে

* আশালতা সেনের অনুবাদ।

মূল্যহীন, একথা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না।

সকলেই জানেন, কাব্যরচনার দ্বারাই দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর বয়স যখন দশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তাঁর একজন বাল্যবন্ধুকে বলেছিলেন—'আমি কবি বা গ্রন্থকার হবো, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়েঘরের নিকট সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোয়াবেন।' দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় একটা নোটবুকে এই মর্মে লিখেছিলেন—'বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হবো, যদি না পারি, তবে ঐতিহাসিক হবো। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলোয়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রম-লব্ধ প্রতিষ্ঠা থেকে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?'

দীনেশচন্দ্র তাঁর কবিত্ব-শক্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে দীনেশচন্দ্র ঐতিহাসিকের দুরূহ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালেই পিতৃদেবের (দীনেশচন্দ্রের খুল্লতাত) মুখে শুনেছিলাম কী অপরিসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহের জন্যে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে 'দরিদ্রের পর্ণকুটীরে' হস্তলিখিত কীটদষ্ট পুঁথির সন্ধান করেছিলেন এবং ছয় বৎসর বিপুল পরিশ্রমের ফলে গ্রন্থ রচনা (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, প্রথম ভাগ) সমাপ্ত করেছিলেন। এরপর দীনেশচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল, মস্তিষ্কের পীড়ায় দীর্ঘকালের জন্যে তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের এই অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার কথা শুনে বাল্যকালেই তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব মনে জাগ্রত হয়েছিল। পিতৃদেবের কথার সমর্থন পেয়েছিলাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ভূমিকায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনার গৌরব দীনেশচন্দ্রের। তাঁর পূর্বে প্রধানত মুদ্রিত গ্রন্থাদি অবলম্বনে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবের' লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন ও 'The Literature of Bengal' এর লেখক মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীনেশচন্দ্রের সমসাময়িক যশস্বী লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী বসন্তরঞ্জন রায় 'বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ওপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেছেন। (যদিও চণ্ডীদাস সমস্যার আজো কোনো সমাধান হয়নি।) আমরা বাংলার নবজাগৃতিতে গৌরব অনুভব করে থাকি, এই জাগরণের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ইতিহাস-চেতনা এবং প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ। দীনেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ প্রভৃতি মনীষিগণকে এই ইতিহাস-চেতনাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবর্তিত করেছিল। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকেই আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী মনীষীর ভেতরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করি, যেমন কবিচরিত-রচয়িতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। এঁদেরও পূর্বগামী হচ্ছেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। তাঁর রচিত 'কবিকলাপ' গ্রন্থখানি ভিন্ন-জাতীয়। ঢাকা রামমোহন রায় পাঠাগার থেকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করার সুযোগ আমার হয়েছে এবং 'শনিবারের চিঠিতে' দীর্ঘকাল পূর্বে আমি এই গ্রন্থখানির সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'কবিকলাপের' প্রত্যেকটি প্রবন্ধ দু'টি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশে সংক্ষেপে কবিচরিত বর্ণিত, সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, দ্বিতীয় অংশে আছে কবির রচনার নিদর্শন। বাস্তবিক পক্ষে দীনেশচন্দ্রের পূর্বে আর কোনো বাঙ্গালী মনীষী বিপুল শ্রম স্বীকার করে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত হননি, আর কেউ এমনভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য আমাদের কাছে উদ্ঘাটন করেননি অথবা

বাংলা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বাঙালী প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেননি। তাই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দীনেশচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। একজন পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন—

'Your work is a Chintamani, a Ratnakar.'

আমাদের সৌভাগ্য এই যে দীনেশচন্দ্র শুধু গবেষকই ছিলেন না, তাঁর ভেতর ছিল একটা কবি-মন। এই জন্যে সাহিত্যের মূল্যবিচারে তিনি অনেক সময় হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হয়েছেন।

আমরা সাহিত্যসমালোচনার দুটি ধারার সঙ্গে পরিচিত, একটি ভারতীয় ধারা, আর একটি পাশ্চাত্য ধারা। ভারতবর্ষে কাব্যবিচার-শাস্ত্র যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করলেও এদেশের সহৃদয় সমালোচকগণ সামগ্রিকভাবে কোনো কবি-কৃতির সৌন্দর্য-উদ্ঘাটন করেন নি, তাঁরা কবির রচনার বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে তার দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস, ধ্বনি প্রভৃতির বিচার করেছেন। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাহিত্যের মূল্য-বিচারে সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, আবার কখনো কখনো তাঁরা কোনো কবির অর্থাৎ রস-স্রষ্টার রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত করে কবি-মানসের ক্রম-বিকাশের ধারাটির অনুসরণ করেছেন। দীনেশচন্দ্র এই দুটি ধারার কোনোটিরই অনুবর্তন করেননি। তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা ও অনুভূতি দিয়ে প্রাচীন কাব্যসমূহের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধার অকৈতব প্রেমের চিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছে, আবার মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও তিনি এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রসের সন্ধান পেয়েছেন। যিনি ধ্বংসের দেবতা বলেই মঙ্গলময়, যিনি দ্বন্দ্বাতীত, যিনি পরম যোগী, সেই পৌরাণিক শিবের মহিমাও যে তাঁকে অভিভূত করেছে, 'সতী' ও 'বেহুলা'য় তার প্রমাণ আছে।

তথাপি, কখনও কখনও প্রবল হৃদয়াবেগ তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে অভিভূত করেছে। যিনি প্রথম জীবনে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছেন, তিনিই পরিণত বয়সে শ্রেষ্ঠ পদকর্তারূপে আমাদিগকে পদামৃত-মাধুরীর আস্বাদন দানে ধন্য করেছেন, এই মর্মে উক্তি করে দীনেশচন্দ্র বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের ঐক্য প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। এরূপ উক্তি সুযুক্তির পরিচায়ক নয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে বিভিন্ন চরিতগ্রন্থ রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে তিনি গোবিন্দদাসের কড়চাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দান করেছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে নানা সংশয়ের অবকাশ ছিল এবং এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে দীনেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে এক কালে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। * এসম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনার স্থান নেই। [illegible] গ্রন্থের সম্পর্কে একটি [illegible] উক্তি করে দীনেশচন্দ্রকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তথাপি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' শুধু ঐতিহাসিকের গবেষণার ফল নয়, যথার্থ সাহিত্যরসিকের 'ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের' স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। এখানে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের গুরুতর পার্থক্য। মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই বলেছেন—

'দীনেশচন্দ্র শুধু যে কীটদষ্ট পুঁথির একজন অক্লান্ত সংগ্রাহকই ছিলেন, তাহা নয়; তিনি কবিত্ববোধশক্তিসম্পন্ন প্রকৃত রসবেত্তাও ছিলেন।'

ময়মনসিংহ গীতিকা (প্রথম খণ্ড) ও পূর্ববঙ্গগীতিকা (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড) সম্পাদন করে দীনেশচন্দ্র আমাদের এক অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্যলোকের সন্ধান দিয়েছেন। এই গীতিকাগুলোর মধ্যে এমন একটি চিরন্তন মানবিক আবেদন আছে যাতে পাশ্চাত্যের সহৃদয় পাঠকগণও মুগ্ধ হয়েছেন। এই গাথাকাব্যগুলির ওপর দীনেশচন্দ্র নতুন আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ময়মনসিংহের নীরব সাহিত্যসাধক, 'সাময়িক সাহিত্য', 'ঢাকার বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক এবং 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক পরলোকগত কেদার মজুমদারের কথা স্মরণ করি। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায় ময়মনসিংহ-গীতিকা সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা পাঠ করে দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। বন্ধু দীনেশচন্দ্রের অনুরোধে সৌরভের সম্পাদক কেদারবাবু চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং দীনেশচন্দ্র তাঁকে এই গীতিকা-সঙ্কলন-কার্যে নিযুক্ত করেন।

দীনেশচন্দ্র বাংলা ভাষায় কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করেছেন, যথা—তিন বন্ধু, আলোকে আঁধারে, ওপারের আলো, শ্যামল ও কজ্জল প্রভৃতি। সাঁঝের ভোগ, বৈশাখী প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গল্পও তিনি লিখেছেন। গল্প বলার সরস ভঙ্গিটি দীনেশচন্দ্র আয়ত্ত করলেও তাঁর এই জাতীয় রচনা নানা কারণে কালজয়ী হতে পারেনি।

পল্লীগাথা অবলম্বনে তিনি 'বাংলার পুরনারী' নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এখানে পল্লী-গীতিকার কয়েকটি নায়িকার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় স্থাপন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি চারটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, সেগুলি 'প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বহু উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজি ভাষায় তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের ভেতর

History of Bengali Language and Literature, Chaitanya and his companions, Chaitanya and his Age, The Folk Literature of Bengal, Eastern Bengal Ballads. Mymensingh (Vol. I-IV)

প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য।

দীনেশচন্দ্র একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, হয়তো তিনি শ্রেষ্ঠ কবি হবেন নতুবা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। তিনি দেশবিদেশের বহু মনীষীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কুণ্ঠাহীন প্রশংসা লাভ করেছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও লাভ করেছিলেন, যদিও তাঁর যশ পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক দীনেশচন্দ্রের ওপর গুণগ্রাহী স্যার আশুতোষের 'করুণামসৃণ কটাক্ষপাত' তাঁকে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দিয়েছিল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্নেহ ও প্রীতি লাভ করেও ধন্য তিনি হয়েছিলেন। এঁদের উভয়ের মধ্যে যে একটা গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তা এঁদের চিঠিপত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু এই সৌহার্দের সম্পর্ক কখনও কখনও যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, তা বলতে পারি না। দীনেশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকমলের গ্রন্থাবলী সম্পাদন করেন এবং তাঁর কবিত্বশক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অবশ্য কৃষ্ণকমলের রচনা যে দীনেশচন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল, তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই বৈষ্ণব কবির রচনায় অনুপ্রাস ও যমকের বাহুল্যকে প্রশংসা করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের বন্ধু দীনেশবাবু কর্তৃক প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি অনুপ্রাস ঠাসা চাপিয়া আছে।' দীনেশচন্দ্র তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, কবিওয়ালাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন এবং বিহারীলালের যে কবিতাটি উদ্ধৃত করে (সর্বদাই হু হু করে মন বিশ্ব যেন মরুর মতন) রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক গীতি-কবিতার প্রথম প্রবর্তকের গৌরব দান করেছেন, তার মধ্যে দীনেশচন্দ্র 'কবিসম্রাটের যথেচ্ছাচার' লক্ষ্য করেছেন। অবশ্য এই ধরণের সাহিত্যিক মতভেদে তাঁদের অন্তরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, তাঁদের ভেতর পত্রবিনিময়ও কোনো দিন বন্ধ হয়নি। 'কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী' প্রকাশের এগারো বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রকে এক চিঠিতে বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়ে লিখছেন—

'বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাশে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী; কিন্তু ময়মনসিংহ-গীতিকা বাংলা পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতউচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন

---

* গোবিন্দদাসের কড়চা সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত 'গৌরপদতরঙ্গিণীর' ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের সংকলয়িতা কবি জগবন্ধু ভদ্র। দীনেশবাবুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন 'ভক্তি' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্র ঘোষ।

আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কারের জন্যে আপনি ধন্য।*

রবীন্দ্রনাথের কাছে দীনেশচন্দ্র যে স্নেহ ও প্রীতি লাভ করেছেন, তাকে তিনি চিরদিনই জীবনের পরম সম্পদ বলে গণ্য করেছেন।

আমরা বলেছি, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ দীনেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূল উৎস ছিল। দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'বৃহৎ বঙ্গ' রচনার মূল প্রেরণাও এখানে। এই বৃহৎ গ্রন্থ (১২১৫ পৃষ্ঠা) দীর্ঘ দশ বারো বৎসরের পরিশ্রমের ফল। বাঙালীর ধ্যান ও ধারণা, তার সাধনা ও সংকল্পের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় স্থাপন করাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই কখনো কখনো তাঁর বিচারে বিভ্রান্তি ঘটলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে 'আপন ঘরে আহ্বান করেছিলেন'।

যেমন গ্রন্থরচনায়, তেমন অধ্যয়নেও দীনেশচন্দ্রের ক্লান্তি ছিল না। বাল্যকালে পিতৃদেবের মুখে শুনেতাম—দীনেশচন্দ্র কোনো বিষয়ে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে সেই সম্পর্কে যাবতীয় পুস্তক গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করেন, কোনো উপকরণকেই তুচ্ছ করেন না।

১৯১৬ কি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র ঢাকা নগরীতে পূর্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষ্যে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা নগরীতে এসেছিলেন। এই সঙ্গে আরও মনীষীর সমাগম হয়েছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ও সেকালের বিখ্যাত সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও এই উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। মনে আছে, সভাপতির ভাষণে দীনেশচন্দ্র আবেগকম্পিত কণ্ঠে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির ওপর বৌদ্ধ প্রভাবের কথা এবং ঢাকার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ 'সাভার' গ্রাম ও তাঁর জন্মভূমি সুয়াপুর গ্রামের ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা করেছিলেন। * পরবর্তী জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেটি ঢাকা হলের মুখপত্র 'শতদল' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। সেই ভাষণের প্রারম্ভে তিনি বাঙালী-চরিত্রের ওপর বাংলার সর্প-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানীর প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছিলেন। দীনেশবাবুর ভাষণ শুনে সেদিন হয়তো অনেকেরই মনে পড়েছিল কবি সত্যেন্দ্রনাথের কথা—

'বাঘেরে সনেতে যুদ্ধ করিয়া
আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই
নাগেরি মাথায় নাচি'।

সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন—যে উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনিস্পন্দ মধুসূদন এনেছিলেন বাংলা কাব্যে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাই এনেছিলেন বাংলা গদ্যে। কথাটা বিতর্কমূলক, কিন্তু নিরপেক্ষ, শ্রদ্ধাবান ও বহুশ্রুত সমালোচকের কাছে একেবারে উপেক্ষনীয় নয়।

আজ দীনেশচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা সেই অমেয়াত্মা পুরুষের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আজকের এই পরস্বগ্রাহিতা ও পুচ্ছগ্রাহিতার যুগে কেউ হয়তো বলবেন—দীনেশচন্দ্র ছিলেন একজন escapist অর্থাৎ তিনি পলায়নী মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করেছিলেন, কেউ বলবেন—দীনেশচন্দ্র ছিলেন re-actionary বা প্রতিক্রিয়াশীল; এই সব অশোভন উক্তি দিব্যধামবাসী দীনেশচন্দ্রের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না। আজ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা অনেক নতুন তথ্য অবগত হয়েছি কিন্তু সেজন্যে আমরা যেন গর্বে অন্ধ হয়ে পূর্বসূরিদের গৌরবকে অস্বীকার না করি। সর্বোপরি, এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ এবং বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি যে অপরিসীম মমত্ববোধ নিয়ে দীনেশচন্দ্র সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, আজকের এই আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে তা আমাদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় * বলতে ইচ্ছা হয়—

'Dineshchandra! Thou shoulst be
living at this hour.
Bengal hath need of thee.'

* বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৩

* বিশদ বিবরণ তদানীন্তন কালের পূর্ববঙ্গ সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'প্রতিভার' দ্রষ্টব্য।

* Wordsworth on Milton.

সংক্ষিপ্ত জীবন

১৭ কার্তিক ১৭৮৮ শক জন্ম।
৩ নভেম্বর ১৮৬৬ খৃঃ। ঢাকা জেলার বগজুড়ী গ্রাম।

১৮৭৮ খৃঃ বারো বৎসর বয়সে বিবাহ। স্ত্রীর নাম বিনোদিনী।

১৮৭৯ খৃঃ মানিকগঞ্জ স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেন।

১৮৮২ খৃঃ তৃতীয় বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন ঢাকা জেলার জগন্নাথ স্কুল থেকে।

১৮৮৫ খৃঃ তৃতীয় বিভাগে এফ, এ পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে।

১৮৮৬ খৃঃ ৩০ আগস্ট, পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের মৃত্যু।

১৮৮৭ খৃঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী, মাতার মৃত্যু।

১৮৮৭ খৃঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী, মাতার মৃত্যু। সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন চল্লিশ টাকা বেতনে।

১৮৮৯ খৃঃ ইংরেজি অনার্স সহ বি এ পাশ করেন। পরীক্ষা পাশ করেই কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশনে পঞ্চাশ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। শম্ভুনাথ স্কুল কিছুকাল বাদে ত্যাগ করে ভিক্টোরিয়া স্কুলে যোগ দেন। কুমিল্লার আসবার পর সাহিত্যসাধনা শুরু। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে পুঁথি সংগ্রহ করতেন। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে:

১৮৯৬ খৃঃ নভেম্বর মাসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। কলকাতায় প্লেগ আরম্ভ হলে সকলে ভয়ে সহর ত্যাগ করতে থাকে।

১৮৯৮ খৃঃ বৎসরের শেষ দিকে ফরিদপুরে যান এবং ভগিনীপতির আশ্রয়ে ওঠেন।

১৮৯৯ খৃঃ গ্রীয়ারসনের চেষ্টায় মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি পান।

১৯০০ খৃঃ কলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯০১ খৃঃ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৯০৯ খৃঃ ১৯১৩ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হন।

১৯১৩ খৃঃ—৩২ খৃঃ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হন।

১৯২১ খৃঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি পান। এবং সরকার থেকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি পান।

১৯২৯ খৃঃ ৩০ মার্চ ৩১ মার্চ হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে মূল সভাপতি।

১৯৩১ খৃঃ জগত্তারিণী পদক লাভ।

১৯৩৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাঁচীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি ও সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৩৯ খৃঃ ২০ নভেম্বর দীনেশচন্দ্র বেহালায় মারা যান।

দীনেশচন্দ্র রচিত গ্রন্থাবলী

১। কুমার ভূপেন্দ্রসিংহ, কাব্যগ্রন্থ: ১০ এপ্রিল ১৮৯০ খৃঃ। ২। রেখা; প্রবন্ধগ্রন্থ: ২০ জানুয়ারী ১৮৯৫ খৃঃ। ৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম ভাগ: ২ ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ। ৪। তিন বন্ধু; উপন্যাস, ১৫ জুলাই ১৯০৪ খৃঃ। ৫। রামায়ণী কথা: ১৬ জুলাই ১৯০৪ খৃঃ। ৬। বেহুলা; পৌরাণিক কাহিনী: ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০৭ খৃঃ। ৭। সতী: পৌরাণিক কাহিনী: ২ মার্চ ১৯০৭ খৃঃ। ৮। ফুল্লরা; পৌরাণিক আখ্যায়িকা: ৯ মার্চ ১৯০৭ খৃঃ। ৯। জড়ভরত; পৌরাণিক আখ্যায়িকা: ১ মে ১৯০৮ খৃঃ। ১০। সুকথা; সন্দর্ভসংগ্রহ, ১ আগস্ট ১৯১২ খৃঃ। ১১। ধরা-দ্রোণ ও কুশধ্বজ: পৌরাণিক উপাখ্যান: ১০ আগস্ট ১৯১৩ খৃঃ। ১২। গৃহশ্রী; ৩ মার্চ

১৯১৬। ১৩। সম্রাট ও সম্রাট-মহিষীর ভারত-পরিদর্শন; ২২ এপ্রিল ১৯১৮। ১৪। নীল মাণিক; পল্লীচিত্র; ২০ আগস্ট ১৯১৮। ১৫। সখীর ভোগ; শিশুপাঠ্য গল্প; ১০ মার্চ ১৯২০ খৃঃ। ১৬। মুক্তা চুরি; পৌরাণিক আখ্যায়িকা; ১৪ এপ্রিল ১৯২০ খৃঃ। ১৭। রাখালের রাজগি; পৌরাণিক আখ্যায়িকা; ২০ মে ১৯২০ খৃঃ। ১৮। রাগরঙ্গ; পৌরাণিক আখ্যায়িকা; ২৪ মে ১৯২০ খৃঃ। ১৯। গায়ে হলুদ; ১৯২০ খৃঃ। ২০। বৈশাখী; শিশুপাঠ্য গল্প; অগ্রহায়ণ ১৩২৭। ২১। সুবল সখার কাণ্ড; বৈষ্ণবোপাখ্যান; ১০ জুন ১৯২২ খৃঃ। ২২। সরল বাঙ্গালা সাহিত্য; ইঃ ১৯২২ খৃঃ। ২৩। ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য; ২৫ জুলাই ১৯২২ খৃঃ। ২৪। বৈদিক ভারত; ইং ১৯২২ খৃঃ। ২৫। ভয়-ভাবনা; গল্প; ১৯২৩ খৃঃ। ২৬। দেশমঙ্গল; গল্প; ৬ ডিসেম্বর ১৯২৪ খৃঃ, ২৭। আলোকে-আঁধারে; উপন্যাস; ২৬ আগস্ট ১৯২৫। ২৮। কানু পরিবার ও শ্যামলী খোঁজা; পৌরাণিক আখ্যায়িকা; ১০ ডিসেম্বর ১৯২৫ খৃঃ। ২৯। চাকুরীর বিড়ম্বনা; উপন্যাস; ১২ জানুয়ারী ১৯২৬ খৃঃ। ৩০। পতিমন্দির; গল্প; ১৯২৬ খৃঃ। ৩১। ওপারের আলো; উপন্যাস; ১৯২৭ খৃঃ। ৩২। মানুদের শিব-মন্দির; উপন্যাস; ২০ অক্টোবর ১৯২৮ খৃঃ। ৩৩। পৌরাণিকী; আগস্ট ১৯৩৪ খৃঃ। ৩৪। বৃহৎ বঙ্গ; প্রথম খণ্ড; ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ খৃঃ। দ্বিতীয় খণ্ড; ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ খৃঃ। ৩৫। আশুতোষ-স্মৃতিকথা; ১৯৩৬ খৃঃ। ৩৬। পদাবলী-মাধুর্য; সন্দর্ভ; ১৯৩৭ খৃঃ। ৩৭। শ্যামল ও কজ্জল; ঐতিহাসিক উপন্যাস; ১৯৩৮ খৃঃ। ৩৮। পুরাতনী; মসুলিম-নারীচিত্র; ৯ জুলাই ১৯৩৯ খৃঃ। ৩৯। বাংলার পুর-নারী; ডিসেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ। ৪০। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান; অক্টোবর ১৯৪০ খৃঃ। ৪১।

History of Bengali language and Literature, 1911. 42. Sati; 10 October, 1916. 43. The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, 1917. 44. Chaitanya and his companions, 1917. 45. The Folk-Literature of Bengal, 1920. 46. The Bengali Ramayans, 1920. 47. Bengali Prose Style, 1800-1857, 1921. 48. Chaitanya and His Age, 7th October, 1922. 49. Eastern Bengal Ballads Mymensing. Vol. I, 1923 : Vol. II 1926. Vol III 1928; Vol IV 1932 50 Glimpses of Bengal Life, 15th August 1925.

।। সম্পাদিত গ্রন্থ ।।

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ও দীনেশ-চন্দ্র সেন সম্পাদিত **ছুটীখানের** মহাভারত; ১৯০৫ খৃঃ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশ-চন্দ্র সেন সম্পাদিত মানিক গাঙ্গুলির **শ্রীধর্মমঙ্গল**; ১৯০৫ খৃঃ। ১৯১২ খৃঃ ১৬ সেপ্টেম্বর দীনেশচন্দ্রের সম্পাদিত **কাশীদাসী মহাভারত** প্রকাশিত হয়। তাঁর **সম্পাদিত কৃত্তিবাসী** রামায়ণ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খৃঃ। দীনেশচন্দ্রের একটি অসাধারণ কীর্তি প্রাচীনকাল থেকে **উনবিংশ শতাব্দীর** মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের **সঙ্কলন 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়'**-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৪ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ খৃঃ দীনেশচন্দ্র সম্পাদনা করেন **কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী**।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ থেকে যে **গোপীচন্দ্রের গান** সংগ্রহ করেন দীনেশচন্দ্র ও বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় তার দুটি খণ্ড ১৯২২ খৃঃ ও ১৯২৪ খৃঃ-এ প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসুর সম্পাদনায় **কবিকঙ্কন চণ্ডীর** দুটি খণ্ড ১৯২৪ খৃঃ ও ১৯২৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র ও বনোয়ারীলাল গোস্বামী **গোবিন্দদাসের কড়চা** সম্পাদনা করেন ১৫ আগস্ট ১৯২৬। দীনেশচন্দ্র ও বসন্তরঞ্জন রায় লালা জয়-নারায়ণ সেনের **হরিলীলা** সম্পাদনা করেন ১ মার্চ ১৯২৮ খৃঃ। দীনেশচন্দ্র ও খগেন্দ্র-নাথ মিত্র ১৯৩০ খৃঃ **বৈষ্ণব পদাবলীর** একটি সঙ্কলন সম্পাদনা করেন। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত এবং দীনেশচন্দ্র সঙ্কলিত ও সম্পাদিত **ময়মনসিংহ গীতিকা (পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা)** ১৯২৩ খৃঃ থেকে ১৯৩২ খৃঃ মধ্যে প্রকাশিত হয়।

স্বগতোক্তি

অদ্য ছয় বৎসর গত হইল একদিন আমার পুস্তকাধারস্থিত অতি জীর্ণ গলিত-পত্র, প্রেমাশ্রুর নীরব নিকেতন চণ্ডীদাসের কবিতাখানা পড়িতে-পড়িতে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একখানা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা জন্মে; ভিক্টোরিয়া স্কুলের সেই সময়ের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সাগ্রহ প্রবর্তনায় এই ইচ্ছা সুদৃঢ় হয়। বৈষ্ণব-কবিগণের গীতি, কবিকঙ্কনের চণ্ডীকাব্য, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান ও অপর কয়েক-খানা বটতলার ছাপা পুঁথিমাত্র আমার সম্বল ছিল, আমি তাহা পড়িতাম ও কিছু-কিছু নোট সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলি-কাতার পিস এসোসিয়েশন হইতে বঙ্গ-ভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে "বিদ্যাসাগর পদক" অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এই সুযোগ পাইয়া তিন মাস কাল মধ্যে আমি সংক্ষেপে বঙ্গভাষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখি, উক্ত সমিতি আমার প্রবন্ধটি মনো-নীত করিয়া "বিদ্যাসাগর-পদক" আমাকে প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধ রচনার সময় রতিদেব-কৃত 'মৃগলুব্ধের' একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি দৈবক্রমে আমার হস্তগত হয় এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হই যে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পল্লীতে পল্লীতে অনেক অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি আছে; এই সংবাদ পাইয়া নিজে নানা স্থান পর্যটন করিয়া সঞ্জয়কৃত মহাভারত, গোপীনাথ দত্তের দ্রোণপর্ব, রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলা, দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদচরিত, রাজারাম দত্তের দণ্ডীপর্ব, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মহাভারতোক্ত উপাখ্যান প্রভৃতি বিবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ করি। তখন বঙ্গভাষার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প মনে স্থির হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় হইতে সুদূরে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যেসব প্রাচীন পুঁথি কীটগণের করাল দংষ্ট্রাবিদ্ধ হইয়া কথঞ্চিৎ প্রাণরক্ষা করিতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কীট কর্তৃক বিনষ্ট হওয়া ব্যতীত প্রতি বৎসরকাল তাহাদিগকে বহ্নিযজ্ঞে আহুতি দিতেছেন—যাহা এখনও আছে, তাহা কিরূপে রক্ষা হয়? আমি এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে একদিন এশিয়াটিক সোসাইটির খ্যাতনামা মেম্বর ডাক্তার হোরন-লি সাহেবের নিকট সমস্ত অবস্থা জানাইয়া এক পত্র লিখি। তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য অঙ্গীকার করেন; এই সূত্রে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহা-শয়ের সঙ্গে আমার পত্র দ্বারা পরিচয় হয়; তিনি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধার করিতে ইতিপূর্বেই উদ্যোগী ছিলেন—আমার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপদেশানুসারে এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীমান বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ আমার সহায়তার জন্য কুমিল্লায় আগমন করেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া পরাগলী (কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত) মহাভারত, ছুটি খাঁর (শ্রীকর নন্দীর রচিত) অশ্বমেধ-পর্ব প্রভৃতি আরও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। বিনোদবাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া কতক-দিন কাজ করিয়া চলিয়া যাইতেন; কিন্তু আমি বৎসর ভরিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানা জেলা হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি, মধ্যে মধ্যে আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেন ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সঙ্গে মফঃস্বলে ক্যাম্পে বাস করিয়া ক্রমাগত পর্যটন করিয়াছি। এই সময়ে কবি আলোয়ালকৃত পদ্মাবতী, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালকৃত কাশীখণ্ড, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, মধুসূদন নাপিত প্রণীত নলদময়ন্তী, গ্রন্থ আমাকর্তৃক সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত পুস্তকের কয়েকখানা ও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অপরাপর কোন কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩০১—১৩০২) মল্লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে হস্তলিখিত পুঁথি খোঁজ করা অতি দুরূহ ব্যাপার—বিশেষত প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ঘরে রক্ষিত, আমাদের সাগ্রহ যুক্তি-তর্ক ও বুদ্ধির কৌশল অনেক সময়েই তাহাদের কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহারা কোনক্রমেই পুস্তক দেখাইতে সম্মত হয় নাই, দৈবাৎ পুস্তক ধরা পড়িলে কেহ কেহ ট্যাক্সের ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দিন ১০ মাইল পদব্রজে গমন ও সেই ১০ মাইল পুনঃপ্রত্যাবর্তন কেবল গমনাগমন সার হইয়াছে।......

—দীনেশচন্দ্র সেন

অন্ধকার ও শ্বেতবিন্দু

দিব্যেন্দু ঘোষ

অনেক দূরে লাল আলো নিভে গিয়ে সবুজ আলো জ্বলে ওঠার অল্প পরেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। প্রথমে প্রায় নিঃশব্দ মন্থর গতি। জানলায় হাত রেখে, পরে হাত সরিয়ে নিয়ে অথচ জানলার প্রায় সমান্তরালে থেকে নিত্যানন্দ ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের প্রত্যন্ত পর্যন্ত এগোল। পায়ের সামনে কলার খোসা ইত্যাদি আছে কিনা দেখল না। চোখ আটকে রইল একটা জানলায়। সেই জানলায় নিত্যানন্দর তিন বছরের মেয়ে আর বউয়ের মুখ। মেয়ে হাত নাড়ছিল। দূর থেকে মনে হল, পুতুলের হাতের মতো। ট্রেনটা একটু মোড় নিল হয়ত, জানলার মুখ আর পুতুলের হাত দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তখনো নিত্যানন্দর পা থামে নি। পেছনে খানিক দূরে অন্য যাত্রীদের আত্মীয়বন্ধুরা, সামনে ট্রেনটা গরবিনীর মতো কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে চলে যাচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্মের প্রত্যন্তে এসে নিত্যানন্দ বুঝতে পারল, এত বড় স্টেশনের গর্জন কোলাহল সব ফাঁকি দিয়ে ঠিক এই জায়গাটায় আশ্চর্য একটু নির্জনতা চোরের মত লুকিয়ে ছিল। একবার যেন দেখতে পেল, শূন্যে রাত দশটার পরের অন্ধকারে দুটো মুখ তখনো ঝুলছে। অবশ্য মাত্র একবারই অস্পষ্ট দেখতে পেল। তখনই অন্য একটা ট্রেন পাশের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। নিত্যানন্দ ফিরল। উজ্জ্বল আলো, প্রায় খালি প্ল্যাটফর্ম, গোল ঘড়ির রাত দশটা দশ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এদিক ওদিক অন্য যাত্রীদের উৎকণ্ঠিত পা ফেলায় দৌড়ের ভঙ্গী এসে যাচ্ছে। তাদের সবার হাতে কিছু না কিছু ভার। নিত্যানন্দর খালি হাত, হাঁটার ধরন অন্যরকম, চোখে সব একটু নতুন নতুন লাগছিল। পারিপার্শ্বিকের এই পরিচিত দৃশ্যাবলী কত দিন যেন দেখে না। নিত্যানন্দর গূঢ় সংবাদটা কেউ জানতে পারেনি। আলো, হাওয়া, দ্রুত ধাবমান যাত্রী কেউ বুঝতে পারেনি। মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে নিত্যানন্দর বয়েস পাঁচ বছর কমে গেছে, সে যে প্রাকবিবাহের নির্ভার দিনরজনীতে ফিরে গেছে, কেউ জানে না। খবরটা এখনই ফাঁস হয়ে যাক নিত্যানন্দ চায় না। যেন সবার অলক্ষ্যে লালন করার মতো, একান্তে চেখে চেখে দেখার মতো। চুরি করা আচার চাটতে জিভে জল এসেছে।

দোতলা বাসের ভেতরটা অন্ধকার। ছাড়বার সময় হলে আলো জ্বলবে। নিত্যানন্দ পাঁচ বছর আগেকার হালকা পায়ে অন্ধকারে দোতলায় উঠে গেল।

হাওড়া ব্রীজ পার হবার সময় গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে ঝাপটা দিল। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে সস্নেহে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখল নিজে আঙুলগুলোকে। কতকাল যেন নিজের অঙ্গের দিকে তাকায় না। নিজের মুখটা এখনই একবার দেখতে ইচ্ছে হল। আয়না না থাকলে দেখা যায় না।

ডান দিকে গঙ্গার তীর ঘেঁষে অনেক দূর পর্যন্ত আলোর অরণ্য, বিদেশী জাহাজের, বন্দরের। সব থেকে উঁচু বাড়িটার মাথার ওপরে লাল বাতি। বাস মোড় ঘুরলে রাস্তা আর পেভমেন্টের মধ্যবর্তী খুঁজে নোংরা জল, শালপাতা, তখনো-খোলা মিষ্টি ইত্যাদির দোকানে গদিয়ান অবাঙালীর মেদ। এসবই এই শহরের প্রাত্যহিকতার কণ্ঠহার। প্রতিদিন দেখে দেখে তার শোভা চোখে সয়ে গেছে। তথাপি আজ এখন সবারই থ্যাবড়া নাকে যেন একটি করে নতুন নোলক। চেহারাই বদলে গেছে। নিত্যানন্দ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বেশ আয়েশ করে ছেড়ে দিল। কোন বুঝতে-না-পারা দুঃখটুঃখ থেকে উৎসারিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস বলে সন্দেহ হল না।

নিজের দুঘরের ফ্ল্যাটের দরজার কড়ায় হাত রাখল, তখন এগারটা।

মানিকের মা দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে দিয়ে আবার গিয়ে বসল রান্নাঘরের দরজায়। অনেকক্ষণ থেকে নিশ্চয়ই ওখানেই বসে আছে। ধোপার কাপড়ের গাঁটরির মতো। মানিকের মা মুখ খুলল না, চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। ওই কাপড়ের বোঁচকা রান্না করবে, নিত্যানন্দকে সময়মত খেতে দেবে, ঘর দোর সামলাবে। বুড়ি অবশ্য বছর পাঁচেক ধরে এসব করছে।

মানিকের মার মনে হয়ত কষ্ট। নিত্যানন্দর তিন বছরের মেয়েটা সারাদিন ওকে জ্বালাত। এখন খালি বাড়িতে ওর খারাপ লাগা হয়ত সঙ্গত।

বসার ঘরের দিকে পেছনে ফিরে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে এসব ভাবছিল নিত্যা-

নন্দ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে খুলতে বেশ অসুবিধে হয়।

শোবার ঘর অন্ধকার ছিল। বারান্দায় জুতো খুলে রেখে ঘরে ঢুকে অভ্যস্ত হাতে টুপ করে আলোটা জেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আগোছালো ঘর আকস্মিক আলোর আঘাতে যেন হাহা করে উঠল। একটু সময় ধরে দেয়াল থেকে দেয়ালে আছড়াতে লাগল সেই চিৎকার। বিছানার চাদরটা কুঁচকে আছে। ওর ওপর স্যুটকেশ রেখে শাড়ি জামা ও অন্যান্য জিনিস গুছোন হয়েছিল সন্ধ্যের পরে। মেঝেয় হোল্ডঅল পেতে বিছানা বাঁধা হয়েছিল। খবরের কাগজে জড়িয়ে বউয়ের স্লিপার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে। এখন মেঝেয় ছেঁড়া কাগজের টুকরো। আলনায় মেয়ের ময়লা জামা, বউয়ের একখানা শাড়ির প্রান্ত হাওয়ায় নড়ছে। দেয়ালে মেয়ের একখানা বিরাট ফোটোগ্রাফ, ফ্রেমের মধ্যে পুরীর সমুদ্রতীরে বসে হাতে ভিজে বালি মেখে হাসছে পেছনে সফেন তরঙ্গমালা। রেডিওসেটের ওপরে স্ট্যান্ডে বউয়ের ফোটো, ঠোঁটে চাপা হাসি। দুপা এগিয়ে নিত্যানন্দ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ বড় ম্রিয়মাণ দেখল। আয়নার দিকে একটু এগোতে পা বড় ভারী মনে হল। খানিক আগের হাওয়ায় উড়ে যাবার মতো নির্ভার মেজাজের দুটো ডানাই এই ঘরে এসে খসে পড়ে গেছে।

মেয়েটা খুব রোগা। মেয়েকে নিয়ে বউ সিংভূমে খনি এলাকায় পাহাড়ের চূড়োর মামাশ্বশুরের কোয়ার্টারে গেল। মেয়ের শরীর ভাল করার আশায় দুমাস থাকবে। পুজোর ছুটির শুরুতে ওদের আনতে যাবে নিত্যানন্দ। এই ঘরে একা নিত্যানন্দর দুমাস থাকবার কথা!

আয়না থেকে সরে দাঁড়িয়ে চার দেয়ালে, বিছানায়, মেঝেয়, আসবাবে আবার চোখ বুলিয়ে, কামড় খাওয়া জন্তুর মতো দাপিয়ে ঘরের বাইরে এল। বারান্দার আলোটা তত উজ্জ্বল নয়। রান্নাঘরের দরজায় মানিকের মা তেমনই বসে।

'একটু চা করবে, মানিকের মা?'

এবার মানিকের মা চোখ তুলে তাকাল। চোখে লেখা ছিল, রাত এগারটা বেজে গেছে।

লেখাটা পড়ে নিত্যানন্দ চট করে সামলে নিল।

'না, না, থাক এত রাত্তিরে আবার চা কিসের!'

বিছানায় যেতে বারটা। রেলস্টেশন থেকে ফিরে যেমন জেলেছিল, এখন তেমনি টুপ করে আলোটা নিভিয়ে দিতেই অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। শিকারী জানোয়ারের মতো লাফিয়ে পড়ল অন্ধকার। অবশ্য একটু পরে কিছু স্বচ্ছ হয়ে এল। চোখে আর ভার-ভার লাগছিল না। খাটের ঠিক ওপরেই পাখাটা প্রায় নিঃশব্দে ঘুরছিল। একটা জীবন্ত বৃত্তের অস্পষ্ট আদল পাওয়া যাচ্ছিল এক-একবার।

এ-ঘরটা বসবার ঘরের মতো নয়। অনেক বড়। খাট থেকে বেশ দূরে উত্তরের জানলার কাছে মানিকের মা মেঝেয় শয্যা পাতছে। তার পাখার হাওয়া সহ্য হয় না। মানিকের মার বারান্দায় না শুয়ে এঘরে শোবার ব্যবস্থা বুড়িকে বলে বউই করে গেছে। কারণ রাত্তিরে একা ঘরে নিত্যানন্দর ঘুম হয় না। ভূতের ভয় নয়। সত্যি, ভূতের ভয় নয় অন্য কিছু। কিসের যে ভয় নিত্যানন্দর জানা নেই। বস্তুত ভয়ই না, অন্য কোন বিচিত্র অনুভব। কোন কাজ নিয়ে অথবা সারারাত মগ্ন থাকবার মতো কোন বইয়ে চোখ রেখে একা ঘরে জেগে কাটাতে মোটেই অস্বস্তি নেই। শুধু চোখ বুজতে পারে না। চোখ বুজতে হলে এক থেকে একশ বছরের কেউ থাকা চাই সেই ঘরে। নিত্যানন্দর বিশ্বাস, ঘর থেকে বাইরে গিয়ে বিপুল শূন্য প্রান্তরে সারারাত একা দাঁড়িয়ে থাকতে তার কোন অস্বস্তি হবে না।

বিয়ের আগে মামাবাড়িতে ছোট হলেও নিজস্ব একখানা ঘর ছিল। বছরের পর বছর একাই তো সেই ঘরে ঘুমিয়েছে। কখনো কোন অস্বস্তি হয়নি এমন অবশ্য বলা যায় না। যেমন, এক রাত্তিরের মাঝামাঝি রাস্তার একটা কুকুর হঠাৎ কঁকিয়ে ওঠায় নিত্যানন্দর ঘুম ভেঙে গেল। দোতলার সেই ঘরের দেয়ালে রাত্তিরে রাস্তার একটা গাছের ছায়া পড়ত, কারণ রাস্তার ঠিক ওপারেই একটা জোরাল আলো ছিল। মাঝরাত্তিরে আচমকা ঘুম ভেঙে চোখ এবং কান দুই ইন্দ্রিয় একসঙ্গে আহত হল। কুকুরটার কঁকানি কানে এল এবং দেখল সামনের দেয়ালটা নাচছে। আসলে সেই রাত্তিরে মৃদু হাওয়া ছিল, গাছের পাতাগুলো সামান্য কাঁপছিল, কিন্তু সেই পাতার ছায়া অনেক বড় হয়ে নৃত্যভঙ্গিমায় দুলছিল দেয়ালে। চোখ খুলেই যে অস্বস্তি শরীর-মনে সঞ্চারিত হল তাকে নিত্যানন্দ আতঙ্ক বলতে নারাজ।

নিত্যানন্দর পা থেকে অনেক দূরে উত্তরের জানলার কাছেও হয়ত পাখার হাওয়া যায়। মানিকের মা সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। পাতলা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যায়। নড়ছে না, সাড়াশব্দ নেই, ঘুমিয়েছে। মানিকের মার বড় ছেলেকে বরিশালে দাঙ্গার সময় তার সামনেই কেটেছিল। ছোট ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে এসে জমিয়ে বসেছিল শেয়ালদা স্টেশনে। সেই দুরন্ত ছেলেটা ট্রেনে কাটা পড়ল। প্রথম প্রথম নিত্যানন্দ মাঝরাত্তিরে উঠলে শুনেছে, বসার ঘরে শুয়ে মানিকের মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এখন কেমন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল! সময় তাজ্জব যাদু জানে।

নিত্যানন্দর ঘুমটুম আসবে না, বুঝতে পারছিল। মস্ত খাটটার মাঝখানে শুয়েছে। দুপাশে টানটান করে হাত ছড়িয়ে দিল, কারো গায়ে লাগছে না। দুপাশে বিছানা একটু বসে গেছে, আরো দুজনের শোবার জায়গা। হাত-পা যেমনা খুশি ছড়ান যায়, কারো গায়ে লাগবার আশঙ্কা নেই। পুরো বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে এমন আরাম করার সুবিধে অন্য সময় পায় না। তবে চাদরটা কুঁচকে যাচ্ছিল।

তিন বছর আগে রাত নটা নাগাদ নার্সিং হোমের দোতলার ওয়েটিং রুমে বসেছিল। যে ঘরে বউ সেখানে শুধু ডাক্তার আর নার্স। কী ঘটছে দেখবার অনুমতি নেই। একটি নার্স বড় একটা ট্রেতে ধূমায়িত জলে ডুবিয়ে অনেকগুলো ছুরি-কাঁচি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে করিডর দিয়ে সেই ঘরে চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ থেমে থেমে শুধু এক-একটি কঠিন ধাতব শব্দ। অস্ত্রগুলো যেন ব্যবহারের পর একটি একটি করে কোন পাত্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। নিশ্চয়ই সিজারিয়ান নয়। তাহলে তো নিত্যানন্দর অনুমতি চাই। তবে? সেই রোগা লম্বা নার্সটিই একটা সরু অকসিজেন সিলিন্ডার কোলে করে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল। নিত্যানন্দ অকসিজেন সিলিন্ডারের দিকে তাকিয়েছিল, অথচ দেখছিল কোঁচকান বিছানার চাদর। নার্সটি করিডর দিয়ে চলে গেলে ভাবছিল, আগে ছাল ওলট-পালট ঘরে কি একা ফিরে যাওয়া যায়।

আরো খানিক এপাশ-ওপাশ করে বিছানায় উঠে বসল মানিকের মায় কায়দায়। বাড়ি থেকেই বেরিয়ে যাবার বাসনা হচ্ছিল। বেরিয়ে গিয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে, যেখানে একটা ডুমুর গাছ, যার বড়-বড় পাতা থেকে বৃষ্টি থেমে যাবার অনেক পরেও টপটপ করে জল পড়ে। ওপারের মিল-কারখানার আলোর প্রতিবিম্ব জলে।

আবার বালিশে মাথা রাখতে হল। একবার ডাক্তার দত্তর ঘরে খুব নিচু ঢেউয়ের মতো একটা নরম চেয়ারে এমন করে কয়েক-ঘণ্টা শুয়েছিল। পাশেই ডাক্তার অন্য চেয়ারে বসেছিলেন। মৃদু নীল আলো জ্বলছিল ঘরে।

বিয়ের ঠিক চারদিন পরে তাঁর কাছে গিয়েছিল। নিত্যানন্দকে দেখেই ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, 'কী-হে, বিয়ে করলে, নেমন্তন্ন করলে না!'

সেদিনও নিত্যানন্দ বড় ম্রিয়মাণ ছিল। যেন প্রচুর ক্লান্তি নিয়ে একটা চেয়ারে বসে বলল, 'তেমন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার তো কিছু হয়নি। মামাবাড়ি রয়েছি, সেখানে জায়গাও খুব কম। বাড়ি পেলে আপনাদের সবাইকে একদিন নেমন্তন্ন করব।'

'তা অমন দুঃখী-দুঃখী ভাব করছ কেন হে? এখন তো দু-পাঁচদিন শুধু নৃত্য করার কথা!'

নিত্যানন্দ প্রায় ভয়ার্ত চোখে আশপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিল। 'বিয়ে করে আমি ভীষণ ভুল করেছি, ডাক্তারবাবু। এসব আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমাকে কিছু হিপনটিক সাজেশন দিন।'

'হয়েছে কী তোমার!' ডাক্তারের একটা ভুরু অন্যটা থেকে ওপরে উঠে গেল।

'কড়া সেন্ট, ফুল, নতুন শাড়ি এসবের ভয়ঙ্কর তীব্র মিশ্র গন্ধ আমার অসহ্য

লাগছে। আমার ঘর একটা মহিলা দখল করে নিয়েছে। আমি কোথায় যাব?'

অনেকক্ষণ ধরে শুধু ডাক্তারের হাঃ-হাঃ হাসির শব্দ। থামতে চায় না। স্বরচিত নাটকের মূল চরিত্রে নেমে ডাক্তার এইরকম হাসেন। নাটকের নেশা তাঁর। নিত্যানন্দ তাঁর নাটকে দলের অন্যতম সদস্য।

নিত্যানন্দ আবার বলল, 'আমাকে কিছু হিপনোটিক সাজেশন দিন।'

'চা খাবে?'

'আমার গলা দিয়ে কিছু নামছে না।'

'ঘুম হচ্ছে?'

'না।'

ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এস।'

পাশের সেই ঘরটায় চলে এল। খুব নীচু ঢেউয়ের মতো একটা নরম চেয়ারে নিত্যানন্দকে শুয়ে পড়তে হল। ডাক্তার মৃদু নীল আলো জেলে দিলেন। পাশেই একটা চেয়ারে, খানিক চুপচাপ বসে থেকে বললেন, 'বলে যাও।'

'কী বলব?'

'তোমার বউয়ের কথা বল। বিয়ের আগে ঘুরে ফিরে বেড়াতে তো মেয়েটির সঙ্গে। সেই সবই না হয় বল।'

দু-মিনিট চোখ বুজে থেকে নিত্যানন্দ মুখ খুলল।

'একদিন বিকেলে একটা খুব পুরোন, প্রায় পরিত্যক্ত পার্কে বেড়াচ্ছিলাম। সেই পার্কে অনেকগুলো প্রাচীন গাছ ছিল। হঠাৎ ঝড় এল, তার সঙ্গে বৃষ্টি। ডালপালা দাপাচ্ছিল। কেমন অন্ধকার হয়ে গেল। শীত-কাল নয়, তবু ঠান্ডা ঝড়ো-হাওয়ায় ও কাঁপছিল হিহি করে। ও তখন ভীষণ রোগা ছিল, আর অদ্ভুত ফর্সা। তাড়াতাড়ি পার্কের বাইরে এলাম। সামনের রাস্তার মোড়ে সিগারেটের দোকানে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে অল্প একটু জায়গায় আরো লোক ছিল। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য এসেছিল সবাই। লক্ষ্য করলাম, তারা ওকে দেখছে, ওর কাঁপুনি দেখছে। ওর কাঁপুনি ঢাকবার সাধ্য ছিল না। দূরে একটা ট্যাক্সি দেখে ওর বরফের মতো হাত জোরে চেপে ধরে দৌড় দিলাম।'

'পদ্য লেখ নাকি?'

'এককালে লিখতাম।'

'বলে যাও।'

'একটা মস্ত মাঠ। হেঁটে হেঁটে কাহিল হয়ে সন্ধ্যায় সেখানে এসে বসছি। ভিড় ছিল না। খানিক দূরে দূরে আরও কেউ কেউ কেউ বসেছিল। গাছ নেই, পুকুর নেই, ফুলবাগান নেই। গরু ছিল বেশ কয়েকটা। ছেলেরা বিকেলে বলটল খেলে, তবু ঘাস ছিল। ওই সময় গরুদের বন্ধু মনে হত, কাছে এলে অস্বস্তি লাগত না, কারণ গরুরা ছেলেদের মতো আওয়াজ দিত না। বসে আছি, বৃষ্টি নামল, বেশ জোর বৃষ্টি। অন্য সবাই দৌড়ে পালাল। আমরা উঠলাম না। বসে বসে ভিজলাম। বৃষ্টি থামলে দেখলাম, বিরাট শূন্য সবুজ মাঠ, আকাশে অজস্র উজ্জ্বল তারা। বৃষ্টির পর বাতাসের ধার বাড়ল, তবু লক্ষ্য করলাম ওর কাঁপুনি ধরেনি। ও বরং প্রতি কথায় হাসছিল। শূন্য মাঠে, তারার আকাশে তাকিয়ে মনে হল, আমরা, শুধু আমরাই। দশটা নাগাদ আমাদের জামা-কাপড় প্রায় শুকিয়ে গেল। ওকে ওদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম, তখনো ঠিক ছিলাম। একা হতেই আমার হাঁটার ধরন বদলে গেল। রাস্তার লোকগুলো আমার দিকে তাকাচ্ছিল, আমাকে মাতাল ভাবছিল।

'অন্য একদিন সন্ধ্যের পর সাদার্ন এ্যাভিনিউ দিয়ে হাঁটছিলাম। বৃষ্টি নামল। একটা গাছের তলায় দাঁড়ালাম। কাছে অন্য কোন আশ্রয় ছিল না। বৃষ্টি বাড়তে লাগল। গাছের ডালপাতা ভেজার পর আমাদের ভেজাল। ওর শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেগে যাচ্ছিল। আমার গায়ে রেঅনের কোট ছিল। কিছুক্ষণ বর্ষাতির কাজ দিল। জলের স্রোত পিছলে যাচ্ছিল, তলার শার্ট ভিজতে সময় লাগল। আমি গাছটার গায়ে পিঠ দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলম। কয়েকটা গেছো পিঁপড়ে আমার ঘাড় কামড়ে দিল।'

'বৃষ্টি বৃষ্টি করে একেবারে ভাসিয়ে দিল যে হে!'

ত্যািনন্দ চোখ খুলল না। শুধু একটু থেমে ঋতু বদলাল।

'শীতকাল। ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে আসছি। আমার বারবার কলসির চা খাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে। একটা তেজী তরুণ দেবদারু গাছের পাতা-গুলো জোর হাওয়ায় পরস্পরের অঙ্গে ঢলে ঢলে পড়ছিল। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম : আমরা মরে যাব, তখনো ওই গাছটা ওখানে থাকবে। মরাটার কথায় ও আরো রেগে গেল। ঝগড়া করে দুজন দুদিকে চলে যেতে ইচ্ছে হল না। আবার ঘাসের ওপর বসলাম। এক সময় দেখি একটা লোক একটা বুড়ো গাছের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়াচ্ছে। আমি সেদিকে তাকাতেই মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল। উঠে পড়তে হল। উঠে পড়তে হল কারণ আমি ভীতু। সেকথা ওকে বললাম। বলতে চেয়েছিলাম, এখানে দুঃসাহস দেখান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আরো বলতে চেয়েছিলাম, রাস্তার ষাঁড়ের তো সাহস আছে, বীরত্ব আছে, কিন্তু তেমন বীরত্ব মানুষের পক্ষে শোভন নয়। ও কিছু শুনতেই চাইল না, নিজেও কিছু বলল না। অর্থাৎ ও আগে থেকেই জানত আমার বীরত্ব নেই। ও তখন প্রায় অবিরাম কাশছে। আমার জানা একটা ওষুধ কিনে দিতে চাইলাম, অনেকবার বললাম, কিছুতেই রাজী হল না। তখনো তো বিয়ে হয়নি!'

ডাক্তার কাশলেন। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওঠ হে নিত্যানন্দ। তোমার কিছু হয় নি।'

'কিছু হয় নি!' বাইরের দিকের ঘরটায় আসতে আসতে নিত্যানন্দ বলল।

'না। বেফাঁস তো কিছু বললে না। তুমি আর পাঁচটা মানুষের মতোই, নিত্যানন্দ।'

'কিছু হয়নি, তাহলে আমি সেন্ট, ফুল, নতুন শাড়ির গন্ধ সহ্য করতে পারছি না কেন? টকটকে রঙে আমার চোখ ঝলসে যাবার মতো হচ্ছে কেন?'

'তোমাকে আমি ওষুধ দিচ্ছি। নার্ভ-গুলো বড় টানটান হয়ে আছে। এই বড়ি-গুলো এক সপ্তাহ খাও তো। সব সময় একটু ঘুম ঘুম পাবে হে।'

ডাক্তার নিত্যানন্দকে খুশী করতে পারেন নি। মনে অনেক প্রশ্ন চেপে রেখে, ওষুধ নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গ আনলেন।

'আমি ভাবছি তোমাকে দিয়ে দ্বিজদাস হবে কিনা।'

'আমি আর অভিনয়ের মধ্যে নেই।' বলতে বলতে নিত্যানন্দ উঠে দাঁড়াল।

সকালে চা দিতে এসে মানিকের মা বলল, দাদাবাবুর কি রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নাই ?'

একটু শুধু ম্লান হাসল নিত্যানন্দ। দুমাস ধরে রাত্তিরগুলো এমন কাটবে না কি! চুনকরা চাটনিতে এত অজস্র পিঁপড়ে ছিল, কাউকে বিষ পিঁপড়ে, আগে দেখেনি।

ঘর ভর্তি জিনিসপত্তর। খালি মেঝে খুব কম। অথচ শূন্য প্ল্যাটফর্মে বসে আছে। সব ট্রেন চলে গেছে গরবিনীর মতো কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে।

এখনই উঠতে হবে। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে, খেয়ে বেরোতে হবে। কিন্তু এক গা ক্লান্তি। চোখে কেমন জ্বালা, খবরের কাগজের ছোটছোট অক্ষরগুলো থেকে থেকে লাফ মারছে। সকালের রোদ্দুরে সারা ঘরে খুবী আশ্চর্য দীনতা ছড়িয়েছে! এ-ঘর তার নিজের কিনা সন্দেহ হয়। এ-ঘরে থাকার অধিকার আছে কিনা সন্দেহ। পাঁচ বছরে দিনযাপনের আদল এমন বদলায়, আগে জানত না।

বন্ধুজনের জমজমাট আড্ডায় গিয়ে ডুবতে চাইল নিত্যানন্দ। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত কথা সযত্নে লুকোতে গিয়ে নিজেকেই বারবার মনে পড়ে যায়। বেশি আত্মসচেতন হলে আড্ডা জমে না।

আর পাঁচজনের মতো নিত্যানন্দ একটা বিষয় ভাল করে জানে। বিয়ের আগে কোন মেয়ের সম্বন্ধে কোটি কোটি কথা বন্ধুরা হাতে দূরবীন নিয়ে শুনবে। তার হাসি-কান্না,

স্বাদ, অভিমান, সন্দেহ, চুলের বিন্যাস, শাড়ির প্যাঁচ, কেটে পড়ার অথবা গেঁথে যাবার সম্ভাবনায় বক্তার হৃৎপিণ্ডের ছলাৎ-ছলাৎ, সব দম বন্ধ করে গিলবে বন্ধুরা। অথচ বিয়ের দুদিন পরে সেই মেয়ের বিষয়ে বন্ধুদের কাছে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালে একেবারে দই কেটে যাবে। বউয়ের মহাভারত শোনাচ্ছে! পুরুষমানুষ!

নিত্যানন্দ ছবি আঁকে না, পদ্য লেখে না, মদ্যটদ্য পান করে না। অর্থাৎ অন্য কোন আশ্রয় নেই। শুধু দুখানা ঘর। বন্ধুদের আড্ডায় বসে মনে হয়, সেই ঘরে দৌড়ে চলে যাবে, আবার ঘরে এলে দৌড়েই বাইরে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

চারটে বিশ্রী রাত্তির পার হলে নিত্যানন্দ পঞ্চম রাত্তিরের আগে সন্ধ্যের দিকে পাড়ায় নিজের ইয়ার ডাক্তারের কাছে গেল। চেম্বারে ঢুকেই বলল, 'কিছু কড়া ঘুমের ওষুধ দে তো, হেমন্ত।'

হেমন্ত তখন একটি বালকের গলায় কলমের মতো সরু টর্চ থেকে আলো ফেলছে। তাকালই না নিত্যানন্দর দিকে।

অনেকক্ষণ পরে ঘর খালি হলে হেমন্ত ঘুরে বসল, নিত্যানন্দর মুখোমুখি।

'ঘুম হচ্ছে না? তোর সঙ্গে তোর বউও জেগে থাকে তো?'

'বউ এখানে নেই। দুমাসের জন্য মেয়ে নিয়ে বাইরে গেছে।'

'তাই বল!'

'বাজে কথা রাখ, হেমন্ত। আমি জানি, ঘুমের ওষুধ খারাপ, কিন্তু রাতের পর রাত ঘুম না হওয়া আরো বেশি খারাপ।'

'সবাই দেখছি জেনে বসে আছিস। ঘুমের ওষুধের অভিজ্ঞতা আছে?'

'আছে। তুইও তো দিয়েছিলি একবার।'

অনেক কথা কাটাকাটি করে, হেমন্তকে জপিয়ে, এক শিশি সাদা বড়ি তার ওষুধের আলমারি থেকে নিয়ে এল।

অথচ রাত্তিরে নিত্যানন্দ বুঝতে পারছিল, ওষুধে কাজ হচ্ছে না। এত করে হেমন্তকে রাজী করান অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। হেমন্ত বলেছিল, ডোজ ঠিক করা সহজ নয়। কম খেলে ঘুম হবে না, বেশি খেলেও না। কার কটা বড়ি দরকার ঠিক করা কঠিন।

রাত বাড়ছিল। রাস্তার দিকে উত্তরের জানলা ঘেঁষে মানিকের মা ঘুমিয়েছে। ভাদ্র মাসের শুরু। রাস্তায় থেকে থেকে কুকুরের চিৎকার এবং নিত্যানন্দর নাকের ডগা বরাবর ওপরে ঝুলন্ত পাখাটার বল-বেয়ারিংয়ের মৃদু ঝিনঝিন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

বাড়িতে ঢোকার প্যাসেজের দিকে পুবের জানলার কাছে একটা ছোট টেবিল। টেবিল-ঢাকা ঘননীল কাপড়টা পাতলা অন্ধকারে কালো মনে হয়। সেই টেবিলের ওপর ঘুমের ওষুধের শিশিটা রেখেছে। ছোট-ছোট শাদা বড়িগুলো আবছা দেখা যায়।

ঘরে মানিকের মা রয়েছে। তবু চোখ বুঝতে অস্বস্তি। তাকালে শিশির শাদা বড়িগুলো চোখে পড়ে। খানিক তাকিয়ে থাকলে বড়িগুলো স্বচ্ছ কাচের বাধা পার হয়ে টেবিলে ছড়িয়ে যায়, কালো জমীনে শ্বেতবিন্দুর শিল্পকর্মের মতো।

ড্রেসিং টেবিলের দেয়ালে মেয়ের বিরাট ছবিতে শুধু ফেনশীর্ষ তরঙ্গমালার আভাস পাওয়া যায়। মেয়ে হাতে বালি মেখে হাসছে, জানে, এখন দেখা যাচ্ছে না। মাথার দিকে রেডিওসেটের ওপর স্ট্যাণ্ডে বউয়ের ছবি, ঠোঁটে চাপা হাসি, জানে, এখন দেখা যাচ্ছে না।

নিত্যানন্দর আধখোলা চোখের সামনে অন্ধকারে কালয় পরিণত ঘননীল টেবিল-ঢাকাটা প্রসারিত হয়ে হয়ে চরাচর ঢেকে দিল। সেই বিপুল বিস্তারে ছড়িয়ে গেল শ্বেত-বিন্দুগুলো। কিছুক্ষণ কিলবিল করে নেচে-নেচে আহ্লাদে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে জড়াজড়ি করল। তারপর ক্রমান্বয়ে দূরে দূরে চলে গেলে প্রত্যেকটির মধ্যে কেমন করে যেন তীব্র গতি সঞ্চারিত হল। পরস্পরের গতিপথ অজস্র কৌনিক বিন্দুতে কেটে কেটে একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেল, ফিরে এল, আবার চলে গেল। আসা-যাওয়ার শাদা দাগগুলো রয়ে গেল, আড়াআড়ি করে রাখা সীমাহীন দৈর্ঘ্যের তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মতো।

চমকে চোখ বন্ধ করল নিত্যানন্দ। খানিক পরে তাকিয়ে দেখল, শিশিতে ছোট-ছোট বড়িগুলো তেমনই রয়েছে।

পরিণত বয়সে জনৈক নেতার মৃত্যুর পর একটা নকশাকাটা কাল গাড়িতে তাঁর দেহ শাদা ফুলে ঢেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর পুরনো কর্মস্থান হয়ে চৌরঙ্গী দিয়ে গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ফুল দিয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা গাড়িটাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে গেল বৈদ্যুতিক চুল্লির বাগানে। সেখানে আরো অনেকে গাড়িটা আসার অপেক্ষায় ছিল। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নেতা। ফিল্মস ডিভিশন থেকে বাগানের ফটক দিয়ে প্রবেশের মুখে ছবি তোলা হল।

ভিড় থেকে খানিকটা দূরে বাগানের একটা গাছের গোড়ায় নিত্যানন্দ মৃত নেতার বিবাহিতা মেয়েকে অন্য দু-তিনজনের সঙ্গে মাটিতে বসা দেখেছিল। নিত্যানন্দ সেই মহিলাকে কাঁদতে দেখেছিল। মহিলার চোখ একবার দেখতে পেয়ে যন্ত্রণায় নিজের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েছিল।

এখন নিত্যানন্দ তার নিজের মেয়ের বয়েস অনেক বাড়িয়ে দিল। ভিড়টিড় দেখল না, শুধু দেখল, তার মেয়ে আরো দু-চারজনের সঙ্গে গাছের গোড়ায় মাটিতে বসে। তার চোখের দিকে তাকান যায় না।

নিত্যানন্দ আর পাঁচজনের মতোই। তথাপি, নাট্যকার ডাক্তার দত্ত যেমন বলেন, তার মস্তিষ্কের সুষুম্না থেকে প্রসারিত তন্তুগুলো হয়ত প্রায়ই বড় টান টান থাকে। তখন একজনের উপস্থিতি টের পায় নিত্যানন্দ। একা হলে, নিঃসঙ্গতা একটানা চলতে থাকলে, সেই একজনের অনিবার্য উপস্থিতির স্বাদ তীব্র হয়। তখন অনেক বেড়ে, যায় নিত্যানন্দর মেয়ের বয়েস। তখন সেই অনিবার্য সঙ্গী কবে হাত ধরে মোক্ষম টান
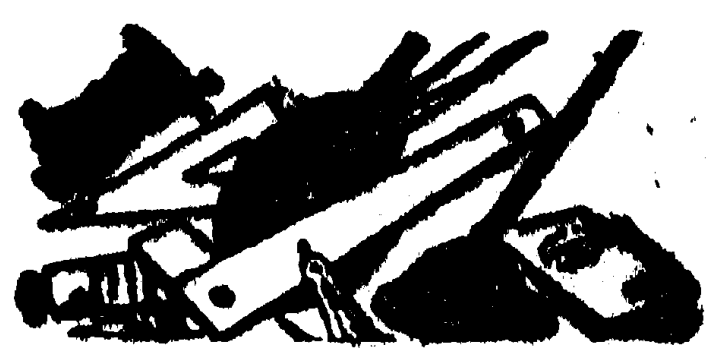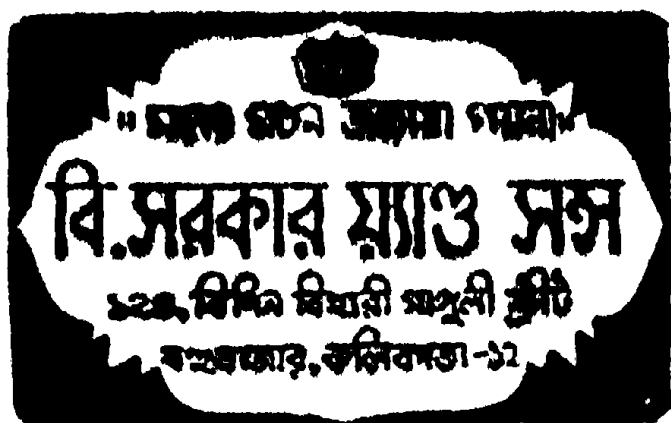
মারবে তার অপেক্ষায় বসে থাকার মানে কী নিত্যানন্দ বুঝতে পারে না।

এখন বুঝতে পারছিল ডাক্তার দত্ত তার সেই তন্তুগুলো তার শরীর থেকে টেনে-টেনে বের করে নিলেন। একটা বিচিত্র জটিল যন্ত্রে সেগুলোর প্রান্ত আটকে দিয়ে যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে চালু করলেন। জোর টান লেগে সেগুলো খুব লম্বা হয়ে গেল। একটু পরে যন্ত্র থেকে খুলে নেওয়ায় সেগুলো, নরম হয়ে গেল। নরম বলে আবার সেগুলোকে শরীরে ঢোকাতে ডাক্তারের অসুবিধে হচ্ছিল।

নিত্যানন্দর একটা বোন ছিল। তিন সপ্তাহ অসুখের পর সকাল থেকে তার চেতনা ছিল না। মামাবাড়িতে সকাল থেকে জন চারেক ডাক্তার ছিল। সন্ধ্যের দিকে শিরায় গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। অসুবিধে হল, শিরাগুলো চুপসে গেছে। অথচ স্নান করে এলে তার হাত-পায়ের নীল শিরা খুব স্পষ্ট দেখা যেত। হাতে একটু ছুরি চালিয়ে আংটার মতো যন্ত্র দিয়ে একটা শিরা টেনে তুলে ইন-জেকশন দেবার চেষ্টা হল। চেতনা ছিল না, তবু ছুরি বসাবার সময় সারা শরীর কেমন মোচড় দিল।

পর দিন সকালে গঙ্গার [illegible] [illegible] নিয়ে গেল, একটা জায়গায় পাশে একটা [illegible] ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল নিত্যা-নন্দ। সেই গাছের পাতা থেকে বৃষ্টি [illegible] পারার অনেক পরেও [illegible] [illegible] পড়ে। নিত্যানন্দ আর পারে [illegible] না। [illegible] ওই পাতার সঙ্গে মানুষের [illegible] [illegible] তুলনা করে দেখতে কেমন লাগে।

[illegible] [illegible] কী সব কারাকারি [illegible] [illegible] কে জানে! সারা শরীরে একটা [illegible] মোচড় নিয়ে নিত্যানন্দ বিছানায় উঠে বসল। [illegible] টেবিলের এক [illegible] [illegible] [illegible] দিকে তাকিয়ে দারুণ ভয় পেল। একসঙ্গে [illegible] বড়ি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] খাওয়া মোটেই ভাল [illegible] [illegible] দুটো, তারপর আরো একটা নিলে [illegible] তো কিছু হল না। [illegible] [illegible] [illegible] দরকার, একেবারে [illegible] [illegible] [illegible] দরকার জানলা দিয়ে।

[illegible] হয়ত কাঁপছিল। [illegible] সেই [illegible] উত্তেজের [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] গিয়ে শিশিটা মানিকের মার [illegible] ওপর পড়ে গেল। আচমকা ঘুম ভেঙে মানিকের মা ধড়মড়িয়ে উঠল। নিত্যানন্দকে তার কাছে দাঁড়ান দেখে একটা [illegible] শব্দ করে, পাশ দিয়ে প্রায় দৌড়ে গিয়ে আলো জ্বালল। আলো জ্বেলে নিত্যানন্দর দিকে একবার তাকিয়ে আবার প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিত্যা-নন্দর মুখে তখন কী ছিল ঠিক বোঝা গেল না, কারণ মুখের সামনে আয়না ছিল না এবং আয়নার দিকে এগিয়ে যাবার কথা মনে আসে নি। বরং নিত্যানন্দর মনে হচ্ছিল, আলো জ্বালবার আগে মানিকের মার মতিভ্রম বিছানায় ছড়িয়ে যাওয়া ঘুমের বড়িগুলো ভাল করে ভোর হবার আগে উঠোনে ছড়ান শিউলির মতো।

শুনতে পেল, মানিকের মা মুখোমুখি ফ্ল্যাটের দরজায় ঘনঘন ঘা মারছে। সেই ফ্ল্যাটের দরজা খুললে বলছিল, 'দাদাবাবু কেমন যেন করছে গো!'

সামনের ফ্ল্যাটের মহিলা নিত্যানন্দর বউয়ের সঙ্গে এক কলেজে পড়তেন। তিনি এবং তাঁর স্বামী মানিকের মার সঙ্গে এঘরে এলেন।

'কী ব্যাপার?'

'আরে কিছুই না। ঘুমের ওষুধগুলো শুধু পড়ে গেছে। মানিকের মা পাগলামি হল। অবশ্য কিছু বলে লাভ নেই। কানেই তো তেমন শোনে না। শিশিটা হাত থেকে পড়ে যাওয়াতেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা হল।

এইসব ভাবছিল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। তখন নিজের হাতের দিকে চোখ পড়ায় চমকে উঠল। দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে এবং খুলে যাচ্ছে, আঙুলগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসছে। নিজের হাতের ওপর অত্যন্ত সন্দেহ হল নিত্যানন্দর।

মানিকের মাকে শুনে পড়তে বলে,

আচমকা ঘুম ভেঙে মানিকের মা ধড়মড়িয়ে উঠলো।

করে আপনাদের ঘুম ভাঙাল!' নিত্যানন্দ সরল হাসি দেখাতে চাইল।

নিত্যানন্দকে ভাল করে দেখলেন মহিলা। তাঁর চোখে অবিশ্বাস স্পষ্ট। নিচু হয়ে একটি একটি করে সবগুলো ঘুমের বড়ি কুড়িয়ে শিশিতে পুরলেন। শিশিটা নিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমার কাছে রইল। দরকার হলে একটা দুটো করে চেয়ে নেবেন।'

মহিলা কী সব আজেবাজে সন্দেহ করলেন। মানিকের মার ওপর বড় রাগ

আলো নিবিয়ে বিছানায় এল। অন্ধকারে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পরই সারা শরীর একটা মোচড় দিল। শিশিটা তো ভাঙেনি। তাহলে বড়িগুলো বিছানায় ছড়িয়ে গেল কী করে? শিশিটা জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে গিয়ে প্যাঁচের মুখটা ঘুরিয়ে খুলবার কী দরকার ছিল? [illegible] আঙুল কামড়ে ধরল নিত্যানন্দ। নিজের কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলগুলোর ওপর প্রথমে খুব রাগ এবং খানিক পরে দুঃসহ ঘৃণা হল।

সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি

সত্য ও ব্যক্তিত্ব

১৯২০-র লন্ডনের সাহিত্য সমাজে যে নামটি উজ্জ্বল অক্ষরে প্রতিভাত ছিল সেই নাম — ভার্জিনিয়া উলফ। সাহিত্যের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন ভার্জিনিয়া উলফ্ অতি দ্রুততালে। তারপর আকস্মিক মৃত্যুতে সেই বিস্ময়কর প্রতিভার জীবনে যবনিকাপতন ঘটে। ব্লুমসবেরী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, অনেকটা অসঙ্গতভাবেই তা করা হয়, কারণ উলফকে ব্লুমসবেরীর বিপরীত বলাটাই সঙ্গততর।

ভার্জিনিয়া উলফ অল্প কালের ব্যবধানে লিখেছেন অনেক, অনেক লেখা ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় বেনামা ও বেওয়ারিশ হয়ে, সম্প্রতি হোগার্থ প্রেস সেই সব রচনার একটি সংকলন "গ্রানাইট অ্যান্ড রেনবো" নামে প্রকাশ করেছেন।

এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ভার্জিনিয়া উলফের স্বামী বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং প্রকাশক মিঃ লিওনার্ড উলফ, তিনি একটি বিজ্ঞপ্তি মারমৎ জানিয়েছেন কিভাবে এই রচনাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এমন মূল্যবান রচনাগুলি, বিশেষতঃ পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী "ফেজেস্ অব ফিকসান" নামক প্রবন্ধটি কিভাবে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে পারে এই প্রশ্ন মনে জাগে। কয়েকটি রচনায় ভার্জিনিয়া উল্ফের রমণীসুলভ স্পর্শ অনুপস্থিত, মাঝে মাঝে বরং লর্ড ডেভিড সিসিলের লেখা বলে মনে হওয়ায় অসম্ভব নয়, তবে তিনিও হয়ত এমনটি লিখতেন না।

এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে ভার্জিনিয়া উলফের নিজেরই একটা মন্তব্য থেকে, "প্রবলেম্ অব বায়োগ্রাফী" নামক প্রবন্ধে এই উক্তিটি আছে। এর অর্থ সত্যকে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। যা সত্য তা যেন গ্রানাইট পাথর আর যা ব্যক্তিত্ব তা হল রামধনুর মত বহু বিচিত্র বর্ণের সমন্বয়। এই সংকলনে কিন্তু ব্যক্তিত্বের ভূমিকাই সর্বাধিক এবং সেই ব্যক্তিত্ব অবশ্য স্বয়ং ভার্জিনিয়া উলফের।

একগাদা অসংলগ্ন প্রবন্ধের সংকলন, তাও আবার এর মধ্যে অধিকাংশ হল পুস্তক সমালোচনার অংশবিশেষ। সুতরাং এর মধ্যে সঙ্গতি এবং সুসংবদ্ধ মনোভঙ্গীর প্রকাশ কেউ অবশ্য আশা করেন না। একমাত্র 'ফেজেস অব ফিকসন' নামক প্রবন্ধটির অতিশয় নিটোল তবে গ্রন্থের উপভোগ্য রচনাবলীর অন্যতম নয়।

গ্রন্থটির রচনারীতি কোথাও ধ্রুপদী, কোথাও শ্লেষাত্মক এবং লঘু। কোথাও আবার অতি-প্রাকৃত ভঙ্গীও চোখে পড়ে। মেরিডিথ থেকে হেমিংওয়ে, হেনরী জেমস, লুইস স্টার্ণ, ক্যাথারিণ ম্যানসফিলড ওয়ালটার র‍্যালে সবই এক নিঃশ্বাসে আলোচিত। সুতরাং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পৌঁছাতে অনেক বিস্ময়কর বাঁকে এসে থমকে থামতে হয়। যেমন মিস বোলডার তাঁর ভাই একটি শব্দ সৃষ্টির গৌরবে স্মরণীয়, জনসনের সেই ক্লান্তিকর বন্ধু বারেত্তি, মহাজন টমাস কুটস, যে সতাত ভগ্নী ফ্যানী বর্ণীর জীবনকে এতখানি উত্তেজনায় পূর্ণ করেছিল। স্টার্ণের 'এলাইজা' যাঁর জন্ম আনজেনগো শহরে। পরিসংখ্যান তত্ত্বের মতে যিনি বোম্বাই শহরের মিসেস ড্যানিয়েল ড্রেপার —তাঁদের সকলকেই হয়ত এক সময় যা অন্য সময় আমাদের শহরের কানাগলিতেও দেখা যেতে পারে, হঠাৎ পথের পাশের চমক লাগানো চকিত মিলন।

এই চরিত্রেরা যে আপনাতে আপনি বিকশিত তা নয়, কিন্তু লেখিকার সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুগভীর সহানুভূতিতে তারা প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। অনেক সময় হয়ত আতিশয্য মনে হতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, বেচারী মেরী করেলী, যিনি সহজপাঠ্য উপন্যাস লিখে অনেক অর্থ উপার্জন করেছিলেন তাঁর সম্পর্কিত প্রবন্ধটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণ-মূলক। এই সব কারণে, পাঠকের সর্বদা মনে হতে পারে কি করে এমন সব মূল্যবান রচনা এতকাল পাঠকের চোখ থেকে আড়াল করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। কোনো গবেষকের সন্ধানী দৃষ্টি যে এই দিকে পড়েনি এতকাল তা প্রকৃত বিস্ময়ের বস্তু।

রোজ মেকলের সংলাপের মত ভার্জিনিয়া উলফের রচনা অপর দিককার অংশী অর্থাৎ পাঠককে সম্মোহিত করার শক্তির অধিকারী। উত্তেজক উক্তি, চমকপ্রদ যমক এবং মনোহর ভঙ্গী এমনই বিস্ময় সৃষ্টি করে যে পাঠককে সহসা বই বন্ধ করে চিন্তা করতে হয়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

> "The objection to the purple patch is not that it is purple but that it is a patch".

কিন্তু সমগ্র উপন্যাস যদি এই একই রঙে রঙানো হয় তাহলে কি তা সহ্য করা সম্ভব?

কিন্তু যদি আমরা হ্যামলেট নাটকের সামগ্রিক অংশ কিংবা মহাকাব্য 'ডন জুয়ানের' সকল সর্গ সহ্য করতে পারি তাহলে রঙে কি করে?

ভার্জিনিয়া উলফ লিখেছেন—

> "We owe a great deal to bad books"

কথাটি সত্য, তবে এই সঙ্গে এই সূত্রে যে চিন্তা মনে জাগে তা অন্তহীন।

ভার্জিনিয়া উলফের আর এক উক্তি—

> "When a writer is completely and even ecstatically conscious of success he has as likely as not, written his worst".

কিন্তু এই উক্তি কি কিঞ্চিৎ ব্যাপক নয়। কিঞ্চিৎ উদ্ভটও বটে। মহিলা লেখিকাদের উচ্ছ্বাস অনেক সময় প্রবল। আবেগ গভীরতর—তবে এমনও হতে পারে একজন পথ প্রদর্শন করেছেন অপরে তাঁর অনুকরণ করেছেন।

ভার্জিনিয়া উলফের এই বিষয়েও একটি সুন্দর মন্তব্য আছে—

> "One of the motives that led them (women writers) to write was the desire to expose their own suffering."

তবে এর পিছনে কি চটুল হওয়ার বাসনা কিঞ্চিৎ প্রবল নয়?

তিনি বলছেন—

> "A writer will always be chary of dialogue because dialogue, puts the most violent pressure on the readers attention".

বর্ণনা বা বিবরণের বিপরীত এই পদ্ধতি। লেখকের আঙ্গিকের কৌশলে পাঠকের মন এক বাঁধা রাস্তায় পড়ে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা হারায়।

এই ধরনের বিচ্ছিন্ন চিন্তা ভার্জিনিয়া উলফের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছড়ান, যুক্তিগ্রাহ্য এবং মর্মভেদী।

অনেক সমালোচকের মত, হয়ত সমালোচকদের দৃষ্টিকোণে ভার্জিনিয়া উলফ অনেক সময় লেখকের রচনার মধ্যে এমন জিনিষ আবিষ্কার করেছেন, যা হয়ত লেখক স্বয়ং কোনদিন মনেও আনেন নি। আর এই জাতীয় আর সব লেখকের মত উলফও পাঠককে একটা অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ জীব হিসাবে গ্রহণ করতেই আগ্রহী। ভার্জিনিয়া উলফের রচনাশৈলী অপূর্ব, যে কোন পাঠক, বিশেষতঃ তিনি যদি আবার লেখক হন, ভার্জিনিয়া উলফের রচনা পাঠ করলে তাঁকে আবার গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে।

—অভয়ঙ্কর

GRANITE & RAINBOW: By VIRGINIA WOOLF:
Published by HOGARTH PRESS—LONDON-18 Shillings only.

ভারতীয় সাহিত্য

সাম্প্রতিক উর্দ্ন কবিতা ॥

ভারতের সমৃদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উর্দ্ন অন্যতম। এই কারণেই ইদানিং রচিত উর্দ্ন সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণের মনে আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রতি লখনউ থেকে তরুণ উর্দ্ন কবি শামিন কারহানি রচিত 'আকশে গন্ল' নামক কবিতা গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশামিন উর্দ্ন সাহিত্যে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি এই বৎসর সাহিত্যরচনার জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের 'বিশমল এলাহাবাদী' পুরস্কার লাভ করেছেন। পার্শিয়ান ক্লাসিক এবং ছন্দ সম্বন্ধে গভীর সংযোগ তাঁর কবিতার অবয়ব নির্মাণেও বিশেষ সহযোগিতা করেছে। কবি হিসেবে তিনি আশাবাদী। তাঁর 'রোশানি তেজ করো' বা 'আমন' কবিতায় এই আশাবাদেরই ধ্বনি ঝঙ্কৃত, তিনি সমাজ সচেতন। অথচ তাঁকে কখনও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় দেখা যায়নি। তাঁর কবিতা অবশ্য খুবই চিত্রময়। বিশেষ করে 'মেরি চাহাত মেরা দিল' এবং 'দিয়া জ্বলতা চলা গয়া' ইত্যাদি কবিতায় এই বিশেষ প্রসাদগুণটি বিদ্যমান। আলোচ্য গ্রন্থে গান্ধীজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, গালিব, জাফর প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রতি নিবেদিত কবিতাও সংকলিত হয়েছে।

গোলাম রব্বানি তবন রচিত কাব্যগ্রন্থটির নাম 'হাদেশি দিল'। প্রকাশ করেছেন দিল্লীর 'উর্দ্ন লেখক সমবায় সমিতি'। প্রকৃতপক্ষে তবন একজন গজল-কবি। উর্দ্ন গজল সম্বন্ধে একটি অভিযোগ এই যে এতে কেবলমাত্র মিল বিন্যাসই প্রধান। ফলে একজন সাধারণের পক্ষেও একটি গজল রচনা খুব কঠিন হয় না। কিন্তু তবনের ক্ষেত্রে বোধহয় একথা প্রযোজ্য নয়। তবন গজলের এই মিল বিন্যাসের মধ্যে যে সাহিত্যপ্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তা অভিনব। যেমন তিনি একটি গজলে লিখেছেন—

'মেরি আফকর কি রানায়িন তেরে
দুখ সে,
মেরি তাসওয়ার মেই' শামিল
তেরি আওয়াজ ভি হেই।'

ফারুক গোরখপুরির 'হাজার দস্তান' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে দিল্লী থেকে। আলোচ্য কবিদের মধ্যে এখনও তাঁর কবি-প্রতিভার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেনি। তবু তাঁর কবিতায় রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনার ইঙ্গিত। যাই হোক, সাম্প্রতিক উর্দ্ন সাহিত্যে এই তিনটি কবিতাগ্রন্থ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আসামের একজন তরুণ কবি ॥

আসামের নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্য আসাম। অথচ আসামের সাম্প্রতিক শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি সীমিত। এই সীমাবদ্ধতা সত্যই মর্মান্তিক। একদিক থেকে আমাদের জাতীয় সংহতির পক্ষেও অন্তরায়। সম্প্রতি আসামের তরুণ কবি নবকান্ত বড়ুয়ার উপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আসামের কাব্যজগতে তাঁর নাম খুবই সুপরিচিত।

আসামের সাহিত্যে রঘু চৌধুরী, যতীন দুয়রা প্রভৃতি কবিরা এক বিশেষ ধরনের রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন করেছিলেন আসামের কাব্যজগতকে। নবকান্ত বড়ুয়া এবং তাঁর সহকবিরা এর বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন তীব্র প্রতিবাদ। এই সর্বপ্রথম আসামের সাহিত্যে এলিয়ট, ফ্রয়েড, মার্কস প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নবকান্ত বড়ুয়ার কবিতায় এলিয়টের প্রভাবই সর্বাধিক বলে মনে হয়। কবিসত্তায় ঐতিহ্যের প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করেননি। বরং তিনি এতেই বর্তমানের মানুষ এবং অতীতের মানুষের মধ্যে যোগ-সূত্রের সন্ধান করেছেন। উপনিষদের প্রভাবও তাঁর কাব্যে বিদ্যমান। মহান আকাশের নীচে আদিত্যবর্ণ পুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। মহাকাশ তাঁকে আহ্বান করেছে বার বার—যে মহাকাশ অন্যদিক থেকে 'ভূমার' প্রতীক। মন মিশে যায় সেই আকাশে। 'হাজার নক্ষত্র মত' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'সোনালী শস্যর শিশু যার স্তনে
রাখিছে জীয়াই।'

নবকান্ত বড়ুয়ার গীতিধর্মিতাও লক্ষ্যণীয়। প্রসঙ্গত তাঁর 'লাখিমী' কবিতা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাচ্ছে—

'মাথো দেখে, আঁচলেরে উরুয়াই
পপীয়া তরার—
ছাই তার চোতালর
দুখান লাহরির হাতে মাটি থলে তুলসীর তল।
....
মেশেকা চুলির পরা নখের চিকুটা
মাটিলৈকে অশরীরী
এটি হাহি- -
ফুল তরা, কার হাঁহি সিতো হায়
নবুজে একোকে।'

কয়েকজন প্রবীণ বাঙালী কবির প্রভাবও তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা গেল। তাঁর কবিত্ব-পরিচয়ের দিক থেকে অবশ্য এই প্রভাবগুলিই একমাত্র প্রধান নয়। কবি হিসেবে তাঁর স্থান সত্যই উল্লেখ্য।

পরলোকে নীরেন্দ্রনাথ রায়

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য-সেবী শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করেছেন। 'পরিচয়' গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় তিনি প্রথম সংখ্যা থেকেই বাঙলা সাহিত্যের নানা বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। কর্মজীবনে তিনি বঙ্গবাসী কলেজে প্রায় ত্রিশ বৎসর ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করে গেছেন। বিশেষ করে শেকসপীয়র-সাহিত্য অধ্যাপনায় তাঁর খ্যাতি ছিল সুবিদিত। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনা করেন তিন বৎসর। সে সময় মস্কো থেকে তিনি বহু রুশ গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে অবসরগ্রহণের পর তিনি নয়াদিল্লীতে রুশ দেশ সম্পর্কিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিদেশী সাহিত্য

এ বছরের নোবেল পুরস্কার

এ বছর সাহিত্যকর্মের জন্য সুইডিশ অ্যাকাদমি দুজনকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এঁরা দুজন হলেন স্যামুয়েল অ্যাগনন ও শ্রীমতী নেলি শাখস। জাতিতে এঁরা দুজনেই ইহুদী। ১৯১৭ সালের পর এই আরেকবার দুজন একসঙ্গে পুরস্কার পাবার গৌরব অর্জন করেছেন। ৬০ হাজার ডলারের পুরস্কার দুজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। পুরস্কার বিতরণ করা হবে আগামী ১০ই ডিসেম্বর।

স্যামুয়েল অ্যাগনন ॥

অ্যাগননের জন্ম ১৮৮৮ সালের ১৭ জুলাই বুখজাদের পূর্ব গ্যালিসিয়ান শহরে। শৈশব অতিক্রান্ত হবার কিছুকালের মধ্যেই তিনি প্যালেস্টাইন শহরে চলে যান। মাঝে কিছু সময় বাদে সারাজীবনই তিনি সেখানে বসবাস করেন। সে কারণেই পূর্ব গ্যালিসিয়ান অঞ্চলের ছায়া বারবার তাঁর সাহিত্যকর্মে অন্তরালবর্তী প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। অবশ্য তাঁর বিষয়বস্তু সব সময়ই ছিল ইহুদী-মানুষের জীবন-উৎস, কখনো কখনো প্যালেস্টাইনের জীবনযাত্রা। ইহুদী জনসাধারণের জন্য তাঁর ছিল অসীম মমত্ব।

অ্যাগনন যখন সাহিত্যজীবন শুরু করেন সে সময় হিব্রু সাহিত্যে 'না মাহাস্লাল হি হাভাস' আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে-

পাঠিকাদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার চিঠিপত্র পান। এই সব চিঠিপত্রে তাঁরা সব বিষয়েই লেখকের কাছ থেকে মতামত জানতে চান। তাঁরা কি লেখেন তার থেকে কি যে লেখেন যা তা বলা সহজ।

এক প্রশ্নের উত্তরে শোলোকফ বলেন যে তাঁর মনের মত অবসর-বিনোদনের উপায় হল শিকারে যাওয়া ও মাছ ধরা। এ দুটি তিনি খুবই ভালোবাসেন। তাছাড়া তাঁর বিশেষ অনুরাগ হল দেশভ্রমণে। ঠিক একজন নিস্পৃহ যাত্রীর মত তিনি দেশভ্রমণ করেন না, দেশভ্রমণ করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে অনেক সমৃদ্ধতর ও লাভবান করে তোলেন। শোলোকফের হাতে এখন ৬৪ হাজার ডলার থাকছে (তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির টাকা)। এ টাকা তিনি কিভাবে ব্যয় করতে মনস্থ করেছেন জানতে চাইলে শোলোকফ বলেন যে, তিনি বিশ্ব-ভ্রমণে বেরুবেন। প্রথমেই, এই বছরের শেষেরদিকে তাঁর যাবার ইচ্ছে ভারতে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ দীর্ঘদিনের। আসছে বছর তিনি ঘুরতে যাবেন ল্যাটিন আমেরিকায় এবং সম্ভবতঃ অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও।

দৈনন্দিন জীবনে শোলোকফ কোনো বাঁধা ছক-বাঁধা জীবন পছন্দ করেন না। তাঁর একরকম কোনও কাঁটায়-কাঁটায় দৈনিক রুটিন নেই। তবে শয্যাত্যাগ করেন প্রতিদিন একেবারে ভোর চারটেয় এবং ভোরেরদিকেই তিনি তাঁর লেখার কাজ করতে ভালবাসেন।

তাঁর সন্তানদের মধ্যেও কি কেউ পিতার সাহিত্য-প্রবণতার অধিকারী হয়েছেন, এ প্রশ্নের জবাব শোলোকফ দেন সকৌতুকে। শোলোকফ চার সন্তানের জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষিবিজ্ঞানী, মধ্যম পুত্র মৎস্য-চাষ-বিশেষজ্ঞ, প্রথমা কন্যা সাংবাদিক ও কনিষ্ঠা কন্যাটি ভাষাতত্ত্বের ছাত্রী, শোলোকফ এখন তিন পুরুষের প্রধানও বটেন। তাঁর ছয়টি নাতি-নাতনী। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নাতিটি সবে হাইস্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

মানুষের মধ্যে কোন নেতিবাচক দিকটিকে তিনি সবচেয়ে অপছন্দ করেন জিজ্ঞেস করলে শোলোকফ এক কথায় জবাব দেন 'নীচতা'। সুখ সম্বন্ধে তিনি কি ভাবেন জানতে চাইলে শোলোকফ বলেন, তাঁর বই কাউকে ভাল হতে সাহায্য করেছে জানতে পারলে তিনি সবচেয়ে সুখীবোধ করেন। নিজের সম্বন্ধে কিছু না ভাবারই চেষ্টা করি।

আজকের লেখকদের সামনে সবচেয়ে বড় কর্তব্য কি? —শোলোকফের মতে ভাল লেখার চেষ্টা করা।

এটা কি ঠিক যে তিনি মহিলা সাহিত্যিকদের লেখার ক্ষমতা সম্পর্কে উহৎ সন্দিহান। শোলোকফের সোজা উত্তর হল হ্যাঁ, এ প্রশ্নে তিনি কিছুটা রক্ষণশীল। তিনি মনে করেন যে, সাহিত্য কাজ হল পুরুষের পেশা। যখন তাঁকে এই সমস্ত কৃতী লেখিকা যেমন, সিমন দ্য বোভোয়া, আখমাতোভা, আন্না সেঘার্স প্রমুখের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, তখন শোলোকফ মন্তব্য করলেন, এঁরা হলেন গিয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠল যে, তবে শোলোকফ কি মেয়েদের পছন্দ করেন না। সংগে সংগে শোলোকফ জবাব দিলেন, 'ঠিক তার উল্টোটা। নইলে, জায়া-কন্যা দৌহিত্রী নিয়ে তার এতবড় জমাট সংসার থাকত না।

সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সোভিয়েত নবীন-পুরুষের লেখকদের কথা ওঠে। এই তরুণ লেখকদের বলা হয়, 'বিদ্রোহী' এ সম্বন্ধে শোলোকফের অভিমত কি? তিনি ইয়েভতুশেঙ্কো ভোজনেসেনস্কী প্রমুখ সম্পর্কে কি মনে করেন? এদের সম্পর্কে যেসব সমালোচনা উঠছে, তাতেই বা তাঁর মত কি? শোলোকফ এ বিষয়ে বলেন, তরুণেরা 'বিদ্রোহী' হবেই। এটাই স্বাভাবিক, তারুণ্যের ধর্মই হল না মানা। তরুণদের কাছ থেকে পরিণত-পরিপক্কতা দাবী করা ভুল। জীবনের নিয়মই হল পরিণতি আসবে ধাপে ধাপে বয়স ও অভিজ্ঞতার সিঁড়ি ভেঙে।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতির মর্ম সম্পর্কে সত্যকারে তিনি কি বলেন? উত্তরে শোলোকফ বলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতির প্রধান মন্ত্র হল সত্যবাদিতা।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় কোনরূপে পরিবর্তন হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে শোলোকফ বলেন, ব্যাপারটা তো পোষাক-আসাকের মরশুমী ফ্যাশন বদলানোর মতো নয়।

তাঁর সবচেয়ে প্রিয় লেখক কারা, এ প্রশ্নের উত্তরে শোলোকফ তলস্তয়, চেকফ, গোগোলের নাম করেন। কিন্তু বলেন যে, সাধারণতঃ তাঁর নিজের পছন্দসই এরকম তকমা তিনি লেখকদের ওপর চাপাতে চান না।

শোলোকফ তাঁর এক-একটি গ্রন্থ রচনায় যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নেন। এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। 'কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' ('ধীরে বহে ডন') লিখতে তাঁর বার বছর সময় লেগেছিল। 'ভার্জিন সয়েল আপটার্ণড' তিনি লেখেন ত্রিশ বছর ধরে। তাঁর 'দে ফট ফর দেয়ার মাদারল্যান্ড' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। শোলোকফ বলবেন, সাহিত্য-সৃষ্টিতে একেবারে ছক করে পরিমাপগত পরিকল্পনা বেঁধে এগুনোকে তিনি খুবই খারাপ মনে করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে কোনও ব্যাপারে রেকর্ড সৃষ্টির জায়গা নয়। শোলোকফের আগামী লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন, ডনের ওপর তিনি লিখেছেন। ভবিষ্যতে তাঁর লেখার ইচ্ছে আছে 'প্রেম সম্পর্কে'। তাঁর 'দে ফট ফর দেয়ার মাদার-ল্যান্ড'-এর পরবর্তী খণ্ড এ বছরেই প্রকাশিত হচ্ছে, শোলোকফ জানালেন।
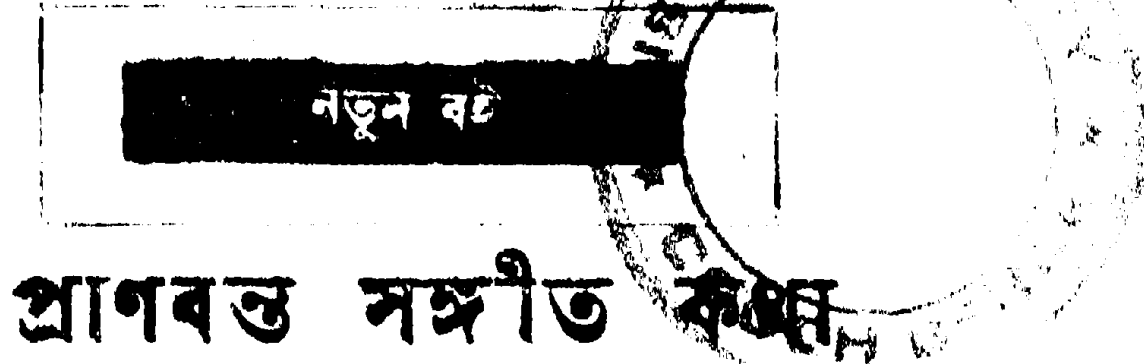
নতুন বই

প্রাণবন্ত সঙ্গীত কথা

বাংলাদেশ সঙ্গীতে ভরা। এদেশের আকাশে-বাতাসে, পত্রের মর্মরে এবং পাখীর কাকলিতে অপূর্ব সংগীতসুষমা ছড়িয়ে রয়েছে। সর্বত্র সঙ্গীতের এমন অপূর্ব সমাবেশ সত্যি বিরলদৃষ্ট। এদেশের মানুষেও তাই স্বাভাবিকভাবেই সংগীতরসে আপ্লুত। সাধারণ মাঝিমাল্লা এবং চাষী থেকে শুরু করে সকলের কণ্ঠেই সংগীত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সংগীতময়তা এদেশের বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালী এবং সংগীতময় বাংলা-দেশের এই পরিচয় বিভিন্নভাবে বিশেষজ্ঞরা পরিবেশন করেছেন। সংগীতের ঐতিহাসিক দিক নিয়ে এযাবৎ সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রসিকজন মাত্রেই সে-কথা জানেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ধূর্জটিপ্রসাদ, শ্রীদিলীপ-কুমার রায় সংগীতে বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশে সংগীতসাধনা নিয়ে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ মূল্যবান আলোচনাও করেছেন। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। সংগীতে অসামান্য দক্ষতা এঁদের আলোচনায় সবচেয়ে বড় সহায়ক। কিন্তু এ কথা তবু অসংগত হবে না যে, বাংলাদেশে সংগীতচর্চা সম্পর্কে এবং রূপরস-বাঞ্জনার বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ বর্তমান। এক্ষেত্রে এখনও প্রকৃত শিল্পীসুলভ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সুখের বিষয় যে, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য সংগীতরসিকদের এই অভাবের দিকটি স্মরণ রেখে শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীতের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, সেজন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীভট্টাচার্যের 'সংগীতচিন্তা' দীর্ঘদিন ধরে রচিত কতকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। লেখক স্বয়ং সংগীতশিল্পী। তাছাড়া বাংলাদেশের কাব্যসাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত নয়। তাঁর কাছে আমাদের যে-প্রত্যাশা ছিল, তা তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। একই সংগে তিনি ঐতিহাসিক, নান্দনিক এবং উপপত্তিক আলোচনায় গ্রন্থটিকে প্রাণবন্ত করেছেন। তাঁর শিল্পবোধ এবং বিচার-বিশ্লেষণ সত্যিই প্রশংসনীয়। বাঙালীর গান, রবীন্দ্রনাথের
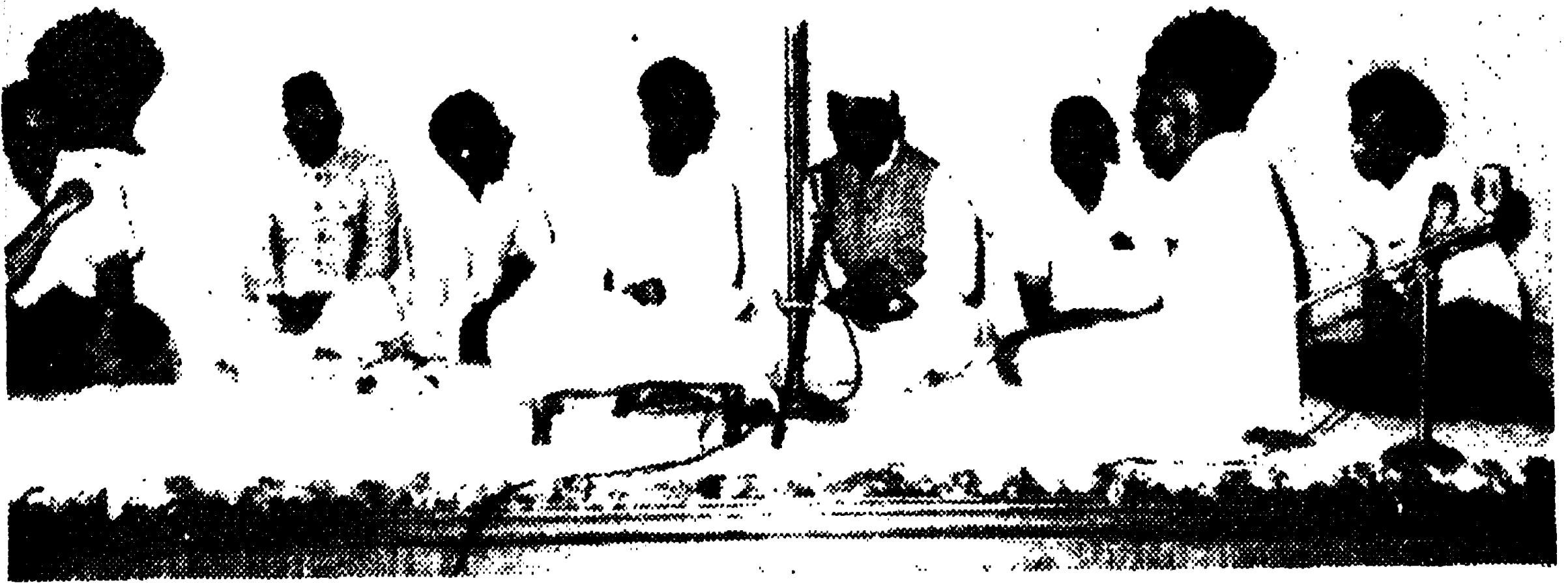
দিল্লীতে বাঙলা ছোটগল্প গ্রন্থ 'বাঙলা কথামালা' প্রকাশ উপলক্ষে 'অনিমা' পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের দৃশ্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিমল মিত্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় উপ-শিক্ষামন্ত্রী শ্রীভক্তদর্শন। বাম দিক থেকে শ্রীমণীন্দ্র রায়, ডঃ জুবের সিদ্দিকি, শ্রীশাহরাদ দেওরা, শ্রীবিমল মিত্র, শ্রীভক্তদর্শন, শ্রীপি এন ত্যাগরাজন, শ্রীআর কে ভূওয়ালকা এবং শ্রীবসু শর্মা।

গান প্রভৃতি আলোচনায় যেমন তাঁর পারদর্শিতা স্পষ্ট, তেমনি নন্দতত্ত্বের দিক থেকে রাগসংগীতে ভাবরূপ, সংগীতে রূপকল্পনা, সংগীতে রূপভেদ, সংগীতের ভাব ও ভাষার বিচারেও যথেষ্ট দক্ষতা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিশিষ্টে তিনি রবীন্দ্রসংগীত ও নানাবিধ চিন্তা, লৌকিক গান ও রাগসংগীত, কবিতা গান ও কাব্যপাঠ পর্যায়ে সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। স্বল্প পরিসরে এরকম সুষ্ঠু আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ খুব কমই দেখা যায়। 'সংগীতচিন্তা' লেখকের শিল্পবোধে প্রাণবন্ত।

সংগীত চিন্তা (আলোচনা) অরুণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক : সংগীত পরিষদ, ৯বি-৮, কালিচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০। দাম : ৫·০০।

হ্যামলেট

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়রের অনেকগুলো নাটকই বাংলায় অনূদিত হয়ে আমাদের নাট্যসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে তাঁর অবিস্মরণীয় ট্র্যাজেডিগুলোর মধ্যে চিরন্তন মানবহৃদয়ের যে লীলা আছে তারই প্রতি যেন আমাদের আত্যন্তিক অনুরাগ। এই দিক থেকে তাঁর 'হ্যামলেট' একটি যুগোত্তীর্ণ সৃষ্টি। শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি এর নাট্যানুবাদ করেছেন এবং অনুবাদে মূল রচনাকে কোথাও বিকৃত করা হয় নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মূল নাটকের গতি অক্ষুণ্ণ থেকেছে। অনুবাদে শেক্সপীরীয় আস্বাদ কোন সময়েই অনুপস্থিত থাকে নি। তবু আক্ষরিক অর্থেই তিনি মূল রচনার আনুগত্য স্বীকার করেন নি, সুসংবদ্ধ শব্দনির্বাচনের মধ্য দিয়ে জীবন্ত সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। নাট্যানুবাদ তাই দর্বার গতিবেগে সমৃদ্ধ হয়েছে, কোথায় অনাবশ্যক শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। স্বগতোক্তির অনুসরণে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় শেক্সপীয়রের কাব্যিক ব্যঞ্জনা, অপূর্ব চিত্রকল্প আর সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বকে পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছেন। সার্থক অনুবাদ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থটির মর্যাদা পাওয়া উচিত।

হ্যামলেট : (নাটক) : শেক্সপীয়র। নাট্যানুবাদ : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনগুপ্ত বুক হাউস, ৩০৩এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিঃ-৬। মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি দিক

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রায় সব কটি দিক নিয়েই বাংলায় আলোচনা হয়েছে। শ্রীনরেশ মৈত্রের 'রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি দিক' রবীন্দ্রপ্রতিভা উপলব্ধির ক্ষেত্রে নতুনতর কোন ইঙ্গিত দিতে পারে নি। কয়েকটি ছোট ছোট প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। লেখকের কোন গভীরতর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে কয়েকটি দিক (অলোচনা)—নরেশনাথ মৈত্র, বসু বুক স্টল, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-৬। দাম—২·৫০।

●

একটি কবিতাগ্রন্থ

প্রচলিত ছন্দে রচিত একটি অনবদ্য কবিতাগ্রন্থ। এতে যে সমস্ত কাহিনী বিধৃত হয়েছে, তা অধিকাংশই বাস্তব জীবনের সত্য ঘটনা। 'দাদার বিয়ে', 'পিকনিক', 'মেয়ের টান' প্রভৃতি কবিতাগুলি অনেকের ভাল লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ভালবেসেছিলাম— মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল। **৪০, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলকাতা—২৯। দামঃ সাড়ে তিন টাকা।**

শারদ সাহিত্য

'মধুরেন'র শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন অবিনাশ সাহা। ছোট গল্প লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, পরেশ সাহা, সুনীল গুহ, আশু মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। শিকারকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র ঘোষ, সুতপা চক্রবর্তী, নারায়ণ দত্ত, জয়দেব রায়, ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ ও বরুণ রায়। কবিতা লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, মণীন্দ্র রায়, গৌরকিশোর ঘোষ ও প্রভাসজীবন চৌধুরী।

মধুরেন—সম্পাদক : কল্যাণ বসু। ৬৪, পাইক পাড়া ফার্স্ট রো। কলকাতা—৩৭। দাম—দুই টাকা।

●

শারদীয় সংখ্যা 'শ্রীমতী'তে লিখেছেন বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সাগরময় ঘোষ, প্রাণতোষ ঘটক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশাপূর্ণা দেবী, সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, শচীনদেব বর্মণ, মণীন্দ্র রায়, আভা পাকড়াশী এবং আরো অনেকে।

শ্রীমতী—২৯, ওয়াটার্লু স্ট্রীট, কলকাতা—১।

●

ত্রিপুরার **সমাচার** পত্রিকাটি অঙ্গিকসৌষ্ঠব ও রচনাসমাবেশে বিশেষ আকর্ষণীয়। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন পুলিনবিহারী সেন, পান্নালাল দাশগুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, চিরঞ্জীব সেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক লাহিড়ী, কিরণকুমার রায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, জয়ন্তী সেন, কুমারেশ ঘোষ, হিমানীশ গোস্বামী এবং

আরো কয়েকজন। কয়েকটি সুন্দর স্কেচ ও ছবি আছে।

সমাচার শারদ সংখ্যা ১৩৭৩—সম্পাদক : অনিল ভট্টাচার্য ও কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। প্রকাশস্থান উল্লেখ নেই। দাম—দেড় টাকা।

●

'এককে'র শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন বিষ্ণু দে, মনীশ ঘটক, কৃষ্ণ ধর, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, মৃণাল বসুচৌধুরী, পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পরিমল চক্রবর্তী, বঙ্কিম মাহাত, অধীর সরকার, মণিদীপা বিশ্বাস, হেনা হালদার, শংকর দে, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সুবন্ধু ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

একক শারদীয় সংখ্যা। সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ৪৪৬।১ কালিঘাট রোড থেকে প্রকাশিত।

●

'প্রত্যয়ে' লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নীললোহিত, ইন্দ্রনীল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, বিষ্ণু দে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জয়শ্রী সেন, সঞ্জীব বসু, মায়া বসু এবং আরো অনেকে।

প্রত্যয়—সম্পাদক : প্রভাসকান্তি ভদ্র। ১৩৯।ডি।৫ আনন্দ পালিত রোড, কলকাতা—১৪ থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

●

প্রবাসী বাঙালীদের পত্রিকা 'সংগঠন'। এর শারদীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখেছেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী, গোপাল ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রাম বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। একটি উপন্যাস লিখেছেন সাধন তপাদার। আরো কয়েকটি বিভিন্ন বিষয়ের রচনা আছে।

সংগঠন—সংগঠন কার্যালয় 'বেঙ্গলী স্কুল বিল্ডিং। বিলাসপুর। আর এস। মধ্যপ্রদেশ। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

●

মাসিক প্রবাসী পত্রিকার বর্তমান বৎসরের শারদ সংকলনে তিনটি উপন্যাস লিখেছেন সীতা দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী, জয়ন্ত সেন। গল্প কবিতা ও আলোচনা করেছেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিৎকুমার সেন, পুষ্প দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, সরোজকুমার রায়চৌধুরী এবং আরো অনেকে। অবনীন্দ্রনাথ, আব্দুল রহমান চাঘতাই, নন্দলাল বসু এবং দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর রঙীন চিত্র ছাপা হয়েছে।

প্রবাসী—সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়। কোন ঠিকানা উল্লেখ নেই। দাম—আড়াই টাকা।

●

মাসিক পত্রিকা জাগরীর শারদীয়া সংকলন অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছে। এবারের সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হলো রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত গল্পের খসড়া। এছাড়া সংখ্যাটি বুদ্ধদেব বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ ভবতোষ দত্ত, শৈলেশ ভট্টাচার্য, আনন্দ ভিক্ষু, শিবাজী গুপ্ত, রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় পুষ্ট। প্রচ্ছদটি সুন্দর ও ছাপাও ঝরঝরে। জাগরী সাহিত্যরসিকদের ভাল লাগবে।

জাগরী—সম্পাদক : শ্রীঅপূর্বকুমার সাহা। ৯।এ, হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা—৩ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা মাত্র।

●

'সংবর্তে' লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অলোক সরকার, রত্নেশ্বর হাজরা, মৃণাল দত্ত, শঙ্কর রায়, শুভাশিস গোস্বামী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকজন।

সংবর্ত : সম্পাদকমন্ডলী সম্পাদিত। ৫৪, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট। কলকাতা—৩। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

●

গল্পের মাসিকপত্র 'স্বরান্তরে'র বর্তমান সংখ্যায় গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, মিহির পাল, শুভাশিস গোস্বামী এবং আরো কয়েকজন।

স্বরান্তর : সম্পাদক—অমল রায়চৌধুরী, ২৯ নয়াপট্টি রোড, কলকাতা-২৮। দাম দুই টাকা।

●

'পুনশ্চে'র শারদ সংখ্যায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, আলোক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রসূন বসু, শিশিরকুমার দাস, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, শান্তি লাহিড়ী, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত, শঙ্কর রায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, কল্লোল মজুমদার, পার্থ রাহা, বেলাল চৌধুরী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং আরো কয়েকজন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব রায়।

পুনশ্চ—৪বি, গোবিন্দ ঘোষাল লেন, কলকাতা-২৫। দাম দু' টাকা।

●

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি অল্পকাল মধ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রগুলির মধ্যে একটি মর্যাদার আসন লাভ করেছে। রচনাগৌরবে, মুদ্রণপারিপাট্যে "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" যে সুনাম অর্জন করেছে তার শারদীয় সংখ্যাটিতে সেই ঐতিহ্য অক্ষুন্ন আছে। এই সংখ্যায় পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন ও মানুষ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ ও রজনীকান্ত সম্পর্কে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, হালিশহরের পুরাতন চিত্র সম্পর্কে পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রবন্ধ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা যে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী সেই বিষয়ে সম্পাদকের প্রবন্ধ এবং বিশেষ করে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ত্রিভঙ্গ রায়ের মূল্যবান রচনাটি এই সংখ্যার গৌরব। কয়েকখানি সুমুদ্রিত আর্ট প্লেট এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। একুশজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকের প্রবন্ধ সম্বলিত এই সাহিত্যপত্র এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—সম্পাদক : সঞ্জীব বসু। চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদ। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিঃ-১। মূল্য দু টাকা মাত্র।

●

'লেখা ও রেখা'র বর্তমান সংকলনটি বিভিন্ন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। গল্প, কবিতা, অনুবাদ কবিতা, গ্রন্থসমালোচনা এবং কাব্য-নাটক এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অমল দাশগুপ্ত, আবদুল আজীজ-আল-আমান, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং আরও অনেকে।

লেখা ও রেখা (শ্রাবণ-আশ্বিন)—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় গ্রন্থাগার, শান্তিপুর; দাম : দেড় টাকা।

●

চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'ফিল্ম'-এর শারদীয় সংখ্যাটি নানাকারণে আকর্ষণীয়। 'আমি ও আমার ছবি' এবং 'আমার ছবি' দুটি আলোচনা করেছেন যথাক্রমে সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক। ভেরনন ইয়ং এবং 'চলচ্চিত্রে কবিতা-ভাবনা' একটি মূল্যবান রচনা। 'বাংলা চলচ্চিত্র আলোচনাচক্রে' ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং বাগীশ্বর ঝার তিনটি আলোচনা;

আন্তর্জাতিক চিত্রপরিচালক পরিচিতি পর্যায়ে জাঁলুক গদার, ইংগমার বেয়ারিম্যান, মাইকেল এঞ্জেলো আন্তনিওনি, আলফ্রেড হিচকক ও গ্রিগরি চুখরাই—পত্রিকাটির মূল্য বাড়িয়েছে। ফিল্ম পত্রিকার সবথেকে বড় আকর্ষণ চারজন পরিচালকের চারটি চিত্রনাট্য : সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক', তরুণ মজুমদারের 'বালিকাবধূ,' পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্বপ্ন নিয়ে' এবং মারিও মনি চেল্লীর 'ক্যাসানোভা'। তাছাড়া আরও কয়েকটি আলোচনা ও বিপার্টাজ আছে। দেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্রের অনেকগুলি ছবি আছে।

ফিল্ম—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ১০এ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। দাম—দুই টাকা।

●

শারদীয় 'ঢেউ'-এর বিশেষ আকর্ষণ হল বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'কয়েকটি বিদেশী কৃত্রিম লিরিক ফর্ম'। কবিতা লিখেছেন রাম বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, পল্লব সেনগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, রত্নেশ্বর হাজরা, শান্তি লাহিড়ী, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিনোদ বেরা, শংকর চট্টোপাধ্যায়, পুষ্কর দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক। গল্প লিখেছেন রবীন্দ্র গুহ, মানবেন্দ্র পাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অজিত রায়। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ হল 'গৌড়ের চর্যাপদাবলী'। তাছাড়া আরো কয়েকটি আলোচনা আছে।

ঢেউ—সম্পাদক : অজিত রায় ও গৌরাঙ্গ ভৌমিক। ৫বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা-৭। দাম এক টাকা।

●

'সাহিত্য মেলা'র তৃতীয় সংকলন শারদীয়া সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটকে সংখ্যাটি জমজমাট। শান্তি পাল, রণজিৎ দেব এবং অনিরুদ্ধ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা এবং তারেশ দাসের একাংক নাটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্য মেলা : পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ১০১, ঘোষপাড়া লেন কলকাতা—৩৬ থেকে প্রকাশিত। দাম—৭৫ পয়সা।

●

নতুন পরিবেশের শারদীয় সংখ্যাটি নানা কারণে আকর্ষণীয় ও সংগ্রহযোগ্য। প্রবন্ধ লিখেছেন ও আলোচনা করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণবরঞ্জন রায়, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম সোম, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, নারায়ণ চৌধুরী, অমিয় চক্রবর্তী। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন। গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অমল দাশগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, অশোক রুদ্র ও আশা দেবী। কবিতা লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, চিত্ত ঘোষ, মিহির সেন, মানস রায়চৌধুরী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ, রত্নেশ্বর হাজরা, ধনঞ্জয় দাশ, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, রাম বসু, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, প্রসূন বসু, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, সুশীলকুমার গুপ্ত, তরুণ সান্যাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। চিত্ত ঘোষালের নাটক 'মানবতার খাতিরে' বর্তমান সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়।

নতুন পরিবেশ—সম্পাদক : ধনঞ্জয় দাশ ও প্রশান্ত গায়েন। ১৪-সি, ডি এল রায় স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

॥ প্রাপ্তি-স্বীকার ॥

'দীপালিকা'র শারদ সংকলন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রম্যরচনা, সংগীত, হাস্যকৌতুকের সমাবেশে বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

দীপালিকা শারদ সংকলন—প্রধান সম্পাদক : দিলীপকুমার সাহা। প্রকাশস্থান ও দামের উল্লেখ নেই।

'বালার্ক'র শারদ সংকলনে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাছাড়া আছে গল্প, কবিতা ও ছোটদের বিভাগ। পত্রিকাটি সুসম্পাদিত।

বালার্ক—বৈশ্বানর গোষ্ঠী সম্পাদিত। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

●

'আন্তর্জাতিক আঙ্গিকে'র বর্তমান সংখ্যায় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে। চলচ্চিত্রপ্রেমিকদের পত্রিকাটি সংগ্রহ করা উচিত।

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক—সম্পাদক : রণো সরকার ও দ্বিপেন দাস। ১৯০, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬ থেকে প্রকাশিত। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

●

কল্যাণী টাউন ক্লাবের 'আমাদের কথা'য় অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া আছে আরো কয়েকটি রচনা।

আমাদের কথা : সম্পাদক—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কল্যাণী টাউন ক্লাব থেকে প্রকাশিত।

নবজাতক শারদীয়া সংখ্যা। সম্পাদক : নৃপেন্দ্র বিশ্বাস। সারদা পল্লী। ভদ্রেশ্বর। হুগলী থেকে প্রকাশিত।

পরলোকে ডঃ কালিদাস নাগ

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগ ৮ নভেম্বর প্রত্যূষে তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৪ বছর হয়েছিল। তিনি বিধবা পত্নী ও ৩টি কন্যা রেখে গেছেন।

তিনি ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি সিংহলে মাহিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

১৯২৩ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ইতিহাসের লেকচারার হিসাবে যোগ দেন এবং ঐ বছরই তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

রোমাঁ রোলাঁর বন্ধু ডঃ নাগ মহাত্মা গান্ধী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়নে এই মনীষীকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এশিয়ার কয়েকটি দেশ সফরে যান, তিনি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর দেশে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারাদির উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বোম্বের ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ডঃ নাগ রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। চৌদ্দ ।।

ভাড়া কি পড়বে?

দেরি না করে শিশির কাজের কথায় আসে : জানেন তো অবস্থা, সর্বস্ব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। ভাড়ার বিষয়ে কিছু বিবেচনা করতে হবে।

অখিল বলেন, মানুষ ক'জন আপনারা?

সেদিক দিয়ে ঝামেলা নেই। এই যা দেখতে পাচ্ছেন। বাড়তি একটি প্রাণীও নয়। আমরা বাদে আর দুটো বাক্স আছে। গেরস্থালির জিনিসপত্তোর সব কেনাকাটা করে নেবো।
নেবো।

চমক খেয়ে অখিল বলেন, আপনার স্ত্রী আসছেন না?

নেই—

দরদ কাড়বার জন্য জোরগলায় অন্দরকে শুনিয়ে বলে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মারা গেছে। বড় দুর্ভাগা মেয়ে—আমি ছাড়া ত্রিসংসারে দেখাশুনোর কেউ নেই।

মাদুর ছেড়ে অখিল তড়াক করে উঠে পড়লেন : বাড়ির মধ্যে একলা আমার স্ত্রী—দুটো মানুষকে আমি ভাড়া দেবো না। দেখতে তো দিব্যি কাঁচা-কাঁচা—দ্বিতীয় সংসার করে পরিবার নিয়ে আসুন, ঘর আপনাকেই দেবো। অমিতাভর কথা ফেলবো না।

বিরক্ত হয়ে শিশির বলে, ঘর ততদিন ফেলে রাখবেন নাকি?

ততদিন মানে ক'দিন? ধরুন এক হপ্তা। মাসের আর দশটা দিন আছে—অমিতাভর বন্ধু আপনি, তা আপনাদের খাতিরে এই দশটা দিনই না হয় খালি রেখে দেবো। চাল-কেরাসিন জোগাড়ে দেরি হয়—বলি, বিয়ের কনের জন্য তো গ্রামে যেতে হবে না। দশ দিনের বেশি কিসে লাগবে। স্ফূর্তি করে জোড়ে এসে উঠবেন, বউয়ের কাঁখে মেয়ে—আমার স্ত্রীকে বলে রাখব, শাঁখে ফুঁ দিয়ে সে-ই আপনাদের ঘরে তুলবে।

দাসীর উদ্দেশে হাঁক দিলেন : মাদুর তুলে নিয়ে যা রে। কুয়োর পাড়ে রেখে দে এখন, দু-বালতি জল ঢেলে কাল ঘরে তুলিস।

এবং দ্বিতীয় বাক্যের সুযোগ না দিয়ে অখিল ভদ্র পাঁচিলের ভিতর ঢুকে গেলেন।

উঠল শিশির, ঘুমন্ত বোঝা কাঁধে তুলে নিল আবার। নিরর্থক এই এত পথ ঘোড়দৌড় করে বেড়ানো। তবে কুমকুমের বেশ খানিকটা বিশ্রাম হয়ে গেছে। নইলে এত বড় ধকল সয়ে ঐটুকু প্রাণীর ঘুম ভেঙে আর জেগে ওঠার কথা নয়।

রেলস্টেশন কোনদিকে, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। অখিল ভদ্র যে পথ ধরে এসেছিলেন, সেই পথে চলল। সাপের ভয় নাকি খুব—শব্দসাড়া করে যাবার কথা। শিশির চুপিসারে চোরের বেহদ্দ হয়ে চলেছে : মা-মনসা দাও না একখানা মোক্ষম ছোবল ঝেড়ে। এবং দ্বিতীয় ছোবলে মেয়েটাকেও নিয়ে নাও। মরবেই তো তিল তিল করে—তার চেয়ে লহমার মাঝে চলে পড়ুক, সে জিনিস অনেক ভালো।

স্টেশন। আলো, মানুষজন—স্টেশনে এসে গেছে। কুমকুম জেগে পড়েছে, ওয়েটিং-রুমের একটা বেঞ্চিতে তাকে বসিয়ে দিল। দেয়াল-জোড়া নানাবিধ পোস্টার—চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেয়ে তাই দেখছে। এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে মেজাজটা রীতিমত ভালো।

গাড়ির খবর নিল। শিয়ালদা যাবার শেষ-গাড়ি চলে গেছে, আর সেই শেষরাত্রের দিকে, চারটে-বাইশে। শিয়ালদার কোন হোটেলে উঠবে ভাবছিল, সে আশায় ছাই। রাত্রের মতন স্টেশনেই তবে আস্তানা গাড়তে হয়। এবং পেটও তো মানবে না, ইতিমধ্যেই সোরগোল তুলছে।

নীল পোশাক-পরা পয়েন্টসম্যান টিউব-ওয়েল থেকে জল ধরে দু-হাতে দু' বালতি স্টেশনবাবুর বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। শিশির পাকড়াও করল : মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই। তোমাদের স্টেশনে রাত কাটাব।

'ভাই' সম্বোধনে লোকটা আপ্যায়িত হয়েছে। বালতি ভুঁয়ে নামিয়ে দাঁড়াল : বেশতো—

শিশির বলে, হোটেল আছে কাছাকাছি?

লোকটা ঘাড় নেড়ে দেয় : গাঁ-গ্রাম জায়গা—বাড়ি ছেড়ে কে এখানে হোটেলের ভাত খেতে যাবে?

চুলোয় যাকগে। উপায় ঠাউরে ফেলেছে শিশির, ভাতের আর পরোয়া করে না। কলকাতায় আসার সময়কার অভিজ্ঞতা। একটা স্টেশনে লোভে পড়ে সিঙাড়া খেয়েছিল। একখানি মাত্র। তাতেই হল। রাতের মুখো কুটোগাছটি দাঁতে কাটার অবস্থা রইল না। সারাক্ষণ চোঁয়াঢেকুর উঠেছে, পেট আকণ্ঠ ভরাত, মনে হচ্ছিল। খাসা জিনিস এই সিঙাড়া। বিস্তর গরিবগুরবো চলাচল করে, তাদের বিষয় বিবেচনা বলে মহাশয় রেল-কোম্পানি খাবারওয়ালাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। মাত্র দু-পয়সা মূল্যের বস্তুটি গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেই পুরো দিবারাত্রির মতো নিশ্চিন্ত। সিঙাড়া এই স্টেশনেও দেখা যাচ্ছে, তবে আর ভাবনা কিসের?

ভাত না-ই হল। শোওয়ার ব্যবস্থা হতে পারবে তো?

উৎসাহভরে লোকটা বলে, খুব—খুব। ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং-রুম খুলে দেবো, ইজি-চেয়ারে আরামসে ঘুমোবেন।

দাও তবে ভাই। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ি।

লোকটা হাত পাতল : দুটো টাকা লাগবে। আগাম।

শিশির বলে, টাকা কিসের? রেল-কোম্পানি ঘর বানিয়ে রেখেছে প্যাসেঞ্জারের জন্যেই তো—

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় : ঠিক, প্যাসেঞ্জারেরই ঘর। কিন্তু ঘর আছে তালা-দেওয়া। তালা খুলব আমি, ঝাঁটপাট দেবো, ইঁদুর-আরশোলা তাড়াব, আলো জেবলে দেবো। ঘরের ভাড়া তো চাচ্ছিনে, আমার খাটনির মজুরি। পারেন তো ঐ তালা-দেওয়া ঘরে শুয়ে পড়ুন গে। নিখরচায় হবে।

শিশির বিরক্ত হয়ে বলে, থাক তোমায় কিছু করতে হবে না। স্টেশনমাস্টারকে বলে ঘর খুলিয়ে নেবো।

দাঁত মেলে লোকটা ফ্যা-ফ্যা করে হাসে : তাই বরঞ্চ চেষ্টা দেখুনগে। দু-টাকায় কিন্তু পার পাবেন না। বড়বাবু মানুষ, মস্তবড় ইজ্জত—ও'র হাতে দিতে হলে নিদেনপক্ষে পাঁচটি টাকা।

এমনি সময় 'নাথুরাম—' বলে কে ডাক দিল। লোকটা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, বড়বাবু চেঁচাচ্ছে ফুটনাথের জোগাড় দিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ ভাবতে লাগুন, ঘর বড়বাবুকে দিয়ে খোলাবেন না এই নাথুরামকে দিয়ে। ট্যাঁকের যেমন জোর, সেই মতো ব্যবস্থা। টিপিটিপি খুলে দিতাম আমি, বড়বাবু টেরই পেতো না। টের পেয়ে গেলে

আমার হাতে আর থাকবে না, পাঁচের এক গ'ন্ডো-পয়সা কমে হবে না তখন।

বালতি তুলে নিয়ে নাথুরাম হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। দু-টাকা কে দিচ্ছে, এক টাকাতেই নিশ্চিত রফা হয়ে যাবে। শোওয়ার দায়েও অতএব নিশ্চিন্ত। আর কুমকুমের মেজাজটিও বেশ খাসা। পোস্টারের ছবি দেখছে মুখ-ভরা হাসি। আঁকুপাকু করছে বেঞ্চি থেকে নামবার জন্য, নেমে বুঝি পোস্টারের মানুষ আর পাখি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে।

এর মধ্যে পকেটে হঠাৎ হাত পড়ে চক্ষু কপালে উঠে গেল। নিজে তো সিঙারা চিবোবে, কিন্তু মেয়ের বেলা সেটা হবে না, তার রসদ গোনাগুনতিতে ঠেকেছে একেবারে। মেজাজ শ্রীমতীর এখন ভাল, কিন্তু মন্দ হতে লহমাও লাগবে না, তখন কি উপায়?

উপায় ঐ যে অদূরে দেখা যাচ্ছে—

বেঞ্চি থেকে মেয়ে নামিয়ে দিল, এবং যেটা ভেবেছে—নিমেষে দেয়ালের ধারে চলে গেল সে। দিব্যি হল—নিজ মনে ছবি দেখতে থাকুক, বেঞ্চি থেকে পড়ার ভয়ও রইল না, শিশির অদূরের স্টেশনারি দোকানে ছুটল।

সে দোকানে লজেন্স নেই, অনুকল্পও নেই কিছু। বলে, আটটার গাড়ির মুখে সব খতম। এক এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে এক ডজন দেড় ডজন করে বাচ্চা। স্টক কতক্ষণ থাকে বলুন।

মোড়ের দিকে হাত ঘুরিয়ে দিল: ওখানে দোকান আছে, অন্দুরে কেউ যায় না, ওরা দিতে পারবে।

চলল শিশির দ্রুতপায়ে। মোড় কিছুতে আসে না। মোড় মিলল তো দোকান আরও খানিকটা এগিয়ে। এত রাত্রে বন্ধ হবার মুখ এবার। লোকজন সব চলে গেছে, এক দরজা মাত্র খোলা। মালিক একাকী দিনের হিসাব মেলাতে গলদঘর্ম হচ্ছে। লজেন্সের ফরমাস তার মধ্যে অতলে তলিয়ে যায়।

শিশিরের দিকে মুখ তুলে মালিক শুধায়: কি আপনার? শুনে নিয়ে ঘাড় কাত করে: দিচ্ছি—। পরক্ষণেই যোগ-বিয়োগের মধ্যে বিস্মরণ হয়ে যায়। মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা: কি চাইলেন? ও, হ্যাঁ—

অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে শিশির বলে, ও—হ্যাঁ রাতভোর চলবে নাকি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হল যে!

লজেন্স আর বিস্কুট দু-পকেট ঠেসে বোঝাই করে শিশির ফিরল। তুমুল সোরগোল এদিকে স্টেশনে: কার বাচ্চা—বাচ্চা ফেলে কে পালাল?

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বিস্তর লোক জমে গেছে।

দেখতে হবে না, বসিয়ে দিয়ে চুপিসারে সরে পড়েছে। এ জিনিস আখচার হচ্ছে—পথেঘাটে হাটেবাজারে নর্দমায় আস্তাকুড়ে খইমুড়ির মতো আজকাল বাচ্চা ছড়িয়ে থাকে। গেল-মাসে কলকাতার ডাস্টবিন থেকে জমাদার একটাকে বের করল, বুকের নিচে তখনো একটু ধুকধুক করছে। সেবারে গাড়ির বাঙ্কে মাস তিনেকের এক বাচ্চা পাওয়া গেল, ঘুম পাড়িয়ে কম্বলে জড়িয়ে রেখে নেমে চলে গেছে। এর্কাজবিসনে গিয়ে লাউডস্পীকারে হরদম শুনতে পাবেন: ছোট ছেলে কার হারিয়েছে, অফিসে এসে নিয়ে যান। সারাবেলা গলা ফাটাচ্ছে, কেউ দাবি করতে আসে না। আরে ভাই, সিকিটা আধুলিটা নয় যে ফুটো পকেট গলে পড়ে গেছে। দাবিই করবে তো হারাতে দিল কেন?

স্টেশন জায়গা, নানান ধরনের আজে-বাজে লোক। একজনে বলে, এমন ফুটফুটে মেয়ে গো! কোন প্রাণে ফেলে চলে গেল।

অন্যে বলে, বেওয়ারিশ মাল—নজরে ধরলে নিয়ে নিতে পারো। কিন্তু নিলেই তো হল না—আখের ভাবতে হবে। যা দিনকাল পড়েছে, একটা পাখির বাচ্চা পুষতেও লোকে বিশবার আগুপিছু করে। এ তো হল মানুষের বাচ্চা, ফুটফুটে হোক আর কুটকুটে হোক খাবে সমানই।

ভিড়ের দিকে কুমকুম ড্যাব ড্যাব করে তাকায়। ভয় পেয়েছে। দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপে, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল।

কান্না শিশিরের কানে গেছে। শুনে শুনে এ কান্না মুখস্থ। এক হাজার বাচ্চা একসঙ্গে কাঁদুক, তার মধ্য থেকে কুমকুমের কান্না ঠিক আলাদা করে নেবে। জনতার মন্তব্যও কিছু কিছু কানে যাচ্ছে, দূর থেকে সে চেঁচাচ্ছে: আমার মেয়ে, আমার—আমার—

দুই কনুয়ে ভিড় ফাঁক করে এসে মেয়ে ঝটিতি বুকের উপর তুলে নিল।

চেনা আশ্রয় পেয়ে মেয়ে নির্ভয়ে এবার দুটো তেদুনো জোর দিল। চোখ বুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে কাঁদছে। লজেন্স মুখে ঢোকাল শিশির, অন্য সময়ের অব্যর্থ প্রতিষেধক—থুঃ করে ফেলে দিল মুখ থেকে। লজেন্স ছেড়ে তখন বিস্কুট, তারপর লজেন্স বিস্কুট দুই বস্তু একসঙ্গে। কোন কিছুই কাজে এলো না। মেয়ে কাঁধে তুলে শিশির স্টেশনের এদিক-ওদিক দ্রুত পায়চারি করছে। কপালের উপর চোখের উপর থাবা দেয় আর ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুরে গুঞ্জরণ করে: ঘুম আয় ঘুম আয়—কান্না থামা ওরে হতভাগী মেয়ে। তোর দু'খানি পা জড়িয়ে ধরি। মাথা খারাপ করে দিস নে। ক্ষেপে গিয়ে এর পরে বস্তার মতন লাইনের উপর ছুঁড়ে মারব, মাথা ছাতু-ছাতু হয়ে ঘিলু ছিটকে পড়বে—

কিছুতে কিছু নয়। ঢংঢং ঘণ্টা বাজল এমনি সময়—গাড়ি আসছে। ঘণ্টার আওয়াজ মন্ত্রের কাজ দিল—মেয়ে চুপ। ঘাড় তুলে ফ্যালফ্যাল্ক তাকাচ্ছে ঘণ্টা বাজানোর দিকে। হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল—উল্টোদিকের গাড়ি, শিয়ালদা থেকে যাচ্ছে বনগাঁয়। হৈ-রৈ, ফেরিওয়ালার হাঁকডাক, প্যাসেঞ্জারের ওঠানামা, ইঞ্জিনের ফ্লাশলাইটে দিনমান চতুর্দিকে—কান্নাটান্না এর মধ্যে কোথায় চলে গেছে, অবাক হয়ে দেখছে শিশু। আরও ভাল করে দেখতে পাবে বলে মেয়ে কোলে শিশির রেলিঙের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

হঠাৎ নারীকণ্ঠ: শিশির যেন ওখানে? আরে শিশিরই তো—

মুখ ফেরাল শিশির। মমতা—পূরবীর জেঠতুত বোন। একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। ভারি আমুদে, সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখত। কলকাতার কাছাকাছি কোনখানে মমতার শ্বশুরবাড়ি—শোনা ছিল বটে কথাটা। বিস্তারিত খবর নেয় নি শিশির। নেবার কখনো প্রয়োজন হতে পারে, মনে আসে নি। এই তল্লাটে এসে পড়েছে—মমতা নামে শ্যালিকা সম্পর্কিত একজনেরা কাছাকাছি কোথাও থাকে, ঘুণাক্ষরে কথাটা মনে এলো না।

মমতা অবাক হয়ে বলে, রাতদুপুরে স্টেশনে কেন ভাই?

পূরবী আর মমতা একই বাড়ির মেয়ে—পূরবীর বাপ আর মমতার বাপ বৈমাত্রেয় ভাই। পৃথক হয়ে দুই ভাই পৈতৃক বাড়ির নিজ নিজ অংশ উল্টোমুখো ঘুরিয়ে নিলেন—সদর দরজা একজনের পূর্বদিকে অন্যের পশ্চিমদিকে। মামলা চলছে পাঁচ-সাত নম্বর—বাড়িতে দু-ভায়ের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ—যা-কিছু দেখাসাক্ষাৎ কোর্টের এলাকায়, হাকিমের এজলাশে। পূরবীর বিয়ের সময় দূর দূর জায়গার আত্মীয়কুটুম্ব এলো, কিন্তু মমতার শ্বশুর-বাড়ি একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি দিয়েও জানানো হয়নি। তেমনি আবার দ্বিরাগমনে শিশির-পূরবী জোড়ে এসেছে—পাড়ার সব বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে খাওয়াচ্ছে, কেবল একই বাস্তুভিটায় জেঠশ্বশুরের ঘর থেকে একটি বেলার ডাক পড়ল না।

এই সময়টা দৈবক্রমে মমতা এলো বাপের বাড়ি—গরুরগাড়ি থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে গেল ওবাড়ির বর দেখতে। কারো আহ্বানের অপেক্ষা করে না। গিয়ে পড়ে পূরবীর মা'র সঙ্গে কলহ করে: বিয়ের একটা খবর পর্যন্ত দিলে না কাকিমা। বেশ করেছ—তোমাদের কাজ তোমরা করেছ। আমি তার জন্যে পূরবীর বর দেখব না বলে রাগ করে থাকতে পারি নে। মা পথ আগলে দাঁড়াল, বলে, যাচ্ছিস ঝাঁটা খেয়ে ফিরবি। তা ঐ তো ঝাঁটা রয়েছে কাকিমা, তুলে নিয়ে ঘা কতক দিয়ে দাও। তবু শুনব না কাকিমা, ঝাঁটা খেতে খেতে জামাই দেখব—জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করব।

হাসিখুশি মেয়ে, পূরবীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সেই তখনই তিনটে ছেলে-মেয়ের মা—রঙ্গরসে তা বলে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। জামাই দেখে ফিরবার সময় পূরবীর মা'র হাত দুটো ধরে বলেছিল, পুরুষে পুরুষে লড়ালড়ি, মেয়েদের কোন ব্যাপার নয়। মামলার ঝাঁঝ অন্দরে কেন ঢুকতে দেবে? জামাই যদ্দিন থাকে অন্তত সেই ক'টা দিন রোজ আমি আসব—কেমন? ঘাড় নাড়লে শোনার মেয়ে নই আমি—হ্যাঁ বলে দাও কাকিমা, আর কি করবে।

টানতে টানতে পূরবীকেও এক একদিন নিজেদের ঘরে নিয়ে আসত। খিলখিল করে হেসে বলত, মজাটা দেখিস নি বুঝি? ওদিকে তোর বাবা এদিকে আমার বাবা চোখ পাকিয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখ পাকানোই শুধু—করবার কিচ্ছুটি নেই। ছিলাম ওদের মেয়ে—এখন পরঘরি, পরের ঘরের বউ। নামের শেষের উপাধি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গেছে। একটু গরম কথা বলেছেন কি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি চলে যাবে : বড্ড মন কেমন করছে—। তারপরে আর দেখতে হবে না—হপ্তার মধ্যে গাড়ি নিয়ে বাড়ির দরজায় এসে হাজির। বাবা বলে তবে আর ডরাবো কেন বল।

শ্বশুরবাড়ির সেই ক'টা দিন হাসি-ঠাট্টায় ভরিয়ে রেখেছিল মমতা—বড় শ্যালী হয়ে ছোটবোনের বরের সঙ্গে যতটা মানায়। তারপরেও শিশির কয়েকবার গিয়েছে—মমতাকে দেখে নি, শ্বশুরবাড়িতে ছিল সে তখন। দেখা এতদিন পরে আবার আজ নিশিরাত্রে স্টেশনের উপর মেয়ে কোলে এই অবস্থায়—

কুমকুমকে দেখিয়ে মমতা বলে, পূরবীর মেয়ে?

অশ্রুতে ভেজা-ভেজা গলা। বলে, আহা রে এমন মোমের-পুতুল মেয়ে দুটো দিনও ভাল করে নেড়েচেড়ে গেল না হতভাগী!

হাত পাতল মমতা, আর কী আশ্চর্য—কুমকুম ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। যেন মুকিয়ে ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি একনাগাড় পুরুষ মানুষের সাথেসঙ্গে রয়েছে—স্ত্রীলোকের কোলের আলাদা স্বাদ—স্ত্রীলোক হাত বাড়িয়েছে তো বর্তে গেল একেবারে।

মমতার পায়ের ধুলো নিয়ে শিশির বলে, এমন হয় না বড়দি, অচেনা মানুষ কেউ ওকে নিতে পারে না।

ঘুমটুম কোথায় গেছে মেয়ের, এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নেই। হাসছে, মুক্তোর মতন দাঁত কয়েকটা ঝিকঝিক করছে।

মমতা বলে, অন্তর্যামী কিনা—এরা সব জানে, সব বোঝে। আপন-পর চিনিয়ে দিতে হয় না।

কচি মুখে চুমু খেয়ে বলে, চিনে ফেলেছ আমায়—উঁ? মাসি হই তোমার।

কুমকুমও পাল্টা কি যেন অবোধ্য একটু আওয়াজ করে।

দেখলে? চিনেছে, 'মাসি' বলে ডাকল। তোমরা বোঝ নি, আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি।

তারপর হেসে উঠে মমতা বলে, কিন্তু এটা কি হল ভাই? আমায় গড় করলে, কর্তাটি যে আমার আগায় পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে বাদ দিলে কোন বিবেচনায়?

তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে শিশির কৈফিয়তের ভাবে বলে, ঠিক বুঝতে পারি নি বড়দি। মানে, দেখিনি তো এর আগে।

মমতা তবু রেহাই দেবে না : কী বুঝেছিলে বল তবে। রাত্রিবেলা বড়দি পর-পুরুষ নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে? মস্ত ধারণা দেখছি তো বড়দি'র ওপর।

কোণঠেসা হয়ে পড়েছে শিশির। মমতার স্বামী সুনীলকান্তি কথা ঘুরিয়ে দিল : তুমি এখানে কোন কাজে, সেটা তো জানলাম না।

শিশির বলে, একটা বাড়ির খোঁজে এসে-ছিলাম। হল না। কলকাতায় ফিরব, তা ট্রেন সেই ভোররাত্রের আগে নেই।

মমতা বলে, ট্রেন এক্ষুনি যদি আসে তাহলেও যাওয়া হবে না। পেয়েছি যখন, ছাড়াছাড়ি নেই। বাড়ি আমাদের কাছে। কষ্ট হবে জানি, তাহলেও থেকে যেতে হবে।

(কষ্ট বই কি! স্টেশনে মশার কামড়ে পড়ে পড়ে আরাম করতাম, সেই মহাসুখে বাগড়া দিচ্ছ বড়দি।)

সুনীলকান্তিও জুড়ে দেয় : নিতান্ত বিনয়ের কথা ভেবো না। কষ্ট সত্যিই। কিছু না হোক, না-খাওয়ার কষ্ট। নেমন্তন্ন ফেরত আমরা—খেয়েদেয়ে বাড়ির সব অকাতরে ঘুমুচ্ছে। হয়তো বা মুঠো দুই মুড়ি-চিঁড়ে আর এক গ্লাস জল সেবন করে রাতের মতন শুয়ে পড়তে হবে।

(করুণাময় ঈশ্বর—পচা সিঙাড়ার স্থলে অযাচিত চিঁড়ে-মুড়ি ফলার জুটিয়ে দিলে।)

মমতা বলে, ওর অফিসের বন্ধুর মেয়ের বিয়ে। মাসের এই শনিবারটা অফিস বন্ধ। দুপুরবেলা বেরিয়েছিলাম এখন সেই বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছি। বাড়িতে আছেন আমার বুড়ো শাশুড়ি আর ছেলেপুলেরা সব। আর আমার ননদ আছে, সেও ছেলে-মানুষের মধ্যে পড়ে—

স্টেশনের বাইরে এসে পড়েছে তখন। ওদিক-ওদিক তাকিয়ে মমতা ব্যাকুলভাবে বলে, একটা রিক্সাও তো দেখা যায় না, কি হবে?

সুনীলকান্তি বিশেষ আমল দেয় না : হবে আবার কি! এইটুকু তো পথ—হেঁটে চলে যাব।

মমতা বলে, আমরা না হয় হাঁটলাম—কিন্তু জামাই? জামাই হেঁটে যাবে সে কেমন?

শিশির হেসে বলে, জামাইকে খোঁড়া ভেবেছেন বড়দি। হাঁটিয়ে দেখুন আগে, তারপরে বলবেন। মেয়ে আমায় দিন বড়দি,

আপনার কষ্ট হবে। পাড়াগাঁয়ে মানুষ, বোঝা কাঁধে চলা-ফেরা আমাদের অভ্যাস।

সোনার পদ্ম মেয়ে, তাকে বোঝা বলছ--ছিঃ! পুরবী উপর থেকে দেখছে, মেয়ের হেনস্থা হলে সে কষ্ট পাবে।

মায়ের প্রাণ মমতার—সত্যিই সে চটে উঠেছিল। হেসে পরক্ষণে জিনিষটা লঘু করে নেয় ঃ খুকু, তোমার নিন্দে করছে, বোঝা বলছে তোমায়। আর যেওনা বাবার কোলে—কখনো না। ওমা, চোখ ড্যাবড্যাব করে কেমন তাকিয়ে পড়েছে দেখ। বুড়ো মানুষের মত কান পেতে কথা শোনা হচ্ছে। কী দুষ্টু—কী দুষ্টুরে বাবা! মেয়ে নিতে চাইলে শিশির—নাও না নাও দিকি কেমন পারো!

শিশির হাত পাতল। মেয়ের দৃকপাত নেই, দেখতেই যেন পাচ্ছে না। মুখ গুঁজে পড়ল মমতার বুকে। চাঁদ উঠে গেছে, বড় উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। আপাতত নিশ্চিন্ত শিশির হাসি-গল্পে ওদের সঙ্গে গ্রামপথে চলেছে।

বাড়ি এসে পেঁছিল। পথ সামান্য, আধ মাইলও বোধহয় হবে না। কুসুমডাঙা গ্রাম—শহর হয়ে উঠছে, গাঁয়ের চেহারা তবু আছে বেশ এখনও।

জেগে আছিস রে ভোলা?

দরজায় নাড়া দিতেই বুড়ো চাকর খিল খুলে দিল। বলে, কেউ ঘুমোয় নি, বুড়ি-মা ছাড়া। কুরুক্ষেত্র করছে, দেখ গিয়ে।

হুল্লোড় কানে এল। অন্যদিন কত আগে এরা ঘুমিয়ে পড়ে—আজকে মমতা বাড়ি ছিল না, মজাটা বড্ড জমেছে সেই জন্যে। মানুষের ইদানীং লড়াইয়ের মন-মরজি—ছেলেপুলেদেরও নতুন এক খেলা হয়েছে, লড়াই-লড়াই খেলা। দুই দলে ভাগ হয়ে ঘোরতর লড়াই করছে—রণক্ষেত্র মমতার শোবার ঘর। পাঁচ ছেলেমেয়ে মমতার—উর্মিলাকে বলে গিয়েছিল, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেপুলেদের সঙ্গে সেও শুয়ে পড়বে, হুটোপাটি না করে ঘুমোবে তাড়াতাড়ি। আর ভোলার উপর ভার ছিল, আলো জেলে বাইরের ঘরে জেগে বসে থাকবে। ভোলার কাজ ভোলা ঠিকই করছে, কিন্তু কান্ড দেখ উর্মিলার--

মমতাই তখন আবার ননদের হয়ে বলে, যা বাঁদর ছেলেমেয়ে—সামলানো সোজা নয়। আমিই বলে হিমসিম খেয়ে যাই—এক ফোঁটা পিসিকে ওরা গ্রাহ্য করে কিনা!

সামলাবে কি—উর্মিই তো পালের গোদা। সেনাপতি এক পক্ষের। তুমুল বিক্রমে মার-মার রবে অস্ত্র নিয়ে শত্রুদল আক্রমণ করেছে। অস্ত্র পাশবালিশ এবং শত্রু হল জয়া, কেয়া আর পুনু অর্থাৎ পুণ্যব্রত—মমতার বড় ও মেজ মেয়ে এবং ছোট ছেলে। উর্মির দলে অন্য দুটি—বড় ছেলে দেবু অর্থাৎ দেবব্রত সর্বশেষ মেয়ে স্বপ্না। অস্ত্রের পিটুনি খেয়ে শত্রুপক্ষ রণক্ষেত্র থেকে পিঠটান দিয়েছে — একেবারে ঘরের বাইরে। ঠিক এমনি সময়ে মমতারাও সেই বারান্ডায়—

না ঘুমিয়ে লড়াই এখন রাত দুপুরে?

রণক্ষেত্রে সেনাপতি পিছনে থাকে, এদের আইনটা ভিন্ন। আক্রমণে সকলের আগে স্বয়ং সেনাপতি। সেনাপতি উর্মিলা। শত্রু-তাড়নার ঝোঁকে দাদা ভাজ ও আগন্তুক কুটুম্বমানুষটির সামনা-সামনি একেবারে। হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণের মেয়ে—আঁচল ফেরতা দিয়ে কোমরে বেঁধেছে, ঝুটি করে চুল বাঁধা, কাঁচের চুড়িগুলো খুলে রেখে দু-হাতে মাত্র দুগাছা গালার চুড়ি। স্বদেশী জেনানা রেজিমেন্ট হলে সেনাপতির সাজ-সজ্জা এমনি প্যাটানের হবে নিশ্চয়। ভোলা দরজা খুলে দিয়েছে, কথাবার্তা হল ভোলার সঙ্গে—সংগ্রামরত অবস্থায় এই সব সামান্য ব্যাপার কানে যাবার কথা নয়। থমকে দাঁড়িয়ে উর্মি জিভ কাটে।

তার উপরে মমতার টিপ্পনী ঃ রণ-রঙ্গিণী সেজেছ ঠাকুরঝি—কুটুম্বকে ধরে নিয়ে এলাম, ভয় পেয়ে না পালায়।

উর্মিলা চকিতে এক নজর শিশিরের মুখ চেয়ে ছুটে পালাল। সৈন্য সামন্তরাও যাচ্ছিল, মিনতির কোলে কুমকুমকে দেখে লুব্ধভাবে ঘুরে দাঁড়ায়।

জয়া বলে, কোথায় পেলে ওমা? আমি একটু নেবো, আমার কোলে দাও।

জয়ার পিঠোপিঠি দেবু। বয়সে ছোট হলেও বেটাছেলে। সেই কর্তৃত্বে জয়াকে হঠিয়ে দেয় ঃ তুই নিবি কিরে! একটা পাশ-বালিশ নিয়ে টলমল করিস—তোর জন্যেই তো হেরে মরলাম। আমায় দাও মা—

দাবীদার সব কটি, পাঁচ ছেলেমেয়ের কোনটি বাদ নেই। এমন কি তিনবছুরে মেয়ে স্বপ্নাও দেখ ঐ গুটিগুটি হাত বাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণকাল পূর্বে প্রচন্ড লড়াই হয়ে গেছে—জওয়ান-জওয়ানী-দের এখনও সেই লড়াইয়ের মেজাজ। কুমকুমের দখল নিয়েও দ্বিতীয় লড়াই বেধে যাওয়ার উপক্রম। এ হাত ধরেছে তো ও ধরেছে পা—বাহ্ কেটে মমতা সরে সরে যায় তো ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে মাকে ঘিরে ধরে আবার। কুমকুম মেয়েটাও বড় কম পাত্র নয়—দিব্যি মজা পেয়ে গেছে, হাসে কেমন খুটখুট করে।

(ক্রমশ)
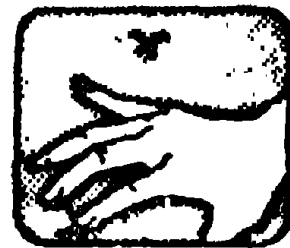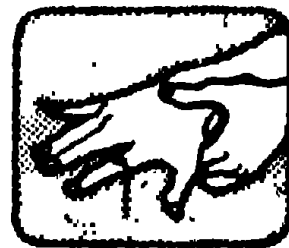
দেশে বিদেশে

আবার আকাল ?

আর একটা অজন্মার বৎসর। আবার অন্নাভাব, আবার মার্কিন গমের জাহাজের দিকে চোখ আর উদরে হাত।

এবং সম্ভবত গত খন্দের চেয়ে এই খন্দে কঠিনতর পরিস্থিতি। কেননা, খরা সত্ত্বেও গতবার কিছু উদ্বৃত্ত ফসল হাতে ছিল—পূর্ববর্তী বৎসরের উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্ত ফসল। এবার একেবারে শূন্য ভাণ্ডার।

স্বয়ং ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচিদাম্বরম সুব্রহ্মণ্যম দেশের খাদ্য পরিস্থিতির এই আশাহীন চিত্র এঁকেছেন। গত ১ নভেম্বর পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই তাঁর বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "আগামী বৎসরে কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে" এবং "প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করার প্রয়োজন হবে।"

অথচ মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও এই সুব্রহ্মণ্যম মহাশয়ই বোম্বাইয়ের এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "এই বৎসর ফসলের পরিস্থিতি আশাপ্রদ।......আগামী বৎসর খাদ্য আমদানী কম হবে—এই বৎসরের ১ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের স্থলে ৫০—৬০ লক্ষ টনের বেশী নয়।"

দেখতে দেখতে এই আশা নিরাশায় পরিণত হয়ে গেল এবং আজ নয়াদিল্লীর কর্তারা দেশবাসীকে সামনের বৎসরের জন্য একটা ঘোরতর খাদ্য পরিস্থিতির হুঁসিয়ারী দিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছেন।

প্রকৃতপক্ষে, নয়াদিল্লী নিজেই সম্ভবত এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম ও তাঁর দপ্তর যখন সতর্ক আশায় বুক বাঁধছিলেন তখন অকস্মাৎ যেন একটা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের সংবাদ তাঁদের সকল আশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল।

অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন উঠবে, খরাতে যদি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফসল জ্বলে গিয়ে থাকে, তাহলে একেবারে ফসল ওঠার মুখে-মুখে দিল্লী সেই সংবাদ পেয়ে আঁতকে উঠল কেন ?

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিহার ও উত্তর প্রদেশে সফর করে গেলেন। একমাত্র মুঙ্গেরের জনসভায় সামান্য একটি উল্লেখ ছাড়া সংবাদপত্রে এমন কিছু বেরোয় নি যার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী এই দুটি রাজ্যে অনাবৃষ্টির সর্বনাশা রূপ দেখেছেন অথবা সেটা তাঁর গোচরে আনা হয়েছে।

এদিকে, নয়াদিল্লীতে সে সময় সংবাদ কি ?

তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। সংবাদের সূত্র—খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংবাদ—"সুফলন হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে যে ভাল ফলন হয়েছিল তাতে ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টন ফসল পাওয়া গিয়েছিল। এই বৎসর ফসলের পরিমাণ আরও বেশী হতে পারে।"

তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। সংবাদের সূত্র—কৃষি মন্ত্রণালয়। সংবাদ — "খরিফের ফলন সাড়ে নয় কোটি টন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।"

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে এর্নাকুলমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হল। বিহার ও উত্তর প্রদেশের খরা-জ্বলা খেতের খবর সেখানে পৌঁছল না। আগামী নির্বাচনের জন্য ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে যখন প্রতিনিধিরা আলোচনায় ব্যস্ত তখন তাঁদের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে উঠে আসন্ন দুর্দিনের আভাস দিলেন না।

ইতিমধ্যে কুহকিনী আশা ক্রমাগত দিল্লীর কানে মন্তর দিয়ে যেতে থাকল—আসছে বছর বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক করা যাবে।

এদিকে, ২ অক্টোবর তারিখের "নিউ-ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার সাপ্তাহিক সংখ্যায় উত্তর প্রদেশের একটি অখ্যাত গ্রামের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এক পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশ করে লেখা হল, "উত্তর প্রদেশ রাজ্যের এই অংশে সাধারণতঃ যেখানে ৩৭ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় সেখানে বৎসরান্তে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ১১ ইঞ্চি। এতে গ্রামের সরু, আঁকাবাঁকা পথের উপর খড়ির গুঁড়োর মত মিহি ধুলোর আস্তরণ শুধু ভেজে। এইবারকার বর্ষাও নৈরাশ্যজনক হয়েছে।...এটা বসেরা গ্রামের পরীক্ষার সময়।...আগামী কয়েক সপ্তাহেই এই বৎসরের বর্ষার জোর পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগামী ফসলের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যাবে।"

কিন্তু ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে নয়াদিল্লীর ভবিষ্যদ্বক্তাদের আশার বাণী ছাপিয়ে এই দুর্দিনের দুঃখাভাব ফুটে উঠতে আরও সপ্তাহাধিক সময় পার হয়ে গেল।

১২ অক্টোবর তারিখে প্রথম লখনৌ থেকে সরকারীভাবে বলা হয় যে, উত্তর প্রদেশে এবার যে দারুন খরা দেখা দিয়েছে এমন ভয়ংকর খরা আর কখনও হয় নি। বলা হল যে, উত্তর প্রদেশের ৫৪টি জেলার মধ্যে ৪১টিই অনাবৃষ্টি-পীড়িত এবং ৭৫ হাজার গ্রামের প্রায় ছয় কোটি মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং অনুমান ১১০ কোটি টাকার খরিফ ফসল নষ্ট হয়েছে।

এই সরকারী বিবরণে আরও বলা হল যে, এই জেলাগুলিতে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অনাবৃষ্টি চলছে। স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে সেপ্টেম্বর মাসে ১৭৯ মিলিমিটার বৃষ্টি হওয়ার কথা, সে-জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫১ মিলিমিটার।

অথচ, আশ্চর্য এই যে, এই সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ দিন পরেও পুণাতে আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা তাঁদের বিবৃতিতে এত বড় বিপর্যয়ের আভাস মাত্র দিলেন না। ১৭ অক্টোবর তারিখে কৃষি-সংক্রান্ত আবহাওয়াবিদ্যার ডিরেক্টর ডাঃ এম গঙ্গোপাধ্যায় "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস" পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, "এই বৎসর পাঞ্জাবের মত প্রধান খাদ্য উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং এমনকি যে সব অঞ্চলে বৃষ্টির ঘাটতি হয়েছে সে সব অঞ্চলেও গত বৎসরের চেয়ে বেশী সুষমভাবে বর্ষণ হয়েছে। অতএব, গোটা দেশ হিসাবে ধরলে এই বৎসর ফলনের পরিমাণ গত বৎসরের চেয়ে অনেক ভাল হবে বলে আশা করা যেতে পারে।"

কিন্তু এই ১৭ অক্টোবর তারিখেই পুণাতে যখন আবহাওয়াবিদরা এভাবে আশার কথা শোনাচ্ছিলেন তখন দিল্লীতে আসন্ন দুর্দিনের ছায়াপাত হচ্ছিল। ঐ তারিখেই সুব্রহ্মণ্যম সিমলা থেকে আশার-বাণী শুনিয়ে দিল্লীতে ফিরে এলেন। ঐ তারিখেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসল এবং কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্য-নির্বাহক সমিতির বৈঠক বসল। উভয় সভাতেই বিহার ও উত্তর প্রদেশের অনাবৃষ্টি-পীড়িত অঞ্চলগুলির জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হল। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বললেন যে, বিহার ও উত্তর প্রদেশ ঐ সঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজস্থানের কতকগুলি অঞ্চলেও খরা হয়েছে। একটি বিবৃতিতে তিনি বললেন, "আসছে বছর খাদ্য পরিস্থিতি সামলান আরও কঠিন হতে পারে।"

দিল্লী যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে চোখ মেলে সামনে ভূত দেখে শিউরে উঠল।

খাদ্য আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক করার আশা অন্তর্হিত হয়েছে। ৩ নভেম্বর তারিখে লোকসভায় শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, চলতি বৎসরের মত সামনের বৎসরেও ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হতে পারে। তিনি বলেছেন, যদিও আমদানী করা কঠিন হয়ে পড়ছে তথাপি "দেশকে আরও বেশী খাদ্য আমদানীর উপর নির্ভর করতেই হবে।"

[ইতিমধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জেলায় এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার কতক অংশে দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে ৩০ লক্ষ মানুষ দুর্গত হয়ে পড়েছেন।]

আর একটি অজন্মার এই সংবাদ অত্যন্ত শোচনীয় তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ক্ষুধা ও আমাদের আপন চেষ্টায় খেতের ফসল বাড়ানোতে আমাদের অক্ষমতা এমনকি আমেরিকার অফুরন্ত উদ্বৃত্ত ফসলের ভাণ্ডারেও টান ধরিয়েছে। পি এল-৪৮০-র যা কিছু সঞ্চয় ছিল অক্টোবর মাসেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার ভিক্ষাপাত্র হাতে বেরোতে হবে। ইতিমধ্যে বিদেশে খাদ্য পাঠাবার ব্যাপারে আমেরিকার নূতন আইন তৈরী হচ্ছে। এই আইন যদি

[illegible] হয় তাহলে আর ভারতীয় টাকা দিয়ে মার্কিন গম কিনে আনা যাবে না, মার্কিন ডলার গুনে দিয়ে মার্কিন গম নিয়ে আসতে হবে। যদি আমেরিকার ভাণ্ডারে থাকে তাহলেও এই বিপুল পরিমাণ খাদ্য নিয়ে আসার মত ডলার আমরা কোথায় পাব? আর যদি খাদ্য আনতেই যদি আমাদের সব ডলার ফুরিয়ে যায় তাহলে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার খরচ মিটবে কি করে?

সুতরাং, আপাতত সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বৈষয়িক প্রসংগ

বিদেশের দরজায় ধর্না

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এর্নাকুলম অধিবেশনে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার সম্পর্কিত বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বৈদেশিক সাহায্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে, কিন্তু আত্ম-নির্ভরতার পথ খুব সহজ নয়।"

প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলি মুখ্যত বৈদেশিক সাহায্যের সমালোচকদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল। কিন্তু এই কথা-গুলি যে একটি নিষ্ঠুর সত্যকে চমৎকার-ভাবে প্রতিফলিত করবে তা কি তিনিই তখন জানতেন?

ছ' মাস হয়ে গেল ভারতের চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা জানতেই পারলাম না ঠিক কি পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য আগামী পাঁচ বছরে আমরা পেতে পারি। অথচ মোট ৪ হাজার কোটি টাকার (মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ববর্তী হিসেবে) বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে এটা ধরে নিয়েই চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। যদি সময়মত সাহায্য না পাওয়া যায় কিংবা যদি সাহায্যের পরিমাণ আশানুরূপ না হয়, তাহলে পরিকল্পনার রূপায়ণ বিশেষ রকমে ব্যাহত হবে।

ইতিমধ্যেই সে রকম আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, কয়েকটি, বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত অনুমান ব্যর্থ হওয়ায় সরকার চতুর্থ পরিকল্পনার আকার কিছু ছাঁটকাট করবার কথা ভাবছেন। অর্থ-মন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী ৩ নভেম্বর লোক-সভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তার থেকেও কোন আলোর নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন, 'এড ইন্ডিয়া' কনসর্টিয়াম সম্ভবত ১৯৬৭ সালের প্রথম তিন মাসের কোন এক সময়ে মিলিত হবে। তাঁর আশা, চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ যাতে আগামী আর্থিক বছর থেকে ভালোভাবে সুরু করা যায়, তার জন্যে সাহায্যকারী দেশগুলি সময় থাকতেই সাহায্যের পরিমাণ জানিয়ে দেবে। হয়ত দেবে। কিন্তু যদি দেয়ও, তাহলেও আসল কথাটা এই থেকে যাচ্ছে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরটি বৃথাই যাবে।

এখন পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের যে সব প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে আছে রাশিয়ার ১০০ কোটি রুবল, হাঙ্গেরীর ২৫ কোটি টাকা, যুগোশ্লাভিয়ার ৬০ কোটি টাকা, সুইজারল্যান্ডের সাত কোটি ফ্রাঁ, ডেনমার্কের তিন কোটি ক্রোনার ও সুইডেনের দু' কোটি ৪০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনার। কিন্তু এই সব প্রতিশ্রুতির দ্বারা খুব বেশি ইতরবিশেষ কিছু হচ্ছে না, কারণ ভারতের বৈদেশিক সাহায্যের প্রধান অংশটাই আসে ভারত সাহায্য সংস্থার অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে। এদের মধ্যে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বড় অংশীদার।

সেই দেশগুলির কাছ থেকে এখন পর্যন্ত কেবল ১৯৬৬-৬৭ আর্থিক বছরের জন্যে ৯০ কোটি ডলারের পরিকল্পনা-বহির্ভূত সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান যদিও সাহায্য-কারী দেশগুলির পক্ষে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, ঐ ৯০ কোটি ডলার বর্তমান বছরের মধ্যেই পাওয়া যাবে, তবু এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৬ কোটি ডলার সম্পর্কে ব্যবস্থাদি চূড়ান্ত হয়েছে। বাকীটা এখনও অনিশ্চিত।

কিন্তু এর চাইতেও অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তা রয়েছে পরিকল্পনা বাবদ সাহায্যের বেলায়। সাহায্যকারী দেশগুলি এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্যই করছে না। তার মধ্যে আবার বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকার পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগে বিশ্ব ব্যাংকই সাহায্যকারী দেশ-গুলিকে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত করে সাহায্যের পরিমাণ বলিয়ে নিত এবং সেটাই হত চূড়ান্ত। কিন্তু এখন বিশ্ব ব্যাংক একটা ক্লিয়ারিং হাউস হিসেবে কাজ করবে; অর্থাৎ কোন দেশ কতটা সাহায্য দিতে পারবে সেটা জেনে নিয়ে ভারতকে জানিয়ে দেবে, তারপর ভারতকেই অগ্রসর হয়ে ঐ দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। এই রকম ব্যবস্থার যেটা সবচেয়ে অসুবিধা সেটা হল, এইভাবে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা শেষ করতে করতে অনেক সময় চলে যাবে। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদিও সম্প্রতি এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁরা যতদূর সম্ভব তাঁদের আগের ভূমিকাই পালন করে যাবেন, তবু তাঁদের উৎসাহ যে আর আগের মত সক্রিয় থাকবে না এ রকম সন্দেহ করার কারণ আছে।

এখন পর্যন্ত যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে নভেম্বর মাস নাগাদ সাহায্য-কারী দেশগুলি একটা বৈঠকে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে গবেষণা করার মত কোন ভিত্তিই এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভারতের এই অসহায়তার সত্যি কোন তুলনা নেই। সাহায্যের প্রত্যাশায় বিদেশের মুখ চেয়ে এইভাবে বসে থাকার মধ্যে ভিখিরির লজ্জা আছে, কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় নেই, কেননা গত তিনটি পরি-

কল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরতা ধাপে ধাপে বেড়ে গেছে (প্রথম পরিকল্পনায় ছিল ১৯৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯২৭ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ২,৬৫০ কোটি টাকা)। এখন উন্নয়নের গোটা স্ট্র্যাটেজিটাই না পাল্টিয়ে বৈদেশিক সাহায্য বর্জন করে চলা এই মুহূর্তে একেবারেই অসম্ভব।

পশ্চিমী দেশগুলির এই আকস্মিক অনীহা সত্যিই বিস্ময়কর। কিছুদিন আগে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের বোর্ডের গভর্ণর মিঃ শেরম্যান মাইজেল যদিও বোম্বাইয়ে বলেছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কারণে মার্কিন বৈদেশিক সাহায্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দেশের ভেতর থেকেই রাজনৈতিক চাপ আসছে। কিন্তু একথা বিশ্বাস করবার খুব বেশী কারণ নেই, কেননা বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, গত বছর মার্কিন অর্থনীতি আগের চাইতে অনেক বেশী হারে বিকশিত হয়েছিল। সুতরাং এই অনীহার পেছনে একটা রাজনৈতিক কারণ যদি কেউ খুঁজতে যায়, তবে হয়ত খুব ভুল করবে না। পশ্চিম জার্মানীতে রাজনৈতিক চরিত্র দেখে সাহায্য দেবার জন্যে বিভিন্ন মহল থেকে ইতিমধ্যেই সোচ্চার দাবী উঠেছে।

অন্তত বিশ্ব ব্যাঙ্কের ঐ রিপোর্টের পর সাহায্যকারী দেশগুলির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা সংশয় পোষণ না করে পারা যায় না। গত ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে স্বচ্ছল দেশগুলির সাহায্যদানের গতি-প্রকৃতির একটা বিষণ্ণ চিত্র আঁকা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঐ দেশগুলির উন্নয়নের কাজ গত পাঁচ বছর যাবত অচল হয়ে রয়েছে, কেননা শিল্পোন্নত দেশগুলির সমৃদ্ধি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেলেও তাদের বৈদেশিক সাহায্যের হার গত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় বাড়েইনি। এবং অদূর ভবিষ্যতে দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

এটা খুবই দুঃখের কথা, কেননা প্রধানত এই শিল্পোন্নত দেশগুলির ভরসাতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এই দশককে 'উন্নয়নের দশক' নামে চিহ্নিত করে। এদের প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করেই ১৯৬১ সালে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (O E C D) স্থাপিত হয়। ঠিক হয়েছিল সমৃদ্ধ দেশগুলি তাদের জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলির সাহায্যের জন্যে আলাদা করে রাখবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেবল ফ্রান্সই তার প্রতিশ্রুতি পালন করে চলেছে। বাকী সকলেই তাদের কথা রাখবার ব্যাপারে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে, ১৯৬১ সালেও সাহায্যকারী দেশগুলি যেখানে তাদের মিলিত জাতীয় আয়ের প্রায় ০·৮ শতাংশ সাহায্য হিসেবে দিত, সেখানে ১৯৬৫ সালে ঐ হার কমে গিয়ে ০·৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সাহায্যদানের শর্তাবলীও সেই অনুসারে কঠোর হয়ে এসেছে। ১৯৬৪ সালে সুদের হার যেখানে ছিল ৩ শতাংশ, ১৯৬৫ সালে তা বাড়িয়ে ৩·৬ শতাংশ করা হয়।

সাহায্যদানের ব্যাপারে এই কড়াকড়ি এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভূমিকার ক্রম-অবস্থায় এই বি-সম দুনিয়ার অর্থনৈতিক বাস্তবতার চিত্রটিকে অত্যন্ত স্পষ্ট আলোকে উদ্ভাসিত করছে। কিন্তু তবু পশ্চিমের বিবেকের জন্যে নিষ্ফল আক্ষেপ করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। এটাই আজকের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সত্য। ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনায় সাহায্যের ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলির টালবাহানা এই সত্যকেই নতুন করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

এই সত্য থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করা উচিত। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা যে একটা দেশের অর্থনীতিকে কতদূর অসহায় করে ফেলতে পারে সেটা এর পর আমাদের বোঝা উচিত। এবং এটাও জানা উচিত যে, যখন স্পষ্টতই ঐ সাহায্যকে অন্য কিছুর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন ঐ সাহায্য নেওয়া নৈতিক দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়।

৩১ অকটোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর দিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রীটস্থ সর্দারজীর প্রতিমূর্তির সম্মুখে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। দিল্লী নাগরিক সমিতির একজন সদস্য প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করেন।

আমার জীবন
মধু বসু

(৩৮)

মিস্টার পালের কাছ থেকে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ আমি টেলিগ্রাম পেলাম—তাতে তিনি লিখেছেন অবিলম্বে দিল্লী রওনা হবার জন্যে। তিনি আমার জন্যে সকলকে বলে কয়ে বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

আমিও আর কালবিলম্ব না করে দিল্লী রওনা হয়ে গেলাম। দিল্লীতে গিয়ে উঠলাম রেস কোর্স রোডে সেজদির বাড়ীতে। ব্রজেন্দ্রদা (স্যর বি এল মিত্র) তখন ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল। তখন দিল্লীতে ছিল ফেডারেল কোর্ট—সুপ্রীম কোর্ট তখনও হয়নি।

ওখানে পৌঁছে মিঃ পালের সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন যে, ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং-এর সেক্রেটারী মিঃ পি এন থাপারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে তাঁর কথা-বার্তা হয়েছে এবং তিনি আমাকে বিশেষ ধরনের কাজ দিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিমূলক ছবি তৈরী করার কাজ।

পরদিন সকালে মিঃ পাল আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ পি এন থাপারের কাছে। প্রথম আলাপেই আমাদের দুজনের দুজনকে বেশ ভাল লাগল। তিনি আগেই আমার রাজনর্তকী (হিন্দী) ও Court Dancer (ইংরাজী) দেখেছিলেন। দুটি ছবিরই তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন—বিশেষ করে ইংরাজী সংস্করণের। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে অনেক কথা হল। আমি বললাম, আমাদের দেশে যে সব ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য আছে—সেগুলির এক-একটি ধারাকে নিয়ে যদি ১ রীল করে এক-একটি ছবি করা যায়—যেমন 'কথাকলি', 'কত্থক', 'মণিপুরী' ও 'ভারত-নাটাম' এবং ভারতীয় লোকনৃত্য—এগুলির বিশেষ আকর্ষণ আছে জনসাধারণের কাছে, আর তাছাড়া দলিল-চিত্র (Documetary film) হিসাবেও এগুলি বহুদিন সংরক্ষিত হতে পারে। তার মূল্যও বড় কম নয়।

যতক্ষণ আমি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে কথা বলছিলাম মিঃ থাপার খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হলে কয়েক মুহূর্ত তিনি কি একটা চিন্তা করলেন, তারপর বললেন: আমি ভেবে দেখলাম মিঃ বোস, আপনার প্রস্তাব মতই বিভিন্ন ধারার নাচগুলি এক রীল করে তুললে ভাল হবে—অর্থাৎ পাঁচটি ধারার নাচের জন্য ৫ রীল।

একজন পাকা আই সি এস অফিসারের মত কথাগুলি তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েই বললেন। তারপর আরও বললেন: অবশ্য আপনার পারিশ্রমিক খুব বেশী হবে না—মানে আপনার মত একজন বিখ্যাত ডিরেক্টারের সাধারণ ফিল্ম কোম্পানীতে যা পাওয়া উচিত এখানে, অর্থাৎ ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়ায় তত বেশী হবে না। তবে আমি চেষ্টা করব যতটা বেশী করা যায়। আর গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের যে হার নির্ধারণ করা আছে সেইটা যাতে আপনি পান তার চেষ্টা করব।

এরপর তিনি জানতে চাইলেন যে দিল্লীতে আমি কোথায় উঠেছি। আমি আমার ভগ্নিপতির ঠিকানা দিলাম। তিনি বললেন যে, ৩।৪ দিনের মধ্যে আমার নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেবেন। আর এই সঙ্গে ইনফরমেশন ফিল্মের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ এজরা মীরকে বোম্বাই-এ আমার বিষয় জানিয়ে দেবেন। এজরা মীর যখন ম্যাডানে ছিলেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। অত্যন্ত অমায়িক এবং চমৎকার লোক ছিলেন এই মিঃ মীর। তাঁর সঙ্গে কাজ আমার ভালই চলবে। মিঃ থাপার আমাকে এও জানালেন যে সংস্কৃতি-মূলক ছবির সব দায়-দায়িত্বর ভার আমার ওপরই থাকবে—অর্থাৎ এ বিভাগে আমি সর্বেসর্বা।

মিঃ থাপারকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। মিঃ পালও আমার সঙ্গে চলে এলেন। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ইম্পিরীয়াল হোটেলে লাঞ্চ খাওয়াতে। খেতে খেতে পুরানো দিনের অনেক কথাই হল—বিশেষ করে গোলাপদার (হিমাংশু রায়ের) কথা। তিনি বলতে লাগলেন, গোলাপদা কত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বম্বে টকীজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর বিরাট মহীরূহে পরিণত হল—ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রনির্মাতাদের একজন বলে স্বীকৃতি পেল— কিভাবে একটার পর একটা ছবি হিট করল। এ স্বীকৃতি হঠাৎ পাওয়া বা ভাগ্যের জোরে পাওয়া নয়। এ যশ, এ স্বীকৃতি অর্জন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, অদম্য সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়েছে—সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হয়েছে গোলাপদার সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি।

গোলাপদার কথা বলতে বলতে মিঃ পালের গলা ধরে এল—চোখে জল চিক-চিক করতে লাগল। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন: কিন্তু গোলাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বম্বে টকীজে ভাঙ্গন ধরল। মাঝ-দরিয়ায় নৌকার হাল ভেঙ্গে গেলে যে অবস্থা হয় বম্বে টকীজেরও এখন সেই অবস্থা। গোলাপ মারা যাবার পর আমিও অবশ্য ছেড়ে দিয়েছি বম্বে টকীজ। এত বড়, এমন সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠানের আজ কি অবস্থা! ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে যেতে বসেছে।...

মিঃ পাল আর বলতে পারলেন না, একটা অব্যক্ত কান্নায় তাঁর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। গোলাপদাকে তিনি অত্যন্ত ভাল-বাসতেন আর তাঁদের বন্ধুত্বও দীর্ঘদিনের। সে ১৯১৮-১৯ সালে মিঃ পালের একখানি নাটক 'দি গডেজ' মঞ্চস্থ করেন গোলাপদা লণ্ডনের এক স্টেজে। তারপর হল ১৯২৪ সালে 'লাইট অফ এশিয়া'। এর চিত্রনাট্য লিখলেন মিঃ পাল এবং এই ছবির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তারপর হল 'সিরাজ', 'থ্রো অফ এ ডাইস' (১৯২৮-২৯ সালে)। সবই মিঃ পালের কাহিনী এবং চিত্রনাট্য। তারপর বম্বে টকীজ প্রতিষ্ঠার পর মিঃ পাল বম্বে টকীজে রইলেন গল্প ও চিত্রনাট্য বিভাগের সর্বময় কর্তা হিসেবে। আজকের বিখ্যাত চিত্র প্রযোজক শশধর মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী এবং কাশ্যপ—এঁরা পরে নামকরা পরিচালক হয়েছিলেন—সবাই ছিলেন মিঃ পালের সহকারীরূপে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। বিখ্যাত অভিনেতা অশোককুমার কি করে অভিনেতা হবার সুযোগ পেলেন তারই ইতিবৃত্ত শুনেছিলাম মিঃ পালের কাছে।

বম্বে টকীজের প্রথম যুগের কথা। 'অচ্ছুৎ কন্যার' আগে 'জন্মভূমি' বলে একখানি ছবি তুলবার সব ঠিকঠাক। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় নামবেন নাজমুল হোসেন ও দেবিকারাণী। কিন্তু কোন কারণে হঠাৎ নাজমুলকে বম্বে টকীজ ছাড়তে হল। এখন সমস্যা দাঁড়াল কে নায়কের ভূমিকা করবে? খুব খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল। অশোককুমার তখন বম্বে টকীজ ল্যাবরেটরীতে কাজ করে। মিঃ পাল গোলাপদাকে বলেছিলেন এই ছেলেটির কথা।

গোলাপদা তাঁর অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন অশোককে। সেখানে গোলাপদা আর মিঃ পাল ছাড়া ছিলেন পরিচালক ফ্রাঞ্জ অস্টেন। মিঃ অস্টেন অশোককে দেখে বলেছিলেন—এতো ভীষণ লাজুক—মুখ তুলে চাইতে পারে না—একে দিয়ে কি নায়কের ভূমিকা অভিনয় করানো যায়? কিন্তু গোলাপদা এবং মিঃ পাল দুজনেই জোর করে তাকে একটা সুযোগ দিতে বললেন। গোলাপদা এমন কথাও বললেন যে, আপনি দেখবেন মিঃ অস্টেন, নাজমুলের থেকে এ অনেক ভাল অভিনয় করবে। নায়ক হিসেবে এ দারুণ জনপ্রিয় হবে।

গোলাপদার সে ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে-বর্ণে সফল হয়েছিল। প্রথম ছবিটা 'জন্মভূমি' অবশ্য খুব একটা কিছু হয়নি কিন্তু তারপরই এলো 'অচ্ছুৎ কন্যা'—(১৯৩৫-৩৬ সালে)। ছবিখানাও যেমন হিট করল তেমনি অশোককুমারের জনপ্রিয়তাও গগন-স্পর্শী হয়ে উঠল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বছর ধরে নায়কের ভূমিকায় অশোককুমার অভিনয় করে আসছেন সমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে—এ একটা অভূতপূর্ব রেকর্ড।

হ্যাঁ—যা বলছিলাম, বম্বে টকীজের কথা! মিঃ পাল ও গোলাপদার অক্লান্ত যত্নে ও চেষ্টায় বম্বে টকীজ গড়ে উঠেছিল—এবং একটার পর একটা হিট ছবি করে ভারতীয় চিত্রজগতকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তখনকার দিনে অচ্ছুৎ কন্যা, কঙ্কণ, বন্ধন, ঝুলা, ভাবী, বসন্ত প্রভৃতি ছবি দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অর্থাৎ চিত্রপ্রদর্শকদের মধ্যে একটা ভীষণ আলোড়ন এনে দিয়েছিল।

এরকম একটা প্রতিষ্ঠানকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে গোলাপদা চলে গেলেন। এ আঘাতটা মিঃ পালের বুকে খুব বেশী রকমই বেজেছিল—সেটা আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান যদি এইভাবে ভেঙে যায় তাহলে তার জন্য, দুঃখ হয় বৈকি। আমারও মনে পড়ল সি-এ-পি'র কথা। কত পরিশ্রমে, কত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে সি-এ-পিকে গড়ে তুলেছিলাম। প্রায় দশ বছর ধরে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংস্থারূপে স্বীকৃতি পেয়ে আজ তার কি অবস্থা! শুধু নাটকেই নয় চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই সি-এ-পির শিল্পীরাই তৈরী করেছে আলিবাবা, অভিনয়, কুমকুম ও রাজনর্তকী এবং প্রথম ভারতে নির্মিত ইংরাজী ছবি কোর্ট ডান্সার। সকলেই একবাক্যে বলত এতগুলি প্রতিভার সমাবেশ একটি সংস্থাতে আর কখনও দেখা যায়নি। অভিনয়ে অহীনবাবু, সাধনা, সুপ্রভা মুখার্জি, বিভূতি গাঙ্গুলী, প্রীতি মজুমদার, মঞ্জু প্রভৃতি। সংগীতে তিমির-বরণ, নৃত্যে—সাধনা, শিল্প-নির্দেশে—সুধাংশু চৌধুরী এবং মঞ্চ ও আলোক নিয়ন্ত্রণে গীতা ঘোষ। এরা ছিল যেন একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের অংশ। এ প্রতিষ্ঠানও ভেঙ্গে গেল!

মিঃ পাল স্বভাবতই একটু ভাবপ্রবণ লোক ছিলেন। তাঁকে এরকম ভেঙ্গে পড়তে দেখে আমি বললাম : আমি বুঝতে পারছি আপনি গোলাপদার মৃত্যুতে এবং বম্বে টকীজের ভাঙ্গনে খুবই আঘাত পেয়েছেন......তবে আপনি আর কি করবেন বলুন—

মিঃ পাল আমায় বাধা দিয়ে বললেন : আমি জানি মধু, তুমি আমার মনের ভাব বুঝতে পারছ, যেমনি আমি পারছি তোমার সি-এ-পি ভেঙ্গে যাওয়ার বেদনা। নিজের হাতের তৈরী প্রতিষ্ঠানের এইভাবে অপমৃত্যু হলে সত্যিই দুঃখ লাগে মধু। থাক...ভেবে আর কি হবে—

এরপর আমরা লাঞ্চ খাওয়া শেষ করে বিদায় নিলাম। বিদায় নেবার সময় মিঃ পাল আমার এই পদপ্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : আমি জানি মধু, তুমি এই নতুন চাকরীতে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছ না। তবে আমি বলছি যে আই এফ আই-তে কাজ করে তুমি আনন্দ পাবে। কারণ আজকের বোম্বায়ের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আগেকার চিত্রশিল্পের অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। এখন এখানে যত ভুঁইফোঁড়দের রাজত্ব। এরা না বোঝে সংস্কৃতি, না বোঝে শিল্প, না বোঝে নাটক। এসব কথা তোমাকে আগেও বলেছি—এদের সঙ্গে তোমার বনবে না। এরা চেনে শুধু টাকা। এরা মনে করে ছবিতে 'স্টার' থাকলেই ছবি হিট করবে। নিজেদের নতুন কিছু দেবার ক্ষমতা নেই—শুধু জানে অপরকে ভাঙ্গিয়ে খেতে। এরাই হল আজকের প্রোডিউসার। সুতরাং তুমি আর এ নিয়ে মন খারাপ করো না। তার চেয়ে আই এফ আই-তে বেশ শান্তিতে কাজ করতে পারবে। এর জন্যে তুমি আমাকে একদিন ধন্যবাদ দেবে।

আমি বললাম : সে তো আমি এখনই দিচ্ছি।

মিঃ পাল হেসে বললেন : আর তাছাড়া তোমার তো দেশ-বিদেশ ঘোরার একটা ভীষণ নেশা আছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাচ তুলতে গেলে সব দেশেই তোমায় ঘুরতে হবে—অর্থাৎ গভর্ণমেন্টের পয়সায় দেশ ভ্রমণ হবে—ছবিও হবে। দেখবে, জীবনে অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে।

আমিও ভেবে দেখলাম মিঃ পালের কথাই ঠিক। যাই হোক, মিঃ পালকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

সেজদির বাড়ীতে বেশ আদরে-যত্নে এবং শান্তিতে ছিলাম। এই পরিবেশে থেকে মানসিক নৈরাশ্য অনেকখানি কাটিয়ে উঠলাম।

৩।৪ দিনের মধ্যেই থাপারের কাছ থেকে নিয়োগপত্র পেলাম। মাহিনা হল ১০০০ু টাকা। মাহিনা ছাড়া সরকারী চাকুরেরা যে সব সুবিধা পেয়ে থাকে—বাড়ীভাড়া, গাড়ীভাড়া ইত্যাদি সেগুলি থেকেও বাদ গেলাম না।

দিল্লীতে এই ক'দিন থেকে শরীর ও মন দুই-ই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। বম্বেতে যখন ফিরে এলাম তখন যেন আমি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

ফিরে এসে বোম্বায়ের তারদেও-তে ইনফরমেশন ফিল্মের অফিসে আমি মিঃ মীরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগেই বলেছি যে মিঃ মীরের সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনিও ইতিমধ্যে আমার নিয়োগ ব্যাপারে খবর পেয়েছেন বেতার এবং তথ্য বিভাগ থেকে। মিঃ মীর আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

এই সময় সাধনার মা এলেন আমাদের ফ্ল্যাটে—সঙ্গে এল সাধনার ছোট ভাই প্রদীপ।

আমি ডান্সেস অফ ইন্ডিয়ার চিত্রনাট্য রচনার কাজ সুরু করলাম। বিভিন্ন ধারার নাচগুলি সম্বন্ধে ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করার জন্য প্রচুর বই কিনলাম এবং রীতিমত পড়াশুনো সুরু করলাম। এর আগে কলকাতা এবং বম্বেতে কয়েকজন দেশবিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর ক্লাসিক্যাল নাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কলকাতায় বালা সরস্বতীকে দেখেছিলাম 'ভারত-নাট্যম' নাচতে। মণিপুর থেকে নৃত্য-শিল্পীর দল এসে মণিপুরী নৃত্য দেখিয়েছিল। বম্বেতে বিখ্যাত 'কথক' নৃত্যশিল্পী লচ্ছু মহারাজকে দেখেছিলাম। সুতরাং প্রায় সবরকম ক্লাসিক্যাল নাচই আমার দেখা ছিল। কিন্তু ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্য বুঝতে হলে প্রত্যেকটি নাচের টেকনিক, মুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। ভারতীয় নৃত্য বেড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। নাচের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নৃত্যশিল্পীকে কঠোর নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। তার সমস্ত পদক্ষেপ অঙ্গ সঞ্চালন, ভাব-ব্যঞ্জনা, মুদ্রা—প্রত্যেকটি জিনিষ শাস্ত্রসম্মত হওয়া চাই—এমন কি সংগীত পর্যন্ত বিশেষ রাগ-রাগিণীকে অবলম্বন করে বাজাতে হবে। শিল্পীর স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা এখানে চলবে না। দর্শকদেরও নৃত্য ও মুদ্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। তাঁরা নৃত্য দেখতে দেখতে যদি মুদ্রা বা অঙ্গ-ভঙ্গীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন তাহলে তাঁরা কিছুতেই সম্পূর্ণ নৃত্যের রস গ্রহণ করতে পারবেন না।

এরকম একটি দুরূহ বিষয়ের চিত্রনাট্য রচনায় যেমন চাই সবরকম নাচ ও তার টেকনিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান—তেমনি চাই সম্পূর্ণ একাগ্রতা। যেসব দিনগুলিতে সাধনার স্যুটিং থাকত সেদিনগুলিতে বেশ নির্বিবাদে বসে আমি পড়তে ও লিখতে পারতাম। কিন্তু যেদিন তার স্যুটিং থাকত না সেদিন সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা হৈ-হল্লা হত। সায়গল একবার গান আরম্ভ করলে সে গান চলতেই থাকত। ও ছাড়া ছিল জ্ঞান দত্ত এবং অন্যান্য কণ্ঠ-শিল্পীরা। গান-বাজনা যত না হত হৈ-হল্লা হ'ত তার থেকেও বেশী।

আমার অফিস ঘরটি ছিল এই ড্রয়িং-রুমের পাশেই—সুতরাং যেসব দিনগুলিতে গান-বাজনার আসর বসত সেসব দিন আর আমার লেখাপড়া বা চিত্রনাট্য লেখা হতো

না। আমি একদিন সাধনাকে এই বিষয় বললাম, কিন্তু কোন ফল হল না।

সাধনা তখন একসঙ্গে দুখানা ছবিতে অভিনয় করছে—টাকাও পাচ্ছে প্রচুর সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই হ'ল। সাধনার বহু স্তাবক এবং তথাকথিত বন্ধু জুটে গেল—এই সব স্তাবকদের অজস্র স্তুতিবাদে সাধনার মধ্যে একটা উচ্ছৃংখলতা বা বেপরোয়া ভাব এসে গেল। যেটা আমি সাধনার ক্ষেত্রে আশা করিনি। এটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছিল। এইসব স্তাবকদের অনেক কথাই আমার কানে আসতে লাগল। এদের ইচ্ছে হ'ল আমি সরে যাই সাধনার কাছ থেকে, যাতে এইসব তথাকথিত বন্ধুর দল সাধনাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসে তার এই প্রচুর রোজগারের সুযোগটা পুরোপুরি গ্রহণ করে। আমি থাকাতে এদের খুব বেশী সুবিধা হচ্ছিল না—কারণ রাত্রি বেশী হলেই আমি গান-বাজনা হৈ-হল্লা জোর করে বন্ধ করে দিতাম। আমার মুখের ওপর কিছু বলতে পারতো না বটে কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম এবং মাঝে মাঝে শুনতেও পেতাম আমার অসাক্ষাতে তারা সাধনাকে উস্কানি দিচ্ছে আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে যাবার জন্য। আমি থাকাতে তারা পুরোপুরি সাধনার ওপর আধিপত্য করতে পারছে না।

প্রায়ই এই নিয়ে খিটিমিটি চলে। একদিন কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠল।

(ক্রমশঃ)
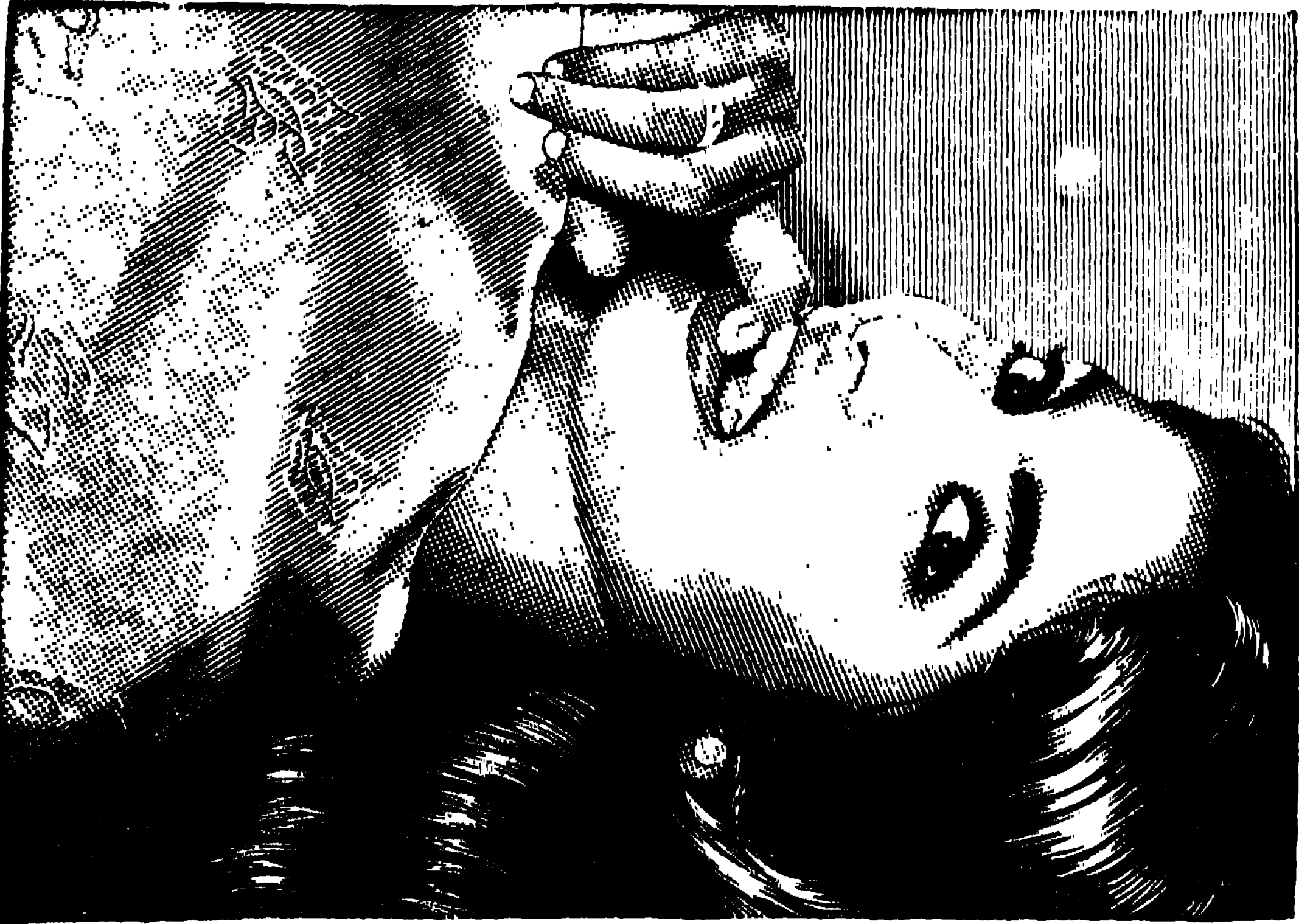
প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা

বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচানো প্রসঙ্গে :

এক সংবাদে প্রকাশ, মহীশূর রাজ্য সরকার ঐ রাজ্যের চিত্র-প্রযোজকদের প্রতিটি কানাড়া ছবির প্রযোজনার জন্যে ৫০,০০০্ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থ সাহায্য করছেন। এ ছাড়া রাজ্যসরকারের অর্থমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেজ ঘোষণা করেছেন যে, ঐ রাজ্যে চিত্র-প্রযোজনাকে উৎসাহ দেবার জন্যে সরকার সম্ভবত সকলরকম সুযোগ-সুবিধা দিতে সব সময়েই তার সাহায্যহস্ত প্রসারিত করবে। যাঁরা ওখানে কানাড়া ছবি তৈরী করতে অগ্রসর হবেন, তাঁদের মহীশূর রাজ্যসরকার চিত্র-প্রযোজনার জন্যে সংরক্ষিত জমি, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং প্রস্তাবিত মূলধনের শতকরা দশ ভাগ অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। রাজ্যে প্রযোজিত বৎসরের তিনটি শ্রেষ্ঠ কানাড়া চিত্রকে যথাক্রমে ৫০,০০০্, ২৫,০০০্ এবং ১০,০০০্ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থাও করেছেন মহীশূর রাজ্যসরকার।

ওপরের সংবাদ থেকে এটুকু বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় না যে, কানাড়া ছবির প্রযোজনা করতে গিয়ে প্রযোজকের যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, এ সম্পর্কে মহীশূর রাজ্যসরকার যথেষ্ট সচেতন। তবুও যাতে কানাড়া ছবি নিয়মিত ভাবে তৈরী হতে পারে, কানাড়া ছবির উৎপাদন যাতে কোনো ক্রমেই বন্ধ না হয়, তারই জন্যে মহীশূর সরকারের এই ব্যবস্থা।

আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রগুলিও ঐ কানাড়া ছবির প্রযোজনার মতোই আজ অধিকাংশ প্রযোজকের পক্ষেই যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি শিল্পসম্মত বাঙলা ছবি তৈরী করতে আজ যে খরচ পড়ে, মাত্র সেন্সার-সার্টিফিকেট পর্যন্ত তার পরিমাণ খুব কম করেও দুই লক্ষ টাকা। জানিয়ে দেওয়া দরকার, ঐ খরচে আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রজগতের একজনও প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয় শিল্পীকে নিয়োগ করা যাবে না; কারণ এঁদের কাউকে নিতে হলে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ বা তারও বেশী তাঁকেই দক্ষিণা দিতে হবে। কাজেই ও-পথে পা বাড়াতে গেলে আরও লাখখানেক বেশী খরচ পড়ে যাবে। এর পরে অন্তত দশটি ছাপ (প্রিণ্ট) ও প্রচার (পাবলিসিটি) বাবদ আরও এক বা দেড় লাখ। অথচ সাধারণ বাঙলা ছবির প্রদর্শনী থেকে এই মোট চার, পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা প্রযোজকের ভাগে ফিরে আসা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই 'প্রতিকারের পথ' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ৪ঠা কার্তিক প্রকাশিত 'অমৃত'-র ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৫ সংখ্যাতে নানা কথার পরে লিখেছিলুম :

'কাল তুমি আলেয়া' চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্তে সুপ্রিয়া দেবী। ফটো : অমৃত

"বাঙলা ছবি যে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করে ভারতের চলচ্চিত্রজগতের প্রতি জগৎবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, সে তার শিল্প-নৈপুণ্যের জন্যে। বাঙালীর সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বাহন রূপে এই বাঙলা চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। এবং সেই কারণেই এই বিশিষ্ট শিল্পটিকে প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্য (সাবসাইডি) দেবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রবীণ পরিচালক দেবকীকুমার বসু।" এই শেষের বাক্যটিতে আমি একটু ত্রুটি করে ফেলেছি। আসলে দেবকীকুমার বসু 'সনির্বন্ধ আবেদন' জানাননি; রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটাণ্ডা-গৃহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বানে

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সভাতে শ্রীবসু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, বাঙলা চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবং প্রতিটি বাঙলা ছবিকে রীতিমত সাবসাইডি দেবার জন্যে দাবী জানিয়েছিলেন।

আজ সরকার বাঙালীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য প্রভৃতি খাতে যেমন অর্থব্যয় করছেন, তেমনই নাটক, নৃত্য, সংগীত, চিত্রাংকন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক চর্চা এবং অনুষ্ঠানেও নানাভাবে অর্থসাহায্য করছেন। চলচ্চিত্রকে আমরা আধুনিক জগতে বাঙালীর সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট বাহন বলে মনে করি। এর মাধ্যমে শুধু যে অভিনয়, নৃত্য, সংগীত ও স্থাপত্য-শিল্পকেই আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি, তাই নয়; বাঙলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাঙালী সংসারের দৈনন্দিন জীবন, বাঙলার শহর ও গ্রাম প্রভৃতি সবকিছুই ধরা পড়ে। এ ছাড়া বাঙলা চলচ্চিত্র পৃথিবীর যে-কোনও দেশে অতিসহজেই প্রদর্শিত হয়ে বাঙালীকে—তার সমাজ ও সংস্কৃতিকে পৃথিবীর অপরাপর জাতির চোখের সামনে তুলে ধরে। এ-কাজ মঞ্চাভিনয়, সংগীতানুষ্ঠান প্রভৃতি অপর কোনো সুকুমারশিল্প দ্বারা সম্ভব নয়। কাজেই বর্তমান জগতে বাঙলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন বাঙলা চলচ্চিত্রকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্বীকার করতেই হবে। এবং ঐ মহীশূর সরকারের মতোই সরকারী সাহায্য (সাবসাইডি), মূলধন নিয়োগ, কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছবিকে আর্থিক পুরস্কার দান, আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত স্টুডিও (প্রয়োগশালা) নির্মাণ, অল্পলাভে পরিবেশন ও প্রদর্শনী ব্যবস্থা-গ্রহণ, বাঙলা ছবির প্রদর্শনীর বাজারকে উপযুক্ত ভাবে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি সকল রকম সাহায্যবিধানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যতশীঘ্র সম্ভব একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

"বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী ব্যবস্থা বাংলার চলচ্চিত্রপ্রযোজকদের দুঃখের অবসান ঘটাতে পারবে কিনা' এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ অমূলক, এই কথা বলে জনৈক পত্রলেখিকা 'অমৃত'র গেল সংখ্যায় প্রকাশিত পত্রমারফত প্রস্তাব করেছেন: 'শুধু বাংলার চিত্রপ্রযোজকদের নয়, সমগ্র বাংলাকে রক্ষা করবার জন্য বাংলাদেশের সকল চিত্রগৃহগুলিকে আইন দ্বারা বাধ্য করতে হবে যাতে তারা প্রতি বৎসর কমপক্ষে ২৬ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখায় এবং protection জাতীয় কর অবাংলা ছবিগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়। আমি মনে করি প্রতি বাংলাভাষী ব্যক্তিরই কর্তব্য 'বাধ্যতামূলক' প্রদর্শনী ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন শুরু করে বাংলার সরকারকে সাহায্য করা।' পত্রলেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই এই উত্তম প্রস্তাবের জন্যে এবং এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে আমার চেয়ে বেশী আর কেউ সুখী হবে না। তবে পশ্চিমবঙ্গ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। কাজেই আইনগতভাবে এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্পর্কে কোনো সংবিধানগত বাধা আছে কিনা তা সংবিধান আইনজ্ঞরাই বলতে পারেন। আর আইন করে ব্যাপক প্রদর্শনীব্যবস্থা সম্ভব হলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ঘোড়াকে টেনে-হিঁচড়ে জলের ধারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও তাকে যেমন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জলপান করানো সুসাধ্য নয়, বাংলার প্রতিটি চিত্রগৃহে বাংলা ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থা করলেও প্রতিটি দর্শকই যে অন্য কোনো ছবি না দেখতে পেয়ে বাংলা ছবি দেখবে বাধ্য হয়ে, এমন কথা হলপ করে বলা যায় কি? না, ওতেই সমস্যার সমাধান হবে না। ঐ সংগে বাংলা ছবির সর্বাত্মক মনোন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাকে শিল্পসম্মত হওয়ার সংগে সঙ্গে জনপ্রিয়ও করে তুলতে হবে। হিন্দী ছবির মতো 'চানাচুর গরমাগরম' করে জনপ্রিয় করবার কথা বলছি না, বলিষ্ঠ কাহিনী, উপভোগ্য অভিনয়, সুষমামন্ডিত কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের সুষ্ঠু সহযোগে ছবিকে আর এবং কালো-সাদা না করে রঙীন বর্ণাঢ্য করে তোলবার কথা বলছি। যথেষ্ট ব্যয় করতে পারা যায় না বলে বাংলা ছবিকে ঠিক উপযুক্ত রূপ দেওয়া সম্ভব না, এটা জানা কথা। কিন্তু সরকারী সাবসাইডি ছবিকে যথার্থ শিল্পরূপ পেতে নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারে।

আর এক কথা। লেখিকা বলেছেন: 'ইংলণ্ডের চিত্রগৃহের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার জন্য আদৌ 'কোটা সিস্টেম' দায়ী নয়।... টেলিভিশনের প্রচণ্ড সাফল্য ও জনপ্রিয়তাই চিত্রগৃহের সংখ্যাহ্রাসের মূল কারণ।'—আমার মনে হয়, দৃষ্টিকে আর একটু সজাগ রাখলে লেখিকা একথা বলতেন না। টেলিভিশন কি সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বী? না, মাত্র সিনেমাতে যে 'ড্রইংরুম ড্রামা' দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রতিদ্বন্দ্বী? যে-নাটককে টেলিভিশন সেটের মধ্যে বন্ধ করা যায়, সেই নাটকই লোকে আর চিত্রগৃহে গিয়ে দেখতে চাইল না। কিন্তু এমন বহু কাহিনী বা বিষয়বস্তু আছে যাকে টেলিভিশন আয়ত্তে আনতে পারে না। চলচ্চিত্র যেমনই সেইদিকে পা বাড়িয়েছে, অমনই বিপদ তার কেটে গেছে। আমাদের দেশেও সিনেমার দাপটে থিয়েটার উঠে যাবার অবস্থা হয়েছিল, এমন কথা শোনা যায়। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। আমাদের থিয়েটার তখন তার বিষয়বস্তু, অভিনয় বা প্রয়োগের দিক দিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে পড়েছিল বলে তার দর্শক আকর্ষণের ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। সে-অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে কেউ কারুর শত্রু নয়। থিয়েটার, সিনেমা, টেলিভিশান—এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিশেষ ক্ষমতায় শুধু সহাবস্থানই করবে না, পরোক্ষভাবে পরস্পরের উন্নতিতেও সাহায্য করবে। আজ যে বহু দর্শকই বাংলা ছবির প্রতি বিরূপ, তার একমাত্র দায়িত্ব বাংলা ছবিরই ও তার নির্মাণকর্তাদের। কাহিনীর অভিনবত্ব, অভিনয়ের সাবলীলতা ও হৃদয়-গ্রাহিতা, কলা-কৌশলের উচ্চমান প্রভৃতির সামগ্রিক অভাব ঘটছে আজ অধিকাংশ বাংলা ছবিতে। তার এই সব ত্রুটিকে দূর করে তাকে নিখুঁত সৌন্দর্যের অধিকারী করে তুলতে হবে রূপরসের দিক দিয়ে। এবং এ-ব্যাপারে যে আর্থিক ও যান্ত্রিক সংগতির প্রয়োজন, তার জন্যে উদারহস্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প রক্ষা পাবে।

চিত্র-সমালোচনা

উত্তরপুরুষ (বাংলা) : এমকেজি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, ৩,৯৮৩৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও প্রযোজনা : সুনীল বসু মল্লিক; পরিচালনা : চিত্রকর; কাহিনী ও সংলাপ অজিত গাঙ্গুলী; সংগীত-পরিচালনা : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়; গীতরচনা : শ্যামল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন : সুনীল ঘোষ (অন্তর্দৃশ্য) এবং অবনী চট্টোপাধ্যায় ও অনিল দাশগুপ্ত (বহির্দৃশ্য); সংগীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সুধীর খান; সম্পাদনা : রবীন দাস; রূপায়ণ : বসন্ত চৌধুরী, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, শিশির বটব্যাল, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মনি শ্রীমানি, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, গীতা দে, শমিতা বিশ্বাস শিখা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৪ঠা নভেম্বর থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

শংকর চৌধুরীর দুর্ধর্ষ জমিদারপিতা যে-দিন জেনেছিলেন যে, তাঁর পুত্র তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁদেরই পুরোহিত-কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করেছেন, সেদিন

ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তিনি তাঁর সন্তানের উপস্থিতিতেই পুরোহিতগৃহে অগ্নি-সংযোগ করে পিতা-পুত্রীকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন; পুত্রের কাতর আবেদনকে ঘৃণায় উপেক্ষা করেছিলেন তাঁরই ভৃত্যদের সাহায্যে তার মুখ বেঁধে দিয়ে এবং পুত্রবন্ধু ডাক্তার অনিল রায়ের অযথা প্রতিবন্ধকতাকে স্তব্ধ করেছিলেন তাঁর লাঠিয়ালের লাঠির আঘাতে। শঙ্কর জেনেছিলেন, তাঁর প্রিয়তমা শ্রীমতী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই অগ্নিগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। দৈবক্রমে শ্রীমতী প্রাণে রক্ষা পেয়ে নন্দ-মিস্ত্রীর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। বালক সন্তান সত্যকে নন্দর স্নেহচ্ছায়ায় রেখে শ্রীমতী যেদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে, সেদিনও সত্যর কাছে তার পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত থেকে যায়। সে শুধু জানে, তার বাপ একজন মস্ত ধনী, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। নিরক্ষর সত্যর কাছে তার মায়ের শেষ অনুরোধ ছিল, সে যেন জীবনে কোনো দিন মিথ্যা কথা না বলে। নন্দমিস্ত্রীর কারখানার ডাক্তার অনিল রায়ের সুপারিশে সত্য কারখানার মালিকের বাড়ীতে বেয়ারার চাকরী পেয়েছিল এবং প্রথম দিনই তার সত্যভাষণের জন্যে মনিবের সুনজরে পড়েছিল। সত্য প্রত্যহ তার মৃতা মায়ের ফোটোকে প্রণাম করে। তার প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ বেয়ারা রাজেন যেদিন সেই ফোটোর অসম্মান করে, তখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্য মায়ের ফোটোটি হাতে করে মনিববাড়ী ত্যাগ করে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পথে বাধা আসে ডাঃ রায়ের কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, সত্যর হাতের ফোটো থেকে তিনি আবিষ্কার করেন সত্যর আসল পরিচয়। কিন্তু সেই পরিচয় বন্ধু শঙ্করের কাছে ব্যক্ত করবার পূর্বেই উত্তেজনা এবং অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অ্যাঞ্জাইনা পেক্টরিস-এর রোগী ডাঃ রায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপরে নানা ঘটনার আবর্তের ভিতর দিয়ে টানাপোড়নের সাহায্যে পিতা শঙ্করের কাছে পুত্র সত্যর যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। কাহিনীটির মধ্যে একটি প্রেমের দিকও আছে। কার-খানার মালিক শঙ্করের মোটরচালক জীবনের কলেজ-পড়া কন্যা গৌরী নিরক্ষর সত্যকে সাক্ষর করে তোলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল; এই ব্যপদেশেই দুজনের মধ্যে মান-অভিমানের পালা কোনো এক সময়ে অব্যক্ত প্রেমে পর্যবসিত হয়।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ছকে-বাঁধা কাহিনীটিকে যতদূর সম্ভব আবেগপূর্ণ এবং অশ্রুবর্ষী করে তোলার দিকে কাহিনী-কার ও প্রযোজকের যত্নের ত্রুটি নেই এবং এ বিষয়ে তাঁরা যে যথেষ্ট সফলকাম হয়েছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ছকে-বাঁধা কাহিনীর সহজাত দুর্বলতাকে কিন্তু চিত্র-নাট্যকার এড়াতে পারেন নি; কাহিনী যতই অগ্রসর হয়েছে, ততই দেখতে পাওয়া গেছে, ঘটনাগুলি যেন স্বাভাবিকভাবে ঘটছে না, অনেকটা কাকতালীয়ভাবে ঘটান হচ্ছে। ছবির আরম্ভ নন্দমিস্ত্রীর অসুখ থেকেই এটা প্রত্যক্ষ করা যায়; অসুখটি ঘটান হয়েছে সত্যর চাকরীর জন্যে ডাঃ রায়কে অনুরোধ করবার উদ্দেশ্যে। তেমনই হঠাৎ এক রাত্রে শঙ্কর বাঙলা রান্নাবান্না—সুক্তো, মোচার ঘণ্ট, (নির্ভেজাল বাঙালী বাড়ীতেও রাত্রে এই সব জিনিস খাওয়া হয় কি?) মুগের ডাল দিয়ে ভাত খেতে থাকে প্রচুর তারিফ করে মাত্র তাঁর আধুনিকা স্ত্রীর দ্বারা সত্যকে তার খাস বেয়ারার পদ থেকে বরখাস্ত করবার জন্যে এবং শেষের দিকে সত্যকে দিয়ে মুরগী চুরি করান হয়, তার দ্বারা হীরের নেকলেস চুরিও যে সম্ভব, শঙ্করের কাছে সেই কথা প্রতিপন্ন করবার জন্যে। এই রকম উদ্দেশ্যমূলক ঘটনা সাজানোর আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারত। এবং এই রীতি নিশ্চয়ই কাহিনীকে দর্শক-মনে সহজ স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হতে দেয় না। তাছাড়া এতে কাহিনী ঘটনা-প্রধান হয়ে পড়ে, চরিত্র সৃষ্টি হয় না।

কাহিনীগত অসুবিধা সত্ত্বেও নায়ক সত্যর ভূমিকায় অনুপকুমার তাঁর সহজাত নাট্যনৈপুণ্য এবং আন্তরিকতা গুণে চরিত্র-টিকে একটি বিশ্বস্ত ও হৃদয়গ্রাহী রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। পিতা শঙ্করের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী চরিত্রটির অন্ত-র্নিহিত বেদনা এবং অবাঞ্ছিত দাম্পত্য-জীবনের ক্লান্তিকে পরিস্ফুট করেছেন অত্যন্ত সংযতভাবে। সহানুভূতিশীল, হৃদয়বান ডাক্তার অনিল রায়ের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে বিকাশ রায়ের অভিনয়-গুণে। শঙ্করের আধুনিকা দ্বিতীয়া স্ত্রী মীরার কোপনস্বভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে-ছেন অনুভা গুপ্ত; কিন্তু অস্বাভাবিক-ভাব চরিত্রটিকে যখন আবার সুহানুভূতি-শীলা করা হয়েছে, তখন তাঁর অশ্রুসজল নয়ন উপহাসের উপাদান হয়ে উঠেছে। বিদুষী গৌরীর চরিত্রের সত্যর প্রতি সহজ সহানুভূতি, তার সারল্য ও প্রতিভাব নির্দশনে আনন্দবোধ, তার প্রতি ভুল বোঝার জন্যে অভিমান, তার লাঞ্ছনায় বেদনাবোধ প্রভৃতি সকল রকম ভাবই স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছেন সন্ধ্যা রায়। অপরাপর ভূমিকায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য (হেড

বেহারা ভিখন), তরুণকুমার (মোটর-ড্রাইভার জীবন), বঙ্কিম ঘোষ (নন্দীমন্ত্রী), গীতা দে (নন্দর স্ত্রী সদু), রবি ঘোষ (ঈর্ষাপরায়ণ বেহারা রাজেন), শমিতা বিশ্বাস (শ্রীমতী), নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (নেতারহাটের চরণ), অমর মল্লিক (মুরগী প্রতিপালক), শিখা ভট্টাচার্য (রাণু ঝি), শিশির বটব্যাল (পুরোহিত, শ্রীমতীর বাবা) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের ওপর প্রশংসনীয়। চিত্রগ্রহণে আলো-ছায়ার সংমিশ্রণে দক্ষতা দেখিয়েছেন বিজয় ঘোষ; কিন্তু ক্যামেরা অপারেশনে বহু জায়গাতেই ফ্রেমের উঁচু-নীচু করা দৃষ্টিকটু। শিল্পনির্দেশনা বাস্তবধর্মী। রবীন দাসের সম্পাদনা ছবির গতিকে অব্যাহত রেখেছে। ছবির গান ক'খানি সুগীত হলেও সুপ্রযুক্ত নয়। আবহসংগীত ছবির ঘটনাকে তাৎপর্য-পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে।

এম কে জি'র "উত্তরপুরুষ" তার আবেগধর্মিতার জন্যে দর্শকসাধারণের হৃদয় জয় করবে।

—নান্দীকর

কলকাতা

ভুটান সীমান্তে 'হাটে বাজারে' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ শুরু

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি 'হাটে বাজারে'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য সদলবলে ভুটান সীমান্তে যাত্রা করেছেন। গত ৮ই নভেম্বর থেকে চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত এখানে একটানা ছবির কাজ শেষ হবে বলে জানা গেল। বনফুল রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে যাঁরা অংশ-গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে এখানে উপস্থিত থাকছেন অশোককুমার, বৈজয়ন্তীমালা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অজয় গাঙ্গুলী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, শমিতা বিশ্বাস, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, গীতা দে, ছায়া দেবী, আশা দেবী ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন দীনেন গুপ্ত।

'বাঘিনী'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ

সমরেশ বসু রচিত এস এম ফিল্মসের 'বাঘিনী' ছবিটি পরিচালনা করছেন বিজয় বসু। সম্প্রতি রামপুরহাটে এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। কাহিনীর প্রধান অংশে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অজয় গাঙ্গুলী, শমিতা বিশ্বাস, ছায়া দেবী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুখেন দাস। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশনায় রয়েছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

হিন্দী 'মণিহার' চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার

শ্রীঅরূপ প্রোডাকসন্সের অসামান্য সাফল্য চিত্র 'মণিহার'র হিন্দী চিত্র গ্রহণের পরিকল্পনা বর্তমানে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি এ চিত্রের হিন্দী ভার্সনের নায়ক-রূপে নির্বাচিত হয়েছেন উত্তমকুমার। পার্শ্ব-নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বম্বের তরুণ নায়ক দেব মুখার্জী। সংগীত পরিচালনা করবেন শচীনদেব বর্মন। নায়িকা চরিত্রে সম্ভবতঃ নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। ছবিটির চিত্রগ্রহণ বাংলাদেশে গৃহীত হবে। পরিচালনা করবেন সলিল সেন।

শ্রীগুরু চিত্রমের 'আলোয় ফেরা'

জ্যোতির্ময় রায় রচিত শ্রীগুরু চিত্রমের 'আলোয় ফেরা' ছবিটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন অমর লাহা। মণিলাল শ্রীবাস্তব প্রযোজিত এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, বিনতা রায়, বনানী চৌধুরী ও জহর গাঙ্গুলী।

বোম্বাই

'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী'

সম্প্রতি কারদার স্টুডিওয় অমর ছায়ার রঙিন চিত্র 'এক শ্রীমান এক শ্রীমতী'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক বাপ্পি সোনি। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শশি কাপুর, ববিতা, রাজেন্দ্রনাথ, মোহন চটি, ওমপ্রকাশ, প্রেম চোপরা ধুমল ও হেলেন।

বিনোদকুমার পরিচালিত 'মেরে হুজুর'

মুভি মুঘলসের রঙিন চিত্র 'মেরে হুজুর'র দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় শুরু করেছেন পরিচালক বিনোদকুমার। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন জীতেন্দ্র, জনিওয়াকর, কে এন সিং, জেব রেহমান ও সুরেখা। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন শংকর-জয়কিষণ।

'মেরে হামদাম মেরে দোস্ত'

কারদার স্টুডিওয় অতি আধুনিক দৃশ্য সজ্জায় নির্মিত রঙিন চিত্র 'মেরে হামদাম মেরে দোস্ত'র দৃশ্যগ্রহণ করলেন পরিচালক অমরকুমার। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ঠাকুর, মমতাজ, অচলা সচদেব ওমপ্রকাশ ও নবাগতা স্নেহলতা। এ ছবির সংগীত পরিচালক হলেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

'য়ো দিন ইয়াদ করো'

সিনে ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে 'য়ো দিন ইয়াদ করো' ছবিটি রঞ্জিৎ স্টুডিওয় পরিচালনা করছেন কে অমরনাথ। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরকৃত এ ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন নন্দা, সঞ্জয়,

প্রসাদ প্রোডাকসন্সের (মাদ্রাজ) 'দাদীমা' চিত্রে অশোককুমার, বীণা রায় ও এক শিশু অভিনেতা

শশিকলা, 'মদনপুরী, ধুমল, মালিকা ও মেহমুদ।

মঞ্চাভিনয়

।। "শাল পিয়ালের বন" ।।

আলোঝলমল সভ্যতার দীপ্তি থেকে বহু দূরে শাল পিয়ালের বনে পরিপূর্ণ শান্তির স্নিগ্ধ ছায়া মেলে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল অরণ্যসন্তান সাঁওতালরা। মহুয়ার নেশা ওদের জীবনে ঢেলে দিতো প্রাণচাঞ্চল্য, মাদল তুলতো আলাপন ওদের চলার ছন্দে। ওরা ভাবছিল এমনি করেই বুঝি কেটে যাবে সব কটা দিন। কিন্তু নেপথ্যের আশা প্রখর সূর্যালোকে ভাষা পেলো না। যান্ত্রিক জগতের কৃত্রিমতা এসে আঘাত করলো এদের নিবিড় নিশ্চিন্ত নীড়ে। জটিলতর সমস্যার হোল সূত্রপাত, হীন চক্রান্ত, অধিকারের জঘন্য দ্বন্দ্ব, লোভ প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি বাসা বাঁধলো প্রকৃতির এই নিঃসীম নির্জনতার অনাবিল মাধুর্যে। বিবর্তনের এই ধারাটি অপূর্ব সুন্দরভাবে রূপ লাভ করছে 'শাল পিয়ালের বন' নাটকে। প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত এই নাটক সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন 'নব-দর্পণে'র শিল্পীবৃন্দ।

নাটকটির মধ্যে যে একটি স্বতন্ত্র স্বাদ পাওয়া যায়, একথা অস্বীকার করা চলে না। কাহিনী গঠনে, নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টিতে অনেক কিছু অবিশ্বাস্য উপাদানের সংস্থাপনা সত্ত্বেও এর ভিন্নতর আবেদন অটুট থেকেছে শেষ পর্যন্ত। হয়তো প্রাণবন্ত অভিনয় অনেক প্রশ্নকে স্তিমিত করেছে, অবিশ্বাস্য ঘটনাকে করে তুলেছে বিশ্বাসের ব্যঞ্জনায় মুখর। নাটকের পক্ষে যেটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই টিম-ওয়ার্ক গঠনে নাট্যনির্দেশক অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন। দৃশ্যগঠন, আলোকসম্পাত, ও আবহসংগীত শাল পিয়ালের বনের গাম্ভীর্য আর বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

অভিনয়ের দিক থেকে অশোক নন্দী (এর্নাকলড), অমিয় গুপ্ত (সুরজপ্রসাদ), কল্যাণ রায় (নোটন), সমর বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাকন), তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় (আয়েলান্তন) প্রশংসার দাবী রাখেন। ছন্দা দেবীর 'সায়ী' মর্মস্পর্শী অভিনয়ের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। 'ডেজি' চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য দীপালি ঘোষ তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছেন।

।।"নাম না জানা তারা"।।

সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কারেণ্ট অ্যাকাউণ্টস কালচারাল ক্লাবের শিল্পীরা অমিতা রায়ের "নাম না জানা তারা" নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি একটি অদ্ভুত রোমাণ্টিক রহস্যের আবরণে ঢাকা। শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ে এই নিগূঢ় সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারেনি। চরিত্র উপলব্ধির অসম্পূর্ণতাই সামগ্রিকভাবে নাটকের বক্তব্য উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নাটকের প্রধান চরিত্র অধ্যাপকের ভূমিকায় সরল সান্যাল মোটেই প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেননি। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন রমেন চট্টোপাধ্যায়, সৌরেন রায়, অরুণ ঘোষ, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন ঘোষ, কাননকুসুম সেন, সীতা মুখোপাধ্যায়, যূথিকা ভট্টাচার্য ও সুচেতা রায়। নাট্য-নির্দেশনার ব্যাপারে মমতাজ আমেদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা ছিল আরো বেশী।
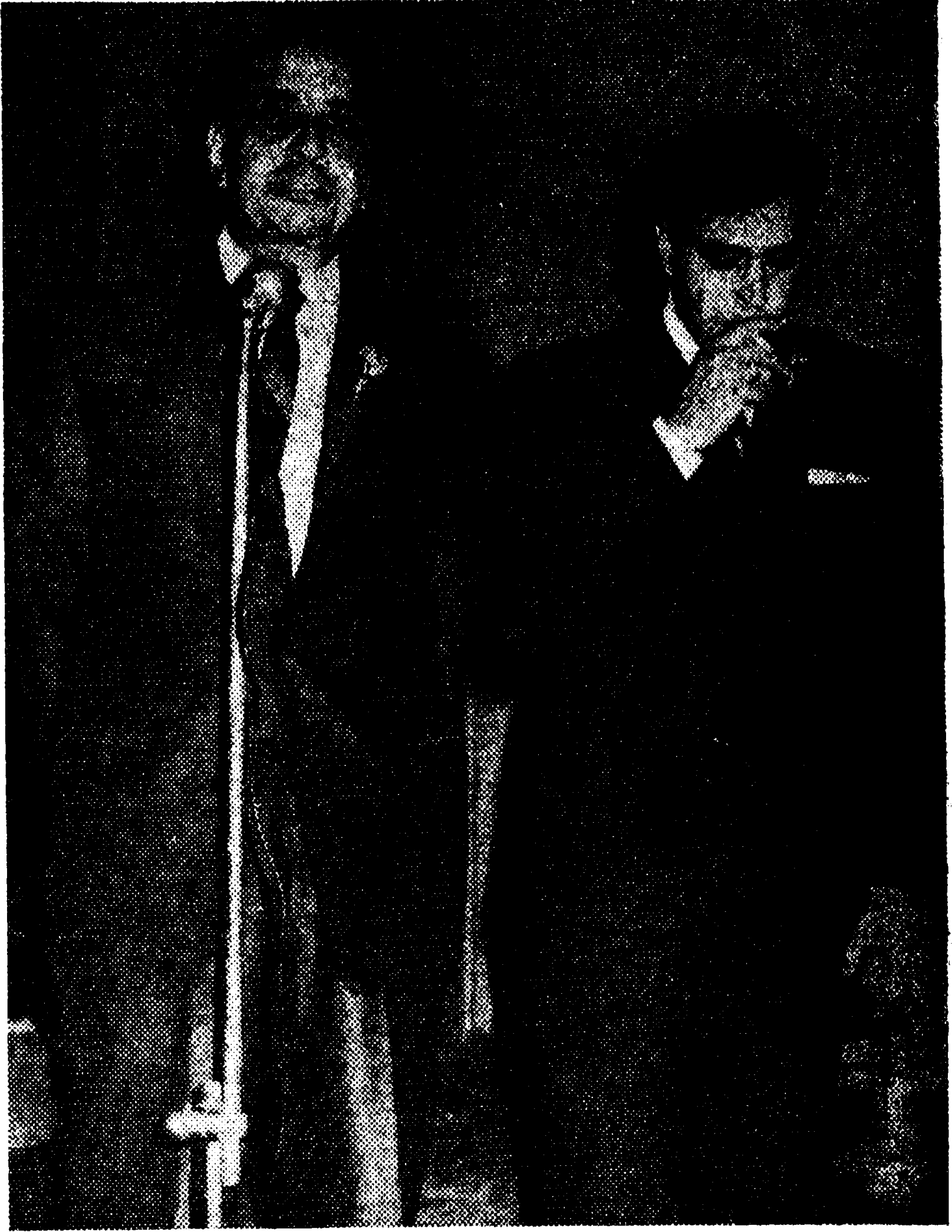
স্পেন্সেস হোটেলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক-চক্রে ঝুক গয়া আসমান চিত্রের প্রযোজক আর. ডি. বনশল নায়ক রাজেন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। ফটো : অমৃত

।।চন্দননগর থিয়েটার সেণ্টার।।

সম্প্রতি চন্দননগর থিয়েটার সেণ্টার 'নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে' "নতুন জীবন" নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সংঘবদ্ধ অভিনয়ে শিল্পীদের প্রতিভার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে। নাট্যকার দিলীপকুমার দে, মৃণাল দত্ত, উদয় রায়, মোহন্ত চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, তপন চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ বিশ্বাস তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মূর্ত করে তুলে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। দুটি স্ত্রী চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন ফ্লোরা শীল ও বেবী মুখোপাধ্যায়। পঞ্চানন ভট্টাচার্যের নাট্যনির্দেশনায় নিষ্ঠা নিহিত আছে।

।।সব্যসাচী শিল্পীগোষ্ঠী।।

পূর্বগৌরবকে পাথেয় করে "সব্যসাচী শিল্পীগোষ্ঠী" আবার নতুন করে নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কিছুদিন আগে হাওড়া ই আর মঞ্চে জগমোহন মজুমদারের "নেপথ্য" নাটকের অভিনয় করে তারা সুসংবদ্ধ অভিনয়-রীতির বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে তোলে। নাটকটির উপস্থাপনার দিকটিতেও সূক্ষ্ম চিন্তা আর সুগভীর পরিকল্পনা নিহিত ছিল। হেমন্ত দত্তর 'বাদল', বুলবুল যোদগীর 'লাইটম্যান', অশোক মুস্তফি 'গজানন', অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেড সিফটার' উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, শিবু বর্মণ, নিমাই দাস, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক চক্রবর্তী, মণ্টু ঘোষ, মুকুলজ্যোতি

ও সন্ধ্যা রায়। নির্দেশনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

।।সম্মিলনী।।

'সম্মিলনী'র উৎসাহী শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি শৈলেশ গুহ নিয়োগীর নতুন নাটক "ঝর্ণা" নাটকের অভিনয় করলেন। গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিপুণ পরিচালনায় নাটকটির অভিনয় অসাধারণ গতিবেগ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন দিলীপকুমার ঘোষ, গোপাল নন্দী, নিরঞ্জন বোস, লোচন দে, রবীন গঙ্গোপাধ্যায়, শনু দত্ত, সৌমিত্রা রায়চৌধুরী, বুলা সেনগুপ্ত, নগেন দাস।

।।খুরদা রোডে নাট্যাভিনয় ।।

'খুরদা রোডে'র একমাত্র প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'অনির্বাণ' গত ১৬ই অক্টোবর দু'টি একাঙ্ক নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছিল। প্রথম নাটক রুপাট ব্রুসের 'লিথুয়ানিয়া' অবলম্বনে 'বেয়াকুনু' ও অপরটি গোপাল দের 'জঠর'। দুটি নাটক পরিচালনা করেন যথাক্রমে ডি কে পন্ডিত ও গোপাল দে। দুটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন ডি কে পন্ডিত, সন্তোষ দে, কে পি চ্যাটার্জি, পি কে বিশ্বাস, এস চক্রবর্তী, হারাধন মজুমদার, রাণু রায়, গোপাল দে।

জি ই সি-র নাট্যাভিনয়

গত ১৭ই অকটোবর '৬৬ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে জি ই সি স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। শ্রীপশুপতি মুখোপাধ্যায় (সদা) এক অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি। শিল্পীর বাচনভঙ্গি ও অভিব্যক্তি সুন্দর। শ্রীবিশ্বনাথ বোস (মানস) স্বার্থান্বেষী ক্রূর মানস চরিত্রের সার্থক রূপায়ণে কোনো কার্পণ্য করেননি। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন শ্রীগৌরচন্দ্র গোস্বামী (জগৎ চৌধুরী), জয়ন্ত মিত্র (মিঃ বাহল), অভয়কুমার ঘোষ (ধনঞ্জয়), প্রকাশকুমার বোস (গগন গড়াই), সনৎকুমার রায় (শ্যামলাল) প্রদীপকুমার ঘোষ (প্রদীপ)।

স্ত্রী চরিত্রে শ্রীমতী অজন্তা চৌধুরী (প্রভা), প্রতিমা পাল (মাধবী) ও সবিতা সমাজদারের (মলিনা ও নার্স) অপূর্ব অভিনয় প্রতিটি দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করে। শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষ পরিচালনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। মঞ্চ পরিকল্পনা ও আলোর কাজ সুন্দর।

।। 'সানডে কালচারাল ক্লাব' ।।

সম্প্রতি ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "রাত্রি-শেষ" নাটকটি রঙমহল মঞ্চে অভিনয় করেছেন সানডে কালচারাল ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ। নাট্যনির্দেশনায় কিছু ত্রুটি ধরা পড়লেও দলগত অভিনয়গুণে তা বেশী প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন চরিত্রে রুপদান করেন অমিয়কান্তি, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার, পঞ্চানন বসু, অজিত মুখোপাধ্যায়, প্রবাল ঘোষ, হেমশঙ্কর রায়, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার বিশ্বাস, বিশ্বনাথ শীল, কল্পনা ভট্টাচার্য, প্রতিমা চক্রবর্তী, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন অমিয়কান্তি।

।। কালচারাল সেমিনার ।।

বহু পরীক্ষামূলক নাটক অভিনয় করে কলকাতার 'কালচারাল সেমিনার' নাট্যানুরাগীর আন্তর স্বীকৃতি লাভ করেছে। সম্প্রতি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "বিষ" নাটক মঞ্চস্থ করে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা তাদের অভিনয়ের মান ও স্বতন্ত্র উপস্থাপনা রীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। নাটকটি রচনা করেছেন সমর মুখোপাধ্যায়, নাট্যনির্দেশনার দায়িত্বও ছিল তাঁর। রহস্য নাটকের পর্যায়ে হয়তো এ নাটককে ধরা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পালিয়ে আসা দুটি মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই নাটকের কাহিনী। কাহিনী গ্রন্থনায় নাট্যকার সফলতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এই সূত্রেই দর্শকরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়েছিল।

সামগ্রিক অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে তুলতে নাট্যকারের সূক্ষ্ম রসবোধ আর নিষ্ঠা প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়েছে। গৌরীশঙ্কর পাল, রমেন সরকার, অজিত সান্যাল, দিলীপ ভট্টাচার্য, সলিল পাল, অলোক মুখোপাধ্যায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকাগুলোতে সুন্দর অভিনয় করেন। কমলা সুর 'উমাশশী' চরিত্রে আশ্চর্য দক্ষতায় নজীর সৃষ্টি করেন। 'কবিতা' তৃপ্তি দাসের অভিনয়ে প্রাণ পায়। মাধবী ও অনিতা চরিত্রে কল্পনা দাস ও অলকা গঙ্গোপাধ্যায় খুব বেশী প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি মনে হয়। আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাতে ছিলেন অমিয় সেনগুপ্ত ও বাবুলাল ঘোষ।

বিবিধ সংবাদ

বিচিত্রানুষ্ঠান

'সপ্তসুর'-এর প্রযোজনায় ও মলয় বসুর পরিচালনায় আগামী ১৮—২০ নভেম্বর এই তিনদিন ধরে বাগবাজার গিরিশ এভিনিউ-এর সি আই টি পার্কে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বোম্বাই ও কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করছেন। প্রথম দিন সারা রাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে অংশগ্রহণ করবেন : চিন্ময় লাহিড়ী, সুনন্দা পট্টনায়ক, সুনীল বসু, শিপ্রা বসু, বাহাদুর খাঁ, আলি আহম্মদ, মীরা মুখার্জি, শতাব্দী রায় ও লিপিকা গুপ্ত এবং কল্যাণী রায়। পরের দু'দিন আধুনিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন : মহম্মদ রফি, গীতা দত্ত, মান্না দে, থিনু পুরুষোত্তম, সুবীর সেন, মীরা সীরাজ, প্রশান্ত ভট্টাচার্য কাঞ্চনমালা, জ্যান হুইস্কি, আরতী মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জি, চন্দ্রানী মুখার্জি, চিন্ময় চ্যাটার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি, বাণী ঠাকুর, শ্রীকুমার চ্যাটার্জি, দ্বীপেন মুখার্জি জহর রায়, অরুণাভ মজুমদার ও হিমাংশু বিশ্বাস।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ শিবির

গত ২৪ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বরাহনগর শান্তি সঙ্ঘ পাঠাগারের পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১২৫ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ৫ম বার্ষিক মুক্ত বায়ু শিক্ষা শিবির পুরী মিউনিসিপ্যাল স্কুলে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সামরিক কায়দায় ও শৃঙ্খলায় পরিচালিত শিবিরবাসীরা পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণারকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। ৩০ অক্টোবর উড়িষ্যার রাজ্যপাল ডঃ এ এন খোসলা শিবিরবাসীদের চা-পানে আপ্যায়িত করেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি ও পুরীর বিশিষ্ট জনসাধারণ শিবির পরিদর্শনে আসেন ও এই মহৎ প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্থানীয় এম-এল-এ শ্রীভগবান প্রতিহারী, বাংলার ব্রতচারী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক, বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায় এই শিবির সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

শ্রীসঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলনী

গত ৫ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত কৃষ্টি সংস্থা শ্রীসঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলনী বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট ও পার্সিবাগান লেনের সংযোগস্থলে বাদুড়বাগান সার্বজনীন দুর্গা পূজার মণ্ডপে বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীসুভাষ দত্তের বেদগানের সঙ্গে উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। সভাপতি ও প্রধান অতিথির প্রাসঙ্গিক ভাষণের পর মূল অনুষ্ঠান শুরু [illegible]

শ্রীবিমল বসুর পরিচালনায়। রেকর্ড ও রেডিওর স্বনামধন্য শিল্পীরা সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন : সর্বশ্রী সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবনাথ দাস, বাবুল কুশারী, নির্মলা মিশ্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, বিভূ ভট্টাচার্য, মৃণাল চক্রবর্তী, বাবু সরকার, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, লাবু বিশ্বাস, সুশীল চক্রবর্তী, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, ই-কো-ডি-লা গোষ্ঠী ও হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। শ্রীদিলীপ বসু প্রখ্যাত শিল্পীদের সাংগীতিক প্রতিভার পরিচয়টুকু নেপথ্য থেকে শ্রোতাসাধারণের সামনে নতুন করে তুলে ধরে এক নয়া নজির সৃষ্টি করেন। শ্রীসঙ্ঘের কর্মিবৃন্দের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সাত হাজারের অধিক নরনারী স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গভীর রাত্রি অবধি সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনেন। হেমন্তকুমারের গানের সঙ্গেই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি কর্তৃক নাট্য প্রতিযোগিতা

আগামী ডিসেম্বর ১৯৬৬-তে লক্ষ্ণৌর বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতিনাট্য প্রতিযোগিতার চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণে ইচ্ছুক যেকোন অপেশাদার সৌখীন নাট্য সংস্থা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করতে পারেন। সেক্রেটারী বেঙ্গলী ক্লাব এণ্ড ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন, ২০ শিবাজী মার্গ, লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রদেশ অথবা রাত্রি ৮টার পর লক্ষ্ণৌর ২৭৯২০ ফোন নম্বরে কিম্বা সমিতির কলকাতার প্রতিনিধি শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত, ৯০।৩ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫ এই ঠিকানাতেও অনুসন্ধান করতে পারেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর ১৯৬৬।

বিজয়া সংগীত সম্মেলন

গত ৩০শে অক্টোবর শোভাবাজার বিজয়া সঙ্গীত সম্মেলনের একাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে শ্রীমাধবকুমার ইংলে মারু বেহাগ ও বাহার রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল পরিবেশন করেন। পরে ভজন গেয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তবলা ও সারেঙ্গীতে যথাক্রমে শ্রীসুধেন্দু কর্মকার ও রামনাথ মিশ্র সহযোগিতা করেন। তবলা সংগতে শ্রীকর্মকার সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বৈতশিল্পী শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ হারমোনিয়াম শ্রীমণিলাল নাগ সেতার হেমন্ত রাগে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে। পরে ঠুংরি বাজিয়ে শ্রোতাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। তবলায় শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

এশিয়ান অ্যাডভারটাইজিং কংগ্রেস

কল্পনা অ্যাডভারটাইজিং অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনের স্বত্বাধিকারী এবং অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ জে চক্রবর্তী [illegible] অনুষ্ঠিত ৫ম এশিয়ান অ্যাডভারটাইজিং কংগ্রেসে গত ৪—৯ নভেম্বর যোগ দেন। গত ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে ও মিঃ চক্রবর্তী ম্যানিলা ও হংকং-এ আয়োজিত ও তৃতীয় ও চতুর্থ এশিয়ান অ্যাডভারটাইজিং কংগ্রেসও যোগ দিয়েছিলেন।

ধলভূমগড়ে সাংস্কৃতিক অধিবেশন

গত ২ নভেম্বর ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে একটি সাংস্কৃতিক অধিবেশনের আয়োজন হয় ধলভূমগড়ে। এই অধিবেশনে ধলভূমের সংস্কৃতি জীবনের একটি সামগ্রিক পরিচয় উপস্থিত করা হয়েছিল। স্থানীয় লোকসঙ্গীতে, ঝুমুর, পাতাঝুমুর, টুসু ও ভাদু গীত ও ছৌ নৃত্য বিভিন্ন শিল্পীরা পরিবেশন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং নাড়াজোল কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক অলকা দেবী। ছাত্র সংসদের উদ্দেশ্য এবং বর্তমান অধিবেশনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে বিবৃতি পাঠ করেন সংসদের আনন্দময়ী দেবী। ধলভূম সংস্কৃতির পরিচয়মূলক প্রাথমিক ভাষণ দেন অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন সাহা। অতীত ধলভূমের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মাহাত তাঁর ভাষণে জনসাধারণের নিকট আবেদন পেশ করেন। নিষ্ঠাবান জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে ধলভূমকে চেনবার ও জানবার জন্য ডাঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুফলাং রাণা, ছবি সাহা, বাসনা মিশ্র ও সন্ধ্যা সাহা। লোকসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীভূষণ গায়েন, বাদল সিং ও [illegible]। কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন স্বপ্না ভট্টাচার্য। সংসদের সদস্যেরা নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' মঞ্চস্থ করেন। অংশগ্রহণ করেছেন পীযূষকান্তি নামাতা, হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপবন্ধু মিশ্র, সুখেন্দু পানিগ্রাহী, কুলদা মিশ্র, শশাঙ্ক দাশ, রবীন্দ্রনাথ দাশ, জীতেন্দ্রনাথ দাশ, নবকুমার গরাই, বিশ্বনাথ মিশ্র, জহর চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় দাশ।

রম্যচক্র-র আগামী নাটক 'দাহ'

উত্তর কলকাতার নবগঠিত অপেশাদার নাট্য-সংস্থা রম্যচক্র ইতিমধ্যেই তাদের বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে, বিশেষ করে শংকরের 'চৌরঙ্গী'র ন্যায় বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণে জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগামী ৪ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় তাঁরা তাঁদের নতুন নাটক, সুকুমার দত্ত রচিত 'দাহ' অভিনয় করবেন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। পরিচালনা করছেন শ্রীদত্ত নিজেই। মুখ্যাংশে অভিনয় করবেন চিত্রতারকা সন্ধ্যা সরকার ও অমিত দে। উক্ত সংস্থা কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেও নাটকটির নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। নাটকটি নতুনত্বের দাবী রাখে।

চণ্ডীদাস গীত অভিনয়ের শুভ উদ্বোধন

গত ১৫ই অকটোবর রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির সাংস্কৃতিকির শাখার নতুন নাটক চণ্ডীদাস গীত অভিনয়ের শুভ উদ্বোধন বাগবাজার নব-বৃন্দাবন মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে নাটকটিকে সার্থক রূপদান করেন যথাক্রমে প্রভাত ঘোষ সুনীতি দাস, বীরেন্দ্র ঘোষ, তারক ঘোষ, হরিপদ দাস শিব ভট্টাচার্য দুলালচন্দ্র ঘোষ, পুলিন-বিহারী ঘোষ প্রভৃতি। নাটক পরিচালনা করেন গোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

উদয়ন

আগামী ১০ই নভেম্বর প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটস্থ 'উদয়ন' ক্লাবের শ্রীশ্রী শ্যামাপূজোর রজত-জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হবে। এই উপলক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করবেন সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার। প্রতিমাশিল্পী শ্রীরমেশ পাল সভায় উপস্থিত থাকবেন।

বাংলার বাইরে বাংলা নাটক

গোরক্ষপুরের স্থানীয় বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের শিল্পীরা দুর্গা পূজা উপলক্ষে 'প্রভাতফেরী', 'বিচিত্রানুষ্ঠান', 'কাঁচকলা', 'সর্পিল', 'দশ লাখ রূপায়ে', 'নিশাচর' প্রভৃতি নাটকগুলি দুর্গা বাড়ীতে মঞ্চস্থ করে প্রবাসী বাঙালীদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেন।

অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে অমিয়-কান্ত ভট্টাচার্যের সুনির্দেশনায় 'সর্পিল' নাটকটি দলগত অভিনয়সৌকর্যে অভিনন্দিত হয়। এই নাটকের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অম্বরনাথের চরিত্রে অমিয়-কান্ত ভট্টাচার্যের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। স্ত্রী-চরিত্রে অপর্ণা ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ অভিনয় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন অণিমা মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সুনীল চক্রবর্তী, মিহির দাস, হরেন্দ্র আচার্য, রবীন মুখোপাধ্যায়, অজিতকুমার সেন প্রভৃতি শিল্পীরা। সাফল্যমণ্ডিত এই নাট্যানুষ্ঠান গোরক্ষপুরবাসীদের মনে বিশেষ উৎসাহ আনতে সক্ষম হয়।

ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেন্স ফিল্মের উদ্যোগে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব :

গেল মঙ্গলবার, ১লা নভেম্বর অ্যাকাদেমী অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেন্স ফিল্মের উদ্যোগে জার্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাব্লিক-এর শিশুদের জন্যে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেছেন শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায় এবং উদ্বোধনকার্য করেছেন অমৃতবাজার পত্রিকা এবং অমৃত সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। ইনস্টিটিউটের সম্পাদকের ভাষণের পরে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের কলিকাতাস্থ বাণিজ্য উপপ্রতিনিধি আন্দ্রেই বেডার তাঁর বাঙলা ভাষণের মাধ্যমে ভারত ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধরণতন্ত্রের শিশুদের মধ্যে এই উৎসব যেন সহযোগিতার একটি নতুন সেতু রচনা করে, সেই আশা প্রকাশ করেন। সভানেত্রী এবং উদ্বোধকের সময়োপযোগী ভাষণের পরে 'স্নো হোয়াইটস অ্যান্ড সেভেন ডোয়ার্ফস', 'ইমপুডেন্স ডাজ নট পে', 'রেস' এবং 'উই কনস্ট্রাক্ট এ স্কুল' নামে চারখানি শিশুচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি ছবিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য।

ইনস্টিটিউট অব চিলড্রেন্স ফিল্মস্ আয়োজিত জার্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাব্লিক-র একটি শিশু-চিত্রের দৃশ্য।

নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলন; ১৯৬৬ :

গেল ৫ই ও ৬ই নভেম্বর নলিন সরকার স্ট্রীটস্থ 'শুকতারা'-মর্মরগৃহে নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলনের দুদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভারতীয় যাদু জগতের ইতিহাসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু যাদুকরের শুভাগমন ঘটেছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে প্রবীণ যাদুকরদের সম্মাননা জানান হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে বহু খ্যাতনামা যাদুকর তাঁদের ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রদর্শন করেন।

রাজেন্দ্রকুমারের সম্মাননায় সাংবাদিক সম্মেলন :

গেল রবিবার, ৬ই নভেম্বর আর ডি বনশলের প্রথম হিন্দী ছবি 'ঝুক গায়া আশমান'-এর নায়ক রাজেন্দ্রকুমারের সম্মাননায় স্থানীয় স্পেন্সেস হোটেলে শ্রীবনশল একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। রাজেন্দ্রকুমারকে সাংবাদিকদের সম্মুখে উপস্থিত করে শ্রীবনশল তাঁর ছবির শ্যুটিং ও নির্মাণকার্যে শিল্পী রাজেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে তিনি যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছেন, উচ্ছ্বসিত ভাষায় তারই বর্ণনা করেন। উত্তরে রাজেন্দ্র-কুমার বলেন, 'প্রযোজকের সঙ্গে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা যে-কোন শিল্পীর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন। কারণ প্রযোজকই শিল্পীকে বড় হতে সাহায্য করেন। এর পর বহু প্রশ্নোত্তর ও হাস্যপরিহাসের [illegible] দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

খেলাধূলা

দর্শক

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে আয়োজিত ৫ম বার্ষিক জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের রানার্স-আপ অন্ধ্র প্রদেশ দল ২-১ গোলে মহীশূর দলকে পরাজিত করে ডাঃ বি সি রায় ট্রফি জয়ী হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলার ফলাফল সমান (১-১) ছিল। মহীশূর দলের রাইট ব্যাকের আত্মঘাতী গোলের সুযোগে অন্ধ্র প্রদেশ দল শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও তারা খেলায় জয়লাভের জন্যে প্রাণপণ করে খেলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

সেমিফাইনালে অন্ধ্র প্রদেশ দল ১-০ ও ০-০ গোলে পশ্চিম বাংলাকে এবং মহীশূর ৫-০ ও ৩-২ গোলে গত বছরের বিজয়ী দিল্লীকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। গত ১৯৬৫ সালের ফাইনালে দিল্লী ১-০ গোলে অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত করে ডাঃ বি সি রায় স্মৃতি ট্রফি জয়ী হয়েছিল।

জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে অন্ধ্র প্রদেশ এবং জুনিয়র বিভাগে উত্তর প্রদেশ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে।

পুরুষ বিভাগের সেমিফাইনালে সার্ভিসেস দল ১৫-১১, ১৫-৭ ও ১৫-১০ পয়েন্টে ভারতীয় রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে। অপর দিকের সেমিফাইনাল খেলায় উত্তর প্রদেশ দলের প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহারের ফলে পাঞ্জাব দল 'ওয়াক-ওভার' পেয়ে ফাইনালে উঠেছিল। মহিলা বিভাগের সেমিফাইনালে অন্ধ্র প্রদেশ ১৫-১০, ১৫-৮ ও ১৫-১৩ পয়েন্টে পাঞ্জাবকে এবং মধ্যপ্রদেশ ১৫-৭, ১৫-৯, ৬-১৫, ১১-১৫ ও ১৫-৪ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস ১৬-১৪, ১৫-১২ ও ১৫-১৩ পয়েন্টে গত বছরের রানার্স-আপ পাঞ্জাবকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : অন্ধ্রপ্রদেশ ১৫-১০, ১৫-৮ ও ১৫-৬ পয়েন্টে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে।

জুনিয়র বিভাগ (বালক) : উত্তর প্রদেশ ১৩-১১, ১০-১৫ ও ১৫-১৩ পয়েন্টে অন্ধ্র প্রদেশকে পরাজিত করে।

কোচবিহার ক্রিকেট ট্রফি

জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (কো চ বি হা র ট্রফি) পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা এক ইনিংস ও ৭৩ রানে আসামকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে খেলবার অধিকার লাভ করেছে। শেষ দিনে চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

বাংলা দল প্রথম ব্যাট করার দান হাতে নেয় এবং ৬ উইকেটে ২৮৭ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে ৩৫২ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় বাংলা প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। উভয় দলের পক্ষে পি নন্দী ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১৪০ রান করেন। আসাম দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৩১ রান সংগ্রহ করেছিল। শেষ দিনে প্রথম ইনিংসের বাকি দুই উইকেটে আসাম ৯ রান সংগ্রহ করে; ১৪০ রানের মাথায় আসামের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তারা পশ্চিম বাংলার থেকে ২১২ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে ১৩৯ রানের মাথায় আসাম দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। আসামের অধিনায়ক প্রবীর হাজারিকা নিজ দলের পক্ষে উভয় ইনিংসেই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (৪২ ও ৪৫ রান) করেন। আসাম দলের ২য় ইনিংসে বাংলার রবি ব্যানার্জি ২৭ রানে ৪ এবং দীপঙ্কর সরকার ৩৮ রানে ৩ উইকেট নিয়ে আসাম দলকে কাবু করেন। ফাইনালে বাংলা দল খেলবে উড়িষ্যা বনাম বিহার দলের বিজয়ী দলের সঙ্গে।

বাংলা স্কুল : ৩৫২ রান (৯ উইকেটে। পি নন্দী ১৪০, এ দত্ত ৬২ এবং আর ব্যানার্জি নট-আউট ৫০ রান। এইচ দাস ১২৬ রানে ৪ এবং এম রহমন ৬৮ রানে ৩ উইকেট)।

আসাম স্কুল : ১৪০ (পি হাজারিকা ৪২ রান। দীপঙ্কর সরকার ৩৪ রানে ৬ এবং রবি ব্যানার্জি ২৫ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৩৯ রান (পি হাজারিকা ৪৫ রান। রবি ব্যানার্জি ২৭ রানে ৪ এবং দীপঙ্কর সরকার ৩৮ রানে ৩ উইকেট)।

রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা

পশ্চিম বাংলার ৩২তম রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ২নং বাছাই খেলোয়াড় অজিত বসু (বয়স ২৫) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। রাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁর এই প্রথম খেতাব জয়।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : অজিত বসু ২১-১৬, ২১-১৮ ও ২১-১৭ পয়েন্টে ১নং বাছাই খেলোয়াড় সরোজ ঘোষকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : রুপা মুখার্জি ২১-১২, ২১-১৮, ২১-২৩ ও ২১-১৪ পয়েন্টে ডেজী কাপাদিয়াকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হন।

জুনিয়র সিঙ্গলস : নাচ্চু মুখার্জি ২১-১৪, ২১-১৭, ১২-২১ ও ২১-১৮ পয়েন্টে অজিত মিত্রকে পরাজিত করেন।

মধ্য ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত মধ্য-ভারত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সুরেশ গোয়েল এবং সরোজিনী আপ্তে 'ডাবল খেতাব' জয় করার গৌরব লাভ করেছেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : সুরেশ গোয়েল (ইউ-পি) ১৮-১৭, ৭-১৫ ও ১৫-৩ পয়েন্টে সতীশ ভাটিয়াকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষ (রেলওয়ে) ১৫-১১ ও ১৭-১৫ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েল (উত্তরপ্রদেশ) এবং সতীশ ভাটিয়াকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) ১২-১০ ও ১১-৪ পয়েন্টে কুমারী শোভা মূর্তিকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী কেলকার (মহারাষ্ট্র) এবং সুরেশ গোয়েল (উত্তর প্রদেশ) ১৩-১৫, ১৫-৬ ও ১৫-১২ পয়েন্টে কুমারী মীনা শাহ এবং গৌতম ঠক্করকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

বালক বিভাগ : এ কে শ্রীবাস্তব (এম-পি) ৯-১৫, ১৫-৬ ও ১৫-৭ পয়েন্টে এস খান্নাকে (এম-পি) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী সরোজিনী আপ্তে এবং কুমারী সুনীলা আপ্তে ১৫-৩ ও ১৫-৫ পয়েন্টে কুমারী মীনা সাহ এবং কুমারী দময়ন্তী সুবেদারকে পরাজিত করেন।

বালকদের ডাবলস : কে শ্রীবাস্তব এবং এস খান্না, ১৪-১৭, ১৮-১৭ ও ১৫-৯ পয়েন্টে কে চীমা এবং এ কে সিংহকে পরাজিত করেন।

ডেভিস কাপ

দিল্লীর জিমখানা কোর্টে আগামী ১২ই নভেম্বর থেকে ভারতবর্ষ বনাম পশ্চিম জার্মানীর ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমিফাইনাল খেলার তিন-দিনব্যাপী আসর বসবে। এই আসরে মোট পাঁচটি খেলা হবে—প্রথম ও তৃতীয় দিনে দুটি করে চারটি সিঙ্গলস খেলা এবং দ্বিতীয় দিনে একটি ডাবলসের খেলা। এই খেলার বিজয়ী দেশ প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলবে আমেরিকা বনাম ব্রেজিলের খেলার বিজয়ী দেশের সঙ্গে। ইন্টার-জোন ফাইনালের বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত দু বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিযোগিতার নিয়মে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশকে কেবল

পরবর্তী বছরের প্রতিযোগিতায় সরাসরি চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালেই খেলতে হয়। অস্ট্রেলিয়া গত ২০ বছরের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬—৬৫) ২০ বারই চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলে ১৩ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। বাকী ৭ বার জয়ী হয়েছে আমেরিকা।

গত চার বছরের (১৯৬২—৬৫) ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পশ্চিম জার্মানীর তুলনায় ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল অনেক বেশী গৌরবের। ভারতবর্ষ গত চার বছরে তিনবার (১৯৬২, ১৯৬৩ ও ১৯৬৫) ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলে পরাজিত হয়েছে। অপর দিকে গত দু বছরে (১৯৬৪-৬৫) জার্মানী তাদের আঞ্চলিক খেলার (ইউরোপীয়ান জোন) ফাইনালেই উঠতে পারে নি। ১৯৬৪ সালে ইউরোপীয়ান জোনের সেমিফাইনালে ২-৩ খেলায় সুইডেনের কাছে এবং ১৯৬৫ সালের তৃতীয় রাউন্ডে ১-৪ খেলায় পুনরায় সুইডেনের কাছে পরাজিত হয়ে জার্মানী প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার ইউরোপীয়ান জোনকে দু'ভাগ ('এ' এবং 'বি' গ্রুপ) করা হয়েছে। 'এ' গ্রুপের ফাইনালে ব্রেজিল ৪-১ খেলায় ফ্রান্সকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অপর দিকে ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ৩-২ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে অপর দিকের ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

রক্ত দিয়ে ইঁট কেনা!

অজয় বসু

শীতের কলকাতা গড়ের মাঠকে নিয়ে মেতে ওঠার অনেক আগেই যাদবপুরের এক আচ্ছাদিত ক্রীড়াঙ্গনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেখানে টেবল টেনিসের এক জমকালো আসর বসছে এই নভেম্বরেই। ভারত-বিখ্যাত খেলোয়াড়েরা আসছেন। যে যেখানে আছেন সবাই। তাছাড়া বাংলাদেশের ঘরের ছেলেমেয়েরা তো আছেনই।

তাঁরা আসবেন, খেলবেন একটি চ্যারিটি টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায়। আমন্ত্রিতদের অনেকে অন্য প্রান্ত থেকে কলকাতায় আসার এবং থাকার খরচ পর্যন্ত নিচ্ছেন না। স্বেচ্ছায় গাঁটের কড়ি ফেলে প্রস্তাবিত আয়োজনকে সফল করে তোলাই তাঁদের ইচ্ছে।

মহৎ সংকল্প। যে পরিকল্পনার সাফল্য তাঁদের কাম্য তা যে মহত্তর তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রকল্পের লক্ষ্য জনসাধারণের সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা হাত পেতে নিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। সেই অর্থ স্টুডেন্টস হেলথ হোম বা ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব হাসপাতাল ভবনটি পূর্ণাঙ্গ করে গড়ার কাজে লাগানো হবে। হেলথ হোমের আটতলা বাড়ীর দেড় তলার মতো সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে! এখনও অনেক কাজ বাকী। অনেক পয়সারও প্রয়োজন। দেড়তলা ও আটতলার অন্তর্বর্তী ফরাকের দিকে হঠাৎ নজর দিলে হয়তো মনে হবে যে, কবে যে বাকী কাজ সারা যাবে! আদৌ সারা হবে কি! কিন্তু পেছনের দিকে তাকিয়ে কিঞ্চিৎ গভীরে সন্ধানী চোখ মেললেই আপাতঃ দৃষ্টির সংশয় শূন্যে মিলোতে সময় নেবে না।

বছর পাঁচেক আগে কলকাতার মৌলালির মোড়ে যেদিন আট কাঠা পরিমিত জমিটুকু ঘিরে হেলথ হোমের সীমানা চিহ্ন আঁকা হচ্ছিল সেদিনও তো কতো সংশয় কতো মনে উঁকি দিয়েছিল। তদানীন্তন মেয়র শিক্ষাবিদ ডাঃ ত্রিগুণা সেনের কল্যাণে বার্ষিক এক টাকা ভাড়ায় কর্পোরেশনের কাছ থেকে জমি তো পাওয়া গেল। কিন্তু এই জমিতে আটতলা বাড়ী তোলা কি মুখের কথা!

জমি পাওয়া গেল! যতো সহজে বলে ফেললাম ততো সহজে কিন্তু জমিটা হাতে আসেনি। ডাঃ সেনের নেতৃত্বে কর্পোরেশন ছাড়পত্র লিখে দিলেন বটে কিন্তু জমি হাতে পেতে ছাত্রদের দস্তুর মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হলো। প্রায় বেওয়ারিশ জমিটুকু ভোগ-দখল করছিল একদল কলঙ্কধারী। দাবী জানাতে ছাত্ররা জমিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বিশ্বনাথের চেলারা চোখ রাঙিয়ে লাঠি-সোটা, ডান্ডা, চিমটে হাতে নিয়ে তেড়ে এলো। মিষ্টি কথায় কাজ হলো না। যুক্তি হলো নস্যাৎ, শেষ পর্যন্ত মগের মুলুকটিকে দখলে আনতে ছাত্রদের আরও বড় করে জোট পাকিয়ে হুংকার তুলে বলতে হলো যে, তাহলে গায়ের জোরেরই পরীক্ষা হয়ে যাক। কুন্ডলীকৃত গাঁজিকার ধূম্রজালের মৌক জোরে যারা এতো দিন নিজেদের বলবান বলে মনে করছিল, হাজারো কণ্ঠের এক হুংকারই তাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনলো।

স্বত্ব ত্যাগ করে গুটি গুটি সরে পড়লো ওরা। তবে যাবার আগে পাশের এক দেওয়ালে কালিঝুলিতে একটি বিরাট কলকে এঁকে নীচে লিখে রাখতে ভুললো না,

STUDENTS HEALTH HOME

ছাত্রছাত্রীরা রক্ত দিয়ে হেলথ হোমের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করছেন

খুব শিক্ষা হয়েছে বটে! হেলথ হোমের অসম্পূর্ণ বাড়ীটার পূবে সেই দেওয়ালটিতে কলকেধারীদের পরম উপলব্ধির এই চিহ্নটুকু আজও হয়তো অস্পষ্ট অক্ষরে আঁকা আছে। ছবিটা দেখতে দেখতে আজ হয়তো হাসি পাবে। কিন্তু সেদিনটা বড় ঝামেলায় কেটেছে ছেলেদের। রক্তগঙ্গা বইলেই বা কে রুখতে পারতো?

গাঁজার কলকে হাতে নিয়ে আড্ডা জাঁকিয়ে যারা এতোদিন জমি জুড়ে বসেছিল ছেলেরা গায়ের জোরের চোখ-রাঙানিতে তাদের হটিয়েছেন। মনের পুঁজিতে নিখাদ আন্তরিকতা ছিল তাই রাজশহর কলকাতার এক চৌমাথার মোড়ে দেড়তলা দালানও তুলতে পেরেছেন। সে পুঁজিতে আজও টান পড়ে নি। ও'দের যাঁরা চেনেন তাঁরা জানেন, টান কোনোদিনই পড়বে না। তাই এই উপলব্ধি সত্য যে, একদিন হেলথ হোমের দেড়তলার মাথা আকাশ ছুঁতে আরও ওপরে উঠবে। দুই তিন করে আটতলায়। আর সেই কাঠামোর অভ্যন্তরে মানুষের সেবা করতে যে মহান আদর্শের জ্যান্ত বিগ্রহ বসানো হয়েছে ষোড়শ উপাচারে তার পুজোও চলবে প্রতিদিন।

টানাটানির বাজারে টাকার টান হয়তো অনাত্র আছে। কিন্তু আদর্শের জন্যে যাঁরা জান, মান, স্বার্থ কবুল করেছেন, সোনা-মাখানো স্বপ্নের বর্ণালীতে যাঁদের মনের দিগন্ত উদভাসিত তাঁদের পথে কোনো বাধাই বাধা নয়। ঠুনকো বাধা কবে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

ছাত্ররা কি করে যে হেলথ হোমের জন্যে টাকা জোগাড় করেছেন তা ভাবলে গর্বে বুকখানাও ফুলে ওঠে। চ্যারিটি খেলা, নাচ-গান, নাটকের, বিচিত্রানুষ্ঠান তো আছেই। তাছাড়া আছে আরও অনেক পথ তাঁদের। দু-একটি দৃষ্টান্ত রাখছি।

ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিলে দাতার হাতে কিছু টাকা আসে শুনে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর ব্যাংকে রক্ত দিয়ে বিনিময়ে যে টাকা পান তার সবটুকু হেলথ হোমের তহবিলে জমা দিয়ে দেন। সঠিক হিসেব আমার জানা নেই, তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, গত চার বছরে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্ততঃ হাজার চোদ্দ টাকা জোগাড় করেছেন এইভাবে। এক এক ফোঁটা রক্তের বিনিময়ে তাঁরা নিজেদের হাসপাতালের জন্যে এক একখানি ইঁট কিনেছেন।

লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজের ছাত্রীরা বার্ষিক বনভোজন উপলক্ষ্যে চাঁদা তুলেছিলেন। সেই টাকার সবটুকুই ঢেলে উজাড় করে দিলেন। বনভোজন সেবারের মতো পরিত্যক্ত হয়ে গেল হেলথ হোম তহবিলে। কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজের ছাত্ররা মাটি কুপিয়ে নিজেদের শ্রমের নগদ মূল্য এনে দিয়েছেন সেই তহবিলে। দাবী, মিছিল, বন্ধ, ঘেরাও, যার ভালোর যুগে দেশে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ শুনতে শুনতে যখন আমাদের কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম ঘটেছে তখন কলকাতার স্টুডেন্টস হেলথ হোমের দিকে তাকালে মনটা যেমন আপনা থেকেই ভরে ওঠে তেমনি ছাত্র-জীবনের প্রকৃত ও অবিকৃত ইতিহাসের সন্ধানও জানা যায়। এই ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা কি করে বিশ্বাস করবেন যে, তীক্ষ্ম, উত্তাপ জড়ানো আন্দোলন গড়া ছাড়া ছাত্ররা আর কিছুই করতে জানেন না?

হেলথ হোমের সঙ্গে যুক্ত আছেন যাঁরা তাঁরাও ছাত্র বটে। কিন্তু গঠনমূলক চিন্তায় ও কর্মের নিরিখে তাঁরা আরও বড়। তাঁরা মানুষ। তাঁরা জনে জনে শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান। তাঁরা কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। তাঁরা নতুন করে কোনো সমস্যার সৃষ্টি ঘটাচ্ছেন না, যে সমস্যা আছে তারই মূলোচ্ছেদে নিজেরাই কোমর কষে এগিয়ে এসেছেন। নিজেদের সামর্থে ও'দের অগাধ আস্থা। প্রত্যয় অবিচল। তাই নেতৃত্বের প্রতীক্ষায় ও'রা রাজনীতিক দলগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেন নি। যারা কাজ করে তাদের পথই এই। যারা করে না তাদের কথা স্বতন্ত্র। কাজ যাঁদের কাছে বড় কলকেধারী গেঁজেলদের—মৌলালির নরক থেকে উৎখাত করতে তাঁদের যেমন আন্দোলনের পথে দেখা যায়। তেমনি দেখতে পাওয়া যায় ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে সুস্থ মানুষের দোরে দোরে ধর্ণা দিতে। কোনো কাজই তাঁদের বিচারে ছোট নয়, নিরর্থক নয়। ফলশ্রুতির মূল্যায়নেই কাজের জাত যাচাই হয়।

হেলথ হোমের কর্মীরা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কলকাতা-যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন ছাত্র ইউনিয়নে, পৌরপ্রতিষ্ঠানে, রাজ্য সরকারের কাছে, ওষুধের কারখানায়, বিগত দিনের ছাত্র আজ যাঁরা চিকিৎসক তাঁদের কাছে হাত পাতেন। সবাই কিছু কিছু দেন—কেউ দেন অর্থ, কেউ দেন ওষুধ। আপাততঃ কাজ চলে যাচ্ছে। বছরে হাজার বারের মতো অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রী প্রায় বিনামূল্যেই ওষুধ-পত্র পাচ্ছেন, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চিকিৎসিত হচ্ছেন। এদেশে অসুখ সারার উপায় না থাকলে ছাত্র-রোগীদের বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে হেলথ হোমের কর্মদ্যোম।

১৯৫২ সালে ডাঃ অজিত বসুর সহৃদয়তায় ধর্মতলা স্ট্রীটে তাঁরই ডিসপেনসারির গায়ে ছত্রিশ বর্গফুট পরিমিত জায়গায় ছাত্রদের নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। তারপর ক্রিক রো ঘুরে ১৯৬৪ সালে মৌলালির মোড়ে হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয়। প্রথমদিকে অবস্থা যাই থাক না কেন, আজ কিন্তু মৌলালির একতলা (এবং ওপরের অসম্পূর্ণ আধতলা) ভবনও কাজের চাপকে ধরে রাখতে পারছে না। কাজ অনেক বেড়েছে। জায়গা বাড়ানো ছাড়া উপায়ও নেই।

মৌলালির মোড় ছাড়া যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, দীনবন্ধু এনড্রুজ কলেজে, হুগলীতে, কালনায়, গোবরডাঙ্গায় শাখা চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আর একটি শাখা মোটরবাসে ঘোরানো হয় প্রয়োজন মতো।

যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়া, বিশ্বের নানা প্রান্তের ছাত্ররা কলকাতার বন্ধুদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। কেউ দিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী, কেউ অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, কেউ অন্য কিছু। সবচেয়ে অকৃপণ মেজাজ রুশ ছাত্রকুলের। তিন খেপে তাঁরা কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছেন কলকাতায়। হেলথ হোম ভবনের কোণের দিকে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এক্সরে প্ল্যানট কাজ করছে। এটিও রুশ ছাত্রদের উপহার। বিশাল মেশিন, নানান বিভাগে ছড়ানো। ক্রিয়াকলাপ বিদ্যুতচালিত। এমন স্বনির্ভর ও অতি-আধুনিক এক্সরে প্ল্যানট সারা ভারতে খুব কমই আছে। দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, এই একটি প্ল্যান্টের দাম কয়েক লক্ষ টাকার কম নয়।

কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা যেদিন নিজেদের হাসপাতাল নিজেরা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেদিন কি কেউ এমন একটি বিরাট এক্সরে যন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন? সেদিন যা ছিল কল্পনার অতীত আজ তা হাতেরই নাগালে। কাজেই কাজের অঙ্গীকার যেখানে, সেখানে টাকার টানও সমস্যা নয়। 'টাকা মাটি!' আসলবস্তু নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যম। সেই বস্তু দিয়েই বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে এক জ্বলজ্বলে আদর্শ রেখেছেন। এই আদর্শের জয় হবেই হবে।

জয় হচ্ছেও। হেলথ হোম প্রতিষ্ঠার ব্রাহ্মমুহূর্তে যাঁরা ছিলেন ছাত্র তাঁরা আজ জীবনের অন্য মুল্লুকের বাসিন্দা। নানা-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। কিন্তু কাল থেকে কালান্তরে এসেও তাঁরাও কেউ হেলথ হোমের মায়া কাটাতে পারেন নি। সবাই যেন জড়িয়ে রয়েছেন আদর্শটিকে। যিনি স্বেচ্ছা-শ্রম দিতে পারেন না, তিনিও স্বেচ্ছায় পরামর্শ দেন, যে চিকিৎসক নিজে এসে আর রোগী দেখতে সময় পান না, তিনিও হেলথ হোমের নবীন কর্মীদের ডেকে বলেন, নমুনা ওষুধ অনেক জমিয়ে রেখেছি, সময় করে নিয়ে যেও। যাঁরা সময় দিতে পারেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। হেলথ হোমের খাতায় কম করে শআড়াই সুচিকিৎসকের নাম লেখা রয়েছে। ও'রা কনসালটান্ট ফিজিশিয়ান। কেউ ছাত্র নন, পাশকরা, নামকরা ডাক্তার। কিন্তু একদিন ছাত্র ছিলেন বলে আজ ছাত্রকুলের সহযাত্রী, পরম মিত্র।

হেলথ হোম প্রতিষ্ঠিত হলো কবে? তা প্রায় বছর দশেক হবে। দশ বৎসর
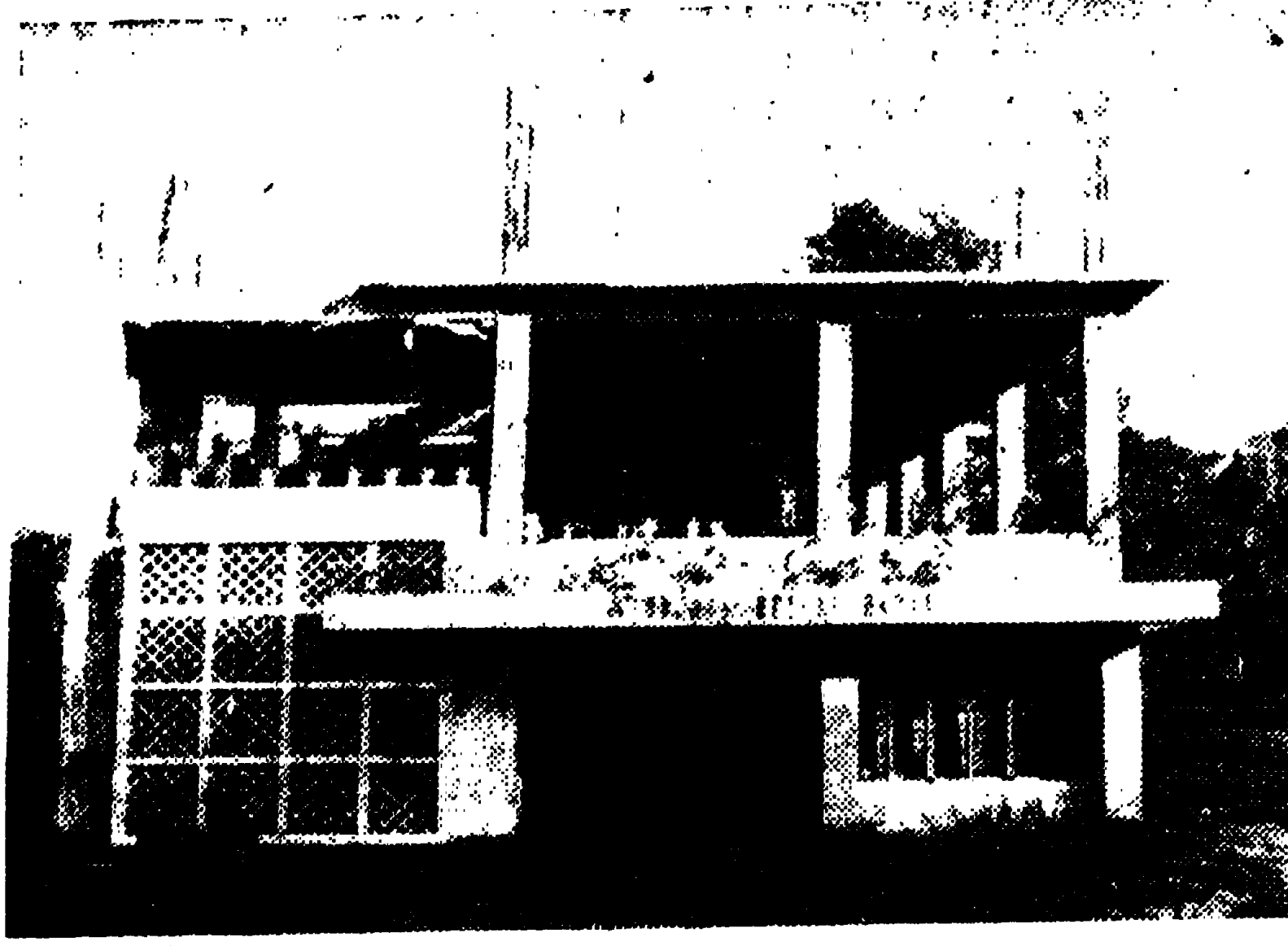
কলকাতায় মৌলালির মোড়ে স্টুডেন্টস হেলথ হোম ভবন

আগেই তো কলকাতার ছাত্ররা নিজেদের হাসপাতাল নিজেরা বানাবার সংকল্পে সর্বপ্রথম সম্মেলন কক্ষে জড়ো হয়েছিলেন। সেখানেই স্বনির্ভরতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। বীজ থেকেই শাখা পল্লব। ফল-ফুলের সম্ভাবনা।

দশ বছর আগেকার সেই ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। স্টুডেন্টস হেলথ হোম প্রসঙ্গে তা বলে রাখা ভাল।

এই শতকের চার-পাঁচ দশকের সন্ধিক্ষণের কথা। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা একদিন তাঁদের এক সহ-পাঠিনীকে যক্ষ্মাক্রান্ত হতে দেখে শিউরে উঠলেন। যক্ষ্মা তখনও কালরোগ। সহপাঠিনীকে কি করে বাঁচানো যায়! ডাক্তার, বদ্যি, ওষুধ, হাসপাতাল, অর্থ, সেবা, সবকিছু প্রয়োজনীয় পাথেয় সঞ্চয় করতে লাগলেন ছাত্রবন্ধুরা। যমে-মানুষে টানাটানি চললো আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রদের নিজস্ব হাসপাতাল গড়ার পরিকল্পনা দানা-বেঁধে উঠতে লাগলো। ছাত্রমনের অস্বস্তি ও বেদনা এই মহৎ চিন্তার উৎস। তবে এই চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে ছাত্ররা সেদিন ডাঃ নীহার মুন্সী এবং আরও জনকয়েক পরিণত বন্ধু, উপদেষ্টা ও নেতাকে পাশে পেয়েছিলেন।

সেদিনের সেই প্রাণান্তকর লড়াইয়ে মানুষের সামর্থের কাছে স্বয়ং যমরাজাকেও মাথা নোয়াতে হয়েছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে সহপাঠিনীকে ছিনিয়ে নেওয়া যমেরও সাধ্যে কুলোয় নি। সেদিনের ছাত্রীটি আরোগ্যোত্তর জীবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হিল্লী-দিল্লী করে বেড়াচ্ছেন। সুখেশান্তিতে, রাজধানীর কর্ম-ব্যস্ত জীবনের মাঝে তিনি আজ সুপ্রতিষ্ঠিতা।

কি নাম তাঁর জানি না। জানতে এতোটুকু আগ্রহও নেই আমার। শুধু জানি যে, তাঁর অস্তিত্ব হেলথ হোমের ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে আছে। নিজের জীবন দিতে গিয়ে তিনি সহপাঠী-দের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণবোধকে উজ্জীবিত করে নতুন কালের সূচনা ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ঘিরেই এক বিরাট কর্ম-কাণ্ডের সূত্রপাত। দূর থেকে দেখে আজ নিশ্চয়ই তিনি পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলতে পারছেন যে, বাংলাদেশের ছাত্রদের যদি চিনতে চান্ তো আগেই স্টুডেন্টস হেলথ হোমকে চিনুন, তাঁদের অখণ্ড পরিচয় যদি জানতে চান্ তো হোমের ইতিহাস পড়ুন।

রাজনীতিসর্বস্ব যে কাল ছাত্র আন্দোলন থামাতে মাথার ওপর লাঠি বাগিয়ে ধরছে, যে কাল হুট্ বলতে আন্দোলনের অজুহাতে ছাত্রদের পথে নামাচ্ছে, যে যুগে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তি, শান্তির চেয়ে অশান্তি বেশি, গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার নেশা আরও বড়, সেই দিশেহারা, অনিশ্চিত যুগও এই ইতিহাস থেকে জীবনের পরম শিক্ষা নিতে পারে। নেবে কি? নিতে পারলে কিন্তু সমাজ নিশ্চয়ই ফাঁকিতে পড়তো না।

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। চৌত্রিশ ।।

সেপ্টেম্বর গিয়ে অক্টোবর শেষ হতে চলল।

জ্যোতিরাণী সংকল্প করে সংযমে বেঁধেছিলেন নিজেকে। বাঁধনটা ঢিলে হতে দেননি।

প্রভুজীধামের কাজে ক্লান্তি নেই, বাড়ির ছাড়া-ছাড়া খুঁটিনাটি ব্যাপার-গুলোতেও শৃঙ্খলার বুনট পড়ছে। অথচ এক-ধরনের নীরবতা থিতিয়ে উঠছে যেটা কোনো বিরোধের প্রস্তুতি নয় বা কোনো বিরোধের ফলও নয়।

জ্যোতিরাণী নিয়মিত প্রভুজীধামে যান। সপ্তাহে তিন চারদিন যানই, দরকার পড়লে তার বেশিও যান।

কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে আর কোথাও যে যান সে-খবর এক ড্রাইভার ভিন্ন আর কেউ রাখে না। গত এক মাসের মধ্যে কম করে ছ' সাত দিন ড্রাইভারকে অবাক করেছেন তিনি। খেয়ে দেয়ে দুপুরে যেমন বেরোন তেমনি বেরিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশে গাড়ি প্রভুজীধামের দিকে ছোটেনি। কলকাতা থেকে পনের বিশ তিরিশ মাইল দূরে দূরে এক-একটা অপরিচিত জায়গায় গিয়েছে।

সিতুর অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেল। এর মধ্যে মায়ের ব্যবহারে সবথেকে বেশি অবাক হয়েছে সিতু। ততগুলো মারাত্মক অপরাধ মা যেন ভুলেই গেছে। রোজ রাত্রিতে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়েছে। নিজে পড়িয়েছে। বাড়িতে থাকলে বিকেলে সঙ্গে করে এক-একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে। মায়ের অনুপস্থিতিতে মাঝেসাজে চুরি করে বেরুনো ধরা-পড়া সত্ত্বেও বকা-ঝকা করেনি। বন্ধুদের একেবারে না দেখে সে থাকতে পারে কি করে এটা বোধহয় মা বুঝেছে। আর, স্বচক্ষে দেখা ডাকাতদের ও-রকম একটা বিচার না দেখেও যে থাকা যায় না, মা হয়ত সেই বিবেচনাও করেছে। মায়ের বিবেচনার ওপর সিতুর আস্থা বাড়ছে।

প্রভুজীধামকে বড় করে তোলার একাগ্রতায় ছেদ পড়েনি, কিন্তু জ্যোতি-রাণীর বাইরের উচ্ছ্বাস কমেছে। আর কেউ না হোক মৈত্রেয়ী চন্দ সেটা ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন। করছেন। একদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, কি ব্যাপার বলো তো, প্রায়ই এত গম্ভীর কেন আজকাল? বীথির মত আবার তোমার পিছনে লাগতে হবে নাকি?

বীথিকে জীবনের আলোয় খানিকটা টেনে তোলার গর্ব মিত্রাদি করতে পারে বটে। পিছনে লেগে থেকে আর ধমকে আর শাসন করে করে মিত্রাদি এখন তাকে অনেকটাই নিজের ইচ্ছেমত চালাতে পারছে বটে। তার আচ্ছন্ন ভাব কমে এসেছে, দায়িত্ব চাপালে সেটা সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে। মিত্রাদির রাগের ভয়ে সময় মত গা ধোয়, একটু আধটু প্রসাধন করে, পরিচ্ছন্ন বেশ-বাস করে বিকেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। হাসিমুখে এক-এক সময় তাদের সঙ্গে ওকে গল্প করতেও দেখেন জ্যোতি-রাণী। ওই বীথির প্রতি ভিতরে ভিতরে সবথেকে বেশি দুর্বলতা মিত্রাদির। এত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সে-ই প্রধান উপলক্ষ বলেই হয়ত। বীথির মত অতটা না হোক, এখানে সুশ্রী মেয়ে আরো আছে। সকলেরই দৈন্যদশা না হলে এখানে আসবে কেন? কিন্তু মিত্রাদির পক্ষপাতিত্ব শুধু ওই বীথিকে নিয়ে। মাস তিনেক আগে একদিন বলেছিলেন, মেয়েটার হাত খালি গলা খালি কান খালি—কটকট করে চোখে লাগে। কি যে করা যায় ভাবছি...

তার দিন তিনেকের মধ্যেই জ্যোতিরাণী একছড়া হার, ছ'গাছা চুড়ি আর একজোড়া দুল এনে মিত্রাদির হাতে গুঁজে দিয়ে-ছিলেন। বলেছিলেন, আমার তো তোলাই থাকে, ওকে পরাও।

মৈত্রেয়ী চন্দ প্রথমে অবাক, পরে খুশি। —এত সব দামী দামী গয়না ওকে দিয়ে দেবে? তোমাকে বলাই আমার ভুল হয়েছে—

জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছেন, আমি দিয়েছি ওকে বলতে হবে না। ওর জন্যে তুমি যা করেছ এই ক'টা গয়নার থেকে তার অনেক বেশি দাম।

মৈত্রেয়ী চন্দ তক্ষুনি বীথিকে ডেকেছেন। গম্ভীর মুখে একে একে গয়না-গুলো পরিয়েছেন। বীথি আড়ষ্ট। তারপর দু'চোখ পাকিয়ে মৈত্রেয়ী তাঁকে বলেছেন, এই সব তোমাকে আমি দিয়েছি ধরে নাও, বুঝলে? কারণ, তোমার জন্যে আমি যা করেছি তার নাকি এ-সবের থেকে ঢের বেশি দাম—তোমার হাত-গলা খালি এ আক্ষেপও আমিই এঁর কাছে করেছিলাম। আমি ছাড়া আর কেউ তোমার জন্যে একটুও ভাবে যদি মনে করো তো এই সব আবার খুলে নেব বলে দিলাম!

মাস তিনেক আগে মনের অবস্থা অন্যরকম ছিল জ্যোতিরাণীর। তিনি হেসে-ছিলেন। মিত্রাদিকে ভারী ভালো লেগেছিল। খুশি মুখে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, দেখো দেখি কেমন দেখাচ্ছে আমাদের গোমড়ামুখ বীথিরাণীকে এখন! তারপরেই ধমক, এই মেয়ে! ক'দিন বারণ করেছি এ-রকম আধ-ময়লা কাপড় পরে তুমি আমার সামনে

আসবে না? এটা অনাথ আশ্রম ভেবেছ, নাকি লোকের মায়া আর ছাড়তেই ইচ্ছে করে না?

বীথি সভয়ে উঠে পালিয়েছে।

শুধু বীথি কেন, মিত্রাদির দাপটের ভয় সকলেই করে। তার কথায় সকলে ওঠে-বসে নড়েচড়ে। তাকেই এখানকার প্রধান কর্ত্রী বলে জানে সকলে। জ্যোতিরাণীও তাই চেয়েছিলেন। মিত্রাদির ঘর নেই, প্রতুজাধাম তার ঘর হোক।

প্রতিষ্ঠানের যে যাই ভাবুক, মৈত্রেয়ীর সমস্ত নির্ভর যাঁর ওপর, কিছুদিন ধরে তাঁকে এমন ধীর স্থির নীরবতার মধ্যে ডুবে যেতে দেখে তিনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। শেষে পরিহাসের সুরে বীথির মত আবার তাঁর পিছনেও লাগতে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন।

জ্যোতিরাণী হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, অতটা দরকার হবে না, বীথি অনেক হারিয়ে চুপ করে গেছল—আমার কিছু পাওয়ার আশা।

মৈত্রেয়ীর হেয়ালী মনে হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরাণী সত্যিই সমস্ত সত্তা দিয়ে এই আশার বলটুকু সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছেন।

নভেম্বর গিয়ে ডিসেম্বর এলো। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সিতুর পরীক্ষার ফল বেরুলো। টেনেটুনে পাস করেছে।

জ্যোতিরাণী আরো ঠাণ্ডা, আরো ধীর, আরো স্থির।

কিন্তু এই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে উতলাও একটু। কারণ, শাশুড়ীর শরীরের হাল ভালো না। ডাক্তার বুকের সর্দির কিছু কিনারা করতে পারেনি। প্রায়ই হাঁপ ধরে, যার ফলে একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। আহারেও তেমন রুচি নেই।

বছরের শেষ। দু' তিন দিন বাদে শিবেশ্বর চাটুজ্জে দিল্লী যাবেন। সেখানকার বে-সরকারী হোমরাচোমরা ব্যক্তিরা এ-সময়ে নতুন বছরের নানান পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামান। দিশী-বিদেশী গোটা তিনেক প্রতিষ্ঠান থেকে সাদরে আমন্ত্রণ এসেছে। গেলে লাভ ভিন্ন লোকসান নেই। প্রতি বছরই গিয়ে থাকেন, এ বছরও যাচ্ছেন।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর জ্যোতিরাণী পাশের ঘরে এলেন। যে-কোনো প্রয়োজনে তিনি এসে থাকেন। তাঁর সংকল্প নড়েনি। এ ঘরের মানুষের অকারণ অসহিষ্ণুতার আঁচ গায়ে এসে লাগলেও মাথায় পাল্টা জবাবের দাহ নিয়ে সরে থাকেন না। বিচ্ছিন্নতার কঠিন আবরণের মধ্যে লোভের আগুন জেলে বিনিময়শূন্য ব্যর্থতার আঘাতে পতঙ্গ দগ্ধাবার আক্রোশ নিয়ে বসে থাকেন না। বাড়ির ছেড়ে বাইরের কোনো অজ্ঞাত কারণে মন-মেজাজ বেশি তিক্ত বা বিক্ষিপ্ত মনে হলেও এ-ঘরের পুরু পরদা সরিয়ে দরকার ছাড়াই জ্যোতিরাণী ঘরে ঢোকেন। কাছে এসে দাঁড়ান। দেখেন। জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে?

জবাব পান না। পেলেও সেটা শ্লেষ-শূন্য হয় না বড়। জ্যোতিরাণীর সংকল্প নড়েনি। তবু আসেন। আসেন বলেই নিভৃতের হিংস্র লোভে তাঁর ঘরে ওই মানুষের অকরুণ পদার্পণ কমে এসেছে। জ্যোতিরাণীর মনে হয় অশান্ত মুহূর্তেও আগের মত রাতের অন্ধকারে রমণীদেহ দীর্ণ করার ক্রূর প্রবৃত্তি আপনা থেকেই বাধা পায়। কেন বাধা, কিসের বাধা জ্যোতিরাণী জানেন না। কিন্তু অনুভব করতে পারেন।

তাই রাত্রির এই ধরনের অবকাশে তিনি এসে দাঁড়ালে এ-ঘরের মানুষের দু'চোখ চক-চক করে উঠতে দেখা যায়। সেই চিরাচরিত ক্ষোভ সত্ত্বেও ওই চোখে বাসনা জমাট বেঁধে উঠতে দেখেন। পাল্টা দাপটে তখনো তিনি নিজেকে আগলে রাখার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন না। অপেক্ষা করেন। ক্ষোভ দম্ভ অহমিকার আড়ালে প্রশ্রয়লুব্ধ বাসনাটাকে শূন্য শয্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে আসেন না।

মাঝের ক'টা দিন এক বিশেষ চিন্তায় মধ্যে ডুবে ছিলেন জ্যোতিরাণী। এ-ঘরের লোকের সঙ্গে তেমন দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি। ...আজও ওই চোখে তাপ দেখবেন, অভিলাষ দেখবেন, বাসনা জমাট বেঁধে উঠতে দেখবেন হয়ত।

কিন্তু আজ তিনি বড় কঠিন প্রয়োজনের তাগিদে এসেছেন।

—পরশু না তরশু তুমি দিল্লী যাচ্ছ শুনলাম?

প্রাকনিদ্রার অবকাশে শিবেশ্বর অর্থনীতির দিশী-বিদেশী জার্নাল ওলটান সাধারণত। সেই গোছেরই কিছু একটা দেখছিলেন। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকালেন শুধু। এটুকুই জবাব।

—কবে ফিরবে? ...দু'চার দিনের মধ্যে ফিরতে পারবে?

এই গোছের প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ঠেকল না হয়ত। —না। কেন?

—সিতুকে আমি অন্য জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। সেখানে থাকবে, পড়বে। কলকাতায় রাখব না।

জার্নাল ফেলে শিবেশ্বর আস্তে আস্তে ফিরলেন তাঁর দিকে। নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে উষ্মার আঁচড় পড়তে লাগল। —কোথায় সেটা?

কোথায় নাম বললেন। কলকাতার থেকে মাইল কুড়ি দূরে। দিন তিনেক নিজে গিয়ে সেখানকার সব-কিছু দেখে এসেছেন জানালেন। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভালো, পড়াশুনা ভালো, ছেলেরা নিয়মের মধ্যে থাকে—সক্কলের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হয়।

ধৈর্য দ্রুত কমে আসছে শিবেশ্বরের। উঠে বসলেন। মুখ লাল, চোখও। —হঠাৎ ওর ওপর বিশেষভাবে নজর রাখার এত দরকার হয়ে পড়ল কেন? এ বাড়িতে থাকলে আমার মতই অমানুষ হবে সেই জন্যে?

—না। নরম সুরে বোঝাবার মত করে জ্যোতিরাণী বললেন, তোমার যা-কিছু ব্যাপার সে-তো আমার জন্যে, আমার বদলে আর কেউ এ-সংসারে এলে তুমি অন্যরকম হতে বোধহয়। কিন্তু সিতুকে এখান থেকে সরানো দরকার হয়েছে।

শিবেশ্বরের অসহিষ্ণুতা বাড়ল বই কমল না। মুহূর্তের জন্য ছেলের প্রসঙ্গও বিস্মৃত হলেন তিনি। জ্যোতিরাণীর আগের কথাগুলোর একটাই বক্র ইঙ্গিত মগজে টেনে নিলেন। অর্থাৎ, স্ত্রীর এত রূপ দেখেই মাথাখারাপ হয়েছে তার, এতখানি রূপের যোগ্য নন বলেই। তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে উক্তির এই তাৎপর্য ছাড়া আর কিছু দেখছেন না।

জ্যোতিরাণী পাশে বসলেন। তেমনি নরম সুরে বললেন, এটা রাগের ব্যাপার নয়, রাগ কোরো না—অনেক ভেবেই আমি এই ব্যবস্থা করেছি।

এভাবে গা-ঘেঁষে বসাটা এখন আর নতুন ঠেকে না শিবেশ্বরের চোখে। নিজের রূপের ওপর অফুরন্ত আস্থা বলেই বসে। দখল ছেড়ে দিয়ে দখল নিতে পারার গর্ব রাখে তাই এ ব্যতিক্রম। কিছুদিনের এই নরম অনুগত হাব-ভাব দেখেও অন্তর্তুষ্টিতে ভরপুর হয়ে উঠতে পারেন না তিনি। কারণ, আনুগত্য আর নম্রতার ভিতর স্ত্রীটির শান্ত ব্যক্তিত্ব উল্টে আরো যেন পুষ্টিলাভ করছে মনে হয় তাঁর। এটুকুই বরদাস্ত করা কঠিন।

—অনেক ভেবে ব্যবস্থা একেবারে করেই ফেলেছ?

—হ্যাঁ, ভর্তি করা হয়ে গেছে।... দোষরা জানুয়ারী ওর জন্মদিন, চার তারিখে নিয়ে যাব।

—চমৎকার! মুখ ক্রমেই লাল হচ্ছে শিবেশ্বরের।—একেবারে বিদেয় করে খবরটা দিলেই তো হত, দয়া করে এই ক'টা দিন আগে আর বলার দরকার ছিল কি? মা-কে বলেছ? মায়ের কষ্ট হবে কিনা ভেবেছ?

—ভেবেছি। এ-জন্যেই এত দিন কিছু বলিনি।...কষ্ট আমারও কম হবে না, কিন্তু পাঠানো দরকার। একটু চুপ করে থেকে সহজ আন্তরিকতার সুরেই বললেন, তুমি থাকলে ভালো হত, দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে রেখে এলে ছেলেটার ভালো লাগত।

—কারোই রেখে আসার দরকার হবে না। গলার স্বরও আর সংযত থাকল না শিবেশ্বরের, সরোষে বলে উঠলেন, তোমার এই সুব্যবস্থা আমার পছন্দ হয়নি—হবে না—বুঝলে?

অবিচল শান্ত দু'চোখ মেলে জ্যোতিরাণী চেয়ে রইলেন। এটুকুর জন্যে প্রায় প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, তবু এই পর্যায়ের উষ্ণ ঝাপটার ওপর সংকল্প স্থির রাখতে সময় লাগল একটু। বললেন, সব জানলে তোমারও পছন্দ হবে। এক বছর আগেই ওকে আমি এখান থেকে সরাব ভেবেছিলাম, তখনো মন শক্ত করতে পারিনি। এখনো না পারলে দেরি হয়ে যাবে।...টাকা চুরিতে তোমার ছেলের হাত খুব ভালো রকম পেকেছে, এক বছর ধরে সে স্কুল পালাতে শিখেছে, সাইকেলের দোকানের লোককে দিয়ে তোমার প্যাডে তোমার নাম সই করিয়ে সেদিনও একসঙ্গে দশদিনের ছুটি নিয়েছে, স্কুলে যাচ্ছে বলে

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোর্টে গেছে কেস্ দেখতে—এর আগেও অনেক দিন তাই করেছে। শুধু এটুকু হলেও ভাবতুম না, এই জানুয়ারীতে তেরোয় পা দেবে ও. এর অনেক আগে থেকেই ও মেয়েছেলে চিনতে শুরু করেছে, এখন খারাপ মেয়েছেলে কাদের বলে তাও জেনেছে—এই সংসর্গ থেকে ওকে এখনো না সরালে কি হবে বুঝতে পারছ?

শেষেরটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিবেশ্বরের রাগের মুখে হঠাৎ এক পশলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা পড়ল যেন। শুধু বিস্মিত বা বিমূঢ় নয়, চাপা অস্বস্তিও একটা। দু'চোখের খরখরে চাউনি বদলেছে। দৃষ্টিটা স্ত্রীর মুখের ওপর আগের মত ধরে রাখা যাচ্ছে না।

তেমনি বিনম্র অথচ ধীর সুরেই জ্যোতিরাণী আবার বললেন, একটা মাত্র ছেলে বাড়িতে থাকবে না এ কারোই ভালো লাগার কথা নয়, শুধু ওর মুখ চেয়েই আমি এই ব্যবস্থা করেছি—আপত্তি কোরো না।

এরপর আর কথা বাড়াতে চান না জ্যোতিরাণী। কয়েক নিমেষ চুপচাপ চেয়ে থেকে ওই মুখে যে-চাপা বিড়ম্বনা লক্ষ্য করলেন, সেটুকু কাটিয়ে ওঠার আগেই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ছেলের প্রসঙ্গে এই আলোচনার পরে সকল সমস্যা ছাপিয়ে এ-অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়া

বড় হয়ে উঠলে আজ অন্তত ভালো লাগবে না। ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ ঠান্ডা পড়েছে, মশারি টাঙিয়ে দেব?

শিবেশ্বর মাথা নাড়লেন শুধু। দরকার নেই। জ্যোতিরাণী চলে গেলেন।

শূন্য শয্যায় খানিক ছটফট করলেন শিবেশ্বর। তারপর উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। ছেলেকে দূরে সরানোর স্থির সংকল্পের মধ্যে স্ত্রীর শান্ত ব্যক্তিত্ব আজই বোধহয় সবথেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর চোখে। কিন্তু এই অস্থিরতা সে-কারণে নয়। ওতে বরং শিরায় শিরায় লোভের আঁচ লাগে, দখলের নেশা জাগে। আজও লেগেছিল, আজও জেগেছিল। ওই ব্যক্তিত্বের গভীরে ভোগের বিস্মৃতি আজ আরো নিবিড়তর হতে পারত। হয়নি। ...চলে গেছে। কিন্তু শিবেশ্বরের এই চাপা অস্থিরতা সে-কারণেও নয়।

...ছেলে টাকা চুরি করে, স্কুল পালায়, বাপের নাম-ছাপা প্যাডের কাগজ চুরি করে অন্যকে দিয়ে তাঁর নাম সই করিয়ে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে স্কুল কামাই করে...শুধু এটুকু হলেও স্ত্রী অত ভাবত না বলেছে। ...ছেলে মেয়েছেলে চেনা শুরু করেছে, খারাপ মেয়েছেলে কাদের বলে জেনেছে... এজন্যেই তাকে দূরে সরানোর নীরব সংকল্পের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ।

স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগেই ছেলের চিন্তা দূরে সরেছে। তার জন্যেও উদ্বিগ্ন নন শিবেশ্বর, তবু এ-অস্থিরতা কেন নিজেই সেটা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

...ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের ওই অমোঘ রূপ দেখে? আপসশূন্য ওমনি কোনো ছায়া তাঁকেও স্পর্শ করে গেল? ছায়া...অনাগত ছায়া?

চিন্তাটা মাথায় আসামাত্র হঠাৎই কি কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের সকল ব্যবস্থা এই মুহূর্তে একেবারে নির্মূল করে দিতে পারলে স্বস্তি বোধ করেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। পাশের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অনাগত ছায়াটার নড়া-চড়া বেড়েই চলেছে নিভৃতের কোথাও। অন্ধকারে, নগ্ন-রূঢ় প্রবৃত্তির দ্বিগুণ উল্লাসে শয্যালগ্ন রমণীর দেহ বিদীর্ণ করে আঘাতে আঘাতে তার সত্তাসুদ্ধ সমর্পণের গ্রাসে টেনে আনতে পারলেই শুধু ওই অস্বস্তিকর ছায়াটার মুক্তি সম্ভব যেন।

স্নায়ুতে-স্নায়ুতে, রক্ত-মাংস-হাড়-পাঁজরে সত্তাগ্রাসের সেই তাড়না গুমরে গুমরে সামনের দিকে ঠেলছে তাঁকে। পরদা ঠেলে পা বাড়ালেই ঘর।

পরদা ছোঁয়া গেল না। পা বাড়ানো গেল না। যেমন এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেলেন শিবেশ্বর চাটুজ্জে।

যথাসময়ে দিল্লী চলে গেলেন তিনি। তাঁর দিক থেকে কোনো বাধা এলো না। আপত্তি উঠল না।

মায়ের মুখে বেশি কথা নেই, হাব-ভাবও ঠান্ডা, কিন্তু তার উদারতা দেখে সবথেকে অবাক লেগেছে সিতুর। জন্মদিন উপলক্ষে আগেই বেশ কয়েক প্রস্থ নতুন প্যান্ট-শার্ট-ট্রাউজার এসেছে। নতুন জুতো হয়েছে। একটা বড় আর একটা ছোট ঝকঝকে দুটো স্যুটকেসও এলো। টুকি-টাকি আরো কত কি ঠিক নেই। তার জন্মদিনে এত ঘটা এই প্রথম। বন্ধু-বান্ধব-দের নেমন্তন্ন করার ঢালা অনুমতি মিলেছে। ছোটদাদু তো আছেই, প্রভুজীধাম থেকে মিত্রামাসি আর বীথিমাসিও এসেছে। আর সকালে গাড়ি পাঠিয়ে মায়ের আদরে মেয়ে শমীকেও আনা হয়েছে। প্রভুজীধামের অন্য সকলের খাওয়ার জন্যেও মা-কে টাকা পাঠাতে দেখেছে।

সকাল থেকে আনন্দে কেটেছে বটে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও আজ এই প্রথম যোগ্য মর্যাদা লাভ করেছে সে। একটা ছেলের জন্মদিনের ঘটা দেখে তাদের তাক লেগে গেছে। বিকেলের দিকে মা তাকে আর মিত্রামাসি আর বীথিমাসিকে নিয়ে গাড়িতে চেপে প্রভুজীধামে এলো। শমীকে আগেই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখানে এসে শিল্পীর আঁকা সেই মস্ত ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের প্রণামের ঘটা দেখেও সিতু কৌতুক বোধ করছে। মায়ের ইঙ্গিতে তাকেও ছবির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু প্রণাম শুধু মা-ই করেছে অনেকক্ষণ ধরে। পাগলাটে একটা লোক সেদিন এটা এঁকে দিয়ে গেল, ছবি ছেড়ে সেটা ঠাকুর-দেবতা হয়ে বসল কি করে সিতুর মাথায় আসে না।

এত আনন্দ সত্ত্বেও সিতুর কাছে যা-কিছু দুর্বোধ্য লাগছিল, সব স্পষ্ট হয়ে গেল পরদিন। আর সেই স্পষ্টতার ধাক্কায় সিতু বোবা একেবারে। শুধু সিতু নয়, বাড়ির আরো অনেকে।

সকালের দিকে ছোটদাদু তাকে ঘরে ডেকে কোলের কাছে বসিয়ে আদর-টাদর করল প্রথম। অথচ খবরের কাগজের আড়ালে জেঠুর মুখ হঠাৎ এত গম্ভীর যে, তার সামনে বসে আদর খেতে সিতুর অস্বস্তি লাগছিল। নানা কথার পর ছোটদাদু বহু ছেলের সঙ্গে বাইরে থাকা, বাইরে থেকে পড়াশুনা, খেলাধুলো করা, আর তারপর মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠার যে ঝকমকে মূর্তি আঁকতে লাগল, শুনতে শুনতে সিতুর মুখ ফ্যাকাশে। ছোটদাদুর কথার শেষে কি আসছে তা যেন সে বুঝতে পেরেছে। বুকের ভিতরের ছোট যন্ত্রটা যেন থেমে আসছে ক্রমশ। শেষে শেষ ধাক্কার মতই মায়ের ব্যবস্থা জানল সে।...কালই তাকে এখান থেকে যেতে হবে।

গত রাত্রিতে জ্যোতিরাণী মামাশ্বশুরে আর কালীদার কাছে সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। তাঁরাও আকাশ থেকে পড়েছিলেন প্রথমে। ভর্তি করা আর থাকার ব্যবস্থা দু'মাস আগেই হয়ে গেছে শুনে হতভম্ব। খুব ঠান্ডামুখে এই সংকল্পের কারণটা জানিয়ে-ছেন জ্যোতিরাণী। যতটা বলা সম্ভব বলেছেন। মামাশ্বশুরকে অনুরোধ করেছেন সিতুকে বলার জন্য, আর শাশুড়ীকে যদি তাঁরা দুজনেই একটু বোঝান ভালো হয়।

কালীনাথ বা গৌরবিমলের পক্ষে আপত্তির একটা কথা তোলাও সম্ভব হয়নি।

ছোটদাদু হেসে বললেন, কি রে, এই ব্যাটাছেলে তুই? কোথায় ফুর্তিতে লাফিয়ে উঠবি তার বদলে এই!

প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে সিতু। তার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। বরং বাড়ি থেকে এই মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তার। মা যা-কিছু দিয়েছে সব তচনচ লণ্ডভণ্ড করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। একবার বেরিয়ে এ-বাড়ির দিকে আর ফিরে তাকাতেও চায় না সে। একটুও কষ্ট হচ্ছে না, তবু চোখ ঠেলে যদি জল আসে, তাহলে নিজের এই দু' চোখের ওপরই বুঝি চরম প্রতিশোধ নেবে। না যাতে আসে সেই চেষ্টা করছে। না, তার কষ্ট হচ্ছে না, ঘরটা আর খাট-চৌকি সব বেশ দুলছে শুধু।

...মায়ের মত এত নির্মম এত অকরুণ আর বুঝি এই পৃথিবীতে কেউ নেই। ও গাধা বলেই এতদিন ধরে মায়ের মতলব বোঝেনি। অন্যকে দিয়ে দরখাস্ত সই করিয়ে স্কুল পালানো, ডাকাতদের কেস দেখা আর টাকা চুরি যেদিন ধরা পড়েছে, ও নেহাৎ গাধা না হলে সেদিন থেকেই মায়ের মতলব বোঝা উচিত ছিল। অতবড় অপ-রাধের পরেও মা তাকে শাস্তি দিল না বা একটি কথাও বলল না বলেই তার ধরা উচিত ছিল চুপচাপ মা কতবড় শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করছে।

একটি কথাও না বলে সিতু উঠে এসেছে। দূরে থেকে মা-কে দেখেছে। যত দেখেছে, ততো নির্মম ততো অকরুণ মনে হয়েছে। দু'মাস ধরে রাগ পুষে এত নিঃশব্দে এত ঠান্ডা মুখে তাকে বাড়ি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছে, তার মত দয়ামায়া-শূন্য আর কে হতে পারে? ব্যবস্থার আর নড়চড় হবে না এটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে এখন।

ছেলেকে ওভাবে চেয়ে থাকতে দেখে জ্যোতিরাণী দু'-দুবার থমকেছেন। ...এই গোছের চাউনি আর যেন কবে দেখেছিলেন। এই গোছের রাগ আর বিদ্বেষের ঝাপটা খেয়েছিলেন, স্বাধীনতার সেই রাতে। বাবার চাবুকের ঘায়ে গায়ে জ্বর উঠে গেছল, অনেকক্ষণ বাদে জ্যোতিরাণী দেখতে গেছলেন তাকে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ছেলে ঘুমের ঘোরে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে—সেইদিন। তখন। সেদিন জ্যোতিরাণী তাড়া-তাড়ি নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। কিন্তু আজ নড়েননি, চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়েই ছিলেন। হাত তুলে একবার কাছে ডেকে-ছিলেন তাকে, আর একবার নিজেই এগিয়ে ছিলেন।

দু'বারই ছেলে বড় বড় পা ফেলে সরে গেছে।

শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন শাশুড়ী কিরণশশী। বয়েস বেড়ে নানা উপসর্গে দেহ বিকল হয়ে আসছে, তার

মধ্যে নাতি কালই বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়তে চলে যাচ্ছে শুনে রাগে একেবারে ফেটেই পড়লেন প্রথম। গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠলেন, যাক্ দেখি কোথায় যাবে—এত সাহস যে আমাকে একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করল না—ছেলে শুধু ওর, আর কারো কিছু না?

গৌরবিমল আর কালীনাথ মুখ খুলতে গিয়ে দ্বিগুণ চিৎকার চেঁচামিচির মুখে পড়লেন।

পায় পায় জ্যোতিরাণী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

কিরণশশী ফিরেও তাকালেন না তাঁর দিকে, অন্য দু'জনকে ধমকে বলে উঠলেন, তোরা কি বলতে এসেছিস? কি পরামর্শ করতে এসেছিস আমার সঙ্গে? ওই দুধের ছেলে বাড়ি ছাড়া হোক তোদেরও সেই ইচ্ছে?

মাথা চুলকে গৌরবিমল বললেন, না কষ্ট তো আমাদের একটু হবেই...তবে সিতুর খুব ভালো লাগবে...বাড়ি ছাড়া হয়ে শ'তিনেক ছেলে তো আছে সেখানে।

কিরণশশী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, থাকবে না কেন। যে দিন-কাল পড়েছে, হাজারে হাজারে থাকবে—মায়েদের সব কাজের অন্ত নেই, থাকবে না তো যাবে কোথায়?

শান্ত মুখে জ্যোতিরাণী বললেন, বেশি দূরে ও যাচ্ছে না, গাড়িতে এক-ঘণ্টারও পথ নয়, ছুটি-ছাটায় যখন খুশি আসতে পারবে—

—থাক্ মা থাক, আমার অত ফিরিস্তি শুনে কাজ নেই! আমি চোখ বুজলে যেখানে খুশি পাঠিও, দেরি তো নেই বেশি, দুটো দিন সবুর করো।

জ্যোতিরাণী বললেন, কষ্ট হলেও আপনি ওকে আশীর্বাদ করে মত দেবেন, আপনিই ওকে মানুষ হতে দেখবেন—

—কি? ওর বাপদাদারা সব অমানুষ হয়ে গেছে, কেমন? রাগের মাথায় তপ্ত বসনা সংযত করা গেলই না।—তুমি এমন মস্ত মানুষের ঘর থেকে এসেছ যে, ছেলে এখানে থাকলে মানুষই হবে না? কি ভাবো তুমি নিজেকে? কেন তোমার এত আস্পর্ধা?

গৌরবিমলের বিড়ম্বিত মুখ, কালীনাথের ঘাড় গোঁজা। শুধু জ্যোতিরাণীর মুখেই কোনরকম অনুভূতির আঁচড় পর্যন্ত নেই। কিরণশশী আবার বলে উঠলেন, আমি না-হয় কেউ নই, ওর বাবার মতামতেরও কোনো দাম নেই, কেমন? সে নেই এখানে, আর তুমি হোটেলে ছেলে রাখতে যাচ্ছ?

তেমনি ধীর মৃদু স্বরে জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, তাঁর মত নেওয়া হয়েছে, তিনি জেনেই গেছেন।

কিরণশশীর সবটুকু জোর যেন এক মুহূর্তে কেড়ে নিল কেউ। ঘোলাটে দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপরেই বুঝলেন তাঁর রাগ চিৎকার চেঁচামিচি সব ব্যর্থ। খুব চাপা আর্তনাদের মত শোনালো কথাগুলো।—দু'জনে পরামর্শ করেই তাহলে এই ব্যবস্থা করেছ, শিবুকেও বুঝিয়েছ তাহলে...ও-ও আমাকে একবার জানানো পর্যন্ত দরকার মনে করল না! গৌর, কালী তোরা আবার আমাকে কি বলতে এসেছিস—ও আমার কে যে আমার কষ্ট হবে! যাও মা যাও, আমি আশীর্বাদ করছি, মনের সাধে ছেলে মানুষ করো গে তোমরা, যাও, যাও—

বসার থেকে শুয়ে পড়লেন তিনি।

গাড়িতে ওঠার আগে পর্যন্ত সিতু লক্ষ্য করেছে বইকি, সকলকে লক্ষ্য করেছে। ঠাকুমা তো গতকাল থেকে তাকে কোলে করেই রেখেছে, আর কেঁদেছে। জেঠু ব্যস্ত, আগেই কাজে বেরিয়ে গেছে। যাবার আগে তার গাল ধরে নেড়েছে আর মাথা ধরে ঝাঁকিয়েছে আর হেসে বলেছে, খুব বেঁচে গেলি, আমার হাতে মানুষ হওয়া হল না তোর।

কিন্তু সিতু জানে জেঠুর কষ্ট হয়েছে। কষ্ট হলেও জেঠু ওই রকম বলতে পারে, হাসতে পারে। ছোটদাদু তাকে ভোলাবার জন্য কত ভালো ভালো কথা বলেছে ঠিক নেই। প্রত্যেক শনিবারে এসে এসে তাকে দেখে যাবে তাও বলেছে।...যত হাসুক আর যাই বলুক, সবথেকে বেশি কষ্ট ছোটদাদুরই হচ্ছে।

...আর মেঘনা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না, কিন্তু গাড়িতে ওঠার আগে স্পষ্ট তার চোখেও জল দেখেছে সিতু। শামু ভোলারও সকাল থেকে চোখ মুখ কাঁদ-কাঁদ।

...মোট কথা, ও বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে বলে কষ্ট সকলের হয়েছে, শুধু একজন ছাড়া। যে তার ডান পাশে বসে আছে। যে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেও তার দিকে। ও-পাশ থেকে মামুর কথা শুনে যে হাসছেও মুখ টিপে এক-একবার। সিতু সেই থেকে আর ফিরেও তাকায়নি তার দিকে, না তাকিয়েও টের পেয়েছে।

কষ্ট শুধু এই মায়েরই হয়নি।

গাড়ি ছুটেছে। এ-পাশে ছোটদাদু, ও-পাশে মা, মাঝে ও। ছোটদাদুর দিকের জানলার ভিতর দিয়ে মন দিয়ে রাস্তা দেখছে সিতু। সম্ভব হলে গাড়িটা থামাতে বলে ও নেমে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসত। ছোটদাদুর কথা শুনতেও ভালো লাগছে না, ছোটদাদু খুনসুটিও করছে এক-একবার। সিতুর তাতে রাগ বাড়ছে।

গাড়ি বিশাল এলাকার মধ্যে ঢোকামাত্র সিতুর ভিতরটা আগে চুপসে গেল। কিন্তু তবু ওই অকরুণ মায়ের দিকে একবার তাকালো না সে।

ওখানকার তিন-চারজন অচেনা লোক এগিয়ে এলো। একটা বাড়িতে অনেক ক্লাস-ঘর আর ছেলে চোখে পড়ল।

অচেনা লোকেরা তাদের নিয়ে আর একটা বাড়ির দোতলায় উঠল, মস্ত একটা ঘর। দু'কোণে দুটো বিছানা পাতা। আর এক কোণে খালি চৌকি একটা। বলার আগেই সিতু বুঝল ওটা তার। লোকগুলো চলে গেল।

একজন চাকর তার বাক্স-বিছানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। কারো সাহায্য না নিয়ে মা নিজেই সামনের তাকের ওপর তার জিনিস-পত্র বার করে গোছালো। আলনায় কয়েকটা জামা-প্যান্ট সাজিয়ে রাখল। স্যুটকেস দুটোর চাবি তাকে দেখিয়ে ড্রয়ারে রাখল। কখন কি করতে হবে না হবে সেই উপদেশ দিল।

সিতু তখন তার দিকে তাকিয়েছে বটে, কিন্তু কথা বলেনি। শোনার বদলে মা-কে তখনো শুধু দেখেছে সে।

খানিক বাদে ছুটির ঘণ্টা বেজেছে। ঘরে ঘরে ছেলেরা ঢুকেছে। এ-ঘরের বাসিন্দা দুটির একজন সিতুর থেকেও ছোট আর একজন সমবয়সী। সকৌতুকে নতুন আগন্তুক দেখল তারা। জ্যোতিরাণী হাসি-মুখে তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, ছেলেকে বললেন আলাপ করতে। সিতু ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু নিরীক্ষণ করল তাদের, একটি কথাও বলল না। বিকেলের খাবার ঘণ্টা বাজল, তারা ওকে খেতে ডাকল। সিতু মাথা নাড়ল, তার খিদে নেই।

ফেরার সময় হল। অফিসেও একবার দেখা করে যেতে হবে। গৌরবিমল উঠলেন, জ্যোতিরাণীও উঠলেন। সিতু জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু নীচের মাঠে ছেলে-দের খেলা-ধুলো ছুটোছুটি কিছুই দেখছে না।

গৌরবিমল আর এক-দফা পিঠ চাপড়ে তাকে চাঙা করে তুলতে চেষ্টা করলেন। সিতুর থমথমে মুখ। কিন্তু না, চোখে জল আসতে সে দেবে না। যা সচরাচর করে না, তাই করল। হেঁট হয়ে ছোটদাদুকে একটা প্রণাম করে উঠল।

গৌরবিমল হেসে বললেন, মা-কে প্রণাম করলি না?

ঘুরে সিতু এবারে দু'হাতে জানলা ধরে দাঁড়াল।

গৌরবিমল অপ্রস্তুত একটু। জ্যোতি-রাণী হাসছেন এখনো।

গাড়ি ফিরছে। দু'জনে দু'ধারে বসেছেন। সিতুর প্রসঙ্গেই মাঝে মাঝে এটা-সেটা বলছেন গৌরবিমল। যেখানে তাকে রেখে আসা হল, সেখানকার ব্যবস্থাদি, খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়ার খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। জ্যোতিরাণী দুই-এক কথায় জবাব দিচ্ছেন।

বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। ওদিকে কথাও এক সময় ফুরিয়েছে। দু'জনেই চুপচাপ।

এরই ফাঁকে গৌরবিমল লক্ষ্য করেছেন কিছু। ছেলের মায়ের তেমনি ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখ। তেমনি নয়, আরো বেশি। কিন্তু চোখদুটি চকচক করছে।

...দু'চোখ যেন ঠিক এমনিই চকচক করতে দেখে এসেছেন ছেলেটারও।

(ক্রমশঃ)

বয়স্ক-শিক্ষা প্রসঙ্গে

'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'—প্রাচীন ভারতের এই শিক্ষাদর্শ আজকের শিক্ষাজগতে খুঁজতে যাওয়া ভুল হবে। আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি এনে দেয় যে বিদ্যা সেই বিদ্যাই সার্থক। যে বিদ্যায় আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব, সেই বিদ্যাই কাম্য। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য চাই সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা। যে বিদ্যায় হৃদয়ের স্বাধীনতা নেই, মানুষের অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে না যে বিদ্যা সে বিদ্যাকে অনর্থকই বিদ্যা বলা যায়। আমাদের জীবন ও সত্তায় সঙ্গতি এনে দেয় শিক্ষিত বিবেক। মনের সজীব বিকাশের জন্য প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা।

দেশের শিক্ষিত মানুষেরা যদি অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি নজর দেন তাহলে হয়ত অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে অশিক্ষার যে প্রবাহ তাকে রোধ করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে, এশিয়ার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। মনকে সংস্কার ও অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে না পারলে মানুষের ভবিষ্যৎ আরও ভয়াবহ।

সমস্যার অন্ত নেই। তার মধ্যে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য যেন বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই দুই সমস্যাই কিন্তু সমস্ত সমস্যার মূলে। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য পরস্পর সম্পৃক্ত। সংস্কার ও সংশয় অধিকার করে থাকে অশিক্ষিত মানুষের মন। নতুন চিন্তা তাদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে পারে না। পারে না নতুন সৃষ্টির আবেগ তাদের মনে মোহ বিস্তার করতে। ফলে দেশের উন্নতির সঙ্গে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের কোন যোগ ঘটে না।

ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের নেই কোন অক্ষরজ্ঞান। অশিক্ষার অচলায়তন সারা দেশ জুড়ে প্রকট। অক্ষর-পরিচয়প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা সমগ্র ভারত-বাসীর মধ্যে সংখ্যায় খুবই স্বল্প। উনিশ বৎসরের স্বাধীনতা সেই কলঙ্কের আবরণ উন্মোচন করতে পারে নি। জনসংখ্যা বাড়ছে বিপুলভাবে। দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ হবে। দুর্গতি ও সামাজিক অনাচারের মূলে আছে অশিক্ষা।

নিরক্ষরতা যে কোন জাতির পক্ষে অভিশাপ। আজও আমাদের দেশের বহু মানুষ পড়তে পারে না দোকানের সাইন বোর্ড, পড়তে পারে না রেল স্টেশন আর রাস্তার নাম। সরকারী বিজ্ঞপ্তির দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক চোখে। বাটখারার গায় কি লেখা তা চিনতে পারে না। ভোটের বাক্সে গরু বা বাড়ি বা কাস্তের ছবি দেখে ভোট দেন। আজও অনেকে জানে না, বোঝে না ভোট কি? তার প্রয়োজনীয়তা কোথায়। স্বাধীন ভারতে আজও পথ হাঁতড়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। দেশের যেখানে শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর, সেখানে কিসের জন্য শিক্ষিতের গর্ব? শতকরা ৭০ জন অধিবাসী যদি তাঁদের অধিকার কি জানতে না চান, জানতে না পারেন—সেখানে গণতন্ত্রের তাৎপর্য কি? জাতীয় আন্দোলনের জন্মভূমি, স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান কলকাতা মহানগরীর অর্ধেক নাগরিক আজও নিরক্ষর অথবা নিরক্ষর সমান।

শিক্ষার দিক থেকে ভারতবর্ষের চিত্রটি যেমন মর্মান্তিক, তেমনি লজ্জাজনক। ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে। চারদিকে নতুনভাবে দেশ গড়ে তোলবার সাড়া। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ এই প্রগতি থেকে দূরে সরে আছে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট অংশ নিয়ত অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন, এই অন্ধকার আমাদের সকলকেই স্পৃষ্ট করছে। এ অন্ধকার মোচনের জন্য আলো তাই জ্বালাতেই হবে।

সেই আলো জ্বালার ব্রত দেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের নিতে হবে। কলকাতা মহানগরীর শতকরা ৪০·৭ জন মানুষ আজও নিরক্ষর। তাদের স্বাক্ষর করার জন্যে একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সব দল-মতের মানুষ নিয়ে কলকাতা বয়স্ক-শিক্ষা নাগরিক পর্ষদ গঠিত হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক-ব্যবসায়ী-শ্রমিক-কর্পোরেশন - রাজ্য সরকার - সমাজ - সেবা প্রতিষ্ঠান সকলেরই সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না এ কাজ।

কলকাতা মহানগরী থেকে এই নিরক্ষরতা অভিশাপ নিঃশেষে মুছে দেবার সংকল্প নিয়েছেন কলকাতার ছাত্র, তরুণ, ব্যবসায়ী, চিন্তাবিদ, শিক্ষক ও সামজসেবীর দল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত এই কলকাতা বয়স্ক শিক্ষা নাগরিক পর্ষদের ঠিকানা ১৬ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলকাতা-৯।

এদেশের শতকরা ৭১·২ জন বয়স্ক মানুষ নিরক্ষর। বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি। এখন যে ব্যবস্থা আছে তাতে বছরে ১০ লাখ মানুষ স্বাক্ষর হতে পারেন। এভাবে চললে নিরক্ষরতা দূর করা কবে যে সম্ভব হবে তা কেউ বলতে পারে না।

'৬১ থেকে '৬৬ এই পাঁচ বছরে শতকরা ৪·৮ জন মানুষ স্বাক্ষর হয়েছেন আর জনসংখ্যা বেড়েছে তার তিন-গুণেরও বেশী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার অবস্থাও খুব আশাপ্রদ নয়। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অগ্রণী বাংলা আজ ক্রমশ পিছু হটছে। '৬১ সালে সারা ভারতে স্বাক্ষরের হার যেখানে শতকরা ·৭, বাংলা দেশে সেখানে বেড়েছে মাত্র শতকরা ·৫ ভাগ। তবে রাজ্যের নানা স্থানে এখন নিরক্ষরতা দূর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

বাংলা দেশের তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরেই নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। পৌর কলকাতাসহ জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ধরলে প্রতি তিনজনে একজন নিরক্ষর। এছাড়া শুধুমাত্র ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী প্রায় ৭ লক্ষ। এর মধ্যে বাংলাভাষী ১৬৮,০০০, হিন্দীভাষী ১৮৮,৫০০, এবং উর্দুভাষী ৮০,০০০। এ ছাড়া ওড়িয়া, তেলেগু ও অন্যান্য ভাষাভাষীদের তো ধরাই হয় নি এ হিসাবে।

কলকাতা বয়স্ক শিক্ষা নাগরিক পর্ষদ একটি পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে মহানগরীর ২৩৩,০০০ নর-নারীর (১৫—৪৫ বৎসরের) কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। শুধু কার্যকরী শিক্ষাই নয়, শিক্ষার অন্যতম বিষয় হিসাবে স্বাস্থ্যজ্ঞান ও পৌরজ্ঞান, সেই সঙ্গে সুনাগরিকতার শিক্ষা এরা দেবেন। প্রথমত এদের কার্যস্থল কলকাতা পৌর এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পর্ষদে প্রায় ৭৫০ জন শিক্ষক এই জন্য প্রয়োজন হবে আর সেই সঙ্গে ১৫০০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য পরি-দর্শক বা স্বেচ্ছাসেবক।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই কার্যক্রমে এগিয়ে আসবেন আর জাতীয় পুনর্গঠনে অংশ নেবেন। এইভাবে গড়ে উঠবে দেশের সুস্থ আবহাওয়া। এ ছাড়া পর্ষদ শিক্ষক শিক্ষণের জন্য ২০ ঘণ্টার একটি পাঠক্রমের ব্যবস্থাও করেছেন। পর্ষদ আশা করেন যে, দলমত জাতি-বর্ণনির্বিশেষে সকলের সহ-যোগিতা তাঁরা পাবেন।

বয়স্কদের শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের। ছাত্রসমাজ এ কাজে অগ্রবর্তী হলে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের পথ স্বাভাবিক হবে। বয়স্ক শিক্ষা নাগরিক পর্ষদ এই বিষয়ে একটি ট্রেণিং কোর্স খুলেছেন।

কলকাতার প্রত্যেক পাড়ায় অশিক্ষিত নরনারীর তালিকা সংগ্রহ করে, তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ক্লাস খোলা হলে স্বাক্ষর-করণের পথ অনেকখানি সহজ হবে। এ বিষয়ে বয়স্ক শিক্ষা পর্ষদ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সহায়তা করবার দায়িত্ব নিয়েছেন।

—সাংবাদিক

অঙ্গনা

প্রমীলা

ঋণশোধ

আমাদের আজকের শিক্ষা আগামী দিনের প্রস্তুতির উৎস। বর্তমানে আমরা যে পরিবেশ এবং সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছি ঠিক সেরকমভাবেই নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। আর এজন্য আমাদের যতটা ত্যাগ-স্বীকার এবং দুঃখবরণ করতে হোক না কেন তারই নিরিখে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম-প্রবাহ স্থিরীকৃত হবে। এর বিপরীত কার্য-ক্রম জাতীয় চরিত্রের ক্ষণভঙ্গুরতাই প্রমাণিত করবে। তাই অতীতের শিক্ষা মনে রেখে বর্তমানে আমাদের পদক্ষেপকে সতর্কতা ও যোগ্যতার সঙ্গে সংযত ও সংহত করতে হবে।

একদিন ছিল যখন নারী তার যোগ্যতাকে প্রমাণিত করেছে কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংযমের মাধ্যমে। নারীর অন্তর-শক্তিকে উন্মোধিত করতে এই নিষ্ঠার সেদিন প্রকান্ড প্রয়োজন ছিল। অন্তরস্থিত অগ্নিশিখায় নারী সেদিন নিজের পথ চিনে নিয়েছিল। ঠিক স্বর্ণপ্রসূ এই মুহূর্তে একাধিক যুগন্ধর নারীপ্রতিভার আবির্ভাব আমাদের পথনির্দেশে সাহায্য করেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা প্রত্যাশিত পথ ও বাঞ্ছিত লক্ষ্যের ঐক্যবদ্ধ পদছন্দে যাত্রা করছি। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই আবেগ ও উত্তেজনায় ভাঁটা এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নির্দিষ্ট পথ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছি। নদীর গতি পরি-বর্তনের মত আমাদের এই হঠাৎ থিতিয়ে বা বিচ্যুত হয়ে পড়াটা জাতীয় জীবনের পক্ষে খুব একটা সুফল প্রদায়িনী হয়নি এবং হতেও পারে না। বরং পরবর্তী সময়ে এই দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠতার প্রয়োজন আরও বেশি ছিল। দেশ এবং জাতিগঠনে নেতৃত্ব দিতে হলে উন্মাদনার স্থলে বলিষ্ঠতাই আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা বৃহত্তর প্রত্যাশা পরিপূরণে খুব একটা সফল হইনি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভগিনী নিবেদিতার জীবনের একদিনের একটি ঘটনা। কোন একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে একজন ছাত্রীকে লম্বা একটি দাগ দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটা কি?' মেয়েটি উত্তরে বলেছিল, 'এটা লাইন।' নিবেদিতা বাংলা প্রতিশব্দ জানতে চাইলে মেয়েটি নিরুত্তর হয়ে যায়। পাশের মেয়েটি এগিয়ে এসে জবাব দেয়, 'লাইনের বাংলা হচ্ছে রেখা'। নিবেদিতা আনন্দে অধীর হয়ে 'রেখা', 'রেখা' বলে চীৎকার করতে থাকেন। দেশের মেয়ে দেশের ভাষা বলতে পেরেছে এজন্যই নিবেদিতার আনন্দ। এরই মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে নিবেদিতার ভারতপ্রেম। ভারত-দুহিতা নিবেদিতা সেদিন আমাদের স্বয়ং উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কর্মের নব নব মন্ত্রে। আজ দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই মহিয়সী নারীর জন্মশতবার্ষিকী। আমরা গভীর ঋণজালে পুরুষপরম্পরায় আবদ্ধ। তাঁর পথ অনুসরণই এই ঋণমুক্তির একমাত্র উপায়—জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা আবার সেই প্রতিজ্ঞাই নতুন করে গ্রহণ করবো। এতে নিবেদিতার প্রতি আমাদের ঋণই শুধু শোধ হবে না, জাতীয় জীবনেও নতুনের ছায়াপাত ঘটবে।

পাহাড় অঞ্চলে মহিলা সমিতি

ছোট্ট শহর হাফলং, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা। সাজানো গোছানো সুন্দর পরিবেশ। পত্রপুষ্পের অজস্র সমারোহে সুসজ্জিত। সমস্ত শহরটাই যেন কোন শিল্পীর নিখুঁত সৃষ্টি। বহিরঙ্গে চাকচিক্যের অভাব অন্ত-রঙ্গের প্রাচুর্যে চাপা পড়ে গেছে—হারিয়ে গেছে। প্রথম দর্শনে হাফলং-এর এই ঐশ্বর্যকে ধরতে পারিনি। ক্রমে ক্রমে পরি-চয় নিবিড় হয়েছে। অবগুণ্ঠনবতীর লাজ-রক্তিম ভাব কেটে গেছে—পরিচয়ের নিবিড় বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে হাফলং আসামের পর্বত-উপত্যকা। কিন্তু তাতে আলাপ জমে না, অন্তরঙ্গতা গভীর হয় না। প্রয়োজন তাই বিস্তৃত পরিচয়ের। বিস্তৃত পরিচয়ে নর্থ কাছাড় হিলসের প্রাণকেন্দ্র হাফলং। পর্বতের সঙ্গে উপজাতির গভীর সম্পর্ক সুবিদিত। এই পর্বত-উপত্যকাও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। শহরের সামান্য পরিবেশ ছেড়ে দিলে হৃদয়ে গভীর হয়ে বাজে উপজাতিদের কলতান। উপজাতিদের পরিচয়েই সমগ্র নর্থ কাছাড় হিলসের পরি-চয়। এই পরিচয় যে বোঝে না পর্বতের হাতছানি তার কাছে নিতান্তই নিরর্থক। পর্বতের আমন্ত্রণ পেয়েও সে উপেক্ষিত।

পর্বতের এই শ্যাম সমারোহকে আরও সুন্দর করেছে একটি হ্রদ। সমস্ত উপত্যকা এই হ্রদের মায়াজালে ধরা পড়েছে। আকাশে পাহাড়ের উদার আহ্বান আর নীচে হ্রদের আকর্ষণ। দুইই সমান। একে অপরের পরি-পূরক। দুজনকেই সমান ভালবাসতে হয়। মনে হয় ভালবাসার পাত্র বুঝি বড়ই দীন। ওদের বিরাট ভালবাসা হৃদয়ে ধারণ করি সে ক্ষমতা আমার কোথায়। তবুও কয়েক-দিন ধরে চেষ্টা করেছি ভালবাসতে এবং ভালবাসা পেতে। সেদিন কয়েকটি সদ্য পরিচিত কাছাড়ী বন্ধুর সঙ্গে হ্রদের ধারে ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। আর সেইসঙ্গে শহর ও পারিপার্শ্বিকের বিস্তৃত পরিচয়

হাফলং মহিলা সমিতির পরিচালকমন্ডলী ও সভ্যদের সঙ্গে আসামের মুখ্যমন্ত্রী-পত্নী শ্রীমতী চালিহা

পরলোকে রামেশ্বরী নেহর্

প্রখ্যাত সমাজ সেবিকা শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহর্ ৮ই নভেম্বর সকালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স ৮০ হয়েছিল।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে উপরাষ্ট্র-পতি ডঃ জাকীর হোসেন তাঁর বাস-ভবনে যান ও মৃতদেহের উপর মালা অর্পণ করেন।

নিচ্ছিলাম। কথাবার্তা বাংলাতেই হচ্ছিল। বাঙালীদের সংগে ওদের আন্তরিকতার এটা বড় পরিচয়। উপত্যকা শহরের পরি-চয়ের সংগে পরিচিত করতে গিয়ে ওরা একের পর এক বলে যাচ্ছিল সব কথা। আমার মনের মুকুরে গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল সব কথা। হঠাৎ নজরে আটকে গেল ফুলসাজে সজ্জিত হাফলং মহিলা সমিতির দিকে। একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহিলা সমিতিও এখানে আছে! আমার মনের ভাব আঁচ করতে পেরে ওরা সহাস্যে বলে উঠেছিল, এই মহিলা সমিতি কিছু নবজাত শিশু নয়। শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরে পা দিতে চলেছে। কথায় কথায় আরো কিছু পরিচয় সংগ্রহ করে পরদিনই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী-সভাপতি শ্রীমতী নিরুপমা হাগজেরের বাড়ীতে। একথা-সেকথার পর সমিতির কথা আসতেই তিনি যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সমিতির সকল বৃত্তান্ত খুলে ধরলেন ধীরে ধীরে।

১৯৫৯ সালে সমিতির সূচনা। সেদিন কিন্তু সমিতির নিজের বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি মিটিং করার জায়গাটুকুও পর্যন্ত নয়। তা বলে হাল ছেড়ে দেননি তিনি। আস্তে আস্তে সবই হয়েছে। নিজস্ব বাড়ী থেকে শুরু করে নার্শারী স্কুল। জায়গার অভাবটাই খুব বেশি ছিল। ১৯৬২ সালে বাড়ী তৈরী হলো। সংগে সংগে শুরু হয়ে গেল দীর্ঘদিনের যতনে লালিত আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ। উইভিং, টেলারিং এবং নিটিং-এর ক্লাশে ছাত্রীর আনাগোনায় সমিতি গমগমিয়ে উঠলো।

সূচনা হয়েছিল স্থানীয় লোকদের সাহায্যে। স্থানীয় লোকেরা আজও সাহায্য করে চলেছেন অকৃপণভাবে। সেইসংগে যুক্ত হয়েছে সরকারী সাহায্য। তাছাড়া সমিতির একটি 'স্মল সেভিংস এজেন্সী' আছে। এজন্য কষ্ট করতে হয় কিন্তু মুষ্টিমেয়ের কষ্টের বিনিময়ে উপকার হয় অনেকের এবং সমিতিরও।

উইভিং টেলারিং এবং নিটিং-এ সমিতির উৎপাদন এখনও উল্লেখযোগ্য না হলেও মোটামুটি সন্তোষজনক। মেখলা, তোয়ালে, বিছানার চাদর, পর্দা এবং নানারকম এম্ব্রয়-ডারীর কাজ আপাততঃ সমিতির মুখ্য উৎপাদন। সপ্তাহে একদিন সমিতির নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র খোলা রাখা হয় জনসাধারণের জন্য। তবে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন নিতান্তই কম। এ'রাও তা বোঝেন। কিন্তু দুটি তাঁত, তিনটি সেলাই মেসিন এবং তিনটি নিটিং মেসিনে এর চেয়ে বেশি উৎপাদন সম্ভবও নয়। সেজন্য এ'রা বেশ চিন্তিত এবং সমিতির কর্ম পরিসর আরো বিস্তৃত করার জন্য উদগ্রীব। এই সমিতি-তেই আবার বসে নার্শারী স্কুল। ছাত্রসংখ্যা সেখানে গোটা তিরিশজন। সবদিক থেকেই সমিতি বৃহত্তের সম্ভাবনায় উজ্জীবিত।

ইতিমধ্যে দুবার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল এবং নিকটবর্তী মাহুরে কিষাণ মেলায়ও অংশ গ্রহণ করেছে। সর্বত্রই সমিতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সমিতির এই ক্ষুদ্র জীবনে অনেক শিক্ষার্থীই এখানে শিক্ষালাভ করেছিল। শিক্ষাকাল এখানে মাত্র মাস দেড়েক। উপ-যুক্ত ছাত্রীদের এখান থেকে পাঠানো হয় গোহাটি মহিলা সমিতিতে। সার্টিফিকেট সেখান থেকেই দেওয়া হয়।

কথায় কথায় বলছিলাম 'আপনারা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করেন না কেন?' মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে নানা অসুবিধা রয়েছে। সকল উপজাতির সমান সহযোগিতা আমরা এখনো পাইনি। তাছাড়া সকলের সব সংস্কার কাটতে আরো সময় লাগবে। আরো বেশি মেয়ের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা সমিতি করতে পারে কিনা একথার জবাবে তিনি কিরকম একটু দৃঢ় হয়ে বললেন, আমরা বাড়ীতে মেয়েদের কাজ করাই এবং বেত প্রভৃতি কাজের আর একটি কেন্দ্র খোলার আমাদের বিশেষ ইচ্ছে আছে। সব কর্মীকেই কাজের বিনিময়ে পারি-শ্রমিকও দিয়ে থাকি।

ফেরার সময় বারবার মনে হচ্ছিল সাধ ওদের বিস্তর। কিন্তু সাধ্য কম। তাই পরি-কল্পনা বিরাট হলেও রূপদান সম্ভব হয় না। কিন্তু অগ্রগামী যুগের সংগে সমান তাল রেখে এরা এগিয়ে চলেছিল, চোখে বিরাট স্বপ্ন, কর্মসূচী আরো ব্যাপক। এটা কম প্রশংসার কথা নয়। শুধু প্রশংসায় নয়, নিজেদের তাগিদেই এ'রা এগিয়ে যাবেন, হয়তো একদিন পৌঁছে যাবেন সাফল্যের স্বর্গদ্বারে। সেদিন এই উপত্যকা এদের কথা স্মরণ করবে শ্রদ্ধা-বিনম্রচিত্তে—পরম কৃতজ্ঞতাভরে।
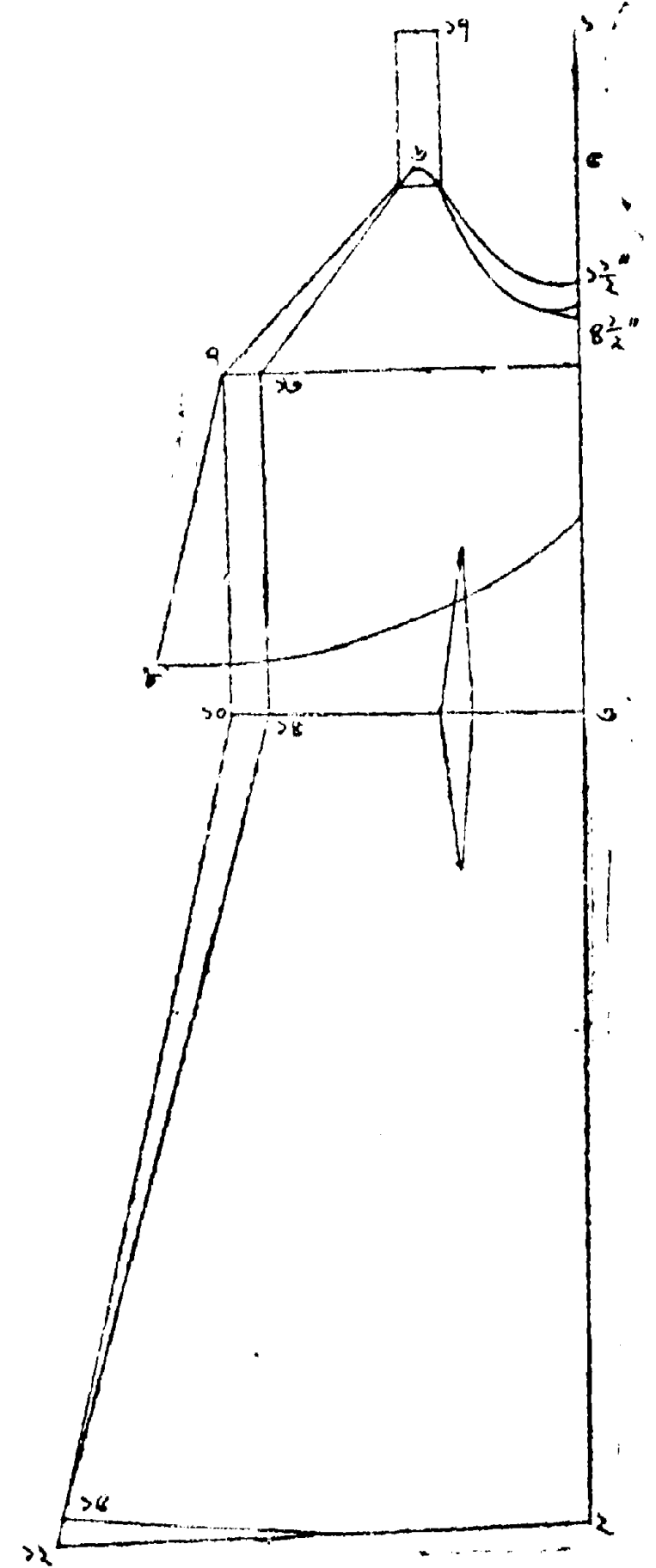
সেলাইয়ের কথা

(১২)

প্লিটেড সেমিজ

এই সেমিজটি অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়েদের উপযোগী, যদিও সেমিজের প্রচলন আজকাল উঠে গেছে তবুও এটি শিখে রাখা ভালো। প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যাবে।

প্লিটেড সেমিজ

মাপ :—

ছাতি—৩৪"

ঝুল—৪০+১"

কোমর—৩০

সেস্থ—১৫+½"

সামনের অংশ

১— ২=ঝুল+১"
১— ৩=সেস্থ+½"
১— ৪=ছাতির ¼—½"
৪— ৭= „ ¼+১"
৩—১০=কোমরের ¼+২"
৫— ৬=৩½" অথবা রুচি অনুযায়ী
১—১১= „ „
১১— ৬=১—৪ এর অর্ধেক
৩— ৯=সেস্থর ৪" ওপরে
৯— ৮=সেস্থ হইতে ১½" ওপরেও ২" পাশে নিয়ে পাশের লাইনে মিশিয়ে দিতে হবে প্লিট দেবার জন্য।
১২—২৫=৬ পয়েণ্ট তারপর ২—১২ এর অর্ধেক করে সেপ দিতে হবে।

পিছনের অংশ

৪—১৩=ছাতির ¼
৩—১৪=কোমরের ¼+১"
১২—১৫=সামনের অংশের মত

স্ট্যাপ :—
১৬=১৭=১" অথবা রুচি অনুযায়ী।

—বসুধা

তরুণী ইলসে থিওবাল্ট

সুরা উৎপাদকদের নির্বাচিত রাণী

দেহসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় বর্তমানে বিশ্বময় কত রাজা রাণী নির্বাচিত হচ্ছে কিন্তু সুরা-রাণী নির্বাচিত হয় একমাত্র পশ্চিম জার্মানীতে। যিনি নির্বাচিত হন, তাকে কেবল সুন্দরী হলেই চলবে না, সুরা সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান থাকা চাই। সুরা-রাণীর কাজ হল দেশবিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পশ্চিম জার্মানীর তৈরী সুরার সপক্ষে প্রচার করা। এ বছরের নির্বাচিত সুরা-রাণী হলেন বাইশ বছরের সুন্দরী তরুণী ইলসে থিওবাল্ট।

ডাঃ মার্গারেট জ্যাকসন

ভারতে ব্রিটিশ পরিবার পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ

ব্রিটেনে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ডাঃ মার্গারেট জ্যাকসন দিল্লীতে এসেছেন। তিনি দিল্লী, কলকাতা আসাম ও হায়দ্রাবাদে পরিবার পরিকল্পনার কাজে সহায়তা করবেন।

ডাঃ জ্যাকসন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে থাকবেন। তিনি ১৯৬০ সালে আর একবার ভারতে এসেছিলেন।

ডাঃ জ্যাকসন বলেন, "পরিকল্পিত মাতৃত্ব ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা সমাধানের পক্ষে অপরিহার্য।"

ডাঃ জ্যাকসন বর্তমানে এস্‌সিটর ডেভন। ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিকের মেডিকেল অফিসার। তিনি ইনভেস্টিগেশন অব ফার্টিলিটি কন্ট্রোল কাউনসিলের সদস্য এবং গত কয়েক বছর ধরে ইন্টারনাশনাল প্ল্যানড পেরেন্টহুড ফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সংবাদ

আগরতলা মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী তন্দ্রা মজুমদার এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর ছাত্রীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রীর প্রথম স্থান অধিকার ত্রিপুরায় এই প্রথম। শ্রীমতী তন্দ্রা জাতীয় বৃত্তি লাভ করেছেন।

* * *

সাড়ে তিন বছরের মেয়ে শ্রীমতী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত শাস্ত্রীয় ও রবীন্দ্র সংগীতে বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিশু সংগীত সম্মেলনে খেয়াল ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে সকলকে বিস্মিত করে দেয়। গত এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গ শিশু উৎসবে স্বাগতা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

• • •

নারী ও শিশুদের কল্যাণসাধন ব্রতে নিয়োজিত সমাজ কল্যাণ সংস্থা শ্রীনারায়ণ বিদ্যার্থী সদানম্ আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, সামাজিক সাম্যবিধানের পথে কৃত্রিম অন্তরায়গুলি দূর করার চেষ্টা হচ্ছে। নারী ও পুরুষদের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করে তাঁদের সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যের ধাত্রী নারীদের শুধু সামাজিক কাজে নিযুক্ত থাকলেই চলবে না, তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে হবে, সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করতে হবে। প্রসঙ্গতঃ তিনি সদনম-এর মত সংস্থাগুলির প্রশংসা করেন।

* * *

শ্রীমতী কনক করাল সোভিয়েট সরকারের বৃত্তি নিয়ে মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে রাশিয়ান ভাষার শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে বিশেষ শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেছেন।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(২১)

তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর বংশধর মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবকে ভারতের শেষ রবাবী আখ্যা দেওয়া চলে। রবাব যন্ত্র কাঁধে নিয়ে বসে আমরা অনেকেই বাজাতে পারি; —একথা সত্য; তবে রবাবী ঘরের বাজনা ও আমাদের বাজনায় আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান,—একথা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু খাঁ সাহেব নিজে বলতেন যে, তাঁর জ্যাঠা জাফর খাঁর বংশধর ও তাঁর পিতা সংগীতনায়ক বাসৎ খাঁর হাতেগড়া ভারতবিখ্যাত ও বাংলাদেশবাসী কাসীম আলী খাঁ ভারতের শেষ রবাবী। মহম্মদ আলী খাঁ বাল্যবয়সে যখন বাসৎ খাঁর সঙ্গে মেটিয়াবুরুজে দুই বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, তখন যুবক কাসীম আলী খাঁর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; বহু রাজ-দরবারে তাঁরা বাজনা হত এবং কোলকাতায় ভবানীপুরের বিখ্যাত অভিজাতবংশীয় কেশব মিত্র মাঝে মাঝে ভবানীপুরে তাঁর সঙ্গে মৃদঙ্গে সংগত করতেন। তখন মহা-রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পঞ্চকোটের রাজা, পানিহাটির জমিদার, রানাঘাটের পালচৌধুরী পরিবার প্রভৃতি বহু অভিজাত ব্যক্তিগণের ঘরে বাসৎ খাঁর সমাগম হতো; তবে তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি কাসীম আলীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন; কাসীম আলীই রবাবের জলসায় প্রধান শিল্পীরূপে আদৃত হতেন,—যদিও তানসেন বংশের প্রবীণতম গুণীরূপে বাসৎ খাঁ সর্বত্রই সম্মানিত আসনলাভ করতেন। দুই বৎসর পরে বাসৎ খাঁ যখন গয়ায় চলে গেলেন, তখন মহম্মদ আলীও পিতার সহিত গয়াবাসী হন। তাঁর অগ্রজ আলী মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিঞা) সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ সংগীতশিল্পী ছিলেন, তিনি বংশ-গত সংগীতবিদ্যা পিতার নিকট শিক্ষার ফলে সবই আয়ত্ত করেছিলেন। উত্তরকালে তিনি কাশীনরেশের দরবারে প্রধান সংগীতগুরুর আসনলাভ করেন; সুর-শৃঙ্গার যন্ত্রে তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল। গৌরীপুরে অবস্থানকালে মহম্মদ আলী বলতেন যে, তিনি নিজে পিতার নিকট কণ্ঠসংগীতের আলাপ ও ধ্রুপদই ভাল করে শিখেছিলেন। রবাব যন্ত্রে অভ্যাস তাঁর প্রথম বয়সে সামান্যই ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর রবাবের অভ্যাস বৃদ্ধি পায়। তা হলেও তিনি রবাবে জোড় ও লড়ি এত পরিষ্কার ও দ্রুত বাজাতেন, যে তার পর কোনও সেতারী বা সরোদী যন্ত্র তুলে বাজাতে সাহসী হতো না। মহম্মদ আলী সহাস্যে বলতেন : "ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার হাতে পাঞ্জাব মেলের মত গতিবেগ ছিল।" মহম্মদ আলী অর্থলোভী ছিলেন না; যদিও আযৌবন তিনি শৌখীন ছিলেন এবং হাতে টাকা পেলে অসনে-বসনে যথেষ্ট খরচ ক'রতেন। তথাপি তিনি টাকার কাঙাল ছিলেন না; অযাচিতভাবে যা পেতেন তাতেই খুসী থাকতেন। তাঁর মাছ ধরার শখ সারাজীবন-ব্যাপী ছিল। গৌরীপুরের বাগানের পুকুরের ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা ছিপ হাতে বসে তিনি এই শখ মেটাতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় আমি তাঁর কাছে শিখতে যেতাম। শিক্ষারম্ভকালে নাড়া বাঁধবার সময় মাত্র একটি গিনি মোহর ও এক ভাঁড় রসগোল্লা তাঁর চরণে উৎসর্গ করেছিলাম। তিনি ব'ললেন, তাঁর পৈতৃক বিদ্যা তিনি আমার নিকট গোপন করবেন না; তবে তাঁর পোষ্য পৌত্র বালক নসুকে তাঁর অভাবের পর যেন আমি দেখি। আমার সম্মতিসূচক প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি আমাকে অকাতরে শিক্ষা দিতে শুরু ক'রলেন। এই প্রসঙ্গে বাঙলার পাঠকদের অবগতির জন্য লিখছি যে, ঐ বালক নসুই আজকের দিনে সুবিখ্যাত সংগীততত্ত্ববিদ ও যন্ত্রসংগীতকার ওস্তাদ সৌকত আলী খাঁ যিনি আজ সংগীত প্রেসের অধিকারী ও যাঁর লিখিত সেনীগীতিমালা (পাঁচ খণ্ড), সেনী রাগমালা ও সেনী সেতার শিক্ষা বাংলা ভাষায় সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ সকলের মধ্যে রত্নস্থানীয়।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন সৌকত আলির মাত্র বারো বছর বয়স। আমি মহম্মদ আলির নিকট যখন শিক্ষা গ্রহণ করতাম,—তখন সে আমাদের সামনে বসে শুনতো; খাঁ সাহেব প্রথমেই আমাকে বেহাগের আলাপ ও ধ্রুপদ শেখাতে শুরু করলেন। আমার ইচ্ছানুযায়ী কোনও প্রসিদ্ধ রাগ দিয়ে তালিম শুরু করা তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তিনি বলতেন : রাগবিদ্যার সকল অংগ প্রসিদ্ধ রাগগুলিতে দেখানোই সহজসাধ্য; তানসেনের ঘরানার গুণীরা প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু রাগই জানতেন,—ঐ সকল রাগের ধ্রুপদ তানসেন ও তাঁর বংশধরগণ প্রায় দুই-তিন হাজার রচনা করেছেন; ঐ সকল ধ্রুপদই তাঁরা গাইতেন। বৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য সব রাগই তাঁরা বাজিয়ে দেখাতেন; কিন্তু কণ্ঠের আলাপ-চারী বা যন্ত্রসংগীতের বিস্তৃত আলাপের জন্য তাঁরা প্রচলিত বড় বড় রাগের ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে মহম্মদ আলীর জ্যেঠতাতপুত্র কাশীর বিখ্যাত রবাবী সাদেক আলী খাঁ যা বলতেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলতেন : "দুনিয়ার যে সব রাগ সবাই গায় বা বাজায়, আমরা অর্থাৎ সেনীরাও সেই সব রাগই গেয়ে বা বাজিয়ে থাকি। কিন্তু দুনিয়া থেকে আমা-দের রাগ পরিবেশন সম্পূর্ণ পৃথক; আমি চল্লিশ বৎসর ধরে 'শুদ্ধকল্যাণ', 'ইমন-কল্যাণ' ও 'দরবারী কানাড়া' এই তিনটি রাগ নিয়ে পড়ে আছি। আজও এই তিনটি রাগের পার খুঁজে পেলাম না।"

মহম্মদ আলী তাঁদের বংশগত রীতি অনুযায়ী আমাকে পূর্ণাঙ্গ আলাপ শিক্ষার জন্য দু-একটি প্রসিদ্ধ রাগ নির্বাচন করতে বলেছিলেন। ঠিক ঐ সময়ই বিখ্যাত সেতারী এনায়েৎ খাঁ গৌরীপুরে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করতেন। তিনি তাঁর পিতা এমদাদ খাঁর আদর্শ অনুযায়ী ইমন ও পুরিয়া এই দুটি রাগ সারা জীবন ধরে সুরবাহার যন্ত্রে অভ্যাস করে গেছেন। আমিও বেহাগ ও শুদ্ধকল্যাণ এই দুটি রাগ বিস্তৃতভাবে শিক্ষা করবার জন্যে মহম্মদ আলী খাঁসাহেবের শরণার্থী হলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের উদ্যান-শোভিত বাগানবাড়ীতে এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে কুসুম গন্ধামোদিত বারান্দায় কার্পেট পেতে খাঁসাহেবের নিকট আমার প্রথম বেহাগ আলাপ শিক্ষা শুরু হয়েছিল। তিনি গৌরীপুরে আমাদের একটি পুরনো সরোদ রবাবের সুরে বেঁধে কাঁধে তুলে রবাবের ঢঙে আলাপ বাজাতেন; কেননা তাঁর দিল্লীধাড়ের রাজবাড়ী থেকে তাঁর নিজের রবাবটি তিনি নিয়ে আসেন নি। কিন্তু আমাকে তিনি রবাবের আলাপ শেখান নি; আমার পক্ষে সুরশৃংগারের আলাপই তিনি উপযোগী মনে করেছিলেন; এই আলাপ ধ্রুপদ গায়কীর অনুকরণে বাজাতে হয়। তিনি আমাকে বলতেন : "রবাবের আলাপ বাজাতে হলে দ্রুত জোড় ও ঝোলের অভ্যাস খুবই প্রয়োজনীয়; তুমি তা পেরে উঠবে না! তাছাড়া তোমার তাতে প্রয়োজনই বা কি? বড় বড় আসরে মৃদঙ্গীদের সঙ্গে সংগতে খ্যাতি ও অর্থ অর্জন তোমাকে করতে হবে না। সুরের মোহে সকলকে মুগ্ধ করা ও নিজে আনন্দ লাভ করা, এইটেই তোমার সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক।"

তিনি আমাকে বেহাগের একটি ধ্রুপদ শেখালেন : (সিরোঁর সিরোঁর পবন চলত) এবং কণ্ঠে আলাপের তান গেয়ে যন্ত্রে সেই সকল তান অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন; এইটেই হলো সুরশৃংগারের পদ্ধতি। এই আলাপে ঘসীট বা মীড়ের কাজ সর্বাধিক; বিলম্বিতের পরে মধ্যলয়ে নানা ছন্দ বাজাতে হয় ধ্রুপদের বাটের অনুকরণে। সর্বশেষে ঝালা ও কিছু বোলের পরিবেশন আবশ্যক হয়। মহম্মদ আলী খাঁসাহেবের আলাপে বা বিলাস খাঁর ঘরের আলাপে রাগ সহজেই খুলে প্রকাশ করতে হয়। কয়েকটি সুরেই রাগ প্রকাশ পাওয়া চাই; একে আওচার আলাপ বলে। এতে বিস্তারের অবকাশও যথেষ্ট বিদ্যমান; কিন্তু কিরানা ঘরের আলাপের মত খণ্ডমেরু প্রকরণ এতে দেখান হয় না। রবাবীরা খণ্ডমেরুর কাজ অপেক্ষা আওচারের কাজেই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন।

শ্যামলী। শান্তিনিকেতন — ফটো : সুকুমার রায়

শুনতে পেলাম বিরাট বৌদ্ধ বিহার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সংঘরক্ষিতের মনে। আজকের এই দীন কুটির হয়ত একদিন বিরাট সৌধে পরিণত হবে কিন্তু সেদিন এ বিজন মৌনতায় নিরাবলম্বন নিঃস্বতায় যে পরম আকর্ষণটি জেগে রয়েছে সে কি থাকবে? গড়ে উঠবে জনকোলাহলমুখরিত জনপদ। হারিয়ে যাবে এ বিজনতার মৌন-মহিমা। দুর্গমকে জয় করার দুষ্প্রাপকে পাওয়ার যে চিরন্তন আকর্ষণ মানুষকে চির কিশোর করে রেখেছে সেই জিজ্ঞাসু কিশোরটির জন্য আর এখানে কোনও নতুনত্বই থাকবে না। বিস্ময়পিপাসী মানব আর এখানে এসে কোনও সুখই খুঁজে পাবে না।

কুন্ডাভাটি গুহাগৃহ আর লংকারাম সংঘের মাঝামাঝি পড়ে এক কালী মন্দির। অদ্ভুত সাদৃশ্য কালীমূর্তিটির দক্ষিণেশ্বরের মার মূর্তির সঙ্গে। সুদূর পশ্চিমঘাটের এই অখ্যাত স্থানে ভবতারিণীর স্মরণে মন আনচান করে উঠলো। ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাত্রী এক স্বনামধন্যা মহিলা কিন্তু এখানের মাতাজী একান্তই সাধারণ—ভস্মেঢাকা অঙ্গার কিনা জানি না সে কথা। সামান্য কয়জন ভক্তের মাতাজী তিনি। কৌতূহলী মন নিয়ে মাতাজীকে প্রশ্ন করে জানলাম মুক্তানন্দ স্বামী নামে বাঙ্গালোরের এক সন্ন্যাসী ঐ গুহাগৃহে বহু বছর তপস্যা করে দেহত্যাগ করবার পর তাঁর শিষ্য তাঁকে এই মন্দিরে এনে সমাধি দেন। আত্মগোপন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেই ভালবাসতেন সে তাপস। এঁরা দুজনা স্বামী-স্ত্রী তাঁর সেবক ছিলেন। উপস্থিত সেই শিষ্যাই সন্ন্যাসিনী মাতাজী। এ মন্দির তাঁরই গড়া। একটি কিশোর পুত্র ও বালিকা কন্যা নিয়ে এই বিজন মন্দিরটি প্রাণবন্ত করে রেখেছেন উপাসনায় সাধন-ভজনে। এই মূর্তিটি তিনি প্রস্তুত করিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূর্তিটির এমন পরিকল্পনা কেমন করে তাঁর মনে এল কে জানে। কাল-ক্রমে গত হয়েছেন শিষ্যটিও। তাঁরও সমাধি দিয়েছেন শিষ্যপত্নী গুরুরই সমাধি পার্শ্বে। সমাধি মন্দিরের একপাশে ফল বাগান, ফুল বাগান একটি পাতকুয়াকে ঘিরে রচিত হয়েছে। পাতকুয়াটি হওয়ার পর আশে-পাশের জনপদবাসীর আর জলকষ্ট নেই। নাতিবৃহৎ নাটমন্দির। মাঝখানে যজ্ঞকুণ্ডে অখণ্ড ধুনি জ্বলছে। সব গড়ে তুলছেন মাতাজী ভক্ত-ভক্তানীর সহায়তায়। এ আশ্রমটিও যেভাবে বড় হয়ে উঠছে অদূর ভবিষ্যতে একটি বৃহৎ আশ্রমে পরিণত হওয়ারই সম্ভাবনা। মূর্তির সামনের নাটমন্দিরের বহু ভক্ত মায়ের ভজন গান করছেন খোল করতাল বাজিয়ে। এক ধারে একটি আসন পেতে বসে আছেন প্রৌঢ়া গেরুয়াবসনা মাতাজী—তিনিও ভজন গান করছেন ভক্তদের সঙ্গে। সঙ্গীত সমাপনান্তে সমবেত নাচ আরম্ভ করলেন তাঁরা। মাতাজীও তাঁদের সঙ্গ নিলেন। নৃত্য-গীতে তাঁরা যেন আত্মবিস্মৃত হলেন। আত্মনিবেদনের এ রীতিটিও বড় ভাল লাগল। **শেষ হল মানুষের সেই চিরন্তনকে খোঁজার।**

সিরাজের কলকাতা আগমন

হেমচন্দ্র ঘোষ

হুগলী থেকে বিতাড়িত ইংরেজ। বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার দিয়ে নবাব আবার তাদের ডেকে আনলেন। এজেন্ট চার্নক লোকজন নিয়ে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট সুতানটীতে উপস্থিত হল। হুকুমনামা এল দিল্লী থেকে। বাৎসরিক তিন হাজার টাকা কর দিয়ে ইংরেজ কলকাতায় ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করল। হুকুমনামায় সর্ত ছিল ব্যবসা ছাড়া তারা দেশের রাজনীতিতে মাথা দেবে না। ১৬৭৪ সালে ডুপ্লেশিস্ চন্দননগরে কিছুটা জমি কেনেন কিন্তু প্রবলতম শত্রু ডাচ্‌দের বিরোধিতায় ফরাসীরা সেখানে কোন ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করতে পারে নি। ১৬৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফরাসীরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় অবাধে বাণিজ্য করার অধিকার পেল। কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ জলা আর জঙ্গল ইংরেজদের কাছে ভীতিপ্রদ হলেও হুগলীর ফৌজদারের শাসানি আর যখন তখন নজরানার চাপ এড়াবার পক্ষে কলকাতা তাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এখনকার পার্ক স্ট্রীটের পূর্বে যে জঙ্গল ছিল সন্ধ্যার আগেই সেখানে বাঘের ডাকে লোকে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। চিৎপুর থেকে কালিঘাট পর্যন্ত সড়কের দুপাশে ঘন জঙ্গলে দস্যুদের আস্তানা ছিল। তারা খিদিরপুরে ঠগীদের মত খুনজখম রাহাজানি নির্বিবাদে করেই যেত। মানিকতলার পূবে বাগমারীর জঙ্গলে শিকারীরা ছুটত বাঘ মারতে। কলকাতার কিছুটা উজানে গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে উলুবেড়ে। উলুবেড়ে ভীষণ অস্বাস্থ্যকর। সেখানে গঙ্গা বেশ গভীর, জাহাজ ভিড়তে অসুবিধে হবে না। খানিকটা ডক তৈরী করে ইংরেজরা সেখান থেকে পালিয়ে এল। কলকাতাকে গড়ে তুলতে পারলে ব্যবসার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে, এদেশের অঢেল দ্রব্যসম্পদ ইউরোপে পাঠিয়ে কোম্পানীর লাভের অংশ শতগুণ বেড়ে যাবে। কলকাতায় আরম্ভ হল ডক তৈরী। তখনকার দিনে জাহাজগুলো পাল তুলে চলত আর সাইজে বড় ছিল না। ইংরেজদের দেখাদেখি ডাচেরা বরাহনগরে আস্তানা গাড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের ব্যবসাবাণিজ্য সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা। ইংরেজ ছাড়া আর কোন বৈদেশিক জাতির এদেশে রাজ্যস্থাপনের কোন সঙ্কল্প কোনদিন ছিল না। ১৬৯৯-১৭০০ সালে কলকাতায় একটি ছোটখাট ফোর্ট তৈরী হল। ইংলন্ডের রাজার নামে ফোর্টের নাম হল ফোর্ট উইলিয়াম। সেই পুরানো ফোর্টটি লুপ্ত হয়ে গেছে; তার জায়গায় নতুন করে যে ফোর্ট তৈরী হল সেটাই সেই পুরানো নামই বহাল রইল। দেশের বড়লোকেরা দুর্গ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় আশ্রয় নিল—বাড়ীঘর করে কলকাতা জাঁকিয়ে তুলল। ক্রমবর্ধমান কলকাতার ঐশ্বর্যের খ্যাতি বাংলার নবাব আজিমের কানে উঠল। নবাব তখন থাকতেন বর্ধমানে। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের নিশ্চিত আশঙ্কায় নবাব আজিম বুদ্ধি করে বাংলাদেশ থেকে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন। যে কোন উপায়ে তাঁর টাকা চাই। ইংরেজরা বেশ দুপয়সা রোজগার করছে, দিল্লীর হুকুমে তাদের কর দিতে হয় না, দেশটা তারা লুঠে নেবে এ কেমন কথা! দেশেরই লোকেরা কলকাতায় এসে উঠেছে, তাদের দেখাশুনো নিরাপত্তার দায়িত্ব নবাব সরকার এড়াবেন কেমন করে! নবাব হুকুম দিলেন দেশীয় লোকদের জন্যে একদল পুলিশ ও একজন কাজী কলকাতায় থাকবেন। ইংরেজ ভারী অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। নবাবের কাছে বহু দরবারেও কোন ফল হল না। ইংরেজ তখন তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে বেঁচে গেল। কোম্পানীর কাছ থেকে ষোল হাজার টাকা নবাব নিলেন, আদেশ দিলেন কলকাতায় নবাবী পুলিশ বা কাজি থাকার প্রয়োজন নেই।

"It was counteracted by a bribe to the prince who forbade the governor of Hughly from proceeding in his intentious.' ঘুষ দেওয়ার রীতিনীতি ও পদ্ধতি ইংরেজ খুব ভালই জানত। এই মহা অস্ত্রে দেশের লোকগুলোকে বোকা বানিয়ে তারা পরে এই গোটা মহাদেশটার রাজা হয়ে বসল। ইংরেজ তাড়াতে তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না। ইংরেজ তাড়াতে দুর্নীতিমুক্ত নবাব দরবরাই যথেষ্ট ছিল। 'নিশানের' সর্ত ইংরেজ পুরাপুরি মেনে চলল না। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির খেলা তাদের পেয়ে বসল। তখন দেশের দুর্দিন। মুর্শিদাবাদের শক্ত রাজদণ্ড মারাঠাদের আক্রমণে শিথিল হয়ে পড়েছিল। বাংলার পশ্চিম ও গটা বিধ্বংশ হয়ে গেল। মারাঠাদের অত্যাচার, তাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি, অকারণে নরহত্যা আর ব্যাপক অগ্নিসংযোগে গ্রামের পর গ্রাম বহু গ্রাম বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এই ডামাডোলের সময়ে ইংরেজ নবাবের কাছ থেকে সুযোগ আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল। কলকাতা গঙ্গার পূবে কূলে—আত্মরক্ষার প্রয়োজন, তাই তৈরী হল ফোর্ট উইলিয়ম। দুর্গের অভ্যন্তরে লাটপ্রাসাদ, রাইটার্সদের অফিস। প্রতিরক্ষার যতখানি প্রয়োজন সুযোগসুবিধামত ইংরেজ করে বসল। ফোর্টের বাইরে ইংরেজ বাসিন্দারা বড় বড় বাড়ীঘর তৈরী করে নবাবী কেতায় বসবাস আরম্ভ করল। বাজার-হাট বেশ জেঁকে গেল। নবাব কলকাতার কোন খবরই জানলেন না। দরবারী চক্রে দেশটাকে পিষে ফেলা হল—ঘুষ দিলেই সব কাজ হাসিল করা যায়। তখন প্রায় গোটা দেশটাই নবাবের হাতছাড়া। দোস্ত মীর হাবিবের সাহায্যে মারাঠারা হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, রাজসাহী, বীরভূম দখল করে নিল। মুর্শিদাবাদ শহর লুণ্ঠিত হল। মারাঠাদের অত্যাচারের হাত এড়াবার জন্যে বিপুল সংখ্যক লোক গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিল। দেশের সম্পত্তিপন্ন লোকেরা কলকাতায় রেফিউজী হয়ে গোলপাতার ঘর করে বাস করতে লাগল। পাকাবাড়ী করার অধিকার তাদের তখন ছিল না। রাজা দর্পনারায়ণ তখনকার দিনের বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সুবে বাংলার প্রধান কানুনগো। তাঁর ছেলেপুলেরা হুগলী থেকে কলকাতায় চলে এলেন। রিফিউজীদের ধারণা, ইংরেজদের গোলাবারুদ, কামান বন্দুক প্রচুর, বিলেতী জাহাজ বড় বড় কামান নিয়ে গঙ্গার ঘোরাফেরা করে, কলকাতা অতি সুরক্ষিত, মারাঠারা কলকাতার দিকে হাত বাড়াবে না। এই সুবর্ণসুযোগ। ইংরেজ নবাবের কাছে আরও কিছু আদায়ের মতলব করল। মারাঠারা কলকাতায় আসতে পারে এই অজুহাত নবাবের কাছে পেশ করা হল। কলকাতাটা ঘিরে চারিদিকে খাল কাটার হুকুম নবাব এককথাতেই দিলেন। নবাব আলিবর্দীর তখন সসেমিরে অবস্থা—না দিয়েই বা উপায় কি? ইংরেজ জানত মারাঠারা গঙ্গা পার হয়ে কোনদিনই কলকাতায় আসবে না—গঙ্গা পার হবার উপযুক্ত যানবাহন মারাঠাদের ছিল না। ভবিষ্যতের প্রস্তুতি ইংরেজদের উদ্দেশ্য। ইংরেজের টাকা নেই, কি করে খাল কাটবে! কাউন্সিল বসল, রিফিউজীদের ঘাড় ভেঙে খাল কাটার প্রস্তাব সভাগণ অতি গম্ভীরভাবে গ্রহণ করল। প্রস্তাবের গুরুত্ব ও গম্ভীরতা না দেখালে উমিচাঁদ নেটিভদের কাছে সব ফাঁস করে দেবে, তাহলে খাল কাটা হবে না—ইংরেজদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। প্যারেড গ্রাউণ্ডে রিফিউজীদের ডাকা হবে ঠিক হল। ইংরেজদের মধ্যে যারা 'রাইটার' তাদের মাহিনা এত কম ছিল যে তাদের হাতখরচ

তার বৃষ্টির মধ্যে মাটির ওপর তরি-তরকারী, চাল-ডাল, ফল-মূল, মাংস, মুরগী খুব সকালে বিক্রী হত। চাল মাটির ওপর ঢেলে বিক্রী হত, কুমড়ো অমত পাকাড়ুয়াল আর থালা ভর্তি শুকনো ওটকেটে খামারগুলো মাছিতে ঢেকে রাখত। তবুও সাহেবদের কাছে কলকাতা ছিল স্বর্গ। জমকালো পোশাক পরে মেয়েরা ঘুরত পার্কের চারিদিকে প্রজাপতির মত— জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট ঝোপের ধারে মেয়েপুরুষের জোড় চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে মশগুল হয়ে কল্পনার সোনার স্বপনে ডুবে থাকত। সাহেবদের পোষাক এখনকার দিনে হলে বলত জংলী। চিকনের ওয়েস্ট কোটের ওপর লংকোট আর হাঁটু পর্যন্ত ঢেকো ব্রিচেস—সবসময়ে হাতে থাকত একটা তরোয়াল। মাথায় পরচুলো তার ওপর তেকোণা টুপি পাখীর ন্যাজের মত ঝুলে থাকত সিল্কের ফিতে। বিলেতের নতুন ডিজাইনের কাপড়চোপড় একবছর পরে মেয়েরা এদেশে পরত। তাতেই কত আনন্দ। পার্কে নৈশ অভিযানে আড়চোখে এর ওর পোশাক দেখে ভালমন্দ বিচার করে নিত। এই ছিল কলকাতার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা। সাহেবপাড়াটা ছিল সুসজ্জিত আর সুরক্ষিত। নেটিভরা কেউ সন্ধ্যার সময় ও পাড়ায় ঢুকতে পেত না—এসওয়েলের শাসন ছিল বড়ই কঠোর। ফোর্টে ছিল প্রচুর গোলাবারুদ, বন্দুক আর কামান, গঙ্গায় ঘুরে বেড়াত বিলেতী জাহাজ—সবাই ভাবত, এর চেয়ে সুরক্ষিত শহর আর হতেই পারে না। ইংরেজরা তবুও মনে মনে ভয় করত, কি জানি নবাব কখন কি করে বসেন! পর্তুগীজরা ছিল বোম্বেতে, তারা দেশের রাজা হতে চায়নি। ফরাসীরা মাদ্রাজে বড় হবার চেষ্টা করছিল। ইংরেজের ঝোঁক ছিল বাংলার—এর অতুল সম্পদ, বড় বড় নদনদী আর নেটিভদের নিম্নস্তরের নৈতিক জীবন একটা রাজ্য গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হবে এটা তারা ধরেই নিয়েছিল। নিষেধ সত্ত্বেও তাই ইংরেজরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেনি। নবাবের আদেশ বারবার উপেক্ষা করে তারা কলকাতার ফোর্ট দুর্ভেদ্য করে তুলতে লাগল। তাদের ভ্রান্ত ধারণা আর ঔদ্ধত্য এতখানি বেড়ে উঠেছিল যে নবাবের আদেশ আমলে না দিয়ে কাশিমবাজারের ফ্যাক্টর ওয়াটের সুপারিশে ড্রেক রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় আশ্রয় দিল। সাহেবপাড়ার একমাত্র নেটিভ বাসিন্দা উমিচাঁদ—তাকে নানাকরণে ইংরাজরা তোয়াজ করে চলত। অজস্র টাকার মালিক, ব্যবসায়ে ইংরেজদের বন্ধু, নবাব দরবারে তার পসার-প্রতিপত্তির সুযোগ পাওয়া যায়—তাই ইংরেজ অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস না করলেও, মুখে সবসময়ে শেঠজীকে আপ্যায়ন করত। পরবর্তীকালে ক্লাইভ এক জাল দলিল করে এই উমিচাঁদকে ঠকিয়েছিল। উমিচাঁদ শৌখিন লোক, চলাফেরার জন্যে একটা স্পেশাল রকমের গাড়ী তৈরী করে নিয়েছিল—মাটির সঙ্গে প্রায় ঠেকান এত নীচু পাদানি আর হ্যান্ডেল ছিল খুব শক্ত। হ্যান্ডেল ধরে ঝোঁক দিয়ে যখন গাড়ীতে উঠত তখন তার দেহের মাংসগুলো থরথর করে কাঁপত। দুটো সিপাহী ছিল উমিচাঁদের দেহরক্ষী। তারা গাড়ী চলার সময় পিছনে দাঁড়িয়ে থাকত, হাতে থাকত খোলা তরোয়াল। বাংলার রাজনীতি ক্রমে ঘোরাল হয়ে পড়ল। ড্রেকের চিঠিগুলো মিথ্যে উক্তি আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ। নবাব সহ্য করতে পারলেন না। ইংরেজ সব দরবারে যে অস্ত্র ব্যবহার করে ফল পেয়েছে এবার সেটা খাটলো না। উমিচাঁদ আদৌ রাজী হল না—মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। ইহুদী বণিক খোজা ওয়াজেদের হাতে নবাব ড্রেককে চিঠি দিলেন—"কলকাতার দুর্গ ধ্বংস করবে—তাদের এদেশ থেকে চলে যেতে হবে। শীঘ্র কলকাতায় যাচ্ছি আমার ফৌজ নিয়ে। আমাকে কেউ সংকল্পচ্যুত করতে পারবে না—আল্লার নামে শপথ নিয়েছি।"

"It has been my design to level the English fortifications for which reason I shall use the utmost expedition. Should any person plead for them, it will avail them nothing. I swear by the Great God and the prophets, I shall totally expel them from this country". মানুষের চিন্তাধারার বিপরীত ফল সংঘটিত হয় নিয়তির চক্রে, সিরাজের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বিবর্তন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, সমাজের শত্রু যারা তাদের হীন ষড়যন্ত্রের বলি হলেন বাংলার নবাব যাঁকে দেখ-না-দেখ কুর্ণিশ করে যারা সন্তুষ্ট করার সর্বদাই চেষ্টা করত। এই অদৃষ্টের পরিহাস। কলকাতার তথা ইংরেজদের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্যে নবাব রাজনারায়ণকে বহাল করেন। সে তার ভাই নারাণ দাসকে কলকাতায় পাঠাল কিন্তু ড্রেক তখন বারাসতে, কাউন্সিলের মেম্বর তাকে ঢুকতে দিল না, তাড়িয়ে দিল গুপ্তচর বলে। ১৭৫৬ সালের ৫ই জুন শনিবার সকালে নবাব কাশিমবাজার আক্রমণ করলেন। ওয়াট বিনা বাধায় কাশিমবাজার নবাবের হাতে তুলে দিল। ওয়াট হল বন্দী, তাকে পাঠান হল মুর্শিদাবাদের কারাগারে। ওয়াটপত্নী তখন সন্তানসম্ভবা অসুস্থ। নবাবের কাছে আবেদন করা হল, নবাব ওয়াটকে মুক্তি দিলেন। সিরাজের এই মানবতার পরিচয়, এই মহান উদারতা কি তাঁর ধ্বংসের কারণ? কাশিমবাজার দখলের পর নবাব কলকাতার দিকে রওনা হলেন। নবাবের বিরাট বাহিনী এগার দিনে দেড়শ মাইল পার হয়ে বারাসতে পৌঁছিল।

"Spies reported that Nawab's army which consisted of from 30000 to 50000 men with 150 elephants and camels, the cannon taken at Cossimbazar and 25 Europeon and 200 portiguese gunners had arrived at Barasat and that a small party had been seen at Dum Dum" — Hill.

নবাবের সাথে বিবাদের মূল কারণ ইংরেজদের দাম্ভিকতা ও নষ্টামি। সিরাজ তার মুর্শিদাবাদে ঘুষ দিয়ে ইংরেজ বহু সুযোগ-সুবিধে নিয়েছিল। কাশিমবাজার আক্রমণের আগ পর্যন্ত ড্রেক সেই রকম চিন্তা করে চিঠির পর চিঠি নবাব দরবারে পাঠাতে লাগল, নয় কথাকাটি করে যুদ্ধের আশঙ্কাটা যদি কমাতে পারে কিন্তু সে বুদ্ধি এবার খাটল না। বিনা বাধায় কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হবে ড্রেক চিন্তাই করতে পারে নি। এবার ড্রেকের ভুল ভাঙলো। ১৯ই জুন ফোর্টে মিটিং ডাকা হল। লাচ কোম্পানীর কার্পেন্টার পুরনো লোক। মেম্বাররা ফোর্টের চারিদিক ঘুরল, দেখলো। গুদামঘরের ভাঙ্গা ছাদে কামান বসান সম্ভব নয়। ফোর্টের দেওয়ালগুলো জায়গার জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে। গভর্নর বা মেম্বররা এদিকে কেউ কোনদিন নজরই দেয় নি।

"During the lush fat years of profit making not a soul appears to have had the energy to examine the fort". গঙ্গার ধারে ফাঁকায় তিন বছরের আঠারটা কামান পড়ে আছে, তাদের গায়ে জং ধরে গেছে। ফোর্টের গোলাবারুদের চার্জে উইদারইংটন, তাকে ডাকা হল। তার হিসেবে প্রচুর গোলাবারুদ, মালমশলা, কিন্তু পরে হিসেব মিলিয়ে দেখা গেল যে, কিছুই নেই, অতি সামান্য। তখন সাহেবপাড়ার সকলে অসন্তোষ ও আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন মিনাসিন সেনা বাহিনীর কর্তা। তাকে কিন্তু ড্রেক মোটেই দেখতে পারত না। উপায় নেই, তাকে ডাকা হল। মিটিং-এ মিনাসিন কোন জবাব দিতে পারল না। সার্জেন্ট গ্রে আর ক্যাপ্টেন গ্রান্ট জানাল তাদের সৈন্যসংখ্যা মাত্র একশ আশিজন। নবাবের বিরাট বাহিনীর কাছে এক নিঃশ্বাসে উড়ে যাবে। মিটিং নীরব। ইঞ্জিনীয়ার জন চিন্তা করে বলল—হোয়াইট টাউনের সব বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলে ফোর্ট থেকে সরাসরি যুদ্ধ চালাতে হবে। এত বড় বড় সুন্দর বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এটা পাগলের কথা। বিদ্রূপের আঘাত সহ্য না করে জন মিটিং থেকে চলে গেল। উমিচাঁদ সাহেবপাড়ার থাকে, নবাবের অনুগৃহীত, ইংরেজদের ভেতরের খবর নবাবকে জানিয়ে দেবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তাকে বন্দী করার প্রস্তাব দেওয়া হল।

১১ই জুন কলকাতায় খবর—নবাব কৃষ্ণনগর পার হয়েছেন! সন্ত্রস্ত ড্রেক আর স্থির থাকতে পারল না। উমিচাঁদকে বন্দী করার ভার পড়ল স্মিথের ওপর। এ রকম একটা ঘটবে, উমিচাঁদ আগে থেকেই সন্দেহ করেছিল। সে সব সময়ে প্রস্তুত। সকালের দিকে স্মিথ উমিচাঁদের বাড়ী ঘিরে ফেলল, সঙ্গে তার মাত্র পঁচিশজন গোরা। কোন আপত্তি না করে উমিচাঁদ গাড়ীতে উঠল। স্মিথের তখন কি করণীয়? তল্লাসী চলল, সঙ্গে সঙ্গেই লুঠপাট। তখন পাঁজীর "সারভিস" চলছিল। উমিচাঁদ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সিপাহীরা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। নবাব এসে পড়েছেন, গুলী চলছে, গাঁজায় দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হল। কেউ কেউ দৌড়ে পালাল, মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ পিছন দরজা দিয়ে ছুটে দিল। সারা ম্যাপালটফট খুব মোটাসোটা, তাড়াতাড়ি দৌড়-ঝাঁপ করতে অক্ষম, তিনি জ্ঞান হারালেন। মিসেস ম্যাকেটের শাঁগাগর ছেলেপুলে হবে, তিনি বেরুতে পারলেন না—হতভম্ব হয়ে মেঝেতে বসে পড়লেন। গোরারা যাতে অন্দরমহলে ঢুকে মহিলাদের অসম্মান না করতে পারে এই ছিল উমিচাঁদের আদেশ। উমিচাঁদের সিপাহীদের প্রধান জগন্নাথ সিং অন্দরের প্রবেশপথে স্মিথকে বাধা দেবার জন্যে গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিয়েছিল। স্মিথ সিপাহীদের গুলির হাত হতে আত্মরক্ষার জন্যে একটু সরে দাঁড়ান। এই সময়ে জগন্নাথ মেয়েদের নিয়ে বাগানের এক কোণে গেল। তিনজন বালিকা সমেত তেরজন মহিলা জগন্নাথের ইঙ্গিতে সার দিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম মহিলাটি একটু বয়স্কা জগন্নাথ তাঁর মুক্ত বুকে ছোরা বসিয়ে দিল। একে একে জগন্নাথের ছোরার বলি হল যোলজন। তাঁদের নির্ভীক প্রশান্ত ললাটে ফুটে উঠেছিল সতীত্বের গৌরবদীপ্তি, প্রভাতী সূর্যের নির্মল করোজ্জ্বলে তাদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একে একে চোখের সামনে এই বীভৎস হত্যালীলা তাদের এতটুকু বিচলিত করে নি, এতটুকু প্রতিবাদ তাদের মুখ থেকে বেরুলো না। বীরাঙ্গনার হাসিমুখে মরণ স্বর্গের সুষমা। ভারতের নারী জীবন দিয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা করে গেছেন।

ঐতিহাসিক আর্মির মতে ভারতের নারী রূপ-মাধুর্যে গ্রীক ভাস্কর্যের কল্পনাকে পরাভূত করেছে, সেই দেশের পবিত্রতার দীপালোকে সমুদ্ভাসিত হয়ে আছে সীতা, সাবিত্রী। মেবারের মহারাণী পদ্মিনী সতীত্বের বিজয় মশাল চিতোরের পর্বতশৃঙ্গে প্রজ্বলিত করে গেছেন। যশোরেশ্বরী প্রতাপমহিষী শরৎকুমারী বিজেতার হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে যমুনার কোলে সলিলসমাধি রচনা করেছিলেন। "শরৎখানার দহ" বাঙালীর পবিত্র তীর্থস্থান। মৃতের স্তূপ দেখে লোকে ভয়ে শিউরে উঠল, কিন্তু জগন্নাথ নির্বাক, দ্বিধাহীন। জগন্নাথ তখন নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে দিল। জগন্নাথ মরে গেছে ভেবে স্মিথ নির্ভয়ে আবার উমিচাঁদের বাড়ীতে ঢুকল। ইংরেজদের ধারণা উমিচাঁদের বাড়ীতে পাহাড়প্রমাণ সোনারূপো আর ঝুড়ি ঝুড়ি হীরে জহরৎ লুকোন আছে। স্মিথ মহানন্দে নির্বিবাদে ঘরের পর ঘর দেখতে লাগল। ড্রেকের সঙ্গে ভাগে স্মিথ বহু টাকা পেয়ে গেল। ১৩ই জুন নবাবী ফৌজ বারাসতে রয়ে গেল। মাত্র দু হাজার, পর দিন সন্ধ্যায় মারাঠা ডীচের পাশে তাঁবু গাড়ল। ইংরেজ তখন মরিয়া। নবাবী ফৌজের হট্টগোল, কামানের ঘনঘন শব্দ আর অজস্র মশালের আলো রাতকে যেন দিন করে দিল—রণভেরী আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। সাহেবদের ছেলে-মেয়েদের ফোর্টে আনা হল। "প্রিন্স জর্জের" ক্যাপ্টেন হেগকে ফোর্টের কাছাকাছি গোবিন্দপুরে নঙ্গর করতে বলা হল। কামান-বন্দুক নিয়ে প্রয়োজনমত সাহায্য করার আদেশ হেগকে দেওয়া হল। নবাবের আক্রমণ শুরু হল পরদিন সকালে আর পেরিং রিডাউট (মিলিটারী চৌকী) হবে অভিযানের প্রথম টার্গেট। নেটিভরা কলকাতা ছেড়ে পালাতে শুরু করল—প্রলোভন আর ভয় দেখিয়ে তাদের রাখা গেল না। নেটিভদের থাকা ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের সময় তাদের দিয়ে মালপত্র বহন চলবে আর নেটিভদের বাড়ীঘর ভেঙেচুরে এগুতে নবাবী ফৌজের কিছু সময় লাগবে—সেই সময়ের মধ্যে পালাবার সুযোগ-সুবিধে তারা খুঁজে নেবে। ত্রিশ হাজার নেটিভ একযোগে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। স্বার্থপর ইংরেজের সকল প্ল্যান তারা ভেঙে দিল, মারাঠা ডীচের ধারে নেটিভ টাউনে উমিচাঁদের বাগানবাড়ী — আম, নারকেল আর বিভিন্ন ফলফুলে ভরা। বাগানের ভেতরে সরু সুরকীর পথ সোজা-সুজি কিছুটা অন্তর ক্রস করে সীমানার পাঁচিল পর্যন্ত শেষ হয়েছে। প্রতি ক্রসিং-এ মার্বেল পাথরের বেদী—বেল-যুঁই-এর কেয়ারী-করা। নবাব এইখানে হেড কোয়ার্টার্স করে উমিচাঁদের বাগানে এলেন। কলকাতা সম্বন্ধে নবাবের চরেরা তাঁকে কোন দিনই সঠিক খবর দেয় নি। নবাব ওয়াকিবহাল হলে লম্বা-চওড়ায় দেড় মাইল শহর দখল করতে নবাবের এত আয়োজন করার প্রয়োজন হত না। জগন্নাথ গুরুতর আহত হয়েছিল কিন্তু মরে নি। এই জখম নিয়ে নবাবের পাহারাদারদের খরদৃষ্টি এড়িয়ে জগন্নাথ নবাবের ঘরে এল, জানাল—মারাঠা ডিচ মাত্র তিন মাইল, আক্রমণের কোনই অসুবিধা নেই। ইংরেজ ভাবতেই পারল না নবাব হঠাৎ প্ল্যান বদলে ফেললেন কেন! ইংরেজ জানত, তারা নিরুপায়, তবু শেষ পর্যন্ত ফোর্টটাকে রক্ষা করার সংকল্প তাদের ছিল। সৈন্য-সংখ্যা মাত্র ৫৫১ জন—এই মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে নবাবের এত বড় বিরাট বাহিনীকে বাধা দেওয়া পাগলের কাজ। মিনাসিন হতাশ হয়ে পড়ল।

> "Drake found 180 soldiers of whom 40 Europeans 60, European militia, 150 Armenian and Portugues militia, 35 Europeon artillary, -- 40 Volunteers from the shipping -- in all 565" — Hill.

ধ্বংস অনিবার্য, মৃত্যুর আশঙ্কায় সাহেবপাড়ার সবাই আতঙ্কে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ইংরেজ বাসিন্দাদের বাঁচাতেই হবে! যে সব নেটিভরা তখনও কলকাতায় ছিল তাদের ধন-প্রাণ রক্ষার ভার তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হল। হোয়াইট টাউন বাঁচাতে হবে অন্ততঃ পালিয়ে যাবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। বাগবাজারের কোলে "পেরিং রিডাউট" মিলিটারী চৌকির চার্জ দেওয়া হল পিকার্ডকে। তার দলে মাত্র পঁচিশ-জন। নবাবী ফৌজের অধিনায়ক রায়দুর্লভ বীর ও বিচক্ষণ। সকালের দিকে আক্রমণের বদলে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেলা দশটায় আক্রমণ শুরু হল। নবাবী গোলন্দাজ সার্জেন্ট জাঁকে কামান দাগলেন—পেরিং রিডাউট ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পিকার্ড আহত হয়ে ফোর্টে চলে গেল। বাগবাজারের যুদ্ধে নবাবী ফৌজের সাফল্যে ইংরেজ দেখল, উত্তর দিকে আর কিছু করার নেই। তারা পূবে আর দক্ষিণের ঘাঁটি শক্ত করার সংকল্প করল। সেই দিনের রাত্রি—কলকাতা ধ্বংসের ভয়াবহ ইতিহাস। বিরাট অগ্নি-কাণ্ডে ধ্বংস হল নেটিভ টাউন—একখানি ঘরও রক্ষা পেল না—আগুনের ফুলকি সারা শহরটাকে আলোয়-আলো করে দিল। অসহায় নরনারীর করুণ আর্তনাদ, জীবন্ত দগ্ধ হবার ভয়ে হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, সর্বস্বান্ত লোকদের ব্যাকুল ক্রন্দন, চোখের সামনে এই ধ্বংসলীলা দেখেও একটিও ইংরেজ এতটুকু সাহায্যের জন্যে এল না। মারাঠা ডীচ খুঁড়ে যারা ইংরেজদের সাহায্য করেছিল তারা এই দুর্দিনে ছেঁড়া জুতোর মত পরিত্যক্ত হল। এই ইংরেজের বিচিত্র চরিত্র। কারও বুঝতে বাকি রইল না, বাগ-বাজারে যুদ্ধে হেরে গিয়ে নবাবী ফৌজের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করার উদ্দেশে ইংরেজরা এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। এই আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ কেউ খতিয়ে দেখল না—নেটিভরা নিঃস্ব হয়ে চলে গেল। ফোর্টের পূবের ঘাঁটি লালদীঘি (গ্রেট ট্যাঙ্ক) এগিয়ে এভিনিউ রোডের মোড়ে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ফোর্টের প্রাণস্বরূপ, ভার দেওয়া ছিল ক্যাপ্টেন ক্লেটনকে। তাঁকে সরিয়ে এনে লেফটানেন্ট লেবুকে চার্জ দেওয়া হল। লেবু ছিল খুব দক্ষ সৈনিক। একটি স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তাকে চন্দন-নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। লেবু তখন ইংরেজের কাজ নিল। ইংরেজরা তাকে

খুব বিশ্বাস করত না। নিরুপায় হয়ে তাকে চাকরী দিতে হয়েছিল। লে'বুর সঙ্গে ছিল ক্যারস্টেয়ারস। সমস্ত দুপুর ধরে নবাবের অশ্বারোহী ফৌজ বড় বড় কামান গোলা-বারুদ নিয়ে লেডি র‍্যাসেলের বাড়ীর পিছনে (মিশন রো) জমায়েৎ হল। কলকাতা তখন পুরোপুরি অবরুদ্ধ নগরী। ইংরেজ মেয়েরা যারা ফোর্টে ছিল তাদের হল চরম দুর্দশা। পুরুষরা যুদ্ধোদ্যমে ব্যস্ত। বাবুর্চি, খান-শামা পালিয়ে গেছে। রান্নার কোন ব্যবস্থাই নেই। যে উদ্দেশে কলকাতার বাজারে আগুন লাগান হল, সেই ফাঁদে ইংরেজরাই পড়ে গেল। বাহির কলকাতার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যেটুকু জল ফোর্টে ছিল তা খরচ করা বারণ হল। ইংরেজ মেয়েরা সারি দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিতে চলল। তাদের লম্বা ঝুলওলা গাউনগুলো ঘামের পচা গন্ধ নেকার ঠেলে আনত। গঙ্গার খোলা জলে বীজাণুভরা, এতদিন তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। বিপদে পড়ে ইংরেজদের মতটা বদলে গেল—গঙ্গায় স্নান আর গঙ্গাজল খাওয়া ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। নবাবী ফৌজের বিরাট আয়োজন। পূবের ঘাঁটি ছেড়ে লেবু ও কারস্টেয়ারস ফোর্টে পালাল। লেডি র‍্যাসেলের বাড়ীর মাথায় নবাবী নিশান উড়ল। দক্ষিণের ঘাঁটিটা নাকি ছিল খুব শক্ত। চার্জ ছিল ক্যাপ্টেন বুকানন আর ম্যাপলিটফটের ওপর। নবাবী ফৌজ শিয়ালদার দিক থেকে সোজা সড়ক ধরে এগুতে লাগল ফোর্টের দিকে। এই রাস্তা এখন বহুবাজার বা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। পূব আর দক্ষিণের দু ঘাঁটি এক-সঙ্গে আক্রমণের ফলে ইংরেজদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। সাহেব-পাড়ার সব বাড়ীগুলোই নবাবের দখলে চলে গেল। ইংরেজদের মধ্যে পালাও পালাও রব উঠল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্যে আটকানর প্রয়োজন। ফোর্ট হতে গেরিলা যুদ্ধের আয়োজন চলতে লাগল। অবরুদ্ধ নগরীর কারও দু দিন খাবার জোটে নি। লেডি র‍্যাসেল খাবারের ভার নিলেন। খাবার জলের খুব টানাটানি। এক বুড়ী "আরক" মনে করে একটা কাপে চুমুক দিয়েই ফেলে দিল, একটা বাচ্ছা মেয়ের মাথায় ছিটকে পড়ল, দেখা গেল সেটা আরক নয় রক্ত। ড্রেক আগা-গোড়াই ভুল করে এসেছে। তার ধারণা চাল অনেক আছে, স্টোর খুলে এক দানাও পাওয়া গেল না। নেটিভ টাউনের যারা প্যারেড গ্রাউণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পোঁটলা-পুঁটলী খুলে চাল সংগ্রহ করা হল। একজন ইহুদী চাল কিছুতেই দেবে না, তাকে তখনি সেখানে গুলি করা হল। প্যারেড গ্রাউণ্ডের শরণার্থীরা বাঁচুক আর মরুক, ইংরেজদের তাতে কি আসে যায়!

"ডোভালডি" একটা ছোট্ট জাহাজ—গঙ্গায় নঙ্গর করে আছে। এতে করে যতটা সম্ভব লোক সরাতে হবে। দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ছোট-ছোট ডিঙ্গী নৌকা নিয়ে কেউবা হাঁটুভোর জল ভেঙ্গে জাহাজে উঠল। "ডোভালডি"র বইবার [illegible]
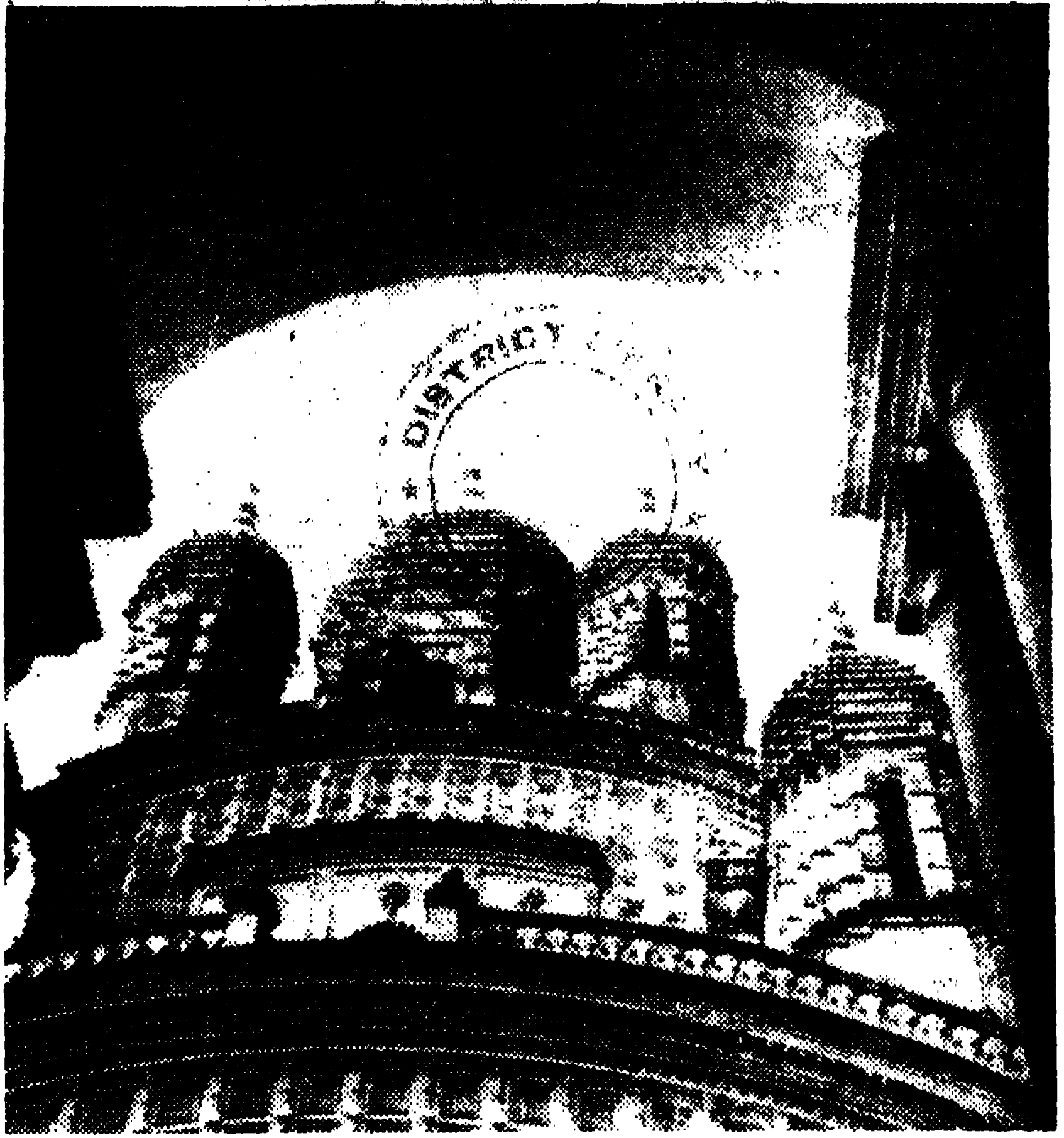
বিষ্ণুপুরের মন্দির

ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

দুশোর ওপর। মিনসিন একটা বজরা নিয়ে পালাচ্ছে, জাহাজে উঠবে। ড্রেক আর তার লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ল, তারাও ছুট দিল। পালাবার সুযোগ পেল না হলওয়েল। "প্রিন্স জর্জের" ক্যাপ্টেন হেগ ফোর্টের কাছে জাহাজটাকে ভেড়াতে বলল কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না—মাঝিমল্লারা ভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। পাল খাটিয়ে জাহাজটিকে চালু করার চেষ্টা চলল, কিন্তু আশা নির্মূল হয়ে গেল। তখন গভর্নর হলওয়েল। তার তখন বিশেষ কিছু করার নেই। ইহুদী, পর্তুগীজ আর ফিরিঙ্গীরা ছিল ভাড়া-করা। তারা সুযোগ পেয়ে চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিল। ছাড়া বাড়ীগুলোতে হানা দিয়ে লুঠ-পাট শুরু করল, রিফিউজীদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে মারধর, তাদের মেয়েদের প্রতি অসৌজন্য ব্যবহারে সবাইকে উত্যক্ত করে তুলল—বাধা দিলে ছোরা নিয়ে তাড়া করতে লাগল। প্যারেড গ্রাউণ্ডে সেই সময়ে এইভাবে অনেকের জীবনান্ত হয়। 'শ্বেতপতাকা' দেখাবার সঙ্কল্প করল হলওয়েল কিন্তু পরক্ষণেই মত বদলে ফেলল। নবাবের হাতে পড়লে তো রক্ষে নেই! কেউ কেউ গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। দক্ষিণের ঘাঁটি দখল করে নবাবী ফৌজ উত্তরে বেঁকল গঙ্গার কোল দিয়ে। বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড। গঙ্গার ধারে পশ্চিমের গেট ভাঙ্গতে এতটুকু সময় লাগল না—বানের জলের মত নবাবী ফৌজ ফোর্টে ঢুকে [illegible]

পিস্তলটা জমা দিল। বিজয়উল্লাসে নবাবী ফৌজ বন্দীদের ওপর খুব নজর দিল না—অনেকেই গঙ্গার ধার দিয়ে পালিয়ে গেল। লেডি র‍্যাসেল পালিয়ে গেলেন সারমনস্ গার্ডেনে — (গার্ডেনরীচ)। ইংরেজদের নির্বুদ্ধিতা তাদের দাম্ভিকতা আর হট-কারিতার ফল তারা যেমন পেল, সেই সঙ্গে তাদের বিশ্বাস করে যারা টাকার থলি খুলে দিয়েছিল তারাও হল সর্বস্বান্ত, নির্মম আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ। ২০শে জুন নবাব ফোর্টে প্রবেশ করলেন। তূর্যনিনাদে নবাবের বিজয় ঘোষণা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, কামানের ঘন গর্জনে কলকাতা কেঁপে উঠল। রায়দুর্লভ, সার্জেন্ট জ্যাঁকু বিজয়ী নবাবকে কুর্ণিশ করলেন—

—কলকাতা ফতে।

ফোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে নবাব। নবাবী ফৌজ জয়ধ্বনি করছে, নবাব মনসুর-অল-মুলক। সিরাজদ্দৌলা, শা কুলিখান, মীর্জা মহম্মদ হয়বৎজঙ্গবাহাদুর জিন্দাবাদ।

নবাব ফিরে গেলেন উমিচাঁদের বাগানে তাঁর হেড কোয়ার্টারে। হুগলীর ফৌজদার অপদার্থ মানিকচাঁদ কলকাতার ভার পেল। নবাবের ইচ্ছায় কলকাতার নাম বদলে হল—আলিনগর।

স্বীকৃতি—মেজর স্টুয়ার্ট, মিঃ হিল, মিঃ নোয়েল বারবার ও স্যর যদুনাথ সরকার প্রভৃতি।

চাঁদ ও পৃথিবী

শচীন্দ্রনাথ বসু

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও মানুষের ভাগ্য

অতীত ও বর্তমানের কথা শেষ হল, এখন প্রশ্ন ভবিষ্যতের। পৃথিবীর অদৃষ্ট অবশ্য চন্দ্র সূর্যের পরিণতির সঙ্গে জড়িত, প্রথম ও ক্ষুদ্রতর বিপদটা আসবে চাঁদের থেকে। পৃথিবীর স্থল, জল ও বাতাসে তার যে জোয়ারী টান তার ফলে আমাদের এই গ্রহের পাক ক্রমশ মন্থর হয়ে আসছে, বর্তমানে এক পাক ঘুরতে প্রতিদিন তার এক সেকেণ্ডের ২৫০০ কোটি ভাগের এক ভাগ বেশী লাগে। এই সামান্য আতিরিক্ত সময়টুকু জুড়ে জুড়ে ৫০০ কোটি বছরে পৃথিবীর দিন হয়ে পড়বে প্রায় দেড় গুণ বড়। মানুষ এবং তার শস্যাদির হয়তো একাদিক্রমে ১৮ ঘন্টার সূর্যতাপ এবং অনুরূপ দীর্ঘ শীতল রাত্রি সয়ে যাবে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে ঝড়বাত্যা সৃষ্টি হয়ে এর ফল হবে সাংঘাতিক।

পৃথিবীর পাক ধীর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রভাব দেখা দেবে। যে আবর্তনী পাক সে হারাচ্ছে তা আত্মসাৎ করবে চাঁদ মহাকর্ষীর সংযোগের মাধ্যমে, এবং তার ফলে পৃথিবীকে ঘিরে তার কক্ষপথের পরিধি বাড়বে, চাঁদ ক্রমশ পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাবে, দেখাবে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। বর্তমানে প্রতি ৩০ বছরে প্রায় এক ফুট করে সে সরে যাচ্ছে। কিন্তু এই অপসারণের মাত্রা কমবে সূর্যের প্রতিযোগিতায়। আমাদের বায়ুমণ্ডল যে পরপর ঠাণ্ডা গরম হয় সূর্যালোকের অভাবে ও প্রভাবে, তার দ্বারা পৃথিবীর পাক আরও দ্রুত হয়। অপসৃয়মান চাঁদের টান যখন পৃথিবীতে দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তার আবর্তনী বেগের উপর সূর্যের দ্রুত-ঘূর্ণি প্রভাব চাঁদের বিপরীত প্রভাবকে হার মানাবে। বেশী জোরে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী আবার চাঁদকে কাছে টেনে নেবে। সম্ভবত তা ঘটবে ৫০০ কোটি বছরে, যখন চাঁদ থাকবে আজকের প্রায় দেড়গুণ দূরে।

আমরা জানি এই সন্ধিক্ষণে আকাশে আর একটি বড় প্রভাব দেখা দেবে যার সঙ্গে সমগ্র সৌরলোকের অদৃষ্ট বাঁধা। সূর্যের বর্তমান তেজের শুরু প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে, তার শেষও হবে প্রায় সমকাল পরে। কিন্তু নেভবার আগে দীপ যেমন জ্বলে ওঠে সূর্যও ব্যবহার করবে সেইরকম। তখন তার যে তেজবৃদ্ধি শুরু হবে তা চাঁদকে আরও দ্রুত টেনে আনবে পৃথিবীর কাছে এবং পৃথিবীর আবর্তনের এমন আকস্মিক গুরুতর পরিবর্তন আনবে যার তুলনায় চাঁদের পরিণতি হবে তুচ্ছ।

জানা আছে যে তারার আদি হাইড্রোজেনের দশ থেকে ১৫ শতাংশ যখন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় তখন তার গর্ভে এক উৎকটতর অবপারমাণবিক প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, তারকা তখন ক্রমবর্ধিষ্ণু মাত্রায় শক্তি ছড়াতে ছড়াতে ফুলে তেতে লাল হয়ে ওঠে। আজ থেকে ৫০০—৬০০ কোটি বছরের মধ্যে সূর্যেরও এই দশা হয়ে তার স্ফীত দেহ প্রায় নিকটতম গ্রহ বুধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। তেজের চরম শিখরে এই দানব সূর্য পৃথিবীর দুই দিগন্তের মধ্যে ১২ ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে থাকবে, এবং তার বিচ্ছুরিত তেজের বন্যা এই গ্রহের তাপ তুলে দেবে ৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশ ঊর্ধ্বে যার অনেক আগেই টিন, সীসা ও দস্তা গলে যায়। তখন ফুটন্ত মহাসাগর থেকে বাষ্পের মেঘ উঠে সমস্ত গ্রহকে আবৃত করবে, গন্ধকও ফুটবে পৃথিবীর গায়ে।

সূর্য তার জীবনের মারাত্মক চরম মুহূর্ত পেরিয়ে আবার যখন ক্রমশ সঙ্কুচিত হবে তখন আকাশ থেকে পৃথিবীর জল ফিরে এসে বন্যা বইয়ে দেবে। কয়েক হাজার লক্ষ বছর ধরে সূর্য তার শেষ পারমাণবিক ইন্ধন ধাতু পদার্থে পরিণত করতে করতে নীল হয়ে জ্বলবে। এই মরণদশায় সে পরপর কয়েকটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাবে যে সময়ে তার বাইরের স্তর বিস্ফারিত হয়ে জ্বলন্ত গর্ভ উন্মুক্ত করবে, ফলে পৃথিবীর উপরে ঝরবে প্রভূত পরিমাণ মারাত্মক এক্স রশ্মি ও গামা রশ্মি। অবশেষে শেষ অবপারমাণবিক শক্তি ক্ষয় করে সে চিরকালের মত স্থবিরত্ব লাভ করলে পৃথিবীর জল জমে গিয়ে চিরস্থায়ী তুষার আবরণে ঢাকবে আজকের এই শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরাকে।

আরও জুড়িয়ে যেতে যেতে দেউলে সূর্য নিজেরই ভারে আরও সংকুচিত হবে, তবু দীর্ঘকাল জ্বলবে তার দুর্বল জ্যোতি। সূর্যের এই দৈহিক ক্ষীণতা কিন্তু বস্তুর ক্ষতির নির্দেশক নয়, তা ঘটবে বস্তুর অধিকতর ঘনতার ফলে; সুতরাং পৃথিবীর কক্ষেরও কোন পরিবর্তন হবে না। সমস্ত আয়ুকালে সূর্য তার বস্তুর মাত্র এক সহস্রাংশ রূপান্তরিত করবে শক্তিতে এবং তার থেকে যে সামান্য ভর ক্ষয় হবে তাতে মহাকর্ষীয় বাঁধন বিশেষ কিছু ঢিলে হবে না। এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকবে শেষপর্যন্ত, আরও পরে যখন দীর্ঘ আয়ু কাটিয়ে আমাদের এই জ্যোতিষ্মান দিবাকর তার অন্তিম দশায় শেষ প্রভাটুকু হারিয়ে অন্ধের মত মহাকাশের পথে ছুটে চলবে তখনও। সম্পূর্ণ কালো এই শবটি আয়তনে হবে পৃথিবীরও ছোট, তবু হিমানীমণ্ডিত বসুন্ধরা তার বশে থাকবে আজকের মতই।

●

কিন্তু মানুষের ভাগ্যে কি আছে? অতিবড় আশাবাদী ছাড়া কেউ সন্দেহ করবে না যে এর অনেক আগেই সে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবে, এমনকি সূর্যের দানবীয় স্ফীতি বা চাঁদের আঁধার-মৃত্যু পর্যন্তও সে টিঁকে থাকবে না। যেসব প্রাণী ইতিমধ্যেই পৃথিবীর পালা শেষ করেছে তাদের ফসিলের দলিল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে প্রজাতির গড় দশ লক্ষ বছর; ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্য যে দানবীয় আকার ধারণ করতে আরম্ভ করবে তার তুলনায় এই পরিমাণ কাল মুহূর্ত মাত্র। এ যুগের খাঁটি মানুষ পৃথিবীতে এসেছে হয়তো হাজার পঞ্চাশেক বছর আগে, যদিও সম্প্রতি কোনও কোনও নৃতাত্ত্বিক এই তারিখটা অনেকদূর পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

কিন্তু সাধারণ প্রাণীর মানদণ্ডে মানুষের প্রজাতিগত আয়ু মাপা ভুল হবে, কারণ ক্রমবিকাশের দীর্ঘ মিছিলের শেষে মানুষের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যা তার সম্পূর্ণ স্বকীয়। অসাধারণ মননশক্তির ফলে এই একমাত্র প্রাণীই নিজের ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ যুক্তিপূর্ণ চিন্তার অধিকারী। এই কারণেই দার্শনিকরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার মধ্যে মানুষের ভাগ্য নিয়ে মাথা ঘামায়, সব কিছুর অর্থ খোঁজে বিজ্ঞানী—এই কারণেই প্রগতির পথে মানুষ আজ এতদূর এগিয়েছে। এই যে বিচিত্র বিশ্ব, দেহে ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর মানুষই তার জটিল রহস্য অনেকখানি উদ্ঘাটন করেছে, সে পৃথিবীতে না এলে এই জ্ঞানও সৃষ্টি হত না।

চতুর্থ তুষার যুগের কৃচ্ছ্র সহ্য করেও আমাদের পূর্বপুরুষরা টিঁকে থেকেছে আগুন জ্বেলে, পশুচর্ম দিয়ে গা ঢেকে। আজ শীত নিবারণের আরও অনেক কার্যকরী উপায় সে আবিষ্কার করেছে। তেমনি প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে জয় করেছে, পরিবেশ বানিয়ে নিচ্ছে নিজের মত করে। সুতরাং যে কারণে অন্যান্য প্রাণী ইতিপূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়, তারা খাম-খেয়ালী পরিবর্তনী প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি, মানুষ নিজের সুবিধামত প্রকৃতিকে ঢেলে সাজাচ্ছে। সুতরাং সভ্য মানুষের ক্রমবিবর্তন আর চিরাগত নিয়মে নির্ধারিত হবে না—বলা যেতে পারে তা নির্ধারণ করবে সে নিজে, তা হবে কৃত্রিম।

যুক্তিপূর্ণ চিন্তার একান্ত মানবিক ধর্ম এই যে ক্রমবিকাশের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে তার এক ক্ষতির দিকও আছে। এখন আর শুধু যে যোগ্যতম সেই টিঁকে থাকছে না, দুর্বল ও পঙ্গুকেও বাঁচাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ক্ষীণ মস্তিষ্ক বা বহুমূত্র রোগের ধাত নিয়ে যে জন্মায় সভ্যসমাজে তারও বেঁচে থাকতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, সে নিজের সন্তানে ঐ দোষ হস্তান্তর করে।

সত্য বটে মানুষ বাধাবিপত্তি জয় করবার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে চলবে, কিন্তু

মানুষের বিপদও অসাধারণ। আজ সবচেয়ে গুরুতর ও আসন্ন সংকট পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা। দেশে দেশে ভাবুক ব্যক্তিরা আশংকা করেন যে এই যুদ্ধ লাগলে মানুষ হয় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নয় অসভ্যতার অতলে তলিয়ে যাবে। যে মানুষ শিল্পে দর্শনে বিজ্ঞানে আশ্চর্য সৃষ্টি সম্পাদন করেছে তারই সমাজে যে এত হিংসা দ্বেষ হানাহানি তার কারণ সে ঐশ্বরিক ও পাশবিকের অদ্ভুত সম্মেলন। মহৎ ও নীচ, সুন্দর ও কদর্য তার মধ্যে একাধারে বর্তমান, এখনও সে অনেকাংশে প্রবৃত্তির দাস। ক্রমবিবর্তনের বর্তমান অবস্থায় সে অর্ধপশু।

এ যুগে মানুষের দ্বিতীয় সংকট প্রজাস্ফীতি, যা যুদ্ধের আশংকাকে আরও প্রবল করেছে। ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল দশ কোটি, ১৮০০ সালে ৯০ কোটি, ১৯৬০ সালে ৩০০ কোটি, জাতিসংঘের হিসাবে ১৯৭৫ সালে তা দাঁড়াবে ৪০০ কোটি। এক খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে যে যে সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা আগের দ্বিগুণ বেড়েছে তা হল ১৬০০, ১৮০০, ১৯০০ ও ১৯৬০। বিশেষজ্ঞরা বলেন ১৯৬০ সালের সংখ্যা দ্বিগুণিত হতে লাগবে মাত্র ৩০-৩৭ বছর। এঁদের একজনের হিসাবে আর ৬৮০ বছরে জনসংখ্যা এত বাড়বে যে পৃথিবীর জল স্থল সমানভাবে ভাগ করে দিলে দুজন লোককে জায়গা দিতে হবে প্রতি বর্গ মিটারে; এখন থেকে ৯০০ বছরে বর্তমানের দুই কোটি গুণ বেশী লোক বাড়বে। বলা বাহুল্য, এমন অবস্থার সৃষ্টি অসম্ভব, তার আগে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। স্থান-সংকোচের আগে নিশ্চয় খাদ্যসংকোচ দলে দলে মানুষ মারবে। এখন পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী লোক স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত যথেষ্ট আহার পায় না।

এখানেও মানুষের সভ্যতা সমস্যাটাকে জটিল করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আয়ু বৃদ্ধি হয়েছে, সেই সংগে পরিবারের আয়তনও। এদেশে ২০ বছরে গড় আয়ু বেড়েছে ২৫ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সুতরাং স্ত্রীলোকে এখন পনেরটি পর্যন্ত অতিরিক্ত সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

অনেকে বলেন মানুষ অন্য গ্রহে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে, তাতে প্রজাস্ফীতির সমস্যা মিটবে। কিন্তু এই সমাধান কাজে পরিণত করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক দুরূহতা এবং অন্যান্য বিবেচনা ছেড়ে দিলেও শুধু খরচের পরিমাণটাই মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এক মার্কিন বিজ্ঞানী হিসাব করেছেন যে বর্তমান জনসংখ্যা বজায় রাখতে ঘণ্টায় ৭০০০ লোক পৃথিবীর বাইরে পাঠাতে হবে এবং তাতে খরচ বাড়বে দৈনিক প্রায় চার কোটি লক্ষ টাকা।

• সভ্য মানুষ তার কলকারখানায় এমন নির্বিচারে জল অপব্যয় করে যাচ্ছে যে বিজ্ঞানীরা অনেকে অদূর ভবিষ্যতে জলের দুর্ভিক্ষ আশংকা করেন। তাছাড়া গত ১০০ বছরে এইসব কলকারখানা ৩৬,০০০ কোটি টন আঙ্গারিক গ্যাস বাতাসে ছেড়েছে এবং প্রায় ঐ পরিমাণ নির্গত হয়েছে বন কেটে চাষের জমি সৃষ্টির ফলে। এর থেকে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ ১৩ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। আঙ্গারিক গ্যাস কম্বলের মত তাপ আটকায়, সুতরাং এরই মধ্যে পৃথিবীর তাপ সম্ভবত আধ ডিগ্রীর বেশী বেড়ে গিয়েছে। ২০০০ সালে কারখানাজাত গ্যাস এই তাপ বাড়িয়ে দিতে পারে দু ডিগ্রী, ৩০০০ সালে সাত ডিগ্রী। এই সময়ে খুব সম্ভবত তুষার যুগও শেষ হবে এবং পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে জমা বরফ গলে যে বন্যার সৃষ্টি হবে তা ভীষণ আকার ধারণ করতে পারে।

তাছাড়া এর পরে আরও তুষার যুগ আসবে হয়তো এবং তার শীত কত প্রখর হবে তা কেউ বলতে পারে না। যন্ত্র সভ্যতার উন্নত শিখরে উঠেও মানুষ কখন নির্দয় প্রকৃতির কাছে হার মানতে পারে।

নিজের খুনী ও প্রজননী প্রবৃত্তি জয় করেও এবং অন্যান্য ভাবিত ও অভাবিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও মানুষ যদি এগিয়ে যায় তবু চন্দ্র সূর্যের পরিবর্তনী প্রভাব যখন কাজ করতে শুরু করবে সেই অতি দূর দুরধিগম ভবিষ্যতে সে কি করে টিঁকতে পারে? অধিকাংশ বিজ্ঞানীর বিশ্বাস এই অসামান্য সংকট সে জয় করতে পারবে না, তবু যারা আশাবাদী, যারা মানুষের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাদের চোখ দিয়ে আমরা প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে পারি, দুঃসম্ভব উদ্বর্তন কল্পনা করতে পারি।

পৃথিবীর পাক প্রথমে মন্থর পরে দ্রুত হয়ে যে সব পরিবর্তন আনবে তার তুলনায় ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের তেজবৃদ্ধি অনেক বৃহত্তর ব্যাপার। দানব রূপে দ্রবণ করতে করতে সে যে তাপ ও মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ করবে তার বিরুদ্ধে হয়তো মানুষের বুদ্ধি কোনও বর্ম আবিষ্কার করবে। ভাবা যায় যে বৃহৎ-মস্তিষ্ক, ক্ষুদ্রাঙ্গ একপ্রকার মানুষ পৃথিবীর সারা গা ঢেকে দেবে তাপসহ আয়না দিয়ে যাতে অধিকাংশ সূর্যতেজ প্রতিফলিত হয়ে শূন্যে ফিরে যায়, তারপর মাটির নিচে গিয়ে আশ্রয় নেবে যথাসম্ভব বাতাস ও জল সংগে নিয়ে। যুগ যুগ পরে সূর্য যখন মরণের পথে পা বাড়িয়ে জুড়োতে শুরু করবে তখন মানুষ হয়তো তার কৃত্রিম গুহা থেকে আবার উঠে আসবে উপরে, প্রস্তুত হবে আসন্ন রাত্রি ও অনন্ত শীতের অপেক্ষায়। যদি বর্তমান পৃথিবীর অর্ধেক জলও সে তখন পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে তবে তার থেকে যথেষ্ট হাইড্রোজেন ইন্ধন পাওয়া যাবে। পূর্বের ১০০০ কোটি বছরে পৃথিবী সূর্যের থেকে যে পরিমাণ শক্তি পেয়েছে, এই ইন্ধন থেকে পারমাণবিক চুলায় মানুষ ততখানি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে। আজ অধিকাংশ সৌরশক্তি আমরা নষ্ট করি, সেকালের হিসাবী মানুষ হয়তো তার সঞ্চয় ব্যয় করবে দশ লক্ষ কোটি বছর ধরে, অর্থাৎ সেযাবৎ পৃথিবীর যা বয়স তার ১০০০ গুণ কাল ধরে।

কিন্তু সেইক্ষণেও হয়তো শক্তির রসদ ফুরিয়ে যাবে না। বৃহস্পতি গ্রহে পৃথিবীর প্রায় ১০০০ গুণ হাইড্রোজেন আছে, মানুষ যদি সেখানে পারমাণবিক চুলা বানাতে সক্ষম হয় তবে প্রায় সবটা শক্তিই শূন্য পথে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই উদ্যমে যে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও শিল্পকুশলতা দরকার হবে আজ তার ভাবনাও ধৃষ্টতা মনে হয়—যে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগে তার চোখে হয়তো এটা পরিকল্পনা নয়, কল্পনা মাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে মানুষ তো কত 'অসম্ভব'কেই সম্ভব করেছে!

তেমনি দানব সূর্যের তাপে পুড়ে মরবার আশংকা দেখা দেওয়ার আগেই সে হয়তো অন্য কোনও শীতলতর গ্রহে আশ্রয় নেবে, যদিও সব লোকের পক্ষে এই নিষ্কৃতি সম্ভবত সম্ভব হবে না। এই আশ্রয় সৌর লোকের ভিতরে না হয়ে বাইরে এমন কোনও তারার পরিবারেও হতে পারে যার কাল দানব-দশা আসতে অনেক দেরী। তারার বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের কাছাকাছি অনেক ক্ষীণ, শীতল M জাতীয় তারার আয়ু সূর্যের ১০,০০০ কোটি বছর বেশী হতে পারে, হয়তো ভাবী মানুষ এমনি কোনও তারার গ্রহে দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশের পূর্ণ ফল উপভোগ করবে, সংস্কৃতির চরম শিখরে উঠবে।

কিন্তু এই ছায়াপথ নীহারিকা ছেড়ে কোথাও সে ঘাঁটি বানাতে পারবে বলে মনে হয় না। আলোর রশ্মিতে চড়ে যদি পাড়ি দেওয়া সম্ভব হত তা হলেও কাছাকাছি অ্যানড্রোমিডা নীহারিকায় পৌঁছাতে কেটে যাবে ১৫ লক্ষ বছর। সুতরাং যে দিন ছায়াপথের ক্ষুদ্রতম তারার দীপ নিভবে সে দিন হয়তো এই প্রাণেরও সমাপ্তি হবে (যদিও এই সীমাও সব বিজ্ঞানী মেনে নেন নি)। কিন্তু মানুষ-অনুসৃত প্রাণের উপর এইখানে যবনিকা পড়লেও কিছুটা সান্ত্বনা হয়তো আমরা পেতে পারি এই ভেবে যে মহাকাশের মহসাগরে ছায়াপথ এক ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র, অন্যান্য নীহারিকায় ভিন্নরূপী প্রাণের তখন হয়তো সবে শৈশব বা যৌবন। আরও বহু কল্প পরে প্রাণ যদি সর্বত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেইখানেই এই মহাকাহিনীর শেষ কিনা কে বলতে পারে? একদা হয়তো আজকের এই প্রসারণী ব্রহ্মাণ্ড আবার সংকোচন করতে করতে অতিঘন আদি পরমাণুতে পরিণত হবে, তার বিস্ফোরণ থেকে নতুন বিশ্ব জন্ম নেবে—'সাড়া দেবে প্রাণ, বুদ্ধি দেখা দেবে নতুন মানুষ; এমনি করে চলবে জ্বলা নেভার

অনন্ত পাতা, প্রাণ হয়তো কোনও দিনই শেষ হবে না।...

অগ্র আলোচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা

Mass — ভর
Elliptical — উপবৃত্তিক
Sea level — সমুদ্র পৃষ্ঠে
Troposphere — ক্ষুব্ধমণ্ডল
Stratosphere — স্তব্ধমণ্ডল
Mesosphere — মধ্যমণ্ডল
Inosphere — আয়নমণ্ডল
Exosphere — বহির্মণ্ডল
Magnetosphere — চুম্বকমণ্ডল
Cosmic ray — মহাজাগতিক রশ্মি
Equator — নিরক্ষ রেখা
Cone — শঙ্কুর
Precession — অয়নচলন
Equinox — বিষুবরেখা
Ursa Minor — শিশুমার
Vega — অভিজিৎ
Nutation — অক্ষবিচলন
Milky Way — ছায়াপথ
Trade wind — নিয়তবায়ু

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

১। 'ব্রিমকুট' বলতে কি বোঝায়? ভারতে কোন দল প্রথম 'ব্রিমকুট' আখ্যা পায়? ২। পৃথিবীতে কতকগুলি দেশ আছে? ৩। সবচেয়ে বেশী 'রেলওয়ের প্ল্যাটফর্ম' কোন দেশের স্টেশনে আছে? ৪। কোন দেশের স্টেশনের নাম সবচেয়ে বড়?

বিনীত
কল্লোল বসাক
অশোকপল্লী
চন্দননগর

●

সবিনয় নিবেদন,

(১) "এন্টি-পোডস" এ কথাটির বৈজ্ঞানিক কারণ কি? কথাটি কোন অর্থে বোঝায়? (২) "এম আই জি সুপার-সোনিক জেট ফাইটার বম্বার-২৪" এবং "১১১এ-সুইং-উইং ফাইটার সুপার-সোনিক জেট বম্বার" এই দুইটি আধুনিক সামরিক বিমানের রচয়িতা কারা? (৩) পৃথিবীর কোন দেশের সামরিক নৌ-বাহিনীতে জেট ইঞ্জিন চালিত 'যুদ্ধ জাহাজ-ক্রুজার' ব্যবহার করছে? (৪) নিম্নলিখিত শব্দগুলির সম্পূর্ণ রূপ কি?

S.H.A.P.E.
S.A.C.U.S.A.F., N.A.S.A., MI-Five, T.V.P., A.A.M-2.

(৫) "১২৬ এম এম হেভী-এ্যাক" গানের আবিষ্কারকর্তা কে? (৬) "দি গ্রেট অক্টোবর রিভল্যুশন", "দি রাশিয়ান রিভল্যুশন", এবং "দি হাঙ্গার" এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ কারা রচনা করেছেন?

বিনীত
রাহুল বর্মণ
রামনগর রোড
আগরতলা (ত্রিপুরা)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পেন-ফ্রেন্ড কথাটির কে প্রচলন করেন?

(খ) চলচ্চিত্রের মহরৎ অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দেওয়ার অর্থ কি?

বিনীত
রামকমল সরকার
আসানসোল

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পরিচালনা ও প্রযোজনার মধ্যে পার্থক্য কি?

(খ) কবি বিষ্ণু দে'র কাব্যসংখ্যা জানতে চাই।

বিনীত
সুতপা সান্যাল
ও
টুকটুকি সান্যাল

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর কোন কোন দেশ এখনও পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করেনি?

বিনীত
দীননাথ মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

সাপের জিভ চেরা কেন?

বিনীত
কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
উড়িষ্যা

●

সবিনয় নিবেদন,

এফ-আর-এস, আই-এ-এস এবং আই-পি-এস এই কথাগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপ কি?

বিনীত
প্রবীর ও প্রদীপ মুখার্জী
খড়দহ

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) দিল্লী থেকে বিমানে মস্কো যেতে কত সময় লাগে?

(খ) মস্কোর কেন্দ্রীয় স্কোয়ারের নাম কি?

(গ) কোন কোন সোভিয়েট মহাকাশচারী ভারত সফর করেছেন?

বিনীত
প্রশান্তকুমার দাশ
মেদিনীপুর

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার কত?

(খ) কেরলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতের হার কত কম?

(গ) পশ্চিমবঙ্গে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা কত?

বিনীত
দত্তা দেবী
শিলং

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

ভূদেব রায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, কলকাতার গ্র্যান্ড-হোটেলে ৫০০ থাকার ঘর আছে। এছাড়া আছে বলরুম, ডাইনিং রুম এবং বিলিয়ার্ড রুম।

বিনীত
আনন্দগোপাল শঙ্খনিধি
পার্কসার্কাস, কলকাতা

●

সবিনয় নিবেদন,

২৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীরকুমার সেনের 'ক' প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে, টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক সংখ্যক বল দেওয়ার রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের এস রামাধীনের। ইংল্যান্ড-এর বিপক্ষে ১৯৫৭ সালের বার্মিংহাম টেস্টে মোট ৭৭৪টি বল করেন এবং খ প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, এক ইনিংসে অধিক সংখ্যক উইকেট পেয়েছেন ইংল্যান্ডের জিম লেকার, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যানচেস্টার টেস্টে ১৯৫৬ সালে, মোট ৫৩ রানে ১০টি উইকেট।

বিনীত
মৃণালকান্তি রায়সিনহা
ভগবানপুর সংস্কৃতি সংসদ
মেদিনীপুর

●

সবিনয় নিবেদন,

১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত শিখা ও রমা দাশগুপ্তার ক প্রশ্নের উত্তরে গৌহাটি থেকে শ্রীবাবলু দাশ জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি ডি খাণ্ডেলওয়াল, কিন্তু যতদূর জানি আগস্ট মাস থেকে জেনারেল ম্যানেজার শ্রীজগজিত সিং মনোনীত হয়েছেন।

বিনীত
অজিত ভট্টাচার্য
জোড়হাট

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী

কমল গঙ্গোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তক। মধুসূদনের সনেট তাঁর অন্যান্য কাব্য থেকে স্বতন্ত্র। শেক্সপীয়রের সনেট সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থ লিখেছিলেন—"With this key Shakespeare unlocked his heart". মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তাঁর ব্যক্তি-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য এবং কবি-মনের ধ্যান-ধারণা চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে; কাব্যের বিষয়বস্তুর অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেননি।

এদেশে অবস্থানকালেই যদিও তিনি প্রথমে সনেট লিখতে আরম্ভ করেন, কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রায় সবই সুদূর বিদেশের মাটিতে লেখা। প্রবাসে নির্বাসিত জীবনের আশাভঙ্গ, হতাশা, দারিদ্র্য, ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তিনি যেন নিজেকে এবং নিজের দেশকে নতুন করে চিনলেন। এই পর্বে কবি যেন আত্মস্থ হয়ে নিজেকে এবং নিজের দেশের ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে গভীরভাবে জীবনের মর্মমূলে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন।

স্বদেশের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যায় চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'পরিচয়' কবিতায়। এখানে তিনি স্বদেশের নাম উল্লেখ করেন নি; স্বদেশের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, সেই দেশে তাঁর জন্ম।

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্ধ্ব কলেবরে,
রজতের উপবীত স্রোতঃ—রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ.........
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত কাননে;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী;—
চাঁদের আমোদ যথা কুসুম-সদনে;—
সে দেশে জনম মম;

'ভারতভূমি' সনেটে মধুসূদন বলেছেন, বিধাতা ভারতভূমিকে অশেষ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু এই ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যই তার দুর্ভাগ্যের কারণ। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন, সাপ তার মণি রক্ষা করবার জন্য বিষময়। ফণা দিয়ে দংশন করতে দ্বিধাবোধ করে না; কিন্তু ভারতবাসী মাতৃভূমির স্বাধীনতা-গৌরব রক্ষা করতে অসমর্থ।

ভারতবর্ষের পরাধীনতায় কবি কতদূর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন 'আমরা' কবিতায় সে-কথা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন।

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ' আবদ্ধ শৃঙ্খলে?

সনেটটির শেষভাগে তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে:—নির্বীর্য ভারত কালক্রমে আবার শৌর্যবীর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে; ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হবে।

রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসরে
চেতাইবি মৃত-কল্পে? পুনঃ কি হয়মে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

সুদূর ফরাসী দেশে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে-করতে বাংলার কবি, বাংলার পূজা-পার্বণ, বাংলার মন্দির, বাংলার আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, গাছ-পালা, বাল্য-জীবনের স্মৃতি-বিজড়িত আনন্দ-উৎসব, রামায়ণ-মহাভারতের নানা প্রসঙ্গ তাঁর কবি-চিত্ত উদ্বেল করে তুলেছে।

প্রবাসে থেকে দুর্গাপ্রতিমার বিচিত্র সৌন্দর্য, দুর্গাপূজার উৎসবের বিপুল আয়োজনের পূর্বস্মৃতি তাঁর ভাবাকুল হৃদয়কে ব্যথাতুর করে তুলেছে।

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;

'বিজয়া-দশমী' সনেটে কন্যা-বিরহের সম্ভাবনায় আকুল মাতৃহৃদয়ের একান্ত কামনাটি কবি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন।

যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

'কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা' কবিতায় কবি প্রবাসে থেকেও লক্ষ্মীকে অন্তরের অর্ঘ্য প্রদান করেছেন এবং বঙ্গগৃহে দেবীর চিরকাল অবস্থিতির প্রার্থনা নিবেদন করেছেন।

হৃদয়-মন্দিরে দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙা পদে,—
থাক বঙ্গ-গৃহে যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ; সুরঙ্গে জ্যোৎস্না; সুতারা আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে!

'কপোতাক্ষ নদ' সনেটে মধুসূদন শৈশবের লীলাভূমি যশোহর জেলার সাগর-দাঁড়ি গ্রামের প্রান্তবর্তী কপোতাক্ষ নদের কথা বর্ণনা করেছেন।

সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

....

বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে!

মধুসূদন কয়েকটি সনেটে সংস্কৃত এবং বাংলা সাহিত্যের পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবিগুরু বাল্মীকি, কালিদাস, জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বাল্মীকিকে বলেছেন 'কবিকুলপতি;' জয়দেবের গান 'মাধবের রব;' কাশীরাম দাস কবীন্দ-দলে পুণ্যবান, প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের ভগীরথ; কৃত্তিবাস সম্পর্কে বলেছেন, 'কীর্তির বসতি সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে;' মুকুন্দ-রাম 'কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ'; ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল 'যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভিতরে;' ঈশ্বর গুপ্তকে বলেছেন 'কোবিদ-বৈদ্য'।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সনেট প্রাচীন কাব্যের খণ্ড-চিত্র স্মরণে রচিত। রামায়ণ ও মহাভারতের খণ্ড-চিত্রই বেশী। রামায়ণের সীতা চরিত্র মধু-সূদনের অন্যতম প্রিয় চরিত্র। দূরে প্রবাসে থেকেও অশোককাননে বন্দিনী সীতার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি।

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে!

আরও দুটি সনেটে সীতার বনবাসের করুণ চিত্র অঙ্কন করে মধুসূদন সীতা-চরিত্রের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দান করেছেন।

'রামায়ণ' সনেটটিতেও কবি বলেছেন—

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্ত কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!

রামায়ণের মতই মহাভারতও ছিল মধু-সূদনের অতিপ্রিয়। তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা-সম্ভব' এবং প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠার' বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। একটি সনেটে ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কথা তিনি স্মরণ করেছেন।

ফরাসী দেশে অবস্থানকালে মহা-ভারতের কাহিনী মধুসূদনের কবি-মানসকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে; উপযুক্ত অবসর এবং মানসিক-শান্তি থাকলে তিনি হয়ত মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে মহাকাব্য রচনা করতেন। 'সুভদ্রাহরণ' 'পাণ্ডব-বিজয়' প্রভৃতি অসমাপ্ত কাব্য এই অভিলাষের নিঃসংশয় নিদর্শন।

মহাভারতের খণ্ড-চিত্র নিয়ে অনেক-গুলি সনেট লিখেছেন মধুসূদন। 'কুরুক্ষেত্রে' সনেটে সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে অভিমন্যুর মৃত্যু-দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, 'সুভদ্রা' সনেটে সত্যভামার পরামর্শে অর্জুন ও সুভদ্রার গোপনে গান্ধর্ব বিবাহের আয়োজনের ঘটনা; 'শিশুপাল' কবিতায় কৃষ্ণকে শত্রুরূপে দ্বেষ করে এবং তাঁরই হাতে নিহত হয়ে শিশুপালের বৈকুণ্ঠ-লাভের কথা; হিড়িম্বা সম্বন্ধে দুটি সনেটে মহাভারতের উক্ত প্রসঙ্গ 'গোগৃহরণে' অর্জুনের বীরত্ব এবং

কবিবর প্যারীমোহন কবিরত্ন মহাশয় প্রাচীন কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত হইতে উৎকৃষ্ট না হউক, কিন্তু তাঁহাদের যে সমকক্ষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কবিরত্ন মহাশয় ১৬৬৫ শকাব্দীর ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহানুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার পিতার প্রথম সন্তান ও অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ হ'ন বলে পিতা সর্বদাই ইঁহার জীবনে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় নানা পীড়াদির হস্ত অতিক্রম করে যখন ইনি পঞ্চম বৎসর বয়ক্রমে উপনীত হলেন, তখন ইঁহার পিতা ইঁহাকে প্রথম পাঠশালা, পরে টোল, তৎপরে ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রদান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কবিরত্ন কিছুতেই তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেননি। কারণ, বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা অপেক্ষা পদ্য ও গীতি রচনাতেই কবিরত্নের সবিশেষ উৎসাহ ছিল এবং সেই উৎসাহই তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ে একমাত্র প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হইয়াছিল। কবিরত্ন ঘটনা অবস্থা বিষয়ে নূতন নূতন গীতিও রচনা করিতেন, ইহা ভিন্ন দেশীয় বৈরাগীগণও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া দেশ-বিদেশে গান করিয়া বেড়াইত। সেই বাল্যকালেই গীতিরচনা বিষয়ে তাঁহার নৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ বলিতেন যে, বয়সকালে প্যারী উহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কমলাকান্তের পদ রক্ষা করিবে। বস্তুত, পরে তাহাই ঘটিয়াছিল।

বিংশতি বৎসর বয়ক্রমকালে কবিবর কলিকাতায় মিঃ হোম সাহেবের অফিসে বিংশতি মুদ্রা বেতনে একটি কর্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে উঁহার হিন্দু-ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকাতে কর্ম-স্থানে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শজন্য সর্বদাই সংকুচিত হইতেন, এমনকি কর্মস্থল হইতে গৃহে আসিবার সময় বস্ত্রাদি সমেত গঙ্গাস্নান না করিয়া গৃহে আসিতেন না। এইরূপে কিছুদিন সেস্থলে কর্ম করিয়া বিরক্তির সহিত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক আপন দেশে গমন করেন এবং কোন দৈবকার্য দ্বারা আপনাকে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন করিবার মানসে সর্বদা সাধু উদাসীনদিগের উদ্দেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং তিনিও উঁহাকে কোন দৈব কর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরত্ন নিজেই বলিয়াছিলেন, কোন বিঘ্ন বশতঃ তিনি উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে ১২৭১ সালের সেই ভয়ানক ঝড় সংঘটিত হয়, কবিরত্নও ঝড়ের গান রচনা করিলেন। এই গান রচনার কিয়দ্দিবস পরে কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে কবিরত্ন বর্ধমান গমন করেন। বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামচাঁদবাবু তাঁহার নিকট ঐ ঝড়ের গান ও অন্যান্য দুই-একটি গান শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং বিদেশের ব্যয় সংকুলানের জন্য প্রাত্যহিক দুইটি করিয়া টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া বলেন যে, "চট্টোপাধ্যায় মহাশয়! আমাকে প্রত্যহ এক-একটি নূতন গান শুনাইতে হইবে।" কবিরত্ন তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্যামচাঁদবাবুর আদেশ অনুসারে প্রত্যহ একটি করিয়া নূতন গান রচনা করিতেন। ক্রমে এই কথা মহারাজের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি উঁহার গীত শ্রবণে পরম সন্তুষ্ট হইয়া উঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন এবং তদবধি উঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উঁহার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কবিরত্ন বর্ধমানে বসিয়া যে সকল গান রচনা করেন, তাহারই অধিকাংশ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেগুলি অশ্লীলভাব-ব্যঞ্জক ও ব্যক্তিবিশেষের দোষব্যঞ্জক, অগত্যা সেইগুলিই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গত ১২৮১ সালে কবিরত্ন মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর উঁহার পিতা দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরত্নের জনৈক হিতৈষী বন্ধুর কলিকাতার বাটীতে আসিয়া কবিরত্নের মৃত্যু সংবাদ দেন এবং তদ্রচিত কতকগুলি গানের কাগজ উঁহাকে প্রদানপূর্বক উহা ছাপাইবার জন্য সবিশেষ আকিঞ্চন করেন। উক্ত বাবু কবিরত্নের ভাবুকতা ও রচনা-নৈপুণ্য জন্য তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যার-পরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে ঐ সমস্ত কাগজপত্র লইয়া ব্যয় সমেত ছাপাইবার জন্য আমাদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সকল কাগজে যে কয়েকটি গীতি ছিল, তদপেক্ষা অনেক গীতি তাঁহার মুখে শুনা যাইত। এজন্য তাঁহার আদেশে আমরা বিস্তর অনুসন্ধানে আর দুই-একটি মাত্র গান পাইয়াছিলাম। তাহাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে সকলের নিকট নিবেদন যাঁহারা কবিরত্নের জীবিতাবস্থায় অনুরক্ত চিত্তে তাঁহার গান শ্রবণ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা এই পুস্তকের উপর কথঞ্চিৎ অনুরক্তি প্রদর্শন পূর্বক কবিরত্নের দরিদ্র পরিবার-বর্গের কথঞ্চিৎ ক্লেশ মোচন করুন।"

শ্রীকালীকিংকর চক্রবর্তী

বাংলা দেশে বিশেষ করে শহর কলকাতায় আমরা মাছ-খেকো বাঙালীরা কিভাবে মাছ নিয়ে বিব্রত হয়েছি তা সকলেই জানেন। ধীরাজ "মৎস্য" নিয়ে যে গান বেঁধেছিলেন সেটি উধৃত করে "ধীরাজ প্রসঙ্গ" শেষ করছি।

মৎস্য

রাগিণী ভ'য়রো। তাল—একতালা

মাছের মত খাসা খাবার জিনিস
আর কিছুই নাই ভূমণ্ডলে।
ঘ্রাণে পঞ্চবৎ অন্ন চলে,
কালিয়ে কাবাব কোপ্তা পোলাও
আদি মীন বৃক্ষে সব ফলে।।

পঞ্চ মকারেতে প্রধান মীন মকার
যা না হলে ভোগ হয় না কালিকার,
ভগবান হয়ে মৎস্য অবতার,
নিমগন ছিলেন জলে।

ঝোলে দেবাসুরের মন ভোলে,
পুরি ফাউল কারি,
পামরুটি বিস্কুট যার নীচে সব ঝোলে।।

শ্বেত রক্তবর্ণ সুন্দর সুঠাম,
রুই মিরগেল কাতলা নানাবিধ নাম,
যে না খায় তায় ভগবতী বাম,
মলে যায় নরকানলে।

তন্ত্রে স্বয়ম্ভু স্বয়ং বলে,
আচার দিয়ে বাসি খেলে ইলিস মাছ,
সশরীরে স্বর্গে চলে॥

মাছের সঙ্গে পচা খেলে ভেটকি ঝুরো
অহোরাত্র সিদ্ধ সাধন হয় পুরো,
তার পিতৃলোক স্বর্গে সুখে নৃত্য করে,
আনন্দে দু-হাত তুলে।

(বলে) বংশে জন্মেছে কি সুছেলে,
আবার টাটকা এণ্ডা যুক্ত খেলে
তপ্সে ভাজা,
চতুর্বর্গ করতলে॥

মোচা চিংড়ী দিয়ে খেলে ছোলার ডাল,
ভবসিন্ধুর মাঝে বাঁধে
পুণ্যের আল,
নির্বাণ মোক্ষ তার পক্ষে শক্ত গাল,
হয় সুতের দাবি চলে।

কবিরত্ন কয় কৌতুকে,
যেতে ইচ্ছা নাই গোলকে,
থাকবো এই ভূলোকে,
চিংড়ী বারমাস যদি মেলে॥

বিশেষত বাঙলায় বাঙালীর পক্ষে,
মৎস্য তুল্য দ্রব্য দেখা যায় না চক্ষে,
চক্ষে দৃষ্টি রয়, বংশ বৃদ্ধি হয়,
দেহ থাকে সবলে।।

বাদলায় তেল না মাখলে,
না মাছ খেলে,
চক্ষু হয় কানা, ঘটে ব্যাধি নানা,
অল্পকালে কাল কবলে।

অক্ষয় লেখক যিনি অক্ষয়কুমার দত্ত,
তেল না মেখে মাছ না খেয়ে উন্মত্ত,
বাহ্যবস্তু ভেবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য
কে-না জানে কে-না বলে॥
বাবাজী মাছ ধরেছেন এতকালে।।

ফরাসী সংস্কৃতির দিকপাল

দিলীপ মালাকার

বাঙালী পাঠকের কাছে রোম্যাঁ রোলাঁ কোনোমতেই অপরিচিত নন। মনীষী রোম্যাঁ রোলাঁর জন্মশতবার্ষিকী শুরু হয়েছে এ বছরের গোড়ায়। রোম্যাঁ রোলাঁর জন্মভূমি ফ্রান্সে জাঁকজমক করে শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়নি। এ খবর দুঃখের সংগেই জানাচ্ছি। বিক্ষিপ্তভাবে নানান জায়গায় রোম্যাঁ রোলাঁর জন্মশতবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়েছে বটে তবে সামগ্রিক ভাবে নয়। রোম্যাঁ রোলার জন্মশতবার্ষিকীর শেষ অনুষ্ঠান হিসেবে চলেছে রোঁলার জীবন ও অবদান সম্পর্কে প্রদর্শনী, প্যারিসের 'আর্শিভ দ্য ফ্রাঁস' (ন্যাশনাল আর্কিভ) মিউজিয়াম বাড়ীতে। 'আর্শিভ দ্য ফ্রাঁস' মিউজিয়ম বাড়ীর রোলাঁ প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। এই প্রদর্শনীটি নিছক খাপছাড়া অসংলগ্ন প্রদর্শনী নয়। বড় বড় ছ'টি হলঘর জুড়ে এই প্রদর্শনী। দুটো হলঘরে দেখেছি ভারতীয় সংস্কৃতির জয়জয়কার।

রোলাঁ প্রদর্শনীতে প্রথম থেকে শুরু করা হয়েছে তার শৈশব, তার পিতা-মাতা ও পরিবার থেকে আরম্ভ করে ইস্কুলের জীবন ইত্যাদি। রোলাঁর সাংস্কৃতিক জীবনে তিনটি ঘটনা শুধু তাঁকে নয় সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (১) যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বিশ্বশান্তির প্রথম প্রচারক তিনিই। এর জন্যে তাঁকে সরকারী রোষে জর্জরিত হয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচার করে চলেছে তাদের অগ্রবর্তীদের মধ্যে রোলাঁ হলেন সর্বপ্রধান। সে বিষয়ে এই প্রদর্শনী অনেক ঐতিহাসিক দলিলপত্র প্রদর্শন করেছে। এমনকি ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামের নায়কদের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রদূত। হিটলারের অগ্রগতির বিরুদ্ধে যেসব আন্তর্জাতিক সমিতি গঠিত হয় তিনি ছিলেন তাদের প্রধান পরামর্শদাতা।

(২) রুশ বিপ্লবের বহু আগে থেকেই রুশ বিপ্লবীদের সংগে রোম্যাঁ রোলাঁর ছিল আন্তরিক যোগাযোগ। লেনিনের সংগে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল রুশ বিপ্লবের বহু আগে। এবং বিপ্লবের পরেও যে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বিভিন্ন চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের প্রমাণ দ্বারা। এমন কি চীনের সুনইয়াৎ সেন এবং বর্তমান চীনের সহ-রাষ্ট্রপতি মাদাম সুনইয়াৎ সেনের টেলিগ্রামও দেখলাম। রোম্যাঁ রোলাঁ রুশ বিপ্লবের পর গিয়েছিলেন রাশিয়া পরিদর্শনে এবং তৎকালীন রুশ চিন্তাবীর ও সাহিত্যিকদের সংগে গড়ে ওঠে প্রীতির বন্ধন। সে সম্পর্কে চিঠিপত্র ও আদান প্রদানের সংগ্রহ সেখান হয়।

(৩) ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে দুটো হলঘরের অনেকখানি জায়গা দেওয়া হয়েছে। প্রথম হলের একটি বিভাগে দেখান হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংগে রোম্যাঁ রোলাঁ সাক্ষাৎকার ও আদান প্রদান সম্পর্কে। আরেকটি অংশের সামান্য অংশ মাত্র গান্ধীর সংগে কথোপকথন। গান্ধীর সংগে রোলাঁর দেখা হয়, মাত্র একবার ১৯৩১ সালে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগে রোলাঁর দেখা হয় অনেকবার এবং গান্ধীর সংগে দেখা হওয়ার বহু আগে রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রথম যোগাযোগ হয় ১৯১৯ সালে, তারপর দ্বিতীয়বার দেখা সাক্ষাৎ হয় ১৯৩০ সালে।

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় হলঘরের প্রায় অর্ধেক জায়গায় জুড়ে থাকে ভারতীয় মণীষীদের ছবি, তাদের ওপর লেখা বই-গুলো নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, এক-ধারে অন্যদিকে রয়েছে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে রোম্যাঁ রোলাঁ আকৃষ্ট হন ১৯১৫ সালে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে। হিন্দু দর্শন সম্পর্কে তখন তিনি গবেষণায় ব্যাপৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতবিক্ষত ছবির পাশেই রয়েছে ইউরোপীয়দের হিংস্র মনোবৃত্তি। বিশ্বযুদ্ধ হিংস্র মনোবৃত্তির প্রতিফলন। যুদ্ধের পরে ভারতে শুরু হয় গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনে রোলাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। তাই তিনি গান্ধী ও তার অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বই লেখেন ১৯২৩ সালে। তারপর তিনি হিন্দু দর্শনে ডুবে যান। এবং একালের হিন্দু দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি নতুন আস্বাদ পান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনে। দেশি ও বিদেশি লেখকদের লেখা যত বই প্রকাশিত হয়েছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল রোম্যাঁ রোলাঁর। সে বিষয়ে কারুর কোনো সন্দেহ নেই। রামকৃষ্ণের ওপর তার প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে আর বিবেকানন্দর ওপর বইটি বেরোয় ১৯৩০ সালে।

রোম্যাঁ রোলাঁ শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না তিনি ছিলেন শিল্পী। তিনি ছিলেন সংগীতসাধক। বিঠোফেন সংগীতে তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন। এ সম্পর্কে রোলাঁর স্ত্রী মাদাম রোম্যাঁ রোলাঁ আমায় বলেছেন যে, বিঠোফেন, শুবার্ট, মোজার্ড সংগীত কোথাও বাজলে তিনি শুনতে শুনতে তাতেই ডুবে যেতেন। ইউরোপীয় ক্ল্যাসিক সংগীতের প্রতি তার ছিল হৃদয়ের টান। তাই কৈশোরে তার বিকাশ সুরু হয়। নিজে হাতে পিয়ানো বাজিয়ে তিনি নিজেই আনন্দ পেতেন।

•

একালের ফরাসী সাহিত্য, সাহিত্য ও শিল্পে আধুনিকতা যার অনেক নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন সিম্বলিইজম্-স্যুরিয়ালইজম ইত্যাদি, এর প্রবর্তক যিনি তার নাম মঃ আন্দ্রে ব্রত। ফরাসী সাহিত্য সমালোচকরা এর নাম দিয়েছিল। স্যুররিয়ালইজমের পুরোহিত বলে। আন্দ্রে ব্রত শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি ও চিত্রকর। ফরাসী আর্টজগতে স্যুররিয়ালইজমের কর্ণধারদের মধ্যে ব্রত হলেন অন্যতম। বছর পঞ্চাশেক আগে যখন স্যুররিয়ালইজম সুরু হয়, তখন তাকে বলা হত "দাদাইজম" (বাংলা ভাষায় দাদার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই)। সেই দিকপালের জীবনাবসান হয়েছে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

ব্রত'র কবর দেওয়ার জন্য ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিটি মহারথী সেদিন জড়ো হয়েছিলেন। সেদিন দেখেছি সবাই তাঁকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেছে।

কবিতায় ছন্নছাড়া পদ, পয়ার, মাত্রা ইত্যাদির প্রাগৈতিহাসিক আইনকানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি নতুন ধরনের কবিতা লিখতে সুরু করেন পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। একালের ছন্নছাড়া কবিতার জন্মদাতা তিনিই। অনেকে ক্ষোভ সহকারে বলে থাকেন দুর্বোধ্য কবিতা। তারই আদর্শ ও নতুন চিন্তার প্রলেপ দেওয়া হয় চিত্রপটে। যার আবার নাম স্যুররিয়ালিস্ট আর্ট।

কবি ও আর্টিস্ট হিসেবে ব্রত খুব নাম কেনেননি। আসলে তিনি ছিলেন পুরোহিত। ইনি শুধু স্যুররিয়ালইজমের নীতিটাই প্রচার করেছেন। অর্থাৎ পুরোহিত। পুজোর উপলক্ষ হল দেবতা এবং পুজোয় অংশগ্রহণকারী ভক্ত ও দর্শকদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়েছেন আন্দ্রে ব্রত। এই ধরনের শিল্প ও সংস্কৃতির পুজোয় পুরোহিতের মূল্য কম নয়। অনেকখানি ওপরে তার স্থান। কারণ নতুন কোনো আদর্শের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ সংস্থাপন করা যার কাজ তাকে নিচু চোখে দেখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। একালের যে কজন অতি আধুনিক শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন যেমন, পিকাশো, ব্রাক্, লেজে, ককতো ইত্যাদি তাঁরা ব্রত'র কাছে অনেকখানিই ঋণী। তেমনি দর্শক ও আর্ট প্রেমিকরা। কবিতায় আরাগঁ, ককতো, প্রেভর ইত্যাদির যে খ্যাতি তার মূলে কিন্তু ব্রত। এঁদের নিয়েই আন্দ্রে ব্রত'র দল। সুতরাং ব্রতকে বাদ দিয়ে এদের কথা ভাবাই যায় না।

আন্দ্রে ব্রত'র স্যুররিয়ালইমজ্ আন্দোলন শুধু আর্ট ও কবিতায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। তার পরিধি বিস্তৃত হয় প্রথমে থিয়েটারে, থিয়েটারএর দৃশ্যসজ্জায় ও পরে সিনেমায়। অধিকাংশ স্যুররিয়ালিস্ট সাহিত্যিক ও শিল্পী ছিলেন বামপন্থী। এবং আন্দ্রে ব্রত ছিলেন এই বামপন্থী দলের নেতা। এককথায় ব্রত ছিলেন চিন্তাশীল মহলের প্রধান পুরোহিত।

প্রাচীন শিল্প ও শিল্পী
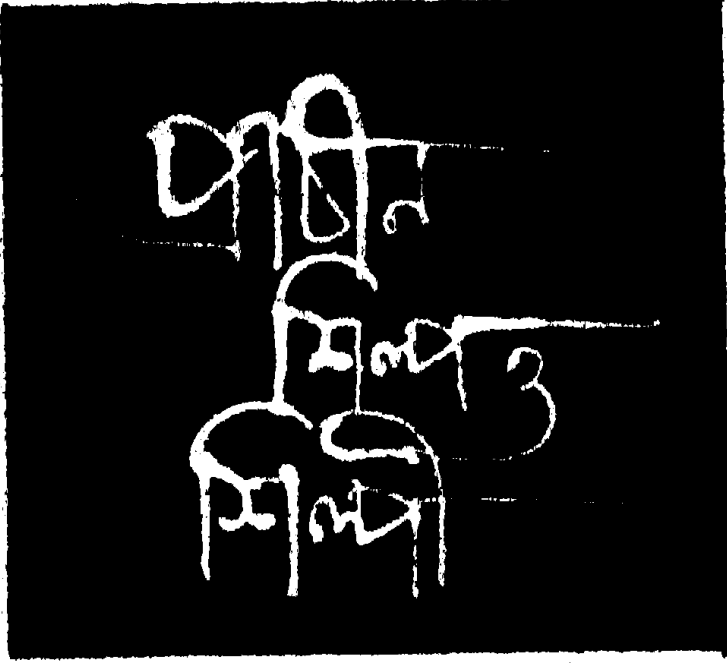
কার্তিকচন্দ্র শাসমল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন, 'যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে, সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোন গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।' ঠিক তেমনি যার শিল্পবোধ নেই, যিনি সুন্দরের সৌন্দর্য বজায় রাখতে জানেন না, তিনি যতই আধুনিক সভ্যতায় সভ্য হন, তাঁকে শিল্পের ও সুন্দরের রসে রসিয়ে তোলা বড়ই কঠিন। এই সৌন্দর্যবোধ, এই শিল্পবোধ এতই সহজাত যে, কোন শিক্ষার তোয়াক্কা করে না। আশেপাশের অতি তুচ্ছ জিনিসকে নিয়ে রসবোধের পরিচয় দেন অতি রসিকজন। বেতারে এক আলোচনা সভায় ডঃ কল্যাণী কারলেকার বলেছিলেন, 'অতি সুবেশা দুটি আধুনিকা একটি ফুলের বাগানে ঢুকে (যেখানকার ফুল তোলা নিষিদ্ধ) গোটাকয়েক ফুল নিয়ে ব্যাগে পুরলেন, খোঁপায়ও দিলেন না।' তাঁদের কাছে ফুলে শোভিত ফুল-বাগান সুন্দর না। ফুল তুললেন, খোঁপায় সেই ফুল দিয়ে নিজেকে আরও সুন্দর ও লোভনীয় করে তুললেন না। তাঁদের কাছে হয়তো ফুল তুলে অপরকে দেখিয়ে বড়াই করাটাই বড়। সুন্দর জিনিস তাঁদের কাছে তুচ্ছ। অথচ আধুনিক সভ্যতার ঢেউ আজ যেখানে পৌঁছায়নি, তাদের মধ্যে তো এই সৌন্দর্যপ্রীতির অভাব নেই, নেই সুন্দরকে ভালোবাসার অনীহা। তারা ধাতুবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাচার হাতের কাছে পায় না, কিন্তু আশেপাশের প্রাকৃতিক জিনিসকে কাজে লাগায় সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়। তাই সাঁওতাল মেয়ে দিনের শেষে ঘরে ফেরার পথে বনজফুল তুলে খোঁপায় দিতে ভোলে না। এতো আজকের আদিবাসীদের কথা। পৃথিবীর অন্ধকারযুগ প্রাগ-ইতিহাসের আদিম মানুষের কতটুকু আজ আমরা জানি। তাদের শিল্পবোধের পরিচয় আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত, তবু তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিহাস, সমাজজীবনের কাঠামো, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তাও শিল্পে ভরপুর। তাদের ব্যবহৃত জিনিস-পত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের বাসস্থান পর্বত-গুহার যেসব চিত্র দেখা গেছে, তা আজও বিস্ময় জাগায়, সৌন্দর্যের প্রতি তাদের আসক্তি, শিল্প-সৃষ্টির প্রবল আগ্রহই এইসব সৃষ্টির পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছে। সেই পুরানো প্রস্তর-যুগের আদিম মানবদের সমাজজীবনের জায়গায় ছিল এক একদলে বাস করা ও যাযাবর বৃত্তি। নিষ্ঠুর প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল হয়েও তারা প্রকৃতির গাছপালা, জীবজন্তুকে ভালোবাসতো। সুন্দর জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হতো। সেই-সব সুন্দর জিনিসগুলিকে রূপ দিতে চেয়েছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের জিনিস-পত্রে। তাই শান্তিদন্ড (ব্যাটন) হাড় বা বল্গা হরিণের শিং-এ তৈরি হলেও এর গায়ে মাছ ও জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করে বা শান্তি-দন্ডের একপ্রান্তকে জন্তুর প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত করে দক্ষতার নিদর্শন রেখে গেছে শিল্পী, পাথরের ছুরির বাঁট তৈরি হয়েছে হরিণের শিং-এ। কোনটা ঘোড়ার মাথা আবার কোনটা জল-হস্তীর মাথা সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে খোদাই-এর মাধ্যমে। বর্শা-ক্ষেপণীকে যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে খোদাই-করা ঘোড়ার সম্মুখের অংশ দেখা যাবে। এর মুখের দিকটাকে রূপান্ত-রিত করা হয়েছে পাখীর ঠোঁটে। ছোট্ট রং মেশানোর পাত্রও সেইসব শিল্পীর রস-বোধের পরিচয় দেয়। এই অতি ছোট্ট, নগণ্য জিনিসকে খোদাই করে রূপ দেওয়া হয়েছে সুন্দর মাছের আকারে। কি নিখুঁত কাজ! শিল্পীর কি দক্ষতা! সত্যই অবাক হতে হয়।

লাইমস্টোনের তৈরি বিখ্যাত 'উইলেন্-ডরফের ভেনাস'গুলি সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। এটি একটি গর্ভবতী নারীমূর্তি। মুখের বিভিন্ন অংশ যদিও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি, তবু এর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বকীয়-ভাব প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর সহজাত সুন্দর দৃষ্টি ও নিপুণ হাতের কারুকার্যে। গাছপালা, জীবজন্তু, নরনারীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি স্বচ্ছ জ্ঞান! কি বিচার-

স্পেনের একটি প্রাচীন চিত্র
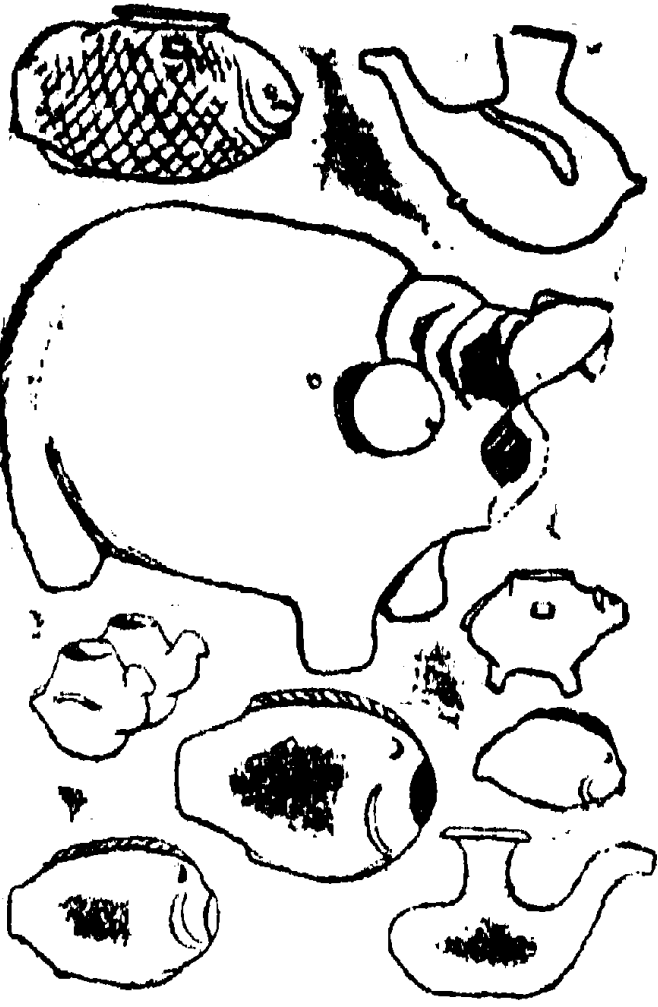
কেটলি জাতীয় কয়েকটি জলাধার

বিশ্লেষণের শক্তি! এছাড়া নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজনে যাদুবিদ্যাকে কেন্দ্র করে যেসব জীবজন্তুর মূর্তি সূক্ষ্ম অগভীর রেখার টানে এঁকেছিল বা নানা রং-এ রঞ্জিত করেছিল সেই আদিম মানুষ, তা আমাদের অবাক করে, লজ্জা দেয়। এইসব জীবজন্তুকে এমনভাবে আঁকা বা পেনটিং করা হয়েছে, যা এদেরকে করে তুলেছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। কোথাও আবার কয়েকটি রেখার টানে একদল বল্গা হরিণকে বোঝাতে গিয়ে শিল্পী যে নিপুণ টেক্‌নিকের আশ্রয় নিয়েছে, তা কেবল পুরোপুরি কোন দক্ষ শিল্পীর পক্ষে সম্ভব।

পেন্‌টিংয়েও পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ দক্ষতার ও শিল্পবোধের কম পরিচয় দেয় নি। কোনটা একরংএ আবার কোনটা বহু রংএ রঞ্জিত করে জীবন্ত করতে চেয়েছে শিল্পী। কিন্তু আজকালকার দিনের মত নানা রং সহজলভ্য ছিল না, ছিল না ব্যবহারের সহজ পদ্ধতি। বিভিন্ন রংএর জন্য শিল্পীকে খুঁজে বার করতে হয়েছে 'অক্সাইড আয়রন', অক্‌সাইড ম্যাঙ্গানীজ, নানান প্রকারের আকরিক পদার্থ। আলতামীরা গুহার বাইসনের পেন্‌টিং কি আধুনিক পেন্‌টিং-এর থেকে কিছু কম? মনে প্রশ্ন জাগে নাকি, যে যাযাবর গোষ্ঠীকে খাদ্যের অন্বেষণে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াতে হয়েছে, তাদের মধ্যে এই রসবোধ ও শিল্পের বিভিন্ন কলাকৌশল জন্মালো কি করে? বর্তমানের মত নিশ্চয় কোন প্রশিক্ষা কেন্দ্র তখনকার দিনে ছিল না অথচ কি নিখুঁত মাপজোপ, কি নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞান। সত্যই এরা জাতশিল্পী!

পুরনো প্রস্তর-যুগের শেষে এবং নব্য প্রস্তর-যুগের প্রারম্ভে, মধ্য-প্রস্তরযুগের লোকজন বসবাস করতো। আবহাওয়া ও পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এরা জীবনযাত্রার পথ বেছে নিয়েছিল। তাই প্রধানত খাদ্যযোগাড়কারী দল' হয়েও তাদের খাদ্যোৎপাদনের মনোনিবেশের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই গোষ্ঠী পুরনো প্রস্তর-যুগের লোকজনদের মত এতটা নিপুণ শিল্পী ছিল না। কিন্তু এদের স্বল্প-সংখ্যক জিনিসপত্রও তাদের সৌন্দর্যপ্রীতির স্বাক্ষর। পেন্‌টিং ও খোদাই-এর কাজ এরা বোধহয় জানতো না। এনগ্রেভিং-এ এরা যে সিদ্ধহস্ত ছিল তা বেশ বুঝা যায় তাদের হরিণের শিংএ তৈরি ছুঁচ দেখলে। সূক্ষ্ম জ্যামিতিক রেখার টানে অলঙ্কৃত করা হয়েছে এগুলিকে। দেহকে সুন্দর করে তোলার জন্য বিভিন্ন অলঙ্কারের প্রচলন এদের মধ্যে ছিল। ছোট ছোট ঝিনুকের খোলা নিয়ে তৈরি এই গলার হার কম সুন্দর বস্তু নয়। তাছাড়া জীবজন্তুর ছোট বড় দাঁতকে ছেঁদা করে গলার হার তৈরি করা এই প্রথম। এগুলি কি মুক্তমালার অপেক্ষা কোন অংশে কম? আবার কোথাও তৈলস্ফটিকের অর্ধ-খোদাই প্রাণীমূর্তি ও অলঙ্কারের অন্য জিনিস শিল্পমনের পরিচয়। শুধু এই নয়, এদের উপর সূক্ষ্ম রেখার বিভিন্ন কারু-কার্যও বর্তমান। এসবই কি তাদের সৌন্দর্য-প্রীতির স্বাক্ষর নয়?

প্রস্তর-যুগের শেষ পর্যায় 'নব্য প্রস্তর-যুগ'। বহু শত বছর অতীত হওয়ার পর আবহাওয়া ও জলবায়ু এখন মোটামুটি স্থায়ী পর্যায়ে এসে পড়লো। মানুষের জীবন-যাত্রায় এলো পরিবর্তন। এরা খাদ্যের জন্য প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে খাদ্যোৎপাদনের দিকে বেশী করে মনোনিবেশ করলো, পুরোপুরি কৃষিজীবী হয়ে পড়লো। কৃষির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজে এলো পরিবর্তনের বিরাট ঢেউ। যাযাবর না হয়ে মানুষ বসবাস আরম্ভ করলো গ্রামে, আর গ্রামজীবনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো সুসংবদ্ধ সমাজজীবন। পুরনো বাসস্থানের বদলে বেছে নিলো নতুন নতুন জায়গা। এইসব স্থাননির্বাচনের পিছনে তাদের শিল্পমনের পরিচয় পাওয়া যায়। বড় বড় হ্রদের কিনারায় কাঠের খুঁটি পুঁতে জলের উপর মাচা বেঁধে তৈরি করলো ঘর-বাড়ী, ক্রমে ক্রমে রূপ নিল গ্রামের। সরু পুলের সাহায্যে স্থলভাগের সঙ্গে এইসব-গুলিকে যুক্ত করা হতো। এছাড়া ছোট ছোট ডোঙ্গাও ব্যবহৃত হতো বহুল পরিমাণে যাতায়াতের জন্য। গ্রাম থেকে বা ঘরবাড়ী থেকে আশেপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-পর্বত, গভীর অরণ্য উপভোগ করা যেতো আর মনোরম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যেতো। আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনে এইসব গ্রামে বসবাসের প্রধান কারণ হলেও তাদের সৌন্দর্য-প্রীতিও আর এক কারণ। এক একটা গ্রাম যেন এক একটা ছবি।

নব্য-প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্রও সৃষ্টিকর্তার রসিকমনের পরিচয় দেয়। বিভিন্ন প্রকারের পাথরের হাতিয়ার, তাদের গঠন-প্রণালীও দেখার মত। কত ধৈর্য, কত অভিজ্ঞতার ফলে তৈরি হয়েছে এইসব অস্ত্র-

মাটির তৈরি কয়েকটি পাত্র
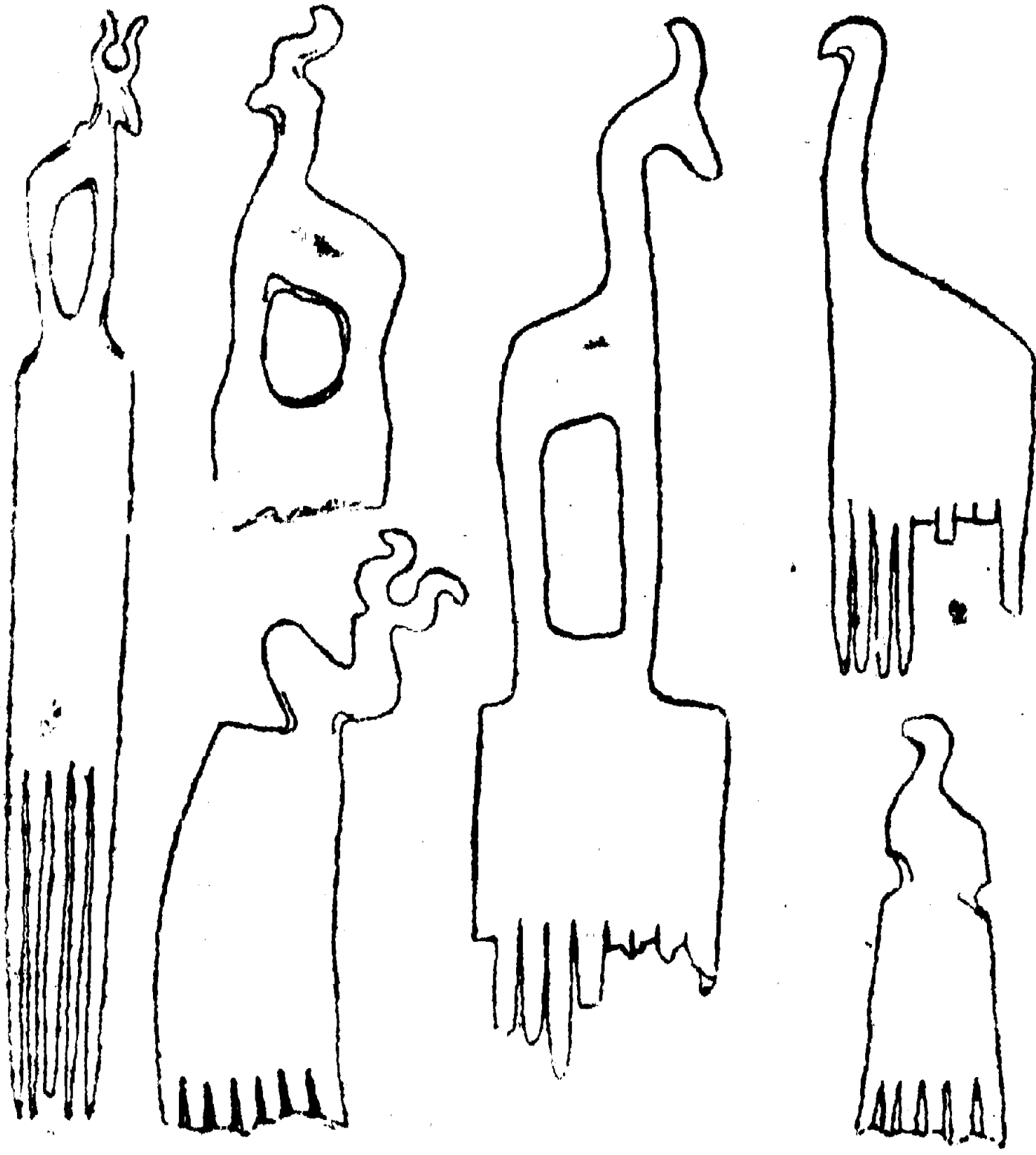
হাতীর দাঁতের তৈরি চিরুনি

হাতির দাঁতে তৈরি ছুরির হাতল

শক্ত, পরিষ্কার ধারণা না থাকলে একপিণ্ড 'ফ্লিণ্ট' কেটে একটি বড় ছোরায় বা কাস্তেয় পরিণত করা সম্ভব নয়। নিখুঁত মাপজোক ও হাতের কাজ দেখলে অবাক হতে হয়। মাটির বাসনপত্র এই যুগে প্রথম দেখা গেল। মৃৎশিল্প মানব-সভ্যতার ইতিহাসকে দিয়েছে আর এক রূপ। এই যুগের মানুষজন তাদের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পের পরিচয় রেখে গেছে তাদেরই ব্যবহৃত নানান প্রকারের নানান ধরনের মৃৎপাত্রে। কোনটার গলা লম্বা ও নীচের অংশ গোল, কোনটার নীচের অংশ লম্বা ও সরু এবং উপরের অংশ ছড়িয়ে পড়েছে, আবার কোনটার নীচের অংশ চ্যাপ্টা। ধরার হাতল কোনটার একটা, কোনটার দুটো, আবার কোনটা হাতল-বিহীন। রং ও রেখার টানে সাজানো হয়েছে প্রত্যেকটি মৃৎপাত্র। কোনটার গায়ে কালো রং, তার উপর সাদা রেখার আলাপনা, আবার কোনটা বাদামী রং-এর। কত হরেক রকমের নক্শা—কতক রেখা ঢেউ-খেলানো, কতক চৌকো, কতক গোল, আবার কোথাও দেখা যায় শুধু ফুটকি। এক-একটি পাত্রের গায়ে এক-একরকমের নক্শা—কোনটার গায়ে চৌকো ঘর, আবার ঝাঁঝরি আঁকা কোনটার গায়ে, লতাপাতাও আঁকা হয়েছে কোনটার গায়ে। সত্যই অবাক হতে হয় এসব দেখে। কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আজকাল গবেষণাগারে 'সেরামিক' শিল্পকে সুন্দর ও মনোরম করতে, কতশত না বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বর্তমানের চীনামাটি ও কাচের পাত্রে। কিন্তু সে-যুগে তো গবেষণাগার ছিল না আজকালকার মত, কি করে তাহলে এইসব অলঙ্কৃত পাত্র তৈরি সম্ভব হয়েছিল অতীতদিনের মানুষের পক্ষে। রং সম্বন্ধে কি স্বচ্ছ জ্ঞান। কি রুচিবোধ! শিল্পীমন ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট না হলে এসব সৃষ্টি কি সম্ভব?

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে কৃষির আবির্ভাবের পর ধাতুর ব্যবহার সমাজে এনে দিয়েছিল বিরাট এক আলোড়ন, সেই আলোড়নের ঢেউ এসে লেগেছিল সমাজের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে। মধ্য-প্রস্তরযুগে কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে কৃষিকার্যের সংগে সংগেই নানান শিল্প গড়ে উঠেছিলো। কুমোর, তাঁতি, ছুতার মিস্ত্রীর চাহিদা সমাজে যে প্রচুর ছিল, তা তাদের দ্রব্যসম্ভার দেখলে অনুমান করা যায়। পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করে ব্যস্ত হয়ে উঠলো ধাতুর বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে। ধাতুর ব্যবহারের সংগে সংগে গড়ে উঠলো নগর-সভ্যতা। চাষবাসের জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, বণিক বা ব্যবসায়ী হলো এই সভ্যতার প্রধান বাহক। ধাতু-সভ্যতার গোড়ায় তাম্র বা তামাই ছিল প্রধান ও একমাত্র বস্তু। তারপর এসেছে মিশ্রধাতু। তামা ও টিনের সংমিশ্রণে তৈরি হলো ব্রোঞ্জ বা পিত্তল। পিত্তলের স্থায়িত্ব তামা অপেক্ষা অনেক বেশী, তাই তাম্রযুগের বিভিন্ন নিদর্শন অপেক্ষা ব্রোঞ্জের নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রচুর, আর প্রায় একই জায়গায় এই দুই ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। আবার তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগেও কিন্তু পাথরের ও হাড়ের তৈরি জিনিসপত্রেরও চলন ছিল। প্রস্তরযুগ অপেক্ষা এ-যুগের দ্রব্যসম্ভার ছিল বিপুল। প্রাচুর্যের চাপে কিন্তু শিল্প নষ্ট হয়নি, হয়নি সুন্দর জিনিসের অভাব। কত শত ছোটখাটো, খুঁটিনাটি জিনিসপত্র সে-যুগের লোকজনদের রসবোধের পরিচয় দেয়। সামান্য চিরুনি কত সুন্দর হতে পারে, তা তাদের চিরুনি দেখলে বুঝা যায়। হাতির দাঁতে তৈরি চিরুনি শুধু চিরুনি নয়, বিভিন্ন জীব-জন্তুর মূর্তি তৈরি হয়েছে খোদাই করে। নগণ্য যে মাদুলী সে-ও কি কম সুন্দর! কোনটা তৈরি করা হয়েছে ষাঁড়ের মাথার আকৃতিতে, আবার কোনটা রূপ নিয়েছে ছোট্ট কুনো ব্যাং-এর। আবার হাতির দাঁতের ছুরির হাতল যেন একটা আর্ট-গ্যালারী। প্রায় সব জন্তুকেই নিপুণভাবে খোদাই করা হয়েছে—বাঘ, ভাল্লুক, ঘোড়া, হাতী, হরিণ, ভেড়া আবার সাপও। ছোট একটা জিনিষের উপর এত প্রাণী আঁকলো কি করে! কিন্তু সবকটাই যেন জীবন্ত। জন্তুজানোয়ারদের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁতভাবে আঁকা।

সেকালের নানান নকসায় তৈরি হরেক-রকমের অলঙ্কার আজও অবাক হ'য়ে দেখতে হয়। সাধারণ সরল অলঙ্কারে সে যুগের মেয়েদের নিশ্চয় মন ভরতো না। তাই তাদের মন জয় করতে কত না রস-বোধের পরিচয় দিতে হয়েছে তখনকার পুরুষকে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারের মাধ্যমে। কানের দুল, হার, হারের লকেট আরও কত অলঙ্কার। প্রত্যেকটি জিনিষের সূক্ষ্ম কারুকার্য কারিগরের দক্ষতাই শুধু প্রমাণ করে না, প্রমাণ করে তাদের কল্পনাশক্তি ও শিল্পমনের। আধুনিক হারের লকেটের চেয়ে কোন অংশে কম তখনকার দিনের লকেট? আধুনিকারা এইসব ডিজাইন করে নিজেদের অলঙ্কারে ব্যবহার করবেন তাই ভাবছি।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

"ছবি তোলার মত সোজা জিনিস আর নেই।" নতুন একটা ক্যামেরার উপর সস্নেহ হাত বোলাতে-বোলাতে প্রিয়তোষ বলল। "বহু লোকের ধারণা ছবি তোলা কঠিন ব্যাপার।"

"আমারও তাই ধারণা", আমি বললাম।

"তোমরা হয় অজ্ঞ, নয় গেঁয়ো। কখনো ক্যামেরা হ্যান্ডেল করেছ একটা?"

আমি বললাম, "একেবারে করিনি তা নয়। বক্স ক্যামেরায় দু রোল তুলেছিলাম একদা।"

পরিতোষ বলল, "বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলেছ? ভাল ছবি কখনো ঐ ক্যামেরায় হয় নাকি? দামী ক্যামেরা না হলে ছবিই প্রায় হয় না। ক্যামেরা যত দামী হবে, তত আধুনিক হবে, আর যত আধুনিক হবে তত মাথা ব্যথা কমে যাবে। সমস্তই স্বয়ংক্রিয় হওয়াতে তোমাকে ভাবতেই হবে না কত এক্সপোজার দিতে হবে, কতখানি অ্যাপারচার খুলতে হবে। একই ফ্রেমে ডবল ছবি তোলা যাবে না। তোমাকে অবশ্য দুটো কাজ করতে হবে, এক নম্বর হল ফিল্মটা ভরতে হবে। ফিল্ম ছাড়া ছবি কখনো হয় না, তবে ভবিষ্যতে তাও হবে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আর দু নম্বর হল ফোকাস করতে হবে। ঠিক মত ফোকাস করাও আজকাল খুব সহজ। তুমি ভিউ-ফাইণ্ডারে দুটো ছবি দেখতে পাবে। একই ছবি। সেই দুটো ছবিকে এক করে মেলাতে হবে। যখনি মিলবে তখনি ক্লিক করে শাটার টিপে দেবে ব্যস!"

আমি ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ব্যাপারগুলো বুঝে ফেললাম সহজেই। পরিতোষ বলল, "কি হে, কি রকম বানিয়েছে ক্যামেরাটি?"

আমি বললাম, "আশ্চর্য!"

পরিতোষ বলল, "ফিল্মও পরানো কত সহজ। এই ক্যামেরায় ফিল্ম পরানোর গতানুগতিক হাঙ্গামার কোন প্রয়োজন নেই। ফিল্মটা পরানো অবস্থাতেই কিনতে পাওয়া যায়. সেটাকেই ঢুকিয়ে দিতে হয়। তাতে দুটো চেম্বার, একটা থেকে অন্যটাতে ঢুকছে, ফলে তোমাকে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে না।"

আমি সময় নষ্ট না করে বললাম, "ক্যামেরাটা আমাকে একবেলার জন্য দেবে?"

পরিতোষ হয়তো আপত্তি করত, কিন্তু কি ভেবে বলল, "ঠিক আছে। একবেলার জন্য তো। ছবি তোল মজাসে।" বলে একটা নতুন ফিল্ম ছ সেকেণ্ডের মধ্যে ভরে দিল। তারপর চলে গেল ক্যামেরাটা আমার হাতে দিয়ে। আমিও শামুর বাড়িতে গেলাম। শামুর আড়াই বছরের ছেলে রয়েছে একটা। সুন্দর চেহারা—কিন্তু এ পর্যন্ত তার একটা ভাল ছবি হল না বলে শামু বহুবার দুঃখ প্রকাশ করেছে আমার কাছে। ভাবলাম এই সুযোগে শামুর দুঃখ দূর করেও আসি, আর ক্যামেরাটারও সুবিধেগুলো পরীক্ষা করে আসি।

শামু বাড়িতেই ছিল। তার ছেলেও বাড়িতে ছিল সেটা টের পেলাম বাড়ির চৌকাঠ পেরুতেই। একটু দাঁড়িয়েছি জুতো খুলবার জন্য, হঠাৎ মনে হল একটা কচ্ছপ আমার পা কামড়ে ধরেছে। সভয়ে তাকিয়ে দেখি পায়ে কচ্ছপ কামড়ায় নি, কামড়ে ধরেছে শামুর ছেলে, যার নাম ও রেখেছে কলরব।

আমি তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিলাম। শামু আমাকে বলল, "কি মনে করে?"

আমি সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলাম কি মনে করে ওর বাড়িতে গিয়েছি। অমন রাম-কামড় খাবার পর আমি আরো কত কি ভুলে গিয়েছিলাম তা আর এখন আমার মনে নেই। তবে নিশ্চয় ভুলেছিলাম যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যাই হোক খানিক পর মনে পড়ল। বললাম, "কলরবের একটা ছবি তুলতে চাই।"

কথাটা শুনে শামু বলল, "কলরবের ছবি তুলবে, পারবে কি?"

"আলবত পারব!" বললাম আমি। বলে ক্যামেরাটিকে টেবিলের উপর রাখলাম। খানিক পরেই শামুর স্ত্রী চা আর ফুলকপি ভাজা নিয়ে এল। আমরা নানারকম গল্প করতে লাগলাম। এর মধ্যে কলরবের গল্পই বেশি। সে কি করেছে, কি রকম দুর্দান্ত হয়েছে এই সবই অধিক মাত্রায়।

হঠাৎ আমি চমকে দেখি টেবিলে ক্যামেরা নেই। নিচে পড়ে গেছে মনে করে তাকিয়ে দেখি নিচেও নেই। কোথায় গেল ক্যামেরা?

একটু পরেই চোখে পড়ল, কলরব ক্যামেরা নিয়ে খাটের উপর উঠেছে, আর বর্তমানে ক্যামেরার উপর বসে আছে নিশ্চিন্ত মনে। চটপট তার হাত থেকে ক্যামেরা উদ্ধার করলাম। কিন্তু ছবি আর উঠল না। যতবার শাটার টিপতে যাই হয় না।

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পরিতোষের কাছে গিয়ে বললাম ব্যাপারটা।

পরিতোষ ক্যামেরাটি নিয়ে দেখে বলল, "কি করে আর ছবি উঠবে। সমস্ত ছবি তো তোলা হয়ে গিয়েছে!"

—"তোলা হয়ে গিয়েছে?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেমন করে?"

পরিতোষ বলল, "যেমন করে তোলা হয় ঠিক তেমনি করে।" বলে খটাং করে ফিল্মটা বার করে ফেলল। বলল, "এখানে ডেভেলপ করলেই বোঝা যাবে।"

●

ডেভেলপ করার পর বোঝা গেল। সব সমেত বারোটা ছবি স্পষ্ট উঠেছে। আমার শামুর আর শামুর স্ত্রীর ছবি গোটা ছয়েক। বাকিগুলো শামুরই ঘরের বিভিন্ন দিক।

পরিতোষ বলল, "একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। শাটার টেপার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম ঘুরে যায়। এ সব ছবিই শামুর ছেলের তোলা।"

কিন্তু কথাটা কানে গেল মাত্র। ভাল করে বুঝবার আগেই মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। আর ঐ মাথা ঘোরা অবস্থাতেই মনে হল, ক্যামেরার এতখানি অগ্রগতি বোধহয় না হলেও পারত।

বিরশা ভগবান

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুযুগ আগের কথা নয়, অতীতের ইতিহাসকে মন্থন করে আনতে হয় না এ খবর। নথিতে পাঞ্জিতে দলিলে দস্তাবেজে রিপোর্টে গেজেটিয়ারে স্টেটসম্যান ইংলিশম্যান পাইওনীয়রের পাতায় পাতায় লিখিত আছে এসব কাহিনী। দেখি সুরেনবাবু প্রশ্ন করছেন কাউন্সিলে, বিচারপতি চন্দ্রমাধব রায় দিচ্ছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমপাদ, শেষসূর্য অস্ত যাচ্ছে ছোটনাগপুরের গিরিদরী বেয়ে—১৮৯৪-৯৫ সাল থেকে পাঁচ ছয় বৎসরের কথা। স্থান—রাঁচি, সিংভূম, পালামৌ জেলা, পাত্র—মুণ্ডা আদিবাসীর দল। রব উঠলো পাহাড়ে জঙ্গলে, অরণ্যের বন্দন মর্মরে, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত—এসেছেন দেবতা, সিঙ্গাবোঙ্গার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, চলবে না অত্যাচার অবিচার অনাচার। জায়গীরদার জমিদার ঠিকাদার, কাটকিনদারদের কথা শুনবো না আমরা, মিশনারী সাহেবদের মিষ্টি ভাষণ, ব্রিটিশদের আইন-আদালতের ভাষা, বাঙালী উকীলদের সওয়াল জবাব। মাটি কার—না দাপ যার, হে শ্বেতকায় মনুষ্যগণ, ছোটনাগপুরে আমাদের, তোমরা ও তোমাদের দালালের দল দালালগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে সরে পড়ো মানে মানে—জয় হোক বিরশা ভগবানের। মহারাণী-রাজ টুণ্ডু যানা, আবুয়ারাজ এতেজানা—মহারাণীর রাজত্ব দূর হোক—আমাদের নিজেদের রাজত্ব আসুক।

আজকের আণবিক যুগের দানবিক দিনে, যখন দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধকেই ছেলেখেলা বলে মনে হচ্ছে তখন এই বিশাল দেশের একটি নগণ্য কোণে এই ধরনের উপজাতির অভ্যুত্থানকে হয়তো আমরা গুরুত্ব দেবো না বা হাস্যকর বলেই মনে করবো, কিন্তু সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্বীকার করতেই হবে যে আদিবাসীদের এই ধরনের বিদ্রোহ গণজাগরণেরই স্বাক্ষর রেখে যায় ইতিহাসের পাতায়।

আদিবাসী কৃষ্ণকায়দের ইতিহাস ভারতবর্ষে নতুন কিছু নয়। বেদে উপনিষদে তন্ত্রে পুরাণে রামায়ণে মহাভারতে পড়ি আগন্তুক আর্যদের সঙ্গে অশ্বেতকায়দের সংঘর্ষের কাহিনী, পঞ্চনদ, ব্রহ্মাবর্ত ব্রহ্মর্ষিদেশ মধ্যদেশ থেকে তারা ক্রমে ক্রমে বিতাড়িত হলো, কিন্তু হিমালয়ের পাদমূলে যে বিশাল ভূভাগ আর সারা মধ্যভারত জুড়ে যে পর্বত অরণ্যমালা সেই বিস্তীর্ণ দেশে রইলো তারা সগৌরবে আঁকড়ে। বিন্ধ্য নর্মদা—বেবারোধসি বেতসীতরুতলে—তাদের গতিবিধি রইলো অক্ষুন্ন। কিন্তু ক্রমশঃই তাদের পূর্বাভিমুখী গতি হয়েছিল—প্রভাতসূর্যের দিকে মুখ রেখে প্রবাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তারা—মুণ্ডা, ওরাং, কোল, ভিল, হো, সাঁওতাল। এককালে এদের সকলকেই সাধারণভাবে বলা হতো কিরাত। তবে নানা জাতি নানা দেশ নানা রক্তের মিশ্রণ হয়েছে—প্রাচীন অস্ট্রিক থেকে টিবেটোবার্মান মঙ্গোলয়েড নিগ্রিটো পর্যন্ত। রাঁচি সুরগুজায় দিকে এলো মুণ্ডারা। দামোদর পেরিয়ে সাঁওতালরা স্থান নিলে শিকারভূমে। মুণ্ডাদের কথা বিশেষভাবে লিখেছিলেন রাঁচির শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় ও রেভারেণ্ড হফম্যান। আজ আরো গবেষণা হচ্ছে—বিহার ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও অন্য অনেকে হয়েছেন উদ্যোগী। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ সম্প্রতি লিখেছেন এই সম্বন্ধে একটি বই। শহীদ বিরশার কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন প্রিয়নাথ জেমস পূর্তি।

সেদিনকার ইতিহাসে এই যে ছোট্ট নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল তার বেশ কিছু অংকের স্ফুরণ এই কলকাতাতেই।

এইসব বিদ্রোহ বিপ্লবের মূলে কথা কিন্তু ভূমিস্বত্ব ও মালিকানা নিয়ে—লাঙ্গল যার জমি তার। রাজা বা গ্রামীণ নেতারা ছিল ভূমাধিকারী নয়—তারা শস্যসম্পদের একটা অংশ পেতো। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ছোটনাগপুরের রাজার অধিকার অন্য সামন্ত নৃপতির মত আস্তে আস্তে সীমাবদ্ধ হয়ে আসছিল, কিন্তু তার চেয়েও উৎপাত করছিল জায়গীরদার ও ঠিকাদাররা যারা ক্রমশঃই বাংলার জমিদারদের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুখসুবিধা দাবী করছিল যার ফলে আসল আদিবাসী রায়তদের অধিকারও খর্ব হয়ে আসছিল। তাছাড়া এই জোতদার জমিদার ও ঠিকাদাররা ছোটনাগপুরের অন্য স্থান থেকে, এমন কি বাইরে থেকেও চাষের জন্য শ্রমিক আমদানী করতে আরম্ভ করেছিল। জমিদারদের ছিল পুলিশী ক্ষমতা। তাছাড়া ইংরেজদের প্রণীত আইনকানুন আমলা আদালত আদিবাসীদের কাছে ভীতিকরই ছিল। ফলে হোল কি

"The people found themselves everywhere oppressed, there was no chance of getting justice either from their own chiefs, who deprived of their power and prestige, had naturally grown unmindful to the welfare of their people, nor from the Govt. whose courts were distant, their processes too cumbrous and their omlas too corrupt to prove useful to the aborigines. The country had been a prey to the taxgatherers in the shape of Thikadars and Katkindars who left no means untried to enrich themselves on the ruins of the people".

১৮৩১-৩২ সালে হোল কোল-বিদ্রোহ। ১৮৩৩ সালে বেণ্টিঙ্ক আজকের নেফার মত একটি সাউথ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী খুললেন—পুরনো জঙ্গলমহল ও রামগড় জেলা উঠে গেলো এবং গভর্নর জেনারেলের একজন এজেণ্ট বসলেন রামগড়ে। জমিদারের পেলে পুলিশ দারোগার ক্ষমতা। এমন সময় আবির্ভাব হলো মিশনরীদের, তারা খ্রীষ্টের নামে স্কুল হাসপাতাল খুললেন, বললেন—যীশুর শরণ নাও। যারা নিলে তাদের কিছু লাভও হলো—উন্নত জীবনমান, শিক্ষাদীক্ষা কিছু এলো। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসীদের স্বাধীনভাবে যৌথ চাষ বা একক চাষ করবার অধিকার ছিল তা ক্ষুন্ন হ'তে হ'তে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যে তারা আর খেতে পায় না, পরতে পায় না। তারপর ছিল বেগারী—প্রত্যেক প্রজাকে বেগার খাটতে হতো—যেমন রোপনির দিন, মোরাবাঁধির দিনে ইত্যাদি। সর্দারেরা মিশনরীদের সাহায্যে অনেক লেখাপড়া মামলা মকদ্দমা করেছিল, কলকাতায় এসে উকীলদের হাতে পড়েছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয়নি। এই সময় থেকেই প্রবাদটি প্রচারিত হলো—টোপি, টোপি, এক টোপি অর্থাৎ টুপিতে টুপিতে ভেদ নেই—স্বার্থের সীমালঙ্ঘন সেখানে হয় না।

এমনি একদিনে বিরশার আবির্ভাব বিশ বছরের তরুণ নওজোয়ান, সুগঠিত দেহ—জন্মে সে খ্রীষ্টান—চাইবাসা লুথারেন চার্চের আওতায় মানুষ—মিশন স্কুলে লেখাপড়া তার। বৈষ্ণব গুরুদের কথা সে শুনেছে, রামায়ণ মহাভারতের গল্পে সে মজেছে, রাম লক্ষ্মণ, ভীম অর্জুনের কাহিনী সে শোনে গুরু আনন্দের কাছে। জমিদার জগমোহন সিং তখন সেখানকার দুর্দান্ত ভূমাধিকারী। সর্দারদের সঙ্গে ঝগড়ার কথা সে জানে। তার মন ছটফট করে। গুরু তাকে মন্ত্রতন্ত্র দিলেন, কিছু তুকতাক ম্যাজিক সে শিখলে, দ্রব্যগুণ জানলে, অসুখে সারাবার পন্থা। কিন্তু তার মন তার জাতভাইদের দুঃখদুর্দশায় ক্লান্ত তপ্ত—সে আয়ুর্বেদ শুধু নয়, কিছু কিছু যৌগিক আসনশাসনও শিখে নিলে। অনেক সময়ই ধ্যানী বিরশাকে দেখা যেতো এক বৃহৎ আম্রবৃক্ষের নীচে।

ভারতবর্ষের মাটিতে আছে অলৌকিকের প্রতি টান ও মোহ। দলে দলে লোক আসে শুরু হয় সেই তরুণ তাপসের কাছে, শুধু গেঁয়ো চাষী নয়, আদিম অধিবাসী নয়, ইংরাজী-জানা সাহেব-ঘেঁষা মানুষও। সে শুধু মাদুলী ওষুধ দেয় না, ঝাড়ফুঁক করে

কলকাতার বাবুদের মত অত্যাচার-
ারের কথাও বলে।, তাঁর দেশের
লোক আসে দূর-দূরান্ত থেকে
ঢ়-জঙ্গল পেরিয়ে। মুখে মুখে প্রচারিত
গেল যে, সে স্বপ্নে পেয়েছে দীক্ষা
ভগবানের কাছে—তিনি তাকে দিয়ে-
এক অপূর্ব রত্ন—যা কাছে থাকলে সব
সারান যায়, সব অত্যাচার-অবিচার
ণ হয়, দুঃখ-কষ্ট হয় দূর। দেবতা
ভূত হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন ওরই এক
পুরুষের রূপ ধরে, নিয়ে গেছলেন
করে বংশধরকে এক মহুয়া বৃক্ষের
–সেখানে চারজনকে ডেকে বললেন—
রা ওঠো, ঐ বৃক্ষের উপরে আছে এক
ম্পদ। বোঙ্গা পারলে না, রাজা পারলে
হাকিম পারলে না। বিরশাই শুধু
সাত রাজার ধন মানিক নিয়ে ফিরল।
একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।
া ও তার একজন অনুগামী চলেছে
কসংকুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে, হঠাৎ
ৃষ্টি বজ্রপাত আরম্ভ হল। অনুগামী
টি দেখলে যে, বিদ্যুৎ আলোকে
সিত-ক্ষণে বিরশার সব কিছু বদলে
–তার ভেতর প্রবেশ করছে যেন এক
 তেজ। রব উঠল যে, স্বয়ং শিংবোঙ্গা
 ভগবান বদলে দিয়েছেন বিরশাকে
বিদ্যুৎপাতের মধ্য দিয়ে। করস্পর-
ত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত আদিবাসীদের
র্তা হবে সে যেমন ছিলেন ত্রেতায়
তি রাঘব রাজারাম, দ্বাপরে এসেছিলেন
রসখা পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ, যেমন
ছ সে মিশনারীদের প্রভু যীশুর পুত

লে ১৮৯৪ সালে ছোটনাগপুরের
ন এক নূতন যুগদেবতার আবির্ভাব
তার নাম বিরশা ভগবান। ১৮৯৪
চক্রধরপুর থানার দারোগার এক
র্ট প্রকাশ যে, সিগ্রিদা গ্রামের রায়-
ও তার নেতা বিরশা বনকর সম্বন্ধে
ত দিচ্ছে মহামান্য হুজুর সরকারের
পরের বছর দেখা যায় যে, তারা বলছে
ধান কাটবে না, তাদের গুরু বলেছেন,
 আপনি ধান দেবেন, কষ্ট করে
 করবার দরকার নেই। সেই ভগবান-
 গুরু ও তার অনুগামীরা চালকাড
পাহাড়ের উপর একটি মঠ স্থাপন
সেখানে দলে দলে লোক চলেছে
উপাচার নিয়ে, নূতন কাপড়, ছাগল,
। ফলে চাষবাসের ক্ষতি হচ্ছে, বেগার
যাচ্ছে না, বাধ্য রায়তরা উদ্ধত হয়ে
আর এক অদ্ভুত ধর্মোন্মাদনায়
া পিছু-পিছু ঘুরছে বিরশা

ভগবানের। লোহারডাগার ডেপুটি কমি-
শনরের কাছে এই রিপোর্ট পৌঁছল, তিনি
চিন্তিত হলেন যে, চাষবাস ঠিকমত না হলে
খাদ্যাভাব ঘটতে পারে। সিংভূম থেকেও
সরকারী খবর এল যে, কোলরাও উত্তেজিত
হয়ে উঠেছে, তারা শুনেছে যে, এই বিস্তীর্ণ
অরণ্যভূমিতে এক নতুন হিন্দুরাজ্য স্থাপন
হবে। তার পূর্বে আকাশ থেকে অগ্নি ও
গন্ধক বর্ষণে সব ধ্বংস হয়ে যাবে — শুধু
বিরশার আশ্রম ও তৎসংলগ্ন স্থানগুলি
রক্ষা পাবে। অতএব চল, চল আশ্রয় লও
সেই মহাপুরুষের। শোনা যায় হাটবারে
তুচ্ছ করে আট-দশ হাজার লোক জড়ো হত
বিরশা ভগবানের কথা শুনতে—আর তাছাড়া
অন্ধ-আতুর-খঞ্জ রোগীর দল ত ছিলই।
দ্বিতীয় যীশুর মত ত্রাণকর্তা ও রোগ
নিরাময় প্রভু যে তিনি। বিরশা নাম
বেলাতেন, কীর্তন গাইতেন, সিঙ্গা-বোঙ্গা—
এক ও অদ্বিতীয় যিনি।

ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক গুরুগিরি থেকে
বিরশা পরিবর্তিত হলেন রাজনৈতিক নেতা-
রূপে—শ্লোগান উঠল—বৃটিশ রাজ বরবাদ
ও মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার। হ্যালেট, হফম্যান,
রিড সবাই লিখেছেন এই অন্দোলনের মোড়
ফেরার কথা। এমনি এক দিনে বেশ একটা
সংঘর্ষ ঘটে গেল স্থানীয় থানার জমাদার
ও পুলিশের সঙ্গে। চালকাদ থেকে তারা
বিতাড়িত হয়ে পালাল। সাজ-সাজ রব পড়ে
গেল সরকারীমহলে—এ তো সাক্ষাৎ বিদ্রোহ—
এখনি দমন করতে হবে। বেশ কিছু
পুলিশী ফৌজ নিয়ে এবং জমিদার জগ-
মোহন সিংহের সহায়তায় পুলিশ সুপার
চললেন দুষ্টের দমনে। সাত ঘণ্টা মার্চ
করে ভোর তিনটেয় তারা পৌঁছল চালকাদে।
বিরশার ঘরে ঢুকে তাকে বন্দী করা হল।
তার অনুগত কয়েকজন বাধা দিতে এসে-
ছিল, পারে নি, তবে বেশীর ভাগ লোকই
নাকি সেদিন আশ্রমে ছিল না। তাড়াতাড়ি
বিরশাকে খুন্তীতে নিয়ে আসা হল কিন্তু
সারা পার্বত্য প্রদেশ ঘিরে একটা থমথমে
ভাব, তাদের দেবতাকে করা হয়েছে গ্রেপ্তার।
যে সব মুণ্ডারা (ধাঙ্গড়) বড়লোকদের বা
জমিদার-ঠিকাদার সর্দারদের বাড়ীতে কাজ
করত তারা চাকরী ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ
করে গ্রামে চলে এল। একটা উদ্বেল জনতার
রোষ যেন ফেটে পড়ছে, কখন কি হয়।
গভর্নমেন্টের তরফ থেকে থানায় থানায়
শক্তি বৃদ্ধি করা হল। কিন্তু বিদ্বেষ
ধূমায়িত হতেই থাকে।

বিরশা ও তার পনেরোজন অনুগত
ভক্তের বিচার হল রাঁচিতে—আড়াই বছরের
সশ্রম কারাদণ্ড—দু বছর ও ফাইন অনাদায়ের

জন্য ছ মাস। নিরক্ষর জনতা দমে গেল।
তারা ভেবেছিল অলৌকিক একটা কিছু
ঘটবে—বিরশা ভগবানকে আটকে কেউ
রাখতে পারবে না—নয় ধরিত্রী দ্বিধা হবেন,
কিম্বা স্বর্গ থেকে দেবতার রোষ এসে
পড়বে জ্বলন্ত অগ্নির মত। চল না
কিছুই। চতুর্থ দিনেও দেবতা ফিরলেন না
তার আস্তানায়। বিরশার ভবিষ্যবাণী ছিল
যে, জেলে পড়ে থাকবে শুধু এক টুকরো
কাঠ। ঘটল না অঘটন, কিন্তু রাঁচি জেলের
ভিতর একটি মাটির দেওয়াল পড়ে গেছল
সেদিন, সেই খবরটাই বড় করে রটিয়ে
দেওয়া হয়েছিল সরবে। সাত হাজারের
একটি ক্ষুব্ধ জনতা দেবতার পুনর্দর্শন পেল
না বটে কিন্তু শুনল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই
দেওয়াল পতনের কথা। রটে গেল তখনি যে,
দেওয়াল ভেঙে দেবতা চলে গেছেন কিছু-
দিনের জন্য স্বর্গবিহারে, আবার উপযুক্ত
সময় হলেই তাঁর হবে পুনরাবির্ভাব।

গভর্নমেন্টের দিক থেকে চেষ্টা হল যে,
মুণ্ডাদের কিছু কিছু সুবিধে-সুযোগ
দেওয়া, তাদের ভূমি সংক্রান্ত (agrarian)
কতকগুলি কষ্টকর বিধির কিছু-কিছু
পরিবর্তন করা (যেমন আবওয়ার, রকুমত,
বেগারি।) ১৮৯৭ সালে এল দুর্ভিক্ষ। এই
সময় মিশনারীরা প্রভূত সেবাকার্য করেন।
বহু লোক ধর্মান্তরিত হয়। জমিদার ও
ঠিকাদারদের কিন্তু নিজেদের পাওনাগণ্ডা
আদায়ের জন্য আলস্য ছিল না। ১৮৯৭-৯৮
এর এক রিপোর্টে প্রকাশ

> "In Lohardagga, the Zamindars are said to take all they can in the way of rent and labour out of the raiyats, specially the aboriginal raiyat whom they coerce by threatening to oust them from their lands. The raiyats on the other hand try to evade payment of their just dues".

১৮৯৮-৯৯ ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাডমিনি-
স্টেশন রিপোর্টেও প্রায় এই এক কথা।

দুর্ভিক্ষের পরেই এল মহামারী—
নিদারুণ রোগ মারীগুটিকা। ওদিকে
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্ত উৎসব
উপলক্ষ্যে বিরশা ও তার অনুচরেরা ছাড়া
পেল হাজারীবাগ জেল থেকে। সেবাব্রতী
বিরশার তখন এক নতুন রূপ—গ্রাম থেকে
গ্রামান্তরে চলল সে নূতন সেবাব্রত নিয়ে—
মুখে তার নতুন ধর্ম ব্যাখ্যা—রোগীকে সে
করবে নিরাময়—মহাপ্রভু চৈতন্যের বাণী তার
মুখে—পতিতপাবন খৃষ্টের অনুপ্রেরণা—সে
শ্রীকৃষ্ণলীলা কথা বলে—আবার বলে
সিংবোঙ্গাই ভগবান, ঐ একই দেবতা।

তোমরা ভূত-প্রেত-পিশাচ নিয়ে থেক না, হোল, সোল, বোল ,দোল—আকাশে বাতাসে পাহাড়ে জঙ্গলে যে সব আত্মাকে দেখছ সবই সেই একের বিকাশ। সবাইকে ভালবাস, প্রেমই হচ্ছে অনাদি মন্ত্র-মৎস্য-মাংসজীবহিংসা ছাড়, মদ্যপান বা হাঁড়িয়াও নয়—মিলেমিশে, সুখে-দুঃখে একতান—পৈতে পর, স্নান করে শুচি হও, সত্য কথা বল, সত্যকাম হও। হিন্দু, খৃস্টান ও মুণ্ডাদের প্রাচীন ঐতিহ্য মিলিয়ে এক নতুন বাণী সৃষ্টি করেছিল এক তরুণ মুণ্ডা, একথা ভাবতেও বেশ লাগে। মুণ্ডাদের জাতীয় জীবনে এসেছিল এক নতুন উন্মাদনা। এই ক বছরেই প্রচারকের দলও গড়ে তুলেছিল, বিরশা-পন্থীরা। ঐতিহাসের এ এক এক অপূর্ব বিস্ময়।

কিন্তু মুণ্ডাদের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘোচে না, জমিদার-ঠিকাদারদের অত্যাচার কমে না, পাদ্রীরা তখনও ভোলায় — জায়গীরদার দারোগার দল দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা করে। ১৮৯৮ সালে আবার দানা বাধল একটা আন্দোলন — ডোমবাড়ী পাহাড়ে 'তিলক' টিকা দিলে বিরশা তার অনুগামীদের—স্থানে স্থানে সভা-সমিতি হতে থাকল। ১৮৯৯ সালে বিরশা চলল মুণ্ডা নাগা বংশী রাজা দুর্জনশালের গড়ে, উদ্দেশ্য মুণ্ডারা জানুক এ হচ্ছে তাদের দেশ, তাদের রাজা আছে, ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে—অবিচার চলবে না—তাদের দাবী মানতে হবে। ১৮৯৯ সালের বড়দিনের সময় অশান্তি তীব্র হয়ে উঠল। এক জার্মান চার্চকে কেন্দ্র করে মুণ্ডারা ছুড়লে তীর—শ্বেতাঙ্গ মিঃ সিজার মারা গেলেন শোনপুরের জঙ্গলে। ফাদার হফম্যান ও কারবেরীর গৃহপ্রাঙ্গণে আগুন লাগাল, ১৯০০ সালের জানুয়ারী মাসে খুন্তী শহর হল ঘেরাও।

তখন নজর পড়ল জনসাধারণের—কাগজে কাগজে লেখা। রাঁচির জর্মান মিশনারীদের একটি কাগজ "ঘরবন্ধু" হিন্দীতে লিখতে আরম্ভ করলে মুণ্ডাদের কথা। কলকাতাতেও তার ঢেউ এসে লাগল স্টেটসম্যান-ইংলিশম্যানের পাতায়। বাংলা দেশ পেরিয়ে পাইওনীয়রও তুললে সে কথা। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ তুললেন প্রশ্ন বাংলা কাউন্সিলে—মুণ্ডা বিদ্রোহের মূল গলদ কোথায়! পুলিশ ছুটল, সৈন্যদল ছুটল, বিরশা ও তার নায়কদের ধরতে, তারা তখন এ জঙ্গল থেকে ও জঙ্গল, এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের ধরবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত হল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল বিরশা "ধারতি আবা"—ধরিত্রীর রাজা। কিন্তু ধরে রাখা গেল না তাকে। তার মৃত্যুঞ্জয় আত্মা প্রাণের খাঁচা থেকে উড়ে পালাল। জেলে হল কলেরা। বিরশা মারা গেল বৃটিশরাজের দণ্ড না নিয়েই। তার অনুগামীদের বিচার হয়েছিল, কলিকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীলে এসেছিল, যথাযোগ্য দণ্ডাদেশও হয়েছিল।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক দিক থেকে বিরশা মুণ্ডার জীবন কাহিনীতে এক মিশ্রিত চেতনারই প্রকাশ পায় যেখানে গণ্ডীবদ্ধ দেশাত্মবোধের সঙ্গে মিলেছে আধ্যাত্মিক বিস্ময়, হিন্দু খৃস্টান ও প্রাচীন মুণ্ডা সংস্কৃতির এক বিচিত্র প্রকাশ, ভাবোন্মদনা, ও নিজের ক্ষুদ্রসমাজ প্রতিষ্ঠার একটা আগ্রহ।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে, মুণ্ডাদের ঐতিহ্যে দেশাত্মবোধ (আজকালকার ইউরোপীয় অর্থে নয়) বা যেখানে আছি, যে ধরিত্রী আহার জোগায় তার প্রতি মমতার সঙ্গে মিশেছিল হিন্দু পৌরাণিক যুগের স্মৃতি। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে পালিয়ে এসেছিল দুর্ধর্ষ পুণ্ডরীক নাগ মানুষের বেশ ধারণ করে। কাশীতে এসে সে এক ব্রাহ্মণ কন্যার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে পুরী জগন্নাথ দর্শনে চলল। নববিবাহিতা কামিনী লক্ষ্য করে যে, তার স্বামীর জিহ্বা সূচীমুখ। প্রশ্ন করে সে—কেন এটা ঘটল। উত্তর এড়িয়ে যায় নাগরাজ। ফেরবার পথে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে প্রসব-ব্যথা এল নারীর। পুনরায় সে প্রশ্ন করে তার জিহ্বার কথা—তখন বলে ফেলে পুণ্ডরীক, তার প্রকৃত ইতিহাস এবং জানিয়ে দেয় যে, এই গোপন তথ্য বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনুষ্যদে অন্তর্হিত হবে। পুত্র প্রসব করলে নার তারপর চিতায় আরোহণ। এমন সময় এ শকলদ্বীপি ব্রাহ্মণ তার সূর্য দেবতার বিগ্রহকে নবজাতকের পাশে রে পুষ্করিণীতে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গিছল ফিরে এসে সে তার বিগ্রহকে ওঠাতে পা না, এবং লক্ষ্য করে যে, এক বৃহৎ সপ তার ফণা বিস্তার করে শিশুটিকে রক্ষ করছে। সর্প বললে সে নাগরাজ পুণ্ডরী এবং তার পুত্রই এই রাজ্যের অধীশ্বর হ নাম হবে তার ফণিমুকুট রায়। ব্রাহ্মণ মু সর্দার মাদ্রাকে ডেকে তাকেই নবজাতক ভার দেন এবং সে মুণ্ডাদের সঙ্গেই এ বাড়ে, পরে তাকেই তারা রাজা করে। এ নাগবংশী রাজারাই ছোটনাগপুরের রাজা মুসলমান যুগে মুঘলদের সময়ে আকবর শাহের রাজত্বকালে, রাজা মানসিংহই প্রথ রোটাস থেকে পালামৌ গিয়ে ছোটনাগপু ও ঝাড়খণ্ডকে সামন্ত রাজ্যে পারণ করেন। আকবর-নামা ও তুজুক-ই জাহাঙ্গরীতে এর বিবরণ আছে। কি দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরের সঙ্গে এই রাজা-রাজড়ার যে সম্পর্কই থাক না কে মূল আদিবাসীদের গ্রামীণ সভ্যতা পুরকালের যৌথ নিয়মেই চলত, চাষবাস সেই নিয়মে। কিন্তু ছোটনাগপুরের বাই থেকে আগত জায়গীরদার ও ঠিকাদার ক্রমশঃই এই আদিম আরণ্য সমাজকে হটি দিয়ে নিজেদের ভোগদখল কায়েমী কর চেয়েছিল। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় তাঁর বিখ মুণ্ডাদের ইতিবৃত্তে ১৬৭৬ খৃঃ অ একটি পাট্টা দলিলের খবর দিয়েছে শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদারের কাছে জে তৎকালীন বাংলা সরকার শ্রীযুক্ত হালদার ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর পাঠিয়েছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Report of the Land Reven Administration of the Low Provinces for 1897-98.
2. Ditto 1898-99.
3. S. C. Roy — Munda and the country Calcutta 1912.
4. Journal of Bihar and Oris Research Society 1931, Vo XVII Patna.
5. Judgment in Criminal Ap peals no 184 and 462 of 19 — Calcutta High Court.
6. Surendra Prasad Sinha - Birsa Bhagwan.
7. K. K. Dutta — History o Freedom Movement of Biha Vol. I Patna 1957.
8. Satchidananda — Cultur Change in Tribal Bihar Nunda & Oraon Calcutta 1963.
9. Grierson — Linguistic Survey of India Vol. IV.
10. Bradley Bist — Chotanagpur.

এ ছাড়া বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল প্রসিডিংস ও স্টেটসম্যান ইংলিশম্যান প্রভৃতির Press cuttings.

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সংগে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০·০০	টাকা	২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০·০০	টাকা	১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫·০০	টাকা	৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

ষষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 18th November, 1966 শুক্রবার, ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

চিঠিপত্র

ডাল হ্রদের ইতিকথা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা নভেম্বর অমৃতে প্রকাশিত শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের লিখিত "ডাল হ্রদের ইতিকথা" মনোযোগ সহকারে পড়লাম। প্রবন্ধটির জন্য লেখককে অশেষ ধন্যবাদ। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারী মানুষের পক্ষে নানা স্থান ভ্রমণ করে সব দেশের সব কিছু জানা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বিভিন্ন দেশের বিবরণ পড়েই সে অভাব মেটাতে হয়। অনেক সময় মনে হয় চারিদিকের চাপে হাসি আর আনন্দ আমাদের জীবন থেকে যেন বিদায় নিয়েছে। ডাল হ্রদের এই ইতিকথা পড়তে পড়তে ক্ষণিকের জন্য মনটা যেন সবকিছু থেকে মুক্তি পেয়ে কাশ্মীরের সেই চেরী আর আঙুর, আপেলের সবুজ বনে ঘুরে ফেরে। ডাল হ্রদে রাশি রাশি ফুলে ভরা শিকারায় চড়ে ঋতুরাজ বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে জীবনটা মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পপলার গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে পাহাড়ে তুষারের ঝড় দেখতে চায়। এত অফুরন্ত আনন্দ আর গানের উৎস ছড়ান আছে কাশ্মীরের হ্রদে, উপত্যকায়! মনে হয় ভূস্বর্গের পথে পথে নানা রঙের বৈচিত্র্য সমারোহ দেখে গান গেয়ে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দিন কেটে যাক।

ডাল হ্রদের নীল জলে মিশে থাকা বিগতদিনের এত ছোটখাট ইতিহাস বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে-গুলিকে আমাদের সামনে পর পর তুলে ধরার জন্য লেখকের চেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

গোলাম রসুল বিশ্বাস,
২৪ পরগণা।

বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত পত্রিকার সাতাশ সংখ্যায় সাংবাদিক পরিবেশিত 'বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে' আলোচনাটি পড়ে একবার ভাবতে বসলাম আমরা কোন্ দেশে বাস করছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তকমা এঁটে আমরা যখন দেশ-বিদেশ তোলপাড় করে তুলছি তখন আমাদের ঘরের কোণেই যে এত অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে তা ভাববার অবকাশ পাইনি। মনে করেছিলাম নিয়ন আলোর রোশনাই এবং কলেজ ও স্কুল বোধহয় সব অন্ধকার ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র তা নয়। বরং বাস্তব থেকে আমরা এর বিপরীত অভিজ্ঞতাই লাভ করি। শুনলে আমার মত অনেকেই অবাক হবেন যে, এদেশে আজও শতকরা সত্তরজনের বেশি লোক অক্ষরজ্ঞানরহিত—অর্থাৎ লিখতে পড়তে জানেন না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে নাম সই করার প্রশ্ন তো উঠতেই পারে না। কারণ আমাদের দেশে নাম সই করাটাই হচ্ছে শিক্ষিতের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার উপকরণ। অন্য বিদ্যার প্রয়োজন হয় না এবং এজন্য বেশি লেখাপড়া জানা বা কণ্টস্বীকারেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তাও সম্ভব হচ্ছে না। দেশের সমগ্র জনসমষ্টির মাত্র দশ লক্ষ লোক শিক্ষিত অর্থাৎ স্বাক্ষরজ্ঞানযুক্ত। বাকী সব ভারতীয় যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অথচ তারা আমাদেরই আত্মার আত্মীয় এবং আমাদের সকলের মিলিত পরিচয়েই আমরা ভারতবাসী।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে অনেক রূপান্তর ঘটেছে। দেশের চেহারায় নিত্য পরিবর্তনের প্রলেপ পড়ছে। কিন্তু এইসব তিমিরবাসীর সংখ্যা কমছে না। দেশের বৃহৎ কর্মযজ্ঞের তাঁরা কোন খোঁজখবরই রাখেন না। এর চেয়ে লজ্জার ও গ্লানির কথা আর কি হতে পারে।

কলকাতা এককালে আমাদের গর্বের সামগ্রী ছিল। আজও এই শহর নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। যদিও শহর হিসেবে কলকাতা পূর্বের মর্যাদা হারিয়ে বসে আছে এবং উদ্ধারের কোন চেষ্টাও করছে না। কিন্তু সংস্কৃতি এবং আচার-সভ্যতায় সমুজ্জ্বল এই মহানগরীর শিক্ষার চিত্র বড়ই দারিদ্র্যপীড়িত। এখানে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এসব কথা শুনলে সহজে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এটা নির্মম সত্য এবং বিশ্বাস না করেও উপায় নেই।

নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করে এবার আমরা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে পড়েছি। কিন্তু অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি কিছুই হয়নি। শিক্ষা-অশিক্ষার তুলনামূলক বিচার করে একথা সবাই বলবেন। যাদের সমন্বয়ে আমরা নতুন দেশ গড়ে তুলছি এবং যারা এই অগ্রগতির অংশীদার তাদের অন্ধকারে রেখে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন একেবারেই নিরর্থক। দেশের যথার্থ অগ্রগতি হবে তখনই যখন আপামর জনসাধারণ অগ্রগতির অর্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। আর এজন্য প্রয়োজন তাদের কাছে শিক্ষার আলোক পৌঁছে দেওয়া। শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত হলেই এইসব মানুষ দেশগঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠবেন। একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

বিনীত
অমলেন্দু রায়,
নিউদিল্লী।

ইস্পাতের নামে রক্তপাত

সবিনয় নিবেদন,

অধিকাংশ সময়েই অমৃত পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত সুচিন্তিত মতামত আমাদের চিন্তাভাবনাকে যথাযথ প্রতিফলিত করে। এজন্য অধিকাংশ সময়েই এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। এই ধৈর্য এবং অপেক্ষা অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে গত ১১ নভেম্বর তারিখের 'ইস্পাতের নামে রক্তপাত' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে।

সারা দেশটা জুড়ে আজ এক অশুভ বুদ্ধি কাজ করে চলেছে। আমরা যে এক বৃহৎ দেশের অধিবাসী সেকথাটা সবাই ভুলতে বসেছে। কেউ সীমানার অধিকার নিয়ে আবার কেউ অন্য কিছু নিয়ে মাতামাতি-দাপাদাপি শুরু করেছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকটা কারো মাথায় আসছে না। আর এলেও সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য সেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি হাজারো ঝামেলার মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ইস্পাত কারখানা আর একটা ছোটখাট দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে ইন্ধন জোগালেন সবাই। রেলস্টেশন পুড়লো এবং আরো অনেক জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হলো। সবচেয়ে বড় কথা যে, কয়েকটি তাজা প্রাণ এই আন্দোলনকে রুধিরাক্ত করলো। একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে কোন বিশেষ রাজ্যের দাবী নিয়ে এই অনাসৃষ্টির কথা অকল্পনীয় এবং অচিন্তনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটা সম্ভব হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের নেতৃবৃন্দ কোনরকম নিবৃত্তির পথ বাৎলে দিতে পারেননি। অথচ আন্দোলন থামার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হল যে, পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের টাকা সরকারের নেই এবং ভবিষ্যতে অন্ধ্রের কথা বিবেচনা করা হবে। একথাটা বলতে এত দেরী হওয়ার কি থাকতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অথচ যে জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হলো তা আমাদেরই পূরণ করতে হবে এবং যে তরুণ প্রাণগুলি নষ্ট হলো তা আর কোনদিনই ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই প্রয়োজন পূর্বাহ্নেই অবস্থার মোকাবিলা করার। এক্ষেত্রে আপনাদের সম্পাদকীয় যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে।

বিনীত
তরুণ চক্রবর্তী
কলকাতা-২৬

সম্পাদকীয়

পরমাণু অস্ত্র-ভীতির বিরুদ্ধে

ডঃ ওপেন হাইমার পরমাণুবিজ্ঞানের একটি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন "সহস্র সূর্যের চেয়ে দীপ্যমান"। পরমাণু-বিভাজনের পর মানুষের হাতে এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা এসেছে। এই ক্ষমতাকে শান্তির কাজে লাগাবারই কথা। কিন্তু আদর্শের বিরোধ, স্বার্থের বিরোধ যতদিন থাকবে ততদিন এই মহাশক্তির চাবিকাঠি কেউ হাতছাড়া করতে চাইবে না। যা শান্তির মহাবল, তাই অন্যদিকে মহাধ্বংসের প্রহরণ। সুতরাং সহস্র সূর্যের চেয়ে দীপ্যমান এই অনন্ত শক্তির জন্য আমরা ভাবিত হয়ে উঠেছি।

শোনা যায়, হিরোশিমার ওপর প্রথম পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করার পর সেই বিস্ফোরণ থেকে উত্থিত আকাশ-ছোঁওয়া ভয়াল ছত্রাকার ধূম-রাশি দেখে মার্কিন পাইলট আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিল, 'হা ঈশ্বর, এ আমি কী করলুম!' সেটা ১৯৪৫ সালের কথা। বোমাবর্ষণকারী পাইলট তখনও জানত না কী ভয়ঙ্কর বোমা তার হাত দিয়ে সেদিন ফেলা হয়েছিল জঙ্গী জাপানকে শায়েস্তা করার জন্য। একই আঘাত তার দুদিন পরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল নাগাসাকিকে। যুদ্ধ সেদিন থেমেছিল। আর উপায় ছিল না জাপানের পক্ষে যুদ্ধ চালাবার। কারণ, প্রচলিত অস্ত্র এই ব্রহ্মাস্ত্রের কাছে কিছুই নয়। এর নাম পরমাণু বোমা।

তারপর কুড়ি-একুশ বছর কেটে গেছে। যে-অস্ত্র ছিল একমাত্র আমেরিকার করায়ত্ত, সেই মন্ত্রগুপ্তি আজ পাঁচটি দেশের করতলগত। এই দুই দশকে এই মারণাস্ত্রের এত মারণ-শক্তি বেড়েছে যে, এদের তুলনায় হিরোশিমার বুক-ফাটানো বোমা নিতান্তই খোকা-এ্যাটম বোমা। তাই দুশ্চিন্তা বাড়ছে তাদের যাদের হাতে বোমা নেই। যাদের হাতে আছে তারাও নিরুদ্বিগ্ন নয়। তাই চলছে সমানে মারণাস্ত্রের এক দুরন্ত, দুর্নিবার প্রতিযোগিতা। সবাই চাইছে অর্জুনের মতো সর্বোত্তম অস্ত্রের অধিকারী হতে। যাতে প্রতিপক্ষ কর্ণ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারে। কিন্তু তার পরিণতি কি, ভারতবর্ষের লোক তা জানে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সর্বনাশা উপসংহারের কাহিনী থেকে।

স্বভাবতই এই প্রতিযোগিতা যত বাড়ছে এবং আমাদের ঘরের কাছে যত এই ভয়ংকর বোমা ফাটানো হচ্ছে ততই ভারতের ওপর চাপ আসছে এই অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। আমাদের পরমাণুনীতি সর্বাংশে শান্তির জন্য উৎসর্গীকৃত। কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি আমাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করবে কিনা, তা কেউ বলতে পারে না। কারণ, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এমনও হতে পারে যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোনোদিন পরমাণু-নীতি পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। তার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি করে রাখাই বাস্তবসম্মত নীতি হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে। এই অস্ত্রের প্রসার রোধ এবং মজুত অস্ত্র ধ্বংস করার জন্য ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরে দাবী জানিয়ে এসেছে। কোনো ফল হয়নি। অস্ত্রধারী রাষ্ট্রগুলি আজ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। কিন্তু পৃথিবীর জনমত ক্রমশঃ এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে গত সপ্তাহে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে পরমাণুঅস্ত্রধারী রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানিয়েছে অ-পারমাণবিক রাষ্ট্রসমূহকে এই মর্মে আশ্বাস দিতে যে তারা তাদের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না এবং তা ব্যবহারের হুমকিও দেবে না। অপর একটি প্রস্তাবে আগামী বৎসর অ-পারমাণবিক রাষ্ট্রসমূহের একটি সম্মেলন আহ্বানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সম্মেলন পরমাণু-অস্ত্র প্রসার রোধ এবং অ-পারমাণবিক রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তার বিষয় আলোচনা করবে। এই প্রস্তাবের নৈতিক মূল্য যতই থাক, এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ জাগবে স্বাভাবিকভাবেই। কারণ, পরমাণুঅস্ত্রধারী ফ্রান্স এই প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত ছিল। পরমাণু-অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেবে না, এই শর্তের প্রতি আপত্তি ছিল আমেরিকার। তা ছাড়া নতুন পরমাণু-অস্ত্রধারী চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য নয়, সুতরাং তার সম্মতির কোনো প্রশ্নই এতে নেই। সেজন্যই এই প্রস্তাবের দ্বারা অ-পারমাণবিক রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা কতখানি বাড়বে তা বিচার্য।

মোট কথা, বর্তমান দশকের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রনির্মাণ নিষিদ্ধকরণ ও মজুত বোমা ধ্বংসের জন্য মতৈক্য না হলে পৃথিবীকে সর্বনাশা ধ্বংসের আতঙ্ক মাথায় নিয়ে বাস করতে হবে। এখনও সমানে চলেছে এই ভয়ংকর অস্ত্রের পরীক্ষা। মস্কো চুক্তির পর রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেন বায়ুমণ্ডলে ও সমুদ্রে এই অস্ত্রপরীক্ষা থেকে বিরত আছে। তাতে তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানুষ রক্ষা পাবে ঠিকই। কিন্তু ভূগর্ভে এখনও তারা এই অস্ত্রপরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ফ্রান্স ও চীন, যারা মস্কো চুক্তির ধার ধারে না, তারা আবহমণ্ডল বিষাক্ত করে তুলছে একটার পর একটা মারণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে। তাদের নিবৃত্ত করার মতো কোনো শক্তি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেই। ইতিমধ্যে যদি আরও দু' একটি রাষ্ট্র এই অস্ত্রনির্মাণে হাত দেয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এক উন্মত্ত প্রতিযোগিতার হাত থেকে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে আরও শক্তহাতে কাজ করতে হবে। বৃহৎ রাষ্ট্রের খেয়াল-খুশির ওপর সভ্যতার ভবিষ্যৎকে অর্পণ করে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। যাতে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয় তার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের শান্তিকামী মানুষকে আজ সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। কারণ, হিরোশিমা-নাগাসাকির পুনরাবৃত্তি ব্যাপক আকারে ঘটলে পূর্ব-পশ্চিমের কোনো দেশই আর রক্ষা পাবে না। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান।

বিচিত্র চরিত্র

কুলদা ঠাকুরদা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
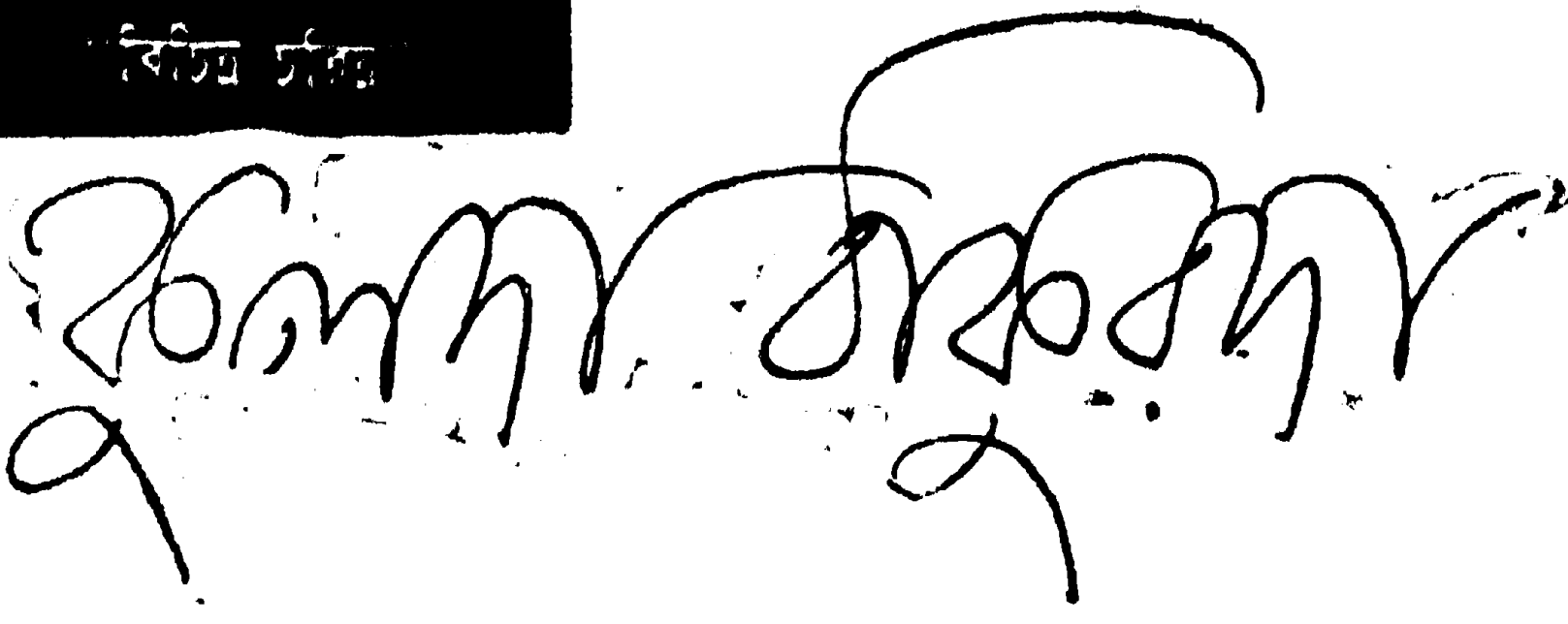
(২)

কুলদা ঠাকুর্দা সে-আমলের নিয়মানুযায়ী উৎসবে-ব্যসনে থেকে শোকে-সন্তাপে, ক্রিয়া-কর্মে, গৃহ-কলহে, বিবাহে, শ্রাদ্ধবাসরে সর্বত্র থাকতেন এবং সবার পুরোভাগে থাকতেন।

তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি ছিলেন ছোট ভাই। বড় ভাই ছিলেন চন্দ্রপ্রসাদ সরকার। বড় ভাই ছিলেন তান্ত্রিক। সে-আমলের ঘোরতর তান্ত্রিক। দুই ভাইয়ে দীক্ষায় যেমন বিপরীত, স্বভাবও ছিল ঠিক তাই, একেবারে বিপরীত। বড় ভাই ছিলেন প্রায় নীরব মানুষ। কুলদা ঠাকুর্দা ছিলেন প্রগলভ। কথাবার্তা বেশীই বলতেন। এবং সে-বলা যেন সকলের কাছেই বেশ একটু বিস্ময়কর এবং কটু ঠেকত। আগে বলেছি, তাঁর কথাবার্তার প্রতি, তাঁর জীবনের ভঙ্গিটির প্রতি নবাজনদের এবং তাঁদের থেকে অবস্থাপন্নদের মনে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ পোষণ করতেন তাঁরা। একটু বাঁকা হাসি হাসতেন এবং বাঁকা উত্তর দিতেন, যথাসাধ্য বাক্যবাণগুলি শাণিত করে নিক্ষেপ করতেন। তার কারণ হিসেবে গতবারে নূতন-পুরাতন এবং অবস্থা ভালোমন্দের কথাটাকেই আমি বড়ো স্থান দিয়েছি, ওইটেই বড়ো বটে, কিন্তু তা ছাড়াও কুলদা ঠাকুর্দার কথাবার্তার বিচিত্র বিস্ময়কর ঢঙটাও অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। বলেছি তো নাকটা যেন চড়া ছিল। স্বাদে-গন্ধে একটু ধরা-ধরা ঠেকত।

সেকালে দেশে, বিশেষ করে পল্লীগ্রামে সামাজিকতার স্থান ছিল খুব উঁচুতে। এবং কয়েকটা রীতি-পদ্ধতির উপর জোরটা পড়ত বেশী। লোকের বাড়ীতে বিপদ, বিশেষ করে মৃত্যু ঘটলে তার বাড়ী যাওয়াটা ছিল সব-থেকে বড় কর্তব্য; ওখানে বিনা নিমন্ত্রণে যেতে হত। এবং সে-যাওয়ার মধ্যে মানুষ-বিশেষে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এমন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত যে, সেই কথাটা অঞ্চলের কথা-বার্তার ইতিহাস বা ইতিকথার মধ্যে একটি চিরকালের স্থায়িত্বের মত স্থায়িত্ব পেত। যেমন আমাদের গ্রামে লক্ষপতি ধনী স্বনামধন্য এবং স্বপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত কীর্তিমান যাদবলালবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাবামাত্র কীর্ণাহারের জমিদারেরা তিন ভাই হাতীতে চড়ে এসে এক মাইল দূরে হাতী থেকে নেমে খালি পায়ে হেঁটে এসেছিলেন সমবেদনা জানাতে। এ-কথাটা বা ঘটনাটা ষাট বছর আগের ঘটনা, আমার নিজের বয়স তখন আট (আট পার হয়ে নয়ে পড়েছি) কিন্তু সে-কথা আজও আমার মনে আছে।

কুলদা ঠাকুর্দার এই গুণটি ও'দের থেকে পরিমাণে কম ছিল না, সমানই ছিল কিন্তু তাঁর প্রগলভতা দোষে ওই গুণটি ম্লান হয়ে যেত। যেমন, আমার জ্যাঠামশাই মারা গেলেন। কৃপণ মানুষ ছিলেন তিনি, অনেক অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তিনি। একালে লক্ষ টাকার কোন দাম নেই কিন্তু সেকালে অর্থাৎ ১৯১২।১৩ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে লক্ষ টাকার দাম ছিল অনেক। সেকালের লোকে বলত—লাখ টাকার গরম অনেক। এবং লাখ টাকার দাঁত ডোরা-বাঘের দাঁতের থেকে শক্ত এবং ধারালো।

কুলদা ঠাকুর্দা এলেন। গ্রামটি ছোট-মাঝারি জমিদারে পরিপূর্ণ। বড় জমিদার বা ধনীর ঘর একঘর। ওই যাদবলালবাবুর ঘর। সকলে এসেছেন। সব যাবে এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গাতীর উদ্ধারণপুরের ঘাট। জ্যাঠামশায়ের কাছারী-বাড়ীর প্রশস্ত দাওয়ার উপর বসে আছেন সকলে, শব বের করে নিয়ে এসে বাঁশের মঞ্চের উপর চাপিয়েছে। কুলদাবাবু এসে ঝুঁকে পড়লেন জ্যাঠামশায়ের শবের মুখের উপর। জ্যাঠামশায় বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কিন্তু সেটা ধর্তব্য ছিল না। ঝুঁকে পড়ে ডাকতে শুরু করলেন—কালিদাস! কালিদাস! কালিদাস! চললে? ধন-জন লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছেড়ে চললে?—অঃ। ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরিয়া! অঃ। এরপর সরে এসে বক্তৃতা শুরু করলেন—অঃ, কতদিন কালিদাসকে বলেছি—কালিদাস, অর্থ সঞ্চয় করে করবে কি? এই তো! এই তো ফল! বলেছি কালিদাস একটা কীর্তি করে যাও। তা—হুঁঃ! লক্ষ টাকা যাবে—হুঁঃ!

বলতে চাচ্ছিলেন—যাবে শৌণ্ডিকের হাতে। কারণ আমার জাঠতুতো দাদা (একমাত্র সন্তান) অপরিমিত মদ্যপান করতেন। কথাটা কুলদা ঠাকুর্দা মিথ্যা বলেননি। অনুমান তাঁর নির্ভুল হয়েছিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর আট মাসের মধ্যেই আমার জাঠতুতো দাদাটি মদ্যপানের ফলে ম্যানেনজাইটিস হয়ে মারা যান। কিন্তু সেদিন কথাটা সকলের কাছে কটু ঠেকেছিল। এবং দু-একটি প্রচ্ছন্ন বাদ-প্রতিবাদের পরেই কুলদা ঠাকুর্দা কথাটাকে ঢাকের বাদ্যের মত কর্কশ এবং উচ্চ করে ফেলেছিলেন। উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন—'মানি না হে! কি বলে, ওই শাস্ত্রবাক্যটিকে আমি মানি না—মান্য করি না; "মা ব্রূয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম" কথাটি আমি মানি না।" সংসারে একটা কথা আছে, হয়তো পুত নয়তো ভূত। তা ভূতের হাতে লক্ষ মুদ্রা পড়ল বলে ভদ্রতার খাতিরে বা শাস্ত্রের ওই বাক্যটির নজীরে আমি বাঃ বাঃ বেশ হল, খাসা হল বলতে পারব না। ন দেবায় ন ধর্মায় ন বিপ্রায় চ! তা থেকে একটা কাজ কর—যেন শ্রাদ্ধটা কালিদাসের বড় করে ভাল করে কর। দানসাগর হলে ভাল হয়, না হলে আটটা কি দশটা ষোড়শ করে বৃষোৎসর্গ—মানে দানসাগর না হলে নিদেন দান-দীঘি একটা কর। বুঝেচ।'

দানসাগর ক্রিয়াই হয়েছিল। এবং তার ফর্দ করবার সময় কুলদা ঠাকুর্দাই মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন। শুধু ফর্দ করার ব্যাপারেই নয়, গোটা শ্রাদ্ধটা পরিচালনার কাজেও তিনি অন্যতম মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন। আগত সমাগতদের স্বাগত জানানোর ভার ছিল তাঁর, পণ্ডিত-অভ্যর্থনা, পণ্ডিতসভা, পণ্ডিত-বিদায় প্রভৃতির দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। একজন বড় পণ্ডিতকে তিরস্কার করতেও শুনেছিলাম। তিনি তাঁর পুত্র ও শিষ্যের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেছিলেন বলে কুলদা ঠাকুর্দা তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে একটু তিরস্কারের সুর মিশিয়ে বলেছিলেন—কি রকম পণ্ডিত আপনি মশাই? শাস্ত্র অধ্যয়নই করেছেন, ধাতস্থ করেননি, রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত করে নেননি। শাস্ত্রে আছে পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম—আপনি পুত্র এবং শিষ্যের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করছেন? রাধে! রাধে! রাধে! গোবিন্দ হে! লজ্জা আপনার হচ্ছে না—আমরা যে মরে যাচ্ছি। ছি-ছি-ছি! (এই নিয়ে আমার একটি গল্প আছে—পিতাপুত্র।)

কুলদা ঠাকুর্দা খাবার সময়েই সব সময় থেকে দীপ্ত এবং বিশিষ্ট হয়ে উঠতেন। প্রায় প্রতিটি নিমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতেন। আগেই বলেছি সামাজিকতার ক্ষেত্রে এমন নিষ্ঠাবান মানুষ সে-আমলেও বড়একটা দেখা যেত না। যেখানে সমাজপতি বা সামাজিক ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন তেমন ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ কখনও অনুপস্থিত দেখেনি। প্রতি বাড়ী—সে ধনীর বাড়ীই হোক বা দরিদ্রের বাড়ীই হোক তিনি তাঁর সমবয়সী খাইয়ে মানুষ যোগীন্দ্র সরকারকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হতেন, বাহির দরজা থেকে হাঁকতে হাঁকতে আসতেন—কই, কই হে পাতুবাবু কই হে! বা লাতুবাবু কই হে! অথবা—কইরে তিনকড়ি কই!

তারপর কিছুক্ষণ তম্বির করতেন—পাতা আন হে। জল আন। বসিয়ে দাও, ব্রাহ্মণদের বসিয়ে দাও। লবণ কই হে? ছি-ছি কোন বন্দোবস্ত নাই! গোবিন্দ বল! ওঃ এযে লেবু। ভাল ভাল ভাল, কিন্তু এ-লেবু কেটেছে কিভাবে হে? লেবু কাটতে জান না? এ-কালের মেয়েরা সব হল কি? হাঁড়ি ধরতে পারে না, ব্যামো ব্যাধি লেগেই আছে—এই সাধারণ কাজ লেবু কাটা তাও

জানে না! রাধে মাধব হে। তা বেশ হয়েছে দিয়ে দাও। ওই দিয়ে দাও। আর দেখ আমাদের দুটো পাতা কর। বুঝেছ, ছেলেদের মধ্যে নয়। ছোকরাদের মধ্যেও ঠিক হবে না। আলাদা, আলাদা করে। হ্যাঁ ওরা তো গণ্ডূষও করবে না, ইষ্ট স্মরণ দূরের কথা। আলাদা করে। বুঝেছ না, আসন পেতে, কাঁসার গ্লাসে জল দেবে। হ্যাঁ শোন। যেন গ্লাসে গন্ধ-টন্ধ না থাকে। ধুয়ে নিয়ো ভাল করে।

খেতে বসে বলতেন—বাঃ, ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, এই হয়েছে। ওই সব বালখিল্যদের সঙ্গে কলকোলাহলের মধ্যে কি আহার হয়? আহার এবং বিহার এই দুটি হল জগতের পরম উপভোগ্য ব্যাপার। ওখানে ব্যাঘাত হলে সংগীতের তালভঙ্গে যেমন বিশ্রী কান্ড ঘটে, অপরাধ হয়—তাই হয়।

কি? অন্ন?—তা গরম আছ তো হে? তাপ না থাকলে ভাত আবার গন্না মেরে ফিরে চাল হতে চান—মানে বুড়োতে ছোকরা সাজলে যেমন বিশ্রী হয়, তেমনি বিশ্রী হয়। রসনা বরদাস্ত করে না, পাকস্থলীও না। না রস, না পুষ্টি। হ্যাঁ, গরম আছে বলছ, হ্যাঁ আছে, তবে আর একটু থাকলে ভাল হত। দেখ, বাড়ীতে জামাই-কুটুম্ব এসেছে তো! তাদের জন্যে আলাদা সুগন্ধি চাল রান্না হয়নি? হয়ে থাকে তো, তাই আন দেখি। আমি ওই চালে অভ্যস্ত। হ্যাঁ। নিয়ে যাও। এগুলি নিয়ে যাও। আর দেখ গব্যঘৃত, গব্যঘৃত থাকলে নিয়ে এস। ও তোমার গণ্ডূষ পরিমাণে নয় হে। অন্তত কাঁচ ছেলের ঝিনুকের এক ঝিনুক। হ্যাঁ। তার সঙ্গে আরও কটুকরো লেবু। আরে এ করলে কি? বলি, ওহে ছোকরা, তোমার কি কোন হুঁস আক্কেলই নেই হে? রাধে-রাধে-রাধে। গোবিন্দ হে! জিজ্ঞাসা করছ কেন? বলি তোমার নিবাস কি ইংলণ্ডে অথবা মক্কায়? ক' টুকরো দিয়েছ? গোনো। হ্যাঁ। এক, এই দুই, এই তিন। এরপরও হাবার মত তাকিয়ে আছ? বুঝতে পারছ না কি হল?

এবার গলা চড়িয়ে ডান হাতখানা লেবু পরিবেশকের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলতেন—বলি আমি কি এ-বাড়ীর শত্রু? তিনটে দিলে শত্রু হয় না? জান না? জানতে হয়। জেনো। অন্তত পরিবেশনের আগে জেনো।

—বাঃ বাঃ! চমৎকার গন্ধ তো ঘৃতের। চমৎকার গন্ধ। না, আর চাই নে। না। আরও দেবে? তুলেছ? তা দাও। অমৃতে অরুচি কার বল? না কি বল যোগী।

হা-হা শব্দে হেসে উঠতেন।

—কি এনেছ? ডাল? ছোলার? তা বেশ। তা ওই তলা থেকে তোল। হ্যাঁ, তলা থেকে। বেশ পুরু দেখে। হ্যাঁ। দাও, আরও এক ডাবুক (একরকম চামচ) দাও। দুটো পাত্র আনতে পার না হে? তাহলে আমাদের দুজনকে ডাল দিয়ে যেতে। আমি কাঁচা কড়াইয়ের ডাল খাইনে। বুঝেছ। গরমের সময় খাই। অন্য সময়ে খাইনে। না। আন দুটো পাত্র আন।

—শোন-শোন-শোন। এত ছুটো না। অশ্বে আরোহণ করে এলে যে। বাঁধো ঘোড়াটা বাঁধো। শোন। এই মাছের কাঁটা-মুড়ো ডালে দিয়েছে তাই দেখে নিয়ে এসো। আরও শোন। এই মাছের মাথা, বুঝেছ, ঝোল বা কালিয়া থেকে বেছে মাছের মাথা, সামনের সেই তেলুক-তেলুক অংশটা—হ্যাঁ, পিছনের দিকটা ভেঙে রেখে দিয়ো; ওই সামনের দিকটা দেখে এনে দেবে আমাদের দুজনকে। আরও আছে। হ্যাঁ। দধি। মানে দই। দইয়ের উপরের সেই যে সর-সর অংশটা, যেটাকে 'থক্‌থকানি' বলে এইসব সাধারণ লোকে, সেই থক্‌থকানিটা চামচে দিয়ে আ-স্তে আ-স্তে তুলে নেবে এবং আস্তে আস্তে রাখবে দুটি পাত্রতে, আমাদের দুজনকে দিয়ে যাবে। বুঝেছ! হ্যাঁ।

এরপর চলত সমালোচনা।—আঃ, এমন বিচি-বেগুনে কোথা থেকে কিনলে হে? কত? কত সস্তা হয়েছে? না, পরে

কিনেছে? ছি-ছি-ছি, এই তো আমাকে বললে বাকুল থেকে আনিয়ে দিতাম। সে-বেগুন একেবারে মাখনের মত। কপি কে রেঁধেছ? ওঃ খুদিরাম নিশ্চয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ। খুদিরাম খুদিরাম গন্ধ ছাড়ছে। আন, আন আর একটু আন। হ্যাঁ, মাছের কাঁটাশুদ্ধ বেছে এনো। আর এ কুমড়োর ছক্কাটা কে রান্না করেছে হে? আনাড়ি! একেবারে আনাড়ি। আর গৃহস্বামী কোথা হে? শোন শোন! এতই খরচ যখন করলে বাবা, তখন আর কিঞ্চিৎ তৈল খরচ করলে যে অতি উত্তম হত মানিক। বলি, পরামর্শ নিলে তো পারতে। একটা খরচ কমিয়ে তৈল-সংস্থান করা যেতো।

যাবার সময় উদ্গার তুলতে তুলতে যেতেন। যাবার সময় পান না থাকলেও চেয়ে নিয়ে যেতেন।

যে-মানুষ এমন প্রগলভ, যে-মানুষ এমনভাবে সর্বত্র নিজেকে প্রচার করে বেড়ান, সেই মানুষের আর একটা চেহারা আমার চোখের উপর ভাসছে। সন্ধ্যাকাশের শুক্রাচার্য যেমন ভোরের আকাশে অধিকতর দীপ্তি ও মাধুর্যে দপ্‌দপ্‌ করে প্রকাশমান থাকেন, তেমনিভাবেই আজ আমার এই বৃদ্ধ বয়সের মনের আকাশে অধিকতর দীপ্তিতে দীপ্যমান রয়েছে। এ যেন জীবনের এক মহাপ্রকাশ, সুমহৎ জীবন-সাধনা ভিন্ন এমন প্রকাশ হয় না।

ঘটনাটা বলি।

২৪।২৫ বা ২৬।২৭ সালের নবমী পুজোর দিন। লাভপুরের সরকারবাড়ীর দুর্গাপুজো অতিপ্রাচীন, অন্তত আড়াইশো তিনশো বছরের হবে। মুরশিদ কুলিখাঁর আমলের পুজো। সে-কথা প্রতিমা দেখলেই মানুষের মনে হবে। এই ধাঁচের প্রতিমা বাংলাদেশে সম্ভবত দু-চারখানি ছাড়া হয় না। তার কাঠামো থেকে সবকিছু। এমন পুরনো কালের দরজাজোড়া আছে, সেই দরজাও তার সাক্ষ্য দেবে।

এই সরকার বংশ প্রথম পাঁচভাবে—পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল। সে-আমলে বলত 'কোঁদা', পাঁচ 'কোঁদা'। বড় কোঁদা, মধ্যম কোঁদা, সেজ কোঁদা, ন কোঁদা, ছোট কোঁদা। নবমীর দিন প্রথম সাজার দেবোত্তরের বলির পর পাঁচ বাড়ীর পাঁচটি নিজস্ব বলি ছিল। সাজার বলিটির চরণ অর্থাৎ ঠ্যাঙ থেকে মুড়ি পর্যন্ত বৃত্তি হিসেবে বিলি হত। থাকত কেবল পাঁজরা এবং মেরু-দন্ডটা। তাও ভোগে রান্না হত, পূজক পুরোহিত, ছেত্তা, নাপিত, চৌকিদার, চাকর-বাকর, পূজাস্থানের পরিচারক প্রসাদ পেতেন। দু-চারজন ব্রাহ্মণ থাকত, তারা খেতো। সুতরাং পাঁচ সরকার বাড়ীর ভিতরে কিছু গিয়ে পৌঁছুতো না। সেইজন্য পাঁচ তরফ আপন আপন পাঁচটি বলি দিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতেন। এই বলির পর্যায়ও ছিল বড় থেকে ছোট পর্যন্ত একের পর এক। বাংলাদেশে পূজাস্থানে বলির পর্যায় একটা বড় অধিকার, ক্ষেত্রবিশেষে সম্মান। অথবা ভুল বললাম, সব ক্ষেত্রেই এটা একটা অধিকার ও সম্মান। ব্রাহ্মণের বলি শূদ্রের আগে; রাজার বলি প্রজার আগে; (তবে রাজা শূদ্র হলে সে-বলি তাঁর গুরুর নামে দিতে হয়); বড়জনের বলি ছোটজনের আগে। এবং এই বলির পর্যায়ের অধিকার নিয়ে যে বাংলাদেশে কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে, খুনখারাপী হয়ে গেছে, তা আজ ফৌজদারী আদালতের নথি খুঁজলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

যাক—। এই পাঁচ কোঁদার সেজ বা মেজ কোঁদা, ২৬।২৭ সালের সোত্তর-একাত্তর বৎসর পূর্বে অপুত্রক হয়ে একমাত্র দৌহিত্রে গিয়ে অর্শাল। দৌহিত্র মালিক হলেন দেবোত্তরের।

এই সূত্রে একটি জটিলতার উদ্ভব হল।

জটিলতাটি এই।—এই বংশের পুজোর যখন সৃষ্টি হয়, দেবোত্তর এস্টেটের যখন নিয়ম সৃষ্টি হয়, তখন এই স্থির হয়েছিল যে, এই যে পুজোর কোশা, এই কোশায় কাশ্যপগোত্রীয় সরকার বংশ ও গোষ্ঠী ছাড়া অপর কোন গোত্রীয়ের নামে এই পুজোর সংকল্প হবে না।

পুজো হয়, পুরোহিত পূজক পুজো করেন তাই আমরা দেখি। কিন্তু ভাবিনে—পুজো যখন যাঁর বাড়ী তিনি নিজে করলেন না, তখন পুজো তাঁর কেমন করে হবে বা তার ফলই বা তিনি কেমন করে পাবেন? কমলাকান্তের দপ্তরের প্রসন্ন গোয়ালিনীর গাইটার মালিকানা কার, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে যে উত্তর কমলাকান্ত দিয়েছিলেন, সত্য উত্তর প্রকৃতপক্ষে তাই। গাইয়ের দুধ যে খায়, গাই তার। পুজো যে করে, পুজোর ফল তার এটা আরও সহজ-ভাবে সত্য। কিন্তু পুজোর গোড়া থেকেই সংকল্পের একটি বিধি আছে। তাতে ওই গঙ্গাজলপূর্ণ কোশায় হরিতকী রেখে সেই হরিতকী ধরে সঙ্কল্প করা হয়—এই মাসে এই তিথিতে এই এই ব্যক্তির নামে সঙ্কল্প করছি যে, যথাবিহিত পদ্ধতিতে ও মন্ত্রে দুর্গা দেবীর অর্চনা করব।

এক্ষেত্রে নিয়ম ছিল, সরকার বংশের বাইরে দৌহিত্রে পর্যন্ত এই পুজোর ফল গিয়ে অর্শাবে না। এই নিয়মে সে সময়, অর্থাৎ যে সময় মেজ বা সেজ কোঁদা পুত্র-হীন হয়ে দৌহিত্রগত হল তখন সকলে মিলে প্রথম সাজার বলির পর প্রথম বলির পুণ্য, সম্মান এবং অধিকার দেওয়া হয়েছিল দৌহিত্রকে।

তাঁর বলিই ছিল দ্বিতীয় বলি। বা মানতের বলির মধ্যে প্রথম বলি।

বিচিত্র ঘটনা সংস্থান মধ্যে মধ্যে ঘটে—এক্ষেত্রেও তাই হল; ২৬।২৭ সালে ওই দৌহিত্র প্রবীণ বৃদ্ধ বয়সে মারা গেলেন এবং মারা গেলেন অপুত্রক অবস্থায়। সম্পত্তি পেলেন ওই বৃদ্ধের ভাগিনেয়। ভাগিনেয়েরও পুত্রসন্তান ছিল না, কন্যা ছিল, তিনি সম্পত্তির অর্ধেক দিয়েছিলেন নিজের ভাগিনেয়কে। ভাগিনেয় ভদ্রলোকটি শিক্ষিত মানুষ, গ্র্যাজুয়েট, সংসারে কৃতী-মানুষ, কয়লার ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ; নাটক রচনা করেছেন, রুচিবান ব্যক্তি। কিন্তু সংসারে পাত্রাধার তৈলের মত লাভপুরের পাত্রে গিয়ে লাভপুরের সেই বিষয়ী মানুষই হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ সরকার বংশেরই একজন শরীক ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই তাঁর ছিল না। ওরই মধ্যে আর সব কিছু তাঁর হারিয়ে গিয়েছিল।

ঝগড়া হল ওই প্রথম বলির অধিকার নিয়ে। কুলদা ঠাকুর্দা সরকার বংশের জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠজন হিসেবে সমস্ত কিছুর ভার নিয়ে বসে পুজো করাচ্ছিলেন। চন্ডী-মন্ডপের দাওয়ায় তাঁর সেই সাদা কম্বলখানি পেড়ে, সামনে ক্যাশবাক্স, পিছনে তাকিয়া নিয়ে বসেছিলেন, সোনার মত ঝকঝকে মাজা গড়গড়াটির মাথায় জ্বলন্ত কল্কে, শটকার নলের মুখে রুপোর মুখীটি তাঁর হাতে, তিনি মধ্যে মধ্যে টানছেন সেই নল। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

নবমীর বলি শেষ হয়ে গেছে। প্রথমটা সরকার বংশের সকলের বিবেচনায় এইটেই স্থির হয়েছিল যে, ওই দৌহিত্র যখন পুত্র-হীন অবস্থায় মারা গেছেন তখন ওই বলির অধিকার তাঁর সঙ্গেই গত হয়েছে। এখন তাঁর ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয়ের ভাগিনেয় বয়স অনুসারে বলির অধিকার পাবেন। অর্থাৎ যে যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ তেমনি তেমনি অগ্রাধিকার পাবেন। সেই অনুসারেই বলি হবার কথা, কিন্তু তা হয় নি, হতে পায় নি। বলির সময়েই ছোটখাট একটি দ্বৈরথ সমরের পর দৌহিত্রের ভাগিনেয়রা তাঁদের পাঁঠাই প্রথম বলি করিয়ে নিয়েছেন। বলি চুকে গেছে কিন্তু ঝগড়ার শেষ হয় নি, আগুন নেভে নি, তান্ডব থামে নি। সেই তান্ডব আরম্ভ হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি।

কুলদা ঠাকুর্দার তিন ছেলে। বড় ছেলে কৃতী কয়লার ব্যবসায়ী। কলকাতাতে তার আপিস, জুড়ি-গাড়ী, বেশ হাঁকডাকের মানুষ, দ্বিতীয়জন কাস্টমস আপিসের সিনিয়র ক্লার্ক। তৃতীয়জন যতীন কাকা। এবং কুলদা ঠাকুর্দার চার ভাইপো। তার মধ্যে এক-জন সেকালের আই বি ইন্সপেক্টর। এবং বাকী তিনজন শিক্ষা-দীক্ষায় চাকরী-বাকরীতে কৃতী না হলেও সাহসে এবং শক্তিতে দুর্ধর্ষ এবং দুর্দান্ত। তাঁরা কুলদা-ঠাকুর্দার ডাইনে-বাঁয়ে বসে আছেন। আর সামনে দাঁড়িয়ে দৌহিত্র বংশের বর্তমান মালিক ভাগিনেয়টি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে ইঙ্গিতে কুলদা ঠাকুর্দাকে লক্ষ্য করে গালা-গাল দিয়ে চলেছেন। সে গালাগাল কদর্য, সে গালাগাল ভালগার হয়ে উঠছে।

এই ভাগিনেয় ভদ্রলোক পরে ওই দিনই অনুশোচনা করে বলেছিলেন—There is a beast in me, সে যখন জেগে ওঠে তখন আমি অসহায় হয়ে পড়ি। আমার কোন হাত থাকে না। এ থেকেই অনুমান করা যাবে সে গালাগাল কতখানি অসহনীয়, কদর্য হয়ে উঠেছিল। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি, ঠাকুর্দার ছেলেদের মুখে অসহিষ্ণু-তার চঞ্চলতা এবং রক্তাভা। ভাইপোরা এত-খানি চঞ্চল না হলেও অবশ্যই চঞ্চল। কিন্তু কুলদা ঠাকুর্দা শান্ত অচঞ্চল, দৃষ্টি নত করে: ক্রমাগত গড়গড়ার নলে টান দিয়ে চলেছেন ফুরুৎ-ফুরুৎ-ফুরুৎ-ফুরুৎ! সে সহ্যের যেন সীমা নেই, তার গভীরতার তল

নেই, যাকে বলে নিবাত নিষ্কম্প তাই। আমি বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছি।

এমন সময় একটা অতিঅসহনীয় কদর্য গাল দিয়ে উঠলেন ভাগিনেয়টি। এবার ধৈর্য-চ্যুতি ঘটল ঠাকুর্দার বড় ছেলের। যিনি কলকাতায় ব্যবসা করেন তাঁর। তিনি ওই ভাগিনেয়কে বলে উঠলেন—খবরদার মুখ সামলে—

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দা নল ফেলে দিয়ে ফেটে পড়লেন, ফেটে পড়লেন নিজের ছেলের উপর; বড় ছেলের বয়স তখন পঞ্চাশ। তার মাথায় একটা চড় মেরে তাকে বাঁ হাতে টেনে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন—এই হারামজাদা; কাকে তুই কি বলছিস? অ্যাঁ? ও কে রে? ওকে জানিস না, ভুলে যাচ্ছিস? ও আমার 'ক' মায়ের ছেলে! ও আমাদের বুকের নিধি, মাথার মণি রে! ওরে ওরে হারামজাদা, ওকে বুকে নিলে ও যদি বুকে বিষ্ঠা ত্যাগই করে, তাহলে কি ওকে আমি ফেলে দেব রে? ওরে বুকের বিষ্ঠা মুছে ফেলে আদর করে ওর মুখে চুমু খেতে হবে। ভুলে যাচ্ছিস তুই?

●

এইখানেই ছেদ টেনে দিতাম। কিন্তু না। এখানে ছেদ টানা চলে না। কুলদা ঠাকুর্দার চরম পরিচয় আরও আছে। তাঁর পরিচয়ের পরিধি বিস্ময়কররূপে বিশাল। ওপরে যে ধৈর্য এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার প্রকাশের কথা বর্ণনা করেছি, তা একবারের একটা ঘটনা নয়। এমন ঘটনা বারবার ঘটেছে। আমি চোখে দেখেছি; তিনি এক ধনীর মাতৃবিয়োগে তাঁর বাড়ী গেছেন সমবেদনা জানাতে, আতিথ্য, ধর্মবোধ, সামাজিকতা লঙ্ঘন করে ধনীটি তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, ব্যঙ্গ করেছে, উপহাসে উপহসিত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি এতটুকু চঞ্চল হন নি; একটি হাসি মুখে টেনে স্থির নির্বাক হয়ে বসে থেকেছেন।

আমি একবার তাঁকে দাঁত বাঁধাতে বলেছিলাম, তিনি আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমি বুঝতে পারি নি, দাঁত বাঁধান তাঁর মত মানুষের জন্য নয়। তিনি বয়সের এবং প্রকৃতির ধর্মের সমস্ত কিছুকেই দান হিসেবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। কেবল চোখের জন্য বলতেন—ওইটে। ওই চশমাটা না নিয়ে হয় না, চলে না।

সে কথা যাক, শেষ কথা শেষের পরিচয় দিই। বয়স তখন তাঁর সত্তর পার হয়েছে বা সোত্তর। কিছুকাল থেকেই দেহ জীর্ণ হয়েছিল। দেশে তখন প্রবল ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়াতে তিনি ভুগেছেন, না হলে তিনি হয়তো আরও দশ বছর বাঁচতেন। হঠাৎ তিনি কি বুঝলেন বললেন, আর নয়, আমি যাব উদ্ধারণপুর, গঙ্গাতীরে বাসা বাঁধব। দিন সন্নিকট হয়েছে। গঙ্গা জলে অন্তর্জলী হয়ে দেহ রাখব।

ঠাকুর্দার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল অনেক পূর্বে। তাঁর সেবার ব্যবস্থা তিনি স্ত্রী থাকতে নিজের হাতে রেখেছিলেন। চাকর দিয়ে করিয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। মহলে-মহলে, বাইরে-বাইরে ঘুরতেন, বাড়ীতে থাকতে সেবা করতেন ছোট পুত্র-বধূ, যতীন কাকার স্ত্রী। অবশ্য যেটুকু সেবার প্রয়োজন হত, তার পরিমাণ খুব অল্প। শেষ যখন গঙ্গাতীরে যাবেন স্থির করলেন, তখনও তিনি উঠছেন, হাঁটছেন, তার সঙ্গে সময় বিশেষে হাসছেনও। তিন-বেলা ইষ্টকে ডাকতেন, সন্ধ্যাবেলা একটু ভাল করে ডাকতেন, গায়ক মানুষ গুন-গুন করে গান গেয়ে ডাকতেন। সেই অবস্থায় গরুর গাড়ীতে ভাইপো ভাইপো বউ, ছোট ছেলে, ছোট পুত্রবধূ, প্রভৃতিকে নিয়ে নিজে পাল্কীতে চেপে উদ্ধারণপুর গেলেন। বাসা করে থাকলেন। বড় ছেলে, মেজ ছেলে, কলকাতায় থাকতেন, তাদের আসবার জন্য পত্র দিলেন। বেশ সুস্থই ছিলেন। বরং গঙ্গাতীরে গিয়ে বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। ছেলেদের কাছে বসিয়ে তাঁর দেনা-পাওনা বুঝিয়ে দিলেন; তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। তাঁর শ্রাদ্ধে কত টাকা খরচ হবে তা বলে দিলেন। তারপর এক গায়ক পৌত্রকে নিয়ে পদাবলী কীর্তন গান নিয়ে মেতে রইলেন।

শুনেছি—এ দৃশ্য দেখি নি।

শুনেছি—কীর্তন শুনতে শুনতে চোখ থেকে জল পড়ত, মধ্যে মধ্যে অহো! অহো বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন, কখনও কখনও বা নিজেই তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল এক করে হাতখানি প্রসারিত করে নিজেও গান ধরতেন।

অনলে নাহি দাহবি, সলিলে নাহি
ডারবি রাখবি বাঁধি তমালতরু ডালে।
সখি রে—!

তারই মধ্যে নাতিকে সচেতন করে দিয়ে বলতেন—ছোট-ছোট করে ভাই। ছোট করে। অন্তরের কথা গুন-গুনিয়ে ভাই। ছোট করে!

—হ্যাঁ—।

সখি রে—রাধা অঙ্গ পোড়ায়ো না—।
না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ না ভাসায়ো জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে।
কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো
তাই তো তমাল ভালবাসি!
মরিলে তুলিয়া রেখো, তমালে-রি ডালে।

শুনেছি প্রয়াণের দিন সন্ধ্যাবেলা সকাল সকাল খেতে বলেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বলেছিলেন, আমি বলব, সময় হলে আমি বলব! তাও তিনি বলেছিলেন। কাছে ছিল ভাইপো শম্ভুনাথ। সেও তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তিনি মালা হাতে নিয়ে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় অর্ধজাগ্রত অবস্থায় মতই হয়ে ছিলেন; হঠাৎ এক সময় জেগে উঠে শম্ভুকে ডেকে বলেছিলেন — শম্ভু! শম্ভু!

—অ্যাঁ, ডাকছেন?

—হ্যাঁ রে। ডাক এসেছে। সময় হল। ডাক, ডাক সকলকে ডাক। আমাকে অন্তর্জলী করবার ব্যবস্থা কর। ঘাটে নিয়ে চল। ঘাটে। নামের তরী বাঁধা ঘাটে। ঘাটে রে ঘাটে! ডাক এসেছে রে!

অন্তর্জলী হয়েই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ১৯২৬।২৭ সালে।

কুলদা ঠাকুর্দা বিচিত্র চরিত্র মানুষ। দোষ-গুণের হিসেব করিনি। স্বর্গে গেছেন কিনা তা নিয়েও মাথা ঘামাই নি, তবে তাঁর চরিত্রবল আশ্চর্য, সেই মধ্যরাত্রে কোমর থেকে নিচেটা গঙ্গার জলে রেখে মারা গিছলেন। একালে মারা গিছলেন বলাই ভাল।

রাত্রি, শিবরাত্রি ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভুবন ভ'রে দিয়েছে আজ
রাঙা কুসুম সমারোহ;
শিবের কোলে পার্বতী যায়
সারাটি রাত তার বিবাহ।

অনাদরের জটায় জ্বলে
সাপের মাথায় মানিক জবা;
পাহাড়ে যায় কন্যারা আজ
বুকের মধ্যে সব সধবা।

সাগরে যায় কন্যারা আজ
বেহুলা যেন বসন খোলে;
সাপখেলানো আলোর নাচে
মহাদেবের আসন দোলে।

স্বর্গ মর্ত পাতালে যায়
কন্যারা আজ জাগরণে
বিভাবরীর চন্দনে যায়;
তারই আলোক তিন ভুবনে।

কানাগলির মুখে ॥ গৌতম গুহ

সজল সন্ধ্যায় টলোমলো আলোর ফোঁটার মতো
কাছাকাছি এসো
স্পর্শের উত্তাপে দুলে
আলোর বলয়ে;
পিছল গলিতে পাশে, অন্ধকার বৃষ্টি টিপ টিপ
নিরুত্তাপ এই মৌসুমে
আগুন কোথায় পাবে?
জেবলে নাও এসো, বুকে নিয়ে যাও হে বান্ধব
আগুনের ফুল

ভুলে যাও কেন
বল্কলে ঘুণ ধরে যেই গাছে
তারও নাম গন্ধবকুল।

স্মরণকরি…………… কালজয়ী জওহরলাল

দেশে বিদেশে

নন্দজীর বিদায়

১৯৬২ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে যখন নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হয়েছিল তখন তাঁর নিজের দলের ভিতরে তাঁর জন্য অশ্রুপাত করার লোক বড় বেশী ছিলেন না। ঠিক চার বৎসর পরে গত ৭ নভেম্বরের দিল্লীর ঘটনার পর যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ইস্তফা দিয়ে গেলেন তখন তাঁর জন্যও চোখের জল ফেলার লোক কংগ্রেস দলের মধ্যে বেশী কেউ ছিলেন না। শ্রীমেননের মত শ্রীনন্দও পদত্যাগ করে যাওয়ার পর বিরোধীপক্ষের মধ্যে তাঁর হয়ে কথা বলার লোক বেশী পেয়েছেন। শ্রীনন্দের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কিঞ্চিৎ বিচিত্র এই কারণে যে, ভারত রক্ষা আইনের ব্যবহারের দরুন শ্রীনন্দ ইদানীং বিরোধীপক্ষের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। আজ সেই বিরোধীপক্ষ থেকেই অভিযোগ উঠছে যে, নন্দজীকে "বলি" দিয়ে কংগ্রেস দল পার পেয়ে যেতে পারেন না।

শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে শ্রীগুলজারীলাল নন্দের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মিল আছে। দুজনেরই রাজনৈতিক বাস্তু নেই। শ্রীকৃষ্ণ মেনন জন্মসূত্রে মলয়ালী; কিন্তু রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী: কিন্তু রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছিলেন গুজরাটের আমেদাবাদ শহরে। দুজনেরই কোন নিজস্ব নির্বাচনকেন্দ্র নেই। শ্রীকৃষ্ণ মেনন আসনের জন্য মহারাষ্ট্রের অতিথি আর শ্রীনন্দ গুজরাটের। উভয়েই এবার পুরাতন নির্বাচনকেন্দ্রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। (শ্রীনন্দ অবশ্য হরিয়ানায় একটি আসনের জন্য মনোনয়ন পেতে পারেন; কিন্তু শ্রীমেননের টিকেট এখনও অনিশ্চিত।)

গুলজারীলাল নন্দ

কংগ্রেস দলের ভিতরে নন্দজী বোধহয় মেননের চেয়েও অধিকতর নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই প্রাক্তন অধ্যাপক, তপস্বী চরিত্রের, স্ববিরোধিতাপূর্ণ মানুষটির সম্ভবতঃ দল পাকাবার মেজাজই নেই। ফলে নির্দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে থাকবেন এমন লোক বোধহয় কি এ আই সি সি-র মধ্যে, কি কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির মধ্যে কেউ ছিলেন না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে নন্দজীর নিঃসঙ্গতা আরও বাড়িয়েছে। ভারতবর্ষে এখন যে-অবস্থা তাতে যে কেউই এদেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে বসবেন তিনি যদি সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করতে চান তাহলে তাঁকে বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতাশালী নেতাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হবে। সি বি আই বা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর মত একটা শক্তিশালী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান যাঁর আয়ত্তে তিনি যদি সেই প্রতিষ্ঠানকে সততার সঙ্গে চালনা করতে চান তাহলে রাজ্য

স্তরের বড় বড় নেতাদের গায়ে আঁচ লাগা খুবই স্বাভাবিক। নন্দজীও যে এ বিপদ ঘটান নি তা নয়। আর একথা ভুললে চলবে না যে, এই রাজ্য স্তরের নেতারাই দুই দুইবার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তৈরী করেছেন। যে-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের গাত্রদাহ ঘটাবেন তাঁর হাত তাঁরা মুচড়ে দেবার চেষ্টা করবেন, এটাও স্বাভাবিক।

শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ক্ষেত্রে পরিস্থিতির এই যোগাযোগ মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর বিদায় প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। তথাপি হয়ত তিনি অন্ততঃ আগামী নির্বাচন পর্যন্ত টিকে যেতে পারতেন—যদি তিনি তাঁর কতকগুলি ভুল কাজের দ্বারা তাঁকে বাদ দেওয়ার জন্য একটা বিশ্বাসযোগ্য অজুহাত সৃষ্টি না করে দিতেন।

গোহত্যা নিষেধের প্রশ্নে নন্দজীর সহানুভূতি খুব সম্ভবতঃ ৭ নভেম্বর তারিখের গোরক্ষা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছিল। ঐদিন যাঁরা দিল্লীতে পার্লামেন্টের সামনে ধর্ণা দিয়েছিলেন তাঁদের দলে অবশ্যই তাঁকে ফেলা যায় না। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু না হয়েও তিনি জ্যোতিষ ও তাবিজ-মাদুলিতে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্রে আস্থাবান হয়েও তিনি যজ্ঞ করেন, সাধুসঙ্গ করেন, নিরামিষ খান। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে চলেন ও তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে, তিনি গোহত্যা বন্ধের প্রশ্নটিকে একটা যুক্তির উপর দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মত এই যে, সকল সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাদত্ত সম্মতিতে যদি গোহত্যা বন্ধ করা যায় তাহলে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শত শত বৎসরের পুরাতন একটি দৃষ্টিগোচর বিভেদের প্রাচীর অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

কিন্তু নন্দজীর কিছু করার ছিল না। তিনি জানেন যে, সংবিধান অনুযায়ী গোহত্যা নিষেধের ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলির, এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে। তথাপি তিনি যথাসাধ্য করেছেন। গোহত্যা নিষেধ সম্পর্কে সংবিধানের যে নির্দেশাত্মক নীতি রয়েছে তার প্রতি তিনি রাজ্য সরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে গোহত্যা নিষেধের আইন চালু করা হবে, এটা তিনি মন্ত্রিসভাকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু তিনি একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। সোমবার পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণ থাকবেন, তাঁর এই অনুমান বা প্রত্যাশা একেবারেই ঠিক ছিল না। যে-সাধুদের সমাজ গড়ে তিনি রাজনৈতিক জীবনে ঠাঁই দিয়েছিলেন তাঁরা ত্রিশূল উঁচিয়ে তাঁরই রাজনৈতিক জীবনকে আঘাত করবে, একথা তিনি সম্ভবতঃ অনুমান করতে পারেন নি। দিল্লী কেন্দ্রীয় সরকারের খাস তালুকের অন্তর্ভুক্ত, এখানকার শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য সরাসরি ও সম্পূর্ণতঃ নন্দজীই দায়ী। সেই দায়িত্ব তিনি কিভাবে পালন করেছেন সেটা ৭ নভেম্বরের ঘটনার মধ্য দিয়েই বোঝা গেছে। ঐদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গোরক্ষা আন্দোলনকারীরা দিল্লীতে এলেন। তাঁদের অনেকের জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণেরও ব্যবস্থা ছিল। সাধুরা ত্রিশূল, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে জমায়েত হলেন। তাঁদের মধ্যে নগ্ন সাধুরাও ছিলেন। পার্লামেন্টে যাওয়ার পথেই মিছিলের একাংশ দোকান-পাটের উপর হামলা করতে লাগল। মিছিলের মধ্যে কিছু লোক কোর্পোসানের তিন নিয়েও যাচ্ছিল এবং গৈরিক টুপি-পরা কিছু লোক তাদের পরিচালনা করছিলেন বলে প্রকাশ, সেই মিছিলকে কোথাও বাধা দেওয়া হল না। মিছিল পার্লামেন্ট ভবনের সামনে পৌঁছবার পর যে-কাণ্ড ঘটল সেটা ত' অভূতপূর্ব। বার বৎসরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার রাজধানীতে গুলী চলল এবং পার্লামেন্টের ভিতরে যখন ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন তখন পার্লামেন্টের ফটকের ঠিক বাইরেই নন্দজীর পুলিশ সেই ফটকের উপরে আছড়ে-পড়া মানুষের ভীড় সামলাচ্ছিল। সেদিন গুলী, আগুন আর ব্যাপক হামলাবাজীতে নয়াদিল্লীতে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪৮ সালের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর সেখানে এমন বিপজ্জনক অবস্থা আর দেখা যায় নি।

আপন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের এই শোচনীয় কোণঠাসা অবস্থার জন্য একটা প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে বিসর্জন দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই প্রায়শ্চিত্তই করলেন।

বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় নন্দজী প্রধানমন্ত্রীকে যে পত্র দিয়েছেন তাতে তিনি গুরুতর অভিযোগ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, তাঁর দপ্তরের সেক্রেটারীর সহযোগিতা তিনি পান নি এবং তিনবার তাঁকে বদলী করার চেষ্টা করে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি একথাও লিখেছেন যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা পান নি, তাঁর দপ্তরের "রাজনৈতিক শাখার" শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে লেখা তাঁর এই পত্রের বয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। স্পষ্টতঃই শ্রীনন্দ নিজেই এই পত্র অথবা কতকগুলি অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিয়েছেন। এটা করা তাঁর মত এমন উচ্চস্তরের একজন নেতার পক্ষে সমীচীন হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন উঠেছে। দলীয় শৃঙ্খলার দিক দিয়ে একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, তিনি এই অভিযোগগুলি বাইরে প্রকাশ করে দিয়ে ভাল করেন নি। এতে ইন্দিরা মন্ত্রিসভার সুনাম বাড়বে না। শ্রীনন্দ আরও আগে পদত্যাগ না করে যে-ভুল করেছেন, পদত্যাগপত্র প্রকাশ করে দিয়ে তিনি সেই ভুলই আরও বড় করে তুলেছেন।

নন্দজীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে
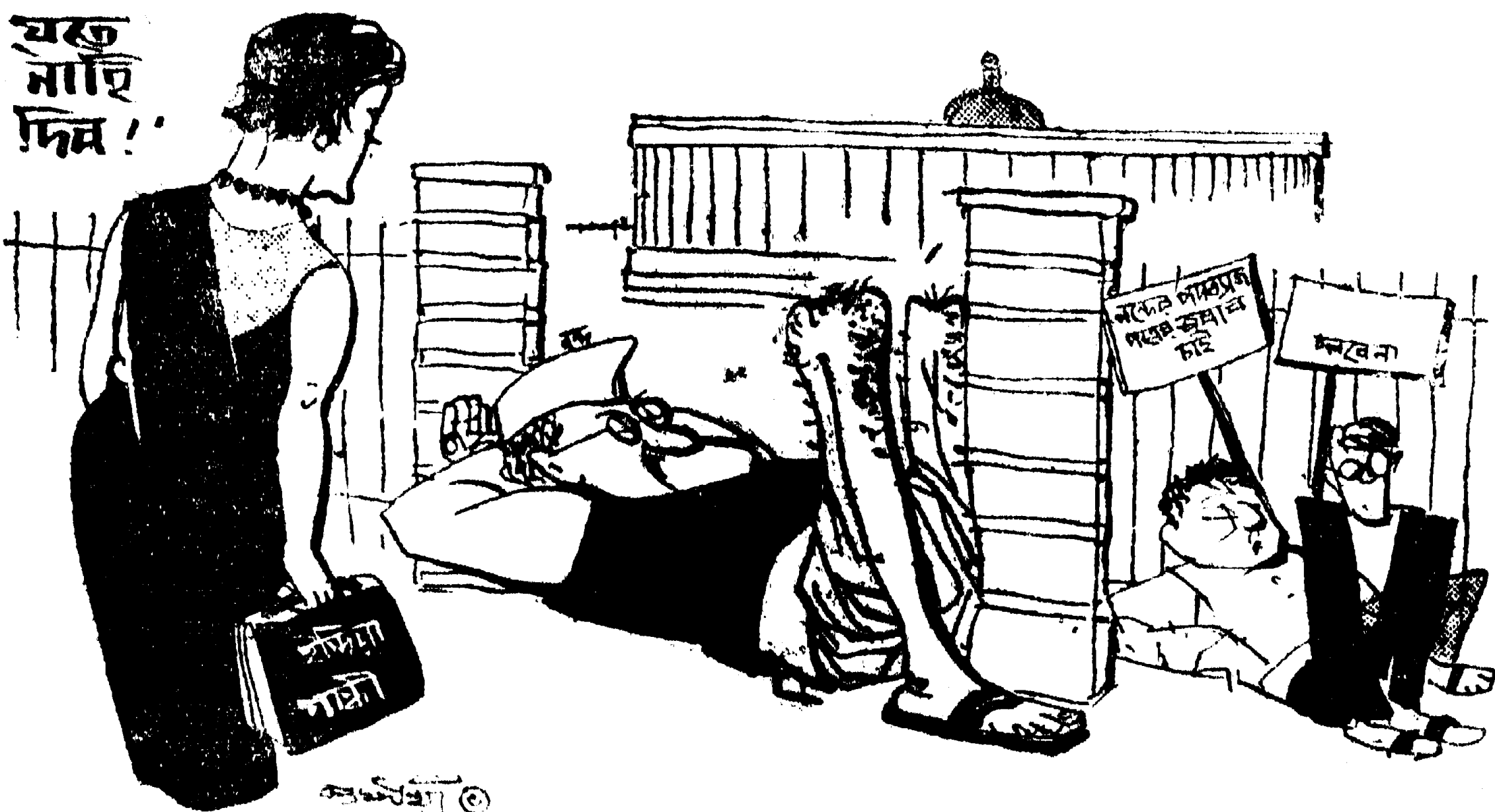
মন্ত্রিসভায় আরও রদবদলের চেষ্টা করতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী যেভাবে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে এলেন তাতেও তাঁর মন্ত্রিসভার সুনাম বাড়বে না। তাঁর পশ্চাদপসরণের ফলে এই ধারণাই দৃঢ় হবে যে, তিনি বাইরের চাপের দ্বারা চালিত হচ্ছেন। বর্তমান মুহূর্তে এটা তাঁর সরকারের পক্ষে ভাল কথা নয়। বিশেষ করে, মনে রাখা দরকার, এই মুহূর্তে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গবর্ণমেন্ট দেশের মানুষের সামনে একটা অনমনীয় দৃঢ়তার প্রতিভাস তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। নন্দজীর পদত্যাগ-পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি দেশে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, এটা তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর দলের অন্যতম অভিযোগ। নন্দজীর বিদায়ের পর সাময়িক-ভাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্য সরকারগুলির কাছে যে-সার্কুলার পাঠিয়েছেন তাতে তিনি বিশৃঙ্খলা দমন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের চাপেই কোণঠাসা হয়ে আছেন, এই ধারণা দেশের মধ্যে প্রশ্রয় পেলে তাঁর গবর্ণমেন্ট এই "শক্ত নীতি"কে কার্যে পরিণত করবেন কিভাবে?

নন্দজী এখন কি করবেন সে-বিষয়ে গবেষণা চলছে। সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের নির্বাচনী সংগঠনের সামগ্রিক ভার তাঁকে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি নতুন করে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করবেন, এটা আশা করা যায় না। কিন্তু অন্তর্দলীয় লড়াইয়ে তাঁর এই পরাভব থেকে তিনি যদি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন তাহলে তিনি কংগ্রেসের ভিতরে নিজের রাজনৈতিক ঘাঁটি শক্ত করার দিকে মন দেবেন। পাঞ্জাব থেকে কেটে নতুন যে হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হয়েছে সেটি তাঁকে সেই সুযোগ দেবে। তাঁর জন্মভূমি এই হরিয়ানা রাজ্যের মধ্যেই পড়েছে। হরিয়ানার নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা তাঁর পুরানো আই এন টি ইউ সি-র বন্ধু। তাঁর ও হরিয়ানার অন্যান্য নেতার সাহায্যে তিনি যদি সেখানে পা রাখবার জায়গা পান তাহলে এখনও হয়ত তিনি নিজের জন্য কৃষ্ণ মেননের অনুরূপ দুর্ভাগ্যকে ঠেকাতে পারবেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

ইস্পাত প্রসঙ্গ

বিশাখাপত্তনমে ভারতের প্রস্তাবিত পঞ্চম ইস্পাত কারখানাটি স্থাপনের দাবীতে সম্প্রতি অন্ধ্র প্রদেশে যে হিংসাত্মক আন্দোলন হয়ে গেল, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের গোটা পরিকল্পনাটাই নতুন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে।

অন্ধ্রের আন্দোলন সর্বত্রই নিন্দিত হয়েছে, কাজেই সে সম্পর্কে এখানে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে বিশাখাপত্তনমের দাবী এবং একটি পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সাধারণভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রথমটির ভিত্তি একটি ইঙ্গ-মার্কিন কনসার্টিয়মের রিপোর্ট। পঞ্চম কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্যে ঐ কনসার্টিয়াম ও ভারত সরকারের মধ্যে ১৯৬৫ সালের ২৭ জানুয়ারী একটি চুক্তি হয়েছিল। ঐ বছর জুনে কনসার্টিয়াম যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম ও মহীশূরের হসপেট সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে তাঁরা বিশাখাপত্তনমের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন, কেননা কারখানাটি সেখানে স্থাপিত হলে প্রারম্ভিক খরচা অনেক কম পড়বে।

দ্বিতীয়টি দেশে ইস্পাতের চাহিদার সঙ্গেই জড়িত। চতুর্থ পরিকল্পনা যদি কোনভাবে ব্যাহত না হয় তাহলে চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে অন্তত ১ কোটি ৫ লক্ষ টন তৈরী ইস্পাত। সেক্ষেত্রে ১৯৭০-৭১ সাল নাগাদ আমরা সব মিলিয়ে উৎপাদন করতে পারব বড় জোর ৮৬ লক্ষ টন। কাজেই শুধু পঞ্চম নয়, ষষ্ঠ একটি কারখানা স্থাপনেরও সুযোগ রয়েছে।

তবু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অন্ধ্র-বাসীদের প্রতি নির্দিষ্ট কোন আশ্বাস দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ ইতিমধ্যে এমন কতগুলি কারণ উপস্থিত হয়েছে যেগুলি ইস্পাত উৎপাদনের সমগ্র পরিকল্পনা সম্পর্কেই সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই কারণগুলি হল :

(১) অর্থের অভাব। পঞ্চম ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে হলে প্রচুর টাকার দরকার হবে। সেই টাকার জন্যে ভারতকে অবশ্যই বৈদেশিক সাহায্যের দিকে তাকাতে হবে, এবং বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্য কতটুকু পাওয়া যাবে (আমরা মুদ্রামূল্য হ্রাসের আগেকার দামে মোট ৪ হাজার কোটি টাকা আশা করেছিলাম) তার কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটুকু বোঝা গেছে যে, সাহায্যের পরিমাণ আশানুরূপ মোটেই হবে না।

(২) এর ওপর আবার চতুর্থ পরি-কল্পনায় ইস্পাত খাতে খরচা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগে ধরা হয়েছিল যে, তিনটি সরকারী কারখানার সম্প্রসারণ এবং বোকারোয় চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্যে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা খরচা হবে। সেই অঙ্ক এখন ১,৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

(৩) ইতিমধ্যে যে তিনটি সরকারী কারখানা চালু আছে সেগুলির অবস্থাই খুব সন্তোষজনক নয়। এই সব কারখানায় উৎপন্ন ইস্পাত দ্রব্য বিক্রি করাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সেপ্টেম্বরের এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, দুর্গাপুর কারখানার মাসিক বিক্রী ৬ কোটি টাকা থেকে ৩ কোটি টাকায় পড়ে গিয়েছে। এর ওপর প্রচুর ইস্পাত পিণ্ড জমে যাওয়ায় রোলিং মিলের অনেকখানিই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এদিকে রেলওয়ে বোর্ড তাঁদের অর্ডার বড় রকমে কমিয়ে দেওয়ায় ভিলাই কারখানাও সমস্যায় পড়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ সাধারণত ভিলাইয়ের উৎপাদনের ৬০ শতাংশই কিনে থাকেন। হঠাৎ তাঁদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪) বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তায় চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সংশয়িত হয়ে পড়ায় অনেক কাজকর্ম ছেঁটে বাদ দিতে হচ্ছে। নতুন নির্মাণ-কার্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকুচিত হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ইস্পাতের চাহিদা কতখানি থাকবে সেটাই বিচার্য বিষয়।

এই পরিস্থিতিতে হুমকির রাজনীতি এবং হিংসাত্মক আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে এখনই পঞ্চম কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের পক্ষে মুস্কিল। চতুর্থ পরিকল্পনার সমস্যাগুলি যদি দূর হয়ে যায় (যার আশা কম) তাহলে অবশ্যই একটি পঞ্চম কারখানা দরকার হবে, কিন্তু সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

এক্ষেত্রে ভারত সরকরের সামনে যা করণীয় ছিল তাঁরা তাই করেছেন। বোকারোয় চতুর্থ কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সরকারী ও বে-সরকারী কারখানাগুলির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন কোন কারখানা স্থাপনের চাইতে এটাই আরো যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ ব্যবস্থা।

বোকারোয় প্রথম পর্যায়ে ১৭ লক্ষ টন ইনগট ইস্পাত তৈরীর লক্ষ্য ধরা হয়েছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় তা বাড়িয়ে ৪০ লক্ষ টন করার কথা আছে।

সম্প্রসারণ পরিকল্পনার আওতায় সরকারী কারখানাগুলির লক্ষ্য (ইনগট ইস্পাতের) এইরকম ধরা হয়েছে : ভিলাই —৩২ লক্ষ টন; দুর্গাপুর—৩৪ লক্ষ টন; রাউরকেলা—২৫ লক্ষ টন।

বে-সরকারী কারখানা দুটির লক্ষ্য মাত্রা এই রকম : টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী—২২ লক্ষ টন; ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী—১৩ লক্ষ টন।

পুরস্কৃত কবি

শংকর কুরুপ

অনন্তকুমার সেন

মালয়ালাম ভাষার কেরালাবাসী কবি শ্রী জি শংকর কুরুপ এবার ভারতীয় জ্ঞানপীঠের সাহিত্যপুরস্কার পেয়েছেন। ঐ পুরস্কারের সম্মানমূল্য এক লক্ষ টাকা। এবারই প্রথম জ্ঞানপীঠের এই সাহিত্যপুরস্কার দেওয়া শুরু হল। ভারতবর্ষে আর কোন সাহিত্যপুরস্কারের সম্মানমূল্য এক লক্ষ টাকা নয়। সেদিক থেকে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই। তাছাড়া ঐ পুরস্কারের নির্বাচকমন্ডলীও সর্বভারতীয় সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ। ঐ নির্বাচকমন্ডলীতে আছেন ডঃ সম্পূর্ণানন্দ, (সভাপতি) এবং সদস্যবৃন্দ—শ্রীকাকা কালেলকর, ডঃ আর আর দিবাকর, ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতব, ডঃ বি গোপাল রেড্ডি, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ ভি রাঘবন, ডঃ করণ সিং, শ্রীমতী রমা জৈন এবং শ্রী এল সি জৈন। শেষোক্ত দুজনই শুধু ভারতীয় জ্ঞানপীঠের প্রতিনিধি। এবার পুরস্কারের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে শ্রীকুরুপের 'ওটাক্কুঝল' নামে কাব্য-গ্রন্থ। দিল্লির বিজ্ঞানভবনে ১৯শে নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে জ্ঞানপীঠের এই পুরস্কার শ্রীকুরুপের হাতে অর্পিত হবে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ প্রান্তের রাজ্য কেরালার প্রাকৃতিক ও চরিত্রগত মিল অনেককেই বিস্মিত করে। দুটি রাজ্যেই সবুজের প্রাচুর্য, নারিকেলবীথি সর্বদা হাওয়ায় আন্দোলিত। অন্যদিকে সমুদ্র কাছে বলে নৌকো এখানকার জীবনযাত্রার অনিবার্য অঙ্গ। বোধকরি স্বাভাবিক পরিবেশ এক-রকম বলে দুটি রাজ্যের জীবনযাত্রাও খানিকটা একরকম। দুটি রাজ্যেই সাধারণ মানুষেরা শ্যামবর্ণ এবং অন্নভোজী। আর তাদের কাব্যপ্রীতিও প্রায় একই রকম। বাংলাদেশে আমরা যেমন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মানুষ হয়ে উঠি, কেরালার মানুষও তেমনি বেড়ে ওঠে ভাল্লাথল আর শংকর কুরুপের কবিতার আবহাওয়ায়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, পাঁচ বছর আগে জন্ম-শতবর্ষ পালিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আর শংকর কুরুপ এখনও জীবিত বয়স মাত্র ৬৫ বছর। এবং আরও একটি পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ গুরু, আর শংকর কুরুপ তাঁর শিষ্য—গীতাঞ্জলির অনুবাদের ভিতর দিয়েই কুরুপ আবিষ্কার করেছেন তাঁর প্রকৃত কবিসত্তা। কাজেই বলা যায় বাংলার সাধনাই সার্থক হয়ে উঠেছে দাক্ষিণের এই প্রান্ত রাজ্যটিতেও।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন ভারতীয় কবির নামই একত্রে উচ্চারণ করা সঙ্গত নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ কেবল ভারতীয় কবি নন, বিশ্বকবিও। কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে যে কবি নিজের প্রাদেশিক গণ্ডির বাইরে এসে সমগ্র ভারতবর্ষকে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাঁর কৃতিত্বও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

শ্রী জি শংকর কুরুপ অবশ্যই এই দ্বিতীয় কোটির কবি।

কুরুপ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই চলমান জীবনের আনন্দ-বেদনা এবং বিশ্ব-প্রকৃতিকে তাঁর কবিতার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের বহু রূপকল্প তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সুগভীর যোগসূত্রের বিষয়ে তাঁর বোধ অনেকটাই রবীন্দ্র-প্রভাবিত এবং এই প্রসঙ্গে কুরুপ যে 'মিস্টিক' দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন তাও রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়ায়। কিন্তু কুরুপ অনুকারক নন, স্বতন্ত্র সৃষ্টিশক্তির অধিকারী—তাই তাঁর কাব্যে প্রাথমিক প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠারও সুনিশ্চিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ভারতীয় জীবনমঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর থেকেই শুরু হয় শংকর কুরুপের কবিতায় নব-রূপায়ণ। জাতীয়তাবাদ তাঁর কবিতার মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই মনোভাব অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী কবি ভাল্লাথলের কবিতাতেও বাণীমূর্তি লাভ করেছিল। কিন্তু কুরুপ ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনকে মিলিয়ে দেবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাই তাঁর কবিতায় জাতীয় ভাবধারাও এক অদৃষ্টপূর্ব কাব্যরূপ গ্রহণ করছে। এক কথায় বলা চলে, মালয়ালাম ভাষায় আধুনিক কাব্যরূপের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে শংকর কুরুপের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সাধনায়।

কিন্তু কুরুপ এখানেই থেমে থাকেন নি, আমাদের জাতীয় জীবনে নেহরুজীর অভ্যুদয়ের পর তাঁর দৃষ্টি অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হল সামাজিক সুবিচারের দিকে। কেবল জাতীয় স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারই নয়, দেশের আপামর-জনসাধারণের জীবনে সুখ-শান্তির জন্যে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের আকুতিও ভাষা পেল তাঁর কবিতায়। প্রথম দিকে তাঁর কবিতায় পরোক্ষভাবে মিস্টিক ভাবরূপের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেতে থাকে এই আবেগ। কিন্তু ক্রমে তাঁর মধ্যে মিস্টিক আবরণ কমে আসে। তিনি দেশে-বিদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্কার থেকে শুরু করে সমস্ত রকম মানবিক মহিমাকেই তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে থাকেন। এবং এই সময় থেকে জাতীয় ভাবধারার প্রতি মনে-প্রাণে অনুরক্ত থেকেও শংকর কুরুপ হয়ে ওঠেন সমগ্র মানবসমাজের কবি।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রী জি শংকর কুরুপ এখন আকাশবাণীর ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের পরামর্শদাতা। তাছাড়া তিনি কেরালা সাহিত্য আকাদমীর সদস্য এবং কেরালা সাহিত্য সমিতির সভাপতি।

অন্যান্য বালকের মত কুরুপ বাল্য-জীবনে ইংরেজি শেখার সুযোগ পান নি, নিজের চেষ্টায় পরে তিনি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছেন। ভূতপূর্ব ত্রিবাংকুর রাজ্যের একটি ছোট গ্রামে ১৯০১ জন্মগ্রহণ করার পর গ্রামেই কাটে তাঁর বাল্যকাল। জন্মেছিলেন তিনি মন্দির-সেবাইতের বংশে, তাছাড়া তাঁর কাকা ছিলেন নামকরা জ্যোতিষী, কাজেই তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় সংস্কৃতের মাধ্যমে। কাকার এই দূরদৃষ্টির ফলেই কুরুপ পরবর্তী জীবনে ভারতীয় মানসকে ভাল করে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কুরুপ প্রথমে কোচিন সরকারের অধীনে মালয়ালাম ভাষার শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন, পরে এর্নাকুলামের মহারাজা কলেজে মালয়ালাম পণ্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন। কাজ থেকে ১৯৫৬ সালে অবসর গ্রহণ করার পর কুরুপ বর্তমানে এর্নাকুলমেই বাস করছেন।

সাহিত্যজীবন শুরু করেন কুরুপ অল্পবয়সেই। কিন্তু মালয়ালম সাহিত্যে তখন মহাকবি ভাল্লাথলের যুগ। তাছাড়া ভাল্লাথলের আগেকার কবি কুমারন আসান এবং উল্লুরের প্রভাবও তখন যথেষ্ট ছিল। প্রথম বয়সে কুরুপের রচনায় উল্লুরের শব্দসম্পদ এবং ভাল্লাথলের দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত ছায়াপাত করেছিল। পরবর্তী কালে কীভাবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করে কুরুপ তাঁর কবিতায় রূপান্তর ঘটান তা আগেই বলা হয়েছে, শ্রী জি শংকর কুরুপ এখন মালয়ালাম ভাষাসাহিত্যে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত।

কুরুপের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়ি, তাছাড়া গদ্য রচনাবলীও প্রকাশিত হয়েছে চারটি খণ্ডে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' এবং কালিদাসের 'মেঘদূতম'ও তিনি মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে তাঁর চারখানি কাব্যনাট্য। এবং জীবিকার জন্যে রচিত অজস্র পাঠ্য-পুস্তক। কুরুপ আগেও অনেকগুলি সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এখনও সম্পাদনা করছেন 'তিলকম' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা।

মালয়ালম সাহিত্যে কুরুপের প্রভাব আজ সর্বব্যাপী, গত দুই দশকের মালয়ালম কবিতাকে বলা হয় 'কুরুপ যুগে'র কবিতা। শ্রী জি শংকর কুরুপ এবার ভারতীয় জ্ঞানপীঠের সাহিত্যপুরস্কার পেয়েছেন, একথা জেনে সাহিত্যপ্রিয় সকলেই আনন্দিত হবেন।

বার্ষিকী

লোকনাথ ভট্টাচার্য
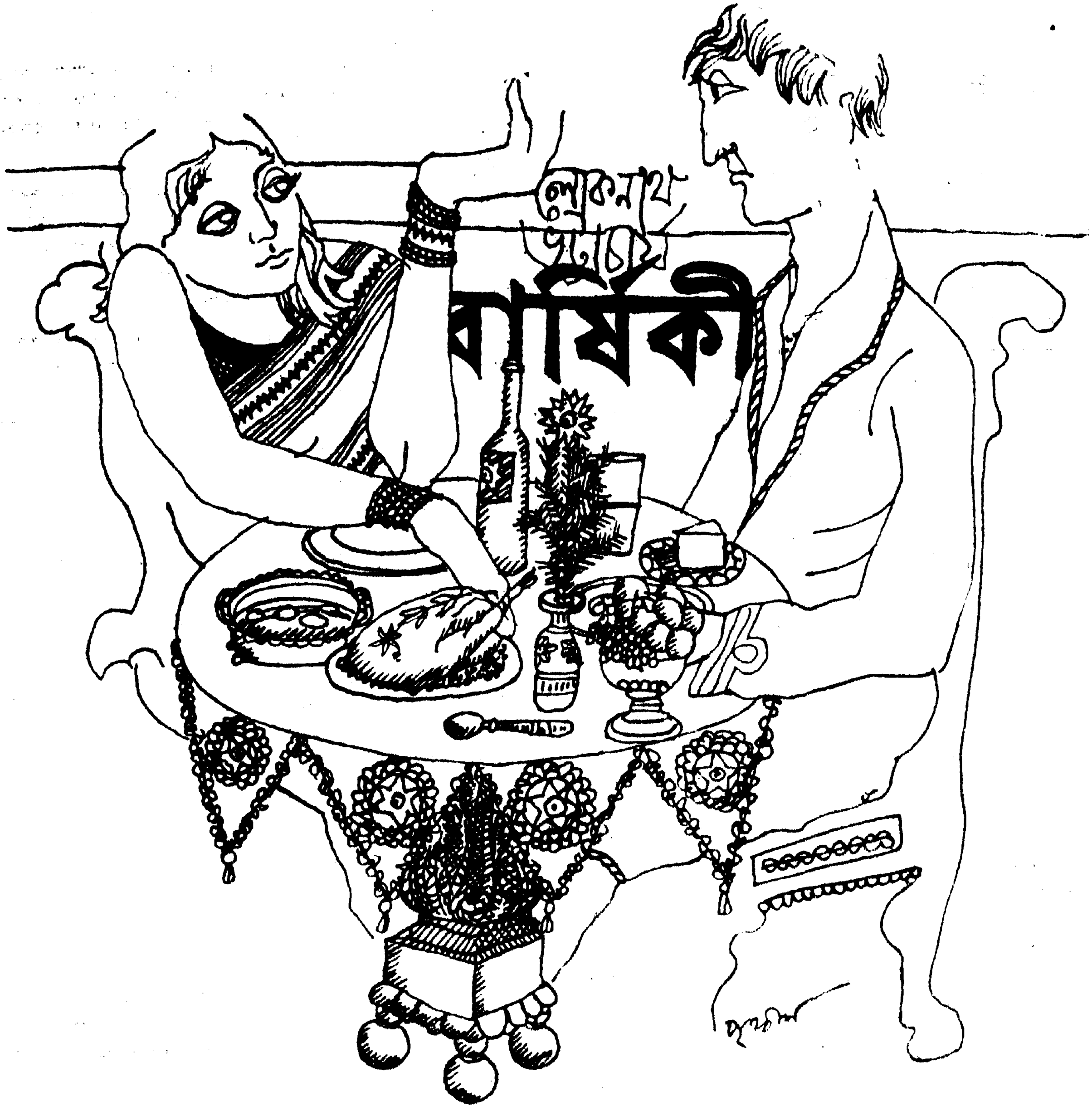
'মনে আছে তোমার সেই বিশ্বাসের ব্যাপারটা ?' তড়িতের প্রশ্ন।

'কোন্‌টা ?' গৌরীর জানতে চাওয়া।

'সেই মাকড়সার জালটা ?'

স্নিগ্ধ উচ্ছল হাসিতে গৌরীর গলাটা যেন সেতারের ঝংকারের মত বেজে উঠল। তড়িৎ বলল :

'সন্ধ্যায় দেখলে আশা, সকালে দেখলে বিপদ—সত্যি !'

'কেন ?' গৌরীর কণ্ঠে সস্নেহ কৌতূহল।

'না, এমনিই। কিন্তু প্রথম যেদিন শুনি, ভারী আশ্চর্য লাগে। কারণ, আগে কখনো শুনিনি। কদ্দিন আগে ? দশ বছর ? না, দশ বছর কেন হবে ? দশ বছরের ব্যাপারটা তো ঘটল অনেক পরে। তারো আগে, ঠিক কতদিন আগে ? সেই যেদিন প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হয়, মনে পড়ে ?'

'তুমি তখন কী ভালোমানুষ-ভালোমানুষই না ছিলে, মনে পড়ে ?'

'আর তুমি ?'

'আমি একরকমই আছি।'

'বোধহয় সত্যিই, তুমি একরকমই আছ। তুমি আমার সেই প্রথম দিনের গৌরীই র'য়ে গেলে।'

'তুমিও একরকমই আছ, একেবারে এক। সত্যি, সব বদলাচ্ছে, কেবল আমরাই কেন বদলালাম না গো ?'

'অনেক বদলেছি, এই তো আমার ঘাড়ের কাছে চুল পাকতে শুরু করেছে, আর তোমারও মুখে একটা-দুটো ক'রে রেখা...'

'যাঃ, কী যে বল !' কথাটা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি গৌরীর।

'না', হেসে বলে তড়িৎ, 'তুমি সমানই সুন্দর রয়ে গেলে—দশটা বছর বই তো নয়, মাত্র দশটা বছর, তা কি সুন্দরকে অসুন্দর করতে পারে ?'

'তবু দশটা বছর, কম সময় নয়। সত্যি, কত কী ঘটল জীবনে, না ?'

'হ্যাঁ, কতই না ঘটল, মাধুরীর পাত্র ভ'রে উঠল কানায় কানায়। আচ্ছা, এখনো বিশ্বাস কর ঐ মাকড়সার জালটা ?'

'করি।'

'আমিও করি, তোমার দেখাদেখিই। আজ আমাদের সব বিশ্বাস এক হয়ে গেছে। সত্যি, কী ক'রে দুটো জিনিস এক হয়ে যায়।'

'দুটো জিনিস এক হয়ে যায়।'

'আজ সকালে কোনো জাল টাল দেখেছ না কি ?'

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে নেয় গৌরী, বলে : 'কই, না তো।'

'তবে বিপদের সম্ভাবনা নেই ?'

এবার দুজনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে। টেবিলের ওপর গৌরীর ফে-বা হাতটা আলতো ক'রে শোওয়ানো রয়েছে, তার ওপর তার নিজের হাতটা রাখে তড়িৎ। দুজনে দুজনের দিকে তাকায় মিষ্ট, স্নেহ-পূর্ণ, অর্থময় দৃষ্টিতে। আজ তাদের বিবাহের দশ বছর পূর্তি—সারা সকালটা কেটেছে একলা একলা, শান্তিতে, নীরব নির্জনে, কখনা বা দুয়েকটা প্রিয়-পরিচিত পুরানো বইয়ের পাতা উল্টে-পাল্টে দেখতে—মনে মনে হয়তো ফিরে যেতে চায় অতীতের এমনই অবসরের কয়েকটি মুহূর্তের স্মৃতিতে, যখন একজন পাড়ে শুনিয়েছে এমন কোনো একটি বইয়ের কোনো একটি লাইন আরেকজনকে। বিশেষত সেই বইটা, পাবলো নেরুদার

একটি অনবদ্য প্রেমের কবিতা সংকলন, যেটা গৌরীই তড়িৎকে উপহার দেয়, তাদের বিয়েরও আগে, বোধহয় মাসকয়েক আগে মাত্র. সেটারও দুটো একটা কবিতা আজ সকালে পড়ল দুজনে। দ্বিভাষিক কবিতার বই. বাঁদিকের পৃষ্ঠায় মূলে কবিতা স্প্যানিশে, ডানদিকের পৃষ্ঠায় তার ফরাসী অনুবাদ। আজো, বইটা তড়িতের উপহার পাওয়ার সেই প্রথম দিনের মতই, মূলে স্প্যানিশ অংশটা ধীর সুরেলা গলায় পড়ছিল গৌরী. গৌরীর পাশ ঘেঁষে বসে উৎসুক তড়িৎ ফরাসী অনুবাদে চোখ বোলাচ্ছিল। আজ সকালেও আগের বহুবারের মতই, সেই একই প্রশ্ন করে গৌরী :

'আচ্ছা, তুমি স্প্যানিশটা কেন কিছুতেই শিখে উঠতে পারলে না?'

'তুমি শেখালে কই, তোমার না শেখানোর কথা ছিল?'

'তা অবশ্য সত্যি. তুমিও কিন্তু চেষ্টা করনি, কোনো আগ্রহ দেখাওনি। অথচ এত সুন্দর ভাষা, আমাদের বাংলার সঙ্গে এত মেলেও।'

'আর ফরাসীটা? সেটাই বা তুমি শিখলে না কেন, পৃথিবীর কোন ভাষার তুলনায় কম যায় সে?'

'কিন্তু সেটাও তো তোমারই শেখানোর কথা ছিল, শিখিয়েছ?'

'তবে তুমিও আগ্রহ দেখাওনি, কোনো চেষ্টা করনি', বলেই তড়িৎ হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। মনে হয় তার, খাসা খেলা এ এক পারস্পরিক এই পারস্পরিক পুনরাবৃত্তি—এর প্রশ্নটা ও পাড়ে. ওর উত্তরটা এ দেয়। তড়িৎ ছাত্রাবস্থায় কয়েক বছর কাটিয়েছে ফ্রান্সে, যখন গৌরী ছিল স্পেনে, ঐ ছাত্রী হয়েই। তাদের প্রথম পরিচয় ঘটে ইউরোপেই, সে আজ প্রায় এগারো বছরের কথা, এবং সে-পরিচয় অচিরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে লাফাতে লাফাতে প্রেমে পরিণত হয়, ঐ ইউরোপেই।

এখন ব'সে ব'সে লাঞ্চ খাচ্ছে দুজনে, এবং খেতে খেতেই ঐ মাকড়সার জালের প্রশ্নটা পাড়া। উপলক্ষ্য বিশেষ, তাই লাঞ্চটা বিশেষ আজকের। গতকাল সন্ধ্যায় দুজনে একসঙ্গে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে বেশ নরম দেখে একটা মুরগী কিনে আনে, সারারাত ফ্রিজে রেখে দেয়, আজ সেটার রোস্ট হয়েছে—খাওয়ার সঙ্গে পানীয় হিসেবে বিয়ার ছাড়া উপায়ান্তর নেই, যদিও বিয়ার জিনিসটা গৌরীর বড় একটা সহ্য হয় না। তবে সেই লাল মদ বা সাদা মদ, বা বড়-জোর ফ্রান্সে যেগুলোকে বলে আপেরিতিফ, যা বিদেশে থাকাকালীন মাঝেসাঝে গৌরীর মন্দ লাগত না, বরং ভালোই লাগত বেশ, তা ইদানীংকার এই পান-বিরোধী দেশে মিলছে কোথায়? অতএব বিয়ারের প্রসঙ্গে তড়িতের পীড়াপীড়িতে অবশেষে সায় দেয় গৌরী, কারণ তড়িৎ জেদ ধ'রে বসে, বলে :

'না, এমন একটা বচ্ছরকার দিনে শুধু শুধু জল খেয়ে পেট ভরাতে আমি কিছুতেই রাজী নই।'

'কিন্তু বিয়ারের গন্ধ শুঁকলেই যে আমার ঘুম পায়, চোখ ঢুলে আসে', হেসে তার ডাগর-ডাগর চোখ দুটো তুলে বলে গৌরী।

'তো খাওয়ার পর না হয় ঘুমোলেই একটু, অন্যান্য ছুটির দিনের মতই ঘণ্টা-খানেকের জন্যে গড়াব।'

গৌরী রাজী হয়—খুব একটা যে অনিচ্ছায়, তাও নয়। এমন একটা দিনে কোনো মনোমালিন্যের প্রশ্রয় তারা দেবে না। তাছাড়া, মনে হয় গৌরীর, লাঞ্চের পর বিছানায় খানিকক্ষণের জন্যে গড়াতেই তো হত, সেই গড়ানোটা না হয় এই বিয়ারের পরে আরো ভালো ক'রেই জমল একটু। এমন একটা দিনে শরীরকে তারা কোনো কষ্টই দেবে না, ছুটির দিনের প্রথার মত আজো দুপুরে বিশ্রাম নেবে। এমনিতেই আজ একটা রবিবার, তাই তাদের কর্মস্থানে ছুটির দরখাস্ত কাউকেই করতে হয়নি. না তড়িৎকে. না গৌরীকে। আর তাদের এই বিবাহ-বার্ষিকীর দিনটা এবার যদি সপ্তাহের অন্য কোনো দিনেও পড়ত, তো সেই দিনটির জন্যে অন্তত ছুটি তারা নিতই। নিতে হয়নি, ভালোই হয়েছে, এই রবিবারটা একটা যোগাযোগ।

বাড়ীতে তারা দুজন ছাড়া মাত্র একটি চাকর, যে রান্নাও করে, এবং ভালো রান্নাই করে—সে-ই পরিবেশন করছিল। খাওয়া শেষ হ'তে হ'তে প্রায় সওয়া দুটো বেজে গেল—এটা-ওটা কথা, হাসি, দুয়েকটা হীরকোজ্জ্বল স্মৃতির অবতারণা, সময় কেটে যায়। তড়িৎ বেশ দেখতে পায়, আধ গেলাস বিয়ারের ঠেলা সামলানোই দায় হ'য়ে উঠেছে গৌরীর চোখ তার এই বুঁজে এল ব'লে—তবুও হাসছে, কথা বলছে, তার কেমন একটা মধুর মাদক-তার ভাব। দেখতে খুব ভালো লাগে তড়িতের—সে ভাবে, আর কি, এবার উঠলেই হ'ল, খানিকক্ষণ গড়িয়ে নেওয়া যাবে।

এমন সময় বেল বেজে উঠল, কেউ এসেছে। দরজা খুলে দেখে তড়িৎ, পাড়ার মিসেস রায়।

'আরে আসুন আসুন', সোৎসাহে ব'লে ওঠে তড়িৎ। মুখে বিরক্তির যেন কোনো চিহ্ন ফুটে না ওঠে, প্রাণপণ প্রচেষ্টা তার।

'দিবা-নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?' মিসেস রায়ের প্রশ্ন।

'কোথায় দিবানিদ্রা? কিছুই করছিলাম না। আসুন।'

ঘরে ঢোকেন মিসেস রায়—পরে গৌরীর উঠে দাঁড়ানো, হাত জোড় ক'রে নমস্কারের ভঙ্গী করা, ভদ্রমহিলার বসা।

'বহুকাল ধ'রেই ভাবছি আপনাদের একটু খোঁজ-খবর নেব, তা আর সময়ে কুলিয়ে ওঠে না', বলেন মিসেস রায়।

'সে কি', বলে গৌরী, 'আমরাও তো যেতে পারি না কখনো—কাজের দিনে তো সময়ই হয় না, আর ছুটির দিনে বাড়ী থেকে নড়তেই পারি না।'

'সেই যেদিন থেকে শুনেছি', আবার বলেন মিসেস রায়, 'আপনাদের বাড়ীতে একটা চুরি হ'য়ে গেছে, কতবার যে ভেবেছি আসব.....'

'কোন চুরি বলুন তো?' জানতে চায় তড়িৎ।

'একটা চুরি হ'য়ে যায়নি আপনাদের? এই তো কয়েক মাস আগেই বোধহয়।'

'ও হ্যাঁ, মাস তিনেক আগে। সামান্যই, এমন কিছু নয়।'

'তবু, কত খোওয়া গেল?'

'বেশি নয়, অত্যন্ত অল্পের ওপর দিয়েই গেছে। এই গোটা পঞ্চাশেক টাকা, নগদ।'

'তা চোরটাকে অন্তত ধরতে পারলেন?'

'কোথায়? পুলিশে অবশ্য রিপোর্ট করি।'

'পুলিশ!' তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন মিসেস রায়। 'ওদের দ্বারা কি কখনো কিছু হয়?'

'আর কার কাছে যাই বলুন,' হেসে বলে তড়িৎ।

'তাও সত্যি অবশ্য। কিন্তু হ'ল কী ক'রে?'

'দিন দুপুরে। আমরা দুজনেই বাইরে ছিলাম, চাকরটারও সেদিন হাফ-ডে। আপিস থেকে আমিই বাড়ীতে ফিরি প্রথম, দেখি সদর দরজাটার তালাটা ভাঙ্গা, ঘরে আলমারীর তালাটাও ভাঙ্গা, এবং ব্যাগটি নেই।'

'ভাগ্যিস আর কিছু যায়নি।'

'হ্যাঁ, বেশি টাকা বাড়ীতে রাখি না তো, যখন যা দরকার ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসি, তাই ঐ পঞ্চাশ টাকার ওপর দিয়েই গেল। অবশ্য একই আলমারীতে গৌরীর সামান্য কিছু গয়না-টয়নাও ছিল, তাতে হাত দেয়নি, আশ্চর্য।'

"আশ্চর্য", বলেন মিসেস রায়।

হঠাৎ কথা থেমে যায়, কী বলবে ভেবে পায় না তড়িৎ। গৌরীর দিকে তাকিয়ে দেখে, একেবারে চুপ ক'রে ব'সে আছে. চোখ দেখে মনে হয় যেন এই ঘুমিয়ে পড়ল ব'লে। মনে মনে শংকিত হ'য়ে ওঠে তড়িৎ. একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে মিসেস রায়কে :

'তারপর আপনাদের কী খবর? আপনার কন্যাটি তো বোধহয় এবার স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল, না?'

'কিন্তু সেই একই চাকরটাকে এখনো রেখেছেন?' ভদ্রমহিলা ছাড়বার পাত্রী নন।

হঠাৎ গৌরী ব'লে ওঠে : 'না ও কিছু করেনি, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই।'

'তা যদি সত্যি হয় তো ভালোই', খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলেন মিসেস রায়, 'তবে জানেন, আজকালকার চাকর-বাকরদের এতটুকু বিশ্বাস নেই। যা চুরি হচ্ছে চাদ্দিকে, আর সব চুরিই প্রায় বাড়ির ঝি-চাকরদেরই। বিশেষ ক'রে এই পাহাড়ী চাকরগুলো। আপনাদেরটাও তো পাহাড়ী না?'

'আলমোড়া থেকে', জানায় গৌরী।

'ওরে বাবা, তবে কিন্তু ভালো করেননি। ওকে পুলিশে দেওয়াই উচিত ছিল। অন্তত

কাজ থেকে ছাড়িয়েও দিতে পারতেন সঙ্গে সঙ্গে। ওকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন এসব চুরিটুরির সম্বন্ধে?'

'অপানাকে কী দেব বলুন', কথা পাল্টিয়ে বলে গৌরী। 'একটু কফি চলতে পারে?'

'সানন্দে।'

গৌরী উঠে যায় রান্নাঘরের দিকে। এখন কোন দিকে কথাবার্তা চালানো যায়, ভাবতে থাকে তড়িৎ। দ্যাখে ভদ্রমহিলার কপালে দুয়েক বিন্দু ঘাম সঞ্চিত হয়েছে। বলে :

'আপনি এই চেয়ারটায় উঠে আসুন, একেবারে ফ্যানের তলায়।'

'উঠব?' বলেই উঠে পড়েন ভদ্রমহিলা। যেন এই প্রস্তাবটিরই অপেক্ষা করছিলেন। ফ্যানের তলায় চেয়ারটায় ব'সেই বলেন :

'সত্যি, হতচ্ছাড়া দেশ, বছরের একটা সময়েও একটু শান্তি নেই।'

'হ্যাঁ', বলে তড়িৎ, 'এখনো অন্ততঃ পুরো আরো একটা মাস, তারপরে অক্টোবর। তখন থেকে একটু ঠাণ্ডা হতে থাকবে আশা করা যায়।'

'তখন কি আরাম আছে? এবং সে-আরাম ক'টা দিনেরই বা। কিন্তু আপনারা তো অনায়াসে একটা এয়ারকণ্ডিশনার কিনতে পারেন, কেনেন না কেন?'

কেবল একটু হাসে তড়িৎ, চুপ ক'রে থাকে। ভদ্রমহিলা আবার বলেন :

'আমি তো ঐ কারণেই বাড়ী থেকে নড়ি না, একবার এয়ারকণ্ডিশনে অভ্যাস হয়ে গেলে...'

মনে হয় তড়িতের, বলে : তো বাড়ীর সেই এয়ারকণ্ডিশান ছেড়ে এখানে তোমার আসাই বা কেন এই দুপুরে? কিন্তু মুখে কিছুই বলে না। ট্রে হাতে গৌরী ফিরে আসে, ট্রের ওপর নেসক্যাফের কৌটো, ভিন্ন পাত্রে দুধ ও চিনি, এবং এক কেটলি গরম জল। কফি তৈরী হয়, চুমুক দিয়ে বলেন ভদ্রমহিলা :

'আপনারা দুপুরে তো হ'লে ঘুমোন না দেখছি, আমিও কক্ষণো ঘুমোই না। এ-দেশটা শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই গেল— এত অলস, কী হবে এ-দেশের?'

পরে তিনি তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটা সৌখীন জাপানী ধরনের হাতপাখা বের করে হাওয়া খেতে থাকেন।

'ভারী সুন্দর তো', বলে গৌরী, 'জানতে পারি কি কোথায় কিনলেন?'

'এ-দেশে নয়, বলা-বাহুল্য। এখানে যা পাওয়া যায়, তা দেখলে গা ঘিন-ঘিন করে।'

তবু তার প্রশ্নের উত্তরটা পেল না গৌরী, তাই চুপ ক'রে থাকে। ভদ্রমহিলা নিজেই বলেন :

'শুনলে আশ্চর্য হবেন, যেখানে ছিলেন সেখানে পাখা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমস্টারডাম থেকে।'

'তাই নাকি?' সবিস্ময়ে তাকায় গৌরী তড়িতের দিকে। তড়িৎ বলে :

'হাত-পাখা বললেই আমার মনে প'ড়ে যায় সেই পুরোনো দিনের পাখাগুলোকে, পাওয়া যেত রাসের মেলায় বা রথযাত্রার।'

'রামো রামো', ঘোর আপত্তির সুরে ব'লে ওঠেন ভদ্রমহিলা, 'সেগুলোকে ভালো বলছেন? হতকুচ্ছিত, যেমন সস্তা, তেমনি জঘন্য। ও ঠাকমা-দিদিমাদের হাতেই শোভা পেত, আজকাল আর চলে না। আজকালকার ঠাকমা-দিদিমারাও তা ব্যবহার করবেন না।'

'তা হোক', মৃদু প্রতিবাদ না ক'রে পারে না তড়িৎ, 'আমার কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগত, কত ব্যবহারও করেছি ছেলেবেলায়। দেশটায় কিছুই রইল না, যা ছিল তাও আজ নেই, যা আসছে নতুনের নাম ক'রে, তাও খুব সুখকর নয়।'

'হ্যাঁ,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন মিসেস রায়, 'এই তো দেশ, এর আবার সুখকর আর অসুখকর! মাঝে মাঝে মনে হয় জানেন, পালিয়ে যাই কোথাও। কিন্তু পালালেই বা কী করে? ঝামেলার তো শেষ নেই।'

'অবশ্য বেড়ানোর সাধ গেলে ভালো জায়গাও অনেক আছে দেশে, যাওয়া যায়,' গৌরী ধীরে টিপ্পনি কাটবার চেষ্টা করে।

'কোথায় ভালো জায়গা? এগুলোকে ভালো জায়গা বলেন? না আছে ভালো হোটেল, না আছে সুখ-সুবিধে, না আছে কথা বলার একটা লোক। আর আপনারা ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, দেখেছেন তো? যেখানেই যান, কী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কত দেখার যোগ্য জিনিস, চারদিকে কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য— আর এখানে?'

'অবশ্য তেমন-তেমন দরকার পড়লে এখানকার বাস উঠিয়ে বিদেশেও বসতি পাতা যায়, অনেকে তো করছেন দেখছি— হয়তো আপনিও পারেন করতে।' তড়িৎ ব'লে বসে একটু বেপরোয়ার মতই, তার উক্তিটা যাতে কোনোরকমে রূঢ় না শোনায়, সে-চেষ্টাও করে।

দুঃখিত বা চমকিত হওয়া দূরের কথা, ভদ্রমহিলা যেন প্রীতই হলেন তড়িতের উক্তিতে, বললেন :

'হ্যাঁ, কথাটা যে না ভেবেছি তা নয়— আর মাঝে মাঝে জানেন, কেমন লোভও হয়।'

'লোভ?' গৌরী ব'লে ওঠে।

'হ্যাঁ, এই আশপাশে যখন লোকজনের চলে যেতে দেখি। এই দেখুন না আমাদের পাশের বাড়ীর, ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি, যাদের ঐ বক্সার কুকুরটা, কাল এঁদের শুনলাম ওরা নাকি ক্যানাডায় চলে যাচ্ছে।'

'চ'লে যাচ্ছে মানে?' তড়িতের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, চ'লে যাচ্ছে, মানে একেবারে চ'লে যাচ্ছে, একদম দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। দেশে ওদের ঘেন্না ধ'রে গেছে—ঘেন্না, ঘেন্না।'

সে-ঘেন্নাটা ভদ্রমহিলার নিজেরও কিনা, তা তাঁর কথার ধরন দেখেই বুঝতে বেগ পেতে হয় না। অর্ধবিস্মিত অর্ধ-নিস্পৃহের মত বলে তড়িৎ : 'সে কি?'

'বাঃ, আশ্চর্য হচ্ছেন? এমন তো আজকাল আকছারই হচ্ছে, কত লোকই যাচ্ছে, কেউ ক্যানাডায়, কেউ অস্ট্রেলিয়ায়, কেউ নিউজিল্যাণ্ডে, কেউ ইংল্যাণ্ডে, যেখানে সুবিধে পায়। আর সুবিধে পেলে কেনই বা লোকে থাকবে বলুন এই পোড়া দেশে, কী করতে? আপনি থাকবেন? আর তেমন-তেমন চেষ্টা করলে সুবিধে একটা কোনো হয়েও যায়, অসম্ভব কী আছে এই পৃথিবীতে।'

'সত্যিই তো, অসম্ভব কী আছে এই পৃথিবীতে', খানিকটা বিদ্রূপের মত আওড়ায় তড়িৎ।

'নিশ্চয়ই, অসম্ভব মনে করলেই অসম্ভব, আর সম্ভব মনে করলেই সম্ভব। সবই সম্ভব, সবই অসম্ভব, নয় কি? ভেবে দেখুন আমার কথাটা। এই যে আপনি গরমে বসে বসে পচছেন, এটা আপনি কেন করছেন? বলবেন, ফ্যানের তো হাওয়া আছে। হ্যাঁ, ফ্যানের আবার হাওয়া। আর দেখুন, এখনো তবু খাবার দাবার মিলছে, তাও কত কষ্ট করে, কিন্তু কিছুদিন বাদে সেটাও মিলবে না। তখন এই আঙুল চোষা।' বলে ভদ্রমহিলা তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ব্যঙ্গও করে তুলে দেখালেন।

তড়িৎ ও গৌরী আঙুলটার দিকে সভয়ে তাকায় — তাদের ভাবখানা যেন, ঐ তো আঙুল, আর তেমন পুষ্টও নয়, ওটা একবার চুষতে আরম্ভ করলে কতক্ষণই বা থাকবে। কাটে কয়েকটি শংকিত মুহূর্তের নীরবতা, শেষে বলে তড়িৎ :

'তাহলে আপনিও দেশ ছাড়ার সংকল্প করেছেন?'

'সংকল্প তেমন নয় — তবে বলছিলাম না, এত লোককে হরদম চলে যেতে দেখলে মনটা একটু খারাপ হয়ই, এমন কি প্রলোভনও জাগে, এই আর কি। এই দেখুন না, আমার জানাশোনার মধ্যেই, গত তিন-চার মাসে কম করে পাঁচ-ছটা পরিবারকে চলে যেতে দেখলাম। তাছাড়া এতদিন পর্যন্ত ইচ্ছে হলে বাইরে যাওয়ার পথ ছিল — এই দু'তিন বছর অন্তর অন্তর একবার ইউরোপ ঘুরে এলাম বা আমেরিকা ঘুরে এলাম, সেটা সম্ভব হত। কিন্তু এখন? সে-গুড়ে বালি, একেবারে বালি, বুঝলেন?'

চুপ ক'রে বসে থাকে দুজন, কী বলবে ভেবে পায় না—ভদ্রমহিলাই বলেন আবার :

'আচ্ছা, আপনারাও তো এককালে ইউরোপে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তা ছিলাম', বলে তড়িৎ। 'কিন্তু সে অনেককাল আগের ব্যাপার।'

'আর ফিরে যান নি?'

'হয়ে ওঠেনি।'

'কেন, যেতে ইচ্ছে নেই?'

'না, ইচ্ছে নয়, সে-কথা নয়।' প্রসঙ্গটা চালাতে ইতস্ততঃ বোধ করে তড়িৎ বলে আবার :

'থাক, আপনার কথা বলুন। কোথায় যাবেন, মানে দেশ যদি ছাড়েনই।'

'কোথায় আর যাব! বলছিলাম না, থেকে থেকে লোভ জাগে, ঐ পর্যন্তই। শেষে হয়তো দেখবেন এখানেই পচে মরতে হল। আবার বলা যায় না, যদি কপালে থাকে, হয়তো একদিন হুট করে পালিয়েও

গেলাম। জানেন, কাল ওদের জ্যানাডার ব্যাপারটা শুনে সারারাত ক্যান.ডার স্বপ্ন দেখলাম। গিয়েছেন কখনো?'

'না।'

'আমিও যাইনি। খবরটা পেয়েই ওদের বাড়ীতেও যাই একবার, অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। ভাবছিলাম হয়তো বক্সারটাকে ওরা সংগে না নিয়েও যেতে পারে, তাহলে কুকুরটা আমরাই নিয়ে নিই। দেখেছেন কুকুরটকে?'

'দেখেছি হয়তো, লক্ষ্য করিনি,' ভাবার চেষ্টা করে বলে তড়িৎ, তাকায় গৌরীর দিকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব দেখেছি', গৌরী বলে ওঠে, 'প্রায়ই ঘুরতে দেখি রাস্তায়। কুকুরটা সম্বন্ধে আমার তেমন কোনো আপত্তি নেই, দেখতে কেমন যেন একটু হোমদামুখো।'

'তা তো হবেই'। বলেন মিসেস রায়, 'নইলে বক্সার কেন। কিন্তু জানেন, ভয়ংকর শক্তিশালী কুকুর, এবং তেমনি কামড়ের। ওরকম একটি কুকুর থাকলে আপনাদের ঐ চুরিটা কি হতে পারত? কিছুতেই হত না।'

'তা অবশ্য সত্যি,' তড়িৎ জানায়।

'আর কুকুরটার সম্প্রতি দুটো বাচ্চাও হয়েছে, জানেন? অবশ্য দুটোর বেশিই হয়, হয়তো ওরা একে-ওকে দিয়ে দিয়েছে, এখন দুটোয় এসে ঠেকেছে। গেটটার সামনেই এখনো কখনো পড়ে থাকে, দেখেন নি?'

'না তো।'

'ও মা, কী মিষ্টি কী মিষ্টি, একেবারে তুলতুলে, ঐ দুটোর ওপরই আমার নিজের লোভ। ইচ্ছে হয়, ধরে খুব কাছে আদর করে নিই। ওরা হাঁটে কীভাবে জানেন? [illegible]' বলে ভদ্রমহিলা চেয়ার ছেড়ে উঠে কার্পেটের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে অনুকরণ করলেন। পরে ফের চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। পরক্ষণেই যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে, বললেন:

'[illegible] লোমওয়ালাটা দেখেছেন? সেটা একেবারে আশ্চর্য!' বাচ্চা আমার কার্পেটটা হামাগুড়ি দেওয়া, এবারে [illegible]। আবার ভদ্রমহিলার চেয়ারে ফিরে আসা এবং হাসিতে গড়িয়ে পড়া—খিলখিল খিল-খিল, খিলখিল খিলখিল।

হঠাৎ দরজার বেলটা বেজে উঠল। গৌরী চকিতে তাকাল তড়িতের দিকে—তড়িৎ জানল, আবার [illegible] উঠিতে উঠিতে মনে হল তার, এভাবে হুট করে কোনো বাড়ীতে আসে কেন, আগে কোনো খবর না দিয়ে? অন্তত একবার ফোন করেও আসতে পারে। কিন্তু সে তো বিরক্ত হবে না, তারা তো আজ বিরক্ত হবে না—দুটি যথাসম্ভব শান্ত, সংযত ও প্রফুল্লভাবে দরজা খুলল তড়িৎ। খুলেই দেখে, আকবর ও আখতার দুই ভাই। স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে সে বলে ওঠে:

'এ কি, আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমাদের!'

এ-রকম দুটি সাধকের দর্শন পাওয়া সব সময়ই সৌভাগ্যের কথা। দুই ভাই প্রখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়ে, গায় একসঙ্গেই—বয়স অল্প হলেও এরই মধ্যেই অর্জিত কীর্তি তাদের অসামান্য। চোখে-মুখে সাধনার দীপ্ত জ্যোতি, ব্যবহারেও তেমনি অমায়িক, ভদ্র।

'আপনারা বেরোচ্ছেন না কোথাও তো, বিরক্ত করলাম না?' মিষ্টি হেসে আকবরের প্রশ্ন।

'না না', বলে তড়িৎ, 'কোথাও বেরোচ্ছি না, অন্তত এখন নয়। আসুন।'

ঘরে ঢুকেই দুই ভাই গৌরীকে হাত জোড় করে নমস্কার করল। গৌরীর মুখে বিস্ময় ও আনন্দের ছাপ।

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই' তড়িৎ বলে, 'ইনি হলেন মিসেস রায়, আমাদের পাড়াতেই থাকেন।' পরে মিসেস রায়ের দিকে চেয়ে: 'আর এই দুই ভাই—এঁদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন, গানও শুনেছেন, হয়তো দেখেছেনও আগে— আকবর হোসেন খাঁ ও আখতার হোসেন খাঁ।'

'ও', বলেন মিসেস রায় 'নমস্কার।' তাঁর গলার স্বর শুনে মনে হয়, হয়তো এদের নামের সংগে তিনি পরিচিত নন। আবার বলেন ভদ্রমহিলা: 'আপনারা গান করেন?'

গৌরীই উত্তর দেয়: 'হ্যাঁ, বিখ্যাত ধ্রুপদ গাইয়ে, হোসেন খাঁর ঘরানা। শোনেন নি আগে? শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়, শুনেছি বৈকি' তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন ভদ্রমহিলা।

'আমরা শুধু এসেছিলাম ধন্যবাদ জানাতে, সেদিনকার জন্যে', একবার গৌরী একবার তড়িতের দিকে চেয়ে বলে আখতার। 'বেশিক্ষণ বসব না।'

'কোন দিনকার জন্যে?' তড়িৎ জানতে চায়।

'যেদিন কুন্তলা ব্যানার্জিকে নিয়ে [illegible]।'

'তার জন্যে ধন্যবাদ? ধন্যবাদ তো আমাদেরই দেওয়ার কথা। কেমন একটি গানের সন্ধ্যা কাটল বলুন তো?' পরে মিসেস রায়কে উদ্দেশ করে বলে তড়িৎ: 'সেদিন এঁদের এক বন্ধু, বোম্বাই থেকে এসেছিলেন—কুন্তলা ব্যানার্জি, হেমন্ত খাঁর ছাত্রী। তিনি এঁদের গান শুনতে চান, এঁরা তখন ভদ্রলোককে সংগে করে এখানে চলে আসেন—এই সন্ধ্যে ছটা নাগাদ, তারপর গান চলে রাত বারোটা পর্যন্ত।'

'আপনাদের খুব কষ্ট দিই সেদিন, [illegible] কাহব, ওভাবে শুনতে শুনতে নিশ্চয় মাথা একটা হয়ে গিয়েছিল?'

'এই দেখুন, আবার ঐ এক কথা। কষ্ট নয়, আনন্দ। ভাগ্যিস সেদিন আমাদের বাইরে বেরোনোর কথা ছিল না। ট্যাক্সি করে হঠাৎ আপনাদের আসতে দেখে চমকে উঠেছিলাম।'

'আগে তো জানাতে পারিনি', আখতার বলে। 'ভদ্রলোক হঠাৎ এমন জেদ ধরে বসলেন—তখন কোথায় যাই। আমাদের বাড়ীতে ধীরেসুস্থে বসবার জায়গা নেই, জয়পুর থেকে কাকা সপরিবারে এসে হাজির হয়েছেন। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে—কিন্তু সব জায়গায় গান-টান ঠিক জমে না। আপনার কথা মনে হল, তাই সংগে সংগে চলে এলাম।'

'সে কি কথা, বেশ করেছেন, ধন্য করেছেন আমাদের। কিন্তু গৌরী, এঁদের একটু চা খাওয়াও অন্তত।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই', হেসে বলে গৌরী, উঠতে যায়।

'না না', প্রতিবাদ করে বলে উঠে আকবর, 'আপনি উঠবেন না। চা-টার কোনো দরকার নেই, আমরা এখুনি যাব।'

'নিশ্চয় দরকার আছে', গৌরী উঠতে উঠতে বলে, 'আপনারা না খেলেও আমরা খাব। আর আমি উঠছিও না, শুধু লোকটিকে চা করতে বলে আসছি।'

গৌরী চলে যেতেই নীরবতা নেমে এল ঘরে। কয়েক মুহূর্ত পরে ভদ্রমহিলা বললেন:

'এবার আমি উঠি।'

তড়িৎ বলে: 'এখুনি যাবেন? চা টা খেয়েই যান না—এক মিনিটের ব্যাপার।'

ভদ্রমহিলা আবার [illegible] হয়ে বসেন, ঘড়ি দেখেন, বলেন:

'বাবা, চারটে বেজে গেছে!'

'বাজুক না। এখন তো তেমন কিছু করবার নেই, আছে কি?'

'না, পাঁচটা নাগাদ একবার বেরোব ভাবছিলাম। তার আগে বাড়ীতে ফিরতে হবে, কিছু কাজও আছে।'

গৌরী ফিরে আসে। হঠাৎ মিসেস রায় বলে ওঠেনঃ

'তো বসে থাকতে থাকতে অন্তত একটু গান হয়ে যাক না এ'দের?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু একটুখানি, দয়া করে' কাতর অনুনয়ের সুরে গৌরী বলে দুই ভাইকে।

ভালোই তো, আজকের বার্ষিকীটা তাহ'লে কাটবে বেশ, মনে হয় তড়িতের। সেও বলেঃ

'চমৎকার। হ'য়ে যাক ভাই।'

দুই ভাই বিড়ম্বিত চোখে এ ওর দিকে তাকায়। গৌরী বলেঃ

'ঐ চা এসে গেছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন আগে।'

ভদ্রমহিলা বলেনঃ 'আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।'

'কতক্ষণ বসতে পারবেন?' আকবর জানতে চায়।

'এই ধরুন মিনিট দশেক।'

'বেশ, তার মধ্যেই করছি।'

'চা-টা খেয়ে নিন', তড়িৎ বলে।

চা শেষ হ'লেই আকবর তড়িৎকে অনুরোধ করেঃ 'তানপুরাটা তাহ'লে একটু দয়া ক'রে আনুন।'

'নিশ্চয়ই' ব'লে তড়িৎ উঠে যায়। এককালে তড়িতের বড় গান শেখার শখ ছিল, আজ শুধু তানপুরাটাই বাড়ীতে আছে। চাকরি, পড়াশুনো, সাহিত্যসাধনা, এতেই সময় কুলিয়ে ওঠে না, গানের চর্চা করবে কখন? একটা কিছু বেছে নিতেই হয় জীবনে আর সব বর্জন করতে হয়।

তানপুরা নিয়ে তার ঘরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা আকবরকে প্রশ্ন ক'রে উঠলেনঃ

'আপনারা কি একসঙ্গে গান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ডুয়েট?'

'দেখবেন', বলে গৌরী, 'এ এক ভারী অদ্ভুত গায়ন পদ্ধতি। একসঙ্গে একজনই গান করেন, যেই তিনি ছাড়েন, অন্যজন ধরেন। দুজনের মধ্যে এই ধরা ও ছাড়ার খেলা সমানে চলতে থাকে।'

তানপুরা বাঁধা হ'তে থাকে, এবং অচিরেই আকবর আলাপ সুরু করে প্রথমে। মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকে তড়িৎ ও গৌরী, ভদ্রমহিলাও থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে রদ্যাঁর খোদিত ভাবুকের মূর্তির মত নিশ্চল থাকেন। কেবল হঠাৎ একটু নড়েচড়ে বসেন তখন, যখন ওরা দ্রুত লয়ে গমক আরম্ভ করে। অভ্যাস না থাকলে গলার ঐ রকম হঠাৎ অদ্ভুত আওয়াজে চমকাবারই কথা। দশ মিনিটেই তাড়াহুড়ো করে আলাপ শেষ হয়, ঘরটা গম-গম করতে থাকে।

নীরবতা ভঙ্গ করে গৌরীই, বলে মিসেস রায়কেঃ

'দশ মিনিটে এই যা শুনলেন, এটা ভালো ক'রে করতে গেলে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগে।'

'ভারী আশ্চর্য, সত্যি', বলেন মিসেস রায়।

'কী রাগ বলুন তো? ঠিক ধরতে পারলাম না', আকবরের দিকে তাকিয়ে জানতে চায় তড়িৎ।

'মেঘ।'

'আশ্চর্য', তড়িৎ ও গৌরী একসঙ্গে ব'লে ওঠে।

হঠাৎ ভদ্রমহিলার প্রশ্নঃ 'আচ্ছা, উজ্জ্বলা মিত্রের গান আপনাদের কেমন লাগে?'

প্রশ্নটা কাকে, সেটা বাকী চারজনের কেউই বুঝতে পারে না এ ওর মুখের দিকে তাকায়। নামটা আগে শুনেছে ব'লে মনে হচ্ছে না, খানিকটা বিমূঢ়ের মত জানতে চায় তড়িৎঃ

'উজ্জ্বলা মিত্র?'

'হ্যাঁ, সে কি, নাম শোনেন নি? আজ-কালকার একজন প্রচণ্ড গাইয়ে—রেডিও, রেকর্ড, সভা-সমিতিতে, সর্বত্র গান করেন।'

'কী গান করেন?' আবার তড়িতের প্রশ্ন, ঐ একই বিমূঢ়ের মতই।

'আধুনিক বাংলা গান। বোধহয় ভজন-টজনও করেন।'

'ও। তবে আধুনিক গানের ঠিক খোঁজ খবর আমরা তেমন কেউই রাখি না, বুঝলেন।'

'সম্প্রতি ও'র একটা রেকর্ড বেরিয়েছে—গানটা হ'ল চাঁদের ঢেউয়ে মাতাল হ'য়ে মন লুটোপুটি খায়।' কী ভীষণ সুন্দর যে কী বলব। পুজো-টুজোর সময় লাউডস্পীকারে শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

কী বলার আছে? সবাই চুপ। শেষে ভদ্রমহিলাই বলেনঃ

'আমার মেয়ে রিণি ওটা এত সুন্দর তুলেছে একেবারে অবিকল। শুনলে ধরতে পারবেন না উজ্জ্বলা মিত্র গাইছে না আমার মেয়ে গাইছে। শুনবেন একদিন এসে।'

এবারও সবাই চুপ, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে গৌরীকে বলতেই হয়ঃ

'হ্যাঁ, নিশ্চয়—তাকেও আজ আনতে পারতেন সঙ্গে করে।'

'ঐ যাঃ', হঠাৎ ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ান, 'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ রিণিরও আবার একটা পার্টি আছে, বন্ধুর বাড়ীতে। আমাকে উঠতেই হয়। চলি।' ব'লে গায়ক দুই ভাইয়ের দিকে চেয়েঃ 'খুব ভালো লাগল, সত্যি। নমস্কার।'

ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যান, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় তড়িৎ। ফিরে আসতেই আকবর-আখতারও উঠে দাঁড়ায়, বলেঃ

'আমরাও চলি। আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করলাম।'

'আবার ঐ সময় নষ্টের কথা', বলে তড়িৎ। 'দেখুন তো, আপনাদের কী ক'রে বোঝাই আপনাদের সঙ্গ সব সময়ই একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের কথা।'

'আগামী শনিবার আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে জগন্নাথ ইনস্টিটিউটে' আকবর বলে। 'আসবেনই কিন্তু, কার্ড রেখে যাচ্ছি।'

'নিশ্চয় আসব', বলে তড়িৎ।

'আপনিও আসবেন', আখতার বলে গৌরীকে।

'কিন্তু আমি তো সেদিন থাকছি না, উনি যাবেন', গৌরী একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে উত্তর দেয়, এবং হঠাৎ যেন কেমন একটু অন্যমনস্কও হ'য়ে পড়ে।

'ও', বলে আকবর, 'বাইরে কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

'নমস্কার।'

আবার দরজা পর্যন্ত আসে তড়িৎ, ওদের রাস্তায় নামবার আগে বলেঃ

'খুব ভালো লাগল, সত্যি—খুব, খুব ভালো লাগল।'

ঘরে ফিরে এসে দেখে, গৌরী চুপ ক'রে ব'সে আছে মাটির দিকে তাকিয়ে, দুই গাল দুই হাতে ধ'রে।

'তোমার ট্রেন তো সাতটা পঞ্চাশে না?' তড়িতের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ', দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে গৌরী।

ধীরে এগিয়ে আসে তড়িৎ, গৌরীর চিবুকটা সস্নেহে তুলে ধ'রে বলেঃ

'সাহস, রাণী সাহস। কাতর হ'লে তো চলবে না। আমরা তো কেউ কাতর হব না, তা কি ঠিক করিনি আগেই?'

চুপ ক'রে থাকে গৌরী তার মুখটায় যেন বৃষ্টিধৌত সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণীর স্নিগ্ধতা নামে, হাসার চেষ্টা করে। আবার বলে তড়িৎঃ

'জানো রাণী, সাহসই এ জীবনে সব, সাহসের মধ্যে দিয়েই মানুষের সকল প্রচেষ্টা অর্থ পায়। যে-জীবনে সাহস নেই সে-জীবনে জীবনই নেই। সেটা ফসিল হ'য়ে গেছে।'

'এখনো রাণী ব'লে কেন ডাকছ। আজ আমার কোনো সম্পদ নেই, সর্বহারা হ'তে চলেছি ভিখিরীরও অধম।'

'ছি, কে বলে তুমি ভিখিরীরও অধম! যে-সাহসের অধিকারী তুমি আজ করেছ নিজেকে, তা তোমার মাথায় পরিয়েছে অমূল্য মুকুট। সম্পদটাই কি সব গৌরী? সম্পদ যে বাঁধন, তাতে যে কেবলি সীমার সুর—কিন্তু সর্বহারা হওয়া, আদিগন্ত মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়ানো, তার থেকে বড় গৌরব আর কী আছে। তখন সমস্ত পৃথিবীটা যে তোমার পায়ের তলায়। থাকগে, এসব কথা তোমাকে আমার বলা কেন আজ, একথা তো তুমিই আমাকে এতদিন ধরে শিখিয়ে এসেছ, পলে পলে তুমি উন্নীত করেছ আমায়, আমায় তোমার সাহসের যোগ্য ক'রে তুলেছ। তুমি তাই রাজ-রাজেশ্বরী, তুমি রাণী, তুমি গৌরী আমার। নয় কি?'

ধীরে ধীরে হাসি ফিরে আসে গৌরীর মুখে, বলেঃ

'কিন্তু আমি একলাই তোমাকে যোগ্য করিনি, তুমিও আমায় তোমার যোগ্য ক'রে তুলেছ। একলা হ'লে আমি কিছুই পারতাম না, জড় হয়ে প'ড়ে থাকতাম।'

তড়িৎ কথা না বলে চেয়ে থাকে গৌরীর চোখে। হঠাৎ গৌরী বলেঃ

'যাই, পাঁচটা বাজল, একটু পরিষ্কার হ'য়ে নিই—এই ঘামে প্যাচপেচে শরীর আর সহ্য হয় না।'

'হ্যাঁ, চল, আমিও একটু পরিষ্কার হ'য়ে নিই—ধীরে-ধীরে মেঘ জমছে, হয়ত দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি হ'য়ে এখনি একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আসবে। ভাবছি, গা-টাই ধুয়ে নিই।'

দুজনে যে যার বাথরুমে চ'লে যায়। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পরিষ্কার হ'য়ে জামা-কাপড় বদলে তড়িৎ তৈরি। ভাবে, একবার দেখে আসা যাক তো, গৌরীর বাক্স-বিছানা সব বাঁধা-টাধা হয়েছে কিনা। বাঁধা অবশ্য আজ সকালেই হয়েছে, তা জানে তড়িৎ, কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে, হয়ত কোন একটা নতুন জিনিসের কথা হঠাৎ মনে পড়েছে গৌরীর, যেটাকে সে এখন বাক্সে পুরতে চায়, বা বেডিং-এ ঢোকাতে চায়।

তাদের শোবার ঘরে নয়, অন্য যে-আরেকটা ঘর, সে-ঘরে গিয়ে তড়িৎ দেখে গৌরী উপুড় হ'য়ে বিছানায় শুয়ে আছে, ডান হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে। ঘরটা বাড়তি, বাইরে থেকে আত্মীয়স্বজন বা অতিথি এলে কাজে লাগে—একটা খাটও আছে তাই, যে খাটের বিছানার ওপর এখন গৌরী শুয়ে। খাটের পাশেই একটু দূরে ও মেঝের ওপর, প'ড়ে রয়েছে একটা ছোট বেডিং—বাঁধা, তৈরি — ও দুটো মাঝারি গোছের সুটকেশ। এখনও শাড়ী বদল করে নি গৌরী, নিশ্চয় বাথরুমেও যায় নি, মনে হয় তড়িতের। বলে ঃ

'এ কি, তুমি এখনো তৈরি হ'য়ে নিলে না? সন্ধ্যের তো আর দেরী নেই।'

কোন উত্তর নেই, একভাবে প'ড়ে থাকে গৌরী। কাছে এগিয়ে আসে তড়িৎ, গৌরীর মুখটাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করে। অল্প আয়াসেই গৌরী মুখ ফেরায় এবং দেখে তড়িৎ, সে মুখ সেই জানলার কাঁচের মত যার উপর কিছুক্ষণ আগেই বহু বৃষ্টি হ'য়ে গেছে।

'কাঁদছ?' সবিস্ময়ে বলে তড়িৎ। 'সেটাই তোমার রাণী সাহস, সাহস। এভাবে তোমার পরীক্ষাটাকে, তোমার-আমার এই দুজনের পরীক্ষাটাকে ক্রমশই আরো শক্ত ক'রে তুলো না।'

এবারও গৌরীর উত্তর নেই, কিন্তু সে উঠে বসে।

'কেন কাঁদছিলে তুমি?' আবার তড়িৎ জানতে চায়।

'কেন কাঁদছিলাম, তা না জেনেই। মনটা হয়ত সব নয় তড়িৎ, ঐ সাহসটাই সব নয়, হয়ত আরো আছে।'

'নিশ্চয়ই আছে, এবং তার সংগে আমাদের মনের যুদ্ধ করতেই হবে সব সময়, আর তাইতেই তো বলিষ্ঠ জীবনের সৌন্দর্য।'

'কী সেই সৌন্দর্য, কী দরকার সেই যুদ্ধের, সেই সাহসের?'

'তবে তাই যদি তুমি চাও রাণী তো থাক, এসবের কোন দরকার নেই—চল একই চেনা পথে চলতে থাকি আবার, যতদিন বাঁচি, যতদিন না মরি। বল, তাই তুমি চাও?'

'আসলে আমি যে কী চাই তড়িৎ, তাই জানি না। হঠাৎ মনে হচ্ছে, যেন এক বিশাল অন্ধকারে প্রবেশ করছি, আর আমার চাওয়ার কিছু নেই।'

'তবে এতদিন ধ'রে কেন চেয়ে এসেছ, সেই প্রার্থিতের জন্যে আমাকেও উদ্বুদ্ধ করেছ? বোধহয় সব যাত্রারই শেষ মুহূর্তে একটু ক্ষণিকের দুর্বলতা আসে, এটা তোমার সেই দুর্বলতা — হয়ত এটাই স্বাভাবিক। হয়ত এটাকে তুমি এখুনি কাটিয়েও উঠবে।'

'শেষ মুহূর্তে'! শেষ ব'লে কিছু আছে কি তড়িৎ?'

'বড় অর্থে নেই। জীবনটাকে, অস্তিত্বটাকে, যদি অখন্ডভাবে নাও — এবং সেই অখন্ডতাটাই একমাত্র চরম সত্য রাণী, গৌরী আমার — তাহ'লে শেষ নেই, শেষের কোন অর্থও নেই। কিন্তু তাহ'লে আরম্ভও নেই, শুধু আছে একটা অনাদি অনন্ত বর্তমান, যা বৃত্তাকার, যা কোন বিন্দুতে আরম্ভ হ'য়ে কোন বিন্দুতে শেষ হয় না। আবার অন্যদিকে রাণী, ছোট অর্থে, এক ব্যবহারিক অর্থে শেষ আছে, সারা জীবনটাই শুধু অনন্ত শেষের সমষ্টি, কেবলি পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তরে যাওয়া — শেষ না থাকলে উত্তরণও সম্ভব নয়, কারণ কোত্থেকে কোথায় উত্তরণ?'

একটু থেকে ধীর স্বরে বলে গৌরী ঃ

'হ্যাঁ, শেষ আছে, মানছি। এবং সেইটে ভেবেও, বরং একমাত্র সেইটে ভেবেই হঠাৎ কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট আমারও হচ্ছে রাণী, বিশ্বাস কর—কিন্তু যাতে প্রাণপণ প্রচন্ড কষ্ট নেই, তাতে প্রাণপণ প্রচন্ড মুক্তিও নেই। আছে কি?'

'শেষ, শেষ, শেষ—শুধু শেষ! আর দ্যাখো এই শেষের দিনটায়, তোমার-আমার এই সর্বশেষ দিনটায়, দুজনে একটু একলা থাকতে পারলাম না। ভদ্রমহিলা কী সময় নষ্ট করলেন, কী আজে-বাজেই না ব'কে গেলেন।'

'ও,' মৃদু হেসে বলে তড়িৎ, 'তাই দুঃখ করছ তুমি? কিন্তু সেটাতে তো তোমার দুঃখ পাওয়ার কথা নয়, কারণ সেটা তো তোমার কর্ম নয়, তোমার বা আমার আয়ত্তের মধ্যেও নয়, সেটা যে শুধু বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। একটা নিছক বাইরের জিনিসকে এতটা প্রাধান্য না হয় আমরা নাই দিলাম গৌরী। আর আজে-বাজেই বা কেন? সব নিয়েই দিন, সব নিয়েই রাত্রি, সব নিয়েই জীবন—এখানে সকলেরই স্থান আছে। ভালই তো, ভদ্রমহিলা এলেন, সময় নষ্ট করলেন, বাজে বকলেন—কিন্তু তাতে আমাদের একলা থাকার মানসিক মুহূর্তটাকে আমরা বিচলিত হ'তে দেব কেন? আমাদের মুহূর্তের আমরাই কর্তা—বিচলিত হলাম ভাবলেই বিচলিত হয়েছি। নইলে নয়।'

চুপ ক'রে থাকে গৌরী, তড়িৎ আবার বলে ঃ

'তা ছাড়া আকবরও এল, আখতারও এল। না, আমাদের এই শেষ দিন নষ্ট হয় নি রাণী, আমাদের কোনদিন কখনো নষ্ট হয় নি — তোমার-আমার দুজনেরই গলায় পরিপূর্ণতার মালা। চল গৌরী, ওঠো, একটু পরিষ্কার হ'য়ে নাও।'

মুহূর্তের মধ্যে গৌরী যেন আবার আকুল হ'য়ে ওঠে, দু হাতে নিজের বুক-টাকে চেপে ধরে, মাথা নীচু করে। মুখটা তুলতে গিয়ে দেখে তড়িৎ, চোখ দিয়ে কান্নার স্রোত অবাধ্য আবেগে ঝ'রে পড়ছে।

...গৌরী উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে

কোন গহনের থেকে বেরিয়ে আসছে এই প্রস্রবণ। বলে তড়িৎ :

'ওকি, আবার—আবার?'

হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, গৌরীর বুকের মাঝখানে ব্লাউজ থেকে কী একটা কাগজের মত অংশ বেরিয়ে রয়েছে।

'ওটা কী?' জানতে চায় তড়িৎ।

গৌরী বুক থেকে তুলে জিনিসটা তড়িতের হাতে দেয়। জিনিসটা যে কী, তা ভাল ক'রে দেখার আগেই বুঝতে পারে তড়িৎ। বলে :

'ও, তবে এই ফটোটাকে জাপটে ধ'রেই এতক্ষণ কাতরাচ্ছিলে তুমি? কিন্তু কেন গৌরী, আবার কেন? আর ফটোরই বা দরকার কী, এ-দুঃখ তো এমনিতেই সারা-জীবনের সঙ্গী।'

চোখ দিয়ে সমানেই জল পড়তে থাকে গৌরীর, আবার বলে তড়িৎ :

'একটা গল্প বলি তোমায়, শুনবে? এক ছিল মা, আর এক ছিল......' বলতে বলতে তার নিজেরই গলাটা ধ'রে আসে: দিনের আলো ইতিমধ্যেই ম্লান, ঘরে তো প্রায় অন্ধকার — বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। নিজেকে সংযত ক'রে নেয় তড়িৎ, বলতে থাকে :

'এক ছিল মা, আর এক ছিল বাবা। আর তাদের এক ছিল ছেলে, একটিমাত্র সন্তান। এমন একটি আশ্চর্য সুন্দর ফুটফুটে ছেলে বোধহয় কারুর ঘরে কখনো জন্মায়নি। পাখির মত তার গলার স্বর, চাঁপার কলির মত আঙুল তার। আর সে কী দুষ্টু দুষ্টু চোখ ছেলেটার, তার মুখে সে কী স্বর্গীয় এক হাসি। তারপর একদিন কোথা ঝড় উঠল কোথায়, আর ছেলেটা হারিয়ে গেল, তার মা-বাবার কোল ছেড়ে চিরকালের জন্যে চ'লে গেল। না না গৌরী, চ'লে গেল নয়, কথাটা মুখে আনতে ভয় পাচ্ছি কেন— এখনো ভয়? এই পাঁচ বছর পরেও? ছেলেটা ম'রে গেল গৌরী। আর সে চোখ চাইবে না, আর সে হাসবে না, আর সে.........যাক গে যাক গে যাক গে গৌরী, এ কী পৈশাচিক খেলা খেলছি আমি এখন! সনু ম'রে গেছে গৌরী, ঐ ফোটোটাতেও সে আর নেই, সে আজ তোমার এই চলে যাওয়ায় নেই, আমার পড়ে থাকায় নেই, এই টিপটিপ বৃষ্টির আসন্ন সন্ধ্যায় নেই। তখন তার বয়স ছিল চার বছর, আজ বেঁচে থাকলে হত ন'বছরের কিশোর।'

'সনু, সনু, বাবা আমার,' ধীর অস্ফুট স্বরে বলতে থাকে গৌরী।

'তারপর,' তড়িৎ আবার শুরু করে— সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ এক নট, দাঁড়িয়ে একাকী এক রঙ্গমঞ্চের ওপর, সামনের শ্রোতৃবৃন্দ অন্ধকারে বিলুপ্ত—'তারপর সেই মা-বাবার আর কোনো সন্তান হল না, তাদের আর সন্তান হওয়ার উপায়ও নেই, জানা গেল। আর সন্তান হ'লেই বা হত কী? যে গেল সে তো গেলই, সে তো আর ফিরে আসবে না, তার শূন্য স্থান কেউই পূরণ করবে না। এমনি কত ফাঁক রয়ে গেছে পৃথিবীতে, যুগযুগান্তর ধ'রে নিত্যনতুন ফাঁকের সৃষ্টি হচ্ছে—বড় বড় গর্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে রাণী, সেই রকম একটা গভীর গর্তে আমরা দুজনে প'ড়ে যাই, চ'লেযাওয়া সনুর দুঃসহ স্মৃতি আমাদের দিন-রাত্রি-অন্ধকার পাগল ক'রে তোলে, প্রতিটি মুহূর্তে চাবুক মারে। যখনই একজন আরেকজনকে দেখি, সে-চাবুক শপাং ক'রে নামে আমার চোখে, তোমার চোখে। যেন একজন আরেক-জনের কাছে একটা প্রকাণ্ড দোষ ক'রে ফেলেছি, তাই চোখাচোখি হ'লেই কী দারুণ দাবানলে জ্বলতে থাকে দুজনের অন্তর। সে-আগুনের কথা তুমি জানো গৌরী, আমিও জানি, এই মুহূর্তেই তার প্রচণ্ড আঁচ পোড়াচ্ছে আমায়।'

ব'লে তড়িৎ থেমে যায়। পরে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ, কারুর কোনো কথা নেই—ধীরে ধীরে বল ফিরে আসে গৌরীর, কখন সে ম্লান হেসে বলে :

'তারপর? গল্পটা শেষ করলে না তো?'

'বাকীটা তুমিই বল।'

'তারপর,' এবার গৌরীরও স্বর উঁচু তারে বাঁধা স্বগত সংলাপের সুর নেয়, 'তারপর সেই চাবুকেই, সেই দুঃখই হয়ে দাঁড়ায় দু'জনের মিলিত জীবন। অবশেষে একদিন তারা ঠিক করল, দু'জনে দুদিকে চ'লে যাবে—অথবা একজন চ'লে যাবে, অন্যজন থাকবে। তারা ভিতরে ভিতরে ক্ষ'য়ে আসছিল, যেন মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরেছে তাদের—তাই আরো একবার চেষ্টা ক'রে দেখবে, নতুন ক'রে জীবনটাকে গড়া যায় কি না।'

'বাঃ, এই তো বেশ বলছ রাণী, তুমি আবার তোমাতে ফিরে আসছ। এ ছাড়া সত্যিই উপায় ছিল না আমাদের। তা ছাড়া কী অজ্ঞ মূঢ় সেই বহুপ্রচলিত বচন যা চিরকাল ব'লে এসেছে, ভাগ ক'রে নিলে আনন্দ বাড়ে, শোক কমে? অন্তত শোকের বেলায় আমাদের জীবনে তো ঠিক তার উল্টোটাই সত্য প্রমাণিত হ'ল। তাই তুমি আমার শোকের কাছে আমাকে এবার এমন সম্পূর্ণ একলা ক'রে ছেড়ে দিতে চাও, যেমন তোমাকেও ছাড়তে চেয়েছি আমি-- ভিন্নভাবে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে এবার সেই শোকের সঙ্গে, পরস্পরের প'ড়ে থাকা জীবনটার সঙ্গে। জীবন জানো রাণী, তা শূন্য পৃষ্ঠায় ভরা একটা বইয়ের মত, তাতে আমরা যা লিখব, তাই লেখা হবে। এ এক উত্তরণের মুহূর্ত, যেমন তোমার, তেমনি আমার—আজকের এই অন্য মুহূর্তটি। প্রার্থনা কর, যেন দু'জনেই উত্তীর্ণ হই।'

ধীর পদে অদৃশ্যে পা ফেলে সন্ধ্যা নেমে আসে, বেশ কয়েক মিনিট নীরবে কাটার পর গৌরী বলে :

'ভালো ক'রে থেকো। আমার যাবার সময় হ'য়ে এল।'

'ভেবো না, সবই রইল, সবই থাকবে। মানুষের পা দুটো মাটির সঙ্গে বাঁধা, আর এই মাটিটা এত সীমাবদ্ধ পৃথিবীর যে হারিয়ে যাবে কোথায়? যতক্ষণ বেঁচে আছ, হারানোর, মানে সম্পূর্ণ ক'রে নিজেকে হারানোর জায়গা নেই।' পরে কী মনে ক'রে একটু হেসে বলে তড়িৎ, 'ধর, মিসেস রায়ের মত যদি একদিন ক্যানাডাতেও পালাতে ইচ্ছে করে, তবু হারিয়ে যাবে না। আর এটাও কম বড় ট্র্যাজেডি নয় জীবনের—এই হারিয়ে যেতে না পারা।'

'আর আমার সম্বন্ধেও ভাবনা কোরো না, আমিও করি না—কারণ আমারও হারানোর জায়গা নেই। অবশ্য কার্সিয়াঙে না গিয়ে না হয় আমিই ক্যানাডায় চ'লে যেতে পারতাম, তোমাকে এখানে রেখে— সেটা আরো দূর হত, ঐ পর্যন্তই। এবং ইস্কুল মাস্টারিটাও পেয়ে গেছি—না, ভাবনা নেই।'

আবার খানিকক্ষণ নীরবে থাকার পর তড়িৎ বলে :

'এবং যেতে তোমার ইচ্ছে করছে?'

'ইচ্ছে করেই যাচ্ছি তড়িৎ, নিজেই নিজেকে তাড়াচ্ছি। এবার এসো, সোনা আমার, মানিক আমার, তড়িৎ আমার, এসো আমার হাতে হাত দাও এই অন্ধকারে— আমরা আমাদের সব কথা কতবার বলেছি নিজেদের, আর কিছু বলব না। এসো, হাত দাও, চুপ ক'রে দু'জনে ব'সে থাকি কিছুক্ষণ, অ্যাঁ? তারপর আমি উঠব, পরিষ্কার হব।'

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

কালিদাস নাগ

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালিদাস নাগ এক অবিস্মরণীয় নাম। দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বাণী বহন করে তিনি ভারতের বাইরে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ, ৭৪ বছর বয়সের এই জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষীর দেহাবসানে সেই অংশটুকু শূন্য হয়ে রইল।

ডঃ নাগের পিতৃদেব মতিলাল নাগ মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ ছিলেন, হয়ত সেই সূত্রেই কালিদাস নাগের শিক্ষার প্রথম দিকটা শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করার সুযোগ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-ছায়ায় মানুষ কালিদাস নাগ নিজের জীবনটাকে গুরুদেবের আদর্শ শিষ্য হিসাবেই গড়তে পেরেছিলেন, সেই তাঁর কৃতিত্ব।

তরুণ অধ্যাপক কালিদাস নাগ যখন স্কটিশ চার্চের ইতিহাস অধ্যাপক, সেই সময় তাঁর ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন পৃথিবীখ্যাত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। তিনি তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফী অফ অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান' নামক গ্রন্থে অধ্যাপক নাগ সম্পর্কে যে প্রশস্তি লিখেছেন, যে-কোনো অধ্যাপকের কাছে তার অধিক আর কিছু কাম্য থাকতে পারে না। এই গ্রন্থের এক অংশে তিনি লিখেছেন—

"It was a shock to my notion of historical integrity which provoked me to write my first original essay on an historical subject or, for that matter, on any subject, and curiously enough, the provocation was given by professor of mine whom I greatly admired and liked, Dr Kalidas Nag now a well known figure in our academic circles, was then a young man and the youngest teacher of History in the Scottish Church College. He taught us ancient Indian History and was able to transmit to us his vigorous enthusiasm for his subject." (P. 342).

এর পর ডঃ নাগ সিংহলের মহিন্দ কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে যান এবং সেখান থেকে য়ুনিভার্সিটি অব প্যারিসে তিন বছর কাজ করে ডক্টরেট নিয়ে ঘরে ফেরেন।

ইতিমধ্যে ১৯২১-এ ডঃ নাগকে জেনিভায় থাই ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব এডুকেশনে ভারতের তরফ থেকে প্রতি-নিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করা হয়। তার পরের বছরই তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন লোকার্নো শহরে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল লীগ ফর পীস অ্যাণ্ড ফ্রীডমের মহাসভায়। ১৯২৩-এ ডঃ নাগ ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ লাইব্রেরীস অ্যাণ্ড লাইব্রেরীয়ানসের সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত হন। আর এই বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তখন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখায় ছাত্র-সংখ্যা অনেক কম ছিল। ডঃ নাগ প্রতিটি ছাত্রকে বিশেষভাবে জানতেন, তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, প্রসন্ন হাসি দিয়ে সকলকেই নানাভাবে উৎসাহিত করতেন।

ডঃ কালিদাস নাগ

ভদ্র ব্যবহারে এবং শালীনতায় ডঃ নাগের জোসর মেলা কঠিন।

আমরা এককালে পাঠাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, সেই সময় 'পাঠাগার' এই নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা কলি-কাতায় বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশ করা হয়, স্বর্গীয় শোকহরণ রায় ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা ডঃ সুশীল রায় প্রভৃতির সঙ্গে আমরাও সেই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেইকালে ডঃ নাগ তাঁর কর্মময় জীবনের উচ্চতম শিখরে, কিন্তু আমরা যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে, সেই অনুযায়ী সহায়তা তাঁর কাছে পেয়েছি, তাঁর সদা হাস্যময় মুখ, অফুরন্ত পরিকল্পনা এবং মানবিক বিশ্বকোষের মত ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বহির্ভারতীয় ভারতের সাংস্কৃতিক জ্ঞান বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য আমাদের বিস্মিত করেছে।

'কল্লোলে'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা গোকুল নাগ ছিলেন কালিদাস নাগ মহাশয়ের অনুজ। কল্লোলের প্রথম দিকটায় কালিদাসবাবু ছিলেন ইয়োরোপে, তাঁর পরিবারবর্গ থাকতেন ভবানীপুরে কুণ্ডু লেনের বাড়ীতে, সেই সময়কার কথা অচিন্ত্যকুমার বিস্তারিত-ভাবে লিখেছেন তাঁর 'কল্লোল যুগে'।

গোকুল নাগ অসুস্থ শরীর নিয়ে পারিবারিক নানা ঝামেলায় বিব্রত, বিধবা দিদি ও ভাগ্নেদের জন্য তাঁকে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন—

"কালিদাসবাবু ডক্টরেট নিয়ে ফিরলেন বিদেশ থেকে। গোকুল যেন হাতে চাঁদ, কপালে সূর্য পেয়ে গেল। মা-বাপ-ছাড়া ভাইয়ে ভাইয়ে জীবনের নানা সুখ-দুঃখ ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অপূর্ব বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিদেশে দাদার জন্য তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। যেমন ভালোবাসত দাদাকে, তেমনি নীরবে পূজা করত। দাদা ফিরে এলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।"

কালিদাসবাবু এসে উঠলেন কুণ্ডু লেনের বাসায়, গোকুল নাগ চলে গেলেন দিদি ও ভাগ্নেদের নিয়ে শিবপুরের বাসায়। এই ভাগ্নেদের মধ্যে সে যুগের সার্থক গল্প-লেখক জগৎ মিত্র ছিলেন আমাদের বন্ধু, তিনি শিক্ষা-বিভাগে একটা উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। এই শিবপুরেই গোকুল নাগের সেই কালব্যাধি ধরা পড়ে।

গোকুল নাগের মৃত্যু যেমন বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক শোকাবহ ঘটনা, তেমনই নিদারুণ হয়ে কালিদাসবাবুর জীবনে বেজেছিল। গোকুল নাগের সূত্রেই ডঃ কালিদাস নাগ 'কল্লোল গোষ্ঠী'র অগ্রজসদৃশ ছিলেন—

"কালিদাস নাগ 'কল্লোলে'র জ্যেষ্ঠতুল্য ছিলেন—শুধু গোকুলের অগ্রজ সম্পর্কেই নয়, নিজের স্নেহবলিষ্ঠ অভিভাবকত্বের গুণে। অনেক বিপদে তিনি নিজে বুক এগিয়ে দিয়েছেন। যখনই নৌকো ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে, হাল তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। ঘোরালো মেঘকে কি করে হাওয়া করে দিতে হয় শিখিয়ে দিয়েছেন সেই মধুমন্ত্র। দুঃখের মধ্যে নিজে মানুষ হয়ে-ছেন বলে শিখিয়ে দিয়েছেন সেই কৃচ্ছ্রাতি-কৃচ্ছ্র, বাধাকে বশীভূত করার তপঃপ্রতাপ। নিজে লেখনী ধরেছেন কল্লোলের পৃষ্ঠায়—শুধু স্বনামে নয়, দীপঙ্করের ছদ্মনামে। দীপঙ্করের কবিতা দীপোজ্জ্বলা।"

—(কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার)

কালিদাসবাবু যে কবিতাও লিখেছেন, এই সংবাদ হয়ত অনেকেরই জানা নেই।

ডঃ কালিদাস নাগ গোকুল নাগের সহ-যোগে 'কল্লোলে' 'জাঁ ক্রিসতাফ' বাংলাভাষায়

অনুবাদ শুরু করেন, গোকুল নাগের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী শান্তা দেবী তাঁর সহযোগিতা করেন। র'মা রল্যাঁকে যেমন ভারতের মনীষীদের সন্ধান দিয়েছেন ডঃ কালিদাস নাগ তেমনই ভারতকে দিয়েছেন র'মা র'ল্যার সন্ধান।

'অচিন্ত্যকুমার এই 'কল্লোল যুগে'ই লিখেছেন—

"কালিদাসবাবুই র'ল্যার আত্মিক দীপ্তির প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় নিয়ে এলেন 'কল্লোলে'।"

র'ল্যার গ্রন্থে বার বার কালিদাস নাগের উল্লেখ আছে নানা সূত্রে। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে-সব গ্রন্থাবলী র'ল্যা মহোদয় রচনা করেন, তার অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন ডঃ নাগ।

১৯২৪-এ প্যারিস থেকে ভারতে ফিরে আসার পর ডঃ নাগ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীনভ্রমণে যাত্রা করেন। সেই যাত্রায় আচার্য নন্দলাল এবং সুরেন কর মহাশয় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। ১৯৩০-এ ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ নিয়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় সফর করেছেন, সেই বছরেই লীগ অব নেশানসের টেম্পোরারি কোলাবরেটর এবং নাইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৬-এ তিনি বুয়েনাস আয়ার্সে ইন্টারন্যাশনাল পি-ই-এন কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গের 'পি-ই-এন' সংস্থার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ডঃ নাগ বারবার বিদেশে গিয়েছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব নিয়ে। কখনো বা অধ্যাপনা-সূত্রে। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নিরলস সাধনা অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে যে 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর' প্রকাশিত হয়, তার পিছনে ডঃ নাগের অবদান সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয়। ভারতীয় সুকুমার শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন অধিকারী ব্যক্তি। ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা বিষয়েও তাঁর অবদান স্মরণীয়।

অসংখ্য সভা-সমিতি, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার ডঃ কালিদাস নাগের গঠনমূলক উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা পনেরোর বেশী, তন্মধ্যে বাংলাভাষায় লিখিত 'স্বদেশ ও সাহিত্য', ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'আর্ট অ্যান্ড আর্কিয়োলজী এব্রড' ফরাসী ভাষায় 'লা থিয়োরীজ ডিপ্লোম্যাটিক দ্যা'ল ইনাডে এট'লা' অর্থশাস্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ—'সিগনে' বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে।

বহু বিচিত্র এই কর্মময় জীবনের অবসান তাই আমাদের কাছে গভীর বেদনার বাণী বহন করে এনেছে।

—অভয়ঙ্কর

নেহরু পুরস্কার

ঘনিষ্ঠতর ও শক্তিশালী সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর জন্য নিবেদিত 'সোভিয়েত দেশ'-নেহরু পুরস্কার কমিটি ১৯৬৬ সালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রচনার জন্য ৩০টি পুরস্কারদানের সুপারিশ করেছেন। শ্রেষ্ঠ বিবেচিত আলোকচিত্রের জন্যও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

পুরস্কার কমিটির আঞ্চলিক উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশগুলি বিবেচনা করে ও কেন্দ্রীয় পুরস্কার কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনার পর 'সোভিয়েত দেশ'-নেহরু পুরস্কার কমিটি নিম্নলিখিত পুরস্কার-গুলি দানের সুপারিশ করেছেন :

(১) পাঁচটি সাহিত্য-পুরস্কার—প্রতিটির মূল্য ৪০০০ টাকা, (২) (ক) পাঁচটি সাংবাদিকতার পুরস্কার—প্রতিটির মূল্য ২৫০০ টাকা, (খ) আলোকচিত্র পুরস্কার—প্রতিটির মূল্য ৮০০ টাকা, (৩) দশটি অতিরিক্ত সাহিত্য-পুরস্কার—প্রতিটির মূল্য ১০০০ টাকা, (৪) দশটি অতিরিক্ত সাংবাদিক পুরস্কার—প্রতিটির মূল্য ৮০০ টাকা।

সাহিত্য-পুরস্কার (প্রতিটির মূল্য ৪০০০ টাকা) : (১) কবি শ্রী শ্রী শ্রী—তেলেগু ভাষায় 'কাডগা সৃষ্টি' কাব্যের জন্য। (২) ডঃ এইচ, আর, বচ্চন—হিন্দীতে 'চৌষট্টি রুশ কবিতা' অনুবাদ কাব্যগ্রন্থের জন্য। (৩) শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস—অসমীয়া ভাষায় তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' গ্রন্থের অনুবাদের জন্য। (৪) শ্রীসুধানন্দ ভারতী — তামিল ভাষায় 'সোভিয়েত গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য। (৫) শ্রীকৃষণ চন্দর—মানবতা ও বিশ্বশান্তির আদর্শে লিখিত তাঁর বিভিন্ন রচনার জন্য।

অতিরিক্ত সাহিত্য-পুরস্কার (প্রতিটির মূল্য ১০০০ টাকা) : (১) শ্রীঅসিত সরকার—বাংলায় 'পুস্কিনের কবিতা' অনুবাদগ্রন্থের জন্য। (২) শ্রীমতী রাজিয়া সজ্জাদ জহীর—উর্দুতে 'লেনিন কি ইয়াদমে (লেনিনের স্মৃতিতে) অনুবাদগ্রন্থের জন্য। (৩) শ্রীমতী সুন্দরী উত্তমচাদানি—সিন্ধী ভাষায় 'আমন সাদে পিও' (শান্তির আহ্বান) কাব্যানুবাদের জন্য। (৪) সর্দার গুরবক্স সিং—পাঞ্জাবী ভাষায় গোর্কীর 'মা' গ্রন্থের অনুবাদের জন্য। (৫) শ্রীঅনন্ত পট্টনায়ক—ওড়িয়া ভাষায় গোর্কীর 'মা' ও শোলোকফের 'মানুষের ভাগ্য' অনুবাদ-গ্রন্থের জন্য। (৬) শ্রীকে, সি, জর্জ ও শ্রীভেলিয়ান ভার্গবন—মালয়ালাম ভাষায় 'মানুষিয়ন আশ্গিনে মহাশানগানাই' অনুবাদগ্রন্থের জন্য। (৭) শ্রীবিদ্যাধর পুণ্ডালিক—মারাঠি ভাষায় 'চক্র' গ্রন্থের জন্য। (৮) শ্রীবি, আর, ব্যাস (স্বপ্নস্থ)—গুজরাতি ভাষায় 'ধরতি-নে-বিজাকাভিও' কাব্যের জন্য। (৯) শ্রীমকমুর জব্বধরী—গোর্কীর 'ফোমা গর্দীক' গ্রন্থের অনুবাদের জন্য। (১০) শ্রীকে, সি, এম অরুণাচলম—তামিল ভাষায় 'কবিদাই এন কইবাল' কাব্যের জন্য।

সাংবাদিকতার পুরস্কার (প্রতিটির মূল্য ২৫০০ টাকা) : (১) শ্রীডি, আর, কৃষ্ণ আয়ার—মালয়ালম ভাষায় 'কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্য দিয়ে' প্রবন্ধ-সংগ্রহের জন্য। (২) শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু—'আত্ম-চরিতে সমাজচিত্র' (পুস্কিন, শেখভ, গোর্কী, তলস্তয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে) নামক প্রবন্ধাবলীর জন্য। (৩) শ্রীআর, কে, করঞ্জিয়া—শান্তি, জোট-নিরপেক্ষতা ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধমালার জন্য। (৪) শ্রীরণবীর সিং—উর্দু ভাষায় 'পঞ্চায়েতের দেশে' নামক প্রবন্ধাবলীর জন্য। (৫) শ্রীপি, ডি, গ্যাড-গিল—মারাঠি ভাষায় 'শান্তিদূত নেহরু' গ্রন্থের জন্য।

অতিরিক্ত সাংবাদিকতার পুরস্কার (প্রতিটির মূল্য ৮০০ টাকা) : শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী—বাংলায় প্রবন্ধাবলীর জন্য। (২) ডঃ অমলেন্দু গুহ—অসমীয়া ভাষায় 'সোভিয়েত দেশত অভিমুখী' গ্রন্থের জন্য। (৩) ডঃ রাধানাথ রথ—ওড়িয়া ভাষায় 'নব সভ্যতার দেশ' গ্রন্থের জন্য। (৪) শ্রীশিব-নারায়ণ শ্রীবাস্তব—হিন্দীতে 'গোর্কীকে দেশমে' গ্রন্থের জন্য। (৫) শ্রীপ্রাগজী দোসা—গুজরাতি ভাষায় 'রুশোনী মোর মুসাফির' গ্রন্থের জন্য। (৬) ডঃ এম, এস, শাস্ত্রী ও শ্রীমতী এম, আর, শাস্ত্রী—কানাড়া ভাষায় 'নেহরু ও সোভিয়েত ইউনিয়ন' সম্পর্কে গ্রন্থের জন্য। (৭) শ্রীকিশোর পারেখ—প্রকাশিত আলোকচিত্রাদির জন্য। (৮) শ্রীকে, চন্দ্র সোনরেক্সা—প্রকাশিত আলোকচিত্রাদির জন্য। (৯) অধ্যাপক জে, সি, জৈন—হিন্দীতে 'সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে পত্রাবলী' গ্রন্থের জন্য। (১০) শ্রীঅজনকুমার ব্যানার্জি—'নেহরু ও সোভিয়েত রাশিয়া এবং ট্রাজেডি এ্যান্ড ট্রায়াম্ফ ইন তাসখেন্দ' গ্রন্থের জন্য।

অমৃতের বিজয়া সম্মেলন

হেমন্তের কুহেলী-বিলীন বিষণ্ণ অপরাহ্ন। সূর্যদেব যে কখন পশ্চিম গগনে মিলিয়ে গেলেন কারো চোখে পড়েনি। শান্ত পরিবেশে 'শিশিরকুঞ্জে' 'অমৃত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের অনেক শিল্পী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

বক্তৃতা নয়, পাঠ নয়, আনুষ্ঠানিক সভার অনুষ্ঠান নয়, নিছক প্রীতি-সম্মেলন। শারদীয় উৎসব শেষে আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের রীতি অনেক প্রাচীন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে এই উপলক্ষে সকলকেই বুকে টেনে নিতে হয়, তারপর মিষ্টিমুখ এরই নাম বিজয়া সম্মেলন। 'অমৃত' পত্রিকার তরফ থেকে ৫ই নভেম্বর

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ : বামদিক থেকে সামনের সারি উপবিষ্ট : সর্বশ্রী দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, তুষারকান্তি ঘোষ এবং তাঁর পৌত্রী কুমারী রণিতা ঘোষ, সুধীরচন্দ্র সরকার, চারু রায়, মধু বসু এবং সরোজকুমার রায়চৌধুরী। মধ্যের সারি : সর্বশ্রী নারায়ণ চৌধুরী, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, যাদুগোপাল বসু, নির্মল সরকার, বিশু মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, কুমারী রীতা ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুহৃদগোপাল দত্ত, সুমথনাথ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, মণীন্দ্র রায় ও শম্ভুনাথ দে বিশ্বাস। পেছনের সারি : সর্বশ্রী রতনকান্তি বসু, সুপ্রিয় সরকার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী এবং ক্ষেত্রনাথ রায়।

ফটো : অমৃত

যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, তা অনেক দিক থেকে স্মরণীয়—ইতিপূর্বে এমন একটি 'বিজয়া সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়নি, আর এতগুলি শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সমাবেশও নজরে পড়েনি। এই কারণে, সকলেই আমন্ত্রণকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পারস্পরিক সম্ভাষণ, প্রণাম, আলিঙ্গন-এর পর সাহিত্যিকবৃন্দ শিশিরকুঞ্জের সুবিস্তৃত উদ্যানে বিচরণ করতে করতে গাছপালা, শাকসব্জি, ফুল ও ফলের বিচিত্র সমারোহ দেখতে লাগলেন। বিস্মিত হলেন কৃত্রিম হ্রদ, তার ওপর ভাসমান নৌকা এবং খাঁটি হরিণ দেখে। তেমনই সবাই পুলকিত হলেন কয়েকটি ছোটখাটো পাহাড় দেখে। একটি পাহাড়ে আবার বড়ো বড়ো ঝাউগাছ!

তখনো দিনের আলো একেবারে নিভে যায়নি, প্রীতি সম্মেলনের জন্য নির্দিষ্ট চত্বরটিতে সবাই একে একে এসে বসলেন—এলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও মনোজ বসু। বিগত যুগের ফিল্ম-জগতের দুই আকর্ষণীয় ব্যক্তি মধু বসু ও চারু রায় এলেন, সেই সঙ্গে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসুও এলেন। অনেকদিন পরে দেখা গেল সরোজকুমার রায়চৌধুরী এবং নারায়ণ চৌধুরীকে। সুধীরচন্দ্র সরকার ও ডাঃ নির্মল সরকার এসে বসলেন। তাঁর পাশে এসে বসলেন আশাপূর্ণা দেবী ও বাণী রায়। যাদুগোপাল বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এলেন প্রায় একসঙ্গে।। বিশু মুখোপাধ্যায় ও বিমল মিত্র একপাশে গল্প করছিলেন, হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। দক্ষিণারঞ্জন বসু ও ভবানী মুখোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, সেইখানে এলেন মিহির গঙ্গোপাধ্যায়। আমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং এবং মণীন্দ্র রায় ও মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী চারদিকে নজর রাখছেন কোথাও এতটুকু ত্রুটি না হয়। সুব্রত এবং সুপ্রিয় সরকার দুই ভাই মধুর হাস্যে সকলকেই অভ্যর্থনা করছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে নানা রকমের আলোচনা ও হাস্যপরিহাস চলতে থাকে। সেই ফাঁকে 'অমৃতে'র ফটোগ্রাফার কয়েকটি স্মরণীয় মুহূর্তকে ক্যামেরার পটে ধরে রাখলেন। কমল চৌধুরী, ক্ষেত্রনাথ রায় ও গণেশ বসু প্রভৃতি অমৃতের কর্মিবৃন্দও চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রইলেন। কোথাও যেন এতটুকু ত্রুটি না ঘটে।

প্রচুর আয়োজন জলযোগের। স্বয়ং গৃহকর্তা প্রতিটি নিমন্ত্রিতের পাশে গিয়ে তাঁদের আহারাদির তদারক করতে লাগলেন। চা এবং জলযোগ শেষ হতে হতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা ও খোল বাজতে থাকে। সবাই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে উঠে পড়লেন, কেউ কেউ ছুটলেন কলকাতার পথে, আর দু-চারজন তখনও গল্প করছেন। বিজয়ার এই মধুর প্রীতি-সম্মেলনে সকলের অন্তরেই একটা সুগভীর আবেগের অনুভূতি এনে দিয়েছিল। 'অমৃতে'র বিজয়া সম্মেলন একটি মধুর স্মৃতির মত মনে জেগে রইল।

—বিশেষ প্রতিনিধি

ভারতীয় সাহিত্য

তামিল লেখিকার সম্বর্ধনা ॥

তামিলনাড়ুর প্রখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী অনুত্তমা ক'দিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। গত ৬ নভেম্বর তামিল লেখক সংঘ তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। সংঘের সভাপতি শ্রী পি এন গুণ্ডাগ্রাজন সকলের সম্মুখে লেখিকাকে পরিচয় করিয়ে দেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমতী অনুত্তমা বলেন যে, "রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর থেকেই বাংলা সাহিত্য সমস্ত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। বর্তমানেও তার গতি অব্যাহত। এই সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুবই দরকার। কলকাতার প্রবাসী তামিল লেখকরা একদিক দিয়ে এই সুযোগ পেতে পারেন।" তিনি আরও বলেন যে, "এখানে যে সমস্ত তামিল লেখক আছেন, তাঁদের বাংলা ভাষা শিক্ষালাভ করা দরকার এবং শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্যের তামিলে অনুবাদ করা প্রয়োজন।" শ্রীমতী অনুত্তমার এই উক্তি সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু দুঃখের হলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কলকাতার তামিল লেখকসমাজ এখনও পর্যন্ত বাংলার লেখকদের সঙ্গে তেমন কোন যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেননি।

ভারতীয় ভাষায় জার্মান সাহিত্যের অনুবাদ ॥

আধুনিক সাহিত্যজগতে অনুবাদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষকরে গ্রন্থাগার, ছাত্র, অধ্যাপক এবং লেখকদের কাছে এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৬৪ সালে সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় ৪০ হাজার গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ অনূদিত হয়েছে জার্মান ভাষায় এবং শতকরা ১০ ভাগ জার্মান থেকে অনূদিত অন্যান্য বিদেশী ভাষায়। এই তথ্য সরবরাহ করেছেন 'ইন্টার নেশনস' নামে পূর্ব জার্মানির একটি অনুবাদ সংস্থা। এই সংস্থাটি জানাচ্ছেন ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে জার্মান থেকে ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে ১৬০টি গ্রন্থ। এর মধ্যে আসামীতে প্রায় ৪টি, বাংলায় ৩৭টি, গুজরাটিতে ৬টি, হিন্দিতে ৪৬টি, কানাড়িতে ৭টি, মালয়ালমে ২১টি, মারাঠিতে ২১টি, ওড়িয়াতে ১২টি, পাঞ্জাবিতে ৪টি, সিন্ধিতে ১টি, তামিলে ১৬টি, তেলেগুতে ১৬টি, উর্দুতে ৫টি এবং আরও কয়েকটি অনূদিত হয়েছে।

ভাগবত গীতার নতুন ইংরেজি অনুবাদ ॥

ভাগবত গীতার কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি অধ্যাপক পি লাল এর আবার নতুন অনুবাদ করেছেন। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যেই গ্রন্থটি বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

কবি হিসেবে পি লাল সুপরিচিত। শ্রীলাল গীতাকে মহাভারতের অপরিহার্য অংশ বলে মনে করেন। এঁদের অনুবাদ খুবই উল্লেখ্য। উদাহরণ হিসেবে তাঁর অনুবাদের একটি নমুনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

'We have heard, Krishna,
hell awaits the families
which discard dharma
What a terrible sin it is
to kill brothers,
and cast covetous eyes on
their land!'

বিদেশী সাহিত্য

জাপানে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী ॥

সম্প্রতি টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন টোকিওর সংস্কৃতি সংস্থা 'ইউনিভার্সাল কালচারাল ফ্রিডাম সোসাইটি'। এ ধরনের অনুষ্ঠান পরিষদ কর্তৃক এইবারই প্রথম প্রদর্শিত হয়। ইউরোপ, এশিয়া এমনকি আফ্রিকারও বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত লেখকদের বই এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিও সংগ্রহ করা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীর আহ্বায়ক শ্রীকাইলা 'মংসু-বিশী সাংবাদিকদের বলেন, 'ভবিষ্যতেও আমরা এইরকম পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করার আশা রাখি। তবে তা আরো ব্যাপকভাবে যাতে করা যায় তাই হবে আমাদের লক্ষ্য।' বর্তমান জাপানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বহির্বিশ্বের ভাবের আদান-প্রদান এভাবেই সম্ভব হবে বলে শ্রীকাইলার বিশ্বাস। ভারতবর্ষ থেকে বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, মুল্করাজ-আনন্দ, ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি বইও ছিল বলে জানা গেছে।

ফরাসী পুস্তক ব্যবসায় সেমিনার ॥

সম্প্রতি প্যারিস শহরে 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্রেঞ্চ বুক অ্যাক্টড' কর্তৃক ফরাসী দেশের বর্তমান পুস্তক প্রকাশনার কাজ ও বহির্বিশ্বে এর ব্যবসার উন্নতি বিষয়ে এক সেমিনার আহ্বান করা হয়। এতে ১০টি দেশ থেকে ২০ জন সম্পাদক ও প্রকাশক উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনটি চলে প্রায় দু' সপ্তাহকাল। এতে ফ্রান্সের পুস্তক ব্যবসায় বর্তমান হালচাল ও সুবিধে-অসুবিধে বিষয়ে বহু আলোচনা হয়। আমন্ত্রিত অতিথি প্রকাশকরা এর পর ফ্রান্সের বিভিন্ন নামজাদা প্রকাশসংস্থা ও পুস্তকালয়গুলি পরিদর্শন করেন।

এই অধিবেশনে মিঃ রবার্ট কেণ্টারস্ সাম্প্রতিক ফরাসী সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। এবং মিঃ ফ্রাঁসোয়াস্ রেগিস ব্যাস্-টাইড সাহিত্য প্রকাশনালয় সম্পর্কে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেন। পুস্তক ব্যবসায়ীদের এই সংস্থাটি ফরাসী দপ্তরের সাংস্কৃতিক ও কারিগরী সংক্রান্ত বিভাগের সহযোগিতায় এই সেমিনার আহ্বান করেছিলেন।

ইতালীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'বেগুত্তা' ॥

'বেগুত্তা পুরস্কার' হচ্ছে ইতালীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। প্রতি বছরই ইতালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কোনো সাহিত্যকর্মের জন্য একজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। 'বেগুত্তা' পুরস্কারটি কয়েকজন ইতালীয় লেখকের হঠাৎ খেয়ালের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে মিলান শহরে 'বেগুত্তা' নামক এক রেস্তোরাঁয় কয়েকজন জাঁদরেল লেখক একত্রিত হয়েছিলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মিঃ ওরিও ভারগেনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেদিনের সেই সন্ধ্যায় মদের আড্ডায় লেখকদের মধ্যে রিকার্ডো বাখেলি, পাওলো মোনেলি, অ্যাডলফ্ ফ্র্যানসি উপস্থিত ছিলেন। প্রখ্যাত শিল্পী মোরিও ভেজ্জানি মাচি, ওত্তাভিও স্তেফোনিনি এবং ভেরেত্তিও ছিলেন সম্ভবত। এই রাত্রিকেই বলা চলে বেগুত্তা রেস্তোরাঁয় গৌরবোজ্জ্বল সন্ধিক্ষণ। নিতান্ত খেলাচ্ছলেই একজন বলেছিলেন 'একটা কিছু করা যাক—যা হবে কালের কাছে সবচেয়ে স্মরণীয়।' কথা কেড়ে নিয়ে আরেকজন নেশার ঝোঁকে জড়ানো গলায় বলেছিলেন 'একটা পুরস্কার ঘোষণা করা যাক আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের জন্য। নাম হবে 'বেগুত্তা' রেস্তোরাঁর নামে।' 'বেগুত্তা পুরস্কার' নামই ঠিক হয়ে গেল। যেমন কথা তেমন কাজ। মদের নেশা গেল মুহূর্তে কেটে। পরদিনই এ-বিষয়ে তাঁরা সভা আহ্বান করলেন। স্থির করলেন প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য 'বেগুত্তা পুরস্কার' দেয়া হবে একজনকে। ১৯২৭ সালের ১৪ জানুয়ারী প্রথম বেগুত্তা পুরস্কার দেওয়া হয় গিওভান বাতিস্তা অ্যাঙ্গিয়োলেত্তিকে, তাঁর 'শেষ বিচার' বইটির জন্য। পুরস্কারের অর্থের অঙ্ক ছিল ৫ হাজার লিরার। এই অর্থ তোলা হয়েছিল সেদিনের মদের আড্ডায় উপস্থিত সেই শিল্পীদের ছবি বিক্রী করে। ১৯৩৬ সালে বেগুত্তা পুরস্কারটিকে রাজনৈতিক কারণে বাতিল

করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর ১৯৪৭ সাল থেকে তা আবার যথানিয়মে চলতে থাকে। ডিভ্যালুয়েশনের জন্য এর অর্থ পরিমাণ এখন এসে দাঁড়ায় ১০০ হাজার লিরাতে। 'বেগুত্তা' পুরস্কারের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হোল এর অন্তর্বর্তী জুরীরা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নির্বাচন করে তাকে পুরস্কারপ্রাপ্ত বলে ঘোষণা করেন। কোন রাজনৈতিক চাল হিসেবে বা ব্যবসায়ী মহলের চাপে বেগুত্তা আজ পর্যন্ত কোন পুরস্কার প্রদান করেনি। গত বছর এ পুরস্কারটি পেয়েছিলেন বায়াগিয়ো মারিন। ইতালীয় সাহিত্যপাঠকদের কাছে 'বেগুত্তা' পুরস্কারের অপরিসীম মূল্য।

মধ্যযুগ ও জার্মান সাহিত্য ॥

যাঁরা জার্মান সাহিত্য নিয়ে কিছু চর্চা করেন বা একে গবেষণার বিষয় বলে মনে করেন তাঁদের কাছে মধ্যযুগের জার্মান সাহিত্য বিশেষ আকর্ষণীয়। বার্লিনের সাহিত্যগবেষক ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক হেলমাট দা বোর সম্প্রতি মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে দুই খণ্ডের একটি মূল্যবান গ্রন্থের সংকলন প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে প্রায় ছয় শত বছরের অবলুপ্ত ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে। শার্লেমেন থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪০০ সাল পর্যন্ত সময়ের রেণেশাসের সূচনা অবধি মধ্যযুগের ইতিহাসকে পরিব্যাপ্ত করেছেন অধ্যাপক বোর। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ঐতিহ্যআশ্রয়ী ভাবধারা, মহাকাব্যপ্রতিম রোমান্সধর্মিতা, সর্বোপরি যে ধর্মকেন্দ্রিক উন্মেষ পর্ব—বিশেষভাবে এ বিষয়গুলির প্রতি অধ্যাপক বোর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। মধ্যযুগের ধর্মের একচ্ছত্র প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা যার তা হচ্ছে 'ক্রিশ্চিয়ানিটি'। এবং কোন বিশেষ যুগ যখন তাকে অস্বীকার করতে পারে না তখন ধর্মের জয়ই যে তার সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। মধ্যযুগের এই 'ক্রিশ্চিয়ান ফেইথ'-ই তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করেছে। আর ঠিক সে কারণেই ইতিহাস, পুরাণ, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, ঐতিহ্যআশ্রয়ী গীতি-কবিতা, এসবই সে সময়কার সাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক বোর এর প্রয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কেননা ইতিপূর্বে মধ্যযুগ নিয়ে যে কয়েকটি বই বেরিয়েছে জার্মানীতে তার প্রায় সবগুলিতেই মধ্যযুগের 'মিনেলিরিক' পর্বটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধ্যাপক বোরের এই গ্রন্থটিতে এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে একমাত্র এ বইটিই বর্তমানে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি।

নতুন বই

• • • বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাস অপ্রকাশিত কাহিনী • • •

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ দুঃখের হলেও একথা সুবিদিত যে, সেই বিপ্লবী বাংলার এখনও পর্যন্ত কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হল না। এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য একদিন যাঁরা হাসতে হাসতে ফাঁসি-কাষ্ঠে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, মৃত্যুকে যাঁরা করেছিলেন পায়ের ভৃত্য, তাঁদের অনেকেরই নাম এখন প্রায় অপরিচিত। সত্যই, জাতি হিসেবে আমাদের এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। তাঁদের সেই আন্দোলনের পথ সম্পর্কে হয়ত অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু দেশের জন্য, জাতির জন্য, মানুষের জন্য তাঁদের সেই নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কাহিনী কি আমরা ভুলে যাব? ভারতবর্ষের ইতিহাসে মনে রাখব শুধু সম্রাটের কাহিনী, তাজমহলের কথা? "সবার অলক্ষ্যে" সেই বিপ্লবী বাংলার অলিখিত ইতিহাসের উজ্জ্বল কাহিনী। যাঁদের বাদ দিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আলোচ্য গ্রন্থটি অবশ্য বাংলার বিপ্লববাদের সামগ্রিক ইতিহাস নয়। কিছু ইতস্তত ঘটনা, কয়েকজন বিপ্লবীর জীবন-কাহিনী এবং বি-ভি'র একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। অবশ্য একথাও ঠিক, বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস কোনও একজনের পক্ষে রচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই ঐতিহাসিক সময়ের অনেক ঘটনাও তত্ত্ব এবং তথ্য দ্বারা প্রমাণ সম্ভব নয়। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকাতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদারের বক্তব্যের সামান্য অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি। '...সরস কাহিনীর পশ্চাতে গ্রন্থাকারের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আছে। বিশ্বস্তসূত্রে যে সকল সন্ধান মিলেছে কেবল তারই সাহায্যে লেখক একটি খাঁটি ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্ণিত ঘটনাগুলির লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মৌখিক বর্ণনার উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করতে হবে। সুতরাং এতে কিছু ভুলচুক থাকাই সম্ভব।' এ ধরনের ইতিহাস রচনার উপাদান এ ছাড়া আর কি আছে? এখনও পর্যন্ত যে সব প্রাচীন বিপ্লবী জীবিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই সব ঘটনা জেনে নেওয়া দরকার। তা না হলে বাংলার ইতিহাসের একটি অধ্যায় সকলের অলক্ষ্যেই থেকে যাবে। যতদূর জানা আছে, এখনও পর্যন্ত 'অনুশীলন সমিতি' বা 'যুগান্তর' দলের কোনও প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হয় নি। এই দিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য গ্রন্থটিকে অসাধারণ মর্যাদা দিতে হয়। লেখক শ্রীভূপেন রক্ষিত রায় এজন্য সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন বলে আশা করি। গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং প্রতিটি ঘটনাই লেখকের বর্ণনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বিপ্লবী জীবনকাহিনীর কথা ছাড়াও এই গ্রন্থে 'বিপ্লবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'বিপ্লবীর কাছে শরৎচন্দ্র' আলোচনা দুটি তথ্যনির্ভর এবং সুখপাঠ্য হয়েছে। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সবার অলক্ষ্যে— (প্রথম পর্ব) : ভূপেন রক্ষিত রায়। বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : সাত টাকা।

॥ চরিত্রগঠনের প্রারম্ভে ॥

শিশু শিক্ষণ একটি সমস্যা বিশেষ। এই শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের মূল। ছেলে-মেয়েরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে জেগে ওঠে নানান জিজ্ঞাসা। কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা সীমাহীন। দেহ-মনের বিকাশের সঙ্গে জড়িত এই কৌতূহল, এই অনুসন্ধিৎসা। শিশুমনের এই জিজ্ঞাসা সঠিক উত্তর না পেলে মনবিকৃতি ঘটতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক পিতা-মাতাকেই একটি কঠোর ও প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ছেলে-মেয়েদের অনুসন্ধিৎসায় একটি বিশেষ স্থান জুড়ে থাকে যৌনজিজ্ঞাসা। শিশু মনের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে শাসনের দ্বারা নিরস্ত করা অপরাধ। শিশুকে মানুষ করা খুবই শক্ত। বিশেষ করে নব-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে শিশুদের এই ধরনের জিজ্ঞাসার উত্তর দান সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ মানবচরিত্রের বিকাশের সঙ্গে যৌন-বোধ জড়িত ওতপ্রোতভাবে। তাই জীবনের প্রারম্ভে সে সম্পর্কে অবহিত না হতে পারলেই পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় সেদিকে লক্ষ্য

প্রথেই ছোটদের যৌনসমস্যা গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-মনে যৌনবোধের ক্রমবিকাশ ঘটে কিভাবে সে সম্পর্কে প্রত্যেক পিতা-মাতারই সচেতন থাকা উচিত। শিশুমনের সেই বিকাশকে বিপথগামী না হতে দিয়ে কিভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্রগঠনে সহায়তা করা সম্ভব, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থখানি থেকে।

শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছেলে-মেয়েদের মনে যে কী গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানসিক পরিবর্তন আনে গ্রন্থকার সে সম্পর্কেই সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, শিশুকালের শিক্ষা কিভাবে পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক পিতা-মাতারই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। সম্ভবত বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই প্রথম লেখা হল।

ছোটদের যৌন সমস্যা— (আলোচনা)— প্রভাত মুখোপাধ্যায়। কুইন্স বুক কোম্পানী। ৬২এ আহিরীটোলা স্ট্রীট। কলকাতা-৫। দাম : চার টাকা।

বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী

ঘন্টাকর্ণের 'হিমালয়ের চিঠি' ভ্রমণ-বিলাসী অনেক পথিককে কেদারনাথের পথে নিয়ে যাবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, প্রবল বর্ষণ, পথের নানা বিপদ, চটিতে আশ্রয়লাভের অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা কোন কিছুই যে পথিককে বিরত করে না তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'হিমালয়ের চিঠি'তে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, কত বর্ণের সমাবেশ, কত শব্দের মধুর ধ্বনি এবং চতুর্দিকের সৌরভিত বর্ষাস্নাত গহন অরণ্যের মিষ্ট অঙ্গ-সুবাস পথিকের ক্লান্তি দূর করে তুষারমণ্ডিত কেদারনাথ দর্শনে আগ্রহান্বিত করে তোলে। তারপর আছে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই সঙ্গে নানান কাহিনীর সমাবেশ যা বইটিকে আরও সরস করে সার্থক ভ্রমণকাহিনীতে পরিণত করেছে।

হিমালয়ের চিঠি (ভ্রমণকাহিনী)— ঘন্টাকর্ণ। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯. ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। দাম— মাত্র ছয় টাকা।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কিশোর পাঠকদের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে বাংলা দেশের লেখকরা যে উদাসীন নন, তার পরিচয় অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের কিশোর উপযোগী গ্রন্থের প্রকাশ। ঝিলিমিলি পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যাটি চিত্র ও রচনায় সেক্ষেত্রে একটি মনোরম সংযোজন। ছড়া, প্রবন্ধ, কবিতা, স্মৃতিকথা, গল্প, ভ্রমণ, কমিকস, রহস্যকাহিনী, হাসির গল্প, ছবি ও ছড়া, রূপকথা, অরণ্যকাহিনী, জীব-জন্তুর গল্প, রহস্য উপন্যাস, পৌরাণিক গল্প, ঐতিহাসিক কাহিনী, কার্টুন, শারীর বিজ্ঞান, অনুবাদ উপন্যাস, ডাকাতের গল্প প্রভৃতির এই আকর্ষণীয় সংগ্রহটিতে লিখেছেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অমিয় চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বন্দে আলী মিয়া, কামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সুশীল রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রেবতীভূষণ ঘোষ, ইন্দিরা দেবী, বিশু মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, কনাই পাকড়াশী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নরেন্দ্র দেব, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ণ শক্তিপদ রাজগুরু, স্বপনবুড়ো, শৈল চক্রবর্তী, অসিত গুপ্ত, রাম বসু, ভারতপুত্রম, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল এবং আরো অনেকে। কার্টুন এঁকেছেন অমল চক্রবর্তী।

ঝিলিমিলি—সম্পাদক : চিত্রজিৎ দে। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত মধুপর্ণীতে লিখেছেন সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়, কমলেন্দু চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, নির্মল মৈত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী, তরুণ সান্যাল, রাম বসু, গোপাল ভৌমিক, সুভাষ সমাজদার, জীবেন্দ্র সিংহ রায় এবং আরো অনেকে।

মধুপর্ণী : সম্পাদক : সুধীর করণ। পশ্চিম দিনাজপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ। বালুরঘাট।

●

'তরুণিমা'র শারদীয় সংখ্যায় লিখেছেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, সুশোভনকান্তি দাশগুপ্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর, হরেন্দ্রনাথ সিংহ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ বসু, প্রবাসজীবন চৌধুরী, স্বপনবুড়ো, মনোতোষ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতির সমাবেশে সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে।

তরুণিমা—সম্পাদক : হরিদাস ঘোষ। ৪০।১ বনমালি সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা।

প্রাপ্তি-স্বীকার

নির্মাল্য : সম্পাদক—নিশীথ ঘোষ ও লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বোড়াই-চণ্ডীতলা, চন্দননগর। হুগলী থেকে প্রকাশিত। দাম আশী পয়সা।

জন্মান্তর শারদ সংকলন ১৩৭৩।। সম্পাদক : সোমেন ঘোষ। ১বি, মল্লিক লেন। কলকাতা-২৫ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিসর্গ শারদীয়া সংখ্যা।। সম্পাদক : রাধাহরি ঘোষ ও দেবাশিস চক্রবর্তী। ৩৪।২, গুলু ওস্তাগর লেন। কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

উষসী শারদীয়া সংকলন।। সম্পাদক : সুভাষচন্দ্র পাল। ৭৩এম ৪ নিউ কেবল টাউন, জামসেদপুর-৩ থেকে প্রকাশিত।

ছন্দিতা শারদীয়া ১৩৭৩।। সম্পাদক : গৌরগোপাল দাস। বি-৫৯, বিধান সরণী। কলকাতা-১৮।

কবিতা : শারদ : ১৩৭৩—সম্পাদনা : সুপ্রিয় বাগচী। ডালগিস হাউস। কলকাতা—৩৭ থেকে প্রকাশিত। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতা সংকলন : শারদ সংখ্যা—সম্পাদক : সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৭ কাঁকুড়-গাছি রোড। কলকাতা—৫৪ থেকে প্রকাশিত। দাম : এক টাকা।

উন্মেষ : ১৩৭৩—সম্পাদক : অমিতাভ গুহ ও তপন রক্ষিত। ১।২৫এ নাকতলা। কলকাতা—৪৭ থেকে প্রকাশিত। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

নবাহ : ১৩৭৩ : ৩৪ হরিশ নিয়োগী রোড, কলকাতা—৩৪ থেকে নবাহ শিল্পীসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

কল্পনায়ন : সীতা মজুমদার সম্পাদিত। ৬৫-এ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৫ থেকে প্রকাশিত। দাম—এক টাকা।

জয়ন্তী—অপরাজিতা গোস্বামী সম্পাদিত। ২।১ শ্রীনাথ দাস লেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

সেতু : শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডু গলি, হুগলী থেকে প্রকাশিত। দাম—দেড় টাকা।

নবোদয়—সম্পাদক : বিশ্বনাথ সরকার।

মহাদিগন্ত—সম্পাদক : সমীর আচার্য ও আলোক মৈত্র। ১৪, পাম্প হাউস রোড। কলকাতা ৩৯ থেকে প্রকাশিত।

'পুরাতন প্রসঙ্গ'

রথীন্দ্রনাথ রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির একটি সর্বভারতীয় তাৎপর্য আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই মধ্যযুগের বিরুদ্ধে এক সংশয়াতুর প্রশ্ন জেগেছিল। ভারতচন্দ্রের ইহচেতনায়, প্রসাদী গানের অন্তরালে তৎকালীন সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবিতে, রামেশ্বরের শিবায়নের বাস্তবনিষ্ঠ জীবনচিত্রণে, গঙ্গারামের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসচেতনায়, রামানন্দ যতির সংশয়দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে নবাবী আমলের নৈতিক শৈথিল্য, বিলাস-ব্যভিচার, অসাধুতা ও সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন মধ্যযুগীয় ক্ষয়িষ্ণুতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের প্রহসন মাত্র। বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে তখন ভাঙন ধরেছে—কুষ্ঠরোগীর গলিত দেহের মতো খসে পড়ছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেই ব্যাধিগ্রস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপরেই গড়ে উঠছে চিহিল সাতুন, হীরাঝিল-মোতিঝিলের স্থাপত্য। সেই নিঃশেষিতপ্রায় যুগের নতুন কিছু দেবার ছিল না, তাই পলাশীর প্রান্তরে এক নির্মম প্রহসনে জীবন-নিয়তির অভ্রান্ত নির্দেশ রচিত হল বজ্র-বিদীর্ণ কামানের গোলায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য সংঘাতের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া বাংলার ভাবজীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন এলেন রংপুর থেকে কলকাতায়। অনিশ্চয়তার কম্পমান যবনিকা সরে গেল, উদ্ভাসিত হল নবযুগের বলিষ্ঠ প্রত্যয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মধ্যযুগের নির্মোক মোচনের পালা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সারা হয় নি। এই শতাব্দীর এক পা মধ্যযুগে, আর এক পা আধুনিক যুগের সন্ধিলগ্নে। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। তাই এই কাব্যের তথাকথিত দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনার চেয়ে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রকেও অন্নদামঙ্গলের প্রলেপ দিতে হয়েছিল। কালের নির্ধারিত সীমা তাঁকে মানতে হয়েছিল। আসল কথা এই শতাব্দী ভাঙনের যুগ, নতুন কিছু গড়ে ওঠার যুগ নয়। এমন কি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধও সংঘাতেরই যুগ, সৃষ্টির যুগ নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মূলে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে এই জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিল। বাঙালীচিত্তের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৃষ্টিমুখর কল্পনার যুগ্মবিকাশের ফলে ঘটেছিল নবযুগের সূর্যোদয়। বাংলাদেশের মনীষীরাই ভারতবর্ষকে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। কারণ তখনো ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে মধ্যযুগের জড়নিদ্রা ভাঙে নি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

> It was truly a Renaissance, wider, deeper, and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople. Bengal had been despised and thrown into a corner in the Vedic age as the land of birds (and not of man), in epic age as outside the regions hallowed by the feet of the Wanderinf Pondav brothers, and in the Mughal times as "a hell well stocked with bread". But now under the impact of the British civilisation it became of pathfinder and a light-bringer to the rest of India. If Periclean Athens was the school of Hellas, "the eye of Greece, mother of arts and eloquence," that was Bengal to the rest of India under British rule, but with a borrowed light, which it had made its own with marvellous cunning.

বাঙালী জাতির চিত্তমুক্তির এই অনন্যসাধারণ অধ্যায় নিয়ে গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা নানাদিক থেকে আলোচনা করেছেন। এই যুগের তথ্যাশ্রয়ী উপকরণগুলির অধিকাংশই আজ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার মধ্যেও এ যুগের সামগ্রিক সত্য উন্মোচিত হয়েছে, একথা বলা যায় না। কারণ বিচিত্র-জটিল ঘটনাপ্রবাহ বা ঐ যুগের মনীষীবৃন্দের কর্মকৃতির ইতিহাসই গবেষকেরা নানাভাবে আলোচনা করেছেন। সে যুগ অস্তমিত হয়েছে, যুগন্ধর পুরুষদের সান্নিধ্যলাভেরও কোনো উপায় নেই। ছাপার হরফে যাদের কর্ম ও চিন্তার দলিল আমাদের হাতে পৌঁছেছে, তাঁদের অন্তর্জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু যাঁরা তেমন কিছু লিখে যান নি, অথচ যাঁদের কথা আলোচনা না করলে এই যুগের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে, তাঁদের হৃদয়রহস্য উদ্‌ঘাটন করা এ যুগের গবেষকদের এলাকার বাইরে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধ্যেরও বাইরে।

এ ক্ষেত্রে যুগজীবন ও মনীষীবৃন্দের অন্তর্জীবন বিশ্লেষণের সবচেয়ে মূল্যবান দলিল হল সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মজীবনী, স্মৃতিকাহিনী, ডায়েরি ও চিঠিপত্র। কারণ এগুলি শুধু যুগজীবনের স্বরূপই উদ্‌ঘাটন করে না, রচয়িতার ব্যক্তিত্বকেও প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিত্বগুলি যুগের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে আন্দোলিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে যুগ-মানস নির্ণয়ের পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান উপকরণ। রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্ত—হিন্দু কলেজের তিনজন সহপাঠী পরবর্তীকালে তিনটি স্বতন্ত্র পথ ধরেছিলেন। এ ঘটনা কি আকস্মিক অথবা তাঁদের জীবননিয়তির অভ্রান্ত নির্দেশ, কিম্বা যুগজীবনের মধ্যেই এর গূঢ় সংকেত নিহিত ছিল—এই জাতীয় প্রশ্নগুলির সমাধান না হলে সেকালের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সহজসাধ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দী অতিকায় ব্যক্তিত্বের শতাব্দী। তাঁদের ব্যক্তিত্বের অভ্রভেদী মহিমা ও গৌরবান্বিত কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। কিন্তু এ হল আধুনিক যুগ, বিচিত্র চিন্তার জট-পাকানো জটিল যুগ। গড্ডলিকাপ্রবাহে স্রোত থাকে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দী যেহেতু ব্যক্তির শতাব্দী, সেইজন্য মত ও পথের সংঘাতেরও শতাব্দী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পুত্রপ্রতিম কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ সে যুগের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় হেস্টি সাহেবের সঙ্গে হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচ্য সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের সমর্থক ছিলেন, আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল, যার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব রামকৃষ্ণ পরমহংস ও যার নাট্যভাষ্য গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক—এদের মধ্যে কি কোনো মিল ছিল? কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও দ্বিজেন্দ্র-

ফটো : রাজীবকুমার দে

নাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক একটি সর্বজনবিদিত কাহিনী। কিন্তু কৌতি-শিষ্য কৃষ্ণকমলের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তার পার্থক্য শুধু দুস্তরই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধীও বটে। ঊনবিংশ শতাব্দী বিশাল ব্যক্তিত্বের মহৎ কর্মপ্রচেষ্টার শতাব্দী। কিন্তু এই বিচিত্র-প্রবাহিনী ধারাগুলির যথার্থ সমন্বয় হয়েছিল কি?

(২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে যে সমস্ত মূল্যবান দলিল আমাদের হাতে উপস্থিত হয়েছে, বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত (১৮৭৫—১৯৩৬) ছিলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও চিন্তাশীল প্রবন্ধকার। পুস্তকাকারে গ্রথিত হয় নি, তাঁর এমন বহু রচনা তৎকালীন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করে আছে। প্রধানত আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বিপিনবিহারী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রথম (১৩২০) ও দ্বিতীয় (১৩৩০) পর্যায় এবং 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রথম (১৩২১) ও দ্বিতীয় পর্যায় (১৩৩৪) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পাণ্ডিত্যে, রসিকতায়, নিপুণ বিশ্লেষণে ও স্মৃতিচিত্রণের মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিপিনবিহারীর এই দুটি গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রথম পর্যায়ের কথক দুজন—আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কথক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, অমৃতলাল বসু, ব্রজমোহন মল্লিক ও রাধামাধব কর। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তৃতীয় পর্যায়ের রচনাগুলি লেখকের জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘকাল পরে তিনটি পর্যায় একত্রিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।*

লিটন স্ট্র্যাচি এলিজাবেথীয় যুগের পত্রসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"The most lasting utterances of a man are his studied writings; the best are his conversations."

ছাপার হরফে যা প্রকাশিত হয়, তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর মুখের কথা, সে তো কালস্রোতে মুহূর্তের বুদ্বুদবিলাস মাত্র। কিন্তু স্ট্র্যাচির এই মন্তব্যে বিচারের সর্বাংশ প্রকাশিত হয় নি। অধ্যয়ননিষ্ঠ ও শ্রমলব্ধ রচনার স্থায়িত্ব ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত থেকেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে এই জাতীয় লেখায় রচয়িতার ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক উদ্ঘাটন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ 'studied writings'-এ রচয়িতা সতর্ক ও সচেতন। অতিসচেতনতার ফাঁক দিয়ে ব্যক্তিত্বের অবিমিশ্র নির্যাস কখন যে অপসৃত হয়, তা তিনি উপলব্ধিও করতে পারেন না। কিন্তু মুখের কথার স্বাদ আলাদা, রস আলাদা। তাতে যত্নকৃত কলাকৌশল ও সতর্ক-সচেতন মনের আত্মপ্রকাশ অনুপস্থিত। তাই এখানে ব্যক্তিত্বের উদ্ঘাটন যেমন সহজ, তেমনি অবলীলাকৃত। এমন কি তুচ্ছ একটি মুখের কথায় মানুষের অন্তর্লোক এমনভাবে উদ্‌যাপিত হতে পারে, যা শ্রমলব্ধ কোনো রচনার ভিতর দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। মুখের কথায় ফুটে ওঠে ব্যক্তিমনের সহজ রূপ।

মুখের কথা ক্ষণবুদ্বুদ। কিন্তু সেই কথাগুলিকে যদি কোনো সুদক্ষ লিপিকার ছাপার হরফে ধরে রাখতে পারেন, তাহলে তথাকথিত 'studied writings'-এর চেয়ে যে এর মূল্য অনেক বেশি হবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুশ্রুত মন্তব্যটিকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—"আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বসওয়েল কেহ ছিল না; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।" ছোটখাটো ঘটনায়, সহজ হাস্যপরিহাসে, আপাততুচ্ছ দু' একটি মন্তব্যে মানবচরিত্রের এমন এক একটি অংশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যা অনেক সময় তাদের জীবনের বড় বড় ঘটনায় পাওয়া যায় না। বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের মধ্যে গত শতাব্দীর কয়েকজন প্রবীণ মনীষীর মুখনিঃসৃত বাণীকে ধরে

* বিদ্যাভারতী সংস্করণ, সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়।

রেখেছেন। যুগজীবনের মহৎ ভাববিপ্লব কিভাবে সে যুগের চিন্তানায়কদের মনে বিচিত্র স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিল, তার একটি আন্তরিক রূপ এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' কয়েকজন মনীষীর বাণী-সংকলন হলেও সংকলয়িতার কৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়। বিপিনবিহারী প্রশ্ন করেছেন, তাঁর প্রশ্নানুযায়ী জবাব আদায় করেছেন। সে যুগের মর্মবাণী তিনি উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন—তাঁর প্রশ্নাবলীর মূলে আছে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর কৌতূহল ও একটি মহৎ ভাবাদর্শ। তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি কথকদের বিচিত্র ভাষণগুলিকে সামগ্রিক ভাবসত্যে গ্রথিত করেছে। ঐতিহাসিক গীবন একদা প্রাচীন রোমনগরীর ভগ্নস্তূপের মধ্যে এক মহিমান্বিত ভাবসত্য আবিষ্কার করেছিলেন। অতীতকীর্তির সমাধিমূলে দাঁড়িয়ে তিনি এক রোমাঞ্চিত অনুভূতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। সেই বিস্ময় ও রোমাঞ্চ তাঁকে রোমসাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই গীবনের এই মহাগ্রন্থ শুধু তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস বিবৃতিতে পরিণত হয়নি, ঐতিহাসিক যাথার্থ্যের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে উজ্জ্বল রসচেতনার। গীবন-রচিত রোমসাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসের সঙ্গে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর কোনো তুলনা চলতে পারে না। কিন্তু বিপিনবিহারী এক মহৎ যুগের শেষরশ্মিরেখার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনার মূলে আছে এক গভীর অনুপ্রেরণা ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদ। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'সূচনা' অংশে বিপিনবিহারীর হৃদয়াবেগ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। শরৎ-সায়াহ্নে বীডন উদ্যানে সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ যে কথা বলেছেন, তা বিপিনবিহারীর নিজেরই কথা :

"যদি কোনও বিজন সন্ধ্যায় সেকালের ছায়া তোমার মনের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও, মনে বল পাইবে, আনন্দ পাইবে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ইদানীন্তন বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের স্পর্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিস। * * * আজ পুরাতনের মোহ আমাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের যে গোপনকক্ষ গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, কি জানি আজ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের দিগন্ত হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া আমার সমক্ষে সেই অর্গলবদ্ধ কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আমার সঞ্চিত বেদনা সেই নিশীথের বায়ুস্তরে মিশাইয়া গেল। আমার এই অফুরান কথা কত শুনিবে? ভাষায় কি আমি মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছি?"

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই স্মৃতিকাহিনীগুলির মধ্যে বিপিনবিহারী কোথায়ও আত্মঘোষণার চেষ্টা করেন নি। নিরভিমানে যা মহৎ, তাকেই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছেন। স্মৃতিকথা যে এতখানি বিষয়নিষ্ঠ হতে পারে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' তার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। আত্মকথাকে বাদ দিয়েও স্মৃতিকথা রচিত হতে পারে, এবং তার আস্বাদন-মাধুর্য যে কমে না, বিপিনবিহারী তা দেখিয়েছেন। স্মৃতিকথা জাতীয় রচনায় রচয়িতার এমন আত্মগোপনের ইতিহাস যথার্থই দুর্লভ। এখানে বিপিনবিহারীর চরিত্ররূপের সর্বোত্তম মহিমা উদ্ভাসিত হয়েছে। সে যুগের মহিমাকে লেখক এমন একটি বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে আরতি করেছেন, যেখানে তাঁর নিজের কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি—বর্ণনীয় বিষয়ের তুলনায় নিজেকে এতোই ছোট মনে হয়েছে তাঁর। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য পর্যালোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকরগ্রন্থ। সৃষ্টির আড়ালে স্রষ্টা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। আত্মগোপনের এই অসামান্য মহিমায় বিপিনবিহারীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যিক-জীবন নতুন অর্থদ্যোতনায় মণ্ডিত হয়েছে।

(৩)

পুরাতন প্রসঙ্গে যে স্মৃতিকাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০-১৯৩২) স্মৃতিকাহিনীই দীর্ঘতম। প্রথম পর্যায়ের পনেরটি অধ্যায়ের মাত্র একটি অধ্যায় ছাড়া আর সবগুলিই কৃষ্ণকমলেরই স্মৃতিকাহিনী। তৃতীয় পর্যায়ের যে চারটি অধ্যায় আছে তাতেও কৃষ্ণকমলের বক্তব্যই সংকলিত হয়েছে। পুরাতন প্রসঙ্গের তিনটি পর্যায় মিলে যে স্মৃতি-কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে, তার অর্ধেকেরও বেশি কৃষ্ণকমলের স্মৃতি-কাহিনী। দীর্ঘজীবী কৃষ্ণকমল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিচিত্র ভাবতরঙ্গের শুধু নীরব দর্শকই ছিলেন না, যুগাবর্তে তাঁর মনোজীবনও আন্দোলিত হয়েছিল। আচার্য কৃষ্ণকমল ছিলেন বিচিত্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর সুকর্ষিত মনোজীবনে। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীরা অনেকেই পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও অগস্ত্ কোঁতের প্রভাব সে যুগে যে কতখানি সক্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আচার্য কৃষ্ণকমলের উক্তি থেকে। কৃষ্ণকমল মনেপ্রাণে ছিলেন কোঁৎশিষ্য। মিল ও কোঁতের মতান্তর ও তুলনামূলক আলোচনা দিয়েই তিনি তাঁর স্মৃতিকাহিনী শুরু করেছেন। এক সময় কোঁৎ-কোটিল্ডের প্রণয়কাহিনী নিয়ে তিনি একটি গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকাহিনী থেকে তৎকালীন বাংলাদেশে কোঁৎ-চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য জানা যায়। কোঁতের ধ্রুবদর্শন নিয়ে এক সময় কৃষ্ণকমলের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাদানুবাদ হয়েছিল। কৃষ্ণকমল কোঁতের ধ্রুবদর্শন নিয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'Positivism কাহাকে বলে?' ও 'প্রামাণিক ধর্ম' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধ দুটির প্রতিবাদে লিখেছিলেন, 'পজিটিবিজম এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম' প্রবন্ধ।

কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-চিত্রণ। বিদ্যাসাগরের আগ্রহেই কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের আবহাওয়া বর্ণনা করতে গিয়ে আচার্য কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগর যে কিভাবে এই কলেজের আমূল সংস্কার করেছিলেন, তারও উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমলের মনে পড়েছিল ডাঃ জনসন সম্পর্কে সকলের বহুশ্রুত অভিমতটির কথা। বিদ্যাসাগরের গদ্য স্টাইল সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য : "সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ।"

কৃষ্ণকমলের বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। বিদ্যাসাগর চরিত্রের অসামান্যতা তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু সেখানেও শ্রদ্ধাতিশয্য তাঁর বিশ্লেষণী মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিনি বিদ্যাসাগরের মতামত ও রুচিকে সমর্থন করতে পারেননি। মধুসূদনকে বিদ্যাসাগর নানাভাবে সাহায্য করেছেন, এ কাহিনী
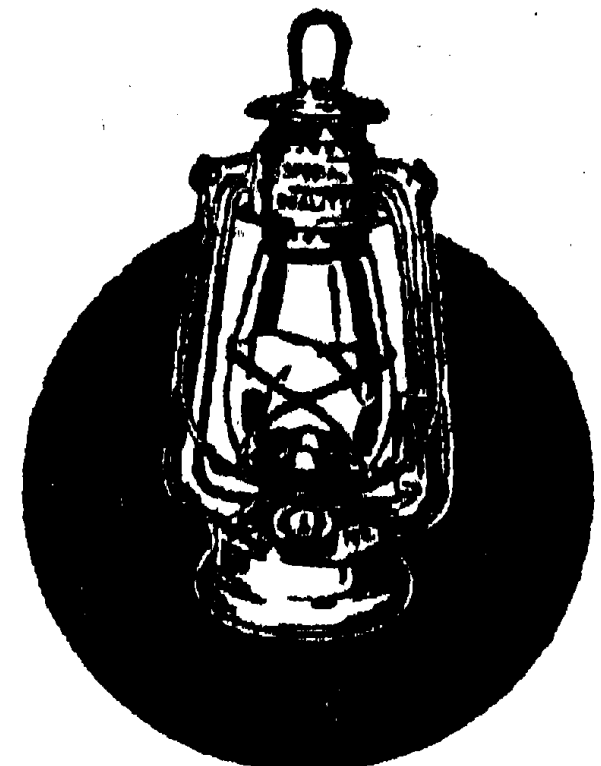
আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছিল তাঁর অসহ্য। বঙ্কিমকেও তিনি পছন্দ করতেন না। বঙ্কিমের রচনারীতি তাঁর ভালো লাগেনি। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কেও ছিল তাঁর বিরূপ ধারণা। কৃষ্ণকমল এসম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য : 'আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁহার bigotry তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে Catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাঁহাকে নগণ্য মনে করিলেন।...... পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলা ত দূরের কথা, তিনি ইংরাজী শিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।' বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর আর একটি মন্তব্যও স্মর্তব্য : 'আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরের সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোন বাঙালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়।......তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্বল্য ছিল, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।' বিদ্যাসাগর চরিতের অভ্রভেদী মহিমা রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ মনীষীকে বিস্মিত করেছিল। শ্রদ্ধাবিগলিত মুগ্ধদৃষ্টির সাহায্যে তাঁরা মানবমাহাত্ম্যের এই অত্যুচ্চ গরিমাকে আরতি করেছেন। কৃষ্ণকমল কাছের মানুষ বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন—তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিনিষ্ঠ মন আবেগের বাষ্পোচ্ছ্বাসে ঝাপসা হয়নি। মানুষ বিদ্যাসাগরের অন্তর্জীবনের বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। কৃষ্ণকমলের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিকথা বিদ্যাসাগরচরিতরচনার মূল্যবান উপকরণ।

আচার্য কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকাহিনী থেকে মদনমোহন তর্কালংকার, দ্বারকানাথ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ পালিত, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রমুখ তৎকালীন খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিদের অনেক অন্তরঙ্গ কথা জানতে পারি। দ্বারকানাথ মিত্র ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রসঙ্গে আচার্য কৃষ্ণকমল তৎকালীন কোঁৎ-চর্চা প্রসঙ্গে আবার আলোচনা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নবজাগ্রত চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গ বিচিত্র আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। এই উপলক্ষে সভা-সমিতি ও নানা আলোচনাচক্রের সৃষ্টি হয়েছিল। সে যুগের সভা-সমিতি ও আলোচনাচক্রগুলি তৎকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই অপরিহার্য অঙ্গ। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমল তালতলা 'পজিটিভিস্ট ক্লাব'-এর যে পরিচয় দিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। যোগেন্দ্রচন্দ্র কোঁতের মতবাদকে আমাদের দেশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সে ইতিহাসও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। কোঁতের মতবাদের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রও প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকমলের মতে "বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমার মনে হয় না।"

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবপ্রবণতার একটি ছবি স্নিগ্ধপ্রসন্ন কৌতুকোচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়েছে। ওকালতি ও কবিত্ব—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব হেমচন্দ্রের জীবনে যে কী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেমন উপভোগ্য, তেমনি কবির ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডির নির্দেশক : 'বৃত্রসংহার' শুরু হইলে তাঁহার ওকালতিতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিনশত টাকা ফী দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না; হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন।" বিহারীলাল চক্রবর্তী স্মৃতিকাহিনী থেকে তাঁর কাব্য-জীবন ও ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। বিহারীলালের কবিমানস ও কাব্য-জীবন সম্পর্কে পরবর্তী কালে অনেকেই আলোচনা করেছেন, কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের এমন অন্তরঙ্গ ছবি যথার্থই দুর্লভ। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে আচার্য কৃষ্ণকমল যুগজীবনের যে কথামৃত পরিবেশন করেছেন, তার সজীবতা বিস্ময়বস্তু।

সেকালের সংস্কৃত কলেজের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস বর্তমান যুগে দুর্লভ নয়, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের প্রথম স্নাতকের মুখ থেকে সে কাহিনী শোনার মধ্যে একটি নতুন রস আছে। কারণ, স্মৃতিরসে সমৃদ্ধ হয়ে সে কাহিনী এখানে সাহিত্য-পদবাচ্য হয়েছে। সে যুগে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে যে-সব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তারও মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথায়। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের রচনা-রীতি পছন্দ করতেন না। বিদ্যাসাগরভক্ত প্যারী কবিরত্ন ও 'হালিসহর পত্রিকা' বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখেছিলেন, স্মৃতিকথায় কৃষ্ণকমল সেগুলি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন। সমকালীন রুচি ও আদর্শের সংঘাত এবং সাংস্কৃতিক আবহাওয়া প্রবীণ কৃষ্ণকমলের স্মৃতিরসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

(৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-মানসের বহুমুখী সম্প্রসারণ সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে উৎসারিত হয়েছে। নাট্য-সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের কাহিনী তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু ও রাধামাধব কর তাঁদের স্মৃতি-কাহিনীতে শুনিয়েছেন বাংলা থিয়েটারের আদি ও মধ্য-পর্বের কাহিনী। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-কাহিনীতে 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় থেকে পেশাদারী থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় পর্যন্ত প্রায় ষোল-সতের বছরের বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। অমৃতলাল বসু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়র কথাসূত্র অবলম্বন করে বাংলা রঙ্গমঞ্চের পরবর্তীকালের কাহিনী শুনিয়েছেন। এই কাহিনীর সঙ্গে অমৃতলালের জীবন-কাহিনীর যে অংশ প্রকাশিত হয়েছে, তার তথ্যগত মূল্য অনস্বীকার্য। রসরাজ অমৃতলালের বাকচাতুর্য ও রসিকতা তাঁর স্মৃতি-কাহিনীর মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর কাশীতেই পরিচয় হয়। নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী'-রচনাপ্রসঙ্গে অমৃতলাল বলেছেন : "কালী, কলম, কাগজ ও একটি বোতল মদ লইয়া নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম। বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে নবীনকে বলিলাম,—'লিখ্‌বে ত লেখ, নইলে মদ দোব না।' নবীন এক নিঃশ্বাসে রঙ্গমতী লিখিয়া ফেলিল।" রাধামাধব করও সে যুগের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন। রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে সেকালের থিয়েটারের গল্প শুনিয়েছেন। রাধামাধব কর শুধু সুদক্ষ অভিনেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও সংগীতরসিক। সেকালের যাত্রা, কবির লড়াই ও তরজা সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা যেমন মনোজ্ঞ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। বৃদ্ধ বয়সে গোবিন্দ অধিকারীর বৃন্দাদূতীর সাজ, বদন অধিকারীর রাধা-বিরহের গান, যাদব কবির ব্যঙ্গ-সংগীত, তরজা গানের উক্তি-প্রত্যুক্তির বাক-চাতুর্য, শতাধিক ইয়ারপরিবেষ্টিত শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের গঞ্জিকাসেবীর আসর প্রভৃতি প্রসঙ্গ করমহাশয়ের কথকতার গুণে রমণীয় হয়ে উঠেছে। বিগতদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উমেশচন্দ্র দত্তর স্মৃতিকথা থেকে সেকালের কৃষ্ণনগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য জানা যায়। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও উক্ত কলেজের প্রথম দিকের অধ্যাপকদের কাহিনী আচার্য দত্তর মুখে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র, রামতনু লাহিড়ী, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সে-যুগের অনেকের সঙ্গেই উমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, নীলকর আন্দোলন প্রভৃতি তৎকালীন সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উমেশচন্দ্র নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর স্মৃতিকাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য। ভূদেব একদিন তাঁকে বলেছিলেন—'ইংরেজ যদি বাঙালীর মেয়ে বিয়ে করে ত ভাল হয়।' ভূদেবের এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁর চরিত্রের নতুন দিক উদ্ঘাটিত করবে। কারণ ভূদেব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁকে অনেকেই প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উমেশচন্দ্রের স্মৃতিকাহিনী থেকে ভূদেব-চরিত্রের নতুন তথ্য পাওয়া গেল। তাঁর উপর সুবিচার হয়নি, তাই পুনর্বিচারের অপেক্ষা রাখে। ব্রজমোহন মল্লিকের স্মৃতিকথায়

ডেভিড্ হেয়ারের যে সংক্ষিপ্ত চিঠিটি আছে, তা অবিস্মরণীয়। ব্রজমোহনের স্মৃতিকথা থেকে তৎকালীন হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যায়।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে যে স্মৃতি-কাহিনীগুলি সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনোধর্ম ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর। তৎকাল প্রচলিত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন দেশাত্মবোধকে তিনি মনে-প্রাণে স্বীকার করতে পারেন নি, তিনি তাই নির্দ্বিধায় বলেছেন : "ইস্কুল-কলেজগুলো উঠিয়া গেলে যে বাস্তবিক আমাদের সমাজের লোক-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হইবে এমন ত মনে হয় না। বরং সমাজের কল্যাণকর সুশিক্ষার প্রবর্তনে সুফল ফলিতে পারে। নাহলে আমরা যতই কেন 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' বলিয়া চীৎকার করি, আমরা কিছুতেই স্বদেশী হইতে পারিব না।" রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজনারায়ণ বসুর দেশাত্মবোধ তাঁর মতে 'বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী।' বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়-কুমার দত্ত সম্পর্কে তাঁর অভিমতগুলির মধ্যেও ক্রিটিক্যাল দৃষ্টির অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথার মধ্যে তৎকালীন ঠাকুরবাড়ির একটি মনোরম ছবি পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরপ্রসঙ্গে তিনি যে দার্শনিক আলোচনা করেছেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি আভাস পাওয়া যায়।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' ইতিহাস হয়েও সাহিত্য। স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে যে এক অপূর্ব মায়াজাল বিস্তৃত হয়, সেই মায়া-মন্ত্রই একে দিয়েছে উপন্যাসের রমণীয়তা। দূরকালের ব্যক্তি ও অতীত ঘটনাবৈচিত্র্য—একটি শতাব্দীর সমুচ্চ শিখরকে প্রকাশ করেছে। যার শুভ্রোজ্জ্বল নিঃসঙ্গ মহিমা আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু একালের পাঠকের সামনে তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায়। এই শতাব্দীতে পশ্চিমের ভাবসম্ভার যেমন আমাদের চিন্তাধারাকে সতেজ ও বিচিত্র প্রবাহিনী করেছিল, তেমনি এই যুগের মধ্যেই ছিল তার প্রদীপ্ত প্রতিবাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্মৃতিকথাগুলির মধ্যে বিচিত্র বিরোধ ছিল, তাকেও এ যুগের ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। পাশ্চমী শিক্ষার প্রভাবে বহু বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার সৃষ্টি হয়েছিল—তাদের স্বতন্ত্র মহিমা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, কিন্তু সব-কিছু মিলে ভাবীকালের কাছে কোন্ অখণ্ড স্বরূপকে প্রকাশ করেছে? তবু সেই অবি-স্মরণীয় ব্যক্তিত্বসমূহের নবজাগ্রত চিৎপ্রকর্ষ একালের পাঠককে স্তম্ভিত করে। আজ সে জোয়ার নেই, এক শতাব্দী পরের পাঠক বিগতদিনের স্মৃতি-চিত্রের মধ্যে তারই সমুন্ধত তরঙ্গচূড়ার স্পর্শ পায়: দূর-যুগের স্মৃতিমেদুর কণ্ঠস্বর শুনে বর্ত-মানকে স্পষ্ট দেখতে পায়, অপরিসীম শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়।

মঞ্জু বসু

(৩১)
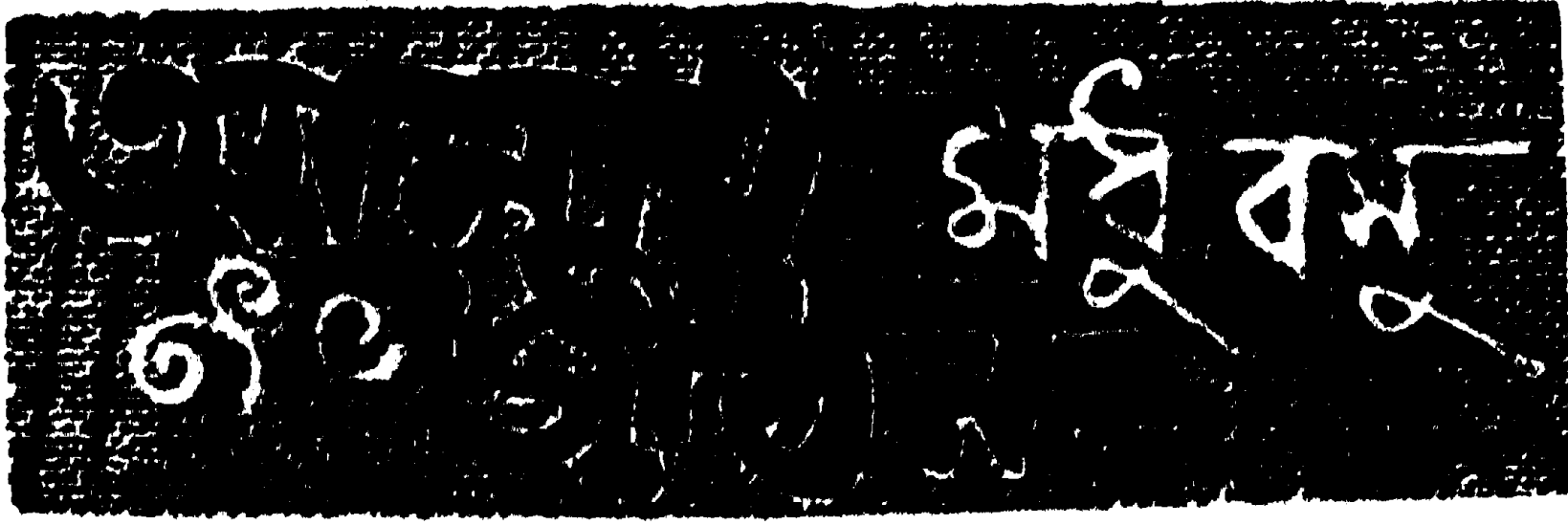
একদিন সকালে আমি আই এন আই এর অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় সাধনা হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে : আজ আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

চমকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা মানে?

—আমি, মা আর প্রদীপ। গম্ভীরভাবে বললে সাধনা।

—হঠাৎ এমন কি কারণ ঘটল যার জন্যে তোমরা চলে যাচ্ছ—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আমি বললাম।

সাধনা বেশ উত্তেজিতভাবেই বলল : তোমার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই খিটিমিটি হয়—তাতে তোমার মেজাজ ঠিক থাকে না—আমারও ভাল লাগে না—সুতরাং—

আমি বাধা দিয়ে বললাম : খিটিমিটির কারণ তো আর কিছুই নয়, রাত্রিবেলায় চেঁচামিচি হৈহুল্লোড় হয়—শুধু সেটাই বন্ধ করতে বলেছি। এতে শুধু আমার অসুবিধা হয় না পাশেরবাড়ীর লোকেরাও এ অসুবিধা ভোগ করে।—প্রতিমা, (প্রতিমা দাশগুপ্ত আমায় বলছিল এই বিষয়। এটা তো ক্লাবঘর নয়।

এই কথায় সাধনা যা জবাব দিল তাতে আমি শুধু আশ্চর্যই হলাম না—একটা দারুণ আঘাত পেলাম। কয়েক মুহূর্ত আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। কোন মতে বললাম : একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ সাধনা। তবে তুমি যদি একেবারে সব স্থির করে ফেলেই থাক, তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই। ...তা কোথায় যাচ্ছ—কোন হোটেলে?

সাধনা বললে : হোটেল নয়, মেরিন ড্রাইভে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছি, সেইখানেই যাচ্ছি।

—ওঃ, তাহলে অনেকদিন আগে থেকেই সব ঠিক করে ফেলেছ।

সাধনা আর কোন কথা না বলে চলে গেল ঘর থেকে।

অফিসে বেরুবার সময় সাধনার মার সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললাম : সাধনা এই যে এখান থেকে চলে গিয়ে আলাদা থাকতে যাচ্ছে—এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে? এমন কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেনি যার জন্যে তাকে এবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন না?

তাতে তিনি বললেন : সাধনা যখন একবার ঠিক করেছে চলে যাবার তখন আর তাকে বলে কোন লাভ হবে না বাবু। তাছাড়া সব বন্দোবস্তই পাকা হয়ে গেছে। মেরিন ড্রাইভের ফ্ল্যাটটির জন্যে আগাম টাকাও দেওয়া, এমন কি জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য লরীর বন্দোবস্তও হয়ে গেছে। আজ লাঞ্চের পরই আমরা remove করব। সুতরাং এখন আর—

হতাশভাবে আমি বললাম : ও, এতদূরে যখন গড়িয়েছে তখন আর বলে কোনো ফল হবে না। কিন্তু আমি আপনাকে বলে রাখছি যে সাধনা আজ যে পথ বেছে নিল সেটা অত্যন্ত ভুল পথ। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার মানে এই নয় যে ঘর-সংসার স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় আলাদা হয়ে থাকা। যাই হোক, তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে—নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই ঠিক করুক।

এই বলে আমি আর না দাঁড়িয়ে অফিসে চলে গেলাম।

মনটা ভীষণ খারাপ লাগল। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা এসে গেল। সেদিন আর লাঞ্চ খেতে বাড়ী এলাম না। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা মাঝে মাঝে উঁকি দিল—হয়ত সাধনা একটা টেলিফোন করবে—কিন্তু কোন ফোন এল না।

সমস্ত দিন কাজে মন দিতে পারলাম না—নানান রকম চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় করতে লাগল। এক এক সময় মনে হতে লাগল হয়ত সাধনা এতক্ষণে মত বদলেছে। হয়ত বাড়ী ফিরে দেখব ওরা যায়নি। হয়ত ঝোঁকের মাথায় সাধনা আমায় বলে ফেলেছে, কিন্তু সত্যিই কি সে এতদিনের প্রেম, প্রীতি ভালবাসা সব দুপায়ে মাড়িয়ে চলে যেতে পারবে?

কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হল—মেরিন ড্রাইভে ফ্ল্যাটের জন্য টাকা আগাম দিয়েছে যখন, তখন বেশ কিছুদিন থেকেই ওরা চলে যাবার তোড়জোড় করছে। তার ওপরে শুনলাম জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্যে লরীর বন্দোবস্ত পর্যন্ত হয়ে গেছে—নাঃ, আর তাকে ফেরানো যাবে না।

তবু? তবু কি অঘটন ঘটে না। অসম্ভব কি সম্ভব হয় না। যদি ......

এই ভাবে আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলাম। মনের মধ্যে যে ক্ষীণ আশার দীপটি ঝিলিক দিচ্ছিল সেটি একেবারে নিঃশেষে নিভে গেল।

বাড়ীতে কেউ নেই। সাধনারা চলে গেছে। তার শোবার ঘর খালি। তার আসবাবপত্র সব নিয়ে গেছে। তাছাড়া ড্রয়িংরুমের বেশীর ভাগ ফার্ণিচার এবং রেডিওগ্রামটিও নেই।

আমার ভৃত্য চামান বললে লাঞ্চের পরে একটা লরী এসেছিল তাতে সব মাল বোঝাই করে মেমসাহেব চলে গেছে। এই সামান্য কটি কথা বলতেই যেন তার গলাটা ধরে এল। আমাদের বিয়ের পর থেকেই চামান আমার কাছে কাজ করছিল। তা প্রায় বার বছর হবে।

সমস্ত দেহ মনে এক দারুণ অবসাদ নেমে এল। মনে হল, এই বিরাট বিশ্বে আমি একা—এতদিন এত বছর ধরে সুখে দুঃখে যে আমার সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছিল, সে যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে বিরাজ করছে এক বিরাট শূন্যতা। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা কি শুধু কথার কথা? সামান্য একটা মুখের কথায় কি তা চিরদিনের মত জলের দাগের ন্যায় মুছে ফেলা যায়?

শেষে সর্বসন্তাপহারিণী সুরার আশ্রয় নিলাম। লোকে বলে শোক দুঃখ মনোবেদনার অবসান ঘটাতে এর আর জুড়ি নেই। কিন্তু আমার তো মনে হয় এতে মানুষের সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলি আরও সজাগ আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বহুদিনের বিস্মৃত ঘটনাগুলি আবার মনের পর্দায় নতুন করে ধরা দেয়। মানসিক যন্ত্রণা কমে যাওয়া দূরে থাক আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় এত বড় ফ্ল্যাটটার মধ্যে আমি একা। একটা লোকও নেই—যার সঙ্গে দুটো কথা বলি। বহুদিনের পুরাতন স্মৃতিগুলি মনের মধ্যে এসে ভীড় করতে লাগল। ভাবতে ভাবতে মন চলে গেল সেই সুদূর অতীতে। মনে পড়তে লাগল—নতুন বিয়ের পর মোটরে কলকাতা থেকে দাহার যাওয়া, সেখানে প্রথম সংসার পাতা—ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্নের জাল বোনা। তারপরে গর্ভ পড়তে সাধনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার পর নিজে অসুস্থ হয়ে পড়া। অসুস্থ অবস্থাতেই বন্ধুবান্ধব

ফিরে গিয়ে সাধনাকে নিয়ে রাঁচী চলে যাবার কথা চিন্তা করা, কিন্তু কলকাতায় এসে দেখা যে, সেও টাইফয়েডে শয্যাশায়িনী—আমাকে দেখে সেদিন জড়িয়ে ধরে তার সেই আকুল কান্না। আরও মনে পড়ল, সে আমাকে পেয়ে কি রকম নিশ্চিন্তবোধ করল। আমি যেন তার একটা বিরাট আশ্রয় যার ওপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল ঃ 'যাক, তুমি এসে গেছ মধু, এবার আমি ভাল হয়ে উঠব।' তারপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সে আমাকে কাছ ছাড়া করতে চাইত না।

যদিও নার্স ছিল তার কাছে সব সময়ের জন্যে—তবুও ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য খাওয়ানো সব আমাকে নিজের হাতে করতে হোত। চুয়াল্লিশ দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের চিকিৎসায় সাধনার জ্বর ছাড়ল। তারপর তাকে নিয়ে চলে গেলাম রাঁচী। দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর সে এতখানি অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল যে সাধনাকে রীতিমত কোলে করে ট্রেনে চড়াতে হয়েছিল।

এই দীর্ঘ দিন শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তার প্রতি-ক্রিয়া সুরু হল রাঁচী পৌঁছবার পর। এতদিন শুধু স্রেফ মনের জোরে নিজেকে খাড়া রাখতে পেরেছিলাম। রাঁচী পৌঁছে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। শয্যা নিলাম। কিছুদিন পর সাধনা ভাল হয়ে উঠল। কিন্তু আমাকে নিয়ে মার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। আমার সেবা শুশ্রূষার ভার মার সাথে সাধনা খানিকটা ভাগ করে নিল।

রোগে ভুগে আমার মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে পড়েছিল। আমার অনেক অন্যায় আবদার ও অত্যাচার মাকে ও সাধনাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হোত। এইজন্যে সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে মা তার হৃদয়ের অজস্র স্নেহধারায় সাধনার মনকে ভরে দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত সাধনার মার এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে মা প্রায়ই বলতেন ঃ সাধনা আমার বাড়ীর লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী—লক্ষ্মী! বারবার মার এই কথাটাই মনে আঘাত দিতে লাগল। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না হঠাৎ মনে হোল কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। শুনলাম স্ত্রীকণ্ঠে কে যেন বলছে ঃ আসতে পারি মিঃ বোস। এবং আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই যে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে হল প্রতিমা দাশগুপ্ত, সঙ্গে বেগম পারা।

প্রতিমা বললে ঃ চলুন মিঃ বোস, একটা সিনেমা দেখে আসি, চুপচাপ একা একা বসে থেকে কি হবে?

আমি বললাম ঃ এখন একটু একা থাকতে চাই প্রতিমা। আর আমার সাথী তো আমার সঙ্গেই আছে। বলে হুইস্কির গ্লাসটা দেখালাম।

প্রতিমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। 'রাজ-নর্তকী'তে' (হিন্দী) আমি তাকে প্রথম হিন্দী ছবিতে ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছিলাম—সেজন্যে সে আমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিল। প্রতিমা হেসে বলল ঃ ও সাথীতে কোনো কাজ হবে না—তার চেয়ে চলুন আমরা তিনজনে কোথাও ডিনার খেয়ে তারপর একটা ভাল ছবি দেখে আসব।

আমি বললাম ঃ আমায় মাফ করো প্রতিমা, আজ বাইরে গিয়ে ডিনার খেয়ে ছবি দেখার মত অবস্থা নয় আমার। আর একদিন হবে'খন।

প্রতিমা বুঝল যে পীড়াপীড়ি করে কোন লাভ হবে না। শুধু বলল ঃ বেশ, কবে যাবেন আমায় টেলিফোন করে বলবেন। একটু চুপ করে থেকে বললে ঃ আপনার বাবুর্চি আছে তো।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, সে আছে বৈকি। সে যাবে আবার কোথায়?

সাধনার বিষয় কোনো কথাই ও জিজ্ঞাসা করল না—আমিও কিছু বললাম না।

প্রতিমা ও বেগম পারা চলে গেল। আমারও চিন্তাধারায় একটা ছেদ পড়ল। সামনের বড় টেবিলটার ওপরে মার ছবিটা ছিল। সেদিকে নজর পড়তেই মনে পড়ল মা প্রায়ই বলতেন সাধনা আমার লক্ষ্মী। মা যাকে লক্ষ্মী বলতেন তার এতখানি পরিবর্তন সম্ভব হল কি করে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমার ভাগ্নী সন্তুর কথা। সন্তু (সুনীতা) আমার 'আলিবাবা' স্টেজ প্রোডাকসানের প্রথম 'মর্জিনা'। তার যথেষ্ট সহজাত প্রতিভা ছিল নাচে, গানে, অভিনয়ে। ওর বিয়ের পরে আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ তোর এত ক্ষমতা, সন্তু, আমার সি-এ-পি স্টেজ প্রোডাকসান কিংবা আমার কোনো ফিল্মে অভিনয় কর না; এতখানি প্রতিভা মাঠে মারা যেতে দিচ্ছিস কেন? তার জবাবে ছোট্ট সন্তু যে কথা বলেছিল আজ দশ বছর পরে এই প্রথম সেই কথার সত্যতা আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম। সে বলেছিল ঃ অভিনয় আর সংসার একসঙ্গে করা চলে না ছোটমামা। ভালো গৃহকর্ত্রী হওয়া অথবা ভালো অভিনেত্রী হওয়া দুটোর জন্যেই দরকার সারাক্ষণের জন্যে অখণ্ড মনোযোগ। আমি প্রথমটা বেছে নিয়েছি ছোটমামা। আমার সমস্ত ক্ষমতাকে আমি সুগৃহিণী হবার জন্যে নিয়োগ করেছি—তাই দিয়ে আমি আমার স্বামী ও গৃহের পরিচর্যা করব।

সেদিন ওর কথাকে আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ এতদিন পরে আমার মনের ভ্রান্ত ধারণা—ধারণাই বা বলি কেন, একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস—ভেঙে গেল। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল,
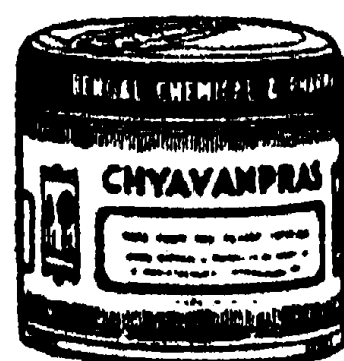
দুটো জিনিসই একসঙ্গে হয়। দুদিক একসঙ্গে সামলানো যাবে না কেন? আমি জানতাম, শিক্ষিত ও অভিজাতবংশীয় ছেলেমেয়েরা যত বেশী মঞ্চ ও চিত্রশিল্পে যোগ দেবে তত বেশী শিল্প দুটির উন্নতি হবে। এই ধারণা নিয়েই আমি আমার সি-এ-পি গড়েছিলাম। আমি সাধনাকে মঞ্চ ও চিত্রশিল্পীর জীবনকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছিলাম। গুরুদেবের 'দালিয়া' নাটকে সে যখন প্রথম অবতরণ করে, তখন তার বয়স মাত্র পনেরো বছর। এবং তখন থেকে এই দীর্ঘকাল ধরে তার সহজাত প্রতিভা আমারই নির্দেশিত পথ বেয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণবিকাশের সুযোগ গ্রহণ করেছিল এবং ক্রমে যশের শিখরে আরোহণ করেছিল। অবশ্য প্রথম যখন আমি সাধনাকে 'আলিবাবা' ফিল্মে মর্জিনার ভূমিকা দিয়েছিলাম, তখন আমার জনকয়েক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে সাবধান করবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : মধু, ঘরের স্ত্রীকে ফিল্মে নামাচ্ছ, এটা কি ভাল কাজ হচ্ছে? তুমি একটু ভেবে দেখো, ভাই। আমি তখন তাঁদের কথায় কান দিই নি, প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এর আরও একটা মস্ত কারণ ছিল এই যে, সাধনাই হচ্ছে শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত প্রথম বিবাহিত মেয়ে, যে এই চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ওর আগে যে দু-একজন অভিজাত বংশীয় মেয়ে চলচ্চিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁরা খুবই ছোটখাটো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউই ফিল্মের অভিনয়টাকে career হিসাবে গ্রহণ করেন নি, তাঁদের কাছে ওটা ছিল সেফ শখ। সাধনাই এ বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমারও জীবনে ছিল এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে একসঙ্গে শিল্পসাধনায় মত্ত হয়ে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছি, এতে আনন্দে দিশাহারা হবারই কথা—এর ভিতর ভাল-মন্দ দেখবার অবসর কৈ? কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল এবং অভিজাত পরিবারের মেয়েদের যতই ফিল্ম লাইনে পেশা গ্রহণ করতে দেখতে লাগলাম, ততই ধীরে ধীরে আমার আগেকার ধারণাকে ভ্রান্ত মনে হতে লাগল। ক্রমেই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগতে শুরু করল, ভদ্রপরিবারের যে-সব শিক্ষিত মেয়ে চলচ্চিত্রাভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কজন শেষপর্যন্ত নিজেকে সংযত রেখে সসম্মানে সব দিক বজায় রাখতে পেরেছেন?

এই যে সব দিক সুষ্ঠুভাবে বজায় রেখে চলতে না পারা, আমার বিবেচনায় এর কারণ হচ্ছে : আকাশ ছোঁয়া অহমিকা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। যেই একটু সাফল্যের পথে কোন মহিলা-শিল্পী পা বাড়ান, অমনই তাঁর পাশে এসে জোটে অগণিত ভক্তের দল। সংবাদপত্রের প্রশংসার সঙ্গে স্তাবকদের অজস্র স্তুতিবাদ এবং আশাতীত অর্থসমাগম মিশে শিল্পীকে এমনই এক অহমিকার সপ্তম স্বর্গে তুলে ধরে, যেখানে পৌঁছে শিল্পী সবাইকেই নস্যাৎ করতে শুরু করেন। তিনি তখন মনে করেন, তাঁর প্রতিভাই তাঁকে সব দিক দিয়ে বড় করে তুলেছে, কারুর সাহায্য পেলেও তিনি বড় হতেন, না পেলেও বড় হতেন—সমস্ত কৃতিত্ব হচ্ছে তাঁর। এই সময়ে তিনি মা, বাপ, স্বামী, গুরু বা আর কারুরই অভিভাবকত্ব স্বীকার করতে চান না; তাঁর মনে হয়, কাউকে গ্রাহ্য করা বা কারুর সদুপদেশ শোনা মানেই ছোট হয়ে যাওয়া। এবং এরই বিষময় ফলে যা হবার, তাই হয়ে থাকে। একদিন যে-সংসারকে তাঁর সুখের বলে মনে হয়েছিল, তা আর তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। যতদূর সম্ভব যথেচ্ছ-চারিতাকেই তিনি তখন জীবন বলে মনে করেন; একটা প্রচণ্ড উন্মত্ততা তখন তাঁকে পেয়ে বসে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, অভিনয়কে—বিশেষ করে চলচ্চিত্রের অভিনয়কে যাঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের দ্বারা সংসারধর্ম পালন করা সম্ভব নয়। এদেশে আজ পর্যন্ত কাউকে দেখলাম না, যিনি উভয় দিকই সমানভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে মানিয়ে চলেছেন। সাগরপারেও যেমন, এদেশেও তেমনই!

সাফল্য একদিন আমাকেও ঐ মহিলা-শিল্পীদের মতই আত্মম্ভরী করে তুলেছিল। তখন আমি পুরুষাকারেই সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলাম। আর কেনই বা না থাকব? পর-পর অনেকগুলো ছবির সাফল্যের ফলে যশ ও অর্থ আমার মনের ওপর সুরার মত কাজ করেছিল; তার ওপর ছিল স্তাবকদের মধুস্রাবী স্তুতিবাদ। কাজেই তখন আমি সাফল্যের গৌরীশৃঙ্গে দণ্ডায়মান সার্থক পুরুষ মধু বসু।

কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেই সার্থক পুরুষ মধু বসুর ক্ষমতা কতটুকু। আর্থিক, মানসিক, শারীরিক,—জীবনে একটার পর একটা ঘা খেতে-খেতে যখন আমার মনে হয়েছে, এই আমার জীবনের শেষ, অতলে তলিয়ে যাওয়া থেকে কেউ আর আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, দেখেছি ঠিক সেই চরম সংকট মুহূর্তে কোথা থেকে যেন একটি অদৃশ্য মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হয়ে আমাকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করেছে। এই অদৃশ্য মঙ্গলহস্তকে আমি ভগবান বলব, কি আমার নিয়তি বলে অভিহিত করব, তা আমি জানি না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয় যে, সার্থক পুরুষ মধু বসুর ক্ষমতায় এই উদ্ধারকার্য সম্ভব হত না। আজ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, রাখে হরি মারে কে? তাই তো আজ মনে হচ্ছে, ঐ সময়ে সাধনার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটবার ছিল, তাই ঘটেছিল। আবার পনেরো বছর পৃথকভাবে থাকবার পরে আজ যে আমরা দুজনে একসঙ্গে বাস করছি, এও সেই মঙ্গলময়েরই ইচ্ছা। যা ঘটবার, তা ঘটবেই—তুমি-আমি নিমিত্ত মাত্র। আজ দুজনে আলোচনা করি, তখন যদি ঐ ঘটনা না ঘটত, তাহলে দুজনের সম্মিলিত চেষ্টা ও উপার্জনে আমরা অনায়াসেই একটি স্টুডিও গড়ে তুলতে পারতাম এবং স্থায়ী প্রোডাকসান ইউনিটও আমাদের থাকত। কিন্তু মনে রাখি না যে, তা যে হবার নয়, তাই তো এসেছিল ঐ অবাঞ্ছিত দুঃখদায়ক বিচ্ছেদ। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ এবং স্টিফেন জোয়াইক-এর কথাগুলি :

> 'A man must humiliate before the unknown God. Human can do nothing without God's will. One second is enough for him to obliterate the works of years of toil and effort. And if so pleases Him —He can cause the Eternal to spring forth from the dust and mud.....No man more than a creative Artiste feels at the mercy of God....!'
>
> —Romain Rolland.

(সেই অজ্ঞাত ভগবানের কাছে মানুষকে নতিস্বীকার করতেই হবে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মানুষের কিছু করার ক্ষমতা নেই। বহু বর্ষব্যাপী উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলকে এক নিমিষে তিনি মুছে ফেলতে পারেন। আবার তাঁর ইচ্ছায় ধুলো-মাটি থেকে মুহূর্তে শাশ্বত বস্তুর জন্ম সম্ভব।... সৃষ্টিক্ষম শিল্পীর চেয়ে কেউ বেশী করে ঈশ্বরের অনুকম্পা অনুভব করে না।—রোমাঁ রোলাঁ)।

> 'The inexorable Fate — one's own Destiny. There is No escape and there is No answer to any why!'
>
> —Stefan Zweig.

(দুর্লঙ্ঘ নিয়তি — মানুষের নিজের ভাগ্য। এর থেকে পরিত্রাণ নেই—এবং কোন 'কেন'র উত্তর নেই—স্টিফেন জোয়াইক)।

(ক্রমশ)

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা :

জোহর ইন কাশ্মীর (হিন্দী) : জোহর ফিল্মস্ (প্রাঃ) লিমিটেড-এর নিবেদন; ৩,৬৪৮·৬১ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, প্রযোজনা ও পরিচালনা : আই এস জোহর; অতিরিক্ত সংলাপ : ফারুক কাইজার; সংগীত-পরিচালনা : কল্যাণজী-আনন্দজী; গীতরচনা : ইন্দীবর; চিত্রগ্রহণ : সি এস পুটু; সংগীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : এম এস শিন্ধে; রূপায়ণ : আই এস জোহর, কমল কাপুর, তেওয়ারী, উল্লাস, মুখরী, সপ্রু, মনমোহন, সোনিয়া সোহনী, মমতাজ বেগম, মনোরমা, সুলোচনা, ভি শান্তারাম প্রভৃতি। দোসানী ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর থেকে ওরিয়েণ্ট, ম্যাজেস্টিক, প্রভাত, পূর্ণশ্রী, মেনকা, কালিকা, প্যারামাউণ্ট, অলোছায়া এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

একদা হাস্যরসাভিনেতা মেহমুদকে জুটি হিসাবে নিয়ে আই এস জোহর আমাদের যে-সব ছবি উপহার দিয়েছেন, সেগুলি প্রধানত ছিল হাল্কা কৌতুক-রসাশ্রিত। এই সেদিনও আমরা 'জোহর অ্যাণ্ড মেহমুদ ইন গোয়া' ছবির অজস্র কৌতুককর পরিস্থিতি দেখে আহ্লাদে যাকে বলে ফেটে পড়েছি। কিন্তু একক আই এস জোহর আলোচ্য ছবিতেও যে হাল্কা কৌতুকোদ্রেককারী দৃশ্যাবলী নেই, এমন নয়; কিন্তু ছবিটি মূলত হচ্ছে দেশাত্ম-বোধক এবং তাও বিগত দিনের কোনো স্বদেশপ্রেমিকের জীবনী বা দেশপ্রেমের জন্যে কোনো আত্মবলিদানের কাহিনীকে আশ্রয় করে নয়, সম্পূর্ণ বর্তমান ভারতের 'জম্মু ও কাশ্মীর' প্রসঙ্গকে উপজীব্য করে গঠিত। 'জোহর ইন কাশ্মীর' ছবির কাহিনীকার, পরিচালক, প্রযোজক এবং প্রধান অভিনেতা আই এস জোহর আমাদের দেশমাতৃকার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত সন্তান, যিনি বারংবার তথাকথিত 'আজাদ কাশ্মীর' থেকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের অবিমৃষ্যকারিতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন : কাশ্মীর হ্যায় ভারতকা কাশ্মীর না দেঙ্গা। ছবির নায়ক আসলাম-বেশে তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছেন : ইয়ে পড়োসী সে লড়াই কৈসী, সভী ভাই হৈ জুদাই কৈসী, ইয়ে তবাহী কী সারী বাতেঁ হৈ, ইসমে ইনসান কী ভলাই কৈসী?—কানে এল, তাঁর ছবির শ্যুটিংয়ের মধ্যেই তাসখন্ড চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় তিনি ছবির বক্তব্যকে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন বলেই প্রতি-বেশীর মধ্যে লড়াইয়ের প্রশ্নকে তুলেছেন।

একটি কাহিনীচিত্রের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের অন্যায় আবদারের এই প্রথম সমুচিত বলিষ্ঠ সমালোচনাপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন ব'লে আমরা সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আই. এস, জোহরকে অভিনন্দিত করছি। আমরা নিশ্চয়ই আশা করি যে, প্রত্যেক রাজ্য-সরকার কাশ্মীর প্রসঙ্গ অবলম্বনে গঠিত এই দেশাত্মবোধক ছবিটির ওপর থেকে প্রমোদকর প্রত্যাহার করে জনসাধারণের কাছে ছবিটিকে প্রদর্শনের সুযোগকে অধিকতর বিস্তৃত করতে সাহায্য করবেন।

অ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী চিত্রে তনুজা। —ফটো : অমৃত

দরবেশের ছদ্মবেশে চারজন অনু-প্রবেশকারী কাশ্মীরী হোমগার্ডের অন্যতম সদস্য আস্‌লাম-এর প্রণয়িনী সাল্‌মার গৃহে উদার বদান্যতা এবং আতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে কি নৃশংস আচরণ করেছিল এবং সুন্দরী সাল্‌মাকে বলপূর্বক আজাদ

কাশ্মীরে 'অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় সেই হোমগার্ড কি আশ্চর্য অকুতোভয়ে তার প্রণয়িনীকে উদ্ধার করে অনুপ্রবেশকারী পাপাত্মাদের সমুচিত শাস্তিবিধান করেছিল, তারই উত্তেজক ও হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বিধৃত হয়েছে "জোহর ইন কাশ্মীর" ছবিতে। শ্রীইন্দর সিং জোহর এই সালমা চরিত্রটিকে যে-ভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে তাকে মূর্তিমতী আধুনিক কাশ্মীর বললেও অত্যুক্তি হবে না। ভারতসন্তানেরা যে নিগৃহীতা কাশ্মীরভূমিকে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে অসীম বীর্যবত্তার পরিচয় দিয়েছে, কাহিনীর আকারে সেই পরম সত্য তথ্যটিই বিবৃত করেছেন শ্রী আই. এস. জোহর।

অভিনয়ে শ্রীজোহর একাই ছবির বারো আনা অংশ জুড়ে রয়েছেন। প্রথমে তিনি বেপরোয়া, বোহিসেবী জুয়াড়ী, মদ্যপ ও গুণ্ডা। পরে সুন্দরী সালমার ভালোবাসা পাবার একান্ত আগ্রহে কাশ্মীর হোমগার্ডের এক একনিষ্ঠ সদস্য এবং শেষে অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সালমা অপহৃত হবার পরে ফকিরের ছদ্মবেশে তিনি ভারতের এক দুরন্ত সাহসী সন্তান। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কার্যকলাপ, সংলাপ এবং তাঁর মুখে আরোপিত গানের চিত্রায়ণে সমগ্র দর্শকসমাজকে আবেগাপ্লুত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। নায়িকা সালমার চরিত্রটি সুন্দরী সোনিয়া সাহনীর অভিনয়নৈপুণ্যে রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট জীবন্ত হয়ে উঠেছিল; কোথাও মনে হয়নি, তিনি অভিনয় করেছেন। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের অন্যতম মোল্লা খাঁয়ের পিতার ভূমিকায় তেওয়ারী অত্যন্ত দৃপ্তভাবে অভিনয় করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোল্লা খাঁ রূপে কমল কাপুর চরিত্রটির ব্যক্তিত্বপূর্ণ ক্রূরতাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। নায়িকা সালমার অন্ধ পিতার চরিত্রটির অসহায়তা এবং ন্যায়ানুগ তেজস্বিতা—দুইই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সপ্রুর অভিনয়ের মাধ্যমে। সালমার মায়ের চরিত্রটিতেও সুঅভিনয় করেছেন সুলোচনা। সালমার ছোটভাই হাসানের চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে বালক-অভিনেতা শহীদের নাটনৈপুণ্যগুণে বারবনিতা নূরার আন্তরিক মহত্ত্বকে অতিসহজেই ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যক্তিত্বসম্পন্না অভিনেত্রী মনোরমা। জনৈক তরুণ পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীর ভূমিকায় নবাগত ডি. শান্তারাম "মুঝে কৈ জংলী কহে" গানের মাধ্যমে বিভিন্ন বশম্বী অভিনেতার ভাবভঙ্গী অনুকরণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ-ছাড়া ছোটবড়ো অপরাপর সকল ভূমিকাই সু-অভিনীত।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। একমাত্র নায়িকার প্রণয়লাভের স্বপ্ন দৃশ্যাবলী ব্যতীত সমস্ত ছবিটাই শাদা-কালো ফোটোগ্রাফী দ্বারা চিত্রায়িত। পরিচালক তাঁর বক্তব্যের প্রতি দর্শকমনকে সদাআকৃষ্ট রাখবার জন্যে কাশ্মীরের নিসর্গদৃশ্যকে গুরুত্ব দেননি। তাই সি. এস. দুট্ট তাঁর ক্যামেরাকে ঘটনার ভাবানুযায়ী দৃশ্যগ্রহণ করার প্রতিই বিশ্বস্তভাবে চালিত করেছেন। যেখানে অসহায় নায়িকা সালমাকে ঘিরে মত্ত অনুপ্রবেশকারীরা তাণ্ডবলীলা করছে, সেখানকার ভয়াবহতা ক্যামেরা যে-ভাবে তুলে ধরেছে, তাও যেমন স্মরণীয়, ঠিক তেমনই স্মরণীয় ছুটন্ত গাড়ীর সংগে বাঁধা অবস্থায় দুষ্কৃতিকারীদের হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবার দৃশ্যগুলি। সেতু ভেঙে যাওয়া, জলের ওপর দিয়ে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বহু রোমাঞ্চকর দৃশ্যে ছবিটি পরিপূর্ণ।

ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে এর সংগীতাংশ। কল্যাণজী আনন্দজীকৃত সুরারোপিত সাতখানি গানই শোনবার মতো এবং এদের মধ্যে কয়েকটি নিশ্চয়ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। আবহসংগীত ছবির ভাবকে পরিস্ফুট করতে অল্প সাহায্য করেনি।

আই. এস. জোহরকৃত "জোহর ইন কাশ্মীর" বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতাপূর্ণ বক্তব্যের অতিসার্থক চিত্ররূপ হয়েছে বলে প্রতিটি চিত্ররসিক এবং দেশপ্রেমিকের অবশ্য-দ্রষ্টব্য চিত্র।

—নান্দীকর

বাংলা চলচ্চিত্রে একটি নতুন প্রয়াস 'তুঁহু মম প্রিয়তম'

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটি নতুন বাংলা ছবি তুঁহু মম প্রিয়তম'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক দীপক মজুমদার। স্ব-রচিত কাহিনী এবং চিত্রনাট্যের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন কিশোরকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার (বম্বে), অসিত সেন, তরুণ বোস, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ইন্দ্রজিৎ ও মধুমতী। আলোকচিত্র গ্রহণে রয়েছেন চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী। বাংলা ছবিতে এই প্রথম সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন সংগীত পরিচালক রোশন। সংগীতে কণ্ঠদান করবেন লতা মুঙ্গেশকর, কিশোরকুমার, শ্যামল মিত্র ও গীতা সেন।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'

সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা ছোটদের জন্য কাহিনী 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' চলচ্চিত্রে রূপ দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এটি প্রযোজনা করছেন আর ডি বনশাল। এ ছবি সম্পর্কে শ্রীরায়ের নিজস্ব বক্তব্য হল, 'এটা হবে গানে ভর্তি ফ্যানটাসীর এক নিরীক্ষামূলক ছবি। অনেক টেকনিক্যাল এফেক্ট থাকবে। উড়ন্ত স্লিপারের দৌলতে সারা ভারত-ভ্রমণ আছে। ছবির কিছু অংশ তোলা হবে হেলিকপ্টারে, যেখান থেকে ছবির নায়করা নামবে মোঘল প্রাসাদে, মহারাজাদের দুর্গে, ঐতিহাসিক কেল্লায় এবং তাজমহলে—তবে নিস্তব্ধ ফতেপুর সিক্রি আমার বেশী পছন্দ।'

ছবির বেশীর ভাগ দৃশ্যই বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে। ছবিতে মোট সাতখানি গান থাকবে। গানের রেকর্ডিং এ মাসেই সুসম্পন্ন হবে বলে জানা গেল। বাঘার চরিত্রে সম্ভবতঃ রবি ঘোষ অভিনয় করবেন।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'

অভাবনীয় শিল্পী সমাবেশে শ্যাডো প্রোডাকসন্সের ঐতিহাসিক চিত্র 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' অনতিবিলম্বে কলকাতার দর্পণা, প্রাচী, ইন্দিরা ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। অজিত লাহিড়ী পরিচালিত এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ,অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, কমল মিত্র, তরুণকুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যো-

পাধ্যায়, দিলীপ রায়, গীতালি রায় ও রাজলক্ষী বসু। [illegible] শিল্পী [illegible] এ ছবিটির [illegible] [illegible]।

মধু বসু পরিচালিত [illegible]

[illegible] অগ্রহায়ণ [illegible] প্রথম সপ্তাহে একটি ঐতিহাসিক যুগের পটভূমিকায় [illegible] বসু-পরিচালনায় [illegible] রচনা করেছেন অভিনেত্রী-পরিচালিকা মঞ্জু দে। এ কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রদীপকুমার ও মঞ্জু দে। একটি নৃত্যের মধ্যে [illegible] [illegible] দেখা যাবে। সম্প্রতি এ-ছবির [illegible] গান রেকর্ডিং গ্রহণ করেছেন সঙ্গীতপরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত। মঞ্জু দে প্রোডাকসন্সের এ ছবিটির পরিবেশনার ভার গ্রহণ করেছেন শুভ্রতা [illegible]।

[illegible] আসছে [illegible] [illegible]

[illegible] হাসির ছবি '[illegible]' [illegible] মুক্তি আসন্ন। দুষ্মন্ত চৌধুরী ও রবীন বসু পরিচালিত এই ছবির কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন [illegible] চক্রবর্তী, তরুণকুমার, জহর রায়, দীপিকা দাস, হরিধন মুখার্জি, রূপশ্রী ঘোষ, নৃপতি চ্যাটার্জি, রাজলক্ষ্মী দেবী, প্রেমাংশু বসু, শীতল ব্যানার্জি, মিহির ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা, অমর বিশ্বাস ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরযোজনে আছেন সুধীন সেন ও আজাদ।

[illegible]

জোমিনী পিকচার্সের নতুন ছবি

প্রযোজক-পরিচালক এস এম জালান তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান জোমিনী পিকচার্সের পক্ষ থেকে পরবর্তী রঙিন ছবিটির জন্য নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত ফিরোজ খান ও পদ্মিনীকে। এছাড়া বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন রাজেশ খান্না, নাজিমা এবং প্রাণ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন রবি। ছবিটির চিত্রগ্রহণ মাদ্রাজে গৃহীত হবে।

'রঙমহল' চিত্রে প্রদীপকুমারের দ্বৈত ভূমিকা

ইউ এন প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'রংমহল' চিত্রের দুই নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার। নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন পদ্মিনী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন আনোয়ারা হুসেন, জীবনকলা, ইন্দিরা ও সাপ্রু। ছবিটির পরিচালক হলেন বাবুভাই মিস্ত্রী।

নরেশকুমার পরিচালিত 'আগ'

প্রযোজক-পরিচালক নরেশকুমার তাঁর রঙিন ছবি 'আগ'এর বহির্দৃশ্য সম্প্রতি কাশ্মীর অঞ্চলে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান ছবির অন্তর্দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন ফিরোজ খান ও তনুজা। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন [illegible] খান্না।

'অজানা' চিত্রের শুভ মহরৎ

সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওর কে এস [illegible] রঙিন ছবি 'অজানা'র শুভ মহরৎ [illegible] পর্যায়ে [illegible] শুরু হল। মহরৎ অনুষ্ঠানের পর নায়িকা [illegible] চিত্রগ্রহণ শুরু হল। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রকুমার, [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]। সুরযোজনার [illegible] প্রযোজিত এ ছবিটি পরিচালনা করছেন কে পি আত্মা। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

[illegible]

বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

সেদিন বাসন্তী রঙে রাঙানো শাড়ি পরে জাহাজ-পাইলট মিঃ মুখার্জি'র ছোট্ট মেয়ে মিনি আবদার করে বলেছিল কথাটা। কিন্তু মিনি বাসন্তী হতে পারল না। দিনের পর দিন বিবর্ণ হয়ে নিউমোনিয়ায় একদিন সে মারা গেল। একমাত্র গৌতম ছাড়া এ সংসারে আর কেউ রইল না। মিনি বেঁচে থাকলে আজ ওর বয়স হত সতেরো। মিঃ মুখার্জির মতই সে দেখতে হয়েছিল। শুনেছি বাপের মত মেয়ের মুখ হলে সে নাকি ভাগ্যবতী হয়। কিন্তু মিনি? সে তো কোনদিন আর বাসন্তী হবে না।

আজ জাহাজের চাকরী জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন মুখার্জি। সারা জীবনের রোজগার দিয়ে একটা মনের মত বাড়ি করেছেন কলকাতায়। জীবনের শেষ কটাদিন এখানেই কাটিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন। সঙ্গে স্ত্রী নীলিমা দেবী রয়েছেন। গৌতমও পরীক্ষার পর ফিরে আসবে। নিজে থেকেই ফেয়ারওয়েল পার্টি নাকচ করে দিয়েছেন মুখার্জি। সহযোগীরা তাই অনাড়ম্বরভাবে সবাই চাঁদা তুলে স্মৃতি হিসেবে রুপোর একটা টাগের মডেল উপহার দিয়েছেন।

বিদায়ের আগের দিন ঘটনাটা ঘটল। ঠিক মিনির মত দেখতে একটা মেয়ে এসে মুখার্জির সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করল। একটা চিঠি দিল। ছোট্ট চিঠি। কিন্তু পড়তে পড়তে মুখার্জি হঠাৎ বেসামাল হয়ে চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে সামলে নিলেন কেন? চিঠিতে কি অশুভ কোন সংবাদ আছে? না আর কিছু! একমুহূর্তে একটা বিরাট অতীত স্মৃতির দরজাকে এক ধাক্কায় খুলে দিল। কখন যেন পায়ে পায়ে নীলিমা দেবী চলে এসেছেন। [illegible] পর [illegible] মুখার্জি মেয়েটিকে [illegible], এ [illegible]। তোমার মা।

—[illegible]

কথাটা শুনেই বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নীলিমা দেবী। মেয়েটি কখন যে তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তা টের পেলেন না। একি শুনলেন নীলিমা দেবী। মুখার্জি আবার সহজ স্বরে বললেন, সোমা আমার মেয়ে।

—মেয়ে!

—হ্যাঁ। ওর মার নাম সুজাতা।

—সুজাতা!

—হ্যাঁ সে অনেক কথা। পরে সব বলছি। মেয়েকে আগে কাছে টেনে নাও। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসছে ও।

শেষজীবনের সব সাধ সব কল্পনা এক মুহূর্তে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। নীলিমা দেবী কিছুতেই সোমাকে কাছে টেনে নিতে পারলেন না। এবার বুঝি গৌতম আর নীলিমা দেবীর প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে মুখার্জি'র কাছে। তাই যাবার দিন একা একাই সোমাকে নিয়ে মুখার্জি কলকাতায় রওয়ানা হয়েছেন। শুধু নীলিমা দেবী বলেছেন, গৌতমের পরীক্ষা শেষ হলে এক সঙ্গে ফিরব।

নিউ আলিপুরের এক প্রান্তে মুখার্জি'র নতুন বাড়ি। প্রথম কয়েকদিন নানান কাজের মধ্যে দিনগুলি শেষ হয়েছে। পুরনো বন্ধু আর আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে লাফাতে লাফাতে কখন যেন পরিশ্রান্ত হয়ে মুখার্জি থেমে পড়েছেন। সবাইকার ঐ এক প্রশ্ন—সোমা কে? ভেবেছিলেন মুখার্জি সোমার কাছ থেকে সুজাতার এই দীর্ঘ না-জানা জীবনের অনেক কিছু জেনে নেবেন। কিন্তু বলি বলি করেও কিছুতেই মুখার্জি এসব কথা সোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। এত কাছে থেকেও সোমা যেন অনেক দূরে সরে রইল। সেই হারিয়ে যাওয়া বাসন্তী সোমা হয়ে ফিরে এসেও মুখ ফুটে একথা বলতে পারলেন না মুখার্জি। মনের মধ্যে কিসের একটা দ্বন্দ্ব ঝড় হয়ে তোলপাড় করছে।

সোমা তাই বাসন্তী হতে পারছে না। সোমা নিজেকে অপরাধী মনে করে। বাবা যেমনভাবে তাকে গ্রহণ করলেন তেমনভাবে

কৈ এখানকার মা তো তাকে কাছে টেনে নিতে পারলেন না? বরং নিজে থেকেই দূরে সরে রইলেন। এ বাড়ির এক কোনার ঘরে বসে বসে একা সোমা কে'দে কে'দে দুটি অশ্রুনদী ভরিয়ে তোলে। প্রতিদিন সূর্য ওঠার সকালে পূবের জানলায় দাঁড়িয়ে সোমা প্রথম সূর্যকে প্রণাম করে। ছোটবেলা থেকেই মা তাকে সূর্যকে প্রণাম জানাতে শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হিন্দুদের কাছে সূর্য হল পবিত্র দেবতা। প্রকৃতি যে মানুষের দেহ আর মন সঞ্জীবিত করে তোলে, এটা হিন্দু দর্শন যতটা বুঝেছে আর কেউ তা বোঝেনি।

কিন্তু মুখার্জি! তিনি কি বোঝাতে পারছেন তার মনের বেদনা। নীলিমা কি কোনদিনই বুঝবে না! সোমাকে কি সে মেনে নেবে না? ভাবতে ভাবতে এক একসময় মুখার্জি কেমন যেন হয়ে যান। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারান। সুজাতা কি এখনও তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে? কিন্তু সুজাতা তো ফিরে আসতে চায়নি। স্বদেশে ফিরে আসার সময় মুখার্জিকে সুজাতা বলেছিল, প্রেম এক আশ্চর্য অনুভূতি। যখন আসে ঝড়ের মত আসে। একে কোন বুদ্ধি দিয়ে, কোন সংস্কার দিয়ে প্রতিরোধ করা যায় না। প্রেম আমার জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে থাকুক। ত্যাগেই তো ভোগ। দেশে ফিরে আবার বিয়ে কোর। আমার জন্য ভেবো না।

সেই থেকে আঠারো বছরের ছাড়াছাড়ি সুজাতার সঙ্গে। স্বদেশে ফিরে মুখার্জি নীলিমা দেবীকে বিয়ে করেছেন। ভুলতে চেয়েছিলেন অতীতকে। কিন্তু সোমা যে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে একদিন বাবার কাছে ফিরে আসবে ভারতকে দেখবে বলে, তা মুখার্জি ভাবতেও পারেন নি।

অভিশপ্ত চম্বল চিত্রের নায়িকা পুতলীবাঈ-এর ভূমিকায় মঞ্জু দে

মুখার্জির মেজদার মেয়ে সুমনা ছাড়া সোমার সমবয়সী কেউ নেই এখানে। মাঝে মাঝে সুমনা এসে সোমাকে ঝড়ের মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ইন্ডিয়া হাউসের এক পরিচিত ভদ্রলোকের চিঠি নিয়ে সোমা এখানে অভিজাত বংশের ছেলে অভিজিৎ বোসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কিন্তু তাকে কেন জানি সোমার ভাল লাগেনি।

হঠাৎ নীলিমা দেবী একদিন ফিরে এলেন কলকাতায়। বোধহয় নিজের অধিকার-টুকু আদায় করতে। কয়েকদিনের মধ্যে নীলিমা দেবীর মা দিল্লী থেকে চলে এলেন মেয়ে-জামাইয়ের নতুন বাড়ি দেখতে। হয়তো বা এ-বাড়ির থমথমে পরিবেশকে সহজ করে দেবার জন্য তার অসময়ে আগমন। সোমার কাছ থেকে সুজাতার সবকিছু খবর নিয়ে তিনি মিলি হিসেবে সোমাকে গ্রহণ করতে নীলিমাকে উপদেশ দিয়ে এক সময় চলে গেলেন। সেই থেকে হঠাৎ যেন নীলিমা দেবী সোমাকে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু সোমা যেন মন থেকে তার নতুন মাকে গ্রহণ করতে পারল না। তবে বাবার মুখ চেয়ে শেষপর্যন্ত সোমা নতুন মাকে আর দূরে ঠেলতে পারল না। বাবা কথা বলেন কম, কিন্তু কথা না বলে প্রকাশ করেন অনেক কিছু। বাবা যে তাকে কত ভালবেসে ফেলেছেন, সে কি সোমা বুঝতে পারে না? তাই তো বাবাকে ছেড়ে থাকার কল্পনাও সে করতে পারে না।

একদিন সূর্যপ্রণামের পর জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির এক পড়ুয়া যুবককে [illegible]

হঠাৎ আবিষ্কার করল। বইয়ের মধ্যেই তাকে সারাদিন ডুবে থাকতে দেখে সোমা। কিন্তু বিকেলবেলা একা একা বেড়াতে গিয়ে এমনিভাবে যে ঐ যুবকটির সঙ্গে সোমার আলাপ হয়ে যাবে, তা সে মোটেও ভাবতে পারিনি। নিজে থেকেই ভদ্রলোক আলাপ করলেন। এমনকি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সোমাকে। যুবকটির মধ্যে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সোমা মনে মনে ভাল লেগে যাওয়ার অনুভূতি প্রকাশ না করে থাকতে পারল না। কথায় কথায় বৌদির কাছ থেকে সোমা জেনে নেয়, ছেলেটির নাম অনুপম। রিসার্চ নিয়ে সাধনায় মগ্ন। কেন জানি না এতদিন ধরে এমনি এক ভারতীয় পুরুষকে দেখবে বলে মনে মনে কল্পনা করে এসেছে। তাই অনুপমকে একান্ত করে পাবার নেশায় মেতে উঠল সোমা।

কিন্তু নীমিমা দেবী তা তো চাননি। তাঁর হারিয়া যাওয়া মিলিকে যেভাবে গড়ে তোলবার স্বপ্ন একদিন দেখেছিলেন, সেই-ভাবে সোমাকে আজ কলকাতার অভিজাত সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন। ব্যারিস্টারের ছেলে অভিজিৎ-এর সঙ্গে সোমাকে গাঁথতে চাইলেন। মুখার্জি কিন্তু সোমাকে এইভাবে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সোমা বাসন্তী হবে। মিলির মত সেও একদিন বলবে, বাবা, তুমি আমার নাম রেখো—বাসন্তী।

সোমা কি শেষপর্যন্ত বাসন্তী হতে পেরেছে?

এ-কাহিনীর নাম 'তীরভূমি'। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক গুরু বাগচী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অভিনেতা বিকাশ রায়। বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় এ-ছবির চিত্রগ্রহণ গৃহীত হচ্ছে। কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন: মিঃ মুখার্জি—বিকাশ রায়, নীলিমা দেবী—মঞ্জু দে, সোমা—মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপম—অনিল চট্টোপাধ্যায়, বৌদি—রুমা গুহ-ঠাকুরতা, সুমনা—জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও অভিজিৎ—রবি ঘোষ।

মঞ্চাভিনয়

'শিল্পী নাট্যমে'র নাটক

'শিল্পী নাট্যমে'র সভ্যবৃন্দ গত ৮ই নভেম্বর রঙমহল মঞ্চে শ্রীঅধীর ভট্টাচার্যের 'কালবৈশাখী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। শ্রীবিশু নিয়োগীর সুনির্দেশনায় নাটকটির অভিনয় সত্যি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিশু নিয়োগী, জ্যোৎস্না বোস, হরিপদ কর্মকার, রাজকুমার সরকার, জলি মজুমদার, কান্তি শ্রীমল অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে মূর্ত করে তোলেন।

'রঙ্গসেনা'র অভিনয়

'রঙ্গসেনা'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি অরবিন্দ আশ্রমের সাহায্যকল্পে এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে একটি মনোরম [illegible] আয়োজন [illegible]। একটি অপরূপ নৃত্যনাট্য 'প্রদীপের নাম [illegible]' অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। নৃত্যে একমাত্র শিল্পী ছিলেন মৈত্রেয়ী চৌধুরী। এরপর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এরাও মানুষ' অভিনীত হয়। অমরেশ দাস, অমরেশ মল্লিক, কুমারেশ দাস, নিরুপম মজুমদার, অরুণ দত্ত, করুণা দাস, ঊষা চৌধুরী, মৈত্রেয়ী চৌধুরী, আশা হালদার, মদন দাস উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেন। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন কুমারেশ দাস।

বেলুড়ে নাটক

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পায়তন শারদ উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকদুটি ছিল শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফু' ও সুধীন্দ্র রাহার 'শিবাজী'। নির্দেশনা, সংগীত ও আলোক-সম্পাতে নাটকটি দর্শকদের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন মনোবিলাস ঘোষ, সুশীল বসু, নিতাই দে, উৎপলেন্দু ধরগুপ্ত, বিশ্বনাথ দে, অহীন্দ্র মুখার্জি, রণজিৎ দে, শ্যামলেন্দু দে, নীরেন সেন, রজতবরণ সেন, গোকুল ভৌমিক, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, অসিত চট্টোপাধ্যায়, কেশবলাল বণিক, জবাকুসুম সিংহ। নীরেন সেনের নাট্যনির্দেশনায় অনেক সম্ভাবনা চিহ্নিত হয়েছে।

'লৌহকপাট'

সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং সংঘের ত্রয়োদশ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক নির্দেশনায় গণেশ রায়চৌধুরী কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। অনিল ব্যানার্জি, দেবব্রত বিশ্বাস, কাশী দাস, মণীন্দ্র দাস ও নাট্যনির্দেশক স্বয়ং অভিনয়ের দিক দিয়ে সবার স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছেন। নাটকের অন্যান্য বিভাগের কাজ মন্দ নয়।

বোম্বাইতে নাট্য-প্রতিযোগিতা

কিছুদিন আগে 'ভারতীয় বিদ্যাভবন কলাকেন্দ্রে'র পরিচালনায় বোম্বাই শহরে আন্তঃকলেজ একাংকিকা অভিনয় প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন কলেজ থেকে মোট দশটি ভাষার প্রায় পঁচাত্তরটি নাটক এতে অভিনীত হয়। এর মধ্যে

মারাঠী ও গুজরাটী নাটক যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রমেন লাহিড়ীর বাংলা নাটক 'রাজযোটক'। আনন্দ ক্লাবের প্রযোজনায় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের দুই শিল্পী শ্যামল বিশ্বাস ও বাসন্তী দে অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

মুঙ্গেরীতে নাট্যাভিনয়

উত্তরপ্রদেশ মুঙ্গেরীর বাঙালী শিল্পীরা সম্প্রতি দুটি নাটক সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন। প্রখ্যাত নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর 'বরলখেলা' আর 'পাগলাগারদ' নাটক দুটি অভিনীত হয়। দুটি নাটকের অভিনয়েই শিল্পীদের নিষ্ঠার ছোঁয়া মঞ্চকে প্রাণবন্ত করে ওঠে। বিভিন্ন ভূমিকায় সুখ্যাতি অর্জন করেন রাণু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভৌমিক, দীপ্তি মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু দাস, শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতমোহন রায়, গৌরী মৌলিক, অজিত মৌলিক, বিশ্বনাথ রায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, ধূর্জটি সরকার। প্রমথেশ মুখোপাধ্যায় নাট্য-নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পচিন্তার পরিচয় দেন। নাট্যানুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন 'বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ'।

দার্জিলিং-এ 'নট নাট্যমের' অভিনয়

সম্প্রতি কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা নট নাট্যমের শিল্পিবৃন্দ দার্জিলিং শহরে কতকগুলো নাটকের অভিনয় করে এসেছেন। অনুষ্ঠানে মোট তিনটি একাঙ্ক ও একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পাখীর বাসা' অভিনীত হয়। এই নাটকটি ছাড়া 'কল্পনা কোরো না' একাঙ্কিকাটিও নট নাট্যমের বহুখ্যাত দুটি প্রযোজনা। এবারও নাটক দুটি অনন্য সাফল্য লাভ করে। বিশেষতঃ নাটক দুটিতে মৃণু দেবী ও জগমোহন মজুমদারের অসাধারণ অভিনয় সমবেত সুধীজনকে বিস্মিত করে। অপর দুটি নাটকের মধ্যে ছিলো 'দার্জিলিংয়ের মেয়ে' ও 'রাজযোটক' প্রহসন। শেষোক্ত নাটিকাটিরও পরিচালক-অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। অপর নাটকটি দার্জিলিংয়ের পটভূমিকায় এক আশ্চর্য মধুর কমেডী। এটির মুখ্য দুটি চরিত্রে রূপদান করেন বিজলী মুখার্জি ও প্রশান্ত মুখার্জি। এছাড়া বিভিন্ন নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন—হারাধন চক্রবর্তী, গোপী বন্দ্যোঃ, কমল মুখোঃ, শ্যামল বন্দ্যোঃ প্রভৃতি। চেখব্ থেকে অনুদিত 'রাজযোটক' (রমেন লাহিড়ী কৃত) ছাড়া বাকি তিনটি নাটকের পরিচালক ও নাট্যকার হলেন জগমোহন মজুমদার। অভিনয়স্থল ছিল এ-শহরের নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক হল।

মঞ্চে 'এণ্টনী কবিয়াল'

সুপরিচিত নাট্য-সংস্থা 'নান্দিক' মানিকতলার ব্রীজের নিকটে সুসংস্কৃত রঙ্গালয় কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নিয়মিত প্রতি বৃহস্পতিবার, শনিবার ও রবিবার 'এণ্টনী কবিয়াল' নাটক মঞ্চস্থ করছেন। জাতে পর্তুগীজ হয়েও একটি বাঙালী মেয়েকে ভালবেসে—তাকে বিয়ে করে ফিরিঙ্গি এণ্টনী কেমন করে কবিয়াল হয়ে উঠল, সেই কাহিনী এই নাটকে বিধৃত। নাটক রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনায় অনিল বাগচী এবং আলোক-সম্পাতে আছেন তাপস সেন।

নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন সবিতাব্রত-দত্ত। মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, কালীপদ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, জয়নারায়ণ মুখার্জি, পরিমল সেন, সমরকুমার, কল্যাণী ঘোষ, গীতা মুখার্জি, সাধনা রায়চৌধুরী অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

ভূমিকালিপির অপর বিশেষ আকর্ষণ-রূপে রয়েছে ভোলা ময়রা ও সৌদামিনী চরিত্রে অজয় গাঙ্গুলী ও কেতকী দত্তর নাম।

থিয়েটার সেণ্টার

থিয়েটার সেণ্টারে আসন্ন আকর্ষণ ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'বিদেহী'। আতঙ্ক শিহরণের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটি পরিচালনা করবেন শ্রীতরুণ রায়। আলোক-সম্পাতে শ্রীআশুতোষ বড়ুয়া এবং সংগীত পরিচালনায় শ্রীশশাঙ্ক ঠাকুর। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন থিয়েটার সেণ্টারের যশস্বী শিল্পীগোষ্ঠী। নাটকটি নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আরম্ভ হবে।

বালীগঞ্জ নাট্য সংসদের নতুন অবদান

আগামী ২৩শে নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় লেকের রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে বালীগঞ্জ নাট্য সংসদের সদস্যরা দুটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করবেন। প্রথমটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন 'একেই কী বলে সভ্যতা?' দ্বিতীয়টি, সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য-কাহিনী 'মাকড়সার রস'। কাহিনীটির নাট্যরূপ দেন অনুপরতন ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ।

'দাবী' নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব

আগামী ২৩শে নভেম্বর '৬৬ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'দাবী' নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ সভাপতি ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন।

এতদুপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় নাটকের সংগঠনকারী, শিল্পী ও নেপথ্য-কর্মীদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করেছেন।

নাট্য প্রতিযোগিতা

আগামী ডিসেম্বরে লখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতির পরিচালনায় প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অপেশাদার যে-কোন সৌখিন নাট্য-সংস্থা এতে যোগদান করতে পারবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করলে জ্ঞাতব্য তথ্য সব জানা যাবে : সেক্রেটারী, বেঙ্গলী ক্লাব এণ্ড ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন, ২০, শিবাজী মার্গ, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ অথবা রাত্রি ৮টার পর লখনউর ২৭৯২০ ফোন নম্বরে বা সমিতির কলকাতার প্রতিনিধি শ্রীবিনয় দাশগুপ্ত, ১০।৩, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর।

• • •

শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনে আগামী ২২শে ডিসেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সৌখিন পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা : গোপীনাথ স্মৃতি কিশোর সংঘ, শ্রীরামপুর, হুগলী। নাম দেবার শেষ তারিখ ২০শে নভেম্বর।

• • •

নৈহাটি যাত্রিক সম্প্রদায়ের পরিচালনায় সারা বাংলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১শে জানুয়ারী থেকে ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে—নাট্য-সম্পাদক, যাত্রিক, ঠাকুরপাড়া রোড, পোঃ নৈহাটি, ২৪-পরগণা।

• • •

শতদল সংস্থার পরিচালনায় ছোট নাটকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ডিসেম্বর মাসে। যোগাযোগের ঠিকানা—১৫, জে. এম. লাহিড়ী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী।

• • •

রূপছায়া আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক একাংকিকা অভিনয় প্রতিযোগিতা আগামী ডিসেম্বরে হবে। যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৫শে নভেম্বর। ঠিকানা: ১২।২, ভট্টাচার্যপাড়া লেন, কলিঃ-৩৬।

• • •

অবসরিকার পরিচালনায় তৃতীয় বার্ষিক একাংক নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। যোগদানের শেষ তারিখ ৩০শে নভেম্বর। ঠিকানা : ১১।১, নৈনানবাটী রোড, কলকাতা-৪৭।

গানের জলসা

সদারঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

বহু প্রতীক্ষিত সদারঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মিলন সুরু হয় ১লা নভেম্বর থেকে সেই মহাজাতি সদনে। সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ, রূঢ়তা-জর্জরিত মন বাস্তবজীবনে যা পায় না, তারই জন্য হাত পাতে শিল্পের দ্বারে, সঙ্গীতের রংমহলে। শুষ্ক, রুক্ষ, স্বপ্নরিক্ত জীবনের তৃষ্ণা বুঝি গতানুগতিক জীবনের রসহীনতায় ক্ষতিপূরণ পুরোপুরি আদায় করে নিতে চায় এই গান-ভরা সম্মেলনের কাছে। তাই তাদের চাহিদারও অন্ত নেই, রাত্রি জাগরণেও শ্রান্তি নেই। সদারঙ্গ-সঙ্গীত, সম্মেলনে শ্রোতৃসমাগমের ভীড়, রাত্রির সুখনিদ্রা-উপেক্ষা-করা নয়নের উৎসুক চাঞ্চল্য এই সত্যকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

এবারের উদ্বোধন-সভাতে নতুনত্ব ছিল। প্রথমদিন গানের আসর সুরু হোলো। দ্বিতীয় দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে সভার উদ্বোধন করেন বেতার ও তথ্যমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর। শ্রীরাজবাহাদুর তাঁর ভাষণে ভারতীয় সঙ্গীতের বিরাট ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের এক মনোজ্ঞ আলোচনান্তে ভারতীয় শিল্পীদের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করবার প্রতিশ্রুতি জানালেন।

সঙ্ঘসচিব শ্রীকালিদাস সান্যাল মাঝে মাঝে সঙ্গীতের "আলোচনাচক্রে"র প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ প্রসঙ্গে বললেন—শ্রোতাদের মনে প্রাথমিক আঙ্গিক জ্ঞানের ভিত্তি থাকলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রসোপভোগ সহজ হয়, দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা ও অনুভবের গভীরতা আসে। মাঝে মাঝে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করে সঙ্গীতের নানা আঙ্গিক ও রসের দিকটি যদি আলোচনা করা যায় তবে সংগীতানভিজ্ঞ শ্রোতারও রসগ্রাহিতাকে উদ্বুদ্ধ হয়।

শেষরাত্রে এ. আই. আর-এর চীফ্-এ্যাডভাইজার সঙ্গীত - মহামহোপাধ্যায় আচার্য কে, সি, ডি বৃহস্পতি সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আলোচনা করে সদারঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্যোক্তা-দের উদ্যমকে সাধুবাদ জানালেন।

এবারের অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য হোলো নৃত্যবাহুল্য পরিত্যাগ এবং নিধুবাবুর টপ্পার অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীকালিপদ পাঠকের টপ্পার আসর। পঞ্চনদের তীরে টপ্পার জন্ম হলেও বাংলার সজল কোমল মাটিতে এবং নিধুবাবুর কল্পনারঞ্জিত প্রেমিকহৃদয়ের রসাভিষিক্ত হয়ে টপ্পা যে নতুন ব্যঞ্জনালাভ করেছে, তা একান্তই বাংলার সম্পদ। ঊনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে গ্রামীন ভাষার আড়ম্বরবর্জিত আধারে দুটি হৃদয়ের বাক্-বিনিময়, মধুর অনুযোগ-মেশানো অনুরাগের সরল মাধুর্যে তদানীন্তন রসিকসমাজে যে আবেগ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল—তারই অপসৃয়মান পদধ্বনি শোনা গেল শ্রীপাঠকের গানে। "তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ"—কবিগুরুর প্রিয়

পণ্ডিত রবিশংকর

সঙ্গীত দিয়ে আসর সুরু হোলো। ভক্তি-ভাবে সূচনা, সমাপ্ত শৃঙ্গার মধুর রসে "কে তোমার শিখায়েছে অপ্রণয়" ঠুংরী ও টপ্পা অঙ্গের "বোলবানানা" তথা কথন-ভাবের বিশিষ্ট্যানুযায়ী, কথার ওপর জোর দিয়ে ও একই কথাকে ভিন্ন ব্যঞ্জনাবৈচিত্র্যে (যেমন 'কে তোমারে দ্বিতীয়বারে "যে তোমারে"তে রূপান্তরিত) প্রণয়কম্পিত হৃদয়ের স্ফুরিত অভিমান যেন অভি-যোগের অশ্রুধারে ফেটে পড়েছে "অন্যের প্রাণ নিতে জান,—নিজে নাহি দিতে জান" —জমজা, পুকার ও মুর্কীর, সূক্ষ্মকাজে টপ্পার আঙ্গিকেই শুধু নয় গানের সাহিত্যও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। জটতালে ও ত্রিতালে শ্রীপাঠকের লয়দক্ষতাকে সুপরি-স্ফুট করতে সাহায্য করেছে শ্রীবিশ্বনাথ বোসের সঙ্গত।

মহম্মদ দবীর খাঁর ধ্রুপদ এই সম্মেলনের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। ধ্রুপদই উচ্চাঙ্গ
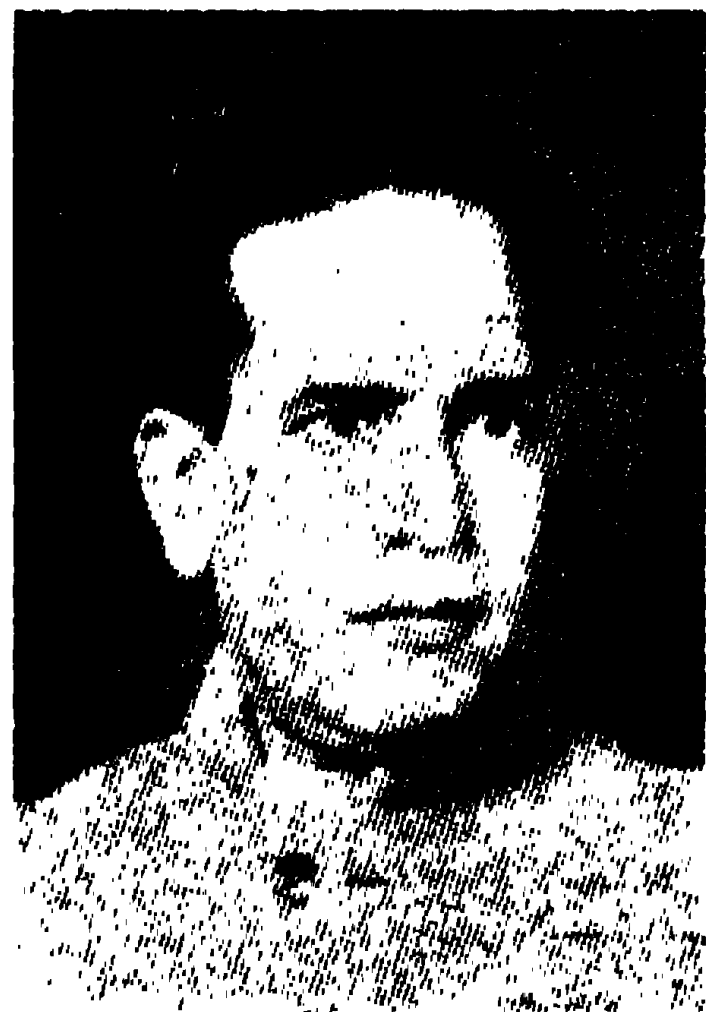
পণ্ডিত ভীমসেন যোশী

সঙ্গীতের উৎস। স্বর্গত ওস্তাদ উজীর খাঁর পৌত্রকে ধ্রুপদের আসরে উপস্থিত করে এ'রা যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করেছেন। দবীর খাঁ সাহেব "দরবারী কানাড়া" রাগে ধ্রুপদ এবং "দরবারী-কানাড়া" ও আড়ানায় ধামার পরিবেশন করলেন। তাঁর 'জাগায়বাণী' প্রভৃতিস্পর্শ ও খান্ডারবাণীর ঝলকানিতে সেনীঘরাণার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত। এই অনুষ্ঠান ধ্রুপদ শিক্ষার্থীর কাজে লাগবে। প্রসূন বানার্জি'র 'বাগেশ্রী'র বিস্তার তান ও সরগমে শিল্পীর রাগনিষ্ঠার পরিচয় ছিল, কিন্তু একই প্রকারের তানের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে অনুষ্ঠানকে অযথা বিলম্বিত না করলে তাঁর গান আরো উপভোগ্য হোত। শ্রীমতী মীরা ব্যানার্জি'র "ইমন" রাগের যথাযথ রূপায়ণে তাঁর শিক্ষা, রেওয়াজ ও রাগজ্ঞানের স্বাক্ষর বাহিত, মধ্যসপ্তকের তানও সুখশ্রাব্য। অপর্ণা চক্রবর্তী "কামোদ" ও ঝিনকোটি আগ্রা ঘরানার নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সংগতিতে পরিবেশন করেছেন। আলাপের অঙ্গ ও বোলভানের দক্ষতা সুন্দর।

সুনন্দা পট্টনায়ক

এ কাননের যোগকোষে অস্থায়ী, বিস্তার ও অন্তরার অঙ্গ সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সরগমের মুন্সিয়ানা ও ঠুংরীর সুনামও অক্ষুন্ন ছিল।

ভীমসেন যোশী প্রথম অধিবেশনে "মিএা কি মল্লার", দ্বিতীয় দিনে "দরবারী কানাড়া', ঠুংরী, ভজন এবং বিশেষ অনু-রোধে আর একটি ভজন (ডি ভি পালুস-কারের জনপ্রিয় রেকর্ড 'চল মন গঙ্গা-যমুনা') গেয়ে শোনালেন। সুরভরা কণ্ঠের সঙ্গে ভাবুক মনের মিলন ঘটে স্বল্পপরিসরেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাঁর অনুষ্ঠান। কিন্তু রাত ১০-৩৫-এ যোগিয়া রাগে ভজন গাওয়াটা তাঁর মত উচ্চমানের শিল্পীর উপযুক্ত কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না।

ওস্তাদ আমীর খাঁ দুটি অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ভাটিয়ার, বিলাসখানী ইমনকল্যাণ ও আভোগী গেয়ে শোনালেন। ইদানীং এ'র কণ্ঠ পঞ্চমের বেশী যায় না। পঞ্চমের

পর তাই বিস্তারও বর্জিত, কণ্ঠ মাঝে মাঝে রুদ্ধ (যাকে বলে চোক্‌ড্‌ ভয়েস), 'জড়ব' তানের ওপর বেশী মনোযোগ দেওয়ায় অনুষ্ঠানে কিছু একঘেয়েমো হয়ত আসতে পারে। কিন্তু এতগুলি অভাব সত্ত্বেও সমঝদার ও রসিক সমাজ তাঁর গানে মুগ্ধ না হয়ে পারেন না কেন? শিল্পীর রাগ-ধ্যান, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য সস্তা চটকে হাততালি কুড়োবার প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করে সঙ্গীতের মর্মমূলে প্রবেশ করবার অনায়াসসিদ্ধতা শ্রোতাদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। একটি রাগ থেকে অপর রাগের রূপান্তরে কোনো হেঁচ্‌কা-টানের চমক নেই, আছে সঙ্গীতের বাইরের মহল থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অন্দরমহলের দ্বার খোলার নীরব উৎকণ্ঠা। এই শান্ত-সৌন্দর্যের গুণেই আমীর খাঁ গুণীসমাজে চির-সম্মানার্হ।

ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁর মাধ্যমে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের এক বিশিষ্ট, বিশুদ্ধ গায়কীর নমুনা পেশ করেছেন সম্মেলনের

ওস্তাদ আমীর খান

কর্মকর্তারা। দুদিনের অনুষ্ঠানে জয়জয়ন্তী ও ললিতে রামপুর ঘরানার বিস্তার ও তানভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। কিন্তু তারানার পুনরাবৃত্তিমূলক সিথাতি শুধু অনাবশ্যকই নয় জাগরণক্লান্ত শ্রোতাদের কাছে একঘেয়েমো মনে হয়েছে। "কিরবাণী" রাগের ভজনটি সুরলাবণ্য সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। প্রথম দিনে গাওয়া এই ভজনটি শ্রোতাদের আব্দারে দ্বিতীয় দিনও তাঁকে গাইতে হয়েছে।

ভজন গানের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল শ্রীরাজবাহাদুরের জন্য। শিল্পী ছিলেন শ্রীমতী সুনন্দা পটুনায়ক। "আজ সুদিন শুভ গায়" রামের জন্মলীলা বর্ণিত এই ভজন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হোলো। উদার, উদাত্তকণ্ঠ ধ্বনিত, প্রতি-ধ্বনিত হয়ে, ভক্তিভাবের অনুরণন তুলেছিল সারা প্রেক্ষাগৃহে। কথার সঙ্গে সুরের মিলন-সুষমা ভাবগাঢ় আবেশ রচনা করেছে। শ্রোতাদের অনুরোধে শ্রীমতী

ওস্তাদ বিলায়েৎ খান

পটুনায়ক আরও দুটি ভজন গেয়ে আসর সমাপ্ত করলেন।

দ্বিতীয়দিন শ্রীমতী পটুনায়ক গাইলেন স্বরচিত রাগ "নীলমাধব"। "রাম গায় বনবাস"—সৃষ্টির প্রেরণায় অনুভবের ধ্যানে এবং আঙ্গিক দক্ষতায় এ অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ। শনিবার গাইলেন কৌশিকী ভৈরব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় দুটিদিনের খেয়ালের কথা-সুর এবং দুটি ভজন শিল্পীর নিজস্ব রচনা। গান শেষ হোল। শ্রোতাদের করতালিতে মহাজাতি সদন মুখরিত হোলো।

তবু বলব প্রথম দুদিনের তুলনায় শেষের দিন তাঁকে কিছু নিষ্প্রভ মনে হোলো। কণ্ঠসঙ্গীতে কয়েকজন তরুণ শিল্পীর অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু কেউই বিশেষ আবির্ভাবরূপে প্রতিভাত হতে পারেন নি।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে পণ্ডিত রবি-শঙ্করের "কৌশী কানাড়া"র আলাপ সঙ্গীত-সম্মেলনের ইতিহাসে এবং রসিক-

ওস্তাদ নীসার হোসেন খান

শ্রোতার স্মৃতিভাণ্ডারে মহামূল্য সম্পদের মত সঞ্চয় করে রাখবার বস্তু। ধ্রুপদী পটভূমিকায় আলাপের অঙ্গে অতিমন্দ্রের সুগম্ভীর ধ্যানকেন্দ্রিকতা থেকে সুর-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধূলিমলিন অনুভবদীপ জগৎ থেকে কতদূরে আমাদের মনকে পৌঁছে দিয়েছিলেন, মুঠো, মুঠো ঐশ্বর্য কেমন শিল্পীজনোচিত ভঙ্গীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সে খবর আত্মবিস্মৃত শিল্পী রবিশঙ্কর হয়ত বলতে পারবেন না, আমরাও পারব না। একটি বাজও সরল নয়। প্রতিটি স্বরশ্রুতি কখনও মীড়ের স্পন্দনে, কৃন্তনের অতৃপ্ত গুঞ্জনে, গমকের দমকে রাগভাবের কারুণ্য, ভক্তি ও মধুর রসকে ঘনীভূত করেছে। ডাগরবাণী বাজের পরিপ্রেক্ষিতে খাণ্ডার-বাণী বাজের ক্ষণদ্যুতির চমক ও ঔজ্জ্বল্য, দীর্ঘ আশের সূক্ষ্ম শ্রুতিস্পন্দন ও জোড়তানে গুরু আলাউদ্দিন তথা বীণকার উজীর খাঁর ঘরানার বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল। 'নটভৈরবী'তে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।

কল্যাণী রায়

কিন্তু একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। শান্তপ্রসাদের সঙ্গে 'সওয়াল" জবাবের অংশে ছন্দের লড়াই-এর উত্তেজনা সৃষ্টি করে একশ্রেণীর শ্রোতাদের হাততালি আদায় করা রবিশঙ্করকে সাজে কি?

ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ প্রথম দিনে 'মালকোষ', দ্বিতীয় দিনে 'ভৈরব-বাহার', 'ভাটিয়ালী' ও ভৈরবী-ঠুংরী বাজিয়ে শোনালেন। মালকোষের গতের সঙ্গে যাদুকর সেতারীর সাপটতানের বিজলী আলো, ত্রিসপ্তক তানের বাহার ঝালার গতি ও প্রলম্বিত মীড় শ্রোতাদের অকৃপণ অভিনন্দন লাভ করেছে। উল্লসিত করতালি-প্রাবল্যে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে যাবার উপক্রম।

পদ্মশ্রী বিসমিল্লা খাঁর সানাই-এর একটি ফুঁ ললিত রাগকে যেন সুরে সুরে রূপময় করে তুলেছে। "ভৈরবী"—ঠুংরী

অনির্বচনীয় মাধুর্যে আবহাওয়াকে ভরিয়ে তুলেছে।

ভি, জি, যোগের ছায়ানট, নটবেহাগ, আড়ানা মহারাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিবেশিত। সহজাত দক্ষতায় তিনি আসর জমিয়েছেন। তবে আমরা তাঁর কাছে আরো বড় জিনিস আশা করি।

কল্যাণী রায়ের "বেহাগ" পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও মনে রাখিবার মতো। তাঁর "গেড়কেল্লা" বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত তিলক-কামোদ রংদার পরিবেশ সৃষ্টি করে আগের দিনের জাগরণক্লান্ত শ্রোতাদের মনে একঝলক হাওয়ার মত স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সরোদে ছিলেন আলাউদ্দিন ঘরানার দুই শিল্পী আশীষ খাঁ ও শরণরাণী।

সঙ্গীতিয়াদের মধ্যে কেরামতের তুলনা নেই। নিজে গাইয়ে। তাই গানের রসকে অব্যাহত রেখে বাজাতে জানেন। পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের অন্যান্যবারের কৌশল প্রদর্শনের চাঞ্চল্য এবার অপূর্ব সংযমে অবলম্বিত। কানাই দত্ত উত্তরোত্তর উন্নতিশীল। মানিক দাস প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। বোম্বের সুদর্শন অধিকারী তবলায় ১১ মাত্রার কোকিলা তাল ছাড়াও, ৯½ মাত্রার ঘোর, ১৫ মাত্রার মীন ও ১৬ মাত্রার চরকে কৌশল প্রদর্শন করেছেন। তবে শ্রীখোল নৃত্যের এফেক্ট মিউজিক হিসেবে যতটা খোলে একক-বাদনে ততটা আগ্রহী করে না।

উত্তরী সংগীত সমাজ

১৩ই অক্টোবর, উত্তরী সঙ্গীত সমাজের মাসিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অধিবেশন শ্যামবাজারস্থিত 'সান্যাল ভবনে' বহু সঙ্গীতরসিক সমাবেশে অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে একমাত্র শিল্পী ছিলেন শ্রীমহীউদ্দিন ডাগর। শিল্পী তাঁর সুললিত কণ্ঠে 'মালকোষ' রাগে আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার পরিবেশন করেন। এঁদের ঘরোয়ানার আলাপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রাগের রূপ বিভিন্ন স্বরের ধীরে ধীরে মীড়, শ্রুতির ও গমকের কুশলী প্রয়োগে যখন ক্রমশঃ বিস্তারিত হচ্ছিল, তখন উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ এক পূর্ণতার তৃপ্তিতে বিমোহিত হন। ধ্রুপদ ও ধামার গানের বিভিন্ন ছন্দ ও লয়কারির কাজ অনবদ্য। এক একবার যখন বাট, ও ছন্দের কাজ করে সম এর মুখে এসে পড়ছিল, তখন সেই গায়নশৈলী শ্রোতাদের বিশেষভাবে পুলকিত করে। এই অনুষ্ঠানে পাখোয়াজে সংগত করেন প্রখ্যাত বাদক শ্রীবিঠলদাস গুজরাটী এবং সারেঙ্গী বাজান শ্রীকেদার মিশ্র।

বিবিধ সংবাদ

ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ ব্যালে

গত ৩১শে অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার যোগজাকর্তা ব্যালের সম্প্রদায় প্রদর্শিত "রামায়ণ" নৃত্যনাট্য ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার প্রগাঢ় মৈত্রী বন্ধনের উপর যেন নতুন আলোকপাত করেছে। নৃত্যগীতাধারের আন্তর্জাতিক ভাষায় রামায়ণ বর্ণনা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। দলবদ্ধ ঐক্যের মধ্যেই বুঝি এর সাফল্য রহস্যের চাবি-কাঠিটি লুকোনো। এ ছাড়াও নৃত্য ও গীতের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্বন্ধে শিল্পীদের সুস্পষ্ট ধারণা ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সত্যিই প্রশংসনীয়।

বিষয়বস্তুর অধিকাংশই "কথাকলি"র আঙ্গিকে পরিবেশিত। কথাকলির সুবিস্তৃত নাট্যসম্ভাবনায় শিল্পসম্মত প্রয়োগে নৃত্য-পরিচালকের কৃতিত্ব উদ্ভাসিত। বানরকুল, রাক্ষসকুল, রাবণ ও জটায়ুকে মুখোশের মাধ্যমে উপস্থিত করে রামায়ণের আখ্যান-ভাগকে বিশ্বাসযোগ্য ও জীবন্ত করা হয়েছে। সজ্জাপরিকল্পনার অপূর্ব বর্ণ-সম্মেলন ও শিল্পসমারোহে প্রাচ্যকল্পনার ঐশ্বর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বনবাসে নির্বাসিত রাম-সীতা ও লক্ষণের বেশভূষার জাঁকজমক একটু অসামঞ্জস্য নয় কি?

তাছাড়া মূল রামায়ণ বর্ণিত ঘটনাবলীর কিছু বিচ্যুতিও আছে। যেমন সীতাহরণ কালে রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণবেশী ভিক্ষুক, লংকাপতি দশাননবেশী নন। অবশ্য ইন্দোনেশিয়া রামায়ণে যদি ঐভাবেই ঘটনা-বিন্যাস থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা। আঙ্গিক বিচারে রাম, সীতা ও লক্ষণের নৃত্যমান উন্নত, তবে ভাববিবর্তন যথাযথ পরিস্ফুট নয়। রাবণ, জটায়ু ও বানরকুলের নৃত্য, গীত, প্রকাশভঙ্গি প্রাণবন্ত। অন্তরাল-বাহিত আবহসংগীত সময়ে সময়ে একঘেয়ে হলেও মহাকাব্যের মর্মসুরের সঙ্গে সংহতি রেখেছে।

নৃত্যপরিচালকের পরিমিতিবোধ অন্তর্দৃষ্টি, ছন্দজ্ঞান বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

অস্ট্রেলীয় পুতুলনাচ

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে যোগদানের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে অস্ট্রেলিয়ার পুতুলনাচের দল গত ৩ ও ৪ নভেম্বর কলকাতার রবীন্দ্রসদনে পুতুলনাচ দেখালেন।

প্রথমে কিছু খণ্ড খেলা এবং পরে একটি পূর্ণ পালা 'ছোট্ট খোকা বিন্দি' প্রদর্শিত হয়। 'ছোট্ট খোকা বিন্দি' পালায় কাঠবেড়ালি গাগার প্রেমে আবদ্ধ আদিবাসী কিশোর বিন্দির অরণ্য থেকে লোকালয়ে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীটি মানবিক রসে পূর্ণ। কিন্তু ইউরোপে আধুনিক পুতুল খেলার দস্তানার সাহায্য না নিয়ে পুরনো ধাঁচে ওপর থেকে সুতো টেনে পুতুল-গুলিকে সচল করে খেলা দেখান হয়। এর ফলে দর্শকদের তন্ময়তায় অন্তরায় সৃষ্টি হয়। তবে এই দোষটুকু তাঁরা পুষিয়ে দিয়েছেন দৃশ্যপট ও আলোর কাজের দ্বারা। পুতুলের অঙ্গভঙ্গী, নেপথ্যসংগীত ও কথোপকথন এক কথায় চমৎকার। বিভিন্ন পশুপাখির কণ্ঠস্বর মঞ্চের উপর যেন জীবন্ত হয়ে কানে বাজে।

মস্কোয় ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব

গত ১৫ নভেম্বর থেকে সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। এই উৎসব প্রথমে মস্কো ও পরে লেনিনগ্রাদ, বাকু, মিনস্ক এবং অন্যান্য কয়েকটি শহরে প্রদর্শিত হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মস্কো গেছেন। উৎসবে ছয়টি কাহিনী-চিত্র শহীদ, তুহি মেরি জিন্দেগি, আরজু (হিন্দী), চিনমিন (মালয়ালম), পাদাশু মুক্তক (তেলেগু) এবং অতিথি (বাংলা) দেখান হচ্ছে। তাছাড়া আছে আরও কয়েকটি তথ্য-চিত্র।

সায়ান্স-ফিকশান সিনে ক্লাব

গত রবিবার ৬ই নভেম্বর অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ওয়াল্ট ডিজনীর বহু-প্রশংসিত ফ্যানটাসি ফিল্ম 'অ্যাবসেণ্ট মাইণ্ডেড প্রফেসর'-এর পরবর্তী কাহিনী 'সন অফ ফ্লাবার' প্রদর্শিত হয়। প্রথম ছবির পরিচালক রবার্ট স্টিভেনসন দ্বিতীয় ছবিটিও পরিচালনা করেছেন এবং ভূমিকালিপিতেও পরিবর্তন ঘটেনি। আত্ম-ভোলা অধ্যাপকের আর এক দফা কীর্তি-কলাপ পরিচালক নিপুণভাবে কৌতুকাবহ দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। ছবিটি এক কথায় রীতিমত উপভোগ্য এবং অনাবিল হাসির উৎস।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অ্যাকাডেমি প্রেক্ষাগৃহের ত্রুটিপূর্ণ প্রক্ষেপণের জন্যই প্রদর্শনীটির অনেকাংশে অঙ্গহানি ঘটে। অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষের এ-বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

ক্লাবের পরবর্তী প্রদর্শনী স্যর আর্থার কোনান ডয়েলের অবিস্মরণীয় কাহিনী 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড' প্রিয়া সিনেমায় ৪ঠা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

মহিলা যাদুকরের সম্মানলাভ

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত যাদুকর সম্মেলনে 'ইণ্ডিয়ান ম্যাজি-সিয়ানস্ ক্লাব' কর্তৃক বিশিষ্ট সৌখিন ইন্দ্রজালবিদ ডাঃ এস আর দাশগুপ্তের ভগ্নী ও শিষ্যা ভারতের প্রথম মহিলা

বিম্বপাধর চিত্রের মহরতে পরিচালক প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী, ঋত্বিক ঘটক, মাধবী মুখার্জী, ক্যামেরাম্যান দীপক দাস, অনিল চ্যাটার্জি ও সুশীল মজুমদার। —ফটো : অমৃত

যাদুকের কুমারী উমা দাশগুপ্ত 'যাদুভারতী' উপাধিতে ভূষিতা হয়েছেন। সম্মেলনে শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী এই সম্মানপত্র প্রদান করেন।

হৈ-চৈ-এর আসর

গত ২৯ অক্টোবর মুর্শিদাবাদের শ্রীভবন মঞ্চে হৈ-চৈ-এর আসরের সভ্যরা দ্বাদশ বর্ষপূর্তি 'যুগ-জয়ন্তী' উৎসবে শ্রীঅতনু সর্বাধিকারী রচিত 'শ্বেতছায়া' নাটকটি বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন সিন্হা—সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী, সেলিম—অসিত সরকার, এডওয়ার্ড—দিলীপ সিন্হা, ইন্সপেক্টার—সুব্রত রায়, সেন— প্রীতিশ ঘোষ, ফৌজদার—তরুণাদিত্য রায়, আবন—সমরেন্দ্র মজুমদার, শুধাংশু—অসীম মুখার্জি ও অনন্ত—রথীন রায়।

নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন অনন্তের ভূমিকায় রথীন রায় ও গড়গড়ির ভূমিকায় পটল রায়। শুধাংশুর ভূমিকায় অসীম মুখার্জির অভিনয়ও সুন্দর।

নাটক প্রযোজনা করেন হৈ-চৈ-এর আসরের সভ্যরা এবং পরিচালনা করেন শ্রীঅসীম মুখার্জি।

বোকারোয় 'রক্তকরবী' অভিনয়

২১শে কার্তিক ডি ভি সি বোকারো ক্লাবের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে বোকারোর 'সৌখিন সাংস্কৃতিক সংস্থার' সভ্যবৃন্দ কবির বহু-আলোচিত 'রক্তকরবী' সাংকেতিক নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে সৌখিন আয়োজিত আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার বিজয়ীদের পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। বোকারো তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীঅজিতকুমার দাস এবং শ্রীমতী দাস উপস্থিত থাকেন। ডি ভি সি এস এ-র বোকারো ইউনিটের সম্পাদক শ্রী পি জি গুহ 'রক্তকরবী' নাটক বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 'রক্ত-করবী' নাটকের শিল্পীদের অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমে সর্বশ্রী সাধন দত্ত (গোঁসাই), মণিকা ব্যানার্জি (নন্দিনী), জ্যোতি মিত্র (বিশু), মদন রায় (মোড়ল) এবং রাজার ভূমিকায় সুনীল ভট্টাচার্য (যতক্ষণ নেপথ্যে ছিলেন) এ-ক'জন শিল্পীর কথা উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় যারা সু-অভিনয় করেন, তাঁরা হলেন : সর্বশ্রী সুবীর রায় (ফাগুলাল), সন্তোষ মুখার্জি (গোকুল), প্রদীপ সরকার (মেজ সর্দার), ননী গাঙ্গুলী (পুরোন-বাগীশ), বৈদ্যনাথ গুপ্ত (অধ্যাপক), গীতা সেন (চন্দ্রা), সুশান্ত সেন (সর্দার), মানব দাস (পালোয়ান), কল্যাণ চক্রবর্তী (কিশোর), বিনয় ব্যানার্জি (প্রহরী), কৃষ্ণদাস ব্যানার্জি (রঞ্জন) প্রভৃতি। মঞ্চ পরিকল্পনা সুন্দর। গানগুলি সুগীত। তবে কয়েকটি স্থানে আবহসংগীতের ব্যঞ্জনা হাল্কা ধরনের হয়েছে। যেমন গোঁসাই এবং মোড়লের প্রস্থান এবং প্রবেশের সময় অহেতুক কৌতুক মিশ্রিত গীটারে শব্দ ব্যবহার। এছাড়া শেষদৃশ্যে যক্ষপুরীর দরজা খুলবার সময় হঠাৎ দুম্ করে একটা পটকা ফাটানোর ব্যাপারে দর্শক বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। যাই হোক দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকের সাফল্যে 'সৌখিন' পরে সমস্ত শিল্পী, কলাকুশলী এবং শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সে-অনুষ্ঠানে 'সৌখিনে'র সম্পাদক শ্রীবিমল রায় জানান যে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর 'বিষাণ' পত্রিকা শ্রীগোপাল দে-র সম্পাদনায় শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে।

পুরীধামে নাট্যাভিনয়

পুরী হোটেলের নবনির্মিত নাট্যশালায় শ্রীমাখনলাল হালদারের উদ্যোগে ও পরি-চালনায় গত ২৮শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানে নৃত্য ও নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ডঃ নন্দলাল কুণ্ডু।

প্রথম দিন পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাবের তরুণ সভ্যবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'; দ্বিতীয় দিন কলকাতার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা 'শিল্পীদল' কর্তৃক সুনীল চক্রবর্তীর 'জীবন ও জীবিকা'; তৃতীয় দিন পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'তাসের দেশ'; চতুর্থ দিন 'শিল্পীদল' কর্তৃক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের 'উম্বার্ষিকী'; পঞ্চম দিবসে পুরী হোটেল রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক শক্তিপদ রাজগুরুর 'জীবনকাহিনী' ও নৃত্য-নাট্য 'মদনভস্ম' পরিবেশিত হয়। তিনটি নৃত্যনাট্যের সংগীত-পরিচালনা করেন শ্রীমাখনলাল হালদার। নৃত্য-পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী তনিমা গাঙ্গুলী ও শ্রীবৈদ্য-নাথ গাঙ্গুলী। কণ্ঠসংগীতে ছিলেন কুমারী ঝর্ণা ঘোষ, কৃষ্ণা ঘোষ, তপতী ঘোষ, তৃপ্তি সরকার, চয়নিকা লাহা, শ্রীসোমনাথ চট্টো-পাধ্যায় ও শ্রীমাখন হালদার এবং যন্ত্র-সংগীতে ছিলেন শ্রীধনগোপাল গাঙ্গুলী ও তাঁর সম্প্রদায় এবং শ্রীআশু গাঙ্গুলী। নৃত্যে কুমারী বীণা হালদার, শ্রীমতী তনিমা গাঙ্গুলী, কুমারী মমতা হালদার, বাণী হালদার, মণিকা লাহা, কণিকা লাহা, মহা-মায়া লাহা, সাধনা, দীপিকা লাহা, স্নিগ্ধা গাঙ্গুলী এবং স্মৃতি সরকার ও অভিনয়ে কুমারী বাণী হালদার, ঝর্ণা ঘোষ, শ্রীবৈদ্য-নাথ গাঙ্গুলী, শ্রীসোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমান কুমার হালদার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। নৃত্যে, গানে, অভিনয়ে, দৃশ্যসজ্জায় এবং আলোকসম্পাতে তিনটি নৃত্য-নাট্যই বিস্ময়-কর উৎকর্ষের জন্য দর্শকের অভিনন্দন লাভ করে। নাটক দুইটি পরিচালনায় ছিলেন শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ব্যবস্থাপনায় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

'ডাকরুম'

গত ৪ঠা নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাংক ক্যালকাটা স্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব কর্তৃক শ্রীমুরারীমোহন সেন লিখিত রহস্যমূলক নাটক 'ডাকরুম' অভিনীত হয়। বিনায়ক অরুণ শিবনাথ ও সুমিত্রার ভূমিকায় অধীপ বিশ্বাস, অরুণ দে শিশির পালচৌধুরী ও শিখা ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য। এঁদের সাবলীল অভিনয় নাটকটিকে পূর্ণরূপ দিতে প্রচুর সাহায্য করেছে।

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামের নতুন অঙ্গসজ্জা—চারিপাশে সিমেন্টের গ্যালারি।

খেলাধূলা

দর্শক

টেস্ট ক্রিকেট প্রসঙ্গ

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর থেকে কলকাতার ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট খেলা সুরু হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ক্রিকেট খেলা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে তারা ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত সফরে এসে দুটি টেস্ট সিরিজে মোট দশটি টেস্ট ম্যাচ খেলে গেছে। কিন্তু প্রধানতঃ দুটি কারণে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আসন্ন টেস্ট খেলায় ভারতীয় দর্শক সাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ শতগুণ বর্দ্ধিত পেয়েছে। প্রথমতঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল। দ্বিতীয়তঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই সফর শেষে পরবর্তী চার বছরে ভারতবর্ষের মাটিতে সরকারী টেস্ট সিরিজ খেলার আয়োজন নেই। ফলে কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে আসন্ন ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট খেলা উপলক্ষে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ক্রিকেট খেলা বাবদ মোটা টাকার সেলামী গুনতে হবে। এই বিরাট ব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড টেস্ট কেন্দ্রগুলির সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উপর মোটা টাকা আদায়ের চাপ দিয়েছেন। এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সি এ বি (ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল) কর্তৃপক্ষ অসমাপ্ত রঞ্জি স্টেডিয়ামের সংস্কার কার্যে হাত দিয়েছেন। অসমাপ্ত স্টেডিয়ামটির চারদিকে আগের দিনের কাঠের গ্যালারির পরিবর্তে বর্তমানে সিমেন্টের পাকা গ্যালারি হচ্ছে। আগের দিনের ব্যবস্থায় মাঠে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার দর্শকের স্থান হত। বর্তমান ব্যবস্থায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক নাকি মাঠে স্থান পাবেন। সিমেন্টের পাকা গ্যালারি করতে ২০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। সি

এ বি কর্তৃপক্ষ টিকিটের মূল্য সরকারীভাবে ঘোষণা না করলেও এই খরচের বহর দেখে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ দর্শক-মহল টিকিটের মূল্য এবং টিকিট সংগ্রহের চিন্তায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সি এ বি কর্তৃপক্ষ টেস্ট খেলা উপলক্ষে টিকিটের মূল্য ধাপে ধাপে বাড়িয়েই চলেছেন। সাধারণ দর্শকের পক্ষে টিকিট সংগ্রহ দুষ্কর ব্যাপার। খেলার টিকিটের মূল্য বেড়েছে অথচ দর্শকদের সুখ-সুবিধার যে ব্যবস্থা করা হয় তা দায়সারা গোছের। খেলার মাঠে দর্শকদের দুর্ভোগের শেষ নেই। মাঠের মধ্যে অসমতল রাস্তায় ভিড় ঠেলে হাঁটতে গিয়ে দর্শকদের মাটিতে আছাড় খেতে হয়। চার-পাশের জঞ্জাল, রাস্তার পুকুর, শৌচাগারগুলির অব্যবস্থা—এইসব মিলিয়ে এক ন্যক্কারজনক পরিবেশ। আসন্ন টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে আমরা এইসব অসুবিধার প্রতি সি এ বি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডেভিস কাপ

১৯৬৬ সালের বিশ্ববিশ্রুত ডেভিস কাপ দলগত লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ব্রেজিল ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করায় আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে রীতিমত হৈচৈ হয়েছে। টেনিস খেলায় ব্রেজিলের হাতে আমেরিকার এই পরাজয়—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই এক অঘটন ঘটনা।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলবার সৌভাগ্য ব্রেজিলের কোন-দিনই হয়নি। গত চার বছরের (১৯৬২-৬৫) খেলার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ব্রেজিল তার ইউরোপীয়ান জোনের খেলায় মাত্র একবার (১৯৬২ সালে) তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত খেলেছিল। ১৯৬৩ সালে ২য় রাউণ্ড ১৯৬৪ সালে ১ম রাউণ্ড এবং ১৯৬৫ সালে ২য় রাউণ্ডে খেলে হেরে যায়। এই ১৯৬৬ সালেই ব্রেজিল ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে ৪-১ খেলায় ৬ বারের (১৯২৭-৩২) ডেভিস কাপ বিজয়ী ফ্রান্সকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বছরেই ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের দ্বিতীয় রাউণ্ডে ব্রেজিল ৩-২ খেলায় গত বছরের ইউরোপীয়ান জোন চ্যাম্পিয়ান এবং ফাইনালের রাণার্স-আপ স্পেনকে পরাজিত করে প্রথম অঘটন ঘটিয়েছিল। অপরদিকে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সাফল্য অনেক বেশী গৌরবের। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার গত ৬৬ বছরের (১৯০০-৬৫) ইতিহাসে মোট ১২ বার (১৯০১ ও ১৯১০ এবং বিশ্বযুদ্ধের দরুণ ১৯১৫-১৮ ও ১৯৪০-৪৫) খেলা হয়নি। বিগত ৫৪ বছরের প্রতিযোগিতায় ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে মাত্র এই চারটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া ২০ বার, আমেরিকা ১৯ বার, গ্রেটবৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। ১৯৩৮ সাল থেকে ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করেছে। আগামী সংখ্যায় বিশদ বিবরণ পাবেন।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত (এর মধ্যে যুদ্ধের দরুণ ৬ বছর খেলা বন্ধ ছিল) যে ২২ বার ডেভিস কাপের খেলা হয়েছে তাতে অস্ট্রেলিয়া ২২ বারই চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ ফাইনালে খেলে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে ১৪ বার এবং বাকি ৮ বার জয়ী হয়েছে আমেরিকা। এই ২২ বারের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা—এই দুটি দেশ পরস্পরের সঙ্গে উপর্যুপরি ১৬ বার (১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৬-৫৯) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছে। এই একটানা ১৬ বারের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জয় ৯ বার এবং আমেরিকার জয় ৭ বার। পরবর্তী ৬ বছরে (১৯৬০-৬৫) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলেছিল ১৯৬০-৬১ সালে ইতালী, ১৯৬২ সালে মেক্সিকো, ১৯৬৩-৬৪ সালে আমেরিকা এবং ১৯৬৫ সালে স্পেন। এই ৬ বছরে (১৯৬০-৬৫) একমাত্র আমেরিকাই ১৯৬৩ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। বিগত ২৩, বছরের প্রতিযোগিতায় এইবার নিয়ে আমেরিকাকে ৫ বার ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে পাওয়া গেল না।

ব্রেজিল বনাম আমেরিকার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে দুই দলাই

দূরপাল্লার সাঁতারু মিহির সেন সম্প্রতি পানামা প্রণালী অতিক্রম করে স্বদেশের মাটি—দমদম বিমান ঘাঁটিতে পদার্পণ করেছেন।

একটি ক'রে সিংগলস খেলায় জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনে আমেরিকা ডাবলসের খেলায় ব্রেজিলকে পরাজিত ক'রে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনের দুটি সিংগলস খেলায় ব্রেজিল জয়ী হয়। ফলে ব্রেজিল ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে ওঠে।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ১৭শ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবে। খেলা শেষ হবে ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী। এবারের প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগে যোগদানের উদ্দেশ্যে নাম দিয়েছে ৩৭টি দল—পুরুষ বিভাগে ১৬টি, মহিলা বিভাগে ১১টি এবং বালক বিভাগে ১০টি দল। গত বছরের ফাইনালে সার্ভিসেস দল ৫১-৪৮ পয়েন্টে রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি নয়বার টড মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ী হয় এবং সেই সূত্রে পুরুষ বিভাগে সর্বাধিকবার ট্রফি জয়ের রেকর্ড করে। গতবার পশ্চিম বাংলা মহিলা বিভাগের ফাইনালে ৩৬-২২ পয়েন্টে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার প্রিন্স বাসলাৎ ঝা ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছিল।

সপ্তদশ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার তিনটি বিভাগের খেলার তালিকা এইভাবে প্রস্তুত হয়েছে :

খেলার তালিকা

পুরুষ বিভাগ

'এ' গ্রুপ : সার্ভিসেস (চ্যাম্পিয়ান), মহীশূর, উড়িষ্যা এবং গুজরাট।

'বি' গ্রুপ : রেলওয়ে (রানার্স-আপ), পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলা এবং মধ্যপ্রদেশ।

'সি' গ্রুপ : মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ এবং বিহার।

'ডি' গ্রুপ : অন্ধ্র প্রদেশ, রাজস্থান, কেরালা এবং দিল্লী।

মহিলা বিভাগ

'এ' গ্রুপ : পশ্চিম বাংলা (চ্যাম্পিয়ান), রাজস্থান, অন্ধ্র প্রদেশ এবং দিল্লী।

'বি' গ্রুপ : মহারাষ্ট্র (রানার্স-আপ), উত্তর-প্রদেশ, মহীশূর এবং উড়িষ্যা।

'সি' গ্রুপ : পাঞ্জাব, কেরালা এবং মধ্যপ্রদেশ।

বালক বিভাগ

'এ' গ্রুপ : মহীশূর (চ্যাম্পিয়ান), পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উড়িষ্যা।

'বি' গ্রুপ : অন্ধ্র প্রদেশ (রানার্স-আপ), দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ।

'সি' গ্রুপ : মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং কেরালা।

সাঁতারু মিহির সেন

১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে মিহির সেন দূরপাল্লার সাঁতারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীকালে (১৯৬৬ সালে) তিনি পক প্রণালী, জিব্রাল্টার, দারদানেলস, বসফরাস এবং সর্বশেষে গত ৩১শে অক্টোবর (১৯৬৬) পানামা প্রণালী সাফল্যের সংগে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলে ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

সাফল্যের খতিয়ান

ইংলিশ চ্যানেল (২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮) : দূরত্ব ২০।২১ মাইল। সময় ১৪ ঘন্টা ৪৫ মিনিট

পক-প্রণালী (৫-৬ এপ্রিল, ১৯৬৬) : দূরত্ব ২২ মাইল। সময় ২৫ ঘন্টা ৪৪ মিনিট

জিব্রাল্টার প্রণালী (২৪ আগস্ট, ১৯৬৬) : দূরত্ব ২৫ মাইল। সময় ৮ ঘন্টা ১মিঃ।

দারদানেলস প্রণালী (১২ সেপ্টেম্বর, '৬৬): দূরত্ব ৪০ মাইল। সময় ১৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট।

বসফরাস প্রণালী (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬): দূরত্ব ১৬ মাইল। সময় ৪ ঘন্টার কিছু কম।

পানামা প্রণালী (৩১ অক্টোবর, ১৯৬৬) : দূরত্ব ৪২ মাইল। সময় ৩৫ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

কোচবিহার ট্রফি

পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল

বোম্বাইয়ে আয়োজিত নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (কোচবিহার ট্রফি) পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে গত বছরের কোচবিহার কাপ বিজয়ী বোম্বাই দল এক ইনিংস এবং ১২০ রানে সৌরাষ্ট্রকে পরাজিত ক'রে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছে।

বোম্বাই দলেরও প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা সুবিধার হয়নি। ৩২ রানের মাথায় ৩য় এবং ১৭৯ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে যায়। ৮ম উইকেটের জুটি দারুওয়ালা এবং এস বিনোদ (২৯ রান) দলের যে মূল্যবান ৮০ রান তুলেছিলেন তার দৌলতেই বোম্বাই প্রথম ইনিংসের খেলায় সৌরাষ্ট্রের থেকে ১৮৯ রানে অগ্রগামী হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলায় বোম্বাই ৭ উইকেটে ১৯[illegible] রান সংগ্রহ করে ১২০ রানে অগ্রগামী হয়েছিল।

সৌরাষ্ট্র : ৭৫ রান (অজিত নায়েক ৩[illegible] রানে ৬ উইকেট)।

ও ৬৯ রান (এ কুরেশী ১১ রানে ৪ এবং মনজুর আলি ১৭ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই : ২৬৪ রান (এ দারুওয়ালা ৭৫ এবং এস বসিরুদ্দিন ৪৮ রান। ঘাভরী ৩০ রানে ৪ উইকেট)

পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল

জামসেদপুরে আয়োজিত বাংলা বনাম বিহার স্কুল দলের পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় বাংলা স্কুল দল প্রথম ইনিংসে বেশী রান সংগ্রহ করার সূত্রে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার লাভ করেছে।

প্রথম দিনে বিহার স্কুল দলের প্রথম ইনিংস ১২১ রানের মাথায় শেষ হয়। দীপংকর সরকার ৩২ রানে বিহার দলের ছয়টা উইকেট পান। বাকি সময়ে বাংলার স্কুল দল দুই উইকেট খুইয়ে ৮৩ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে ৩৭৭ রানের (৮ উইঃ) মাথায় বাংলা স্কুলদল প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বাংলার পক্ষে সর্বোচ্চ ১৩০ রান করেন পলাশ নন্দী।

খেলার শেষ অর্থাৎ তৃতীয় দিনে বিহার স্কুল দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৩৭ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলা শেষ হয়।

বিহার স্কুল : ১২১ রান (ধীরেশ নন্দী ২৯ রান। দীপংকর সরকার ৩২ রানে ৬ উইকেট)

ও ১৩৭ রান (এস আমীন ৩৫ রান। দীপংকর সরকার ২৮ রানে ৩ এবং এস ঘোষ ৪১ রানে ৩ উইকেট)।

বাংলা স্কুল দল : ৩৭৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পলাশ নন্দী ১৩০ এবং পি চেইল ৬৬ রান। সুদীপ রায় ১১২ রানে ৪ উইকেট)

মূল প্রতিযোগিতার তালিকা

আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে মাদ্রাজে কোচবিহার ট্রফির মূলে খেলা আরম্ভ হবে। ফাইনাল খেলা হবে চারদিন—ডিসেম্বর ৯—১২।

(এ) : পূর্বাঞ্চল বনাম দক্ষিণাঞ্চল
(বি) : বিজয়ী 'এ' বনাম পশ্চিমাঞ্চল (সেমিফাইনাল)
(সি) : মধ্যাঞ্চল বনাম উত্তরাঞ্চল (সেমিফাইনাল)

সুব্রত মুখার্জি কাপ

১৯৬৬ সালের নিখিল ভারত স্কুল ফুটবল (সুব্রত মুখার্জি কাপ) প্রতিযোগিতার ফাইনালে গভর্নমেণ্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (কার-নিকোবর, আন্দামান) ১-০ গোলে স্টেটস স্পোর্টস স্কুল দলকে (জলন্ধর) পরাজিত করে সুব্রত মুখার্জি কাপ জয়ী হয়েছে। জয়সূচক গোলটি দেন বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ওয়েলিংটন।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

পূর্ব জার্মানীতে আয়োজিত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার ৭টি বিভাগে রাশিয়া ৫টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। একটি ক'রে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে জাপান এবং হাঙ্গেরী। রাশিয়া স্বর্ণপদক পেয়েছে হেভী ওয়েট, লাইট হেভী ওয়েট, লাইট ওয়েট, ব্যাণ্টাম ওয়েট এবং মিডল ওয়েট বিভাগে। জাপান ফেদারওয়েট এবং হাঙ্গেরী মিডল হেভীওয়েট বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হয়।

হকিগুরু ছুটি নিলেন

অজয় বসু

হকি খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক হাবুল মুখার্জির জীবনাবসান ঘটেছে।

পরিণত বয়সেই তিনি ছুটি নিয়েছেন। ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত নয়, তবু কেন জানি না আজ মনে হচ্ছে যে বড্ড অসময়েই তিনি বুঝি ছুটি নিলেন, আরও কিছুদিন তিনি আমাদের কাছে থাকলে ভাল হোতো।

সামনেই এশীয় ক্রীড়া। পরীক্ষার চাহিদা নিতান্ত সামান্য নয়। তাই ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিতে হাবুল মুখার্জিকে জাতির প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি. ভাগ্য ঠিক সেই সময়েই তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ঘটনাটি শোকাবহ যে তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল ভারতীয় হকিজগতে দুর্বৎসর। টোকিওর এশীয় ক্রীড়াভূমি, রোমের ওলিম্পিক আসর, জাকার্তা ক্রীড়াঙ্গন, সর্বত্রই ভারতীয় হকি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দলের সংজ্ঞায় চিহ্নিত। শীর্ষাসন দখলে এনেছে প্রতিবেশী পাকিস্থান। চার বছর পর। টোকিও ওলিম্পিক হকিতে হৃত সাম্রাজ্যের অনেকখানি পুনরুদ্ধার করলেও এশীয় হকির হারানো শীর্ষাসনও ফিরে পাওয়ার কাজ এখন অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এই কাজ সম্পূর্ণ করে তোলার অবকাশ পাওয়া যাবে আশঙ্কে।

কাজ সম্পূর্ণ করার সংকল্পে গুরুকে সামনে রেখে হাবুল-শিষ্যরা তৈরী হচ্ছিলেন। রোগাক্রান্ত শরীর নিয়েও হাবুল মুখার্জি প্রশিক্ষণের ভার হাতে তুলেছিলেন। এমন সময় ঘটলো এই বিয়োগান্ত ঘটনা। এই ঘটনায় ভারতীয় হকি দলের মনোবল কমে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই আশংকা হয় যে হাবুলবিয়োগে ভারতীয় হকির সত্যিই মস্তো ক্ষতি হয়ে গেল।

মস্তো ক্ষতি। কিন্তু অপূরণীয় নিশ্চয়ই নয়। শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যে তিনি শিক্ষার ধারা রেখে দিয়েছেন। সেই শিক্ষার কৌলীন্যগর্ব অক্ষুণ্ণ রাখা শিষ্যদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না, এমন অলুক্ষণে কথাই বা মনে আসবে কেন! যেহেতু টোকিওর ফলাফলেই প্রকাশ যে হাবুল-শিষ্যরাই হলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়। সেরা শিষ্যরা যদি উপযুক্ত গুরুপ্রণামী না দিতে পারেন, তাহলেই বোধহয় বিস্মিত হতে হবে।

হাবুল মুখার্জি পরিণত বয়সে তিন তিনবার ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন। এবং সেই তিনবারই ভারত ওলিম্পিক হকিতে সর্বশ্রেষ্ঠের সম্মানে ও মর্যাদায় অভিনন্দিত হয়েছে। ১৯৫২, ১৯৫৬ এবং এক ওলিম্পিয়াডের পর আবার ১৯৬৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মুখ্য প্রশিক্ষকের ভূমিকায়; তিনবারই ভারত বিশ্ববিজয়ী আখ্যা নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছে। প্রশিক্ষণের হাল যেবার অন্যহাতে ধরা ছিল সেইবারই অর্থাৎ ১৯৬০ সালে ভারতকে শীর্ষাসন খোয়াতে হয়েছে। কাজেই প্রশিক্ষক হিসেবে হাবুল মুখার্জির ভূমিকা যে অনন্য তা বলাই বোধহয় বাহুল্য।

ব্যক্তিগত সাফল্যের মূল্যায়নে, শিষ্য-প্রশিষ্যদের কীর্তির পরিচয়ে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জাঁদরেল কর্মকর্তা হিসেবে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের প্রশাসনিক কাঠামোয় তাঁর অস্তিত্ব ছিল না। হয়তো সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু-সংবাদে অধীর হয়ে হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা তেমন হা-হুতাশ করেন নি। কিন্তু ভারতীয় হকির শুভানুধ্যায়ী হিসেবে আমরা, দেশের মানুষেরা আজ তাঁর স্মৃতি-তর্পণে জাতিগত ঋণ স্বীকার করছি। আমাদের কাজ পুণ্য কাজ।

প্রশিক্ষক হিসেবে হাবুল মুখার্জির ব্যক্তিত্ব ও প্রত্যয় দুই ছিল অবিচল, সেকাল এবং একালের হকি সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও ছিল তেমনি স্বচ্ছ। রোমে হার হলেও টোকিওতে জিতবেই, এই ভবিষ্যতবাণী আগে শোনাতে তাঁর দ্বিধা জাগে নি। আর মুখের সেই কথাটিকে তিনি কাজে পরিণত করতে পেরেছেন কিনা তার সাক্ষী ইতিহাসই। যে ব্যক্তি আগেভাগে আশ্বাস জাগিয়ে কঠিন কাজকে সাধ্যায়ত্ত করে তুলতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই শূন্যকুম্ভ

নন। কাজেই প্রশিক্ষক হিসেবে হাবুল মুখার্জি যে সার্থক সে বিষয়ে কণামাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এমন অটুট প্রত্যয়ের পাশে ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বকে সমীহ না করা ছাড়া খেলোয়াড়দের অন্য উপায়ও থাকতো না। শেষদিকে দেখেছি, শিষ্যদের সঙ্গে মাঠে নেমে মেহনত করার ক্ষমতা যখন তাঁর আর নেই তখন শিক্ষাভূমির একপাশে চেয়ারে বসে বসেই হাবুলবাবু সমস্তকিছু নিরীক্ষণ করতেন। শরীর মজবুত না থাক, দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ন। দেখতেন আর হাঁক তুলে নির্দেশ দিতেন। ভুলচুক হলে কারুরই রক্ষে থাকতো না। উচ্চকণ্ঠ গর্জনা নিজস্ব ভাষা প্রয়োগে আরও তীক্ষ্ন, শাণিত। এই কণ্ঠ এবং ওই বিশেষণগুলিকে ভয় পেতেন না এমন অসমসাহসী হকি খেলোয়াড় ভারতবর্ষে ছিলেন না।

বছর কুড়ি আগে আর এক মাঠে হাবুলবাবুর এমনি দাপট আমি লক্ষ্য করেছিলাম।

হাবুলবাবু তখন লক্ষ্ণৌ ক্রীড়াসংস্থার জবরদস্ত কর্মকর্তা। আমরা গিয়েছি আই এফ সি শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে। হাবুলবাবুর নাম আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁর স্বরূপ জানা ছিল না। কাছে গিয়ে জানলাম। জানলাম যে হাবুল মুখার্জিই হলেন লক্ষ্ণৌর ফুটবল মাঠে (বোধহয় সমস্ত মাঠেরই) একেশ্বর। যা বলবেন তিনি তা সবাইকে মানতে হবে। খেলোয়াড়, দর্শক, স্থানীয় এবং বাইরের প্রতিযোগী, সবাইকে।

আমরা কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌয় খেলতে গিয়েছি। বেশিদিন থাকার কথা নয়। কিন্তু হাবুল মুখার্জির ব্যবস্থাপনার দৌলতে প্রথম রাউন্ড থেকে ফাইনাল জয় করতে এবং মধ্যে মধ্যে দু' একটি প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিতে নিতেই পুরো এক মাসের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। লক্ষ্ণৌয় একটানা এক মাস থাকতে এবং একটি হোটেলে প্রতিদিন কড়া মশলায় বানানো 'রোগান জুস' গলাধঃকরণে আমাদের অরুচি ধরে গিয়েছিল। অসুবিধের কথা কর্তাব্যক্তির সবিনয়ে নিবেদন করলে কি হবে, যা ইচ্ছে এবং যেমন ইচ্ছে তেমনি করেই হাবুল মুখার্জি আমাদের

এবং অন্য প্রতিযোগীদেরও আটকে রাখলেন। তর্ক করে বা ফিক্স থাবার হুমকিতে সুফল ফললো না। 'কর্তার' ইচ্ছেতেই সকলকে সব কর্ম সম্পাদন করতে হলো। সময়ে সময়ে তিনি হয়তো আমাদের প্রতিও অবিচার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু যাই করুন না কেন, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কি শক্ত ধাতে মানুষ হিসেবে তিনি গড়া। সাধে কি আর তখনকার দিনে আই এফ সি শীল্ড 'হাবুল শীল্ড' নামে অভিহিত করা হোতো!

হাবুল মুখার্জির নেতৃত্বে সেকালে লক্ষ্ণৌর আই এফ সি শীল্ড ভারতের অন্যতম শীর্ষপর্যায়ের ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে উঠতে পেরেছিল। বয়সের চাপে হাবুলবাবু ওই প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়ার পর সর্বভারতীয় নিরিখে আই এফ সি শীল্ডের মর্যাদাও কমে গিয়েছে।

বাংলাদেশ ছেড়ে কবে যে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরের স্থায়ী বাসিন্দা তিনি বনে গিয়েছিলেন তা হাবুল মুখার্জির নিজেরই স্মরণ ছিল না। লক্ষ্ণৌই তাঁর যৌবনের লীলাভূমি। বার্ধক্যের বারাণসী। বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ ছিল না। তাই বাংলা ভাষাও প্রায় ভুলে বসেছিলেন। চোস্ত উর্দু-হিন্দী-ফারসীর ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ যে কটি বাংলা শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো তাও ভাঙা ভাঙা, টানাটানা। তবে সাজে-পোশাকে, বৈঠকী মেজাজে তিনি ছিলেন পুরোপুরি সাবেকী বাঙালী। খাটো শার্ট এবং ততোধিক খাটো ধুতি পরনে। আড়ম্বর ও আধুনিকতার চিহ্নমাত্র নেই। আকৃতি অতি নিরীহ। কিন্তু গলার স্বরে, বাচনভঙ্গীতে তিনি আদৌ গোবেচারী ছিলেন না। নিজের সামর্থে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল সেকথা সকলকে বুঝিয়ে দিতেও তিনি কোনোদিন সংকোচ বোধ করেন নি।

একালের প্রশিক্ষক হাবুল মুখার্জি যৌবনে নামকরা হকি খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর কালে তাঁর মতো সুদক্ষ ফরোয়ার্ড সারা ভারতে খুব কমই ছিলেন। হকি খেলেছেন তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে। সে সময়ে কলকাতায় বেটনেও খেলে গিয়েছেন। এই সময়ের হিসেব মনে রাখলে হাবুল মুখার্জির ঠিক কতো বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তার আন্দাজ পাওয়া কঠিন। যদিও খবরে প্রকাশ যে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতআশি। দুঃখের কথা, হাবুল মুখার্জির ভরাযৌবনে ভারতীয় হকির ওলিম্পিক আত্মপ্রকাশ ঘটে নি। ঘটলে নিশ্চয়ই তিনি জাতীয় দলে নিজের জায়গা করে নিতেন। এ কথাটি স্বয়ং ধ্যানচাঁদও তাঁর আত্মজীবনীতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে রেখেছেন। ১৯২৮ সালে ভারত যখন সবপ্রথম ওলিম্পিক হকিতে যোগ দেয় তখন বাহাইপুরের আন্তপ্রদেশ হকিতে হাবুলবাবু খেলেছিলেন বটে কিন্তু বয়সের ভারে তাঁর খেলার ভার তখন কমেছে। কাজেই প্রথম ওলিম্পিক দলে তাঁর জায়গা হয়নি।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকির সেই প্রথম অনুষ্ঠান জয় করতে সেবার (১৯২৮) হাবুল মুখার্জি উত্তরপ্রদেশকে সহায়তা করেছিলেন। সে দলের সেরা ফরোয়ার্ড ছিলেন অবশ্যই ধ্যানচাঁদ। মার্কিনস, সিম্যানের ভূমিকা তার পরই। তবু মেহনতী হাবুল মুখার্জির অবদানের কথা অস্বীকৃত থাকার নয়। তা ছাড়া দলের প্রবীণতম সদস্য হিসেবে তাঁকে সময়ে সময়ে সতীর্থদের চালিয়েও নিয়ে যেতে হয়েছে। সেই হিসেবে হাবুলবাবু ১৯২৮ সালে উত্তরপ্রদেশ দলের গুরুগিরি করলেও আসলে তিনি ধ্যানচাঁদের গুরু নন। কলকাতার এক বিখ্যাত বাংলা দৈনিকে এক নামকরা ক্রীড়াসমালোচক হাবুলবাবুকে ধ্যানচাঁদের গুরু হিসেবে অভিহিত করলেও ইতিহাস জানে যে হকিতে ধ্যানচাঁদের অবিসম্বাদী গুরু হলেন সুবেদার মেজর বালে তেওয়ারী।

১৯২২ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ধ্যানচাঁদ হকিতে মন দিলে বালে তেওয়ারী স্বেচ্ছায় তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার নেন। ১৯২৬ সালে সেনাদলের পক্ষে ধ্যানচাঁদ নিউজিল্যাণ্ডে ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দক্ষতার কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ধ্যানচাঁদ শুধু সেনাবাহিনীর মাঠেই হকি খেলেছেন। ১৯২৮ সালে উত্তরপ্রদেশের প্রায় অন্য সব খেলোয়াড়, মায় হাবুলবাবু পর্যন্ত অপরিচিত। তবে হাবুল মুখার্জির নাম তিনি আগেই শুনেছিলেন নামকরা খেলোয়াড় এবং উত্তরপ্রদেশের হকির প্রসার ও উন্নয়নের নেতা হিসেবে।

এতো নাম তখন হাবুল মুখার্জির যে তাঁর বদলে গোলরক্ষক পি সি ব্যানার্জি যখন উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন তখন 'আমি রীতিমতো বিস্ময়বোধ করলাম!' সেই থেকেই হাবুলের সঙ্গে ধ্যানচাঁদের পরিচয়। খেলার মাঠে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেছেন। সিনিয়ার হিসেবে হয়তো হাবুলবাবু কিছুটা বেশিই করেছেন। তা বলে হাবুল মুখার্জিকে ধ্যানচাঁদের গুরু বলা যায় না। বললে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হবে।

তবে ধ্যানচাঁদের না হোক, অনেক উত্তরসূরীর যে গুরু এই হাবুল মুখার্জি তাতে কোনো দ্বিমত নেই। সাকরেদদের মধ্যে সবচেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাবু। একা বাবুর পরিচয়েই বাবুর গুরু হকি-ইতিহাসে অক্ষয় প্রসিদ্ধি পেতে পারেন। পেয়েছেনও। এবং সে পরিচয় আরও পরিণত হয়েছে হেলসিঙ্কির পর মেলবোর্নে এবং আরও পরে টোকিওতে হাবুল-শিষ্যদের সাফল্যে।

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। পনেরো ।।
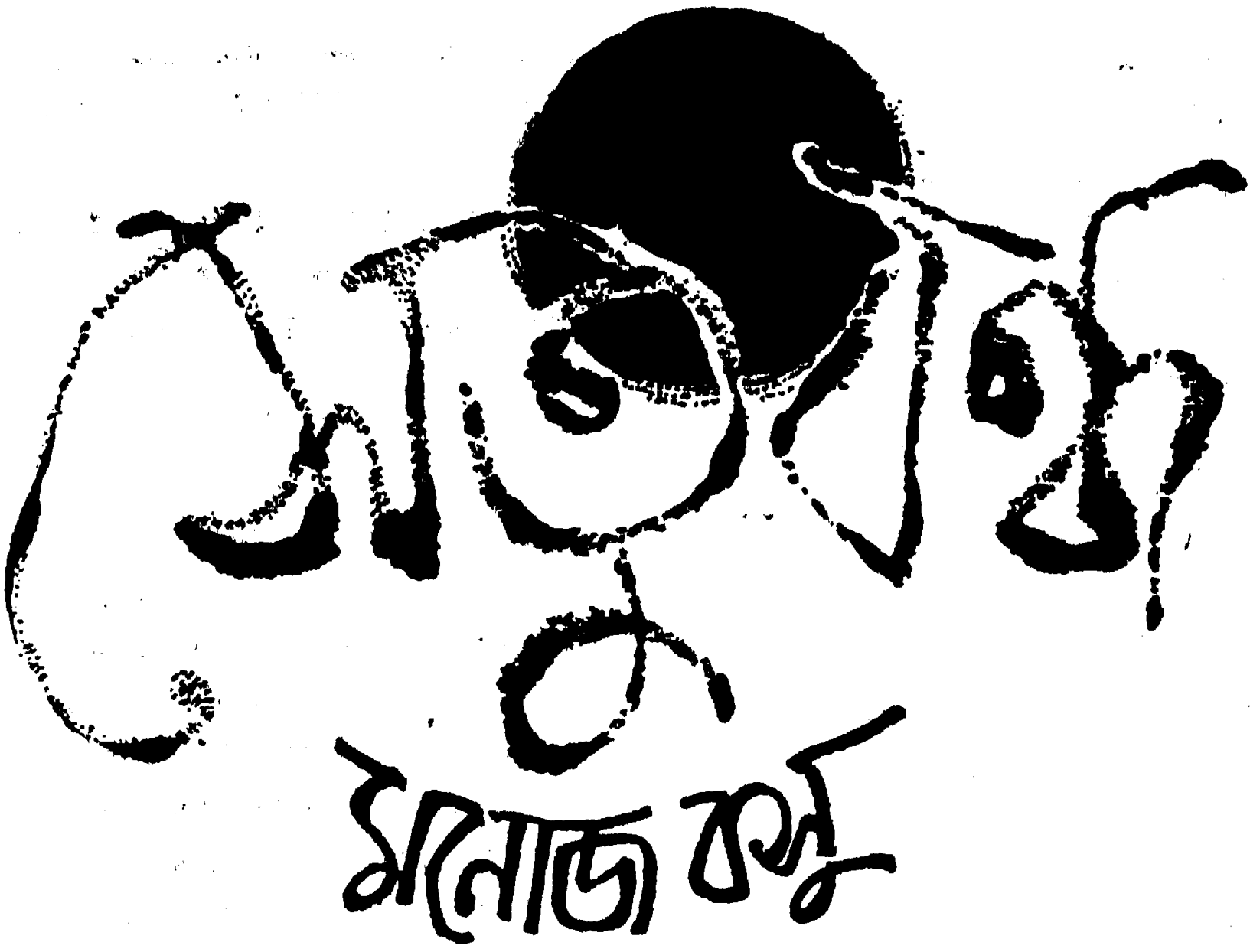
অদূরে পুকুর। ধুতি-গামছা ও হেরিকেন নিয়ে সুনীলকান্তি বলে, হাত-পা ধুয়ে নেবে চলো। ক্লান্ত আছ—যা-হোক দুটি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়বে।

তবু শিশির দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি ভরে দেখছে। মেয়ে নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। কষ্টে বিরক্তিতে এমনও মনে এসেছে—আপদ-বালাই কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিই, আছাড় মেরে কান্না থামিয়ে দিই চিরকালের মত। সেই মেয়ে অকস্মাৎ সাত রাজার ধন মানিক—মানিক একটুকু কাছে নেমে বলে হুড়োহুড়ি ছেলেপুলেদের মধ্যে—

রণবেশ খানিকটা সামলে দলপতি উর্মিলাও এইবারে এসে পড়ল, লজ্জা করে বেশিক্ষণ অন্তরালে থাকতে পারে নি। মুগ্ধ চোখে কুমকুমের দিকে তাকিয়ে বলে, টানাটানি করছে, তাতেও যেন ওর বেশি মজা। দেখ বউদি, ঠোঁট টিপে হাসে কেমন চেয়ে দেখ। ভারি হাসকুটে মেয়ে, কাঁদতেই জানে না।

মমতা গাল টিপে বলে, আড্ডাবাজ মেয়ে। রাত দুপুর হয়ে গেছে, ঘুমের নাম-গন্ধ নেই চোখে।

উনুন ধরিয়ে ভোলা ওদিকে রান্নাঘর থেকে ডাক দেয় : এসো বউদি, হয়ে গেছে—

কী করছে দেখ একটুখানি কোলে নেবার জন্য। না, গণ্ডগোলে কাজ নেই, কেউ তোমরা পাবে না—

নিজ সন্তানদের তাড়া দিয়ে মমতা উর্মির কোলে মেয়ে দিল। বলে, ধরো ঠাকুরঝি। তোমার শাকরেদদের কাছে দিও না; কাড়াকাড়ি করে ফেলে মারবে। ভাত আছে হাঁড়িতে, ভাজা-মাছ ক'খানা একটু ঝোল করে দিই তাড়াতাড়ি—

কুমকুম উর্মির কোলে, মমতা রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। দেবু খোশামোদ করে : দাও ছোটপিসি। ফেলে দেবো না, কক্ষনো না, দিয়ে দেখই না একবার—

পিসির সঙ্গে একই দলে এতক্ষণ জীবনপণে লড়াই করেছে, তা বলে খাতির নেই। না—বলে ঝঙ্কার দিয়ে উর্মি পাক দিয়ে পিছন ঘুরল। সেদিকে জয়া। মেয়ে নিয়ে উঠানে নামল তো সেখানেও ভিখারির মতন ঘিরে ধরেছে। একফোঁটা স্বপ্নাটা আবার তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছে হাত বাড়িয়ে একটু ছুঁয়ে নেবার জন্য।

হেরিকেন উঁচু করে ধরে সুনীলকান্তি ডাক দেয় : দাঁড়িয়ে কি দেখ? চলে এসো।

দাঁড়িয়ে শিশির দু-চোখ ভরে মেয়ের সমাদর দেখে। কোল থেকে মেয়েকে উর্মি মুখের সামনে তুলে ধরে বক-বক করছে : হাসলে তুমি মানিক পড়ে, কাঁদলে তুমি মুক্তো ঝরে। তা কাঁদতেই তো জান না—মুক্তো আমাদের কপালে নেই। মানিকই কুড়োবো তবে, কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাহাড় জমাবো।

কেয়াকে বলে, এই, ঠোঁট ফুলোচ্ছিস কেন? কী হবে কোলে নিয়ে? তার চেয়ে মানিক কুড়িয়ে কুড়িয়ে তোল।

পুনু বলে, মানিক কোথায় ছোটপিসি?

দেবু বয়সে বড়, তায় পুরুষছেলে। বলে, দূর বোকা! মানিক না হাতী—মানিক বুঝি মুখ থেকে পড়ে? পিসি এমনি বলছে।

উর্মি জোর দিয়ে বলে, সত্যি রে সত্যি। ঝাঁপাঝাঁপি না করে মাটির উপর নিচু হয়ে দেখ, দুটো-চারটে পেয়ে যাবি। রাতের বেলা না-ও যদি পাস, দিনমানে কাল ঠিক পাবি।

এমনি সব কানে শুনতে শুনতে শিশির সুনীলকান্তির সঙ্গে পুকুরঘাটে চলল।

(কান্নায় কুমকুম কি পরিমাণ দক্ষ, সে খবর এরা কি করে জানবে? স্টেশনে মমতা সেই হাত বাড়িয়ে নিল, একটি বারও কাঁদে নি তারপর। ভুলে গেছে কান্না। থাপ্পড় কষিয়ে দিলেও বোধহয় কাঁদবে না। আমার মায়ের কোলে বসেও দুলে দুলে অমনি হাসত। মেয়েরা জাদু জানে, পলকে শিশু বশ করে নেয়। দশাশই পুরুষমানুষ—তাকেও একেবারে শিশু বানিয়ে ফেলে। পূরবী নিজে মানুষটা একফোঁটা—নিতান্ত এক শিশু বিবেচনা করে কত আমায় তাড়না করত!)

পায়ে ঠোক্কর খেল শিশির। সুনীলকান্তি বলে, আলো ধরে তো যাচ্ছি—দেখে পথ চলো ভাই।

হেসে শিশির বলে, আলোটা নিভিয়ে দিন বরঞ্চ। জ্যোৎস্নায় চারিদিক দিনমান—আলো এর মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকার কী দরকার, বাড়ি চলে যান বড়দা। চান-টান সেরে আমি যাচ্ছি।

হাত-পা ধুতে এসেছিল, নিশ্চিন্ত আনন্দে শিশির অবগাহন-স্নান করল বেশ খানিকক্ষণ ধরে। বাড়ি ফিরে দেখে, রোয়াকে সতরঞ্চি পেতে কুমকুমকে বসিয়ে দিয়ে উর্মিলা ঠাঁই করছে শিশিরের জন্য। মমতার পাঁচ ছেলেমেয়ে চতুর্দিক ঘিরে—খেলা দিচ্ছে। এই একটু আগের সে কুমকুম নেই এখন—জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন কোন রাজবাড়ির মেয়ে। কাজল পরিয়েছে চোখে, পাউডার বুলিয়েছে মুখে। পথের ধুলো-ময়লা-মাখা জামা ছাড়িয়ে বোধহয় স্বপ্নারই জামা একটা পরিয়ে দিয়েছে। পেটেও পড়েছে নিশ্চয় উত্তম কিছু—নইলে এতক্ষণ ধরে এত হাসি-স্ফূর্তি আসে না। ধরণীগিন্নি মারা যাবার দিন থেকেই ভোগান্তি—তাহলেও, বলতে নেই, স্বাস্থ্য মেয়ের অক্ষুণ্ণই আছে। একটুখানি এই যত্ন পেয়েছে—পালিশ-করা সোনার মতন অমনি ঝকমক করছে।

শিশির ডাকল : কুমকুম—

তাকিয়েও দেখে না মেয়ে। নতুন সঙ্গীদের নিয়ে মত্ত।

ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে জাহাজ যেন বন্দরে নোঙর করেছে, রাত্রিটা আজ নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। কী আরাম, কী আরাম!

স্বাতী এলো শ্বশুরঘর করতে।

এলো গলির ভিতরের সেই এঁদো বাসাবাড়িতে নিতান্ত সাধাসিধে ভাবে—নিম্নবিত্ত গৃহস্থঘরের বউ যেমন ধারা আসে। একটা ট্রাঙ্ক আর একটা স্যুটকেস মাত্র সঙ্গে—তৃতীয় জিনিষ নেই। গলির মোড়ে গাড়ি রেখে ড্রাইভার একাই দু-হাতে জিনিষ দুটো পৌঁছে দিল।

ফুলশয্যা-বউভাত ঐ বাড়িতেই। গলিটা ঘিরে নিয়ে মানুষজনের বসবার জায়গা হল। মানুষ আর ক'জনই বা—বেশি লোক ডেকে সামাল দেয় কে! তারণ অথর্ব হয়ে পড়েছেন। প্রতিক্ষণ যাঁর কথা মনে পড়ছে, তিনি পুণ্য মুখুজ্জে। সর্বকর্মে ধুরন্ধর—এ বাড়ির বড় সুহৃৎ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। কলকাতায় নেই তিনি, সুজাতার বিয়ের পর কাশীবাসী হয়েছেন। তিনি উপস্থিত থাকলে কাউকে কিছু দেখতে হত না। চিঠিতে তারণ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন — কয়েকটা দিন

এসে তাপসের ফিরে দিয়ে যাওয়ার জন্য। অত দূরে থেকে আসার নানান ঝামেলা। লিখেছিলেন অবশ্য, চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। খাটা-খাটনি-দৌড়ঝাঁপ কে করে—বিয়ের খর হয়েও তাপসের রেহাই হল না। সে আর পূর্ণিমা ভাই-বোনে মিলে সমস্ত করল। শুভকর্ম চুকে গেল কোনরকমে।

হপ্তাখানেক পরে কিছু জিনিষপত্র এসে পড়ল কুটুম্ববাড়ি থেকে। বউভাতের দিন বিজয়া দেবী এসে মেয়ের সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করে গেছেন। ভালবেসে বিয়ে করেছে, কষ্ট সহ্য করতে মেয়ে গররাজি নয়। তবু ভিন্ন একভাবে মানুষ হয়েছে চিরকাল—মায়ের প্রাণ টনটন করে উঠল, নিতান্ত নইলে নয় এমনি কয়েকটা ফার্নিচার ও কিছু কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিলেন। ভেবেচিন্তে কম-সম করেই পাঠিয়েছেন।

একটা দুটো রেখে বাকিগুলো পূর্ণিমা ফেরত দিতে চাইছে : জায়গা কোথা? কি স্বাতী, তোমার কি মত বলো।

স্বাতী উৎসাহ ভরে বলে, বটেই তো! জায়গা কোথা ছোড়দি?

কিন্তু মা যদি রাগ করেন?

স্বাতী নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলে, আমরা নাচার। মায়ের কোন বিবেচনা নেই। এই জিনিষ ঘরে ঢোকাতে গেলে আমাদের তবে তো পথের উপর নেমে পড়তে হয়।

বিজয়া দেবী সেই বিকালেই চলে এলেন। মুখ কালো করে পূর্ণিমাকে বলেন, জিনিষ ফেরত না দিয়ে আমার বাড়ি গিয়ে দু-ঘা জুতো মেরে এলে পারতে। সে তবু বাড়ির মধ্যে গোপন থাকত, পথের লোকের কাছে জানান দেওয়া হত না।

পূর্ণিমা বলে, আপনি বড্ড রেগে আছেন মা। বসুন আগে, বলছি—

বসলেন না বিজয়া দেবী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছে : যে জিনিষ পাঠিয়ে ছিলাম সবক'টা স্বাতীর। নজর ফেলে দেখতে পারতে পুরানো জিনিষ—নতুন একটাও নয়। মেয়েটা ঘরে নিয়ে এলে, মেয়ের জিনিষ ক'টা নিতে পারবে না?

পূর্ণিমা পুনরায় বলে, বসুন মা, ঠাণ্ডা হোন—

ঘাড় বাঁকিয়ে বিজয়া দেবী বললেন, যা বলবার আছে বলো তুমি। শুনে যাই।

আমি একলা কিছু করি নি, আপনার মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি। ছাতে আছে স্বাতী—ডেকে দিচ্ছি, তার মুখেই শুনে নিন।

মেয়ে কি বলবে—ঘাড় তুলে উল্টো কিছু বলবার তাগত আছে তার? বাড়ির ছেলে তাপসেরই বড় আছে! খবর কোনটাই অজানা নেই। রোজগার করো বলে সকলকে কেঁচো করে রেখেছ তুমি।

এমন এমন শক্ত কথা, তবু পূর্ণিমা রাগ করে না। শান্ত হাসি-ভরা কণ্ঠে বলে যায়, আপনার বড্ড মনে লেগেছে মা, লাগবারই কথা। কিন্তু নিরুপায় হয়েই করতে হল। এক-এক চিলতে ঘর—পা ফেলবারই জায়গা হয় না দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে জিনিয এনে ঢোকালে মানুষের আর জায়গা থাকে না। মেয়ে এতদিন পালন করেছেন, মেয়ের জিনিষপত্তোর আরও কিছুদিন রাখতে হবে, যতদিন না বড় জায়গার সুবিধে হচ্ছে।

জায়গা তো হাতেই আছে, তার জন্যে আকাশ-পাতাল খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। আমাদের নিউ আলিপুরের একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে, তার পরে আর নতুন ভাড়াটে আসতে দিই নি। আজ কিছু স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলি, কিছু মনে করো না মা। এই বাড়িতে এই ঘরে রেখে তাপসের ভবিষ্যৎ তোমরা নষ্ট করছ। চিকিচ্ছের চেয়ে ডাক্তারের ঠাটঠমক লাগে বেশি। বড়লোক পেসেন্ট যদি দৈবাৎ এখানে এসে পড়ে, কী ভাববে বল দেখি। বস্তির মানুষ যারা এক টাকা-দু'টাকার ডাক্তার ডাকে তারাই আসবে শুধু এখানে।

বিজয়া দেবী হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চুপ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে পূর্ণিমাকে দেখছেন। মুখ ভাবের একটুও বদল নেই, শক্ত মেয়ে বটে। বললেন, হুকুম যদি হয়, জিনিষগুলো নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে পাঠাতে পারি। ভাল বই মন্দ থাকবে না সেখানে।

পূর্ণিমা বলে, হুকুম আমি দিলে হবে না। থাকবে আপনার মেয়ে-জামাই—তাদের কি মত, জেনে নিন।

আমার মেয়ে—তার মতামত কি জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে? জামাইর মতও আলাদা হবে না। অন্ধকূপে ইচ্ছে করে কে পড়ে থাকতে চায়? তবু কার ঘাড়ে কটা মাথা, তোমার সামনে তাই প্রকাশ করে বলতে যাবে! পাঁচখানা বড় বড় ঘর সেই ফ্ল্যাটে—শুধু মেয়ে-জামাই কেন, বেয়াইকে নিয়ে সবসুদ্ধ তোমরা থাকতে পারবে। আরামে থাকবে, এঁদো বাড়িতে পচে মরার কি দরকার!

পূর্ণিমা চুপ করে আছে।

বিজয়া দেবী অধীর কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ-না যা-হোক কিছু বলো। হুকুম শুনে চলে যাই।

পূর্ণিমা বলে, তাপস নেই, সে তো জানেন। পুরী থেকে ফিরুক—থাকতে হয়, ওরাই থাকবে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে পরে জানাব।

রাগে গরগর করতে করতে বিজয়া দেবী চলে গেলেন।

কী ঘুম ঘুমাল শিশির—কত দিনের পরে। চড়া রোদ চারিদিকে। বাড়ির মানুষ উঠতে কারো বাকি নেই। ছেলেপুলের কলবর—কুমকুমও উঠে পড়ে ওদের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে, হাসির ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে।

বাইরে এসে দেখে, দাওয়ায় জলচৌকির পাশে জলের ঘটি, নিমের দাঁতন। সুনীল-কান্তিকে দেখে বলে, মরে ঘুমিয়েছি বড়দা।

মুখ ধোওয়া সারা হতেই মমতা চা ও চিঁড়ে-ভাজা নিয়ে হাজির। শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আপনার বাড়ি আনন্দ-নিকেতন। কী ভাল যে লাগল! সকালের দিকটা তো বিস্তর ট্রেন—যাই এবারে বড়দা।

মমতা বলে, এক্ষুনি কেন ভাই। রবিবারে উনি আজ বাড়ি থাকবেন, থেকে যাও আজকের দিনটা। ধকল যাচ্ছে খুব, বিশ্রাম হবে।

শিশির বলে, যা বলেছেন। বড় কাতর হয়ে পড়েছি, বিশ্রামের দরকার। কিন্তু শুয়ে-বসে থেকে মনের উদ্বেগ যাবে না। বাতাসে ভাসছি, চেষ্টা-চরিত্র করে মাটিতে পা রাখবার একটা ব্যবস্থা করি—সেই সময় এসে দু-চার দিন থেকে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেব।

মমতা জেদ ধরে বসল : রাত্রে একরকম উপোস গেছে। একবেলাটা অন্তত খেয়ে যাবে। তাছাড়া বাচ্চারও কষ্ট হবে। কোথায় নিয়ে তুলবে—চান-খাওয়া ঠিকমতো হয় কি না হয়—

এতই দরদ তবু তো বড়দির মুখ দিয়ে এমন কথাটা বেরুল না, রেখে যাও বাচ্চাকে কয়েকটা দিন। একফোঁটা মেয়ে কতই বা তোমাদের খাবে! না হয় মূল্য ধরে দিতাম।

যাই হোক, প্রস্তাবটা মন্দের ভাল, সন্দেহ কি! দুপুরের ভোজও এখান থেকে চুকিয়ে গেলে সারাদিনের মতো নিশ্চিন্ত। এবং কুমকুমের হাঙ্গামাও পুরো একটা বেলা কাটিয়ে যাওয়া যাবে।

কুটুম্বর আপ্যায়নে সুনীলকান্তি নিজে বাজার করে আনল। গাঁয়ের মানুষ শিশির, খায়-দায় ভালো—মেসের ঠাকুরের ঘাট খেয়ে এই ক'দিনেই অরুচি হয়ে গেছে, কুটুম্বের বাড়ি আজ মুখ বদলানো যাবে। সিগারেট ধরিয়ে সুনীলকান্তি তক্তপোষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বলে, তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যেও। রোজই তো কলকাতা যাই, মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারবে।

শিশির বলে, পাকা ঠিকানা কোথায় পাব বড়দা। তবে আর বলছি কি! মেসে
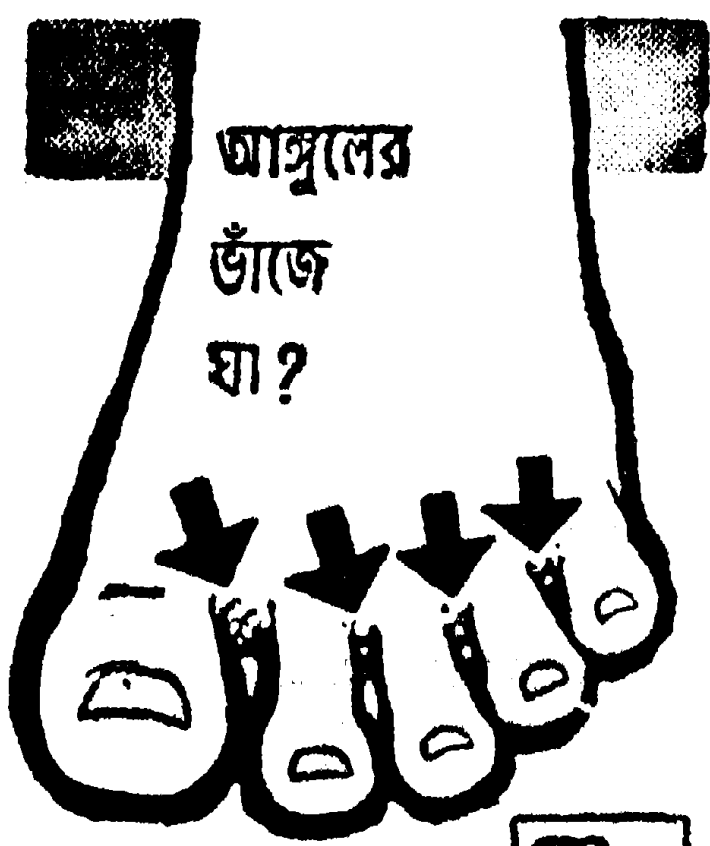
ছিলাম আর একজনের বন্ধু হয়ে। তা আমায় যা-হোক করে সহ্য করত, কুমকুমকে সহ্য করল না। বাচ্চা থাকলে ওদের পাশায় আড্ডায় অসুবিধে হয়।

সকরুণ নিঃশ্বাস ফেলে ঃ কপাল ঠুকে আবার পথে বেরিয়েছি। যত বিপদ ঐ বাচ্চা নিয়ে। খালি হাত-পা হলে ভাবনাটা কি ছিল আমার!

এহেন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতেও সুনীল-কান্তি বুঝে উঠতে পারে না। বাজারে মাছের বড় আকাল, সর্ষের তেল একেবারে মিলছে না, এইসব দুঃখ তোলে।

শিশির নিজের কথা বলে চলেছে, কেউ কিছু না বললেও, মেসে অবশ্য থাকা চলত না। পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমরা হট্টগোল সইতে পারিনে। বাসা করবই— আজ হোক আর দু'দিন পরে হোক। চাকরি একটা হবো-হবো করছে—ভেবেছিলাম চাকরিতে ঢুকে ঘোরাঘুরির দায়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় উঠব। সেইটে হলে ভাল হত। ঠান্ডা প্রকৃতির বিশ্বাসী একটা মেয়েলোকের খোঁজ রাখবেন তো বাসার জন্য। কুমকুমকে যত্নআত্তি করবে, সংসারের সমস্ত ভার নিয়ে নেবে। ভুলবেন না বড়দা।

চাকরির কথায় মুচকি হেসে সুনীল-কান্তি বলে, হবো-হবো বুঝি চাকরি—নিয়ে নেবার অপেক্ষা? আছ তোমরা বেশ।

শিশির নিঃসংশয় কণ্ঠে বলে, দাম-কাকা স্বয়ং মুরুব্বি। এস. সি. দাম—রিহ্যাবিলিটে-শন অফিসার। কণ্ট্রাক্টের লোভে বহু কোম্পানী এসে তেল দেয়। ও'র কথায় যে-না-সেই চাকরি দেবে। মফঃস্বলে পড়েছিলাম বলে গড়িমসি হয়েছে—নইলে কবে হয়ে যেত। এবারে আর অজুহাত নেই। অফিসেও ক'দিন গিয়েছি। বড্ড ব্যস্ত থাকেন, মানুষ-জনের আসা-যাওয়া—ভাল করে দুটো কথাই বলা যায় না। রবিবারে আজ বাড়ি আছেন —ভাবছি, শিয়ালদা নেমে সোজা তাঁর বাড়ি চলে যাবো।

দেখতে পাবে আলমারিতে সারি সারি চাকরি সাজিয়ে রেখেছেন। বাড়ি গেলে পছন্দ করে নির্ঘাৎ একটা নিয়ে আসতে পারবে।

হেসে ওঠে সুনীলকান্তি। হাসতে হাসতে বলে, পাড়াগাঁয়ের সরল বুদ্ধির মানুষ—হিংসা হয় তোমাদের দেখে। দুনিয়া যদি এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিত!

শিশির দৃকপাত করে না ঃ চাকরি দাম-কাকা দেবেনই। আচ্ছা, দেখবেন। চাকরি দেবেন কি আমাকে—যে-বাবার ছেলে আমি, তাঁরই নামে দিতে হবে। মেয়ে নিয়ে বিপাকে পড়েছি, কোনখানে রাখবার জায়গা পাচ্ছিনে, চাকরি না পেয়ে বাসা করি কোন্ ভরসায় - এ-সমস্ত অনেক বলেছি, পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না বোধহয়। কলকাতায় বরাবর একলা এসেই তো দেখা-সাক্ষাৎ করি —ভাবছেন, এবারো তাই। তাই ভাবছি কুম-কুমকে নিয়ে তুলব আজ দাম-কাকার বাড়ি, চাক্ষুষ দেখিয়ে মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করে আসব।

স্টেশন অবধি রিক্সায় যাবে। ভোলা স্টেশনে গিয়ে রিক্সা নিয়ে এলো। খাইয়ে-দাইয়ে কুমকুমকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, কাঁচা ঘুমে জাগিয়ে তুলে উর্মি রিক্সায় বাপের কোলে বসিয়ে দিল।

শিশিরের চোখে পলক পড়ে না ঃ বাইরে আসুন ও বড়দি, একবারটি এসে দেখে যান। দেখুন, কী কান্ড! আমার এই অস্থিত-পঞ্চক অবস্থা—আর ইনি কোন লাটসাহেবের কন্যে, এমনিভাবে সাজানো হয়েছে। চলেছি চাকরির দরবারে—দরবারটা হল, চাকরির অভাবে বাচ্চা মেয়ের বিষম কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই কুমকুম কোন পুরুষে যে কষ্ট পেয়েছে, কে মানবে। উল্টো ফল হবে বড়দি।

কপালের টিপ মুছে আঁচড়ানো চুল ছড়িয়ে দিল।

খবরদার!—গর্জন উঠল। গর্জন করতে গিয়ে হেসে ফেলে মমতা ঃ দেখ ভাই, আমার ঠাকুরঝির কান্ড। আকুলি-বিকুলি করছে-- ছটফট করছে কাটা কবুতরের মতো। যত্ন করে সাজিয়েছে, সাজ ভেঙো না মেয়ের।

শিশির বলে, হ্যাংলা ভাব একটা দেখাতেই হবে দাম-কাকার সামনে। আচ্ছা, চোখের উপর কিছু করব না। ট্রেনের মধ্যে হতে পারবে। গায়ে এমন চকচকে জামা চলবে না তো—আসার সময় যেটা গায়ে ছিল, দিব্যি সেটা ময়লা হয়ে আছে। যাকগে, এখানে কিছু নয়, অঢেল সময় আছে, ট্রেনের কামরায় নতুন করে সাজানো যাবে। সেই আমাদের পাড়াগাঁয়ের আদি-অকৃত্রিম সাজ।

ছুটির দিন বলে সতীশ দাম মাছ ধরতে গেছেন কোথা। সন্ধ্যায় ফিরবেন। সেই অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কুমকুম আবার নিজ মূর্তি ধরেছে কলকাতায় এসে। মুখে ছিপি এঁটে রাখো টফি দিয়ে—খোলা পেলেই কান্না। কান্না, কান্না, কান্না। এহেন কন্যা নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি তোলপাড় করা যায় না—সারা বিকাল এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরেছে। বসেছে হয়তো কোন বাড়ির রোয়াকের উপর। সেই বাউণ্ডুলে অবস্থা।

পথে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছে, যদি দৈবাৎ মামা অবিনাশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সংসারে কত অভাবনীয়ই তো ঘটে। মামা না-ই হলেন, মামার গাঁয়ের কোন একজন— মামার কোন শাকরেদ ঃ আরে আরে, শিশির না? শিশির তুমি এখানে—মামা-মামী তোমার জন্যে উতলা। মেয়ে হবার কথা জেনে চিঠি লিখেছিলেন—মেয়ে নিয়ে কলকাতায় ভেসেছ, তা-ও জানেন ও'রা। গাইগরু পুষেছেন এই মেয়ে দুধ খাবে বলে, নতুন কলোনীতে আলাদা একটা ঘরও বানিয়ে রেখেছেন।

কিছুই হয় না। তেমনি কপাল কিনা শিশিরের!

মেয়ে ঘাড়ে করে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে এ-পথে সে-পথে ঘুরছে। আর চোখের জলে বারম্বার ডাকছে মামাকে। সংকটে পড়ে মানুষ যেমন ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকে। সেই মামা তো ঈশ্বরই—আশৈশব যতটুকু তাঁর দেখা আছে, আর যতদূর শুনেছে তাঁর সম্পর্কে। স্বাধীনতার জন্য জীবনভোর লড়লেন, তারপর যেদিন সেই বস্তু এসে গেল, অদৃশ্য গলিঘুঁজির জগৎ থেকে পিলপিল করে কারা সব বেরিয়ে এসে

মসনদে কর্তা হয়ে উঠে পড়ল। তাদের স্বদেশপ্রেমে সভাক্ষেত্র সরগরম, তাদের ছবি আর বিবৃতির ভিড়ে খবরের-কাগজে তোমাদের জন্য দু' ছত্র জায়গা হয় না। অন্তিম ক্ষণে নিজের ভিটের উপর আত্মজনের মধ্যে শেষনিশ্বাস মোচন করবে, সেটুকু সম্বলও ঘুচিয়ে দিল স্বাধীনতা এসে। হারো না যে মামা, চিরকাল গরব করে এসেছ?

কে যেন সেই মামারই কণ্ঠে বুকের ভিতর থেকে বলে ওঠে, প্রতাপের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি, প্রতারণার সঙ্গে পারিনি বটে! রাজত্বলিপ্সু অধৈর্য অদূরদর্শী যাদের একদা নেতার মালা দিয়েছিলাম, কিম্বা পতিত জায়গা-জমির কাগজে-কলমে মালিক বলে যে লোকটাকে তোয়াজ করতে গিয়েছিলাম,—রেহাই কেউই করল না, নিজ নিজ মুনাফার মওকা খুঁজেছে আমাদের মূল্যে। তা বলে হারজিতের কথা এরই মধ্যে আসে কি করে? দেশের অদৃষ্টে অনেক দুর্দৈব —আদর্শ ও আত্মমর্যাদা নিভে গেলে যে-অন্ধকার ধেয়ে আসে, তাই।

দাম-কাকা কতক্ষণে ফেরেন সেই হল কথা। তারপরে রাত্রিবাসের ভাবনা। মেস থেকে তাড়াল সর্বনাশী হতভাগী মেয়েটার কারণে। রয়েল বেঙ্গল হোটেল কোন্ মুলুকে, তাই এবার খুঁজে বের করো। তারা জবাব দিলে স্টেশন ছাড়া গতি নেই।

ফিরলেন অবশেষে সতীশ দাম। অতিশয় ক্লান্ত, তাহলেও শিশিরকে দেখে সমাদরে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালেন। একদিক দিয়ে কিন্তু ভালো হয়েছে—সাজিয়ে-গুজিয়ে কুমকুমকে উর্মি চকচকে ঝকঝকে করে দিয়েছিল, বেলাভর ঘোরাঘুরির ফলে সেই মেয়ের মনে হবে পঞ্চাশ বছর গায়ে তেল পড়েনি, একশ বছর পেটে অন্ন যায়নি—পুরোপুরি একটি ঝোড়ো-কাক। ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কিছু প্রয়োজন হল না। খুব আদর-যত্ন করলেন দামসাহেব—বাবুর্চিকে ডেকে পুডিং আনালেন কুমকুমের জন্য, ধরে ধরে খাইয়ে দিল সে। চায়ের নাম করে শিশিরকেও প্রচুর খাওয়ালেন। এবং বড় একটা কেক সঙ্গে দিয়ে দিলেন মেয়ের জন্য। কাজের কথাবার্তাও হল। দুটো দিন বড় ব্যস্ত—এই দু' দিন বাদ দিয়ে বুধবারে অফিসে এসো তুমি।

কথাবার্তা দস্তুরমতো আশাপ্রদ। শিশিরের কষ্টে দামসাহেব বিচলিত মনে হল। ঠিক এই জিনিষটাই চেয়েছিল সে। মেয়ের জন্য উৎপাত অশান্তির সীমা নেই, তবে চাকরির দিক দিয়ে খানিকটা সুবিধা করে দিল বটে! এ-সমস্ত ভালো, রাত্রিবাসের চিন্তা এইবারে। খোঁজ করো কোন্ অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল হোটেল—শিয়ালদার কোন্-দিকে।

হোটেল-ম্যানেজারকে অমিতাভর চিঠি দিল। ম্যানেজার বলে, মুশকিলে ফেললেন। ঘর একটাও খালি নেই। একলা হতেন, দোতলার হলে একস্ট্রা তক্তাপোষ ঢুকিয়ে দিতাম একটা। মেয়ে ঘাড়ে করে এসেছেন, সে তো হবার জো নেই।

চিঠিতে অমিতাভ অধিকন্তু সুপারিশ করেছে হোটেল চার্জের বিষয়ে কিছু কনসেশন করতে। চুলোয় যাক সে-কথা—মোটেই মা রাঁধে না তার তপ্ত আর পান্তা! শিশির বলে, অমিতাভবাবু তো শতকণ্ঠে আপনার প্রশংসা করেন—কলকাতা শহরে হোটেলের অন্ত নেই, ম্যানেজারও অগুন্তি। কিন্তু সুশিক্ষিত হৃদয়বান ম্যানেজার আপনি একমাত্র—দ্বিতীয়জন মিলবে না। মেঘ থমথম করে, বৃষ্টি নামবে হয়তো এখনি। এই অবস্থায় কোথায় যাই বলুন—বাচ্চা তাহলে বেঘোরে মারা পড়বে।

ইত্যাদি আমড়াগাছি অন্তে ম্যানেজার, দেখা গেল, চিন্তা করছে। ভেবেচিন্তে বলে, আমি ঐ ছোট কামরায় থাকি, ওখানেই থাকুন আজ রাত্রের মতো। বারান্দায় দরোয়ানের খাটিয়ায় কোনরকমে আমি কাটিয়ে দেবো। হোক তাই, কী করা যাবে! কাল তিনতলায় একটা ঘর খালি হবার কথা আছে। না হলেও, কী ব্যবস্থা করা যায়, দিনমানে ধীরেসুস্থে ভেবে দেখা যাবে। সকালবেলা এই ম্যানেজারের ভিন্ন মূর্তি, চড়া মেজাজ, ঝাঁজের সঙ্গে বলল, ঘর-টর খালি হবে না মশায়।

শিশির করুণ কণ্ঠে বলে, তাহলে উপায়? আপনি আরো কী সব ভেবে দেখবেন বলেছিলেন।

ভেবেছি। রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে উঠে বারদশেক ভাবা হয়েছে অন্ততঃ। অন্যত্র জায়গা দেখুন আপনি, রয়েল বেঙ্গলে সুবিধা হবে না। ঘরের মধ্যে দুয়োর এঁটে শুয়েছেন মশায়, আমি তিন হাত দূরে বাইরের বারান্দায়—কান্নার গুঁতোয় আমাকেও মুহুর্মুহু ঘুম ভেঙে উঠে বসতে হয়েছে। তেতলার ঘর খালিও যদি হয়, আপনাকে সে-ঘর দিতে পারব না। সাফ কথা।

কুমকুমকে দেখিয়ে বলে, একফোঁটা তো মেয়ে—কান্না শিখেছে বটে! দমে কেমন করে কুলোয় কে জানে। এই মাল যতক্ষণ আছে, হোটেলে আপনাকে রাখতে পারব না মশায়। একটা লোকও তাহলে থাকবে না, হোটেল উঠে যাবে। এক্ষুনি অবিশ্যি যেতে বলছি নে। সবাই কাজেকর্মে বেরিয়ে যাবে, এখন ততটা ভয় করিনে। ইচ্ছে হলে পুরো দিনমানটাই থেকে যেতে পারেন। কিন্তু রাত্রিবেলা, ওরে বাবা! রাত্রের আগেই দয়া করে অব্যাহতি দিতে হবে।

জজের মতন রায় দিয়ে ম্যানেজার মাথা ঝুঁকে একটা হিসাব নিয়ে পড়ল। সকাতরে শিশির চেয়েই আছে, ঘাড় তুলে তাকায় না। তারপর হঠাৎ উঠে কোন কাজে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। অর্থাৎ রায় যা দিয়েছে, কোনরকম আপীল তার উপরে চলবে না।

বিকেলবেলা শিশির জামা-জুতো পরে মেয়ে আবার কাঁধে তুলল। অফিসে হিসাব মিটিয়ে দিতে গেছে। চলে যাচ্ছে বলেই বোধহয় ম্যানেজারের নরম সুর। বলে, মালের বন্দোবস্ত করে একলা চলে আসুন, আপনার মতন ভদ্রলোককে মাথায় করে রাখব, বন্দোবস্ত একটা করতেই হবে—সর্বক্ষণ মেয়ে সামলাবেন তো চাকরি-বাকরি করবেন কখন? আবার তা-ও বলি, বন্দোবস্ত বড় সহজে হবে না। পয়সাকড়ি দিয়ে লোক রাখলেন—চেল্লাচেল্লিতে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে কোন সময় হয়তো গলা টিপে ধরবে। (বাপ হয়ে আমারই হাত নিশপিশ করে, মাইনের লোকে গলা টিপবে কত বড় কথা!) এক হতে পারে যদি বিয়ে করেন। তাই করে ফেলুন—

মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার জোর দিয়ে বলে, এছাড়া উপায় দেখিনে মশায়। মাইনের ঝি দিয়ে হবে না—এত ধকল সাত-পাক-ঘোরা বউ-ই নেবে শুধু। আপনার অবস্থা দেখে মনটা বড় খারাপ হল, সারারাত খালি ভেবেছি। বাজারে সব জিনিস অমিল, বিয়ের কনে কেবল ব্লাকে যায়নি—যত খুশি পাওয়া যায়। আপনার এইটুকু বয়সে আজকাল তো একটা বিয়েই হয় না—বাহাদুর লোক আপনি, এরই মধ্যে এক পাট সংসারধর্ম চুকিয়ে-বুকিয়ে এসেছেন। তা একেবারেই হাল ছাড়বেন কেন, দেখুন আমার একটা চান্স নিয়ে—

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

মেয়েরা জ্যুডো বিদ্যায়

হার্টফোর্ডশায়ারের (ইংলন্ড) কুইন-সউড গার্লস স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যে কোন স্কুলের ছেলে, এমনকি বয়স্ক লোকও সৌজন্যমূলক আচরণ করলেই ভালো করবে। তা যদি না করে তাহলে সেই সতেরো বছরের স্কুলের ছাত্রটির ভাগ্যে যা ঘটেছিল তাই ঘটতে পারে। এই সতেরো বছরের ছেলেটি তার চেয়ে এক বছরের ছোট কুইনসউড গার্লস স্কুলের একটি মেয়ের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছিল। কী ঘটছে তা বোঝবার আগেই ছেলেটি দেহের কয়েক জায়গায় আঘাত পেয়ে ঘুরপাক খেয়ে মেঝের ওপর ছিটকে পড়ল।

সে বেচারা জানত না যে সে যাকে বিরক্ত করেছে সেই মেয়েটি জ্যুডো বিদ্যায় পটু।

জ্যুডো কুইনসউড গার্লস স্কুলের ৪০০ জন ছাত্রীর জন্যে একটি আবশ্যিক বিষয়। চার বছর আগে হেড মিসট্রেস এডমা এসাম এটি স্কুলে চালু করেন। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রীরা তাই এ-বিদ্যায় বেশ পটু হয়ে উঠেছে।

মিস এসাম একজন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটও। তিনি বলেন : "ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ারে বসলে জীবনের অনেক অপ্রীতিকর দিক সম্বন্ধে জানা যায়। জানা যায় শিশুদের, বিশেষ করে মেয়েদের, কত রকমের বিপদের মধ্যে পড়তে হয়। আমি চাই মেয়েরা নিজেদের রক্ষা করতে শিখুক। তাছাড়া, যারা মাথার কাজ করে, তাদের পক্ষে জ্যুডো ব্যায়াম ভালো।"

কুইনসউডে যে জ্যুডো শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে কোন অপেশাদারসুলভ হাল্কা ভাব নেই। সত্যিকারের জ্যুডো যা, তাই শেখানো হয় মেয়েদের। মেয়েদের প্রশিক্ষক মিঃ জেমস্ বার্নস একজন খ্যাতনামা জ্যুডোবিদ।

মিঃ বার্নস কয়েকমাস হল শিক্ষাক্রমে জ্যুডোর সঙ্গে ক্যারেট যুক্ত করেছেন।

মিঃ বার্নস-এর আনন্দ এই যে, তাঁর সফল ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে জুডি মুনসন। ছেলেবয়েসে পোলিও রোগে আক্রান্ত হবার ফলে জুডির একটা পা পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু সে এখন ঘোড়া চড়ায়, সাঁতারে ও টেনিসে পারদর্শী এবং সর্বোপরি ক্যারেটে প্রথম।

মাত্র দুমাসের চেষ্টায় জুডি এখন দু ইঞ্চি পুরু কাঠের ব্লক ঘুষিতে বা কনুই-এর ধাক্কায় চুরমার করে দিতে পারে, বলেন মিঃ বার্নস। তিনি বলেন, "এই বিদ্যায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম যোগ্য হওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা এই বিদ্যায় গায়ের জোর নয়, কৌশলই আসল।"

জুডি নিজে বলে তার বাবা-মা প্রথমে তার ক্যারেট শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন না। কিন্তু এখন সে যে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ, সেজন্য তাঁরা আনন্দিত।

জুডি বলে, "যদি কেউ আমাকে আক্রমণ করে, তাহলে আমি ক্যারেট বিদ্যা প্রয়োগ করতে পিছপাও হব না। কেউ যদি তার হ্যান্ডব্যাগ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে, তাহলে সে উচিত শিক্ষাই পাবে।"

জ্যুডো আবশ্যিক বিষয়, ক্যারেট কিন্তু তা নয়। নৌকাচালনা, পর্বতারোহণ প্রভৃতি যে ১৪টি বিষয়ের মধ্যে কুইনসউডের মেয়েদের বেছে নিতে হয়, ক্যারেট তাদের মধ্যে একটি।

সেলাইয়ের কথা

(১৩)

কামিজ (লেডিস্ শার্ট)

এই জামাটি পাঞ্জাবী মেয়েদের জাতীয় পোষাক, তবে আজকাল বাঙালী মেয়েদের মধ্যে এই জামার খুবই প্রচলন হয়েছে, কমবয়সী বাঙালী মেয়েদের এই কামিজ ও সালোয়ার পরা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাপ :—

ছাতি—২৬"
ঝুল—২৯"
সেস্থ—১০"
পুট—১১"
হাতা—১৩"
মুহুরী—৫"

ফরমুলা :—

১— ৪=ছাতির ¼—½"
১— ২=ঝুল+½"
১— ৩=সেস্থ+½"
১— ৫=পুটের ½+½"
১—১৭=½" (অথবা রুচি অনুযায়ী)
১— ৬=ছাতির ১/১২
১—৮=ছাতির ১/১২+½"
৫—১৪=½"
১৪—১৮=১৪—১৯ এর অর্ধেক
৯—১৮=½"
১৫—১৯=১½"
৪—১০=ছাতির ¼×১½"
৩—১১=৪—১০ এর ½" কম
২—১৩=৪—১০ এর ২" বেশী
৭—১৬=২—১৩
২—১৬=২" মুড়বার জন্যে
১৩—১২=ঝুলের ½ ভাগ

প্লিট :—

৩—১. এর ½" সেলাইয়ের জন্যে বাদ দিয়ে সমান ভাগে ২টো প্লিট হবে। দু পাশে ½" করে ও ওপরে ও নীচে ৩" করে প্লিট মোড়া হবে।
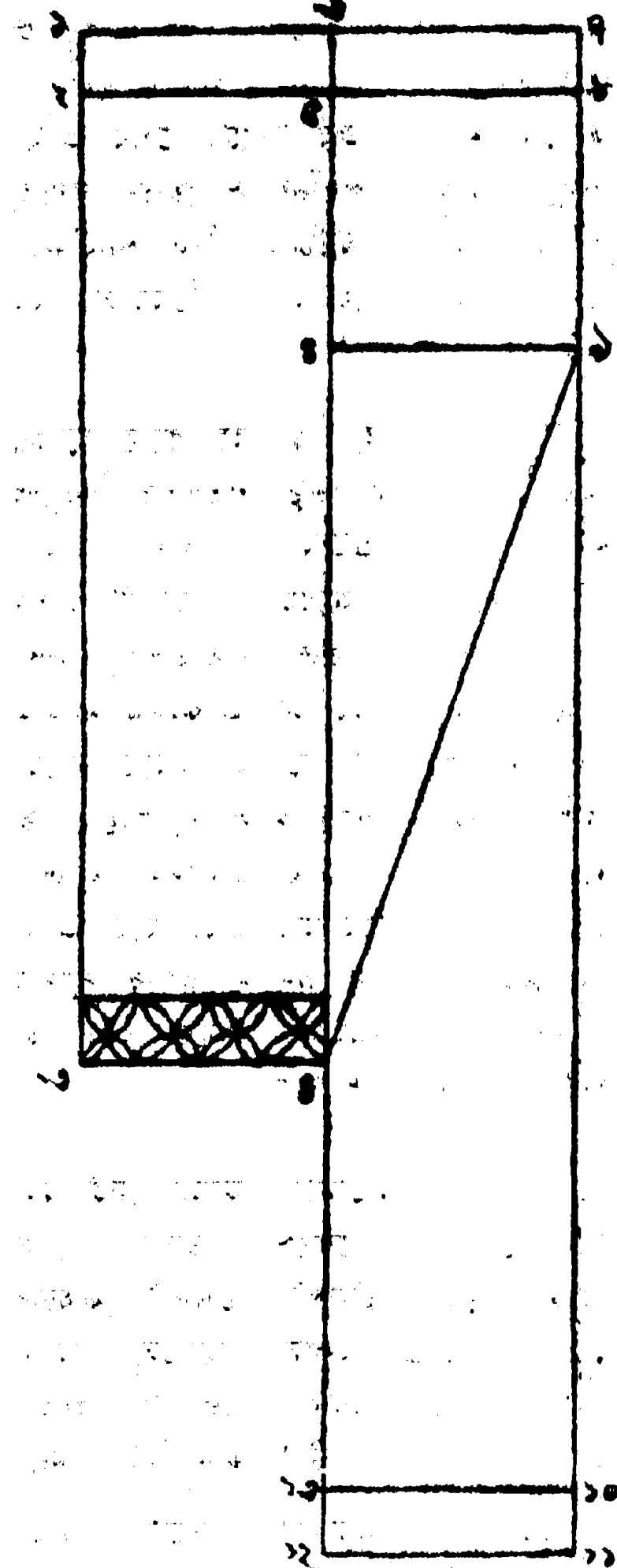
হাতা :—

১— ২=ঝুল+½"
১— ৩=ছাতির ¼—½"
১— ৪=১—৩ এর অর্ধেক
১—১১=১—৪ এর অর্ধেক
১— ৯=৯—১০=১০—৩
=১—৩ এর ⅓ ভাগ করে
৩— ৫=১—৪
২— ৭=১½" মুড়বার জন্য
২— ৬=৪—৫ এর ½" কম
৭— ৮=২—৬ এর ½" বেশী

আর এক রকম কুলহাতা

কুলহাতা :—

১—৯=ছাতির ¼—½"
(ছোট হাতা হলে—½" হবে)।
১—২=ছাতির ১/১২+২ পয়েন্ট
৮—৯=১—২
১—৯=৮=২
৮—৯ যোগ করে দিতে হবে।
৮—৯ লাইনকে সমান ৩ ভাগ করতে হবে, তারপর ছবি অনুযায়ী সেপ করতে হবে।
১—৩=হাতের পুরো ঝুল—২"
(কাফের জন্যে)
৩—৭=২—৮ এর ½" কম।
৮ ও ৭ যোগ করতে হবে।
৪—৭ ও ৬—৫=মুহুরীর ½+½"
(সেলাইয়ের জন্যে)
৪—৫ ও ৫—৬=২" বা ২½" কাফের লম্বা।

"কল্পনা"

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

(শাশ্বত সাহিত্য কি, এই প্রশ্ন আমার এক বন্ধু করেছিলেন।)

১৮৬৪ সালের অক্টোবরে এক প্রচন্ড ঘূর্ণিবায়ু ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে প্রচুর ক্ষতি করেছিল। একটি ইউ-রোপীয়ানের লেখা সম্ভবত গত শতাব্দীতে প্রথম প্রকাশিত একটি পাক-প্রণালীতে এ নিয়ে আক্ষেপ করে লেখা হয়েছিল, এর ফলে সবচেয়ে ভাল চালের দাম বেড়ে গিয়েছিল। চালের দাম এত বেড়েছিল যে টাকায় ন সেরের বেশি তা পাওয়া যেত না। গরীব লোকদেরও বেজায় কষ্ট গিয়েছিল সেবার। মোটা চালও টাকায় পঁচিশ-ত্রিশ সেরের বেশি পাওয়া যেত না।

এসমস্ত কথা পড়তে পড়তে মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। মনে হয়, যদি—যদি কখনো সেই যুগে ফিরে যেতে পারতাম। তাহলে আজকের এই দৈনন্দিন বেঁচে থাকার ঝামেলা থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যেত। ভাতের অভাবে কাউকে মরতে হত না। ভাতের জন্য লোকের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হত না।

অবশ্য এও জানি, কথাটা মোটেই সত্যি নয়। তখনকার আমলে একটি টাকা আয় করা যতখানি কঠিন ছিল, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। অতএব প্রাচীনকালের যুগ আজ শস্তা মনে হয় মাত্র। তখনকার আমলে তা মোটেই শস্তা ছিল না। এবং টাকা দিলেই যে সমস্ত অফুরন্ত পাওয়া যেত তাও নয়। এই ভারতবর্ষে বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে। শস্তার ভারত-বর্ষেও দুর্ভিক্ষ হয়েছে। কেউ হয়ত টাকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু খাদ্য তাদেরও জোটেনি। সত্যি কথাটা এই যে বেঁচে থাকা সর্বযুগে এবং সর্বকালেই একটা সমস্যা ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও। সাহিত্যও তাই। খাদ্য যেমন মানুষের প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজন সাহিত্যেরও।

কিন্তু তবু বার বার ঐ দামগুলির দিকে চোখ পড়ে। মুগ্ধ হয়ে যাই। কাগজের উপর কয়েকটি কালো কালো অক্ষর, যার মধ্যে কোন কবিতা নেই, রস নেই, সেগুলোকে দেখে হৃদয়টা লাফিয়ে ওঠে। কিছুতেই হৃদয়কে শান্ত করতে পারি না। একে নিশ্চয় সাহিত্য বলা চলে। কিংবা হয়ত বলা চলে এ সাহিত্যেরও বড়। এই পাক-প্রণালীটির নানা স্থানে এই 'শস্তা' জিনিসের নমুনা দেওয়া আছে। তখনকার কোলকাতার সেরা বাজারের কিছু বাজারদরও এখানে দেওয়া হল। জিনিস শস্তা হলেও সাহিত্যে, আমার ধারণা, এর মূল্য অসাধারণ।

পেঁয়াজ	সের —	৩ থেকে ৮ পয়সা
হলদি	সের —	৩ থেকে ৫ আনা
রসুন	সের —	২ থেকে ৩ আনা
আদা	সের —	২ থেকে ৪ আনা
শুকনো লংকা	সের —	৩ থেকে ৫ আনা
ধনে	সের —	৩ থেকে ৪ আনা
জিরে	সের —	৫ থেকে ৬ আনা
গোলমরিচ	সের —	৫ থেকে ৬ আনা

এই বইতে আরো লেখা আছে, 'এই দাম-গুলি যতই বেশি মনে হক না কেন, এক টাকার মসলা কিনলেই ছজন লোকের এক মাস ভালভাবে যাবে।'

এক টাকার মসলা কিনলে ছজন লোকের এক মাস চলে যাবে। এরকম সুন্দর কথা আমার ভাল লাগে। কোনো সাহিত্যে বা কোনো কাব্যে এর তুলনীয় আর কিছু আছে কি?

কিন্তু কেবল হিসেবের খাতায় কতক-গুলি মসলার দাম থেকে অনেক কিছু কল্পনা করা সকলের পক্ষে হয়ত সম্ভব নয়। তাঁদের জন্য পাক-প্রণালী থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া যাক্ :

'দুসের ডুমো ডুমো করে কাটা মাংস এক পোয়া টক দই বাটা পেঁয়াজ এবং লঙ্কার সঙ্গে মেখে রেখে দিন। সঙ্গে রসুন এবং আধ পোয়া ঘি দিন।...'

এই বইতে এরকম আশ্চর্য জায়গা রয়েছে পাতায় পাতায়। লেখাটা প্রাচীন বটে, কিন্তু আজও এর রস পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। ক্ল্যাসিক সাহিত্য তাকেই বলে যা চিরকাল বেঁচে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই লেখা কখনো পুরনো হবে না। শস্তার যুগেই হক, দামি যুগেই হক তাতে কিছু অসুবিধে হবার কথা নয়। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন মানুষ আনন্দ পাবে......দুসের ডুমো করে কাটা মাংস........।

আমার বন্ধু আমার কাছ থেকে শাশ্বত সাহিত্যের সংজ্ঞা চেয়েছিলেন। তাঁরই উপকারার্থে আমি এই প্রবন্ধটি লিখেছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি এরপর থেকে আমার বিরুদ্ধে লেগেছেন, এবং আমি যে রাম মূর্খ একথাটা সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আমার চিন্তা-ধারায় যে মোটেই মূর্খামির পরিচয় নেই সেটা আমি আশা করি রসিক পাঠকদের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি।

এশিয়ার গল্প ॥ এক

আমার নতুন কাকা

চু ইয়ো সুপ

আমার বয়স ছ'বছর। নাম ওক-হি। মাত্র দুজনের পরিবার আমাদের—আমার মা আর আমি। না, ভুল হল একটু হিসেবে। আরও একজন আছে, আমার কাকা। স্কুলে পড়ে। বাড়িতে প্রায় থাকেই না; সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে। কখনো কখনো সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখতে পাই না তাকে। তাই মাঝে মাঝে ভুল যাই তার কথা। আবার মায়ের বয়স চব্বিশ, বিধবা। খুব সুন্দর দেখতে, পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সুন্দরী।

ঠাকুরমার কাছে শুনেছি, আমার জন্মের এক মাস আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিল, বিয়ের এক বছর পরে। বাবা এখানেই শিক্ষকতা করতেন; সুতরাং এখানেই ঠাকুরমার বাড়ির পাশেই বাড়ি কিনেছিলেন। বিয়ের পরে বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন এ বাড়িতেই থাকতেন। বাবাকে না দেখলেও তার ছবি দেখেছি আমি। বেশ ভাল ছিলেন দেখতে।

ঠিক ঠিক হিসেব করলে আমাদের পরিবার দুজনেরই। কিন্তু যেহেতু ঘর একটা খালি পড়েছিল এবং টুকিটাকি কাজ করবার জন্যে একজন কাউকে দরকার অতএব আমার কাকাকে এনে রাখা হল আমাদের সঙ্গে।

মা বলেছিল এই বসন্তেই কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করিয়ে দেবে আমাকে। শুনে খুব আনন্দ হল আমার। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি আমার বড়কাকা (অর্থাৎ যে কাকা আমাদের সঙ্গে থাকে তার বড় ভাই) একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে আছেন বাইরের ঘরে। আমাকে ডেকে ভদ্রলোককে নমস্কার করতে বললেন বড়কাকা। আমি লজ্জা পেলাম একটু। ভদ্রলোক বড়কাকাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার ভাইর মেয়ে', বললেন বড়কাকা

'এসো, এখানে এসো', ভদ্রলোক ডাকলেন আমাকে, 'তোমার চোখ দুটো কিন্তু ঠিক তোমার বাবার মত।'

'ওক-হি', ডাকলেন বড়কাকা 'এসো, লজ্জা কিসের, তুমি ত বড় হয়ে গেছ এখন। এসো নমস্কার কর এঁকে। তোমার বাবার বন্ধু ইনি। এই ঘরে থাকবেন এখন থেকে।'

ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে থাকবেন শুনে আমার খুব আনন্দ হল। কাছে গিয়ে খুব ভদ্রভাবে নমস্কার করলাম তাঁকে আর তারপরেই ছুটে পালিয়ে গেলাম বাগানে।

এই নতুন কাকার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় আমার। আমাকে খুব স্নেহ করতেন তিনি। গ্রামের বয়স্ক লোকদের

কাছেই শুনেছিলাম তিনি আমার বাবার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অনেক দূরে কোথায় যেন পড়াশুনো করেছেন। এখানকার স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে এসেছেন এখন। গ্রামে কোন হোটেল নেই যে থাকবেন। অতএব এখানকারই কেউ একজন আমাদের বাড়ির কথা বলেছে তাঁকে।

অনেক ছবির বই ছিল নতুন কাকার কাছে। ওঁর ঘরে গেলেই আমাকে তুলে নিয়ে কোলে বসাতেন তিনি এবং ছবি দেখাতেন। কোন কোন দিন মিষ্টি দিতেন খেতে। একদিন দুপুরবেলা খেয়ে উঠে ওঁর ঘরে গেছি, দেখি উনি তখনো খাচ্ছেন। আমি বসে বসে ওঁর খাওয়া দেখছি; জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাত ছাড়া আর কি খেতে সবচেয়ে ভালবাসো তুমি?'

'ডিম, তুমি?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমিও তাই', হেসে বললেন নতুন কাকা।

ডিম ভালবাসি শুনে একটা সেদ্ধ ডিম দিলেন আমাকে। খেতে খেতে বললাম, 'মাকে বলব যে তুমি ডিম খেতে ভালবাসো।'

'না, না, বলতে হবে না। কক্ষনো বলো না কিন্তু, কেমন?' বললেন তিনি।

আমি তাঁর নিষেধ শুনিনি। বলে দিয়েছিলাম মাকে। বলে ভালই করেছিলাম। কেননা, সেদিন থেকে মা আরও বেশি করে ডিম রাখতে শুরু করেছিল।

ইতিমধ্যে আমি কিণ্ডারগার্টেনে যেতে শুরু করেছি। নাচতে শিখেছি, গান গাইতে শিখেছি। আমার শিক্ষয়িত্রী খুব চমৎকার অর্গান বাজাতে পারেন। কিণ্ডারগার্টেনের অর্গানটা গীর্জার অর্গানের চেয়ে অবশ্য অনেক ছোট কিন্তু আওয়াজটা ভারি চমৎকার। আমাদের ওপরের ঘরেও অর্গানের মতই একটা কি যেন আছে দেখেছি। আগে বুঝতে পারিনি, পরে মাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে ওটাও অর্গানই।

অর্গানটা কখনো বাজাতে দেখিনি মাকে। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'মা তুমি অর্গান বাজাতে পার?'

তক্ষুনি কোন উত্তর দিল না মা। একটু চুপ করে থেকে বলল 'তোমার বাবা কিনেছিলেন এই অর্গানটা। তখন আমি সারাদিনই বাজাতাম। কিন্তু তিনি চলে যাবার পর আর ছুঁইনি।'

দেখলাম মা-র চোখ ছল-ছল করে উঠল। আমি অমনি মিষ্টি খাবার আব্দার ধরলাম। আমাকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে এল মা।

নতুন কাকার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে খুব ভাল লাগত আমার। মা কিন্তু বারণ করতেন। বলতেন, সব সময় গিয়ে গিয়ে জ্বালাতন করবে না ওকে।

আমি জ্বালাব কি উনিই নানারকম গল্প করতেন আমার সঙ্গে। আমাদের বাড়িতে আসবার একমাস পরে একদিন আমাকে বললেন, 'তোমার চোখ দুটো তোমার বাবার মত, কিন্তু এমন সুন্দর নাক কোথায় পেলে তুমি? মার কাছ থেকে? আর ঐ সুন্দর ঠোঁট দুটো? তাও মার কাছ থেকে? তোমার মা কি তোমার মতই সুন্দরী নাকি?'

'মাকে দেখনি তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

চুপ করে রইলেন নতুন কাকা। উত্তর দিলেন না।

আমি তাঁর জামার হাত ধরে টানতে শুরু করলাম, 'চলো, মাকে দেখতে যাবে চলো।'

নতুন কাকা গেলেন না। বললেন, 'না আমি ব্যস্ত আছি এখন।'

আসলে মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। থাকলে নিশ্চয়ই বসে বসে গল্প করতেন না আমার সঙ্গে। আমাকে যেতে বলে কাজ করতেন। তা করলেন না; বরঞ্চ আদর করে চুমু খেলেন আমার গালে, আমার কোটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'কে তৈরি করে দিয়েছে কোটটা?......তুমি কি মার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোও নাকি...?'

একটা ব্যাপারে একটু অবাক লাগত আমার। নতুন কাকা আমাকে স্নেহ করতেন খুবই, আদরও করতেন, কিন্তু ছোটকাকা বাড়িতে থাকলে নয়। তখন দেখতাম আর আদরও করতেন না, চুমুও খেতেন না, কোন কিছু জিজ্ঞেসও করতেন না।

সেদিন শনিবার ছিল। বিকেলবেলা নতুন কাকা বললেন, 'চলো, গ্রামের পেছনের পাহাড়টায় বেড়াতে যাই।' আমার আনন্দ আর ধরে না। তক্ষুনি রাজী। নতুন কাকা বললেন, 'যাও, মাকে জিজ্ঞেস করে এসো আগে।' মা আপত্তি করলেন না। মুখ মুছিয়ে চুল আঁচড়ে সাজিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন, 'বেশি দেরী করো না।' বেশ জোরেই বললেন কথাটা। আমার মনে হল নতুন কাকাও শুনতে পেলেন।

আমরা দুজন গিয়ে পাহাড়ে উঠলাম। পাহাড়ের নীচে গ্রাম, রেলস্টেশন। নতুন কাকা শুয়ে রইলেন ঘাসের ওপর আর আমি ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগলাম চারদিকে। ঘাসের পাতা ছিঁড়ে তাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগলাম। ফেরার পথে আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগলেন নতুন কাকা। আমার কিণ্ডারগার্টেনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। শুনলাম, ওদের একজন আর একজনকে বলছে, 'ওর বাবার সঙ্গে বেড়াচ্ছে।' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। নতুন কাকা সত্যি আমার বাবা হলে কি ভালই হতো!— ভাবলাম মনে মনে। বাড়ির গেটের কাছে এসে নতুন কাকাকে হঠাৎ বলেই ফেললাম কথাটা, 'তুমি আমার বাবা হলে খুব ভাল হত।' নতুন কাকার মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'এমন কথা আর কক্ষনো বলো না।'

ভয় পেয়ে এক দৌড়ে আমার ঘরে চলে গেলাম। মা এলেন; জিজ্ঞেস করলেন, 'কদ্দুর গিয়েছিলি রে?' আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। কাঁদতে থাকলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

পরে দিন রোববার। জামা-কাপড় পরে গীর্জায় যাবার জন্যে তৈরি হয়েছি। মার তৈরি হতে তখনো একটু দেরী। ভাবলাম নতুন কাকা এখনো আমার ওপর রেগে আছেন কিনা দেখে আসি। তাঁর ঘরে গিয়ে উঁকি দিতেই নতুন কাকা দেখে ফেললেন আমাকে। হেসে বললেন, 'বাঃ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমাকে। যাচ্ছ কোথায়?'

নতুন কাকাকে হাসতে দেখতে আমার মনটা হাল্কা হল; বললাম, 'মা'র সঙ্গে গীর্জায় যাচ্ছি।'

'গীর্জায়? কোন গীর্জায়?'

'ঐ যে, ঐ কাছের গীর্জাটায়।'

মার ডাক শুনে চলে গেলাম আমি। গীর্জায় প্রথম গান হল, তারপর প্রার্থনা শুরু হল। সবাই যখন মাথা নিচু করে প্রার্থনা করছে তখন হঠাৎ নতুন কাকার কথা মনে হল আমার। নতুন কাকাও কি এসেছেন গীর্জায়? মাথা তুলে তাকাতে লাগলাম চারদিকে। হঠাৎ আনন্দে নেচে উঠল মনটা। ঐ তো নতুন কাকা! কিন্তু নতুন কাকা ত মাথা নিচু করে প্রার্থনা করছেন না, বরঞ্চ মাথা তুলে তাকাচ্ছেন চারদিকে! একটু অবাক লাগল আমার। তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি। নতুন কাকা কিন্তু হাসলেন না। ভাবলাম, বোধ হয় দেখতে পাননি আমাকে; হাত তুলে ইশারা করতে লাগলাম তাঁকে। এবার আমাকে দেখতে পেলেন তিনি আর সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নিচু করে ফেললেন। মার হঠাৎ নজরে পড়ল যে আমি প্রার্থনা করছি না। অমনি আমাকে টেনে বসিয়ে দিলেন তাঁর পাশে। আমি ফিস-ফিস করে বলতে লাগলাম মাকে, 'মা, নতুন কাকা এসেছেন এখানে।'

মার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। সমস্ত প্রার্থনাটাই বিস্বাদ হয়ে গেল সেদিন। যতক্ষণ না সব শেষ হল মা আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন না পর্যন্ত। প্রার্থনা শেষ হলে নতুনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন একবার যেন ভীষণ চটেছেন। নতুন কাকার দিকে তাকালাম; তিনিও হাসলেন না। এমন ভাব করলেন যেন দেখেনইনি আমাদের। নতুন কাকার দিকে আমি যতবার তাকিয়েছি ততবারই মা জোর করে মঞ্চের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন আমার মুখ। আমারও তখন খুব রাগ হয়েছিল; জল এসে গিয়েছিল চোখে। নেহাৎ আমার কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রী আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন তাই কাঁদতে পারিনি।

প্রথম যখন কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি হয়েছিলাম তখন ছোটকাকা রোজ আমাকে সেখানে পৌঁছে দিত এবং ছুটি হলে নিয়ে আসত গিয়ে। কিছুদিন পরে অবশ্য আমি একাই যাতায়াত করতে পারতাম। যখন বাড়ি ফিরতাম, প্রতিদিন মা দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজায়, কোলে করে ভেতরে নিয়ে যেতেন আমাকে। একদিন দেখি মা দরজায় নেই। বোধহয় পাশের বাড়ি গেছেন ঠাকুমার কাছে—ভাবলাম মনে মনে। কিন্তু তবু খুব অভিমান হল; মনে হল আমার কেউ

নেই এ-জগতে। ঠিক করলাম, ভয় দেখাব মাকে। কিন্তু ভয় দেখাবার আয়োজন করবার আগেই বাড়ির বাইরে মার গলা শুনতে পেলাম। আমি ফিরেছি কিনা খোঁজ করছেন। পা থেকে জুতো খুলে হাতে নিলাম আমি আর তারপর এক ছুটে ভেতরের ঘরের আলমারির মধ্যে জুতো-শুদ্ধ ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। একটু পরেই ঘরের মধ্যে মার গলা শুনতে পেলাম, 'ওক-ছি, ওক-ছি ফিরেছিস?' একটু পরে যেন নিজের মনেই বললেন না ফেরেনি এখনো।' তারপর মা গেটের দিকে চলে গেলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করবেন ওখানে। আমি হাসলাম একটু। মজা খুশি হব। কিছুক্ষণ পরে যেন কিসের একটা গণ্ডগোল কানে এল। মার আর ছোটকাকার গলা শুনতে পেলাম।

হঠাৎ শুনলাম, মা কাঁদছেন। প্রথম ভাবলাম, বেরিয়ে পড়ি। পরে মনে হল না এখনো যথেষ্ট শাস্তি হয়নি মার। সুতরাং বেরুলাম না। আলমারির ভেতরে গরম লাগছিল খুব, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙলে দেখলাম চারদিক অন্ধকার। কেঁদে ফেললাম ভয়ে। হঠাৎ মার গলা কানে এল, তারপর আলমারির দরজা খুলে গেল। আলমারি থেকে টেনে বের করে আমার গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন মা। কিন্তু তারপরই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন, 'ওক-ছি, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, আর কেঁদো না। আমি ত রয়েছি তোমার কাছে। তোমার শরীর খারাপ লাগছে না তো? তুমি কাছে থাকলে আমার আর কোন দুঃখ নেই। তুমিই আমার সব। তোমাকে ছেড়ে আর কাউকে চাই না আমি।'

পরের দিন কিণ্ডারগার্টেন থেকে ফিরবার পথে মনে পড়ল গতকাল কি করেছিলাম। মার জন্য খুব কষ্ট হল। ভাবলাম, মাকে একটু খুশি করতে পারলে হতো। কিন্তু কি করে খুশি করব? হঠাৎ মনে পড়ল কিণ্ডারগার্টেনের একটা ঘরে ফুলদানীতে ফুল রাখা ছিল। ফিরে গেলাম সেখানে। ঘরে কেউ নেই। ফুলদানী থেকে দুটো ফুল তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভারি সুন্দর ফুল তো! কোথায় পেলি রে?'

সত্যি কথাটা বলতে ভয় হল। কিন্তু কি বলব? হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'নতুন কাকা দিয়েছেন, বলেছেন তোমাকে দিতে।' কথাগুলো আমার নিজের কানে যেতে আমিও অবাক। মার মুখ লাল হয়ে উঠল, গম্ভীর হয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ; তারপর বললেন, 'ফুলগুলো নেওয়া তোমার উচিত হয়নি।' মাকে এতো বিচলিত হতে দেখে খুব অবাক লাগল আমার। কিন্তু তবুও খুশিই হলাম। কারণ মিথ্যেটা ঠিক কাজে লেগেছে আর তাছাড়া মা চটেছেন নতুন কাকার ওপর, আমার ওপর ত নয়।

খানিক পরে মা বললেন, 'লক্ষ্মীটি, ফুলের কথা কাউকে কিছু বলো না, কেমন?'

চলো গ্রামের পেছনের পাহাড়টায় বেড়াতে যাই

ভেবেছিলাম, ফুলগুলো মা ফেলে দেবেন। কিন্তু না, ফেললেন না। একটা ফুলদানীতে করে ওপরের ঘরের অর্গানের ওপর রেখে দিলেন। যতদিন না শেষ পাপড়িটি পর্যন্ত শুকিয়ে গেল ততদিন পর্যন্ত ওখানেই রইল ফুলগুলো। তারপর ডাঁটাগুলোকে কেটে ফেলে পাপড়িগুলোকে প্রার্থনার বইয়ের মধ্যে রেখে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা নতুন কাকার কোলে বসে ছবির বই দেখছি হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠলেন নতুন কাকা। ভেতরের ঘর থেকে অর্গানের আওয়াজ আসছে। নিশ্চয়ই মা অর্গান বাজাচ্ছেন। ছুটে গেলাম সে ঘরে। যাই ভেবেছিলাম তাই। ঘরে বাতি নেই। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সাদা পোষাক পরে একমনে অর্গান বাজাচ্ছেন মা। মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি; মা কিন্তু দেখতেই পেলেন না আমাকে। চমৎকার বাজাচ্ছেন মা। কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীর চেয়েও ভালো। এতক্ষণ ধরে গাইতে শুনে এলাম। মার গলা যে এতো ভাল আমি জানতাম না।

একদিন রাত্রে নতুন কাকার ঘর থেকে ফিরছি, আমার হাতে একটা সাদা খাম দিলেন নতুন কাকা। বললেন, 'মাকে দিও। বলো গত মাসের টাকা।'

মাকে দিলাম খামটা। মার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। [illegible]

'নতুন কাকা দিলেন। গত মাসের টাকা।' আমার কথা শুনে মার চেতনা ফিরে এল আবার। তারপর যেন লজ্জায় গোলাপী হয়ে উঠল তাঁর গাল। খাম খুলে কয়েকটা নোট বের করলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল একটা। তারপর খামের ভেতরে আবার তাকাতেই বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ! প্রথমটা একটু ইতস্তত করছিলেন, তারপর খুললেন। কাগজে কি লেখা ছিল জানি না, কিন্তু দেখলাম মার হাত কাঁপছে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে। খানিকটা পরে টাকা আর কাগজের টুকরোটা খামে পুরে সেলাইয়ের বাক্সে রেখে দিলেন। তারপর বসে রইলেন চুপচাপ। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল মার বোধহয় অসুখ করেছে। মাকে বললাম, 'মা, চলো শুতে যাই।' 'হ্যাঁ, চলো।' বললেন মা। তারপর চুমু খেলেন আমাকে।

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙে গেল আমার। হাত বাড়িয়ে দেখলাম মা বিছানায় নেই। ভয় পেয়ে তাকাতে লাগলাম চারদিকে। জ্যোৎস্নায় ঘর আলো হয়ে আছে। ঘরের একধারে একটা বড় কাঠের বাক্সের কাছে বসে আছেন মা। বাক্সটায় বাবার জামা কাপড় থাকে। সাদা জামা কাপড়গুলো তুলে মেঝের ওপর বিছিয়ে রাখলেন মা, তারপর চোখ বন্ধ করে বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে নিজের মনে মনেই যেন কি বলতে লাগলেন। আমার মনে হল, মা প্রার্থনা করছেন। উঠে গিয়ে মার কোলে বসলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, কি করছ এখানে?' মা চোখ খুলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর খুব মধুর গলায় ডাকলেন, 'ওক-হি।'

'হ্যাঁ, মা?'

'চলো শুতে যাই।'

'তুমিও শোবে তো?'

'হ্যাঁ, আমিও শোব তোমার সঙ্গে।'

মার কথার মধ্যে যেন গভীর বেদনা ছিল।

মাকে আজকাল আর ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না আমি। মার আচরণে কেমন যেন অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছিল। কোন কোন দিন সন্ধেবেলা অর্গান বাজাতেন, কখনো কখনো গানও গাইতেন। মাকে বাজাতে বা গাইতে দেখলে খুব আনন্দ হত আমার। কিন্তু প্রায়ই দেখতাম, গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলতেন তিনি।

কিন্ডারগার্টেনে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেল। সেদিন রোববার। মা গীর্জায় গেলেন না, বললেন মাথা ধরেছে। আমি আর মা ছাড়া আর কেউ নেই বাড়িতে। আমাকে ডাকলেন মা, বললেন, 'ওক-হি, তোমার বাবাকে দেখবে?'

'হ্যাঁ, একটা বাবা চাই আমার।' বললাম আমি। মা চুপ করে রইলেন একটু, তারপর খুব শান্ত গলায় বললেন 'তোমার জন্ম হবার আগেই তোমার বাবা চলে গেছেন। কিন্তু তাই বলে তোমার নতুন বাবা হওয়া উচিত নয়। হলে আশে-পাশের সবাই তোমাকে আর আমাকে ছি-ছি করবে। পৃথিবীটা যে কী ভয়ানক তা তো তুমি জান না। সবাই নিন্দে করবে, তোমার বন্ধুরা হাসবে তোমার দিকে তাকিয়ে। ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়েও হবে না তোমার। তুমি পড়াশুনোয় এতো ভাল হলে কি হবে, নাম হবে না তোমার।

'ওক-হি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না তো কখনো? যেও না। আমার কাছেই থাকবে তুমি......চিরকাল, আমি যখন বুড়ি হয়ে যাব তখনো। তোমার কিন্ডারগার্টেনের পড়া, স্কুলের পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হয়ে গেলেও আমার কাছেই থাকবে। আচ্ছা ওক-হি, তুমি কতটা ভালবাস আমাকে?'

'এ-ই এতোটা', দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে দেখালাম আমি।

'এতো। বাঃ, খুব ভাল। আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না তো? তুমি স্কুলে যাবে, ভাল করে পড়াশুনো করবে আর খুব ভাল মেয়ে হবে। তখনো কিন্তু আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না।'

'আচ্ছা', বললাম আমি; তারপর হাত-দুটোকে পেছনের দিকে ছড়িয়ে ধরে বললাম, 'তোমাকে এ-ই এতোটা ভালবাসি মা।'

'আমার লক্ষ্মী মেয়েটাকে ছাড়া আর কাউকে দরকার নেই আমার। আর কাউকে চাই না আমি', বললেন মা আর তারপর জোরে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা আমার চুল আঁচড়ে দিলেন মা, নতুন জামা কাপড় পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছি মা?'

মা একটু হেসে বললেন, 'কোথাও না।' তারপর অর্গানের ওপর থেকে একটা সাদা ভাঁজকরা রুমাল নিয়ে আমার হাতে দিলেন। বললেন 'তোমার নতুন কাকার রুমাল এটা। যাও দিয়ে এসো। দিয়েই চলে আসবে কিন্তু, দাঁড়াবে না।'

রুমালের মধ্যে একটা ভাঁজ করা কাগজ আছে মনে হল। নতুন কাকাকে গিয়ে দিলাম রুমালটা। কিন্তু নতুন কাকা যেন কেমন পাল্টে গেছেন। একটু হাসলেন না পর্যন্ত।

একদিন বিকেলে নতুন কাকার ঘরে গিয়ে দেখি নতুন কাকা তাঁর জিনিষপত্র বাঁধছেন। রুমালটা দেবার পর থেকেই নতুন কাকার মধ্যে ভীষণ একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। মুখে বিষণ্ণ বেদনার ছাপ থাকত সব সময়। বেশি কথা বলতেন না, তাকিয়ে থাকতেন শুধু। সুতরাং নতুন কাকার ওপর আমার টানও কমে গিয়েছিল; আমি আর বিশেষ যেতাম না তাঁর কাছে। সেদিন তাকে জিনিসপত্র বাঁধতে দেখে আমি অবাক হলাম। দৌড়ে চলে গেলাম মার কাছে।

'মা, নতুন কাকা চলে যাচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'স্কুল ছুটি হয়েছে বলে।'

'কোথায় যাচ্ছেন নতুন কাকা?'

'ওঁর বাড়ি যাচ্ছেন।'

'ফিরে আসবেন আবার?' মা কোন উত্তর দিলেন না এ প্রশ্নের।

নতুন কাকা চলে গেলেন।

নতুন কাকার দেওয়া কটা পুতুল নিয়ে খেলছি আমি, মা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে।

'পাহাড়ে বেড়াতে যাবি?' জিজ্ঞেস করলেন মা।

'হ্যাঁ, যাব।'

মার হাত ধরে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। পাহাড়ের ধার দিয়ে স্টেশনে এসে থামল ট্রেনটা। একটুক্ষণ থেমেই চলতে শুরু করল আবার।

বাড়ি ফিরে ভেতরের ঘরে গেলেন মা। অর্গানের ডালাটা খোলাই ছিল এ কদিন। বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে সেলাইয়ের বাক্সটা রেখে দিলেন তার ওপর। তারপর প্রার্থনার বইটা খুলে ফুলের সেই শুকনো পাতাগুলো বের করলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'ফেলে দিয়ে আয় তো।' ডিমওয়ালা এলো। ডিম নিলেন না মা। খুব শান্ত গলায় বললেন 'ডিম খাবার আর লোক নেই। আর ডিম লাগবে না আমাদের।' ভাবলাম আমার জন্যে ডিম রাখতে বলি মাকে, কিন্তু মার মুখের দিকে তাকিয়ে আর সাহস হল না। একেবারে সাদা হয়ে গেছে মার মুখ। সুতরাং আমি ফিস-ফিস করে পুতুলের কানে কথা বলতে লাগলাম। বললাম, 'দেখেছিস, মা কেমন মিথ্যে কথাটা বলল! মা বুঝি জানে না আমি ডিম ভালবাসি? খুব জানে। যাক গে, মার শরীরটা খারাপ, সাদা হয়ে গেছে একেবারে। মাকে এখন আর কিছু বলব না।'

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

দুরারোগ্য ক্যান্সার ও তার প্রতিকার

বহু শত বিজ্ঞানীর আত্মত্যাগ এবং নিরলস সাধনা ও গবেষণার ফলে মানুষ আজ নানা রোগব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু একটি জটিল ব্যাধি বিজ্ঞানীদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে আজও দুরারোগ্য হয়ে রয়েছে এবং প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শত শত মানুষের জীবন সংহার করে চলেছে। এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির নাম ক্যান্সার।

মানব-ইতিহাসের আদিযুগ থেকে দুরারোগ্য ক্যান্সারের আবির্ভাব ঘটে। ভেষজ শাস্ত্রের জনক হিপ্পোক্রেটিস খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে এই ব্যাধিটির সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং এর একটি নাম দেন যার অর্থ হলো 'কর্কট'। মিশর ও ভারতের আরও সুপ্রাচীন পুঁথিপত্রে কর্কটরোগের উল্লেখ পাওয়া যায় কাজেই এই অনুমান করলে অযৌক্তিক হবে না যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এই ব্যাধিটি হাড়ের চেয়ে চামড়াই বেশি আক্রমণ করে বলে জীবাশ্মের মধ্যে এর নিদর্শন তেমন পাওয়া যায় না।

'ক্যান্সার' কথাটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, কিন্তু ক্যান্সার বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। আমরা জানি, প্রত্যেক প্রাণীর দেহ এক বা একাধিক কোষের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের দেহে লক্ষ লক্ষ কোষ আছে এবং তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে টিস্যু বা কোষগুচ্ছ আর টিস্যুর দ্বারা গঠিত হয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দেহমধ্যে অবিরামভাবে জীর্ণশীর্ণ কোষের বিনাশ ঘটছে এবং তার স্থলে উদ্ভব হচ্ছে নতুন নতুন কোষের। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে প্রতিটি জীর্ণ কোষের স্থান গ্রহণ করে ঠিক একটিই নতুন কোষ। এ কারণে একজন সুস্থ সবল মানুষের দেহে মোট কোষ-সংখ্যার কোন তারতম্য ঘটে না। কোষ বিনিময়ের এই হলো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কখনও কখনও এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয় এবং দেহে প্রয়োজনাতিরিক্ত কোষের উদ্ভব হয়। এই অতিরিক্ত কোষগুলি সম্মিলিত হয়ে টিউমার বা আবের সৃষ্টি করে।

এই ধরনের বহু টিউমার দেহের কোন এক স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যায় এবং তাতে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না; যেমন হলো আঁচিল। ক্যান্সারও একরকম টিউমার-বিশেষ, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকারক। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন ক্যান্সার সম্বন্ধে এই তথ্য প্রথম প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে কোষবৃদ্ধি শুধু একস্থানে সীমিত থাকে না। নতুন কোষগুলি তাদের সন্নিহিত টিস্যুগুলি ও অঙ্গসমূহকে আক্রমণ করে, তাদের প্রতিহত করে, রক্তক্ষরণ ঘটায়, উন্মুক্ত পথ বন্ধ করে দেয়, দেহের অত্যাবশ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক কাজে বাধা দেয় এবং শেষপর্যন্ত তাদের বিনাশ সাধন করে। যখন এই অত্যধিক বৃদ্ধিক্ষম কোষগুলি রক্তে বা রক্তরসে প্রবেশ করে, তখন দেহের সুদূর প্রান্তে তারা বাহিত হতে পারে এবং সেখানে গিয়ে নতুন ক্যান্সার উপনিবেশ গড়ে তোলে।

ক্যান্সার বলতে কোন অঙ্গবিশেষের রোগ বোঝায় না। মানবদেহের এমন কোন স্থান নেই যেখানে এই ব্যাধি হয় না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং বাইরের চামড়া থেকে দেহাভ্যন্তরের চর্বি, মাংস, শিরা-উপশিরা, হাড়, পাকস্থলী, ফুসফুস, জননাঙ্গ ইত্যাদি আন্তর যন্ত্রের সর্বস্থানে এ ব্যাধি হতে পারে। পুরুষের পরিপাক যন্ত্র এবং মেয়েদের জননাঙ্গ অতি সহজে আক্রান্ত হয়। ক্যান্সার যে কেবল মানুষেরই হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায় তা নয়, বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যেও এই ব্যাধি লক্ষ্য করা গেছে।

ক্যান্সার হওয়ার মূল কারণ কি? কেমনভাবে ও কি কারণে একটি সুস্থ সবল কোষ ক্যান্সার কোষে রূপান্তরিত হয়?

গবেষণাগারে ক্যান্সার সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল ইঁদুরের ওপর পর্যবেক্ষণ

এসব প্রশ্নের সদুত্তর বিজ্ঞান আজও দিতে পারে নি। টিস্যুর উত্তেজনার ফলে ক্যান্সার হয়ে থাকে, এধারণা অধিকাংশ বিশেষজ্ঞরা এখন স্বীকার করেন না। অন্যান্য যেসব তত্ত্ব এখন প্রায়ই উপস্থাপিত করা হয় সেগুলি হচ্ছে : (১) ভ্রূণ অবস্থায় কোষে যদি কোন দুর্বিপাক ঘটে তার ফলে ক্যান্সার হয় এবং সারা জীবনব্যাপী তা বজায় থাকে; (২) ভাইরাসের আক্রমণে ক্যান্সার হয়; (৩) এক শ্রেণীর কোষসমূহের ভিন্ন প্রকারের কোষে আকস্মিক রূপান্তরের ফলে ক্যান্সার হয়।

বিজ্ঞানীরা আশা করেন, ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ বা আরও শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে কোষ-পরমাণুর অন্তর্লোকের রহস্য উদ্ঘাটন করা একদিন সম্ভব হবে এবং তার ফলে আরও সঠিক খবর জানা যাবে। কি কি কারণে ক্যান্সার হয় তা যদিও অজ্ঞাত আছে এখনও, তবে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, গামা ও এক্স-রশ্মি থেকে যে ক্যান্সারের উৎপত্তি হতে পারে তা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে হয় ত্বকের ক্যান্সার, গামা ও এক্স রশ্মিতে হয় তেজ-স্ক্রিয়াজনিত ক্যান্সার। চিকিৎসকেরা যাঁরা তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে নাড়াচাড়া করেন, টেকনিসিয়ানরা যাঁরা গামা ও এক্স রশ্মি নিয়ে অনবরত কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে তেজস্ক্রিয়াজনিত ক্যান্সার দেখা যায়। পরমাণুর বিভাজনের ফলে বিকীর্ণ তেজ-স্ক্রিয় রশ্মি থেকেও ক্যান্সার হয়। তবে এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, রোগ নির্ণয় বা নিরাময়ের উদ্দেশ্যে স্বল্পকালের জন্যে উল্লিখিত রশ্মিগুলি যে ব্যবহার করা হয় তাতে রোগীর পক্ষে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইরাসের দরুন ক্যান্সার হতে পারে। বিভিন্ন প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে এটা দেখা গেছে। কিন্তু মানব-দেহের ক্যান্সারে ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসের কতখানি হাত আছে বা আদৌ কোন হাত আছে কিনা তা এখনও অপরিজ্ঞাত। বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এই বিষয়টি সম্পর্কে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন।

ক্যান্সারের উৎসমূল যাই হোক না কেন, একটা কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ক্যান্সার কোন সংক্রামক ব্যাধি নয়। তবে ক্যান্সার বংশগত ব্যাধি কিনা, এ প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল এবং এ বিষয়ে কোন সুমীমাংসায় এখনও পর্যন্ত আসা যায়নি।

ক্যান্সারের সূচনাতে বাইরের দিক থেকে সচরাচর কোন উপসর্গই দেখা যায় না। প্রথম অবস্থায় কোনরকম জ্বর বা বেদনা প্রকাশ পায় না আর এজন্যেই প্রথমাবস্থায় এই ব্যাধিটি ধরা অত্যন্ত দুরূহ। কতকগুলি লক্ষণ দেখা গেলে ক্যান্সার সন্দেহে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। এই লক্ষণগুলি হলো, দেহের কোন অংশ ফোলা বা বেদনাহীন ছোট ছোট টিউমারের আবির্ভাব, রক্তস্রাব (যখন বেদনা-হীন হয় তখনও), দীর্ঘকালব্যাপী গলা ধরে থাকা, বারংবার পেটের গোলমাল হওয়া, অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তশূন্যতা, দেহের ওজন কমে যাওয়া, অস্বাভাবিকভাবে চামড়া শাদা বা হলদে হয়ে যাওয়া। তবে এই লক্ষণ-গুলি দেখা দিলেই যে ক্যান্সার হয়েছে বলে ভাবতে হবে এমন কোন কথা নেই। মোদ্দা কথা হলো, এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য এবং তিনি যদি বলেন, তখন ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞকে দেখানো প্রয়োজন। রোগ নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজন রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা, এক্স-রশ্মি ও বায়োপসি। শরীরের যে স্থানে রোগ আক্রমণের সন্দেহ সেখান থেকে সামান্য একটু অংশ তুলে অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করাকে বলা হয় 'বায়োপসি'।

যতদিন পর্যন্ত ক্যান্সারের সঠিক কারণ নির্ণীত না হচ্ছে ততদিন এর চিকিৎসা-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, [illegible] বলাই

বাহুল্য। ক্যান্সার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমানে কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সার নিরাময়ের সাফল্যজনক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে, যেগুলি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে। প্রতি বছর নতুন নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং সাফল্যও লাভ করা যাচ্ছে। ক্যান্সার চিকিৎসার প্রথম ব্যবস্থা হলো অস্ত্রোপচারের দ্বারা টিউমার অপসারণ। কখনও কখনও এই ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ক্যান্সারের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

ক্যান্সার নিরাময়ের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে চিকিৎসা। রেডিয়াম এবং তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট, ফসফরাস বা আয়োডিন নিঃসৃত গামা রশ্মির সাহায্যে এবং এক্স রশ্মির দ্বারাও অনেক সময় সুনিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক কম্পন ও হার্মোন চিকিৎসার দ্বারাও কখনও কখনও বিশেষ সুফল লাভ করা যায়। রাসায়নিক চিকিৎসায় সম্প্রতি আশাজনক ফল পাওয়া গেছে, যদিও এই পদ্ধতিটি সংশয়াতীতরূপে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে দেহের ক্যান্সারদুষ্ট কোষগুলিকে 'পুড়িয়ে বিনষ্ট' করে দেওয়া যাবে অথচ দেহের সুস্থ সবল কোন অংশের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। এ কাজে তাঁরা সূক্ষ্ম লেসার আলোকরশ্মি ব্যবহার করছেন। এই অভিনব পদ্ধতিটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। অপর যে একটি পদ্ধতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখন বিশেষ গবেষণা চলছে তাকে বলা হয় 'ক্রিয়োজেনিক সার্জারি'। এ পদ্ধতিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কোন পদার্থের প্রয়োগে ক্যান্সারদুষ্ট কোষকে 'জমিয়ে ঠাণ্ডা' করে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, ক্যান্সার নিরাময়ের কোন উপযুক্ত ভেষজ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এবং এটি বিজ্ঞানীদের কাছে আজ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। ক্যান্সার রোগ সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে দু'জন মার্কিন ভেষজ-বিজ্ঞানী ডাঃ পেটন রাউস এবং ডাঃ চার্লস হাগিনস্‌কে এবছর যুগ্মভাবে ভেষজ ও শরীরতত্ত্ব বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। ভাইরাস যে প্রাণীদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে তা সর্বপ্রথম প্রমাণ করেছিলেন ডাঃ রাউস। আর ডাঃ হাগিন্স ২৫ বছর আগে পুরুষদের মূত্রগ্রন্থির ক্যান্সার এবং মেয়েদের স্তনের ক্যান্সারের হর্মোন চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল ক্যান্সার চিকিৎসাকেন্দ্র ও গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। আমাদের দেশে বোম্বাই ও কলিকাতা মহানগরীতে আধুনিক যন্ত্রপাতি-সম্বলিত জাতীয় ক্যান্সার গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে ক্যান্সার সম্পর্কে নানা অনুসন্ধান চলছে। কলকাতায় জাতীয় ক্যান্সার গবেষণামন্দিরে গত ৭—৯ নভেম্বর তিনদিনব্যাপী তৃতীয় নিখিল ভারত ক্যান্সার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বিজ্ঞান সম্মেলনে ভারতের ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও বিদেশের বহু বিশিষ্ট ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী যোগদান করেছিলেন এবং এই দুরারোগ্য ব্যাধিকে পরাভূত করার জন্যে তাঁরা নানা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

[illegible] কোন দেশ সর্বপ্রথম [illegible] এবং [illegible]

[illegible] কে আবিষ্কার করেন?

বিনীত
[illegible]
[illegible]

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১৯শ সংখ্যায় [illegible] প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, [illegible] [illegible] ১৯৪৬-৪৭ [illegible] ১৯৫৯-৬০-এ [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ৫০০ [illegible] হয়ে যান। [illegible] রেকর্ড। তার আগে ছিল ব্রাড-ম্যানের ৪৫২ নটআউট।

(খ) টেস্ট ক্রিকেটে ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও নবম উইকেটে নিম্নলিখিত ব্যাটস্‌ম্যানগণ রেকর্ড করেন।

* তৃতীয় উইকেট—৩৭০, ইংলণ্ডের এডরিচ ও ডেনিস কম্পটন, ১৯৪৭ সালে লর্ডস মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে।

* চতুর্থ উইকেট—৪১১, ইংলণ্ডের পিটার মে ও কলিন কাউড্রে, ১৯৫৭ সালে বার্মিংহাম মাঠে ওয়েস্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে।

* ষষ্ঠ উইকেট—৩৪৬, অস্ট্রেলিয়ার ব্রাডম্যান ও জ্যাক ফিঙ্গলটন, ১৯৩৬-৩৭ সালে, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে।

* নবম উইকেট—১৬৩, ইংলণ্ডের কাউড্রে ও স্মিথ ১৯৬৩তে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে।

বিনীত
সুশান্তকুমার বসু ও মৃণ্ময় রায়
যোগীরামবাবু, বাঁকুড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৪শ সংখ্যায় প্রবাসীশিশু প্রবোধ, সত্যব্রত ও সুলেখা সান্যালের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ ছিল 'কুইন এলিজাবেথ', কিন্তু ১৯৬১ সালে তার চেয়ে বেশী প্রায় ৮০০০ টন ওজনের 'ইউ এস এস এন্টারপ্রাইজ' নামে বিমানবাহী জাহাজটি চালু হয়, এটিই সবচেয়ে বড় জাহাজ এবং আণবিক শক্তিতে চালিত হয়। একই সংখ্যায় এদেরই (খ) প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের মুদ্রা বা প্রধান মুদ্রার নাম জানাতে চেষ্টা করছি। যেমন আমাদের দেশে যেমন টাকা বা রুপিয়া বোঝায়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নাম; সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে যে মুদ্রা চলে তার নাম 'ফ্রাঙ্ক', তবে তিনটি দেশের 'ফ্রাঙ্ক' তিন রকম দেখতে। স্পেনের মুদ্রার নাম 'পেসেতা'। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের মুদ্রার নাম 'ক্রোণের'। চিলি, আর্জেন্টিনা, কিউবা, উরুগুয়ে ও মেক্সিকোর মুদ্রার নাম 'পেসো'। জার্মানী ও ফিনল্যাণ্ডের মুদ্রার নাম 'মার্ক'। রাশিয়ার 'রুবল'। ইতালীর মুদ্রার নাম 'লীরা', চেকোস্লোভাকিয়ার 'ক্রাউন', রুমানিয়ার 'লিউ', জাপানের 'ইয়েন', চীনের 'য়েন', আইসল্যাণ্ড-এর 'ক্রোনা', যুগোশ্লাভিয়ার 'দিনার', ভেনিজুয়েলার 'বলিভার', ইরাণের 'রিয়াল', গুয়াটেমালার 'কোয়েৎসাল', থাইল্যাণ্ডের 'বাত', পর্তুগালের 'এস্কুডো', পোল্যাণ্ডের 'জ্লোটি', পেরুর 'সল', পানামার 'বালবোয়া', কানাডা ও আমেরিকার 'ডলার', বুলগেরিয়ার 'লেভ', ইংল্যাণ্ড-এর 'স্টার্লিং', হাঙ্গারীর 'ফোরিন্ট', কোরিয়ার 'হোয়ান', অস্ট্রিয়ার 'শিলিং', তুরস্কের 'পিয়াস্টার'। আমি যে কটি নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি সাধ্যমত জানাতে চেষ্টা করলাম। আরও অনেক দেশের মুদ্রা আমার যা অজ্ঞাত, অনুজের পাঠকগণ যদি জানান বাধিত হব।

বিনীত
কবিতা দাস
[illegible] ইস্ট রোড,
বেলেঘাটা
কলিকাতা—১০

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। পঁয়ত্রিশ ।।

মিলনে ফুল ফোটে, ফল ধরে। ফুলে অবজ্ঞা করলে সেই ক্ষত ফলে এসে লাগে।

এই অবজ্ঞার দিকটার প্রতি সচেতন থাকলে ছেলেকে দূরে না সরিয়ে জ্যোতিরাণী উল্টে তাকে আরও বেশি কাছে টানার কথা ভাবতেন হয়ত। মনোবিজ্ঞানীর মতে শিশুর ভিতরের জগতটা বাইরের মত অত ছোট নয়। বেশীর ভাগ বাবা-মায়েরা এ-খবর রাখেন না। জটিল এই চিত্তদাহের যুগে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও যে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, সেটা ওই ভুলের ফসল। যে ছেলের অত দাপট আর অত চতুর কাম্যকলাপ, বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার নামে তার পায়ের নীচের মাটি কেন অত দুলে উঠেছিল সে সম্বন্ধে জ্যোতিরাণীরও কোন ধারণা নেই, শিবেশ্বরেরও না।

দুলে উঠেছিল সিতুর অনুভূতিপ্রবণ নিরাপত্তাবোধের অভাবে। যে-অভাবের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই। সজাগ শিশুর জীবনে এই আবেগের বিপর্যয় ঘটে শুধু তার বাবা-মায়ের সক্রিয় মনোযোগের অভাবে। এই অভাবের পটভূমিতেই সিতুর আবির্ভাব। তার অবোধ চেতনার ওপর বাবা-মায়ের মিলিত হাসির আলো কখনো পড়ে নি। বরং তার বিপরীত ছাপ পড়েছে। আজও সিতু বাবা-মায়ের বিরোধ কি নিয়ে জানে না, কিন্তু চেতনা স্ফুরণের বহু আগে থেকেই তার অনুভূতির ওপর ওই বিরোধের ছাপ পড়েছে—পড়ে এসেছে। অসুখে ভুগেছে জন্মের পর থেকে বছর কতক। শিশুর চেতনায় নিরাপত্তার অভাব ছায়াপাত করে গেছে তখন থেকে। আশ্রয় মিলেছে ঠাকুমার কাছে, ছোট দাদুর কাছে। কিন্তু শিশুর মানসিক পুষ্টির পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়।

...ভিতরটা তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ বলে আজও সিতু রাতে একা শুয়ে চোখ বুজলে একটা অদ্ভুত আবছা ধোঁয়াটে দৃশ্য কল্পনা করতে পারে। সে যেন কবে কোথায় একটা দৈত্য গোছের কারো ভয়াবহ কান্ড দেখেছিল। দৈত্যটার দয়া নেই, মায়া নেই—সে কেবল হাতের কাছে যা পায় ভেঙে-চুরে তচনচ করে। বিষম আক্রোশে সে কেবল ভাঙে আর ভাঙে।

কল্পনাটা মনে এলে এখনও সিতু অস্বস্তি বোধ করে। আর মনে-মনে অবাকও হয়।

কিন্তু জানে না এ কল্পনা কেমন করে দানা পাকালো। তার চার বছর বয়সের কথা মনে থাকার কথা নয়। মনে নেইও। সে জানবে কি করে বাবা-মায়ের এক প্রত্যক্ষ বিবাদের দৃশ্যই ঘষা-মোছা হতে হতে এই উদ্ভট কল্পনায় এসে ঠেকেছে।...দুর্ভিক্ষের পদসঞ্চারের আগে চাল আটকে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার লোভে এক বিশিষ্ট জনকে বিক্রমের মারফত বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল একদা, আর, তার আপ্যায়নের জন্য যে চায়ের সেট্ জ্যোতিরাণী বার করেছিলেন শিবেশ্বরের তাতে মান খোয়া গেছল। অতিথিরা বিদায় নেবার পর তাই নিয়ে তর্কের ফলে শিবেশ্বর সে-দিন ওই চায়ের সেট্ সংহার করেছিলেন। আর, চার বছরের সিতু অবাক বিস্ময়ে সেই সংহার-পর্ব দেখেছিল। আসল ঘটনা বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে বলেই অনুভূতির রাজ্যে ওই গোছের ছাপ পড়ে আছে।

মনোবিজ্ঞানীর মতে এই রকমই হয়ে থাকে।

সিতুর ছোট জীবনে এরকম প্রতিকূল ছাপ কত যে পড়েছে ঠিক নেই।

তারপর যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। এই অবস্থায় প্রতিটি শিশুর একই পরিণতি। বাবা-মায়ের সদয় মনোযোগের অভাব তাকে দেউলে করে বলেই ভিতরে ভিতরে সে নিরাপত্তার কাল্পনিক দুর্গ রচনা করে। তখন সেটাই তার পুষ্টির রসদ জোগায়। এই সঙ্গে খাওয়া-পরা ভালো পেলে বাইরের স্বাস্থ্য ফেরে। অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ু তখন ওই নিরাপত্তার অভাব দূর করার তাগিদে বাইরের দিকে ছোটে, ধ্বংসের ভিতর দিয়েও সে নিজের শক্তির স্বাদ পেতে চায়। শক্তি অনুভব করার কৃত্রিম প্রেরণার ফলে প্রবৃত্তি হয়ে ওঠে উদ্ধত অনমনীয় দাম্ভিক সাফল্য-জেদী রোমাঞ্চসন্ধানী।

সিতুর বেলায়ও তাই হয়েছে। তার অপরিণত মনে বাবা-মায়ের সদয় মনোযোগের ছাপ পড়ে নি তাই বাঁকা রাস্তা ধরেও পাঁচজনের মন সে নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করেছে, তাঁদের বাহবা জোটে নি বলেই এক-একটা কাণ্ড করে পাঁচজনের বাহবা কুড়োবার ঝোঁক। সেই কাল্পনিক দুর্গ থেকে শক্তি টেনে-টেনে সর্বদা নিজের বৈশিষ্ট্য বড় করে তোলার তাগিদ।

বছর দুই আগে নিজের নামের বৈশিষ্ট্যের ওপর অপমানের কালি ঢেলেছিল বলে সজারু-মাথা সুবীরের সঙ্গে তো বেদম মারামারিই হয়ে গেছল প্রায়। মারামারির ফলে জাপটা-জাপটি করে এক বাড়ির রক থেকে দুজনে রাস্তায় এসে পড়েছিল। সুবীর বয়সে বড়, গায়ের জোরও কিছু বেশি—মার হয়ত সিতুই বেশি খেয়েছিল। কিন্তু কুরু-কুল নিধন যজ্ঞের মতই তার অমিত আক্রোশ দেখেছিল বন্ধুরা সেদিন। হোমিওপ্যাথী শিশিতে নস্যি পুরে সুবীরের নেশা-করা দেখানোর চাল সিতু

ঘুচিয়ে দিয়েছিল প্রায়। ধস্তাধস্তির ফলে সুবীরের শার্টের পকেটের শিশি ভেঙে গুঁড়িয়েছিল আর সেই কাচ বিঁধে সুবীরের জামা-প্যান্ট রক্তাক্ত হয়েছিল। ফলে মার বেশি খাওয়া সত্ত্বেও সিতুর নামের মর্যাদা রক্ষার শৌর্য অন্য বন্ধুদের চোখে ছোট হয়ে যায়নি।

নিজের সাত্যাকি নামের বৈশিষ্ট্য সিতু নিজেই আবিষ্কার করেছিল। আর পাঁচজনের মত সাদামাটা নাম নয়, ওই নামের মহিমা ঠাকুমার কাছে কিছু শোনা ছিল। ঠাকুমার নাম-কীর্তনে নাতিকে খুশি করার উপকরণ ছিল। বন্ধুদের কাছে বলার সময় সিতু তার ওপর বেপরোয়া রঙ চড়াতে কার্পণ্য করেনি। যেমন, জন্মের পর অনেক লক্ষণ বিচার করে ওই নাম রাখা হয়েছিল তার। মাথায় পাকা চুল ছিল একটা, সেটা জ্ঞান-বুদ্ধির লক্ষণ। শূন্যের ওপর দু হাত মুঠো করে চিৎকার করত—সেটা বীরত্বের আর জেদের লক্ষণ। কেষ্ট ঠাকুরের ফটোর দিকে তাকালেই চার মাস বয়েস থেকে খিলখিল করে হাসত আর আনন্দে হাত-পা ছুড়ত—সেটা কোনো এক জীবনের আপনজনকে চিনতে পারার লক্ষণ। ও জন্মাবার আগে ঠাকুমা অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে কিছু—পরে ঠাকুরমশাইরা ঠাকুমাকে বলেছে সেই সব স্বপ্নেরও বিশেষ অর্থ আছে। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে তার নাম রাখা হয়েছে সাত্যাকি।—সাত্যাকি কে ছিল জানিস তো? মহাভারতের মস্ত যাদব বীর একজন। রাজা শিনির ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের রথ চালাতো, কেষ্ট ঠাকুর ভারী ভালবাসত তাকে। রথ চালাতো মানে কি গাড়োয়ান? যেমন তোদের বুদ্ধি! কেষ্ট ঠাকুর তো অর্জুনের রথ চালাতো—সে কি গাড়োয়ান? সব থেকে সাহসী বিশ্বাসী আর চালাক লোককেই এ কাজের ভার দেওয়া হত। হেঁজিপেঁজি বা ভীতু লোক হলে রথ কোন্ বেঘোরে টেনে এনে ফেলবে ঠিক কি —যুদ্ধ করা তখন মাথায় উঠবে।

বন্ধুরা কেউ নির্বাক কৌতূহলে, কেউ বা হিংসামেশান বিস্ময়ে সাত্যাকি নামের লোভনীয় গুণাবলী শুনেছে। ফলে কলিযুগের ক্ষুদ্র সাত্যাকির গাম্ভীর্যমণ্ডিত ব্যাখ্যা আরো অনায়াস বিস্তৃতি লাভ করেছে।—সাত্যাকির অস্ত্রবিদ্যার গুরু কে ছিল জানিস? স্বয়ং অর্জুন—কেষ্ট ঠাকুর যাকে ভালবাসে তাকে না শিখিয়ে যাবে কোথায়? আর, সাত্যাকির মেজাজখানা কি রকম ছিল তোরা ভাবতেই পারবি না—কেষ্ট ঠাকুরের দাদা বলরামকে পর্যন্ত একবার গালাগাল করে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছিস। আর, অতবড় বীর ছিল বলেই তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের নামজাদা একজন সেনাপতি হয়ে বসতে পেরেছিল। শুধু বীর নাকি, চালাকও তেমনি। তার চালাকির কাছে ধরা না পড়লে কেষ্ট ঠাকুর তো দুর্যোধনের ফাঁদে পা দিয়ে বন্দী হয়ে বসেছিল প্রায়। সাত্যাকিই তো দিলে দুর্যোধনের প্ল্যান বানচাল করে। ওদিকে প্রতিশোধ নিতেও তেমনি ওস্তাদ। মহাভারতের যুদ্ধের পাঁচ দিনের দিন চন্দ্র-বংশের রাজা ভূরিশ্রবা শয়তানি করে দিল সাত্যাকির দশ-দশটা ছেলেকে একেবারে খতম করে। সাত্যাকি তখন কি করল জানিস তোরা? ছেলের শোকে হাপুস নয়নে কাঁদল নাকি বসে বসে? হুঃ! সেই পাত্র আর কি—সোজা একদিন নিজে হাতে ভূরিশ্রবার মাথাটা কেটে দুখানা করে নিয়ে এলো।

সিতুর মুখখানা দেখে বন্ধুদের কারো কারো মনে হয়েছিল সে-ও ওই পুরাণের সাত্যাকি—কয়েক যুগ বাদে আবার এসে হাজির হয়েছে। সব বন্ধুদের এতটা সহ্য হয়নি। সুবীরের তো হয়ইনি। কিন্তু সেদিনের মত কিছু বলা সম্ভব হয়নি, কারণ সাত্যাকি নামে যে পুরাণে কোনো মহারথীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাও আগে জানা ছিল না। দলের মধ্যে সকলের থেকে বয়সে আর মাথায় কিছু বড় বলে দস্তুরমত হিংসাই হয়েছিল তার। কিন্তু পাঁচ-নাম জড়িয়ে গুণাবলীর যে ব্যাখ্যা শুনল তা নিছক বানানো যে নয় সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধিও আছে। তাই সেদিনের মত শুধু টিপ্পনী কেটেই ক্ষান্ত হতে চেষ্টা করেছিল। মুখ মচকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তা নিজেকে কি তুই সেই মহাভারতের বীর ভাবিস নাকি?

নামের সার্থকতা বুঝিয়ে দিতে পেরে সিতু পরিতুষ্ট। পুরাণের সাত্যাকির মতই চতুর জবাবও তাই মুখে এসে গেছল। বলেছিল, তা কেন, এ যুগের বীরদের নাম তো সুবীর হয়।

তাৎপর্য থাক না থাক, চটপটে জবাব শুনে অন্য বন্ধুরা হেসে উঠেছিল। তার ফলে সুবীরের দ্বিগুণ রাগ হয়েছিল। আর সেই রাগেই সে পুরাণের সাত্যাকি সম্পর্কে একটু অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। আশাতীত ফলও পেয়েছে। পরের আসর সুবীর মাত করেছে।

সাত্যাকি নামের মহিমা-বর্ণনায় সিতুর ভাবগত অতিরঞ্জন হয়ত ছিল, সজ্ঞানে পুরাণগত তথ্যের বিকৃতি সে কিছু ঘটায়নি কিন্তু পুরাণের সাত্যাকিচরিত্রের বিকৃত দিকটাও তেমনি ভারী যা সিতুর অজ্ঞাত। সেই দিকটাই হাতের মুঠোয় নিয়ে সুবীর তাকে নাকের জলে চোখের জলে করতে চেয়েছে। সকলের সামনে তার বুকের ওপর বিষাক্ত তীর ছুঁড়েছে যেন একটা।—কি রে শিনির ছেলে মহাবীর সাত্যাকি, ওই নামের গর্ব করতে লজ্জাও করে না তোর! অ্যাঁ? আমরা হলে যে লজ্জায় মরে যেতাম রে! শেষকালে কিনা সকলে মিলে এঁটো বাসন-পেটা করে মারল তোকে! ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—

সাত্যাকি অবাক, বন্ধুরাও অবাক। সুবীর আনন্দে ডগমগ। অন্য বন্ধুদের দিকে চেয়ে সোৎসাহে বলে উঠল, ও খুব চালিয়াতি করে গেল সেদিন, কেমন বীরপুরুষ ছিল সাত্যাকি জানিস তোরা? দাদুর মহাভারত আমি নিজে পড়ে দেখেছি, তার আগে দাদুর কাছে শুনেছি। ভূরিশ্রবা যুদ্ধের পাঁচ দিনের দিন সাত্যাকির দশ ছেলেকে খতম করেছিল আর চৌদ্দ দিনের দিন সাত্যাকিকে যুদ্ধে হারিয়ে মাটিতে ফেলে পায়ে করে থেতলেছিল। মনের সুখে থেতলে শেষে তলোয়ার বার করে সাত্যাকির মাথা কাটতে গেছল। নির্ঘাৎ কেটে ফেলত, বুঝলি?

সিতু নির্বাক হঠাৎ, রাগে ফুঁসছে। এক বর্ণও বিশ্বাস করে নি, কিন্তু পুরাণের সাত্যাকির বদলে সুবীর যেন তাকেই মাটিতে ফেলে থেতলাচ্ছে। মিথ্যে বলে রুখে ওঠার আগে দুলু অতুল ওরা সুবীরের উদ্দীপনার ইন্ধন জোগাল।—কেটে ফেলে নি? ফেলত?

—হ্যাঁ, কাটবে কি করে, অর্জুন বেইমানী করল যে। অর্জুন যেই দেখে সাত্যাকির মাথা যায়-যায় ওমনি যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে তীর ছুঁড়ে ভূরিশ্রবার সেই তলোয়ার-ধরা ডান হাতটা দিলে কেটে।

সকলে শুনছে, স্তব্ধ রাগে সিতুও শুনছে।

সুবীর বলল, ভূতিশ্রবাই সত্যিকারের বীর ছিল, বুঝলি? অর্জুনের এই বেইমানী দেখে দিলে সব অস্ত্র ফেলে আর যাচ্ছেতাই করে বকলে অর্জুনকে। তারপর বাঁ হাতে মাটিতে শর পুঁতে-পুঁতে আসন বানিয়ে তার ওপর বসে উপোস করতে লাগল। বোঝ একবার, এমন অন্যায় যারা করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও ঘেন্না—তার থেকে যুদ্ধের জায়গায় বসেই উপোস করে মরবে।

বন্ধুরা উদগ্রীব। সিতু স্তব্ধ। সে এখনও বিশ্বাস করছে না, কিন্তু সুবীর এভাবে বানিয়ে বলছে কি করে ভেবে পাচ্ছে না।

—এদিকে সিতুর বীর সেনাপতি সাত্যাকির অবস্থা কি জানিস? সুবীরের চোখে-মুখে প্রায় নৃশংস উল্লাস, বলে গেল, ভূরিশ্রবার পায়ের থেতলানোর চোটেই একেবারে অজ্ঞান—অজ্ঞান হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। ভূরিশ্রবা যখন শরাসনে উপোসে বসেছে তখন তার জ্ঞান ফিরল। বীরপুরুষ তখন গা-ঝেড়ে উঠে দেখে ভূরিশ্রবার হাতে অস্ত্র নেই—তীরের আসনে বসে আছে। কাপুরুষের মত ওই সুযোগে সে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল। সকলে বারণ করলে, কিন্তু বীর সেনাপতি এ রকম সুযোগ ছাড়ে কখনো! কারো কথা না শুনে নিরস্ত্র লোকটার মাথা কেটেই নিল। আর সিতু বলে কিনা এটাই মস্ত প্রতিশোধ।

সুবীর এখানেই থামে নি। তার তহবিলে আরও কিছু হুল ছিল।—তারপর আরও কত গুণ মহাভারতের বীর সাত্যাকির শোন—পাঁড় মাতাল ছিল লোকটা, জল খেত কিনা সন্দেহ, শুধু মদই খেত। মাতাল অবস্থায় কৃতবর্মাকে তলোয়ারের এক ঘায়ে দিলে সাবড়ে, তারপর যাদবদেরও মারতে লাগল। ভোজরা আর অন্ধকরা তাতে এয়সা রেগে গেল যে, দিলে চিরকালের মত তার বীরত্ব ঘুচিয়ে। খেতে-টেতে বসেছিল বোধহয় তখন তারা, সেই এঁটো বাসন দিয়েই রাম পিটুনি। সে-কি যে-সে পিটুনি, পিটুনির চোটে সাত্যাকি একেবারে অক্কা—

কি-রকম অক্কা দেখাবার জন্যেই হাত-পা ছড়িয়ে দাওয়ার ওপর শুয়ে পড়েছিল সুবীর।

—মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! সেই মুহূর্তে টুঁটি ছিঁড়ে নেবার মত করেই সিতু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এ-রকম আচমকা আক্রমণের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, সুবীর নিজেও না। সকলেই হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু সুবীরও ছাড়ে নি বা কেউ ছাড়িয়েও দেয় নি। ধস্তাধস্তি লপটা-লপটি রাস্তা পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

সিতুর ওই রকম মারাত্মক ক্রোধের পিছনেও একটাই কারণ। তার শক্তির কল্পিত দুর্গ ধূলিসাৎ করার উপক্রম করেছিল সুবীর। ওটাতে আঘাত পড়লে তার অস্তিত্বের ওপর আঘাত পড়ে। মারামারির দুই-একদিন পর মহাভারতের সাত্যকির পূর্ণ সমাচার জানার আগ্রহে সেও তৎপর হয়েছিল। ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ছোট দাদুকেও জিজ্ঞাসা করেছে। তাঁরা কেউ পছন্দমত জবাব দিতে পারেন নি। ঠাকুমার মুখে তো শুধু সেই একঘেয়ে প্রশংসার কথাই শুনেছে। মহাভারত একখানা তারও আছে। সিতু সেটাই খুলে বসেছে শেষ পর্যন্ত। আর তারপর হতাশ হয়েছে, ঠাকুমা বাবা-মা—যারাই তার নামের জন্য দায়ী, সকলের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। ওই নামের ওপর সুবীর কালি একটু বেশি লেপেছে বটে কিন্তু বানিয়ে কিছুই বলেনি। কেন যে এ-রকম একটা নাম রাখা হয়েছিল তার, আশ্চর্য! আর নামটা এখনও বদলান যায় কিনা সে-কথাও ভেবেছে।

এমনি নানান ভাবনা দিয়েই শক্তির কাল্পনিক দুর্গটা সর্বদা সুরক্ষিত করতে চেয়েছে সে। নিজেরই অনেকগুণ বড় একটা চেহারা সামনে ধরে রাখতে না পারলে বাবা-মায়ের মনোযোগের অভাবজনিত অপুষ্ট সত্তার অভাব-বোধ ঘুচবে কি করে? সেই বড় চেহারা গড়ার উপাদানও বাইরে থেকেই সংগ্রহ করেছে। বাইরের দিকে চোখ তাকালেই তো বাহাদুরী দেখাবার উপকরণ চোখে পড়ে। প্রয়োজনের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষকে লাইনে দাঁড়াতে দেখে, লাইনের অগ্রভাগ দখলের চেষ্টায় মারামারি করতে দেখে। মনে মনে সিতু তক্ষুনি এক বিশাল লাইন কল্পনা করে, শেষ নেই এতবড়!

লাইন আর সেই লাইনের অবধারিত সর্ব-প্রথম মানুষটি সে নিজেই—যার দাপটে অন্য কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। পাড়ার বড় ছেলেরা দল বেঁধে মারামারি করে বেপাড়ায় দলের সঙ্গে। সোডার বোতল ছোড়ে, অ্যাসিড বালব ছোড়ে, লাঠি-ছোরা নিয়েও ছোটে। বছরে দু-চারবার অন্তত হুলস্থূল কান্ড বেঁধে যায়। প্রত্যক্ষ রোমাঞ্চ জুড়িয়ে যাবার পর সিতুর কল্পনার ঘোড়া ছোটে। পাড়ার অপ্রতিহত সর্দারের আসনে নিজেকেই বসায় সে। তারপর বেপাড়ার দলকে যথেষ্ট শিক্ষা দেয়—এমন চমকপ্রদ শিক্ষা যা তাদের মনে থাকতে পারে। এই জন্যেই স্বচক্ষে ব্যাঙ্ক লুঠের ডাকাতদের দেখে এত রোমাঞ্চ তার। ডাকাত দলের সর্দারের সঙ্গে একটা মানসিক একাত্মতা গড়ে উঠেছিল বলেই মায়ের সেই কথায় অমন চমকে উঠেছিল সে। ধরা-পড়ার খবর পেয়ে মা সরোষে বলে উঠেছিল, বেশ হয়েছে, এবারে ফাঁসি হবে।

শুধু এই ব্যাপারে নয়, বড় হতে হলে অনেক কিছুই বোঝা দরকার আরো, অনেক কিছুরই অস্পষ্টতা কাটিয়ে ওঠা দরকার। বড় ছেলেরাও আলাদা রকে বসে আড্ডা দেয়, রাজা-উজীর মারে। খেলার গল্প করে, সিনেমার গল্প করে। সিতু লক্ষ্য করেছে, মেয়েদের পাশ কাটাতে দেখলে তাদের হাব-ভাব বদলায়। চোখে চোখে চাপা ইশারা খেলে, পরে কি-সব চটুল মন্তব্যে মেতে ওঠে। সিতু সঠিক বোঝে না, কিন্তু বোঝার আগ্রহ কম নয়। পাড়ার মধ্যেই দুই-একটা ভালবাসা-বাসির ব্যাপার ঘটে। কোন্ বাড়ির ছেলে আর কোন্ বাড়ির মেয়ে নিখোঁজ তাই নিয়ে চাপা উত্তেজনা দেখা যায়—ছেলেদের দলের আর মেয়ের দলের রোমাঞ্চকর আলাপ কানে আসে। সিতুরা ছোটর দলে, তাদের নীরব বিস্ময় বা কৌতূহল চোখে পড়েও পড়ে না কারো। এ ছাড়াও নীলিদিরা চুপি-সাড়ে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করে আর হাসাহাসি করে। সিতুরা তাদের চোখে ছেলেমানুষ, শুনে ফেললেও কিছু বুঝেছে ভাবে না। না বুঝলেও সিতু অন্তত আবছা কিছু রহস্যের সন্ধান পায়। হাঁ করে গিলতে

দেখলে নীলিদি বা অন্য কেউ হয়ত হাসি চেপে ধমকে ওঠে, এই ছেলে, কি শুনছিস—যা পালা এখান থেকে।

ফলে সিতুর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মেয়েদের দিকে চেয়ে-চেয়ে রহস্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে সে। না পারা মানেই তো ছেলেমানুষ থেকে যাওয়া। শুধু নীলিদিদের নয়, মায়ের দিকে চেয়েও কত সময় রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে সে। মাকে দেখতে তার খুব ভালো লাগে আর খুব সুন্দর লাগে। তবু পাড়ার ছেলেরা গোপনে আর মেয়েরা খোলাখুলি মায়ের চেহারার এত যে প্রশংসা করে, তাও প্রায় রহস্যের মতই লাগে তার। নিজেকে বড় ভাবার তাগিদে এই রহস্য নিয়েও সে মাথা ঘামায়। আর, এক-দিন তো বলতে গেলে ওই সুবীরই চোখ খুলে দিয়েছিল তার। নইলে দুপুরের নিরিবিলিতে বস্তিঘরের মেয়েদের কত সময়েই তো রাস্তার কলে চান করতে দেখেছে, চোখে তো কিছু পড়ে নি। সুবীরই একদিন পাঁজরে খোঁচা দিয়ে দেখাল তাকে, কেমন বেহায়ার মত চান করছে দেখ—

সিতু দেখেছে, প্রায় মেঘনার বয়সী আর তার মতই মোটাসোটা এক মেয়েলোক চান করছে। ভাল করে লক্ষ্য করেও সিতু বেহায়াপনার নজির ঠিক ধরে উঠতে পারছিল না।—কেন, কি হয়েছে?

গলা খাটো করে ধমকের সুরে সুবীর বলেছিল, আঃ কি-সব দেখা যাচ্ছে দেখছিস না!

অতঃপর সিতু দেখেছে। রহস্যের পর্দা খানিকটা নড়েছে।...নীলিদিদের এমন কি মায়েরও বুকের আঁচল খসে গেলে ঈষৎ ব্যস্ততায় সামলাতে দেখেছে।

এমনি সব ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়ে সিতুর বড় চেহারাটা নিজের কাছে বেশ বড়ই হয়ে উঠেছিল। ফলে শক্তির কাল্পনিক দুর্গটাও প্রায় দুর্ভেদ্য বাস্তবই ভাবত সে। কিন্তু মা তাকে দূরে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙে-চুরে খান-খান হয়ে গেল। তার আশ্রয়টুকু গেল যেন। সেই অনুভূতিপ্রবণ নিরাপত্তার অভাববোধ চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল তাকে, বাইরে থাকার নামে এ জন্যেই তার পায়ের নীচের মাটি দুলে উঠেছিল।

পরের ছ' মাসের মধ্যেও নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না সিতু। ভিতরে ভিতরে আবার একটা শক্তির দুর্গ গড়ে তুলতে না পারা পর্যন্ত সে অসহায়। এই পরিবেশে তার সুযোগ কম।

রাগ তার সব থেকে বেশি মায়ের ওপর।

ছ' মাসের মধ্যে বার তিনেক তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আসার সময় প্রতিবার তার ভিতরটা নিঃশব্দে আর্তনাদ করেছে। আরও বেশি পরিত্যক্ত মনে হয়েছে নিজেকে। ফলে মায়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহারই করেছে সে। ঠাকুমা জেঠু ছোট দাদু এমন কি শামু ভোলা মেঘনার সঙ্গেও ডবল ভাব তার। শুধু মায়ের সঙ্গে নয়। যাবার সময় থমথমে মুখে মাকে শুধু লক্ষ্যই করেছে দূর থেকে। কাছে আসতে চায়নি।

এ ছাড়া মাসে বার দুই অন্তত জ্যোতি-রাণী এসেছেন ছেলেকে দেখতে। প্রথম প্রথম মামাশ্বশুরকে সঙ্গে এনেছেন। ছেলে তার সঙ্গে স্কুলের খেলাধুলোর খাওয়া-দাওয়ার গল্প করেছে। হাব-ভাবে মা-কে সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে বাড়ির থেকে এখানে সে ঢের-ঢের ভালো আছে।—এত ভালো আছে যে, জীবনে বাড়িতে আর না গেলেও চলে। কথাবার্তা সব ছোট দাদুর সঙ্গে।

এর পর ইচ্ছে করেই বার দুই একলা এসেছেন জ্যোতিরাণী। ছেলের মুখ বিমর্ষ, বিরস। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বা খোঁজ-খবর করলে ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়। খানিক বাদেই প্যান্ট-জামা বদলে প্রস্তুত হয়, খেলতে যাবে। মুখ দেখে জ্যোতিরাণীর সন্দেহ হয় তিনি চলে যাবার পর সত্যি খেলতে যাবে কিনা।

একবার শমীকে সঙ্গে এনেছেন। ভেবে-ছিলেন ওকে দেখে খুব খুশি হবে। আর শমী তো খুশিতে নাচতে নাচতে এসেছিল। কিন্তু ফিরেছে বিমর্ষ মুখে। কারণ এত দিন পরে দেখেও সিতুদা তার সঙ্গে হাসি মুখে খেলা করেনি, গল্প করেনি, এমন কি ভালো ব্যবহারও করেনি।

করেনি যে জ্যোতিরাণীও সেটা লক্ষ্য করেছেন।

ভালো ব্যবহার সিতু করবে কি করে। মায়ের সঙ্গে হাসি মুখে শমীকে আসতে দেখেই তার ভিতরটা খচখচ করে উঠেছে।... মা তাকে একটুও ভালবাসে না, ভালবাসলে এভাবে তাকে দূরে সরিয়ে দেয় কি করে। কিন্তু ওই আদরের মেয়েকে দিব্বি ভাল-বাসে বলে ধারণা। সিতু বাড়ি থাকে না, এই সুযোগে ওই মেয়ে নিশ্চয় মা-কে আগের থেকে অনেক বেশি দখল করেছে—করছে। এই সম্ভাবনাটা সব থেকে বেশি অসহ্য। মা সামনে বসে না থাকলে ওকে ধরে সিতু এখানেও দুই-এক ঘা বসিয়ে দিতে পারত। হাতে যা পারে নি মুখে তাই করেছে। শমীর সব প্রশ্ন আর কৌতূহলের জবাবে খেঁকিয়ে উঠেছে।

বেগতিক দেখে নিজে না এসে একলা মামাশ্বশুরকে পাঠিয়েছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু ফিরে এসে তিনি যে খবর দিয়েছেন তাতেও অবাক হয়েছেন। মামাশ্বশুর বলে-ছেন, তুমি যাও নি বলে ছেলেটার মন খারাপ হয়েছে—ভালো করে কথাই কইল না।...আশা করে থাকে তো, ছুটি-ছাটার দিনে নিজেই যেও। তারপর হাসিমুখে জানিয়েছেন, ব্যাটার পেটে পেটে হিংসে আছে, কম করে পাঁচ-সাতবার জেরা করেছে, শমী আজকাল প্রায়ই আসে কিনা, সপ্তাহে কদিন আসে—মা গাড়ি পাঠিয়ে আদর করে তাকে নিয়ে আসে কিনা।

কিন্তু এরপর যখন জ্যোতিরাণী এসে-ছেন—ছেলের সেই একই মুখ। বরং আরো বেশি অসহিষ্ণু, আরো বেশি ক্ষুব্ধ। তিন কথার একটা জবাব মেলে না। শেষে জ্যোতি-রাণী বলেছেন, আমি এলে তোর যদি রাগ হয় আর ভালো করে কথাই না বলিস, এবার থেকে তাহলে শুধু ছোট দাদুকেই পাঠাব—তাহলে ভালো লাগবে তো?

খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে সিতু বলেছে, কাউকে পাঠাতে হবে না!

ছ' মাসের মধ্যেও ছেলের এখানে মন বসল না কেন জ্যোতিরাণী ঠিক বুঝে ওঠেন না। যখনি আসেন শুকনো মুখ দেখেন, আর একটু রোগাও হয়েছে মনে হয়।

মন বসে নি কারণ সিতু এখানে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে। সেই অনুভূতিপ্রবণ নিরাপত্তাবোধের একটা শূন্যতা সর্বদা হাঁ করে আছে যেন। সেই শূন্যতা তাকে গিলতে আসে। সকালে গিলতে চায়, দুপুরে গিলতে চায়, বিকেলে গিলতে চায়, আর রাত্রিতে তো প্রায় তাকে ধরেই ফেলে এক-একদিন। সিতুকে যুঝতে হয়। হয় বলেই মুখ শুকনো, ঠোঁট শুকনো, জিব শুকনো। প্রতি দিনের থেকে প্রতিটি দিন অসহ্য তার কাছে।

হঠাৎ এই নির্বাসন দণ্ডের মেয়াদ ফুরাল।

ছুটি-ছাটা কিছু নেই, এক সকালে ছোট দাদু এসে হাজির। কিন্তু নির্বাসনের মেয়াদ যে একেবারেই ফুরাল সেটা তখনও কেউ জানে না। ছোট দাদুও না, সিতুও না। আপাতত পনেরো বিশ দিনের জন্য বাঁচতে চলেছে সিতু। ঠাকুমার খুব অসুখ তাই নীচের অফিসে কথাবার্তা বলে আর দরখাস্ত দিয়ে ছোট দাদু পনেরো বিশ দিনের জন্য তাকে নিতে এসেছে।

...ঠাকুমাকে সিতু ভালই বাসে, খুবই ভালবাসে। তবু এই হঠাৎ অসুখটার জন্যে মনে মনে ঠাকুমার প্রতি সে কৃতজ্ঞ। ঠাকুমার বিবেচনা আছে। আসতে আসতে ছোট দাদুর কাছে শুনেছে, ঠাকুমা নাকি তাকে দেখার জন্য বায়না ধরেছে, এমন কি এক্ষুনি তাকে নিয়ে যাবার জন্য বাবাকেও বলে-ছেন।...ভুগছে তো অনেক দিন ধরেই, এ-রকম বায়না বুড়ী মাঝে-সাজে করলেই তো পারে। এবারে সে চুপি-চুপি সেই পরামর্শই দিয়ে আসবে।

(ক্রমশ)

পরলোকে

তরুণ শিল্পী নিখিল বিশ্বাস

চিত্ররসিক

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে শিল্পপ্রেমিকদের কাছে শিল্পসংবাদ পরিবেশন করব বলে মনে করেছিলাম কিন্তু নিখিল বিশ্বাস সে সাধে বাদ সাধলেন। একটা বড় দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু করতে হল। গত ১০ই নভেম্বর অল্পকাল রোগ ভোগের পর সুখলাল কার্ণানী হাসপাতালে নিখিল বিশ্বাস মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে অনেকখানি ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি অপূর্ণ রেখে মারা গেলেন। দীর্ঘকায় সুস্থ সবল মানুষটি যে এরকম আকস্মিকভাবে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীদের ছেড়ে চলে যাবেন তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাই-ই হল। এক বছরের মধ্যে দুজন প্রতিভাবান শিল্পীকে আমরা হারালাম। গত ডিসেম্বরে কিশোরী রায় এবং এ-বছর নিখিল বিশ্বাস (আরো তরুণ বয়সে) চিরকালের মত শিল্পসৃষ্টি বন্ধ করলেন। ফুটপাথে প্রদর্শনী করে নিখিল বিশ্বাস শিল্পীসমাজে আপন স্থান করে নিতে শুরু করেন। আর সেদিন তাঁর ছবি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে প্রদর্শিত ও প্রভূত প্রশংসিত হল। সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস্, ক্যালকাটা পেন্টার্স প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। যে অল্প কয়েকজন শিল্পী নিয়মিতভাবে কাজ করে যান, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ড্রাফ্টম্যানশিপের উন্নতির দিকে তিনি এক লক্ষ্যে সাধনা করতেন। গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর কাজের মধ্যে একটা বলিষ্ঠতা, মানবিকতা এবং আঙ্গিকের উৎকর্ষতার প্রশংসনীয় উন্নতি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তার পূর্ণ পরিণতি হবার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। তাঁর শিল্পীবন্ধুরা তাঁর শিল্পসাধনার একটি প্রদর্শনী আয়োজনের কথা চিন্তা করছেন। আশা করি তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করতে কলকাতার শিল্পী-সংস্থা ও শিল্পানুরাগীরা এগিয়ে আসবেন।

শিল্পী : নিখিল বিশ্বাস

শিল্প পরিচয়

অক্টোবরের মাঝামাঝি (১৩ থেকে ১৭ই) রাখাল দাস ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পাশে সদর স্ট্রীটে পথের ধারে তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী করেন। স্টেট ট্রান্সপোর্টের কর্মী রাখাল দাস তাঁর প্যাস্টেল ড্রইংগুলির জন্যে সুবিখ্যাত হয়েছেন। এই প্রদর্শনীতে ত্রিশখানির ওপর প্যাস্টেল ও তৈলচিত্রের সমাবেশ করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তাড়াতাড়ি প্রদর্শনীর আয়োজন করার ফলে নতুন ছবি বিশেষ কিছু দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে আয়োজিত তাঁর একক প্রদর্শনীতে এর অধিকাংশের সাক্ষাৎ মিলেছে। তাঁর তেলরং এবং প্যাস্টেলের কাজগুলি দুভাগে ভাগ করা যায়। শহরতলীর নিসর্গ দৃশ্যের রোমান্টিক ছবিগুলি প্যাস্টেলে আঁকা এবং জীবনের গভীরতর বেদনা বা নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি তিনি তেলরংএর ছবিতে ফোটাতে চেয়েছেন।

●

নভেম্বরের ২রা থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শিল্পী বিমল করের একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীকরের জন্ম কুমিল্লায়, শিল্প-শিক্ষা কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে। পরে দিল্লীতে ইউনেস্কোর এক বিশেষজ্ঞের কাছে দিল্লীতে আরো কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। এছাড়া ফটোগ্রাফি ও সংগীত-চর্চার শখও তাঁর আছে। শ্রীকরের প্রদর্শিত সত্রিশখানি ছবির মধ্যে তাঁর জলরং, প্যাস্টেল এবং তৈল মাধ্যমে কাজের যে নমুনা পাওয়া গেল তার মান, তাঁর মত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীর পক্ষে খুব উন্নত বলা চলে না। শ্রীকর অতিআধুনিক শিল্পীদের মত নন্‌ফিগারেটিভ কাজের দিকে ঝোঁক দেননি কিন্তু ফিগারেটিভ কাজও খুব একটা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন বলে মনে হল না। তাঁর কাজের মধ্যে একটা অ্যামেচারিশ ভাব অত্যন্ত প্রকট। কয়েকটি প্যাস্টেলের নিসর্গদৃশ্য ও প্রতিকৃতি এবং তেলরংএ আত্মপ্রতিকৃতিটি কোনমতে চলনসই বলা যায়। তেলরংয়ে দিনমজুরের ইঁটভাঙ্গার ছবিটিতে আবহাওয়া সৃষ্টির কাজে কিছুটা সাফল্যলাভের লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে দেখা গেল। শ্রীকর চিরাচরিত পন্থা ও আধুনিক বিমূর্ত শিল্পকলা এই দুয়ের মধ্যে কোনটাকে বেছে নেবেন তা বোধহয় স্থির করতে পারেননি।

●

নভেম্বরের তিন তারিখে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে চিমনলাল পেপার কোম্পানী ভারতে হস্তনির্মিত কাগজের একটি সুন্দর প্রদর্শনী করেন। এঁরা ভারতের হাতেতৈরী কাগজের প্রাচীন

শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের কাগজ অনেকদিন থেকে তৈরী হয়ে আসছে। এ'রা সেই সব কারিগরদের কাছ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে বাজারে উপস্থিত করতে চেষ্টা করছেন। এ'দের প্রদর্শিত কাগজের মধ্যে, বর্ধমান, নেপাল, দেরাদুন, হায়দ্রাবাদ, দার্জিলিং, কেরল, রাজস্থান, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় তৈরী বিভিন্ন ধরণের কাগজের নমুনা পাওয়া গেল। এই সব কাগজের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারেরও নমুনা এ'রা উপস্থিত করেছিলেন। ব্যক্তিগত চিঠির কাগজ ও খাম, নানা ধরণের কার্ড, টেবল ম্যাট, উপহার মোড়বার কাগজ, ন্যাপকিন প্রভৃতি বহু রকমের ব্যবহারে হস্তনির্মিত কাগজকে লাগানো হয়েছে। এছাড়া জলরংয়ে কাজ করার জন্যে পুরু সাদা কাগজের চাহিদা মেটাবার মত কাগজও এ'রা প্রস্তুত করিয়েছেন। এটি যদি বিলিতী কাগজের

প্রসাধন — শিল্পী : বিমল কর
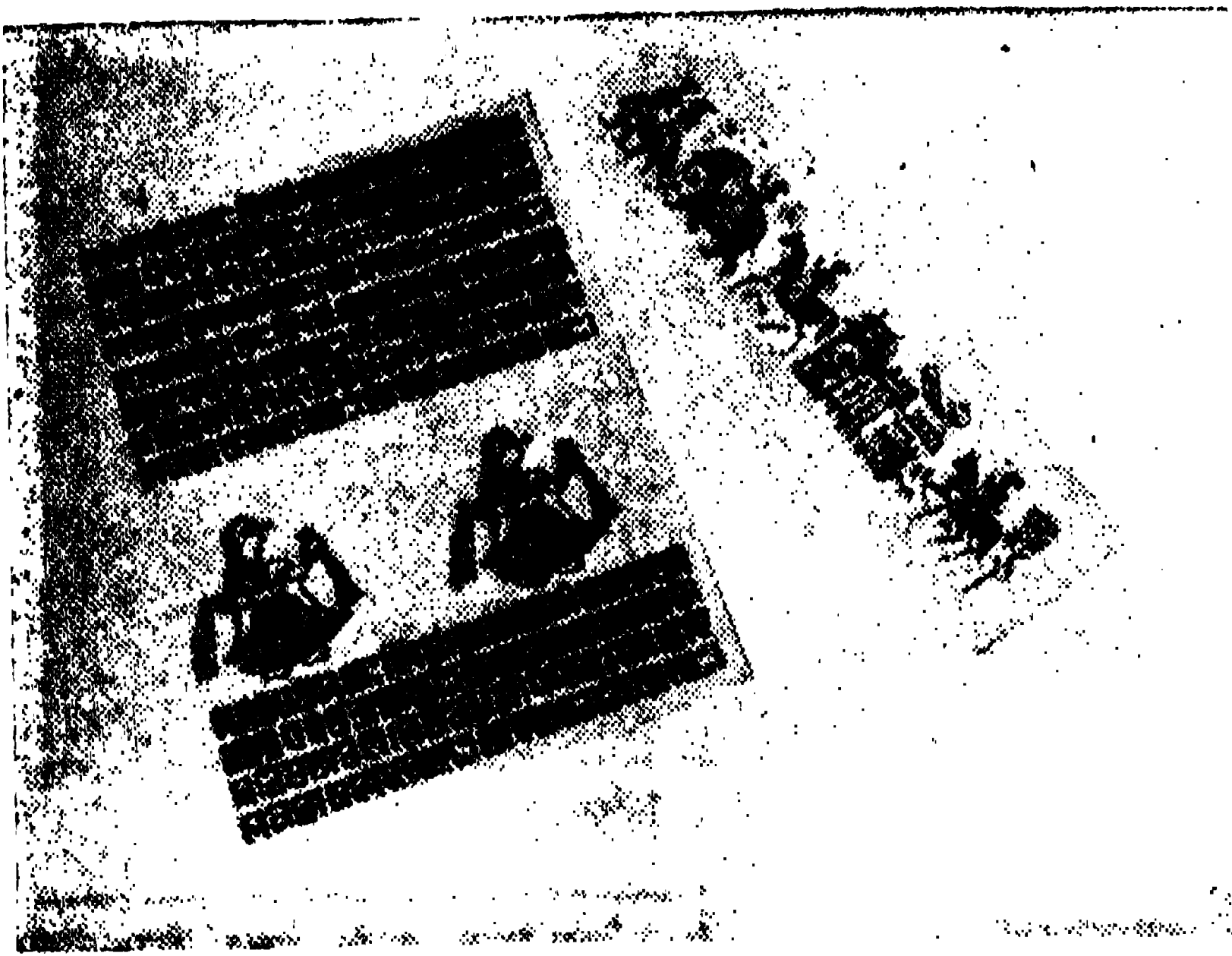
হস্তনির্মিত কাগজে ছাপা গ্রীটিং কার্ড

মত ব্যবহারযোগ্য হয় ত শিল্পীদের একটি বিশেষ চাহিদা মিটবে।

●

সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিস্টস্-এর অন্যতম সদস্য শ্যামল দত্তরায়ের একটি উল্লেখযোগ্য একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে ৫ই থেকে ১১ই নভেম্বর হয়ে গেল। শ্রীদত্তরায় এই গোষ্ঠীর শুরু থেকে এ'দের আয়োজিত সমস্ত প্রদর্শনীতেই ছবি দিয়ে আসছেন। তবে একসঙ্গে সাঁইত্রিশখানি জলরং, তেলরং ও গ্রাফিকের কাজ নিয়ে একক প্রদর্শনী বোধ হয় এই প্রথম করলেন। অধিকাংশ ছবিই তাঁর হালআমলের কাজ। তাঁর আগের কাজের পরিণতির নিদর্শন। তাঁর পুরানো কাজের ফর্ম নিয়ে ভাঙা-চোরার পরীক্ষার পালা শেষ করে এখন তাঁর [illegible] বিমূর্ত ডিজাইন সৃষ্টির দিকে একাগ্রভাবে মনঃসংযোগ করেছেন বলে মনে হল। তাঁর জলরংয়ের কাজগুলি দুঃখের বিষয় আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করতে পারেনি। শ্রীদত্তরায়ের আগেকার জলরঙের কাজ বেশ ভাল লাগত। এই ছবিগুলিতে জলরঙের ব্যবহার অতি সীমাবদ্ধ। কালিকলমের নকশারই প্রাধান্য বেশী। এ এক ধরণের গ্রাফিক কাজেরই নিদর্শন বলে মনে করা যেতে পারে। আঙ্গিকের প্রয়োগটাই বেশী করে চোখে পড়ে এবং সমগ্র ছবিগুলির মধ্যে কতগুলি বিশেষ ধরনের নক্শার পৌনঃপুনিক প্রয়োগ কিছুটা একঘেয়েমির সৃষ্টি করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর তেলরঙের কাজের মধ্যে রঙ এবং ডিজাইনের বাহার অনেক বেশী আকৃষ্ট করে। তাঁর রঙের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ও নয়ন-তৃপ্তিকর ভাব অনেক বেশী পরিস্ফুট। কম্পোজিশনের বাঁধুনি অনেক সুচিন্তিত এবং বক্তব্যের অভাবও অনেক ক্ষেত্রে প্রায় চিরা-চরিত। শিল্পীর আঙ্গিকে দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গ্রাফিকের কাজগুলির মধ্যে।

দি নাইট আই রিমেম্বার — শিল্পী : শ্যামল দত্তরায়

ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য

গৌতম বসু

এটা আমাদের একদেশদর্শিতার ফল কিনা জানি না তবে খুবই সত্যকথা যে, আমরা নিজেদের কাছাকাছি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সামান্য ওয়াকিবহাল হলেও সেই দেশের সাহিত্য সম্পর্কে প্রায় কিছুই খবর রাখি না। অথচ অপেক্ষাকৃত দূরদেশের সাহিত্য-শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ঢের বেশী লক্ষ্য করা যায়। নইলে যে ইন্দোনেশিয়া কোন এক সময়ে ছিল বৃহৎ ভারতের সঙ্গে গাঁটছড়া বন্ধনে আবদ্ধ সে দেশের লেখক সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই কেন? কিংবা তাঁদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অস্বাভাবিক নিরুৎসাহিত হই কেন? বলাবাহুল্য এই প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা বলতে পারি নিঃসন্দেহেই এই অবস্থা খুব দুঃখজনক এবং কিছুটা লজ্জারও বটে।

অবশ্য একথা ঠিক যে ভারতীয় কিংবা চীনা-জাপানী সাহিত্যের মতো ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য তেমন কোন সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী নয়। এমন কি ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষা 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া'র বয়সও খুব কম। এই 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া'র ধারণা স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল আজ থেকে ঠিক আটত্রিশ বছর আগে এক যুব সম্মেলনে। সেটা ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাস। জাকার্তায় সংঘটিত হল 'সারা ইন্দোনেশীয় যুব সমাবেশ'। সম্মেলন থেকে ধ্বনিত হল স্বাতন্ত্র্যের দাবি—এখানকার সব অধিবাসীই এক-ইন্দোনেশীয় জনগণ এবং তাঁদের জাতীয় ভাষা হিসেবে সর্বসাধারণবোধ্য একটি ভাষা স্বীকৃত পেল, নাম তার দেওয়া হল 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া'। সত্যি কথা বলতে, এই 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া' হল মালয়ী ভাষারই এক বিশেষ আধুনিক প্রক্ষেপণ।

সর্বসাধারণবোধ্য 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া'কে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংহতি বেশ দৃঢ় হল। বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলো এখন যেন একে অপরের আরো বেশী কাছে এল, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় হল বহুল পরিমাণে। জাতীয়তাবোধ তীব্রভাবে বাসা বাঁধল সকলের মধ্যে। এক জাতি, এক প্রাণ একতার শ্লোগান হল দুর্জয়।

যদিও আজকের ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য বেশ কিছুটা রাজনৈতিক মতবাদঘেঁষা তবু বলা যায় এ-অবস্থা বরাবর ছিল না। অবশ্য প্রথম যুগেও সাহিত্যরচনার পিছনে জাতীয়তাবাদের তাগিদ অনুভব করেছিলেন লেখকেরা। সে প্রায় ১৯৩০ সালের কথা। এ সময় ইন্দোনেশীয় বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগই তাঁদের সৃষ্টি-ক্ষমতা ব্যয় করেছিলেন 'ভাষা ইন্দোনেশিয়া'কে সমৃদ্ধ করতে। এ ভাষাকে সকল রকম ভাবপ্রকাশের বাহন করে তুলতে তাঁদের চিন্তাভাবনার অন্ত ছিল না। এর জন্যে তাঁরা গরম গরম রাজনৈতিক বুলি কপচানো বা ইস্তেহার রচনার চেয়ে ঢের ঢের বেশী গঠনমূলক সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। সে-সময়কার সাহিত্যে কিছু পরিমাণে রাজনীতির গন্ধ ছিল আর ছিল বাইরের জগৎ সম্পর্কে সন্দেহ এবং সংশয়। বর্তমান জীবনের ক্লান্তি নৈরাশ্য আর অনিশ্চয়তা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করল। লেখকেরা বুঝতে পারলেন তাঁদের পায়ের তলাকার মাটি যেন সরে যাচ্ছে, কোথাও কোন আদর্শ নেই, আশ্রয়ের জায়গা নেই।

পৃথিবীকে এই যে স্বপ্নভঙ্গজনিত হতাশার চোখে দেখা তা অনেকটা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে বলা যায়। নিজেদের ঐতিহ্যকে তেমন মূল্য দিতে না শিখে হঠাৎ যেভাবে এযুগের সাহিত্যিকেরা বিদেশী হাওয়ায় প্রবল ধাক্কা মারতে চাইলেন তাতে সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনার দিক থেকে খুব বেশী উপকার হল না। সবাই এক ছাঁচে সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগলেন। ফলে ইন্দোনেশীয় সাহিত্য শৈশবেই একরকম বৈচিত্র্যহীন, আশাহীন, জীবনহীন হয়ে পড়ল।

যখন এই অবস্থা, তখন বাইরের জীবনে এল প্রচণ্ড ধাক্কা। নতুন মোড় নিল ইন্দোনেশীয় সাহিত্য। জাপান আক্রমণ করল ইন্দোনেশিয়া। সামাজিক জীবনের কাঠামোটা একরকম ভেঙে চুরমার হবার উপক্রম। জীবনের প্রতি সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের পাল্টে গেল। সাহিত্যে এরই প্রতিফলন ঘটতে শুরু হল। তরুণতর বুদ্ধিজীবীরা নতুন ধাঁচের জিনিস নিয়ে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে হাজির হলেন। বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের নতুন দৃষ্টি দিল, প্রকাশভঙ্গিতেও ঘটল আশ্চর্যজনক পরিবর্তন। কেউ কেউ আবার এ সময় ঊনিশশতকীয় ফরাসী প্রতীকীবাদ দ্বারা আন্দোলিত হলেন। নতুন ঢেউ এল কবিতায়। প্রতীকীবাদ আন্দোলন জোরদার হল। ইন্দোনেশীয় কবিতার ক্ষেত্রে এর ফল যে খুব ভালো হয়েছে সেকথা না বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না।

এদিক থেকে যে ইন্দোনেশীয় কবি সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন, তিনি হলেন চেয়ারিল আনোয়ার (১৯২২-৪৯)। ইনি সর্বান্তকরণে সবরকম সমাজ-ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে অস্বীকার করেছেন এবং পরস্পর-বিরোধী দুই মনোভাবের সঙ্গে আপোষরফা করেননি। আপাত বোহিমিয়ান ভাব এবং উপরিতল থেকে উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের প্রতি তাঁর অনুরাগ রয়েছে বলে মনে হলেও তিনি ছিলেন আসলে নীতিবাগীশ লেখক। বলা বাহুল্য, তাঁর এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাক-যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর ইন্দোনেশীয় কবিতার মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। অবশ্য তাঁর এই নীতিবোধকে যদি কেউ সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করেন, তবে কবির প্রতি খুব অবিচার করা হবে। এটা ঠিক নীতিশাস্ত্রগত নীতিবোধ নয়।

মাত্র ২৭ বছরের স্বল্পজীবনে তিনি ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে যে-স্থান গ্রহণ করেছেন, তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। অন্যান্য কবিদের মধ্যে সিতোর সিতুমোরাং, ডবলু, এস রেন্ড্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিতুমোরাং অনেকটা আনোয়ারের অনুরাগী। তাঁর কবিতায় রাজনীতি স্বাধীনতা এবং জাপানী আক্রমণ বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। রেন্ড্রা হলেন সবচেয়ে তরুণ কবি। তাঁর কবিতায় ধর্মীয় চেতনা এবং প্রেমই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

যে প্রতীকীবাদ ইন্দোনেশীয় কবিতায় নতুন জোয়ার এনেছিল, তার ঢেউ এসে লাগল গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে। এদিক থেকে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি হলেন ত্রিশনো সমারদজো। ১৯১৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ইঁদুর এবং মানুষ' গল্পটি ইন্দোনেশীয় গল্পের ক্ষেত্রে একদা ভীষণ আলোড়ন তুলেছিল, এর মধ্যে সে-সময়কার ইন্দোনেশিয়ার দারিদ্র্য যেমন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি মানুষের জয়গানও এখানে ঘোষিত হয়েছে।

অন্যান্য যে সমস্ত গদ্যলেখক ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে অনন্ত তুর (১৯২৫—) উল্লেখযোগ্য। তাঁকে বলা যেতে পারে 'বৈপ্লবিক সংগ্রামের' লেখক। তাঁর গল্পে যুদ্ধের বিভীষিকা প্রকট হয়ে উঠেছে সত্য, তবে মানবিক মূল্যবোধে লেখকের আস্থা হারাননি। আর একজন গল্পলেখক ইতিমধ্যে খুব আলোড়ন তুলেছেন। তিনি হলেন আব্দুল্লাহ কাদ্রী মিহারদজা। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি গল্প ইন্দোনেশীয় বুদ্ধিজীবীমহলকে বেশ চমকিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে সকলের নজর পড়ল। রাতারাতি তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। গল্পটি যে-কারণে এত চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল তা হচ্ছে সে-সময়কার ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে লেখক আত্মবিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস আর প্রেমই আজকের ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের একটা বিরাট জায়গা দখল করে রয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস এই পথেই ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের মুক্তি।

বুদ্ধমূর্তি মুক্তিনাথ
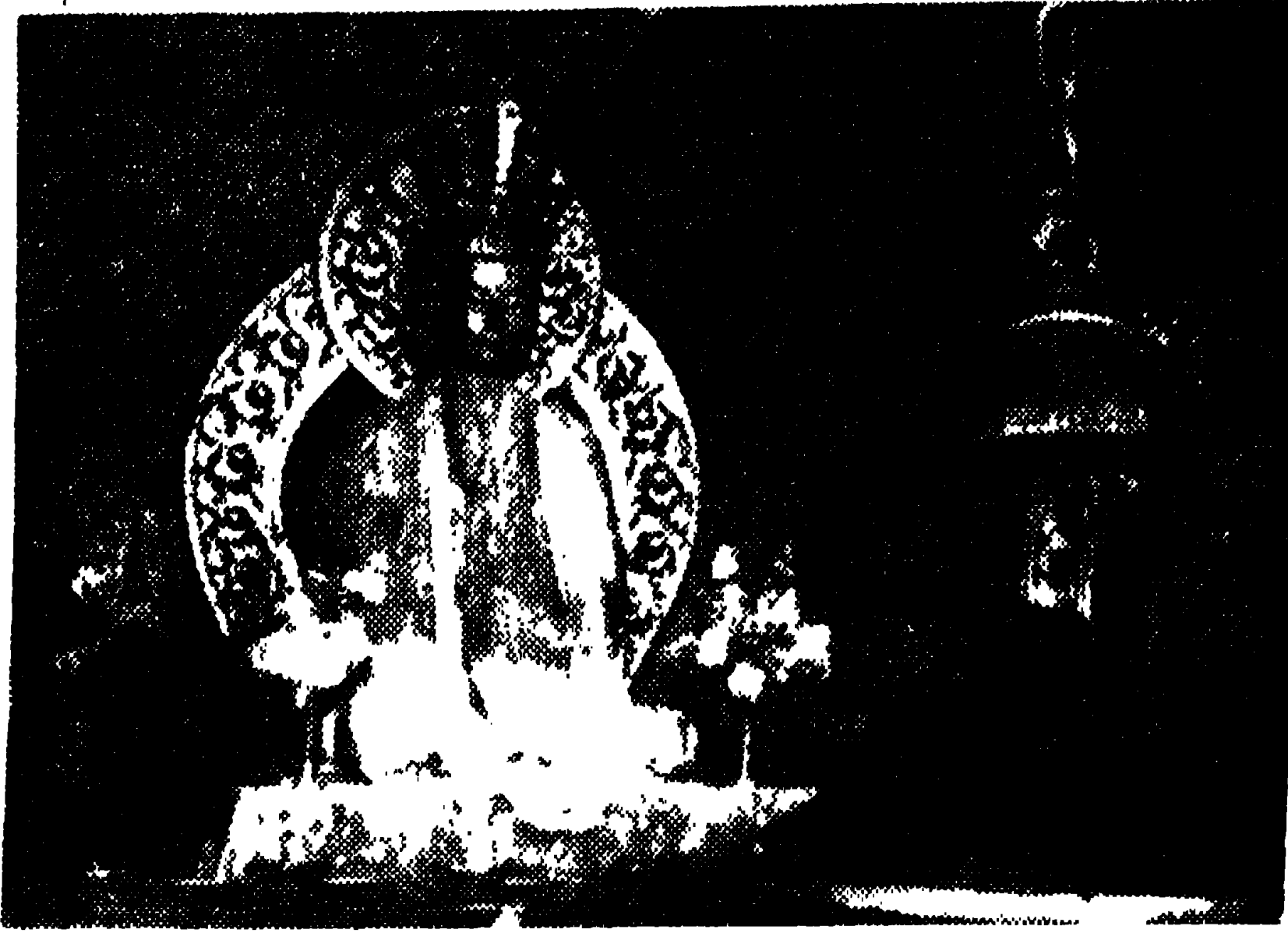
মুক্তিক্ষেত্র মুক্তিনাথ

ভক্তি বিশ্বাস

"—ও মণি! এবার তাহলে যাওয়া হোল না, কি বল?" হতাশভরা কণ্ঠে উমাপ্রসাদ দাদা বল্লেন আমার স্বামী মিঃ বিশ্বাসকে

"এই নিয়ে তিনবার বাধা পেলাম, জান! একবার তো টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রওনা হবার দুদিন আগে চিঠি এলো বিরাট একটা ল্যাণ্ডসাইড-এ পথ ধ্বসে গেছে, মেরামত করতে দুমাস লাগবে। কি আর করা। টিকিট ফেরৎ দিয়ে আবার কেদার-বদ্রীর দিকে গেলাম।"

তিনজনা নির্বাক হয়ে বসে বসে ভাবি।

যুদ্ধ বেধে গেল হঠাৎ, পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে ৫ই সেপ্টেম্বর '৬৫। আমাদের টিকিট কেনা, মালপত্র বাঁধাছাঁদা সব শেষ। কিন্তু এই অনিশ্চিত অবস্থায় ঘর ছেড়ে বেরুনোই তো মুস্কিল।

একটু থেমে দাদা বল্লেন, "তাহলে, মুক্তিনাথ এবারেও হোল না।"

কিন্তু হোল না বললেই হোল? আমরা এখানে থাকলেও আমাদের মন যে চলে গেছে সেই দুর্গম রাজ্যের পথে, সেই যে পথ চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম শৃঙ্গগুলির অন্যতম দুটি পর্বত অন্নপূর্ণা ও ধোলাগিরি-শৈলমালার মধ্য দিয়ে! উত্তরে তিব্বতের মালভূমি থেকে নেমে এসেছে কালীগণ্ডকী নদী, এই দুটি চিরতুষারাবৃত গিরিমালার মধ্য দিয়ে পথ করে, তারই তীর ধরে ধরে চলবার পথ! সে পথ যে সৌন্দর্যের আধার, সৌন্দর্য-পিপাসুর স্বর্গ!

নেপালের "পশুপতিনাথের" মন্দিরের নামডাক বেশী, কিন্তু "মুক্তিনাথে"র নাম কটা লোকেই বা জানে, সে পথে যায়ই বা ক'জন? কিন্তু যে আকর্ষণে আমরা ঐ কঠিন তীর্থে যাবার বাসনা করেছি, সে কি কেবল তীর্থেরই টানে? বহুরূপী হিমালয় তার নব নব রূপের আকর্ষণে আমাদের মন টানে, তাই যেমন প্রতি বৎসর পথে বের হয়ে পড়ি, এবারও তেমনি চেষ্টা করা হচ্ছিল; এমন সময় এই বিপত্তি!

রাত্রির অবসানে আসে ঊষার আলো, আমাদের দুঃসময়েরও এক সময় অবসান হোল, যুদ্ধ শেষ হোল। হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই আবার শেষ হোলো। আর দেরী নয়, আমরা তাড়াতাড়ি করে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম।

কলকাতা ছেড়ে বারাউনি হয়ে গোরক্ষপুর পেঁছুনো গেল ১লা অক্টোবর '৬৫ সাল। গোরক্ষপুর থেকেও ৩৪ মাইল দূরে আছে কুশীনগর। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব এখানে মহাপ্রয়াণ করেছিলেন। এত কাছে এসে কুশীনগর না দেখেই যাবো, তাই তাড়াতাড়ি করে একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করে ফেললেন দাদা। কুশীনগরে প্রাচীন নগরীর ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে, নতুন তৈরী মনোরম বৌদ্ধমন্দির আছে, কোনটি বার্মিজদের তৈরী; কোনটা চীনাদের, কোনটা ভারতীয়। এই মহাপুরুষ যেখানে মহাপ্রয়াণ করেন, সেই জায়গাটিতে আছে সবুজ ঘাসঢাকা বিশাল একটি মৃত্তিকা স্তূপ; চারিদিকে লালমাটির পথ দিয়ে চলে স্তূপটিকে প্রদক্ষিণ করা। পথের ধারে ধারে আছে সযত্নরোপিত ফুলগাছের সারি। গম্ভীর ভাবপূর্ণ পরিবেশ, শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই নুয়ে আসে মহামানবের স্মৃতিভরা তীর্থে।

বিকালের ট্রেনে গোরক্ষপুর ছাড়বার কথা, যাবো নওতনওয়াতে কিন্তু নতুন টাইমটেবলের গোলযোগের জন্য ট্রেন ফেল করে রাত্রির ট্রেনে চাপলাম। নওতনওয়াতে রাত একটাতে পেঁছেও কোন অসুবিধা হোল না। গোরক্ষপুরের ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মিত্র দাদার বিশেষ বন্ধু, তাঁর লোক আমাদের নিয়ে ডাকবাংলোতে যাবার জন্য অত রাত্রেও জিপ নিয়ে হাজির ছিল। পরদিন প্রত্যুষে তারাই জিপ ও সাইকেল রিক্সা করে আমাদের ভৈরবাতে পেঁছে দিলেন। পথে ভারত-নেপাল সীমান্ত পার হয়ে এলাম। মাঝপথে তাই কাস্টমসের ঝামেলা। মাইল দশেক দূরে ভৈরবা পেঁছে সেখানে প্লেন ধরবো, যাবো মধ্যনেপালের পোখারা শহরে। সেখান থেকে এবারের পদযাত্রা শুরু হবে।

নেপালের সীমান্ত শহর ভৈরবা। এখানে আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন ওখানকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ কোরেশী। হাসিখুশী, মোটাসোটা অবাঙালী মুসলমান, ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। কেরোসিন পেট্রোল জাতীয় যাবতীয় তেলের একচ্ছত্র ব্যবসা ওখানে তাঁর। এছাড়া ইঁটের ভাঁটি, মদের ভাঁটিও রয়েছে। ভৈরবাতে থাকবার যোগ্য সাধারণ হোটেল আছে। কিন্তু মিঃ কোরেশীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁর দোকানে মালপত্র রেখে তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করলাম।

ভৈরবার দিনটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যেন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বসে আছি ট্রেনের অপেক্ষাতে! বিকালে যখন স্থিরনিশ্চয় হওয়া গেল যে কাল দুপুরের আগে আর কোন প্লেন পাওয়া যাবে না, তখন আমরা মিঃ কোরেশীর গৃহে থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম!

"তবে আমরা নেপালে এলাম, কি বল? লোকের কাছে বলতে পারব নেপালে গিয়েছি," আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে দাদা বল্লেন। "যা হচ্ছিল, তাতে আসবো এমন আশাই করিনি।" মিঃ বিশ্বাস উত্তর দেন নিশ্চিন্ত সুরে।

ভৈরবা একেবারে সীমান্তের শহর। এখানকার পথেঘাটে ভারতীয় নেপালী একাকার হয়ে মিশে গেছে, বেছে আলাদা করা যায় না। চেহারা বা চালচলন কোনটাতেই দুই জাতের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট নয়। শহরটি ছোট, সন্ধ্যে হতেই এত নির্জন বোধ হল মনে হয় যেন নিশুতি রাত। কেবল শহরের বাতিগুলি মিটমিট করে জ্বলছে, দূরে আকাশের গায়ে হিমালয়কে কতো দূরের বলে বোধ হচ্ছে। ঐদিকে বাসের পথ চলে গেছে বুটোয়ালের দিকে। মাথার উপর তারাভরা নীলাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

বুদ্ধদেবের জন্ম লুম্বিনীতে। ভৈরবা থেকে মোটরে ২১ মাইল গেলে লুম্বিনী পাওয়া যায়। ভৈরবা এয়ারপোর্টের নাম লুম্বিনী এয়ারপোর্ট। এখন বর্ষার পর পথে নদী পার হওয়া অসম্ভব জেনে আমাদের লুম্বিনী দেখবার আশা ত্যাগ করতে হোল।

এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নেপালে ঢুকতে পেরেছি, এতেই আমরা খুশী!

মিঃ কোরেশী বেলাবেলি খেয়ে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। বেশ গরম, তাই বারান্দায় চারখানা চারপাই পেতে শোবার জায়গা করে নিলাম। কোন কাজ নেই, তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি। কিন্তু

ঘুমাবো কি, সারারাত ঘরের পাশে একটা কুকুর একটানা চিৎকার করে চলেছে, সেটাকে অনেক কষ্টে তাড়ানো হল, তো কানের পাশে মশার ভোঁ ভোঁ! সহস্র সহস্র মশা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। অতিষ্ঠ হয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুই, তখন আবার সেই কুকুরের কাতরানি শুরু হোল। প্রচণ্ড গরম, চারিদিক থম্‌থম্ করছে, হাওয়া নেই একটুও। আমার স্বামী নিদ্রার আশা ত্যাগ করে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে মশা তাড়াচ্ছেন, আমরা তারই সুবিধা নিয়ে মাঝে মাঝে তন্দ্রায় ঢলে পড়ছি। আমাদের সঙ্গে এসেছে আমাদের ভাগ্নে, নাম তার বন্ধু। সে কিন্তু আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে মশা কমে গেল, তখন আবার মাছিরা এলো দল বেঁধে আক্রমণ করতে। কাল দিনমানে যেন অতটা বুঝিনি। বেলা ন'টা বাজতে বাজতেই অতিষ্ঠ হয়ে আমরা মালপত্র নিয়ে লুম্বিনী এয়ারপোর্টে গিয়ে হাজির হলাম।

এখানে আলাপ হোল মিঃ রায়ের সঙ্গে, এয়ারপোর্টের স্টেশন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বাঙ্গালী ভদ্রলোক, মিষ্টভাষী। আমাদের অনুরোধে তিনি পোখারার ট্যুরিস্ট অফিসারের কাছে আমাদের আগমন-বার্তা জানিয়ে ওয়্যারলেসে খবর পাঠালেন। প্লেন এলো প্রায় একটার সময়। প্লেন আসতেই তিনি প্লেনের পাইলট ক্যাপ্টেন বালসারা ও বাচ্চা নেপালী কো-পাইলটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁরাও আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশী। প্লেনের রেডিও অফিসার মিঃ আনিস হোসেনও এগিয়ে এসেছেন। তিনি আমার স্বামীকে দেখেই চিনেছেন, তাঁর দাদা মহবুব ওঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন চুয়াডাঙ্গার স্কুলে। এরা সাদরে আহ্বান করে আমাদের চারজনকে প্লেনের কক্‌পিটে তাঁদের বসবার জায়গাতে নিয়ে গেলেন নেপালের দুর্লভ দৃশ্য দেখাবার উদ্দেশ্যে।

উড়লো প্লেন, আমরা কক্‌পিট থেকে নীচে দেখছি, সিনেমার ছবি যেন চোখের সামনে সরে সরে যাচ্ছে। পথ চলেছে, নদী বয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, সবুজ জলভরা পুষ্করিণী ঘিরে গ্রামের লাল টালী ও শন-ছাওয়া ঘরবাড়ী। গ্রামগুলি ঘিরে শস্যক্ষেত্র সবুজ হয়ে আছে। ক্রমে ক্রমে এই দৃশ্য মিলিয়ে এগিয়ে আসে তরাই-এর বনভূমি। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি-পূর্ণ তরাই-এর জঙ্গল, উপর থেকে মনে হয় যেন ছোট ছোট ঝোপে ঢাকা দিগন্তবিস্তৃত চারণভূমি। ছেদ নেই, বিরাম নেই। মাইলের পর মাইল চলেছে তো চলেইছে। কিছুদূর এগিয়ে ওই জঙ্গলই যেন উঁচু হয়ে উঠলো। তরাই-এর পর বনসমাচ্ছন্ন শৈবালিক পার্বত্য অঞ্চলের শুরু। দুই একটি পর্বতমালার পরই পাহাড়ী গ্রাম দেখা যেতে লাগলো। ছোট ছোট পাহাড়গুলির চূড়া থেকে নীচের উপত্যকা অবধি ধাপে ধাপে চাষের ক্ষেত নেমে গেছে—এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ছড়ানো দুটি একটি গ্রাম। কয়েকটি সবুজ পর্বতমালা পেরিয়ে মহাভারতশ্রেণী পর্বতমালা, তার সমান্তরালে চলেছে বিরাট একটি পুরাতন নদীর শুষ্ক চওড়া বুক, নেপাল রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। আমরা সোজাসুজি ঐ অঞ্চল পার হয়ে আরও উত্তরে চলেছি। আরও নতুন নতুন গ্রাম ঘিরে ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ ক্ষেত দেখা গেল। নেপালের মধ্যাঞ্চলে পৌঁছে গেলাম আমরা। দূরে দিগন্তরেখাতে স্তর স্তর পর্বতমালা আকাশে মিশেছে, সেই মিলন-ক্ষেত্রে নেপালের বিখ্যাত চিরতুষারময় হিম-শৈলরাজি আবছা আবছা দেখা যেতে লাগলো। কো-পাইলট দেখাচ্ছেন—

ঐ দেখুন বাঁয়ে ধৌলাগিরি, ঐ যে অন্নপূর্ণা, ঐটি মচ্ছপুছারে—অন্নপূর্ণা গিরিমালারই একটি শিখর। ডাইনে হিমল-চুলী, আরও দূরে মানাস্‌লু।

মেঘের পর্দা ঠেলে ফেলে উজ্জ্বলরূপে এগিয়ে এসেছে অনুপম সৌন্দর্যরাশি, আমাদের হৃদস্পন্দন যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, নিঃশব্দে কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি।

আমরা উত্তরের এই সকল হিমশিখরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।

নীচে এখনো সবুজ ক্ষেতঢাকা পর্বত-মালার সারি। পাহাড়ের নীচ থেকে চূড়া অবধি ধাপে ধাপে ক্ষেত তৈরী করা, তার উপর দিয়ে আমাদের প্লেন উড়ে চলেছে। এমনি একটি পর্বতমালাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতেই পোখারা শহর দেখা গেল। প্লেন বেঁকে ঘুরে ধীরে ধীরে নামলো এয়ার-পোর্টে। আমাদের বাঁয়ে রইল নীল জলভরা পোখারার সৌন্দর্যময় "কিউয়া" হ্রদ। যেন ইন্দ্রনীলমণি বসানো রয়েছে ওখানে, তার রংটি এমনি মনোরম। পঁচিশ মিনিট লাগলো ভৈরবা থেকে পোখারা আসতে।

পোখারা শহরটি বিরাট একটি সবুজ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। জিওলজিস্টরা বলেন, এক সময়ে এখানকার সমস্ত এলাকা জুড়ে বিরাট একটি হ্রদ ছিল। এখনকার হ্রদ তারই অবশেষ। এয়ারপোর্টের অবস্থিতি বড় সুন্দর। চারিদিকে ঘনসবুজ শৈলরাজি, উত্তরদিকে সারি সারি তুষার-শিখর। ফিউয়া হ্রদ এয়ারপোর্ট থেকে মাইল খানেক দূরে। হ্রদের জলে নীলাকাশের ছায়ার সঙ্গে সবগুলি তুষারশৃঙ্গের ছায়া পড়ে—যেন বিশাল একখানা আরসিতে মুখ দেখা! মুক্তিনাথ থেকে ফিরে একদিন ঐ দৃশ্য দেখতে এসেছিলাম। সেদিন হাওয়া বইছিল ধীরে ধীরে। মৃদু হাওয়াতে অপরূপ ছবিভরা আরসীখানা কে যেন বারে বারে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিচ্ছিল। নিশ্চল হ্রদের বুকে তুষারশুভ্রশৃঙ্গ 'ফিস্‌টেইলের' প্রতিবিম্বের সৌন্দর্যের জগৎজোড়া খ্যাতি।

সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে, তারপর প্লেনে চড়ে পৌঁছতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন আমাদের পথচলার উৎসাহের আর কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। তবু কর্তব্যের খাতিরে মিঃ বিশ্বাস দাদা আর বন্ধু গেলেন ট্যুরিস্ট অফিসে হোটেল ঠিক করতে, আর আমি রইলাম জিনিসপত্র নিয়ে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু ফিরে এলো, Sun n' Snow হোটেলে জায়গা নেই, আজ রাতের জন্য কেবল অমর হোটেলে স্থান পাওয়া যেতে পারে। হোটেলের মালিক একটি মেয়ে বলেছে, কাল ভোরে তাদের আত্মীয়স্বজন আসবে পূজা উপলক্ষ্যে, সুতরাং কাল ঘর খালি করে দিতে হবে, আমরা আপাততঃ তাতেই রাজী।

অমর হোটেলের কথা শুনে ট্যুরিস্ট অফিসার মুখ টিপে হেসে বললেন, "All right, you will feel homely there!"

বন্ধু তাঁর বক্রোক্তি শুনে এসে আমাকে বলছে—"মামা তো মানছেন না। ওখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু আমি বলি কি, আজ রাতটা না হয় ট্যুরিস্ট বাংলোর মাঠে তাঁবু পেতেই কাটিয়ে দিতাম, কাল একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যেতো!"

আমার বলবার কিছু নেই, শান্ত মুখে ওঁদের সবার পিছু পিছু অগ্রসর হই। এখানেও বিপত্তি! পিছু পিছু আমাকে আসতে দেখে হোটেলের কর্ত্রীর মেজাজ গরম হয়ে উঠলো, সে পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত আমাদের আর ঘর দিতে পারবে না, সোজা জানিয়ে দিলো! কথা কাটাকাটি, অবশেষে রাগারাগি!

বন্ধু কথা না বাড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তিব্বতী শেরপা হোটেল বা অন্নপূর্ণা হোটেলে দুখানা কামরা পাওয়া গেল। আমরা সেখানে চলে এলাম। ইতিমধ্যে বিকাল হয়ে এসেছে, সেই অল্প-বয়সী মেয়েটি—অমর হোটেলের গৃহকর্ত্রী, সে অতি আধুনিক সাজে সাজতে আরম্ভ করেছে, ঘর থেকে বেরুলো নানারকম মদের
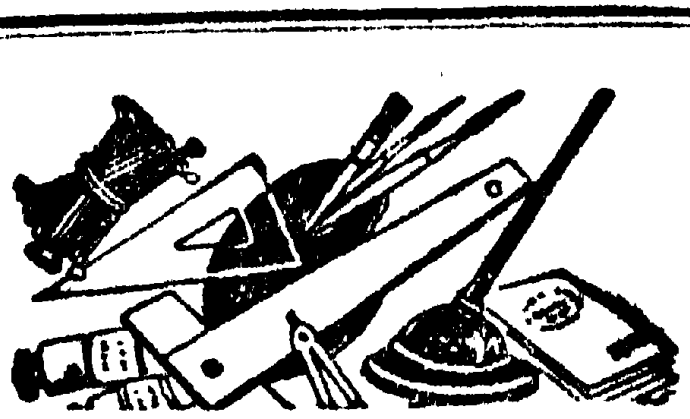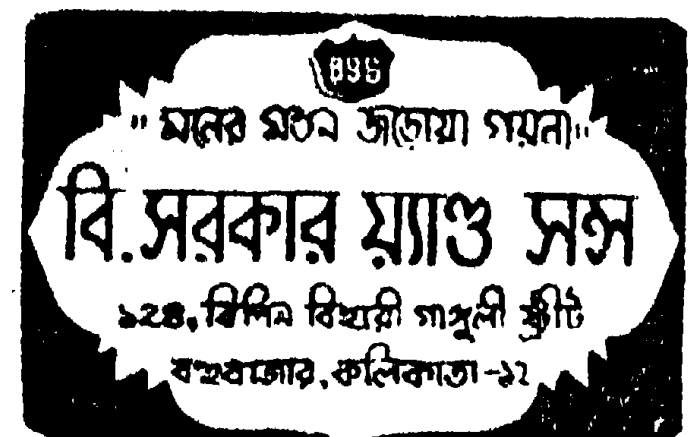
বৌদ্ধ চোর্টেন—মুক্তিনাথ

বোতল, সামনের ছোট লনে অনেকগুলি চেয়ার পেতে নানা দেশের, নানা বয়সের ছেলের জমায়েত হতে শুরু করলো, রেডিওতে সিনেমার গান বাজছিল। টুরিস্ট অফিসারের 'হোমলি'র অর্থ এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হতে শুরু করেছে। মিঃ বিশ্বাস এতটা বুঝতে পারেন নি, সকলের ঠাট্টায় অস্থির হতে হোল তাকে।

অন্নপূর্ণা হোটেলটি ভালো। এই হোটেলের মালিক তিব্বতী, অর্থাৎ হিন্দী, বাংলা, ইংরাজী বা নেপালী কোন ভাষারই চলনসই জ্ঞান নেই। ওখানকার যাবতীয় কর্মীও তিব্বতী। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো হোটেল। অনেক ইউরোপীয় টুরিস্ট এসে উঠেছেন এখানে।

পোখারা থেকে মুক্তিনাথের দূরত্ব কেউ সঠিক বলতে পারে না। পাহাড়ী পথ, তার উপর এইসব অঞ্চলে কস্মিনকালেও সার্ভের রশি পড়েনি। তবে মনে হয়, পঁচাত্তর বা আশি মাইলের কম নয়। আমাদের বন্দোবস্ত তদনুরূপ করতে হবে। আমরা সময়মত আসতে না পারাতে সময়টা যাত্রার পক্ষে খানিকটা দেরী হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণই প্রকৃষ্ট সময়। বর্ষার পরেও কিছু যাত্রী যায় বটে, এখন তাদেরও ফিরবার সময় হয়ে এসেছে। আজ দশহরার দিন, এমন সময় নেপালের মত পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাজ্যে কুলি পাওয়াও খুব দুর্ঘট। দশহরার উৎসবের দিনে কে বা চাইবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বনেবাদাড়ে ঘুরে মরতে? এখানকার টুরিস্ট অফিসারটির আন্তরিক সহযোগিতায় চারজন কুলির বন্দোবস্ত হ'ল, দৈনিক চোদ্দ টাকা (নেপালী) হিসাবে। পূজার সময় তাই, নইলে দশ বার টাকায় পাওয়া যেত। ছুটির দিন, দোকান বন্ধ, ব্যাংক বন্ধ, অনেক কষ্টে ভারতীয় টাকাগুলি পরিবর্তন করে নেপালী টাকা নেওয়া হল। ভৈরবাতে মিঃ কোরেশী ভারতীয় টাকা কিছুটা বদলে দিয়েছিলেন। ভারতীয় একশ' টাকাতে নেপালী একশ' ষাট টাকা পাওয়া যায়। এরা আট আনাকে "মোহর" বলে। মোহরের উল্লেখ করে এরা দাম বলে।

কুলির বন্দোবস্ত হ'ল, মন তাই সকলের অনেকটা হাল্কা।

কাল দিনের প্রখর সূর্যালোকে মেঘে ঢাকা তুষারশিখর ভাল দেখা যায় নি। আজ বাইরে অপরূপ দৃশ্য। উত্তর দিগন্তের সবটা গোলাকারে ঘিরে সারি সারি তুষার-শিখর অনুপম রূপ নিয়ে যেন হাসছে। শুভ্র চূড়াগুলিতে কেবল একটু লালাভ আলোর ছোঁয়া লেগেছে, বাকিটা এখনো নীলচে, উজ্জ্বল লাল সূর্যালোক ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে নামছে, সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র শিখরগুলি উজ্জ্বলতর হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। মিঃ বিশ্বাস তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বই বের করে আনেন। একজন জার্মান পর্বতারোহী ম্যাপ এঁকে ছবি দিয়েছেন, টুরিস্ট অফিস থেকে তাই নিয়ে এসেছেন—

অন্নপূর্ণা (সাউথ), অন্নপূর্ণা (১), মচ্ছপুছারে, অন্নপূর্ণা (৩), অন্নপূর্ণা (৪), অন্নপূর্ণা (২), লামজুং হিমল পর-পর দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ও সুন্দর দেখাচ্ছে মচ্ছপুছারে শৃঙ্গটি। মাছের লেজের প্রান্তভাগের মত দেখতে, তাই এই নাম। কি উজ্জ্বল, কি বলিষ্ঠ রূপ তার। ওই পশ্চিম প্রান্তে ধৌলগিরি, ওই অন্নপূর্ণা, ওরই মাঝখান দিয়ে আমাদের চলার পথ? পায়ের কাছে অন্নপূর্ণা হোটেলের বাগানে অজস্র জিনিয়া ফুটে আছে, তার মাঝখানে লাল টালী ছাওয়া শাদা ঘরগুলি যেন সৌন্দর্য আরও পরিস্ফুট করেছে।

আটটার একটু পর ভীমবাহাদুর তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হোল। তার আসবার কথা ছিল সাতটায়। ভীমকে আমাদের কুলিসর্দার ও রাঁধুনি নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু একটি কুলি ইতিমধ্যে পালিয়ে গেছে। সে দশেরার দিন তার বাড়ী থেকে বেরোবার অনুমতি পায়নি। অন্নপূর্ণা হোটেলের মালিক একজন তিব্বতী কুলি নিয়ে এসেছেন, ইতিমধ্যে ভীমও একজন নেপালী সংগ্রহ করতে পেরেছে। যাই হোক, বের হতে দেরী হলেও ভীমের আনা নেপালীটিকে নিয়েই শেষপর্যন্ত যখন রওনা হতে পারলাম, বেলা ন'টা তখন বেজে গেছে।

আজকের গন্তব্যস্থল এগারো মাইল দূরে নওদাঁড়া বা নওদান্ডাগাঁও। পোখারা উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কতকগুলি পাহাড় দেখা যায়। তারই একটি চূড়ায় নওদাঁড়া।

এয়ারপোর্ট থেকে পোখারা বাজারের দূরত্ব দুই মাইলের বেশী ছাড়া কম হবে না। লাল মেটে পথ সবুজ গাছপালার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়েছে, বাজারের ঘর-বাড়ীগুলি দুধারে সারি দেওয়া। মাঝে মাঝে বট-অশ্বত্থ গাছ ছায়া মেলে আছে। সরু অসমতল পথ, কাঁচা, তবে সাইকেল চলে, আর চলতে পারে জীপ, চলেও। বেশীর ভাগই পায়ের উপর ভরসা করে থাকা। বাজারের কাছে পথের মধ্যস্থলে একটা ছোট মন্দির, কিছু পরে একটা বড় নল থেকে ক্রমাগত জল পড়ে পথ ভেসে যাচ্ছে, তার পরই পথের এক পাশে বাঁধানো অশথ গাছ। একটি আমেরিকান দম্পতি দুটি ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দাঁড়িয়ে আছেন—হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন, এখন বিশ্রাম করছেন। আবার বেরুবেন বেড়াতে। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে আর থামবার ইচ্ছা হয় না, পশুবলির রক্তে রঞ্জিত মন্দিরের ভিতরের বিগ্রহ ও তার চারিদিকের বারান্দা। বীভৎস দেখাচ্ছে। আমরা নল পার হয়ে বাঁধানো ফুটপাথ ও লালমাটির পথ ধরে এগিয়ে চলেছি, কিন্তু পিছনে বারবার দেখছি, ভীম বা অন্য পান্ডবদের কারুর দেখা নেই। পথেও লোকজন নেই বললেই চলে, বাজারও বন্ধ। ক্বচিৎ এক-আধজনা থালায় করে পূজার সামগ্রী সাজিয়ে নিয়ে মন্দিরের দিকে চলেছে। আমরা তিনজন পথের ধারে 'ভেষজ-সদন' নামে বন্ধ কবিরাজী দোকানের বারান্দায় বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করি। বন্ধু এগিয়ে গেছে।

চার-পাঁচজন লোক একটা পাঁঠা বলি দিয়ে ধড়টা বয়ে নিয়ে চলেছে। একজনের হাতে মাথাটা ঝুলছে। দুটো থেকেই টস্‌টস্‌ করে রক্ত পড়ছে। প্রায় একঘণ্টা পর ভীমের দেখা পাওয়া গেল। নতুন আগন্তুক কুলিটি বাড়ী গিয়েছিল খেতে, ভীমও তার সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ীতে ওকে সামলাতে গিয়ে-ছিল।

দাদার পরামর্শমত পোখারা বাজার থেকেই কিছু খাবার কিনে নেওয়া হোল। পথে চা তৈরী করে খেয়ে একটানা সারাদিন চলা যাবে। নওদাঁড়ার আগে থেমে থাকা আজ ঠিক হবে না।

পোখারা বাজার ছেড়ে রওনা হতেই সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। অল্প কিছুদূরে এগিয়ে পথ বাঁদিকে ঘুরে গেছে সোজা মালটিপারপাস্ স্কুল এবং হাসপাতালের দিকে। আরও কিছুদূরে এগিয়ে শ্বেতী নদীর তীর ধরে পথ। প্রথম মাইল-ছয়

কোথাও চড়াই বা উৎরাই নেই। শ্বেতীর ধারে ধারে মাইলখানেক গিয়ে নদী পার হতে হোল। বর্ষার জলের তোড়ে কাঠের ছোট পোলটি ভেঙে গেছে, তার আধভাঙা ব্রীজের ভাঙা অংশটুকু পার হবার জন্য একটি অভিনব উপায় এরা সৃষ্টি করেছে। জলের ধারাটা আস্ত অংশের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে, শেষ প্রান্তে প্রায় ছয় ইঞ্চি চওড়া একটি বাঁশকে গাঁটের উপরের অংশ কেটে কেটে মই তৈয়ারী করেছে। সেই মই বেয়ে শ্বেতীর বক্ষে নেমে পাথর ডিঙিয়ে নদী পার হতে হোল।

আরও মাইল তিন চলে 'হুনজা' গ্রাম পেলাম। দলে দলে তিব্বতী ও নেপালী ছেলেমেয়েরা চলেছে বোঝা নিয়ে তাদের গাঁয়ের দিকে। আমরা তাদের দলে ভিড়ে এগিয়ে চলেছি। বেলা পৌনে একটার সময় একটা মাঠের মধ্যে ছোট্ট হুনজা গ্রামে আমরা পৌঁছলাম। এটি তিব্বতী হুনজা, তিব্বতী রেফিউজীদের গ্রাম, তাই ঘরবাড়ীগুলির অবস্থা শোচনীয়। হুনজা একটি গ্রাম নয়, বিরাট এলাকা জুড়ে পর পর তিনখানি গ্রাম, তিনটির নামই হুনজা। গ্রামগুলি ছড়ানো। চারধারে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। তিব্বতী হুনজাতে একটি দরিদ্র তিব্বতীর ছোট্ট কুঁড়েতে বসে চা তৈরী করে, সঙ্গের আনা খাবার খেয়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু করা গেল। বেলা এখন দুটো।

চলতে চলতে গ্রামগুলির মাঠে কয়েকটা সর্ষের তেলের ঘানি দেখলাম। মেয়েরা নিজেরাই ঘানি ঘুরাচ্ছে। বড় বড় মাঠের কোথাও কোথাও আমগাছের তলায় গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে গোল হয়ে ভিড় করে বসে উদ্‌গ্রীব হয়ে কি যেন দেখছে। আমরাও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, দশেরা উপলক্ষে যে মহিষ বলি দেওয়া হয়েছে, সেই মহিষের মাংস কুঠার দিয়ে কেটে কেটে টুকরা করে ভাগ করা হচ্ছে। ওরা এই মাংসকে 'শিকার' বলে। মহিষের মাংস ওদের কাছে নিষিদ্ধ নয়। শুনলাম, ওদের মন্দিরে মুর্গি, পাঁঠা, ভেড়া বলি হয়। মুর্গির ডিম ঠাকুর-পূজার একটি বিশেষ উপকরণ। পথে আসবার সময় পোখারা বাজারে ফুল, তুলসী-বেলপাতা-চন্দনের সঙ্গে দুটি মুর্গির ডিম সাজিয়ে নিয়ে পূজার জন্য চলেছে, এ অতি সাধারণ দৃশ্য।

হুনজার শেষগ্রামে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় আড়াইটা বেজে গেল। একটা বাঁধানো অশত্থগাছের তলায় বেদীতে বসে বন্ধু চা খাচ্ছে, আমাদের জন্যেও চা রেডি! গাছতলায় একটু অপেক্ষা করতেই কুলিরাও এসে উপস্থিত। একটি আমেরিকান যুবক এসে গাছতলায় বসে চা খাচ্ছেন। পরনে তাঁর পর্বতারোহীর পোষাক, পিঠে মালবোঝাই দামী, রুকস্যাক, সঙ্গে মাল নিয়ে কয়েকজনা কুলি চলেছে। একজন শেরপাও আছে সঙ্গে, বললেন, "তুকুচে পিক" চড়তে যাচ্ছেন। তবে তো আমাদের পথেই চলবেন এখন।

এখনো মাইল পাঁচ-ছয় বাকি। এখানে চা খেতে খেতেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে
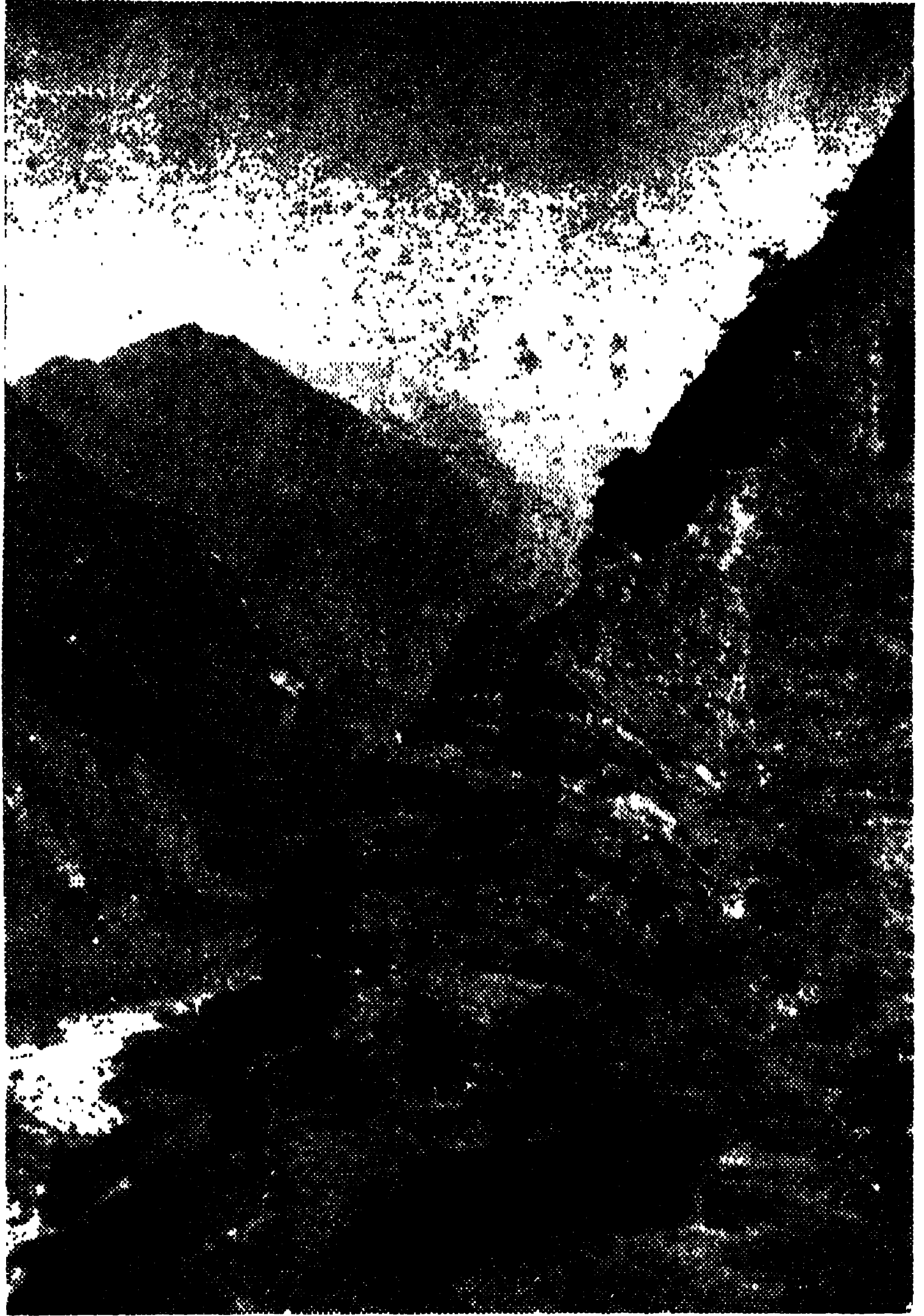
তাতপানি থেকে নীলগিরি শিখর

শুরু করেছে। আমরা মালপত্র খুলে বর্ষাতি বের করে নিলাম। এখান থেকে একটি বিরাট শস্যক্ষেত্রের শুরু। শস্যক্ষেত্রটিকে অর্ধ-চন্দ্রাকারে ঘুরে কেনাল গেছে, তারই বাঁধের উপর দিয়ে এখনকার পায়ে-চলা পথ। পথের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি ছোট ঝরনাও পেলাম। ঝরনাতে ও কেনালের টলটলে স্বচ্ছ জলে ছোট্ট ছোট্ট রূপালী মাছ খেলে বেড়াচ্ছে।

হুনজার শস্যক্ষেত্র শেষ হতে হতেই নদীর বুক চিরে পথ গেছে সোজা পোখ্যরা থেকে দেখা সেই ধোঁয়াটে পাহাড়ের নীচ অবধি। এপর্যন্ত পৌঁছাতেই সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এল। আমরা যথাসাধ্য দ্রুত পা চালাবার চেষ্টা করি। শুভ্র বেলাভূমির মাঝে মাঝে নদীর স্ফটিক স্বচ্ছধারা বয়ে চলেছে, সেই ধারাগুলি পার হবার সময় আমাদের জুতো-মোজা সব জলে ভিজে একসা হয়ে গেছে। এখানে অল্প জল, নদী পার হবার কোন বন্দোবস্ত নেই, সকলে হেঁটেই পার হচ্ছে। এখন আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। পথও চড়াই, তাছাড়া ঘন বনের মধ্য দিয়ে। তাই আমাদের দ্রুত চলবার চেষ্টায় বিশেষ ফল হচ্ছে না। নও-দাঁড়া এখনো অন্ততঃ দুই মাইল দূরে, দেড় হাজার ফুট উঁচুতে। দাদা তাঁর স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছেন। বন্ধুও এগিয়ে গিয়েছে, সে দেরাদুনের পাহাড়ী পথে হেঁটে অভ্যস্ত, চলায় তার কোন অসুবিধা নেই। আমরা দুজন পথ চলে অভ্যস্ত নই, তাছাড়া আজ যাত্রাপথের প্রথম দিন, তাই বেশ ধীরে ধীরে হাঁটছি। ফলে, পথের বাঁধানো সিঁড়ির মত পথে চলতে চলতে কখন যে সন্ধ্যার কালো আঁধার আমাদের ঘিরে ফেললো, আমরা টের পেলাম যখন, তখন আর চলবার পথ চোখে দেখতে পাচ্ছি না। একটু আগে একটা পথের সংযোগস্থলে দেখি, একদল মেয়ে পিঠে ঘাসের বোঝা নিয়ে কলরব করতে করতে বাড়ী ফিরছে। প্রশ্ন করে বুঝলাম, পথ দুটি একই দিকে গেছে, তবে একটি সিঁড়ির মত পাক-দণ্ডিপথ বলে কম সময়ে

যাওয়া যাবে। আমরা দায়ে ঠেকে পাকদণ্ডি পথই বেছে নিলাম। পাকদণ্ডি পথ খানিকটা এগিয়ে পুরনো চওড়া পথে মিশেছে।

নীচ থেকে বন্ধুর গলা ভেসে আসছে। আমরাও চেঁচিয়ে জবাব দিই। আমাদের থামতে বলে বন্ধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে ও আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য পথে থেমে ছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও আমাদের দেখতে না পেয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে।

"আমি কি ভাবতে পেরেছি যে, আপনারা ওই বিচ্ছিরি সর্টকাট ধরবেন?"

খুব বিপদে পড়েছি, তবে এখন সাহস দেবার জন্য বন্ধু রয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে একশা, রেনকোটের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে এসে ভিজেছি, চোখের চশমাতে জল পড়ে পড়ে চোখেও দেখতে পাচ্ছি না। জুতো মোজা তো আগেই ভিজেছে; এদিকে পথের অবস্থাও কহতব্য নয়। ভুল করে কেউ আজ টর্চও সঙ্গে আনি নি। এত দেরী হল অপ্রত্যাশিতভাবে কেবল কুলিদের জন্য। অতিসাবধানে অন্ধকারে এক-পা এক-পা করে চলেছি। এক অন্ধ অন্যজনের হাত ধরে চলবার চেষ্টা করছি। দুরবস্থার আর অন্ত নেই। পথে লোকও নেই বললেই চলে। দু-একজনা যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, প্রশ্ন করছি—

"নওদাঁড়া কেত্তে বাট ছে?"

উত্তর পাচ্ছি—"কেয়া এক দো ফার্লং।" কিন্তু আমাদের সেই দুই ফার্লং কি আজ আর শেষ হবে না?

আকাশ মেঘে ঢাকা, তাই অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, এমনি সময়ে একজন পথিক যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে আমাদের পিছন থেকে এসে আমাদের পার হয়ে এগিয়ে চলেছে, সেও নওদাঁড়া যাচ্ছে। আমরা তারই পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলেছি।

হঠাৎ অদূরে পাহাড়ের চূড়ার দিকে মনে হল একটা আলো নড়ছে। হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে আলোটা আমাদেরই দিকে। কাছে আসতেই দেখি লণ্ঠন হাতে আমাদেরই এক কুলি মহাত্মা। ধড়ে প্রাণ এল। অন্ধকারে পাথুরে পিছল পথে আমাদের বিপদ অনুমান করে দাদা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নওদাঁড়া আর দূরে নেই। মনে হল স্বর্গ থেকে দেবদূত যেন আলো হাতে নেমে এসেছেন।

সকালে কাকভেজা হয়ে যখন নওদাণ্ডা ইস্কুলে পৌঁছলাম, তখনও অঝোর বৃষ্টি ঝরছে। শীতে আমরা জড়সড়। রাত সাড়ে সাতটা। ইতিমধ্যে দাদা তাঁর নরম গরম স্লিপিং ব্যাগখানা খুলে আরাম করে জড়িয়ে বসেছেন। তিনখানা বেঞ্চ জোড়া দিয়ে নিজের জন্য শোবার চৌকী তৈরী করে নিয়েছেন, আমাদের তিনজনের জন্যও কয়েকখানা বেঞ্চ জোড় দিয়ে ঠিক করিয়ে রেখেছেন খাটের মত করে। ওদিকে দোকানে চা আনতে পাঠান হয়েছে।

ভোরে উঠে দেখি, বৃষ্টি থেমে গেছে। চারিদিকের মাঠ-ঘাট, গাছপালা বৃষ্টির জলে ধোয়া। কিন্তু ঘন কুয়াশায় এখনও চারিদিক ঢাকা। পথ চলেছি, বিশেষ চড়াই বা উৎরাই কোথাও নেই। পর্বতমালার গিরিশিরার উপর নওদাঁড়া একটি সৌন্দর্যপূর্ণ সমৃদ্ধশালী গ্রাম। আমরা গ্রামের বাজার ও ঘর-বাড়ীর সারির মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলেছি। গিরিশিরার উপর দিয়ে পথ, তাই পর্বতের দু-দিকের উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদূরে চলবার পর মেঘ ধীরে ধীরে সরে গেলেও দূরের পাহাড়গুলির গায়ে এখনও স্তূপ স্তূপ কুয়াশা জমে প্রায় পুরো পাহাড়গুলিকেই ঢেকে রেখেছে। ফিরবার সময় এই পথেই পৃথিবীর বৃহত্তম শৃঙ্গগুলির অন্যতম অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণীর অনুপম সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ফিরেছিলাম। যতদূর দৃষ্টি চলে, তুষারমৌলী শিখরাবলি ততদূর পর্যন্ত পরিষ্কার উজ্জ্বল দেখা গিয়েছিল। সেই সময় এখান থেকে পোখারার 'ফিউয়া' হ্রদের পূর্ণ অবয়ব চোখে পড়েছিল। ঘন সবুজ উপত্যকা, চারিদিকে ছোট-ছোট পাহাড়ের সার চলেছে দিগন্ত অবধি, দূরের শৈলমালার চূড়া শুভ্র তুষারে ঢাকা, তার মধ্যে কে যেন একখানা নীলা পাথরের বিশাল টুকরো সবুজ সমতল ঘাসের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছে। আজ কিন্তু সবই পেঁজা তুলোর মত মেঘের স্তূপে ঢকা পড়ে গেছে। চারিদিকের মেঘের সমুদ্রের মধ্যে কিছু যে ওখানে আছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না। ওই মেঘের সমুদ্র যেন মাটির ও পাহাড়ের ঘন কুয়াশার সঙ্গে যোগ দিয়ে একাকার হয়ে মিশে গেছে। আমরা সেই ঘন মেঘের পর্দা ঠেলে এগিয়ে চলেছি।

একটার পর একটা গ্রাম পেরিয়ে চলেছি। বেশ বড় বড় সুন্দর সাজান সমৃদ্ধশালী গ্রাম। সবই পাহাড়ের গিরিশিরাতে বা পাহাড়ের গায়ে বসান। গ্রামের আশে-পাশে পাহাড়ের গায়ে উপর থেকে নীচ অবধি যতদূর দৃষ্টি চলে সব চাষের ক্ষেত ভরা। ফসল ফলে সবুজ হয়ে আছে। গ্রামের বাড়ীগুলি মাটি ও পাথরের তৈরী, বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন, লাল মাটি দিয়ে নিকান-পুঁছান। মাঝখান দিয়ে গ্রামের প্রধান সড়ক চলেছে, পাথরে বাঁধান হলেও সাধারণভাবে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। এখানে বাথরুম পায়খানার বালাই নেই, তাই এই দুরবস্থা। পাহাড়ীরা স্বভাবজ নোংরা, কিছুটা জলাভাবের জন্য, কিছুটা শীতের জন্য। কিন্তু এদের স্বাস্থ্যপরিপূর্ণ উজ্জ্বল দেহ দেখলে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না যে, এদের খাদ্যাভাব একদম নেই। লাল টুকটুকে আপেলের মত ফুলো-ফুলো দুটি গাল নিয়ে ক্ষুদে-ক্ষুদে বাচ্চারা সর্বত্র দৌড়াদৌড়ি করে আনন্দে খেলা করছে। আমাদের দেখতে দৌড়ে এল। প্রতি গৃহের উঠানে বাঁশ মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে তাতে অজস্র ভুট্টা শুকনো করবার জন্য উঁচু করে ঝোলান হয়েছে। হাঁস, মুর্গি, গরু, মহিষ চরে বেড়াচ্ছে। মাঠে আছে ধান, কিছু কিছু গম। স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সজীব গৃহে স্বাস্থ্যবান লোকদের আনাগোনা দেখলেও আনন্দ হয়। নেপালে আধুনিক সভ্যতা এখনও সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায় নি। এটি সহজেই লক্ষণীয়। কৃষিনির্ভর দেশ, তাই এখনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মুখ ফিরিয়ে নেই। মনে হল, এখানকার জনসাধারণ বেশ আত্মসন্তুষ্ট। এদের কাঁচা টাকা-পয়সার অভাব আছে কিন্তু সহজভাবে থাকা-খাওয়ার অভাব নেই।

পথ চলবার সময় গ্রামের অনেকে এসে যেচে আলাপ করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ ফৌজের কাজ নিয়ে কলকাতা, ব্যারকপুর, লক্ষ্ণৌ গেছেন। এখন ফিরে এসে শেষ জীবন ক্ষেত-খামারের দেখাশোনা নিয়ে পরম সুখে আছেন।

"লুমেলে"র পর আরও দু-একটি ছোট গ্রাম পার হয়ে গিরিশিরার শেষপ্রান্তে 'চন্দ্রকোটে' পৌঁছলাম। চন্দ্রকোটের শেষ-প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে আছে একটা বিশাল আমগাছ। তার পাশে একখানা ঘরে একটি নেপালী মেয়ে আমাদের চা খাওয়ার জন্য ডেকে বসাল। দাদা ও বন্ধু এখানে চা খেয়ে গেছেন। বৌটি ফেরৎ পয়সা দিতে না পারায় ও'রা আমার জন্য চায়ের কথা বলে গেছেন।

আম গাছের নীচ থেকেই উৎরাই পথের শুরু। প্রচণ্ড খাড়া উৎরাই। নীচে নামা যে এত কষ্টকর হতে পারে, সেকথা সেদিন প্রথম অনুভব করলাম। খাড়া সিঁড়ির ম উঁচু পাথরের অসমতল ধাপ সোজা নীচে দিকে নেমে চলেছে। প্রতি পদক্ষেপে ম হয়, আর টাল সামলান গেল না। দাদা বন্ধু অনেক দূরে গেছেন, আমরা দুজে একত্রে চলেছি।

চন্দ্রকোটের পর বীরথাটে পৌঁছাে আমাদের দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা বে গেল। কাল বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে জোঁকে কামড় সহ্য করে প্রাণপাত পরিশ্রম করে দেড় হাজার ফিট উঁচুতে উঠে এলেছিলা আজ আবার প্রায় ততটাই নীচে নে আসতেও আমাদের কম কষ্ট পেতে হল ন মণ্ডী নদীর উপরের ঝোলান ব্রীজ প হলেই বীরথাটে গ্রাম, মণ্ডী-ভুরুণ্ডি সঙ্গমে। একটু এগিয়ে পথের ধারে ভুরু নদীর তীরে ইস্কুলবাড়ী। আমরা ইস্কুলে বারান্দামত ঘরের মধ্যে বেঞ্চ জোড়া দি তার উপর বিশ্রাম করবার জন্য গা এগি দিলাম। ইতিমধ্যে দাদা আগে পৌঁছে বিশ্র করে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে ফেলে ভীমবাহাদুরকে দিয়ে। এখন স্না উদ্যোগ করছেন।

এখানে আসবার পথে ব্রীজে থাকে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শ করেছিল, আকাশও ঘন মেঘে ঢেকে গে কুয়াশা আমাদের চারিদিক ঘিরে ফেলে দাদা বলছেন, এখানে আমরা খাওয়া ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে সুদামের রওনা হব। মাইল চারেক চললে সুদ পাওয়া যাবে আশা করা যাচ্ছে। পাহ মতে পথও 'ময়দান-মাফিক' অর্থাৎ চ উৎরাই নেই। ভীমবাহাদুর বললে, সু গ্রামে থাকবার ভাল ঘর পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে।

'হ্যালো! ডক্টর!' সেই আমেরি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। ইনি ফিজিওলজি একাই এসেছেন। পোখারাতে টু অফিসে অনেকক্ষণ এ'র সঙ্গে গল্প গিয়েছিল। এখানে দেখে মনে হল, পুরনো বন্ধুর দেখা পেলাম। আমি ত স্বামীর সঙ্গে হেঁটে বেড়াতে এসেছি

খুব খুসী হয়েছেন। উৎসাহিত হয়ে বলছেন, আগামীবারে নেপালে সস্ত্রীক বেড়াতে আসবেন। এখানে একটি নেপালী রোগীর চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

পোখারা ছেড়ে এ পর্যন্ত যতদূর এসেছি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য তেমন পাহাড়ী বন্য-সৌন্দর্য কোথাও চোখে পড়ে নি। তার প্রধান কারণ, মেঘ ও কুয়াশা। তাই সকলে একটু মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়েছি। যেন খাটুনির তুলনায় মজুরী অতি কম। এদিকে বৃষ্টির জন্য জোঁকের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেড়েছে। পথে চলবার সময় পদে-পদে জোঁক দেখছি, তাই পথ চলার আতঙ্ক বেড়ে গেছে। পথ চড়াই না হলেও পাথুরে, তেমন সমতল নয়। কোথাও কোথাও আবার ঝর্ণার ধারা গ্রামের ভিতর পথের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে, দু ধারে বিছুটির ঘন জঙ্গল। এই পথে জুতো শুকনো রেখে বিছুটি ও জোঁকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে চলা যেমন কষ্টকর তেমনি বিরক্তিজনক। তবু আজ দুপুরে বিশ্রাম করে ক্লান্তি অপনোদনের পর বিকালের পড়ন্ত বেলায় ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়াতে নদীর তীর ধরে ছায়া-ঢাকা পথে চলতে কিন্তু বেশ লাগছে। তিনটের সময় রওনা হয়ে পাঁচটা অবধি প্রায় সমান রাস্তায় চলে আমরা কিন্তু সুদামে গ্রাম পেলাম না। আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি এল বলে, অন্ধকারও হয়ে এসেছে। তখন দাদার পরামর্শ অনুযায়ী 'লামভারে' গ্রামে রাত্রিবাস করাই স্থির হল।

'লামভারে' অত্যন্ত ছোট একটি গ্রাম। তারই ততোধিক ছোট ঘরের মালিকের নিকট থাকবার অনুমতি পাওয়া গেল। মালিকের চেয়ে মালিকানীর প্রতাপ বেশী। সেই আমাদের থাকবার অনুমতি দিল। ঐ একই ঘরে এক পাশে আমরা আমাদের বিছানা চারটি ঘেঁসাঘেঁসি করে পেতে ফেললাম। অন্য কোণে ঝুড়ি-ঢাকা মুর্গি ও হাঁসের পালের কোঁকর-কোঁ ও প্যাঁক-প্যাঁক শোনা যাচ্ছে, তারই পাশে বিছান সবুজ কাঁচা ঘাসের উপর একটি মহিষ বৎস বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে। ঘরের ভিতরের দরজার কাছে আমাদের পায়ের দিকে উনানে রান্না চড়ল। উনানের ঠিক উপরেই শিকে ঝুলান 'শিকার' অর্থাৎ বলি দেওয়া মোষের মাংস শুকনো করা হচ্ছে। কিন্তু ঘরটি বেশ পরিষ্কারভাবে লাল মাটি দিয়ে নিকান। এক কোণে ছোট ছোট সরু সরু কাঠের তাকে কাঁচের ও ঝমঝকে পিতলের বাসন শোভা পাচ্ছে। ঘরটিতে ঢুকলেই পরিচ্ছন্নতার জন্য মনটা বেশ একটা প্রসন্নভাবে পূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের রান্না ভীমই করল। বাড়ীর নেপালী গৃহিণী ভীম ও তার দলবলের জন্য মোটা চালের ভাত ও ওই শিকারের ঝোল রেঁধে দিলেন। ঘর ছোট হলেও রাত্রে ঘুমের তেমন কোন ব্যাঘাত কিন্তু হল না। কেবল একটি-দুটি ইঁদুর মধ্যরাত্রে সশব্দে আমাদের গায়ের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল।

৬ই অক্টোবর। আজ পরিষ্কার দিন, আকাশ নির্মেঘ, চারিদিকের পাহাড় ঘন-সবুজ। ভুরুণ্ডী নদীর তীর ধরে ধরে এখানকার পথ চলেছে। প্রথমে জঙ্গলের পথে মাইল দুই সামান্য চড়াই ও উৎরাই, মাঝে মাঝে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলেছি। একটা ঝর্ণার উপর দুটি গাছের গুঁড়ি পাতা; আমরা তার উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গ্রামে পেঁছিলাম। এখানে একটি ঘরে বসে বিশ্রাম করে নেবার ফাঁকে চা ও আলু পোড়া খেয়ে নিলাম। একটু এগিয়ে দেখি আরও একটা বড় ঝর্ণা, তার উপর একটা নড়বড়ে কাঠের পোল রয়েছে। এখানেও একজন পাহাড়ীর ঘর রয়েছে। ঘরের বাইরে গাছতলায় একটা বিলিতি দামী মালভরা রুক-স্যাক পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখি ঘরে আগুনের ধারে উবু হয়ে বসে একজন আমেরিকান ট্যুরিস্ট বিশ্রামের ফাঁকে চা খাচ্ছেন।

এই পোল পার হয়েই উলেরির চড়াই শুরু হল। ওঃ কি কষ্টকর চড়াই! কেবল উঁচু-উঁচু, যেন প্রায় বুকসমান পাথরের সিঁড়ি-সিঁড়ি, আর সিঁড়ি! এমন আমাদের কল্পনাতীত ছিল। এমন চড়াই-এর খবর আগে জানা থাকলে মুক্তিনাথ আসবার ইচ্ছা কতদূর ফলবতী হত বলা কঠিন। বীরথাটের পর পথে গ্রামবাসীদের যাকেই দেখেছি, জিজ্ঞাসার উত্তরে সকলেই হাত উঁচু করে আকাশের মধ্যস্থলে আঙুল উঁচিয়ে বলেছে—'উলেরি? ওই উধর।'

ভেবেছি কি যে বলে এরা তার মাথা-মুন্ডু নেই। আকাশের মাঝখানে উলেরি হবে কি করে? কিন্তু আজ চড়াই ওঠা শুরু করে বেশ বুঝতে পারছি, কেন ওরা আকাশের মাঝামাঝি আঙুল নির্দেশ করত! উঁচু-উঁচু পাহাড়ের ধাপ পাহাড়ের গা বেয়ে সিধা উঠে গেছে চূড়ার দিকে একেবারে একটানা, কোথাও ছেদ নেই। মাথার উপর পরিষ্কার আকাশ, আজ প্রখর তপন আগুন ছড়াচ্ছে, পথে কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই যে, তার শীতল ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে। পথেরও কোন অন্ত নেই। ভোর সাড়ে ছয়টারও আগে লামভার ছেড়ে রওনা হয়েছি, মাইল দেড়েক চলে সুদামে গ্রাম পার হয়েছি, এ পর্যন্ত সোজা রাস্তা, তার একটু পর থেকেই চড়াই ওঠা শুরু করেছি, এখন বেলা এগারোটা অবধি চলেও উলেরির কোন চিহ্নই নেই; চড়াই-এরও কোন শেষ নেই। নীচেও যেমন সিঁড়ি, সামনেও তেমনি অন্তহীন সিঁড়ি উঠেই চলেছে কেবল। আমরা প্রচন্ড ক্লান্ত হয়ে পথের পাশে এক বৃদ্ধের ছোট কুটিরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। এ পথে এই একটিই ঘর দেখা গেল। দাদা আগেই এসে এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দুজনের অবস্থা অতি কাহিল, চলবার আর সামর্থ নেই। বৃদ্ধটি সমবেদনার সঙ্গে যত্ন করে তার বাগানের গাছের একটি বড় কাঁকুড় নুন ও মরিচ মাখিয়ে খেতে দিলেন। আর দিলেন এক-এক গ্লাস করে ঠান্ডা ঘোলের সরবৎ।

সঙ্গে সঙ্গে সাহস দিয়ে বলেন—

'উলেরি বহুৎ দূর নেই হ্যায়। আপ ধীরে চলনেসে ভি পন্দর মিনটমে পোঁহুছ যায় গা।',

আবার পথে বের হলাম, তেমনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছি অতি ধীরে-ধীরে। কোথায় পনেরো মিনিট! ঠিক এক ঘন্টার পর উলেরির প্রথম ঘরবাড়ী দেখা গেল, আরও পনেরো মিনিট পর একটা থাকবার যোগ্য তিন দিক ঢাকা বারান্দাতে আশ্রয় মিলল। বেশ বুঝছি, আজ বিকালেও আমার আর নড়বার শক্তি থাকবে না। কুলিরা এখনও এসে পেঁছয় নি, কখন আসবে তার স্থিরতাও নেই। তারা এসে পেঁছালেও এগোতে চাইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে আমার স্বামী ও উমাপ্রসাদ দাদা ঠিক করলেন আজ এখানেই আস্তানা নিয়ে এই বারান্দাতেই রাত্রিবাস করা হবে। আমার মনের একটা উদ্বেগ কাটল, আমি সবচেয়ে খুশী। দাদা ছাড়া সকলেই দারুণ ক্লান্ত। দাদার যেন কোন ক্লান্তি নেই। খুশী হয়ে রাত্রির জন্য স্পেশাল ডিস রান্না করতে রাজী হয়ে যাই। বন্ধু তাতেও খুশী নয়, সে এক্ষুনি আর একবার চায়ের দাবী করে বসেছে। ভীমবাহাদুর একটায় পেঁছিল, কিন্তু অন্যরা এখানে আসতে আড়াইটা বাজিয়ে ফেলল। তারা পথের কোথায় রান্না করে খেয়ে তবে এসেছে!

একটি খাড়া ধরনের পাহাড়ের গায়ে মাঝামাঝি জায়গায় উলেরির ঘরবাড়ীগুলি তৈরী। দূর থেকে মনে হয়, কে যেন পুতুলের ঘর তৈরী করে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসিয়ে রেখেছে। দুটি ঝর্ণা আছে, বেশ কিছুটা দূরে বলে উলেরির খানিকটা জলাভাব। এসব অসুবিধাতে আমাদের অভ্যস্ত হতেই হবে, সুতরাং ঘরের পাশেই এক ঘটি জলে হাত-মুখ ধুয়ে স্নানপর্ব সমাধা করে নিতে আমাদের মোটেও অস্বস্তিবোধ হল না। যে ঘরের বারান্দায় স্থান পেলাম, সেখানকার গৃহিণীই দুপুরে আমাদের জন্য রান্না করে দিলেন, ভাত আর আলুর ঝোল, তাই অমৃত মনে হল!

উলেরি থেকে 'মচ্ছপুছারে' শৃঙ্গের খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা গেল। দুটি ঘন সবুজ পাহাড়ের শৃঙ্গের খাঁজের মধ্যে মচ্ছপুছারের মৎসপুচ্ছটি দেখা গেল। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে। আমরা অন্ধকার না হওয়া অবধি এই অনুপম সৌন্দর্য দেখবার জন্য বাইরে বসে রইলাম।

আজ দশেরা উপলক্ষ্যে উলেরির ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক অতিথি এসেছেন। বিকালবেলা কয়েকটি সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণী আমাদের বারান্দায় সপ্রতিভভাবে আমাদের গা ঘেঁসে বসে গল্প জুড়বার চেষ্টা করল। ভাষার বাধা না থাকলে ওদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সৃষ্টি হত। লাল টুকটুকে লম্বা হাতা ব্লাউজ পরা, গাঢ় নীল রঙের ঘাঘরা, কোমরে সাদা কাপড় জড়ান, গলায় নানা রঙের পুঁতির মালা, মাথায় পাতলা চাদর, নাকে নাকছবি, কানে মোটা ভারি গহনা-পরা একটি হাস্যমুখী মোটসোটা, গোলগাল তরুণী বেশ আসন হয়ে বসে আমাকে প্রশ্ন করছে।

'ঘর কি ধর?'

'কলকাত্তা'—উত্তর দিই। এর পর কি যে বলছে, বুঝবার শক্তি নেই আমার, ভাষা

জানি না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসারায় ও ভাঙা হিন্দির মাধ্যমে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি হাত দিয়ে আমার কানের ফুল, হাতের সোনার বালা গলার হার দেখতে দেখতে মন্তব্য করল--'রামরূ ছে।' অর্থাৎ বেশ সুন্দর।

সন্ধ্যে হতে হতেই চারিদিকে নানারকম বাজনার শব্দে উলেরি মুখরিত হয়ে উঠল। মেয়েরা বাজনার আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে পালাল, উৎসবে যোগ দিতে গেল তারা। পাহাড়ী গানে ও বাজনায় সারা রাত উলেরি উৎসব-মুখর হয়ে রইল।

দশেরার সময়ে নেপালের ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে সকলেই কপালে মস্ত টিপ পরে। কেউ কেউ সারা কপাল জুড়ে টিপ দেয়। ওরা এই উৎসবকে 'টিকা' বলে। আমাদের পক্ষে কুলি সংগ্রহের একটি বাধা ছিল এই 'টিকা'-পরা উৎসব। এই সময় মেয়েরা ছেলেদের কিছুতেই ঘর-ছাড়া হতে দেয় না। এখানে আজ দেখছি, সমস্ত ছেলে-মেয়েরা রঙীন চাল ও আরও কত রকম কি দিয়ে কপাল-জোড়া 'টিকা' পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেপালের সর্বত্র মদ খাওয়ার খুব প্রচলন। এখনে ঘরে তৈরী দিশী মদ 'ছাং' ওদের খুব প্রিয়। ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে সকলেই 'ছাং' খেতে অভ্যস্ত। আমরা ও রসে বঞ্চিত, কিন্তু পরে সেই আমেরিকান ফিজিও-লজিস্টটি বলেছিলেন, ছাং নাকি খেতেও ভাল।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উলেরির পায়-খানার ব্যবস্থা। অভিনব উপায়ে সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে। উলেরির গ্রাম শেষ হবার অনতিদূরে একটি শুকনো ঝর্ণার-ধারা উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। তারই উঁচু দুই তীরে দুটি লম্বা ও যথেষ্ট চওড়া তক্তা পাতা, যেন পোলের মত করা অনেকটা। এটিই পায়খানা। অন্যান্য গ্রামের তুলনায় এই গ্রামখানি এই জন্য বেশ পরিচ্ছন্ন।

পর দিন প্রত্যূষে উঠে আবার একবার মচ্ছপুছারে শিখরের প্রভাতসূর্য দেখে নিই। প্রভাতের সূর্যালোকের লাল রঙ লেগেছে শুভ্র তুষারশিখরে। কাছে সবুজ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে নীল আকাশের নীচে অনন্যরূপে দেখা যাচ্ছে। চোখ ফেরান যায় না।

কালকের কঠিন চড়াই পথ আজ উলেরি ছেড়েও এগিয়ে গেছে। প্রথম দুই ফার্লং সেই সিঁড়ি, উঠতে বেশ কষ্ট হয়। পরের পথও চড়াই, তবে সে খুব ধীরে ধীরে উঠেছে। প্রায় সমস্ত পথটাই ঘনবনের বড় বড় গাছের নীচ দিয়ে। এমন পথে চলতেও আনন্দ আছে।

উলেরি থেকে একজন ইণ্ডিয়ান আর্মির লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। সে শিখা যাচ্ছে, ওখানেই ওর দেশ। আজ বিকালে শিখা পৌঁছাবে। আমরাও আজ শিখায় থামব। ছেলেটি তিন বছর পর ছুটি পেয়েছে, তাও তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে। বেচারী বড় মন-মরা হয়ে চলেছে। সঙ্গে একটি কুলি তার মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।

চড়াই পার হয়েই ঘন বনের সুরু। আদিম বন, বিরাট বিরাট গাছে ভরা। কত জাতের গাছ, কত রকম লতা বৃক্ষকাণ্ডগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও ছোট ছোট ফুল ফুটেছে লতাগুলিতে। কোন কোন ঝোপ পথের পাশে অজস্র ফুল-সম্ভার নিয়ে যেন সাজান। লাল মাটির পথ দু পাশে ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে পাথর ছড়ান, কোথাও পাহাড়ের গায়ে ঝোপের আড়ালে গুহা, বুঝি কোন বন্য জন্তুর আবাসস্থল। উঁচু-উঁচু গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে পথ ঢেকে গেছে কোথাও কোথাও। ভয় হয় এই বুঝি পাতার ফাঁক দিয়ে জোঁক ধরবে। কিন্তু এ পথে জোঁক নেই কোথাও। কোথাও ঝিরঝিরে হাওয়ার দোলা লেগে সরসর করে শব্দ হচ্ছে গাছের পাতায়-পাতায়। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছে মিষ্ট ফুলের সুবাস। যুঁই চামেলী কি এখানেও এসে জুটেছে? নিস্তব্ধ পথের নীরবতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে দু-একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে কলগুঞ্জন করে। কোন গাছের ডালে ডালে পাখী বসেছে, ভাল করে দেখবার আগেই উড়ে পালাচ্ছে।

প্রায় মাঝপথে বেশ বড় একটি ঝর্ণা পেলাম। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। হাল্কা নীল জলরাশি ঘন গভীর বনের সবুজ গালপালার ফাঁক দিয়ে দুটি পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বয়ে এসেছে। মস্ত একটি কাল রঙের পাথরের তলায় তার উচ্ছলরূপে প্রথম প্রকাশ। পাথরটির নীচে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলে ছোট ছোট নানা রঙের উপলখণ্ড ভরে আছে, গলান কাঁচের মধ্য দিয়ে যেন দেখা যাচ্ছে। ওইখানটায় জল জমে একটি ছোট্ট জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, জলে যেন অজস্র মণিমুক্তা ঝলমল করছে। ছোট্ট একটি কাঠের পোল পার হয়ে ওপারে চলবার পথ আবার উঁচুর দিকে উঠে গেছে। পোল পার হলেই মস্ত মস্ত কতকগুলি সমতল পাথর। আমরা আমাদের বোতল পুরে ঝর্ণার সুমিষ্ট জল ভরে নিয়ে পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করে নিই। মিঃ বিশ্বাস এই সুযোগে প্রস্তরশয্যা গ্রহণ করেন। মুহূর্তে নাসিকা-গর্জন!

পাহাড়ের পথ চলেছে ওই ঝর্ণারই একটি ছোট ধারার পাশ দিয়ে। দূরে ওদিকের পাহাড়ে উঁচু থেকে একটা ঝর্ণার রূপালী স্রোত ঝরে পড়ছে ঝরঝর শব্দে। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি একটি লোক পাহাড়ের উঁচু জমিতে কাজ করছে। বন-ভূমির মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে একটি ছোট্ট পাথরের তৈরী ঘর, তার চার পাশ ঘিরে খানিকটা জমিতে চাষ করা হয়েছে। আমরা ভাবি, ঘোরেপাণি বুঝি আর দূরে নেই। এক দল নেপালী মেয়ে-পুরুষ কলরব করতে করতে বনের পথে নীচের দিকে নেমে চলেছে। ভাষা বুঝি না, তাই প্রশ্ন করেও জানা সম্ভব হল না যে, ঘোরেপাণি আর কতদূর। তা হোক, দূরত্ব জেনেই বা কি লাভ? কষ্ট যখন নেই, আনন্দের পথ দীর্ঘ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কোথাও কোথাও বনভূমি এত গভীর, এত বড় বড় গাছ জন্মেছে, মনে হয় কোন-কালেও সূর্যালোক তার তলায় প্রবেশাধিকার পায় না। মস্ত মস্ত মূল্যবান দেওদার গাছ যেন পাহাড়ের চূড়াকেও ছাড়িয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু এই রাজ্যে তার মূল্য কে বা বোঝে। অতল সাগরের বুকে অজানা মণি-মুক্তার মত এও অবহেলায় ছড়ান। বছরে বছরে বেড়েই চলেছে। কোথাও বৃষ্টির জলে পথরেখা ধুয়ে গেছে, বড় বড় গাছের শিকড় বের হয়ে পড়েছে, তারই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে চলতে হচ্ছে। এখানকার বনে জোঁক নেই, শীতের জন্য বোধহয় থাকা সম্ভব নয়, তাই পরম নিশ্চিন্তে চলেছি। পথের ধারে ছোট ছোট বুনো ঝোপে অজস্র হলদে ও লাল বেরী ফল ফলেছে। উনি সেগুলি সংগ্রহ করে আমাদের মধ্যে বিলোচ্ছেন। সামান্য টক-মিষ্টি তার আস্বাদ। মুখে দিলে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হয়। সমস্ত পথটাই ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠে গেছে। প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা দূর থেকে সবুজ বনের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা সবুজ জায়গাতে ঘোরেপাণি গ্রামের লাল টালীর ঘর কটি দেখতে পেলাম। ঘোরেপাণির চূড়া যেখানে আকাশে শেষ হয়েছে, ঠিক তার একটু নীচেই ছবির মত দেখা যাচ্ছে।

উলেরি থেকে ঘোরেপাণি আরও অন্তত দু' হাজার ফিট উঁচু, মনে হয় তাও সাড়ে ন' হাজার ফিট হবে, কেউ তো সঠিক বলতে পারে না। এইজন্য এখানে শীত অনেক বেশী। মোটে দুটি ঘর স্থায়ী বাসিন্দা আছে। শীতের ভয়ে এখানে কেউ থাকতে চায় না। দুটি ঘরের বাসিন্দারা বললে, তারা সারা বৎসর এখানেই থাকে। তাদের ঘরে স্তূপাকার লেপ-তোষক তারই সাক্ষ্য দেয়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে বরফ পড়া শুরু হবে। ছয়-সাত ফিট উঁচু হয়ে জমবে বরফ। এখনো খুব শীত। আমরা ঝকঝকে রোদের মধ্যে ঘোরেপাণি পৌঁছলাম, চারিদিকের শস্যক্ষেত্র ও সবুজ বনভূমি রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোদ চলে গিয়ে কুয়াশা চারিদিকে ঢেকে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়া। চড়াই ওঠার আমাদের সব জামা-কাপড় ঘামে ভিজে গেছে। এখন থেমে থাকাতে শীত লাগছে, ঠকঠক করে কাঁপছি। ওই ঘরদুটির একখানিতে আশ্রয় পেয়ে উনুনের ধারে বসে পড়েছি গরম হবার আশায়।

এই দুটি বাড়ী ছাড়া আরও কয়েকটি ঘর খালি পড়ে আছে। সেগুলি যাত্রী নিবাস। এখন লোকাভাবে নোংরা পড়ে আছে। উপত্যকার একপাশ দিয়ে একটি নীল স্বচ্ছতোয়া ঝরনা বয়ে চলেছে। ঘোরেপাণির অবস্থিতি অতি সুন্দর, যেন পটে আঁকা রঙিন ছবি, তেমনি বাছাই-করা কয়েকটি ডগমগে রঙ দিয়ে আঁকা।

রৌদ্রাভাবে, ঠাণ্ডা হাওয়াতে, শীতে আমরা কাতর হয়ে পড়েছি। তাই তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়ার পাট চুকিয়ে 'শিখা'র দিকে রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি সবাই। এখানে এসে মিঃ বিশ্বাস একটু অসুস্থ বোধ করছেন। বলছেন, বেশী চা খাওয়ার জন্য তাঁর এই দুর্ভোগ। এবার যাত্রার শুরু হতেই দুধের অভাবে তাঁকে চা খেতে হয়েছে, চা খেতে তিনি অনভ্যস্ত। উনি নেপালী গৃহিণীর দেওয়া লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। বন্ধু ও দাদা স্নানের চেষ্ট

আছেন। রোদ না উঠলে, আমি ওদের দলে নেই। তার চেয়ে উনুনের ধরে বসে চা খাওয়া অনেক বেশী আরামপ্রদ। মিঃ বিশ্বাস ভাত খেতে পারবেন না বলছেন, ও'র জন্য একটু স্যুপ তৈরি করবার চেষ্টায় আছি।

ঘরের গৃহিণীর চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। মহিলাটির ভারিক্কি গড়ন। বাচ্চারা সকলেই তাদের মাকে কাজে সাহায্য করছে। কেউ বাসন মেজে দিচ্ছে, কেউ মুর্গি তাড়াচ্ছে, কেউ অন্য ফাইফরমাস খাটছে। ছোট্ট বাচ্চাটি বছরখানেকের হবে, মায়ের কোলজুড়ে বসে আছে। অনেকগুলি মস্ত মস্ত মুরগী চারিদিকে খু'টে খু'টে দানা খাচ্ছে। ঘরে-বাইরে তাদের অবাধ গতি। মিঃ বিশ্বাসের শোয়া দেহের উপর দিয়ে নির্বিচারে চলাফেরা করছে।

ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই আমরা রান্না-খাওয়া বিশ্রাম সেরে ঘোরেপাণি ছেড়ে শিখার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়লাম। এখানকার পথ আগের মতই ঘন বনের মধ্য দিয়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা। এখন আবার দু'দিকের বন আরও ঘন হয়ে এগিয়ে এসে যেন পথের লাল রেখাটাকেও নিঃশেষে মুছে দিয়েছে। মাথার উপর বড় বড় গাছের ডালপালা আকাশ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রেখেছে। চারিপাশে কালো কালো গাছের গু'ড়ি, তাদের গা থেকে নীচ অবধি নানা জাতের ফার্ণ ও পরগাছা। কোথাও বড় গাছের নীচে চারাগাছের ঝোপ। অপূর্ব গম্ভীর শান্ত বনভূমি। পথটা গাছে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া অবধি উঠে আবার ক্রমে নীচের দিকে নেমে চলেছে। দু'দিন ধরে কেবলই উঠেছি, আজ এখান থেকে কেবলই নামার শুরু। নামছি তো নামছিই। বনেরও যেমন শেষ নেই, নামারও শেষ নেই যেন। দু'ধারের পাইন, ফার, দেওদার ছাড়াও অন্যান্য উ'চু-উ'চু গাছের সমারোহ। তাদের গায়ের ফুলভরা লতাগুলি ঝুলে ঝুলে নেমেছে কোথাও। লালরঙা মেটে পায়ে-চলা পথের পাশে গাঢ় সবুজ পাতা ঢাকা পার্বত্য বনভূমি আমাদের মনে প্রশান্তিভাব জাগিয়ে তোলে, মনটা উদাস হয়ে ওঠে। কোথায় যেন বনের কোন গাছের ডালে একটা নাম-না-জানা পাখী ডেকেই চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে নির্জনতা একটু অস্বস্তির সঞ্চার করে। খস্‌খস্‌ শব্দে চমকে উঠে পাশের জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছি। কি একটা মস্ত জানোয়ার যেন! সঙ্গের নেপালী কুলিটি বললে— "গাঁওয়া কি ভ'ইসা।" আশ্বস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি। যদিও জানতাম, পায়ে-চলা পথের আশে-পাশে সাধারণত বন্যজন্তুরা চলাফেরা করে না।

উৎরাই পথেরও প্রায় শেষ হয়ে এলো, বনেরও প্রায় শেষ। চোখের সামনে এগিয়ে এলো নতুন নতুন দৃশ্য। যেন পটপরিবর্তন হোলো। এতক্ষণে প্রায় নয় কি সাড়ে নয় হাজার ফিট উ'চু ঘোড়েপাণির পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি। এখন অন্নপূর্ণা শৈল-মালার অন্য অংশে আমরা এগিয়ে চলেছি। পোখারাতে আমরা এই শৈলমালার পূর্ব থেকে এর শিখরাবলী দেখেছি দূরে থেকে। এখন শৈলমালাকে ডাইনে রেখে আমরা পশ্চিম হয়ে ঘুরে পরে উত্তরের দিকে এগিয়ে যাবো। উত্তরে আবার কাগবেণীর পর এই শৈলমালাকে ঘুরে কিছুটা দক্ষিণে এলে পাবো মুক্তিনাথকে।

ঘন বন হাল্‌কা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল যেন প্রকৃতির বন্যপর্দাখানি সরিয়ে দিচ্ছে কেউ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে 'ঘার-খোলা' নদী। ডানদিকের দুটি গিরিমালার উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে এসেছে। তার দুই তীরের পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকগুলি গ্রাম, এদিক-ওদিক ছড়ানো, যেন ছবিতে আঁকা। লাল বাড়ী-গুলি যেন পুতুলের ঘর, এখান থেকে তেমনি ছোট ছোট দেখাচ্ছে। ঘোরেপাণি পাহাড়ের উৎরাই শেষে 'চিত্রে' গ্রামের শুরুতে পথ বাঁদিকে বে'কে গেছে। বাঁকের মুখে পথের পাশে একখণ্ড জমিতে মস্ত মস্ত উ'চুউ'চু বাঁশ পু'তে তেপায়ার মত করে দোলনা টাঙানো হয়েছে। গ্রামের অগুণতি ছোট-মাঝারি বয়সের ছেলেমেয়েরা দোল খাচ্ছে। পোখারা থেকে প্রতি গ্রামেই এমনি দোলনা দেখে এসেছি। বোধহয়, দুর্গাপূজো উপলক্ষে দরিদ্র গ্রামবাসীদের উদ্যোগে আনন্দের এই ছোট্ট আয়োজনটুকু তারা করেছে ছেলেমেয়েদের জন্যে।

'চিত্রের' শেষদিকের পথের অনেকটা সমতল, খাড়া পাহাড়ের গায়ে খাঁজকাটা পথ। চিত্রে শেষ হতেই ফালাটে গ্রামের শুরু। বন্ধু তার চিরন্তন প্রধান যায়ী পথের ধারে বসে গ্লাস হাতে চা খাচ্ছে। আমরা এসে পৌঁছাতেই "দিদি", "দিদি" বলে ডাকা-ডাকি শুরু করেছে। ওর ডাক শুনে পথের ধারের পাথরের ঘর থেকে একটি যুবতী বের হয়ে এলো ধূমায়মান চায়ের কাপ হাতে। আমি আর দাদা চা খেতে বসে গেলাম। উনি এক'গ্লাস দুধ চেয়ে নিলেন, না পেলে দই বা ঘোলও চলবে।

এখানে একদল মুক্তিনাথ-ফেরৎ যাত্রীর সাক্ষাৎ পেলাম। পূজার সময় মুক্তিনাথে মস্ত মেলা বসেছিল, অসংখ্য ভারতীয় ও নেপালী তীর্থযাত্রী সেখানে গিয়েছিল। আমরা অনেক দেরী করে যাচ্ছি, হয়তো এখন কোন লোকই সেখানে থাকবে না। তা হোক্‌, বেশী লোকের ভীড় আমরা পছন্দও করি না, এ একরকম ভালাই হ'ল।

এদের সঙ্গে সঙ্গে একজন আমেরিকান মহিলাকে আসতে দেখলাম। সঙ্গে চারজন মালবাহী কুলি। চলেছেন একাই। খুব হাঁপিয়ে পড়েছেন। চড়াই উঠে গরমে, রোদে তাঁর মুখটি লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে, টস্‌টস্‌ করে ঘাম ঝরছে। বললেন, তাতপানি থেকে এসেছেন, এখন ঘোরেপাণি যাবেন।

ফালাটের শেষ হতে হতেই 'শিখার' শুরু। ঘোরেপাণি থেকে শিখা আসবার রাস্তায় পাহাড়ের চূড়া থেকে নামবার পথে মোড় ফিরতেই ধোলাগিরির শিখর ও সঙ্গে সঙ্গে অদূরে নিচেই শিখাগ্রাম দেখা গেল। এইজন্যেই গ্রামের নামটি "শিখা"। মাঝখানে পাহাড়ের ঢেউ বে'কে গিয়ে অনেকটা পথ চোখের আড়ালে চলে গেছে। বাঁকের ওপারে শিখাতে সর্বাগ্রে চোখে পড়ছে একটি শুভ্র বৌদ্ধ-মন্দির। একটু এগিয়েই শিখার ইস্কুলবাড়ি। কথা হয়েছে, আজ আমরা সেখানেই থাকবো।

বন্ধুর পিছু পিছু অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। পথে একজনের শব্জী-বাগান থেকে কিছু বীণ ও টম্যাটো সংগ্রহ করে আঁচলে বে'ধে নিয়ে চলেছি। মিঃ বিশ্বাস বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছেন। ও'র হাতে দুটি ক্যামেরা। আজ নির্মেঘ রৌদ্রালোকিত দিন পেয়ে ছবি তোলার মরশুম পড়ে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি এগোন সম্ভব হচ্ছে না। দাদা ওকে সঙ্গ দিচ্ছেন।

শিখার ইস্কুলের সামনে একটি দোকান-ঘর। দোকানী একটি যুবতী, তার স্বামী ইণ্ডিয়ান আর্মিতে সুবাদার। বন্ধু "দিদি" "দিদি" বলে ডেকে তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। হয়তো এখানেই থাকবার জায়গাও পাওয়া যাবে। মেয়েটি নেপালী হলেও হিন্দি বোঝে, তাই সুবিধা হোল। বেলা সাড়ে চারটা।

ভীমবাহাদুর এসে পৌঁছেই মাল নামিয়ে ইস্কুলবাড়িটা একবার ঘুরে দেখে এল। তারপর আমাদের উঠবার জন্যে তাড়া দেয়। এই ইস্কুলঘর বা দোকান কোনটাই তার পছন্দ নয়। এটি মদের আড্ডাখানা। সন্ধ্যে হতে হতেই এখানে হৈ-হুল্লোড় শুরু হবে। কাজে কাজেই অত্যন্ত অনিচ্ছাতে আবার উঠে পড়তে হল। অল্প একটু এগিয়ে একখানা দোতলা বাড়ীর দুখানি ঘরের মধ্যে বড় ঘরখানি পাওয়া গেল। কাঠ ও পাথরের তৈরী দালান। একতলাতে গৃহস্বামীর শস্য-পূর্ণ শস্যাগার। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ঘরটি পেয়ে আমরা খুশী। আমাদের খুশীর শেষ রইল না, যখন ঘরের জানালাগুলি খুলেই তুষারমৌলী ধোলাগিরির অপরূপ রূপ চোখে পড়ল। পড়ন্ত সূর্যের লালাভ আলোতে অপূর্ব দেখাচ্ছে শিখরটিকে।

ক'দিন ধরে দেখছি, নেপালে চাল ও শব্জী যথেষ্ট পাওয়া যায়। আটা ও ডাল খুব কম। পোখারা বাজারে অড়হর কলাই ছাড়া অন্য ডাল পাইনি। পথে কলাই ছাড়া আর কোন ডাল পাওয়া যাচ্ছে না। শাক-শব্জী প্রচুর মেলে। দুধ ও দই পাওয়া যায়, তবে সাধারণতঃ এরা চা ছাড়া এসব বিক্রি করতে চায় না। চা সর্বত্র, সব সময় পাওয়া যায়। ভুট্টা, শিমের বীচি, কাঁকুর আলু, পে'য়াজ, বীণ, কপি, কুমড়ো, টম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। মুর্গি ও মুর্গির ডিম সর্বদা পাওয়া যায়। আমরা পথে নিরামিষ খেয়েছি বলে আমাদের প্রয়ো-জনে এলো না। ভুট্টার আটা পাওয়া যায়, আমাদের সাহস হলো না খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে। তবে ভুট্টার খই ও ভুট্টা ভাজা প্রায় রোজই খেয়েছি। পথের কোথাও দোকান দেখিনি, তাই বাজার করবার হাঙ্গামা নেই। ঘরে ঘরে ভালো খাঁটি ঘি সর্বত্র মেলে। ভেজাল হবার সম্ভাবনা নেই, কেননা পোখারার ট্যুরিস্ট অফিসার বললেন, এই রাজ্যে ডালডার প্রবেশাধিকার নেই! খাঁটি সর্ষের তেল সর্বত্র পাওয়া যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কেটে যাবে মেঘ

অসীম বর্ধন

আজকের দিনের জটিল জীবনের নানা **সংগ্রাম ব্যর্থতা** দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কখনো **যদি** আপনার মনে হতাশার অবসাদ জাগে, যদি সে অবসাদ সর্বক্ষণ আপনাকে ম্রিয়মাণ **করে** রাখে, তাহলে হাল ছেড়ে দেবেন না। **হতাশার** অবসাদ-মেঘ কাটিয়ে ওপরের মুক্ত **আকাশে** উঠে যাওয়ার উপায় আছে।

শুধু মনের আবহাওয়াটাকে বদলাতে **পারলেই** আপনার অবসাদ-মেঘের গুমোট **কেটে** যাবে। নিশ্চয়ই জানতে চান, কি করে সে আবহাওয়া বদলানো যায়? বেশ, তাহলে **প্রথমেই** 'কিছু পারলুম না' এই মনোভাবের **পাঁক** থেকে এক পা বাইরে এগিয়ে দেবার খুব চেষ্টা দিয়ে সুরু করে ফেলুন। তাহলে **সব** ব্যাপারটা ঠিকভাবে বোঝা সুবিধে হবে।

সময়ের ফেরে ঘটনাচক্রে দুঃখ হতাশার **মধ্যে আমাদের** মাঝে মাঝে পড়তেই হয়। **তবে তার মধ্যে** আপনি কতদিন কষ্ট পাবেন, **সেটা** নির্ভর করবে আপনি কিভাবে নিজের **সঙ্গে অবস্থাকে** মানিয়ে নিতে পারেন, **তার** ওপর।

হতাশা অবসাদের সঙ্গে লড়াই করে **একে জয় করা** যায় না কখনো। একে **জয় করে এর কবলে** একেবারে জড়িয়ে পড়া থেকে যদি রেহাই পেতে চান, তাহলে **কটা কথা** মনে রাখতে হবে :

স্বাধীন হতে হবে—আমরা জানি, অর্থ **সম্পত্তিই** সবকিছু নয়। তবে কি চাই? **চাই** আপনার নিজের চিন্তার শক্তি সম্পর্কে **বেশ খাঁটি** একটা ধারণা। ওইখানেই সব **স্বাধীনতা**। কে আপনার জীবন চালাচ্ছে? **আপনিই** চালাচ্ছেন। জানবেন, কখনো অন্য **কারুর** হুকুমে আপনাকে চলতে হয়নি, **চলতে** পারেন না। আর জানবেন, স্বাধীন **উদার ভাবনায়** শক্তি আছে, উদ্দীপনা আছে। **সঙ্কীর্ণ** স্বার্থ-চিন্তায় রোগবীজ ভরা **আছে**। মনটাকে দুদিকেই খোলা রাখুন—**একদিকে**, যা-কিছু ভাল, উদার ভাবনা **স্বাধীনভাবে** গ্রহণ করুন, আর অন্যদিকে **অকাতরে** বিলিয়ে দিন স্নেহ আশীর্বাদ শুভ **চিন্তা** সকলের জন্যে, কারুর নির্দেশের **অপেক্ষায়** না থেকে। তাহলে আর কিছুতেই **অবসাদ** আসবে না—কিছুতেই না! দেখা গেছে, এভাবে অবসাদ দূর করে উদ্দীপনা **খুবই** আনা যায়!

ভয় উদ্বেগ ছাড়তে হবে—হতাশা অবসাদের মূলে অনেক সময়েই থাকে ভয় আর **উদ্বেগ**। এ-দুটো জিনিস বড় মনোকষ্ট দেয়—মনকে **ক্ষত**-বিক্ষত করে তোলে—অথচ **সেই ক্ষত** সৃষ্ট হয় নিজেরই মনের ভয় **উদ্বেগের** অহরহ আঘাতে। আপনি যখন **উদ্বেগ, ভয়**, দুঃখ-কষ্টের কথা বলেন ঠিক **তারপরেই** ও-বিষয়ে একটা কিছু করে **ফেলতে প্রবল ইচ্ছা** হয়। হয় না-কি? মনে **হয়**, তোলপাড় করে সব ঠিক করে দিই! **ছোট ছেলে-মেয়েরাও অমনি** করে।—চারা বেরুচ্ছে কিনা বোঝবার জন্যে মাটি ওলট-পালট করে ছোলাটাকে বার করে তার দেখা চাই রোজ। ওতে চারা ফোটে না কখনই। তেমনি মনের রাজ্যেও অস্থির হলে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। বীজ লাগানোর মতো একটা চিন্তাকে আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগাবো, কিন্তু সেটিকে কার্যকরী করার সময় না দিয়ে ক্রমাগত অদলবদল করে অস্থিরতার পরিচয় দেবো না। তার মানে এই নয় যে, পায়ে পা দিয়ে বসে দেখবো কি হয়। আসলে, এর মানে হলো যে চিন্তা অনুসারে পরিকল্পনা করে কাজে নেমেছি, সেই মতো আরো খাটবো আরো নিখুঁত হবো, পরিকল্পনাটিকে সফল করার আরো নতুন নতুন উপায় পদ্ধতি পথ খুঁজে বার করতে থাকবো।

আন্তরিক হতে হবে। কখনো কাউকে বেকায়দায় ফেলে আপনি কি পরে দুঃখবোধ করেছেন, কিংবা মারাত্মক একটা ভুল করার পরে আফশোষে ছটফট করেছেন? হয়তো করেছেন। সেই মনোভাব প্রকাশ করেছেন কি? করা উচিত। এসব মনোভাব নিয়ে একটু ভাবাও দরকার। এসব ব্যাপারে আন্তরিক আত্মবিশ্লেষণ করতে না পারলে খারাপ হয়। আবার, কাউকে অতিরিক্ত তোষামোদ করা, কারুর দোষ-গুণ না জেনে গায়ে পড়ে গুণকীর্তন করা (কাজ হাসিলের জন্যে)—এগুলোতেও আন্তরিকতার অভাব থাকে। ফলে, মনটা এই আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যে পরে অবসন্ন বোধ করে। সুতরাং সব সময়ে আন্তরিকভাবে কথা বলা, কাজ করাটাই ভাল। তাতে সুখী হবেন।

নিজেকে ক্ষুদ্র ভাববেন না। জীবনে সুখী হতে হলে সবকিছু থেকে ভাল জিনিসটুকু আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে। আর, তা করতে হলে প্রথমে আপনার মধ্যে যা সবচেয়ে ভাল, তা দিতে হবে বিলিয়ে, আর ঠিক সেই অনুপাতেই আপনি ফিরে পাবেন আপনার প্রয়োজনমত ভাল ভাল জিনিস। আপনার মধ্যে অনেক ভাল জিনিস আছে, সেবিষয়ে অহরহ সচেতন থাকবেন। এই সচেতনতার যাদুশক্তি আছে। এ-শক্তি সম্পর্কে আপনি খানিকটা না জানলে তো জগতকে (নিজেকেও) কিছুই দিতে পারবেন না।

আত্মার শক্তি কাজে লাগান। আত্মার শক্তি হলো ভগবানের দেওয়া অক্ষয় ক্ষমতা। শুনে মনে হয়, ভারী দুর্লভ। অথচ সেটা রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই! হতাশা অবসাদ যখনই বোধ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আত্মার শক্তির কাছে কান পাতুন। আধ্যাত্মিক পর্যায়ে চিন্তার অভ্যাস করুন বোঝবার চেষ্টা করুন, বিশ্বাস করবার চেষ্টা করুন, কি আপনার আত্মার ইচ্ছা। সেই আত্মিক ইচ্ছাটাই হলো আমাদের কাজকর্মের মূল শক্তি—যেমন বড় বড় জটিল যন্ত্রের আসল প্রাণশক্তি হলো বিদ্যুৎ—অথচ তাকে দেখাই যায় না! এই শক্তিকে ভাল কাজে লাগাতে হবে, তবে তার ভাল ফল পেয়ে নিজেরও ভাল হবে।

সব অবসাদ-চিন্তা ছাড়ুন—হতাশা আর অবসাদ চিন্তার এমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, যা দিয়ে এমন সব জিনিস টেনে আনে, যাতে ব্যর্থতা হতাশা আরও বেড়ে চলে। প্রত্যেকটি হতাশ চিন্তাই তার কারণ। চিন্তাকে সকলের ভালোর জন্যে ছড়িয়ে দিন, তাহলে কাজের গতি বাড়বে, সফলতার পথ মুক্ত হবে।

হতাশা অবসাদের কারণ খুঁজতে হবে—হতাশা অবসাদ কখন যে চেপে বসে বোঝা যায় না। হঠাৎ মনে হয়, সব ছেড়ে দেব সব বাজে। কেন এমন হলো, তা ভাববার অবকাশও পাই না। কিন্তু ভাবতে হবে। মনে করতে হবে, কবে কে দুটো কড়া কথা বলেছিল একটি ভুলের জন্যে, হয়তো একটা ভুল চিঠি আপনি লিখেছিলেন, হয়তো কোন একটা কথা রাখতে পারেননি। তুচ্ছ হলেও সেগুলো থেকেই অস্বস্তিকর চিন্তা গুমরে ওঠে। সেগুলোকে স্বাভাবিক তুচ্ছ বলেই ভাবতে হবে, ও থেকে যেন সমস্ত জীবনটাকেই ব্যর্থ বলে মনে না হয়। জীবনে আরো অনেক ভাল কাজ আপনার করার আছে।

হতাশা ছেড়ে কর্মচঞ্চল হয়ে থাকুন—জীবনে কি পেতে চান, সেদিকে মন দিন। কারণ, সফল হতে হলে কোন একটা বিষয় মনোনিবেশ করার অভ্যাসটা বড় দরকার। আর তারপর ক্রমাগত মানসিক উদ্যোগ আর মনোনিবেশ থেকে গড়ে উঠবে আপনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, মৌলিক ভাবধারা আর নিজস্ব প্রেরণা। কাজে-কর্মে নিজেই তখন এগুতে চাইবেন। যদি আপনার চিন্তায় সর্বদা নিন্দা তিরস্কার করার প্রবণতা থাকে, সে-চিন্তায় যদি সবকিছু বাতিল করার ভাবনাই প্রাধান্য লাভ করতে থাকে তাহলে এক্ষুনি তা বন্ধ করুন। তার বদলে নতুন চিন্তা নতুন আদর্শ নিয়ে ভাবতে সুরু করুন। তা থেকেই আপনার সামনের দিনগুলো নতুন সাজে সেজে উঠবে। এই নতুন চিন্তাকে দিবা-স্বপ্ন বলে নেবেন না, কিংবা এ-দিয়ে মনকে বিক্ষিপ্ত করা হবে বলে আশঙ্কা করবেন না। কিছু একটা গড়বার করবার নতুন চিন্তা মনকে কাজ করায় তাতে মন সুস্থ থাকে, জীবনের স্বপ্নগুলোকে সত্যে পরিণত করার পথ গড়া হতে থাকে।

আর একটা কথা বলে শেষ করি। হতাশা আর মানসিক অবসাদ এলে বুঝতে হবে য আপনার আর দরকার নেই, তাকে বোধহয় আপনি আঁকড়ে থাকতে চাইছেন, তাকে ছাড়তে মন চাইছে না। আর নয়তো, য আপনার খুব দরকার, সেটিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করবার জন্যে মনকে রাজী করাতে পারছেন না। নিজেকে পুরোপুরি প্রকা করে তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করুন। সবা কাছে যা ভাল, সেগুলোর সঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে জগতের ভাল সব কিছুকে পাবার চেষ্টা করুন।

অথ কুম্ভীর কথা

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

টাকার কুমীর, কুম্ভীরাশ্রু—এই দুটি কথাতেই বোঝা যাচ্ছে যে কুমীরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় একেবারে অগভীর নয়। ঘরের ঢেঁকী অনেক সময় কুমীর হয় এও তো আমাদেরই প্রবাদ বাক্য।

গোবেচারা কুমীর নিজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার আশায় ধূর্ত শিয়ালের কাছে যেভাবে নাজেহাল হয়েছিল তার গল্প বাংলাদেশের কোন ছেলেমেয়ে না জানে? কাজেই কুম্ভীর কথা আমাদের ঘরের কথা।

বিলেতি জাতবিচারে কুমীর দুই জাতের। একটা অ্যালিগেটর অর্থাৎ আমাদের বাঘাকুমীর—যারা চঞ্চুহীন, আর একটা ক্রোকোডাইল—মেছোকুমীর যেটার দীর্ঘ চঞ্চু রয়েছে। কুলপঞ্জী বিচারে একটা আর একটার কাজিন অর্থাৎ 'তুতো' ভাই।

বাঘাকুমীর এদেশে একেবারে নেই বলা যায় না, তবে কম। মেছোকুমীরই আমাদের দেশে বেশী। আমেরিকা ও চীন সমুদ্রের এক এক জায়গায় বাঘাকুমীরই বেশী আর আফ্রিকা ও এশিয়ার সংলগ্ন সমুদ্রে মেছোকুমীরের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আফ্রিকার কুমীরগুলির নাকি নর-মাংসের প্রীতি বেশী। আফ্রিকায় সিংহের পেটে ও সর্পদংশনে যত লোক না মরে কুমীরের পেটে তার চেয়ে বেশী লোক যায়। এটা কুমীরের বদনাম কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন—নরম মাংসের উপর কুমীরের লোভ বেশী বটে তা বলে তাদের নর-মাংস প্রীতির কথাটা ঠিক নয়।

কুমীরের রূপের খ্যাতি নেই কিন্তু শক্তির খ্যাতি রয়েছে। জলে এবং স্থলে উভয়ক্ষেত্রেই একবার যদি কুমীরের খপ্পরে কেউ পড়ে তবে যে যতবড় শক্তিমানই হোক কৌশল না জানলে দৈহিক শক্তিতে তার সংগে এঁটে ওঠা যাবে না। মাথা থেকে ল্যাজের শেষ অবধি উপরের দিকে তার যে চামড়া রয়েছে তা সাধারণ শক্তি নিয়ে যে কোন ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করেও ঘায়েল করা যায় না। একমাত্র বন্দুকের বুলেটই তাকে ছিদ্রিত করে কাহিল করে। কুমীরের নীচের দিকে পেটের ভাগটা খুব দুর্বল—ওখানে আঘাত করে কৌশলী শিকারী তাকে জব্দ করে। নইলে কুমীর দুর্ধর্ষ জীব।

সাধারণত কুমীর লম্বায় ১৪।১৫ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে ১৮।১৯ ফুট পর্যন্ত লম্বাও পাওয়া গেছে আর ওজন দুই টন। ডাইনোসোরাসের সমসাময়িক ইনি। ডাইনোসোরাস পৃথিবীর পিঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিন্তু শক্তিশালী কুমীর তার প্রচণ্ড বন্য জীবনীশক্তি নিয়ে জীবন-যুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে আছে আজও।

শুধু কি বেঁচে আছে, অনেকে মনে করেন প্রকৃতি এর জৈব জীবনে এত সুযোগ দিয়েছে যে মাঝে মাঝে প্রকৃতিই আবার তার অমোঘ শাসন-বিধান সৃষ্টি করে এর জীবনে মৃত্যু ডেকে না আনলে এর জীবজগতে অমরত্ব লাভ করবার কথা। দৈহিক ক্ষয় বলে কোন বস্তু এর নেই—এমনকি জীবজগতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কোষহ্রাসের যে রীতিতে জীবের স্থবিরত্ব ও মৃত্যু এনে দেয় সেটাও এর দেহের ব্যাপারে ঘটে না বলে বিশেষজ্ঞদের মত। স্বজাতি ও মানুষ ব্যতীত আর কেউ শত্রুতা করে একে জব্দ করতে পারে না।

বয়স্ক কুমীর এই বিরাট দেহ ও প্রায় ২ টন ওজন নিয়ে জলে-স্থলে যখন আহার অন্বেষণে বিচরণ করেন তখন তার গতির দ্রুততা লক্ষ্য করলে অবাক হতে হয়। তার বাস্তুস্থান নির্মাণের সময় কুম্ভীর তার ল্যাজকে বুলডোজারের মত ব্যবহার করে। ৫০ ফুট একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করতে তার কয়েক ঘণ্টা সময় যথেষ্ট। জলে এই জীবটি তার লাঙ্গুলকে বৈঠার মত ব্যবহার করে। ছয়জন লোক বৈঠা টেনে একটি ছোট ডিঙ্গি যত দ্রুত চালাতে পারে তার চেয়ে দ্রুত জল কেটে সাঁতার দিতে পারে কুম্ভীর। ল্যাজই হল এর আক্রমণের প্রধান অস্ত্র। জলে এবং স্থলে দুই জায়গায় ইনি এর লাঙ্গুলের নিশ্চিত আঘাত শক্তিতে ও বিদ্যুৎ গতিতে প্রচণ্ড বলশালী যে-কোন জীবকে ঘায়েল করে থাকেন। এর লাঙ্গুলের শক্তির প্রমাণস্বরূপ ইনি একটি ৫০০ পাউন্ড ওজনের গণ্ডারকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করে বিকল করে দেন। লাঙ্গুলের প্রচণ্ড আঘাতে এক ভদ্রলোক ২০ ফুট শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছেন দেখা গেছে।

এক এক পাটিতে ৩৪টি করে কুম্ভীরের মুখমণ্ডলে ৬৮টি দাঁত রয়েছে। এই দন্ত-পংক্তি আহার্য চর্বণের জন্যে নয়—কারণ কুমীর চিবিয়ে খায় না, গিলে খায়। ছোট খাবার হলে একেবারে আর খাবার যদি বড় হয় তাহলে তিন-চার ঢোকে গিলে খায়। অথচ তার দাঁত রয়েছে এবং তার দন্তমূল নাকি দৃঢ় নয়, ফলে ছোট ছেলেমেয়েদের দুধের দাঁতের মত খুব স্বল্প সময়ের ভেতরই আবার নতুন দাঁত ওঠে—সেইজন্যেই কুমীরের জীবনে নাকি বার্ধক্য ও জরা আসে না। অনন্ত যৌবনের অধিকারী কুম্ভীর।

সরীসৃপের কন্ঠস্বরের কোন রেকর্ড পাওয়া যায়নি। সরীসৃপের কন্ঠস্বর নেই বলেই বিশ্বাস। কিন্তু কুমীর সরীসৃপ এবং তার কন্ঠস্বর রয়েছে এবং তা ভয়াবহ। সিংহনাদের মত এত গম্ভীর না হলেও কুম্ভীরের কুম্ভীর নাদে মেদিনী কম্পিত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কুম্ভীর নিনাদে পায়ের নীচে ভূকম্পন স্পষ্টই অনুভব করা যায়।

নিনাদ, গর্জন ব্যতীত কুমীরের অন্যরূপ কন্ঠস্বরও রয়েছে। হিস-হিস আওয়াজ এবং হুম্পা-হুম্পা এই দুই আওয়াজেও তিনি তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেন। হিস-হিস আওয়াজ হলো বিরক্তির প্রকাশ। হুম্পা-হুম্পা হচ্ছে উদরপূর্তির পূর্ণতৃপ্তির প্রকাশ। হুম্পা-হুম্পা তৃপ্তি ব্যতীত অন্য মনোভাব প্রকাশের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। শ্রীমতী কুমীর যখন তার ভাবী সন্তানদের ডিম্বরূপে গর্ভে অনুভব করেন তখন এই হুম্পা-হুম্পা শব্দে এটি প্রকাশ না করে পারেন না। পুরুষ কুম্ভীর যখন শ্রীমতী কুম্ভীরের প্রতি প্রেমাসক্ত হন তখন এই নিনাদ দ্বারা তার পৌরুষ প্রকাশ করে থাকেন। জীবজগতে পুরুষ যখন প্রেমে পড়ে এবং নারী যখন সন্তানবতী হয় তখন সেটা গোপন করা বড় শক্ত। কুম্ভীর-কাহিনীতে এই ঘটনা বড় স্পষ্ট।

আসন্নপ্রসবা শ্রীমতী কুমীর ডিম্ব প্রসবের সময় হয়েছে বুঝতে পারলেই সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তার [illegible] ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চারদিক থেকে ছোট ছোট

বাঙ্গালোরের লালবাগ ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

গাছের শুকনো ডালপালা, খড়কুটো সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—এই খড়কুটো শুকনো ডালপালা ও মাটি দিয়ে সে তার অণ্ডজ সন্তানদের নীড় নির্মাণ করে। পুরুষ কুমীর একমাত্র আহার অন্বেষণ ও প্রেম করা ছাড়া অন্য কোন শ্রমসাধ্য কাজে বড় তৎপরতা দেখায় না। শ্রীমতীর নীড় নির্মাণে তার কোন উৎসাহ দেখা যায় না। এ কাজের ভার শ্রীমতী কুমীরকে একা বহন করতে হয়। মাটি শুকনো ডালপালা ও খড়কুটো দিয়ে তিন-চার ফুট উঁচু একটা প্যাটাফর্মের মত তৈরী করে নেয়। সেই প্যাটাফর্মের মাঝখানটায় বেশ বড় একটি গর্ত করে নিয়ে তার ভেতর সে ডিম প্রসব করে। ডিমগুলোকে আবার খড়কুটো ও মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়। একসঙ্গে ৬০ থেকে ৮০টি ডিম শ্রীমতী প্রসব করেন। এবং এই সময় থেকেই ডিম পাহারা দেয়া তার একটি বিশেষ কাজ। কারণ শ্রীযুক্ত কুমীরই অবসর পেলে ঐ সব ডিম আহার করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। তাছাড়া প্রতিবেশী কুমীর যাঁরা আছেন সন্ধান পেলে তাঁরাও ডিম চুরি করতে দেরী করেন না।

এই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার সময় হ'লে শ্রীমতী ডিমের ভেতর আপনার বাচ্চাদের কান্না শুনতে পায়। সে তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়ে বাচ্চাদের আলোর পৃথিবীর দরজা খুলে দেয়। এই সময় এই কুমীর-শিশুদের পিতৃদেব দুর্ভাগ্যবশত যদি নিকটেই কোথায়ও থাকেন—আপনার সন্তান-দের গলাধঃকরণ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না।

ডিম ফুটে সন্তান তিন-চার সপ্তাহ জল অর্থাৎ শিক্ষানবিশী করে। এই সময় কুমীর মাতা তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ-জীবনে কিভাবে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় তার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সন্তানদের শিক্ষার কাজ ও তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তাঁকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তাঁর নিজের আহারের আর সময় থাকে না. ফলে. শেষ পর্যন্ত তা অনাহারজনিত মৃত্যু ঘটে।

শিশু কুমীররা কিছুকাল মার সঙ্গে খেলা উপভোগ করতে দেখা যায়, কিন্তু তিন-চার সপ্তাহের ভেতরই নিজের আহার নিজেরই অন্বেষণ করে নিতে হয় ব শৈশব-জীবনের নিরঙ্কুশ কৌতুক ও আনন্দ গভীর জীবিকা অন্বেষণে শেষ হয়ে যায়।

কুম্ভীর সমাজে নিজের শক্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্মুখ-সমরের রীতি প্রচলিত। এই লড়াই একটা দ্রষ্টব্য বস্তু যুযুৎস দুই কুম্ভীর মাথা থেকে ল্যাজ অবধি সমান্তরাল ভাবে পাশাপাশি ব পরস্পরকে ল্যাজ দিয়ে আঘাত করতে থাকে গদাযুদ্ধের মত এই লাঙ্গুলযুদ্ধ অনেকক্ষণ চলতে পারে এবং চলেও। এতে মৃত্যুও হয়

জলে এবং স্থলে দুই ক্ষেত্রেই কুম্ভী তার শিকারের উপর যখন নজর দেয় তখ সে লক্ষ্যভ্রষ্ট বড় হয় না—এ-ব্যাপারে তা লক্ষ্য অব্যর্থ। প্রবল স্রোতের ভেতর কো বন্যজন্তু সাঁতার কেটে নদী পার হচ্ছে. ঠি সেই সময় কুমীর যেভাবে সময়মত সঠিক স্থান নির্দেশ করে ডুব দিয়ে গি তার শিকার ধরে তা দেখলে অবাক হ হয়।

বছরের বারো মাসের ভেতর সে সা মাস আহার করে থাকে ; বাকি পাঁচ মা সে আর আহার করে না। এই সময় শীত ঘুম ঘুমিয়ে সেই সাত মাসের খাদ্যদ্র হজম করে।

এই বীভৎস জন্তুটিকে আমরা যত এড়িয়ে যাই না কেন, বর্তমান চিকিৎস বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীরা এর জৈব প্রক্রিয়ার ভেত এমন সব চমকপ্রদ ঘটনার সন্ধান পেয়েছে যাতে এই জীবটিকে দিয়ে মানুষের অসী উপকার হবে বলে মনে করেন। আমাদে দেহের ভেতর যেসব জৈব প্রক্রিয়া ঘটে কুমীরের দেহেও সেই সব জৈব প্রক্রিয়া একা ভাবে ঘটছে। মানুষের দেহে এই জৈ প্রক্রিয়া এত দ্রুত হচ্ছে যে তার ছবি তো যাচ্ছে না, কিন্তু কুমীরের শরীরে সেই জৈ প্রক্রিয়া এমন ধীরে ধীরে ঘটছে, যে তার চ চিত্র নেয়া যাচ্ছে, ফলে জীব-বিজ্ঞানী নিকট এই জীবটি একটি মূল্যবান পরীক্ষ আধার। ইনসোলিন মানুষের দেহের র কণিকায় দ্রুত কাজ করে, কিন্তু সেই ইন সোলিনই কুমীরের দেহে এত ধীরে ধী প্রত্যেকটি স্তর সুস্পষ্ট ভাবে পরীক্ষা করব সুযোগ দিয়ে অতিবাহিত হয় যে এ জীবটিই একদিন আমাদের চিকিৎসাশা গভীর পরিবর্তনের সুযোগ করে দেবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

২৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 25th November, 1966 শুক্রবার ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

পরিচ্ছন্ন কলকাতা

সবিনয় নিবেদন,

নেহরুর 'দুঃস্বপ্নের নগরী' কলকাতায় সম্প্রতি শুরু হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রসের উদ্যোগে 'পরিচ্ছন্ন কলকাতা' সপ্তাহ। অর্থাৎ যে কলকাতাকে আমরা দেখছি তাকে আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর করা হবে। নিশ্চয়ই ভাল ব্যবস্থা। এর জন্য সব থেকে বড় দরকার অভ্যাস বদলান। এ না হলে কলকাতার কোন উন্নতি হবে না। যে আলস্য এবং নোংরামি আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাকে দূর করা খুবই কঠিন।

যেমন ধরুন বিরাট কোন অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে দেওয়ালে পানের পিক ফেলে ফেলে বিচিত্র ছবি তৈরি করা হয়েছে। আপনি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পাশের বাড়ীর ওপর থেকে তরকারির খোসা অথবা দইয়ের খুড়ি মাথার ওপর পড়লে একটুও আশ্চর্য হবেন না। কারণ এ ঘটনা হামেশাই ঘটে। রাস্তায় কলা লেবুর খোসা হড়কে গিয়ে যদি আপনি চারমাস থেকে চার বৎসর কোন আরোগ্য নিকেতনে শায়িত থাকেন, তবে কি আপনার অদৃষ্টকে গালি দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করবার আছে। রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি রঙ বেরঙের বাড়ী আর ঐ সব বাড়ীর দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র প্রাচীর-পত্র। জন্ম নিয়ন্ত্রণ থেকে 'হায়ার সেকেন্ডারী মেড ইজি', কোচিং ক্লাসের পরীক্ষা পাশের গ্যারান্টী, সচিত্র অশ্লীল (?) সিনেমা বিজ্ঞাপন সব কিছুই দেখা যাবে। দেখে আপনি বিস্মিত হবেন!

অথচ এ জিনিস খুব সহজেই বন্ধ করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন হয় না কোন অতিরিক্ত পয়সা খরচের বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার। অভ্যাসকে বদলাতে শিক্ষার প্রয়োজন। শিশু শিক্ষা আরম্ভ থেকে যদি তাদের সচেতন করা যায় তবে কোন ফল হবে না কি? শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে আবেদন অনেকখানি কাজ করে। আবার নাও করতে পারে। যেমন ধরুন কয়েক বৎসর আগে পুলিশ থেকে চেষ্টা হয়েছিল. 'লাইন দিয়ে বাসে উঠতে শিখুন'। কিন্তু সে শিক্ষা কতদূর এগিয়েছে জানি না। কারণ লোহার রেলিঙ দিয়ে ঘের দেওয়া স্থানেও হুড়োহুড়ি করে বাসে ওঠাটা কি এখনও অ-দৃষ্ট-পূর্ব।

রাস্তার ওপর ময়লা ফেলার অভ্যাস অনেকেরই আছে। কলকাতা কর্পোরেশন এই ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন। দেখা যায় রাস্তার ওপর কোথাও কোথাও ময়লা ডাঁই হয়ে আছে। কুকুরে-কাকে ময়লা ছড়িয়ে চতুর্দিক আরও কুদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে। দুর্গন্ধ নাকে রুমাল দিয়েও বন্ধ করা সম্ভব নয়। অথবা কর্পোরেশনের গাড়ী ময়লা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর গাড়ী থেকে ময়লা ছিটিয়ে পড়ছে রাস্তার দুধারে। দৃশ্যটা নিশ্চয়ই সুখকর নয়, স্বাস্থ্যকর তো নয়ই। ভাঙা খোঁড়া ফুটপাথ, জল না ওঠা টিউবওয়েল, এতো সর্বত্র। বড় বড় রাস্তা এবড়ো খেবড়ো। কর্পোরেশন রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে থাকেন। এই আলো কোথাও জ্বলে কোথাও জ্বলে না।

কলকাতার রাস্তার ধারে ধারে চায়ের দোকান, পান-বিড়ি ও নানাপ্রকার ছোট-খাট দোকান বেড়েছে অসম্ভবভাবে গত কয়েক বৎসরে। এইসব দোকান কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দেয়। অথচ দোকান-গুলিকে বাড়াবার জন্যে কাঠপাতিয়ে ফুটপথের কিছুটা অংশ আটকিয়ে দেওয়া হয়। চায়ের দোকানের সামনেটা জলে চায়ে কাদায় একাকার। পুরোন কাগজওয়ালারা ফুটপাথ জুড়ে কাগজ বিছিয়ে বসে, কয়লা-ওয়ালা কয়লা ভাঙতে বসে যায় রাস্তায়। এর ফলে কংক্রিটের ফুটপাথও কয়েকদিনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাছাড়া আছে কলকাতার বস্তি। মোট লোকসংখ্যার বেশ কিছু পরিমাণই নানাকারণে বস্তি জীবনকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এইসব বস্তির পরিধিও কম নয়। বস্তির মধ্যেকার দৃশ্যটা অনেকেরই অজানা। ঘরগুলোতে আলো ঢুকতে পারে না, কাঁচা ড্রেন, খাটা পায়খানা, জলের অভাব, অস্বাস্থ্যকর আবর্জনার স্তূপ, দুর্গন্ধ মিলিয়ে যে এক বীভৎস নরকের জীবন এখানে চলেছে. কলকাতার দীর্ঘ ইতিহাসে আজও তার কোন প্রতিকার নেই।

এই প্রসঙ্গ থেকে কলকাতার খাটাল-গুলো বাদ দেওয়া যায় না। যদিও শোনা যায় কলকাতা শহর থেকে খাটাল অপসারণে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু সেই আইনের প্রয়োগ কোথায়? এখনও অসংখ্য খাটাল ছড়িয়ে আছে কলকাতার বুকে। এর ফলে যে নোংরা ও দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে তার কি কোন প্রতিকার নেই?

কলকাতার সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত-হারে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কল-কাতাকে নিয়ে খুবই বিব্রত। কিন্তু এর মধ্যেই নিজেদের চেষ্টায় কলকতাকে সুন্দর করা যায় না কি? যেমন ধরুন রাস্তায় ময়লা ফেলা, কলা, আম ও নানান ফলের খোসা ফেলা, থুথু ফেলা, রাস্তায় ময়লা জড় করা এগুলো সহজেই বন্ধ করা যায়। রাস্তা পরিষ্কার রাখতে কর্পোরেশনের কর্মী ও জনসাধারণের দায়িত্ব প্রায় সমান। কর্পোরেশন আছে—ওরাই করবে—এই অজুহাতে সরে থাকা অন্যায়।

মনে হয় অপরিচ্ছন্নতা নোংরাপ্রিয়তা আমাদের অ-শিক্ষার জন্যই অনেকটা দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়ে শিক্ষিতের গন্ডী যতই বিস্তৃত করা হোক না কেন, এদিকে মনের দৈন্য থেকে যাচ্ছে নিদারুণভাবে। শিশুশিক্ষায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা, স্বাভাবিক সৌজন্য-মূলক ব্যবহারের নিয়মকানুন আবশ্যিক শিক্ষা হওয়া উচিত।

কিন্তু অভিযোগ যতোই হোক, প্রতিকার কোথায়? পরিকল্পনাধীন শহরকে আধুনিকীকরণের জন্য কত পরিকল্পনা, কত অর্থ ব্যয়, কত বিশেষজ্ঞদের মাথা-ব্যথা। কিন্তু কোন পথ দেখা যায় না। সাময়িক উত্তেজনায় যা কিছু উদ্যম নিঃশেষ হয়ে যায় সপ্তাহ-মাস-বৎসর শেষে।

সুলেখা চৌধুরী
কলকাতা-৯

লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের ১৮ই কার্তিকের ২৬ সংখ্যায় শ্রীঅমিতা রায়ের "লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখাটি সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। এধরণের প্রবন্ধ ইতি-পূর্বে আমার চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে তিনি যেভাবে বাঙালীর একটি চিরন্তন অনুষ্ঠানকে টেনে এনেছেন, যেভাবে তিনি বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সংযোগ ঘটিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়কে নিয়ে এভাবে একটি রচনা সৃষ্টি করা গবেষণারই নামান্তর বলা যায়। ভয় বিশ্বাস আর স্বার্থের খাতিরে মানুষের মনে কিভাবে ভক্তির অভিব্যক্তি ঘটেছে তারই একটা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পেলাম অমিতা দেবীর প্রবন্ধে।

একস্থানে অমিতা দেবী লিখেছেন, "দেবী কখনো পদ্মাসনে, কখনো পেচকাসনে, কখনো ময়ূরের উপর অধিষ্ঠিতা।" এস্থানে "ময়ূরের উপর অধিষ্ঠিতা" বলতে তিনি লক্ষ্মীদেবীর কোন রূপের কথা বলতে চেয়েছেন, বুঝতে পারলাম না। কারণ লক্ষ্মী-দেবীকে কখনো ময়ূরের উপর অধিষ্ঠিতা হতে দেখেছি কিংবা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। তাই এ-তথ্যটি যেমন অস্পষ্ট তেমনই রয়ে গেল। একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে বোঝার অসুবিধা হত না।

যাই হোক্, আজকেরদিনে এধরনের প্রবন্ধ যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন তা অবশ্য স্বীকার্য।

বিনীত
শিখা মল্লিক
কলিকাতা—৫৩।

অমৃত

সম্পাদকীয়

মন্ত্রিবদল ও জাতীয় সমস্যা

দশমাসের মধ্যেই শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার বড়রকমের রদবদল করতে হল। সাধু বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বিদায় নিলেন। যাবার সময় তিনি এমন সব কথা বলে গেলেন যাতে এখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মন্ত্রিসভার ভিতরে আশানুরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা পর্যাপ্ত ছিল না। প্রধানমন্ত্রী এই অভিযোগ অবশ্য সুস্পষ্টভাষায় অস্বীকার করেছেন। যাই হোক নন্দাজীর বিদায়-কালীন বিতর্ক আপাতত থেমেছে। প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগে তাঁর মন্ত্রিসভার দপ্তরগুলো অদলবদল করে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী চাগলাকে দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার পেলেন শ্রীযশোবন্ত চ্যবন। পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে স্বরণ সিং-কে পাঠানো হয়েছে প্রতিরক্ষায় এবং পূর্ত ও সেচ দপ্তর থেকে ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ গেলেন শিক্ষায়। এই দপ্তরবদল মন্ত্রিসভার ভিতরকার কোনো নীতিবদলের পরিচায়ক নয়। নির্বাচনের আগে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী দপ্তরগুলো পুনর্বণ্টন করলেন মাত্র।

তবে এবারে লোকসভার অধিবেশন গোড়া থেকেই খুব উত্তপ্ত। কারণ, মন্ত্রিবদল হলেই সমস্যা রাতারাতি সমাধান হয়ে যায় না। অন্যান্য সমস্যার কথা বাদ দিলেও ভারতবর্ষের সামনে এখন দুটি সমস্যা অতি মারাত্মক আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি হল ব্যাপকভাবে আইন ও শৃংখলা রক্ষার সমস্যা, অন্যটি হ'ল খরা ও অনাবৃষ্টিজনিত ব্যাপক অঞ্চলে খাদ্যাভাব। আইন ও শৃংখলার যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে ছাত্রবিক্ষোভের একটি নিকট সম্পর্ক আছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোনো না কোনো কারণে ছাত্রদের বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে নিছক আইন ও শৃংখলার মামুলি নীতি প্রয়োগ করে তাকে সামলানো যাচ্ছে না। এ বিষয়ে মন্ত্রিসভার ভিতরেও নানারকম মত রয়েছে বলে মনে হয়। শ্রীচাগলা যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন যে, শুধুমাত্র পুলিশের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ছাত্রবিক্ষোভ সমাধানের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায় না। তাঁর মতে, এটি একটি বৃহত্তর ও গভীরতর সামাজিক সমস্যা। তার সমাধানের জন্য সরকার, শিক্ষাব্রতী ও ছাত্র-সমাজকে ভিন্নভাবে অগ্রসর হতে হবে বিক্ষোভের মূল কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকারের জন্য। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এত ব্যাপকভাবে সমস্যাটা দেখছেন না। তিনি আইন ও শৃংখলার প্রশ্নে ছাত্র বলেই বিক্ষোভকারীদের রেহাই দেবার পক্ষপাতী নন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিদপ্তর রদবদল হয়ে গেছে। নতুন শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত কী তা জানা যায়নি। নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছাত্রদের বিষয়ে কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। মোটকথা, সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। পুলিশ আইন রক্ষা করছে, ছাত্ররা আইন ভাঙছে। ফলে আসল গলদ কোথায় তার কিনারা না হয়ে সারা দেশে এই অপরিণতবুদ্ধি তরুণ ও ছাত্রদের নিয়ে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটছে। এর সুষ্ঠু সমাধান সবারই কাম্য।

অন্যদিকে ঘোরতর বিপদ দেখা দিয়েছে খরার জন্য প্রত্যাশিত ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ায়। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অংশে খরার জন্য অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, জাতিকে একতাবদ্ধ হয়ে এই ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এ নিয়ে দলবাজী রাজনীতি করা চলবে না। যা-খাদ্য আছে তা ভাগ করে খেতে হবে। যেখানে উদ্বৃত্ত আছে তা ঘাটতি এলাকায় সমবন্টনের আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি এই হতাশার মধ্যেও ঘাটতি এলাকায় আশা সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আশ্বাস কার্যকর করতে হলে খাদ্যনীতির পরিবর্তন দরকার। সাম্প্রতিক মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয়েছে যে, একটি জাতীয় খাদ্যবাজেট তৈরী করা হবে এবং সেই ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি সকল রাজ্যে খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা হবে। গত বৎসরই খাদ্যশস্য কমিটি এই ধরনের বাজেট তৈরীর সুপারিশ করেছিল। তা এখন পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। উদ্বৃত্ত অঞ্চল তার খাদ্য হাতছাড়া করতে চায় না। তার ফলে এই নিরন্নের দেশেই উদ্বৃত্ত রাজ্যে মাথাপিছু দৈনিক ১৮ আউন্স খাদ্য খরচ হয় অথচ খাদ্যাভাবগ্রস্ত এলাকায় মাথাপিছু দৈনিক ৬ আউন্স খাদ্য দিতে পারবেন কিনা, এ নিয়ে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সংশয় প্রকাশ করেছেন। এই যদি বন্টনের নমুনা হয় তাহলে এক জাতি, এক দেশ ইত্যাদি কথা বলার কোনো অর্থই হয় না। অনেক রাজ্য কৃষিপ্রধান, অনেক রাজ্য শিল্পপ্রধান। শিল্পপ্রধান রাজ্য ভারতের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করছে। সুতরাং তার রাজ্যে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় না বলে সেখানকার অধিবাসীদের অন্নকষ্ট ঘুচবে না, অন্তত সবার সঙ্গে সমবন্টনের সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে, এ নীতি কখনোই জাতীয় নীতি হতে পারে না। আশা করি, আগামী বৎসর জাতীয় খাদ্যবাজেট কার্যকর রূপ নিয়ে এই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে।

বিচিত্র চরিত্র

শশীশেখর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

"যাঁহা শশীশেখর
তাঁহাই ডেংগারা।"

(প্রথম পর্ব)

সুন্দর টকটকে লাল রঙের একটি দানা, দুটো মসুর দানাকে একটা করলে যতটা বড় হয় আকারে ততটুকু। আমার ছোট ভাই দানাটি সামনে রেখে দিয়ে বললে—বল তো কি? নেড়েচেড়ে দেখলাম, কিন্তু কি তা' বলতে পারলাম না। বললাম—হারলাম। কিন্তু কি বল্ তো?

—রক্তচন্দনের বীজ।

—রক্তচন্দনের বীজ? রক্তচন্দনের গাছ বীজ থেকে হয়? প্রশ্নটা করেই একটু অপ্রতিভ হলাম। শতকরা নব্বুইয়ের বেশী হয়তো বা নিরেনব্বুই ক্ষেত্রেই তো বীজ থেকে অংকুর, অংকুর থেকে গাছ। এই একটা যেটা বাদ থাকছে, তার জন্ম শিকড় বা মূল থেকে। সে ডাল কেটে মাটিতে পুঁতলে শেকড় গজায়, আবার ডাল মাটিতে চাপা দিয়ে রাখলে তাতে শেকড় গজায়; আবার কিছু কিছু গাছ আছে, তার শেকড়ের গেঁড়ো আছে, তুলে এনে পুঁতলেই হয়। কন্দ একটা বিশেষ জাত। কিন্তু তার চেহারা স্বতন্ত্র। কন্দের গাছে রক্তচন্দনের ডালের মত রাঙা টকটকে কাঠের সার হয় না। রক্তচন্দনের সার—অত্যন্ত শক্ত। সহজে ক্ষয় হয় না।

ছোট ভাই উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এবং সে উত্তর নিশ্চয়ই উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতাতে রূপ নিত। কারণ আমার ছোট ভাইয়ের স্বভাবই ওই; বিদ্যা জাহিরের সুযোগ পেলে সে ষোল আনার স্থলে আঠারো আনা করে নেয়। অবশ্য কেই বা না করে বলুন। সে, মন্ত্রী থেকে শুরু করে যে-কোন লোক পর্যন্ত। নিজের নিজের সাবজেক্ট একবার পেলে হয়। বিদ্যা জাহির করে না বোধহয় একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়, তবে তাঁদের বিদ্যাকে বলা হয় বড়-বিদ্যা অর্থাৎ চুরি; চোরেরা বোধহয় বিদ্যে জাহির করে না। আমার ছোট ভাইয়ের বিদ্যা অত্যন্ত ছোট বিদ্যা, সে তো থামবে না, সুতরাং আমি সুযোগটাকে অন্য প্রসঙ্গের বা প্রশ্নের চাপান দিয়ে তার মুখ বন্ধ করলাম। বললাম—এখানে রক্তচন্দনের বীজ কোত্থেকে এল? পেলি কোথায়?

—দিয়ে গেল। বলে রেখেছিলাম। ডেঙেরার শশীবাবু লাগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পুকুরের পাড়ে; এখন বেশ ঘন জঙ্গলের মত হয়েছে। ওই বীজ ঝরে পড়ে, বর্ষার সময় গাছ গজায়, কতক মরে, কতক থাকে। যা থেকেছে তাতেই বেশ জঙ্গলের মত হয়েছে।

শশীবাবু। ডেঙেড়ার শশীবাবু, বাবু শশীশেখর সরকার। মনে পড়ে গেল মানুষটিকে।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন আমার বয়স ছিল ১৩।১৪, তখন তাঁকে চোখে দেখেছি। নাম শুনেছি অনেক আগে; কবে—তখন আমার বয়স কত, তা বলতে পারব না। হিসেব করে বলা শক্ত। সেকালে ডেঙেড়ার শশীবাবুর নাম দিনে একবার না-হোক সপ্তাহে একবার এ বোধহয় প্রত্যেকে উচ্চারণও করত এবং অন্যের মুখের উচ্চারিত নামটা কানে ঢুকত। ছেলেরও ঢুকেছে, বুড়োরও ঢুকেছে।

আমাদের দেশে কতকগুলো বিখ্যাত বস্তু এবং স্থান ছিল: একটা ছিল—"তিন-ফুঁকো সাঁকো" অর্থাৎ তিনটে ফোকর-ওয়ালা একটা কালভার্ট; বারিপুকুরের পাড়ের উপরকার ভূতাশ্রিত বিশাল শিমুল গাছ, কুয়ে নদীতে কালিদহ বলে একটা দহ সেখানে কুমীর থাকত, পাকা শড়কের উপর প্রায় মাইল-পাঁচেক দূরের—সুঁদী-পুরের বটতলা—বটগাছের ডালে ডালে 'নামাল' শিকড় নেমে মাটিতে ঢুকেছিল; (বোটানিক্যাল গার্ডেনের বটগাছের মতন); আর একটা হল 'গনুটিয়ার রেশমকুঠী'—কুঠীটা বাংলাদেশের সবথেকে বড় কুঠী ছিল, এমন ধরনের আরও জিনিস ছিল, স্থান ছিল, নানুর, শান্তিনিকেতন, জ্ঞান-দাসের কান্দরা বা রামজীবনপুর, কিন্তু এগুলির জাত আলাদা; নানুর, শান্তি-নিকেতন, কান্দরা আর তিনফুঁকো সাঁকো সুঁদীপুরের বটতলা—এ ঠিক এক জাতের স্থান নয়।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছি আমার যখন পনের-ষোল বয়স, তখন তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তার আগেই শান্তি-নিকেতনের ৭ই পৌষের মেলায় গিয়েছি, রাত্রে বাজীপোড়া দেখেছি, দিনে তাঁকে দেখেছি দূর থেকে।

শশীবাবু ও জাতের মানুষ নন, তবে তার তুলনা বোধহয় গনুটিয়ার কুঠীর সঙ্গে। না, তাও যেন নয়। তিনি এতখানি ফরেন অর্থাৎ বিদেশী নন। তার তুলনা ও বারিপুকুরের পাড়ের শিমুল গাছের সঙ্গে যার যার মাথাটা ক্রোশান্তর দূর থেকে দেখা যায় এবং যার মগডালে থাকেন এক ন্যাড়া-মাথা ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য ডালে শিমুলের ফলের মত গণ্ডাকয়েক প্রেত ঝুলে থাকে। তারা তাঁর হুকুমবরদার। না—তাও ঠিক হল না। শশীবাবু ছিলেন ভৈরব।

মনে পড়ছে, দশাশায়ী আকার, দাড়ী-গোঁফে ঢাকা মুখ, মাথায় খাটো করে কাটা কোঁকড়া কাঁচাপাকা চুল থগায় থগায় মাথা ভরে রাখত; বড় বড় চোখ, চোখের ক্ষেত ঈষৎ লালচে, হা-হা-হা উচ্চ দিলদরিয়া মেজাজের হাসি; অবাধ জিহ্বা, কিছুই বাধে না মুখে।

মনে পড়ছে ডেঙেড়ার সরকারবাবুর এই উঁচু দুটো বলদ (লোকে বলত হাতীর মত বলদ ঘোড়ার মত ছোটে) টানা, সুন্দর তেরপলমোড়া আয়না বসানো টাপর-ঢাকা গাড়ী লাভপুরের উপর সদরের সামনে এসে থামল। গাড়ী নামল। গাড়ী থেকে নামলেন ওই চেহারার মানুষটি, মানুষটি নামবার আগেই তাঁর কণ্ঠস্বর টাপরের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঠাঁইটার শূন্যমণ্ডলে সোর তুলছে।

—মতিলালবাবু রয়েছ নাকি? মতি-লালবাবু!

মতিলালবাবু সরকারবংশের দৌহিত্র এবং পাঁচকোঁদার এক কোঁদা বা তরফের মালিক—শশীবাবুরই সমবয়সী, শান্ত শুদ্ধ চরিত্রের নির্মল মানুষ এবং রূপবান মানুষ। ছানি-কাটানো চোখের পুরু লেন্সের চশমা-পরা মতিলালবাবু ঘাড় উঁচু করে তাকাতেন, দেখবার সুবিধার জন্য। তাঁকে কেউ ডাকছে শুনে তিনি বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেইভাবেই তাকাতেন এবং শশীবাবুকে দেখে সসম্মানে প্রীতির সঙ্গেই বললেন—আরে আরে আরে, আসুন আসুন! শশী-বাবু আসুন। তারপর খবর ভাল? ভাল আছেন?

—ভাল? প্রশ্নটা একবার উচ্চারণ করে নিয়ে পরক্ষণে হা-হা-হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন শশীবাবু। সে এক ভিন্ন জাতের হাসি: সে-হাসি একালে হাসা যায় না, দমে কুলোয় না মানুষের। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—মন্দ থাকব কেন, কোন্ দুঃখে হে মতিলালবাবু? মন্দ রাখবে যে তার নামটা কি—ঘরটা কোথা তার? সে...কে, ধরে আমি মাথায় ডাণ্ডা মারি হে! গতর দেখছ না, কেঁদো বাঘের মতন? শালা—আধখানা পাঁঠা না হলে পেট ভরে না। দুটো বোতলের কম নেশা হয় না। দুপাশে দুটো পরিবার। মন্দ থাকবার উপায় আছে?—বলে আবার হা-হা-হা শব্দে হেসে মতিলালবাবুর বৈঠক-খানায় সামনের বায়ুমণ্ডলকে ত্রস্ত এবং

চকিত করে তুললেন। বলতে ভুলে গেছি, শশীবাবু কথার মধ্যে কয়েকটা অশ্লীল গালিগালাজ ব্যবহার করেছেন; গালাগালিগুলি প্রয়োগ করেছেন যে নামহীন এবং গ্রাম-ঠিকানাবিহীন ব্যক্তি বা দেব বা যক্ষ বা যক্ষ কি কিন্নর মানুষকে মন্দ রাখেন তাঁর প্রতি। সে ব্যবহার অতি স্বচ্ছন্দ এবং অসংকোচ অকুণ্ঠ ব্যবহার।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম এবং শুনছিলাম। গিয়েছিলাম আমি পোস্টাপিস: ফেরার পথে মতিলালবাবুর বৈঠকখানার সামনে ওই হাতীর মত উঁচু এবং ঘোড়ার মত ছুটতে সক্ষম বলদদুটিকে এবং সুন্দর টাপরওয়ালা গাড়ীটি দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, তারপর নামলেন ওই বিচিত্রদর্শন মানুষটি। ও'র ব্যক্তিত্বশালী চেহারার সব কথাই আগে বলেছি—বলিনি শুধু রঙের কথা। তাঁর রঙ ছিল শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ নয়। তারপর এই কথাবার্তা শুনে পথে যেন আটকে গেছি, সকৌতুক কৌতূহলের বঁড়শি সুতোয় গাঁথা পড়ে গেছি।

মতিলালবাবুও সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলেন।—বেশ বলেছেন, বেশ বলেছেন; ভাল থাকব মনে করলে মন্দ রাখে কে? তা এখনও আধখানা পাঁঠা খেতে পারেন?

—পারি না? দিয়ে দেখ—। তবে কচি পাঁঠা হওয়া চাই। গোটাই খেয়ে নেব হে। হা-হা-হা—।

হঠাৎ হাসি থেমে গেল। কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে গেল। কপালে দুটি জোড়া পুরু মোটা ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কে হে বাপ্ —এই ছোকরা তুমি কে হে? এ্যাঁ?

একটু চমকে উঠেছিলাম আমি। বলেছিলাম—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোকে বই কাকে বলছি। মতিলালবাবু বলে দিলেন, ওটি হল হরিদাস বাঁড়ুজ্জের বড় ছেলে।

—হরিদাসবাবুর বড় ছেলে? আ! আচ্ছা! শোন শোন!

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। মতিলালবাবু বলে দিলেন—উনি হলেন ডেঙেড়ার শশীবাবু, বাবু শশীশেখর সরকার।

আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করলাম।

—ওরে আমার মানিক রে। বলে সবল হাতদুখানি দিয়ে তুলে নিলেন আমাকে। তারপর বললেন—তোর সঙ্গে আমার নাতিঠাকুরুণ সম্পর্ক রে শালা। কি নাম রে তোর?

—আমার নাম শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—হুঁ। তারা পুজো করে হয়েছিস বুঝি?

আমি বললাম—আমাকে কিছু বলছিলেন?

—বলছিলাম। বলে অকস্মাৎ যেন কাতুর কাতুকুতুতে হা-হা করে হেসে ভেঙে পড়লেন বা গড়িয়ে পড়লেন। সে-হাসি আর থামে না।

হা-হা-হা-হা-হা-হা! হা-হা-হা!

ইতিমধ্যে গাড়ীর ভিতর থেকে চওড়া-পাড় ফরাসডাঙার শাড়ী পরে নামলেন একটি মহিলা, তার পিছনে পিছনে আর একজন। দুজনেই স্থূলকায়া এবং সেকালের সংজ্ঞায় সর্বাভরণভূষিতা। চুড়ি-বালা-কঙ্কণ, উপর হাতে অনন্ত-বাউটি-বাজুবন্ধ, কোমরে ভারী সোনার বিছে। মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা। বয়স অন্তত পঞ্চাশ। এপারে তো হবেই না, ওপার হলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

তার হাসির তোড়ে আমি অভিভূত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি হাসছিলেন নিজের মনেই, নিজের আনন্দেই। হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ল তাঁর। আমি তাঁকে দেখছি বা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখেই তিনি হাসি কমিয়ে আনলেন, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন—দেখছিস?

বুঝতে পারলাম না, বললাম—আজ্ঞে?

—ওই দুটোকে দেখছিস? ওই মেয়েদুটোকে। দুটোই আমার মাগ, দুটো গুজরাটি হাতী রে! তবে একসময় দেখতে ভাল ছিল রে শালা। বুঝলি না, খাসা, সুন্দরী ছিল রে। ছোটটাকে তো সুন্দরী দেখে গরীবের ঘর থেকে বিয়ে করে এনেছিলাম। বুঝেছিস না ভাই। তা তুই

সূর্যাস্ত ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

দাঁড়িয়েছিলি ওখানে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিলি আমাকে। পেনামও করলি না, রাগ হয়ে গিয়েছিল। তার উপর বউরা নামছে—শালা ডেঙেড়ার শশীবাবুর জোড়া মহিষী নামছে—তুই ছোঁড়া তাদের দিকে তাকাস—তুই কে রে? হলই বা তোর বয়স অল্প, তবু তো তুই বেটাছেলে রে। আমি অংক জানি, তুই আমার সম্পর্কে নাতি রে শালা। ভাগ্যে মতিলালবাবু বললে—নইলে হয়তো লড়াই লাগিয়ে দিতাম তোর সঙ্গে। তা তুই আমার একটা বউ নিবি? বলে হা-হা-হা-হা শব্দে হাসতে লাগলেন।

এই শশীবাবু। যিনি হা-হা-হা-হা করে দিঙমণ্ডল কাঁপিয়ে হাসেন। যিনি খারাপ থাকেন না। যিনি যে বা যিনি মানুষকে মন্দ রাখেন, তাকে খুঁজে বেড়ান—তিনি ডেঙেড়ার শশীবাবু!

ও'কে দ্বিতীয়বার দেখলাম আমার বিয়ের পর। তখন আমার বয়স সবে সতের পার হয়ে আঠারোতে পড়েছি। তাঁকে দেখলাম আমাদেরই গ্রামে আমার মামা-শ্বশুরদের বাড়ীতে, তাঁদের বাড়ীতে তখন রাসযাত্রা উপলক্ষে উৎসব চলছে। সে-উৎসব সপ্তাহব্যাপী সমারোহের উৎসব। থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বাজীপোড়ানো সাতদিন ধরে নাগাড়ে চলত। আমার মামাশ্বশুরেরা 'লক্ষপতি' ধনী ছিলেন। সেকালে এই লক্ষপতি ধনী শব্দটাই গ্রাম-জীবনে চরম শব্দ ছিল।

ও'দের ওখানে সেদিন সন্ধ্যাতে শশীবাবু এসেছেন। এসেছেন সিউড়ী অর্থাৎ সদর থেকে। ও'দের নিমন্ত্রণেই এসেছেন। এবং ও'দের গেস্ট হাউসে একদিকের ঘরে একলা আছেন সঙ্গে চাকর আছে।

রাত্রি তখন ন'টা, আমি ও'দের গেস্ট হাউসে গিয়েছি, আমার ছোট মামাশ্বশুরের খোঁজে; নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু জমিদারবাড়ীর ছেলে রায়বাহাদুরই ছিলেন না, তিনি নাট্যকার হিসেবেই বাংলাদেশে পরিচিত। ছোটগল্পও তিনি লিখতেন। আমার সাহিত্য-জীবনের প্রথম গুরু তিনি। আরও একটা বড় পরিচয় ছিল তাঁর, তিনি ছিলেন বড়দরের অভিনেতা, তিনি আমাদের থিয়েটারের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তাঁকেই ডাকতে গিছলাম, থিয়েটারের প্রয়োজনে। দেখলাম—তিনি কথা বলছেন শশীবাবুর সঙ্গে। প্রথম দেখা হওয়ার পাঁচ-ছয় বছর পর।

গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং বেশ ভাল করে শোনা যায়, দশ-বিশ হাত দূরে থেকে এমনি জোর গলাতেই কথা তিনি বলছিলেন—এই দেখ, শুধু দুটো বোতল দিয়ে গেল হে! লোকটাকে বললাম, বেটা জল আনলি স্থল কই রে? মা আনলি বাবা কই? স্থল নইলে জল থাকবে কিসে রে? বাবা নইলে মা দাঁড়াবে কার বুকে রে? ব্যাটা হাঁ করে চেয়ে রইল।—বলে হাসতে লাগলেন সেই হাসি। হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা। হাসি থামিয়ে বললেন—প্রথমে স্থল, তারপর জল। প্রথম গাঁজা, তারপর মদ। গাঁজা চাই হে কুড়োরামবাবু! গাঁজা।

একটু হেসে নির্মলশিববাবু বললেন—আনিয়ে দিচ্ছি। এখুনি এনে দেবে। তবে একটা অনুরোধ করি। কলকাতায় কিছু গেস্ট আছেন—ও'রা, মানে কলকাতার লোক তো—

কথা শেষ হবার আগেই তিনি হাসতে লাগলেন—হা-হা-হা-হা-হা। লজ্জা হবে? ও'রা ঘেন্না করেন?—হা-হা-হা-হা-হা।

নির্মলশিববাবু একটু লজ্জিত এবং হয়তো বা বিব্রত হয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। এই মানুষটিকে সাবধান করতে যাওয়া তাঁর ভুল হয়েছিল। শশীবাবুর দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। সেদিনও আমি সেই প্রথম দিনের মত তাঁর ব্যক্তিত্বের বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গির প্রতি কৌতূহলের বঁড়শিতে যেন গেঁথে গিছলাম। আজ তাঁর কথা লিখবার সময় মনে হচ্ছে কৌতূহলটার রকমে একটু তফাৎ হয়েছিল। প্রথম দিনের কৌতূহল-টুকুর বিশেষণ ছিল সকৌতুক। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের অর্থাৎ সেদিনের কৌতূহল-টুকুর বিশেষ ছিল সবিস্ময়, বিস্ময়ের আর বাকী ছিল না আমার।

আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন না। বললেন, কে বাবা মানিক?

নাম বললাম। চিনলেন। বললেন—বিয়ে হল শুনলাম তোর। চারুর বেটীকে বিয়ে করেছিস! তা বেশ। তা বউটা তো খুব ছোট রে। বলে পরিহাস শুরু করলেন। সে-পরিহাস অবশ্যই অশ্লীল। কিন্তু আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ।

আমি চুপ করে রইলাম। কি বলব?

সেটা হঠাৎ তাঁর খেয়ালের মধ্যে এল; মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কি রে, মুখ লাল হয়েছে, মেজাজও তাতছে নাকি? দূর শালারা। লাভপুরের বাবুগুলো ভাবে কি বল তো? কি ভাবিস বল তো শুনি। শুকনো নেশা করি, গাঁজা খাই—এইসব হাসিঠাট্টা করি, তা করতে পাব না? কেন রে? কি বলবি? বলবি—ওরে শালা বুড়ো, এটা তোর ডেঙেড়া নয়?—তা শোন। আমার উত্তরটা শোন—যাঁহা শশীশেখর তাঁহাই 'ডেংগা-রা'।

(ক্রমশঃ)

রাইনের মারিয়া রিলকে অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট

কী বিশুদ্ধ উৎক্রমণ! দ্যাখো এক বৃক্ষের উত্থান!
গান গায় অর্ফিয়ুস! মহাবৃক্ষ কানের কন্দরে!
আর সব শব্দহীন। তবু অন্য কিছু জায়মান—
আরম্ভ, আহ্বান, বার্তা—সেই শান্ত মৌনের অন্তরে।

স্তব্ধতার প্রাণী যারা, ভিড় ক'রে বেরোলো তন্ময়
গুহা ছেড়ে, নীড় ছেড়ে, পরিচ্ছন্ন, উন্মুক্ত কাননে,
ক্রমে বোঝা গেলো তারা অমন নিস্পন্দ যে-কারণে,
তা নয় পাশব শাঠ্য, উৎকণ্ঠাও নয়—

কিন্তু শুধু শ্রবণ। গর্জন, রোল, নিনাদে বধির
হ'য়ে গেলো তাদের হৃদয়। এবং, জানাতে অভ্যর্থনা,
যেখানে অস্পষ্ট কোনো কুঁড়েঘর ছিলো কোনোমতে,

কম্পমান খুঁটি নিয়ে অতি ক্ষুদ্র প্রবেশের পথে,
গোপন বিবর যেন, অন্ধকার ইচ্ছার রচনা—
সেইখানে, তাদের কানের রন্ধ্রে, তুমি দিলে বানিয়ে মন্দির।

* * *

প্রায় সে বালিকা, ধীরে যার অভিসার,
বীণা আর গানের সংগতে বাঁধা আনন্দনিঃসৃত,
বাসন্তিক বসনের স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত, প্রীত—
আমার কানের রন্ধ্রে পেতে নিলো সুখশয্যা তার।

ঘুমোলো আমার মধ্যে। সব হ'লো তার নিদ্রাময় ঃ
আমি যাতে চিরকাল অভিভূত, সেই তরুশ্রেণী,
অনুভূতিগম্য সব দূরত্ব, অনুভূত প্রান্তর, সরণি,
এবং আমার ভাগ্যে উপলব্ধ সকল বিস্ময়।

ঘুমোলো সে বিশ্ব। দেব, গায়ন্তিক কোন ক্ষমতায়
দিলে তাকে এমন অবৈকল্য, যাতে সে হ'লো না
জাগরণে প্রথম ইচ্ছুক? জেগে উঠে ঘুমোলো তখনই?

কোনখানে তার মৃত্যু? বলো, সেই নতুন রাগিণী—
অবসিত না-হ'তে তোমার গান—ক'রে নেবে তুমি কি রচনা?—
আমার অন্তর থেকে কোথায় বিলীয়মান?...বালিকা সে, প্রায়...

রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রান্স

লুই র‍্যনু

[বেদজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিত লুই র‍্যনু-র নাম এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিগত কয়েক দশক ধ'রে প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ মহলে সুবিদিত। স্বনামধন্য সিলভ্যা লেভি-র যোগ্য ছাত্ররূপে র‍্যনুর ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। 'বেদ ও পাণিনি সংক্রান্ত অধ্যয়ন' নামে চৌদ্দ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর ফরাসী গ্রন্থটি ছাড়াও ত্রিশ-বত্রিশটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, শ'খানেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাষণ চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে ইণ্ডোলজি'র ক্ষেত্রে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন, সবকিছু, র‍্যনু অধিগত ক'রেছিলেন, বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন তিনি তাঁর রচনাবলীতে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে তিনি 'ভারতবর্ষ বেদ-এর ভবিতব্য' রূপে যে অধ্যায়টি তুলে ধরেছেন তা' প্রত্যেক ভারতবাসীরই অবশ্য-পাঠ্য।

গত ১৮ই আগস্ট, একাত্তর বছরের কর্মক্ষম জীবনের শেষে র‍্যনু আমাদের জগৎ ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন; সামান্য অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের অপ্রত্যাশিত কুফলে তাঁকে আকস্মিকভাবে চ'লে যেতে হ'ল ব'লে ফরাসী ইণ্ডোলজিস্টদের আক্ষেপের শেষ নেই। অবশ্য র‍্যনু'র সমাদর ফ্রান্সের গণ্ডী ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতেই বিস্তার লাভ করেছিল; সরবোন (পারী) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় গবেষণার অধ্যাপক যদিও ছিলেন তিনি, তবু তাঁকে ইংলণ্ডে, অ্যামেরিকায় জাপানে এবং অন্যান্য দেশেও যেতে হয়েছে সাময়িক অধ্যাপনার আমন্ত্রণ নিয়ে।

ভারতবর্ষের অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন লুই র‍্যনু। রবীন্দ্রনাথের শত-বার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী জাতির তরফ থেকে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শ্রদ্ধার্ঘ জানানো হয়, র‍্যনু অনিবার্যরূপে তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অবদানের স্মৃতি নিয়ে এইসঙ্গে তাঁর ভাষণটি মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ ক'রে দিই।—

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কোন্ সম্ভ্রমের অধিকারী ছিলেন, সে-ধারণা করতে গেলে ফিরে তাকাতে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের অনতিকাল পরের বছরগুলোর দিকে। ১৯২০ সালে লুই জিলে লেখেন যে তাঁর মতে পশ্চিমের চিন্তার জগতে তখন রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সেই আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন, যে-আসন একদা ছিল লিও টলস্টয়ের।

সত্য বলতে কি, রবীন্দ্র-উন্মাদনা আমাদের শুরু হয়—ইংলণ্ডে অন্তত—আরো কিছু আগেই। ১৯১২ সালে একদল ইংরেজ লেখক, ইয়েটসের নেতৃত্বে, মেতে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ কবিতার তর্জমা নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের ইওরোপ আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর খ্যাতির সূচনা থেকেই। পরের বছরে, ১৯১৩ সালে, নোবেল পুরস্কার এনে দিল এর ফলশ্রুতি—বিপুল সাফল্য। ফ্রান্সে আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাদ ইংরেজি থেকে ফরাসী তর্জমার মাধ্যমে পাবার পথ চেয়ে। বিশ থেকে পঁচিশ সাল পর্যন্ত এই প্রতীক্ষা —যে-পর্বে আমরা, পিঠাপিঠ পাই ফরাসী ভাষায় 'ঘরে বাইরে' (আলব্যার তিবো যা প'ড়ে মুগ্ধ হন), 'গীতাঞ্জলি', 'অমল বা রাজার চিঠি' : সবই আঁদ্রে জিদ-এর অনুবাদে; অতঃপর, মূল বাংলা অনুসরণ ক'রে পিয়ের জাঁ জুভ পরিবেষণ করলেন 'বলাকা'।

কি ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনায়? কোন্ যাদু?

স্মরণে রাখতে হবে তৎকালীন পাঠকদের মনের অবস্থা : আঙ্গিকের সৌকর্যে বীতস্পৃহ, সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একই ধরণের প্রয়োগ নৈপুণ্যে ক্লান্ত, অস্তমান দাদাইজমের প্রভাবে যেমন, তেমনি উদীয়মান সুররিয়ালিজমের প্রভাবে কবিতা ক্ষত-বিক্ষত। ওদিকে আবার মহাযুদ্ধের আঘাতে পশ্চিমের নীতিগত মূল্যবোধের ভিত্তি ট'লে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশে এনে দিলেন স্নিগ্ধ পবিত্র বাতাস। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি নতুন ক'রে স্থাপন করলেন স্বাদু প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মূলগ্রাহী, উৎসানুগ তাঁর প্রেরণা : শতব্যবহৃত শব্দমালাই তাঁর হাতে উদ্দীপিত পেল সহজ মহত্ত্বের, তাঁর নির্ভরতার স্থল সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্যের কল্যাণবশে।

সমালোচকের চেতনায় পুনরধিষ্ঠিত, আমরা প্রতিবাদ তুললাম (যেমন ধরি জ্যুল ব্লক-এর কথা), বড্ড বেশি ফুল ফুটিয়েছেন উনি, মলয় আর জ্যোৎস্না, দীপাবলি, বেণু, নৃত্য আর চোখের জলের সমাবেশ বড্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। এ-ই তাঁর সৃষ্টি-প্রাচুর্যের পুরস্কার? কিন্তু আমরা তো ভুলিনি, তাঁরই চিত্রকল্প যে প্রস্ফুট ক'রে তুলেছিল পৃথিবীর এক নবযৌবনের বার্তা। বলতে পারি, তাঁর বিশ্ববীণাই আমাদের কাছে খুলে ধরেছিল নতুন ক'রে সনাতন বিশ্ববোধ, ক্ষণে ক্ষণে যার স্বাদমাত্র পেয়েছিলেন লামার্তিন বা হুগো।

লুই র‍্যনু

অন্য দিকে দেখি শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রতীকরূপেই পূজিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের সুদিব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল অতি ক্ষীণ। যেটুকু জানতাম, তার ভরসায় বুঝতে আমাদের সময় লাগেনি যে শ্রদ্ধেয় এই ঐতিহ্যেরই একনিষ্ঠ ধারাবাহক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথে আমরা পাই এক মিস্টিকের দেখা। মিস্টিক ছিলেন বই-কি, কিন্তু তিনি ছিলেন মিস্টিকেতর অনেক-কিছুও, সর্বপ্রথম তিনি ছিলেন জীবনের উপাসক। তাঁর মিস্টিক সত্তার মূলে সুর ছিল প্রকৃতির প্রেম : প্রকৃতি "তাঁর অন্তরে উন্মোচন ক'রে দিয়েছিল এক দৈবীভাব যা তাঁতেই ছিল প্রচ্ছন্ন, যা একাধিক্রমে তাঁরই আন্তর-স্বরূপ, তাঁরই প্রতিভা-পুরুষ এবং সামগ্রিক সেই সত্তা যার অধিষ্ঠান বিশ্বপ্রকৃতিকে বেষ্টন ক'রে, বোধির সাহায্যে যাকে জেনেছিলেন তিনি অথচ চাননি যার সংজ্ঞা।" (জ্যুল ব্লক-এর উক্তি)। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "নবজাতকের ক্রন্দনের তাৎপর্য কি কেউ জানে? আমার কবিতা এই ক্রন্দনের সামিল, বিশ্বের আহ্বানে আত্মার উত্তর।"

আঁদ্রে জিদ্-এর উল্লেখ আমরা করেছি, ফ্রান্সে রবীন্দ্রনাথকে সর্বাধিক পরিচিত

ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন যে লেখক। ১৯১৪ সাল থেকে তাঁর ডায়েরিতে লেখা দেখি, তিনি তখনই ভারতীয় কবিতা অনুবাদে রত আছেন। গীতাঞ্জলির ভূমিকায় তিনি মৃত্যুর উদ্দেশে লিখিত স্তোত্রের প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বিশ্বের কোনও সাহিত্যে আমি জানি না গভীরতর সুন্দরতর দ্যোতনা আর আছে কিনা।"* বিশেষভাবে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এর সঙ্গীতপ্রাণতা থেকে উৎসারিত আনন্দের প্রতি, "আমায় একাধারে অশ্রু আর আনন্দে যা ভরে তোলে এই কবিতায়, তা হল কাব্যের সেই বহ্নিদীপ্ত উন্মাদনা যা কিনা আপাতদৃষ্ট বুদ্ধিসর্বস্ব বিমূর্ত ভারতীয় শিক্ষায় সদা সঞ্চারিত রাখে প্রাণের স্পন্দন, আনন্দের শিহরন।..." বিস্ময়কর বোধি-র সাহায্যে আঁদ্রে জিদ লক্ষ করেছিলেন কতক স্তবকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষরূপে কি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ভারতের সাহিত্যের প্রাচীনতম গগনচুম্বী নিদর্শন ঋগ্বেদের প্রেরণার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেরও তিনি সোৎসাহী ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন তাদের ইঙ্গিতময় লাবণ্যের জন্যে, যেহেতু (আগেই বলেছি) তিনি 'অমল'কে উপস্থিত করেছিলেন ফরাসী নাট্যরসিকদের সামনে, রুগ্ন এক শিশুর কাহিনী, যে রাজার চিঠি পাবার পথ চেয়ে কোনমতে বেঁচে আছে। শিশুটি জানলার ধারে বসে পথচারীদের ডাকে, তারা তার সঙ্গে কথা বলে, প্রথম প্রথম অনিচ্ছাসত্ত্বেই। কিন্তু শিশুর কথাবার্তায় তারা ভুলে যায় দৈনন্দিন জীবনের উদ্বেগ; গল্প-শেষে তারা যে যার পথে পা বাড়ায় মনে এক তৃপ্তির আনন্দের স্বাদ নিয়ে। যে চিঠির প্রতীক্ষা শিশুটি করে, তা আসবেই সে জানে, তবু কখনোই তা আসে না। অবশেষে শিশুটির মৃত্যুর ক্ষণে স্বয়ং রাজা এসে উপস্থিত হন তার শয্যাপার্শ্বে। তিনি নিজের পরিচয় না দিলেও শিশু তাঁকে চিনে নেয়।" লুই জিলে'র ভাষায়, এই রূপকে আমরা দেখি "ছোট্ট এই রোগীর কাছে রহস্যময় এক সনদ আসে, তার তাৎপর্যের ক্ষণিক স্পর্শ এসে লাগে। এ যে ঈশ্বরে নিয়োজিত হবার আহ্বান, করুণার আমন্ত্রণ ঃ এই সেই কণ্ঠ যা আজ হোক কাল হোক আমাদের বুঝিয়ে দেয় সব ঝুটো হ্যায় ভালবাসাটুকু ছাড়া আর বাস্তব বলতে একমাত্র যা কিছু তা ওই ঊর্ধ্বলোকে, অনন্তে।"

অথচ রবীন্দ্রনাথ ষোলআনা এই বৈরাগ্যবাদীও নন। গজদন্তের মিনারে তো তিনি দিন কাটাননি। সুস্পষ্ট এক বাণী নিয়েই তিনি বারে বারে অতিক্রম করেছেন সপ্তসিন্ধু, ভারতের সত্যকার রূপ তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে, বস্তুবাদী রণোন্মাদ পশ্চিমের আক্রমণের হাত থেকে পূর্বাচলের নীতিবোধ রক্ষা করতে। তাঁর জীবনের কমখানি অতিক্রান্ত হয়নি সংগ্রামে। রাজনীতির মল্লভূমিতে নিজে না অবতীর্ণ হলেও কথায় এবং কাগজে-কলমে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন মহৎ মুক্তির একাধিক আন্দোলনে; প্রতিবাদও জানিয়েছেন তিনি, ঘোষণাও করেছেন তাঁর আশার বাণী সুদৃঢ় কণ্ঠে। ম্যানিকীসুলভ(manichean) তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টিতে পূর্বাচলের সবই ভাল ও পশ্চিমের সভ্যতা দানবীয়—পশ্চিমে বসেই এ-ধরণের উপলব্ধি প্রচারে হয়তো থেকে থাকবে সাময়িক পল্লব-নির্ভরতা। আজ কিন্তু আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে ধনাত্মক যা-কিছু দিয়েছিলেন তিনি ঃ সৌভ্রাত্রের শিক্ষা, মানুষে মানুষে সত্যকার প্রেমের দৃষ্টান্ত। ১৯৩১ সালে তাই রোমাঁ রোলাঁ দিয়েছিলেন তাঁকে সত্তর-পূর্তি উৎসবের Golden Book-এ অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঈশ্বর-প্রেরিত প্রহরী। করুণতম সংকট মুহূর্তে তিনি অতন্দ্র শান্ত্রীরূপে জেগে আছেন জাতির শিয়রে, জগতেরও শিয়রে, আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত প্রতীক, আলোকের, সমন্বয়েরও প্রতীক, সোনার হার্পে ঝঙ্কৃত এরিয়েলের চিরন্তন মন্ত্র যা ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষুব্ধ প্রবৃত্তি-সমূহের সমুদ্রের ঊর্ধ্বে।"

মহান এই ভারতীয় লেখকের সঙ্গে জাঁ-ক্রিস্তফের লেখকের ছিল সহজাত এক সহানুভূতির সম্পর্ক ঃ দুই লেখকের মধ্যে যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছিল তা-ই সে-সম্পর্কের স্বাক্ষর বহন করছে। সম্প্রতি তা ছাপা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাদুতে আকৃষ্ট হয়ে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে যাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন, তাঁদের মধ্যে অন্তত মার্সেল মার্তিনে, জাঁ-রিশার ব্লক, জর্জ দুহামেল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ঃ যান্ত্রিক সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে শেষোক্ত-জনের প্রয়াসও ছিল গীতাঞ্জলির কবির প্রয়াসের মতোই আন্তরিক। আর-একজনের নাম করব—সুরকার দারিয়ুস মিল্‌হো, যিনি রবীন্দ্রনাথের বাণীর ভিত্তিতে একটি সিম্ফনিক পোয়েম রচনা করেছিলেন।

অপ্রত্যাশিতই হয়তো—আনা দ্য নোয়াই যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন বাংলার এই কবিকে, কবিরূপে ততটা নয়, যতটা চিত্রশিল্পীরূপে। তিনি লেখেন, "অদৃশ্য তারকালোকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর বইগুলো তিনি যখন রচনায় মগ্ন ছিলেন, কবির কল্পনাসমৃদ্ধ ছবিগুলো যে তখন তাঁকে ঘিরে নেচে চলেছিল দলে দলে, তাঁর তর্কবুদ্ধি সেদিকে নজর দেয়নি। বিশ্বের সর্বত্র থেকে তারা ছুটে এসেছিল তাঁর দ্বীপ অভিমুখে।...বিস্ময়কর এই সৃষ্টিগুলি—যা একাধারে চোখ জুড়োয় আর আমাদের টেনে নিয়ে চলে বহু দূরের সেই-সব দেশে, যেখানে কাল্পনিক জিনিসই বাস্তবের চেয়ে বেশি ক'রে বাস্তব—ভেবে চমৎকৃত হতে হয় কী ক'রে যুক্তিবাদী স্বপ্নপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টির দ্বার খুলে দিলেন! বুনো পায়রার মতো কমনীয় রঙের যেহাতে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই হাতেই তাঁর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে খুঁজে পেল হঠাৎ অব্যক্তের আনন্দসুধার মাতাল হয়ে, ক্ষুরস্য ধার রচনার বিধিনিষেধ থেকে অনেক অনেক দূরের এক জগৎ যেখানে কল্পনার অদম্য শক্তিই সর্বেসর্বা। প্রথমে কিছু স্কেচ এঁকে নিয়ে তিনি তারপর বসলেন অবচেতনার ঐশ্বর্যরাশিকে সমৃদ্ধতর নিটোলতর ক'রে তুলতে অলৌকিক পথ-প্রদর্শকের অতি বাধ্য শিষ্যের মতো।..."

* বর্তমান অনুবাদকের 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।।

এশিয়ার গল্প ॥ ৯

।।দুই।।

ভিয়েৎনাম

আমার বিয়ে

গিলডা করডেরো ফারনাণ্ডো

বহুকাল ধরেই আমরা ভালবাসছি পরস্পরকে। জমি চাষ করা হয়েছে, ফসল বোনা হয়েছে, ফসল তোলা হয়েছে। চূড়া-ওয়ালা উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে খড়ের তুষ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাওয়া। খালি মাঠগুলোর ওপর দিয়ে হাওয়া যেন তোমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেড়াচ্ছে যেন ডেকে ডেকে পাচ্ছে না তোমাকে।

গির্জার সামনের খালি জায়গাটায় ছেলেছোকরারা দল বেঁধে আগাছা পরিষ্কার করছে, দুরমুস দিয়ে মাটি সমান করছে। চত্বরের ওপর গিটার টাঙান ছিল একটা, নিয়ে এসেছে একটি ছেলে। কারণ, নাচ তো চাই-ই। সবাই মিলে নাচব আমরা। মেয়েরা সেদ্ধ কলা দিয়ে খাবার তৈরি করছে। মস্ত বড় বড় ঘেরওয়ালা স্কার্ট পরেছে তারা, চুলে ফুল দিয়েছে। তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে নাচব না আমি। যদি ভুল করে বসি সেই ভয়ে মাথা নীচু করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি তোমার জুতোর দিকে, যেন মুখস্ত করছি।

আমার বয়স ষোল বছর না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে। কিন্তু তুমি আর অপেক্ষা করতে পারছ না। ডালা তৈরির কাজে আমার বোনদের সাহায্য করবার অছিলায় আমাদের বাড়ি যাতায়াত কর তুমি। যেন আবহমানকাল ধরেই করছ। আমার স্কুলমাস্টার বাবার ধারণা আমরা নেহাৎ শিশু, আমাদের আবার প্রেম কি। তাঁর ইচ্ছে নয় আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু তুমি তা শুনবার পাত্র নও। একদিন

কাপড় কাচতে যাচ্ছি, মাথার ওপর গামলা ভর্তি জামা-কাপড়। তুমি এসে দু'হাত দিয়ে গামলাটা ধরলে যেন পড়ে না যায়, তারপর আমার মুখ থেকে উষ্ণ চুমু খেয়ে নিলে একটা। গামলাটার ছায়া পড়েছে আমার চোখের ওপর। আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে বললে, আসছে পূর্ণিমার দিন তোমার বাবা-মা আমাদের বাড়িতে আসবেন বিয়ের কথা বলতে।

তারপর সাতদিন কেটে গেছে। আজ পূর্ণিমা। আঙুলের নখগুলোকে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে ফিতের মত সরু করে ফেলেছি আমি। তোমার বাবা-মা আজ আসবেন অথচ আমি আমার বাবাকে ভয়ে কোন কথা বলতে পারিনি এখনো। আমার মা আর বোনেরা কিন্তু ব্যাপারটা আন্দাজ করে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করে দিয়েছে। ঝাঁটা দিয়ে ঝুল ঝাড়ছে, বেঞ্চগুলোকে ঘষে-ঘষে হাড়ের মত সাদা করে ফেলেছে। তোমার বাবা-মা যেন

বুঝতে পারেন যে ওরা সুগৃহিণী। তোমার মা বাজার থেকে মস্ত বড় মুরগি কিনেছেন একটা। সুতরাং শহরের সবাই জেনে গেছে যে আজ রাতে তোমার বাবা-মা আসছেন আমাদের বাড়িতে।

আমি বাবার কাছে গেলাম। আমার দুই কণ্ঠাস্থির মাঝখানে আঁচিল আছে একটা। আঙুল দিয়ে ছুঁলাম আঁচিলটাকে আনুগত্যের লক্ষণ ওটা। কাসলাম দু-একবার। কিন্তু বাবা গ্রাহ্যই করলেন না। যেন দেখতেই পাননি আমি দাঁড়িয়ে আছি।

নারকেল গাছের পেছনে গোল চাঁদ উঠল। তোমার পরিবারের লোকজনরা দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে আসছেন দেখতে পেলাম। আমার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল। তোমার বাবা-মা আগে আগে হাটছেন। তাঁদের পেছনে মিঃ মার্টিন। আমার বাবা যে স্কুলে পড়ান মিঃ মার্টিন তার অধ্যক্ষ। সুতরাং আমার বাবাকে রাজী করান তাঁর পক্ষে সহজ হবে। তোমাদের তিনজন মোটাসোটা আত্মীয়াও আছেন তাঁদের সঙ্গে। তিনজনেরই মাথায় মস্ত মস্ত চুপড়ি, এতো ভারি যে ঘাড় ভেঙে যাবার কথা। তোমাকে তো নিশ্চয়ই বাড়িতে রেখে এসেছেন ও'রা। কেননা এ আলোচনায় তোমারও উপস্থিত থাকবার নিয়ম নেই, আমারও না। এবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছেন ও'রা—তোমার মা, তোমার বাবা, মিঃ মার্টিন এবং আত্মীয়া তিনজন। আমি এক দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে মশারির মধ্যে লুকিয়ে রইলাম।

আমার বাবা এবং মার সঙ্গে ওরা গিয়ে টেবিলে বসলেন। তোমার আত্মীয়া তিনজন চুপড়ির জিনিসপত্রগুলো বের করতে শুরু করলেন। প্রথমেই মস্ত বড় একটা মুরগি বের করে থালার ওপর রাখলেন। মাথা ঠোঁট, পায়ের নখ—সবশুদ্ধ সেদ্ধ করা হয়েছে মুরগিটাকে। লেটুস পাতা দিয়ে বাসা তৈরি হয়েছে, সেদ্ধ ডিম তার মধ্যে। মুরগিটা যেন বাসার সামনে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। মুরগির ঠোঁটের ফাঁকে আর একটা সেদ্ধ ডিম। আমার বোনেরা দেখে অবাক। কেননা, বিয়ের মুরগি আগে কখনো দেখেনি ওরা, এই প্রথম দেখল।

দ্বিতীয় চুপড়িটা থেকে অন্যান্য খাবার বেরুল। শুয়োরের মাংস আর চিংড়ি মাছ দিয়ে নুডুল্, সিম দিয়ে তৈরি খাবার, গরুর মাংস আর আলু দিয়ে স্টু। তৃতীয় চুপড়িটিতে শুধু প্লেট, কাঁটা-চামচ, ছুরি গ্লাস ইত্যাদি। তোমার পরিবারের সবাই আমাদের এখানে খাবেন আজ। কিন্তু সব খাবার তো বটেই এমনকি খাওয়া হয়ে যাবার পরে নোংরা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টুকরো কাপড় অবধি নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে। কোন ব্যাপারে এমনকি এই এক টুকরো কাপড়ের জন্যেও মেয়ের বাড়ির লোকজনদের বিরক্ত করা খুব অসভ্যতা। যাবার সময় কোথাও একটু নোংরা রেখে যাবেন না। আমাদের বাড়ি-ঘর যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি করে রেখে যাবেন।

মিঃ মার্টিন তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন আমার বাবাকে। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা ভালর দিকে যাচ্ছে। আমার বাবা বললেন, আজকাল তো আর ছেলেমেয়েদের বাবা-মা-রা এসব ঠিক করে না, ছেলেমেয়েরা নিজেরাই করে। আমরা দুজন (অর্থাৎ তুমি আর আমি) তেমন কিছু ঠিক করেছি বলে তাঁর মনে হয় না। তবে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন এক্ষুনি। বলেই সোজা আমার ঘরে এসে হাজির হলেন বাবা। জিজ্ঞেস করলেন তুমি আর আমি পরস্পরকে বিয়ে করব স্থির করেছি কিনা। আমি কোন জবাব দিলাম না, চুপ করে রইলাম। কারণ, বাবাকে আমি ভালবাসি। আমি জানি বিয়ে করবার জন্যে পড়াশুনো বন্ধ করে দেব ঠিক করেছি শুনলে বাবা খুবই কষ্ট পাবেন। বিয়ে করে একগাদা ছেলেপিলে নিয়ে সংসারের ঘানিতে ঘুরব, উদয়াস্ত ধোয়ামোছা আর রান্নার কাজ করে করে আমার জীবন-যৌবন নষ্ট হবে এটা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু বাবা তো আর জানেন না তোমাকে আমি কী ভীষণ ভালবাসি; তোমার সন্তানদের বন্ধনে বন্দী হয়ে ধোয়ামোছা আর রান্নাবান্না করেই তো দিন কাটাতে চাই আমি। চুপ করে আছি দেখে বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন সে কথা। এবারও চুপ করে রইলাম আমি। জবাব না পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাবা।

যেহেতু আমি চুপ করে ছিলাম অতএব বাবা মিঃ মার্টিনকে বললেন, না বিয়ের কোন কথা হয়নি তোমার আর আমার মধ্যে। সুতরাং দুই পরিবারের মধ্যে কোন রকম বৈবাহিক সম্বন্ধ হতে পারে না। এই বিংশ শতাব্দীতে জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ছেলেমেয়েদের মতই ত মানতে হবে। মিঃ মার্টিন কিন্তু সে কথা শুনবার পাত্র নন। বললেন, 'ঠিক আছে আসছে পূর্ণিমার দিন আবার আসব আমরা।'

পরের পূর্ণিমাতেও তোমার বাবা-মাকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হল। আমার বাবা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশি দিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ইতিমধ্যে আমি ষোল বছরে পা দিয়েছি। এখন আমি পূরিপূর্ণ যুবতী। তোমার বাবা-মা এবার যখন আবার আসবেন তখন তাঁদের একটা পরিষ্কার জবাব দিতেই হবে। অতএব আমার বাবা আর মা পরামর্শ করতে বসলেন। ঠিক করলেন, বিয়েতে তাঁরা মত দেবেন তবে চলতি নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের আগে এক বছর ধরে তোমাকে আমাদের পরিবারের সেবা করতে হবে। বাবা বেছে বেছে খুব শক্ত-শক্ত কাজ ঠিক করলেন তোমার জন্যে, যেন করতে না পেরে পালিয়ে যাও তুমি। আমাকে বিয়ে করার আশা ত্যাগ কর।

পরের পূর্ণিমায় তোমার বাবা-মা, মিঃ মার্টিন আর সেই তিনজন আত্মীয়া যখন চুপড়ি নিয়ে এসে ফের হাজির হলেন আমার বাবা তোমার 'দাসত্বের সর্ত' দাখিল করলেন তাঁদের কাছে। পুরো এক বছর ধরে আমাদের রোজকার প্রয়োজনীয় জল তুলে দিতে হবে তোমাকে অর্থাৎ প্রতিদিন পাঁচবার করে ঝুঁয়োতলায় যাওয়া এবং জল নিয়ে ফেরা। ডালা, চুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে যা কিছু দরকার এক বছর ধরে সব জোগাড় করে এনে দিতে হবে, মাপ মতো পাতা কেটে, রোদে শুকিয়ে লোহার রোলার দিয়ে থেঁতলে দিতে হবে। সোমবার দিন হাট বসে শহরে। আমাদের সেদিনকার সব খাবার রান্না করে পাঠাতে হবে তোমাদের। তোমাদের খরচায় বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে আমাদের খামার। আমাদের বাথরুমের বাঁশের দেয়ালগুলো খুলে পড়ে যাচ্ছে। সারিয়ে দিতে হবে তোমাকে। ধান রুইবার সময়, ফসল কাটবার সময় মাঠে গিয়ে কাজ করতে হবে। এক বছর পরে বিয়ের দিন স্থির হবে।

তোমার সঙ্গে আমার দেখা-শোনা বন্ধ হয়ে গেল। পরিবারের সবাই মিলে পাহারা দিতে লাগল আমাদের। কেননা এসব শক্ত শক্ত কাজ করে উঠতে না পেরে যদি তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাও। দেখা করতে পারি না তোমার সঙ্গে, কথা বলতে পারি না। ফলে খুব দুঃখের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল আমার দিনগুলো।

একদিন আমার মা খুব ভয়ংকর পরীক্ষার মধ্যে ফেললেন তোমাকে। মাছ কুটতে দিলেন। যে মাছ দিলেন তার কানকো ক্ষুরের মত ধারাল, পেটের নিচে লুকোনো আঁশ। এ মাছ কুটতে গিয়ে বহু প্রেমিক ব্যর্থ হয়েছে এবং ফলে বিয়ের সম্বন্ধও ভেঙে গেছে। তুমি খপ করে ধরলে মাছটাকে এবং ঝকঝকে পরিষ্কার করে কুটে ফেললে। আমার মার মুখে অধুনা কেউ হাসি দেখেনি। কিন্তু তোমার ওপর এতো খুশি হলেন মা যে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আমার বুক ফুলে উঠল আনন্দে! তুমি যখন এ মাছ কুটতে পার তখন পাহাড়ও টলাতে পার।

জমি চাষ হল, বীজ বোনা হল, এবার ফসল তোলার সময় আসছে। মাসের পর মাস এই অমানুষিক পরিশ্রম করে শরীর খারাপ হয়ে গেছে তোমার। রোগা হয়ে গেছ, কালো হয়ে গেছ। এখনো তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবার উপায় নেই। তুমি যেন মরিয়া হয়ে জল বইতে থাক; আমাদের ঘরের মেঝে পরিষ্কার করবার সময় একটু হাসো না পর্যন্ত।

এমনি করে ছমাস কাটল। একদিন সকালে বাজারে যাচ্ছি আমার বোন আর আমি, পথে এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। বলল ওদের বাড়ি গেলে একটা জিনিস দেখাবে। কাছেই বাড়ি ওদের, মেয়রের বাড়ির পাশে। আমার বোন বাজারে চলে গেল; ঠিক হল মাংসের দোকানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ও। আমি আমার বান্ধবীর সঙ্গে গেলাম। হাত ধরাধরি করে ওদের অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, তারপর গেলাম ওদের রান্নাঘরে। রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম হয়ত কেক বানিয়েছে, কিংবা জেলি বানিয়েছে—তাই দেখাবে বলে নিয়ে এসেছে আমাকে। কিন্তু

সে সবের ধার দিয়েও গেল না। এক উনুনের পাশের দরজাটা খুলে বাক্স থেকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল আমাকে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এবং বাইরে থেকে খিল লাগাবার শব্দ এল আমার কানে।

চারদিকে তাকালাম। কারো শোবার ঘর এটা। ঘরের মাঝখানে চাঁদোয়া খাটান খাটে বিছানা বালিশ; একদিকে মার্বেলের হাত মুখ ধোবার জায়গা, জলের ঘড়া। জামা-কাপড়ের আলমারির গায় মস্ত আয়না একটা। জানলার কাছের চেয়ারটা দেখা যাচ্ছে আয়নায়। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই ঘরে। আয়নার দিকে তাকিয়েই সেই শূন্যতা নজরে পড়ল আমার। ভীষণ ভয় হল। জানলার কাছে ছুটে গেলাম। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে এটা আমার বান্ধবীর বাড়ি নয়। মেয়রের বাড়ি। দুই বাড়ির মধ্যে যাতায়াতের দরজা আছে একটা। একটু পরেই মেয়রগিন্নী এসে ঘরে ঢুকলেন। নরম, গোলগাল চেহারা মহিলার। রুটি দুধে ভেজালে যেমন হয়। আমাকে কান্না-কাটি করতে বারণ করলেন মেয়রগিন্নী। মা নাকি আসবেন বিকেলবেলা। এক কাপ আদা-চা এলো আমার জন্যে। মেয়রগিন্নী আমাদের ওখানকার রতি দেবী। প্রেমিক-প্রেমিকারা তাঁর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলে ধরে নেওয়া হয় তারা 'ইলোপ' করেছে। আমি যদিও একাই রয়েছি তবু এরও সেই একই অর্থ হবে। কেননা পাত্রের বাবা-মা-ই চুরি করে এনেছেন আমাকে। যতদিন না আমার বাবা-মা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছেন ততদিন এখানেই থাকতে হবে আমাকে।

সেদিন রাতে পাশের ঘরে আমার মা আর মেয়রগিন্নী কথা বলছেন শুনলাম। মেয়রগিন্নী আমাকে নিয়ে যেতে বারণ করছেন মাকে। মার পক্ষে নাকি এটা এক রকম ঋণ পরিশোধ। মেয়রগিন্নীর কথা শুনে একটু অবাক হলাম আমি। কিসের ঋণ? আমরা তো কখনো কারো কাছ থেকে টাকা ধার করিনি। তবে? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে হেসে ফেললাম আমি। কথাটা শুনেছিলাম আমার বোনের কাছে। আমার মা ছিলেন শহরের মেয়ে। তাঁর পাণিপ্রার্থী তখন অনেক। একটি চাষীর ছেলে পাণিপ্রার্থী হয়ে বিয়ের আগের 'দাসত্ব' করছে সে সময়। আমার বাবা সেই সময় গিয়ে মাকে বিয়ে করতে চাইলেন। বাবা তখন স্কুলের শিক্ষক। আমেরিকান সাহেবদের জায়গায় প্রথম যে সব দেশী শিক্ষক চাকরি পেয়েছিলেন বাবা তাঁদের একজন। সুতরাং তখন তাঁর খুব খ্যাতি চারদিকে। তাছাড়া, সারাক্ষণ জুতো পরে থাকতেন বাবা। সুতরাং তাঁকে দিয়ে কুয়ো থেকে জল টানানো বা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করানোর প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমার মা হুড়মুড় করে বাবার প্রেমে পড়ে গেলেন এবং পালালেন দুজনে মিলে। এদিকে [illegible] আমার মার বাড়িতে ১৮টা নারকেল গাছ বসিয়ে দিয়েছে সেই চাষী ছেলেটি।

সেদিন রাত্রে তোমার বাবা-মা আবার আমাদের বাড়ি গেলেন। দুদিন ধরে আলাপ আলোচনা চলল। স্থির হল আগামী রোববারই বিয়ে হবে আমাদের। তোমাদের পরিবার আমাদের পরিবারকে ১৩০১ টাকা যৌতুক দেবে। ঐ একটাকাটা দিয়ে মোমবাতি কেনা হবে। আমার বাবা ৭০০ নারকেল গাছশুদ্ধ একটা জমি দেবেন আমাদের, তোমার বাবা দেবেন সে জমির অর্ধেক সাইজের ধানী জমি একটা। আমার মা একটা ভাল শুয়োর দেবেন, তোমার মা দেবেন দুটো গরু আর একটা ছাগল। তোমার ঠাকুরদা রবারের টায়ার লাগান নতুন গরুর গাড়ি উপহার দেবেন আমাদের। আমার ঠাকুরদা বহুকাল আগেই মারা গেছেন সুতরাং তার কিছু দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তিন দিন পরে মেয়রগিন্নীর বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে এলেন মা। বিয়েতে মেয়রগিন্নীকে আমাদের ধর্মমাতা করা হল। বিয়ে হবে রোমান ক্যাথলিক গীর্জায়। খাওয়া-দাওয়ার খরচ তোমাদের। অতএব তার ব্যবস্থাও তোমাদের বাড়িতেই হবে।

আমার বিয়ের পোষাক তৈরি করতে হবে ইতিমধ্যে। আমার বোনের কাছে শুনলাম, অতিথিদের জন্যে বিরাট খাবার-ঘর তৈরি হচ্ছে তোমাদের বাড়ির উঠোনে; লম্বা-লম্বা খাবার টেবিল বসান হচ্ছে। অসংখ্য শুয়োর, ছাগল আর মুরগি কাটা হচ্ছে। পুরো উঠোনটাই একটা বিরাট খোলা রান্নাঘরে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বর জানেন কত লোক আসবে। আত্মীয়স্বজনদের সংখ্যাই তো অনেক। তাছাড়া নেমন্তন্ন করারও দরকার হয় না। শুধু খবর পেলেই আসবে তারা। আসাই নাকি কর্তব্য। প্রাচ্যের বিয়েতে দু ধরনের খাবার ব্যবস্থা হয়। কিছু লোক কাঁটা-চামচের ব্যবহার জানে তাদের জন্য কাঁটা-চামচের ব্যবস্থা হয়; অন্যান্যদের জন্য কাঁটা-চামচ ছাড়া খাবার ব্যবস্থা হয়। আমাদের বিয়েতেও নাকি তাই হবে। এখন অবশ্য তোমার সঙ্গে যতক্ষণ খুশি কথা বলতে পারি আমি, বলছিও তাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছি কথা বলে। কিন্তু কথা বলা পর্যন্তই, ছুঁতে পারব না কেউ কাউকে। পাহারা আছে।

দেখতে না দেখতে সপ্তাহটা শেষ হয়ে গেল। রোববার এল। আমাদের বিয়ের দিন। তোমাদের বাড়িতে ঘুম ভাঙল আমার। আগের দিন রাতে আমার বোনদের সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে এসে ছিলাম আমি। সবাই মিলে নানারকম ঠাট্টা-তামাশা করছে। বিয়ের পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ কোথা থেকে তুমি এসে হাজির হলে এবং চুরি করে চুমু খেয়ে ফেললে একটা। আমার বোনরা হৈ-হৈ করে উঠল। আমি খুশি হলাম; ভাল লক্ষণ, দিনটা ভাল যাবে আমার।

আমার সাদা জুতোজোড়া সবে পায়ে দিয়েছি, ব্যান্ড বাজিয়ে আমাকে গীর্জায় নিয়ে যেতে এল সবাই। সবচেয়ে সেরা ব্যান্ড পার্টি আনা হয়েছে বিয়েতে যেন এ নিয়ে কোন দুঃখ না থাকে কারো মনে। পোষাকটা একটু তুলে ধরে হাঁটছি; তুমি আছ পাশে-পাশে। রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর জানালায় কৌতূহলী মুখের ভীড়। অতিথি-দের অনেকে এসেছেন আমাদের সঙ্গে।

গীর্জায় এসে পৌঁছলাম আমরা। পুরোহিত বৃদ্ধ হয়েছেন বলে দীর্ঘ সময় নিলেন মন্ত্র পড়তে। গীর্জার দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে আর ভেতরটা ঠাণ্ডা। এতো লোকজন জামা-কাপড়ের এত রং-চং দেখে কড়িকাঠের ঝুলন্ত চামচিকেগুলো তাকিয়ে আছে ঘাড় উল্টে। বিয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে খুব জোরে আমার পা মাড়িয়ে দিলে তুমি। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেল আমার। এটা তুমি ইচ্ছে করেই করলে। শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাকে। আমার ওপর তোমার প্রভুত্বের স্বাক্ষর এটা।

গীর্জা থেকে ফিরে এলাম তোমাদের বাড়িতে। ব্যান্ড পার্টি আর অতিথিরাও ফিরল সঙ্গে-সঙ্গে। সবচেয়ে বড় খাবার টেবিলে মধ্যখানে বসান হল আমাদের। এগারোটা বাজে। প্রাতঃরাশ শুরু হল। আমরা ছাড়া অন্য সবাই দুপুরের খাওয়া খাচ্ছে তখন। খাওয়া শেষ হলে বয়োজ্যেষ্ঠ-দের হাতে চুমু খেলাম আমরা।

হাতে থালা নিয়ে তুমি আর আমি একে-একে সব আত্মীয়স্বজনদের কাছে গেলাম। উৎসবের যিনি কর্তা তিনিও চলেছেন আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে; গিটার বাজিয়ে বিয়ের গান গাইছেন তিনি আর আমি নাচছি। তোমার কাকার কাছে গিয়ে থালাটা রাখলাম। তামাশা করবার জন্যে মাত্র তিনটে টাকা দিলেন তিনি। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। অবশেষে গান শুনে আর আমার নাচ দেখে তাঁর কাছে যা ছিল সব দিয়ে দিলেন। শূন্য পকেটটা উল্টে দেখিয়ে দিলেন পর্যন্ত। আমার হাতের মদের গেলাস থেকে এক চুমুক খেতে দিলাম তাঁকে। আমি নিজেও ছোঁয়ালাম একটু ঠোঁটে। এটা ধন্যবাদ জানাবার রীতি আমা-দের। তুমি কিন্তু প্রতিবারই দু-তিন চুমুক করে খাচ্ছ আর তোমার স্ফূর্তি ক্রমশঃই বাড়ছে। আমার আত্মীয়রা সকলেই খুব ভালবাসে তোমাকে। তাই তোমার থালায় টাকার স্তূপ জমে উঠল।

একে-একে সকলের সামনেই নাচলাম আমরা। তারপর শুরু হল টাকা গোনা। কার আত্মীয়রা কত দিয়েছে তার হিসেব।

তারপর সব টাকাগুলো রুমালে বেঁধে হাতে দিয়ে দিলে তুমি। তোমার প্রথম রোজগার। আমাদের দেশে টাকা-পয়সা মেয়েদের কাছে থাকাই রীতি।

প্রচুর খাবার আর মদ খেয়েছে সবাই। হৈ-হল্লা আর গল্প-গুজব চলছে চারদিকে। অবশেষে একে-একে বিদায় নিল সবাই। কিন্তু কি নোংরা আর কি বিশৃঙ্খলা যে রেখে গেল তারা তা আর বলবার নয়।

অতিরিক্ত মদ খেয়ে ফেলেছ তুমি। মুখ লাল হয়ে উঠেছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে গা দিয়ে। ধরে-ধরে ওপরে নিয়ে এলাম তোমাকে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলাম, নেশা কাটাবার জন্যে চা করে দিলাম!

অন্ধকার হয়ে আসছে। কেরাসিনের বাতিটার পলতে তুলে দিলাম। তারপর বিয়ের পোষাক ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরলাম। তোমার পরিবারের লোকজনরা নিচে কুয়োতলায় বসে থালা-বাসন ধুতে শুরু করেছে। হাত ছুঁই-ছুঁই করছে থালা-বাসনের স্তূপ। আমি গিয়ে ধুতে বসে গেলাম তাদের সঙ্গে। নইলে হয়ত ভাববে, বৌটা কুড়ে। আর তুমি, আমার বর, বাঁশের খাটে শুয়ে আছ তখন। তুমি তো আমার সব, আমার ঐশ্বর্য, আমার আনন্দ, আমার দাঁড়াবার মাটি, আমার বিশ্রাম, আমার শান্তি, আমার মাধুর্য, আমার অবলম্বন... অথচ আজ এই বিয়ের রাত্রেই নেশায় অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে রইলে তুমি!

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

সৈনিক লেখকের চোখে ভারত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষে অনেক পেশাদার ইংরাজ সৈনিক আশ্রয় পেয়েছিলেন। দেশীয় রাজা-রাজড়ারা তখন মোটারকমের সেনাবাহিনী পুষতেন পড়শীদের সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজনে, নিরন্তর দ্বন্দ্ব সেকালে লেগেই থাকত, তাঁরা আগ্রহভরে য়ুরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের মোটা বেতনে পুষতেন। এইরকম ভাগ্যপরীক্ষার সুযোগসন্ধানে এসেছিলেন ফিলিপ মেডোজ টেইলর, যদিও সামরিক বা বে-সামরিক ক্ষেত্রে তিনি তেমন সাফল্যলাভ করে উচ্চপদে উঠতে পারেন নি, ইংগ-ভারতীয় সাহিত্যে কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর কোনও লেখক এমন খ্যাতিলাভ করেন নি।

মেডোস টেইলর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে লিভারপুলে জন্মেছিলেন, আর পনের বছর বয়স হতে না হতেই তাঁকে বোম্বাই শহরে অন্নের সন্ধানে পাঠানো হল। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রলোভনে চাকরীর আশায় তিনি সেদিন এসেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয় স্যর চার্লস মেটকাফের হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে একটা সৈনিকের কাজ জুটে গেল, স্যর চার্লস ছিলেন নিজাম সরকারের রেসিডেণ্ট। ঔরঙ্গাবাদে এসে তৎক্ষণাৎ কাজে যোগ দিলেন মেডোস টেইলর আর পাঁচ বছরের মধ্যেই ফারসী, মারাঠী এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। মেডোস টেইলর তাঁর "দি স্টোরী অব মাই লাইফ" নামক গ্রন্থে বলেছেন—

> "I could speak Hindusthani like a gentleman".

হায়দ্রাবাদে থাকাকালে তিনি স্থানীয় ভদ্রসমাজে মেলামেশা করতে ভালোবাসতেন, তার ফলে তাঁদের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা হয়, তিনি লিখেছেন—

> "I was often asked to sit down with them while their carpets were spread and their attendants brought hookahs."

এর ফলে ভারতীয় নাগরিক জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিজীবনে এবং সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করেছে।

কিছুকাল সামরিক বিভাগে কাজ করার পর মেডোস টেইলর বেসামরিক বিভাগে কাজ নিলেন এবং নিজের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য জরিপবিদ্যা এবং ইনজিনিয়ারিং কাজও শিখলেন, সেই সঙ্গে ভারতীয় ও ইংরাজী আইন, জীববিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যাও শিখলেন। তাঁর অধঃস্তন সৈনিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার বেশ ভদ্র এবং সৌজন্যপূর্ণ হওয়ায় তিনি তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিলাভ করলেন। বারো বছর কাজ করার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাপ্তেন পদে উন্নীত হলেন। কিন্তু এর কিছু পরেই স্ত্রীপুত্র-কন্যা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, নিজের শরীরও ভেঙে পড়ল, মেডোস টেইলর তিন বছরকাল ইংলণ্ডেই কাটালেন। এই তিন বছর টেইলরের জীবনে এক মূল্যবান কাল, কারণ উত্তরকালে তাঁর যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছে তার ভিত্তিস্থাপনা হয়েছে এই কালে।

মেডোস টেইলর এই সময় পণ্ডিত-মহলে খ্যাতি অর্জন করলেন তাঁর "কনফেসানস্ অফ এ ঠগ" নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করে। একটি গ্রন্থেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেও সুস্থ হয়ে টেইলর হায়দ্রাবাদে ফিরে আবার পুরাতন কাজে যোগ দিলেন। ১৮৪১-এ সোরাপুরের রাণী ব্রিটিশদের প্রতি প্রতিকূল হয়ে ওঠায় সোরাপুর রাজ্যে পাঠান হল টেইলরকে। বিশেষ কোনো সৈন্যবল না থাকা সত্ত্বেও শুধু বুদ্ধি এবং কৌশল প্রয়োগে রাণীর সিংহাসনচ্যুতি সম্ভব করলেন, গদীতে বসানো হল রাণীর শিশুসন্তানকে। এইকালে নাবালকের অভিভাবকত্বের ভার রইল টেইলরের ওপর।

মিউটিনির সময় টেইলরকে উত্তর বেরার প্রদেশের বুলদানায় পাঠানো হল, হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট লিখেছেন—

> "Two million people must be kept quiet by moral strength for no physical force was at my disposal."

উপযুক্ত পরিমাণ সেনাবাহিনী সঙ্গে না নিয়ে টেইলর কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে পেরে-ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য ইংলণ্ডে যেতে হল। দুর্বল স্বাস্থ্য আর তাঁকে চাকরীর শৃংখলে বেঁধে রাখতে পারল না, চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ইংলণ্ডে বসে বসে তিনি গভীরভাবে সাহিত্য-চর্চায় মন দিলেন।

যখন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত সেই কালেও ১৮৪১ থেকে ১৮৫৩ পর্যন্ত তিনি লণ্ডনের টাইমস পত্রিকার ভারতীয় সংবাদদাতা ছিলেন।

মেডোস টেইলরের ভারতজীবনের সমগ্র অংশটুকুই তাঁর উত্তরজীবনের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে প্রস্তুতিপর্ব। ঠগীদের সম্পর্কে একটা পুস্তক রচনা করার জন্য পরামর্শ দেন মেডোস টেইলরের বন্ধু স্যর এডওয়ার্ড বুলওয়ার। আত্মজীবনীতে এই বিষয়ে লিখেছেন টেইলর—

> "He sent word, that had be possessed any local knowledge of India or its people, he would write a romance on the subject. Why did I not do so? I pondered over his advice and hence my novel **Confessions of a Thug.**"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মেডোস টেইলর কর্নেল স্লীমানকে ঠগীসংক্রান্ত অনুসন্ধান বিষয়ে সহায়তা করেন, এবং ঠগীদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিবরণ সমগ্র জগৎকে চমকিত করে। সভাজগত যখন ঠগীদের বৃত্তান্ত নিয়ে বেশ উত্তেজিত ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রকাশিত হয়েছে "কনফেসানস্ অব এ ঠগ"। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর রাতারাতি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। তাঁর গ্রন্থটি সর্বত্র সমাদৃত হল, ঠগীদের সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মত তাঁর গ্রন্থটি বাস্তবরসসমৃদ্ধ হওয়ায় সুখপাঠ্য হল।

ঠগীজীবনের এই কাহিনী একটি সাধারণ বিবরণী হিসাবে বিধৃত, ঠগী-বৃত্তিতে অভিজ্ঞ একজনের মুখে গল্পটি বলা হয়েছে, তার সঙ্গে মিশেছে বলিষ্ঠ কল্পনা এবং চিত্তচমকপ্রদ বিবরণ, বর্ণনা-ভঙ্গী এমনই বাস্তবভিত্তিক যে কাহিনীটি আগাগোড়া সত্যকাহিনীর মত শোনায়।

এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমীর আলি একজন প্রকৃত ঠগ, আমীর আলিকে ধরে তার জবানবন্দী আদায় করেছিলেন টেইলর স্বয়ং। আমীর আলির এই বীভৎস কাহিনী একটি রক্তস্নানের পর্ব থেকে পর্বান্তরে নিয়ে গেছে আর সেই ভয়ংকর বিভীষিকার চিত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় মানবিক বৃত্তি প্রযুক্ত হওয়ায় ঠগী কাহিনী এতখানি আকর্ষণমূলক গ্রন্থ হয়েছে।

আমীর আলি সুন্দর পরিচ্ছদ, উত্তম আহার, উত্তেজনা এবং যুদ্ধের মধ্যে যে রহস্যময় উত্তেজনা আছে তার মধ্যে সে আনন্দ পায়। সে উদগ্র প্রেমিক, কিন্তু তার একমাত্র দুঃখ যে মাত্র সাতশ ঊনিশটি খুন সে করেছে হাজারে পৌঁছাতে পারেনি।

কনফেসানস্ গ্রন্থে টেইলর একজন বস্তুবাদী সাহিত্যিক হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছেন—এই বাস্তবভিত্তিক রচনার নিদর্শন কিন্তু তাঁর পরবর্তী রচনায় অনুপস্থিত, সেই সব রচনাগুলি পরিপূর্ণ-ভাবে রোমান্সধর্মী।

পরবর্তী সংখ্যায় টেইলর লিখিত অন্য গ্রন্থগুলির বিবরণ দেওয়া যাবে।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র সেনের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ॥

বাংলাদেশকে যিনি সর্বপ্রথম তার সাহিত্য এবং ভাষা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, সম্ভবত তিনি হলেন ডঃ দীনেশ-চন্দ্র সেন। গত ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় মহাবোধি সোসাইটি হলে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, আচার্য দীনেশ-চন্দ্র ছিলেন ক্ষণজন্মা ও কৃতীপুরুষ। বাঙালীকে তিনিই সর্বপ্রথম সচেতন করে জানিয়েছিলেন যে, সাহিত্য হচ্ছে জাতীয় সম্পদ। গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনেও ছিল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সাহিত্যে তাঁর প্রতিভা এবং অবদানের তুলনা নেই। বাঙালীর সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের সম্পর্ক।"

যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন বসু বলেন, "দীনেশচন্দ্রই প্রথম বাংলা সাহিত্যকে বিদেশীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি কর্পোরেশনকে জমি এবং রাজ্যসরকারকে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য অনুরোধ জানান।" প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা ভাষায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা সকলেই দীনেশচন্দ্রের কাছে ঋণী।" রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা ভাষার কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য দীনেশচন্দ্র সেন যে শ্রম-স্বীকার করেছেন, তার তুলনা বিরল।"

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে শ্রীউমাশঙ্কর যোশি নির্বাচিত ॥

প্রখ্যাত গুজরাটি কবি সমালোচক এবং ছোটগল্পকার শ্রীউমাশঙ্কর যোশি সম্প্রতি গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন। সমকালীন গুজরাটি সাহিত্যে উমাশঙ্কর যোশি অন্যতম প্রধান। 'সংস্কৃতি' নামক একটি পত্রিকার তিনি সম্পাদনা করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সুদীর্ঘদিনের।

জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান ॥

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, তার থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছর সাড়ে ছ' হাজার শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যদি এর থেকে পাঠ্যপুস্তকের কথা বাদ দেওয়া যায়, তাহলে দশ হাজার শিক্ষিতের জন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাকি

এই পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা যায় যে, যদিও প্রতি বৎসর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তবু তুলনায় তা ক্রমশ কমে আসছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে ২৪,৫৯৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালে তা কমে গিয়ে হয়েছিল ২১,২৬৫টি। ১৯৬৫-৬৬ সালে এর সংখ্যা আরও কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২০,১১৫টি। এর মধ্যে অবশ্য একমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই ১০৪৩৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বাংলায় ১৪২২টি, অসমীয়াতে ১৪টি, গুজরাতীতে ৯২২টি, হিন্দিতে ২৩৭৬টি, কানাড়িতে ২৪১টি, কাশ্মীরীতে ১০টি, মালয়ালমে ৫৭৩টি, মারাঠিতে ১৬১২টি, ওড়িয়াতে ১২০টি, পাঞ্জাবিতে ১৬৭টি, সংস্কৃতে ২০৭টি, তামিলে ৯৪৭টি, তেলুগুতে ৫১৮টি, উর্দুতে ৩৭২টি এবং অন্যান্য ভাষায় ২৮টি।

পুস্তক প্রকাশন সংস্থাগুলির অধিকাংশেরই মূলধন স্বল্প। সমস্ত দেশে এমন ১৫টি পুস্তক প্রকাশন সংস্থা নেই, যাদের কার্যকরী মূলধন ১ লক্ষ টাকার বেশি। একটিমাত্র ভারতীয় প্রকাশন সংস্থা আছে, যে লন্ডন এবং নিউইয়র্কে সামান্য ক'টি গ্রন্থ প্রকাশ করে থাকে। সমবায় ভিত্তিতে প্রকাশন সংস্থা একমাত্র কেরল ছাড়া আর কোথাও নেই।

একজন তরুণ কবি ॥

যে সমস্ত ভারতীয় ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে আর একটি নাম সংযুক্ত হল। এই নামটি হল গীয়েভ প্যাটেলের। কিছুদিন আগে বোম্বে থেকে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন কবি নিসিম এজাইকেল। তাঁর কবিতায় আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার একটা সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুট হতে লক্ষ্য করা যায়। এই যুগ-যন্ত্রণায় আহত কবিমন কখনও বিক্ষোভে, কখনও বেদনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কবিতার অবয়ব নির্মাণে অবশ্য তিনি খুব একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় অন্তঃমিলের অভাবও লক্ষ্যণীয়। প্যাটেলের কবিতার নিদর্শন হিসেবে 'ক্যাথলিক মাদার' কবিতা থেকে কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা যাচ্ছে।

"She's the youngest of three,
you said.
'She's always been so: sickly',
And you smiled; the child
Responded but turned shyly away.
We were all three
Barely perturbed."

কৃষ্ণ মেননের জীবনী ॥

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেননের নাম অতি সুপরিচিত। সম্প্রতি তাঁর একটি জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি রচনা করেছেন টি. জে. এস. জর্জ। অবশ্য গ্রন্থটিতে কৃষ্ণ মেননের রাজনৈতিক কর্মের কোনও বিশ্লেষণধর্মী রচনা নেই। কেবলমাত্র তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত এতে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির মুদ্রণ অনস্বীকার্য।

বিদেশী সাহিত্য

দি পোয়েট স্পীকস্ ॥

সম্প্রতি ব্রিটেনের ব্রিটিশ কাউন্সিল ইংরেজ কবিদের কতগুলি সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে 'দি পোয়েট স্পিকস' নামক একটি মাঝারি আকারের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বেশ কিছুদিন থেকেই কাউন্সিল ইংরেজী ভাষার কবিদের কতগুলো সাক্ষাৎকারের আয়োজন করে যাচ্ছিলেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আলোচিত কবিকে তাঁর কবি-কর্ম ও ব্যক্তিগত নানা প্রশ্ন করা হয়। কবিরা সেগুলোর জবাব দেন। ৬টি লং প্লেয়িং রেকর্ডের (Ango R.G. 451-6) মাধ্যমে এই সাক্ষাৎকার সংলাপগুলোকে ধরে রাখা হয়। এইভাবে খ্যাতিমান থেকে শুরু করে তরুণতর কবি পর্যন্ত প্রায় ৪৫ জন কবির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাৎকার-গুলি নেওয়ার জন্য ৪ জন বিশিষ্ট কাব্য-সমালোচককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোল কোনো কবিকেই এই অনুষ্ঠানসভায় সাক্ষাৎকারের জন্য আগে থেকে কোনো প্রস্তুতির সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিশেষত কবিতার আঙ্গিক-কৌশল, কবিতায় মুক্তি, ছন্দ-অলঙ্কার, পূর্ববর্তী কবির প্রভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হয় তাঁদের। প্রবীণ কবিদের মধ্যে ছিলেন ব্লানডেন, ডেভিড জোন্স, হার্বার্ট রীড, ভারনন্ ওয়াটকিন্স প্রভৃতি। অবশ্য প্রবীণদের তুলনায় তরুণ ও তরুণতর কবিদের সংখ্যাই ছিল বেশী। যুদ্ধ-পরবর্তী তরুণতরদের মধ্যে জর্জ ম্যাকবেথ্, ক্রিস্টোফার মিডলটন্, সিলভিয়া প্লেথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত অগ্রজদের মধ্যে টম গান্, পিটার পোর্টার, টেড্ হিউজেস আছেন। নরওয়ের প্রখ্যাত কবি ও অনুবাদক সি. এফ. প্রিডজ্‌ও ছিলেন।

কবিতা পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে এ বইটির খবর লোভজনক। কেননা সমকালীন আধুনিক ইংরেজী কবিতা বিষয়ে পাঠকের যা যা বিভ্রান্তি আছে কবিদের নিজমুখে বলা তাঁদের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা যে কবিতা পাঠককে উপকৃত করবে সন্দেহ নেই। সমস্ত গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন পিটার ওর।

পরলোকে পিয়ের ডেস্‌কাভে ॥

প্রখ্যাত ফরাসী নাট্যকার-ঔপন্যাসিক ও সমালোচক পিয়ের ডেস্‌কাভে গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেছেন। পিয়ের ডেস্‌কাভে ১৮৯৬ সালের ১ জানুয়ারী প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। এবং ভবিষ্যতে লেখক হিসেবেই কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

প্রথম জীবন শুরু হয় সাংবাদিক হিসেবে। ১৯২৪ সালে 'লে পোতি জার্নালে'র তিনি হন অন্যতম সম্পাদক। ১৯২৫ সালে তিনি নিজেই প্রকাশ করেন 'জার্নাল পার্লে'। চলতি বছরেই তিনি বেতার মাধ্যমে একটি সাহিত্য বাসর পরিচালনা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে প্যারিস আকাশবাণীর 'বেতার জগৎ' পত্রিকার সম্পাদকপদ অলংকৃত করেন ডেস্‌কাভে। এ সময় তিনি অনেকগুলি 'রেডিও নাটক' লেখেন। তার মধ্যে 'লা সিটি দ্য ভজু' 'লে ডিসাইপাল' প্রত্যেক ফরাসীবাসীর জনপ্রিয়। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'লে ইন্‌ফেন্টা দ্য লিয়াসন' এবং 'লা প্যাকার্ড দ্য সিগি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর সমালোচনা ও রচনাগুলিও ফরাসী সাহিত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। 'লাইসে এবং ইওরোপ' 'আমার গনকোর্ট পুরস্কার' 'বাল্‌জাক' প্রভৃতি রচনা বিশিষ্ট।

ডেস্‌কাভে দীর্ঘ কয় বছর ছিলেন 'সোসাইটি অব্‌ পিপল্‌ অব্‌ লেটারস'এর সহ-সভাপতি। এবং 'ফরাসী লেখক সমবায়ের' সভাপতি। ফ্রান্সের সর্বজন-পরিচিত পুরস্কার 'থিওফ্রাস্তে রেনোডেট'এর জুরীদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

নতুন বই

অগ্রজ সাহিত্যিকের সার্থক সৃষ্টি

শ্রীনরেন্দ্র দেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। সুদীর্ঘকাল তিনি বঙ্গভারতীর সেবায় অতিবাহিত করেছেন, বিশেষতঃ ভারতী যুগের যে দু'-একজন সাহিত্যিক আমাদের মধ্যে এখনও বর্তমান সৌভাগ্যের বিষয় নরেন্দ্র দেব তাঁদের অন্যতম। একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনা ও সুমধুর স্বভাবের জন্যই নরেন্দ্র দেব সকলের প্রিয়। কবিতা, উপন্যাস, গল্প, সাহিত্য আলোচনা, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগই তাঁর দানে পরিপুষ্ট। "ভালোবেসেছিল যারা" নরেন্দ্র দেবের সাম্প্রতিক উপন্যাস এবং সার্থক উপন্যাস। প্রেমের বিচিত্র ভঙ্গী ও রূপ পরিণত দৃষ্টি নিয়ে লেখক দেখেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন, কাহিনীর বিন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি যেমন বিশেষভাবে চোখে পড়ে, সেই সঙ্গে তেমনই বাস্তবানুগ চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের অনন্যসাধারণ দক্ষতায় বিস্মিত হতে হয়। নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অনেক জটিলতা আছে, অনেক বিধিনিষেধ আছে আবার সেই সঙ্গে আছে বাঁধা রাস্তা অতিক্রম করে উদার আকাশের নীচে দাঁড়ানোর বিদ্রোহী মনোভঙ্গী। এক বিশাল পটভূমিকায় লেখক প্রকাশ, বিভাস, নিভা, কেশব, কনক, অবিনাশ, উমা, নির্মল, নিরঞ্জন, বিজয়, ভোলানাথ, রাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলি এঁকেছেন, তারা একে একে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এর মধ্যে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতও আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে পরিপূর্ণ কাহিনীটি চোখের উপর ভেসে ওঠে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি নিখুঁত চিত্র। বলিষ্ঠ তুলিতে অনেক রকম রঙ দিয়ে আঁকা। লেখকের মনে তারুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাঁর ব্যক্তিমানস এই সজীবতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। সুগভীর সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বিচার করেছেন। তাঁর ভূমিকা শাসকের নয়, তাঁর প্রচেষ্টা ধ্বংসাত্মক নয়, গঠনমূলক। তাই নরেন্দ্র দেবের 'ভালোবেসেছিল যারা' উপন্যাসটি অনেকের কাছে এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দেবে, নতুন চিন্তার সন্ধান দেবে। নরেন্দ্র দেবের লিপিকুশলতার নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, যে অনায়াস-ভঙ্গীতে তিনি কাহিনীটি বিধৃত করে পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগিয়ে রেখেছেন তা এই যুগে সর্বদা চোখে পড়ে না। 'ভালোবেসেছিল যারা' চিত্তচমকপ্রদ উপন্যাস হিসাবে সমাদৃত হবে। ছাপা ও বাঁধাই লোভনীয়।

ভালবেসেছিল যারা (উপন্যাস)—নরেন্দ্র দেব। প্রকাশক : এস, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিঃ। ১-সি কলেজ স্কোয়ার। দাম—সাড়ে ছ' টাকা মাত্র।

উপন্যাসে সমাজচিত্র

আধুনিক সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি বর্তমান যুগের অনেক গল্প ও উপন্যাসে প্রতিফলিত। আধুনিক সমাজের মধ্যে যে আবিলতা ও অভিশাপ এই মুহূর্তে একটা সমস্যার আকার নিয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় তারই সার্থক রূপায়ণ করেছেন তাঁর 'যাত্রা-সহচরী' নামক সাম্প্রতিক উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক গৌতম, নায়িকা ললিতা অর্থাৎ লিলিয়ান লুইস দুটি চরিত্রই জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেখানেই লেখিকার কৃতিত্ব। গৌতম তার জীবনের যাত্রাপথে প্রথম দিকেই পেয়েছিল লিলিয়ানকে তার জীবনের যাত্রাসহচরী

হিসাবে। জীবনের সেই দীর্ঘ পথপরিক্রমা সরল রেখায় চলেনি, অনেক চড়াই-উৎরাই অনেক মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। জীবনের এই বিচিত্র যন্ত্রণার একটা সুস্পষ্ট আকৃতি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখিকা অসামান্য লিপিকুশলতায়। নাটকীয় মুহূর্ত-গুলিকে তিনি সংযম এবং দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন আর সেই সঙ্গে ডাঃ অভিলাষ চৌধুরীর সফল জীবনের আড়ালে যে বেদনাময় অন্ধকার তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। আশা গঙ্গোপাধ্যায় প্রচুর লেখেন নি বটে কিন্তু তাঁর মুন্সীয়ানায় মুগ্ধ হতে হয়। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই সুরুচিসঙ্গত।

যাত্রা-সহচরী— (উপন্যাস) আশা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—অরুণালোক প্রকাশনী। ৪০/বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

জ্যোতিষ সম্পর্কে নতুন গ্রন্থ

জ্যোতিষবিশারদ শ্রীসত্যেন মুখোপাধ্যায় সংখ্যাতত্ত্ববিদ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'মহর্ষি পরাশর বর্ণিত পঞ্চধা বিংশোত্তরী ও দ্বিধা অষ্টোত্তরী দশা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকৌশল' গ্রন্থে মৌলিক দৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আর্যভট্টের পরবর্তী সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা খুব কমই চোখে পড়ে। জ্যোতিষ গবেষণামূলক এই গ্রন্থখানি জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীর বিশেষ কাজে লাগবে এবং ভাগ্যগণনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পঞ্চধা বিংশোত্তরী ও দ্বিধা অষ্টোত্তরী দশা সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ কৌশল

(আলোচনা)—সত্যেন মুখোপাধ্যায়। সেকপুর। মেদিনীপুর। দাম—তিন টাকা সাঁইত্রিশ পয়সা।

ডালহৌসীর আশেপাশে

ডালহৌসী স্কোয়ার স্মরণাতীতকাল ধরে কেরানীপাড়া, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কেরানীদের সঙ্গে এ যুগের কেরানীদের অনেক পার্থক্য, বেশভূষার পরিবর্তন ঘটেছে, রীতিনীতিরও অনেক পার্থক্য, এখন সেখানে দলে দলে মহিলা করণিক এসে ভীড় করে ট্রামে-বাসে ঝুলে প্রতিদিন অফিস যাতায়াত করেন। রাস্তার পানওলার দোকান থেকে পান কিনে আবার পানের বোঁটায় লাগানো চুন চুষতে চুষতে গল্প করেন। এই দৃশ্য ডালহৌসীর আবহাওয়াকে রঙীন করেছে। এই পট-ভূমিকায় বাস্তবজীবনের ছবি এঁকেছেন সুকুমার রায় তাঁর 'আপিস কলকাতার সীমানায়' উপন্যাসে। যাঁরা এই ডালহৌসীকে কেন্দ্র করে বহুদূর থেকে এসে দশটা-পাঁচটা রুটিন বাঁধা জীবন যাপন করেন তাঁরা যন্ত্রচালিত অচেতন পদার্থে পরিণত হয়ে যান না, রক্তমাংসে গড়া মানুষের হৃদয়বৃত্তি ও মনোভঙ্গীর বাইরের জগতের মানুষ তাঁরা নন, অসিত, শরদিন্দু, নগেন্দ্র, শ্যামলী সেন সবই যেন পরিচিত মূর্তি। গোরী মিত্র ভদ্রেশ্বর থেকে এসেছিল সুরেন তাকে কাজ যোগাড় করে দেয়, সুরেনও ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা, অসিত কিন্তু ওদের এই মেলামেশার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়, গৌরীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা তার, শরদিন্দুও এই একই লক্ষ্য নিয়ে গৌরীকে ভোলাবার চেষ্টা করে। গৌরী মিত্র কিন্তু শরদিন্দুর প্রলোভন কাটিয়ে ওঠে, অসিতের ফাঁদ থেকে সে আপনাকে মুক্ত করে নেয়। গৌরী শেষ পর্যন্ত সুরেনকেই বেছে নেয় তার জীবনের সঙ্গী হিসাবে। সুরেনের সঙ্গে সুরমাকে মিলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত বিফল হল। শ্যামলী সেনের আকর্ষণও ফিকে হয়ে যায়। লেখকের আপিসপাড়ার অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসটির সাফল্যের মূলে অনেক-খানি সাহায্য করেছে। আধুনিক মনের বক্রতা, নীচতা, হিংসা ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রভৃতি বিবিধ ভঙ্গীর বিশ্লেষণও নিখুঁত। কাহিনীকে কেন্দ্র করে আশপাশের চরিত্র-গুলির সুস্পষ্ট রেখাচিত্র গড়ে উঠেছে। সংযত বর্ণনাভঙ্গী, কাহিনীবিন্যাসের অসামান্য কুশলতা ও সেই সঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাপ্রবাহ পাঠকচিত্তকে আগ্রহ ও বিস্ময়ে ভরিয়ে তোলে। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

আপিস কলকাতার সীমানায়

(উপন্যাস)—সুকুমার রায়। প্রকাশক—জ্ঞানতীর্থ। ১নং বিধান সরণী। কলিকাতা—১২। মূল্য—চার টাকা মাত্র।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শারদীয় 'চতুষ্কোণে' প্রবন্ধ লিখেছেন হাইনস্‌ মোদে, নীহাররঞ্জন রায়, শিশির-কুমার মিত্র, দিলীপকুমার রায় ও প্রবোধচন্দ্র সেনের পত্রাকারে লিখিত বাংলা ছন্দের পরিভাষা, শিশিরকুমার ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার ভৌমিক, নেপাল মজুমদার, সুজিতকুমার দত্ত, উমা গুহ, মনোরঞ্জন রায়, সুনীল চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, নীহার-বিন্দু চৌধুরী, পল্লব সেনগুপ্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, নীরদচন্দ্র রায়, সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, চিত্তরঞ্জন দেব। গল্প লিখেছেন মিহির আচার্য, মানবেন্দ্র পাল, অশোককুমার সেন-গুপ্ত, ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়, সৌরি ঘটক, ছবি বসু, সত্য গুপ্ত, মৃণাল চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন। অন্নদাশঙ্কর রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সত্য গুহ, মণীন্দ্র রায়, দাক্ষিণা-রঞ্জন বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, কৃষ্ণ ধর, সুশীলকুমার নন্দী, অরুণ ভট্টাচার্য, গণেশ বসু, শিবশম্ভু পাল, শ্যামা-সুন্দর দে, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, আবুল কাশেম রাহিমুদ্দিন এবং আরো কয়েকজনের কবিতা বর্তমান সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

চতুষ্কোণ : সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ১২৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

●

কুরান্টের বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন কে পি মুখার্জি, বি ভূষণ, কমলা শাস্ত্রী, কেশব সেনগুপ্ত, রতন সেন, মলয় মিত্র, শৈলপতি রায়, অপর্ণা সান্যাল, তপন বিশ্বাস, নন্দলাল ভট্টাচার্য, শিবাজী গুপ্ত, অপর্ণা মৈত্র এবং আরো অনেকে।

কুরান্ট—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক শ্রেণীর ছাত্রগণের মুখপত্র। দাম এক টাকা।

অভিনব স্বাদের উপভোগ্য কাহিনী

প্রখ্যাত দুই কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়ের নাম বাংলা-দেশে বিশেষ পরিচিত। তাঁদের নাম দুটি অবলম্বন করে শ্রীপ্রণব রায় হাসির গোয়েন্দা কাহিনী 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট' রচনা করেছেন। গায়ক অচলকুমার এই কাহিনীর নায়ক। নায়িকা নূপুরকে নিয়ে বিব্রত হয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে গিয়ে দুই গোয়েন্দার তাড়নায় তারা দুজনই পড়েছিল নানান কৌতুককর ঘটনায়। কাহিনীর প্রতিটি মুহূর্ত যেমন চমকপ্রদ তেমনি রোমাঞ্চকর। গোয়েন্দা দুজনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, ব্যর্থতা এবং নায়ক-নায়িকার জীবনের কাহিনী সমস্ত গ্রন্থের পটভূমিকে হাস্যোজ্জ্বল করে রেখেছে। গ্রন্থের পরিণতি মিলনান্তক এবং গোয়েন্দা-দ্বয়ও সার্থক। শ্রীরায়ের এই সুখপাঠ্য গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট

(গোয়েন্দা কাহিনী) — প্রণব রায়। রোমাঞ্চ। ১২ হরীতকীবাগান লেন, কলকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

সেতুবন্ধ

মনোজ বসু
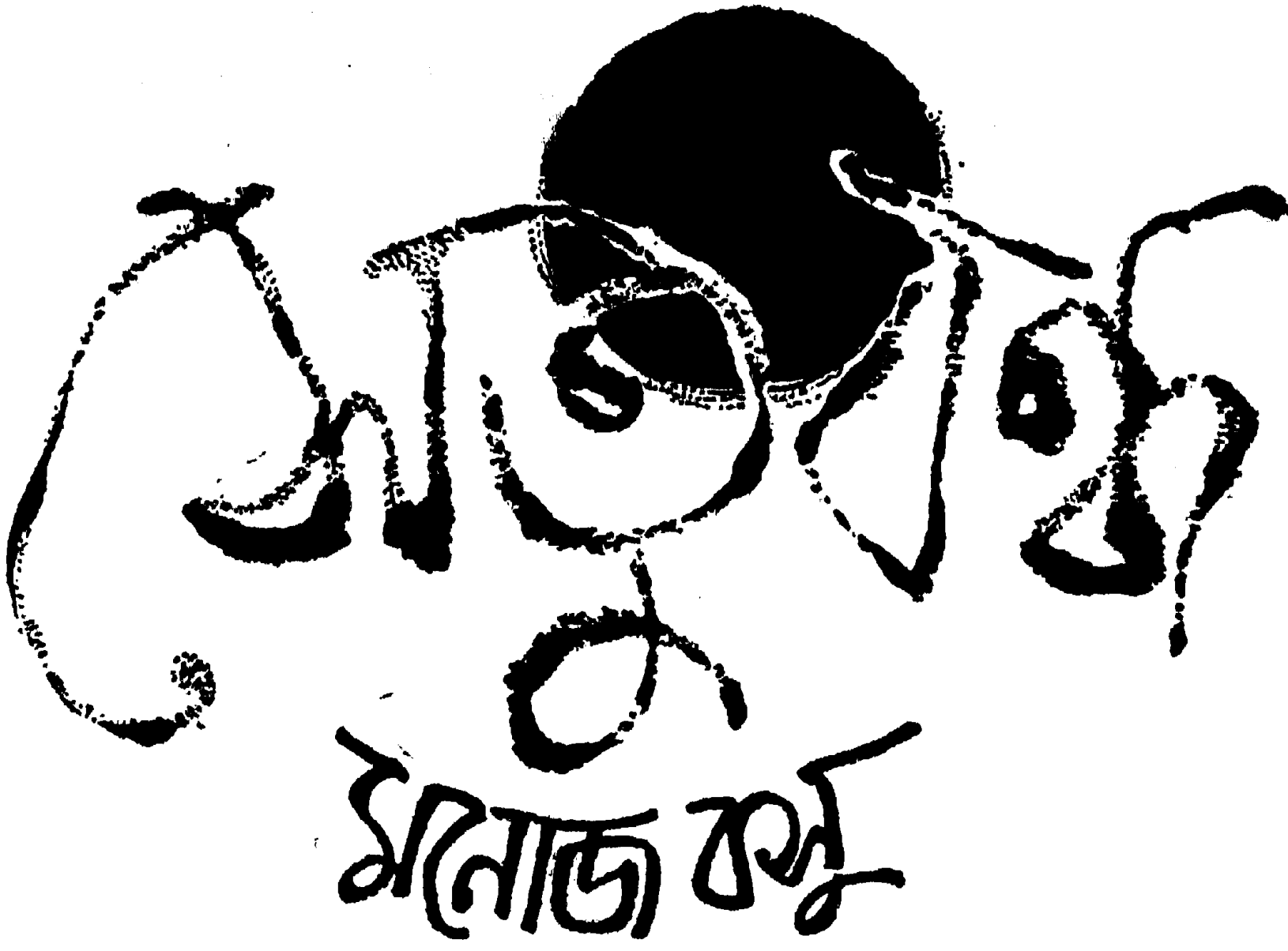
[উপন্যাস]

।। ষোল ।।

ঠন্-ঠন্ করে রিক্সা এসে পড়ল, রিক্সার উপর শিশিরের কোলে কুমকুম। ছেলে-মেয়ে কে কোনদিকে ছিল, ঘিরে এসে দাঁড়াল। সকলের পিছনে খানিকটা দূরে ঊর্মি।

আর কুমকুমের কাণ্ড দেখ এদিকে। রিক্সা থামানোর সবুর সয় না, আঁকুপাকু করছে মেয়ে নামবার জন্য। স্টেশনে নেমেও আচ্ছা একচোট কেঁদেছে, চোখ ভিজে-ভিজে এখনো। ভিজে দুটো চোখের দৃষ্টি ছেলে-পুলে সকলকে ছাড়িয়ে পিছনে যে মানুষ তারই দিকে। ঊর্মিও তাড়াতাড়ি তখন রিক্সার কাছে চলে আসে। কুমকুম ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। খিলখিল করে কী হাসির ঘটা! ভিজে চোখের উপর হাসি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

মমতা কি কাজে ছিল, সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল। শিশির বলে, মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এদেশ-সেদেশ করে বেড়িয়েছি—কান্না-কাটি খুবই করে। আপনাদের কাছে ছিল পুরো দিনও নয়—তার ভিতরেই কী মায়া করেছেন, ধুন্দুমার লাগাল এখান থেকে গিয়ে। এতদূর আগে দেখিনি কখনো। হোটেলের ম্যানেজার সারা রাত্তির কাল দু চোখ এক করতে পারে নি। বাঘ মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর কিছুতে তৃপ্তি পায় না শুনেছি—হাউ-মাউ-খাউ করে হামলা দিয়ে বেড়ায়। এ জিনিসও প্রায় তাই। ফেরত এনেছি, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। কান্না-টান্না গিয়ে হাসির লহর বয়ে যাচ্ছে ঐ দেখুন। আপনারা বিশ্বাসই করেন না, কাঁদিতে পারে এ মেয়ে।

মমতা হেসে উঠে ঊর্মিকে দেখায় : ধরেছ ঠিক। মায়াবিনী আছে একটি এ বাড়িতে—আমার ঐ ননদটি। ছেলেপুলে পলকের মধ্যে বশ করে ফেলে। দুঃখের কথা কি বলি ভাই, আমারই পেটের ছেলে-মেয়ে সব পর করে নিয়েছে। পিসির পিছু পিছু তারা সর্বক্ষণ—শতেক বার ডেকে তবে কাছে আনতে হয়। তোমার কুমকুমের উপরেও ঠাকুরঝি মায়া খাটিয়েছে।

শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : সংসারে এখনো মায়া-মমতা আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, ভুলে গিয়েছিলাম বড়দি। সে জিনিস একফোঁটা মেয়ে দিব্যি কেমন ধরে ফেলল—আমায় চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে তবে ছাড়ল। কাঁদে, আর কাটা-কবুতরের মত আছাড়ি-পিছাড়ি খায়—কি করি, উপায় খুঁজে পাইনে। শেষটা মনে হল, বড়দি'র ওখানেই ফেরত নিয়ে দেখি। ঠিক তাই। অবোলা শিশু মুখে তো বলতে পারে না, ভালবাসার জায়গা ছেড়ে এক পা নড়ব না—কান্না দিয়ে বোঝায়।

মতলবটা ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করে মমতার দিকে তাকায়। মমতা কি বলে প্রতীক্ষা করে আছে। মমতার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে। রিক্সা করে শুধুমাত্র মেয়ে আনে নি, এক গাদা জিনিষপত্র কেনাকাটা করে এনেছে। রিক্সাওয়ালা সেগুলো নামিয়ে রাখছে। মস্ত এক হাঁড়ি ভরতি রাজভোগ—

সোল্লাসে মমতা বলে, চাকরি হল বুঝি?

হয় নি ঠিক এখনো—

মমতা মুশড়ে গিয়ে বলে, মিষ্টি দেখে ভাবলাম চাকরি হয়ে গেছে, মিষ্টিমুখ করাতে এসেছ আমাদের।

শিশির বলে, চাকরি হয় নি বটে, কিন্তু না হয়ে আর উপায় নেই। এতাবৎ অফিসে গিয়ে কাঁদাকাটা করতাম, দাম-কাকা হুঁ-হাঁ দিয়ে যেতেন। কাল মেয়ে সশরীরে বাড়ি নিয়ে তুললাম। মেয়ে নয়, আমার পাশুপাত অস্ত্র—মোক্ষম কাজ দিয়েছে।

রসিয়ে-রসিয়ে শিশির সেই গল্প করছে :

সতীশ দামের ড্রইংরুমে সোফার উপর কুমকুমকে বসিয়ে দিলেন : দেশ-ভুঁই ছেড়ে পাকাপাকি এসেছি কাকাবাবু, কোন ঘরটা নেবো দেখিয়ে দিন। বলি, আর তাকিয়ে-তাকিয়ে মনোভাবের আন্দাজ নিই। আজকে দাম-কাকা মস্তবড় পজিসনের লোক, দেড়খানা মুখের অন্ন জোগানো তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। বাড়িতে জায়গাও ঢের—নিচের তলায় দুটো-তিনটে ঘর, বারো মাস খালি পড়ে থাকে। আসল বিপদটা হল, একটা গেঁয়ো লোক বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে উঠবে, আপন লোক বলে যার-তার কাছে পরিচয় দিয়ে বেড়াবে, কাকার তাতে মাথা কাটা যায়। অথচ যে মানুষের ছেলে আমি—সেকালের কথা মনে করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করতেও পারেন না। মুখ শুকিয়ে আমশিপানা হয়েছে দেখলাম—

মিষ্টি ছাড়াও আরো নানান জিনিষ—তিন রকমের বেবী-ফুড তিন কৌটো, কেক, টফি এক বাক্স, কুমকুমের জামা-জুতো। টফির বাক্স তুলে নিতে ছেলে-মেয়েরা ঘিরে দাঁড়াল। শিশির মুঠো-মুঠো টফি দিচ্ছে তাদের হাতে। গল্প চলেছে সমানে :

দাম-কাকার তো আমশিপানা মুখ। মুখ দেখে কষ্ট হল। সোফা থেকে মেয়ে তুলে নিয়ে এক হপ্তার সময় দিয়ে চলে এলাম : কষ্টে-সৃষ্টে এই সাতটা দিন কাটিয়ে দেব, তারপরে কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই, কাকা। ট্যাঁক ফাঁকা। দেশ থেকে সামান্য যা-কিছু নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বর্ডারের মুখে সবই প্রায় কেড়েকুড়ে নিল। কাছায় বাঁধা নোট ক'খানা ছিল, মেস-খরচা দিয়ে তাও খতম হয়ে গেছে! হপ্তার ভিতরে চাকরি হল তো হল—নইলে আপনার বাড়ি ছাড়া গতি নেই। কাকার এমন অট্টালিকা থাকতে সত্যি তো আর পথে পড়ে মরতে পারিনে। শাসানিতে ভয় ধরে গেল দাম-কাকার—পরশু দিন যেতে বলেছেন। ঐ দিনে নির্ঘাৎ কিছু হয়ে যাবে।

মমতা ভর্ৎসনা করে বলে, কী তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা! ট্যাঁকের ঐ অবস্থা—এত সব কিনে খামোকা টাকাগুলো নষ্ট করে এলে কেন?

অবস্থা সত্যি কি আর খারাপ?

হাসতে-হাসতে শিশির বলে, দাম কাকাকে ঐ বলে ধাপ্পা দিয়ে এলাম। নয় তো চাড় হবে কেন? মামার কলোনিতে ঘর হবে বলে সর্বস্ব ঘুচিয়ে এক কাঁড়ি টাকা হ্যান্ড করে নিয়ে এসেছি। কলোনি পড়ে গিয়ে ঘর বাঁধতে হল না—সে টাকা পুরো-পুরি মজুত। রীতিমত ধনীলোক আমি। খোঁজ নিন গে, রাজ-রাজড়ার ট্যাঁকও এত পুরু ভারী নয় এই স্বাধীন ভারতে।

হেসে হেসে বলছে শিশির, মমতার মুখে কিন্তু একফোঁটাও হাসি নেই। বলে, রাজ-রাজড়া হও, যা-ই হও, টাকা নষ্ট করা ঠিক নয়। কাঁচা বয়সের এই পথে-পথে ঘোরা চিরকাল কখনো চলবে না। মামার কলোনিতে না হয়েছে, ঘর তো হবেই কোন একদিন—

লুফে নিয়ে শিশির বলে, হতেই হবে। কোন একদিন হবে বলে ঠেলে রাখলে হবে না— এক্ষুনি, দু-দশ দিনের ভিতর। মেসে ছিলাম। হাটুরে হট্টগোলে থাকা অভ্যেস তো নেই—কী দিনেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঠাঁই না পেয়ে আবার সেইখানে যেতে হচ্ছে।

চাকরি হোক ভাল, না হোক ভাল, জুতমত একটা ঘর পেলেই বাসা করে ফেলব। করতেই হবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

কথা তোলবার ফাঁক এসে গেছে,—এ সুযোগ শিশির ছেড়ে দিল না। বলে, মরিয়া হয়ে ঘর খুঁজছি, বাসা করবই। যে ক'টা দিন বাসা না হচ্ছে—আপনার কাছে একটু দরবার নিয়ে এসেছি বড়দি—

মমতা বলে, সেটা বুঝেছি। বাচ্চার জন্যে জামা-জুতো, কৌটো-কৌটো বেবি-ফুড—আমাদের গরীব ঘরের ছেলেপুলে সাদা-মাটা গরুর দুধ খায়, রাজার কন্যের কৌটোর দুধ ছাড়া চলে না।

হাসিমুখে উপহাসের ঢঙে বলে যাচ্ছে। শিশির হাঁ-হাঁ করে ওঠে: ছি-ছি, একলা কুমকুমের জন্য এনেছি বুঝি! যা দিনকাল, কখন কোন জিনিষের আকাল এসে পড়ে ঠিক-ঠিকানা নেই। অভাব হলে বড়রা না খেয়ে থাকতে পারে, ছেলেপুলে তা পারবে না। তাদের জন্যে দুধের জোগাড় কিছু অন্তত রাখতে হয়।

মমতা চুপচাপ। এ তো ভারি মুশকিল—আরজি ঠিক-ঠিক পৌঁছে গেছে, রায় তবে কি জন্য বেরোয় না? শিশির বলে, কাল থেকে মেয়েটা যা কান্ড লাগিয়েছে—এবাড়ি ছাড়া কোনখানে তাকে ঠান্ডা রাখা যাবে না। মরেই যাবে কাঁদতে-কাঁদতে। অসুবিধা আপনাদের বুঝতে পারছি বড়দি—

কাতর সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে যাচ্ছিল। মমতা থামিয়ে দেয়: অসুবিধা কী আর এমন। আমার ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে থাকবে। (রায় মিলে গেছে—ঈশ্বর তুমি করুণাময়!) যদ্দিন উর্মি আছে ছেলেপুলে নিয়ে আমার সংসারে ঝামেলা নেই। এই যে এনে নামিয়ে দিলে—টের পাচ্ছ এ বাড়িতে আছে তোমার মেয়ে? পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে আমার—সাড়া-শব্দ পাও?

সন্ধ্যার পর অফিস-ফেরতা সুনীল-কান্তি এসে পৌঁছল। রায় পাওয়া গেছে নির্ভয় এখন শিশির। বাড়ির কর্তাকে তবু একবার সরাসরি বলা দরকার—না বললে দোষের হয়।

হাতমুখ ধুয়ে একটা রাজভোগ গালে ফেলে শিশির বারান্দায় এসে বসল।

শিশির বলে, চাকরি হয়ে যাচ্ছে বড়দা—

হয়ে যাক, তারপরে বোলো। কঞ্জুষের বাড়ির ভোজ খাওয়া—না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

এবারে ঠিক হবে। এই হপ্তার ভিতরেই। বাসা খুঁজছি। ঘর পাওয়া এত মুশকিল কলকাতায়! পেলেই বাসা করে ফেলব। সেই ক'টা দিন কুমকুমকে এখানে রেখে যাচ্ছি।

সে কেমন করে হয়! সুনীলকান্তি আকাশ থেকে পড়ে: বৃহৎ সংসার আমার, আর এই তো সামান্য একটু জায়গা।

শিশির বলে, আমি থাকছি নে, ভোরে উঠে চলে যাব। বাচ্চার জন্যে কত আর জায়গা লাগবে! এখানে আদর-যত্ন পেয়ে কী রকম যে গছে গেছে—

সুনীলকান্তি কথা পড়তে দেয় না: ও কিছু নয়। ছেলেপুলের মজাই তো এই। বাচ্চা পোষা আর পাখি পোষা—যে খাঁচায় রাখবে, সেখান থেকে নড়তে চাইবে না। আমার এখানে ভাই নানান অসুবিধা, অন্য জায়গা দেখ।

বড়দি কিন্তু বললেন, অসুবিধা কিছু হবে না।

ও, পারমিশন হয়ে গেছে। তবে আর আমায় কি জন্যে বলছ?

মুখ কালো করে সুনীলকান্তি ঘরে ঢুকে গেল। এবং মুহূর্ত পরেই বচসা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। শব্দ-সাড়া করে হচ্ছে, গোপন কিছু নয়।

এই বাজারে একটা পাখি পোষা যায় না—কোন আক্কেলে তুমি হাঁ বলে দিলে? কী দুটো ছাই-ছাতু হাতে করে এসেছে, আর বড়দি বড়দি করে দুবার মিষ্টি বচন ঝেড়েছে—গলে অমনি জল!

মমতা অভিমানের সুরে বলে, আমার বাপের বাড়ির সম্পর্ক বলেই তুমি এই রকম করছ।

সুনীল বলে, সম্পর্ক তো ঝগড়াবিবাদ আর মামলা-মোকদ্দমার!—তোমার বাবা আর ওর শ্বশুরের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ছিল না—কোন খবরটা না জানি আমি?

বাড়ির এত জায়গা থাকতে কলহের ক্ষেত্র এই ঘরটা কেন হল? এবং দাম্পত্য কলহ, ফিসফিস করে না হোক, কিঞ্চিৎ চাপা গলায় কেন হল না? ইচ্ছা করেই শিশিরকে শোনাবার জন্য। কিন্তু শুনছে না শিশির—নিরুপায়, নিরুপায়—শুনে কোন সুরাহা হবে? মারো আর ধরো আমি পিঠ করেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিছি তুলো। তোমরাও যদি বিদেয় করো, মেয়ে তাহলে গঙ্গার জলে অথবা চলন্ত ট্রেনের চাকার নিচে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কলহ করে যতই গলা ফাটাও, শুনতে আমি পাব না। কান অকস্মাৎ কালা হয়ে গেছে।

খুব ভোরে উঠে মমতার সঙ্গে দু-এক কথা বলে শিশির পালাবে। সুনীলকান্তি দেরিতে ওঠে, সে উঠে পড়বার আগেই। মেয়ে রেখে বেরিয়ে যেতে পারলে ভাল-মন্দর দায়ী তারপর ওরাই। এক কথায় তখন আর তাড়ান চলবে না।

মনে মনে এমনি এক মতলব ভেঁজে রেখেছিল। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে আজকে সুনীল ঘোর থাকতে উঠে পড়ল। শিশিরের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে। না, মোলায়েম সুর। কুমকুমকে জাগিয়ে তুলে কাঁধে নিতে বলছে না। বলে, আরে ভাই, ঝামেলার কী দরকার? মামার কলোনি না-ই যখন পেলে দেশে-ঘরে ফিরে যাও না আবার। মাথার দিব্যি কে দিয়েছে। বলি পাকিস্তানে কি মানুষ থাকে না। এসে পড়েছ মেয়ে নিয়ে, এত করে বলছ—আত্মীয়ের বিপাকে দেখা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু ছা-পোষা মানুষ, আমার দিকটাও দেখবে তো। এই মাসটা কেবল রাখছি—মাসের উপরে আধখানা দিনও আর নয়। বাসা হোক চাই না হোক, মেয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুনতে কটু লাগছে তোমার, কিন্তু দাতাকর্ণ না-ই যদি হতে পারি কি করা যাবে বল।

এত দূর নেমেছে, রাত্রে শুয়ে শুয়েও তবে স্বামী-স্ত্রীর কলহ চলেছে। শিশির ভক্তি ভরে বড়দার পায়ে প্রণাম করল।

এক্সপোর্ট সেকসনের বড়বাবু নটবর হোড় ছাতা ও কাঁধের চাদর যথারীতি বেয়ারার হাতে দিয়ে চেয়ার নিলেন। ছাতার গায়ে চাদর বিড়ে করে পাকিয়ে বেয়ারা আলমারিতে ঢোকাল। দুর্গা-খাতা বের করে নটবর ভক্তিভরে মাতৃনাম লিখছেন। শ্রীদুর্গা-শ্রীদুর্গা—এমনি একশ' আটবার। উপর থেকে নিচে আবার নিচে থেকে উপরে দু'বার গণে নিঃসংশয় হলেন, একশ-আটই বটে। খাতা কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখলেন আবার কাল লাগবে। পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে ড্রয়ারে ঢোকালেন।

কাজের মানুষ, এক মিনিটের অপব্যয় ধাতে সয় না। বেয়ারাকে বললেন, ভবতোষ-বাবুকে ডাক। ভাইজাগের ফাইলটা হাতে নিয়ে আসবেন।

পুরানো বহুদর্শী বেয়ারা — একা ভবতোষ নয়, অনিল, দ্বিজদাস, হীরেনবাবু, মাখন—বাছাই-করা বাবু ক'টিকে যথাযথ ফাইল সহ দর্শন দেবার কথা বলে এলো। বাবুগণ ততোধিক বহুদর্শী—বিনা ফাইলে শূন্য হাতে এসে পড়ল সকলে—এদিক থেকে, ওদিক থেকে এক-আধটা চেয়ার টেনে কাছাকাছি বসে পড়ল।

ভবতোষ কেবল দাঁড়িয়ে। বলে, পানের কৌটো কোথায় দাদু? ছাড়ুন।

বিনা বাক্যে নটবর কৌটো বের করে ধরেন। যার যেমন অভিরুচি খিলি নিয়ে
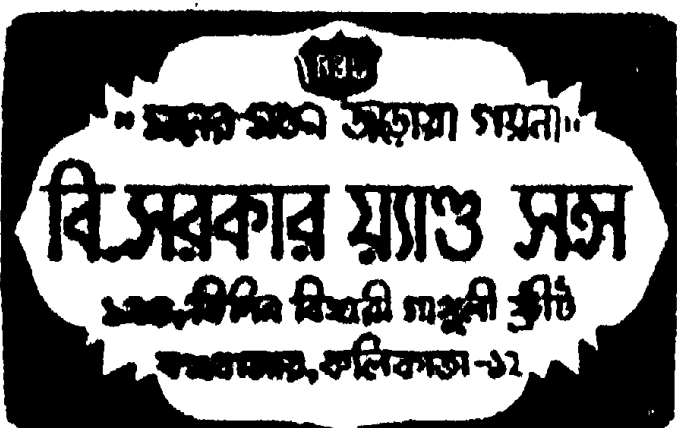
দিল। নিত্যিদিন এই রকম চলে, খিলি দানে নটবরের কৃপণতা নেই। অফিসসৃদ্ধ লোকের যেন দাবি জন্মে গেছে নটবরের খিলির উপর।

নটবর শ্ধোন : তারপর ভবতোষ, মছ্বড়েদের খবর কি? চারে তো ঘাই মারছে, বড়শিতে গাঁথল কিছু?

প্রশ্নটাও মামুলি। ইদানীং রোজই এই-রকম প্রশ্ন। স্ত্রীলোক যে ক'টি অফিসে কাজ করছেন তাঁদের নিয়ে রং-তামাসা। সত্যি-মিথ্যে কিছু টাটকা খবর নটবর সংগ্রহ করে এনেছেন, সেই মাল ছাড়বার মুখে গৌর-চন্দ্রিকা। তারই লোভে ভিড় করে এসেছে নটবরের বশম্বদ সাগরেদগুলি।

ভবতোষ খোশামোদ করে বলে, আমরা কি জানি দাদু, খালি চোখে কতটুকুই বা দেখা যায়! লং-সাইটের চশমায় নতুন কি দেখে এসেছেন বলুন তাই।

নটবর চেয়ারের উপর দুই পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। কৌটো থেকে ইতিমধ্যে দুটি আঙুলে আলগোছে দুই খিলি তুলে মুখে ফেললেন। কপকপ করে চিবোচ্ছেন।

এইবার — গৌরচন্দ্রিকা শেষ হয়ে কথারম্ভ এইবারে। উৎকর্ণ হয়ে আছে মানুষ ক'টি—

রসভঙ্গ অকস্মাৎ। ডেপুটি-ম্যানেজারের আরদালি এসে হানা দিল : সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

যমরাজের ডাকও এর চেয়ে জরুরী নয়। তটস্থ হয়ে নটবর উঠে পড়লেন। চিবানো পান থুঃ-থুঃ করে ফেলে দিয়ে মুখ মুছে পলকের মধ্যে সাহেবের কামরায়।

টেবিলের বিপরীত দিকে অচেনা এক ছোকরা বসে আছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক নজর তার দিকে চেয়ে যথারীতি হাত কচলে নটবর উপরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : স্যার—

সাহেব বললেন, চাটুজ্জের জায়গায় লোকের কথা বলছিলেন—এঁকে নেওয়া হল। শিশিরকুমার ধর। মফঃস্বলে ছিলেন, করতেন মাস্টারি। অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, গোড়া থেকে তৈরি করে নিতে হবে।

গোবেচারা চেহারা, মফস্বলের লোক বলে দেবার দরকার ছিল না। সেই লোক আচমকা উদয় হয়ে তা-বড় তা-বড় উমেদারের কান কেটে ছেড়ে দিল—এত বড় জিনিষ অমনি হয় না। পিছনে তদ্বির রীতিমত। দেখতে যত হাবাগবাই হোক, লোকটা তদ্বির-সম্রাট।

ডেপুটি সাহেব আবার বলেন, ঠিক যে চাটুজ্জের কাজটুকু, তা নয়। ফ্যাক্টরির সঙ্গে আমাদের অফিসের যোগাযোগ ঠিকমতো থাকে না। অর্ডার বুক করে দেখা যায় মালের অকুলান। শিশিরবাবুর বিশেষ করে এই কাজ। মাঝে মাঝে ফ্যাক্টরিতে চলে যাবেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানাবেন, তারিখ-মতো কোন কোন জিনিষের সাপ্লাই হওয়া সম্ভব, কখন কোন আইটেম তৈরির উপর জোর দিতে হবে। আপনি পুরানো লোক—ভার দিচ্ছি, আপনাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

সবেগে ঘাড় নেড়ে নটবর সায় দিলেন : শিখতে মানুষের ক'দিন লাগে? ঠিক হয়ে যাবে স্যার, কোন চিন্তা নেই। আজকে হল দোসরা তারিখ—আসছে মাসের দোসরা এই মানুষকে একটিবার বাজিয়ে দেখবেন। চৌকোস করে দেবো। প'য়তাল্লিশ বছর ধরে নুন খাচ্ছি, কত নিরেশ তরিয়ে দিলাম।

ডেপুটি হেসে বললেন, সে তো জানিই। সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকে আপনার হেপাজতে দিয়ে দিচ্ছি।

অতএব এত দিনে চাটুজ্জে মশায়ের জায়গায় উপযুক্ত লোক মিলল। দেহ রেখে-ছেন তিনি পাক্কা দেড়টি বছর। এত বড় চাকরিটা খালি পড়ে আছে এত কাল, ত্রিভুবন তোলপাড় হয়েছে বুঝতেই পার-ছেন। ভিতর থেকে, বাইরে থেকে। নটবরের নিজের সেকসন—আদাজল খেয়ে লেগে-ছিলেন তিনি শালার ছেলেটির জন্য। ভাগনেকে যা-হোক করে ঢুকিয়ে নিয়ে-ছিলেন—শ্বশুরবাড়ি তার জন্য মুখ দেখানোর জো নেই, শালা-শালাজ খোঁটা দেয়। বিস্তর রকমে লড়ে দেখেছেন নটবর, কিছুতে কিছু হল না। ভারি নাকি শক্ত কাজ, চাটুজ্জের স্থলে তাঁরই মতন ভারিক্কি লোকের আবশ্যক—

হত কিনা দেখে নিতাম আজ যদি হার্বার্ট সাহেব ঐ চেয়ারে সশরীরে থাকতেন। নেটিভের মধ্যে চিনতেন শুধু এই অফিসের লোকগুলো। চাকরি খালি হলে অফিসের লোকেই ভাই-বেরাদার এনে সাহেবের সামনে ঠেলে দিত, সাহেব যাকে খুশি নিয়ে নিতেন। এখনকার এই দেশি সাহেবদের হরেক জানাশোনা, একশ গণ্ডা খাতির-উপ-রোধের দায়। উপযুক্ত লোকই বাছাই হল শেষ পর্যন্ত—ভারিক্কি চাটুজ্জের স্থলে চ্যাংড়া ছোঁড়া, মফস্বলের মাস্টার, কলকাতা শহর সম্ভবত এই সর্বপ্রথম তার চর্মচক্ষে পড়েছে। নিগূঢ় রহস্য আছে, সন্দেহ কি!

কিন্তু মুখের চেহারায় মনোভাব তিলেক প্রকাশ পাবে না। তাহলে আর প'য়তাল্লিশ বছরের চাকরি কিসের? এক-মুখ হাসি। ডেপুটির কামরা থেকেই সাহস দিতে-দিতে শিশিরের হাত জড়িয়ে ধরে বেরুলেন : কিছু ভেবো না ভাই। আমি যখন রয়েছি, ভুলচুক সেরে-সামলে নেবো। কোন দায় ঠেকতে হবে না। প'য়তাল্লিশ বছরের চাকরি আমার—কেয়ার-টেকার হয়ে ঢুকেছিলাম, সেকসনের বড়বাবু এখন। উপরওয়ালার কী খাতির, দেখলে তো চোখের উপর। আমার হাতে সঁপে দিলেন—কত বড় আস্থা থাকলে এ জিনিষ হয়। হচ্ছেও এই প্রথম নয়। গরু-গাধা যা হোক একটা ঢুকিয়ে নিয়ে আমার উপরে ফেলে দেন—দাদুবাবু এটাকে ঘোড়া বানিয়ে দিন।

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলেন, তোমায় বলছি নে ভায়া। তুমি তো মানুষ হে—পুরোদস্তুর মানুষ। লেখাপড়া কদ্দুর করেছ?

শিশির সবিনয়ে বলে, বি-এ পাশ করে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। দেশ ভাগা-ভাগির গোলমালে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল।

বিস্ময়ে নটবরের আর্তধ্বনি বেরিয়ে পড়ে : ওরে বাবা, ওরে বাবা! বিদ্যের গৌরীশঙ্করে চড়ে বসে আছ, এভারেস্ট ছুঁই-ছুঁই অবস্থা। শুধু মানুষ কেন, ষোলআনা শিক্ষিত মানুষ তুমি—ঘাড় নুইয়ে সেলাম করা উচিত। তা দেখ, বিপরীত হয়ে গেল— পয়লা দিনেই 'তুমি' ডেকে বসলাম।

শিশির বিনয়ে গদগদ হয়ে বলে, তাই তো ডাকবেন। পদমর্যাদা, বয়স সব দিক দিয়েই কত উঁচুতে আপনি। আপনাকে ডেকে নিয়ে আপনার আশ্রয়ে আমাকে দিয়ে দিলেন। কপাল-গুণে চাকরিটুকু হয়েছে, আপনার দয়া না থাকলে বরবাদ হয়ে যাবে।

(ক্রমশ)

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

রূপনাথ একটু হুজুগে লোক। যে কোনোরকম জিনিস নিয়ে তার মেতে থাকবার ক্ষমতা অসাধারণ। এই হুজুগ নিয়ে কখনো করে বেড়াত সে রাজনীতি, কখনো ধরত ফোটোগ্রাফি, আবার কখনো তার হঠাৎ মাছ ধরার নেশায় ধরত। এর প্রত্যেকটি হুজুগ নিয়ে যে সে আমাদের ভুলে যেত তা নয়। অসুবিধের ব্যাপার এই যে তার হুজুগগুলিতে আমাদের যোগ দিতে হত। রাজনীতি যখন করত তখন তার বক্তৃতা শুনতে হত আর চাঁদা দিতে হত, ফোটোগ্রাফি যখন করত তখন তার ক্যামেরার সামনে নানা ভঙ্গীতে দাঁড়াতে হত, আর মাছ ধরার সময় তার সঙ্গে যেতে হত কোলকাতা ছাড়িয়ে জঙ্গলের মধ্যে, পুকুরের ধারে। এরকম আরো বহুপ্রকার হুজুগ তার ছিল, তাতে রূপনাথ আমাদের কাত করত বটে, কিন্তু খুব মারাত্মক রকম নয়। আমাদের সামলে উঠতে তেমন দেরি হত না। কিন্তু তার সর্বশেষ হুজুগে আমাদের সকলের জীবন একেবারে ওষ্ঠাগত হয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, একদিন এসে বলল, হরিপদর কথা ভাবলে আমার কান্না পায়। আমি বললাম, হরিপদর কথা ভাবলে হাসি পাবার কিছু কি আছে নাকি? লোকটার একটু সেন্স অফ হিউমার নেই। সর্বদা গম্ভীর। ওকে দেখলে কান্না পাওয়াই তো স্বাভাবিক।

রূপনাথ বলল, ওর সেন্স অফ হিউমার নেই? কথাটা ঠিক জানতাম না। আসল ব্যাপার কি জানিস, আমি ওর একটা কুষ্ঠি করিয়েছি। তাতে দেখতে পাচ্ছি একত্রিশ বছর বয়সে ওকে একটা দারুণ দুর্যোগের সামনে দাঁড়াতে হবে। তার নানারকম ক্ষতি হবে। বোধহয় সমস্ত সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবে আর তার একটা কালো রঙের রোগা বন্ধু তাকে পথে বসাবে।

আমি বললাম, ওসব কুষ্ঠি ফুষ্ঠিতে আমার বিশ্বাস নেই। ওসব বিশ্বাস করলে কোনো লাভ হয় না। তা শুনে হঠাৎ রূপনাথ কেমন যেন খেপে গেল। চেঁচিয়ে বলল, তোর কুষ্ঠিতে বিশ্বাস হয় না, তবে কিসে বিশ্বাস হয়?

রূপনাথ এমন ভঙ্গীতে কথাটা বলল তাতে বুঝলাম সম্প্রতি ও কুষ্ঠির ব্যাপারে মেতেছে। আমি তাই একটু সাবধানে কথা বলাই সঙ্গত মনে করলাম। বললাম, একেবারে অবিশ্বাস হয় তাও নয়। ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও জগতের উন্নত দেশগুলির কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে না, আর বিশ্বাস করেও আমাদের দেশের হাজার রকম দুরবস্থা হচ্ছে, সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এই কারণেই আমার এই কুষ্ঠির উপর তেমন......

রূপনাথ বলল, আরে আমাদের দেশের অবস্থা খারাপ সেটাও তো কুষ্ঠি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

আমি বললাম, তাই নাকি?

রূপনাথ বলল, আলবত যায়। তা ছাড়া আরো বলছি শোন। তরুণকে চিনিস তো—তার বড়সাহেব হয় এই বছরে পটল তুলবে, নয়তো বিলেত যাবে আর ফিরবে না, নয়ত তার চাকরী যাবে। একটা কিছু হবে। তা ছাড়া আরো শোন, সুবর্ণর কপালে খুব দুর্ভোগ আছে। তার বৃহস্পতিটা খুব অসুবিধেয় ফেলবে, আর শনিটা বড় বেয়াদবি করছে।

বৃহস্পতিটা অসুবিধেয় ফেলবে?

—দারুণ অসুবিধেয় ফেলবে। আর শনিটা যা আরম্ভ করেছে তা আর কহতব্য নয়।

আমি এ ব্যাপারে কিছু কহতব্য আছে কিনা বুঝতে পারলাম না, চুপ করে রইলাম। আমি এরকম অবস্থায় চুপ করেই থাকি। আকাশের গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলি আমাদের জন্মের সময় বিভিন্ন অবস্থানে থাকে সেটা অবশ্য আমার জানা আছে। সে জন্য কেন আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্য বিভিন্ন হবে সেটা আমি বুঝতে পারি না। আর এই প্রসঙ্গ মনে এলেই হঠাৎ আমার কেন জানি না হিরোশিমা আর নাগাসাকির কথা মনে হয়।

হিরোসিমা আর নাগাসাকির সমবয়সী লোক শিশু বৃদ্ধ বালক বালিকা যুবক যুবতী একদিনে নিশ্চয়ই জন্মায়নি। একই কুষ্ঠি নিয়েও নয়। কিন্তু কেন তাদের মধ্যে লক্ষাধিক লোক একই মুহূর্তে পরমাণু বোমার আঘাত পেল তা আমি বুঝতে পারি না। তা ছাড়া টাইটানিক দুর্ঘটনা, বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, যেখানেই অগুনতি মানুষের মৃত্যু একসঙ্গে ঘটে তখন কি ধরে নিতে হবে যে প্রত্যেকের জন্ম একই সময়ে হয়েছিল?

আমিই সবচেয়ে রোগা আর কালো

রূপনাথ বলল, কি হে চুপচাপ রয়েছ কেন, ব্যাপারটা কি?

আমি বললাম, হরিপদর কি হবে তা হরিপদ ভাবুক, আমি ভাবতে চাই না। তরুণের বড়সাহেব এ বছরে কি করবে তা জেনে আমার কোনো লাভ নেই। সুবর্ণর কপালে যদি দুর্ভোগ থেকেই থাকে থাক, আমার কিছু করবার নেই।

রূপনাথ ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল। কিন্তু আমার বিপদ গেল না। আমি শুনতে পেলাম হরিপদ নাকি আমার মৃত্যুকামনা করে দুটো যজ্ঞ করেছে। দেড়শো টাকা মানত করেছে এই ব্যাপারে কোথায়। কেবল তাই নয় সে নাকি বেশ ভাল গোছের দুটো গুণ্ডা খুঁজছে আমাকে এই ধরাধাম থেকে বিদায় করে দেবার জন্য।

কারণ? কারণ আর কিছু নয়—তার সমস্ত বন্ধুর মধ্যে আমিই সবচেয়ে কালো আর সবচেয়ে রোগা।

হরিপদ পথে বসতে চায় না।

ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের (আই-পি-আই) অধিবেশন উদ্বোধন করতে এলে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সাদর অভ্যর্থনা করেন।

দেশে বিদেশে

মন্ত্রিসভায় রদবদল

প্রথমে এক পা এগিয়ে, পড়ে দু' পা পিছিয়ে, শেষে একটি সতর্ক পদক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার রদবদল করেছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ দ্বিধা ও বলিষ্ঠতার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

গত ২৪ জানুয়ারী যখন শ্রীমতী গান্ধী সরকারের দায়িত্ব নেন, তখনই তিনি তাঁর মনোমত একটা কার্যকর ক্যাবিনেট তৈরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রীজীর মৃত্যুর পর এত তাড়াতাড়ি কোন বড়রকমের পরিবর্তন করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেননি। কেবল আইন দপ্তর থেকে অশোক সেনকে ও পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তর থেকে হুমায়ুন কবীরকে বাদ দিয়েছিলেন। তাঁদের বদলে তিনি এনেছিলেন শ্রীজি এস পাঠক ও শ্রীফকরুদ্দীন আলী আমেদকে। সেই সঙ্গে আরো দু'টি নতুন মুখকেও তাঁর ক্যাবিনেটে দেখা গেল : শ্রীজগজীবন রাম (শ্রম) ও শ্রীঅশোক মেহতা (পরিকল্পনা)। তবু স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ, খাদ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিকে তিনি আগের মতই রেখে দিয়েছিলেন।

৮ নভেম্বর ক্যাবিনেট থেকে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের পদত্যাগ তাঁকে প্রার্থিত পরিবর্তনের একটা সুযোগ এনে দিল। তিনি সেই সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করলেন। নন্দজীর পরিত্যক্ত আসনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনকে বসানো সম্পর্কে তিনি মনস্থির করে ফেললেন।

সেই সঙ্গে আরো দু'টি সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে ফেলেছিলেন : এক, অর্থ দপ্তর থেকে শ্রীশচীন চৌধুরীর এবং দুই, বাণিজ্য দপ্তর থেকে শ্রীমানুভাই শা'র অপসারণ। শোনা গেল, শ্রীচৌধুরীর জায়গায় শ্রীফকরুদ্দীন আমেদ ও শ্রীশা'র জায়গায় পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপুনাচা আসছেন। এইটি শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই দু'টি সিদ্ধান্ত থেকেই তাঁকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। কারণ কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে 'সিণ্ডিকেট' নামে যে শক্তিশালী গোষ্ঠী রয়েছে, এই দু'টি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেই মহল থেকে প্রবল আপত্তি জানানো হয়েছিল। চ্যবনের নিয়োগের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আপত্তি ছিল শ্রীএস কে পাতিলের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটির ওপর তাঁর লোভও কম ছিল না। দ্বিতীয় আপত্তি আসে মহীশুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার কাছ থেকে, কারণ মহারাষ্ট্র-মহীশুর সীমানা বিরোধ নিয়ে চ্যবনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা ছিল। শ্রীপুনাচাকে বাণিজ্য দপ্তরের ভার দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী মহীশুরের এই আশঙ্কাকে দূর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পুনাচার নিয়োগের বিরুদ্ধে সিণ্ডিকেট থেকেই প্রবল বাধা আসে। শ্রীচৌধুরীর অপসারণের বিরুদ্ধে শ্রীঅতুল্য ঘোষ স্বয়ং উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই প্রবল বাধার মুখে দাঁড়িয়ে প্রধান-মন্ত্রী জানালেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব সাময়িকভাবে তিনি নিচ্ছেন, এবং মন্ত্রি-সভায় আর কোন রদবদল হবে না। জটিলতা এড়াবার জন্যে এর চাইতে ভালো সিদ্ধান্ত সেদিন আর কিছু ছিল না বটে, কিন্তু এটাও সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, প্রধানমন্ত্রী সিণ্ডিকেটের চাপের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

বোধ হয় এই ধারণাকে খণ্ডন করার জন্যেই তিনি তৃতীয় পর্যায়ে আরেক পা' এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এই পদক্ষেপ ছিল সতর্ক। পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী তিনি শ্রীচ্যবনকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আনলেন বটে, কিন্তু পূর্ব ইচ্ছা অনুযায়ী শ্রীচৌধুরী ও শ্রীশা'কে সরাবার আর কোন চেষ্টাই করলেন না। অর্থাৎ সিণ্ডিকেটকে খুব বেশী চটাতে তিনি ভরসা পান নি।

মন্ত্রিসভার যে রদবদল ১৩ই নভেম্বর ঘোষণা করা হল, তাতে প্রতিরক্ষা দপ্তরে চ্যবনের জায়গায় এলেন শ্রীস্বরণ সিং এবং তাঁর জায়গায় পররাষ্ট্র দপ্তরে এলেন শ্রীচাগলা। শ্রীফকরুদ্দীন আমেদ শ্রীচাগলার জায়গায় শিক্ষা দপ্তরে এলেন এবং তাঁর রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কে, এল, রাও আবার সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

শ্রীমতী গান্ধীর নতুন ক্যাবিনেটের গুণ সম্পর্কে অবশ্য কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। শ্রীযশোবন্তরাও বলবন্তরাও চাবন সম্পর্কে দলের অন্যান্যদের দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক, একজন দৃঢ় ও অভিজ্ঞ নেতা হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। মহম্মআলি করিম চাগলা পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন (তিনি ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত ও লণ্ডনে হাইকমিশনার এবং নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কে ভারতের মুখ্য বক্তা ছিলেন) এবং এই পদটি তাঁর আগেই পাওয়া উচিত ছিল। শ্রীস্বরণ সিং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন, কাজেই তাঁর নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। একমাত্র শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে শ্রীফকরুদ্দীন আলি আমেদের নিয়োগে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আসামের অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁর দক্ষতার গৌরবোজ্জ্বল রেকর্ড রয়েছে।

কিন্তু রদবদলের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক পর্যায়ে যে দ্বিধার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে এই ক্যাবিনেটের প্রতিভাস একাধিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথমত, এই ধারণা গড়ে উঠেছে যে, বাইরের চাপ প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীন কর্মের ক্ষেত্রকে ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলছে।

দ্বিতীয়ত, রদবদল ঘোষণা করতে পাঁচদিন সময় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কেবল নিজের দ্বিধাগ্রস্ততাকেই পরিস্ফুট করেছেন।

তৃতীয়ত, এই বিলম্বের দ্বারা শ্রীচ্যবনের কার্যকারিতাকে গোড়াতেই দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, শ্রীচৌধুরী ও শ্রীশা'র অপসারণের সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা করে ফেলার পর তাঁদের রাখার সিদ্ধান্ত করায় তাঁদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারের 'ইমেজ'কে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে দেওয়া উচিত হয় নি।

ব্যর্থ নায়ক

পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রধান স্থপতি, একদার 'মিরাকল্‌স্‌ ম্যান্‌' ডাঃ লুডভিগ এরহার্ড পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলারের পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। তাঁর দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন তাঁর জায়গায় বাডেন-ভুর্টেনবার্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কুর্ট-গেওর্গ কিসিংগারকে মনোনীত করেছেন। ডাঃ কিসিংগার এককালে নাৎসী পার্টির সদস্য ছিলেন এবং পনেরো মাস মার্কিন বন্দী শিবিরে কাটিয়েছিলেন।

অথচ তিন বছর আগে ডাঃ এরহার্ড যখন তিনি চ্যান্সেলারের পদে নির্বাচিত হন তখন তিনি ছিলেন জনপ্রিয়তার শিখরে। এই তিন বছরে তাঁর সম্পর্কে জনসাধারণের ক্রমশ মোহভঙ্গ ঘটেছে। তাঁর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অসন্তোষের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছিল। মার্কিন স্টারফাইটার জেট কেনা নিয়ে জেনারেলদের বিদ্রোহ তাঁর প্রতিভাসকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। গত জুলাই মাসে গুরুত্বপূর্ণ উত্তর রাইন-ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্যের নির্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের পরাজয়ের পর ভোটারদের ওপর তাঁর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা সম্পর্কে দলের লোকেরা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। এর ওপর জার্মান ভূমিতে মোতায়েন বৃটিশ সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহের প্রশ্নে একটা গভীর অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে এসেছিল।

বৃটেনের ঐ রাইন আর্মিতে ৫১ হাজার সৈন্য আছে। এছাড়া আছে আট হাজার বৈমানিক। বৃটেন এদের খরচা পশ্চিম জার্মানীর কাছে দাবী করছে। বন সরকারের পক্ষে ঐ খরচা বইতে গেলে বাজেটে ঘাটতি পড়ে যায়; আর না বইলে বৃটেন সৈন্য সরিয়ে নিতে ইচ্ছুক এবং তার ফলে ন্যাটোর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

এসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদিও আগামী এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত আছে, তবু অন্তর্বর্তীকালের কিছু কিছু খরচা বইবার জন্যে ডাঃ এরহার্ড ১৯৬৭ সালের বাজেটের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কর ধার্যের প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ডাঃ এরহার্ডের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অন্যতম অংশীদার ফ্রী ডেমোক্র্যাটরা পদত্যাগ করল। কোয়ালিশন ভেঙে গেল।

অবশ্য এতেও এরহার্ড সরকারের পতনের কারণ ছিল না, কেননা জার্মানীর সংবিধান অনুযায়ী দুটি নির্বাচনের মধ্যে চ্যান্সেলারকে অপসারণ করা যায় না। তবু ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন এরপর আর ডাঃ এরহার্ডকে ক্ষমতায় রাখা নিরাপদ মনে করলেন না।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ
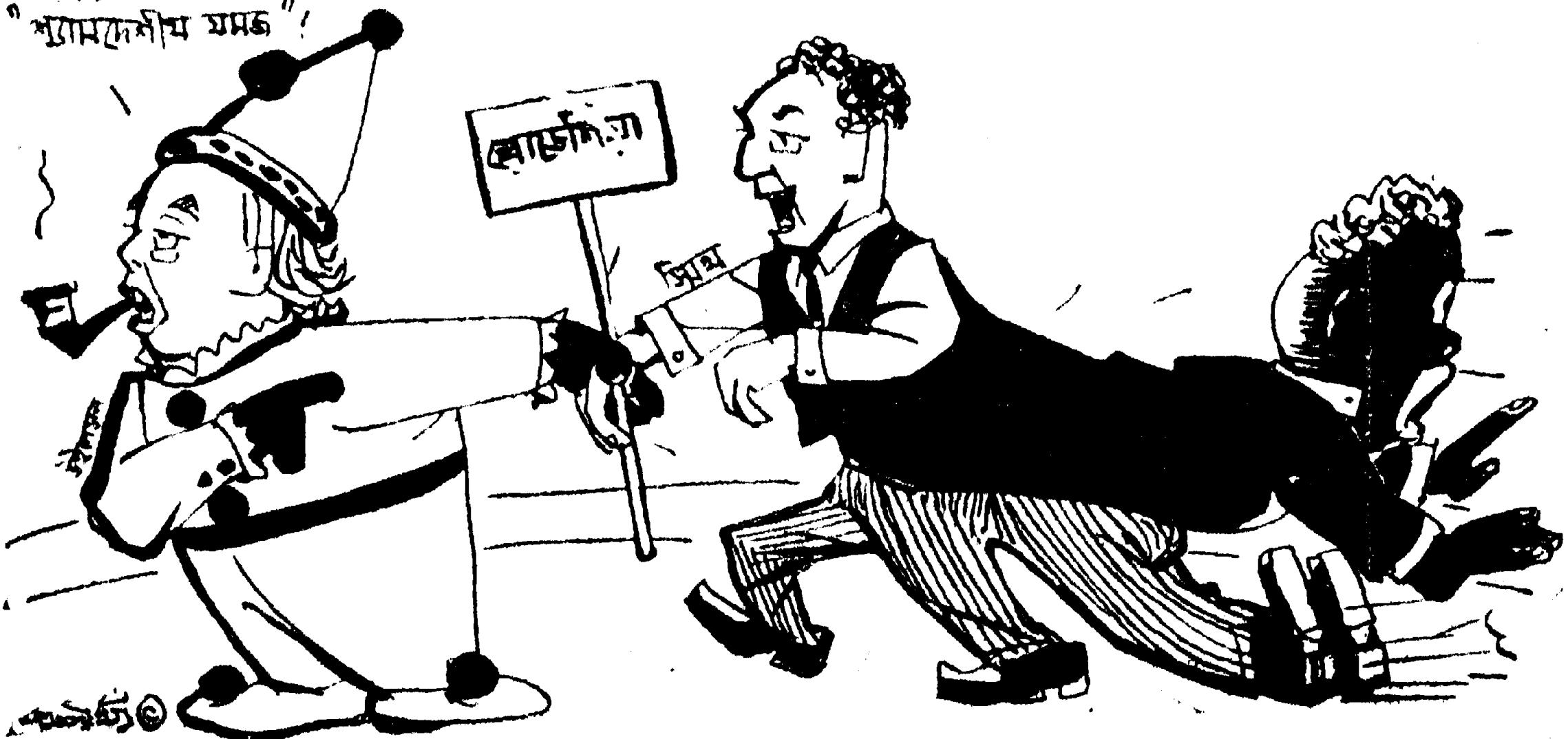
অটোমেশনের ভালমন্দ
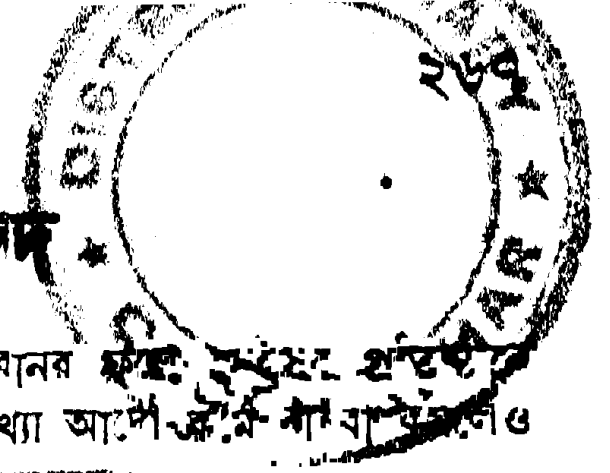
আমাদের দেশে লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন, কয়েকটি বিদেশী পেট্রোলিয়ম কোম্পানী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অফিসের কাজকর্মের জন্য ইদানীং কম্প্যুটার ও অন্যান্য আধুনিক ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করছেন। এমনকি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও পরীক্ষা সংক্রান্ত নথিপত্র তৈরী করার জন্য এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন।

এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহারের নামই অটোমেশন—যেটা পৃথিবীর উন্নততর দেশগুলিতে বেশ কয়েক বছর ধরেই চালু হয়ে গেছে এবং যেটা আমাদের দেশে চালু করার চেষ্টার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন মহল আন্দোলন চালাচ্ছেন। এই আন্দোলনের মূল কথা হল, অটোমেশনের ফলে যন্ত্র মানুষের স্থান নেবে এবং তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমবে, বেকারী বাড়বে।

এই প্রসঙ্গে একজন মার্কিন অধ্যাপক, যিনি, তাঁর নিজেরই কথায়, "কোন না কোন ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম্প্যুটার চালু করার সঙ্গে যুক্ত" ছিলেন, সম্প্রতি একটি ভাল প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখকের নাম জন ডীয়ারডেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "ব্যবসায় পরিচালনা" বিভাগের অধ্যাপক, বর্তমানে আমেদাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন। বোম্বাইয়ের "ইকনমিক টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশিত এই আলোচনা অটোমেশন সংক্রান্ত এই বিতর্কের উপর বেশ কতকটা আলোকপাত করে।

অধ্যাপক ডীয়ারডেন তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই দেখিয়েছেন যে, কম্প্যুটারের এমন কতকগুলি ব্যবহার আছে যেগুলি মানুষের দ্বারা করান সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে কম্প্যুটারের ব্যবহার বিজ্ঞানীকে এমন কতকগুলি জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে যেগুলি শুধু মানুষের মস্তিষ্কের ব্যবহারের দ্বারা কোনদিনই সম্ভব হত না। এক্ষেত্রে কম্প্যুটার মানুষকে সরিয়ে তার স্থান নেবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক ডীয়ারডেন বলেছেন যে, কম্প্যুটার সুপরিকল্পিতভাবে, অপচয় নিবারণ করে, ব্যবসায় চালাতে, ব্যবসায় পরিচালকগণকে সাহায্য করতে পারে।

প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত কতকগুলি কাজ আছে যেগুলি হাতেকলমে না করে যন্ত্রের সাহায্যে করলে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া যায়। অধ্যাপক ডীয়ারডেন বলছেন, এইসব ক্ষেত্রে অবশ্য যন্ত্র ইঞ্জিনীয়ার ও ইঞ্জিনীয়ারিং টেকনিসিয়ানের কাজ করবে; কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষে কারিগরী বিদ্যায় অভিজ্ঞ লোকের অভাব আছে সেহেতু, এই মার্কিন অধ্যাপকের মতে, এই ধরনের কাজে কম্প্যুটারের প্রয়োগ ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হবে এবং এতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

এরপর অধ্যাপক ডীয়ারডেন অধিকতর বিতর্কিত প্রসঙ্গে এসেছেন। সেই প্রসঙ্গটি হচ্ছে, যেখানে কম্প্যুটার অফিসের কেরানীর স্থান গ্রহণ করে সেখানে কি হবে?

এই বিষয়ে তাঁর প্রথম কথা হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অফিসের কাজকর্ম ঢেলে সাজানোই অনেক অপচয় নিবারণ করা যাবে এবং লোকের প্রয়োজন কমে যাবে। কোন একটি বিশেষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য কম্প্যুটার ব্যবহার করার খরচ পোষাবে কিনা সেটা বিচার করার সময় দেখতে হবে যেন অফিসের কাজকর্ম ঢেলে সাজানর দরুণ যে ব্যয়সংক্ষেপ হবে সেটা যেন কম্প্যুটারের খাতে ধরা না হয়।

অর্থাৎ, আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নে ব্যবহৃত ভাষায় বলতে গেলে, অটোমেশনের আগে চাই র‍্যাশনালাইজেশন। (ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন মহল অবশ্য, মোটের উপর বলতে গেলে, উভয়েরই বিরোধী—এবং একই কারণে অর্থাৎ; বেকারের সংখ্যা বাড়বে বলে)।

কিন্তু যেখানে র‍্যাশনালাইজেশনের পরও হিসাব করে দেখা যাবে যে, অটোমেশনের ফলে যে ব্যয়সংক্ষেপ হবে তাতে কম্প্যুটারের খরচ পুষিয়ে যাবে এবং তদুপরি লগ্নী পুঁজি থেকে একটা সন্তোষজনক লভ্যাংশ পাওয়া যাবে সেখানে কি হবে? সেক্ষেত্রে কি কম্প্যুটার ব্যবহার করতে দেওয়া হবে? অথবা হবে না?

অধ্যাপক ডীয়ারডেনের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষ কোন একটি কোম্পানী বা সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম্প্যুটার সংগ্রহের ব্যাপারে উপযুক্ত সময়ের প্রশ্নটিই আসল বিবেচ্য। কম্প্যুটারের দাম বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে অধিকাংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের কলেবর ও জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের নথিপত্র তৈরী করার খরচও বাড়ছে। প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে এমন একটা সময় আসবে যখন হাতে নথিপত্র তৈরী করার চড়তি খরচ কম্প্যুটারের পড়তি খরচকে ছাড়িয়ে যাবে। এই মার্কিন অধ্যাপকের মতে, সেটাই হচ্ছে ঐ বিশেষ কোম্পানী বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে কম্প্যুটার চালু করার উপযুক্ত সময়।

আর্থিক দিক দিয়ে যখন অটোমেশন যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত হবে তখন ভারতবর্ষে যদি কম্প্যুটার যন্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তাহলে কর্মসংস্থানের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, সেখানে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, সরকারী সোশ্যাল সিকিউরিটি ও কর আদায় বিভাগ প্রভৃতি যেসব প্রতিষ্ঠানে নথিপত্র রাখা ও প্রস্তুত করাই প্রধান কাজ সেসব প্রতিষ্ঠানে প্রথম কম্প্যুটার চালু করা হয়েছে এবং, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেরানীগিরির কাজ কম্প্যুটার যন্ত্র দিয়ে করানর [illegible] প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীর সংখ্যা আগের [illegible]ও খুব অল্পই কমেছে।

আমেরিকায় কম্প্যুটারের প্রবর্তনের ফলে মোট কর্মসংস্থানের খুব বেশী ইতরবিশেষ না হওয়ার তিনটি কারণ অধ্যাপক ডীয়ারডেন উল্লেখ করেছেন। কারণ তিনটি হচ্ছে :—(১) কতকগুলি ক্ষেত্রে কম্প্যুটার ব্যবহার করা হয়েছে এমন কয়েকটি কাজের জন্য যে-কাজ মানুষকে দিয়ে করান যেত না। (২) এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রসার এমন দ্রুতগতিতে হয়েছে যে, যেসব কর্মচারীর ছাঁটাই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাঁরাও ব্যবসায়ের প্রসারের ফলে কাজে নিযুক্ত রয়ে গেছেন। (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা কেরানীর কাজ করতে আসেন তাঁদের অধিকাংশ হলেন হাইস্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা মেয়ে—যাঁরা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কাজ করেন।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, শেষোক্ত দুটি কারণ অনুপস্থিত। তদুপরি, এখানে অনাবশ্যক ফাইলপত্রের কাজে আটকে-থাকা লোকের সংখ্যা বেশী এবং কর্মচারীদের মজুরী কম। তার ফলে, ভারতবর্ষের কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে কম্প্যুটার ব্যবহার করা যখন আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হবে তখন অটোমেশনের ফলে সেই প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পাবে।

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, অধ্যাপক ডীয়ারডেনের অভিমত এই যে, আর্থিক দিক দিয়ে উপযুক্ত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও অটোমেশনের প্রক্রিয়াটিকে অযথা বিলম্বিত করে রাখার যুক্তি নেই। অটোমেশন এক সময় না এক সময় গ্রহণ করতেই হবে। যন্ত্রের ব্যবহার যদি আটকে রাখা হয় তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই আধুনিককালের উপযোগী নথিপত্র প্রস্তুত করার জটিলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তার জন্য আমলাবাহিনী বাড়াতে হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে যখন অটোমেশন অনিবার্য হয়ে উঠবে। তখন সমস্যাটা কঠিনতর হবে। কেননা, ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তে কম্প্যুটার বসালে যন্ত্র যত সংখ্যক মানুষের স্থান গ্রহণ করত, সময় পার হয়ে যন্ত্রের সাহায্য নিতে গেলে তার চেয়ে অনেক বেশী লোককে সরাবার প্রশ্ন দেখা দেবে।

বেকারী বৃদ্ধির ঝুঁকি সত্ত্বেও উপযুক্ত সময়ে কম্প্যুটারের সাহায্যগ্রহণের সপক্ষে এই মার্কিন বিশেষজ্ঞের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের অর্থনীতি যেমন যেমন প্রসার লাভ করবে তেমনি তেমনি একটি একটি করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে কম্প্যুটার চালু করার উপযুক্ত সময় আসবে। যেহেতু প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে চালু হবে সেহেতু উদ্বৃত্ত কর্মচারীদের সমস্যাটা সুশৃঙ্খলভাবে সামলান যাবে।

বিস্ময়কর অঘটন

অজয় হোম

পুরাকাল থেকে অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু (UFO—Unidentified Flying Object) বা উড়ন্ত চাকি পৃথিবীর বুকে আসাযাওয়া করলেও ১৯৫৪ সালে ফরাসীদেশের উপর যে প্রবাহ দেখা দেয় তার ফলেই বিংশ শতাব্দীর জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জল্পনাকল্পনাও কিছু কম চলে না। ইওরোপ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু এ বিষয়ে গবেষণাও সেই থেকে শুরু করেছেন।

গবেষণার বিষয়বস্তু—বস্তুটি কি? ধাতব কিছু? অনৈসর্গিক? কেন দেখা যায়? প্রাকৃতিক কোনো রহস্য? যদি অন্যগ্রহের জীবের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তারা আসে কিভাবে এবং কোথা থেকে? কোন্ জ্বালানীতে ওই উড়ন্ত বস্তু ওড়ে?...বহু প্রশ্ন মানুষের মনে। মুশকিল হয়েছে প্রামাণ্য কিছু নিদর্শন হস্তগত না হওয়াতে না করতে পারা গেছে ওই উড়ন্ত বস্তুর আভ্যন্তরীণ জীবদের কোনো একটিকে বন্দী, না পারা গেছে তাদের কাউকে গুলীতে নিহত বা আহত করতে, না সংগ্রহ করা গেছে উড়ন্ত বস্তুটির কোনো অংশ। সুতরাং, গবেষণারও অন্ত নেই, মতবাদেরও শেষ নেই। বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এ বিষয়ে একেবারে নীরব। কোনো মন্তব্যই করতে চান না।

বিংশ শতাব্দীর শুরু ১৯০০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অর্থাৎ আকাশে মাটিতে সাগরে কমপক্ষে ১০৭ বার দৃষ্ট হওয়ার সাক্ষীসহ সঠিক সংবাদ পাওয়া গেছে। কল্পনাপ্রসূত বা ভিত্তিহীন সংবাদের সংখ্যার কোনো হিসেব নেই। কিছু সংবাদ বৈজ্ঞানিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়। দৃষ্টবস্তুর সংবাদেও তারতম্য আছে। চাকতির আকার ছাড়াও কখনও কখনও খাড়া চুরুটের মতো, কখনও বা শূন্য থেকে মাটিতে অবতরণ, গমকরা...এমনকি ১৯২২ সালের ২২শে জানুয়ারির ঘটনায় প্রকাশ ৮ ফিট লম্বা মনুষ্য সদৃশের পৃথিবীর বুকে অবতরণ!

১৯০৮ সালে রাশিয়ায়, ১৯০৯ সালে ইংল্যাণ্ডের ওয়েলসে, ১৯১৩ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে গ্রেট ব্রিটেনের উপর প্রবাহের প্রাবল্য বেশি হয় অর্থাৎ খুব ঘন ঘন দেখা যায়। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৬ সালের গোড়া পর্যন্ত দেখাটা খুব ছাড়া ছাড়া হয়েছে, ক্কচিৎ ঘটেছে।

অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু দেখার নবযুগ শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। যুদ্ধের মধ্যেও ইউরোপের আকাশে বহু পাইলট 'বেস'-এ ফিরে রিপোর্ট করেছে অদ্ভুত আলোর চাকতি তাদের প্লেনের আশেপাশে ঘুরতে এবং তা একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীর দ্বারা চালিত হওয়া সম্ভব। অনেকে আবার দেখলেও তখন প্রকাশ করেনি ভয়ে, পাছে দোষারোপ করা হয় দৃষ্টিবিভ্রমের, মস্তিষ্কের গণ্ডগোল ইত্যাদির যা প্রতিটি বিমানচালকের পক্ষে মারাত্মক। চাকরিই চলে যাবে। কয়েকজনের রিপোর্ট যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাগজের মধ্যেই থাকে জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে, জনসাধারণের কাছে প্রকাশ পায় না।

ইওরোপের উত্তরাংশে বিশেষতঃ নরওয়ে সুইডেনের উপর ১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু দৃষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। নগণ্য দু'চারজন ছাড়া কেউই বলেননি উল্কা জাতীয় কোনো বস্তু বলে। হয়তো যুদ্ধের ঠিক পরে বলেই যাঁরা দেখেছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁদের মতে এসব মানুষেরই তৈরি প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতির ফলে। তাছাড়া সে সময় জার্মান 'ভি' বোমার ভীতি ছিল ইওরোপের প্রতিটি মানুষের মনে। অজানা গ্রহের কোনও উচ্চস্তরের জীবের আগমন এবং তাদের তৈরি এই অদ্ভুত ধরণের উড়ন্ত বস্তুর কল্পনা করাও তখন ছিল অসম্ভব। সকলেই ভেবেছে কোনও রাষ্ট্রের নতুন ধরণের বায়ুযান বা রকেট।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ 'ল্য ফিগারো' কাগজের রিপোর্টই সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"সংবাদ পাওয়া গেছে গত কয়েকমাসের ভিতর সুইডেনের উপর দু-হাজারের উপর ভৌতিক রকেটের আগমন। আমাদের ইংরেজ সহযোগী 'দি ডেইলি মেল' তার রিপোর্টার আলেকজান্ডার ক্লিফোর্ডকে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করার ভার দিয়েছিলেন। ক্লিফোর্ডের রিপোর্টের সারাংশ আমরা এখানে প্রকাশ করছি। স্টকহলমু থেকে যে সংবাদ ইংরেজ রিপোর্টার পাঠিয়েছেন, সেইসব ঘটনার বিবরণ পড়ে বিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়ে গেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ হচ্ছে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে দৃষ্টিবিভ্রমের ফল। অনেক বলেছেন, এসব কিছু না; হয় উল্কা বা সেই জাতীয় কোনো বস্তু কিংবা হাওয়া-অফিসের কোনো নতুন পরীক্ষা আলোকোজ্জ্বল বেলুন ছেড়ে। স্থানীয় নাট্যশালাগুলিতে হাস্য-রসের বিষয়বস্তু করে দেখানোও হচ্ছে। সুইডেন ও হল্যাণ্ডের সেনাবিভাগ কিন্তু বিষয়টিকে হাল্কাভাবে নেন নি, তাঁরা ইতিমধ্যে রীতিমতো তদন্ত শুরু করেছেন...

"মিঃ ক্লিফোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কমসে কম দু-হাজার বিশ্বস্ত সাক্ষী এধরণের উজ্জ্বল বেলুন দেখেছে। তাদের সাক্ষ্য থেকে যে নিম্নোক্ত সূত্র পাওয়া গেছে তা তারা কেউই অস্বীকার করেনি :

১। উড়ন্ত বস্তুর আকার চুরুটের ন্যায়।

২। লেজ থেকে আগুন বার হয়। তার রঙ কমলা, কিন্তু কিছু লোক বলেছে সবুজ রঙের।

৩। উড়তে দেখা গেছে ৩০০ থেকে ১০০০ মিটার উঁচুতে।

৪। গতিবেগ প্রায় উড়োজাহাজের ন্যায়। কিছু লোক বলেছে খুব ধীর গতির বিমান।

৫। একমাত্র শীসের মতো মৃদু আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।"

উড়ন্ত বস্তুর চেহারার বিবরণ দিতে গিয়ে ডানার কথা কেউই উল্লেখ করেনি। কিছু লোক অবশ্য বলেছে মাছের মত পাখনা আছে। এইখানেই বিজ্ঞানের আপত্তি অসম্ভব ব্যাপার বলে, কারণ কোনো ডানাহীন বস্তু এত আস্তে উড়তে পারে না, বিশেষত নিঃশব্দে। ক্লিফোর্ডের উক্তিতে আছে, যে কিছু উড়ন্ত বোমা দক্ষিণ-পূব থেকে উত্তর-পশ্চিমে গেছে। কিন্তু গত ১৯৪৬-এর মে মাসের প্রথম দিকে বোমাগুলো স্কাণ্ডিনেভিয়ার ঠিক উত্তর থেকে এসে সোজা দক্ষিণ দিকে খুব ধীরে আকাশে ভেসে গেছে। অধুনা ডেনমার্কের উপর দেখা গেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই বোমাগুলির কোনও অংশ সংগ্রহ করা যায়নি। কোথায় যে এরা ফেটেছে এবং কোথায় পড়ে গর্ত সৃষ্টি হয়েছে তার কোনো সংবাদ বা চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিছু বড়ো হ্রদ ও সমুদ্রে পড়ে তলিয়ে গেছে। তারও অবশেষ পাওয়া যায়নি।

দেখা যাচ্ছে ১৯৪৬ সালে স্কাণ্ডিনেভিয়ার উপর যে প্রবাহ তা তৎকালীন রাজনীতিতে বা বিজ্ঞানে যা সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হতো চিন্তাধারাটা তার বাইরে যায়নি। পুরাণের যুগ পার হয়েছে, ধর্মের গোঁড়ামি ঊনবিংশ শতাব্দীতেই শেষ, প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য তখন। আর তা ছাড়া অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু দৃষ্ট হওয়াটা ১৯১৫ সালের পর কোনো বড়ো ধরণের হয়নি, একমাত্র ১৯১৭ সালে ফাতিমার (পর্তুগাল) ব্যতীত।১ সেটারও ছাপ পড়েছিল পুরোপুরি ধর্মীয় ব্যাপারের।

১৯৪৭-৫২ হল আমেরিকাতে প্রবাহের যুগ। বেশির ভাগ দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। ২৪ জুন ১৯৪৭ কেনেথ আর্নল্ডের নিজ বিমানে ওয়াশিংটনে মাউন্ট রেইনিয়েরের উপর দেখার সংবাদ পরদিন আমেরিকার প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় খুব ফলাও করে বার হয়। যদিও এর আগে এপ্রিল মাসে ভার্জিনিয়ার রিচমণ্ডে হাওয়া অফিসের এক কর্মচারী বেলুন ওড়াতে গিয়ে প্রথম দেখে। আর্নল্ডের দেখার দশ দিন আগে ১৪ই জুন বেলা দুটোর সময় যুক্তরাষ্ট্রের এক বিমানচালক রিচার্ড র‍্যানকিন কালিফোর্নিয়ায় বেকার্সফিল্ডের আকাশে দেখে দশটি বস্তু সারিবদ্ধভাবে ত্রিকোণাকারে উত্তর দিকে উড়ে যেতে। র‍্যানকিন যাচ্ছিল চিকাগো থেকে লসএঞ্জেলসে।

তার কাছে ওগুলোকে চাকতি বলেই মনে হয়েছে এবং প্রতিটির ব্যাস ৩০ মিটার। উড়ে যাচ্ছে ন'শ কিলোমিটার বেগে। আর্নল্ডের দেখার চারদিন পর ২৮ জুন এয়ার ফোর্সের জেটচালক লেফটেনান্ট

১) দ্রঃ বর্তমান লেখকের 'আজকের অঘটন', অমৃত ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় খণ্ড, ১৯ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬।

আর্মস্ট্রং নাভাদার মিডহুদের ৩০ মাইল উত্তরে বেলা দুটোর সময় উড়ে যেতে দেখে সারিবন্ধভাবে পাঁচ-ছ'টি সাদা চাকতি ৬ হাজার ফিট উপর দিয়ে। সেইদিনই এম বিউশ্চার বেলা ৩-৪৫ মিনিটে মিল-ওয়াকির ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বরুফিল্ডে সাতটারও বেশি চাকতি তার খামারের উপর দেখে। ওইদিন আরও পরে ইলিনয়ের উপর দেখা যায়। এমনিভাবে ১৯৪৭-এর প্রায় আগস্টের শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল উড়ন্ত চাকির প্রবাহ আমেরিকার বুকে। ১৯৪৫-৪৭-এর মধ্যে পাঁচটি অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়— অ্যালমোগোর্দো, হিরোশিমা, নাগাসাকি, ক্রসরোডস 'এ' ও ক্রসরোডস 'বি'তে। এই সময় আমরা প্রযুক্তিবিদ্যায় অ্যাটমিক যুগে প্রবেশ করি।

১৯৫৩-৬০ হল ফরাসী দেশে প্রবাহের যুগ। এর ভিতর ১৯৫৪ সালে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বিশেষত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের ভিতর প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ দেখে। ঘটনাবলীর প্রকাশ এত প্রকট হওয়াতে খবরের কাগজে তার প্রচার হল অসম্ভব আবেগপূর্ণ। যার ফলে বিজ্ঞানীরা সত্য তথ্যের অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টাই করেননি। কারণ, তাঁরা সাব্যস্ত করেছিলেন এ হুজুগ বেশিদিন টিকবে না। তাই কোনো ফরাসী বৈজ্ঞানিকই খোলাখুলি অনুসন্ধান চালিয়ে বা মন্তব্য করে জনগণের কাছে হাস্যাস্পদ হতে চাননি। তার ফলে তাঁরা আর এ নিয়ে মাথা ঘামান না, চুপ করে যান। প্রবাহের শেষে এই সব দেখা আর তার সমস্যা নিয়ে হাসাহাসি চলে। ক্রমে মানুষের মন থেকে অনুসন্ধিৎসা চলে যায়, বিষয়-বস্তু ধামাচাপা পড়ে। বৈজ্ঞানিকরাও নিশ্চিন্ত হন।

প্যারির উত্তর-পশ্চিমে ৪০ মাইল দূরে ভের্নন একটি ছোট্ট শহর। ২৩ আগস্ট ১৯৫৪ রাত একটার সময় জনৈক ব্যবসায়ী বের্নার্ড মিসারে তার মোটরটি গ্যারেজে বন্ধ করে বাইরে আসেন। গ্যারেজে যখন গাড়ি তুলছিলেন তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার। পরিষ্কার আকাশ। শেষ রাতের নিষ্প্রভ চাঁদ সবে উঠেছে। আকাশের দিকে তাকাতেই দেখলেন বিশালাকায় শব্দহীন স্থিতিশীল উজ্জ্বল এক বস্তু তাঁর কাছ থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে নদীর উপরে। ওই উজ্জ্বল বস্তুটিকে একমাত্র বিশাল এক দাঁড় করানো চুরুটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

মিসারে পরে বলেন, 'এই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে বেশ কয়েক মিনিট তাকিয়ে ছিলাম, তারপর হঠাৎ ওই অদ্ভুত চুরুটের তলা থেকে গোল চাকতির মতো এক আলোকোজ্জ্বল বস্তু টুপ করে যেন খসে পড়ল। পতনটা আস্তে আস্তে থেমে এল। তারপর হঠাৎ দুলে উঠল। পরক্ষণেই গোঁৎ খেয়ে নদীর উপর থেকে আমার দিকে যেন তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে চাকতিটার আলার জোরও বেড়ে উঠল। অল্পক্ষণের জন্যে চাকতিটাকে পুরো দেখতে পাই। দেখি চাকতিটাকে ঘিরে এক জ্যোতির্ময় আলো।

'আমার ঠিক মাথার উপর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণদিকে উড়ে যায়। আরও একটি ঠিক একই ভাবে চুরুটের তলা থেকে খসে উড়ে গেল। তৃতীয় এল, চতুর্থও গেল। সব চুপচাপ। চুরুটটাও সেইভাবে শূন্যে দাঁড়িয়ে। বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাবার পর পঞ্চম চাকতি স্থিতিশীল চুরুটের তলা থেকে বার হল। অন্যগুলোর চাইতে এর নীচের দিকে পড়াটা অনেক বেশি। নতুন পোল যেটা তৈরি হচ্ছে প্রায় তার মাথার উপর। সেখানে দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু দুলতে থাকল। এবার আমি চাকতির গোল আকার পরিষ্কার দেখতে পাই। লাল আলো। ঠিক মাঝখানে আলোর তেজ রীতিমতো জোরালো। সেই উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়ে চাকতির ধারকে মৃদু আলোকে আলোকিত করছে। আর সমস্তটাকে ঘিরে এক জ্যোতি-র্মণ্ডল। প্রথম চারটির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এটাও দুলল। তারপর বিদ্যুৎ-গতিতে উত্তর মুখো উপর দিকে উঠতে উঠতে আমার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

'চুরুটের আলো এখন আর নেই বললেই হয়। ওটা বোধহয় লম্বায় তিনশ ফিটই হবে। রাতের অন্ধকারে ওটাকেও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে দেখলাম। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি ৪৫ মিনিট ধরে আমি এই অলৌকিক দৃশ্য দেখছি।'

মিসারে তখন জানতেন না যে তিনি ছাড়াও এই বিস্ময়কর অঘটনের আরও সাক্ষী আছে। এই দৃশ্য দেখেন দুজন পুলিশ রাত একটায় রোঁদে বেরিয়ে এবং আর একজন সেনা-ইঞ্জিনীয়ার শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

৭ সেপ্টেম্বর আমিয়ঁতে সকাল ৭-১৫ মিনিটে, ১৪ সেপ্টেম্বর প্যারি থেকে ২৫০ মাইল দূরে প্রায় আধ ডজন গ্রামের উপর দুপুর থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে দেখা যায়। ১৫ সেপ্টেম্বর 'ফ্রান্স-সোয়া' দৈনিকে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার ভিতর থাকে নতুনত্ব—

'এয়ার পুলিশের তিনজন অনু-সন্ধানকারী গতকাল নর্ড প্রদেশের কোয়ারুবল গ্রামে যায় ম্যারিয়াস দ্যায়িলদকে প্রশ্ন করতে। কারণ, দ্যায়িলদে নাকি তার বাগানের খিড়কির কাছে দুজন 'মঙ্গল-গ্রহে'র অধিবাসীকে দেখেছে। অনুসন্ধান-কারীরা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে জানে যে দ্যায়িলদের কথামতো গত শুক্রবার থেকে শনিবারের রাতের মধ্যে একটি রহস্যজনক উড়ো-জাহাজ নামে সেন্ট-আমাঁদ-ব্রাঁ-মিসেরঁ'র ৭৯নং ক্রসিং-এর কাছে রেল লাইনের উপর।

'সাক্ষী এজেহারে বলে, শুক্রবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সে একটা চ্যাপ্টা ধরনের অদ্ভুত উড়ো-জাহাজ দেখে। সেটা উচ্চতায় তিন মিটার, লম্বায় ছ' মিটার। তার খিড়কির দরজা থেকে কয়েক গজ দূরে রেল লাইনের মাঝে বসে আছে। সেই চাকতির মতো উড়ো-জাহাজ থেকে বেরিয়ে এল মানুষাকৃতি দুজন। বামন বলাই তাদের ভালো। গায়ে ডুবুরির পোষাক। দ্যায়িলদে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে উড়ো-জাহাজ থেকে কে যেন তাকে লক্ষ্য করে সবুজ আলোর টর্চ ফেলে। সে আর নড়তে পারে না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। যখন সে আবার নড়ার ক্ষমতা ফিরে পায় তখন দেখে চাকতিটা উড়তে আরম্ভ করেছে। বামনাকৃতি দুজনকে আর দেখতে পায় না।

'অনুসন্ধানকারীরা অনেক খুঁজেও সেই দুজনের রেখে যাওয়া কোনো চিহ্ন পায় না। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও কোনো পায়ের ছাপ পায়নি। কিন্তু রেলের স্লিপারের উপর পরিষ্কার চিহ্ন আছে কোনো ভারি যন্ত্রের নামার। স্লিপারের কাঠের উপর চার স্কোয়ার সেন্টিমিটার করে পাঁচ জায়গা বসে গেছে। প্রতিটি দাগের চেহারা একই রকম। মাঝের তিনটির প্রত্যেকটির ব্যবধান ৪৩ সেন্টিমিটার করে। পিছনের দুটির প্রথম তিনটি থেকে দূরত্ব ঠিক ৭৩ সেঃ মিঃ করে।

'এয়ার পুলিশের একজন অনুসন্ধান-কারী বলেন, এই যানের আমাদের উড়ো-জাহাজের মতো চাকা নেই, পায়া আছে এবং বিশেষ কোনো চিহ্নই রেখে যায় না।

'ম'ঁসিয় দ্যায়িলদের বিবরণ সেই অঞ্চলের অনেকেই সত্য বলে বলেন। অ্যোয়ঁ'র এক যুবক এদমঁদ আভেরলট এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ম্যঁসিয় হাবলার্দও দ্যায়িলদের মতো রাত সাড়ে দশটার সময় দেখেন আকাশপথে একটা লালচে আলো উড়ে যেতে। ভিস-এ তিনজন ওই একই দৃশ্য দেখে।'

রেলরাস্তা পরিদর্শন বিশেষজ্ঞরা অনু-সন্ধানকারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং সরজমিনে তদন্ত করে অভিমত দেন, স্লিপারের কাঠের উপর যে ভারী বস্তুর ছাপ পড়েছে, হিসেব করে দেখা যাচ্ছে বস্তুটির ওজন ৩০ টন। দাগগুলি সাম্প্রতিক এবং প্রতিটি গর্তের চারপাশ খুব নিখুঁত করে কাটা, তাতেই বোঝা যায় কত চাপ ওই স্লিপারগুলির উপর পড়েছে। তাঁরা অকুস্থলের রেলের খোয়া পরীক্ষা করে দেখেন পাথরের টুকরোগুলি সাদাটে হয়ে ভঙ্গুর হয়েছে। অতিরিক্ত তাপ পেলে তবে এ-অবস্থায় আসা একমাত্র সম্ভব। কিছু পোড়া কালো পাথরও নজরে পড়ে। কিন্তু সেই অদ্ভুত যানের চালকদের কোনো চিহ্ন পান না। বৃষ্টি না হওয়াতে জমি ছিল শক্ত। সম্ভবত তার জন্যেই পায়ের কোনো ছাপ পড়েনি।[২]

সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে প্রতিদিনই খবরের কাগজে একটার পর একটা খবর বেরতে থাকে। ২৬ সেপ্টেম্বরের কাগজে যে-খবরটা বেরয় তাতেও নতুন খবর থাকে।

---

২ Michele, Aime. **Flying Saucers and the Straight-line Mystery**, Criterion Books Inc., New York, 1958

...নিজের বাড়ি-লাগোয়া জমিতে একটি মেয়ে নিচু' হয়ে কাজ করছিল। কানে এল তার কুকুরটা হঠাৎ অসম্ভব চিৎকার শুরু করেছে। ডাকটা ভয়মিশ্রিত। চোখ তুলে দেখে তার থেকে খুবই অল্প দূরে একটা গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে একজন। ঠিক যেন ক্ষেতের কাকতাড়ুয়া। উঠে দাঁড়ায়, একটু এগিয়ে যায়। না, ঠিক কাকতাড়ুয়া নয়, তবে প্রায় সেইরকম। ডুবুরির পোষাক-পরা। পোষাকটা প্রায় স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি। ঝাপসা স্বচ্ছ শিরস্ত্রাণের পিছনে দুটো অসম্ভব বড়ো ড্যাবাড্যাবা গোল চোখ। তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারপরেই সেই ক্ষুদে পা সমেত পোষাকটা ওই দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে হেলতে-দুলতে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রাণভয়ে চিৎকার করে মেয়েটি বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকে। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, একটা বড়ো গোল চ্যাপ্টা ধরনের ধাতুর তৈরি জিনিস বাড়ির কাছের গাছগুলির পিছন থেকে ধাপে ধাপে শূন্যে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিকে বেশ দ্রুতগতিতে চোখের বাইরে চলে যেতে।

মেয়েটির চিৎকারে আশেপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। যেখান থেকে উড়ন্ত বস্তুটি উঠেছিল, সেখানে সকলে গিয়ে দেখে দশ ফিট মতো ব্যাসের এক গোল দাগ, আগাছাগুলো চেপটে মরে গেছে। যেসব বড়ো বড়ো গাছ ওই জায়গাটা ঘিরে ছিল, তাদের ডাল ভেঙে গেছে। গাছগুলোর ছাল কে যেন চেঁছে তুলে নিয়েছে। যেদিক দিয়ে উড়ে গেছে, সেদিকের ক্ষেতে গমের চারা কে যেন সারিবন্ধভাবে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। ...মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং দুদিন প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হয়ে থাকে।

১৬ অক্টোবর ১৯৫৪ একটি আশ্চর্যজনক ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। সিয়ের-দ্য-রিভিয়ের নামে একটি ছোটো গাঁয়ের চাষী গ্যী প্যীফুর্কা মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিল হেঁটে। হাতে ছিল তার ঘোড়ার লাগামটা ধরা। হঠাৎ ঘোড়াটা ভয় পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় দেখা যায় একটা অদ্ভুত যান। ব্যাসে পাঁচ ফিট হবে। ধূসর রঙ। চেহারাটা বড়ো গামলার মতো। কতকগুলো গাছ-আগাছার পিছন থেকে উড়ল মাটি থেকে প্রায় ৫০ মিটার উঁচুতে। তারপর এগিয়ে এল তার দিকে। হঠাৎ ঘোড়াটা বিনা অবলম্বনে মাটি থেকে শূন্যে তিন মিটার উঠে গেল। ভয়ে বিস্ময়ে চাষী ঘোড়ার লাগামটা দিল ছেড়ে। আরও দু'-এক মিটার শূন্যে উঠে ধুপ করে ভারি বস্তার মতো। ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে দশ মিনিট অজ্ঞান হয়ে রইল। পরে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ভয়ে হোঁচট খেতে ও কাঁপতে থাকে। যানটি অসম্ভব দ্রুতবেগে চক্ষের পলকে উড়ে চলে যায়। সাক্ষী প্যীফুর্কা নিজে কিন্তু ভয় পাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু অনুভব করে না।

২০ অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ সারেবুর্গ-এর জ্যাঁ সোরেনে তার্কেনস্টেন গাঁয়ের কাছ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে রাস্তার উপর কিছু দূরেই একটি আলোকোজ্জ্বল বস্তু। গাড়ির গতি কিছুটা ওই বস্তুর কাছে এসে কমিয়ে ফেললেন। যখন প্রায় কুড়ি গজ দূরে অকস্মাৎ অনুভব করেন তিনি শক্তিহীন। দেহ তাঁর অবশ, নড়বার ক্ষমতা নেই। গাড়ির এঞ্জিনও সেইসঙ্গে অদ্ভুতভাবে আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। গাড়ি তার আপনগতিতে বস্তুটার আরও কাছে এগিয়ে যেতে অনুভব করেন আগুনের প্রচণ্ড এক হল্কা তাঁর সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েক মুহূর্ত মধ্যে সেই গোলাকার বস্তুটি উড়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শরীর স্বাভাবিক। গাড়ির এঞ্জিনও আপনা থেকে আবার চালু।

আপনা থেকে মোটর বন্ধ হওয়া, ইলেক্ট্রিক বাতি নিভে যাওয়া, রেডিও স্তব্ধ হওয়া ইত্যাদির খবর যখনই ওই চাকতি জাতীয় বস্তু এ-সবের কাছাকাছি এসেছে, তখনই ঘটেছে।

আজেবাজে অনেক খবর বাদ দিয়ে অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তু দৃষ্ট হওয়ার সংবাদ ১৯৫৯ সালে ১৮৬, ১৯৬০-এ ১৩২, ১৯৬১-তে ১৪১, ১৯৬২-তে ১৬৩, ১৯৬৩ আগের বছরের মতোই। ১৯৬৪-৬৫ সালের সংবাদ বাছাই করা সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ অবিশ্বাস্য সাক্ষীহীন কল্পনাপ্রসূত খবর এত বেশি যে, সম্ভাব্য সত্য নিরূপণ করা খুবই কষ্টকর।

অসনাক্ত উড়ন্ত বস্তুর গবেষণায় যেসব দেশের সংস্থা বিশেষভাবে নিযুক্ত আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল—যুক্তরাষ্ট্রের 'নিকাপ' বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন কমিটি অন এরিয়াল ফেনোমেনন, 'অ্যাপ্রো' বা এরিয়াল ফেনোমেনা রিসার্চ অর্গানিজেশন, 'অ্যাটিক' বা এয়ারোস্পেস টেকনিক্যাল ইনটেলিজেনস্ সেণ্টার; ইংল্যণ্ডের 'বুফোরা' বা ব্রিটিশ আনআইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট্ অ্যাসোসিয়েশন, লণ্ডন উফো রিসার্চ অর্গানিজেশন; আর্জেনটিনার 'কোডোভান' বা কমিসিয়' অবজারভেডোরা দ্য অবজেতোস ভোলাডোরেস নো আইডেনটিফিকাডোস; ফ্রান্সের 'কিয়ো' বা কমিসিয়' ইনতারনাতিয়নাল দা' অ্যাংকিতস উরানেস, 'গেপা' বা গ্রুপে দা'এত্যুদে দাস ফেনোমিনস আরিয়্য' এবং অস্ট্রেলিয়ার উফো অ্যাসোসিয়েশন।
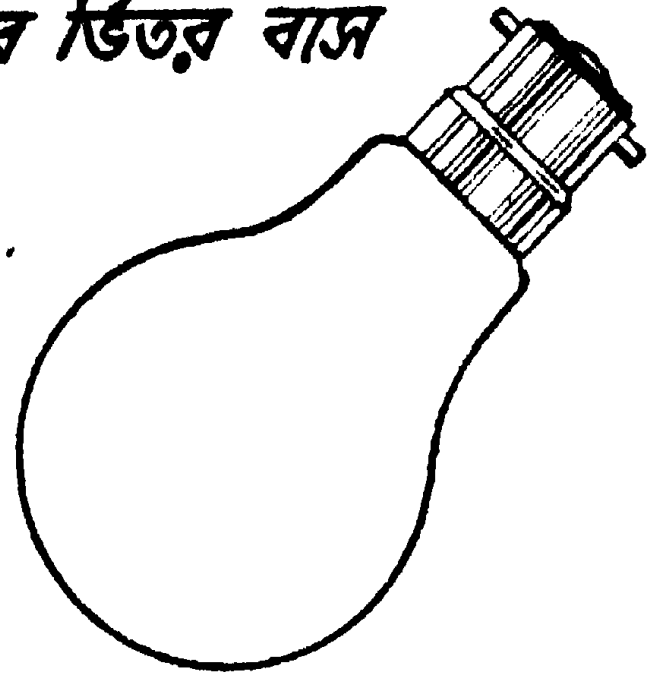
ডঃ জে ই লিপ হলেন প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি গ্রহান্তরের কোনও উন্নততর জীবের আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগের চেষ্টায় বহুদিন ধরে রত এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, যদি তারা তাও না করে, তবে এটা সুনিশ্চিত, তারা আমাদের সভ্যতার রকমফের দেখছে খুব কাছ থেকে তাদের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের জন্যে যা আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত। যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্সের পক্ষ থেকে তাঁর রিপোর্ট।৩ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখে ডেটনে অবস্থিত এয়ার টেকনিক্যাল ইনটেলিজেনস্ সেণ্টার।

ডঃ লিপ বলেছেন, "এটা কল্পনাসাধ্য, নীহারিকাপুঞ্জের ভিতর পারস্পারিক আকর্ষণে পরিভ্রমণরত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাবলীর মধ্যে একটি বা বহু জাতি গ্রহান্তর ভ্রমণের এমন এক পন্থা আবিষ্কার করেছে যা আমাদের বিচারবুদ্ধি বা জ্ঞানের মাপকাঠির বাইরে। এর মধ্যেও একটা কথা আছে। মহাশূন্যের আয়তনের ব্যাপ্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা। ওদিকে আয়তনের ব্যাপ্তি যতো বাড়বে, সম্ভাবনা ততই কমবে সেইসব জগতের পক্ষে পৃথিবীকে খুঁজে পাওয়ার। যদি না সেই ধরনের অতি-জাতির সংখ্যা খুব বেশি মাত্রায় থাকে, নচেৎ তারা কখনই নীহারিকাপুঞ্জের বাইরে আকারে পঞ্চম-শ্রেণীভুক্ত সৌরজগতের এই তিন নম্বরী গ্রহ পৃথিবীর বুকে আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়বে না।"

সেইরূপ অতি-জাতির সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ধারণ করতে ডঃ লিপ ১৬ আলোক-বর্ষী ব্যাসার্ধ গোলাকার পরিমাণের অন্তর্গত নক্ষত্রপুঞ্জে বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, এর মধ্যে কেবলমাত্র ২২টি গ্রহে অতি-জাতির বাসযোগ্য স্থান।

ডঃ লিপের মতে, ইংরেজি এস যদি বাসযোগ্য সম্ভাব্য নক্ষত্রলোকের সংখ্যা হয়, আর ইংরেজি আর হয় মহাশূন্যে আলোচিত একটি অংশের ব্যাসার্ধ, তাহলে এস = ২২ (আর।১৬)৩। মনে রাখতে হবে ১ পারসেক = ৩·২৬ আলোক-বর্ষ = সূর্য-পৃথিবীর গড়-দূরত্বের ২১০,০০০ গুণ।

এখন বুদ্ধি দিয়ে আন্দাজ করতে হবে ক'টি বাসোপযোগী গ্রহ আছে। এই জাতীয় আনুমানিক বাসোপযোগী গ্রহের সংখ্যা খুব যে সুনিশ্চিত হবে তা নয়, তার কারণ বুদ্ধিসম্পন্ন জীব নীহারিকাপুঞ্জের গ্রহগুলিতে পরিসাংখ্যিক যত্রতত্রভাবে বাস নাও করতে পারে। যদি কল্পনা করা যায় যে, প্রতিটি সম্ভাব্য নক্ষত্রলোকে একটি করে বাসযোগ্য গ্রহ আছে এবং পৃথিবীর মানুষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও পারিপার্শ্বিক অসুবিধার স্তর প্রতিটি গ্রহের অন্তর্গত জাতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরের মাঝামাঝি, তাহলে বোঝা যাবে এগারোটি এমন জাত আছে, যারা ইতিমধ্যে মহাকাশে **বিচরণ শুরু করেছে। আর বাকি এগারোটি গ্রহ এখনও শুরু করেনি অর্থাৎ আমাদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ব্যাসার্ধ আর-এর ভিতর গোলাকার পরিমাণ গ্রহান্তরে ভ্রমণরত জাতি যারা ১৬ আলোক-বর্ষীর চেয়ে বড়ো তাদের সংখ্যা : এস = ১১ (আর।১৬)৩।**

প্রাণের বিকাশ ঘটতে গেলে এইসব গ্রহগুলি সদ্য বা নবজাতক হলে চলবে না। বয়েস যথেষ্ট হওয়া দরকার। কারণ, তা না হলে বিভিন্ন অণুর সংযোজনে ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর অণু এবং অবশেষে প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারে না। এর জন্যে বেশ কয়েকশ' কোটি বছর লাগে। আমাদের পৃথিবীর বয়েস ৪০০ কোটি বছর। দেখা যাচ্ছে, কয়েকশ' কোটি বছর ধরেই প্রাণের বিকাশের উপযুক্ত অবস্থায় পৃথিবী অবস্থান করছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে তার বিকাশও কিছু কম হচ্ছে না। ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু প্রথম দিকের বেশিভাগ সময় জীবনের অস্তিত্ববিহীন অবস্থায় কেটেছে। সুতরাং, যেসব গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটবে, তার বয়েস কমপক্ষে কয়েকশ' কোটি বছর হওয়া প্রয়োজন।

মহাবিশ্বে প্রকল্পমতো **২২টি** সম্ভাব্য আদিম প্রাণের বিকাশের উপযুক্ত গ্রহে যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গারঘটিত অণু থাকবে, গ্যাসীয় স্তর থাকবে তার উপর, থাকবে জল, কারণ জলই হচ্ছে প্রাথমিক প্রাণের বিকাশের মাধ্যম। তাদের পুষ্টির ক্ষেত্র।

আমাদের হিসেব মতো নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ১১টি নক্ষত্র একক এবং যথেষ্ট বয়স্ক। এর ভিতর শতকরা দশভাগ অর্থাৎ একটি কি দুইটি গ্রহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের চেয়েও অগ্রসর। লক্ষ লক্ষ নীহারিকাপুঞ্জ বা গ্যালাক্সির মধ্যে যে কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে তাদের ভিতরও ওই হিসেব।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী ফেজেনকভ এবং ওপারিনের মতে জীব সম্ভাবনাপূর্ণ গ্রহের শতকরা সংখ্যা যত কমই হোক, মহাবিশ্ব অনন্ত সংখ্যক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ধরে রেখেছে তার বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে। প্রতি মণ্ডলীতে অসংখ্য নক্ষত্র। জীবনহীন গ্রহও যেমন অনন্ত, জীবন্ত গ্রহের সংখ্যাও তেমনি অগণন হওয়া উচিত।৪ এখন প্রশ্ন তার মধ্যে অতি-জাতি বা অতি-বুদ্ধিজীবিবাসী গ্রহের সংখ্যা কত?

আমাদের সৌরজগতে মঙ্গল গ্রহ বর্তমানে প্রাণহীন বলে জানা গেছে। আগে প্রাণ থাকলেও থাকতে পারতো, এখন নেই। ডঃ লিপ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের যে ধারণা ছিল বুঝি বা মঙ্গলগ্রহ থেকেই উড়ন্ত চাকিতে ক'রে অতি-জাতির কোনো দল আসছে, এখন দেখা যাচ্ছে তা ঠিক নয়।

মেরিনার-২ থেকে খবর পাওয়া গেছে, পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে সামান্য ছোটো এবং সূর্যের কাছাকাছি শুক্র গ্রহের তাপমাত্রা ৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপর। শুক্রগ্রহের উপর একটা ঘন আবহাওয়ামণ্ডল রয়েছে। **বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যের তাপে শুক্র গরম হয় কিন্তু উপরের আবহাওয়ামণ্ডলের জন্যে এই তাপ বেরিয়ে আসতে পারে না।** সে কারণে শুক্রের তাপমাত্রা সব সময়েই বেশি।

সন্ধান পাওয়া গেছে শুক্রের আবহাওয়ামণ্ডলে কিছু পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অতি সামান্য মাত্রায় অক্সিজেনের। প্রাণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু বৈজ্ঞানিক বলেন যে, শুক্র একটি লাল রঙের গরম মরুভূমির মতো গ্রহ, এবং উপরের আবহাওয়ামণ্ডলের জন্যে ওর ভিতরের ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; এমনও হতে পারে যে গরম আবহাওয়ার উপযুক্ত প্রাণ ওই মেঘের তলায় চলাফেরা করছে।

অনেকে মনে করেন, অন্যান্য গ্রহের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম হবে বেতার তরঙ্গ। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহজগৎ রয়েছে তার দূরত্ব ১০ আলোক-বর্ষ। তার মানে, সেখান থেকে কোনো খবর পাঠালে আমাদের উত্তর তাদের কাছে পৌঁছতে কুড়ি বছর লাগবে। আরও দূরের কথা ছেড়েই দিলাম। প্রশ্ন জাগে উড়ন্ত চাকিতে করে যে অতি-বুদ্ধিজীবীরা আমাদের পৃথিবীর আকাশে আসেন তাঁরা এই দূরত্বকে কোন বিজ্ঞানে হ্রাস করেছেন?

সম্প্রতি পেগাসাস নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে STA-21 ও STA-102 নামে দুটি বেতার তরঙ্গের উৎস বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। তাদের ভাষা বা কোড আমরা বুঝতে পারি নি। বেতার তরঙ্গের বর্ণালী থেকে এবং তাদের তীব্রতার অদ্ভুত তারতম্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে সে তরঙ্গগুলি সভ্য প্রাণীদের পাঠানো। জডরেল ব্যাংক থেকেও STA-102 তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে বলা হয়েছে যে এখানে উঁচুদরের সভ্যতা থাকা খুবই সম্ভব। উড়ন্তচাকিকে আজ স্বীকার করে না নিলেও অজানা এক সভ্যতার ডাক আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সংশয় নেই।

উড়ন্তচাকির বিবিধ গুণাবলীর মধ্যে একদলের ধারণা এই অভূতপূর্ব যন্ত্র বা যানের প্রত্যাভিকর্ষের ক্ষমতা আছে।৫ কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। ১৯৫৪ সালে ১৬ই অক্টোবর সিয়ের-দা-রিভিয়ের গ্রামের চাষী গাঁর ঘোড়া মাটি থেকে বিনা অবলম্বনে চার-পাঁচ মিটার শূন্যে উঠে যাওয়া প্রত্যাভিকর্ষের যেমন একটি ঘটনা, তেমনি আর-একটি বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন পাই ওই ১৯৫৪ সালের ৪ঠা অক্টোবরের ঘটনায়।

ঘটনাস্থল পঁসে, ফ্রান্স। সময় রাত আটটা। শ্রীমতী ফুর্নেরে-র জবানীতে বলি, "বেশ খানিকক্ষণ আগেই অন্ধকার হয়েছে। বাড়ি থেকে কুড়ি গজ দূরে মাঠের মধ্যে দেখলাম একটা উজ্জ্বল বস্তু শূন্যে ভাসমান রাখার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে বাদামগাছটার ডানদিকে যেন নামার উদ্যোগপর্বে রত।

৩ Lipp, J.E. Appendix D to Report Project Sign: Unidentified Flying Objects, US Air Force, 1949; Vallee,, J. Anatomy of a Phenomenon, London 1966.

৪ Fesenkov, V. and Oparin, A. Life in the Universe, Twayne Publishers Inc., New York, 1961.

৫ Plantier, J. La Propulsion des soucoupes Volantes par action directe Sur l'atome, Mame Paris, 1955.

[illegible] কাছে পৌঁছেছি তাতে মনে হল বস্তুটি ব্যাসে প্রায় তিন গজ, চ্যাপটা, গোল, কমলালেবুর রঙ। ভয়ে আমার প্রাণ খাঁচা-ছাড়ার উপক্রম। ছেলেটার হাত ধরে মিসেস খ্যাইয়িয়ে-র বাড়ির দিকে দৌড়। কোনোরকমে পড়িমরি করে সেখানে পেঁছে দরজায় দিয়েছি খিল।

"আমাদের চিৎকারে আশেপাশের বাড়ির লোক সব ছুটে আসে। তারা আমাদের মুখ থেকে শুনে সকলে দলবেঁধে বাদামগাছটার কাছে যায়। সেই উজ্জ্বল চ্যাপটা গোল বস্তুটা কিন্তু তারা আর দেখতে পায় না। দেখে দেড় গজের মতো জায়গা যার একদিকে ২৭ ইঞ্চি অপর প্রান্ত ২০ ইঞ্চি চওড়া এক গর্ত। কে যেন সদ্য মাটি চুষে বা শুষে তুলে নিয়েছে। গর্তের মধ্যে সাদা সাদা সরু কেঁচো সব কিলবিল করছে। গর্তের তলাটা মুখের মাপের চেয়ে বেশ বড়ো। যে মাটি শুষে তুলে নেওয়া হয়েছে সেগুলি গর্তের বাইরে চার গজ ব্যাসার্ধ জুড়ে দশ থেকে বারো ইঞ্চি মাপের ছোটো ছোটো ঢিবিতে ঘাসের উপর ছড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় বাদামগাছটার শিকড় যা মাটির তলায় ছড়িয়ে আছে মাটি শুষে তুলে নেওয়া সত্ত্বেও তার সামানাতম সরু ও সূক্ষ্মতম শিকড়ের একটিও জখম হয় নি তা স্পষ্ট দেখলাম। বিস্ময়ে আমরা হতবাক।"৬

কেবলমাত্র ইউরোপ আমেরিকায় নয় ভারতের গা লাগোয়া সিকিম তিব্বত ও চীনেও উড়ন্তচাকি দেখা যায়। তবে তারা দেবতাজ্ঞানে ব্যাখ্যা করে। সম্প্রতি লামা অনাগারিক গোবিন্দ-র বইতে ১৯৩৩-৩৪ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ দেখলাম।৭

৬ Hayneck, Dr. J.A.H. Talk presented to the Hypervelocity Impact Conference, Elgin Air Base, Florida, April 27, 1960.

৭ Lama Anagarika Govinda. The Way of the White Clouds, Hutchinson, London, 1966.
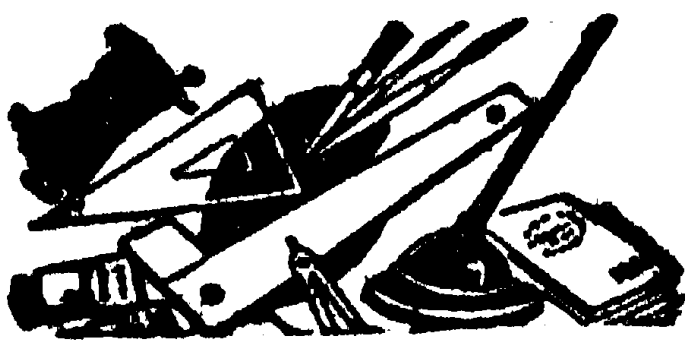
তিনি বলছেন, "গ্যাংটক থেকে যেবার দিন মহারাজা তাঁর প্রাসাদের বারান্দায় মধ্যাহ্ন-ভোজনের বন্দোবস্ত সময়ের একটু আগেই করেছিলেন। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ না থাকাতে আমার আনন্দই হয়েছিল। ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে মহারাজার সঙ্গে বেশ প্রাণখুলেই আলাপ আলোচনা করেছি। দিনটা ছিল বড়ো সুন্দর। বারান্দা থেকে উপত্যকা আর তার শেষে দূরে পর্বতশ্রেণী অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের চোখের সামনে। দূরে পর্বতশ্রেণীর মাঝে গত রাত্রে মহারাণীর আবাস দিলখুসার বারান্দায় বসে কতকগুলো আলো খুব দ্রুতগতিতে চলাফেরা করতে দেখি। তাই মহারাজাকে বললাম, ওই পাহাড়ের মধ্যে কি মোটরগাড়ি যাবার রাস্তা আছে? না নতুন কোনো রাস্তা তৈরি হচ্ছে?

"মহারাজা খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এরকম মনে হওয়ার কারণ কি? ওখানে কোনো রাস্তা নেই এবং রাস্তা তৈরি করার কোনো পরিকল্পনাও নেই। মোটর যাবার একমাত্র রাস্তা আমার রাজ্যে তা হল যে রাস্তা ধরে তিস্তা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আপনি এসেছেন।

"আমি তখন গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা মহারাজাকে বললাম। কী অদ্ভুত গতিতে যাওয়াআসা করতে দেখি আলোর মালা। মনে হয়েছিল মোটরগাড়ির হেডলাইট বুঝি!

"মহারাজা হেসে গলা নামিয়ে বললেন, এখানে নানা ধরণের অদ্ভুত কান্ড ঘটে। বাইরের লোকদের সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করি না, কারণ আমাকে তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ভাবতে পারে। যখন আপনি নিজের চোখে দেখেছেন তখন বলতে বাধা নেই। এসব আলো মানুষের তৈরি কোনো আলো নয়। কারণ, যেসব অসম্ভব জায়গা দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করে এবং যে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ওড়ে তা মানুষের তৈরি কোনো যানের দ্বারা সম্ভবপর নয়। কেউই এর কারণ বলতে পারে নি। আর আমারও এ-সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। দেশের মানুষের বিশ্বাস অশরীরি আত্মা বলে।...বুঝলাম মহারাজা আর কিছু বলতে অনিচ্ছুক, আমিও আর চাপাচাপি করলাম না।"

চীনদেশের পবিত্র পর্বত উ তাই শান অর্থাৎ পাঁচ চুড়ো পাহাড় যাকে তিব্বতীরা বলে রি-বো-ৎসে-ল্ডা, যা ধ্যানী বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর নামে উৎসর্গীকৃত, সেই পাহাড়ের উপরও এধরনের আলোর যান দেখা যায়। জন ব্লোফেল্ড বহুদিন ওই পাহাড়ের উপর কাটিয়েছেন, তিনি বলেন,৮ "আমরা প্রায় সন্ধ্যার দিকে সর্বোচ্চ মন্দিরে পেঁছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম চূড়ার উপর একটা ছোটো মিনার, আমাদের কাছ থেকে প্রায় একশ ফিট উঁচুতে। একজন সন্ন্যাসী বললেন, মিনারের জানালাগুলি দিয়ে মাইলের পর মাইল উন্মুক্ত শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিপথে পড়ে না।

৮ Blofeld, J. The Wheel of Life, Rider & Co., London, 1959.

"মাঝরাতের অল্প পরেই লণ্ঠন হাতে এক সন্ন্যাসী আমাদের ঘরে ঢুকে বলেন, 'বোধিসত্ত্ব দর্শন দিয়েছেন'। দৌড়ে মিনারের চূড়ায় পেঁছতে এক মিনিটও লাগে নি। সেই ঘরে ঢুকে সামনেই জানালার দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠল। এতক্ষণের কথাবার্তা আলোচনার পর এ-ধরনের দৃশ্যের জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। জানালার বাইরে একশ কি দুশ গজ দূরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় অসংখ্য আলোর গোলাপিন্ড চাকতির আকারে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। রাজকীয়ভাবে চলাফেরা করছে। আমরা তার আকৃতির মাপ আন্দাজ করতে পারলাম না। কোথা থেকে এই আলোর চাকতি এল, আর এগুলো কীই বা, সবগুলি পশ্চিমদিকে উড়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেও কেউ তার অর্থ বের করতে পারল না। ফাঁপা বলগুলির রঙ আগুনে কমলা। শূন্যের ভিতর দিয়ে উড়ে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে ধীরে ধীরে রাজ-কীয়ভাবে..."

বর্তমানে যেসব দেশ অর্থাৎ আমেরিকা রুশ ও পশ্চিম ইউরোপ জ্ঞানবিজ্ঞানে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে তাদের মনে একটা অহঙ্কার এসেছে যে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাত আর কোথাও নেই এবং থাকতেও পারে না। তাদের পক্ষে বহির্জগতের কোনো অতি-বুদ্ধিজীবী প্রাণীর অস্তিত্ব স্বীকার মানে পার্থিব অগ্রগামী সভ্যতারূপ কুমারীর উপর বলাৎকার তুল্য।

এই প্রসঙ্গে ১৯২০ সালে ক্রেমলিনে এচ জি ওয়েলস আর লেনিনের কথোপকথন মনে পড়ছে—"আমি (ওয়েলস্) লেনিনকে বলি মনুষ্যকৃত প্রযুক্তিবিদ্যায় দিনে দিনে উন্নতির সঙ্গে একদিন পৃথিবীর অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। আর সেদিন আপনাদের এই মার্কসীয় দর্শন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

"লেনিন আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আপনি ঠিক বলে-ছেন। এটা আমি নিজেই বুঝেছিলাম যখন আপনার লেখা উপন্যাস 'টাইম মেশিন' পড়ি। সমস্ত মানুষের ধ্যানধারণা আমাদের এই গ্রহের মাপকাঠিতে। যদিও প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নতির সর্বোত্তম শিখরে উঠবে কিন্তু তা পৃথিবীর মাটি ও মিথ্যা ধ্যানধারণা আঁকড়েই থাকবে সৌরজগতের বাইরে কখনই যেতে পারবে না।

"যদি কখনও আমাদের দ্বারা সম্ভব হয় গ্রহান্তরের জীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, তবে আমাদের যতকিছু দর্শন নীতি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। তখনই হবে আমাদের সুপ্ত প্রযুক্তিজ্ঞান সীমাহীন এবং তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হিংসাত্মক ভূমিকার জীবন হবে শেষ...।"৯

চিন্তা করুন, যে দেশে আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাকে কীভাবে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি।

৯ Alexandrov, V. L'Ours et la Baleine, Stock, Paris, 1958.

যদিও শিক্ষার মাধ্যমে ও অগণিত প্রামাণ্যে জানি আমাদের পূর্বপুরুষরা নদীর অপর পারের পূর্বপুরুষ অপেক্ষা জ্ঞানে বিজ্ঞানে এবং শাস্ত্রবিদ্যায় কখনই উন্নত ছিলেন না। আজ আমরা রাত্রে উন্মুক্তস্থানে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই আমাদের সৃষ্ট উপগ্রহ আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহকে চক্র দিচ্ছে কয়েক মিনিটের মধ্যে। উপগ্রহের এই আলো কখনই আকাশের বুকে দেখা যেতো না যদিনা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ভারতবর্ষ চীন গ্রীস মিশর রুশ ইংল্যণ্ড প্রভৃতি দেশের মনীষীর ঐতিহ্য বহন করতো। কিন্তু আমরা আটকা আছি দুই মেরুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র এক ভূখণ্ডে। আমাদের সমস্ত কিছু অনুভূতির মূল শিকড় শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছে এই মাটিকে। সুতরাং এই পৃথিবী ছাড়া আর কিছু সহজে আমরা ভাবতে পারি নে। আর কিছু আমাদের নেইও।

যদি আমাদের এই সৌরজগতের অপর পারের অন্য কোনও গ্রহের অধিবাসী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করে, তখন হয়তো আমাদের তাদের জ্ঞানবুদ্ধির অনুগ্রহে বা কৃপায় থাকতে হবে। আমাদের এই সভ্যতাকে তারা কী চোখে দেখবে তাও আমাদের অজানা। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এবং তাদের সভ্যতা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই দূরের স্পর্শ এখন পর্যন্ত আমরা অনুভব করি নি কল্পনাতেও নেই।

আমার জীবন

মধু বসু

(৪০)

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানারকম জটপাকানো চিন্তা করতে করতে কখন যে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নেই।

সকালে উঠে মনে হ'ল যে বোম্বাইতে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য—। ঠিক করলাম যে ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া ছবির জন্যে তো আমাকে বাইরে বহু জায়গায় যেতেই হবে, সুতরাং মিঃ এজরা মীরকে বলে এখুনি বেরিয়ে পড়াই ভাল। ঠিক এই সময় মনে পড়ল শ্রীনিরঞ্জন পালের কথা। তিনি বলেছিলেন ঃ একদিন এই আই-এফ-আই-এর কাজের জন্যে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে মধু।'

সত্যিই আজ তাকে ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে। কারণ আজ যদি কোন বম্বে প্রোডিউসারের হয়ে ছবি করতাম তাহলে তো আর বম্বে ছেড়ে যেতে পারতাম না। আর তখন এই বিচ্ছেদ-বেদনায় মনটা এমন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত যে কোন কাজই করতে পারতুম না। নতুন নতুন দেশ দেখা নতুন নতুন লোকের সংস্পর্শে এলে মনটা অনেকটা ভুলে থাকবে—অনেকটা শান্তি ফিরে আসবে মনে। আমার তখন যেরকম মনের অবস্থা, তাতে এই ধরণের একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে।

সেইদিনই আই-এফ-আই অফিসে গিয়ে মিঃ এজরা মীরকে ট্যুরে যাবার কথা বলতে তিনি বললেন! বেশ তো—আপনার তো চিত্রনাট্য তৈরী, আপনি এবার বেরিয়ে পড়ুন। আমাকে আপনার 'ট্যুর প্রোগ্রাম' দিন—আমি এক সপ্তাহের মধ্যে সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—'এক সপ্তাহ? আমি বললাম ঃ বড্ড দেরী হয়ে যাবে মিঃ মীর। আমি দু'তিনদিনের মধ্যে বম্বে ছাড়তে চাই। আর বন্দোবস্ত করার বিশেষ এমন কি আছে? আপনি আমাকে একজন ভাল ক্যামেরাম্যান দিন—আমি একজন সহকারী ঠিক করে নিচ্ছি।

মিঃ মীর আমাকে খুব ভালবাসতেন। তিনি যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং এই বিভাগের সর্বেসর্বা—এ-মনোভাব নিয়ে কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ ঠিক আছে, আপনি স্থির করুন—কবে আপনি রওনা হতে চান। আমি আপনাকে ভাল ক্যামেরাম্যান দিচ্ছি, আপনি আপনার সহকারী ঠিক করে নিন। আপনি শুধু আমাকে জানিয়ে দেবেন আপনার কত টাকার দরকার হবে, আর প্রথমে আপনি কোথায় যেতে চান।

আমি বললাম ঃ প্রথমে আমি যেতে চাই দক্ষিণ ভারতে। সেখানে 'ভরত নাট্যম্' এবং 'কথাকলি' নাচ তুলে যাব ইম্ফল এবং মণিপুরে। ওখানে তুলব 'মণিপুরী নাচ' এবং নাগাদের লোকনৃত্য। তারপর যাব উড়িষ্যা এবং রাঁচী। সেখানে তুলব আদিবাসীদের 'ছউ' এবং সাঁওতাল নৃত্য। তারপর বম্বেতে ফিরে এসে উত্তর ভারতের দিকে যাব।

মিঃ মীর হেসে বললেন ঃ আপনি তো দেখছি অল ইন্ডিয়া ট্যুরের ব্যবস্থা করেছেন।

আমি বললাম ঃ তা তো করতেই হবে মিঃ মীর। ভারতের সব জায়গার ক্ল্যাসিকাল নাচ ও লোকনৃত্য তুলতে গেলে সেইসব জায়গায় না গেলে তো চলবে না। কাল আপনাকে বিস্তারিতভাবে ট্যুর-প্রোগ্রাম দিয়ে দেব, আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেব এখন আমার কত টাকার দরকার। তারপর যেমন যেমন দরকার হয় আপনাকে জানাব।

এই বলে আমি বাড়ী চলে এলাম।

টুকলু (প্রীতি মজুমদার) তখন বম্বেতে একটা হোটেলে থাকে। জানাশোনা পরিচালকদের অধীনে ছোটখাটো ভূমিকার অভিনয় করে। টুকলুকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম ঃ মিছিমিছি কেন হোটেলে থেকে পয়সা নষ্ট করছিস। আমি তো এত বড় ফ্ল্যাটে একলা আছি। হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে আয় তুই এখানে। এখানেই থাক, তারপর দু'তিন দিনের মধ্যেই আমি দক্ষিণ ভারত 'ট্যুরে' বেরুচ্ছি। যদি চাস তো আমার সঙ্গে যেতে পারিস আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে। বিনা পয়সায় অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরবি। তার ওপর আমি দেখব যাতে তুই সহকারী হিসেবে ভাল টাকা পাস।

আমার কথা শুনে তো টুকলু লাফিয়ে উঠল। সে তখনই হোটেল থেকে ওর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে এল আমার ফ্ল্যাটে।

পরদিন সকাল বেলায় মিঃ মীরকে আমি সম্পূর্ণ 'ট্যুর' প্রোগ্রাম এবং যা যা দরকার, তার তালিকা দিলাম। কত টাকা এখন লাগবে, কত রোল ফিল্ম লাগবে তাও জানালাম।

এর দু'তিন দিন পরেই আমি টুকলু এবং ক্যামেরাম্যান প্রভাকর ও তার সহকারী মাদ্রাজ যাত্রা করলাম। সঙ্গে চামান গেল। সেটা হবে ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি।

মাদ্রাজে এসে আমি দুজন ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এলাম, যাঁরা আমায় দাক্ষিণাত্যে থাকার সময় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের একজনের নাম হল আম্বি নাটেশন—মাদ্রাজের বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক জি এ নাটেশান এন্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীজি এ নাটেশানের জ্যেষ্ঠ পুত্র; অপরজনের নাম হল সাচী। নাচ-গানের দিকে তাঁদের আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট, সেই সূত্রে তাঁদের ওখানকার প্রায় সমস্ত শিল্পীদের সঙ্গেই বেশ পরিচয় ছিল। আমি যখন আমার মাদ্রাজ আসার উদ্দেশ্য তাঁদের বললুম, তখন তাঁরা পরামর্শ দিলেন—বিখ্যাত 'ভরত নাট্যম' নৃত্যবিশারদ মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই-এর সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীপিল্লাই থাকেন কুম্ভোকোনাম থেকে কিছু দূরে, পান্ডানল্লুর নামক গ্রামে। মীনাক্ষীসুন্দরম ছিলেন রামগোপাল, শান্তা রাও, রুক্মিণী আরুন্ডেল্ল প্রভৃতি বিখ্যাত 'ভরত নাট্যম' নৃত্যশিল্পীদের গুরু।

কিন্তু মুস্কিল হল যে, আমি তো তামিল একেবারেই জানি না, আর শুনেছিলাম যে, মীনাক্ষীসুন্দরমও এক বর্ণ ইংরাজী বোঝেন না। এই বিপদের মুখে সাচী এগিয়ে এল আমায় সাহায্য করতে—সে দক্ষিণ ভারতীয়, তামিলই তার ভাষা। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের বেশীরভাগ সংগীত ও নৃত্যশিল্পী ও গুরুদের সঙ্গে ওর আলাপ। নিজে থেকেই আমাকে জানাল যে, আমার সঙ্গে যেতে সে রাজী আছে। টুকলুও গেল আমাদের সঙ্গে।

প্রথমে আমরা গেলাম কুম্ভোকোনাম, তারপর সেখান থেকে মোটরে করে পান্ডুনল্লুর গেলাম। খুবই ছোট গ্রাম পান্ডুনল্লুর। মীনাক্ষীসুন্দরমের বাড়ী বলতে খান-তিনেক মাটির ঘর, সঙ্গে একটা লম্বা বারান্দা, তার সংলগ্ন আরও দু'তিনখানা ঘর, যেখানে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা থাকে। আমার নির্দেশমত সাচী শ্রীপিল্লাইকে বলল যে, আমরা এসেছি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। 'ভরত নাট্যম্' নৃত্যের ওপরে আমরা একটা প্রামাণ্য ছবি করতে চাই। এজন্যে কোন্ শিল্পীকে নিলে ভাল হয়, সেই বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাই।

এই কথা শুনে মীনাক্ষীসুন্দরম্ বললেন যে, আমি কখনও 'ভরত নাট্যম' নৃত্য দেখেছি কিনা। তার উত্তরে আমি বললাম যে, বালা সরস্বতী যখন কলকাতায় গিয়েছিল, তখন তার নাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এরপর 'ভরত নাট্যম্'-এর টেকনিক সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু বললেন। তিনি বললেন ঃ এ-নাচের জন্যে শিল্পীকে খুব অল্প বয়স থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—ছয়-সাত বছরের বেশী বয়স না হলেই ভাল, কারণ তখন শরীর থাকে খুব নমনীয়, তারপর দশ বছর রীতিমত একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠাসহকারে ট্রেনিং নিতে হবে। তারপর যদি শিল্পীর তালজ্ঞান এবং সুরজ্ঞান থাকে, যেটা অবশ্য সহজাত, তাহলেই সে 'ভরত নাট্যম' পুরোপুরি শিখতে পারবে এবং তার জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

এমন সময় বার-তের বছরের একটি মেয়ে সেখানে এসে হাজির হল—সঙ্গে একজন মৃদঙ্গবাদক। স্বভাবতই সে এসেছিল শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে। মীনাক্ষীসুন্দরম তাদের জানালেন যে, মাদ্রাজ থেকে কয়েকজন বিশেষ অতিথি এসেছেন, সুতরাং আজ আর নৃত্যশিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে না। মেয়েটি এবং মৃদঙ্গবাদক এই কথা শুনে চলেই যাচ্ছিল। এঁদের কথাবার্তা যদিও তামিল ভাষাতেই হচ্ছিল, তবুও আমি অনুমানে বুঝলাম, এঁদের কথাবার্তার বিষয়বস্তুটা কি। আমি তখন সাচীকে দিয়ে বললুম যে, 'ভরত নাট্যমের শ্রেষ্ঠ গুরু তাঁর ছাত্রীকে কিভাবে নৃত্যশিক্ষা দেন, সেটা যদি আমাদের দেখার সৌভাগ্য ঘটে, এর থেকে বড় আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। এই সঙ্গে 'ভারত নাট্যমে'র আসল রূপটিও আমরা বুঝতে পারব। বালা সরস্বতীর নাচ দেখেছি আজ প্রায় আট-দশ বছর আগে, তখন নাচ সম্বন্ধে ভাল বুঝতামও না—আর এতটা আগ্রহও ছিল না।

সাচীর কথা শুনে মীনাক্ষীসুন্দরম্ হেসে বললেন : এ'রা হলেন সব কলকাতা শহরের লোক, বড় বড় থিয়েটারে নাচ দেখতে অভ্যস্ত, এখানে এই কুঁড়েঘরের উঠোনে বসে এতক্ষণ ধরে নাচ দেখার ধৈর্য থাকবে কি?

আমি বললাম : খুব থাকবে। 'ভরত নাট্যম' নাচ সম্বন্ধে জ্ঞান আমার খুব কম—বইতে যেটুকু পড়েছি, তার বেশী নয়। বেশীর ভাগ মুদ্রার মানেই হয়ত আমি বুঝতে পারব না, কিন্তু মনের মণিকোঠায় এই স্মৃতিটুকু চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যে, 'ভরত নাট্যমে'র শ্রেষ্ঠ গুরুর নৃত্য-শিক্ষাদান-পদ্ধতি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

কথাবার্তা যা-কিছু সব তিনি বলছিলেন তামিল ভাষাতেই, আর আমি ইংরাজী—মাঝখানে সাচী দোভাষীর কাজ করছিল।

নাচ শুরু হোল—শিল্পীর নাম জয়শ্রী। এর সঙ্গে বাজনা বলতে শুধু মৃদঙ্গ—তার বাজনার সঙ্গে দুটি ছড়ির সাহায্যে মীনাক্ষীসুন্দরম তাল দিয়ে যেতে লাগলেন। শিল্পী যখন মুদ্রা ও যথাযথ ভাব-ব্যঞ্জনা-সহকারে 'অভিনয়ম্' অংশটুকু করছিল, তখন মৃদঙ্গবাদক গানও গাইছিলেন।

নাচ যখন শেষ হল আমরা বুঝতেই পারলুম না যে কি করে এত দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। সাচী অবশ্য সব বড় বড় নৃত্যশিল্পীদের নাচই দেখেছিল, এটা তার কাছে নতুন কিছু নয় কিন্তু আমার আর টুকলুর কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই তের বছরের কিশোরী নৃত্যশিল্পীর নৃত্যশৈলী এমন একটা উঁচু মার্গের যে, তার প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি মুদ্রা যেন ভাবে ও ভাষায় মুখর হয়ে উঠছিল। গুরুজী বিশেষ বিশেষ স্থান ও মুদ্রাগুলি বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—সেগুলি সাচী আবার ইংরাজীতে অনুবাদ করে আমায় বলে দিচ্ছিল। এমন বিমুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে বসে দেখছিলাম যে, স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়েছিলাম।

সত্যিই তো, আমরা শহরের শিক্ষিত দর্শক—বড় বড় থিয়েটারে কুশন-দেওয়া সীটে সবরকম আরামের মধ্যেও দু'ঘণ্টা বসে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠি—শেষকালে আর বসে থাকার ধৈর্য থাকে না—কিন্তু এখানে এই শক্ত উঠানের মধ্যে অনেক রকম অস্বস্তির মধ্যে বসেও এই ত্রয়োদশী কিশোরী বালিকার নাচ দেখতে দেখতে এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে, তিনঘণ্টা সময়কে মোটেই দীর্ঘ মনে হয়নি।

মীনাক্ষীসুন্দরমকে জিজ্ঞাসা করলাম : এই মেয়েটিকে কি আমার ছবিতে নাচতে অনুমতি দেবেন?

তাতে তিনি বললেন : এর শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে এখনও তিন বছর দেরী আছে, তার আগে তো এ সাধারণ্যে নাচতে পারবে না।

সাচী জিজ্ঞাসা করল : তাহলে আপনার মনোমত কোন ছাত্রীর নাম বলে দিন, যাকে আমাদের ছবিতে 'ভরত নাট্যম' নৃত্যের জন্য নিতে পারি।

তিনি তখন তাঁর দুই ছাত্রী—শান্তা রাও ও রাণীর নাম করলেন।

আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

রাণী কুম্ভোকোনামে থাকত, আমরা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আমাদের ছবির জন্যে ঠিক করে ফেললাম। শান্তা রাও তখন বাঙ্গালোরে। কুম্ভোকোনাম থেকে মাদ্রাজ ফিরে আসার পর সাচী তার ঠিকানা যোগাড় করল এবং যোগাযোগ করে তার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল।

এর পর আমাদের পরবর্তী কাজ হল একদল 'কথাকলি' নৃত্যশিল্পী ঠিক করা। কেরালা হল কথাকলির জন্মস্থান।

আমি, টুকলু এবং সাচী রওনা হলুম কোচিনের দিকে—সঙ্গে গেল পুরাতন ভৃত্য চামান।

কোচিনে সাধনার নৃত্যশিল্পী মাধব মেননের বাড়ী—সে এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। আমি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ত্রিবান্দ্রমে গিয়ে 'কথাকলি' নৃত্য তোলার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তাতে সে বলল যে, ওখানে কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের দল পাওয়া খুব কষ্টকর হবে, তার চেয়ে ত্রিচুরের কাছে কেরালা কলামণ্ডলম-এ গিয়ে কবি ভাল্লাথোলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কবি হিসেবে ভাল্লাথোলের নাম ভারত-বিশ্রুত। এর নাম আমি আগেও শুনে-ছিলাম। এঁর যে একটি নৃত্য-শিক্ষায়তন আছে, তাও আমি জানতাম। আসলে মাধব মেনন এই 'কেরালা কলামণ্ডলমে'রই ছাত্র ছিলেন।

কোচিন থেকে আমরা গেলাম ত্রিচুর এবং সেখান থেকে মোটরে কেরালা কলা-মণ্ডলম্। কবি ভাল্লাথোলের সঙ্গে আলাপ হোল। দক্ষিণ ভারতের এমন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার—কিন্তু কি অমায়িক!

যখন সাচী তাঁকে বলল যে, আমরা ভারত সরকারের আই-এফ-আই বিভাগ থেকে এসেছি 'কথাকলি' নাচের দশ মিনিটের মত একটা ডকুমেণ্টারী ছবি তুলবার জন্যে। তখন তিনি তো গাছ থেকে পড়লেন।

বললেন : দশ মিনিটে কথাকলি নাচ? দশ মিনিটে তো এ-নাচের কিছুই দেখানো যাবে না। আপনারা কখনও পুরো একটা 'কথাকলি' নাচ দেখেছেন?

আমি বললাম যে, না, কথাকলি নাচ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তাতে তিনি বললেন : বেশ, আজ রাত্রেই আমি একটা নাচের প্রোগ্রাম বন্দোবস্ত করছি, কিন্তু সেটা শেষ হতে ৮।৯ ঘণ্টা সময় লাগবে। আপনাদের কি অতক্ষণ বসে থাকার ধৈর্য থাকবে?

আমি বললাম : আমার ধৈর্য ঠিকই থাকবে, কারণ আমার সম্পূর্ণ 'কথাকলি' নাচ দেখার খুব ইচ্ছে।

পরদিন আমি আমার বন্ধু সাচীকে মাদ্রাজ পাঠিয়ে দিলাম একটা স্টুডিওর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে, যেখানে আমি 'ভরত নাট্যম' এবং 'কথাকলি' দুটো নাচেরই শুটিং করতে পারি।

সেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আর টুকলু গেলাম কেরালা কলামণ্ডলম-এ 'কথাকলি' নাচ দেখার জন্যে।

এখানে আমি এই কথাকলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'-একটি কথা বলতে চাই। ভারতীয় নৃত্য হল দু'রকমের—'লাস্য' এবং 'তাণ্ডব'। প্রথমটি হল কোমল ও শান্ত রসাশ্রিত, এটি মেয়েদের জন্যে এবং লাস্য নৃত্য শুধু মেয়েরাই করে থাকে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তাণ্ডব হল পুরোপুরি পুরুষালি—এতে প্রয়োজন শক্তি এবং ভয়ঙ্কর রসের। কথাকলি হল শেষোক্ত ধরনের—এতে স্ত্রী-চরিত্রগুলিও পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয়। অর্থাৎ এই কথাকলিতে মেয়েদের কোন স্থান নেই।

কথাকলি নাচের বিষয়-বস্তুগুলি সব গৃহীত হয় হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী থেকে। রামায়ণ বা মহাভারতের এক-একটি অধ্যায় নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। কথাকলি খুব কষ্টসাধ্য নৃত্য এবং ভরত নাট্যমের মত তিনটি ভাগে এটিও বিভক্ত। যথা : অভিনয়ম, নৃত্যম্, এবং গীতম্ (সঙ্গীত)। কিন্তু 'ভরত নাট্যমে' অভিনয় এবং নৃত্যে সমানভাবেই জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কথাকলিতে অভিনয়ম অর্থাৎ যাকে বলে সেটাই প্রধান এবং তা রূপায়িত হয় বিবিধ মুদ্রা ও ভাবব্যঞ্জনার মাধ্যমে।

কথাকলিতে পারদর্শিতা লাভ করতে হলে একজন তরুণ শিক্ষার্থীর সময় লাগে ছয় থেকে আট বছর।

আমরা যখন কেরালা কলামণ্ডলমে পৌঁছলাম, তখন শুনলুম নাচ আরম্ভের বেশ কিছু দেরী আছে। শিল্পীরা সবে মেক-আপ শুরু করেছে। এর মেক-আপটা একটু বিশেষ ধরনের, সেইজন্যে এক-একজন শিল্পীদের সময় লাগে অনেকক্ষণ করে। কবি ভাল্লাথোল আমাদের কফি খাওয়ালেন। এই কফি খেতে খেতে নাচের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললেন।

অবশেষে শিল্পীদের মেক-আপ শেষ হল এবং খবর পেলাম যে, খুব শিগ্গীর নাচ আরম্ভ হবে।

কবি ভাল্লাথোল বললেন : সাধারণত একটা সম্পূর্ণ কথাকলি নাচে সময় লাগে ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা—অতক্ষণ ধরে বসে থাকতে আপনাদের বিরক্তি ধরে যাবে, আর তাছাড়া আপনারা তো ২।২॥ ঘণ্টার শো দেখতে অভ্যস্ত তাই আমি একে কেটে ছোট করে এনে দাঁড় করিয়েছি ৫ ঘণ্টায়। এই নাচের শেষে আপনারা ত্রিচুর ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমুতে পারবেন।

আমি হেসে বললাম : ধন্যবাদ।

নাচ সুরু হবার সংকেত হ'ল। প্রেক্ষাগৃহের মেঝেতে মাদুর বিছানো, চেয়ার-বেঞ্চির কোনো ব্যাপার নেই, আর আলো বলতে দুটি বড় বড় পিলসুজের ওপর তেলের প্রদীপ। কোন দৃশ্যপটের বালাই নেই, সামনের পর্দাটি হল একটি মোটা রঙীন কাপড়, শিল্পসম্মতভাবে তাতে নক্সা কাটা আর চারিধারে একটা

বর্ডার। এটা টাঙানো হয় না দুদিক থেকে দুজন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

পর্দা সরে গেল নাচ সুরু হ'ল। প্রথমে ভেবেছিলাম ৫ ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকব কি করে, কিন্তু সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতেও পারলুম না। যখন শেষ হ'ল তখন আমি টুকলুকে বললাম : এত শিগ্‌গীর? টুকলুর চোখ তখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছে—মাঝে খানিকটা ঘুমিয়েও নিয়েছিল, সে উঠে চোখ রগড়ে বললে : শিগ্‌গীর মানে? ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনটে বেজে গেছে।

কবি ভাল্লাথোলকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলাম। আসবার সময় বলে এলাম যে কাল আবার আসব।

মাত্র দশ মিনিটে 'কথাকলি'র কোন কোন অংশ নেওয়া যায় এসম্বন্ধে তাঁর সংগে দু'তিনদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা হল। তিনি বহু দেশবিদেশ ঘুরেছেন এবং মানব-চরিত্র ও মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য। উনি রামায়ণ থেকে একটা অংশ নির্বাচন করলেন এবং সেটা ও'র ছাত্রদের দিয়ে মহড়া দেওয়ালেন এবং অপূর্ব দক্ষতায় মুদ্রা অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে একটি দশ মিনিটের উপযোগী নৃত্য-নাট্য রচনা করলেন।

কবি ভাল্লাথোলকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি আর টুকলু নৃত্যশিল্পীদের দলকে নিয়ে রওনা হলুম। এই দলে প্রায় ছিল ২৫ জন লোক—নৃত্যশিল্পী ও বাদ্য-যন্ত্রীদের মিলিয়ে।

আমরা যখন কইম্বাটরে পেঁছিলাম তখন সাচীকে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। সে এখানে এসেছে তার আগের দিন—আর সংগে করে নিয়ে এসেছে এক অতীব দুঃসংবাদ। মাদ্রাজে প্রবল বন্যা—লোকজন ভয়ে সহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। এতগুলো লোক নিয়ে এখন যাব কোথায়? এখন উপায়?

আমার অবস্থা দেখে সাচী বললে : উপায় একটা আছে—যদি কইম্বাটরের স্টুডিওতে নাচটা চিত্রগ্রহণ করা যায়। অবশ্য এখানেও একটা মস্ত বিপদ রয়েছে প্লেগে সারা সহর ছেয়ে গেছে, সুতরাং স্বাস্থ্য-বিভাগের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কাউকে কইম্বাটর সহরের মধ্যেই ঢুকতে দিচ্ছে না।

এদিকে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে আসছে আমাকে এক্ষুণি ঠিক করে ফেলতে হবে কি করব—মাদ্রাজে গিয়ে বন্যাপ্লাবিত সহরে আটকে থাকব না প্লেগ-সংক্রামিত কইম্বাটরেই থেকে যাব। উভয় বিপদের মধ্যে পড়ে গেলাম—এ যেন জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ!! আমি আমার বিষয় ভাবছিলাম না, ভাবনা হোল সঙ্গের লোকগুলির জন্যে।

যাই হোক, আমি শেষ পর্যন্ত কইম্বাটরে নেমে পড়াই ঠিক করলাম। সাচীর বাড়ীও কইম্বাটরে। সাচী বললে মিঃ নাইডুর স্টুডিওটা হল সহরের ঠিক বাইরে সেখানে প্লেগের সীমানা নয়—সেই স্টুডিওর মধ্যে এই লোকগুলির থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে আমার থাকা সম্ভব নয়, কারণ সেখানে ভাল থাকবার মত ঘর নেই, তারপর আমি যা খাই তা সেখানে পাওয়া যাবে না, সুতরাং আমাকে থাকতে হলে সহরের মধ্যে একটা ভাল হোটেলে থাকতে হবে—আর সেটা প্লেগ সীমানা'র মধ্যে।

আমি তখন সাচীকে বললাম যে নৃত্যশিল্পী ও বাদ্যযন্ত্রীদের যদি প্লেগ-সীমানার বাইরে থাকার ও খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যায় তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই—আমার আর টুকলুর ব্যবস্থা আমি ঠিক করে নেব, আর তাছাড়া আমাদের সঙ্গে তো প্রতিষেধক র'য়েছে অর্থাৎ কিনা হুইস্কি।

সাচী হেসে বললে : ও প্রতিষেধকে হবে না মিঃ বোস, আপনাদের প্লেগের টিকা নিতে হবে, নইলে স্টেশন থেকে বেরুতেই দেবে না।

যাই হোক, আমরা সবাই নেমে তো পড়লাম কইম্বাটর স্টেশনে। নেমে সেই ঝামেলা। টিকে না নিয়ে স্টেশন থেকে বেরুতে দেবে না। গেলাম স্টেশনমাস্টারের কাছে। তিনি বললেন : কোন উপায় নেই, যারা শুধু এখানকার বাসিন্দা তারাই ভেতরে যেতে পারে, বাইরের লোককে ভেতরে যেতে গেলে টিকে নিতেই হবে।

তখন যুদ্ধের সময়—আমার কাছে একটি বিশেষ ধরনের অনুমতিপত্র ছিল, শুধু আমার জন্যে নয়, আমার সঙ্গের লোকজনদের জন্যেও—তাতে আমাদের যেকোন জায়গায় যাবার অনুমতি ছিল, তা সে যতই সংরক্ষিত জায়গা হোক না কেন। এই অনুমতিপত্রটি স্টেশনমাস্টারকে দেখাতে তিনি বললেন : আপনার কাছে যখন এই স্পেশাল পারমিট রয়েছে তখন যেতে আপনারা পারেন, কিন্তু মিঃ বোস, আপনি অত্যন্ত বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছেন।

তাতে আমি বললাম : তা আমি জানি, সেইজন্যেই তো আমার দলের সমস্ত লোককে মিঃ নাইডুর স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেইখানে তারা থাকবে।

মিঃ নাইডুর নাম শুনে স্টেশনমাস্টার বললেন : হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে, তাঁর স্টুডিও তো সহর থেকে বেশ দূরে। কিন্তু আপনি কোথায় থাকছেন মিঃ বোস?

আমি বলাম : আমি আমার সহকারী এবং সাচী সকলে একটা ভাল হোটেলেই থাকব এবং সবরকম প্রতিষেধক আমরা নেব। তারপর অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

এরপর স্টেশনমাস্টারের আর কিছু বলার রইল না।

স্টেশনেই টিকা দেবার সমস্ত ব্যবস্থা ছিল—দলের সকলকে সেইখানে টিকা দেওয়া হোল। তারপর সাচী সকলকে নিয়ে সোজা মিঃ নাইডুর স্টুডিওতে চলে গেল। সাচীর সঙ্গে মিঃ নাইডুর বেশ ভাল আলাপ-পরিচয় ছিল—স্টেশন থেকেই সে টেলিফোনে সমস্ত দলটির থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলল। মিঃ নাইডুও সানন্দে রাজী হলেন।

সাচী স্টেশন থেকেই টেলিফোনে আমার আর টুকলুর জন্যে একটা বেশ ভালো হোটেল ঠিক করে দিল। আমি আর টুকলু চলে গেলাম হোটেলে—সঙ্গে রইল চাপরাশি।

সাচীকে বলেছিলাম তার পরদিন সকাল থেকেই যাতে শুটিং সুরু করা যায় তার বন্দোবস্ত করবার জন্যে। কারণ তাহলে এই শিল্পীদের কাজ শেষ করেই রাত্রে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যায়। সাচী সেই মতই সব বন্দোবস্ত করল—মিঃ নাইডুও আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করলেন—এমন কি আমার সঙ্গে ফিল্ম স্টক ছিল না, সেটা তিনি আমাকে ধার দিয়ে কার্যোদ্ধার করে দিলেন।

'কথাকলি'র মেক-আপটাই হচ্ছে একটা মস্ত ঝামেলার ব্যাপার। আগেই বলেছি যে এতে শিল্পীদের সময় লাগে প্রচুর। কারণ প্রথমে মুখে রং চড়ায়, তারপর চালের গুঁড়োর সঙ্গে কি সব মিশিয়ে আবার সেগুলো মুখে লাগায়—এতে মেক-আপ সম্পূর্ণ হলে মনে হয় যেন ঠিক মুখোস পরেছে।

এদের 'মেক-আপ' শেষ হতেই বেলা দুটো-তিনটে বেজে গেল—তারপর এদের নিয়ে শুটিং শেষ করতে রাত্রি প্রায় তিনটে বেজে গেল। সাচীকে বললাম : কাল সকালেই যেন এরা প্রথম ট্রেনেই রওনা হতে পারে, তার বন্দোবস্ত কর।

পরদিন সকালবেলায় যখন আমি হোটেলে বসে ব্রেক-ফাস্ট খাচ্ছি তখন সাচী হাসতে হাসতে গিয়ে হাজির। সে বলল : মিঃ বোস, এইবার আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, সমস্ত লোকজনদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম নির্বিঘ্নে। আপনি কিন্তু দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

আমি বললাম : হ্যাঁ সাচী। ঈশ্বর করুণাময়—বিশেষ করে তোমার কথা মনে হলেই মনে হয়—ইউ আর গড্-সেন্ট্। মাদ্রাজে তোমার সঙ্গে ক'দিনেরই বা আলাপ। কিন্তু তোমাকে না পেলে আমি যে কি করতাম তা আমি ভাবতেই পারি না।

সাচী আমায় বাধা দিয়ে বলে উঠল : ও সব কথা বলবেন না মিঃ বোস। আপনার সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেদিন থেকে কেন জানি না আপনার ওপর আমার এক দারুণ শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ অনুভব করেছি। আর আমি সত্যি করে বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন, খুব পুরোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর চেয়েও আপনাকে এই ক'দিনে আমার বেশী ভাল লেগেছে।

ইতিমধ্যে খবর এসে গেল মাদ্রাজ থেকে বন্যার জল কমে গেছে। এই খবর পেয়ে আমি, টুকলু, ক্যামেরাম্যান প্রভাকর ও তার সহকারী এবং সাচী সবাই মাদ্রাজের দিকে রওনা হলাম।

প্লেগের সীমানার থেকে বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

(ক্রমশঃ)

তিসরী কসম চিত্রে রাজকাপুর ও ওয়াহিদা রহমান

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

পশ্চিমী চলচ্চিত্রে আধুনিকতা :

সম্প্রতি আমেরিকার চলচ্চিত্র-প্রযোজক-সংস্থা (দি মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশান অব আমেরিকা) পুরাতন উদারপন্থী সেন্সার ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি দশধারা সংবলিত নতুন সেন্সারবিধি প্রবর্তনে আগ্রহী হয়েছেন। এই বিধি অনুসারে :

মনুষ্যজীবনের মৌল মর্যাদা ও মূল্যকে সমর্থন ও সম্মান জানাতে হবে;

অশোভন এবং অযথাভাবে মানুষশরীরকে অনাবৃত দেখানো চলবে না;

অবৈধ যৌন-সম্পর্ক সমর্থন করা চলবে না;

সাধারণ শোভনতার মানদণ্ডকে লঙ্ঘন করে ঘনিষ্ঠ যৌনদৃশ্য দেখানো চলবে না;

যৌনসম্পর্কিত বিপথগমনের দৃশ্যাদি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযত ও সতর্ক হতে হবে;

অশ্লীল সংলাপ, ভঙ্গী বা আচরণ দেখানো চলবে না।

ইত্যাদি বহুবিধ করণীয় ও নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকার বেশ কিছুসংখ্যক ছবিতে আধুনিক ইয়োরোপের চলচ্চিত্রের সুস্পষ্ট যৌনাবেশ সংক্রমিত হতে দেখেই এই নতুন সেন্সারবিধির কথা চিন্তা করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে আধুনিক ইয়োরোপে চলচ্চিত্রের ধারা প্রসঙ্গে জনৈক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালককেও বলতে শুনেছিলুম : যারা আজ ওদেশে ক্যামেরা হাতে করে পথে বেরিয়ে পড়েছে, তাদের চিন্তাভাবনা মতো ছবি তৈরী করবার উদ্দেশ্যে, তাদের পকেটে নেই পয়সা। আর্থিক সামর্থ্য অল্প বলেই তারা তাদের ছবি থেকে কিছুটা আয় সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয় হবার জন্যে তাদের ছবিকে বেশ কিছুটা নগ্ন যৌনআবেদনপূর্ণ করেছে সজ্ঞানেই। কিন্তু এ-পন্থা বেশী দিন চলতে পারে না; দর্শক ক্রমেই এসব জিনিস দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

বলা বাহুল্য, নগ্নতা ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী হচ্ছে সুইডেন। ভারতে অনুষ্ঠিত গেল তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে যাঁরা 'ওয়েডিং সুইডিশ স্টাইল' ছবিটি দেখেছেন, তাঁরাই কথাটা স্বীকার করবেন। গেল দু-তিন বছর ইয়োরোপের বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত বহু চিত্রতেই নগ্ন-যৌবন দেখাবার একটা নির্লজ্জ প্রয়াস লক্ষ্য করে বহু বিচারকই স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। বেপরোয়া নগ্নস্নানের দৃশ্য, এমনকি যৌন-বিহারের দৃশ্যও কিছু কিছু ছবির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মনে হয়, বাস্তবতার নামে মনুষ্যদেহের নগ্নতাকে পরিদৃশ্যমান করা কোনো কোনো চিত্রনির্মাতাকে নেশার মতো পেয়ে বসেছে। এটা নিশ্চয়ই ভয়ের কথা। মানুষ যৌনব্যাপারে যে-শোভন গোপনীয়তা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত হয়েছে বলে নিজেদের সভ্য বলে জ্ঞান করে, বাস্তবতার নামে তাকেই আজ ছাল ছিঁড়ে সকলের প্রত্যক্ষীভূত করতে হবে, এমন বন্য মনোভাবকে আধুনিক বলতে আমরা সত্যই কুণ্ঠিত।

খাস ইয়োরোপেও যে চলচ্চিত্রের এই তথাকথিত আধুনিকতা নিয়ে সভ্য মানুষ উদ্বেগ বোধ করছে, এমন নিদর্শন দেখা গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকারী মহল তাদের কোনো কোনো ছবিতে যৌন ব্যাপারের বাড়াবাড়ি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। প্রাগের এক সংবাদপত্র চলচ্চিত্রে প্রেমের দৃশ্য সম্পর্কে বলেছেন : কয়েক বছর আগেও যাঁরা চলচ্চিত্রে যৌন আকূতি দেখতে চাইতেন, তাঁদের ভরসাস্থল ছিল

সুইডেন। কিন্তু বর্তমানে যৌনতরঙ্গ আমাদের ছবিগুলিকেও গ্রাস করেছে। আজ যে-সব চেক বা শ্লোভাক ছবি নগ্ন দৃশ্য প্রদর্শন করে তাদের দর্শকদের আকৃষ্ট করে না, সেই সব ছবির সংখ্যা নগণ্য—একটি হাতের আঙুলেই তাদের গুনে শেষ করা যায়।

অবশ্য আজও নগ্ন যৌন প্রদর্শনীর ব্যাপারে সুইডেনের চলচ্চিত্রকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা অন্য কোনো দেশের নেই। 'নাট্‌লেক' (নাইট গেমস্‌) নামে একটি আধুনিক সুইডিস ছবিকে ভেনিস ও সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে অনুষ্ঠিত গেল চলচ্চিত্রোৎসবগুলিতে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হতে দেওয়া হয়নি। হলিউডের বিগত যুগের বিখ্যাত শিশু অভিনেত্রী শার্লি টেম্পল (বর্তমানে তিনি একজন আটত্রিশ বৎসর বয়স্কা সম্ভ্রান্ত গৃহবধূ) সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো উৎসব সমিতির সভ্যা হিসেবে এই ছবিখানিকে দেখবার পর ঘৃণাভরে বলেছেন : আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে এই যে, অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে ছবিখানি অশ্লীলতাকে তার একমাত্র সম্বল করেছে।"

বর্তমান পশ্চিমী ছবির এই ভয়াবহ আধুনিকতার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে উঠুক। তা না হলে মানুষ কিছুদিন বাদে আর নিজেকে সভ্য বলে পরিচয় দিতে পারবে না।

লবকুশ চিত্রে অনীতা গুহ ও জনৈক শিল্পী

চিত্র-সমালোচনা

দাদীমা (হিন্দী) : প্রসাদ প্রোডাকসন্স (মাদ্রাজ)-এর নিবেদন; ৪,৭২৯'৫৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ও পরিচালনা : এল ভি প্রসাদ; চিত্রকাহিনী ও সংলাপ : পণ্ডিত মুখরাম শর্মা, সঙ্গীত-পরিচালনা : রোশন; গীতরচনা : মজরু; চিত্রগ্রহণ : দ্বারকা দিবেচা; শব্দানুলেখন : যশোবন্ত মিৎকার; সঙ্গীতানুলেখন : কৌশিক; শব্দপুনর্যোজনা : মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা : শান্তি দাস; সম্পাদনা : শিবাজী অবধূত; নেপথ্য কন্ঠদান : লতা মঙ্গেশকর, মোহম্মদ রফী, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, মহেন্দ্র কাপুর ও পুরণ; নৃত্য পরিচালনা : সুরেশ ও সত্যনারায়ণ; রূপায়ণ : অশোককুমার, রেহমান, কাশীনাথ, দিলীপরাজ, কানহাইয়ালাল, ডেভিড, মোহন চোটি, রণধীর, করণ দেওয়ান, মেহমুদ, দুর্গা খোটে, বীণা রায়, শশীকলা, তনুজা, মমতাজ, চাঁদ উসমানি, পূর্ণিমা প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স (প্রাঃ) লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১১ই নভেম্বর থেকে প্যারাডাইস, দর্পণা, গণেশ, নাজ, ছায়া, রূপালী, আলোছায়া, ভবানী, পার্কশো হাউস এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের ধনী পরিবারের কাহিনী "দাদীমা"। বহু ঘটনার ভীড়। আরম্ভে দেখা যায়, রাজা প্রতাপ রায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিমাতা—যিনি হচ্ছেন "দাদীমা", তিনি—দীননাথ নামে একজন

অনুগৃহীতাকে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করিয়ে প্রতাপ রায়েরই শ্যালক ডাক্তার ভারতীর সাহায্যে প্রতাপকে পরাস্ত করেন। পরাজয়ের অপমানে জর্জর প্রতাপ নিজের গৃহে শ্যালকের উপস্থিতি সহ্য করতে না পেরে তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী পার্বতীকে গৃহ-ত্যাগে বাধ্য করেন। ডাঃ ভারতীর গৃহে পার্বতীকে কিন্তু নিজের সদ্যোজাত পুত্র-সন্তানের সঙ্গে আর একটি সদ্যোজাতকেও স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার ভার গ্রহণ করতে হয়। দৈবক্রমে ঐ অনাথ শিশু-কেই রাজা প্রতাপ রায় নিজ পুত্রজ্ঞানে চুরি করে নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত ঐ শিশুর জন্যেই নিজ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। পার্বতী যখন নিজ গর্ভজাত শিশুকে সঙ্গে করে স্বামীগৃহে এসে উপস্থিত হন, তখন প্রতাপ তাকে নিজ গৃহে গ্রহণ করতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হন এবং স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে ভৃত্যদের মহলে তার স্থান নির্দেশ করে দেন। কালক্রমে শিশু দুটি একই মায়ের যত্নে যখন বড়ো হয়ে ওঠে, তখন অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে তারা পর-স্পরের অনুরক্ত। ইতিমধ্যে প্রকাশ পায়, ঐ অনাথ বালক আর কেউ নয়, দাদীমারই বিধবা পুত্রবধূর সন্তান— তিনি শাশুড়ীর আত্মীয়কলহে উত্যক্ত হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পার্বতীর স্নেহচ্ছায়ে বর্ধিত সোমু ও শঙ্কর কেমন করে দাদীমা ও প্রতাপ রায়ের বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে বিমাতা ও সপত্নীপুত্রের মধ্যে মিলন ঘটাতে সমর্থ হল, তাই নিয়েই ছবির উত্তেজক ও হৃদয়-দ্রাবী দৃশ্যাগুলি রচিত।

বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য বহু ঘটনার সমাবেশ সত্ত্বেও আবেগধর্মিতার গুণে ছবির শেষাংশের বহু পরিস্থিতিই দর্শকহৃদয়কে স্পর্শ করে এবং চক্ষুকে করে অশ্রুসজল। এ ছাড়া সোমু ও শঙ্করের সঙ্গে যথাক্রমে সগুণা ও সীমার রোমান্টিক দৃশ্যাগুলিও সাধারণ দর্শকেরা অল্প উপভোগ করেন না এবং প্রতাপের কুটিলা ভগ্নী গঙ্গার সঙ্গে তার উদারহৃদয় স্বামী মহেশের মনুষ্যো-চিত আচরণের দৃশ্যাগুলি হাল্কা হাসির খোরাক ও মানবিক আবেদনে পূর্ণ বলে অসামান্য তৃপ্তিদায়ক।

অশোককুমার, রেহমান, করণ দেওয়ান, মেহমুদ, দুর্গা খোটে, তনুজা, মমতাজ, শশীকলা, বীণা রায় প্রভৃতি যশস্বী শিল্পীর সমন্বয়ে 'দাদীমা' ছবির অভি-নয়াংশ অবশ্যই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দৃপ্ত, মর্যাদাভিমানী প্রতাপ রায়ের ভূমিকায় অশোককুমারের বলিষ্ঠ অভিনয় ছবিটির অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। এর পরই স্থান করে নিয়েছেন মেহমুদ উদারহৃদয়, সংস্কারমুক্ত পুরুষ মহেশের ভূমিকায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উপভোগ্য সুঅভিনয় করে। সোমুর প্রতি অনুরক্ত সগুণার চরিত্রে তনুজা করেছেন অত্যন্ত স্বাভাবিক দরদী অভিনয়। সোমুর ভূমিকায় কাশীনাথ বাচনে ও ভঙ্গীতে চরিত্রটির ব্যথা, বেদনা এবং জননীপ্রীতিতে মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর তুলনায় দিলীপরাজ অভি-নীত শঙ্করের চরিত্রে আবেগপ্রবণতা প্রকাশ পেলেও অভিব্যক্তি বেশ কিছুটা কম। সীমার ভূমিকায় মমতাজের সাবলীল অভিনয় চমৎ-কারিত্বে দর্শক-উপভোগ্য। মুখরা ও কুটিলা গঙ্গা রূপে শশীকলা যথারীতি সুঅভিনয় করেছেন। প্রতাপের স্ত্রী পার্বতীর বেশে বীণা রায়কে মানিয়েছিল চমৎকার, কিন্তু তাঁর অভিনয়ে আবেগ এবং অভিব্যক্তির অধিকতর প্রকাশের অবসর ছিল। নাম-ভূমিকায় দুর্গা খোটে অল্পের মধ্যে চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করেছেন অনায়াসেই। অপরাপর ভূমিকায় রেহমান (ডাঃ ভারতী), করণ দেওয়ান (দীননাথ), মোহন চোটি (মোহন), কানহাইয়ালাল (বিহারী), চাঁদ উসমানী (ডাঃ ভারতীর স্ত্রী) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। সঙ্গীতাংশ ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। মহেন্দ্র কাপুর ও মান্না দে গীত "এ মা তেরি সুরৎ সে অলগ ভগবানকী সুরৎ ক্যা হোগী" গানটি বার বার শোনবার মত।

ইস্টম্যান কলারে তোলা ঘটনাপ্রধান

সন্দীর্ঘ ছবি, প্রসাদ প্রোডাকসন্সকৃত "দাদীমা" সাধারণ দর্শকদের খুশীই করবে।

—নান্দীকর

কলকাতা

'লব-কুশ' চিত্রের শুভমুক্তি

এ বি এন প্রোডাকসন্সের আংশিক গেভাকলারে রঞ্জিত রামায়ণের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় 'লব-কুশ' এ সপ্তাহের ২৫শে নভেম্বর থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। এই পৌরাণিক কাহিনীর মুখ্যচরিত্রে রূপদান করেছেন অনিতা গুহ, অসিতবরণ, শ্রীমান শঙ্কর, শ্রীমান সুশোভন, সবিতা চ্যাটার্জি ও গোপীকৃষ্ণ। ছবিটির পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায়।

'আলোয় ফেরা' চিত্রের শুভমহরৎ

শ্রীগুরুচিত্রমের পক্ষ থেকে জ্যোতির্ময় রায় রচিত 'আলোয় ফেরা' চিত্রের শুভ-মহরৎ গত ১৯শে নভেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সাড়ম্বরে পালিত হল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ঋত্বিক শ্রীদেবকীকুমার বসু। কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বনানী চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, বিনতা রায়, রেণুকা রায়, জহর রায় ও জনিওয়াকার। ছবিটি পরিচালনা করছেন অমর লাহা। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'মহাসতী বেহুলা' চিত্রের পরিকল্পনা।

রাজা ফিল্মসের ধর্মমূলক চিত্র 'মহাসতী বেহুলা'র পরিকল্পনা সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন সুধীর ঘোষ এবং পরি দত্ত। নতুন শিল্পী সমাবেশে ছবির কাজ শুরু হবে বলে জানা গেল। পরিবেশনায় রয়েছেন বিদ্যুৎ ফিল্মস সংস্থা।

'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ' চিত্রের সংগীতগ্রহণ

মহাজাতি কথাচিত্রমের প্রথম প্রয়াস 'শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ' চিত্রের সংগীতগ্রহণ সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় গৃহীত হয়। সংগীত-পরিচালক কালোবরণের পরি-চালনায় কন্ঠদান করেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। ছবিটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন সুরেশ রায়।

'তিন অধ্যায়' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু

অপ্সরা ফিল্মসের নতুন ছবি শৈলেশ দে রচিত 'তিন অধ্যায়'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, রবীন মজুম-দার, ছায়া দেবী, ছন্দা দেবী, বঙ্কিম ঘোষ ও সুপর্ণা সেন। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার।

সিনে প্রোডাকসন্সের 'ছায়াপথ'

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল পরিচালিত সিনে প্রোডাকসন্সের নতুনতম বক্তব্যের যুগোপযোগী কাহিনী 'ছায়াপথ'র চিত্রগ্রহণ দ্রুত সুসম্পন্ন হচ্ছে। ছবির সম্পূর্ণ দৃশ্য-গ্রহণ কলকাতা ও শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহীত হচ্ছে। অভিনয়াংশে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সুমিতা সান্যাল, কণিকা মজুমদার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, এন বিশ্বনাথন, দিলীপ রায়, শিবশঙ্কর ও তরুণকুমার। পন্ডিত রবি-শঙ্কর সুরকৃত এ ছবিটির পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন সুরঞ্জনা।

বোম্বাই

বোম্বাই

'প্রিন্স' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা-শাম্মি কাপুর

ঈগল ফিল্মসের পক্ষ থেকে এফ সি মেহরা তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'প্রিন্স' চিত্রের জন্য নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত করেছেন শাম্মি কাপুর ও বৈজয়ন্তীমালাকে। আগামী মাসে ছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু হবে।

'আয়ে দিন বাহার কে' মুক্তি প্রতীক্ষিত

জে ওমপ্রকাশ প্রযোজিত ফিল্ম যুগের রঙিন চিত্র 'আয়ে দিন বাহারকে' [illegible]
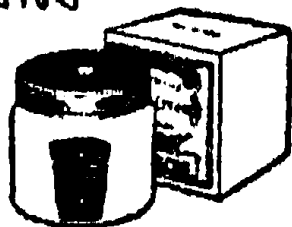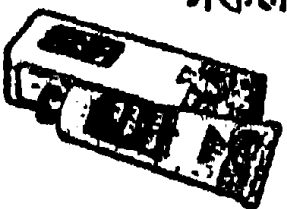
মুক্তিপ্রতীক্ষিত। কাহিনীর প্রধান চরিত্র-চিত্রণে রয়েছেন ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, নাজিমা, সুলচনা, রাজমেহরা, সবিতা চ্যাটার্জি ও রাজেন্দ্রনাথ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রঘুনাথ ঝালানী। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

'ইনসান' চিত্রের শুভমহরৎ

সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় স্ক্রীনয়েজ সংস্থার নতুন ছবি 'ইনসান'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সোনিয়া সাহনী, সঞ্জীবকুমার, জফর খান, নাজির হুসেন, নানা পালসিকর, আনোয়ার হুসেন, শেখ মুখতার, ধুমল এবং শবনম। সুরকার জয়দেব ছবিটির সঙ্গীতপরিচালক। তরুণ পরিচালক জগদীশ মুখার্জি এ চিত্রটি পরিচালনা করছেন।

শান্তি সামন্ত পরিচালিত 'পাগলা কাঁহি কা'

অজিত চক্রবর্তী প্রযোজিত ও শান্তি সামন্ত পরিচালিত রঙিন ছবি 'পাগলা কাঁহি কা'র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি রাজকমল স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। রঞ্জন বসু রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন শাম্মি কাপুর, আশা পারেখ, কে এন সিং, প্রেম চোপরা এবং হেলেন। শংকর জয়কিশন ছবিটির সুরকার।

'জাল' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ

সম্প্রতি গোয়ার পাঞ্জিব অঞ্চলে মণি ভট্টাচার্য পরিচালিত অপরাধমূলক চিত্র 'জাল'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ শুরু হল। ধ্রুব চ্যাটার্জি রচিত এ কাহিনীর প্রধান অংশে অভিনয় করছেন মালা সিনহা, বিশ্বজিৎ, সুজিতকুমার, জনি ওয়াকর, হেলেন, তরুণ বোস, অসিত সেন এবং নিরুপা রায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

মঞ্চাভিনয়

নান্দিক-এর এন্টনী কবিয়াল :

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ। আপার সার্কুলার রোড ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল থেকে ঐ বিবেকানন্দ রোড ধরে পূর্বমুখে মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পরে মাণিকতলা পুলের বাঁ পাশ দিয়ে যে নীচু রাস্তাটিকে খাল ধারের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়, সেই ক্যানাল ওয়েস্ট রোড বাঁ দিকে উত্তরমুখে মোড় নেবার পরেই মাণিকতলা পুলিশ স্টেশনের গায়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, মঞ্চটির অবস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলতে হল এই কারণে যে, এই মঞ্চে "নান্দিক" নাট্যগোষ্ঠী বর্তমানে নিয়মিত অভিনয়ের আসর বসাচ্ছেন প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এবং রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও সাড়ে ৬টায়। তাঁরা অভিনয় করছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত নতুন নাটক—"এন্টনী কবিয়াল"।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠকবৃন্দের কাছে এন্টনী কবিয়াল বা এন্টনী ফিরিঙ্গীর নাম অপরিচিত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন বিদগ্ধ সমাজ কবির লড়াইয়ের অনুষ্ঠানে উন্মত্ত ছিল, তখন ভোলা ময়রা, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওলার সঙ্গে এই বিদেশী এন্টনীর নামও সগৌরবে যুক্ত ছিল। শোনা যায়, এই এন্টনী আসলে ছিলেন পর্তুগীজ এবং তিনি তাঁর বাপের সঙ্গে নুনের ব্যবসা করতেন। বিদেশী এন্টনী কিন্তু কি জানি কেন, বাঙলা দেশকে ভালবেসে ফেলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতিকেও। ফরাসডাঙ্গার বাসিন্দা এন্টনী নাকি কোন বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে বৌবাজারে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালীই আজও ফিরিঙ্গী কালী নামে পরিচিত।

এন্টনীর এই কিংবদন্তীমূলক জীবনী অবলম্বনে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য ১৫টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ যে ত্রয়াঙ্ক নাটকখানি গড়ে তুলেছেন, তা প্রধানত আবেগধর্মী। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা সৌদামিনীর সঙ্গে এন্টনীর প্রণয় ও বিবাহ এবং সেই উপলক্ষ্যে কিছুটা আলোড়ন ও লাঞ্ছনা—এই নাট্য-কাহিনীর

সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন এন্টনীর গান গাইবার ক্ষমতার উত্তরোত্তর বিকাশের সঙ্গে তাঁর কবিয়াল হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভের কাহিনীটিকে। কখনও ভাবাবেগে এবং কখনও গানকে উপজীব্য করে তিনি আলোচ্য নাটকখানিকে মোটামুটিভাবে প্রাণবন্ত, রসপূর্ণ এবং উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। নাটকের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্মরণীয় নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

পুরোপুরি তিন ঘণ্টাব্যাপী অভিনয়ে এই নাটকটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছেন "নান্দিক" শিল্পীগোষ্ঠী। আর তা না হবেই বা কেন? পুরাতন যুগের জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং আধুনিক যুগের সবিতাব্রত দত্ত, তরুণ মিত্র, কালিপদ চক্রবর্তী, সমর চট্টোপাধ্যায়, পরিমল সেন, কেতকী দত্ত, সাধনা রায় চৌধুরী, কল্যাণী ঘোষ প্রভৃতির একত্র সমাবেশ যে কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে শ্লাঘার বস্তু। তার ওপর এই শক্তিশালী শিল্পীর যে সুসংবদ্ধ অভিনয় দ্বারা এই নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করবার জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন, তা দর্শক মাত্রেরই উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না।

নাম-ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের গান এবং আন্তরিক অভিনয়-গুণে দর্শকমাত্রকেই অভিভূত করেছেন। এন্টনীর প্রাণপ্রিয়া সৌদামিনীবেশে কেতকী দত্তের অবতরণ সমগ্র অভিনয়টিকে বিদ্যুৎ-দীপ্ত করে তুলেছে; এন্টনীর নব-পরিণীতা বধূরূপে তাঁর ভাবভঙ্গীপূর্ণ সহজ সংলাপ যে আশ্চর্য পরিবেশের সৃষ্টি করে, তা অবর্ণনীয়। তাঁর কণ্ঠের গান দুখানিও কম উপভোগ্য নয়। আমাদের বিস্মিত করেছেন, ভোলা ময়রার ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী অঙ্গভঙ্গীসহকারে কবিগান গেয়ে। জয়গোপাল চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী তরঙ্গিনীর ভূমিকায় তরুণ মিত্র ও সাধনা রায়চৌধুরী চরিত্র দুটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁদের নাটনৈপুণ্য গুণে। পর্তুগীজ কুমারী লিণ্ডারূপে কল্যাণী ঘোষকে যেমন চমৎকার মানিয়েছিল, সংবেদনশীল অভিনয়েও তিনি তেমনই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এন্টনীর প্রতি সহানুভূতিশীল মামাবাবুর ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য দর্শক-অন্তরকে স্পর্শ করতে পেরেছেন সহজেই। গেঁজেল ভজহরি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে নিখুঁত চরিত্রাভিনেতা কালিপদ চক্রবর্তীর অভিনয় কৌশলে। দাইমার ভূমিকায় সীতা মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। এ ছাড়া পরিমল সেন (জন), ডিসুজা (ক্ষিতীশ উপাধ্যায়), জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (বড় গোঁসাই), পরেশ দাস (শশীকান্ত), আশু মুখোপাধ্যায় (উমাকান্ত), সমর চট্টোপাধ্যায় (শিশির) প্রভৃতি সকলেই সমগ্র অভিনয়টিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছেন। ঢোলবাদক কেষ্টাকেও ভোলা যায় না।

দৃশ্য-পরিকল্পনা এবং আলোকসম্পাতের কৃতিত্ব তাপস সেনের। মাত্র কেন্দ্রস্থ চক্রের আবর্তনের সঙ্গে দৃশ্যান্তর ঘটার রঙ্গজগতে নিশ্চয়ই একটি অভিনব ব্যাপার। পুরনো ঢং-এর গানে উপযোগী সুর-সংযোজন এবং আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন অনিল বাগচী।

"নান্দিক" নিবেদিত 'এন্টনী কবিয়াল' যে একটি অবশ্য দর্শনীয় নাট্যাভিনয় একথা বলাই বাহুল্য।

রজনীগন্ধা

রতন ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রা' নাটকটির বারাসতের 'রজনীগন্ধা'র উৎসাহী শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি সফল মঞ্চরূপ উপস্থিত করেছেন। শহর থেকে দূরে যেসব নাট্যসংস্থা নতুন ধরনের নাট্য-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত আছে 'রজনীগন্ধা'র প্রয়াস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

...শহর থেকে দূরে একটা নির্জন পার্ক। সেই পার্কে এসে বাসা বেঁধেছে শিল্পী সনাতন, সংসারের সম্ভোগের বাসরে যার নাম ছিল শিবদাস। কোলাহলমুখর সমাজ সভ্যতা থেকে দূরে সরে এসে 'অমৃতস্য পুত্রা'র ছবি সে আঁকতে চাইছে। কিন্তু রঙ মিলছে না কিছুতেই। লোভ, বিদ্রুপ, বঞ্চনা কিছুতেই প্রাণের চিরন্তন বৃত্তিকে স্পষ্ট প্রকাশের পথে সাহায্য করতে পারছে না। সবশেষে গহন অন্ধকারের মধ্যে শিল্পীর জীবনপ্রদীপ নিভে গেলো। অসমাপ্ত ছবিকে বুকে নিয়ে জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকের কন্ঠ মর্মভেদী আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠ্‌লো 'ভগবান, আর কতোকাল'।

পার্কের বুকের ওপর বয়ে যাওয়া জীবন-প্রবাহের চাঞ্চল্য আর সবশেষে করুণ পরিণতিকে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে 'রজনীগন্ধা'র শিল্পীবৃন্দ মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। 'সনাতনে'র ভূমিকায় দিলীপ মৌলিক অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে শিল্পী হৃদয়ের নিগূঢ় যন্ত্রণা সবার সামনে মেলে দিতে পেরেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গীর মাধুর্য অভিনয়ে এনেছে প্রাণ। লতিকা দাশগুপ্তের 'শিবানী' চরিত্র চিত্রণে যথার্থ শিল্পীর স্নিগ্ধ লাবণ্য প্রতিভাত হয়েছে। অধ্যাপক চরিত্রে সোমেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অপূর্ব, বিশেষ করে শেষদৃশ্যে তাঁর মর্মভেদী আর্তনাদ ভোলা যায় না। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী কালিপদ চক্রবর্তী 'সজ্জনে'র ভূমিকায় এক অসাধারণ দীপ্তি এনেছেন। মঞ্চে তাঁর উপস্থিতির মুহূর্তগুলোই সবচেয়ে বেশী নাটকীয় গতিবেগে সমৃদ্ধ হয়েছে। রমণীমোহনের ক্রুরতা সুকু চ্যাটার্জির সাবলীল অভিনয়ে ধরা পড়েছে, কনেস্টবলের ভূমিকায় শক্তি গাঙ্গুলীর অভিনয় চমৎকার। বিদ্যুতের চরিত্র মৃণাল দাশগুপ্তের অভিনয়ে মোটেই প্রাণ পায়নি। আদর্শবাদী, সুন্দরের পূজারী বিদ্যুতের পোষাকের দিকে নাট্যনির্দেশকের নজর দেওয়া উচিত ছিল। প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তরুণ' উচ্ছলতাকে যে পরিমাণে প্রকাশ করেছে, তার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে সেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিবেক চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শ্যামল গাঙ্গুলী, বিনয় ঘটক, গোপা ব্যানার্জি, অর্জুন মজুমদার, কৌস্তুভ মুখার্জি ও চলচ্চিত্র পরিচালক দিলীপ বসু।

মঞ্চসজ্জার মধ্যে আরো একটু প্রতীকধর্মিতার প্রয়োজন ছিল। স্বপ্নের দৃশ্যের কম্পোজিশনে নাট্যনির্দেশককে আরো একটু গভীরতর চিন্তায় ডুব দিতে হবে। নির্দেশনা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতে ছিলেন শ্যামল বিশ্বাস, কাশী পাল, চিত্ত মুখার্জি, বিমল ভট্টাচার্য।

বিবিধ সংবাদ

থিয়েটার সেন্টার-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক নাট্যপ্রতিযোগিতা :

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় নাট্য-প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী ও পূর্ণ বিকশিত হবার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে থিয়েটার সেন্টার জেলাভিত্তিক নাট্যপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যাপক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা যেমন অভিনব, তেমনই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। প্রধানত দেশাত্মবোধক এগারোখানি নাটক নির্বাচিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতায় অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে যে-কোনও একখানি নাটক অবলম্বন করে প্রতিযোগী দল তাঁদের উৎকর্ষের প্রমাণ দিতে পারবেন। প্রতি জেলার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলকে যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচ শত টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। কলিকাতায় দেওয়া হবে চারটি পুরস্কার : এক হাজার, সাড়ে সাতশত, পাঁচশত এবং আড়াই শত টাকা। এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে বারান্তরে।

আমেরিকার নির্বাকযুগের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

গেল ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের অডিও-

'টিপু সুলতান' নাটকের একটি মুহূর্তে সনৎ মুখোঃ, দিলীপ বোস, মাঃ উদয় সিংহ ও মাঃ স্বরূপ বোস।

ভিস্যুয়াল অফিসার, মিস এলিজাবেথ, কে রুশোর আমন্ত্রণক্রমে কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে আমরা আমেরিকার গৌরবময় নির্বাক যুগের তিনখানির চলচ্চিত্র (১) হোয়েন দি ক্লাউডস্ রোল বাই, (২) দি ঈগল এবং (৩) ব্লাড অ্যান্ড স্যান্ড-এর কিছু কিছু অংশের মাধ্যমে সে-যুগের প্রখ্যাতনামা শিল্পী ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো, ভিল্‌মা ব্যাঙ্কী, লুই ড্রেসলার, নিটা ল্যান্ডী প্রভৃতির অভিনয় দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলুম। উপযুক্ত আবহসঙ্গীত ও নেপথ্যভাষণ ছবিগুলিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

কলিকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠান
চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার্স অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যাভিনয়

গত ১লা নভেম্বর কলিকাতার বন্দর প্রতিষ্ঠান সি, ই, ও রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের টিপু সুলতান নাটকটি বিপুল সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পিবৃন্দের অভিনয় প্রাণবন্ত হয়েছিল। শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় (টিপু), শ্রীজয়দেব চক্রবর্তী (হায়দার), শ্রীঅরুণ সেনগুপ্ত (লালী), শ্রীদিলীপ বসু (মাধবরাও নারায়ণ), শ্রীদিলীপ গুহ (ওয়েলেসলি), অপূর্ব নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেন রঞ্জিৎ শিকদার (করিমশাহ), বাসুদেব ভট্টাচার্য (শৈয়দ গফর), মাঃ উদয়কুমার সিংহ (খালেক), মাঃ স্বরূপকুমার বোস (মেয়াজুউদ্দিন)।

স্ত্রী চরিত্রে সবিতা সমাজদার (রুনী বেগম) ও প্রতিমা পালের (সাফিয়া) অভিনয়

রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত মণিপুরী নৃত্যের একটি দৃশ্য

এককথায় অপূর্ব, সে তুলনায় অজন্তা দেবী (কৃষ্ণাবাঈ) কিছুটা ম্লান।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দক্ষ পরিচালনা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। শ্রীসত্যেন লাহিড়ীর আবহসংগীত সুপ্রযুক্ত ও সুন্দর। আলো ও মঞ্চপরিকল্পনা সুন্দর।

রবীন্দ্র সদনে মণিপুরী নৃত্য

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের পরিকল্পনাস্বরূপ সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার উদ্যোগে মণিপুরী নৃত্যের একটি সুষ্ঠু ও চিত্তাকর্ষক আসর বসেছিল। মণিপুরের এই শিল্পীদল তাদের হৃদয়গ্রাহী নৃত্যসুষমা এবং শাশ্বত শিল্পরূপের যে পরিচয় তুলে ধরেছিলেন, বহুদিন যাবৎ কলকাতার বুকে তেমন কোন বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যায়নি।

দেবী নাট্য সমাজের যাত্রাভিনয়

কালীপুজা উপলক্ষে গত ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পণ্ডিতিয়া রোডে সন্ধ্যা সঙ্ঘের আসরে দেবী নাট্য সমাজের ভক্ত হরিদাস যাত্রাভিনয় হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পারষদ ও ভক্ত হরিদাস জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রেমধারা প্রবাহিত করেন। এই সুন্দর যাত্রাভিনয়ে হরিদাসের ভূমিকায় অজিত পাত্র, নিমাই মণ্ডল (রামলাল ডাকাত), শম্ভু রায় (নবাব) এবং নিমাইয়ের চরিত্রে সুজিত ভট্টাচার্য সুঅভিনয় করেন।

লোকশিক্ষার আসর

সোদপুর রবীন্দ্র ঠাকুর রোডে বাবুলালের মাঠের কালীপুজার মণ্ডপে স্থানীয় যুবগোষ্ঠীর উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী এক 'লোকশিক্ষার আসর' বিপুল উদ্যম ও নিষ্ঠার সঙ্গে বসেছিল এবং জনসম্বর্ধনা ও প্রশংসা-লাভ করেছিল। 'কালীপুজাকে উপলক্ষ করে এই-ই প্রথম এ অঞ্চলের এই ধরণের লোক-শিক্ষাকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটল।

এই আসরে প্রথম দিন : ১১ই নভেম্বর স্থানীয় তরুণ দল লাঠিখেলার বিবিধ কসরত প্রদর্শন করে আনন্দ-আয়োজনের সূচনা করেন। দ্বিতীয় দিন ১২ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্তের সভাপতিত্বে এক আলোচনার আসর বসে। বিষয়টি ছিলঃ 'মাতৃতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা'। প্রধান বক্তা অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে 'মাতৃতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা' সম্পর্কীয় অতীব জটিল বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য করে আলোচনা করেন শ্রীমনোমোহন ঘোষ ('চিত্রগুপ্ত') এবং সভাপতি শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত। আলোচনা-শেষে গানের আসর ভরে ওঠে কবি রামপ্রসাদ ও কবি নজরুল ইসলাম বিরচিত মাতৃবিষয়ক গানে। ভাবসমৃদ্ধ কণ্ঠে মাতৃনাম গান করেন অধ্যক্ষা ও সঙ্গীত-অধ্যাপিকা শ্রীমতী লতিকা দেবী চট্টোপাধ্যায় ও বেতারশিল্পী শ্রীদিলীপ ঘোষ। গানের আসরে এ'রাই ছিলেন মুখ্য শিল্পী। স্বামী বিবেকানন্দ রচিত ইংরেজি কবিতা : 'কালী দি মাদার' কবিতাটি (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত) শ্রীমনোমোহন ঘোষের কণ্ঠে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন শ্রীসুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশোভাকর চট্টোপাধ্যায়। শেষ দিনে ছিল কলকাতা আকাশবাণী শিল্পী দলের তরজা গানের আসর।

যুবগোষ্ঠী আকর্ষণীয় ও চিত্তগ্রাহী করে তোলবার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক চিত্রকাহিনী 'কালীপ্রতিমার পশ্চাৎপদটি জুড়ে দিয়েছিলেন। পশ্চাৎপটে পর্দায় প্রক্ষেপিত ও প্রতিফলিত বারোখানি স্লাইডের সাহায্যে প্রদর্শিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ লীলা-কাহিনী' বিপুল জনমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেছিল এই তিন দিন ধরেই। সোদপুরের এই যুবগোষ্ঠী সমগ্র বাংলার যুব-মানসে করণীয় কিছু কাজের হদিশ এই আসর মারফৎ পৌঁছে দেবার চেষ্টায় একটা স্মরণীয় নজির রাখলেন। সুভাষ ভট্টাচার্য, কানাই দে, উৎপল ভট্টাচার্য, বিমল ভট্টাচার্য, সুবল পাল, কেশব মল্লিক প্রমুখ নেতৃস্থানীয় যুবকদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ও প্রাণপাত যত্নে তিন-দিবসব্যাপী 'লোকশিক্ষার আসর' ও পুজো আরাধনা সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শ্রীবিমল দাস।

'গীতবিতানের' রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন

শান্তিনিকেতনের বাইরে যে কটি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে গীতবিতান'ই বোধহয় প্রামাণ্য এবং প্রাচীনতম। পঁচিশ বছর আগে ৮ই ডিসেম্বর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এই সঙ্ঘের উদ্বোধন করেছিলেন। আগামী ৮ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র সদনে গীতবিতানের রজত-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। সাত দিন-ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে প্রধান অতিথির পদ যথাক্রমে অলঙ্কৃত করবেন সর্বশ্রী অধ্যাপক সত্যেন বোস, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাদার কালো (এস জি), ফণীভূষণ চক্রবর্তী, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও সৌমেন ঠাকুর। অনুষ্ঠান-সূচী হল—৮ই ডিসেম্বর থেকে 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য, বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন, শাপমোচন নৃত্য-নাট্য, প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ রূপায়িত তাসের দেশ, মায়ার খেলা নৃত্যনাট্য এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ১৩ই ডিসেম্বর কণ্ঠ-সঙ্গীতে ওস্তাদ আমীর খাঁ, যন্ত্রসঙ্গীতে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ই ডিসেম্বর কণ্ঠ-সঙ্গীতে তারাপদ চক্রবর্তী, সেতারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

সোশ্যাল এণ্টারপ্রাইজের 'শ্যামা'

আগামী ৪ ডিসেম্বর আকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে গণেশ সিংহ প্রযোজিত সোশ্যাল এণ্টার প্রাইজের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হবে। নৃত্য ও সঙ্গীতে অংশ নেবেন আরতী ব্যানার্জী, নরেশ রায়, শক্তি নাথ, রত্না নিয়োগী, বাণী ঠাকুর, শ্যামল মিত্র, রাখাল রক্ষিত, গণেশ সিংহ এবং মলয় বীথির ছাত্রীরা।
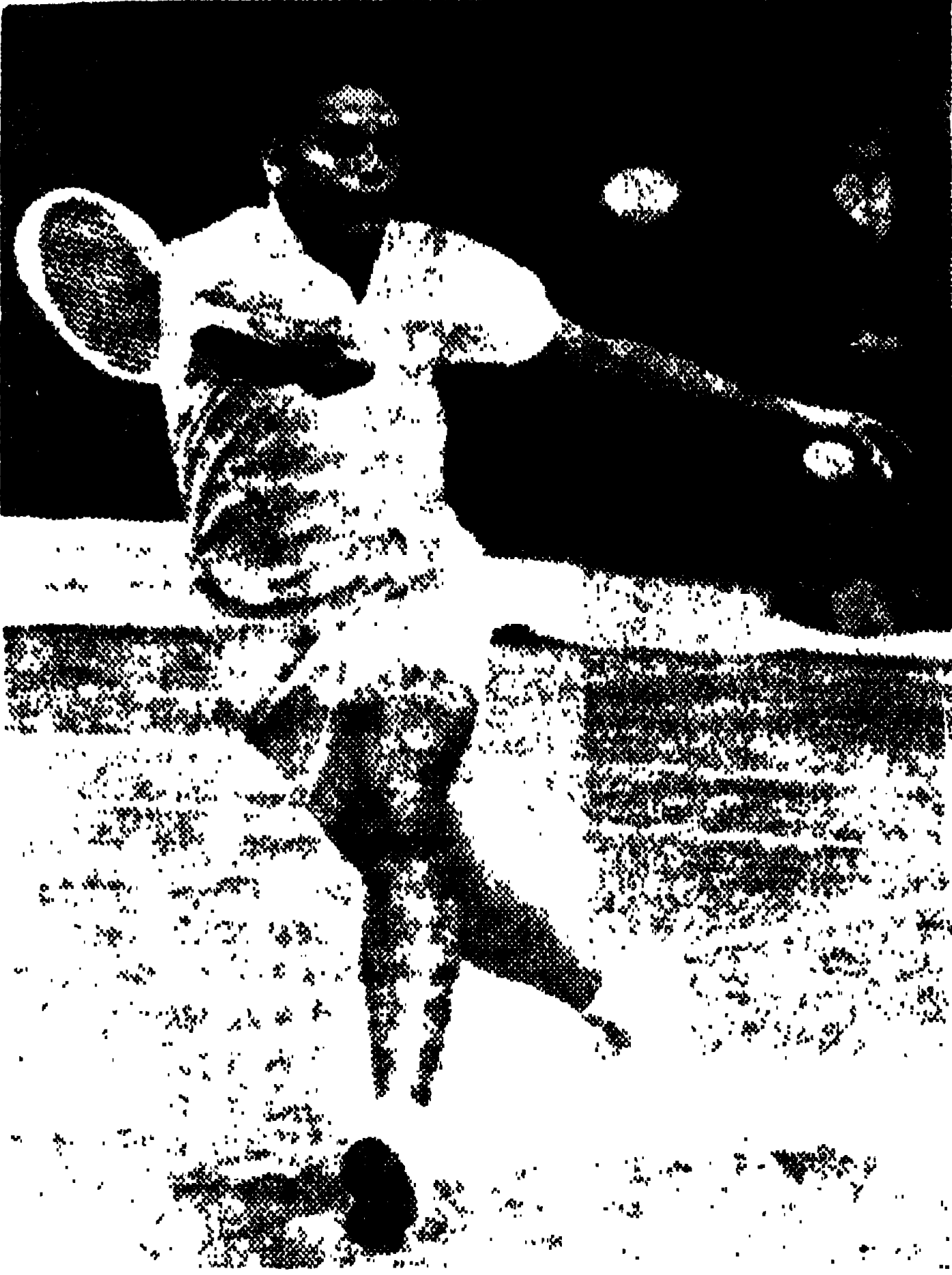
ক্রীড়ারত কৃষ্ণান

কৃষ্ণান-জয়দীপের জয়

অজয় বসু

কৃষ্ণান ও জয়দীপের জয়ধ্বনিতে সেদিন রাজধানীর জিমখানা ক্লাব কোর্ট সোচ্চার। তাই বা বলি কেন! সে ধ্বনি জিমখানা ক্লাব কোর্টের ছোট্ট পরিধি ডিঙিয়ে সারা ভারতের ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভারতের ক্রীড়াজীবনে এই জয়ের মূল্য যথেষ্ট। কৃষ্ণান-জয়দীপ ভারতীয় ক্রীড়ার শুভানুধ্যায়ীদের মনের আকাশকে নতুন আশায় রঙিন করে তুলেছেন।

কৃষ্ণান-জয়দীপের কৃতিত্বে ভারত দলগত টেনিসের সেরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে এগিয়েছে। ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে ভারতের পদক্ষেপ এই প্রথম নয়। তবুও এবারের সাফল্য ঘিরে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের বাধিত উৎসাহের হেতু কি? কিছু কারণ আছে বৈকি। মস্তো কারণ এই যে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে এগোতে এবছরে ভারতকে দস্তুরমতো যোগ্যতা ও দক্ষতার কড়ি সঞ্চয় করতে হয়েছে।

ডেভিস কাপের বিভাগীয় বিন্যাস আগে অনেকবার ভারতকে অনায়াসেই আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে এগিয়ে [illegible] সাহায্য করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে এশীয় অঞ্চলের বিজয়ীর মর্যাদায় ছিল বাছাই দলের স্বীকৃতি। তখন ইউরোপীয় ও মার্কিন মন্ডলের সেরা দলগুলি নিজেদের মধ্যে খেলতো এবং যে দল জিততো, আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার সংরক্ষিত থাকতো এশীয় অঞ্চলের বিজয়ীর। কাজেই ভারতকে সেইসব ক্ষেত্রে আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে তেমন শক্ত, সমর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে হয় নি।

এবছর হোলো। কারণ, ডেভিস কাপের বিভাগীয় বিন্যাসের রীতিটির সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ব্যবস্থায় আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে খেলেছে এশীয় ও ইউরোপীয় অঞ্চলের বিজয়ীরা এবং সেমিফাইনালের পরীক্ষায় যারা পাশ করলো তাদের সঙ্গে খেলার ব্যবস্থা আছে মার্কিনমন্ডলের সেরা প্রতিযোগীর। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে ওঠার আগে ভারতকে ইউরোপ-শ্রেষ্ঠ টেনিস দলকে হার মানাতে হয়েছে।

ইউরোপ-শ্রেষ্ঠ হলো পশ্চিম জার্মানী। জার্মানীর বুংগার্ট, বুডিং, কুনকে আন্তর্জাতিক টেনিসমহলে পরিচিত। বছর তিনেক আগে উইম্বলেডনে রয় এমার্সনকে পরাজিত করার দৌলতে উইলহেলম বুংগার্ট রীতিমতো বিখ্যাতও হয়েছেন। কুনকে পরীক্ষার জন্যে ভারতে আসতে পারেন নি। কিন্তু বুংগার্ট ও বুডিং যথারীতি হাজির ছিলেন। সুতরাং ভারতের সঙ্গে খেলার সময় জার্মানীর শক্তি বেশ কমে গিয়েছিল, একথা মনে করার কারণ নেই।

বরং ভারতের অবস্থা ছিল অনুপাতে অনেকটা অনিশ্চিত। গত বছরের পর নামকরা টেনিস কোর্টে কৃষ্ণানের বড় একটা সাক্ষাৎ মেলে নি। তার ওপর যখন তখন তাঁকে হাত বা পায়ের আঘাতে ভুগতে হচ্ছে। কৃষ্ণান কি আগের মতোই আছেন? এই প্রশ্ন প্রকট। তারওপর কিছুদিন আগে জয়দীপও কাঁধের ব্যথায় ভুগছিলেন। সুতরাং সব মিলিয়ে ভারতের অবস্থা কিছুটা অনিশ্চিত ছিল বৈকি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই অনিশ্চয়তা নিরসনে কৃষ্ণান ও জয়দীপ, দুজনেই দিল্লীর জিমখানা কোর্টে রীতিমতো বৃষকন্ধের ভূমিকা নিতে পেরেছেন।

ভারত-জার্মানীর আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে জয়ের পথে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং কৃষ্ণান। প্রথম সিঙ্গলস কৃষ্ণানে বুংগার্টে। কে জেতেন, কে হারেন, তা দেখতে এবং জানতে যখন সবাই উদ্‌গ্রীব সেই লগ্নেই এই খেলা। সুরুতে অনেক আলোচনার সুর সোচ্চার। অনেক সংশয়ে অনুরাগীদের মন অস্থির। কিন্তু সেই অস্থিরতা ঘোচাতে এবং জল্পনাকল্পনায় দাঁড়ি টানতে কৃষ্ণান যেন জিমখানা কোর্টে তাঁর পুরানো দিনকেই ফিরিয়ে আনলেন।

কোথায় গেল কব্জির যন্ত্রণা? কে বলবে, কৃষ্ণান ম্যাচ প্র্যাকটিশে বঞ্চিত! বুংগার্টকে দাঁড়াতেই দিলেন না। মাজিতে প্রথা প্রকরণ তাঁর। সূক্ষ্ম কিন্তু অপরিমিত শক্তিধর। সরাসরি তিন সেটেই ফয়সালা হয়ে গেল। বুংগার্ট লাইনচ্যুত হলেন। কৃষ্ণান সার্থক নেতৃত্ব দিলেন। প্রথম খেলাতেই জয়ের গুরুত্ব, মূল্য, প্রভাব অনেক। দলের মনোবল গড়তে, বিপক্ষের মনোবল গুঁড়োতে। সেই প্রভাবে প্রভাবিত হলেন জয়দীপ। এবার তাঁর খেলা বুডিংয়ের সঙ্গে।

দিল্লীতে এসে অনুশীলনী কোর্টে এই বুডিং স্বল্পমেয়াদী খেলায় দর্শকদের অবাক করে তুলেছিলেন। শক্ত, মজবুত চেহারা। মারেও তেমনি জোর। নামডাক অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অনুশীলনকালে আরও হাঁকডাকওয়ালা বুংগার্টকে হারাতে তাঁকে অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। দেখে বিশেষজ্ঞের দল তাঁদের পুরানো মতটা সংশোধন করে বল্লেন, ভারতের ভয় বুডিং, বুংগার্ট নন।

কিন্তু বরাভয় মূর্তি জয়দীপের। প্রথম দিকে কিছুটা বিচলিত, অনিশ্চিত। বিপক্ষে উৎসাহে বুডিং শুরু করলেন। প্রচন্ড আঘাতে একটি সেট দখল করে নিলেন চোখের পলকে।

ক্রীড়ারত জয়দীপ মুখার্জি

গেল, গেল রব উঠলো ভারতীয় ক্রীড়ানুরাগী মহলে! কিন্তু তারপর?

তারপর কাজে মন দিলেন জয়দীপ। মাপা মারের সুনিয়ন্ত্রিত বাঁধনে বুডিংয়ের ফুটন্ত উৎসাহ ও উদ্যমকে জড়িয়ে নিলেন। ক্রীড়াধারার বিন্যাসে জয়দীপ চিন্তা করেছিলেন নিশ্চয়ই। তাই প্রথাপ্রয়োগে সার্থক হয়ে উঠতেও তিনি খুব সময় নেন নি। যতো সময় অতিক্রান্ত হলো ততোই জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলেন জয়দীপ। শেষদিকে কোর্ট জুড়ে জয়দীপের প্রতিষ্ঠা। বুডিং থেকেও নেই। একনায়কের কাছে যেন আত্মসমর্পণ করেছেন।

তৃতীয় দিনেও অবিকল একই ভূমিকায় জয়দীপকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। পায়ের নীচে জমি খুঁজে নিতে সময় নিয়েছেন বটে। কিন্তু ভিতরটুকুর সন্ধানেই যা কিছু বিলম্ব। বুডিং এবং আরও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুংগার্টের বিপক্ষে জয়লাভের সূত্রে প্রথম সেট হারানো সত্ত্বেও, জয়দীপ তাঁর প্রত্যয় ও লড়িয়ে মনোভাবের নির্ভেজাল পরিচয় রেখেছেন। যে কোনো খেলার বড় আসরে বড়সড় ভূমিকা পেতে হলে লড়িয়ে মনোভাবের মূলধন জোগাড়ে রাখতেই হবে। জয়দীপ এটুকু জোগাড় করতে পেরেছেন জেনে ভারতীয় ক্রীড়ানুরাগী মাত্রেই আজ আশ্বস্ত।

ভারতের পরের খেলা ব্রেজিলের সংগে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে। ভারত এর আগে ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে খেলেছে। কিন্তু কোনোবারই আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালের বাধা টপকে বিজয়ীকে চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ জানাতে আর এক কদম আগে বাড়তে পারে নি। এবারে কি পারবে? হ্যাঁ, অথবা না বলার আগে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রেজিলের দিকে সংক্ষেপে নজর দেওয়া যাক।

ব্রেজিল অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার মতো নামডাকওয়ালা দল কোনোদিনই ছিল না। আজও নেই। তবু এবারের ডেভিস কাপে দলগত সাফল্যের নজীরে ব্রেজিল রীতিমতো চাঞ্চল্যের খোরাক জোগাতে পেরেছে। গত বছরে ভারত যে দলের কাছে হেরেছিল সেই স্পেনকে ব্রেজিল এবার হারিয়েছে এবং আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে আমেরিকার বিপক্ষেও জিতেছে। ব্রেজিল বনাম স্পেনের খেলার সময় পয়লা নম্বর স্প্যানিয়ার্ড এবং এবারের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান ম্যানুয়েল সানতানা আহত হয়ে পড়ায় ব্রেজিল অযাচিত সুযোগ পেয়েছিল সত্যি। কিন্তু আমেরিকাকে হারাতে ব্রেজিলকে কোনো দৈব ঘটনা বা ভাগ্যদেবীর অকারণ প্রসন্নতার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়নি। নিজেদের খেলোয়াড়দের যোগ্যতা, দক্ষতার মূলধনেই ব্রেজিল হারিয়েছে আমেরিকাকে।

স্বদেশীয় টেনিস সংস্থার সুনজরে ছিলেন না বলে পয়লা নম্বর ব্রেজিলীয় আর ডবলিউ বার্নস আমেরিকার বিপক্ষে খেলেন নি। তবু আন্তঃ আঞ্চলিক সেমিফাইনালে ব্রেজিল জিতেছে ৩-২ ম্যাচের ব্যবধানে।

ওয়াকেফহাল মহল নিঃসন্দেহ যে সেই খেলায় ব্রেজিল আদৌ ফাঁকতালে জেতেনি। জয়ের পথে ব্রেজিলের এডিসন ম্যানডারিনো ও টমাস কক মেহনত ও লড়িয়ে মনোভাবের মস্তো মূলধন হাতে তুলতে পেরেছিলেন। প্রথম দিনে দু দলই একটি করে খেলায় জেতে। দ্বিতীয় দিনে আমেরিকা এগিয়ে যায়। কিন্তু শেষ দিনে ম্যানডারিনো ডেনিস রলস্টন ও টমাস কক্ ক্লিফ রিচকে পরপর দুটি সিংগলসে হারিয়ে চূড়ান্ত জয়ে স্বদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় ডেনিস রলস্টনের স্বীকৃতি বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের একজন হিসেবে। তাঁকে যিনি হারাবার সামর্থ্য ধরেন তিনিও নিশ্চয়ই কম যান না। তাছাড়া পেছন থেকে এগিয়ে আসার কৃতিত্বে যাঁরা কীর্তিমান, বার্নস থাকুন না নাই থাকুন, তাঁরা থাকতে ব্রেজিলের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। সুতরাং দলগত টেনিসে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রেজিলের সামর্থ উপেক্ষণীয় নয়। পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে কৃষ্ণান-জয়দীপের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেও ব্রেজিলকে অশক্ত, হৃতবীর্য বলে মনে করা চলে না। ভারতীয় ক্রীড়ানুরাগীরা অথবা ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি সেই উচ্চমন্যতায় ভোগেন তাহলে ভুল করা হবে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা যদি কলকাতাতেই হয় তাহলে অনুকূল অবস্থার বিবিধ বাড়তি সুযোগ ভারতই পাবে।

কলকাতার লনে বল পড়ে দ্রুততর গতিতে ছোটে। এই গতির স্বরূপ ভারতীয়রা যেমন চেনেন আর কেউই তেমন চেনেন না। বল পড়ে কতোটা উঁচুতে ওঠে তাও তাঁদের মুখস্থ প্রায়। এই কোর্টেই জয়দীপ তাঁর খেলোয়াড়জীবনের দীর্ঘ মেয়াদ অতিবাহিত করেছেন। কৃষ্ণানও খেলেছেন বহুবার। অথচ এই কোর্ট ম্যানডারিনো ও টমাস ককের অদেখা। তাঁরা মূলতঃ ক্লে ও হার্ডকোর্টে মানুষ। সুতরাং কলকাতার লনে খেলা হলে বাড়তি সুবিধে কৃষ্ণান ও জয়দীপের অনুকূলে সংরক্ষিত থেকে যাবেই।

তাছাড়া অতিপরিচিত আবহাওয়া। এবং আশা করা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক নয় যে নিজেদের খেলোয়াড়দের সমর্থন জোগাতে ভারতীয় দর্শকরা কলকাতায় কৃষ্ণান-জয়দীপের পাশেই থাকবেন। চেনা মুখ ও চেনা পরিপার্শ্ব প্রতিযোগীদের মনোবল জোগাতে যে কতোবড় ভূমিকা নিতে পারে তাও সবাই জানেন। সেকথা যেমন ভারত জানে, তেমনি জানে ব্রেজিল।

দেখা যাক শেষপর্যন্ত কি হয়। যদি কলকাতাতেই খেলা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক টেনিসে ভারতের পক্ষে আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য দৃষ্টান্তকে আমরা কি আগেভাগেই স্বাগত জানাতে পারি না? হয়তো পারি। তবে সে প্রত্যাশা আপাততঃ মনের গহনেই লুকিয়ে থাকুক না কেন। কাঁঠাল যদি গাছের ডালেই ঝুলতে থাকে তখন গোঁফে তা দেওয়ার উদ্যমটি ভাল নয়। শোভনও নয়। তাই নয় কি?

যা ভাল নয় এবং শোভন নয় তার প্রভাব অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে আমরা বরং বলি, কৃষ্ণান ও জয়দীপ স্বমহিমায় আবার প্রতিভাত হোন। ম্যানডারিনো ও টমাস ককও তাঁদের ভূমিকা গ্রহণ করুন। খেলা খেলার মতোই হোক্। হারজিতে কিবা আসে যায়! কৃষ্ণান-জয়দীপ তেমন খেলতে পারলেই আমরা খুসী হতে পারবো।

ইন্টার সার্ভিসেস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাদার্ন কম্যান্ড এবং ইস্টার্ন কম্যান্ড দল ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

ইন্টার সার্ভিসেস ফুটবল

কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলের রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৬৬ সালের ইন্টার-সার্ভিসেস ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনালে সাদার্ন কম্যান্ড ৫-১ গোলে ১৯৬৪ সালের বিজয়ী ইস্টার্ন কম্যান্ড দলকে পরাজিত করে ফাইনাল খেলায় মোট ৮ বার জয়লাভের সূত্রে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিকবার ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছে। এই সামরিক ফুটবল প্রতিযোগিতাটির সূচনা থেকে সাদার্ন কম্যান্ড উপর্যুপরি ৭ বার (১৯৫৬—৬২) ট্রফি জয়ী হয়। পরবর্তী দু বছরে জয়ী হয় সেন্ট্রাল কম্যান্ড (১৯৬৩) এবং ইস্টার্ন কম্যান্ড (১৯৬৪)। দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৬টি সামরিক দল দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে লীগের খেলায় যোগদান করেছিল—'এ' গ্রুপে সাদার্ন, ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড এবং 'বি' গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স, নেভী এবং সেন্ট্রাল কম্যান্ড। 'এ' গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সাদার্ন কম্যাণ্ড (৪টি খেলায় ৭ পয়েন্ট) এবং 'বি' গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দল গোলের গড়পড়তার ভিত্তিতে প্রথম স্থান পেয়েছিল।

সেমিফাইনাল খেলায় সাদার্ন কম্যাণ্ড ৫-০ গোলে নেভী দলকে এবং ইস্টার্ন কম্যাণ্ড ৩-১ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

ফাইনাল খেলার প্রথমার্ধের ৮ মিনিটের মাথায় ইস্টার্ন কম্যাণ্ড দল প্রথম গোল দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট বিপক্ষ দলকে চেপে রাখে। খেলার ২৪ মিনিটে সাদার্ন কম্যাণ্ড দল গোল শোধ দেয়। বিশ্রাম সময়ে খেলার ফলাফল সমান (১-১) ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় সাদার্ন কম্যাণ্ড দল আরও ৪টি গোল দিয়ে ৫-১ গোলে জয়ী হয়।

কুমারী মার্গারেট স্মিথ

বর্তমান বিশ্বের টেনিস সম্রাজ্ঞী অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ প্রতিযোগিতামূলক টেনিস খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন। কুমারী স্মিথের বর্তমান বয়স ২৪ বছর। সুতরাং এই বয়সে আন্তর্জাতিক টেনিস খেলা থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ—বিশ্ব টেনিস মহলে এক অপ্রত্যাশিত এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। প্রথমশ্রেণীর আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁর গত ৭ বছরের (১৯৬০-৬৫) অসাধারণ সাফল্যের কাহিনী—আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়। একটানা আট বছর দেশ-বিদেশের টেনিস খেলায় যোগদান করে কুমারী স্মিথ আজ

আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পুরস্কার হাতে কুমারী মার্গারেট স্মিথ

খুবই ক্লান্ত—সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে টেনিসের আন্তর্জাতিক খেতাব জয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁর আজ ফুরিয়ে গেছে। তিনি যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক খেতাব জয় করেছেন তা আর কোন দেশের পুরুষ বা মহিলা খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অস্ট্রেলিয়া, ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড (ওরফে উইম্বলেডন) এবং আমেরিকা—এই ৬টি দেশের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা হল বিশ্ব টেনিস মহলে বাছাই করা প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা। এদের মধ্যে উইম্বলেডনের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের কৃতিত্ব সব থেকে বেশী সম্মানজনক—এবং তা টেনিসে বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য। কুমারী মার্গারেট স্মিথ পূর্বোল্লিখিত ৬টি প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়েছেন—এরকম কৃতিত্ব অর্জন অপর কোন পুরুষ বা মহিলা খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং কুমারী মার্গারেট স্মিথকে নিঃসন্দেহে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকস টেনিস খেলোয়াড় বলা যায়। এই সাফল্যের নিকট [illegible] [illegible] একমাত্র আমেরিকার মহিলা খেলোয়াড় ডরিস হার্ট। তিনি কেবল জার্মাণ টেনিস প্রতিযোগিতার তিনটি খেতাব (সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস) জয় করতে পারেননি।

১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে কুমারী মার্গারেট স্মিথ প্রথম আন্তর্জাতিক খেতাব লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। ১৯৬১ সালে তিনি তাঁর ১৮ বছর বয়সে টেনিস খেলা উপলক্ষে প্রথম বিদেশ সফরে যান। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত—এই ৬ বছরে কুমারী মার্গারেট স্মিথ বাছাই করা প্রথমশ্রেণীর ২৭টি আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ৭১টি বিভাগে যোগদান করে ৪৪টি খেতাব জয় করেন (গড় ৫৭)। এই হিসাবের মধ্যে আছে ১৯৬৩ সালের ১০টি, ১৯৬৪ সালের ১২টি এবং ১৯৬৫ সালের ১১টি খেতাব। তিনি সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ১৭টি—এই হিসাবে আছে অস্ট্রেলিয়ান খেতাব ৬টি (উপর্যুপরি ১৯৬০-৬৫), উইম্বলেডন খেতাব ২টি এবং আমেরিকান খেতাব ২টি। প্রথমশ্রেণীর আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতায় কুমারী স্মিথের এই ৪৪টি খেতাব জয়—পুরুষ এবং মহিলাদের পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক খেতাব জয়ের বিশ্ব রেকর্ড। কুমারী স্মিথ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একাধিকবার 'ত্রিমুকুট' সম্মানও পেয়েছেন অর্থাৎ একটি প্রতিযোগিতার একই বছরের আসরে সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় করেছেন। আন্তর্জাতিক টেনিস জগতের দুই প্রধান—উইম্বলেডন এবং আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্য—উইম্বলেডন খেতাব ৬টি (সিঙ্গলস ২, ডাবলস ১ ও মিক্সড ডাবলস ৩) এবং আমেরিকান খেতাব ৮টি (সিঙ্গলস ২, ডাবলস ১ এবং মিক্সড ডাবলস ৫)। আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি উপর্যুপরি পাঁচ বছর মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ী হয়ে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার মিক্সড ডাবলস খেতাব জয়ের রেকর্ড করেন। মহিলাদের দলগত বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতায় (ফেডারেশন কাপ) কুমারী স্মিথের ক্রীড়াচাতুর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে (১৯৬৩) আমেরিকা ফেডারেশন কাপ জয়ী হয়। পরবর্তী দু বছরে (১৯৬৪-৬৫) কাপ জয়ী হয় অস্ট্রেলিয়া। কুমারী স্মিথ এই তিন বছরের (১৯৬৩-৬৫) প্রতিযোগিতায় ১১টি সিঙ্গলস খেলায় অংশ গ্রহণ করে প্রত্যেকটিতে জয়ী হন, এমন কি একটা সেটেও পরাজয় স্বীকার করেননি। এই তিন বছরের প্রতিযোগিতায় কুমারী স্মিথের একমাত্র পরাজয় ঘটেছিল ডাবলসের ৩টি খেলায়। তাঁর এই বিরাট সাফল্যময় খেলোয়াড়-জীবনে কেবলমাত্র একটি বড় সাধ অপূর্ণ থেকে গেল—তিনি দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব পাননি অর্থাৎ একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান—এই চারটি খেতাব জয়। তিনি দু-দুবার (১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে) তিনটি করে সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে অল্পের জন্যে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারেননি। এ পর্যন্ত টেনিসের এই দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' পেয়েছেন মাত্র তিনজন খেলোয়াড়—১৯৩৮ সালে আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ, ১৯৫৩ সালে আমেরিকার কুমারী মরীন ক্যাথেরীন কনোলী (পরবর্তীকালে শ্রীমতী নরম্যান ব্রিঙ্কার) এবং ১৯৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ার রড লাভের।

কুমারী মার্গারেট স্মিথের খেলোয়াড়-জীবনে ১৯৬৫ সালই ছিল সব থেকে সাফল্যের বছর। সেই তুলনায় ১৯৬৬ সালের সাফল্য খুবই নগণ্য। কারণ কব্জির ব্যথা সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সফর শেষে তিনি আমেরিকান সফর বাতিল করে [illegible] আগস্ট মাসে স্বদেশে ফিরে আসেন।

পরলোকে জি ডি সোন্ধী

ভারতীয় ক্রীড়ামহলের অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক এবং খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ জি ডি সোন্ধী তাঁর ৭৬ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসাবে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মাটিতে অলিম্পিক গেমস আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। তারই স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩২ সালে ইন্টার ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটিতে তিনি আজীবন সভ্যপদ লাভ করেন। তিনিই ছিলেন এশিয়ান গেমসের প্রতিষ্ঠাতা।

স্টুডেন্টস হেলথ হোম টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতার ছাত্র-কল্যাণ সংস্থা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত চ্যারিটি টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে, মহারাস্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লী, বিহার এবং পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট পুরুষ এবং মহিলা খেলোয়াড়রা অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। পুরুষদের সিংগলসের সেমিফাইনালে ৭নং খেলোয়াড় রতীশ চাঁচাদ স্ট্রেট সেটে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত খেলোয়াড় গৌতম দিওয়ানকে পরাজিত করে ক্রীড়ামহলে দারুণ বিস্ময়ের উদ্রেক করেন। গত ১০ বছরে গৌতম দিওয়ান সিংগলস খেলায় ৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। প্রতিযোগিতায় আরও দুটি উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ফলাফল—মহিলাদের সিংগলস সেমিফাইনালে বাংলার ৩নং খেলোয়াড় ডেজী কাপাডিয়ার কাছে ভারতবর্ষের ৫নং খেলোয়াড় সুনন্দা কারাণ্ডিকারের এবং অবাছাই খেলোয়াড় এস ভারতনের (মাদ্রাজ) কাছে তৃতীয় রাউণ্ডে ৪নং বাছাই খেলোয়াড় পি হলদঙ্করের পরাজয়।

রতীশ চাঁচাদ

রূপা মুখার্জি

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস : রতীশ চাঁচাদ ২১-১৪, ২১-১৬ ও ২১-১৮ পয়েন্টে এস ভারতনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : রূপা মুখার্জি ২১-১৩, ২১-১৬ ও ২১-১৮ পয়েন্টে ডেজি কাপাডিয়াকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জি রঙ্গনায়কুলু এবং এন আর পিল্লাই ২১-১৩, ১৭-২১, ১৭-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৮ পয়েন্টে বি এস খাম্বাটা এবং এ ফার্ণাণ্ডেজকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস : নাচ্চু মুখার্জি ১৭-২১, ২০-২২, ২১-১৫, ২৩-২১ ও ২১-১৫ পয়েন্টে অমিত মিত্রকে পরাজিত করেন।

সুনন্দা কারাণ্ডিকার

এস ভারাতন

ডেভিস কাপ

ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল

নিউ দিল্লীর জিমখানা কোর্টে আয়োজিত ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতি-যোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন ফাইনালে ব্রেজিলের সংগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পাঁচ বছরে (১৯৬২—৬৬) ভারতবর্ষ এই নিয়ে চারবার (১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৫-৬৬) ইণ্টার-জোন ফাইনালে উঠলো। এই ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার পরবর্তী ধাপ হল চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলা। আগের পাঁচটি (১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬২, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সাল) ইণ্টার-জোন ফাইনালে পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলার সুযোগ হাত-ছাড়া করেছে। ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার বিজয়ী দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে গত দু' বছরের (১৯৬৪-৬৫) ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সংগে খেলবে। ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলার আসর বসবে
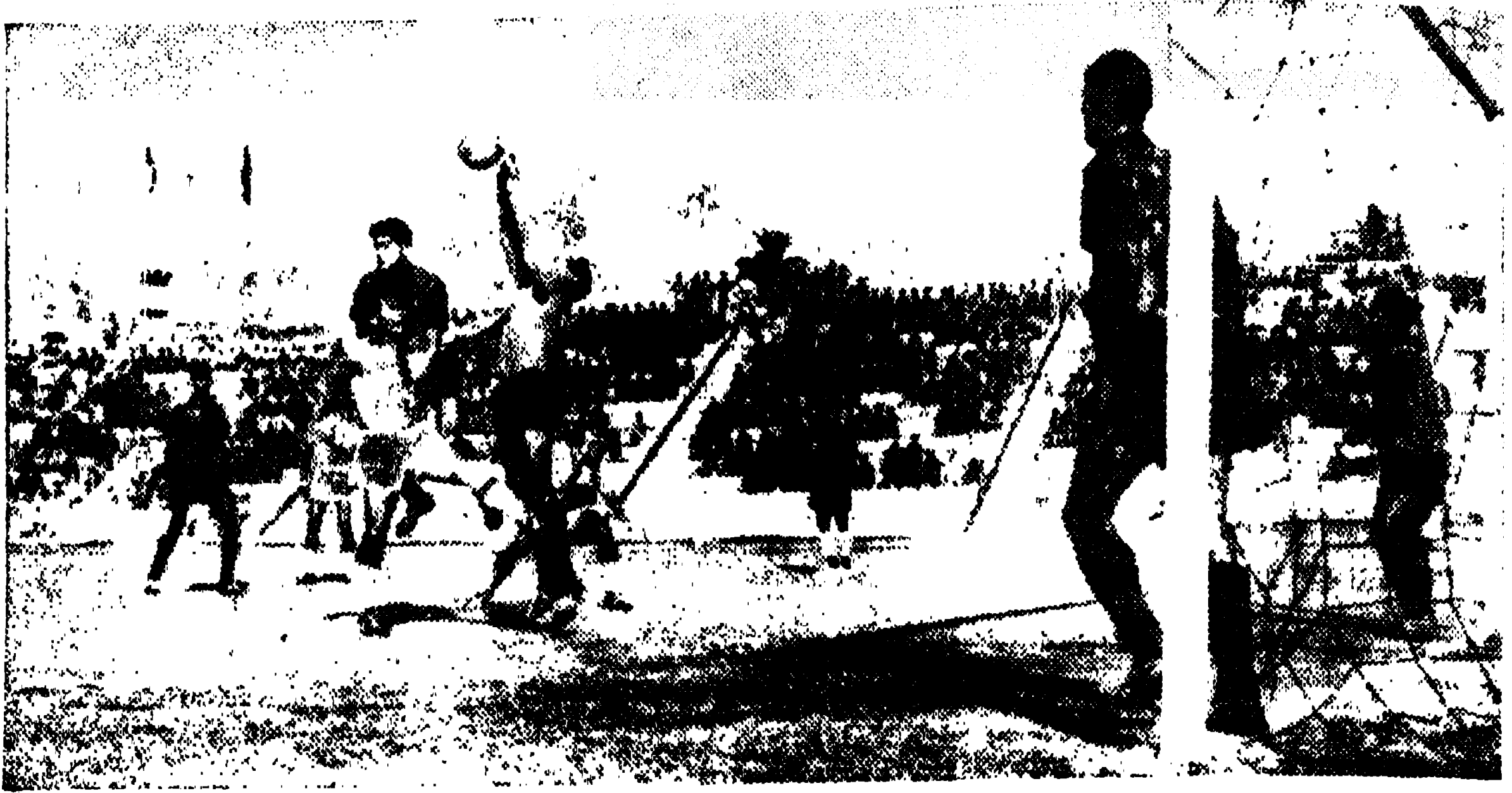
সাদার্ন কম্যান্ড বনাম ইস্টার্ন কম্যান্ড দলের ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য।

ফটো : অমৃত

কলকাতায় সাউথ ক্লাব কোর্টে আগামী ৩, ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর।

পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ভারতবর্ষের ৩—২ খেলায় জয়লাভের মূলে ছিল অভ্যস্ত তৃণাচ্ছাদিত কোর্ট এবং জয়দীপ মুখার্জির দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা। ভারতবর্ষের তিনটি জয়ের মধ্যে জয়দীপ মুখার্জি দুটি এবং অধিনায়ক রমানাথন কৃষ্ণন একটি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হন। তৃতীয় দিনের খেলায় জয়দীপ মুখার্জি বনাম পশ্চিম জার্মানীর ১নং উইলহেলম বুংগার্টের আড়াই ঘণ্টাব্যাপী লড়াই ম্যারাথন লড়াইয়ের আখ্যা লাভ করেছে। জার্মান খেলোয়াড়রা তৃণাচ্ছাদিত কোর্টে টেনিস খেলতে অভ্যস্ত নন—তাঁদের সুপরিচিত মাঠ হল ক্লে কোর্ট। এই ক্লে কোর্টে খেলার সুযোগ পেয়েই এ-বছরের ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী ৩—২ খেলায় ৩নং বাছাই গ্রেট বৃটেন এবং ৩—২ খেলায় ২নং বাছাই দেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে এই ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। ইউরোপীয়ান জোনের বাছাই তালিকায় পশ্চিম জার্মানী পেয়েছিল ৬ষ্ঠ স্থান।

প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলাতেই ভারতবর্ষ জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। প্রথম সিঙ্গলসে ভারতবর্ষের অধিনায়ক রমানাথন কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে (৭—৫, ৭—৫, ও ৬—৪ গেমে) পশ্চিম জার্মানীর ১নং খেলোয়াড় উইলহেলম বুংগার্টকে পরাজিত করেন। এই দুজনের খেলার ফলাফল নিয়ে খুব বেশী জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। কারণ এই দুজনের খেলার উপরই দুই দেশের ভাগ্য খুব বেশী নির্ভর করেছিল। এই নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কৃষ্ণান এবং বুংগার্ট পাঁচবার মিলিত হলেন। কৃষ্ণানের জয় হল এই নিয়ে তিনবার। বুংগার্টের খেলার মূলধন ছিল ক্ষিপ্রগতি-সম্পন্ন সার্ভিস এবং রকমারি স্ট্রোক। কিন্তু এই দুটি প্রয়োগ করে তিনি কৃষ্ণানকে কাবু করতে পারেননি। কৃষ্ণানের ব্যাকহ্যাণ্ড এবং ভলিতে বুংগার্ট দিশেহারা হয়ে সময়ে সময়ে পুতুলের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর কিছু করবার ছিল না। প্রথম দিনের দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় জয়দীপ মুখার্জি প্রথম সেটে ২—৬ গেমে পরাজিত হয়ে শেষ-পর্যন্ত ২—৬, ৭—৫, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে ইনগো বাডিংকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে বুংগার্ট এবং বাডিং সহজেই ৬—১, ১০—৮ ও ৬—৪ গেমে ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিতলাল জুটিকে পরাজিত করেন। ফলে ভারতবর্ষ ২—১ খেলায় অগ্রগামী হলেও পশ্চিম জার্মানীকে একেবারে খরচের খাতায় লিখতে কেউ সাহস পাননি। ডাবলসের খেলায় মুখার্জি মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। তাঁর ত্রুটিপূর্ণ খেলাই জার্মান জুটিকে আধিপত্য বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই দিনের খেলা দেখে বুংগার্টের বিপক্ষে মুখার্জি যে জয়ী হবেন, এমন ভরসা কেউ পাননি। ডাবলসে দুই দেশই খেলোয়াড় পরিবর্তন করে। কৃষ্ণানের পরিবর্তে জয়দীপ মুখার্জি নামেন। অপরদিকে জার্মান দলে হ্যারোল্ড রিওসের বদলী হয়েছিলেন বুংগার্ট।

তৃতীয় দিনে জয়দীপ মুখার্জি খেলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেন। এই দিনের প্রথম সিঙ্গলসে মুখার্জি আড়াইঘণ্টা মরণ-পণ করে পশ্চিম জার্মানীর ১নং খেলোয়াড় বুংগার্টকে ৪—৬, ৮—৬, ৮—৬ ও ৬—৩ গেমে পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। এই অবস্থায় শেষ সিঙ্গলস খেলাটির গুরুত্ব যথেষ্ট কমে যায়। কৃষ্ণানের পিঠের মাংসপেশীতে টান ধরায় তাঁকে বিশ্রাম দিয়ে তাঁর বদলে প্রেমজিৎলালকে খেলতে দেওয়া হয়। শেষ সিঙ্গলস খেলায় বাডিং ৪—৬, ৬—৩, ৩—৬, ৬—১ ও ৬—৪ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় জয়ী হয়।

মুক্ত বায়ুতে ভ্রাম্যমাণ শিবির

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের উত্তর শহরতলী কেন্দ্রের উদ্যোগে এ বছর দার্জিলিংয়ে শিশুদের মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ শিবিরের ৬ষ্ঠ বার্ষিক ছাউনি পড়েছিল। এবারের এই ভ্রমণ-পরিক্রমায় ৫২টি স্কুলের ১২৫ জন বালক-বালিকা ছিল। দলটি দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করে এবং শরীর চর্চা দ্বারা জনসাধারণকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের (উত্তর শহরতলী কেন্দ্র) উদ্যোগে মুক্তবায়ুতে বালক-বালিকাদের ব্যয়াম প্রদর্শনী

নবদ্বীপের রাসে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের একটি প্রতিমা

নবদ্বীপের অভিনব রাস

বলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

বাংলার স্বরূপকে চিনতে হলে গ্রামকে জানতে হবে। কলকাতা শহরে মাথা খুঁড়ে অনেক চোখ ধাঁধানো জমকালো জিনিস দেখা যায়, কিন্তু বাঙালী হয়ে যদি বাংলার স্বরূপকে জানতে চান, বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু অনুধাবন করতে চান তবে একটু কষ্ট করে বাংলার মফঃস্বলের দিকে পা বাড়াতেই হবে।

গ্রামবাংলার লোকোৎসবগুলোই বাংলার ধারক ও বাহক। নবদ্বীপের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাসমেলাও তেমনি বাংলা দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে অগ্রগণ্য ও অভিনব। এবার রাসের পুজো ১২ই অঘ্রাণ রবিবার, আড়ং তার পরের দিন।

কলকাতা থেকে নবদ্বীপে আসবার দুটো পথ। শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে ছোট রেলে নবদ্বীপঘাট। গঙ্গার পরপারে নবদ্বীপ ধাম। আবার হাওড়া থেকে সোজা নবদ্বীপ আসা যায় বারহবড়া লাইনে। যাতায়াতের কোন অসুবিধা নেই। সকালের ট্রেনে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে বেলা ১০টার মধ্যে নবদ্বীপে পৌঁছানো যায়। দুপুরের ট্রেন রওনা হয়ে নবদ্বীপে বেলা ৪টেয় আসা যায়। এখানে ভারত সেবাশ্রম পরিচালিত বিরাট যাত্রীনিবাস ছাড়াও রামকানাই ধর্মশালা রয়েছে তাছাড়া ছোট-খাটো আশ্রয়স্থল অনেকই আছে। আগে থেকে যোগাযোগ করে আসলে যে সুবিধা হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। নবদ্বীপে আসবার ৮ খানা, যাবার ৮ খানা ট্রেন রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ামাত্র ২ টাকা ৬০ পয়সা।

নবদ্বীপে পৌঁছেই নবদ্বীপের রাসের অভিনবত্ব আপনার চোখে ধরা পড়বে। অন্যত্র দেখেন, গোপীজন পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে, রাসমণ্ডলীতে চলে রাসোৎসব। নবদ্বীপের রাসে এই দৃশ্য বেশী চোখে পড়ে না। মন্দিরে প্রবেশ করলে অবিশ্যি প্রচুরই ঠাকুর দেখতে পাওয়া যায়। দেখবেন নবদ্বীপের শিল্পীদের তৈরী বড় বড় দেবী প্রতিমা। কোথাও নৃমুণ্ডমালিনী কালী, কোথাও মহিষমর্দিনী কোথাও মকরবাহিনী গঙ্গা, অন্নপূর্ণা, কোথাও বা যোদ্ধবেশে শ্রীকৃষ্ণ, পার্থসারথী প্রভৃতি। শিবদুর্গা ও দুর্গা-প্রতিমাও বেশ কিছু চোখে পড়বে। গোপী-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যাবে শ্রীবাসাঙ্গন-ঘাটে। নবদ্বীপধাম স্টেশনে নেমে শহরের পথে পা বাড়াতেই কিছু কিছু প্রতিমা চোখে পড়বে। কয়েক মিনিট পরেই ব্যাদড়া-পাড়ার 'শবশিবা' দেখতে পাবেন। এটাই নাকি নবদ্বীপের সবচেয়ে প্রাচীন পূজানুষ্ঠান। আর কিছুদূর এগিয়েই দেখা যাবে নবদ্বীপের সুবিখ্যাত ও সুউচ্চ 'চারিচারা-পাড়ার ভদ্রাকালী'। এই দু'খানা ছাড়া নবদ্বীপে অন্যান্য প্রাচীন পূজানুষ্ঠান-গুলোর মধ্যে তেঘরীপাড়ার 'বড়শ্যামা', আগমেশ্বরীপাড়ার 'আমড়াতলা মহিষ-মর্দিনী', মহাপ্রভুপাড়ার 'গোসাইগঙ্গা', যোগনাথতলার 'গৌরাঙ্গিনী' প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

এবার কয়েকটি প্রাচীন ও প্রখ্যাত পূজানুষ্ঠানের সামান্য বিবরণ দেয়া যাক—

(১) চারিচারাপাড়ার ভদ্রকালী—নবদ্বীপ রাসের সর্বোচ্চ ও অন্যতম প্রাচীন প্রতিমা। প্রতিবারই প্রতিমাটি ২৬ ফুট উঁচু ও প্রস্থে ১৫ ফুট হয়। এতবড় প্রতিমাকে দেখতে হলে একটু দূর থেকে মাথা উঁচু করে তবে দেখতে হবে। রামায়ণের মহীরাবণের কাহিনীর মৃন্ময় প্রকাশ এই প্রতিমাটি। রাম-লক্ষ্মণ যখন ঘুমে অচৈতন্য ছিলেন তখন মহীরাবণ ছদ্মবেশে বীরবেশে বীর হনুমানকে ভুলিয়ে রামচন্দ্রের শিবিরে প্রবেশ করে। সেই অবস্থায় মহিরাবণ মায়ামুগ্ধ করে রাম-লক্ষ্মণকে পাতালপুরীতে নিয়ে যায় বলি দেওয়ার জন্যে। হনুমান খোঁজা-খুঁজির পরে সেখানে মাছিরূপে প্রবেশ করে ছলেবলে মহীরাবণকে বধ করে মহা-মায়াকে মাথায় করে রাম-লক্ষ্মণসহ পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে আসে। হরি-সভা পাড়াতেও একখানা ভদ্রাকালী হয়।

(২) ব্যাদড়াপাড়ার 'শবশিবা' — এই মূর্তিটিই নাকি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বিশিষ্ট পন্ডিতদের নিকট জানা যায় এই মূর্তিটি নাকি তন্ত্রোক্ত ধ্যানের প্রকৃত গোপনীয় মূর্তি। শবের ওপরে শায়িত মহাকাল। আবার মহাকালের ওপরে উপবিষ্ট দক্ষিণ কালিকা। শাস্ত্রবিধি অনুসারে এই মূর্তির প্রচার নিষিদ্ধ। তবু নবদ্বীপের শাক্তরাসে এই মূর্তি প্রচারিত হয়ে আসছে কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের সময় থেকে। নবদ্বীপে আর একখানা শবশিবা হয়।

(৩) তেঘরীপাড়ার বড়শ্যামা — ভদ্রা-কালীও 'শবশিবা'র মত 'বড়শ্যামা' ও অন্যতম প্রাচীন প্রতিমা। শিবের ওপরে দন্ডায়মানা বিরাট নৃমুন্ডমালিনী কালী।

(৪) আমড়াতলার 'মহিষমর্দিনী'—এই মূর্তিটিও বহুদিন থেকে পূজিত হয়ে আসছে। বিপুলায়তন দুর্গাপ্রতিমা। মহিষাসুর বধের দৃশ্য। এছাড়া নন্দী-পাড়াতেও আর একখানা মহিষমর্দিনী হয়।

(৫) মহাপ্রভুপাড়ার 'গোসাইগঙ্গা'— অন্যতম প্রাচীন পূজানুষ্ঠান। মহাপ্রভু-মন্দিরের সেবাইত গোস্বামীরাই এই পূজানুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাই এই গঙ্গা মূর্তির নামকরণ হয়েছে 'গোসাই-গঙ্গা'।

(৬) যোগনাথতলার 'গৌরাঙ্গিনী' — বেশ প্রাচীন পুজো। অভিনবত্ব আছে।

অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি। দু'জোড়া বাঘের **ওপরে 'গৌরাঙ্গিনী'** মা দাঁড়িয়ে আছেন। **বেশ সুউচ্চ** প্রতিমা।

(৭) বুড়োশিবতলার 'বিন্ধ্যবাসিনী'— জোড়া বাঘের ওপর তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত নীলবর্ণ দেবীমূর্তি। অনেকদিন থেকে পূজিত হয়ে আসছেন। আর একখানি 'গোঁসাই-গঙ্গা' হয় শ্রীবাসাঙ্গনঘাটে।

প্রাচীন পুজোনুষ্ঠান ছাড়াও আরও কয়েকটা পুজো বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেইদিক থেকে পাঁচমাথার 'রণচন্ডী', ফাঁসীতলাঘাটের 'কৃষ্ণকালী', দন্ডপানিতলার মুক্তকেশী, দেয়াবাপাড়ার 'এলোকেশী', আলোছায়ার নিকটস্থ 'মকরবাহিনী গঙ্গা', রাধাপ্রেমের নিকটস্থ 'পার্থসারথী', পোস্টাফিসের সামনের 'কাত্যায়নী' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রাসযাত্রা হয়ে থাকে শরাদ পূর্ণিমাতে আর নবদ্বীপের রাসযাত্রা হয় কার্তিক পূর্ণিমাতে। এবার ১২ই অঘ্রাণ পূর্ণিমা পড়েছে। বাংলার বাইরে উড়িষ্যার কোন কোন জায়গা এবং নদীয়ার শান্তিপুর ছাড়া আর কোথাও এর প্রচলন নেই। শ্রীমদ অদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রপৌত্র মথুরামোহন গোস্বামী এই রাসের প্রবর্তক।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পন্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রোক্ত দেবী মূর্তির সাকার পুজোর প্রবর্তন করেন। তিনি স্বহস্তে যে কালী পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন আজও সে পুজো নবদ্বীপে আগমেশ্বরী পুজো নামে খ্যাত। পাড়াটার নামও আগমেশ্বরীপাড়া হয়ে গেছে। নবদ্বীপ শুধু তীর্থস্থান হিসেবেই নয় এককালে সংস্কৃত চর্চা ও তান্ত্রিক সাধনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বেই নবদ্বীপ তথা বাংলা দেশে তন্ত্রের মত প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমের দিকে শ্রীহট্টে চন্দ্রশেখরাদি, চট্টগ্রামে পুন্ডরীক বিদ্যানিধি, রাঢ়দেশে নিত্যানন্দ, বূঢ়নে যবন হরিদাস, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য ও নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যরা আবির্ভূত হন। এইভাবে বঙ্গভূমি যখন বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি প্রবাহে অতি ধীরে ধীরে সিঞ্চিত হতে আরম্ভ করেছিল ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু। মহাপ্রভু প্রেমের বন্যায় সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে দিলেন। কথিত আছে—শান্তিপুরে ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। নবদ্বীপ সত্যিই ভগবৎ প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। সেই রসপ্রবাহ আজও বাঙালীর মনকে সিঞ্চিত করে চলেছে ফল্গু ধারার মত। যাই হোক বৈষ্ণবদের রাসোৎসবে নবদ্বীপ খুব আনন্দ হতে থাকে। তাতে নাকি গোঁড়া শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব দেখা দিয়েছিল। তখন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে নবদ্বীপে রাস উপলক্ষ্যে শক্তিপুজো প্রবর্তিত হয়। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতগতিতে রাসযাত্রায় শক্তি-পুজো চলে আসছে।

নবদ্বীপের রাসের একটি প্রতিমা

শোনা যায় বৈষ্ণবেরা এই সময় খুব অসুবিধায় পড়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। তখন মহারাজা তাঁদেরকেও শাক্তদের সঙ্গে একযোগে শক্তিপুজো করতে নির্দেশ দিলেন। তাই তখন থেকে শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলেই একযোগে নবদ্বীপের এই অভিনব রাসোৎসবে অংশ গ্রহণ করে আসছেন। আগে সে ভাবই থাক না কেন আজ আর কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। এই উৎসব বাংলা তথা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ত বটেই বাংলার বাইরে থেকেও কিছু কিছু দর্শক এই রাসোৎসব দেখতে এসে থাকেন।

প্রায় পাঁচশ বা তদধিক রঙ-বেরঙের প্রতিমাগুলো যখন আড়ঙের দিন চোখের সামনে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন মনটা যেন কোন এক পৌরাণিক যুগে বিচরণ করতে থাকে। আগে রাস পুজোয় যে সব নোঙরামি ছিল এখন তা আর নেই বললেই চলে। এই রাসযাত্রার প্রতিমাগুলোর শিল্পনৈপুণ্য সত্যিই বড় প্রশংসনীয়। প্রতিপদের দিন যখন অসংখ্য প্রতিমা রাস্তার ওপর শোভাযাত্রা করে চলতে থাকে তখন এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয়। আড়ঙের দিন সকাল দশটা থেকেই প্রতিমা রাস্তায় নামানো হয়। ঘন ঘন বাদ্যধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা চলে অনেক রাত পর্যন্ত—তারপর প্রতিমা নিরঞ্জন হয়।

নবদ্বীপের এই রাসমেলার জনপ্রিয়তা এত বেশী যে, বেশ ক'দিন আগে থেকেই হাজার হাজার দর্শক নবদ্বীপে আসতে থাকেন। নবদ্বীপের কোথাও আর খালি জায়গা থাকে না। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রচুর আত্মীয়স্বজন সমাগম হয়। রাসমেলায় প্রচুর খুচরো ব্যবসায়ীর আনাগোনা চলে। রঙবেরঙের খেলনা, মাটির পুতুল, চানাচুর, খবারের বেলুন, ডুগডুগি, বাঁশী, চুড়ি প্রভৃতি প্রচুর বিক্রি হয়। স্থানীয় দোকানগুলো থেকেও বেশ জিনিসপত্র বিক্রি হয়ে থাকে।

রাসমেলার একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে আর সেইজন্যেই রাসমেলাকে কেন্দ্র করে অনেক খেটে খাওয়া মানুষ দু'পয়সা পেয়ে থাকেন। আমাদের একঘেয়ে জীবনে মেলার প্রয়োজন অপরিসীম। অগণিত মানবগোষ্ঠীর একটা মিলিতরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। তাছাড়া পরিচিত অপরিচিত নানা জনের দেখা মেলে, বৈচিত্র্যহীন জীবনে আসে ক্ষণিকের বৈচিত্র্য, আসে মিলনের শুভক্ষণ।

নগর-পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কিরণশশী চোখ বুজলেন।

অনেক দিন ধরে ভুগছিলেন, সময় ঘনিয়েছে এ-কথাও প্রায়ই বলতেন। তবু মৃত্যু এত কাছে এগিয়েছে এ কারো মনে হয়নি। এমনি ভুগতে ভুগতে আরো দু'-চার বছর কেটে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। চিন্তিত হবার মত বা আড়ম্বর করার মত ব্যাধির প্রকোপও খুব দেখা যায়নি। দেহগত জ্বালা-যন্ত্রণা মুখ বুজে সহ্য করতেন। মুখ খুলতে দেখা যেত শুধু বউয়ের ওপর মেজাজ বিগড়োলে।

সিতু যাবার পর থেকে মেজাজ বিগড়েই ছিল। ক'দিন ধরে নাতির জন্যে কান্নাকাটি করছিলেন খুব। কিন্তু জ্যোতিরাণীর কাছে নয়। ছেলের কাছে, কালীনাথের কাছে, গৌরবিমল এলে তাঁর কাছে। কেঁদেছেন, অনুনয় করেছেন আবার রাগও করেছেন। —ছেলেটাকে এখনো আনলি না তোরা, কবে আছি কবে নেই, কাছে দেখবও না ক'টা দিন?

জ্যোতিরাণীর সামনে চুপ। তখন অভিমানটাই বড়।

তাঁর যাবার সময় হয়েছে তখনো ভাবেননি জ্যোতিরাণী। তবে দেখতে দেখতে শরীর বেশ খারাপ হয়েছে বটে। খাওয়ার এত অরুচিও আগে দেখেননি। সমস্ত দিন-রাতও উপোসে কাটল দুই-একদিন। শিবেশ্বরকে বলেছেন। তক্ষুনি আরো বড় ডাক্তার তলব করা হয়েছে। শেষ সময়ের আভাস তিনিও দেননি। কি কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বিড়বিড় করে বলেছেন, নাতিটাকে আনার ব্যবস্থা করো বাবা, আর কিছু কষ্ট নেই।

শুনে শিবেশ্বর জ্যোতিরাণীর দিকে তাকিয়েছেন। চাউনিটা গম্ভীর, অপ্রসন্ন।

ছেলেকে আনা দরকার সেটা জ্যোতিরাণীও সেই রাতেই অনুভব করেছেন। মামাশ্বশুরকে বলেছেন, কাল সকালেই গিয়ে সিতুকে নিয়ে আসুন।

সিতু এসেছে। ঠাকুমার যে অসুখের প্রতি সে কৃতজ্ঞ, তিন দিন না যেতে সেটা যে এমন এক ওলট-পালট কাণ্ড ঘটিয়ে যাবে সে কল্পনাও করেনি। এসে অবধি বুড়ীকে আগের থেকে একটু বেশি নিঝুম মনে হয়েছে শুধু তার। কথাবার্তা কানে ঢোকেও না যেন সব। ঘুমে পেয়েছে ঠাকুমাকে। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমোয়, ঘুম ভাঙলে গায়ে হাত বোলাবার জন্যে আবার খোঁজে তাকে। এই তিনটা দিন খুব বেশি-ক্ষণ সে থাকতেও পারেনি ঠাকুমার কাছে। এতদিন অদর্শনের ফলে সকাল-দুপুরে আর বিকেলের বেশির ভাগ সময় সুবীর-দুলুর সঙ্গে কেটেছে। তাকে ঘন ঘন নিয়ে আসার ব্যাপারে ঠাকুমার সঙ্গে পরামর্শটা সময় বুঝে ধীরে-সুস্থে করলেই হবে ভেবেছিল।

কিন্তু সময় আর পেল না। চার দিনের দিন সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত বাড়িসুদ্ধ সকলকে দিশেহারার মত ছোটাছুটি করতে দেখেছে, ঠাকুমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে দেখেছে, একসঙ্গে দুটো তিনটে ডাক্তার আসতে দেখেছে।

আর ঠাকুমার শ্বাসকষ্ট দেখেছে। আর রাত প্রায় বারটার সময় তাঁকে একেবারে স্তব্ধ হতে দেখেছে।

জেনেছে এরই নাম মৃত্যু। ঠাকুমা আর জাগবে না আর কথা বলবে না।

মৃত্যুর আগে যদি অবাঞ্ছিত কোন দাগ পড়ে, সেই দাগ নাকি ক্ষতর মতই লেগে থাকে। কথাটা সম্ভবত সত্যি।

শিবেশ্বরের বিক্ষিপ্ত চিত্তে এই গোছেরই একটা দাগ পড়েছে। এই রাতেই মৃত্যু আসছে কেউ জানত না। শিবেশ্বর না, জ্যোতিরাণী না, কালীনাথ না, গৌরবিমল না। কিন্তু এই না-জানার ভিতর দিয়ে মহাযাত্রিণীর প্রতি অবহেলার একটা নীরব অথচ মর্মান্তিক অভিযোগ জ্যোতিরাণীর মাথায় এসে পড়েছে।

...এও যোগাযোগ।

বেলা দুটোর সময়ও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শাশুড়ীকে ঘুমুতে দেখে গেছেন তিনি। দু'দিন ধরে অবস্থা অবশ্য সন্দেহ-জনকই দেখা গেছে। তবু অবস্থার অবনতি কিছুই চোখে পড়েনি। বাড়ির কর্তা আর কালীদাও মোটামুটি ভালো দেখেই বেলায় অফিসে বেরিয়েছেন। মামাশ্বশুরও কাজে গেছেন।

এই সময়ে মিত্রাদির টেলিফোন। মিত্রাদির অসহিষ্ণু উত্তেজিত গলা।—কই তুমি এলে না এখনো, বাড়িতেই বসে আছ আর কতক্ষণ আমি এভাবে থাকব!

জ্যোতিরাণী হতভম্ব।—কেন? কি হয়েছে?

—কি হয়েছে!...সেই বেলা এগারোটায় টেলিফোন করেছি, শিবেশ্বরবাবু এপর্যন্ত তোমাকে কিছু বলেননি!

মিত্রাদির গলায় কান্নার সুর। কিছু একটা ঘটেছে বোঝা গেল। জ্যোতিরাণী থমকালেন একটু।—না তো...মায়ের শরীর ভালো না, ভুলে গেছেন বোধহয়।...কি হয়েছে?

—বীথির, ইয়ে—

আর শোনা গেল না। মিত্রাদি চুপ হঠাৎ।

—বীথির কি হয়েছে? বলছ না কেন? জ্যোতিরাণী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এবারে খুব চাপা গলা শোনা গেল মিত্রাদির।—টেলিফোনে বলতে পারছি না, ঘরে লোক এসে গেছে। বিশেষ কিছুই হয়েছে, তুমি এসো শিগগীর, আমার মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল—দেরি করো না।

ওধার থেকে রিসিভার রাখার শব্দ। জ্যোতিরাণী বিমূঢ় খানিকক্ষণ, তারপরেই আতঙ্ক। কি হয়েছে বীথির? কি হতে পারে? টেলিফোনে বলা গেল না কেন? হঠাৎ সাংঘাতিক কিছু অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকলে বলা যেত। তা নয় নিশ্চয়। আর কি হতে পারে? বেলা এগারোটায় টেলিফোনে কি জানিয়েছিল মিত্রাদি...আর ঘরের লোকও মিত্রাদির টেলিফোন সম্পর্কে কোনরকম উচ্চবাচ্য করল না কেন?

বেরোবার আগে মেঘনাকে শাশুড়ীর ঘরে বসিয়ে রেখে গেছলেন জ্যোতিরাণী।

গাড়িতে বসেও আতঙ্ক কমেনি জ্যোতিরাণীর। কি দেখতে চলেছেন প্রভুজীধামে জানেন না। বীথির কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ-পরা সেই স্টেশনের মুখখানাই এতদিন বাদে আবার চোখের সামনে দেখছেন তিনি। মিত্রাদির এই তাড়া আর এই গলা কেন? গোটা প্রভুজীধামে ওই এক মেয়েই বোধহয় সত্যিকারের ভালবাসা পেয়েছে মিত্রাদির। উঠতে বসতে ফিরতে তার দিকে চোখ। তার কি হল? কি হতে পারে? নিজের ওপর দিয়ে সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে বসল মেয়েটা? জ্যোতিরাণী শিউরে উঠলেন। কিন্তু পরে সে-রকম কিছুও মনে হল না। পম্মার শোক ভোলবার নয় বটে, কিন্তু মিত্রাদির দাপটে পড়ে অনেকটাই ভুলতে হয়েছিল। আড়ালে আবডালে মিত্রাদি ইদানীং বীথির নামে উল্টো রকমের দুই-এক কথা বলতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যার পরেও সেদিন ওকে ফিরতে না দেখে রাগ করেই বলেছিল, একটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা, এবারে রাশ টানতে হবে—প্রায়ই দেরি করে ফিরতে। বেশি কিছু বললে একটু-আধটু ফোঁসফাঁসও করে আজকাল, গুণ বাড়ছে—

শুনে কেন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিলেন জ্যোতিরাণী। পম্মার শোক নিয়ে বসে থাক এ চাননি বটে, কিন্তু ঠিক এ-রকম শুনতেও চাননি। বেশি এগিয়ে যদি গিয়েই থাকে তো মিত্রাদির জন্যেই গেছে সেটা আর মুখ ফুটে বলতে পারেননি। এগিয়ে দেবার তাড়ায় মিত্রাদির শাসন এক-একদিন মাত্রা ছাড়িয়েছে এ তিনি নিজেই দেখেছেন। সেদিনও মিত্রাদি মুখে যেটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে ওকে নিয়ে বেশ গর্ব আছে তাঁর। যে মেয়ে শোকের আসন পেতে বসেছিল একেবারে, নড়ে বসতে চাইত না, মুখ ফুটে কথা বলতে চাইত না—সে এখন দিব্বি হাসে, বেশ গুছিয়ে কথা বলে, পদস্থ জনের পদার্পণ ঘটলে সপ্রতিভ মুখে প্রতিষ্ঠান দেখায়, এ-পর্যন্ত চাঁদাও কম আদায় করেনি। সম্প্রতি কোন্ এক বড়লোকের কাছ থেকে আট-দশ হাজার টাকার ডোনেশান পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া গেছে নাকি—খুশিতে আটখানা হয়ে বীথির কেরামতির কথা জানিয়েছিল মিত্রাদি। প্রথম যোগাযোগ অবশ্য মিত্রাদিই করিয়ে দেয়, বীথি তারপর লেগে থেকে বেশ গুছিয়ে আদায় করে নিয়ে আসতে পারে।

পৌঁছুলেন।

গাড়ি দেখেই দারোয়ান শশব্যস্তে ফটক খুলে দিল। ভিতরে মেয়েরা কেউ বাগানে ঘুরছে, গাছের ছায়ায় বসে গল্প করছে কয়েকজন, নিয়মিত কাজেও ব্যস্ত অনেকে। জ্যোতিরাণীর চিন্তার বোঝা হাল্কা হল একটু, বড় গোছের কোনো অঘটন ঘটেছে বলে তো মনে হয় না। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না।

শুধু মিত্রাদির মুখখানা ছাড়া। অস্বাভাবিক গম্ভীর।

অফিস-ঘরে দু'-চারজন মেয়ে ছিল, তাদের বিদায় করে জ্যোতিরাণীকে নিয়ে মৈত্রেয়ী চন্দ নিজের ঘরে এলেন। তারপর নিজেই আগে ধুপ করে বিছানায় বসে পড়ে বললেন, শুনেছ? শিবেশ্বরবাবু বলেছেন কিছু?

জ্যোতিরাণী মাথা নাড়লেন, শোনেননি। তারপর ঈষৎ শঙ্কিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

—দুধ কলা দিয়ে আমরা কাল-সাপ পুষেছিলাম, বীথি চলে গেছে।

জ্যোতিরাণী বিমূঢ়।—কোথায়?

—মরতে। মৈত্রেয়ী চন্দ সক্ষোভে বলে উঠলেন, সেই মরা মরল, আমাদের মুখে চুন-কালি দিয়ে মরল—তুমি দুঃখ কোরো না, এ-রকম মেয়ে গেছে ভালই হয়েছে।

জ্যোতিরাণী নির্বাক। মিত্রাদিকেই দেখছেন। এই ভালো হওয়াটা মিত্রাদি নিজেই বরদাস্ত করতে পারছে না বোঝা যায়।

ঘটনা শুনলেন। চালচলন ইদানীং বড় বেশি দ্রুত বদলাচ্ছিল বীথির, লোকজনের
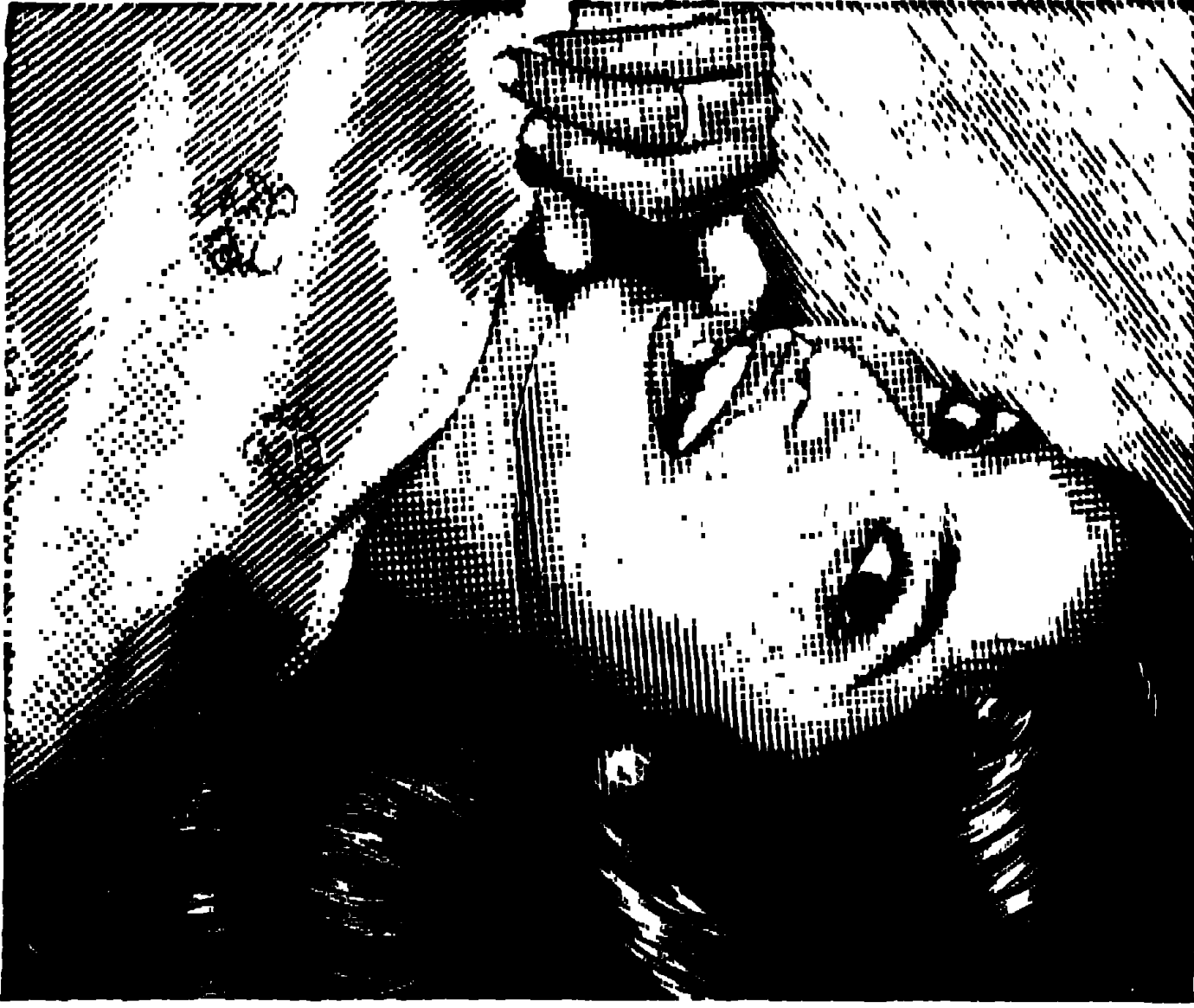
সঙ্গে মেলা-মেশা বাড়ছিল। যা করছে প্রভুজীধামের স্বার্থেই করছে ভেবে মিত্রাদি অনেক দিন লক্ষ্য করেও করেনি। পরে খটকা লেগেছে তার। বীথিকে ডেকে বুঝিয়েছে, শাসনও করেছে। শুনলে জ্যোতিরাণীর মন খারাপ হবে, লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার ওপরেও মিত্রাদির মায়া পড়েছিল—তাই তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু বীথি মাত্রা ছাড়িয়েই যাচ্ছিল। যে অবাঙালী লোকটি আট-দশ হাজার টাকা চাঁদা দেবে আশা করা গেছল—মেশামিশিটা তার সঙ্গেই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল। চুপি চুপি ক'দিন দুপুরে বেরিয়ে গেছে, সিনেমা দেখে সন্ধ্যায় ফিরেছে। দিন-তিনেক আগে বিকেলে বেরিয়ে রাত ন'টায় ফিরেছিল। মিত্রাদির জেরায় পড়ে শেষে স্বীকার করেছে সিনেমায় গেছল। সেই রাতে মিত্রাদি কঠিন শাসন করেছিল তাকে, জ্যোতিরাণীকে জানিয়ে এর বিহিত করা হবে বলেছিল। ফলে দুটো দিন চুপচাপ ছিল বীথি। তারপর কাল বিকেল থেকে নিখোঁজ। ফিরবে আশা করে রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে মিত্রাদি। তারপর গাড়ি নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আন্দাজে খুঁজবেই বা কোথায়, পাবেই বা কোথায়। অত রাতে আর টেলিফোন করে জ্যোতিরাণীর মাথায় ভাবনার বোঝা চাপায়নি। সকালে বেরিয়ে আবার দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। সেই বড়লোকের বাড়িও গেছল মিত্রাদি, না বাড়িতে নয়—হোটেলে, হোটেলেই একটা সুইট ভাড়া করে থাকত লোকটা। গিয়ে শুনল, আগের দিন সে ওখানকার বাস তুলে দিয়ে মাদ্রাজ না কোথায় চলে গেছে। মিত্রাদি বেয়ারাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, হোটেলে লোকটার সঙ্গে একজন বাঙালী মেয়েকেও দেখেছে তারা।

চিত্রার্পিতের মত বসে শুনলেন জ্যোতিরাণী। মুখে কথা সরে না। অনেকক্ষণ বাদে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে সকলে জেনেছে তো?

—পাগল! চাপা আক্রোশে মৈত্রেয়ী চন্দ বললেন, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ওই কালামুখীর খোঁজ করেছি না শোক করেছি? কাউকে জানতেও দিইনি, এক ড্রাইভার যদি কিছুটা আঁচ করে থাকে। এখানে সকলকে বলেছি, এক আত্মীয়ের খোঁজ পেয়ে বীথি সেখানে গেছে, কবে ফিরবে বা তারা আর ওকে এখানে পাঠাবে কিনা তারও ঠিক নেই।

গাড়ির কোণে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন জ্যোতিরাণী। খুব বড় একটা আশার দিক যেন পায়ে করে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে কেউ। সব জানার পরেও এ-যেন তিনি বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। আর কারো ব্যাপার হলে এমন অবিশ্বাস্য লাগত না, এতটা বিচলিতও হতেন না। বসে আছেন, কঠিন মুখে লালচে আভা। মিত্রাদির মতই বীথির প্রসঙ্গ একেবারে মুছে দিতে চেষ্টা করছেন তিনি।...কিন্তু মুখে যতই রাগ দেখাক, ভিতর পুড়ছে মিত্রাদিরও, আর নিজেও তিনি পুড়ছেন—ভিতরটা দুমড়ে ভাঙছে তাঁরও।

...সেই মেয়ে এই করল!

স্টেশনের সেই একদিনের দৃশ্য...সেই ঘটনা কি ভোলবার। বছর ঘুরতে চলল, কিন্তু মনে হচ্ছে মাত্র সেদিনের ব্যাপার—চোখে লেগে আছে, কানে লেগে আছে, অনুভূতির সঙ্গে মিশে আছে সেই একদিনের সর্বকিছু।...মাথায় খাটো ঘোমটা, কপালে আর সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, এক পিঠ খোলা লালচে চুল, খরখরে উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভদ্রতার মুখোশ-পরা এক শয়তানের ওপর—যে তাকে পিচ্ছিল নরকে টানার চেষ্টায় হাত বাড়িয়েছিল। হাতের কৌটো দিয়ে আঘাত করে করে সেই শয়তানের নাক-মুখ রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। তার পরেও পাগলের মূর্তি বীথির, দু' চোখ সে-কি ধক-ধক করে জ্বলছিল! ছুটে এসে তাঁর হাত ধরেছিল, বলেছিল, সব দিকের এত কুৎসিতের মধ্যে আপনাকে বড় সুন্দর লাগছে...আর বলেছিল, বাঁচার জন্যে এ আমরা কোথায় মরতে এলাম দিদি, কেন এলাম?

সেই মূর্তি সেই স্পর্শ সেই কথা জ্যোতিরাণী ভুলবেন কেমন করে? সেই দিনটা সত্যি, না আজ যা শুনে এলেন এটা সত্যি? দুই-ই সত্যি হয় কি করে?

...সেই বীথি এই করল?

অতটা অন্যমনস্ক না থাকলে বাড়ি ঢোকামাত্র কিছু একটা ব্যতিক্রম টের পেতেন। শূন্য পুরীতে ঢুকেছেন মনে হত। কিন্তু নিজের ঘরে এসেও বীথির কথাই ভাবছিলেন তিনি। ছেদ পড়ল মেঘনার ব্যস্ত পদার্পণে।

—বউদিমণি এই ফিরলে তুমি! ওদিকে যে হুলুস্থুলু বেধেছে, ঠাকরোন বোধহয় চলল!

জ্যোতিরাণী বিষম চমকে উঠলেন প্রথম। সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠল। এতক্ষণের ভিন্ন এক নিবিষ্টতার ওপর খবরটা এমন আচমকা ঘা দিয়েছে যে, ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক মেঘনার মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন তিনি।

সেই অবকাশে উত্তেজিত মেঘনা ঘটনা জানাবার ফাঁকে নিজের দোষও একটু লাঘব করে গেল।...বিকেল পর্যন্ত সে ঠাকরোনের ঘরের দোরেই ছিল আর সারাক্ষণ চোখ রেখেছিল। কিন্তু বুড়ীমা নিঃসাড়ে পড়ে আছে দেখে সে বিকেলের একটু কাজ সারতে আর গা-হাত ধুতে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল। ভোলাকে বলেছিল নজর রাখতে। সন্ধ্যার মুখে বাবু ফিরতে সেও পিছনে পিছনে উপরে উঠে এসেছে। বুড়ীমার ঘরে ঢুকেই বাবুরও চক্ষুস্থির, তারও। ঠাকরোন ভয়ানক ছটফট করছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে —মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, নিঃশেষ নিতে পারছে না, চোখ এক-একবার কপালে উঠছে—

মেঘনার মুখের কথা শেষ হল না, আত্মস্থ হয়ে জ্যোতিরাণী শাশুড়ীর ঘরের দিকে ছুটলেন।

কালীদা অক্সিজেনের নল ধরে বসে আছেন, ও-পাশে মামাশ্বশুর। ঘরের মাঝখানে শিবেশ্বর দাঁড়িয়ে, অন্য ধারে চিত্রার্পিতের মত সিতু। দরজার পাশে শামু আর ভোলা।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও নীরব দুই চোখের ঝাপটায় জ্যোতিরাণী বাধা পেলেন যেন। শিবেশ্বরের এই চাউনি অকরুণ নিষেধের মতই প্রায়। কিন্তু তা বলে শামু-ভোলা-মেঘনার মত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না তিনি।

একটু বাদে বাদে শিবেশ্বর চামচেয় করে মায়ের মুখে জল দিচ্ছেন। জলের পাত্রটা জ্যোতিরাণীর পাশেই। কষ্ট দেখে তিনিও একবার মুখে জল দেবার জন্য চামচের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। তার আগেই শিবেশ্বর জলের পাত্রটা নিজের হাতে নিয়েছেন। জল দিয়ে পাত্রটা একটু দূরে সরিয়ে রেখে তাকিয়েছেন স্ত্রীর দিকে। অর্থাৎ, এই শেষ সময় এটুকু তিনিই পারবেন, তিনিই করবেন।

বুকের ভিতরে কিছু একটা হচ্ছে জ্যোতিরাণীর। মুখ বুজে তার যন্ত্রণা সহ্য করছেন। কেবলই মনে হচ্ছে, একলা ঘরে এই একটু জলের জন্য শাশুড়ী অনেকক্ষণ ছটফট করেছেন। জলের পাত্রটা এই জন্যেই তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। শেষ সময়ের এই অপরাধ জ্যোতিরাণীর নিজের কাছেও ছোট নয়।

ডাক্তাররা আরো দুই-একবার আনাগোনা করে গেল। করার কিছু নেই। এখন শুধু প্রতীক্ষা। সকলে তাই করছেন।

জ্যোতিরাণী বাদে। প্রাণপণে এখনো আশা করছেন তিনি। অনিচ্ছাকৃত ওই অবহেলার বোঝাটা প্রায় মৃত্যুর মতই অসহ্য।

কিন্তু আশা যে নেই তাও জানেন।...থেকে থেকে আর এক মৃত্যুর চিত্র চোখে ভেসেছে তাঁর। শ্বশুরের মৃত্যুর। সেদিনের কথা যেন। স্তব্ধতার সেই একই চিত্র।

সেখানে এখন শিবেশ্বর বসেছেন। মামাশ্বশুর জায়গা খালি করে দিয়েছেন। এ-পাশে জ্যোতিরাণী। মাঝে শাশুড়ী।...সেবারেও শেষ সময়ে তাঁরা দুজনে দু'দিকে বসেছিলেন, মাঝে শ্বশুর ছিলেন। সেবারেও একজনের অবহেলায় মৃত্যুর স্তব্ধতা ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। অজ্ঞাত বা অনিচ্ছাকৃত অবহেলা নয় আজকের মত। শেষ সময়ে ওই লোককে তপ্ত আক্রোশে জ্যোতিরাণীর টেনে নিয়ে আসতে হয়েছিল।...সেই অন্তিম সময়ে, তারপর দুজনে দু'দিকে বসেছিলেন। নিজের অজ্ঞাতে সেদিনও জ্যোতিরাণীর দু'চোখ এই সামনের মানুষের মুখের ওপর ঘুরে এসেছে এক-একবার।

...সেদিন সেই মুহূর্তেও তিনি হৃদয় খুঁজছিলেন। মনে হয়েছিল, দুজনে দুই তীরে বসে আছেন...মাঝখানে জীবন দিয়ে সেতু গড়ছেন একজন।

কিন্তু আজ কি দেখছেন তিনি? আজ তাঁর মনে হচ্ছে, দুই তীরের মাঝে যে পলকা সেতুটা ছিল, তাও শেষ হতে চলল।

...সেদিনের সেই ইচ্ছাকৃত অবহেলার আর অস্তিত্ব নেই, দাগও নেই। কিন্তু আজকের

[illegible] হবে না।

রাত্রি বারোটার কাছাকাছি সব শেষ।

সিতুর দিকে কারো চোখ ছিল না। চোখ গেল শবদেহ নেবার আগে। জ্যোতিরাণী ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কান্না থেমে গেল। শিবেশ্বরের গাল বেয়ে ধারা নেমেছিল। তিনিও হতচকিত। আচমকা আর্তনাদ করে সিতু ঠাকুমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাগলের মত দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে তাঁকে, আগলে রাখতে চেয়েছে। সকলে বুঝি শেষ আশ্রয়টুকু ছিনিয়ে নিচ্ছে তার। তা সে নিতে দেবে না—দেবে না।

তাকে সরাবার চেষ্টায় কালীদা আর মামাশ্বশুর হিমসিম খেয়ে গেলেন। টেনে তুলে জ্যোতিরাণীর কাছে এনে দিলেন তাঁরা। কিন্তু জ্যোতিরাণীর তাকে ধরে রাখার সাধ্য নেই। এক ঝটকায় মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে আবার ঠাকুমাকে আঁকড়ে ধরতে গেল সে। হাত বাড়িয়ে এবার শিবেশ্বর টেনে আনলেন তাকে। জোর করতে হল না। এই হাতের মুঠো সিতুর শক্তি কেড়েছে।

ঘটা করে এগারো দিনের শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে গেল। শ্বশুরের সময় এর সিকিও হয়নি। অবস্থা তখন এতবড় ছিল না, যা হল তাই স্বাভাবিক বোধহয়। তবু তফাতটা মনে এসেছে জ্যোতিরাণীর। বার বার মনে হয়েছে এটা শেষ অধ্যায়, তাই তার অবসানও এত বৃহৎ।

কাজের বাড়ির ফাঁকে ফাঁকেও ছেলের দিকে চোখ গেছে তাঁর। ঠাকুমাকে ভালবাসত, শোক হতেই পারে। কিন্তু এত বড় উৎসবের মধ্যেও সেটা চোখে-মুখে এ-রকম থিতিয়ে থাকার কথা নয়, বিশেষ করে এই বয়সে। বাড়িতে যা হচ্ছে তার সঙ্গে ওই ছেলের খুব একটা যোগ নেই যেন। হঠাৎ-হঠাৎ চোখোচোখি হয়েছে তার সঙ্গে। চাউনিটা স্বাভাবিক লাগেনি তেমন। তাঁর দিকে তপ্ত দৃষ্টি রেখে ছেলে যেন কিছু একটা অশান্ত জল্পনা-কল্পনায় মগ্ন।

ওইটুকু ছেলের বুকের তলায় কোন্ ভীতির কাটা-ছেঁড়া চলেছে জ্যোতিরাণী ভাবতেও পারেন না।

যে গেল সিতু তার শোক নিয়ে বসে নেই। তার নিরাপত্তার কল্পিত দুর্গটা হঠাৎ আবার ধূলিসাৎ হয়েছে, তার অনুভূতির মধ্যে যে আশ্রয়ের অভাব-বোধ বাসা বেঁধে আছে ঠাকুমা চোখ বোজার ফলে সেটার সঙ্গেই এখন ডবল যুঝতে হচ্ছে তাকে। বাড়িতে থাকতে না দিয়ে মা তাকে অথৈ জলে ঠেলে দিয়েছে, তবু এতদিন তার কোমরে যেন একটা দড়ি বাঁধা ছিল। সেটা ঠাকুমার স্নেহের দড়ি। সেটাই বুঝি এতদিন ডুবতে দেয়নি তাকে। বার বার টেনে টেনে তুলেছে। এখন কি হবে? কে রক্ষা করবে?

[illegible] দিন ধরে, সিতুর ভিতরটা অশান্ত হয়ে ওঠে। আবার তাকে সেইখানে যেতে হবে। এদিকটা একটু ঠাণ্ডা হলেই মা তাকে আবার পাঠাবে। একটা দিন গেল মানেই একটা দিন এগিয়ে এলো। এই এগিয়ে আসাটা তার কাছে মৃত্যু এগিয়ে আসার মতই।

কল্পনায় সিতু তাই অনেক অস্ত্র শানিয়েছে। যেতে যাতে না হয় সেই অস্ত্র। মায়ের ব্যবস্থা নাকচ করে দেবার মত অস্ত্র। কিন্তু অস্ত্রগুলো কল্পনার অস্ত্রই। একটাও যে টিকবে না তাও ভালই জানে। অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাই মা-কে দেখে এক-এক সময় লক্ষ্য করে।

মনের কথা খুলে বলতে পারে এখন একমাত্র ছোট দাদুকে। বলতে পারে, ছোট দাদু আমাকে বাঁচাও, আমাকে যেতে দিও না। বলার জন্যে উন্মুখ হয়েছে কতবার। বুকের ভিতরে ঠক-ঠক হাতুড়ি পেটার শব্দ হয়েছে। কিন্তু বলতে পারেনি শেষপর্যন্ত। এইখানে তাঁর গোঁ-ও বটে, গর্বও বটে। এত ভীতু সে, এটা কেউ জেনে ফেললে সবই গেল বুঝি। আর জানার পরেও যদি জোর করে পাঠানই হয় তাকে—তখন? ছোট দাদু শুধু তার কথাই শুনবে, মায়ের কথা শুনবে না এতখানি ভরসাও তার নেই। বরং মা যখন কথা বলে, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক সকলকে তা শুনতে হয়, সেটাই দেখে অভ্যস্ত সে।

অতএব সিতু নিজের মধ্যেই শুধু অবিশ্রান্ত গুমরে চলেছে। তার এমন ভয়াবহ সমস্যা যে এক মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে কল্পনাও করেনি।

একরাশ ঠাসা অন্ধকারের মধ্যে দপ করে একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠলে কি হয়? অন্ধকারের আর লেশমাত্রও থাকে না। সিতুর সব ভাবনা-চিন্তার এই গোছেরই অবসান।

তিন সপ্তাহের কিছু আগেই জ্যোতিরাণী ছেলেকে স্কুল-বোর্ডিংএ পাঠাবার কথা ভাবছিলেন। এখানকার এই ফাঁকার মধ্যে না থেকে সঙ্গী-সাথীদের পেলে বরং ভালো লাগবে মনে হয়েছিল। সাড়া দিয়ে মামাশ্বশুর ঘরে ঢুকলেন। আমতা আমতা করে বললেন, কাল তো একবার সিতুর স্কুলে যেতে হয়—

সন্ধ্যার পরে মামাশ্বশুরকে পাশের ঘরে ঢুকতে দেখেছেন জ্যোতিরাণী। আধঘণ্টার মধ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে হঠাৎ এই প্রসঙ্গ শুনে বিস্মিত তিনি। কিছু না বলে চুপচাপ চেয়ে রইলেন।

—শিবু তো সাফ বলে দিলে সিতু বাড়িতেই থাকবে, আর কোথাও যাবে না। ওর ওই স্কুলে নিজে হাতে একটা চিঠিও লিখে দিল।

এমনই অবিশ্বাস্য যে জ্যোতিরাণী হকচকিয়ে গেলেন প্রথম।

গৌরবিমল আবার বললেন, ছ'-সাত মাস গেছে এ-বছরটার পরে যা-হয় করা উচিত—তা কথা কানেই তুলল না, কালই ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করতে বলল। কি-যে খেয়াল...

জ্যোতিরাণী নির্বাক। আর একটু অপেক্ষা করে গৌরবিমল চলে গেলেন।

খেয়াল নয় সেটা শুধু জ্যোতিরাণীই অনুভব করতে পারেন। খুব ভালো করেই অনুভব করছেন। এটা রাগ আর অনুশাসন। ছেলের ওপর নয়, তাঁরই ওপর। নাতিকে বাড়ি-ছাড়া করা হয়েছে বলে শাশুড়ী মনের কষ্টে ছিলেন।...সেই রাগ, সেই ক্ষোভ? না আর কিছু?

...কেন ছেলেকে বাড়ি থেকে সরানো হয়েছিল সেও খুব ভালো করেই জানা আছে, জ্যোতিরাণী নিজেই জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এই হুকুম। শুধু তাঁকে আক্কেল দেবার জন্যে। অনেক দিন ধরেই নিজেকে সংযমে বেঁধে রেখেছেন জ্যোতিরাণী। তবু ছেলের ব্যাপারে এ-রকম অবুঝ ঘা পড়তে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে লাগলেন তিনি। বাইরে শান্ত।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পাশের ঘরে এলেন। শাশুড়ী চোখ বোজার পর থেকে এ-ঘরের মানুষ রূঢ় বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নিজেকে আগলে রেখেছেন। শয্যায় বসেছিলেন। এই পদার্পণের জন্য মনে মনে প্রস্তুতও ছিলেন সম্ভবত।

—সিতুকে স্কুল-বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছ?

শিবেশ্বর জবাব দেবার দরকার বোধ করলেন না।

জ্যোতিরাণী আবার বললেন, বছরের অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে, এ-সময়ে ছাড়িয়ে আনলে ওর একটা বছর নষ্ট হতে পারে—

—হলে ভয়ানক গোছের কিছু অনিষ্ট হবে ভাবছ?

জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী চুপচাপ অপেক্ষা করলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে ছাড়িয়ে আনতে চাও কেন?

—ছাড়িয়ে আনতে চাই ও এখানে থাকবে বলে, এটুকু বুঝতে তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে? ওকে নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, বুঝলে?

আরো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে জ্যোতিরাণী বুঝতেই চেষ্টা করলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আশার যে আলোটা হঠাৎ বড় বেশি নিষ্প্রভ ঠেকছে তার ফলে জ্যোতিরাণী চোখেই শুধু ঝাপসা দেখছেন না, মাথার ভিতরে আর বুকের ভিতরেও কি-রকম যেন করছে। ঠিক এই মুহূর্তে যোঝার আর শক্তিও নেই বুঝি।

পরদিন ছোট দাদুর কাছ থেকেই সিতু জানল আর তাকে স্কুল-বোর্ডিং-এ যেতে হবে না। খবরটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি দুর্বোধ্য লাগল তার কাছে। আজই নাকি ছোট দাদু তার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট

আনতে যাচ্ছে—এখানকার স্কুলেই আবার ভর্তি করা হবে তাকে, বাড়িতে থেকেই পড়বে। কালী জেঠুকে বলল, দুবেলার জন্য খুব ভালো দুজন প্রোফেসার ঠিক করতে, আর তাকে শাসালো, এই ক'মাসের মধ্যে মন দিয়ে পড়াশুনা করে ভালো পাস করতে না পারলে তোর বাপ পিঠের ছাল-চামড়া তুলে নেবে মনে থাকে যেন।

তখনো সিতু জানে না এমন খবরটা বিশ্বাস করবে কি করবে না। জেঠুর গম্ভীর [illegible] বা মন্তব্য থেকেও বোঝা গেল না যা শুনল তা সত্যি কিনা। কিন্তু খানিক বাদেই বুঝল। সত্যিই বটে। বুঝল মায়ের দিকে তাকিয়ে। মায়ের এই মুখ দেখামাত্র অনেক কিছু স্পষ্ট তার কাছে। আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া গোছের এই ব্যবস্থা ছোট দাদুও করেনি, কালী জেঠুও না... এই মা তো নয়ই। করেছে বাবা। আর সেই ব্যবস্থা নড়চড় হবার নয় বলেই মায়ের ওই ফ্যাকাশে মুখ।

সিতু তারপর [illegible] দেখেছে মাকে। বুকের তলায় তার নতুন তাজা রক্তের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। চোখের কোণে চাপা উল্লাস, কারো দর্প [illegible] করতে পারার মতই চাউনিটা উদ্ধত।

ছেলের এই নিরীক্ষণের তাৎপর্য জ্যোতিরাণী কি অনুভব করতে পেরেছেন। ভিতরটা তাঁর এত অবসন্ন লাগছে কেন?

(ক্রমশঃ)

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পাউন্ড-কে £B সংক্ষেপে লেখা হয় কেন? (খ) পৃথিবীর সর্বাধিক দ্রুতগামী বিমান কোনটি এবং গতিবেগ কত? (গ) বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা হয় কিভাবে? (ঘ) পৃথিবীর কোন দেশে সর্বপ্রথম ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং কেন?

বিনীত
রত্না ও দেবাশিস ঘোষ
কলকাতা—৪

●

সবিনয় নিবেদন,

'Laser' কথাটির অর্থ কি?

বিনীত
ভাস্করদেব চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যাত্রিবাহী বিমান কোনটি? এর আসনসংখ্যা কত? (খ) 'রবিন হুড'—এর লেখক কে?

বিনীত
উৎপল মজুমদার, হিমানী নন্দী,
গৌতম ভট্টাচার্য
কলকাতা—১০

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর প্রথম ছাপান পুস্তকের নাম কি? (খ) ১৯৫০ সালে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের কোচ ও খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

বিনীত
অনুপকুমার চক্রবর্তী
তিনসুকিয়া, আসাম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ-এর ছবিগুলি কার? (খ) ইতিহাসে 'রোহিলাখণ্ড' ও 'রোহিলাদের' উল্লেখ আছে, বর্তমানে 'রোহিলাখণ্ড' কোন দেশ এবং তাদের বংশধর কারা?

বিনীত
রবিকিরণ ভট্টাচার্য
মাইথন

সবিনয় নিবেদন,

বাংলাদেশে কবে প্রথম ট্রামগাড়ী, রেলপথ, ইলেকট্রিক আলো, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয়?

বিনীত
হাসিমোহন নস্কর
২৪-পরগণা

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ভারতের সর্বমোট সৈন্যসংখ্যা কত? (খ) ভারতের বিমানসংখ্যা কত? (গ) সি-টি-সি পুরো কথাটি কি?

বিনীত
ক্ষিতীশ আইচ
আসাম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ডাকের গহনা কি? এই গহনা বা সাজের প্রচলন বাংলাদেশে কবে থেকে শুরু হয়? (খ) 'হাপু গান' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। (গ) দেশবন্ধু লোকান্তরিত হওয়ার পর একটি গান রচিত হয়েছিল 'চিত্তরঞ্জন, স্বদেশী প্রাণধন'; সম্পূর্ণ গানটি জানতে চাই।

বিনীত
রবিকিরণ ভট্টাচার্য
মাইথন

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

২৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সাগুদানা এক প্রকার গাছের ফল। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়ও তৈরী হয় অবশ্য।। ইতিপূর্বে স্বাধীনতা লাভের পরে আমাদের দেশে ডিভ্যালুয়েশন হয়েছে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে।। বিশ্বের সেরা মোটর সাইক্লিস্ট ইউলিয়ম হার বেগ ২৯০ কিমি ঘণ্টায়, ১৯৫১ সালে তিনি এই রেকর্ড স্থাপন করেন।। ডাকটিকিটের প্রথম প্রচলন হয় সিন্ধুতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে।। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দামী ডাকটিকিট বৃটিশ গায়েনার—দাম ১ সেন্ট। এখন তার মূল্য ১০,০০০ পাউণ্ড।। ভারতীয় হকি দল ৭ বার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। ১৯২৮ (কামস্টার্ডাম), ১৯৩২ (লস এঞ্জেলস), ১৯৩৬ (বার্লিন), ১৯৪৮ (লণ্ডন), ১৯৫২ (হেলসিঙ্কি), ১৯৫৬ (মেল বোর্ণ), ১৯৬৪ (টোকিও)।

বিনীত
বিদ্যুৎকুমার নিয়োগী
বি-ই কলেজ। সেনগুপ্ত হল
হাওড়া-৩

●

সবিনয় নিবেদন,

গত ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, এ-আই-এন-ই-সি: অল ইণ্ডিয়া নিউজ-পেপার এডিটরস কনফারেন্স। আই-সি-ডবলিউ-এ: ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ারল্ড এফেয়ারস।

গত ২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত রত্না ও দেবাশিস ঘোষের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভারতীয় হকি দল সাতবার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং যে যে সালে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সেই সালগুলো দেওয়া হল: ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৮, ১৯৪৮, ১৯৫২ ১৯৫৬ এবং ১৯৬৪।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত কানাই, রঞ্জিত, উৎপল, রাজু ও সুভাষ প্রমুখের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ইস্টবেঙ্গল দল একবার অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ১৯৫০ সালে।

বিনীত
শাশ্বত পাত্র
কলিকাতা—৩২

●

সবিনয় নিবেদন,

২২ সংখ্যায় প্রকাশিত শিখু ও স্বপনা দাসের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভারতীয় সৈনাবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ।

বিনীত
অশোককুমার ব্যানার্জি
কলকাতা—৩৩

●

সবিনয় নিবেদন,

২২ সংখ্যায় প্রকাশিত বাবলু দাস ও বাচ্চুর (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিনেমা হল হচ্ছে নিউইয়র্কের রক্সি—আসন সংখ্যা ছ' হাজার।

বিনীত
আশীষকুমার সিংহ
পাটনা—৪

●

সবিনয় নিবেদন,

২৫ সংখ্যার শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায়-এর (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, স্যর রোলাণ্ড হিলের চেষ্টায় বিলাতে ৬ই জানুয়ারী ১৮৪০ খৃঃ ডাকটিকিটের প্রচলন হয়।

একই সংখ্যায় রত্না ও দেবাশিষ ঘোষের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, বৃটিশ গায়েনার ডাকটিকিট বর্তমান সবচেয়ে বেশী দামী। এর বর্তমান দাম ১০,০০০ পাউণ্ড।

বিনীত
আশীষকুমার সিংহ
পাটনা—৪

●

সবিনয় নিবেদন,

২২শ সংখ্যায় প্রকাশিত শিখু ও স্বপ্না দাসের (খ) প্রশ্নের উত্তর নীচে দেওয়া হল। (খ) এশিয়া মহাদেশে প্রথম বিজ্ঞানে কালিংগ পুরস্কার পান ভারতের জগজিৎ সিং ১৯৬৩ সালে।

বিনীত
গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা—৩১

মুক্তিক্ষেত্র মুক্তিনাথ

ভক্তি বিশ্বাস

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

শিখার আরামদায়ক ঘরখানিতে গালিচা ঢাকা শয্যায় মিঃ বিশ্বাস আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। এখন ধৌলাগিরির ওই অপরূপ তুষারসজ্জা দেখে তার ছবি তুলছেন। একেলেই জানালার ধারে বসে সেই অসীম সৌন্দর্য উপভোগ করছি। দাদা সর্বঘটে আছেন। আমাদের দুজনার সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দিচ্ছেন, ঠাট্টা করছেন, ও'কে ছবি তোলা বাৎলাচ্ছেন, ওদিকে বন্ধুকে দুষ্টু বুদ্ধি দিচ্ছেন, কি করে তার ছোটমামাকে ঠকিয়ে চা ও কফি দুটোই খাওয়া যায়! সঙ্গে আলুপোড়া পাওয়া যাবে, না ভুট্টাভাজা আর চকোলেট, সেই তার বর্তমান সমস্যা। বন্ধুর অবশ্য সবগুলি একত্রে হলেও আপত্তি নেই। দাদার সম্মুখে মস্ত সমস্যা, ওই চকোলেট, শুকনো মটরশুটি, বিস্কুটগুলি তো এখনো খেয়ে শেষ করা গেল না, ওগুলি কি শেষ পর্যন্ত আবার বয়ে বয়ে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে? আমার গৃহিণীপনার দিকে কটাক্ষ করে চলেছেন।

ধৌলাগিরি দেখতে দেখতে খাঁটি গরম দুধে তৈরী কফির গ্লাস হাতে গল্প জমে উঠে। দাদা বলেন,

মধ্য নেপালে অবস্থিত এই ধৌলাগিরি শৈলশ্রেণীর ১নং শিখরটি সর্বপ্রথম আরোহণ করেন Norman G. Dynrenfurth প্রমুখ দশজন পর্বতারোহী, ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ও ২৩শে মে তারিখে। নেতা ছিলেন Mase Eiselin একজন সুইস পর্বতারোহী। এই শিখরটির উচ্চতা ২৬,৮১০ ফুট।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী রোমাঞ্চকর হল অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ (১) (২৬,৫০৩) বিজয়ের কাহিনী। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী আলপাইন পর্বত-সংস্থা থেকে এই পর্বতারোহণের চেষ্টা করা হয়। এঁদের মত ছিল, হয় জয় না হয় মৃত্যু, পরাজয় কদাচ নয়। Maurice Herzog -এর নেতৃত্বে এই দল তুকনওয়া-পোখারা-তুকুচে হয়ে সর্বপ্রথম ধৌলাগিরি আরোহণ করবার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা করেন। কিন্তু ঐদিক থেকে ধৌলাগিরি শৃঙ্গ আরোহণ অসম্ভব বিবেচনা করে তাঁরা অন্নপূর্ণার ১নং শিখরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। বহু কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করবার পর Herzog, ও Lachenel এরা দুজনে এই শৃঙ্গটি আরোহণ করতে সমর্থ হন। আট হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু শিখর আরোহণ জগতের ইতিহাসে এই প্রথম। অবরোহণকালে উভয়েরই হাত-পায়ের আঙুল তুষারক্ষতে আক্রান্ত হয়। পরে এঁদের আঙুলগুলি কেটে ফেলতে হয়।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে মধ্য নেপালের ২৬০৪১ ফুট উঁচ অন্নপূর্ণা ২) শিখর আরোহণ করেন Lt. Col. J. O. M. Roberts এর নেতৃত্বে R. G. Grant, C. G. Bonnington ও আংনিমা। দলটি ছিল সর্বভারতীয় নেপালী-বৃটিশ-দল, ভারতীয়দের পক্ষ থেকে Capt. M. A. Soarres (ডাক্তার) ও Capt. Jagjit Sing যোগদান করেন।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে একটি জার্মান দল আসেন Her H. Steinmets -এর নেতৃত্বে অন্নপূর্ণা (৪) আরোহণ করতে। তাঁদের মধ্যে H. Biller ও J. Wellenkemp শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হন।

অন্নপূর্ণা শৈলমালার যে শৃঙ্গটি 'গণেশ' বা 'অন্নপূর্ণা সাউথ' বলে পরিচিত সেটি আরোহণ করেন ১৯৬৪ সালে জাপানের কিয়োটো ইউনিভার্সিটির পর্বতারোহীর দল। Prof. H. Higuchi -র নেতৃত্বে, নেতাসহ M. Kimura, U. Ageta ও দুজন শেরপা শৃঙ্গে আরোহণ করতে সমর্থ হন।

দাদা বলেন—কিন্তু ভারতীয়রাও যে পেছিয়ে নেই বা চুপ করে বসে নেই, তা জানা যায় বিশেষ করে অজানা পথে প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়ে সর্বপ্রথম অন্নপূর্ণা (৩) শৃঙ্গ আরোহণের সম্মান লাভ করেন ১৯৬৫ সালে অধুনা এভারেস্ট বিজয়ী-দলের নেতা এম এস কোহলি ১৯৬১ সালের ৬ই মে। নেতাসহ সোনাম্ গিয়াৎশো এবং শেরপা সরদার সোনাম্ গিরমি এই শৃঙ্গ আরোহণ করেন।

'যতদূর জানা যায়, ধৌলাগিরির অন্যান্য আরও চারটি শিখরে এখনো মানষের পদার্পণ ঘটেনি। দুটি দল ইদানীং যাবার চেষ্টা করছে।'

আজ ৮ই অক্টোবর। আজও প্রত্যুষে দাদার স্নেহময় কণ্ঠের ডাকে উঠে পড়েছি, তুষারধবল ধৌলাগিরির উপর প্রথম আলোক-সম্পাত দেখতে। কাল রাত্রে শোবার আগে চাঁদের আলো তুষারশিখরের উপর পড়ে যে মোহিনী মায়ার সৃষ্টি করেছিল তার নেশা আজও কাটাতে পারছি না। তাই প্রত্যুষে দাদার এক ডাকেই সকলে উঠে পড়েছি। জানালা দিয়ে নতুন সূর্যের নরম আলোয় আবিরের রং এ রাঙানো ধৌলাগিরি তুষারশৃঙ্গের অলৌকিক রূপ-রাজি আর একবার দর্শন করে নিই।

শিখা বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অন্যান্য গ্রামের মত এখানেও চারিদিকে শস্যক্ষেত ঘেরা। ধাপে ধাপে ক্ষেত পাহাড়ের নীচ থেকে চূড়া অবধি উঠে গেছে। সবুজ হয়ে আছে চারিদিক। ছিমছাম বাড়ীগুলি ঘিরে সব্জী ক্ষেত, কুমড়ো, বীন, শসা, টমাটো লাউ লাগানো, কলাগাছও অজস্র। মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ীর একাংশে অজস্র ডালিয়া, কসমস, গাঁদা ফুটে আলো হয়ে আছে। একটু বেলা হতেই দলে দলে ছেলেমেয়েরা ক্ষেতের কাজ করতে পথে বের হয়েছে।

শিখা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই 'ঘাড়' গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে পায়ে চলা সমতল সরু পথ। 'ঘাড়' পার হয়ে অসমতল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উঁচুতে উঠে এলাম। এখানটা যেন একটা ছোটখাট গিরিসংকট। গিরিসংকট পার হয়ে আবার তেমনি অসমতল পাথরের সিঁড়ি, সোজা নীচে নেমে গেছে ঘাড়খোলা ও কালীগণ্ডকী নদীর সঙ্গমের দিকে। প্রায় দেড় হাজার ফুট একটানা উৎরাই। নামতে তেমন কষ্ট নেই, তাই বেশ দ্রুত চলেছি। পাহাড়ের উঁচু থেকেই দেখতে পাচ্ছি পিঁপড়ের সারির মত একদল যাত্রী ঘাড়খোলা নদী পার হয়ে চড়াই বেয়ে কষ্টে উঠছে।

পাহাড়ের গায়ে স্তর স্তর সবুজ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে লাল মাটির পথ চলেছে। পথের ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর অন্তর চৌকোনা পাথরের বাঁধানো স্তূপের মত। পথিকদের বিশ্রামের জন্য এগুলি তৈরী করা। তারই আসনের মত ধাপে বসে প্রয়োজন অনুসারে বিশ্রাম করে নিচ্ছি। কোথাও কোথাও ধস নেমে পথ নষ্ট হয়ে গেছে, রাস্তা ভেঙে একাকার, সেখানে অতি সাবধানে দাদার পিছু পিছু পার হচ্ছি। আগাগোড়া পাহাড়টাই ক্ষেতভরা, মাঝে মাঝে দুটি একটি ঘর ইতস্ততঃ ছড়ানো। অনেকটা নীচে নামবার পর, উপর থেকেই দেখি যেন কালীগণ্ডকীর উপরের ব্রীজটা ভাঙা মত, তাছাড়া যাত্রীরা নদীর যেখান দিয়ে পার হয়ে এসেছে সে পথ আমরা ভুল করে আগেই ছেড়ে এসেছি। তাই আমাকে থামতে বলে দাদা এগিয়ে গেলেন। আমি একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে বিশ্রাম করছি, মিঃ বিশ্বাস আর বন্ধুর কোন পাত্তাই নেই, ওরা যে কত পিছনে কে জানে!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দাদার কোন সাড়া পাচ্ছি না, তাই ওই পথেই এগোতে সুরু করলাম। একটু এগোতেই দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে দাদা আসছেন, উনি পথে কোন লোকের দেখা পাননি, তাই পুরো পথটাই নেমে ব্রীজের অবস্থা দেখে আবার উঠে এসেছেন।

আরও খানিকটা নেমে একটা বাঁকের মুখে ঘাড়খোলা ও কালীগণ্ডকীর সঙ্গম দেখতে পেলাম। ওখানেই প্রথম নীলগিরি শৃঙ্গের প্রথম দেখা পেলাম। দুটি সবুজ শৈলমালার সংযোগস্থলে তুষারশুভ্রশিখরটিকে দেখা গেল। বাঁয়ে ধৌলাগিরি, ডাইনে অন্নপূর্ণা, এই দুটি শৈলমালার মাঝখান দিয়ে পথ করে কালীগণ্ডকী নদী বয়ে এসেছে আমাদের কাছ অবধি। দুটি পর্বতমালাকে যেন যোগ করে নীলাভ তুষারের ধবল উজ্জ্বল রূপ নিয়ে নীলগিরি শিখর দাঁড়িয়ে—ওই শিখর, অন্নপূর্ণারই একটি বিখ্যাত শিখর। যে পথের স্বপ্ন এতকাল দেখেছি নিদ্রায় জাগরণে, সেই পথ এখন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত!

আর একটু নীচে নামতেই একটি আমেরিকান দম্পতির সঙ্গে দেখা, এসেছেন নেপালের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁরা দাদার সঙ্গে বসে পড়লেন, আমি ছবি তুলে

নেবো। এ'দের পিছনের পটভূমিতে রইল সবুজ উত্তুঙ্গ দুটি শৈলমালার মধ্যে তুষারমৌলী শিখর নীলগিরি, তার স্থল-জলে রূপ নিয়ে, পারের কাছে সঙ্গমের নীল সফেন জলধারা বয়ে চলেছে।

পর্বতারোহণের ইতিহাস থেকে জানা যায়, দুর্গম নীলগিরি বহুকাল ধরে অজেয় ছিল। ওলন্দাজ পর্বতারোহীরা সর্বপ্রথম এই শিখর আরোহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী এলবার্ট এগ্‌লারের নেতৃত্বে তিনজন ওলন্দাজ, শেরপা ওয়াংদি ও ফরাসী পর্বতারোহী লাওনেল ট্যাবী ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর এই শিখরে সর্বপ্রথম আরোহণ করেন। পর্বতারোহীদের পরম আকাঙ্ক্ষার সেই দুর্গম শিখর এখন নীলাভ উজ্জ্বলরূপে আমাদের সামনে দেখা যাচ্ছে।

ঘাড়খোলা নদীর উপর দুটি গাছের গুঁড়ি পেতে বিপজ্জনক পোল তৈরী করা। একটু দূরে নদীটি কালীগণ্ডকীতে আত্ম-সমর্পণ করেছে। আমরা দুজন অভ্যস্ত পদক্ষেপে পার হয়ে এসেছি। তবু দাদা তাঁর অকুণ্ঠ সাহায্যদানে অগ্রসর হয়ে এসেছেন। সঙ্গমের উপর নদীর এপারে একটি মন্দির, অন্য তীরে "তাত্‌পানি" গাঁয়ের প্রথম ঘরখানি দেখতে পেলাম।

মাত্র সোয়া ন'টা বেজেছে, কিন্তু ভীম-বাহাদুরের নির্দেশমত আজ এখানেই দুপুরে খাওয়া সেরে "দানা"র পথে যাত্রা করতে হবে। মাঝপথে থাকবার মত সুবিধা-জনক ঘরের অভাব হতে পারে, তাই এই সাবধানতা। আমরা আরও কিছুদূর এগোতে রাজী ছিলাম, কেবল অসুবিধার ভয়ে সাহস পেলুম না। তাছাড়া এই সঙ্গমটির সৌন্দর্য আমাদের বারবার আকর্ষণ করছিল। পাহাড়ী বন্য স্রোতস্বিনীর সহজাত উদ্দাম রূপ নিয়ে ঘাড়খোলা নদী এসেছে, উচ্ছল হয়ে উঠেছে তার স্রোতধারা অসংখ্য প্রস্তরের বাধা ডিঙোতে গিয়ে। একটু দূরে এই উদ্দাম ধারা শান্ত হয়েছে বৃহতের কাছে বিলীন হতে পেরে।

এতদিন পর আমরা পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-ময় পথে প্রবেশ করলুম। রূপসী কালী-গণ্ডকীর দর্শনও আজ এই প্রথম। ঘন সবুজ বনের সমারোহ দুধারের দুটি পর্বতমালার গায়ে, তারই মাঝখান দিয়ে বিশাল চওড়া শুভ্র পথ বয়ে এসেছে চঞ্চলা নীলাম্বরী কালীগণ্ডকী। তার রূপেরও সীমা নেই যেন! শতসহস্র ছোটবড় উপল-খণ্ড ডিঙিয়ে তার চলবার পথ, তাই উচ্ছল রূপে তার প্রকাশ। আমরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি।

দুজন জর্মান ভ্রমণকারী যুবক নেপাল ভ্রমণ সেরে ফিরে চলেছেন। দুপুরে খাবার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন, তাতপানির ওই ঘরখানিতে। একজন ইঞ্জিনীয়ার, অন্যজন WHO-র ডাক্তার। এ'দেরও মুক্তিনাথ দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মুক্তিনাথের সাত মাইল আগে ঝুমসুম্বার পর আর আগাবার অনুমতি পাননি, তাই সেখান থেকে ফিরে চলেছেন। আমরা মুক্তিনাথ যাচ্ছি শুনে যেচে এসে আলাপ করলেন। আমাদের দেখে, বিশেষতঃ এই দুর্গম পথে একজন ভারতীয় মেয়েকে চলতে দেখে বারবার আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এ'রা কাঠমাণ্ডু হয়ে কলকাতা যাবেন। সেখানে গিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন, কিন্তু আজও তাঁদের কোন খবর পাইনি।

দাদার উদ্যোগে এখানে রান্না-খাওয়ার পাট সকাল সকাল শেষ হলো। আজ ক'দিন পর ঘাড়খোলা নদীর তুহিনশীতল স্রোতে প্রাণভরে স্নান করা গেল। ছোট হলেও নদীটির রূপের অবধি নেই। সুশীতল জলস্পর্শে আমাদের ক্লান্ত ব্যথা-জর্জরিত দেহ শান্ত হোল। আমার স্বামী নদীর জল ছেড়ে তো উঠতেই চান না! ঘরের দাওয়ায়, গাছের ছায়ায়, নির্মেঘ নীলাকাশের নীচে শুয়ে বিশ্রামলাভ, আজ পরম স্বর্গ-সুখপ্রাপ্তি!

বেলা একটার একটু পর আবার রওনা হওয়া গেল। একটু এগিয়েই কালীগণ্ডকী নদীর উপর একটা ঝোলান বড় ব্রীজ। ব্রীজ পার হলেই তাতপানি গ্রামের অন্যান্য ঘর-বাড়ী শুরু হয়েছে। এই গ্রামেই একটা উষ্ণজলের কুণ্ড আছে, তাই এখানকার নাম "তাত-পানি"। নেপালী ভাষাতে তাতপানি অর্থে তপ্ত-জল। এখন যাবার সময় তাড়াতাড়িতে কুণ্ডটি খুঁজে দেখার সময় হোল না। ফেরবার পথে বন্ধু অনেক খুঁজে কুণ্ডটি বের করে দেখিয়েছিল।

সৌন্দর্যপূর্ণ পথ, তাই এখনকার চলাতে আর আমাদের কষ্টবোধ নেই। এখন পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন চড়াই বা উৎরাই নেই, নদীর তীর ধরে ধরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পথ চলেছে। কোথাও কোথাও ময়দানের মধ্য দিয়ে পথ। কেবল দু' এক জায়গায় পাহাড় ধসে পড়েছে, সেখানে নতুন তৈরী পায়েচলা পথে উ'চুতে উঠে আবার নীচে আসতে হচ্ছে। তবে তেমন পথ খুব কম। চলতে চলতে মুক্তিনাথ-ফেরত যাত্রীদলের সঙ্গে দেখা হোল।

"কি ধর যাতা, মুক্তিনাথ?"

"—হাঁ জী—"

"আপ্‌তো কঠিন রাস্তা চলা আয়া, অব্ তো ময়দানকা মাফিক রাস্তা, সেরেফ্ মুক্তিনাথ কা নজ্‌দিগ্ থোরা চড়াই হোগা।"

তবে আমরা কঠিন পথ পার হয়ে এসেছি, এখনকার পথ ময়দানের মত! শুনে মনে ভরসা পাচ্ছি।

কালীগণ্ডকীর তীর ধরে বড় বড় চৌকো পাথর বাঁধানো পথে চলা, বেশীর ভাগই ঘনসবুজ শস্যপূর্ণ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। দুই তীরে উত্তুঙ্গ গিরিমালা চলেছে, তাদের চূড়ায় রূপালী তুষার কিরীট, মাঝে মাঝে উ'কি মারছে। পূর্বদিকে তুষারমৌলী অন্নপূর্ণা পর্বত-মালা, [illegible] শুভ্র ধবল ধৌলাগিরি [illegible], আমরা চলেছি, উত্তরে কালী নদীর উপত্যকা ধরে ছায়াঘেরা পথে। নেশার বুঁদ হয়ে যেন কেবল হে'টেই চলেছি। আজ সকলের মন আনন্দে পরিপূর্ণ।

কি একটা গ্রাম এগিয়ে এলো। পথের পাশে পাথরের তৈরী দালানে বন্ধু বসে অপেক্ষা করছে।

"কি হোল? থেমে কেন? চলো!" তাকে বলি।

"আমরা এসে গেছি যে, এইটেই "দানা"।" বন্ধু হেসে উঠেছে। "আজ বুঝি চলতে ভারি ভালো লাগছে। না? যোগ দেয় সঙ্গে সঙ্গে, "ভারি সুন্দর পথ, না? দাঁড়ান, চায়ের কথা বলে আসি। ছোটমামার জন্য দুধও দেবে বলেছে। দিদি! দিদি!" বন্ধুর ডাকে একটি তরুণী বেরিয়ে এলো চায়ের কাপ হাতে, ঘাঘরা পরা মাথায় লাল রঙের কাপড় দিয়ে ঘোমটা দেওয়া। দাদার জন্যও আর এক কাপ চা করতে বলে দিল, ও'র জন্য দুধ, দাদা আর উনি এসে পে'ৗছেছেন।

আমরা ভীমবাহাদুরের জন্য অপেক্ষা করি, সে এসে ঘর ঠিক করবে। ওর চেনা আছে এখানে। আমরা বসে বসে বাড়ী মালিকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম ভদ্রলোক ইণ্ডিয়ান আর্মিতে কাজ করে, তাই ভাল হিন্দি বলতে পারেন।

ভীমবাহাদুর পে'ৗছেই না থেমে এগিয়ে গেল ঘর ঠিক করতে। আমরা ওকে অনুসরণ করে অগ্রসর হই। কিছুদূর আঁকাবাঁকা পথে চলে দেখি একটা ঝরনা বাঁদিক থেকে এসে মিশেছে কালী নদীতে তারই বুকের উপরের ছড়ানো পাথরে পা ফেলে হে'টে পার হওয়া। পাহাড়ী নদী অগভীর হলেও উদ্দাম, তার স্রোতে পা দিয়ে পার হই এমন সাধ্য কি! একটু থমকে গেলাম। পথচলতি একজন পাহাড়ী যুবক সাহায্য করতে ছুটে এসেছে। কোন কথা না বলে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বড় বড় পাথর ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসে নদীর জলের উপর পা রাখবার মত স্থান ঠিক করে দেওয়াতে পার হলাম সহজেই। অকুণ্ঠচিত্তে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। নেপালে এইরকম অযাচিত সাহায্য কিন্তু দুর্লভ। সাহায্য তো দূরের কথা, প্রশ্ন করেও সব সময় সদুত্তর পাওয়া যায় না। থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে, খাবার কোথায় পাওয়া যাবে এসব মামুলি প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অসহযোগিতা যেন এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ছেলেটি বুঝলাম এর ব্যতিক্রম।

আজ রাত্রে থাকবার জন্য একটা ছোট্ট ঘর পেলাম। তারও একপাশে বেড়া দেওয়া কোণে আমাদের মালপত্রসহ কুলিরা রইল। ঘরের অন্যপাশে দুটি অতিথি ও গৃহকর্ত্রী তাঁর দুটি সন্তান নিয়ে রইলেন। একতলা ঘরের কোণে আমরা আমাদের বিছানা কটি পেতে নিয়েছি, আমাদের পায়ের কাছে উনুন জ্বলছে, তবে গৃহকর্ত্রী তাঁর অরুণ্য সেবা দিয়ে অন্যান্য ত্রুটিগুলি ঢেকে দেন।

ফেরবার পথেও এই ঘরেই স্থান পেয়েছিলাম। সে রাত্রিতে কি মুষলধারে

বৃষ্টি! আমরা ভয়ে আঁতকে উঠে দেখি, উপর থেকে খড় ফুটো করে জল পড়ছে টপ্‌টপ্ করে। বন্ধুর বিছানা তো ভিজেই গেল, আমরাও কেউ শুকনো রইলাম না। তাড়াতাড়ি মই বেয়ে ছাতের উপর উঠে প্লাস্টিকের চাদর বিছিয়ে জল আটকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হ'ল। তখন জল ঐ চাদরে জমে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগল। সারারাত প্রায় এমনি করে বিছানা নিয়ে ঝড়জলের সঙ্গে যুদ্ধ করা!

সুন্দর পথে হেঁটে আজ সকলেই খুশী। গাঁয়ে পেঁছেই এখানকার একটি মেয়ের কাছ থেকে নানারকম সব্জী সংগ্রহ করে নিয়েছি। সেইগুলো রাঁধবার কাজে লেগে যাই। কয়েকটা টুকটুকে লাল টমাটো পাওয়া গেছে, চাটনীও হবে, বন্ধুর হুকুম! দাদা সকলের জন্য খাঁটি ভঁয়সা দুধের কফি তৈরী করেছেন, অপূর্ব লাগছে খেতে।

সাড়ে ছয়টা বাজবার আগেই বেরিয়ে পড়েছি। পথ চলতে চলতেই বোঝা গেল দানা মস্ত গ্রাম, যেন শেষ নেই। অনেকগুলি বিরাট বিরাট পাথরের তৈরী দালান আছে। বাড়ীগুলি সব তালাবন্ধ, লোকজন কেউ নেই এখন। শুনলাম, এসব বাড়ী এই অঞ্চলের বড়লোকদের, তাঁরা এখন তুকুচে বা আরও উঁচুতে অন্য গ্রামে আছেন। এখানে তাঁরা শীতকালে এসে থাকেন। একখানা বাড়ী আছে এ অঞ্চলের বড় ব্যবসায়ী ঠাকুর প্রসাদজীর। তুকুচে গিয়ে আমরা তাঁর বাড়ীতেই উঠেছিলাম। দানায় অনেকগুলি ফলের বাগিচা আছে, নানারকম ফলের গাছ ভরা। কমলা বাগানের গাছে ভরা কমলালেবু, এখনো সবুজ।

সমুদ্রতল থেকে দানা চার হাজার ফুট উঁচু মাত্র, কিন্তু দু'পাশের দু'টি শৈলমালা অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরির উচ্চতা কোথাও ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার ফুটেরও বেশী। এই শৈলমালা দুটির দূরত্ব এখানে মাত্র ২২ মাইল মত। বিখ্যাত জিওলজিস্ট Toni Hegen বলেন, কালীগণ্ডকী নদী এই দুটি শৈলমালার মাঝখান দিয়ে যে গভীর খাতের সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে, এমন খাত পৃথিবীতে আর খুব কমই আছে।

আজকের পথও কালকের মতই সুন্দর, তেমনি অন্নপূর্ণা-ধৌলাগিরির তুষার-কিরীট-শোভিত পর্বতমালার মধ্য দিয়ে কালীগণ্ডকীর শুভ্র তীর ধরে ধরে। মাঝে মাঝে কুয়াশা এসে হাল্‌কা আবরণে পাহাড়ের চূড়ার তুষার-সজ্জা ঢেকে দিচ্ছে। একটু এগোতেই দেখি দুইদিকের দুটি গিরিমালা আবার তাদের তুষারসম্পদ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দাঁড়িয়ে, আর কোথাও কোন আবরণ নেই!

"ও মণি, ডাক্তার! একটু থামো, থেমে একবার দেখে নাও।" দাদার কথায় থামতে হয়, এই ফাঁকে সেই অপরূপ সাজসজ্জা দেখে নিই। চলার ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম করতে বসে আবার আশ মিটিয়ে প্রাণভরে দেখি। পথের মাঝে মাঝে দু' এক জায়গায় ধস নেমে পথকে দুর্গম করে তুলেছে, কিন্তু পথের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। 'দানা' ছেড়ে একটু এগোতেই "রূপ্‌সী" গাঁও পথে পড়লো। রূপ্‌সী গ্রামের শেষে রূপ্‌সী ঝরনা। রূপ্‌সী ঝরনা সত্যই রূপসী। খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে তার মস্ত রূপালী ধারা অঝোরে ঝরে পড়ছে, মধ্যে মধ্যে সবুজ বনভূমি তার অঙ্গের কিয়দংশ ঢেকেছে তাতে তার রূপ যেন আরও পরিস্ফুট হয়েছে। উঁচুতে একটি ধারা নামতে নামতে অনেক চওড়া হয়ে কয়েকটি ধারাতে বিভক্ত হয়ে গেছে। রূপসী 'রূপ্‌সী' আমাদের মন কেড়ে নিয়ে চলার পথ ভাসিয়ে দিয়ে নীচে কালী নদীতে আত্মসমর্পণ করতে ছুটে চলেছে। আমাদের পথচলা শেষ করে দিতে চায় যেন 'রূপ্‌সী'। রূপের গরবে গরবিনী নৃত্য-চ্ছন্দে নেচেই চলেছে—তার থামা নেই, ছেদ নেই, একই লয়ে দ্রুততালে চলা। আমরা সব ভুলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে কেবলই দেখি।

বন্ধু তাড়া লাগায়। "চলুন এবার। অনেকটা যে হাঁটতে হবে। আবার তো বলবেন, পা ব্যথা করছে—পারছি না!" বন্ধুর তাড়া খেয়ে আবার চলা শুরু করি।

রূপসী পার হয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঁচুতে উঠে চলেছি। ক্রমাগত উঠে উঠে একটা খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধার ঘেঁষে কঠিন পাথরের গায়ে খাঁজকাটা পথে চলা। খুব সংকীর্ণ পথ। কেবলই সিঁড়ির ধাপ দিয়ে তৈরী, হয় নামা, নয় ওঠা। অল্প কিছুদূর যাবার পর আমরা 'কাপ্রে' গ্রামে পৌঁছলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ঘরবাড়ী দেখলেই বোঝা যায়। অনেক ক্ষেতখামার গ্রামের ঘরবাড়ীগুলি ঘিরে, নীচে নদীর তীর অবাধ। প্রচুর সব্জী ফলে আছে বাড়ীর আনাচে কানাচে। একটি পাহাড়ী মেয়ে ক্ষেতে কাজ করছিল, তার কাছ থেকে কচি লাউডগা চেয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়ে চলেছি, 'ঘাসায়' রান্না করে খাবো। দেখে বন্ধু হাসে, বলে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' মনোরম পথ, চলে আনন্দ প্রচুর।

ধীরে ধীরে চড়াই উঠছি, কঠিন পথ কোথাও নেই। কেবল বন্ধু যদি একটু ধীরে চলতো তো বেশ হতো। ও চোখের আড়াল হলেই মনে হয় বুঝি নিঃসঙ্গ- হয়ে গেলাম। একটু এগিয়ে পথ সংকীর্ণ হয়ে গেছে, খাড়া পাহাড়ের দেয়াল কেটে কেটে পথ তৈরী করা পাথরের সিঁড়ি কেবল। এক জায়গায় দুটি পাহাড়ের মধ্যেকার খাদ যোগ করে কালো পাহাড়ের গায়ে যেন লেগে আছে একটি লাল রং-এর লোহার ব্রীজ। তারপরই দুটো বেশ বড় সুড়ঙ্গ, পাহাড় ফুটো করে তৈরী করা। এই সংকীর্ণ পথ পার হবার সময় দাদা ও মিঃ বিশ্বাস এক-দল ঘোড়ার দেখা পেয়েছিলেন। তাঁরা উপর থেকে নামছে। ওঁরা বললেন, তাঁরা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তবে ঘোড়াগুলিকে পার হতে দেন। তাছাড়া কোন উপায় ছিল না। সংকীর্ণ বলে বেশ বিপজ্জনক।

এখানে কালীগণ্ডকীর বুকও সংকীর্ণ হয়েছে, আর রূপ হয়েছে অপরূপ। রূপসীর রূপে যেন হিংসায় জ্বলে মরছে, তাই নিজেও রূপসী সেজেছে। কিছুটা উঁচু থেকে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে, উচ্ছল হয়ে উঠেছে তার নীল জলধারা, রূপালী ঢেউ-এর ছড়াছড়ি। ওপারের সবুজ বনভূমির চিত্রপটখানি জলের ধোঁয়াতে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মস্ত মস্ত পাথর ডিঙিয়ে চলার চেষ্টাতেই এমন উচ্ছল রূপের প্রকাশ, ধোঁয়া হয়ে উড়ছে জলকণা, সৌন্দর্য যেন প্রাণময়ী হয়েছে।

ওপারের বনভূমি দূরে নয়, দেখি কয়েকটি বাঁদর ছোট ছোট গাছের ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে, এপারে কিন্তু একটিও নেই। শস্যভরা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পথ গেছে এঁকে বেঁকে, কোথাও কোথাও পাথর ছড়ানো পথের উপর দিয়েই ঝরনার ধারা বয়ে চলেছে, তার দুপাশে বিছুটির জঙ্গল। জুতো বাঁচিয়ে চলাই মুশকিল, তবু আমাদের ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা পরমানন্দে চলেছি। পথের অসীম সৌন্দর্য আজও যেন আমাদের আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে চলেছে।

ঘাসায় পৌঁছাতে এগারোটাও বাজেনি। আমরা বিশ্রামের ফাঁকে একবার চা খেয়ে নেবার প্রত্যাশায় পথের ধারে একটা কুটিরের দোরগোড়ায় বসে পড়েছি। ভাষার অসুবিধা সর্বত্র, কিন্তু ক্ষুধার ইঙ্গিত সর্বদেশে এক। কুটিরের গৃহিণীর কাছে জানালাম, আমরা ক্ষুধার্ত, চা ও ভুট্টাভাজা চাই। ভীমবাহাদুরের কাছে গুটিকয়েক বাঁধা বুলি শিখেছি, তাই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ব্যবহার করছি, কিন্তু ওদের কথা একবর্ণও বুঝছি না।

পথের অন্যধারে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে খেলা করছে, গৃহকর্তার সন্তান এরা, সবচেয়ে বড়টির বয়েস দশের বেশী হবে না। স্তূপাকার ভুট্টা জমা করা রয়েছে তারই পাশে খেলা করছে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর বাচ্চাগুলি। তাদের মায়ের আহ্বানে সবচেয়ে বড় মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকে আমাদের জন্য একখানা বড় থালাতে ভুট্টাভাজা নিয়ে এল। অন্যান্য বাচ্চাগুলি এক এক করে ধাপ ধাপ করা পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো। সবচেয়ে ছোট বাচ্চা-টির বয়স বছর খানেক। সেটিকে নামানো মুশকিল। বাচ্চাগুলি এক একজনা এক একটা ধাপে দাঁড়িয়ে গেল, আর ছোটটিকে একজন বুকে ধরে ঝুলিয়ে নীচের ধাপের ছেলেটির কাছে দিয়ে দিল, সে তার পরেরটিকে তেমনি ঝুলিয়ে দিল, যেন রীলে রেস! আমরা মাটিতে তৃণশয্যায় শুয়ে শুয়ে ওদের কাণ্ড দেখছি। অদ্ভুত বুদ্ধি!

দাদা আর মিঃ বিশ্বাস এসে পৌঁছাতেই তাদের পিছু পিছু ভীম-বাহাদুরও একটু বাদেই হাজির হোল। আমরা ভীমবাহাদুরের পিছু পিছু চলেছি। পথের ধারে তিনচারটি কল বসানো, বাঁধানো চত্বরে মেয়েরা কাপড় কাচছে, বাসন মাজছে। আরও খানিকটা এগিয়ে একখানা ঘরের পাশের ঢাকা বারান্দায় থাকবার স্থান ঠিক করে ফেললো সে। পথের একধারে ঘর ও বারান্দা, অন্যধারে নালা দিয়ে তীব্র বেগে জল ছুটে চলেছে। এটি এখানকার ইরিগেশন ক্যানাল। পাহাড়ী ঝরনাকে বেঁধে চাষের কাজে লাগানো হয়েছে। আমরা ক্যানাল-এর জলে স্নান করে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হয়ে পড়ি।

বেলা দুটো বেজেছে, কিন্তু অল্প আগেই টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। আমরা দ্বিধা করছিলাম, রওনা হবো কি না! কিন্তু থামতে দাদার প্রচণ্ড অনিচ্ছা। এইটুকু বৃষ্টিতে অনায়াসে পথ চলা যায়। তাছাড়া এখন থামলে ভবিষ্যতে কি করবো আমরা? হিমালয়ের আবহাওয়া তো সর্বত্রই এমনি। সুতরাং চলাই স্থির হলো। আমি আর দাদা এগোলাম। বন্ধু বর্ষাতি বের করে রাখেনি। বকুনি খেয়ে অবশেষে কুলিদের দাঁড় করিয়ে তাদের কাছ থেকে বর্ষাতি বের করে নিয়ে চলা সুরু করলো।

লেতের পথ সহজ সরল, বেশী চড়াই বা উৎরাই কোথাও নেই। কোথাও ঘন বনের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চলা। কোথাও বনের মধ্য থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে ঝরনা এসে পথ ভাসিয়ে নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, তারই উপরের পাথরে পাথরে পা রেখে অতি সাবধানে পার হওয়া। চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বৃষ্টি সমানে পড়ে চলেছে। বাতাসে সন্ সন্ শব্দে গাছের পাতা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। চোখে চশমার কাঁচে জল পড়ে ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু এত বৃষ্টিতেও দেখি, পথের পাশে একটা ছোট ঝোপে এক ঝাঁক ছোট্ট ছোট্ট মিনিভেট পাখী যেন বৃষ্টি পেয়ে মহানন্দে খেলা জুড়েছে। গায় লাল রং, মাথা ও ল্যাজের দিকটা কেবল কুচ্‌কুচে কালো। সবুজ ঝোপের মধ্যে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে গাছভরা জীবন্ত লাল ফুল। দলে একটা হলদে কালোয় মেশানো পাখী রয়েছে সেটি ঐ জাতেরই মেয়েপাখী।

বনের মধ্যে গাছতলায়, প্রবল বৃষ্টির ধারা থেকে আত্মরক্ষা করতে মাঝে মাঝে আশ্রয় নিচ্ছি। আজ সকলে একত্র চলেছি। গ্রামের ঘরবাড়ীর পর ক্ষেতখামার পেরিয়ে আবার বনভূমির সুরু। বিশাল গাছতলায় মস্ত সমতল পাথর দেখিয়ে দাদা বলেন—"দিদি, তোমার শোবার জায়গা রয়েছে দেখ।" উনি করুণ দৃষ্টিতে তাকান, পাথরের সবটা জলে ভিজে গেছে। বসবারও উপায় নেই।

লেতে মাইল চারেক দূর, অবশ্য পাহাড়ী মাপে। কিন্তু সে পথ কেবল লতিয়ে লতিয়ে চলেছে, যেন আজ আর শেষ হবে না। বন-ভূমির শেষে নীচে নেমে নদীর উপর একটা ঝোলান ব্রীজ পার হয়ে কয়েকখানা ঘরের পাশ দিয়ে পথ, এখান থেকে চড়াই-এর সুরু। শেষ দুই ফার্লং কেবলই চড়াই, কষ্টকর চড়াই। এখনো চারিদিক মেঘে ঢাকা। ঝমঝমে বৃষ্টি মাথায় করে পথ চলতে হচ্ছে। কিন্তু ফেরবার পথে এইখান থেকে ধৌলাগিরির অপরূপ তুষারসৌন্দর্য দেখতে পেয়েছিলাম। কদিনের বৃষ্টিতে তখন আরও নতুন তুষারে চারিদিকের পাহাড়ের সবুজ-কালো চূড়াগুলি পর্যন্ত ঢেকে গেছে। ধৌলাগিরির সবচেয়ে উঁচু শিখরটি সম্পূর্ণরূপে শুভ্র হয়ে সূর্যা-লোকে হীরকের মত জ্বলজ্বল করছে, তার ঠিক পাশেই তেমনি শুভ্র একটি হিমানী সম্প্রপাত, যেন নীলাকাশের গা বেয়ে নীচে ঝরনার মত নেমে এসেছে। স্তরে স্তরে সবুজ পাহাড়ের পিছনে এমনি শুভ্র তুষারের শিখরাবলি, অতি অপরূপ দেখাচ্ছে। এই সৌন্দর্য দেখতেই আসা, আমরা প্রাণ-ভরে তাই দেখে নিচ্ছি।

লেতের শেষ চড়াইটুকু উঠতে বেশ কষ্ট হয়, বিশেষ করে বৃষ্টির মধ্যে। দুই ফার্লং পথ অনেক কষ্টে উঠে পাহাড়ের চূড়াতে পৌঁছলাম, একটু এগিয়েই লেতের ক্ষেত-খামার সুরু হল। বেলা সাড়ে পাঁচটার

একেবারে কাকভিজে হয়ে লেতেতে পৌঁছলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘর পাওয়া গেল, বেশ বড় ঘর, ছিমছাম পরিচ্ছন্ন। আগুন আর চা-ও মিললো। শীতে সবাই ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছি। লেতে বেশ ঠাণ্ডা জায়গা, তার মধ্যে জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে, বৃষ্টি তো আছেই। শীতে জবুথবু অবস্থা। জানালা দরজা সব বন্ধ করে দিয়েছি। উলের তৈরী মোটা মোটা ভোটিয়া গালিচা পেতে দিয়েছেন গৃহকর্ত্রী, তারই উপর শ্লিপিং ব্যাগগুলি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছি। বন্ধু যেখানে শুয়েছে, তার ঠিক মাথার উপরেই 'শিকার' ঝুলানো, কিন্তু উনুন থেকে অনেক দূরে। উঠে চলাফেরা করতে গেলেই ওই শিকারে মাথা ঠুকে যাচ্ছে তার। ছেলেটা বড্ড ভিজেছে আজ, অসুখবিসুখ করে কিনা কে জানে।

পরদিন সকালে রওনা হতে হতে প্রায় পৌনে সাতটা। কাল সারারাত ঘরের মধ্যে একটি বাচ্চা এবং দুজন বড় পুরুষ হুপিং কাশি কেশেছে। মিঃ বিশ্বাস ভয় করছেন আমরাও হয়তো ঐ কাশিতে আক্রান্ত হবো যাত্রা শেষে কলকাতা ফিরলে। কাল রাত্রে ঘর লোকে ভর্তি ছিল। অনেক পথিক জুটেছিল রাত্রে, তার মধ্যে কয়েকজন তিব্বতীও আছে।

লেতে ছেড়ে বেরুতেই এখানকার ইস্কুলবাড়ী, সেটা পার হয়েই দেখি ধৌল-গিরির আধখানা মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। এই আধখানারই কি অপরূপ শোভা! আর একটু এগিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি অন্নপূর্ণার তুষারশুভ্ররূপ। অদ্ভুত পথ আজকের।

"ও ভাই, একটু থেমে পিছনে তাকিয়ে দেখ, কেবল সামনেই দেখছো।" বারবার দাদা ডাকছেন, তাই বারবার থেমে চলেছি।

লেতে গ্রামটি একটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। লেতের পর 'আপার লেতে' ছেড়ে আর দুএকটি ছোট গ্রাম পেরিয়ে ধীরে ধীরে উৎরাই পথে কালীগন্ডকীর উপত্যকাতে পৌঁছে গেলাম। আবার নদীর তীর ধরে ধরে পথ। কোথাও কোথাও তার বিশাল বালুকাময় পাথর ছড়ানো বুকের উপর পায়ের ছাপ রেখে রেখে এগিয়ে চলেছি। নির্মেঘ নীলাকাশে উজ্জ্বল তপন শোভা পাচ্ছে। চারদিকের বনভূমি বৃষ্টিতে ধুয়ে উজ্জ্বলতর হয়েছে। এখান থেকে মাইল দুই পরে পথ পূর্বদিকে বেঁকে গেছে। আমরা ধৌলাগিরির শৈলমালাকে পিছনে রেখে কালীগন্ডকীর উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছি। নবতর সৌন্দর্যরাজ্য এগিয়ে আসছে। দুই তীরে ঘনসবুজ বনময় শৈল-মালা সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর অবধি ঢেউ-এর মত এগিয়ে চলেছে, মাঝখান দিয়ে চলেছে নদীর বিশাল চওড়া শুভ্র বেলা-ভূমি। শুভ্র বালুকারাশির উপর সূর্যকিরণ পড়ে যেন জ্বলছে। স্বচ্ছতোয়া সবুজরঙা কালী কয়েকটি ধারাতে বিভক্ত হয়ে তীব্র-বেগে বয়ে চলেছে। পিছনে ধৌলাগিরির তার শুভ্র নির্মল তুষার-সম্পদ নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে, ডানদিকে নীলাগিরি শিখর নীলাভ শুভ্র উজ্জ্বল মূর্তিতে বিরাজমান।

বেলা দশটা নাগাদ বাঁকের মুখে দুটি আমেরিকান কিশোরীর সঙ্গে দেখা। তারা পিস্‌কোর নির্দেশে এখানে এসেছে। টিমিগাঁও থেকে ফিরছে। সেখানে এদের এক-জন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই এখন ফিরে চলেছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রাণচাঞ্চল্যে ভর-পুর মেয়েদুটি। সৌন্দর্যময় পরিবেশে যেন উড়ে উড়ে চলেছে। আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলে, তুকুচে এখনো তিন ঘণ্টার পথ!

নদীতীর ঘেঁসে উত্তরদিক দিয়ে পর্বত-মালার গায়ে গায়ে পথ। বাঁক ঘুরবার আগে একটা ফুলশোভিত প্রকান্ড মাঠ পার হয়ে এলাম, উনি বলছেন, আহা, এখানে বেশ তাঁবু গেড়ে আনন্দে থাকা চলতো। এখন বেশীর ভাগ পাইন ফার দেওদার গাছের বনের মধ্য দিয়ে পথ, তবে কোথাও কোথাও নদীর বুকে নেমে যাচ্ছি। বিরাট চওড়া শুভ্র বুক, তারই মাঝখান দিয়ে চলে চলে পথের যে রেখা পড়েছে, তাই অনুসরণ করে চলেছি।

বাঁক ঘুরবার পর থেকেই অর্থাৎ দশটার পর থেকে প্রচন্ড হাওয়া বইতে শুরু করেছে, কালীগন্ডকীর উপত্যকাজাত বিখ্যাত ঝোড়ো হাওয়া। এই হাওয়া নাকি সারাবৎসরই চলে। শীতল হাওয়া জামার ভিতর ঢুকে যেন হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক থেকে প্রচন্ড ঠেলা দিচ্ছে, স্থির হয়ে দাঁড়ানোও চলে না। পর্বতমালার ঢেউ যেমন বেঁকে গেছে, নদীর গতিপথও সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে গেছে, হাওয়ার বেগ কিন্তু সমানই আছে। প্রায় আড়াই ঘন্টা নদীর শুকনো বেলাভূমির উপর দিয়ে চলবার পর 'দেবী-থান' গাঁও পেলাম। পরপর তিনখানা গ্রাম নিয়ে দেবীথান। আরও দেড়মাইল পর তুকুচে গ্রাম দেখা গেল। একটা ছোট ঝরনা উত্তর দিকের পাহাড় থেকে বয়ে এসেছে, তার উপর-কার কাঠের ব্রীজ পার হলেই তুকুচে গ্রামে ঢোকা যায়।

তুকুচে বেশ দীর্ঘবপু ও সুন্দর সাজানো গ্রাম। নদীর বুকের সমভূমির উপর গ্রামখানি গড়ে উঠেছে। দক্ষিণে নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারা, তারপরই সবুজ বনসমাচ্ছন্ন পর্বতের শ্রেণী। তার পিছনে নীলাভ পর্বতের তুষার-ঢাকা শিখর—নীলাগিরির শিখর। পশ্চিমে নদীর বেলাভূমির শেষেও একইরূপ অপরূপ দৃশ্য, সেই পর্বতমালার ঢেউ, ঢেউ-এর পিছনে নীলাভ শিখর, তারও পিছনে বিশাল ধৌলাগিরির বিরাট শুভ্ররূপ। উত্তরে গ্রামের লাগোয়া অল্পস্বল্প ক্ষেতের পরই ঘনসবুজ পর্বতের সারি, পিছনের তুষারশুভ্র শিখরটি 'তুকচে পিক'। একটু উঠে গেলেই যেন তুকচে পিকটি ছোঁয়া যাবে, এত কাছে মনে হচ্ছে! তুকুচের সৌন্দর্যের যেন আর সীমা নেই!

তুকুচে গ্রামে বেশ বড় বড় ব্যবসায়ী আছে, অনেকগুলি কাঠ ও পাথরের তৈরী দোতলা বাড়ীও আছে। পোস্টঅফিস, ইস্কুল, হাস-পাতাল, দোকানবাজার সবই আছে। পথে কাগবেনিতে দাদার সঙ্গে মুক্তিনাথের প্রধান পূজারীর দেখা হয়েছিল। তিনি কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি এখানে বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঠাকুরপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করা। দাদা তাই আমাদের অপেক্ষা করতে বলে ঠাকুরপ্রসাদজীর খোঁজে গেলেন। বন্ধু ইতিমধ্যে আর একজনা 'দিদি' যোগাড় করে ফেলেছে। আমরা এককাপ চা খেয়ে থেতে পথের ধারে চওড়া বাঁধানো রোয়াকে অপেক্ষা করলাম।

একটু পরে দাদা আমাদের ডেকে পাঠালেন। একজন দর্জি পথ দেখাচ্ছেন। তার পিছু পিছু গ্রামের ভিতর এক জায়গায় গিয়ে দেখি ঠাকুরপ্রসাদজীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। কর্তা তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরুচ্ছেন বলে তৈরী হচ্ছিলেন, আমাদের মহাসমাদরে বসালেন। ওপাশের বাড়ীতে একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন থাকবার জন্য। ঠাকুরপ্রসাদজী বললেন, আপনারা তাড়াহুড়া না করে আজ দিনটা এখানে বিশ্রাম করুন, কাল ভোরে ছয় মাইল এগিয়ে ঝুমসুম্বা যাবেন, পরশু দুপুরের পর মুক্তিনাথ পৌঁছে যাবেন।

অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন ঠাকুরপ্রসাদজীর গৃহিণী। বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, তবু রান্নাবান্না স্বহস্তেই করেন। সাহায্য করতে চাকর আছে। অত বেলাতেও আবার স্বহস্তে আমাদের জন্য চা তৈরী করে দিলেন, ভাত রেঁধে দিলেন। গৃহ-সংলগ্ন বাগিচা থেকে বাঁধাকপি এনে ঝোল তৈরী করলেন। যত্নের কোন ত্রুটি নেই। যে ঘরখানা থাকবার জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন, সেটি সুসজ্জিত, তাঁদের এক ছেলের ঘর ছেলেটি কাঠমান্ডুতে লেখাপড়া করছে। একখানা চৌকিতে পাতা বিছানা, ঘরজোড়া মেজেতে কার্পেট বিছানো, এককোণে ছোট একটা টেবিল ও গুটিকয়েক চেয়ার, দেয়ালে মস্ত একখানা আরসি ঝোলানো। একপাশে দেয়ালের সেলফে কয়েকখানা বই। জানালা খুলতেই, সামনে বাগানের পর নদীর নীল-ধারা, তার পিছনে নীলগিরি পর্বতশিখরের হাসিমুখ দেখা গেল। যেন একখানা আঁকা ছবি! একঝলক রৌদ্র এসে ঘরের আধখানা ভরিয়ে দিল। চেয়ার টেবিল সরিয়ে আমরা মেজেতেই আমাদের বিছানা ক'টি পেতে ফেলি। মিঃ বিশ্বাস আগেই খাটে শুয়ে পড়েছেন। কৌতূহলী হয়ে দাদা নেড়েচেড়ে দেখেন বইগুলি। কয়েকখানা ইংরাজী বই-এর মধ্যে একটা মস্ত বই বের হোল Maurice Herzog-এর লেখা Annapurna। অন্নপূর্ণা (১) (২৬,৫০৪ ফুট) শিখর বিজয়ের গৌরবময় কাহিনী আবার আমাদের মনে জেগে ওঠে। কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে দূর দেশ থেকে লোক কজনা এসেছিলেন দুর্গমের আহ্বানে! বইখানিতে কত দুর্লভ

সুন্দর ছবিতে ভরা। এই তুকুচে গ্রাম ও তার চতুর্দিকের ছবিও আছে এতে!

এ'রা বৌদ্ধ। সেইমত এ'দের বসবার ঘরের উঁচু বেদীর উপর বুদ্ধমূর্তি, সামনে পাশের দিকে বসবার জন্য নীচু বেঞ্চি, তার উপর মোটা পুরু গালিচা লম্বা করে পাতা। বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দীপাধার সাজানো। সন্ধ্যাবেলা গৃহিণী অনেকগুলি তেলের প্রদীপ জেলে মূর্তির সামনে সাজিয়ে দিলেন। একটি ৮।১০ বছরের মেয়ে আছে তাঁর, আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। সে আমাদের ছাড়তেই চায় না।

বাজারে ঠাকুরপ্রসাদজীর খোঁজ করতেই একজন দরজি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক দেখে আমরা তাকে খানিকটা দই বা দুধ সংগ্রহ করতে বলে দিলাম। একথা শুনে ঠাকুরপ্রসাদ-গিন্নির মহা আপত্তি। সে যে নীচ জাত! তার ছোঁয়া জলও তো ঘরে নেয়া চলবে না, দুধ তো দূরের কথা। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করা হোল। ভিন্ন ঘরে, ভিন্ন উনানে ভীম-বাহাদুর দুধ ফুটিয়ে দিল। এদেশে দেখছি, বৌদ্ধদের মধ্যেও জাতিভেদ মানা হয়। আমরা খুব বিস্মিত হয়ে গেলাম।

আজ ১১ই অক্টোবর, আমাদের যাত্রার সপ্তম দিন। ঠাকুরপ্রসাদজীর পরামর্শমত আমরা যথাসম্ভব ভোরে রওনা হবার চেষ্টা করি। তুকুচের উচ্চতা আট হাজার ফিট, তাই এখানে প্রচণ্ড শীত। কাল বৃষ্টি পড়ে শীত আরও বেড়েছে। এত শীতে প্রত্যুষে ওঠা অসম্ভব, তবু তাড়াতাড়ি করতেই হয়। ঠাকুরপ্রসাদজী সাবধান করে দিয়েছেন, বেলা ন'টা দশটা থেকে কালকের মত ঝোড়ো হাওয়া চলবে কালীগণ্ডকীর উপত্যকায়, সারাদিন বইবে, সন্ধ্যা হলে তবে থেমে যাবে, সুতরাং ভোরেই যতটা পথ এগিয়ে চলা যায়, ততই সুবিধা।

তুকুচে যেন প্রকৃতির দুই রূপের সীমারেখাতে অবস্থান করছে। এতদিন যে সবুজ পাইন, ফার গাছভরা বনভূমি, সবুজ পাহাড়, শ্যামল ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এসেছি, তেমন দৃশ্য ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সম্মুখে তিব্বতের দিকে যতই এগিয়ে চলেছি, পাহাড়ের রঙ ক্রমশঃ বদলাচ্ছে। ছোট ছোট বৃক্ষ ঝোপ, শুকনো ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ। তাও ক্রমশঃ মিলিয়ে সম্পূর্ণ শুষ্ক মেটে পাহাড়ে রূপান্তরিত হতে চলেছে। কাল রাত্রেও বেশ বৃষ্টি পড়েছে, তাই দুই পাশে তুকুচে পিক, নীলগিরি শিখর, পিছনে ধোলাগিরির বিশাল তুষারশৈলের উপর নতুন করে তুষারপাত ঘটে আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কালীগণ্ডকীর দুই তীরের সবুজ পাহাড় ক্রমশ ধূসর হবার দিকে, কেবল কালীরই কোন পরিবর্তন নেই। তেমনি বিশাল শুভ্র-বেলাভূমির মধ্য দিয়ে নীল রেখায় এ'কে বয়ে চলেছে। কোথাও কোথাও নদীতীরের [illegible] ঝোপের ছোট ছোট সরু ডালে নানারঙের ছোট ছোট পাখী কিচিমিচি করে নেচে নেচে খেলা করছে।

ফটো : সাগর রক্ষিত

আজও কালীগণ্ডকীর বুকের উপর দিয়ে পায়েচলা পথ। তুকুচে পিককে আজ যেন আরও কাছে মনে হচ্ছে। মিঃ বিশ্বাস দাদাকে বাইনোকুলারের মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছেন, পিকে ওঠবার রিজ ধরে যেন দুটি কালো বিন্দু এগিয়ে চলেছে। বিন্দু দুটি যে নড়ছে, তা যেন আমরা সকলে খালি চোখেও দেখতে পাচ্ছি। সেই আমেরিকান পর্বতা-রোহী ও তার সঙ্গী শেরপাটি নয়তো? না, কেবলই চোখের ভুল? বারবার করে দেখেও সকলে একই মত প্রকাশ করলাম। সবাই দুটি বিন্দুকে স্পষ্ট নড়তে দেখছি।

এখনকার পথ মোটামুটি সমতল; কেবল যখন কোন পাহাড়ের গায়ে উঠে পাহাড়ের গায়ের কাটা পথে চলতে হচ্ছে, তখনই কেবল সামান্য চড়াই বা উৎরাই। নদীর বুক, ধীরে ধীরে উঁচু হলেও, আমাদের চলবার সময় তা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। একটু এগিয়ে ডানদিকে দেখি, একটা ব্রীজ দিয়ে গড়খাই পার হয়ে যেন লালমাটির তৈরী করা অনেকটা দুর্গের মত একটা গ্রাম। আমরা নাম শুনেছি, তাই ভাবি ওই বুঝি "মার্ফা" গ্রাম। আরও এগিয়ে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা, হেসে হেসে যেন নাচতে নাচতে চলেছে। পিঠে একটা করে টুকরি। কোথায় চলেছে কে জানে, ওদের ভাষা তো জানা নেই যে জিজ্ঞেস করবো! কিন্তু ভাঙা হিন্দিতে বললো, ওটা মার্ফা নয়, মার্ফা আরও দূরে, অন্য পাহাড়ে। তা-ও একটু এগিয়েই দেখা গেল।

মার্ফার কাছে আসতেই দেখি একদল সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণী ঝরনার ধারে আগুন জ্বালিয়ে কাপড় সিদ্ধ করে, ঝরনার জলে কাপড় কাচছে। এদের চেহারা ও পোশাকের অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ল। এরা সব কাজ দল বেঁধে করে দেখছি। আরও কিছু পরে দেখি পথে একদল ছেলেমেয়ে দল বেঁধে ইস্কুলে যাচ্ছে, সঙ্গে পিছনে তাদের শিক্ষক রয়েছেন। গ্রামের কাছে পথের ধারে দেয়ালে গাঁথা সারি সারি ধর্মচক্র রয়েছে, প্রত্যেকটির গায়ে লেখা—ওঁ মণি পদ্মে হুঁম্। তামার তৈরী ধর্ম-চক্রগুলি একটু ঘুরিয়ে দিলেই টুন্‌টুন্ করে মিষ্টি আওয়াজ করে বাজতে থাকে। তুকুচেতে ঠাকুরপ্রসাদজীর বিরাট দালানের চারিদিক ঘিরে যে দেয়াল আছে তার পুরোটাতেই এমনি ধর্মচক্র সাজানো দেখে-ছিলাম। কোথাও আছে পাথরের তৈরী উঁচু উঁচু তোরণ তারই মধ্য দিয়ে চলবার পথ। তোরণের ভিতরের চৌকোনা ছাদে বুদ্ধদেবের জীবনী আঁকা রঙিন ছবি। অপূর্ব সুন্দর ছবিগুলি। কতকালের পুরোন কে জানে, রঙ কিন্তু একটুও নষ্ট হয়নি। বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই করা গ্রামটি।

দুটি ঘোড়ায় চড়া মূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তাদের পরনে ফেদার জ্যাকেট, ফেদার প্যান্ট, বুট জুতো, মাথায় পালক আঁটা টুপি, হাতে চামড়ার গ্লাভস। এরা থাম্‌পা জাতের লোক। বলিষ্ঠ, বেপরোয়া চেহারা, দেখলেই ভয় হয়। ঘাসাতেও এমনি একজন থাম্‌পাকে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম, গ্রামের [illegible] বললে, "ওরা থাম্‌পা।"

মার্ফা একটি মস্ত গ্রাম, অন্ততঃ দুশো আড়াইশো বাড়ী আছে। পাকা দালান, অবশ্য পাথরের তৈরী এবং চওড়া বারান্ডা-ওলা বাড়ী অনেক আছে। গ্রামের চলবার রাস্তাগুলি সরু সরু, অনেকটা যেন কাশীর গলি।

অল্পস্বল্প উঁচুনীচু এবং কিছুটা নদীর উপর দিয়ে পার হয়ে আরও মাইল দেড়েক দূরে 'সিয়াং' গ্রাম। সিয়াং গ্রামটিও মস্ত বড়। পাহাড়ের বেশ কিছুটা উপর থেকে শুরু হয়ে নীচে নদীর বুক অবধি ছড়ানো। সিয়াং পার হয়ে চলেছি। পথ পাহাড়ের বাঁক ঘুরে গেছে। আরও দুই মাইল এগিয়ে "ঝুমসুম্বা" গ্রাম দেখা গেল। গ্রামে পৌঁছানোর একটু আগে একটা মস্ত ময়দান, ঝুমসুম্বার এয়ার-স্ট্রিপ, মাটিতে প্লেন-এর চাকার দাগ রয়েছে।

বেলা দশটা বাজবার আগেই ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে। নদীর বাঁক ঘুরবার সংগে সংগে হাওয়ারও দিক পরিবর্তন হোল। আমাদের পিছন থেকে যেন ঠেলে ফেলে দিতে চায়, কি জোর হাওয়ার! হাওয়ার সংগে সংগে শুকনো পথ থেকে ধুলো উড়ে এসে চোখেমুখে ঢুকছে। ঝোড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ একটানা বয়েই চলেছে, তার সংগে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেছি।

ঝুমসুম্বাকে লোকে ঝুমসুম বা ঝুমসা বলে। ঝুমসার একটু আগে ছোট একটা ঝরনার উপর ফেলা কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে পার হয়ে অল্প উঠেই নেপালী চেকপোস্ট। এখানে ইণ্ডিয়ান আর্মির লোক সাহায্য করবার জন্য আছে। আমাদের থামিয়ে আমাদের পারমিট পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। ইণ্ডিয়ানদের বড় একটা বাধা দেয় না, কিন্তু ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানদের বেলায় খুব কড়াকড়ি।

নদীর উপর একটা কাঠের তৈরী মাঝারি ব্রীজ পার হয়ে গ্রাম পাওয়া গেল। বন্ধু সর্বাগ্রে এগিয়ে গেছে। ঝুমসুম্বা পৌঁছে দেখি, সে হাওয়া বাঁচিয়ে একটা দেয়ালের ধারে পিঠ দিয়ে বসে তার চিরাচরিত প্রথানুযায়ী চায়ের চেষ্টা করছে, তবে এখনো কোন "দিদির" স্বারস্থ হতে পারেনি! আমরা পৌঁছাতেই সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সকলের সংগে এগিয়ে চললো। খোঁজ করে শকসুবাহাদুরজীর বাড়ী বের করলাম। এঁর নামে ঠাকুরপ্রসাদজী চিঠি দিয়েছেন। ইনি এখানকার বড় ব্যবসায়ী। ঐ চিঠির জোরে এখানে ভাল একখানা ঘর পাওয়া গেল।

ঝুমসুম্বাতে শীত অসম্ভব। এখানকার উচ্চতা নয় হাজার ফিট। কনকনে হাওয়ার সংগে ঠাণ্ডা মিশে অসহনীয় শীত বোধ হচ্ছে। রোদ্দুর থেকেও কোন লাভ হচ্ছে না। আমরা ক্লান্ত, তার উপর এই প্রচণ্ড শীত, তাই স্নানের আশা পরিত্যাগ করে বন্ধ ঘরের ভিতর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে শুয়ে পড়েছি। আমাদের আর নড়বার শক্তি নেই।

শকসুবাহাদুরজী খুব যত্ন করে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা, খাবার যোগাড় করে দিলেন। কোন ত্রুটি নেই। সন্ধ্যার সময় চেকপোস্ট থেকে ইণ্ডিয়ান আর্মির কর্তা শ্রীইন্দ্রদেও সিং ও তাঁর সহকর্মী আমাদের সংগে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোকের বাড়ী শোণপুরে। আমাদের সকলের খোঁজখবর লিখে নিলেন। আমাদের দুটি উপকারের ভারও নিলেন। পোস্টাপিসের অভাবে বহুদিন কলকাতাতে চিঠি দেওয়া হয়নি, তাই তিনি ওয়্যারলেসে কাঠমাণ্ডুর ইণ্ডিয়ান এমব্যাসির সংগে যোগাযোগ করে কলকাতায় মায়ের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাবেন যে অল ওয়েল অ্যাট মুক্তিনাথ। আর ঝুমসু বা তুকুচে গ্রাম থেকে ফিরবার জন্য দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। ফেরৎ পথে তিনটি কঠিন চড়াই পার হতে হবে। একটা শিখাতে, একটা ঘোরেপার্ণিতে, আরেকটা চন্দ্রকোটে। ওই বিশ্রী চড়াইগুলি উঠতে আর ইচ্ছে করছে না।

নেপালে আসবার সময় নেপালের তরফ থেকে কোন পারমিটের প্রয়োজন নেই, অবশ্য কেবল ভারতীয়দের জন্য। ইউরোপীয়দের যথারীতি পাশপোর্ট নিতে হয়। তবে ভারতীয়দের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কলকাতায় পুলিশের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিতে হয়। নেপালে ঢুকবার সময় বিশেষ কোন চেক হয় না। কিন্তু ফেরবার সময় কড়াকড়ি আছে। তাই সমস্ত মূল্যবান জিনিস, বিশেষ করে ক্যামেরা ইত্যাদি ডিক্লেয়ার করে নিয়ে আসা উচিত, নইলে ফেরবার সময় অসুবিধাতে পড়তে হয়। নেপালে সব ইউরোপীয় দেশের জিনিস আমদানি ও বিক্রি হয়, তাই ভারতে ঢুকতে এত কড়াকড়ি।

তিনটি যুবক পর্বতারোহণের জন্য এসেছে। তাদের একজন জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে লেতেতে পড়ে আছে। বাকী দুজন এখানে এসেছে। এখানকার এয়ার-স্ট্রিপটা সুইস রেডক্রসের তৈরী। প্রয়োজনানুসারে প্লেন যাতায়াত করে। ওরা চেষ্টা করছে কাঠমাণ্ডুতে খবর দিয়ে যদি একটা প্লেন আনানো যায়, তবে তাতে করে অসুস্থ ছেলেটি ফিরে যাবে। তারা কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এ কাজ করতে পারেনি। পোখারা ফেরবার পথে হুনজা গ্রামে ওদের সংগে দেখা হয়েছিল। আমরা মুক্তিনাথ থেকে ফেরবার আগেই ওরা ঝুমসা ছেড়ে পোখারার পথে রওনা হয়ে গিয়েছিল।

ঝুমসা গ্রামটি ছোট হলেও বেশ স্বচ্ছল বলে মনে হোল। সকল বাড়ীগুলিই পাথরের তৈরী। কালীগণ্ডকীর উপত্যকা-জাত হাওয়ার প্রচণ্ড আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এখানকার বাড়ীগুলি এমনভাবে দেয়াল দিয়ে ঘেরা যেন বাতাস সহজে চলাফেরা করতে না পারে। বাড়ীগুলির ভিতরের দিকে উঠান আছে, তারও চারিদিক ঘেরা উঁচু দেয়াল। উঠানে ভেড়া ও গরুর গোবর জমিয়ে শুকনো করা আছে, তাতে নাকি বাড়ী গরম থাকে। এগুলি শীতকালে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করাও চলে। এখানে কোন গাছপালা নেই, কাজেই কাঠের অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। ঘরগুলির জানালাও একমুখী ও ছোট ছোট। কিঞ্চিৎ অন্ধকার, হাওয়া খেলতে পায় না। এরা গরু, ভেড়া, হাঁস, মুরগী পোষে। ফসলের ক্ষেত কোথাও নেই। এখানকার গরুকে এরা বলে "লুলু গাই"। ইয়াক ও দিশী গাই-এর সংমিশ্রণ।

টুন-টুন-টুন-টুন শব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দেখি একদল ইয়াক মাল বয়ে নিয়ে চলেছে। একটি তিব্বতী তাদের নিয়ে চলেছে। গলায় ঘণ্টা বাঁধা, ইয়াকগুলির, চলতে গেলে টুনটুন করে মিষ্টি মিষ্টি বাজছে। তিব্বতের সংগে ব্যবসাই এই অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা ছিল, এখন তিব্বত চীনের অধীনে যাওয়াতে সেই ব্যবসা অনেক কমে গেছে। তবু কিছু কিছু এখনো লুকিয়ে লুকিয়ে চলে। পশম ও পশমজাত দ্রব্য, পাথরে লবণ, পনীর ইত্যাদি আসত। লবণের চাহিদা সবচেয়ে বেশী ছিল। নেপালের সর্বত্র এই লবণ চলত। এখান থেকে চাল, গম ইত্যাদি শস্য ও কাপড়চোপড় সৌখীন দ্রব্যাদি রপ্তানি হোত।

কালীগণ্ডকীর উপত্যকা ধরে উত্তরে এগিয়ে গেলে শেষ নেপালী শহর মুস্তাং। এই মুস্তাং কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিব্বত ও নেপালের মধ্যাঞ্চলের বাণিজ্যের প্রধান যোগসূত্র ছিল। ইয়াক ক্যারাভানে করে বাণিজ্য চলতো।

শকসুবাহাদুরজী আমাদের সংগে অনেক আলাপ করলেন। এতদূরে বাস করেও এঁরা বহির্জগত থেকে সম্পর্কহীন নন। এঁর ছেলেরা রীতিমতো লেখাপড়া শিখেছে, বিদেশে থেকেছে। নেপালের মহারাজা ও মহারাণীর সংগে তোলা এঁদের সকলের ছবি দেখালেন।

পরদিন প্রত্যুষে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। আমাদের থাকবার ঘরখানার ঠিক পিছনে নীলাভ পাহাড়ের চূড়া নীলগিরির শিখরে প্রথম সূর্যালোক পড়েছে, পড়েছে পাশে তুকুচে পিকে, ধৌলাগিরির চূড়ায়। লাল হয়ে উঠেছে শিখরগুলি। গ্রাম শেষ হবার আগেই একটা বিরাট মাঠ, তারপরই কালীনদীর বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্য দিয়ে পায়েচলা পথ চলে গেছে। নীলাম্বরী কালী সাদা বালুচরের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে দ্রুতগতিতে বয়ে চলেছে। আজ আমাদের যাত্রার শেষ দিন, মনের মধ্যে তাই চঞ্চলতা অনুভব করছি, আজ দুপুরের পরই মুক্তিনাথ পৌঁছাতে পারব আশা করছি।

শকসুবাহাদুরজী জানালেন, মুক্তিনাথে যাত্রীনিবাস আছে। সেবাসমিতির এই যাত্রী-নিবাসে বিনামূল্যে খাবারও পাওয়া যায়। কিন্তু, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকাতে বারণ করলেন, তাই সংগে করে দুদিনের মত চাল, আলু, ঘি, তেল, বিস্কুট, চা, দুধ, চিনি নিয়ে চলেছি, যেন খাবারের জন্য থাকতে অসুবিধা না হয়। সংগে আনা তাঁবু দুটোও রেখে গেলাম। পথে যদি কোথাও কখনো প্রয়োজন হয়, তাই এ দুটো এনেছিলাম। আরও বাড়তি কিছু মাল যতটা সম্ভব গুছিয়ে রেখে গেলাম শকসুবাহাদুরজীর জিম্মাতে।

সবুজ পাহাড়ের রাজ্য আগেই শেষ হয়েছে। এখন কেবল ধূসর ও বাদামী পাহাড়ের ঢেউ চলেছে দুই পাশে; সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরও তেমনি বাদামী পাহাড়েরই ঢেউ। পাহাড়গুলির ঢঙেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সেগুলি তেমন যেন সুচালো নেই, কেমন ভোঁতা ভোঁতা দেখতে। সামনে তুষারশৃঙ্গও নেই, পিছনে তাকালে অবশ্য তুকুচে পিক, নীলগিরি শিখর ও ধৌলাগিরি শৃঙ্গমালা দেখতে পাচ্ছি। যত এগিয়ে চলেছি, পথের রিক্ততা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। যেন গেরুয়া বসনাঞ্চল উড়িয়ে চলেছেন কোন্ অজানা সন্ন্যাসী পর্বতের পথে পথে, রিক্ততা তাই সর্বদিকে সর্বঅবয়বে প্রকট। ভোঁতা পাহাড়গুলির গায়ে তীব্র হাওয়া লেগে লেগে কেটে কেটে কেমন সরু সরু লালমাটির ঝালরের মত ঝুলেছে, সেও তেমনি রুক্ষ। পথের ধুলার রঙও বাদামী।

কালীগণ্ডকীর বিস্তীর্ণ বালুময় বুকের উপর মাইল দেড়েক সোজাসুজি গিয়ে পথ বেঁকে গেছে ডানদিকের গেরুয়া পাহাড়ের গায়ের চড়াই পথে। আমরা এইখানে মুক্তিনাথের পথ ধরলাম। যদি সোজা নদীর উপর দিয়ে আরও দেড়মাইল এগিয়ে যেতাম, তবে পৌঁছতাম কাগবেণীতে। কাগবেণী নাকি নেপালীদের শ্রাদ্ধের প্রকৃষ্ট স্থান, এদের গয়া। সুতরাং এটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। মুক্তিনাথ যাবার পথে কষ্টকর চড়াইর হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা ফেরবার পথে কাগবেণী গিয়েছিলাম। ফেরবার পথে কাগবেণীর রাস্তা কেবলই উৎরাই হবে, কঠিন হলেও চলতে অনেক সুবিধা।

এই দুটি পথের সংযোগস্থলে একটি নেপালী পরিবার ডালপালা, ও পাথর দিয়ে তৈরী একখানা কুটির করে বাস করেন। বন্ধু বসে গেছে চা খেতে। তার নেপালী "দিদি" ঘরে ঢুকেছেন চা তৈরী করতে। আমরাও চা খাবার নামে একটু বিশ্রাম করে রওনা হলাম।

এখনকার পথ ধীরে ধীরে চড়াই উঠেছে। আমরা সেই ধূসর চড়াই পথে ক্রমাগত উঠেই চলেছি। ঝুমসুম্বার উচ্চতা নয় হাজার ফুট, মুক্তিনাথ তের হাজার পাঁচশো ফুট। সুতরাং অনেকটা চড়াই উঠতে হবে এখনো। কিছুদূর এগিয়ে রুক্ষ মস্ত মস্ত পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পথ, তারপর দেখি অনেকটা ময়দানের মত। ময়দানটি ছোট ঘাস ও রুক্ষ কাঁটা ঝোপে পূর্ণ। কয়েকটা বড় বুনো গোলাপের গাছও দেখলাম। ছোট ছোট ঝোপগুলি জুনিপার গাছ। জ্বালালে জুনিপার কাঁচাও জ্বলে। আমরা ময়দান পথে তখনো উঠেই চলেছি। উপর থেকে অনেক নীচে সাদা বালুচরের মধ্যে কালীগণ্ডকীর নীলধারাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আমরা ডাইনে বেঁকে চলেছি, সেদিক থেকে মুক্তিনাথের নদী নেমে এসেছে। অত উঁচু থেকেও নদীর সঙ্গম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তার পাশেই কাগবেণী গ্রামটি। দূরের ধূসর ও বাদামী পাহাড়ে খোঁরাটে খোঁরাটে দেখাচ্ছে। দাদা দেখান—

"ওই দেখ, দেখছো? পাহাড়ের গায়ে গুহার মতন, আর ওই যে ওখানেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে পায়ে-চলা পথের দাগ দেখা যাচ্ছে, ওখানেই একটা গ্রাম আছে। গুহার ভিতরে ঘরবাড়ী আছে। কৈলাশ মানস-সরোবর যাবার পথে আমরা ওইরকম অনেক গ্রাম দেখেছিলাম। এটি তিব্বতের বৈশিষ্ট্য।".

ভীমবাহাদুর চড়াই উঠবার সময় বলেছিল, একঘণ্টা পর জলের ধারা পাওয়া যাবে। কিন্তু বেলা বারোটা বেজে গেল তবু পথে অনেক খুঁজেও কোথাও জলের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। থাকবেই বা কোত্থেকে, সবই যে শুকনো রুক্ষ পাহাড়। তখন অগত্যা বুনো-গোলাপের ঝাড়ের ছায়াতে মাথাটা কোনক্রমে রোদ থেকে বাঁচিয়ে ঝুমসুম্বা থেকে আনা রুটি, আচার ও চা খেয়ে আবার চলা শুরু করলাম। দলে দলে ঝব্বু ও চমরী চরে বেড়াচ্ছে পথের ধারের ময়দানে। এই শুকনো পর্বতগাত্রে ওরা কি খায় কে জানে!

পথ চলতে চলতে দুটি ঘোড়ায়-চড়া মূর্তি আমাদের ছাড়িয়ে নীচে নেমে গেল। প্রশ্ন করে জানলাম, তারা মুক্তিনাথ থেকে নামছে। মাইল-তিনেক আরও চলবার পর আমরা পাহাড়ের বাঁকের মুখে 'মুক্তিনাথ' গ্রামখানি দূর থেকে প্রথম দেখতে পেলাম।

এখনকার পথে আর তত চড়াই নেই, ধীরে ধীরে উঠেছে। শেষের দুই মাইল আবার চড়াই পেয়েছিলাম। কালকের মত আজও বেলা বাড়তেই প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে, পিছন থেকে বইছে এই যা রক্ষা। আমরা জামা-কাপড় সামলাতে সামলাতে অতিকষ্টে চলেছি। আমার শাড়ীর আঁচল পতাকার মত পত্‌পত্ করে উড়ছে। এদিকে প্রচণ্ড রোদ্দুরে চোখ চাওয়া যায় না।

আরও এগিয়ে চলে একটা পাহাড়ের বাঁক থেকে তিন-চারটা গ্রাম স্পষ্ট দেখা গেল। তার সবশেষটাই মুক্তিনাথ। বন্ধু বল্লে, আর মাইল-দুই হবে, কার্যত হোল অনেক বেশী। পাহাড়ের দেশে দূরত্ব বোঝা কঠিন, তাই ক্রমাগত হেঁটেই চলেছি, গ্রামের ঘরবাড়ীগুলি বড় হচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে, কিন্তু গ্রামগুলি আর কাছে আসে না। পথ কিন্তু বেশ ভাল, তাই চলতে কষ্ট নেই।

আরও বেশ কিছুদূর চলে আমরা পথের পাশে গ্রামের দেখা পেলাম। প্রচুর শস্যক্ষেত আছে গ্রামের চারিদিকে ঘিরে, একেবারে যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচ অবধি, নদীর তীর পর্যন্ত। তাই এখন আবার শ্যামল দেখাচ্ছে পাহাড়কে। সম্মুখের উপত্যকা মুক্তিনাথেই শেষ হয়ে গেছে। তার চারিদিকে ঘিরে তুষারাবৃত শিখরাবলী। পিছনে তাকালেও দূরে একটি উজ্জ্বল শিখর চোখে পড়ছে।

মুক্তিনাথের দুই মাইল আগের গ্রামখানির নাম ঝারকোট, ঝারকোটে একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ী আছে, ধসে ধসে পড়েছে। খোঁজ করে জানা গেল, ওটি ঝারকোটের প্রাচীন রাজার দুর্গ ছিল। এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। ঝারকোট খুব বর্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রচুর চাষের ক্ষেত, বড় বড় ঘরবাড়ী আছে। স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা মাঠে চাষের কাজ করছে, কুলায় করে শস্য ঝাড়ছে, ছেলেরা উদুখলে মশলা গুঁড়ো করছে। এই ধূসর পাহাড়ে দুষ্প্রাপ্য অনুর্বর জমিতে কতো রকমারি ফসল ফলেছে। বড় বড় পিপ্পল গাছের ছায়া-ঢাকা পথ একটানা চলেছে। পথের পাশের নালা দিয়ে তীব্রবেগে ঝরনার জল বেয়ে চলেছে—এটি ইরিগেশান ক্যানাল। ঝারকোট পার হবার পর বেশ খাড়া চড়াই পথ বেয়ে উপরে উঠে গেলে দেখা গেল মুক্তিনাথের সাদা সাদা ঘরবাড়ী —এখান থেকে স্পষ্ট দেখা গেলেও এখনো দুই মাইল দূরে। ওই তো ধর্মশালা, মন্দির, যাত্রীনিবাস, সব এক-এক করে চোখে পড়ছে। ওখানেও চারিধারে অজস্র পিপ্পল গাছ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে ঘরগুলি ঘিরে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে ওখানকার ইস্কুল। অনেকগুলি বাচ্চা লেখাপড়া করছে। তারা দলবেঁধে এসে আমার স্বামীর কাছ থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা চেয়ে নিয়ে গেল।

মুক্তিনাথ পৌঁছাতে আমাদের পোনে তিনটা বেজে গেল। বন্ধু মিনিট-পনের আগে এসে পৌঁছেছে। মিঃ বিশ্বাস দাদার সঙ্গে আরও আধঘণ্টা পরে এলেন। প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের থাকবার জন্য যাত্রীনিবাসের দরজা খোলা হল। কোন লোকজন নেই, অকথ্য রকম নোংরা পড়ে আছে। বন্ধু খুঁজে খুঁজে একজন লোক ধরে নিয়ে এসে ঘর সাফ্ করাবার কাজে লাগাল। আমি বাইরে রোদ্দুরে পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। মনে একটা নিশ্চিন্তভাব নেমে এসেছে।

দাদা আর মিঃ বিশ্বাস পথে সহকারী পূজারীর দেখা পেয়ে ধরে নিয়ে এসেছেন। সে নীচের গ্রামে যাচ্ছিল পূজার জন্য চিনি আনতে। আমাদের কাছে চিনি পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে উঠে এসেছে, সে-ও নিতান্ত অনিচ্ছাতে। আমাদের ধারণা, আমাদের দেখেই, কাজের ভয়ে সে পালাচ্ছিল। কিন্তু দাদা বড় কঠিন ঠাঁই, তাকে ধরে সঙ্গে করে এনেছেন। তার সাহায্যে যাত্রীনিবাস সাফ্ করে, বিছানা চৌকির ব্যবস্থা করে আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ আনতে লোক পাঠানো হল।

যাত্রীনিবাসের অবস্থা অতি শোচনীয়। স্যাঁতসেঁতে মেজে, টিনের ছাতে ধোঁয়া যাবার জন্য গোল করে মস্তবড় ছেঁদা করা, তার ভিতর দিয়ে নীলাকাশ দেখা যাচ্ছে। জানলাগুলি বন্ধ করলেও ফাঁক থেকে যাচ্ছে, আর হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। ভীমবাহাদুর ভিতরের উঠানের পাশে একটা ঢাকা বারান্দাতে রান্নার জায়গা করে নিয়েছে। ওরই একপাশে আগুনের ধারে তারা রাতে শোবে। ড্রাম চেয়ে নিয়ে তাতে ঝরনার জল ভরেছে।

ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

শোবার ঘর গরম করবার জন্য আগুন জ্বালানো হল, আমরা তারই পাশে বসে আরাম করে স্যুপ, বিস্কুট, সিদ্ধ আলু ও দাদার তৈরী খাঁটি দুধের কফি খাচ্ছি।

মুক্তিনাথের চারিদিকের দৃশ্য অতি-মনোরম। প্রায় চারিদিক গোলাকারে ঘিরে সু-উচ্চ পর্বতমালা, তার উপর শ্বেতশুভ্র উজ্জ্বল তুষারশৃঙ্গরাজি শোভা পাচ্ছে। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে পিপ্পল গাছের ছায়া-ঢাকা পথে ঝরনাটি কলগুঞ্জন করে নেচে নেচে বয়ে চলেছে। মুক্তিনাথের একটু উপরেই তার উৎস, পাহাড়ের মধ্য থেকে জলধারা নিঃসৃত হয়ে আসছে। কাগবেণীতে ওই ঝরনাটিকেই আমরা কালীগণ্ডকীতে মিশতে দেখেছি। এখানে আসবার সময় মুক্তিনাথে পথের পাশে দেয়ালের মত গাঁথনী করে তাতে অনেকগুলি ধর্মচক্র সারি সারি সাজানো দেখেছি। যেমনটি তুকুচে বা পথের অন্যত্র দেখেছি। প্রত্যেকটি ধর্মচক্রের গায়ে লেখা 'ওঁ' মণিপদ্মে হুঁ, ঘুরিয়ে দিলে বহুক্ষণ ধরে মিষ্টি আওয়াজ করে ঘুরতে থাকে। এখানে স্থায়ী বাসিন্দা খুব কম, বিশেষ করে শীত-পড়া শুরু হতে অর্থাৎ দুর্গাপূজার মেলার পর সকলে নীচে নেমে যায়। এদিকের সবচেয়ে বড় তীর্থ এই মুক্তিনারায়ণ, তাই মেলাও নাকি বেশ বড় হয়। ভারত ও নেপালের বহু দূর দূর প্রদেশ থেকে লোক আসে তীর্থপূজো করে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়।

মুক্তিনাথের পূজার জন্য দুইজন পূজারী আছেন। একজন হিন্দু অন্যজন বৌদ্ধ। এমনটি অন্য কোথাও দেখিনি। নেপাল হিন্দুরাজ্য হলেও, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সর্বত্র লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে এই অঞ্চলটি বৌদ্ধপ্রধান। তিব্বতের কাছে বলে এমনটি ঘটেছে।

মুক্তিনাথের মন্দিরে নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেখতে কিন্তু অবিকল বুদ্ধ-মূর্তি, কেবল চতুর্ভুজ বলে নারায়ণ বলে চেনা যায়। সোনা বা পিতলের মূর্তির উপর সোনার জল দেওয়া। পিছনে আছেন নাগরাজ বাসুকি সহস্রফণা বিস্তার করে। বামে লক্ষ্মীদেবী। ডাইনে নারায়ণের বোন। সাদা রঙ-করা পাথরের তৈরী চৌকোনা ছোট মন্দির। কারুকার্য বিশেষ নেই, সোনার চূড়া দূর থেকে জ্বলজ্বল করে। মন্দির ঘিরে একশ' আট ধারাতে জল পড়ছে। ধারাগুলি মনুষ্যনির্মিত। ওখানকার ঝরনাটি থেকে নালা কেটে জল এনে একশ' আটটি নলের মুখে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। নলের মুখগুলি পিতলের তৈরী, কোনটা হাতীর মুখ, কোনটি ঘোড়ার মুখ, কোনটি উটের বা ড্রাগনের। চারিদিকে ঘিরে পিপ্পল ও বুনো-গোলাপের ঝাড়। বুনো-গোলাপ গাছগুলিতে অজস্র টুকটুকে লাল ফল ফলেছে। খেতেও টকমিষ্টি।

বেলা পড়ে এসেছে, শীতও বাড়ছে ক্রমশঃ। আমরা মুক্তিনাথে একটি দিন থাকবো, সুতরাং পূজারীর সহায়তায় চাল, আটা, সব্জী ও দুধের ব্যবস্থা করা হোল। কাঠ তো আগেই আনানো হয়েছে।

প্রচণ্ড শীত লাগছে, আগুনের ধার থেকে আর নড়া যাচ্ছে না, বিছানাপত্রে মনে হয় কেউ জল ঢেলে রেখেছে। এয়ার-ম্যাট্রেসের উপর স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকেও শীতে হি-হি করে কাঁপছি।

রাত্রে খাবার সময় বাইরে বেরুতে হোল। বাইরে খোলা আকাশের রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে থাকি। এ যে অলৌকিক, দেখে দেখে আশ আর মেটে না। গভীর নিকষ কালো আকাশে অগণ্য তারা উজ্জ্বল হয়ে যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সেগুলি অনেক কাছে যেন এগিয়ে এসেছে। মধ্যাকাশে কাল-পুরুষ শোভা পাচ্ছে, উত্তরে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা। প্রতিটি নক্ষত্রকে যেন আলাদা করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারার সংখ্যাও যেন বেড়ে গেছে মনে হয়। চারিদিক ঘিরে নিকষ কালো পাহাড়ের শ্রেণী, তুষারশিখরগুলিও এখন কালো দেখাচ্ছে, মাথার উপর উজ্জ্বল নক্ষত্রশোভিত চন্দ্রাতপ। অদ্ভুত এক বিচিত্র দৃশ্য, এমনটি পাহাড়ের উঁচুতে ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি, ঘরে ঢুকবার কথা মনেও হয় না। আর ওই তো ঘরের শ্রী! কিন্তু প্রচণ্ড শীতের জ্বালায় বাইরে বেশীক্ষণ থাকবারই বা উপায় কই!

মুক্তিনাথের প্রথম রাত্রিটি প্রচণ্ড শীত সত্ত্বেও ভালই কাটলো। কেবল আমার স্বামী মিঃ বিশ্বাস বলছেন, তাঁর নাকি শীতের জন্য ভাল ঘুম হয়নি। সকালে সূর্যালোক আসবার পরেও সেই হাড়-কাঁপানো শীত কমতে চায় না। চারিদিকের ছোট ছোট ঝোপগুলির পাতায় এবং ঘাসের ডগায় শিশির জমে সাদা তুষার হয়ে আছে। কাল আসবার সময় ঝারকোটের কাছে দু'-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল, কিন্তু সে-বৃষ্টি জল নয়, তুষারপাত হচ্ছিল। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বাড়তেই ঘাসে ও গাছের পাতার সেই তুষার গলে মাটিতে মিশে গেছে। আবার বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝোড়ো-হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এত শীতে অতিশয় পীড়াদায়ক। আজও আমরা এখানে রাত কাটাবো। বাইরে খোলা মাঠে পাথরে

বসে বসে দেখি চারিদিকের তুষার-ঢাকা পর্বতশ্রেণী গোল করে ঘিরে আছে। প্রভাত সূর্যালোকে আবার তুষারশিখরে হেসে উঠেছে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলি যেন ছবির মত দেখাচ্ছে। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে নীল ঝরনা বয়ে চলেছে। অপরূপ দৃশ্য!

স্নান সেরে নারায়ণের পুজো দিতে যাবার আগে রান্না সেরে নিলাম। আজ বিশ্রামের দিন, তাই একটু বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব হোল। তাছাড়া আগুনের তাপে বসে থাকতেও মজা। সকলে মিলে ঝরনাতে স্নান, প্রচণ্ড শীত হলেও বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। পূজারী পুজোর সব আয়োজন করেই রেখেছেন। আমাদের সঙ্গে শুকনো ফল ও মিছরী ছিল, তাই দিয়ে পুজো দেওয়া হোল। সারাদিন বাইরে বাইরে রোদ্দুরে বসেই শুয়েই বিশ্রাম করা, ঘুরে বেড়ানো, দিনটা কাটলো মন্দ না। বুড়ো-শিশুর দল যেন আনন্দে আজ মশগুল।

দাদা বললেন, সমস্ত পথটা দেখলে তো! পাহাড়ের সবটাই প্রায় ক্ষেতভরা। মনে হয়, এই অঞ্চল খুব উর্বর, তাই এত ফসল ফলে। এই নদীবহুল পর্বতাঞ্চল জলদান করে সারা বৎসর নেপালকে উর্বর করে রাখে, তাই বুঝি এই পর্বতমালার নাম অন্নপূর্ণা—অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা।

এই অঞ্চলেই আছে নেপালের মস্ত মস্ত কয়েকটি নদী, কালীগণ্ডকী, শ্বেতী-গণ্ডকী, মিরিস্টি খোলা, মার্সিয়ান্দী প্রভৃতি। আর আছে অসংখ্য অগণ্য উপনদী, তাই এই অঞ্চল এত সমৃদ্ধ হয়েছে। সার্থক অন্নপূর্ণা নামাকরণ।

বিকালবেলা সকলে মিলে পাতালগঙ্গা ও জ্বওলা দেবীর মন্দির দেখতে গেলাম। মুক্তিনারায়ণের মন্দিরের অনতিদূরে জ্বওলা-মায়ের মন্দির। মধ্যপথে এক জায়গায় একটি ঝরনা অন্তঃসলিলা বয়ে চলেছে। পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়ে নদীর জল বয়ে চলেছে, কান পেতে তার শব্দ শোনা যায়। লোকে বলে, পাপীরা নাকি শুনতে পায় না সে-শব্দ। আমরা তাহলে কেউ পাপী নই! একটি স্থানে কেবল গর্ত করে ঐ পূতবারি নেবার ব্যবস্থা আছে। এই অন্তঃসলিলা ধারার নাম পাতালগঙ্গা। আমরা পাতালগঙ্গার পবিত্র জল বোতলে পুরে নিলাম, বাড়ী নিয়ে যাব।

জ্বওলা দেবীর মন্দির নাম, কিন্তু আসলে সেটি একটি বৌদ্ধ মনাস্টারী। মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের একটি স্বর্ণময় মূর্তি আছে। পূজারিটি তিব্বতী বৌদ্ধ। মন্দিরে নানারকম তিব্বতী ছবি, পট আছে, ঠিক যেমন অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধ মনাস্টারীতে দেখা যায়। মূর্তির সামনে শত শত প্রদীপ জ্বলছে। মূর্তির বেদীর নীচে মন্দিরের মেজেতে তিনটি গুহার মত ছোট-ছোট গর্ত আছে সেখানে আগুন জ্বলছে। এই আগুন কখনো নেভে না। মাটির নীচ থেকে ন্যাচারাল গ্যাস বের হচ্ছে, তাকেই জ্বালানো হচ্ছে, তাই নাম জ্বওলামায়ী। আগুনের পিছনে একটি লুক্কায়িত ঝরনার ধারা বয়ে চলেছে। হাত দিয়ে দেখলাম, সেই ঝরনার জল তুহিন শীতল। আগুনের তাপে একটুও গরম হয়নি। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র লীলা।

'মুক্তিনাথ' পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম। পাহাড়ের উপর আর কয়েক শ' ফুট উঠলেই যেন চূড়ায় পৌঁছানো যাবে। ধসা পাহাড় নেমে এসেছে মন্দিরের পিছন অবধি। পাহাড়টির গায়ে ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে পাহাড়টিকে ডিঙোলে একটি গ্লেসিয়াল হ্রদ পাওয়া যাবে, তার নাম 'দামোদর-কুণ্ড'। এটি কালী-গণ্ডকীর একটি উৎপত্তিস্থান বলে পরিচিত। এখান থেকে দামোদর-কুণ্ডের দূরত্ব কেউ সঠিক বলতে পারে না। দামোদর-কুণ্ডে অনেক শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। এই শালগ্রাম শিলা শিলীভূত সামুদ্রিক প্রাণী বা 'ফসিল'। কোটী কোটী বছর আগে হিমালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্র থেকে হিমালয় মাথা তুলে ওঠে। এত উঁচুতে এই ফসিলের অস্তিত্ব দেখে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল দামোদর কুণ্ডে যাবো, কিন্তু ওপথে যাবার কুলি সংগ্রহ করা গেল না। তিব্বতী কুলি ছাড়া এপথে নেপালীরা কেউ যেতে চায় না। তাছাড়া এখনকার অনিশ্চিত অবস্থা, প্রায়ই ডাকাতি বা রাহাজানি হয়, তাই ওপথে যেতে চায় না কেউ। আমাদের আসতেও দেরী হয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, শীঘ্রই তুষারপাত হবার সম্ভাবনা। তাই এবারকার মত আমরা দামোদর-কুণ্ডের আশা ত্যাগ করলাম। এপ্রিল বা মে মাসে যাওয়া অসম্ভব নয় বলে সকলে জানালেন। অগত্যা এখানে কয়েকজন ভোটিয়ার কাছ-থেকে দামোদর-কুণ্ড থেকে সংগৃহীত শালগ্রাম কিনে নিলাম।

মুক্তিনাথ থেকে আরও এগিয়ে একটা আঠারো হাজার ফুটের গিরিসঙ্কট ডিঙিয়ে গেলে পশ্চিমে কাঠমাণ্ডুতে যাওয়া যায়। পর্বতারোহীরা কাঠমণ্ডু থেকে ওই পথেই অন্নপূর্ণা ও ধৌলাগিরি আরোহণ করতে আসেন।

একটি দিন পরমানন্দে কাটলো। পরদিন সকাল থেকেই ফেরবার তোড়জোড় সুরু করেছি। ফিরবার পথের যাত্রী হলেও আর দুঃখ বা আফশোস নেই। আমরা পরম সৌন্দর্যের সন্ধানে এসেছিলাম, সে সৌন্দর্য আজ দশদিন ধরে প্রাণভরে দেখেছি, মন আমাদের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত।

আজও চারিদিকের শ্যামল মুক্তিনাথ তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের বাইরে আবাহন করে। নির্মেঘ নীলাকাশের চন্দ্রাতপ তলে উজ্জ্বল হয়ে চারিদিক ঘিরে আজও তেমনি তুষারশুভ্র শৃঙ্গাবলী শোভা পাচ্ছে, তার রূপের যেন সীমানা নেই। নীরব নিস্তব্ধতা হরণ করে ঝরনা বয়ে যায়। বাতাসে মর্মর ধ্বনি শোনা যায়।

'মুক্তিনাথ কি জয়!' ধ্বনি দিয়ে আমরা নামতে সুরু করলাম। ফিরবার পথে আজ আমরা কাগবেণী হয়ে ফিরবো। আজও বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঝোড়ো হাওয়া সুরু হয়েছে। আজ সম্মুখ থেকে বইছে, যেন পিছনে ঠেলে দিচ্ছে, চলবার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। অসাবার সময় যেখানে একদল ঘোড়-সোয়ারের দেখা পেয়েছিলাম, সেই ময়দানের পরই পথ নীচের দিকে খাড়া উৎরাই নেমে গেছে, সেই পথেই চলেছি। অত উঁচু থেকেও চারিধারে শস্যক্ষেত ঘেরা গ্রামখানি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গ্রামটির দুদিকে দুটি নদী, কালীগণ্ডকী ও মুক্তি-নাথের ঝরনা। আরও দূরে নদীর শুভ্র বেলাভূমির ওপারে স্তরে স্তরে রুক্ষ পর্বত-মালার সারি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেন ধোঁয়াটে হতে হতে আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। পাহাড়গুলির চূড়া ভোঁতা-ভোঁতা।

প্রায় হাজার খানেক ফুট একটানা কঠিন উৎরাই বেয়ে নেমে আমরা ঝরনার ধারে পৌঁছলাম। উৎরাই শেষ হতে হতেই শস্য-ক্ষেতের সুরু। গোলাপী রঙের ফুলে রঙিন হয়ে আছে ক্ষেতগুলি। তারই মাঝ-খান দিয়ে সরু আলপথে চলে ঝরনার তীরে পৌঁছাতে হয়। বন্ধু এগিয়ে গেছে। দূরে থেকে দেখেছি, নদীর সঙ্গমে বহু লোক জমায়েৎ হয়ে যেন কি করছে, বন্ধু তাই দেখতে গেছে। আমরা ঝরনার তীরে ওর অপেক্ষাতে বসে আছি, ও ফিরলে কাগ-বেণীতে ঢুকবো।

ফিরে এসে বন্ধু বলে—"যা ব্যাপার দেখলাম, সে শুধু ভীষণ নয়, বীভৎসও! একটি ছোট ছেলে মারা গেছে, তার সৎকার হচ্ছে ওখানে, নদীর সঙ্গমে; তাই দেখতেই লোকের ভীড় অত ওখানে। ছেলেটির মৃতদেহের গলায় এক টুকরো রশি বেঁধে সেই রশির প্রান্ত ধরে একটু দূরে দুজন লোক বসে আছে। আর মৃতদেহটি শত-শত শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কয়েকটা শকুন মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। দেহের প্রায় সবটাই খাওয়া হয়ে গেছে। বীভৎস দৃশ্য! এ-চোখে দেখা যায় না। আমি তো দেখেই পালিয়ে এসেছি। আপনারা যাবেন না ওখানে।"

কাগবেণী গ্রামটি খুব ছোট নয়। দেখতে অনেকটা পাথরের তৈরী দুর্গের মত। ঝরনার উপর পাতা দুখানি গাছের মোটা গুঁড়িতে পা রেখে পার হয়েই গ্রামের রাজপথ পাওয়া গেল। দুজন ঘোড়সোয়ার পাশাপাশি সহজে চলতে পারে এমন চওড়া। একজন গ্রামবাসীর নির্দেশে আমরা সেই পথে এগিয়ে চলেছি। পথ নয়, সে যেন সুড়ঙ্গ-পথ। দুপাশে পাথরের দেয়াল, মাথার উপর পাথরের ছাদ। দুদিকের ঘর-বাড়ী সেই সদর রাস্তার মাথার উপর মিশে গেছে। সদর পথের উপরের ছাদে লোকজনের চলাফেরার আওয়াজ পাচ্ছি। মনে মনে ভাবি, বই-এ বাগদাদ শহরের যেমন বর্ণনা পড়ি বুঝি এমনি!

ু একটু এগোতেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গাম, যেন রাত্রির মধ্যযাম! ঐ অন্ধকার পথে বীরদর্পে বন্ধু এগিয়ে চলেছে, র তার পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে আমাকে গাতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও কেবল ড়ের মাথায়, উপরকার ছাদে ছোট্ট ছেঁদা । সূর্যের আলো অতি কৃপণের মত পথে প্রবেশ করছে। সেই স্বল্পালোকিত , কোথাও ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল শব্দ লক্ষ্য করে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চলা। ঝ মাঝে তা-ও যখন হারিয়ে ফেলছি, ভয়ে কর রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে! গলির পাশের খুলে কেউ যদি উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে পড়ে, আমার যে চেঁচাবারও সাহস বে না। প্রাণের দায়ে এমতাবস্থায় থেমে ধু! বন্ধু!" বলে চেঁচাচ্ছি। বাপ্‌রে! দেশ!

বন্ধুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। কার দেশে জানি না, সে ওই অন্ধকারে ক্রমাগত য়েই চলেছে, আর মাঝে মাঝে সাড়া তার অবস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বার কোন লক্ষণ নেই তার। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখি! কোথায়? মিঃ স আর দাদার কোন পাত্তাই নেই।

প্রায় মিনিট দশ-পনের হেঁটেছি, মনে যেন যুগ-যুগান্তর হেঁটেই চলেছি। গলিপথে চলে শেষে একটা উন্মুক্ত পৌঁছানো গেল। এটি গ্রামের শেষ সুড়ঙ্গেরও শেষ। উঠান ঘিরে দেয়াল, পরই শস্যক্ষেত, শস্যক্ষেত্রের পর নীলাভ গিতভরীর শুভ্র বেলাভূমি।

বন্ধু কোন অদৃশ্য মানবের নির্দেশে চলেছিল জানি না, কিন্তু এতক্ষণে হুড়ুড় রাজ্যে কয়েকজন জলজ্যান্ত র দেখা পাওয়া গেল। তাদের ভাষা না, দেখতে তারা নেপালীদের মত এরা তিব্বতী বা ভোটিয়া। বন্ধু আমাকে গ্রাহ্য না করে চলেছে, কিন্তু একদল মেয়ের সামনে এসে পড়ে কে এগিয়ে দেয় কথা বলার জন্য।

"মামীমা, যদি বলুন, আমাদের জন্য করে দিতে পারবে কিনা!"

হুকুম করা সহজ, কাজ করা তত নয়। ভাষার বাধা থাকাতে আরও কঠিন। অনেক কষ্টে হাত-মুখ নেড়ে ইসারা তে তাদের বুঝিয়ে দিলাম, আমরা র্ত, খাবার চাই!

কয়েকটি সুশ্রী তরুণী খাবার তৈরী দিতে রাজী হল। তারা ইঙ্গিতে তাদের এসে বসতে বললো। কাঠের মই-এর সিঁড়ি, চার-পাঁচটি সিঁড়ির পর পাথরের টের তৈরী ঘর। তিব্বতী ঢঙে ঘরের দুইদিকে লম্বা করে সরু ভোটিয়া গালিচা বিছানো। সম্মুখে উনুনে আগুন জ্বলছে, তার পাশে বড় উঁচু আসন। লম্বা টানা আসনের সামনে অনেকগুলি ছোট ছোট জলচৌকী পাতা, তারই উপর থালা রেখে খাওয়ার ব্যবস্থা। অন্য ধারে কাঠের তৈরী তাকের উপর সাজানো আছে বাসনপত্র, খাদ্য দ্রব্য। ঘরের ঠিক মাঝখানে ছাদথেকে ঝোলানো দড়ির দোলনাতে একটি ছোট বাচ্চা ঘুমাচ্ছে।

মেয়েদের মধ্যে একজন রান্নার ভার নিয়ে বাসনপত্র সাফ করতে লাগলো, তাকে সাহায্য করতে লাগলো আর একটি যুবতী। এদের ভাণ্ডারে কি খাদ্যদ্রব্য আছে জানি না, অনেক কষ্টে আলু-ভাতে ভাত, ঘরে তৈরী মাখন জ্বালিয়ে ঘি ও কিছু দুধ সংগ্রহ করা গেল।

একজন নেপালী এসে ঘরে বসে হিন্দিতে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। সে ব্যবসা করে, সেই উপলক্ষ্যে কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, বেনারস ইত্যাদি দেখেছে। মেয়েদের একজন একটা প্রকাণ্ড হাঁড়ি থেকে কি এক ঘোলাটে পানীয় এনে তাকে খেতে দিল, একটু পরেই তার গন্ধে বুঝলাম সেটা মদ!

কিছু পরে আরও কয়েকটি লোক ঘরে ঢুকলো, আসন নিয়ে বসে মেয়েদের দেওয়া মদ খেতে লাগলো! আমার তো চক্ষু ছানা-বড়া! এ কোথায় নিয়ে এসেছে বন্ধু।

খানিক পরে দুটি তরুণী এলো, প্রত্যেকের পিঠ-বোঝাই কাঠ কেটে এনেছে। ঘরের মধ্যেই লাগানো মই বেয়ে একজন ঘরের ছাদে উঠে গেল, সেখানে কাঠগুলি রোদে শুকাতে দেবে।

শুঁড়িখানায় বসে আমার আর অস্বস্তির সীমা নেই। এমন জায়গায় এসে পড়বো স্বপ্নেও ভাবিনি। তবে ওরা আমাদের সঙ্গে বেশ সদ্ব্যবহার করেছে। অতি যত্ন সহকারে খাবার পরিবেশন করে খাওয়াল। কিন্তু খাওয়া হয়ে যাবার পর আমি অত্যন্ত সহজ বাংলাতে ওঁকে বলি—"এখানে আর নয়! অনেক হয়েছে। এবার রাস্তায় গিয়ে পাথরে শুয়ে বিশ্রাম করবে চলো।"

তাড়া দিয়ে পয়সা মিটিয়ে সবাইকে বের করে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে আমরা আবার সেই সুড়ঙ্গপথে সহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। গ্রামের সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে নদী পার হতেই একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। সে-ই যেখানে আমরা কালীগণ্ডকীর তীর ছেড়ে মুক্তি-নাথের চড়াই পথ ধরেছিলাম, সেই সেখানকার কুটিরের গৃহিণী। আমাদের দেখেই চিনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। তার ঘর দেড় মাইল দূরে।

গ্রামের বাইরে চলতে চলতে নদীর বুকে বালুর উপর কয়েকজন লোককে গুটিশুটি মেরে বসে থাকতে দেখলাম। এগিয়ে দেখি, তারা আমাদেরই ভীমবাহাদুরের দলবল। চুপ করে আমাদের অপেক্ষাতে বসে আছে! আমাদের দেখে ওরা বলে, কাগবেণী তিব্বতী গাঁও, তাই আমরা সেখানে যাবার চেষ্টাই করিনি। ওখানে মস্ত মস্ত ভোটিয়া কুকুর আছে, আমাদের দেখলে কামড়ে দেবে। একথা কিন্তু আমাদের আগে জানায়নি!

দেড় মাইল দূরের ঘরের গৃহিণীর সঙ্গে তার ঘরে গিয়ে চা-খাওয়া বিশ্রাম দুটোই হ'ল। আবার পুরোন পথে ফিরে চলা।

আবার ঝুমেসুম্বা। ওই পথেই হেঁটে ছয়দিন পর আমরা আবার পোখরা ফিরে এলাম। দানার পর অন্য এক পথে পালপুঙ্খ হয়ে আসা সম্ভবপর ছিল, পথ সরল হলেও দূরত্ব বেশী বলে আমরা সে পথে আসবার চেষ্টাই করিনি। পোখরাতেই হ'ল এবারকার মত আমাদের হাঁটা পথের শেষ। আমরা এবার যাবো প্লেনে করে কাঠমাণ্ডু, পশুপতিনাথ দর্শন করে এবারকার মত যাত্রা শেষ করবো।

কাঠমাণ্ডু দেখতে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। প্লেনে করে যেতে যেতে হিমালয়ের অন্তহীন তুষার-সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। কাঠমাণ্ডুতে "ভাট-গাঁওয়ের" ও ললিতপুরের পুরোন প্রস্তর ও কাঠের স্থাপত্য অতি মনোরম। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে নেপালে হিন্দু রাজার রাজত্ব চলে এসেছে। অসংখ্য কারুকার্যময় হিন্দু মন্দিরও তাই নির্মিত হয়েছে। ভারত ও তিব্বত থেকে শান্তির বাণী নিয়ে এসেছে বৌদ্ধধর্ম। তাও এখানে সাদরে গৃহীত হয়েছে। নেই কোন মুসলিম ধর্মাবলম্বী বা ক্রীশ্চান মিশনারী। হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম দুটি ভায়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আছে বলে আমাদের মনে হয়নি কোথাও। তাই যেমন হিন্দু মন্দির তৈরী হয়েছে, তেমনি আছে বহু বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ। একটা থেকে অন্যটা আলাদা করা যায় না। এমন মিলমিশ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অতি মনোরম, তবু মুক্তিনাথের দুর্গম পথের দেড়শো মাইল পথ হেঁটে যে আনন্দ পেয়েছি, তা কখনো ভুলবার নয়। বিরাট তুষারমৌলী দুটি শৈলমালা, অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা ও সার্থকনামা শুভ্র ধৌলাগিরির (বা ধবলগিরি) মধ্য দিয়ে বিশাল চওড়া কালীগণ্ডকীর অন্তহীন রূপ দেখতে দেখতে চলে পথের যে অলোকিক সৌন্দর্যের স্বাদ পেয়েছি, সে স্বাদ এখনো ভুলতে পারছি কই?

—সমাপ্ত—

অঙ্গনা

প্রমীলা

সমাজব্যাধি ও মায়েরা

অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছি আমরা সেই কোন অতীতে। কিন্তু লক্ষ্যপথে পৌঁছানো আজও সম্ভব হয়নি। পরিপূর্ণ আলোকের ছত্রছায়াতলে সমবেত হতে আমরা পারিনি। লক্ষ্যে স্থির এবং প্রতিজ্ঞায় অবিচল হয়েও নির্মমভাবে আমাদের পরাজয় মেনে নিয়ে দূরে সরে আসতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আলোর পরোবর্তী অন্ধকার হয়তো কেটে যাচ্ছে আমাদের প্রদীপ্ত প্রাণের পরশে। কিন্তু অন্ধকার লুকিয়ে থাকছে আনাচে-কানাচে। আর সেখান থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে আমাদের শুভ এবং মহৎ প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমরা একান্ত অসহায়ভাবে আদিম বর্বরতার শিকার হয়ে পড়ছি—একবার ভেবে দেখছি না যে এই ঘৃণ্য এবং জঘন্য জীবনের গণ্ডী পার হয়ে এসেছি অনেকদিন আগে এবং পূর্বপুরুষের যত্নলালিত প্রয়াসে। অন্ধকারের পথ চেয়ে আমরা কোন অতলে তলিয়ে গেলাম, নিজেদের হারিয়ে ফেললাম, আলোর ইশারা সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না। যুগে যুগে এভাবেই আমাদের নরকের অন্ধকারে পচে মরতে হয়েছে। পুরুষানুক্রমিক প্রচেষ্টায় হয়তো নিষ্কৃতি পেয়েছি। কিন্তু সে সুকৃতিকে মূল্যহীন করে আবার অন্ধকারের প্রগলভতায় মেতে উঠেছি। অতীত আবর্জনাকে সমাজের বুকে টেনে আনত এতটুকু আটকায়নি। প্রতিবাদকারীরা দুষ্কৃতিকারীদের অট্টহাসিতে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে বসে আছেন। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার কথা ভেবেই এসব কথা বলতে হচ্ছে। বর্তমান সমা অসামাজিক আবহাওয়া পাকাপোক্ত আ গেড়ে বসেছে। ঠিক যে মুহূর্তে আম নতুন সমাজ গঠনে ব্রতী তখনই অসামাজি আবহাওয়া এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। অনেক কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত অবস্থা। আ সমাজের বুকে অসামাজিকদের এমন দাপ যে শুভবুদ্ধি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে জীবন আজ প্রতিমুহূর্তে বিপন্ন। এম সব দুষ্কৃতি ঘটছে এবং দুষ্কৃতিকারী এমন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে যে সাধার মানুষ একান্ত নিরুপায় হয়ে পড়ছে এব কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। এ দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ আমাদের সমবেত হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে মায়ের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সর্বাধিক। স সন্তানকে মানুষ করবেন শুধু নয়, সমা শাসনও করবেন। আর মায়ের শাসন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হবে আর মায়েদের প্রচেষ্টায়ই সমাজ কলুষমু হতে পারে।

মেয়েদের কথা

সমানাধিকারের ভিত্তিতে দেশের নারী-সমাজ কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে, তার সমীক্ষার জন্য এবং প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য সরকারী এবং বে-সরকারী তরফ থেকে সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে পশ্চিম জার্মানীতে কয়েকটি চেষ্টা হয়েছে। এই সমীক্ষা চালানোর ফলে প্রকৃত অবস্থা অনেকটা জানতে পারা গেছে। সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বিশেষজ্ঞদের তদন্তকারী এক সংস্থার রিপোর্ট সম্প্রতি পাওয়া গেছে। পাঁচশো পৃষ্ঠার এই রিপোর্ট সকলের সামনে পেশ করা হয়েছে। এছাড়া বে-সরকারী উদ্যোগও চুপচাপ বসে নেই। তারা সমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মেয়েদের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য—জীবনে এবং জীবন ও দক্ষতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব-সম্বলিত তথ্যের জন্য। এইরকম একটি সংস্থা হচ্ছে 'ইনস্টিটুটে অফ রিসার্চ'। ডঃ (মিসেস্) হিল্ডগার্ড ওয়াইল্ড হলেন এই সংস্থার সভাপতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হ্যানোভার টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিনিয়র প্রফেসরের স্ত্রী।

মেয়েদের সংস্থা 'ইনস্টিট্যুট অফ রিসার্চ'-এর তিনি কোনরকম দায়সারা-গোছের সভাপতি নন। মেয়েদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার আগ্রহ এবং উৎসাহ তাঁর প্রবল। এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলেন, সঙ্গী ছিলেন তাঁর স্বামী। তিন সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী ছিল তাঁর এই অভিযান। এই সময় অনেক ভারতীয় রমণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সেইসব ভারতীয় রমণীর সঙ্গে তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় নারীদের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের কাছ থেকে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীমতী হিল্ডগার্ডের মতে নারীর পক্ষে গৃহের কাজে কোনরকম অযত্ন বা অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত নয়। যদিও ক্রমশ অধিক সংখ্যক মেয়ে চাকুরী গ্রহণ করছে বা জীবিকাধারী হয়ে পড়ছে, তথাপি গৃহের দায়িত্বকে তাদের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। মায়েদের পক্ষে চাকুরী করার সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে শিশু-সন্তান। শিশু-সন্তানকে ফেলে রেখে কারখানা অফিসে পড়ে থাকা অনেকের পক্ষে পোষাচ্ছে না। ভারতীয় মেয়েদের ম জার্মান ললনাদেরও গৃহকর্ত্রীর ঐতিহ্যে প্রতি সমান মমত্ববোধ আছে। শ্রীমতী হিল্ড গার্ডের এই মতামত জার্মান জনমত সংগ্রহ কারী একটি সংস্থারও সমর্থনলাভ করেছে

এই সংস্থার তথ্য অনুযায়ী দেখা যা যে, ফেডারেল রিপাবলিকের শতকরা সত্ত জনেরও বেশি লোক বিশ্বাস করেন যে নারীর স্থান গৃহে এবং তাদের পক্ষে অন যে-কোন ধরনের কাজ হবে নারীচরিত্র বিরোধী। পড়াশোনার পর এবং বিয়ে আগে পর্যন্ত কোন চাকুরী করা চল পারে কিন্তু বিয়ে এবং মাতৃত্বই হচ্ছে নারী পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। আর মেয়েদে কাছে সকলে এটাই প্রত্যাশা করেন।

পুরুষের প্রত্যাশা অন্য হলেও কর্ম ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা কিন্তু প্রতি বৎসরই ক্রমবর্ধমান। সরকারী রিপোর্টে জানা যা যে, ১৯৪৮ সালে নারী-কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩·৮ মিলিয়ন আর আজ এই সংখ্যা পৌঁচেছে ৯·৫ মিলিয়নে। গড় হিসেবে বলা যায় যে, প্রতি তিনজনের মধ্যে এদেশে একজন হচ্ছে নারী-কর্মী। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একটা কথা উঠতে পারে যে, পশ্চিম জার্মানীতে এত বেশি সংখ্যায় মেয়েরা কাজ করে কেন? উত্তরে সহজেই এদেশের 'ম্যান-পাওয়ার শর্টেজ'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া মেয়েরাও ক্রমশ সচেতন হচ্ছে এবং তারাও আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চায় না। এজন্য এবং জীবনকে স্বচ্ছন্দ করার জন্যই তারা চাকরী নেয়। অলসভাবে বসে থেকে অপরের ভাগ্যকে হিংসে করার চেয়ে নিজের ভাগ্য ঠুকে দেখা ভাল।

বর্তমানে জার্মান পার্লামেণ্টে নারী-সদস্যের সংখ্যা হলো আটত্রিশ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন ডঃ (মিসেস্) এলিজা-

স্কারঝাপট। সম্প্রতি হাইডেলবার্গ ব৷বদ্যালয়ের রেক্টর পদে নিযুক্ত ।ছেন ডঃ (মিসেস্) মার্গট বেকে। এই ববিদ্যালয়ের ৫৮০ বছরের ইতিহাস এর রা আরো মহনীয় হলো।

জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আঠারটি ।ারে এখন নারী অধ্যাপক আসীন। ওদেশে রদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় রটি। এরা সম্মিলিতভাবে নারীসংক্রান্ত পারে খোঁজখবর রাখে। নাগরিক-জীবনে ব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব খুব বেশি। মেয়ে- । ব্যাপারে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা ।ই এদের সাহায্যপ্রার্থী হন। তাছাড়া ৃশের মন্ত্রিসভায় মহিলা দপ্তরও আছে।

কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ।পত্তা অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে । যায় যে, কর্মী মেয়েদের ছুটি একটু ।স্থায়ী। রাত্রির কাজ তাদের জন্য চবারে নিষিদ্ধ। যারা বিয়ে করে ঘর- ।ার করছেন, তাঁরা মাসে একদিন বাড়তি ট দাবী করতে পারেন। মাতৃসম্ভবা বা 'নার্সিং-মাদার'কে কাজে বহাল করার পারেও নিষেধাজ্ঞা আছে। সন্তান প্রসবের র্ব এবং পরে প্রতি ক্ষেত্রে তাঁদের ছ' ।ের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এক্ষেত্রে দর নিয়মিত বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত ।ও মঞ্জুর করা হয়। সন্তানধারণের সময় ক প্রসবের পর চারমাস পর্যন্ত কর্মী ইয়ের কোন নিয়ম এদেশে নেই। চার- অতিক্রান্ত হলে অবশ্য ছাঁটাই চলতে র।

এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, বিয়ের পর র্মান তরুণীরা কি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্নায় মন দেন? অনেকের ক্ষেত্রে এই রাসাটা সত্যি। স্বামী যদি নিরাপত্তা এবং ।লতার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, তবে ।কেই বিয়ের পর চাকুরী ছেড়ে দেন। কাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য সন্তানধারণের পরই ।জ সাময়িকভাবে বাধা পড়ে। ছেলে যখন ল যেতে শুরু করে, তখন অনেক মা-ই ব চাকুরী নিয়ে পুরোন জীবনে ফিরে মন। চাকুরী এবং সংসার একসঙ্গে ন অসম্ভব। অনেকে অবশ্য কোনরকমে ।ই চালিয়ে দেন। আর এটা তাঁদের পক্ষে ব হয় ছোট্ট পরিবার সম্পর্কে তাঁদের পষ্ট ধারণার জন্য। এরকম ক্ষেত্রে কাংশ পরিবারেই সন্তানসন্ততির সংখ্যা । অথচ এদেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং র্কে কোনরকম উপদেশ কাউকে দেওয়া না। সবাই নিজেরাই নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবার-পরিধি বিস্তৃত করেন না। ।ী যাতে সংসারের পক্ষে অসুবিধার ট না করে সেজন্য মেয়েদের নানা ধরণের -টাইম চাকুরীর ব্যবস্থাও আছে। এর

সাধারণ কর্মী একজন জার্মান নারী

এই মহিলা ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক

ফলে দুয়ের মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্যবিধান করা যায়।

আমাদের দেশের মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স ষোল থেকে সতের। কিন্তু জার্মানী মেয়েদের বিয়ের বয়স তেইশ থেকে পঁচিশ। এর ফলে মনে হতে পারে যে, ওদেশ মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হওয়ার রেওয়াজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপীয় মেয়েদের 'ম্যাচুরিটি' আসে আমাদের দেশের মেয়েদের তুলনায় অনেক দেরীতে। জার্মান রমণীর গড় আয়ুষ্কাল বাহাত্তর বছর। সুতরাং বত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করলেও, সে চল্লিশ বছর বিবাহিত জীবনের স্বাদ পেতে পারে। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারেও এরা সংস্কারমুক্ত। ছেলেবেলা থেকে ছেলে-মেয়েরা পাশাপাশি একই সঙ্গে বড় হয়। স্কুল থেকে শুরু করে 'ইয়ুথ ক্যাম্প' এবং 'হলিডে হোমসে' এরা একই সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ এবং হৈ-চৈ করে। ভালবাসার পাত্রকে বিয়ে করার জন্য গোড়া থেকেই এদের মনে একটা সংস্কার গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পর জার্মানীতে তিন মিলিয়ন নারী পুরুষের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়। নতুন সমাজ গড়ে তোলা এবং অস্তিত্ব বজায় রাখা তখন এক সমস্যা হয়ে ওঠে। ফলে বিয়ের বাজারে তখন একটা দৈন্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে-সমস্যা আজ এরা কাটিয়ে উঠেছে। জার্মান রমণী স্বাভাবিক স্বামী পেতেই ভালবাসে। তাদের স্বামী হবে বলিষ্ঠ, কর্মীষ্ঠ, আমুদে এবং উচ্চাভিলাষী। সেইসঙ্গে শিক্ষার উপরও তারা সমান গুরুত্ব আরোপ করে। তারা স্বামীই চায়—সিনেমার নায়ক নয়। স্ত্রী এবং সন্তানের রক্ষণা-বেক্ষণ ও সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য। এক্ষেত্রে 'টিপিকাল হাউসওয়াইফ' এবং ব্যবসায়ী অচল। আজকের জার্মান রমণী সর্বক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগী এবং যে-কোন অবস্থার মোকাবিলায় জন্য প্রস্তুত।

এখনও হয়তো জার্মান পুরুষ ও রমণীর মধ্যে কিছু ফারাক আছে। কিন্তু মেয়েরা ক্রমেই লক্ষ্যের নিকটবর্তী হচ্ছে।

ভারতসুন্দরী বিশ্বসুন্দরী

ভারতসুন্দরী কুমারী রীতা ফারিয়া ১৯৬৬ সালের বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হয়েছেন। এই প্রথম একজন ভারতীয়া নারী বিশ্বসুন্দরীর গৌরব অর্জন করলেন।

কুমারী রীতার বয়েস তেইশ। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের একষট্টিজন সুন্দরী। শুধু দেহসৌন্দর্যের জন্য নয়, বুদ্ধি ও ভঙ্গীর জন্যও এই ভারতসুন্দরীকে বিশ্বসুন্দরী মনোনীত করা হয়েছে। কুমারী রীতা ফারিয়ার দেহের মাপ ৩৫, ২৪ ও ৩৫ ইঞ্চি।

বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন যুগোশ্লোভিয়ার উনিশ বছর বয়স্কা সুন্দরী ধীবরকন্যা কুমারী নিকিকা মারিনোভিক। তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন একুশ বৎসর বয়স্কা গ্রীসের কুমারী এফি প্লুম্বি। ব্রেজিলের আঠার বছর বয়স্কা মার্লু চি মানভাইলিয়ার স্থান চতুর্থে।

বিশ্বসুন্দরী কুমারী রীতা ফারিয়া ২৫০০ স্টার্লিং পুরস্কার পাবেন, তাছাড়া এক বছরের ভ্রমণ ব্যয় এবং অভিনেত্রী হওয়ার সুযোগ সুবিধাও তিনি পাবেন।

ভারতের রিতা ফারিয়া, মিস্ ইউনিভার্স

সান্ধ্য পোষাক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিনী হওয়ায় রীতা ফারিয়া একটি রুপোর কাপও পেয়েছেন। তাঁর পোষাক ছিল লাল আর সোনালী রংয়ের শাড়ি।

নবনির্বাচিতা বিশ্বসুন্দরীর আগ্রহ রয়েছে 'মেডিকেল কেরিয়ারে'র দিকে। একটু বৈচিত্র্যের আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসা বৃত্তির মাধ্যমে জাতিকে সেবা করাই তাঁর লক্ষ্য।

কুমারী রীতা ফারিয়ার সখ হচ্ছে, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা ও খেলাধুলা। কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও তিনি ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষা বলতে পারেন।

পিঙ্গল চক্ষু ও পিঙ্গলকেশী বিশ্বসুন্দরী বলেছেন যে, তিনি যতবেশী সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে দেখা করবেন। সম্ভবতঃ লণ্ডনের কয়েকটি হাসপাতালও তিনি দেখতে যাবেন।

পশ্চিম বাংলার এক চা-বাগানের মালিক শ্রীঅসবোর্ন লোবো বিশ্বসুন্দরী রীতা ফারিয়ার প্রণয়ী। আগামী জুন মাসে তাঁদের বিয়ে হবে কথা আছে।

কুমারী রীতা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী হবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন যে, তার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ, শিশুকাল থেকেই তাঁর স্বপ্ন চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করা।

কুমারী রীতা গত মাসেই ভারতসুন্দরী আখ্যা লাভ করেছিলেন। তখন তাঁকে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, "এই সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী। আমার পড়াশোনা আর পেশাই হবে স্থায়ী জিনিস, আর তাই আমি সর্বান্তঃকরণে অনুসরণ করে যাব।"

এ বছরের বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা একাধিক কারণে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রথম কারণ, এই প্রথম একজন ভারতীয় নারী এই গৌরব অর্জন করলেন। এই গৌরব অর্জনে ভারতের এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় কারণ, এই প্রথম লৌহদেশ নামে পরিচিত যুগোস্লাভিয়ার এক নারী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। তাঁর নাম নিকিকা মারিনোভিক। বয়েস উনিশ। নিকিকা দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ [illegible] স্টার্লিং।

লণ্ডনে সাংবাদিকদের কাছে কুমারী রীতা বলেছেন, "এবার আমি আমার নিজের শহর বোম্বাইয়ে ফিরে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করব। ঈশ্বরের দয়া হলে পরীক্ষায় পাশ করব। তারপর বিয়ে। পশ্চিম বাংলার এক চা-বাগানের মালিক অসবোর্ণ লোবোর বাগদত্তা আমি। আমরা বিয়ে করব এই জুন মাসে। তারপর পশ্চিম-বাংলায়ই পুরো সময়ের ডাক্তার হিসাবে কাজ করব।"

সেলাইয়ের কথা

(১৪)

সালোয়ার

কামিজের সঙ্গে এই সালোয়ার পরার রীতি। আগের সংখ্যায় কামিজের বিষয় জানিয়েছি, এবার আপনাদের সালোয়ার বিষয় জানাচ্ছি।

মাপ :—

ঝুল — ২৪"
সিট — ২৪"
মুহুরী — ১৬"

ফরমুলা :—

১ — ২ = ২" (মুড়বার জন্যে)
২ — ৩ = পুরো ঝুল
১ — ৬ = ½ মুহুরী
২ — ৫ = ১ — ৬
৩ — ৪ = ½ মুহুরী
৬ — ৫ = ২" (মুড়বার জন্যে)
৫ — ৪ = পুরো ঝুল
৫ — ১৪ = সিটের ¼ + ২"
১৪ — ৯ = সিটের ¼ — ১"
৬ — ৭ = ১৪ — ৯
৫ — ৮ = ১৪ — ৯
৯ — ৪ = যোগ (লাইন টেনে)
৭ — ৮ = ২" (মুড়বার জন্যে)
১০ — ১১ = ২" (মুড়বার জন্যে)
১২ — ১৩ = ২" (মুড়বার জন্যে)
১০ — ১৩ = সিটের ¼ — ১"
১১ — ১২ = সিটের ¼ — ১"
১৩ — ৪ = সিটের ¼ + ২"
৪ — ৯ = যোগ, (৪ — ৯ — কাটবার লাই

যদি কেউ ইচ্ছে করেন, তবে পা এই মুড়ীর ওপরে সাদার ওপর সাদা, কি যে রং-এর সালোয়ার করবেন, সেই রং-এ সুতো দিয়ে মেসিন-সেলাই দিয়ে এইরকম নক্সা ক'রে দিতে পারেন।

"বসুধা

গত সংখ্যায় সেলাইয়ের কথায় [illegible] সালোয়ারের নক্সাটি ছাপা হয়েছে।

উত্তমর্ণ

বিশ্বনাথ রায়
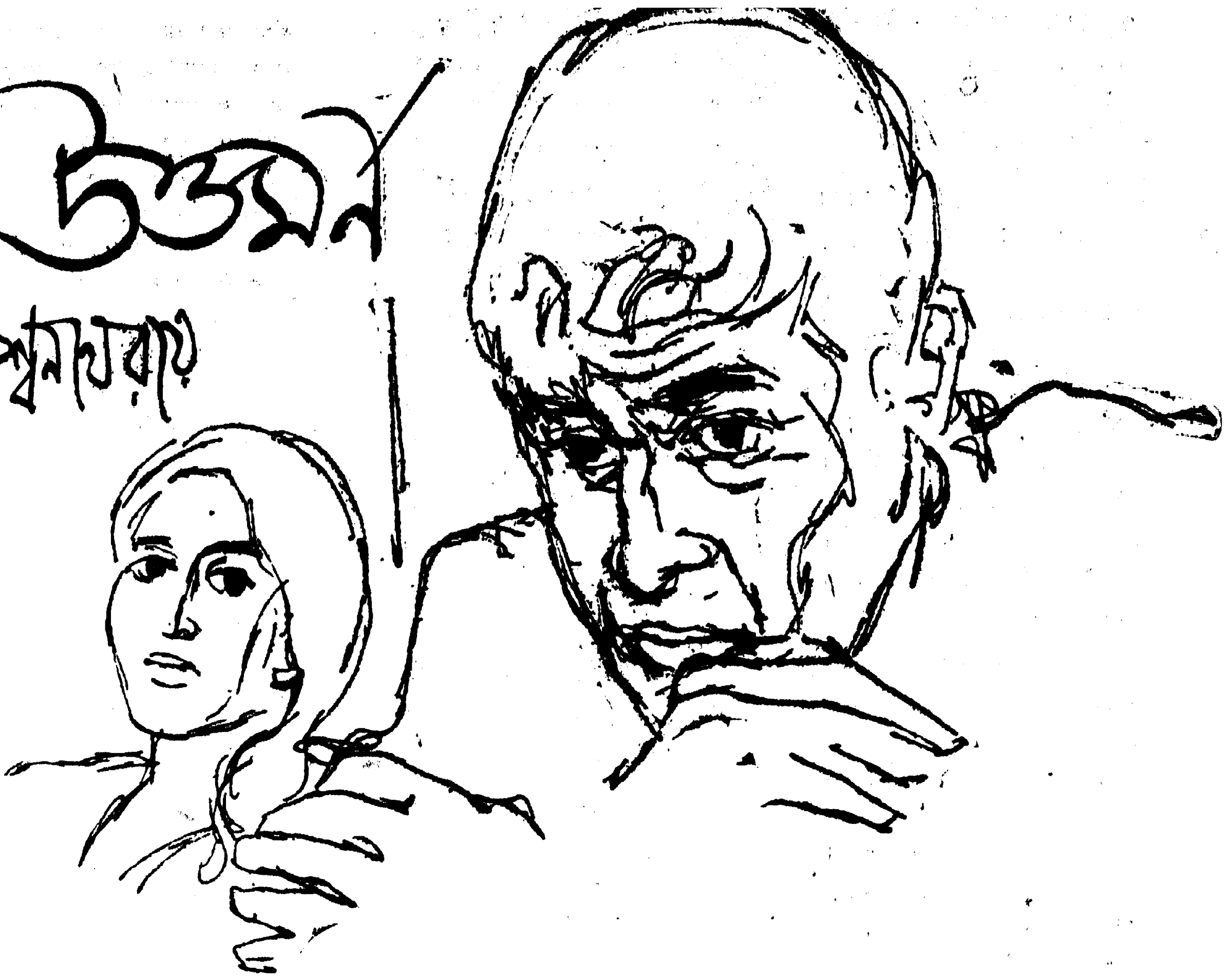
ঘুম নেই। পাড়াটা খাঁ খাঁ করছে। দূরের র্জার ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দুটো বাজল। স্ত বাড়িগুলোর জানালা বন্ধ। যে কটা লা, তাও অন্ধকার।

অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে ণ্ড রাগ হল অমিতাভের। পৃথিবীর খে ঘুম নেমে এসেছে, আর তার চোখেই মের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কয়েকটা চিঠি খবে বলে কাগজ এগিয়ে নিল, কিন্তু রল না। মনটা ভীষণ ছটফটিয়ে উঠল। উকে বলতে পারছে না তার যন্ত্রণার কথা, শে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ক্ষ্মীপ্রিয়া। কোলের কাছে ছ' বছরের খুকু টিয়ে-মুটিয়ে শুয়ে আছে। অঘোরে মোচ্ছে। ওরাও যেন অমিতাভের কাছ কে অনেক দূরে চলে গেছে। কেমন স্পষ্ট অচেনা ওরা।

রাতে ঘুমোতে ভয় করে অমিতাভের। রদিনের সূর্যোদয় যে জীবনের কি সংবাদ বহন করে আনবে, সে ভাবতেও রে না। পৃথিবীকে বিশ্বাস নেই। এতবড় শ্বাসঘাতকতা আর প্রবঞ্চনার জায়গা বোধ য় আর কোথাও নেই।

বালিশটা উল্টে নিল। এদিকটা গরম য়ে গেছে। ওদিকটা মাথায় দিলে তবু নিকটা ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা হবে কি করে? নের ভিতর থেকে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। নাকের কাছে হাত নিয়ে এল অমিতাভ। হাতের তালুতে গরম নিশ্বাস পড়ছে।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার গায়ের ওপর আলতো-ভাবে হাত রাখল অমিতাভ। হয়ত ডাকবার ইচ্ছে ছিল। একা রাত জাগতে অসহ্য লাগে। যদি কেউ সঙ্গী হয়ে পাশে থাকে, নিজেকে অনেকটা সহজ মনে হয়, অনেকটা ভরসা পাওয়া যায়।

পাশ ফিরে শুল অমিতাভ।

নাঃ!

ঘুম আসবার কোন লক্ষণ নেই। মাথার ভিতরটা দপদপ করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যত চরিত্র অমিতাভের কাছে আনাগোনা করেছে, সব এক এক করে যাতায়াত সুরু করল। প্রথমেই দেখতে পেল গোবর্ধনকে। মুদির দোকান করে জাঁকিয়ে বসেছে সে। মুচকি হেসে বলল—কেমন আছো অমিতাভ!

অমিতাভ ঈষৎ উচ্চস্বরে বলল—আমার টাকা ফিরিয়ে দাও।

—দেবো, দেবো। ভারিক্কী চালে গোবর্ধন বলল—দোকানে একটু লাভ হোক, নিশ্চয়ই তোমার টাকা দিয়ে দেবো।

—কিন্তু আমার যে সংসার চলছে না। অমিতাভের কণ্ঠস্বরটা কেমন কাঁদো কাঁদো লাগছে।

—সে কি হে! তুমি অমন রাজা লোক। তোমার সংসার কখনও না চলে!

—বিশ্বাস করো। র‍্যাশন আনবারও একটা পয়সা নেই।

—আচ্ছা দেখি। এ মাসের হিসেব করে যদি দেখি লাভ হয়েছে, কিছু দিয়ে যাব।

গোবর্ধনের মুখটা মিলিয়ে গেল।

দয়া! অমিতাভের ঠোঁটটা ফুলে উঠতে লাগল। যদি পারে একটা থাবা বসিয়ে দেয় গোবর্ধনের ঘাড়ে। এক বছর হয়ে গেল সে দোকান দিয়েছে অমিতাভের পয়সায়, আর বলতে চাও, এতদিনে লাভ হয়নি? গত বছর রেসের মেলায় হঠাৎ একসঙ্গে দু হাজার টাকা জিতে গিয়েছিল। ফুর্তির মেজাজ তখন রেসের মাঠের মতই দরাজ। অমিতাভ বস্তিপাড়ায় ঢোকামাত্রই সকলের সে কি অভ্যর্থনা। একসঙ্গে দু হাজার টাকা কেউ কখনো দেখেও নি। মুহূর্তের মধ্যে অমিতাভ নিজেকে রাজা মনে করল। ভেবেছিল, লক্ষ্মীপ্রিয়াকে একগাছি হার গড়িয়ে দেবে, আর মেয়েটার জন্য মোটা মোটা বালা করে দেবে। হাজারখানেক টাকা গয়না করে আটকে ফেলবে, বাকিটা দিয়ে ছোট্ট একটা ব্যবসা খুলবে। যা হোক দু' পয়সা এলেই সেসব বদমতলব ছেড়ে দেবে। খুকুটাকে ভদ্দরলোকের মেয়ের মত মানুষ করবে। লেখাপড়া শেখাবে, ভাল বিয়ে

দেবে। নিজে লেখাপড়া না জানলে কি হবে, ভদ্দরলোকের ছেলে তো সে। বদ অভ্যাসের জন্যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বলেই কি সে ছোটলোক হয়ে গেছে।

অনেকে জিজ্ঞেস করেছে রেস খেলো কেন? আরে, যে টাকা সে রোজমজুরিতে রোজগার করে, তা যে সংসারের তলানিটুকুও সামলাতে পারে না। বিকেলে ধার, ভোরবেলায় ডিউটির অনেক আগেই বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যেতে হয় খাঁ সাহেবের তাগাদার ভয়ে। প্রতিমাসেই খাঁ সাহেবের কাছে হাত পেতে ঘোড়ার টিপ ধরে, ভাবে এবারের বাজিটা জিতলেই সুদেআসলে শোধ করে দিয়ে আসবে। এ জায়গা, ও জায়গা থেকে ধার করতে করতে, ধারের পরিমাণ প্রায় পাঁচশোর কাছাকাছি চলে গেছে।

অমিতাভ ভেবেছিল বাজি জেতার সংগে সংগে খাঁ সাহেবের টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আসবে। বড় লজ্জা করে তার। বস্তি পাড়াতে একমাত্র সেই ধোবারবাড়ির কাচা জামাকাপড় পরে। বিড়ি কারখানায় কাজ করলেও এ-পাড়ার লোকে তাকে একটু মান্যি করে। সামনে দাদা বলে ডাকে। পেছনে হয়ত শালা বলে, সে তো রাজার জামাইকেও বলে।

অমিতাভ ছটফট করে উঠল।

কাল সকালেই দুশো টাকা না পেলে ইজ্জৎ থাকবে না।

খাঁ সাহেব ভোর হবার সংগে সংগে দরজায় এসে হামলা করবে। লক্ষ্মীপ্রিয়া ঘুম থেকে উঠেই ঈশ্বরকে আর স্বামীকে গাল পাড়বে, তারপর অমিতাভের সংগে প্রচণ্ড ঝগড়া হবে। মেয়েটা ফ্যালফেলিয়ে বাপ-মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে। অমিতাভ হয়ত মেয়েটাকে আদর করে ডাকবে, আয়, কাছে আয়।

লক্ষ্মীপ্রিয়া গর্জে উঠে বলবে—না। খবরদার না। জুয়াড়ী, মিথ্যেবাদী, খবরদার আমার মেয়েকে ছোঁবে না।

অমিতাভ নিজের আক্রোশে, নিজেই ফেটে পড়বে—কি আমি জুয়াড়ী?

—নিশ্চয়ই! একশোবার। তার চেয়েও জোরে লক্ষ্মীপ্রিয়ার চীৎকার।

হাসি নেই। অমিতাভ নিজেও হাসতে ভুলে গেছে। না। ভুলে যায়নি। বাইরে তো হাসি-ঠাট্টা ঠিক চলছে। বাড়িতে পারে না। একটা অপরাধবোধ সবসময়ে খচখচিয়ে উঠছে। ওদের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় ওদের সে ঠকিয়েছে। যে টাকায় ওরা সুখে থাকতে পারত, সেই টাকাতে আজ গোবর্ধনের

হঠাৎ সমস্ত রাগটা গিয়ে যেন মেয়েটার ওপর পড়ে

সাত বছরের মেয়েটা ছোট হাতভরতি চায়ের কাপ নিয়ে টলমল করতে করতে অমিতাভের সামনে এসে দাঁড়ায়। কাপটা এগিয়ে দেয় অমিতাভের দিকে। হঠাৎ সমস্ত রাগ যেন মেয়েটার ওপর গিয়ে পড়ে। এক ঝটকায় কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুচার ঘা মেয়েটার পিঠের ওপর বসিয়ে দেয়। লক্ষ্মী-প্রিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে, অমিতাভের ওপর। চীৎকার করে বলতে শুরু করে সক্কালবেলায় মাতলামো হচ্ছে। দুধের মেয়েটার ওপর যত জারিজুরি। যাও না! তোমার পিরীতের বন্ধুদের কাছে। টাকা হাতে পেয়ে তো তাদের কথাই প্রথমে মনে পড়েছিল। কই মেয়েবউকে তো একটা পয়সাও হাতে তুলে দাওনি।

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। একেবারে ঠান্ডা অমিতাভ। সত্যিই অতগুলো টাকা পেয়েছিল, একটা টাকাও দিতে পারেনি লক্ষ্মীপ্রিয়াকে।

পাঁজরাগুলো টনটনিয়ে উঠল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন লক্ষ্মীপ্রিয়া মেয়েটাকে আঁকড়ে শুয়ে আছে। ওরা যেন কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। ওদের মুখে আর

সংসারে ফতোয়া উড়ছে। সেদিন সন্ধেবেলা গোবর্ধন তার বউছেলেকে নিয়ে সিনেমা যাচ্ছিল। রমেশ মিত্তির রোডের মোড়ে ওদের সংগে দেখা হয়ে যায়। গোবর্ধন ওর দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলেছিল,—কেমন আছো?

সেদিনই ভেবেছিল অমিতাভ টাকাটার তাগাদা করবে, কিন্তু পারেনি। লজ্জা করেছিল। হাজার হোক বউ নিয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। একটা অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি নাই বা করল। গোবর্ধন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

অমিতাভ শুনতে পেয়েছিল গোবর্ধনের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিল—ও কে গো?

গোবর্ধন ভারিক্কী চালের হাসি হেসে বলেছিল—মোটা খদ্দের।

মাথাটা টনটন করে উঠছে। নাঃ! শুয়ে থেকে কিছু লাভ নেই। জানালার কাছে উঠে এল সে। দূর! একটু বাতাসও চলছে না। ভগবানও কি মানুষের মত কিপটে হয়ে গেল। তোয়াজ না করলে একটু বাতাসও ছাড়বে না।

জানালাটা ভাল করে ফাঁক করে কড়া-তের বিড়ি ধরাল একটা। গোটাকয়েক লম্বা লম্বা টান দিল বিড়িতে। বস্তিপাড়া নিঝ্‌ঝুম হয়ে আছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। সকলের মনেই শান্তি। সবাই সারাদিন খেটেখুটে এসে খাবার পর ঘুমে বেহুঁস হয়ে পড়ে। বস্তিতে থাকলে কি হবে, খুশির মেজাজে সবাই ছোটখাটো এক একটা রাজা। দু' পয়সা থাক, চার পয়সা থাক, ছেলেমেয়ের মুখে তুলে দিয়েই খুশি। ছেলেমেয়েদের খাওয়াবার জন্যেই তো যত রোজগার।

মেয়েটার দিকে তাকাল অমিতাভ। জামাটা ছিঁড়ে গেছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার শাড়িও ছিন্ন। ছ' মাসের মধ্যে একটা শাড়িও কিনে দিতে পারেনি। দেবে কি করে? যা আয় হয় খাঁ সাহেবের হাতে চলে যায় আর বাকিটা ঘোড়ার পায়ে বিলিয়ে যায়। কাল একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে। একজোড়া শাড়ি আর একজোড়া ফ্রক নিয়ে আসবে সে।

গোবর্ধনকে গিয়ে ধরবে। বলবে, ভালয় ভালয় টাকা দিয়ে দাও, নইলে হামলা করবে সে। চুরিজোচ্চুরির টাকা নয়, রীতিমত খেটে কামানো টাকা। পাকা টিপস্‌ জেনেই সে লাগিয়েছিল। ফ্লুকস্‌-এ মোটেই হয়নি। অবশ্য টিপ্‌টা গোবর্ধনই বাৎলে দিয়েছিল।

গোবর্ধন ওৎ পেতে বসেছিল। পাড়ায় ঢুকতেই সে বলল—ভায়া কেমন টিপ ছেড়েছি বলতো।

—অদ্ভুত মাইরি!

—আমায় কিছু দাও। ভাগ দাও।

—ভাগ? ভাগ আবার কিসের? তুমিও ধরতে পারতে।

—আমার কপালে কিছুই হয় না। সেই জ্যোতিষীগুলোর মত। দেখো না, সকলকে রাজা উজীর করে, নিজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

অমিতাভ ততক্ষণে মনে মনে অঙ্ক কষতে বসেছে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার গয়না করতে হতে পড়বে। আহা! বিয়ের পর একটুকরো সোনা সে দিতে পারেনি কখনো।

—আচ্ছা বেশ। ধার দাও। পাঁচশো টাকা। একটা দোকান করব। আস্তে আস্তে শোধ দিয়ে দেব।

অমিতাভ কি ভাবল। মেজাজটাও তখন রাজারাজড়ার মত। দিলদরিয়া চালে বলল—ঠিক শোধ দেবে তো?

—আলবাৎ! ছেলের দিব্বি!

—অত দিব্বি দিতে হবে না। এই নাও।

দশটাকার বান্ডিলটা ছুঁড়ে দিয়েছিল গোবর্ধনের দিকে। টাকা ওভাবে ছুঁড়ে দিতে কি আরামই না লাগে। মেজাজটা কেমন হাল্কা হয়ে যায়। বাকী টাকাটা ফুর্তি করে উড়িয়ে দিয়েছিল অমিতাভ। গোবর্ধনই নিয়ে গিয়েছিল। জীবনে সে ফুর্তি করেনি। জমিদার বড়লোকেরা করে শুনেছিল; সেসব ভদ্দরলোকের ব্যাপার। ওরা যাকিছু করে মানিয়ে যায়। অমিতাভের বড়দাও যেত হাতে টাকা পেলে; এ নিয়ে বউদির সঙ্গে দাদার কত ঝগড়া হত, ছোটবেলায় অমিতাভ শুনেছে। বড় হয়েও অবাক হয়ে অমিতাভ ভেবেছে, কেন, কিসের জন্যে যায় লোকে?

আস্বাদটা জানত না সে। কখনোও শোনেনি। আস্বাদ মেটাবার জন্যেই গোবর্ধনের এককথাতেই রাজি হয়ে গেল। সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলায় যখন সে বাড়ি ফিরল, তখন তার হাতে ছখানা দশ টাকার নোট। বাড়ির দরজায় ঢুকতে গিয়েই দেখল দরজার মুখ খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে মোটা লাঠি হাতে নিয়ে।

মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল অমিতাভ, মোটা হাতে খপ করে ঘাড়টা চেপে ধরে বলল—এই উল্লু কাঁহা ভাগতা? রুপেয়া ল্যাও।

—আজ যে টাকা নেই খাঁ সাহেব।

—ঝুট্টা মৎ বোল।

জোর করে পকেট হাতড়ে টাকাগুলো নিয়ে বলল—আউর চাল্লিশ রুপেয়া কাল দেগা। হাম আয়েগা।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে খাঁ সাহেব চলে গেল। শূন্য পকেটে অমিতাভ বাড়ি ফিরল।

বিড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে নতুন বিড়ি ধরালো।

ভোর হয়ে আসছে। আজ আর ঘুম আসবে না। মুখ হাত-পা ধুয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে গোবর্ধনকে ধরতে হবে। শ' দুয়েক টাকা নিতেই হবে ওর কাছ থেকে। খাঁ সাহেবকে কিছু দিতে হবে, আর সংসারের জন্য কিছু রাখতে হবে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার জন্য একটা শাড়িও আনা যাবে।

কলঘরে গিয়ে মুখ ধুতে গিয়ে দেখল একবিন্দু জল নেই। কলের মুখ ঘোরাতেও জল পড়ল না। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। যত রাগ গিয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ওপর পড়ল। কিছু যদি সঞ্চয় করে রাখে। দিনরাত শুধু প্যানপ্যানানি। ঈশ্বরকে গাল পাড়বে, আর স্বামীর পিন্ডি চটকাবে। যদি একটাও কাজের কাজ হয় ওর দ্বারা।

কলঘর থেকে বেরিয়ে বস্তির টিউব-ওয়েলে গিয়ে দাঁড়াল। এর মধ্যেই জল নেবার লাইন পড়ে গেছে। লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল গোবর্ধনের কাছে কথাটা পাড়বে কিভাবে? যে করেই হোক টাকার কথাটা তুলতে হবেই আজ।

—কি ভায়া এত সকালে? পেছনদিকে তাকিয়ে দেখে গোবর্ধনও লাইনে এসেছে। তার হাতে একটা বালতি।

—ঘরে জল নেই। মুখ ধুতে এসেছি।

—জলের কথা আর বোলো না। গোবর্ধন হতাশার সুরে বলল—যেটা কর-পোরেশনও হয়েছে তেমনি। হাত ধুলে আর মুখ ধোবার জল কুলোয় না।

—বালতি কেন? একটু পরেই তো কলে জল আসবে।

—আহা! গোবর্ধনের কথায় সহানুভূতি উছলে উঠল—গিন্নীকে রোজ সকালে জল তুলে দই। বেচারীর কোমরে আবার ভীষণ ব্যথা কি না। জল না তুলে দিলে মুখ ধোবে কি করে?

অমিতাভের বুকটা টনটনিয়ে উঠল। সেও তো একটা বালতি আনতে পারত। ভোরবেলাতে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে ঘুম থেকে উঠেই জল টানতে হবে। নিজের জন্যে, মেয়েটার জন্যে। অন্যদিন বেলা করে ওঠে বলেই জানতে পারে না। কোত্থেকে বালতি ভরতি জল থাকে। সে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই লক্ষ্মীপ্রিয়া টিউবওয়েলের জল ভরে ঘরে তোলে। আজ আসবার সময় একটা বালতিও হাতে করে আনতে পারত।

গোবর্ধন বালতিটা মাটিতে রেখে বলল—দাও ভায়া, তোমার কোম্পানির একটা বিড়ি টানি। বড় ভাল বিড়ি।

নিঃশব্দে এগিয়ে দেয় বিড়ি।

বিড়ি ধরিয়ে গোবর্ধন জিজ্ঞাসা করল—তারপর ভায়া, কি খবর বল? এত সকালে তুমি?
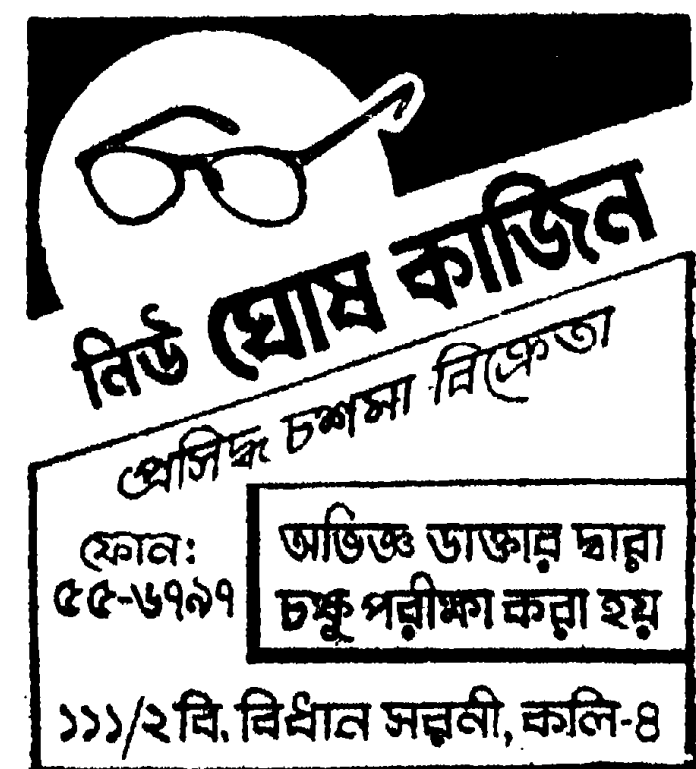
—কেন আসতে নেই?

—আরে, তুমি হচ্ছো রাজা মানুষ। বেলা আটটার আগে ঘুম ভাঙে না। আমাদের তখন অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে যায়।

—আজ তোমার কাছেই যাব ভেবেছি। মরীয়া হয়ে অমিতাভ বলে ফেলল।

—কি ব্যাপার? সকালবেলায় গরীবের কাছে? হঠাৎ?

অনেকক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করল অমিতাভ। নিজের দেওয়া টাকা চাইতে নিজেরই কি লজ্জা। বার বার চেষ্টা করেও সে আসল কথাটা বলতে পারল না। শেষ-পর্যন্ত সে শুধু বলল—একটা ভাল টিপ্‌ আবার বাৎলে দাও না দাদা!

সাত-পাঁচ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১৯৫৪ সালে ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল হঠাৎই এক ইংরেজ ভদ্রলোকের, যেমন নতুন কিছু করতে হলে আমরা সব ক্ষেত্রেই আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি। উপলক্ষ্য মাত্র পক্ষীশিকার। বন্ধু সমভিব্যাহারে নামকরা ইংরেজ মদ্য ব্যবসায়ী 'গীনেসের' ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্যার হিউগ বীভার বলে এক ইংরেজ ভদ্রলোক পক্ষীশিকারে বেরিয়েছিলেন। দিনের শেষে মাথার ওপর এক-ঝাঁক সোনালী প্লোভার পাখীকে দ্রুতগতিতে উড়ে যেতে দেখে ও'রা তর্ক জুড়ে দিলেন কোন্ পাখী সবচেয়ে দ্রুতগতিতে উড়ে যায়।

খেলাধুলো যাঁরা করেন বা ভালবাসেন তাঁদের কাছে যেমন খেলাধুলোর কথাই সবচেয়ে আনন্দদায়ক বিষয়বস্তু, তেমনি শিকারীদের কাছে তাদের শিকার জন্তু বা পাখীদের আলোচনা স্বাভাবিক ঘটনা। নিঃসন্দেহে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল প্রেমিক ক্রীড়ানুরাগীদের মত স্যার হিউগ বীভার আর তাঁর বন্ধুদের পাখীদের দ্রুতগতির আপেক্ষিক তুলনামূলক এই আলোচনা উত্তেজিত আকার ধারণা করেছিল এবং সেই উত্তেজনার ফাঁকে খাঁটি ব্যবসায়ী হিউগ বীভারের মাথার ভেতরটা নড়েচড়ে উঠেছিল।

আয়ার্ল্যান্ডের নদীর তীর থেকে বন্দুক কাঁধে হিউগ বীভার লন্ডনে ফিরে এলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে শুরু করে বহু বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটিও করলেন। হতাশ হলেন বীভার, আশ্চর্য! কোন বইয়েই পাওয়া গেল না ও'দের কৌতূহলের উত্তর—কোন্ পাখী, সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন!

মাথা চুলকোলেন বীভার, এরকম কোন বই নেই যে বইয়ে থাকবে সবচেয়ে দ্রুতগতি-সম্পন্ন, সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে পুরনো, এমনি সবকিছুর টাটকা খবর? আর তা যদি থেকেও না থাকে 'গীনেস' এরকম একটা বই প্রকাশ করলেই বা দোষ কি? দোষ ত' নয়ই, বরং এতে করে 'গীনেসে'র আখেরে ভালই হবে। কে না জানে মদের দোকানে এসব তর্ক বেশী করেই বাধে! 'গীনেসের' বইয়ের তথ্য নিয়ে যারা তর্কে বাজিমাত করবে তারা নির্ঘাত 'গীনেসের' মদ বিক্রিও বাড়িয়ে দেবে।

হিউগ বীভার সহকারীদের বললেন বার কর সেই যোগ্য ব্যক্তিটিকে, যে এধরনের খবর জোগাড়ে পারদর্শী।

সেই সময়ে লন্ডনের ডেলি মেলের [illegible] সম্পাদকের দুটি পুত্ররত্নের ছেলেবেলা থেকে এই ধরনের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা তাদের পরিণত জীবনে জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়ার খ্যাতি এনে দিয়েছে! দুই যমজ ভাই নরিস ম্যাকহোয়ার্টার আর রস ম্যাকহোয়ার্টার এবিষয়ে রীতিমত ব্যবসা খুলে বসেছে। তাদের কাছে সংবাদপত্রের কাছ থেকে, লেখকদের কাছ থেকে অনবরত প্রশ্ন আসছে আর ম্যাকহোয়ার্টার দুভাই সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর জোগাড় করে সংগে সংগে পাঠিয়ে দিচ্ছে, অবশ্যই দক্ষিণার বিনিময়ে।

কি রকম খবর জানতে সবাই চায়, তা কিছু নমুনা ও উত্তর দিচ্ছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী ওজনের মানুষ (হাঁ আছে, তেষট্টি টন ওজনের)।

যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে ছোট পানশালা (ডরসেটে চলে যান, নাম দি স্মিথস্ আর্মস)।

ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশী শতরাণ (১৯৭টা সেঞ্চুরী করেছেন স্যার জন হবস্) ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯৫৫তে ম্যাকহোয়ার্টার ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত এমনি নানা তথ্য নিয়ে 'গীনেস'দের উদ্যোগে প্রকাশিত হল এই অভিনব এনসাইক্লোপিডিয়া। আট থেকে আশী বছরের চিরশিশুরা বইটি পেয়ে ত' খুব খুশী, এতদিনে খাসা একটা বই পাওয়া গেল। এ বই বেরোবার আগে কেউ কি জানত মিসেস ভ্যাসলেট বলে এক ভদ্রমহিলা একসঙ্গে উনসত্তরটি শিশুর মা হয়েছেন, এদের মধ্যে ষোলো জোড়া যমজ, সাত জোড়া তিনটে করে, আর চার জোড়া চারটি করে।

হুহু করে গীনেসের এ বইটি বেস্ট সেলার বই হয়ে উঠল। অবশ্য কেউ কেউ যে নাক কোঁচকায় নি, তা নয়। কিন্তু হলে কি হবে? বইটি ইতিমধ্যে এগারোটি সংস্করণ অতিক্রম করেছে এবং বিক্রয়সংখ্যা দশ লক্ষ ছাপিয়ে গেছে। আমেরিকার পাঠকদের জন্যে বিশেষ সংস্করণ ছাড়াও বইটি ফরাসী ও জার্মান ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

বলাই বাহুল্য বইটিতে খেলাধুলো সংক্রান্ত খবরেরই বেশী প্রাধান্য এবং মানুষের সর্বাধিক কৃতিত্বের ফিরিস্তির মধ্যে কায়িক কৃতিত্বের বিবরণ বেশী মর্যাদা পেয়েছে সংগ্রাহকদের কাছে।

যেমন ধরুন কেনেথ বেইলী বলে এক ভদ্রলোকের কথা। ভদ্রলোক চুয়াল্লিশ বৎসরে দৌড়েছেন এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ন'শ বিরানব্বই মাইল। কোন কিছুই কোনদিন তাঁর দৌড়ে বাধা সৃষ্টি করেনি। এমন কি ছুটতে ছুটতে একবারও মোটর চাপাও পড়েননি কেনেথ বেইলী। কিন্তু কলকাতায় বা শহরতলীতে কুকুর যেমন তাড়া করে, তেমনি এক চাঁদনী রাত্রে কেনেথ বেইলীর পেঁচার ভয়ানক আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছে।

স্বভাবতই এ ধরনের বইয়ে প্রকাশিত কোন খবরটাই শেষ খবর নয়। সাহারা মরুভূমির মধ্যে এক মরূদ্যানে একটি নিঃসঙ্গ পাম গাছের খবর ছিল ১৯৫৫ এর সংস্করণে ধু ধু মরুভূমির মধ্যে এক মরূদ্যানে এ গাছটি বেঁচে ছিল বেশ কয়েক বছর, গাছটি থেকে হাজার মাইলের মধ্যে অন্য কোন গাছ ছিল না, তবু তার মনে নিশ্চিত কোন দুঃখ ছিল না নিঃসঙ্গতার জন্যে। ১৯৬০ সালে গাছটি মোটর চাপা পড়ল এক আনাড়ী লোকের হাতে। আর তাই চালু সংস্করণে নিঃসঙ্গ গাছটির আর অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হল না।

গীনেসের এই বইয়ে মোটরগাড়ী ছোটানোর দ্রুতগতির রেকর্ড ইচ্ছা করে পরিত্যক্ত। তা না হলে এই রেকর্ড অতিক্রম করতে গিয়ে অযথা দুর্ঘটনা বাড়ানো হত। প্রমাণ? একটি সংস্করণে পিয়ানো ভেঙ্গে তার ধ্বংসাবশেষগুলো একটি ন'ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গোল চাকার মধ্যে মাত্র চোদ্দ মিনিট তিন সেকেন্ডের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলার রেকর্ড ছেপে শহরের বহু পিয়ানো ভাঙ্গার দুঃখ-দায়ক সংবাদ 'গীনেস'কে পেতে হয়েছে। তার চেয়ে পৃথিবীর মধ্যে বহুদিনের জীবিত জিনিষের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পাহাড়ে ২৬৪০ খৃষ্টপূর্ব শতাব্দীতে আলোর মুখ দেখা অতি প্রাচীন পাইন গাছের খবরটি তুলনামূলকভাবে অনেক নিরাপদ।

গীনেসের বইটিতে এমন অনেক কিছু আছে যার রেকর্ড এখনও অনতিক্রম্য। যেমন এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি পার হয়েছেন অলিম্পিক ফেরত এক পোলিশ স্কি টিম ১৯৩২ সালে মাত্র একুশ মিনিটে—এ খবর এখনও চালু সংস্করণে বিরাজমান।

শুধু এই নয়, কত দ্রুত কে নাচতে পারে তারও রেকর্ড আছে এ বইটিতে। মোট কথা, মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ সবাই কোন না কোন বিষয়ে রেকর্ড ভঙ্গ করে চলেছে আর সেই সমস্ত খবর সাধারণের গোচরীভূত হবার আগেই 'গীনেসের' এই রেকর্ড বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মজা হল, কোন পাখী সবচেয়ে দ্রুত উড়তে পারে তার খবর নিশ্চিত পাওয়া যাবে (এক ধরনের হাঁস উড়ে যায় ঘণ্টায় ৮৮ মাইল বেগে)। কিন্তু যে সোনালী প্লোভারের গতিবেগ নির্ধারণের সূত্রে এই যুগান্তকারী রেকর্ড বইয়ের সৃষ্টি, সেই প্লোভার পাখী ঘণ্টায় কত মাইল উড়ে যায়, এ খবর এ বইয়ে নেই। 'গীনেসের' বইয়ে ফার্স্ট বয় ছাড়া কারোর স্থান নেই যে!

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ষষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 2nd December, 1966. শুক্রবার ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

কলিকাতা বধির শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বধির-শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজটি (Training College for theTeachers of the Deaf) যে পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘকাল অনুভূত একটি গুরুত্বপূর্ণ অভাব দূর করে মূক-বধির শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকার সাধন করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে মূক-বধির শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এই কলেজটির যথেষ্ট অবদান থাকবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। এবং সেই কারণেই উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্তমানে আলোচ্য কলেজটিতে এক বছরের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়ে থাকে। কিন্তু মূক-বধিরদের বিশিষ্ট ও জটিল শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এক বৎসরে বিস্তারিত জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাটির মূল ত্রুটি যা আমি লক্ষ্য করেছি তা এইরকম :

১। কলেজের নির্ধারিত পাঠক্রমে (Syllabus) উপপাত্তিক (Theoratical) দিকটির উপর যতটা গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছে, প্রায়োগিক (Practical) দিকের প্রতি ততটা গুরুত্ব অর্পিত হয় নি। মূক-বধির শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রায়োগিক জ্ঞান বেশি থাকা প্রয়োজন। আবার, একথাও ঠিক যে, উপপাত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণ না থাকিলে প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এক বৎসর সময়ের মধ্যে কোন প্রকারেই এই উভয়-দিকের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা সম্ভব হয় না।

২। দ্বিতীয়ত আলোচনার সংক্ষিপ্ততা। প্রতি পত্রের উপর বৎসরে মাত্র ৭৫টি করে বক্তৃতা নির্ধারিত রয়েছে। এত স্বল্পসংখ্যক বক্তৃতায় দুরূহ বিষয়গুলিকে চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত না করে উপায় থাকে না। ফলে পাঠ্য বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে, তাঁদের ধারণা প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করতে পারে নি। য়ুরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের মূক-বধির শিক্ষা নিতান্ত পশ্চাৎপদ থাকবার একটি কারণ হিসাবে, শিক্ষকদের প্রায়োগিক জ্ঞানের অগভীরতার কথা উল্লেখ করা চলতে পারে।—মনে হয় শিক্ষণ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন এবং শিক্ষণ সময়কে বাড়িয়ে দিলে সুফল পাওয়া যাবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে কলেজের সিলেবাসটি মোটামুটিভাবে উচ্চমানের হলেও, বাস্তবপক্ষে ছাত্রদের কাছে তা যেভাবে পরিবেশিত হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা সন্তোষজনক নয়। দু' একটি ক্ষেত্রে সিলেবাসটির অস্পষ্টতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

(ক) মুদ্রিত সিলেবাসে মনস্তত্ত্ব বিষয়টিকে (২য় পত্র) বধির প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দেবার কথা উল্লিখিত থাকলেও, কার্যত তা হয় না। কারণ সেরকমভাবে শিক্ষা দিতে হলে বধিরদের সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন, এবং যার কোন সুযোগই ভারতবর্ষে নেই। বিষয়টির প্রায়োগিক দিকটির প্রতি অবহেলাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

(খ) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ানুগ শিক্ষার ক্ষেত্রে চতুর্থ পত্রটির গুরুত্ব সর্বাধিক। সুবিস্তৃত এই বিষয়টিকে ৭৫টি বক্তৃতার মধ্যে পরিবেশন করতে গিয়ে কলেজের দায়িত্ব স্খলন ছাড়া অন্য কোন লাভ হচ্ছে না। আমার মনে হয়, উক্ত পত্রের উপর বক্তৃতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কলেজ থেকে বেরোনো শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চশ্রেণীতে বিষয়ানুগ শিক্ষা বিষয়ে তাদের চিন্তার দৈন্য লক্ষ্য করেছি।

(গ) পঞ্চমপত্রে শ্রুতিতত্ত্বের (Audiology) কোর্সটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। যদিও সমস্ত সিলেবাসটির মধ্যে যে কয়টি পত্রে প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এই বিষয়টি অন্যতম। কিন্তু সীমিত কোর্সটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন আবশ্যক বলে মনে করি।

(ঘ) ষষ্ঠপত্রের দ্বিতীয়াংশের পরিকল্পনা সবিশেষ প্রশংসনীয়। মূক-বধিরদের সমস্যাগুলি, সেগুলি সমাধানের উপায়, মূক-বধিরদের প্রতিষ্ঠাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি এই পত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আলোচনায় উৎকর্ষের অভাবে এসব প্রায় গতানুগতিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টির উপর আলোচনা করার জন্য যাঁদের আহ্বান করে থাকেন তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেও মূক-বধিরদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাঁরা বধিরদের সমস্যার সান্নিধ্যে কোনদিন আসেন নি, কোনদিন সে বিষয় চিন্তা করার প্রয়োজন যাঁদের হয় নি, তাঁরা প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে কিরকম আলোকপাত করবেন তা সহজেই অনুমেয়। এ ব্যবস্থার পরিবর্তন আশু কর্তব্য।

কলেজটির শিক্ষামান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মহলের কারো কারো কাছে বিরূপ মন্তব্য শুনেছি। আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসাবে তাঁরা বলে থাকেন যে, যদি কলেজটির শিক্ষা উচ্চমানের হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেক্‌নিক্যাল্ ডিপার্টমেন্ট মূক-বধির শিক্ষা সম্পর্কে 'স্পেশাল অফিসার' নিয়োগ কালে কিংবা কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় 'টিচার-ইন্-চার্জ' নিয়োগ কালে 'ফরেন' ট্রেন্ড'-দের উপরে অধিক গুরুত্ব অর্পণ করত না। সে যাহোক, দেশের বর্তমান অর্থসংকটে 'ফরেন ট্রেন্ডেদ' মোহমুক্তি আবশ্যক। অবশ্য তা করতে হলে ট্রেনিং কলেজগুলির শিক্ষামান অবিলম্বে উন্নত করতে হবে। এই উন্নয়ন যে খুব কষ্টসাধ্য তা আমি মনে করি না। আলোচ্য কলেজটির শিক্ষামান উন্নত করতে হলে নিম্নলিখিত দিকগুলির প্রতি সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন :

১। দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা কোর্সের পত্তন।

২। দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য উচ্চমানের সিলেবাস নির্ধারণ।

৩। এক বৎসরের সার্টিফিকেট কোর্সটির শিক্ষণ ব্যবস্থায় প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।

৪। বিশেষ যোগ্যতার শিক্ষক নিয়োজন।

৫। গবেষণার ব্যবস্থাপন।

আমার মনে হয়, এক বৎসরের সার্টিফিকেট কোর্সের পাশাপাশি, দুই বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আবশ্যক। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী যাঁদের রয়েছে তাঁরাই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার পেছনে আর একটি যুক্তি এই যে, বর্তমানে ভারতের অন্যান্য মূক-বধির শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ডিপ্লোমা দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও ট্রেনিং এক বৎসরেরই। সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষকদের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। কারণ, ব্যবহারিক দিক থেকে ডিপ্লোমার মূল্য বেশি বলেই সাধারণের ধারণা।

আমি এটাও মনে করি যে, এই ট্রেনিং কলেজটি অবিলম্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। নতুবা, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা বধির-শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চতর পড়াশুনা বা গবেষণার সুযোগ পাবেন না। এই বিষয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইদানীং ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আলোচ্য বিষয়ে সহানুভূতিপূর্ণভাবে চিন্তা না করলে অদূর-ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের মূক-বধির শিক্ষকদের বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

ভারতবর্ষে বধির শিক্ষা সম্বন্ধীয় গবেষণার সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে শিক্ষার মান বিশেষ উন্নত হচ্ছে না। জাতীয় জীবনে এতে কতকগুলি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বধির শিক্ষার মান উন্নয়ন করে জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা একান্ত আবশ্যক। সরকার এবং ট্রেনিং কলেজের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে তৎপরতা প্রদর্শন করলে সুধীজন কর্তৃক প্রশংসিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীনির্মলেন্দু চক্রবর্তী, এম-এ, সি-ডি-ই,
সহ-অধ্যক্ষ, মূক-বধির বিদ্যামন্দির।

সম্পাদকীয়

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র

যন্ত্রের বন্দনা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেও আছে। তিনি একে বলেছেন 'দীপ্ত-অগ্নি-শত শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয়' পথের অগ্রদূত। কবির এই উক্তিকে কেউ অতিরঞ্জন বলবেন না। যন্ত্রের স্থান মানুষের জীবনে আজ অপরিহার্য। একে বাদ দিয়ে দ্রুতগতি, স্পন্দমান জীবনের কল্পনাও আজ করা যায় না। কিন্তু যন্ত্র মানুষের ওপর প্রভুত্ব করবে, এমন কোনো দিনের কল্পনা যত বিলম্বিত হয় ততই ভাল। কারণ, মানুষের প্রয়োজনে, তার দাসত্বের জন্যই মানুষের মনীষা এই 'পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র' যন্ত্রকে এনে উপহার দিয়েছে বস্তুবিশ্বের মাঝখানে।

এই প্রসঙ্গেই ভারতবর্ষে অটোমেশন প্রবর্তন নিয়ে নানা বিতর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষের শ্রম লাঘবের জন্য স্বয়ংক্রিয় এই ধরনের কম্প্যুটর যন্ত্র পশ্চিম দেশে চালু হয়েছে। যন্ত্রের গণনা নির্ভুল, তাতে শ্রম বাঁচে, সময় বাঁচে এবং মানুষকে শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো কর্মে নিয়োগ করার সুযোগ পাওয়া যায়। পশ্চিমে, যেখানে লোকসংখ্যা কম, সম্পদ বেশি এবং লোকের প্রয়োজন সব সময়েই অনুভূত হয়, সেখানে অটোমেশন শ্রম-জীবনের ভারলাঘবকারী রূপে অভিনন্দিত হওয়া বিচিত্র নয়। যদিও পুরোপুরি অটোমেশন সমস্ত পাশ্চাত্য দেশেও সম্ভব কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে। যন্ত্রের প্রয়োজন ও তার সীমা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নীতি এখনও পাশ্চাত্য দেশে ঘোষিত হয়নি। তার পরীক্ষাকর্ম চলছে।

ভারতবর্ষের শ্রমিক মহলে অটোমেশনের বিরুদ্ধে যে-বিক্ষোভ ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সে-বিষয়ে সকলেরই গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। বলা প্রয়োজন যে, অটোমেশন নিয়োগ সম্পর্কে ভারত সরকারের কোনো সুস্পষ্ট নীতি এখনও ঘোষিত হয়নি। তা এক পক্ষে ভাল, কারণ এই নীতি ঘোষণার মত সময় এখনও আসেনি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অটোমেশন সম্পর্কে সতর্ক পদক্ষেপের জন্য যে সুপারিশ শ্রম সম্মেলন থেকে করা হয়েছিল, তা পরীক্ষা করে দেখা সরকারের প্রয়োজনের বাইরে। আমাদের দেশে যাঁরা কলমের কাজ করেন, তাঁরা স্বভাবতই কম্প্যুটর যন্ত্রকে তাঁদের জীবিকা-সংহারক দানব রূপে দেখছেন। ধীরে ধীরে এই ভীতি জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হবে। তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। একে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিরোধের টেকনিক হিসেবে মনে করলে ভুল হবে। কারণ, যন্ত্রের সাহায্য নিতে এ-যুগের মানুষ আর অস্বীকার করতে পারে না। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তাকে যন্ত্রনির্ভর হয়ে চলতে হয়। কিন্তু যন্ত্রীকরণের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার নিকটসম্পর্ক আছে। ভারতবর্ষের সমাজ এই মুহূর্তে অটোমেশনের জন্য তৈরী কিনা এবং তার প্রয়োগে সত্যি সত্যিই মানুষের জীবিকাহানির সম্ভাবনা আছে কিনা তা বিচার-বিবেচনা না করে বিদেশের অনুকরণে (এবং সেখানকার কোম্পানীর মাল বিক্রীর নতুন বাজার তৈরী করার জন্য) কম্প্যুটর আমদানীর নীতি সমর্থন করা কঠিন।

আমাদের দেশে মানুষের কর্মসংস্থান একটি প্রধান সমস্যা। দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষিতের হার বাড়ছে। সে তুলনায় শিল্পসংস্থা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আজ যদি ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য, দক্ষতার জন্য এবং নির্ভুল হিসাবের জন্য আপিসে আপিসে বৃহদাকৃতির ইলেকট্রনিক কম্প্যুটর বসানো হয়, তাহলে প্রথমেই যে-আশংকা জাগবে তা হল এর ফলে নতুন বেকার সৃষ্টি হবে না তো? বেকারের সংখ্যা বাড়লে তা সরকারের দুর্ভাবনাই বাড়াবে এবং সমাজের অর্থনীতির ওপর বৃহৎ চাপ সৃষ্টি করবে সেই কর্মহীনের দল। সুতরাং অটোমেশনে যে সুফল আশা করা যায় তার অনেকখানি খেয়ে নেবে বাড়তি সামাজিক সমস্যা। সুতরাং থিওরির দিক দিয়ে অটোমেশন শিল্প-প্রগতির সহায়ক হলেও ভারতবর্ষের মতো একটি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশে রাতারাতি অটোমেশন চালু করার জন্য ব্যস্ততার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবাদ উঠেছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সরকার অগ্রণী হোন। তিনটি পরিকল্পনাকালে বৃহৎ শিল্পের প্রসার হলেও ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতির প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনও বাঞ্ছিত লক্ষ্য থেকে দূরে। এখনও আমাদের দেশের প্রধান সম্পদ জনবল। পাশ্চাত্য দেশের মতো অতি-আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উপযোগী করে এখনও সমাজকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তাই যন্ত্রীকরণ আমাদের কতটা চাই, কোথায় তার সীমারেখা টানা হবে এবং শিল্পোন্নয়নের কোন্ পর্যায়ে গেলে অটোমেশনের গ্রীণ সিগন্যাল দেওয়া সম্ভব, তা ভালভাবে পরীক্ষা করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। নতুবা কাজের সরলীকরণের নামে সর্বকর্মপারদর্শী যন্ত্র আমদানি করে মানুষের দুশ্চিন্তাকেই হয়তো বাড়িয়ে তোলা হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রবন্দনাকে বৃহত্তর মানব-প্রগতির সঙ্গে মিলিয়ে একসঙ্গে পাঠ করলে আমরা দেখতে পাবো তার অন্তরালে যার বন্দনা তিনি করেছেন, সে শুধু নিষ্প্রাণ যন্ত্র নয়, এই যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষের মনীষাই সেই অভিনন্দন গ্রহণ করেছে।

বিচিত্র চরিত্র

শশীশেখর ঃ ডেংগারার সিংহ

● ● ● ● ●

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

(মধ্যপর্ব)

"যাঁহা শশীশেখর তাঁহাই ডেংগারা"। কথাটা বলেছিলেন শশীবাবু। এবং তিনি তাই প্রমাণও করেছিলেন। সেদিন ওই গেস্ট হাউসে বসে প্রথমে শুকনো নেশা করে তারপর তরল নেশা করেছিলেন, সে সকলের সামনেই, কাউকে ভ্রূক্ষেপ না-করেই। স্টেজের সামনে বসে থিয়েটার দেখছিলেন। একপাশের প্রসিনিয়ামের সুদৃশ্য থামের গায়ে চেয়ার নিয়ে বসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছিলেন অভিনয়।

অভিনয় হয়েছিল 'বঙ্গনারী'; দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের শেষ রচনা। এই নাটকটি সেকালে বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছিল। এর মধ্যে দুই পাষণ্ডের চরিত্র আছে; নাট্যকার তাদের একজনকে বলেছেন—দেবর্ষি, একজনকে বলেছেন—মহর্ষি। মহাজন এবং ধর্মধ্বজী-ভণ্ড। ধর্মধ্বজী-ভণ্ড ছোটভাইকে ফাঁকি দিয়ে পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি ষড়যন্ত্র করে আত্মসাৎ করেছেন। পাওনাদার মহাজন সব পাওনাই আদায় করছেন ছোটভাইয়ের ঘাড় থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই ছোটভাইয়ের কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ওই ধর্মধ্বজী ভণ্ডকে বললে—তোমার ভাইঝিকে সমর্পণ কর আমার কামানলে। ধর্মধ্বজী তাতেই রাজী হয়ে দুই ভাইঝির অন্যতমা বিধবা-জনটিকে তাঁর বাড়ীতে পেয়ে একটা ঘরে আবদ্ধ ক'রে রেখে গেলেন বন্দিনীর মত। এবং পরে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন মহাজন। এবং এই বিধবাটিকে আক্রমণ করলেন পশুর মত। বাঘ যেমন লালসায় লাফিয়ে পড়ে হরিণীর উপর তেমনি ভাবে লাফিয়ে পড়তে চাইলেন।

এই বিধবা মেয়েটি ছিল সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিনী এবং আমাদের রামায়ণ মহাভারত উপনিষদ ইত্যাদি শাস্ত্র পারঙ্গমা। এবং জীবনে শুচিশুদ্ধ একটি অসাধারণ মেয়ে। ধরিত্রীর মত সহ্যশীলা, প্রদীপশিখার মত প্রদীপ্তা এবং তেজস্বিনী, মালতী পুষ্পের মত শুভ্র কোমল। মেয়েটি ওই কামুক পশুটার সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করে বাধা দিলে; সেই বাধা দিতে দিতেই সে মানুষকে ডাকলে, দেবতাকে ডাকলে, বুক-ফাটিয়ে, কিন্তু রুদ্ধদ্বার ঘরখনার দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে সে ডাক ঘরের মধ্যেই যেন নিঃশব্দ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। মেয়েটি নিদারুণ আক্ষেপে বলে উঠল—আমার কেউ নেই। বিশ্বসংসারে কেউ সাড়া দিল না—কেউ নেই।

তাকে ব্যঙ্গ করে এই কামুকটি বলে উঠল—কেন সুন্দরী, আমি আছি!

এইখানে নাটক উঠেছে চরম মুহূর্তে। মোড় ফিরল নাটকের গতির। মেয়েটি পেয়েছে আপন জন। সে ওই কামুকটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমি আছ! কি আশ্চর্য এতক্ষণ আমি দেখেও দেখিনি এইতো তুমি আছ!

তারপর সে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা। একটি অসহায় নারীর পরম আকুতিভরা বেদনার্ত আবেদন। 'তোমারই পাশব প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তোমারই মহত্ত্বের দুর্গে আমি আশ্রয় নিচ্ছি। তোমারই বিরুদ্ধে সহায় হতে তোমাকেই আমি মিনতি জানাচ্ছি, তোমার বিরুদ্ধে তুমিই এসে আমাকে উদ্ধার কর আশ্রয় দাও।' ব'লে মেয়েটি আছাড় খেয়ে পড়ল, বললে—"এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।"

বাংলা নাটকে এমন আবেগময় দৃশ্য খুব কমই আছে। সমস্ত শ্রেণীর দর্শককে যেন নাটকের প্রাণপুরুষ আমলকির মত করতলগত করে নেয়। সে যেমনই দর্শক হোন। অভিভূত তাঁকে হতেই হবে। তারপর হয়তো বিচার করতে পারেন, এমন ঘটনা ঘটে কি ঘটে না, বাস্তব কি অবাস্তব। মিনার্ভায় এই ভূমিকায় অভিনয় করতেন কোন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী ও অভিনেতা। আমাদের ওখানে যে অভিনয় হয়েছিল, সে অভিনয়ও খুব উচ্চস্তরের এবং সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় হয়েছিল।

সেদিন শ্রোতা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সে কালের নাট্যজগতের দিকপাল। রসরাজ অমৃতলাল বসু, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ, নাট্যকার অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, নাট্যকার এবং নট অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এঁরাও ছিলেন দর্শকদের মধ্যে। তাঁরা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন। এই দৃশ্যটিতে অভিনয়ের মান এবং অভিনয়ের রসের পাক উত্তাপে এবং গন্ধে দর্শকদের বিহ্বল ক'রে তুলেছিল।

শশীশেখরবাবু দেখতে দেখতে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রসিনিয়ামের পাশে চেয়ারে বসে আত্মহারা হয়ে ধমক দিতে শুরু করলেন, ধমক দিচ্ছিলেন মহাজনবেশী অভিনেতাকে।

—এই—এই—এই! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও বলছি, ছেড়ে দাও।

—আঃ—আঃ। আর না—আর না। আর না। না—না। বন্ধ করো বন্ধ করো ঠিয়েটর। থিয়েটারকে তিনি ঠিয়েটর বলতেন। তাঁর কথাগুলি বিচার করলেই বুঝা যাবে যে শশীবাবু ব্যাপারটাকে অতি-বাস্তব, অর্থাৎ সত্যই ওই ঘটনাটা ঘটেছে এ প্রত্যয় করেন নি, ওটা যে অভিনয় হচ্ছিল সে কথা তাঁর খেয়াল ছিল কিন্তু এই রসের তীব্রতা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। মধ্যে মধ্যে নিজের বুক চেপে ধরে আঃ আঃ বলে চীৎকারও করছিলেন। ইতিমধ্যে এল নাটকীয় চরম মুহূর্ত। ওই মহিমময়ী মেয়েটির ওই যে অতিবিচিত্র উচ্চতম স্তরের মানবিক আবেদন ওই কামার্ত মহাজনটিকেও স্পর্শ করল; লোহাতে ছোঁওয়া পেল স্পর্শমণির। লোহা সোনা হয়ে গেল। সে থরথর করে কেঁপে উঠে মেয়েটিকে হাতজোড় ক'রে বলে উঠল—তুমি মা—তুমি মা। তোমার কোন ভয় নেই, মা, আমি তোমার সন্তান।

ব'সে সে মেয়েটির পায়ে গড়িয়ে পড়ল। এই মুহূর্তেই পড়ল চতুর্থ অংকের যবনিকা।

শশীশেখর হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। বলতে লাগলেন—জয় ভগবান—জয় ভগবান, জয় জগজ্জননী, জয় কালী। জয় জয় হোক। জয় জয় হোক। এবং মদমত্ত হস্তীর মতই উঠে চলে গেলেন গেস্ট হাউসের দিকে। চাকরকে ডাকলেন—ওরে বেটা ওরে হারামজাদা, দে রে, দে, আর একপাত্তর দে! বলিহারি বলিহারি বলিহারি! বহুৎ আচ্ছা!

হয়তো এ মেজাজ তাঁর একটা বিশেষ কালের একটা বিশেষ অনুকূল স্থানের জন্যও বটে এবং তাঁর আর্থিক বৈষয়িক যে অবস্থা ছিল তার জন্যও বটে। কিন্তু এই অবস্থাতেও এই কালেও এই মেজাজের বিপরীত প্রকাশ দেখা গেছে। একটা আধটা নয়, হাজার হাজার। ওই হাজার দরুণে মানুষের চরিত্রের যে প্রকাশ, তাকেই বলতে হবে সাধারণ প্রকাশ। শশীশেখরবাবুর চরিত্রের প্রকাশই ব্যতিক্রম।

পরদিন তিনি বলেছিলেন—আর একটু বেশী হলে ওই মহাজনটাকে আমি মারতাম। তোমাদের থিয়েটারে আগুন ধরিয়ে দিতাম। হাঁ—

কুঞ্জদাঠাকুরদা তাঁর আত্মীয় হতেন বন্ধুও ছিলেন। তিনি শুনে পরিহাস ক'রে বলেছিলেন—এ কি তুমি তোমার ডেংগারা পেয়েছ?

শশীশেখরবাবু বলেছিলেন—যাঁহা শশী-শেখর তাঁহাই ডেংগারা। হ্যাঁ—।

কথাটা বাড়িয়ে খুব বলেন নি শশী-শেখরবাবু। তিনি বাইরে খুব কমই যেতেন। কারণ তাঁর ওই মেজাজ। তাঁর মেজাজ স্থান কাল মানত না, স্থান কালকেই তাঁর মেজাজকে মানতে হ'ত।

কোথাও যেতে হলে তাঁর সরঞ্জাম নিয়ে যাবার জন্য প্রায় বাদশাহী আমলের খান-ই-সামান দরকার হ'ত। এ কালে সেকালের খান-ই-সামানরা যে খানসামা চেহারা নিয়েছে তা দিয়ে তাঁর চলত না।

তাঁর মেজাজ চাইত—বাঘ আর বলদ তাঁর চোখের সামনে একঘাটে জল খাবে। সেটা হয়তো তাঁর ডেংগারার কাছারীবাড়ীর সামনে যে বিস্তীর্ণ দীঘিটা আছে তার ঘাটে রেলিং দিয়ে ঘেরা ব্যবস্থায় এপাশে বাঘ ওপাশে বলদকে জল খাওয়ানো যায়,

কিন্তু বনেজঙ্গলে তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তাঁর মন তা মানতে চাইত না।

সেই বুলিই তাঁর মুখে লেগে থাকত—যাঁহা শশীশেখর তাঁহাই ডেংগারা।

তাঁর প্রজারা তা মানত। না মেনে তাদের উপায় ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছি অনেককে—কেমন লোক?

—ওরে বাপরে!

—মানে?

—সাক্ষাৎ বাঘ গো। রাজা বাঘ!

—খুব অত্যাচারী?

—অত্যেচারী? তা দাপ বাবু ভীষণ! ভীষণ দাপ্! আর থাবা মারলে তো মাথা ভেঙে যাবে গো! তা অত্যেচারী বটে বইকি। কিন্তু—।

—কিন্তু আবার কি?

—কিন্তু অমন দয়ালও আবার নাই মশায়।

—সে আবার কি রকম। মারের চোটে পিঠের চামড়া কাটলে টিংচার আইডিন লাগিয়ে দেন।

—কথাটা খুব মিথ্যে বলেন নাই মশায়। সত্যি বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু আছে।

—কি আছে?

—আছে। চলুন তাহলে হুজুরের কাছারীতে চলুন বাবু। চোখে দেখে আসবেন।

শশীবাবুর খাস কাছারী অর্থাৎ ডেংগারার কাছারী। তক্তাপোষের উপর পাতা ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতেন শশীবাবু। সকাল থেকেই একটা ঘোর লেগে থাকত চোখে। দশাশয়ী পুরুষ, খালি গায়ে গড়গড়ার নল হাতে বসতেন। আশেপাশে একদল পারিষদ, তাঁরা হুঁকোতে তামাক খাচ্ছেন। কেউ একখানা খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছেন; সে আমলে আজকের কাগজ আজই পৌঁছুতো না কোন গ্রামে। ডাকে কাগজ আসত। হয় দু'দিন বা তিন দিনের বাসী খবর।

—কি খবর রে কাগজের? এ্যাঁ?

—গান্ধীজী লাটসাহেবকে চরম পত্র দিয়েছেন।

—চরম পত্র? কি চরম পত্র?—

—ভারতীয় কংগ্রেসের দাবী না-মানিলে আন্দোলন হইবে।

—আন্দোলন হইবে? তা হোক। ছাই হবে। অহিংস আন্দোলন। কচুপোড়া। আর কি খবর বল!

—"দিবা দ্বিপ্রহরে বলপূর্বক যুবতী নারীহরণ। কতিপয় দুর্বৃত্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া পিতামাতা ও আত্মীয়ের সম্মুখে জোরপূর্বক মুখে কাপড় বাঁধিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান। বাধা দিতে গেলে রামদা দিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হয়।"

হাত থেকে গড়গড়ার নল পড়ে গেল, সোজা হয়ে বসলেন শশীশেখরবাবু, স্তিমিত চোখ বিস্ফারিত হল, বুকের উপর পড়ে-থাকা ধবধবে পৈতাটা ধরে বললেন—বাবাটার নাম কি? বাড়ী কোথা? শালাকে ধরে এনে মা কালীর থানে হাড়কাঠে লাগিয়ে খাচ্জং জিং করে দে। দা তুললে আর শালা বেটীকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে লুকলো! তারা তারা!

—তা কি করবে বলুন—শুধু হাতে—দায়ের ছামনে—

—কি করবে? নিকালো—তুমি বেটা আভি নিকালো, নেহিতো তোকেই লাগাব আমি হাড়কাঠে। তা হলে তো তুই শালাও তো তাই করবি। ওরে শালা মরবি। দায়ের কোপ খেয়ে মরবি। নিজের বুকে জান থাকতে বেটী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? বেরো শালা বেরো। বেরো বলছি। —থু—থু—থু। তোর মুখে থুতু দি আমি। থু—থু। এই গোপাল—নে, শালার হাত থেকে হুঁকো কেড়ে নে। না—হুঁকোটা ওকেই দে। ও হুঁকোটাই পতিত হল। খবরদার হুঁকোটা কেউ খাবি না। না—দে তো আমাকে দে তো।

হুঁকোটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে অথবা আছড়ে ভেঙেই দিতেন। যদি একজন কাবুলীওলার ঢঙের মুসলমান এসে সেলাম ঠুকে না-দাঁড়াতো।

—সেলাম হুজুর।

—সেলাম! কে তুই?

—আমি হুজুরের অম্বিয়া শেখ। মৌজা গোপালছিতে নতুন এসেছি।

—হুঁ। কি চাই তোর?

—গমস্তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছি।

—হুঁ। জানি। গমস্তা লিখেছে আমাকে। আমি লোক পাঠাতাম তোকে তুলে আনবার জন্যে। তা দেখছি তুই নিজেই হাজির। কি বলতে চাস কি?

—হুজুর আপনার গমস্তা আমাকে ছাপান্ন বছরের খাজনা চাইছে। তা দোব কেন আমি? আমি চার বছরের খাজনা এক বছরের সুদ এই দোব। বছরে চার আনা খাজনা পাঁচ বছরের পাঁচসিকের বেশী ছাপান্ন বছরে চৌদ্দ টাকা কেন দেব আমি? চার বছরের বেশী বাকী তো তামাদি।

—হ্যাঁ তাই দিতে হবে। আমার মহলে সুদ নাই তামাদি নাই নালিশ নাই। এই নিয়ম। তোর মাতামহের ওয়ারিশান হয়ে এই ভিটে পেয়েছিস। তোর মাতামহের খাজনা বাকী ছিল ষাট বছরের। তোর মাতামো সারাজীবন জেলই খেটেছে। শেষ চৌদ্দ বছর দ্বীপান্তরে, বারো বছর খেটে খালাস পেয়ে এসেই বছরখানেক ভুগে মারা গেল। দ্বীপান্তরে যাবার সময় বলেছিল—হুজুর ভিটেটা যেন থাকে। বলেছিলাম—আমার রাজ্যে ভিটে যায় না, এসে খাজনা মিটিয়ে দিস। ভিটে থাকবে, ফিরে এল যখন তখন আমিই খড় বাঁশ দিয়েছিলাম, খেতে ধান দিয়েছিলাম। তোর মাতামো রমজান ঘর করে নিয়ে বাস করলে। আমাকে টাকাও চেয়েছিল, বলেছিল—হুজুর কিছু টাকা দ্যান কিছু ব্যবসা করি। তা হলে আর চুরি ডাকাতি দাঙ্গা করি না। হঠাৎ মরে গেল। তোর বাবা এসে ঘর দখল ক'রে বিশ বছরের খাজনা মিটিয়ে গেল, বললে বাকীটা আবার দোব, বাস্, সেই গেল গিয়েই মরে গেল। তোর মা নেকা করলে নেসার খাঁ কাবুলীওলাকে। তুই অর্ধেক কাবুলে, অর্ধেক দেশী মোসলমান। বজ্জাত। তোরা বজ্জাত। এতদিনে তুই এসেছিস, শুনেছি, তোদের বাড়ী মহাজনে কিনেছে। তা তোর বাবার মামার ভিটে পড়ে আছে, খাজনা বাকী আছে দিতে হবে। সুদ নাই। না দিলে দখল পাবি না।

সেইদিনই আর কিছুক্ষণ পর এসে দাঁড়াল গোবিন্দপুরের গোপাল মণ্ডল, তার পিছনে একটি শিশুকে কোলে ক'রে একটি অবগুণ্ঠনবতী বিধবা যুবতী।

—কি বৎস গোপাল? গোবিন্দপুরের গোপাল আমার যশোমতীর নয়নমণি—

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে গোপাল বড় বড় দাঁত মেলে হেসে বললে—একবার বাবার চরণে এলাম। ওই হতভাগীকে নিয়ে?

—হতভাগী? কে হতভাগী—

—নে প্রণাম কর গো। প্রণাম কর—

—ও কে? এ্যাঁ? ওর চেহারায় যে শহুরে ছাঁচ রে? গায়ে যে শহুরে গন্ধ—

আজ্ঞে বাবার দিষ্টি দেব দিষ্টি। ঠিকই ধরেছেন—ও আমাদের পুলিনের পরিবারই বটে—

—শহরের সেই বউ?

—হ্যাঁ বাবা। গাঁয়ের বউটি তো অ্যানেক দিন গত হয়েছেন।

—হুঁ। তাতো বুঝলাম। কিন্তু—।

পুলিনের বিবরণ বলতে হবে। না বললে অস্পষ্ট থাকবে। পুলিন শশীবাবুর মহলের প্রজা; জাতে সদ্‌গোপ; বিয়ে করেছিল গ্রামেই। ছোকরা মায়ের এক ছেলে; ছেলেবয়স থেকে মামার বাড়ী থাকত; মামার বাড়ী লাভপুরের কাছে, মামার বাড়ী থেকে লাভপুর ইস্কুলে পড়ত। পড়া ছেড়েছিল ক্লাস এইটে উঠে; পর পর দু' তিন বছর প্রমোশন পায় নি। পড়া ছেড়ে লাভপুরে দোকানীদের খাতা লিখত। বাড়ী গিয়ে চাষ করতে ভাল লাগে নি। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যেত; জমিজেরাত ছিল ভাগে। এইভাবেও বেশ চলছিল কিন্তু হঠাৎ পুলিনের কি মতি হল, লাভপুর থেকে গেল বোলপুর, বোলপুর থেকে বর্ধমান। শেষ বর্ধমানেই আবার একটি কার মেয়েকে বিয়ে করে বর্ধমানে গেড়ে বসল। একটা পান সিগারেটের দোকান দিলে। তার সঙ্গে আর কি করত তা কেউ জানে না, তবে পুলিনের কোঁচার ঝুলটা বাড়ল, টেরীটা হল খুব বাহারের, তার সঙ্গে জুতো জোড়াটা হল বেশী চকচকে। এবং দেশে একদিন এসে বসল—এখানকার জমিজেরাত বাড়ীঘর গরুবাছুর সব বিক্রী করবে, গ্রামের বউটি বাড়ীতে থাকত, সে কাঁদলে, পায়ে ধরলে, কিন্তু পুলিন সংকল্পে অটল হয়ে রইল। বউটি জিজ্ঞাসা করলে—আমার কি হবে? আমি কোথায় যাব?

পুলিন বললে—সে আমি জানি না। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই। আমি আবার বিয়ে করেছি। সে মেয়ে আমাদের স্বজাত নয়। আমারও আর জাত নেই। তার সঙ্গে সম্পর্কও নাই।

অগত্যা গ্রামের বউয়ের বাপ এসে পড়েছিল শশীবাবুর পায়ে, —হুজুর রক্ষেকর্তা, হুজুর মা-বাপ। আপনি বিচার করুন।

বিবরণ শুনে শশীবাবু তার সিপাহী পাঠিয়েছিলেন—হারামজাদের কানে ধরে গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে আয়।

শ্বশুর বাবুর কাছ পর্যন্ত গেছে শুনে পুলিন তার আগেই পালিয়েছিল। তবে এরই মধ্যে যা পেরেছিল অস্থাবর অর্থাৎ তালগাছ শিরীষ গাছ আমগাছ বেচে কিছু টাকা উঠিয়ে নিয়েছিল। শেষ কামড়, যাবার সময় বাড়ীর বাসনকোসন যা পেয়েছিল তাই নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শশীবাবুর বিচারে গ্রামের বউ, গ্রামের বাড়ী, জমি পুকুর ইত্যাদির মালিকানা পেয়েছিল। এবং আরও হুকুম ছিল তাঁর, যে পুলিন যেন গ্রামে না ঢুকতে পায়। এখন গ্রামের বউটি গত হয়েছে বছর দুয়েক আগে। মালিকহীন সম্পত্তিটা হয়েছিল শশীবাবুর খাস সেরেস্তাভুক্ত। এখন এসেছে এই বিধবা মেয়েটি কোলে একটি শিশুকে নিয়ে; পুলিন মারা গেছে মাস তিনেক আগে। তার সম্মুখে প্রশ্ন—এই ছেলে নিয়ে সে কোথায় যাবে?

এসেছিল সে গ্রামের মণ্ডল গোপালের কাছে। গোপাল সবকিছু খোঁজখবর ক'রে দেখে তাকে নিয়ে এসেছে হুজুরের কাছে।

সমস্ত শুনে শশীবাবু বললেন—হুঁ। সবই বুঝলাম। সে বউ গত হয়েছে, সে সম্পত্তি এখন খাসে এসেছে; এখন পুলিন মরেছে—এখন এ বউ যাবে কোথায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হ্যাঁ তো বটে। কিন্তু মেয়েটার জাত কি খবর নিয়েছ বাবা গোপাল? সংসারে সব কিনতে মেলে বাবা, সব উপার্জনও করা যায়, সম্পত্তি বিষয় বিদ্যে বুদ্ধি যশ খ্যাতির সব, দুটো জিনিস যে কেনা যায় না। একটা হ'ল জাত আর একটা বাপ। বুঝেছ। মেয়েটার জাত কি? তোমাদের সকলে ওকে সমাজে নেবে?

এবার ঘোমটার ভিতর থেকে কথা ভেসে এল—বাবা! সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটি যুক্ত হয়ে যুক্ত করে পরিণত হল।

গোপাল বললে—পুলিনের বউ কি বলবে হুজুর।

—কি বলছে? বলুক! বল গো!

—বাবা। আমার জাত যাই হোক, এই ছেলে—এই ছেলের বাপ তো সে। এ তো আপনার সেই প্রজারই ছেলে, আপনার প্রজার জাতই তো ওর জাত। হুজুর, ও কোথা যাবে? আর হুজুর, সে যখন আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছিল, তখন আমিই বা কোথায় যাব? আর আমার জাত বলতেও তো সেই স্বামীর জাত! আপনি রাজা, আপনি প্রজার জাত বিচার ক'রে ছোট বড় করলে চলবে কেন?

মেয়েটির কথায় শহরের টান, কথার গাঁথুনীতে শহরের ঢঙ; সে তার অবগুণ্ঠনাবৃত আকৃতি এবং কাপড় সেমিজের মধ্যে পরিস্ফুট ছিল।

শশীবাবু তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—তুই বেটী শহরের মেয়ে বটিস, আর ভাল জাতের মেয়েও বটিস। কথায় তোর প্যাঁচ আছে, আর সওয়াল আছে। কিন্তু—

একটু চুপ করে থেকে ভেবে নিয়ে বললেন—সম্পত্তি পেয়ে এখানে থাকবি, না শহরে থাকবি? এসে গিয়ে ধান পান বেচে চলে যাবি?

—আজ্ঞে বাবা এখানে থাকব।

—এখানে থাকবি? ভাল কথা। শোন—এখানে থাকবি, জমি বেচতে পাবি না, এই সর্ত যদি করিস তবে আমি জমি ফিরে

দোব। নইলে না। চালাকি ক'রে এখানে কিছুদিন থেকে জমিজেরাত বিক্রীও করতে পাবে না। সে আমি ঢোল শহরৎ ক'রে দোব। বুঝলি রে হারামজাদী।

হারামজাদী তাঁর ছিল সমাদরের ডাক। কন্যাস্থানীয়াদের হারামজাদী বলতেন—গুখোর বেটীও বলতেন, অর্থাৎ শুকর হতেন এবং বিষ্ঠাখাদক হতেন তিনি নিজে।

সময়টা ছিল শ্রাবণের শেষ। একদল চাষী এসে তাঁর কাছারীর সীমানায় ঢুকল। গোপাল এবং পুলিনের স্ত্রীর কথা সরিয়ে রেখে তিনি হাঁকলেন—কোথাকার রে বেটারা? তোরা কোথাকার? হরবোল পাল লাগছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা। আমি হরবোলই বটে।

—হুঁ। কি সংবাদ? ধান্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। শাওনের শেষ; ধান চাই ঘরের ধান চাল—শেষ—।

—হ্যাঁ—। 'যেমন করেই বাঁধো ধান ভাদোরে টানাটানি', তা ভাদর যে এল। এবার তো ধান ভাল রে।

—তা ভাল। তবে দেখে তো পেট ভরবে না বাবা। ধান দেন।

—আজই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই তো দিন দেয়া আছে হুজুরের।

—দিন দেয়া থাকলে পাবি। তার কথা কি? কত ধান চাই? ডাক নায়েববাবুকে ডাক।

হরবোল চলে গেল—নায়েবকে ডাকতে। গোপাল সুবিধে পেয়ে বললে—হুজুর, তা হলে এ বউটির উপর কি হুকুম হ'ল?

—হুকুম তো হয়ে গিয়েছে রে বেটা চাঁদারাম। থাকবে গাঁয়ে। জমি পাবে। তবে এবার চাষের খরচ লাগবে।

—আজ্ঞে ঘরখান তো পড়ে গিয়েছে—

—ঘর ক'রে নিক। আমি তো দেয়াল দিই না যে ক'রে দোব। তুই বেটা সাত্য হেদো।

—তা আজ্ঞে বাঁশ খড় গাছ।

—সে না হয় দোব। কিন্তু ওই মেয়েটা বলুক না ওর কি চাই? পুলিন টাকাকড়ি কি রেখে গিয়েছে?

ঘোমটার ভিতর থেকে মেয়েটি বললে—টাকা নাই বাবা, কিছু গয়না আছে, সে কিছু গয়না গড়িয়ে দিয়েছিল।

—তোর ধম্ম তোর ঠাঁই। বাঁশ খড় গাছ পাবি। যেমন নিয়ম আছে। আর গয়না যখন আছে তখন একশো টাকা সেলামী দিবি। বুঝলি। হাঁ। আর এবারের চাষের খরচ। যা জলটল খেগে যা।

কিছুক্ষণ পর নায়েব এল। বললে—পুলিনের জমিটা বিলি করলে পাঁচশো টাকা সেলামী পাওয়া যাবে।

—হুঁ। তা জানি। কিন্তু মরদের বাত আর হাতীর দাঁতের দাম পাঁচশো টাকার চেয়ে বেশী। বাত দিলে জাত দেওয়া হয়। ও আর ফেরে না। তবে ভয় হচ্ছে, বাড়ীর ছোকরাবাবুদের জন্যে হে! মেয়েটা শহুরে আর চটক সুন্দর। কথাবার্তাও খাসা। ছোঁড়ারা না—।

বলে হা—হা করে হেসে উঠলেন। বললেন—ওই হল বংশের ধারা। আমিই কি শালা কম নচ্ছার ছিলাম!

হঠাৎ থেমে যান। তারপর বলেন—মো-সায়েবদের দিকে ফিরে—আচ্ছা বলতো, বেটাছেলেগুলো সবাই নচ্ছার—না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। স ব্বা ই।

—তুই শালা কচু জানিস। শুধু সায় দিচ্ছিস আমার কথায়।

—আজ্ঞে না। ঈশ্বরের দিব্যি—

—ঈশ্বরের দিব্যি? ছেলের দিব্যি ছেলের মাথায় হাত দিয়ে মিথ্যে কিরে করলে ছেলে মরে। তা ঈশ্বরের দিব্যি করছি শালা, ঈশ্বর মারলে তোর কি যাবে আসবে রে? হ্যাঁরে শালা, ঈশ্বর তোর কে? এ্যাঁ? কে হয় তোর? শালা—!

হা—হা—হা শব্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন শশীবাবু! তারপর নায়েবকে বললেন—দেখ হে মজুমদার, ওই বিধবা বউটা দেখতে সুন্দরী বয়স অল্প, শহর থেকে গাঁয়ে এসে থাকতে চাচ্ছে, ছুঁড়িটার স্বভাব ভাল। নইলে বর্ধমান থেকে আসত না। মহাজনটুলিতে সাজানো বাজার, সেখানে গিয়ে মাথার ঘোমটা খুলে দাঁড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে পাইকারি মহাজন, মাস কয়েকের মধ্যে গদীর মহাজন হতো। তাতেই দিলাম জমিটা হে। আর চেহারাটাও বেশ মিষ্টি হে। জমি দিতে ভাল লাগল।

বলে আবার হাসি।

এরই মধ্যে অমুবিয়া শেখ গোল বাধালে।

সে বললে—তা হলে আমার খাজনা মাফ হবে না কেন? আমি পাঁচ বছরের খাজনা পাঁচসিকার বেশী দিব না। এই লিবার তবে হুকুম দ্যান। বলে সে কাছারী ঘরের মধ্যে ঢুকে দুটো আধুলি একটা সিকি শশীবাবুর সামনে ফেলে দিয়ে কেমন একটা দুর্বিনীত হাসিমুখে দাঁড়াল।

শশীবাবুর হাসি থেমে গেল।

চোখের ক্ষেত লালচে হয়ে উঠল। অমুবিয়া শেখের দিকে তাকিয়ে তিনি ওই সিকি আধুলি তিনটের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে বললেন—উঠাও, উঠাও—আভি উঠাও। উঠাও—

আমি আর দিব না বাবু। আবদার করলে অমুবিয়া। ওই মেয়েটাকে জমি ছেড়ে দিছেন—

—হাঁ—হাঁ দিচ্ছি। দেব। তুম উঠাও। উঠাও!

—লিবেন না?

—না।

অমুবিয়া আধুলি সিকিতে তার পাঁচসিকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। গেল মানে একেবারে বেরিয়ে চলে গেল। নায়েব মাথা চুলকে বললে—লোকটা বড় পাজী বদমাশ লোক, গমস্তা লিখেছে—ওর সঙ্গে একটা মিটমাট করলে লোকটা তাবে থাকবে আমাদের—

—না।

—কিন্তু ও তো খাজনা দেবে না।

—নালিশ হবে। মরদকা বাত, হোক না খরচ। শালা মরদকা বাত—হাতীকা দাঁত। অমুবিয়া শেখ দোগাছি মৌজায় থাকবে না। বেতমিজ—বেতরিবৎ—বদমাস লোকটা।

সমস্ত কাছারীঘরটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিস্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করছিল। শুধু ঝড়দলের মাথায় কতকগুলো কবুতর আপন মনে কোঁউ কোঁউ কোঁউ শব্দে গুঞ্জন করে চলেছে।

হরবোল পাল এসে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে।

—হুজুর—।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কাল বিকেলে ॥ শিশিরকুমার দাশ

কাল বিকেলে
মাঠের কোণে হেঁটে যাবার সময়
তুমি আঙুল তুলে

দেখালে দূরে সূর্য ডুবছে।
মাথার পর একটা কালো মেঘ
রয়েছে ঝুলে
যেন পাখির ঠোঁট

সূর্য লাল যেন একটা মস্ত ডালিম
বাতাস খেয়ে খেয়ে
উঠছে দুলে।

হঠাৎ সেই পাখিটা তার
ঠোঁটের ঘায় ডালিমটার
বুক ঠুকরে দিতেই আশে পাশে

চোখের মত টলটলে সব
দানা
গড়িয়ে পড়ল।

সারা আকাশ জানলাগুলো দিলে খুলে।

যদিও দহন ॥ করুণাসিন্ধু দে

কেন দেখা হলো শরতের দূর মেঘে
আমি যে বেঁধেছি সীমায় সীমায় নীল
প্রতিটি প্রহর দ্বন্দ্বমুখর বেগে
অশান্ত আলো ঊর্মিতে ঝিলমিল।

স্মরণ শুধু কি জ্বলেছে অভিজ্ঞানে
করকাশূন্য অনঘ আকাশ কার
ব্যবধান গড়ে স্বভাবের কোন দানে
বকুল ঝরানো উচ্ছ্বাসে অস্মার!

স্বপ্নে-দুলালী ঘুম পাড়ানিয়া গান
তড়িৎ বিহীন অনুভব দূরে থাক;
পাথঘাটে ঘোর, বাতাসেও উত্থান
প্রতি রাত হোক ঘোষক চক্রবাক।

ঘনিষ্ঠ প্রেমে শিকড় ছড়ানো ধূলি
খেয়াল-খুশীর কখনো ঘূর্ণী, দাহ;
যদিও দহন, তৃষ্ণাও শতমূলী—
নিঃশ্বাস হয় সৌরভ, পরিবাহ।

শাদা পাল তোলে শরতের দূর মেঘে
ছিন্ন বাসনা, নই তার দাবিদার;
আমি গ্রাস করি যৌবনে উদ্বেগে
তিন মুড়িলার প্রজ্ঞার উদ্ধার।

যাওয়া যায় না ॥ তুলসী মুখোপাধ্যায়

যাব বললেই হুট করে যাওয়া যায় না
এমনকি ঐ যে ভবঘুরে
কোনোখানেই যার জায়গা হয় না
যাবার কথা হয়েছে কী, কপাল কুঁচকে আসবে
নিদেনপক্ষে দু-একবার আঙুল মটকাবে,
আর তুমি তো পুরোদস্তুর সংসারী,
কিছু না হোক ছোটখাট গৃহস্থ তো বটে!
যাব বললেই যাওয়া হয় না
পেছনের টান বড় বালাই
দিবানিশি আংটার মতন ধরে থাকে।

যাব বললেই হুট করে যাওয়া যায় না
ছুটির দরখাস্ত থেকে শুরু করে
ঘরদোর তদারকির একটা যেমন-তেমন বন্দোবস্ত
ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম, কনিষ্ঠের দুধের বোতল—মায়
গিন্নির মানের ব্যাপারটাও ভাবতে হয় বৈকি!
অতঃপর জিনিষপত্তর বাঁধাছাঁদা করতে করতেই
হুস করে কখন ট্রেন চলে যায় স্টেশন কাঁপিয়ে,
অথচ, বৎসরান্তে নতুন টাইম টেবিল কিন্তু চাই-ই চাই!

যাব বললেই তো আর হুট করে যাওয়া হয় না
পিছনের টান বড় বালাই
দিবানিশি আংটার মতন ধরে থাকে।

ঐতিহাসিক অতৃপ্তি ঃ রুশো

সুধাংশু দাশগুপ্ত

'La Nouvelle' রচনার ঠিক আগে মণ্ট্‌মরেনসির নির্জন অরণ্যে বসে রুশো লিখেছিলেন, 'বাঁচা ও ভালবাসা আমার কাছে অভিন্ন, তবু কেন আমাতে সম্পূর্ণ অনুরক্ত একজন বন্ধুও পেলাম না? কেন আমার অন্তর স্নেহে পূর্ণ ও সহজ আবেগে বিচলিত হলেও কোন ব্যক্তি-বিশেষকে আমি ভালবাসতে পারলাম না? ভালবাসবার ইচ্ছার আগুনে দগ্ধ হতে হতে বার্ধক্যে উপনীত হয়েও কেন আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোল না?' হার্মিটেজের নির্জনতায় সমস্ত স্মৃতির দ্বার এক এক সময় যখন খুলে যেত, তখন সমস্ত মন হাহাকার করে উঠত তাঁর—একে একে চোখের সামনে এসে দাঁড়াত অতীত জীবনের সঙ্গিনীরা—ম্যাদাম বেসল, মেরিয়ন, ম্যাদাম ওয়ারেন, ডিডেরো, থেরেশা। চোখের সামনে ভেসে উঠত টিউরিনের সেই পোষাকের দোকান যেখানে মিস্টার বেসনের অনুপস্থিতির দিনগুলো ভরে উঠত এক নতুন রোমাঞ্চ আর আনন্দে। ভেসে উঠত এনেসির সেই সম্ভ্রান্ত পল্লীর বিরাট বাড়ীটা, যেখানে তাঁর 'মা' ম্যাডাম ওয়ারেনের শয্যা কতশত রজনীর অস্থিরচিত্ততার সাক্ষ্য বহন করছে। কে জানে তিনি এখন কোথায়, কোথায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রোসি? মনে পড়ত মেরিয়নকে—মেরিয়ন, তাঁর সমস্ত জীবনের জঘন্যতম কৃতঘ্নতার সাক্ষী মেরিয়ন, নির্দোষ সরলা মেরিয়ন—কে জানে সে এখন কোথায়? থেরেসা—সে তো কাছেই আছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন সহবাসে থেরেসা তাঁকে দিয়েছে একে একে পাঁচটি সন্তান। কিন্তু না আর কিছু নয়, রুশো তাকে ভালবাসেনি, যেমন ভালবাসেনি আগের কাউকে, ম্যাডাম বেসল, মেরিয়ন, ডিডেরো, ম্যাডাম ওয়ারেনকে। মন্টমরেনসির নির্জনতায় এমনি সব স্মৃতিতে মন তাঁর মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠত, বাস্তবজীবনের প্রেম-পিপাসার অতৃপ্তিকে কল্পনায় আদর্শায়িত করতে ইচ্ছা হোত। ঠিক এমনি এক অতীত-রমণের মুহূর্তে 'La Nouvelle'-এর নায়ক-নায়িকা 'জুলি' ও 'ক্লেয়ার' ধরা পড়ল রুশোর মানসচক্ষুতে, ধরা পড়ল এক ঐতিহাসিক আবেগ, এক আকাঙ্ক্ষা, এক অতৃপ্তি—যার কোন ভাষা নেই, যা রুশোর সম্পূর্ণ একার, যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা রুশো সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

থেরেশাকে তিনি ভালবাসেননি—কিন্তু থেরেশার সন্তানদের তিনি ভালবেসে-ছিলেন। তারা যে রুশোর সন্তান! একে একে পাঁচটি সন্তান দিয়েছিল থেরেশা, সে জানত এরা ভালবাসার সন্তান নয়, কারণ রুশো কোনদিনই তাকে ভালবাসেনি। কেন ভালবাসবে তাকে রুশো—সে কুরূপা, সে অশিক্ষিতা, সে এক হোটেলের সামান্য ঝি বই ত নয়। থেরেশার মা'ও জানত এ কি ধরনের খেলা! কিন্তু সে কিছু বলত না কারণ মেয়ে তার আশ্রয়, তার নিঃসম্বল জীবনে থেরেশাই তার একমাত্র অবলম্বন। তাই, শুধু রুশো কেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা যখন থেরেশাকে নিয়ে লোফালুফি করত সে চুপ করে থাকত। এরা সবাই টাকা দিত—আর এইটাই ছিল থেরেশার মার সব-চেয়ে বড় প্রয়োজনের সামগ্রী। এই টাকাই তাকে আনন্দে উল্লাসে আর দশজনের মত বাঁচতে দেয়, এনে দেয় নিরুদ্বিগ্ন জীবনের স্বাদ। কিন্তু থেরেশা? সে তো স্বপ্ন দেখেছিল—যে স্বপ্ন সব মেয়েই দেখে, দেখে প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মহিলারা, দেখে ফোৎনেল, কোঁডিয়াক, ডিডেরো প্রভৃতি আরো অসংখ্য সম্ভ্রান্ত মেয়ে যারা রুশোর কাছে নিয়মিত আসে আর স্বপ্ন দেখে—স্বামী, ঘর, সন্তান। রুশো তাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও, দিয়েছিল এক নিশ্চিন্ত জীবনের গৌরব। দিয়েছিল সেবার অধিকার—যা দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে থেরেশা ভোগ করেছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে, এমনকি সেই নির্জন মণ্ট্‌মরেনসির অরণ্যের দিনগুলোতেও। কিন্তু সন্তান? থেরেশার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের কান্না একে একে পাঁচ-বার নিবৃত্তি পেয়েছে, আবার পরমুহূর্তে জেগে উঠেছে দ্বিগুণ ব্যথায়। প্রতিটি সন্তানকে রুশো মাতৃহীন শিশু হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে চেয়েছিলেন তাদের—রুশোর সন্তান সমাজের আর দশ-জনের মত তাঁদের কাছে মানুষ হোক! অনেকের সন্তানই তো আত্মীয়-বান্ধবের কাছে বড় হয়! সংগতির অভাবেও তো অনেকে আপন সন্তানকে অন্যের কাছে দত্তক দেয়! থেরেশার দুঃখ—রুশো তাও দেননি। তার সন্তানেরা মাতৃহীন—এই নির্মম আত্মহননের অসহায় সাক্ষী হয়ে দিনের পর দিন থেরেশা বাস করেছে রুশোর সঙ্গে। কোন প্রতিবাদ করেনি সে কোনদিন।

কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারত ম্যাদাম ওয়ারেন। এনেসি থেকে চারমেৎ, এনেসিতে ছয় আর চারমেতে তিন বছর, এই ন'বছর, কুড়ি থেকে উনত্রিশ বছর অবধি রুশো ছিলেন ম্যাদাম ওয়ারেনের কাছে। ন'বছর আগে যেদিন টিউরিন থেকে কপর্দকহীন ছিলেন, সেই কুড়ি বছরের কিশোর রুশোকে দেখে যে সন্তানহীনা মহিলার হৃদয় কেঁদে উঠেছিল—তিনি ম্যাদাম ওয়ারেন। তিনি আগে ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট—পরে হলেন ক্যাথলিক। ধর্মীয় প্রেরণায় প্রোটেস্ট্যান্ট স্বামীর আশ্রয় থেকে চলে এসেছিলেন। ধর্মপ্রাণা এই সন্ন্যাসিনী নারীর ধর্মপ্রেরণার স্বীকৃতিস্বরূপ স্যাভয়ের ক্যাথলিক রাজা ১৫০০ লিভার বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। এই ধর্মপ্রাণা নারীর মধ্যে রুশো সেদিন তাঁর মাকে দেখতে পেলেন। শৈশবে মা মারা গেলে তাঁকে মানুষ করেছিল এক আত্মীয়া। মাকে স্পষ্ট মনে পড়ে না তাঁর। ম্যাদাম ওয়ারেনকে সহজেই তাই মা বলে মনে হল। রুশোও তাঁর পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে ক্যাথলিক হয়েছিলেন। এনেসিতে যেদিন ম্যাদাম ওয়ানের রুশোকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, সেদিন তাই রুশোর মনে হয়েছিল সবই যেন এক অলিখিত নিয়মের নির্দেশ, এক অভাবিত যোগাযোগ—যা তাঁকে একসঙ্গে আশ্রয়, মা ও একই ধর্ম-বোধের নিশ্চিত অবলম্বন এনে দিয়েছে এনেসির এই কুটিরে। এরপরের দিনগুলো ম্যাদাম ওয়ারেনের জীবনে একেবারে নতুন। নিঃসঙ্গ এনেসির বাড়ীটা এতদিন বাদে এক নতুনরূপ নিয়ে জেগে উঠল, প্রতিটি মুহূর্তের সযত্নতায় জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন ম্যাদাম ওয়ারেন। অস্থিরচিত্ত, অলস ও স্বপ্নাতুর এই নিরাশ্রয় সন্তানের জন্য ম্যাদাম ওয়ারেনের ভাবনার অবধি ছিল না। তাঁকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার, স্বাধীনভাবে দাঁড়াবার সবরকমের চেষ্টাই তিনি অক্লান্তভাবে করতে লাগলেন।

কিন্তু রুশো,—টিউরিনের ম্যাদাম বেসল যে আগুন তাঁর দেহে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তা সহজে নেভবার নয়। হোক না সে 'মা', তবু সে উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী, সন্ন্যাসের উপবাসী দেহে যে নারী থরে থরে সাজিয়েছে তাকে দিনের পর দিন, যে নারীর ডাক রুশো যৌবন থেকেই শুনতে পান, যে ডাক শোনবার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মন হাহাকার করবে। তাই, যেদিন মাদাম ওয়ারেনকে দু হাতে টেনে এনেছিলেন রুশো, সেদিন তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ হয়নি। কিন্তু ক্ষোভ হয়েছিল সেদিন যেদিন ম্যাদাম ওয়ারেনের কর্মচারী গ্রোসিকে নিজের আসনে দেখতে পেয়ে-

ছিলেন তিনি। কিন্তু সে ক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি—গ্রোসীর সঙ্গে এক সহজ বোঝা-পড়ায় নেমে এলেন একদিন। ম্যাদাম ওয়ারেন প্রসন্নসম্মতিতে অনুমোদন করে-ছিলেন এই নতুন ব্যবস্থা। একজন যুবক, একজন কিশোর—যুবক যা দিতে পারে, কিশোর তা পারে না। অভিজ্ঞ চাতুরীতে যুবক তাকে দিতে পারে নব নব মুহূর্তের জন্ম কিন্তু কিশোর তাকে দেয় অন্য কিছু। কিশোর অবুঝ—তার স্বপ্নাতুর মনে নিয়ম-নীতি নেই, সম-অসমবোধ নেই, আছে এক উচ্ছৃংখল জীবনের প্রাথমিক উন্মাদনা, যা তাকে মুগ্ধ করে, নিশ্চিন্ত করে। কিন্তু গ্রোসির অকস্মাৎ মৃত্যু হলে ম্যাদাম ওয়ারেন বুঝতে পারলেন গ্রোসির মূল্য তাঁর কাছে কতটুকু, প্রত্যহের অভ্যস্ততায় দেহের প্রয়োজন তাঁকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। নতুন লোকের গ্রোসির স্থলাভিষিক্ত হতে সময় লাগে না—কারণ গ্রোসি ম্যাদাম ওয়ারেনের প্রয়োজন, বয়স্ক কর্মঠ লোকের নিশ্চিন্ত অভিভাবকত্বের মূল্য তাঁর এই মধ্য-বয়সে একান্তই আজ প্রয়োজন। কিন্তু এবার রুশো দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভে জ্বলতে লাগলেন। ম্যাদাম ওয়ারেন সে ক্ষোভ বুঝেও বুঝলেন না—মর্মাহত হয়ে রুশো একদিন ম্যাদাম ওয়ারেনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে বিদায় নিলেন। চারমেতে পান্থগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে কেউ সেদিন কাঁদেনি, কেউ সামনে এসে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বলেনি—'না যেতে নাহি দিব।' যদি কেউ বলত, রুশোর হারামি'টজের হাহাকার হয়ত' এত তীব্ররূপ ধারণ করত না।

কিন্তু ম্যাদাম বেসল! টিউরিনের সেই পোষাকের দোকানের কর্ত্রী! কতই বা বয়স তখন রুশোর—সতেরো, আঠারো! টিউরিন ছোট শহর—রুশো তখন জীবিকার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পোষাকের দোকানের মালিক কার্যোপলক্ষ বিদেশ যাবার উদ্যোগ করছিলেন। একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল এই সময়। রুশোকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। ঐ সরল, নিষ্পাপ কিশোরকে নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছিল তাঁর। রুশোকে নিযুক্ত করে তিনি বিদেশ গেলেন। ম্যাদাম বেসল পূর্ণযৌবনা—তাঁর নিশ্চিদ্র ব্যবসায়ী স্বামীর জীবনে রুশো যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। তার নিঃসঙ্গ জীবনের নিরানন্দ মুহূর্তগুলোর মধ্যে রুশো যেন নিয়ে এল এক নতুন সুরের ছন্দ। রুশোর জীবনে এই প্রথম নারীর পদক্ষেপ—ম্যাদাম বেসল যেন এক ভর-দুপুরের ঝড়, যা ঐ কিশোরকে এক নতুন উত্তেজনায় পাগল করে তুলল। আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনার প্রথম স্পর্শ রুশোর জীবনে স্থায়ী রেখাপাত করবার আগেই মিঃ বেসল ফিরে এলেন। ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াবার আগেই রুশোর চাকরী গেল। সেদিন ম্যাদাম বেসল কি হারালেন জানা যায়নি—কিন্তু রুশোর জীবনের এক মহত্তর পটভূমিকা সুরু হবার আগেই শেষ হয়ে গেল। 'La Nouvelle' রচনার সময় ম্যাদাম বেসল-এর মুখখানা কতবার রুশোর সামনে ভেসে উঠেছিল কে জানে!

কিন্তু মেরিয়ন? সে তো কোন দোষ করেনি! তবু কেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল তার—কেন সে কর্মচ্যুত হল, কেন সারাজীবনের মত এক কুৎসিত গ্লানির বোঝা তুলে দিলেন রুশো তার মাথায়? টিউরিনের মানুষকে সত্যকথা সেদিন কেউ বলেনি। কিন্তু যেদিন রুশো তাঁর আত্মজীবনী কনফেশান-এ সত্যকথা বললেন, সেদিন মেরিয়ন হয়ত বেঁচে নেই। সমসাময়িক টিউরিনের মানুষ অবিশ্বাসের সঙ্গে পড়েছিল কনফেশানের কথাগুলো। মনে হয়েছিল তাদের—ওসব কথা যেন 'Without any Slavish regard for truth'. মনে হয়েছিল 'He enjoyed making himself out a great sinner, and sometimes exaggerated in this respect'. কিন্তু মেরিয়নই শুধু বলতে পারত সত্যকথা—কিন্তু তখন সে কোথায়?

ম্যাদাম ভার্সেলির বাড়ীতে রুশো তখন চাকর—টিউরিনেরই এক বাড়ী, যে টিউরিনেই রয়েছে ম্যাদাম বেসল। ঐ বাড়ীতেই মেরিয়ন ঝি। মাত্র তিন মাস পরেই মারা গেলেন ম্যাদাম ভার্সেলি। কিছুদিন বাদে রুশোর কাছে পাওয়া গেল মদমামের একগাছা দামী ফিতা—চুরি করেছিলেন তিনি। কিন্তু ধরা পড়তেই রুশো বললেন—ফিতেটা তাঁকে মেরিয়ন দিয়েছে। তিনি মেরিয়নকে ভাল-বাসেন—এ ফিতেটা মেরিয়নের ভালবাসার দান। মেরিয়ন শুনে অবাক—এ অপবাদ তার মৃত্যুর সামিল, তার দীর্ঘ পরিচারিকার জীবনে এ অপবাদ এই প্রথম, তার ভবিষ্যৎ জীবিকার পক্ষে এ এক ভয়ানক গ্লানিকর অপবাদ! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! রুশোর ঐ কথা—এ ফিতে ভালবাসার উপহার। চুরির অপবাদে মেরিয়ন কর্মচ্যুত হল—আর সেই কর্মচ্যুতির মুহূর্তে মেরিয়নের মনে হল সব অন্ধকার, সামনে পেছনে এক অনিশ্চয়তার কালো পর্দা তখন তাকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরেছে। শুধু কাতর-দৃষ্টিতে সে একবার রুশোর দিকে তাকিয়ে-ছিল। রুশো একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পেতেন—কি অনুনয়, কি প্রাণান্ত নীরব আকুতি ছিল ঐ দৃষ্টিতে। রুশো তখন বলে চলেছেন তাঁর ভালবাসার কল্পিত কাহিনী দোষস্খালনের স্বার্থপর প্রচেষ্টায় মেরিয়নের শাস্তি হয়ে গেল। কনফেশানের সেই কথাগুলো মেরিয়ন হয়ত কোনদিন পড়েনি—

"Never was wickedness further from me than at the cruel moment; and when I accused the poor girl, it is contradictory and yet it is true that my affection for her was the cause of what I did. She was present to my mind, and I threw the blame from myself on the first object that presented itself".

হায় মেরিয়ন! তোমার দায়স্খালন যে সারা-জীবনের মত ঐ অশান্ত আত্মাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে রুশো কি তা একদিনও ভেবেছিলেন। যে ভালবাসার অভিনয় তিনি মেরিয়নের সঙ্গে করেছিলেন তা কোনদিন তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠলো না—ভালবাসতে পারলেন না তিনি কাউকে, সুস্থ ভালবাসাও পেলেন না কোনদিন।

রুশোর শেষজীবন ছিল ভয়ঙ্কর। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোয়, রুশো যখন অনুতাপ আর রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন, তখন এক-একবার হয়তো তাঁর মনে হয়েছে মেরিয়নকে, ম্যাদাম বেসল, ওয়ারেন, থেরেশাকে। মনে হয়েছে পাঁচটি নিষ্পাপ শিশুর কচি-কচি হাত আর মুখ—কিন্তু সবাই তখন অনেক দূরে। প্যারিস পার্লামেন্টে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ এমিলি, পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—আদেশ এল, রুশোকে বন্দী কর। দাবী উঠলো প্যারিসের পথে পথে—এমিলির সঙ্গে লেখককেও পুড়িয়ে মারা হক। ১৭৬৭ সালের ১০ই জুন—প্যারিসের প্রকাশ্য রাজপথে এমিলিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হল, বহ্ন্যুৎসবের উল্লাস পথে পথে রুশোকে খ্যাপা কুকুরের মত খুঁজে বেড়াতে লাগল। তিনি পালিয়ে গেলেন সুইজার-ল্যাণ্ডে; সেখানেও আগুনে পোড়ান হচ্ছে তাঁর বই—সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল জেনেভা, বার্ণ, নিউস্যাটল, সর্বত্র চলতে লাগল বহ্ন্যুৎসব। সমস্ত ইউরোপ মেতে উঠলো রুশো-বিদ্বেষে, প্রচণ্ড রোষ খুঁজে বেড়াতে লাগল রুশোকে।

রুশো পালিয়ে গেলেন প্রুসিয়ায়—মেটিয়ার্স নামের ছোট্ট একটা গ্রামে তিনি আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেখানেও কিছুদিন বাদে সুরু হল আন্দোলন—তাঁকে সবাই চিনে ফেলেছে। গীর্জার পাদ্রী থেকে সুরু করে পথেঘাটের সাধারণ মানুষ যেখানেই রুশোকে পায় সেখানেই তাঁকে মারতে লাগল। রুশো পালিয়ে গেলেন বার্ণে। সেখানেও নিষ্কৃতি নেই। পালিয়ে গেলেন ইংল্যণ্ডে। সেখান থেকেও তাঁকে পালাতে হল, নাম ভাঁড়িয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন তিনি। ...সে দুঃসহ বেদনার দিনগুলোতে কেউ তাকে সুখ দেয়নি, শান্তি দেয়নি। সারাজীবনের তাঁর অতৃপ্তি নিয়ে যখন বিদ্রোহী রুশো মৃত্যুর দিন গুণছিলেন তখন ম্যাদাম বেসল, মেরিয়ন, তাঁর 'মা' ম্যাদাম ওয়ারেন, থেরেশা কেউই হয়ত বেঁচে নেই। যদি থাকত তাহলে তারা বুঝতে পারত—কনফেশানের আত্মস্বীকৃতি আর অনুতাপ, দিনের পর দিন এক মহৎ প্রাণের তিল-তিল মৃত্যু। যদি মেরিয়ন অন্ততঃ জানতে পারত—সে ক্ষমা করে যেত ঐ দুঃখী দার্শনিককে, যে এ দুনিয়ায় স্বাধীনচিন্তার আদি পিতা যে অষ্টাদশ শতকে প্রথম শুনিয়েছিল—"man is born Free, and every where he is in chains".

এশিয়ার গল্প

।। তিন ।।

মালয়

জোসই ভি, আয়েলো

চক্র

জমিই কারদোর প্রাণ। জমি ছাড়া তার নিজের আর কোন অস্তিত্ব নেই। জমির প্রয়োজন ছাড়া তার নিজের কোন প্রয়োজনও নেই। গ্রীষ্মকালে জমির প্রয়োজনও অনেক। সূর্যের তাপ যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে সেলাই করতে থাকে মাটিকে। জল শুকিয়ে যায়। জমির প্রাণদায়ী দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়। কাদামাটি পাথরে পরিণত হয়। ঘাস অন্যান্য গাছ-গাছড়া যার শিকড় দূরগামী নয়—মরে যায়। প্রচণ্ড পরিশ্রমের দিন তখন।

ঘামের স্রোত কারদোর শরীর বেয়ে মাটিতে পড়ে। মাটি ভেজে না। মাঠের বাতাস নিঃশব্দ আর ভারী হয়ে ওঠে। কারদোর মাথায় লাল কাপড়ের পটি, হলুদ তাপ লেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার মুখ। 'বোলো'র ঘা মেরে মেরে খড়ের পাঁজা তৈরি করছিল সে। রোদ লেগে ঝকমক করছে 'বোলো'র দুই মুখ। প্রতিটি ঘা ধুলো ওড়ায় আর কারদো এগিয়ে যায় ফসলের এক পাঁজা থেকে অন্য পাঁজায়, জমির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি।

লাঙল আর মোষ লাগালে কাজটা অনেক সহজে হয়। কিন্তু মোষের শরীর তেতে আগুন হয়ে যাবে রোদে, অথচ ঠাণ্ডা করবার মত জল নেই। জল ঢাললে মাটির মত শুষে নেবে সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং বাঁশ বনের ছায়ায় শুয়ে থাকে মোষটা আর কোমর অবধি খড়ের মধ্যে প্রচণ্ড রোদে কাজ করে যায় কারদো।

ধানের শীষগুলো ছোট এ বছর। প্রতি ঋতুতেই ছোট হচ্ছে একটু একটু করে। একটা সময় ছিল যখন শীষগুলো পুরো ওজনের হত। ওপরের পর্দাটা ছিঁড়ে ফেললে হলুদ রং-এর ঘনসন্নিবিষ্ট গোটা-

লম্বায় হাতের তালুর মাঝখানেও পৌঁছয় না আর পর্দাটা ছিঁড়লে গোটার মধ্যে মধ্যে ফাঁক দেখা যায়—বিরলদন্ত মুখের হাসির মত। ডাঁটা থেকে শীষ ছিঁড়ে নিতেই আলো লেগে পোকা-মাকড়গুলো দৌড়ে পালায়। পুরো জমিটা জুড়ে গিজ-গিজ করছে পোকা।

কিন্তু ফসল ফলাবার পদ্ধতি পাল্টানো চলবে না। কারদোর পিতা-পিতামহদের পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে।

নীচু হয়ে, হাতটাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে 'বোলো'র ফলাটা কঠিন মাটির মধ্যে চালিয়ে দেয় কারদো। বোলোর হাতলটা হাতের তালুর ভাঁজের মধ্যে ঘুরে যায়। টেনে তুলে নিয়ে ফের মাটির মধ্যে চালিয়ে দেয় বোলোটা। ধীরে ধীরে মাটির উল্টানো চাঙগড় গাছের গোড়া ঘিরে ফেলে।

দুপুরে আকাশের মধ্যবিন্দুতে সূর্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাজ বন্ধ করে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় কারদো। পথে শুকনো খাল পড়ে একটা। ধানের সময় প্রচুর জল থাকে খালে; জমিতে প্রাণ নিয়ে আসে সেই জল।

জমিগুলোকে দূরে থেকে মনে হয় জলজ সবুজ। ঢালু হয়ে উঠে গিয়ে আরও খণ্ড খণ্ড ধানের জমি। মাঝামাঝি জায়গায় সমতলভূমির শুরু, সেখানে বাড়ির বাদামী ছাত চোখে পড়ে। চাষের জমি ছাড়িয়ে বাঁশের ঝাড়, আর আম বাগান। শহরের সেটাই সীমান্ত--তার বৃত্তরেখা সমুদ্রের দিকে প্রসারিত।

পাহাড়ের কাঁধের ওপর থেকে জমি সমতল হয়ে নেমেছে। কাঠের ধোঁয়া আর গোবরের গন্ধ নিয়ে উপত্যকা এবং সমতল ভূমি থেকে গরম হাওয়ার ঝাপটা উঠে আসে। দূরে থেকে মানুষ বা যে কোন প্রাণীর গন্ধই ভাল, বিশেষতঃ মাঠে আগুন দিয়ে তার শুকনো হাওয়ায় নিশ্বাস নেবার পর।

কারদোর শরীরে চেতনা ফিরে আসে। হাত আর উরুর ভারি ভাব হাল্কা হয়। মুখের ভেতরটা অবশ্য শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, জোরে কামড়ে ধরেছিল বলে ঠোঁট দুটোও ফুলে আছে একটু। এছাড়া আর কোন অস্বস্তি নেই তার শরীরে, শ্রান্তি দূর হয়ে গেছে। একটু পরেই বাঁশ গাছের ছায়ায় এসে পৌঁছলো সে। সেখানেই তার ঘর। ঘরের পেছনে কুঁয়ো একটা।

কুঁয়োর অন্ধকার মুখের গহ্বরে দড়ি বাঁধা একটা বালতি নামিয়ে দিল কারদো। বালতিতে জল ঢুকতেই ভারি হয়ে টান পড়ল দড়িতে। বালতিটা টেনে তুলল কারদো। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে মাথার জটপাকানো চুলের ওপর উপুড় করে দিল। ঝক-ঝকে পর্দার মত গড়িয়ে পড়ল জলটা, মুখ থেকে, বুক থেকে ধুয়ে নিল মাটি। বালতির পর বালতি জল ঢেলে যেতে লাগল কারদো আর জলের সঙ্গে শরীরের গরম যেন ধুয়ে পড়ে যেতে লাগল মাটিতে।

স্নান শেষ করে বাড়ি ঢুকল কারদো। শূন্য বাড়ি। রান্নাঘরে গিয়ে কিছু নুন দেওয়া শুকনো মাছ আর ঠাণ্ডা ভাত নিয়ে খেতে বসল সে। দিনের পর দিন এই একই জিনিষ খেয়ে আসছে কারদো। কিন্তু তবু অসীম আগ্রহের সঙ্গে মুঠো মুঠো ভাত আর মাছ মুখে পুরতে লাগল সে। এতো মিষ্টি ভাত সে আর কখনো খায়নি, এমন সুস্বাদু মাছও না। এর বেশি আর কি চাই তার?

সেই গ্রীষ্মের শেষে কারদো তার অন্য চাহিদাটা অনুধাবন করল।

ফসল রোদে শুকিয়ে ঘরে তোলা হয়ে গেছে। মাটিকে ফালা ফালা করে চিরে উল্টেপাল্টে ফেলবার জন্যে লাঙ্গল তৈরি। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় কালো মেঘ জমে থেকে পালিয়ে যায় সন্ধ্যে লাগতে লাগতে। রাতটা হঠাৎ ঠাণ্ডা আর আকাশটা ঝক-ঝকে পরিষ্কার। মাটির উত্তাপ আর তখন যথেষ্ট নয়। একটি শরীর শরীরের উত্তাপ, তার গভীরতা আর কোমলতার কথা ভাবে কারদো আর বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে। আর তাই ফসল বেচতে তাড়াতাড়ি করে গ্রামে যায়।

খুবই সাধারণ মেয়েটি, লম্বা কালো চুল মাথায়, মাঝখানে সিঁথি, চওড়া মুখ ধুতনীর কাছে সরু হয়ে এসেছে ক্রমশ। মেয়েটির নাক চ্যাপটা, ভ্রূ মোটা আর তার স্নিগ্ধ চোখের রং বাদামী। উঠোনে ঘুরে ঘুরে মুরগীর বাচ্চাগুলোকে খাবার দিচ্ছিল মেয়েটি। তার কঠিন চওড়া নিতম্বে স্কার্টটা ভরাট হয়ে আছে। কারদো চুপচাপ তাকিয়ে ছিল তার দিকে। নজরে পড়তেই লজ্জা পেল মেয়েটি, কেমন অস্বস্তিবোধ হল তার আর তাকে ঢাকতে গিয়ে হাসল একটু। অমনি টোল পড়ল গালে। কেউ কথা বলল না। কি বলবে কারদো, মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না সে। এই হল তাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের ইতিহাস।

কারদো জানত না যে মেয়েটি অনেক কিছুই জানে তার সম্বন্ধে। পাড়ার লোকের কাছে শুনেছে যে কারদোর বাবা-মা নেই আর প্রায় সাড়ে সাত একর জমির মালিক সে। তার আগের বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই কারদোর কথা ভাবতে শুরু করেছে সে। কারদোকে অমন-ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার মনে হল এবার তার পালা।

জমিতে গাছ পুঁতবার সময় তখনো আসেনি। মেয়েটির বাবার অনুমতি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত একসঙ্গে বাস করতে শুরু করল তারা। গীর্জায় বিয়ে দেবার জন্যে কোন পাদ্রী আসেনি। পাহাড়ে কোন পাদ্রী থাকে না, শহরও অনেক দূরে। তাছাড়া জমিতে বীজ দেবার সময় হয়েছে তখন।

প্রথম রাতে কারদো তার ঘরের শান্ত অন্ধকারে নাম ধরে ডাকল মেয়েটিকে। সেদিনই সে প্রথম জানল যে নারী শুধুই উত্তাপ নয়, শুধুই গভীরতা বা কোমলতা নয়, ধেনো মদের মত প্রবল নেশাও।

ধানের কাজ সবে তখন শুরু হয়েছে, কারদো লুসিং-কে মাঠে নিয়ে গিয়ে ধানের চারা তৈরির ছোট জমি দেখাল। চারদিকে কলার খোল আর মাটি দিয়ে তৈরি দেয়াল, মধ্যে জল। চারা ধানের সবুজ ডগা ইতিমধ্যেই জল ছাড়িয়ে উঠেছে। লুসিং দুপায়ের ওপর বসে পড়ে ধানগাছ থেকে পোকা ছাড়াতে শুরু করে; তার দুই আঙ্গুলের চাপে তাদের নরম শরীর থেকে সবুজ রস বেরোয়।

'এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে', দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে ভাবল লুসিং, কিন্তু কারদোর মুখে হাসি দেখে মন শান্ত হল তার। কারদো এই সব কাজ একা করেছে ভেবে বিস্মিত হল লুসিং। যে ধানের চারা এখন তার হাতের মধ্যে কারদো তার বীজ বুনেছিল, তারপর দিনের পর দিন পাহাড়ের কুঁয়ো থেকে বালতি বালতি জল এনে ঢেলেছে সে।

'শীগগিরই বৃষ্টি হবে,' আলাপ জমাবার জন্যে বলল কারদো। দীর্ঘকাল একা থেকে এখন একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে কেমন অদ্ভুত লাগছিল তার।

'বাঁধ বাঁধাবার কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব,' বলল লুসিং।

'এবছর ফসল ভাল হবে,' কারদো বলল। সে নিজে নয়, অন্য কেউ তার কথা জবাব দিচ্ছে—এর মধ্যে কেমন যেন একটা সুখকর বিলাসিতা আছে মনে হল তার। খানিকটা পরে অন্য একটা জমিতে গেল সে। এখনো পরিষ্কার করা হয়নি জমিটা।

দুপুরবেলা লুসিং খাবার নিয়ে এল মাঠে। এও এক বিলাসিতা তার পক্ষে। বাড়ি গিয়ে আর খেতে হয় না তাকে। বাঁধের গা থেকে জঙ্গল সাফ করাও এখন আশ্চর্য সহজ মনে হচ্ছে তার। বিকেলটাও যেন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় এবং অন্ধকার নামতে শুরু করে। কাজ শেষ করে পিঠটান করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মাঠ ভরে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকতে শুরু করে দেয়।

দুদিন পরে সন্ধ্যার আকাশে মেঘ জমে। পুব দিক থেকে গরম হাওয়া আসে আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি নামে। কারদোর গালে পড়ে অশ্রুবিন্দুর মত দেখায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে, বিন্দু বিন্দু হিমের মত হাতে এসে পড়ে তার। দূরের পাহাড়ে বাজ গর গর করে এবং বৃষ্টি আরও ঘন হয়ে নামে। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে কারদো। গ্রীষ্মের শুকনো কঠিন মাটিকে নরম করতে আরও একদিনের বৃষ্টি দরকার। তারপর সে জমিতে লাঙল দেবে। কি কি করতে হবে পরিষ্কার জানে সে।

বৃষ্টি নিয়ে পাহাড় থেকে হাওয়া নেমে আসছে। ঘরের মধ্যে একা বসে বসে পাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছিল লুসিং। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মাটির তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে। ছাতের ধার থেকে জলের ধারা সোজা মাটিতে গিয়ে পড়ছে। লুসিং তাকিয়ে ছিল সেদিকে। মনটা খুশী তার। কারদোকে আর কুয়ো থেকে জল টেনে আনতে হবে না। এবার আকাশ জল বয়ে এনে দিচ্ছে তাকে। কিন্তু সেদিন ধানের চারা ছুঁয়ে তার মনে যে ভয় জেগেছিল হঠাৎ আবার ফিরে এল সেই ভয়। জল আর মাটির গন্ধ নাকে যেতেই তার মনে পড়ল কী প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে জমিতে বাঁধ-বাঁধতে। কারদোকে সে কাজে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি পারবে কি?

কারদো খুশীর হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরল। বৃষ্টি হয়ে মাটি নরম হয়েছে বলে খুব খুশী সে। কেরোসিন বাতির হলুদ শিখাটা কাঁপছে খোলা জানালায়। সেটুকু পর্যন্ত ভাল লাগল তার।

'লুসিং!' ডাকল কারদো।

'কি বলছ।' রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল লুসিং।

ভেজা জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে কারদো বলল, 'কাল থেকেই আমরা বাঁধের কাজ শুরু করে দেব, কি বল?'

'খাবার দিয়েছি,' বলল লুসিং।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কারদো। বাঁধের কাজ কি এতই নগণ্য ওর কাছে? এই প্রথম তার মনে হল, লুসিংকে তার জীবনের অনেক কিছুতেই ডাকা যাবে না। এই বোধ, বৃষ্টির মত, যেন আর একটি

নতুন ঋতুর সূচনা করল তার মনে। একটু পরে বলল, 'কাল তুমি বাড়িতেই থেকো। মাঠে না গিয়ে বাড়িতে থাকাই বোধহয় ভাল হবে তোমার পক্ষে।'

কারদোর গলা যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল একটু। লুসিং লক্ষ্য করল সেটা, মনে হল যেন কিছু একটা গন্ডগোল করে ফেলেছে কোথাও। রান্নাঘর থেকে উঠে এসে নিজের শরীরটাকে চেপে ধরল কারদোর শরীরের সঙ্গে, তার শরীরের উত্তাপ মিলে গেল কারদোর শরীরের উত্তাপের সঙ্গে।

—'রাগ করেছ?' জিজ্ঞেস করল লুসিং।

—'না, রাগ করব কেন। আমি চাই না তুমি মাঠে কাজ করে অকালে বুড়ো হয়ে যাবে, পিঠ বেঁকে গিয়ে নুয়ে পড়বে।'

—'তোমার যা কিছু সব ত আমারও। আমিও তোমার সঙ্গে মাঠে যাব।' কারদোর মুখটা টেনে এনে তার গালের সঙ্গে নিজের গাল চেপে ধরল লুসিং, 'চলো, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

লুসিং-এর মসৃণ হাত এবং কাঁধের ওপর আলো খেলা করছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল কারদো। সুখের একটা ঢেউ উঠল তার মধ্যে। এই নতুন ধরনের জীবনযাত্রার সুখকর অনুভূতি যেন মুখের কথা কেড়ে নিল তার। খেতে বসে সারাক্ষণ চুপ করে থাকল সে।

লুসিং-এরও ভালো লাগল নীরবতাটুকু। মনের সব দুশ্চিন্তাগুলিকে দূর করে দিল সে। ভাবল, প্রতিটি সন্ধ্যাই এরকম হবে, এমনি মুখোমুখী বসে থাকবে তারা, খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কিন্তু নীরবে। খাওয়া শেষ হলে মাদুরের ওপর শুয়ে ঘুমুল তারা।

বাইরে বৃষ্টির বেগ দ্বিগুণ হল, সারা রাত্রি চাল থেকে গ্রীষ্মের শুকনো ধুলো ধুয়ে নামিয়ে দিল, মাটি নরম কাদা হয়ে গেল। বাঁশের মেঝের ফাঁক দিয়ে হাওয়ার ঝাপটা এলো মাটির গন্ধ নিয়ে। আবার নতুন হয়েছে মাটি, আর এক ঋতুর ফসল ফলাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। মাঠে জল জমে শক্ত জমাট মাটির ঢেলাগুলো গলে যাচ্ছে, হাঁ-করা শ্রান্ত ফাটলগুলো ভরে উঠছে কানায় কানায়। ভোর হতেই ঘাসের ঘুমন্ত বীজগুলো জেগে উঠে পাতা ছড়াতে শুরু করবে।

ভোরে খালি গায়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় কারদো, দেখে, হলুদ রং-এর একটা আলোর রেখা মাটি আর আকাশের অন্তর্বর্তী অন্ধকারকে হালকা করে দিল। লুসিং আর সে প্রাতঃরাশে বসবার আগে থেকেই মুরগীগুলো ডাকতে শুরু করেছে। নিঃশব্দে খেল তারা এবং নিঃশব্দেই মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এই প্রথম স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মাঠে কাজ করছে তারা। উঁচু করে আল বাঁধতে হবে মাঠে; পুরনো আল যেখানে ভেঙে পড়েছে সেখানে নতুন আল তুলতে হবে। তা না হলে ধানের গাছ বাড়বার জন্য জল ধরে রাখা যাবে না জমিতে। কোদাল দিয়ে চেঁচে চটচটে মাটির ওপরকার একটা পরত তুলে ফেলে কারদো। কোদালের মুখটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শঙ্খের মত মসৃণ হয়ে এসেছে। কারদো কোদাল দিয়ে মাটি কেটে দিচ্ছে আর লুসিং ধনুকের মত বেঁকে বসে বাঁধের ফাটলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছে সেই মাটি।

সূর্য ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে আর রোদ্দুরের তাপ বাড়ছে সেই সঙ্গে। লুসিং-এর হাতে ছিটকে লাগা কাদা ক্রমশঃ শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। উপুড় হয়ে বসে মাটি টেনে মাটি গুঁজে দিতে গিয়ে তার শরীরের সবটুকু কমনীয়তা নিংড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে এবং তার পিঠের ওপরকার কাপড় কালো হয়ে উঠছে।

শ্রান্তিতে লুসিং-এর শরীর কাঁপছে দেখে কারদো বলল, 'এসব মেয়েমানুষের কাজ নয়; দাও আমিই করছি।' দীর্ঘ নৈঃশব্দের পরে তার কথাগুলো কেমন কর্কশ শোনাল।

লুসিং রাজী হল না। তার দৃষ্টি মাটির ওপর স্থির হয়ে আছে। মুখে একটু হাসি টেনে কাজ করতে লাগল সে। কি বলবে ভেবে পেল না কারদো। পরের বাঁধটা বাঁধবার জন্যে এগিয়ে গেল সে। লুসিংও চলল তার সঙ্গে; কারদোর ছায়ার পাশে লুসিং-এর ছায়া পড়ল।

সন্ধ্যেবেলা কাজ শেষ করে বাড়ির পথ ধরল তারা। লুসিং-এর মনে হল তার শরীরের ভার বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। শুকনো মাটি খসে খসে পড়ছে গা থেকে। সারাদিন দুজন মিলে কি কাজ করেছে তাই ভাবছিল লুসিং। কারদোর সমান কাজ করেছে সে, ভার হয়ে থাকেনি তার জীবনে—ভাবল লুসিং এবং ভেবে শ্রান্তি দূর হয়ে খুব আরাম বোধ হল তার।

তৃতীয় দিন বৃষ্টি হবার পর পুরো কাজটা কারদোর ঘাড়েই পড়ল। তিনবার করে লাঙল দিতে হবে জমিতে এবং প্রতিবার লাঙল দেওয়া হলে একবার করে মই দিয়ে মাটি গুঁড়ো করে দিতে হবে।

প্রথম পূবে, তারপর দক্ষিণে, তারপর ফের পূবে ঘুরে যায় বাঁশের দাঁতওয়ালা মইটা। ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় শুকনো মাটির দলাগুলো, শেকড়শুদ্ধ উপড়ে আসে যত বাজে গাছ-গাছড়া আর জমির ওপরটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পুরনো মাটির গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে ওঠে আবার। পাখীগুলো প্রাণভরে পোকামাকড় খায়।

বর্ষার প্রচন্ড বৃষ্টি নামবার আগেই ধানের চারা পুঁততে ফেলতে হবে জমিতে। জমির চারদিকের নালায় এখন প্রচুর জল।

এক' দিন আকণ্ঠ জল শ্বষে নিয়েছে মাটি, এখন আর পারছে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি চাষের কাজই করছে কারদো। মাটির বড় বড় চাঙড়গ্বলোকে গ্বঁড়িয়ে ধ্বলো করে ফেলতে হবে।

সবচেয়ে ওপরের জমির জলটা ছেড়ে দিল কারদো। অসংখ্য ব্দব্দ তুলে লাফিয়ে পড়ল জল, এক খণ্ড র্পোর পাতের মত ছড়িয়ে গিয়ে তার পরের চৌকো জমিটাকে ভরে দিল, গড়িয়ে নেমে গেল তার পরের জমিতে এবং সেখান থেকে আবার তার পরের জমিতে। যেন বেগে ছ্বটতে ছ্বটতে নামছে ঢাল্ব কাদার ওপর দিয়ে, ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে দ্ব পাশে এবং জমিগ্বলো ধীরে ধীরে এক-একটি হ্রদে পরিণত হচ্ছে।

শেষ বারের মত জমিতে মই দিল কারদো। জমি জলে ভরে আছে বলে কারদো আর তার মোষের পা কাদা থেকে উঠে আসবার সময় কোন শব্দ করছে না। মোষটা এগিয়ে যাচ্ছে আর কাদা ছিটিয়ে দিচ্ছে কারদোর গায়ে। শ্বর্তে গরম থাকে জলটা, তারপর ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকে। জলে ভিজে কুঁচকে যেতে থাকে কারদোর গায়ের চামড়া। যা দ্ব-একটা আগাছা ছিল মইয়ের টানে তাও উঠে আসে। জমি তৈরি এবার।

ভোরের আবছা আলোয় কারদো আর ল্বসিং-এর ছায়া পড়ে জমিতে। স্বর্য উঠে প্বরো পাহাড়টা যখন দেখা যায় তখন তার দ্বজন যে জমিতে ধানের চারা তৈরী করেছে

সেখানে এসে পেঁছয়। আর সেই ধূসর স্তব্ধতার মধ্যে শেষ ঝিঁঝি পোকাটি বিগত গ্রীষ্মের গান গায়।

খালি পায়ে ছুঁলে জমির জল প্রথমটা খুব ঠান্ডা। গায়ের শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল লুসিং, শরীরটা কেঁপে উঠল একবার তারপর নেমে পড়ল বাঁধ থেকে।

কারদো সোজা নেমে পড়ল জলের মধ্যে। মাটি নরম এবং অসমতল। সকাল-বিকেল-সন্ধে এই মাটির ওপর হেঁটে বেড়িয়েছে কারদো। এবার সেখানে প্রাণ সৃষ্টির পালা। সুতরাং তার আর ধৈর্য নেই।

'তাড়াতাড়ি কর', অধৈর্য হয়ে লুসিংকে বলল কারদো।

লুসিং মাথা নেড়ে হাঁটু ডোবা জলের মধ্য দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

'একটা ঝুড়ি ছুঁড়ে দাও আমাকে' ধানের চারা যেখানে তৈরি করা হয়েছে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল কারদো। ছুঁড়ে দেওয়া তলা-চ্যাপ্টা ঝুড়িটা লুফে নিয়ে জলের ওপর বসিয়ে দিল কারদো। ধীরে ধীরে তার আঙুলে এক এক গোছা চারাকে আলাদা করল, নেমে গেল কাদার মধ্যে এবং এক এক মুঠো চারা গাছ তুলে এনে ঝুড়ি ভরতে থাকল।

তার উল্টো দিকেই লুসিং চারা তুলছে তার ঝুড়িতে।

'ডগাগুলো কেটে দিয়ে ভালই করেছিলে', লুসিংকে বলল কারদো।

'তুমি বলেছিলে বলেই ত কেটেছিলাম। সেলাই পোকা ছিল যে', উত্তর দিল লুসিং।

'হ্যাঁ, তা ছিল; তাছাড়া ছিল আগাছা আর পাখী। কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে ফসল ভাল হবে এ বছর।'

'আমারও তাই বিশ্বাস', বলল লুসিং, 'দু দিন আগে সকালবেলা শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল আমার।'

'এতো তাড়াতাড়ি?' বলল কারদো, কিন্তু উত্তেজনায় মুখ লাল হয়ে উঠল তার।

লুসিং তার পেটে চাপ দিল, 'আমি বুঝতে পেরেছিলাম।'

'তাহলে আমাদের সুদিন আসছে। জমিতে ভাল ফসল হবে।'

'চলো যাই এবার। অনেক চারা তোলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, প্রচুর। দাঁড়াও আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

'দরকার নেই, আমি পারব', বলল লুসিং, তারপর পাশের ধান ক্ষেতের দিকে পা বাড়াল।

'একটি সন্তান কিছু যথেষ্ট নয় আমার পক্ষে', লুসিং-এর কাছে যেতে যেতে ভাবল কারদো। মাঠের কাজের জন্য আর এক জোড়া হাত ত খুবই দরকার। তার বাবার কথা মনে পড়ল তার। বাবা বলতেন, যত বেশি লোক কাজ করবে জমিতে তত বেশি উর্বর হবে জমি। ধানের প্রথম চারাটা পুঁতবার সময় প্রায় তার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল কারদো, 'অমনি ফলবতী হয়ো।'

লুসিং নিঃশব্দে কাজ করছে তার পাশে। তার হাত ঝুড়ি থেকে ধানের চারা তুলে নিচ্ছে, ডুব দিচ্ছে জলে, জল থেকে কাদায় এবং ফের কাদা থেকে উঠে আসছে ঝুড়িতে—গতি এত দ্রুত যে হাত প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। দেখতে না দেখতে প্রথম জমিটা ভরে উঠল ধানের চারার লম্বা-লম্বা লাইনে।

ভোরের রোদ পিঠে নিয়ে উপুড় হয়ে পাশাপাশি কাজ করে তারা। ধীরে-ধীরে জলের চৌকো আয়নাগুলো ছিটে ছিটে সবুজে ছেয়ে যায়। দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করে তখন মাঠের নৈঃশব্দ্য তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বিকেলে তারা আবার কাজে নামে। রোদ তখন সবচেয়ে তীব্র। গায়ের শালটা শুকনো কাদায় শক্ত হয়ে আটকে থাকে তার চুলের সংগে, স্কার্টটা ভেসে-ভেসে যেতে থাকে জলের ওপর দিয়ে। হাত আর তেমন দ্রুত চলছে না, জলে নরম হয়ে গেছে, মাটি ভেদ করতে গিয়ে আঙুলের ডগার নরম চামড়া উঠে আসতে শুরু করেছে। গলা আর মুখের ভেতরটা শুকনো। কুঁজোর জল অনেকক্ষণ আগে নিঃশেষিত। এই কাদাভরা জমিতে গলা ভেজাবার আর কিছু নেইও।

কারদো কিন্তু এ সব লক্ষ্য করছে না; লুসিং শ্রান্ত কি তার তেষ্টা পেয়েছে খেয়ালই নেই তার। লুসিং একেবারে মুছে গেছে তার মন থেকে, এই নির্দয় জমি তার কারণ। জমিতে দাঁড়িয়ে বর্তমান ছাড়া আর সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। লুসিং কাজ করছিল খানিকটা দূরে। কাজ বন্ধ করে বাঁধের ওপর গিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে। চোখ খুলে লুসিং-এর মনে হল বোধহয় বহুক্ষণ কেটে গেছে এর মধ্যে। সূর্যের দিকে তাকাতে ভুল ভাঙল, সামান্যই এগিয়েছে সূর্য। লুসিং-এর মনে হল, তার শরীরটা যেন মাটির দলা একটা। অনেক কষ্টে সমস্ত শক্তি জড়ো করে উঠে দাঁড়াল সে।

'আমি যাচ্ছি, কারদো। রান্না করতে হবে।' বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল লুসিং।

খুব রাগ হল কারদোর।

'মেয়েমানুষ ত!' নিজেই নিজেকে বলল কারদো, 'আমি হলে এমন করে কাজ ফেলে চলে যেতে পারতাম না।'

চারা পুঁতবার পক্ষে উপযুক্ত দিনের সংখ্যা খুব কম। ঐ ক' দিনের মধ্যেই পুঁতে শেষ করতে হবে সব। আগে পুঁতলে পোকার ভয়; দেরী করে পুঁতলে বর্ষার ভয়। সুতরাং যতক্ষণ না মেঘের মাথার ওপর চাঁদ উঠে এলো ততক্ষণ পর্যন্ত একটানা কাজ করল সে।

কারদো বাড়ি ফিরে দেখল লুসিং মাদুরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে, মুখের ওপর একখানা হাত। রান্নাঘরে ভাত পুড়ে গেছে, মেঝের ওপর টুকরো টুকরো মাটি ছড়ান। কারদোর মনে হল লুসিং-এর সংগে কতকাল আগে বিয়ে হয়েছে তার—যেন যতকাল ধরে জমি চাষ করছে মানুষ ততকাল! কিন্তু লুসিং-এর ওপর রাগও হল কারদোর। ঠেলে তুলতে গিয়ে মনে পড়ল লুসিং-এর পেটের বাচ্চাটার কথা আর করুণায় ভরে গেল তার মন। নিজের কম্বল দিয়ে লুসিংকে ঢেকে দিল সে। পর দিন ভোরে পোড়া ভাতের কথা উল্লেখও করল না কারদো। তারপর থেকে একটানা অনেকক্ষণ জমিতে কাজ করা অভ্যেস হয়ে গেল লুসিং-এর। প্রথম দিনের মত আর সে ক্লান্ত হয় নি।

কিছুদিন পরে বর্ষা নামে। ধানের চারা পোঁতার সময়ও শেষ হয় আর সেই সংগে খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার আনন্দও ফুরিয়ে যায়। পাহাড় থেকে ভিজে ঠান্ডা হাওয়া নামে। ধান গাছের সারির ফাঁকে-ফাঁকে আগাছা জন্মায়। কারদো টেনে তোলে রোজ, কিন্তু তুললে কি হবে আবার যেন তক্ষুনি গজিয়ে ওঠে। যেন বৃষ্টি এসে বুনে দিয়ে যায় আগাছাগুলোকে।

মাঠে প্রথমটা ঠান্ডা লাগে, তারপর ঘাম ঝরতে শুরু করে। ধানের চারার ওপর যখন উপুড় হয়ে কাজ করে কারদো তার শরীরের চার দিকে যেন একটা বাষ্পের মন্ডল তৈরি হয়। ভ্রূর মধ্য দিয়ে গড়িয়ে নেমে তার চোখের ভেতর চলে যায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম। কিছু দেখতে পায় না চোখে আর কাদামাখা হাত দিয়ে মুখ কচলায়।

ঘাসগুলো যখন ছোট তখন টানলেই উঠে আসে। কিন্তু কিছুদিন গেলেই ঘাসের ধারাল পাতায় লেগে জলে-ভেজা হাতের চামড়া চিরে দু ফাঁক হয়ে যায়। চুলের মত সরু কাঁটা আঙুলে গেঁথে গিয়ে আঙুল চুলকোয়। সন্ধেবেলা লুসিং সেই সব ক্ষতমুখে তেল মালিশ করে করে দিলে বেশ আরাম লাগে কারদোর। কিন্তু পরের দিন কাজ করতে গিয়ে বৃষ্টি আর আগাছা থেকে আবার নতুন রকমের কষ্ট দেখা দেয়।

প্রথমটা রেগে গিয়ে বৃষ্টিকে অভিশাপ দিত কারদো। সব কিছু ভেজা আর পচা। যে সব জামা-কাপড় পরে সে মাঠে যেত সেগুলো পচে গলে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এমন কি তার বাড়ীর বাঁশের খুঁটি থেকে ব্যাঙের ছাতা গজাত। দিনের পর দিন বৃষ্টি হয়ে যখন মাঠ ভেসে যাবার আশঙ্কা দেখা দিত এবং কারদোর এত পরিশ্রমের ফসল নষ্ট হবার উপক্রম হত তখন কারদো বৃষ্টিকে অভিশাপ না দিয়ে পারত না।

ধীরে ধীরে ধান গাছগুলো ঘন সবুজ ডাঁটায় ভরে ওঠে। আবার আশার আলো দেখা দেয় কারদোর মনে। চারাগুলো এখন মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর অত ঘনঘন আগাছা পরিষ্কার করতে হয় না, তাছাড়া ধান গাছগুলো এখন আগাছার তুলনায় অনেক বেশি লম্বাও বটে। ধীরে ধীরে মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়, পাহাড়ের ভিজে হাওয়া শুকিয়ে আসে। একদিন হঠাৎ পূব দিক থেকে আলো পড়ে আকাশটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বৃষ্টি আর নামে না। পরদিন

ভোরের রোদে ঝকমক করতে থাকে হ্রদগুলো। আরো কিছুকাল পরে হাওয়া এলে সবুজের ঢেউ দুলে ওঠে মাঠময়।

লুসিং-এর শরীরে বিয়ের প্রথম ফসল আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তবু ঘরের কাজ শেষ হলেই মাঠে গিয়ে কারদোর সঙ্গে কাজে হাত লাগায় সে, রোদের সঙ্গে সঙ্গে যে সব নতুন পোকা জন্মেছে মাঠে মারে সেগুলোকে। পেটের সন্তান নিয়েও কাজ করতে কোন অসুবিধে হয় না তার। এখন মই, লাঙল, কাস্তে আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি সারাবার জন্য অনেক সময় তাদের হাতে।

শরীরে রোদ টেনে নিয়ে গাছগুলো সাদা ফুল ফোটায়। ফুলের গুচ্ছগুলো যখন ফসলের সবুজ দানায় পরিণত হয় তখন জমির জল বের করে দেওয়া হয়। ধীরে-ধীরে উপুড়করা নৌকোর মত ধানের খোসাগুলো দুধে ভরে ওঠে। পাকবার সময় ধানের গোটাগুলো বুনো ফুল আর গ্রীষ্মের মাটির গন্ধ ছড়ায়। তারপর একদিন হলুদ হয়ে যায় সমস্ত মাঠ। একটা নাম-না-জানা গান কারদোর রক্তের মধ্যে খেলা করে, দ্রুত করে তোলে তার রক্তের গতিকে এবং ফের বেঁচে থাকার আনন্দ ফিরে পায় কারদো।

ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি রোদে ঝলসাতে থাকে তাদের দুটো কাস্তে। পড়ে যাবার আগেই ফলার বাঁকা মুখে ধরা পড়ে যায় গাছগুলো। হাত দুটোকে ফাঁসের মত করে ছুঁড়ে দিয়ে ধান গাছের ডাঁটাগুলোকে গোছা-গোছা করে বেঁধে ফেলে তারা, তারপরে ফেলে রাখে মাঠে। খড়ের গাদা ছাড়া মাঠে আর কিছু পড়ে থাকে না।

মাড়াইয়ের জন্য মোষের গাড়ি করে কাটা ধান আসে। কারদো কয়েক বান্ডিল ধানশিষ নিয়ে বন-বন করে ঘোরায় মাথার ওপর। খড় আর ধুলো ওড়ে এবং ধানের গোটাগুলো শিষ থেকে খসে পড়ে। একটা কুলো পেতে সেগুলো ধরে নেয় লুসিং, কুলোর নিচে টোকা দিয়ে ধানগুলোকে ছুঁড়ে দেয় হাওয়ায়। ধানগুলো ফের এসে পড়ে কুলোর ওপর আর হাওয়ায় উড়ে যায় তার সঙ্গের ধুলো জঞ্জাল। মাড়াই করা ধান গাছগুলোকে মাটিতে ফেলে আবার পেষে পা দিয়ে। দিন ভোর খড়ের ওপর হেঁটে বেড়ায় তারা দুজন। যতক্ষণ না শেষ ধানটি শুকিয়ে ঘরে তোলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধুলো, মাটি, মানুষ, নারী—সব মিলে-মিশে ফসল তোলার একটি ঋতুর পরিমণ্ডল।

রাত্রে ফসল ঘরে তুলে রেখে স্নান করতে যায় তারা দুজন, সূক্ষ্ম ধুলো আর ঘামের চাপবাঁধা ময়লা ধুয়ে ফেলে গা থেকে। আলো পড়ে ফ্যাকাশে দেখায় লুসিং-এর মুখ। তার পেটের অস্বাভাবিক স্ফীতির দিকে তাকিয়ে কারদোর মনে পড়ে যে লুসিং-এর সন্তান ধারণের এটাই শেষ মাস।

বাড়ি ফিরে কারদো বলল, 'বাচ্চা হবার সময় কাউকে এসে তোমাকে সাহায্য করতে হবে।'

মাথা নাড়ল লুসিং, 'দরকার নেই, আমি নিজেই পারব। কি করতে হয় আমি জানি। আমি অনেকবার দেখেছি বাচ্চা হতে।'

'তোমার মা বা কোন কেউ যদি—'

'মা বুড়ো হয়েছেন, পাহাড় ভাঙার শক্তি নেই তাঁর। বোনেদের ছেলেমেয়ে আছে, জমি তদারকের কাজ আছে। তাছাড়া তুমিই ত রয়েছ, ওদের দরকার কি।'

'আমি কি জানি এ সবের?' প্রতিবাদ করল কারদো, 'আমি শুধু শুনেছি যে প্রথম বাচ্চাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়।'

'কিছু চিন্তা কর না। আমি বলে দেব তোমাকে কি করতে হবে।'

'...আমি কি জানি এ সবের?'

'যেমন খুশি তোমার', বলল কারদো, কিন্তু লুসিংকে সে সময় সাহায্য করবার ক্ষমতা তার কতটুকু আছে সে সম্বন্ধে মনে তার সন্দেহ থেকেই গেল।

'এখনো ত অনেক দেরী, ভাবছ কেন?' বলল লুসিং।

কিন্তু তবু ভাবনা থেকেই গেল। কেননা এ ধরনের সমস্যা আগে কখনো আসি নি তার জীবনে। এটা জমির সমস্যা নয় যে সে বুঝবে, একেবারেই নতুন।

আবার ধান কেটে মাটিতে জড়ো করে কারদো। বিশাল দিগন্ত, মাঠ আর দূরের পাহাড় কাঁপতে থাকে রোদের প্রচণ্ড তাপে। কারদোর পিঠের জামা আর পেশি পুড়তে থাকে রোদে, গরম বাষ্প বেরুতে থাকে লম্বা হাতাওয়ালা জামার ভেতর থেকে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। তপ্ত মাটির গন্ধ জামার। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা নির্জনতার কথা মনে করিয়ে দেয় গন্ধটা। ক্লান্ত কারদো কাজ বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটু। হাল্কা সবুজ রঙ-এর খড়গুলি হলুদ হয়ে আসা পাতার গায়ে রক্তাভ রেখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারবন্দী হয়ে। তাছাড়া রয়েছে পাকা ধানের গাছ, কাটা হয়নি তখনো। কাটবে কারদো।

লুসিং মাঠে আসে নি, কেননা কালই ভূমিষ্ঠ হবে তার সন্তান। সুতরাং কারদো বিশ্রাম নেবার কথা ভাবতেও পারে না, সামনের দিকে নুয়ে-নুয়ে একটানা কাজ করতে থাকে আর দেখতে-দেখতে তার ছন্দের মধ্যে হারিয়ে ফেলে নিজেকে; লাঙলে চেরা মাটির সঙ্গে, তার ভাঁজের সঙ্গে, গরম হলুদ ধুলো এবং রোদের কম্প্র তাপের সঙ্গে যেন একাঙ্গ হয়ে যায় সে। চারা গাছগুলো ভগায় তাপ লেগে বিশাল নৈঃশব্দের মধ্যে কাঁপতে থাকে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

সৈনিক লেখকের চোখে ভারত

(২)

এর পর টেইলর লিখলেন 'টিপু সুলতান'। প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশের অতি অল্পকালের মধ্যেই এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। টেইলর ছিলেন সচেতন সাহিত্য-শিল্পী। তাঁর প্রকাশক একদিন তাঁকে একটা পরিকল্পনা দিলেন, টেইলরের শিল্প-সচেতন মনে সেই পরিকল্পনাটি সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। এই কাহিনীর ঘটনাকাল ১৭৮২ খৃীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৯, অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধের কাল। আঙ্গিকের দিক থেকে 'টিপু সুলতান' স্যার ওয়ালটার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনুকরণ। যদিও রচনার মধ্যে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা নেই, তথাপি টেইলরের নিখুঁত চিত্রায়ণের ফলে 'টিপু সুলতান' একটা সজীব চরিত্রে রূপায়িত হয়েছেন। এই ব্যাপারে তিনি অসামান্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে এই উপন্যাসটিও প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

প্রাক্-অবসরকালীন ছুটির মধ্যে লিখিত এই দুটি গ্রন্থ সাফল্যলাভ করায় মেডোস টেইলরের শুধু যে আর্থিক লাভ হল তা নয়, ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য বিভাগে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভ হল। ভারতবর্ষে ফেরার পর, সিপাহী বিদ্রোহের আগে এবং পরের সরকারী কর্মের বিরামবিহীন চাপের ফলে টেইলরের পক্ষে সাহিত্য-সাধনা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৮৬০ খৃীষ্টাব্দের আগে মেডোস টেইলর ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় কল্পনামূলক কাহিনী রচনা করতে পারেন নি।

১৮৬৩ খৃীষ্টাব্দে মেডোস টেইলর লিখলেন "তারা"। এই গ্রন্থটি তিনটি বিভিন্ন খণ্ডে রচিত ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রথম পর্ব। লেখক মেডোস টেইলরের পক্ষে একটি বিশেষ অনুকূল অবস্থা হল শুধু ভারতীয় পটভূমি নয়, ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ কালের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

আমরা সকলেই সমসাময়িক ইতিহাসের মধ্যেই বিচরণ করি, সেই ইতিহাসকে আশ্রয় করে যদি কাহিনী গড়ে তোলা যায় এবং সেই কাহিনীর মধ্যে একটা বাস্তবতার স্পর্শ থাকে তাহলে অনায়াসে কাহিনী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সাধারণ পাঠক গুরুতর চিন্তার ধার ধারে না, তারা চায় একটা হাল্কা জাতের চটুল কাহিনী, তাতে যদি কিঞ্চিৎ ইতিহাসের ফোঁড়ন থাকে তাহলে পাঠক অতি অল্প শ্রমে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং উপন্যাস পাঠ একত্রেই করা যাচ্ছে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। টেইলর পাঠকের এই মনস্তত্ত্বটুকু সহজেই ধরতে পেরেছিলেন তাই প্রকাশক প্রদত্ত ফর্মুলা তিনি সহজেই প্রয়োজন অনুসারে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিককাল তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল, সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানা সহজ হয়েছিল। এইবার তা নিজের কল্পনায় মিলিয়ে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা শুরু করলেন। স্বীয় আত্মজীবনীতে টেইলর লিখেছেন—

> "'Tara' was the first of the series of three historical romances which I had proposed to write on the three great modern periods of Indian history, which occured at an interval of exactly a hundred years. 'Tara' illustrated the rise of the Maharattas and their first blow against the Musalman power in 1657. 'Ralph Darnell', my second work, was to illustrate the rise of English political power in the victory of Plassey in June 1757 'Seeta,' which was to be third, was to illustrate attempts of all classes to rid themselves of the English by the Mutiny of 1857".

এই ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে 'তারা' উপন্যাস হিসাবে টেইলরের এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এবং সম্ভবতঃ উপন্যাসের এই খণ্ডটিই সর্বোত্তম। টেইলর নিজেই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে বিজাপুরে ভ্রমণকালেই এই কাহিনী তাঁর মাথায় এসেছিল তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি তিনি আগেভাগেই দেখে রেখেছিলেন, তিনি বলেছেন—

> "The incidents and actions of the story had been planned for nearly twenty years and I knew all the scenes and localities described as I had the story in my mind during the visit to Beijapore and had noted the details accurately".

উপন্যাসটির কাঠামোর ভারসাম্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, পণ্ডিত ব্যাসশাস্ত্রীর কন্যা তারা এবং স্ত্রী অনুন্দা দেবী কালিকার কাছে উৎসর্গীকৃত। মোরো থিরুমল তাকে ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু আফজল খাঁর বীর সন্তান ফাজিল তাঁকে উদ্ধার করে। তারপর, আরো অনেক চমকপ্রদ ঘটনাবলীর পর ফাজিল তারাকে বিবাহ করে।

এই উপন্যাসের মধ্যে প্রচুর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্য বর্তমান, আদর্শবাদী নর-নারী এবং রোমান্সবহুল পরিস্থিতির বর্ণনা আছে। এই উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই কালের "মর্নিং পোস্ট" পত্রিকা লেখেন :

> "'Tara' is a unique. There is nothing like it in English fiction. No other writer has ever attempted the portrayal of Indian life, society and interests entirely free from any European admixture of character or incident — 'Tara' is all Indian".

পরবর্তী খণ্ড "র‍্যালফ্ ডারনেল" উপন্যাসের উপজীব্য বৃটিশ রাজশক্তির অভ্যুদয়, পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের বিস্ময়কর বিজয়লাভ। এই উপন্যাসটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবনযাত্রা এবং সামাজিক পরিবেশের একটা তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থাবলীর তুলনায় টেইলরকৃত এই উপন্যাসটি অনেক নিকৃষ্ট। এই ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ খণ্ডটির নাম 'সীতা', সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত এক করুণমধুর প্রেমকাহিনী। নূরপুরের প্রধান বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সীতার প্রতি প্রণয় নিবেদন করে তাকে জয় করেন। সীতা ছিল সাহগঞ্জের স্বর্ণকার এবং মহাজন নরেন্দ্রের পৌত্রী। সীতা একজন আদর্শ স্ত্রী। স্বামীর জন্য সে আত্মবিসর্জন করে তার প্রেমের গভীরতার পরিচয় দান করে। তবে এই উপন্যাসের প্রধানতম আকর্ষণ হল ইংরাজ নর-নারীদের এই বিবাহসম্পর্কিত মনোভঙ্গী। এই বিষয়বস্তুর বিবরণ বিস্তারিতভাবে এই উপন্যাসটিতে দেওয়া আছে।

মেডোস টেইলরের এই ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ খণ্ডটির নাম "এ নোবল কুইন"। বলা বাহুল্য এই উপন্যাসের নায়িকা চাঁদবিবি আলি আদিল শাহের বিধবা পত্নী। এই উপন্যাসে পোর্তুগীজ চরিত্রাবলী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে এবং ডন ডিয়াগো চরিত্রটিকে অতিশয় যত্ন নিয়ে রূপায়িত করা হয়েছে। ডন ডিয়াগো ছিলেন সুযোগ-সন্ধানী ধর্মীয় প্রচারক। আহমেদনগর অবরোধের সময় তার পতন ঘটে। এই উপন্যাসটিতেও ভারতীয় আবহাওয়া সুন্দর ভঙ্গীতে প্রকাশিত। মেডোস টেইলর বিবিধ ধরনের আরো অনেক সাহিত্যকর্মও করেছেন। মূলতঃ ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রচুর বক্তৃতা করেছেন এবং ভারতবর্ষের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও রচনা করেছেন।

মেডোস টেইলরের আত্মজীবনী "দি স্টোরী অব মাই লাইফ" ১৮৭৪ খৃীষ্টাব্দে লিখিত হয় কিন্তু এই গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ করেন তাঁর কন্যা।

এই আত্মজীবনীটির মূল্য দ্বিবিধ। আত্মজীবনীটি পাঠ করলে সেইকালের রাজনৈতিক বাতাবরণের একটা বাস্তব চিত্র চোখে পড়ে। বিশেষতঃ কোম্পানী কিংবা ইংরাজ সরকারের কর্মচারী নন এমন একজন নিরপেক্ষ ইংরাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। আর একজন সাহিত্য-কর্মীর সাহিত্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মুখ্যতঃ ভারতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাঁরা উপন্যাস বা গল্প লিখেছেন তাঁদের মধ্যে মেডোস টেইলরকে একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার বলা হয়।

মেডোস টেইলর যখন চোখে আর দেখতে পান না, বয়সে প্রাচীন তখন আর একবার ভারতে এলেন। তাঁর চিকিৎসকরা উষ্ণ আবহাওয়ায় বাস করার পরামর্শ দেওয়ায় তিনি ভারতবর্ষে এসে হায়দ্রাবাদে সার সালারজঙ্গের অতিথি হলেন। কিন্তু সেই সময় জঙ্গল জ্বরে তাঁকে আরো কাবু করে ফেলল। স্বদেশে ফেরার পথে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মেনটোনে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেডোস টেইলরের নাম একালে বিশেষ পরিচিত নয়। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাম্প্রতিক পুনরভ্যুত্থানের যুগে তাঁর রচনাবলী পাঠ করলে একটা বিচিত্র চমকপ্রদ সাহিত্যের স্বাদ এ যুগের পাঠকরা পাবেন।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের প্রদর্শনী ॥

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, সে বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হবেন। বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের সংখ্যা নিতান্ত কম না হলেও, খুব সুপ্রচুর নয়। আবার বাংলা ভাষারও বিদেশী ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজন। বিদেশী ভাষার যদিও বাংলায় কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় বিদেশী ভাষায় বাংলার অনুবাদ অতি সামান্য। এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

গত ১৯ নভেম্বর কলেজ স্ট্রীটের ওয়াই এম সি এ হলে এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, ১৯৪৭ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে একটা গভীরতা ছিল। কিন্তু বিগত ২০ বৎসরে তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে।

এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন 'লিটারেরি গিল্ড'। তাঁদের এই প্রচেষ্টা যে সকলের প্রশংসা অর্জন করবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদর্শনীতে প্রায় দুইশত অনুবাদ গ্রন্থ এবং পাঁচশত অন্যান্য গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। কিন্তু কয়েকটি প্রখ্যাত অনুবাদ গ্রন্থ এই প্রদর্শনীতে স্থান না পাওয়ার কারণ বোঝা গেল না।

পরলোকে হিন্দী লেখিকা ॥

ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখিকা শ্রীমতী উষাদেবী মিত্রার মৃত্যুতে হিন্দী কথাসাহিত্যের যে ক্ষতি হল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দীর্ঘ রোগভোগের পর তিনি গত ২০ সেপ্টেম্বর জব্বলপুরে পরলোক-গমন করেন। সংবাদ পেয়ে অগণিত বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সেখানে উপস্থিত হন।

শ্রীমতী উষাদেবীর মাতৃভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু হিন্দীতেই তিনি সাহিত্য রচনা করেন। যখন সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব তখন হিন্দী কথাসাহিত্যের সবে প্রারম্ভিক যুগ। তিনি ছিলেন প্রেমচাঁদের সমসাময়িক। বিধবা হবার পর সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। প্রায় ৮০০ শত ছোটগল্প এবং উপন্যাস তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে 'বচন কা মোল', 'জীবন কো মুস্কান', 'পথচারী, 'নষ্ট-নীড়', 'আওয়াজ আউর সম্মোহিত', 'মেঘ-মল্লার', 'রাগিণী', 'নীল চামেলী' ইত্যাদি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় নৃত্যকলা বিষয়ক গ্রন্থ ॥

ভারতীয় নৃত্যকলার উপর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বোম্বে থেকে শ্রীমতী এনাক্ষী ভাবনানীর "ভারতীয় নৃত্য" নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "Dance symbolises an inspiration which elevates us from the earthly bonds that bind us down to higher levels, thus releasing its wrapped and suppressed feelings, and creates even if it be fleetingly, those moments of the soul when we become one with the universe"

এই কারণেই পৃথিবীর সমস্ত দেশে নৃত্যের বিশেষ প্রচলন আছে। ভারতীয় নৃত্যের উৎসও সেখানে। লেখিকা আলোচ্য গ্রন্থে ভারতবর্ষের নৃত্যের যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এছাড়াও অজন্তা, সোমনাথপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি মন্দিরগাত্রের চিত্রের অসংখ্য নিদর্শন গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি করেছে। এ ছাড়াও ই, কৃষ্ণ আয়ার রচিত 'ভারত-নাট্যম', সীতারা দেবী রচিত 'কথক' এবং ভেরিয়ার এলুইন রচিত 'আদিবাসী নৃত্য' প্রভৃতি রচনা গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাম্প্রতিক কয়েকটি হিন্দী কথা-কাহিনী ॥

হিন্দী কথা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসে জ্ঞানেন্দ্র বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি 'পূর্বোদয় প্রকাশন' সংস্থা থেকে তাঁর একটি গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকের ভাষায় এতে বিতর্কমূলক গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রর অধিকাংশ রচনাই অবশ্য বিতর্কমূলক। তবে আলোচ্য গ্রন্থে যে সমস্ত গল্প সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

অপর যে গল্প গ্রন্থটি সম্প্রতি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে তার রচয়িতা শিব-প্রসাদ সিংহ। তাঁর গল্প-সংগ্রহের নাম 'খুদা সরায়'। তাঁর গল্পের ভিত্তিভূমি প্রধানত গ্রামীণ জীবন। বর্তমান সময়ের চাঞ্চল্য তাঁর সাহিত্যকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করেনি। 'তাড়িঘাটকা ফুল' এদিক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। 'কিসকি পাঁখে' গল্পটিতে অতীতের স্মৃতি প্রকাশিত। 'অরুন্ধতী' গল্পটি পারিবারিক জীবনের ইতিবৃত্ত। তাঁর সমস্ত গল্পের বিষয়ই আমাদের অতি পরিচিত। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, বিষয় অথবা ফর্মের দিক থেকে তিনি কোনও অভিনবত্ব দাবী করতে পারেন না।

সাম্প্রতিক হিন্দী কাব্য এবং কথা-শিল্পের ইতিহাসে রাজকমল চৌধুরীর নাম খুবই পরিচিত। বাংলার তথাকথিত 'হ্যাংরি' দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি হিন্দীতে এই ধারার প্রবর্তন করেন, বলা যেতে পারে। হিন্দীতে এই সাহিত্য ধারার নাম 'ভুখা পিঢ়ি'। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসটির নাম 'শহর থা শহর নহি' থা'। প্রকাশ করেছেন পাটনার 'বিহার গ্রন্থ কুটীর'।

জাতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ॥

জাতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ পাঠ্যপুস্তক এবং অতিরিক্ত পাঠ্যবিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করে থাকেন। কিন্তু এর জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তাঁরা যে পারিশ্রমিক দেন, তা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। তাই এ ব্যাপারে সম্প্রতি পরিষদ দুটি প্রস্তাব গ্রহণের কথা বিবেচনা করছেন। তাঁরা এই ব্যাপারে লেখকদের উৎসাহিত করার জন্য হয় পনের শতাংশ রয়েলটি অথবা এককালীন ২৫,০০০ টাকা দেবার কথা ভাবছেন। এ ছাড়াও জনসাধারণকে দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনার কথা পরিষদ বিবেচনা করছেন। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যবহারের উপযোগী একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার কথাও পরিষদের বিবেচনা-ধীন রয়েছে। অহিন্দিভাষী অঞ্চলের জন্য হিন্দি রচনার উদ্দেশ্যে পরিষদ একটি 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' গঠন করেছেন বলে জানা যায়।

সাংবাদিকের ভূমিকায় জন স্টেইনবেক ॥

আমেরিকান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে জন স্টেইনবেক নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি সাংবাদিক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন। বর্তমান সময়ের পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোড়নকারী যে ঘটনা ভিয়েতনামের যুদ্ধ—সেই যুদ্ধ সম্পর্কে নতুন নতুন ঘটনা ও উপকরণের সন্ধানে লং আইল্যান্ডের একটি নামজাদা পত্রিকার তরফ থেকে তিনি স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে ভিয়েতনামে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি জানান, 'মানবিকতার মহৎ উদ্দেশ্যে, যথার্থ সাংবাদিকতার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণই আমার লক্ষ্য। ভিয়েতনাম ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংবাদও সংগ্রহ করার ইচ্ছে আমার আছে।'

কলকাতায় জার্মান লেখিকা এলসে ল্যাংগনার ॥

জার্মান সাহিত্যের সর্বজনবিশ্রুত লেখিকা এলসে ল্যাংগনার মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছিলেন কলকাতায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন ও ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু তথ্যের খবর

শ্রীমতী ল্যাংগনার

নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, 'বিশেষভাবে জানতে চাই ভারতবর্ষের মানুষকে।'

শ্রীমতী ল্যাংগনার বর্তমান শতকের গোড়ার দিক থেকেই তাঁর সাহিত্যকর্ম ও নারীপ্রগতিমূলক কর্মকলাপের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। চল্লিশ বছর ধরে তিনি ক্লান্তিহীনভাবে সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন। পঞ্চাশের শেষপ্রান্তে পৌঁছে আজও তিনি প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। জার্মান সাহিত্যে শ্রীমতী ল্যাংগনারই প্রথম মহিলা সাহিত্যসেবী যিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি তিন অঙ্কের নাটক লিখে সে সময়ে পৃথিবীতে যথেষ্ট হৈ-চৈ তুলেছিলেন। ফলে হিটলারের নাৎসীবাহিনী থেকে নির্যাতনও তাঁকে কম সহ্য করতে হয়নি। নাটকটির নাম হচ্ছে 'ফ্রাউ এম্মা ফাইটস্ ইন দি হিন্টারল্যান্ড'। রচনাকাল ১৯২৯ সাল। তাঁর 'চাইনীজ ডাইরী', 'আই ইনভাইট্ ইউ টু কিয়োটো' প্রভৃতি উপন্যাস পশ্চিম জার্মানীতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। পশ্চিমী দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও হয়েছে গ্রন্থ দুখানা।

একটি সময়োপযোগী জীবনীগ্রন্থ ॥

হেমিংওয়ের ছোটগল্প, বিশেষত তাঁর উপন্যাসগুলি সাহিত্যপাঠকের কাছে পরিচিত। যে দুর্দমনীয় জীবনযাত্রা তাঁর কথাসাহিত্যে বারবার ছায়াপাত করেছে সেখানে জীবন-উত্তীর্ণ এক মহৎ মুক্তির কথা তিনি বলেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে মানুষ, মানুষের মুক্তি। 'যুদ্ধ নয়, প্রেম—' এই-ই ছিল তাঁর ঘোষণা।

শেষের তেরো বছর হেমিংওয়ে যে কী ভীষণ নিঃসঙ্গ ছিলেন তা লেখকের অকৃত্রিম বন্ধু হচারের এই 'পাপা হেমিংওয়ে' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ১৯৬১ সালের বসন্তকালীন এক সন্ধ্যায় অসুস্থ হেমিংওয়ে বারান্দার একটি ডেকচেয়ারে বসেছিলেন। কথায় কথায় হচারকে একবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানুষ কী চায়?' নিজেই আবার তার জবাব দিলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই ভাল স্বাস্থ্য, ভাল কাজ আর মুখোমুখি টেবিলে বসে বন্ধুর সঙ্গে মদ্যপান। কিম্বা বিছানায় শুয়ে আলস্যের আনন্দ। হচ্, আমি এসব কিছুই পেলাম না, আমি একা। বড়ো নিঃসঙ্গ।'

হচার ছিলেন তাঁর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। বিপর্যস্ত শেষ দিনগুলিতে ক্যাবারে-রেস্তোরাঁ, শিকার অভিযানে, গাড়ীতে বা নৌকোয়, বুলফাইট সার্কিটে সর্বত্র তিনি ছিলেন তাঁর নিঃসঙ্গতার একমাত্র সাক্ষী। এ ছাড়াও হেমিংওয়ের মৃত্যু, তাঁর অতীত জীবন, খ্যাতি, মদ্যাসক্তি, যুদ্ধ ও পতিতালয় যাত্রা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে বইটাতে। প্রকাশ করেছেন বিশ্রুত প্রকাশক ওয়েডিনফিল্ড য়্যান্ড নিকলসন। বইটির আরেকটি আকর্ষণ দুর্লভ ফোটো 'ফটোগ্রাফ'। 'পাপা হেমিংওয়ে' সকলেরই অবশ্যপাঠ্য।

কবি ইয়েভতুশেংকো

আমেরিকায় ইয়েভ্‌তুশেংকো

খ্যাতনামা তরুণ রুশ-কবি ইয়েভ্‌গেনি ইয়েভ্‌তুশেংকো সম্প্রতি আমেরিকা সফর করেছেন।

নিউইয়র্কে তাঁর কবিতা পাঠের আসরে যে অসাধারণ ভীড় হয়েছিল এবং এই সোভিয়েত কবির কবিতা-পাঠ শোনার "অতিরিক্ত" টিকিট সংগ্রহের জন্য নিউইয়র্কের কনসার্ট হলের সামনে যে দস্তুরমত 'কিউ' পড়ে গিয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে "এ-পি-এন"-এর বিশেষ প্রতিনিধি জি বোরোভিক লিখছেন যে, এ যেন ঠিক মস্কোর মতোই। কবিতা শোনার আগ্রহে হলের সামনে পথের ওপর টিকিট সংগ্রহের আশায় পথচারীদের ভীড় জমে যেতে দেখা গেল। নিউইয়র্কের কাঁচেস কলেজের আমন্ত্রণে কবি ইয়েভতুশেংকো তাঁর কবিতার খাতা হাতে নিয়ে মার্কিন দেশ সফরে এসেছেন।

ইয়েভতুশেংকোর কবিতা-পাঠের আসরের দু' রাত্রি হলে একেবারে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ও সিঁড়িতে বসে নিউইয়র্কবাসী সোভিয়েত কবির কবিতা শুনেছে।

প্রথম অনুষ্ঠানের সুরুতে শ্রোতাদের

সামনে সোভিয়েত কবির পরিচয় প্রদান করেন সুপরিচিত মার্কিন লেখক আর্থার মিলার ও জন আপডাইক। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ভাষণ দেন কবি রবার্ট লাওয়েল। ভিয়েৎনামে যুদ্ধের প্রতিবাদে এই খ্যাতনামা কবিই হোয়াইট হাউসে এক জলসাতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইয়েভ্‌তুশেঙ্কোর প্রথম কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জন স্টেইনবেক। এ ঘটনায় কয়েকটি সংবাদপত্র বিশেষ সজাগ হয়ে ওঠে। ওয়ার্লড জার্নাল ট্রিবিউন একটি প্রবন্ধে ইংগিত করে যে, মার্কিন ঔপন্যাসিক ও সোভিয়েত কবির মধ্যে আলোচনায় শেষোক্তজন সম্ভবতঃ ভিয়েৎনাম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভংগী বদল করেছেন।

ইয়েভ্‌গেনি ইয়েভ্‌তুশেঙ্কো এর প্রতিবাদ করে পত্রিকাটির সম্পাদকীয় দপ্তরে সংগে সংগে একটি চিঠি দেন। ইয়েভ্‌তুশেঙ্কো লেখেন যে, স্টেইনবেক সম্পর্কে সর্বদাই তাঁর মনে এক প্রীতির মনোভাব আছে। যদিও ভিয়েৎনামের যুদ্ধ সম্পর্কে উভয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমতই পোষণ করেন।

ইয়েভ্‌তুশেঙ্কোর কবিতা পাঠের দু'টি অধিবেশনেই প্রায় দু' হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। গত ১৯শে ডিসেম্বর ইয়েভ্‌তুশেঙ্কোর কবিতা পাঠ করা হয়েছিল নিউইয়র্কের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানকেন্দ্র লিঙ্কন সেন্টারে। এই ছিল তাঁর শেষ কবিতা-পাঠ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পর তাঁর মার্কিন দেশ সফর শেষ হয়েছে। সফরকালে সোভিয়েত কবি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সভায় কবিতা পাঠ করেছেন।

নবোকভের নবতম উপন্যাস ॥

এমন অনেক লেখক আছেন পৃথিবীতে, যাঁরা সাহিত্যে হঠাৎ একটা হৈচৈ তুলতে ভালবাসেন, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। তাঁদের কয়েকটি উপন্যাস হাতে পেলেও কখনই সবগুলি পড়ার আগ্রহ শেষ হয় না। 'লোলিটা' লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন যিনি, স্বভাবতই সেই নবোকভের সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলের সীমা নেই। সম্প্রতি তাঁর 'ডিস্‌পেয়ার' উপন্যাসটির ইংরেজী সংস্করণ দ্বিতীয়বারের জন্য প্রকাশিত হোল। 'ডিস্‌পেয়ার' তিনি রচনা করেছিলেন ১৯৩২ সালে। শোনা যায় ১৯৩৭ সালে এর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু নবোকভ তখন ছিলেন অখ্যাত, পাঠকের অপরিচিত। বর্তমানে 'লোলিটা'র লেখক হিসেবে তাঁর যে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি তারই ফলে 'ডিস্‌পেয়ার'-এর অত্যধিক চাহিদা বর্তমানকালে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রায় ২৯ বছর পর এই অসম্ভব চাহিদা থেকেই এর দ্বিতীয় ইংরেজী সংস্করণটির প্রকাশ। প্রকাশ করেছেন 'ওয়েডেনফিল্ড অ্যান্ড নিকলসন' সংস্থা। 'ডিসপেয়ারে'র নায়ক হেরম্যানকে সমালোচকরা 'এক্সিস্‌টেন্সিয়ালিজম্‌'-এর নিয়ন্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। গ্রন্থটি ফরাসী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। ফ্রান্সের 'সিচুয়েশন' নামক পত্রিকায় সার্ত্র স্বয়ং বইটির সমালোচনা করেছেন। তিনি বইটি সম্পর্কে বলেন, 'ডস্টয়েভস্কির নির্বোধ প্রতিধ্বনি', কিন্তু মজার কথা হচ্ছে নবোকভ নায়কের যকলমে খুব কড়া কড়া ভাষায় ডস্টয়েভস্কির প্রতি তির্যক মন্তব্য করেছেন। উপন্যাসটি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে নবোকভ বলেন, 'এর নায়ক হেরম্যানের জগৎ বাস্তবতার সংগ্রামে জর্জরিত। নায়ক হেরম্যান তাই খল, নিষ্ঠুর, শয়তান এবং পাগল।'

পড়ুন বই

স্মরণীয় একটি পরিবারের কাহিনী

বাঙলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্ট ভূমিকা বহুজনজ্ঞাত। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত ভাবতে পারেন নি একদিন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আগমনে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে তার উত্তরপুরুষদের। ঠাকুর পরিবার যখন ঐশ্বর্যের বিপুল সম্ভারে স্ফীত, তখন অন্যান্য ধনী বাঙালীদের মত জীবনের সম্ভারকে এঁরা অনাচারে নিঃশেষিত না করে সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন এরা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এদের কেউ কেউ বাঙলা দেশের সমাজজীবনে বিশিষ্ট নেতৃত্বের ভূমিকাও নিয়েছিলেন। ব্যবসা, ধর্ম, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে পদচারণায় এরা যে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন, আজকের দিনে তা কেবলমাত্র বিস্ময়ের রূপ নিয়েই ভেসে ওঠে। বিশেষ করে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এই তিনজনই ঠাকুর পরিবারের সব থেকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। কেবলমাত্র ঠাকুর পরিবারের বললে অন্যায় হবে, সেকালের অধিকাংশ বাঙালী এঁদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। দীর্ঘকাল বাঙলা দেশের বুকে এঁরা যে ঝড় তুলেছিলেন তা এখনও স্তিমিত হয় নি। সম্ভবত সেই কারণেই ঠাকুর বাড়ীর কথা উঠলেই আমরা উল্লসিত হয়ে উঠি।

দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, [illegible], গণেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের নাম স্মরণযোগ্য। এঁদের সঙ্গে এসে মিলেছেন সেকালের বিশিষ্ট দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিরা। সাহিত্য শিল্প রঙ্গমঞ্চ ব্যবসা-বাণিজ্য ধর্ম যাবতীয় ক্ষেত্রে বাঙলা দেশ সেদিন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারই তথ্যনির্ভর বিবরণ পাওয়া যাবে শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "ঠাকুর বাড়ীর কথা" গ্রন্থে। সম্প্রতি এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণ, পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, পঞ্চানন, জয়রাম, নীলমণি, রামলোচন, রামমণি এঁদের জীবনের আকর্ষণীয় উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রিন্স দ্বারকানাথের কর্মজীবনের ব্যাপক বিস্তৃতি, বিপুল বিত্ত এবং রাজকীয় চালচলন গ্রন্থকার নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ঔদার্য ধর্মপ্রবণতা, সন্তানস্নেহ, সন্তানদের চরিত্রবিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণব্যবস্থা এবং সম্পত্তিরক্ষার বিস্ময়কর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মহর্ষির সন্তান ও পুত্রবধূদের প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং পরিবারের উত্তরপুরুষদের সম্পর্কিত আলোচনা দুটিতে ঠাকুর বাড়ীর পরিমণ্ডল যে কতখানি সার্থক প্রতিভা উন্মেষের অনুকূল ছিল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন গ্রন্থকার তা সকলকেই আকৃষ্ট করবে। শেষ অধ্যায়ের বাঙলার সমাজ জীবনে ঠাকুর বাড়ীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর রচিত বর্তমান গ্রন্থে একটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়ল। গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখছেন : "...'ইয়ং বেঙ্গল' নাম দিয়ে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল...।" 'ইয়ং বেঙ্গল'কে কোন প্রতিষ্ঠান বলা ঠিক নয়। কারণ 'ইয়ং বেঙ্গল' ছিল একটি নতুন চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত সেকালের তরুণ ছাত্র দল। যাকে বলা চলে একটা 'জেনারেশন'।

১১৪ পৃষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'মেঘদূতের' এই হল বাংলায় সর্বপ্রথম অনুবাদ। দ্বিজেন্দ্রনাথের মেঘদূত প্রকাশের তারিখ ১৮৬০ খৃঃ। এর পূর্বে ১৮৫০ খৃঃ (১২৫৭ সাল ৪ ভাদ্র) লালমোহন গুহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ 'মেঘদূতে'র বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন ও প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থকার ২৫৮ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশিত পত্রিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সম্পাদকের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে-

ছেন; কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পত্রিকাটির নাম কোথাও নেই।

অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত 'বাংলার সমাজ জীবনে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা' অধ্যায়টি সংযোজিত না হলেই ভাল হত।

গ্রন্থকার বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য দিয়ে তাঁর প্রথম দিককার বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। বহু অজানা জিনিসকে নতুন-ভাবে জানা যাবে। কিন্তু কোথাও কোথাও মাত্রাতিরিক্ত উদ্ধৃতি দৃষ্টিকটু লাগে।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যদি গ্রন্থরচনায় সময় আরও সতর্ক হতেন তাহলে তাঁর এই গ্রন্থখানি বাঙলা সংস্কৃতির মূল্যবান আকররূপে বিবেচিত হত।

সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত এই গ্রন্থখানিতে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের তিনখানি আর্ট প্লেট ছবি আছে।

পরিশিষ্টে ঠাকুর পরিবারের বংশলতা, উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা, রবীন্দ্রনাথ রচিত বাঙলা ও ইংরেজি গ্রন্থের কালানু-ক্রমিক তালিকাসূচী গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

ঠাকুর বাড়ীর কথা (আলোচনা) হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। দাম বার টাকা।

কাব্যসংকলন

আধুনিক কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যত বেশী হৈ-চৈ কিম্বা আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে, সম্ভবত অন্য কোন বিষয়ে তেমন দেখা যায় না। ফলে আধুনিক বাংলা কবিতার স্বরূপ, তার গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করা একেবারে অপরিহার্য এবং স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে হয়। এর আগে আধুনিক বাংলা কবিতার কয়েকটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত সে রকম যথেষ্ট নয়। ইদানীং এদিকে আরো বেশী নজর পড়েছে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু কোন একটি বিশেষ পত্রিকা থেকে বাছাই-করা কবিতা নিয়ে কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ ইতিপূর্বে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। সেদিক থেকে বর্তমান সঙ্কলনটি অভিনবত্বের দাবী রাখে। এরকম একটি কাব্যসঙ্কলন প্রকাশের জন্য সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

কবিতা, সঙ্গীত ও শিল্প সমালোচনার ত্রৈমাসিক হিসেবে 'উত্তরসূরী' বিশেষ পরিচিত। গত বছরে এই কাগজটি তার বারো বছর বয়স অতিক্রম করেছে, এবং সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে শুধুমাত্র 'উত্তর-সূরী' থেকে বাছাই-করা কবিতার আলোচ্য সঙ্কলনটি। বলাবাহুল্য, এর ফলে প্রবীণ কবিদের সঙ্গে মোটামুটিভাবে হালের বেশ কয়েকজন কবিকে নিয়ে মোট ৮৯ জন লেখক স্থান পেলেও কিয়ৎসংখ্যক কবি বাদ পড়ে গেছেন। তাছাড়া, যেসব কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে তাও সবসময়েই যে কবিদের প্রতিনিধিত্ব করেছে এমন নয়। তবে বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতা বুঝবার পক্ষে এই সঙ্কলনটির অবদান নিঃসন্দেহেই মনে রাখার মত।

বারো বছরের বাংলা কবিতা (কাব্যসঙ্কলন) : সম্পাদনা—অরুণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক : প্রান্তিক, টি কে ব্যানার্জি অ্যাণ্ড সন্স; ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম : পাঁচ টাকা।

বাংলা গল্পের হিন্দী অনুবাদ

তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটের "অপরা প্রকাশন" হিন্দী সাহিত্য-গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি শরদ দেবড়ার সম্পাদনায় বাঙলা সাহিত্যের উনিশজন "শীর্ষস্থ কথাকারোঁ কী স্বনির্বাচিত প্রণয়-কহানিয়া"র একটি মনোরম সংকলন প্রকাশ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, আশা-পূর্ণা দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বাণী রায়, সমরেশ বসু, শঙ্কর প্রভৃতি বাঙলা ভাষার প্রখ্যাত গল্পকারদের গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন কুসুম বাঁটিয়া, পুষ্পা দেবড়া, সবিতা বনজী, ডাঃ মাহেশ্বর, মনমোহন ঠাকোর, ছেদীলাল গুপ্ত, প্রিয়দর্শী প্রকাশ, দিনেশ প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যের লেখক-বৃন্দ। এই সংকলনে শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, হরিনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায়, বনফুল, পরিমল গোস্বামী, বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রখ্যাত গল্পলেখককে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, হয়ত গ্রন্থটির আকার বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা সম্ভব হয় নি, কিন্তু বাঙলা কথাযাত্রার যাত্রিক হিসাবে উল্লিখিত লেখকবৃন্দকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত নয়। গ্রন্থটিতে একটি ভূমিকা থাকা উচিত ছিল, তাহলে বাঙলা কথাসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তাঁদের সুবিধা হত। তবু প্রচেষ্টা হিসাবে "অপরা প্রকাশনে"র এই আয়োজন বাঙালী পাঠকবৃন্দ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। সম্পাদক অতিশয় পরিচ্ছন্ন ভঙ্গীতে গ্রন্থটির বিন্যাস করেছেন, তাঁর সাহিত্যজ্ঞান এবং সুরুচি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। অনুবাদগুলিও মূলানুগ এবং যথাযথ হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাঙালী কথাকার-দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা এবং হিন্দীতে "কিয়ে হুয়ে" দস্তখত আছে ও প্রত্যেকের ফটোগ্রাফও আছে, এছাড়া গ্রন্থ-টিতে পিকাসো, পল গঁগা, আঁরি মাতিসে প্রভৃতি পৃথিবীখ্যাত শিল্পীদের কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের অনুসরণে রেখাচিত্র সন্নি-বেশিত হয়েছে, সেগুলি এঁকেছেন—চারু খান এবং আবরণ চিত্র এঁকেছেন কমল বোস। বাঁধাই অপূর্ব।

বংগলা কথা-যাত্রা (প্রণয় কাহিনীর সংকলন)—সম্পাদক : শরদ দেবড়া। প্রকাশক—অপরা প্রকাশন : তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য—দশ টাকা মাত্র।

একটি মূল্যবান গ্রন্থ

শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য লিখিত 'তত্ত্ব ও তথ্য' গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভে তত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জন বিশেষ প্রয়োজন। ধর্মবিষয়ের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এবং বিশিষ্ট ধর্মসাধকদের তত্ত্ববিষয়ক তথ্যাবলী সংকলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। সদাচার্যের স্বরূপ ও কৃত্য, সদাচার্য উপদেশ, সংশিষ্য লক্ষণ ও কৃত্য, গুরুভক্তি, শ্রীগুরুসেবা, আচার্য-অভিমান, ভাগবতসেবা, ভাগবত-বিভব, মন্ত্ররহস্য, শরণাগতি রহস্য, কৈঙ্কর্যের স্বরূপ, অর্চাবিগ্রহ-ভক্তসংবাদ, আদর্শ বৈরাগ্য প্রভৃতি তেরটি অধ্যায়ে সুন্দরভাবে উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য। তাছাড়া আর একটি অধ্যায়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর বিবরণও আছে। প্রতিটি ভক্তপ্রাণ মানুষের কাছে বর্তমান গ্রন্থখানি পরম আদরণীয় হবে। শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য এই গ্রন্থখানি সম্পাদনার জন্য সকলের ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

তত্ত্ব ও তথ্য : (আলোচনা) শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা। দাম—৪·৫০।

মধুর ও মনোরম ভ্রমণকাহিনী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সামান্য কয়েক-খানি গ্রন্থ রচনা করলেও 'পালামৌ' রচনার জন্য বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান তিনি অধিকার করে নিয়েছেন। ১২৮৯ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত এই মনোরম ভ্রমণকাহিনী এখনও মনকে আকর্ষণ করে খুব সহজভাবেই। 'পালামৌ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নাথ লিখেছিলেন : "...সঞ্জীবচন্দ্র যে, বিশেষ কোনো কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়া-ছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে [illegible] বর্ণনা

করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভান্ডার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোল রমণীই হোক, বনসমাকীর্ণ পর্বতভূমিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, ছোটো হউক, বড়ো হউক, সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।" 'পালামৌ' তুলনারহিত ভ্রমণকাহিনী। চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন : "...উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌ-এর ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙলা সাহিত্যে আর নাই। আমি জানি, উহার সকল কথাই প্রকৃত, কোন কথাই কল্পিত নয়, কিন্তু মিষ্টতা মনোহারিত্বে উহা সুরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।"

সঞ্জীবচন্দ্রের এই মধুর ও মনোরম ভ্রমণকাহিনী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত। সম্পাদিত গ্রন্থখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব সাহিত্য আলোচনা, সংক্ষিপ্ত জীবন, রচনাবলী ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পালামৌ-এর সংক্ষিপ্তসার, শব্দার্থ, টীকা, মন্তব্য, বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য, সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষারীতি ও হাস্যরস, সৌন্দর্যদৃষ্টি, বর্ণনাক্ষমতা, পর্যবেক্ষণশক্তি এবং পালামৌ ভ্রমণকাহিনী কিনা সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও সংকলন গ্রন্থ সম্পাদকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয়কে সুস্পষ্ট করে। বাঙলা দেশে সাধারণত গ্রন্থসম্পাদনায় এই ধরনের রীতি অনুসরণ করা হয় না। 'পালামৌ'-এর এই সুসম্পাদিত সংস্করণটি সমাদৃত হবে।

পালামৌ (ভ্রমণ) — **সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।**

সমাজচিত্রের সার্থক রূপায়ণ

কাল-চেতনা বাংলা উপন্যাসে নতুন নয়। সমাজ-বিন্যাসের সর্পিল প্রকৃতি বাঙালী জীবনকে আপন বৃত্তের বাইরে এমন এক ভিন্নতর আবর্তে টেনে নিয়ে এসেছে, যেখানে সে কোনো-প্রকার মাধ্যাকর্ষণবিহীন। তার পরিবেশ অসংলগ্ন, ক্লান্ত করুণ। বস্তুত এই বিকেন্দ্রিত জীবনের অভিজ্ঞতাই বাংলা উপন্যাসের আধুনিক রূপ।

'খাল বিল পারের কাহিনী' মূলত লোকায়ত জীবনের অন্তর্জ্বালী যন্ত্রণার বিচ্ছুরণ। কাহিনীর পূর্বাপর একাধিক অপঘাত মৃত্যুতে চরিত্রগুলো মাথা তুলতে পারেনি। বোধকরি এবংবিধ সংঘটন দুর্বলতা পরিহার করা হলে অক্ষয়, নটবর, পুঁটিরাম, চাঁপা, শংকরী পাঠকের সংগে অন্তরঙ্গ হতে পারত। অন্তত দু-তিনটি প্রসংগ সম্বন্ধে অমনোযোগিতার কথা বলা যায়। যথা, পুতলী-পরাশরের অনুরাগ। তাদের যৌবন-যন্ত্রণা শিল্পের ফুল হ'য়ে ফুটতে পারতো। হারান চরিত্রের নির্বিকারতাও গ্রহণ করতে পারতো এক অসামান্য ভূমিকা। বিসর্জনের মারামারির চিত্রে রঙ এবং রেখার দুর্বল প্রয়োগ হয়েছে।

অন্যত্র, নটবরের একটি ভাবনা ছিল : 'এ সংসারে মানুষ চেনা দায়। ......সবাই মানুষ অথচ দেখ কেউ কারো সংগে মেলে না'—এই বিচিত্র জীবনচর্যার মৌল উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে থাকে ঔপন্যাসিক সাফল্য। 'খাল বিল পারের কাহিনী' নিশ্চয় একজন আগ্রহী লেখকের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ।

লেখকের ভাষায় সাবলীল ব্যবহার বিষয়ানুগ। প্রচ্ছদচিত্রে কিছুটা স্থূলতার অবলেপ আছে। অন্যথায় রমণীয়।

খাল বিল পারের কাহিনী : (উপন্যাস) ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ॥ মোহন লাইব্রেরী

মূল্যবান আকর

রাজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'খেয়াল-খাতা' গ্রন্থখানি নানা কারণে আকর্ষণীয়। শিল্পী নন্দলাল প্রসংগে তাঁর স্মৃতিমূলক সচিত্র আলোচনাটি মূল্যবান। বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থ সমালোচনার ধারা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিবরণ লেখকের বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়। 'মহাস্থবির জাতকে'র সমালোচনাটি লেখকের মৌলিক চিন্তাশক্তিকে সুস্পষ্ট করেছে। দৈনিক পত্রিকা সম্পর্কে লেখকের আলোচনাটি বেশ হৃদয়গ্রাহী। 'স্পেসিমেন ক্রিটিসিজম', 'শিবানী কী অসতী?', 'ব্যথার দেয়ালী', 'কামনার কাপালিক', 'নারী—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে'—এই আলোচনাগুলি তথ্যনির্ভর এবং সুবিশ্লিষ্ট। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র গল্প, উপন্যাস ও কলকাতা সম্পর্কে কয়েকখানি বই লিখে খ্যাতিলাভ করেছেন। আশা করি বর্তমান গ্রন্থেও তাঁর খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁর সম্পাদিত 'খাম-খেয়ালী' পত্রিকায় মুদ্রিত নন্দলাল বসুর 'শিল্প সাধ্য ও সাধনা' নিবন্ধটি বর্তমান গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ছাপা হয়েছে গ্রন্থসূচনায়।

খেয়াল খাতা— (আলোচনা) — প্রথম খণ্ড, রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর কে পাবলিশিং কোং। ১১এ গোকুল মিত্র লেন। মদনমোহন তলা। কলকাতা-৫। দাম চার টাকা।

একটি মার্জিত রুচির উপন্যাস

'মরুমেঘ' যদিও শ্রীপরিমলকান্তি রায়ের প্রথম উপন্যাস, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এইটিই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ নয়। বহুদিন পূর্বে তিনি 'নবশক্তি' কাগজে নিয়মিত ছোট গল্প লিখতেন। সে সময় তাঁর লেখা পাঠকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থ 'মরুমেঘ' লেখকের মার্জিত রুচি ও পরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক। লেখকের ভাষাও খুব সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বিচার করেছেন।

মরুমেঘ : (উপন্যাস) পরিমলকান্তি রায়। প্রাপ্তিস্থান : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২ এবং 'জনপদ' ৬৮ কাশীপুর রোড, কলিকাতা—৩৬। মূল্য : সাড়ে তিন টাকা।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার মাসিক পত্রিকা 'ময়ূখে'র সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন অসীম বসু, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণাময় ঘোষ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যেন মিত্র এবং আরো অনেকে।

ময়ূখ (নভেম্বর সংখ্যা)—সম্পাদক : সৌরেন মুখোপাধ্যায়। ১০, বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেন কলকাতা-১২। দাম : তিরিশ পয়সা।

●

বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা মোটেই বেশী নয়। সেদিক থেকে 'বিজ্ঞানবার্তা'র আবির্ভাব নিঃসন্দেহেই অভিনন্দনযোগ্য। ইতিমধ্যে এর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংকলনে বিভিন্ন রচনার মধ্যে শচীন্দ্রনাথ বসু, রমাপদ রায় ও শিপ্রা রায়ের প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ইলেকট্রনিক কম্প্যুটার সম্বন্ধে সমরেন্দ্রকুমার মিত্র, বিশ্বরঞ্জন নাগ, সোফিয়া গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ নাগের আলোচনাগুলি আকর্ষণীয়।

বিজ্ঞানবার্তা (২য় সংখ্যা)—প্রধান সম্পাদক : সুমন গঙ্গোপাধ্যায়। ২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯। দাম : এক টাকা।

●

রবীন্দ্র-ভারতীর বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসন্তী চক্রবর্তী, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শীতাংশু মৈত্র, শোভনলাল মুখোপাধ্যায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, ক্ষেত্র গুপ্ত, সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা (চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)—**সম্পাদক : ধীরেন্দ্র দেবনাথ। ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭। দাম : এক টাকা।**

মনোজ বসু
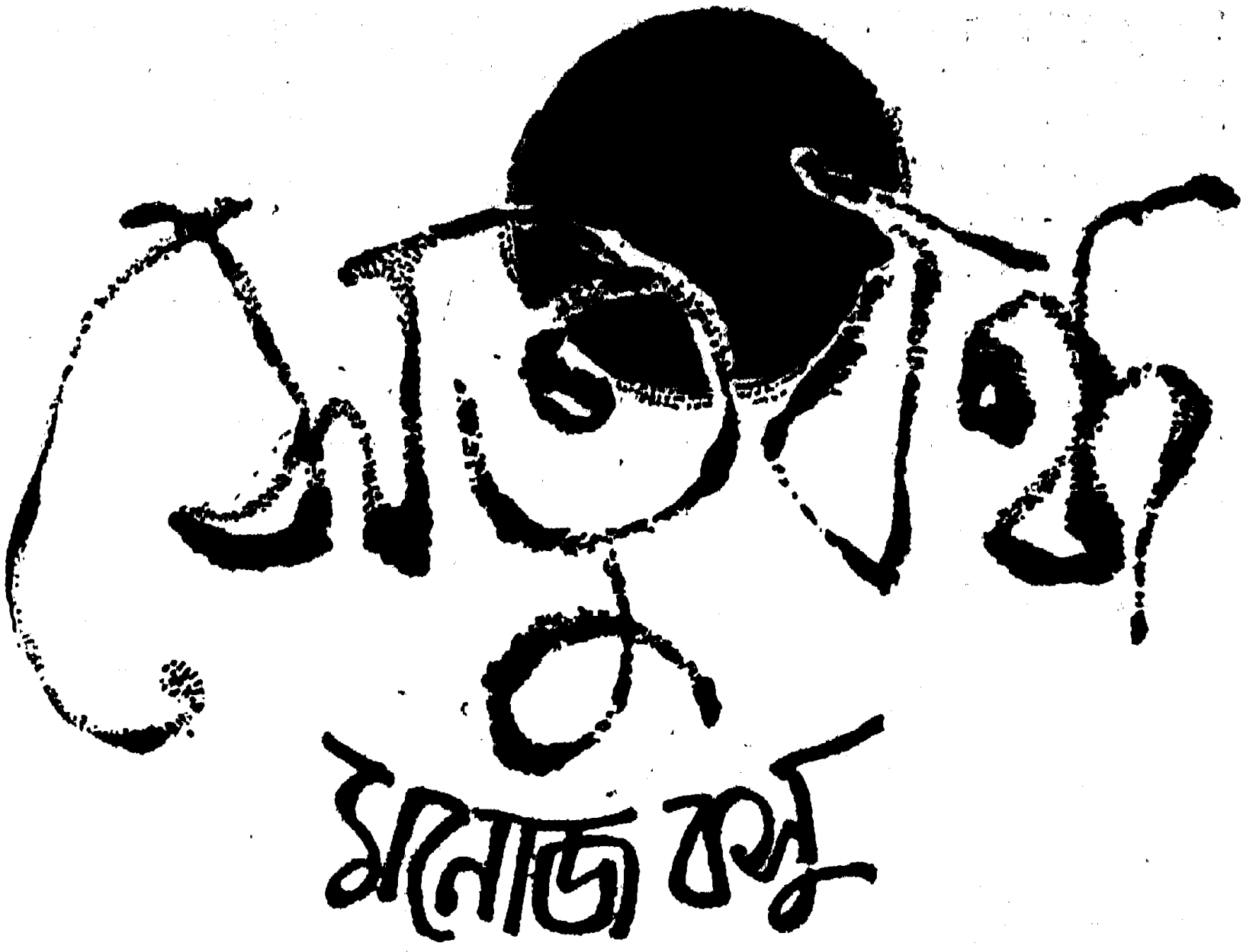
[উপন্যাস]

॥ সতের ॥

মহরম পরবের দু-দিন ছুটি—এই কণ্টা দিন বাদ দিয়ে ছুটির পরদিন থেকে শিশির কাজে বসবে। সারাক্ষণ তাকে নিয়ে আলোচনা। বাইরে থেকে এসে হুট করে সেকেন্ড ক্লার্কের চেয়ারে বসল—ভিতরের রহস্যটা কি? অফিসময় ফুস-ফুস গুজ-গুজ। ইতিহাস বের করে ফেল দিকি, খুঁটোর জোরটা কোথায়। ডিটেকটিভ লাগানোর মতন কেস—শার্লক হোমস কি রবার্ট ব্লেক। ছোকরার সঙ্গে কথাবার্তায় একেবারে কিছুই আস্কারা হয় না—যেমন বিনয়ী, তেমনি লাজুক। দশবার দশ রকম প্রশ্নের পরে শিষ্ট-শান্ত একটি জবাব মেলে। নাকি দুঃখ শুনে কর্তাদের দয়া হয়েছে—সেইজন্য নিয়ে নিলেন।

দয়া? চক্ষু কপালে তুলে নটবর বলেন, দয়ার বশে চাকরি দিয়ে দিল, এমন অহৈতুকী দয়া তো কলিযুগে হয় না। সত্যযুগে হয়তো হত। আর চাকরিও যেমন-তেমন নয়, এক্সপোর্টের মেজ বাবু। যে-না-সেই এর জন্যে হাজার টাকা অন্তত বাজে খরচা করবে।

এদিক-ওদিক একবার সতর্ক চোখে দেখে নিলেন, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া বাইরের কেউ আছে কিনা। ঠান্ডা সুরে মিনমিন করে বলেন, হতে পারে হাবা-গবা গেঁয়ো মানুষ, লেখাপড়াই খানিকটা শিখেছে, মাথায় সারবস্তু কিছু নেই। তা যদি হয়, নিশ্চিন্ত। গেঁয়ো গরু নিয়ে বাস করায় বিপদ নেই। আরও এক রকম হতে পারে ভায়ারা—অতিশয় ঘড়েল মানুষ, বাইরে যেমন দেখা যায় ভিতরটা তার উল্টো। পরিচয় পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত গুণে-গেঁথে হিসেব করে কথা বলবে। কুচ্ছো নিতান্তই করতে হয়তো নিজেদের নিয়ে করো, কর্তাদের ছুঁয়ে কদাপি কিছু বলবে না।

ঢোক গিলে দম নিয়ে আবার বলেন, হাল আমলের আলগা-মুখ ছেলেছোকরা তোমরা— মনে যেটা এলো, মুখে বলে খালাস। সাহেব কর্তারা ছিল, বাংলা কথার মার-প্যাঁচ বুঝত না। এখন সব দেশি কর্তা, কোন্ কথাটা হয়তো কানে গিয়ে পেঁাছেছে। চর বসিয়ে দিল অফিসের মধ্যে—কান পেতে সবিস্তারে শুনে নিয়ে কর্তাদের কাছে পুট-পুট করে লাগাবে।

এতখানি কেউ অবশ্য বিশ্বাস করে না। দ্বিজদাস বলে, চর হোক যা-ই হোক, আপনার কি দাদু? কড়া লাগাম আপনার মুখে, ভুলেও কখনো একটা বেফাঁস কথা বেরোয় না।

তোমরাও লাগাম আঁটো—ভালোর তরে বলছি। গোলামি কাজ করবে আর নবাবি বুলি ছাড়বে—ক্ষতি বই তাতে লাভ হয় না। মুখে লাগাম কষে আছি বলেই উঠতে উঠতে আমি এইখানে। কিন্তু সঙ্গদোষেও সর্বনাশ হয়—কার মুখের কথা কোন্ নামে দরবারে উঠবে, কে বলতে পারে?

নানান আলোচনা শিশিরকে নিয়ে আচমকা এমনি দ্বিতীয়-কেরানি হয়ে বসার দরুন। উপমা দিয়ে বলা যায়, অফিসের নিস্তরঙ্গ তড়াগে উপরওয়ালারা সহসা এক পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন।

বীথি চুপিসারে পূর্ণিমাকে বলে, স্পাই ঢুকিয়ে দিয়েছে নাকি আমাদের কথাবার্তা চাল চলনের নোট নেবার জন্য। এতো বড় বিপদ হল পূর্ণিমা-দি।

পূর্ণিমা বলে, তা আবার আমাদেরই সেকশনে। দাদুর হুকুম হয়েছে, হলঘরের কোণে তার জন্যে নতুন টেবিল পড়বে। তোমার সিটের সামান্য দূরে।

বীথি বলে, বয়কট করব আমরা ভদ্রলোককে। কথা বলব না কেউ, কাছে যাবো না, মেলামেশা করব না—

পূর্ণিমা বলে, ঠিক উল্টো। বেশি করে মেলামেশা করব। ডেকে ডেকে কথা বলব। গায়ে গড়িয়ে ভাব জমাব।

দুচোখে অগ্নিবর্ষণ করে বীথি বলে, মানে?

নটবর বাবুর রটনা বেদবাক্য বলে ধরে নিও না। আমি ভার নিচ্ছি। চরের উপরে চরবৃত্তি করে হাড়হদ্দ জেনে পাকা খবর দেবো তোমাদের।

শিশিরের বড় ইচ্ছে করে, সুনীলকান্তির বাড়ি অবধি গিয়ে তার মুখের উপর সুখবরটা শুনিয়ে আসে : বলেছিলেন বড়দা, দাম-কাকার আলমারিতে চাকরি থরে থরে সাজানো থাকে, বের করে দিয়ে দেবেন একটা। তাই সত্যি সত্যি দিলেন কিনা দেখুন। যে সে চাকরি নয়, এক্সপোর্ট সেকশনের সেকেন্ড ক্লার্ক। বিশ বছর অবিরাম কলম চালিয়েও লোকে এই উঁচুতে উঠতে পারে না—দাম-কাকা যেন মেঘলোক থেকে আলগোছে আমায় চূড়োর উপর নামিয়ে দিলেন।

ইচ্ছেটা এমনি, কিন্তু সাহসে কুলায় না সুনীলকান্তির মুখোমুখি হতে। কষ্ট করে সুনীল অত ভোরে উঠে পড়েছিল, স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে কথা শোনানোর জন্য : মমতার খাতিরে রাখছি বটে তোমার কনে, কিন্তু এক মাসের উপর আধখানা দিনও ফাউ দেবো না। চাকরি হল, এর উপরে একটা ঘরের ব্যবস্থা হলেই অকুতোভয়ে গিয়ে পড়বে, কুমকুমকে তুলে নিয়ে গটমট করে চোখের উপর দিয়ে এসে রিক্সায় চাপবে। এবং শুনিয়ে আসবে : এক মাসের বেশি হয়নি তো বড়দা, দেখুন দিকি হিসাবপত্তোর করে।

অমিতাভর সেই মেসে গিয়ে উঠেছে। চাকরে লোকেরা মেস করে আছে—বেকার অবস্থা ঘুচে শিশিরেরও চাকরি হওয়ার দরুন মেসে খাতির বেড়েছে। পুরোপুরি দলের হয়ে গেল এবারে সে। আছে অমিতাভর সঙ্গে একটি সিটে। লাটুবাবু রিটায়ার করে মেস ছাড়বেন। সেই সিট নিয়ে শিশির পুরো মেম্বার হতে পারবে। বেশি নয়—মাস তিন-চারের ভিতর এসে যাবে সেই সৌভাগ্য।

তিন মাস থাকছে কিনা সে অত দিন! এক মাসের উপর আধেলা দিনও দয়া করবে না, সুনীলকান্তি নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। শিশিরের পাত্তা না পেলে তখন স্ত্রীর উপরে হামলা দেবে। চাকরি হল, ভাবনা এবার দুশমন ঐ মেয়েটা নিয়ে। রাত্রের ঘুম দুঃস্বপ্নের মতো সে হরে নিয়েছে।

মেসের ঠাকুরকে সেই পুরানো প্রস্তাব মনে করিয়ে দেয় : পঁচিশ টাকা হিসাবে তিন বছরের ন'শ টাকা আগাম পেলে বাচ্চার সমস্ত ভার নেবে বলেছিলে?

ঠাকুর নারাজ। বলে, চাকরি-বাকরি করেন না তখন, উটকো মানুষ কখন আছেন কখন নেই—সেইজন্যে কথা একটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। জানি, বিশ মণ তেল পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। এখন সোনার চাকরি হয়েছে, আপনার মেয়ে আমাদের ঘরে থাকবে কেমন করে?

শিশির বলে, তাহলে যেমন ঘরে থাকতে পার, তেমনি কোন এক খানে নিয়ে ওঠাও। সে ঘরে আমি শুদ্ধ যাতে থাকতে

পারি। তুমি কর্তা হয়ে থাকবে। ঐ পঁচিশ টাকাই মাইনে।

তার মানে বাবু, ঘর দেখে নিতে বলছেন এই শহরে। ঘরের গতিক জানেন না। ঘর দিন একখানা, আর আকাশের চাঁদ পেড়ে দিন। মানুষে চাঁদ ফেলে বাসের ঘর নিয়ে নেবে। ঘরের অভাবে বাবু, কলকাতার অর্ধেক ছোঁড়াছুঁড়ি বিয়ে করতে পারছে না। ছোঁড়ারা রোয়াকবাজি করে, ছুঁড়িগুলো সিনেমার ছবি দেখে বেড়ায়।

ঠাকুর আরও বলে, চার দেয়াল আর মাথায় ছাত—দৈবে-সৈবে ঘর মিলে গেল তো পিঁপড়ের মতন লাইন দিয়ে লোক ঢুকে পড়বে। মেজের উপর এক প্রস্থ, তাদের উপর দিয়ে চৌপায়া-তক্তাপোশ পেতে এক প্রস্থ—আবার বাড়ি থেকে মাচান ঝুলিয়ে মই বেয়ে তার উপরে উঠে ঠাঁই নিচ্ছে—এমনও দেখা আছে বাবু।

ভেবে-চিন্তে শিশির মমতার নামে চিঠি দিল একটা : বড়-দি, নিজে গিয়ে পদতলে প্রণাম করে সুখবর জানানোর কথা, কিন্তু এর পরে আর ছুটিছাটা নেই। চাকরিতে বসে সময় একটুও পাবো না। দায়িত্বের কাজ—ডেপুটি-ম্যানেজার, গোড়াতেই বলে দিলেন। প্রয়োজন হলে অফিসের পরেও খাটতে হবে। রবিবারেও বেরুতে হতে পারে। কুমকুমকে আপনাদের আশ্রয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, এই ক'দিন অহোরাত্র আমি বাসা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লেন, বাই-লেন, পাকা-ঘর, বস্তি-ঘর খুঁজতে কোথাও বাদ রাখছি নে। লাখ লাখ বাড়ি, এত বড় শহরে—আমি চাচ্ছি পুরো বাড়ি নয়, একখানা দু-খানা ঘর। সে জিনিস এত দুর্লভ, ধারণা ছিল না। বাসার একটা সুরাহা হলেই শ্রীচরণে হাজির হব, তিলার্ধ আর দেরি করব না।

শিশিরের টেবিল বরঞ্চ বীথিরই খানিকটা কাছাকাছি, পূর্ণিমা থেকে অনেকখানি দূরে। দায় যখন স্বেচ্ছায় কাঁধ বাড়িয়ে নিয়েছে—সেই দূর থেকে পূর্ণিমা আড়চোখে বারম্বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পয়লা দিনটা এমনি চোখের দেখা দেখে ভাব বুঝে নিল। বোঝবার কি আছে ছাই—সর্বক্ষণই তো ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ ছাড়া কোন-

কিছুতে কৌতূহল নেই। একগাদা লোক এক ঘরে।—কারো পানে চোখ তুলে তাকায় না একবার। তিন-চারটে যুবতী মেয়ে আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করছে, তাদের পানেও না। এই মানুষ চরবৃত্তি করবে নাকি—চোখে দেখবার আগে বীথি কত রাগ করেছিল—দেখার পরে আর রাগ নেই। করুণা আসে হাঁদারাম মানুষটার উপর।

দ্বিতীয় দিনও অবিকল এমনি। টিফিনের সময়টা—হয় ক্লান্তি, নয়তো ক্ষিধে পেয়ে গেছে—দু'দিনের মধ্যে বোধকরি এই সর্বপ্রথম ফাইল থকে মুখ তুলল। সবাই সিট ছেড়ে যাচ্ছে দেখে সে-ও বেরুল। আর তক্কে তক্কে রয়েছে তো পূর্ণিমা—কোন্ দিক দিয়ে সাঁ করে এসে তার পাশটিতে দাঁড়ায়।

আসুন শিশিরবাবু, পরিচয় করা যাক। নাম জানলাম কি করে বলুন দিকি? পারলেন না। জ্যোতিষ জানি আমি, মানুষের মুখ দেখে পড়ে ফেলি।

হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে মুহূর্ত পরে নিজেই আবার বলে দেয়, অ্যাটেনড্যান্স-খাতায় নাম দেখে নিয়েছি। কিন্তু শুধু নামে তো পরিচয় হয় না।

পরিচয় না হয় হল, কিন্তু বড় বেশি যে কাছ ঘেঁসে আসে। বিপন্ন শিশির সরে গেল তো কথাবার্তার মাঝে অনামনস্কভাবে আরও খানিক এগিয়ে আসে পূর্ণিমা। কী কান্ডরে বাবা, এক-অফিস লোক কিলবিল করছে—সে বিবেচনাতেও সমীহ করবে না? চাকরি-করা মেয়েগুলো কী!

পূর্ণিমা প্রশ্ন করে : থাকেন কোথা আপনি?

(তা বই কি! ঠিকানা বলি, আর সেই অবধি ধাওয়া করো। কিছুই অসম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে।) ভাসা-ভাসা রকমে অনিচ্ছুক কণ্ঠে শিশির জবাব দেয় : বেলগাছিয়ার দিকে।

অনেক দূর থেকে আসেন। ট্রামে-বাসে যা ভিড়—কষ্ট হয় না?

হয়ই তো। কাছে-পিঠে একটা ঘর পেলে হত। কিন্তু কে খুঁজে দেয়? পাড়াগাঁয়ের মানুষ, জানাশোনা নেই তো তেমন।

গাঁয়ের মানুষ, সেটা আর বলে দিতে হবে না। মুখে বেশ স্পষ্ট করে লেখা আছে।

হেসে পড়ল পূর্ণিমা। শিশিরের সরে-যাওয়া এবং পূর্ণিমার কাছ ঘেঁসে এগুনো—সেই খেলা নিঃশব্দে চলছে। হেসে পূর্ণিমা বলে, আর সরবেন কোথা? কংক্রিটের নিরেট দেয়াল—ওর মধ্যে ঢুকে যেতে পারবেন না।

না, না—করছে শিশির বেকুব হয়ে গিয়ে। তবে তো যাদুমণি অনামনস্কতা নয়—ইচ্ছে করেই ঘাড়ের উপর পড়া। মেয়েরা সব কী হয়ে যাচ্ছে, লজ্জা-সরম পুড়িয়ে খেয়েছে—ঘাটে-মাঠে রুজিরোজগারে বেরুনোর ফলে এমনি দশা।

পূর্ণিমা ভরসা দেয় : ঘর আমি দেখে দেবো। আমাদের অনেক জানাশোনা।

(যখন দেবে, তখন দেবে। মানুষজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আপাতত রেহাই দিয়ে নিজ কর্মে কেটে পড়ো দিকি!)

দিচ্ছে রেহাই—বয়ে গেছে। বলে, আসুন না—ক্যান্টিনে গিয়ে চা খেয়ে নেওয়া যাক একটুখানি।

শিশির ঘাড় নেড়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দেয় : আজ্ঞে না, চা আমি খাইনে—

মোটেই না?

যৎসামান্য। না খাওয়ার মতন। ভরদুপুরে চা আমার একদম সহ্য হবে না। মারা পড়ব।

না খেলেন। চায়ের বাটি সামনে রেখে আলাপ-পরিচয় হবে। চা ঠান্ডা হয়ে পড়ে থাকবে, ফেলে দেবে তারপর।

কমলি নেহি ছোড়ে গা। হাত বাড়িয়েছে—সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ ধরবে নাকি? হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানবে সর্বচক্ষুর সামনে?

ফুটবল খেলায় খুব দক্ষ শিশির। বিপক্ষ দল ঘিরে ফেলেছে, বল নিয়ে সুকৌশলে তার মধ্য থেকে কাটান দিয়ে বেরিয়ে বিস্তর খেলায় দর্শকের হাততালি পেয়েছে। সেই খেলা আজও খেলল—দু-পা দ্রুত এগিয়ে কিঞ্চিৎ বাঁয়ে ঘুরে পূর্ণিমার কবল থেকে সুড়ুৎ করে একেবারে নিজের সিটে। নির্ভয় নিরাপদ আসন। টিফিনের সময়টা, মতলব ছিল, এদিক-সেদিক একটু চক্কোর দিয়ে বেড়াবে—সেটা হল না দুর্ধর্ষ বেহায়া ঐ রমণীটির জন্য।

ভবতোষকে নটবর চোখ টিপে কাছে ডাকলেন : শোন হে শোন। ছিপ ফেলে বসে থাকার কথা বলতাম, তার উপর দিয়ে যাচ্ছে এখন। মাছেরা সব সেয়ানা হয়ে গেছে, চারে এসে টোপ গিলতে চায় না। মা-লক্ষ্মীরা মরীয়া হয়ে জলে নেমে তাড়া করেছে, তাড়া খেয়ে মাছ তখন দিশা করতে পারে না—

বিস্ময়ের ভান করে ভবতোষ বলে, বলেন কি দাদু?

একটার অবস্থা আজ স্বচক্ষে দেখলাম। লং-সাইটের চশমা পরে নির্ঝঞ্ঝাট বুড়োমানুষ একটেরে বসে থাকি—নজরে কোন কিছু এড়ায় না। বাপরে বাপ, অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেই কান্ডবান্ড—ছুটি হওয়া অবধি সবুর সয় না?

রসের আন্দাজ পেয়ে এদিকে-ওদিকে আরও কিছু কান খাড়া হয়েছে। নটবর বলেন, টিফিন খেতে যাচ্ছে—বাঘিনী হয়ে সেই সময় হামলা দিয়ে পড়ল। ম্যান-ইটার অব কুমায়ুন। ক্ষুধার্ত মানুষ খেয়ে-দেয়ে পেট ঠান্ডা করে আসুক, সেটুকু ফুরসং দেয় না। বুঝে-সমঝে শিকারটি পাকড়েছে ঠিক। জংলি পল্লীগ্রামের আমদানি—রূপ দেখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে। জানে না, ওটা হল শিশি-কৌটোর রূপ। আপিসে আসার সময় রূপসী হয়ে আসে, তালিতুলি দিয়ে পাঁচটা অবধি কোনরকমে টিকিয়ে রাখে রূপ। সন্ধ্যার পরে কি সকালবেলা দৈবাৎ যদি দর্শন হয়ে যায়, সংসারে বৈরাগ্য এসে যাবে।

হাসাহাসি রঙ্গ-রসিকতা চলল কিছুক্ষণ ধরে। এদের চরও একটি-দুটি দাদুর সাকরেদের দলে ভিড়ে আছে। হতে পারে সে চর ভবতোষই। অথবা অন্য কেউ। টুক করে

বীথিকে সে বলে দিয়েছে। ছুটির পর পূর্ণিমা বাড়ি চলেছে, বীথি গিয়ে তাকে ধরে ফেলল : বুড়োটা কি বলেছে শোন। 'ছুটেফোটা কাজকর্ম করবে না, সারাটা দিন কাটে কি নিয়ে?

পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে পড়ল : আমায় নিয়ে বলেছে?

টিফিনের সময় তুমি বুঝি শিশির-বাবুকে পাকড়েছিলে?

প্রচণ্ড এক নিশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা বলে, প্রেমে হিয়া জরজর। চুপচাপ কেমন করে থাক বলো!

মানেটা তাই বটে। তবে বাঘিনী মূর্তি ধরে হামলা দিয়ে পড়েছিলে ভেড়ার মতন নিরীহ মানুষটার উপরে—

আহা রে, নিরীহ গন্ডল একটি—দাদুর দয়ার শরীর, দুঃখে প্রাণ কেঁদেছে।

পরের দিন পূর্ণিমা খড়কে-ডুরে পরে অফিসে এসেছে, এ শাড়ি কিশোরী মেয়েকে হয়তো মানায়—তবু। এবং শাড়ির সঙ্গে ঝকমকে ব্লাউজ। নটবর চশমা খুলে বার-বার তাকাচ্ছেন।

এক সময় ফাইল হাতে করে পূর্ণিমা নিজেই তাঁর টেবিলে এলো। অজুহাত—একটা জরুরি পরামর্শ নিতে এসেছে যেন। কিন্তু কাজের কথার আগেই নিজের কথা। ফিক্ করে হেসে বলে, শাড়িটা কেমন দাদু?

ভাল—

ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে কেনা। ডুরে শাড়ি আর এই হলদে-কালো ছিটের জামায় ঠিক যেন ডোরা-কাটা এক বাঘিনী, তাই বেশ ভাল লাগে আমার। আপনি ভয় পেলেন না তো দাদু?

সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিসটা জানতে এসেছে সেই প্রশ্ন। এবং উত্তরটা নিয়েই ফর-ফর করে নিজের জায়গায় গিয়ে কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ জানান দেওয়া হল : তোমার নিন্দে শুনেছি—যত খুশি বলো গে, গ্রাহ্য করিনে। জানানো হয়ে গেছে বেপরোয়া মেয়েমানুষ দেরি করতে যাবে কেন আর?

নটবর সরাসরি এর পর শিশিরকে ডাকলেন : শোন ভারী, পাড়াগাঁ থেকে এসেছ, শহরের হালচাল কিছু জানো না, আপিসের কাজেও নতুন। কন্দর্পের মতো সঠাম চেহারা—আমি তোমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতকথা বলবার জন্য ডেকেছি।

শিশির বিগলিত কণ্ঠে বলে, সে আমি জানি। মাথার উপরে কেউ আমার নেই—ডেপুটি সাহেব আপনাকে ডেকে সেই যে আমায় সঙ্গে দিয়ে দিলেন, তখন থেকে অভিভাবক বলে আপনাকে জ্ঞান করি। কি আদেশ আছে বলুন, যথাসাধ্য করব।

বিনয়ের কথাবার্তায় নটবর বিষম খুশি। শহুরে নয় বলেই এমনি। বললেন, তোমায় সতর্ক করে দেওয়া। ছেলেধরার নজর পড়েছে—সামাল, খুব সামাল ভায়া। নইলে পরে পস্তাবে। বিস্তর অঘটন ঘটায় ওরা।

ছেলেধরার নজর, শোনা যায়, বাচ্চা ছেলেপুলের উপরে। এত বয়স পেরিয়ে এসে তার উপরেও কেন সেই নজর—শিশির বিমূঢ়ভাবে নটবরের পানে তাকিয়ে পড়ে। এবং তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পূর্ণিমার সিটের দিকে—

নটবর বলেন, দেখ, বিশ্বাস হল তো? দৃষ্টি দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে তোমার। রক্ত নেই। আহা, কোন্ মায়ের বাছা গো! বাঁচতে চাও তো চাকরি ছেড়ে পালাও এই অফিস থেকে। তা ছাড়া উপায় দেখি নে।

বিজয়া দেবী রাগ করে চলে গেলেন। সেই সময়টা তাপস কলকাতায় নেই, রোগী দেখতে পুরী চলে গিয়েছিল। বড়লোক রোগী, অপূর্ব রায়ের পুরানো ঘর, ডাক্তার রায় মারা যাবার পর থেকে তাপস দেখে আসছে। বায়ু-পরিবর্তনে পুরী গিয়ে রোগের কী সব নতুন লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। ভয় পেয়ে তাঁরা তাপসকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

ফিরে এসে তাপস স্বাতীর কাছে সব শুনল। পূর্ণিমাকে বলে, স্বাতীর মা এসেছিলেন শুনলাম। কি বলে দিয়েছিস ছোড়-দি?

এতগুলো দিন অতীত হয়েছে, পূর্ণিমার মনের গরম তবু কাটেনি। বলে, ভুল হয়ে থাকে তো যা বলবার বলে দি গে তুই।

তাপস বলে, শেষ জবাবটা নাকি আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে শুনলাম। তোর কথাই যেন সব নয়। এত উন্নতি আমার কদ্দিন থেকে—কিসে এত বড় হয়ে গেলাম, বল্ দিকি। কেন এমন পর হলাম? স্বাতী এসেছে কার কথায়—হাঁ-না আমি কিছু বলতে গিয়েছিলাম?

পূর্ণিমা বলে, স্বাতীকে এর মধ্যে জড়াবি নে। ঐ তোর হয়েছে তুরুপের তাস—ওর নাম করে সব ব্যাপারে জিতে যাবি। খুব ঠান্ডা মাথায় এই কদিন ভেবে দেখলাম—আগে যেমনধারা ছিল, তেমনটি আর চলবে না। মা কিছুই অন্যায় বলেন নি। ডাক্তার-মানুষ তুই এখন, রোগীপত্তর বাড়িতেও এসে পড়তে পারে। পারে কেন, আসবেই। শুধু গুণ থাকলে হয় না, ঠাটকাট চাই। মা সত্যি কথাই বলেছেন, ভেক নইলে ভিখ মেলে না। নিউ-আলিপুরের ফ্ল্যাটে তোরা চলে যা।

তুই যাবি তো সেখানে? তুই ঘাড় নাড়ছিস, আমি তবে যেতে যাব কেন রে? স্বাতীই বা কেন যাবে?

বিবেচক শাশুড়ির হিতকথা কিছুতেই কানে নেবে না। বেশি বলতে গেলে উল্টো মানে করে : বুঝেছি, বুঝেছি ছোড়দি, দু-চক্ষে দেখতে পারিসনে তুই আর এখন। এক-অন্নে রাখবিনে, পৃথক করে দিচ্ছিস।

স্বাতীকে বলতে গেলে সে কেবল হাসে : আমার ওসব বুঝিনে ছোড়দি। থোড়-ছেঁচকি কি ভাবে রাঁধতে হয় বলে দিন—ঐ অবধি বুঝব, তার উপরে নয়।

অবশেষে—যে ভয় করা গিয়েছিল—একদিন সত্যিই ডাক্তার ডাকতে এই বাড়ি অবধি হানা দিল। ঠিকানা ডাক্তারখানা থেকে পেয়েছে—মোড়ের উপর মোটর রেখে গলিতে ঢুকে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বার দুয়েক এ বাড়ির সামনে দিয়েই গেছে, কিন্তু এহেন স্থানে ডাক্তার অপূর্ব রায়ের জামাই থাকে, ভাবতে পারে নি। দুই ভদ্রলোক—চালচলন ও বেশভূষাতেই মালুম হয় দস্তুরমতো ওজনদার ব্যক্তি। রোগীর বাড়াবাড়ি অবস্থা, ডাক্তারকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবেন। তাপস তখন স্নান করছে। বাইরের ঘরে তারণের শয্যার পাশে নড়বড়ে চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর থেকে তারণই জেদ ধরলেন : না, এ জিনিস চলবে না। ঐ দরের মানুষ এঁদোঘরে জবুথবু হয়ে বসে রইলেন—লজ্জায় আমারই মাথা কাটা যায়।

তাপস বলে, বাড়ি তো খুঁজছি বাবা। কতজনকে বলে রেখেছি। জানো তো, এ বাজারে বাড়ি পাওয়া কত কঠিন।

ওসব জানিনে আমি। এইটে জানি, এভাবে প্রাকটিস চলবে না তোর—চলতে পারে না।

একটু ভেবে তারণ আবার বলেন, কুটুম্বর ফ্ল্যাটে উঠতে আপত্তি, অন্য বাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না। এই বাড়িই তবে খানিকটা ভদ্রস্থ করে নে। পুরো বাড়ি হয়ে না উঠলে এই বাইরের ঘরটা অন্তত। এইখানে চেম্বার করে আপাতত বসতে থাক্।

বাবার তাড়া খেয়ে তাপস আর কিছু বলতে পারে না। বাইরের ঘরের কলি ফিরিয়ে দেয়ালে ডিসটেমপার করে কিছু ভাল ফার্নিচারে সাজিয়েগুছিয়ে নেওয়া হবে, বাপে আর মেয়েয় পাকাপাকি প্ল্যান করে ফেলেছে। স্বাতীর মতামত নেই, তবে বসে থাকে এইসব পরামর্শের মধ্যে। এবং চরবৃত্তি করে তাপসের কাছে চুপিসারে ফাঁস করে দেয়।

(ক্রমশঃ)

রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে

নিখিল ভারত চারুকলা ও কারুশিল্প সমিতির ৩৬তম বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে গত সপ্তাহে। সমিতির নিজস্ব ভবনে দুটি প্রদর্শনী হলে মোট ৪৯জন শিল্পীর ৭২টি কাজ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ৭২টি কাজের মধ্যে ৩টি তেলরঙা, ৪টি জলরঙা, ২টি গ্রাফিক এবং ১টি ভাস্কর্য পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য ২৫০. টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্তদের দলে আছেন শ্রীমতী সান্ত্বনা গুহ তেলরঙায়, শ্রীশরদিন্দু রায় জলরঙায় এবং শ্রীগণেন গাঙ্গুলি গ্রাফিকে। তেলরঙায় প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীওমপ্রকাশ শর্মা 'সূর্যাস্তের স্বর্ণ' ছবির জন্য। জলরঙায় প্রথম পুরস্কারটি শ্রীখোদিদাস বি পারমার পেয়েছেন 'জমি ও জীবনের' জন্য। 'মূক' এই ভাস্কর্যের জন্য শ্রীমেথারাম ধারমানি পুরস্কার পেয়েছেন।

সমিতি প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যফলক পুরস্কার দিয়ে থাকেন। বিচারকদের চোখে প্রতিযোগিতায় হাজির কাজগুলির মধ্যে কোনটিই এ বছরের শ্রেষ্ঠ এবং উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়নি। কাজেই রাষ্ট্রপতির রৌপ্যফলক এবার আর কাউকে দেওয়া হয়নি। ডাঃ বি পি পাল [illegible] এবং শ্রী কে কে নায়ার, শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে সদস্য হিসাবে নিয়ে গঠিত এক বিচারকমন্ডলী ১৮১জন শিল্পীর ৫০০টি কাজ বিচার করে দেখেছিলেন। তাঁদের বিচারে প্রদর্শনযোগ্য ৭২টি কাজের মধ্যে দশটিকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

চিত্রকলা সমালোচকরা এবং তথাকথিত চিত্রকলা রসিকরা সর্বভারতীয় এই প্রদর্শনীতে

'ল্যান্ডস্কেপ' শিল্পী ঃ গোকুল কৃষ্ণ দেমবী

'বৃষ্টির পর সূর্যের আলো' ঃ শিল্পী শরদিন্দু সেনরায়

●

নয়াদিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ বছরের 'সোভিয়েট দেশ নেহরু পুরস্কার' প্রাপক সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের পুরস্কার বিতরণ করেন। পুশকিন, শেখভ, টলস্টয় প্রমুখ বিশ্বখ্যাত রুশ সাহিত্যিকদের আত্মচরিত সংক্রান্ত রচনাবলীর জন্য শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু শ্রীমতী গান্ধীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

ঢুকে কি দেখবেন বলতে পারি না। তবে এই লেখকের মত সাধারণ দর্শকরা হতাশ হবেন। প্রথম কারণ ছবিগুলির অধিকাংশই দুর্বোধ্য, এবং এগুলি যে ভারতীয় তা বুঝার উপায় নেই। এবং কোন ছবিতেই শিল্পীর নিজস্ব কোন ছাপ নেই।

ছবিগুলির অধিকাংশই এদেশে যাকে বলা হয় 'আধুনিক', তাই। বছর দশেক আগে এই আধুনিক ছবিগুলির মধ্যে ইউরো-আমেরিকার প্রখ্যাত শিল্পীদের ছাপ দেখা যেত, এখনকার আধনিক ছবিগুলিকে ইউরো-আমেরিকার সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত ছবিগুলির নকল বলে মনে হয়। ড্রয়িং জানেন না, তুলি ধরতে শেখেন নি, রং চেনেন না এমন একশ্রেণীর তরুণ-তরুণী শিল্প-জগতে প্রবেশ করেছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় যে পাঁচশটি কাজ এসেছিল তা এ'দেরই হাত থেকে। এই পাঁচশটির মধ্য থেকে যে ৭২টি কাজ প্রদর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তার মধ্যেও এমনি অনেকগুলি কাজ থেকে গেছে।

সংখ্যায় অল্প হলেও কয়েকটি ভালো কাজ অবশ্য চোখে পড়লো। চিত্তরঞ্জন দাসের 'মুসকিল আসান', গোকেল কৃষেন দেমবীর 'ল্যান্ডস্কেপ', অরূপ দাসের 'দন্ডায়মান আকৃতি', এম এস যোশীর 'মেঘ', শরদিন্দু সেনরায়ের 'বৃষ্টির পর সূর্যের আলো', কে এস ভর্মার 'জীবনের ছন্দ' প্রভৃতি।

সোবিয়েত ল্যান্ড
নেহেরু পুরস্কার

সোবিয়েত-ভারত সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে ভারতে সোবিয়েত রাষ্ট্রদূতাবাস থেকে প্রকাশিত 'সোবিয়েত ল্যান্ড' পত্রিকা কয়েকজন ভারতীয় সাহি-ত্যিক এবং সাংবাদিককে নেহরু পুরস্কার দিয়েছেন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের দলে আছেন তেলেগু কবি শ্রীশ্রী, হিন্দী কবি এইচ আর বচ্চন, উর্দু সাহিত্যিক কৃষ্ণ চন্দ্র, বাঙালী সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, অসমীয়া সাহিত্যিক শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস, ওড়িয়া সাহিত্যিক অনন্ত পট্টনায়ক প্রভৃতি। এ'দের পুরস্কারদান এবং সম্বর্ধনার জন্য নয়া-দিল্লীর আইফ্যাকস্ হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল গত ১৫ই নভেম্বর। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কার বিতরণ করেছিলেন।

নেহেরু পুরস্কার উপলক্ষ্যে নয়া-দিল্লীতে সমাগত ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা তাঁদের সম্মানের জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন সম্বর্ধনা সভা এবং বৈঠকে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার এবং ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ পেয়ে-ছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে অন্যান্য ভাষার সাহিত্যিকদের বিশেষ কৌতূহল লক্ষিত হয়। একাধারে কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু ঘরোয়া আলো-চনায় তাঁদের এ কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করেন।

নেহেরু পুরস্কারের অঙ্গ হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক সাংবাদিকদের দুই সপ্তাহের জন্যে রুশ দেশে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্ভবতঃ আগামী গ্রীষ্মে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে।

—বিনয় চট্টোপাধ্যায়
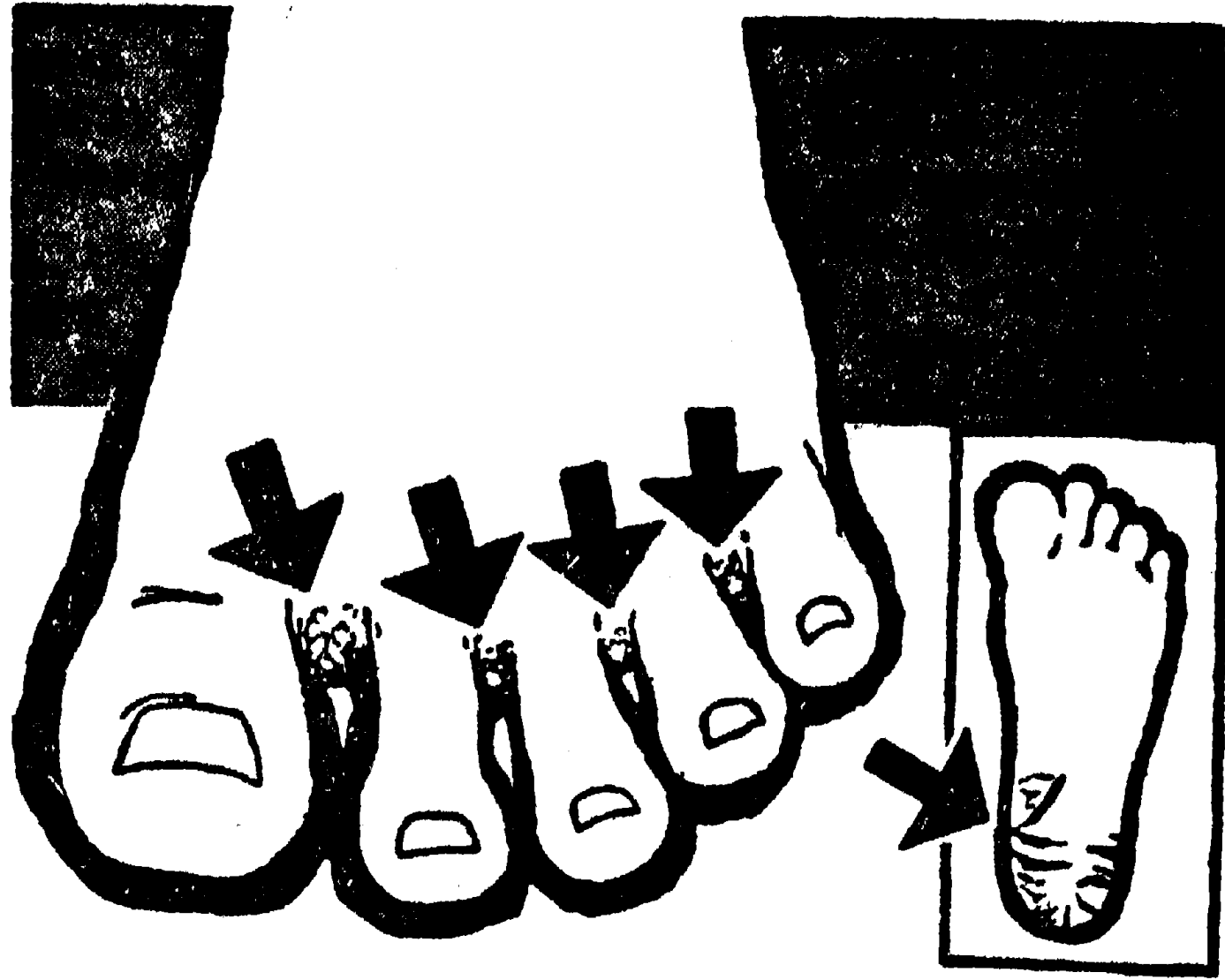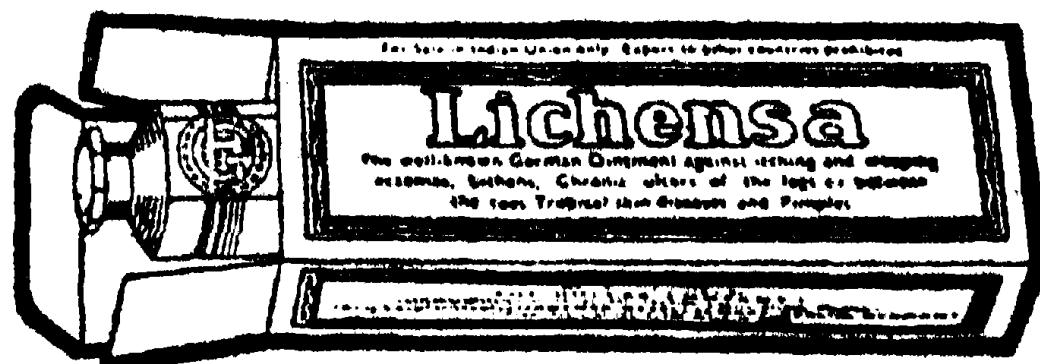
দেশে বিদেশে

মার্কিন গম : দড়ির টান

প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশকে সাহায্যদানের ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করছে মার্কিন সাংবাদিকরা তার নাম দিয়েছেন "aid on short strings", অর্থাৎ এই সাহায্যের পিছনে দড়ির টান থাকবে বটে; তবে সেটা বড় রকমের টান নয়, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট টান দেওয়া হবে মাত্র।

মার্কিন গমের পিছনকার এই দড়ির ছোট একটা টান সম্প্রতি ভারতবর্ষ অনুভব করেছে। ছোট হলে কি হবে, এই এক টানেই ভারতবর্ষের প্রায় হোঁচট খাওয়ার দাখিল (অবস্থা) হয়েছে। মার্কিন গমের জাহাজের উপর ভারতবর্ষ যে আজ কত অসহায়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সেটা আমেরিকার এই এক মোচড়েই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে চুক্তি এখন চালু আছে সেই চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন বন্দর থেকে শেষ গমের জাহাজ ভারতের বন্দরে এসে পৌঁছবে ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ আজ থেকে দুই মাসের মধ্যে। তার পর কি হবে? ভারতবর্ষ খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, সে আশা ত এখনও দূর-অস্ত্।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারত সরকার গত জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন গম সরবরাহ করার জন্য আর একটি চুক্তি করার প্রস্তাব দিয়েছেন। নয়াদিল্লীতে সংবাদ আসছিল যে, ভারত সরকারের এই প্রস্তাব একে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ ও পররাষ্ট্র বিভাগের এবং এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের অনুমোদন লাভ করল। কোন পর্যায়ে ভারত সরকারের এই প্রস্তাব যে সেদেশে কোন বাধা বা আপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে এমন কোন ইঙ্গিত ছিল না। সর্বশেষ সংবাদ ছিল যে, প্রস্তাবটি প্রেসিডেন্ট জনসনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন খাদ্য সরবরাহ চুক্তি সম্পাদনের পরও সেই চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষে খাদ্যশস্য এসে পৌঁছতে কমপক্ষে দেড় মাস সময় লাগবে। এদিকে ভারতবর্ষের এমন অবস্থা যে, বিদেশ থেকে খাদ্যের জাহাজ নিয়মিত এসে না পৌঁছলে এক মাস কি করে চলবে কেউ বলতে পারে না। প্রেসিডেন্ট জনসন তখন অস্ত্রোপচারের পর তাঁর টেক্সাসের গ্রামের বাড়ীতে বিশ্রাম করছিলেন। কিন্তু তিনি নূতন চুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করবেন না, এমন মনে করার কোন কারণ কেউ দেখতে পান নি।

প্রথম সন্দেহ দেখা দিল গত ১৮ই নভেম্বর ওয়াশিংটনে এক জনসভায় মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্কের এক মন্তব্যের ফলে। সেই সভায় রাস্ক একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, পর পর দুই বৎসরের খরার ফলে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে যে গুরুতর খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন; কিন্তু ২০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করার জন্য ভারতের অনুরোধ যে কবে রক্ষিত হবে তা তিনি বলতে পারেন না।

প্রায় এই সময়েই জানা গেল যে, মার্টিন আবেল ও আর্থার টমসন নামে মার্কিন কৃষি দপ্তরের দুজন অফিসার সপ্তাহখানেক আগে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছে সরেজমিনে অনুসন্ধান করার জন্য।

২০ নভেম্বর তারিখে দিল্লীর "হিন্দুস্থান টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে প্রথম হদিস পাওয়া গেল যে, টেক্সাসের খামারবাড়ী থেকে দিল্লীকে সম্ভবত রশির টান দেওয়া হচ্ছে। পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থিত সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে বলা হল যে, চারটি কারণে প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতকে নতুন করে খাদ্যশস্য যোগান দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে গড়িমসি করছেন — (১) ম্যানিলা সম্মেলনের সঙ্গে একই সময়ে নয়াদিল্লীতে ভারতবর্ষের উদ্যোগে ইন্দিরা-নাসের-টিটো বৈঠক আহ্বান করা হয়েছিল এবং সেই বৈঠক থেকে উত্তর ভিয়েৎনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানান হয়েছিল। (২) খাদ্যের জন্য ভারতবর্ষের নিজেরই উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলির সরকারের উপর চাপ দেওয়ার চেয়ে ওয়াশিংটনের দ্বারস্থ হওয়া ভারত সরকার সহজ মনে করেন। (৩) সারের উৎপাদন বাড়াবার জন্য ভারত সরকার যতটা করতে পারেন তা করেন নি। এই বিষয়ে বিশ্ব-ব্যাংক আন্তর্জাতিক তেলের কোম্পানীগুলির সহযোগিতা গ্রহণের যে পরামর্শ দিয়েছিল ভারত সরকার তা গ্রহণ করেন নি। (৪) খাদ্য যোগান দেওয়ার জন্য ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর যে পরিমাণ চাপ দিচ্ছেন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার উপর সে পরিমাণ চাপ দিচ্ছেন না।

২১ নভেম্বর তারিখের "ওয়াশিংটন পোস্ট" তারিখের সংবাদ ওয়াশিংটনস্থিত পি টি আই-এর প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হল এবং সেই সংবাদ এদেশে ব্যাপক প্রচার লাভ করে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। সেই সংবাদে বলা হয়েছিল যে, নতুন খাদ্য সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন করার জন্য ভারত সরকারের অনুরোধ আপাতত চাপা দিয়ে রাখার জন্য স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জনসন আদেশ দিয়েছেন। কারণ:—মোটামুটি "হিন্দুস্থান টাইমস"-এর সংবাদদাতা যা জানিয়েছিলেন তারই অনুরূপ।

আরও জানা গেল যে, শুধু দূরে থেকে দড়ির টান দেওয়াই নয়, সে-টানে ভারতবর্ষ কত দূরে এগিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত দূরে এগোতে রাজী সেটা সরেজমিনে যাচাই করার জন্য কৃষি দপ্তরের আর একজন—এবার অধিকতর উচ্চপদস্থ—প্রতিনিধিকে নয়াদিল্লীতে পাঠাচ্ছেন। সেই প্রতিনিধি হচ্ছেন মার্কিন কৃষি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী মিসেস ডরোথি জ্যাকবসেন। মিঃ আবেল ও মিঃ টমসনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করার জন্য মিসেস জ্যাকবসেন গত ২৩ নভেম্বর দিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন।

"ওয়াশিংটন পোস্ট"-এ প্রকাশিত সংবাদ এদেশে প্রচারিত হওয়ার পর দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম বলেছেন যে, প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতবর্ষের আবেদন চাপা দিয়ে রেখেছেন, এমন কোন সংবাদ সরকারীভাবে তাঁদের জানান হয় নি। কিন্তু দিল্লী ও ওয়াশিংটন, উভয় রাজধানী থেকেই ইতিমধ্যে যেসব সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট জনসন সত্য সত্যই ভারতবর্ষের উপর একটা চাপ দিতে চাইছেন। দুই রাজধানীতেই মার্কিন সরকারী প্রতিনিধিরা অবশ্য একথা অস্বীকার করেছেন যে, ভিয়েৎনামের ব্যাপারে ভারত সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার জন্য অথবা ম্যানিলা বৈঠকের সময় নয়াদিল্লীতে ইন্দিরা-নাসের-টিটো বৈঠক আহ্বান করার জন্য ভারতকে জব্দ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন করে খাদ্যশস্য পেতে হলে যে কতকগুলি বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে সেকথা মার্কিন সরকারী প্রতিনিধিরা গোপন করছেন না।

প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রেস সেক্রেটারী গত ২১ নভেম্বর তারিখে বলেছেন, ভারতকে মার্কিন খাদ্যশস্য সরবরাহ করার ব্যাপারে নতুন করে আর কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে কিনা সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির পর্যালোচনার উপর।

এই পর্যালোচনায় তাঁরা কি দেখবেন? এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি। তবে কতকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় গত অক্টোবর মাসে মার্কিন কংগ্রেসে মার্কিন খাদ্যসাহায্য সংক্রান্ত যে নতুন বিল পাশ করা হয়েছে তার ধারাগুলির মধ্যে। এই ধারাগুলিতে বলা হয়েছে যে, মার্কিন খাদ্য পেতে হলে গ্রহীতা দেশকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। কি কি লক্ষণের দ্বারা এই আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়াস বিবেচনা করা হবে? এর ইঙ্গিত আইনে দেওয়া আছে। যথা:—(১) গ্রহীতা দেশ খাদ্যফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য জমির পর্যাপ্ত ব্যবহার করছে। (নতুন বিলে বলে দেওয়া

হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের স্বার্থে প্রয়োজন মনে না করলে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের কাছে মার্কিন খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হবে না। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য অভিযোগ করেছিলেন যে, সে এক দিকে খাদ্যফসলের জমিতে তুলা চাষ করে সেই তুলার বিনিময়ে রুশ অস্ত্র সংগ্রহ করছে, অন্যদিকে মার্কিন গম আমদানী করে খাদ্যের প্রয়োজন মেটাচ্ছে।) (২) গ্রহীতা দেশকে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের সাহায্যে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক, চাষের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্প গড়ে তুলতে হবে। (৩) এই সব উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

বিলে বলা হয়েছে যে, এই আইন অনুযায়ী যেসব চুক্তি করা হবে তার প্রতিটি চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা বিবরণ থাকতে হবে—যে-বিবরণে লেখা থাকবে কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বন্টনের ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রহীতা দেশটি কি করছে।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই নতুন "স্বাধীনতার-জন্য-খাদ্য" বিলে স্বাক্ষর করে প্রেসিডেন্ট জনসন বলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, গ্রহীতা দেশ নিজের অধিবাসীদের খাদ্যের যোগান দেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য আত্মনির্ভরশীলতার কি বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করছে সেটা সযত্নে বিবেচনা করার পর" তবেই যেন তাঁরা সে-দেশকে খাদ্য বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, সাহায্য শুধু সেখানেই দেওয়া হবে "যেখানে সাহায্যপ্রাপক দেশ ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য করার ইচ্ছার প্রমাণ দেবে।"

যদিও এই বিলের বিধানে নেই তথাপি এই বিল অনুমোদনের জন্য সেটি মার্কিন কংগ্রেসের কাছে পাঠিয়েছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর বাণীতে বলেছিলেন, ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম একটা আন্তর্জাতিক সংগ্রাম হওয়া চাই, কেননা আমেরিকার একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা ঘোষিত এই সব নীতির কথা মনে রাখলে এটা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় মনে হবে না যে, ভারতবর্ষ যখন ক্ষুধার্ত পেটে আমেরিকার গমের জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে, বিহার ও উত্তর প্রদেশের কয়েক কোটি মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের অবস্থার মধ্যে রয়েছে তখন প্রেসিডেন্ট জনসন ভারতবর্ষের কাছ থেকে খাদ্যের আবেদন পেয়ে সে-আবেদন চাপা দিয়ে বসে থাকবেন।

ভারতবর্ষের আবেদন মঞ্জুর করার আগে প্রেসিডেন্ট জনসন নিশ্চিত হতে চান যে, (১) ভারতবর্ষ তার নিজের দেশে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে তার সুষম বন্টন করছে। (২) সে ভিক্ষাপাত্র হাতে শুধু ওয়াশিংটনে নয়, মস্কো, অটাওয়া, সিডনি ও প্যারিসে যাচ্ছে। (৩) বেসরকারী মালিকানায় হবে না, রাষ্ট্রায়ত্ত হবে এ সব বাছবিচার না করে ভারতবর্ষ তার সারশিল্প গড়ে তুলছে।

প্রথম সর্তটি পূরণ করার জন্য ভারতবর্ষ ইতিমধ্যে উদ্যোগী হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিতে জানিয়েছেন যে, এবার সোভিয়েট রাশিয়ায় খুব ভাল ফসল হয়েছে জানতে পেরে তাঁরা সেদেশের কাছে খাদ্য চেয়েছেন। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও খাদ্যের ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। তাদের কাছ থেকে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে সেটা জেনে তাদের কাছে অনুরোধ করে পাঠান হবে।

সোভিয়েট রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে কিনা তার স্থিরতা নেই। কিন্তু এটা আশ্চর্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে ভারতবর্ষের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রী করে ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অর্থনীতিকে পরিচালনা করার অধিকার চাইছে আবার অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্য আনবার জন্য আমাদের উপর চাপ দিচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়া যদি খাদ্যশস্য দেয় তাহলে সেও ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার চাইবে না কেন? এবং যদি সে তা করে তাহলে আমেরিকা কি সেটা মেনে নেবে?

চীনের উপর চাপ

বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সমাজ থেকে চীনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির একটি সম্মেলন আহ্বান করার প্রথম প্রস্তাব এসেছিল ক্রুশ্চেভের কাছ থেকে। এই প্রস্তাবে 'ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির' কাছ থেকে বিশেষ সাড়া না পাওয়ায় প্রস্তাবটি চাপা ছিল। ক্রুশ্চেভের পর ব্রেজনেভ-কোসিগিন জুটিও এই প্রস্তাব নিয়ে আর নাড়াচাড়া করেন নি।

ইতিমধ্যে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শগত কলহ আন্তঃরাষ্ট্রীয় কলহে পরিণত হয়েছে এবং চীনের ভিতরে রেড গার্ড আন্দোলন এই দুই স্তরের কলহকেই একটা নতুন তিক্ততার পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

এখন ক্রুশ্চেভের পুরাতন প্রস্তাবটি আবার নতুন করে উঠছে। লক্ষ্যণীয় যে, এবার প্রস্তাবটি এসেছে মস্কো থেকে নয়, সোফিয়া থেকে এবং সোভিয়েট নেতাদের মুখ থেকে নয়, একজন বুলগেরিয়ান নেতার মুখ থেকে। সোফিয়াতে বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেস হচ্ছিল। এই উপলক্ষে সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৮০টি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি
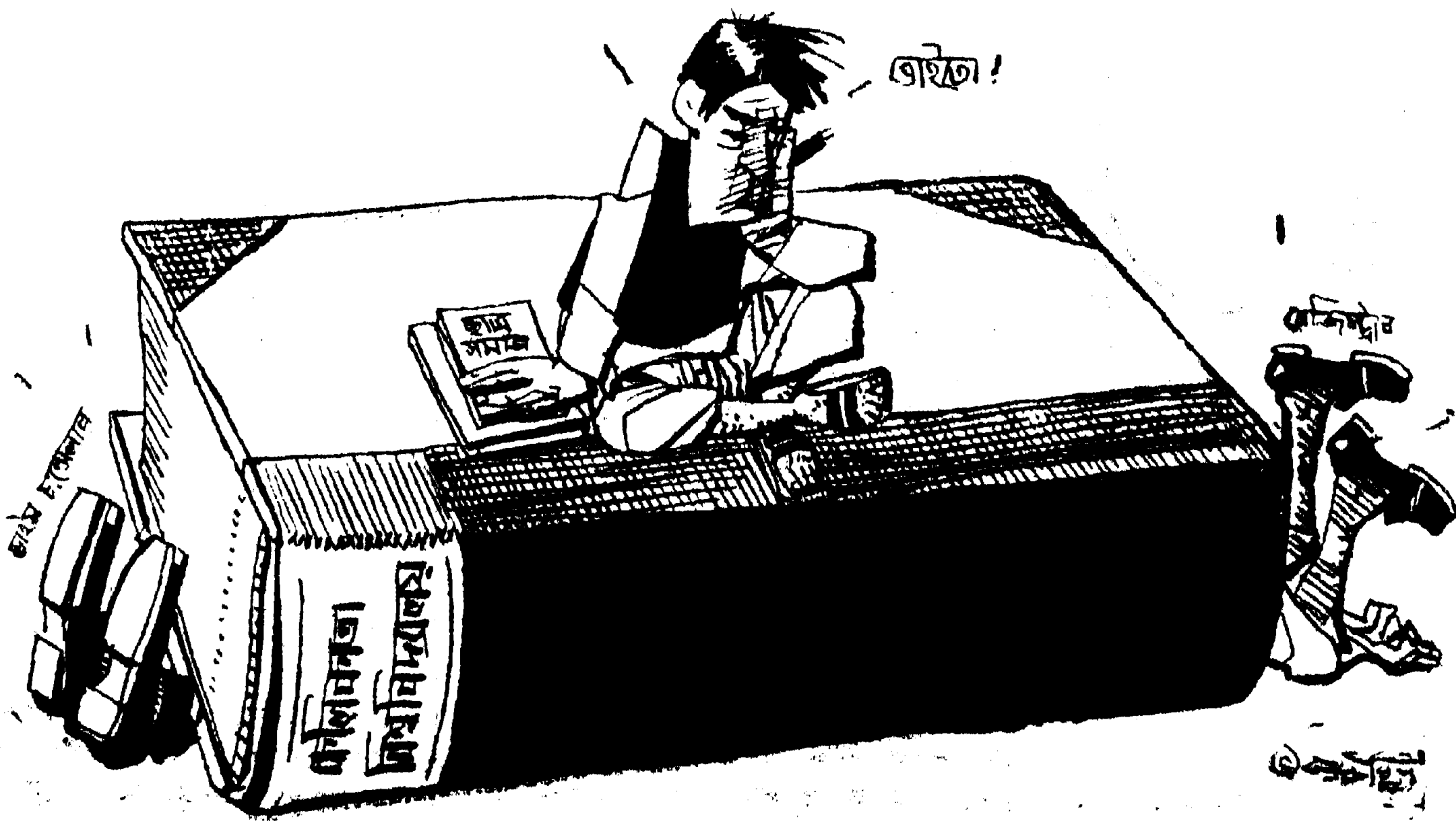
উপস্থিত ছিলেন। এই প্রতিনিধিদের সামনে বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট নেতা টোডোর জিভকভ বললেন, "কম্যুনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক পার্টিসমূহের প্রতিনিধিদের সভা ডাকার পক্ষে অবস্থা দিনের পর দিন অনুকূল হচ্ছে।"

জিভকভের এই আহ্বানের ফল কি হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। (সোফিয়াতে রুমানিয়ার কোজেস্কু বলেছেন, "বিভেদ বাড়ে ও ভাঙ্গনের আশংকা দেখা দেয় এমন কিছু করা উচিত হবে না।") তবে পৃথিবীর কম্যুনিস্ট সমাজে চীনের নিঃসঙ্গতা যে বাড়ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উত্তর কোরিয়া ও জাপানের কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সম্প্রতি টিরানায় আলবেনিয়ার লেবার পার্টির কংগ্রেস উপলক্ষে পৃথিবীর ২৯টি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছেন বলে চীনের পক্ষ থেকে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, এই ২৯টির মধ্যে ২৫টিই "কাগজে পার্টি"। উত্তর কোরিয়া, রুমানিয়া, উত্তর ভিয়েৎনাম, জাপান প্রভৃতি দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা যদিও টিরানা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তথাপি তাঁদের পুরাপুরি চীনপন্থী বলা যায় না, এই পার্টিগুলি বরং সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের মধ্যে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতেই উৎসুক।

চীন যে তার নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন সেকথা টিরানা কংগ্রেসে প্রেরিত মাও সে-তুংয়ের বাণীর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "সারা পৃথিবীতে আমাদের মিত্র আছে। নিঃসঙ্গতার জন্য আমরা ভীত নই; আমরা নিঃসঙ্গ থাকব না—আমরা অজেয়। যে মুষ্টিমেয় জীব চীন ও আলবেনিয়ার বিরোধিতা করছে তাদের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।"

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

খরা ও খাদ্য পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতির এক উদ্বেগজনক চিত্র পেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় অনাবৃষ্টির দরুণ এবার আমন ধানের ফলন শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ কম হয়েছে। বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণায় অনেক অঞ্চলে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ফলন কম হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে খরার ফলে আমন ধানের ফলন মোট ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টন কম হবে।

খরাক্লিষ্ট অঞ্চলে ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এ বাবদ আট কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে। এই অংক বাজেট বরাদ্দেরও তিন কোটি টাকা বেশী। কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছে না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে আরো দু' কোটি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।

কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছে ক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ সম্পর্কে। কারণ কেবল রিলিফের টাকা জুগিয়ে দিলেই দুর্দশার লাঘব হবে না, সাধ্যায়ত্ত দরে খাদ্য যোগাড়ের ব্যবস্থাও থাকা চাই। রাজ্য সরকার এইখানেই ভীষণ রকম বিপদের মধ্যে পড়েছেন। লেভির ধান আদায়ে শোচনীয় ব্যর্থতা এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রয়োজন মত সাহায্য না পাবার দরুণ গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনিং ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে হয়েছিল। এখন খরার ফলে যখন রেশনিং ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে তখন আর তা নতুন করে প্রবর্তনের সাধ্য রাজ্য সরকারের নেই। শুধু তাই নয়। কেন্দ্রের দেয় গমের পরিমাণও হঠাৎ অর্ধেক কমে যাওয়ায় সরকার এক নতুন বিপত্তির মুখে পড়েছেন। এর ফলে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং এলাকাতেও রেশন ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু রাখা যাবে কিনা সেটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সেপ্টেম্বরেও দেড় লক্ষ টন গম পাওয়া গিয়েছিল। অক্টোবরে সেই পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টনে। নভেম্বরে তা আরও কমে গিয়ে একেবারে ৭৫ হাজার টনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিহারের অবস্থা আরও সাংঘাতিক। সেখানে শতাব্দীর প্রচণ্ডতম খরায় রাজ্যের ৫ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষই আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যেখানে রাজ্যের বার্ষিক খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ৭০ লক্ষ ৩০ হাজার টন, সেখানে এ বছর উৎপাদন রবিশস্য মিলিয়ে ধরলেও ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টনের বেশি হবে না। রাজ্যের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এলাকায় শতকরা ৯০ ভাগ খারিফ শস্য নষ্ট হয়ে গেছে। আশংকা করা যাচ্ছে, খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৬৪ লক্ষ টন দাঁড়াবে। যদি এই মুহূর্তে বিপন্ন মানুষগুলির মুখে ক্ষুধার অন্নের সংস্থান করা না যায়, তাহলে, সর্বোদয় নেতা শ্রীকাকাসাহেব কালেলকরের মতে, কমপক্ষে ৬০ লক্ষ মানুষ অনাহার মৃত্যুর কবলে গিয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

বিহারের মত তীব্র না হলেও প্রায় অনুরূপ খরার মুখে পড়েছে উত্তর প্রদেশের পূর্ব অঞ্চল। স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার বা উত্তর প্রদেশের বিপন্ন মানুষের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা একা ঐ সব রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রের কাছ থেকে সাহায্য ক্রমশ বেশি পরিমাণে আসা দরকার। অথচ আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছতে যাচ্ছি যখন কেন্দ্রের পক্ষে রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বর্তমান খরার পরিপ্রেক্ষিতে বিহার সরকার কেন্দ্রের কাছে মাসে মাসে চার লক্ষ টন খাদ্যশস্য চেয়ে বলেছেন যে, ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য না পেলে বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব নয়। অথচ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম জানিয়ে দিয়েছেন যে, মাসে এক লক্ষ টনের বেশি খাদ্য বিহারে পাঠাবার সঙ্গতি কেন্দ্রের নেই।

কেন্দ্রের এই অসহায়তার কারণ মোটামুটি তিনটি : এক, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশ ছাড়াও রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি আরো কয়েকটি রাজ্যে কমবেশী খরার দরুণ খাদ্যশস্যের সরবরাহের ওপর বাড়তি চাপ; দুই, একটি কেন্দ্রীয় শস্যভাণ্ডারের অভাব, এবং তিন, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীতে অসুবিধা। যেহেতু প্রথম দুটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্যে কেন্দ্রকে বহুলাংশে তৃতীয় বিষয়ের, অর্থাৎ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীর ওপর নির্ভর করতে হয়, সেইজন্যে আমদানী ব্যবস্থায় কোনরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে খাদ্য প্রেরণ সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সাম্প্রতিক কঠোরতার বিষয়টি বিচার্য।

মার্কিন সরকার এ বছর ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কোটি টন খাদ্যশস্য ভারতকে সরবরাহ করেছেন। কিন্তু যেহেতু ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৮ থেকে সাড়ে ৮ কোটি টনের বেশি হবার কোন আশা নেই (প্রথমে আশা করা হয়েছিল যে, উৎপাদনের পরিমাণ হবে সাড়ে ৯ থেকে ১০ কোটি টন), এবং যেহেতু ব্যাপক অনাবৃষ্টির দরুণ খাদ্যের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে, সেইজন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এ বছরের জন্যে আরো ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমেরিকার কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী আলোচনায় এ সম্পর্কে মার্কিন সরকারের সাম্প্রতিক চিন্তাধারা এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে তার সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভারত সরকার এখনও আশা করছেন, শেষ পর্যন্ত এবং সময় মত প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করবেন। কিন্তু যেহেতু এই রকম একটা সংকটের মুহূর্তে ঐরকম একটা অনিশ্চিত আশার ওপর নির্ভর করে বসে থাকা যায় না, সেইজন্যে সরকার কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ঐ কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। কানাডা চলতি বছরে দশ লক্ষ টন গম সরবরাহ করেছে। তাছাড়াও কয়েকটি বার্ষিক কিস্তিতে আরো দশ লক্ষ টন পাঠাতে রাজী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য গম ও পশম রপ্তানীর ওপর নির্ভরশীল। তাই সুদীর্ঘ কিস্তিতে ও সুবিধাজনক দরে গম সরবরাহ করা তার পক্ষে অসুবিধাজনক। তা সত্ত্বেও দর এবং কিস্তি শোধের শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করতে সে রাজী হয়েছে, এটা খুবই আশার কথা।

আমার জীবন

মধু বসু

(৪১)

কইম্বাটুর থেকে আমরা যখন মাদ্রাজ পেঁাছলাম তখন বন্যার জল প্রায় নেমে এসেছে। শান্তা রাও-এর কাছ থেকে খবর এল—সে আসছে দিন পনেরো পরে। সুতরাং আমাদের হাতে তখন অফুরন্ত সময়। আম্বি ও সাচী আমায় বলল যে আমি যখন নাচের ছবি করছি তখন আমার চিদাম্বরম মন্দিরটি একবার দেখা উচিত। দক্ষিণ ভারতের যতগুলি মন্দির আমি দেখেছি সেগুলির 'গোপুরম' (প্রবেশদ্বার) এবং মন্দির তৈরীর পদ্ধতি সবই প্রায় একরকম, তবে চিদাম্বরম মন্দিরের একটি বিশেষত্ব আছে ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে। সেই সম্বন্ধে ভালরকম ওয়াকিবহাল হবার জন্যে আমি, টুকলু ও সাচী চিদাম্বরম মন্দির দেখবার জন্য রওনা হলাম।

ভরতমুনি নির্দেশিত 'করণ'গুলি আমি ভরতনাট্যম সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ "তাণ্ডব-লক্ষণম"-এ পড়েছিলাম এবং তাতে শুধু ছবিগুলিই দেখেছিলাম—কিন্তু চিদাম্বরম মন্দিরের গোপুরমের স্তম্ভের গায়ে দেখলাম সেই সমস্ত 'করণ'গুলি ভরতমুনি নির্দেশিত ১০৮টি নৃত্য-ভঙ্গী অপূর্বভাবে খোদাই করা আছে এবং প্রত্যেকটি 'করণে'র উপরে ভরতমুনির নাট্য-শাস্ত্র থেকে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকগুলিও লেখা রয়েছে।

আমরা নটরাজের মন্দিরও দেখলাম। প্রবাদ আছে যে এইখানে নটরাজ নাকি তাঁর 'তাণ্ডব'নৃত্য করেন। এই মন্দির দেখতে দেখতে আমার মনে হল—নটরাজের মন্দির-সংলগ্ন উঠোনে শিবের 'তাণ্ডব'-নৃত্য তুললে কেমন হয়?

সাচীকে এইকথা বলতেই সাচী বললে : মন্দিরের ভেতরে কোন শুটিং করবারই অনুমতি দেবে না এরা, নাচ তোলা তো দূরের কথা—তবে চেষ্টা করে একবার দেখা যেতে পারে। আমি কাল সকালে মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয় কথা বলব।

সাচী খুব করিৎকর্মা ছেলে ছিল—সারা মাদ্রাজে এমন জায়গা ছিল না যেখানে তার কোন জানাশুনো লোক ছিল না। পরদিন সকালে সে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে আমাকে এসে বলল : সব বন্দোবস্ত করে এলাম মিঃ বোস। মন্দিরের সংলগ্ন উঠোনে আপনি 'তাণ্ডব নৃত্য'র শুটিং করতে পারেন।...আচ্ছা, ভালকথা, এই তাণ্ডব-নৃত্য করবে কে? আপনি কি কোন আর্টিস্টকে ভেবেছেন?

আমি বললাম : মাধব মেনন করতে পারবে এই নাচ। সে সাধনার সঙ্গে বরাবর 'শিব-পার্বতী' নৃত্যে 'তাণ্ডব' নেচেছে। তার চেহারা ভাল আর শিল্পী হিসেবেও খুব ভাল।

সেইদিনই আমি কোচিনে মাধব মেননকে টেলিগ্রাম করে দিলাম অবিলম্বে মাদ্রাজ চলে আসবার জন্যে। তারপর আমরা মাদ্রাজ ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পরে শান্তা রাও মাদ্রাজে এসে পেঁাছল এবং রাণীও কুম্ভোকোনাম থেকে এল। মাত্র দশ-বারো মিনিটের মধ্যে 'ভরতনাট্যমে'র কতকগুলি বিশেষ মুদ্রাসহ সম্পূর্ণ নাচটা আমাকে তুলতে হবে। আগেই বলেছি যে একটা গোটা ভরতনাট্যম নাচে সময় লাগে খুব কম পক্ষে তিন ঘণ্টা—কিন্তু সেইটাকে দশ-বারো মিনিটে কমিয়ে আনতে হবে, এ এক সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

অনেক রিহার্সালের পর শান্তা এবং রাণীর দুজনের নাচ মিনিট দশেকের মধ্যে দাঁড় করানো গেল। মাদ্রাজে একটি ষ্টুডিও ভাড়া করে সেখানেই নাচটির শুটিং করা হ'ল। তারপর যখন 'দি ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া' (মোট পাঁচ রীল) ছবিটি সম্পূর্ণ হ'ল তখন দেখা গেল যে এই ভরত-নাট্যম অংশটুকুই সবথেকে ভাল এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

ইতিমধ্যে কোচিন থেকে মাধব মেনন এসে পড়ল। তাণ্ডব-নৃত্যের সঙ্গীতাংশ আগে তোলা হ'ল, পোষাক তৈরী হয়ে গেল। তারপর আমরা সদলবলে অর্থাৎ ক্যামেরাম্যান সহকারীসহ, মাধব মেনন, টুকলু, রূপসজ্জাকর প্রভৃতি চিদাম্বরম যাত্রা করলাম। অবশ্য আমার বন্ধু এবং গাইড সাচীকে তো সঙ্গে নিলামই।

নটরাজের মন্দির-সংলগ্ন উঠোনেই আমরা 'তাণ্ডব' নৃত্যের শুটিং করলাম। সাচী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খুব সুকৌশল বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল যে শুটিং-এর সময় কোন বাইরের লোক যেন এই মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারে। তারপর গোপুরম-গুলির স্তম্ভের গায়ে খোদিত নৃত্য-ভঙ্গীর ছবি তুললাম।

মন্দির কর্তৃপক্ষকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে আমরা মাদ্রাজে ফিরে এলাম।

আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম হল মণিপুর যাওয়া। আমার খুব ইচ্ছে ছিল সাধনা ও তার ব্যালেকে দিয়ে মণিপুরী রাস-নৃত্য তোলা—কারণ এই নাচটি 'রাজ-নর্তকী'তে অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধনা তখন তার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। সেইজন্য আমি স্থির করলাম যে আমাকে যখন ইম্ফাল (মণিপুর) যেতেই হবে নাগাদের লোক-নৃত্য তুলবার জন্যে, তখন সেইখানকারই আসল শিল্পী দিয়ে 'রাস-নৃত্য'-র শুটিং করে নেব।

দক্ষিণ ভারতের প্রোগ্রাম শেষ হল। ভরতনাট্যম, কথাকলি ও তাণ্ডব-নৃত্যের 'নেগেটিভ টেস্ট' নেওয়া হ'ল ওখানকারই এক ষ্টুডিওর ল্যাবরেটরী থেকে—। 'টেস্ট' ভালই লাগল—তারপর সমস্ত ফিল্মটিকে পাঠিয়ে দিলাম বোম্বাইতে পরিস্ফুটনের জন্যে।

এরপর আমরা মাদ্রাজে এক সপ্তাহের বিশ্রাম নিলাম। সেই সময়ে অবশ্য মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ-শিল্পীদের গান শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, যেমন এম, এস, শুভলক্ষ্মী, বসন্ত কোকিলম প্রভৃতি। এছাড়া প্রসিদ্ধ বীণকারদের বীণা-বাদনও শুনলাম। অবশ্য এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল আম্বি নাটেশন ও সাচীর ব্যবস্থাপনার গুণে। বালা সরস্বতীর নাচ আর একবার দেখবার ইচ্ছে হল। আম্বির সঙ্গে তার বিশেষ জানাশুনো ছিল—সে সমস্ত বন্দোবস্ত করল। কিন্তু যেদিন আমরা তার বাড়ীতে গেলাম, সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর শরীরটা ভাল ছিল না—কিন্তু এত ভদ্র যে তাঁর এই অসুস্থতাসত্ত্বেও তিনি আমাদের একেবারে বঞ্চিত করলেন না। তিনি ঘরে বসে বসে 'অভিনয়মে'র কতকগুলি মুদ্রা এবং চোখের কাজ আমাদের দেখালেন—সঙ্গে তাঁর মা তানপুরা নিয়ে গান গাইতে লাগলেন। এই অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি যা দেখালেন, সত্যিই তা অপূর্ব লেগেছিল। 'ভরতনাট্যম' নৃত্য-পদ্ধতির তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠা শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত—তাঁর 'অভিনয়ম' (মুদ্রাভঙ্গী) এমন অপূর্ব এবং শিল্পশৈলীর এমন উচ্চতম শিখরে পেঁাছেছিল যে তা কথিত ভাষার মতই সহজ ও সরলভাবে লোকের কাছে ধরা পড়ত।

মাদ্রাজ ছাড়বার সময় হয়ে এল। আম্বি আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করল। পুরোপুরি দক্ষিণ ভারতীয় কায়দায় আমাদের প্রচুর খাওয়ালো।

সাচী ও আম্বির সঙ্গে আমাদের ক'দিনেরই বা আলাপ—বড়জোর মাস তিনেক হবে—কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই এরা এত আপনার লোক হয়ে গিয়েছিল যে ছেড়ে আসতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমাকে বিদায় দিতে তাদেরও বেশ কষ্ট হয়েছিল।

যাই হোক, নভেম্বরের শেষদিকে আমি, টুকলু এবং আমার ক্যামেরা-ইউনিট চলে এলাম কলকাতায়। ইতিমধ্যে আমি মিঃ এজরা মীরকে লিখে দিয়েছিলাম একজন শব্দযন্ত্রী যেন একটি পোর্টেবল সাউণ্ড রেকর্ডার নিয়ে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। কারণ মণিপুরী এবং নাগা-নৃত্যের সংগীত গ্রহণ করতে হবে।

কলকাতায় পেঁাছে আমি গেলাম সাধনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। যদিও সাধনা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিল, কিন্তু আমাকেও তিনি খুব ভালবাসতেন। সুতরাং আমাদের এই বিচ্ছেদ হওয়ায় তিনি মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : সাধনা কি যে ছেলে-

মানুষি করল। যা হোক, আমি ওকে লিখে দিয়েছি যে আমি শিগগীর বম্বে যাচ্ছি। আমি যতদূর জানি তাতে আমার মনে হয় যে তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যাপার ঘটেনি—যাতে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন হবে। আমার মনে হয় কাছে গিয়ে ওকে একটু ভালভাবে বোঝালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে বম্বে থেকে সাউণ্ড-রেকর্ডিস্ট প্যাটেল তাঁর সহকারীকে নিয়ে এসে হাজির হলেন কলকাতায়। তারপর আমি, টুকলু, সাউণ্ড ও ক্যামেরা-ইউনিট এবং চামান ১লা ডিসেম্বর ইম্ফালের দিকে রওনা হলাম। দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের পরে একদিন সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম ডিমাপুরে। এইখানে ট্রেন থেকে নেমে যেতে হয় মোটরে বা বাসে। তখন যুদ্ধের সময়—মণিপুরে সৈন্য-চলাচল অবিশ্রান্তভাবে চলেছে। স্টেশনের ওয়েটিং রুমগুলি ভীড়ে ভর্তি। বেশীরভাগ সৈনাদলই তখন অস্থায়ী কুঁড়েঘরগুলিতে ছাউনী ফেলেছিল। এই ঘরগুলি মাটি আর বাঁশ দিয়ে তৈরী। সেইরকম একটি ঘরেই আমরা সে রাতটা কাটালাম। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে আলাপ হোল। চমৎকার ভদ্রলোকটি। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের ক্যান্টিনে নৈশভোজের জন্য।

তখন ওখানে দারুণ শীত। বাঁশের দেওয়ালের ভেতর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছে হু-হু করে—আপাদমস্তক মোটা 'র‍্যাগ' মুড়ি দিয়ে শুয়েও শীত যায় না। কিন্তু কি আর করা যাবে—কোন উপায় নেই—কোনরকমে রাতটা কাটালাম—কখনও শুয়ে, কখনও বসে, কখনও সিগারেট ধরিয়ে জোরে টানতে টানতে। তারপর সকাল হতেই আমরা মোটরে করে রওনা দিলাম কোহিমা হয়ে মণিপুরে।

আমরা ইম্ফাল পৌঁছলাম সন্ধ্যাবেলায়। এখানকার কমিশনার ছিলেন তখন মিঃ স্টুয়ার্ট, আই-সি-এস। আমি কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। স্থানীয় এক বাঙ্গালী ডাক্তারের বাড়ীতে আমার দলের অন্যান্য সকলের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চমৎকার লোক এই মিঃ স্টুয়ার্ট—ওখানেই একলাই থাকতেন—আই-সি-এস বলে তেমন দেমাক বা কোন চাল ছিল না। আমাকে দেখে হেসে বললেন : মিঃ বোস, জাপানীদের বোমার ভয়ে সকলে এখন ইম্ফাল ছেড়ে পালাচ্ছে—আর আপনারা এখন এখানে এলেন নাচের ছবি তুলতে!

আমিও হেসে উত্তর দিলাম : অত ভয় করলে কি পৃথিবীতে বাস করা চলে?

মিঃ স্টুয়ার্ট ইতিমধ্যে নাগাদের নৃত্য তোলবার বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং মণিপুরের মহারাজার প্রাসাদ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করেছিলেন, মহারাজার নিজস্ব নৃত্যশিল্পীদের দিয়ে 'রাস-নৃত্য'টি চিত্রগ্রহণ করবার।

মণিপুরে আমরা এক সপ্তাহ ছিলাম—মিঃ স্টুয়ার্টের সুবন্দোবস্তের ফলে আমাদের কোন অসুবিধাই হয়নি—এবং বেশ আরামেই ছিলাম। বেশ ভালোভাবেই আমাদের নাগা লোক-নৃত্যে এবং মণিপুরী রাস-নৃত্যের চিত্রগ্রহণ শেষ হল।

মিঃ স্টুয়ার্ট আমাদের নিকটবর্তী নাগাদের গ্রামের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের কুটিরশিল্প দেখালেন। যদিও বিমান-আক্রমণের সংকেতধ্বনি অর্থাৎ 'সাইরেনে'র আওয়াজ প্রায়ই শোনা যেত এবং যেকোন মুহূর্তে ইম্ফালে বোমা বর্ষণের আশংকা ছিল, তবুও স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল খুব শান্ত এবং সংযত। সাধারণভাবেই তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করে যেত। কুটির-শিল্পের নিয়মিত কাজে কোনরকম বিশৃংখলা দেখা যেত না।

অদ্ভুত তাদের হাতের কাজ। মণিপুরী নাচের পোষাক থেকে আরম্ভ করে কত বিচিত্র ধরণের কাপড় চাদর প্রভৃতি তৈরী করছে। এক জায়গায় দেখলাম শ্রীখোল তৈরী হচ্ছে। মণিপুরী খোল আমাদের বাংলাদেশের খোলের থেকে কিছু ছোট। বাপ-ছেলে সবাই এ কাজে মেতে রয়েছে। ছেলেটা তো আমাদের দেখে গলায় খোল ঝুলিয়ে বাজাতে বাজাতে নাচতে সুরু করে দিল। মাঝে মাঝে চরকির মত ঘুরছে আর বাজাচ্ছে। এরা যে খোল বাজানোতে এবং নাচে কত দক্ষ তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

মণিপুর থেকে চলে আসবার সময় মিঃ স্টুয়ার্ট আমাকে একটি চমৎকার মণিপুরী 'বেড কভার' উপহার দিলেন। আমার বন্ধু-ভাগ্য সত্যিই ভালো—মাদ্রাজে পেলাম আম্বি আর সাচীর মত বন্ধু আর সুদূর ইম্ফালে পেলাম মিঃ স্টুয়ার্টকে। এঁদের সাহায্য না পেলে ভরতনাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী নাচ এমন সুষ্ঠুভাবে তুলতে পারতাম কি না সন্দেহ।

মিঃ স্টুয়ার্টের সঙ্গে যখন মণিপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলাম তখন বহু ছবি ও ফিল্ম তোলা হয়েছিল। ইম্ফাল থেকে ফেরবার সময় মিঃ স্টুয়ার্টকে কথা দিয়ে এলাম যে তাঁকে একটা করে সমস্ত ছবির প্রিন্ট বম্বে থেকে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয়, বম্বে পৌঁছে আমি খবর পেলাম যে ইম্ফালে বোমা পতনের সময় মিঃ স্টুয়ার্টের মৃত্যু হয়েছে। শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

* * *

ইম্ফালে থাকতেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে কলকাতা পৌঁছে এখান থেকে রাঁচী যাব—সাঁওতাল নৃত্য তোলার জন্য, তারপর রাঁচি থেকে আবার কলকাতা ফিরে এসে সাধনার বাবাকে নিয়ে বম্বে যাব। ইম্ফাল যাওয়ার সময়ই তিনি আমায় বলেছিলেন যে তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—বম্বের জল-হাওয়াটা তাঁর বেশ সহ্য হয়ে গিয়েছিল, তাই তিনি সাধনাকে লিখে দিয়েছেন যে শীগ্‌গিরই তিনি সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন। তাছাড়া তাঁর কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যেটা তাঁর মনকে সব সময় পীড়া দিচ্ছিল, সেটা আমার আর সাধনার এই বিচ্ছেদ।

আমারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি বম্বেতে গিয়ে সাধনাকে বুঝিয়ে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সাধনা কখনও তার বাবার কথা ঠেলতে পারবে না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক জিনিষ, আর বিধাতার বিধানে ঘটে অন্য জিনিষ।

যখন ইম্ফাল থেকে কলকাতা এসে পৌঁছলাম তখনই একটা মর্মান্তিক দুসংবাদে আমার সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সাধনার বাবা ঠিক দুদিন আগে অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন।

ইম্ফাল যাওয়ার আগেও তাঁর সঙ্গে দু'তিন দিন দেখা করতে গেছি, তখন এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি যে তিনি এত শিগগীর আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁর শরীরও এমন কিছু খারাপ দেখিনি। সেইজন্যে তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু আমার কাছে ঠিক বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন মনে হল। আমি তাঁকে ঠিক আমার শ্বশুরমহাশয় বলে ভাবিনি কখনও, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল ঠিক যেন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। তিনিও আমাকে সেইভাবেই দেখতেন। বম্বের মেরিন ড্রাইভ এবং স্টিফেন কোর্টের ফ্ল্যাটে বহুদিন তিনি আমাদের কাছে একসঙ্গে ছিলেন। খুব সহজেই তিনি সকলকে আপনার করে নিতে পারতেন। তাছাড়া সাধনা ও মধু ছিল তাঁর প্রাণ। যদিও সাধনা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান—কিন্তু আমাদের দুজনকে তিনি কখনও আলাদাভাবে দেখেননি।

আমার মনে তাই খুব আশা হয়েছিল যে বম্বেতে গিয়ে তিনি সাধনাকে বুঝিয়ে বললে সুফল নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু সে আশার দীপশিখাটুকু একেবারে নিভে গেল। অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছে নয় যে আমার ও সাধনার তখন পুনরায় মিলন হয়।

* * *

কলকাতায় কয়েকদিন থাকার পর আমি আমার দলবল নিয়ে রাঁচী যাত্রা করলাম। আমার বন্ধু কমল বিশ্বাস রাঁচী থেকে আমায় লিখে জানাল যে, সাঁওতাল নাচের সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

রাঁচীতে গিয়ে হোটেলে উঠলাম। বহু পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হতে লাগল। প্রায় রোজই কারুর না কারুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ লেগেই ছিল। কত পুরোন স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। স্কুলের কয়েকজন বন্ধুরা আমায় বলতে লাগল : তোদের ওরকম বাড়ী—অতবড় বাগান—সব একেবারে জলের দরে বিক্রি করে দিলি?

কিন্তু আমি আর আসল ব্যাপার কি করে প্রকাশ করে বলি : কেন বেচতে হোল?

আমাদের বাড়ীর দিকে কিন্তু আমার একবারও যেতে ইচ্ছে করল না—অর্থাৎ ইচ্ছে করেই আমি ওদিকে যাই নি—পাছে বহু পুরোন স্মৃতির দংশনে আমার মনটা ক্ষত-বিক্ষত হয়—বিশেষ করে মার স্মৃতি।

একদিন এক স্কুলের পুরোনো বন্ধু জোর করে আমায় ধরে নিয়ে গেল। প্রায় আট বছর

পরে রাঁচী গেছি—বহু পরিবর্তন হয়েছে—সে রাঁচী আর নেই। বহু বাড়ীঘর উঠেছে, বহু উন্নতি হয়েছে শহরের। আমাদের বাড়ীর সামনেও বহু নতুন নতুন বাড়ী হয়েছে। বাবার সেই বড় সাধের বাগানটি আর নেই। সেই বাগানটার মধ্যে অনেকগুলো বাড়ী উঠেছে নাম হয়েছে পি এন বোস কম্পাউন্ড—তবে আমাদের বাড়ীটা এখনও তেমনিই আছে—সেই একই রং—একই সেট।

বাড়ীর দিকে যত দেখি ততই মার কথাগুলো মনে পড়ে—শেষে আর সহ্য করতে পারলাম না—মুখ ফিরিয়ে নিলাম। চলে আসতে চাইলাম। আমার সেই বন্ধুটি বলল: চল্ না, তোর সেই নীচের পড়বার ঘরটা একবার দেখে আসি। কতদিন, কত আড্ডা দিয়েছি সেখানে।

এক অব্যক্ত বেদনায় আমার বুকের ভেতরটা তখন টনটন করছে—কথা বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল—কোনক্রমে বললাম: না ভাই, আমার একটা জরুরী কাজ আছে—আমার এখুনি হোটেলে ফিরতে হবে। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

* * *

বন্ধু কমল বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় যে জায়গাটাকে আমরা বলতাম, 'কমলের জমিদারী' রাঁচী শহর থেকে পাঁচছয় মাইল দূরে—সেখানে সাঁওতাল নাচ তোলা হল। এই নাচের প্রধান বাদ্যযন্ত্র হল মাদল। এখানকার কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে এলাম।

ডিসেম্বরের শেষ নাগাৎ বম্বে ফিরে গিয়ে সাধনার সঙ্গে দেখা করলাম—সাধনার মা তখন ওখানেই ছিলেন। ওরা তখন ছিল গ্রীনস্ হোটেলে।

দেখলাম বাবার মৃত্যুতে সাধনা খুব ভেঙ্গে পড়েছে। সেও যেমনি শ্বশুরমশায়ের সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান ছিল, সাধনাও তেমনি তার বাবাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম: জন্ম-মৃত্যু সবই বিধাতার খেলা। এভাবে ভেঙ্গে পড়লে কি চলে? অবশ্য আমি জানি তুমি তোমার বাবাকে কি রকম ভালবাসতে—তাই এ শোকের সান্ত্বনা নেই—যাই হোক, মনকে শক্ত করো। ঈশ্বর তোমায় শান্তি দেবেন।

তারপর বললাম: মিছামিছি কেন হোটেলের এতবড় 'স্যুইট' নিয়ে পয়সা নষ্ট করছ, তারচেয়ে ফিরে চল আমাদের ফ্ল্যাটে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধনা কোন জবাবই দিল না—এ কথাটা একেবারে চাপা দিয়ে, তার বাবার কথাই বলে যেতে লাগল।

যাবার আগে আমি আবার তাকে বললাম: আর একবার ভালো করে ভেবে দেখো সাধনা—যদি তুমি কোনদিন মনোভাব পরিবর্তন করে ওরলির ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে চাও আমাকে জানাবারও দরকার হবে না—সোজা চলে এস। এই বলে চলে এলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক নাট্য-প্রতিযোগিতা :

গেল হপ্তায় প্রকাশিত 'অমৃত'-এর প্রেক্ষাগৃহ বিভাগের **'বিবিধ সংবাদ'** মারফৎ জানানো হয়েছে, কলকাতার থিয়েটার সেণ্টার সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিক নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় অভিনয় করবার জন্যে যে-এগারোখানি নাটক নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে : (১) গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদৌল্লা, (২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ-এর নাট্যরূপ, (৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুক্তধারা, (৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী-র নাট্যরূপ, (৫) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা-প্রতাপ, (৬) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপ-আদিত্য, (৭) ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের দেশের ডাক, (৮) শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা, (৯) রমেশচন্দ্র গোস্বামীর কেদার রায়, (১০) বিধায়ক ভট্টাচার্যের ২৬-এ জানুয়ারী এবং (১১) ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৈনিক।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই নাটকগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেকগুলি হচ্ছে কস্টিউম ড্রামা (যে-নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ঐতিহাসিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে হয়) এবং বাকি অর্ধেকে সাজ-পোশাকের বালাই ততটা নেই। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৈনিক ছাড়া প্রতিটি নাটকই পঞ্চাঙ্কে সম্পূর্ণ। সকলেরই জানা আছে, আগেকার যুগে পুরো পাঁচঘণ্টা ধরে অভি-নীত হবার মতো করেই পঞ্চাঙ্ক নাটকগুলি রচিত হত; কাজেই বর্তমানের দর্শকরুচি অনুযায়ী এই নাটকগুলিকে তিনঘণ্টার মধ্যে অভিনীত হবার উপযোগী করে প্রয়োজন মতো কাটছাঁট করে নিতে হবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার জন্যে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমঠ-এর একটি সুন্দর অভিনয়যোগ্য নাট্যরূপ প্রণয়ন করেছেন। 'দশরূপক' নাট্যসম্প্রদায় গৈরিক পতাকা নাটকটি যে সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছিলেন, সেটিও মন্দ নয়। এছাড়া নির্বাচিত বাকি পঞ্চাঙ্ক নাটকগুলির কোনো সংক্ষেপিত সংস্করণ আছে কিনা জানা নেই।

শহর বা মফঃস্বলে—যেখানেই যাই না না কেন, বর্তমানে সর্বত্রই পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যামূলক নাটকই অভিনীত হতে দেখি। যে-দু'একটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখেছি, সেখানেও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিকের ছদ্মবেশে বর্তমান জীবন-জিজ্ঞাসাকেই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এ-অবস্থায় প্রধানত ইতিহাসাশ্রিত দেশাত্ম-বোধক নাটকগুলিকে প্রতিযোগিতার জন্যে

সুনীল ব্যানার্জি পরিচালিত **অ্যান্টনী ফিরিংগী** চিত্রে নাম-ভূমিকায় উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

নির্বাচিত করে দেশের নাট্যসম্প্রদায়গুলিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরসিক দর্শক-সম্প্রদায়কে ভিন্ন পথে ভাবিত ও চালিত করবার এই উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যে-সব নাটক একদা বাঙলার দর্শকসমাজকে প্রশংসায় মুখর করে তুলেছিল, বাহুল্য-বর্জিত ও কিছুটা সংক্ষেপিতভাবে অভিনীত হয়ে তারা বর্তমান দর্শকদের মধ্যে কি প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সে-সম্পর্কে একটা সমীক্ষার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আর বাঙলা নাটকগুলির মধ্যে যেগুলি প্রায় ক্লাসিকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের বইয়ের আলমারীর উপরতাকে চিরকালের জন্যে তুলে রেখে তাদের ওপর ধুলো জমানোর কোনো অর্থ হয় না। ইংলণ্ডের যে-কোনও নাটুকে দল যেমন আজও শেক্সপীয়রের নাটকাবলী আধুনিক রুচিসম্মতভাবে কাটছাঁট করে অভিনয় করাকে অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করেন, বর্তমানের পেশাদার অপেশাদার-নির্বিশেষে সকল নাট্যসম্প্রদায়েরই তেমনই বাঙলা সাহিত্যের নামকরা পুরোনো নাটকগুলিকে মাঝে মাঝে পাদ-প্রদীপের সামনে উপস্থাপিত করার গুরু-দায়িত্ব বহন করা উচিত বলে মনে করি।

পরিকল্পিত সারা বাঙলা জেলা-ভিত্তিক নাট্য - প্রতিযোগিতা নানাদিক দিয়েই সুফলপ্রসূ হবে বলে আশা করছি। পশ্চিমবঙ্গের পনেরোটি জেলা এবং কলকাতাতে আজ কমপক্ষে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার নাট্যসংস্থা রয়েছে। এই প্রতি-যোগিতা তাদের প্রতিটিকেই সুযোগ দেবে দলগত শক্তিপরীক্ষার। নাটক প্রযোজনায় এবং শিল্পীদের ব্যক্তিগত ও দলগত অভিনয়ে তাঁরা যেমন নিজেদের মূল্যায়নের অবসর পাবেন, তেমনই অপরাপর দলের শক্তিসামর্থ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। প্রতিটি জেলায় যতগুলি দল এই প্রতি-যোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন, প্রতিযোগিতা জেলার বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থানীয় নাট্যপিপাসুরাও তাঁদের জেলার নাট্য অনুশীলনের মান সম্বন্ধে ওয়াকি-বহাল হতে পারবেন। এইভাবে এই নাট্য-প্রতিযোগিতা প্রতিটি জেলাকে নাট্যসচেতন করে তুলবে এবং ঐ সঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রে সারা দেশময় একটি প্রবল দেশাত্মবোধের প্লাবন জাগিয়ে দেশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে সাহায্য করবে। আমাদের পুরাতন নাটকগুলির প্রতি বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মহৎ কর্তব্যটিও এরই মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। যথোপযুক্তভাবে নাট্য অনুশীলনের জন্যে কোন্ জেলায় কতখানি সুযোগ আছে বা না আছে, তাও এরই ভিতর নিরূপিত হতে পারবে। এমনও হতে পারে, স্থানীয় ব্যক্তিদের বদান্যতায় বহু জেলাতেই—বিশেষ করে যে-সব জেলায় নাট্যাভিনয়ের জন্যে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাব রয়েছে, সেইসব জেলায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। প্রতি-যোগিতা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে বাঙলার নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই অবগত হবেন, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায় কতগুলি ও কত রকম নাট্যপ্রতিভা এতকাল পর্যন্ত অজ্ঞাত অবস্থায় লুক্কায়িত ছিল এবং আমাদের দেশে নাট্য আন্দোলন আজ কতদূরে জোরদার হয়ে উঠেছে।

চিত্র-সমালোচনা

তিসরী কসম (হিন্দী) : ইমেজ মেকার্স-এর নিবেদন; ৪,২০৮·৬৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : শৈলেন্দ্র; পরিচালনা : বাসু ভট্টাচার্য; কাহিনী ও সংলাপ : ফণীশ্বর নাথ 'রেণু'; চিত্রনাট্য : নবেন্দু ঘোষ; সংগীত-পরি-চালনা : শঙ্কর জয়কিষেণ; গীতরচনা : শৈলেন্দ্র ও হসরৎ; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : সুব্রত মিত্র; শব্দানুলেখন পরিচালনা : আলাউদ্দিন; সংগীতানুলেখন : মীনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা : দেশ মুখো-পাধ্যায়; সম্পাদনা : জি সি মায়েকার; নৃত্য-পরিচালনা : লচ্ছু মহারাজ; নেপথ্য কণ্ঠদান : লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, সুমন কল্যাণপুর, মোবারক বেগম, শঙ্কর-শম্ভু ও মুকেশ; রূপায়ণ : রাজ-কাপুর, ইফতেকার, অসিত সেন, কৃষণ ধাওয়ান, বিশ্ব মেহেরা, সমর চট্টোপাধ্যায়, সি এস দুবে, ওয়াহিদা রেহমান, দুলারী, সবিতা, সবিনা প্রভৃতি। রিসেণ্ট পিকচার্স (প্রো) লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৫-এ নভেম্বর থেকে জ্যোতি, জনতা, দর্পণা, গ্রেস, মেনকা, কালিকা, নাজ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

হিন্দী চলচ্চিত্রজগতে একখানি অসাধারণ চিত্র হচ্ছে এই 'তিসরী কসম'। ইস্টম্যান কলারের ঝলক নেই, নায়িকাকে নাস্তানাবুদ করে নায়কের জবরদস্ত প্রেম নেই, খল দুর্বৃত্তের সঙ্গে নায়কের ধস্তাধস্তি, মারপিট, রক্তারক্তি, গুলী-বিনিময় নেই, সমূহ বিপদ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে নায়ক-নায়িকার উদ্ধারপ্রাপ্তি নেই, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, বীভৎসতা—কিছুই নেই, এমনকি নায়ক বা নায়িকার অপরকে 'আমি তোমায় ভালোবাসি', এ-কথাও বলা নেই, তবু—তবু কি আশ্চর্য রূপরসের আধার, কি অপরিসীম আনন্দের আকর এই 'তিসরী কসম'! প্রেমের অফুরন্ত ফল্গুধারা বয়ে চলেছে নায়ক-নায়িকার মধ্যে; দুজনেই দু'জনের পরমনির্ভর; অনন্ত প্রেম দু'জনকেই মহৎ করে তুলছে। একজন মনে করছে : এমন সাদাসিধে ভালোমানুষও হয়, এতো দেবতা; আর একজন ভাবছে : এমন রূপ শুধু দেবীরই সম্ভব, এমন মিষ্টি কণ্ঠস্বর পৃথিবীর নয়, এই পরমাশ্চর্য কুমারী জীবনে কোনো পাপই করতে পারে না। অথচ একজন দেহাতী গরুরগাড়ীর গাড়োয়ান, অপরজন নৌটঙ্কীর (ভ্রাম্যমাণ নাটুকে দলের) প্রধানা অভিনেত্রী। স্টেশন থেকে বহুদূরের মেলাতলায় পৌঁছে দেবার মাঝে নামের মিল উভয়ের মনের মিল

ঘটায়—দু'জন দু'জনের মিতা; গ্রামপথের গাছপালা, পাখী, পুকুর-নদী—এদের পরস্পরের মনকে নিকটবর্তী করে, কিন্তু দেহকে নয়। তাই দেখি, দু'জনের মন যখন দু'জনেরই জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, তখন নায়িকা—পৃথিবী সম্বন্ধে তারই অভিজ্ঞতা বেশী—নায়ক থেকে দূরে চলে যায়, নায়ক তার স্মৃতিটুকু সম্বল করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে পা বাড়ায়। মনে পড়ে বৈষ্ণবকবির কথা : এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি। বলতে বাধা নেই, দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন প্রযোজক শৈলেন্দ্র এবং পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য।

পরমাশ্চর্য অভিনয় করেছেন রাজকাপুর নায়ক হীরামনের ভূমিকায়। দেহাতী গাড়োয়ান হীরামন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর মাধ্যমে। কী আশ্চর্য বলা ও চলাফেরার ভংগী, কী অপূর্ব সারল্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর মুখের 'ইস্‌' অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনে হয়, রাজকাপুর তাঁর জীবনে এর চেয়ে ভালো অভিনয় কখনও করেননি। নোটংকীর রাণী হীরাবাঈরূপে ওয়াহীদা রেহমানও অপূর্ব সুন্দর। চলন্ত গরুর-গাড়ীতে বা মেলাতলা ছেড়ে হীরামনের সংগে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের সময়ে যে আশ্চয দরদ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর বাচনে ও ভংগীতে, তা তাঁর অসামান্য নাট-নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক। হীরামনের বন্ধুরা যেন সত্যই গ্রামাচরিত্র, এমনই তাদের বাস্তব অভিনয়। জমিদার বিক্রম সিংয়ের ভূমিকায় ইফতেকার চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শাদাকালো চিত্রগ্রহণে আলোছায়ার সংমিশ্রণে যে অসামান্য রসরূপের আলেখ্য রচনা করেছেন সুব্রত মিত্র, তার তুলনা ক্বচিৎ মেলে। ছবিখানি গীতিরসে ভরপুর। ন'খানি গানই সুলিখিত, সুরসমৃদ্ধ, সুগীত এবং সুপ্রযুক্ত। পূর্ণিয়া জেলার বিশেষ বাক্যরীতি ও গানের ভংগী ছবিটিকে একটি অনন্যসাধারণতা দিয়েছে; মনে হয়েছে, এমন আন্তরিক সংলাপ শুধু মাটি থেকেই জন্মায়, জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে এর প্রতিটি ছত্রে।
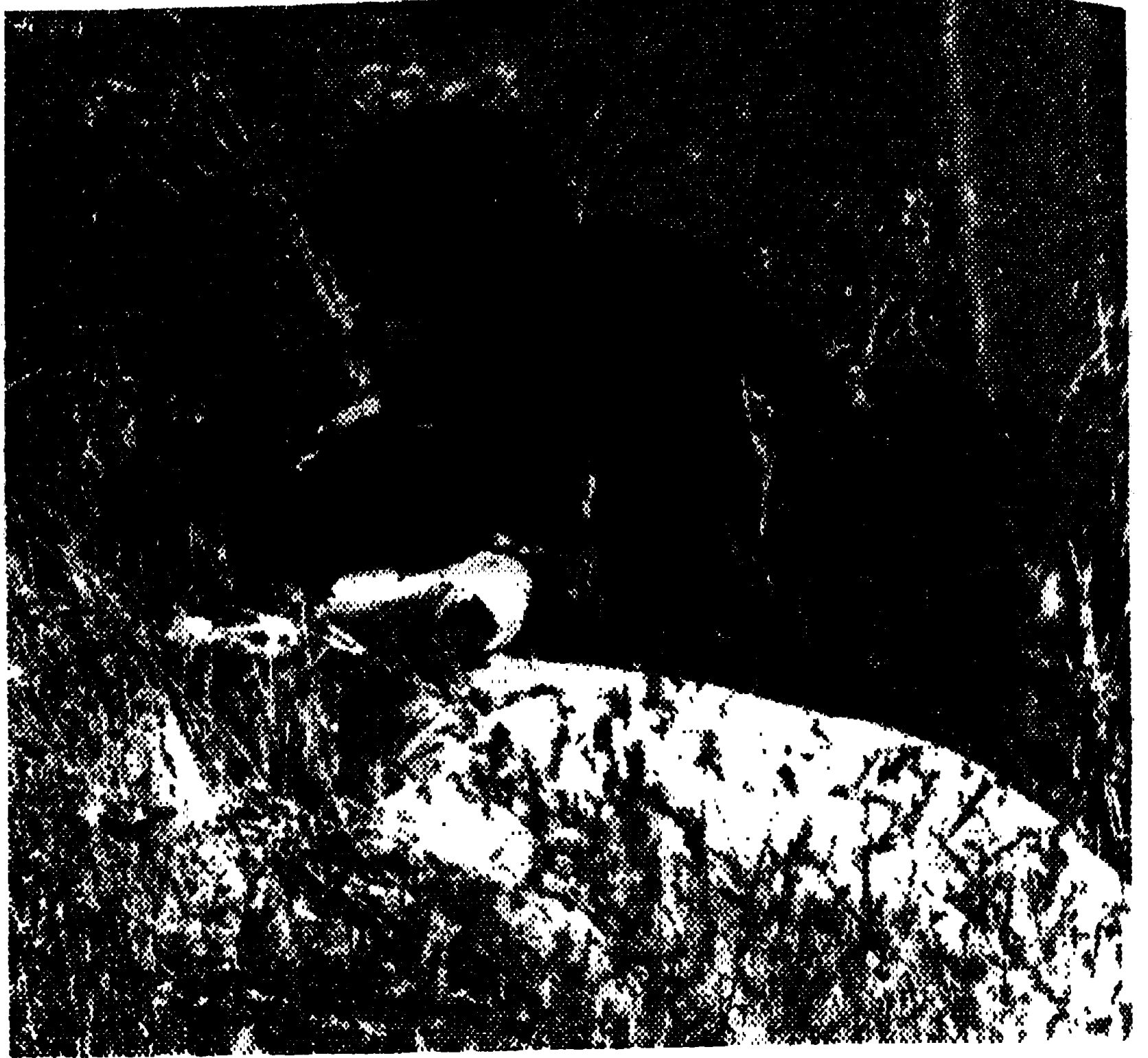
তিসরী মঞ্জীল চিত্রে শাম্মী কাপুর ও আশা পারেখ

ইমেজ মেকার্স-এর 'তিসরী কসম' হিন্দী চলচ্চিত্রজগতকে একটি নূতন মর্যাদা দান করেছে।

কলকাতা

'খেয়া' ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণ

গত মাসের শেষ সপ্তাহে শ্যামল মিত্র প্রযোজিত ও সুরকৃত 'খেয়া' ছবির বহির্দৃশ্য-গ্রহণ বসিরহাট অঞ্চলে পালিত হল। লতা সেন রচিত এ কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রাংশে রূপদান করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, বিকাশ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

'প্রস্তর স্বাক্ষর' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'প্রস্তর স্বাক্ষর' ছবিটির বহির্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি টাটানগর অঞ্চলে শুরু করেছেন পরিচালক সলিল দত্ত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'শিলাপটে লেখা' অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য বিধৃত হয়েছে। কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, গীতালি রায়, গীতা দে এবং জহর রায়। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

নির্মল মিত্র পরিচালিত 'প্রথম বসন্ত'

প্রতিভা বসু রচিত 'প্রথম বসন্ত'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক নির্মল মিত্র। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত এ ছবির দৃশ্যগ্রহণে অংশগ্রহণ করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক ও অজয় গাঙ্গুলী। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সরকার।

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই সুবৃহৎ রচনাটি উপন্যাস হিসাবে বাঙলার পাঠকসমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত। বর্তমান সমাজ-জীবনের একটি দিশাহারা প্রতিচ্ছায়া, আধুনিক কালের অব্যক্ত যন্ত্রণা-দগ্ধ অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, সংশয় এই কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানুষের বিচিত্র পরিচয়ের আড়ালে আদর্শের দৃপ্ত পদক্ষেপ আজও প্রতিধ্বনিত হয়, আজও প্রেম সব সংশয় অতিক্রম করে আঁকড়ে ধরে হৃদয়কে।

শ্রীলোকনাথ চিত্রম বর্তমান জীবনের এই মহাকাব্যকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করেছেন। 'কাল তুমি আলেয়া'-য় যে শিল্পী সমাবেশ করা হয়েছে, তা সত্যই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নায়ক-নায়িকা ও সোনাবৌদির চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুমিতা সান্যাল, অজয় গাঙ্গুলী, কমল

মিত্র, দীপ্তি রায়, রবি ঘোষ, তরুণ, ভানু বন্দ্যো, নীলিমা দাস, জহর রায়, শৈলেন মুখার্জি, শেখর চ্যাটার্জি, শিখা ভট্টাচার্য, বঙ্কিম ঘোষ, বুবু গাঙ্গুলী, কঙ্কণা।

'কাল তুমি আলেয়া'-র আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হল উত্তমকুমারের সংগীত-পরিচালনায় আশা ভোঁসলে ও হেমন্ত-কুমারের কণ্ঠদান।

আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে 'কাল তুমি আলেয়া' মুক্তিলাভ করবে।

চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'সোনার খাঁচা'

অভিজ্ঞ পরিচালিত চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'সোনার খাঁচা' বর্তমানে অরোরা স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। নৃপেন্দ্র চৌধুরী রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন জহর রায়, গীতা দে, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবিটির প্রযোজক হলেন সমর চৌধুরী ও বীরেন পোদ্দার।

দীপক পিকচার্সের 'ভক্তের ভগবান'

'জন্মতিথি' খ্যাত পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি দীপক পিকচার্সের 'ভক্তের ভগবান' ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন রবীন মজুমদার, জহর রায়, রেণুকা রায়, প্রেমাংশু বসু, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা রায় ও তন্দ্রা বর্মণ। সংগীত পরিচালনা করছেন কালিপদ সেন।

বোম্বাই

'মুক্তি' চিত্রের পুনর্নির্মাণ

প্রমথেশ বড়ুয়ার বহু প্রশংসিত 'মুক্তি' ছবিটির পুনর্নির্মাণ করছেন প্রযোজক মুকুল রায়। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন পৃথ্বীরাজ কাপুর, নূতন ও জিতেন্দ্র। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন শংকর-জয়কিশণ।

'জওয়ান মুহব্বৎ'র চিত্রগ্রহণ শুরু

রূপাঞ্জলী চিত্রের 'জওয়ান মুহব্বৎ' বর্তমানে কারদার স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিপ সোনি পরিচালিত এ চিত্রে রূপদান করছেন শাম্মি কাপুর, আশা পারেখ, বলরাজ সাহনি, প্রাণ, রাজমেহরা, মুমতাজ, রাজেন্দ্রনাথ এবং শশিকলা। শংকর-জয়কিশণ ছবিটির সংগীত পরিচালক।

'নীলকমল' চিত্রের নৃত্য দৃশ্যগ্রহণ

সম্প্রতি মহালক্ষ্মী স্টুডিওয় কল্পনা-লোকের রঙিন চিত্র 'নীলকমল'র নৃত্য দৃশ্য-গ্রহণে নায়িকা ওয়াহিদা রহমান এবং চল্লিশ-জন নৃত্যশিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। ফণী মজুমদার কৃত চিত্রনাট্যে অভিনয় করছেন রাজকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, মনোজকুমার, বলরাজ সাহনি, হেলেন, ললিতা পাওয়ার, জীবন ও মেহমুদ। ছবিটির পরিচালক রাম মহেশ্বরী।

স্টুডিও থেকে বলছি

সংসারে এমন মানুষও আছে যারা কাঁদাতে জানে। ভালবাসতে জানে না। প্রেমিকার চোখের জল তাদের কাছে কোন দাম নেই। ভাবে, ত্যাগ করার গৌরব নিয়েই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবে। যারা প্রেম তাদের কাছে আছে শুধু অবহেলা ও নির্বাসন।

হেরম্ব যেন ঠিক এই দলের মানুষ। সুপ্রিয়ার ভালবাসাকে সে মূল্য দেয়নি। বরং দূরে সরিয়ে দেবার জন্য অন্য একজনের ছোট দারোগা অজয়ের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে দিয়ে ভালবাসার মূল্য দিয়েছিল হেরম্ব। কিন্তু মন থেকে সুপ্রিয়া ভালবেসেছিল হেরম্বকে। তাই ও বিয়েতে আজও সুখী হতে পারেনি সুপ্রিয়া।

হেরম্ব যেন অন্য প্রকৃতির মানুষ। সে ভেবেছিল, সুপ্রিয়াকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেললে হয়তো চিরদিনের জন্য জীবন একবেশী অপূর্ণ থাকবে যে একদিন আপসোস করতে হতে পারে। তাই সারা বছর ছেলেদের শেলি কীট্স্ পড়িয়ে গরমের ছুটিতে একটুখানি হাল্কা হবার জন্য একবার করে বাইরে ঘুরে আসে হেরম্ব।

এবারের যাত্রাটা যেন ভিন্ন। সুপ্রিয়াকে আঘাত করবার জন্যই হয়তো হেরম্ব দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ওর বিবাহিত সংসারে হঠাৎ অতিথি হয়ে এসেছে। তাই ওর আকস্মিক আবির্ভাবটা যেন এক গভীর ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হয় সুপ্রিয়ার কাছে। এতদিন পর হেরম্বকে কাছে পেয়ে সুপ্রিয়া নতুন করে সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখে। পালিয়ে যেতে চায় হেরম্বের সঙ্গে। কিন্তু এবারেও হেরম্ব আরও কিছু সময় চেয়ে সুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যায়। দিনের কবিতা শেষ হয়।

শুরু হল রাতের কবিতা। দিবারাত্রির কাব্যে এবার বুঝি হেরম্বর উতলা হবার পালা। সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে এসে গোষ্ঠীর দলের ছেলেবেলার মাস্টারমশাই অনাথবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় হেরম্বের সঙ্গে। মাস্টারমশাই এখন কত পাল্টে গেছেন।

'দেবীতীর্থ' কামরূপ কামাখ্যায় গুরুদাস, যমুনা সিংহ ও অসিতবরণ

যৌবনের সেই ঢেউভাঙা রূপ আজ যেন থিতিয়ে গেছে। রূপকথার সেই মানুষটি যিনি সত্যবাবুর বাড়িতে মাস্টারি করতে করতে তার মেয়ে মালতীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আজ শুধু স্মৃতি বলে মনে হয়।

সে যে অনেক অনেক বছর আগের কথা। তবুও মালতীবৌদিকে দেখার লোভ সামলাতে পারে না হেরম্ব। মাস্টারমশাইয়ের সংগে শহরের নির্জন উপকণ্ঠে তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় হেরম্ব। নাম না বললে হয়তো মালতীবৌদি হেরম্বকে চিনতে পারতেন না। কুড়ি বছর পর দেখা। মালতীবৌদি সকৌতুকে হেরম্বকে বললেন, 'তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে গো! তখন হেসে না মরে যদি রাজী হয়ে যেতাম! আমার তাহলে আজ দিব্যি একটি কচি সুপুরুষ বর থাকত।'

সুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসে হেরম্বর যা হয়নি, এখানে তাই হল। মালতীবৌদির যৌবনবতী মেয়ে আনন্দকে দেখে হঠাৎ যেন হেরম্ব বিচলিত হয়ে পড়ল। আনন্দর সবকিছুতেই হেরম্বের মনে এক নতুন প্রাণের বার্তা নিয়ে আসে। ও হেন বসন্তের দূত। হেরম্বর জীর্ণ পুরাতন মনকে রাঙিয়ে দেবার জন্য তার যেন আবির্ভাব।

এখানকার পরিবেশটা অন্যরকম। অনাথবাবু সংসারে থেকেও নিরাসক্ত। কঠিন সাধনায় মগ্ন। মালতীবৌদি মন্দিরের সেবায় নিমগ্ন। ধর্মের জন্য তিনি কারণ পান করেন। তাঁর ধারণা, 'মদ খাওয়া হল ধর্ম।' কিন্তু আনন্দ! সে এত সব বোঝে না। মাঝে মাঝে পূর্ণিমার রাতে মন্দিরের চাতালের সামনে আনন্দ চন্দ্রকলা নেচে কেমন যেন বেহুঁস হয়ে যায়।

আজ সেই পূর্ণিমার রাত। হেরম্বকে আজ আনন্দ চন্দ্রকলা নাচ দেখাবে। হেরম্ব মন্দিরের সিঁড়িতে বসে। আনন্দ নেচে ওঠে চন্দ্রকলা। চাঁদের দিকে মুখ করে এক ঝলক আলোর মতো আবেগে নাচতে থাকে আনন্দ। হঠাৎ নাচের মাঝপথে এসে আনন্দ থেমে যায়। কেন যেন আজ সারা শরীরটা তার জ্বলে উঠল।

হেরম্ব ছুটে আসে। আনন্দ তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে আনন্দ বলে, 'এরকম হল কেন আজ? তোমার জন্যে?' হেরম্ব উত্তর দেয়, 'হতে পারে। আমি তো সহজ লোক নই। পৃথিবীতে আমার জন্য অনেক কিছুই হয়েছে।' কিন্তু প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না। এ যেন তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম।

প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই হেরম্ব সুপ্রিয়াকে চিঠি দিল। যথাসময়ে অশোকের সংগে স্বাস্থ্যপুনরুদ্ধারের জন্য সুপ্রিয়া সমুদ্র-সৈকতে এসে হাজির হয়। তারপর একা

একাই একদিন এখানে হেরম্বর সংগে দেখা করতে আসে সুপ্রিয়া। হেরম্ব ভাবে, নারীকে জেনে সে কি জীবনের নারীজ্ঞান আরম্ভ করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই।

হঠাৎ এরমধ্যে একদিন অনাথবাবু মালতীকে কিছু না বলেই গৃহত্যাগী হলেন। সেই থেকে মালতীবৌদি ভেঙে পড়লেন। একদিন রাতের অন্ধকারে আনন্দর সম্পূর্ণ ভার হেরম্বকে দিয়ে মাস্টারমশাইকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন মালতীবৌদি।

হেরম্ব ভেবে পায় না এখন সে কি করবে! সুপ্রিয়া আর আনন্দ! কাকে সে গ্রহণ করবে? কাকে ফিরিয়ে দেবে। রাতের কবিতা বুঝি শেষ হয়ে এল।

বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত শক্তিমান লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর নাম 'দিবারাত্রির কাব্য'। এমন আশ্চর্য প্রেমের কাহিনী বুঝি বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। বর্তমানে এটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন নাবিক প্রোডাকসন্সের অন্যতম দুই পরিচালক নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীভৌমিক। সম্প্রতি পুরী-বহির্দৃশ্য গ্রহণের পর এ

দিবারাত্রির কাব্য চিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক

সপ্তাহ থেকে রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় এ ছবির অন্তর্দৃশ্যের কাজ শুরু হয়েছে। কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন: হেরম্ব—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিয়া—মাধবী মুখোপাধ্যায়, মালতীবৌদি—অনুভা গুপ্তা, অনাথবাবু—কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ—অঞ্জনা ভৌমিক, অশোক—অসীমকুমার এবং খুনী—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। আলোকচিত্রগ্রহণ, সংগীত এবং শিল্প-নির্দেশনায় রয়েছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী, ওস্তাদ বাহাদুর খান ও রবীন ঠাকুর।

স্টারে দাবী নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক উৎসবে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন শৈলেন মুখার্জি, জ্যোৎস্না বিশ্বাস এবং অনুপকুমার। চিত্রে শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ও প্রধান অতিথি শ্রীমনোজ বসুকে দেখা যাচ্ছে। ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

গিরিশ নাট্য সংসদের দ্বিতীয় পানিপথ ও রাজলক্ষ্মী

গিরিশ নাট্য সংসদ কলকাতার একটি সুপরিচিত সৌখীন নাট্য-সংস্থা। এ'দের অভিনয়কুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখা গেছে ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র কোহিনুর ও সোনাই দীঘি অভিনয়ের মধ্যে।

বর্তমানে এ'রা শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র 'রাজলক্ষ্মী' এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'দ্বিতীয় পানিপথ' নাটক দুইটি শহরের বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করছেন।

গত ২৮ অক্টোবর দর্জিপাড়ায় সাধক রামপ্রসাদ উদ্যানে, ১২ ও ১৩ নভেম্বর দেশবন্ধু পার্ক মহিলা উদ্যানে এবং ২০ নভেম্বর দমদম রোডস্থ সি-আই-টি বিল্ডিংস-এ: এ'রা দ্বিতীয় পানিপথ ও রাজলক্ষ্মী নাটক দুটি অভিনয় করে সহস্র দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

অভিনয়ে, উপস্থাপনায় ও দলগত সংহতিতে এ'দের নাটক ভবিষ্যতে আরও রসজ্ঞ জনসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে এ আশা নিশ্চয় করা যায়।

বালীগঞ্জ নাট্য সংসদের দুটি অভিনব নাট্য প্রচেষ্টা

গত ২৩ নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যা সাতটার সময়ে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে বালীগঞ্জ নাট্য সংসদের সদস্যারা দুটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথমটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত প্রহসন 'একেই কী বলে সভ্যতা?' দ্বিতীয়টি শরদিন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের রহস্য কাহিনী 'মাকড়সার রস'। কাহিনীটির নাট্যরূপ দেন অরুপরতন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ।

'একেই কী বলে সভ্যতা'র বিষয়বস্তু একালেরও উপযুক্ত। শুধু বিদেশী অন্ধ অনুকরণে এবং হ্যাট-কোট-প্যান্টের মাধ্যমে যে সভ্যতা লাভ করা যায় না, বালীগঞ্জ নাট্য সংসদ দর্শকদের সামনে তা সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেন।

এই প্রহসনটির মঞ্চসজ্জায় অভিনবত্ব আছে, সাজ-সজ্জায় ঊনবিংশ শতাব্দীকে অবলম্বন করা হয়েছে, সর্বোপরি নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয় নাটক 'মাকড়সার রস' একটি অভিনব রহস্য কাহিনী। এযুগে বাংলা দেশে রহস্য কাহিনীকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা যায়নি। তবু যে কটি মঞ্চে উপ-স্থাপিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যেই মেলোড্রামা প্রাধান্য পেয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য কাহিনীর মধ্যে সে সুযোগ কম, ফলে নাট্য সংসদ রহস্য কাহিনীর ক্ষেত্রে নতুন প্রচেষ্টা করেছেন বলা চলতে পারে।

কাহিনীর নাট্যরূপ সরল, গতিযুক্ত এবং আগাগোড়া কৌতূহল বজায় থাকে। মঞ্চপরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসার দাবী
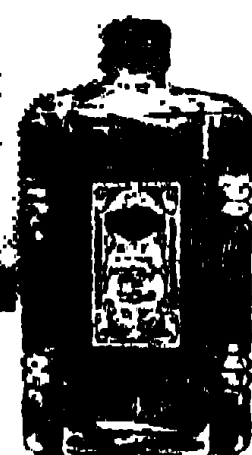
মাধো আলোকসজ্জা ও সঙ্গীতপরিচালনা সাধারণ পর্যায়ের।

দুটি কাহিনীরই বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন দিলীপ চ্যাটার্জী, মানস ঘোষ, সোমেন মিত্র, শিবশেখর নস্কর, অরূপ ভট্টাচার্য, সৌমেন চক্রবর্তী, সবিতা সমাদ্দার। নাট্যপরিচালনার কৃতিত্ব শিবশেখর নস্করের।

মহিলা শিল্পী মহলের 'কবি' ও 'মিশরকুমারী'

অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা শিল্পীরা বাস করেন অমলিন আনন্দলোকে; সাধারণ জীবনের দুঃখদৈন্য তাঁদের স্পর্শও করে না—মহিলা শিল্পী মহলের প্রারম্ভিক নাট্য পরিবেশন লগ্নে কানন দেবী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—বেশ কয়েক বছর আগে, "একথা হয়ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নামী ও দামী শিল্পীর জীবনে সত্য। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পীই জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলিতে কল্পনাও করতে পারেন না কর্মজীবনান্তে কি ভয়াল, অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে। বুঝতে পারেন, যখন সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছে যান, 'দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়।' আমাদের শিল্পী বোনেরা সেই সৌভাগ্যবঞ্চিত দিনগুলিতে যাতে দিশেহারা হয়ে না পড়েন তারই জন্য আমাদের এই সংঘের সৃষ্টি। এই সঙ্ঘ উপার্জিত অর্থে আমাদের একটি গৃহ-নির্মাণের পরিকল্পনা আছে—যাতে দুর্দিনে তাঁরা এখানে আশ্রয় পেয়ে নানা কাজে ব্রতী থেকে জীবনের দিনগুলি সসম্মানে ও শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারেন।"

মহিলা শিল্পী মহলের প্রতিষ্ঠাত্রী কানন দেবীর এই মহৎ ব্রত সার্থকপ্রায়। সম্প্রতি তিনি আমাদের জানিয়েছেন এপর্যন্ত কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে মহিলা শিল্পী মহল প্রযোজিত নাটক মঞ্চস্থ করা অর্থে তাঁরা বণ্ডেল রোডে জমি কিনেছেন। কয়েক বছরের মধ্যে বাড়ী উঠবে এ আশাও করা যায়। আগামী ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও এঁরা দুটি নাটক মঞ্চস্থ করছেন। ৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি এবং ৬ই তারিখে হবে মিশরকুমারী। মঞ্চ ও পর্দার প্রথিতনামা প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা এই নাটকদ্বয়ে অংশগ্রহণ করবেন।

গান্ধার প্রযোজিত 'দশটি বছর' নাট্যাভিনয়

গান্ধার নাট্যগোষ্ঠী গত ২৩শে নভেম্বর মুক্তাঙ্গন মঞ্চে সমারসেট মম-এর 'দি লেটার' অবলম্বনে অমর বসু রচিত 'দশটি বছর' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। বিশেষ করে গান্ধার সম্পর্কে একটা কথা বলব, নতুন ধরনের বিষয়-বক্তব্যের নিরীক্ষামূলক প্রযোজনা-রূপে এঁদের প্রয়াস প্রতিবারের মত এবারও সার্থক হয়েছে।

সমারসেট মম-র 'দি লেটার' রহস্যাত্মক কাহিনী হলেও একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য রয়েছে। নাট্যকার অমর বসু তাঁর 'দশটি বছর' নাটকে মূল কাহিনীর যথার্থ সুর বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এক বিবাহিত দম্পতির এ কাহিনী। দশটি বছর স্বামী তার স্ত্রীকে দেবীর মত ভালবেসে ছিল। কিন্তু স্ত্রীটি তার স্বামীর কাছে কোনদিনই দেহগত সুখ পাইনি। ফলে স্বামীর এক বন্ধুকে সে ভালবাসা জানাল। একদিন স্বামীর অবর্তমানে তার বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ স্ত্রীটির সং-ভালবাসা নিয়ে বিবাদ ঘটে। এবং ভদ্রমহিলা কোন দ্বিধা না করে তার স্বামীর বন্ধুকে গভীর রাতে খুন করে।
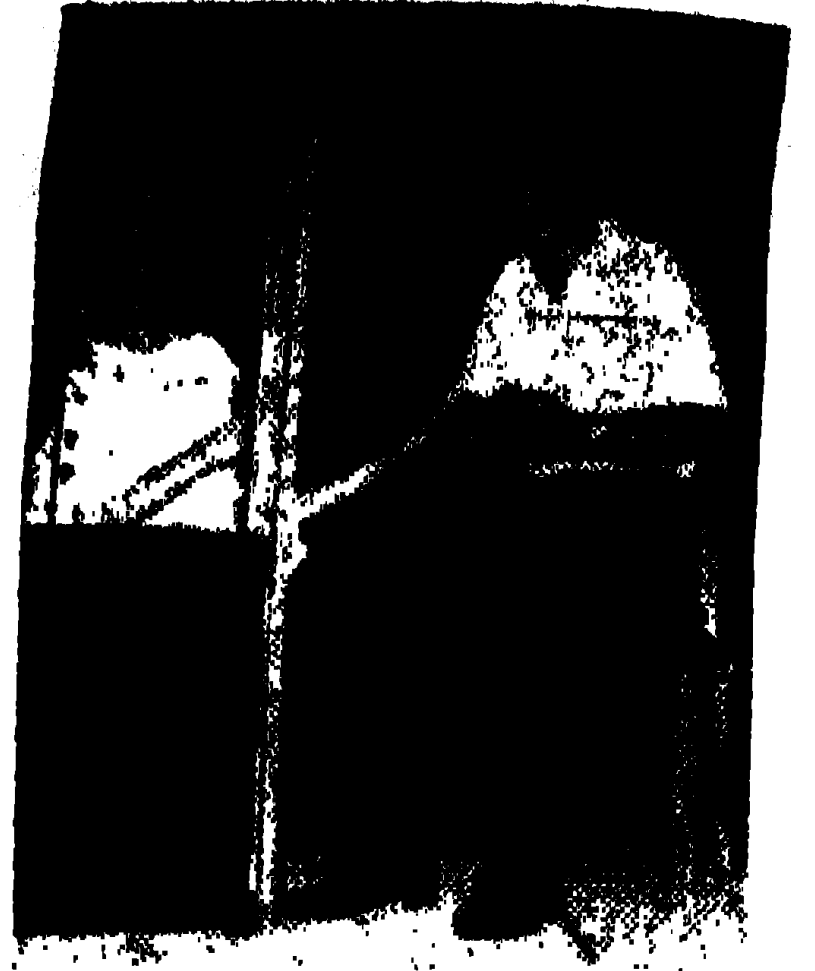
গান্ধার শিল্পীগোষ্ঠী কর্তৃক অভিনীত দশটি বছর নাটকের দৃশ্য

যথাসময়ে এই খুনের তদন্ত শুরু হল। স্বামীটির এক উকিল বন্ধু শেষপর্যন্ত আইনের যুক্তি দেখিয়ে ভদ্রমহিলাকে কাঠগড়া থেকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীটি তার স্ত্রীকে এই অন্যায়ের জন্য ক্ষমা করতে পারেননি।

এই কাহিনীটি সরাসরি না বলে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ায় নাটকটি খুবই রসঘন হয়ে ওঠে। দৃশ্য রচনার মধ্যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নাটকের শেষ দৃশ্যে, স্বামীটি যখন স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন স্ত্রীর ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত এবং স্বামীটির আগামীদিনের কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারলাম না।

আঙ্গিক এবং অভিনয়ে নাটকটি গান্ধারের পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

রঙমহলে অতএব নাটকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সরযূ দেবী ও জহর রায়।

স্বামী এবং স্ত্রীর চরিত্রে স্বাভাবিক এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেন অসিত মুখোপাধ্যায় ও মুক্তি গোস্বামী। বিশেষ করে শ্রীমতী গোস্বামীর অভিনয়টি এক কথায় অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন অচিন্ত্য চক্রবর্তী, রাজা চক্রবর্তী, তরুণ চৌধুরী, সুবিমল দাস, রণেন পাল, ভব রায়, রুণু পাল এবং সৌরেন বসু। কলাকুশলী বিভাগে দৃশ্যরচনা এবং আলোকসম্পাতের কাজ প্রশংসনীয়। আবহসংগীতের পরিবর্তে পারিপার্শ্বিক শব্দ এবং ধ্বনি ব্যবহৃত হওয়ায় নাটকটি আরও বেশী বাস্তব রূপ ধারণ করে।

গান্ধার প্রযোজিত 'দশটি বছর' অবশ্যই দর্শনীয় বলা চলে।

কালবৈশাখী

চতুর্দশ বার্ষিক পূর্তি উপলক্ষে 'শিল্পী-নাট্যম্'-এর সভ্যরা তাঁদের অষ্টাদশ নাটক শ্রীঅধীর ভট্টাচার্যের 'কালবৈশাখী' শ্রীবিশু নিয়োগীর সুষ্ঠু পরিচালনায় গত ৮ই নভেম্বর রঙমহল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এক আত্মভোলা শিল্পীর জীবনের বেদনাবিধুর কাহিনীর পটভূমিকায় সফল নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্যকার এই বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকে। অভিনয়াংশে বিশু নিয়োগী, হরিপদ কর্মকার, রাজকুমার সরকার, মণি মজুমদার, কান্তি শ্রীমল, দিলীপ ঘোষ, শংকর ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না বোস, রাণু রায় ও অনিলা ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। রতনকুমার ও দীপ্তি গুহের নিরুপম ও চপলা বড়ই আড়ষ্ট। শ্রীঅশোককান্তি মজুমদারের সুরসৃষ্টি সুশ্রাব্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ডঃ কালিদাস নাগের মৃত্যুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বহরমপুর টেক্সটাইল টেকনলজি কলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'গুরু' অভিনয়

বহরমপুর কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনলজির ছাত্রবৃন্দ তাঁদের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের 'গুরু' (অচলায়তনের সংক্ষিপ্ত রূপ) নাটক মঞ্চস্থ করেন। পৃথকভাবে আলোচনা না করে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে দলগত অভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন গৌতম ভট্টাচার্য ও বিকাশ মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন উজ্জ্বল কর, সুজয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ ভড়, বাসুদেব সরকার, স্বপন বিশ্বাস, মৃন্ময় কুশারী প্রভৃতি। মঞ্চপরিকল্পনা ও আলোকসম্পাতে ছিলেন অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ ঘোষ।

কানাই-বলাই

রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের আমন্ত্রণে গত ৫ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় সব পেয়েছির আসরের সোনারকাঠির দল স্বপনবুড়ো রচিত ও পরিচালিত বিশ্বরূপা শিশুনাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনব নৃত্য-নাট্য 'কানাই-বলাই' বিবেকানন্দ হলের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যমণ্ডিতভাবে অভিনয় করে।

এই প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'অমৃতে'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

প্রথমে আসরের পরিচালক স্বপনবুড়ো আসরের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি এই শিশু-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে ভাষণ প্রদান করেন। সুধীর সিংহ নৃত্য-পরিচালনা ও সুনীল সাহা সংগীত-পরিচালনা করেন। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোক-নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা প্রদর্শন

প্রথম বসন্ত চিত্রের মিউজিক টেকিং-এ রবীন চ্যাটার্জী, পরিচালক নির্মল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখার্জী

দক্ষিণ পরিষদ অভিনীত দুটি পাতা একটি কুঁড়ি নাটকে কমলা দাস ও অমিয় দাস।

করেন। হরবোলা পাখ-পাখালীর ডাকে পরিবেশকে জীবন্ত করে তোলেন।

যশোদা, কানাই, বলাই, কংস, নারদ, রম্ভা, ফলওয়ালী, পূতনা, গোপ-গোপিনীর দল নৃত্য-গীতে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

জেসপস্‌ কোচ ওয়ার্কস ড্রামা কমিটি

জেসপস্‌ কোচ্‌ ওয়ার্কস ড্রামা কমিটি সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'আদর্শ সংসার' অভিনয় করেন। উপস্থাপনা, প্রযোজনা ও সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় সবই প্রায় ভালো হয়। নাট্যনির্দেশনায় রাসবিহারী দাস নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। ফটিক সেনের 'শঙ্কর', সময় চৌধুরীর 'পিনাকী', টুকু ঘোষের 'মিনু', হেমন্ত দাসের 'রমাপদ' অপূর্ব। অন্যান্য চরিত্রে সীতা নাগ, সময় ভট্টাচার্য, অবনী দে, কল্পনা ভট্টাচার্য সুঅভিনয় করেন।

বোম্বাইতে বাংলা নাটক

বোম্বাইতে শিবাজী পার্কে সম্প্রতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটক অভিনীত হয়। প্রান্তিক অভিনীত 'টাকার রং কালো', বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব অভিনীত 'সত্য মারা গেছে' ও লিটল পায়োনিয়ার্স অভিনীত 'ধৃতরাষ্ট্র' নাট্যানুরাগীদের পরিতৃপ্ত করেছে।

'বঙ্গমৈত্রী সংসদ' সান্তাক্রুজে অভিনয় করলেন 'পাহাড়ী ফুল'। গোরেগাঁওতে মঞ্চস্থ হোল 'উল্কা' ও 'মেঘে ঢাকা তারা'। শহরের অন্যান্য জায়গায় শারদীয়া পূজামণ্ডপে 'স্বীকৃতি', 'সংক্রান্তি', 'তুষারমেয়ে', 'আজকাল' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

অ্যামেচার ইউনিট

'অ্যামেচার ইউনিটে'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা'র মঞ্চে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি' নাটকের অভিনয় করলেন। সামগ্রিক অভিনয়ের মান মোটামুটি সুন্দর। 'চরণ' চরিত্রে প্রয়োগপ্রধান শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন হিমাংশু দাশ, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অমর ভট্টাচার্য, সুশান্ত মিত্র। আবহসঙ্গীত সংগতে কিশোর ভড় প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

রাঁচীতে বাংলা নাটক

রাঁচীর প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'চেনামুখ' সম্প্রতি 'পাথরের চোখ' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন অনন্তপুর-নিবারণপুর পূজামণ্ডপে। জানা গেল যে, ওয়েলফেয়ার সেন্টার হলে এই সংস্থার শিল্পীবৃন্দ শীঘ্রই আর একটি নাটকের অভিনয় করবেন।

'ছন্দরাগ'

মহড়ার 'ছন্দরাগে'র পরিচালনায় সম্প্রতি স্থানীয় রিজেন্ট পার্কে শিশিরকুমারের জন্মোৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের অনুষ্ঠানে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রতিভার ওপরে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। 'খেলরক্ষা' ও 'রজনীগন্ধা' নাটকদুটি এই দুদিনে পরিবেশিত হয়। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন রজেন রায়।

'চতুরঙ্গে'র অভিনয়

'চতুরঙ্গে'র বলিষ্ঠ প্রযোজনায় 'আবর্ত' নাটক নিয়মিত মঞ্চস্থ হোচ্ছে। এই নাটকটি গড়ে উঠেছে এক ভূমিহীন চাষীর জীবন-কাহিনী নিয়ে। সমরেশ বসুর ছোটগল্প অবলম্বনে এই নাটক ইতিমধ্যে নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। গত ২৫শে নভেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় একটি অভিনয় হয়েছে। নাট্যনির্দেশনায় আছেন বরুণ দাশগুপ্ত।

সম্প্রতি হায়দরাবাদে স্থানীয় বাঙালী সমিতির উদ্যোগে জতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বায়েন' নাটক অভিনীত হয়। সুবলের ভূমিকায় ঢোলক বাজাচ্ছেন শ্রীসুবোধ সেন এবং পাঁচুর ভূমিকায় শ্রীশিখরেন্দু ভট্টাচার্যকে কাঁশি বাজাতে দেখা যাচ্ছে।

ডার্করুম

সম্প্রতি কলকাতার হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ 'ডার্করুম' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন স্টার রঙ্গমঞ্চে। দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অধীপ বিশ্বাস, অরুণ দে, শিশির পালচৌধুরী, শিখা ভট্টাচার্য উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

নাট্যসম্মেলন

এবারকার নাট্যসম্মেলন হবে আগামী ১৬ই ডিসেম্বর। জানা গেছে এবারে এই নাট্যোৎসব সর্বভারতীয় রূপ পাবে। সুদীর্ঘ পনেরো দিনের এই উৎসবে ৪২টি সংস্থা নাটক মঞ্চস্থ করবে। দেশের বিভিন্ন জেলার নাট্যসংস্থাকে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার জন্য উৎসব প্রাঙ্গণে দুটি মঞ্চ তৈরী হবে। এই উপলক্ষ্যে নাট্যকলাবিষয়ক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা : ২, বৃন্দাবন পাল লেন, কলি : ৩।

বিবিধ সংবাদ

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১৫ নভেম্বর ভবনাথ সেন স্ট্রীটে শ্রীশ্রী 'শ্যামাপূজা উপলক্ষে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের পরিচালনায় ও শ্রীপৃথ্বীশ বসুর ব্যবস্থাপনায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট শিল্পীদের সমাবেশে এই অনুষ্ঠানটি সার্থকতা লাভ করে। বিশেষভাবে শ্রীপৃথ্বীশ বসুর ত্রুটিহীন ব্যবস্থাপনার জন্য উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ গান শুনে পরিতৃপ্ত হন। সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন প্রখ্যাত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব চট্টোপাধ্যায়, রত্না মুখার্জি, দীপক ব্যানার্জি, চিত্তপ্রিয় মুখার্জি, অনিল দত্ত, কৃষ্ণা ব্যানার্জি, নিতাই গোস্বামী, শঙ্কর ভট্টাচার্য, পরেশ চ্যাটার্জি, অশোক দাস, দিলীপ চ্যাটার্জি এবং হাস্যকৌতুকে সুশীল চক্রবর্তী ও মলয়।

টাকী সম্মিলনীর বিজয়া সম্মিলনী

গত রবিবার ২০ নভেম্বর '৬৬ ভবানীপুর তানসেন সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ভবনে টাকী সম্মিলনী বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। *সম্মিলনীর সভ্যদের সংগীত পরিবেশন ছাড়াও যে সব শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে রবি চক্রবর্তীর সরোদ, শ্রীসরোজ কুশারীর রবীন্দ্রসংগীত ও ভজন, শ্রীতরুণ দত্তের সেতার, শ্রীমতী ছবি ঘোষের উর্বশী ও লোকনৃত্য, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের হাস্যকৌতুক ও শ্রীমতী তপতী রায়ের সেতার বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।* সমগ্র অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করেন শ্রীরমণীমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রীপ্রবোধ ঘোষ। সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীলালবিহারী বসু উপস্থিত সভ্য ও অতিথিবৃন্দের আপ্যায়ন করেন।

বিশ্ব শিশু দিবসে কিশোর কল্যাণ পরিষদের আনন্দানুষ্ঠান

১৪ই নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে কিশোর কল্যাণ পরিষদ চৌরঙ্গীস্থ ওয়াই এম সি এ হলে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের শিশুদের একটি মনোজ্ঞ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয়, চিলড্রেনস্‌ সুইট হোম গার্লস স্কুল, জুইস গার্লস স্কুল, ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা নৃত্যগীতাদি পরিবেশন করে। রুশ বালিকা কুমারী তানিয়া উরলভ নিজের ভাষায় একটি কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ

করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'লোক-সেবক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতাস্থ সোভিয়েত সাংস্কৃতিক দপ্তরের শ্রীমতী উরলভ।

ম্যাক্সমুলার ভবনে চলচ্চিত্রম্-এর উদ্যোগে জন থিয়েল-কৃত তথ্যমূলক চলচ্চিত্রের বক্তৃতা-সহ প্রদর্শনী :

গেল শনিবার, ১৯-এ নভেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার 'চলচ্চিত্রম্'-এর উদ্যোগে ম্যাক্সমুলার ভবনে টি ভি ও তথ্যমূলক চলচ্চিত্রের প্রযোজক-পরিচালক ও সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ জার্মান মনীষী জন থিয়েলের তথ্যমূলক চলচ্চিত্র প্রযোজনার বিশেষ রীতিনীতি সম্পর্কে একটি সারগর্ভ ভাষণের পরে তাঁরই পরিচালিত "দি মঙ্ক অব স্যালজ্‌বার্গ" ও "মোৎজার্ট অ্যান্ড দি ক্লকওয়ার্ক ফ্লুট" নামে তথ্যমূলক চলচ্চিত্র দুটি প্রদর্শিত হয়।

শিশু রঙমহলের অনুষ্ঠান

শৌভনিক-এর সহযোগিতায় মুক্ত অঙ্গন রঙ্গালয়ের উন্নয়নকল্পে প্রখ্যাত শিশু সংস্থা 'শিশু রঙমহল' (সি-এল-টি) মুক্ত অঙ্গনে পর পর কয়েকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন।

এই পরিকল্পনার প্রথম প্রদর্শনী রবিবার ৪ঠা ডিসেম্বর বেলা ৩-৩০টায় মুক্ত অঙ্গনে 'পাপেট শো' ও 'যোগিং মাউস' অনুষ্ঠিত হবে।

নিখিল ভারত আব্দুল করিম সংগীত সম্মেলন

২৫শে নভেম্বর নিখিল ভারত আব্দুল করিম সংগীত সম্মেলন সুরু হয় মহাজাতি সদনে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে সংগীত ওস্তাদ আব্দুল করিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, এই মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের দাবী উপেক্ষা করেও এখানে আসার কারণ এই উপলক্ষে সংগীত-জগতের এক মহাগুণীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের আন্তরিক তাগিদ। আমি এখন গান না গাইলেও সংগীতে অনুরাগী। আমাদের পরিবারে গানের চর্চা সদাপ্রবহমান। আমার পিতা শিশিরকুমার ঘোষ শুধু কণ্ঠসংগীতই নয়, যন্ত্রও (যেমন সেতার পাখোয়াজ ইত্যাদি) অনুশীলন করতেন। এখন গানের প্রচার ও প্রসারের ক্রমবর্ধমানতা নিঃসন্দেহে আনন্দের কথা। এইসব আসরে অনেকেরকণ্ঠে গান শোনা যায়, অনেক নতুন প্রতিভা বিকাশেও সাহায্য করেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। তবু মনে হয় কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। সে ক্ষতি অপূরণীয়। মনের অনুসন্ধিৎসা সজাগ রাখলে বহু লুপ্ত জিনিসের পুনরুদ্ধার সম্ভব। এ আমার বহু পরীক্ষিত সত্য। একবার বহু পুরোন এক গানের আস্থায়ী ও আভোগ মাত্র পেয়েছিলাম। বহু সন্ধান করে, বহু স্থান ও গুণীর কাছে ঘুরে সেই গানের সঞ্চারী ও আভোগও সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাঁর একটি 'তিলক-কামোদ' গানের কিছু অংশ হস্তগত হয়, পরে বাকী অংশ উদ্ধার করে গানটির পূর্ণাবয়ব আনতে পেরেছি। ফৈয়াজ খানের গাওয়া একটি বাহার ঠুংরী এখনও স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পাই। প্রকৃত গুণীর গাওয়া শুদ্ধ সংগীতের মাধুর্য মনের মধ্যে চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। শুনলাম সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনে শ্রীশশিপদ পাঠকের গাওয়া টপ্পা 'সে কেনরে করে অপ্রণয়'—আপনাদের মুগ্ধ করেছে। ঐ গানটি বহুকাল আগে আমার বড়দাদার কণ্ঠে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, যে মহান গুণীর নামে এই সম্মেলন—ঐ নামেই এঁদের একটি সঙ্গীত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলবার ইচ্ছাও আছে শুনলাম—সেই মহৎ সংকল্প সার্থক হোক—আজকের দিনে এই প্রার্থনা করি।

গানের জলসা

একটি অধিবেশন : দুজন শিল্পী

ক্রিয়েটিভ ক্লাবের মাসিক অধিবেশন সুরু হয় কল্যাণী রায়ের ছাত্র শ্রীদেবু চ্যাটার্জির সেতার দিয়ে। রাগ 'মালকোষ', এর আগেও শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বাজনা আমরা শুনেছি। কিন্তু এবারের বাজনায় তাঁর দ্রুত উন্নতি সহজ-লক্ষণীয়। রাগরূপ পরিচ্ছন্ন, তান স্পষ্ট, ঝালার লয়ও সুন্দর। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রশংসার দাবী রাখে।

দ্বিতীয় শিল্পী মালবিকা কানন প্রথমে গাইলেন 'নন্দ', দ্বিতীয় রাগ 'সাহানা', পরে ঠুংরী। শিল্পীর সুরেলা কণ্ঠে রাগের অনাড়ম্বর সহজ গতি তানের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিস্তার-মাধুর্যে নিমেষেই সুর জমে উঠল! শ্রীমতী কাননের কণ্ঠ-মাধুর্য ও রাগ-শুদ্ধতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। ইনি স্বনামধন্যা, তবু বলব ইদানীং এঁর অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও রেওয়াজ ছাড়াও নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে রসিক-সমাজে এঁকে অধিকতর আদরনীয় করে তুলছে।

ঘরোয়া আসরে গিরিজা দেবী (বেনারস)

উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের পক্ষ থেকে শ্রীমতী অমলাশঙ্কর তাঁদের গল্‌ফ-ক্লাব রোডের বাসভবনে এক চিত্তগ্রাহী ঘরোয়া জলসার আয়োজন করেছিলেন কিছু দিন আগে।

গিরিজা দেবী অনুষ্ঠান সুরু করেন শুদ্ধকল্যাণ দিয়ে। বিলম্বিত ও দ্রুতের আধারে স্বল্প কটি তানের সীমিত পরিসরে রাগরূপ মূর্ত হয়ে উঠতে দেরী হয় নি! দ্বিতীয় রাগ মধ্যলয়ের ইমনকল্যাণ। পরবর্তী ঠুংরী ও দাদরা গানে ছড়িয়ে দেন শিল্পী নিজেকে। শুদ্ধ স্বরের নিরঞ্জন পটভূমিকায় সহজেই ফুটে ওঠে শৃঙ্গার ও করুণ রসের নিটোল মাধুর্য। কিছুদিন আগে উদয়শঙ্কর সেণ্টারের শিক্ষার্থীরা গিরিজা দেবীর জন্য আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে — বিচ্ছেদশঙ্কাতুরা নায়িকার দয়িতের কাছে করুণ মিনতি 'না, যেও না' নৃত্যের ভাষায় ব্যক্ত করে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সেই 'না'-ই তিনি রূপায়িত করলেন তাঁর প্রাণকাড়া ঠুংরীর মাধ্যমে। গিরিজা দেবীর দরাজ কণ্ঠে, মুর্কীর চকিত ইসারায়, জমজমা পুকারের শিঞ্জণে, বিভিন্ন বোলের অর্থব্যঞ্জক উচ্চারণ সৌন্দর্যে সর্বোপরি শিল্পীর প্রসন্ন মেজাজের ললিত স্পর্শে নায়িকার মাধুর্যভরা অন্তরাকুতি যেন লীলায়িত হয়ে উঠল। শেষে অনুরোধে গাওয়া "পানীয়া ভরেনী কোন আলবেলী কিনারে ঝমাঝম" বেনারস ঘরানার বৈশিষ্ট্য, ঠাট-ঠমক ও অলংকার-গুঞ্জনে পরিবেশিত। গানের সঙ্গে সঙ্গে 'নায়িকা-ভেদে'র চিত্র-সৌন্দর্য যেমন নিবিড় হয়ে উঠেছে তেমনই প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ হয়েছে 'অর্থভাব' ও 'বোলবাণ্ডী' ঠুংরীর স্বাতন্ত্র্য ও সম্মেলন। তিন জি যোগের বেহালা-সঙ্গত সংগীতরসকে ঘনীভূত করেছে। তবলায় সুপণ্ডিত আনোখে-লালের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীঈশ্বরলালের বং, একতাল ও দ্রুতচাচরের সঙ্গত-দক্ষতা ও সৌন্দর্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার্থী সম্মেলন

উত্তরী সংগীত সমাজ আয়োজিত ২য় বার্ষিক সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন আগামী ৩ ও ৪ ডিসেম্বর '৬৬ উত্তর কলিকাতাস্থিত বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে (২ সি, কে সি বোস রোড, শ্যামবাজার) প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলনে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিভাবান সংগীত শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করবেন।

সাধু তারাচরণ রোডস্থ তারা মঠে শ্রীশ্রী-জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে প্রখ্যাত গায়িকা কীর্তনশ্রী কুমারী বীণা ঘোষ ভক্তিপূর্ণ কীর্তন পরিবেশন করিয়া অগণিত ধর্মপ্রাণ শ্রোতৃবর্গকে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

এশীয় ক্রীড়ার জনক

অজয় বসু

এশীয় ক্রীড়াভূমিতে ইন্দোনেশিয়া আবার ফিরে এসেছে, এই কথাটি জেনেই অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধী পরিণত বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ছুটি নেওয়ার আগে মন্তো সান্ত্বনায় তিনি পরিতৃপ্ত বোধ করেছিলেন নিশ্চয়ই।

চার বছর আগে জাকার্তায় আয়োজিত এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষে ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ইন্দোনেশিয়া অধ্যাপক সোন্ধীর আজীবনের সাধনার ফলশ্রুতি গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সে অপচেষ্টার জের চলে আর তিন-সাড়ে তিন বছর। তারপর ইন্দোনেশিয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মশুদ্ধির পথে পা বাড়ায়। এসব কথা গুরুদত্ত সোন্ধী জেনেই গেলেন।

১৯৬২ সালে জাকার্তা ক্রীড়াকালে রাজনৈতিক মত ও পথের চাপে এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমির আবহাওয়া কিভাবে বিষিয়ে উঠেছিল, সবিস্তারে তা স্মরণ করার আজ দরকার নেই। তবে সংক্ষেপে তার উল্লেখ রাখা যেতে পারে। যেহেতু অধ্যাপক সোন্ধীর চারিত্রিক মহিমা বোঝাতে ওই দৃষ্টান্তের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছুই নেই।

ওলিম্পিকের মতো এশীয় ক্রীড়ার সনদেও এই সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে মতের পার্থক্য থাকুক বা নাই থাকুক, কূটনৈতিক সম্পর্ক যাইহোক না কেন সংগঠক রাষ্ট্র এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন অনুমোদিত কোনো দেশকে এশীয় ক্রীড়ায় যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না। কিন্তু বার্ষাট্টিতে ইন্দোনেশিয়া জাকার্তা ক্রীড়ায় ফরমোজা ও ইজরাইলকে যোগ দিতে দেয়নি কম্যুনিস্ট চীন ও আরব লীগের নেপথ্য চাপে।

এশীয় ক্রীড়ার সনদ লঙ্ঘনের এই নজীরে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। জাকার্তা ক্রীড়াকালে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং এশীয় ক্রীড়ার জনক অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধী। জাকার্তায় বসে ভ্রষ্টনীতি ইন্দোনেশীয় আচরণের প্রতিবাদে অন্যেরা যখন প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানাতে ইতস্তত করছেন তখন এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সভায় অধ্যাপক সোন্ধী জোরগলায় বলেন, সনদ লঙ্ঘনের এই নজীর অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। এশীয় ক্রীড়াকে এক অঞ্চলের সার্বজনীন অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার মহৎ সংকল্প আমরা নিয়েছি। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে সে পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হতে চলেছে। এ হতে পারে না। বিধিভঙ্গের সনদ উপেক্ষার অবক্ষয়ে যে অনুষ্ঠান চরিত্রবর্জিত সেই আয়োজনকে আমরা এশীয় ক্রীড়া বলতেও পারিনি। কাজেই আমার প্রস্তাব, চতুর্থ এশীয় ক্রীড়াকে আসল নামে না ডেকে শুধুমাত্র জাকার্তা ক্রীড়া বলে অভিহিত করা হোক। এর আনুষ্ঠানিক মর্যাদা হনন করা হোক।

অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধি

অধ্যাপক সোন্ধীর বক্তব্যে সায় মেনে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনে উপস্থিত সদস্যদের অনেকেই তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করায় চতুর্থ এশীয় ক্রীড়া তার আনুষ্ঠানিক মর্যাদা হারাতে বাধ্য হয়। ফলে ইন্দোনেশিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। আর সেই জ্বলুনীর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে সোন্ধী এবং তাঁর দেশ ভারতের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে।

পেছনে উস্কানি ছিল বলেই সেদিন হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় তরুণ-তরুণী হাতে কালো পতাকা, মুখে সোন্ধী মুর্দাবাদ ধ্বনি নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। দল বেঁধে তারা সোন্ধী জাকার্তায় যে হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলে চড়াও হয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তোলে যে বাহাত্তর বছর বয়স্ক অধ্যাপক সোন্ধীর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে।

বিদেশ বিভুঁইয়ে গুরুদত্ত সোন্ধী যখন এক বিকৃত' উগ্র ও অন্যায় মনোভাবের বিরুদ্ধে নীতির জন্যে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন স্বদেশ থেকে তিনি বিশেষ সমর্থন পাননি। স্বদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কেউ কেউ প্রকাশ্যে তাঁর ভূমিকার নিন্দা করেছিলেন। তাঁদের আশংকা এই যে সোন্ধীর জন্যে ভারত-ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কে চিড় ধরবে। স্বয়ং ভারত সরকারের মনোভাবও ছিল অবিকল তাই-ই।

ভারত সরকারের উপদেশে জাকার্তাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআপাপান্ত প্রকাশ্যে বলে বসেন যে সোন্ধীর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তবু ইন্দোনেশীয় জনতা জাকার্তাস্থ ভারতীয় দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশীয় সরকার ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করে দেয়। পরের তিন-সাড়ে তিন বছর ভারত সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়া সেই এক-গুঁয়ে, আপোষহীন নীতি অনুসরণ করেছে এবং বিগত ভারত-পাক সংঘর্ষকালেও পাকিস্থানের কোলে ঝোল টানার চেষ্টায় সদম্ভে শাসিয়েছে ভারতকে।

এই ফাঁকে ইন্দোনেশিয়াও ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির আরও আমদানী ঘটাবার অপচেষ্টায় গানেফো ক্রীড়ার আয়োজন ঘটিয়েছে। কিন্তু গানেফো আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির অনুমোদন না পাওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি ও অন্য প্রায় সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থা অধ্যাপক সোন্ধীকে সমর্থন জানানোর ফলে গানেফো ক্রীড়া আসর জমাতে পারেনি। এই ফাঁকে এ বছরেই ইন্দোনেশীয় রাজনীতিতে এবং সেখানকার জনজীবনে ওলোট-পালট ঘটে গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের নিজের পায়ের নীচেকার মাটিই সরে যাবার উপক্রম ঘটেছে। ফলে বৃহত্তর চিন্তাধারার সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া, এশীয় ক্রীড়া সম্পর্কেও ইন্দোনেশিয়ার আগেকার মত গিয়েছে বদলে। নিজের আচরণের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে ইন্দোনেশিয়া সর্তাধীনে আবার ফিরে

এসেছে এশীয় ক্রীড়াভূমিতে। কাজেই শেষ জয় যে তাঁরই তা জেনেই অধ্যাপক সোন্ধী সেবানিঃস্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছেন। তিনি যে সার্থকজীবন তাতে আর সন্দেহ কি।

সন্দেহ যাঁদের ছিল তাঁরা জীবনের সমস্ত মূল্যকেই রাজনীতির পায়ে বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। রাজনীতিক অক্টোপাশে তাঁরা ক্রীড়াজীবনকে জড়িয়ে দিতেও কুণ্ঠিত নন। নীতির বালাই তাঁদের নেই। চার বছর আগেও ছিল না। তাই ভারত-ইন্দোনেশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের কথা ভেবেই তাঁরা সোন্ধীর নীতিনিষ্ঠ ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। যেদিন তাঁরা বুঝলেন যে সোন্ধী হলেন উপলক্ষ্য মাত্র, আসলে ইন্দোনেশীয় রীতি ও নীতি অন্যাপক্ষীয় রাজনীতিক প্ররোচনায় উজ্জীবিত সেদিন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তবে মুখে মুখে সে ভুল স্বীকার করেন নি। করেন নি বলেই সোন্ধী সম্পর্কে তাঁরা কোনোদিন সুবিচারও করতে পারেন নি।

কিন্তু খেলাধুলোর পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির ভূমিকা এবং মৌল নীতি সম্বন্ধে যাদের ধারণা এমন ঘোলাটে নয় তাঁরা জানেন ও স্বীকারও করেন যে গুরুদত্তের জীবনাদর্শ উচ্চপ্রশংসার অপেক্ষা রাখে। ভারত সরকার যখন তাঁকে ত্যাগ করেছে, হোটেলের বাইরে মারমুখী ইন্দোনেশীয় জনতা যখন প্রাণে মেরে ফেলার হুংকার তুলছে তখনও সোন্ধী নিজের নীতিতে অবিচল। তুচ্ছ প্রাণ যায় যাক, নীতির মর্যাদা রাখতেই হবে, এই সংকল্পেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর প্রজ্ঞা ও বজ্রকঠিন ভূমিকাই সার্বজনীন ক্রীড়া এশিয়ান গেমসকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ভালই হয়েছে যে জনককেই একদিন অগ্নিপরীক্ষার লগ্নে এশীয় ক্রীড়াকে আগলে রাখতে হয়েছে। লালন ও পালনের দায়িত্ব তো তাঁরই। এমন একটি মহান কাজের দায়িত্ব পালনে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর মানুষ আর কেই বা ছিলেন!

অতি সঙ্গত কারণেই অধ্যাপক সোন্ধীকে এশীয় ক্রীড়ার জনকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অনেকদিন থেকেই তিনি এশীয় অঞ্চলে ওলিম্পিক অনুসরণে একটি সার্বজনীন ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর পাতবার চেষ্টা করছিলেন। সেই চেষ্টারই এক বিক্ষিপ্ত বাস্তব রূপ ১৯৩৪ সালে দিল্লী পশ্চিম এশীয় ক্রীড়ার আয়োজন এবং অখণ্ড রূপ ১৯৫১ সালে ওই দিল্লীতেই এশীয় ক্রীড়ার প্রথম অনুষ্ঠান।

তার আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে লণ্ডনে আয়োজিত ওলিম্পিকের পুনরনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে (১৯৪৮) অধ্যাপক সোন্ধীর নেতৃত্বেই এশীয় অঞ্চলের ক্রীড়া প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন বসে। লণ্ডনের মাউন্ট রয়াল হোটেলের এই সম্মেলনে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার ও এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১৯৪৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী নতুন দিল্লীতে অধ্যাপক সোন্ধীরই পৌরোহিত্যে।

এশীয় ক্রীড়াবিদ সম্মেলন আহবান করার অথবা এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রস্তাব পেশে নেতৃত্ব দেবার অনেক আগেই অধ্যাপক সোন্ধী আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ভারতে ওলিম্পিক আন্দোলনের প্রসার ঘটাবার উদ্দেশ্যে তিনি দু-তিন দশকেই সক্রিয় ছিলেন। তখন তিনি ভারতীয় ওলিম্পিক এসোঃর অবৈতনিক সম্পাদক। তাঁর নিষ্ঠা ও উদ্যম দেখে ১৯৩২ সালেই আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দেন।

শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলোর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। জাতীয় চরিত্র শুধু বিদ্যায়তনেই নয় খেলার মাঠেও গড়ে ওঠে, এই আপ্তবাক্যে অধ্যাপক সোন্ধীর ছিল অগাধ আস্থা। নিজের জীবনেও তিনি শিক্ষায় এই ধারা মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন এক সফল শিক্ষাবিদ। লাহোর গভর্মেণ্ট কলেজের অধ্যয়ন শেষ করে তিনি কেমব্রিজ থেকে ইংরাজীতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে ইন্দোরের এক কলেজে অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন সুরু করেন। তারপর ফিরে আসেন লাহোর গভর্মেণ্ট কলেজে এবং ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই সেই কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরপর্বে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডেপুটি ডাইরেক্টার জেনারেলের পদেও কিছু দিন কাজ করেছেন।

উচ্চশিক্ষিত সোন্ধী ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়ামহলে সর্বজনশ্রদ্ধেয়। আরও একটি কারণে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ক্রীড়াজগতে তাঁর ভূমিকা মূলতঃ কর্মকর্তার হলেও দেশের বিবিধ ক্রীড়াসংস্থার কর্মকর্তা সেজে বসে থাকার লোভ তাঁর কোনোদিনই ছিল না। আমাদের দেশে যাঁরা পরিচিত ক্রীড়া কর্মকর্তা তাঁদের অনেকেই নানান সংস্থার গদী আঁকড়ে বসে থাকেন সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতো। যিনি ক্রিকেটের কর্মকর্তা তিনিই আবার ফুটবল, অ্যাথলেটিকস এবং আরও পাঁচটি সংস্থার মাতব্বর। কিন্তু অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধী ছিলেন এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। শেষজীবনে এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদে ছাড়া অন্যত্র তাঁকে দেখা যেতো না।

জলন্ধরে তাঁর জন্ম। শেষজীবন কেটে শৈলশিখর সিমলার সাবাথুতে। পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার প্রাক্কালে (১৯শে নভেম্বর ১৯৬৬) সাবাথুতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর বিয়োগলগ্ন বিস্ময়কর। এতো কাণ্ডের পর ইন্দোনেশিয়া ক্রীড়ায় ফিরলো। তিনি চোখে দেখে যেতে পারলেন না। তবে জেনে গেলেন যে তাঁরই জিৎ হয়েছে। সেইটিই পরম সান্ত্বনা। নয় কি?
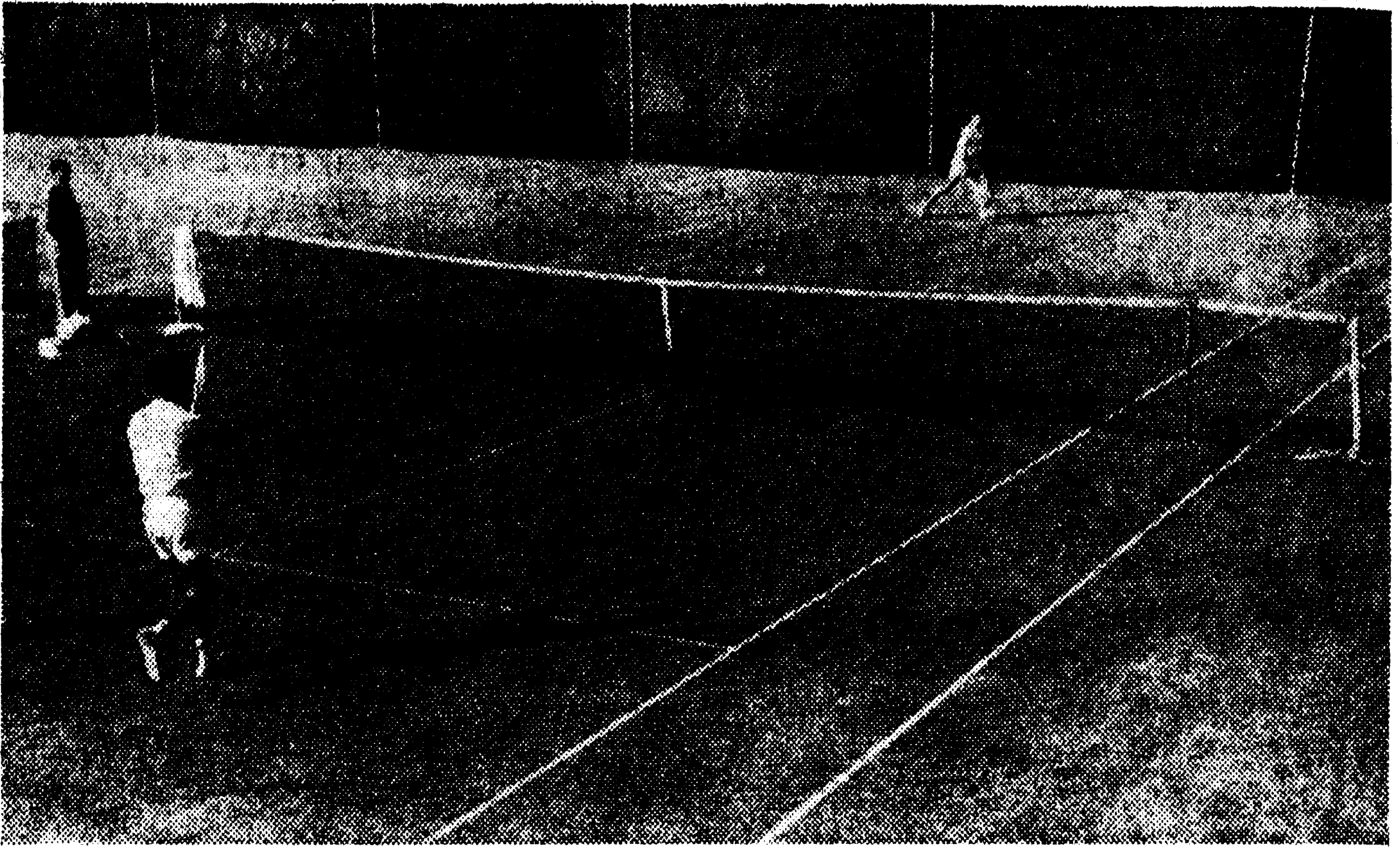
সাউথ ক্লাবের ঐতিহাসিক টেনিস কোর্ট—এখানে আগামী ৩রা ডিসেম্বর থেকে ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের ডেভিস কাপ ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার তিনদিনব্যাপী আসর বসবে। ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন ফাইনাল

আগামী ৩রা ডিসেম্বর কলকাতার সাউথ ক্লাবের সুরম্য তৃণাচ্ছাদিত টেনিস কোর্টে ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের ডেভিস কাপের (১৯৬৬) ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার তিন দিনব্যাপী আসর বসছে। এই খেলাটি হল ভারতবর্ষের ৬ষ্ঠ বারের ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলা, অপর দিকে ব্রেজিলের পক্ষে প্রথম। ভারতবর্ষ ইন্টার-জোন ফাইনালে ইতিপূর্বে ৫ বার পরাজিত হয়ে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলার সুযোগ হারিয়েছে। বিশ্ব টেনিস খেলার আসরে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার স্থান শীর্ষে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সরকারী নাম 'ইন্টারন্যাশনাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ। ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব—দলগত লন টেনিস প্রতিযোগিতায় বেসরকারীভাবে বিশ্ব খেতাব জয়। এই আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের প্রথম যোগদান ১৯২১ সালে এবং ব্রেজিলের ১৯৩৫ সালে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং ব্রেজিলের সাক্ষাৎ এই প্রথম।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ব্রেজিলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য এই প্রথম। পাঁচ বছরের (১৯৬২—৬৬) ইউরোপীয়ান জোন খেলার তালিকা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, যোগদানকারী দেশের বাছাই তালিকায় (যার সংখ্যা ৮) ব্রেজিলের কোন স্থান ছিল না। ১৯৬৬ সালের ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপে ব্রেজিলের খেলা পড়েছিল। এই ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপে ছিল শক্তিশালী দেশ—১নং বাছাই স্পেন (গত বছরের ইউরোপীয়ান জোন চ্যাম্পিয়ান এবং ডেভিস কাপের রানার্স-আপ), ৪নং বাছাই ফ্রান্স (৬ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী), ৫নং বাছাই চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ৮নং বাছাই সুইডেন। ব্রেজিল ইউরোপীয়ান জোনের খেলায় ১নং বাছাই স্পেনকে ৩-২ খেলায় এবং জোন ফাইনালে ৪নং বাছাই ফ্রান্সকে ৪-১ খেলায় পরাজিত করে ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হয় এবং মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমিফাইনালে আমেরিকার কাছে ১-২ খেলায় পিছিয়ে থেকেও শেষ দিনের দুটি সিংগলস খেলায় জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত ৩-২ খেলায় ১৯ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে

টমাস কোচ (অধিনায়ক)

রমানাথন কৃষ্ণান (অধিনায়ক)

উঠেছে। খেলার ফলাফল অপ্রত্যাশিত হলেও ব্রেজিলের এই সাফল্যের প্রতি কটাক্ষ করার কোন কারণই নেই। তারা যে আজ অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তার মূলে আছে দলগত ঐক্য, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, নিষ্ঠা এবং মরণপণ সাধনা। আন্তর্জাতিক লন টেনিস খেলার আসরে ব্রেজিলের পুরুষ খেলোয়াড়দের এই প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তবে অনেক আগেই বিশ্বের টেনিস খেলার মানচিত্রে ব্রেজিলের মহিলা খেলোয়াড় মারিয়া বুনো বিরাট সাফল্যের সূত্রে স্বদেশের নাম উৎকীর্ণ করেছেন। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় তাঁর বিরাট সাফল্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত : তিনবার (১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬৪) উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় এবং চারবার (১৯৫৯, ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৬) আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়। বিশ্বের মহিলা খেলোয়াড়দের বাছাই তালিকায় তাঁর স্থান ছিল : ১৯৫৯-৬০ সালে প্রথম, ১৯৬২ সালে দ্বিতীয়, ১৯৬৩ সালে তৃতীয় এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে দ্বিতীয় স্থান।

ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের আসন্ন ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে সব থেকে বড় সুবিধা — স্বদেশের সুপরিচিত পরিবেশ এবং তৃণাচ্ছাদিত কোর্টে খেলার আসর বসছে। ব্রেজিলের খেলোয়াড়দের পক্ষে এই দুই-ই প্রতিকূল অবস্থা। প্রথমতঃ ব্রেজিলের খেলোয়াড়রা ক্লে কোর্টে টেনিস খেলতে অভ্যস্ত। স্বদেশের ক্লে কোর্টে খেলার সুবিধা পেয়েই তারা শক্তিশালী আমেরিকাকে ৩-২ খেলায় পরাজিত করেছিল।

ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের পক্ষে খেলবেন রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল। অপর দিকে ব্রেজিলের পক্ষে টমাস কোচ (১নং), এডসন ম্যাণ্ডারিনো (২নং) এবং কার্লোস ফার্ণাণ্ডেজ।

কার্লোস ফার্ণাণ্ডেজ

এডসন ম্যাণ্ডারিনো

জয়দীপ মুখার্জি

প্রেমজিৎ লাল

চার বছরের খেলার ফলাফল
(১৯৬২-৬৫)

ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের আসন্ন ইন্টার জোন ফাইনাল খেলা আরম্ভের সময় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় এই দুই দেশের গত চার বছরের (১৯৬২-৬৫) খেলার ফলাফল নিঃসন্দেহে বিশেষ পর্যালোচনার বিষয়। ডেভিস কাপের খেলায় ভারতবর্ষ এবং ব্রেজিলের এই প্রথম সাক্ষাৎ। ইউরোপীয়ান জোনের প্রতিযোগী ব্রেজিল গত চার বছরে (১৯৬২-৬৫) মাত্র একবার (১৯৬২ সালে) ইউরোপীয়ান জোনের তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত উঠেছিল। অপরদিকে এশিয়ান জোনের প্রতিযোগী ভারতবর্ষ গত চার বছরে (১৯৬২-৬৫) তিনবার (১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৫) মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলেছে এবং বাকি একবার খেলেছে এশিয়ান জোন ফাইনাল পর্যন্ত। সুতরাং সাফল্যের বিচারে ব্রেজিলের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক বেশী উন্নত ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে।

ভারতবর্ষের খেলা

১৯৬২: ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ০-৫ খেলায় মেক্সিকোর কাছে পরাজিত হয়।
১৯৬৩: ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ০-৫ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়।
১৯৬৪: এশিয়ান-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ২-৩ খেলায় ফিলিপাইনের কাছে পরাজিত হয়।
১৯৬৫: ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ২-৩ খেলায় স্পেনের কাছে পরাজিত হয়।

ব্রেজিলের খেলা
ইউরোপীয়ান জোন

১৯৬২: ব্রেজিল ৩য় রাউণ্ডে ১-৪ খেলায় বৃটেনের কাছে পরাজিত হয়।
১৯৬৩: ব্রেজিল ২য় রাউণ্ডে ১-৪ খেলায় ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়।
১৯৬৪: ব্রেজিল ১ম রাউণ্ডে ১-৪ খেলায় স্পেনের কাছে পরাজিত হয়।
১৯৬৫: ব্রেজিল ২য় রাউণ্ডে ২-৩ খেলায় ইতালীর কাছে পরাজিত হয়।

১৯৬৬ সালের খেলা
ইন্টার-জোন ফাইনালের পথে

ভারতবর্ষ: এশিয়ান জোনে ইরাণকে ৫-০, সিংহলকে ৫-০, এশিয়ান-জোন ফাইনালে জাপানকে ৪-১ এবং অস্ট্র

প্রতিযোগিতায় ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীকে ৩-২ খেলায় পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠেছে।

ব্রেজিল: ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপে ডেনমার্ককে ৫-০, স্পেনকে ৩-২, সেমি-ফাইনালে পোল্যান্ডকে ৪-১ এবং ফাইনালে ফ্রান্সকে ৪-১ খেলায় পরাজিত করে এবং মূল প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে আমেরিকাকে ৩-২ খেলায় পরাজিত করে ইন্টার-জোন ফাইনালে উঠেছে।

ইন্টার-রেলওয়ে এ্যাথলেটিক্স

নিউ দিল্লীর রেলওয়ে স্টেডিয়ামে ৩২তম আন্তঃ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানের পুরুষ বিভাগে উত্তর এবং দক্ষিণ রেলওয়ে দল সমান ৭৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করার সূত্রে যুগ্মভাবে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে দক্ষিণ রেলওয়ে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট হিসাবে মার্শাল টিটো স্বর্ণপদক লাভ করেছেন উত্তর রেলওয়ের জার্ণেল সিং। চৌকস ক্রীড়া-সাফল্যের সূত্রে দক্ষিণ রেলওয়ে কাউল স্বর্ণপদক পেয়েছে। প্রথম দিনে ৫টি এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ৩টি আন্তঃ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক্স রেকর্ড ভঙ্গ হয়। উত্তর রেলওয়ের কুমারী কমলেশ ছটওয়াল ৩৭·৪৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ডিসকাসে জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

পুরুষ বিভাগ (সোদী আরবীয়া গোল্ড কাপ) : উত্তর এবং দক্ষিণ রেলওয়ে (৭৯ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ (কিরণ্যা নারায়ণ কাপ) : দক্ষিণ রেলওয়ে (৫৪ পয়েন্ট)।

দলীপ ট্রফি

দক্ষিণাঞ্চল দল : ৪৭০ রান (কুন্দেরণ ৬৭, জয়সীমা ১৭১ এবং সুব্রহ্মণ্যম ১২৩ রান। দেশাই ৭৬ রানে ৩ এবং মোহল ৯৩ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৩৮ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বোলিয়াপ্পা ৪৬ রান। যোশী ১৭ রানে ২ উইকেট)।

পশ্চিমাঞ্চল দল : ৪০২ রান (বিজয় ভোঁসলে ৬৮, অজিত ওয়াদেকার ১০৩ এবং ফার্ণান্ডেজ ৫৬ রান। ভেঙ্কট-রাঘবন ৯৫ রানে ৫, চন্দ্রশেখর ১১৯ রানে ২ এবং সুব্রহ্মণ্যম ২১ রানে ২ উইকেট)।

ও ৬৩ রান (১ উইকেটে)।

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সূত্রে পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত করে দলীপ ট্রফি জয়ী হয়েছে।

প্রথম দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের খেলার গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয় নি। ৮ রানের মাথায় ১ম, ২৩ রানের মাথায় ২য় এবং ৫৬ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। দলের এই শোচনীয় অবস্থায় ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কুন্দরন এবং জয়সীমা ৭৪ রান এবং ৫ম উইকেটের অসমাপ্ত জুটিতে জয়সীমা এবং সুব্রহ্মণ্যম ১২০ রান সংগ্রহ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। প্রথম দিনে ৪টে উইকেট পড়ে দক্ষিণাঞ্চল দলের ২৫০ রান দাঁড়ায়। ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের নবনির্মিত পীচ প্রাণহীন ছিল। প্রথম দিনে জয়সীমা ১০৩ রান এবং সুব্রহ্মণ্যম ৫৩ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে দর্শক সংখ্যা ৩৫ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। টেস্ট ম্যাচ ছাড়া গত পনেরো বছরের খেলায় এখানে এত বেশী দর্শক সমাগম কখনও হয় নি। ৪৭০ রানের মাথায় দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। জয়সীমা এবং সুব্রহ্মণ্যমের ৫ম উইকেট জুটির ২৩৫ রান—দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতায় ৫ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান হিসাবে গণ্য হয়েছে। এই দুজনের খেলায় ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের দর্শকমণ্ডলী প্রচুর আনন্দ পান। দক্ষিণাঞ্চল দলের অধিনায়ক জয়সীমা প্রথম দিনেই সেঞ্চুরী করে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সুব্রহ্মণ্যমের খেলার জৌলুষে তাঁর খেলা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। জয়সীমা ৪১৭ মিনিটের খেলায় তাঁর ১৭১ রানে ২১টা বাউণ্ডারী করেন। অপর দিকে সুব্রহ্মণ্যম ২৪৪ মিনিট খেলে তাঁর ১২৩ রানে ২০টা বাউণ্ডারী করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষ ৪৫ মিনিটের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দলের ২টো উইকেট পড়ে ৫১ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩২৭ (৭ উইকেটে)। এই দিনের প্রথম ২৫ মিনিটের খেলায় দুটো উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে গিয়ে মাত্র ১৪ রান যোগ হয়—অধিনায়ক বোরদে এবং মোহল খেলা থেকে বিদায় নেন। তাঁরা দুজনেই চন্দ্রশেখরের বলে আউট হন। ৫ম উইকেটে বিজয় ভোঁসলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন অজিত ওয়াদেকার। এই জুটিই শেষ পর্যন্ত দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে ভোঁসলে এবং ওয়াদেকার ১২০ মিনিট খেলে দলের ১২০ রান তুলে দিয়েছিলেন। ভোঁসলের ৬৮ রানে ১২টা এবং ওয়াদেকারের ১০৩ রানে ১২টা বাউণ্ডারী ছিল। প্রথম দিকে সুইং বোলিংয়ে ভোঁসলে বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়েছিলেন। ওয়াদেকার কোন বোলারকেই গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর ড্রাইভ এবং পুল এই দিনের উপস্থিত ৪৫ হাজার দর্শককে আনন্দ দিয়েছিল। ওয়াদেকার যখন আউট হন তখন 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে পশ্চিমাঞ্চল দলের আরও ৩০ রান করার প্রয়োজন ছিল। ৮ম উইকেটের জুটি সুর্তি এবং ফার্ণাণ্ডেজ ৫২ মিনিটের খেলায় ৩৬ রান তুলে দিয়ে 'ফলো-অন' থেকে দলকে রক্ষা করেন।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ২৫ মিনিট আগেই খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। ৪০২ রানের মাথায় পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে প্রথম ইনিংসে ৬৮ রান বেশী করার দৌলতে দক্ষিণাঞ্চল দলীপ ট্রফি জয়ী হয়। ফলে শেষ দিনের বাকী সময়ের খেলাটা খেলার নিয়ম রক্ষার জন্যেই চালাতে হয়েছিল—কোন উত্তেজনা বা আকর্ষণ ছিল না। পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দলের রান সংখ্যা অতিক্রম করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রথম ইনিংসের ৮ম উইকেটের জুটি সুর্তি এবং ফার্ণাণ্ডেজ ৭৫ মিনিট খেলে মূল্যবান ৬০ রান সংগ্রহ করেছিলেন। সুর্তির ৪৮ রানে ৬টা এবং ফার্ণাণ্ডেজেরও ৫৬ রানে ৬টা বাউণ্ডারী ছিল। অষ্টম উইকেটের জুটি সুর্তি এবং ফার্ণাণ্ডেজ খেলার মোড় এমনভাবে ঘুরিয়ে ছিলেন যে, এক সময়ে পশ্চিমাঞ্চল দলের জয়লাভ অসম্ভব মনে হয় নি। কিন্তু সুর্তির বিদায়ের পর খেলার গতিও বদলে যায়। শেষ দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের শেষ তিনটে উইকেট পান ভেঙ্কটরাঘবন—মোট উইকেট ৫টা ৯৫ রানে।

টমাস কাপ

কোয়ালালামপুরে আয়োজিত ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন (টমাস কাপ) প্রতিযোগিতার এশিয়ান জোনের খেলায় মালয়েশিয়া ৮—১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে এশিয়ান জোন ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ভারতবর্ষের একমাত্র জয়—একটি সিঙ্গলসে। ভারতবর্ষের সুরেশ গোয়েল ১৮—১৫ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে মালয়েশিয়া দলের অধিনায়ক টি কে সানকে পরাজিত করেন।

প্রথম দিনে চারটি খেলা হয়—দুটি সিঙ্গলস এবং দুটি ডাবলস। মালয়েশিয়া একটি সিঙ্গলস এবং দুটি ডাবলস খেলায় জয়ী হয়ে ৩—১ খেলায় অগ্রগামী হয়।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী খেলায় সুরেশ গোয়েল ১৮—১৫ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে মালয়েশিয়ার অধিনায়ক তে কিউ সানকে পরাজিত করলে ভারতবর্ষ ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় মালয়েশিয়ার ১নং খেলোয়াড় এবং বর্তমানের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান (বে-সরকারীভাবে) তান আইক হুয়াঙ্গ ১৫—৪ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে ভারতবর্ষের খ্যাতিমান খেলোয়াড় দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান করেন। প্রথম ডাবলসের খেলায় তান আইক হুয়াঙ্গ এবং ইউ চেং হো ১৩—১৫, ১৫—২ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে ভারতীয় জুটি দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষকে পরাজিত করেন। প্রথম দিনের শেষ ডাবলসে বে-সরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান তান ই খান এবং এন ধন বী

ইস্টবেঙ্গল বনাম সার্ভিসেস দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ২—১ গোলে বিজয়ী সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়বৃন্দ। মধ্যে দণ্ডায়মান ইস্টার্ন কমান্ডের জি ও সি-ইন-সি লেঃ জেনারেল এস এইচ এফ জে ম্যানেকশ। ফটো : অমৃত

সহজেই ১৫—৯ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে ভারতীয় জুটি সুরেশ গোয়েল এবং সতীশ ভাটিয়াকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনে তান আইক হুয়াঙ্গ ৬-১৫, ১৫-৭ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করলে মালয়েশিয়া ৪-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। পরবর্তী খেলায় ইউ চেং হো ১৫-৯ ও ১৫-৫ পয়েণ্টে সতীশ ভাটিয়াকে পরাজিত করেন।

এইদিনের তৃতীয় সিঙ্গলসে মালয়েশিয়ার অধিনায়ক তে কিউ সান ১৫-৯ ও ১৫-১ পয়েণ্টে দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করেন।

শেষ দুই ডাবলসে তান আইক হুয়াঙ্গ এবং ইউ চেং হো ১৫-১০ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে গোয়েল এবং ভাটিয়াকে পরাজিত করেন; এন বুন বী এবং তান ঈ খান ১৫-২ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষকে পরাজিত করেন।

এশিয়ান জোন ফাইনালে মালয়েশিয়া খেলবে পাকিস্তানের সঙ্গে।

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে ভারতীয় দলের দর্শনীয় খেলার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়, বিশেষ করে সুরেশ গোয়েলের।

দূরপাল্লার সন্তরণ

গঙ্গাবক্ষে আয়োজিত ২২ মাইল (ত্রিবেণী থেকে শ্রীরামপুর) দূরপাল্লার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ক্যালকাটা সুইমিং এসোসিয়েশনের বৈদ্যনাথ নাথ ৬ ঘণ্টা ২২ মিনিটে প্রতিযোগিতার দূরত্ব অতিক্রম করে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত আগস্ট মাসে ভাগীরথীর জলে আয়োজিত ৪৫ মাইল (জঙ্গীপুর থেকে বহরমপুর) সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করেছিলেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৯ জন সাঁতারুর মধ্যে যে ১৮ জন নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হন, তাঁদের মধ্যে ১১ বছরের বালিকা কাজল ঘোষের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সময়ের দিক থেকে তার স্থান ছিল দ্বাদশ।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম তিনজন: ১ম বৈদ্যনাথ নাথ (ক্যালকাটা এস এ) — সময় ৬ ঘণ্টা ২২ মিঃ ৫ সেঃ; ২য় রঞ্জিৎ তালুকদার (ক্যালকাটা এস এ) — সময় ৬ ঘণ্টা ৪২ মিনিট; ৩য় নীলমণি মল্লিক (বাবুগঞ্জ) — সময় ৬ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট।

আন্তঃ রেলওয়ে মুষ্টিযুদ্ধ

চক্রধরপুরের (বিহার) সেরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তঃ রেলওয়ে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দলগত চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল : দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে (৩৫ পয়েণ্ট), মধ্য রেলওয়ে (৩১), পূর্ব রেলওয়ে (২৪) এবং পশ্চিম রেলওয়ে (১১)।

এশিয়ান গেমস প্রসঙ্গ

আগামী ৯ই ডিসেম্বর ব্যাংককে পঞ্চম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হবে। এই এশিয়ান গেমসের পরিকল্পনায় ভারতবর্ষই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। স্বর্গীয় অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধীকে (জি ডি সোন্ধী) এশিয়ান গেমসের জনক বলা হয়। মুখ্যতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৫১ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম এশিয়ান গেমসের আসর বসেছিল। সেই থেকে প্রতিটি এশিয়ান গেমসে ভারতবর্ষ যোগদান করে এসেছে। আসন্ন পঞ্চম এশিয়ান গেমসে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১০৪ জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় দল গঠনও করা হয়েছিল, ভারত সরকারের নিযুক্ত কেন্দ্রীয় ক্রীড়া পরিষদ এবং ভারত সরকারের শিক্ষা-দপ্তর ভারতীয় দলের এই ১০৪ জন সদস্য সংখ্যা অনুমোদনও করেছিলেন; কিন্তু ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর ১০৪ জন সদস্যের পরিবর্তে ৮১ জনের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করায় ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আগামী পঞ্চম এশিয়ান গেমসে ভারতবর্ষ যোগদান করবে না। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু খেলাধূলার আদর্শের পরিপন্থী। 'জয় নয়, যোগদানই লক্ষ্য'—খেলাধূলার এই মহান আদর্শের প্রতি আস্থা রেখে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন যদি ৮১ জন সদস্য নিয়ে এশিয়ান গেমসে যোগদান করতেন তাহলে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং মর্যাদা কোন অংশে খর্ব হত না। তাঁদের ক্রীড়ানুষ্ঠান থেকে ভারতবর্ষের নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বরং ভারতবর্ষের মর্যাদা খর্ব করেছে।

অদ্রিকণ্ড

হিমানীশ গোস্বামী

ট্রেনে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হল। পুজোর ক'দিন শান্তিতে কাটানোর জন্য তিনিও চলেছেন কোলকাতার বাইরে। কোলকাতার গোলমাল তাঁর সহ্য হয় না। এবারে আমার সঙ্গে গুরুময়ের আসবার কথা ছিল, শেষপর্যন্ত আসতে পারল না বলে মন খারাপ হয়ে ছিল খানিক, কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে সেটা কেটে গেল। আরো ভাল লাগল এটা জেনে যে তিনি যে বাড়িতে যাচ্ছেন সেটা আমার বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির বাড়ি এবং আমার গন্তব্যস্থল থেকে সে বাড়ির দূরত্ব কয়েক মাইল মাত্র।

সেটা অবশ্য অনেক পরে জেনেছিলাম, তার আগে জেনেছিলাম তাঁর নাম। স্বর্ণময় শর্মার নাম এতদিন কেবল বই-এর পাতাতেই দেখে এসেছি। তাঁর লেখা পাইথনের আঙিনায় কিংবা হিমালয়ের মুলুকে বাংলায় বিখ্যাত সাহিত্য হিসাবে সবিশেষ সম্মানিত। পাইথনের আঙিনায় বা হিমালয়ের মুলুকের মধ্যে ভ্রমণকাহিনী তো আছেই, আর আছে প্রকৃতির এক আশ্চর্য রূপদর্শন। কতবার যে বইগুলি পড়েছি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছি তার হিসেব নেই। হিমালয়ের মুলুকের সেই অংশটি ভুলবার নয়। এখনো মনে আছে "... সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনমধ্যে বিশাল মহীরুহদল নীরব শান্তিতে দণ্ডায়মান। শিরশির করিয়া কনকনে ঠান্ডা বাতাস পাতাদের কাঁপাইল। বেশি জোরে নয়, কিন্তু যতটুকু কাঁপাইল তাহাতেই মৃদু একটা আওয়াজ হইল। পাতার ভিতরকার মৃদু কাঁপুনি আমাকেও কাঁপাইল। এই দারুণ ঠান্ডায় পাহাড়ী পথে কতদূর হাঁটিয়াছি খেয়াল নাই। গায়ে একটি ছিন্ন গরম চাদর ও হাতে একটি লাঠি, কাঁধে একটি ঝোলা, তাহাতে কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস। কতদূর আসিলাম? কোন পথে যাইতেছি? হঠাৎ কোন জন্তু পিছন হইতে হিংস্রভাবে লাফাইয়া পড়িবে [illegible] জঙ্গলে কিই বা করিতে পারি, কিন্তু এমনভাবে না ঘুরিয়াও তো পারি না। আমার মধ্যে কি যেন একটা আছে, পথকে দেখিলে তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে......।" ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশী হয়ে উঠলাম বলাই বাহুল্য। পথ আমাকেও টানে। কিন্তু সময় কম, অতএব ট্রেন এবং বাসের উপরই ভরসা করি। স্বর্ণময়বাবুর মত যদি লিখতে পারতাম, তাহলে কি ভালই না হত! কেমন সুন্দর হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, দেশের সঙ্গে পরিচিত হতেও যেমন পারতাম, তেমনি তাদের সঙ্গে দেশের লোককে পরিচয় করিয়েও দিতে পারতাম!

মনে মনে স্থির করলাম, এই ছুটির মধ্যেই স্বর্ণময়বাবুর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলব। যদি সম্ভব হয় ও'কে নিয়ে চিরিমিরি থেকে হাঁটাপথে ঝগড়াখণ্ডের দিকে একবার যাব। পাহাড়ী অঞ্চল। পথ ঠিক নাই একটা দিক ঠিক রেখে হাঁটতে হয়। খুব ভোরে বার হলে সন্ধের মধ্যে পৌঁছুনো সম্ভব।

ঝগড়াখণ্ডে দুদিন বিশ্রাম নিয়েই ছটফট করতে লাগলাম। এবারে চিরিমিরিতে যেতে হবে। গিয়ে স্বর্ণময়বাবুর সঙ্গে ভাব করতে হবে। তৃতীয় দিন ভোরের ট্রেনে চিরিমিরিতে গেলাম। স্বর্ণময়বাবু যে বাড়িতে অতিথি, সেটি স্টেশনের ঠিক উপরেই একটি পাহাড়ের উপর। একটু খাড়া পথ। কিন্তু হাঁটাপথে দুশো কিংবা আড়াইশো গজের বেশি নয়। অন্য একটি পথ আছে, জীপে করে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটি ঘোরাপথ। প্রায় চার মাইল। আমরা সবসময়েই সোজা পথেই আসি কেননা অন্য পথটিতে সময় অনেক বেশি লাগে, এবং জীপও সর্বদা পাওয়া যায় না।

পৌঁছুতে বেলা সাড়ে আটটা হয়ে গেল। গিয়ে দেখি প্রশান্তমামা বারান্দায় বসে চা-পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, এসো এসে। আমি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। একটু হতাশই হলাম বলতে গেলে, কেননা আশেপাশে স্বর্ণময়বাবুকে দেখতে পেলাম না। সিদ্ধান্ত করলাম তিনি নিশ্চয়ই বহু আগেই বেড়াতে বেরিয়েছেন। চিরিমিরির শালবনের মধ্যে, পাহাড়ের মধ্যে আলোছায়ার মধ্যে ঝরণার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

ঠিক সেইজন্যই জিজ্ঞেস করলাম, স্বর্ণময়বাবু কোন পথে গিয়েছেন আজ?

প্রশান্তমামা বললেন, কোন্ পথে গিয়েছেন মানে? ওতো ঘুমুচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ঘুমুচ্ছেন?

প্রশান্তমামা বললেন, ঘুমুচ্ছেন।

আমি বললাম, কাল ফিরতে বোধহয় অনেক রাত হয়েছিল?

প্রশান্তমামা বললেন, স্বর্ণ তো কোথাও বেরোয়নি। ও আসা পর্যন্ত প্রতি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা বিছানায় শুয়েই রয়েছে।

এমন সময় স্বর্ণময়বাবু এলেন, পরনে ড্রেসিং গাউন।

"বুঝলে প্রশান্ত—আমাকে দোতলায় থাকতে দিয়েছ কেন। রোজ দুতিনবার ওঠানামা করতে হয়। একতলাতে ব্যবস্থা করলেই বোধহয় ভাল হত।" বললেন স্বর্ণময়বাবু।

তারপর কাছে এসে বসলেন একটি চেয়ারে। আমাকে দেখে বললেন, "ও আপনি এসেছেন। ঐ অতদূর থেকে। ট্রেনে এলেন? আর স্টেশন থেকে এটুকু পথ? হেঁটে হেঁটে? যাই বলুন মশাই, পাহাড় ঐ দূর থেকেই দেখতে ভাল। তার উপরে ওঠানামা করা এক ঝামেলা। আগে যদি জানতাম পাহাড়ে এতখানি উঁচুনিচুর ঝামেলা আছে তাহলে কি আর এই চিরিমিরিতে আসি?"

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। পাইথনের আঙিনায় আর হিমালয় মুলুকের লেখক এর আগে পাহাড়ে চড়েন নি! আমি আর হেঁটে চিরিমিরি থেকে ঝগড়াখণ্ডে যাবার কথা তুললাম না। একেবারেই চুপ করে গেলাম।

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(ছত্রিশ)

একে একে দুটো বছর গত হল।

দুটো বছরে জ্যোতিরাণী দু ধাপও সামনের দিকে এগোতে পেরেছেন কি? বরং পিছনের দিকে সরছেন কিনা এক-একসময় সন্দেহ হয়। কাজের সঙ্গে মিশে আছেন তিনি। কর্তব্য করে চলেছেন। আনন্দ-শূন্য কর্তব্য বোঝার মত। স্থির ধৈর্যে তিনি তা বহন করছেন। মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে। মন খুলে তখন মিত্রাদির সঙ্গেই শুধু যা দুটো কথা বলেন। মিত্রাদিই এখন একমাত্র অন্তরঙ্গ জন তাঁর।

মৈত্রেয়ী চন্দর উৎসাহে ভাটা পড়েনি বটে, কিন্তু মেজাজ-পত্র তাঁরও ভালো না। ভালো না থাকার কারণ আছে। আরো শক্ত হাতে প্রতিষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থার রাশ টেনে ধরতে চান তিনি। মেয়েদের প্রতি তাঁর আচরণ আর অনুশাসন আরো অকরুণ আরো রুক্ষ। তারও কারণ আছে।

শুধু বীথি ঘোষ নয়, বীথি ঘোষের পথে আরো কেউ কেউ পা দিয়েছে।

একজন বিয়ে করেছে। দুজন নিখোঁজ হয়েছে। বিয়ে যে করেছে তাকেও অন্যদের থেকে খুব তফাত করে দেখেন না মৈত্রেয়ী চন্দ।

—বিয়ে? জ্যোতিরাণীর বিবেচনায় সহানুভূতির আভাস পেয়ে মুখের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন মৈত্রেয়ী চন্দ। —দুদিন বাদে চিবুনো ছিবড়ের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে দেখো, এসব বিয়ে আমার খুব জানা আছে!

প্রয়োজনেও জ্যোতিরাণী একটু শক্ত হতে পারেন না মিত্রাদির এই অভিযোগ। শুধু অভিযোগ কেন মিত্রাদির সন্দেহ অনু-শাসনও তিনি মুখ বুজে মেনে নেন। তার কর্তৃত্বের ওপর হাত দেন না।

নতুন বছরে বিধি-ব্যবস্থার নতুন তোড়-জোড় দেখে জ্যোতিরাণী বলেছিলেন, এই দুটো বছরে আমরা কিছু এগোলাম না পেছোলাম?

মৈত্রেয়ী চন্দ কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছলেন। মুখ তুলে তাকিয়েছেন। তারপর দৃষ্টিটা বেশ করে তাঁর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়েছেন। গম্ভীর। খুশির আমেজ লাগলে ঠাট্টার মাত্রা-জ্ঞান নেই এখনো। কিন্তু খুশি বা ঠাট্টা কিছুই বোঝা যায়নি। —তিন শ পঁয়ষট্টি দুগুণে কত?

কত নিজেই হিসেব করেছেন। সাতশ তিরিশ। তেমনি গম্ভীর মুখে মন্তব্য করেছেন তারপর, দু'বছরে তুমি গোটাগুটি সাতশ তিরিশ দিনই পিছিয়েছ মনে হচ্ছে। আশ্চর্য......।

নতুন কোনো অভিযোগ কিনা জ্যোতি-রাণী তখনো বুঝে ওঠেননি।—আমি আবার কি করলাম।

—কি করলে আয়নায় দেখো গে যাও, একচোখো ওপরঅলার যেন কাঁচা বানাবার নেশা লেগেছে।

বিরক্ত হতে গিয়েও জ্যোতিরাণী হেসে ফেলেছিলেন।

আনন্দের সঙ্গে যোগ কমই এখন। এই নির্লিপ্ত দিনযাপনের মধ্যে সকালের কাগজ খুলে সেদিন অপ্রত্যাশিত আনন্দ আর রোমাঞ্চের খোরাক পেলেন যেন।

বিভাস দত্ত প্রাইজ পেয়েছেন। কাগজে ছবি বেরিয়েছে। প্রাইজ আরো অনেকে পেয়েছেন। ছবি আরো অনেকের বেরিয়েছে। স্বাধীন সরকারের পরিপোষকতায় সংস্কৃতির উপাসকদের এই প্রথম স্বীকৃতি-লাভ। প্রাক-স্বাধীনতায় বিদেশী শাসনের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করেও দেশের দিকে চোখ রেখে সৃষ্টির উপাসনা করেছেন যাঁরা এই সম্মান তাঁদের প্রাপ্য। সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সাহিত্যের পুরস্কার পেয়েছেন বিভাস দত্ত।

জ্যোতিরাণী সাগ্রহে তাঁর খবরটা পড়লেন আর বার কয়েক তাঁর ছবিটাই দেখলেন।

চার হাজার না পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার। টাকার অংকটা বড় কিছু নয়। এই স্বীকৃতিলাভের সঙ্গে জ্যোতিরাণী যেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। পুরস্কার পেয়েছে দুর্ভিক্ষের কালে লেখা বিভাস দত্তর সেই বই।

......শ্বেতবহ্নি!

বিদেশী সরকার যে বই বাজেয়াপ্ত করেছিল। যে বই লেখার ফলে বিভাস দত্তর জেল হয়েছিল। যে বইয়ের উৎসর্গের পাতায় জ্যোতিরাণীর নাম লেখা।

বইটা বার করে আর একবার ভালো করে পড়বেন ভেবেছিলেন। কিন্তু পড়া আর হয়ে ওঠেনি।

কাগজ ফেলে তক্ষুনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। নম্বর ডায়েল করলেন। তারপরেই সঙ্কোচ। দেখাসাক্ষাৎ আজকাল আরো কমেছে। টেলিফোনের যোগাযোগও। এই একজনের কাছ থেকে জ্যোতিরাণী নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন সেটা অস্পষ্ট নয় আদৌ। শমীর কাছেও নয়। বছর খানেক আগে ঠোঁট ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসেছিল, কাকুর সঙ্গে তোমার ঝগড়াঝাটি হয়েছে?

জ্যোতিরাণী থমকেছিলেন। তারপর বলেছেন, আমি কি তোর মত ছোট মেয়ে যে ঝগড়া হবে! ...কেন?

—কাকু আজকাল আসতেই চায় না, বেশি বললে রেগে যায়।

—লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বেশি বলতে যাস কেন?

মেয়েটা বোকা নয়। এখন এগারো পেরুচ্ছে চলল, বুদ্ধি আরো পেকেছে। কাকুর প্রসঙ্গ নিজে থেকে তোলে না বড়, কিন্তু কখনো-সখনো ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে সকৌতুকে দুজনকে লক্ষ্য করে। তার ধারণা মাসি আর কাকুর মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল চলেছে।

রিং হয়ে যাচ্ছে। ঘরে কেউ নেই বোধহয়। এই ফাঁকে জ্যোতিরাণী টেলিফোন ছেড়ে দেবেন কিনা ভাবলেন। কাগজে এত বড় খবরটা বেরুবার পরে অভিনন্দন না জানানো আরো বিসদৃশ। 'শ্বেতবহ্নি'র অন্তত এটুকু দাবি আছেই। সে-দাবি অস্বীকার করার নয় বলেই রাজদণ্ডের মেয়াদ ফুরোতে ভদ্রলোককে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে তিনি জেলখানা পর্যন্ত ছুটে গেছলেন একদিন। আজও এড়ানোর চেষ্টা পুরস্কারটাকেই অসম্মান করার সামিল।

—হ্যালো! শমীর হাঁপ-ধরা গলা, কোথাও থেকে ছুটে এসে সাড়া দিয়েছে।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—নীচে। টেলিফোন বাজছে শুনে দৌড়ে এসে ধরলাম, ঠিক মনে হয়েছে তুমি—কাগজে কাকুর ছবি আর প্রাইজের খবর দেখেছ? কাল রেডিওতে শোনোনি বুঝি? রাত্তিরে বলেছিল...আমরা তো পরশুই জেনেছি, কাকুর কাছে আগেই চিঠি এসেছে।

শমীর উচ্ছ্বাসের ফাঁকে জ্যোতিরাণী নীরব একটু। ...আগে হলে পরশুর তাজা খবরটা সকলের আগে তাঁর কাছে পৌঁছুত। ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের রেখা পড়ল একটু। ভদ্রলোকের এই নিস্পৃহতাও কম স্পষ্ট নয়।

—কাকু কোথায়?

—একতলার বসার ঘরে। কাকু তিন দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে জানো না বুঝি, আজ একটু ভালো। এক-ধার থেকে লোক আসছে তো দেখা করতে, ক'বার করে ওঠানামা করবে বলো—নীচেই বসে আছে। পাকা মেয়ের মতই কথাবার্তা আজ-কাল শমীর। —আমি তো ভেবেছিলাম তুমিও আসবে, কাকুকে ডাকব?

—থাক, ডাকতে হবে না...বিকেলের দিকে আমিই যাব'খন।

—সত্যি? শমীর গলায় খুশি ঝরল, সকাল সকাল এসো তাহলে—সন্ধ্যে না হতেই তো আবার মাস্টারমশাই এসে হাজির হবে।

গত বছর শমীর পরীক্ষার ফল খারাপ হতে বিভাস দত্ত তার জন্য অল্প মাইনের প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন একজন।

টেলিফোন রেখে আবার একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন জ্যোতিরাণী। যাবেন তো বলে দিলেন। যাওয়া উচিতও। কিন্তু সংকোচের আরো কিছু কারণ ঘটছে সম্প্রতি। এতক্ষণ মনে ছিল না। ...পদ্মার শোক নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকের, তাঁর সঙ্গে আলোচনার অভিলাষও ব্যক্ত করেছিলেন। ইচ্ছেটা জ্যোতিরাণী তাঁর মুখের ওপরেই নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বীথির মুখে যদি হাসি ফোটে কোনদিন তখন লিখবেন। ...বীথি বা তার মত আরো কটা মেয়ের শোকের শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকছে সে খবর কারো মুখে পেয়েছেন কিনা জানেন না। কিন্তু জ্যোতিরাণীর সংকোচ ঠিক সেই কারণেও নয়। নামী এক সাপ্তাহিক কাগজে বেশ কিছুদিন ধরে আর একখানা উপন্যাস ফেঁদে বসেছেন ভদ্রলোক। ...'ছাড়পত্রবাহ'। পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণী অনেক সময় বিরক্ত হয়েছেন, কোনো কোনো বারের সাপ্তাহিকপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে না পড়েও পারেন না। এই উপন্যাস যেন পদ্মার শোক নিয়ে লেখার ইচ্ছে বাতিল করার প্রতিশোধ।

উপন্যাসের শেষ ঠিক কোন বক্তব্যে গিয়ে দাঁড়াবে এখনো জানেন না অবশ্য। কিন্তু সামাজিক ছাড়পত্রের যে-পর্যায়ে বিচরণ করছেন লেখক তার মূলে সূরে প্রচ্ছন্ন একটা কটাক্ষ জ্যোতিরাণীর চোখে অন্তত বিঁধছে।

উপন্যাস শুরু হয়েছিল তিন বান্ধবীকে নিয়ে। যাদের শিক্ষা আছে রুচি আছে বুদ্ধিও আছে। কম-বেশি রূপও আছে। তাদের দুজনের জীবনে যথাসময়ে পুরুষ এসেছে। একজন মিলিটারি চাকুরে আর একজন যাত্রীবাহী বিমানের আকাশ-চারী এঞ্জিনিয়ার। সুপুরুষ, সুযোগ্য পুরুষ। তাদের দুই নায়িকা প্রথমে হিসেবের রাস্তায় চলতে ভুল করেনি। মেলামেশা করেছে, তাদের কাছে টেনেছে। বিপজ্জনক কাছে নয়। যতটা কাছে এলে আরো কাছে আসার নেশা লাগে ততটাই। কিন্তু ব্যবধান বরদাস্ত করা হৃদয়ের রীতি নয়। পরস্পরের হৃদয়ের তাপে ততোদিনে বিশ্বাস পুষ্ট, আকাঙ্ক্ষা নিবিড়। দুই জোড়া নারী-পুরুষের সেই চিরাচরিত প্রতীক্ষার জগতে বিচরণ।

চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই দুজনেরই বিয়ে। কোথাও বিঘ্ন হয়নি, মাঝের এই চার-পাঁচ মাস সময়টাই দুঃসহ বিঘ্নের মত। মিলিটারী চাকুরের কপালে মিলিটারী তলব আসার ফলে এই দেরি। ছুটি ক্যানসেল করে তাকে ছুটতে হবে। চার-পাঁচ মাস বাদে আবার ছুটি মিলবেই আশা। বড় জোর আরো দুই-এক মাস দেরি হতে পারে। তখন বিয়ে তথা অবিচ্ছেদ্য মিলন।

গণ্ডগোলটা হয়ে গেল ঠিক এই পর্যায়ে এসে—ছেলেটি চলে যাবার তিন-চারদিন আগে। বিদায়-পর্বে নিবিড়তায় মিলিটারী চাকুরের ভাবী বধূর ব্যবধান-রক্ষার সব হিসেব তলিয়ে গেল। তলিয়ে যে যাবে দশ দণ্ড আগেও কেউ তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু গেল। বিরহতপ্ত বিদায়ী পুরুষকে রমণী গ্রহণ না করে পারল না। তিন দিনের সেই দুর্বার দুরন্ত মিলনে কোনো ফাঁক থাকল না, ফাঁকি থাকল না।

তারপর পুরুষ চলে গেল। রমণী পরের মুহূর্ত থেকে দিন গুনতে লাগল।

ঘটনাটা জানল শুধু তৃতীয় বান্ধবী, যার জীবনে মনের মত পুরুষ সমাগম তখনো ঘটেনি। তিন মেয়ের মধ্যে সে-ই সকলের থেকে সুশ্রী, সুচতুরা। দুই বান্ধবীর প্রণয়-পর্বের প্রতিটি অধ্যায়ের খবর রাখত। স্বাধীনচেতা মেয়ে, বাবা নেই, মা আছে। একমাত্র কন্যা হিসেবে বিগত বাপের ছোট বাড়ি আর স্বল্প বিত্তের অধিকারিণী। স্বভাবতই তার আঙিনায় প্রত্যাশিত পুরুষের ভিড় বেশি। আর স্বভাবতই এই মেয়ের ছাঁটাই-বাছাই আর

বিচার-বিশ্লেষণের বেড়া উপকে যোগ্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটতে দেরি হচ্ছে।

কিন্তু বান্ধবীদের ক্ষেত্রে সে উদার আবার সুপরামর্শদাত্রী। মিলিটারী চাকুরের ভাবী বধূ সদ্যবিরহের প্রথম যাতনার আর সেই সঙ্গে সহজাত দুশ্চিন্তা লাঘবের তাড়নায় প্রিয় বান্ধবীর কাছে শেষের তিন দিনের গোপনতম ব্যাপারটাও উদ্ঘাটন না করে পারেনি।

দ্বিতীয় বান্ধবীর বিয়ের লগন পিছো-বার কারণটা পারিবারিক। গুরুদশাজনিত অশৌচের মেয়াদ ফুরোতে মাস তিনেক দেরি। মিলনের সামাজিক বাধা ঘুচতেও দীর্ঘ তিন মাসের ধাক্কা। আকাশচারী এঞ্জিনিয়ারের কাছে এই গুরুদশা দুর্দশার সামিল। আর তার ভাবী দিগঙ্গনাটির স্বভাবও এক নম্বর বান্ধবীর তুলনায় একটু বেশি চপল চটুল। ফলে শেষপর্যন্ত পিপাসার কোনো নিবিড়তম মুহূর্তে গুরুদশার বাধা নিয়ে মাথা ঘামায়নি তারা। তারপর থেকে গোপন অভিসারের অবাধ উত্তাল জোয়ারে ভাসছে দুজনে। তিন মাসের দূরের তারিখটা তখন আর ধু ধু মরু প্রান্তের ওপারে মনে হয়নি। ওইটুকু গোপনতার ব্যঞ্জনায় দেহলীলার উৎসব বরং শাসনশূন্য আদিমতর রসের খোরাক জোগাচ্ছে।

বলতে হয়নি, প্রণয়ীশূন্য ওই সুচতুরা তৃতীয়াটি দিন কয়েক বান্ধবীর আচরণ লক্ষ্য করেই কন্দর্পের অব্যর্থ শর-সন্ধান আবিষ্কার করেছে। সরাসরি জেরার ফলে দ্বিতীয়াটিও স্বীকৃতির আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে।

অতঃপর দুটি মেয়েই অন্তঃসত্ত্বা। কিছুটা ভীতত্রস্তাও।

দ্বিতীয়ার ভাবনা ঘুচল, আগন্তুক আবির্ভাবের ঘোষণা স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই গুরুদশার বাধা শেষ। যথাস্থানে তার বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্কট দাঁড়াল প্রথমা অর্থাৎ মিলিটারি চাকুরের ভাবী রমণীটিকে নিয়ে। তিন মাসের আগেই বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেল। ধাক্কাটা মুখ বুজে হজম করল সকলে, বিয়ে স্থির—লোকের চোখে পড়ার আগে লৌকিক অনুষ্ঠানটুকু কোনমতে হয়ে গেলে রক্ষা। মেয়েকে নিয়ে গিয়েও সঁপে দিয়ে আসা যেত, কিন্তু ভদ্রলোককে তখন উত্তর সীমান্তের এমারজেন্সি এরিয়ায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ নাগরিকের সে-এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।

জরুরী পত্রাঘাতে ভাবী বধূ বিপদ জানিয়েছে তাকে। দু'তিন দিনের জন্যেও এসে বিয়েটা না করে গেলে মান বাঁচে না। জবাব এসেছে, ভেবো না, ছুটির দরখাস্ত করেছি, এলাম বলে।

তার বদলে দুঃসংবাদ এলো। এমন দুঃসংবাদ যে মাথায় বজ্রাঘাত। রাতে সীমান্ত এলাকা প্রহরীদের সঙ্গে প্রতি-বেশী শত্রুর চোরা গুলীতে মিলিটারি চাকুরেটির জীবন-নাশ হয়েছে। কাগজে ফলাও করে তার ছবি আর মৃত্যুর বিবরণ বেরিয়েছে। সামরিক শোকলিপিতে শহীদের স্থান তার। মর্মন্তুদ হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সরকারের তীব্র প্রতিবাদ নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

এদিকে মেয়েটির অবস্থা শোচনীয়। বাড়ির মানুষদের ভ্রূকুটি কুটীল, শোকের ওপরে লাঞ্ছনা গঞ্জনা মুখ বুজে সহ্য করছিল সে। কিন্তু ত্রাসে আতঙ্কে উঠল যখন পরিত্রাণের তোড়জোড়ের আভাস পেল। এক অনাগত শিশুর আবির্ভাব নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র। তার দেহের অভ্যন্তরে যে-শিশুর জীবনের সূচনা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ ছাড়া গতি নেই নাকি। আগে হলে সে নিজেও সায় দিত কিনা জানে না, কিন্তু চার মাস শেষ হতে চলেছে—দেহে মনে মাতৃত্ব বাসা বেঁধেছে। এখন সে শুধু শিউরে উঠছে আর নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা খুঁড়ছে—না না না না!

মেয়েটি বাড়ি থেকে পালালো একদিন। এলো সেই অনূঢ়া তৃতীয় বান্ধবীটির কাছে, প্রণয়ী-বিরহিত জীবন যার। ব্যাকুল হয়ে তারই আশ্রয় ভিক্ষা করল, পাগলের মত বলতে লাগল, শুধু ক্ষণিকের দুর্বলতার নয়, যে আসছে দুটি জীবনের নিখাদ ভালবাসার সুদৃঢ় শক্তিতে জন্ম তার। তাকে সে হত্যা করতে পারবে না, পারবে না।

আশ্রয় মিলল। আশ্রয় যে দিল বিভাস দত্তর কাহিনীর নায়িকা সেই মেয়েটিই। বান্ধবীকে সে কাছে রাখল না, তখনকার মত তাকে নিয়ে সে দূরে চলে গেল। তার অজ্ঞাতবাসের পাকা ব্যবস্থা করে তবে ফিরল।

যথাসময়ে প্রথমা এবং দ্বিতীয়া দুই বান্ধবীরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। দুটিই মেয়ে।

আর তারপর দু'মাসের মধ্যে এক অঘটনের সংবাদ এলো নায়িকার অর্থাৎ তৃতীয়ার কানে। এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় দ্বিতীয়ার আকাশচারী এঞ্জিনিয়ার স্বামী মারা গেছে।

নায়িকার অর্থাৎ তৃতীয়ার তত-দিনে পদবী বদল হয়েছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে প্রণয়ী খোঁজেনি, মেয়ের জন্য তার মা মনের মত ঘর আর বর খুঁজেছে। পেয়েছে। বড় ঘর আর বড় মানুষের ঘর। কিন্তু সেই বড় ঘর আর বড় ঘরের বড় মানুষ যে এমন হবে মা-মেয়ে কেউ আশা করেনি, অবধারিত বিরোধ শুরু হয়েছে মাস কয়েকের মধ্যেই। বছরের পর বছর ধরে সেই বিরোধ পুষ্টি-লাভ করেছে, করছে। কারণে বিরোধ অকারণে বিরোধ, শুধু বিরোধের জন্যে বিরোধ। বুদ্ধিমতী বুদ্ধিবোধসম্পন্না নায়িকার সঙ্গে তার স্বামীর চলনে বলনে আচরণে স্বভাবে রুচিতে এক পরিপুষ্ট বিরোধ বাসা বেঁধে আছে।

এক কথায় দুটি জীবনে প্রেম-প্রীতির অস্তিত্ব নেই কোথাও।

এই বিরোধ বর্ণনার বাস্তব নজিরগুলি পড়তে পড়তে এক-একসময় সাপ্তাহিক-পত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে জ্যোতি-রাণীর। অনেক রেখে-ঢেকে বিভাস দত্ত একখানা চেনা-মুখ টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন বার বার। বলা-বাহুল্য সেই চেনা-মুখ জ্যোতিরাণীরই। বিরোধের নজির-গুলো মেলেনি আদৌ, কিন্তু বিরোধের চেহারার একটা প্রচ্ছন্ন মিল আছেই।

সবথেকে বেশি ধাক্কা খেয়েছেন জ্যোতি-রাণী নায়িকার চিন্তার ভিতর দিয়ে যে বেপরোয়া সামাজিক প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন লেখক—সেটা পড়ে।

...এই নায়িকার কোলেও বিয়ের দেড় দুই বছরের মধ্যে সন্তান এসেছে। ছেলে। কাহিনীর বর্তমান পর্যায়ে সেই ছেলের বয়েস ছয়। যে পর্যায়ে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সান্নিধ্যটুকু পর্যন্ত অসহ্য। ঠিক এই সময়েই এক বাস্তব বিশ্লেষণ অশান্ত করে তুলেছে নায়িকাকে, ছ' বছরের ছেলে-টার প্রতি পর্যন্ত বিমুখ করে তুলতে চাইছে। বার বার কে যেন মগজের মধ্যে এক নগ্ন প্রশ্নের ঘা বসাচ্ছে।

সে কেবল ভাবে ভাবে আর ভাবে। দুই বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। প্রথমার সঙ্গে দেখা হয়। যে মেয়ে পদস্থ মিলিটারি চাকুরের ঘরনী হতে পারত। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় হয়েছে শুধু তার সন্তানের জননী। বান্ধবীর কথাগুলো আজও কানে লেগে আছে তার। সে বলে-

ছিল, দুটি জীবনের নিখাদ ভালবাসার সুদৃঢ় শক্তিতে জন্ম ওই সন্তানের।
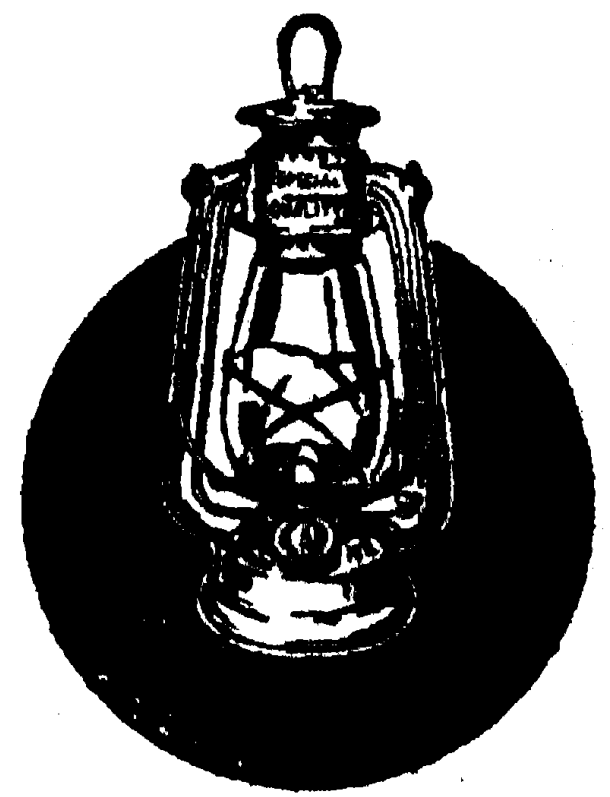
...সমাজের বিবেচনায়, আত্মজনের বিবেচনায়ও ওই মায়ের কপালে অসতীর ছাপ।

দ্বিতীয় বান্ধবীর সঙ্গেও দেখা হয়। সময়ে দুটো মন্ত্র উচ্চারণ করে আকাশচারী এঞ্জিনিয়ারের ঘরনী হতে পেরেছিল। কিন্তু মাত্র মাস কয়েক আগে ওই এরোপ্লেন দুর্ঘটনা ঘটলে এই বান্ধবীর কপালেও সেই অসতীর ছাপ পড়ত।

...সমাজের বিবেচনায় আত্মজনের বিবেচনায় এখন সে সতী, তার সন্তান সতীর সন্তান।

...আর নায়িকার নিজের সন্তান? তার ছাড়পত্রের কোনো প্রশ্নই নেই। সমাজ-বিধানে সে বড়ঘরের ভাগ্যবান ছাড়প্রত্রবাহ। কিন্তু প্রশ্নের ঝড় উঠেছে নায়িকার মনে। এমন যুক্তিশূন্য বুদ্ধিশূন্য বিধান আঁকড়ে ধরে সত্তার ক্ষয় পূরণ করা যাচ্ছে না কেন? দুঃশীলতা কাকে বলে? কাকে বলে ব্যভিচার? মন্ত্রবন্ধ বিবাহিত জীবনে যে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রেম নেই, অনুরাগের বন্ধন নেই—তাই কি চরম দুঃশীলতা নয়? চরম ব্যভিচার নয়?

—মা!

বিষম চমকে উঠলেন জ্যোতিরাণী। ঘুরে ছেলেকে দেখা-মাত্র ভিতরের কিছু একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি প্রাণপণে বুঝি নির্মূল করে ফেলতে চাইলেন তিনি। যে অনুভূতিটা তিনি গ্রহণ করতেও চান না, স্বীকার করতেও চান না। হঠাৎ বিভাস দত্তর ওপরেই ক্রুদ্ধ তিনি। ওই সাপ্তাহিক-পত্র হাতে এলে সত্যিই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন এবার।

মুখ কাচুমাচু করে সিতু বলল, নীলিদি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়, ক'দিন ধরেই বলছিল আমাকে...আজ এসেছে। একবারটি এসো না—

ছেলের এই নরম মুখ নতুন ঠেকল। দু'বছর ধরে ওর এক ধরনের চাপা উদ্ধত-ভাব দেখে আসছেন। মায়ের অকরুণ শাসন থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পেরেছে। অকরুণ মা হার মেনেছে, হাল ছেড়েছে। তার চাল-চলন চাউনিতে এটুকুই লক্ষ্য করেন জ্যোতিরাণী। ফেল করা দূরে থাক দু'বছর ধরেই পরীক্ষার ফল রীতিমত ভালো হচ্ছে। সেও যেন মাকে জব্দ করার জন্য, মা-কে নিজের গোঁ দেখানোর জন্য।

...হার সত্যিই মেনেছেন কিনা জানেন না, কিন্তু ছেলের সম্পর্কে নির্লিপ্ত যে হয়েছেন তাতে কোনো ভুল নেই। ছেলেকে স্কুল-বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে এনে জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর চাবুক হেনেছিল তার বাবা, বলেছিল, ওকে নিয়ে আর তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—বুঝলে?

...বড় মর্মান্তিক বোঝা বুঝেছিলেন জ্যোতিরাণী সেই রাতে। এই দু'বছর ধরে তারপর মাথা না ঘামাতেই চেষ্টা করছেন। দিন কয়েক আগে ছেলের মুখে সিগারেটের গন্ধ পেয়ে মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠেছিল। দুর্বার রোষে পাশের ঘরের পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। বলতে যাচ্ছিলেন, মাথা ঘামাচ্ছি না, তোমার ছেলে সিগারেট ধরেছে—খবরটা তোমাকে জানালাম।

কিন্তু যাননি। বলেন নি কিছু। সিগারেট খাওয়াটা হয়ত দোষের ভাববে না, শুধু তাঁর মুখ থেকে শুনতে হল সেই আক্রোশেই হয়ত ঘরে ডাক পড়বে ছেলের, হাতে চাবুক উঠবে। ফলে তাঁর দিকে সিতুর চাউনিই শুধু আরো বদলাবে, তার বেশি কিছু হবে না। তার থেকে মাথা ঘামাতে চেষ্টা না করাই ভালো। দু'বছর ধরে নিজেকে এমনি করেই টেনে রেখেছেন তিনি।

—নীলিদি কে?

—দুলুর দিদি, ওই যে গলিতে থাকে।

...বিভাস দত্তর উপন্যাসের নায়িকার মন নায়িকার চিন্তা যে তাঁর মন নয় তাঁর চিন্তা নয় আদৌ, নিজের কাছে সেটা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করার তাড়না প্রবল এখনো। তাই ছেলের ওপর তক্ষুনি সদয় তিনি। —বলতে বল, আসছি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিতুর প্রস্থান। নীলিদির কাছে মান বজায় থাকবে কিনা সেই ভাবনা ধরেছিল তার।

এই দু'বছরে সিতু মাথায় বেড়েছে বেশ। বয়েস চৌদ্দ হল। নাকের নীচে পাতলা কালো দাগ পড়ছে। কিন্তু ভিতরের পরিবর্তন আরো দ্রুত হারে এগোচ্ছে। এগারো বছরের শমীকে নেহাতই ছেলে-মানুষ ভাবে। নীলিদির বয়স আঠের। ভীতু অতুলের দিদি রঞ্জুদিরও ওই বয়েসই হবে। দেখতে ওদেরই ভালো লাগে এখন। যে রহস্য নিয়ে সিতু অনেক চিন্তা করেছে ভালো করে এখন তাদের দিকে তাকালে অনেকটাই যেন হদিস মেলে তার। নীলিদির থেকেও ভালো রঞ্জুদিকেই বেশি লাগে। ভাইয়ের ওপর হামলা করেছিল বলে এক কালে রঞ্জুদি মায়ের কাছে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাকে। সিতুর ভালো লাগলে কি হবে, এখনো তেমনি কড়া মেজাজের হাবভাব রঞ্জুদির। ছেলে-মানুষের দিকে তাকাবার মত করে তাকায় তার দিকে।

সে তুলনায় নীলিদি বরং দিন-কতক ধরে বেশ খাতির-টাতির করছে তাকে। বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর করে ঘরের তৈরি নাড়ুটাড়ু খেতে দিচ্ছে। এই ফাঁকে সিতু তাকে খুব কাছ থেকে খুব ভালো করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। কেন নীলিদির মায়ের সঙ্গে দেখা করার এত আগ্রহ এখনো জানে না। ওকেই মুরুব্বি ধরে এসেছে।

বোঝা গেল মা আসতে। উঠে প্রথমে ভক্তিভরে প্রণাম সারল।

জ্যোতিরাণী বললেন, দেখি তো বোজই, নাম কি তোমার?

—নীলা।

তারপর আমতা আমতা করে কোন আশায় আসা তাও বলল। স্কুল ফাইন্যালে পাস করতে পারেনি। আর পড়া হবে না। তাঁদের প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ প্রভুজীধামে যদি কাজ-টাজ পায় কিছু।

জ্যোতিরাণী হতভম্ব প্রথম। পরে বিরক্ত মনে মনে। জানালেন সেখানে যাদের কোনো ঠাই নেই আশ্রয় নেই তারা থাকে, কিছু শিখেটিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে—তার মত মেয়েদের নেবার তেমন সুবিধে নেই। কিন্তু মেয়েটা মাথা গোঁজ করে বসেই রইল তবু। জ্যোতিরাণীর মায়াই হল একটু। শক্ত হতে পারে না বলে মিত্রাদি মিথ্যে রাগ করে না! ছেলের দিকে চোখ পড়তে মনে হল পারলে ও এক্ষুনি আরজি মঞ্জুর করে ফেলে। মেয়েটার হয়ে ছেলেও যেন নীরব আবেদন পেশ করছে। একটু আগের তাড়না এখনো মুছে যায়নি...ছেলের প্রতি সদয় হবার তাড়না। আশ্বাসের সুরেই বলে ফেললেন, আচ্ছা যিনি সেখানকার সব দেখাশুনা করছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

[ক্রমশঃ]

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

শান্ত সৌর বর্ষ

সৃষ্টির আদিকাল থেকে সূর্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। প্রথম যুগে মানুষ ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে সূর্যের দিকে তাকিয়েছে। সে দেখেছে, তাদের আবাসভূমি পৃথিবীর জীবনচক্র সূর্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে দিনের সূচনা হয় আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে রাত্রির আঁধার পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। সে দেখেছে, পৃথিবীর সর্বশক্তির আধার হচ্ছে সূর্য এবং সর্বজীবের প্রাণ পোষণ করে সূর্য। তাই পুরাকালে সর্বদেশের মানুষ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করত। তারপর বিজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ ক্রমশ জানতে পেরেছে। সে জেনেছে, মহাকাশে সূর্য হচ্ছে একটি সুবিশাল জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড এবং সূর্যদেহ থেকেই পৃথিবী আদি ৯টি গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে ও সূর্যকে কেন্দ্র করেই তারা মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছে।

এককালে মানুষের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিষ্ক তাকে প্রদক্ষিণ করছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত এই মতবাদই প্রচলিত ছিল। এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করলেন পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস্। তিনিই প্রথম বললেন, সূর্যই মহাকাশে স্থির হয়ে আছে এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ তাকে প্রদক্ষিণ করছে। সে যুগে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, তাই কোপারনিকাস তাঁর মতবাদ চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। প্রায় ৫০ বছর পরে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করে কোপারনিকাসের মতবাদের সত্যতা প্রদর্শন করলেন। পরবর্তীকালে কোপারনিকাস-গ্যালিলিওর মতবাদই সর্বজনস্বীকৃত হয়।

কোপারনিকাস-গ্যালিলিওর পর আমরা আজ তিন শতাব্দী পার হয়ে এসেছি। এই তিন শতাব্দীকালে আমরা সূর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করেছি এবং তাকে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আজ আমরা জেনেছি, সূর্য হচ্ছে জ্বলন্ত গ্যাসের বিরাট অগ্নিকুণ্ড। কোটি কোটি বছর ধরে এই গ্যাস দাউ দাউ করে নিয়ত জ্বলছে, কিন্তু সূর্যদেহের এই প্রচণ্ড তাপের কোনো পরিবর্তন আজ পর্যন্ত তেমন হয় নি। এ কারণ কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্যের মধ্যে নিরন্তর তাপকেন্দ্রীক বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে এবং তারই ফলে সূর্যদেহে অনবরত প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে বলেই সূর্যের পক্ষে তা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। এরই অনুকরণে পৃথিবীর মানুষ সাম্প্রতিককালে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছে। সূর্যের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি প্রচণ্ডবেগে চতুর্দিকে ছুটে যাচ্ছে এবং এমন ভয়ংকর সংঘাতের সৃষ্টি করছে যার ফলে তাদের সংযুক্তি (ফিউশন) ঘটে ও তার দরুন প্রচুর শক্তির উৎপত্তি হয়। সূর্যের তাপশক্তি এভাবে বজায় না থাকলে পৃথিবীতে নানা অঘটন ঘটত। কারণ সূর্যের তাপশক্তি যদি বর্তমান তাপশক্তির অর্ধেক হয়, তা হলে পৃথিবীপৃষ্ঠের সমুদয় তরলপদার্থ জমে যাবে। পক্ষান্তরে এই তাপশক্তি কয়েকগুণ মাত্র বেশি হলেই সাগর-মহাসাগর টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করত।

ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সূর্যতাপের বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও সূর্যপৃষ্ঠের অবস্থা সব সময় একরকম থাকে না। সূর্যপৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অনেক সময় সূর্যের উজ্জ্বল পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে কতকগুলি কালো বিন্দু ও কালো রঙের বিস্তৃত স্থান দেখা যায়। কোনো সময় এগুলি খুব ছোট থাকে, আবার কখনও কখনও তাদের মধ্যে বেশ বড় কালো গর্তের মতো স্থান দেখতে পাওয়া যায়। এই কালো বিন্দু ও স্থানগুলি বিজ্ঞানের ভাষায় 'সৌরকলংক' নামে অভিহিত। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২—৩ হাজার বছর আগে চীনদেশের বিজ্ঞানীরা সৌরকলংক পর্যবেক্ষণ করে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করে পাশ্চাত্য জগতে গ্যালিলিওই প্রথম সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করেন। ধর্মযাজকদের প্রভাবে তখন এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, সূর্য অতি পবিত্র বস্তু। তাই গ্যালিলিও সূর্যপৃষ্ঠে কলংকের কথা বলায় চারিদিক লোকে তখন তাঁকে ধিক্কার দিতে থাকে। এরপর জার্মান বিজ্ঞানী শাইনার লক্ষ্য করেন, সূর্যপৃষ্ঠের কালো
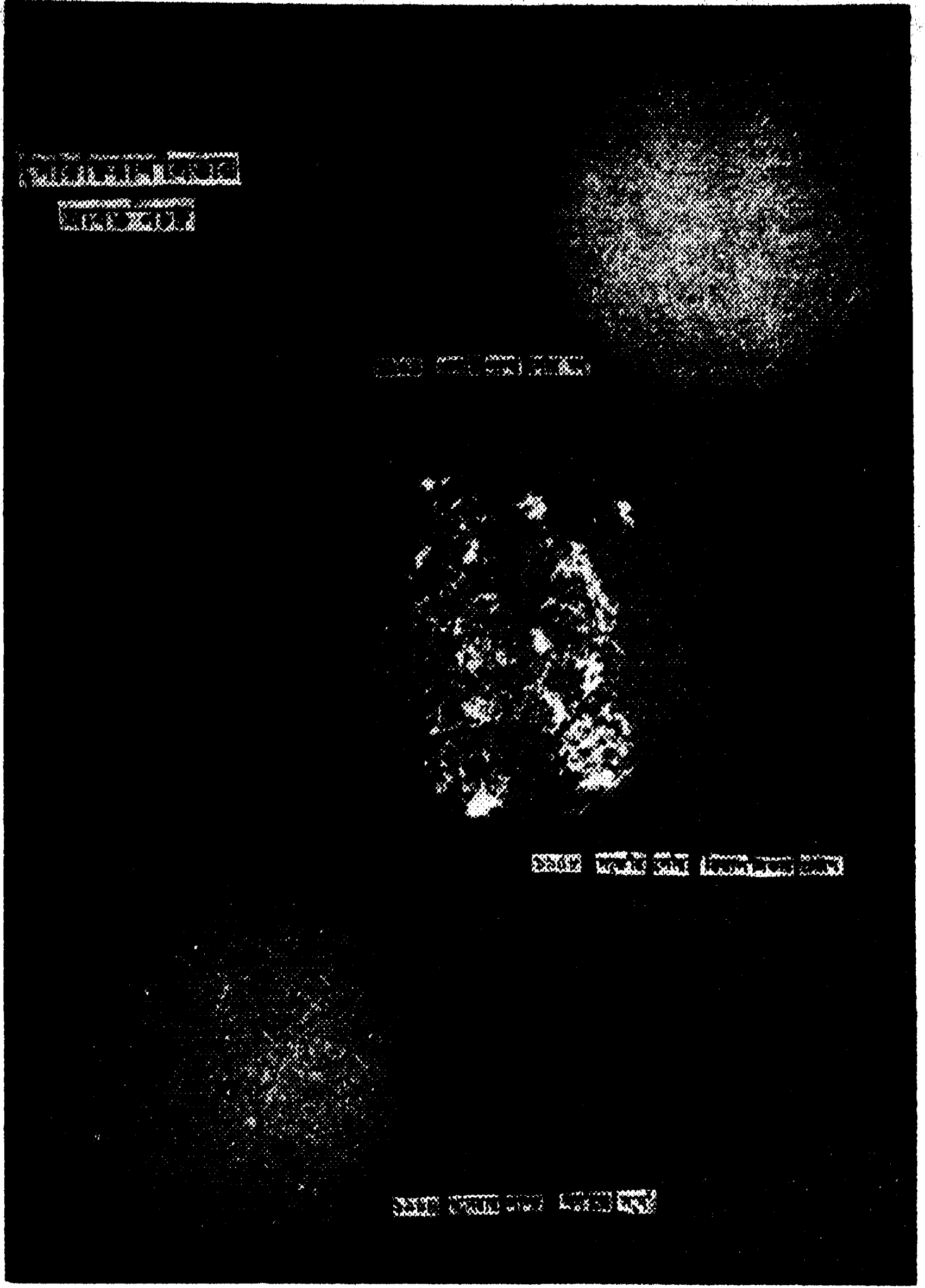
বিন্দুগুলি পূর্বদিক থেকে ধীরে ধীরে কিছুকাল পশ্চিম দিকে চলে যায়। কখনও কখনও পশ্চিমের বিন্দুগুলি অন্তর্হিত হয়ে কিছুকাল পরে আবার পূর্বসীমান্তে দেখা দেয়। এ-থেকে শাইনার সিদ্ধান্ত করেন, পৃথিবীর মতো সূর্যও পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘোরে। পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যকে যে দিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করে সূর্যও সেইদিকে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘোরে। মোটামুটি ২৭ দিনে একগুচ্ছ কলঙ্ক-বিন্দুকে সম্পূর্ণ ঘুরে পূর্বস্থানে আসতে দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কগুলিকে কিন্তু সূর্যপৃষ্ঠের স্থায়ী চিহ্ন বলা যায় না। বেশির ভাগ ক্ষুদ্র কলঙ্ক সূর্যপৃষ্ঠে আবির্ভাবের ৩—৪ দিনের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। কলঙ্কগুলির প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই সূর্যের এক পূর্ণ-আবর্তনকালের মধ্যে অদৃশ্য হয়। অতি অল্পসংখ্যক কলঙ্কগুচ্ছকেই এক থেকে তিন মাস স্থায়ী হতে দেখা যায়। এপর্যন্ত একটিমাত্র কলঙ্ককে দীর্ঘ ১৮ মাস স্থায়ী হতে দেখা গেছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্যের দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক হচ্ছে সৌরকলঙ্ক। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন একমাসের মধ্যে, যতগুলি সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, সেই সংখ্যাকে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার একটা পরিমাপ বলে গণনা করা যেতে পারে। এই সংখ্যাটি সমান থাকে না, অতএব সূর্যের ক্রিয়াশীলতা পরিবর্তনশীল। তবে এই ক্রিয়াশীলতা একটা নিয়ম মেনে চলে। বহু পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, গড়ে প্রতি এক বছরে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার পুনরাবর্তন ঘটে অর্থাৎ একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ইতিমধ্যেই সৌরকলঙ্কের সংখ্যা একবার সর্বাধিক ও একবার সর্বনিম্ন হয়। সংবৎসরকালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা গণনা করে বিজ্ঞানীরা সূর্যের ক্রিয়াশীলতার একটা পর্যায়বৃত্তিক আবর্তনকাল পরিমাপ করেছেন। ১১ বৎসর অন্তর এই আবর্তনকাল লক্ষ্য করা যায়। যখন সূর্যের ক্রিয়াশীলতা সর্বনিম্ন হয় তখন সেই কালকে বলা হয় 'শান্ত সৌর বর্ষ'। সাম্প্রতিককালে ১৯৫৪ সালে সূর্যের ক্রিয়াশীলতা সর্বনিম্ন হয়েছিল এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে আবার শান্ত সৌর বর্ষ লক্ষ্য করা গেছে।

কি কারণে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য ঘটে সে সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত উপনীত হতে পারেন নি। তবে সূর্যের সর্বাধিক ক্রিয়াশীলতার সময় যেমন সূর্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের সুযোগ এসে উপস্থিত হয়, তেমনি সূর্য সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে শান্ত সূর্যের বর্ষকালেও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। ১৯৫৭-৫৯ সালে যখন আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছিল, তখন সূর্যের ক্রিয়াশীলতা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সূর্য সম্পর্কে নানা অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালান। তেমনি ১৯৬৪-৬৫ সালে শান্ত সূর্যের বর্ষকালে একটি আন্তর্জাতিক প্রকল্প রচিত হয়। এই প্রকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্সের সঙ্গে জাপান, ভারত, চেকোশ্লোভাকিয়া, ক্যানাডা, পোল্যাণ্ড, ইতালী এবং অস্ট্রেলিয়াও অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে এই প্রকল্পে সংগৃহীত তথ্যাদি বিচার-বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সৌরকলঙ্ক হচ্ছে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক। কিন্তু সৌরকলঙ্কের প্রকৃত রূপ এবং তার উৎপত্তি ও লয়ের সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত। তবে সৌরকলঙ্কের ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। বহু পূর্বে ডাচ বিজ্ঞানী ৎসিমান প্রমাণ করেছিলেন, একটি পরমাণু যদি শক্তিমান চুম্বকের কাছে থাকে তা হলে ঐ পরমাণুজাত এক-একটি বর্ণরেখা বিভক্ত হয়ে দুই বা ততোধিক বর্ণরেখায় পরিণত হয়। এই সূত্র অবলম্বন করে বিজ্ঞানী হেল্ সৌরকলঙ্ক ও উজ্জ্বল সূর্যপৃষ্ঠের একই বর্ণরেখা সূক্ষ্মভাবে তুলনা করে প্রমাণ করতে সমর্থ হন, সৌরকলঙ্কের বহু রেখা প্রকৃতপক্ষে ৎসিমান সূত্রানুযায়ী বিভক্ত। সুতরাং সৌরকলঙ্কগুলিকে চুম্বকধর্মী বলা যেতে পারে।

সৌরকলঙ্কের চুম্বকধর্মের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কোনো ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একবর্ণীয় সৌরচিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উজ্জ্বল স্থান দেখা যায়। এইগুলি সূর্যের বর্ণমণ্ডলের উত্তপ্ত গ্যাসের বুদ্বুদবিশেষ। বিজ্ঞানীরা এগুলিকে 'সৌর বুদ্বুদ' বলেন। সৌর বুদ্বুদগুলি সাধারণত ক্ষণস্থায়ী। দেখা যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে কিছুকাল ঐ অবস্থায় থাকবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার মিলিয়ে যায়। পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে, এই সঙ্গে পৃথিবীর চুম্বকধর্মের পরিবর্তনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, বেতার-বার্তা শোনবার কালে অনেক সময় বেতার-যন্ত্রটি নিঃশব্দ হয়ে যায়। সমুদ্রবক্ষে নাবিকেরাও সচরাচর লক্ষ্য করেন, সময় সময় তাঁদের কম্পাসের কাঁটাগুলি অযথা বিচলিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকধর্মের আকস্মিক পরিবর্তনে এইসব ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাকে 'চৌম্বক ঝড়' বলেন। এখন জানা গেছে, সৌর বুদ্বুদের ক্রিয়াশীলতার ফলেই এই চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি হয়। একারণে সৌরকলঙ্কের সর্বাধিক ক্রিয়াশীলতার সময়ে চৌম্বক ঝড়ের বেশি সৃষ্টি হয়। আর শান্ত সৌর বর্ষে চৌম্বক ঝড় কম হয়।

পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরুতে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায় তা-ও সূর্যের চুম্বকধর্মের প্রভাবে সৃষ্ট হয়। শান্ত সৌর বর্ষে পৃথিবীর এই দুটি মেরুপ্রান্ত ছাড়া অন্যত্র মেরুজ্যোতি দেখা যায় না। পৃথিবীকে ঘিরে মহাকাশে যে বিকিরণ বলয় আছে তা-ও সূর্যের ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

শান্ত সৌর বর্ষ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রকল্পে অনেক নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ মূল্যবান তথ্য জানতে পেরেছেন, এই শান্ত বর্ষকালে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ধনাত্মক পরমাণুকণিকার তীব্রতা অর্ধেক হ্রাস পায়। এ ছাড়া আরও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য শান্ত সৌর বর্ষে সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু সেসব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রাণীজীবন

পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রগুলির শুধু অস্তিত্বের জনাই অনেক প্রাণীজীবন প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে নানারকম প্রাণীর কাজকর্মেরও শক্তিকেন্দ্রের ওপর প্রভাব পড়ে। এ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের সেণ্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (সি-ই-জি-বি) একটি নতুন প্রাণী গবেষণাগার খুলেছেন। সি-ই-জি-বি ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এর বিদ্যুৎ সরবরাহের উৎস।

প্রাণী গবেষণাগারটি লেদারহেডে অবস্থিত বোর্ডের সেণ্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রিসার্চ ল্যাবরেটরীর পাশেই গড়ে উঠেছে। লণ্ডনের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লেদারহেড এখন এক "ডরমিটারী" টাউন।

প্রধানত জলজপ্রাণী নিয়ে বিচার করা হয়। কারণ, শক্তিকেন্দ্রগুলির জন্য ঠাণ্ডা জলের প্রয়োজন হয়। এই জল নিকটস্থ নদী, হ্রদ বা সমুদ্র থেকে নেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জল গ্রহণ করে যখন সেই জল ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তা বেশ গরম থাকে। যে সব প্রাণী নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে তাদের মধ্যে জীবাণু থেকে বড় মাছ সবই রয়েছে।

অন্যদিকে প্রাণীরাও শক্তিকেন্দ্রগুলির ক্ষতি করতে পারে। শক্তিকেন্দ্রগুলিতে অনেক কনক্রিটের খাল থাকে, যদি বাঁচবার উপযোগী পরিবেশ পায় তাহলে প্রাণীরা সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। বর্তমানে সি-ই-জি-বি 'মুসেল' নামে এক ধরনের 'শেলফিশ' নিয়ে গবেষণা করছেন। 'মুসেল' কনক্রিটের খালগুলিতে বাঁচবার উপযোগী পরিবেশ পায়।

সূর্যপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত তড়িৎকণার দ্বারা সৃষ্ট মেরুজ্যোতি

ছোট মুসেলগুলিকে নিয়ে আরও বিপদ। এগুলি এত ছোট যে মেটাল গ্রিডের মধ্যে দিয়ে একেবারে স্টেশনের মধ্যে ঢুকে যায়। এমনকি তাদের কনডেনসার টিউবের মধ্যেও দেখা গেছে।

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান মুসেলদের রীতিনীতি, খাদ্য-অখাদ্য, পছন্দ-অপছন্দ, প্রজনন পদ্ধতি ইত্যাদি জানা। গবেষকরা যখন এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করবেন তখনই মুসেল আক্রমণ প্রতিহত করা যাবে।

পাওয়ার স্টেশন যে জল ছেড়ে দেয় তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা আবার অন্যরকম। যে জল ছেড়ে দেওয়া হয় তা নদী বা সমুদ্রের জলের চেয়ে অনেক গরম এবং তা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত নদী বা সমুদ্র জলের উষ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। এতে অনেক অসুবিধার উৎপত্তি হয়। কাঠ ঝাঁঝরা করে দেয় এমন জলজ পোকা ঠাণ্ডা জলের চেয়ে গরম জলেই বেশি তৎপর। এই ধরনের পোকার মধ্যে রয়েছে 'টেরেডো' পোকা—অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে এরা কাঠ ঝাঁঝরা করে দেয়। এতে প্রতিবেশীদের নৌকার ও স্থানীয় কাঠের তৈরী জেটির প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। এক টুকরো কাঠ জলে ডুবিয়ে রাখলে টেরেডো পোকা অনায়াসে ধরা যায়। ঠাণ্ডা জলে এরা খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না, কিন্তু গরম জলে এদের ক্ষতির পরিমাণ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এদের পরীক্ষা করা দরকার, যাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সৌরবিদ্যুৎচালিত মোটরযান

শক্তিকেন্দ্রগুলি প্রাণীজীবনের ওপর একটি শুভ প্রভাবও বিস্তার করে থাকে। শক্তিকেন্দ্রগুলি ঠাণ্ডা জল গ্রহণ করে পরিবর্তে গরম জল ছেড়ে দেয় বলে এবং গরম জলে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে ফেনল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েজ-এ এখন ব্রিটিশ মৎস্যশিকারীদের খুব ভিড় দেখা যায়। তারা জায়গাটার নামকরণ করেছে ইলেকট্রিসিটি কাট।

দুধের আতংক

দীপ্তিময় দে

যাদের শিশু ও রোগীর জন্য একটু ভাল দুধের ব্যবস্থা করতে হয় তাদের সত্যিই আতংকিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমেই দুধের ভেজালের কথাটা সবার মনে আসে। ভেজাল ছাড়া দুধ আজকাল প্রায় বাঘের দুধের মতই দুষ্প্রাপ্য। তাই ক্রেতাকে গোয়ালার সংগে রফা করে ভেজাল দুধই মেনে নিতে হয়। কপাল ভাল হলে দুধে কেবলমাত্র কলের জলই মেশান হয়। কিন্তু শহরের বর্ধিষ্ণু গোয়ালাদের ভেজাল বিজ্ঞান ক্রমেই উন্নতি লাভ করছে। এর সাহায্যে যে কৃত্রিম দুধ তৈরী হয় ল্যাকটোমিটারও তাকে গরুর দুধ বলেই ভুল করে বসে। আপেক্ষিক গুরুত্বে (স্পেসিফিক গ্রাভিটি) কোন তফাৎ নেই। তাই বলছিলাম দুধে মেশাবার উপকরণগুলির মধ্যে নির্দোষ কিছু থেকে থাকলে তা বিশুদ্ধ কলের জল। নির্দোষ এই কারণে যে এ থেকে রোগের সম্ভাবনা থাকে না। যদিও কলের জলটা ক্রেতার একটু বেশী দামে কিনতে হয়।

দুধ নিয়ে এই ছল-চাতুরীর মূলে আছে এর চাহিদা ও সরবরাহের অসামঞ্জস্য। ভারতবর্ষের ৪০ কোটির বেশী লোকের জন্য গরু মোষের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ গবাদি পশুর সমান। আমাদের দেশের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ লোকই কৃষির উপর নির্ভরশীল। আয়ের বিকল্প সংস্থান হিসাবে প্রতিটি কৃষকই দু-চারটি গরু অথবা মোষ পোষেন। এর মধ্যে অল্প কিছু ভাল জাতের গরু আছে। বাদ বাকী বেশীর ভাগ গরুর মাথা পিছু দুধ পাওয়া যায় মাত্র ১ কেজির মত। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের Sahiwal. Red Sindhi এবং Tharparkar কুলীন শ্রেণীর গরু। এরা প্রতি স্তন্যদানকালীন সময়ে (প্রায় ৩০০ দিন), ২০০০ কেজির মত দুধ দেয়। তুলনামূলকভাবে, এদের সংখ্যা নিতান্তই কম। গরুর চাইতে মোষ অনেক বেশী দুধ দেয়। ভাল জাতের গরু মোষ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে কেন্দ্রিভূত বলে এই অঞ্চলকেই দেশের প্রধান দুধ সরবরাহকারী বলা যায়।

গ্রামের অসংখ্য চাষী পরিবারের কাছ থেকে দেশের শতকরা ৯০ ভাগ দুধ পাওয়া যায়। আগেই বলেছি, এসব চাষীদের গরু মোষের সংখ্যা দু-চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই দেখা গেছে, গ্রাম প্রতি গড়ে দুধ পাওয়া যায় ৯০ কেজির মত। যেমন, গ্রাম প্রতি আসামে ১১ কেজি থেকে দিল্লীতে প্রায় ৪৫০ কেজি। কিন্তু প্রধান সমস্যা দেখা দেয় এই দুধ শহরে আনার ব্যাপারে। রাস্তার ও যানবাহনের অভাবই প্রধান। তাই, যদিও পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় যে ১৯৫১ এবং ১৯৫৬ সালে দেশে মোট দুধের উৎপাদন যথাক্রমে ১৬১·২ এবং ১৯১·৭ লক্ষ মেট্রিক টন, কিন্তু পানীয় হিসাবে এর মধ্যে ব্যবহারের পরিমাণ মোটে শতকরা ৩৬·২ ভাগ। বেশীর ভাগ দুধই ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবার অসুবিধার দরুণ কম প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হয়েছে। দেশের দুধ উৎপাদক অঞ্চলগুলি কেন্দ্রিভূত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে দুধের অভাব থাকা সত্ত্বেও রাস্তা ও পরিবহনের অসুবিধার জন্য দুধের অপচয় হয়, তাই ঘাটতি অঞ্চলে দুধ পাওয়া দায়। দিনে মাথা পিছু আমরা দুধ পাই মাত্র ৫ আউন্সেরও কিছুটা কম।

তুলনায় গ্রামের চেয়ে শহরের লোকের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বেশী। আমাদের দেশে স্বল্প আয়ের গ্রামের লোকের কাছে দুধের ব্যবহার প্রায় সৌখিনতার পর্যায়ে পড়ে। তাই দুধ ও দুধের তৈরী অন্যান্য খাবারের চাহিদা শহর অঞ্চলেই বেশী। দেশের শতকরা ৫০ ভাগ পানীয় দুধের ব্যবহার শহরেই সীমাবদ্ধ। এর পরিমাণ ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশী। এই দুধের প্রায় শতকরা ৬০-৭০ ভাগ আসে শহরের নোংরা খাটালগুলি থেকে। বাকী গ্রাম থেকে। অবশ্য এই খাটালগুলিকে বর্তমানে আস্তে আস্তে গ্রামের দিকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা এদের আলাদা কলোনী করে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে পরে বলছি।

এ পর্যন্ত যা বললাম, তা থেকে দেশে দুধের চাহিদা ও সরবরাহের যে ছবি পাওয়া যায় তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বরং দুধ সংগ্রহে ইচ্ছুকদের পক্ষে আতঙ্কজনকই বলা যায়। কিন্তু এতসব অসুবিধা অতিক্রম করে দুধের যোগাড় হলেও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। এরপর আছে দুধ থেকে নানা রোগের আতংক। এ বিষয়ে সাধারণ লোকের খুব একটা পরিষ্কার ধারণা নেই। এসব সত্ত্বেও আমরা দুধের জন্যে এত মাথা খুঁড়ে মরি কেন? কারণ দুধ স্তন্যপায়ী জীবের একটি অবশ্য খাদ্য। পরিমাণে অল্প জুটলেও এর গুণ অনেক। এর প্রধান কার্যকারিতা হাড় ও মাংসপেশী গঠনে। রসায়নবিদের কাছে দুধের চেহারা হচ্ছে, জল ৮৭%, খনিজ লবণ—০-৭৫%, প্রোটিন—৩-৪৫% লবণ—০-৭৫%, প্রোটিন—৩-৪৫ শতকরা শর্করা—৪-৯০% স্নেহজাতীয় উপাদান—৪%। দুধের মধ্যেকার পুষ্টিকারক জিনিষ হচ্ছে এর স্নেহজাতীয় উপাদান, Casein, Lactose (দুধের শর্করা—যা দুধে প্রচুর আছে) আর খনিজ লবণ। Casein হচ্ছে দুধের প্রোটিন। খনিজ লবণ ক্যালসিয়াম যোগায় যা দিয়ে হাড় ও দাঁত শক্ত হয়। দুধে ভিটামিন A আর D-ও থাকে। দুই পাইন্ট (প্রায় ৩ পোয়া) দুধের উপকারিতা পরিমাণ সহ যে খাবারের তালিকা দিচ্ছি এ তার যে কোনটির সমান। যেমন, ১½ পাউন্ড মুরগীর মাংস, ২½ পাঃ মাছ, ১৬টি ডিম, ১ পাঃ বীন ২½ পাঃ কড়াইশুটি, ৬½ পাঃ টমাটো।। দুধের এই সব গুণের জন্য মানুষ যেমন তাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, নানাধরণের জীবাণুও দুধের মধ্যে বাসা বাঁধে খাদ্যের সন্ধানে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এদের মধ্যে অনেকেই আবার রোগ বয়ে আনে। খোঁজ করে দেখা গেছে, দুধে এই সব জীবাণু আসে প্রধানত ১। গরু থেকে, ২। বাতাস থেকে, ৩। যে পাত্রে দুধ রাখা হয় তা থেকে, ৪। বাসন-কোসন ধোয়ার জল থেকে, আর ৫। দুধের কাজে লিপ্ত কর্মীদের কাছ থেকে। প্রায় ৩০-৩৫ রকমের রোগ দুধের মারফৎ ছড়াতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় সব কটি রোগ এদেশে হয় না। সাধারণত আমাদের দেশে যে সব রোগ দুধ থেকে হয় তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যে সব রোগ গরু মোষ থেকে হয় তাদের মধ্যে আছে—

(1) Tuberculosis, (2) Streptococcal Infection, (3) Undulant Fever, (4) Foot and Mouth disease—Virus Infection, (5) Anthrax, (6) Paratyphoid, (7) Salmonellosis (other than Typhoid and Paratyphoid)

আর দুধের কাজে নিযুক্ত লোকেদের থেকে যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে আছে—

(1) Typhoid, (2) Paratyphoid, (3) Streptococcal Infection, (4) Diptheria, (5) Cholera, (6) Dysentry, (7) Salmonellosis (other than Typhoid and Paratyphoid).

এই সব রোগের আক্রমণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত যাতে রোগের জীবাণু দুধে বাসা বাঁধবার সুযোগ না পায় আর কোনক্রমে দুধে আশ্রয় পেলেও তাকে যাতে ধ্বংস করা যায়। পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে তাদের দেশের দুধ উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকে ঢেলে বৈজ্ঞানিক পন্থায় সাজিয়েছেন। সে ঢেউ আমাদের দেশেও এসে লেগেছে। এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার রূপরেখাটিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১। গ্রামাঞ্চলে বড় বড় গোরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ উৎপাদন করা, ২। দুধ সংরক্ষণের জন্য হিমঘরের ব্যবস্থা, ৩। বিভিন্ন গোরক্ষণ কেন্দ্রের দুধ যোগাড় করা ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Insulated অথবা Refrigerated মোটর ভ্যানে, ট্যাংকারে অথবা রেল ট্যাংকারে কেন্দ্রীয় দুগ্ধকেন্দ্রে পাঠানর ব্যবস্থা করা, ৪। কেন্দ্রীয় দুগ্ধকেন্দ্রে Pasturisation ও Bottling plant-এর সাজসরঞ্জাম রাখা, ৫। ক্রেতাদের কাছে Pasturised দুধের বিক্রির ব্যবস্থা করা—সোজাসুজি পৌঁছে দেওয়া চলতে পারে অথবা Consumer Stores-এর মাধ্যমেও ব্যবস্থা করা চলে, ৬। উপরের সব কটি

স্তরেই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়গুলি কড়াকড়ি-ভাবে মেনে চলে নির্দোষ পরিষ্কার ও নির্ভেজাল দুধ পাওয়ার চেষ্টা করা।

উপরিল্লিখিত বিষয়গুলিকে আমাদের দেশে রূপ দেবার চেষ্টায় সুবিধা-অসুবিধা অনেক আছে। গ্রামাঞ্চলের দুধের উৎপাদকরা আছেন অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর বেশীর ভাগ গৃহস্থেরই গরুর সংখ্যা দু-চারটির বেশী নয়। যদি ২০০০ কেজি দুধ যোগাড় করার মত একটি কেন্দ্র খুলতে হয় তাহলেই অনেক গ্রামকে এর দুধ সরবরাহকারীর তালিকায় রাখতে হবে। গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা মোটেই উন্নত নয়, এমন কি বর্ষার সময়ে অনেক গ্রামে যাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। দুধ রাখার ও আনা নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত বাসনপত্র ধোয়ার জন্য উপযুক্ত পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থাও সব গ্রামে নেই। এই কারণে দুধের নোংরা বাসনপত্র থেকেও বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আর তাছাড়া সব কেন্দ্রেই রেফ্রিজারেশন-এর বন্দোবস্ত থাকাও অর্থ-নৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক নয়। তাই অনেক সময় গ্রামের দুধ শহরে নিয়ে আসা কঠিন কাজ। যে সব ক্ষেত্রে কম সময়ে এই দুধ সংগ্রহ করা ও শহরে চালান দেওয়া সম্ভব সে যায়গায় তা করতে হবে। যেখানে দুধ সংগ্রহের পরিমাণ বেশী সেখানে হিমঘরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংগৃহীত দুধ সময়মত Insulated অথবা Refrigerated যানবাহনে কেন্দ্রীয় দুগ্ধকেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থাও থাকবে। যে সব ক্ষেত্রে এর কোনটাই সম্ভব নয়, সেখানে শহরের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে নতুন গোরক্ষণ কেন্দ্র খোলা উচিত, যেখান থেকে তাড়াতাড়ি দুধ শহরে পেঁছান সম্ভব। এরকম প্রায় ৬০-৭০টি সুব্যবস্থিত গোরক্ষণ কেন্দ্র আমাদের দেশে রয়েছে। যদিও এ থেকে পাওয়া দুধের পরিমাণ সমস্ত দেশের চাহিদার তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। বর্তমানে এই কেন্দ্রগুলি সৈন্য-নিবাস, গো-প্রজনন কেন্দ্র ও গবেষণাগার অথবা নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানর কাজেই ব্যবহার করা হয়। এরকম এক-একটি কেন্দ্রের দুগ্ধবতী গরু মোষের সংখ্যা ১০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত। এখানে আধুনিক গোশালা, দুধ দোহার জায়গা, মাছি নিরোধক দুগ্ধ সংগ্রহ ও ওজন করার ঘর ও আরও অনেক সুবিধা থাকে। কিছু কিছু কেন্দ্রে Pasturisation ও Bottling Plant, , হিমঘর আর এই সব কেন্দ্রে ব্যবহৃত বাসনপত্র পরিষ্কার ও জীবাণুহীন (Sterilisation) করার যন্ত্রপাতিও থাকে।

দুধের উৎপাদন বাড়ানর সঙ্গে শহরের দুধ সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। গত কয়েক বছরে এ বিষয়ে যে সব দিক থেকে নজর দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ১। দুধ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সমবায় সমিতি গঠন, ২। দুগ্ধবতী গরু মোষের জন্য শহরের উপকণ্ঠে গ্রামাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন, ৩। দুধ উৎপাদনের জন্য পরিকল্পিত গোরক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করা, ৪। যে সব এলাকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত দুধ উৎপাদন হয় সেখানে মাখন, ঘি ইত্যাদির কারখানা স্থাপন করা। এই ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হিসাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যায়, যেমন Kaira District Co-operative Milk Producers Union, Anand এটি ১৩৮টি সমিতি নিয়ে গঠিত—প্রায় ৪০,০০০ কৃষক সভ্য আছে এতে। দিনে ২৪,০০০ গ্যালন দুধ হাত বদল হয় এখানে। বেশীর ভাগ দুধ Pasturise করে ট্রেনে করে ৩০০ মাইল দূরে বম্বেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে এখানে UNICEF এবং Colombo Plan এর সাহায্যে একটি দুগ্ধজাত খাদ্যের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এতে

গুঁড়ো দুধ, Casein, Baby Food তৈরী হয়। শহর থেকে খাটাল সরাবার অভিযানে বম্বের কাছে Aarey Milk Coloney স্থাপন করা হয়েছে। এই কলোনীতে বর্তমানে বিভিন্ন মালিকানার প্রায় ১৫০০০ মোষের বাস। এ থেকে দিনে ১৭০০০ গ্যালন দুধ পাওয়া যায়। এ দুধ Pasturise করার পর বোতলে ভর্তি করে শহরে বিক্রি করা হয়। দিল্লী ও মাদ্রাজে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় দুধ সরবরাহকারী বড় বড় প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। আমাদের ঘরের কাছে রয়েছে Haringhata Dairy Farm, বেলগাছিয়াতে Pasturisation Plant ও মাখন, ঘি তৈরীর ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে কলকাতা শহরের ক্রেতাদের জন্য বেশ কিছু দুধের ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যে কারখানাগুলি থাকে তার কাজ সম্বন্ধে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। অবশ্য সব কারখানাতেই ঠিক একই ধরনের কাজ হয় না। এটা নির্ভর করে কারখানার কাজে কতটা দুধ পাওয়া যায় তার উপর। যদি দুধের পরিমাণ কম হয়, তবে সাধারণত Pasturise করা ও বোতলে ভরার কাজ করা হয়ে থাকে। দুধ সরবরাহ কিছুটা বাড়াবার জন্য আরও কয়েক রকমের দুধ তৈরীর কাজও হয়ে থাকে। যেমন Toned Milk, Double Toned Milk, Standardised Milk ইত্যাদি। অনেকেই এদের নাম শুনেছেন ও ব্যবহার করেছেন। আগেই বলছি দুধে খানিকটা স্নেহজাতীয় পদার্থ (ফ্যাট) থাকে। দুধে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফ্যাট রেখে বাকীটা মাখন তৈরীর কাজে তুলে নিলে ঐ দুধকে Standardised Milk বলে। মোষের দুধে ফ্যাটের পরিমাণ গরুর দুধের চাইতে অনেক বেশী। খাঁটি মোষের দুধের সঙ্গে ফ্যাট তোলা (Skimmed) গুঁড়ো দুধ জলে গুলে মেশালে যে দুধ পাওয়া যায় তাকে Toned Milk বলে। এ প্রক্রিয়ায় দুধের ফ্যাটের পরিমাণ খাঁটি মোষের দুধের চাইতে কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিষ (solids-not-fat) গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে ঠিক রাখা হয়। শুধু মেশালে এটা সম্ভব হয় না। পানীয় হিসেবে মোষের দুধে যতটা ফ্যাট থাকে তা প্রয়োজনাতিরিক্ত। তাই আমাদের মত দুধের ঘাটতির দেশে এই উপায়ে অনেক বেশী লোককে পুষ্টিকর দুধ দেওয়া চলে। Double Toned Milk ও Toned Milk এর মতই তৈরী হয়। তবে এতে মোষের দুধ, ফ্যাট তোলা গুঁড়ো দুধ আর জলের [illegible]

ফ্যাট কম থাকে (১·৫% যেখানে Toned Milk এ থাকে ৩%) কিন্তু প্রোটিন বেশী থাকে (১০% Solids-not-fat, Toned Milk এ থাকে ৯%)। তাই এই দুধও বেশ পুষ্টিকারী, দামও কম। বেশী লোকের কাছে দুধ পৌঁছে দেবার জন্য নানারকমের, নানাদামের দুধ তৈরীর এই প্রচেষ্টায় মূলে UNICEF এর দান অনস্বীকার্য। অনেক জায়গায় যন্ত্রপাতি দিয়ে ও অন্যান্য রকমে সাহায্য করেছেন এই প্রতিষ্ঠান।

Pasturisation এর সাহায্যে দুধকে সংক্রামক রোগজীবাণু মুক্ত করা হয়। জগতবিখ্যাত বিজ্ঞানী Louis Pasture এর নামানুসারে এই প্রক্রিয়ার নামকরণ হয়েছে। দেখা গেছে যে ১৪৩ঃ ফাঃ হিঃ তাপে দুধ ৩০ মিনিট রাখলে ক্ষতিকারক রোগ-জীবাণু (Pathogenic Bacteria) নষ্ট হয়ে যায়। এতে দুধের অন্য কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যদি এরচেয়ে বেশী সময় গরম করা যায় তা হোলে ফুটান দুধের গন্ধ পাওয়া যায়। এইভাবে দুধ Pasturise করতে হলে সময়টা বেশী লাগার দরুণ বিরাট পাত্রের প্রয়োজন। গবেষকরা বের করেছেন যে তাপ বাড়ালে সময় কম লাগে। কিন্তু তাতে দুধে অবাঞ্ছিত স্বাদ এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। একমাত্র ১৬১ঃ ফাঃ হিঃ তাপে ১৫ সেকেণ্ড দুধ রাখলে Pasturisation ও ঠিক হয়, আর স্বাদেও কোন পরিবর্তন হয় না। এই দুই উপায়েই Pasturisation করা চলে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার (HTST — High Temperature Short Time) দুধ কতক্ষণ ১৬১ঃ ফাঃ হিঃ তাপের সংস্পর্শে থাকে তা Radiotracer এর সাহায্যে জানা যায়।

Pasturisation এর সাফল্য নির্ধারণে সাহায্য করে Phosphatase Test. দুধে Phosphatase নামে এক ধরনের Enzyme থাকে। ১৪৩ঃ ফাঃ হিঃ তাপে ৩০ মিনিট দুধ রাখলে Phosphatase এর কার্যকারিতা ৯৬% নষ্ট হয়ে যায়। Phosphatase এর এই বিশেষত্বটিকেই কাজে লাগান হয়। Pasturisation সফল হলে পরীক্ষা করে দুধে Phosphatase এর চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু ১ঃ ফাঃ হিঃ তাপ কম হলে বা ৫ মিনিট সময় গরম কম করা হলে অথবা ০·৫% কাঁচা দুধ Pasturisation এর পর দুধের সঙ্গে মেশালে এ পরীক্ষায় তা ধরা পড়বে। Phosphatase test HTST-Pasturisation এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

Pasturisation করার পরও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। ক্রেতার কাছে দুধ পৌঁছে দেবার জন্য দরকার বোতল ও Aluminium Foil এর ছিপির। [illegible] মুক্ত করা অবশ্য প্রয়োজন। এরপর দুধ ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবার দেরী থাকলে হিমঘরে রাখা উচিত। হিমঘরে না রাখা হলে আমাদের মত গরম দেশে গ্রীষ্মকালে (তাপ ৩০ঃ সেঃ ৩৭ঃ সেঃ) দুধ ১২ থেকে ২০ ঘন্টার মধ্যে খারাপ হয়ে যায়। আরও বেশী গরম পড়লে (তাপ ৪২ঃ সেঃ—৪৪ঃ সেঃ) অনেক সময়ে দুধ খারাপ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে দুধ থেকে রোগের আতঙ্ক খানিকটা কম এই কারণে যে, আমরা দুধ ফুটিয়ে খাই। তাই গুণাগুণ কিছুটা নষ্ট হলেও রোগের ভয় থাকে না। কিন্তু ফুটান দুধ অনেকক্ষণ ফেলে রেখে খেলে বিপদের আশঙ্কা থাকে। তাই দুধকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ করতে গেলে কতকগুলি বিষয়ে নজর দিতে হবে যেমন, ১। Pasturise করার আগে দুধকে উপযুক্তভাবে ঠান্ডা করা দরকার, যাতে দুধে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী এক ধরনের জীবাণু জন্মাতে না পারে। এই জীবাণুগুলি (Staphylococcal Enterotoxin) তাপে ধ্বংস হয় না। তাই Pasturisation মানুষকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, ২। Pasturisation এর সাফল্য নির্ধারণ, ৩। Pasturisation এর পর যাতে রোগজীবাণু সংক্রামিত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে প্রায়ই দেখা যায় উপরিলিখিত কোন একটি নির্দেশ মেনে না চলার দরুণই দুধ থেকে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

এদেশে অবশ্য দুধ থেকে রোগ ছড়াবার সম্ভাব্য আরও কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে প্রধান Ice Cream এর বহুল প্রচলন। অনেক Ice Cream তৈরীর প্রতিষ্ঠানই বৈজ্ঞানিক প্রণালী মেনে চলে না, আর তাছাড়া এর জন্য যে সব মূল্যবান যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তার সংস্থান করাও এদের অনেকের পক্ষেই অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব নয়। তাই, অলিতে-গলিতে আজকাল যে হারে Ice Cream এর কারখানা গজিয়ে উঠছে তাতে বিপদ বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। দুগ্ধজাত খাবারের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভয়। কিন্তু আইন বলে নিষিদ্ধকরণের ফলে এ বিষয়ে ভাবনার কারণ এখন কম।

দুধের এই আতঙ্কজনক ইতিবৃত্তে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। এতে ভয় পেয়ে কোন দেশই দুধের ব্যবহার কমিয়ে দেয়নি। বরং দুধ দোষমুক্ত করার নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ের উদ্ভাবন ও তার সাফল্যে দুধ সবার কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠছে। যারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক নয় তাদের সতর্কতার জন্যই এ বিষয়ের অবতারণা। বৈজ্ঞানিক সতর্কতাতেই আতঙ্কের অবলুপ্তি।

অঙ্গনা

প্রমীলা

প্রয়োজনে

মানুষের প্রয়োজন যত বাড়ছে চিন্তার পরিধিও ততই বিস্তৃত হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ চিন্তার পরিধি বিস্তৃত করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রয়োজনের কাছে এই চিন্তাধারা তথা কর্মধারা শত-সহস্র পথে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। এই প্রয়োজনের তাগিদ যদি না থাকতো তখনই চিন্তার ক্ষেত্রে দৈন্য এবং সংকট ঘনীভূত হতো। মানুষ জন্তু-জানোয়ারের মতই স্বাভাবিক নিয়মে জীবনধারণ করেই ক্ষান্ত থাকতো, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু মানুষ এবং পশুতে তফাৎটা এখানেই। পশুর ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না। মানুষ নিত্য নতুন প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে আর একটি একটি করে সমস্যার সমাধান করে সে এগিয়ে চলেছে সম্মুখের পানে। কিন্তু এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান কোনদিন সম্ভব নয়। সভ্যতা যতই এগিয়ে যাবে সমস্যা ততই বাড়বে এবং মানুষ তার সমাধান করবে আপন বুদ্ধিবলেই।

সমস্যার সংকট যে আমরা কি রকম উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি তার ভূরি ভূরি বিরাট উদাহরণগুলো ছেড়ে দিলেও আমাদের সাধারণ জীবনের ঘটনাগুলোই তার সাক্ষ্য বহন করবে। বড় বড় ঘটনা বিরাট মনীষার কীর্তি কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনের তুচ্ছ কথা সাধারণ মানুষের নিজস্ব চিন্তা-ধারার ভাস্বর। আর সেজন্যই গর্বও সেখানে অনেক বেশি। কারণ এই গর্বের সবটা না হলেও অনেকটাই তার স্বোপার্জিত।

আমাদের দেশের মেয়েরা আজ অনেকেই ঘরের একঘেয়েমী কাটিয়ে বিরাট বিশ্বের কর্মস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছে। আর কর্মস্রোতে নিজেকে যুক্ত করতে গিয়ে সর্বত্র অভিজাত বা অনভিজাতের বিচার করা চলে না। অবশ্য তা হয়নি। প্রয়োজনের খাতিরে আমাদের মেয়েরা নানান জীবিকায় নিজেদের যুক্ত করেছে। সাধারণ কাজ করতেও আপত্তি করেনি। একদিন আমরা ভাবতেও পারিনি যে এদেশের মেয়ে খবরের কাগজ ফেরি করবে অথবা চামড়া-প্ল্যাস্টিকের কারখানায় কাজ করবে। কিন্তু আজ তা সম্ভব হয়েছে এবং এই সম্ভব হওয়ার মধ্যে ভবিষ্যতের গর্ভে আরও বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত আছে। সেই স্বর্ণপ্রসূ সম্ভাবনা বাস্তব হবে আজকের কর্মযজ্ঞের অংশীদার-দের আপ্রাণ প্রয়াসে এবং হয়তো যা আগামী দিনে। কিন্তু সে পথ এরাই তৈরী করে যাচ্ছেন এবং নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে ভবিষ্যতের মসৃণ যাত্রাপথ।

সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে নারীর আজ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেউ নতি-স্বীকারে প্রস্তুত নয়। বিশেষভাবে নারী আজ অঘটনপটীয়সীর ভূমিকা নিয়েছে। তাই সর্বকর্মে তার দুর্দম প্রকাশ সকলকে বিস্মিত করে দিচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের আরও বাকি আছে এবং আজকের প্রচেষ্টা সেই ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির সার্বিক রূপদানের দুর্জয় সংকল্পে অমলিন। আজও যারা একথা জানেন না তাদের জেনে নিয়ে যথাযোগ্যভাবে নিজেদের গড়ে তোলা প্রয়োজন। নাহলে সেদিন তারা বড় পিছনে পড়ে যাবেন।

উলের কাজে বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারা

প্রত্যেক দেশেরই একটি স্বতন্ত্র ধারা আছে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ শুধু যে তাদের আচারে ব্যবহারে দেখা যায় তা নয়, তাদের শিল্পকর্মেও দেখা যায়। বস্তুতঃ বিভিন্ন দেশের উলের কাজ এই ধারার ব্যতিক্রম নয়।

অনুমান করা হয় যে উত্তর আফ্রিকার মরু অঞ্চলের যাযাবর মানুষেরা 'উল বোনা' রীতির প্রবর্তক। প্রথম যুগে উল বোনার কাজ ফ্রেমে আটকে করা হত। ফ্রেমগুলি ছিল দুই রকমের। গোলাকার এবং সরু লম্বাটে; গোলাকৃতি ফ্রেমে মোজা জাতীয় জিনিস তৈরী হত এবং লম্বাটে ধরনের ফ্রেমে কার্পেট, টেন্ট ফ্ল্যাপ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিশেষ ধরনের পোষাক তৈরী হত। উত্তর আফ্রিকার যাযাবর সম্প্রদায় ছিল বর্তমান আরব অধিবাসীদের আদি-পুরুষ। তাই আরবীয় বুননে এদের প্রভাব অতি প্রকট। আরব দেশে এমবসড প্যাটার্নের প্রচলন খুব বেশী। এছাড়া ক্রশ স্টিচ প্যাটার্ণ এবং দুই রং-এর উলের বোনাও দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বণিকদের সহায়তায় আফ্রিকার এই উল বোনার পদ্ধতি স্পেনে প্রচলিত হয় এবং মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের সময় এই বুনন রীতি দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবর্তিত হয়। এই কারণে বোধহয় স্পেনের আদি-যুগের উল বোনার রীতির সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা ও আরব দেশের উল বোনার রীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

স্পেনের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাকের সূক্ষ্ম লেশের কাজ জগতের চোখে সেকালে একটি বিস্ময় ছিল। স্পেনের অভিজাত ব্যক্তিদের ইতালী ভ্রমণ বিশেষ করে রোম ও ফ্লোরেন্স ভ্রমণ ইতালীর উল বোনার রীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভৌগোলিক সীমার দিকে তাকালে দেখা যায় যে ইতালী ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফুলে ফলে ভরা সৌন্দর্যের ভূস্বর্গ। তাই এদেশের উল বোনার কাজে দেখা যায় লতাপাতার আধিক্য। ইতালীবাসীরা উল বোনার কাজে হুকড্ নিডল (hooked needle) ব্যবহার করতেন। লেসের কাজেও ইতালীর খুব খ্যাতি।

সূক্ষ্ম লেশ বোনায় ফ্রান্স জগতে অদ্বিতীয়। ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত লেশ বোনা ফরাসী দেশে খুব প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সোয়েটার ও জ্যাকেটের প্রচলনই বেশী।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে জার্মান ও অস্ট্রিয়ার ভৌগোলিক পটভূমিকা ছিল আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ বিপরীত। অস্ট্রিয়া-জার্মানীর একত্রীকরণ দুটি রাষ্ট্রকে এক সাম্রাজ্যভুক্ত করলেও দুই দেশের চিন্তাধারাকে কোন একটি নির্দিষ্ট খাতে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। তাই উত্তর জার্মানী ও দক্ষিণ জার্মানীর উল বোনার প্যাটার্নের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উত্তর জার্মানীর উল বোনার কাজে 'ধর্ম সংস্কার' যুগের পিউরিটান মনোভাবের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু অস্ট্রিয়ার উলের প্যাটার্নগুলি সহজ, সরল; এখানে পাতা ও ফুলের নক্সাই বেশী।

জার্মানী ও ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত হলেও হল্যান্ডের উলের বুননে ঐ দুই দেশের প্রভাব বিশেষ নেই। হল্যান্ডের উলের বুননে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি জিনিষ প্রকাশ পেয়েছে। সপ্ত-দশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাচেরা এমবসড প্যাটার্নেও পারদর্শী হয়ে ওঠে।

ডেনমার্কের উলের কাজে ডাচ প্রভাব খুব বেশী। ডেনমার্কের অধিবাসীদের কাছে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উলের কাজ একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ডেনমার্কের রাজপরিবারগণের পোষাক তৈরীর জন্য হল্যান্ডের একদল বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানান হয় এবং কোপেনহেগেনে একটি হোসিয়ারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞের দলটিই ডেনমার্কে উল বোনার রীতির প্রবর্তন করে।

নরওয়ের উলবোনায় দুই রং-এর কাজের প্রচলন খুব বেশী। বিশেষ করে সাদা সোয়েটারের উপর গাঢ় লাল কিংবা সবুজ উলের নক্সা খুব জনপ্রিয়। কেবল প্যাটার্ন ও চেকার প্যাটার্ন এখানে খুব প্রচলিত।

'ইণ্ডিয়ান ফ্লেয়ার উইথ দি কন্টিনেন্টাল স্টাইল' শিরোনামায় এক ইন্দো-জার্মান ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি হামবুর্গে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ভারতীয় পোশাকের সংগে ইউরোপীয় পোশাকের সমন্বয়সাধন। চিত্রে উভয়ের সমন্বয়ে সান্ধ্য ও আনুষ্ঠানিক পোশাকের মনোজ্ঞ রূপ দেখা যাচ্ছে। শাড়ী পরার বিশেষ ধরণটি এবং কাশ্মীরী শাল ও উলের সূক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত গাউন ও স্কার্ট লক্ষণীয়।

ফেয়ার ইসলে-এর উলের কাজের সংগে স্পেনের উলের কাজের খুব সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের পিছনে কি কারণ আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন। তবে সম্ভবতঃ স্প্যানিস আর্মাডার নাবিকরাই এই সাদৃশ্যের জন্য দায়ী। এই প্রসংগে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ফেয়ার ইসলে-এর অধিবাসীরা নাকি সমুদ্রতীরে ভেসে আসা স্পেনীয় সৈনদের উলের পোষাকের নক্সা দেখে অনুরূপ নক্সা তোলে।

শেটল্যান্ড-এর উলবোনার কাজে ফেয়ার ইসলে-এর উলবোনারীতির প্রভাব খুব স্পষ্ট। শেটল্যাণ্ডে-এর অধিবাসীরা সাদা, ক্রীম, ধূসর, কালো ইত্যাদি রং-এর উলের পোষাক খুব পছন্দ করে। এখানকার লেশও খুব বিখ্যাত; এই সব লেশবোনার পদ্ধতি কোথাও লেখা নেই, পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে লেশবোনার পদ্ধতি তারা শিখে আসছে।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উলবোনার রীতি জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। উত্তর আফ্রিকার যাযাবর অধিবাসীদের কাছ থেকে ধর্মযাজকদের মাধ্যমে উলবোনার রীতি বৃটেনে প্রচলিত হয়, পরে নরম্যানরা ইউরোপের উচ্চতর উলবোনার পদ্ধতির সংগে বৃটেনের পরিচয় করিয়ে দেয়। কালক্রমে ফরাসীদের সূক্ষ্ম লেশ ও ইতালীর জ্যাকেটের সংগে বৃটেনের পরিচয় ঘটে। বৃটেন কিন্তু এই বিষয়ে অন্যের অন্ধ অনুকরণ করেনি। বৃটেন অন্যান্য দেশের উলবোনার রীতি আত্মসাৎ ক'রে তাদের নিজের দেশের ধারার সংগে মিলিয়ে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

—রমা সরকার

আয়ের উৎস

শ্রীমতী দুর্গা মালব্য নতুন দিল্লীর আধুনিক ঘরণী গৃহিণীদের একজন। এ'র আধুনিকতাটুকু রূপ পেয়েছে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে। সেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পেলাম তাঁর সংগে দেখা করতে গিয়ে ২নং সফদরজঙ্গে।

নয়াদিল্লীর অভিজাতপাড়ায় এক কেতাদুরস্ত বাংলো। তবে, এ'র বাড়ীর চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় বাড়ীর পিছনের মুরগী খামারটি। খাস দিল্লী শহরের বুকের উপর এতবড় আর এমন সার্থক মুর্গী পালন কেন্দ্র দেখে আশ্চর্য হতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা এটি চালাচ্ছেন একজন ঘরের গৃহিণী সংসারের নানান দায়িত্ব সামলিয়ে ছেলেমেয়েদের অসংখ্য দাবী পূরণ করেও।

কথা হচ্ছিল তাঁর বাড়ীর পিছনে বাগানে বসে। শ্রীমতী মালব্য তাঁর মুরগীঘরে ওষুধ 'স্প্রে' করছিলেন মশামাছি তাড়ানোর জন্য। 'স্টিরাপ পাম্প' চালাতে চালাতে তিনি বললেন, "যে কোনও মেয়ের পক্ষেই বেশ বড় করে মুরগী পালন করা একটা উপজীবিকা হতে পারে। কাজের দিক দিয়ে এটা অন্য যে কোনও কাজের চেয়ে কোনও অংশে কম নয় আর আয়ও হয় বেশ ভাল। এরজন্য আমি যত খাটি যতটা

সময় ব্যয় করি তার সবটাই অবশ্য, সুদে-আসলে উশুল হয়ে যায়।"

প্রশ্ন করে জানলাম, গরমের সময় ডিম থেকে তাঁর দৈনিক আয় হয় ষাট টাকা। শীতকালে এই আয় বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় দৈনিক আশী টাকায়।

প্রায় বছর তিন আগে শ্রীমতী মালব্য খানিকটা শখ করে আর কিছুটা জরুরী অবস্থার চাপে বাড়ীতে মাত্র দু' চারটে মুরগী পুষতে শুরু করেন। সে সময়ে বাড়ীর পিছনে 'লন' সংলগ্ন উঠানে খানিকটা জায়গা ঘেরাও করে মুরগীর ঘরও তৈরী করা হলো। আজ তাঁর খামারে মুরগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দু' হাজারে। ডিম-দেওয়া মুরগী বা 'লেয়ার' (layer) ৬০০, বাচ্চা তোলার জন্য মুরগীর সংখ্যা ২০০ আর বাদবাকী ছোটবড় মুরগীছানা।

ইনি আধুনিক 'ডিপলিটার' পদ্ধতিতে মুরগী পোষেন। দেখলাম মুরগীর খাঁচাগুলি খুব পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, চারপাশ তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। বুঝতে বাকী রইল না কেন তাঁর শখের মুরগী পোষা শেষ পর্যন্ত একটা সার্থক ব্যবসায়ে দাঁড়িয়েছে। খাঁচাগুলিতে আলো আর হাওয়া যথেষ্ট। মুরগীদের জন্য সবরকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থারও এতে অভাব নেই। বসার জন্য দাঁড় রয়েছে, ডিম-পাড়া ঝুড়ি আছে। খাবার পাত্র আর বিশেষ ধরনের জলের পাত্রও রয়েছে। এই পদ্ধতিতে যেমন জায়গাও কম লাগে তেমনি হাঙ্গামাও অনেক কম। আর নোংরাও হয় না। শুনলাম মুরগী ঘরের চারপাশে প্রতিদিন প্রতিষেধক ছিটিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। ছয় মাস অন্তর একবার করে মুরগী ঘরের মেঝের খড় বদলে ফেলা হয়। এসব কাজ নাকি রুটিনমাফিক হয়ে থাকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমতী মালব্য জানালেন, তাঁর প্রত্যেকটি মুরগীকে বসন্তরোগ আর রাণীখেতের প্রতিষেধক টীকা দেওয়া আছে। ভয়ানক অবাক হয়ে বললাম, "এতগুলি মুরগীর এইভাবে প্রতিষেধক টীকা দেওয়া তো কম হাঙ্গামার ব্যাপার নয়।" এর উত্তরে শ্রীমতী মালব্য যা বল্লেন তাও অবাক করে দেওয়ার মতন। তিনি বল্লেন, "এই প্রতিষেধক টীকা দিতে খরচ পড়ে মুরগী পিছু মাত্র নয় পয়সা। এই সামান্য কষ্টটুকু সহ্য না করলে পরে যে আমাকেই পস্তাতে হবে।"

মুরগীদের সুসম খাদ্য দেওয়া আর যথাযথ তদারকী করার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। ডিমের সংখ্যা বাড়ল সেই সঙ্গে আয়ও। মুরগী বিশেষজ্ঞের নির্দেশমত সুসম মিশ্রখাদ্য সর্বদা মুরগীদের খেতে দেওয়া হয়। খাবারের সঙ্গে 'এণ্টিবায়োটিক' কিছুটা মিশিয়ে দেন, যাতে সহজে পাখীগুলো অসুস্থ হয়ে না পড়ে। মুরগীদের জন্য টাট্‌কা সবুজ তরি-তরকারী যেমন উপকারী তেমনই প্রয়োজনীয়। মুরগী ঘরের পাশেই তাঁর একটি সব্জীর বাগান দেখলাম। বাগানে যা ফলে তা ঘরেও খাওয়া চলে আবার মুরগীদের জন্যও শাকপাতা যথেষ্ট হয়। ছয়মাস অন্তর যখন মুরগীর ঘরের মেঝেতে খড় বদলানো হয় তখন সেই পুরনো খড় এনে সব্জী বাগানে সার হিসাবে দেন।

শ্রীমতী মালব্যের পোলট্রির দুটি দৃশ্য।

এর খামারে মুরগীর ডিম প্রত্যেকটা বেশ বড় আর এক একটির ওজন প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম।

মুরগীদের মধ্যে একটাও বুড়ো বা অসুস্থ মুরগী নেই। বেশী বয়সের মুরগী তিনি রাখেন না। তখন ডিমও পাওয়া যায় না। দেড় বছর বয়সের বেশী কোনও মুরগী পালে নেই বললেই চলে। বাজার থেকে ডিম না কিনে তিনি নিজের খামারের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা করে আবার মুরগীর সংখ্যা বাড়িয়ে নেন। মুরগী-বাছাই নিয়মিত আর ঘন ঘন করেন বলে তাঁর এমন একটাও মুরগী নেই যে কম ডিম দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুরগীদের দেখাশোনা করে কাজ সেরে হাত ধুয়ে এসে পাশে বসলেন শ্রীমতী মালব্য। বেশ হাসিখুশি চট্‌পটে মানুষটি। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে একটু হেসে বললেন, "জানেন, আমার ইচ্ছা আছে যে, মুরগীর সংখ্যা বাড়িয়ে মোট তিন হাজারে দাঁড় করাবো আর আমার পোল্ট্রী বা খামারের জন্য একটা ইনকুবেটর (ডিম ফুটানো যন্ত্র) কিনব। সবরকমে যত্ন নিয়ে পুরোপুরি মুরগীদের দেখাশোনা করাই আমার ইচ্ছা যাতে ডিমও প্রচুর পেতে পারি আর বলতে পারেন, আমার এই ব্যবসাটিও না ফেল করে।"

সেলাইয়ের কথা

(১৫)

রকমারী রকমের স্কার্ট

ফ্লেয়ার কাট্ স্কার্ট

(১)

মাপ :—

কোমর—২২"

স্কার্টের ঝুল—১৮"

১—২=কোমরের ¼—১"

২—৩=কোমরের ¼—১"

৩—৪=কোমরের ¼—১

৪—১=কোমরের ¼—১"

২—৫=৩—২ এর কিংবা ২—১ এর অর্ধেক

৩ ও ১=সেপ্ করে মিলিয়ে দিতে হবে।

৫—৬=১৮"

৬—৭=৩" (মুড়বার জন্যে)

৩ থেকে ও ১ থেকে a-b-c-d ইত্যাদি সব জায়গাতেই ১৮" দূরত্ব থাকবে।

a-b-c ইত্যাদি লাইন থেকে ক, খ, গ ইত্যাদি লাইনের সব জায়গাতেই ৩" দূরত্ব থাকবে।

তারপর ক, খ, গ ইত্যাদি ধরে গোল করে কাটতে হবে।

রাউণ্ড স্কার্ট

(২)

১—২=১½"

২—৪=পুরো ঝুল স্কার্টের+½"

১—৫=কোমরের ¼+½" সেলাই

২—৫=সেপ করে মিলিয়ে দিতে হবে, (ছবির মত)

৪—৬=১—৫+৮"

৭—৬=১—২+১½" গোল করে ছবির মত সেপ্ করতে হবে।

৩—৪=১½"

৮—৭=১½"

—'বসুধা'

সংবাদ
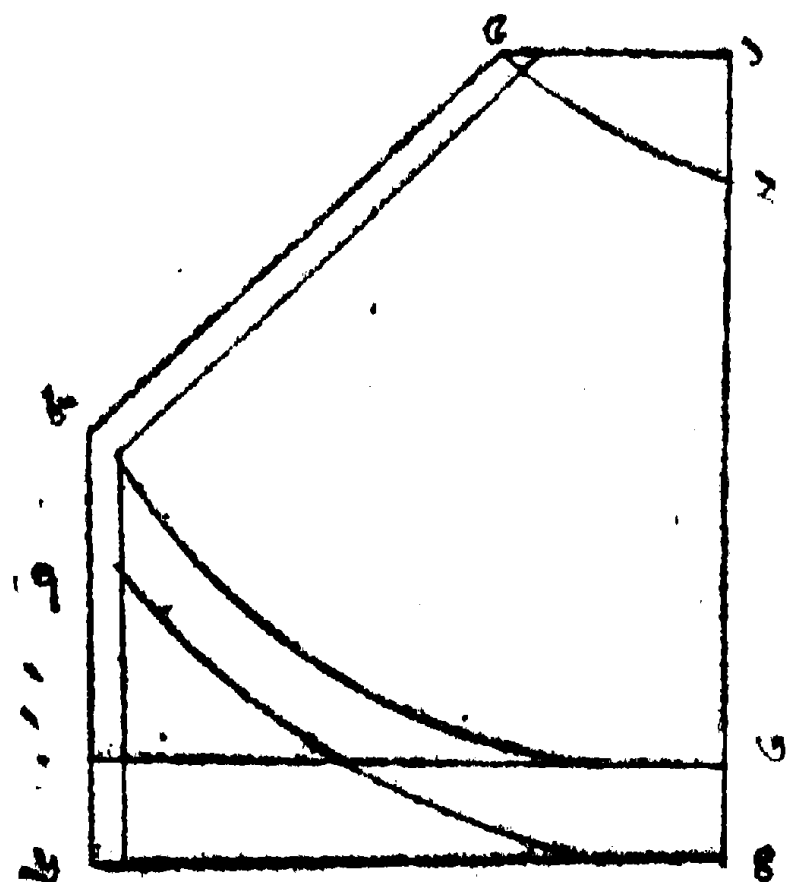
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাটনার হিন্দী মহিলা মাসিক পত্রিকা 'নারী জগৎ'-এ এক শুভেচ্ছা বাণীতে বলেছেন, প্রত্যেক শিক্ষিত মহিলার উচিত অন্তত একজন নিরক্ষর ও গরীব বোনকে লেখাপড়ায় সাহায্য করা। দেশের প্রগতির জন্য প্রত্যেক নারীর আর একজন নারীকে সাহায্য করা কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রীর জন্ম-দিন উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যায় এই বাণী প্রকাশিত হয়।

* * *

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের কেরল শাখার সাম্প্রতিক এক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং প্রাক-স্নাতক ছাত্রদের যৌনবিদ্যা শিক্ষা-দানের প্রশ্ন বিবেচনার জন্য সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা উচিত। সেইসঙ্গে স্কুল ও কলেজগুলিতে নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীও করা হয়েছে।

সভায় সভানেত্রীত্ব করেন রাজ্য কল্যাণ বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা দামোদর মেনন।

* * *

শ্রীমতী কবিতা পালিত এবছর ভাগল-পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমতী কবিতা অনার্সেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

* * *

বিহারের প্রথম মহিলা চিত্রশিল্পী শ্রীমতী কুমুদ সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীর শ্রীধরণী আর্ট গ্যালারীতে তার আটত্রিশ-খানি ছবির প্রদর্শনী দেখিয়ে শিল্প-রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। স্বর্গত হিন্দী কবি অধ্যাপক নলিন বিলোচনের সহধর্মিণী শ্রীমতী কুমুদ প্রথম জীবনেই চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে শিল্পশিক্ষা নেবেন। তা আর সম্ভব হয়নি। তবে পঁচিশ বছর আগে রাজগৃহে আচার্য নন্দলালের সান্নিধ্যে আসবার তার সুযোগ হয় এবং তাকেই তিনি গুরু বলে বরণ করেন। স্বামী-সঙ্গিনী হয়ে শান্তি-নিকেতনে এসে তিনি শিল্পগুরু নন্দলালের শেষ দর্শনও লাভ করেন।

শ্রীমতী কুমুদ শুধু চিত্রশিল্পীই নন। তিনি বিহারের নারীজাগৃতির একজন পুরোধা, পাটনা বেতার কেন্দ্রে শিল্প বিভাগের কর্মাধ্যক্ষা এবং একটি শিশু নিকেতনের প্রতিষ্ঠাত্রী।

একটি অপরিচিত নাটক

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

'দি স্টেজ বাট ইকোজ্ ব্যাক দি পাবলিক ভয়েস'—লিখেছিলেন স্যামুয়েল জনসন।

আমাদের কাছে যদি এমন কোনো সিঁদকাটি থাকত, যা দিয়ে সিঁদ কেটে সোজা একবারে একশো বছর আগেকার বাংলাদেশে পিছু হেঁটে যেতে পারতাম, তাহলে জনসনের ঐ কথাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সহজতর হত। সেদিনকার কলকাতার রাস্তাঘাট এবং কলকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকে নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছিলেন। কেউ কেউ আবার ঐ নোঙরা পথঘাট ও স্বাস্থ্যের সংগে আমাদের সমাজদেহের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা যে যথার্থ কথা বলে গিয়েছেন আজকের দিনের ঐতিহাসিকেরা তা স্বীকার করে থাকেন। সেদিন সমাজের সর্বাঙ্গে ঘা। বিধবা-বিবাহ সমস্যা বোধকরি সব থেকে দগদগে। তাই এর দাওয়াই-এর চিন্তা সকলকেই অল্পবিস্তর ভাবিত করে তুলেছিল। গত শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'তেই সম্ভবতঃ এই সমস্যাটির কথা প্রথম পাবলিককালি আলোচিত হয়। তারপর প্রতি দশকে 'পাবলিক ভয়েস' জোরদার হয়েছে। অবশেষে বিদ্যাসাগরের নায়কতায় আঠারোশ ছাপ্পান্ন সালের ষোলোই জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। গত শতকের ইতিহাসে এর চেয়ে বড়ো সামাজিক ঘটনা বোধহয় আর ঘটেনি।

এদিকে নবজাতক বাংলা-স্টেজও দিনে দিনে বড়ো হয়ে উঠছে। যাত্রার খোলোস ছেড়ে ইউরোপীয় আদর্শের বাঙলা নাটক তখন পা-পা করে চলতে শিখেছে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদাদর্শ যদিও তার হাত ধরে আছে, কিন্তু দামাল ছেলে মাঝে মাঝে হাত ছাড়িয়ে নিজের শক্তি পরীক্ষায় উন্মুখ। এমন সময় 'সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার'। হুড়মুড় করে এসে পড়ল বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের ঢেউ। দুকূল ভেসে গেল। সুতরাং বাঙলা নাটক ঐ উত্তাল-আন্দোলনকে এড়িয়ে যেতে পারল না। জনসনের ভাষায় বলা যায়, সে সামাজিক সমস্যার 'পাবলিক ভয়েস'-কে প্রতিধ্বনিত করে তুলল আমাদের রংগমঞ্চে।

সেদিনকার বাঙলা ভাষায় অনেকগুলি নাটক রচিত হয়েছিল যাদের বিষয় ছিল বিধবা-বিবাহ কেন্দ্রিক। 'বিধবা বিষম বিপদ' সেইরকম একটি নাটক। অনেক নাটকের কথাই অনেক সমালোচক লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু এ নাটকখানি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যে বছর বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল, সে বছর পাঁচুই ভাদ্র এই ক্ষুদ্র নাটকটি প্রকাশিত হয়। আইনের তারিখ থেকে মাত্র চৌত্রিশ দিনের ব্যবধান।

বালিকা বিধবাদের মর্মন্তুদ কৃচ্ছ্রসাধন সেকালে বহুজনেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। তাই সমাজের বেশির ভাগ লোকই বালিকা-বিধবাদের বিবাহে পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সব থেকে যা জটিল সমস্যা তা ছিল আরো গভীরে। তরুণী বিধবাদের পক্ষে নৈতিক আদর্শ বজায় রাখা সেদিন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে, ভেতরে ভেতরে পাপচর্চা ও ব্যাভিচার ভয়ংকর আকার ধারণ করল। অবৈধ গোপন প্রণয় দুর্বার সর্বনাশের দিকে সমাজকে দ্রুত নামিয়ে নিয়ে চলল। —বিধবা-বিবাহের নাট্যকারেরা সেই সর্বনাশকে নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙময় করে তুললেন।

সুতরাং 'বিধবা বিষম বিপদ' সমাজের কাছে একটি সতর্কবাণী। এখন তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

একজন মুখোপাধ্যায় ও একজন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়ালগ দিয়ে নাটকের কথারম্ভ। এঁরা দুজনেই কুলীন ব্রাহ্মণ। দুজনেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু মনের দিক থেকে দুজনের ফারাক দুস্তর। চট্টোপাধ্যায় উদার ও স্নেহকাতর। মুখোপাধ্যায় ঠিক তার উল্টো। তবে দুজনের সমস্যা কিন্তু একই ধরনের। চট্টোপাধ্যায়ের তিন মেয়ে। সেকালের প্রথা অনুযায়ী একটি কুলীন পাত্র ডেকে তিনি তাঁর তিন কন্যাকে সমর্পণ করে দিয়েছেন। কিন্তু বছর ঘুরল না। কুলীন পাত্রটি দেহ রাখলেন। ব্যস, সংগে সংগে তিন কন্যাও হ'ল বিধবা। এই নিদারুণ সংবাদে চট্টোপাধ্যায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি শোকাহতচিত্তে মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক অনুরূপ কারণেই ঐ মুখোপাধ্যায়েরও দুটি তরুণী-কন্যা বিধবা। কিন্তু তিনি গোঁড়া প্রকৃতির বলে মেয়েদের নিদারুণ দুঃখেও নীরব।

এ হেন যখন অবস্থা, চট্টোপাধ্যায় তখন একটি প্রস্তাব রাখলেন। প্রস্তাবটি এই রকম : 'পরাশর মুনির বচনে কলি যুগে বিধবাদিগের পুনর্বার বিবাহ দেওয়া স্পষ্ট লেখা রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ব্যবস্থা লিখেছেন তাহা যথার্থ শাস্ত্র বোধ হচ্ছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। আসুন আমরা সেই শাস্ত্রমত চলি। সুব্রাহ্মণের সন্তান সৎপাত্র তিনটি ডেকে তিনটি মেয়েরই বিবাহ দি। আপনিও কেন দুটি কন্যার বিবাহ দেন না। তা হলেও অশাস্ত্র কর্ম হলো না, ধর্মতও পতিত হতে হবে না।'

'মুখো—(কানে হাত) রাম রাম! চাড়ুয্যে বল কি হে? তুমি কি খেপেছ? দেশের লোকে ছি ছি করবে, চুপ কর, অমন কথা মনেও করো না।'

দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মুখোপাধ্যায় আদৌ বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। চট্টোপাধ্যায় সেদিক থেকে অনেক বুদ্ধিমান। তরুণী মেয়েদের পক্ষে বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্বীর আদর্শ অনুসরণ করা যে কত কঠিন সে তিনি জানতেন। স্খলন-পতনের লজ্জা থেকে সমাজকে বাঁচাতে গেলে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রস্তাবকে গ্রহণ-না-করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব শুনে কানে হাত ঢেকেছেন, তাই তাঁর কপালে দুঃখ জুটতে দেরী হ'ল না। তাঁর কন্যা প্রসন্নময়ী অবৈধ ও গোপন প্রণয়ের ফলে অন্তর্বত্নী হ'ল। তখন সামাজিক মর্যাদা মিশে গেল পথের ধুলোয়। —এই হ'ল নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পরিচয়।

মাত্র একত্রিশ পৃষ্ঠায় নাটিকাটি সমাপ্ত। একবারে নাটকের শেষে একটি নিবেদন আছে। নিবেদনে নাট্যকার লিখেছেন—

বিধবা বিষম বিপদ।

আপনারা এই একটী সমাজের বিধবার বিবরণ শুনিলেন। কিন্তু সকল সমাজেই এইরূপ জানিবেন। বরং এ অপেক্ষা অধিক ঘটনাও হইয়া থাকে। এবং এই সকল ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া পল্লীগ্রামে দলাদলী হইলাও সুরু।

অধিক কি কহিব অক্ষয় বৎসরে।

শকাব্দাঃ ১৭৭৮। সন ১২৬৩। ৫ ভাদ্র।
ইং ১৮৫৬। ২০ আগষ্ট।

'আপনারা এই একটি সমাজের বিধবার বিবরণ শুনিলেন। কিন্তু সকল সমাজেই এইরূপ জানিবেন। বরং এ অপেক্ষা অধিক ঘটনাও হইয়া থাকে।'...

বিধবা-বিবাহকে কেন্দ্র করে সেদিন যে অনেক নাটক লিখিত হয়েছিল, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। প্রশ্ন করা যেতে পারে, সেই নাটকগুলির থেকে এ বইখানির স্বাতন্ত্র্য কোথায়? যাহোক স্বাতন্ত্র্য অবশ্য খুঁজে বের করা কঠিন। তবে এ নাটকটিকে এ জাতীয় নাটকগুলির অন্যতম পথিকৃৎ বললে বোধহয় ভুল বলা হয় না। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটককেই সাধারণতঃ বিধবা-বিবাহের প্রথম নাটক বলে উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ তথ্য কি ঠিক? উমেশচন্দ্রের আগেও যে বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে নাটক লেখা হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। তাই আর যাই হোক, উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহকে অন্ততঃ প্রথমের মর্যাদা দেওয়া যায় না। আগেই বলেছি ষোলোই জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল। আর উমেশচন্দ্রের নাটকখানি যে দোসরা আগস্টের আগেই প্রকাশিত হয়েছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট' সেকালের একটি সমাদৃত পত্রিকা। ঐ পত্রিকায় দোসরা আগস্টের সংখ্যায় উমেশচন্দ্রের নাটকখানি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাহলে এ তথ্য থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ নাটকটি অন্ততঃ আইন পাশের আগেই লেখা হয়েছিল। ছাপাও হয়েছিল অনুরূপ অবস্থায়। তাই আইনের তারিখের দিকে নজর রাখলে ঐ বইখানিকে প্রাক-আইন যুগের শেষ বই বলে ধরা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন হবে, উত্তর-আইন যুগের প্রথম বই কোনটি? —এ মর্যাদা ও গৌরব সম্ভবতঃ 'বিধবা বিষম বিপদের'ই প্রাপ্য। আবার এই ক্ষুদ্র নাটিকাটিকে অন্যতম পথিকৃৎ-ও বলা যেতে পারে। কারণ, উমেশচন্দ্রের নাটক ও এ নাটকটির প্রকাশ-কাল এত কাছাকাছি যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রভাবে রচিত হয়েছিল। এমন অনুমান করাও চলে না। তাই সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে বাঙলা নাটকের ইতিহাসে এ নাটকটির জন্য একটি পৃথক ও মর্যাদার আসন দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন নয়।

নেপালের রাজদরবার থেকে অথবা গোয়ালের মাচা থেকে আবিষ্কৃত পুরাতন পুঁথি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একদা যুগান্তরের বাণী বহন করে এনেছিল। সে তুলনায় এ গ্রন্থটির কৃতিত্ব সামান্য।

তবে এক বিষয়ে তাদের সঙ্গেও মিল আছে। চর্যাপদের বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখককে যেমন স্পষ্ট করে খুঁজে পাওয়া যায় না, এর লেখককেও তেমনি খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঐ প্রাচীন গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ছিল আদ্যন্ত খণ্ডিত, নয়ত রসিক পোকার আক্রমণে পাতায় পাতায় ক্ষত-চিহ্ন। বর্তমান গ্রন্থটিরও পরিচয়-বাহী প্রথম পত্র বিনষ্ট। তবে নাটকাংশ একেবারে গোটা। কোনো অংশ তেমনভাবে কীটদষ্ট নয়। শেষাংশে নাট্যকারের নাম প্রকাশের অবকাশ ছিল, কেন জানি না, লেখক নিজেই নিজের নাম গোপন করে গেছেন। সে হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের রসিকতার মত এ গ্রন্থটিও আমাদের কাছে হেঁয়ালি ও মস্করা কম করে নি।

এখন যদি কোনো নবীন গবেষক ঐ রহস্য উদ্ধারে ব্রতী হ'ন তাহলে হয়ত মুশকিল আসান একদা হলেও হ'তে পারে।

আত্ম বিলোপ

সুভাষ সিংহ

মনে মনে সাধনার উপর খুব চটে গেলাম। সেই কখন থেকে বসে আছি। এখন দুপুর। চারিদিকে অস্ফুট গুঞ্জন। এক কাপ কফি আর কয়েকটা সিগারেট নিঃশেষিত হয়েছে অর্থাৎ কম করে এক-ঘন্টা কেটে গেছে, অথচ শ্রীমতীর দেখা নেই। দুপুরের কফি হাউস আমার কাছে অসহ্য লাগে। এত গোলমাল আর চিৎকার, ছেলেমেয়েদের ভীড়, হো-হো হাসি আর অজস্র সিগারেটের ধোঁয়ায় চারিদিকে কেমন চাপা গুমট ভাব। আমার খুব বিশ্রী লাগে, মনে হয় সবকিছুর মধ্যে একধরনের আতিশয্য বা রুচিহীনতা উপচে পড়ছে। অবশ্য সাধনার এ জায়গাটা খুব প্রিয়। কারণ ইউনিভার্সিটি কাছে। ক্লাস পালিয়ে ইচ্ছে মত আসতে পারে। তাছাড়া দেখেছি এখানে এলে ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে।

চারিদিকে তাকালাম। কোনো পরিচিত মুখ চোখে পড়ল না। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা বেশ ঝকমারি। এক-দুদিনের ব্যাপার হলে কথা ছিল না। ঘন-ঘন আসার ফলে হেড ক্লার্কের দু-একটি বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছে।

বেশ অপমানিত বোধ করছিলাম। এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে গৌরব কিছু নেই। বরং নিজেকে ছোট মনে হয়। এসব ভেবে বিরক্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

রাগ করে আজ আর বেয়ারাকে টিপস দিলাম না। ওর বিষণ্ণ মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে অসংখ্য চেয়ারের ব্যূহ ভেদ করে লম্বা হল পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে সুরু করি। পাশ ঘেঁষে তরতর করে একটি যুবতী দ্রুতবেগে উপরে উঠে যায়। হয়তো ওর জন্যেও কেউ অপেক্ষা করছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ফুটপাতের উপর দাঁড়ালাম। অল্প শীতের আমেজ হাওয়ায়। বেশ মিষ্টি রোদ। ট্রাম স্টপে ভীড়। একটু অপেক্ষা করা যাক। সিগারেট ধরিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে আসা তরুণ-তরুণীর দিকে নজর রাখলাম।

হাঁ, দূর থেকেও চিনতে ভুল হলো না। ভীড় কেটে সাধনা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। ফর্সা। দোহারা গড়ন। মোটামুটি ডাসা-ডাসা।

চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কেমন মিটমিট করে হাসছে। সব চালাকি। আজ আর কোন ছলাকলায় ভুলবো না। কঠিন কথা শোনাবার জন্যে মনে মনে তৈরী হলাম।

—ইস অনেক দেরী হয়ে গেল। বলে সাধনা ভ্রূ কাঁপিয়ে চারিদিকে চোরা চাহনি দিল, কি করবো বলো। চলে আসছি অমনি সেমিনারের খপ্পরে পড়ে গেলাম। কে জানতো আজ আবার ক্লাস আছে। ওকি মুখখানা অমন গোমড়া করে কেন রেখেছো?

জানতাম একটা না একটা কৈফয়ৎ ওর থাকবেই। আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকাই। রোজ দেখি তবু মনে হয় অপরিচিতা কে একজন কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কপালের উপর খুচরো দু-একটি চুল বাতাসে উড়ছে। প্রত্যেকবার এমনি ব্যাপার হয়। কাছে এসে হেসে দাঁড়ালে সব ভুলে যাই। রাগ করতে পারি না। অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। শেষপর্যন্ত মনটা কেমন নরম হয়ে ওঠে।

গম্ভীর মুখ করে বললাম, সময়জ্ঞান তোমার একদম নেই তা জানি। কিন্তু তখন অফিস থেকে বেরিয়ে আসা ভাল দেখায় না।

সাধনার মুখ পলকে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ও এতটা আশা করেনি। ভেবেছিল ওর একটু হাসি, চোখের মদির চাহনি আমার মনের সাময়িক অসন্তোষকে দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট।

—তুমি এত রেগে যাবে ভাবিনি। সাধনার চোখ-মুখ বেশ মলিন দেখাচ্ছিল।

—আমার জায়গায় তুমি হলে কী করতে? দ্যাখ, এসব আমি পছন্দ করি না।

সাধনা চমকে তাকাল। দপ করে এক পলক জ্বলে উঠল ওর দুটি গভীর চোখ। থরথর করে ঠোঁট দুটি কাঁপল কয়েক মুহূর্ত।

কোত্থেকে দুটি মেয়ে এসে ওর কাছে দাঁড়াল।

সাধনা ওদের সঙ্গে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলে। মেয়ে দুটি আমার দিকে এক-পলক তাকায়। বেশ হাসি-হাসি মুখ। কি একটা কথা বলতে সাধনা হেসে উঠল। একটু পরে মেয়ে দুটি চলে যায়।

ও ফিরে আসতেই বললাম, অন্য কোথায়ও চলো সাধনা। এখানে থাকলে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পাবে না। বেশ পপুলার তুমি দেখা যাচ্ছে।

একটা ট্যাকসি ডাকতে গেলে সাধনা বাধা দেয়।

—এত সুন্দর রোদ! হাঁটতে তোমার ভাল লাগে না?

—লাগে। তুমি সঙ্গে আছো তাই।

দেখলাম শুনে সাধনার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতে এখন মন্দ লাগছে না। রোদের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। কোথায় যাব ভেবে পেলাম না। সাধনা এখনো বোধকরি আঘাতটা সামলে উঠতে পারেনি।

বেশ কিছুটা সময় নিঃশব্দে পার হয়ে যায়। এভাবে পাশে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে মুখ বুজে হেঁটে যাবে কতক্ষণ সহ্য করা যায়! মেয়েদের মনটাকে আজও চিনলাম না। সাধনার সঙ্গে মেলামেশা কমদিনের নয়। ওর ব্যবহার মাঝে মাঝে রহস্যময় লাগে। মনের ভিতর ঢোকা যায় না। এই মুহূর্তে ও হয়তো অন্যকিছু চিন্তা করছে। আর আমি ওর কথা ভেবে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দি।

চারিদিকে কত লোক হেঁটে যাচ্ছে। অনেকের মুখে তৃপ্তির ছাপ। দেখে বেশ ঈর্ষাবোধ করলাম। আমার মনে শান্তি নেই। তিন বছর একটা মেয়ের মন জয় করবার জন্যে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। চাকরিতে প্রোমোশোন হলো না। পরীক্ষাই দিলাম না। মন পড়ে রয়েছে অন্যদিকে। প্রেমের পরীক্ষা দিতে দিতে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে বসেছি!

—রাগ করলে? সাধনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলি, একটু আমার দিকে তাকাও।

সাধনা নিস্পৃহকণ্ঠে বলল রাগ করে লাভ কি। তোমার কাছে তার কি কোন মূল্য আছে?

—নেই বুঝি? ইচ্ছে করে যদি আঘাত দিতে চাও, বলার কিছু নেই।

সাধনা তাকাল আমার দিকে। পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি দিন দিন কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছো। আমার বড্ড ভয় করে।

অনেকদিন একথা শুনেছি। মনে মনে রাগ হলো। একই কথা বারবার শুনতে আমার ভাল লাগে না। সব জেনেও সাধনার ওকথা বলা চাই। শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে। একটা না একটা অজুহাত লেগেই আছে। এভাবেই কয়েকটা বছর পার হলো। সবাই জেনে গেছে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা। কোন পাপ আমরা করছি না। ভালবেসে আমরা দুজনে মিলিত হবো—এর চেয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষা মানুষের আর কি হতে পারে!

—তোমাকে আমি ভয় করি। সাধনা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তাই তো তোমার জন্যে এত ভাবনা। কখন কি করে বসো কে জানে!

—ভয় করো? মনে হলো বালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, এতদিন পর আমার সম্পর্কে এই তোমার ধারণা! কোনদিন কী ভালবাসিনি?

হেসে উঠল সাধনা, কে বললে? যাকগে, এখন এসব আলোচনা থাক। বাঃ শুধু হেঁটেই মরছি, কিছু খাওয়াবে না? শুধু প্রেমালাপে কি পেট ভরে!

কাছাকাছি একটা রেস্তোরায় ঢুকে চা আর কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে সাধনার মুখোমুখি বসলাম। বেয়ারা পর্দা ফেলে দিতেই লক্ষ্য করলাম সাধনার ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি।

—হঠাৎ হাসির কি হলো?

—বাঃ হাসি পেলে কি করবো! ও কি তুমি আবার ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়ে আছো কেন? নতুন কোন অপরাধ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

—না, তুমি অপরাধ করবে কেন, তবে ইদানীং কথাবার্তায় তোমার সস্তা রসিকতা লক্ষ্য করছি। বেশ অবাক লাগছে। বাজে মেয়েদের সঙ্গে মিশে এরকম কথা বলতে শিখেছো। কিছু মনে করো না—আমি বাধ্য হলাম এসব বলতে।

সাধনার মুখ পলকে কালো হয়ে উঠল। একবার আমার দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, বেশ তো আমি বাজে মেয়ে—আমার সঙ্গে মিশো না। কেউ দিব্যি দেয়নি।

পর্দা সরিয়ে বেয়ারা চা আর খাবার রেখে চলে যায়।

—খাও। বলে ওর দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দি।

নিঃশব্দে দুজনে চায়ে চুমুক দি। একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকালাম। মাথা নীচু করে সাধনা চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

আজ আমার কি হয়েছে যেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছি কি? নইলে এত রূঢ়ভাবে সাধনার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না। ওর মনটাকে বিষাক্ত করে তুলে আমার লাভ হলো কি? ওকে আঘাত দিলে সে আঘাত আমারই দিকে ফিরে আসবে। সব বুঝি অথচ হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বাড়ির সবার সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক। তাদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। বন্ধুরা ভুল বোঝে। সন্দেহের চোখে দেখে। অফিসেও অস্বস্তিকর পরিবেশ। কলীগদের টিটকিরি শুনতে হয়। একটা মেয়ের জন্যে এভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া অনেকের কাছে বেশ বাড়াবাড়ি মনে হয়, বিয়ে করে ফেলো বাপু—কতদিন পিছনে ফেউ-এর মত ঘুরে মরবে! প্রকাশ্য একথা উচ্চারণ করতে না পারলেও আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা কলীগদের মনোভাব বুঝি এরকমই।

—এই শুনছো!

সাধনার হাত ধরতে গেলে ও সরে বসল। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হেসে বলল, এবার ওঠা যাক। এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিলে?

—ভাবছিলাম অনেক ঘোরাঘুরি হলো, অনেক মেলামেশা, এবার কিছু করা যাক। আর কতদিন তুমি দূরে থাকবে!

—কেন! এই তো বেশ কাছেই রয়েছি। তুমি হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে।

—ঠাট্টা রাখ! বেশ উষ্ণকণ্ঠে বললাম, তুমি কি কোনদিন সীরিয়াস হবে না?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন! পরীক্ষাটা হয়ে যাক। পাশ করার পর কি করবো বলতো?

—ঘর সংসার করবে। অন্য কোন মতলব আছে না কি?

—ওই জন্যেই বলি, কেরানীর চাকরী ছাড়ো। নইলে তোমার মনের সংস্কার কাটবে না। একটা মাস্টারীও কি জোটাতে পারো না?

—কেরানীর বউ হতে বুঝি লজ্জা করবে! তীক্ষ্ণচোখে সাধনার দিকে তাকিয়ে বলি, চুপ করে থেকো না। জবাব দাও!

সাধনা চোখ বড় বড় করে বলল, খালি বিয়ের কথা ভাবছো। এত বিয়ে-পাগলা হলে কবে থেকে! ইস্ পাঁচটা বাজে। বাড়িতে বকুনি খেতে হবে। এই ওঠো। ছিঃ ওরকম অসভ্যের মত তাকিয়ো না!

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সাধনার দিকে। ও চোখে চোখ রাখতে না পেরে মাথা নীচু করল।

দীর্ঘশ্বাস চেপে বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালাম। আলো জ্বলতে শুরু করেছে। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর খেয়াল হলো সাধনা পাশে রয়েছে।

—তোমার আজ হলো কী? সাধনা বলল, এত কী ভাবছো!

—ভাবছি শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিণতি কি হবে।

—দোহাই! সাধনা হাল্‌কা কণ্ঠে বলল, একটু কম ভাব। দিন দিন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছো। তুমি এমন করলে আমি সাহস পাব কোত্থেকে? বাড়ির সবাই কঠোর হয়ে উঠছে। এখন ফিরলে কত জেরা করবে। আমার কিছু ভাল লাগে না।

তিক্তকণ্ঠে বললাম, অনেক শুনেছি এসব কথা। বাড়ির দোহাই দিয়ো না। তুমি কি কচি খুকি। তুমি চলে এসো বাড়ি ছেড়ে। কতদিন বলেছি রেজেস্ট্রী ম্যারেজটা করে ফেলি, তুমি একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ। স্পষ্ট করে বলো দেখি তোমার মতলবটা কি?

—উঃ এত বোকার মত কথা বলো না! সাধনা হেসে বলল। তুমি যা অস্থিরচিত্তের পুরুষ, আমার ভাবনা হচ্ছে তোমার উপর নির্ভর করলে—। দ্যাখ, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমার সামনে পরীক্ষা। কিছুদিন এসো না। পাশ করতে হবে তো! এবার যেতে দাও। বাড়ির কথা ভাবলে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যায়।

মনে মনে যথেষ্ট রাগ হলেও চেপে গেলাম। এর পর বেশি অগ্রসর হলে ফল খারাপ হবে। হ্যাঁ, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সাধনা বোধহয় আমাকে নিয়ে খেলা করছে। না কি অভিনয়? কিছু বোঝবার জো নেই। ওকে কটু কথা বললেও লাভ হয় না কিছু। ও হেসে সবকিছু উড়িয়ে দেয়। যেন কোন অবুঝ বালকের প্রলাপোক্তি ধরতে নেই—ওর ব্যবহারে আমার মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।

সাধনা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, কই বাসে তুলে দাও।

—কালকের জন্যে সিনেমার টিকিট কাটছি। ভুলে যেয়ো না যেন।

—না। এখন কিছুদিন এসো না। বাঃ পড়তে হবে না! বই খুললেই তো তোমার মুখ ভেসে ওঠে। হাসছো, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—হচ্ছে। তবে তোমাকে না দেখে থাকতে পারবো না।

—এই কী হচ্ছে! সাধনা অপূর্ব ভ্রূ-ভঙ্গী করে ফিসফিস কণ্ঠে বলল। আস্তে বলো! বলে ও অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক সুবেশ যুবকের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল।

—চালাকি ছাড়ো! বলে গাঢ়কণ্ঠে বললাম, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

—আমারও কি ছাই ভাল লাগে! সাধনার কণ্ঠস্বর বিহ্বল হয়ে ওঠে। দেখা না হলেও আমার চিঠি পাবে। লক্ষ্মীটি আর কটা দিন ধৈর্য ধরো!

সাধনাকে বাসে উঠিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম কোথায় যাওয়া যেতে পারে। এখন কফি হাউসে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়। না কি বাড়ি ফিরবো? কিছু ঠিক করতে না পেরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে শুরু করি।

* *

ভেবেছিলাম নিজেকে সংযত রাখতে পারবো। সে চেষ্টা কম করিনি। নানারকম কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছি। আর প্রতিদিন সাধনার চিঠির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থেকেছি। একদিন দুদিন করে কয়েকটা দিন কেটে যায়। চিঠি না পেয়ে হতাশ হয়ে উঠলাম। মুস্কিল, কাউকে একথা বলা যায় না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও নয়। তাছাড়া খুব বেশি ঘনিষ্ঠতাও কারু সঙ্গে নেই। কাউকে বলতে পারলে মনটা হাল্কা হয়ে যেত। মা মাঝে মাঝে বলেন, "তোর কী হয়েছে? এমন শুকনো হয়ে উঠছে কেন চোখমুখ!" ভাল করে জবাব দিতে পারি না। মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। মা মুখ কালো করে চলে যান।

একদিন দুপুরে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কফিহাউসে চলে আসি। দূরে থেকে শুধু একবার সাধনাকে দেখবো। দেখা করবো না। শুধু দেখতে চাই ও ভাল আছে।

কফি খেতে খেতে ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখনো হাতে বেশ সময় আছে। চারিদিক তাকিয়ে দেখলাম। সাধনা এখানেও আসতে পারে। ছাত্রছাত্রীর দল গিজগিজ করছে। এই ভীড়ের মধ্যে বিশেষ একজনকে খোঁজা কি সহজ কথা! কে জানে ও হয়তো দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। তা যদি হয় না এসে কি পারবে? এত ব্যস্ত যে একটা চিঠি পর্যন্ত দিতে পারে না! না কি কোন অসুখে পড়ল? হয়তো সে-কারণেই কোন খোঁজ নিতে পারছে না। এভাবে এলোমেলো চিন্তায় দ্রুত সময় কেটে যায়।

হঠাৎ চোখ পড়ল আদিনাথ দূরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। না, আমাকে দেখতে পায়নি। লক্ষ্য করলাম ও জানালা ঘেঁষে একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসল। দেখলে আটকে রাখবে। অথচ আজ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারার মুড নেই। ওদের সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। আমিই ইচ্ছে করে আসি না। ফলে ওরা আমার উপর ভীষণ চটে আছে।

কোনরকমে মানুষের পিছন পিছন লুকিয়ে হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়াই। এখান থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে।

একের পর এক ছেলেমেয়ের দল বেরুচ্ছে। কফি হাউসের দিকে অনেকে পা বাড়ায়। কেউ কেউ ট্রাম বা বাস ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু যার জন্যে অপেক্ষা করা তার দেখা নেই। না কি আজ আসেনি?

—কি রে খুব লুকিয়ে বেড়াচ্ছিস?

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আদিনাথ রুক্ষ চুলে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে মিটমিট করে হাসছে। রোগা চেহারা। গালে কয়েকদিনের জমানো দাড়ি।

অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, তুই এসময়? স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

আদিনাথ হাসল আজ যাইনি। রোজ পড়াতে কি ভাল লাগে?

—তা লাগবে কেন। ওদিকে মাইনে বাড়ার জন্যে চেঁচামেচি করা চাই!

—থাম! আদিনাথ ধমক দিয়ে উঠল, উপদেশ দিস না। তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? বলে মুখ টিপে হেসে বলল, তোর সাধনার খবর কি?

—আদি! আমার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পেল, ছ্যাবলামো করিস না। এখন কেটে যাও বাপধন!

—আয়নায় চেহারা দেখেছিস? আদিনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করছিস কেন! অনেকদিন বলেছি কথাটা কানে তুলিস নি। বললে রেগে উঠিস। আমি নিজের চোখে সেদিন দেখলাম।

—কি? রক্তচোখে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলি, কি দেখেছিস?

—অন্য একটি ছেলের সঙ্গে সাধনা ঘুরছে। কফি হাউসেই পর পর কয়েকদিন দেখেছি।

—তাতে কি হলো। ওর সহপাঠীর সঙ্গে মিশতে পারবে না এমন অন্যায় আব্দার করা যায় না। সাধনা তো মেয়েমানুষ নয়।

—শুধু কফিহাউস হলে কথা ছিল না। কোথায় না যায় ওরা। সহপাঠী কি বিশেষ একজন? তুই চটিস না সুবোধ। বন্ধু হয়ে তোর মঙ্গল কামনাই সব সময় করি।

চুপ করে থাকি। সব মিথ্যে। এ কখনও হতে পারে না। কি উদ্দেশ্যে আদিনাথ এসব বলছে কে জানে। ওদের ধারণা আমার অধঃপতন ঘটতে সুরু হয়েছে। কারণ সাধনার প্রতি আমার অন্ধ মোহ।

আমার কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে আদিনাথ ম্লানমুখে চলে যায়।

পর পর কয়েকটা সিগারেট টেনে মুখ বিস্বাদ হয়ে উঠল। আজ সে নিশ্চয়ই আসেনি। আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করা যাক। ইডিয়ট আদিনাথ! আমার মনটাকে বিষিয়ে দিয়ে চলে গেল। যদিও এসব বিশ্বাস করি না তবু ক্ষীণ একটা সন্দেহ মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। জোর করে কিছু বলা যায় না।

দূরে থেকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে লাইটপোস্টের আড়ালে চলে যাই। কোন ভুল নেই। সত্যিই তো সঙ্গে একটি ছেলে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। হাতে বই। সাধনার চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল, হাসি-খুশি। ওরা হ্যারিসন রোডের দিকে এগিয়ে চলল।

মুহূর্তে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এখন কী করা উচিত ভেবে পেলাম না। অনেক দূরত্ব রেখে ওদের অনুসরণ করলাম।

ওরা বাঁদিকের গলিতে ঢুকল। আর এগোলাম না। কফি হাউসের ভীড় এড়িয়ে একটা ফাঁকা রেস্তোরায় ঢুকেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা পর্দা ঘেরা ছোট্ট কেবিনে গিয়ে মুখোমুখি বসেছে।

ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। নানারকম পরস্পর-বিরুদ্ধ চিন্তায় মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তাহলে কি আদিনাথের ধারণাই সত্য?

বিভিন্ন রাস্তায় হেঁটে হেঁটে এক সময় একটা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াই। নিয়নের আলোতে চারিদিকের পরিবেশ অবাস্তব মনে হলো। যন্ত্র-চালিতের মত কাউন্টারের সামনে এগিয়ে গেলাম। একটা টিকিট কেটে অন্ধকার প্রেক্ষা-গৃহে ঢুকে নরম গদীর সীটে দেহ এলিয়ে দি। জানি না ছবির নাম। এক সময় মনে হলো অবসাদে দুচোখ জড়িয়ে আসছে।

ভেবেছিলাম, আমি চুপচাপ থাকবো। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কখন অন্যমনস্ক হয়ে সাধনার কথা ভাবতে সুরু করি। ওই দৃশ্য বার-বার মনে পড়ে। ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। হাস্যোজ্জ্বল ওদের চোখ-মুখ। ভেবে দেখলে এর মধ্যে অশোভন কিছু নেই। সহপাঠীর সঙ্গে মেলামেশা বা রেস্টুরেন্টে বসে মাঝে মাঝে চা খাওয়া—এতে ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। এসব হলো যুক্তির কথা। মন কি সব সময় যুক্তির সিঁড়ি ধরে চলে? ফলে আত্মযুদ্ধ করতে করতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলাম। সজ্ঞানে স্বীকার করতে চাই না। মনে হয় বড় বেশি অনুদার হয়ে উঠছি। তবুও ওদের ঘিরে আমার কল্পনা অনেক দূর এগিয়ে যায়। শুধু বিশেষ একজন সহপাঠীর সঙ্গে কেন এত মেলামেশা? আদিনাথও এই ইঙ্গিত দিয়েছে। অনেকভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছি, শেষে মনে হলো ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিত্বকে হারাতে বসেছি: ফলে আত্ম-পীড়নই আমার একমাত্র নিয়তি!

সাধনার কাছ থেকে সব জানতে চাই। আমার মনে ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনুক। কথা ছিল না তবু ওকেই প্রথমে একটা চিঠি দিলাম। ছোট্ট চিঠি। এমনভাবে

একটা ট্যাকসি ডাকতে গেলে সাধনা বাধা দেয়।

—এত সুন্দর রোদ! হাঁটতে তোমার ভাল লাগে না?

—লাগে। তুমি সঙ্গে আছো তাই।

দেখলাম শুনে সাধনার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতে এখন মন্দ লাগছে না। রোদের তেজ ক্রমশ কমে আসছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। কোথায় যাব ভেবে পেলাম না। সাধনা এখনো বোধকরি আঘাতটা সামলে উঠতে পারেনি।

বেশ কিছুটা সময় নিঃশব্দে পার হয়ে যায়। এভাবে পাশে একটা জলজ্যান্ত মেয়ে মুখ বুজে হেঁটে যাবে কতক্ষণ সহ্য করা যায়! মেয়েদের মনটাকে আজও চিনলাম না। সাধনার সঙ্গে মেলামেশা কমদিনের নয়। ওর ব্যবহার মাঝে মাঝে রহস্যময় লাগে। মনের ভিতর ঢোকা যায় না। এই মুহূর্তে ও হয়তো অন্যকিছু চিন্তা করছে। আর আমি ওর কথা ভেবে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দি।

চারিদিকে কত লোক হেঁটে যাচ্ছে। অনেকের মুখে তৃপ্তির ছাপ। দেখে বেশ ঈর্ষাবোধ করলাম। আমার মনে শান্তি নেই। তিন বছর একটা মেয়ের মন জয় করবার জন্যে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি। চাকরিতে প্রোমোশোন হলো না। পরীক্ষাই দিলাম না। মন পড়ে রয়েছে অন্যদিকে। প্রেমের পরীক্ষা দিতে দিতে নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে বসেছি!

—রাগ করলে? সাধনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলি, একটু আমার দিকে তাকাও।

সাধনা নিস্পৃহকণ্ঠে বলল রাগ করে লাভ কি। তোমার কাছে তার কি কোন মূল্য আছে?

—নেই বুঝি? ইচ্ছে করে যদি আঘাত দিতে চাও, বলার কিছু নেই।

সাধনা তাকাল আমার দিকে। পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি দিন দিন কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছো। আমার বড্ড ভয় করে।

অনেকদিন একথা শুনেছি। মনে মনে রাগ হলো। একই কথা বারবার শুনতে আমার ভাল লাগে না। সব জেনেও সাধনার ওকথা বলা চাই। শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে। একটা না একটা অজুহাত লেগেই আছে। এভাবেই কয়েকটা বছর পার হলো। সবাই জেনে গেছে আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা। কোন পাপ আমরা করছি না। ভাল-বেসে আমরা দুজনে মিলিত হবো—এর চেয়ে মহৎ আকাঙ্ক্ষা মানুষের আর কি হতে পারে!

—তোমাকে আমি ভয় করি। সাধনা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তাই তো তোমার জন্যে এত ভাবনা। কখন কি করে বসো কে জানে!

—ভয় করো? মনে হলো বালির মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, এতদিন পর আমার সম্পর্কে এই তোমার ধারণা! কোনদিন কী ভাল-বাসিনি?

হেসে উঠল সাধনা, কে বললে? যাকগে, এখন এসব আলোচনা থাক। বাঃ শুধু হেঁটেই মরছি, কিছু খাওয়াবে না? শুধু প্রেমালাপে কি পেট ভরে!

কাছাকাছি একটা রেস্তোরায় ঢুকে চা আর কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে সাধনার মুখোমুখি বসলাম। বেয়ারা পর্দা ফেলে দিতেই লক্ষ্য করলাম সাধনার ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি।

—হঠাৎ হাসির কি হলো?

—বাঃ হাসি পেলে কি করবো! ও কি তুমি আবার ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়ে আছো কেন? নতুন কোন অপরাধ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

—না, তুমি অপরাধ করবে কেন। তবে ইদানীং কথাবার্তায় তোমার সস্তা রসিকতা লক্ষ্য করছি। বেশ অবাক লাগছে। বাজে মেয়েদের সঙ্গে মিশে এরকম কথা বলতে শিখেছো। কিছু মনে করো না—আমি বাধ্য হলাম এসব বলতে।

সাধনার মুখ পলকে কালো হয়ে উঠল। একবার আমার দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, বেশ তো আমি বাজে মেয়ে—আমার সঙ্গে মিশো না। কেউ দিব্যি দেয়নি।

পর্দা সরিয়ে বেয়ারা চা আর খাবার রেখে চলে যায়।

—খাও। বলে ওর দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দি।

নিঃশব্দে দুজনে চায়ে চুমুক দি। একটা সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকালাম। মাথা নীচু করে সাধনা চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

আজ আমার কি হয়েছে যেন। প্রতি-হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছি কি? নইলে এত রূঢ়ভাবে সাধনার সঙ্গে কথা বলতে পার-তাম না। ওর মনটাকে বিষাক্ত করে তুলে আমার লাভ হলো কি? ওকে আঘাত দিলে সে আঘাত আমারই দিকে ফিরে আসবে। সব বুঝি অথচ হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে যায়। বাড়ির সবার সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক। তাদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। বন্ধুরা ভুল বোঝে। সন্দেহের চোখে দেখে। অফিসেও অস্বস্তিকর পরিবেশ। কলীগ-দের টিটকিরি শুনতে হয়। একটা মেয়ের জন্যে এভাবে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়া অনেকের কাছে বেশ বাড়াবাড়ি মনে হয়। বিয়ে করে ফেলো বাপু—কতদিন পিছনে ফেউ-এর মত ঘুরে মরবে! প্রকাশ্যে একথা উচ্চারণ করতে না পারলেও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা কলীগদের মনোভাব বুঝি এরকমই।

—এই শুনছো!

সাধনার হাত ধরতে গেলে ও সরে বসল। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হেসে বলল, এবার ওঠা যাক। এত গম্ভীর হয়ে কি ভাবছিলে?

—ভাবছিলাম অনেক ঘোরাঘুরি হলো, অনেক মেলামেশা, এবার কিছু করা যাক। আর কতদিন তুমি দূরে থাকবে!

—কেন! এই তো বেশ কাছেই রয়েছি। তুমি হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে।

—ঠাট্টা রাখ! বেশ উষ্ণকণ্ঠে বললাম, তুমি কি কোনদিন সীরিয়াস হবে না?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন! পরীক্ষাটা হয়ে যাক। পাশ করার পর কি করবো বলতো?

—ঘর সংসার করবে। অন্য কোন মতলব আছে না কি?

—ওই জন্যেই বলি, কেরানীর চাকরী ছাড়ো। নইলে তোমার মনের সংস্কার কাটবে না। একটা মাস্টারীও কি জোটাতে পারো না?

—কেরানীর বউ হতে বুঝি লজ্জা করবে! তীক্ষ্ণচোখে সাধনার দিকে তাকিয়ে বলি, চুপ করে থেকো না। জবাব দাও!

সাধনা চোখ বড় বড় করে বলল, খালি বিয়ের কথা ভাবছো। এত বিয়ে-পাগলা হলে কবে থেকে! ইস্ পাঁচটা বাজে। বাড়িতে বকুনি খেতে হবে। এই ওঠো। ছিঃ ওরকম অসভ্যের মত তাকিয়ো না!

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সাধনার দিকে। ও চোখে চোখ রাখতে না পেরে মাথা নীচু করল।

দীর্ঘশ্বাস চেপে বাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়ালাম। আলো জ্বলতে শুরু করেছে। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর খেয়াল হলো সাধনা পাশে রয়েছে।

—তোমার আজ হলো কী? সাধনা বলল, এত কী ভাবছো!

—ভাবছি শেষ পর্যন্ত আমাদের পরি-ণতি কি হবে।

—দোহাই! সাধনা হাল্কা কণ্ঠে বলল, একটু কম ভাব। দিন দিন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছো। তুমি এমন করলে আমি সাহস পাব কোত্থেকে? বাড়ির সবাই কঠোর হয়ে উঠছে! এখন ফিরলে কত জেরা করবে। আমার কিছু ভাল লাগে না।

তিক্তকণ্ঠে বললাম, অনেক শুনেছি এসব কথা। বাড়ির দোহাই দিয়ো না। তুমি কি কচি খুকি। তুমি চলে এসো বাড়ি ছেড়ে। কতদিন বলেছি রেজেস্ট্রী ম্যারেজটা করে ফেলি, তুমি একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ। স্পষ্ট করে বলো দেখি তোমার মতলবটা কি?

—উঃ এত বোকার মত কথা বলো না! সাধনা হেসে বলল। তুমি যা অস্থিরচিত্তের পুরুষ, আমার ভাবনা হচ্ছে তোমার উপর নির্ভর করলে—। দ্যাখ, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমার সামনে পরীক্ষা। কিছু-দিন এসো না। পাশ করতে হবে তো। এবার যেতে দাও। বাড়ির কথা ভাবলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

মনে মনে যথেষ্ট রাগ হলেও চেপে গেলাম। এর পর বেশি অগ্রসর হলে ফল খারাপ হবে। হ্যাঁ, অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সাধনা বোধহয় আমাকে নিয়ে খেলা করছে। না কি অভিনয়? কিছু বোঝবার জো নেই। ওকে কটু কথা বললেও লাভ হয় না কিছু। ও হেসে সবকিছু উড়িয়ে দেয়। যেন কোন অবুঝ বালকের প্রলাপোক্তি ধরতে নেই—ওর ব্যবহারে আমার মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।

সাধনা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, কই বাসে তুলে দাও।

—কালকের জন্যে সিনেমার টিকিট কাটছি। ভুলে যেয়ো না যেন।

—না। এখন কিছুদিন এসো না। বাঃ পড়তে হবে না! বই খুললেই তো তোমার মুখ ভেসে ওঠে। হাসছো, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—হচ্ছে। তবে তোমাকে না দেখে থাকতে পারবো না।

—এই কী হচ্ছে! সাধনা অপূর্ব ভ্রূভঙ্গী করে ফিসফিস কণ্ঠে বলল। আস্তে বলো। বলে ও অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক সুবেশ যুবকের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল।

—চালাকি ছাড়ো! বলে গাঢ়কণ্ঠে বললাম, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

—আমারও কি ছাই ভাল লাগে। সাধনার কণ্ঠস্বর বিহ্বল হয়ে ওঠে। দেখা না হলেও আমার চিঠি পাবে। লক্ষ্মীটি আর কটা দিন ধৈর্য ধরো!

সাধনাকে বাসে উঠিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম কোথায় যাওয়া যেতে পারে। এখন কফি হাউসে গেলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায়। না কি বাড়ি ফিরবো? কিছু ঠিক করতে না পেরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে শুরু করি।

* *

ভেবেছিলাম নিজেকে সংযত রাখতে পারবো। সে চেষ্টা কম করিনি। নানারকম কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছি। আর প্রতিদিন সাধনার চিঠির প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থেকেছি। একদিন দু'দিন করে কয়েকটা দিন কেটে যায়। চিঠি না পেয়ে হতাশ হয়ে উঠলাম। মুস্কিল, কাউকে একথা বলা যায় না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও নয়। তাছাড়া খুব বেশি ঘনিষ্ঠতাও কারু সঙ্গে নেই। কাউকে বলতে পারলে মনটা হাল্কা হয়ে যেত। মা মাঝে মাঝে বলেন, "তোর কী হয়েছে? এমন শুকনো হয়ে উঠছে কেন চোখ-মুখ!" ভাল করে জবাব দিতে পারি না। মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। মা মুখ কালো করে চলে যান।

একদিন দুপুরে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে কফিহাউসে চলে আসি। দূর থেকে শুধু একবার সাধনাকে দেখবো। দেখা করবো না। শুধু দেখতে চাই ও ভাল আছে।

কফি খেতে খেতে ঘাড়র দিকে তাকালাম। এখনো হাতে বেশ সময় আছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। সাধনা এখানেও আসতে পারে। ছাত্রছাত্রীর দল গিজগিজ করছে। এই ভীড়ের মধ্যে বিশেষ একজনকে খোঁজা কি সহজ কথা! কে জানে ও হয়তো দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে। তা যদি হয় না এসে কি পারবে? এত ব্যস্ত যে একটা চিঠি পর্যন্ত দিতে পারে না! না কি কোন অসুখে পড়ল? হয়তো সে-কারণেই কোন খোঁজ নিতে পারছে না। এভাবে এলোমেলো চিন্তায় দ্রুত সময় কেটে যায়।

হঠাৎ চোখ পড়ল আদিনাথ দূরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। না, আমাকে দেখতে পায়নি। লক্ষ্য করলাম ও জানালা ঘেঁষে একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসল। দেখলে আটকে রাখবে। অথচ আজ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারার মুড নেই। ওদের সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। আমিই ইচ্ছে করে আসি না। ফলে ওরা আমার উপর ভীষণ চটে আছে।

কোনরকমে মানুষের পিছন পিছন লুকিয়ে হলঘর পেরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাস স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়াই। এখান থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে।

একের পর এক ছেলেমেয়ের দল বেরুচ্ছে। কফি হাউসের দিকে অনেকে পা বাড়ায়। কেউ কেউ ট্রাম বা বাস ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়। কিন্তু যার জন্যে অপেক্ষা করা তার দেখা নেই। না কি আজ আসেনি?

—কি রে খুব লুকিয়ে বেড়াচ্ছিস?

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আদিনাথ রুক্ষ চুলে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে মিটমিট করে হাসছে। রোগা চেহারা। গালে কয়েকদিনের জমানো দাড়ি।

অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, তুই এসময়? স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?

আদিনাথ হাসল আজ যাইনি। রোজ পড়াতে কি ভাল লাগে?

—তা লাগবে কেন। ওদিকে মাইনে বাড়ার জন্যে চেঁচামেচি করা চাই!

—থাম! আদিনাথ ধমক দিয়ে উঠল, উপদেশ দিস না। তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস? বলে মুখ টিপে হেসে বলল, তোর সাধনার খবর কি?

—আদি! আমার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ পেল, ছ্যাবলামো করিস না। এখন কেটে যাও বাপধন!

—আয়নায় চেহারা দেখেছিস? আদিনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, এভাবে নিজেকে ধ্বংস করছিস কেন! অনেকদিন বলেছি কথাটা কানে তুলিস নি। বললে রেগে উঠিস। আমি নিজের চোখে সেদিন দেখলাম।

—কি? রক্তচোখে আদিনাথের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলি, কি দেখেছিস?

—অন্য একটি ছেলের সঙ্গে সাধনা ঘুরছে। কফি হাউসেই পর পর কয়েকদিন দেখেছি।

—তাতে কি হলো। ওর সহপাঠীর সঙ্গে মিশতে পারবে না এমন অন্যায় আব্দার করা যায় না। সাধনা ছেলেমানুষ নয়।

—শুধু কফিহাউস হলে কথা ছিল না। কোথায় না যায় ওরা। সহপাঠী কি বিশেষ একজন? তুই চটিস না সুবোধ। বন্ধু হয়ে তোর মঙ্গল কামনাই সব সময় করি।

চুপ করে থাকি। সব মিথ্যে। এ কখনও হতে পারে না। কি উদ্দেশ্যে আদিনাথ এসব বলছে কে জানে। ওদের ধারণা আমার অধঃপতন ঘটতে সুরু হয়েছে। কারণ সাধনার প্রতি আমার অন্ধ মোহ।

আমার কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে আদিনাথ ম্লানমুখে চলে যায়।

পর পর কয়েকটা সিগারেট টেনে মুখ বিস্বাদ হয়ে উঠল। আজ সে নিশ্চয়ই আসেনি। আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করা যাক। ইডিয়ট আদিনাথ! আমার মনটাকে বিষিয়ে দিয়ে চলে গেল। যদিও এসব বিশ্বাস করি না তবু ক্ষীণ একটা সন্দেহ মনের ভিতর উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। জোর করে কিছু বলা যায় না।

দূর থেকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে লাইটপোস্টের আড়ালে চলে যাই। কোন ভুল নেই। সাঁতাই তো সঙ্গে একটি ছেলে। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। হাতে বই। সাধনার চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল, হাসি-খুশি। ওরা হ্যারিসন রোডের দিকে এগিয়ে চলল।

মুহূর্তে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এখন কী করা উচিত ভেবে পেলাম না। অনেক দূরত্ব রেখে ওদের অনুসরণ করলাম।

ওরা বাঁদিকের গলিতে ঢুকল। আর এগোলাম না। কফি হাউসের ভীড় এড়িয়ে একটা ফাঁকা রেস্তোরায় ঢুকেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা পর্দা ঘেরা ছোট্ট কেবিনে গিয়ে মুখোমুখি বসেছে।

ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। নানারকম পরস্পরবিরুদ্ধ চিন্তায় মেজাজ গরম হয়ে উঠল। তাহলে কি আদিনাথের ধারণাই সত্য?

বিভিন্ন রাস্তায় হেঁটে হেঁটে এক সময় একটা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াই। নিয়নের আলোতে চারিদিকের পরিবেশ অবাস্তব মনে হলো। যন্ত্রচালিতের মত কাউন্টারের সামনে এগিয়ে গেলাম। একটা টিকিট কেটে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে নরম গদীর সীটে দেহ এলিয়ে দি। জানি না ছবির নাম। এক সময় মনে হলো অবসাদে দুচোখ জড়িয়ে আসছে।

ভেবেছিলাম আমি চুপচাপ থাকবো। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কখন অন্যমনস্ক হয়ে সাধনার কথা ভাবতে সুরু করি। ওই দৃশ্য বার-বার মনে পড়ে। ওরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। হাসোজ্জ্বল ওদের চোখ-মুখ। ভেবে দেখলে এর মধ্যে অশোভন কিছু নেই। সহপাঠীর সঙ্গে মেলামেশা বা রেস্টুরেন্টে বসে মাঝে মাঝে চা খাওয়া—এতে ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। এসব হলো যুক্তির কথা। মন কি সব সময় যুক্তির সিঁড়ি ধরে চলে? ফলে আত্মযুদ্ধ করতে করতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলাম। সজ্ঞানে স্বীকার করতে চাই না। মনে হয় বড় বেশি অনুদার হয়ে উঠছি। তবুও ওদের ঘিরে আমার কল্পনা অনেক দূর এগিয়ে যায়। শুধু বিশেষ একজন সহপাঠীর সঙ্গে কেন এত মেলামেশা? আদিনাথও এই ইঙ্গিত দিয়েছে। অনেকভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছি, শেষে মনে হলো ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিত্বকে হারাতে বসেছি; ফলে আত্মপীড়নই আমার একমাত্র নিয়তি!

সাধনার কাছ থেকে সব জানতে চাই। আমার মনে ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে। কথা ছিল না তবু ওকেই প্রথমে একটা চিঠি দিলাম। ছোট্ট চিঠি। এমনভাবে

লিখলাম যাতে ওর মনে আঘাত না লাগে।

কয়েকটা দিন বিচ্ছিরিভাবে কাটলো। প্রতিদিন ভাবি এই বুঝি ওর চিঠি এলো। না পেয়ে ক্লীবের মত চেয়ারে বসে মাথা নত হয়ে আসে। কেউ কেউ আমার উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করেছে। ওদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে সংকুচিত হয়ে উঠি। রোজ অফিস ফেরত শরীরের ওজন নি আজকাল। বলা বাহুল্য দিন-দিন ওজন কমে যাচ্ছে। বুঝি কেন এমন হচ্ছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। ছোট বোন কোত্থেকে মেয়েদের ফটো নিয়ে এসে চোখের সামনে তুলে ধরে বলে, 'পছন্দ হয়!' আমার রুক্ষ জবাব শুনে মুখ কালো করে বেরিয়ে যায়। মার ফিসফাস কণ্ঠস্বর কানে আসে। মার চোখের দিকে তাকাতে পারি না। অন্তহীন অভিযোগ তাঁর দুচোখে। দাদাদের মুখ গম্ভীর। তাঁদের আমি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি।

আমার চিঠির জবাব আসল চারদিনের মাথায়। অফিসের ঠিকানায় এসেছে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতার মধ্যে কেটে যায়। চিঠি খুলতে বুক কেঁপে ওঠে। লক্ষ্য করি অদূরে বসে কর্মরত প্রৌঢ় হেড ক্লার্কের মুখে মৃদু হাসি। উনি সব জানেন। জানাবার লোকের অভাব নেই এ অফিসে।

বেশ বড় চিঠি। পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেলাম। সাধনা জীবনে এই প্রথম আমাকে চিঠি দিল। ও লিখেছে—'প্রিয় সু......। বেশ আশ্চর্য হয়েছি তোমার চিঠি পেয়ে। তোমাকে জানতাম এতদিন বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু অনুচ্চারিতভাবে তুমি যা ইঙ্গিত করতে চেয়েছো তাতে আমার বিশেষ ভাবনা হচ্ছে। আমি কিন্তু এরকম কিছু তোমার কাছ থেকে আশা করিনি। এত সেন্টিমেন্টাল তুমি জানতাম না! এত ভাবনা আমাকে নিয়ে? এতে আমার খুশী হবার কথা। দুঃখিত সত্যিই হতে পারলাম না। আরো আগে তোমাকে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল স্বীকার করি। নানাকারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তোমার আশঙ্কা মিথ্যে। প্রশান্ত আমার সহপাঠী। খুব ভাল ছেলে। ও আশা করছে এবার ফার্স্ট ক্লাস পাবে। পড়াশুনার ব্যাপারে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করে। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে ছুটির পর কখনো কফি হাউসে বা রেস্তোরায় গিয়ে চা খাই। তুমি কী স্পাইং সুরু করেছিলে? এতটুকু বিশ্বাস নেই আমার উপর? তোমার চিঠি আমাকে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তান্বিত করে তুলেছে। পরস্পরের প্রতি যদি বিশ্বাস না থাকে, যদি অকারণে সন্দেহ মনে বাসা বাঁধে তবে পরবর্তীকালে আমাদের দুজনের জীবন কি দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না? তোমার বন্ধু আদিনাথ একদিন অযাচিতভাবে এসে আমাকে দোষারোপ করে গেছে। আমার খুব খারাপ লেগেছে ওর কথাবার্তা। তোমার মানসিক বিপর্যয়ের বিষাদচিত্র বর্ণনা করে শেষপর্যন্ত রায় দিয়েছে যে, [illegible] তোমার প্রতি আমার

উপেক্ষা আর অবহেলা! এখন বুঝি সব দোষ আমার! অথচ এমন কি ঘটেছে যে যার জন্যে তোমার মাথাব্যথার অন্ত নেই? আদিনাথের সঙ্গে বাক্যালাপের আমার প্রবৃত্তি ছিল না। ওর কথা বলার ঢং ভাল লাগেনি। ওর সাহস দেখে অবাক হয়েছি মনে মনে। কে জানে এর পিছনে তোমার পরোক্ষ সমর্থন আছে কিনা।'

'সেসব দিনের কথা তুমি ভুলে গেলে কিভাবে? আমি কিছু ভুলিনি। মেয়েদের মনের কথা কিসছু বোঝ না। বুঝলে আমার সম্পর্কে তোমার অমন ধারণা হত না। বিশেষ করে আমার মনে পড়ছে একটি দিনের কথা। সেদিন আমরা অনেক হাঁটার পর বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার শরীর ভাল ছিল না। তুমি অনেক প্রশ্ন করেছিলে, আমি হেসে সব উড়িয়ে দিয়েছি। গঙ্গার পাড়ে গিয়ে নিরিবিলি জায়গা দেখে দুজনে ঘন হয়ে বসেছিলাম। ওদিকে মেঘ জমছিল আকাশে। আস্তে আস্তে চারিদিক কালো হয়ে আসছিল। তখনও সন্ধ্যে হতে বেশ দেরী। তুমি দু'একবার ফিরে যাবার কথা বলেছিলে, আমি তেমন উৎসাহ দেখাইনি। আমার খুব ভাল লাগছিল না। প্রথম দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়তে কেঁপে উঠেছিলাম। পরে ঝপঝপ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছিল। আমরা উঠিনি। দুজনে আরও ঘন হয়ে বসেছিলাম। আমি ঠান্ডায় কাঁপছিলাম। তখন আশেপাশে কেউ ছিল না। তুমি বারবার পীড়াপীড়ি করছিলে ফিরে যেতে। তোমার আশঙ্কা ছিল হয়ত ঠান্ডা লেগে আমার জ্বর হয়ে যেতে পারে। আমি তোমাকে সেদিন আমার সর্বস্ব দিতেও মনে মনে তৈরী ছিলাম। তুমি আমাকে দু' হাত দিয়ে আলিঙ্গন করেছিলে। ফলে আমার শীত কম লাগছিল। আমি দুচোখ বুজে তোমার বুকে মাথা এলিয়ে দিয়েছিলাম।"

"এমনি আরও অনেক নিবিড় মুহূর্তের বিচ্ছিন্ন ছবি এখন আমার মনে পড়ছে। সব কিছু চিঠিতে লেখা যায় না। তুমি কী সব ভুলে গেছো? এখন ভালভাবে পরীক্ষাটা দিতে পারলে বেঁচে যাই। পাশ করতে পারলে একটা চাকরী খুঁজতে হবে। পরীক্ষার পর কিছুদিন বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। আমার মনে হয় চিরকালের জন্যে দুজনে মিলিত হবার আগে আরও কিছুদিন আমাদের পরস্পরকে জানা দরকার। অর্থাৎ আমাদের মানসিক দিক থেকে তৈরী হবার জন্যে আরও সময় দরকার। অনুরোধ, ধৈর্যহীন হ'য়ে আমাকে বিব্রত করো না! ইতি সাধনা।"

আনন্দে চকচক করছে সাধনার চোখ-মুখ। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে প্রশান্ত। ওর মুখেও ভরপুর হাসি।

একবার ভাবলাম চলে যাই। এতক্ষণ যে খুশীর আমেজ সারা মনটাকে ছেয়েছিল, সাধনার সঙ্গে প্রশান্তকে দেখে মুহূর্তে বিস্বাদ লাগল সবকিছু।

—তুমি! সাধনা চোখ কপালে তুলে বললো, উঃ এতদিন ডুব মেরে ছিলে কোথায়? অফিসে টেলিফোন করে পাই না। একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তুমি আর ওখানে থাকো না। তোমার বড়দা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। কী সব কান্ড সুরু করলে সুবোধ?

একটু থেমে পরক্ষণেই বলে উঠল, এসো, আলাপ করিয়ে দি। প্রশান্তর কথা তোমাকে আগেই বলেছি। শোন প্রশান্ত—এর নাম—।

নমস্কার বিনিময়ের পর প্রশান্ত খুব ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে। সাধনা, আমি চল্লাম। একদিন বাড়িতে এসো। বলে আমাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে দ্রুতবেগে এগিয়ে যায়। একটু পরে ভীড়ের মধ্যে ওকে আর দেখা যায় না।

আমার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করে সাধনা হেসে উঠল, আবার কি হলো? দাঁড়িয়ে রইলে কেন। আজ তোমাকে পেট ভরে খাওয়াব।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকি।

—হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছি। প্রশান্তর সাহায্য ছাড়া পাশ করতে পারতাম না। ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সাধনা বারবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। আমি এবারও ওর কথার কোন জবাব দিলাম না। বিষিয়ে উঠেছে মনটা। অথচ আজ কত আনন্দের দিন। আমার নির্লিপ্ত ব্যবহারে সাধনা যে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা ওর মুখ চোখ দেখে বোঝা গেল। আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। এতদিন পর দেখা অথচ ওর সঙ্গ এখন আর তেমন আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না! ভাবছি ওর সঙ্গে আজ চরম বোঝাপড়া করে ফেলবো।

—কি হয়েছে তোমার? সাধনা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলল, এতদিন পর দেখা। তোমার মুখ দেখে মনে হয় তোমাকে জোর করে কেউ এখানে নিয়ে এসেছে। আমার সাফল্যে কী তুমি খুশী হওনি?

—বাজে কথা বলো না। আমার কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুক্ষ শোনাল, খুব সুখের কথা তুমি পাশ করেছো।

সাধনার উত্তরের অপেক্ষা না করে ফের বললাম, আরও সুখের কথা প্রশান্ত নামক জনৈক নাবালকের নানারকম সাহায্য তুমি পেয়েছো!

—ছি! সাধনা উষ্মার সঙ্গে বলল। তোমার কি একথা বলা উচিত?

—খুব দরদ দেখছি! শ্লেষের সুরে বললাম, বাড়িতেও যেতে বললো শুনলাম। তা তখুনি গেলে পারতে।

—মনটা এত ছোট হয়ে গেছে তোমার! সাধনার কন্ঠস্বর তিক্ত হয়ে ওঠে অযথা কেন আমাকে আঘাত দাও! কি লাভ তোমার?

—চুপ কর সাধনা। আমি আস্তে আস্তে বললাম, পরস্পরকে দোষারোপ করে লাভ নেই। তার চেয়ে শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক।

সাধনার মুখ পলকে রক্তশূন্য হয়ে যায়। লক্ষ্য করলাম ঘন-ঘন আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। বেশ মুগ্ন দেখাচ্ছে। ভেবেছিলাম বাইরে থেকে ঘরে আসছে, নিশ্চয়ই ওকে আরো সুন্দর দেখাবে।

—তুমি পাগলের মত আবোল-তাবোল বকছো কেন। সুবোধ, তোমাকে অনুরোধ করছি আজকের দিনটা এভাবে নষ্ট করে দিয়ো না!

সাধনার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় হয়ে উঠি। ওর বড় বড় দুটো চোখ ছলছল করছে। ও প্রাণপণে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি নীরবে হাঁটতে লাগলাম।

এভাবেই কি আমাদের দিনের পর দিন কেটে যাবে? এখনও কি আমরা উভয়ে মানসিক দিক থেকে তৈরী হইনি! ওর মনের কথা জানি না। ও কি আমাকে আরো পরীক্ষা করতে চায়? মাঝে মাঝে মনে হয় সাধনা স্বাভাবিক নয়। ওর মনে কোন রোগ ঢুকেছে। তাই ওর ব্যবহার অমন বিরক্তিকর মনে হয় আমার কাছে। এমন নয় যে, বাড়িতে ওর দায়-দায়িত্ব আছে। বাড়ির সচ্ছল অবস্থার কথা আমার অজানা নয়। তবে কী কারণে অপেক্ষা করছে?

—কোথায় যাবে? সাধনার উদ্দেশ্যে বললাম, আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না আজ।

—বাঃ তা হয় না। একটু থেমে সাধনা তীক্ষ্ণ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল আমার সঙ্গ কী তোমার ভাল লাগছে না?

—তোমার কী মনে হয়? পাল্টা প্রশ্নে সাধনাকে কাবু করতে চাইলাম।

সাধনা চুপচাপ হাঁটতে থাকে। মুখটা একটু বিমর্ষ দেখায়।

—শোন। বলে ওর বাঁহাত ধরে একটু মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, পরীক্ষায় ভাল-ভাবে পাশ করেছো। খুব আনন্দের কথা। এবার আর তোমার কোন আপত্তি নেই আশা করি। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট দেখে রেখেছি—আমাদের দুজনের কোন অসুবিধে হবে না।

সাধনার মুখে মৃদু হাসির রেখা লক্ষ্য করলাম। ফলে আশান্বিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

—আগে একটা চাকরী হোক, তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে। বলে সাধনা মৃদু হেসে বলল এই তো বেশ দুজনে আছি। এরপর সব সময় কাছে পেলে আমাকে বেশি দিন সহ্য করতে পারবে না। প্লীজ, আজকের সন্ধেটা কথা কাটাকাটি করে মাটি করে দিয়ো না!

শেষের সুরে বললাম, এখন চাকরী নেওয়া বাকি আছে। এরপর [illegible]

চাকরীতে স্থায়ী হলে তারপর বিয়ের কথা ভাবা যাবে!

সাধনা তাড়াতাড়ি বলে উঠল চট করে বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে?

—কেন? ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাকালাম, তোমার মন কি এখনো স্থির হয়নি?

—তা নয়। আমি বলতে চাইছি দুজনে রোজগার করলে স্বচ্ছলভাবে চলা যাবে। আর আমি খুব শীঘ্র আর কিছু না হোক একটা মাস্টারী জুটিয়ে নেব।

অর্থাৎ বলতে চাও তোমার ভার বহনের মত সামর্থ আমার নেই।

—একটা কথাও যদি সহজভাবে না নিতে পার......। তোমাকে আঘাত দেব

হাত থেকে ওকে বাঁচাতে না পারলে আমার কোন আশা নেই।

—কথা বলছো না কেন? সাধনা আমার ঠোঁটের উপর আঙুল ছুঁইয়ে মৃদু কটাক্ষ করল, রাগ হয়েছে বুঝি। তুমি ভারী ছেলেমানুষ। চলো, ওঠা যাক।

বাইরে বেরিয়ে সাধনা একটা ট্যাক্সি ডাকল।

গাড়ি তীব্রবেগে ছুটে চলে। সাধনা সীটের কোণে বসে বাইরে মুখ বের করে রাত্রির কলকাতা দেখতে থাকে। আমার দুচোখ জ্বালা করে উঠল। চোখের সামনে ভাসছে মার মুখ। কতদিন যেন মাকে

...ওর মুখেও ভরপুর হাসি...

ভেবে কথাটা বলিনি। সব গোলমাল করে দিচ্ছ। চলো, এই রেস্টুরেন্টে ঢুকি।

কোন উত্তর না দিয়ে ওকে অনুসরণ করে সুসজ্জিত একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

খেতে খেতে অনেক কথা বললো সাধনা। ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে কাটাবে তার পরিকল্পনা শুনতে শুনতে একসময় অসহ্য-বোধ হলো। নিজেকে নিয়ে যে এত ব্যস্ত সে অন্যের মনের কথা ভাবতে পারে না। এখন মনে হলো সাধনা একমাত্র নিজেকে [illegible]

দেখি না! অফিসের কলীগদের বিদ্রূপ আরও কতকাল আমাকে সহ্য করতে হবে কে জানে। আদিনাথ আমাকে বোকা ভাবে। এরপর বোধকরি একে একে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই আঙুল তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে—যেন ওদের সম্মিলিত হাসির ধাক্কায় আমার কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলো।

কিন্তু আমি কী করব। সরে যাবার কোনো উপায় আমার নেই। প্রেম না বিতৃষ্ণা কীসের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমি বাঁধা পড়েছি সাধনার সঙ্গে। আমি

ইংগিত ও পাতালপুরী

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

পাতালপুরী বা অপরাধজগতের ইংগিত নিয়ে কিছু বলতে হলে সাধারণভাবে ইংগিতের রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। ইংগিত ভাবের আদান-প্রদানের আদিম পদ্ধতি—এ হলো গীতিময় কাব্য, জীবননাটকের নীরব দূতী। পন্ডিতদের মধ্যে অনেকের মতে ইংগিত-ইশারা হলো মানুষের মুখের ভাষার পিতামহ। একদিন ভাষা ছিল বড়ো দুর্বল, মনের যেকোন ভাবকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। সেদিনের মানুষ মুখহাত নেড়েচেড়ে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতো। ক্রমশ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংগিত আবেগে অনুরাগে ভরে উঠলো, মানব সংস্কৃতি উপকৃত হলো। অনেক সময়ে জীবনের অকৃত্রিম ছন্দ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইঙ্গিতাশ্রয়ী হয়ে। এর ব্যঞ্জনায় রয়েছে ছন্দ, সৌন্দর্য, প্রহেলিকা। মুখের ভাষা কানের ভিতর দিয়েও প্রিয়জনের মরমে হানা দেয়। সঙ্কেতের ভাষা চোখে চোখে ইশারায় কাজ করে যায়। অনেক সময়ে চোখের ভাষা মুখের ভাষা থাকে অধিকতর তাৎপর্যদ্যোতক এবং সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

ইংগিত দৃষ্টিকেন্দ্রিক। ইংগিত এবং মুখের নানান অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট শক্তি ধরে যদিও অবশ্য সে শক্তি সীমিত। আঁধার নয় আলো হলো এর প্রিয় বন্ধু। অবশ্য অন্ধকারে গায়ে চাপ দিয়েও অনেককিছু বোঝানো যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সিচুয়েশন সম্পর্কে আগেভাগে কিছু ধারণা থাকা চাই। ইঙ্গিতে রয়েছে নীরবতার যাদু—ভাবের আদানপ্রদান হয় নিঃশব্দে। সকলের মাঝে অথচ সকলকে ফাঁকি দিয়ে চোখের ইশারায়, হাতের ইঙ্গিতে মনের কথা কতো সহজে জানিয়ে দেওয়া যায়। চোখের টানে, ভুরুর ভঙ্গিমায়, ঠোঁটের বঙ্কিমতায়, কখনো বা নিচের ঠোঁট অল্প একটু উল্টিয়ে মনকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ করে তুলে ধরা যায়—কোন কথা বলার কোন প্রয়োজন না রেখে।

জাতিতে জাতিতে নারীতে পুরুষে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ইঙ্গিতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত মানুষের চেয়ে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মধ্যে ইঙ্গিতের ব্যবহার বেশী করে দেখা যায়। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতের প্রকৃতিও সময়ে সময়ে পাল্টে যেতে পারে। বাঙালী জাতি কিছু বেশী ইঙ্গিতপ্রবণ। এদিক দিয়ে ফরাসী চরিত্রের সঙ্গে আমাদের বেশ মিল থেকে গেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ আজ পাশ্চাত্যের ইঙ্গিত কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেলেছে। শহরে শিক্ষিত মানুষের ইঙ্গিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রতীক নয়। নানা জাতি ও সংস্কৃতির প্রভাব তার ওপর পড়েছে।

ইঙ্গিত সর্বদা অর্থবোধক হবে। যেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বা ভঙ্গি বর্তমান অথচ তার দ্বারা কোন অর্থপ্রকাশিত হচ্ছে না ইঙ্গিত-ইশারার অভিধানে তার কোন স্থান থাকবে না। নাচে আমরা যেসব মুদ্রা লক্ষ্য করি তার আদিতে রয়েছে ইঙ্গিত। নৃত্য যেমন ছন্দানুসারী, শিল্পীর চোখে ইঙ্গিতও তেমনি সময়ে সময়ে কাব্যমুখর বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। স্বাভাবিক গতিশীল ইঙ্গিত কাব্যের রূপান্তর মাত্র। ইঙ্গিতের প্রকাশে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। চোখ, ভুরু, চোয়াল, ঠোঁট, ঘাড়, হাত এমনকি পায়ের কোন কোন অংশও কখনো কখনো ইঙ্গিত-ইশারার ডাকে সাড়া দিতে চায়—ইঙ্গিতের সোনার কাঠি প্রতিটি অঙ্গকে স্পর্শ করে।

ভারতবর্ষে ইঙ্গিতের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা জানি না। তবে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মুখে শুনেছিলাম যে, অধ্যাপক গিরীন্দ্র-শেখর বসু একসময়ে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থার অঙ্গভঙ্গি posture সংগ্রহ করতে সুরু করেছিলেন তবে তাঁর পরি-কল্পনা সুরুতেই থেমে গিয়েছিল। ইদানিংকালে অধ্যাপক জে বি এস হলডেন লক্ষ্য করেছিলেন যে, এদেশের কুকুরের শয়নের ভঙ্গি ইউরোপের কুকুরের থেকে ভিন্ন ধরনের। এ সম্পর্কে কাজ সুরু করার পূর্বেই বিজ্ঞানীর মৃত্যু ঘটলো। অবশ্য দুই বিজ্ঞানীর চিন্তার বিষয়বস্তু ছিল মূলত posture নিয়ে যা ইঙ্গিত বা gesture এর আওতায় বিশেষ আসবে না।

ইঙ্গিতের প্রকাশ স্বতস্ফূর্ত। এ কেবল মানুষের মুখের ভাষার পরিপূরক নয় তাকে শক্তি ও সুষমা জুগিয়েছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দারুণ দুর্যোগের দিনে ইংলন্ডের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দুই আঙুলের ফাঁকে ইংরাজী V (victory বোঝাতে) অক্ষরের সংকেত দেখিয়ে তাঁর দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই ইঙ্গিত ইংরেজদের মনে সেদিন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করেছিল। ইঙ্গিতের আর দুটি উদাহরণ দিয়ে সাধারণ আলোচনা শেষ করতে চাই। দেখা যেতে পারে, রাগ বা অভিমান প্রকাশ করতে কেউ হয়ত মাথার সামনে একটি হাতের বা দুটি হাতের আড়াল দিয়ে গাড়ীবারান্দা খাড়া করে নিজের মুখের খানিকটা অপরের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এক সিন্ধী বৃদ্ধা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুই উরু চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এথেকে বোঝা যায় যে উরু চাপড়ানোর সঙ্গে অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত জড়িয়ে রয়েছে। এই ইঙ্গিতটি বাঙালী-সমাজ বহির্ভূত।

যা কিছু বললাম তা শুধু ইঙ্গিতের গোড়ার কথা। এবার অপরাধজগতে ইঙ্গিতের ভাব সম্পর্কে দুচার কথা বলতে চাই। অপরাধজগতের ভাষার কিছু অংশ হলো কৃত্রিম। কৃত্রিমতার মূল কারণ হচ্ছে সাধারণের থেকে গোপন করার প্রবৃত্তি। এখানে পাতাল-পুরীতে কৃত্রিম ইঙ্গিতের ব্যবহার রয়েছে। একশ্রেণীর অপরাধীর ইঙ্গিত অপর শ্রেণীর থেকে হবে ভিন্ন ধরনের। কলকাতার অপ-রাধীদের ইঙ্গিত-ইশারার কিছু উল্লেখ করছি। বলা যায় না, জেনে রাখলে পাঠক-পাঠিকাদের হয়তো কেউ কোনদিন বিপদের হাত থেকে নিজেকেও বাঁচিয়ে নিতে পারবেন। বিশেষ করে ভীড়ের ট্রামেবাসে মানিব্যাগ প্রভৃতি রক্ষা করার বিষয়ে একটু বেশী সজাগ হতে পারবেন।

চোরেদের ইঙ্গিত : করতল দেখানোর অর্থ তালাভাঙার যন্ত্র চাওয়া। হাত দুখানা দেহের পিছনে রাখলে বুঝতে হবে যে চুরির স্থান একখানা কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে আড়াল করা চাই। কলকাতার একটি বিখ্যাত ঘড়ির দোকানে চুরির সময়ে এমনি এক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। করতল মাথার সুমুখ থেকে পিছনে ঘষার অর্থ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশের আহ্বানের ইঙ্গিত। মাথার ওপর দুহাত পিছন থেকে সুমুখপানে আনলে বুঝতে হবে যে, পুলিশ বা কোন লোক আসছে। ট্যাক্সির প্রয়োজন হলে সর্দার বিড়ি খাবে। ফাউন্টেন পেন দেখানোর অর্থ 'চাবি চাই'। ফাউন্টেন পেনের দুই অংশ আলাদা করে ধরলে বুঝতে হবে, তালাচাবির প্রয়োজন।

পকেটমারের ইঙ্গিত : পকেটমারদের একজন আপন কাঁধের যেদিকে হাতের চাপ দেবে তাতে বোঝাবে যে সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তির পকেটে টাকা আছে। পকেটমারদের একজনের যে-চোখের ওপর ভুরু নাচাবে প্রতারিত ব্যক্তির সেইদিকের পকেটে বা পেটে কাপড়ে টাকা আছে। ধরে (প্রতারিত ব্যক্তি) বোকা বোধ হলে ঘনঘন তুড়ি দেবে। পালিয়ে পড়বার দরকার হলে হাই তুলতে থাকবে। বিপদের আশঙ্কায় কাশবে এবং ডান হাত ওপরে তুলে দেখাতে থাকবে।

জুয়াড়ীদের ইঙ্গিত : চোখের ইশারার অর্থ হচ্ছে তাসের বাজীতে প্রতারিত ব্যক্তিকে হারিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। দলের লোকেদের বাঁ-হাত লম্বা করে দেখানোর অর্থ বাজী মাৎ হতে দেরী নেই।

চোরাই মালের কারবারী : যারা চোরাই মাল কেনাবেচা করে তারা কাউকে সন্দেহ-জনক মনে করলে রুমাল নাড়তে থাকবে। দর মনোমাফিক না হলে আঙুল কামড়াবে। তাতে করে দলের লোকেরা সর্দারের নির্দেশে সমাধান হবে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্রাট আকবরের রাজসভায় একদিন এক বিদেশী পণ্ডিত এসে মেঝের ওপর খড়ি দিয়ে একটা লম্বা লাইন টেনে বলেছিলেন—কোনও অংশ না মুছে লাইনটাকে ছোট করতে হবে।

এ-যে অসম্ভব ব্যাপার! অনেক চিন্তা করেও কেউ কোনও উপায় খুঁজে পেল না। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল। শেষকালে কি একজন বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষের মান মর্যাদা—

এমন সময় বীরবল ধীরে ধীরে উঠে এসে লাইনটার পাশে খড়ি দিয়ে আর একটা বড় লাইন টেনে দিলেন। অমনি বিদেশী পণ্ডিতের লাইনটা ছোট হয়ে গেল। কোনও কিছু মুছতে হল না কোথাও।

এইটেই হচ্ছে আপেক্ষিকতার প্রথম এবং প্রধান কথা—একটা জিনিসের অপেক্ষা বা তুলনায় আর একটা জিনিস কি রকম। বড় কি ছোট, রোগা না মোটা, সাদা অথবা কালো, মন্দ কিম্বা ভাল ইত্যাদি। এই তুলনাটা না করলে আমরা কোনও জিনিসেরই হদিস পাব না, কারণ আমাদের বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরম (অ্যাবসলিউট) বলে কিছুই নেই। হিমালয় পাহাড় সবার ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু কালই যদি পৃথিবীর বাকী পাহাড়গুলো দশ মাইল উঁচু হয়ে যায় প্রত্যেকে, তাহলে হিমালয় হয়ে যাবে সর্বনিম্ন—যদিও তখনো তার উচ্চতা সেই ২৯,১৪০ ফুটই থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরম বলে কোনও কিছুই নেই। সবই আপেক্ষিক। এবং যদি কোনও বস্তুকে পরম বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে সেটা ভুল করা হবে।

এবং এই রকমই একটা ভুল ধারণা অপ্রমাণ করতে আইনস্টাইনকে একদিন এগিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁর আপেক্ষিক মতবাদ সঙ্গে নিয়ে। সেটা ছিল ১৯০৫ সাল। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকমত উপলব্ধি করতে হলে আমাদের আরো কিছু বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাইকেলসন এবং মোরলে একটি পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাটি ছিল খুবই সাধারণ এবং নিরীহ, কিন্তু ফলটি হল যুগান্তকারী! পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, আলোকের বেগ সব দিকেই সমান।

তখন প্রশ্ন উঠল, তাহলে সেই ইথার-স্রোতের কি হল? আলোকের বেগ যদি সব দিকেই সমান হয় তাহলে তো ইথার-স্রোতের অস্তিত্ব থাকতে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ইথারও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এত যুক্তি দেখিয়ে এবং এত কষ্ট করে যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল, সেই ইথার-এর অস্তিত্ব কিনা সামান্য একটা এক্সপেরিমেন্টের ধাক্কাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! বিজ্ঞানীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন যে, ইথার যদি—

কিন্তু তার আগে আমরা একবার দেখে নিতে পারি যে, এই ইথার বস্তুটি আসলে কি।

আজব দেশে গিয়ে অ্যালিস বেড়ালের মুখে হাসি দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সে আরো বিস্মিত হয়ে দেখল যে, বেড়ালটি নেই—কিন্তু তার হাসিটা থেকে গেছে!

হাস্যরত বেড়াল অস্বাভাবিক হলেও সম্ভব। কিন্তু বেড়ালের হাসি আছে অথচ বেড়াল নেই—এটা একেবারে অসম্ভব!

তবে আজব দেশে অবশ্য অনেক রকম জিনিস ঘটে যেতে পারে, আমাদের এই বাস্তব জগতে যা সম্ভব নয়। এখানে যুক্তি-তর্কের বাইরে কোনও কিছু ঘটে না। যেমন, জল আছে ঢেউ নেই, এটা হতে পারে। কিন্তু ঢেউ আছে জল নেই—এটা অসম্ভব। ঢেউ চলাচল করবার জন্যে মাধ্যম একটা অবশ্যই থাকতে হবে। জলের ঢেউ জলের ওপর দিয়েই চলে। শব্দতরঙ্গ কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে। তবে এর প্রধান মাধ্যম হল বাতাস। এই বাতাস পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কম-বেশী বর্তমান আছে। সেই জন্যে কাছে-পিঠে শব্দ হলে আমরা সব সময়েই শুনতে পাই।

কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে এই বাতাস দিয়ে কাজ চালান মুশকিল, কারণ আলোকতরঙ্গ মহাশূন্যের লক্ষ কোটি মাইল দূরে তারাদের কাছ থেকেও আমাদের এই পৃথিবীতে আসছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মহাশূন্যে বাতাস যদি কোথাও থাকে তাহলে তার পরিমাণ এতই নগণ্য যে, মহাশূন্যকে বায়ুশূন্য হিসেবেই ধরে নেয়া যেতে পারে। সুতরাং আলোকতরঙ্গের মাধ্যম কিছুতেই বাতাস হতে পারে না।

তাহলে সেটা কি? কিছু একটা মাধ্যম অবশ্যই থাকতে হবে যার মধ্যে দিয়ে তরঙ্গগুলি প্রবাহিত হবে, না হলে ব্যাপারটা অসম্ভবের পর্যায় পড়ে যাবে—অনেকটা সেই আজব দেশের বেড়ালের হাসি আছে, কিন্তু বেড়াল নেই-এর মত!

সুতরাং জন্ম নিল—ইথার।

এই ইথারকে বলা হল আলোকতরঙ্গবাহী ইথার (লাইট-ক্যারিয়িং ইথার) এবং কল্পনা করা হল যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জিনিসটি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যাতে করে যেকোনও স্থান থেকে অন্য কোনও স্থানে (তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব যত বিরাটই হোক না কেন) আলোকতরঙ্গ অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারে।

কিন্তু এই ইথারকে নিয়ে গোড়াতেই একটা মুশকিল দেখা দিল। আলোকতরঙ্গ আলোর গতির আড়আড়ি (ট্রান্সভার্স) চলে, এবং এই জাতীয় আড়াআড়ি তরঙ্গ কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হতে পারে। সুতরাং আলোকতরঙ্গবাহী ইথারকে কঠিন পদার্থ অবশ্যই হতে হবে। আবার, এই সর্বব্যাপী ইথারের মধ্যে দিয়ে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি অনায়াসেই ঘোরাফেরা করছে, কোথাও কণামাত্র বাধা না পেয়ে। ইথারের তাই অত্যন্ত পাতলা বায়ব পদার্থ হওয়ারও সমান প্রয়োজন। অর্থাৎ, এই সদ্যজাত ইথারকে একাধারে কঠিন এবং বায়ব পদার্থ, দুই-ই হতে হবে! আমাদের পরিচিত কোনও

বস্তু জলরূপে স্বভাবের নয়। বিজ্ঞানীরা তাই ইথারকে নিয়ে গোড়াতেই একটু মুশকিলে পড়ে গেলেন।

কিন্তু এর চেয়ে ঢের বড় মুশকিলের তখনো বাকী ছিল। এবার আঘাতটা গিয়ে পড়ল একেবারে ইথারের শিকড়ে। কি করে, সেটা আমরা এখন দেখব।

শৌখিন ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় প্রায় দেখা যায় যে জল-ভরা কাঁচের পাত্রের মধ্যে নানা রকমের রঙীন মাছ চলা-ফেরা করছে। এখানে মাছগুলি গতিশীল, কিন্তু জলটা স্থির। আমাদের গ্রহ-নক্ষত্রগুলিও অনেকটা এই মাছের মত ইথার সমুদ্রের মধ্যে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং কাঁচের পাত্রের জলের মত ইথার স্থির হয়ে বসে রয়েছে সর্বক্ষণ।

এখন, আমাদের এই পৃথিবীও একটি গ্রহ। আমরা অনুভব না করলেও, সূর্যের চার পাশে আমাদের মা বসুন্ধরা দিবা-রাত্রি চক্কর দিচ্ছেন প্রচন্ড বেগে—ঘন্টায় প্রায় ৬৬০০০ মাইল, অর্থাৎ সেকেন্ডে প্রায় ১৯ মাইল বেগে। এই প্রচন্ড গতিবেগ ইথারের মধ্যে স্বভাবতই একটা ঝড়ের সৃষ্টি করবে—বাতাসের মধ্যে যেটা আমরা টের পাই মোটর-গাড়ী পাশ দিয়ে সাঁ-আ করে বেরিয়ে গেলে। এবং এটাও আমরা দেখেছি যে, মোটর গাড়ী যেদিকে যায়, বাতাসটা তার উল্টো দিকেই সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাতাস এবং মোটর গাড়ীর বেগ সমানই থাকে। এই নিয়ম অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের এই পৃথিবীতে ইথার-স্রোত সেকেন্ডে প্রায় ১৯ মাইল বেগে পৃথিবীর বার্ষিক গতির উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে। এবং যেহেতু আলোকতরঙ্গ ইথারের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে, এবং গতিবেগ ইথার-স্রোতের দ্বারা প্রভাবিত হবে—ঠিক যেমন নদীর ওপর নৌকোর গতিবেগ স্রোতের অভিমুখে বৃদ্ধি পায়, প্রতিকূলে কমে যায়। সুতরাং যে আলোকরশ্মি পৃথিবীর গতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে তার বেগ বিপরীতমুখী আলোকের চেয়ে সেকেন্ডে ৩৮ মাইল বেশী হবে, কারণ ১৯ মাইল বেগের ইথার-স্রোত প্রথমটিকে সাহায্য করবে এবং দ্বিতীয়টি থেকে বিযুক্ত হবে। অন্যান্য দিকে নির্গত আলোকরশ্মিগুলির বেগ তাদের কোণের পরিমাণ অনুযায়ী হ্রাস-বৃদ্ধি পাবে।

ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার এবং অতি সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে আমেরিকার প্রথম নোবেল প্রাইজ বিজয়ী অ্যালবার্ট অ্যাব্রাহাম মাইকেলসন ভদ্রলোকটি ছিলেন একটু বেশী রকমের বাস্তববাদী। আজীবন তিনি শুধু এক্সপেরিমেন্টই করে গেছেন এবং অধিকাংশই আলোকের গতি-বেগের ওপর। সব শুনে তিনি বললেন—বটে! দিক অনুযায়ী আলোকের বেগ কম-বেশী হবে? তাহলে তো পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা।

এই না বলে মাইকেলসন সাহেব ধাঁই করে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে বসলেন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, যার ফলে বিজ্ঞানজগতে একটা লণ্ডভণ্ড কান্ড হয়ে গেল।

আমরা আগে বলেছিলাম যে, আমাদের এই পৃথিবী প্রচন্ড বেগে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু পৃথিবীর এই ১৯ মাইল বেগ আলোকের কাছে নেহাতই বালক। আলোক সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে যাতায়াত করে! সুতরাং পৃথিবী দ্বারা উৎপন্ন ইথার-স্রোতের এই নগণ্য ১৯ মাইল বেগ আলোকের অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল ১৮৬০০০ মাইল বেগের যেটুকু তারতম্য ঘটাবে তার পরিমাণ হবে নিতান্ত সামান্য—এক ভাগের দশ হাজার ভাগের মত!

মাইকেলসন তাই গোড়া থেকেই অত্যন্ত সাবধান হয়ে গেলেন। অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি কাজে লাগলেন, যাতে আলোকের বেগের কণামাত্র হ্রাস-বৃদ্ধিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে না যেতে পারে কোনও মতে। আলোক-প্রভব থেকে নির্গত রশ্মিগুলিকে তিনি একটি ৪৫ ডিগ্রী কোণে স্থাপিত আয়নার সাহায্যে দু ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। এক ভাগ আয়নার ভেতর দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল ইথার-স্রোতের দিকে। দ্বিতীয়টি আয়নায় কোণাকুণিভাবে প্রতি-ফলিত হয়ে প্রথম রশ্মির সমকোণে প্রবাহিত হল (আপতন কোণ ৪৫ ডিগ্রী ছিল বলে)। এইভাবে দুটি রশ্মি ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে আড়াআড়ি ভ্রমণ করার পর সমান দূরত্বে অবস্থিত অন্য দুটি আয়নার ওপর মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে আবার সেই একই পথে প্রত্যাবর্তন করে মধ্যস্থ সেই প্রথম আয়নাটিতে এসে মিলিত হল—যেখান থেকে তারা পৃথক হয়ে গিছল সর্বপ্রথমে। তারপর এই মিলিত রশ্মি দুটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে পর্যবেক্ষকের চোখের ওপর গিয়ে পড়ল।

এখন, তরঙ্গবাদের একটি সুবিখ্যাত সূত্র হচ্ছে ইনটারফিয়ারেন্স—অর্থাৎ, একটি তরঙ্গের চূড়া (ক্রেস্ট) দ্বিতীয় তরঙ্গের পাদ (ট্রাফ)-এর ওপর পড়ে যোগফল শূন্য হয়ে যাওয়া। শব্দতরঙ্গের বেলায় অনুরূপ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় নিস্তব্ধতা, কিন্তু আলোকের ক্ষেত্রে উৎপন্ন হবে অন্ধকার। অর্থাৎ দুটি আলোকতরঙ্গ যখন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে একই সঙ্গে প্রবেশ করবে তখন আমরা কতকগুলি সাদা এবং কালো (উজ্জ্বল এবং অন্ধকার) ব্যান্ড পাশাপাশি দেখতে পাব আইপিস-এর মধ্যে। সাদা ব্যান্ডটি থাকবে কেন্দ্রস্থলে, তার পাশে দুটি কালো ব্যান্ড এবং তারপর আবার দুটি সাদা ব্যান্ড—এইভাবে পর-পর সাজান থাকবে ইন্টারফিয়ারেন্স ব্যান্ডগুলি আইপিস-এর মধ্যে। কিন্তু যদি আলোকতরঙ্গ দুটি ঠিক একই সময়ে যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ না করে সামান্য একটু আগুপিছু হয়ে যায়, তাহলে ব্যান্ডগুলি কেন্দ্র থেকে ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে কিছুটা সরে যাবে।

আবার যেহেতু মাইকেলসনের আলোক-তরঙ্গ দুটি সমান দূরত্ব যাতায়াত করছে, তারা ঠিক একই সঙ্গে যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করবে যদি তাদের বেগের মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকে—অর্থাৎ, ইথার-স্রোত যদি না থাকে। কিন্তু ইথার যদি বর্তমান থাকে তাহলে অংক কষে দেখা গেছে যে, এই ইথার-স্রোতের সেকেন্ডে ১৯ মাইল বেগের প্রভাবে প্রথম তরঙ্গটি (যেটি স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে অনুকূলে ফিরে আসছে), ইথার-স্রোত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলে যে সময়ে ফিরে আসত তার এক ভাগের দশ হাজার ভাগ বিলম্বিত হবে, এবং দ্বিতীয় তরঙ্গটি বিলম্বিত হবে এক ভাগের কুড়ি হাজার ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় তরঙ্গটি প্রথম তরঙ্গের সামান্য একটু আগে যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করবে, যার ফলে ইন্টারফিয়ারেন্স ব্যান্ডগুলি কেন্দ্রস্থল থেকে এক পাশে কিছুটা সরে যাবে। কিন্তু ইথার-স্রোত (সুতরাং ইথার) যদি অবর্তমান থাকে তাহলে তরঙ্গ দুটি ঠিক একই সময়ে যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে এবং ইন্টার-ফিয়ারেন্স ব্যান্ডগুলি আইপিস-এর ঠিক কেন্দ্রস্থলেই পরিলক্ষিত হবে।

সুতরাং মাইকেলসনের যন্ত্রের ওপর চোখ রেখে ব্যান্ডগুলির অবস্থান লক্ষ করে অনায়াসেই আমরা বলে দিতে পারি—ইথার আছে কি নেই।

১৮৮৭ সালে মাইকেলসন সাহেব যন্ত্রের ওপর চোখে রেখে দেখেছিলেন যে, ইন্টারফিয়ারেন্স ব্যান্ডগুলির কণামাত্র পরি-বর্তন হচ্ছে না—তারা ঠিক মাঝখানেই অবস্থান করছে!

যাতে ফলাফলের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ না থাকে এবং সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য হয়, সেই জন্য পরীক্ষাটি তিনি বার-বার সম্পন্ন

করলেন দিনের বিভিন্ন সময়ে এবং বছরের বিভিন্ন দিনে। কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেল যে ইন্টারফিয়ারেন্স ব্যান্ডগুলি ঠিক কেন্দ্র-স্থলেই রয়েছে! অর্থাৎ ইথার বলে কোনও কিছুই নেই—সবই আষাঢ়ে গল্প!

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাইকেলসনের এক্সপেরিমেন্ট থেকে পাওয়া এই ফলটি এতই অপ্রত্যাশিত যে, বিজ্ঞানীরা সবাই বিমূঢ় হয়ে গেলেন। কিন্তু সেই হাইগেন্স-এর আমল থেকে (১৬৭৮—আলোকতরঙ্গবাদের প্রবর্তক হাইগেন্স) এই ইথার বস্তুটি সকলের মনে এতই দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, ফট করে এর অস্তিত্বটা সরাসরি অস্বীকার করে দিতে কেউই সম্মত হলেন না। সুতরাং শুরু হল একটা জোড়াতালি এবং গোঁজামিলের প্রচেষ্টা—যাতে শ্যাম এবং কূল দুই-ই বজায় থাকে।

মাইকেলসনের এক্সপেরিমেন্টের অসঙ্গতিটা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে সে সময়ের বিজ্ঞানীরা চারটে কারণ খাড়া করেছিলেন। এর মধ্যে যেটি প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত, সেইটেই আমরা এখানে আলোচনা করব এখন।

বেগ, দূরত্ব এবং সময়ের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে—দূরত্বকে বেগ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাই সময়। সুতরাং কোনও কারণে বেগ যদি কিছুটা কমে যায়, তখন দূরত্বকে যদি আমরা সেই অনুপাতেই কমিয়ে দিই, তাহলে সময়টাকে আগের সমানই রাখা যেতে পারে। আমরা দেখেছিলাম যে, ইথার-স্রোতের প্রভাবে মাইকেলসনের এক্সপেরিমেন্টে প্রথম রশ্মিটির বেগ দ্বিতীয় রশ্মিটির তুলনায় কিছুটা কমে যাওয়া উচিত ছিল—যদিও বাস্তবে সেটা ঘটে নি। সুতরাং যদি কল্পনা করে নেয়া যায় যে, প্রথম দিকের দূরত্বটাও সেই অনুপাতে হ্রাস পাচ্ছে, তাহলে দুটি রশ্মির ভ্রমণকাল একই হবে, এবং ইন্টারফিয়ারেন্স ব্যান্ডগুলি ঠিক কেন্দ্র-স্থলেই অবস্থান করবে তখন। এইভাবে মাইকেলসনের এক্সপেরিমেন্টের দীর্ঘ ৬ বছর পরে ১৮৯৩ সালে ফিটজেরাল্ড একটা ব্যাখ্যা খাড়া করলেন, যাতে করে ইথারের অস্তিত্বও অগ্রাহ্য করা হল না, আবার পরীক্ষালব্ধ বাস্তব ফলটিও পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়া হল।

কিন্তু তখুনি প্রশ্ন উঠল—দূরত্বটা খামখা হ্রাস পাবে কেন?

ফিটজেরাল্ড বললেন — কেন? জলের ওপর দিয়ে যখন নৌকো চলে, তখন জলের প্রতিরোধ ক্ষমতার (রেজিস্টেন্স) জন্যে নৌকোটা কি সামান্য একটু ছোট হয়ে যায় না? ইথারের ক্ষেত্রে এই রকমই একটা কিছু হচ্ছে নিশ্চয়।

কিন্তু ব্যাখ্যাটা কারুরই পুরোপুরি মনঃপুত হল না। এর মধ্যে যে একটা গলদ রয়েছে, সেটা একটু তলিয়ে দেখতেই বেরিয়ে পড়ল। জলের মধ্যে পরিভ্রমণের সময় প্রতিরোধের দরুণ যে সংকোচনটা হয়, সেটা গতিশীল বস্তুর দৃঢ়তার ওপর নির্ভর করে। কাগজের নৌকো যতখানি হ্রাস পাবে, কাঠের নৌকোর সংকোচন তার চেয়ে অনেক কম হবে নিশ্চয়। এই জিনিসটাকে বলা যেতে পারে যান্ত্রিক সংকোচন। কিন্তু মাইকেলসনের এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গতির জন্যে আমাদের প্রয়োজন একটা সর্বব্যাপী সংকোচন যেখানে কাগজ, কাঠ, লোহা সবই সমপরিমাণে সংকোচিত হবে, এবং এই সংকোচনটা নির্ভর করবে কেবলমাত্র গতিশীল বস্তুটির গতির ওপর—আর কোনও কিছুর ওপর নয়। সুতরাং ফিটজেরাল্ডের ব্যাখ্যা কিছুটা সাহায্য করলেও, বিজ্ঞানীরা এটাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না।

এর ঠিক দু বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৯৫ সালে লোরেনটজ আবার এই সংকোচন মতবাদটা (এই জন্যে এটাকে বলা হয় ফিটজেরাল্ড-লোরেনটজ কনট্র্যাকশন) তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, বস্তুর অন্তর্গত বৈদ্যুতিক আধান (ইলেকট্রিক চার্জ) যে বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে সেগুলি ইথারের মধ্যেই অবস্থান করে, এবং বস্তুটি যখন গতিশীল হয় তখন এই ক্ষেত্রগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক আধানের পরিবর্তন হয়ে বস্তুটির ঠিক ততখানি সঙ্কুচিত হয়ে যায়—ফিটজেরাল্ডের সঙ্কোচন সূত্র অনুযায়ী যতখানি প্রয়োজন।

লোরেনটজ-এর এই ব্যাখ্যাও পুরোপুরি কেউ মেনে নিতে পারলেন না। তাছাড়া, ফিটজেরাল্ড-লোরেনটজ সঙ্কোচন মতবাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনও প্রমাণও দেখাতে পারা গেল না— নিজের কপালে হাত রেখে জ্বর হয়েছে কিনা, সেটা কেউ কোনও দিন বলতে পারে না বলে। এক্ষেত্রে রোগীর হাত এবং কপাল দুটোই একই পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, তাই প্রক্রিয়াটি সফল হয় না। মাইকেলসনের এক্সপেরিমেন্টে পৃথিবীর গতির প্রভাবে যে সঙ্কোচনটা হচ্ছে সেটাও—আমরা দেখেছি—এইরকম সর্বব্যাপী। সেইজন্যে কোনও গজ বা ফিতে দিয়ে এক্সপেরিমেন্টের আগে এবং পরে যন্ত্রের মাহুটা মেপে কোনও দিনই নির্ণয় করা যাবে না, বাস্তবিকই কোনও সঙ্কোচন হচ্ছে কিনা—কারণ সেই গজ বা ফিতেটাও এই সর্বব্যাপী সঙ্কোচনের আওতায় পড়ে একই অনুপাতে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তাই এই সঙ্কোচন মতবাদটা প্রমাণিত হল না, আবার এটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়েও দেয়া গেল না পুরোপুরি। সেই জন্যে মাইকেলসনের যুগান্তকারী এক্সপেরিমেন্টের দীর্ঘ সাত বছর পরেও বিজ্ঞানীরা সেই আগের মত উভয় সঙ্কটেই পড়ে রইলেন।

ইথার যে বর্তমান আছে, এই বিশ্বাসটা সবার মনে দৃঢ়সংবদ্ধ। কিন্তু ইথারকে খুঁজে বার করবার সকল প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যর্থ হচ্ছে তাই নয়, এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে যে যুক্তিগুলি খাড়া করা হচ্ছে সেগুলিও পরস্পরবিরোধী এবং মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে —ইথার আদপেই বর্তমান আছে কি না? এবং যদি থাকে, তাহলে আমরা এর সন্ধান করে উঠতে পাচ্ছি না কেন?

বিজ্ঞানজগতের এই উভয় সঙ্কটের অবসান সহজে হল না। ইথারকে কেন্দ্র করে গোলমাল বেড়েই চলল দিন-দিন। চিরকালের সঠিক এবং নিখুঁত বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রবিষ্ট হল অস্পষ্টতা। তারপর এল সন্দেহ। এবং সর্বশেষে নৈরাশ্য। বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে দিলেন। অধীত বিদ্যার ওপর বিশ্বাস তাঁদের কমে আসতে লাগল ক্রমে। আকুল হয়ে তাঁরা দিন গুনতে লাগলেন নতুন প্রতিভার প্রত্যাশায়—যিনি সমস্ত সন্দেহ দূর করে ইথার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে দেবেন। সমস্ত অস্পষ্টতা স্বহস্তে সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানজগতে আবার যিনি ফিরিয়ে আনবেন অখণ্ড আস্থা এবং আশ্বাস।

তিনি এলেন! সমস্ত অশুভ নির্মূল করতে কংসের কারাগারে এবং স্বর্ণলঙ্কায় যেমন নেমে এসেছিলেন নারায়ণ, ঠিক সেই-ভাবেই আবির্ভাব হল তাঁর বিজ্ঞানজগতে। মন্মথ হয়ে ১৯০৫ সালে বিশ্ববাসী শুনল বিজ্ঞানের অভয়বাণী ছাব্বিশ বছরের যুবকের কণ্ঠে। এই যুবকটির নাম—আলবার্ট আইনস্টাইন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
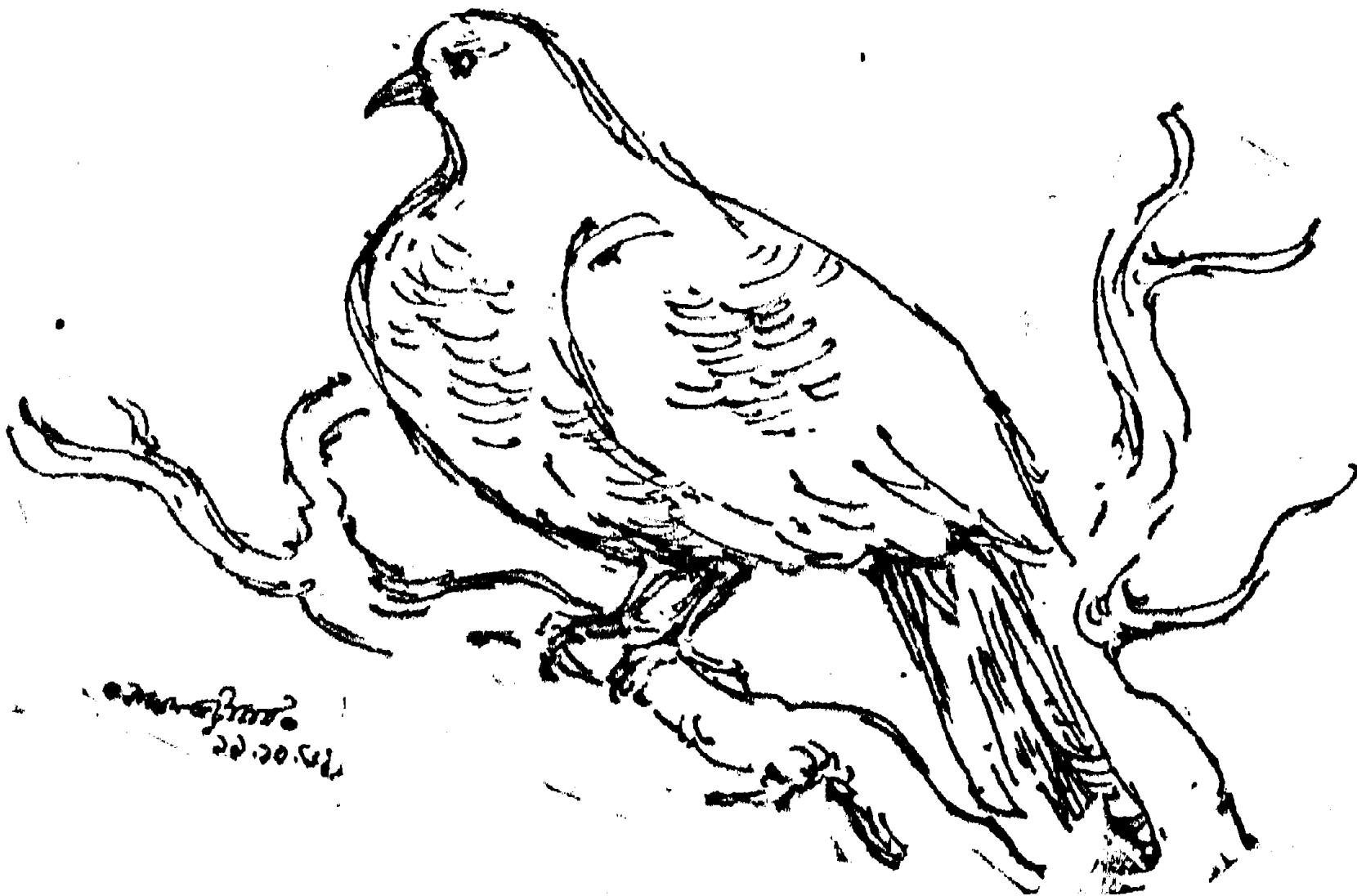
জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(১) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় কোন সালে, কোথায় এবং তার সভাপতি কে ছিলেন? (২) 'ইতিহাস'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? (৩) খৃস্টাব্দ যীশু খৃস্টের জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ না হয়ে ১ জানুয়ারী থেকে কেন? (৪) 'পাঁচ এ পঞ্চবাণ' ও 'আটে অষ্টবসু'-এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি? (৫) চুংগী বা অকট্রয় ডিউটি কি?

বিনীত
শ্রীমৃণালচন্দ্র দত্ত
মুরারই, বীরভূম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) মালীর প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? (খ) কানাডা, ফ্রান্স, ফিলিপিন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন প্রভৃতি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নাম কি? (গ) জওহরলাল নেহরু কোন সালে প্রথম পার্লিয়ামেন্টে বক্তৃতা করেন?

বিনীত
সুনীল সরকার
কুমারডুবি, ধানবাদ

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ক্লোরিন কে আবিষ্কার করেন? (খ) ultraviolet ray বলতে কি বুঝায়? (গ) সূর্য হতে আলো পৃথিবীতে আসতে কত সময় লাগে?

বিনীত
সোমনাথ ভট্টাচার্য
শিলং-৩

●

সবিনয় নিবেদন,

(১) পৃথিবীর দশজন শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকের নাম কি? (২) Neorealism এবং Surrealism বলতে কি বোঝায়? (৩) Photography কে শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়াসে অগ্রণীদের নাম কি? (৪) এইচ জি ওয়েলস-র লেখা কি কি বইয়ের বাঙলা অনুবাদ হয়েছে? (৫) ভারতবর্ষের সর্বা-পেক্ষা প্রাচীন মহাবিদ্যালয়ের নাম কি এবং তা কত সালে স্থাপিত হয়?

বিনীত
স্বপন দে
নবগ্রাম, হুগলী

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্ম-স্থান কোথায় ও তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি? দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর লেখা বই-গুলি কি কি? (খ) ভারতে কোন্ কোন্ দেশের রাষ্ট্রদূত আছেন? ভারতীয় আইন-শৃংখলা তাঁদের উপর প্রযোজ্য কিনা? (গ) মন্ত্রী ও রাজ্যপাল পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় সংবিধানে কি উল্লেখ আছে? (ঘ) 'সুব্রত মুখার্জি' ফুটবল প্রতিযোগিতা কোন বছর থেকে আরম্ভ হয় এবং এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোন্ কোন্ স্কুল উক্ত খেলায় অংশ-গ্রহণ করেছিল? (ঙ) বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম কোথায় অবস্থিত?

বিনীত
শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীধনঞ্জয় ঘোষ
রঘুনাথপুর, মুর্শিদাবাদ

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

২১ সংখ্যার শ্রীআশিসকুমার ভুঞার (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই, ১৮৭৭ সালে কলকাতার গড়ের মাঠে ইংরাজ সৈন্যরাই প্রথম ফুটবল খেলা শুরু করে। ১৮৭৮ খৃঃ প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ গিলি-গান তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি দল তৈরী করেন। এই দলে পরে হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররাও যোগ দেন। পরে ১৮৯৩ খৃঃ কলকাতায় আই এফ এ স্থাপিত হয়।

বিনীত
আশিসকুমার সিংহ
পাটনা-৪

●

সবিনয় নিবেদন,

২৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত সন্তোষকুমার গুপ্তের (গ) প্রশ্নের উত্তর নীচে দেওয়া হল। ১৯৬১ সনের লোকগণনার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা নিম্নরূপ।

দিল্লী ৫২·৭ জন, কেরালা ৪৬·৮ জন, মাদ্রাজ ৩১·৪ জন, গুজরাট ৩০·৫ জন, মহারাষ্ট্রে ২৯·৮ জন, পঃ বঙ্গ ২৯·৩ আসাম ২৭·৪ জন, মহীশূরে ২৫·৪ জন, পাঞ্জাব ২৪·২ জন, উড়িষ্যা ২১·৭ জন, অন্ধ্র-প্রদেশ ২১·২ জন, ত্রিপুরা ২০·২ জন, বিহার ১৮·৪ জন, নাগাভূমি ১৭·৯ জন, উঃ প্রদেশ ১৭·৬ জন, হিমাচল প্রদেশ ১৭·১ জন, মধ্যপ্রদেশ ১৭·১ জন, রাজস্থান ১৫·২ জন, জম্মু ও কাশ্মীর ১১·০ জন, নেফা ৭·২ জন।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত অশোককুমার ধরের (ক) প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রীদের নাম ও মন্ত্রিত্বকাল নীচে দেওয়া হল।

ডিজরেলী—প্রথমবার : ১৮৬৮ সালে কয়েক মাসের জন্য। দ্বিতীয়বার : ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত।

গ্লাডস্টোন—প্রথমবার : ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল। দ্বিতীয়বার : ১৮৮০ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল। তৃতীয়বার : ১৮৮৬ সালে কয়েক মাসের জন্য। চতুর্থ-বার : ১৮৯২ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল।

লয়েড জর্জ—১৯১৬ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত।

উইনস্টন চার্চিল- প্রথমবার : ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার : ১৯৪৫ সালে কয়েক মাসের জন্য। তৃতীয়বার : ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত।

বিনীত
মুরারীমোহন আশ
প্রফুল্লনগর, ২৪-পরগণা

●

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শ সংখ্যার (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ১৮ই কার্তিক) অমৃত-য় 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শ্রীউমাপ্রসাদ সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, মোহনবাগান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯৬৬ পর্যন্ত মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন : শ্রীশিবদাস ভাদুড়ী ১৯১১ থেকে ১৯১২), শ্রীহাবুল সরকার (১৯১৩ থেকে ১৯১৫), শ্রীবিজয়দাস ভাদুড়ী (১৯১৬ থেকে ১৯১৮, শ্রীপ্রকাশ ঘোষ (১৯১৯ থেকে ১৯২০), শ্রীগোষ্ঠ পাল (১৯২১ থেকে ১৯২৬), শ্রীউমাপতি কুমার (১৯২৭ থেকে ১৯২৯), সুধাংশু বসু (১৯৩০), ডাঃ সন্মথ দত্ত (১৯৩১ থেকে ১৯৩৩), শ্রীআবদুল হামিদ (১৯৩৪), শ্রীভোলা সরকার (১৯৩৫), শ্রীসতু চৌধুরী (১৯৩৬—১৯৩৭), শ্রীবিমল মুখার্জি (১৯৩৮—১৯৩৯), শ্রী এ রাচৌধুরী (নন্দ) (১৯৪০-১৯৪১), শ্রী এস গুই (মোনা) (১৯৪২), শ্রীঅনিল দে (১৯৪৩—১৯৪৫), শ্রীশরৎ দাস (১৯৪৬-১৯৪৭), ডাঃ টি আও (১৯৪৮-১৯৪৯), শ্রীশৈলেন মান্না (১৯৫০—১৯৫৫), শ্রীআবদুল সাত্তার (১৯৫৬), শ্রীস্বরাজ চ্যাটার্জি (১৯৫৭), শ্রীসমর ব্যানার্জি (১৯৫৮), শ্রীসুশীল গুহ (১৯৫৯) শ্রীসুবিমল গোস্বামী (চুণী) (১৯৬০—১৯৬৪), শ্রীজার্নাল সিং (১৯৬৫-১৯৬৬)।

বিনীত
শংকরনাথ শীল
কলকাতা-১০

●

সবিনয় নিবেদন,

২১শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীআশিস-কুমার ভুঞার 'খ' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত গল্পটির নাম 'ভিখারিণী' (কবির ষোল বছর বয়সে লেখা)। এ গল্পটি ভারতী (শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রসংগত এও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এটি 'দেশ' (২৫ বৈশাখ ১৩৬১) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্র রচনাবলীর (সরকারী সংস্করণ) সপ্তম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

বিনীত
বশিষ্ঠ বাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(২২)

১৯২৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর আমাদের বিশেষ চেষ্টার ফলে তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ বংশীয় এবং কাসেম আলী খাঁ রবাবীর নিকটতম আত্মীয় মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব রবাবীকে গৌরীপুরে আনবার সুযোগলাভ আমাদের ঘটেছিল। রামপুরের নবাব হুম্মান সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি তখন স্থায়ীভাবে গিধোড়ের মহারাজার আশ্রয়ে বসবাস ক'রছিলেন।

আমার জীবনে যত গুণীর সংস্পর্শে আমি এসেছি, তাঁদের মধ্যে আমার সংগীত-গুরু মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব ছিলেন প্রাচীনতম। তিনি আমার ঠাকুরদার বয়সী ছিলেন; তবে আমাদের মত শিষ্য ও ছাত্রদের তিনি বাবা ব'লে ডাকতেন। গৌরীপুরে আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে দাদা কালীপুরের জমিদার স্বর্গীয় জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ও আমি,—আমরা উভয়ে মিলে তাঁর কাছে শিখতাম। স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী জ্ঞানদাদার কাছ থেকে সংগীতের অনেক তালিম পেয়েছেন। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব অতি সাদাসিধে লোক ছিলেন। ঘরে একটুকরো কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতেন; সংগীতসভায় অবশ্য ওস্তাদ-জনোচিত ভালো পায়জামা ও আচকান পরতেন। দরবারে প্রায়ই হাঁটু গেড়ে বসতেন; তাঁর বেড়াবার ও মাছ ধরবার খুব সখ ছিল এবং অন্য বিষয়ে বিলাসিতা না থাকলেও আহার সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সৌখিন ছিলেন। তিনি এতপ্রকার রান্না জানতেন যা খুব ভাল বাবুর্চি'রাও জানে না। নিজে রন্ধনশালায় গিয়ে বিভিন্ন মশলাযুক্ত মৎস্য ও মাংসের বিচিত্র রকমের খানা, বহুপ্রকার হালুয়া, সুরুয়া, পায়েস প্রভৃতি নিজেও তৈরি ক'রতেন ও বাবুর্চি'কে শেখাতেন; হিন্দুর অখাদ্য মাংস কখনও স্পর্শ ক'রতেন না, কেননা তিনি ব্রাহ্মণ অথচ মুসলমান ছিলেন। মিঞা তানসেনের বংশধর হিসেবে মুসলমান ধর্মের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ও পীরদের শিষ্য ছিলেন; আবার হিন্দুদের প্রধান দেব-দেবীরও আরাধনা ক'রতেন। সংগীতসাধকদের জীবনে ধর্মসমন্বয়ের যে দৃষ্টান্ত বর্তমান, ওস্তাদ আলাউদ্দিন ও তাঁর পরিবারে আমরা তা দেখতে পাই। মিঞা তানসেনের বংশধরদের মধ্যেও সেই সমন্বয় ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়েই কণ্ঠে আলাপ গাইতেন; যদিও যন্ত্রে বিশেষত রবাব, সুরশৃঙ্গার ও সেতারে অতি বৃদ্ধবয়সেও তাঁর হাত যথেষ্ট তৈরি ছিল। একটি সরোদ যন্ত্র সুরশৃঙ্গারের মত ক'রে সুর মিলিয়ে তিনি আমাদের শোনাতেন; কেননা তাঁর প্রথম আগমনকালে গৌরীপুরে সুরশৃঙ্গার যন্ত্র ছিল না। তাঁর হাতে তরপবিহীন রবাবী ঢংয়ের সরোদে আমি ভীমপলাশী, শুদ্ধকল্যাণ, পাহাড়ী ঝিঁঝিট ও আলাহিয়া এই কয়েকটি রাগ ভাল ক'রেই শুনেছি। তিনি রবাবের পদ্ধতিতে সুদক্ষ ছিলেন; বিলম্বিত আলাপে আস্থায়ীতে পাঁচ-ছ'টি তান বাজিয়ে অন্তরা ধ'রতেন এবং অন্তরায় দুই-তিনটি তান বাজিয়ে সঞ্চারী ও আভোগের দু'টি তান বাজিয়ে জোড় শুরু করিতেন এবং অনেকক্ষণ ধ'রে জোড়ের রবাবে বিস্তার দেখাতেন। বিস্তারের কাজ জোড় অঙ্গেই বেশী হয়; কয়েদ বিস্তার বা খণ্ড মেরুর তানের পরিবর্তে আওচার, বিস্তার এই যন্ত্রের বিশেষত্ব। জোড়ের পর ঝালা-ঠোক ও পরে লড়ির বোল খুব দ্রুতভাবে অনেকক্ষণ ধ'রে বাজাতেন। জোড় এবং লড়িতে তাঁর ন্যায় দ্রুত এবং পরিষ্কার বাজনা আমি কখনো শুনিনি। অন্যান্য ওস্তাদরা, বিশেষত সরোদীরা এই সকল অঙ্গ বাজান সন্দেহ নেই, কিন্তু জোড়ে এতটা বিস্তার আমি কারুর হাতে শুনিনি। ঠোক্‌ঝালা ও লড়িতে আলাউদ্দিন বিশেষ অগ্রসর হয়েছিলেন; কিন্তু মহম্মদ আলীর হাতে জোড় ও বোল যেরূপ স্পষ্টভাবে অতি দ্রুতলয়ে প্রকাশিত হতো, তার তুলনায় আলাউদ্দিন ও অন্যান্য সরোদীগণের মান কিছু কম, অধিকাংশ সরোদী ছোট ছোট দ্রুত জোড়ে টুকরো বাজান, বিস্তার করেন না। আমি মহম্মদ আলীর নিকট তাবদুল্লা খাঁ সাহেবের ঘরের সুরচয়ন নামক ছোট সুরবাহারে আলাপ শিখতাম; সেতারেও মহম্মদ আলী খুব তৈরি ছিলেন। সেতারে তিনি বর্তমান প্রচলিত সব অলংকারই ব্যবহার করতেন; চিকারীর সঙ্গে একপ্রকার লড়ি-জোড় তিনি বাজাতেন, যা এখন কারুর হাতে শুনি না। এনায়েত খাঁ, বিলায়েত খাঁ, বা রবিশংকরের হাতেও চিকারীর ঐপ্রকার জোড় শোনা যায়নি। মিজরাপের সাহায্যে তর্জনী দ্বারা বাজাবার তারে তিনি আঘাত দিতেন কিন্তু জোড়ের জন্য চিকারীতে কনিষ্ঠা ও অন্য একটি তারে অনামিকা ব্যবহার ক'রতেন একটি বিশেষ ছন্দ নিয়ে। এরকম বাজ আজ ভারতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে অথচ এইজন্য বর্তমান বড় বড় ওস্তাদের মাথাব্যথা কিছুমাত্র নাই,—অতীতে যা সমাদৃত হয়েছে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও নেই।

নাড়া বাঁধবার পর খাঁ সাহেব আমাকে বেহাগ রাগে আলাপ শেখাতে শুরু করেন, তবে বহু রাগেরই ধ্রুপদ শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁর রাগপদ্ধতি দেড়শ বছর আগেকার; বর্তমানে রাগের রূপ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হলাম যে তাঁর রাগ ও বাদ্যপদ্ধতির সঙ্গে এখনকার হিন্দুস্থানী নানা ঘরানা অপেক্ষা বিষ্ণুপুরে ঘরেরই মিল অনেক বেশী। খাঁ সাহেবের অতি প্রিয় রাগ ছিল : দরবারী কানাড়া, শুদ্ধকল্যাণ, ইমন কল্যাণ, কেদারা, বেহাগ, খাম্বাজ, দেশ, টোড়ি ও পরজ। এইসব রাগের যে-রূপ তিনি দিতেন, তাতে মানুষের অন্তঃকরণের ঊর্ধ্বতর স্তর উন্মুক্ত হয়ে যেত। তাঁর ন্যায় রাগের রস প্রকাশ বর্তমান দিনের উচ্চাঙ্গ সংগীতে খুবই ক'মে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই আমায় ব'লতেন, বিগত শতাব্দীর গুণীদের গানে ও বাজনায়, রসের যে গভীরতা ছিল, তা এ যুগে অলংকারের বাহুল্যে আচ্ছাদিত হ'য়ে গিয়েছে। এই জন্যই এখনকার সংগীত মহাসম্মিলনীর গুণীগণের গান-বাজনায় তিনি বিশেষ তৃপ্তি বোধ ক'রতেন না। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব যে ঢংয়ে গাইতেন ও বাজাতেন, রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শ উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীত সেরূপই হওয়া সঙ্গত। ঐরূপ শুদ্ধবাণীর গান ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে সমাদৃত হ'তো। এখন যাঁরা বলেন যে ঐরূপ সংগীত অতি সাদাসিধে ধরনের, তাঁরা চেষ্টা ক'রে দেখলে বুঝতে পারবেন যে ঐরূপ সংগীত মোটেই সহজ-সাধ্য নয়; অনেক বছর সাধনা করলে তবেই বিশুদ্ধ সংগীত পরিবেশন সম্ভবপর।

খাঁ সাহেব গৌরীপুরে দু'বার এসেছিলেন; প্রথমবার বেহাগ ও দ্বিতীয়বার শুদ্ধকল্যাণ এই দুই রাগ খুব বিস্তৃতভাবে আমাদের শিক্ষা দেন। তাঁর ঘরানার এই নিয়ম ছিল যে শুদ্ধকল্যাণ, ভৈরব এই দুই রাগ প্রথমে আয়ত্ত ক'রতে পারলে পরে দরবারী কানাড়া, ইমন কল্যাণ, টোড়ী প্রভৃতি রাগ আয়ত্ত করা সহজ। খাঁ সাহেব এই কথা আমাদের ব'লতেন যে হিন্দুস্থানী এই সকল বিখ্যাত রাগের বিস্তারের শেষ নেই; এই সকল রাগ জাতির চিরস্থায়ী সম্পদ। খাঁ সাহেব আমাদের সব সময়েই ধ্রুপদ শিখতে ব'লতেন; তিনি বলতেন প্রতি রাগেরই চাবিকাঠি অর্থাৎ বাদী, সম্বাদী, গ্রহ, ন্যাস, লয়, স্থান ও অন্যান্য লক্ষণসমূহ এক একটি ধ্রুপদের মধ্যে নিহিত। রাগের গঠন সম্বন্ধে শিখতে হলে ধ্রুপদের জ্ঞান আবশ্যক এবং এক-একটি রাগের বহুসংখ্যক ধ্রুপদ শিখতে পারলেই রাগ বিস্তারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর ঘরানায় শুধু কণ্ঠে নয় বীণ, রবাব, সুর-শৃঙ্গার প্রভৃতি যন্ত্রেও ধ্রুপদের সুর বাজানো হতো। বর্তমানে ওস্তাদরা এই সদ্‌অভ্যাসটি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন, ফলে সুরঅলংকারের বৈচিত্র্য বর্তমানে যতই দেখা যাক, একালের অধিকাংশ ওস্তাদই রাগদারী বা রাগের স্বরূপ প্রকাশে পূর্বের আচার্য অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কাঁচা। এঁরা জনসাধারণকে ভোলাতে পারেন বা চমকিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু প্রাচীন সমঝদাররা বর্তমান উচ্চাঙ্গসংগীতের রাগ পরিবেশনে খুবই দুঃখিত ও নৈরাশ্যগ্রস্ত।

আমরা খাঁ সাহেবের সঙ্গ গৌরীপুরে দু'বারে দু'-তিন মাস [illegible] [illegible] করেছি।

জন্যে তাঁর গিধোড় রাজার নিকট অবস্থান-কালে আমার প্রিয় শিক্ষক ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ গৌরীপুরে এসেছিলেন; তিনি উজির খাঁ সাহেবের কাছে রামপুরে সুর-শৃঙ্গার শিক্ষার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন এবং তাঁর সংগৃহীত একটি সুরশৃঙ্গার যন্ত্র গৌরীপুরে আমাকে উপহারস্বরূপ দেন। তখন থেকে আমি সুরচয়ন যন্ত্র ত্যাগ ক'রে সুরশৃঙ্গার যন্ত্র শিক্ষা শুরু করি। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব গিধোড় থেকে ফিরে এসে হাফিজ আলী প্রদত্ত সুর-শৃঙ্গারটি নিজেও বাজাতে লাগলেন এবং আমাকেও সুরশৃঙ্গারের তালিম দিতে শুরু করলেন। গিধোড়ের রাজা খাঁ সাহেবের গৌরীপুর যাত্রাকালে তাঁকে বলেছিলেন, গৌরীপুরে যাওয়ার তাঁর প্রয়োজন কি? গৌরীপুরের আর্থিক পারিতোষিক যা খাঁ সাহেব পেতেন, তা রামপুরের তুলনায় অনেক কম। খাঁ সাহেব রাজাবাহাদুরকে প্রত্যুত্তরে বললেন যে টাকার জন্য তিনি গৌরীপুরে আসা-যাওয়া করেন না। আমার প্রতি তাঁর এতটাই মমতা প'ড়ে গেছে যে বৃদ্ধবয়সেও রেলে, স্টীমারে গিধোড় থেকে গৌরীপুরে না গিয়ে থাকতে পারেন না।

পিচোলা হ্রদ (রাজস্থান) ফটো : মণি চক্রবর্তী

আমাকে দেখা ও শেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি গৌরীপুরে যান। খাঁ সাহেব আমাকে অনেকবার বলেছেন যে, তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় এবং তাঁর ভাগিনেয়বংশীয় উজির খাঁ সাহেব শতাধিক শিষ্যের দীক্ষা দিয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ শিষ্যরাই প্রচলিত পদ্ধতির সংগীত শিখেছেন। রামপুরের নবাব, তাঁর ছেলেরা আর শেষে আলাউদ্দিন ও হাফিজ আলী শুধু তাঁর কাছ থেকে ঘরের আসল শিক্ষা পেয়েছেন: পক্ষান্তরে মহম্মদ আলী জীবনে চার-পাঁচ জনের বেশী শিষ্য তৈরি করেন নি। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন ভারতবিখ্যাত রামপুরের নবাবভ্রাতা ছম্মান সাহেব; যাঁর তুল্য গায়ক, বাদক ও পন্ডিত এই যুগে দুর্লভ, তাছাড়া তাঁর নিজের চিকিৎসক রামপুরবাসী ডাক্তার নাটুরাম ভাতখন্ডে কলেজের সেক্রেটারী রাজা নবাব আলী খাঁ—খাঁ সাহেবের নিকট অনেক শিখেছেন। বাংলার বিখ্যাত গিরিজাশংকর চক্রবর্তী রামপুরে ছম্মান সাহেবের সভায় কিছুদিন খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছিলেন; তারপর তাঁর পোষ্যপুত্র সৌকত আলী ও আমি তাঁর শেষ দুই শিষ্য। খাঁ সাহেব আমাকে কণ্ঠ-সংগীতের আলাপ, ধ্রুপদ ও সুরশৃঙ্গারের তালিম দিয়েছিলেন। তখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল খাঁ সাহেবের জীবিতকালের মধ্যে যতটা পরিমাণে সম্ভব রাগ সংগ্রহ করা। প্রায়ই ধ্রুপদের রাগ ও সুরের দিক ছাড়া লয়কারী ছন্দের কাজ শিক্ষার সময় সুযোগ আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। খাঁ সাহেব নিজে বলতেন ধ্রুপদ গান নিবন্ধ সুরে গাইবার পর নানাপ্রকার ছন্দের কাজ দেখানো সুসংগত, তবে বাটোয়ারা ও বিস্তার ধ্রুপদে কতটা চলে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনও প্রশ্ন তখনো জাগেনি; ধামারে অবশ্য বাটের কাজ দেখাতেই হবে একথা খাঁ সাহেব বলতেন। যন্ত্রসংগীতে সুরশৃঙ্গারে বিলম্বিত, মধ্য, ঝালা ও ঠোকের শিক্ষা তাঁর কাছে পেয়েছি। সুর-শৃঙ্গারের বিলম্বিত ও মধজোড় কণ্ঠ-সংগীতের অনুকরণে রচিত। এই দুই বিভাগে বীণা ও রবাবের ন্যায় সুরশৃঙ্গারে বোলের কাজ হয় না। আমি খাঁ সাহেবকে একদিন বললাম, আমি রবাব শিখতে চাই; খাঁ সাহেব যে শিষ্যকে যাইই শিখিয়েছেন, তা তা অধিকারী বিবেচনায় শেখালেও ঘরানার পদ্ধতি অনুযায়ী শিখিয়েছেন। তিনি আমায় বললেন, রবাব যন্ত্রটি বিশেষ রেওয়াজের ফলে আয়ত্তে আসে: কেননা পাখোয়াজের সঙ্গে সংগতি এই যন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন,—"আপনার জীবনে টাকার জন্য সংগীত পরিবেশন কখনও দরকার হবে না। পাখোয়াজীর সঙ্গে লড়ন্ত বোল বাজিয়ে সংগীত সভায় জয়লাভ আপনার দরকার হবে না কিন্তু আমাদের দরকার হ'তো; তাতেই আমাদের সম্মান ও অর্থ-প্রাপ্তি হতো। যাঁরা ভগবানের কৃপায় সঙ্গতিপন্ন ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে সংগীতসাধনার উদ্দেশ্য নিজের বিদ্যা ও আনন্দ লাভ এবং দশজনকে আনন্দ বিতরণ। এইজন্যই রবাবের পরিবর্তে সুর-শৃঙ্গারের চর্চাই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 9th December, 1966. শুক্রবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

মন্ত্রিবদল ও জাতীয় সমস্যা প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

পরিবর্তন সর্বত্রই কাম্য। কেননা, পরিবর্তনই হচ্ছে প্রগতি এবং সেই সঙ্গে জীবনের লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং এহেন পরিবর্তনকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকা যায় না। কিন্তু তাই বলে কি পরিবর্তনের নামাবলী দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখতে হবে অথবা সর্বদা পরিবর্তন শব্দটি জপ করতে হবে। পরিবর্তন তো আমাদের চিন্তা এবং কর্মে প্রকাশ পাবে এবং তাই ক্রমে বাস্তব-জীবনে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু এতো গেল নিছক ব্যক্তি-জীবনের কথা। আজকের পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পরিবর্তন খুব একটা সাড়া জাগাতে বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে না। পরিবর্তন এখন দেশের সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখতে হবে। আজকের দুনিয়ায় সমাজ, শিক্ষা, অর্থ সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজনীতি। রাজনীতি বাদ দিয়ে এসব কথা চিন্তা করবার বা ভাববার কোন অবকাশ আজ আর নেই। এই রাজনৈতিক দুনিয়ার ওলট-পালটই দেশের গভীরে বিরাট ভূমিকার অধিকারী। এখান থেকে নিরূপিত হয় আগামী দিনের আবহাওয়া। এই আবহাওয়া অবশ্যই আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পূর্বাভাষ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অনেক সময়ই অপ্রত্যাশিত এবং ঘটনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই কারও পক্ষে বোঝার কোন উপায় থাকে না। কিন্তু যখন ঘটে গেল তখন পায়ের তলায় মাটিও থাকে না। অবস্থা এমনি মর্মান্তিক হয়। সম্প্রতি আমাদের দেশে এরকম একটা বিরাট ওলট-পালট হয়ে গেল। 'গো-হত্যা বন্ধ করা আন্দোলন'কে কেন্দ্র করে শ্রীগুলজারীলাল নন্দকে পাততাড়ি গুটোতে হলো। এমনকি বিদায় নেবার মুহূর্তে তাঁকে সমর্থন করার মত বিশেষ কোন লোক ছিল না। এক্ষেত্রে অবশ্য বিরোধীদের কথা স্বতন্ত্র, নন্দজী বিদায় নেবার পর মন্ত্রিসভায়ও বেশ রদ-বদল ঘটলো। এই রদ-বদলকে কেন্দ্র করে অমৃত পত্রিকার ২৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয় 'মন্ত্রিদবল ও জাতীয় সমস্যা' বিশেষ সময়োচিত হয়েছে। দপ্তর রদবদল হলো কিন্তু জাতীয় সমস্যার কোন কিনারা হলো না। এমনকি এই সমস্যা মীমাংসা হবার মত কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াসও দেখা যাচ্ছে না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঠিকই বলা হয়েছে 'মন্ত্রিবদল হলেই সমস্যা রাতরাতি সমাধান হয়ে যায় না।' কথাটা অত্যন্ত বাস্তব সত্য। খাদ্যাভাব এবং আইন শৃঙ্খলার সমস্যা আজ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে এর আশু সমাধান কাম্য। কিন্তু সমাধান কাম্য হলেই তো আর সমাধান হয় না। সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে অবশ্য সময়ের দরকার। কিন্তু সেই সময় দীর্ঘ হওয়া সম্ভবত অনুচিত। পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের পথনির্ণয়ের প্রয়োজন।

বিনীত

অনিলবন্ধু রায়

নিউদিল্লী

বয়স্ক শিক্ষাপ্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকায় সাংবাদিকের বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনাটি বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষেও দেশের শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর, ভাবতে অবাক লাগে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শহর কলিকাতার শতকরা ৪০·৭ জন অর্থাৎ ১০ লক্ষ লোক নিরক্ষর। ১৯৬১ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ সারাভারতে স্বাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৭, আর পশ্চিমবাংলায় বেড়েছে শতকরা ৫। কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে তিন গুণের বেশী। নির্বাচন সামনে, কিন্তু নির্বাচন কি? কেন ভোট দিতে হয়, তা জানে কয়জন?

বয়স্ক শিক্ষার সরকারী প্রচেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয়নি, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ক্লাবগুলিতে, যাত্রা পার্টিতে, পাঠাগারে সামান্য ৫০।১০০ টাকা সাহায্য করলে, অনেক টাকা ব্যয় করা যায়, কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণ হয় কি? স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথমদিকে গ্রামে গ্রামে বয়স্ক ঐ কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য সরকারী সাহায্য পেতেন, কিন্তু কোন কাজই হয়নি। এখন প্রতি ব্লকে অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে, জেলা অফিস আছে, কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যতঃ হচ্ছে বলে মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই। ভ্রাম্যমাণ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠন করলে ভাল কাজ হতে পারে। বেকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষণ দিয়ে ৫।৬ জনের এক-একটি ভ্রাম্যমাণ দল গড়লে, তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ দিলে, তাঁরা প্রতি গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় এক একমাসের বয়স্ক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করবেন। সন্ধ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহে বা পাঠাগারভবনে স্থান পাওয়া যেতে পারে। গ্রামেই ৫।৬ জনের আহারাদির ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবং এজন্য গ্রামে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কর্মীদের যাতায়াত খরচ এবং সামান্য ভাতা দিলে চলবে। ব্লকের সমাজশিক্ষার অফিসার এই কাজ তদারক করবেন। এই কর্মীরা আলোচনাসভায় দেশের খাদ্যসমস্যা ও জনবাহুল্য সমস্যা সমাধানের অনুকূলে জনশিক্ষা দেবেন। গ্রামের কোন বয়সের কতজন কতদূর শিক্ষিত, কতজন স্বাক্ষর, কতজন নিরক্ষর এবং কতজন স্বাক্ষর হলেন, তার নিখুঁত পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। প্রতি বৎসর এই শিবিরগুলি আবর্তন করলে, মনে হয় পাঁচ বছরে শতকরা ৭৫ ভাগ নিরক্ষর স্বাক্ষর হবেন।

বিনীত—

বিনোদবিহারী দাস,

২৪ পরগণা।

সিনেমা ও টিভি

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীনান্দীকর মহাশয় অমৃতের গত ২৭শ সংখ্যায় (ষষ্ঠ বর্ষের তৃতীয় খণ্ডের) অমৃতের ছাব্বিশ সংখ্যায় আমার লেখা যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে তার সমালোচনা করেছেন। তিনি আমার প্রস্তাবের জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, যার জন্য আমি তাঁর কাছে এবং অমৃতের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

আমার সপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু মন্তব্য তিনি করেছেন তাঁর আলোচনার মধ্যে। শ্রীনান্দীকর মহাশয় লিখেছেন—"দৃষ্টিকে আর একটু সজাগ রাখলে লেখিকা একথা বলতেন না,—টেলিভিশন কি সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বী?" আমার উত্তর—টেলিভিশনের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন সিনেমা কখনই হতে পারে না তেমন সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নিশ্চয়ই জন্ম নয় টেলিভিশনের, এবং একথা সম্পূর্ণই সত্য। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী না হলে ক্ষতি করবার ক্ষমতা থাকে না একথা নান্দীকর মহাশয়ের মনে জাগল কেন? প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সমানে সমানে, এবং অনেকের মত আমিও মনে করি টেলিভিশন হচ্ছে—রেডিও-কাম-সিনেমা-প্লাস-থিয়েটার। টেলিভিশনের মাধ্যমে শুধু 'ড্রইংরুম ড্রামা'ই দেখতে পাওয়া যায় (এবং যাবে) এ ধারণা তাঁর কেন হল? ইতিমধ্যেই টেলিভিশন মারফৎ খেলাধুলো, শোভাযাত্রা ইত্যাদি ইত্যাদি, সিনেমা নিউজের আগেই, এবং কখন কখন সদ্যসদ্যই প্রচার করা হচ্ছে, একথা নিশ্চয় নান্দীকর মহাশয় জানেন। এছাড়া সময় ও ঝামেলার কথা যদি ধরা যায়, তাহলে এটা কে না জানে যে সিনেমা এবং থিয়েটারে যাওয়া আসার জন্য সময় ক্ষয় হয় প্রচুর। অথচ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তিমত বিভিন্ন কেন্দ্রের দ্বারা প্রচারিত 'ড্রইংরুম ড্রামা' নিউজ ইত্যাদি টেলিভিশনের মারফৎ দেখা এবং শোনা সম্ভব। তাছাড়া পশ্চিমদেশের লোকেরা যাঁরা অদূর ভবিষ্যতে চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা, সিনেমা মারফৎ দেশলাই-কাঠের তৈরী সেট্‌সীনের বাড়ীতে আগুন লাগান ইত্যাদি দেখে আর উত্তেজিত হতে চান না। রেলগাড়ী যেমন গরুরগাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী নয় তেমনি টেলিভিশনও সিনেমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বর্তমান আণবিক এবং স্পুটনিক্‌ যুগে সিনেমা অচল একথা স্বীকার না করে উপায় নাই। ইংলন্ডে এবং অন্যান্য পশ্চিম দেশে সিনেমাগুলি যে দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে —"যাওয়া-আসার জন্য সময়ের অপব্যয়" এবং যেহেতু টেলিভিশন হচ্ছে রেডিও-কাম-সিনেমা-প্লাস-থিয়েটার, সেই হেতু এমন কোন বিষয়বস্তু নেই যা টেলিভিশনের মারফৎ দেখান ও শোনান চলে না।

বিনীত

কমলাদেবী সান্যাল,

কলিকাতা—৪২

অমৃত

সম্পাদকীয়

বিদ্যাস্থানে শনির দৃষ্টি

বৎসর শেষ হতে চলল। পশ্চিমবাংলার শিক্ষায়তনগুলির দুর্দশার প্রতি নজর দিলে যে কোনো সুস্থবুদ্ধি মানুষই একথা বলবেন যে, এই শিক্ষাবৎসরটি একেবারে জলে গেছে। আমাদের পালপার্বণের দেশে ইতুপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সমস্ত পার্বণেই শিক্ষার সীমাবদ্ধ দিনগুলি অপচিত হয়। দুর্গাপুজো উপলক্ষে এত দীর্ঘ অবকাশও অন্যত্র নেই। ৩৬৫ দিনের বৎসরে ৫২টি রবিবার বাদ দিলে যে দিনগুলি অবশিষ্ট থাকে তার মধ্যে ছুটি-ছাটা, পালপার্বণ, জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি ইত্যাদি বাদ দিয়ে বৎসরে মাত্র ১৮৬ দিন ক্লাশ হবার কথা। আমরা হিসাব করে দেখেছি, এ বৎসর বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট একশো দিনও পুরো ক্লাশ হয়নি। তার ওপর শিক্ষকের অনুপস্থিতি, বৃষ্টি-বাদল ইত্যাদি আকস্মিক ঘটনা ধরলে ছাত্রদের হাতে কার্যকর ক্লাশের দিনের সংখ্যা আরও কম হবারই সম্ভাবনা। বর্তমান সিলেবাসে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-পর্বতপ্রমাণ পাঠ্যসূচী আছে বৎসরে মাত্র ৮০।৯০ দিন ক্লাশ করে সেই পাঠ্যতালিকা শেষ করা প্রায় অসম্ভব। তার ওপরে এবারে অনেক পরীক্ষার দিন পিছিয়ে গেছে, স্কুলগুলি নমো নমো করে বার্ষিক পরীক্ষার আয়োজন করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার্থীদের যে কী হাল হবে এতে তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ দেশের নানা দুরবস্থার মধ্যে শিক্ষার এই ছত্রখান চিত্রের কথা মনে করলে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শংকিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কলকাতায় দুটি সরকারী কলেজ এবং একটি বেসরকারী কলেজে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অযথা ঝক্কি পোহাতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের কোনো দোষ না থাকলেও, মাদার ইন্সটিটিউশন হিসেবে তাকেই জবাবদিহি করতে হচ্ছে এই অভাবিত পরিস্থিতির। ফলে পুজোর ছুটির পর আর বিশ্ববিদ্যালয় খোলাই সম্ভব হয়নি। যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তাহলে ৮ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ঘোষিত হবে। তবু একদল ছাত্র চাইছেন কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের বিরোধ মীমাংসায় বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে আসুক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ নিয়মশৃংখলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোনো অধিকার নেই।

ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষাকর্তৃপক্ষের বিরোধ শুধু বাংলাদেশেই হচ্ছে তা নয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম শুরু হয় আলীগড়ে, তারপর দেখা দেয় বেনারসে। এর পরবর্তী পর্যায়ে লখনৌ, ওসমানিয়া, ইন্দোর প্রভৃতি নানাস্থানে কোনো না কোনো কারণে বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এর খেসারৎ দিতে হচ্ছে ছাত্রদেরই। এবং ছাত্রদের ক্ষতির প্রতিক্রিয়া ভুগতে হবে অভিভাবককে এবং সমাজকে। তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিশৃংখলা আর কতদিন চলবে? বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে আমাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সমাজপ্রগতির কর্মসূচীই বা কীভাবে অক্ষুন্ন রাখা হবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, ছাত্রসমাজকে নিয়মের পথে, আইনের পথে এবং শিক্ষা-শৃংখলার পথে আনতে যদি শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হন তাহলে তার জন্য চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমাজ। ভারতের বর্তমান অবস্থায় এই ক্ষতি অপূরণীয় এবং তার প্রতিবিধানের জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিত।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ছাত্রসমাজের একাংশ যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ মহলের নেতৃত্বের অভাব এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করছে। কোনো বিরোধেরই মীমাংসার সূত্র পাওয়া যায় না, এটা ভাবা যায় না। পুলিশ ডেকে, ছাত্র ঠেঙিয়ে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করে যে সমস্যার সমাধান হয় না এটা প্রায় সকলেরই জানা। নয়াদিল্লীর উচ্চতম মহলও এ বিষয়ে কোনো পথনির্দেশ দিতে পারছে না। রাজ্যসরকারসমূহ একপ্রকার নির্বিকার এবং শিক্ষকরা অসহায়। আমরা ভাবতেই পারছি না যে, ভারতের মতো একটি সমস্যাজর্জর দেশে যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বহু সংকট ঘনায়মান সেখানে দেশের ভবিষ্যৎরূপে গণ্য তরুণ শিক্ষার্থীসমাজের এই মনোভাব কীভাবে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা বাদ দিলেও, ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থেই এই মনোভাব পরিত্যাগ করা উচিত।

বিচিত্র চরিত্র

শশীশেখর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(অন্ত্যপর্ব)

হর্‌বোল পাল ফিরে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

অম্‌বিয়া শেখ তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

হর্‌বোল পাল প্রসঙ্গ ধরে শশীবাবুর চরিত্র বৈচিত্র্য তুলে ধরবার আগে অম্‌বিয়া শেখকে নিয়ে শশীবাবুর চরিত্রের যে প্রকাশটি হয়েছিল, তাই বলে শেষ করে নি। শশীবাবু কুলদাবাবুর চেয়েও জটিল চরিত্র মানুষ। কুলদাঠাকুরদা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, ঠাকুর্দা নায়ক নন, কিন্তু প্রধান পার্শ্ব-চরিত্র। শশীবাবু কিন্তু আজীবন নায়ক। সে প্রথম বয়স থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। ঘটনাও তাঁর জীবনে অনেক বেশী ঘটেছে সেই কারণে, তিনি নিজের জীবনের আলোর বিভিন্ন বর্ণের ছটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার বেশী সুযোগও পেয়েছেন।

অম্‌বিয়া শেখকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করবার যে সংকল্প তিনি করেছিলেন তা তিনি কাজেও পরিণত করেছিলেন। মরদের বাত একটা বলে যে দম্ভ তিনি করতেন, তা সব ক্ষেত্রেই তিনি বজায় রেখে-ছিলেন. জীবনে এমন কথা কেউই বলবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার বাত হাতীর দাঁতের মতই মজবুদ এবং বহুমুখী বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

মামলা-মোকর্দমা হয়েছিল—সে দেওয়ানী ফৌজদারী দুই-ই। কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে, দু-চারটে দেওয়ানী মামলায় তিনি বাদী থাকলেও বাকীগুলোর সঙ্গে তাঁর বা তাঁর কর্মচারী কি পাইক নগদীর কোন সম্পর্ক ছিল না।

সব মামলাই চলেছে অম্‌বিয়া শেখ ভারসাস উক্ত গ্রামের হাকিমুদ্দি শেখ, তোরাপ খাঁ, কাদের বক্স প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে। এখানে আর একটা কথা বলা উচিত, সেটা হল কালটার কথা এবং ওই গ্রামটার কথা। গ্রামটার কথা আগে বলি, গ্রামটা মুসল-মানের গ্রাম। হিন্দু বলতে আছে এক ঘর নাপিত (সেও একলা জমিদারের কাছারিতে বাস করে) এবং হিন্দুদের নিচেকার জাত-কুলের কয়েক ঘর। নাপিত হাজামের অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম করে এবং গ্রামে হিন্দু অতিথি এলে জল তুলে দেয়, বাটনা বেটে দেয়; এবং ওই ব্রাত্যেরা চাকরের কাজ করে। এবার কালের কথা বলি, কালটা ২৪।২৫।২৬ সাল; মুসলীম লীগের আগমন ঠিক না হলেও তার আগমনী শোনা যাচ্ছে। এদিকে হিন্দুরাও হিন্দু মহাসভার তোড়জোড় শুরু করেছে। সেই সময়ে একটি মুসলমান প্রধান গ্রামে অম্‌বিয়া শেখ নামক ব্যক্তিটি পড়ল শশীশেখরবাবুর রুষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে, কিন্তু সে রোষবহ্নি সরাসরি অম্‌বিয়া শেখের উপর পড়ল না, ওই গ্রামেরই মুসলমানদের মন বা চিত্তের আতসী কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে অম্‌বিয়া শেখের সর্বাঙ্গে পড়ে তাকে ঝলসে দিল। অম্‌বিয়া পালিয়েছিল, না হলে হয়ত ভস্ম হয়েও যেতে পারত।

এখানে সেই আপশোসের কথাটা মনে পড়ে যায় যে, মানুষের প্রয়োজনে গৃহ-পালিত জীবের মাংস, গৃহপালিত জীব-জন্তুতেই বহন করে নিয়ে গিয়ে মার্কেটে পৌঁছে দেয়। এবং কসাইও যে চপিং করে তাও তার নিজের উদরের প্রয়োজনে নয়, যার পয়সা আছে, যে খায় তার প্রয়োজনে। কেমন খানা হবে বা কিমা কতটা হবে সব নির্দেশই দেয় খাদক-খরিদ্দার, অর্থাৎ অর্থবান ব্যক্তি।

মূল কথাটা তাই-ই বটে। কিন্তু তার প্রকাশটা ঠিক টাকা ঘুষ দিয়ে লোক কয়েকটা হাত করার কথা নয়। লোকগুলি স্বেচ্ছায় এসেছিল হুজুরের হয়ে অমবিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

হুজুরের এলাকায় সুদ নাই, নালিশ নাই, তামাদিও নাই। তামাদি মানে বারড্ বাই লিমিটেশন। সেকালে বাংলা দেশের খাজনা আইনে চার বছর পার হয়ে পাঁচ বছরে পড়লেই প্রথম বছরের খাজনা বারড্ হয়ে যেতো। সেই কারণে নিয়ম চার বছরের চৈত্র মাসে নালিশ দায়ের করতে হত; এবং চার বছরের উপর এক বছরের খাজনা সুদ হিসেবে পাওয়া যেত। শশীবাবু এ নিয়ম মানতেন না। সুদ তিনি নিতেন না। প্রজারাও কখনও তামাদি বলত না। গ্রামে আট-দশ ঘর অবস্থাপন্ন প্রজা ছাড়া সব প্রজারই খাজনা পাঁচ বছরের উপর বাকী, তা সে সাত-আট-দশ-বারো এমন কি চার আনা, আট আনা খাজনা হলে অমবিয়ার মত ছাপান্ন বছর না হোক বিশ-পঁচিশ বছরের বাকী থাকত।

দু বছরের যার বাকী সে নিয়মিত এক বছর করে দিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা সেক্ষেত্রে দু বছরের দিচ্ছে, এইভাবে বছরের ডোলজমা বা পাওনা টাকাটা উঠে যেত। যে বৎসর জমিদার অর্থাৎ শশীবাবু আসতেন মহলে সে বৎসর সেরেস্তার বাকী সাফ হত।

প্রজারা প্রথমেই এসে অভিবাদন করে সেলামী বা নজরানা দিত। যে যেমন লোক তেমনি নজরানা। এক টাকা থেকে সেকালে পাঁচ টাকা পর্যন্ত। আর জমিদারের খাদ্য খরচ তারা বহন করত। সে কম নয়। জমিদার যতদিন গ্রামে থাকতেন, ততদিন ওই গ্রামের হিন্দু ব্রাত্যেরা এসে ওখানেই বসে পাত পাড়ত। এবং দুটো ডাল, চারটে তরকারি, মাছের অম্বল এবং পায়েস-সহযোগে ভোজন করে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে যেত।

শশীশেখরবাবুর কাছারী থেকে গ্রামের মসজেদে তাঁর পুজোই বলুন আর যাই বলুন পাঠিয়ে দিতেন; বাতী, ধূপ, লোবান, গুগগুল, মিষ্টান্ন এবং একখানি মূল্যবান পশমী বা রেশমী বস্ত্র। গ্রামের মকতব মেরামতের জন্য টাকা দিতেন, গ্রামের ইঁদারা মেরামতের জন্য টাকা দিতেন। আর দিতেন গ্রামের যারা অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ পঙ্গু দরিদ্র তাদের প্রত্যেককে আধ সের চাল।

শশীবাবু একটা কালকে তাঁর জীবনে টেনে ধরে রেখে বেঁচে থেকে গেছেন। তাঁর জমিদারী বেশী ছিল না। আট-দশ হাজার টাকা আয় ছিল, কিন্তু জমি ছিল প্রচুর। তাঁর প্রত্যেক মহলে একটা বা দুটো বা তিনটে বাখার বা গোলা ছিল, তার মধ্যে ওই গ্রামে তাঁর খাস জোতের ধান মজুত থাকত।

তাঁর খাস কাছারি ডেংগারায় কাছারি বাংলার সামনে ছিল প্রকান্ড একটা পুষ্করিণী। তার একটা পাড়ে তাঁর কাছারি, বাকী দুটো পাড়ের উপর অনেকগুলি বাখার বা গোলা। বাখারই বেশী। বাখার সেইগুলিকে বলা হয়, যেগুলি খড় পাকানো দড়ি জড়িয়ে বাঁধা হয়। খড় পাকানো দড়ি-গুলি মোটায় প্রায় আড়াই ইঞ্চি, লম্বায় অনেক।

এর চারি পাশে কোন পাঁচিল বা বেড়া নেই। পাহারাও বিশেষ প্রয়োজন হত না। শুনেছি শশীবাবুর গোলা বা বাখার থেকে ধান কখনও চুরি হয় নি।

শশীবাবুর বাড়ীর দরজায় নিরন্ন এসে বিনা অন্নে ফেরে নি।

হরবোল পালের কথায় আসি এবার। হরবোল পাল তাঁর গাঁয়ের লোকেদের নিয়ে ভাদ্র-আশ্বিন মাসের জন্য ধান ঋণ করতে এসেছিল। ধান দাদন বলা হয়। ধান দাদন দেওয়ার মত তৈলসরস কারবার আর নেই। ধান যে দাদন দেয়, তার এক মণ ওজন দেড় মণ হয়, আর যে নেয় সে শুকিয়ে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত তার গৃহলক্ষ্মী (গৃহিণী নয়) অভাবের টুবারকুলসিসে কঙ্কাল হয়ে দেহত্যাগ করে। দাদন নিয়ে যে খেতে লাগল একবার তাকে আর দেনা শোধ করে সহজ-স্বচ্ছন্দ হতে বড়-একটা কেউ দেখে নি সে-কালে। এক মণ ধান বর্ষায় দিলে মাস আষ্টেক পর ফাল্গুন-চৈত্রে সেটা দেড় মণ হল। এক মণের সুদ আধ মণ। শোধ দিলে শোধ গেল, না দিলে দেড় মণ আসল হল এবং তার উপর আধ মণের স্থলে ত্রিশ সের ধান সুদ চেপে পাওনা হল দুমণ দশ সের। এ বৃদ্ধির কাছে শশীকলার বৃদ্ধিও হার মানে। চন্দ্রের কলা বাড়ে সিংগল কলায় ধান দাদনের সুদ বাড়ে যমজ বা জোড়া কলায়।

শশীবাবুর প্রচুর জমি, প্রচুর ধান; সে ধান তিনি বিক্রী করতেন না। তার কারণ অবশ্য এই নয় যে, তাঁর প্রচুর টাকা ছিল, তাঁর জমিদারী ছিল, জমি প্রচুর ছিল, ধান প্রচুর ছিল, কিন্তু টাকা বেশী ছিল না। কিন্তু ধান বিক্রী করেও টাকা সেকালে বিশেষ হত না, কারণ ধানের দর সেকালে

মণ-করা এক টাকার নিচে ছিল। ধান যখন নতুন উঠত, তখন আউশ ধান দশ আনা মণে বিকেয়েছে, আমন বিকিয়েছে চৌদ্দ আনায় এ আমি দেখেছি। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় সবে হয় তো মণের দাম টাকা পার হয়েছে। শশীবাবু ধান ঋণ দিতেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের চাষীরা জোট বেঁটে তাঁর বাড়ী আসত এবং প্রয়োজন মত ধান নিয়ে যেত।

হরবোল পাল বললে—হুজুর, আমাদের এবার ড্যার (দেড়) পোটী ধান লাগবে। আমরা চৌদ্দ জনাতে লোব। আর আজ্ঞে ঘর দুই আছে, বড় নাতোয়ান হয়ে পড়েছে; বলতে গেলে জমি-জেরাত সবই গিয়েছে। তাদের দু ঘরকে দু বিশ ধান দেয়ার হুকুম দিতে হবে।

নাতোয়ান মানে নেতিয়ে পড়েছে অবস্থায়। নিজেদের জমি-জেরাত বিক্রী হয়ে গিয়েছে, এখন অপরের জমি ভাগে নিয়ে চাষ করে খায়। তারা দু ঘরে দু বিশ ধান এমনি ভিক্ষে চেয়েছে।

বলাবাহুল্য এরা হয় শশীবাবুর মহলের প্রজা; নয় আশপাশ গ্রামের লোক এবং তাঁর অনুগত লোক।

এখন 'বিশ' মানে বলি। বিশ অর্থে একটা মাপ বা ওজন, আড়াই মণে এক বিশ হয় এবং ষোল বিশে এক পোটী হয়। হরবোলেরা চৌদ্দজনে দেড় পোটী অর্থাৎ চব্বিশ বিশ বা ষাট মণ ধান ঋণ নেবে। এবং দু ঘর ভেঙে-পড়া গৃহস্থের জন্য দু বিশ বা পাঁচ মণ ধান দান হিসেবে পাবার প্রার্থনা জানাচ্ছে।

শশীবাবু নায়েবকে বলতেন — কোন বাখারে দেড় পোটী ধান আছে হে?

নায়েব খাতা দেখে বলত—ওই কোণের একটা বাখারে আছে।

—শুনলি রে বেটা হরবোল—এ্যাঁ, ওই কোণের গোলায় দেড় পোটী ধান আছে। যাও নাও গে যাও। আর মজুমদার, অন্য কোন গোলা থেকে দু বিশ ধান আলাদা দিয়ে দিয়ো। হরবোল।

—আজ্ঞে প্রভু!

—ওঃ বেটার আমার বিনয় খুব।

—আজ্ঞে অবিনয় কি করলাম, কখন?

—দেখ ফ্যাসাদ! না অবিনয় কর নাই, কথাটা ঠাট্টা করে বলেছি। তা গতবারের কথা মনে আছে?

—আজ্ঞে আছে। এবার তা হবে না।

—হুঁ, সামলে রাখবে ভাল করে। না হয় বড় (খড় পাকানো দড়ি) তোমরা নিয়ে যাও। যখন ধান দিতে আসবে তখন নতুন বড় নিয়ে এসে ধান বেঁধে দিয়ে যাবে। যাও বাখার ভেঙে নাও গে।

তারা চলে গেল, নিজেরাই বাখার ভাঙলে, এবং ধান বস্তায় বস্তায় বস্তাবন্দী করে গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে চলে গেল। শশীবাবুর তরফ থেকে কেউ দাঁড়াল না, তারা নিলে তারাও যাচাই করে দেখলে না, ধান মাপে বা ওজনে দেড় পোটী আছে কিনা। যাবার সময় খড়ের বড় যত্ন করে তুলে রেখে গেল, চাষবাড়ীতে। এবং সেরেস্তায় গিয়ে ধানের খাতায় একটা সই বা আঙুলের টিপ ছাপ দিয়ে চলে গেল।

ফাল্গুন মাসে আবার গাড়ী বোঝাই করে ধান নিয়ে তারা এল এবং কাছারীতে এসে শশীবাবুকে প্রণাম করে দাঁড়াল—প্রণাম হুজুর।

—কে বৎস? ও! হরবোল! একবার হরি হরি বল বাবা।

—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। আমরা ধান এনেছি বাবা!

—এনেছ? সোনারে আমার! সোনা ছেলে। ধান তো ভালই এবার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কার্তিকে আর খানিক জল পেলে আরও ভাল হত।

—তা সব ধান এনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ড্যার (দেড়) পোটী ধান আর শুকতি দু আড়ি হিসেবে দুবিশ আট আড়ি হয় আমরা আড়াই বিশ সব সমেত সাড়ে ছাব্বিশ বিশ এনেছি।

—বাস, যাও বেঁধে দাও গিয়ে। ভাল করে বাঁধবে। না হলে হারামজাদাদিগের গলায় গামছা বেঁধে এনে আবার বাঁধাব আমি। হ্যাঁ। তোরা বেটারা যেমন ভাল, তেমনি মন্দ। উঁহু মন্দ বেশী। ফাঁকি দিতে পারলে—কিছুতে ছাড়বে না।

—আজ্ঞে না। আজ্ঞে না। খুব ভাল করে বেঁধে দোব বাবা।

—বহুৎ আচ্ছা।

এর মধ্যে শশীবাবুর একটি পরিচয় আছে। শশীবাবুর ধান দাদনে এক মণে

ফটো : সুকুমার রায়

আধ মণ অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ টাকা সুদ নেই। সুদই ছিল না। নিতেন শুখতি বা বাথার খামতি। কথাটার মানে বলতে হবে। এবং বুঝিয়ে বলতেও হবে। কথাটা হল এই যে, ধান যখন প্রথম ঝাড়াই হল তখন ধানে কিছু রস থাকে যা পরবর্তীকালে শুকিয়ে যায়, যার ফলে ওজনে কমে যায়। ফাল্গুনের এক মণ ধান বর্ষার সময় আসতে আসতে কমে গিয়ে ৩২ সেরে দাঁড়াবে, মণকরা ৮ সের কমতি হয়। সেই হিসেবে শুখতি বা বাথার খামতি (বাথারের মধ্যে শুকিয়ে খামতি হবে) দু আড়ি অর্থাৎ বিশ সের ধরে দিয়েছে তারা। আড়াই বিশটা তাই। এই নিয়ম প্রায় তাঁর সারা জীবনটাই তিনি পালন করে গেছেন।

এ ছাড়া পুকুরের মাছ, তাঁর মহলের খাস পতিতের উপর জন্মান গাছ, পুকুর-পাড়ের তাল গাছ, অজস্র বাঁশ নিয়ে তাঁর বংশের এক দানসত্র খোলা ছিল। তাকে তিনি সারা জীবন চালিয়ে গেছেন এবং প্রশস্ততর করেছেন, সঙ্কীর্ণ করেন নি। কোথাও কোন হাসপাতালে বা ইস্কুলে বা ইদারায় বা অন্য কোন সাধারণের ব্যবহার্য বড় দালানের গায়ে মারা মার্বেল ট্যাবলেটে শশীশেখর-বাবুর নাম নেই। এ সবে মোটা টাকা চাঁদা তিনি দেন নি, কিন্তু ওই দানসত্র তিনি সারা জীবনই উন্মুক্ত রেখেছিলেন। অত্যাচারও—হ্যাঁ অত্যাচার বলতেই হবে। তার এক বিচিত্র বিচারবোধ ছিল, সেই বোধ অনুযায়ী বিচার করে সাজা দিতে গিয়ে অত্যাচার করেছেন বই কি!

আর একটা ঘটনার কথা বলে শীবাবুর প্রসঙ্গ শেষ করব। সে অনেক কালের কথা, সম্ভবত ১৪।১৫ সালের কথা। কি আরও দু-এক বছর আগেরও হতে পারে। ঘটনাটির মধ্যে অবশ্য নূতন কোন পরিচয় শশীবাবুর নেই, ওই যে তিনি বলতেন 'যাহা শশীশেখর তাহাই ডেংগারা' তারই মৌলিক চেহারাটা। খাস ডেংগারা ধামে তিনি যে ডেংগারার সিংহ নামে অভিহিত হতেন তারই স্বরূপ।

শশীবাবু তখন যৌবনের শেষের দিকে পৌঁচেছেন। একদিন শীতের প্রভাতে উঠে, গো-শালায় গরুগুলির খাওয়া দেখছেন; গায়ে ফতুয়ার উপর আলোয়ান, পায়ে খড়ম, বাঁ হাতে রুপোর বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন এবং ঘুরছেন গরুগুলির ডাবা দেখে দেখে; সঙ্গে চাকর আছে, তার কাঁখে আছে একটা ধামি বা বড় ডালায় গুঁড়ো-করা খইল; শশীবাবু ডান হাতে মুঠো মুঠো খইল নিয়ে গরুর ডাবায় ছড়িয়ে দিচ্ছেন। অন্য গরুগুলি ফোঁস ফোঁস শব্দ করে মাথা নাড়ছে। যা বলতে চাচ্ছে তা শশীবাবু বুঝছেন, তিনি হেসে বলছেন—'যাচ্ছি-যাচ্ছি। সবুর।' তাতেও মাথা নাড়লে বলছেন—''তুই হিংসুটি ক্যানে' এত? এ্যাঁ। হারামজাদীর তর সইছে না। দেখতে পারছে না। মর-মর-মর—কালকুটি মর।'' এক্ষেত্রে গাইটার রঙ কালো।

এটা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল।

এমন সময় সামনে সদর রাস্তায় এক অশ্বারোহীর আবির্ভাব। অশ্বটি অবশ্য আরব দেশের নয়, পারস্যেরও নয়, এমন কি আমাদের পাঞ্জাব জাত ঘোড়াও নয়; এ ঘোড়া খাস বঙ্গদেশীয় অশ্ব যা নাকি উচ্চতায় হাত আড়াই বা তার থেকে কিছু উঁচু। যাদের দেখা যায় সামনের পা বাঁধা অবস্থায় মজা পুকুরে ঘাস খেতে; যাদের হাটে দেখা যায় হিন্দুস্থানী হাটুরেদের বোঝা বয়ে আনতে; বাংলা দেশের দু-দশ ঘর মুসলমান গৃহস্থদের বাড়ীতেও এদের দেখা যায়। মাথায় টুপী এবং ক্ষারে-কাচা পিরহান পরে মিয়া সাহেবরা এই অশ্বে আরোহণ করে কুটুম্ব বাড়ী গমন করেন। অশ্বটি এমনি সাধারণ সচরাচর অশ্ব হলেও অশ্বারোহী কিন্তু তা নন, অশ্বারোহী সম্পূর্ণরূপে রাজকীয় ছাপে ছাপমারা রীতিমত খাঁকি পোষাক পরা দারোগা সাহেব। কাঁধে পিতলের তৈরী হরফ বি-পি এবং টুপির মাথায় রুপোর বা রুপদস্তার লতাপাতায় ঘেরের মধ্যে রাজমুকুটের বা ক্রাউন লাগান। অশ্বারোহীর পিছনে জন-তিনেক কনেষ্টবল, সে আমলের 'সিপাই'।

শশীবাবু দেখেই হাত তুলে হাঁকলেন—ও-ই—ও-ই—ও-ই! কে হে? কে? ও চামারী সিং! বলি ওহে!

চামারী সিং বালিয়া জেলার লোক। ছ' ফুট লম্বা এবং তেমনি চওড়া জোয়ান। কালো রঙ, মুখে বসন্তের দাগ! তাকে বেশ দূর থেকে চেনা যায়।

শশীবাবুর ভুল হয় নি। চামারী সিং-ই বটে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে সম্ভ্রম দেখিয়ে সেলাম করে বললে—সালাম হুজুর! আচ্ছা আছেন তো? বাড়ীর সব ভাল তো?

—তা তো বটেই হে চামারী সিং। মন্দ রাখে তার নাম কি? বাড়ী কোথায় হে? সদানন্দময়ী কালীর খাসতালুকের প্রজা হে আমি, মন্দ আমায় রাখে কে? কিন্তু তোমাদের ব্যাপার কি? তোমাদের দারোগার লেজ গজিয়েছে, না শিঙ বেরিয়েছে হে, যে বন্ধু মানুষকে চিনতে পারে না? রাম-ছাগলের খাসীর উপর চড়ে...র (গাল ব্যবহার করলেন), মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছে [illegible] কি? ব্যাপার কি?

—নেহি বাবুজী। উনি হামলোকের বড়াবাবু দারোগাসাহাব নেহি হ্যায়। উনি নয়া ছোটাবাবু আসিয়েছেন। একঠো কামসে চলিয়েছেন—

—এ-হে-হে! তা হলে তো বড়ই অন্যায় হয়ে গেল! ছি-ছি-ছি। ছোটবাবু মশায়। শুনুন-শুনুন। বড়ই অন্যায় করেছি আমি। গাল দিয়ে ফেললাম। আপনার বড়দারোগা আমার বন্ধু লোক, এক গেলাসের ইয়ার, আমি তাকে গাল দি, সে আমাকে গাল দেয়। বুঝলেন না। তা মশায় আপনাকে ঠাওর করতে পারি নি। বড়ই অন্যায় হয়েছে। নামুন। দয়া করে নামুন।

বাবুটি থানা থেকে আসছেন, শশীবাবুর পরিচয় জেনেই এসেছেন। দারোগাবাবু তার সঙ্গে আলাপ করতেও বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু এই তরুণ ম্যাট্রিক পাশ কাচ দারোগাসাহেবটি শশীবাবুর বিবরণ শুনে তাঁর সঙ্গে সংশ্রবে আসতে নারাজ ছিলেন। তবু এমন ক্ষেত্রে নামতে হল। শশীবাবু তাকে সমাদর করে কাছারীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং হাঁক-ডাক শুরু করলেন। —আন চা আন। জলখাবার আন। জলদি আনবি। হালুয়া লুচি আলুভাজা আর টাটকা খেজুরের গুড়।

পরিচয় পর্ব সেরে জল খাইয়ে বললেন —যাবেন কোথায়?

—একটু কাজ আছে। সরকারী কাজ তো। কি করে বলব বলুন?

—আরে মশায় আমিও তো সরকারের অধীনে বিশ্বস্ত জমিদার। রাজভক্ত প্রজা তো বটেই। তার উপর জমিদার হিসেবে তো এককালে আমরাই পুলিশের কাজ চালিয়েছি। আজও হুকুম পালন করি।... থানার সব দারোগার সব কাজই করে দি। এক সঙ্গে মদ খাই; গান-বাজনা করি। শালা বেশী বলব কি, মাতাল হয়ে আমি কিল মারি দারোগাকে, দারোগা কিল মারে আমাকে। বলুন—আমাকে কি কাজ? হুকুম করে দিয়ে এইখানে বসুন—ওই রামছাগলের খাসীটার ওপর চেপে ধুলো খেতে খেতে যেতে হবে না, খাওয়া-দাওয়া করুন, মাছ ধরাই, খাসী কাটি;

—আজ্ঞে না—

—না। দরকার হবে না। তা ছাড়া জরুরী কাজ।

—অ। তাহলে একটু মাল খেয়ে যান। গৃহজাত দ্রব্য। মানে এখানে চোলাই-করা উৎকৃষ্ট মাল। মেঝের উপর ফেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিন, শালা দপ্-দপ্ করে নীল আলো জ্বলবে। বুকের ভেতর যাবে, সে মাইরী জানান দিয়ে যাবে—

—আজ্ঞে না, আজ্ঞে না। মাপ করবেন।

—তাহলে বিলাতী মাল—ও এইচ এম এস হুইস্কী, একটা আছে আমার। তাই একটু খান।

—মাপ করবেন শশীবাবু। যা খাওয়ালেন তাই যথেষ্ট। এবার আমি যাব। উঠলাম আমি নমস্কার।

চলে গেলেন দারোগা। কোন মতেই থাকলেন না। শশীবাবু খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে মা কালীকে নিবেদন করে গলায় ঢেলে দিয়ে বললেন—শালা কে-রে? ও মজুমদার। মজুমদার।

—আজ্ঞে?

—চামারী সিং বলেছে কথা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ব্যবস্থা করেছ?

—করেছি। লোক চলে গেছে।

—বেশ। ওরে হারামজাদা গোবিন্দে, দে আর এক গ্লাস দে।

গোবিন্দে বললে—কাল ওই খেজুর গাছে মহলদারকে তাড়ি দিতে বলেছিলাম—তা, জিরেন কাটের গাছের হাঁড়িতে বাখর দিয়ে তাড়ি বানিয়ে দিয়ে গিয়েছে, বলে গিয়েছে খুব ভাল হয়েছে।

—বাস্-বাস্ তাই আন। ভারী উৎকৃষ্ট জিনিষ। মূত্রাশয় একবারে ধৌত করে দেবে। আন।

বিকেলবেলা প্রায় তিনটে থেকে শশীবাবু কাছারীর সামনেটায় ঘুরছেন। একটু অস্থির ভাব ঘোরাফেরার মধ্যে। হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। মুখে একটু হাসি ফুটল, সেই রামছাগলের খাসীর মত তেজীয়ান এবং উচ্চ অশ্ববরের উপর খাকী পোষাক পরিহিত দারোগাটিকে দেখা গেল। শীতের দিন সূর্য এরই মধ্যে পশ্চিমে অনেকটা নিচে নেমেছে। রৌদ্রের মধ্যে বিবর্ণতা ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে শীতের রেশ অনুভূত হচ্ছে। মাটিতে দাঁড়িয়ে বোঝা যায় শীতটা যেন মাটির ভিতর থেকে অদৃশ্য বাষ্পের মত বেরিয়ে উপরের দিকে উঠে চলেছে।

দারোগাবাবুর বাহিনীটি তাঁর কাছারীর কাছে এসে এবার সরাসরি চলে গেল না, দাঁড়াল; চামারী সিং উঠে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। —সেলাম বাবুসাহেব।

—চামারী! এস-এস, সেলাম। কি খবর কাজ হয়ে গেল?

—নেহি বাবুসাব! উ-শালা এক হারামী আদমী, শালা ভাগলো। খবর পাইয়েছিল কুছু-রকমে। শালা ভাগিয়ে গিয়েছে। বদমাস ফেরারী আসামী।

—ফেরারী? তা পেলে না? ফিরে যাচ্ছ

—হ্যাঁ। ফিরে যাচ্ছি। লেকেন দারোগাবাবু থাকিয়ে গিয়েছেন। হম লোক ভি গিয়েছি। সমুচা দিন খানা ন—পিনা ন; আস্মান ন, আরে বাবু দশ মিনট বৈঠতে টাইম ভি ন মিলল। থোড়াসে চা পিব। দারোগাবাবুর তো বিলকুল ছুতি-উতি শুখ গিয়া হো গা!

—আরে বাপরে। সে কি! সে কি! আসুন-আসুন ও ভাই ছোট দারোগাবাবু আসুন। আসুন। বসুন। বসুন। ওরে চা আন, চা আন। শোন ভাল কড়া করে চা আনবি। বুঝলি? বসুন ভাই আমার বসুন। দেখুন তো, মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। বসুন। দেখুন একটা কথা বলি। জুতো-টুতো খুলুন। ওই মা দুর্গার অসুরের মত শালা আষ্টেপৃষ্ঠে টাইট পোষাক পরে দড়াদড়ি নেকড়া কানি (পট্টী বেল্ট বুটের ফিতে) বেঁধে শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ বসুন।

—আন। দে দু কাপ করে চা দে। চামারী ভাই দু কাপ তিন কাপ খেয়ে নাও!

—আর একটা কথা বলব? আমি বলি কি, হাঁড়ি করে জল গরম করিয়ে দিই, সর্বাঙ্গ ধুলোতে কিচকিচ করছে, বেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে ফেলুন, ইচ্ছে হলে চান করুন। আমি ধোয়া ধুতি দিচ্ছি। ওই চোঙা ছেড়ে কাপড় পরুন।...—চান করবেন! বহুৎ আচ্ছা। এই তো ভাই, দাদা বলতে তুমি ভাই, ভাই বলতে তুমি দাদা।

—আর একটা কথা বলব? চান করলেন এই অবেলায়, হোক না গরম জল, ঠান্ডা লাগতে পারে। বিলিতী বোতলটো আনি খান এক ডোজ।...বেশ বেশ। তাহলে —ও মজুমদার, এক কাজ কর। দাও একটা খাসী ফেলে। আর মাছ ধরাও। বুঝেছ? হ্যাঁ। চামারী সিং-দের সিধে দাও। আর তারই বা দরকার কি? বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই, আপৎকালে বিচার নাই, শ্মশানেও নাই। খানকী বাড়ীতে নাই। অবার ইয়ার বক্সীর আড্ডাতেও নাই। বল ভুনি খিচুড়ী চড়াতে বল। বুঝেছ। আর খোঁজ লাগাও শালা ফেরারী হরামী গেল কোথায়? এই সময় গোবিন্দ কয়েকটা বোতল নিয়ে এসে সামনে নামিয়ে দিল, শশীবাবু বললেন—ওরে গোবিন্দে। ওরে ব্যাটা লগনচাঁদা আমরা! এ যে খুব ভাল খানদানী মাল রে! বাহবা বাহবা। তা দে এখানে দুটো বোতল দে, আর চামারীকে জিজ্ঞেস কর, ওরা নেবে কিনা? কি? ওরা গাঁজা নিয়েছে, সিদ্ধি ও নিয়েছে? সেই কাঁচা সিদ্ধি? বলিস কম করে খেতে। হ্যাঁ। বাঃ-বাঃ বেশ। এস ভাই বসা যাক। ওরে খাসীটার নাড়ী ভাজি করে এনে দে তো! বলিহারি বলিহারি!

—এাঁ কি বলছ ভাইটি আমার? আমি বেশ লোক! মাইরী তুমি ঠিক ধরেছ, তবে ষোল আনা ধরতে পার নাই ভাই আমি আবার রাম বদমাস। শালার শালা তস্য শালা।

—হা-হা-হা-হা-হা-হা! নাও আর এক পাত্তর নাও হে!

—নাও ভাই এইখানে শোও। দেখ কোন অসুবিধে হবে কিনা। দেখ!

খাওয়া-দাওয়ার পর শশীবাবুর গেস্ট-হাউস—একটি বাংলা বাড়ীতে মেঝের উপর পুরু খড় বিছিয়ে তার উপর সতরঞ্চি পেতে চাদর পেতে বালিশ দিয়ে শোবার জায়গা করে দিয়েছে; দারোগার জন্যে এর উপর তোষক আছে। এবং প্রত্যেককেই কম্বল দেওয়া হয়েছে। জানালগুলি বন্ধ। চমৎকার আরামপ্রদ গরম হয়ে আছে ঘরখানা।

এইখানে শুইয়ে শশীবাবু বিদায় নিলেন—তাহলে আমার ভাইটিমণি, আমি শুই গে ভাই। ঘরে আমার দুটো পরিবার ভাই। আঃ—কি করব বল। কপাল আর কি। তা শোও একলাই শোও।

ক্লান্ত দারোগাবাবু—মদের নেশায় ভাম দারোগাবাবু—উদরের ভারে অবসন্ন দারোগা-বাবু এবং কনেষ্টবলেরা শুয়েই মিনিট-কয়েকের মধ্যে প্রগাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারটে নাকের আটটা রন্ধ্র দিয়ে সে এক বিচিত্র কনসার্ট বাজতে লাগল।

এরই মধ্যে প্রথম ঘুম ভাঙল একজন সিপাহীর। যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে কিসের ঠান্ডা স্পর্শ লাগছে। তাছাড়া একটা কেমন যেন শব্দও হচ্ছে। নাক ডাকার মিলিত শব্দ ছাড়া আর একটা শব্দ। কি? কি?

'হড়-হড়-হড়' 'হড়-হড়-হড় 'হড়-হড়-হড়'!

কি? সিপাহীর হাতে যেন স্পর্শটা লাগছে। যেন জলের স্পর্শ। হাতখানা ভিজে গেছে। শুধু হাত কেন? এই তো জল—এই তো জল—এই তো জল! ওই তো বাইরে শব্দ উঠছে—"হড়-হড়-হড়', ও তো জলের শব্দ।

সে তাড়াতাড়ি উঠে চামারী সিংকে ডাকলে—আ-হো, হো চামারিয়া ভাইয়া। এ দাদা হো! উঠোতানি, উঠো দাদা হো। উ লোক পানি ডারতা হ্যায় বাহার সে!

তাই ঢালছে। বাইরে বন্ধ জানালার ওপারে পুকুর থেকে ভারে ভারে জল তুলে হুড় হুড় করে ঢেলে দিচ্ছে—একটা নালা দিয়ে সেই জল এসে ঢুকছে ঘরের মেঝের মধ্যে; ভিজিয়ে দিচ্ছে খড়, বিছানা, জামা-কাপড় সব।

আলোটা উস্কে দিয়ে চামারী উঠে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজার খিল খুলে টানলে। কিন্তু খুলল না। বাইরে থেকে বন্ধ।

চামারী দারোগাবাবুকে ডাকলে। দারোগাবাবু। দারোগাবাবু। উঠিয়ে হুজুর। উঠ যাইয়ে। পানি সে বিলকুল সব ভরিয়ে গেল। শশীবাবু বাহার সে পানি ঢালছেন।

—বাবুজী, শশীবাবু সাব! বাবুজী!

—আরে হামি কুছ নাহি জানতা হ্যায় চামারী সিং। হামকে বাঁধকে রাখিয়ে দিয়েছে। ভূত—ভাইয়া ভূত। এই শীতকা রাতমে হামকে বাঁধকে রাখিয়েছে, আওর জানালাকা ভিতর সে ভার ভার পানি উঠাকে ঢালতা হ্যায়। কেয়া করে গা হাম।

হা-হা-হা-হা-হা-।

—শশীবাবু! শশীবাবু!

—কে দারোগাভাই!

—হ্যাঁ দাদা আমি। আমার দোষ হয়েছে দাদা। আমি ঘাট মানছি দাদা—। এই শীতে জল ঢেলে আর রোগে ফেলবেন না দাদা। বিধবা মায়ের আমি ছোট ছেলে। একটু আদরের। দোষ আমার হয়েছে।

—হয়েছে? স্বীকার করছ?

—করছি।

—ওরে শালা ভূতরা বন্ধ কর্। পানি ঢালা বন্ধ কর।—

বন্ধ হয়ে গেল জল ঢালা।

—এবার দরজাটা খুলে দেন দাদা।

—দিচ্ছি। দে রে দরজা খুলে দে।

দরজা খুলল। শশীবাবু তাদের হাত ধরে পাশের ঘরে এনে বললেন—শোও, বাকি রাতের জন্যে নিশ্চিন্ত ঘুমোও। শশী-শেখরের বাত—হাতীকা দাঁত, কোন ব্যাঘাত হবে না। নাও কাপড় ছাড়। সব ঠিক করা আছে দেখ। আর এক পাত্তর খাও। আর চামারী তোমরা একবার দম দিয়ে নাও।—বাস্, দরজা দিয়ে দাও। আমি চললাম।

হয়তো সামন্ততন্ত্রের এবং ধর্মসর্বস্ব যুগের একজন আদুরে দুলাল ব্যক্তির প্রমত্ত মস্তিষ্কের এবং অহংকৃত ব্যক্তিত্বের ছেলে-মানুষী কৌতুক এবং নিষ্ঠুরতা একসঙ্গে দুই-ই।

তবু তাছাড়া আরও কিছু যেন আছে।

বাকীটুকু শুনলেই তা সম্ভবত মানতে হবে।

পরদিন সকালে ফেরারী আসামীটিকে শশীবাবুর কাছারীতে প্রতীক্ষমান অবস্থায় পাওয়া গেল। সে নিজেই এসে আত্মসমর্পণ করলে। দারোগাকে শশীবাবু বললেন—নাও ভাই—নিয়ে যাও তোমার আসামী। আসামীকে বললেন—ধরা তো পড়তিসই। আর এভাবে ফেরার থেকেই বা করবি কি? তার থেকে যা করেছিস, তার জন্যে মেয়াদটা খেটে আয়গে। চলে যা। তোর মাগ্-ছেলে রইল, তাদের জন্যে ভাবিস নে। খোরাকী ধান আমি দোব। বুঝলি। চলে যা।

এই শশীবাবু!

মরবার সময়ও তিনি নাকি বলেছিলেন —যাঁহা শশীশেখর তাঁহাই ডেংগেরা। জয় কালী।

শুনেছি, ঠিক জানিনে। না—সত্য কথাটা বলাই ভাল শেষটুকু আমার যোজনা।

পিকাসোর চোখে সাত নারী

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
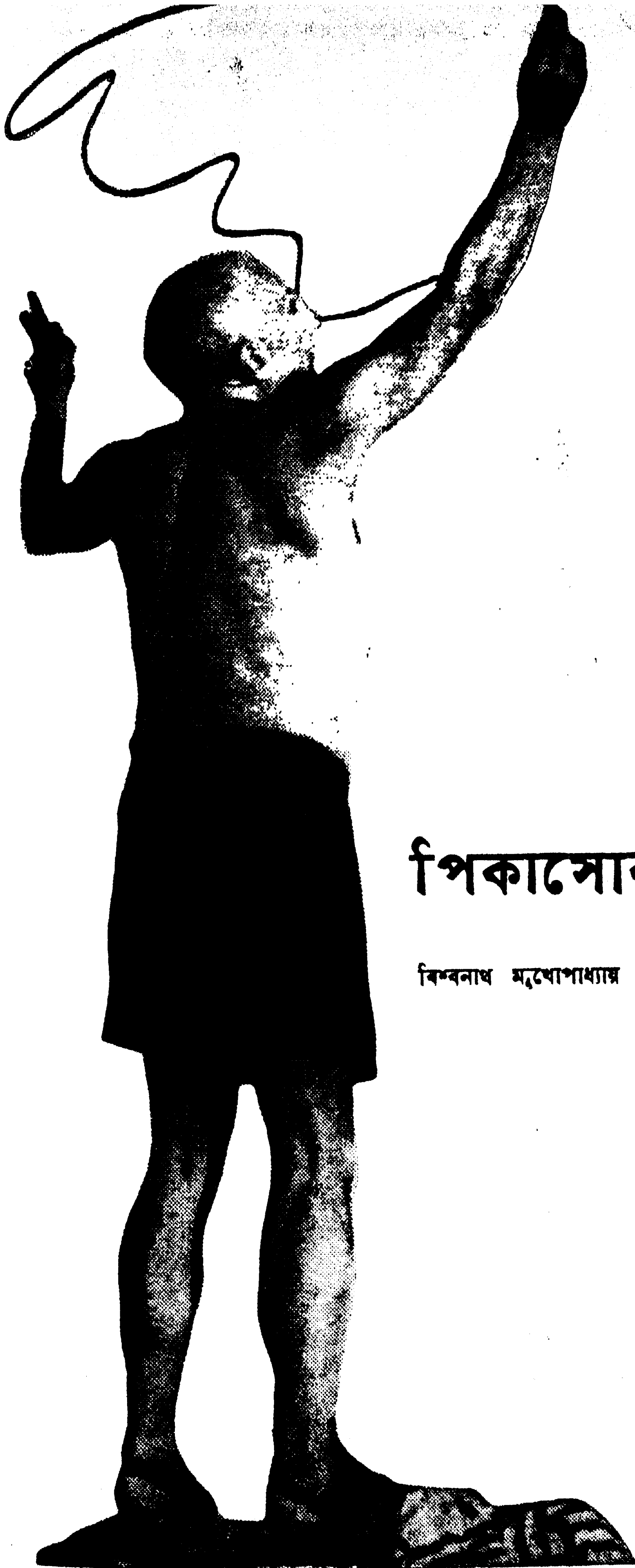
মহৎ শিল্পসৃষ্টি একদিকে যেমন শিল্পীমানসের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তেমনি তা জীবন অনুভূতি প্রকাশের নৈষ্ঠিকসাধনা। শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ শিল্পোপলব্ধির তারতম্য ও সক্রিয় অধ্যবসায়-নির্ভর। অন্বীক্ষা এবং অনুশীলনই মহাশিল্পীদের হৃদয়-সংবাদী হবার সফল সরণি।

তাই ফ্রান্সের শিল্পানুরাগীরা এ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পী পাবলো পিকাসোর পঁচাশী বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্যারিসের গ্রান্ড প্যালেতে তাঁর ১৯০০ সালের পরবর্তী শিল্পসৃষ্টির এক অদ্ভুত সংগ্রহের সুবিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। গত ১৯ নভেম্বর স্বয়ং পিকাসো সেই মহাপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তদবধি শুধু যে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পিকাসো অনুরাগীরা সেই প্রদর্শনী দেখতে প্যারিসে জড় হচ্ছেন তাই নয়, দেশ-দেশান্তরে পত্র-পত্রিকাগুলি পিকাসোর শিল্পপ্রতিভার সমীক্ষায় মুখর হয়ে উঠেছে।

যদিও এ প্রদর্শনীতে স্পেনের ভয়াল গৃহযুদ্ধে শিল্পীর গভীর মর্মবেদনার অবিস্মরণীয় প্রতিচ্ছবি গোয়ের্নিকা কিম্বা ডেজনে সিঅলে আর্ব প্রভৃতি পিকাসোর কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ ছবি আনা সম্ভব হয়নি তবু তার ভুবনবিখ্যাত অনেক ছবি, স্কেচ, ড্রইং, সিরামিকস, ভাস্কর্য ও টুকুম-টাকুম সেখানে এসেছে। শিল্পৈশ্বর্যের কথা ছেড়ে দিলেও, সৃষ্টির অভিভূতকারী বিপুলতা ও বৈচিত্র্যে পিকাসো শিল্পের ইতিহাসে অনন্য। কৈশোরোত্তীর্ণ পিকাসোর দীর্ঘ, সুস্থ, কর্মোদ্দীপ্ত জীবনে এমন খুব কম দিনই গিয়েছে যেদিন তিনি কোন-না-কোন শিল্পকর্মে না লিপ্ত থেকেছেন। বর্তমান প্রদর্শনীটি তাঁর সেই অতি-মানবিক সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ও বিশালতার সামগ্রিক না হলেও সম্যক পরিচয়। সেই পরিচয়ের আরেক উপলব্ধি হল শিল্পী, মানসের নানা পর্যায়ের বিবর্তন ও তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের এক তুলনাহীন চিত্রায়ণ।

পিকাসোর শিল্পসৃষ্টির পরেই তাঁর জীবন সম্পর্কে মানুষের অদম্য কৌতূহল হচ্ছে তাঁর পরিবর্তনশীল, চঞ্চল, ক্ষুব্ধ তীব্র প্রণয় কথা। তাঁর দীর্ঘায়ু জীবনে কত যে বিচিত্র রূপিণী নারীদের আনাগোনা! অধিকাংশকে পিকাসো তাঁর অমর তুলির যাদুতে চিরন্তনী করে রেখেছেন। মহাশিল্পীর জীবনে জড়িত সেই বহু নারীর মধ্যে বিশিষ্টা হচ্ছেন সাতজন। —এ-

প্রদর্শনীতে পিকাসোর চোখ দিয়ে সেই সাত নারীর পরিচয় প্রমূর্ত।

প্রথমা ফেরনান্দে অলিভিয়ের। উনিশশো চার সালে তরুণ পিকাসো যখন মন্টমার্টে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টায় আপ্রাণ সাধনামগ্ন তখন একুশ বছরের এই তন্বী তরুণী তাঁর জীবনে এলেন। ন বছর সহবাস করার পর তাঁদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়। অলিভিয়ের পরে বলেন, 'সে বিশ্বাস রাখেনি। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত সে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবেই,—এই ভরসায় ধৈর্য ধরে বসে ছিলাম।' —কিন্তু পিকাসো কোনদিন ফিরে যাননি। সম্প্রতি অলিভিয়ের দারিদ্র্যের মধ্যে মারা গেছেন। তিনি তাঁর পিকাসো স্মৃতি সম্পর্কে একটি বই লিখে গেছেন।

দ্বিতীয়া অলগা কোখ্লভা ছিলেন রুশ নর্তকী। ১৯১৮ সালে তাঁর সঙ্গে পিকাসোর বিয়ে হয়। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। কোখলভা ও সন্তানকে নিয়ে পিকাসো মাতৃস্নেহের যুগপুরাতন বিষয়বস্তু অবলম্বনে কয়েকটি ছবি আঁকেন। পরে কোখলভার সঙ্গে পিকাসোর সম্পর্ক তিক্ত হতে হতে প্রায় বৈরীতায় দাঁড়িয়ে যায় এবং তাঁকে আর স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিরূপে নয়, দানবীরূপে দেখতে ও আঁকতে লাগলেন।

'৩৫ সালে তাঁদের বিয়ে ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু অলগার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের

বাস্তবের তিন নারী : ধরা পড়েছেন পিকাসোর তুলিতে

সেই তিক্ত, দ্বেষ ও তীব্র ঘৃণার সম্পর্কের জের মেটেনি।

পিকাসো ও অলগার দাম্পত্য জীবন শেষ হবার আগেই মারি থেরেসে ওয়ালটার নামে তৃতীয়া নারী পিকাসোর জীবনে এলেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি পিকাসোর মডেলের কাজ করতেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁদের সম্পর্কের রূপান্তর ঘটলো এবং '৩৫ সালে তাঁদের সেই সম্পর্কের ফলস্বরূপ একটি কন্যা জন্মালো। '৩৬ সাল পর্যন্ত কমনীয় ও কামময়ী নারী চিত্রায়ণে শ্রীমতী ওয়াল্টার ছিলেন পিকাসোর প্রধানা মডেল। বাঁক বক্র, ডিম্বাকৃতি রেখা ও নানা বিচিত্র ঢঙে পিকাসো সে যুগের নারীমূর্তিগুলি এঁকেছেন।

শ্রীমতী ওয়ালটারের মডেলবৃত্তির শে... বছর পিকাসোর সঙ্গে যুগোশ্লাভ ফটো-গ্রাফার শ্রীমতী ডোরা মাআর দেখা হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধাবলম্বনে তাঁর সর্বচে... বিখ্যাত ছবি গোয়ের্নিকায় তিনিই হচ্ছেন ক্রন্দনরতা নারী। ১৯৪৩ সালে তাঁদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়।

'৪৩ সালেরই মে মাসে নাৎসী অধিকৃত প্যারিসের সেন নদীর বাম তীরে একটি রেস্তোরাঁয় ফ্রাঁসোয়াজ জিলো নামে এক একুশ বছরের তরুণী চিত্রশিল্পীর সঙ্গে পিকাসোর পরিচয় ঘটে। তখন তাঁর বয়স বাষট্টি। প্রায় দশ বছর পিকাসো এই তরুণীর সঙ্গে আবেগ-উদ্বেগ, মিলন উৎকণ্ঠা ও সন্দেহ-সহযোগিতার এক বিচিত্র ও জটিল জীবনযাপন করেন। ফ্রাঁসোয়াজের গর্ভে ও পিকাসোর ঔরসে একটি ছেলে ও আরেকটি মেয়ে জন্মায়।

ফ্রাঁসোয়াজকে মডেল করে পিকাসো এঁকেছেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'নারী-পুষ্প' এবং ফ্রাঁসোয়াজ তাঁদের সেই দশ বছরের অনন্য দাম্পত্য জীবন নিয়ে লিখেছেন 'পিকাসোর সঙ্গে জীবন', সম্প্রতিকালে এটি একটি বিপুলভাবে বিক্রীত জনপ্রিয় বই। সেই বইটির মধ্যে এক জায়গায় লিখেছেন যে, যদিও আযৌবন পিকাসোর জীবনে এ... বিচিত্র মতি মেজাজ ও রুচির নারী এসেছেন এবং চলে গেছেন কিন্তু পিকাসো

এরাও ছিলেন একদা পিকাসো প্রণয়ী

প্রকৃতপক্ষে কারুর সঙ্গেই সম্পর্কচ্ছেদ করেননি। তিনি হচ্ছেন সেইভাবের প্রেমিক যার পক্ষে তাঁর প্রাক্তন উপপত্নী কিম্বা রক্ষিতাদের একটি স্বতন্ত্র জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাই তিনি বলেছেন, 'আমি ক্রমে উপলব্ধি করলাম যে তাঁর মধ্যে সেই উপাখ্যানখ্যাত ব্লু বিয়ার্ডের মত একটা বেয়াড়া মনোবিকার আছে যার জন্যে তিনি তাঁর জীবনে সংগৃহীত সমস্ত মেয়েদের মাথাগুলি কেটে নিয়ে তাঁর নিজস্ব যাদুঘরে সংগ্রহ করে রাখতে চান। কিন্তু সে কাটা বলিদান নয়, জবাই। তিনি চান যে সব নারীরা কোন-না-কোন সময়ে তাঁর জীবনে এসেছে তারা মাঝে মাঝে তাদের উপপতির জীবনের চতুঃসীমার মধ্যে ভাঙা পুতুলের মত এক-আধবার নড়ে-চড়ে কিম্বা হর্ষ-বেদনায় চীৎকার করে প্রমাণ করবে যে এখনো তাদের জীবনের কিছুটা অবশিষ্ট আছে। আর সেই ভগ্নহৃদয়, ছিন্নজীবন হতভাগিনীদের জীবনাবশেষগুলি এমন একটি সুতোয় গাঁথা থাকবে যার প্রান্তটুকু থাকবে তাঁর মুঠোর মধ্যে।'

ফ্রাঁসোয়াজের বইটিতে পিকাসোর প্রাক্তন প্রেমিকা, বিশেষ করে অলগা কোখলভার যে বিকৃত মস্তিষ্কতা ও নিষ্ফল প্রতিহিংসা পরায়ণতার বিবরণ আছে তা মনকে রীতিমত নাড়া দেয়।

ফ্রাঁসোয়াজ বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার শূন্য স্থান পূরণ করলেন জ্যাকুলীন রোক। তিনি পিকাসোর পূর্ব-পরিচিতা এবং ফ্রাঁসোয়াজ বিদায় নিলে তিনি বল্লেন, 'আমাকেই তাঁর দেখা-শোনা করতে হবে।'

জ্যাকুলীনের সহবাস আরম্ভের কিছু-দিন পরেই অলগা কোখলভার মৃত্যু ঘটে। '৬১ সালে পিকাসো ৭৯ বছর বয়সে গোপনে ৩৫ বৎসর বয়স্কা জ্যাকুলীনকে বিয়ে করেন এবং তিনি তাঁর আইনত বিবাহিতা দ্বিতীয়া স্ত্রী। '৫৪ সালে পিকাসো প্রথম জ্যাকুলীনকে আঁকেন। সেই এঁকে চলা আজো অব্যাহত আছে।

জ্যাকুলীন পিকাসোর শিল্পরীতি ও শিল্পীজীবন সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বই লিখেছেন।

'৫০ দশকে পিকাসোর জীবনে আরেকজন নারী আসেন। তার নাম শ্রীমতী সেলভিজে। পিকাসো বহুবার, বহুভাবে, কখনো সোজাসুজি প্রমূর্ত করে, কখনো বা পিকাসোসুলভ ভাঙাচোরা এবং আকারান্তরেও বিকার ঘটিয়ে তাকে এঁকেছেন। তবে সম্ভবত তার সঙ্গে পিকাসোর সম্পর্ক শিল্পী ও মডেলের মধ্যেই সীমিত ছিল।

প্রদর্শনীতে যার ছবি নেই

প্রদর্শনীতে পিকাসো তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে বহু ছবি দিয়েছেন। কিন্তু পিকাসো অনুরাগীরা বিপুল আগ্রহের সঙ্গে যে ছবিটি বিশেষভাবেই দেখতে চাইবেন সেইটেই তিনি দেননি। সেটি মার্সেল উমবেয়ার ছবি। উনিশো তের সালে উমবেয়ারের সঙ্গে পিকাসোর প্রথম দেখা হয় এবং '১৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গে বাস করেছিলেন। কিন্তু মাত্র একবার তাঁকে এঁকেছিলেন।

—সম্ভবত বহু নারীর ঘনিষ্ঠতম সংসর্গে এলেও ঐ একটি মাত্র নারীকেই তিনি প্রকৃত পক্ষে ভালোবেসে ছিলেন।

তিন জন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমরা তিনজন
আমরা একই নৌকোর সোয়ারি
আমি তুমি আর সে
চলেছি একই বন্দরের সন্ধানে।

আমি কবি শিল্পী চারুকারু
আমি শুধু দেখছি চর্মচক্ষে
আপাতপ্রতীয়মানকে
দেখছি কেমনটি হয়ে আছে চোখের সামনে
ছন্দে শ্রীতে ভঙ্গিতে কেমন,
আমার কারবার শুধু কেমন-কে নিয়ে।

আর তুমি বৈজ্ঞানিক
তুমি দেখছ সূক্ষ্মযন্ত্রে, অনুবীক্ষণে
শুধু দেখছ কী আছে, কী আছে
গহনে গহ্বরে সমস্ত আবরণের অন্তরালে
অণুর অন্দরমহলে, শূন্যের দুর্গমে,
কী আছে, আরো যেন কী আছে
এর পরেও যেন আরো কী
আরো—
তোমার কারবার শুধু কী-কে নিয়ে।

আর সে
অজানা নির্জনে বসেছে কঠিন ধ্যানাসনে
সে দেখছে তৃতীয় নয়নে
বুদ্ধির অতীত বোধে
দেখছে, কে আছে? কে আছে?
দুটি জড়কণা ছুটে এসে মিলিত হয়েই
এই জগতের বিস্ফোরণ—
কে প্রথম ছোটাল তাদের
কে তাদের অন্ধ করে মিলিত করল।
তার কারবার শুধু কে-কে নিয়ে।

আমরা তিন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী
চলেছি একই ভাঙা নৌকোয়
একই অতল জল ঠেলে-ঠেলে,
আমি দাঁড় টানছি তুমি হাল ধরে আছ
আর সে বসে গান গাইছে।
কিন্তু আমাদের এক মিলিত জিজ্ঞাসা
এক মিলিত আর্তনাদ—
কোথায়?

পানের কৌটো

কিন মিওচিট

এশিয়ার গল্প

।। চার ।।

ব্রহ্মদেশ

'পানের কৌটোটা কে বয়ে নিয়ে যাবে?'

প্রশ্নটা বড় জ্বালাচ্ছিল কো কো তিনকে। 'ফের কেউ একথা তুললে যাচ্ছেতাই কিছু একটা করে বসব আমি', মনে মনে ভাবল কো কো তিন। তারপর ঠুকে ঠুকে ছাই ঝাড়ল পাইপ থেকে, যেন খুব চটেছে। 'বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেবে—তাই নিয়ে এতো কান্ড করার কি আছে? একটা পরিবারের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বই তো নয়। ওদের উচিত ছেলেগুলোকে হলুদ পোষাক দিয়ে সোজা মঠে পাঠিয়ে দেওয়া। মঠের সন্ন্যাসীরাই ওদের মাথা কামিয়ে সেই পোষাক পরিয়ে দেবে। এর জন্যে গানের দল নিয়ে, ঘোড়া নিয়ে শোভাযাত্রা করবার কি আছে?'

নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল কো কো তিন। না বলে উপায়ই বা কি, কে শুনছে তার এসব যুক্তিপূর্ণ কথা। প্রথম যেদিন নিজের শহরে ফিরে এল কো কো তিন সেদিন থেকেই কারো সঙ্গে মেলাতে পারছে না নিজেকে। শহরটা ছোট হলেও সমৃদ্ধিশালী। চারদিক ধানক্ষেত দিয়ে ঘেরা। আত্মীয়স্বজনরা সাধারণ মানুষ, সহজ সরল। কো কো তিন ফিরে এলে তারা যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা করেছিল তাকে। কিন্তু করলে কি হবে, সে নিজেই পাল্টে গেছে, আগেকার সেই ফুর্তিবাজ মন আর নেই তার।

কো কো তিন-এর অভিযোগ—সব পাল্টে গেছে। আসলে পাল্টেছে সে নিজেই এবং সেজন্যে অন্য কাউকেই দোষ দিতে পারে না সে। তার আত্মীয়-স্বজনরা মোটেই পাল্টায়নি, আগের মতই রয়েছে, তেমনিই সরল আর মন-খোলা। শুধু সে নিজে আর সেই স্কুলে-পড়া ছেলেটি নেই। তখন এই সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ যে সামান্য আনন্দের উপহার দিতে পারত তার জন্যেই উদ্গ্রীব হয়ে থাকত সে। এখন সে বিদেশ থেকে একগাদা ডিগ্রীর মালা নিয়ে দেশে ফিরেছে, উঠতি আইনজীবী একজন; এখন আর এই ছোট শহরে দীক্ষা গ্রহণের মত বাজে ব্যাপারের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে।

কাকার চিঠি পেয়েই বড় শহর থেকে এখানে এসেছে কো কো তিন। কাকা লিখেছিলেন: আমাদের ইচ্ছা আমার ছেলে-দের অর্থাৎ তোমার খুড়তুতো ভাইদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের উৎসবে তুমি উপস্থিত থাক। বৃদ্ধ পিতামহ মৃত্যুর পূর্বে দেখে যেতে চান ওরা বৌদ্ধ পোষাক পরেছে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ তুমি, কিন্তু ফিরে আসার পর তোমার সঙ্গে বিশেষ দেখাশোনাই হয়নি আমাদের। দীক্ষাগ্রহণের এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিবারের সবাই আসবে। তুমি এলে পিতামহও খুবই খুশি হবেন এবং যদি যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে আসতে পার তাহলে তোমাকে বৌদ্ধ যাজকের পদে অভিষিক্ত করা হবে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমাদের পরিবারে ছোট ছেলেদের দীক্ষাগ্রহণ এবং একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের যাজকের পদে অভিষেক একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আমার ছেলে-দের কারোরই বয়স এখনো বিশ বছর হয়নি, সুতরাং যাজকের পদে অভিষিক্ত হবার অধিকারও হয়নি তাদের। তুমি ছাড়া আর কোন উপযুক্ত লোক দেখছি না আমি। আমরা সবাই আমাদের পারিবারিক রীতি-নীতিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তাছাড়া, এবারে পানের কৌটো কে বয়ে নিয়ে যাবে দেখবার জন্যেও সবাই উদ্গ্রীব হয়ে থাকবে। তোমার কাকীমা হ্লা তো রীতি-মত উত্তেজিত।

কো কো তিন এসেছে। তার নিজের দীক্ষাগ্রহণের কথা এখনো পরিষ্কার মনে আছে তার। সেবার তার কাকাকে যাজকের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। গান-বাজনার দল নিয়ে খুব জাঁক-জমক করে শোভাযাত্রা করা হয়েছিল। একদল মেয়ে ছিল শোভা-যাত্রায়, হাতে হলুদ বৌদ্ধ পোষাক এবং সন্ন্যাসীদের জন্য চমৎকার রঙিন মোড়কে মোড়া উপহার। যে পানের কৌটো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে ছিল সবচেয়ে নজরে পড়ার মত। ওখানকার সব সেরা সুন্দরী সে এবং সেজন্যেই পানের কৌটো বয়ে নিয়ে যাবার সম্মান সে পেয়েছিল।

মনে পড়ছে, গানের দলের ছেলেরা নানারকম রসিকতা করে গান গাইছিল। ধীসকতার উদ্দেশ্য সুন্দরী মেয়েটি—তার প্রেমিক ত যাজকের পদে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছে, এক সপ্তাহ আটকে থাকতে হবে আশ্রমে, তখন কি রকম লাগবে তার? আর যদি সে পুরো তিন মাস থাকতে চায়?

বাদ্যযন্ত্রগুলো আকাশ ফাটানো আওয়াজ করে উঠল হঠাৎ, যেন মেয়েটির হৃদয়ের তোলপাড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইল। গানের দল থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠল, 'হো! হো! হো দেখো, পানের কৌটোটা যেন ফেলে দিও না আবার!'

পনেরো বছর আগের ঘটনা এটা। সেদিন যে পানের কৌটো বয়ে নিয়ে গিয়ে-ছিল তাকেই বিয়ে করেছিলেন তার কাকা এবং তিনিই তার কাকীমা হ্লা। আবার সেই অনুষ্ঠান হবে তাদের পরিবারে। শহরের লোকেরা উদ্গ্রীব হয়ে আছে অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে। পানের কৌটো বইবার জন্যে মেয়ে বাছাই করা হবে। কিন্তু তাই নিয়ে লোকের মনে এতো উৎসাহের সৃষ্টি হবে বুঝতেই পারেনি কো কো তিন। এ যে মিস ইউনিভার্সের নির্বাচনকেও হার মানাল! কারণটা তার মাথায় ঢুকতে সময় লাগল একটু—যাকে পানের কৌটো বইতে দেওয়া হবে সে যে শুধু শহরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর স্বীকৃতি পাবে তাই নয়, তাদের পরিবারের বধূও হবে সেই।

স্থানীয় লোকজন, ধানের ক্ষেতে কাজ করাই যাদের অহংকৃত ঐতিহ্য, তাদের পক্ষে এ রীতি চমৎকার মানানসই। কেননা যে মেয়েটিকে পানের কৌটো বইতে দেওয়া হবে তার সঙ্গেই বড় হয়ে উঠেছে সে এবং কালক্রমে পরস্পরকে ভালবেসেছে তারা। কিন্তু কো কো তিন ত তার কাকাদের মত এই মফস্বলে মানুষ হয়নি। তাকে বড় শহরে পাঠান হয়েছে লেখাপড়া শিখতে। ছুটিছাটা ছাড়া এ শহরে বিশেষ থাকেইনি সে। সুতরাং তার ক্ষেত্রে এ রীতি অচল।

অবশ্য তার মানে এ নয় যে সে এখন একটা মস্ত কেউকেটা হয়েছে এবং এই মফস্বল শহর আর তার রীতি-নীতি তাকে আর মানাচ্ছে না—ভাবতে ভাবতে নিজেকে প্রায় ধমকে উঠল কো কো তিন। দূর বিদেশে এই ছোট শহরের স্মৃতিই বয়ে বেড়িয়েছে সে। এখানকার প্যাগোডা উৎসবের কথা বার বার মনে পড়ত তার। চারপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক গরুর গাড়ি চড়ে এখানে আসত আর পুরো অঞ্চলটা জুড়ে নাচ আর গানের বন্যা বইত।

পাইপে গোটা কয়েক টান দিল কো কো তিন, দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। তার শহরের লোকজনের কার্যকলাপ তাকে এমন করে জড়িয়ে ফেলবে ভাবতেই পারেনি সে। ওরা কি ভেবেছিল একটা মেয়ে যার সঙ্গে তার পরিচয় পর্যন্ত নেই তাকে বিয়ে করবে সে, যেহেতু পানের কৌটো বইবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে মেয়েটি?

'তোমরা কেউ বয়ে নিয়ে যেতে চাও এই কৌটো?' কাকীমা হ্লার গলা কানে এলো কো কো তিন-এর। লাল লাক্ষা দিয়ে তৈরি পানের কৌটোটা একখণ্ড সিল্কের কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন হ্লা। সুন্দর করে খোদাই করা একটি পায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে কৌটোটি, ঢাকনার ওপর একটি পৌরাণিক পাখীর মূর্তি। আশ্চর্য সুন্দর কৌটোটা। সুতরাং তার বাহকেরও সুন্দরী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কৌটোর সর্বশেষ বাহক সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং পরিণত মনের মহিলা ছিলেন। স্মৃতির ভারে চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ ছিল তার। 'এখন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—পানের কৌটো নিয়ে যখন শোভাযাত্রায় গিয়েছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর', বলল, কো কো তিন। খুশিতে গোলাপী ছোপ লাগল হ্লার গালে, 'ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি ত আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না', বলল হ্লা, 'শহরে যদি তোমার কোন বান্ধবী থাকে তাকে নিয়ে আসছ না কেন এখানে?'

আতঙ্কে হাত তুলল কো কো তিন, 'তুমি কি ভেবেছ আমার বান্ধবী শহর থেকে এসে এই রাস্তা দিয়ে পানের কৌটো বয়ে নিয়ে যাবে, ঐ সব ঠাট্টা-তামাসা আর বিশ্রী গান-বাজনা সহ্য করবে? কক্ষনো না। খুব ভুল করেছ তুমি।'

'কেন, এই কৌটো বয়ে নিয়ে যাওয়া ত একটা সম্মানের ব্যাপার। এতে আপত্তি করার কি আছে?' বলল হ্লা।

'তুমি জান না, শহরের মেয়েরা আজ-কাল আর এসব জিনিষ পছন্দ করে না। ওরা—' হঠাৎ থেমে গেল কো কো তিন। শহরের মেয়েদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে কিভাবে সমর্থন করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

'এই পোষাকটা পরেছিলাম আমি', একটা সিল্কের স্কার্ট দেখিয়ে বলল হ্লা, 'দ্যাখো, কি রকম চমৎকার নতুন রয়েছে এখনো!'

স্কার্টটার রং হালকা সোনালী, ওপরের দিকের যে অংশটুকু কোমরের সঙ্গে জড়ান থাকবে তার রঙ কালো। মাঝের অংশে সোনা এবং রূপোর জরির কাজ, রূপোলী চুমকি বসান। নীচের অংশটুকু সাদা সিল্কের আর তার ওপর সূক্ষ্ম কাল সুতোর সমান্তরাল রেখা কয়েকটা।

হ্লার পানের কৌটো বয়ে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা মনে পড়ল কো কো তিন-এর। তার এক হাতে ছিল কৌটোটা অন্য হাতে স্কার্টের সাদা প্রান্তভাগ। পায়ে লাল চটি। স্কার্টটা পাখীর ডানার মত ঝুলে ছিল। পায়ের ওপর আর পোষাকের আড়াল থেকে যেন ছোট্ট ইঁদুরের মত উঁকি দিচ্ছিল তার পায়ের আঙুল। সুন্দরী সুঠাম হ্লার চলনে লাবণ্য ঝরে পড়ছিল। রঙ-করা পায়ের নখ আর হাই হিলের কথা মনে পড়তে হাসি পেল কো কো তিনের এবং সেই সঙ্গে তার শহরের বান্ধবী মেইজির কথাও মনে পড়ল। 'মেইজি ত এসে পড়ল বলে, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে! ভগবান রক্ষে কর!' ভাবল কো কো তিন।

এই অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন শহরে কেন যে সে মেইজিকে আসতে বলেছিল। 'স্বজনদের সম্বন্ধে সে যে লজ্জিত তা মোটেই নয়', নিজেকে শাসন করল কো কো তিন, 'আসলে এদের এই আদ্দিকালের কান্ডকারখানার সঙ্গে মেইজি মোটেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না।'

কিন্তু মেইজির আসবার খবরটা কি করে বলবে সে হ্লাকে? তাদের দুজনের মধ্যে যে কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই তা ত কিছুতেই বিশ্বাস করবে না হ্লা, শত বললেও না।

হ্লাকে মেইজির কথা বলতে গিয়ে উল্টোপাল্টা বকে এক কান্ডই করেছিল সে। ভাবতেও খারাপ লাগছিল কো কো তিন-এর, মেইজি বর্মী মেয়েই—অন্য দেশের নয়—তবে আধুনিক—আইনব্যবসায়ী, তার সহকর্মী—না, না বুড়ি নয়, বয়স অল্পই—বিবাহিতও নয়—একাই আসছে—তার প্রেমিকাও নয়, নিছক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তার সঙ্গে—পুরো পথটা নিজে গাড়ি চালিয়ে আসছে—দেখেছ আজকালকার মেয়েরা সব কি রকম—নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই নিতে পারে।

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল হ্লা, যেন ঠিক-ঠিক বুঝতে পেরেছে সব। কিন্তু কো কো তিন জানত, ঠিক উল্টো বুঝেছে সব কিছু। 'ঈশ্বর! আদালতে গিয়ে এভাবে কথা বললেই হয়েছে আর কি, একেবারে ডুবিয়ে দেব নিজেকে।' বিষন্ন মুখে ভাবল কো কো তিন।

কপাল ভাল, শহরের শান্ত নির্জন জীবনের মধ্যে মেইজির প্রবেশের দৃশ্যে উপস্থিত ছিল না সে। দীক্ষাগ্রহণের উৎসব সংক্রান্ত কাজে মঠে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল মেইজির লাল রঙ-এর গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দরজায় আর হ্লার কাছে বসে গল্প করছে মেইজি। হ্লা তখন লাক্ষার কৌটো, রুপোর গ্লাস, সাদা হাতী সব পরিষ্কার করতে বসেছে। উৎসবের জন্য নামান হয়েছে এগুলো। মেইজি তার ছুঁচলো নখে লাল রঙ মেখে হিংস্র করে তুলেছে তাকে, চুলের সযত্ন বিন্যাস এমন যে দেখলে মনে হবে হাওয়ার ঝাপটা লেগেছে, সিগারেট ঝুলছে রঙ-করা ঠোঁট থেকে; ঝকমক করছে মেইজি—পোষাকে পরিচ্ছেদে, শহুরেপনায়।

জিনিষগুলোর দিকে তাকিয়ে ভদ্র-গোছের একটু ঔৎসুক্য দেখাল মেইজি; বলল, 'পুরনো কায়দায় দীক্ষাগ্রহণের মিছিল দেখবার জন্যে ছটফট করছি আমি। আমাদের শহরে সেদিন মিছিল করেছিলাম আমরা, তবে গাড়ি করে গিয়েছিল সবাই—এখানকার মত এত ধীর মন্থরগতিতে নয়। এমন সুন্দর নয়—যারা দীক্ষিত হবে তারা ঘোড়ার পিঠে আর অন্যান্য মেয়ে-পুরুষরা পায়ে হেঁটে যায় নি।'

'কোথায় কি বলতে হবে ঠিক জানে মেইজি', ভাবল কো কো তিন, কিন্তু তার কেমন মনে হয় মেইজির কথার মধ্যে কেমন একটু পিঠ চাপড়ানোর ভাব আছে। ভেতরে ভেতরে নিস্ফল আক্রোশে ফুঁসতে লাগল সে। কিন্তু দোষ ত তারই। মেইজিকে আসতে বলে অত্যন্ত নির্বোধের মত কাজ করেছে সে।

যাই হোক, নিমন্ত্রণ করেছে অতএব অতিথিসেবায় মন দিল কো কো তিন। বেড়াতে বেরুল মেইজিকে নিয়ে। ধান-ক্ষেতের চারদিক ঘুরে-ঘুরে তুষ ঝাড়া দেখাল, মেইজি খুব খুশি—প্রায় স্কুলে-পড়া বাচ্চা মেয়ের মত। 'পরিবেশের এই পরিবর্তন বোধহয় খুব ভাল লেগেছে ওর,' ভাবল কো কো তিন। আম আর পেয়ারা গাছের ঠান্ডা ছায়ায় বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে বৌদ্ধ মঠটা। মেইজিকে দেখাল কো কো তিন।

একটা বট গাছের নিচে বাঁশের মাচার ওপর গিয়ে বসল তারা। কো কো তিন তাদের পরিবারে দীক্ষাগ্রহণের রীতি ব্যাখ্যা করে বোঝাল মেইজিকে। তাদের পরিবারের ছেলেরা অল্পবয়সে যে মঠে দীক্ষিত হয়ে পরে বড় হয়ে সেই মঠেই যাজক পদে অভিষিক্ত হবে। তার পরিবার গোঁড়া বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী ছেলেদের দীক্ষাগ্রহণকে অবশ্য করণীয় বলে মনে করে তারা। ছেলেবেলায় হলুদ বৌদ্ধ পোষাক-পরা এবং বড় হয়ে যাজকের পদে অভিষিক্ত হওয়াকে চরম সম্মান বলে মনে করে।

এবারে অভিষিক্ত হবার পালা তার—মেইজিকে বলল কো কো তিন। এক সপ্তাহ মঠে গিয়ে থাকতে হবে তাকে। সুতরাং একাই শহরে ফিরে যেতে হবে মেইজিকে, কিছু মনে করবে না ত মেইজি?

এক টুকরো খড় চিবুচ্ছিল মেইজি। সূর্য ডুবছে। ফসলহীন মাঠে কেটে নেওয়া ধান গাছের গোড়ার ওপর গোলাপী আলোর ছোঁয়া লেগেছে। সেদিকে বিষন্ন উদাস দৃষ্টিতে তাকাল মেইজি, খুব শান্তকণ্ঠে বলল, 'চমৎকার লাগছে জায়গাটা।' কো কো তিন-এর ইচ্ছে হল মেইজিকে এই একটা সপ্তাহ থাকতে বলে এখানে—মঠ থেকে তার ফিরে আসা পর্যন্ত। কিন্তু মেইজির চোখে হঠাৎ কৌতুকের ঝিলিক দেখা দিল, 'মঠ থেকে যখন ফিরে আসবে—মাথা কামান অথচ সন্ন্যাসীর পোষাক নেই, সাধারণ মানুষের পোষাক পরা—কী চমৎকার দেখাবে তোমাকে!' —একটা চালু গানের সুরে গুন-গুন করে গাইতে-গাইতে মাঠে নেমে পড়ল মেইজি। মাঠের সব ফসল কাটা হয় নি, কিছু রয়েছে তখনো, তার ফাঁক দিয়ে, আল-গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

পরদিন মেইজিকে সঙ্গদান করার মত সময় ছিল না কো কো তিনের। অন্য সবাইর মত সেও ব্যস্ত ছিল কাজে। মেইজিকে দেখা-শোনার ভার পড়েছিল হ্লার ওপর। এইসব সেকেলে রীতি-নীতি দেখে নিশ্চয়ই প্রাণভরে হাসবে মেইজি—ভাবছিল কো কো তিন, 'হ্লাকেও সেকেলে ভাবছে ও, স্পর্ধা বটে!' কথাটা মনে হতেই রাগ হল কো কো তিন-এর। মেইজিকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করতে পারছে না বলে আবার অপরাধীও মনে হচ্ছিল নিজেকে, ওর অনু-রাগ পাবার বিন্দুমাত্র আশাও যদি কখনো থেকে থাকত তাও গেল। নিজের শহরে ডেকে এনে তারপর এরকমভাবে উপেক্ষা করলে অন্ততঃ মেইজির মত মেয়ের মন পাওয়া যায় না।

হ্লা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। মেইজির চিঠি। লিখছে, হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠিয়েছে শহর থেকে, তাই চলে যেতে হচ্ছে তাকে। চিঠিতে প্রচুর ক্ষমাপ্রার্থনা আছে। গাড়িটা রেখে গেছে মেইজি। কারণ গাড়ির ইঞ্জিনের ওপর পুরো ভরসা নেই তার। কো কো তিন যেন ইঞ্জিনটা সারায় এবং শহরে নিয়ে যায় গাড়িটা।

চিঠি পেয়ে অবাক হল না কো কো তিন। এরকম কি একটা ঘটবে বলেই ধরে নিয়েছিল সে।

হ্লা খুব দুঃখিত। 'বেচারা! একটু আনন্দ ফুর্তি করছিল!' বলল হ্লা। কো কো তিন-এর যেমন একদিকে খুব একটা স্বস্তি বোধ হল তেমনি চটেও গেল আবার। স্বস্তিবোধ হল যথেষ্ট আপ্যায়ন না করতে পারার জন্য মেইজির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না বলে আর চটে গেল মেইজি এভাবে পালাল বলে। অথচ নিজেকে এভাবে সরিয়ে নিল বলে মেইজির কাছে বোধহয় তার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত।'

কো কো তিন উৎসবের কাজে ডুবিয়ে দিল নিজেকে। পানের কৌটো বইবার জন্য মেয়ে বাছাইয়ের কাজেও সাহায্য করতে এগিয়ে গেল সে। হ্লাকে ঘিরে স্থানীয় মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে সব, ঠাট্টা-তামাসা করছে নানারকম। কো কো তিন একবার চোখ বুলিয়ে নিল তাদের ওপর। মুখে-চোখে একটা তাজা ভাব সকলের। চাল-চলন গ্রাম্য হলেও মনোহর। 'মেইজির মত শহুরে মেয়েদের তুলনায় এদের তাজা চেহারা মনকে কত বেশি তৃপ্তি দেয়', ভাবল কো কো তিন, 'মেইজিকে আমি দেখাব এই মফস্বল শহরের একটি মিষ্টি ফুলও বড় শহরকে কেমন উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।'

দীক্ষাগ্রহণের দিনটি পরিষ্কার ঝক-ঝকে হয়ে দেখা দিল। খুব ভোরে সূর্যের আলো কোমল থাকতে থাকতে শোভাযাত্রা শুরু হবার কথা। কেননা শোভাযাত্রীদের পৌঁছতে হবে মঠে এবং তারা যাবে পায়ে

হেঁটে, খুব ধীরে ধীরে। রোদ কড়া হবার আগেই পেঁাছতে হবে। বাড়ির সামনে অনেক লোকের ভীড়, নানা রং-এর পোষাক তাদের গায়ে। প্রাচীনকালের সৈনিকের পোষাক পরে জিন দেওয়া ঘোড়া নিয়ে এক-সারি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যারা দীক্ষা নেবে ঘোড়াগুলো তাদের জন্যে। প্রতিটি ঘোড়ার কাছে লাল পোষাক পরা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে লম্বা ডাঁট-ওয়ালা সোনালী রং-এর ছাতা, দীক্ষার্থী ছেলেদের আড়াল করবে রোদ থেকে। মেয়েরা পদ্মফুল আঁকা হলুদ রং-এর বৌদ্ধ পোষাক, রুপোর পানপাত্র, ফুল এবং নৈবেদ্যের মোড়ক নিয়ে ব্যস্ত। শোভাযাত্রায় যাবার সময় সকলেই যাতে একটা করে জিনিষ বইতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

অবশেষে সবাই প্রস্তুত হল, যাত্রা শুরু হবে। কে একজন চীৎকার করে উঠল, 'এই যে! পানের কৌটো বইবার লোক এলো।'

শোভাযাত্রার আসল লোকটির কথাই ভুলে গিয়েছিল কো কো তিন। তখন মনে পড়ল। ভাল, এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একটু আলাপ করে রাখলে মন্দ হয় না!

সবাই যে দিকে তাকাচ্ছিল সেদিকে চোখ ফেরাল সে। ঐ তো, হ্লা নিয়ে আসছে তাকে, প্রাচীন বর্মী পোষাক পরা, চুল টান করে বেঁধে খোঁপা করেছে, ভ্রূর ওপর এসে পড়েছে কিছু আর দুই কান ঘিরে নেমেছে দুগোছা। চমৎকার দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে, এক হাতে স্কার্টের সাদা প্রান্তভাগ ধরে আছে আর লাল চটি পরা পায়ের ওপর পাখীর ডানার মত ঝুলে আছে স্কার্টটা। পানের কৌটোটা হলার হাতে। মেয়েটি শোভাযাত্রায় এসে তার জায়গায় দাঁড়ালে কৌটোটা তার হাতে দিয়ে দেবে সে।

বিস্মিত হয়ে তাকাল কো কা তিন। 'এমন সুন্দর দৃশ্য বোধহয় আর কখনো দেখা যায়নি। নারীর সৌন্দর্য এমনই, পুরুষকে প্রেরণা দেয়, মহৎ করে তোলে; মেইজির মত অসহিষ্ণু নয়। মেইজি কঠিন বাস্তববাদী, জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের মত উন্নতিকামী।' কো কো তিন এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। তার মনে হল পানের কৌটোটা তারই তুলে দেওয়া উচিত মেয়েটির হাতে। কেননা, এই মেয়েটি তার ভেতরের মহৎ বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে।

...দীক্ষাগ্রহণের রীতি ব্যাখ্যা করে বোঝালে মেইজিকে...

হ্লা খুশির হাসি হেসে তাকাল তার দিকে এবং কৌটোটা তুলে দিল তার হাতে, যেন তার মনের বাসনাটা বুঝতে পেরেছে সে। কো কো তিন ভালো করে তাকাল মেয়েটির দিকে, তারপর থেমে গেল হঠাৎ, 'মেইজি, তুমি।' চটে গিয়ে বলল কো কো তিন, 'আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার মানে?

'বেশি চ্যাঁচাবে না', উত্তর দিল মেইজি, 'কে কী ব্যবহার করেছে তোমার সঙ্গে? আমি চিরকাল এই পানের কৌটো নিয়ে সেকালের সুন্দরীদের মত মিছিলে যাবার স্বপ্ন দেখেছি। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে জানাব একথা, কিন্তু তুমি হাসবে বলে বলিনি। তোমার মুখের চেহারা দেখে, ব্যবহার দেখে খুব খারাপ লেগেছে আমার। তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তোমার নিজের লোকজনদের সম্বন্ধে তোমার লজ্জার শেষ নেই। সেকালের রীতিনীতি যে কত সুন্দর এবং তোমার আত্মীয়-স্বজনরা যে কী ভাল সে কথা তোমার মস্তিষ্কে ঢোকাবার সুযোগ আমি পাইনি। আমার কথা শুধু তোমার কাকীমা হ্লা বুঝতে পেরে-ছিল, আর তাই—'

'তোমরা দুজন ষড়যন্ত্র করে বোকা বানিয়েছ আমাকে', ফুঁসে উঠল কো কো তিন, 'এই নাও কৌটো। এটা বয়ে নিয়ে যাবার মানে জানো?' আরও কি বলল কো কো তিন, কিন্তু শোনা গেল না, ডুবে গেল গানের ঢেউয়ের নিচে।

গানের দল থেকে কে একজন গান শুরু করল: একটি মেয়ে সম্বন্ধে গান। মেয়েটির প্রেমিক মঠ থেকে ফিরে আসবে, সন্ন্যাসীর জীবন থেকে ফিরবে সাধারণ জীবনে। মেয়েটি আকাশী রং-এর 'পাসো' বুনেছে তার জন্যে, ফিরে এসে পরবে সে। পোষাকটি নিয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রেমিকের জন্যে।

মেইজিকে শোভাযাত্রায় তার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল কো কো তিন, 'তুমি কি আকাশী রং-এর 'পাসো' নিয়ে প্রতীক্ষা করবে আমার জন্যে?'

'না, আকাশী রং-এর পাসো নয়', নিচু গলায় বলল মেইজি, 'সবচেয়ে ঝকঝকে স্যুট আর তেমনি একটা টাই নিয়ে। তোমার কামানো মাথা নিয়ে কী চমৎকারই না দেখাবে তোমাকে!'

নিজের জায়গায় ফিরে এলো কো কো তিন। হাসছে মনে মনে। পানের কৌটো বইবার জন্য এমন ঝগড়াটে মেয়ে কেউ কখনো বেছে নেয়!

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

শিল্পী ওয়েলস

এই বছর হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের জন্ম-শতবার্ষিকী, সেই উপলক্ষে আমাদের এই বাংলাদেশে অনেকগুলি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, ওয়েলসকে এ-দেশের মানুষ যেভাবে স্মরণে রেখেছে, তাঁর স্বদেশে তাঁর সেই মর্যাদা বর্তমানে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। এই হ্রাস পাওয়ার মূলে অবশ্য ওয়েলসের ব্যক্তি-চরিত্র বা ওয়েলসের সাহিত্য কোনো দিক থেকেই দায়ী নয়, এর একমাত্র কারণ, বর্তমানের মেজাজ পরিবর্তিত, রুচি অন্য পথে।

ওয়েলসের মধ্যে কিন্তু প্রথম শ্রেণীর লেখকের সবকিছু মৌলিক গুণই ছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন মহৎ লেখক, তাঁর সৃজনীশক্তি ছিল অসামান্য, বলিষ্ঠ কল্পনা, তীক্ষ্ণ বোধ, সক্রিয় মেজাজ, অনুভূতির প্রাচুর্য। তাঁর চরিত্রে এবং প্রথম যুগের রচনা 'কিপস্', 'লুইসান' প্রভৃতির মধ্যে যে ডিকেন্সীয় প্রভাব বা সাদৃশ্য আছে, তা নিছক এক্সিডেন্ট নয়। কিন্তু কেন তিনি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পর স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে প্রচারবিদ সাংবাদিকে পরিণত হলেন? বার্নার্ড বারগনজী সম্প্রতি 'দি আর্লি এইচ জি ওয়েলস' নামে যে বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তার মধ্যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক রোমান্সের সন্ধানসূত্র পাওয়া গেলেও এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটি বস্তু পাওয়া যাবে, লেখক হিসাবে ওয়েলসের লেখকচরিত্রের ক্রম-বিকাশের একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

শ্রীযুক্ত বারগনজীর থীসিসের প্রথম বক্তব্য এই যে, হেনলীর উত্তরসাধক হলেও তিনি নন্দনতাত্ত্বিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি যুগ-সন্ধিক্ষণের ফসল। এই তথ্যটুকু অবশ্যই এড়িয়ে যাওয়া যায়। ওয়েলস নিজেও বলতেন যে যুগ-সন্ধি শুধু নয়, তার সঙ্গে ঘটবে ভূমন্ডলের পরিবর্তন। এই কল্প-কথাটি অতিশয় ভক্তিভরে লালন করেছেন হ্যুয়াসমান এবং ম্যাকস্ নরদু প্রভৃতি ভূষণ্ডি-কাকদের প্রচুর উধৃতিসহকারে। ম্যাকস্ নরদুকে অবক্ষয়ের প্রাণপুরুষ বলা হয়। তাঁর বিশ্লেষণ সুদূরপ্রসারী, বিশেষ করে টমাস হার্ডির জুডের মধ্যে 'মৃত্যু-বাসনা'-কে যেভাবে অনুমান করা হয়েছে, তা চমকপ্রদ। দুষ্কৃতিকারী পিতৃহন্তারক পুত্র সম্পর্কে ডাক্তারদের অভিমত শুনে জুড মন্তব্য করেছিল—

"It is the beginning of the coming universal wish not to live"

এ-কথা বলা হয়ত অন্যায় হবে না যে, এইচ জি ওয়েলসকে 'এস-ফ' বা সায়ান্স ফিক্সানের সফল লেখক হিসাবে চিহ্নিত করার যে উৎকট আগ্রহ, কিংবা তাঁকে জুলে ভার্নের সমকক্ষ হিসাবে উল্লেখ করার মধ্যে যে-বাড়াবাড়ি, তা নিছক অযৌক্তিক এবং আতিশয্য মাত্র।

তাঁর প্রথমদিকের রচনা বিষয়ে এক প্রশস্তি প্রসঙ্গে আরনলড বেনেট বলেছেন—'ওয়েলস মুখ্যত একজন সার্থক শিল্পী।' শ্রীযুক্ত বারগনজী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জুল ভার্নের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন, এই সূত্রে জুল ভার্ন নিজেই বলেছেন—

"I make use of physics; he (Wells) invents .... very curious; and I will add, very English".

তথাপি ওয়েলসের রচনাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বলে চিহ্নিত করার আগ্রহ, তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে যে গভীরতা ও আশাবাদ আছে, তাকে উপেক্ষা করার ঝোঁক এখনও প্রবল। যে বস্তুগত গুণ ওয়েলসের রচনায় বর্তমান, তাকে অবহেলা করা সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধির সংকীর্ণতা বলা যায়। শ্রীযুক্ত বারগনজী এইচ জি ওয়েলসের আভ্যন্তরীণ জীবন এবং অতিপ্রাকৃত চিন্তার মধ্যে একটা সংযোগসূত্রের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। যে মনোভংগী বারগনজীর বক্তব্যের মধ্যে পরিস্ফুট তাকে নিঃসন্দেহে নির্ভুল বলা যায়। ওয়েলস নিরলসগতিতে একটা পলায়নের হাত থেকে বেঁচে আসার আনন্দ-উৎসব করেছেন, এই পলায়ন হল তাঁর প্রতিভা, আর এই অসামান্য প্রতিভাই তাঁকে সমাজের যে নীচের তলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল, তার হাত থেকে বার করে এনেছে, বার করে নিয়ে এসেছে এডওয়ার্ডীয় প্রদোষালোকে উদ্ভাসিত মধ্যবিত্ত সমাজের মাঝখানটিতে।

স্বাভাবিক কারণেই 'দি টাইম মেশিন' অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। আমার ধারণা ছিল যে, ওয়েলসের এই আশ্চর্য গল্পটি, যে-গল্পটিকে জোসেফ কনরাড থেকে ভি এস প্রিচেট পর্যন্ত এই গল্পটির প্রশংসা করেছেন, তা এক আকস্মিক প্রেরণার ফলশ্রুতি। হেনলীর 'নিউ রিভিয়্যু' পত্রিকায় হয়ত গল্পটি রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রিত হয়েছিল। অনেকের হয়ত জানা নেই যে, এই 'নিউ রিভিয়্যু' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে 'দি টাইম মেশিন' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু 'টাইম মেশিনে'র সর্বশেষ রূপটি ওয়েলস লিখিত তৃতীয় বা চতুর্থ রূপান্তর। মূল কাহিনীটি অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল। 'দি ক্রনিকল আর্গোনাট' যা প্রথমে 'দি সায়ান্স স্কুল জার্নালে' প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, তখন ওয়েলসের বয়স ছিল মাত্র বাইশ। 'দি টাইম ট্রাভলার' গল্পটি পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত—এর গঠনভঙ্গী অত্যন্ত ঢিলা ধরনের এবং রচনার মধ্যে অপটুত্বের লক্ষণ পাওয়া যায়। এই কাহিনী ঈশারউড, আপওয়ার্ডের প্রথম দিককার ফ্যানটাসিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, অবশ্য যৌন-বাতিক-গ্রস্ততা অংশটুকু বাদ দিয়ে।

শ্রীযুক্ত বারগনজীর পরিণত সংস্করণের 'টাইম মেশিন' সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণ বিভিন্ন স্তরে গভীর অর্থপূর্ণ। এই অংশটি সর্বাঙ্গসুন্দর, সকল দিক থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

গ্রন্থটিতে এইচ জি ওয়েলসের ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়, অবশ্য স্বাভাবিক গতিকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করার ওয়েলসীয় প্রকৃতির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। যে অন্ধ তার স্বাভাবিক শক্তিতে একচক্ষু রাজাকে সহজেই প্রতিহত করতে পারে।

ওয়েলসের সবক'টি বড়গল্প সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা আছে। 'দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুনে' ওয়েলস উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে যে-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তাকে স্বাভাবিক বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বারগনজী প্রচুর ক্লেশ স্বীকার করেছেন। উদ্ভিদতত্ত্বকে অতিপ্রাকৃত গল্পের সঙ্গে এই-ভাবে আর কেউ খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেননি।

শ্রীযুক্ত বারগনজী যদি ওয়েলসের 'ট্রুথ এবাউট পাই ক্রাফ্ট' জাতীয় লঘু গল্পগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করতেন তাহলে গ্রন্থটির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেত।

তবে এইচ জি ওয়েলসের সাহিত্য-কৃতী সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের যেটুকু ধারণা, তিনি যে তার চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদার অধিকারী, এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীযুক্ত বারগনজী।

—অভয়ংকর

THE EARLY H. G. WELLS : By Bernard Bergonzi. Published by — MANCHESTER UNIVERSITY PRESS : LONDON. Price — 21 Shillings.

ভারতীয় সাহিত্য

আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী রুশভাষায় প্রকাশিত ॥

জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক রচনাবলী দুটি খণ্ডে রুশভাষায় অনূদিত হয়ে সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় আগত সোভিয়েট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ এম সিনুৎখিন বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ ডি এম বসুর হাতে এই গ্রন্থ দুটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে অর্পণ করেছেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমি বর্তমানে যে 'চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রন্থমালা প্রকাশ করছেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী সেই গ্রন্থমালারই অংশ। এই গ্রন্থমালায় অন্যান্য বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন নিউটন, ফ্যারাডে, আইনস্টাইন প্রমুখ জগৎ-বরেণ্য বিজ্ঞানী। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বিশিষ্ট সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনূদিত হয়েছে। এই অনুবাদক-মণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক সিনুৎখিনও রয়েছেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী ও বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে অধ্যাপক সিন্যুৎখিন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রের রুশভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলী ডঃ ডি এম বসুর হাতে অর্পণকালে বলেন যে বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞানজগতে অসামান্য দানের বিষয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সজাগ। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন দিকের দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র।' জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত পথে আজ বহু সোভিয়েট বিজ্ঞানী গবেষণা-কাজ করে চলেছেন বলে তিনি জানান। সোভিয়েট অধ্যাপক আরও জানান যে, আকাডেমিসিয়ান তিমিরিয়াজেফ, হোলো-দান, ভেদেনাস্কী, তোপচিয়েফ, পোপোফ, লেবেদেফ ও হেক্কেল প্রমুখ খ্যাতনামা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের লিখিত জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারের সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৩০টি নিবন্ধ-পুস্তক সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সিনুৎখিন বলেন যে, 'চিরায়ত বিশ্ব-বিজ্ঞান' গ্রন্থ-মালায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকা দেশগুলি থেকে একমাত্র আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনাবলীই যে প্রকাশ করা হয়েছে তা 'এই অসাধারণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিভার' প্রতিই সোভিয়েতের মহান শ্রদ্ধার্ঘ।

রুশভাষায় জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী সকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করে বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ ডি এম বসু বলেন যে, এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের দ্বারা বিজ্ঞানে প্রগতির পথে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতা আরও বর্ধিত হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আশা করেন যে, জগদীশ-চন্দ্রের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান গবেষণা সাধনার ধারার আর একটি পীঠস্থান হয়ে উঠবে মস্কো এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা-সংস্থা 'সি-এস-আই-আর'-এর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ আত্মারাম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকরা।

সোভিয়েত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক সিন্যুৎখিন হলেন মস্কো লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক। আরও দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীসহ তিনি বর্তমানে ভারতীয় পরি-সংখ্যান সংস্থার ('আই-এস-আই') অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে কলকাতায় থাকছেন। তিনি বসুবিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণাধারাও পর্যবেক্ষণ করবেন এবং উদ্ভিদ-গবেষণা সংক্রান্ত যে 'ক্রেসক্রোগ্রাফ' যন্ত্রটি আচার্য জগদীশচন্দ্র স্বয়ং উদ্ভাবন করেন, সেটির কাজ-কর্ম দেখে যাবেন, যাতে সোভিয়েতে এই যন্ত্রটি নিয়ে কাজ করা যায়।

অধ্যাপক সিনুৎখিনের সংগে আগত অপর দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী হলেন গ্যালিনা এম ক্রাসনোভাযেভা ও দুমিত্রি এম দুরেমানোফ।

মস্কো লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এম সিনিউথিন সোভিয়েট অ্যাকাডেমি সায়েন্সের পক্ষ থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কলকাতা বোস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডঃ ডি এম বসুকে উপহার দিচ্ছেন।

বোম্বেতে রবীন্দ্র সপ্তাহ ॥

সম্প্রতি বোম্বেতে ভারতীয় বিদ্যা-ভবনের উদ্যোগে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীগুরু-দয়াল মল্লিক। এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর একটি আলোচনা। বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানব'। এই আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীকুলপতি মুন্সী। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতীয় সমাজজীবনে প্রতীচ্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। এরই প্রভাবে ভারতীয় নবজাগরণের সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ এই নবজাগরণের প্রথম এবং প্রধান পুরুষ।

অন্যান্য যাঁরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভারতে নিযুক্ত চেক কন্সাল জেনারেল ডঃ জোশেফ ফেবিক, ইস্রায়েলের কন্সাল জেনারেল মিঃ আর ডেফনি, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানীর কন্সাল জেনারেল মিঃ রিচার্ড কুনিচ, জাপানের কন্সাল জেনারেল মিঃ এন ওকুচি, নেদারল্যাণ্ডের কন্সাল জেনারেল মিঃ ডি এইচ ডলগর্গ, রাশিয়ার কন্সাল জেনারেল মিঃ য়ুরি কে গালিসনিকভ, ডঃ জি ভি আনিকিন, ডঃ ওয়াই এন ব্রাউন, প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য। এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ এবং সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ভারত বিদ্যাভবনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনবীন টি কান্ডনওয়ালা সমবেত সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও 'বাংলা সিনেমা উৎসব' এবং বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথ ও 'রবীন্দ্র

গবেষণা'র উপর দুটি পৃথক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

আধুনিক কবিতার আলোচনা সভা

গত ৩০ নভেম্বর, বুধবার গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্ধারিত সভাপতি শ্রীমণীন্দ্র রায়ের অনুপস্থিতিতে সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীপি কে গুহ। আলোচনার উদ্বোধন করে শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ভারতীয়তা ও আধুনিকতার সম্পর্কে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। সভার অন্যতম বক্তা শ্রীতরুণ সান্যাল মোটামুটিভাবে আধুনিক কবিতার ইতিহাস এবং বিশিষ্ট কবিদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ দেন। শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী, আধুনিক কবিতায় জটিলতা কেন সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করেন। সভায় শ্রীমণীন্দ্র রায়ের পাঠানো 'আধুনিক কবিতা' বিষয়ক একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়।

পুস্তক প্রদর্শনী ॥

ইংলন্ডের অন্যতম সাহিত্য পত্রিকা হচ্ছে 'টাইমস লিটারেরি সাপলিমেন্ট'। এই পত্রিকার সম্পাদক হলেন মিঃ আর্থার ক্রুক। সম্প্রতি তিনি একটি নির্বাচিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯৫০-এর পর লিখিত উপন্যাস এবং ছোটগল্পের এই তালিকাটি সাহিত্যরসিকদের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থগুলির একটি প্রদর্শনীও সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এতে ভারতীয় সাহিত্যিকদের লেখা ৯টি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থগুলি হচ্ছে—শ্রীআর পারওয়ার জাভবালা রচিত 'এ ব্যাকওয়ার্ড প্লেস', 'গেট রেডি ফর ব্যাটল', 'দি হাউসহোল্ডার এন্ড হিস লাইক বার্ডস', 'ফাইভ ফিসেস এন্ড আদার স্টোরিস',—শ্রীভি এস নইপাল রচিত 'এ হাউস ফর মিঃ বিশ্বাস', 'মিগুয়েল স্ট্রীট', 'মিঃ স্টোন অ্যান্ড নাইটস কম্পেনিয়ন',—শ্রীআর কে নারায়ণ রচিত 'দি ম্যান-ইটার অব মালগুদি' এবং শ্রীরাজা রাও রচিত 'দি সারপেন্ট এন্ড দি রোপ'।

পরলোকে শিল্পী যতীন সেন

'তিনজন বৃদ্ধের সভায়' শেষ সভ্যটি লোকান্তরিত হলেন। অন্য দুজন সভ্য রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ইতিপূর্বেই গত হয়েছেন। শেষ প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন শিল্পী যতীন সেন। এবার তিনিও বিদায় নিলেন। সেইসঙ্গে একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রবাহ সমাপ্ত হোল।

পরশুরামের গড্ডালিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্নের সঙ্গে যতীন সেনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। পরশুরাম এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন আর চিত্রিত করেছেন যতীন সেন। শুধু তাই নয়, পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট'-এর তিনি নাট্যরূপ দেন এবং তাঁরই পরিচালনায় রামমোহন হল ও ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নাটকটি অভিনীত হয়। পরশুরামের কয়েকটি পুস্তকের প্রচ্ছদপটও তাঁরই হাতের কাজ।

মাত্র আঠার বছর বয়সে দ্বারভাঙ্গা থেকে ভাগ্যান্বেষণে তিনি কলকাতা আসেন। তারপর জীবনের বাদবাকি ছেষট্টি বছর কাটিয়ে গেলেন এই শহরে। জীবনের এই সুদীর্ঘ সময় বহু বৈচিত্র্যমণ্ডিত। কলকাতায় এসেই তিনি রাজশেখর বসুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং সে-পরিচয় কোনদিন ক্ষুণ্ন হয়নি বরং দিনে দিনে প্রাণবন্ত হয়েছে। রাজশেখর বসুদের পার্শীবাগানের বাড়ীতে প্রথমে আরবিট্যার ক্লাব এবং পরে উৎকেন্দ্র সমিতির তিনি ছিলেন উৎসাহী কর্মী। তখন এই বৈঠকে সমবেত হতেন রাজশেখর বসু ছাড়া ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শশিশেখর বসু প্রভৃতি। বকুলবাগানের বাড়ীর আড্ডায় আসর জমাতেন পরলোকগত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রভৃতি।

কর্মমুখর এই শিল্পীর জীবন ছিল অক্লান্ত কর্মের নিরন্তর উৎস। বেঙ্গল কেমিক্যালের গোড়ার দিকে তিনি এই সংস্থায় যোগ দেন এবং সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর শিল্পী হিসেবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নিউ থিয়েটার্স ফিল্মের হাতীর মুখ তাঁর নিজস্ব শিল্পকৃতি এবং পুরনো চিত্রা সিনেমার (এখনকার নাম 'মিত্রা') দেয়াল-চিত্র তাঁরই পরিকল্পিত। এর চেয়ে তাঁর বড় কৃতিত্ব এদেশে কমার্শিয়াল আর্টের সূচনা করা। বাংলা লাইনো টাইপের প্রথম ডিজাইনও তাঁর করা। রাজশেখর বসুর গল্পের চিত্রণে তাঁর দক্ষতায় রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়েছিলেন। গল্প ও ছবির এমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক কদাচিৎ চোখে পড়ে।

শিল্পী যতীন সেন

কলকাতার বহু উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের তিনি ছিলেন সজীব সাক্ষী। শেষে এই সাক্ষীও বিদায় নিলেন। ৮৪ বছর বয়সে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল কিন্তু তিনি বেঁচে রইলেন আপন কর্মের মাধ্যমে।

একটি মারাঠি অনুবাদ গ্রন্থ ॥

অধ্যাপক শ্রীভি কে গজেন্দ্রগাদকার সম্প্রতি গুরুদেব রাণাডের মহারাষ্ট্রের মিস্টিসিজমের উপর রচিত গ্রন্থটির অনুবাদ মারাঠি ভাষায় করেছেন। এই গ্রন্থটি মহারাষ্ট্রের অন্যতম সম্পদ হলেও মারাঠি ভাষী লেখকরা এর রস আস্বাদ করতে পারতেন না। অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষা। শ্রীগাদকার এই অভাব দূর করলেন। অনুবাদ অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সুন্দর। এই কারণে অনুবাদক মারাঠি সাহিত্যপ্রেমিকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবেন বলে আশা করা যায়। ভারতীয় অনুবাদ সাহিত্যেও এটি একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

বিদেশী সাহিত্য

লরিতে কবিতার অনুষ্ঠান ॥

হামবুর্গে অ্যাদোলফসপ্লাদজ জায়গাটিকে বলা চলে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ব্যাঙ্কপাড়া। বাঘা বাঘা ব্যাঙ্কগুলি চারদিক থেকে একে ঘিরে রয়েছে। একটা টাকা টাকা গন্ধ ছড়িয়ে থাকলেও এখানেই আবার শহরের বীটনিকদের ভীড়। ফুটপাথ শিল্পীদেরও শিল্পপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান এটি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সত্যিকারের কবিকে এখানে দেখা যায়নি। চতুর্থ শ্রেণীর কিছু বাউণ্ডুলে কবি মাঝে মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে আসে। কিন্তু বেলা না পড়তেই চলে যায়। কোনো উল্লেখযোগ্য কবিতার অনুষ্ঠান বা কোনো নামী কবিকে এ পর্যন্ত এখানে দেখতে পাওয়া যায়নি।

হামবুর্গের বিখ্যাত কবি ও গীতিকার পিটার রুহমকরফ এ নিয়ম ভেঙেছেন। সম্প্রতি সেখানকার এক লেখক সমবায় সম্মেলনে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে মুক্তমঞ্চে সর্বস্তরের সাধারণের কাছে কবিতা পড়ে শোনাতে হবে। প্রত্যেক কবিকেই নেমে আসতে হবে মানুষের মধ্যে। সেজন্য অ্যাদোলফসপ্লাদজ-য়েই তিনি প্রথম 'পাবলিক পোয়েট্রি রিসাইটাল'-এর উদ্বোধন করলেন।

কয়েকদিন আগের কথা। পাঁচশো লোকের এক জনতায় দেখতে দেখতে ভরে গেল ম্যাককপাড়া। সিংহ-কেশর খাঁট-নিকসরাও গীটার হাতে জড়ো হয়েছিল। সঙ্গে তাদের অগণিত 'ফ্যান'। আসরে ধীর মন্থর গতিতে প্রবেশ করল একটি লরি। তাতে মাইকেল নরার অর্কেস্ট্রা দল। মৃদু জাজের সুর তুলছিলেন তাঁরা। ক্রমশঃ তা চড়া সুরের আবহ তৈরী করল। লরির মধ্যে ছিলেন হামবুর্গের এডুকেশন সেনেটর মিঃ ক্র্যামার। তিনি মহাকবি গেটের সঙ্গীত-প্রিয়তা ও প্রাচীন গ্রীক কবিদের সঙ্গীতময় কবিতার কথা উল্লেখ করে এই উদ্যোগটিকে সমর্থন জানান। অতঃপর লরির মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন রুহমকরফ। ডানহাতে মাইকটিকে মুঠো করে ধরে বিষণ্ণ রুহমকরফ তাঁর জেসুইট রক্তের পাংশু মুখমণ্ডল তুলে ধরলেন জনসাধারণের দিকে। তাঁর সবচেয়ে সহজবোধ্য কবিতা 'স্টক-টেকিং' পড়ে শোনালেন। 'আরথলি প্লেজারস' থেকে হার্বার্ট ওয়েনারের বিরুদ্ধে লেখা কয়েকটি কবিতাও পড়েন। 'প্যাস্টোরাল সং' এবং 'ডেফিনিটলি ডেভিয়েশন' কবিতা দুটি ছিল গদ্যধর্মী এবং বিবৃতিমূলক। এতে এ জাতীয় কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু দামী মন্তব্য ছিল। এ কবিতা দুটির মধ্যেই স্থানে স্থানে নিজের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন তিনি। যেমনঃ 'আমি আমার ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে অবহিত আছি। যদি প্রয়োজন বুঝি, যদি অক্ষম হই তবে একদিন কবিতার রাজ্য থেকে মুক্তি নেব।'

লরির উপরে এই উন্মুক্ত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানটি প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলেছিল।

লং প্লেয়িং-য়ে কবি অডেনের কবিতা পাঠ ॥

ডবল্যু এইচ অডেন তাঁর কয়েকটি স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি করেছিলেন বেশ কিছুকাল আগে। আমেরিকার 'পোয়েটিক সোসাইটি অব শিকাগো' এই কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন। উদ্দেশ্য, জনমানসে কবি অডেনের কবিতার আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতার ক্ষেত্রে অডেনের অপরিসীম প্রভাবের কথা স্মরণ করা। সেদিনের সভার শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি টম গান, পিটার পোর্টার, ম্রেড হিউজেস, প্যাট্রিসিয়া বীয়ার প্রভৃতি।

পর পর আটটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন অডেন। শিকাগো গ্রামোফোন কোম্পানী সেগুলি টেপ করে রেখেছিলেন। সেই বহু মূল্যবান আবৃত্তিগুলোর ১৫,০০০ লং প্লেয়িং রেকর্ড সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে। গত নভেম্বর মাসে কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী এই একটি রেকর্ডের মাধ্যমে অডেনের আবৃত্তি শোনানোর আয়োজন করেছিলেন।

নতুন বই

সুসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পর্কিত গবেষণামূলক একখানি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। চর্যাপদের পরেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্য-নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। শুধু প্রাচীনতার জন্য নয়, নানা কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যগ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান। অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে উনিশটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটির বিশিষ্টতা ও মূল্য অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বে প্রাচীন সাহিত্যের কোথায় কোথায় রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে, কাব্যে কতখানি গীতিলক্ষণ ও কতখানি নাট্যগুণ বর্তমান, গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে কোথায় তার মিল এবং কোথায় সে স্বতন্ত্র, কাব্যপরিকল্পনায় বড়ু চণ্ডীদাস পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির দ্বারা কি পরিমাণে প্রভাবিত, প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে ও উপমা নির্বাচনে কবির মৌলিকতা, সামাজিক উপাদান, কাব্যের অন্তর্গত সংস্কৃত শ্লোক, বিভিন্ন রাগ-রাগিণী, চণ্ডীদাস সমস্যা, কাব্য-নামের প্রামাণিকতা, ভাষা ও ব্যাকরণ—ইত্যাদি বিষয়গুলির গ্রন্থকার তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 'পাঠ পরিচয়' অংশটি আলোচনা বিভাগের সর্বশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়টি বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। এই অধ্যায়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য যে সমস্ত নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসংখ্যা সম্পর্কে। এ পর্যন্ত সকলেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ডিত পদসমেত প্রাপ্ত পদের সংখ্যা ৪১৫টি বলে উল্লেখ করে এসেছেন। লেখক প্রমাণ সহকারে দেখিয়েছেন এই কাব্য-গ্রন্থের প্রাপ্ত পদের সংখ্যা ৪১৫ নয়, ৪১৮টি।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর এই সুবৃহৎ গ্রন্থটিকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। কাব্য-আলোচনা অংশটি প্রথমভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয়ভাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সকল খণ্ডের অন্তর্গত পদ ও পদের অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান অপ্রচলিত, ভাষা দুর্বোধ্য; এবং সেই কারণেই আধুনিক পাঠকের অনেকের কাছেই কাব্যটি দুরূহ। বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক পদের যে আক্ষরিক সরল গদ্য অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুরূহতাকে অনেকাংশে লাঘব করেছে। প্রাচীন সাহিত্যকে যদি কেবল প্রাচীন সাহিত্য-রসিকের সীমায় না রেখে প্রাচীন ও আধুনিক—সকল পাঠকের আকর্ষণের বস্তু করে তুলতে হয়, তবে অধ্যাপক ভট্টাচার্য যে রীতিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পাদন করেছেন, সেই রীতিতে অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্য সম্পাদন করা আবশ্যক। গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিস্তারিতভাবে ভাষাতাত্ত্বিক টীকা-টিপ্পনী এবং কাব্যের অন্তর্গত সকল পৌরাণিক প্রসঙ্গের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, ছন্দ তত্ত্ব সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনাই লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-পরিচয়' শীর্ষক একটি মূল্যবান মৌলিক প্রবন্ধ সংযোজিত হওয়ায় আলোচনা গ্রন্থটি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তার মর্যাদাও বর্ধিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালা এবং আরো সাতটি পুঁথির পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ লাভ করেছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
(সম্পাদিত গ্রন্থ)—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা। ১ কলেজ রো, ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা—৯। দাম—দশ টাকা।

দিব্য-প্রসঙ্গ

হরিশচন্দ্র সিংহ ফলিত গণিতের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিসংখ্যান শাখার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি একজন গুরুর সন্ধান পান এবং তাঁর নির্দেশে ঈশ্বরলাভেই যে মানবজীবনের সার্থকতা তা বুঝতে পারেন এবং সেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। অথচ এই কালে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছেন উচ্চতর গবেষণার জন্য—কর্মজীবনের সঙ্গে ধর্মজীবনটিকে এমন জড়িয়ে নিয়েছিলেন হরিশচন্দ্র যে বিপুল সম্মান ও অর্থ উপার্জনের প্রস্তাব তিনি উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর নানাপ্রকার কঠিন রোগভোগ করলেও, অধ্যাত্ম-সাধনায় তিনি অবিচল

ছিলেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে হরিশচন্দ্রের মহাসমাধিলাভ ঘটে।

হরিশচন্দ্রের 'ভগবৎ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আচার্য যদুনাথ সরকার ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"তাঁহার উপদেশগুলি এখানে যত্নের সহিত, প্রেমের, বিশ্বাসের সহিত লিপিবন্ধ হইয়া বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল। কালে এই ক্ষুদ্র বীজ অন্য কোনো শুষ্ক হৃদয়ে পড়িয়া ভক্তির বারি সিঞ্চনে অঙ্কুরিত, ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরের জগতে খাঁটি জিনিস কখনও বৃথায় লোপ পায় না। ভক্ত-পরম্পরা নিজচরিত্র দ্বারা গুরুর নাম অমর করিয়া রাখে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের আশ্রিত সাধু হেমচন্দ্র রায়ের সঙ্গলাভ করে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে হরিশচন্দ্র চিত্তে চিরশান্তি লাভ করেন। এই গ্রন্থ সেই সাধুসঙ্গের ফলশ্রুতি। হরিশচন্দ্র এই গ্রন্থে 'অবতার', 'কর্মফল' ও 'সমর্পণ রহস্য', 'শ্রীগুরু' (গুরুর প্রয়োজনীয়তা) এবং 'জন্ম ও মৃত্যু' এই দুরূহ তত্ত্বগুলি সরসভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্ট অংশে হেমচন্দ্র রায়ের কয়েকটি ভক্তি-সংগীত সন্নিবেশিত হয়েছে। 'স্মৃতি-কথা' অংশে হেমচন্দ্র রায়ের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। গ্রন্থটি পাঠ করলে শান্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করা যায়।

ভগবৎ প্রসঙ্গ প্রথম পর্যায়ে সিদ্ধ-সাধক হরিশচন্দ্র যেভাবে ধর্মের গভীর তত্ত্বকে সরল ভঙ্গীতে বিধৃত করেছেন, তা যেমন ধর্মপরায়ণ মানুষের কাছে সমাদৃত হবে, তেমনই ধর্মতত্ত্বজ্ঞানীদের কাছেও মূল্যবান মনে হবে। গ্রন্থটিতে কয়েকটি চিত্র আছে, মুদ্রণ ও বাঁধাই মনোরম।

ভগবৎ প্রসঙ্গ (প্রথম পর্যায়)—শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশকমণ্ডলী। ৪নং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫। মূল্য সাড়ে চার টাকা মাত্র।

মরণের পরে

ত্রিপুরা জেলার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকাইল গ্রামটি মহাকালী বরদেশ্বরীর পীঠস্থান। সেই গ্রামের এক বিখ্যাত বৈদ্যপরিবারে মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী একজন সুপ্রতিষ্ঠিত উকীল ছিলেন। তিনি সঙ্গীতবিদও ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, জৈন, ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর সাধনা-পূত চিত্তে বহু অলৌকিক ব্যাপার স্ফুরিত হয়েছে এবং জীবনে অনেক সময় আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে জাগ্রত অবস্থায় ও স্বপ্নে অনেক অলৌকিক ঘটনা উপলব্ধি করেছেন। তিনি যে একজন উপযুক্ত আধার ছিলেন সেই বিষয়ে সংশয় নেই। ১৩৪০ সনে তিনি 'মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থে পরলোক ও অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে বহু ঘটনা এবং দৃষ্টান্তসহ একটি পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পরমুহূর্তে মানুষ কোথায় যায়, তার কি হয় এই কথা জানার বাসনা দেহীমাত্রেরই আছে, বিশেষতঃ যাঁরা সদ্য আত্মীয় বা প্রিয়জন বিয়োগে কাতর তাঁদের আগ্রহ সর্বাধিক। স্বামী অভেদানন্দ, মৃণালকান্তি ঘোষ, 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে বাংলাভাষায় মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষাতেও এই বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক আছে। পরজন্ম যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা ত' পরলোক সম্পর্কে সংশয়হীন, যাদের ধর্মে জন্মান্তর বা পরলোক সম্পর্কে বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই তাঁদের আগ্রহও কম নয়। মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর এই গ্রন্থটি সম্প্রতি তাঁর সুযোগ্য পুত্র নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী মহাশয় প্রকাশ করায় আমরা আনন্দিত হয়েছি। গ্রন্থটির নূতন সংস্করণটি জনসমাজে সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলি কিন্তু অতিশয় অপটু হাতের আঁকা, এই ছবিগুলি গ্রন্থে সংযোজিত না হলে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব : (আলোচনা)— মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, বি, এল, এডভোকেট, আলিপুর। ৪নং ফার্ন প্লেস, কলিঃ-১৯। দাম—চার টাকা মাত্র।

নতুন কবিতার বই

সাম্প্রতিক কবিতা ষষ্ঠ দশকের মধ্যভাগ অতিক্রম করে যেন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। নবাগত কবিদের রচনায় কেমন যেন দায়সারা গোছের তাড়াহুড়া, নিষ্ঠা ও সততার একান্ত অভাব সহজেই চোখে পড়ে। ধ্যানের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার সময় নেই, নেই আন্তরিক ইচ্ছেও। ভাবতেও ভয় করে, বাংলা কবিতার আধুনিক স্রোত কি ভয়াবহ বন্ধ্যা প্রান্তরের সম্মুখীন।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা পরিচিত কবি এবং ইতিমধ্যেই তাঁর কবিব্যক্তিত্বও গড়ে উঠেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাঁর রচনার সংকলন 'অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি' নানা কারণে মনোযোগ আকর্ষণের দাবী রাখে। চিন্ময়ের মন সমাজজীবনের কেন্দ্র হতে সরে না গিয়ে, সমাজকেই নানা সুখদুঃখে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আবর্তন করছে বারবার। এক বৃহৎ জীবন-ভূমিতে দাঁড়িয়ে আত্মোপলব্ধিজনিত বিষাদ আনন্দ উপলব্ধি করছেন চিন্ময়। প্রেম এক কেন্দ্রীয় অনুভব তাঁর কাব্যে, কিন্তু তা ব্যক্তিগত নয়, বহু মানুষের উপলব্ধিত সত্যের সঙ্গী।

সেই নারী চিরন্তনী,
দেহে যার আলোর ফসল
তার এক নাম রাধা,
পরকীয়া প্রেম অন্য নাম,
মধ্যরাতে কোন বাঁশি ডেকে বলে,
হে কান্ত শ্যামল,
বিরহ দহনে জ্বলে প্রতি অঙ্গে
তোমাকে পেলাম।

'অমল' একটি উল্লেখযোগ্য ভালো কবিতা। 'তৃষ্ণার আড়াল থেকে, হ্যামলেট, যুবরাজ প্রভৃতি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি : চিন্ময় গুহঠাকুরতা। পরিবেশক— মিত্রালয়। আড়াই টাকা।

আকাশ-রাজার কাহিনী

কালক্রমে রূপকথারও রূপান্তর ঘটেছে। আজ আর কোনো সন্ধ্যায় আকুল চন্দ্রালোকে দাওয়ায় বসে কোনো শিশু ঠাকুমার কাছে চাঁদের বুড়ির সুতোকাটার গল্প শুনতে চায় না। তার আধুনিক জিজ্ঞাসা : চাঁদে কেমন করে যাওয়া যাবে? ক'দিন লাগে যেতে? আমার যদি রকেট থাকতো যেতাম একবার...।

ঘোড়া ছুটিয়ে রূপকথার রাজপুত্র রাক্ষস-খোক্কস মারবে, আর, পাতালপুরীর রাজকন্যাকে অর্ধেক রাজত্বের সঙ্গে লাভ করবে—সেই রূপকাহিনীর নেশায় আজকের কিশোর আর মাতাল হ'তে চায় না। এখন তার কল্পনার ঘোড়া বিজ্ঞান; স্বপ্নের রাজকন্যা মহাকাশ-বিস্ময়।

আকাশ-পাতাল জুড়ে মানুষের বিস্ময়ের রূপ ও রসের বদল ঘটানো জুলে ভর্ন-এর একটি অসামান্য কৃতিত্ব। অদ্রীশ বর্ধন শিশুগ্রাহ্য ভাষায় তাঁর বই অনুবাদ করে বাঙালী তরুণ পাঠকদের বিশেষ ভালোবাসার পাত্র হয়েছেন। প্রচলিত রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ যেভাবে বীভৎস প্রচ্ছদচিত্র, অসংগত খুন-জখম-অনাচার এর উদ্দাম কাহিনী দিয়ে আমাদের কৈশোরের মূল্যবোধের ক্ষতিসাধন করছে, এ-জাতীয় বই সেই সজ্ঞান পাপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষেধক।

আকাশ-রাজার কাহিনী চুম্বকের মতো তরুণ মনকে বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট করে রাখবে।

রোবার হলেন আকাশ-রাজা (বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনী) অদ্রীশ বর্ধন। আলফা-বিটা পাব্লিকেশনস্। একটাকা পঁচাত্তর পয়সা।

সেতুবন্ধ

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। ১৮ ।।

সন্ধ্যার পর সকলে একত্র হয়। তাপস পূর্ণিমাকে বলে, বাইরের ঘর জুড়ে ডাক্তার সাহেব তো জাঁকিয়ে বসলেন। বৃদ্ধ বাপটির কোথায় জায়গা হবে শুনি?

পূর্ণিমা বলে, জায়গার অভাব কি। বারান্ডার ঘরে আমি যেখানটা আছি।

অরে তুই! কপালগুণে কিছুদিন উপরের ঘরে প্রোমোশান হয়েছিল—স্বাতীকে নিয়ে এসে আমাদের ঠেলেঠুলে উপরে তুলে দিয়ে আবার নিচে পুনর্মূষিক হয়ে এলি। সে ঘরও বাপকে দিয়ে দিচ্ছিস, তোর জায়গা কোথায় এবার শুনি?

পূর্ণিমা বলে, বাঃ রে, অমন সুন্দর রান্নাঘর রয়েছে। একটা ক্যাম্প-খাট কিনব, সারাদিন গোটানো থাকবে। খাওয়া-দাওয়া আমাদের সন্ধ্যের পরেই তো চুকে যায়— খাট খুলে নিয়ে তোফা তার উপর গড়িয়ে পড়ব।

তাপস বলে, খাটের হাঙ্গামাটাই বা কেন, তোফা মেজের উপর তোফা মাদুর বিছিয়েও তো নেওয়া যায়। কিম্বা তোফা রাস্তার ফুটপাথে?

পূর্ণিমা বলে, মানুষে থাকে না বুঝি? থাকে বই কি! কিন্তু তুই নোস, থাকব আমি। বাইরের ঘর যদি আমার ডাক্তারি চেম্বার হয়, রান্নাঘরই তখন বেডরুম। আবার তোকে উপরের ঘরে যেতে হবে।

বুঝিয়েসুঝিয়ে হয় না তো পূর্ণিমা এবার নিজমূর্তি ধরে: জানিস তো, কথার উপর কথা বললে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। যখন যে ব্যবস্থা করেছি, বরাবর সেই মতো হয়ে এসেছে। এবারও আমার কথায় হবে, এর মাঝে তোর ফোড়ন কাটতে হবে না।

তাপস নিরস্ত হয় না। দিনকাল বদলেছে—বড় হয়েছে সে, পাশ করে উপায়ক্ষম হয়েছে। তাড়া খেয়ে তর্ক করে: বরাবরের মতন হল এবারে কই? স্বাতীর মায়ের জবাব আমার মত ছাড়া যখন হয় না, সমস্ত কিছু এবার থেকে তাহলে আমার মতেই হবে।

জবাব খুঁজে না পেয়ে পূর্ণিমা চুপ করে যায়। ভাই-বোনের বচসা ওদিকে তারণের কান অবধি গেছে। তিনি চেঁচাচ্ছেন বাইরের ঘর থেকে: শুনে যা তোরা। রান্না-ঘরে কেন যাবে পুনি? ঠাঁই নাড়ানাড়ির দরকার হবে না, যেখানে যেমন আছিস তেমনি সব থাকবি। আমি আর ক'দিন—বাইরের ঘর খালি করে দিয়ে যাবো।

পূর্ণিমা বকে ওঠে: কু-ডাক ডেকো না বাবা, মানা করে দিচ্ছি, যাবার এখনো ঢের ঢের বাকি। দিচ্ছে কে যেতে? স্বাতী সবে এসেছে, পাকাপোক্ত হোক সংসারে—এখনই যাই-যাই করলে ওর কি মনে হবে বলো তো?

স্বাতী কি কাজে এসেছিল, ননদের কথা শুনে হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে সায় দেয়।

তারণ বলেন, মরণের কথা কে বলছে। সে হলে তো চুকেই যেত। কিন্তু সে জিনিস তোর আমার ইচ্ছেয় তো হবে না। কাশী চলে যাব আমি—পাপপঙ্কে পড়ে থেকে দম আটকে আসে। পূর্ণ-দা চিঠি দিয়েছেন।

পূর্ণ মুখুজ্জের চিঠি আসছেই অবিরত, নতুন কিছু নয়। কাশীবাস করেও তিনি পাড়ার সুহৃৎ তারণকে তিলেকের তরে ভুলতে পারেন নি। প্রায়ই চিঠি লেখেন। সংসাররূপ নরককুণ্ডের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ এবং তারণকে কাশীবাসের জন্য আহ্বান। প্রবাদে বলে কাশীধাম মর্ত্যলোকের বাইরে। সেটা যে কতদূর সত্যি কাশীতে একটা চক্কোর দিয়েই মালুম হবে। এমন খাঁটি মালাই এবং ভেজালহীন মিষ্টান্ন মর্ত্যলোক হলে মিলত না। দামের দিক দিয়েও সত্য যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বেগুনের সাইজ মিঠে-কুমড়োর মতো। রাজপুত্রের চেহারার পোনামাছ গঙ্গা থেকে সদ্য উঠে এসে মেছুনির পাটায় শুয়েছে। এর উপরে নিখিল-ভারতবর্ষের প্রবীণ বহুদর্শী দাবাড়েরা ঘাটের চাতালে চাতালে দিগ্বিজয়ের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেছেন। তুরীয়ানন্দের তবে আর বাকি কতটুকু রইল—কেন মিছে সংসারজ্বালায় জর্জর হওয়া? বার্ধক্যে বারাণসী—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেসুজেই বিধান দিয়ে রেখেছেন।

শেষ চিঠি যা পূর্ণ লিখেছেন, সত্যি সত্যি তাতে মন টেনেছে। উতলা হয়েছেন তারণ কাশীবাসের জন্য। খোলাখুলি প্রস্তাব পূর্ণকেও বাতে ধরেছে, চলাচলে অসুবিধা হয়। তবে বাসা ঠিক দশাশ্বমেধ-ঘাটের উপরে—দুই বন্ধু একবাড়িতে একসঙ্গে থাকলে ভাবনার কিছু নেই। গঙ্গাস্নান করো, মালাই-মিষ্টি খাও, সময়ে সময়ে রিক্সা করে বাবা-বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা দর্শন করে এসো—আর দাবা খেল অহোরাত্রি। কুসমি যখন রয়েছে যাবতীয় ঝামেলা সে-ই পোহাবে। আর কাশীস্থানে মরলে তো দেখতে হবে না—পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম কোন কিছুরই হিসাব নেবে না চিত্রগুপ্ত—সরাসরি একেবারে শিবলোকে। হেন সুযোগ যে হেলা করে, সে ব্যক্তি মানুষ নয়—নররূপী গাধা। তাদের জন্যেও ব্যবস্থা রয়েছে গঙ্গার ওপারে ব্যাসকাশীতে—মরে গেলে গর্দভলোক।

লিখছেন: সারাজীবনই খাটলেন। সার্থক খাটনি—ছেলে মানুষ হয়ে গেছে। একটি মেয়ে অবিবাহিত—সে-ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য কারো পরোয়া করে না। বউ-ঠাকরুন আসতে চান তো তাঁকেও নিয়ে আসুন—কেন তাঁকে পাপপঙ্কে রেখে আসবেন। আপনার নিজের পেন্সন আছে, ছেলে নিশ্চয় কিছু কিছু পাঠাবে। পুনি বিয়েথাওয়া করল না—তারও কর্তব্য আছে বাপ-মায়ের উপর, সে-ই বা কেন দেবে না।

এ সমস্ত সন্ধ্যারাত্রের আলোচনা। ভোর-বেলা অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বিপদের খবর এলো। ভাল করে তখনো ভোর হয় নি। স্বাতীর ছোটভাই দেবাশিস এসে উপস্থিত। স্ট্রোক হয়েছে বিজয়া দেবীর। অপূর্ব রায় থাকতেও একবার হয়েছিল—সেবারে মৃদু আক্রমণ, এবারে কি হয়েছে—এরা ছেলে-মানুষ, কী জানে আর কী বোঝে? তাপসকে এক্ষুনি যেতে হবে—কোন ডাক্তার ডাকবে, কি ভাবে চিকিৎসা হবে, সে গিয়ে না পড়লে কিছু হচ্ছে না।

মহাব্যস্ত হয়ে পূর্ণিমা তোলপাড় লাগাল। স্বাতীকে ডাক দেয়: দেরি কেন গো? যে অবস্থায় আছ ঐ বেশে অমনভাবে গাড়িতে উঠে পড়ো। তাপসকে বলে, অষুধপত্তোর যা নেবার নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়—

তিষ্ঠাতে দেয় না, তাড়িয়ে তুলল গাড়িতে। দেবাশিসকে ডেকে বলে, অফিস আছে, অডিটের মুখে এখন কামাই করা চলবে না—নইলে আমিও যেতাম। তা ছাড়া, আনাড়ি মানুষ আমি—অসুখের ব্যাপারে

করতেও পারব না কিছু। মন উতলা রইল, অফিস থেকে ফোন করব।

বিজয়া দেবীর অসুখে পূর্ণিমা উদ্বেগ বোধ করছে। অত সব কড়া কথা শোনাল সেদিন—নিজেকে মনে মনে গালি দিচ্ছে, ঘাড়ে যেন ভূত চাপল—রাগের মুখে লঘু-গুরু জ্ঞান থাকবে না, এ কেমন কথা! অফিসে গিয়েই সে ফোন করল।

স্বাতী ধরেছে। বলল, ভালই আছেন মা, যতদূর ভয় হয়েছিল, তেমন কিছু নয়। ব্যস্ত হবার কিছু নেই ছোড়দি। নার্স রয়েছে, কথাবার্তা একেবারে মানা। লোকজন দেখলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—আমাদের অবধি কাছে যেতে দিচ্ছে না।

তাপসকে পেলে সঠিক অবস্থাটা জানা যেত। কিন্তু সে এখন ডাক্তারখানায় রোগি-পত্তরের ভিড়ের মধ্যে। সেখানে ডাকাডাকি করা উচিত নয়।

টিফিনের সময়টা আবার পূর্ণিমা ফোন করল। তাপস এবারও নেই। ডাক্তারখানায় রোগি দেখে তারপর কলে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরে নি। এমন কম বয়সে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রাকটিস দিব্য জমিয়েছে। ফোন ধরেছে—এবার দেবাশিস। পূর্ণিমা বলে, যাব একবার তোমাদের ওখানে, মাকে দেখে আসব। দেবাশিস বলে, একটু ধরুন, জিজ্ঞাসা করে আসি। ফিরে এসে বলে, সেরে গেলে তখন আসবেন। এখন নয়। দেখতে আসা ডাক্তারে একেবারে বারণ করে দিয়েছেন।

হার্টের অসুখে তাই নিয়ম বটে। দেখতে গিয়ে বেশির ভাগই ক্ষতি করা হয়। তা ছাড়া পূর্ণিমা যাবে—কিছুতে ওরা সেটা চয় না। কারণ বোঝা যাচ্ছে—সেই যে ঝগড়া হয়েছিল, পূর্ণিমাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন তিনি। দেখাসাক্ষাৎ মানা—সেই জন্যেই পূর্ণিমাকে এত করে শোনাচ্ছে। যাই হোক ভাল আছেন তিনি, যত সাংঘাতিক ভাবা গিয়েছিল তেমন কিছু নয়—স্বাতীর কাছে শুনে অবধি অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

ছুটির মুখে পূর্ণিমা শিশিরের টেবিলে ঝুঁকে এসে দাঁড়াল ঃ সেদিন আপনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন।

থতমত খেয়ে শিশির বলে, কি বলেছি?

আপনি থাকেন নাকি বেলগাছিয়ায়। ডাহা মিথ্যে!

চটে গিয়ে শিশির বলে, কোথায় থাকি তবে?

অফিসে—

অফিসে বুঝি থাকতে দেয়। দরোয়ানদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

এই অবোধের সঙ্গে কথা বলে ভারি সুখ। পূর্ণিমা বলে, সন্দেহ থাকলে তবে তো জিজ্ঞাসা। আমার নিজের চোখে দেখা। একলা আমিই বা কেন, সবাই দেখে। ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় দেখি টেবিলে বসে কাজ করছেন, পরের দিন এসেও অবিকল সেইভাবে দেখা যায়। অফিসে থাকেন মানে শুয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করেন, এমন কথা বলছি নে—সারারাত্তির সমস্ত সকাল নিশ্চয় কাজ করে যান।

রসিকতাটা এতক্ষণে বুঝি হৃদয়ঙ্গম হল। কৈফিয়তের সুরে শিশির বলে, কাজের মোটে শেষ নেই—

নেই তাই রক্ষা। শেষ হয়ে গেলে মাইনে কি মাইনে দিয়ে রাখবে? চাকরি চলে যাবে। এক সঙ্গে অত কাজ করে না—চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

সুরটা আদেশের মতো। চকিতে শিশির একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে।

পূর্ণিমা বলে, মিনিট সাতেক বাকি এখনো ছুটির। ওতে কিছু যায় আসে না। এ অফিসে আসে সবাই যেমন দেরি করে, সকাল সকাল চলে গিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয়।

'না' বলা শিশিরের পক্ষে অসম্ভব। আবার চোখ তুলে ওদিকে দেখে নটবরের গৃধ্রবৎ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। থতমত খেয়ে জড়িত কণ্ঠে বলে, আজ্ঞে—

পূর্ণিমাও দেখে নিয়েছে নটবরকে। অন্তরাত্মা জ্বলে ওঠে। এর পরে আর দ্বিধাসঙ্কোচ নেই। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ক্ষিধে পেয়ে গেছে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক আগে।

অপাঙ্গে দেখে নিল, শুধুমাত্র দৃষ্টি নয়—নটবরের কানও এদিক পানে বাড়ানো, সিকিখানা কথা ফসকে না যায়। খিলখিল করে হেসে কথা শেষ করে ঃ খেয়েদেয়ে তারপরে কি করা যাবে? নৌকো নিয়ে গঙ্গার উপর ঘুরব—কেমন?

শিশির স্তম্ভিত। সত্যি সত্যি বলছে এইসব, না কানে ভুল শুনেছে? বলছে তাকেই তো, না লোক ভুল করেছে?

গলা নামিয়ে পূর্ণিমা এবারে উপদেশ ছাড়ছে ঃ বেশি খেটে মুনাফা নেই। এক গুণ সারলেন তো চার গুণ এসে পড়বে। সেকশনে বেশি কাজ হচ্ছে বলে নামযশ নেবেন নটবরবাবু। আপনার কানাকড়িও নয়। কাজে ফাঁকি দিয়ে বরঞ্চ কর্তাদের যদি তোষামোদ করতে পারেন, ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি। নটবরবাবু সারাদিনের মধ্যে দশ-পনেরটা সই ছাড়া কিছু করেন না। পরনিন্দা পরচর্চাতেই দিন কেটে যায়—সময় কোথা? এক লাইন ইংরেজি লিখতে কলম ভাঙে, তবু ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু হয়ে গ্যাঁট হয়ে আছেন। কিসের গুণে জানেন?

বলছে মুখে আর ঝুঁকে পড়ে দুখানা হাতে ফসফস করে শিশির ফাইলপত্তর গুছিয়ে দিচ্ছে। এবারে আরও নিচু গলা—বিড়বিড় করে বলে, কোন গুণে বড়বাবু হওয়া যায় শিখে নিন। সামনে ঐ আদর্শ বড়বাবুটি হাজির। জি. এম. মুস্তফি সাহেবের বাড়ির বারান্ডায় একাদিক্রমে বিশ বছর দাঁতন করেছেন উনি। দাঁতন শেষ করে চাকর সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে যেতেন। মুস্তফি-গিন্নি ওঁর কেনাকাটা বড় পছন্দ করতেন। মুস্তফি সাহেব রিটায়ার করলেন, তারই মাস ছয়েক আগে দাদুর তপস্যার সিদ্ধি। আর, সব অফিসেরই নিয়ম যে একবার উঠে পড়লে তারপরে আর নামতে হয় না।

চলল দুজনে। শিশির নিজের ইচ্ছের ঠিক যাচ্ছে না, তাকে যেন বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে। সোজাসুজি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুখ হয় না—যাচ্ছে ঘুরপথে নটবরের টেবিলের সামনে দিয়ে। নটবর এই সময়টা একটু ব্যস্ত। লাটুবাবু এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন, হাতে একতাড়া কাগজ—সইয়ের জন্য কতকগুলো এগিয়ে ধরেছেন আর হাত-মুখ নেড়ে বোঝাচ্ছেন কি-একটা জিনিস। পাছে নজর এড়িয়ে যায়—পূর্ণিমা সেখানে থমকে দাঁড়াল একমুহূর্ত, বাঁ-হাত দিয়ে শিশিরের ডান হাতটা চেপে ধরল। নটবর চোখ তোলেন না, খসখস করে সই মেরে যাচ্ছেন। চোখ তুলতে হবে না, পূর্ণিমা জানে—বিনি চোখেই উনি দেখতে

পান। হাসতে হাসতে শিশিরকে নিয়ে এবারে সে বেরিয়ে পড়ল।

লাট্বাব্ অন্তরঙ্গের মধ্যে পড়েন না, লোকাভাবে তব্ নটবর তাঁকেই সাক্ষী মানেন : দেখলেন মশায়? অফিসের ভিতরেই বেলেল্লাপনা—অরাজক অবস্থা চলেছে। স্ত্রীলোক ঢোকানোর এই পরিণাম। দিব্যি ছিল, রান্নাঘরে রাঁধাবাড়া নিয়ে থাকত। স্ত্রীশিক্ষার নামে কতকগ্লো নচ্ছার ছ্ঁড়ি দেগে ছেড়ে দিয়েছে—ভেড়াকান্ত-গ্লোর মাথায় হাত ব্লিয়ে চরেফিরে খাচ্ছে—

নটবরও উঠে পড়লেন। লাট্বাব্ ব্যস্ত হয়ে বলেন, যাচ্ছেন নাকি দাদ্? সই আরও আছে, এই ক'টা সেরে দিয়ে যান।

বিরস ম্খে নটবর বলেন, কাল হবে। পাঁচটা না বাজতে সবাই উঠে পড়ে, আমারই বা কোন দায় পড়েছে? তিরিশ বছর একটানা খেটে এসেছি, আর নয়। আপনারও মশায় ঘরবাড়ি নেই? চলে যান। ছোঁড়াছ্ঁড়িদের দেখে শিখে নিন। যা-কিছ্ বাকি থাকে, কাল করব।

ছ্টলেন ব্ড়োমান্ষটা—রেসের ঘোড়া কোথায় লাগে!

ছ্টির ম্খটায় এখন অফিসপাড়ার রাস্তায় বিষম ভিড়। বাইরে এসেই দ্জনে আলাদা হয়ে গেছে, হতে বাধ্য হয়েছে। দিব্যি খানিকটা ফাঁক রেখে চলছে। বাঁচল শিশির, ঘাম দিয়ে জবর ছাড়ল রে বাবা!

কিন্তু কতক্ষণ! চিলের মতন আচমকা পূর্ণিমা শিশিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চরম অবস্থা। সঙ্কোচে আত্মরক্ষার তাগিদে শিশির দেহে যেন এতটুকু হয়ে গিয়ে পিছলে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সাধ্য কি। সেদিনের সেই টিফিনের সময় বেকুব হয়ে গিয়ে পূর্ণিমা আজ রীতিমত সতর্ক। হাতে হাত জড়িয়ে নিয়েছে সকলের আগে। দেখি যাদু, পালাও কেমন করে। হাতে হাত বেঁধে একেবারে গায়ের উপর। শহুরে মেয়ের এত কাছাকাছি এই প্রথম—অফিসে ঢোকার পর থেকে ক'দিন এই যা চলছে। লজ্জা করছে, তবু একটা স্নিগ্ধ সুরভি মনের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয়। মুক্তি লহমার মধ্যে আদায় করে নিতে পারে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে। ইচ্ছা করছে না, সে জিনিষ তখন যেন বর্বরতা মনে হয়।

দরকারও হল না। মিনিট কতক পরে হাত ছেড়ে দয়াবতী নিজেই দূরে সরে গেল। আগের মতন ব্যবধান রেখে চলেছে।

কথা বলল পূর্ণিমা। কলকাকলী কোথায় উপে গেছে, কলহ দস্তুরমতো। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে, আমি জঘন্য—তাই নয়?

শিশির আকাশ থেকে পড়ে : সে কী কথা!

খুব কুরূপ-কুৎসিৎ?

শিশির প্রবল ঘাড় নাড়ে : না-না-না—

কাছে যাচ্ছিলাম, আপনি অত সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন কেন তবে? গায়ে গা ঠেকে যায় পাছে—এই না?

বাঃ রে, তা কেন হবে?

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে ঝাঁঝালো হচ্ছে। ঘাড়ের ঝাঁকুনিতে শিশিরের আমতা-আমতা প্রতিবাদ উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বলে, প্রেমে পড়ে গেছি হয়তো ভাবলেন। প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

শিশির বলে, আজ্ঞে না। ক'টা দিনেরই বা পরিচয়—আহাম্মুকের মতো অমন আজব ভাবনা ভাবতে যাবো কেন? তা ছাড়া আপনারা হলেন শহুরে সভ্যভব্য রমণী, আমি পাড়াগাঁ থেকে আসছি—

আরো বিস্তর বলতে যাচ্ছিল শিশির, ঘাড় নেড়ে পূর্ণিমা স্বীকার করে নেয় : খাঁটি সত্যি। কথাগুলো মনে করে রাখবেন, তা হলে আর সঙ্কোচ আসবে না, সহজ হয়ে মিশতে পারবেন।

একটু থেমে আবার বলে, মনে রাখবেন পাঁচ-সাত বছর পুরুষ নিয়ে ঘর করছি। ঘরগেরস্থালি নয়, যা মেয়েরা একটিমাত্র পুরুষের সঙ্গে করে। পুরুষের দঙ্গল নিয়ে ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসে কাজ করি। কাপুরুষ লুব্ধ ভণ্ড কপটই তাদের মধ্যে বেশি। রামায়ণের সীতা একবার অগ্নি-পরীক্ষা দিয়েছিলেন, আর আগুনের মধ্য দিয়ে অহরহ চলাফেরা আমাদের, শতেকবার অগ্নিপরীক্ষা। প্রেম পায়ে-পায়ে ঘোরে—টাকায় বড়, প্রতিষ্ঠায় বড়, বিদ্যাবুদ্ধিতে বড়, চেহারায় চমকদার—কতজনে এমন ছোঁক-ছোঁক করে বেড়িয়েছে। এত সব সমুদ্র বাতিল করে দিয়ে খানাখন্দে নিশ্চয় ডুবে মরতে যাব না। তাহলেও যেচে ঘনিষ্ঠতা করছি, পালাতে গেলে গ্রেপ্তার করি। কেন বলুন তো?

আকাশ-পাতাল হাতড়ে জবাব খুঁজে পায় না শিশির। চুপ করে থাকে।

পূর্ণিমা বলে, আমি বলি তবে। খোলা-খুলি বলছি। আলাপ করতে এসেছিলাম গোড়ায় আক্রোশ নিয়ে। মুখে হাসি ছিল, আর মনে মনে ছুরি শানাচ্ছি : কেমন করে জব্দ করব আপনাকে।

শুষ্কমুখে সভয়ে শিশির বলে, আক্রোশ কেন? অপরাধটা কি আমার?

হুট করে এসে চাটুয্যের চেয়ার দখল করলেন। উপর থেকে এনে বসিয়ে দিল। তার আগে অফিস-বাড়ির ছায়াও মাড়ান নি কোন দিন, এর চেয়ে বড় অপরাধ কি আছে? ভাল লাগে এ জিনিষ? কেন রটনা হবে না, উপরওয়ালার চর আপনি—চাকরির ছলে আমাদের মধ্যে থেকে গুপ্তকথা উপরে রিপোর্ট করবেন বলে পাঠিয়েছে?

শিশির বলে, কী সর্বনাশ! দেশ ছেড়ে এসে পথে-পথে ঘুরছি। অসহায় অবস্থা। কর্তাদের তাই দয়া হল। এ ছাড়া অন্য কারণ তো খুঁজে পাই নে।

মুশকিল সেইখানে। বড়লোকে দয়া করে, সহজে কেউ বুঝতে চায় না। দয়াটা অহেতুকী নয়, তারপরে অবশ্য বোঝা গেল। দামসাহেব মাঝে ছিলেন। দাম প্রসন্ন থাকা মানে অঢেল কন্ট্রাক্ট। তাঁর খাতিরে একটা চাকরি কিছুই নয়। ভিতরের বৃত্তান্ত ফাঁস হয়ে গেল, আপনার সর্বনাশ অন্যদিক দিয়ে। কেউটেসাপ সন্দেহ করেছিল, এখন জেনে ফেলেছে নির্বিষ ঢোঁড়া।

দুজনে পাশাপাশি চলেছে এখন। হেসে উঠে পূর্ণিমা আবার বলে, ডাঁটে ছিলেন, উপরওয়ালার লোক বলে সবাই ভয় করত। ভয় ঘুচে গেল। নরম মাটি কেঁচোয় খোঁড়ে—ভাল মানুষ, নরম মানুষ পেয়ে নটবরবাবু আপনাকে নাজেহাল করছে। এত অন্যায় চোখ মেলে দেখা যায় না—গিয়ে পড়ি মাঝে-মাঝে, আপনাকে উদ্ধার করে আনি। রাগে পড়ে নটবর-দাদু অকথা-কুকথা রটাচ্ছেন। কানে আপনার একটু-আধটু নিশ্চয় উঠেছে। সাকরেদদের নিয়ে ফুসফুস গুজগুজ করেন, চোখেও ঠিক দেখেছেন।

তটস্থ হয়ে শিশির ঘাড় নাড়ে : আমি কিছু জানি নে তো।

পূর্ণিমা বলে, তাই বটে! 'পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।' আমি পুতুল নই বলে চোখে কানে আমার সমস্ত পড়ে। যে জিনিষ ও'রা ঠারে-ঠোরে বলতে চান, আমি তাই অভিনয় করে চোখের উপর দিয়ে দেখিয়ে আনলাম। অভিনয়—সত্যিকার কিছু নয়। এ জিনিষ চলবেই মাঝে-মাঝে বুড়ো মানুষটার খাতিরে। ঐ যে, দেখুন না—

চোখের ইঙ্গিতে দেখাল। মোড় ঘুরে এসে নটবরকে দেখা যাচ্ছিল না, বেশ খানিকটা দূরে সেই মূর্তির পুনশ্চ উদয়। আহা রে, অফিস অন্তে বুড়োমানুষ বাড়ি গিয়ে কোথায় বিশ্রাম করবেন—তা নয়, গুপ্তচরের মতন পিছন ধরেছেন। অফিসের নৈতিক আবহাওয়া ঠিক রাখার দায় যেন ঐ মানুষটার উপর।

মুহূর্ত মাত্র দেরি নয়, পূর্ণিমা হাত জড়িয়ে ধরল শিশিরের। কানের কাছে মুখ এনে অধীর বিরক্তিতে বলে, জ্বালাতন—জ্বালাতন! একটা জায়গায় যাওয়ার দরকার ছিল—তা দাদুকে নিরাশ করে যাই কি করে! ও'র মুণ্ডু ঘুরিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করে তবে যাব।

বলে, আর উচ্ছ্বসিত হাসি হাসে। হাসিতে ঢলে-ঢলে পড়ছে। নটবর একদৃষ্টে তাকিয়ে পথ চলছেন। হোঁচট খেয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়তেন আর একটু হলে—কোন গতিকে সামলে নিলেন। আর শিশিরেরই বা কী অবস্থা! পারলে এই রমণীর হাত ছাড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে পালাত।

হঠাৎ বুঝি পূর্ণিমার খেয়াল হল, রাস্তায় মাত্র নটবরের দুটি চক্ষু নয়—বিস্তর চক্ষু তাদের দিকে। যেন শূলের ফলা দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

পূর্ণিমা বলে, চলুন এই রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ি। দাদুর ধৈর্যের পরীক্ষা করব—বেরুনো অবধি দাঁড়িয়ে থাকেন, না 'দুত্তোর' বলে বিদেয় হয়ে যান।

প্রতিবাদে শিশির কিছু বলবে, তার কি অবসর দিল ছাই! লেখাপড়া-জানা শহুরে মেয়ে কেমনধারা চিজ, কিছু কিছু শোনা ছিল বটে—হাতে-কলমের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। পুতুল-নাচের পুতুল বানিয়ে ইচ্ছা মতন নাচাচ্ছে—দিশা করতে দেয় না।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

পঞ্চমাঙ্কের প্রস্তুতি

রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির খবরের কাগজ প্রাভদা-য় গত ২৭শে নভেম্বর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চীনা নেতৃবৃন্দকে যে ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, তার কঠোরতায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। ১৯৬৪ সালে ক্রেমলিন থেকে নিকিতা ক্রুশ্চেভের বিদায়ের পর রাশিয়ায় চীন সম্পর্কে এত তীব্র সমালোচনা শোনা যায়নি।

পাঁচ হাজার শব্দের ঐ প্রবন্ধে প্রায় প্রকাশ্যেই চীনের বর্তমান নেতৃত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্যে আহবান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি তেমন পরিণতি ঘটে তাহলে ক্রেমলিন মোটেই দুঃখিত হবে না।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল প্রাভদার এই আক্রমণকে রুশ-চীনা সম্পর্কে ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে মনে করছেন।

চীনের বিরুদ্ধে প্রাভদা প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে এই অভিযোগগুলি করা হয়েছে :

- বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য ভাঙন ধরাবার জন্যে মাও সে-তুং উঠে-পড়ে লেগেছেন।
- গত দু' বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও, এমন কি এক ঘন্টার জন্যেও চীনারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারণা বন্ধ করেনি।
- চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একাদশ অধিবেশনে প্রকাশ্যে বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ পথ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- চীনা নেতৃবৃন্দ অন্যান্য ভ্রাতৃদলের ওপর এমন একটা পন্থা আরোপ করতে চাইছে, যা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ক্রমাগত উত্তেজনার মধ্যে রাখবে এবং যার চূড়ান্ত পরিণতি হল, বিশ্ববিপ্লবের নামে, বিশ্বযুদ্ধ।
- অথচ তারা নিজেরা এমন একটি পন্থা বেছে নিয়েছে যাতে তাদের নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে না হয়।

অভিযোগগুলি নিঃসন্দেহে গুরুতর, কিন্তু নতুন কিছু নয়। সুতরাং দু' বছর ধরে সুর মোটামুটি নরম রাখার পর রুশ নেতৃবৃন্দ এখন হঠাৎ প্রকাশ্য আদর্শগত জেহাদে ফেটে পড়লেন কেন?

বৈষ্ণবাচার্য পন্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের উনবিংশ বার্ষিক স্মৃতি-পূজায় ভাষণরত অনুষ্ঠানে সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

প্রাভদা প্রবন্ধের ভাষা এবং এর মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রাখলে তিনটি সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে :

এক, রুশ নেতৃবৃন্দ হয়ত এখন স্থির-নিশ্চয় হয়েছেন যে, চীনের সংগে মিটমাটের আর কোন সম্ভাবনা নেই। একথা উল্লেখযোগ্য যে, চীনের সম্পর্কে কঠোর মনোভাবের দরুণই ক্রুশ্চেভকে ক্রেমলিন থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তারপর এই দু' বছর ধরে চীনাকে বাগে আনবার চেষ্টা করা হয়। সেই চেষ্টা সম্পর্কে রুশ নেতৃবৃন্দ যদি পুরোপুরি হতাশ না হতেন, তাহলে হয়ত তাঁরা ক্রুশ্চেভের সময়ে ফিরে যেতে চাইতেন না। কেন্দ্রীয় কমিটির একাদশ সম্মেলনের পর রেড গার্ডদের মাধ্যমে যে 'সাংস্কৃতিক' বিপ্লবের সূচনা করা হয়, মনে হয় সেটাই এই হতাশা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

দুই, মাও সে-তুং গোষ্ঠীর রীতি-নীতির বিরুদ্ধে চীনের ভেতরেই বিরোধিতা যে ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছে, প্রাভদা প্রবন্ধে তা স্বীকার করা হয়েছে। এটা আজ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, চীন নিজের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একটি পৃথক ব্লক তৈরী করবে বলে যতই আস্ফালন করুক, আঁতাত করবার মত কোন দেশ তার নেই। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে চীনের পরিকল্পনাগুলিও ব্যর্থ হয়েছে এবং তার ফলে চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও চীনা নেতৃত্বের বাগাড়ম্বরের অনেকখানিই অপূর্ণ থেকে গেছে। বাইরে এবং ভেতরে এই ব্যর্থতা, প্রাভদার মতে, দলের কর্মীদের, বুদ্ধিজীবীদের এবং সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষের ভাব জাগিয়ে তুলছে। এই অসন্তোষকে চাপা দেবার জন্যে রেড গার্ডদের দ্বারা যে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সূচনা করা হয়েছে, তাতে জনসাধারণের বিরোধিতাকে আরও উস্কে দেওয়া হয়েছে মাত্র। রুশ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে মাও-চক্রের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে এই বিরোধিতা ও অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

তিন, সাম্প্রতিক কালের চীনের নীতি সম্পর্কে, বিশেষতঃ রেড গার্ড বিপ্লবের পর থেকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশে এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট দলে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই সংশয়েরই ফল উত্তর কোরিয়া ও কিউবার চীনা শিবির ত্যাগ এবং জাপান, ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক চীনা পন্থার নিন্দা। ক্রেমলিন এই সুযোগও গ্রহণ করতে চেয়েছে।

এছাড়া একটি চতুর্থ কারণও আছে যার আলোকে এই সময় রাশিয়ার এই আক্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হবে।

প্রায় দু' সপ্তাহ আগে বুলগেরীর কম্যুনিস্ট পার্টির এক সম্মেলনে রুশ-

গেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী টোডোর ঝিভকভ বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে (প্রকারান্তরে চীনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে) একটি বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন।

সমবেত পূর্ব-ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থিত হয়, কারণ চীন-বিরোধিতা ইউরোপীয় কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে অনুমোদন দেয়, পূর্ব জার্মানী সমর্থন জানায়, পোল্যান্ড নীরব থাকলেও ধারণা হয় যে, এইরূপ একটি সম্মেলন আহূত হলে সে তাতে যোগ দেবে।

ঝিভকভের প্রস্তাবটি ছিল রাশিয়ার একেবারে মনের মত। ঐ প্রস্তাবটিকে ঘিরে বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে চিন্তাতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, স্পষ্টতই তাকে জোরদার করবার উদ্দেশ্য নিয়েই **প্রাভদার** প্রবন্ধটি লিখিত। এটি যে ২৭শে নভেম্বর প্রকাশ করা হয়েছে তার কারণই হল ২৮শে নভেম্বর থেকে হাঙ্গেরীর কম্যুনিস্ট পার্টির অধিবেশন।

ঐ অধিবেশনে বিশ্ব সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স ও গ্রীসের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির কাছ থেকে জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু তাহলেও দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত সম্মেলনকে পুরোপুরি চীন-বিরোধী প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তা দেখা দিয়েছে। বুডাপেস্ট কংগ্রেসের উদ্বোধনী দিবসে হাঙ্গেরীয় নেতা মিঃ য়ানোস কাদার চীনকে একঘরে করার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মেলন ডাকার মনোভাবের বিরোধিতা করেন।

প্রধানত এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মিঃ লিওনিড ব্রেজনেভ ২৯শে নভেম্বর বুডাপেস্ট কংগ্রেসে বলেন যে, চীনকে একঘরে করার মতলব করা হচ্ছে এই ধারণা ঠিক নয় এবং এটা সাম্রাজ্যবাদীরাই ছড়াচ্ছে।

সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানান যে, প্রথমেই একটি বিশ্বসম্মেলন ডাকা হবে না; এইরূপ একটি সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে আগে একটি ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট সম্মেলন ডাকা হবে।

এই দুটি ঘোষণার উদ্দেশ্যই হল রাশিয়ার জেহাদ সম্পর্কে যেসব কম্যুনিস্ট মহলের এখনো সংশয় আছে, তাদের সংশয় নিরসন করা। এর ফলে রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দ্বিধাগ্রস্ত দেশগুলির পক্ষে যোগ দেওয়া সহজ হবে।

প্রাভদার সম্পাদকীয় এবং বুডাপেস্ট কংগ্রেসে মিঃ ব্রেজনেভের ঘোষণার মধ্যে যদিও এই পরিবর্তনটুকু লক্ষ্যণীয়, তবু একথা ঠিক যে, কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে চীনের বর্তমান নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করার পেছনে রাশিয়ার স্বার্থ অবিকৃত আছে।

এই স্বার্থ তিনটি প্রধান কারণ থেকে উদ্ভূত :

এক, চীনের ক্রমবর্ধমান জঙ্গীবাদ এবং সমরসজ্জা রাশিয়াকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে, কারণ রাশিয়া মনে করে তার শান্তি ও নিরাপত্তার পথে চীন আমেরিকার চাইতেও বড় কাঁটা।

দুই, বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনে চীন যে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তা খতম করতে না পারলে ঐ আন্দোলন ক্রমশ অক্ষম হয়ে পড়বে। কারণ একদিকে চীনের এককভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা নেই, অন্যদিকে চীনের বিভেদাত্মক জেহাদের ফলে অন্যান্যদের পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না, মাঝখান থেকে রাশিয়ার মর্যাদাও ক্রমেই হ্রাস পেয়ে চলেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে অবিলম্বে বিশ্বের কম্যুনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য স্থাপিত হওয়া দরকার (তাতে যদি চীনকে বাদ দিতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই)।

তিন, বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অক্ষম রূপটি ভিয়েৎনামে যেমনভাবে ফুটে উঠেছে তেমন আর কোথাও হয়নি। এবং রাশিয়া এর জন্যে একমাত্র চীনকেই দায়ী করছে; কারণ চীন একদিকে শুধু উত্তর ভিয়েৎনামে রুশ সাহায্য পাঠাবার পথেই অন্তরায় সৃষ্টি করেনি, অন্যদিকে কোনরকম মীমাংসায় না আসার জন্যে হ্যানয়ের ওপরেও সমানে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। ক্রেমলিনের বিশ্বাস, চীন যদি এতখানি একগুঁয়ে না হতো তাহলে ভিয়েৎনামে একটা মীমাংসায় আসা অসম্ভব হতো না, এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনও একটা প্রচন্ড বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেত।

এই দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রাভদার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে : 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকল বৈপ্লবিক বাহিনীর ঐক্যের প্রয়োজন এটাই দাবী করছে যে, (চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির) জাতীয়তাবাদী, রুশ-বিরোধী নীতি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করে তার জায়গায় মাও সে-তুংবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাকে পরাভূত করা দরকার।

পৃথিবীটার হলো কী ?
একদিকে উপোসে মরছে !
আবার অন্যদিক থেকে
আমাকে চাঁদমারি করছে !

বৈষয়িক প্রসঙ্গ
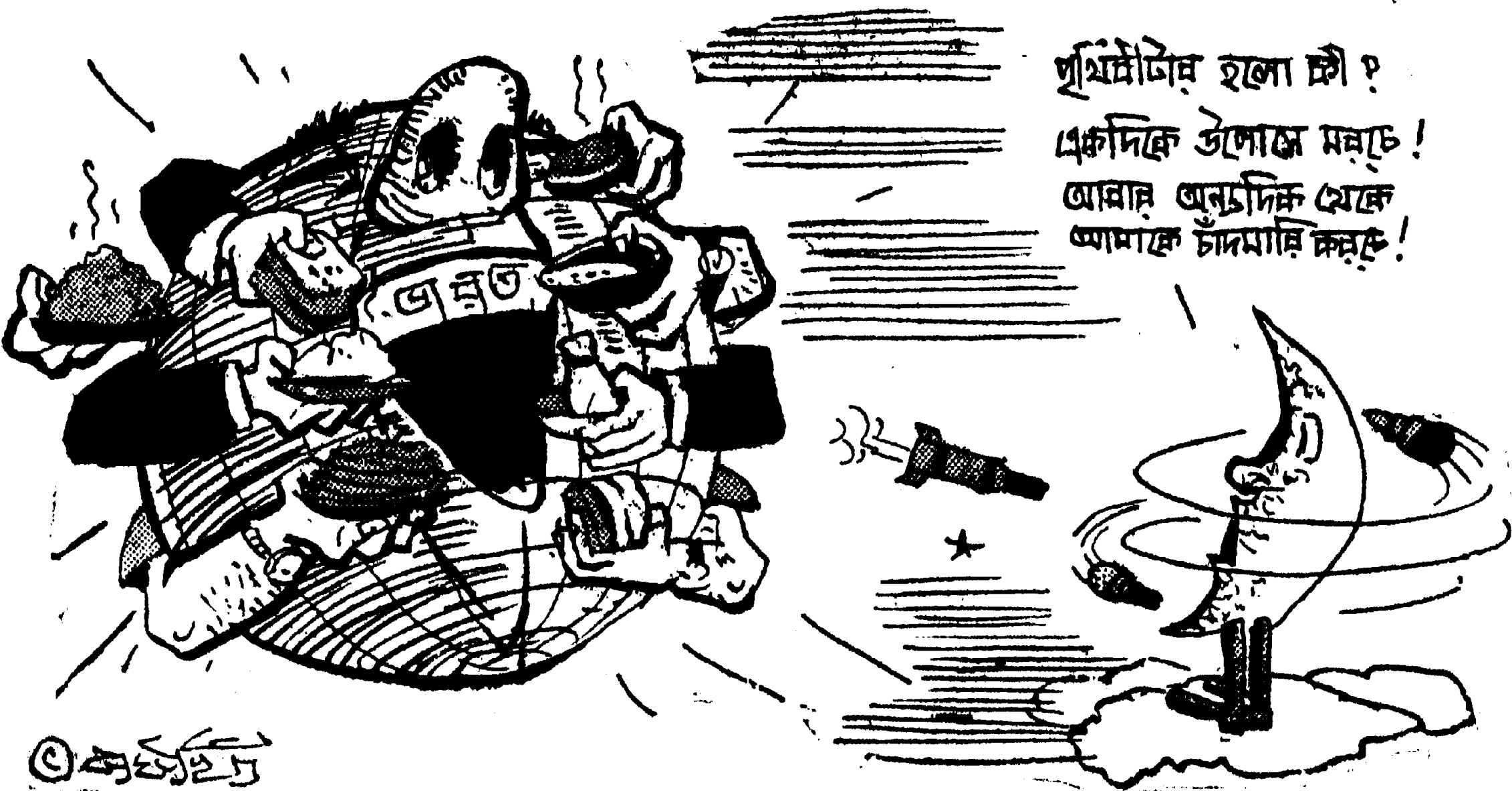
বিনিয়ন্ত্রণ, না নিয়ন্ত্রণ?

ভারতীয় অর্থনীতির উপর সরকারী বিধিনিষেধের বন্ধন প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠিন এবং এইসব বিধিনিষেধের নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে মুক্তি দেওয়া উচিত—একথা বলাই যখন রেওয়াজ হয়ে উঠছে এবং ক্রমে ক্রমে কয়েকটি সরকারী নিয়ন্ত্রণবিধি তুলে নেওয়া হচ্ছে তখন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ভিন্ন কথা বলেছেন। এই অর্থনীতিবিদের নাম ডাঃ ডি আর গ্যাডগিল। বোম্বাইয়ে দুই-দিনব্যাপী এক আলোচনাসভায় তিনি ভারতীয় অর্থনীতির যে-পর্যালোচনা করেছেন তাতে বলেছেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি প্রধানতঃ একটি অবাধ অর্থনীতি দ্বারা চালিত হয়, এই অর্থনীতি শুধু বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিধির দ্বারা অংশতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়।

ডাঃ গ্যাডগিলের মতে, ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনীতির ব্যাধিগুলির প্রতিকারের পথ নিয়ন্ত্রণ হ্রাস নয়, অধিকতর নিয়ন্ত্রণ। বিশেষ করে, পাশ্চাত্যের অর্থনীতিগুলিতে মূল্যনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কর্তৃত্বসম্পন্ন যে-ধরনের সংস্থা আছে ভারতবর্ষেও সে-ধরনের সংস্থা গঠন করা দরকার।

ডাঃ গ্যাডগিল বলেছেন, "ভারত সরকার যেখানে সরাসরি সরকারী খাতে অর্থব্যয়ের বৃহৎ কার্যসূচীতে হাত দেন সেখানেই তাঁরা সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু যেখানে সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের ক্ষমতা অন্যের হাতে থাকে, বিশেষ করে যেখানে একই সঙ্গে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের খুঁটিনাটি ব্যাপার রয়েছে অথবা যথার্থ ফললাভের জন্য যেখানে একটা দীর্ঘমেয়াদী নীতির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কাজ করার প্রয়োজন আছে সেখানে গভর্নমেন্ট ব্যর্থ হয়েছেন। গভর্ণমেন্ট যে অর্থনীতির স্থিরতা আনতে পারেন নি সেটাই তাঁদের সবচেয়ে লক্ষণীয় ও মারাত্মক ব্যর্থতা।

ডাঃ গ্যাডগিল বলছেন যে, উন্নয়নের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিরতা রক্ষা করতে না পারার যে-ব্যর্থতা সেটা সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে দেশের ভিতরে মূল্যমান স্থির রাখার ক্ষেত্রে ও বহির্বাণিজ্যের আয়-ব্যয়ে সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে। এই দুই ক্ষেত্রে অসাম্য চলতে থাকলে শুধু যে রাজনৈতিক স্থায়িত্বের দিক থেকে দীর্ঘমেয়াদী কুফল দেখা দিতে পারে তাই নয়, রাজনৈতিক ও

নাৎসী বন্দীশিবিরে ইহুদী নিধনের নায়ক সুম্যান : নাৎসী বন্দীশিবিরের প্রাক্তন চিকিৎসক হোর্স্ট সুম্যানকে ঘানা থেকে বহিষ্কারের পর ফ্রাঙ্কফুর্টে একটি বিমান থেকে অবতরণ করতে দেখা যাচ্ছে। ডাঃ সুম্যান ছিলেন ঘানার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নক্রুমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। বন্দীশিবিরে হাজার হাজার ইহুদী নিধনের ব্যাপারে জড়িত থাকার দায়ে তার বিচার হবে। দুইজন জার্মান গোয়েন্দা সুম্যানকে ঘানা থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে নিয়ে আসেন।

সামাজিক স্থায়িত্ব রক্ষার দিক থেকেও একই রকমের কুফল দেখা দিতে পারে।

তিনি বলছেন, 'বড় বড় উৎপাদনকারীদের সুবিধা দিলে সেই সুবিধার সুফল উৎপাদনের সকল অংশীদারের মধ্যে মোটামুটি সহজভাবে ও দ্রুত ছড়িয়ে যায়—এটা যেখানে প্রত্যক্ষ হয় শুধু সেখানেই 'বন্টনের আগে উৎপাদন'-এর ধ্বনি অর্থবহ অথবা, নিদেনপক্ষে, নির্দোষ হবে। হয় উন্নয়নের কৌশলটাই এমন হওয়া চাই যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এই উন্নয়নের সুফল মোটামুটি সহজে ও দ্রুত ছড়িয়ে যায় অথবা এই কৌশল এমন হ'তে হবে যাতে একই সঙ্গেও সরাসরিভাবে ছোট ও বড়রা তার আওতায় আসে। নচেৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি অসাম্য দূর করার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে।"

ডাঃ গ্যাডগিলের মতে, বিচারের এই মানদন্ডে ভারতবর্ষের উন্নয়নের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা, "সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণেই প্রকট হয়ে উঠছে যে, বন্টনের ক্ষেত্রে এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের এবং সমাজের এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

ডাঃ গ্যাডগিলের যুক্তিতে এই বৈষম্যকে পরিকল্পনার ব্যর্থতা বললে ভুল হবে, এটা সরকারী নীতিরই ফল। কেননা, তিনি বলছেন, "সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের ঘোষিত নীতিটাই বিপজ্জনক। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় মজুরী ও বেতনের নীতি সম্পর্কে যে-বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, সংসার খরচ বৃদ্ধির দরুন লোকসান পুরোপুরি পুষিয়ে দেওয়া অসম্ভব, এমনকি বলতে গেলে অবাঞ্ছিতও বটে।"

এই নীতির ফল কি? ডাঃ গ্যাডগিল বলছেন, "এর অর্থ শুধু এই হতে পারে যে, পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য আয়, এবং স্বভাবতঃই এমনকি স্বল্পবেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদেরও জীবনযাত্রার মান, ছাঁটাই করা প্রয়োজন। এর

তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই নীতির দ্বারা এটাই পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে যে, পরিকল্পনাগুলি এমনভাবে চালু করা হয়েছে যাতে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ক্রমাবনতির প্রয়োজন হয়। কারণ, এটা পরিষ্কার যে, সরকারী কর্মচারীদের যেখানে দুর্ভোগ ভুগতে হয় সেখানে যাঁরা নিকৃষ্টতর অবস্থায় আছেন তাঁদের দুর্ভোগ আরও বেশী।"

তিনি বলেছেন যে, উন্নয়নের কর্মসূচীগুলি অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে যাতে বৈষম্য না বাড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার। সেজন্য পরিকল্পনার আয়তন ও কাঠামো কিরকম হবে সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন হবে। উপযুক্ত নীতির কথা বিবেচনা না করেই যাঁরা বৃহৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চান তাঁরা অংশতঃ সেইসব পরিকল্পনাকারের দ্বারা প্রভাবিত যাঁরা একথাই মনে করেন যে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি লগ্নী করলে অর্থনীতি আপনা-আপনিই সন্তোষজনকভাবে চালু হবে।

ডাঃ গ্যাডগিল তাঁর সিদ্ধান্ত এভাবে প্রকাশ করেছেন, "অবাধ অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রীর যে-আস্থা তারই কিঞ্চিৎ সংশোধিত ভাষ্য এবং স্বয়ংক্রিয়তাবাদের প্রতি প্রযুক্তিবিদের যে-আস্থা—বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভবের এই হল দুটি কারণ।"

মূল্য ও আয় সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত একটি নীতি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা ডাঃ গ্যাডগিল তাঁর প্রবন্ধে কতকটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, একটা সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের জন্য বাজারদরগুলিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দফায় বিবেচনা করতে হবেঃ—সাধারণের নিত্যব্যবহার্য অত্যাবশ্যক বস্তুর দর, কৃষিপণ্যের দর এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য যেসব মূলধনী পণ্য অত্যাবশ্যক অথচ যেখানে ঘাটতি আছে সেসব পণ্যের দর।

এই তিন দফা দরের জন্য ডাঃ গ্যাডগিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, দেশের প্রধান প্রধান সমস্ত কৃষিপণ্য ক্রয় বা সংগ্রহের, গুদামজাত করার এবং বিক্রয় বা বন্টন করার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কলকারখানায় তৈরী ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, সর্বপ্রকার উৎপাদনকৌশল অবলম্বন করে এইসব পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা। একই যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন যাতে বাড়ান যেতে পারে তার জন্য এইসব পণ্যের রকমফের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হবে।

যেসব মূলধনী পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে সেগুলির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যাটিও গুরুত্বপূর্ণ। এইসব পণ্যের উৎপাদনে যে বাড়তি লাভ হয় সেটা মুছে দেওয়া প্রয়োজন।

আয় নীতি সম্পর্কে ডাঃ গ্যাডগিল বলেছেন যে, কৃষিপণ্যের উৎপাদকদের আয়ের স্থিতিসাধন করতে হবে প্রধানতঃ মূল্যের স্থিতিসাধনের দ্বারা। কৃষিপণ্যের উৎপাদনে কমবেশী হওয়ায় চাষীদের যে-অসুবিধা হয় সেকথা বিবেচনা করে একটা বীমার ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে যে বেকারত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয় সেটা নিবারণ করা এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মকৌশল ও যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির যথাসম্ভব সদুপযোগ করা আয় নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ গ্যাডগিলের মতে, যেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে উৎপাদকদের ও ব্যবসায়ীদের আয়বৃদ্ধির প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

সরকারী পরিকল্পনাকারদের বর্তমান চিন্তাধারার বিরোধী হলেও ডাঃ গ্যাডগিলের এইসব অভিমত অর্থনীতিবিদ মহলে আলোচনা ও বিতর্কের খোরাক যোগাবে তাতে সন্দেহ নেই।

আমার জীবন

মধু বসু

(৪২)

ওরলির অত বড় ফ্ল্যাটে এত ভাড়া দিয়ে শুধু আমি টুকলুর থাকার কোনো মানেই হয় না। সুতরাং একটা ছোট ফ্ল্যাট খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু ছোটই হোক আর বড়ই হোক—যে-কোন ফ্ল্যাট পাওয়াই তখন একটা দারুণ সমস্যা, আর তার সঙ্গে তো বিরাট অঙ্কের 'পাগড়ী' অর্থাৎ সেলামীর প্রশ্ন তো ছিলই।

একদিন মিঃ মীরকে আমার এ-সমস্যার কথা জানালাম। মিঃ মীর শুনে বললেন : আরে এ-কথা আমায় এতদিন বলেননি কেন মিঃ বোস! আপনি তো একটা গভর্নমেণ্টের ফ্ল্যাটই পেতে পারেন। আচ্ছা, আমি খোঁজ করে দেখছি যে, ভাল জায়গায় কোন ভাল ফ্ল্যাট খালি আছে কিনা।

এর কিছুদিন পরে মিঃ মীর বললেন : আপনার জন্যে একটা ভাল ফ্ল্যাট পাওয়া গেছে মালাবার হিলে রিজ রোডে। আপনি তো জানেন এই বোম্বায়ের এই পল্লীটা কিরকম অভিজাত আর ভাড়াও বেশী নয়।

কয়েকদিন পরে আমি ওরলির ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে রিজ রোডে উঠে এলাম। টুকলুও আমার সঙ্গে এল।

ইতিমধ্যে আমি ম্যাডাম মেনকার নৃত্য-সম্প্রদায় থেকে কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে 'কথক' নৃত্যের শ্যুটিং শেষ করলাম।

আমি উত্তর ভারতে যাবার আয়োজন করছিলাম কুলু ও কাংড়া ভ্যালির লোক-নৃত্য, পাঞ্জাবের 'ভাঙরা' নৃত্য এবং পেশোয়ারের 'খটক' নৃত্য তুলবার জন্যে। এমন সময় একদিন মিঃ মীর আমায় বললেন : শিগ্‌গীর বোম্বাইতে একটা বিরাট সংগীত-জলসা হচ্ছে—ওখানে বহু বড় বড় গাইয়েরা আসছেন। 'ভারতের নৃত্য' তো প্রায় শেষ করে আনলেন, এবার ভারতের সংগীত সম্বন্ধে একটা ৪।৫ রীলের ডকুমেণ্টারী তুলুন না।

প্রস্তাবটা আমার বেশ ভাল লাগল। আমি আমার সাউণ্ড এবং ক্যামেরা ইউনিটকে উত্তর ভারতে লোক-নৃত্যগুলি তুলবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে জলসার জন্যে বোম্বায়ে যে-সব বড় ওস্তাদ এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলাম। আমি বিখ্যাত গায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলাম যে, ভারতীয় সংগীতের মধ্যে যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী আছে এবং তার ব্যাপ্তি এত বিরাট যে, ৩।৪ রীল বা ৩০।৪০ মিনিটের মধ্যে তুললে তার প্রতি সুবিচার করা হবে না। আমি স্থির করলাম যে, এর চেয়ে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে একটা ছবি করলে মন্দ হবে না। আমি ভারতের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তবে অল্পক্ষণের জন্যে বাজানোয় রাজী করতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

যাই হোক, আমি কয়েকজন বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রীকে ঠিক করে ফেললাম, যেমন সেতারে বিলায়েত খাঁ, সানাই-এ বিসমিল্লা খাঁ, ফ্লুটে পান্নালাল ঘোষ, বীণায় ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পা। সারেঙ্গী, বিচিত্র-বীণা, তবলা, পাখোয়াজ এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের কতকগুলি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র যাঁরা বাজিয়েছিলেন, তাঁদের নামগুলো আমার ঠিক মনে পড়ছে না। সরোদের জন্য মিঃ মীর আমায় বললেন, হাফেজ আলিকে ঠিক করতে কিন্তু আমার একটা দুর্বলতা ছিল বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ-র ওপর। সেজন্য আমি বহুকষ্টে তাঁকে রাজী করালাম অল্পক্ষণ বাজাবার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যেদিন তাঁর সরোদ বাজনার শ্যুটিং-এর দিন ঠিক করেছিলাম, সেদিন ঘটল এক দুর্ঘটনা। আমার প্রোগ্রাম ছিল সন্ধ্যা ৬টায় আলাউদ্দীন খাঁর সরোদ এবং সন্ধ্যা ৭-৩০মিঃ ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পার বীণা। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এসে পৌঁছুলেন না, এদিকে ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পা ঠিক ৬-৩০ সময় এসে বীণার সুর বেঁধে ৭টার মধ্যে একেবারে তৈরী।

তখন গিরিয়াপ্পা বললেন : এখনও যখন খাঁ সাহেব এলেন না—এর পর এসে সুর বেঁধে তৈরী হতে হতে প্রায় ৮টা বেজে যাবে এবং যত তাড়াতাড়িই করুন ৯টার আগে আপনি ও'র শ্যুটিং শেষ করতে পারবেন না। ওদিকে আজ রাত্রে সংগীত-সম্মেলনে আমাকেই প্রথম বাজাতে হবে। অতএব যদি আমার 'বীণা'-র শ্যুটিং করতে চান, তাহলে এখুনি নিয়ে নিন মিঃ বোস। এর থেকে দেরী হলে আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমিও দেখলাম, সত্যিই তো খাঁসাহেব কখন আসবেন তার ঠিক নেই—এর মধ্যে গিরিয়াপ্পার 'বীণা'র শ্যুটিংটা সেরে ফেলা যাক।

লাইটিং, রিহার্সাল, সাউণ্ড-মণিটার—এইসব করতে করতে প্রায় আটটা বাজল। যখন 'final take' করব বলে তোড়-জোড় করছি, এমন সময় ওস্তাদজী এসে হাজির। উনি এসেই দেখলেন যে, আমি গিরিয়াপ্পার বীণা 'টেক' করবার জন্য একবারে তৈরী। এই দেখেই তিনি মনে মনে খুব ক্ষুণ্ণ হলেন—তাঁর অভিমানে ঘা পড়ল।

আমি খাঁসাহেবকে অনেক করে বুঝিয়ে বললাম—তাঁর জন্যে একঘণ্টারও বেশী সময় অপেক্ষা করেছি, ভেঙ্কাটা গিরিয়াপ্পাকে আজ জলসায় প্রথম বাজাতে হবে বলে তাঁর কাজটা শেষ করে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু আমার অত অনুনয়-বিনয়, যুক্তি কিছুই খাঁসাহেব শুনলেন না, বুঝলেনও না। তিনি শুধু বললেন : তাঁর এখানে আসতে দেরী হওয়ার জন্যে দায়ী তিনি নন, আমাদের প্রোডাকশান ম্যানেজার ঠিক সময়ে যাননি। এতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে, তিনি শ্যুটিং করতে পারবেন না।

যা হোক, অভিমান করে তিনি চলে গেলেন।

এদিকে ওস্তাদ হাফেজ আলি শুনেছিলেন যে, সরোদ-বাদ্যের জন্য আমি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে ঠিক করেছি, সুতরাং এর পর আবার তাঁর কাছে গিয়ে সরোদ বাজাতে অনুরোধ করতে পারলাম না। ফলে হল কি সরোদ বাজনাটাই বাদ পড়ে গেল।

এর বেশ কিছুদিন পর একদিন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কোন অভিমান নেই—কথাবার্তা ব্যবহার আন্তরিকতায় ভরা। শুধু তাই নয়, তিনি প্রায় তিনঘণ্টা ধরে আমাকে সরোদ বাজিয়ে শোনালেন। সে যে কি অপূর্ব সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়েছিল, তা বলে বোঝানো শক্ত—সে সরোদ-বাদ্য কোন দিন আমি ভুলবো না।

এরপর অনেক কথা হল—বিশেষ করে তিমিরবরণের কথা। দেখলাম, তিনি তিমিরকে কি গভীর স্নেহ করেন।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, ইতিমধ্যে ইনফরমেশন ফিল্ম-এ প্রফুল্লদা (প্রফুল্ল রায়) একজন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। অন্যান্য পরিচালকদের মধ্যে আর একজন পরিচালক ছিলেন, তাঁর নাম ভাস্কর রাও। ভারী অমায়িক ভদ্রলোক। ইনি নাকি পুণায় প্রভাত ফিল্মে শান্তারামের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

এরপর আমি 'ভারতের নৃত্য' এবং 'ভারতের বাদ্যযন্ত্র' ছবি দু'খানির সম্পাদনা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে আমার সাউণ্ড ও ক্যামেরা ইউনিট উত্তর ভারতের লোক-নৃত্যগুলি তুলে ফিরে এল।

যদিও ২।৩ জন সম্পাদক ছিলেন চিত্র-সম্পাদনার জন্যে, তবু মিঃ মীর স্বয়ং সম্পাদনার তত্ত্বাবধান করতেন। মিঃ মীর ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সম্পাদক। সুসম্পাদিত হলে যে ছবির রূপ বদলে যায়, সেটা মিঃ মীরের কাছে শিখলাম, বিশেষ করে ডকুমেণ্টারী ছবির ক্ষেত্রে। কথায় কথায় তিনি আমায় একদিন বলেছিলেন যে, তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সম্পাদনা জিনিসটা ভালভাবে শিক্ষা করা।

এই সময় আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল।

ইনফরমেশন ফিল্মসের কাজ একেবারে রুটিন-বাঁধা—১০টা—৬টা। আমাদের অন্যান্য স্টুডিওর মত নয় যে, সময়ের কোন মা-বাপ

নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে 'এডিটিং'-এ বসলে দেরী হয়ে যেত বৈকি অল্প-সল্প—তা নাহলে ৫।৬টার মধ্যে কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরে আসতাম।

সন্ধ্যার সময় একা-একা বাড়ীতে বসে থাকতে ভাল লাগে না, তাই মাঝে মাঝে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ায় যেতাম, সেখানে অনেক পুরনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হোত—সময়টা বেশ কেটে যেত।

একদিন ক্লাবে দুজন পুরোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—লীলা ও মায়া। কলকাতা থেকেই এদের আমি চিনতাম। তারা আমাকে তাদের বড় বোন কৃষ্ণার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। প্রথম আলাপেই আমার মনে হোল, আমাদের মধ্যে যেন কোথায় একটা মিল আছে। কথা বলতে বলতে বুঝলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের ওপর তার বিরাট দখল আছে। তাকে দেখলে মনে হয় যেন সব সময় সে একটা গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন। আমাদের সমাজের অন্যান্য মেয়েদের মত পরের কথা নিয়ে গল্পসল্প করতে তাকে কোনদিন দেখিনি। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারতাম দর্শন ও মনস্তত্ত্বে তার বিশেষ আগ্রহ। কথাচ্ছলে আমি যখন তাকে বললাম যে, ড্যান্স অফ ইণ্ডিয়া ছবি তোলার ব্যাপারে আমাকে অনেক দিন মাদ্রাজের অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে আমি অরুণাচলমে রমণ মহর্ষির আশ্রম দেখেছি কিনা। আমি স্বীকার করলাম যে, আমি দেখিনি।

তাতে সে বলল : দক্ষিণ ভারতে এত জায়গায় ঘুরলেন অথচ রমণ মহর্ষির আশ্রমেই গেলেন না? আপনাদের বাংলাদেশে যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দক্ষিণ ভারতে তেমনি রমণ মহর্ষি। আমি যখনই সময় পাই, তখন অরুণাচলমে গিয়ে রমণ মহর্ষির সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে প্রচুর শান্তি পাই।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই আমরা কথাবার্তার মধ্যে এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে, লীলা মন্তব্য করলে : কি মধু, আমার বোনকে পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে?

যা হোক, এরপর থেকে প্রায়ই কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হয়—একসঙ্গে সিনেমা যাই। আমার এ নিঃসঙ্গ জীবনে দেবতার আশীর্বাদের মতই সে এসে দাঁড়াল আমার জীবনে। যদিও তার মা ছিলেন বাঙালী এবং বাবা ছিলেন মারাঠী। সে বাংলা বলতে পারত ভালই, তবে লিখতে বা পড়তে পারত না। আমি তাকে বাংলা বই, বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের এবং রামকৃষ্ণের 'কথামৃত' বইগুলি পড়তে দিতাম—আর সে তার পরিবর্তে আমাকে দিত ইংরাজী বই।

আমার মত তার জীবনেও ছিল একটা বিরাট ট্র্যাজেডী। স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করে সে কোর্টে দরখাস্ত করেছিল বিবাহ-বিচ্ছেদের। সমাজ-কল্যাণের কাজ করার দিকে তার ছিল অসাধারণ আগ্রহ, তাই সে ভারতীয় রেডক্রশ-এ যোগদান করেছিল। তখন যুদ্ধের সময় সেবার কাজে অনেক দূর-দূর জায়গায় যেতে হোত তাকে কিন্তু যখনই সে বোম্বারে ফিরে আসত, তখনই আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে নিরিবিলিতে পরস্পরের সান্নিধ্যের আনন্দ উপভোগ করতাম। ক্রমশঃ আমার এই বন্ধুত্ব নিবিড় অনুরাগে পরিণত হলো।

ইতিমধ্যে 'ড্যান্সেস অফ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদনা শেষ হল এবং ভারতের সর্বত্র মুক্তিলাভ করল। এই ছবি সম্বন্ধে বিভিন্ন কাগজের মতামতগুলি নীচে উদ্ধৃত করলাম :

"A new chapter opens in the history of short films in India with the release of I.F.I's "DANCES OF INDIA." This series of cultural shorts will help to acquaint millions both in India and abroad with the true meaning behind Indian classical dancing....Director Modhu Bose as well as the Information Films of India deserves our best congratulations for these remarkable documentaries."

....'DIPALI' (23.6.1944)

"The presentation on the screen by the Information Films of India of the "Dances of India" has highly educative and cultural value..The dances are rendered by expert exponents who adhere to the classical traditions in their pure forms.. The efforts of I.F.I. and Director Modhu Bose are to be highly commended for the meticulous care and artistic taste with which these dances have been produced with a genuinely documentary basis."

....TIMES OF INDIA (BOMBAY) (17.7.44)

"The informative method of presenting film subjects, a feature of the shorts produced by Information Films of India, has been admirably used in the series of "The Dances of India" which have been directed by Mr. Modhu Bose.... Director Bose has obtained the authentic examples of the Indian classical dances as well as countless folk dances, which have a homely charm all their own."

EVENING NEWS (BOMBAY) 18.6.44.

আমার পরবর্তী ছবির কথা হয়েছিল 'ভারতের চিত্রশিল্প' সম্বন্ধে একটি ডকুমেণ্টারী করার, এই উপলক্ষে আমি প্রথমে গেলাম মাদ্রাজে। সেখানে চিত্রশিল্পীদের সংগীত ও অভিনয়-এর শুটিং করলাম। এই প্রসঙ্গে Indian Express (23.12.1944) লিখলো :—

"Modhu Bose's "Dances of India" and "Musical Instruments of India" have proved that under capable direction, shorts, dealing with the cultural heritage of India can be artistic hits. Mr. Bose is here in Madras again in connection with his latest documentery film are the 'Indian Screen' which will deal with the various aspects of the Indian film Industry. It will trace the growth of films in India from the days of Phalke and Madras Theatres upto the present films".

মাদ্রাজ থেকে এলাম কলকাতায় এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমি নিউ থিয়েটার্সের বড় বড় শিল্পী এবং সংগীতজ্ঞদের নিয়ে শুটিং করার যে প্রস্তাব করলাম তাঁর কাছে, তাতে তিনি সমস্ত রকম সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু ম্যাডান থিয়েটার্সের প্রথম যুগের কার্যপদ্ধতি কিছু না দেখালে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু ম্যাডানের তখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে —কোনো পুরোন ছবি বা ফিল্ম নেগেটিভ কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল শুধু কয়েকটা পুরোন ক্যামেরা আর প্রোজেক্টার।

বাজোরজী এবং জাহাঙ্গীরজীর কাছ থেকে যতটা জানতে পারলাম যে, তখনকার দিনে কেমন করে তাঁবু খাটিয়ে পর্দা জলে ভিজিয়ে ছবি দেখানো হত—তাই নিয়েই আমি ছবির শুটিং করার আয়োজন করলাম। অবশ্য যখন আমি ১৯২৮ সালে ম্যাডানে ছবি করেছিলাম, তখন জে এফ ম্যাডানের জামাই এবং ম্যাডানের আসল নির্মাতা রুস্তমজী ধোতিবালার কাছে অনেক কিছুই শুনেছিলাম। তার মধ্যে অনেক ইতিহাস এবং পুরনো তথ্য ছিল।

আমি তখন কলকাতায় একটা হোটেলে থাকি। টুকলুও আমার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছে।

সে-সময়ে নিজের মানসিক বিপর্যয়ে আমি বিভ্রান্ত হয়ে আছি। একদিকে সাধনার সঙ্গে বিচ্ছেদ—অন্যদিকে আমার নিঃসঙ্গ জীবনে কৃষ্ণার প্রভাব আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। কোথায় কেমনভাবে কার কাছ থেকে শান্তি পাবো বুঝতে পারছিলাম না। এমন একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যেখানে আত্মসমর্পণ করে আমি পরিত্রাণ পাবো। এই যখন অবস্থা, তখন আকস্মিকভাবে আমার জীবনে আবির্ভাব হল সেই অপ্রত্যাশিতের—যিনি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম হিতৈষী বন্ধু, আমার আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু। আজ আমি যদি কিছুমাত্র ধর্মের আলোক দেখতে পেয়ে থাকি, তা মাত্র তাঁরই কৃপায় সম্ভব হয়েছে। এই বন্ধু, এই গুরু, এই মহামানব সম্বন্ধে পরে বলছি। (ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা :

লবকুশ (বাঙলা) : এ, বি, এন, প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৭৩৪·৮০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ প্রযোজনা : বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ননী দত্ত; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অশোক চট্টোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় উপদেশ : ভূপেন রায়; কাহিনী সংকলন : 'সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়; সঙ্গীত পরি-চালনা : শ্রীকান্ত; গীতরচনা : গোপাল দাশগুপ্ত ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্র-গ্রহণ : বিভূতি চক্রবর্তী; গেভাকলার চিত্রগ্রহণ : অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা; শব্দানুলেখন : জে, ডি, ইরাণী ও সুনীল ঘোষ (অন্তর্দৃশ্য) এবং অবনী চট্টোপাধ্যায় ও দেবেশ ঘোষ (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতানু-লেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টো-পাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা : বটু সেন; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল রায়চৌধুরী; নেপথ্য কণ্ঠদান : হেমন্তকুমার, মান্না দে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগচী, কৃষ্ণ সেন, বিনয় অধিকারী, সমীর-কুমার, সলিল মিত্র, বিমলভূষণ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও শিপ্রা; রূপায়ণ : মাস্টার শংকর ঘোষ, মাস্টার সুশোভন, তীর্থংকর রায়, মুনমুন, অসিতবরণ, প্রবীরকুমার, আশীষ-কুমার, শংকরনারায়ণ, মিহির ভট্টাচার্য, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, অনীতা গুহ, মলিনা দেবী, তপতী ঘোষ এবং (নৃত্যে) গোপীকৃষ্ণ ও সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। গোল্ডউইন পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৫-এ নভেম্বর থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার চিত্রে মাধবী মুখার্জী

লঙ্কেশ্বরকে সবংশে নিধন করবার পরে শ্রীরামচন্দ্র জানকীর অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শুচিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে। কিন্তু তবু মা-জানকীর দুঃখের অবসান ঘটেনি। বহুদিন রাবণগৃহে বন্দিনী থাকবার অপরাধে অযোধ্যার প্রজারা তাঁর চরিত্র সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগল। প্রজানুরঞ্জক রাম তাদের সন্তোষ-বিধানের জন্যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে প্রেরণ করেন। সেখানেই সীতার দুই যমজ সন্তান —লব ও কুশের জন্ম। মহর্ষির নির্দেশে লব ও কুশ অচিরেই শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া যখন দৈববিধানে বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে হাজির হয়, তখন লবকুশ তাকে বন্দী করে এবং তাদের পরাক্রমের কাছে রামসৈন্যরা পরাস্ত হয়। শেষে মহর্ষির মধ্যস্থতা ও পরামর্শে লবকুশ অশ্বমেধের ঘোড়াকে মুক্তি দেয় এবং মহর্ষিরই সঙ্গে তারা শ্রীরামচন্দ্রের সভায় উপনীত হয়ে সুললিতকণ্ঠে রামকাহিনী গান করে। তাদের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে রাম আবার যখন সীতাকে রাজমহিষীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হন, তখনও অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ তাঁকে গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে শোকে দুঃখে ধরিত্রীদুহিতা সীতা ধরিত্রীগর্ভে বিলীন হয়ে যান।

রামায়ণ-বর্ণিত এই সীতার বনবাস ও লবকুশ সংক্রান্ত কাহিনী বাঙালী মাত্রেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। এবং এই কাহিনীকেই আশ্রয় করে এ, বি, এন, প্রোডাকসন্স-এর আলোচ্য পৌরাণিক চিত্র "লবকুশ" গড়ে উঠেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এর কাহিনী সংকলনে পরলোকগত সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ওপর নির্ভর করেননি; বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ ক'রে এর ঘটনাবলীকে যথাসম্ভব নাটকীয় করবার চেষ্টা করেছেন তিনি। অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটক করার উপলক্ষে শেষ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রকেও তিনি লবকুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়েছেন। অবশ্য এই যুদ্ধ লব ও কুশ নিক্ষিপ্ত বাণগুলির বহু অত্যাশ্চর্য শক্তি দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করা বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

ছবিটি প্রধানত ভক্তিমূলক এবং এই ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, ছবির শেষাংশে সীতার পাতালপ্রবেশের পরে রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার, এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ছলে গেভাকলারে (রঙীন চিত্রে) দশাবতার স্তোত্র অবলম্বনে বাঙলা গানের সঙ্গে দশাবতার মূর্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে।

ভক্তিপ্রবণ দর্শকদের কাছে এর মূল্য কম নয়।

ছবিটিতে ছোটবড়ো, বহু চরিত্রের সমাবেশ আছে স্বাভাবিকভাবেই। তবু ওরই মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে সীতা, বাল্মীকি, লব, কুশ ও রাম—এই পাঁচটি চরিত্র। লব ও কুশের ভূমিকায় শ্রীমান শঙ্কর ও সুশোভন যথাসম্ভব যোগ্যতা দেখিয়েছে। সীতা ও রামরূপে অনীতা গুহ এবং অসিতবরণ যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহারের ত্রুটি করেননি। বাল্মীকির বেশে শঙ্করনারায়ণ চলনসৈ অভিনয় করেছেন। বশিষ্ঠরূপে মিহির ভট্টাচার্য চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় মলিনা দেবী, তপতী ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, সুবল দত্ত, প্রবীরকুমার, আশীষকুমার প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণ পর্যায়ের। ছবিটিতে তীর নিক্ষেপ উপলক্ষে অনেকগুলি ট্রিক্-শট দর্শকদের চমৎকৃত করে। গেভাকলারের দৃশ্যগ্রহণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ছবির অধিকাংশ গানই সুগীত।

পৌরাণিক চিত্র "লবকুশ" ভক্তিপ্রবণ দর্শক-দর্শিকাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে।

—নান্দীকর

কলকাতা

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' চিত্রের শুভমুক্তি

প্রমথনাথ বিশী রচিত শ্যাডো প্রোডাকসন্সের 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' এ সপ্তাহের ৯ ডিসেম্বর থেকে দর্পণা, প্রাচী, ইন্দিরা এবং শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। প্রাচীন জমিদার বংশের নাটকীয় ঘটনায় বিবৃত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা গুহঠাকুরতা, কমল মিত্র, তরুণকুমার, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, গীতালি রায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সুস্মিতা সান্যাল এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অজিত লাহিড়ী পরিচালিত ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালিপদ সেন। দেবালী পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

'অকালবসন্ত' চিত্রের শুভমুক্তি

রূপ কে শোর পরিচালিত মুকুল পিকচার্সের 'অকালবসন্ত' চিত্রটি এ সপ্তাহে ৯ ডিসেম্বর ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, প্রভাত, শ্রী প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। মিষ্টি-মধুর এই প্রেম-প্রহসনটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার, আই এস জোহর, সোনিয়া সাহনী ও, পরভীন চৌধুরী। সুর সৃষ্টি করেছেন ও পি নায়ার।

মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্র 'বধূবরণ'

দিলীপ নাগ পরিচালিত ডি এস প্রোডাকসন্সের 'বধূবরণ' চিত্রটি বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। শ্যামল গুপ্ত রচিত এই কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন প্রদীপকুমার, গীতা দত্ত, বিকাশ রায়, অভি ভট্টাচার্য, অজয় বিশ্বাস, রাখী বিশ্বাস, ভারতী দেবী, জীবেন বসু, জহর রায় ও গীতা দে। কমল দাশগুপ্ত ছবিটির সুরকার।

বলাই সেন পরিচালিত 'কেদার রাজা'

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত ও বলাই সেন পরিচালিত জিন্দেল ফিল্মসের সামাজিক চিত্র 'কেদাররাজা'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। তপন সিংহকৃত চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, অসিতবরণ, গীতা দে, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আমেদ, সুখেন দাস ও রত্না ঘোষাল। সুর-সৃষ্টিকার কালিপদ সেন।

'অসামাজিক' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ

সম্প্রতি কে, ডি, পিকচার্স নিবেদিত "অসামাজিক" চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। "সুবর্ণরেখা"র বিপুল সাফল্যের পর সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তাঁর পুনরায় আত্মপ্রকাশ সঙ্গীতরসিক-সমাজকে আনন্দ দিয়েছে। সম্প্রতি এই চিত্রের সঙ্গীতগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। শ্যামল মিত্র কণ্ঠদান করলেন গৌরীপ্রসন্ন রচিত একটি গানে "মনে হয় মনটাকে আকাশে ছড়িয়ে দিয়ে" উপভোগ্য সুরসৃষ্টি করেছেন বাহাদুর খাঁ। শ্যামল মিত্রের সুরেলা ও ভাবগ্রাহী কণ্ঠে গানটি সুখশ্রাব্য হয়েছে। অপর একটি গান শ্রীমতী নীতা সেনের কণ্ঠে "পীরিতের রংমহলে"—দুটি গানই জনপ্রিয়তার দাবী পূর্ণ করবে বলে আশা করা যায়।

বোম্বাই

'এক পহেলি' চিত্রের শুভ মহরৎ

উষা মুভিজের রঙিন চিত্র 'এক পহেলি'র শুভ মহরৎ সম্প্রতি আর, কে স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হয়। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন ফিরোজ, তনুজা, মদনপুরী, কুমাম দেওয়ান মাধুরী সাধনা ও রাজেন্দ্রনাথ। ছবিটির পরিচালক নরেশকুমার। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন উষা খান্না।

এইচ এস রাওয়াল পরিচালিত 'সংঘর্ষ'

সম্প্রতি শুভ বিবাহের পর দিলীপকুমার গত সপ্তাহ থেকে এইচ এস রাওয়াল পরিচালিত 'সংঘর্ষ' চিত্রে অভিনয় করলেন। বর্তমানে ছবির অন্তর্দৃশ্য রূপতারা স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। মহাশ্বেতা দেবী রচিত এই কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন বৈজয়ন্তীমালা, রাজকুমার, জয়ন্ত, দুর্গা খোটে, সুলোচনা ইফতিকর, উল্লাস, সাপ্রু ও সুন্দর। সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন নৌশাদ।

বহুবেগম' মুক্তিপ্রতীক্ষিত

এম সাদিক পরিচালিত রঙিন চিত্র 'বহুবেগম' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। জুন নিসার আখতার রচিত ও প্রযোজিত এই চিত্রের প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন অশোককুমার, মিনাকুমারী, প্রদীপকুমার, জনি ওয়াকার, নাজ, সাপ্রু, বালম, লীলা মিশ্র, হেলেন এবং ললিতা পাওয়ার। রোশন ছবিটির সুরকার।

দিল এক দিওয়ানে হাজার

এন, সি প্রডাকসন্স-এর প্রথম নিবেদন "দিল এক দিওয়ানে হাজার" ছবির প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। বিনোদ শর্মার চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করছেন সমর চৌধুরী। বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবেন বাংলা ও বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা শিল্পিবৃন্দ। আগামী মাসের মাঝামাঝি ছবিটির নিয়মিত সুটিং শুরু হবে।

মঞ্চাভিনয়

অতএব (হাসির নাটক) : রচনা : বিধায়ক ভট্টাচার্য; পরিচালনা : হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায়; দৃশ্যসজ্জা : গণেশ দাস; শব্দপ্রক্ষেপণ : প্রভাত হাজরা; আলোকসম্পাত : অভয় দাস; রূপায়ণ : জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মিন্টু চক্রবর্তী, সরযু দেবী,

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৯৬৬ সালের ৬ই অক্টোবর থেকে "রঙমহল" রঙ্গমঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে।

সমস্যাকন্টকিত, মিছিলসর্বস্ব, দুঃস্বপ্নের পুরী কলকাতা শহরের বাসিন্দারা আজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় দুঃসহ-ভাবে ক্লিষ্ট হয়ে হাসতে প্রায় ভুলেই গেছে। এমন দিনে "রঙমহল"-এর কর্তৃপক্ষ নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দকে উপহার দিয়েছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রণীত নতুন নাটক "অতএব"। নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের নীরস একঘেয়েমিকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে প্রায় পুরোপুরি তিনঘণ্টা ধ'রে প্রাণ খুলে যদি কেউ হাসতে চান, তাঁকে আমি উপদেশ দেব—সোজা "রঙমহল"-এ গিয়ে "অতএব" দেখে আসুন; শরীর ও মন, দুইই হাল্কা হয়ে যাবে, জীবনীশক্তি ফিরিয়ে পাবেন, পরমায়ু বৃদ্ধি পাবে।

অকৃতদার দোলগোবিন্দ চৌধুরী প্রৌঢ় বয়সে তরুণী অমিতাকে বিবাহ করতে চান; অথচ অমিতা সৌমিত্র নামে একটি কৃতবিদ্য সুদর্শন তরুণকে ভালোবেসে বসে আছে। অমিতার আণ্টি বর্ষীয়সী চিরকুমারী হেমাঙ্গিনী দেবীর ধারণা অসামান্য ধনী দোলগোবিন্দকে বিবাহ করলে অমিতা শেষ পর্যন্ত সুখীই হবে এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি অমিতাকে উপরোধ, অনুরোধ এবং আদেশ করে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এই বিবাহে সম্মত করতে চেয়েছিলেন। একদিকে সৌমিত্র ও তার বন্ধু কালাচাঁদ; অপরদিকে দোলগোবিন্দ ও হেমাঙ্গিনী—এরই মাঝে অমিতা ও তার মন্ত্রণাদাত্রী সখী ও ভগ্নী নয়নতারা। আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে কতরকমই না অভাবনীয় পরিস্থিতি। এমন কি প্রেমের ব্যর্থ পরিণতিস্বরূপ গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা পর্যন্ত! হাসতে হাসতে দম আটকে যাবার যোগাড়! কথায় বলে শেষবেশ। এখানেও শেষবেশই হ'ল। কিন্তু কেমন করে কার দয়ায় কাপুরুষ সৌমিত্র তার দয়িতা অমিতাকে লাভ করল, তা বর্ণনা করলে নাটক দেখার মজাটাই মাটি হয়ে যাবে। তাই বলি—নাটকটি দেখে প্রাণভরে হাসুন।

অভিনয়ে মাত করেছেন—নয়ন-এর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। বুদ্ধিদীপ্ত নয়নকে তিনি ভাবে, ভঙ্গীতে, সংলাপের দ্রুত তীব্রতায় মূর্ত করে তুলেছেন। চোখে-মুখে কথা কওয়া যাকে বলে, ঠিক তাই করে তিনি ভূমিকাটিকে দর্শকদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। অসামান্য চরিত্রাভিনেতা জহর রায় প্রতি নাটকেই নতুন হয়ে দেখা দেন। এই নাটকের প্রধান চরিত্র, প্রৌঢ় ধনী দোলগোবিন্দ চৌধুরীর ভূমিকায় যে পরিপাটি সুবিন্যস্ত চুল নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তিনি চরিত্রটির অন্তর্নিহিত সাদাসিধে ভাব এবং বাহ্যত 'এমন সাদাসিধে বুড়োর মনে মনে এত' ভঙ্গীটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। স্বভাব-সিদ্ধ নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনি ভূমিকাটিকে অভাবনীয়ভাবে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। রোমাণ্টিক নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে অজয় গাঙ্গুলী ও দীপিকা দাস চরিত্র দু'টির দাবিকে পূরণ করেছেন অবলীলাক্রমে। আধুনিকা প্রৌঢ়া হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় আজও এমন অবলীলাক্রমে সাবলীল অভিনয় করলেন সরযূ দেবী, যা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জীবের মুক্তিদাতা, গীতাপাঠক ও দাবাখেলক অনন্তচরণ মাইতিরূপে হরিধন মুখোপাধ্যায় দর্শকদের হাসির হররায় ডুবিয়ে দিয়েছেন। সৌমিত্রের বন্ধু কালাচাঁদের ভূমিকাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়গুণে। বেচারাম বল রূপে মিণ্টু চক্রবর্তী সুন্দর। অপরাপর ভূমিকায় প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন।

"অতএব" নাটককে বিভিন্ন দৃশ্যপটে ভূষিত ক'রে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যই সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত। আলোকসম্পাত এবং দৃশ্যান্তরের নেপথ্য যন্ত্রসঙ্গীত সুরুচির পরিচায়ক।

রঙমহলের "অতএব" নাটক দেখে অনেকদিন বাদে প্রাণভরে হেসে বাঁচলুম।

।। প্রতীক ।।

কলকতার 'প্রতীক' সংস্থার উৎসাহী শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে শ্রীজ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দৃষ্টি' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন শিয়ালদহ নেতাজী ইনস্টিটিউট মঞ্চে। এই বাস্তবনিষ্ঠ ও জীবনধর্মী নাটকের সংঘাত শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ কয়েকটা মুহূর্তে পরিচালক শ্রীসুফল পালের নিষ্ঠা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য অন্ধ কুমোরের ভূমিকায় সলিল দে-র অপূর্ব অভিনয়। চরিত্রটির অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা শিল্পীর আন্তরিক অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। চরণের কুমারী মেয়ে সদু-র

অতএব নাটকে অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

চরিত্রে কল্পনা ভট্টাচার্যের অভিনয়ও সুন্দর। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন——উশীনর বিশ্বাস, সন্তোষ বসাক, পরিতোষ চক্রবর্তী, শ্রীসরকার, মানসকুমার দে, গোপাল চক্রবর্তী, দেবনাথ চ্যাটার্জি, রঞ্জিতকুমার ওঝা, ভূপাল ভট্টাচার্য, সুবোধ সরকার, রবীন চক্রবর্তী, রাধারাণী। মঞ্চসজ্জা ও আবহসংগীতে ছিলেন পরিতোষ চক্রবর্তী, মণি বোস, আশীষ সরকার।

নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে হাস্যকৌতুকে ও সাপুড়িয়া নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন শংকর বিশ্বাস ও কল্পনা চক্রবর্তী, রীণা হালদার। মিলনোৎসবের সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুষম পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদক মিহির মুখার্জির আন্তরিকতা প্রশংসার দাবী রাখে।

।। অনামী ।।

'অনামী'র মঞ্চসফল নাটক 'প্রতিচ্ছবি' সম্প্রতি অভিনীত হোল কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে। নীলোৎপল দে রচিত ও পরিচালিত এই নাটকের অসাধারণ অভিনয় যেভাবে পূর্বে নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছিল, তার ছাপ এইদিনকার আয়োজনেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিটি শিল্পী তাদের নিজেদের চরিত্র সম্পর্কে অসম্ভব সচেতন থাকার জন্য চরিত্রায়ণ অসাধারণ হয়েছে। নাটকের টিমওয়ার্ক এক কথায় অপূর্ব।

অভিনয়ের দিক দিয়ে বিশু চ্যাটার্জির 'সুনীল' একটি আশ্চর্য চরিত্রসৃষ্টি। নীলোৎপল দে সোমনাথ চরিত্রের রূপায়ণে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য রাখতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন নীলেন দে, সুধাংশু চক্রবর্তী, দীপক সমাদ্দার, মণ্টু গোস্বামী, দুলাল ঘটক, শ্যামল লাহিড়ী, সত্য গোস্বামী, সজল মুখার্জি, রেবতী রায়, জীবনবন্ধু, শান্তি পাল, দেবাশীষ প্রামাণিক, রাণু রায়, শিপ্রা সাহা। আলোক-সম্পাতে শশী পালের দক্ষতাও প্রতিমুহূর্তে ধরা পড়েছে।

।। রম্যচক্র ।।

শংকরের 'চৌরঙ্গী'-র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে 'রম্যচক্রের' শিল্পিবৃন্দ এক দুঃসাহসিক নাট্যপ্রচেষ্টার নজীর সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সূত্রে কলকাতার অসংখ্য নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন শিল্পিবৃন্দ। এবারে তাঁদের নতুন নাটক 'দাহ' মঞ্চস্থ হোল বিশ্বরূপার মঞ্চে। এই নাট্যাভিনয়ে 'চৌরঙ্গী'র বলিষ্ঠতা আর প্রাণময়তা অটুট থাকতে পারেনি। 'দাহ' নাটকটির রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন সুকুমার দত্ত।

সামগ্রিকভাবে নাট্যাভিনয়ে প্রতিটি শিল্পীই মোটামুটি ভালো অভিনয় করেছেন। কিন্তু এই সংস্থার সংঘবদ্ধ অভিনয় আরো অনেক উন্নত মানের হওয়া প্রয়োজন ছিল। সেদিনকার অভিনয় আমাদের এ-প্রত্যাশা মেটায়নি। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, মলয়া সরকার, অমিত দে, দীনেশ ভট্টাচার্য, দেবদাস গাঙ্গুলী, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা দেবী, ছবি রায়চৌধুরী, জ্যোতি বাগচী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দত্ত, অনন্ত দে, ফণী চক্রবর্তী, প্রশান্ত চক্রবর্তী, অজিত ঘোষ, রূপা রায়চৌধুরী, বিদ্যুৎ মুখার্জি, সত্যেন চৌধুরী। সংগীতে ও আবহসংগীতে ছিলেন সুকুমার মিত্র ও রবীন পাল।

।। ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (বড়বাজার শাখা) ।।

ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া (বড়বাজার শাখা) এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ কিছুদিন আগে মিনার্ভা থিয়েটারে গঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। এই নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ ও শ্রীগঙ্গাপদ বসু। সোমনাথ মজুমদারের নির্দেশনায় নাট্যাভিনয় করেন যামিনীকান্ত ঘোষ, সন্তোষ ঘোষ, দুর্গাচরণ পাল, বিতান বসু, অমল ঘোষাল, প্রণব মুখার্জি, কেকা নিয়োগী, বীণা গাঙ্গুলী।

।। গ্রীভস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব ।।

কলকাতার গ্রীভস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি সলিল সেনের 'স্বীকৃতি' মঞ্চস্থ করে স্টার রঙ্গমঞ্চে। সামগ্রিক অভিনয় ভালোই হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন সুশান্ত সান্যাল, কমল বোস, অরুণ চক্রবর্তী, এইচ এল চক্রবর্তী, কিরণ রায়, এনায়েৎ পীর, সুচেত ভট্টাচার্য, কান্তি চক্রবর্তী, শ্রীবাস পাল, অমলেন্দু নন্দী, সত্যেন দত্ত, ইন্দু আচার্য, পবিত্র সেন, গীতা নাগ, হিমানী গাঙ্গুলী, ইরা মিত্র, সবিতা মুখার্জি, জেনিফার উড।

।। 'দোলা' ও 'অন্তরালে' ।।

'প্রবন্ধ সমিতি' ও 'হেয়ালী'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি দুটি নাটকের সুন্দর উপস্থাপনার জন্য সবার স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। প্রবন্ধ সমিতির প্রযোজনায় হেয়ালীর শিল্পীরা 'দোলা' ও 'অন্তরালে' অভিনয় করেছেন। নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে দুটি নাটকের নির্দেশক জগন্নাথ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব সর্বাধিক। যাঁরা দুটি নাটকে প্রশংসা পেয়েছেন, তাঁরা হোলেন যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন বসু, শংকর আঢ্য, প্রণব চক্রবর্তী, তাপস কুণ্ডুচৌধুরী, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

।। 'রক্তের টিপ' ।।

সম্প্রতি 'অঞ্জলি' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী রামরাজাতলা পূজামণ্ডপে পরেশ সাহার 'রক্তের টিপ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন।

নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন শেখর লাহিড়ী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন শেখর লাহিড়ী, মোহন ঘোষ, মিলন মুখার্জি, দিলীপ মুখার্জি, বিভাস চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তী, সুব্রত রায়, অরুণ সরকার, পুলক ভট্টাচার্য, দিলীপ দে, সুশীল চক্রবর্তী, নরেশ কুমার।

।। পাঁশকুড়াতে অভিনয় ।।

পাঁশকুড়ার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অস্থায়ী সংঘ' সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' ও ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকদুটি মঞ্চস্থ করেছেন। দুটি নাটকেরই দলগত অভিনয় রসোত্তীর্ণ হোতে পেরেছে।

।। শ্রীরামপুরে ।।

শ্রীরামপুরের নাইন বুলেটস্ ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান স্থানীয় তারাপুকুর প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিচিত্রানুষ্ঠানের পর 'বিদিশ' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকে সুঅভিনয় করেন পল্টন চৌধুরী, সুশোভন রায়, বরুণ গাঙ্গুলী, সৌমেন বণিক।

।। প্রাচীতীর্থ ।।

'প্রাচীতীর্থে'র শিল্পীবৃন্দ আগামী ১১ই ডিসেম্বর অন্ধ্র এসোসিয়েশন হলে তিনটি একাঙ্ক নাটকের পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। একাঙ্ক নাটক তিনটি হল মুকুলেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্কেচ', 'দিনপঞ্জী' ও 'আমিন'। নাট্যনির্দেশনায় আছেন তপন কর।

বিবিধ সংবাদ

'বেতালা'র আসরে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

উত্তর কলকাতার শিল্পসাহিত্য সঙ্গীত-রসিকদের প্রতিষ্ঠান 'বেতালা'র একমাত্র উদ্দেশ্য হল একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের আসর বসান। প্রখ্যাত শিল্পীদের এ'রা মাঝে-মধ্যে আমন্ত্রণ করে আনেন। এ'দের এক আসরে এসেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। ঘরোয়া আসর হলেও বহিরঙ্গে ছাপ ছিল 'কনফারেন্সের'। —মিনিয়েচার কনফারেন্স। সংবাদ ও সাহিত্যজগতের পরিচিত ক'জনের চেনামুখ চোখে পড়ল—দর্শকের আসনে তাঁরা বসে। শ্রীমতী মিত্র ক্ষণমাত্র বিরতি না দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের ডালি যেন উজাড় করে দিতে লাগলেন একাদিক্রমে দেড়ঘন্টার ওপর। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানান রসের নানান রাগের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় একটি আসরে মাত্র একজন শিল্পী এমনভাবে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। বিরতি না দিয়ে দেড়ঘন্টার ওপর গান গাইলেও শ্রীমতী মিত্রের কণ্ঠমাধুর্যের আকর্ষণ এতটুকু হ্রাস পায় নি। নিটোল লাবণ্যে ভরপুর ছিল তাঁর অনুপম কণ্ঠ। সেটাই সবচেয়ে বিস্মিত করেছে। মনে হয় কনফারেন্সে জনতার মাঝে গাইবার চেয়ে ঘরোয়া পরিবেশেই শিল্পীদের 'মেজাজ' থাকে সবচেয়ে ভালো। এজন্যে অবশ্য 'বেতালা'র সম্পাদিকা শ্রীমতী মীরা সিংহও সমবেত গুণীজনের প্রশংসা কুড়িয়েছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

নান্দিক নিবেদিত কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত **এন্টনী কবিয়াল** নাটকের কয়েকটি দৃশ্যে সবিতাব্রত দত্ত, জহর গাঙ্গুলী, কেতকী দত্ত ও কল্যাণী ঘোষ। ফটো : অমৃত

শিশুশিক্ষামূলক চলচ্চিত্রপ্রদর্শনী

কিশোর-কিশোরীরা জাতির সম্পদ। তাদের মানসিক গঠন পূর্ণাঙ্গ করবার সদিচ্ছায় 'চাচা নেহরু'র জন্মদিনে (১৪

জাগো নাটকে সুমিতা সান্যাল, জয়শ্রী সেন ও নির্মলকুমার।

নভেম্বর) 'ভাইবোনের আসর' সোনারপুরে অন্নপূর্ণা সিনেমার সহযোগিতায় সহস্রাধিক ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখিয়ে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের এক অভিনব পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করে। এই অনুষ্ঠানে নেহরু, রবীন্দ্রনাথ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রমুখ ভারতমাতার সুসন্তানদের জীবন-চিত্র দেখাবার সঙ্গে খেলার মাধ্যমে কেমন করে শরীর গড়তে হয় তাও ছবির মধ্যে দিয়ে ছোটদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। শ্রীবঙ্কিম ঘোষ 'নেহরু হল' প্রতিষ্ঠার জন্যে একখণ্ড জমি দান করে তার দলিলপত্র অনুষ্ঠানের পরিচালক শ্রীবিজন গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করেন। বিবিধ দেশাত্মবোধক গান এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল। এই অভিনব অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন সোনারপুরের বি-ডি-ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ হালদার।

'অংশীদার'-এর অভিনয়

গত ৮ নভেম্বর '৬৬ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক চৌরঙ্গী স্কোয়ার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলেন শ্রীগঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটক। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীগোকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সর্বশ্রী অমরনাথ দত্ত, গোপাল ঘোষ, কবি বসু, ত্রিলোকী ট্যাণ্ডন, প্রতিমা পাল প্রভৃতি। প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের 'সবলা' আবৃত্তি করে দর্শকদের তৃপ্তিবিধান করেন শ্রীমতী নমিতা দাস।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সমাবর্তন উৎসব

গত ১৯শে নভেম্বর পাথুরিয়াঘাটাস্থ মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডঃ নির্মলকুমার বসুর পৌরোহিত্যে পরিষদের ষোড়শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সমাবর্তন

অংশীদার নাটকে পূর্ণেন্দু রায় ও প্রতিমা পাল

উৎসব বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীদের মধ্যে বেবী, মুনমুন ও স্বাতী ভট্টাচার্য আবৃত্তি; রুণু ভট্টাচার্য ও তপতী হাজারী রবীন্দ্র-সঙ্গীত; মিতালী গঙ্গোপাধ্যায় রজনীকান্ত গীতি; বন্দনা সাহা খেয়াল এবং মীনা দে ও মহুয়া গুহ লোকনৃত্য পরিবেশন করে। কুমারী মহুয়ার অনবদ্য নাগানৃত্য সকলের প্রশংসা অর্জন করে। সভাপতি ডঃ বসু সর্বসমেত ৮৫ জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ থেকে একটি মনোজ্ঞ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

আগামী ১০ই ডিসেম্বর থেকে তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনী শুরু হচ্ছে মহাজাতি সদনে। ১০ থেকে ১৭ অবধি অনুষ্ঠানে ভারতখ্যাত প্রবীণ ও নবীন শিল্পীর কণ্ঠ, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও এবারের বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর এক 'সঙ্গীত-চক্র'।

বিধান সংগ্রহশালার যাত্রাভিনয়

চিত্র ও মঞ্চ জগতের প্রাচীন ইতিহাস সংরক্ষণে ব্যারাকপুরের বিধান সংগ্রহশালা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। গত ২৬ নভেম্বর সংগ্রহশালার প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট সুধীজন এবং নাট্য ও চিত্ররসিকদের উপস্থিতিতে এক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। উপস্থিত জনমণ্ডলীর সঙ্গে গিরিশ যুগের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী সন্তোষকুমারীকে (তেলেনা) পরিচিত করিয়ে দেন 'রূপমঞ্চ' সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅসিত চৌধুরী ,এবং শ্রী ডি. এন, ভট্টাচার্য সভায় বক্তৃতা করেন। পরে স্থানীয় নাট্যসংস্থা শ্রীনাট্যম কর্তৃক অভিনীত ব্রজেন দে'র 'সারথি' সকলকে মুগ্ধ করে। মানিক সেনের বিকর্ণ, মলয় ঘোষের ভীম, কানন ভৌমিকের দ্রৌপদী এবং স্বপ্না মুখোপাধ্যায়ের উত্তরা দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। পরিচালক চিত্ত দত্ত অভিনয় করেন শকুনির ভূমিকায়। তাঁর পরিচালনা এবং অভিনয় দুইই সমান প্রশংসনীয়।

"হিমাংশু স্মৃতিবাসর"

সুরসাগর হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোগে গত ২৮শে নভেম্বর, ৩৭, পরাশর রোডস্থিত রবিতীর্থ ভবনে প্রখ্যাত সুরকার হিমাংশু দত্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় স্বর্গত সুরকারের কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের সব কটি গানই সুগীত। বিশেষ করে "রাতের ময়ূর ছড়ালো", "যদি ভুলে যাবে মোরে", "বেদনাতে বিজড়িত গান", "ওগো নিরুপম তব সাথে", "বাজে রিণিকি ঝিনি" ও "তুমি যে আঁধার" গানগুলি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। সঙ্গীতে অংশ নেন—গৌতম বসু, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, মধুছন্দা বসু, মিতা

কে ডি পিকচার্সের অসামাজিক চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী শ্যামল মিত্র, সঙ্গীত পরিচালক ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও চিত্রপরিচালক পীযূষ বসু।

চক্রবর্তী, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, সুলেখা সোম, শ্রীপর্ণা ঘোষ দস্তিদার, তনিমা মুখোপাধ্যায়, মিনতি ঘোষ, শ্যামলী দে সরকার, রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন রায়চৌধুরী, রথীন চৌধুরী ও পঙ্কজ চক্রবর্তী।

আনন্দলোকের নাট্যাভিনয়

আগামী রবিবার ১১ই ডিসেম্বর, সকাল ১০টায় বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহে আনন্দলোক নাট্য সংস্থা আগন্তুক রচিত "শতাব্দীর স্বপ্ন" ও রসরাজের ব্যাপিকা বিদায় নাটক দুটি মঞ্চস্থ করছেন।

অভিনয়ে আছেন বঙ্কিম ঘোষ, কালিন্দি সেন, দুলাল আঢ্য, ভবরূপ ভট্টাচার্য, অসিত মুখোপাধ্যায়, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুরাধা দাশগুপ্তা এবং আরো কয়েকজন।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর অভিনয়

গত ১৫ নভেম্বর '৬৬ ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতির গড়িয়াহাট শাখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীই উন্নতমানের অভিনয়কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে সামগ্রিক উৎকর্ষই ছিল নাটকটির প্রাণ। এরই মধ্যে শৌখিন নাট্যামোদী হিসেবে শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী, শ্রীরাণা চ্যাটার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না।

নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন শ্রীজ্ঞানেশ মুখার্জি।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২০ নভেম্বর বাউরিয়া, গ্লোস্টার কেবলস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ক্লাব প্রাঙ্গণে বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যের ব্যবস্থা হয়। কৃষ্ণা রায়ের ভারত-নাট্যম, অনুপশঙ্কর ও শ্রীমতী উমা দত্তের পাঞ্জাবী ভাঙ্গরা, পাপড়ি বোস ও কৃষ্ণা রায়ের রাজস্থানী লোকনৃত্য, চৈতালী সেন ও অনুপশঙ্করের জেলে-জেলেনী নৃত্য দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। নৃত্যে সুর যোজনা করেন—অরবিন্দ মিত্র, অনিল ঘোষ, শঙ্কর পণ্ডিত, কালাচাঁদ চ্যাটার্জি। কণ্ঠসংগীতে সংগীত বিশারদ রমেন দে, কালিদাস চ্যাটার্জি, শংকর চ্যাটার্জি, অমল মুখার্জী প্রভৃতি আনন্দ দান করেন। শ্রীরবীন পাল

ও তাঁর সম্প্রদায় যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক সোমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'বোবা কান্না' অভিনীত হয়। অভিনয়ে মিঃ এস এস সাহা দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেন। শ্রীকমল সাহার (বাটানগর) অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠরূপে পরিবেশিত হয়।

।। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সম্বর্ধনা ।।

গত ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার সুপরিচিত নাট্য-সংস্থা 'বৈশাখী'র শারদোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্যকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সংঘ-সভ্য শান্তিরঞ্জন দে-কে মানপত্র দেওয়া হয় সংঘের একজন বিশিষ্ট অভিনেতা হিসেবে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়।

সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীভট্টাচার্য আধুনিক নাটক ও মঞ্চালয়ের সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সম্পাদক সোমেশ ঘোষাল নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রীভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও অভিনয়কলা বিষয়ে আলোচনা করেন। অতঃপর 'বৈশাখী'র অভিনেতারা তাঁদের পরীক্ষামূলক মঞ্চ-সফল নাটক 'লবণাক্ত'র পুনরাভিনয় করেন। প্রত্যেক অভিনেতাই প্রাণঢালা অভিনয়ে নাটকটিকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছেন। বিশেষতঃ গোপলার ভূমিকায় গৌর রায়ের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। এছাড়া শান্তি দে, কল্যাণী অধিকারী, নীলিমা চক্রবর্তী ও কল্লোল মজুমদার ও চণ্ডীদাসের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়।

ভিনদেশী ছবি

সেক্সপীয়ারের তিনটি নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ

দি রয়্যাল সেক্সপীয়ার কোম্পানী সম্প্রতি সেক্সপীয়ারের তিনটি নাটক 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম', 'ম্যাকবেথ' এবং 'কীং লেয়ার'র চলচ্চিত্রায়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই বলিষ্ঠ প্রয়াসের প্রথম ছবিটি 'এ মিড সামার নাইটস ড্রিম'র চিত্রগ্রহণ আগামী বছরের গ্রীষ্মকালে লন্ডন শহরে গৃহীত হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন পিটার হল এবং পিটার ব্রুক। ইতিমধ্যে 'ম্যাকবেথ' ও 'কীং লেয়ার'র দুটি প্রধান চরিত্রাভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন অভিনেতা পল স্কফিল্ড।

প্যারামাউন্ট পিকচার্সের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র 'ইজ প্যারিস বার্ণিং?'

প্যারামাউন্ট পিকচার্সের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্র 'ইজ প্যারিস বার্ণিং?' ছবিটি ইউরোপে ব্যবসায়িক সাফল্যে এক অসাধারণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এমন কি 'টেন কমান্ড-মেন্টস'র রেকর্ড পর্যন্ত ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছে। সারা ইউরোপের দর্শকরা ছবিটির সাফল্যে পঞ্চমুখ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রেনে ক্লেয়ার।
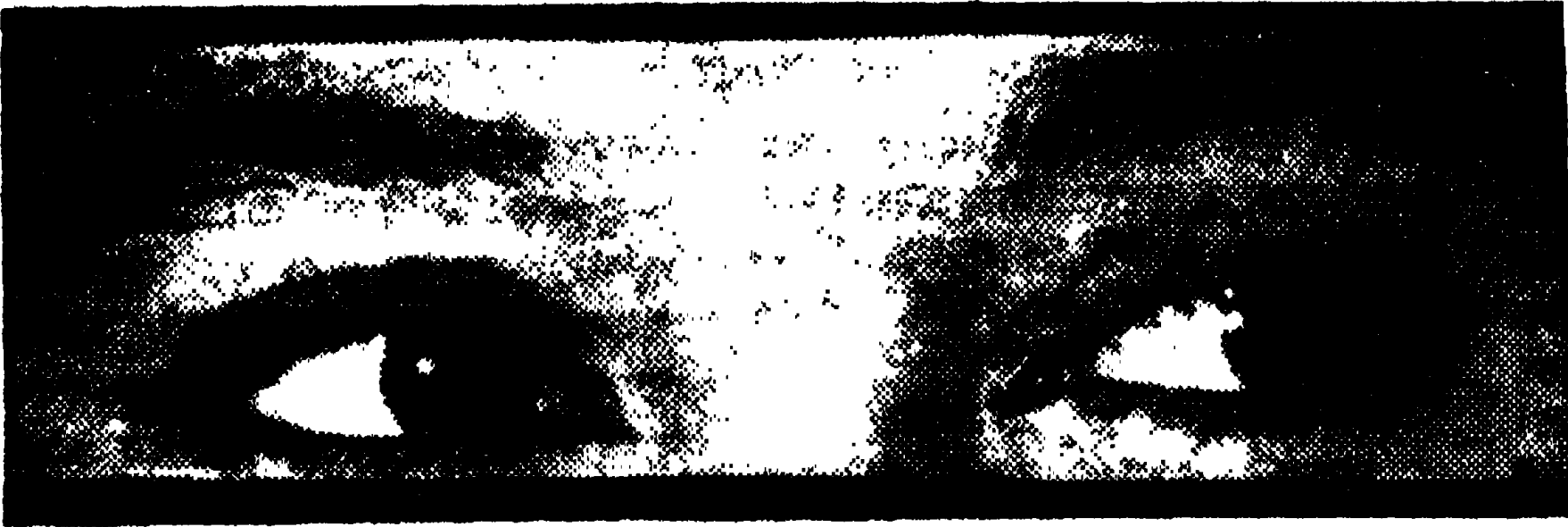
ক্লোজ আপ

গুরুদাস ভট্টাচার্য

পুরো পাখিটাই চোখের সামনে ছিল; কিন্তু অর্জুন তা দেখেননি, তিনি দেখছিলেন শুধু দুচোখের মাঝের অংশটুকু, তীরটা গিয়ে বিঁধবে যেখানে। এটা অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতির ও একাগ্রতার ব্যাপার। সাধারণভাবে, আমরা যখন লোককে দেখি, তখন গোটা মানুষটাকেই দেখি আপাদ-মস্তক। তবে, টুকরো করেও যে দেখি না বা অনুভব করি না, তা নয়। ঠাসবুনুনি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যখন একটা কুশলী হাত হঠাৎ বেরিয়ে এসে হাঁকে 'টিকিট', কিংবা আনন্দিত নির্জনতায় একটা হাত এগিয়ে গিয়ে আর একটা হাতকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করে, কিংবা দুটি নির্ণিমেষ দৃষ্টির সামনে একটি আলোকিত মুখ এক-মাত্র হয়ে ওঠে, তখন পুরো মানুষটাকে চোখে পড়ে না। তবে তার অস্তিত্বের বোধটা থাকে, যেভাবেই হোক।

চলচ্চিত্রে যখন এই ব্যাপার ঘটে—সমস্ত স্ক্রীন জুড়ে শুধু হাত বা পা বা মুখ বা ঠোঁট বা চোখ, তখন সেই শটকে বলা হয় 'ক্লোজআপ'। 'বিগ ক্লোজআপ'। অর্জুন দেখেছিলেন 'বিগ ক্লোজআপ'। অর্থাৎ বাস্তবের ব্যাপারকেই পর্দার বুকে বড়ো করে, আর একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেখানো।

এতে বিস্ময়ের কিছু যে নেই, আজকের দর্শক তা ভালভাবেই জানে। তারা চমৎকৃত হয় অন্য কারণে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে ছায়াছবিতে ক্লোজআপ দেখে দর্শক ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল, ভেবেছিল: মানুষকে বুঝি কেটেকুটে ঐ সব দৃশ্য তোলা হয়েছে! তারপরে যখন ব্যাপারটা বোধগম্য হল, তখন একদল দর্শক ক্ষিপ্ত স্লোগান দিল: 'আমাদের [illegible] খানা-সিকিখানা দেখানো চলবে না; পুরো পয়সা দিচ্ছি, পুরো মানুষটাই দেখব।' বুঝুন ব্যাপারখানা।

চলচ্চিত্রের আদিযুগে, ক্যামেরা যখন নড়ত না, মহাস্থবির হয়ে যাবতীয় ছবি তুলত, বা যখন নড়ল তখনও, ক্লোজ-আপের স্বরূপ ধরা পড়েনি। এমন কি ১৯০৩ সালে তোলা আট মিনিটের আমেরিকান ছবি 'দি গ্রেট ট্রেন রবারী'র বহির্দৃশ্যে ক্লোজআপ যখন অনিবার্য হয়ে উঠল, তখনও পরিচালক এডউইন পোর্টার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। এবিষয়ে প্রথম সচেতন প্রয়োগ যিনি করেছেন, তিনি ঐ দেশেরই প্রখ্যাত পরিচালক ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ। গল্প লেখা ও অভিনয় শেষে ১৯০৮ থেকে পরিচালনা। ক্যামেরার নড়াচড়া, বিষয়ের থেকে তার দূরত্বের হের-ফের [illegible] অংশট, ক্লোজআপ ইত্যাদি ব্যাপারকে তিনি শিল্পসমন্বিত করে

তুললেন। ঘোষণা করলেনঃ 'আমি যা করতে চাইছি, তা হল, আপনাদের দেখতে সাহায্য করা।' কয়েক বছর পরে রাশিয়ার প্রখ্যাত পরিচালক আইজেনস্টাইন বললেন ঃ 'না, তার চেয়েও বেশি—দৃশ্যকে অর্থবান করে তোলা।' সার্থক ক্লোজআপে এ দুটোই থাকে—দৃশ্যময়তা ও অর্থময়তা।

ক্লোজআপের আবিষ্কার চলচ্চিত্র-পাড়ায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। স্পষ্ট হয়ে উঠল থিয়েটারের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য। থিয়েটারে মঞ্চ ও দর্শকের দূরত্ব বরাবর এক, দৃষ্টিকোণ এক, এবং স্থান কালও পরিমিত। চলচ্চিত্রে পর্দানশীন দৃশ্য ও চরিত্ররা কখনও দূরে, কখনও খুব কাছে, কখনও পাহাড় প্রমাণ উঁচুতে, কখনও খাদের অতল নীচে; আর স্থানকাল—ব্যালে নর্তকীর পা উঠল গাছপালার মধ্যে, নামল ড্রয়িং রুমে! ক্যামেরার লেন্স তথা পরিচালক যতটুকু ও যেভাবে দেখান, আমরা ততটুকু ও সেইভাবে দেখি। থিয়েটারে সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে, চলচ্চিত্রে তা নাও হতে পারে। সেখানে আমরা দেখি খণ্ডাংশ, ভগ্নাংশ। এইভাবে ছবির সঙ্গে চলে চলে, এগিয়ে-পিছিয়ে অ্যাবাউট-টার্ন করে আমরা একাত্ম হয়ে উঠি চিত্রকাহিনীর সঙ্গে। স্ক্রীন জুড়ে একটা মুখ, দুটি করুণ চোখ, দৃষ্টি ঝাপসা, চোখ ছলছল, তার কোলে সামান্য একটু বাষ্প, তখনও জল হয়ে ঝরে পড়েছে কি পড়েনি—তবু আমরা বিচলিত হয়ে উঠি। কারণ আমরা দেখি, ওরা গ্লিসারিনের সৃষ্টি নকল-দানা নয়, মুক্তোর মতো আদি ও অকৃত্রিম অশ্রু-বিন্দু। ক্লোজআপ এই যে স্বাদ দিল, এ নতুন, স্বাভাবিক, তাই প্রিয়তর। এবং এ স্বাদ অফুরান। যেহেতু এ শটের প্রয়োগ-সম্ভাবনা অসীম।

ক্লোজআপ ছোটকে বড়ো করে দেখায়, দূরকে নিকট করে। আমাদের চারপাশে কতো অগুনতি ছোট ছোট ঘটনা-বস্তু-অবস্তুঃ পোকা, ফুল, পাতা, ধুলো ধানের শিষ, চামড়ার রেখা কিংবা মাঠ, বন, মেঘ, মেঘের রং-ফেরা, নদীর ঢেউ-তোলা, ঘরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইমোশনের সীমান্ত। বিশেষ প্রয়োজন না হলে খেয়ালই করি না—ক্লোজআপ তাদের দেখায় বড়ো করে, দেখায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেলসশুদ্ধ, তারকার রঙীন মুখোশ খুলে দেখায় চরিত্রের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তাকে। ফলে, চলচ্চিত্রে দৃশ্যরচনা যেমন নতুন ধরনের, অভিনয়ও তেমনি স্বতন্ত্র রীতির। টাইপেজ বা শ্রেণীচরিত্র এখানে ফোটে পোষাকে-রূপসজ্জায় নয়, প্রকৃতিদত্ত চেহারায় ও স্বভাবজ ব্যক্তিত্বে। যেমন 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ।

চলচ্চিত্র যে টুকরো-টুকরো দ্রুতগামী শটে বহুধা বিভক্ত, ক্লোজআপ তার অন্যতম কারণ। দৃশ্যান্তরের নানা প্রক্রিয়া আছে; ক্লোজআপের সাহায্যেও একাজ হয়। ট্রিকশটেও এর ব্যবহার নিয়মিত, যার ফলে একটা মডেল জাহাজ বা বাড়ি পর্দায় অরিজিন্যালের মতো দেখায়।

ক্লোজআপ ছোটকে শুধু বড় করে না, জড়বস্তুকে চেতন করে তোলে। তখন একটা ছুরি কি চিঠি কি ফোন কি রিভলবার বা মদের বোতলও অন্যতম পাত্র-পাত্রী হয়ে ওঠে, কাহিনীর ঘনিষ্ঠ তো হয়ই। একটা পুরনো ছবির দৃশ্যঃ একটি অসহায় মেয়ে দস্যুদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে; ক্লোজআপে দেখা গেল—ওটা পিস্তল নয়, একটা রেঞ্চ; এর পরের উত্তেজনা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা না করলেও চলে।

ক্লোজআপ অন্য সব-কিছুকে বরবাদ ক'রে একটি বিষয়কে প্রধান করে তোলে। যেমন ঃ ঘরভর্তি লোক, টেবল, এমনকি ভাসকেও বাদ দিয়ে একগোছা ফুলকে তুলে ধরে; সমস্ত দেয়ালটা, ছবিগুলো, এমনকি ক্যাবিনেটও বাদ দিয়ে শুধু ঘড়ির ডায়ালটা দেখাতে পারে; গোটা শরীরটাকে ফ্রেমের ওপারে রেখে শুধু একটা চোখকে সামনে আনতে পারে, চোখের অতল নীল সমুদ্রে ডুব দিতে পারে। দৃশ্য তখন সুন্দর ও অর্থবান হয়ে ওঠে। গ্রিফিথই এসবের সূচনা করেছিলেন। তাঁর 'দি ইনটলারেন্স' ছবির এক জায়গায় ঃ স্বামীর বিচার হচ্ছে, মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে; ক্লোজআপে দেখান হল স্ত্রীর শংকিত মুখ, তার পরেই দুহাত মুঠো করা, আঙুলগুলো ছটফট করছে। মনের তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ পেল অস্থির আঙুলের মাধ্যমে; একটি থেকে আরেকটি, অংশ দিয়ে সমগ্রকে বোঝান গেল। শিল্পশাস্ত্রে এরই নাম ব্যঞ্জনা।

কিন্তু শুধু ক্লোজ আপে ছবি হয় না, সৌন্দর্য ও অর্থ ফোটে না। আশপাশের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা চাই। যেমন, চালচিত্র না থাকলে দুর্গা বা সরস্বতী প্রতিমাই নয়। তাই ক্লোজআপের ব্যবহার হয় লংশট, মিডশট ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে—আগে বা পরে। পরিচালক নাকের ডগা বা কানের লতি বা চুলের টিকি বা পায়ের নূপুর দেখান আপত্তি নেই; কিন্তু তার আগে বা পরে মানুষটাকে, তার পরিবেশকে দেখানো চাই। এই দেখানোর একটা নিয়ম আছে। আবার, নিয়ম ভেঙে অনেক নতুন নতুন রীতিও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

সুপরিকল্পিত প্রয়োগে ক্লোজআপ সুন্দর ও অর্থবান হয় নানাভাবে।

ফেইদারএর একটি ছবি ঃ শ্রমিক কলোনীতে নতুন বাড়ি উঠেছে, মন্ত্রী একে একে উদ্‌বোধন করছেন; কিন্তু অন্যত্র জরুরী কাজ থাকায় বেশ দ্রুতই কর্তব্য সমাধা করছেন; যতো সময় যায়, পা ততো দ্রুত চলে, শেষে প্রায় দৌড়তেই থাকে সকলে। দেখতে বেশ মজা লাগছে। এমন সময়ে একটা ক্লোজআপ ঃ একটি মোটা লোক হাঁস-ফাঁস করতে করতে ছুটছে আর কপালের ঘাম মুছছে। একজনকে দিয়েই সকলের শোচনীয় অবস্থাটা বোঝান গেল, মজা তখন পলাতক। আইজেনস্টাইনের 'ঈভান দা টেরিবল'-এর প্রথম ভাগের শেষ দৃশ্য ঃ নির্বাসিত জার ঈভান একটি গির্জার দোতলায়, মুখের ক্লোজ-আপ; তার পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে; দূরে মাঠের ওপর পিলপিল করে লোক আসছে ওকে ফিরিয়ে নিতে। এখানে জার ও জনতা, ক্লোজআপ ও লংশট-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা। পুদভকিনের 'দি এন্ড অফ সেন্টপিটার্সবার্গ'-এর একটি দৃশ্যেঃ বাগানে জারের বিরাট স্ট্যাচুর ক্লোজআপ; দূরে দুর্ভিক্ষের অঞ্চল থেকে আগত দুটি কৃষক চলে যাচ্ছে। এখানে উভয়ের সম্বন্ধ—বিপরীত। টোনী রিচার্ডসনের 'এ টেস্ট অফ হনী'তে নিগ্রো প্রেমিকটি চলে যাচ্ছে, ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে গরিব মেয়েটি (ও-ই বিদায় দিয়েছে) দেখছে; ওর মুখের ক্লোজ-আপের ওপাশে খাল দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে তার হাল-মাস্তুল-লস্কর নিয়ে; এগুলি

জীবন ও জটিলতার প্রতীক যার দ্বারা মেয়েটির অবস্থা বোঝান হচ্ছে।

ক্লোজআপ চরিত্রের ভেতরকার নিগূঢ় ভাব ও ভাবনাকে, স্নেহ-প্রেম-লোভ-ঘৃণা-দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে প্রকাশ করে। কোথাও নাটকীয়, কোথাও কাব্যিক রীতিতে, কোথাও বা দুটোকে মিশিয়ে। যেমন : মিডশটে এক ব্যক্তিকে আপাদমস্তক দেখা গেল, বেশ শান্ত সংযত হয়ে কথা বলছেন; ক্লোজআপে তাঁর হাত কাঁপছে, একটা কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। বাইরের উপাদান ও ক্রিয়ার সাহায্যে ভেতরের ঝড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা পুরনো আমলের ছবি : জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বিয়ের বাসর থেকে মেয়েটি পালিয়ে যাচ্ছে একটা হলের মধ্যে দিয়ে; হলে থরে থরে উপহার সাজানো, সুন্দর ভালো দামী ও প্রয়োজনীয় উপহার—ওরা ওর দিকে চেয়ে যেন হাসছে; স্বামীর দেওয়া জিনিস, বিবেচনা-কোমলতা-ভালবাসা যেন তাদের গায়ে মাখানো—ওরা হাত বাড়িয়ে ওকে যেন ডাকছে; ক্লোজআপ — ক্লোজআপ — ক্লোজআপ — পালানর পথ রোধ করে ওরা যেন বাধা দিচ্ছে। ছুটন্ত পা ধীরে ধীরে আস্তে চলে চলে থেমে যায়।

মাইকেল রুমের 'দি থার্টিন' : মরু-দস্যুরা ঘিরে ফেলেছে একদল সৈন্যকে; একজনকে পাঠান হল সাহায্যের জন্যে। ক্যামেরা সৈন্যটিকে অনুসরণ করল না, নীচু হয়ে ক্লোজআপ নিল বালির ওপর তার পদ-চিহ্নের, তারপর এগিয়ে চলল : প্রথমে দৃঢ়, ক্রমশ ক্লান্ত অনিশ্চিত বিপর্যস্ত পদ-চিহ্ন...বালিতে হাঁটু পর্যন্ত গর্ত, এলো-মেলো...বন্দুকটা...তরবারি...তারও পরে লোকটাকে দেখা গেল হামাগুড়ি দিতে দিতে চলেছে, চলেছে, পড়ে গেল মুখটা রগড়ে।

মুখ মানুষের সবচেয়ে মুখর প্রত্যঙ্গ। সশব্দ বাক্য ও সাংকেতিক অঙ্গভঙ্গি যেকথা ব্যক্ত করতে পারে না, মুখ তা পারে। সে নিগূঢ় ইমোশনকেও নিঃশব্দে প্রকাশ করে। অলংকারশাস্ত্রে তাই সাত্ত্বিক অভি-নয়কে সর্বোত্তম বলা হয়েছে। কিন্তু মঞ্চে এর কতোটুকু দর্শকের কাছে ধরা পড়ে, যেমন হয় চলচ্চিত্রের ক্লোজআপ-এ!
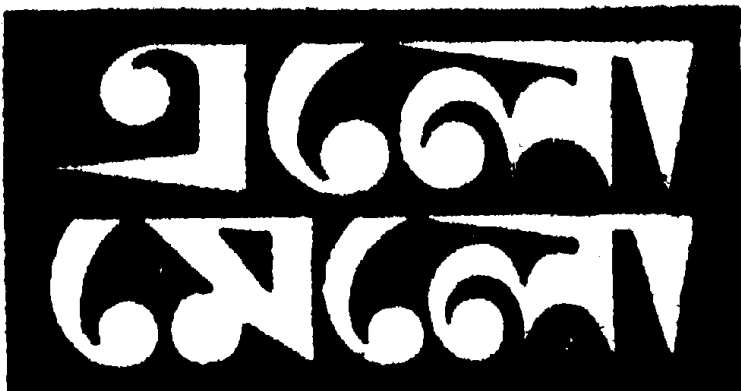
সেকালীন একটা ছবিতে : একটি মেয়েকে ভাড়া করে পাঠান হল এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে, যে পাঠাল সে আড়াল থেকে চোখ রাখল। মেয়েটি প্রথমে প্রেমের অভিনয় করতে লাগল, ক্রমে যুবকটিকে ভালবেসে ফেলল; পেছনে জাগ্রত চক্ষুর কথা ভেবে আবার অভিনয় সুরু করল। দূর থেকে লোকটি বুঝতে পারল না, কিন্তু ক্লোজআপ মুখে ধরা পড়ল তিনটি পরস্পর-বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বলীলা।

মুখের ভাষা বিভ্রান্তও করতে পারে। দীর্ঘ অনুশীলনে বা সহজাত ক্ষমতায় অনেকে মুখের ওপর এক অদৃশ্য মুখোশ এ'টে রাখতে পারেন। কিন্তু মুখের ওপর এমন কতকগুলো অংশ আছে যার ওপর মানুষের কন্ট্রোল নেই; যেমন : চিবুক বা কানের লতি বা নাকের ওপরতলা। মুখ জুড়ে হাসি, চিবুকে কিন্তু ভাব লেপটে থাকে; চোখের ভাষা কোমল অথচ নাকের পাশ রুক্ষ কর্কশ। আইজেনস্টাইনের একটা ছবিতে এক ব্যক্তিকে দেখি : সুন্দর চেহারা, সুশ্রী মুখ, উদ্দীপ্ত চোখ, উদাত্ত কণ্ঠ—ঠিক যেন এক সাধু। তারপরেই একটা চোখের বিগ ক্লোজআপ—রেশমী পক্ষ্মের আড়ালে দৃষ্টিটা চতুর। ঘুরে দাঁড়ালো, ক্লোজআপ-এ মাথার পেছন দিক ও কানের লতি দেখা গেল—কী কর্কশ স্বার্থপর বদমাশ শয়তান! আবার ঘুরল—সেই সুশ্রী মুখ, উদ্দীপ্ত চোখ ইত্যাদি, কিন্তু আর সাধু মনে হবার উপায় নেই। অন্যদিকে, জাঁ কক্‌তোর 'দি বিউটি অ্যান্ড দি বিস্‌ট্‌'-এর নায়ক পুরো একটা দ্বিপদী জন্তু, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা গেল : মুখে কী আশ্চর্য বিষাদ ও লাবণ্য, ভাল-বাসা পাবার জন্যে কী অসীম ব্যাকুলতা!

ক্লোজআপ ডিটেল্‌স্‌কে বড়ো করে তোলে, বিষয়ের অর্থ বদলে দেয়, নতুন বা বাঞ্ছিত ভাষ্য রচনা করে। দুটো পাশাপাশি উদাহরণ দিচ্ছি। দভ্‌ঝেনকোর 'আর্সেনাল'এ যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে, বন্দুক হাতে মুহূর্ত গুনছে সৈন্য-শ্রমিক-শিক্ষক-বণিক-শিল্প-পতি-কেরানী-শিল্পী : মনে হয় যেন পাথরের স্ট্যাচু। দ্বিতীয়টি কার্ল গ্রুনের কয়লাখনি নিয়ে তোলা ছবির একটা দৃশ্য : শ্রমিকরা জামা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে খনির পোশাকে নীচে নেমে গেল : তারপরেই ঝুলন্ত জামাগুলোর একটা ক্লোজআপ—মনে হয় ফাঁসিকাঠে সারি সারি মানুষ ঝুলছে। (শটটা যেন বলছে : 'দ্যাখো, দ্যাখো, মানুষ রয়েছে এখানে, আর খাঁচায় করে নেমে গেল যারা, ওরা মেশিনমাত্র।')

চলচ্চিত্র গতিশীল দৃশ্যমালা। তার চলার ছন্দ আছে। ক্লোজআপও ছন্দ সৃষ্টি করে। লুপু পিয়েক-এর একটা ক্রাইম ছবি : ব্যাঙ্কের ভল্‌ট্‌-এ চুরি করতে ঢুকে আটকে পড়েছে নটা চোর; বেরোবার রাস্তা কেউ জানে না, এদিকে হাতে মাত্র দশ মিনিট সময়, তার পরেই টাইম-বোমা ফাটবে, ভল্‌ট্‌টা বেমালুম উড়ে যাবে ওদের নিয়ে। নজন বন্ডামার্কা জোয়ান পাগলের মতো ছুটো ছুটি করতে থাকে ঘরময়, তারপর হঠাৎ থেমে যায়, চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে—তিন মিনিট। শুধু ঘড়ির হাত ঘুরছে, আর সব চুপ। একা ক্যামেরাই দুরন্ত চঞ্চল অস্থির...পরপর ক্লোজআপ মুখের, মুখের, ঘড়ির, মুখের...দ্রুত...দ্রুততর হয়ে ওঠে ছবির ছন্দ। পুনশ্চ, ছন্দমাত্রেরই যতি আছে। যথা, রেইজম্যানের 'দি লাস্‌ট্‌ নাইট' : বিপ্লবীদের হাতে পেট্রোগাড; স্টেশনে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল; সমস্ত বন্ধ, শুধু দরজা-জানলা গলে বেরিয়ে আছে রাইফেলের অসংখ্য নিষ্ঠুর মুখ। কে এরা? শত্রু? মিত্র? একের পর এক ক্লোজআপ : সব স্তব্ধ! শেষে এক বৃদ্ধা প্লাটফর্মে ঢুকে পড়ল সাহস ক'রে, ফিরে এল গতি-ছন্দ।

আর, যখন সব গতি থেমে যায়, শেষ যতি, শেষ ছেদ, তখন—তখন রবার্ট ব্রেস'র 'ট্রায়াল অফ জোয়ান অফ আর্ক'এর শেষ দৃশ্য : হাঁটু থেকে প্রায় বুক অবধি... খুঁটিতে বাঁধা দড়ি দিয়ে, শেকল দিয়ে; শেকলবাঁধা হাত করজোড়, 'দোয়া' প্রার্থনার ভঙ্গিতে—অন্তিম মুহূর্তে জোয়ান।

তবু ছন্দ অনিবার। ছেদ ও যতি, স্থির-অস্থিরে মেশানো কার্ল ড্রেয়ারের 'প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক'। ছবিটির বারো আনা অংশই ক্লোজআপএ তোলা। পাথরের আসনে বসে সারি সারি বিচারক; দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, হাঁ করে, চোক পাকিয়ে, একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ছে; তার ওপর ক্যামেরা চার্জ—ক্লোজআপএ বাঘের মতো হিংস্র মুখ, গণ্ডারের মতো পুরু চামড়া, শকুনের মতো মাংসাশী দৃষ্টি, রাঘব বোয়ালের মতো ভয়ংকর হাঁ, টক্‌টকে লাল আলজিবটাও দেখা যাচ্ছে! মেঝেয় বসে বন্দিনী জোয়ান উত্তর দিচ্ছে আশা-নিরাশায় বিষণ্ণ সংযমে; খুব কাছে ক্যামেরা, ক্লোজআপ, বিগ ক্লোজ-আপ : মনের যে এতো যন্ত্রণা, মুখের যে এতো ভাষা হতে পারে, দুঠোঁটে যে এতো বেদনা, দুচোখে যে এতো বিশ্বাস থাকতে পারে, নির্বাক ছবি কোন শব্দ না করে এতো কথা বলতে পারে, এমনভাবে সমগ্র চেতনাকে গ্রাস করতে পারে, শুধু ক্লোজআপএ যে এমন নাটক এমন কবিতা ফোটানো যেতে পারে, আগে কোনদিন জানতাম না, এখনও জানি না। ড্রেয়ারের এক সহকারী বলেছেন : নির্বাক যুগের এই শেষ মহৎ ছবিটি তোলা হয়েছিল 'নতজানু হয়ে'। এ-ছবির মুখো-মুখি বসতে গেলেও 'নতজানু' হতে হয়। অতঃপর কয়েক মাস আর কোন ছবি দেখি নি, দেখতে পারি নি। এবং দীর্ঘ দিন অন্তে সেই দেখার স্বাদ ও স্বাদের স্মৃতি সমান উজ্জ্বল না।

এই ঘরানার ক্লোজআপ-সমৃদ্ধ, ব্যক্তি-গতশিল্প ছবি—যার বক্তব্য অন্তর্মুখী গভীরতায় আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে, যে ছবি চিত্রকলার (এবং কবিতার, গানের) পাশে সমকক্ষ-আসন নিতে পারে—তাত্ত্বিক-সমা-লোচক বেলা বালাজ তার একটি আশ্চর্য সুন্দর নাম দিয়েছেন : মাইক্রোড্রামা।।

পঞ্চম অনুষ্ঠান ব্যাংককে

অজয় বসু

লাখ তেরো-চোদ্দ লক্ষ লোকের আবাস ব্যাংকক আজ এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষ্যে সরগরম হয়ে উঠেছে। ব্যাংককের বাসিন্দারা এমনিতে সংযত। হৈচৈ বা আড়ম্বরপূর্ণ জীবনধারার দিকে তাঁদের ঝোঁক নেই। কিন্তু স্বদেশের মাটিতে এশিয়ায় বৃহত্তম ক্রীড়ার আয়োজন ঘটায় তাঁরাও আজ এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে উঠেছেন।

বিদেশীরা এসেছেন। তাঁদের সামনে নিজেদের পরিচয়ের রুচিস্নিগ্ধ রংপটে তুলে ধরতে হবে। তাই নগরসজ্জা থেকে শুরু ক্রীড়াকেন্দ্রের সুষ্ঠু সংগঠনে ওঁদের উদ্যম ও আন্তরিকতার অন্ত নেই যেন। পথে পথে ফেস্টুন ঝুলছে। লাল, নীল, হলুদে আলোকমালায় রাস্তার চারপাশ আলোকিত। অফিস কাছারি, দোকানপাট, সর্বত্রই যেন উৎসবের মেজাজ।

এই উৎসবে আমন্ত্রিত যাঁরা তাঁদের সুবিধে অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। সেই দৃষ্টি কতোখানি ব্যাপক [illegible]ঘাঁটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশীরা তা বুঝে নিয়েছেন। বিমান-ঘাঁটিতে বিদেশীরা যদিও বা শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের হাত থেকে সহজে নিস্তার পেলেন, কিন্তু এশীয় ক্রীড়া সংগঠক দপ্তরের কর্মীদের কাছ থেকে অতো সহজে ছাড়া পাবার রাস্তা নেই। কোথায় যাবেন? কি করতে পারি? এই পথ ধরে সোজা চলে যান। গিয়ে অমুক অমুক জায়গায় খোঁজ করবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। বিদেশীদের সবরকমে সাহায্য করার জন্যে কর্মীরা এগিয়ে আসছেন তো আসছেন।

কয়েক হাজার বিদেশী ক্রীড়া প্রতিনিধি এবং কয়েকশ' সাংবাদিক এশীয় ক্রীড়ার সূত্রে ব্যাংককে এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের আদর, আপ্যায়নে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে দেশের বাইরে যে সুনাম পাওয়া যাবে না এ বিষয়ে সারা ব্যাংকক সচেতন।

এশীয় ক্রীড়া সংগঠনে এবং বিদেশীদের দেখাশোনার আয়োজনের সহায়তায় থাই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার রীতিও দরাজ। আর্থিক সাহায্য তো করাই হয়েছে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নানান কাজের হাল ধরে বসে আছেন। সংগঠক সমিতির অবৈতনিক সভাপতি হলেন জেনারেল প্রাভাস চারুসাথাইরা, প্রেসিডেন্ট এয়ার চীফ মার্শাল দাউই ছুল্লাসাপ্যা, ভাইস প্রেসিডেন্ট পুলিশ জেনারেল লুয়াং ছত্রাকারনকোশল। এঁদের মধ্যে জেনারেল প্রাভাস চারুসাথাইরা হলেন এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি। এবং স্বয়ং থাইরাজ হলেন অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক।

বারোদিনের অনুষ্ঠান। ৯ই ডিসেম্বর উদ্বোধন, সমাপ্তি ২০শে। বারোদিনের ফাঁকে অ্যাথলেটিক, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, মুষ্টিযুদ্ধ, সাইক্লিং, হকি, ফুটবল, লন টেনিস, সুটিং, জলক্রীড়া, টেবলটেনিস, ভলিবল, ভারোত্তোলন ও কুস্তি, এই চোদ্দটি বিভাগীয় ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হবে। প্রথম দিনে শুধু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, দ্বিতীয় দিন থেকে শুধু খেলা আর খেলা।

পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার মূলকেন্দ্র হলো পথুমওয়ান অঞ্চলে জাতীয় স্টেডিয়ামটি। একটি বড়সড় স্টেডিয়াম এবং সেই স্টেডিয়াম ঘিরে আরও কটি ক্রীড়াকেন্দ্র। আগে এই স্টেডিয়ামের আকার ছিল সংক্ষিপ্ত। বড়জোর হাজার পাঁচেক দর্শকের জায়গা হোতো। সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে এখন সেখানে খুব কম হলেও পঞ্চাশ হাজার দর্শক আঁটে। স্টেডিয়ামের সবুজ মাঠ ঘিরে লালচে অ্যাথলেটিক ট্র্যাকটিও একেবারে নতুন করে গড়া। শোনা যাচ্ছে যে ওলিম্পিক ক্রীড়াকালে যে সংস্থা টোকিওতে অ্যাথলেটিক ট্র্যাক গড়েছিলেন তাঁরাই ব্যাংককে সেই কাজের ভার নিয়েছিলেন।

ছোট বড়ো, নানান ধরনের আরও কটি ক্রীড়াকেন্দ্র এশীয় উপলক্ষ্যে ব্যাংককে গড়ে তোলা হয়েছে। নবনির্মিত ক্রীড়াকেন্দ্র-গুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রা দ্যানং—ক্রুং তান—ব্যাংকাপি রোডে ইনডোর স্টেডিয়াম (হুয়ামাক্ স্টেডিয়ামও বলা হয়)। জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে নব-নির্মিত ইনডোর স্টেডিয়ামের ব্যবধান বারো কিলোমিটারের মতো। ব্যাংককের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এই অঞ্চলটি একসময় জলাজমি ছিল। আশপাশের অনেকখানি এখনও সেই রকম আছে। কিন্তু সেই পরিবেশে বৃত্তাকার ইনডোর স্টেডিয়াম যেন আরও খুলেছে। আকাশ থেকে এই স্টেডিয়ামের ছাদটিকে ফুলের পাপড়ির মতো দেখায়। এই স্টেডিয়াম আধুনিক স্থাপত্যকলার এক জ্বলজ্বলে নিদর্শন। তেমন তেমন স্টেডিয়াম যেসব দেশে নেই সেইসব দেশের অধিবাসীদের কাছে প্রায় বিস্ময়কর। চারশ একর জায়গা জুড়ে ছড়ানো এই স্টেডিয়ামের পরিধি। এখানে ব্যাডমিণ্টন ও বাস্কেটবল কোর্ট আছে। আছে মুষ্টিযুদ্ধের রিং। হাজার বারো দর্শক স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে গা এলিয়ে বসে নির্বিঘ্নে ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখতে পাবেন।

রোড রেস সাইক্লিং প্রতিযোগিতার জন্যে একেবারে নতুন করে গড়া হয়েছে মৈত্রী সড়ক। সড়ক নির্মাণের খরচ খরচা বহনের টাকা এসেছে লটারির সূত্রে। তাছাড়া জাতীয় স্টেডিয়ামেই সাইক্লিং প্রতিযোগিতার অন্যান্য বিভাগীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে।

জাতীয় স্টেডিয়ামের হাতার মধ্যে হকি খেলার, দশটি টেনিস কোর্ট এবং ফুটবল মাঠ রয়েছে। তবে ফুটবলে প্রতিযোগী ও খেলার সংখ্যা বেশি বলেই ছুলাতে আর একটি স্টেডিয়াম ফুটবলের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেখানে বিশ হাজার দর্শকের জায়গা হয়। সুইমিং পুল, ভলিবল কোর্ট, জিমনাসিয়াম সবই পথুমওয়ানস্থ ক্রীড়াকেন্দ্র অঞ্চলে। তবে টেবল টেনিস হবে লুম্পিনিতে এবং ছাত্র ইউনিয়নের নিজস্ব হলে এবং ভারোত্তোলন সুয়ান ড্যুসিটের প্রেক্ষাগৃহে। এই হল বা প্রেক্ষাগৃহ মূল ক্রীড়াকেন্দ্রের একেবারে নাগালে নয়। এশীয় ক্রীড়ার কুস্তি হবে যেখানে সেই থামাসার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাসিয়াম বা কাই সার্ড হল জাতীয় স্টেডিয়ামের ততো কাছে নয়।

ওলিম্পিক বা আগের আগের বারের এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষ্যে ক্রীড়াগ্রাম নির্মাণে

সংগঠক দেশগুলি যে রীতি অনুসরণ করেছিল ব্যাঙ্ককেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে একেবারে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে এই গ্রাম। এশীয় ক্রীড়া অন্তে গ্রামখানি মাঝারি আয়ের মানুষদের স্থায়ী আবাসে পরিণত হবে। মূল স্টেডিয়াম থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে ক্রুং জান্ প্রেসিন্টকূট অবস্থিত এই ক্রীড়াগ্রামে ৭১৪টি ভবন আছে। গ্রামভবনের ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আরামদায়ক। 'আপ্ রুচিখানায়' বিশ্বাসী সংগঠকেরা বিভিন্ন স্বাদ ও রুচির মন জোগাতে নানান ধরনের আহার্য সরবরাহের আয়োজন করেছেন।

সাংবাদিকদের কাজের সুবিধের জন্যে মূল স্টেডিয়ামের পশ্চিম কোণে বড়সড় একটি প্রেস সেন্টার বসানো হয়েছে। সেখানে ডাকঘর, তার অফিস, টেলিফোন বুথ, আলোকচিত্র পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা আছে। ইনডোর স্টেডিয়ামেও আর একটি ছোট-খাটো প্রেস সেন্টার আছে। বেশির ভাগ সাংবাদিকের থাকার ব্যবস্থা মূল স্টেডিয়ামের পেছন দিকে আটতলা সাংবাদিক ভবনে। সাংবাদিক ভবনের ঘরের সংখ্যা অনেক। সব মিলিয়ে দুশোর বেশি সাংবাদিক সেখানে সাময়িক আস্তানা গেড়েছেন।

ব্যাঙ্ককে এশীয় ক্রীড়ার পঞ্চম অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার মুখে সবায়ের মুখেই এক প্রশ্ন, জাপান এবার কি করবে? কতো মেডেল নিজের ঘরে তুলবে? এইসব প্রশ্নের এককথায় এই জবাবও অনেকে দিচ্ছেন যে যা প্রত্যাশা জাপান করেছে তাই পূর্ণ করবে। নয়াদিল্লী থেকে জাকার্তা, এশীয় ক্রীড়ার চতুর্বার্ষিকী চারটি অনুষ্ঠানে জাপান প্রতি পদক্ষেপেই বাড়তি পদক সংগ্রহ করেছে। এবারেও নিশ্চয়ই জাপ সংগ্রহে ঘাটতি দেখা দেবে না।

ঘাটতি বদলে বাড়তি সঞ্চয়েই জাপানের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত। জাকার্তা ক্রীড়ায় জাপান সবসমেত ১৫৫টি (৭৪টি স্বর্ণ, ৫৭টি রৌপ্য এবং ২৪টি ব্রোঞ্জ) পদক পেয়েছিল। ব্যাঙ্ককে যদি জাপ সংগ্রহসংখ্যা আরও না বাড়ে তাহলেই অনেকে আশ্চর্য হবেন।

আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি অনুমোদিত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাফল্য ও মানের নিরিখে জাপানই পুরোবর্তী। জাপানের অগ্রগতির অর্থ হলো এশিয়ার পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার আরও উন্নত মানের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং ব্যাঙ্কক ক্রীড়ায় জাপানের ভূমিকার দিকে আজ সারা এশিয়ারই চোখ রয়েছে।

যে কোনো আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার আগে কে কোন্ বিভাগে জিতবে বা কোন্ ক্রীড়াবিদ বিশিষ্ট ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ব্যক্তিগত ক্রীড়াকৃতির মূলধনে তা নিয়ে ওয়াকেফহাল মহলে রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়ে যায়। পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার আগেও সেই আলোচনা সোচ্চার। এবং জাপ তরুণ হিদেও ইজিমা অনেক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

অনেকের ধারণা, হিদেও ইজিমার কল্যাণে ব্যাঙ্ককে সর্বপ্রথম এক এশীয় অ্যাথলিটের পক্ষে দশ সেকেণ্ডে শতমিটার পথ দৌড়ানো সম্ভবপর হবে। হিদেও ইজিমা এর আগে একাধিকবার ১০·১ সেকেণ্ডে শতমিটার পথ অতিক্রম করেছেন। বাধা ডিঙোতে তাঁকে মাত্র দশমিক এক সেকেণ্ডের সময় ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। স্বল্পপাল্লার দৌড়ে নামমাত্র দশমিক এক সেকেণ্ড কমিয়ে ফেলা যেমন কম কথা নয়, তেমনি হিদেও ইজিমার সামর্থও সীমাবদ্ধ নয় বলেই অনেকের ধারণা। এই ধারণার সত্যিমিথ্যে যাচাই করার সময় আসন্নপ্রায়। দেখাই যাক্, হিদেও ইজিমা বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিতে পারেন কিনা।

বিশেষজ্ঞদের দৃঢ়মূল ধারণা, সাইক্লিং হকি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, লন টেনিস এবং বাস্কেটবল ছাড়া বাকী বিভাগীয় প্রতি-যোগিতায় জাপানের শীর্ষস্থান পাওয়ার পথে আর কোনো প্রতিযোগী তেমন শক্ত-সমর্থ বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। সাঁতার, টেবল টেনিস, ভারোত্তোলন, মল্ল-ক্রীড়া, অ্যাথলেটিকস, ভলিবলে জাপানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে ফাটল ধরাবে কে?

ভারতের বড় ভরসা কুস্তি, হকি ও ফুটবল। হকিতে ভারত ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু আশ্চর্য এই যে বিশ্ব বিজয়ী ভারত এশীয় হকিতে কোনোদিন শীর্ষস্থান পায়নি। নয়াদিল্লী ও ম্যানিলাতে হকি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। এশীয় ক্রীড়ায় হকির আসর সর্বপ্রথম বসে জাপানে। দ্বিতীয়বার জাকার্তায়, কিন্তু জাপান ও জাকার্তায় পাকিস্থান পেয়েছে এশীয় শ্রেষ্ঠ এবং ভারত দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হকি দলের সম্মান। এই সম্মান ছিনিয়ে নিয়ে ভারত তা নিজের হাতে তুলে নিতে পারে কিনা এশিয়া তথা হকি দুনিয়ার সকলেই তা দেখবার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

ফুটবলে এশীয় চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার কাজ ভারতের পক্ষে আগের অনুপাতে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু চার বছরের ফাঁকে এশিয়ার নানান অঞ্চলে ফুটবলের মানোন্নয়নে সাধ্যমতো চেষ্টা চলেছে। অঞ্চলবিশেষে সে চেষ্টা ফলপ্রসূও হয়েছে এবং দুটি এশীয় ক্রীড়ার ফাঁকে এশিয়ার এখানে ওখানে যেসব আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা হয়েছে যোগদানকারী ভারত তাতে নিজের প্রাধান্য বজায়ও রাখতে পারে নি। কাজেই ব্যাঙ্ককে ভারতীয় ফুটবলের অবস্থাটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

এ বছরেই কিংসটনে কমনওয়েলথ ক্রীড়ার সর্বশেষ অনুষ্ঠানে ভারত মল্ল-ক্রীড়ায় অবশ্যই সাফল্যের উল্লেখযোগ্য নজীর রেখেছে। কিন্তু অনেকের ধারণা, এশীয় ক্রীড়ায় কুস্তির মান কমনওয়েলথের কুস্তির মানের চেয়েও উঁচু ধাপে উঠবে। কাজেই নিজের মান বাঁচাতে ভারতীয় মল্লবীরদলকে জাপানী, ইরানী, পাকিস্থানী এবং দক্ষিণ কোরিও দলের সঙ্গে দস্তুরমতো কাটাকুস্তিই লড়তে হবে।

পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার সব বিভাগেই ভারত যোগ দেবে বলে আগে জানিয়েছিল। কিন্তু অর্থমন্ত্রকের আপত্তির ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে সব বিভাগে যোগ দেওয়া হয়ে উঠলো না। কয়েকটি বিভাগে ভারতীয় অনুপস্থিতি হয়তো অনুভূত হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাববোধ হলো একজন ভারতীয়ের সম্বন্ধে। সেজন অধ্যাপক গুরুদত্ত সোন্ধী।

এশীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং এশীয় ক্রীড়ার জনক গুরুদত্ত সোন্ধী বিহনে এই সর্বপ্রথম এশিয়া ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হতে চলেছে। সোন্ধীর জীবনাবসান ঘটেছে কদিন আগে। তাই বিয়োগ ব্যথাটা রীতিমতো গভীর। এশীয় ক্রীড়ার আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী, যাঁরা এই অনুষ্ঠানের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, যাঁদের কাছে খেলাধুলোয় রাজনীতির চেয়ে নীতির মূল্য আরও বড় তাঁদের ব্যথা গভীরতর।

সোন্ধী বনাম ইন্দোনেশিয়ার মতদ্বৈধ ঘিরে জাকার্তায় অনেক জল ঘোলা করে তোলা হয়েছিল। ঘোলা জল গড়াতে গড়াতে অনেকদূরে ছড়িয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া এশীয় ক্রীড়া এবং আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গানেফো ক্রীড়া প্রচলনে এগিয়েছিল। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলেছে। ইন্দোনেশিয়া তার মত পালটিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া আবার এশীয় ক্রীড়াভূমিতে ফিরেছে। নীতির জয় ঘটেছে। দু-চোখ মেলে সোন্ধী এমন আশ্বাসজনক দৃষ্টান্তটি দেখে যেতে পারলেন না! কাল তাঁকে ছিনিয়ে নিলো আগেই।

এইটেই আফসোসের কথা!

তবে এই আফশোষই বা কিসের? ইন্দো-নেশিয়ার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে তিনি না পারুন, নীতিনিষ্ঠ সোন্ধীরই যে চূড়ান্ত জিৎ হয়েছে একথা তামাম দুনিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াও নিশ্চয়ই মানবে। রাজ-নীতির এই জয়ই তো খেলাধুলোর আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক।

এই আশায় আশান্বিত হয়ে আমরা তাই প্রার্থনা করি, হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটুক। মৈত্রী প্রসারে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে সে মহৎ আয়োজন সফল হোক, সার্থক হয়ে উঠুক পরিবর্তিত পটভূমিকায়।

ডেভিস কাপ—আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার

খেলাধূলা

দর্শক

ডেভিস কাপ
ইণ্টার-জোন ফাইনাল

কলকাতার সাউথ ক্লাবের সুরম্য তৃণ-
দিত ঐতিহাসিক লনে আয়োজিত
ভিস কাপের ইন্টার-জোন ফাইনালে
রতবর্ষ ৩-২ খেলায় ব্রেজিলকে পরা-
ত করে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড
ং ফাইনালে ২০বারের ডেভিস কাপ
য়ী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবার অধি-
র লাভ করেছে। ভারতবর্ষের খেলাধুলোর
তহাসে এই সাফল্য এক নতুন অধ্যায়ের
সূচনা। ভারতবর্ষ বনাম অস্ট্রেলিয়ার
১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ
রাউন্ড খেলার আসর বসবে অস্ট্রেলিয়ার
মেলবোর্নে, আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে
ডিসেম্বর। ভারতবর্ষকে নিয়ে এশিয়া মহা-
দেশের দুটি দেশ ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ
রাউন্ডে উঠলো। প্রথম উঠেছিল জাপান,
১৯২১ সালে এবং তারা চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে
০-৫ খেলায় আমেরিকার কাছে পরাজিত
হয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল। এ পর্যন্ত
ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে
৯টি দেশ—অস্ট্রেলিয়া ৩৪বার (জয় ২০),
আমেরিকা ৪৩ বার (জয় ১৯), গ্রেট বৃটেন
১৬ বার (জয় ৯), ফ্রান্স ৯বার (জয় ৬),
ইতালী ২ বার, বেলজিয়াম ১ বার, জাপান
১ বার, মেক্সিকো ১ বার এবং স্পেন
১ বার।

ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের ডেভিস কাপ
ইণ্টার-জোন ফাইনাল খেলাটি দীর্ঘকাল দুই
দেশের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নির্দিষ্ট
তিনদিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি
হয়নি। কৃষ্ণান বনাম বকের শেষ সিঙ্গলস
খেলাটি চতুর্থ দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল।
যোগ্যতার মাপকাঠিতে দুই দেশই সমান-
সমান ছিল। এই দুই দেশের ইণ্টার-জোন
ফাইনাল খেলার ফলাফল সম্পর্কে অস্ট্রে-
লিয়ার ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক বিশ্ব-
বিশ্রুত রয় এমার্সন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন
যে, ভারতবর্ষ জয়ী হবে। তিনি বলেছিলেন,
রমানাথন কৃষ্ণান তাঁর দুটি সিঙ্গলস এবং
জয়দীপ মুখার্জি অন্ততঃ একটি সিঙ্গলস
খেলায় জয়ী হবেন। ব্রেজিলের একমাত্র জয়
হবে ডাবলসে।

ব্রেজিলের পক্ষে এই প্রথম ইণ্টার-জোন
ফাইনাল খেলা; অপরদিকে ভারতবর্ষের
পক্ষে পঞ্চমবার। আগের চারবারের ইণ্টার-
জোন ফাইনাল খেলার ফলাফল ভারতবর্ষের
অনুকূলে ছিল না—১৯৫৯ সালে অস্ট্রে-
লিয়ার কাছে ১—৪ খেলায়, ১৯৬২ সালে
মেক্সিকোর কাছে ০—৫ খেলায়, ১৯৬৪
সালে আমেরিকার কাছে ০—৫ খেলায় এবং
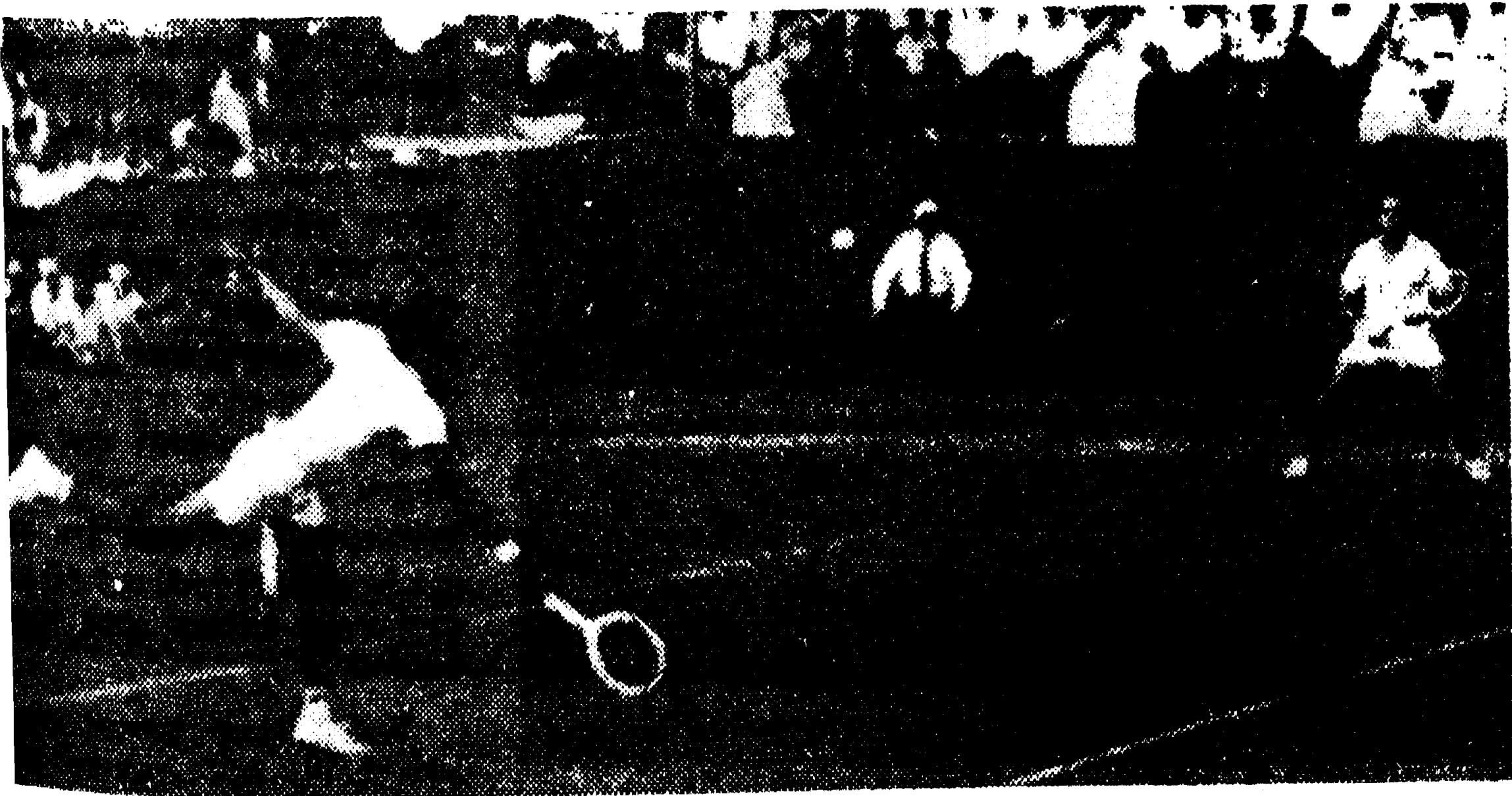
ডেভিস কাপ ইণ্টার-জোন ফাইনালে তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় জয়দীপ মুখার্জি (বাঁদিকে) এবং ব্রেজিলের এডিসন মানডারিনো (ডানদিকে)। ফটো : অমৃত

১৯৬৫ সালে স্পেনের কাছে ২—৩ খেলায় ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছিল।

ব্রেজিলের খেলোয়াড় কক এবং ম্যানডারিনোর সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড় কৃষ্ণান এবং জয়দীপের এই প্রথম খেলা নয়। এর আগে বিভিন্ন খেলা উপলক্ষে কৃষ্ণান তিনবার ককের বিপক্ষে খেলে দু'বার এবং ম্যানডারিনোর সঙ্গে চারবার খেলে তিনবার জয়ী হন। অপরদিকে জয়দীপ দুবারই ককের কাছে পরাজিত হন। ম্যানডারিনোর বিপক্ষে জয়দীপের দু'বারের খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়—একবার জয় এবং একবার পরাজয়।

ডেভিস কাপের ইউরোপীয়ান জোনের প্রতিযোগী ব্রেজিলের গত চার বছরের (১৯৬২—৬৫) ডেভিস কাপ খেলার ফলাফল—এক শোচনীয় ব্যর্থতারই পরিচয় (বিস্তৃত অমৃতের ৩০ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। ১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপের খেলায় ব্রেজিল যোগ্যতার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরিচয় দিয়ে রাতারাতি আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে খ্যাতিলাভ করেছে। ১৯৬৬ সালে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিলের ব্যর্থতা সারাদেশে যে বিষাদ এনেছিল, আজ টেনিস খেলোয়াড়দের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে দেশবাসীর কিছুটা সান্ত্বনা। ব্রেজিলের টেনিস খেলোয়াড়দের এই সাফল্যের প্রধান সহায় হল—কঠোর অনুশীলন, নিয়মানুবর্তিতা এবং জ্বলন্ত স্বদেশপ্রীতি। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কারণে সেখানে কিভাবে শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের যোগ্যতা উপেক্ষা করা হয়েছে, তারই একটি ঘটনা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বছরে ব্রেজিলের টেনিস খেলোয়াড়দের যোগ্যতার মাপকাঠিতে রচিত ক্রমপর্যায় তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছিলেন রোনি বার্নেস, ২য় স্থান টমাস কক এবং ৩য় স্থান এডিসন ম্যানডারিনো: ডেভিস কাপের খেলা উপলক্ষে ব্রেজিলের টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং কোচ কঠোর অনুশীলন এবং নিয়মানুবর্তিতা পালনের যে-পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, ব্রেজিলের ১নং খেলোয়াড় রোনি বার্নেস তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কড়ার দিতে অনিচ্ছুক থাকায় তাঁকে শেষপর্যন্ত ব্রেজিলের ডেভিস কাপ দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছে।
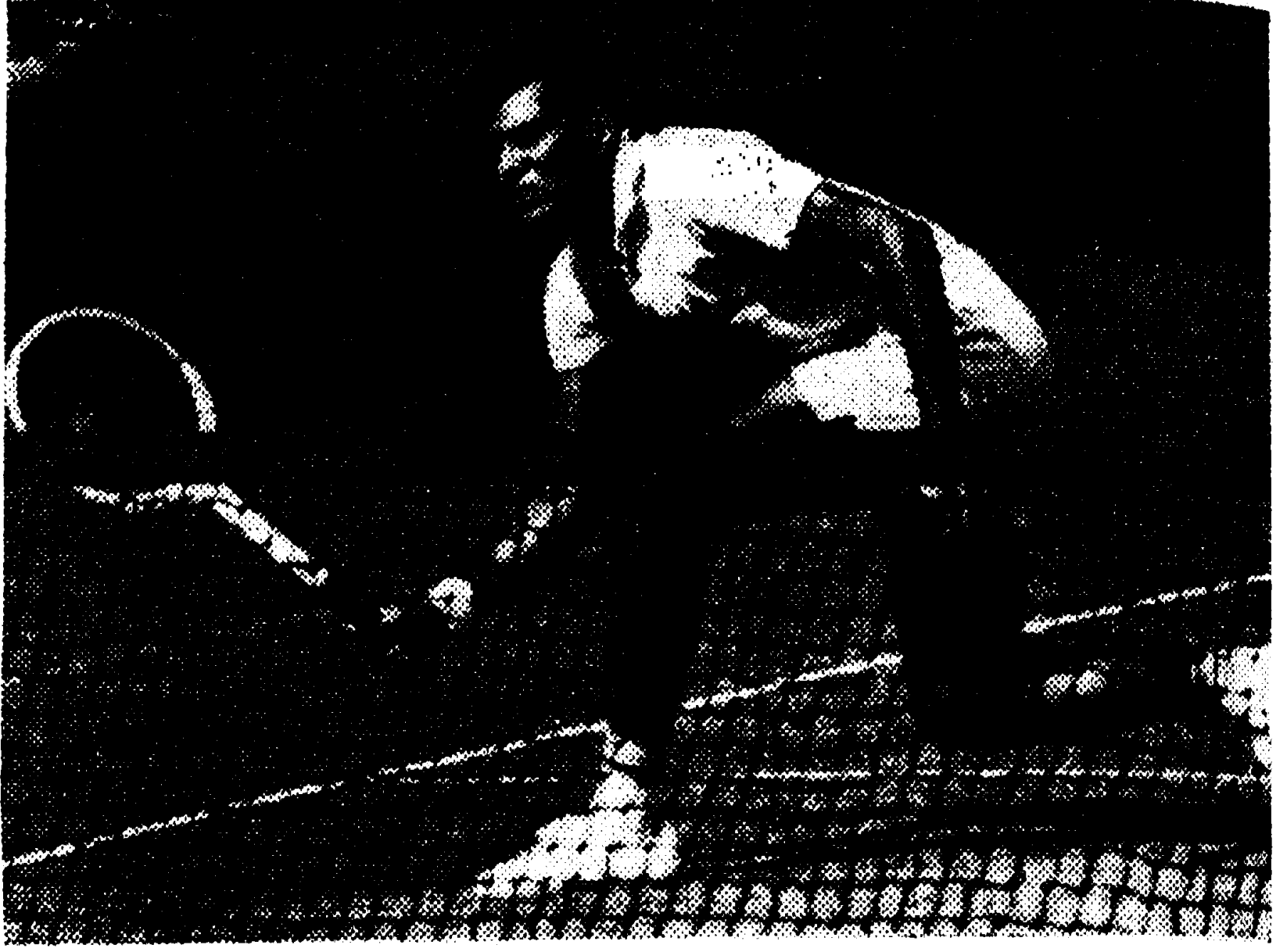
ক্রীড়ারত জয়দীপ মুখার্জি ফটো : অমৃত

ব্রেজিলের টেনিস খেলোয়াড়দের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—তাঁরা জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সহজে বিচলিত হন না—দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে সাফল্যলাভ করেন। তাছাড়া বিপক্ষের থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েও তাঁরা সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন—একাধিকবার দেখা গেছে, তাঁরা ব্যবধান অতিক্রম করে জয়ী হয়েছেন। এককথায় ব্রেজিলের খেলোয়াড়রা হলেন শ্রমশীল সংগ্রামী খেলোয়াড়। প্রধানতঃ এই চারিত্রিক গুণেই ব্রেজিল আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে আশাতীত সাফল্যলাভ করেছে। এদিক থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা দুর্বল।

প্রথম দিনের দুটি সিংগলস খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। প্রথম খেলায় জয়দীপ মুখার্জির বিপক্ষে ব্রেজিলের ন্যাটা খেলোয়াড় টমাস কক্ স্ট্রেট সেটে জয়ী হলে ব্রেজিল ১—০ খেলায় এগিয়ে যায়। কিন্তু কৃষ্ণান দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় এডিসন ম্যানডারিনোকে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান করেন। পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে দুটি সিঙ্গলস খেলায় জয়ী হয়ে জয়দীপ যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, এইদিনের খেলায় তা রক্ষা করতে পারেননি। জয়দীপ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। লড়াই করার কোনরকম লক্ষণ তাঁর খেলায় প্রকাশ পায়নি। ম্যানডারিনোর বিপক্ষে কৃষ্ণান প্রথম সেটে হেরে গিয়ে পরবর্তী তিনটি সেটে জয়ী হন। কৃষ্ণান খেলার সর্ববিষয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসের খেলায় কৃষ্ণান-জয়দীপ জুটি ব্রেজিলের কক-ম্যানডারিনো জুটিকে পরাজিত করে পণ্ডিতমহলের ভবিষ্যদ্বাণী নস্যাৎ করেন।
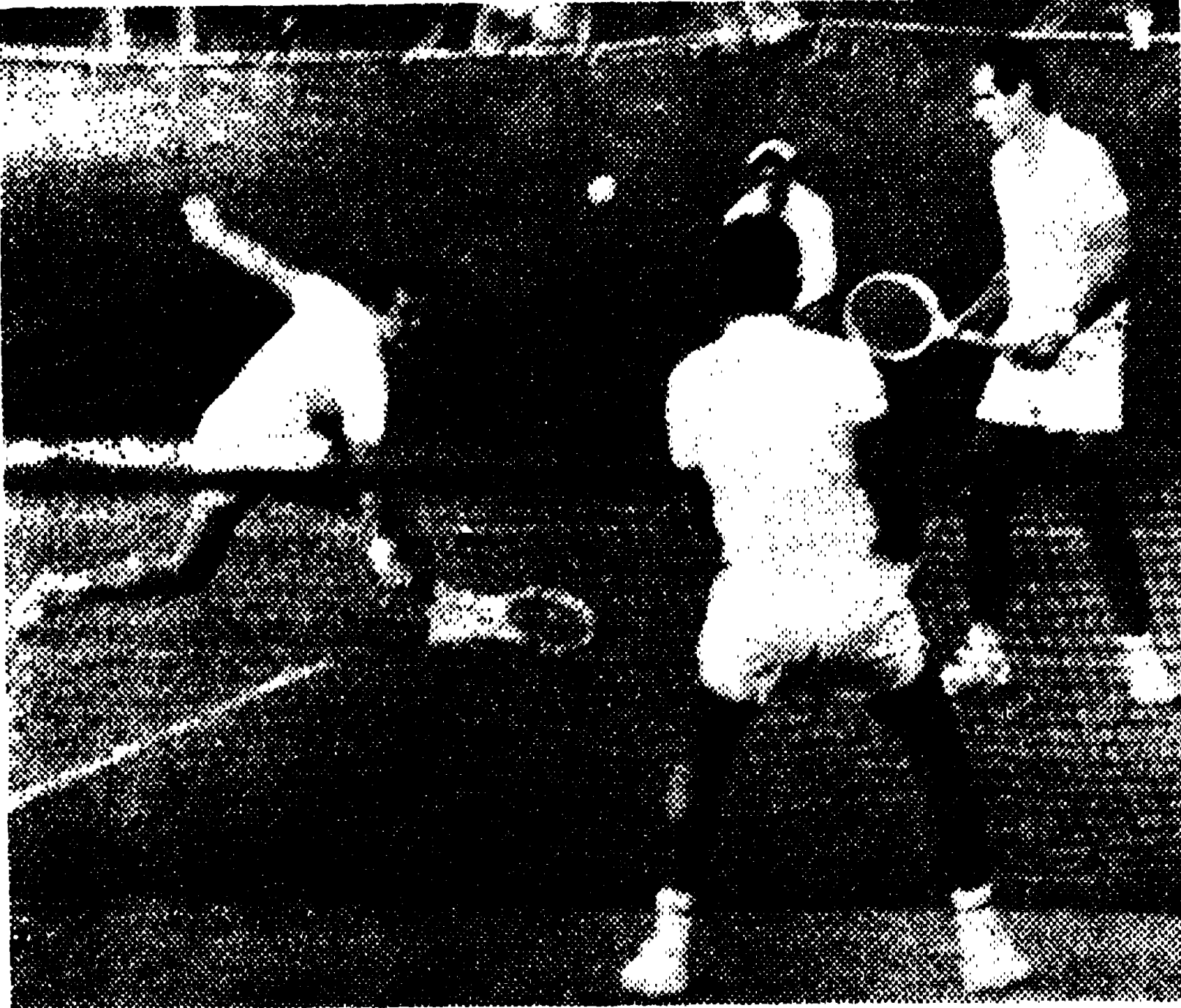
ডেভিস কাপ ইণ্টার-জোন ফাইনালের ডাবলসে ব্রেজিলের ম্যানডারিনো (বাঁদিকে) একটি শক্ত বল খেলেছেন। ফটো : অমৃত

ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং জয়দীপের কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের ফলে ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়।

তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় ম্যানডারিনোর সঙ্গে জয়দীপ মুখার্জি তিন ঘন্টা সমানে লড়াই করে শেষপর্যন্ত পরাজিত হন। খেলার ফলাফল তখন সমান ২-২ দাঁড়ায়। ফলে কৃষ্ণান বনাম ককের শেষ সিঙ্গলস খেলার ফলাফলের উপরই ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।

তৃতীয় দিনে কৃষ্ণান বনাম ককের শেষ সিঙ্গলস খেলা অসমাপ্ত থাকে। আলোর অভাবে খেলা বন্ধ রাখতে হয়। এই সময়ে কক ২-১ সেটে অগ্রগামী ছিলেন। ভারতীয় মহলে এই পরিস্থিতিতে তখন দারুণ দুর্ভাবনা এবং উত্তেজনা। ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের অধিনায়ক রমানাথন কৃষ্ণানের উপরই তখন দেশের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কৃষ্ণান তা যোগ্যতার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। শেষদিনে তিনি পরপর দুটি সেটে জয়ী হলে ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় ব্রেজিলকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করে। সদ্যসমাপ্ত ইন্টার-জোন ফাইনালের ডাবলসে কৃষ্ণান-জয়দীপ জুটির এবং ককের বিপক্ষে কৃষ্ণানের চূড়ান্ত সিঙ্গলসে জয়লাভ ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।
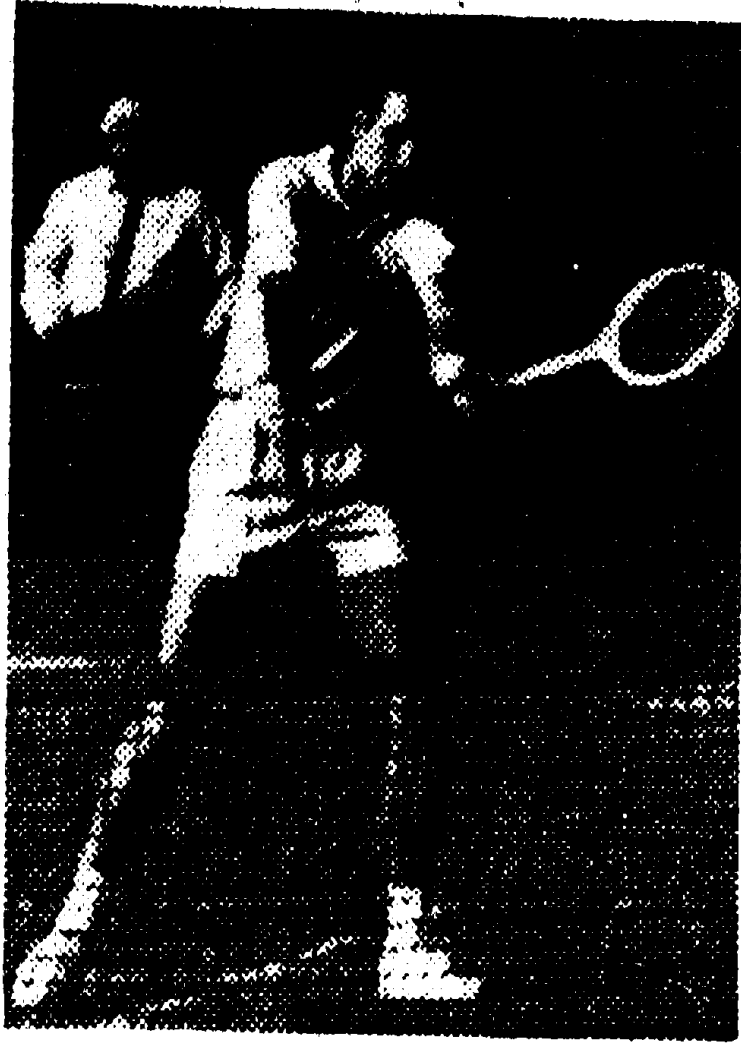
ক্রীড়ারত ব্রেজিলের ন্যাটা খেলোয়াড় টমাস কক্

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম সিঙ্গলসে টমাস কক ৬-২, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় সিঙ্গলসে রমানাথন কৃষ্ণান ৫-৭, ৬-২, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে এডিসন ম্যানডারিনোকে পরাজিত করেন।

ডাবলসে রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৩-৬ ও ৬-৩ গেমে টমাস কক এবং এডিসন ম্যানডারিনোকে পরাজিত করেন।

তৃতীয় সিঙ্গলসে এডিসন ম্যানডারিনো ৯-৭, ৩-৬, ৬-৪, ৩-৬ ও ২-৫ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

চতুর্থ সিঙ্গলসে রমানাথন কৃষ্ণান ৩-৬, ৬-৪, ১০-১২, ৭-৫ ও ৬-২ গেমে টমাস ককক পরাজিত করেন।

এশিয়ান গেমস

আগামী ৯ই ডিসেম্বর ব্যাঙ্ককে পঞ্চম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হবে। খেলা শুরু হবে ১০ই ডিসেম্বর থেকে এবং ক্রীড়ানুষ্ঠানের সমাপ্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হবে ২০শে ডিসেম্বর পঞ্চম এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান তালিকায় মোট ১৪টি খেলা স্থান পেয়েছে : এ্যাথলেটিকস্, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, টেবিল টেনিস, বক্সিং, কুস্তি, ভরোত্তোলন, সাঁতার ও ওয়াটার পোলো, সাইক্লিং এবং স্যুটিং। এশিয়ান গেমসের প্রধান উদ্যোক্তা ভারতবর্ষকে নিয়ে মোট ১৮টি দেশ পঞ্চম এশিয়ান গেমসে যোগদানের উদ্দেশ্যে নাম দিয়েছে। ভারতবর্ষের কাছে আসন্ন পঞ্চম এশিয়ান গেমস এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা বলা চলে। ১৯৫৮ সালের টোকিওতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে হকি খেলা প্রথম তালিকাভুক্ত হয়। টোকিওর এই এশিয়ান গেমসের হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান শেষপর্যন্ত গোলের গড়পড়তায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল। ১৯৬২ সালে জাকার্তায় আয়োজিত এশিয়ান
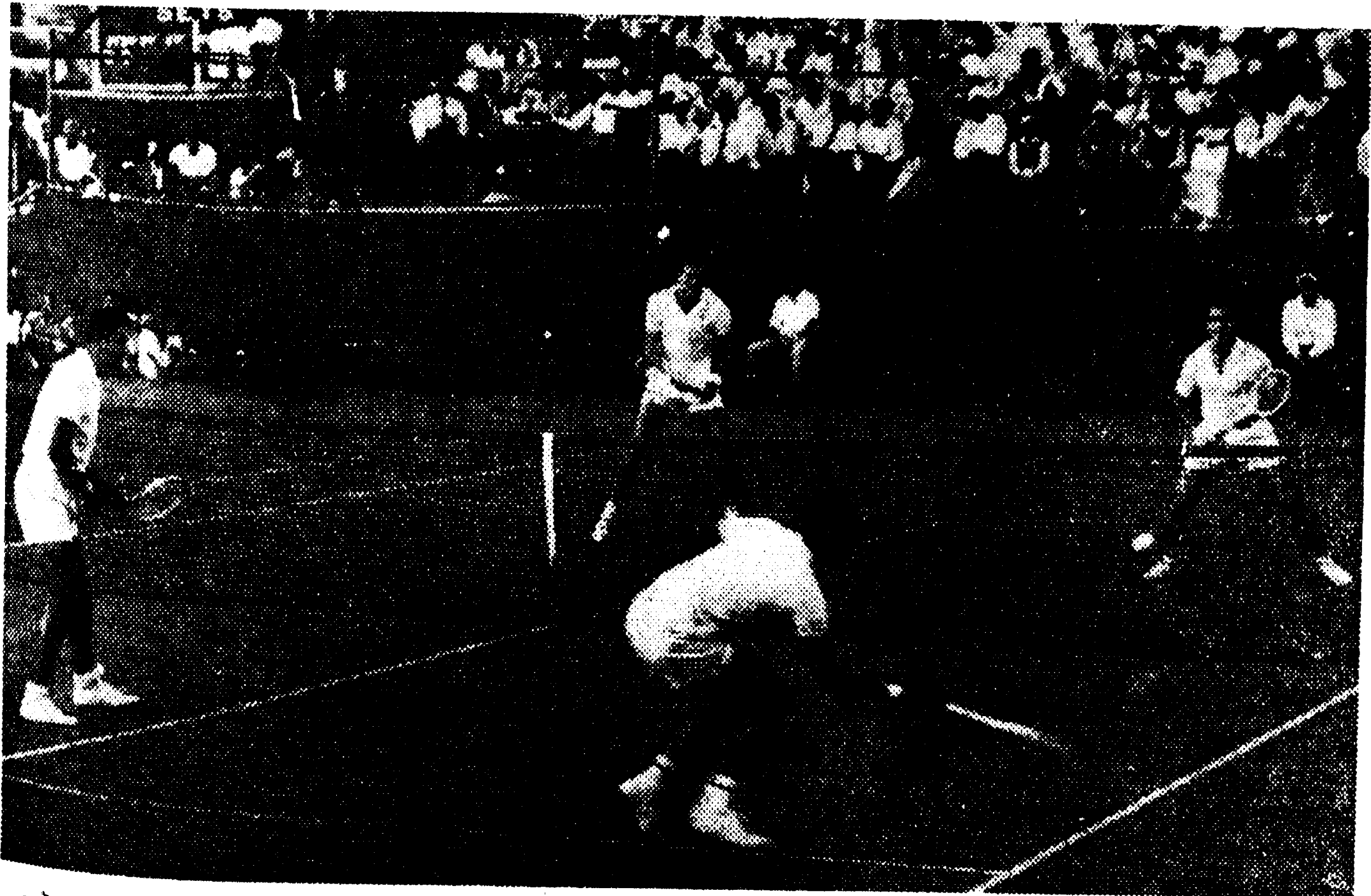
সাউথ ক্লাবের লনে ডেভিস কাপ ইন্টার-জোন ফাইনালের ডাবলসে ক্রীড়ারত রমানাথন কৃষ্ণান (বাঁদিকে) এবং জয়দীপ মুখার্জি (ডান দিকে)। পর্দার দিকে টমাস কক (বাঁদিকে) এবং এডিসন ম্যানডারিনো (ডানদিকে)। এই খেলায় কৃষ্ণন এবং জয়দীপ জয়ী হলে ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়।

ফটো : অমৃত

গেমসের হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ২—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। এই সময়ে পাকিস্তান ছিল অলিম্পিক হকিতে স্বর্ণপদক বিজয়ী। শেষ-পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে টোকিওর অষ্টাদশ অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে পাকিস্তানকে পরাজিত করে অলিম্পিক গেমসের হকিতে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছে বটে, কিন্তু এখনও এশিয়ান গেমসের হকিতে স্বর্ণপদক জয় বাকি আছে।

খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাবৃন্দ

খেলোয়াড়বৃন্দ (মোট সংখ্যা ৮৭) : হকিতে ১৮, ফুটবলে ১৮, এ্যাথলেটিক্সে ১৭, কুস্তিতে ৮, ভলিবলে ১২, ব্যাডমিণ্টনে ৩, টেবিল টেনিসে ৩, বক্সিংয়ে ২, টেনিসে ৩ ভারোত্তোলনে ১, সাঁতারে ১ এবং স্যুটিংয়ে ১ জন।

কর্মকর্তাবৃন্দ (মোট ১৮) : হকিতে ২, ফুটবলে ২, এ্যাথলেটিক্সে ২, কুস্তিতে ২, ভলিবলে ১, ব্যাডমিণ্টনে ১, টেবিল টেনিসে ১, বক্সিংয়ে ১, টেনিসে ১, ভারোত্তোলনে ১, সেফ দ্য মিশন ১, সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ ১, রেফারী ১ এবং পাচক ১ জন।

এ্যাথলেটিকস্ দল

ভারতীয় এ্যাথলেটিকস্ দলে মোট ১৭ জন এ্যাথলীট নির্বাচিত হয়েছেন—পুরুষ বিভাগে ১৪ জন এবং মহিলা বিভাগে ৩ জন। পুরুষ বিভাগে ১৪ জনের মধ্যে আছেন—সার্ভিসেস দলের ৯ জন, পাঞ্জাবের ৩ জন, মহারাষ্ট্রের ১ জন এবং রেলওয়ের ১ জন। মহিলা বিভাগে ৩ জনের মধ্যে আছেন—পাঞ্জাবের ২ জন এবং মহারাষ্ট্রের ১ জন। পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্র ছাড়া আর কোন রাজ্যের প্রতিনিধি নেই—কি শোচনীয় ব্যর্থতা!

পুরুষ বিভাগ

২০০ ও ৪০০ মিটার : আজমীর সিং (পাঞ্জাব)।

৮০০ মিটার : বি এস বড়ুয়া (সার্ভিসেস) এবং দয়াল সিং (সার্ভিসেস)।

১,৫০০ মিটার : এডওয়ার্ড সিকুইয়েরা (মহারাষ্ট্র) এবং সর্দার সিং (সার্ভিসেস)।

৪×১০০ মিটার রিলে : বি এস বড়ুয়া, জগেন সিং (সার্ভিসেস), জগদীশ সিং (রেলওয়ে) এবং আজমীর সিং (পাঞ্জাব)।

ডিসকাস : বলকার সিং (সার্ভিসেস)—অধিনায়ক এবং পরভীন কুমার (পাঞ্জাব)।

হাইজাম্প : ভীম সিং (সার্ভিসেস)।

হপ-স্টেপ-জাম্প : লাব সিং (সার্ভিসেস) এবং মহীন্দর সিং (পাঞ্জাব)।

সটপুট : যোগীন্দর সিং (সার্ভিসেস)।

হ্যামার : পরভীন কুমার (পাঞ্জাব)।

[illegible] : চরণ সিং (সার্ভিসেস)।

মহিলা বিভাগ

২০০ মিটার : সন্দেশ সোধী (পাঞ্জাব)।

৮০ মিটার হার্ডলস : মনজিৎ ওয়ালিয়া (পাঞ্জাব)।

লং জাম্প এবং পেণ্টাথলন : ক্রিশ্চিন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র)।

ফুটবল দল

ভারতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন বাংলার ১১, রেলওয়ের ৩ এবং একজন করে অন্ধ্র, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়।

গোল : পিটার থঙ্গরাজ এবং সি মুস্তাফা (বাংলা)।

ব্যাক : জার্নেল সিং (অধিনায়ক), আলতাফ হোসেন, সি প্রসাদ, সৈয়দ নৈমুদ্দিন (সকলেই বাংলার) এবং অরুণ ঘোষ (রেলওয়ে)—সহ-অধিনায়ক।

হাফ-ব্যাক : ইউসুফ খাঁ (অন্ধ্র), পি সিং (বাংলা), কাজল মুখার্জি (রেলওয়ে) এবং কৃষ্ণজী রাও (মহীশূর)।

ফরওয়ার্ড : প্রদীপ ব্যানার্জি (রেলওয়ে), ইন্দর সিং (পাঞ্জাব), বীর বাহাদুর (সার্ভিসেস), অশোক চ্যাটার্জি, পি কান্নন, পরিমল দে এবং অরুময়নৈগম (সকলেই বাংলার)।

ভারতীয় হকি দল

ব্যাংককে আয়োজিত আসন্ন পঞ্চম এশিয়ান গেমসে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গঠন করা হয়েছে। গত ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে যাঁরা ভারতীয় দলে খেলেছিলেন তাঁদের থেকে আটজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়ে নতুন আটজন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা হয়েছে। এই নতুন আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র—জগদীপ সিং (বয়স ১৯) এবং হারমিক সিং (বয়স ১৯) আছেন। এঁরা এ বছরের নেহরু হকি প্রতিযোগিতায় বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এশিয়ান গেমসের সমতুল্য আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ইতিপূর্বে কোন কলেজ ছাত্রের ভারতীয় হকি দলে স্থান লাভের সৌভাগ্য হয় নি। অন্যান্য দেশ কিন্তু অলিম্পিকের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়ানুষ্ঠানে স্কুল এবং কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ের প্রচুর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ব্যাংককগামী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন গোলরক্ষক শঙ্কর লক্ষ্মণ। দলের নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আছেন—পাঁচজন করে সার্ভিসেস, পাঞ্জাব এবং রেলওয়ের, ২ জন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মাত্র একজন পশ্চিম বাংলা রাজ্যের।

দলে আছেন তিনজন বলবীর সিং—একজন হাফ-ব্যাক (সার্ভিসেস দলের) এবং দুজন ফরোয়ার্ড (রেলওয়ে এবং পাঞ্জাবের)।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গোল : শঙ্কর লক্ষ্মণ (সার্ভিসেস) এবং জগদীপ সিং (বিশ্ববিদ্যালয়)।

ব্যাক : গুরুবক্স সিং (বাংলা), পৃথ্বীপাল সিং (পাঞ্জাব) এবং ধরম সিং (পাঞ্জাব)।

হাফ-ব্যাক : মহীন্দরলাল (রেলওয়ে), বলবীর সিং (সার্ভিসেস), হরমিক সিং (বিশ্ববিদ্যালয়), জগজিৎ সিং (পাঞ্জাব), এবং এ ফ্র্যাঙ্ক (রেলওয়ে)।

ফরোয়ার্ড : বলবীর সিং (রেলওয়ে), বলবীর সিং (পাঞ্জাব), ভি জে পিটার (সার্ভিসেস), হরবিন্দর সিং (রেলওয়ে), হরিপাল কৌশিক (সার্ভিসেস), ইন্দর সিং (রেলওয়ে), তারসেম সিং (পাঞ্জাব) এবং নোয়েল টপ্পো (সার্ভিসেস)।

ইরাণী ট্রফি অজয়

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে ভারতীয় অবশিষ্ট একাদশ দল ৬ উইকেটে রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাইকে পরাজিত করে ইরাণী ট্রফি জয়ী হয়েছে। পিচ ভিজে থাকার দরুণ নির্দিষ্ট দিনে খেলা আরম্ভই হয়নি। ভারতীয় অবশিষ্ট একাদশ দল পরিচালনা করেছিলেন পতৌদির নবাব এবং বোম্বাই দল হারদিকার। এই খেলায় রঞ্জি স্টেডিয়ামের পিচ বোলারদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে ১৫টি, তৃতীয় দিনে ১৩টি এবং চতুর্থ দিনে ৩টি উইকেট পড়েছিল। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর মাত্র আধ-ঘণ্টা খেলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে ১১৩ রানের মাথায় বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতীয় অবশিষ্ট দল ৪ উইকেট খুইয়ে ৫৭ রান সংগ্রহ করে। প্রসন্ন ২৭ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৪৪ রানে বোম্বাইয়ের ৪টি উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে ১৩৪ রানের মাথায় ভারতীয় অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় বোম্বাই দলের ৭টা উইকেট পড়ে ৯১ রান উঠেছিল।

চতুর্থ দিনে মাত্র ৯৯ রানের মাথায় বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনে ৭৯ রান সংগ্রহ করতে ভারতীয় অবশিষ্ট দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৪ উইকেট খুইয়ে ৮১ রান তুলে দেয়।

বোম্বাই : ১১৩ রান (ওয়াদেকার ৫৬ রান; প্রসন্ন ২৭ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৭৪ রানে ৪ উইকেট)

ও ৯৯ রান (ওয়াদেকার ২৭ রান; প্রসন্ন ৩১ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৩৫ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় অবশিষ্ট দল : ১৩৪ রান (জয়সীমা ৫০ এবং পতৌদির নবাব ৩৪ রান। শিভালকার ২৮ রানে ৩ এবং দেশাই ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ৮১ রান (৪ উইকেটে। কুন্দরন ৩২ এবং বোরদে নট আউট ৩০ রান)

নগর-পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শমীকে বলে দিয়েছেন বিকেলে যাবেন। শ্বেতবাহু আর ছাড়পত্রবাহ এক বই নয়, তাই ইচ্ছে থাক না থাক না গেলেও নয়।

বেলা সাড়ে তিনটে চারটে নাগাত প্রভুজীধামে এসেছিলেন। মিত্রাদির কাছে সিতুর নীলিদির কাজের তদ্বিরেই নয় ঠিক। মাঝে মাঝে যেমন এসে থাকেন তেমনি এসেছেন। মিত্রাদির মেজাজ ভালো দেখলে বলতেন, নইলে আজ বলতেনই না হয়ত। নতুন কোনো মেয়ে নেবার কথা উঠলে মিত্রাদি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে, দেখতে কেমন। ভালো বা সুশ্রী শুনলে চাপা রাগে গরগর করে ওঠে, কাজ নেই বাপু, অন্য রাস্তা দেখতে বলো, খুব শিক্ষা হয়েছে।

সুন্দরী আর সুশ্রী মেয়েগুলোর ওপরেই এখন মিত্রাদির বেশি রাগ। বীথি ঘোষের অভাব সর্বরকমে ছেঁটে দেবার জন্যে একে একে আরো তিনটে মেয়েকে কাছে টেনেছিলেন। বাসন্তী, রমা আর কমলা। সংগঠনের কাজে সুশ্রী চালাক চতুর চৌকস মেয়েরই দরকার। তাতে সুবিধে যে হয় সেটা জ্যোতিরাণীও অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু দেখেশুনে দুজনেরই ঘেন্না ধরে গেছে। তাদের একটা বিয়ে করে বসল আর দুটো বীথির মতই উধাও। ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে, আবার সমস্যার কথা মনে হলে বুকে চিন্তার পাথর চেপে বসে। মোটামুটি আরো দু'তিনটে সুশ্রী মেয়েকে আড়ালে দেখিয়ে রেখেছে মিত্রাদি। ওদেরও চাল-চলন ভালো না নাকি। কোনো ছলছুতোয় আগেই ওদের এখান থেকে তাড়াবে কিনা সেই পরামর্শও করেছে। জ্যোতিরাণী এখানে এলেই শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন তাদের, ডেকে প্রায় অকারণেই রূঢ় ব্যবহার করেন। আরো রাগ হয় কারণ ওরা সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না পর্যন্ত।

যাই হোক, সিতুর নীলিদিকে নিয়ে এ-সব সমস্যা কম। সুন্দরী তো নয়ই, সুশ্রীও নয়। মিত্রাদিকে রাজি করানো যেতেও পারে। বাড়ির উল্টো দিকে থাকে যখন, গড়ে-পিটে নিতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু ওদিকে তো আবার স্কুল ফাইন্যাল টপকাবারও বিদ্যে নেই।

বিরক্ত মুখে গাড়িতে চেপে ফিরতি পথ ধরলেন জ্যোতিরাণী। মিত্রাদির সঙ্গে দেখাই হল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে বাড়ির কি কাজে বেরিয়েছে শুনলেন। ফিরতে রাত হবে। বেশি রাত হলে আজ না-ও ফিরতে পারে বলে গেছে নাকি। মাঝে মাঝে মিত্রাদি এই রকমই করে বসে। জ্যোতিরাণী বলে দিয়েছেন, হঠাৎ কলকাতায় চলে আসার দরকার হলে বা বেশিক্ষণের জন্য প্রভুজী-ধামের বাইরে থাকতে হলে তাঁকে একটা টেলিফোন করে যেন জানিয়ে দেয়। কিন্তু মাথায় কিছুর ঝোঁক চাপলে তার আর মনেই থাকে না কিছু—ওমনি ছুটল।

গাড়ি এখন যাঁর বাড়ির রাস্তায় চলেছে, জ্যোতিরাণী জোর করেই এতক্ষণ তাঁর চিন্তাটা সরিয়ে রেখেছিলেন। ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা বেজে গেছে। প্রভুজীধাম থেকে আর একটু আগে বেরুলে ভালো হত। ...খানিক বাদে শমীর মাস্টার আসবে। অগ্রহায়ণের বিকেলের আলোয় টান ধরেছে।

তিনতলার বারান্দার রেলিংএ শমী দাঁড়িয়ে। গাড়ি চোখে পড়তে ছুটে নেমে এলো। কাছে এসে বড় করে দম নিয়ে গড়গড় করে একদফা অভিযোগ সারল। যথা, দেরি দেখে ও ভাবল মাসি ভুলেই গেছে, টেলিফোন করার ইচ্ছে ছিল, কাকু ঘরে থাকাতে হল না, কাকু বলল, করতে হবে না, তুমি ভোলো নি।

তার হাত ধরে জ্যোতিরাণী হাসিমুখে বাড়িতে ঢুকলেন। দেরির কৈফিয়ত দিতে দিতে তিনতলায় উঠলেন। দোতলার মহিলাদের কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি এলে ইচ্ছে করেই তাঁরা আড়াল নেন কিনা জানেন না।

বিভাস দত্ত শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। উঠে বসতে বসতে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন, শমীর ঘড়ি দেখা বাড়-ছিল আর আপনার ওপর রাগ হচ্ছিল।

এক হাতে শমীকে জড়িয়ে ধরে রেখে জ্যোতিরাণী চামড়ার গদি-আঁটা মোড়ার ওপর বসে পড়লেন। —ওকে টেলিফোন করতে দেননি কেন, যদি ভুলে যেতাম?

হাসির ফাঁকে দু' চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকালো একটু। মাস তিনেক বাদে দেখা, বেশ রোগা রোগা লাগছে ভদ্রলোককে,

ক'দিনের জ্বরে এতটা হবার কথা নয়। অসময়ে বয়সের ছাপ পড়ছে।

হালকা উক্তির মধ্যে ঠেস দেবার মত হালকা কৌতুকের রসদ পেলেন বিভাস দত্ত। —ভুলে গেলে কি আর মনে করানো ঠিক হত, সে দুর্ভাগ্যও আমরা পাওনা ভাবতাম।

ফাঁক পেলে ভদ্রলোক কথা শোনাবেন জেনেই এসেছেন। জ্যোতিরাণী সে-রকম সুযোগ বিশেষ দিতে চান না। শমীকে টেনে নিয়ে বসার ফাঁকে দেয়ালের দিকে এক পলক দেখে নিয়েছিলেন। হাজারী-বাগের সেই ফোটোটা টাঙানোই আছে—যে ফোটোতে সিতুর সংগে তিনি আর বিভাস দত্ত আছেন। ও নিয়ে যে কথা-বার্তা হয়ে গেছে একদিন তারপর ওটা সরানোই ছেলেমানুষি হত। তবু তিনতলায় পা দেবার আগে জ্যোতিরাণীর ওটার আর আলমারিতে ওমর খৈয়ামের ফোটো দুটোর কথা মনে হয়েছে।

বললেন, লেখকদের তো দুর্ভাগ্যের জাল বুনতে ভালই লাগে, তার মধ্যে আবার শমীকে টানছেন কেন। যাক, শরীরের হাল তো ভালই করেছেন, ডাক্তার টাক্তার দেখাচ্ছেন?

বিভাস দত্ত জবাব দেবার ফুরসত পেলেন না। তার আগে শমী হেসে উঠল। —কাকুর নিজের ডাক্তার নিজেই, মোটা মোটা দুটো হোমিওপ্যাথী বই পড়ে আর ওষুধ কিনে খায়। ক'মাস ধরে রাত্তিরে তো আর্ধেক দিন কিচ্ছু খায় না, আজ বলে পেটখারাপ, কাল জ্বর-জ্বর—সে-দিন এক ডাক্তার বন্ধু এসে খুব বকেছে কাকুকে।

—বেশ করেছে, এরপর হোমিওপ্যাথী বই চুপিচুপি একদিন রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিস।

হৃষ্ট গাম্ভীর্যে বিভাস দত্ত বললেন, নিজের ওপর দিয়ে হাত পাকাচ্ছি, ওটা সেকেন্ড ফ্রন্ট—সাহিত্য করে ক'দিন চলবে ঠিক কি। শমীর দিকে তাকালেন, এই পাকা মেয়ে হাঁটারে একটু চায়ের জল চাপা না!

শমীকে তেমনি আগলে রেখেই জ্যোতিরাণী বাধা দিলেন, আমার চায়ের দরকার নেই, আপনারও এতক্ষণে বার কয়েক হয়ে গেছে নিশ্চয়। যে জন্যে এসেছেন সে-প্রসংগে দুই এক কথা না বললে নয়। শমীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল থেকে লোক আসছে বলেছিলি টেলিফোনে—কাকুর অভ্যর্থনা টভ্যর্থনা কেমন হল বল্—

সোৎসাহে শমী যে ফিরিস্তি দিল, শুনে বিভাস দত্তও হাসছেন অল্প অল্প। ...সকাল থেকে লোক কেবল এসেছে আর এসেছে, তার ধারণা চল্লিশজনের কম নয়। চা করতে করতে জগু হিমসিম খেয়ে গেছে, শেষে দুধ ফুরিয়ে যেতে দোকান থেকে চা এনে দিয়েছে। লোকেরা সব মস্ত মস্ত ফুলের তোড়া আর সুন্দর সুন্দর মালা এনেছে—মালা পরে-পরে এক-একবার কাকুর কান পর্যন্ত ঢেকে গেছল। শমী একসংগে কাউকে এত মালা আর তোড়া পেতে দেখেনি কখনো। সেই সব মালা আর তোড়া দিয়ে শমী সুন্দর করে এই ঘরখানা সাজাচ্ছিল, কিন্তু কাকু দিলে না, সব ও-ঘরে পাঠিয়ে দিলে। তারপর অনেকে আবার ক্যামেরা এনেছিল, মুখের ওপর দপ-দপ আলো জেবলে ছবি তুলেছে—সকলের সংগে যে-সব ছবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে শমীও আছে। উপসংহারে জানিয়েছে, বিকেলেও কারা কারা আসবে বলে কম করে পাঁচ-ছ'টা টেলিফোন এসেছিল—কাকু সক্কলকে কাল সকালে আসতে বলে দিয়েছে, তুমি আসছ জানে তো, সেইজন্যেই—

শেষের উচ্ছ্বাসের ফলে পরে মেয়েটার ধমক খাওয়ার সম্ভাবনা। আগ্রহের খবরটা ফাঁস করার দরুন তার কাকুর কতটা মানহানি হল জ্যোতিরাণী একবার দেখে নিয়ে শমীকেই বললেন, আমি ফুলটুল কিছুই আনিনি তবু আমার খাতির দেখ্, তা কাকুর প্রাইজ পাওয়ার আনন্দে তুই কি করলি শুনি!

—আমি আবার কি করব, এক-একবার কাকুর কাছে গিয়ে বসেছি, লোকেরা কাকুর সংগে আমাকেও দেখল। শমী হেসে উঠল, একজন আবার বলছিল বড় হয়ে আমি নাকি কাকুর থেকে ভালো লিখব—

—ঠিকই বলেছে। জ্যোতিরাণী সায় দিলেন।

ঠাট্টা কিনা শমী ধরতে পারছে না। ঘরের আলো আরো কমে এসেছে। হাত বাড়িয়ে বিভাস দত্ত সুইচ টিপে দিলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি লেগে আছে তখনো। ইতিমধ্যে শমীর আবার কি মনে পড়েছে, সাগ্রহে মাসির দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, জেঠিরা বলছিল প্রাইজ তো তোর মাসির বই পেয়েছে, তোর কাকুর কি? সত্যি?

এইবার অস্বস্তি জ্যোতিরাণীর। তবু তার দিকে চোখ রেখে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। সত্যি।

দাবিটা স্বীকার করছে কিনা বোঝার জন্যে শমী কাকুকে একবার দেখে নিল। স্বীকার করার মুখ মনে হল।—কিন্তু বইটা তো কাকু লিখেছে!

—লিখলেও ওটা আমার বই, গোড়াতেই আমার নাম লেখা আছে দেখিসনি?

—প্রাইজের পাঁচ হাজার টাকা তাহলে তুমি পাবে না কাকু পাবে?

বিভাস দত্ত হাসতে লাগলেন। জবাব হাতড়ে না পেয়ে জ্যোতিরাণী ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কে পেলে তোর বেশি আনন্দ হবে?

সঙ্কোচে সলজ্জ হেসে শমী জবাব দিল, কাকু...

—ওরে মেয়ে! আমার ওপর এই দরদ তোর?

এটা পক্ষপাতিত্ব বলে স্বীকার করতে শমীর আপত্তি। বলে উঠল, তোমার যে অনেক টাকা আছে, কাকুর তো নেই!

তরল আলাপ এই পর্যায়ে এসে ঠেকবে ভাবা যায়নি। জ্যোতিরাণী হেসেই উঠতে পারতেন কিন্তু বিভাস দত্তর ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বিভাস দত্ত ঝুঁকে দরজার দিকে তাকালেন একবার, তারপর শমীকে বললেন, আর পাকামো করতে হবে না, এখন যাও তোমার যম এসে গেছে।

দরজা পেরিয়ে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে পাশের ঘরের দিকে যেতে দেখা গেল। শমীর মাস্টার। মুখ বেজার করে শমী চলে গেল। হাসিমুখে জ্যোতিরাণী বললেন, বেচারী। বিভাস দত্তর দিকে চেয়ে ওর দোষ লাঘব করতে চেষ্টা করলেন তিনি, ওর পাকামোর দোষ কি, যা শোনে তাই বলে। একটু আগেই শুনল সাহিত্য করে আপনার ক'দিন চলবে ঠিক নেই, হোমিওপ্যাথী শিখে সেকেন্ড ফ্রন্ট খোলা দরকার।

বিভাস দত্ত শুনলেন, মন্তব্য না করে মুখে হাসি টেনে আনলেন একটু। এতক্ষণে তাঁর সিগারেটের খোঁজ পড়ল। জ্যোতিরাণীরও মনে হল, আর দু'চার কথার পর উঠলে ভালো হয়।

সিগারেট ধরিয়ে বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রভুজীধামের কাজকর্ম ভালো চলছে?

—চলছে। ...আপনার চেহারা সত্যি খারাপ হয়েছে, এ-ব্যাপারে নিজের বিদ্যে কুলোবে না, ডাক্তার-টাক্তার দেখান।

জবাবে একটু সাহিত্য করলেন বিভাস দত্ত, মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, সময় ঘনালে কারো বিদ্যেতেই কুলোয় না। স্বাস্থ্য আলোচনায় আগ্রহ নেই, জিজ্ঞাসা করলেন, কালীদা আর মামাবাবুর খবর কি, অনেকদিন দেখা হয়নি।

অনেকদিন দেখা হয়নি কারণ অনেকদিন তিনি যাননি। কিন্তু এই প্রত্যাশিত অনুযোগটুকু জ্যোতিরাণী করে উঠতে পারলেন না। অল্প মাথা নাড়লেন শুধু, অর্থাৎ খবর ভালো।

—আর আপনার গ্রেটম্যানের মেজাজ-পত্র?

আসল প্রশ্ন এটাই, আগেরগুলো ভূমিকা। ভদ্রলোকের অনেক জানা আছে বলেই আরো জানার কৌতূহল বিরক্তিকর।

তবু হাসিমুখে প্রসঙ্গ বাতিল করতে চাইলেন জ্যোতিরাণী। —আমি মশাই কারো মেজাজের ফিরিস্তি দিতে এখানে আসিনি, সকালে প্রাইজের খবরটা পড়ে আনন্দ হল তাই এলাম। আপনি তো পরশুই খবর পেয়েছেন শুনলাম, জানাননি কেন?

সিগারেট অর্ধেক পুড়েছে এরই মধ্যে। —জানালে আনন্দের দায়টুকু টেলিফোনেই শেষ করতে পারতেন।

প্রতিবাদের ছলেও কারো অভিমান নিয়ে নাড়াচাড়া করার ইচ্ছে নেই। সহজ ঠাট্টার সুরে জ্যোতিরাণী বললেন, দায় সারা হয়েছে, এখন উঠি তাহলে। ...বাড়ি গিয়ে আপনার শ্বেতবহ্নি আর একবার পড়ব ভাবছি, কি লিখেছেন এতদিনে ভুলেও গেছি।

ওঠার অবকাশ দিলেন না বিভাস দত্ত। —শ্বেতবহ্নি যেতে দিন, এ বইটা পড়ছেন?

মুহূর্তের মধ্যে একটা অস্বস্তি ছেঁকে ধবার উপক্রম করল বুঝি। —কোন্ বইটা?

—যেটা লেখা হচ্ছে...ছাড়পত্রবাহ।

এইজন্যেই আসবেন কি আসবেন না ভাবছিলেন জ্যোতিরাণী। শুধু এই তিক্ততার পাশ কাটাবার জন্যে। বিভাস দত্তর এ চাউনি তরল না হোক, সরলও নয়। ঈষৎ-চঞ্চল চাপা আগ্রহে ভরপুর।

—পড়ছি তো এখন পর্যন্ত।

সিগারেট অ্যাশপটে গুঁজতে লাগলেন বিভাস দত্ত। আঙুল ক'টাও শান্ত নয় খুব। হাসতে চেষ্টা করলেন কিন্তু এবারের দৃষ্টিটা সরাসরি মুখের ওপর তুললেন না। —তার মানে, শেষ পর্যন্ত পড়ে উঠতে পারবেন কিনা সন্দেহ?

—খুব। জবাবের সুর হাল্কা, আর স্পষ্ট।

—ভালো লাগছে না?

—না-নাঃ।

জবাবটা নিভৃতের কোনো দুর্বলতার ওপর ঘা বসানোর সামিল। যে দুর্বলতা সংগোপনে সমর্থন আশা করে, না পেলে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বিভাস দত্তর চোখে মুখে এই গোছের অভিব্যক্তি এঁটে বসতে লাগল। —উপন্যাসটা শেষ হবার আগেই এক বিজ্ঞ সমালোচকের মস্ত সমালোচনা বেরিয়েছে, সেটা পড়েছেন বোধহয়?

—না। ...কেন?

—তিনি রায় দিয়েছেন, আমার লেখার ধার কমছে, অবাস্তব গল্প ফেঁদে এখন মনস্তত্ত্বের অন্তঃপুরে ঢোকার চমক দেখাতে চেষ্টা করছি। ভাবলাম আপনার একেবারে ভালো না লাগাটা এই মন্তব্য পড়ার ফল কিনা।

জ্যোতিরাণী শুনলেন, চুপচাপ দেখলেনও একটু। কথাটা ওঠার পর বিরূপ সমালোচকের থেকেও আরো স্পষ্ট করে কিছু বুঝিয়ে দেবার তাগিদ। বললেন, পড়িনি, শুনে এখন পড়তে ইচ্ছে করছে। ...এই বইটা আমার ভালো লাগবে আপনি আশা করেছিলেন?

—লেখক আশা করে থাকে।

—আর, ভালো লাগলেও সমালোচনা পড়ে সেটা অস্বীকার করার সুযোগ নিতে পারি ভাবছেন কেন? পরের প্রশ্নটা মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েই হাসলেন একটু। উষ্মার আঁচ পেলেও লেখা সার্থক ভাবার সম্ভাবনা। —আমার ভালো লাগছে না ভালো লাগার মত ওতে কিছু পাচ্ছি না বলে। শমী আপনার নিজের কেউ নয় তবু ছেলে-মেয়ের মায়া কি জিনিস সে-তো ওকে দিয়েই টের পাচ্ছেন। নিজের ছেলেকে নিয়ে আপনার নায়িকা বেচারীকে অমন মন-বিষণো সমস্যার ধোঁয়ায় ডোবাচ্ছেন কেন? হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালেন, পালাই—

বিভাস দত্তর দুই হল্‌দে আঙুলে দ্বিতীয় সিগারেট জ্বলছে। ঠোঁটের ফাঁকে তাঁরও হাসির আভাস এখন। এতটা শোনা গেল বলেই ছাড়পত্রবাহ প্রত্যাশিত দাগ ফেলতে পেরেছে ভাবছেন হয়ত।

গাড়িতে বসে জ্যোতিরাণী সামনের রাস্তা দেখছেন, দোকান-পাট দেখছেন, লোক চলাচল দেখছেন। আসলে বাইরের কিছুই দেখছেন না তিনি, নিজের ভিতর দেখছেন। দাগ সত্যিই কোথাও পড়েছে কিনা খুঁজছেন। পড়েনি। তিনি পড়তে দেননি। বিভাস দত্ত চান পড়ুক। ভাবছেন পড়েছে। ...কেউ ভাবল বলেই তাঁর এই অসহিষ্ণুতা কেন, অস্থিরতা কেন?

বাইরের দিকে মন ছিল না জ্যোতি-রাণীর, শুধু চোখ ছিল। সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে দেবার মত কি বাইরে থেকে সেই চোখে প্রচণ্ড বিষাক্ত একটা কাঁটা এসে ঢুকল হঠাৎ? চোখের ভিতর দিয়ে গিয়ে একেবারে বুকের ভিতর পর্যন্ত জ্বালিয়ে বিষিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অবশ করে দিতে পারে এমন কাঁটা? জ্যোতিরাণী স্বপ্ন দেখছেন? কি দেখছেন? কাকে দেখছেন?

দেখলেন বীথিকে। দেখছেন বীথি ঘোষকে।

সামনের গাড়িগুলোতে বাধা পেয়ে পেয়েও জ্যোতিরাণীর গাড়ি গজ তিরিশেক এগিয়ে গেছে। তারপর তাঁর আচমকা নির্দেশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি পালাতেই চান কিন্তু প্রায় চেঁচিয়ে উঠেই গাড়ি থামাতে বলেছেন, হুঁস নেই। জানলা দিয়ে ঝুঁকে পিছনের দিকে চেয়ে আছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে এক মর্মান্তিক দেখাই দেখছেন।

দেখেছে বীথি ঘোষও। ...হাত নেড়ে বিদায়ী সঙ্গী সামনের ঝকঝক হলদে গাড়িতে উঠল। একরাশ হাসি ঝরিয়ে বীথি ঘোষও হাত নেড়ে বিদায় দিল তাকে। ...হল্‌দে গাড়ি অদৃশ্য হল। বীথি ঘোষ এবারে আস্তে আস্তে ফিরল তাঁর দিকে। তাঁর গাড়ির দিকে। যেখানটায় দাঁড়িয়েছে গাড়ি সেখানে শাদাটে আলো নেই ওখানকার মত। শহরের নামজাদা বিলিতি হোটেলের গাড়ি-বারান্দার নীচের ফুটপাথ ওটা। রাতেও ওটুকু জায়গা দিনের আলোর মত শাদা। বীথি ওইখানেই দাঁড়িয়ে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছে দেখেছে।...দেখছে।

বৃহৎ সৃষ্টির মূলে যে যোগাযোগ বৃহৎ ধ্বংসের মূলেও কি তাই?

বড় চার রাস্তার মাঝে ট্রাফিক কন্ট্রোল পোস্ট-এর পুলিস গাড়ির ভিড় সামলাবার চেষ্টায় মেন রোডের দু'দিকের গাড়ি-গুলোকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিল। ফলে মেন রোডের দু'দিকেও এক গাদা করে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ছাড়া পাবার পরেও গাড়ি নড়ে না প্রায়। রাস্তা পেরুলেই আবার বাস স্ট্যান্ড। সেখানে দু'তিনটে বাস আবার জনতার ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে আছে। ফলে ফুটপাথের দিকের গাড়িগুলো লোকের প্রাণ আর গাড়ির ঠোকা-ঠুকি বাঁচিয়ে হাঁটা বেগে পাশ কাটাতে চেষ্টা করছে। ওই হোটেলের কাছাকাছি এসে গোটা কয়েক গাড়ির পিছনে জ্যোতিরাণীর গাড়ি দাঁড়িয়েই গেছল। দূরের ওই মোড়ে পুলিস আবার হাত দেখিয়েছে সম্ভবত।

তখনি সেই প্রচণ্ড ধাক্কা। দু' তিনটে গাড়ি আগের ওই হল্‌দে গাড়িটা বিরক্তিকর হর্নের দাপটে একটু জায়গা করে নিয়ে লাইনের জঠর থেকে সরে গিয়ে গাড়ি-বারান্দার ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল। ওই গাড়ি থেকে বীথি নামল আর সেই ফিটফাট মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

ধাক্কা খেয়েও জ্যোতিরাণী নিজের অগোচরে জানলার বাইরে ঝুঁকে পড়ে-ছিলেন। বিলিতি হোটেলে বোধহয় বীথি একাই ঢুকবে, সঙ্গের লোকটার এক হাত গাড়িতে—সে আবার উঠবে মনে হল।

বীথিও দেখল। জ্যোতিরাণী যেভাবে জানলার বাইরে ঝুঁকে পড়েছিলেন, এত কাছ থেকে না দেখার কথা নয়।

দেখা মাত্র বীথি খুব একটা চমকে উঠল বলে মনে হল না তাঁর। তবে সঙ্গীর উদ্দেশে হাসি মুখের বিদায়ী আপ্যায়নে ছেদ পড়ল বটে। দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর এসে স্থির হয়ে থাকল কয়েক নিমেষ। সঙ্গিনীর দর্শন-ব্যতিক্রম অনুসরণ করে লোকটাও এদিকে তাকালো একবার। ...তারপর লঘু কিছু একটা মন্তব্যও করল বোধহয়।

গাড়ি এগোতে লাগল একটু একটু করে। জ্যোতিরাণীর গাড়ি হল্‌দে গাড়ির পাশ কাটালো। তারপর গজ তিরিশেক যেতে না যেতে তাঁর আচমকা নির্দেশে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়েই গেল।

তাঁকে দেখা মাত্র বীথি যদি সত্রাসে গা-ঢাকা দিত, শশব্যস্তে যদি হোটেলে ঢুকে

অদৃশ্য হয়ে যেত, জ্যোতিরাণী তাহলে নামার কথা একবার ভাবতেনও না। আত্মস্থ হবার অবকাশ পেলেই ড্রাইভারকে আবার গাড়ি ছোটাবার হুকুম দিতেন। বীথিকে আবার এভাবে দেখার স্পর্শটাও মুছে ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরতেন।

কিন্তু বীথি গেল না। বীথি নড়ল না।

বীথি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার শাদাটে আলোয় কান-গলা-হাতের দামী গয়নার ছটা ঠিকরোচ্ছে। রাজেন্দ্রাণীর মত দাঁড়িয়ে বীথি যেন অপেক্ষা করছে।

জ্যোতিরাণীর চমক ভাঙল। মাথায় রক্ত উঠেছে এক-ঝলক, বুকের তলায় শিয়ালদা স্টেশনে দেখা আর এক বীথির মুখ ভেসে উঠেছে, তাই রক্ত উঠেছে। বুকের তলায় কাউকে আশ্রয় দিলে এত সহজে তাকে ভোলা যায় না, তাই রক্ত উঠেছে মাথায়। শুধু আশ্রয় দেননি, সেই মুখখানা তিনি ভালবেসেছিলেন, সেই মুখে তিনি পদ্মার শোক নিঃশেষ করার মতই আলো দেখে-ছিলেন, আগুন দেখেছিলেন। এই বীথিকে তিনি ক্ষমা করবেন কি করে?

গাড়ি থেকে নামলেন জ্যোতিরানী। কি করবেন, কি বলবেন জানেন না। কিছু না পারুন এই বীথিকে খুব—খুব ভালো করে দেখবেন একবার।

বীথি নড়ছে না, এগিয়ে আসছে না। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে।

জ্যোতিরাণী দেখলেন। একেবারে সামনে, মুখোমুখি দাঁড়িয়েই দেখলেন। তারপর কথাও তিনিই আগে বললেন। —চিনতে পারছ?

কথা নয়। শব্দের চাপা আগুন এক ঝলক। কিন্তু ওটুকুতে বীথির কান ঝলসে গেল না। চেয়ে আছে সেও। তার ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস। বলল, চিনতে পেরেছি বলেই দাঁড়িয়ে আছি, নইলে তো ছুটে পালাতুম।

শেষের উক্তি খট্ করে কানে লাগল বটে, কিন্তু এই রোষের মুহূর্তে জ্যোতিরাণী সেটা মাথায় নিলেন না। উদ্গত ঘৃণায় আর কঠিন দুই চোখের আগুনে তার মুখখানা ঝলসালেন আর এক-প্রস্থ। —কপালে সিঁথিতে এখনো সিঁদুর দেখছি...এগুলো শোভা না নতুন শেকল?

শেকল শুনলে জ্যোতিরাণী কি এখনো একটু সান্ত্বনা পেতে পারেন? নিজেকে বিধবা ধরে নিয়ে বিয়ে যদি আবার করে থাকে সেই আশা?

বীথি ঘোষের দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর নড়েচড়ে স্থির হল আবার। ঠোঁটের হাসি স্পষ্টতর। —এগুলো শোভার শেকল।

তিন কথার জবাবে একটা কথা শোনা যেত না...সেই বীথি। এখন তার ঠোঁটে হাসি চোখে হাসি। কথার থেকেও এ হাসির ধার বেশি।

—কি দেখছেন? খুব চাপা ঠাণ্ডা বিদ্রুপের সুরে বীথির গলায়।

অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, কত নীচে নেমেছে তাই...

বীথির মুখে তেমনি বিদ্রূপের মতই পলকা বিস্ময়, নামব কেন! আপনাদের বিচারে তো অনেক উঠেছি! —আসবেন? চোখের ইংগিতে অভিজাত হোটেলের দরজার দিকটা দেখালো।

—না। শেষবারের মত দেখে নিয়ে ঘৃণার একটা শেষ ঝাপটা মারতে চাইলেন যেন। —খুব...খুব ভালো আছ, কেমন?

বীথির ঠোঁটের হাসি গালের দিকে ছড়ালো এবার। কথার সুরে বিস্ময়ের আমেজ।—শোক ভোলবার জন্যে মিত্রাদির হাতে দিয়েছিলেন, তাঁর কেরামতির ওপর বিশ্বাস কমেছে নাকি আজকাল আপনার?

আবারও খচ করে কানে বিঁধল জ্যোতিরাণীর। গাড়িতে ফিরবেন ভেবেও পা বাড়াতে পারলেন না, কি বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করলেন।

এবারে ঈষৎ গম্ভীর অথচ আগ্রহের সুরে বীথি বলল, যতখানি ঘৃণা নিয়ে আপনি আমাকে দেখছেন তার সবটুকু যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি ভালই বাসতেন আমাকে, আর সেটা মিত্রাদির ভলবাসা নয়।...তাই যদি হয়, হোটেলে আমার ঘরে আসুন একটু, আপাতত আমি একাই আছি ওখানে। শুনলে আপনার প্রভুজী-ধামের কিছু উপকার হতে পারে, অবশ্য উপকার যদি সত্যিই চান—এখানে আশপাশের লোকের চোখ আমার থেকেও আপনাকে বেশি ছেঁকে ধরেছে—

জ্যোতিরাণী বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। পিছন ফিরে তাকালেন একবার। এদিক-ওদিকে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে বটে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর দেখার বস্তু বীথির মুখখানাই। চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে কি করে? বীথি এই ঝাঁঝে কথা বলছে কি করে? কি বলতে চায়, হোটেলের উপকার হতে পারে এমন কি বলতে পারে?

দ্বিধা লক্ষ্য করেই বীথি আবার বলল, আপনাকে আমার এখনো সেই দিদিই ভাবতে ইচ্ছে করে।...কিন্তু ভাবা শক্ত। দু'বছর বাদে কলকাতায় পা দিয়ে প্রথমেই আপনার কথা মনে হয়েছে, শুধু আপনার কথা। মনে হয়েছে একবার দেখা হলে বেশ হয়। দেখা যখন হলই আসুন একটু, আপনার ভয় কি?

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে জ্যোতিরাণী হোটেলের দরজার দিকে না এগিয়ে পারলেন না। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বীথি বুঝি টেনে নিয়ে চলল তাঁকে। অবসর বিনোদনের বিশাল অভিজাত পরিবেশের পাশ কাটিয়ে আর একদিকে এসে তার সঙ্গে লিফট-এ উঠলেন। দোতলায় এলেন।

হালফ্যাসানের বড় ঝকঝকে একটা সুইট-এ এনে দাঁড় করাল বীথি তাকে। রুচির ছাঁচে-ঢালা পরিপাটি বিলাস-কক্ষ। নির্বাক জ্যোতিরাণী ঘরের চারিদিকে দেখ-লেন একবার। বীথি বলল, এখানকার ব্যবস্থা আমার ভালো লাগছে না, পাঁচ-সাতদিন মাত্র থাকার কথা তাই আছি। লন্ডনেও নয়, আরামে ছিলাম বটে আপনার প্যারিসে, দেখলে মিত্রাদিরও হিংসেয় ভেতর টাটাতো। বসুন, চা-কফি কিছু আনতে বলব?

বসলেন। মাথা নাড়লেন চা-কফির দরকার নেই। কথা শুনে সর্বাংগ রি-রি করে উঠল। মিত্রাদির সম্পর্কে এই দ্বিতীয়-বারের শ্লেষও কান এড়ালো না। মিত্রাদির স্নেহ মাড়িয়েছে বলেই তার ওপর বেশি রাগ ভাবলেন। দেখছেন জ্যোতিরাণী ওকে। এই দুবছরে অনেক সুন্দর হয়েছে, ধারালো হয়েছে। শুধু সাজে-পোষাকে গয়নায় নয়, চেহারার মধ্যেও আরামে থাকার রঙ ধরেছে, পেলবতা এসেছে।

বীথির মুখে হাসি ফোটাতে চেয়ে-ছিলেন জ্যোতিরাণী। বীথি হাসছে। আর এ-হাসি দেখে জ্যোতিরাণীর ভেতর কাটছে। এই হাসির আড়ালেও আঁতিপাতি করে একটুখানি কান্না খুঁজছেন তিনি। তাও পাচ্ছেন না বলেই যাতনার মতই অপরিসীম তিক্ততা। বললেন, পদ্মার শোক একেবারে মুছে দিতে পেরেছ তাহলে?

বীথি চটপট জবাব দিল, ও-সব জ্বলে-টলে ছাই হয়ে গেছে, ছাই শোক করে না।—

এ জবাব শোনার পরেও অপমানে ওকে বিধ্বস্ত করার আক্রোশে জ্যোতিরাণী বলে উঠলেন, কত সহজে ছাই হতে পারো জেনেও শিয়ালদা স্টেশনে অমন আগুনের অভিনয় করেছিলে কি করে? স্টেশনের সেই লোকটা কি দোষ করেছিল তাহলে? তার রক্তপাত ঘাটিয়ে ছেড়েছিলে কেন, লন্ডন প্যারিস করাতে পারবে না বলে?

বীথি দেখছে তাঁকে। শুনছে। চোখের কোণে কৌতুক ঝরছে। রয়েসয়ে জবাব দিল, অপটু হাতে লোকটা একসঙ্গে হঠাৎ এক-ডেলা আফিং গেলাতে এসেছিল, মিত্রাদির মত পাকা হাতে একটু একটু করে—

—দোষ ঢাকার জন্যে কথায় কথায় আর মিত্রাদিকে টেনো না, তাকে আমি চিনি।

বীথির চাউনি বদলালো, হাসি-ছোঁয়া নির্লিপ্ত কৌতুক মুছে যেতে লাগল। সোজা হয়ে বসল আস্তে আস্তে, খরখরে দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর বিঁধিয়ে রাখল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই হিস-হিস আগুন ঝরলো যেন গলা দিয়ে।—চেনেন! মিত্রাদিকে চেনেন আপনি? তাহলে আপনার এত রাগ কেন? অভিনয় তাহলে এতক্ষণ ধরে আপনি করছেন? আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন কোন্ মতলবে? যান— মিত্রাদিকে চেনেন যখন আর আপনাকে দরকার নেই—চলে যান!

জ্যোতিরাণী হতভম্ব। হঠাৎই যেন কপালে সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর-পরা স্টেশনের সেই মেয়েটাকে দেখলেন তিনি। এই মুখে সেই আগুন দেখলেন এক ঝলক। নির্বাক চেয়ে আছেন।

তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর এই বিমূঢ় মূর্তি লক্ষ্য করল বীথিও। তার ফলেই একটু

একটু করে ওর মুখে সংশয়ের ছায়া পড়তে লাগল আবার। কিন্তু দু'চোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর থেকে নড়ল না, গলার স্বর অপেক্ষাকৃত সংযত শোনালো শুধু। বলল, দূরে পা বাড়াবার আগে ঠান্ডা মাথায় কিছু ভাবার শক্তিও ছিল না আমার। পরে কেবলই মনে হয়েছে, অতদিন ধরে মিত্রাদি আমাকে যা বুঝিয়েছে তার সবটাই মিথ্যে সবটাই ভুল হয়ত বা আপনি অনেক বড় তাই এতদিনের খাতির সত্ত্বেও মিত্রাদিকে আপনি চেনেন না। একটু আগে আপনার অত রাগ আর ঘৃণা দেখে আমার সেই বিশ্বাস বেড়েছিল, আমার আশা হয়েছিল, আনন্দ হয়েছিল...

—বীথি তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছেন কিনা ঘোরালো দৃষ্টি মেলে বীথি তাই যেন যাচাই করে নিতে চায়। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস চিকিয়ে উঠল।—বিভাসবাবু কেমন আছেন? লেখক বিভাস দত্ত?

এত ঠান্ডা অথচ এমন আচমকা ছুঁড়ল প্রশ্নটা যে রাগে লাল হওয়ার বদলে জ্যোতিরাণী হকচকিয়ে গেলেন প্রথম। জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ তাঁর কথা?

মুখের ওপর থেকে যাচাইয়ের দু'চোখ নড়ছে না বীথির, কিন্তু হেসে উঠছে। শুধু তাঁর কথা কেন, শোক ভোলার রাস্তা যারা করে নিয়েছে তাঁদের সকলের কথাই তো শুনেছি...শিবেশ্বর চাটুজ্জের কথা, কালীনাথবাবুর কথা, মিত্রাদির নিজের কথা, আপনার আর বিভাসবাবুর কথা শুকনো শোক পুষে হাঁদার মত আটকে থাক বলেছিলাম শুধু—

বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে জ্যোতিরাণীর আর সেই সঙ্গে বুদ্ধি-বিভ্রমও ঘটছে যেন।—মিত্রাদি এসব তোমাকে বলেছে?

বীথি ঘোষ হেসে উঠল আবারও, কেন, নিতে অসুবিধে হচ্ছে মিত্রাদিকে? জবাব না পেয়ে হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। জলজলে চাউনি গনগনে মুখ। বলে গেল একদিন না, আটঘাট বেঁধে আপনার বন্ধু থেকে আমাকে সর্বক্ষণ আগলে রেখেছে আর বলেছে—একটু একটু করে আমাকে শোক ভোলাবার রাস্তায় টেনে নিয়ে গেছে আর বলেছে—তাঁর হিসেবের রাস্তায় পা চলতে চায়নি বলে উঠতে বসতে শাসন করেছে আর বলেছে—বলেছে, ওই এক রাস্তায় পা দিয়েছেন বলে আপনিও তাঁর হাতের মুঠোয়—বলেছে, একটি কথাও যদি আপনার কানে যায় ফিরে আবার আস্তাকুঁড়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে আমাকে, কেউ রক্ষা করতে পারবে না—উঠতে বসতে আমাকে বলেছে বুঝিয়েছে শাসিয়েছে—চাঁদা আদায়ের নামে আদর করে সাজিয়েগুজিয়ে দিনের পর দিন পয়সা-অলা এক দঙ্গল নেকড়ের চোখের সামনে আমাকে টেনে টেনে নিয়ে গেছে—তাদের থেকে একজনকে বেছে নিয়ে দিন-দিন তাকে আমার দিকে টেনেছে আর আমাকে তার দিকে ঠেলেছে—মিত্রাদির ভয়ে আমি ঠক-ঠক করে কেঁপেছি, ত্রাসে পাগল হয়ে আপনার কাছে ছুটে যেতে চেয়েছি—কিন্তু ততদিনে মিত্রাদি আমার সব বিশ্বাস খেয়ে দিয়েছে আর আমার সম্পর্কেও আপনার কান বিষিয়েছে। শেষে ছবি দেখাবার নাম করে এক রাতে আমাকে নেকড়ের দলের সেই একজনের কাছে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।...চেনেন? মিত্রাদিকে চেনেন আপনি?

জ্যোতিরাণী কি নিস্পন্দ হয়ে গেলেন? নিষ্প্রাণ হয়ে গেলেন? দুঃস্বপ্ন দেখছেন? দুঃস্বপ্নের ঘোরে শুনছেন কিছু?

বড় করে দম নিল একটা বীথি। চোখের আগুনে হাসির ছোঁয়া লেগেছে। এমনি কাঠ হবে মনে সে আশাই ছিল যেন। লঘু সুরে বলে উঠল, শুধু আমি কেন, দেখতে ভালো এমন আরো তিনটে মেয়ের ওপর চোখ ছিল মিত্রাদির—বাসন্তী রমা আর কমলা—তাদের ওপরেও সদয় হয়ে উঠছিল—দূরে গিয়ে মনে হয়েছিল ওদেরও কাল ঘনিয়েছে—নিজের বুদ্ধির ওপর বড় বিশ্বাস মিত্রাদির, কাপুরের আশ্বাস পেয়ে ধরে নিয়েছিল ও আমাকে সাগরপারেই ফেলে আসবে, এই দেশে অন্তত আর আমার মুখ কেউ দেখবে না—এখানে থাকব না অবশ্য, তবু এসেছি। এসেই প্রভুজীধামে ফোন করে বাসন্তী রমা আর কমলার খোঁজ করেছিলাম। আরো একটু জোরে হেসে উঠল বীথি, আমাকে নিয়েই যা একটু বেগ হয়েছিল মিত্রাদির—ওরা তো তার হাতের খেলনা, খেলনা বেচা সারা—আমাকে গছিয়ে কপুরের কাছ থেকে মিত্রাদি পনের হাজার টাকা পেয়েছিল শুনেছি—ওরা কি দরে বিকোলো কে জানে—

—মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! আচমকা চিৎকার করে ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতিরাণী।—মিথ্যে মিথ্যে! আমি একটুও বিশ্বাস করি না—তুমি অতি ছোট, অতি নীচ অতি জঘন্য!

শব্দ করে নয়, নীরবেই হাসছে বীথি। খুশি যেন, তৃপ্ত যেন।—গাড়িতে আমাকে যার সঙ্গে দেখেছিলেন সে-ই কাপুর...চারদিনের জন্য প্লেনে মাদ্রাজ গেল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। সে ফিরলে মিত্রাদিকে নিয়ে আসুন, দেখুন আসে কিনা। অত কেন, আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে তাকে বলুন গিয়ে, দেখুন কি হয়—

শরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা বিষের স্রোত বয়ে চলেছে জ্যোতিরাণীর। সেই জ্বালায় আর যাতনায় ঘর ছেড়ে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলেন তিনি। সামনে লিফট্ চোখে পড়ল না—টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। বড় হল পেরিয়ে বাইরে এলেন। গাড়িতে উঠলেন। অব্যক্ত যাতনায় ভিতরটা ডুকরে উঠছে তখনো। মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে—

মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে বুঝি। তাঁর নির্দেশে গাড়ি মিত্রাদির বাড়ির রাস্তায় ছুটেছে। প্রভুজীধামে শুনেছিলেন নিজের বাড়ির কি কাজে বেরিয়েছে মিত্রাদি, ফিরতে রাত হতে পারে—বেশি রাত হলে প্রভুজীধামে নাও ফিরতে পারে। চমকে উঠলেন, ছায়া-ভীতি যেন।...বলা সত্ত্বেও মিত্রাদি না জানিয়ে মাঝে-মাঝেই এমন নিখোঁজ হয় কেন? না, মিথ্যে বিষ ঢেলেছে বীথি, মিথ্যে মিথ্যে—

মিত্রাদির বাড়ির দরজায় গাড়ি থামল। অভ্যাসে শৌখিন বড় ব্যাগটা হাতে করেই দরজা খুলে নামলেন। দোতলার দিকে তাকালেন। আছে...ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু পা বাড়াবার আগেই আবার এক ধাক্কা।

সামনে আর একটা গাড়ি। চেনা গাড়ি। অতি চেনা। নিজের বাড়ির মালিকের গাড়ি। গাড়িতে ঠেস দিয়ে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। প্রভুপত্নীকেই দেখছে। নিজের অগোচরেই জ্যোতিরাণী এগিয়ে গেলেন দু-পা।—কি ব্যাপার, বাবু এখানে?

ড্রাইভার মাথা নাড়ল। অত আলো নেই বলে হোক বা জ্যোতিরাণীর মাথায় আর কিছু ঢোকে না বলে হোক, ড্রাইভারের বিব্রতভাব চোখে পড়ল না।

অবাক তিনি। সব তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন।...এখানে আবার কেন! আবার কি ফাংশন-টাংশান এলো...কি এমন আলোচনার দরকার হয়ে পড়ল। বিরক্ত, সঙ্গে আরো কারা আছে কে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তে মিত্রাদিকে না পেলেই নয়—যে-ই থাক জ্যোতিরাণী বিদায় করতে চেষ্টা করবেন না পারেন অপেক্ষা করবেন।

ওপরে এলেন। সামনের বড় ঘরে পা দিলেন। কেউ নেই। বাড়িতেই জনপ্রাণী নেই যেন। জ্যোতিরাণীর মাথায় কিছু ঢুকছে না, নিজের অজ্ঞাতে ব্যাগটা টেবিলে রেখেছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই দাঁড়িয়ে গেলেন তারপর। ঘরের ও-মাথায় শোবার ঘরের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ।

কানের মধ্যে, মাথার মধ্যে বুকের তলায় চেতনার একশ দামামা একসঙ্গে বেজে উঠল বুঝি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্বের ওপর সেই চেতনার আঘাত বেজে চলল। পড়ে যেতে গিয়েও টেবিলটা আঁকড়ে ধরে দাঁড়ালেন।

...সামনে বন্ধ দরজা। অপলক কয়েকটা মুহূর্ত।

উর্ধশ্বাসে আবার ঘর থেকে ছুটে বেরুলেন জ্যোতিরাণী।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

মাতৃস্নেহ

সেদিন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আজকের মায়েদের মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে। সব মা চান যে, তাঁর সন্তান মানুষের মত মানুষ হোক। এজন্য প্রয়োজন শৈশব থেকেই সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা। সকলেই এদিকটায় নজর দেন। কিন্তু এখানেই একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। আর এই রন্ধ্রপথেই ভবিষ্যতের বিরাট আশাটা কোন মুহূর্তে হারিয়ে যায়। তৎপরিবর্তে জেগে থাকে বিরাট ব্যর্থতা। সাজানো বাগান শুকিয়ে গিয়ে শুষ্ক-জীর্ণ লতাপাতার স্তূপ জমে ওঠে। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনাই এই স্তূপীকরণের কারণ। কিন্তু এই ব্যর্থতা আসে কেন? দুর্বলতার কোন রন্ধ্রপথে আমাদের ভবিষ্যতের সাধ-আহ্লাদের স্বপ্ন এমনভাবে নষ্ট হয়ে যায়? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া কঠিন। বিশেষভাবে আজকের দিনে যখন চারদিকে এই একটি প্রশ্নই উদাত্ত সঙ্গীতের মত আমাদের তাড়া করে ফিরছে।

সেই ভদ্রমহিলা কিন্তু সহজেই উত্তরটা দিতে পেরেছিলেন। একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, আজকের মায়েরা সন্তানের দোষের চেয়ে গুণ বড় করে দেখে। কিন্তু এর বিপরীতটাই হওয়া উচিত। গুণ বিচার করবে পাঁচজন। সন্তানের দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে মা, এদিকে তার সদাসতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। মা যদি সবসময় সন্তানের গুণপনায় মুখর হয়ে থাকে আর তা যদি সন্তানকে স্পর্শ করে তবে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সেখানেই অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে অধিকাংশ মা নিজের অজ্ঞাতসারে সন্তানের সবচেয়ে বড় ক্ষতিসাধন করেন।

মায়ের সন্তানপ্রীতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু সন্তানকে মানুষ করতে হলে এই প্রীতি ফল্গুধারার মতই অজস্রধারায় সন্তানের শিরে বর্ষিত হওয়া উচিত। কিন্তু অধিকাংশ মা এই প্রীতি গোপন রাখতে পারেন না এবং অনেকসময় তা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ক্রমে এই প্রীতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে সন্তান ভীষণভাবে আস্কারা পেয়ে বসে। তখন তাকে সামলানো দায় হয়ে পড়ে। এইখানটায় এসে ভদ্রমহিলা একটু থামলেন। মনে মনে কি যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, সন্তানকে অতিরিক্ত আস্কারা দেওয়াই হচ্ছে তার সর্বনাশের মূল। আমরা সন্তানকে বোঝাতে পারি না কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ। সন্তানস্নেহে অন্ধ হয়ে সবসময় তাদের আদর-আব্দার পূরণ করে চলি। স্নেহের সঙ্গে শাসন আর কোন সময়ই সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত স্নেহের প্রশ্রয়ে সন্তান ক্রমেই বেয়াড়া হয়ে ওঠে। কারণ তাদের পক্ষে এই স্নেহের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারে সন্তানকে নিয়ে ভুগতে হয়।

ভদ্রমহিলা থামলেন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ওঁকে কি রকম বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। জানি না ওঁর ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখের ছায়াপাত ঘটেছে কিনা সন্তানঘটিত কারণে। হয়ত তিনি ঠেকে শিখেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই অনেক বিলম্বে। আবার হয়ত সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেছেন অনেককে শেখাতে, কেউ কর্ণপাত করে নি। কিন্তু কেউ যদি ভদ্রমহিলার কথায় কর্ণপাত করতেন তবে সন্তানঘটিত ব্যাপারে তার চোখ হয়ত অশ্রুসজল হয়ে উঠত না বরং সেখানে আনন্দাশ্রুর বান ডাকত।

এয়ার হোস্টেস শ্রীমতী মঙ্গলা

বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় ভারতের স্থান আজ বিশ্বে সর্বশীর্ষে। শ্রীমতী রীতা ফারিয়া যে সম্মান অর্জন করলেন সেজন্য আমরা সকলে গর্বিত। কিন্তু সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আর একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না। অবশ্য এটা ছিল এয়ার হোস্টেসদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে নির্বাচিত এয়ার হোস্টেসরা জড় হয়েছিল পঞ্চম বার্ষিক এই প্রতিযোগিতায় 'মিস ইন্টারন্যাশনাল এয়ার হোস্টেস' নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে। এই প্রতিযোগিতায় এয়ার ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীমতী মঙ্গলা মুতালিক। হরিণাক্ষী, স্বর্ণবরণা বাইশ বছরের তন্বী শ্রীমতী মঙ্গলার ইন্ডিয়া এয়ার হোস্টেস হবার সকল গুণই আছে। রূপ, মাধুর্য ও মধুর আপ্যায়নে সে একজন সফল এয়ার হোস্টেস।

মাত্র তিন বছর হল মঙ্গলা এয়ার ইন্ডিয়ার এই চাকুরী গ্রহণ করেছে। এবং এই তিন বছরে সে লন্ডন, পার্থ এবং হংকং ঘুরে এসেছে। এছাড়াও সে এয়ার ইন্ডিয়ার রুটে অন্যান্য জায়গাও ঘুরে এসেছে। তবে বিদেশের মধ্যে তার কাছে ইংল্যান্ডই বেশী ভাল লাগে। শহরের মধ্যে তার ভাল লাগে বেইরুট, প্যারিস, নিউইয়র্ক, সিডনী এবং পার্থ।

আসামের রাজধানী শিলং-এ মঙ্গলার জন্ম এবং সেন্ট মেরী কলেজে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে। ১৯৬৩ সালে সে আই-এ পরীক্ষা পাশ করে। অবশ্যই এয়ার ইন্ডিয়ায় যোগদানের পূর্বে। তারপর আকাশে ওড়ার এবং বিদেশে ঘোরার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এয়ার হোস্টেসের চাকুরী নিয়েছে। এই বৈচিত্র্যমণ্ডিত জীবনে সে বেশ সুখেই আছে। তবু এরই মাঝে একঘেয়েমি কাটানোর জন্য সে মাঝে-মধ্যে ফ্যাশান মডেল হিসেবে ফ্যাশান প্যারেডে নেমে পড়ে। সুন্দর চেহারা আর সুন্দর পোশাকে মঙ্গলা ফ্যাশান মডেল হিসেবে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। আবার টেবিল টেনিসে মঙ্গলার আগ্রহও কম নয়। মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে সে খেলায় মেতে ওঠে। হৈ-চৈ এবং কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে মন যখন একটু নির্জনতা খোঁজে তখন মঙ্গলা একটি বই নিয়ে তার মধ্যে ডুবে যায়, ক্ষণিকের জন্য তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।—তার প্রিয় লেখক আরভিং ওয়ালেস।

শ্রীমতী মঙ্গলা

• • • • একজন চিত্রশিল্পী • • • •

এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ। প্রাত্যহিক জীবনের ধূলিমলিন সীমানা পেরিয়ে নতুন জগতের দ্বারোদ্ঘাটন। ক্যানভাসে ক্যানভাসে নতুন জীবন মূর্ত হয়ে রয়েছে তুলির সজীব টানে, রঙের ছোঁয়ায় আর শিল্পীমনের উষ্ণ পরশে। সারা ঘরটাই ক্যানভাসে ভর্তি। বিছানা, টেবিল, চেয়ার, ঘরের কোণ সর্বত্র অসংখ্য ক্যানভাসের সমাবেশ। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো এই ক্যানভাসগুলির কোনটা অর্ধসমাপ্ত, কোনটা শেষ তুলির টানের অপেক্ষায় আছে, আবার কোনটা বা তুলির পরশে সজীব হতে হতেই থেমে গেছে, সেদিন শিল্পীকে আবিষ্কার করেছিলাম, এই শিল্পের মাঝখান থেকেই। ঘরে ঢুকেই একটু বিস্মিত হয়েছিলাম শিল্পের এই সমারোহ দেখে। বিস্ময়ের ঘোর ফিকে না হতে লম্বা ছিপছিপে দোহারা গড়নের নলিনী মালাবী বলে উঠেছিল, 'সব সময়ই আমার আঁকতে ভাল লাগে।' পরে বুঝেছিলাম আমারই প্রশ্নের উত্তরে নলিনীর এই প্রাণবন্ত উত্তর।

প্রথমে ভেবেছিলাম আঁকাটা বুঝি ওর নিছকই 'হবি'। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম হঠাৎ আপনি এদিকে ঝুঁকলেন কেন? উত্তর পেয়ে কৌতূহলই শুধু চরিতার্থ হয় নি, বুঝেছিলাম এই শিল্পকলাই ওর জীবননির্দেশক গতিপথ। এই ভাবটা আরো স্পষ্ট হল ওর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে। দেখলাম ছোট ছোট দুঃখ-ব্যথা এবং আনন্দ কথার মালা গাঁথা পড়েছে ওর তুলির টানে। দারিদ্র্যমণ্ডিত মাতৃত্ব, অশান্ত যৌবন এবং...সঙ্গীত, অপূর্ব শিল্পময়তা লাভ করেছে নলিনীর তুলিতে। নলিনীর বাসনা মনের আবেগগুলি জীবন্ত করে ধরে রাখে ক্যানভাসে। কিন্তু সাধ থাকলেও সবসময় সাধ্যে কুলোয় না। নলিনীর এই বিনম্র স্বীকৃতি তার শিল্পীসত্তাকে যেন আরো উজ্জ্বল করে তোলে।

নলিনী প্রথমে ছিল কমার্শিয়াল আর্টের ছাত্রী। দু' বৎসর পর সে কমার্শিয়াল আর্ট থেকে ফাইন আর্টে যোগদান করে। বোম্বের জে জে স্কুল অফ আর্টসে সে তিন বছর ফাইন আর্ট অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই নলিনী বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। তার আঁকা কয়েকটি ছবি বিক্রিও হয়েছে। সম্প্রতি নলিনীর শিল্পকৃতির পরীক্ষা হয়ে গেল বোম্বের পুণ্ডোল আর্ট গ্যালারীতে। সেখানে সে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল। প্রদর্শনীটি রসিকজনের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

এই প্রদর্শনী নলিনীর জীবনে নতুন দিগদর্শক হয়ে উঠবে আশা করা যায় এবং তার শিল্পখ্যাতিও দিগন্তবিস্তৃত হয়ে দেশ ও দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করবে।

• • • • • • নতুন খাদ্যব্যবস্থায় মেয়েরা • • • • • •

বিকল্প খাদ্য অভ্যাস করতে যদিও আমাদের এখনো বেশ কিছুটা সময় লাগবে তবুও আমরা এই অভিযান থেকে বিরত থাকব না। পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য কেবল পরিচিত ও কতকগুলি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে নতুন ধরণের বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থার জন্য আজকের বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। কাজেই যে সব খাদ্যের কথা হয়তো আমরা কোনদিন কল্পনা করিনি আজ সেগুলোর চাহিদাও কম নয়। চীনাবাদাম একটি বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য; অথচ সস্তা ও সহজলভ্য। চীনাবাদামের তেল বার করে আগে এর খোসা বা বীচি কোনো কাজে লাগত না এখন চীনাবাদামের বীচি থেকে ময়দা তৈরী হয়। এই ময়দা ভারত সরকারের গবেষণাগারে প্রস্তুত একরকম বিস্কুটের উপাদান হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রোটিনজাত বলে চীনাবাদামের আটা ময়দা ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ আটা ময়দার সঙ্গে দশভাগ এই ময়দা মিশিয়ে সুষমখাদ্য প্রস্তুত করা চলে। কোয়েম্বাটুর ও বোম্বাইতে, চীনাবাদামের আটা ময়দা প্রচুর তৈরী হচ্ছে। এছাড়া সয়াবিন, ট্যাপিওকা, শ্যামাঘাস ছাতু, ছোলার-ডাল বা সম এগুলো নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বিকল্প খাদ্য হিসাবে। তবে আজ শুধু সয়াবিনের কয়েকটি রান্নার উল্লেখ করছি।

আমাদের দেশে এখনো সয়াবিনের খুব বেশী প্রচলন হয়নি! তবে শিগগিরই সাধারণের মধ্যে এর চলন হবে বলে আশা করা যায়। সয়াবীন একরকম মটরজাতীয় বস্তু—এটি সেদ্ধ করলে দুধের মত হয়ে যায়। এই দুধ থেকে ছানা, দই, পায়েস, পুডিং ও নানাজাতীয় মিষ্টিখাবার প্রস্তুত করা যায়। আর এই সয়াবিনের ছিবড়া দিয়ে ভাত, খিচুড়ি পোলাও সবই হতে পারে। এক-কথায় সয়াবিন চাল ও দুধের পরিপূরক।

সয়াবিন যদি নিরামিষ হিসাবে ব্যবহার করেন তাহলে সেদ্ধ করে তার সঙ্গে কাঁটালের বীচি ও অন্যান্য তরকারী মিশিয়ে পোলাও বা খিচুড়ি তৈরী করতে পারেন। আর আমিষজাতীয় করতে গেলে, মাছ, মাংস, ডিম, চীজ ও কপি, কড়াইশুঁটি সহযোগে চমৎকার উপাদেয় পোলাও রান্না করা যায়। দুভাগ সয়াবিন ও একভাগ কিমা দিয়ে রান্না করলে বেশ উপাদেয় ঘুগনি রান্না হয়। অথবা দুভাগ সয়াবিন ও দুভাগ আলু সিদ্ধ করে মিশিয়ে অল্প ঘি ও নুন দিয়ে মেখে রুটি বা পরটা জাতীয় কিছু করা যেতে পারে। তবে এগুলি হাতে করে গড়ে নিতে হবে।

সয়াবিনের দুধ থেকে আজকাল নানা রকম মিষ্টিখাবার তৈরী হচ্ছে। একভাগ সয়াবিনের দুধ ও একভাগ কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ অথবা রাঙ্গাআলু সেদ্ধ মিশিয়ে চিনি ও কিসমিসসহযোগে পায়েস ও পুডিং প্রস্তুত করা যায়। সয়াবিনের সঙ্গে নারকেল

কোরা বেটে চন্দ্রপুলিজাতীয় ছাঁচও তৈরী করা যায়।

সয়াবিনের দুধে সুজি ভিজিয়ে তাতে একটু এলাচের ও কর্পূরের গুঁড়ো মিশিয়ে চমৎকার মুখরোচক মালপো করা যায়। আবার অর্ধেক সয়াবিন ও অর্ধেক কলাই-ডাল (ভিজিয়ে) বাটা মিশিয়ে একটু মৌরী দিয়ে ঘি বা তেলে ভেজে গুড়ের রসে ফেললে বেশ ভাল খেতে হয়।

এইভাবে যদি আমরা কয়েকটি বিকল্প খাবারের পরিকল্পনা করি তাহলে ছানা বা চাল আটার কথা খুব বেশী মনে হবে না। এইভাবে পরিকল্পনা করে অনেক তুচ্ছ জিনিসেও পুষ্টিকর খাবার তৈরী হতে পারে।

—বেলা দে

পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ

পৃথিবী পরিবর্তনশীল। এই যুগ-পরিবর্তনের মধ্যে আমরাও এগিয়ে চলেছি ক্রমাগত ভবিষ্যতের দিকে। সে ভবিষ্যৎ আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক জানি না। শুধু জানতে পারি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা [illegible] হিসাব। আমরা সব সময়েই আমাদের মঙ্গল কামনা করি—কেউ নিজেরই খারাপ চাই না। তা' সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক হোক না কেন। সত্যি [illegible] গেলে, আজকে আমরা সব [illegible] একটা আমাদের সংখ্যাত লক্ষ্য [illegible] আমরা কথায় কথায় বলে [illegible] সমস্যা জর্জরিত ভারতবর্ষ। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদেরই একান্ন-বর্তী পরিবারের বাপ-ঠাকুরদাদারা বলতেন, এ সোনার ভারত— এ সোনার বাংলা। এই চরম সত্যকে আজ যেন ভাবতেই বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু কেন?

ভারতবর্ষ, সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লোক কৃষিজীবী। দুটি কতক শহর বাদ দিলে প্রায় সমস্ত ভারতটাই গ্রাম। এই দেশের জীবনধারণ একমাত্র চাষেরই উপর নির্ভরশীল। খণ্ড অসম্বন্ধ ভূমি, অনুন্নত ধরনের চাষবাস, যথাযথ সাহায্যের অভাব, তার উপর নিজেদের অশিক্ষা। প্রতি একান্নবর্তী পরিবারে বেকার, ছদ্মবেকার ও প্রচ্ছন্ন বেকারের অবস্থানও একটা ভাববার বিষয়। কিন্তু তখন ভাবনার কোন কারণ ছিল না। কারণ, খাদ্য যোগানের সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের একটা ভারসাম্য বা সামঞ্জস্য ছিল। বাড়ীর গৃহকর্তা সখ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতেন।

এই সমস্ত কৈশোর ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান ব্যতিরেকে সন্তানের আবির্ভাব হোত। একদিকে উপার্জনহীন স্বামী অপরদিকে আরও কতকগুলি অযাচিত সন্তান খাদ্যের উপর, সম্পত্তির উপর, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার উপর দাবীদার।

আসল কথা, বিবাহিত জীবনের একটা যে গুরুদায়িত্ব আছে, একটা কর্তব্যের বাঁধন আছে সেটা ঠিকমতো উপলব্ধি করবার বা করাবার মতো পরিবেশ ছিল না তখন। যার ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পরনির্ভরশীল বা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতাম। ব্যক্তি-চেতনার এই সমস্ত কুসংস্কার আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট। একান্নবর্তী পরিবারের এত বড় ভাঙন ঘটলো, তার কারণ, শুধুমাত্র যে ইউরোপীয় সভ্যতা দায়ী—একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সুতরাং, আজকের সমস্যাসংকুল ভারত-বর্ষের উন্নতি নির্ভর করছে আজকের প্রতিটি ব্যক্তি পরিবারের উপর। আজ আমরা যদি আমাদের ব্যক্তি সমস্যাগুলি, বিশেষ করে, জনসংখ্যা সমস্যা, সমষ্টি-সমস্যার উপর যুক্ত করে সাফল্যের সঙ্গে নির্ভর করতে যাই, তাতে যে বিলম্ব ঘটবার সম্ভাবনা আছে আজ একথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। আজ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হাজারে ৪০ জন, মৃত্যু সংখ্যা হাজারে ৪২-৬ থেকে কমে (১৯৬১ সালের হিসাব অনুযায়ী) ১৬·০ এসেছে। এছাড়া উদ্বাস্তু বহিরাগত আত্মীয়-স্বজনের ভীড় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে।

বিবাহের বয়স আইনদ্বারা নির্দিষ্ট করা থাকলেও তার ব্যতিক্রম বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে। সুতরাং ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা আজ আমাদের গৃহ সমস্যায় পরিণত। তাই, আমরা আমাদের পরিবার ততখানিই সীমিত করতে চাই যতখানি আমাদের অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্বোপরি একটা সুখী পরিবার গঠনের অনুকূল।

আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি একটি পরিবারের দুটি কিংবা তিনটি সন্তান যথেষ্ট। এরপরে ভবিষ্যতে আর যাতে সন্তান না আসে তার জন্যে সরকারী ও বে-সরকারী পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট-গুলি বিনা ব্যয়ে সাহায্য করবে। আমরা একথা জানি, সরকার যদি প্রতিদিন হাজারটা করে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র গঠন করেন তাতে কোন ফলই হবে না যদি না আমরা আমাদের শুভাশুভ ফলের জন্য চিন্তা করি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪১টি উন্নয়ন ব্লকে ৯৭০টি পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে, বন্ধ্যাকরণের জন্যে মোবাইল সমেত ৯৮টি ইউনিট আছে। এছাড়া বহু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান তো আছেই। তাতে দেখতে পাচ্ছি, যে পরিমাণ জনগণের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার কথা তা পাচ্ছি না। আসল কথা, এ পরিকল্পনা যে শুধুমাত্র কাগজ-কলমের উপর নির্ভর করে না সেটাই আমাদের বলার কথা।

কলকাতার একটি এলাকার কথা বলতে পারি। ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যা যাট হাজার, কিন্তু প্রায় দেড় বছরের হিসাব অনুযায়ী মাত্র ৫৪০টি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে স্ত্রপ ৩৫২ ও ২৩টি পুরুষের বন্ধ্যাকরণ করা হয়েছে। আরও কয়েকটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা ব্যক্তিগতভাবে জানি—যা' উদ্ধৃত হিসাবের অর্ধেক মাত্র।

অবশ্য এটা আশার কথা, পরিবার পরিকল্পনার প্রথম ধাপে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পঃ বঙ্গ আগে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই তো সমগ্র ভারতবর্ষ নয়!

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল, ভারতের সমগ্র পরিবারের কাছে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবার গঠন করবার প্রয়োজন রয়েছে যেমন তেমনি ভারতের সমগ্র পরিবার পরিকল্পনার সমাজ-কর্মীদের এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে অফিসের চেয়ার ছেড়ে জনগণের চৌকাঠে চৌকাঠে হাজির হতে হবে।

আমাদের শিক্ষা যাতে আমাদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে থাকে তারই জন্য এই আবেদন।

৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৬৬) পর্যন্ত প্রায় পক্ষকালব্যাপী পরিবার পরিকল্পনা দিবস পালন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রদর্শনী, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হবে এর গুরুত্ব সম্পর্কে। এর জন্যে বেশ কিছু অতিরিক্ত অর্থব্যয়ও ঘটবে কিন্তু সেটা যাতে অনর্থের কারণ না হয়ে ওঠে—যাতে জনগণ এই পরিকল্পনার প্রকৃতিগত সত্য সম্বন্ধে পারস্পরিক সহ-যোগিতায় সাহায্য লাভ করতে পারেন তারই ধ্বনি জনচিত্তে পৌঁছে দিতে হবে।

—রমেন চৌধুরী

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পশ্চিমবঙ্গে মোট কতগুলি সিনেমা হল আছে এবং তন্মধ্যে কয়টি তাপনিয়ন্ত্রিত? (খ) পশ্চিমবঙ্গে মোট থানার সংখ্যা কত? (গ) আসামে চা-বাগানের সংখ্যা কত এবং সবচেয়ে বড় বাগানের নাম কি?

বিনীত
বাদল নন্দী
আসাম

●

সবিনয় নিবেদন,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি পরীক্ষায় ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালে যাঁরা ম্যাথমেটিক্সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন তাঁদের নাম জানতে চাই এবং ১৯৬৬ সালে ঐ পরীক্ষায় রসায়নে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রদের নাম জানতে চাই।

বিনীত
নীলেশ সরকার
বালী

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) মাঝারি শক্তিসম্পন্ন একটি অ্যাটম বোমার আকার কত বড়? (খ) পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার শহর কোনটি?

বিনীত
আশিস ঘোষ
কলকাতা—৪

●

সবিনয় নিবেদন,

কোন কোন রাষ্ট্র কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত?

বিনীত
বেলা চৌধুরী
২৪-পরগণা

●

সবিনয় নিবেদন,

'খো খো খেলা' বলতে কি ধরনের খেলা বুঝায়? এই খেলার পদ্ধতি কি এবং প্রবর্তক কে?

বিনীত
দেবাশীষ সান্যাল
পানিহাটি, ২৪-পরগণা

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) সাবমেরিন আবিষ্কৃত হয় কবে এবং আবিষ্কারকের নাম কি? (খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয় কত খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম অধিবেশন কবে ও কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দপ্তরটি **কে উদ্বোধন করেন এবং এর উচ্চতা কত?** (ঘ) টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন এর উৎপাদন কত ছিল? (ঙ) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের নাম কি এবং কবে প্রকাশিত হয়?

বিনীত
প্রবোধ সান্যাল, সত্যব্রত সান্যাল,
সুলেখা সান্যাল
কাটোয়া, বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ফুল ও ফলের নাম কি? (খ) কোন পাখি সর্বাপেক্ষা উঁচুতে উড়তে পারে? (গ) আকাশের রঙ নীল কেন?

বিনীত
শ্যামল সান্যাল
তারাবাগ, বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মতারিখ কি? (খ) অক্টারলনী মনুমেন্টের উচ্চতা কত? (গ) শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কি এবং কবে প্রকাশিত হয়?

বিনীত
বিমলকুমার শেঠী
মুর্শিদাবাদ

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) এপর্যন্ত ভারতের কয়জন মনীষী বিদেশে পরলোকগমন করেছেন? (খ) পৃথিবীর সর্বাধিক উগ্র গন্ধযুক্ত পদার্থ কি?

বিনীত
প্রদীপ মুখার্জি
খড়দহ

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবিষ্কর্তা কে? (খ) দশমিক ও শূন্য সংখ্যার আবিষ্কর্তা কে?

বিনীত
দেবশ্রী মুখার্জি
খড়দহ

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৬শ সংখ্যার (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় খণ্ড ১৮ই কার্তিক) অমৃতয় প্রকাশিত শ্রীরূপময় রায় ও শ্রীসুশান্ত বসুর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, টেস্ট ক্রিকেটে একদিনে সবচেয়ে বেশী উইকেট পড়েছে ২২টি। ১৯৫১-৫২ সালে অস্ট্রেলিয়া : ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলায় অ্যাডিলেড টেস্টে।

বিনীত
শঙ্করনাথ শীল
কলকাতা-১০

●

সবিনয় নিবেদন,

২৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীর ও প্রদীপ মুখার্জির প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, **এফ-আর-এস, আই-এ-এস এবং আই-পি-**এস এই কথাগুলির পুরো নাম যথাক্রমে ফেলো অব দি রয়্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এবং ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস।

বিনীত
অনির্বাণ দাশগুপ্ত
সোনারপুর, ২৪-পরগণা

●

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগে ২৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশান্তকুমার দাশের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, (ক) দিল্লী থেকে এয়্যারোফ্লোৎ-এ লাগে ৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিট এবং এয়ার ইন্ডিয়ায় লাগে ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। (খ) মস্কোর কেন্দ্রীয় স্কোয়ারের নাম রেড স্কোয়ার। (গ) যে সব সোভিয়েট মহাকাশচারী ভারত ভ্রমণ করেন, তাঁরা হলেন—ইওরী গাগারিন, টিটভ, আঁদ্রিয়ান নিকোলায়েফ, বিকোভস্কি এবং নিকোলায়েফ তেরেস্কভা।

বিনীত
কেয়া তরফদার
কলকাতা-২৮

●

সবিনয় নিবেদন,

২২শ সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশিত শিখু ও স্বপ্না দাসের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত দেশগুলির রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর নাম যথাক্রমে—মহারাষ্ট্র, রাজ্যপাল—শ্রীপি ভি চেরিয়ান, মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীভি পি নায়ক, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যপাল—ডঃ করণ সিং, মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীজি এম সাদিক, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যপাল—শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই, মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীকে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী, কেরালা রাজ্যপাল—শ্রীভগবান সহায়, (রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন), নাগাভূমি রাজ্যপাল—শ্রীবিষ্ণু সহায়, মুখ্যমন্ত্রী—শ্রীপি শিলু আও।

বিনীত
শ্রীধূর্জটি মজুমদার
কলিকাতা—১২

●

সবিনয় নিবেদন,

২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত উমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, মোহনবাগান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত চিরঞ্জীব ও চঞ্চল দাস মহাশয়ের (২) নং প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিচি বেনোর মোট রানসংখ্যা ১,৯৭০, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৩ এবং মোট উইকেট লাভের সংখ্যা ২৩৬টি ৬২৫৫ রানের বিনিময়ে।

২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তি সুরের (খ) নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জানাচ্ছি যে, ডঃ নারলিকার-এর জন্ম ১৯শে জুলাই ১৯৩৬ সালে কোলাপুরে।

বিনীত
নিত্যানন্দ আঢ্য
পহলামপুর, হুগলী।

আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আইনস্টাইন বললেন—বৃথা চেষ্টা! ইথার এর অস্তিত্ব কোনওদিনই ধরা (ডিটেক্ট করা) যাবে না।

অমনি সহস্রকণ্ঠে প্রশ্ন উঠল—কেন? কেন? তাহলে কি ইথার নেই?

আইনস্টাইন জবাব দিলেন—সেটা অন্য কথা। ইথার আছে কি নেই, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু ইথার থাকলেও, সেটা কোনওদিন ধরা পড়বে না।

একটা অবিশ্বাসের ঢেউ উঠল। অস্তিত্ব আছে—কিন্তু ধরা যাবে না! তাহলে ইথার কি পরমেশ্বর?

না—মৃদু হেসে জবাব দিলেন ছাব্বিশ বছরের যুবক আইনস্টাইন—কিন্তু সেই ভুলটাই আপনারা করেছিলেন। ইথারকে আপনারা তুলে দিয়েছিলেন পরমেশ্বরের সিংহাসনে। কিন্তু আমাদের এই মহাবিশ্বে পরম বলে কোনও কিছু নেই—একমাত্র পরমেশ্বর বাদে। এবং এই কথাটা আপনারা ভুলে গিয়েছিলেন বলে মিছিমিছি এ-যাবৎকাল ইথারের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন মরীচিকার মতো। ইথারকে কোনওদিনই ধরা যাবে না।

ব্যাপারটা ঠিকমতো বোধগম্য হল না কারুরই। আইনস্টাইন তখন বুঝিয়ে বলতে শুরু করলেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনও গতিই পরম নয়। সব গতিই আপেক্ষিক (অল মোশন ইজ রিলেটিভ)—এবং এইজন্যেই আইনস্টাইন তাঁর মতবাদের নাম দিয়েছিলেন 'আপেক্ষিক মতবাদ'—। ঐ যে ঐ মোটরগাড়ীটা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে ২৫ মাইল বেগে, ওটা ওর পরম বেগ নয়। আপেক্ষিক। পৃথিবীর সঙ্গে আপেক্ষিক। কিন্তু শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর বিরাট বেগটা (ঘন্টায় প্রায় ৬৬০০০ মাইল) আমরা অনুভব করি না। মনে হয় পৃথিবী স্থির। আর সেইজন্যেই পৃথিবীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা শুধু বলি—ঐ মোটরগাড়ীটা ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগে চলেছে। কিন্তু অনন্ত মহাশূন্যে এ জিনিসটা চলবে না। সেখানে বলতে হবে কোন গ্রহ নক্ষত্রের আপেক্ষিকে আমাদের ঐ রকেটটা ঘন্টায় দশ হাজার মাইল বেগে ছুটে চলেছে মহাকাশে। এবং এই আপেক্ষিক গতিটাই শুধু আমরা নির্ধারণ করতে পারি। শুধু তাই নয়, আমরা এমন কোনও যন্ত্র (তা সে যত জটিলই হোক না কেন) কোনওদিনই উদ্ভাবন করতে সক্ষম হব না যা দিয়ে পরম গতি পরিমাপ করা সম্ভব হবে, কারণ—পরম গতি বলে কোনও কিছু নেই। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে। সূর্য তার পরিবারবর্গকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে নীহারিকার মধ্যে। আবার নীহারিকাও মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে অন্যান্য নীহারিকার আপেক্ষিকে। থেমে কেউ নেই। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই গতিতে পরিপূর্ণ। এবং এই সর্বব্যাপী গতির রাজত্বে কেমন করে আমরা কল্পনা করতে পারি যে কেবলমাত্র আমাদের এই ইথারই শুধু লাটসাহেবের মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে সর্বক্ষণ?

সুতরাং ইথারও নিশ্চয় গতিশীল।

কিন্তু মাইকেলসন এবং তারপরে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যখন এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে কাচের পাত্রে জলের মতো ইথার স্থির হয়ে রয়েছে এবং গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলী এই নিশ্চল ইথার সমুদ্রের মধ্যে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে রঙীন মাছের মতো।

কিন্তু এটা তো ঠিক কথা নয়। যে বস্তু যেদিকে যতটা বেগে অগ্রসর হচ্ছে, তার আশপাশের ইথারও ঠিক ততখানি বেগে সেইদিকেই প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে ইথার-কারেন্টের আপেক্ষিক বেগ সর্বদাই শূন্য থেকে যাচ্ছে।

বেড়ালের পিঠের সঙ্গে একটা লাঠি উঁচু করে বেঁধে সেই লাঠিটার মাথার সঙ্গে আর একটা লাঠি আড়াআড়িভাবে আটকে, তার প্রান্ত থেকে যদি একটা মাছ ঝুলিয়ে দেয়া যায় বেড়ালটার ঠিক সামনেই, তাহলে বেড়ালটা সেই মাছটাকে কখনোই খেতে পারবে না। কারণ বেড়াল যেই ছুটতে শুরু করবে মাছটাকে ধরতে, মাছটাও গতিশীল হয়ে যাবে তক্ষুনিই। বেড়াল এবং মাছের মধ্যেকার দূরত্বটা তাই কখনোই হ্রাস পাবে না এবং ওদের আপেক্ষিক বেগটাও সর্বদা শূন্য থেকে যাবে।

ইথারের ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসটাই হচ্ছে, যার ফলে তার আপেক্ষিক বেগ শূন্যেই থেকে যাচ্ছে সর্বদা। আর যেহেতু আমরা কেবলমাত্র আপেক্ষিক বেগই পরিমাণ করতে পারি (পরম বেগ নয়), মাইকেলসনের ইনটারফিয়ারেন্স ব্যাণ্ড কোনওবারই পরিবর্তিত হয়নি কণামাত্র—আপেক্ষিক বেগ প্রতিবারই শূন্য ছিল বলে।

ব্যাখ্যা শুনে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা বোবা হয়ে গেলেন!

সকলের মনের অবস্থাটা হল অনেকটা 'জুতো আবিষ্কার' কবিতার হবুচন্দ্র রাজার মতো:

'এত কি হবে সিধে!

ভাবিয়া মল সকল দেশশুদ্ধ।'

গত বিশ বছর ধরে তাঁরা সমানে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে গেছেন, অথচ এই সোজা কথাটা কারুর মাথায় ঢোকেনি যে ইথার নিশ্চল নয় এবং সেইজন্যে ইথার-স্রোতের অস্তিত্ব ধরা যাবে না!

এইটেই হল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর প্রথম প্রতিজ্ঞা:

ইথার ধরা যাবে না (দি ইথার ক্যান নট বি ডিটেক্টেড)।

বিজ্ঞানীরা তারপর প্রশ্ন করলেন, তাহলে সেই ফিটজেরাল্ড-লোরেনট্‌জ্‌ সংকোচন মতবাদটা—

হাঁ, সেটা ঠিক থাকবে।

কিন্তু ইথার যদি না থাকে—

ইথারকে আপনারা ধরে নিতে পারেন—আইনস্টাইন বাধা দিয়ে বললেন—স্থান

(স্পেস) এর সমগোত্রীয়। গতির প্রভাবে এই স্থান নিজেই সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে এই স্থান-এর মধ্যে অবস্থিত সবকিছুই আকারে হ্রাস পায়। সেইজন্যেই এই সংকোচনটা হচ্ছে সর্বব্যাপী। কিন্তু শুধু আকারে হ্রাস পাওয়াই নয়, এর মধ্যে আরো অন্য অনেক ব্যাপার আছে যেগুলি আমাদের এবার মন দিয়ে দেখতে হবে।

এই বলে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদ-এর দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি উপস্থাপিত করলেন:

আলোকের বেগ সর্বদা ধ্রুবক থাকবে এবং এইটেই (এই সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) হচ্ছে মহাবিশ্বে সর্বোচ্চ বেগ। আলোকের চেয়ে বেশী, এমন কি, আলোকের সমান বেগও কোনও বস্তু বা ব্যক্তি কখনো আয়ত্ত করতে পারবে না।

বেগ-এর যে একটা ঊর্ধ্ব সীমা আছে, যার ওপরে সে কখনোই উঠতে পারবে না—এইটেই বোধহয় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

কি করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন সেটা আমরা এবার দেখব।

কোনও বস্তু যখন গতিশীল হয় তখন সেই গতির প্রভাবে বস্তুটির দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়—এটা আমরা আগেই দেখেছি। এটা কোনও রকমের যান্ত্রিক সংকোচন নয়। সংকোচনটা হচ্ছে সর্বব্যাপী এবং একমাত্র বস্তুটির বেগ-এর ওপরেই সেটা নির্ভরশীল।

বস্তুর বেগ দিয়ে যদি আলোকের বেগকে (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) ভাগ করা যায়, তাহলে আমরা একটা ভগ্নাংশ পাব। এই ভগ্নাংশটিকে বর্গ করে ১ থেকে বিয়োগ করলে আমরা আর একটা ভগ্নাংশ পাব। এই দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির বর্গমূল নির্ণয় করলে আমরা আবার একটি ভগ্নাংশ পাব। এই শেষোক্ত ভগ্নাংশটাই হচ্ছে সংকোচনের সূচক (ইনডেক্স অফ কনট্রাকশন)। ফিটজেরাল্ড—লোরেনটজ্-এর সংকোচন সূত্র এই বলে।

এই সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে বস্তুর বেগ যত বেড়ে যাবে, সংকোচন সূচকটি তত ছোট হয়ে যাবে। কারণ, বস্তুর বেগ যত বেড়ে যাবে, আলোকের বেগের সঙ্গে পার্থক্যটা ততই কমে আসবে। সুতরাং প্রথম ভগ্নাংশটি বৃদ্ধি পাবে। ফলে, দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি (১ থেকে প্রথম ভগ্নাংশের বর্গ বিয়োগ করে যাকে পাওয়া যায়) কমে যাবে। এখন, আমাদের সংকোচন সূচক হচ্ছে এই দ্বিতীয় ভগ্নাংশের বর্গমূল। সুতরাং সেটি স্বভাবতই আরো হ্রাস পাবে, যার ফলে বস্তু ছোট হয়ে যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর বেগ যত বাড়বে, বস্তুটি তত ছোট হয়ে যাবে।

দু-একটা উদাহরণ নিয়ে আমরা দেখতে পারি সংকোচনটা কি পরিমাণে হয়।

ধরা যাক একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট এবং তার মধ্যে সেকেণ্ডে ৯৩০০০ মাইল (অর্থাৎ, আলোকের বেগ-এর অর্ধেক) বেগ সঞ্চারিত করা হল। তাহলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট হ্রাস পেয়ে ১৭ ফুটে দাঁড়াবে।

বস্তুটি যদি ১৬১০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়, তাহলে তার দৈর্ঘ্য দশ ফুট হ্রাস পাবে, অর্থাৎ জিনিসটা অর্ধেক হয়ে যাবে।

বেগ যদি সেকেণ্ডে ১৮৫০০০ মাইল হয়, (অর্থাৎ, আলোকের বেগের মাত্র ১০০০ মাইল কম হয়) তাহলে সেই ২০ ফুট বস্তুটা মাত্র ১ ফুট হয়ে যাবে।

এবং বস্তুটির মধ্যে যদি সেকেণ্ডে ১৮৫৯০০ মাইল বেগ (অর্থাৎ, আলোকের বেগ-এর চেয়ে শুধু ১০০ মাইল কম) সঞ্চারিত করা যায়, তাহলে তার ২০ ফুট দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়ে মাত্র ৭ ইঞ্চিতে দাঁড়াবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বেগ বাড়তে বাড়তে আলোকের বেগ-এর যতই নিকটবর্তী হবে, বস্তুটির দৈর্ঘ্য ততই হ্রাস পাবে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে বস্তুর বেগ যখন একেবারে আলোকের বেগ-এর সমান হয়ে যাবে, তখন কি হবে?

সংকোচন সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, তখন সূত্রের প্রথম ভগ্নাংশটি আর ভগ্নাংশই থাকবে না। পুরোপুরি ১-এ পরিণত হয়ে যাবে। ফলে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি হয়ে যাবে শূন্য এবং সেইজন্যে তৃতীয়টিও। অর্থাৎ আমাদের সংকোচন সূচকটি শূন্য হয়ে যাবে, যার ফলে বস্তুটি একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে!

কিন্তু এটা তো আর সম্ভব নয়।

বস্তুকে সংকুচিত করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এবং তারপরে আরো ক্ষুদ্র করা যায় এবং তারপরেও আরো অনেক ক্ষুদ্র করা সম্ভব—কিন্তু একেবারে বিলীন করে দেয়া কিছুতেই যাবে না। এটা অসম্ভব। আর সেইজন্যেই কোনও বস্তুর বেগ কখনোই আলোকের বেগ-এর সমান হতে পারবে না।

এইটেই হচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর যুগান্তকারী আবিষ্কার!

বস্তুর বেগ যখন আলোকের বেগ-এর সমানই হতে পারে না, তখন তার বেশী যে হতে পারবেই না—সেটা বলা বাহুল্য। তবু, বেশী যদি হয় তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ায়, আমরা একবার দেখে নিতে পারি।

এক্ষেত্রে সংকোচন সূত্রের প্রথম ভগ্নাংশটি ১-এর বেশী হয়ে যাবে, যার ফলে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি হয়ে যাবে ঋণাত্মক (নেগেটিভ) এবং তৃতীয় ভগ্নাংশটি, অর্থাৎ আমাদের সংকোচন সূচকটি হবে একটি ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল।

গণিতের নিয়ম অনুযায়ী ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করা যায় না। এই জাতীয় সংখ্যাকে তাই বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যা (ইমাজিনারী কোয়ানটিটি)। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের সংকোচন সূচকটি কাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে—কোনও বস্তুর বেগ আলোকের বেগ-এর সমান হতে পারে না এবং তার চেয়ে বেশী হওয়া কেবল কল্পনাতেই সম্ভব।

বেগ-এর এই সর্বোচ্চ সীমা আবিষ্কার, আপেক্ষিকবাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের একটা যুগান্তকারী কৃতিত্ব — এটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এর প্রভাব যে কতটা সুদূরপ্রসারী সেটা আমরা এবার দেখব।

(৩)

প্রথমে আমরা আলোচনা করব সময় (টাইম) সম্পর্কে। ধারণা ছিল যে, সময় কারো অধীন নয়। এর গতি কেউ কমাতে-বাড়াতে পারে না, আর সেই জন্যেই এটা প্রত্যেকের জন্যেই সমান, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে সময় একই গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে — আদি-অন্তহীন একটি চিরন্তন নদীর মত।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন আপনি আজ সকালে সাতটার সময় চা খেয়েছেন, এখন, যারা এই ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে তাদের প্রত্যেকেই বলবে (যেহেতু সময় জিনিসটা প্রত্যেকের জন্যেই সমান) যে আপনি আজ সকাল সাতটার সময়েই চা খেয়েছেন।

এই উক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুলচুক নেই। কারণ মিছিমিছি তো আর কেউ ইচ্ছে করে সাতটার ঘটনা সাড়ে ছ'টা বা সাড়ে সাতটায় ঘটেছে, বলবে না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, কণামাত্র মিথ্যা ভাষণ না করেও, দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে যে, আপনি আজ সকাল সাড়ে সাতটায় চা খেয়েছেন!

এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

এ-ব্যাপারটা সম্ভব হতে পারে, কারণ এ-জিনিসটা নির্ভর করে দর্শকটির অবস্থানের ওপর।

একটা জিনিস আমরা কি করে দেখতে পাই? আলোক যখন যেখান থেকে এসে আমাদের চোখে পৌঁছয়, তখনই বস্তুটি দৃশ্যমান হয়। আপনার হাত-মুখ, চায়ের পেয়ালা, এবং পেয়ালার অন্তর্গত ধূমায়মান ঐ লোভনীয় তরল পদার্থটি থেকে আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে দর্শকদের চোখের ওপর পড়ছে। কিন্তু আলোক-তরঙ্গের একটা বেগ আছে, এটা আমরা আগেই দেখেছি। সুতরাং দর্শকদের মধ্যে আপনার কাছ থেকে যে যত দূরে অবস্থান করবে, সে তত দেরীতে আপনাকে চা খেতে দেখবে।

কিন্তু আলোকের এই বেগটা এতই বিশ্রী রকমের বিশাল, এবং সেই তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী এতই ক্ষুদ্র যে, আলোক যদি গোল হয়ে ঘুরে যেতে পারত তাহলে মাত্র এক সেকেণ্ডে আমাদের

পৃথিবীকে সাড়ে সাতবার চক্কর দিয়ে আসতে সক্ষম হত!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে দুজন ব্যক্তি—তাদের দূরত্ব যত বেশীই হোক না কেন—যখন একটি ঘটনা ঘটতে দেখে, তাদের এই দেখার মধ্যে সময়ের পার্থক্যটা কখনোই সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ অতিক্রম করতে পারে না, এবং সেই জন্যেই এ যাবৎকাল লোকের ধারণা ছিল যে, সময় জিনিসটা প্রত্যেকের জন্যেই সমান।

কিন্তু কথায় বলে, দাদারও দাদা আছে। আলোকের বেগ যেমন বিশাল, আমাদের এই মহাশূন্যেও তেমনি বিস্তৃত। এই মহাশূন্যের অতিগভীর গর্ভে এমন নক্ষত্র প্রচুর আছে যেখানে আমাদের পৃথিবী থেকে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান এই আলোকতরঙ্গের পৌঁছুতেও লক্ষ লক্ষ বছর লেগে যায়! কিন্তু অত বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের সৌরমণ্ডলের এই বৃহস্পতি গ্রহ থেকেই দেখা যাক না, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

পৃথিবী থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৪৮ কোটি মাইল। এই দূরত্ব আলোক-তরঙ্গের (বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) অতিক্রম করতে প্রায় ৩৫ মিনিট লেগে যাবে। সুতরাং বৃহস্পতি গ্রহে যদি কোনও দর্শক থাকে (অবশ্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সমেত) তাহলে সে বলবে যে, আপনি আজ সাড়ে সাতটার পরে চা খেয়েছেন—যদিও আপনি ঠিক সাতটার সময়েই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছিলেন!

সুতরাং দেখা গেল যে, সময় জিনিসটা প্রত্যেকের জন্যে সমান নয়। এটা নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থানের ওপর। অর্থাৎ, স্থানের সঙ্গে সময়ের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে, আসলে দুটো জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং পরস্পরের পরিপূরক। আইন-স্টাইন তাঁর আপেক্ষিক মতবাদে এই ব্যাপারটাকে বলেছেন—স্পেস টাইম কন্টি-নিউয়াম। স্থান থাকলে তবেই সময়ের মূল্য আছে। আবার, সময়ের অবর্তমানে স্থান হয়ে যায় অর্থহীন। দুটোকে একই সঙ্গে থাকতে হবে, কিম্বা একই সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে হবে—স্পেশ টাইম কন্টিনিউয়াম।

আলোকের অত্যধিক বেগের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে বাস করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই জিনিসটা আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না। বিশেষ করে, সময় যে কারুর ওপরে নির্ভর-শীল—এটা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তাই, একই সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাওয়াটা স্বাভাবিক মনে হলেও, একই ঘটনা (যেমন, আপনার ঐ চা খাওয়াটা) বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে শুনলে আমাদের কেমন যেন বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু গ্রহান্তরে না গিয়ে, আমাদের ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে বাস করেও এই ব্যাপারটা আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি এইভাবে।

আপনার সেই চা খাওয়ার ব্যাপারটাই নেওয়া যাক আবার। ধরুন, আপনি বম্বে মেলের রেস্টুরেন্ট কারের কোণের দিকের চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। কামরার অন্য প্রান্তে বসে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি ঠিক আপনার সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন। কম্পার্টমেন্টের জানলাগুলি সব খোলা। ট্রেনটি একটু আগে চলতে শুরু করেছে হাওড়া স্টেশন ছেড়ে। রেস্টুরেন্ট কারে দাঁড়িয়ে যে ওয়েটারটি আপনাদের তদারক করছে, সে বলবে যে, আপনারা দুজনে একই সময়ে চা খেয়েছেন। বাইরে যে চাপরাশিটি প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে কিন্তু অন্য কথা বলবে। সে প্রথম জানলা দিয়ে আপনাকে চা খেতে দেখবে, এবং একটু পরে মাদ্রাজী ভদ্রলোক-টিকে চলন্ত ট্রেনের রেস্টুরেন্ট কারের শেষে জানলা দিয়ে দেখবে। সুতরাং চাপরাশিটি স্বভাবতই বলবে যে, আপনি প্রথমে চা খেয়েছেন, এবং তারপরে মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি—যদিও কামরার ওয়েটারটির মতে আপনারা দুজনে একই সময় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছেন!

সুতরাং একই ঘটনা বিভিন্ন সময়ে ঘটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও সম্ভব।

এবার মাদ্রাজী ভদ্রলোকটিকে বাদ দিয়ে শুধু আপনাকে নিয়েই একটু গবেষণা করা যাক। চায়ের পেয়ালা শেষ করে আপনি একটা সিগারেট ধরালেন। ট্রেনটি চলছে এবং জানলাগুলো আগের মতই খোলা রয়েছে। রেস্টুরেন্ট কারের ভেতরে দাঁড়িয়ে ওয়েটার দেখল যে, আপনি চা এবং সিগারেট খেলেন একই জায়গায় বসে (কোণের দিকের চেয়ারটাতে), অবশ্য বিভিন্ন সময়ে (আগে চা পরে সিগারেট)। কিন্তু লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে যে সিগন্যালম্যানটি চলন্ত ট্রেনের জানলার ভেতর দিয়ে আপনাকে চা খেতে দেখল এবং কিছুক্ষণ পরে আর একজন সিগন্যালম্যান যে আপনাকে সিগারেট ধরাতে দেখল, তারা বলবে যে, আপনি যেখানে চা খেয়েছেন তার প্রায় মাইলখানেক দূরে সিগারেটে টান দিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দুটি ঘটনা একই স্থানে ঘটলে তাদের বিভিন্ন স্থানে ঘটানোও সম্ভব—যদি অবশ্য তাদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকে। কিন্তু যদি একই সময়ে ঘটে, তাহলে ঘটনাদুটির মধ্যে স্থানের পার্থক্য কিছুতেই আনা যাবে না, কারণ আপনি যদি সিগ্রেট এবং চা একসঙ্গেই খেতে থাকেন, তাহলে দুজন সিগন্যাল-ম্যানই বলবে যে, আপনি একই জায়গায় চা এবং সিগ্রেট খেয়েছেন—আর রেস্টুরেন্ট-কারের ওয়েটার যে বলবেই, সেটা বলাই বাহুল্য।

আবার, ঘটনা দুটি যদি একই স্থানে ঘটে, তাহলে তাদের মধ্যে সময়ের পার্থক্য আনাও সম্ভব নয়। সেই মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি এবং আপনি রেস্টুরেন্ট-কারের দুই প্রান্তে বসেছিলেন বলেই প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে চাপরাশিটি আপনাদের একইসঙ্গে চা খাওয়াটা বিভিন্ন সময়ে দেখল। কিন্তু আপনারা দুজনে যদি একই টেবিলে বসে চা খেতেন (অর্থাৎ, স্থানের ব্যবধান যদি না থাকত), তাহলে চাপরাশিটি সময়ের পার্থক্য আনতে পারত না আপনাদের কাজের মধ্যে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, স্থান এবং সময়কে আলাদা করে দেখা চলতে পারে না। একটির কথা বললে দ্বিতীয়টির উল্লেখ করতেই হবে—কারণ, এই দুটি জিনিস পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এবং একটি অন্যটির ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

স্থান এবং সময়ের মধ্যে এতই যখন বন্ধুত্ব এবং মাখামাখি, তখন বস্তুর গতির প্রভাবে স্থান যদি সংকুচিত হয়ে যায়, সময়েরও একটা কিছু নিশ্চয় হওয়া উচিত তাহলে।

অনুরূপ ক্ষেত্রে আইনস্টাইন দেখালেন—সময় বৃদ্ধি পায়, এবং বৃদ্ধি পাওয়ার সূত্রটি সেই একই। তবে সংকোচন সূচকের ভগ্নাংশটি দিয়ে এবার আমাদের গুণ করার পরিবর্তে ভাগ করতে হবে, যেহেতু সময় বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু সময় বৃদ্ধি পাওয়া মানে ঘড়ি স্লো হয়ে যাওয়া, কারণ একঘণ্টা যদি দু' ঘণ্টায় পরিণত হয়, তাহলে ঘড়ির কাঁটার গতি নিশ্চয় অর্ধেক হয়ে যাবে। অর্থাৎ, সময় বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ তাৎপর্য হল—সময়ের গতি শিথিল হয়ে যাওয়া। তাহলে আমরা সংকোচন সূচকের ভগ্নাংশটি দিয়ে এবার সোজাসুজি গুণ করে নিয়ে বলে দিতে পারি যে, সময়ের গতি কতখানি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

সেই শেষোক্ত উদাহরণটি নেয়া যাক যেখানে বস্তুর বেগ ছিল সেকেণ্ডে ১৮৫৯০০ মাইল, অর্থাৎ, আলোকের বেগের মাত্র ১০০ মাইল কম। এ-ক্ষেত্রে আমাদের ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের বস্তুটি ছোট হয়ে মাত্র ৭ ইঞ্চিতে দাঁড়িয়েছিল, অর্থাৎ সংকোচন সূচকটি ছিল ৩-এর ১০০ ভাগ। এখন তাহলে ঐ বস্তুটির মধ্যে সময়ের গতিও ঐ একই অনুপাতে শিথিল হয়ে যাবে। সুতরাং ১০০ বছর মনে হবে মাত্র ৩ বছর।

সময়ের গতির এই শিথিল হয়ে যাওয়ার একটা দিক কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক।

ধরুন, আপনি এমন একটা মহাকাশযান নির্মাণ করলেন, যার গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৮৫৯০০ মাইল এবং এই গাড়ীতে চড়ে আপনি মহাশূন্যে হাওয়া খেতে বেরুলেন (মহাশূন্যে কিন্তু হাওয়া নেই, মনে রাখবেন) এবং একনাগাড়ে তিন বছর ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে এলেন আবার। কিন্তু বাড়ীতে এমন একটা বিস্ময়কর এবং দুঃখ-জনক ঘটনার আপনি সম্মুখীন হবেন যার জন্যে আপনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনি দেখবেন যে, আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সবাই অনেককাল হল মারা গেছেন!

শোক এবং বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে একটু চিন্তা করলেই অবশ্য আপনি এই অভাবনীয় ঘটনার কারণটা অনায়াসেই খ'ুজে পাবেন। ঐ প্রচণ্ড বেগ-বান মহাকাশযানে যখন আপনি আরোহী ছিলেন, তখন বেগ-এর প্রভাবে আইন-স্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর সূত্র অনুযায়ী আভ্যন্তরিক সময় শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মহাকাশযানের বাইরে আমাদের এই পৃথিবীতে সময় ঠিক আগের মতোই চলছিল। তাই মহাকাশযানের অভ্যন্তরে আপনার হিসেবে যখন মাত্র ৩ বছর কেটেছিল, পৃথিবীতে সেই সময়ে পুরো ১০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে! আর সেইজন্যেই আপনার সমসাময়িক কাউকেই আর আপনি ফিরে এসে জীবিত দেখতে পাননি।

জন্মিলে মরিতে হবে। মৃত্যু জিনিসটা সুনিশ্চিত। ইংরেজিতে আমরা বলি—আজ শিওর' অ্যাজ ডেথ। সেইজন্যে আদিম যুগ থেকে মানুষ চেষ্টা করে আসছে মৃত্যুকে জয় করতে। এমন একটা কোনও ওষুধ বা প্রক্রিয়া মানুষ যুগ যুগ ধরে খ'ুজে বেড়াচ্ছে যেটা প্রয়োগ করে সে অমর হতে পারবে, অথবা, অমর যদি না-ও হয়, আরো বহু বছর যাতে বে'চে থাকতে পারবে অন্ততঃ। কিন্তু এই 'এলিক্সির অফ লাইফ'-এর সন্ধান মানুষ আজো পাইনি।

কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ কি সেই বহুআকাঙ্ক্ষিত 'এলিক্সির অফ লাইফ'-এর একটা সন্ধান দিচ্ছে না?

তিন বছরে একশ' বছর! তাহলে বেগ যদি আরো বাড়ানো যায়, তখন সেই প্রচণ্ড বেগে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে দু'শ'-পাঁচশ' এমনকি, হাজার বছর পর্যন্ত জীবিত থাকা যেতে পারে না কি?

আপেক্ষিকবাদ-এর সূত্র এবং গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী খাতা-কলমে সম্ভব—কিন্তু বাস্তবে এটা হতে পারে না। প্রথমত, মহা-কাশযান-এর মধ্যে আমরা এখনো পর্যন্ত মাত্র সেকেণ্ডে ১০-১৫ মাইল বেগ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছি। সুতরাং সেকেণ্ডে ১৮৫৯০০ মাইল বেগ আয়ত্ত করা একরকম অসম্ভবই বলা চলে। তাছাড়া, এই প্রচণ্ড গতিবেগ উৎপন্ন করতে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে, সেটা সংগ্রহ করতে জগতের যাবতীয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং তাতেও শেষপর্যন্ত কুলোবে কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ, মাত্র একটি লোককে পাঁচশ' বা হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখতে পৃথিবীর অবশিষ্ট মানুষদের না খেয়ে মরতে হবে!

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায় পৃথিবীর অবশিষ্ট মানুষ বিশেষ একটি কোনও ব্যক্তির জন্যে এই জাতীয় আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত, তাহলেও কিন্তু ঐ বিশেষ ব্যক্তিটি অতিদীর্ঘজীবী হতে পারবেন না—কারণ, ঐরূপ প্রচণ্ড গতিবেগ আয়ত্ত করা মানুষের তৈরী কোনও বস্তুর পক্ষে অসম্ভব। কেন, সেটা আমরা এবার দেখব। কিন্তু তার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক যে, বেগ যদি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে, তাহলে এই অতিবেগবান মহাকাশযানগুলির অভ্যন্তরে সময়ের কিরকম পরিবর্তন ঘটে।

আমরা একটু আগে দেখলাম যে, মহা-কাশযানের বেগ বাড়িয়ে সময়ের গতি শিথিল করে দেওয়া যায়। সেকেণ্ডে ১৮৫৯০০ মাইল বেগবান যান-এ ৩ বছর পরিভ্রমণ করে ১০০ বছর পরের পৃথিবীতে আমরা ফিরে আসতে পারি। অর্থাৎ, আইন-স্টাইনের সূত্র অনুযায়ী প্রয়োজনমতো বেগ বাড়িয়ে ভবিষ্যতে আমরা পদার্পণ করতে পারি অনায়াসে (অবশ্য, খাতা-কলমে)।

এখন এই বেগটাকে আরো ১০০ মাইল বাড়িয়ে আমরা যদি একেবারে আলোকের বেগ-এর সমান করে দিই, তাহলে কি হবে? তখন সেই মহাকাশযানের অভ্যন্তরে সময়ের গতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং এইরকম গাড়ী করে আমাদের কোনও জায়গায় যেতে কোনও সময়ই লাগবে না। অর্থাৎ, আজ সকাল দশটায় কলকাতা থেকে রওনা হলে, আজ সকাল দশটাতেই বিলেতে পে'াছে যাব!

এইরকম একটা যন্ত্র কল্পনা করতে বেশ মজা লাগে। এবং আমরা প্রত্যেকেই কখনো না কখনো কল্পনা করেছি অথবা স্বপ্ন দেখেছি যে, মুহূর্তের মধ্যে বা চোখের পলকে যে-কোনও স্থানে পে'াছে যাচ্ছি। কিন্তু মুহূর্তও একটা সময়, এবং চোখের পলক ফেলতেও সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একটা স্থান থেকে অন্য একটা স্থানে যেতে একেবারে কোনও সময়ই লাগবে না, এটা কল্পনা, এমনকি, স্বপ্নেও অসম্ভব। অর্থাৎ, আবার আমরা ফিরে এলাম আধুনিক বিজ্ঞানের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারে—আলোকের বেগই হচ্ছে এই মহাবিশ্বে বেগ-এর সর্বোচ্চ সীমা।

এখানে একটা কথা বলে রাখা যেতে পারে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকবাদ-এর
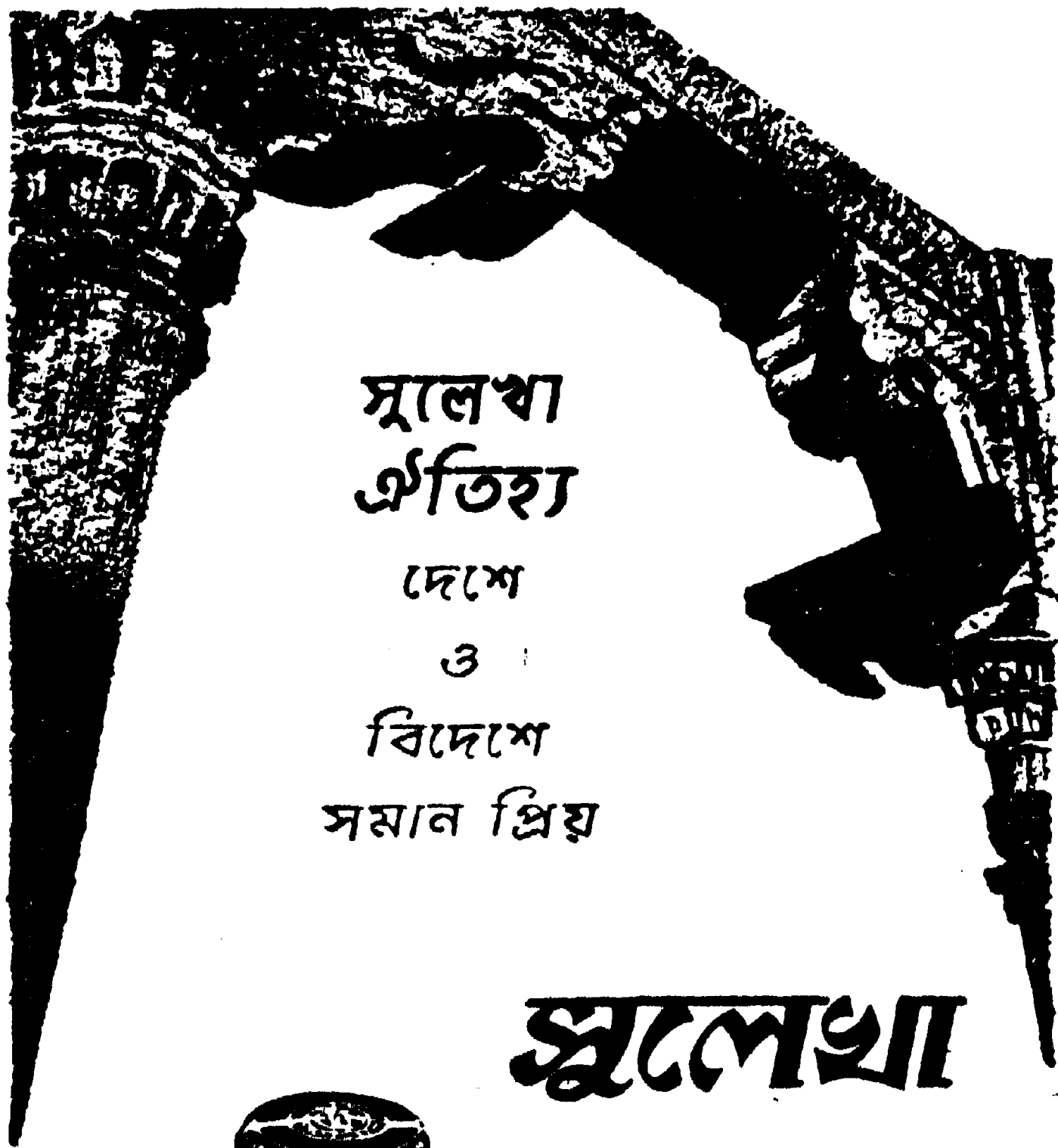
হরিদ্বারে পুণ্যস্নান

ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

াহায্যে বিজ্ঞানে যে পরিবর্তন এনেছেন, সটা বৈপ্লবিক। পুরোন বিজ্ঞান (ক্ল্যাশি- ্যাল ফিজিক্স)-এর কাঠামো আমূলে পালটে াচ্ছে এখন। তাহলে এটা কি সম্ভব নয় যে, ভবিষ্যতে আবার এইরকমই একজন মহা- প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটতে ারে যিনি আইনস্টাইনের বিজ্ঞানের বর্তমান াঠামো বদলে দিয়ে আবার নতুন এক ্তাধারার দ্বার খুলে দেবেন? খুবই ম্ভব। এবং তাই যদি হয়, তাহলে এটাও ক সম্ভব নয় যে, আইনস্টাইন বেগ-এর যে ই ঊর্ধ্বসীমা আবিষ্কার করেছেন, সেটা ্জ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরো ঊর্ধ্বে ঠে যেতে, অথবা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে েতে পারে?

না—এটা অসম্ভব। আইনস্টাইনের ্জ্ঞান অবশ্যই বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। ন নব প্রতিভার পদক্ষেপে বিজ্ঞানজগতে ারো অনেক অজ্ঞাত রাজত্ব আবিষ্কৃত হবে, ানুষের জ্ঞান দিন দিন বৃদ্ধি পাবে, কৃতির আরো অনেক রহস্য উন্মোচিত ে ভবিষ্যতে, কিন্তু বেগ-এর সম্বন্ধে ন আর কিছুই জানা যাবে না। আইন- াইনের আবিষ্কৃত ঊর্ধ্বসীমাটাই হচ্ছে া-এর শেষ কথা। এর বেশী বেগ কোনও- াই সম্ভব নয়।

একটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা বোধহয় জেই বোঝা যাবে। পুরাকালে পৃথিবী ন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল খুবই পরি- ত। এই সেদিন পর্যন্ত আমরা জানতাম যে আমেরিকা বলে প্রকাণ্ড একটা ণ্ড আমাদের এত নিকটেই অবস্থান করছে। কিন্তু এখন আমরা পৃথিবীর পরিচয় মোটামুটি পেয়ে গেছি। অন্তত আমাদের এই বিশ্ব যে কতখানি বিস্তৃত, সে সম্বন্ধে আমাদের একটা সঠিক ধারণা হয়ে গেছে। আমরা জানি যে, আমাদের পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু পৃথিবীর বুকের ওপর আজও অনেক স্থান আছে, যেগুলো আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত। ভূগোলের জ্ঞান আমাদের যত বাড়বে, এইসব অজ্ঞাত স্থান-গুলি ততই আমাদের আয়ত্তে আসবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভূগোলের অগ্রগতি যতই হোক না কেন, পৃথিবীর বুকের ওপর এমন দুটো শহর আমরা কোনও দিনই খুঁজে পাব না যাদের দূরত্ব হবে ৩০০০০ মাইল—কারণ, পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে আমাদের জানার আর কিছুই বাকি নেই। ২৫০০০ মাইলই হচ্ছে পৃথিবীর বুকের ওপর দূরত্বের শেষ কথা।

ঠিক সেইরকম, আলোকের বেগই যে বেগ-এর সর্বোচ্চ সীমা, আইনস্টাইনের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটাই হচ্ছে বেগ-এর ওপর শেষ কথা। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই হোক না কেন, এর নড়চড় কখনো হবে না। আলোকের বেশী বেগ কোনও কালেই সম্ভব নয়।

আলোকের বেশী বেগ (সুপার-লাইট ভেলসিটি) তাহলে অসম্ভব। কোনও একটা অসম্ভব ব্যাপারকে ঠিক বলে ধরে নিয়ে কার্যপ্রণালী শুরু করলে যে-সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হব, সেটা স্বভাবতই হবে আরো অসম্ভব।

এ-ক্ষেত্রে দেখা যাক আমাদের সিদ্ধান্তটি কি পরিমাণে অসম্ভব হচ্ছে।

মহাকাশযানের বেগ যত বৃদ্ধি পায়, তার অভ্যন্তরে সময়ের গতি ততই শ্লথ হয়ে যায়, যদিও বাইরে কালস্রোত ঠিক আগের মতোই প্রবাহিত হতে থাকে—এটা আমরা একটু আগেই দেখেছি। আর সেই-জন্যেই তিন বছর মহাকাশযানে কাটিয়ে একশ' বছর পরের পৃথিবীতে পদার্পণ করতে আমরা পেরেছিলাম। অর্থাৎ, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ভবিষ্যতে পদার্পণ করা সম্ভব। বাস্তবে সেটা আমরা পারি, কি না পারি—সেটা অবশ্য অন্য প্রশ্ন।

তারপরে, মহাকাশযানের বেগ যখন আলোকের সমান হয়ে গেল, তখন আমরা দেখলাম যে, আভ্যন্তরিক সময়ের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেল, যার ফলে একটা স্থান থেকে অন্য কোথাও যেতে কোনও সময়েরই প্রয়োজন হল না আর। অর্থাৎ, আজ সকালে দশটার সময় কলকাতা ছেড়ে ঠিক সকাল দশটার সময়েই আমরা বিলেতে পৌঁছে গেলাম আজ।

কিন্তু এর পর যদি মহাকাশযানের বেগ আলোকের বেগকেও ছাড়িয়ে যায় (সুপার-লাইট ভেলসিটি), তাহলে কি হবে? তখন স্বভাবতই আভ্যন্তরিক সময়ের যে-গতিটা নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল, সেটা পেছনের দিকে চলতে আরম্ভ করবে, অর্থাৎ, আজ সকাল দশটায় কলকাতা পরিত্যাগ করে গতকাল

রাত্তির দশটার সময়ে আমরা বিলেতে পেঁাছে যেতে পারব।।

এখন ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করে দেখা যাক যে উপরোক্ত তিনটি ঘটনা থেকে আমরা কি পাচ্ছি।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ঘটনাটি প্রকৃতির নিয়মের অধীন সুতরাং সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘটনাটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ—সুতরাং অসম্ভব।

প্রথমটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা মরে যাবার পরও আমরা একশ' পাঁচিশ' হাজার এবং আরো অনেক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারি। অর্থাৎ, ভবিষ্যত-জগতে বহুকাল বিচরণ করা সম্ভব।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মহাকাশযানের অভ্যন্তরে সময়ের গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে, আমরা চিরকাল জীবিত থাকতে পারি। কিন্তু যেহেতু কোনও গতি কখনো আলোকের সমান হতে পারে না, তাই এ-জিনিসটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ—সুতরাং অসম্ভব।

প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘটনা থেকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ বহুকাল বেঁচে থাকতে সক্ষম হলেও, চিরজীবী কিছুতেই হতে পারে না।

রামায়ণের মহাবীর হনুমান অমর হয়ে ছিলেন সীতাদেবীর বরে। গতিবেগ অতি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি করে তিনি হয়তো এখনো বেঁচে রয়েছেন এই পৃথিবীতে এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। কিন্তু একদিন মরতে তাঁকে হবেই। অমর কেউ নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সীতাদেবী মহাবীর হনুমানকে অতিদীর্ঘজীবী হবার বর দিয়েছিলেন—অমর হবার নয়। হনুমানের এই অতি দীর্ঘ জীবন হয়তো আজ থেকে এক লক্ষ কিংবা দু' লক্ষ বছর পর্যন্তও বিস্তৃত হতে পারে সীতাদেবীর আশীর্বাদের অসামান্য প্রভাবে কিন্তু যেহেতু কোনও গতি কোনও কালেই আলোকের সমান হতে পারে না, হনুমানকে একদিন দেহত্যাগ করতেই হবে। সুতরাং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর সূত্র থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, রামায়ণের মহাবীর হনুমান অমর নন।

তৃতীয় ঘটনাটি এবার পর্যবেক্ষণ করা যাক। এখানে ব্যাপারটি আরো অসম্ভব। বস্তুর বেগ আলোকের চেয়েও বেশী। ফলে, বস্তুর অভ্যন্তরে সময় বিপরীত গতিতে চলেছে—অর্থাৎ আমরা অতীতে ফিরে যাচ্ছি। এই ঘটনার তাৎপর্য এই হচ্ছে যে, আমাদের পিতা পিতামহ প্রপিতামহ ইত্যাদি পূর্বপুরুষরা জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্বেই আমরা জন্মে গেছি।

প্রথম ঘটনাটি অস্বাভাবিক, কিন্তু অসম্ভব নয় (কারণ বস্তুর বেগ আলোকের বেগ-এর নীচেই থাকছে)। সেইজন্যে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা দেখতে পেলাম যে, পুত্রের মৃত্যুর বহু বছর পরেও পিতা বেঁচে রয়েছেন। অস্বাভাবিক হলেও, ব্যাপারটা সম্ভব।

কিন্তু তৃতীয় ঘটনাটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ (বস্তুর বেগ আলোককে অতিক্রম করে যাচ্ছে), সুতরাং অসম্ভব। সেইজন্যে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে আমরা দেখতে পেলাম যে, পিতার জন্মের বহু পূর্বেই পুত্র জন্মগ্রহণ করে বসে রয়েছে।

এ-জিনিসটাকে সাদা কথায় বলা হয়—গাঁজাখুরি। সুতরাং দেখা গেল যে, একটা অসম্ভব ঘটনা থেকে যাত্রা শুরু করলে আমরা একেবারে অসম্ভবে গিয়ে পেঁাছুব। সেইজন্যেই পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়ে গেছেন—গোড়ায় গলদ আছে কিনা, সেটা গোড়াতেই দেখে নিও বাপু।

(৪)

একটা প্রশ্নের উত্তর মুলতুবী রেখে আমরা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে এসেছি। প্রশ্নটা ছিল অতিবেগবান মহাকাশযান বাস্তবে নির্মাণ করা কেন সম্ভব নয়? এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের দেখতে হবে বেগ-এর সঙ্গে ভর (ম্যাস্)-এর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা।

ভর এবং ওজনের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ওজন হচ্ছে একটা বল (ফোর্স)। ভর কিন্তু কোনও বল নয়। ভরকে বলা যেতে পারে বস্তুর অন্তর্গত সামগ্রীর পরিমাণ (কোয়ানটিটি অফ ম্যাটার)। এই ভর-এর সাধারণত কোনও পরিবর্তন হয় না। কোনও একটি বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে, সেই ছাইগুলি এবং যে-সব গ্যাস বস্তু থেকে বেরিয়ে গেছে আগুনের উত্তাপে, সেগুলি একত্রিত করে ওজন করলে দেখা যায় যে, ওজনটা ঠিক আগের মতোই আছে। বস্তুর এই গুণটিকে বলা হয়— ভর-এর নিত্যতা (কনজারভেশন অফ ম্যাস্)।

এখন বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে কি হয় দেখা যাক। একটা কাঠের গোলকের দৃষ্টান্ত প্রথমে আমরা নেব। ঠেলা দিলে এই কাঠের গোলকটি গড়িয়ে যাবে, অর্থাৎ গোলকটির মধ্যে একটা বেগ সঞ্চারিত হবে। কিন্তু ঠেলা দেয়া মানে বল প্রয়োগ করা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বল প্রয়োগ করে বস্তুর মধ্যে বেগ সঞ্চারিত করা যায়।

আবার, গোলকটিকে জোরে ঠেলা দিলে যতখানি বেগে গড়িয়ে যাবে, আস্তে ঠেলা দিলে তার চেয়ে কম বেগে যাবে। অর্থাৎ, বস্তুর বেগ প্রযুক্ত বল-এর অনুপাতিক।

এখন কাঠের গোলকটির পরিবর্তে একটা সম-আয়তনের লোহার গোলক নেওয়া যাক। অর্থাৎ, এবার আমরা একটি বেশী ভর-এর বস্তু নিলাম। আগের মত ঠেলা দিলে এই লোহার গোলকটি কিন্তু কাঠের গোলকটির মত অতটা বেগে গড়িয়ে যাবে না। অনেক আস্তে আস্তে যাবে। এবং যত বেশী ভর-এর গোলক আমরা নেব, সঞ্চারিত বেগটা ততই কমে যাবে। অর্থাৎ, বেগ ভর-এর ব্যস্তানুপাতিক (ইনভার্সলি প্রোপোরশন্যাল)।

এখন, বস্তুর ওপর বলপ্রয়োগ করতে হলে আমাদের শক্তি (এনার্জি) খরচ করতে হচ্ছে, এবং যে পরিমাণে শক্তি খরচ করব, প্রযুক্ত বল সেই অনুপাতেই বেড়ে যাবে।

তাহলে বস্তুর ভর, বস্তুর ওপর প্রযুক্ত শক্তি, এবং বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত বেগ, এই তিনটে জিনিসের মধ্যে যে সম্পর্কটা খুঁজে পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে এই যে—

শক্তি যত বেশী হবে বেগ তত বেড়ে যাবে, কিন্তু ভর যত বেশী হবে বেগ তত কমে যাবে।

এবার সেই কাঠের গোলকটির ওপর শক্তি প্রয়োগ করে করে ওর বেগটাকে বাড়িয়ে যাওয়া যাক ক্রমাগত। বাড়তে বাড়তে, ধরা যাক, বেগটা গিয়ে পেঁাছল সেকেণ্ডে একেবারে ১৮৫৯৯৯ মাইলে—অর্থাৎ আলোকের বেগ-এর মাত্র ১ মাইল কম। সুতরাং আর সামান্য একটু শক্তি প্রয়োগ করলেই আমরা বস্তুর বেগ আলোকের বেগ-এর সমান করে দিতে পারি।

কিন্তু আমরা এর আগে বহুবার দেখেছি যে, এ জিনিসটা—মানে বস্তুর বেগ আলোকের সমান হওয়া—অসম্ভব। কিন্তু শক্তি ব্যয় করে বস্তুর বেগটাকে যখন ১৮৫৯৯৯ মাইলে তুলতে পারলাম, তখন এই বাকী মাত্র ১ মাইল বেগ-এর জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য আর একটু শক্তি খরচ করতে আমরা পারব না কেন? নিশ্চয় পারি। অনায়াসে পারি। শুধু তাই নয় আরো অনেক বেশী পারি।

তাহলে সেক্ষেত্রে বস্তুর বেগ আলোকের সমান অথবা অধিক হবে না কেন? কে তাকে আটকাবে?

হ্যাঁ, সেইটেই হচ্ছে প্রধান প্রশ্ন। কে তাকে আটকাবে?

শক্তি প্রযুক্ত হয়ে চলেছে ক্রমাগত। আর মাত্র এক মাইল বাকী রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে এই শেষ এক মাইল অতিক্রম হয়ে যেতে পারে—অর্থাৎ, যেকোনও মুহূর্তে অসম্ভব হয়ে যেতে পারে সম্ভব! একে আটকাতেই হবে। কিন্তু কে রোধ করবে এ বেগ বৃদ্ধি?

এর উত্তর হল—ভর!

ভর ছাড়া এক্ষেত্রে আর কারুর ওপর ভরসা করা যায় না।

শক্তি বেগ আর ভর এর [illegible] আলোচনার [illegible]

ভর যত বেশী হবে, বেগ তত কমে যাবে

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ক্রমাগত শক্তি
য়োগের ফলে বেগ যখন বাড়তে বাড়তে
লোকের কাছাকাছি পেণছৈ যায়, তখন
র ভরও যদি বাড়তে শুরু করে দেয়,
লে বেগ-এর অগ্রগতির পথে একটা
বধক সৃষ্টি হয় যার ফলে বস্তুর বেগ
লোকের বেগ অতিক্রম করে একটা অসম্ভব
ড ঘটিয়ে দিতে কোনও দিনই সক্ষম হতে
র না। প্রকৃতপক্ষে এই জিনিসটাই ঘটে,
ভরবৃদ্ধিজনিত ক্রমবর্ধমান এই প্রতি-
কের জন্যেই অতিবেগবান মহাকাশযান
ণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়।

তাহলে আমাদের প্রশ্নের জবাবটা পাওয়া
।

(৫)

কিন্তু পুরোন বিজ্ঞানের (ক্ল্যাশিক্যাল
জক্স) একটি চিরন্তন সত্য হচ্ছে—ভর-
নিত্যতা (কনজারভেশন অফ ম্যাস)।
ৎ, ভর-এর পরিবর্তন কিছুতেই হতে
র না। এ বিষয়ে আমরা আগেই উল্লেখ
ছি, এবং এই ধারণাটা আইনস্টাইনের
ন বিজ্ঞানীদের মনে বদ্ধমূল ছিল।
তু আইনস্টাইন যখন দেখলেন যে,
ত শক্তি প্রয়োগের ফলে বস্তুর বেগ
তে বাড়তে তাঁর আপেক্ষিকবাদ-এর
য় প্রতিজ্ঞা — আলোকের বেগই হচ্ছে
মহাবিশ্বে বেগ-এর সর্বোচ্চ সীমা—
ন করে অসম্ভবকে সম্ভব করতে
ছে, তখন তিনি জোর গলায় বললেন—

ভর-এর নিত্যতা চিরসত্য নয়! বস্তু
বেগবান হয়, তখন তার ভর-এরও
বর্তন ঘটে!

মনে কতখানি সাহস থাকলে গলায়
খানি জোর আসতে পারে, সেটা ভাবলে
মত হয়ে যেতে হয়। কতখানি বৈপ্লবিক
ধারার অধিকারী হলে একথা—

কিন্তু শুধু একথা কেন? আইন-
নের প্রত্যেকটি বিবৃতিই তো বৈপ্লবিক!

জ্ঞান হওয়া থেকে মানুষ জেনে এসেছে
সময় কারো অধীন নয়। কালস্রোত
রুখতে পারে না। সমস্ত ভূখণ্ড জয়
সমগ্র পৃথিবীর একছত্র সম্রাট হওয়াও
তা সম্ভব—কিন্তু সময়কে জয় করা
ভব। সময় একই স্রোতে প্রবাহিত হবে
াল এবং সর্বত্র।

কিন্তু ছাব্বিশ বছরের যুবক আইন-
ন ১৯০৫ সালে বললেন — সময়ের
ও শিথিল হয়ে যায় সময় সময়!!

এত বড় হাস্যকর কথা বোধহয় কোথাও
বলে নি কোনও দিন। পাগলের এই
ণ্ড প্রলাপ শুনে সমগ্র বিশ্ব অট্টহাস্য
উঠেছিল সেদিন অখণ্ড অবিশ্বাসে।

কিন্তু মাত্র পনেরো বছরের মধ্যেই সেই
াস্যের শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেল
সে। অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে
ণাগারে পরীক্ষা চালিয়ে, এবং সূর্য-
গ্রহণের সময় আলোকরশ্মির বক্রতা পর্য-
বেক্ষণ করে এবং আরো বিভিন্ন প্রকার
এক্সপেরিমেন্ট করে তাঁরা দেখলেন যে,
সেদিনের সেই যুবকটি যা যা বলেছিল
সেগুলি অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য হলেও—
তার প্রত্যেকটি বর্ণই সত্য!

তখনই স্বীকৃত হল আইনস্টাইনের
প্রকৃত মূল্য—এক্সপেরিমেন্টের কষ্টিপাথরে
যাচাই করার পর।

প্রতিভার পদধ্বনি একাধিক বার শোনা
গেছে বিজ্ঞানজগতে সেই পাইথাগোরাসের
সময় থেকে। তাঁদের অবদান এবং আবিষ্কার
নিয়ে আলোচনারও অন্ত নেই। আবার,
আর্কিমিডিস বড় না নিউটন বড় — এই
জাতীয় তর্কেরও সূত্রপাত ঘটেছে বার বার।

কিন্তু আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন
ওঠে না। তিনি জাতে আলাদা। তিনি শুধু
বিজ্ঞানীই নন—তিনি বিপ্লবী। এত বড়
বিপ্লবী শুধু বিজ্ঞানজগতে কেন, শিল্প,
সাহিত্য, রাজনীতি অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে
আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি কোথাও।

এইখানেই আইনস্টাইনের শ্রেষ্ঠত্ব।

(৬)

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর এই
বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলি সত্যিই অদ্ভুত!
প্রথম প্রথম অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই আপেক্ষিক
তত্ত্ব বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তার মানে
এই নয় যে, সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের বুদ্ধির
অভাব ছিল যার ফলে আইনস্টাইনের
গাণিতিক সূত্রগুলি তাঁদের বোধগম্য হয়
নি। কারণটা ছিল অন্য।

আপেক্ষিক তত্ত্ব লোকে বুঝতে পারে
নি জিনিসটা কঠিন বলে নয়, কিন্তু তত্ত্ব
অনুসরণ করে আইনস্টাইন যে সব সিদ্ধান্তে
উপনীত হয়েছিলেন সেগুলি বিশ্বাস করা
কঠিন ছিল বলে।

বস্তুর বেগ বাড়লে তার ওজন বৃদ্ধি
পাবে, আকারে সেটা ছোট হয়ে যাবে এবং
তার ভেতরে সময় আস্তে আস্তে চলবে—
এসব ব্যাপার এতই নতুন ধরনের যে চিন্তা
করলেই কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

কিন্তু আমাদের এই সব নিয়ে চিন্তা
করবার কোনওই প্রয়োজন নেই আপাততঃ।
এই সব ভৌতিক ব্যাপার ঘটতে শুরু করে
বস্তুর বেগ যখন আলোকের সঙ্গে তুলনীয়
(কমপেয়ারেবল উইথ দি স্পীড অফ
লাইট) হয়, তখন। আলোকের বেগ হচ্ছে
সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল। সুতরাং
আলোকের সঙ্গে তুলনীয় হতে হলে বস্তুর
বেগ সেকেন্ডে অন্তত ৩০০০০—৪০০০০
মাইল হওয়া দরকার। কিন্তু সেকেন্ডে মাত্র
এক মাইল বেগ মানেই ঘণ্টায় ৩৬০০
মাইল! সুতরাং ভয়ের কোনওই কারণ নেই।

ধনী ব্যক্তিরা অনায়াসে তাঁদের রোলস
রয়েস হাঁকিয়ে যেতে পারেন ঘণ্টায় ৫০ বা
১০০ মাইল বেগে। তাঁদের গাড়ী যেটুকু
ছোট হবে সেটা কারুরই চোখে পড়বে না—
কারণ এক্ষেত্রে সংকোচনের পরিমাণটা হবে
কোটি ভাগের কোটি ভাগ মাত্র! এমন কি,
ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে একটা ১০০
মিটার দীর্ঘ রকেট মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হলে
তার সংকোচন হবে এক মিলিমিটার-এর
১০০ ভাগ মাত্র! সুতরাং ভয়ের কোনওই
কারণ নেই।

আবার, অনেক মোটা মানুষ সকাল
বিকেল দৌড়ান অভ্যেস করেন ওজন কমা-
বার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আইনস্টাইনের
আপেক্ষিকবাদ বলছে—বেগ বাড়লে ওজনও
বেড়ে যাবে! তাহলে?

না, এ ক্ষেত্রেও ভয়ের কোনও কারণ
নেই। ৩০০ পাউন্ড ওজনের একজন মেদ-
বহুল ব্যক্তি যদি ঘণ্টায় ১৫ মাইল বেগে
দৌড়ান (খুবই অস্বাভাবিক অবশ্য) তাহলে
তাঁর ওজন বৃদ্ধি পাবে এক আউন্সের লক্ষ
ভাগের কোটি ভাগ মাত্র!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের
দৈনন্দিন জীবনে আপেক্ষিকবাদ-এর প্রভাব
কণামাত্র নেই। আমরা স্বচ্ছন্দে দৌড়-ঝাঁপ
করতে পারি, অথবা বেগবান মোটরগাড়ী
বা বিমানে যাতায়াত করে যেতে পারি
যেখানে খুশি। ওজন বেড়ে যাবার
আশঙ্কা আমাদের একবিন্দুও নেই।

কিন্তু আশঙ্কার কারণ দেখা দেয়
ব্যাপারটা যখন আমরা বিপরীত দিক থেকে
দেখি। এবং এই আশঙ্কার কারণটা হচ্ছে
অত্যন্ত অধিক।

আমরা দেখেছি যে, বেগ বাড়তে বাড়তে
যখন সেটা আলোকের সঙ্গে তুলনীয় হয়,
তখন বস্তুর ভরও বাড়তে শুরু করে দেয়।
গোড়ার দিকে কিন্তু এ জিনিসটা হয় না।
তখন যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হয়
বস্তুর বেগ ঠিক সেই অনুপাতেই বেড়ে
যায়। কিন্তু শেষের দিকে সেটা হয় না।
তখন শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বেগ বৃদ্ধির হারটা
পূর্বের চেয়ে অনেক কমে যায়। পরিবর্তে
বস্তুর ভর কিছুটা বেড়ে যায়।

তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই
শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শক্তির সবটাই বেগে
পরিবর্তিত হচ্ছে না। কিছুটা ভর-এও
রূপান্তরিত হচ্ছে।

অর্থাৎ, শক্তি থেকে আমরা ভর পেতে
পারি।

এ পর্যন্ত ভয়ের কোনওই কারণ নেই।
কিন্তু এর বিপরীতটাই আশঙ্কার প্রকাণ্ড
কারণ, এবং সেটা হচ্ছে এই যে, শক্তি যখন
ভর-এ রূপান্তরিত হতে পারে, তখন ভর
থেকেও নিশ্চয় আমরা শক্তি পেতে পারি!

এই শক্তির পরিমাণ প্রচণ্ড!

আইনস্টাইন অঙ্ক কষে দেখালেন যে,
আলোকের বেগ-এর বর্গ দিয়ে যদি ভরকে
আমরা গুণ করি তাহলে গুণফলটা হবে
সেই ভর থেকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ।

এখন আলোকের বেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। এর বর্গ হচ্ছে ৩৪৫৯৬০০০০০০০, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি। সুতরাং ভর-এর সম্পূর্ণটাই যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে মাত্র এক একক ভর থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি একক শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এক টাকার লটারীর টিকিট কেটে কেউ কেউ দু পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। কিন্তু এক-এর পরিবর্তে সাড়ে তিন হাজার কোটি —এই জাতীয় সৌভাগ্য বোধহয় দিবা-স্বপ্নেও সম্ভব নয়।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ এই বিশাল শক্তিভাণ্ডারের পথের ঠিকানা আমাদের জানিয়ে দিল। এই শক্তিটা যে কি পরিমাণে বিপুল সেটা ঠিক মত অনুভব করার জন্যে দু-একটা দৃষ্টান্ত আমরা নিতে পারি।

মাত্র এক পাউণ্ড ওজনের কোনও বস্তুকে (লোহা কাঠ কাগজ ঘাস যে কোনও বস্তু হলেই চলবে) যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে যে শক্তি উৎপন্ন হবে তা দিয়ে সমগ্র ভারত-বর্ষের প্রত্যেকটি পাওয়ার হাউস ছ' মাসের ওপর চালান যেতে পারে! এমন কি, মাত্র এক চামচে চায়ের পাতা এই প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করবে সেটা একটা প্রমাণ সাইজের জাহাজকে সাত সমুদ্র পেরিয়ে সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতে সক্ষম!

এই বিশাল শক্তিভাণ্ডারের পথের নির্দেশ আইনস্টাইন আমাদের দিয়েছিলেন ১৯০৫ সালে। কিন্তু তখনো বিজ্ঞানীরা এই ভাণ্ডারের চাবি-কাঠির সন্ধান পান নি। সুতরাং শক্তিটা কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে জানা গেলেও, সেটা ব্যবহার করা গেল না। তবে চাবি-কাঠির সন্ধান চলতে লাগল সমানে। বস্তুর সূক্ষ্মতম উপাদান অণু এবং পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা দিন দিন নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে লাগলেন। ১৯১৩ সালে নীলস বোর প্রকাশ করলেন তাঁর পরমাণুর কাঠামোর ওপর (অন দি স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম) মৌলিক প্রবন্ধ। ১৯৩২ সালে রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে প্রথম নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন সংঘটিত হল। এনরিকো ফার্মি ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানলেন নিউট্রনের সাহায্যে ১৯৩৪ সালে। ইউরেনিয়াম পরি-বর্তিত হল নতুন একটি বস্তু—নেপ-চুনিয়াম-এ। তারপর বিজ্ঞানীরা আরো এগিয়ে যেতে লাগলেন ফার্মির প্রদর্শিত পথে। ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওপর তাঁরা আক্রমণ করলেন বার বার। অবশেষে বিচূর্ণ হল ইউরেনিয়াম ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। এবং চুরমার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বস্তু অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তার স্থলে দেখা দিল বিপুল পরিমাণ শক্তি — ঠিক যেমন ২৬ বছরের যুবক আইনস্টাইন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ৩৪ বছর পূর্বে সেই ১৯০৫ সালে!

কিন্তু খবরটা শুনে ষাট বছরের বৃদ্ধ আইনস্টাইন অস্থির হয়ে উঠলেন। গুপ্ত-ধনের চাবি-কাঠির সন্ধান তাহলে পেয়ে গেছে মানুষ! এই বিপুল শক্তি—বৃদ্ধ আলবার্ট আইনস্টাইন শিউরে উঠলেন আতঙ্কে—এই বিপুল শক্তি মানুষ যদি কল্যাণের কাজে না লাগায়? যদি যুদ্ধ, যদি ধ্বংস......

না না না না না, এ হতে পারে না— অস্থিরভাবে ঘরময় পদচারণ শুরু করলেন শুক্লকেশ বৃদ্ধ—এ কিছুতেই হতে পারে না। এ জিনিস বন্ধ করতেই হবে।

তক্ষুনি কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন তিনি। চিঠি লিখলেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন-ডি-রুজভেল্টকে :

প্রিয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়,

বৈজ্ঞানিক ফার্মি এবং জিলার্ড-এর কয়েকটি নতুন গবেষণা—যেগুলির লিখিত বিবরণ আমার কাছে এসে পৌঁছেছে— আমার মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করেছে যে ইউরেনিয়াম ধাতু অদূরভবিষ্যতেই একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎসতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই জাতীয় একটি মাত্র বোমা কোনও বন্দরে বিস্ফোরিত হলে সমগ্র বন্দর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা অনায়াসে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে! সুতরাং আমি অনুরোধ করি—

কিন্তু আইনস্টাইনের অনুরোধ কেউ শুনল না।

মহাপুরুষদের কথা আমরা কোনও দিনই শুনি না। তাঁদের জন্মতিথি আমরা পালন করি প্রতি বৎসর সভা-সমিতি করে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে তাঁদের অবদানের কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরি। নাটক মঞ্চস্থ করি তাঁদের জীবনী নিয়ে। একশ' বছর পূর্ণ হলে শতবার্ষিকীর আয়োজন করি। তখন উৎসব হয় আরো জমজমাট। বক্তৃতার বন্যা বয়ে যায়। ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা যায় আরো অনেক দূর থেকে। সবই আমরা করি, শুধু মহাপুরুষদের উপদেশ আমরা পালন করি না কোনওদিন। সেইটে বাদে আর সমস্ত কিছুই আমরা করি অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে।

আইনস্টাইনের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। আমেরিকা শুনল না এই মহাপুরুষের উপদেশ। ১৯৩৯ সালের চিঠিতে যে একটি মাত্র বোমার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সেই একটি মাত্র বোমাই বর্ষিত হল জাপানের নগর হিরোশিমার ওপর ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ৬ তারিখে।

মানুষের হাতের তৈরী প্রথম আণবিক বোমা মানুষের ওপর পড়ল! মরে গেল ষাট হাজার মানুষ। আহত হল লক্ষাধিক লোক। বন্ধ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এর পর আরো দশ বছর জীবিত ছিলেন আইনস্টাইন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু স্বর্গে গিয়েও বোধহয় এই মহামনীষী শান্তি পাচ্ছেন না আজও। অনুশোচনায় হাত কামড়াচ্ছেন হয়ত—কেন আমি আবিষ্কার করলাম যে, আলোকের বেগকে আলোকের বেগ দিয়ে গুণ করে সেটাকে আবার বস্তুর ভর দিয়ে গুণ করলে রূপান্তরিত শক্তির সমান হবে? কেন মানুষকে দিলাম এই বিপুল শক্তিভাণ্ডারের পথের নির্দেশ? ওরা তো কই আমার কথা শুনল না! শান্তির পথে ওরা গেল না! ওরা করল যুদ্ধ। আজকে হয়ত আরো অনেক বড়—

হ্যাঁ, আজকে আমরা আরো অনেক বড় জিনিস বানিয়েছি। যে বোমা হিরোশিমায় ষাট হাজার জীবন্ত মানুষকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, তার চেয়ে আড়াই হাজার গুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা আমাদের হাতে এখন আছে! পৃথিবীর যে কোনও নগর আমরা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দিতে পারি যে কোনও মুহূর্তে!

কিন্তু এর চেয়ে আরো বড় কোনও বোমা কি আমরা বানাতে পারি না যা দিয়ে আইনস্টাইন এবং তাঁর আপেক্ষিকবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে আমাদের মন থেকে?

আপেক্ষিকবাদ শুধু বেঁচে থাক বিজ্ঞানীদের উচ্চ জগতে যেখানে কারবার হয় আলোকের তুলনীয় বেগের সঙ্গে। আমাদের সামাজিক এবং দৈনন্দিন জীবনে যেখানে বস্তুর বেগ অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর সেখানে তো সূত্র অনুসারেই, আমরা দেখেছি যে, আপেক্ষিকবাদ-এর কোনও প্রভাব নেই। তাহলে আমরা ভুলে যাই না কেন আপেক্ষিক-বাদ, আর সেই সঙ্গে আপেক্ষিকবাদ-এর একেবারে সেই গোড়ার কথাটা—'অপেক্ষা'।

এই 'অপেক্ষা' শব্দটাই সকল দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধের কারণ। আমার 'অপেক্ষা' ওর বেশী আছে—এই চিন্তাটাই সকল অনিষ্টের মূলে। আপেক্ষিকবাদ-এর সঙ্গে সঙ্গে এই 'অপেক্ষা' কথাটা ভুলে গিয়ে আমরা যেন বলতে পারব :

"যার যাহা আছে তার থাক তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।"

সেই দিনই মহামনীষী আইনস্টাইন এবং তাঁর মানসপুত্র আপেক্ষিকবাদে সত্যিই ভালবাসব আমরা।

(সমাপ্ত)
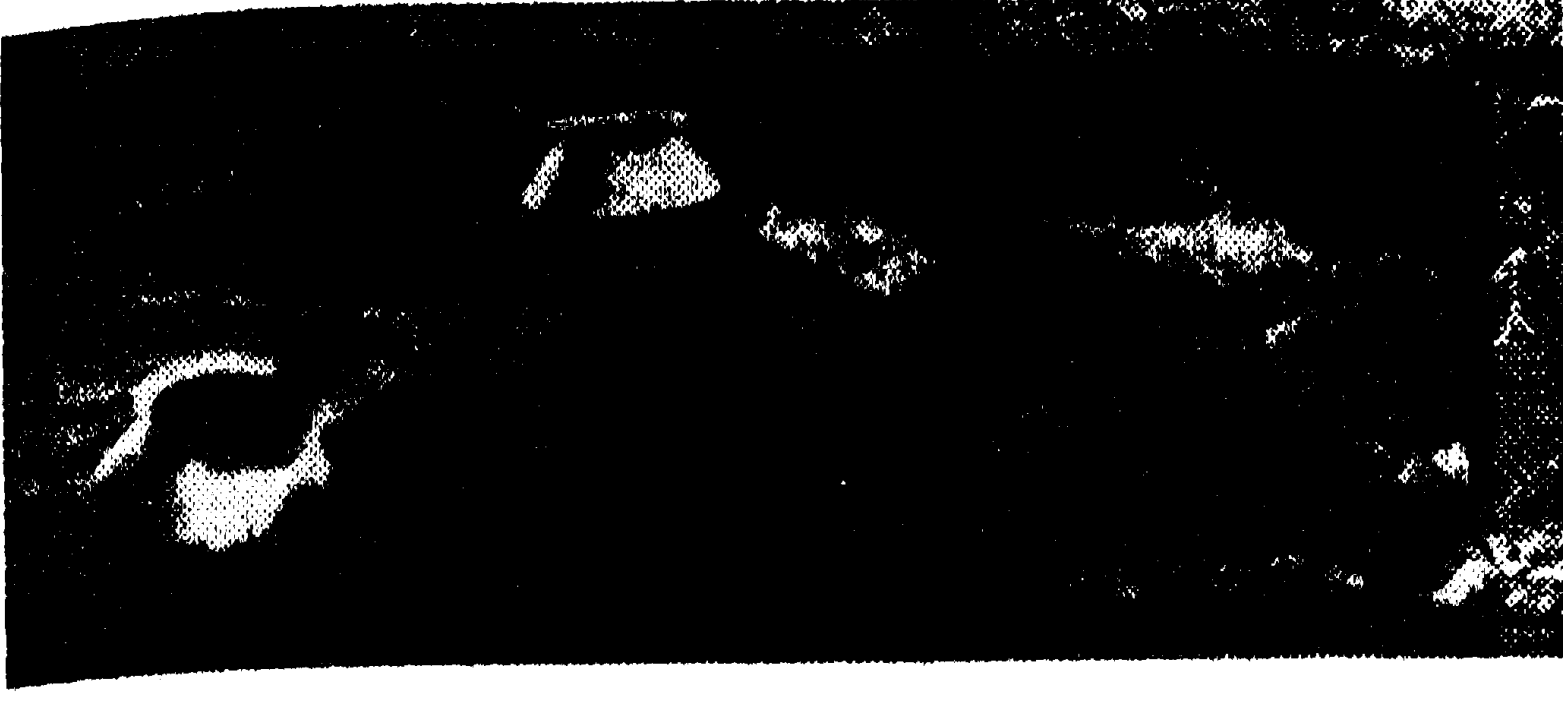
পথের ধারে সংসার

যাদের নাম কোরাওল

দীপালি ঘোষ ও প্রদ্যোৎ মিত্র

মানুষের সবচাইতে আদিম বৃত্তি যাযাবর বৃত্তি। তার বুঝি শেষ নেই। তাই বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত উন্নতির যুগেও দেখি আদিম বৃত্তি নিয়ে মানুষ সুখেই আছে। যেখানে জমি নিয়ে এত হাহাকার—এত হানাহানি সেখানে এই যাযাবর মানুষগুলো জমি সম্পর্কে একান্তই উদাসীন। মাটির প্রতি কোন আকর্ষণই নেই। মাটির সঙ্গে নেই এদের কোন প্রাণের বন্ধন। সব ঠাঁই তাদের ঘর—অতএব কোন বিশেষ ঘরে এদের কি প্রয়োজন। এই যাযাবরী বৃত্তির সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে এক দার্শনিক চেতনা মিশে আছে এদের জীবনে।

সারা পৃথিবীতে অনেক রকমের যাযাবর রয়েছে। ভারতবর্ষেও জীপসীর সংখ্যা প্রচুর। নানা শহরে পথেঘাটে যাযাবরের তাঁবু বা তাদের আস্তানা চোখে পড়ে মাঝে মাঝে। নানারকম তাদের পেশা। কেউবা নাচগান, বাঁদরের খেলা দেখাতে দেখাতে চলে। কেউ কেউ পথে পথে চলতে চলতে চুড়ি-কাঁচির ব্যবসায় করে, আবার এমনও আছে যাদের কোন পেশাই নেই। আহারের জোগানের জন্য কোনো নিয়মের গণ্ডীতে এরা নিজেদের আবদ্ধ করেনি। তেমনই এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের দেখা পানাগড়ের রাস্তায়।

এরা নিজেদের বলে রাঠোর। সূর্যবংশী রাজপুত বলে নিজেদের গৌরবান্বিত করতে চায়। কিন্তু আশেপাশের স্থানীয় লোকেদের কাছে এরা কোরাওল বলে পরিচিত। থানার ডাইরীতেও তাই লেখা। মানুষের সমাজে কোরাওল শব্দটি একান্তই অপাংক্তেয় অন্ত্যজ। কোরাওল মানে চোর-[illegible] এক কথায় অসামাজিক পরগাছা হিসেবেই এদের গণ্য হয়। যাযাবর সমাজেও এদের স্থান নীচে। তার কারণ এরা কোন কাজকর্ম করে না। 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' [illegible] ভিক্ষাই এদের একমাত্র এবং প্রধান জীবিকা। শ্রমের আনন্দে এদের লোভ নেই। অবশ্য ভিক্ষার জন্য যেটুকু পরিশ্রমের দরকার তা এরা করে থাকে। আর সেজন্য অবিশ্রান্ত পথ হাঁটা তো আছেই। এদের জন্য বোধহয় লেখা—'হে শংকর হে ভবেশ সবারে দিয়েছ ঘর—আমারে দিয়েছ শুধু পথ'। পথের ধারেই জন্ম বিবাহ মৃত্যু সব কিছু। জীবনের চক্র শুধু পথপরিক্রমা করে কোনদিন হয়তো পথের বাঁকে চিরদিনের মত থেমে যায়। সারা জীবন চলতে মাঝে মাঝে থামতেও হয় বৈকি। তবে তা দু' একদিনের জন্য। কোন জায়গায় এর বেশি থাকতে পারে না। সেজন্য কোন জায়গাকে ভালও বাসে না। যখন থামে রাস্তার ধারে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে তারা আশে-পাশে গ্রামে ভিক্ষায় বেরোয়। কোরাওল দল দেখলেই গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সাবধান হয়ে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করে। দুদিন স্থিতির পরই আবার 'চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরিয়া'। এ চলার বুঝি কোনদিন বিরাম হবে না যতদিন না পা-দুটো চিরকালের জন্য থেমে যায়। পথেই এদের সংসার স্থিতি সব কিছু. এদের নিজেদের ভাষায় বলে 'খ'হা ক্ষেত ব'হা খলিয়ান'।

বিচিত্র জীবন এই যাযাবর কোরাওলদের। এদের সমাজের বিধিব্যবস্থাগুলোও অদ্ভুত। দলগুলি খুব বেশি বড় হয় না। নিজেদের আত্মীয়পরিজন নিয়েই দল গড়ে ওঠে। সবচাইতে মজার হোল দল চলে দলনেত্রীর নির্দেশে। পুরুষের কোন কর্তৃত্ব এদের সমাজে চলে না। কিন্তু দলে যে পুরুষ থাকে না তা নয়, তবে তাদের কোন মর্যাদা নেই। তারা শুধু ভিক্ষার সময় স্ত্রীদের দেহরক্ষীর কাজ করে। স্ত্রীরাই সর্দারনী (সর্দারিন) হয়ে থাকে এবং দল পরিচালনা করে। এককেটি দলে একাধিক সর্দারিন থাকতে পারে। অর্থাৎ যে কটি পরিবার যৌথভাবে ঘোরে তাদের কর্ত্রীরাই সর্দারিন হয়ে থাকে। ছোট ছোট পরিবার অর্থাৎ নাবালক ছেলেমেয়ে আর স্বামী-স্ত্রী। স্বামী-স্ত্রীকে যে সব সময় বিবাহিত হতে হবে এমন কোন অনিবার্য বিধি নেই। আবার সংগী পুরুষ যে স্বামী হবে তারও কোন কারণ নেই। একবার একটা দলের সর্দারিনকে এ প্রশ্ন করে নিজেরাই বিব্রত হয়েছি, উত্তেজিত হোয়ে সে বলেছিল—এ আপদটা স্বামী হতে যাবে কেন—স্বামী তো কোনকালে মরে গেছে। এ কেবল ভিক্ষার সংগী। যে পুরুষের স্ত্রী নেই তার বড় দুর্ভাগ্য। দুটো খাওয়ার জন্য এদলে সেদলে সে নিগৃহীতের মত ঘুরে বেড়ায়, কোন দলই তাকে বেশি দিন রাখে না, ছেলেরা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মার দলেই থাকে, পরে স্ত্রীর দলভুক্ত হয়ে যায়। বাবা মার সঙ্গেও সমস্ত সম্পর্ক চুকে যায়। সেজন্য অনেক সময় দেখা যায় বিবাহিতা মেয়ে মার দলভুক্ত হয়ে আছে। তেমনি করে বিবাহিতা ছোট বোনকেও দলের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু পরে ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহৎ হয়ে দেখা দেয়—সেজন্য বিবাহিতা মেয়ে কি বোন হাঁড়ি আলাদা করে নেয়। এক যাত্রায় পৃথক অন্ন হলেও পথ আলাদা হয় না। একই জায়গায় থাকে যূথবদ্ধ হয়ে, শুধু রান্নার ব্যবস্থাটা যার যার তার তার। কঠিন জীবনসংগ্রামে অনাহারের দিনে একে অন্যের

দুটি কোরাওল ছেলে

অন্নের হিস্যা নিতেও চায় না, দিতেও নয়। এ ব্যবস্থা নিষ্ঠুর মনে হলেও স্বাভাবিক ও সত্য। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্রী আলাদা করে সর্দারিন হিসাবে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রী করে নেয়।

কোরাওল গোষ্ঠীকে নিকটবর্তী থানায় গিয়ে নাম রেজিস্ট্রী করাতে হয়। অন্যান্য জীপসীদের বেলায় এত কড়াকড়ি নেই। কারণ তাদের কোন না কোন একটা পেশা থাকে। কিন্তু কোরাওলরা যে শুধুই পরান্নজীবী। গ্রামে গিয়ে এরা শুধু ভিক্ষাই করে না, গৃহস্থের অনবধানতার সুযোগ নিয়ে এটা-ওটা তুলে নিয়ে আসে। বরং বলা যায় এতেই এরা বেশী পারদর্শী। এজন্যই কোরাওলগোষ্ঠী যেখানে যায় সেই এলাকার থানা কর্তৃপক্ষ এদের দলনেত্রীর নাম ও তার অধীনস্থ গোষ্ঠীর হিসাব পঞ্জীভুক্ত করে রাখে। থানার লোকেরাই এদের এক থানা থেকে অন্য থানায় হস্তান্তরিত করে দিয়ে যায়। থানার লোক কখনই এদের পিছু ছাড়ে না। সেজন্য প্রত্যেক দলের সঙ্গে এক বা একাধিক সিপাহী বা চৌকিদার নিযুক্ত থাকে। এদের স্বাধীনতা গ্রামবাসীর নিরাপত্তার অন্তরায় বলে মনে করা হয়। ভিক্ষার সময়ও চৌকিদার সঙ্গে যায়। যথেষ্ট পরিমাণে ভিক্ষা না দিলে এরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্রী রকমের অশান্তি সৃষ্টি করে এবং সুযোগ পেলেই চুরি করতে চেষ্টা করে। এজন্য সব সময় সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়।

আমরা যে দলকে পেয়েছিলাম সে-দলে মোট তিনজন দলনেত্রী ছিল—তাদের দুজন পরস্পর বোন। অন্যজন এক বোনের ভাসুরের স্ত্রী। বড় বোন বিধবা হলেও সঙ্গে একটি পুরুষ দেহরক্ষী ছিল। এছাড়া তার বিবাহিত মেয়েও ছিল। মেয়েটির স্বামী অবশ্য সে সময় অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দ্বিতীয় বোনের অধীনে ছিল তার স্বামী এবং নাবালক ও অবিবাহিত পুত্র-কন্যা। তার ভাসুরের স্ত্রীর সঙ্গে শুধু তার স্বামীই রয়েছে। তারা তখনও নিঃসন্তান।

দলের লোকেরা প্রত্যেকে সঙ্গে চৌকিদার নিয়ে আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিক্ষায় বেরোয়। পুরুষরা ভিক্ষা করে না। কেবল মেয়েদের সঙ্গে থাকে। ভিক্ষা করা ছাড়াও থানার লোকেদের সঙ্গে কথা-বার্তাও মেয়েরাই করে থাকে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখতে এক গ্রামে একজন গেলে সেখানে আর একজন ভিক্ষা করতে যায় না।

সাধারণতঃ ভিন্ন দলে ছড়িয়ে থাকলেও প্রয়োজনমত এক দল অন্য দলের সঙ্গে থানার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। যদিও তার খুব একটা প্রয়োজন ওদের হয় না। এদের গতিবিধি সম্পর্কে থানায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গেজেট রাখা হয় এবং তার দ্বারাই আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। ছেলেমেয়ে বিবাহযোগ্য হলে পাত্রপাত্রী খোঁজার জন্য ওদের ব্যস্ত হতে দেখা যায় না। কারণ প্রতিনিয়ত পরিক্রমার পথে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের দেখা হয়েই যায়। সেখানে যদি বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়ে থাকে তবে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করে।

স্বামীসহ কোরাওল দলনেত্রী

দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা এদের অতি অল্প ও তা সাধারণ। সম্পত্তি বলতে বোঝায় দু-একটা গরু, গাধা, কুকুর ও মুরগী এবং সামান্য কিছু এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি-কড়া। বিছানাপত্র যা থাকে তা ছোট দড়ির খাটিয়ার উপর ভাঁজ করা থাকে। এই খাটিয়া শোয়া-বসার জন্য বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। ভূমিশয্যাই এদের পছন্দ। অবস্থাপন্ন দলে তাঁবু গোছের জিনিসও থাকে। তবে সাধারণতঃ আকাশের নীচে গাছের ছায়াতেই ওরা শয্যা রচনা করে। একসঙ্গে থাকলেও প্রত্যেক দলনেত্রীর পৃথক পৃথক খাটিয়া, গরু, গাধা ইত্যাদি থাকে। গরু, গাধা মাল বইবার কাজে লাগে। দরকার মত যাতে মুহূর্তের মধ্যে আস্তানা গুটিয়ে নিতে পারে সেজন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। একেক জায়গায় এদের বাস দুই থেকে চার দিন। কারণ কোন থানার লোকেরাই বেশী দিনের জন্য এদের ঝক্কি নিতে চায় না।

জীপসীদের পোশাক সাধারণতঃ রং-চংয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু কোরাওলদের পোশাক তেমন আড়ম্বরপূর্ণ নয়। ছেলেরা ধুতি-সার্ট পরে। মেয়েরা শাড়ীকে ঘাঘরার মত পরে। উর্ধ্বাঙ্গে একটা ঢিলে সার্টই যথেষ্ট। মেয়েদের পায়ে চটি দেখা গেলেও পুরুষরা খালি পায়ে চলতে অভ্যস্ত। গয়নাপত্র উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

'চল মুসাফির' জীবনে পূজার্চনার অবকাশ খুবই সামান্য। তবু ভগবানে বিশ্বাস রয়েছে। নিজেদেরকে হিন্দুই মনে করে। মৃত্যুর পর শবদাহ বিধি। দলের লোকেরাই সৎকারের ব্যবস্থা করে ও সমারোহের সঙ্গে ভোজের আয়োজন করে।

তখন অপরাহ্নের মেঘে দিনান্তের রং ছিল লেগে। পূবে হাওয়া বার বার এসে দুলিয়ে দিচ্ছিলো পাতাবাহারের লতা বাগানের বেড়ার গায়ে গায়ে। শর্‌শর্‌ শব্দ উঠছিল আস্তে আস্তে। আর হাওয়ায় শিউরে ওঠা শ্বেতকরবীর ডালে বসে দোল খাচ্ছিলো একটা কালোবুটিদার হলদে প্রজাপতি। সেই প্রজাপতিটাকেই একদৃষ্টে দেখছিলেন অমিতাভ চৌধুরী।

ভারী সুন্দর তো প্রজাপতিটা! ভাবছিলেন অমিতাভ। অথচ কত ক্ষণস্থায়ী ওর জীবন! কিন্তু শুধু ঐ প্রজাপতিটারই কি? বলতে গেলে মানুষের জীবনও কি খুব ছোট নয়? এই তো তাঁর নিজেরই জীবনের

অবেলায়

পারিজাত মজুমদার

নর্চল্লিশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল টের টেরই পেলেন না। প্রায় স্বপ্নের মত লাফিয়ে নামা ঝর্ণার মত চোখের নিমেষে টে পালিয়ে গেল যেন এতগুলো বছর র দেহের ওপর দিয়ে তাঁর অজ্ঞানতে।

দূরে ঢেউ-খেলানো, রক্তাভ প্রান্তরের রে বনশ্রেণীর কোলে কোলে দিনশেষের য়া নামছে গভীর হয়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত ঐ অরণ্যভূমি কতদূর গেছে? কত দূর?

সূর্যাস্ত হতে এখনো কিছু দেরী। রুক্ষ বাদামী মাটির বুকে এখানে ওখানে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘ বন্য ঘাসের ঝোপ—ছোট ছোট জলার পাশে পাশে। মাঠের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা সরু খাল। খালটা মানুষের হাতে কাটা না প্রাকৃতিক কে জানে!—দূরে পঞ্চকোটের উন্নত শ্যামশীর্ষ দেখা যায়...

'সাহেব্‌!'

'কিরে?' চাকর শরতের ডাকে ফিরে তাকালেন অমিতাভ চৌধুরী।

'আজ রাতে কি রান্না হবে?'

'তোর কি ইচ্ছে?'

'আজ বিরিয়ানী করি?' পোলাও বিরিয়ানী রান্নায় হাত পাকা শরতের। এবং

আগে সে কলকাতার হোটেলে কাজ করেছে। তাছাড়া, রবিবারটা মনিবকে একটু ভালমন্দ খাওয়াতে চায় সে।

'মুরগীগুলো একবারেই সব শেষ করে ফেলবি?' হাসলেন অমিতাভ, 'হঠাৎ দরকার পড়লে তখন মুস্কিল হবে। এখানে তো কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না, আর যদি জোর বর্ষাবাদল নামে তো গোঁসাইগঞ্জ যেতেও পারবি না। কাজেই একটু বুঝে-শুনে চালা। আজ বরং নিরিমিষি দিয়েই চালিয়ে দে।'

'মুরগী রাঁধছি না তো আজ'—হাসে শরৎ, 'আজ বাইরে থেকে মাংস এনেছি। খরগোসের মাংস।'

'কোথায় পেলি?'

'সাঁওতালপাড়া থেকে এনেছি। ওদের সঙ্গে আজকাল আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।'

অমিতাভ আর কিছু বলেন না। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শরৎ বলে,—

'যাই চায়ের জল চাপাই গিয়ে।' রান্নাঘরে চায়ের যোগাড় করতে চলে যায় সে।

শ্বেতকরবীর গাছটার দিকে আবার তাকালেন অমিতাভ। এখন আর প্রজাপতিটা নেই সেখানে। কোথায় গেল? এদিক ওদিক তাকালেন অমিতাভ।

ঐ যে, বেড়ার গায়ে গায়ে উড়ছে প্রজাপতিটা, পাতাবাহারের রঙিন পাতার দলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। বসছে না কোথাও।

'এই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করো না!'

হঠাৎ নারীকণ্ঠ শুনে চমকে ফিরে তাকালেন অমিতাভ।

এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, দেখে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীই হবেন, এসে দাঁড়িয়েছেন, বাগানের বেড়ার ধারে। দেখামাত্রই অমিতাভ বুঝলেন এঁরা এ অঞ্চলের বাসিন্দা নন। কারণ প্রসাদপুরের প্রায় সব লোককেই তিনি মোটামুটি চেনেন।

'আচ্ছা, ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসটা কোথায় বলতে পারেন?'—অমিতাভর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন আগন্তুক ভদ্রলোক।

"ঐ যে দূরে একটা বড় বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আমার আঙুলের সোজা,'—হাত বাড়িয়ে দূরে একটা বাড়ীর দিকে নির্দেশ করলেন অমিতাভ, 'ঐটাই হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস।'

'জায়গাটা দেখলে ফ্যাল্লো ল্যান্ড মনে হয়।' চারদিকের আগাছা-ভরা রুক্ষ প্রান্তরের দিকে চেয়ে বললেন আগন্তুক।

'তাই তো বটে।' হাসলেন অমিতাভ, 'এই ফ্যাক্টরী গড়ে ওঠার পরই এখানে লোকবসতি হয়েছে। আসল প্রসাদপুর গ্রামটা এখান থেকে একটু দূরে। এখন অবশ্য এ অঞ্চলটাকেও প্রসাদপুর বলা হয়।'

'আপনি কি এখানে অনেকদিনের বাসিন্দা?'

'আমি? না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। আমি মাত্র বছরখানেক হল এখানে [illegible]। আগে ইঞ্জিনীয়ারিং [illegible] ক্যালকাটা অফিসে কাজ করতুম, এখন বদলি হয়ে এখানে—। ভেতরে আসুন না? দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবেন?'

'ভেতরে যাবো। আমাদের কিন্তু আবার গোঁসাইগঞ্জে ফিরতে হবে।'

'আপনারা গোঁসাইগঞ্জে থাকেন?'

'না না। মাত্র কাল রাতে এসেছি। ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে পোস্টিং নিয়ে এসেছি। কিন্তু কোয়ার্টার পাইনি এখনো। তাই গোঁসাইগঞ্জেই উঠেছি একটা হোটেলে। অবশ্য সে যা হোটেল। কিন্তু এদিকে তো তাও নেই শুনেছি!'

'আপনি ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসে কাজ নিয়ে এসেছেন? তাই বলুন। আসুন ভেতরে আসুন। আপনার কোনো চিন্তা নেই। আমাদের চেনা সাইকেল রিকসা-ওয়ালা আছে। কাছেই থাকে, তাকে আমার চাকর ডেকে এনে দেবে।' বাগানের ছোট গেটটা খুলে ধরলেন অমিতাভ।

বাড়ীর ভিতর ঢুকতে ঢুকতে আগন্তুক ভদ্রলোক বলেন, 'আমার নাম বিনয়েন্দ্র বোস। আর ইনি হচ্ছেন মিসেস শমিতা বোস। আপনার নামটা—?'

'অমিতাভ চৌধুরী।'

বসবার ঘরখানি বেশ ছিমছাম। ঘরের একপাশে দুখানা আলমারি ভর্তি বই। বিপরীত প্রান্তে শ্বেতপাথরের ছোট গোল টেবিলের ওপর দুধ-রঙের ফুলদানিতে পাতাবাহার আর জংলা ফুলের তোড়া। ঘরের মাঝখানে নীচু বেতের টেবিল, তার চারপাশে খানকয়েক বেতের চেয়ার। জানলা-দরজায় দুলছে ভারী নীল পর্দা, সাদা রেশমের কাজ করা। ঘরের মেঝেয় বিছানো সুদৃশ্য নীল কার্পেট।

'বেশ ভালোই কোয়ার্টার পেয়েছেন দেখছি।' চেয়ারে বসে চারদিক দেখতে দেখতে এই প্রথম কথা বললেন শমিতা বোস।

'হ্যাঁ, তা মন্দ নয়।' উত্তর দিলেন অমিতাভ।

'এই ফার্নিচার, ঘরের পর্দা কার্পেট এসব কি আপনার অফিস থেকে দিয়েছে, নাকি—।'

প্রশ্নটা সমাপ্ত করেন না বিনয়েন্দ্র।

'এই বেতের টেবিল-চেয়ারগুলো ওরাই দিয়েছে। তবে ঐ শ্বেতপাথরের টেবিলটা, এই আলমারি, তারপর এই ঘরের পর্দা আর কার্পেট,—এসব আমিই আনিয়েছি। পর্দা অবিশ্যি ছিল আগে থেকেই, কিন্তু সে ভালো নয় বলে আমি এগুলো কিনেছি।'

'আপনার বেশ আর্টিস্টিক টেস্ট আছে, ঘর-সাজানো দেখেই বুঝছি।' বলেন শমিতা, 'শোফা-কোচের ভারে জর্জরিত করে ফেলেন নি ঘরটাকে!'

'কিন্তু আসল পরিকল্পনাটা কার সে খোঁজ নিয়েছ?' সহাস্যে বলে ওঠেন বিনয়েন্দ্র, 'হয়তো এসবই মিসেস চৌধুরীর পছন্দ। তাঁর হুকুমেই উনি যা কিছু করেছেন।'

'[illegible] কথা মনে করিয়ে দিয়েছ!' বলে ওঠেন শমিতা স্বামীর দিকে চেয়ে, তারপর অমিতাভর দিকে ফিরে বলেন, 'কই, মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে তো এখনো আলাপ হল না!'

'তাঁর সঙ্গে আলাপ না হয় নাই হল!' রহস্যময় হাসি হাসেন অমিতাভ।

ব্যাপারটা কি? শমিতা আর বিনয়েন্দ্র মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করেন পরস্পরের।

হো-হো করে এবার হেসে ওঠেন অমিতাভ। বলেন, 'আমার এই ওয়ার্ল্ড হাফটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হবে আপনাদের, কারণ আমার বেটার হাফ নেই। আয়্যাম ওয়েডেড টু দ্যাট ওয়ার্ল্ড অব বুকস!' আলমারির বইগুলোর দিকে চোখের নির্দেশ করেন তিনি।

'ব্যাচিলার!' বিস্মিত কণ্ঠ বিনয়েন্দ্রের।

'হ্যাঁ, কনফার্মড ব্যাচিলার!' কনফার্মড কথাটার ওপর অনাবশ্যক জোর দেন অমিতাভ।

'আপনি তো তবে সত্যিকার স্বাধীন আর সুখী লোক মশাই। নিন এর সিগারেট খান।' সিগারেটের টিন খুলে ধরে বিনয়েন্দ্র।

'নো, থ্যাংকস।'

'সেকি? ব্যাচিলর, অথচ ধোঁয়ার নেশা নেই? আমি তো মশাই চেইন-স্মোক ম্যারেড হয়েও।'

'কি করব বলুন।' হাসেন অমিতাভ 'সিগারেট, ড্রিঙ্কস, কিছুর মধ্যেই রস পাই না আমি। অথচ পরীক্ষা করেছি সবকিছু নিয়েই।'

'তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনি একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ!' সহাস্য মন্তব্য করেন শমিতা।

'সম্পূর্ণ?' হাসতে গিয়েও কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠেন অমিতাভ। তারপর বলেন, 'মানুষ কি কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে?—আপনি কি বলেন?' বিনয়েন্দ্রর দিকে তাকান তিনি।

'স্বয়ংসম্পূর্ণ?' একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন বিনয়েন্দ্র, 'তা জানি না মশাই। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, ম্যারেড লোকের তুলনায় ব্যাচিলররা অনেক স্বাধীন। আমাদের তো নিজস্ব বলতে কিছু নেই। আধখানা সেলফকে একবারে মেরে ফেলতে হয়েছে!' কপট অসহায়তার ভঙ্গি করেন বিনয়েন্দ্র।

'ওটা তোমার সম্পর্কে নয়, বরং আমার সম্পর্কে প্রযোজ্য!' বলে ওঠেন শমিতা।

'আসল কথা কি জানেন? কোনো মানুষই নিজের অবস্থায় সুখী নয়।' হাসেন অমিতাভ, 'আমি ভাবি আপনি খুব সুখী, আপনি ভাবেন আমি খুব সুখী, সেই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস। আর বিয়ের সম্বন্ধে তো কথাই আছে, দিল্লী কা লাড্ডু, যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া ওভি পস্তায়া। আচ্ছা, আপনারা বসুন [illegible] আসছি।'

[illegible] ঘরে গিয়ে শরৎকে তিনজনের [illegible] খাবার আনতে নির্দেশ দেন অমিতাভ। ফিরে এসে দেখেন আলমারির [illegible] বইগুলোর [illegible] ঝুঁকে হয়ে [illegible]

নাম পড়তে চেষ্টা করছেন শমিতা। বিনয়েন্দ্র সিগারেট টানছেন আপন মনে।

'অতো কষ্ট করতে হবে না আপনাকে।' হাসতে হাসতে আলমারির পাল্লা খুলে দেন অমিতাভ। বলেন, 'নিন, যে বই আপনার ইচ্ছে বার করে দেখুন। ইচ্ছে হলে পড়ার জন্যে নিয়ে যেতেও পারেন।'

'আমার ভারী বইয়ের নেশা।' অমিতাভর দিকে চেয়ে সলজ্জে হাসেন শমিতা। আর এই প্রথম অমিতাভ লক্ষ্য করেন শমিতার চোখ দুটি ভারী সুন্দর। তাঁর মুখের স্বচ্ছ হাসিটিও।

একটা বই বার করে নিয়ে দেখতে দেখতে শমিতা বলেন, 'এখানে কোনো লাইব্রেরী নেই?'

'আছে, তবে সে নামেই। গিয়ে হয়তো দেখবেন সব বইই আপনার পড়া।'

'বইয়ে যে কি রস পান আপনারা, আপনারাই জানেন।' স্বস্থানে বসেই বলে ওঠেন বিনয়েন্দ্র, 'শুকনো পাতাগুলো অক্ষরে ভর্তি। জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার তো দু'পাতা পড়তে গেলেই মাথা ঝিমঝিম করে!'

'দেখলেন তো?' অমিতাভর দিকে চেয়ে শমিতা বলেন, 'খালি আমাকে বই-পড়া নিয়ে খোঁটা দেন উনি!'

'কোথায় যেন পড়েছিলুম দাম্পত্য কলহ হচ্ছে renewal of love—প্রেমের পুনরুজ্জীবন!' সহাস্য মন্তব্য করেন অমিতাভ।

'না, উনি সত্যিই বই-পড়া পছন্দ করেন না, বিশ্বাস করুন। অথচ যখন স্টুডেন্ট ছিলেন, ওঁকেও কি অনেক বই পড়তে হয় নি? বলুন?'

'আরে সে তো তোমার ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বই। সব প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্লড-এর ব্যাপার! কবিতা-টবিতার বই কিংবা দর্শন-টর্শনের বই আমি জীবনে পড়ি নি!' উত্তর দেন বিনয়েন্দ্র।

'ও, আপনি তবে সিবিল ইঞ্জিনীয়ার-এর পোস্টটায় এসেছেন?'—বিনয়েন্দ্রের দিকে ফিরে বলেন অমিতাভ, 'যে পোস্টটা কিছু-দিন আগে অ্যাডভার্টাইজ করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

শরৎকে চা-খাবারের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকতে দেখে অমিতাভ শমিতার দিকে ফিরে বলে ওঠেন, 'আসুন, এবার একটু গলা ভিজিয়ে নিন।'

এগিয়ে এসে শমিতা বলেন, 'বাব্বা! এত!'

'এত কোথায়? এ তো খুব সামান্য!' প্রতিবাদ করেন অমিতাভ, 'এখানে কিছুই পাওয়া যায় না! মিষ্টি কি চপ-টপ যে আনাবো তার উপায় নেই!'

'আরে না মশাই, এ তো অনেক!' বলে ওঠেন বিনয়েন্দ্র, 'টোস্ট, ওমলেট, কাজুনাটস আবার কি চাই? চায়ের সঙ্গে আপনি কি ডিনার খাইয়ে দিতে চান নাকি?'

খেতে খেতে বিনয়েন্দ্র বলেন, 'আপনি কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন তা তো এখনো জানা গেল না!'

'আমি আছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এ।'

চা-পানের পরেও কথাবার্তা চলতে থাকে। গল্পে গল্পে ক্রমে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়। বিনয়েন্দ্র হঠাৎ ঘড়ি দেখে বলে ওঠেন, 'সাড়ে আটটা বাজে। এবার উঠি। আপনার সেই সাইকেল-রিকসাওয়ালাকে কাইন্ডলি ডেকে আনতে বলুন আপনার বয়কে।'

'যাবেন? আচ্ছা—'

অনিচ্ছুকভাবেই অমিতাভ ডাকেন, 'শরৎ!' কি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যেটা পার হয়ে গেল আজ! ভাবতে অবাক লাগে তাঁর। আগন্তুকদের তখনি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু আটকাবেনই বা কি বলে? গোঁসাইগঞ্জ ফিরতে হবে ওদের, পথ অনেকখানি। তার ওপর খুব নিরাপদও নয় রাস্তাটা। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার পথ, ধারে-কাছে লোক-বসতি নেই...। তবে রিকসাওয়ালা হরিপদ। তার সওয়ারির ওপর চট করে হামলা করতে সাহস করবে না কেউ। ঐটুকুই যা ভরসা।

শরৎ এসে দাঁড়াতে অমিতাভ বলেন, 'হরিপদকে একবার ডেকে আন। এঁরা গোঁসাইগঞ্জ যাবেন সাইকেল-রিকসায়। বলবি, তাড়াতাড়ি আসতে।'

'যদি ও ঘরে না থাকে?'

'এখন থাকবে। এখানে আর সওয়ার কোথায় এত রাতে?'

'এত রাত?' হাসেন বিনয়েন্দ্র।

'এখানে তো তাই। আপনি পথে যেতে যেতেই দেখবেন কি অন্ধকার আর কি নিঃঝুম চারদিক। পথের দুধারে ঝোপ-জঙ্গলও পড়বে।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে হাজির হয় হরিপদ। লিকলিকে শরীর, কিন্তু কথা-

বার্তায় খুব চটপটে। হাবভাব দেখে মনে হয় সাহসীও বটে।

হরিপদর হাতেই বিনয়েন্দ্র আর শমিতাকে জিম্মা করে দেন অমিতাভ। বলেন, 'এ'রা আমার বিশেষ বন্ধু। এখানে নতুন এসেছেন। তুমি এ'দের একটু দেখা-শুনো কোরো।'

'সে আপনাকে বলতে হবে না! আমার যেটুকু ক্ষেমতা আমি করব।' উত্তর দিলে হরিপদ, তারপর বিনয়েন্দ্রের দিকে ফিরে বললে, 'আপনাদের যা কিছু দরকার হয় আমায় বলবেন। বাজার-হাট কি অন্য কোনো কাজ! যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়, তাহলেও আমি আছি, আমি এ তল্লাটে বহুদিন রয়েছি। যে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে হরিপদ কেমন ছেলে।'

ছেলে! কথাটা শুনে হাসি পেলো বিনয়েন্দ্রের। 'ছেলে' বলবার বয়েস আছে কি হরিপদর? অন্ততঃ চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কম তো হবে না ওর বয়েস!

যাই হোক, মিনিট কয়েকের মধ্যেই হরিপদর সাইকেল-রিক্সায় উঠে বসলেন বোস দম্পতি। অমিতাভ বললেন, 'আবার আসবেন।' পরক্ষণেই জোরে ছুটতে শুরু করলো রিক্সাটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সামনে অনেকখানি ঢালু রাস্তা। অতএব স্পীডেই রিক্সা চালাতে পারবে হরিপদ। কিন্তু তারপর কিছুটা চড়াই আছে। তারপর আবার ঢালু, আবার চড়াই। গোঁসাইগঞ্জ পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ওদের? আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন অমিতাভ।

ওরা অবশ্য গোঁসাইগঞ্জের মুখেই নামবে না। হোটেলে যাবে। ওখানে রেসিডেন্শিয়াল হোটেল বলতে তো ঐ একটিই আছে। সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা কেমন? খুবই কি খারাপ?

ভাবতে ভাবতে শমিতার মুখটা ভেসে উঠলো তাঁর চোখের সামনে।

* * *

অফিসে বসে কাজ করছিলেন অমিতাভ। এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

'হ্যালো, অমিতাভ চৌধুরী স্পীকিং।'

'আমি বিনয় বোস কথা বলছি।' সাড়া এল ওদিক থেকে।

'মিস্টার বোস! অফিস থেকেই কথা বলছেন তো, নাকি—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অফিস থেকেই কথা বলছি, নিজের রুম থেকে। একটু আগে দোতলায় গিয়ে আপনার ঘরে উঁকি মেরে দেখলুম অনেক লোকের ভিড়, তাই আর গেলুম না। এখন কি ফ্রী আছেন?'

'হ্যাঁ, এখন ফ্রী।'

'তবে একটু চলে আসুন না নীচে। আমার এখানে এখন একদম ফাঁকা।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি।'

অমিতাভ আসতেই বিনয়েন্দ্র বলেন, 'আসুন। আপনি তো আর আজকাল আমার খোঁজখবরই নেন না। অথচ এই নতুন জায়গায় আপনার সাহায্য না পেলে কি করে চালাই বলুন তো?' আয়েস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়েন বিনয়েন্দ্র।

'সেকি মশাই?' হেসে ফেলেন অমিতাভ, 'এই পরশু তো এসে আপনার খোঁজ নিয়ে গেলুম, আর আপনি এই অভিযোগ করছেন?'

'পরশু আর আজকের মধ্যে অনেক তফাৎ! মাঝখানে একটা গোটা দিন, একটা গোটা রাত। তার মধ্যে মানুষ মরতে পারে, অ্যাক্সিডেন্টে জখম হতে পারে, কতকিই তো হতে পারে।'

'তা অবশ্য পারে।' বিনয়েন্দ্রের হাসিতে যোগ দেন অমিতাভ।

'তারপর কি খাবেন বলুন, চা না কফি?'

'এখানকার যা কফি, দুধের বংশ নেই! চা-ই বলুন।'

বেয়ারাকে ডেকে বিনয়েন্দ্র বলেন, 'একটা বড় পট চা, আর খাবার যা কিছু পাও নিয়ে এসো ক্যান্টিন থেকে। চপ, মিস্টি, কেক যা পাও দুজনের মত আনবে।' তারপর অমিতাভর দিকে ফিরে বলেন, 'কিছুই পাবে কিনা সন্দেহ! কি যে জায়গা মশাই আপনাদের।'

'ভাববেন না। দুদিন বাদেই এটা আপনার জায়গাও হবে।'

'আপনি মশাই হাসছেন! কিন্তু এখানে চিরকাল বাস করতে হবে মনে হলে আমার গায়ে জ্বর আসে। কেন যে মরতে এই পোস্টটার জন্যে অ্যাপ্লাই করতে গেলুম বেশী মাইনের লোভে! বেশ ছিলুম পুরোনো অফিসটায়। মাইনে কম হলেও তো কলকাতায় থাকতে পেয়েছিলুম।'

'গতস্য শোচনা নাস্তি।' বলেন অমিতাভ, 'এখন এই জায়গাটাকেই ভালো-বাসতে চেষ্টা করুন। এখানেও কিছু কিছু দেখবার জিনিস আছে। এই যে জঙ্গলটা—কতো অজানা গাছ আর ফুল যে আছে ওখানে! একটা ছোট নদীও আছে ভেতরে, বেশ স্বচ্ছ তিরতিরে জল। জলের তলায় বালি আর নুড়ি চিকচিক করে।'

'আরে মশাই রেখে দিন ওসব কাব্য! ঝোপ-জঙ্গলে আবার দেখার কি আছে? ওখানে গেলে লাভের মধ্যে হবে শুধু সাপের কামড় খাওয়া। এ অঞ্চলটাই তো সাপের আড্ডা শুনেছি।'

সাপ অবশ্য এ অঞ্চলে খুব। অস্বীকার করতে পারেন না অমিতাভ।

'আর আপনি যাকে নদী বলছেন, শুনেই বুঝেছি সে তো আসলে একটা নালা! ওর মধ্যে দেখবার কি আছে বলুন তো?' বলেন বিনয়েন্দ্র।

এ লোকের কাছে অরণ্য-সৌন্দর্যের কথা তোলাই ভুল। বুঝতে পারেন অমিতাভ। ভাগ্যে আদিবাসীদের কথাও বলে ফেলেননি তিনি! —বলে ফেলেননি যে পূর্ণিমা রাত্রিতে যখন নিবিড় বনশ্রেণীর মাথায় ওঠে রুপোলী চাঁদ, আর বনফুলের মালা পরে এখানকার ছেলেমেয়ের দল সেই জ্যোৎস্না-লোকে নাচে দামামার তালে তালে, তখন এক অপরূপ স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়। শুনলে বিনয়েন্দ্র কি বলতেন—'দূর মশাই, কতক-গুলো ইয়ে, মেয়েমদ্দ সব মিলে হাঁড়িয়া খায়!'

'আচ্ছা, এখান থেকে মাইল বারো-তেরো দূরে নাকি একটা কালীমন্দির আছে। সেটা নাকি পীঠস্থান শুনেছিলুম?' এবার আসল কথায় আসেন বিনয়েন্দ্র।

'পীঠস্থান? জানি না তো। তবে হ্যাঁ, নয়মডাঙার কালীমন্দিরটা বিখ্যাত বটে এ অঞ্চলে। জায়গাটা বেশ সুন্দর। পাশেই একটা আশ্রমও আছে।'

'ওখানকার কালী নাকি খুব জাগ্রত শুনতে পাই?'

জাগ্রত! অমিতাভ তা জানেন না। তবে জায়গাটা সুন্দর বলে বেড়াতে যান মাঝে মাঝে।

বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকে এসে।

'নিন, চা খান।' কাপে চা ঢেলে অমিতাভর দিকে এগিয়ে দেন বিনয়েন্দ্র, 'চপ আর দরবেশ পাওয়া গেছে, কি সৌভাগ্য! আমি তো ভাবছিলুম আপনাকে শুধু চা-ই খাওয়াতে হবে।'

'গরমও রয়েছে দেখছি!' চপে কামড় দিয়ে সহাস্যে বলেন অমিতাভ।

'একদিন আমাদের কালীমন্দির দর্শনের ব্যবস্থা করুন। আমি তো এদিকের কিছুই চিনিটিনি না, আপনার ওপর সব ভার দিয়ে দিচ্ছি। গাড়ীর ব্যবস্থা-টবস্থা যা কিছু করতে হয় সব আপনার দায়িত্ব! আমি শুধু টাকা দিয়ে খালাস হবো, বলে দিচ্ছি কিন্তু।'

'বেশ। কবে যাবেন বলুন।'

'এই রোববারেই চলুন। শমিতা পুজো দেবার জন্যে খেপেছে।'

শমিতা পুজো দেবার জন্যে খেপেছে! খট করে কানে লাগলো কথাটা। কই, শমিতাকে দেখে তো তেমন মনে হয়নি একবারও।

না। ও রূপে কল্পনা করা যায় না শমিতাকে। মন বিদ্রোহ করে। বরং শমিতাকে কল্পনা করা যায় এই রূপে। সাদা শান্তিপুরী শাড়ী পরে চুল এলিয়ে দিয়ে গুলমোহর গাছের ছায়ায় ঝরাফুলের রাশির ওপর পা ছড়িয়ে বসে আপনমনে পড়ছেন ব্রাউনিং-এর 'লাস্ট রাইড টুগেদার' কিংবা কোমরে শাড়ী জড়িয়ে বাগানের মাটি কোপাচ্ছেন হলদে গোলাপের চারা পুঁতবার জন্যে।

'আপনি তবে সব ব্যবস্থা করে আমায় জানাচ্ছেন শনিবারের মধ্যে?' বলেন বিনয়েন্দ্র।

'হ্যাঁ।'

সত্যিই সব ব্যবস্থা করেন অমিতাভ। তাঁর এক বন্ধুর মারফৎ যোগাড় করা জীপে করে রবিবার ভোরে যাত্রা করেন সবাই। বিনয়েন্দ্র, শমিতা, আর অমিতাভ নিজে।

জীপ ছুটছে ঝড়ের বেগে। দুধারে ধান আর সবজীর ক্ষেত। সকালবেলার হাওয়া তীরবেগে এসে বিঁধছে সকলের চোখে-মুখে।

পলকমাত্র পরিষ্কার!

বন্‌বন্‌
কালো আর বেইজ
সাইজ ৫ থেকে ৮ : ৬.৯৫
৯ থেকে ১২ : ৭.৯৫
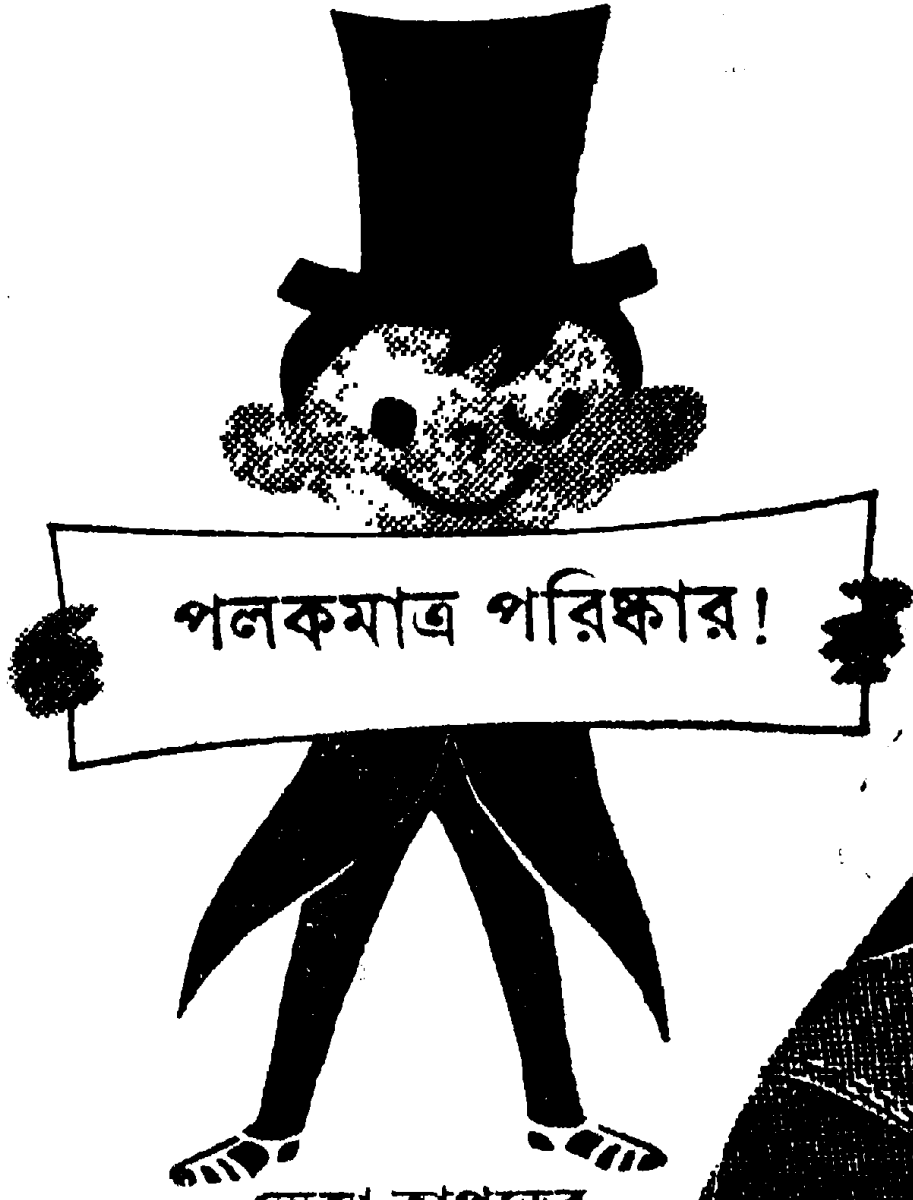
ভেজা কাপড়ের
এক ঝাপটায়
ময়লা দাগ
নিমেষে উধাও

দৌড়। ঝাঁপ। লাথি। লাফ। চিৎপটাং। স্বাস্থ্যবান ছেলে-মেয়েদের সকল রকম ধকল সইবে এমন জুতো বাটা স্যানডাক্ কেমিলন—নতুন যুগের নতুন জুতো। আধুনিক নকশা আর চকমকি রঙদার—ছোটদের মন মাতাবে এমন জুতো স্যানডাক্। যেমন স্টাইল তেমন টেকসই। ফ্যাশান-মাফিক—তাই বলে ফ্যাশানসর্বস্ব নয়। আর, নিটোল ফিট্—দিনের পর দিন। এ-কথা ঠিক—এর চেয়ে মজবুত জুতো ছোটদের জন্য আর নেই। হাজার ব্যবহারেও আশ্চর্য অটুট এর গঠন। আর, যত ঝড়ই এর উপর দিয়ে যাকনা কেন, দেখতে থাকে চিরনতুন—যেন এখুনি কেনা। নতুন যুগের যন্ত্রবিজ্ঞানেই এ সম্ভব, আর কেমিলন—অপূর্ব এক রাসায়নিক মিশ্রণ, বহু বছর গবেষণার ফল।

আর, ধুলো-ময়লা-কাদা—স্যানডাক্ উপহাসে উপেক্ষা করে! মায়েদের কাছে এ সানন্দ সংবাদ। কলের জলের নিচেই হোক, বা ভেজা কাপড়ের এক ঝাপটায় ধুলো-কাদা যত ময়লা—ম্যাজিকের মতো—নিমেষে উধাও।

নতুন যুগের এই নতুন জুতো আপনার ছেলেমেয়েদের চমৎকার মানাবে। আজই নিয়ে আসুন বাটার দোকানে।

ছেলেমেয়েদের জন্য Bata

স্যানডাক্*

কেমিলন*
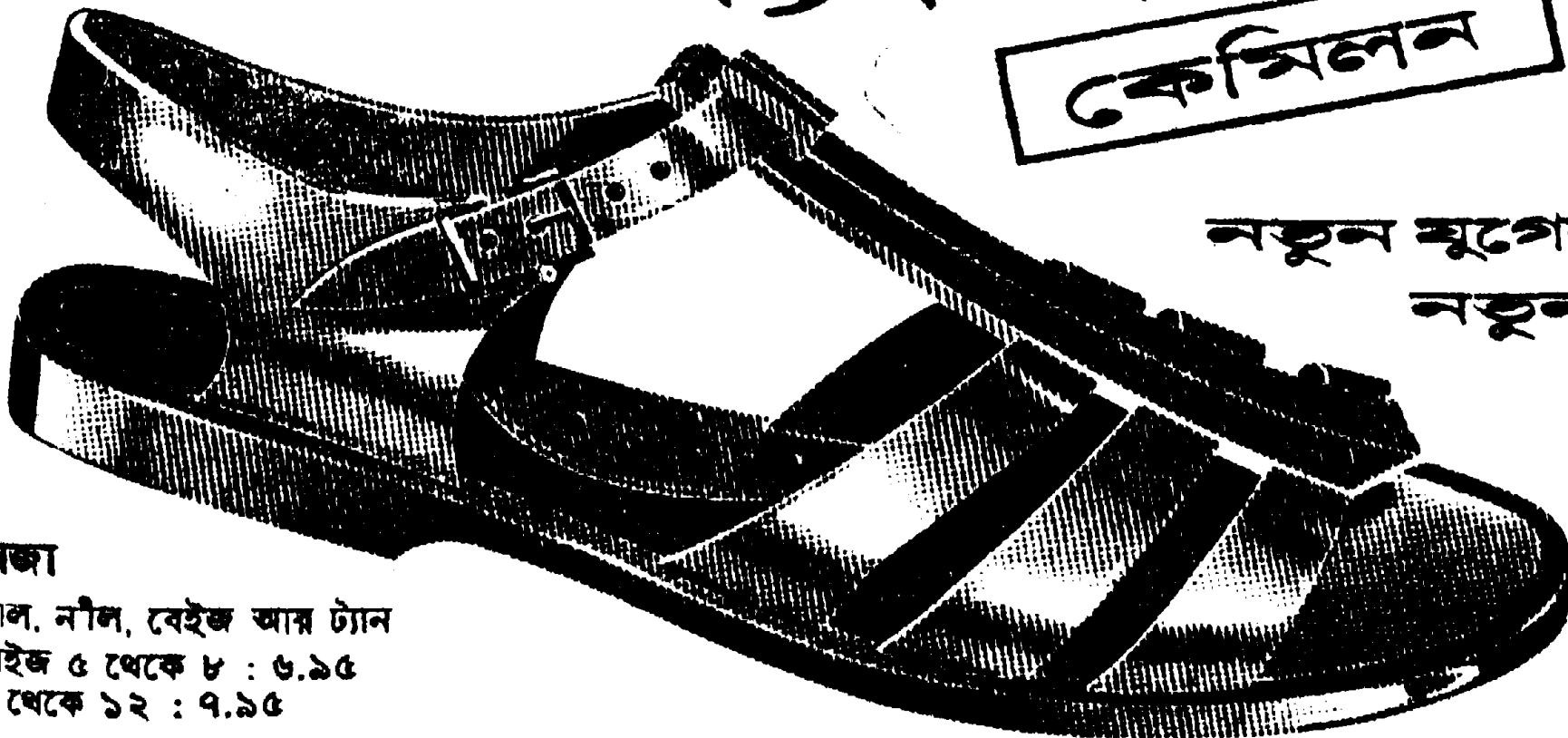
নতুন যুগের
নতুন জুতো

রাজা
লাল, নীল, বেইজ আর ট্যান
সাইজ ৫ থেকে ৮ : ৬.৯৫
৯ থেকে ১২ : ৭.৯৫

* রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক'স। বাটা-অনুমোদিত-বিধি মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত

'কি ভালো যে লাগছে!' দু'পাশের দৃশ্যের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেন শমিতা।

শমিতার পরনে আজ কালো—ভেলভেট-পাড় ঘিয়ে রং-এর শাড়ী। কপালে তারার মত চন্দনের টিপ ঝিকমিক করছে। চুল এলোখোঁপা করে বাঁধা, মুখের ওপর এসে পড়েছে চূর্ণকুন্তল—ঝোড়ো হাওয়ায়। তাঁর কাজলবিহীন, দীর্ঘপক্ষ্ম চোখ দুটিতে যেন কোন ধরা-না-দেওয়া সুদূরের স্বপন। শমিতার পাশে বিনয়বাবুকে দেখে বার বার একটা তুলনাই মনে আসে অমিতাভর—একঝাড় তাজা রজনীগন্ধার পাশে একটা প্রকান্ড কুমড়ো! মূর্তিমতী কবিতার পাশে মূর্তিমান গদ্য!

'পঞ্চকোটের মাথাটা কি সুন্দর দেখুন!' অমিতাভর দিকে চেয়ে বলেন শমিতা, 'আঃ, কি ঘন সবুজ অরণ্যে ঢাকা! ওখানে গিয়েছেন কোনোদিন?'

'অনেক বার।'

'আমাদের নিয়ে চলুন না একদিন।'

'আপনারা রাজী থাকলে আমার আর আপত্তি কি!'

'আমি তো সব সময়েই রাজী। কিন্তু মিস্টার বোসকে রাজী করাবার ভার আপনার ওপর। উনি বেড়াতে একদম ভালোবাসেন না, আর আমার অবস্থা কি রকম জানেন? সেই—

সুদূর বিপুলে সুদূর, তুমি যে বাজাও
ব্যাকুল বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সেকথা
যে যাই পাশরি!'

বিনয়েন্দ্র কোনো কথা না বলে নীরবে সিগারেট টানতে থাকেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে অমিতাভ বুঝতে পারেন, বিনয়েন্দ্র এসব আলোচনা বিশেষ পছন্দ করছেন না। শমিতা কিন্তু ওসব লক্ষ্য করেন না। দূরের ক্ষেতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলেন, 'আমি চঞ্চল হে—গানটা আমার বড়ো ভালো লাগে। মানুষের মনের ব্যথাটাকে কি আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ! মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সেকথা যে যাই পাশরি!...আপনার ভালো লাগে না ও গানটা?'

'খুব বেশী রকম ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলো আমার সব চাইতে প্রিয় তার মধ্যে একটা হল—আমি চঞ্চল হে আরেকটা—যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি, আরেকটা হল—ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু আরেকটা—'

'ও গুনে গুনে পার পাবেন না আপনি!' হেসে ওঠেন শমিতা, 'একটা একটা একটা করে দেখাবেন প্রায় বেশীরভাগ গানই কোনো বিশেষ মুহূর্তে ভালো লাগে।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি।'

অমিতাভর কথা শেষ হতে না হতে গাড়ীর গতি শ্লথ হয়ে আসে।

'এসে গেছি!' চারপাশে চেয়ে বলে ওঠেন অমিতাভ।

সুরকি-ঢালা, উঁচু-নীচু পথ। দুধারে ছোট ছোট মাটির ঘর-বাড়ী। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ছোটখাটো ঝোপঝাপ। অদূরে একটা ছোট পাহাড়, গাছ-পালায় ছাওয়া।

'ও পাহাড়টার নাম কি?' জিজ্ঞেস করেন শমিতা।

'জয়কালী পাহাড়।' উত্তর দেন অমিতাভ।

'মশাই কিছু খাওয়ান দিকি। সকালবেলা তো এক কাপ চা খেয়েও বেরোইনি। পেট চুঁই-চুঁই করছে!' বলে ওঠেন বিনয়েন্দ্র।

'যাচ্ছি যাচ্ছি, যেখানে ভোজনের ব্যবস্থা আছে সেখানেই যাচ্ছি।' হাসতে হাসতে বলেন অমিতাভ।

কয়েক পা গিয়েই একদিকে মোড় নেন অমিতাভ। চলতে থাকেন সঙ্কীর্ণ এবড়ো-খেবড়ো মাটির পথ ধরে। পথটার দুধারে খড়ের চালার নীচে বসেছে সারি সারি দোকান। কোথাও বিক্রী হচ্ছে গরম গরম কাঁকনি জিলিপি, কোথাও সন্দেশ-রসগোল্লা, কোথাও মনোহারী জিনিস, আবার কোথাও বা ফুলপাতা।

খানিকটা এগিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন দোকানে ঢুকে পড়েন অমিতাভ। গিয়ে বসেন লম্বা, কাঁচা-কাঠের বেঞ্চিতে। তাঁর পিছন পিছন শমিতা আর বিনয়েন্দ্রও এসে বসে পড়েন।

জলযোগান্তে সেই দোকান থেকেই এক-হাঁড়ি সন্দেশ কেনেন বিনয়েন্দ্র। তারপর দোকানের বাইরে এসে বলেন, 'দুখানা সরা কিনতে হবে, আর কিছু ফুল। সরা কোন্‌খানটায় পাবো বলুন তো?'

'একটু এগোলেই পাবেন।' বলে নিজেই এগিয়ে যান অমিতাভ, তারপর শমিতার দিকে ফিরে হাসিমুখে বলেন, 'কিছু মানত্ টানত্ আছে নাকি আপনার? মিস্টার বোসের কাছে শুনেছিলুম আপনি এখানে পুজো দেবার জন্যে খুব ইগার্ হয়ে উঠেছেন?'

এ কথায় কিন্তু কোনো সাড়া দেন না শমিতা—না হাসি দিয়ে, না কথা দিয়ে। এবং তাঁর মুখটা যেন একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। অমিতাভ অবাক হয়ে ভাবেন, তাঁরই অজ্ঞানতে তাঁর কথার মধ্যে কি কোনো প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিলো?

পুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ হলে মন্দিরে এসে প্রবেশ করেন সবাই মিলে। অমিতাভ বলেন, "আমি আর যাচ্ছিনে আজ। আপনারা যান, পুজো দিয়ে আসুন। আমি ততক্ষণ বসছি ওদিকটায়।' মন্দিরের এক-পাশে ছোট্ট একটা ঝর্ণা নামছে প্রকান্ড প্রকান্ড শিলার মাঝখান দিয়ে। সেদিকেই এগিয়ে যান অমিতাভ লম্বা লম্বা পা ফেলে।

সামনেই একটা প্রকান্ড অশ্বত্থ গাছ। তার নীচে ছড়িয়ে আছে শুকনো হলুদে পাতা পাথরের ওপর। দুয়েকটা পাতা পড়েছে ঝর্ণার জলে। ঘুরে ঘুরে চলেছে স্বচ্ছ স্রোতের আবর্তে। জলের প্রায় কিনারা ঘেঁসে একটা উপলখন্ডের ওপর বসেন অমিতাভ।

রোদের তেমন তেজ নেই এখন। সূর্য ঢাকা পড়েছে একখন্ড মেঘের আড়ালে। জয়-কালী পাহাড়ের মাথায় খর্বাকৃতি গাছগুলো এখান থেকে দেখা যায়। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আশেপাশে তাকান অমিতাভ। বেশ কিছু লোক এসে আছে এদিক্-সেদিকে শালপাতায় করে খাবার খাচ্ছে গাছের ছায় পাথরের ওপর বসে। কেউবা মুখ ধু নিচ্ছে ঝর্ণার জলে। চারদিকে গাছ-গাছালি ভিড়। কাছেই একটা বনলতার ঝো লালে-হলুদেয় মেশানো একরকম অচেনা ফু ফুটেছে। তার ঝাঁজালো গন্ধ ভেসে আস হাওয়ায় হাওয়ায়।

বুকের তলায় কেমন একটা ব্যথা অনু ভব করেন অমিতাভ। কি যেন নেই— যেন হারিয়েছে—কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে জীবনের পথচলায়!

মনে হয়, তাঁর হৃদয়টা যেন বহু ধরে তাঁর ব্যস্ত জীবনের এককোণে প ছিল ধুলোয়-মলিন, মরচে-পড়া এক অনাদৃত তানপুরার মত। তারপর সেদিন সেই তানপুরোটা বেজে উঠলো বহু বর্ষের ঘুম ভেঙে, তার নিভৃত অন্ধকা কোণ থেকে, এক অজানা আনন্দের অপরূ মূর্ছনায়।

আরো কতো মেয়েই তো এসেছে তাঁ জীবনে। কিন্তু শমিতার আসা। এ যে আসা নয়—এ যে পরিপূর্ণ একটা সূর্যোদয় মতো! মনে হল যেন যুগ-যুগান্তের অন্ধকার ভেদ করে একটা আলোর জোয় এসে প্লাবিত করে দিলো তার সমস সত্তাকে।

কিন্তু আজ—?

হঠাৎ কেন যেন তালভঙ্গ হল সে আলোর সুরঝঙ্কারে।

'এখানে বসে কবিত্ব করছেন!' বিনয়েন্দ্রের কর্কশ কন্ঠ হঠাৎ বেজে উঠলো কানের কাছে। চমকে ফিরে তাকান অমিতাভ।

'আপনি বেশ এন্‌জয় করলেন এতক্ষণ!' শমিতা বলে ওঠেন, 'আর আমরা ঐ ভিড়ে দাঁড়িয়ে...বাব্বা! একটু বসি।' ছায়া-ঘেরা পাথরের ওপর বসে পড়েন তিনি।

'কিছু না পেতেই বসলে? ধুলো লাগবে!' অসন্তোষ ফুটে ওঠে বিনয়েন্দ্রের কণ্ঠে।

'লাগুক। এখানকার ধুলো তো পবিত্র' হেসে ওঠেন শমিতা। আসল কথা, প্রকৃতির কোলে গিয়ে অতো কৃত্রিম, আঁটসাঁট ভাবে থাকতে ভালো লাগে না তাঁর। কাপড়ে না হয় লাগলোই একটু ধুলো। পায়ে না হয় ফুটলোই দুয়েকটা কাঁটা! ক্ষতি কি তাতে?

'আপনারা বসুন।' অমিতাভর দিকে চেয়ে বলেন বিনয়েন্দ্র, 'আমি বাইরে গিয়ে একটু সিগারেট্ টেনে আসি। মন্দিরের ভেতরে তো ওসব নিষেধ।'

'উনি বরং না খেয়ে দু'একদিন কাটাতে পারেন, কিন্তু সিগারেট ছাড়া ওঁর এক ঘণ্টাও চলে না!' বিনয়েন্দ্র চোখের আড়াল হতে শমিতা বলেন হাসতে হাসতে।

অমিতাভ কোনো কথা না বলে মৃদু হাসেন শুধু। তিনি যে আগের তুলনায় চুপচাপ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন এখন, সেটা চোখ এড়ায় না শমিতার। সকালবেলা যে প্রাণপ্রাচুর্যের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল

অমিতাভর তীক্ষ্ণ, পরিশোধিত মুখের সহজ হাসিতে, তাঁর বাগ্ময়, গভীর চোখের দীপ্ত চাহনিতে, এমনকি তাঁর দীর্ঘ, ঋজু দেহের বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায়, এখন আর তা নেই। হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় শমিতা বলে ওঠেন—

তখন আপনি বলছিলেন না, আমি নাকি খুব ইগার হয়ে উঠেছি পুজোর জন্যে! কিন্তু কথাটা যে কতবড়ো মিথ্যে!' হঠাৎ থেমে গিয়ে একমুহূর্তে ঝর্ণার স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকেন শমিতা। তারপর আবার বলেন, 'জানেন, বাইরের পুজো-আচ্চায় আমার একদম বিশ্বাস নেই। পুজো করতে হলে করবো নিজের মনে। তাও কোনো বাসনা নিয়ে নয়। অথচ ওঁর এইসবে খুব আগ্রহ। আর সেটা চালান আমার নাম দিয়ে। আজ এখানে উনি কেন এসেছেন, জানেন?'

অমিতাভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান শমিতার দিকে। শমিতা বলতে থাকেন, 'আমাদের ছেলেপুলে নেই। হবার সম্ভাবনাও নেই—ডাক্তার বলেছে। তাই পৃথিবীর যেখানে যত ঠাকুর আছে সেখানেই পুজো দেন উনি। আজও একভরি সোনার গয়না মানত করে এলেন।'

সমস্ত ব্যাপারটা যে কতখানি খারাপ লেগেছে শমিতার, নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারেন অমিতাভ।

'ছেলে ছেলে করে উনি পাগল!' শমিতা আবার শুরু করেন, "ওঁকে আমি বহুবার বলেছি, সন্তান ছাড়াও অনেককিছু সৃষ্টি করবার আছে জগতে। বড় বড় শিল্পী বৈজ্ঞানিক আর মহাপুরুষের কথা ভাবো। তাঁদের অনেকেই নিঃসন্তান। কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি কি আরো অনেক মহত্তর সৃষ্টি নয়? বলেছি, এসো আমরা একটা সেবাসদন খুলি শিশুদের জন্যে, কি অমনি একটা কিছু করি। কিন্তু সেদিকে ওঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। আমাদের বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক হল, কিন্তু এতদিনেও ওঁর কোনো পরিবর্তন দেখলুম না!'

শমিতার কথা শুনতে শুনতে অমিতাভর মনের মেঘ কেটে যায়।

'আচ্ছা, প্রেমের মধ্যে কোনো সার্থকতা খুঁজে পান না উনি?' জলের গা ঘেঁসে ওঠা ঘাসের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে জিজ্ঞেস করেন অমিতাভ, 'প্রেম কি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ একটা পরম উপলব্ধি নয়? ধরুন একটি অপরূপ সুন্দর ফুল, সে নাইবা দিল ফল—তার স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যে কি নেই জীবনের কোনো প্রেরণা?'

"ওসব কথা উপলব্ধি করবার মত লোক বলেই কি ওঁকে মনে হয় আপনার?' তিক্ত হাসির সঙ্গে প্রশ্ন করেন শমিতা।

মাথা নীচু করে নীরবে ঘাড় নাড়েন অমিতাভ। তারপর একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন সামনের জলধাবার দিকে, স্তব্ধ হয়ে।

'আচ্ছা, এমন কেন হয়, বলতে পারেন?' শমিতা বলে ওঠেন হঠাৎ, 'যার সঙ্গে যার কোথাও কোনোখানে মিল নেই তার সঙ্গেই তাকে মিলিয়ে দেন ভগবান, আর যার সঙ্গে—!'

অমিতাভ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকান শমিতার দিকে, আর সেই মুহূর্তেই থেমে যান শমিতা। কিন্তু কোনো কথাই বলবার দরকার হয় না। তাঁর নীরব চাহনিতেই অমিতাভ বুঝে নেন্ সমস্তটুকু।

'আজকের এই দিনটা আমার চিরদিন মনে থাকবে।' আস্তে আস্তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন অমিতাভ।

'আচ্ছা—' বলে কি বলতে গিয়ে থমকে যান শমিতা। বেদনায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হবে আসে। অমিতাও চেয়ে দেখেন শমিতার আয়ত সুন্দর চোখদুটি জলে ভরে এসেছে।

'বড়ো দেরী, বড়ো দেরী করে ফেলেছি আমরা!' প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বলেন অমিতাভ, 'যদি আমাদের দেখা হত দশবছর আগে, তখন, তখন কেন তুমি এলে না শমিতা? বড়ো দেরী, বড়ো দেরী করে এলে!'

'আরে মশাই আপনি তো একবারও বলেননি, পাশেই আরেকটা ঠাকুর আছে?'

দুজনেই চমকে মুখ তুলে দেখেন বিনয়েন্দ্র আসছেন দূর থেকেই উঁচু গলায় কথা বলতে।

মুখ মুছবার ছলে রুমালে চোখদুটো তাড়াতাড়ি মুছে নেন শমিতা। বিনয়েন্দ্র এগিয়ে এসে বলেন, 'পাশেই একটা ছোট শিবমন্দির আছে, সেখানেও পুজো দিয়ে এলুম। এই নাও।' প্রসাদী ফুলপাতা শমিতার হাতে তুলে দেন তিনি।

খানিক গল্পগুজবের পর মন্দিরের বাইরে এসে জীপে ওঠেন তিনজনে।

জীপ্ ছুটেছে ঝড়ের বেগে। বাইরে দিগন্ত-বিলীন ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছেন শমিতা, কিন্তু কিছুই তিনি লক্ষ্য করছেন না। তাঁর চোখের সামনে কেবল একটি ছবিই ভেসে উঠছে বারবার—মন্দিরের পাশে সেই ঝর্ণাতলা—সেই বন্য গাছ-গাছালির ভিড়—সেই অশ্বত্থের ছায়ায় শিলাখণ্ডের ওপর বসে কাটানো ক'টি মুহূর্ত—যা আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না।

জীপ্‌টা হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে থামতে সম্বিৎ ফিরে পান যেন শমিতা। চারদিকে চেয়ে স্বগতোক্তির মতই বলে ওঠেন, 'এত তাড়াতাড়ি এসে গেলুম!'

অমিতাভর ইচ্ছানুযায়ী আজ তাঁর বাসাতেই দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে শমিতা-বিনয়েন্দ্রর। তাই তাঁদের আপ্যায়ন করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যান অমিতাভ।

স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ড্রইং-রুমে এসে বসেন। শোবার ঘর থেকে নিজের ছোট্ট, বহুপুরনো গ্রামোফোনটা নিয়ে এসে রেকর্ড বাজাতে শুরু করেন অমিতাভ—নাটক আবৃত্তি গান।

জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে শমিতা দেখেন, দিনের আলো ক্রমেই পড়ে আসছে। অনেক উঁচুতে, আকাশের কোলে ভাসছে কয়েকটা অলস মেঘ। নীচে আন্দোলিত রুক্ষ প্রান্তর দূরদিগন্তে বিলীন। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির চেহারাটাই যেন আজ কেমন ক্ষ্যাপা উদাসীন মনে হয়।

এমন সব দুপুরে অন্যদিন শমিতার সময় যেন কাটতেই চায় না। আর আজ কি দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে দিনের প্রহরগুলো।

শরৎ চা নিয়ে আসে।

চায়ের পর যাবার আয়োজন করেন বিনয়েন্দ্র। হরিপদর রিক্‌সা এসে দাঁড়ায় বাগানের গেটের সামনে। সেই প্রথমদিন যেমন এসে দাঁড়িয়েছিলো।

বিনয়েন্দ্র বলেন—'আমার ওখানে শিগ্‌গিরই যাবেন একদিন।'

'যাবো।'

শমিতার সঙ্গে একবার মাত্র চোখাচোখি হয় অমিতাভর। কিন্তু কেউই কোনো কথা বলেন না। পরক্ষণেই রিক্‌সা ছেড়ে দেয়।

সুরকি-ঢালা, লাল পথের ওপর দিয়ে ছুটেছে রিক্‌সাটা। যতক্ষণ দেখা যায় সেদিকে চেয়ে থাকেন অমিতাভ। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে আসেন নিজের ঘরে।

থেমে-যাওয়া গ্রামোফোনটায় একখানা রেকর্ড। কতোদিন আগে তিনি কিনেছিলেন এটা? তারপর কতোকাল ওটা বাজানো হয়নি, ধুলো পড়ে গেছে। সযত্নে রুমাল দিয়ে মুছে রেকর্ডখানাকে গ্রামোফোনে চাপিয়ে দেন অমিতাভ।

ক্ষণেকের মধ্যেই বেজে ওঠে তাঁর ছাত্র-বয়েসের বহুপ্রিয় সেই গানখানা—

অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে
দিনের বিদায়ক্ষণে

অবেলায়! সত্যি, বেলা পার করেই তো এসেছে শমিতা তাঁর জীবনে......

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়, অবসন্ন দিনের শেষ আলো যাই-যাই করছে পঞ্চকোটের চূড়ায়। এলায়িত প্রান্তরের শেষে দিক্‌চক্র-রেখায় নামছে সন্ধ্যার ছায়া।

অমিতাভর মনে হয়, পাঁচবছর আগে নয়, দশবছর আগে নয়, যেন যুগযুগান্ত আগে যৌবনকে পিছনে ফেলে এসেছেন তিনি। তারপর কতো সহস্র যোজন বন্ধুর পথ পার হয়ে আজ এসে পৌঁছেছেন জীবনের ক্লান্ত প্রহরে।

জীবনে এই প্রথম তিনি পিছনে ফিরে তাকালেন।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

দায়িত্বজ্ঞান সুরেনের একেবারেই নেই। লোকটা ছোটবেলা থেকেই ঐ রকম। কোনো কাজ ওর উপর দিয়ে যে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে তা নয়। যদি কেউ বলত, সুরেন তুমি দুটো ব্লেড কিনে নিয়ে এস, সুরেন গিয়ে হয়ত একটা তালা কিনে নিয়ে আসবে! যদি বলা যায়, সুরেন তুমি বিপুলবাবুর কাছে তাঁর ভুলে ফেলে যাওয়া ছাতাটা পৌঁছে দিয়ে এস, তাহ'লে সে ছাতাটা নেবে, নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েও পড়বে, কিন্তু বিপুল-বাবুর বাড়িতেই সে যাবে না। সে হয়ত তার মামার বন্ধু কুমারবাবুর বাড়িতে গিয়ে ছাতাটা দিয়ে আসবে জোর করে। আমি একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সুরেন, তুমি অত দায়িত্ব-জ্ঞানহীন কেন বলোত! সুরেন উত্তর দিল, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মানে? আমি বলেছিলাম, এই যে সব ভুলে যাও তুমি। ব্লেড কিনতে বললে তালা কেনো। ট্যাকসি ডাকতে বললে চিনি নিয়ে এসো।

সুরেন বলেছিল, আমি দায়িত্বহীন না আমার সব আত্মীয়-স্বজন দায়িত্বহীন?

আমি বলেছিলাম, দায়িত্বহীন তো তুমিই। ভুল তো তুমিই করো।

সুরেন বলেছিল, ভুল আমি করি না। আমার মেমারি ভয়ানক শার্প। আমি ওগুলো ইচ্ছে করে করি।

আমি বলেছিলাম, অন্যায়—অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়। ইচ্ছে করে করাটা তো আরো অন্যায়। ভুলে করে ফেললে না-হয় বুঝতাম সেটা তোমার অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু ইচ্ছে করে ওসব করাটা উচিত নয়।

সুরেন হেসে বলেছিল, উচিত নয়, বটে? বলতে খুব সোজা, কিন্তু আসলে যদি ব্যাপারটা জানতে, তাহলে বুঝতে পারতে ঠ্যালা কাকে বলে। সকাল থেকে, আমার প্রায় একুশটি গুরুজন আমাকে নানা-বিধ আদেশ করেই চলেছেন। কারুর দোকান থেকে তামাক আনতে হবে, কারুর জন্য ডাক-টিকিট কিনতে হবে, কারুর জন্য আবার লবণ কিনতে হবে। এইরকম লেগেই আছে সমস্ত দিন। ও সুরেন তুই বালীগঞ্জে যাচ্ছিস, তাহলে নীরেনদের বাড়িতে এই জিনিসটা পৌঁছে দিবি, ও সুরেন তুই লিলুয়া যাচ্ছিস যখন ঐ পথে চন্দননগরটাও ঘুরে আসিস। ওখানে প্রিয়বাবুকে বলবি আমি একবার ডেকেছি! ও সুরেন...।

সুরেন থামল একটু। তারপর বলল, আর কত বলব। দিনরাত অন্যের কাজ করা কি সোজা কথা? তাই ইচ্ছে করে সমস্ত ব্যাপার গোলমাল করে ফেলি, ফলে আমার উপর আর কেউ কাজের ভার দিতে চায় না।

আমি বললাম, কিন্তু সেকথা সোজা-সুজি বললেই তো চুকে যায়!

সুরেন বলল, কে বলল চুকে যায়। সে চেষ্টা কি করিনি নাকি? একদিন জ্যাঠামশাই বললেন, শেওড়াফুলি থেকে একটা তবলা আনতে হবে তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে। বললাম আমার লেখাপড়া আছে লাইব্রেরীতে যেতে হবে। তা শুনে তাঁর কি সব কথা-বার্তা আর তম্বি! শেষপর্যন্ত যেতেই হল আমাকে। অবশ্য শেওড়াফুলিতে ঠিক যাইনি, ডায়মন্ড হারবারে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা কাঁসি নিয়ে এসেছিলাম। সোজাসুজি বললে বড় গোলমাল হয় বাড়িতে।

আমি বললাম, কিন্তু তাই বলে যে শুনলাম তোমার বোনের জ্বর—ডাক্তার-বাবুকে ডেকে আনতে তোমার তিন ঘণ্টা লেগে গেল, সেটা কি ঠিক হয়েছিল? কোথায় নাকি তুমি সে সময় তাস পিটছিলে?

সুরেন বলল, আরে আমি তো তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্রামে করে সোজা ডাক্তার-বাবুর বাড়িতে গিয়েছি। তারপর তাঁর বৈঠকখানাতেও গিয়েছি...।
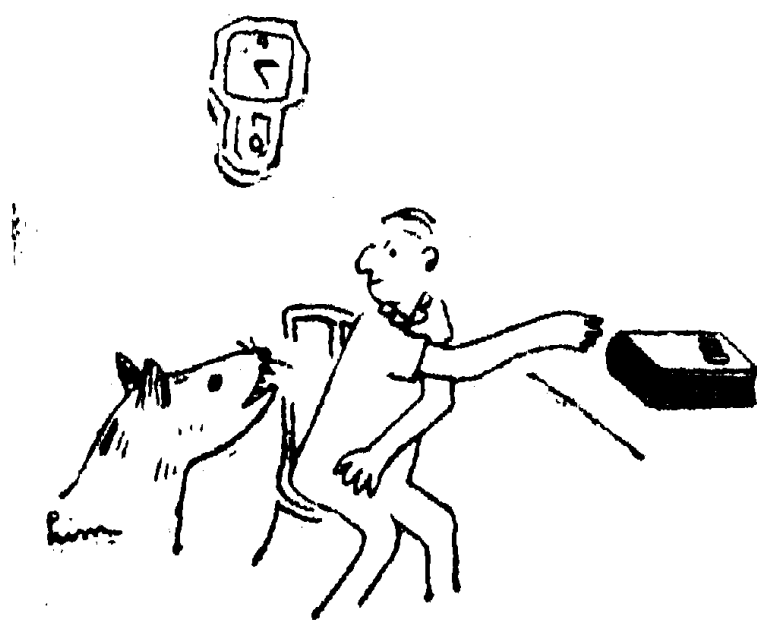
আমি বললাম, আর গিয়েই ভুলে গিয়ে তো! একেই তো বলে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা।

সুরেন বলল, ভুলে গিয়েছি কে বল তখন দুপুর বেলা। ডাক্তারবাবু দুপুরে শু ঘুমুচ্ছেন। সবে ডাকতে যাব এমন সম ডাক্তারবাবুর ছেলে লক্ষ্মণদার সেই খ্যাপা অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা এসে ঠিক আমা কাছ থেকে আধহাত দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়ি আমাকে তার দেড় বিঘত লম্বা জিভটা দেখাতে লাগল, আর বঙ্কিম চোখে আমা দেখতে লাগল। কুকুরটা এত শয়তান আমাকে দেখে একটুও ডাকল না। ও ডাক সবাই টের পেয়ে যেত আমি এসেছি, আ তাহলে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস কর আমি কেন এসেছি, আর আমি তা বলতে পারতাম আমার বোনের জ্বর হয়েছে কিন্তু তা হল না শয়তানটা এক ডাকল না। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সে আমার দিকে তাকিয়ে গ-র-র-র গর্জন কর লাগল, কিন্তু জোরে নয়, চাপা গলায়। বা হয়ে আমি বসে পড়লাম পাশের চেয়ারে।

আমিও বসে রইলাম, কুকুরটাও ব রইল। আমি যদি একটু নড়েচড়ে ব কুকুরটা গর-র-র- করে ওঠে। আমি য একটু পা নাড়াচাড়া করি তাহলে সে ক দৃষ্টিতে এমন করে তাকায় যে, আম শরীর ভয়ে হিম হয়ে আসে। সে যে অদ্ভুত অবস্থা তার আর বলবার ন টেবিলের উপর একখানা বই রয়েছে, এক গোয়েন্দা গল্পের সংকলন। ভাবলাম বই এই সুযোগে পড়ে ফেলি। হাত বাড়া যাব আর ঐ অ্যালসেশিয়ানের গ-র-র-র কাঠ হয়ে বসে রইলাম। কিছু কর পারলাম না।

বেলা দুটোর সময় ডাক্তারবাবুর বৈঠ খানায় ঢুকেছি। পাশের ঘরে ডাক্তারবাবু আরামের নাক-ডাকার আওয়াজ পাও যাচ্ছে। অথচ আমি ভয়ে কিছু কর পারছি না, সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি ঠিক বেলা পাঁচটা যখন দেয়াল-ঘড়ি বাজল, তখন দেখলাম কুকুরটা নেহাত কৃপা করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ত আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে তুললাম, আ চটপট তাঁকে নিয়ে এলাম।

সুরেন বলল, আমি যে ডাক্তারবাবু ডাকতে গিয়ে তাস পিটিনি সেকথা কে বিশ্বাস করেনি। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস আ ইচ্ছে করে...... কিন্তু ঐরকম বদমাইশ এক কুকুরের পাল্লায় পড়লে যে কোন লোক হাসিমুখে দায়িত্বজ্ঞান-হীন হত।

আমি বললাম, কিন্তু কুকুরটা ঠি পাঁচটার সময় চলে গেল কেন সেটা বুঝলাম না।

সুরেন বলল, কথাটা আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ডাক্তারবা বলেছিলেন, কুকুটরাকে ঐভাবেই ট্রে দেওয়া হয়েছে। দিবা-নিদ্রার সময়ে যা কোনো রোগী বিরক্ত না করে সেজন্যই ব্যবস্থা।

ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড

অংশু দত্ত

ং ফরাসী রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য-
নেই যান সেখানেই পান সাদর
মস্কোতে কয়েক মাস আগে তাঁকে
সম্মান দেওয়া হয়েছে। তারপর
তিনি যে আপ্যায়ন পেলেন তেমন
বুঝি সম্প্রতিকালে কোন পশ্চিমী
গ্যে জোটেনি। হিসাবে ভুল হল
হিত সাগরের তীরে প্রায়-অপরিচিত
বন্দরে গিয়ে। ২৪শে আগস্ট
আসার আগের দিন ফরাসী
রাজ্যের মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতি
অনেক আবেগবিজড়িত কণ্ঠে
বলেন, 'রাষ্ট্রপতিকে সাদর অভ্যর্থনা
ন সবাই প্রস্তুত।' ২৪ ঘণ্টা যেতে
ই সোমালি জাতীয়তাবাদীরা বড় বড়
'দেশে স্বাধীনতা' লিখে বিক্ষোভ
সুরু করল। এল পুলিশ ও
। অতঃপর বজ্রপাত। এবং সরকারী
মতে, ৪ জন নিহত ও ৭০ জন
আয়োজিত জনসভায় না গিয়ে
ত্যাগ করলেন আঞ্চলিক বিধান
।

এলাকা নিয়ে এত হৈচৈ সেই
সোমালিল্যাণ্ড কিন্তু ছোট্ট দেশ:
৮,৮৮০ বর্গ মাইল (অর্থাৎ
নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা একসঙ্গে
যা হয়)। আর জনসংখ্যা ১৯৬০
হিসাব মত ৮১,০০০ (অর্থাৎ এক
শহরের লোকসংখ্যার চেয়ে কম)।
এই এলাকার অর্থনীতির প্রধান
হল পশুপালন যা থেকে আসে
দুধ, ঘি ও পশুচর্ম। এছাড়া
অধিবাসীরা তৈরী করে নুন যার
শে রপ্তানী হয়। শুল্কমুক্ত বন্দর
ও জিবুতি-আদ্দিস আবাবা রেল-
র সপ্তম-অষ্টমাংশ গেছে ইথিওপিয়া
এই দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক
কে কিছুটা শক্ত করেছে।

লোকসংখ্যা কম হলে কি হয়,
সোমালিল্যাণ্ডের রাজনৈতিক
জটিলতা নেহাৎ কম নয়। এইটুকু
অনেক জাতি-উপজাতির সংমিশ্রণ
। এদের মধ্যে সোমালিরা হল একক
রিষ্ঠ সম্প্রদায়, যদিও তারা সমগ্র
র ৪৩% মাত্র। সোমালিদের
আবার সোমালি প্রজাতন্ত্র থেকে
। এমন বহিরাগত সোমালিদের বাদ
স্থানীয় সোমালিরা হবে এই ভূখণ্ডের
জনসংখ্যার ৩৭%। অন্য উল্লেখযোগ্য
হল আফার বা দানাকিল উপজাতি।
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ৪০% দানাকিল, বাকী লোকেরা আরব ভারতীয়, পাকিস্থানী ও ইউরোপীয়।

দানাকিলরা নিজেদের আরব বলে দাবী করলেও আসলে তারা সোমালি ও গালাদের সগোত্র। সোমালি ও দানাকিল উভয় উপ-জাতি মূলতঃ পশুপালক, ইসলাম তাদের প্রধান ধর্ম এবং দুই সম্প্রদায়কেই হামিতীয় বলে ধরা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যও সুপ্রচুর। সোমালিরা দক্ষিণাংশে বসবাস করে, দানাকিলরা থাকে উত্তরে। তারা ভিন্নভাষায় কথা বলে, যদিও তাদের ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য আছে যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা হল, সোমালি ও দানাকিলরা নিজেদের পৃথক বলে ভাবে।

এই ভূখণ্ডের সোমালিরা 'ইসা' কৌম-ভুক্ত। ইসা সোমালিদের স্ববৈশিষ্ট্যচেতনা প্রখর। ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড ছাড়াও ইথিওপিয়া (৫০,০০০ থেকে ১০০,০০০) ও সোমালি প্রজাতন্ত্রের উত্তর অংশে (প্রায় ৫৫,০০০) ইসা সোমালিরা ছড়িয়ে আছে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইসা নেতারা এক স্বতন্ত্র ইসা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। সোমালি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত রাষ্ট্র বিশেষ সূত্রে আবদ্ধ থাকবে, ইসানেতারা এমন ভাব প্রকাশ করলেও, এই বিশেষ সম্পর্কটি ঠিক কী রূপ নেবে সেকথা তাঁরা পরিষ্কার করে বলেননি। সম্ভবতঃ সোমালি জাতীয়তাকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র ইসা আন্দোলন মাথাচাড়া দিবে উঠবে না। ইসা সোমালিরা সংখ্যায় দু'লক্ষের কম; প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের প্রায় কিছুই নেই; দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মীর অভাবে তাদের নেতৃত্ব দুর্বল। এমন আন্দোলনের পক্ষে ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার ইসা-সোমালি-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়া মুস্কিল। পক্ষান্তরে বৃহত্তর সোমালি রাষ্ট্রের দাবীতে সোমালি প্রজাতন্ত্রের সরকার ও সমস্ত রাজনৈতিক দল নিরবচ্ছিন্ন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব অংশতঃ ইসা তরুণদের ওপর পড়তে বাধ্য। এইভাবে ইসা স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সোমালি জাতীয়তার এক বিশেষ আঞ্চলিক প্রকাশে রূপান্তরিত হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়।

ইসা সোমালিদের আন্দোলন এবং সোমালি প্রজাতন্ত্রের সোমালি ঐক্যের বাণী

প্রচার দানাকিলদের কিছুটা চঞ্চল করেছে। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি সোমালি-দানাকিল শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সমতারক্ষার দাবী জানিয়েছে। সোমালিদের মতে ফরাসী সরকার সোমালিদের বিরুদ্ধে দানাকিলদের উস্কানি দিয়েছে। দানাকিলরা বলে, তাদের আন্দোলন নিজদের ন্যায্য অধিকাররক্ষার উদ্দেশ্যে চালিত এবং বিদেশী উস্কানি তার বনিয়াদ নয়।

ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ বিভেদ গভীর ও জটিল হয়েছে ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার বিবাদের ফলে। সোমালি প্রজাতন্ত্রের সব রাজনৈতিক দল একবাক্যে 'পঞ্চ সোমালিয়ার' একীকরণের দাবী করে আসছে। তাদের মতে 'পঞ্চ সোমালিয়া' হল (১) পূর্বতন বৃটিশআশ্রিত বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড; (২) পূর্বতন ইতালীয় অছি অঞ্চল ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড; (৩) হাউদ ও তৎসংলগ্ন সংরক্ষিত অঞ্চল (যে ভূখণ্ড ১৯৫৪ সালে বৃটেন ইথিওপিয়াকে ছেড়ে দেয়); (৪) কেনিয়ার উত্তর সীমান্ত জেলা; ও (৫) ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড। শেষোক্ত অঞ্চল সম্বন্ধে সোমালি প্রজাতন্ত্রের সরকারী ও বে-সরকারী নেতাদের বক্তব্য হল, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী সোমালি এবং তারা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন ও বৃহত্তর সোমালিয়ায় যোগ দিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে সোমালি সরকার দাবী করেছে (ক) ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডে ফরাসী শাসনের অবসান ও ফরাসী সেনাপসরণ; (খ) দু' বছরব্যাপী রাষ্ট্রসংঘের শাসন প্রবর্তন এবং (গ) তারপর সোমালি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আলোচ্য ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য গণভোট গ্রহণ। ইথিওপীয় অর্থনীতির পক্ষে জিবুতি বন্দর ও জিবুতি-আদ্দিস আবাবা রেলপথের গুরুত্ব অস্বীকার না করে সোমালি সরকার বলে, ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড বৃহত্তর সোমালিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও জিবুতি বন্দর ও জিবুতি-আদ্দিস-আবাবা রেলপথ দিয়ে ইথিওপিয়ার আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়ার গ্যারাণ্টিসহ এক বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। এবং সে চুক্তির সর্তাবলী বাস্তবে রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রসংঘকে তত্ত্বাবধানের অধিকার দেওয়া হোক।

অপরপক্ষে ইথিওপিয়ার দৃষ্টিভঙ্গী নিম্নরূপ। (ক) সোমালি প্রজাতন্ত্র যদি ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের দিকে নজর না দেয় তবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ইথিওপিয়ার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি বৃহত্তর সোমালি রাষ্ট্রে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্তি দাবী করা হয়, তবে ইথিওপীয়রা তাদের সগোত্র ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের অধিবাসী দানাকিল বা আফারদের কথা ভুলতে পারে না। ইথিওপীয় সরকারের মতে ফরাসী সোমালি উপকূলের অধিকাংশ অধিবাসী হল দানাকিল আর এই ভূখণ্ডের তিন-চতুর্থাংশে তারা বসবাস করছে। (খ) অতীতে জিবুতি অঞ্চলে ইথিওপিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করত। (গ) জিবুতি বন্দর ও জিবুতি-আদ্দিস-আবাবা রেলপথ যেমন ইথিওপিয়ার অর্থনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, জিবুতিও তেমন ইথিওপিয়ার নির্ভরশীল। জিবুতি বন্দরের আমদানীর ৮৬ শতাংশ ইথিওপিয়ায় যায়। বন্দর থেকে রপ্তানীমালের ৯৬ শতাংশ আসে ইথিওপিয়া থেকে। ১৯৫৯ সালের ফরাসী-ইথিওপীয় চুক্তিবলে ইথিওপিয়া লাভ করেছে জিবুতি-আদ্দিস রেলপথের মালিকানা ও পরিচালনার অর্ধাংশ এবং জিবুতি বন্দর ব্যবহারের প্রায় অবাধ অধিকার।

সোমালিয়া-ইথিওপিয়ার মতভেদকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের শাসন বজায় রাখবার একটা যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করছে। ফরাসী সরকারী মহল থেকে বলা হয়, ফরাসী শাসনের অবসান ঘটলে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড নিয়ে সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাবে। এছাড়া ফরাসী সরকারের মতে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বেচ্ছায় ফরাসী শাসনাধীনে থাকতে চায়। এ-দাবীর প্রমাণস্বরূপ তারা ১৯৫৮ সালের গণভোটের উল্লেখ করে। অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশের মত ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডও সে সময় পঞ্চম প্রজাতন্ত্র তথা ফরাসী কম্যুনিতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের সুযোগ পায়। গণভোটে দুটি বিকল্প প্রশ্ন ছিল : (১) আপনি কি চান, ফ্রান্স ও ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের বর্তমান সম্পর্ক অব্যাহত থাক? (২) আপনি কি চান ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করে বৃহত্তর সোমালিয়ায় যোগদান করুক? গণভোটের ফল হয় নিম্নরূপ :

তালিকায় ভোটদাতার সংখ্যা	১৫,৮৩৩
ভোট দেন	১১,৫৭৯
নির্ভুল ভোট	১১,৫১২
ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে	৮,৬৬১
বিপক্ষে	২,৮৫১

গণভোটে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার পক্ষে জোর প্রচার চালায় পার্তি দ্য লা দেফ্স দেস্যাতেরে সেকোনোমিক এ সোসিও দ্যু তেরিতোয়ার (DIEST)। এই দল ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে বিধান পরিষদের ৩১টি আসনের মধ্যে ১০টি অধিকার করে। এবং এর নেতা হাসান গুলেদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। গুলেদ-এর মিত্র হিসাবে গণভোটের সময় প্রচার চালান বর্তমান মন্ত্রিসভার নেতা আলি আরেফ।

সেদিন এঁদের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন মাহমুদ হার্বি ও তাঁর পরিচালিত য়্যুনিয়ঁ রেপ্যুবলিকেন দল। গণভোটের রায় ফরাসী কম্যুনিতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে গেলে হার্বি দেশ ছেড়ে প্রথমে কায়রো ও পরে মোগাদিশুতে তাঁর প্রচার-কার্যালয় স্থাপন করেন। কিছু দিনের মধ্যে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডে তাঁর দল বেআইনী ঘোষিত হয়। ১৯৬০ সালে পূর্ব ইউরোপ ও প্রজাতন্ত্রী চীন ভ্রমণান্তে আফ্রিকা ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় হার্বি মারা যান।

গণভোটে দানাকিল ও ইউরোপীয়রা প্রায় সবাই ফরাসী সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে ভোট দেন। যারা ভোট দেয়নি তাদের অধিকাংশ সোমালি বলে জানা যায়। আবার যেসব সোমালি ভোট দেয়, তাদের বেশীরভাগ দ্বিতীয় প্রস্তাবের পক্ষে মতপ্রকাশ করে।

হার্বির মৃত্যু ও তাঁর দল বেআইনী ঘোষিত হলেও বৃহত্তর সোমালি আন্দোলন নষ্ট হয়নি। কিছুদিন পরে সংগঠিত হয়েছে পার্তি দ্য মুভম' পপ্যুলেয়ার (PMP)। এর নেতা আহমদ ইদ্রিস মুসা। এ দলটি প্রধানতঃ ইসা সোমালিদের সমর্থন পেয়ে আসছে। এদের দাবী হল পূর্ণ স্বাধীনতা। গত জানুয়ারী মাসে হাভানার ত্রি-মহাদেশীয় সম্মেলনে এই দলের প্রতিনিধি যোগ দেয় এবং সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে "জিবুতিকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার মার্কিনী নয়া-ঔপনিবেশিক ও ইথিওপীয় চক্রান্তের" নিন্দা করা হয়। আগস্ট মাসের দাগল বিরোধী বিক্ষোভ এদের দ্বারা সংগঠিত হয়। মোগাদিশু থেকে এই দলের স্বপক্ষে প্রচার চালাচ্ছে ফ্রং লিবেরাসিয়ঁ দ্য লা কোৎ দ্যু সোমালি (FLCS) বা সোমালি উপকূল মুক্তি ফ্রন্ট, যার নেতা হলেন আব্দুল্লাহি আর্দেইয়ে।

ইতিমধ্যে আরও দুটি দল আসরে নেমেছে : আফার গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন ও জিবুতি মুক্তি আন্দোলন। প্রথমটি পার্তি দ্য মুভম' পপ্যুলেয়ার-এর মত ফরাসী শাসনের তীব্র সমালোচনা করে। সম্ভবতঃ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে এই দুটি দল ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করতেও পারে। অপর পক্ষে জিবুতি মুক্তি আন্দোলনের মূল ঘাঁটি ইথিওপিয়ায়। এবং এদের সমর্থন আসে প্রধানতঃ সোমালিবিরোধী দানাকিল আফারদের কাছ থেকে।

কিছুদিন আগে ফরাসী সরকার ঘোষণা করেছে, ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই-এর আগে ফ্রান্সের সঙ্গে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য পুনর্বার গণভোট গ্রহণ করা হবে। দেশের মধ্যে দানাকিল-সোমালি বিভেদ ও বাইরে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র, ইথিওপিয়া ও সোমালিয়ার বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসী সরকারের এই সিদ্ধান্ত আলোচ্য ভূখণ্ডের বিপদসঙ্কুল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 16th December, 1966 শুক্রবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		[illegible]
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

চিঠিপত্র

বিচিত্র চরিত্র প্রসঙ্গে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জগৎ বহু বিচিত্র ও বিপুল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। যে সকল মহান সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে শতাব্দীকাল এগিয়ে দিয়েছেন তারাশঙ্করবাবু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা দেশের মাটি ও মানুষকে তিনি গভীরভাবে ভাল বেসেছেন। নিজস্ব চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান স্বতন্ত্র। তাঁর বহু-বিস্তৃত সাহিত্যজগৎ নির্মল ও পরিশুদ্ধ। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে আমরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। বর্তমানে 'অমৃত' পত্রিকায় তাঁর "বিচিত্র চরিত্র" বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ও বিচিত্র সংযোজন। ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের চরিত্র এমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণে কেউ অগ্রণী হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। মনে হয় তারাশঙ্কর-বাবুই "বিচিত্র চরিত্র" দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ণ স্থানটি পূর্ণ করে দিলেন। "বিচিত্র চরিত্রে" তিনি প্রতিটি মানুষের চরিত্রকে আন্তরিকতার নিবিড় উত্তাপে আমাদের সম্মুখে জীবন্ত করে তুলেছেন। প্রতিটি চরিত্রই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসঙ্গী। সেই জন্যই বোধ হয় "বিচিত্র চরিত্র" অতি সহজেই আমাদের অন্তর কেড়ে নিয়েছে। এরা প্রত্যেকেই সৎ বা মহাপুরুষ নয়। কিন্তু চরিত্র চিত্রণের আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় নিঠুর দরদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এদের প্রত্যেকের জন্যই আমাদের সমবেদনা ও সহানুভূতির অন্ত নেই। এমন সুন্দর বিষয় উপহার দেওয়ার জন্য লেখককে ও প্রকাশের জন্য 'অমৃত' পত্রিকাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

বিনীত—

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী

দমদম ক্যান্টনমেন্ট

মন্ত্রীবদল ও জাতীয় সমস্যা

সবিনয় নিবেদন,

'মন্ত্রীবদল ও জাতীয় সমস্যা' সম্পাদকীয়ের জন্য আপনাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। লেখাটা অত্যন্ত সময়োচিত এবং আকর্ষণীয়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এবং এতদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীরূপে শ্রীচ্যবন সফল-কাম হয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রদপ্তরেও তিনি আশানুরূপ কাজ দেখাতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

কিন্তু রেলমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীর চূড়ান্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের স্থায়িত্ব পরেই আরেকটি ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রচুর জীবন-হানি ঘটল। শ্রীপাতিল কিন্তু সেই এক সুরই তুললেন 'অন্তর্ঘাতী কাজই এই দুর্ঘটনার কারণ'। এই অন্তর্ঘাতী কাজ কতদিন চলবে জানি না এবং এর ফলে আরও কত মূল্যবান প্রাণ বিসর্জিত হবে, তাও আমাদের সম্পূর্ণ অবিদিত। সুব্রহ্মণিয়মের অসাফল্যের কথা আর নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই এই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন যে 'সুষ্ঠু-ভাবে কাজ চালাবার জন্যই' করা হয়েছে, তা মনে হয় না, 'মন্ত্রিসভার ভিতরে আশানুরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা পর্যাপ্ত ছিল না' এটাই বোধহয় সঠিক কারণ।

বিনীত

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

শান্তনু সেনগুপ্ত

কলিকাতা-৩১

বিস্ময়কর অঘটন

সবিনয় নিবেদন,

৯ই অগ্রহায়ণের অমৃতে শ্রীযুক্ত অজয় হোমের 'বিস্ময়কর অঘটন' সত্যিই হৃদয়গ্রাহী। ৯ই সেপ্টেম্বরে এই লেখকের "আজকের অঘটন"ও মনকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে, যখন বৈজ্ঞানিক মহল এই গ্রহান্তরের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তৎপর, সেই পরিস্থিতিতে লেখকের আলোচনা বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছে। নানা উদ্ধৃতি ও উদাহরণ দ্বারা লেখক তাঁর উভয় রচনাকেই রসগ্রাহী ও সর্বজন বোধ্য করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে এত পরিষ্কার আলোচনা আমি আর পড়িনি।

অমৃতে মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত হোম মহাশয়ের এইরূপ তথ্যবহুল রসসমৃদ্ধ আলোচনা থাকলে খুশী হব।

বিনীত

বন্দনা রায়চৌধুরী

শিলং

দুধের কথা

সবিনয় নিবেদন,

অমৃত পত্রিকার ত্রিশ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদীপ্তিময় দে'র 'দুধের আতঙ্ক' আলোচনাটি বেশ সময়োচিত হয়েছে। আজ সারা দেশ জুড়ে অনেক সমস্যার সঙ্গে দুধের সমস্যাও অত্যন্ত তীব্র। শিশু এবং রোগীর জন্য দুধের হাহাকারের কথা সুবিদিত। এ সম্পর্কে আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা এতই তিক্ত যে এ সম্পর্কে বেশি বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে দুধটুকু আমরা পাই তার উপরও বা কতটুকু নির্ভর করা যায়? আমাদের প্রাপ্ত দুধটুকু নিয়েও নানা ঝামেলা। গয়লার দুধের ভেজালের কথা ছেড়েই দিলাম। সরকারী উদ্যোগে যে যোগ্যতার সঙ্গে সরবরাহ করা হয় না। কারণ প্রায়ই দুধ জমে যায়। এর কারণ সম্বন্ধে অবশ্য সরকারী উদ্যোগে ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে কিন্তু তাতে ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। যদি ফল কিছু হতো তাহলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোত না। কিন্তু শ্রীদে'র লেখাটি পড়ে বেশ শঙ্কাবোধ করলাম। তিনি নানা-ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে দুধে কি পরিমাণ ভেজাল চলে এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী দুধ কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। লেখক এক্ষেত্রে রোগের যে তালিকা পেশ করেছেন তা সত্যি ভয়াবহ। সুতরাং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিকের উপর কড়া নজর রাখা কর্তব্য।

লেখকের হিসেবমত দেখা যাচ্ছে প্রচুর দুধ আমাদের দেশে পাওয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত যানবাহন এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে অধিকাংশ দুধই কম প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। লেখক বলেছেন যদিও পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় যে ১৯৫১ এবং ১৯৫৬ সালে দেশে মোট দুধের উৎপাদন যথাক্রমে ১৬৯-২ এবং ১৯১-৭ লক্ষ মেট্রিক টন, কিন্তু পানীয় হিসেবে এর মধ্যে ব্যবহারের পরিমাণ মোটে শতকরা ৩৬-২ ভাগ। বেশির ভাগ দুধই ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেবার অসুবিধার দরুণ কম প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার হয়েছে। দেশের দুধ উৎপাদক অঞ্চলগুলি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে দুধের অভাব থাকা সত্ত্বেও রাস্তা ও পরিবহণের অসুবিধার জন্য দুধের অপচয় হয়, তাই ঘাটতি অঞ্চলে দুধ পাওয়া দায়। দিনে মাথা পিছু আমরা দুধ পাই মাত্র পাঁচ আউন্সেরও কিছুটা কম এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় মোট উৎপাদনের কতটা আমরা সর্বাধিক প্রয়োজনে পেয়ে থাকি। আজকাল দেশে যানবাহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু এখনও দেশের বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সমস্ত দুধ আমাদের প্রয়োজনে এসে পৌঁচুচ্ছে না। এদিক থেকে বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ প্রভৃতি উন্নতি করেছে। কলকাতাও এক্ষেত্রে বেশ উন্নতিসাধন করেছে। হরিণঘাটার কল্যাণে দুধ সরবরাহ নিশ্চয়ই বেড়েছে। কিন্তু প্রয়োজন আরও বেশি। সুতরাং নজর দিতে হবে গ্রামের দুধ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির দিকে। সেখানে দুধ সংগ্রহ করে শহরে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে চাহিদা অনেকটা পূরণ হবে এবং আমাদেরও দুধের তৃষ্ণা মিটবে।

বিনীত—

দেবপ্রসাদ মিত্র

উদয়রাজপুর

অমৃত

সম্পাদকীয়

শহরবাসের ইতিকথা—

এই নামে বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক একদা একটি বই লিখেছিলেন। এই শহর কলকাতা মহানগরীরই অন্য নাম। শহরবাসের অনেক গুণ বর্ণনা করা যায়। শিল্পবিপ্লবের যুগে এক ইংরেজ কবি আক্ষেপ করে লিখেছিলেন, God made the country and man made the town. মানুষের হাতে-গড়া শহর মানুষকে গ্রামছাড়া করেছে। শহরে শিল্পকারখানা মানুষকে জীবিকার টানে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। শহর আলোকিত, শহরে সামাজিক সংস্কারের বালাই নেই, ইত্যাদি নানা কারণেই ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে জীবিকাসন্ধানী ও মুক্তিসন্ধানী মানুষ চলে আসে শহরে। কলকাতা তেমনি একটি শহর যেখানে শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের নানাপ্রান্তের লোক দেশ-দেশান্তরের লোক এসে জড়ো হয়েছে শহরবাসের সার্থকতাকে প্রতিপন্ন করার জন্য। এই শহরে যাঁরা থাকেন সকলেই একে ভালবাসে এমন কথা বলা যায় না। বোম্বাইয়ের জন্য বোম্বাইবাসীদের দরদ আছে, মাদ্রাজ প্রধানত তামিলদের নিয়ে শহর, দিল্লী যেহেতু রাজধানী তার প্রতি সরকারের নজর আলাদা। কিন্তু কলকাতা শুধু বাঙালীর শহর নয়, সকলেরই শহর। কলকাতার এই কসমোপলিটান মেট্রোপলিটান চরিত্র আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু এই ভাললাগা তখনি সার্থক হবে যখন এই শহরের মঙ্গল-অমঙ্গল ও উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক নাগরিকই সমান আগ্রহ দেখাবেন।

দুঃখের বিষয় নানা জায়গায় মাথাকুটেও কলকাতার বাড়ন্ত সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। এটা মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ বিভাগের ফলে একটা অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ এই মহানগরীকে বইতে হচ্ছে, ভারতের আর কোনো শহরের ভাগ্যে তা ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, দেশভাগের ফলেই কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমি পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। এর ফলে অর্থনৈতিক চাপও তাকে সইতে হচ্ছে। সেই কারণেই কলকাতার সমস্যা সমাধানে জাতীয় সচেতনতা আমরা আশা করেছিলাম। সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। তার জের টেনে এই শহর আজ নাভিশ্বাসগ্রস্ত। নানাভাবে এবং নানাদিক দিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটছে।

বর্তমান মাসে কলকাতা কতকগুলি অভাবিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। কলকাতার খাদ্যসরবরাহ সরকারের একটা প্রকান্ড দায়িত্ব। ৫০।৬০ লাখ লোককে খাওয়ানো কম কথা নয়। তদুপরি খাদ্যের জোগান সীমাবদ্ধ। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে ঘাটতি পোষাতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বন্দরের নানা অব্যবস্থা খাদ্যখালাসের পথে সৃষ্টি করেছে প্রতিবন্ধকতা। কলকাতার বন্দর শুধু কলকাতাকে খাওয়ায় না, গোটা দেশের অর্থনীতি এই বন্দরের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এই বুজে-আসা নদীর নাব্যতা চালু রাখা এবং মালতোলা ও মাল-খালাসের জন্য বন্দরের কাজকর্ম ঠিক রাখার দায়িত্ব একটি বৃহৎ ব্যাপার। এদিকে নয়াদিল্লীর আরও সজাগ হওয়া উচিত।

কলকাতার যানবাহনের অবস্থা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। এইভাবে কাঁঠাল-বোঝাই নৌকোর মতো প্রতিদিন মানুষ যে আপিসে যাতায়াত করতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত। মাটির তলায় রেল, মাথার ওপরে রেল ইত্যাদি নানাবিধ পরিকল্পনা আপাতত কর্তাব্যক্তিদের মগজ থেকে দূর হয়েছে। কলকাতার চারদিকে একটি চক্রাকৃতি রেললাইন স্থাপনের প্রস্তাব আজ পর্যন্ত কার্যকর করা গেল না। এই অবস্থায় এই শহরের মস্তিষ্ক যদি অল্পেতেই গরম হয়ে ওঠে তাহলে শহরবাসীদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। ইতিমধ্যে সরকারী বাসকর্মীরা ধর্মঘটের পথে পা দিয়েছেন, ট্রামকর্মীদেরও একই সিদ্ধান্ত। একটা জমজমাট ও কর্মব্যস্ত শহরে সর্বপ্রকার পরিবহনব্যবস্থা অকস্মাৎ থেমে গেলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। এর সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো পৌরসভার কর্মীরাও সর্বাত্মক ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন। এর মীমাংসা কীভাবে হবে জানি না। তবে কলকাতায় অনেক ঝামেলা শহরবাসীকে পোহাতে হলেও একসঙ্গে এতগুলি ঝামেলা বোধহয় এর আগে আর পোহাতে হয়নি।

এ ছাড়াও আছে একশ্রেণীর ছাত্রদের আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয় নিষ্কর্মা। প্রেসিডেন্সী কলেজ এক শ্রেণীর ছাত্রের হাতে মারের পর মার খাচ্ছে। এম-এ, এম-এস-সি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। যতরকম দুর্ভাগ্য ও দুর্বুদ্ধি হতে পারে সবই এখন কলকাতা মহানগরীকে পেয়ে বসেছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নির্বিকার। যে-শহর নিয়ে আমরা গর্ব করি এবং যার শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে গোটা দেশের ভাগ্য জড়িত তাকে এমনভাবে সীতার মতো বনবাসে পাঠিয়ে অযোধ্যাধিপতির মতো নিষ্ক্রিয় থাকা ন্যায় নীতি নয়, সুস্থ নীতিও নয়। নাগরিকদের কাছে আমাদের আবেদন, কলকাতাকে এই অরাজকতার হাতে নিক্ষেপ করবেন না। নগরপিতা ও সরকারের কাছে নিবেদন, কলকাতার রোগ সারাবার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন, দিল্লীকে জাগান। এভাবে একটি মহান নগরীর অপমৃত্যু আমরা নীরবে প্রত্যক্ষ করতে পারি না।

বিচিত্র [illegible]

বিলিতী মাস্টার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১ম)

এবার বিলিতী মাস্টারের কথা বলব। হঠাৎ কাল রাত্রে মাস্টারমশায়কে স্বপ্ন দেখেছি। কেন দেখেছি, কি সূত্রে, সে কথাটা নিয়ে জট পাকাবো না। হয় তো সরকারে সরকারে উপাধির মিলে কুলদা সরকার তারপর শশী সরকার তারপর বিলিতী মাস্টার যার ডাকনাম সেই নন্দ সরকার মশায়কে মনে পড়ে থাকবে। থাক। জট পাকিয়ে জটা বাঁধবার আগেই ছেড়ে দিলাম, বিলিতী মাস্টারের কথা বলি।

নন্দ সরকার—নন্দগোপাল বা দুলাল—ঠিক জানি না. নন্দ সরকার বলেই জেনেছি আজীবন। আমাদেরই পাড়ার লোক। চেহারা যদি বলি রাজপুত্রের মত ছিল তা হলে এক বিন্দু অতিরঞ্জন করা হবে না। ৬ ফুটের মত লম্বা, বুকের পাটাখানা তা চল্লিশ ইঞ্চি হবে, কোমরটা সরু, টিকালো নাক, গৌরবর্ণ রঙ, ব্যাকরণ অনুসারে রাজপুত্র হতে হলে যা যা প্রয়োজন তা সবই ছিল। শুধু চোখ দুটি একটু ছোট ছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল—ছিল সত্যকারের মেধা এবং বুদ্ধি, আরও ছিল সুন্দর হস্তাক্ষর; আগের কাল হলে বলতাম মুক্তোর মত, এ কালে বলব ছাপা হরফের মত, আজকাল অনেকে ডেকরেটিভ লেখা বেশ চমৎকার লেখেন এবং নতুন ঢঙও আবিষ্কার হয়েছে অনেক, কিন্তু নন্দ মাস্টারের মত এমন সুন্দর হাতের লেখা, সে ডেকরেটিভ লেখাও অন্য কারুর দেখেছি বলে মনে করতে পারি না। আমাদের লাভপুরের অন্নপূর্ণা থিয়েটারের যে পোস্টার তিনি হাতে লিখতেন তার সঙ্গে ছাপা পোস্টারের কোন তুলনাই হয় না। পড়াশোনাতেও ভাল ছেলে, ক্লাসের ফার্স্ট বয় বা সেকেন্ড বয় ছিলেন নন্দ মাস্টার, তার নিচে কখনও নামেন নি। এণ্ট্রান্স পাশ করেছিলেন ফার্স্ট ডিভিশনে। তা ছাড়া দেহে ছিল অসাধারণ শক্তি। পালোয়ানের মত। ফুটবল খেলায় তিনি ছিলেন অসাধারণ ফুলব্যাক। রিটার্ন শটে বলকে তেপান্তর পার করে দিতেন। এদিকের পেনাল্টী-এরিয়া কি ব্যাকের এলাকা থেকে যে বলটাকে বেশ সুবিধা ক'রে রিটার্ন শট মেরে ফেরাতে পারলে, সে বলটা সটান গিয়ে ও দিকের গোলের মুখে 'এইট্টিন ইয়াড' দাগের সামনেই গিয়ে মাটিতে পড়ত বেশ জোর শব্দ তুলে। এবং তাঁর সেই মধ্যম পান্ডবের গদার তুল্য পাখানি যখন তিনি সবেগে আস্ফালন ক'রে বল মারবার জন্য উৎক্ষিপ্ত করতেন তখন কি স্বপক্ষের কি বিপক্ষের যে কোন খেলোয়াড় দু চার পা পিছু হঠত বা থমকে দাঁড়াত। কোনরকমে তাঁর সেই গদাতুল্য বলশালী চরণের আঘাত খেলে ভগ্নউরু দুর্যোধনের মতই ধরাশায়ী হতে হ'ত।

মধ্যম পান্ডবের সঙ্গে খানিকটা মিলও ছিল। দেহের শক্তির কথা তো শুনেছেন এবার আহারের কথা বলি—তাহ'লে বিচার করে বলতে পারবেন, তুলনাটা অন্যায় করেছি কি না।

ভোজকাজে অর্থাৎ নেমন্তন্ন বাড়ীতে বিশালকায় নন্দ মাস্টার হেলতে-দুলতে-দুলতে একটি কাঁসার গ্লাস হাতে এসে আসন গ্রহণ করতেন। দরিদ্র মধ্যবিত্ত বাড়ীর গৃহস্থ বা কৃপণ লোকে খুব খুশী হত না এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি কিন্তু ধনীজনে বিশেষ করে যিনি খাইয়ে খুশী হন তিনি সাগ্রহে বলতেন—দে রে—দে রে নন্দগোপাল এসেছে পাতা দে—পাতা দে।

নন্দগোপাল কথায়বার্তায় ছিলেন একটু 'মাটো' অর্থাৎ নরম। একটা অপ্রতিভ অপ্রতিভ লজ্জিত ভাব ছিল। লজ্জিতভাবে একটু হাসতেন, এবং একটি দুটি হ্যাঁ—হ্যাঁ শব্দ উচ্চারণ করেই মল্লভূমে মল্লের মত গিয়ে আসন পরিগ্রহ করতেন। সে কালে আর যাঁরা খাইয়ে লোক ছিল তাঁরাও তাই করতেন। ওই মল্লভূমে মল্লদের মত দুই জানুতে চপেটাঘাতের শব্দ তুলে বসার মত জাঁকিয়ে বসতেন। তারপর শুরু হত খাওয়া। সে অন্ন থেকেই আরম্ভ। সাধারণ লোকেদের থেকে অন্ন বেশী নিশ্চয় খেতেন, কিন্তু সেটাকে প্রায় মল্লযুদ্ধের পাঁয়তাড়া বা বাইঠোকা বলা যায় তার বেশী কিছু নয়। আসল ক্রীড়া আরম্ভ হ'ত মাছ থেকে। খানার পর খানা, দুখানা চারখানা দশখানা বিশখানা পঁচিশখানা—খানার পর খানা পড়ছে আর খেয়ে যাচ্ছেন খাইয়ে নীরবে। আর দেব? ঘাড়টা একটুখানি নড়ল—হ্যাঁ। পড়ল, পঁচিশখানার পর আর দুখানা। নন্দগোপালের হাত উঠেই রইল—পাতায় নামল না। আবার দুখানা পড়ল।

—আর?

নন্দগোপাল নীরব এবং তাঁর হাত যথাস্থানে স্থির হয়ে প্রতীক্ষমান হয়ে উঠেই রয়েছে। নামে নি।

তার অর্থ খুব স্পষ্ট। সুতরাং—

আর দুখানা। —আর?

একটু হেসে মৃদুস্বরে অনুযোগ করে নন্দগোপাল বলতেন—দাও দাও আর কত বলব? বলেই বাঁ হাত দিয়ে বালতিখান টেনে বললেন—উপুড় ক'রে দিয়ে যাও আর পার তো একটা মাছের মুড়ো আনো।

এরপর পায়েস তাও বেশ খানিকটা খেয়ে, এক বালতি লেডীকেনি বা ছানাবড়া অনায়াসে খেয়ে ফেললেন নন্দ মাস্টার, অতঃপর খেয়ে হেউ হেউ শব্দে ঢেকুর তুলে মাতঙ্গের মত পদক্ষেপে উঠে চলে গেলেন নিজের বাড়ীর দিকে। এবার এককলকি তামাক। বলতে ভুলেছি যজ্ঞি বাড়ী থেকে পান নিয়ে কানে গুঁজতেন মাস্টার। পান মুখে দিয়ে তামাক।

খাওয়ার পর যাট সোত্তোরটা পর্যন্ত বেশ সেকালের মিষ্টি খেয়ে উঠতেন তিনি। নিতান্ত দরিদ্রের বাড়ী বাদ দিয়ে অন্য বাড়ীতে যেখানে মিষ্টি বরাদ্দ দুটো করে কি একটা ক'রে সেখানে তিনি অন্ন এবং ডাল তাই খেতেন প্রচুর পরিমাণে। কচুর তরকারি তাই আধসের তিন পোয়া পরিমাণ খেয়ে ঢেকুর তুলতেন। এ শেষ বয়স পর্যন্ত চালিয়েছেন তিনি।

শুধু তাই নয়, খাবার সময় কিছু মাছ যা কিছু মিষ্টি, কিছু না হলে কিছুটা ভাত—তাই পুরে নিয়ে যেতেন তাঁর গ্লাসে। যে গ্লাস নিয়ে তিনি খেতে আসতেন সেই গ্লাসে।

সঙ্গে ছেলেপুলে এক আধজন থাকত, [illegible] নে. যেন

ফেলিস নে। নিজের বাঁ হাতে থাকত একখানা থালা। সেটা ছাঁদা। খাবার সময় নিজের পাতার কাছেই পেতে রাখতেন। পরিবেশককে বলতেন—ওটায় দাও। কুটুম্ব আছে বাড়ীতে, আসতে পারে নি!

এইখানে আর একটা কথা না বললে নন্দগোপাল বা বিলিতী মাস্টারকে ঠিক বুঝানো যাবে না। এবং সত্য নন্দগোপাল আপনাদের সামনে ঠিক অভিবাদন করে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই পেটেন্ট একটু অপ্রতিভ হাসি হাসবেন না।

সেটি হল এই যে, ওই নেমন্তন্ন-বাড়ী থেকে গেলাস-ভর্তি উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং থালায় করে ছাঁদা আনার দীনতার মত একটি দীনতা তার চরিত্রে ছিল। এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৌরবর্ণ বিশাল বক্ষপাটা, টিকলো নাক, এসব সত্ত্বেও বাইরের চেহারাতেও একটা দীনতার ছায়া ফুটে উঠেছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। চেহারায় রূপের এইসব উপকরণ সত্ত্বেও তাঁকে কখনও উজ্জ্বল দেখায়নি। একটা মালিন্য যেন তার উপরে রূপোর বা সোনার জিনিসের উপর ময়লার আবরণের মত একটা ম্লান আবরণ বিছিয়ে রাখত। মুখে ব্রণ হত; সে মুখ-ভর্তি ব্রণ। এবং মুখের গৌরবর্ণ ভেদ করে অসংখ্য কালো তিল ফুটকির মত ফুটে থাকত।

চরিত্রের দীনতা কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে ওই ছাঁদা আনার ব্যাপারে। তাছাড়া আরও কয়েকটা কথা বলি, তাহলে সবটা স্পষ্ট হবে।

নন্দগোপালের জীবনের পটভূমি খুব স্বচ্ছল পটভূমি নয়। বাপ, গ্রামের জমিদার-দের বাড়ীতে গমস্তা-নায়েবের কাজ করতেন। পাড়াঘরে পুজো-অর্চনার কাজও করতেন। জামজেরাতও কিছু ছিল। মধ্যে মধ্যে ছেলেও পড়াতেন। তাঁর চরিত্রেও ছিল এই ধরনের দীনতা।

আমাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়। একশো কুড়ি-পঁচিশ বছরের পুজো। সেই পুজোর কাজে নন্দগোপালের বাপ পরি-চারকের কাজ করতেন। পরিচারক মানে ভৃত্য বা চাকর; এখানে মায়ের পুজোর জন্য ব্রাহ্মণ-পরিচারক বা ভৃত্য বা চাকর, যে যাই বলুন নিযুক্ত হত। পুজক পুরোহিতকে সব হাতে হাতে জুগিয়ে দেওয়া ছিল পরি-চারকের কাজ। তার সঙ্গে ছিল পুজোর ভাঁড়ারের জিম্বাদারী।

বাদশাহী আমলে বাদশাহদের 'খান-ই-সামান' যিনি থাকতেন তিনিই ছিলেন বাদ-শাহের আসবাবপত্র কাপড়-চোপড় প্রভৃতি সমস্ত জিনিসের জিম্বাদার। পদটা ছোট ছিল না। ইংরিজীতে যাকে স্টুয়ার্ট বলে তাই। অনেক সময় অনেক 'খানি-ই-সামান' খান-ই-খানানও হয়ে গেছেন। পুজোবাড়ীতে দেবতা হলেন সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী, পুজক-পুরোহিত সেই হিসেবে উজীর-উকিল, এবং সেই হিসেবে পরিচারককে খান-ই-সামান নিশ্চয়ই বলা যায়। পুজোর সমস্ত ভান্ডার-টাই থাকত তাঁর জিম্মায়। আমাদের এই পুজোতে বিজয়াদশমীর দিন মায়ের চিঁড়ে-গুড়। এবং সে অল্পস্বল্প নয়, মণ দরুণে। দু'মণ চিঁড়ে এবং তদপুযুক্ত অন্য উপ-করণের বরাদ্দ ছিল। দইয়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভিজিয়ে দেওয়া হত; তার জন্য বড় বড় পোড়ামাটির পাত্র (যাকে আমরা কুঁড়ে বলি) আসত কুমোরবাড়ী থেকে। সেকালে দাম ছিল, এক আনা হিসেবে দু' আনা। যাই হোক এই ভিজানো দই-চিঁড়ে বিতরণের পর এই শূন্য কুড়েদুটি নিয়ে যেতেন নন্দ-গোপালের বাবামহাশয়। তাঁর সারাজীবনই তিনি এই পরিচারকের কাজ করেছেন। তাঁরই জীবনকালে কুড়ে ভাঙত বলে মাটির কুড়ের পরিবর্তে পিতলের বড় গামলাতে চিঁড়ে ভিজোবার ব্যবস্থা হল। তাতে মাটির বাসন ভাঙার ঝঞ্ঝাট গেল, নন্দগোপালের বাবা এই কুড়ে দাবী করে বসলেন। বললেন—এটা আমি পেতাম। এবং এই দুটি কুড়েতেই আমার বাড়ীর দুটি বলদের জাব খাবার ঠাঁই হয়ে এসেছে চিরকাল। এখন আমি কুড়ে কোথায় পাব? হয় কুড়ে দাও, নয় দাম দাও। কর্তারা দামই দিতেন, এই দু' আনা দাম ও'দের বৃত্তি হয়ে গিয়েছিল। সে-বৃত্তি নন্দ-গোপালের ছেলেরাও পেয়েছে। উঠেছে জমিদারী উচ্ছেদের পর। আমি নন্দগোপালের ছাত্র; শিক্ষক হিসাবে তিনি ভাল শিক্ষক ছিলেন—অঙ্কে এবং ইংরিজীতে দুটোতেই ছাত্রজীবনে নিজে যেমন ভাল ছাত্র ছিলেন, মাস্টারী-জীবনে শিক্ষকও হয়েছিলেন তেমনি ভাল। এক সময়ে কিছুদিন তিনি আমাকে প্রাইভেটও পড়িয়েছেন; তিনি পুজোর পর একাদশীর দিন মাতঙ্গের মত এসে বসতেন সামনে সতরঞ্চির উপর এবং অপ্রতিভের মত একটু হেসে হাত বাড়িয়ে দিতেন—কুড়ের দামটা!

পুজো আমাদের শরিকানি পুজো। আমরা সিকির অংশীদার। দু' আনার অংশ দুটি পয়সা তাঁর হাতে তুলে দিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হত আমার। কিন্তু নন্দ-মাস্টারের তাতে কোন সঙ্কোচ ছিল না। পয়সাদুটি ট্যাঁকে গুঁজে হেসে উঠতেন তিনি।

এইভাবে পয়সার দিকে ঝোঁক তাঁকে এবং তাঁর ভাইদের চিরকালটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এটা যেন বংশগত বা পরিবারগত
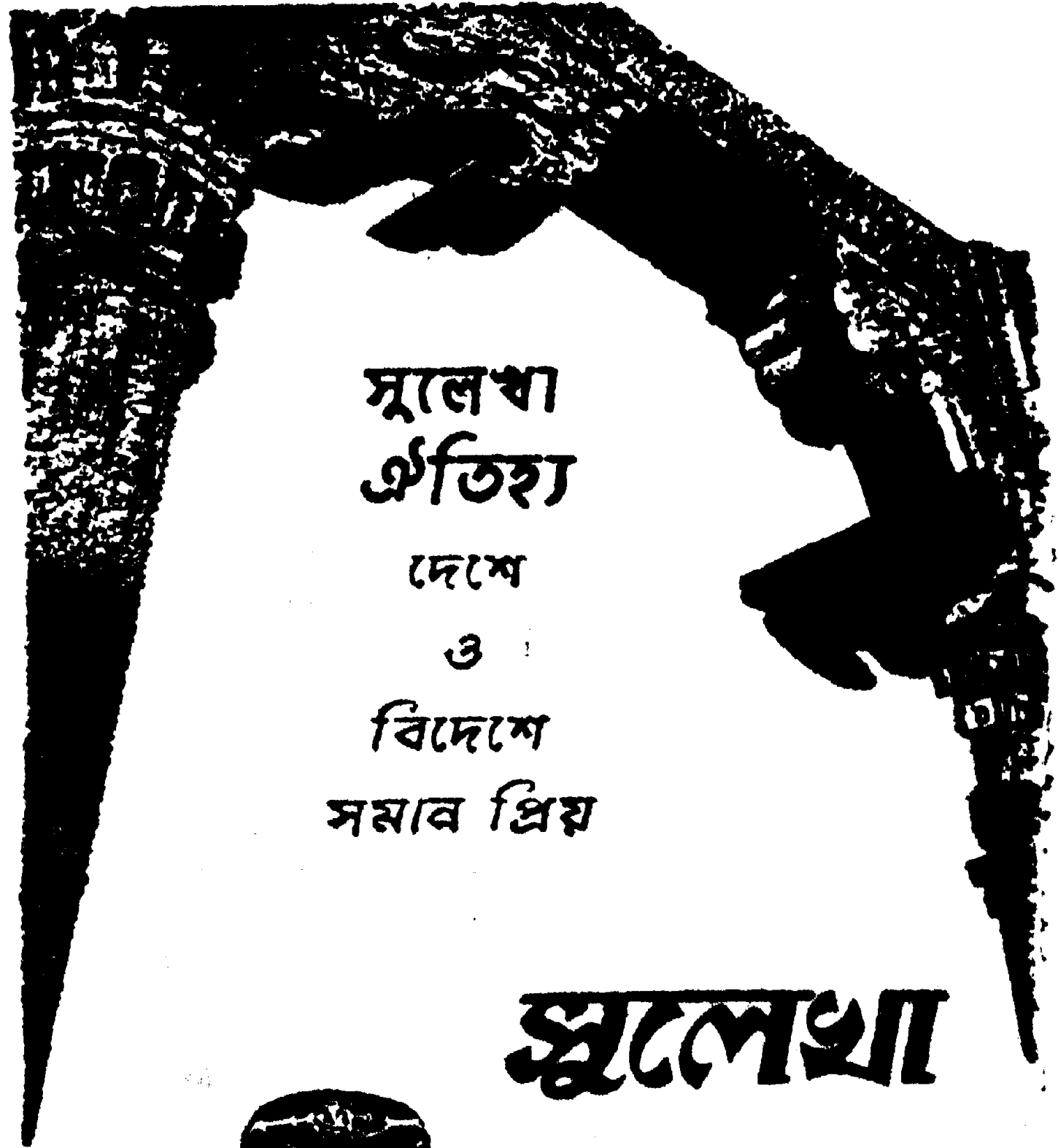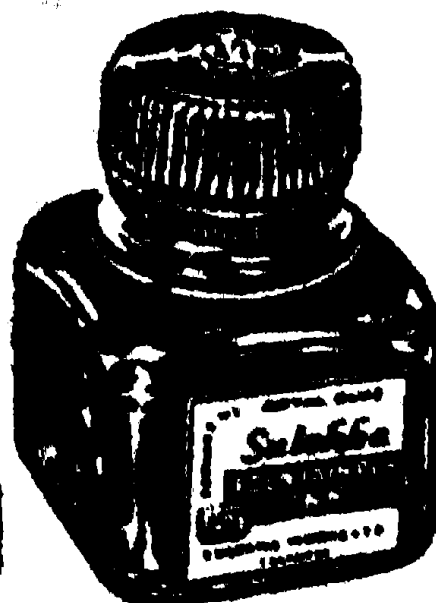
ষা রক্তগত প্রবৃত্তি তাঁদের। অপর সকলকে মানাতো কিন্তু নন্দগোপালকে মানাতো না। সেটা তিনি অনুভবও করতেন এবং সেই-জন্যই বোধহয় অপ্রতিভ হাসি হাসতেন।

নন্দমাস্টারের ভাইরা এবং নন্দমাস্টার নিজে পাকা তামাকখাইয়ে ছিলেন। তাঁরা বাল্যকালে এ-বিদ্যা শিখেছিলেন তাঁর পিসিমার কাছ থেকে। এবং স্কুল-জীবনে সেকালে তাঁদের বাড়ীতে আপনা-আপনি থেকে একটা তামাকের আড্ডা বসে গিয়েছিল। দৈনিক এক পয়সার মেম্বরশিপের তামাকের আড্ডা।

একটি পয়সা দিলে, দিনে বার-তিনেক তামাক খেতে পেতেন। প্রভাতী, ভাতি, শুতি। প্রভাতবেলা কল্কে সাজা হলে তাতে টানতে পেত একবার, ভাত খাবার পর ভাতি, শোবার সময় শুতি। এক কল্কে তামাক পাঁচ-সাতজনে পেট পুরে খেতে পারে। এবং তিনবারে তিন কল্কে তামাকের দাম সেকালে এক পয়সার বেশী নিশ্চয় ছিল না। সুতরাং সাতজনের সাত পয়সা থেকে তামাকের দাম এক পয়সা বাদ দিয়ে ছ' পয়সা নগদ লাভ হত তাঁর। এ-ব্যবসাটা তাঁর নিজের ছাত্র-জীবনে পত্তন হয়ে আপনি গড়ে উঠেছিল; তারপর ছাত্র থেকে শিক্ষক হলেন তখনও এ-ব্যবসা তাঁর চলেছে; তখন চলেছে তাঁর ছোট ভাইয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টরীতে। তারপর এখানেই তাঁর ছেলে তামাক ধরছে। তারপর কালধর্মে কনসার্নটি লিকুইডেশনে গেছে। 'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই'—প্রবাদের মতই ব্যবসার গদী এবং গদীয়ান এ'রা কেউই নেই আজ। শুধু আছে প্রবাদ বা কাহিনী।

এবার বলব নন্দগোপাল সরকার 'বিলিতী মাস্টার' হলেন কেমন করে।

আগেই বলেছি—নন্দগোপাল সরকার ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছাত্র ছিলেন—সেইসঙ্গে পরিশ্রমী ছাত্রও ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যবান ও কঠোর পরিশ্রমী। ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়ে বছরে বছরে ক্লাসের পর ক্লাসের দরজা খুলে ফার্স্ট ক্লাসে উঠে শেষ দরজা খুলে বর্ধমানে গিয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে গ্রামে ফিরলেন। কিছুদিন পর পরীক্ষায় খবর বের হল. দেখা গেল ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছেন নন্দগোপাল সরকার। কিন্তু

তারপর? কলেজে পড়বার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাহলে?

আমাদের গ্রামের ইস্কুলের হেডমাস্টার শশিভূষণ নিয়োগী মশায় তাঁকে ডেকে বললেন—পড়তে তো আর পারছ না নন্দ। তাহলে ইস্কুলেই কাজ কর। কি বল?

নন্দমাস্টার আবার ইস্কুলের কাঠের ফটকটি খুলে এবার মাস্টার হিসেবে ঢুকলেন ইস্কুলে। এবং খুঁজতে লাগলে একটি তামাক খাবার গোপন কর্ণার। মাস্টাররা যে সকলেই তাঁর মাস্টার, ভরসা ফেল-করা বুড়ো ছাত্ররা, যারা একদা তাঁর সহপাঠী ছিল। এবং যারা পাকা তামাকখোর। পুরনো ফেল-করা ছাত্রের সংখ্যা তখন একাল থেকে অনেক বেশী থাকত। তাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তানরাই বেশী থাকত, গরীবের ছেলে যারা ফেল করত, তারা ইস্কুল ছেড়ে কুলকর্ম করত, কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা মা সরস্বতীকে সহজে ছাড়ত না। এবং সেকালে বড়লোকের ছেলেদের এক বছরে পাশ করলে সেটা সম্ভবতঃ অগৌরবেরও কারণ হত। কথায় কথায় তাঁরা বলতেন—"ওরে, ওইসব হাভাতেদের মত তো চাকরী করতে হবে না আমাকে। বছরে বছরে পাশ করলে মজাটা যে ফুরিয়ে যাবে। এ শালা জিরেন কাটের রস। তারিয়ে তারিয়ে খেতে হয়।" কথাটা বলে মুচকে মুচকে হাসতেন। এবং গরীববাড়ীর ভাল ছেলে যারা, তারা কথাটা শুনে সবিনয়ে সায় দিয়ে মুখ নামাতো। এ'রা সব বোর্ডিংয়ে থাকতেন। এবং বড় বাড়ীর ছেলেতে-ছেলেতে দস্তুরমত প্রতিযোগিতা চলত জামা-কাপড়ের ফ্যাশন, সেন্ট, সিগারেট এবং ভাল তামাকের গন্ধের ব্যাপার নিয়ে। কলকাতা থেকে তাঁরা জামা করিয়ে আনতেন। সিগারেট জোগাতো সেকালে পানওয়ালা ফটিক দাসের বাবা। সেন্ট ইত্যাদি জোগাতো ওসমান চাচা।

ওসমান চাচার এক স্টেশনারির দোকান ছিল। স্টেশনারির সঙ্গে সেকালে সিল্কের গেঞ্জি, সিল্কের এবং সুতীর রুমাল, সিল্কের মোজাও রাখতেন ওসমান চাচা। লাল-নীল পেন্সিল, সেকালের সরু কপিইং পেন্সিল তো স্টেশনারিরই সামিল।

বড়লোকের বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেটিই ছিল তাঁর বাঁধা খরিদ্দার। তিনি তাদের প্রত্যেককে আলাদা ডেকে নিয়ে বলতেন—শুনো চাচা—শুনো।

—কি চাচা?

—এই দেখ।

—সেন্ট!

—হাঁ। খাস বিলাতী, এ-চাকলায় কেউ দেখেনি। ইবার গেলাম মহাজনের দুকান। সিউড়ীর ফাজিল মিয়ার দোকান। কইলাম নতুন জিনিস দ্যান মিয়াসাহেব। নতুন সেন্ট। তা এই দিলেন। দাম তুমার আড়াই টাকা শিশি, তা তিন শিশি আনছি। এক শিশি নিলেন গিয়া ই-পাড়ার ছুটোবাবু, এক শিশি নিলেন উ-পাড়ার ছুটোবাবু। আর এই এক শিশি তুমার তরে রাখছি আমি। ছুটোবাবুর মেজাজ জান তো, সে নিজে যে-গন্ধ মাখবে, সে আর কেউ যেন না মাখতে পায়—ওই হল তার বাত্। আমারে কয়—দাও যে-কয়টা আনছ, সব আমারে দাও। সে দুকান তালাস করব বলে চাপ। অনেক কষ্টে লুকায়ে রাখছি তুমার জন্যে।

সেকালের বারো আনার সেন্ট—আড়াই টাকায় বিক্রী হয়ে যেত। সে এক-আধটা নয়, দশ-বারোটা। কিন্তু কেউ জানত না যে, অন্যেরাও এই গন্ধ পেয়েছে। এবং ওসমান চাচা ঠিক এই কথাগুলি তাদেরও বলেছে।

এই—এইসব ছেলেদের কাছে তামাক খেতে গিয়ে সেখান থেকেই নন্দমাস্টার জোটালো তার বিলিতী মাস্টার খেতাব। পাঁজিতে বিজ্ঞাপন থাকত পাঁচ টাকার বাবুগিরির দ্রব্যের। সেইসঙ্গে আরও বহুবিধ বিজ্ঞাপন, সেই বিজ্ঞাপন দেখে বড়লোকের ছেলেরা ভিপিতে জিনিস আনাতো।

এমনি একটি বড়লোকের ছেলে এল। শহর থেকেই এল। তার দু'-চারটে জিনিস আসত ইউরোপ থেকে। সেই সূত্রে বিজ্ঞাপন বা নানা দোকানের ক্যাটালগ আসত।

তারই মধ্যে নন্দমাস্টার আবিষ্কার করে ফেললে বিনামূল্যে নমুনা হিসেবে অনেক জিনিস অনায়াসে আনানো যায়। মোয়া খেতে হলে কড়ি ফেলতে হয় যে-দুনিয়ায়, সেই দুনিয়াতেই বিনামূল্যে জিনিস মেলে—এর থেকে বড় আবিষ্কার আর কি হতে পারে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ না হোক, এটি যে সেই বিচিত্র আংটি, তাতে আর সন্দেহ কোথায়?
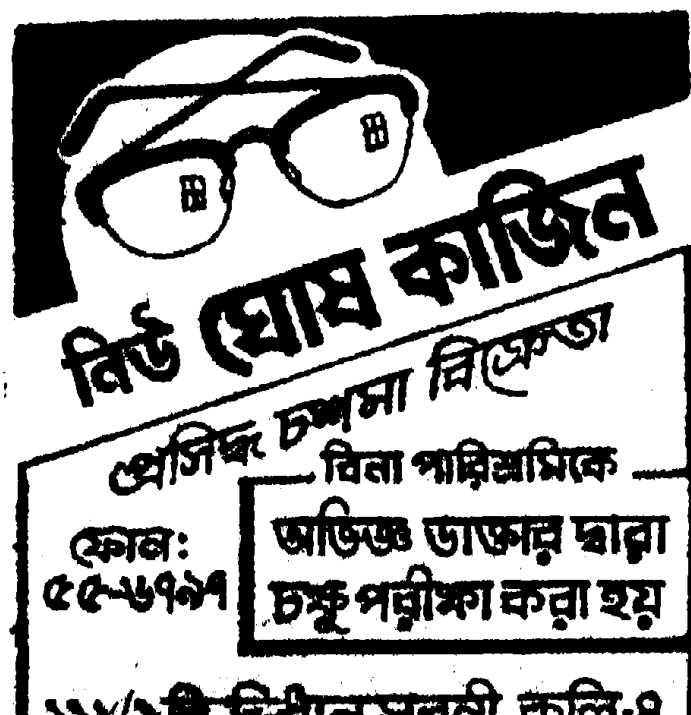
প্রথমেই নন্দগোপাল চিঠি লিখেছিল—জার্মানীতে কোন এক ফার্মে বা কোন জ্যোতিষীকে। জ্যোতিষীটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বিনামূল্যে তিনি কোষ্ঠী গণনা করে পাঠাবেন, নন্দমাস্টার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্ম-তারিখ সময় ইত্যাদি জানিয়ে লিখলেন—"আপনার বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আমার জন্ম-তারিখ ইত্যাদি পাঠালাম, অনুগ্রহপূর্বক কোষ্ঠী বিচার করে পাঠাবেন।"

অনেক দিন, প্রায় মাসদুয়েক পর আমাদেরই গ্রামের বিনোদ বাঁড়ুজ্জে আমাদেরই গ্রামের পোস্টাপিসেরই পোস্টম্যান একটি সুদৃশ্য প্যাকেট নিয়ে ইস্কুলে এসে—সে এক সোরগোল তুলে ঢুকলেন।

পোস্টম্যান হলেও রাধাবিনোদ বন্দোপাধ্যায় এই গ্রামবাসী এবং ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে যে একটি বিশেষ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—সেই অধিকারে ইস্কুলে ঢুকেও এইভাবে কথাবার্তা বলবার অধিকার তাঁর সেকালে ছিল।

—কই, কই নন্দ কই! নন্ডা গুপাল সিরকার? বাপরে বাপরে জার্মানী থেকে কি আসছে রে বাবা! নন্ডা গুপাল সিরকার! নন্দমাস্টার নয় বিলিতী মাস্টার—। লে বাবা সই কর্।

এই থেকেই নাম হল বিলিতীমাস্টার—

এরপর বলব মাস্টারের জীবনের কিছু কথা। যাতে মাস্টারের চরিত্রটি পাঠকের মনের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ঐতিহাসিক পরকীয়া: ভলতেয়ার

সুধাংশু দাশগুপ্ত

প্যারিসের রাস্তায় সেদিন একটি শোভাযাত্রা দেখা গেল—প্রায় লক্ষ লোক নীরবে শোকাবনত মস্তকে এগিয়ে চলেছে সামনে, সবার আগে চলেছে একটি শববাহী শকট। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে আরও কয়েক লক্ষ দর্শক - শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নর-নারী। সবাই দেখছে এক প্রিয়জনের শেষ সম্বর্ধনা। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা শেষ হল অনতিদূরের Pantheon -এর সমাধিক্ষেত্রে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হল শেষকৃত্য—একটিমাত্র ফলক গ্রথিত করে দেওয়া হল সমাধিভূমিতে—'Here lies Voltaire'.

১৭৯১ সালের কোন একটি সকালে বিশ্ব-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল প্রতিভা প্যারিসের রাজপথে সর্বকালের জন্য স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। আজ যাঁরা ভলতেয়ারের জন্য চোখের জল ফেললেন, তাঁরা ভলতেয়ারের কেউ নন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কেউ ছিল না ঐ মহান জনতার মধ্যে—তবু কাঁদল সবাই, কাঁদল জানা-অজানা কয়েক লক্ষ লোক, Pantheon-এর সমাধিক্ষেত্রে শেষ স্মৃতিচারণা করতে এসে নিয়মশাসিত অনন্তের রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে সার্থক অনিয়মস্রষ্টার অন্তিম শয়ান প্রত্যক্ষ করে গেলেন তাঁরা।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা—সেদিনও ছিল সকাল। ভলতেয়ারের অবস্থা সেদিন ভাল নয়। একজন পুরোহিত খবর পেয়েই এলেন, অযাচিতভাবেই এলেন। মুমূর্ষু ভলতেয়ার প্রশ্ন করলেন—আপনি কে? উত্তর দিলেন পুরোহিত—আমি ঈশ্বরের দূত। ভলতেয়ার পাল্টা প্রশ্ন করলেন—আপনার পরিচয়-পত্র? (Your credentials ?) পুরোহিত রেগে ফিরে গেলেন। শেষসময় আসন্ন দেখে ভলতেয়ার নিজেই একজন পুরোহিত ডেকে আনালেন। যে এল, সে প্রথমেই দাবী জানাল, ভলতেয়ারকে লিখে দিতে হবে 'আমি ক্যাথলিক ধর্মে পূর্ণ বিশ্বাসী।' ভলতেয়ার ক্ষেপে গেলেন। নিজেই কাগজখানা টেনে নিয়ে কাঁপা হাতে খস্‌খস্‌ করে লিখলেন:

"I die adoring God loving my friends, not hating my enemies, and detesting Superstition".

তারিখ। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৭৭৮:

স্বাঃ ভলতেয়ার

সেদিন যাঁরা ভলতেয়ারের পাশে ছিলেন, তাঁরা কেউই অবাক হননি। কারণ, এই-ই তো ভলতেয়ার— Zadig, Candide, Micromegas, L'-Ingenu -র মত দুর্ধর্ষ, বিদ্রোহী কাহিনী যে লিখতে পারে, যে নিজের সম্বন্ধে চীৎকার করে বলতে পারে— 'who does not carry great name but wins respect for the name, he has',সেই-ই ভলতেয়ার। এ শুধু একটা নাম নয়, এ এক ছদ্মনাম, যার আড়ালে বহুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে আসল নামের মানুষ Francois Marie Arouet, যে নাম অষ্টাদশ শতকের এক বিস্ময়, এক মূর্তিমান জিজ্ঞাসা। ১৭৯১ সালে তাই প্যারিসের মানুষ বাধ্য করেছিল সম্রাট ষোড়শ লুইকে—'ফিরিয়ে আনো ভলতেয়ারকে প্যারিসের মাটিতে, Pantheon-এর সমাধিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গৌরবে সমাধিস্থ কর ফরাসীদেশের মানসপুত্র সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী ভলতেয়ারকে।' সম্রাট লুই মাথা নত করেছিলেন। ১৭৭৮ সালের ৩০শে মে যাঁর মৃত্যু হয়, তাঁর সত্যিকারের সমাধি হল ১৭৯১ সালে। ১৭৭৮ সালে প্যারিসে তাঁকে কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ধর্মযাজকদের ভয়ে বন্ধুরা অনতিদূরে এক অবজ্ঞাত অনাদৃত সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছিলেন ভলতেয়ারের মৃতদেহ। ১৭৯১ সালে আবার ফিরিয়ে আনা হল সেই দেহাবশেষ প্যারিসে। পূর্ণ মর্যাদায় সমাধিস্থ হল এবার। এ-ও এক ব্যতিক্রম। অনিয়মের মূর্তিমান স্রষ্টার সত্যিকার স্মৃতিচারণা হল এমনিভাবে—তের বছর পরে স্বাভাবিক নিয়মভঙ্গের মধ্য দিয়ে।

ভিড়ের মধ্যে হয়ত দাঁড়িয়েছিলেন মারকুইস দ্য চাটালেট আর মারকুইস্‌ দ্য সেন্ট ল্যাম্বার্ত। দুজনের চোখেই জল—হয়ত পাশাপাশিই দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা, যেমনি তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন বিয়াল্লিশ বছর আগে এমনি এক সকালে। সেদিনও তাঁদের চোখে জল ছিল—সমব্যথী দুজনের সঙ্গে আর একজন ব্যথীও কাঁদছিলেন তাঁদেরই মত, তিনি ভলতেয়ার। সেদিনও তাঁরা ছিলেন এমনি এক মহাযাত্রার সামনে—মনস্বিনী এক নারীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। ম্যাডাম চাটালেট আর বেঁচে নেই—মারকুইস্‌ দ্য চাটালেটের ঘরে আর তাঁকে কোনদিন কেউ দেখবে না। মারকুইস্‌ দ্য চাটালেটের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের কত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কত মুহূর্ত কেটেছে কাইরির এই বাড়ীতে। মারকুইসের মনে তখন এক নিঃসীম শূন্যতার ব্যথা বাজছে—বাজছে আরো বেশী করে এই জন্যে যে, জীবনের শেষসীমান্তে এসে যাঁর প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী, যাঁর কল্যাণস্পর্শে সেবাযত্নে পরিচর্যায় তার শেষদিনগুলো মধুর করে তুলতে পারত সে আর নেই। কিন্তু সেদিন সেণ্ট ল্যাম্বার্ত কাঁদছিলেন কেন? চাটালেট ভাবছিলেন ল্যাম্বার্ত-এর ব্যথা কতটুকু। মাত্র কয়েক বছরে কতটুকু জেনেছে সে তার স্ত্রীর—কতটুকুই বা পেয়েছে সে। কিন্তু ল্যাম্বার্তের ব্যথা, সে তাঁর নিজস্ব, মাত্র এক বছর আগে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার ম্যাডামের সঙ্গে। সুপুরুষ যুবক ল্যাম্বার্তকে দেখে প্রৌঢ়া ম্যাডাম এক নিমিষে ভালবেসেছিলেন—ঠিক তেমনি নিবিড়ভাবে, যেমনিভাবে বেসেছিলেন কুড়ি বছর আগে ভলতেয়ারকে, তারও আগে যৌবনে স্বামী মারকুইস্‌ দ্য চাটালেটকে। কতই বা বয়স—৪৪? প্যারিসের অভিজাত-সমাজে ভালবাসার পক্ষে এ-বয়স কি খুব বেশী? ল্যাম্বার্ত তখন তরুণ, সুপুরুষ—দুর্দমনীয় তার আকর্ষণ। যৌবনের প্রাণধর্ম শেষবারের মত বুঝি ম্যাডামের জ্বলে উঠেছিল—নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তিনি ল্যাম্বার্তকে। কিন্তু ল্যাম্বার্ত? কি পেয়েছিলেন তিনি ম্যাডামের মধ্যে? সুন্দরী? প্যারিসে ম্যাডামের মত সুন্দরী তো অনেক ছিল, সুপুরুষ ল্যাম্বার্তের এতটুকু দাক্ষিণ্য পাবার জন্য তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ত তার কাছে। না—ম্যাডাম চাটালেট একজনই ছিল প্যারিসে। আর ঐ একজনই পারত মানুষকে বাদ দিয়ে তার প্রতিভাকে ভালবাসতে—তাঁর কাছে রূপ তুচ্ছ, যৌবন তুচ্ছ, বৈভবও তুচ্ছ, একটুকরো প্রতিভার জন্যে তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারতেন একনিমিষে। ভলতেয়ার তো তাঁরই সৃষ্টি। কুরূপ ভলতেয়ারকে তিনি দেখেননি, দেখেছিলেন 'Letters on the English'-এর বিদ্রোহী লেখক ভলতেয়ারকে। আর দেখমাত্রই বলতে পেরেছিলেন—'মুক্তি চাই, বল্গাহীন সাদাঘোড়ায় চড়িয়ে আমায় তুমি উড়িয়ে নিয়ে যাও, সত্তার মুক্তপক্ষের বিস্তারে আমায় তুমি পূর্ণ কর, ধন্য কর।' ভলতেয়ার সে-ডাক শুনেছিলেন, ম্যাডাম চাটালেটের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন চিরন্তন-নারীর রূপ, তাঁর কল্যাণস্পর্শ; উপলব্ধি করেছিলেন— 'God created woman only to tame mankind'.

ভলতেয়ারের উপলব্ধি মানব-ইতিহাসে চিরকালের মত সত্য হয়ে রইল। ভলতেয়ারের আগে সবার ধারণা ছিল 'woman will be the last thing civilized by man'—নারীর মূল্য ভলতেয়ারের আগে এত তীব্রভাবে কেউ উপলব্ধি করেননি। আর এই মূল্যবোধ ভলতেয়ারের জীবনে এনে দেন ম্যাডাম চাটালেট—একটি নাম, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। প্রথম সাক্ষাৎ ১৭২৯ সালে, ভলতেয়ারের বয়স চল্লিশ, ম্যাডাম বিবাহিতা, বয়স আটাশ। ১৭২৯ থেকে ১৭৪৯ সাল—দীর্ঘ কুড়ি বছর ভলতেয়ার ছিলেন ম্যাডাম চাটালেটের। হায় ল্যাম্বার্ত! ভলতেয়ারের দুঃখের কাছে তোমার দুঃখ কতটুকু! কিন্তু মারকুইস্‌ দ্য চাটালেট? তিনি তো স্বামী!

ব্যাভিচারী স্ত্রীর জন্যে তাঁর এই দুঃখ কেন?

মারকুইস্ দ্য চাটালেট স্ত্রীকে ভালবাসতেন। ম্যাডামের মত স্ত্রীকে ভাল না বেসে পারা যায় না। সুন্দরী, তন্বী—আচারে-ব্যবহারে প্যারিসের অভিজাত-মহলে ম্যাডাম চাটালেট তখন গর্বের ধন। বয়সে চ্যাটলেট একটু বড়ই ছিলেন, তখনকার দিনে এমন বয়সের তফাৎ হামেশাই ছিল। তবু ম্যাডামকে মারকুইসের মনে হত কত-দূরে—শতচেষ্টাতেও তাঁর নাগাল পেতেন না তিনি। ম্যাডাম যেন অন্যজগতের মানুষ—সর্বক্ষণ বই আর লেখাপড়া নিয়ে আছেন। তিনি বাড়ীতে নিয়ে আসতেন বোঝা বোঝা গণিতের বই, দুর্বোধ্য সব ফর্মুলায় সেগুলো ভর্তি। কতদিন সঙ্গে আসত ম্যাডামের গুরু, বন্ধু—ভলতেয়ার, ম'পার্সিস্, ক্লেয়ার, প্যারিসের কতসব গাণিতিক। এক-একদিন ম্যাডাম বলতেন অনুযোগ করে—'দেখই না পড়ে আমি কি লিখেছি। একটু একটু বুঝতে চেষ্টা কর—এস না।' মারকুইস্ বলতেন—'ওরে বাবা! ওগুলো দেখলে আমার মাথা ঘোরে।' ছুটে পালাতে হত তাঁর। অঙ্কের ভূত কথাটা মারকুইসের মত তীব্রভাবে পৃথিবীতে আর কেউ বোধহয় কোনদিন বোঝেনি। মারকুইস্ এক-একদিন উল্টোপথ ধরতেন। ঘরে ঢুকেই বলতেন—'শোন আজ একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে।' ইচ্ছা, একটা মজার ব্যাপারের অবতারণা করা। যাতে দুষ্টু ম্যাডাম ছুটে আসে। ম্যাডাম শুধু শুনে বলতেন—'ও, এই!' ব্যস্, সব চুপচাপ—ম্যাডাম তখন হয়ত Newton এর দুরূহ principia অনুবাদে ব্যস্ত, নয়ত টেবিলের সামনে মোমবাতি জ্বালিয়ে পরীক্ষা করছেন Physics-এর কোন জটিলতত্ত্ব। এমনি করে মারকুইস্ প্রতিদিন হেরে যেতেন। যখনই মন চেয়েছে একটি নিবিড় মুহূর্ত, অস্ফুট টুকরো টুকরো অর্থহীন কথা, তখন mathematics আর physics -এর জটিল সূত্রগুলো সব স্বপ্ন-সাধ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তিনি বেরিয়ে গেছেন, প্যারিসের কাফে, স্কোয়ার আর শহরতলীর মত্ততায় নিজেকে সঁপে দিয়ে সুস্থ করেছেন। সেখানে শুধু দাবী করলেই হয়, অন্যের দাবী পূরণের অক্ষমতার নিষ্ঠুর অসহায়তায় কষ্ট পেতে হয় না। প্যারিসের সব মারকুইসের ইতিহাসই তো এই। তবু মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তেন তিনি, শহর থেকে দূরে জমিদারীর কাজে ডুবে থাকতেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তখন কারুর কোন দীর্ঘশ্বাস পড়ত না, mathematics -এর জটিল সূত্রগুলোও হাত-পা নেড়ে তার সামনে এসে বাধার সৃষ্টি করত না।...এমনি এক অনুপস্থিতির কালেই ঘটে গিয়েছিল সেই দুর্ঘটনা, পৃথিবীর ইতিহাস যার ফলে পেয়েছিল ভলতেয়ারকে, পেয়েছিল ফরাসী দেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ চিন্তানায়ককে।

ভলতেয়ার 'Letters on the English' ছাপাতে সাহস পাননি। কয়েকজন বন্ধুকে পাণ্ডুলিপিখানা পড়তে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন এই গ্রন্থের বক্তব্য ফ্রান্সের রাজ-পুরুষেরা সহ্য করতে পারবেন না। ফ্রান্সের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবর্জিত শাসনতন্ত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতার তুলনামূলক আলোচনাই এ-গ্রন্থের মূল বক্তব্য। তিনি তখন জানতেন না যে, এই গ্রন্থের বক্তব্যই পরবর্তীকালে ফ্রান্সের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাধ্বনি হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু দুষ্টু প্রকাশক ছলেবলে পাণ্ডুলিপিখানা হস্তগত করে ছেপে ফেলে। গরম কেকের মত বিক্রী হতে লাগল বই—প্রমাদ গণলেন ফ্রান্সের সৎ মানুষ। তারা সবাই ভলতেয়ারের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পেলেন। হলও তাই—প্যারিস পার্লামেণ্ট আদেশ দিল 'এ-বই প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হক', এ-বই 'Scandalous, contrary to relegion, to morals, and to the respect for authority'। জেলখানার সঙ্গে ভলতেয়ারের আগেই পরিচয় ছিল। ১৭১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল ব্যাস্টিল জেলখানার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। Regent -বিরোধী দুটি কবিতাই এ-অভিজ্ঞতার জন্যে দায়ী। ঐ জেলখানাতেই চিরকালের মত তিনি 'ভলতেয়ার' ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। আগে নাম ছিল Francois Marie Arouet। এবার ভলতেয়ার তাই ভালমানুষের মত জেলে যেতে চাইলেন না। গা ঢাকা দিলেন তিনি—যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলেন ম্যাডাম দ্য চাটালেটকে। মারকুইস্ তখন বিদেশে।

ম্যাডাম চাটালেট ভলতেয়ারের সঙ্গে পালাতে গেলেন কেন? স্নেহশীল স্বামীর আশ্রয়ে ভলতেয়ারকে নিয়ে সাথীত্বের পূর্ণ গৌরবে বাস করতে তো কোন বাধা ছিল না তাঁর। তাছাড়া তাঁর মত মনস্বিনী নারী পালাবার মত সহজ দুর্ঘটনার অংশীদার হতে গেলেন কেন? এ-প্রশ্নের জবাব কারুর জানা নেই। ম্যাডাম চাটালেট নিজেই এর জবাব। প্যারিসের বাতাসে তখন তাঁর হাঁফ ধরেছে—যে স্বাধীন মুক্তবায়ুর স্বাদ তিনি পেতে চাইছিলেন, তা তাঁর স্বামী দিতে পারেননি, দিতে পারেননি তাঁর ঘর, দিতে পারেননি প্যারিসের অভিজাত-সম্প্রদায় যার আপাতমুক্ত অ্যারিস্টোক্রেসীর অন্তস্তলে বইছে বাঁধা ছকের নিয়মনীতির চোখরাঙানি আর শাস্ত্রাচার। প্যারিসের নিয়মনীতি যেদিন তাঁর প্রণয়ের পাত্র ভলতেয়ারকে তাড়া করল, সেদিনই তিনি বুঝতে পারলেন—'এসেছে সময়, বন্দরের কাল হল শেষ।' তাঁরা পালিয়ে গেলেন। গিয়ে উঠলেন ম্যাডামের কাইরির বাড়ীতে। সহস্রধারার কাজে ভাসিয়ে দিলেন নিজেদের। এ-প্রেম শুধু দেহাশ্রয়ী নয়, দেহাতীত ভাব ও সমধর্মীতায় এ-এক নতুন চিন্তামুক্তি-সাধনার প্রেম। ম্যাডাম করতেন গবেষণা, ভলতেয়ার লিখতেন উপন্যাস, নাটক। একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতেন, একে অন্যকে দেখে খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠতেন। ম্যাডাম বলতেন— 'You are so interesting — a creature lovable in everyway' ভলতেয়ার বলতেন— you are a greatman whose onlyfault is being a woman. হয়ত ভলতেয়ার ম্যাডামকে বলতেন সাজতে। হেসে ম্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে বলতেন—এই তো, সেজেছি, পরেছি the finest ornament in France বলেই জড়িয়ে ধরতেন ভলতেয়ারকে। ভলতেয়ার বলতেন হাসতে হাসতে—'God created you only to tame mankind'। এই কথাটিই L'Ingenu-তে ভলতেয়ার লিখেছিলেন অন্যভাবে 'God created woman only to tame mankind'। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম নারীর সত্যিকারের মূল্যায়ন হয়ে গেল।

'Letters on the English' -এর আগে ভলতেয়ার Newton পড়ে তার ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ম্যাডামের সাহচর্যে Newton-এ আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। ম্যাডাম তখন Newton -এর Principia অনুবাদ করছিলেন—শুধু অনুবাদ নয়, বিদগ্ধ টীকাসহ অনুবাদ। এই দুরূহ কাজ আর ধৈর্য দেখে ভলতেয়ার মুগ্ধবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। ফরাসী একাডেমীতে তখন এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দুজনেই প্রতিযোগী হলেন। সে কি রোমাঞ্চ। কে কাকে পাল্লা দিয়ে প্রথম হতে পারে তার প্রতিযোগিতা ঘরে বসেই শুরু হয়ে গেল। ভলতেয়ার তো এক ব্যয়সাধ্য লেবরেটরীই তৈরী করে ফেললেন। শেষকালে উভয়েই প্রবন্ধ পাঠালেন। যথাসময়ে একাডেমীর রায় বেরুলে দেখা গেল—ম্যাডামের 'Physics of Fire' প্রবন্ধ প্রথম হয়েছে। প্রণয়ীযুগলের সেদিনকার আনন্দ বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কোন নিয়মনীতি বা শাস্ত্রীয় স্বীকৃতির ফললাভে তদ্রূপ আনন্দ সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। এই প্রতিযোগিতার ফল যাই হক, উভয়ের জীবনে প্রতিযোগিতা যেন দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়াল—গবেষণা আর আবিষ্কার, আবিষ্কার আর গবেষণা, কে কাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে এই হল উভয়ের কর্মধারা।

ক্রমে কাইরি হয়ে উঠল ফ্রান্সের নতুন প্যারিস। মারকুইস ফিরে এসে সব শুনেছিলেন—চলে গেলেন কাইরিতে। সহজ ব্যবহার, প্রসন্ন সম্মতিতে সহজ করে দিলেন সমস্ত ব্যাপারটা। না করে উপায় কি? অভিজাত মহলে তাঁর একটা মর্যাদা আছে, ব্যাপারটাকে সহজতার বাইরে নিয়ে গেলে ক্ষতি হবে তাঁরই বেশী। প্যারিসের অভিজাত মহলে কোন্ স্ত্রীরই বা প্রণয়ী নেই? তা-ও তারা ম্যাডামের মত মনস্বিনী নন। তাঁর মত মনস্বিনী নারী তাঁর স্ত্রী, এ-গৌরব থেকে কোনরকমভাবে বিচ্যুত হওয়া তাঁর অ্যারিস্টোক্রেসীতে সম্ভব নয়। ম্যাডামও চাননি মারকুইসের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বিরোধ—এই মানুষটি সম্বন্ধে

ম্যাডামের প্রচণ্ড মমত্ববোধ মাঝে মাঝে ম্যাডামকে ভাবিয়ে তুলত। ভলতেয়ারের বক্তব্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সোচ্চার। বিবাহাধীন প্রেম ও জীবন এত শাস্ত্রাচার-জর্জরিত যে, ভলতেয়ারের এতে ছিল তীব্র অনীহা। L'Ingenu আর Zadig-এ তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে ভলতেয়ার প্রকাশ করেছিলেন এ অনীহা। মারকুইস্‌ তাই নিশ্চিন্ত—সমস্ত ফ্রান্স তখন ম্যাডাম চাটালেটের নামে মুখর, বিদগ্ধজনের মুখে মুখে তখন ম্যাডামের নাম। ভলতেয়ার তাঁদের বন্ধু—যার নাম তখন সারা ইউরোপের আকাশে-বাতাসে, প্রিন্স ফ্রেডারিক তাঁর গুণগ্রাহী। রাশিয়ার ক্যাথারিন তাঁকে ডাকেন 'the divinity of gayety' বলে। এ-বন্ধুত্ব তো আভিজাত্যেরই লক্ষণ। তাই সহজ হাসিতে ম্যাডাম যখন মারকুইসকে ডেকে বলতেন 'Come, join us' —তিনি সব ভুলে যেতেন। 'ও সুখে আছে, আনন্দে আছে', এমনিভাবেই ভাবতেন মারকুইস্‌, সহজ সস্নেহে গ্রহণ করতেন ম্যাডামকে। বিদায়ের সময়ে ঠিক তেমনিভাবে বিদায় নিতেন যেমন নিতেন আগে। আবার ফিরে যেতেন প্যারিসে। আগে পেছনে থাকত mathematics আর physics -এর দুরূহ সূত্র, এখন পেছনে শুনতে পান এক ঝলক হাসি, এক আনন্দময় মুক্তপক্ষ দম্পতির কলহাস্য।

ওদিকে সারাদিন অতিথি অভ্যাগতে ভরে যেত কাইরি, সারাদিন তাদের কাটত নানা আলাপ-আলোচনায়। রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর কোনদিন বসত নাটকের আসর, কোনদিন ভলতেয়ার পড়ে শোনাতেন তাঁর নতুন গল্প বা উপন্যাস। ক্রমে ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত আর বুর্জোয়াদের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল কাইরি—দলে দলে লোক ছুটতে লাগল কাইরিতে। দেখতে নিজের নাটকে ভলতেয়ারের অভিনয়, শুনতে তাঁর নতুন ছোটগল্প, উপন্যাস—ব্যঙ্গকৌতুক রহস্যে যাতে রয়েছে নতুনতর স্বাদ যা এ যাবত কেউ দিতে পারেনি। L'Ingenu -র সেই Red Indian, Miss St. Yres, Zadig-এর সেই দার্শনিক, সেই সেমিরা নামের মহিলা—তারা তখন আর গল্পের চরিত্র নয়, ফরাসীবাসীর কাছে তারা তখন এক একটি নিয়মভঙ্গের জ্বলন্ত প্রতিভূ। তৎকালীন বিবাহ, প্রচলিত নিয়মনীতি আর শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মধ্যকার বঞ্চনাগুলোকে যখন তীব্র শ্লেষ আর কৌতুকের মধ্যে দেখা যেত, তখন বঞ্চনাগুলো সত্য হয়ে উঠত দর্শকদের মনে। প্রতিটি দর্শকের ভাবান্তর হয়ত লক্ষ্য করতেন ম্যাডাম চাটালেট্‌, আর ভলতেয়ার-গর্বে প্রতিটি করতালিধ্বনির সঙ্গে মনে মনে বলতেন—ধন্য, আমি ধন্য, I wear the finest ornament in France.

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ লেখেনি কোন বিধাতা। ১৭৩০ সাল থেকে শুরু হ'ল ভাঙ্গাগড়ার খেলা, মিলন আর বিরহের সেতুবন্ধন হয়ে চলল একের পর এক ভলতেয়ারের জীবনে। 'Brutus' মার খেল ১৭৩০ সালে—লোকে নিলে না। ১৭৩২ সালে মার খেল Eriphyle—গুণগ্রাহীরা নাটকটা বন্ধ করে দিতে বললেন। কিন্তু Zaire নিয়ে এল বরমাল্য, পরেই এল Mohamet ১৭৪১ সালে, ১৭৪৩ সালে এল Merope, Semiramis এল ১৭৪৮ সালে। কখন' জয়ের আনন্দ, কখন' ব্যর্থতা—কখন' উৎসাহিত হন, কখন' ব্যর্থতার গ্লানিতে মুষড়ে পড়েন। শেষে এল সব-চেয়ে বড় ব্যর্থতার দূত, এল মারকুইস দ্য লাম্বার্ত ১৭৪৮ সালের কোন এক সন্ধ্যায়। সে এল, জয় ক'রল—এক নিমেষে উষ্ণীষ তুলে ঘোষণা ক'রল—'বিদায় ভলতেয়ার'। ভলতেয়ার সেদিন লিখেছিলেন 'I displaced Richelien (মারকুইস দ্য চাটালেটের নাম), Saint - Lambert turns me out! That is the order of things; one hail drives out onother; so goes the world.'' স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক কবিতাও লিখলেন একটা—

"Saint Lambert, it is all for thee
The flower grows;
The rose's horns are all for me
For thee the rose".

"সেন্ট লাম্বার্ত,
শুধু তোমার জন্যে ফোটে ফুল;
কাঁটাগুলো আমার
গোলাপটি তোমার।"

কিন্তু এমনি সহজ কৌতুকে মেনে নিতে পারেননি ঘটনাটিকে। যেদিন লাম্বার্ত-কাহিনী আবিষ্কার ক'রলেন, সেদিন রাগে দুঃখে ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েছিলেন। লাম্বার্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন বোঝাপড়ার আশা নিয়ে। কিন্তু এক নিমিষে সব জল হয়ে গেল—যে মুহূর্তে লাম্বার্ত ক্ষমা চাইলেন, ভলতেয়ার গলে গেলেন। বয়সে তিনি প্রায়-বৃদ্ধ, জীবনের অন্তিম ডাক শোনবার সময় হয়েছে তাঁর। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল উনিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা, কাইরিতে এক সন্ধ্যাবেলায় যেদিন মারকুইস দ্য চাটালেট তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেদিন তিনিও লাম্বার্তের মত মুখ কাঁচুমাচু করে সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণে বলেছিলেন— 'Excuse me'। লাম্বার্তের ঔদ্ধত্যের কথা একনিমেষে তিনি ভুলে গেলেন। সুদর্শন লাম্বার্তের পৌরুষদীপ্ত মুখে তারুণ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি দেখে ভলতেয়ার সব ভুলে গেলেন, করুণায় তাঁর মন গলে গেল। লাম্বার্তকে তিনি ক্ষমা করলেন।

সন্তান হবে ম্যাডাম চাটালেটের—পরিণত বয়সের বহু প্রত্যাশার, বহু কামনার ধন, পরিপূর্ণ প্রেমে মহীয়ান এক সন্তান। কিন্তু দুর্ভাগ্যও এল সঙ্গে। ১৭৪৯ সালের এক সকালে এল খবরটা—না এলে পৃথিবীর কোনখানে কারুর কোন ক্ষতি হ'ত না। তবু এল সে খবর—ম্যাডাম চাটালেটের প্রসবকালে মৃত্যু হয়েছে। তিন-জোড়া চোখের সামনে একনিমেষে পৃথিবীর সব আলো যেন নিভে গেল। ম্যাডামের শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনজন—স্বামী, ভলতেয়ার, সেন্ট্‌ লাম্বার্ত, কারুর বিরুদ্ধে কারুর আজ কোন অভিযোগ নেই, সবহারানোর একই ব্যথা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন, ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল পরকীয়া প্রেমের তিন শরীক।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উৎসবে (বামদিক থেকে) সর্বশ্রী তুষারকান্তি ঘোষ, নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র এবং রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

মহাত্মা শিশিরকুমার স্মরণে

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আজ এখানে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার আহ্বান পেয়ে আমি সবিশেষ আনন্দিত হয়েছি।* যাঁর পুণ্য নামে এই প্রতিষ্ঠান নিজের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পেয়েছে, সেই মহাত্মা শিশিরকুমারের উপযুক্ত পুত্র সেই পবিত্র রক্তধারার সুযোগ্য অধিকারী, আমার সোদরোপম বন্ধু, শ্রীমান তুষারকান্তি ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি। তাঁর প্রাণচঞ্চল কর্মশক্তিকে আমি ভালবাসি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের কাঁটাপুকুর লেনে যে প্রতিষ্ঠান-শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিল, সেদিনই হয়তো মহাত্মা শিশিরকুমারের অদৃশ্য হস্ত তার ললাটে জয়টীকা পরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেই কিশোর সমিতি শিশিরকুমারের নামাংকিত গৌরব ধারণ করে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে, এবং আজ আর একথা কারও অজানা নেই যে, কলকাতার উত্তরাঞ্চলে এই সংস্থার কী অপরিসীম প্রতিষ্ঠা, কী সীমাহীন সমাদর। ভারতের মনীষীবর্গ এই সংঘশক্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, দেশের যুবশক্তিকে একটা সুস্থ, সবল, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ জাতিতে গড়ে তুলবার মহৎ দায়িত্ব নিয়েছে এই সংগঠন।

আমাদের এই কলকাতা শহরেই এরকম অনেক ক্লাব আছে, যেখানে গ্রন্থাগার, সমাজকল্যাণমূলক কাজ, এবং খেলাধুলোর চর্চা হয়ে থাকে। কিন্তু শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট উপরোক্ত বিষয়ে যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তার মূলে কী আছে, এই কথাটাই আমি চিন্তা করে দেখেছি। আমার মনে হয়, যাঁর পবিত্র নাম ধারণ করে এই প্রতিষ্ঠান গৌরবান্বিত হয়েছে, তিনিই অদৃশ্যভাবে তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদে একে চিরসঞ্জীবিত করে রেখেছেন এবং এই সমাজসেবী কর্মিবৃন্দকে তাঁরই মহান পতাকা বহন করে পথ চলার অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন।

জাতির এক চরম দুর্দিনে মহাত্মা শিশিরকুমার এসেছিলেন; রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, সমাজ-সংস্কারে, জনগণের চিত্তে, আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগিয়ে দিতে তাঁর প্রভাব যেন একটা দৈব নির্দেশ। সে যুগে তাঁর মত উদার, মনস্বী, নির্ভীক, কুশাগ্রবুদ্ধি, স্পষ্টবাদী, চরিত্রবান পুরুষেরই জাতির জীবনে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, প্রজাদের ওপর নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, নিজের গ্রামে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সেই পত্রিকায় দিনের পর দিন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখতে থাকেন। তাঁর স্বাধীন নির্ভীক মন্তব্যে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিদেশী শাসকের নূতন আইন যখন বাংলা সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করে তখন রাতারাতি অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এর পর তিনি পত্রিকাকে টেনে নিয়ে এলেন গ্রাম থেকে এই কলকাতা শহরে। এমনও সময় এসেছে, যখন একাধারে শিশিরকুমার সম্পাদক, কম্পোজিটর ও প্রেসম্যান। তিনি ছিলেন অক্লান্তকর্মী—সংকল্পে অটল। তাঁর ললাটে ছিল যৌবনের উজ্জ্বল রাজটীকা, চোখে বিদ্যুদ্দীপ্তি, বুকে অদম্য সাহস, তাই সমস্ত বাধাবিপত্তি, ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে, কর্তব্যের পথে বীরের মত, যোদ্ধার মত এগিয়ে গিয়েছেন।

সাংবাদিকের ভূমিকায়, তিনি যে ঐতিহ্য রচনা করে গিয়েছেন, বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ন্যায় ও সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে, স্বদেশপ্রীতির যে পরিচয় অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামের পথে তদানীন্তন বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যর এস্লি ইডেনকে প্রদত্ত তাঁর নির্ভীক উক্তির মধ্যেই তার পরিচয়। গভর্নর তাঁকে বলেছিলেন, "এসো না, আমরা দুজনে মিলে বাংলা শাসন করি।" অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেভাবে দেশশাসন করে যাবেন, তারই ধামাধরা প্রতিধ্বনি শিশিরকুমারের পত্রিকায় যেন প্রকাশ পায়। শিশিরকুমার দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন "দেশে একজনও অন্ততঃ সত্যনিষ্ঠ সম্পাদক থাকা উচিত।"

বস্তুতঃ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে সংবাদপত্র সম্পাদনার বিরাট দায়িত্ব বহন করে তিনি দায়িত্বশীল সংবাদ-সমীক্ষার একটা 'ট্র্যাডিশন' গড়ে তুলেছিলেন। যা সত্য এবং যা দেশের স্বার্থের পরিপোষক তাকে খুঁজে বের করার কাজেই তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দিতেন, এবং একজন আদর্শ সাংবাদিকের ভারসাম্য, সমতাবোধ এবং গণমানসের অনুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বলেই তিনি বিদেশী রাজপুরুষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের কণ্ঠেও সাংবাদিকের কর্তব্য সম্বন্ধে এই কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

শিশিরকুমার শুধু একজন রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন না, তাঁর হৃদয়ে পাতা ছিল ভক্তির সিংহাসন; শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস হয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ না হলে মানুষ কখনো মানুষের অন্তরে এমন স্থায়ী আসন পায় না। তাঁর "অমিয় নিমাই চরিত" ও ইংরেজীতে লেখা "লর্ড গৌরাঙ্গ" তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বাংলার নাট্যকলা সম্বন্ধেও তিনি আগ্রহী ছিলেন এবং "নয়শো রুপেয়া" ও "বাজারের লড়াই" নামে দুটি প্রহসন রচনা করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত ভজনাবলী এবং সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থখানি বহু সমাদর লাভ করেছে।

শিশিরকুমার পরলোকতত্ত্বে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন এবং Hindu Spiritual Magazine নামে একটি মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন, আর অনুরাগী জনসাধারণকে প্রেততত্ত্বে আলোচনার সুযোগ দিয়েছিলেন।

একটিমাত্র জীবনে এই বিপুল কর্মশক্তির চেতনা, স্বভাবতঃই, সেই পুরুষসিংহের প্রতি জাতিকে শ্রদ্ধাশীল করেছে এবং কাঁটাপুকুর লেনের সেই স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মহাত্মা শিশিরকুমারের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বরেণ্য হয়ে উঠেছে।

মানুষ আসে, আবার চলে যায়—রেখে যায় তার স্মৃতিটুকু!

তাই, আজ আমি তাঁকে স্মরণ করি, সেই অসীম ঘন নীরবতায় বরণ করি মনের উজ্জ্বল মণিপুরে, বোধন করি, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে।

---

* শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণ।

এশিয়ার গল্প

।।পাঁচ।।

কম্বোডিয়া

মরা কুঁয়োদে

লিন্ডা টি ক্যাসপার

কোমরে একটা কাটারি গুঁজে জমির তদারক করতে বেরিয়ে পড়ল মাঙ্গা অগাস্তো। অথচ সে জমির ওপর আর কোন অধিকার নেই তার। সে আর তার মালিক নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে বুকের মধ্যে একটা ব্যথা মোচড় দিয়ে উঠছিল তার। চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল রোদের উজ্জ্বল ফলা লেগে। কাঁধদুটো ঝুলে পড়েছে, হাঁটু বেঁকে গেছে, পিঠ বেঁকে গেছে। পুরো ষাট বছরের জীবনটা যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তার এই শরীরের মধ্যে।

'মবোলো' আর আম গাছগুলো পার হয়ে গাছের সবুজ ঢেউ—যেন সবুজ সাপ একটা। জমিটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল সে। পাবার আগেই অবশ্যি ঐ মবোলো আর আম গাছগুলোকে পুঁতেছিল সে, তার যত্নেই বড় হয়ে উঠেছে গাছগুলো। বাঁধ ছাড়িয়ে আরো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার জমি। নদীর ধারে গিয়ে ঢালু হয়ে গেছে। জমির চারদিক ঘুরে ঘুরে রাস্তা। চলতে চলতে তার মাটি শক্ত আর সাদা হয়ে এসেছে। একটু দূরে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আবার জেগে উঠেছে খানিকটা পরে। একবার গাছ-গাছড়ার মধ্যে ডুবে গেছে, বেরিয়ে এসেছে ফের। আবার তারপর অদৃশ্য হয়েছে গাছের আড়ালে।

ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল মাঙ্গা অগাস্তো। পায়ে পায়ে যেন মাপতে লাগল জমিটা। সারা গায়ে গাঁট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পেয়ারা গাছ। সন্তানবতী শরীর যেন ঝুঁকে পড়েছে অজস্র পেয়ারার ভারে। পাকা দেখে একটা পেয়ারা ছিঁড়ল মাঙ্গা অগাস্তো। থেঁতলে মাড়ির চাপে শুষে নিল ভেতরের ঠাণ্ডা শাঁসটুকু। খুব রেগে গিয়ে অগাস্তো স্থির করেছিল গাছগুলো কেটে ফেলবে সব। কিন্তু কাটতে গিয়ে মায়া হল। না, সে নিজের হাতে কাটতে পারবে না। অন্য কাউকে দিয়ে কাটাবে।

এই ফলের ক্ষেত শেষ হয়ে যাবে, মরে যাবে। তার নিজের মৃত্যুর আগেই মরবে। এর চেহারা পাল্টে যাবে; গাছগুলো কেটে ফেলবে, উইঢিবিগুলোকে ভেঙে সমতল করে দেবে। সারি দিয়ে বসান গাছের চারার মত সারবন্দি বাড়ি উঠবে এখানে। পুরো জমিটাকে সমতল করে ফেলবে। নদীর কাছে বলে জায়গাটার নাম হবে 'রিভারসাইড পার্ক'। সেপা তাদের জামা-কাপড় কাচতে যেত ঐ নদীতে। আর যাবে না।

সব কিছুই পাল্টে যাবে তার জীবনের। কনভেন্টে দুধ দেবার জন্যে শহরে যেত প্রতি সপ্তাহে। এখন সেই শহরে গিয়েই থাকতে হবে তাকে, তার ছেলের বৌর বাড়ির কাছাকাছি। চাষ-আবাদকে ঘেন্না করে বৌটা, কিন্তু সেপা যখন নিজের হাতে তৈরি ফল দিয়ে আসে, শাকসব্জী দিয়ে আসে তখন উছলে ওঠে খুসীতে।

এর পর ঝুড়ি ভর্তি মাছ নিয়ে বাজারে যেতে দিতে হবে সেপাকে। খদ্দেরের আশায় বসে থাকবে

সেপা। দেখবার নাম করে চটকে চটকে মাছগুলোর সর্বনাশ করে ঠোঁট উল্টে চলে যাবে খদ্দেররা। অথবা হয়ত পায়রার খোপের মত একটা ঘরে গিয়ে বাসা বাঁধতে হবে তাকে। এত ছোট যে নড়বার জায়গা থাকবে না, মাথা ঠেকে যাবে ছাতে। পড়শিদের ঘরের দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে।

তার স্ত্রী সেপার কথা মনে পড়ল অগাস্টোর। বুড়ি হয়ে মুখের হাঁটা ঝুলে পড়েছে সেপার, হাতদুটো যেন গাছের শুকনো শেকড়। ক্রমশঃ ক্ষয় হয়ে হয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে আঙুলের ডগাগুলো। তবু সেই ভোঁতা আঙুল দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চালের কাঁকড় বাছবে সে। মুরগীগুলো পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করে তখন। আশায় আশায় থাকে কখন হাত ফস্কাবে সেপার। সেপা তুষ ছড়িয়ে দেয় তাদের দিকে। দুঃখ হয় সেপার জন্যে। এই কয়েক বছর আগেও মাথায় ঝুড়ি ভর্তি জিনিস নিয়ে সরু সরু বাঁধ পার হয়ে গেছে সে। বাহুমূল সুঠাম, উজ্জ্বল ছিল। ঘাড় পিঠ তারের মত ঋজু। এখন মনে হয় সে চিরকাল এমনি বুড়িই ছিল। পাগুলো সরু সরু, পাজামা ঢল-ঢল করছে। মনেই হয় না যে সে কোনকালে তার সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়েছে বা রোদ মাথায় নিয়ে কাজ করেছে। গায়ের চামড়া ঝুলে গিয়ে ঢোলা জামার মত দেখাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে পুরোনো মজা কুয়োটার কাছে এসে দাঁড়াল মাঙ্গ অগাস্টো। নজরে পড়বে এমন কোন চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়নি কুয়োটার ধারে।

বেলা হয়েছে। সূর্যের আলো তেরছা হয়ে পড়েছে মাটিতে। 'দুহাৎ' গাছের ছায়ার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।
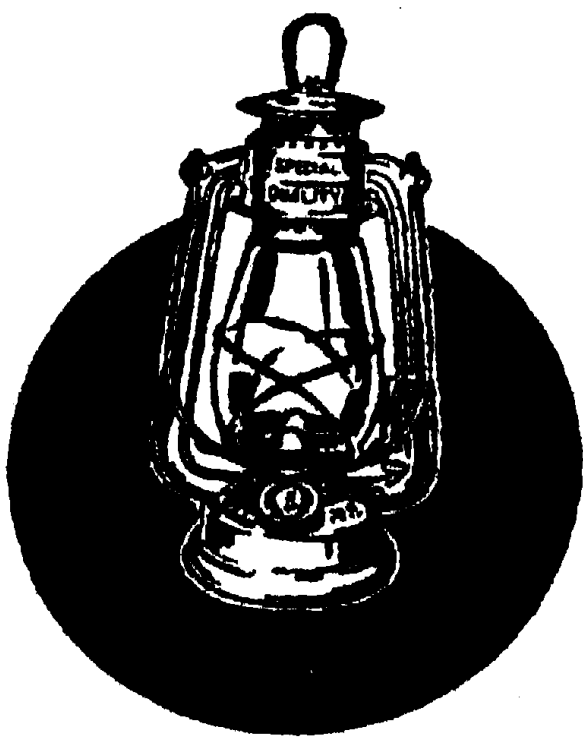
একবার একটা বাদুড় পড়ে গিয়েছিল কুয়োটার মধ্যে। তখন কেউ টের পায়নি। টের পাওয়া গেল কয়েকদিন পরে যখন মরে পচে দুর্গন্ধ বেরুতে শুরু করল। কুয়োটাকে বুজিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি তার। কারণ, কাছেপিঠে সবাই জানে যে ওখানে কুঁয়ো আছে একটা। সেপা অবশ্য তাকে বহুবার বলেছে কুঁয়োটা বন্ধ করে দিতে। উইঢিবিগুলোর মত কুঁয়োটাকেও বড় ভয় সেপার।

নিজেকে নিঃস্ব সহায়সম্বলহীন মনে হল মাঙ্গ অগাস্টোর, বড় ক্লান্ত মনে হল। আরো খানিকটা হাঁটল সে। এখানটায় পাদ্রীরা বছরে একবার এসে প্রার্থনার অনুষ্ঠান করে, নব-জাতকদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। ঐ চালাটার নিচে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টিকে দেওয়া হয় প্রতি বছর। যে লোকই টিকে দেয় সে চীৎকার করে ছেলেমেয়েদের নাম বলে যায় আর একটা বেঁটে-খাটো আত্মম্ভরী গোছের লোক একটা লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে নেয় নামগুলো। চালাটার নিচে মুরগী থাকে। তাদের নোংরা পুরু হয়ে জমে রয়েছে মাটির ওপর।

সেপার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল শহরে। ধর্মপিতা হয়েছিল মেয়র। ঘণ্টা বাজাবার জন্যে টাকা রাখা হয়নি বলে ক্ষেপে গিয়েছিল তার ভাই। ফি না পেলে গীর্জার তোষাখানার অধ্যক্ষ ঘন্টাবাজাবার দড়ি দেবে না। সুতরাং চটে গিয়েছিল তার ভাই। খুব মন খারাপ হয়েছিল তার। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেনি মন খারাপ করে। আবার মেতে গিয়েছিল ফুর্তির হল্লায়। ছোটখাটো একটা দল শহর থেকে খামার অবধি গিয়েছিল তাদের সঙ্গে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাঁধের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছিল সারাক্ষণ।

নদীর ধারে পাকা তরমুজ পাওয়া যেতে পারে। মাঙ্গ অগাস্টো এগিয়ে চলল সেদিকে। কিন্তু পৌঁছে দেখল, একটাও পাকে নি। এমনকি চিনেবাদাম গাছগুলো পর্যন্ত অজস্র পাতায় ছেয়ে আছে শুধু। নদীটা মন্থরগতিতে বয়ে চলছে। সাদা মাটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে এসে পড়ছে রোদ। চোখ জ্বালা করছে। চোখ ফিরিয়ে চুনাপাথরের রাস্তা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল সে। দুধারের ছোট ছোট গাছ-গাছড়াগুলোকে ধরে ধরে হাঁটতে লাগল। রাস্তাটা সে-ই কেটেছিল—একেবারে জমির সমতল অবধি। তারা উঠে যাবার আগে আর নতুন ফসল ফলবে না এ জমিতে। খানিকটা পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে মাঙ্গ টৌরিওর জমির ভেতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। তার মত মাঙ্গ টৌরিওরও একটা ছেলে মারা গেছে যুদ্ধে।

মাঙ্গ টৌরিও তার গরুটাকে বাঁধছিল একটা গাছের সঙ্গে।

'বাচ্চাটাকে বুঝি দুধ খাওয়াচ্ছ আজ?' জিজ্ঞেস করল মাঙ্গ অগাস্টো।

'হ্যাঁ। আজ বিকেলেই বেচে দিতে হবে। কিনে নিয়ে গিয়ে এগুলোকে কাটবে ওরা। মরবার আগে বাচ্চাটা তবু মায়ের দুধ খেয়ে নিক একটু।'

'জেনি কেমন আছে?'

'ভালো না। কান্নাকাটি করছে এখনো। আজ ভোরে গিয়ে টেনে তুলে ফেলেছে চারাগুলোকে। তুমি ত জান কী অসম্ভব যত্ন করত ও গাছগুলোর। ফুল ঝরে গিয়ে ফলের কুঁড়ি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কাপড়ের থলে বেঁধে দিত, সিম গাছের লতাগুলোকে তুলে দিত জাফরির ওপর। ইচ্ছে করছে, আগুন লাগিয়ে দিই মাঠটায়। পুড়িয়ে ছারখার করে দিই সব।' হাতের কাটারিটা তুলে মাঙ্গ টৌরিও এক কোপেই বসিয়ে দিল একটা আমগাছে, 'ওরা এসে ত খুঁড়ে ফেলবে সব...'

মাঙ্গ অগাস্টো চারদিকে তাকাল একবার। 'কিছু থাকবে না, এই গাছ ফসল সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে,' ভাবল মনে মনে। তখন কে বলবে সে বাস করত এখানে বা তার অস্তিত্ব ছিল। টুকরো টুকরো পাথর পড়ে আছে এখানে ওখানে। কুড়িয়ে রাখতে ইচ্ছে করছে, মনে হচ্ছে অমূল্য সম্পদ ওগুলো। ছেলেবেলায় পাখী তাড়াবার জন্যে হয়ত ছুঁড়েছিল সে। সেপাও নদী থেকে কিছু কুড়িয়ে এনেছিল তার তৈরি ছোট্ট রাস্তাটার ওপর ছড়িয়ে দেবার জন্যে।

'তুমি কি ছেলের সঙ্গে থাকবে এরপর?' জিজ্ঞেস করলে মাঙ্গ টৌরিও, 'ওর কসাইখানার চাকরিটা পাকা তো?'

'হ্যাঁ, সংসার তো চালাচ্ছে চাকরির টাকা দিয়েই। ওর ওখানে গিয়ে থাকতেও বলেছে আমাদের, কিন্তু...', বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল মাঙ্গ অগাস্টো। তার ছেলের বৌ বলেছে, ঘর নেই। থাকবে কোথায়? মাঙ্গ টৌরিওকে সে বলতে চাইছিল না সেকথা। মরবার জন্যে সামান্য খানিকটা জায়গা তো দরকার তার! ছেলের বাড়িতে তারা বেড়াতে গেলে খাবার পর্যন্ত লুকিয়ে রাখে বৌটা। এমন বজ্জাত!

'যে লোকটা খাজনা নিত আমাদের কাছ থেকে তাকে খুঁজে বের করবার জন্যে আরও কিছু সময় চাইলে হয়', বলল মাঙ্গ টৌরিও, 'জমির মালিক যে আমরাই লোকটাকে পেলে তা প্রমাণ হয়ে যাবে।' মাঙ্গ টৌরিওর গলায় আশা ধ্বনিত হল।

'সে লোকটাকে তো আর গভর্ণর পাঠান নি খাজনা নিতে। ও আমাদের ঠকিয়ে টাকা নিয়ে গেছে।'

'তাহলে কি কোন আশাই নেই নাকি?' জিজ্ঞেস করল মাঙ্গ টৌরিও। 'অবশ্য দোষ আমাদেরই। ওকে জিজ্ঞাসাবাদ কিছু না করেই বিশ্বাস করা উচিত হয়নি আমাদের। অন্ততঃ ও তো সে কথাই বলবে। আমরা আমাদের দোষেই মরেছি।'

'বাহান্ন টাকা করে হেক্টার দিতে চেয়েছিল আমাকে। চল্লিশ হেক্টার জমি ছিল আমার বাবার। হয়ত তার চেয়েও বেশিই ছিল। ঠিক জানি না আমি। কি করেই বা জানব।'

'হেক্টর প্রতি বাহান্ন টাকা? ওরা নিশ্চয়ই টুকরো-টুকরো [illegible] করে

বেচবে জমিটা। হয়ত এক স্কোয়ার মিটারের দামই দেবে বাহান্ন টাকা। এক হেক্‌টর মানে দশ হাজার স্কোয়ার মিটার জমি...' মাঙ্গা টোরিওর কণ্ঠস্বরে তিক্ততা।

মাথা নাড়ল মাঙ্গা অগাস্টো।

'তবে এজেন্ট অবশ্যি কিছু টাকা আমাদের দেবে বলেছে। জমির দাম হিসেবে নয়, তার মালিক অনুগ্রহ করে দেবেন—আমাদের যাতে আমরা অন্য কোথাও গিয়ে কিছু একটা করে খেতে পারি। বলা যায় না, হয়ত আবার সেখানে গিয়েও হাজির হবে লোকটা। ওর কাছেই শুনলাম এখান থেকে, একখণ্ড বড় জমির ফালি নাকি ময়কারকে দান করা হবে। শহরের বড় রাস্তা অবধি রাস্তা হবে সে জমিতে। আমাদের জমি দিয়ে উদারতা!' বিরক্তিতে খানিকটা থুথু ফেলল মাঙ্গা টোরিও। পান আর সুপারির রসে লাল টক্‌টকে।

মাঙ্গা অগাস্টো সাড়াশব্দ করল না। সে তখন ভাবছে যে টাকাটা পাবে তাই দিয়ে এরই ছোট্ট একটুকরো জমি কিনে নেবে আবার। ভাবতেই তার মনটা আশার ভরে উঠল। নদীর ওপারে, পাহাড়গুলোর ধারে ছোট একটি খামার হবে তার। ছেলের বৌর সঙ্গে আর থাকতে হবে না তা হলে। খামারে নতুন পদ্ধতিতে চাষ করবার চেষ্টা করবে সে। ধান রুইবে। ছোট খামারই ভাল তার পক্ষে, কেননা শরীরের শক্তি ত কমে আসছে। ইপিল গাছ লাগাবে। গাছগুলো বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি, তাছাড়া হাওয়ায়ও কোন ক্ষতি করতে পারে না ওদের। বড় বড় সাদা আর মিষ্টি ওলকপি ফলাবে। নদীর ধারটায় ভাল তরমুজও হবে। সেপাও খুশি হবে। তার বাড়ির পেছনে বাঁশ পড়ে আছে

কতগুলো। বৃষ্টি শুরু হবার আগেই কেটে শুকিয়ে রাখা যেতে পারে ওগুলোকে। এ বাড়ির চাল থেকে একটা ছোট চালাও তৈরি করে নেওয়া যাবে. বাকিটা দেয়ালের জন্যে লাগবে।—এমনি অনেক ছোটখাট কথার স্রোত বয়ে যেতে লাগল তার মনের ওপর দিয়ে। মনে বেশ খানিকটা জোর এল তার।

'এজেন্ট বলেছে', বলল মাঙ্গ টৌরিও, 'এদিকটার নাম হবে 'রিভার সাইড', নদীর ওধারটার নাম হবে 'হিল সাইড'। ভেবেছিলাম একটুকরো জমি কিনে নেব ওর কাছ থেকে। কিন্তু তা হবে না। অনেক টাকা খরচ করে ভাল বাড়ি তুলতে রাজী থাকলে জমি দেবে, নইলে দেবে না। কত জমি আছে লোকটার কে জানে। নদী ছাড়িয়ে গিয়েও সব জমি ওরই, হয়ত পুরো এলাকাটাই ওর। শুনেছি ও নাকি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে: একটা ব্যাংক আর একটা য়ুনিভার্সিটিরও মালিক।'

নদীর ওপর আকাশের ঢল বেয়ে নামছে সূর্য। সেপা বসে থাকবে তার খাবার নিয়ে। কুমড়ো সেদ্ধ, টমাটো সেদ্ধ আর নোনা মাছ। সে যতক্ষণ না যাচ্ছে ততক্ষণ খাবে না সেপা। কোন কোন দিন ভিনিগারে ভেজান পাখীর ডিম খায় তারা। খাবার কথা ভেবেও কিন্তু বিন্দুমাত্রও ক্ষুধার উদ্রেক হল না মাঙ্গ অগাস্টোর। ভেতরে ভেতরে চাপা রাগ রয়েছে একটা। কিছু একটা করে রাগের ঝাল মেটাতে হবে। আগে আগে রাগ হলে সেপার ওপর ঝাল মেটাত। ইচ্ছে করে দুঃখ দিত সেপাকে। কিন্তু এবার, তার নিজেরই বুক পুড়ে যাচ্ছে দুঃখে। সেপার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে সে এবার। কিন্তু তার আগে রাগের ঝালটা মিটিয়ে নিতে হবে।

ফুসফুস ফুলিয়ে টান করে পথ চলতে লাগল মাঙ্গ অগাস্টো। যেন রীতিমত যুবক আছে এখনো, বুড়ো হয়নি, পরাজিত হয়নি। কাঁধদুটোকে পেছনের দিকে একটু হেলিয়ে দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। মনে হলো পাঁজরার হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসে খোঁচা মারছে। নাঃ, সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে সে, দুর্বল হয়ে গেছে। সূর্যটা তীব্র তেজে জ্বলছে মাথার ওপর। হাত দিয়ে ভ্রূ মুছল মাঙ্গ অগাস্টো।

পুড়িয়ে ফেলতে না পারলেও গাছগুলোকে অন্ততঃ কেটে নষ্ট করে দিতে পারবে সে। কোমর থেকে খুলে কাটারিটা দিয়ে হাওয়া কাটল একবার। 'দুহাত' গাছ দিয়ে শুরু করবে সে, কাটতে কাটতে বাড়ি অবধি যাবে। রাগে দুঃখে জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। কাটারি তুলে কোপ বসিয়ে দিল একটা গাছে। কিন্তু কাটল না, ফিরে এল কাটারি। আবার মারল, তারপর আবার, আবার। গাছের ছিটকে আসা টুকরো থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা পর্যন্ত করল না সে। তীব্র ক্রোধে বেঁকে গিয়ে বীভৎস দেখাল অস্ত্র শরীরটাকে।

'এই, কি করছ? থাম। ও গাছ কি তোমার নাকি যে কাটছ?'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এজেন্ট। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে চশমার কাচে লেগে।

মাঙ্গ অগাস্টো ঘুরে দাঁড়াল। এজেন্টের গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজ যেন কুঁকড়ে ফেলল তাকে। গলা শুকিয়ে গেল। প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেও পারল না। কেবল কাটারিটা তুলে ধরে রাখল খানিকটা, প্রতিবাদ হিসেবে নয় বরঞ্চ যেন আত্মরক্ষার্থে।

এজেন্ট পুলিশের ভয় দেখাল তাকে, অকথ্য গালিগালাজ করল।

মাঙ্গ অগাস্টো থেমে থাকল একটু। এজেন্ট যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মরা কুঁয়োটার দূরত্ব কতটা হিসেব করল মনে মনে। যৌবনে হরিণ আর বুনো শুয়োর ধরত সে। বনের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে রাখত আর জানোয়ারগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলত সেই গর্তের মধ্যে।

মাঙ্গ অগাস্টো এগুতে শুরু করল।

হৃদপিন্ডের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে। ধূর্ততায় সমস্ত শরীর যেন ধনুকের ছিলার মত টান।

ছুটতে শুরু করেছে এজেন্ট। কিন্তু কুঁয়োর দিক থেকে বেশ অনেকটা বাঁয়ে চলে গেল। মাঙ্গ অগাস্টোর তাড়া খেয়ে ডানদিকে ঘুরল আবার। মাঙ্গ অগাস্টোর নজর কুঁয়োটার দিকে। এজেন্টকে সে প্রয়োজনমত ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, বাঁদিক থেকে ডানদিকে তাড়া করে নিয়ে চলল।

একটা 'দুহাত' গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাটারিটা আবার কোমরে গুঁজল মাঙ্গ অগাস্টো। আর দরকার হবে না কাটারির। মরা কুঁয়োটার ওপরে কিছু ধুলো আর শুকনো পাতা পাক খেয়ে উড়ছে তখনো। ধুলো আর পাতাগুলো ধীরে ধীরে নেমে এল মাটির ওপর। মাঙ্গ অগাস্টো দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর শরীরটাকে সোজা করে তুলে ধরে পা বাড়াল বাড়ির দিকে।

...একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এজেন্ট...

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

জনপ্রিয় লেখকের পরিণাম

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের একটি বাড়িতে একটা শাদা মার্বেল পাথরের গায়ে লেখা আছে যে, উইলিয়ম ম্যাকপীস থ্যাকারে এই বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে। থ্যাকারের পিতৃদেব রিচমণ্ড এবং তাঁর পিতামহ উইলিয়ম দুজনেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অফিসর। যখন ম্যাক্‌পীস থ্যাকারের জন্ম হল, তখন তাঁর জননীর বয়স মাত্র উনিশ বছর। এরই পাঁচ বছর পরে ম্যাক্‌পীস থ্যাকারের পিতৃবিয়োগ হয়, আর তাঁর বিধবা জননী বিবাহ করলেন মেজর হেনরী কারমাইকেল স্মিথ নামক সেনা-বিভাগের একজন অফিসরকে। ভদ্রলোক বিশেষ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান পুরুষ ছিলেন। কয়েক বছর পরে তাঁর স্ত্রীর এই পুত্রটির শিক্ষাদানের ভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন।

কিপ্‌লিঙ-এর মতো থ্যাকারেও ইংল্যাণ্ডের স্কুলে পড়তে গিয়েছিলেন। এন্টনি ট্রলোপ 'ইংলিশ মেন অব লেটার্স' নামে যে জীবনী সংগ্রহ প্রকাশ করেন তার মধ্যে থ্যাকারের জীবনী আছে। জর্জ ভেনাবেলস তাঁকে একখানি চিঠিতে থ্যাকারের বাল্যজীবন সম্পর্কে লিখেছিলেন :

a pretty, gentle and rather timid boy."

থ্যাকারে চার্টার হাউসের ছাত্র হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন। স্কুলের কঠোর জীবন তাঁর পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সহজ হয়নি, তার পরিচয় তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় পাওয়া যায়। তিনি চার্টার হাউসকে 'স্লটার হাউস' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই সময়কার অনেক স্কুলের নৃশংসতা সদনকামীর পৈশাচিকতাকেও অতিক্রম করে যেত। এই জঘন্য অবস্থা থ্যাকারের চিত্তে যে গভীর রেখাপাত করে, তা কোনোদিনই মন থেকে মুছে ফেলা যায়নি। আবার অন্যদিকে স্কুলের ছেলেদের সম্মান, জ্ঞান ও শৌর্য লক্ষ্য করে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে থ্যাকারের পড়াশোনার যে-রেকর্ড আছে তা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়, কারণ পড়াশোনায় তাঁর অবহেলা ছিল এবং ডিগ্রী না নিয়েই কলেজ ছেড়ে দেন, আর সামাজিক দিক থেকে এডওয়ার্ড ফিট্‌জিরালড আর আলফ্রেড টেনিসনের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।

এই সময় থ্যাকারের মনে ভ্রমণের নেশা প্রবল হয়ে উঠল, তিনি ভাইমারে বেড়াতে গেলেন, সেখানে পরিচয় হল গোটের সঙ্গে। তারপর স্বদেশে ফিরে ১৮৩১-এ মিডল টেম্পলে ভর্তি হলেন।

এই সময় তিনি টম টেইলরের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন। কিন্তু আইনও থ্যাকারের মনে লাগল না। তিনি আইন ছাড়লেন এবং সাংবাদিকের জীবন গ্রহণ করবেন স্থির করলেন। সেই বছরই 'ন্যাশনাল স্ট্যাণ্ডার্ড' নামক পত্রিকার তিনি স্বত্বাধিকারী হলেন, এই পত্রিকার জন্য তিনি প্রচুর লিখতেন ও ছবি আঁকতেন। পত্রিকাটি অল্পকালের মধ্যে উঠে যেতে থ্যাকারে চলে গেলেন প্যারিসে, বাসনা ছিল ছবি আঁকাটায় হাত পাকাবেন। ব্যালে নর্তকীদের ব্যঙ্গচিত্র দিয়ে 'ফ্লোর এত জেফির' নামে একটি ছবির বইও প্রকাশ করেন এই সময়। আর এই সময় 'কনস্টিটিউশ্যনাল' পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতার কাজও করতেন।

এই বছরই থ্যাকারের বিবাহ হল এক কর্ণেলের কন্যা ইসাবেলা সয়ের সঙ্গে। এই বিবাহ হয়ত সার্থক হত, কিন্তু পর পর তিনটি কন্যা প্রসব করে ইসাবেলা উন্মাদ হয়ে গেলেন। ছোট মেয়েটি শৈশবেই মারা গেল। সবচেয়ে যিনি বড়, সেই এ্যান ইসাবেলা সাহিত্যিক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম—'মিস এঞ্জেল' (১৮৫৭), পরে তিনি ম্যাক্‌পীস থ্যাকারের গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করেন, ইণ্ডিয়া অফিসের কর্মচারী মিঃ রিচমণ্ড রিচির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, এই সূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ ঘটে। ম্যাকপীসের দ্বিতীয় কন্যা হ্যারিয়েটের বিবাহ হয় লেসলী স্টিফেনের সঙ্গে, তিনি ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সাহিত্যিক হিসাবে থ্যাকারে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করলেন এবং 'ফ্রেসার'স ম্যাগাজিনের লেখক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন। তাঁর কাহিনীর নাম ছিল 'দি ইয়েলো প্লাস করসপনডেন্স', এই গল্পে একজন অশিক্ষিত ফুটম্যান (উর্দী-আঁটা চাকর) উচ্চতলার সমাজের গল্প বলে যাচ্ছে। এই সময়টা থ্যাকারে 'দি টাইমস', 'দি নিউ মনথ্‌লি ম্যাগাজিন' প্রভৃতিতেও গল্প, সমালোচনা ইত্যাদি লিখতেন। এই সময়কার এক বিখ্যাত রচনার নাম 'দি গ্রেট হোগার্টি ডায়মণ্ড'। এই কাহিনীর নায়ক স্যামুয়েল টিটমারস একটা অপয়া হীরকখণ্ড পায়, তারপর তার অদৃষ্টে নেমে এল দুঃসময়ের দুর্গতি। 'ফিটজ বুডল পেপারস' উপন্যাসে জর্জ সাভেজ কিভাবে জার্মান সুন্দরীদের কবলে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছে তারই ইতিহাস বিধৃত করেছেন।

থ্যাকারের জীবনে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ স্মরণীয় কাল, এই বছরই 'পাঞ্চ' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে রচনা প্রকাশ শুরু হল। এর মধ্যে আছে 'জেসমেন্ত্র ডায়েরী' 'দি স্নবস্ অব ইংলণ্ড' আর 'ভ্যানিটি ফেয়ার'।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভ্যানিটি ফেয়ার' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয়। এই উপন্যাসে যে ফেয়ার সমাজের বিস্ময়কর রূপায়ণে এমনই দক্ষতার পরিচয় দিলেন যে, ম্যাকপীসকে সামাজিক আবরণবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তা হিসাবে সকলে গ্রহণ করল। নায়কহীন এই উপন্যাস এক অবিস্মরণীয় ছাপ পাঠকের মনে রেখে দেয়, চরিত্রের এমন আশ্চর্য বিশ্লেষণ সচরাচর দেখা যায় না। সরল এবং চতুর, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, সচ্ছল অবস্থার মানুষ এবং যারা সারা বছর না খেয়ে হাসিমুখে কাটায়, তাদের সকলেরই কথা তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে লিখলেন।

এই সাফল্যের পর 'পেনডেনিস', 'দি নিউ কমস' ও 'হেনরী এসমণ্ড'—এই তিনখানি জনপ্রিয় গ্রন্থও তিনি লিখলেন। ভ্যানিটি ফেয়ারের ডবিনের মত হেনরী এসমণ্ড আত্মত্যাগী সম্মানিত ব্যক্তি, বন্ধুর সহায়তায় জন্য যে-কোনোরকম স্বার্থত্যাগ এদের কাছে কিছুই নয়।

স্বাভাবিক কারণেই ডিকেন্সের সঙ্গে থ্যাকারের একটা তুলনামূলক আলোচনা ওঠে, উভয়ে সম-সাময়িক। এক তুমুল বিরোধও ডিকেন্সের মৃত্যুর কিছু আগেই তিনি মিটিয়ে নিয়েছিলেন। ডিকেন্সের সম্পর্কে বলা হত যে, তিনি 'দরিদ্রজনের শেক্সপীয়র', মানবিক অনুভূতির স্পর্শ তিনি সংবেদনশীলতার ফলে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, ডিকেন্স কিঞ্চিৎ ভাবাবেগাশ্রয়ী মানুষ, সহজ সেন্টিমেন্টে অভিভূত হয়েছেন, থ্যাকারে কিন্তু অনেক মার্জিত এবং চতুর। থ্যাকারের রচনায় বিলাসিনীদের বিশ্লেষণ আছে, একেবারে শল্য-চিকিৎসকের ওস্তাদ হাতের ছাপ, নির্মম এবং নিপুণ। ডিকেন্স কিন্তু অতি দরিদ্রের কুটিরে প্রবেশ করেছেন এবং মানবিক দুর্দশার চিত্র এঁকেছেন সূক্ষ্ম তুলিতে। লেখকের চোখের জলের সঙ্গে লেখক অঙ্কিত চোখের জলের মিলন হয়েছে। তাই ডিকেন্সকে আজও ভোলা কঠিন, কিন্তু থ্যাকারেকে ক'জন স্মরণে রেখেছে। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' আর 'হেনরী

এসমণ্ড' এই নামে দুটি ক্লাসিক গ্রন্থ আছে এই তথ্যটুকু অবশ্য অনেকে জানতে পারেন।

থ্যাকারে সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে তাঁর তুলির রঙ অতি স্থূলে, তাঁর চরিত্রের মধ্যে যা ভালো, তা অতিশয় ভালো, যা দুষ্ট এবং দুঃশীল, তা অতিশয় প্রবলভাবেই দুষ্ট এবং দুঃশীল। এই সূত্রে স্মরণ রাখতে হবে, থ্যাকারে ছিলেন ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী, যারা কার্টুনিস্ট, তারা কিছুটা অতিরঞ্জনে অভ্যস্ত, উপন্যাসকারের শিল্প-মানসে ব্যঙ্গচিত্রকারের মানসিকতার প্রবল প্রভাবে এই অবস্থা সম্ভব।

উপন্যাসকার থ্যাকারসে কবি থ্যাকারসেকে অতিক্রম করে গেছেন, তাই তিনি যে কবিও ছিলেন এ-কথা অনেকে ভুলে গেছেন। তাঁর কবিতায় বলিষ্ঠ অনুভূতি, করুণা এবং শ্লেষ চমৎকার ফুটে উঠেছে। তাঁর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, কোথাও নিদারুণ ট্র্যাজেডির সঙ্গে সরস রসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। গেয়টের 'সরোজ অব ভেরদর' নামক উপন্যাসের প্যারডি করেছেন, নায়িকার প্রেমিকের আত্মহত্যার পর নায়িকা-বর্ণনায় নমুনা—

"Charlotte having seen his body
Borne before her on a suntter
Like a well-conducted person.
Went on cutting bread and butter."

থ্যাকারের অনেক ছদ্মনাম, আর কোনো ইংরাজ লেখকের এত ছদ্মনাম ছিল না। যেমন টিটমারস, আইকে সলোমনস, ইয়েলো প্লাস, গোলিস মফ, ফিট্‌জবোডল, পল পিনডার, মিসেস টিকেলটোবী।

যে-টাকা থ্যাকারসে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন, তা সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে নষ্ট করেছেন, বে-হিসাবী লগ্নী করেছেন। একবার লিখেছিলেন—

'My secondary ambition is to be famous; but my primary ambition is to make a living for my children."

থ্যাকারসে যে ভারতে জন্মেছিলেন, সে-কথা তিনি বিস্মৃত হননি। কেননা, ভ্যানিটি ফেয়ারের বিখ্যাত চরিত্র, বগলী-ওয়ালার প্রাক্তন কলেকটার, যোস-সিডলীর চরিত্রটি তিনি এঁকেছিলেন, এর ওপর বেকী সার্পের নজর ছিল। ডিকেন্স যেমন মিকবারের চরিত্র জনক-জননীর অনুকরণে এঁকেছেন, থ্যাকারসের চরিত্রটি হয়ত তাঁর পিতার অস্পষ্ট স্মৃতি।

১৮৬৩-তে যখন থ্যাকারসের মৃত্যু হয় তখন জীবনে তিক্ততাও যত, তেমনই ছিল সর্বোচ্চ বিজয়লাভের গরিমা। পৃথিবী সম্পর্কে থ্যাকারসের মত তাঁর এই পদাংশে পাওয়া যাবে—

"Oh, vanity of vanities!
How wayward the decrees of Fate are;
How very weak the very wise
How very small the very great are!

একদিন যা ছিল পাঠক-সমাজের মাথার মণি, যাঁর বই হাজারে হাজারে বিক্রী হয়েছে, এমনই অদৃষ্টের পরিহাস সেই ম্যাকপীস থ্যাকারে আজ একজন বিস্মৃত লেখক মাত্র।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

হিন্দি সাহিত্যিকদের আলোচনা সভা ॥

সম্প্রতি প্রয়াগে হিন্দি সাহিত্য গোষ্ঠী 'বিবেচনা'র উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিক থেকেই এই আলোচনা সভাটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। দীর্ঘদিন সাহিত্য-জগৎ থেকে অজ্ঞাত-বাসের পর ডঃ রামবিলাস শর্মা এই আলো-চনায় যোগদান করেন। আলোচনার বিষয় ছিল "আধুনিক সাহিত্যিক প্রবৃত্তি : আলোচনার সূত্র"। অন্যান্য যাঁরা এই আলো-চনায় যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ বচ্চন সিং, ডঃ রঘুবংশ, ডঃ জগদীশ গুপ্ত, বিজয় দেব নারায়ণ সাহী, অধ্যাপক এস সি দেব, লক্ষ্মীকান্ত বর্মা প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য। ডঃ বচ্চন সিং আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, "সাহিত্য সমালোচনার অবস্থা বর্তমানে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এর একটা সমাধান প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা এখন একান্ত কর্তব্য। বিজয়দেব নারায়ণ শাহী বলেন, "জো ভি বড়্তি প্রতিমান বনেগা ওস কা দায়রা সীমিত হো হোগা।" লক্ষ্মীকান্ত বর্মা "আলোচনা মে সৌন্দর্যবাদী দৃষ্টি" বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে যাঁরা নতুন-কালের কবিতায় সৌন্দর্যদানে সম্মত, তাঁরা সর্বদাই প্রাচীন কবিতার মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবেন। ডঃ রঘুবংশ সিং বলেন, 'সৃজনাত্মক ভাববোধ এবং যুগবোধের সমন্বয় সাধনের দ্বারা সাহিত্য সমালোচনার নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন।' ডঃ রামবিলাস শর্মা বলেন, "আধুনিক হিন্দি-সাহিত্য সমালোচনা যুগো-পযোগী নয়। এমন কি এই সমালোচনা এক-দিক থেকে মৌলিকও নয়। এর অনেকটাই বহিরাগত। এর কারণ বোধহয়, এখন হিন্দি ভাষা দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং এখনও বাক্য-বিন্যাস রীতি ইংরেজির মত। নিজের অভিব্যক্তি এই কৃত্রিমতা মুক্ত না হলে হিন্দি-সাহিত্য সমালোচনার বিস্তার অসম্ভব।"

বৃটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থসূচী ॥

গ্রন্থজগতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হিসেবে সম্প্রতি একটি নতুন সংযোজন হয়েছে। গ্রন্থটি হচ্ছে বৃটিশ মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসূচী। এতে ১৪৫৫—১৯৫৫ পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার উল্লেখ আছে। এতে প্রায় চার মিলিয়ন গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। ২৬৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থটির দাম ১৭০৯ পাউণ্ড ১০ শিলিং। এই সূচীতে কয়েকশত ভারতীয় গ্রন্থও স্থান পেয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ১০০ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। প্রায় ছয় বৎসর পরিশ্রমের পর এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়।

গুজরাটী সাহিত্যের অনুষ্ঠান ও একজন গুজরাটি সাহিত্যিক ॥

সম্প্রতি প্রখ্যাত গুজরাটি সাহিত্যিক শ্রীগুলাবদাস ব্রুকার কলকাতায় এসেছিলেন গুজরাটি সাহিত্য-মণ্ডলের ২১তম বার্ষিক গুজরাটি-সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য। গুজরাটি সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র শ্রীউমাশঙ্কর যোশির নামই বিশেষ পরিচিত। এমনকি শ্রীমনসুখলাল জাভেরির মত কবি কলকাতায় বসবাস করা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বাঙালী সাহিত্যিকদের বিশেষ যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। শ্রীগুলাবদাস ব্রুকারের সঙ্গেও বাংলা সাহিত্যের পরিচয় তেমন নিবিড় নয়। অথচ বর্তমান গুজরাটি সাহিত্যে তাঁর অবদান খুবই উল্লেখ্য।

গুজরাটি সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে একটি ছোটগল্পের মাধ্যমে। গল্পটির নাম ছিল 'লতা! শান বোলে।' প্রকৃতপক্ষে এই গল্পটিই তাঁকে গুজরাটি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। গল্পটির নতুন বক্তব্য-ভঙ্গি এবং শিল্পচাতুর্য তরুণ মনকে সহজেই জয় করে নেয়। তাঁর রচিত সাহিত্যে তারুণ্যের যে জয়গান ঘোষিত, একদিক থেকে গুজরাটি সাহিত্যে তা ছিল দুর্লভ। তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

His style is simple and straight, and he goes deep into psycholo-gical recesses of his characters.

তাঁর বহু রচনা ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'লতা! শান বোলে', 'বসুধারা', 'উভি ভাতে', 'মানব-মন' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পি ই এন বোম্বাই শাখার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টে 'গ্যেটে শতবার্ষিকী' অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। এ ছাড়াও আমেরিকার 'রাইটার্স গিল্ডে'র আহ্বানে তিনি আমেরিকাও ভ্রমণ করেন।

কলকাতায় উপরে উল্লিখিত অনুষ্ঠানে তিনি যে ভাষণ দেন, তার প্রথমটি ছিল 'আঙ্গিক' সম্পর্কে। বাকী তিনটি ভাষণ ছিল গুজরাটি ছোটগল্পের উপর। তিনি তাঁর ভাষণে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী গুজরাটি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেন। কোন বিশেষ বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাটি সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে, তিনি বিভিন্ন উদাহরণ সহকারে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে স্বাধীনতার পূর্বে আবির্ভূত মলয়ানীল, ধূমকেতু, উমাশঙ্কর যোশি, পান্নালাল প্যাটেল প্রমুখের সাহি-ত্যিক প্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। তিনি

স্বাধীনতার পরবর্তী বা যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজে মূল্যবোধের সঙ্কটের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যে বিবর্তনের যে সূত্রপাত, গুজরাটি সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অনিবার্য কারণেই দেখা গেল এই সময়ের সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন। গুজরাটি সাহিত্যে স্বাধীনতা পরবর্তী যেসব তরুণ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের সাহিত্যিক নিদর্শনের পরিচয় তিনি তুলে ধরেন। বিশেষ করে ডঃ সুরেশ যোশি, চন্দ্রকান্ত বক্সী, শিবকুমার যোশি, মধু রাই প্রমুখের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভারতীয় ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনা ॥

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলের ডীন এবং ইউ এস ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিনের চেয়ারম্যান ডাঃ উইলিয়াম হুবার্ডের কাছ থেকে জানা গেছে যে, ভারতীয় ভেষজ-বিজ্ঞানের ইতিহাস সঙ্কলনে সহায়তার জন্য দেশব্যাপী পাণ্ডুলিপি সন্ধান করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার পন্থা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ডাঃ হুবার্ড স্বল্পকালের জন্য ভারত সফরে এসেছেন।

তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই গবেষকদলের অপর দুজন হলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এন্ড সার্জেনসের ইণ্টারন্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ আলফ্রেড গেলহর্ন এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিনের রিসার্চ ও ট্রেনিং ডিভিসনের প্রধান ডাঃ কার্ল ডগলাস।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিন একটি গবেষণা সংস্থা। প্রধানতঃ জৈব-ভেষজবিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানে এই সংস্থার কাজ সীমাবদ্ধ। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট এই সংস্থার রিজেণ্ট বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগ করেন, বিজ্ঞানীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীর অনেকগুলি কর্মসূচী রয়েছে।

লাইব্রেরীর বিশেষ বৈদেশিক মুদ্রা সূচীর টাকায় ভেষজবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ডিরেক্টরী ও ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস প্রণয়ন করা হবে এবং পর্যালোচনা ও অনুবাদের কাজ করা হবে।

তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত এই দলটি বোম্বাই আসার আগে দিল্লী এবং হায়দরাবাদে সরকারী কর্মচারী এবং বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ডাঃ হুবার্ড বলেন যে, ভারতীয় ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা এসকল পরিকল্পনার অন্যতম। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডি ভি সুব্বা রাও-এর সহযোগিতায় এ-পরিকল্পনাকে রূপদানের চেষ্টা হচ্ছে। একমাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় ভেষজবিজ্ঞানের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি এ-প্রসঙ্গে আরও বলেন, ভারতীয় ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় পাণ্ডুলিপি-সমূহের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। তবে নষ্ট পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের হেপাজতে রয়েছে। ঐ সকল পাণ্ডুলিপির অনুবাদের মাইক্রোফিল্ম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে প্রেরণ করা হবে।

ডাঃ হুবার্ড বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিনের একটি বিভাগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভেষজবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপৃত রয়েছে। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির মূলে আছেন ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীরা এবং এই বিভাগ। ভারতীয় চিকিৎসকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারেও আমেরিকার ন্যাশনাল লাইব্রেরী আগ্রহশীল। কুষ্ঠব্যাধির ক্ষেত্রে ভারতীয় চিকিৎসকবৃন্দের মত অভিজ্ঞতা অন্য দেশের চিকিৎসকদের খুব কমই আছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল তাঁদের কাজকর্মের কথা খুব কমই জানেন। ডাঃ হুবার্ড বলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হলে এই পর্যালোচনার ফলে বিশ্বের অঞ্চলের বিজ্ঞানীরা উপকৃত হবেন।

বিদেশী সাহিত্য

পোলিশ অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যাঞ্জের গ্রন্থ-পরিচয় ॥

বিদেশী প্রকাশকমহলে ইদানীং প্রখ্যাত পোলিশ অর্থনীতিবিদ অস্কার ল্যাঞ্জের অর্থনীতিবিষয়ক গ্রন্থগুলির অনুবাদ ও সেগুলির প্রকাশের অসাধারণ উদ্যোগ দেখা দিয়েছে। অস্কার ল্যাঞ্জ মাত্র গত বছর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন একথা সকলেরই স্মরণে আছে।

তাঁর 'পলিটিক্যাল ইকনমি' একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বইটি ইংরেজী, ফরাসী, জাপানী এবং ইতালীয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি পৃথিবীর আরো অনেক ভাষাতেই অনূদিত হচ্ছে বলে জানতে পারা গেছে এবং খুব তাড়াতাড়িই এর অনেকগুলির প্রকাশ লাভ ঘটবে। অস্টিয়াতে এ বইটির একটি জার্মান অনুবাদ বেরিয়েছে, মেক্সিকো থেকে স্প্যানিশ ভাষায় একটি, ব্রাজিল থেকে পোর্তুগীজ ভাষাতে একটি অনুবাদও বেরিয়ে গেছে। এছাড়া হাঙ্গেরীয়ান এবং চেক ভাষায়ও সম্প্রতি এর অনুবাদ হয়েছে।

'পলিটিকাল ইকনমির' দ্বিতীয় খণ্ডটি তাড়াতাড়িই পোল্যান্ড থেকে বেরুচ্ছে। এতে মাত্র চারটি অধ্যায় থাকছে বলে এর প্রকাশক জানিয়েছেন।

ল্যাঞ্জের আরেকটি সর্বজনপরিচিত গ্রন্থ হোল 'ইনট্রোডাকশান টু ইকনমেট্রিকস'। গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকান ছাত্রমহলে বইটির অত্যন্ত চাহিদা। বইটির তৃতীয় সংস্করণটি 'এনলার্জড এডিশন' হিসেবে ইংরেজীতে শীঘ্রই বেরুচ্ছে। 'পোলিশ সায়েণ্টিফিক পাবলিশার্স' এবং ফ্রান্সের 'গথিয়ার-ভিলারস' সংস্থার যুগ্ম উদ্যোগে বইটির একটি ফরাসী অনুবাদ বেরুচ্ছে বলে জানা গেছে।

ল্যাঞ্জের অন্যান্য বইগুলির মধ্যে ইনট্রোডাকশান টু ইকনমিক সাইবারনেটিকস, 'অপটিমাম ডিসিশান-মেকিং' 'ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রাইটিংস' প্রভৃতি পৃথিবী-খ্যাত।

এইল ইউনিভার্সিটির ১৯৬৬ পুরস্কার ॥

আমেরিকার এইল ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রতি বছরই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্য একজন লেখককে পুরস্কৃত করে থাকেন। এবছর এইল সিরিজের তরুণতর কবি জেমস টেটেকে (২২) ১৯৬৬ সালের বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'দি লস্ট পাইলট'। এইল ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে এ বইটির একটি 'হার্ড-কভার' ও 'পেপার বাউন্ড' সংস্করণ বের করছেন।

বর্তমানে জেমস টেট অয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সৃজনশীল লেখক-গোষ্ঠীর সঙ্গে আছেন।

কেটি লুশেম কবি হলেন ॥

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা রাজনীতিবিদ কেটি লুশেম সম্প্রতি রাজনীতির জগৎ থেকে কবিতার জগতে প্রবেশ প্রবেশ করেছেন। ফলে বর্তমানে তিনি আমেরিকার রাজনীতি দুনিয়ার এবং কবিতার জগতের একমাত্র আলোচ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য কেটি লুশেম এ প্রসঙ্গে রসিকতা করে বলেন, 'এতে কবিদের শঙ্কিত হবার কারণ নেই।'

কেটি লুশেম সম্পর্কে যেটুকু তথ্য জানা যায় তা হচ্ছে এই যে তিনি হঠাৎ কবি হননি। কবিতা চর্চার একটা পর্ব ধীরে ধীরে চলছিল দীর্ঘদিন থেকে। যখন তখন যে কোনো বিষয়ের উপর ঝটপট কবিতা বানাতে পারতেন কেটি। রাজনৈতিক শ্লোগান, ছড়ার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ, যুবার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুহূর্তে চার লাইনের কবিতা উপহার ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা তৈরী করতেন অনায়াসেই। হোয়াইট হাউসে এ কারণেও তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠছিল দিন দিন। কোনো রাজনৈতিক

'টোস্টের' সম্মুখীন হলেই হোয়াইট হাউস থেকে ডাক পড়তো তাঁর—'একটি জোরালো চতুষ্পদ শ্লোক চাই।' গত মাসেও কেটিকে

কেটি লশেম

কবি বলতে এই রকমের 'চতুষ্পদ শ্লোক' রচয়িতা হিসেবেই জানতো সকলে।

কবিতার আসরে প্রবেশ করার কিছু-দিনের মধ্যেই নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পাতলা একটি কবিতার বই বেরিয়েছে—'উইথ অর উইদাউট রোজেস'। রাজনীতির আড়ালে তিনি যে বাস্তবিকই একজন কবি এ বইটি তার সাক্ষ্য দেয়। 'ডিনার অ্যাট এইট', 'সিক ট্রানজিট', 'ট্রাভেল হিন্টস', 'গ্র্যান্ড মাদারস মাইন্ড', ইত্যাদি কবিতাগুলি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবং কবি হিসেবে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

কেটির কবিতা প্রসঙ্গে একজন আমেরিকান সমালোচক বলেছেন 'কবিতায় কেটি তাঁর প্রিয় কবিদের প্রতিধ্বনি রাখতে ভালবাসেন। এটা হচ্ছে তাঁর কৃতজ্ঞতা।' অ্যান্ড্রু মারভেল, এ ই হাউসম্যান, ডরোথি পারকার তাঁর মৌলিক কণ্ঠে স্বর তুলেছেন কখনো কখনো। 'ট্রাভেল হিন্টস' নামক কবিতাটি তাঁর অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করে।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো—কেটি ছিলেন 'ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কমিটির' ভাইস চেয়ারম্যান; 'ডেমোক্রাটিক ওমেনস 'অ্যাকটিভিটিজ'-এর এককালীন ডিরেক্টর। বর্তমান সেসব ছেড়ে দিয়ে তিনি যোগদান করেছেন 'এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স'-এর ডেপুটি অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী অব স্টেট হিসেবে। এই পদ-মর্যাদায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইতিহাসে তিনিই আমেরিকার প্রথম মহিলা।

একজন দার্শনিক, মনীষী ও রাজনীতিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥

জার্মান সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গটফ্রিড হিবলহেলম লাইবনিতজ একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি। লিপজিক শহরে ১ জুলাই ১৬৬৪ তাঁর জন্ম। তীক্ষ্মবুদ্ধি এই বালক মাত্র পনের বৎসর বয়সে লিপজিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও পরে জেনা ও অলটডর্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শেষে ১৬৬৭ সালে ডক্টরেট উপাধিলাভ করেন। দর্শন, আইন, রাজনীতি, ইতিহাস, ভাষা, গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। জ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করেও এই মনীষী সম-কালীন রাজনীতিতে যথেষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন। সর্বজনমান্য এই মনীষীকে সম্রাট চতুর্থ চার্লস ব্যারন উপাধি প্রদান করেছিলেন। আড়াইশত বৎসর ১৪ পূর্বে নভেম্বর ১৭১৬ সালে এই মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করেন। সম্প্রতি জার্মান ডাকবিভাগ এই মনীষীর স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রবর্তন করেছে।

নতুন বই

রবীন্দ্রনাথ—বহুবিচিত্র

বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুধীরকুমার করণ বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথকে এক বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণে বিচারের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একান্তরূপে মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থে তাই গ্রাম এবং গ্রামীণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির বিশ্লেষণে তিনি সচেষ্ট। 'লোকায়ত' এই বিশেষণটি ব্যবহার করার কৈফিয়ৎ হিসাবে তিনি বলেছেন যে কথাটির প্রচলিত অর্থ পরিহার করে তিনি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'লোকে আয়ত' কথাটিই গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি সর্বপ্রথম 'গ্রামজীবন ও রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, গ্রামচিত্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' কাব্যের 'মধ্যাহ্নে' কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দান করে ভাষার রঞ্জিত রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চিত্রের নিদর্শন দিয়েছেন। লেখক যথার্থই বলেছেন : "ঔপনিষদিক সংযমই রবীন্দ্র সংস্কৃতির মুখ্য বস্তু; তাই তাঁর গ্রাম চেতনাও সুস্পষ্টভাবে প্রকৃতিবোধের অন্তর্গত।" অতঃপর তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্রাবলী'র গ্রামসম্পর্কিত অংশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গ্রামজীবন' নিয়ে গ্রন্থটির প্রথমাংশটিতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে যেমন গ্রাম উপস্থিত, তেমনই তাঁর কর্ম-জীবনে গ্রামোন্নয়ন ও পল্লীসংস্কার একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করেছিল, ডঃ করণ 'গ্রামোন্নয়ন', আদিবাসী সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে 'লোক-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ' অংশটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। ডঃ আশু-তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর লোকসাহিত্যের ইতিহাসেও এই অংশ-অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তথাপি স্বল্প-পরিসরে অল্পকথায় পরিবেশিত ডঃ করণের আলোচনাটি উপভোগ্য। লোক-সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা পথিকৃতের, ডঃ করণ তা সুন্দর ভঙ্গীতে প্রমাণিত করেছেন।

গুরু বিষয়কে সহজগ্রাহ্য সরল ভাষায় প্রকাশের শক্তি লেখকের আছে, তাই গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে। গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ (আলোচনা)—**ডঃ সুধীর করণ। প্রকাশক : গ্রন্থ নিলয়,** ৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। দাম—৬-৫০ পয়সা।

কবিতার সোনার ফসল

তিরিশের দশক থেকে বাংলা কবিতার মোড় ফিরেছে। তারপর এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে তার অনেক রূপান্তর ঘটেছে, পশ্চিমের আদর্শে বাংলা কবিতার অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে, আঙ্গিক, বাক্‌প্রতিমা সবই আর দেশী গণ্ডীতে আবদ্ধ নেই। এর ফলে সেকালের কবিতা আর একালের কবিতার অনেক তফাৎ, যাঁরা সেকালের কবিতা পড়ে আর কিছুই পড়েননি এতাবৎকাল, তাঁদের চোখে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা উদ্ভট মনে হবে। অনেকে আবার অর্থ বুঝি না এই কথা বলে কবিতা পড়তেই চান না। তাঁরা অবশ্য নিজেদেরই বঞ্চিত করে রেখেছেন বাংলা সাহিত্যের এক সোনার ফসল থেকে। যে রূপান্তর ঘটেছে তা স্বাভাবিক, যদি তা না হত তাহলে বাংলার কাব্যসাহিত্য আজ মহা-সাগরে পরিণত না হয়ে আবদ্ধ জলের পঙ্কিল ডোবা হয়ে থাকত। অতীতের কাঠামো থেকে আপনাকে মুক্ত করে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথপরিক্রমা সুরু হয়েছে এই সত্যটুকু আজ সাহিত্য-পাঠকের উপলব্ধি করার সময় সমাগত। বাংলা সাম্প্রতিক কবিতাও তার শৈশবের অপটু অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠে এখন সমৃদ্ধির পথে।

সুখের বিষয় সাম্প্রতিক কালের কয়েকখানি সুপ্রতিষ্ঠিত লিটল ম্যাগাজিনে বাংলা নতুন কবিতার জন্য মর্যাদার আসন পাতা আছে। এইকালে অনেক কাব্যসংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' (১) নামক সদ্যপ্রকাশিত সংকলনগ্রন্থে বর্তমানে জীবিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখছেন এমন খ্যাত-অখ্যাতদের কবিতা সংগ্রহ করে পাঠকের কাছে তুলে ধরাই এই সংকলনের উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত চারটি খন্ডে "মোটামুটিভাবে সব কবিরই লেখা গ্রহণ সম্ভব হবে" এই আশা পোষণ করেন প্রধান সম্পাদক—গৌরাঙ্গ ভৌমিক। এই সংকলনে অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, সমর সেন, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, সুশীল রায়, ধনঞ্জয় দাশ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, নীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, রবীন্দ্র গুহ, মঞ্জুলিকা দাশ, গণেশ বসু, মৃণাল দত্ত, সামসুল হক, সেবাব্রত চৌধুরী, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ৮৪জন কবির কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। বলাবাহুল্য সব কবিতাগুলিই সুনির্বাচিত এবং প্রতিনিধিত্বমূলক। গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও মুদ্রণ পারিপাট্য মনোরম। তবে দামটা কিঞ্চিৎ সুলভ করা উচিত ছিল।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা (১)
সম্পাদকমন্ডলী : গৌরাঙ্গ ভৌমিক (প্রধান সম্পাদক) সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু, সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—অরুণিমা পাবলিশার্স—৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও বাণী

স্বামী অভেদানন্দের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে দেশব্যাপী। ভারতে এবং বিদেশে তাঁর কর্মময় জীবন একদিন যে-আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার কীর্তিগাথা আজ এ-দেশের মানুষ প্রায় বিস্মৃত। এই মহামনীষী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ। সম্প্রতি ব্রহ্মচারী অরুণচৈতন্য লিখিত 'স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি স্বামীজীর কর্মময় জীবনকথা নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। স্বামীজীর বাল্যজীবন যে কতখানি আকর্ষণীয় ছিল, তা গ্রন্থকার সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। অভেদানন্দজীর রচনা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে নানা বিষয়ে তাঁর উপদেশ। তাঁর জীবনীপঞ্জীও আছে পরিশিষ্টে। গ্রন্থখানি বহুলপ্রচারিত হবে।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে স্বামী অভেদানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই মূল্যবান স্মারক-গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। স্বামী অভেদানন্দের সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা এবং স্বামীজীর রচনা সংকলিত হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা' রচনার পান্ডুলিপি এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রে'র পান্ডুলিপির প্রতিচিত্র এবং কয়েকটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে। আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বামী অভেদানন্দ, জননী সারদাদেবী ও স্বামী অভেদানন্দ, অভেদানন্দের স্মৃতি এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কুমুদবন্ধু সেন, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, নীরদবরণ চক্রবর্তী, মতিলাল রায়, রাজেন্দ্রলাল আচার্য, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী অতুলানন্দ এবং আরো অনেকে। তাছাড়া আছে দেশী ও বিদেশী পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন, বহু মনীষীর শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্বামীজীর ভাষণ, রচনাংশ এবং বিভিন্ন তথ্য। অনেকগুলি আলোকচিত্র এই সংকলনটির অন্যতম আকর্ষণ।

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী **(জীবনী)—ব্রহ্মচারী অরুণচৈতন্য। অশোক প্রকাশন। এ ৬২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।**

Souvenir: Swami Abhedananda centinary celebration, 1966-67. Ramkrishna Vedanta Math. 19 B Raja Rajkrishna Street, Calcutta-6. Price Rs. 2.00.

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা

শ্রীশিবানী চট্টোপাধ্যায়ের 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বহুমুখী চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। চিরশিশু রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ, দাম্পত্য-প্রেমে বিশ্বকবি, কবিচিত্তে স্বদেশ-চিন্তার উন্নয়ন, পরিকল্পনা, রবীন্দ্র-জীবনে মৃত্যু, উড়িষ্যা পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ—এই কয়েকটি আলোচনায় লেখিকার বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

সীমার মাঝে অসীম তুমি—
(আলোচনা)—শিবানী চট্টোপাধ্যায়। ডি, এম, লাইব্রেরী। বিধান সরণি। কলকাতা-৬। দাম দু' টাকা।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

প্রবন্ধ-গল্প-কবিতায় সমৃদ্ধ 'পত্রপুট'-এর প্রথম সংখ্যাটি বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র পালের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ; শ্রীঅনিমেষ চক্রবর্তী, শ্রীপ্রণব রায় ও শ্রীঅতুলরঞ্জন সান্যালের গল্প এবং শ্রীঅঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুশান্ত মিত্রের কবিতা বেশ প্রশংসনীয়। পল্লী পরিচিতি সংক্রান্ত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'পঞ্চমাংক' আলোচনাটি বিশেষ মূল্যবান এবং শ্রীলোকনাথ ঘোষের ক্রীড়াবিষয়ক রচনাটি মনোজ্ঞ হয়েছে।

পত্রপুট—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ এবং বোনিয়াপাড়া যুবক সঙ্ঘ, ১১০।১, সদর বক্সী লেন থেকে প্রকাশিত।

কবিতার কাগজ হিসেবে 'বক্তব্য' পত্রিকাটি কবিতানুরাগীদের কাছে মোটামুটি পরিচিত। বর্তমানে এর ষষ্ঠ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই দশকের কবিতা সম্পর্কে যে সমীক্ষাটি করা হয়েছে সে বিষয়ে বেশ কিছুটা বিতর্কের অবকাশ থাকলেও মোটামুটি সুলিখিত। কবিতা লিখেছেন অলোক সরকার, তারাপদ রায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সত্যেন্দ্র আচার্য, কবিরুল ইসলাম, দীপালি রাউত এবং আরো অনেকে।

বক্তব্য : সম্পাদক—দীপেন রায় ও তাপস গুপ্ত, ৬।স, স্কট লেন, কলকাতা—৯। দাম : ৫০ পয়সা।

সহজ ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায়

এখন সহজ করে বলা চলে, পাতা যায় হাত
নিজেই আগল খুলে বন্ধ করা যায়
কপালে টিকিট এ'টে যাওয়া যায় যে-কোন বাড়িতে
সব খেলা ভেঙে দিয়ে বলা যায় 'ওড়াও ফানুস'
তোমার চাতুরী জেনে সাজা যায় চতুর নাগর।

এভাবে সহজ হলে বিষাদ বেদনাগুলি কমে আসে ঢের
কমে আসে জটিলতা
বুকের বদলে 'পাখি', দেহের বদলে 'খাঁচা'
লিখে ফেলা যায়
কেনা যায় করাতের দাঁতগুলি, গোলাপের লাল
তেমন বাসনা হলে এমনকি তোমাকেও ফেলে যাওয়া যায়।

স্বপ্নভঙ্গ ॥ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দোলপূর্ণিমার চাঁদ শুয়ে আছে আমার শয্যায় ঃ
মনে পড়ছে সুধীন্দ্রনাথের কোনো প্রেমের সনেট,
কিংবা র‍্যাফেলের সেই অনবদ্য ম্যাডোনার ছবি:
বাঙ্ময় আলেখ্য দেখছি, নাকি শুনেছি নিঃশব্দ কবিতা!
এখন বাইরে দীপ্ত বসন্তের বর্ণাঢ্য উচ্ছ্বাস,
জানলা দিয়ে ভেসে আসছে অজস্র ফুলের গন্ধভার।
আলোর সরোদে কাঁপছে বাহারের বিচিত্র মূর্ছনা:
নির্জনে নদীর মতো চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম।

খুলেছে রূপসী রাত্রি তার সব রহস্যের দ্বার ঃ
ভুলে গেছি পরিপার্শ্ব। স্বপ্নাবেশে তন্ময় হৃদয়
ডুবে গেছে যেন কোনো গাঢ় অনুভবের গভীরে।
হঠাৎ বুকের মধ্যে বেজে উঠল বিষম বেদনা,
অবিরাম যেন কার করুণ কান্নার কণ্ঠস্বর
আমার হৃৎপিণ্ড বিঁধছে বিষমুখ শায়কের মতো।
রঙ নয়, রঙ নয়—চারিপাশে শুধু রক্তধারা
আর তীব্র আর্তনাদ। কে কাঁদে? কে কাঁদে এই রাতে?
সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণা নিয়ে কাঁদছে কি এ বিপন্ন পৃথিবী?
অথবা আমারই ক্ষুব্ধ বুকে দুলছে অশ্রুর সাগর?

সজল নয়নে দেখছি প্রিয় সব স্বপ্নের সমাধি!

শোক ॥ মৃণাল বসুচৌধুরী

দুঃখ গভীর হলে শোক
যেমন আগুন থেকে স্মৃতি,
শূন্যে প্রদীপ বাতায়নে—
যেমন ঝর্ণা থেকে নদী।

আয়ত চোখের নীচে জল
কখন নীরবে নিয়মিত
কখন স্বপ্ন জ্বালাময়
কখন আবেশে হাহাকার।

দুঃখ গভীর হলে শোক
বাতাস তীব্র হলে ঝড়,
সামান্য জোয়ার থেকে নদী
সামাল, শীতল অজগর।

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

॥ ১৯ ॥

রেস্তোরাঁয় সকলে বসে খাচ্ছে-দাচ্ছে, জায়গায় নয়—নিয়ে তুলল ছোট্ট কেবিনের ভিতর। নিজে একটা চেয়ার নিয়ে শিশিরকে চেয়ারটা দেখিয়ে দিল পূর্ণিমা : বসুন—

ছোকরা বয়টা মিটিমিটি হেসে মেনুর কার্ড শিশিরের দিকেই এগিয়ে দিল। এসব জায়গায় খেয়েছে কি কখনো—কার্ড হাতে হতভম্ব হয়ে থাকে সে। বুঝেসুঝে পূর্ণিমাও চুপ করে আছে। কী করে দেখা যাক, কী অর্ডার দেয় পাড়াগেঁয়ে জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী।

চা আর—। বিপন্ন মুখে শিশির পূর্ণিমার দিকে তাকাল। সমাধান আসে না। ঠোঁট টিপে হাসছে মনে হয়। শিশিরকে অপদস্থ করে মজা দেখবে।

চুলোয় যাকগে। চা আর—। গোড়ার কার্ডে পদ পড়ে গেল সে পর পর। খাদ্য তো বটেই—ঐ ঐ নামে যা দেবে, খাওয়া যাবে নিশ্চয়।

এতগুলো নাম শোনার পর এতক্ষণে পূর্ণিমার বুদ্ধি কাজে ঢুকল। শিশিরের হাত থেকে মেনু-কার্ড ছিনিয়ে নিয়ে বলে, নিয়ে এসেছি আমি, অর্ডার আমি দেব। এঁর অর্ডার মঞ্জুর নয়।

যা বলবার বলে বয়কে বিদায় দিয়ে শিশিরের দিকে অতঃপর পরিপূর্ণভাবে তাকায় : আপনি যেন ছটফট করছেন—

কলহের সূত্রপাত নাকি আবার—নিরিবিলি জায়গাটা নিয়েছে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে বলে?

পূর্ণিমা বলে, ছটফট করছেন না—ভাল লাগছে তাহলে?

তা লাগছে—। তারপরে শিশির মরিয়া হয়ে বলে ফেলে, কিন্তু গরমও লাগছে। মানে এই খুপরির থেকে বাইরে গিয়ে বসলে হত না।

না। পূর্ণিমা সজোরে ঘাড় নাড়ে : আমার খাওয়া মাটি হয়ে যাবে। পুরুষের সামনে মেয়েরা মন খুলে খেতে পারে না।

শিশির যেন পুরুষ নয়—কথা সেইরকম দাঁড়াচ্ছে কিনা? একবার ঐ যে পত্রলিকা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই বস্তু ধরে নিয়েছে। প্রতাপ আমার জানো না রমণী। বিদেশ-বিভূঁয়ে মরে আছি—মজার কথা বলতে নেই, যা বলছ সয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ পূর্ণিমা বলে, চায়ে বসিয়ে কাজ-কর্ম পণ্ড করছিনে তো আপনার?

কাজ আর কি! মেসে অনেক রাত করে ফিরি। যে-ঘরে থাকি, পাশার হুল্লোড় সেখানে। তার মধ্যে শোওয়া কেন, বসবারও জায়গা থাকে না। রাত ন'টা সাড়ে-ন'টা অবধি আড্ডা চলে, আড্ডা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তবে মেসে যাই।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! ঐ রাত্রি অবধি পথে পথে ঘোরা—

পথে ঘুরি বটে, তবে উদ্দেশ্যও থাকে। ঘর খুঁজে বেড়াই। ঘর আমার চাই-ই—এই মাসের ভিতর। এক-একদিন শিয়ালদা অথবা হাওড়া স্টেশনে চলে যাই। আমার অঞ্চলের মানুষ দেশভুঁই হারিয়ে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে—স্টেশনে চেনা মানুষ যদি বেরিয়ে পড়ে, তাদের ধরে একটা আস্তানার যদি জোগাড় হয়।

একটু থেমে কাতরস্বরে পূর্ণিমাকে বলে, বলেছিলেম ঘর খুঁজে দেবেন—ভুলে যাবেন না সেটা। তাড়াতাড়ি দরকার—কাল হয়ে যায় কালকেই গিয়ে উঠব, পরশু অবধি দেরি করব না। এমনি অবস্থা। মেস ছাড়বার জন্য পাগল হয়েছি—দূর বলেই নয়, পাড়াগাঁয়ে নিরিবিলি-থাকা মানুষ, মেস জায়গাই আদপে সহ্য হয় না আমার। তার উপরে ঐ আড্ডা। বলব কি আপনাকে—আড্ডায় আতঙ্ক হয়েছে। স্বপ্নে দেখি ঐ পাশাখেলা—'কচ্চে বারো' হুঙ্কারে শুয়ে কেঁপে ঘেমে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠি বিছানার উপর।

বলছে হাসির ঢঙে, কিন্তু না হেসে পূর্ণিমা রুদ্ধস্বরে বলে, সোজাসুজি বলতে পারেন না, খেটেখুটে এসেছি, বিশ্রাম এবারে, আড্ডা চলবে না? চক্ষুলজ্জায় বাধে—উঁ? দেখুন, আপনাদের মতন নিপাট ভালো-মানুষগুলো দুচক্ষের বিষ আমার।

কথার উত্তাপে শিশির কৌতুক বোধ করে। কৈফিয়তের সুরে বলে, মেস-জায়গা, সবাই প্রধান—কার কথা কে কানে নিতে যাবে। তাছাড়া নিজে আমি মেম্বার নই, একজন মেম্বারের গেস্ট হয়ে আছি। সিটের মালিক যে নিজেই হল পয়লা নম্বরের আড্ডা-ধারী। তবু তো ন'টা দশটার মধ্যে শেষ করে দেয়। চালাত যদি সকালবেলা অবধি আর পাশার বদলে ঢাকের বাজনা জুড়ে দিত, তাহলেই বা কি করতে পারতাম।

পূর্ণিমা বলে, লেগে পড়েছি ঘর দেখতে। নইলে তো মারা যাবেন আপনি। কেমন ঘর চাই, খুলে বলুন। ক'টা ঘর—মানুষ ক'জন আপনারা?

একলা। সেদিক দিয়ে সুবিধা আছে। যেমন-তেমন একটা ঘর হলেই চলবে।

নির্জলা মিথ্যা বলল। কিন্তু সামান্য পরিচয়ে যুবতী রমণীর কাছে গোটা মহাভারত কেন শোনাতে যাবে? মিথ্যাটা এখনই হাতে-নাতে ধরা যায় কেউ যদি খপ করে বাঁ-দিককার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। হাত ঢুকিয়ে মমতার পোস্টকার্ডখানা বের করে আনে। পোস্টকার্ড আজকেই এলো অফিসের ঠিকানায়। মমতার চিঠিতে সে ঠিকানা দেয়নি—সুনীলকান্তি পাছে মেস অবধি এসে হামলা দিয়ে পড়ে। কিন্তু মারাত্মক বোকামি করে বসে আছে, এখন সেটা মালুম হচ্ছে। চাকরির কথায় সুনীল ঠাট্টা-তামাসা করত, তারই জবাবে শিশির বাহাদুরি করে জানিয়েছিল—শুধু চাকরি পেয়েছে, তা-ই নয় —সুবিখ্যাত হার্মান-ম্যাম্বার্সের চাকরি। ব্যস, ঠিকানা পেয়ে গেল ঐ থেকে—মেসের না হোক অফিসের ঠিকানা। ঠিকানা চেপে রাখতে পারলে বেশ খানিকটা সামলানো যেত। কলকাতা শহর বৃহদরণ্য বিশেষ—এখানে কোন্ শাখায় কে বাসা বেঁধেছে, খুঁজে বের করা কঠিন। মেয়ে জিনিস খানাখন্দে ছুঁড়ে ফেলবার নয়—এক মাসের জায়গায় দু-তিন মাস হলেও ঘরে রাখতে বাধা হত। গালিগালাজ করত নিয়মিত শিশিরের উদ্দেশে, কিন্তু না রেখে উপায় ছিল না। বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই মাটি হল সমস্ত।

নিশ্বাস ফেলে শিশির আরও জুড়ে দিল : কেউ নেই আমার। মা ছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। মুক্তপুরুষ আমায় বলতে পারেন। মা মরার পর সর্বস্ব ফেলে হিন্দুস্থানে এই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঘর তাড়াতাড়ি চাই। দালাল ধরলে হয়তো হয়। আমি তো কায়দা-কৌশল জানিনে—আপনি যদি জুটিয়ে দেন দয়া করে। এখন যা অবস্থা, পথে পড়ে না মরি কোনদিন।

মিথ্যা পুনশ্চ। একলা মা নন, মায়ের আগে পুরবী চলে গেছে পথের কণ্টক একটি ফেলে। যার জন্যে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। এক-একটা দিন যায়, আতঙ্কে হিসাব করি মাস পুরতে ক'দিন বাকি আর।

এত সব বলা যায় না শহুরে শিক্ষিত মেয়ের কাছে। তার বয়সে কলেজই ছাড়ে না কতজনা—ক্লাস-রেজিস্টারে ছাত্র নাম বজায় রেখে ফুর্তিফার্তি করে বেড়ায়। আর শিশির ইতিমধ্যে একপ্রস্থ সংসারধর্ম করে মেয়ের বাপ হয়ে বসেছে রীতিমত। এসব বলে হাস্যাস্পদ হবার মানে হয় না। আজব দর্শনীয় বস্তু ভেবে পুর্ণিমা ড্যাবড্যাব করে তাকাবে তার দিকে, হাসতে হাসতে হয়তো বা মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

খাবার এসে গেল। বাঁচোয়া—কথার ছেদ পড়ে সেইদিকে মনোযোগ এখন। সর্বনাশ, ছুরি-কাঁটা দিয়ে গেছে আবার। আজব স্বভাব শহুরে মানুষের। দু-দুখানা পা দিলেন ঈশ্বর—মোজায় মুড়ে সযত্নে বস্তুদুটো রেখে দাও, পায়ের কাজের দায় ট্রাম-বাস-ট্যাক্সিতে নিয়ে নিয়েছে। পঞ্চ-অঙ্গুলি সহ এমন এক-একখানি হাত—তা আঙুলে যেন বিষ-মাখানো, খাদ্যের সঙ্গে কদাপি ছোঁয়া না লাগে, জটিল এইসব যন্ত্রপাতি সহযোগে গলাধঃকরণ করো—

বেকুব হবার ভয়ে শিশির শুধু চায়ের বাটি তুলে নিয়ে মুখে ঠেকাল। এই জিনিষটা মুখে তোলবার এখন অবধি কল বেরোয়নি।

পুর্ণিমা বলে, কি হল, খাবার কিছুই যে ছোঁন না। খাসা কাটলেট করে এরা, খেয়ে দেখুন।

চালাক মেয়ে—শিশিরের এহেন অরুচির কারণ ধরে ফেলেছে ঠিক। এবং সহানুভূতিশীলাও বটে। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, মাগো, কাঁটা-চামচে ধোয়া না ভাল করে। কী নোংরা! হাতেই খাওয়া যাক—কি বলেন?

বাঁচিয়ে দিল রে বাবা! বেলা নটায় নাকে-মুখে চাট্টি খেয়ে সেই বেলগাছিয়া থেকে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে, দেহ চনমন করছে ক্ষিধেয়, হেন অবস্থায় কতকগুলো উত্তম উত্তম খাদ্য সামনে নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকা! ছুঁতে পারছিল না কাঁটা-চামচের ভয়ে। সেসব দয়াবতী স্বহস্তে সরিয়ে দিল। পুর্ণিমা হাতে খাচ্ছে, শিশির তো খাবেই। তাহলেও কিছু ভয় রয়ে গেছে—ধীরে ধীরে রুচিসম্মতভাবে খেতে হবে। গ্রামারীতির গোগ্রাসে খাওয়া দেখলে হেসে ওঠে না কি করে পাশের এই সতর্ক মেয়ে-চৌকিদার।

ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি—খেতে খেতে পুর্ণিমা ঘড়ি দেখছে। পরম আগ্রহে শিশির বলে, তাড়া আছে বোধহয়?

না, তাড়া কিসের—

পরীতে হরণ করে গাছের মাথায় কি ঘরের চালে কিম্বা দূর-দূরান্তরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে তোলে—পাড়াগাঁয়ে গল্প চলিত আছে। এ-ও খানিকটা তাই—অফিস-ফেরতা মানুষটাকে ছোঁ মেরে রেস্তোরাঁর এই খোপে এনে তুলেছে। অব্যাহতি পেলে বেঁচে যায়। কাজও আছে, বেহালার দিকে ঘুরবে আজ।

পুর্ণিমা নিজেই তারপরে একটু একটু করে বলছে, আমার ভাই ডাক্তার। তার শাশুড়ির হার্টের অসুখ—সেকেণ্ড স্ট্রোক হয়েছে ভোররাত্রে—

শিশির উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আরে সর্বনাশ, ভয়ানক ব্যাধি!

ভয়ানক কিছু হয়নি, শুনতে পেলাম। মাইল্ড এ্যাটাক। অফিসের জন্য নিজে যেতে পারিনি, ফোন করে জানলাম। যেতে ওরা মানা করছে, তাহলেও বোধহয় যাওয়া উচিত। কি বলেন?

আশান্বিত হয়ে শিশির বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়। মাইল্ড বলে হেলা করবার জিনিস নয়। ভুক্তভোগী আমি, আমার মা ঐ রোগে গিয়েছেন। যাচ্ছেতাই রোগ—টুক করে প্রাণ টেনে নেয়, চিকিচ্ছেপত্তোরের সময় দেয় না একটু—

পুর্ণিমা দ্বিধান্বিত ভাবে বলে, এ-রোগে কথাবার্তা বলা বারণ। গেলে কথাবার্তা বলবেন তো তিনি। আর একটু ইয়ে অর্থাৎ কথা-কাটাকাটি হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। দেখলে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন। এইসব কারণে ভাবছি—

একটু ভেবে নিজেই আবার বলে, তবু একবার যাওয়া উচিত। আমার নিজেরই ভাল লাগছে না, তাছাড়া আমার ভাজ মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে ভাববে—দেখ, মায়ের এতবড় অসুখে দেখতে এলো না। রোগীর কাছে না-ই বা গেলাম, বাইরে থেকে খবরা-খবর নিয়ে আসব।

শিশির মহোৎসাহে সায় দেয় : যাবেন বইকি! রোগীকে জানতে দেবেন না, আপনি গেছেন। তাহলে উত্তেজনার কারণ ঘটবে না!

দাম এবং যথোচিত টিপস্ মিটিয়ে বাইরে এলো তারা। এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে পুর্ণিমা বলে, নেই দাদু, এতক্ষণ কি আর থাকেন! দিব্যি এক মজা করা গেল। ওমা, বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখি এর মধ্যে—বুড়োমানুষ বৃষ্টিতে হয়তো ভিজেছেন। কাল এর শোধ তুলবেন। সাঙ্গোপাঙ্গদের কলম ছুঁতে দেবেন না বোঝা যাচ্ছে। সারাদিন এই নিয়ে চলবে।

জলে ডুবে, আগুনে পোড় খেয়ে হাতির পদতলে নাস্তানাবুদ হয়ে এরা এক-এক প্রহ্লাদ-মার্কা মেয়ে—অপবাদে এদের মজা লাগে। শিশিরের অন্তরাত্মা কাঁপছে, উপর-ওয়ালার কানে উঠে নতুন চাকরি খতম হয়ে না যায়। 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে'—নিতান্ত শহুরে জায়গা না হলে রমণীর পাশ থেকে সাঁ করে ছুটে পালাত।

নমস্কার! কাল দেখা হবে আবার অফিসে—

বাস এসে গেল, উঠে পড়ে পুর্ণিমা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। যাচ্ছে চলে, তখনো ভয় ধরিয়ে যায় আগামী দিন মনে করিয়ে দিয়ে।

নিরিবিলি পেয়ে শিশির পকেট থেকে মমতার চিঠি বের করল। অফিসে কাজের ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখেছিল। ভিতরের অর্থ তলিয়ে দেখছে এইবার। চিঠি নয়, যেন আদালতের সমন। এই রবিবারে কুসুমডাঙা যেতে হবে কন্যা-দর্শনে। না গেলে, ভয় দেখিয়েছে—সুনীলকান্তি এসে পড়ে ধরে নিয়ে যাবে। পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করানোর মতো।

কুমকুমের প্রশংসা দিয়ে চিঠির আরম্ভ: এমন মেয়ে হয় না। ভাল আছে সে, খেলা-ধুলো হাসিখুশিতে বেশ আছে, তার জন্য চিন্তা নেই। শান্তশিষ্ট এমন মিশুক মেয়ে আমরা দেখিনি। তুমি যে একেবারে ডুব মেরে বসেছ, কারণটা কি? কিসের লজ্জা-সঙ্কোচ, বুঝি না। এ-বাড়ির কর্তাটিও অফিসের চাকরি করে। রেলে মাত্র ঘণ্টা-খানেকের পথ—রবিবারেও আসার সময় হয় না, আমরা কেউ বিশ্বাস করিনে। এই রবিবারটা দেখব আমরা, না এলে উনি তোমার অফিসে গিয়ে ধরে আনবেন—

অফিসের অনিলবাবুর বাড়ি বেহালায়। শিশিরের পাশেই তাঁর সিট—ঘরের জন্য তাঁকেও সে ধরেছে। অনিল বলেছেন, যাবেন আমার বাড়ি, দুজনে মিলে পাড়া ধরে ধরে খুঁজব। আজকে বেহালার দিকে যাবে। শহরের ভিতর কোন আশা নেই, শহর-তলীতে কপালক্রমে যদি মিলে যায়—

ঘরে মেলে তো রবিবারেই মেয়ে নিয়ে আসবে—চামার লোকদের সঙ্গে তারপরে আর সম্পর্ক নেই। মেসের ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, ঘর জুটিয়ে দিলে সে এসে কুমকুমের ভার নেবে। মাইনে অবশ্য মেসে যা পায় তার ডবল, তাহলেও মানুষটা ভাল—ক'টা দিন নেড়েচেড়ে কুমকুমের উপর মায়াও পড়েছে ঠিক। নইলে শুধু টাকার লোভে রাজি হত না।

নিউ মার্কেটের কাছে পুর্ণিমা নেমে পড়ল। প্রথম এই কুটুম্ববাড়ি যাচ্ছে—খালি হাতে যাওয়া শোভন নয়। রোগীর কাছে কি নিয়ে যাওয়া যায়? ফলটল নেওয়া—সে বোধহয় হাসপাতালে চলে। কত বড়লোক ওঁরা—পথ্য-অষুধ নিশ্চয় পর্বতপ্রমাণ জমেছে এতক্ষণে। সেখানে কয়েকটা ফল হাতে করে হাজির দেওয়া হাস্যকর।

ফল নয়, ফুল। ভেবেচিন্তে পুর্ণিমা ফুল কিনল, বাণ্ড বাঁধিয়ে নিল দাঁড়িয়ে থেকে। ফুলই মানায় বড়লোক রোগীর পাশে। হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে-সাতটা বাজে। এত রাত্রে রোগী দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে রোগীর সামনে যাচ্ছে না—বাড়িতে একটিবার হাজির দেওয়া, স্বমুখে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাবতীয় খবরাখবর জানা। এর জন্য রাত করে যাওয়ায় দোষ হবে না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েই দেরি। একজনকে আহ্বান করে নিয়ে কিছু না খাইয়ে বিদেয় করা যায় কেমন করে? একটা কাজ হয়েছে অবশ্য। বুড়োমানুষ নটবর আশায় আশায় পিছু নিয়েছিলেন, প্রত্যাশা তাঁর ষোল-আনা পূরণ হয়েছে। যা-কিছু দেখবার চর্মচক্ষে দেখে নিয়ে গেলেন। সেকশনে কাল কিছুমাত্র কাজকর্ম হবে বলে মনে হয়

না। ফুসফুস-গুজগুজ এমনিতেই চলে থাকে—কাল একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

ট্যাক্সি নিল একটা। বিলাসিতাটুকু বাধ্য হয়েই করতে হল—বাসে-ট্রামে আরও কতক্ষণ নিত বলা যায় না। ঢুকে পড়ল ডাক্তার অপূর্ব রায়ের বাড়ি। এ-বাড়ি এই প্রথম এসেছে সে।

নিচের তলায় জনমানব নেই। করিডরে একটা আলো জ্বলছে শুধু। পূর্ণিমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। খুব সম্ভব, বাড়াবাড়ি অবস্থা—উপরতলায় রোগীর শয্যা ঘিরে আত্মীয়জন বিমর্ষমুখ হয়ে বসে আছে—এমনি একটা ছবি মনে এসে যায়।

পায়ে পায়ে উপরে উঠছে। গোটা-তিনেক ধাপ উঠেছে, একটা চাকর উপরতলা থেকে দ্রুত নেমে এলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। এ-বাড়ির চাকর-বাকর অনেকেই তারণের বাড়ি গেছে। এ-লোকটা সম্ভবত নতুন, পূর্ণিমাকে চেনে না।

বলে, উপরে তো নয়—উপরে কেন যাচ্ছেন?

কথার সুরটা বিশ্রী লাগে। সন্দেহ করেছে কিছু যেন।

পূর্ণিমা বলে, মাকে দেখতে যাচ্ছি—

লনে আছেন তিনি—

কেমন করে পূর্ণিমা বিশ্বাস করবে! বুঝতে পারেনি লোকটা। তখন বিশদ করে বলে, বিজয়া দেবীর কাছে এসেছি, তিনি উপরে নেই?

বাড়ির পিছন দিকে লন। সেইদিকে লোকটা আঙুল দেখাল : ওখানে রয়েছেন দেখুনগে। সকলে মিলে মার্কেটে গিয়েছিলেন, এখুনি ফিরেছেন। তারপরে আর উপরে ওঠেননি।

হার্টের অসুখে ভোরবেলা যাঁর এখন-তখন অবস্থা, সেই মানুষ মার্কেট ঘুরে এসে লনে বসে গুলতানি করছেন, চিকিৎসার এমন হাতে-হাতে ফল বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু এক ধাপ উপরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকটা বলছে, পথ আটকে আছে। নেমে অগত্যা করিডরে আসতে হল। লন সেখান থেকে নজরে আসছে।

একটা উৎসব হয়ে গেছে, একনজরে বোঝা যায়। চাঁদোয়া-টাঙানো লনের উপর, নিচু-টেবিল ও চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো। ঐখানে নিমন্ত্রিতেরা বসেছিল। খানাপিনাও হয়েছিল—প্লেট-চামচে, ছুরি-কাঁটা, কাপ-ডিস টবের পাশে পড়ে আছে, চাকরটা সেই-গুলো ধোওয়ার কাজে লেগে গেল। ফুলের তোড়া একটা সে হাতে করে এনেছে—কত তোড়া কতদিকে, চাঁদোয়া থেকেই ঝুলছে দশ বারোটা।

থমকে দাঁড়াল পূর্ণিমা। জিজ্ঞাসা করে : আজ বুঝি অনেক লোকজন এসেছিল?

মুখ তুলে চাকরটা বলে, বেশি আর কী! ছোট্ট পার্টি—দিদিমণি আর জামাই-বাবুর বন্ধুরা শুধু। ছ'টার মধ্যেই সারা হয়েছে। ও'দের বিয়ের বছর পুরল কিনা আজ।

তাই বটে, আজকের এই তারিখেই তাপস আর স্বাতীর বিয়ে হয়েছিল। পূর্ণিমার খেয়ালে আসেনি। কী যেন হয়ে গেছে সে, অফিস আর টাকাকড়ি আর ঘর-সংসার—এর বাইরে কোনকিছু জানতে নেই। আনন্দলোক থেকে সে নির্বাসিত। কোনরকম চপল প্রসঙ্গ তার সামনে কেউ আনে না। বাবা থেকে শুরু করে সকলে মিলে দেবী বানিয়ে দিয়েছে; তুচ্ছ কথা তুলবে কোন্ ভরসায়! ভয় পায়।

আরও কয়েক পা এগোল পূর্ণিমা। লনে উঁকিঝুঁকি দেয়। উৎসবঅন্তে আলো নেভানো, একদিকে শুধু একটা ল্যাম্পস্ট্যান্ড মৃদু আলো বিকীরণ করছে। রহস্য-ঘেরা আলো-আঁধারি ভাব। তাসের টেবিল পড়েছে সেইখানটায়—ও'রা তাস খেলছেন। বিজয়া দেবী স্বয়ং, স্বাতী, তাপস এবং চতুর্থ ব্যক্তি—কে, আমুদেস্বভাব সুবেশা মহিলাটি? —দিদি অণিমা। কাশীপুর থেকে অণিমা পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে, শুধু অণিমা কেন, রঞ্জুও। চারজনে ওরা তাসে মত্ত। বিজয়া দেবী আর জামাই পার্টনার, বিপক্ষ দল অণিমা আর স্বাতী। তারণের বাড়ির বউমানুষ যে স্বাতী, সে-স্বাতী এখানে নয়। উচ্ছল, হাসামুখী। অণিমা পর্যন্ত এ-বাড়ি এসে ভিন্ন মেজাজ নিয়েছে। ছোট্ট রঞ্জু অবধি—দাসী গোছের এক মেয়ে তাকে কোলে নিয়ে ঘুরছে।

যেন এক ভিন্ন জগৎ, স্বপ্নরাজ্য—এর মধ্যে পূর্ণিমার স্থান নেই, তাকে কেউ ডাকবে না। তার দৃষ্টিতে সমস্ত আনন্দ বুঝি জ্বলে-পুড়ে যাবে। জ্যোৎস্না-ভরা এই রাত্রি সকলে মিলে আনন্দ করে কাটাবেন। ভোরবেলা দেবাশিসকে পাঠিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে আসা হয়েছে—পূর্ণিমা না এসে পড়ে, বারম্বার ও'রা নিষেধ করে দিয়েছেন।

রঞ্জুকে নিয়ে মেয়েটা এইদিকেই আসে যেন। ফুল ভালবাসে রঞ্জু—তারণের বাসায় কয়েকটা বেলফুলের চারা হয়েছে, রঞ্জু এসেই আঁকুপাকু করে, তার জন্য কুঁড়ি পর্যন্ত তুলে দিতে হয়। আজ কত সুন্দর তোড়া গেঁথে এনেছে রোগীর জন্য—রোগীই যখন নেই, এ-জিনিস রঞ্জুকে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ধরা দেওয়া চলবে না এখন এই অবস্থায়। বিনা নিমন্ত্রণে আগ বাড়িয়ে চলে এসেছে—সে বড় লজ্জার। এমনও ভাবতে পারে, ডিটেক্‌টিভ-পুলিশের মতন চুপিচুপি খোঁজ নিতে এসেছে—অসুখটা সত্যি কিনা। দুটোতেই মাথাকাটা যাবার ব্যাপার।

সরে গিয়ে পূর্ণিমা একটা থামের অন্তরালে দাঁড়ায়। রঞ্জুকে নিয়ে মেয়েটা করিডরে উঠল, সেখানে কাকাতুয়া দেখাচ্ছে। এ-জায়গা থেকে তাসের টেবিল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাসখেলার সঙ্গে গল্পগাছা, জল, হাসাহাসি। কী একটা কথা নিয়ে মা-মেয়ে এবং অণিমায় মধ্যে হাসির পাল্লা চলেছে যেন। বিজয়া দেবীর আত্মকথা দেখ—শেষ রাত্রে একবড় রোগের প্রচণ্ড আক্রমণ, সারা-দিন নাকি শয্যাশায়ী, সন্ধ্যার আগেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ—পার্টি সেরে মেয়ে-জামাই নিয়ে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে মহানন্দে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে ফিরলেন, খুব সম্ভব এই বিয়ের দিনে জামাই-মেয়ের জন্য উপহারের জিনিস। অণিমা ও রঞ্জুকে ও'রাই হয়তো গাড়িতে তুলে কাশীপুর থেকে নিয়ে এসেছেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে নিজ থেকেও অবশ্য চলে আসতে পারে।

আর পূর্ণিমা, দেখ, সকালবেলা-পরা অফিসের কাপড়-চোপড়ে নিঃসঙ্গ দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চাকরটা হাঁ-হাঁ করে সিঁড়ির পথ আগলে এসে দাঁড়াল—চোরই ভেবেছিল হয়তো। পূর্ণিমা নিজেই এবার চোর ভাবছে নিজেকে—উৎসব-দিনে ঢুকে পড়ে বেকুবি করেছে, সকলের চোখ এড়িয়ে পালাতে পারলে হয়। নিউ মার্কেটে সে-ও গিয়েছিল রোগিনীর জন্য ফুল কিনতে। দেখা হয়ে যেতে পারত—ভাগ্যিস তা হয়নি। লজ্জায় পড়ে যেতো। গুরুস্থানীয়া মহিলা, কৈফিয়ৎ রচনা করতে গলদঘর্ম হয়ে যেতেন। পূর্ণিমার অবশ্য আর্থিক লাভ কিছু ছিল—ফুল কেনা এবং এই ট্যাক্সি করে আসার খরচ বেঁচে যেত।

ফুল নিয়ে কি করে এখন? পয়সার জিনিস নষ্ট করতে মন চায় না, রঞ্জুর হাতে বাণ্ডটা দিতে পারলে হত। সেটা যখন সম্ভব নয়, সন্তর্পণে একটা বেতের চেয়ারে রেখে দিল। রঞ্জুর হাতে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই—তবু ফুল জিনিস পথের ড্রেনে ফেলে দিতে পারে না, রঞ্জুর নামে এখানে রেখে যাচ্ছে। ঠাকুরের নামে লোকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে কি আর ঠাকুর হাতে করে তুলে নিয়ে যান? দিয়ে যায় এই পর্যন্ত, দিয়ে পরিতৃপ্তি। তারপরে হয়তো বা সে জিনিষ গরু-ছাগলেই খেয়ে ফেলল।

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ফুড়ুৎ করে পূর্ণিমা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দ্রুত পায়ে চলেছে।

বাড়ি ঢুকল।

আলো নেভানো। ভানু, ভানু—করে ডাকছে।

হার্মান কোম্পানীর চাকরি হবার পর ভানুমতীকে রেখেছে। কুসমির ছোট বোন ভানুমতী। কুসমিকে আর পাওয়া যাবে না, পূর্ণ সুখস্বচ্ছন্দের সঙ্গে কাশীবাস করছে সে। মহানন্দে আছে, চিঠি লিখেছিল সে সেখান থেকে : চমৎকার জায়গা। বেগুনগুলো আয়তনে মিঠেকুমড়োর মতো। রাবাড়ি ও প্যাড়া অতিশয় সুস্বাদু, দামেও সস্তা। এবং বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার চরণাশ্রয়ে পরকাল নিয়েও কিছুমাত্র উদ্বেগের হেতু নেই—দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিবলোকে গমন। একটুকু সতর্ক থাকতে হবে—গঙ্গার ওপারে ব্যাসকাশী গিয়ে মৃত্যু না হয়। শিবলোকের বদলে গাধা হয়ে তাহলে বিচরণ করতে হবে।

এমনি সব লিখেছিল কুসমি। ছোট বোন ভানুমতীর কথা লিখেছিল : বর কারখানায় কাজ করে, মজুরি সামান্য। দুঃখ-কষ্টে আছে তারা। ভানুকে রেখে দাও—কতই বা কড়ু কর্ম তোমাদের, স্বচ্ছন্দে সে পারবে।

ভানুমতী সেই থেকে আছে। রাত্রে সে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু এত সকাল সকাল তো চলে যাবার কথা নয়—

ডাকাডাকিতে তারণই উঠে আলো জ্বেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দোর খুললেন। পূর্ণিমার কাছাকাছি নিশ্চয় বাতের ব্যথা বেড়েছে। বরের অসুখের নাম করে ভানুমতীটা অজ্ঞ সন্ধ্যার পরেই সরে পড়ল। দেহের কষ্ট, তার উপরে নিঃসঙ্গ একাকী পড়ে। রেগে টং হয়ে আছেন, গজর-গজর করছেন : যে-যার মজা নিয়ে আছে, আমার দিকে কে ফিরে তাকায়? পূর্ণ-দা ভাগ্যবান মানুষ, পুণ্যস্থানে গিয়ে আছে। কত জন্মের মহাপাপে পড়ে পড়ে নরকভোগ আমার।

কটমট করে বারম্বার তাকাচ্ছেন মেয়ের দিকে। বাতের ব্যথা এবং বাড়িতে একলা পড়ে থাকা—এর জন্যও অপরাধ নিশ্চয় পূর্ণিমার। তার উপর তৃতীয় অপরাধ, অন্য দিনের চেয়ে কিছু বেশি রাত্রি হয়েছে বাড়ি ফিরতে।

শান্তকণ্ঠে পূর্ণিমা বলে, শুয়ে পড়োগে বাবা, তেল মালিশ করে দিচ্ছি, ব্যথা কমে যাবে।

কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বাপের হাঁটুতে কবিরাজী বাতের-তেল মালিশ করতে বসল। এই কাজ সেরে এখুনি আবার রান্নায় যেতে হবে। ও-বেলার রান্না বাবা মুখে দেন না। একলা হলে রান্নার পাটে যেতোই আজ। কিন্তু বুড়োমানুষ বাবা এক্ষুনি তো ক্ষিধে ক্ষিধে করে উঠবেন।

তেল মালিশ হচ্ছে, আরাম পেয়ে তারণ বকাবকি থামালেন এতক্ষণে। চোখ বুজেছেন। চোখ খুলে একবার বললেন, আলোটা নিভিয়ে দে পুনি।

উঠে গিয়ে পূর্ণিমা সুইচ তুলে দিল। ঘর অন্ধকার। ডাক্তার অপূর্ব রায়ের বাড়ির তাসখেলা এখনো বোধহয় চলছে।

(ক্রমশঃ)

কলকাতা সেমিনারে যোগদানের জন্য আগত উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য এলাকার প্রতিনিধি দল। বাম থেকে দ্বিতীয়— গারো পাহাড়ের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম আম্পং সাংমাকে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

পাহাড়ের সমস্যা

উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য জনগোষ্ঠীগুলির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কলকাতায় বেসরকারী উদ্যোগে সম্প্রতি যে আলোচনাসভা হয়ে গেল সেই সভায় যোগদানকারী একজন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, মণিপুরের যেসব গ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে গিয়েছিলেন সেসব গ্রামে তিনি কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন। গ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে জানান যে, "জাপানী হামলার" সময় তাঁরা তিনদিন বনেজঙ্গলে পালিয়ে ছিলেন! প্রশ্নের উত্তরে গ্রামবাসীরা জানান যে, ঐ জাপানীদের সঙ্গে কয়েকজন "ভারতীয়" ছিলেন বলে তাঁরা শুনেছেন বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর বা তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম তখন বা আদৌ কখনও তাঁরা শোনেন নি এবং এবিষয়ে কিছুই জানেন না।

এই ধরনের গ্রামবাসীকেই আজ আমরা ভারতবর্ষের সংবিধানের আওতায় এনে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদেহের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত করার চেষ্টা করছি। এটা একটা কঠিন ও বৃহৎ কাজ।

সেদিক থেকে কলকাতার এই আলোচনাসভা একটি বিশেষ প্রশংসনীয় প্রয়াস। সম্ভবতঃ এই প্রথম আসাম, ত্রিপুরা, নেফা, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের পার্বত্য মানুষদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা নিজেদের এলাকার বাইরে গিয়ে খোলাখুলিভাবে নিজেদের মতামত উপস্থিত করলেন। এই আলোচনায় শুধু যে পার্বত্য জাতিগুলির প্রতিনিধিরা অবশিষ্ট ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষদের মুখোমুখি হলেন তাই নয়, এই প্রতিনিধিরাও সম্ভবতঃ এই সর্বপ্রথম পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় করার সুযোগ পেলেন। স্বভাবতঃই এই আলোচনায় যেসব কথা বলা হয়েছে তার সবগুলি সকলের মনঃপূত হবে না। এই ধরনের আলোচনায় তা' হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু এই আলোচনার মধ্য দিয়ে যদি পার্বত্য অঞ্চলগুলি ও তাদের অধিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে একটা জাতীয় নীতি গড়ে তোলার মত আলোকের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে আলোচনাসভার উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ সার্থক হবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও এটা সত্য কথা যে, এই ধরনের কোন জাতীয় নীতি এখন ভারত সরকারের নেই। প্রকৃতপক্ষে, এমন কোন সংস্থা নেই যাঁরা পার্বত্য অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সরকারী নীতির কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নিয়মিতভাবে তার সন্ধান রাখেন, সে-বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেন এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কার্যকলাপকে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট, সন্তোষজনক নীতির আধারে গ্রথিত করে দেন।

যদি তা থাকত তাহলে ভারত সরকার নিশ্চয়ই নীতিগতভাবে গোহত্যা নিষেধের দাবী মেনে নেওয়ার আগে বিষয়টি পার্বত্য জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিবেচনা করতে বাধ্য হতেন। কলকাতার সম্মেলন উপলক্ষে যেসব প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের আলোচনা থেকে বোঝা গেছে, গো-বধ নিষেধের দাবী মেনে নেওয়াটাকে তাঁরা সংখ্যাগুরুর ইচ্ছা সংখ্যালঘুর উপর চাপিয়ে দেওয়ার নজীর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এইসব পার্বত্য জনগোষ্ঠীগুলির অনেকেই গো-মাংস খায়। যে-সংবিধানের প্রতি তাঁদের দ্বিধাহীন আনুগত্য দাবী করা হয় সেই সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির দোহাই দিয়ে আমরা যদি তাঁদের খাদ্যের অধিকার কেড়ে নিই তাহলে সংবিধান সম্পর্কে তাঁদের প্রীতি কি বাড়বে? এই আলোচনাসভা হল বলেই আমরা জানতে পারলাম যে, মণিপুরে একটি নাগা পত্রিকায় ভারতবর্ষে গো-বধ নিষেধের আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে। এই আন্দোলন সম্পর্কে এত কথা আলোচনা হয়েছে; কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের এই বৃহৎ লোকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কেউ এযাবৎ প্রশ্নটি বিবেচনা করার কথা বলেন নি। কলকাতার আলোচনাসভায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু সেদিক থেকে বিষয়টি ভেবে দেখতে বাধ্য হবেন।

আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শের কথা বলি এবং আশা করি এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শ ভারতবর্ষের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত পার্বত্য জনগোষ্ঠীগুলিকেও আকৃষ্ট করবে। কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যখন তৈল শোধনাগার উপলক্ষে যজ্ঞ করা হয় তখন পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেকথা কি কেউ লক্ষ্য করেন? অথবা

দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করে যখন পার্বত্য এলাকায় বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রামের প্রধানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সরকারী কনজারভেটর অব ফরেস্টের হাতে দেওয়া হয় তখন কি কেউ লক্ষ্য করেন?

এই আলোচনাসভায় পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য সর্দার তারলোক সিং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য থেকে যেটুকু বোঝা গেছে সেটা হচ্ছে এই যে, পার্বত্য অঞ্চলগুলি সম্পর্কে ভারত সরকারের যদি কোন নীতি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে এই যে, পার্বত্য এলাকাগুলির সমস্যা মূলতঃ অর্থনৈতিক এবং এই এলাকাগুলির উন্নয়নের সমস্যা দূর করতে পারলে অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

পার্বত্য অঞ্চলগুলির উন্নয়নের সমস্যা রয়েছে একথা ঠিক। আসামের অধিবাসীদের শতকরা ১৯ জন পাহাড়ী। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার বাবদ যেখানে সমগ্র রাজ্যে ব্যয় হয়েছে আট কোটি টাকা সেক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ব্যয় করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে যদিও গত কয়েক বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট দ্রুত প্রসার ঘটেছে তথাপি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা সমতলের জেলাগুলির তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে আছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে পার্বত্য জেলাগুলিতে স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের ৬৪·৪ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছিল এবং সমতলের ক্ষেত্রে সেই হার ছিল ৫৫·৪ শতাংশ। কিন্তু সে-বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে পাহাড়ী এলাকায় স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের ১৩·৭ শতাংশ পড়ত সে-জায়গায় সমতলে সেই অনুপাত ছিল ১৭·৪ শতাংশ। গারো হিল্‌স্‌, খাসি হিল্‌স্‌, মিজো হিল্‌স্‌ ও ত্রিপুরার পার্বত্য উপজাতীয়দের অর্থনীতি দেশবিভাগের ফলে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এখন যেসব অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সেসব অঞ্চলে আসাম ও ত্রিপুরার এইসব পার্বত্য এলাকার কমলালেবু, পান ও চুনাপাথরের ভাল বাজার ছিল। দেশবিভাগের ফলে সে-বাজার নষ্ট হয়ে গেছে এবং বিকল্প বাজার গড়ে ওঠে নি। কলকাতার আলোচনাসভায় রেভারেন্ড নিকলস্‌ রয় অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্থান-সীমান্তবর্তী পার্বত্য জেলাগুলির ফলের উৎপাদকদের রক্ষা করার জন্য শিলংয়ে একটি ফলসংরক্ষণ শিল্প গড়ে তোলার জন্য গত কয়েক বৎসর ধরে ক্রমাগত দাবী করে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু গবর্নমেণ্ট সে-বিষয়ে কিছুই করছেন না।

উন্নয়নের যে সকল কার্যসূচী এযাবৎ গ্রহণ করা হয়েছে আসামের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে তার ফল কি হয়েছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশন হিসাব দিয়েছেন যে, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬২-৬৩ সালের মধ্যে আসামের সমতলে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩·৬ শতাংশ আর পার্বত্য এলাকায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১১·৬ শতাংশ।

এইসব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে যে, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সর্দার তারলোক সিং যে-নীতির প্রবক্তা সে-নীতির ভুল এই যে, পাহাড়ী এলাকাগুলির সব সমস্যাই নিছক অর্থনৈতিক নয়। সুতরাং, "পাহাড়ী এলাকায় আরও টাকা লগ্নী কর" এটা এইসব অঞ্চল সম্পর্কে একটা জাতীয় নীতির সবখানি কথা হতে পারে না।

এমনকি, এই ধরনের নীতিতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। যেহেতু পাহাড়ী অঞ্চলগুলি নিয়ে রাজনৈতিক সমস্যা আছে সেহেতু এই অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, এই যদি নীতি হয় তাহলে কিছু লোক সেই রাজনৈতিক সমস্যাগুলি জীইয়ে রাখার জন্যই সচেষ্ট হবেন। দ্বিতীয়তঃ, উন্নয়নের জন্য অর্থ লগ্নী করার সুফল কারা ভোগ করছেন সেদিকে যদি বিশেষ দৃষ্টি রাখা না হয় তাহলে পাহাড়ী অধিবাসীদের মধ্যে একটা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হতে পারে এবং তাতে অসন্তোষ কমার পরিবর্তে আরও বেড়ে যেতে পারে।

সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলগুলি সম্পর্কে কোন জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হলে সে-নীতির মধ্যে ঐ অঞ্চলগুলির উন্নয়নের অতিরিক্ত আরও কিছু থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পার্বত্য অধিবাসীদের মনোভাব, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে হবে, বিভিন্ন স্তরের কার্যকলাপ এইসব অধিবাসীর কাছে কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তার সন্ধান রাখতে হবে এবং তদনুসারে সরকারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

কলকাতায় সদ্যসমাপ্ত আলোচনসভা এই প্রয়োজনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

এশীয় ব্যাংক : আশা ও আশংকা

"এই অঞ্চলের জনগণের স্বয়ং-সাহায্যের ও সংহতির আকাঙ্ক্ষা এতদিনে মূর্ত হল" —এই কথা বলে জাপানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ আইসাকু সাটো গত ২৪ নভেম্বর টোকিওয় আনুষ্ঠানিকভাবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্বোধন করেন।

এশিয়ার ঐক্য এই অঞ্চলের রাজনীতি-বিদদের একটা দীর্ঘদিনের কামনা। আঞ্চলিক আনুগত্যের গোঁড়ামিতে নয়, তা না হলে উন্নয়নশীল এশিয়ার স্বাধীন অগ্রগতি অনেকাংশে ব্যাহত হবে বলে। তবু আজ পর্যন্ত এশীয় ঐক্যের প্রশ্নের কোন মীমাংসা সম্ভব হয়নি। অপেক্ষাকৃত সীমিত ক্ষেত্রে ঐক্যের কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে বটে—যেমন মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স ও ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে মাফিলিন্দো, এবং আরো বৃহত্তর ভিত্তিতে অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়া—কিন্তু তাতেও খুব বেশি ফল লাভ হয়নি। কারণ, প্রথমত, রাজনৈতিক অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হয়নি; দ্বিতীয়ত, এবং প্রধানত, এই ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতার পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে হলে যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকা দরকার, সে সামর্থ্য এই অঞ্চলের দেশগুলির নেই। উন্নয়নের মূলধন জোগাড় করতে তাদের তাই অন্যত্র নির্ভর করতে হয়। এটা অনেক সময়েই সুখপ্রদ নয়।

এই দ্বিতীয় অসুবিধা দূর করবার আগ্রহ থেকেই এশীয় ব্যাংকের উৎপত্তি। আর এই অসুবিধা যদি বহুলাংশে দূর করা সম্ভব হয়, তবে প্রথমটি আপনা থেকেই সেই পরিমাণে দূর হবে।

যারা মূলধন দিয়ে এই ব্যাংক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, তাদের বিশ্বাস এককভাবে এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে যা করা অসম্ভব, মিলিতভাবে তা করা কিছুই কঠিন নয়। এই বিশ্বাস নিয়েই আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে ব্যাংক ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় কাজ আরম্ভ করছে। ম্যানিলাই হবে ব্যাংকের সদর কার্যালয়।

জাপানের অর্থদপ্তরের উপদেষ্টা মিঃ তাকেশি ওয়াতানাবে এই ব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দশজন ডিরেক্টারের একটি বোর্ড কাজকর্মের তদারক করবে। ভারত এই বোর্ডের একজন সদস্য এবং এর চেয়ারম্যান হলেন ফিলিপিন্সের অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী এডুয়ার্ডোজ রোমুয়ালডেজ।

ব্যাংকের মূলধন ধরা হয়েছে ১১০ কোটি মার্কিন ডলার। সনদের সর্ত অনুসারে এর অর্ধেক আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সমান বার্ষিক কিস্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে দিয়ে দিতে হবে, এবং প্রদত্ত মূলধনের গড়পড়তা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রূপান্তর-যোগ্য মুদ্রায় রাখা হবে।

আশা করা যাচ্ছে, এর ফলে প্রত্যেক বছর ব্যাংক মোট ১০ কোটি ডলার খরচা করতে পারবে। কিন্তু যেহেতু এই অংকের মধ্যে ব্যাংকের প্রশাসনের খরচাও ধরা হয়েছে, তাই প্রত্যেক বছর প্রকৃতপক্ষে ৮ কোটি ডলারের (রূপান্তরযোগ্য মুদ্রায়) বেশি উন্নয়নের কাজের জন্যে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। প্রথম বছর এই অংক হবে আরো কম, ৬ কোটি ডলারের বেশি নয়।

ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্যে যে ৩০টি দেশ ২৪ নভেম্বর টোকিওয় উপস্থিত ছিল, তারা ইতিমধ্যেই সাড়ে ৯৬ কোটি ডলার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাংক সম্পর্কে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

টোকিও সম্মেলনে আরো দুটি রাষ্ট্রকে সদস্যপদে গ্রহণ করা হয় : ইন্দোনেশিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড। সুইজারল্যাণ্ড এই প্রথম এই ধরনের কোন সংস্থায় যোগ দিল। এই নিয়ে ব্যাংকের মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়ালো বত্রিশ।

এই ৩২টি দেশের মধ্যে আবার ১৩টি এই অঞ্চলের বাইরের। এদের মধ্যে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী। এদের রাখতে হয়েছে, কারণ প্রকৃত কার্যকর হতে গেলে যে পরিমাণ মূলধন ব্যাংকের দরকার, সেটা এশীয় দেশগুলির পক্ষে এখনই নিজেদের ভেতর থেকে জোগাড় করা সম্ভব নয়।

বাইরের দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান সবচেয়ে বেশি : ২০ কোটি ডলার। এশীয় দেশগুলির মধ্যে একমাত্র জাপানই ঐ পরিমাণ অর্থ দিতে সক্ষম হয়েছে। জাপানের পরেই বৃহত্তম অবদান ভারতের : ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার।

কোন কোন মহল মনে করছেন, পশ্চিমী দেশগুলির উপস্থিতির ফলে ব্যাংকের কার্যকলাপ ওদের উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হবে। কিন্তু এই আশংকা অমূলক। কেননা ব্যাংকের মোট ভোট-সংখ্যার ৬৩·২৪ শতাংশই এই অঞ্চলের দেশগুলির হাতে থাকছে।

এশিয়ায় একটি উন্নয়ন ব্যাংক গঠনের প্রস্তাবটি প্রথম ওঠে ১৯৬৩ সালে। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় এই ধরনের ব্যাংক ইতিমধ্যেই চালু আছে।

ব্যাংকের আবশ্যকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নেপালের প্রতিনিধি ডাঃ যাদব প্রসাদ পন্থ বলেছিলেন, বর্তমান 'উন্নয়নের দশকে' এশিয়ার অনেক দেশই ৫ শতাংশ বিকাশের হারের নির্দিষ্ট লক্ষ্যও অর্জন করতে পারেনি, তার প্রধান কারণ ছিল মূলধনের স্বল্পতা।

অতিরিক্ত মূলধনের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে এশীয় ব্যাংকের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। কিন্তু তাহলেও ব্যাংকের মূলধনের সংস্থান এমন কিছু নয় যে, এই অঞ্চলের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটানো সম্ভব। দুশো কোটি লোকের উন্নয়নের চাহিদা বার্ষিক ৮ কোটি ডলার দিয়ে মেটানো যায় না।

তাছাড়া এই ৮ কোটি ডলারের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ সুবিধাজনক ঋণ দেবার জন্যে ব্যবহার করা যাবে। বাকীটা অপেক্ষাকৃত কঠিন সর্তে দিতে হবে। এটাও কিছু কম অসুবিধা নয়।

মনে হচ্ছে, অন্তত আগামী কয়েক বছর অর্থের অভাবে ব্যাংকের কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত সংকুচিত থাকবে। এশীয় দেশগুলির, এমনকি জাপানেরও, অবস্থা এমন নয় যে, তাদের পক্ষে এখনই আর্থিক অবদান আরো বাড়ানো সম্ভব।

বাজারে বণ্ড বিক্রি করে অর্থসংগ্রহ করা যায় বটে, কিন্তু মিঃ ওয়াতানাবে এবং মার্কিন প্রতিনিধি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট জনসনের পরামর্শদাতা মিঃ ইউজিন ব্ল্যাক দুজনেই মনে করেন যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক আবহাওয়া এমন যে, কোন মূলধনী বাজারেই বণ্ড ছেড়ে খুব বেশি সুবিধে হবে না।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারটি নিয়ে উদ্বিগ্ন। ম্যানিলায় কাজ আরম্ভ করবার প্রায় সংগে সংগেই মূলধন যোগাড়ের দিকে তাঁদের দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা মিঃ ওয়াতানাবের ভাষায়, "আমাদের মূলধন যদি অকালে ফুরিয়ে গিয়ে আমাদের উৎসাহের আগুনকে নিভিয়ে দেয়, তবে সেটা খুবই শোচনীয় ট্র্যাজিডি হবে।"

রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে

রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে সম্প্রতি কিছু নতুন লোকের আবির্ভাব ঘটেছে। এ'রা শিল্পী ন'ন, এ'রা রাজনীতিজ্ঞ, তবে শিক্ষানবিশ, মঞ্চজড়তা এখনও কাটেনি। এ'রা টিকিট-প্রার্থী।

শুধু অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেই এসেছেন, হাজার দুই। বিহার থেকে আসা শুরু হয়েছে, হাজার চার পাঁচে উঠবে। উত্তরপ্রদেশ দিল্লীর গায়ে, কাজেই সংখ্যাটি অনুমানের বাইরে।

এখন সাত নম্বর যন্তর মন্তর রোডে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে রোজ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠক বসছে। কে এসেম্বলীর জন্য কে লোকসভার জন্য কংগ্রেসের টিকিট পাবেন তা চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন এই কমিটি।

প্রার্থীরা একা আসেন নি। কেউ সঙ্গে করে এনেছেন তাঁর মুরুব্বিকে, কেউ এনেছেন তাঁর বাহনকে। দলবেঁধে ঘুরছেন অনেকেই। দেখেই বুঝা যায় রাজধানীতে এ'রা নতুন।

এক বন্ধু সাংবাদিক খাদি গ্রামোদ্যোগ-ভবনে রেডিমেড গরম কোট কিনতে গিয়ে শোনেন গত তিন দিনে তাঁদের পুরানো স্টকের তিন'শটি কোট 'গরম কেকের' মত বিক্রি হয়ে গিয়েছে!

রাজধানীতে হঠাৎ শীত পড়ে গিয়েছে। অন্ধ্র থেকে টিকিট প্রার্থীদের অনেকেই নয়াদিল্লী স্টেশনে নেমে সোজা চলে গিয়েছেন খাদি ভবনে। ভবিষ্যতে তাঁদের অনেক লড়াই লড়তে হবে, শীতের সঙ্গে লড়াই থেকে যার শুরু।

ডিসেম্বরটা এখানে খুব খারাপ সময়। দিল্লীওয়ালাদের পক্ষে নয়, বহিরাগতদের পক্ষে। এই বহিরাগতদের মধ্যে বিদেশীরা পড়ে না। বিদেশীরা অধিকাংশই শীতের দেশের মানুষ। কিন্তু বাঙালী, মাদ্রাজি, মারাঠি, গুজরাটি নিতান্ত প্রাণের দায় না হলে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে কেউ দিল্লী আসে না।

বিদেশী পর্যটকরা কিন্তু ঠিক এই সময়ই দলে দলে দিল্লী আসে। আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলি এই সময়ই দিল্লীতে বসে। ট্যাক্সীওয়ালা, হোটেলওয়ালা, দোকানী, ঠিকাদার এই সময়ই সারা বছরের লাভ তুলে নেয়।

এবারের ডিসেম্বর-জানুয়ারী কিন্তু এদের পক্ষে খুব খারাপ সময়। বিদেশী পর্যটকরা এ বছর ভারতে আসতে অনিচ্ছুক। আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলির সংখ্যাও বিশেষভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

"আমি এ বছর ভারতে যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম, যাত্রার আয়োজনও একরকম পাকা হয়েছিল। এমন সময় খবরের কাগজে পড়লাম তোমাদের দেশে খাদ্যাভাব চরমে উঠেছে। লোকে না খেতে পেয়ে মরছে, মা শিশু বিক্রি করছে। এসব খবর পড়ে খুবই মনোবেদনা অনুভব করছি। ঠিক করেছি এ বছর আর ভারতে যাবো না, তোমরা একেই অন্নকষ্টে আছো, তোমাদের আহারে ভাগ বসাতে যাওয়া অন্যায় হবে......"

একজন মার্কিন নাগরিক তাঁর ভারতীয় বন্ধুকে উপরোক্ত মর্মে চিঠি লিখেছেন।

এমন দিন যায় না যেদিন আইফ্যাকস হলে একটা না একটা থিয়েটার হয়। ইংরাজি নাটকের পর হয়ত বাংলা নাটক। তারপর হিন্দী। একদিকে থিয়েটার হচ্ছে, আর তার পাশের হলেই হচ্ছে চিত্রশিল্পের প্রদর্শনী। একদিনও ফাঁক যায় না। অনেকদিন দুজন চিত্রশিল্পীর প্রদর্শনীও চলে একসঙ্গে।

চিত্রপ্রদর্শনী খোলে চারটের সময়। থিয়েটার শুরুর সময় ছটা। চিত্রপ্রদর্শনীতে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত হয়ত একজনও দর্শকের দেখা নেই। তারপর হঠাৎ প্রদর্শনী হল ভরে উঠলো। এত ভিড় যে লোকে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছে। তারপর ছটা বাজতে না বাজতে চিত্রপ্রদর্শনী হল ফাঁকা হয়ে গেল। বিরাট হলঘরে শিল্পী একা বসে, সামনে একতাড়া ক্যাটালগ্।

এই ভিড় আসলে থিয়েটার দর্শকদের ভিড়, সময় কাটাতে তারা ছবি দেখতে ঢুকে পড়েছিল।

আইফ্যাকস হল থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে বিঠলভাই ভবন। এখানে রোজ একটা না একটা সভা, সম্মেলন লেগেই থাকে। আর, থাকে সাংবাদিক সম্মেলন।

আইফ্যাকস হলের আবহাওয়াটা সাংস্কৃতিক, আর বিঠলভাই ভবনের আবহাওয়াটা রাজনৈতিক।

যখন একই দিনে দুটি সাংবাদিক সম্মেলন কি ২টি সভা বসে তখন সাংবাদিক এবং দর্শকরা মুশকিলে পড়ে যান—কাকে ফেলে কাকে রাখবেন? সেদিন সাংবাদিকদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। বিঠলভাই ভবনে প্রবেশপথেই সাংবাদিকদের খাতির করে নিয়ে যাওয়া হোল প্রথম যে হলঘরটিতে সেখানে নানাধরনের খাবারের প্লেট সাজানো। সাংবাদিকরা ঢুকতেই, 'আসুন' 'আসুন' বলে খাবারের প্লেট তাঁদের ধরিয়ে দেওয়া হোল। পাকোড়ায় কামড় দিয়েই সাংবাদিকরা বুঝলেন ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। 'ভিয়েতনাম ও বিশ্বশান্তি'র উপর সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসে ঢুকে পড়েছেন 'সিমেন্ট বিনিয়ন্ত্রণের সুফল' সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে। যাঁরা পাকোড়ায় কামড় দিয়েছিলেন তাঁদের সেদিন দু'দিকই সামলাতে হয়েছিল।

সেদিন বিঠলভাই ভবনে সামিয়ানা খাটিয়ে পাশাপাশি ২টি সম্বর্ধনা সভা হচ্ছে। 'ক' সভা কর্তৃক সম্বর্ধিত হবার পর মন্ত্রী বাড়ী ফিরে দেখেন তিনি আসলে যাদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেই 'খ' সভার লোকেরা তাঁকে নিয়ে যাবে বলে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে!

ভেজালে রাজস্থান সকলের সেরা—সরকারীভাবে পরিবেশিত এখবরে দিল্লী দুঃখ পাবে। কেননা, খাদ্যভেজালে রাজস্থান হয়তো একটু এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ভেজাল তো শুধু খাদ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

রাজধানী দিল্লী গর্ব করতে পারে যে সব ভেজালের সেরা বলে তার মধ্যে একটি হোল ওষুধ। রাজস্থান গর্ব করতে পারে 'ঘীয়ের সঙ্গে সাপের চর্বি' ভেজাল দিয়ে তা 'খাঁটি দেশী ঘী' হিসাবে কলকাতার বাজারে প্রথম চালু করার জন্য। কিন্তু দিল্লী দেখিয়ে দিয়েছে, খাদ্যের চেয়ে বহুগুণে লাভজনক কারবার হোল ভেজাল ইনজেকসন তৈরী করায়।

খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে সস্তা যা তা হোল নুন। দিল্লীতে নুন বিক্রী হয় সেলোফেনের প্যাকেটে—সে নুনে মেশানো শাদা পাথরের গুঁড়ো। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে আত্মহত্যা করতেন সে নুন মুখে দিয়ে!

ওষুধের মধ্যে পেটেন্ট ওষুধে ভেজাল সবচেয়ে বেশী। ভেজাল ইনজেকসনের পরেই, যার স্থান সে হোল ভিটামিন বড়ি।

দিল্লীতে যা তৈরী হয় তার সবই দিল্লীতে বিক্রী হয় না। অধিকাংশই যায় কলকাতায়।

খাঁটি চিকিৎসক স্বভাবতই ভেজাল ওষুধের কারবারে সাহায্য করবেন না। দিল্লী তাই ভেজাল চিকিৎসক তৈরীতে মন দিয়েছে কিছুকাল যাবৎ। এখন দিল্লীতে প্রতি একজন খাঁটি চিকিৎসক পিছু দুজন ভেজাল চিকিৎসক।

দিল্লীতে শিক্ষায় ভেজাল দেওয়া শুরু হয়েছে ডিগ্রি সহজলভ্য হবার পর থেকেই। খবর নিলে জানা যাবে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলিতে বর্তমান ম্যাট্রিক ও গ্রাজুয়েট চাকুরিয়াদের একদা বড় অংশ ভেজাল শিক্ষায় শিক্ষিত। কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ক্রমাবনতির এটা যে একটা কারণ প্রশাসকরা ছাড়া সবাই কিন্তু তা বুঝতে শুরু করেছে।

মধুতে ভেজাল চলে সবাই জানে, কিন্তু খাদি গ্রামোদ্যোগ ভান্ডারকে ভেজাল মধু বিক্রীর দায়ে পড়তে হবে কেউ কল্পনা করে নি। আরও অবাক হবার মত জিনিস আছে, —দিল্লীতে ভেজাল বেনারসী শাড়ী বিক্রী হচ্ছে, তৈরীও হচ্ছে বোধহয়। খাঁটি কংগ্রেস নেতা শ্রী ইউ এন ডেবর খাদি গ্রামোদ্যোগ ভান্ডারের পৃষ্ঠপোষকদের একজন। সেখানে ভেজাল মধু বিক্রী হয়েছে শুনে নিশ্চয়ই তিনি দুঃখ পাবেন। কিন্তু দিল্লীতে যেমন ভেজাল মধু বিক্রী হয় তেমনি ভেজাল মদও বিক্রী হয়।

আর, খুব সম্ভব একই প্রেসে ছাপা হয় 'শুদ্ধ মধু' আর 'হোয়াইট হর্সের' লেবেল। এ প্রেস অবশ্য ভেজাল প্রেস নয়। রাজধানীর ভেজাল "PRESS" হোল ভেজাল সাংবাদিক। এ ভেজাল সব ভেজালের সেরা। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ভেজাল সাংবাদিকরা সব কাজই করে, শুধু সংবাদ লেখে না।

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

আমায় মুগ্ধ করেছেন

(৪৩)

আগেই বলেছি যে ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে আমি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসেছিলাম ইনফরমেশন ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়ার 'দি ইণ্ডিয়ান স্ক্রীন' ডকুমেণ্টারীর কিছু অংশ তুলবার জন্যে। নিউ থিয়েটার্সের শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছিলেন তাঁর প্রধান প্রধান শিল্পীদের অভিনয় ও সঙ্গীত গ্রহণ চিত্রায়িত করবার। আমার এখনও মনে আছে সায়গলের গান রেকর্ডিং-এর 'শট'— সায়গল গান করছে এবং পংকজ মল্লিক অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, অর্থাৎ চিত্রনির্মাণের গোড়ার দিকে কিভাবে ছবি দেখানো হ'ত তার প্রচুর বিবরণ সংগ্রহ করেছিলাম বাজোরিজী ও জাহাঙ্গীরজী ম্যাডানের কাছ থেকে। অবশ্য জে. এফ. ম্যাডানের জামাই এবং ম্যাডান কোম্পানীর নিমাতা বৃন্দমজী ধোণ্ডিবালার জীবিতা-বস্থায় তাঁর কাছ থেকেও অনেক ইতিহাস শুনেছিলাম, যে কি করে তখন কলকাতার ময়দানে তাঁবু ফেলে নির্বাক ছবি দেখানো হ'ত। তখন কোন চিরস্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মিত হয়নি। আমি ঠিক করলাম যে যে সব দৃশ্য বোম্বাই-এ আই-এফ-আই-এর স্টুডিওর বাইরে তাঁবু ফেলে সেসব 'শট' নেব।

কলকাতায় যতদিন ছিলাম, বেশীর-ভাগ সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় হেম সোমের সঙ্গে বিশেষ দেখা হ'ত না। যেদিন আমি বোম্বাই রওনা হ'ব, তার আগের দিন সোম আমার কাছে এসে আমাকে তার বাড়ীতে লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করল।

আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হেম সোমের কথা আগেই বলেছি, তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সোম একবার বম্বে এসে আমার মালাবার হিলের ফ্ল্যাটে কিছুদিন ছিল। সেটা সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে হবে। গ্রামোফোন কোম্পানীর কি একটা কার্য উপলক্ষ্যে সে বম্বে এসেছিল। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ডিং বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিল্লো সোম—সেই সূত্রে আমার মঞ্চ ও চিত্রের কতকগুলি গানের রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। তবে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ আগে হয়নি। আমাদের চৌরঙ্গী প্লেসের ফ্ল্যাটে যখন আসত তখন রেকর্ডিং সংক্রান্ত কথাবার্তাই হ'ত। কিন্তু বম্বে থাকাকালীন তাকে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার সুযোগ পেলাম এবং সেই সঙ্গে তার ভেতরের আসল মানুষটিকে বুঝতে পারলাম।

আমি জানতাম যে সোম একজন সত্যিকারের সং লোক কিন্তু তার যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান আছে তার পরিচয় এর আগে কখনও পাইনি। খুব সহজ সরলভাবে সে আমাকে 'গীতা' থেকে মূল্যবান শ্লোকগুলি বুঝিয়ে বলত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্ম এবং দর্শন সম্বন্ধে তার যে এত গভীর জ্ঞান—তা সে কারও কাছে কখনও প্রকাশ করত না। তার মত অমায়িক লোক আমি খুব কমই দেখেছি।

মালাবার হিলের ফ্ল্যাটে রোজ গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বহু রকমের আলোচনা হ'ত—ধর্ম, দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। সে সময়টা আমিও একটা ভয়ানক মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে চলেছিলাম সুতরাং এই সব আলোচনায় বেশ খানিকটা আমাকে সান্ত্বনা যোগাত।

একদিন কথায় কথায় সোম বলেছিল, কলকাতায় একজন গৃহী সন্ন্যাসী আছেন। তিনি নাকি মহাযোগীও। সোম তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলছিল বটে, তবে সবটাই অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা। এমন কি তাঁর নামটাও আমার কাছে তখন প্রকাশ করেনি। আর আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। তারপর সোম কলকাতায় চলে এসেছিল, এদিকে আমিও সেই মহাযোগীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তা, কলকাতায় এসে যেদিন সোমের সঙ্গে দেখা হলো, এবং তার বাড়ীতে লাঞ্চ খাওয়ার কথা হলো সেটা ছিল রবিবার। সোম বলল যে সে এসে আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাবে, কারণ আমি এর আগে তার বাড়ীতে কোনদিন যাইনি, এমন কি তার বাড়ীর ঠিকানাটাও জানতাম না, শুধু জানতাম যে সে শ্যামপুকুরে থাকে, এই পর্যন্ত।

এদিকে আর এক ব্যাপার। যেদিন সোমের বাড়ীতে লাঞ্চ খেতে যাব তার আগের দিন মিঃ এজরা মীর হঠাৎ কলকাতা এসেই একটা জরুরী কাজে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সঙ্গে পরদিন অর্থাৎ রবিবার আমায় লাঞ্চও খেতে বললেন। মহা মুস্কিল—সোমকে খবর দিই কি করে। বাড়ীর ঠিকানা জানি না —টেলিফোনও নেই!!

রবিবার সকালে টুকলু আসতেই ওকে বললাম ঃ সোমকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সেটা এখুনি দিয়ে আসতে হবে। নলিন সরকার স্ট্রীটে এইচ. এম. ভি'র রিহার্সাল রুম আছে সেখান থেকে সোমের বাড়ীর ঠিকানা পাবি। আর ওকে একটু আমার হয়ে বুঝিয়ে বলিস কেন যেতে পারলাম না—ও যেন কিছু মনে না করে।

সেদিন সকালে আমার একটা খুব জরুরী কাজ ছিল। দুজনে একসঙ্গেই হোটেল থেকে বেরুলাম। তারপর কি মনে হল—ভাবলাম টুকলুকে না পাঠিয়ে নিজেই গিয়ে বুঝিয়ে বলে আসি সোমকে।

গেলাম নলিন সরকার স্ট্রীটে এইচ. এম. ভি'র রিহার্সাল রুমে, গেটে ঢুকতেই দেখা হল দশরথের সঙ্গে। দশরথ ওখানকার পুরনো বেয়ারা হলে কি হবে—ওখানে গাইয়ে-বাজিয়েদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল, সকলেই ওকে ভালবাসত তার সুন্দর স্বভাবের জন্য। আমাকে দেখেই দশরথ বলে উঠল ঃ কবে এলেন বোস সাহেব? আপনি কি আর কলকাতায় আসবেন না, একেবারে পুরোপুরি বোম্বাইয়ের বাসিন্দা হয়ে গেলেন?

আমি হেসে বললাম ঃ আসব, আসব শিগগিরই আসব। এখন বল দেখি হেম সোমের বাড়ির ঠিকানাটি কি? আমার বিশেষ দরকার।

তাতে দশরথ বলে উঠল ঃ হেমবাবু তো এখানেই আছেন।

আমি খুশী হয়ে বললাম ঃ বল কি দশরথ? আজ রবিবার—রবিবারেও এসেছেন? যাক ভালই হয়েছে, চল দেখি— বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি আর টুকলু ভেতরে চলে গেলাম।

দেখলাম গাইয়ে ধীরেন দাসের সঙ্গে সোম কি একটা গানের রেকর্ডিং সম্পর্কে কথা বলছে।

আমি যখন তাকে বললাম ঃ হঠাৎ কাল রাত্রে মিঃ মীর এসেছেন, এবং আজ একটা জরুরী ব্যাপারে দুপুরে তাঁর হোটেলে আমাকে ডেকেছেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমাকে লাঞ্চ খেতে বলেছেন। তিনি আবার আজ রাত্রেই বম্বে চলে যাচ্ছেন।

এই কথা শুনে সোম খুব হতাশ হয়ে পড়ল। সে ম্লান মুখে বলল ঃ তুমি মাছ ভালবাস বলে আমি নিজে বাজার গিয়ে ভাল মাছ নিয়ে এলাম, তার ওপর আমার স্ত্রী নিজে হাতে রান্না করছেন। এ অবস্থায় তুমি যদি না খাও তাহলে আমি তো দুঃখিত হবই, আমার চেয়ে আরও বেশী দুঃখিত হবেন আমার স্ত্রী। তোমার বিষয় অনেক কিছু আমি তাঁকে বলেছি। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছেন।

সোমের মুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হল। কি করব বুঝতে পারছি না—এদিকে

মিঃ মীরের সঙ্গেও দেখা না করলে নয়। এদিকে সোমকেও নিরাশ করতে মন চাচ্ছিল না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সোম বলল : মিঃ মীরকে একটা ভাল করে বুঝিয়ে চিঠি লিখে দাও। তিনি তো লোক ভাল, সুতরাং বুঝবেন। আর তুমিও তো কালই বম্বে যাচ্ছ, সেখানে তো দেখা হবেই। তবে তোমাদের দেখা করা যদি এতই প্রয়োজনীয় হয় তবে সন্ধ্যার সময় তার যাবার আগে গিয়েও তো দেখা করতে পার।

সোমের কথা অনুযায়ী আমি একটা চিঠি লিখে টুকলুর হাতে দিয়ে বললাম, সে নিজে গিয়ে যেন মিঃ মীরের হাতে চিঠিখানা দেয় এবং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে।

কিছুক্ষণ পরে সোমের সঙ্গে তার বাড়ীতে গেলাম। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে সোম বলল : হ্যাঁ মধু, তোমাকে যাঁর কথা বলেছিলাম তিনি এখন আমাদের বাড়ীতেই থাকেন, তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেব তোমার।

আমি বললাম : ভাগ্যিস তাহলে আমি নিজে এসেছিলাম, আমি তো টুকলুকে দিয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখে পাঠাচ্ছিলাম যে আমি লাঞ্চ খেতে আসতে পারবো না। যাক, এ ভালই হল, না এলে তো তাঁর সঙ্গে দেখাই হতো না।

সোমের বাড়ী আসতেই সোম দোতলার ওপরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। তাঁকে দেখলাম। শুনলাম যে সোমকে 'হেমদা' বলে সম্বোধন করছেন। প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে এত আপনার করে নিলেন যে মনে হল যেন কতকালের পরিচয়। বম্বেতে সোম আমাকে বলেছিল যে তিনি গৃহী সন্ন্যাসী, তবুও আমি ভেবেছিলাম যে হয়ত দেখব গেরুয়া পরে বসে আছেন। কিন্তু সে ভুল আমার ভাঙল যখন দেখলাম যে তিনি শাদা ধুতি ও গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে আছেন আর একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন। আমি আরও ভেবেছিলাম, তিনি শুধু ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়ই আলোচনা করবেন কিন্তু আমাদের আলোচনা হ'ল বহু বিষয়ে—সিনেমা, সাহিত্য, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কথাবার্তায় এমন একটা অন্তরঙ্গতার সুর ছিল যা আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করল। কথা বলতে বলতে সময়টা কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলুম না এমন কি খাবারের কথাও ভুলে গেলাম; লাঞ্চের পর এজরা মীরের সঙ্গে যে দেখা করার কথা সে কথাও ভুলে যেতে বসে-ছিলাম। কিন্তু সোম সব জানত, সে ঠিক সময়ে আমাকে মনে করিয়ে দিল।

তারপর খাওয়া-দাওয়া হল। এতদিন হোটেলে খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিল। মাদ্রাজেও হোটেল, কলকাতা এসেও সেই হোটেল। আজ অনেক দিন পরে বাংলাদেশে বাড়ীর রান্না খেলাম। সোমের স্ত্রী নিজে রান্না করেছিলেন—বহুরকমের পদ ছিল। খেয়ে খুবই তৃপ্তি পেলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলাম। এখন পর্যন্ত কিন্তু সোম আমাকে তাঁর নামটি বলেনি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি।

অতি-পরিচিতের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যেমন বলি, তাঁকেও তাই বললাম : আজ তাহ'লে আমি আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

তাতে তিনি হেসে বললেন : নিশ্চয়ই হবে—অনেকবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

"অনেকবার দেখা হবে" কথাটার মধ্যে তখন তেমন কোন গুরুত্ব দিই নি।

কিন্তু এর বেশ কিছুদিন পরে আমার জীবনের এক অত্যন্ত সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি আমার শ্রেষ্ঠতম হিতৈষী বন্ধু হিসেবে আবার আবির্ভূত হলেন, তখন বুঝলাম সেই সেদিনের কথার অর্থ—"আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখা হবে"।

কথাগুলি যে কতখানি অর্থবহ, তা আমি সেদিন বুঝিনি। বুঝিনি যে সেগুলি শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। তাঁর মুখের কথাই যে তাঁর বাণী তাও বুঝিনি; এও বুঝিনি যে তিনি শুধু বর্তমান নয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎই শুধু নয়—তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। বুঝিনি যে অনেক সৌভাগ্য থাকলে কেউ অমন ত্রিকালদর্শীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে।

বম্বে ফিরে দি গিয়ে দি ইন্ডিয়ান স্কাইনের বাকী কাজ শেষ করার আয়োজন করতে লাগলাম।

এর মধ্যে ইনফরমেশন ফিল্মসের অফিসে অনেক কিছু অদল-বদল হয়েছে। আগে মিঃ মীর চিত্র নির্মাণ এবং কার্য পরিচালনা উভয় দিকই দেখতেন। এখন ইনফরমেশান এন্ড ব্রডকাস্টিং বিভাগ থেকে একজন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে যিনি বিভাগটি পরিচালনার দিকটা দেখবেন আর মিঃ মীরের দায়িত্ব থাকবে শুধু প্রোডাকশান বিভাগ।

একদিন সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারটি আমায় বললেন : মিঃ বোস, আপনার ইন্ডিয়ান স্কাই-এর সঙ্গে সঙ্গে যদি অন্য দু-একটা ডকুমেন্টারীর কাজ হাতে নেন তাহলে ভাল হয়। আমি চাই যে আপনি এগুলো করেন। বলে অন্য দুখানা ডকুমেন্টারীর চিত্রনাট্য আমার হাতে দিলেন। চিত্রনাট্য দুখানি আমি পড়ে দেখলাম যে একটি হল যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা এবং অপরটি হল কালোবাজারীদের বিষয়ে।

আমি অফিসার ভদ্রলোককে বললাম যে, আমি যখন আই-এফ-আইতে কাজ নিই তখন মিঃ থাপারের সঙ্গে স্পষ্টভাবে এই কথাই হয়েছিল যে সাংস্কৃতিক ছবি ছাড়া আমি আর অন্য কিছু করব না। কিন্তু এখন...

তিনি বাধা দিয়ে বললেন : আমি তা জানি মিঃ বোস। কিন্তু এখন ডকুমেন্টারী-গুলির মান এত নেমে গেছে যে কর্তৃপক্ষের একান্ত ইচ্ছা যে একজন অভিজ্ঞ এবং গুণী পরিচালকের দ্বারা এগুলি তোলা হোক। আপনি তো সংস্কৃতিমূলক ছবিগুলি তুলবেনই, সেই সঙ্গে এগুলিও যদি কিছু কিছু করেন তবে ছবিগুলির মান অনেকটা উন্নত হয়।

আমি দেখলাম যে এই অফিসারটির সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ হবে না—মিঃ মীরের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে আসল সত্যি কথাটা বললেন। 'ভারতের নৃত্য' এবং 'ভারতের বাদ্যযন্ত্র' ডকুমেন্টারী দুটির অভাবিত সাফল্যে ভারতবর্ষের সব কাগজেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও পাবলিসিটি বেরিয়েছে। সেই জন্যেই আই-এফ-আই-এর কয়েক-জন পরিচালকের মধ্যে অত্যন্ত গাত্র-দাহ হয়েছে। তারা অভিযোগ করেছে যে মধু বোস শুধু সংস্কৃতিমূলক ছবি করবে কেন? এসব ছবি তো এমনি জনগণের ভালো লাগবে। তাঁকে দিয়ে অন্যান্য প্রোপাগান্ডা ছবিই বা করানো হবে না কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারা জানে যে তুমি আমার পুরনো বন্ধু—সেইজন্যে অবস্থাটা সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে—বুঝলে

মিঃ বোস। তুমি বরং সেক্রেটারী মিঃ থাপারকে এ বিষয়ে লিখে দেখ।

আমি মিঃ নিরঞ্জন পালের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললাম। মিঃ পাল বললেন ঃ তুমি যখন মিঃ থাপারকে লিখতে বলছো আমি অবশ্য লিখব—কিন্তু কোন ফল হবে না। আমি শুনেছি যে ইনফরমেশন ফিল্মসের আরও অনেক অদল-বদল হবে মিঃ থাপারের সঙ্গে এই বিভাগের কর্তৃপক্ষের তেমন বনিবনা হচ্ছে না। মিঃ থাপারকে নাকি অন্য কোন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে। তার চেয়ে মধু—একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য সংস্কৃতিমূলক ছবির লাইসেন্সের জন্য আবেদন করো না কেন? জানো তো, সাধনা, উদয়শঙ্কর এবং আর ২।১ জন শিল্পী এরকম লাইসেন্স পেয়েছে। আর তাছাড়া তোমার দাবী তো আরও বেশী, কারণ এক সময় তোমার কোম্পানী ছিল এবং সে কোম্পানীর হয়ে তুমি ছবি করেছ। তুমি নিজেও অনেক নাচ-গানের ছবি পরিচালনা করেছ। তোমার পক্ষে লাইসেন্স পাওয়া মোটেই শক্ত হবে না।

একটু থেমে তিনি আরও বললেন ঃ লাইসেন্স পেলে তুমি নিজেও ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনা করতে পার তাতে তোমার ফাইনান্সিয়ার পাওয়া মোটেই শক্ত হবে না। আর যদি একান্তই ফাইনান্সিয়ার না পাও তবে লাইসেন্সটা বিক্রি করে দাও। ভাল দাম পাবে।

আমি বললাম ঃ আমি জানি মিঃ পাল,

যে এখন একটা লাইসেন্সের দাম কালো-বাজারে দেড় থেকে দু লক্ষ টাকা, কিন্তু আপনি জানেন যে আমি ওসব কালো-বাজারী ব্যবসায়ের মধ্যে নেই। যদি লাইসেন্স পাই তবে নিজেই ছবি করব।

মিঃ পাল হেসে বললেন : আমি তা খুব ভাল রকমই জানি—ওটা বললাম এমনি কথার কথা। যাই হোক, তুমি লাইসেন্সের জন্যে আবেদন কর। আর তুমি যখন বলছ তখন আমি মিঃ থাপারকে লিখব—তবে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না।

এই ফিল্ম লাইসেন্স সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

তখন যুদ্ধের বাজার—একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা নানা অসদুপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করছিলেন। চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি বহু গজিয়ে উঠতে লাগল। এদিকে কাঁচা ফিল্মের দারুণ টানাটানি। সেই জন্য ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে তাঁদেরই লাইসেন্স দেওয়া হোত যাঁরা ইতিপূর্বে ছবি করেছেন।

তখন ১৯৪৫ সালের মার্চ-এপ্রিল মাস হবে। আগেই বলেছি কৃষ্ণা রেডক্রশ-এ চাকরী নিয়েছিল। সে সময় সে ছিল দেওলালির মিলিটারী ক্যাম্পে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বম্বেতে যখন আসত তখন আমরা কয়েকটা দিন বেশ হাসি-খুশীর মধ্যে দিয়ে কাটাতাম। কিন্তু এই সময়টা এতই কম, কোথা দিয়ে কেটে যেত জানতেই পারতাম না।

কিছুদিন পরে মিঃ পাল আমায় ফোন করে জানালেন যে মিঃ থাপারের কাছ থেকে চিঠির জবাব পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে তিনি এখন অন্য দপ্তরের ভার নিয়েছেন সুতরাং আমার বিষয়ে আর কিছু বলা বা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে আমিও একটি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলাম।

আই-এফ-আই থেকে আমাকে "সর্টেজ অ্যান্ড হোর্ডিং অফ কয়েন্স" সম্বন্ধে ছবি করতে দেওয়া হয়েছিল। আমি 'করব না' বলতে পারলাম না। সেইজন্য 'দ ইন্ডিয়ান স্ক্রীণ'-এর সঙ্গে এ ছবিটাও সুরু করলাম। মিঃ মীরের ওপর ভার ছিল চিত্রনাট্য অনুমোদন করা—প্রযোজনা করা এবং সম্পাদনা তত্ত্বাবধান করা। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর দায়িত্ব ছিল চিত্রনির্মাণের সমস্ত খরচের টাকা-পয়সা অনুমোদন করা। আমি যখন তাঁকে বললাম যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের জনক মিঃ ডি জি ফাল্কে যেখানে প্রথম ভারতীয় ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' নির্মাণ করেছিলেন সেইখানে যেতে হবে এবং স্টুডিওর মধ্যে একটা তাঁবু করতে হবে—অর্থাৎ ম্যাডান কোম্পানী যেভাবে বায়োস্কোপের ছবি দেখাতেন তার 'শট' নিতে হবে, তার জন্য খরচ বরাদ্দ করতে হবে—তিনি তো শুনেই ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে চাইলেন। বললেন, এ তো বেশ কিছু খরচের ব্যাপার। আমাকে এ বিষয়ে দিল্লীতে লিখতে হবে তাদের অনুমোদনের জন্যে।

জানি না তিনি সত্যিই দিল্লীতে লিখেছিলেন কিনা—তবে কয়েকদিন পরে আমায় জানালেন যে কর্তৃপক্ষ এত টাকা মঞ্জুর করতে রাজী হচ্ছেন না।

আমার মনে হল যে তিনি চান না যে আমি ছবিটা শেষ করি। তিনি চান যে, আমি যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ছবিগুলিই করতে থাকি। সেইজন্যে আমার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মন কষাকষি চলতে লাগল। শেষে ৩১শে মার্চ তারিখে আমি এক মাসের নোটিশ দিয়ে পদত্যাগ পত্র দাখিল করলাম।

এদিকে এপ্রিল মাস গেল, মে মাসও গেল—কিন্তু দিল্লী থেকে লাইসেন্সের ব্যাপারে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। দিল্লীতে আমি আমার ভাগনে বড়দির একমাত্র ছেলে বুড়োকে (ভাল নাম ডাঃ সুশান্ত সেন) লিখলাম এই সম্বন্ধে একটু তদারক করে আমায় জানাতে। বুড়ো তখন দিল্লীতে ডাক্তার হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছে এমন কি আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলালও দরকার হলে বুড়োকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। মিঃ আজিজুল হক ছিলেন তখন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী এবং বুড়োর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

জুন মাস নাগাৎ বুড়ো আমায় টেলিগ্রাম করল অবিলম্বে দিল্লী চলে আসতে। 'চলে এস' বললেই তো আর যাওয়া যায় না—বেশ কিছু টাকার দরকার। কারণ যাওয়া-আসার খরচ, এবং দিল্লীতেও খরচ বেশ মোটা হবে। তারপর দু'মাস ধরে কোন কাজ-কর্ম নেই—সুতরাং রোজগারও নেই—এমনিতেই খুব টানাটানি করে দৈনন্দিন চালাচ্ছি।

কি করব ভাবছি। হঠাৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো টাকা যোগাড় করি কি করে? অথচ বুড়োটা আমায় টেলিগ্রাম করেছে অবিলম্বে চলে আসতে—এই বিভাগের সর্বময় কর্তার সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করেছে—হয়ত আজিজুল হকের সঙ্গেই হবে।

বম্বেতে অনেককেই চিনি, তার মধ্যে পয়সাওলা লোক অনেকেই ছিলেন—কিন্তু টাকা ধার চাইবার মত অন্তরঙ্গ বন্ধু তেমন কেউ ছিল না। একজন লোকের কথা মনে পড়ল—তিনি মিঃ ওয়াদিয়া। কিন্তু তাঁরও তখন টাকা-পয়সায় টানাটানি যাচ্ছে বলে শুনেছি, সুতরাং তাঁর কাছেই বা চাই কি করে?

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাবলাম—কিন্তু কোনো কুল-কিনারা পেলাম না—অথচ পরদিনই আমাকে দিল্লী যেতে হবে।

পরদিন সকালে আর কোনো উপায় না দেখে মরিয়া হয়ে মিঃ ওয়াদিয়াকেই ফোন করে বললাম যে, একটা জরুরী ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তিনি বললেন, বৈকালে যেতে।

সেইদিনই দুপুরবেলায় আমি আর টুকলু বসে লাঞ্চ খাচ্ছি এমন সময় বাইরে 'কলিং বেল' বাজার আওয়াজ হল। একটু পরে চাকর এসে খবর দিল যে ডাক পিয়ন এসেছে একটা টেলিগ্রাম মণি অর্ডার নিয়ে। টুকলুকে বললাম, কার টি-এম-ও দেখতে।

টুকলু পোস্টম্যানের কাছ থেকে মণি-অর্ডার ফর্মটা নিয়ে এসে বললে: টেলিগ্রাম মণি-অর্ডার এসেছে—তোমার নামে কলকাতা থেকে—৫০০্ টাকা।

কথাটা শুনে আমি তো আমার কানকে বিশ্বাসই করতে পারলাম না। আমার নামে টাকা পাঠাবে কে? আমি তো কাউকেই লিখিনি টাকার জন্যে! দেখলাম মণি-অর্ডারের কুপনে লেখা আছে: Have faith in God Kalida.

কালীদা? কালীদা কে?

টুকলুকে বললাম: কালীদা বলে তো কাউকে আমি চিনি না। কে এই ভদ্রলোক?

তাতে টুকলু বলে উঠল: এ তোর নিশ্চয়ই তোমার দাদা পাঠিয়েছে, ওটা এই-ভাবে পড়:

Have faith in God Kali—Da.

আমি হেসে বললাম: দূর তোর যেমন বুদ্ধি! Have faith in God Kali? সেজদাকে সেজদাই বলি—শুধু দাদা নয়। আর তাছাড়া সেজদাকে আমি কখনই চিঠি-ফিঠি লিখি না।

যাই হোক, কালীদা যিনিই হোন—মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম।

আমার যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল দেখে আমি মিঃ ওয়াদিয়াকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম যে হঠাৎ একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে আমাকে আজ রাত্রেই দিল্লী চলে যেতে হচ্ছে—সেইজন্যে বিকালবেলায় তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে উঠছে না। তিনি যেন কিছু না মনে করেন। দিল্লী থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

সেই রাত্রেই আমি দিল্লী রওনা হলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ
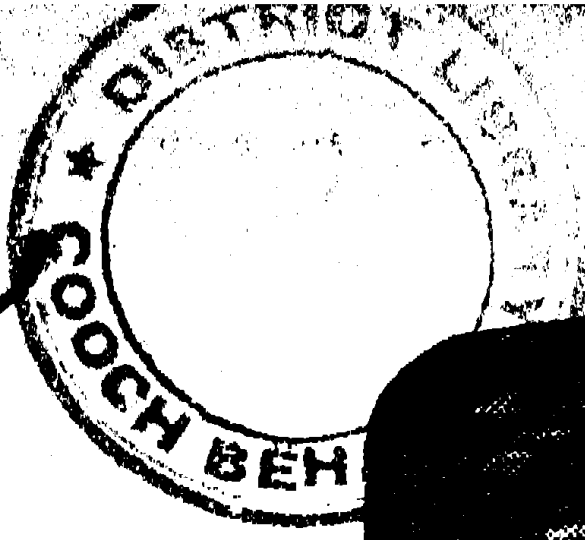
আজকের কথাঃ

জনৈক বিদেশীর চোখে হিন্দী ছবিঃ

কোনো শিল্পবস্তু সম্পর্কে সমঝদারি বা গুণাবধারণ করা শিক্ষাসাপেক্ষ। সূক্ষ্ম রসবোধ জন্মাবার জন্যে যথেষ্ট পরিশীলনের আবশ্যকতা আছে। সকলেরই জানা থাকা উচিত, 'কি দরের চা', তা বলবার জন্যে মাসিক চার-পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে টি-টেস্টার নিয়োগ করা হয়। বহু বছর ধরে বিভিন্ন জাত বা সংমিশ্রণের (ব্লেন্ড-এর) চা চেখে চেখে জিভকে রীতিমত তৈরি করার ফলেই এই টি-টেস্টারের কদর। সংগীতশাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলে এবং বেশ কয়েক বছর ধরে নাম-করা গাইয়েদের আসরের নিয়মিত শ্রোতা হলেই না সংগীতের সমঝদার হওয়া যায়? কোনো গায়কের কণ্ঠের মিষ্টত্ব শ্রোতামাত্রকেই তুষ্ট করতে পারে বটে, কিন্তু তার গায়কী রীতি, তান-লয়-মাত্রা-জ্ঞান, তার কণ্ঠের অবরোহ এবং আরোহশক্তি, তানবিস্তারের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কোনো রাগ বা রাগিণী গাওয়ার সময়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয়দান-শক্তির ওপর গায়কের আসল মর্যাদা নির্ভর করে। এবং এই মর্যাদা নির্ণয়ের ব্যাপারে সমঝদারদের রায়কেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়। নৃত্য, অংকন প্রভৃতির ব্যাপারেও ঐসব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন সমঝদার আছেন সকল উন্নত জাতির মধ্যে।

বর্তমান যুগে চলচ্চিত্রও অন্যতম চারু-শিল্পকলারূপে স্বীকৃত। চলচ্চিত্রজগতের কোন্ বিশেষ চিত্রটি যথার্থ শিল্পসৃষ্টিরূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, তা প্রকৃষ্টভাবে বোঝবার জন্যে যে বিশেষ চোখ এবং বোধশক্তির আবশ্যকতা আছে, এ-কথা আজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সংগীত, নাটক, কাব্য ও চিত্রাংকনাদির যথার্থ অনুধাবন ও পর্যালোচনার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ পাঠধারার অস্তিত্ব আছে বহুকাল ধরে; বর্তমানে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ওরই সংগে যুক্ত হয়েছে চলচ্চিত্রপর্যালোচনা-সম্পর্কিত বিশেষ পাঠ্যসূচী, যাকে বলা হয়— a course in Film Appreciation

ভারতে নির্মিত হিন্দী ছবি সম্পর্কে যে-বিদেশী ভদ্রলোকের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের ফল আমরা এখানে উল্লেখ করছি, তিনি চলচ্চিত্রের সমঝদার হিসেবে কতখানি পোক্ত, তা আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর বক্তব্যের সংগে আমাদের মতের খুব বেশি অমিল নেই এবং বক্তব্যটি চমৎকার উপভোগ্য বলে আমরা এটি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না।

হিন্দী ছবির গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করে তিনি মন্তব্য করেছেনঃ

বিষয়বস্তু : অবধারিতভাবে প্রেম-কাহিনী—চিত্রটিকে চালু রাখবার জন্যে এবং
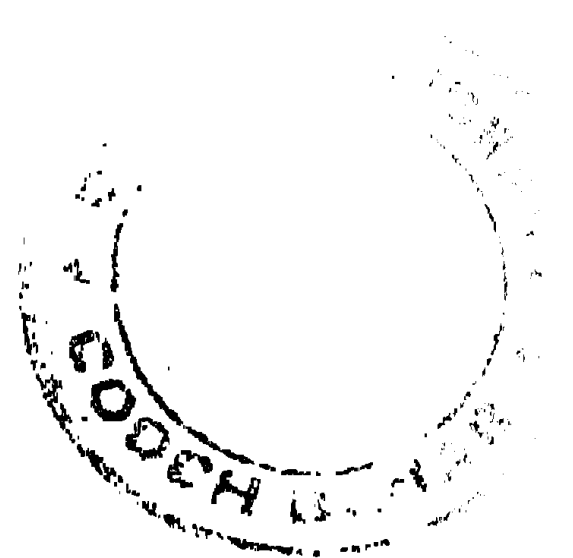
তপন সিংহ পরিচালিত হাটেবাজারে চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা। ফটো : অমৃত

কাহিনীটির বিস্তারের জন্যে এর মধ্যে থাকে প্রচুর বাধাবিপত্তি। বাধাগুলি হয় দৈব-প্রেরিত, নয় চিরাচরিত প্রেম-ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ-এর অন্যতম একটি খল বা দুর্বৃত্ত চরিত্রের কার্যকলাপ-উদ্ভূত। এই খলটি এমনই দুষ্ট যে, লোকটি ভীষণ মাতাল, ধর্ম বা গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এবং প্রায়ই অত্যন্ত ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন।

রীতি ও বর্ণ : ছবিটি হয় নির্দোষ সুখের কাহিনী, নয় রোমাঞ্চকর ভাবপ্রবণতা-পূর্ণ মেলোড্রামা। ছবির সমাপ্তিতে মিলন—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো দুজন নায়ক-নায়িকার মিলন; তখন ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় ঘোষিত হয়েছে। ছবির মধ্যে ভালো চরিত্রগুলি সুখী, আর খারাপগুলি অসুখী ও পরাজিত বা মৃত। ছবির মধ্যে বাস্তবের ছিটেফোঁটাও থাকবে না, কোনো সমস্যার অবতারণা পর্যন্ত করা হবে না। এবং সমস্যা থাকে না বলেই যখন খুশী সমাপ্তি এনে ফেলা যায়।

কাহিনীর চরিত্রগুলি বিশেষ সুবিধা-প্রাপ্ত ধনী পরিবারভুক্ত। নায়ক যদি গরীবও হয়, সদ্বংশে তার জন্ম হতে বাধ্য। সমাজ-বহির্ভূত বিবাহ চিন্তাই করা যায় না। যা-কিছু পার্থক্য, সে শুধু মেজাজের—কেউ একটু উদারপন্থী, কেউ সংকীর্ণচেতা গোঁড়া—এই নিয়েই ছবির মধ্যভাগে যা-কিছু ঝড়-তুফান।

যদিও খোলাখুলিভাবে কিছু বলা হয় না, তবু দেখা যায় যে, সকলেই উচ্চ-বংশসম্ভূত। নায়কদের মধ্যে কেউ বা তার বাপের ব্যবসায়ে সাহায্য করে, আবার কেউ বা ডাক্তার। সকলেরই বেশ স্বচ্ছন্দ জীবন, প্রচুর টাকাকড়ির ওপর তারা আসীন। বাড়ীঘর সব প্রাসাদ বললেই হয়; অবশ্য বাইরেটা খুব বেশী দেখানো হয় না। এমনকি, একজন ডাক্তারও প্রাসাদেই বাস করেন; যদিও ভারতীয় ডাক্তাররা বাস্তব-জীবনে কচিৎ তা ক'রে থাকেন। রাস্তাও স্টুডিওর মধ্যে তৈরী করা হয়, বাস্তবের সম্পর্কচ্যুত করবার জন্যে।

অভিনেতা-অভিনেত্রী : প্রত্যেকেই ফর্সা ও মোটা। মেয়েরা প্রায়ই শক্তিশালিনী এবং খোলাখুলিভাবে গুরুভার; ওদের দেহটি বড়, মাথাটি ছোট, মাথার চুল লম্বা। তাদের বিশেষ কিছু করতে হয় না; তারা মাত্র দেখতে-শুনতে ভালো ও সঙ্গীতপটু পুরুষের অপেক্ষায় থাকে। কোনো কোনো সময়ে তাদের কলেজের ছাত্রীরূপে দেখানো হয়; বিবাহের পাত্রী হিসেবে তাতে যোগ্যতা বাড়ে। কাহিনীটিকে প্রথমে সিমলা, কাশ্মীর বা ঐ জাতীয় কোনো পার্বত্যদেশে শুরু করা হয়—লতা, ফুল, পাতা, হ্রদ, নির্ঝরের প্রকৃতির মাঝে। এর পরে তাকে টেনে আনা হয় শহরে।

প্রেম : প্রেম হয় একেবারে সর্বস্ব পণ করে, সর্বগ্রাসী। অবশ্য এটা খালি অনুভূতিতেই। চোখের সামনে দেখানো হয়ে থাকে পিঠ চাপড়ানো, হাত দিয়ে গাল বা ঠোঁট ছোঁওয়া এবং কাঁধের ওপর মুখ রাখা। বাকীটা চোখের অর্থপূর্ণ চাহনি বা নাচের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে থাকে। মেয়েরা পুরুষকে আকৃষ্ট করে তাদের বুকের উচ্চতা, কোমর ও পেট এবং পাছা দ্বারা। অবশ্য এতে তার বাপের সমর্থন থাকা চাই।

সমবেত নৃত্য ও গীত ছবির অবাস্তবতাকে বৃদ্ধি করে মাত্র; যদিও দর্শকদের কাছে সংলাপ থেকে এদের আকর্ষণ ঢের বেশী।

চাকররা অত্যন্ত অনুগত। মনিবেরা চাকরদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ; চাকরেরাও মনিবের সুখদুঃখের অংশীদার। ওদের দুঃখ কৌতুকসৃষ্টির জন্যে।

ছবিগুলি একাধারে ট্রাজেডি, কমেডি, নাচ ও গানের আড়ত। এই সর্বাত্মকতা বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ—বিভিন্ন রুচির দর্শক তাদের রুচি অনুযায়ী দৃশ্যাবলী দেখতে পায়। ছবিগুলি দেখে মনে হবে, ভারতবর্ষ অভিজাত শ্রেণীতে পূর্ণ, প্রাচুর্যে উপচে উঠছে। অথচ বাস্তব অবস্থা এর থেকে যোজন দূরে।

চিত্র-সমালোচনা

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার (বঙ্গভা : শ্যাডো প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন ৪,১৭২'১০ মিটার দীর্ঘ এবং ১(রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনা : অজি লাহিড়ী; কাহিনী : প্রমথনাথ বিশী; চিত্র নাট্য : মৃণাল সেন; সঙ্গীত-পরিচালনা কালিপদ সেন; গীত-রচনা : প্রণব রা চিত্রগ্রহণ : বিজয় দে; শব্দানুলেখন : অনি দাশগুপ্ত (অন্তর্দৃশ্য) এবং অনিল তালুক দার (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প নির্দেশনা : সুবোধ দাস; সম্পাদনা গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠদান ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আর মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, গীতা দ এবং ইয়ুথ কয়ার-এর শিল্পবৃন্দ রূপায়ণ : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসিতবর বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মি (অতিথি), শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রা (অতিথি), জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মাধব মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রু গুহঠাকুরতা, গীতালি রায়, দীপিকা দ (অতিথি), শ্রাবণী বসু, ভারতী দ প্রভৃতি। দেবালী পিকচার্স ও পদ্ম ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার ১ ডিসেম্বর থেকে দর্পণা, প্রাচী, ইন্দিরা এব অপরাপর চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে।

প্রমথনাথ বিশী লিখিত সুখ্যা উপন্যাস "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" এর কাহিনী যে অতীত যুগকে আমাদে সামনে উপস্থাপিত করে, তা যেমন উত্তেজনাময়, তেমনই রোমহর্ষক। প্রবল প্রতাপান্বিত চৌধুরী পরিবারের বিরা ঐশ্বর্য, বিলাসব্যসন, দস্যুবৃত্তি, প্রতিবেশী রক্তদহের জমিদারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার কাহিনী আজকের দিনের পাঠকদে কাছে যতই অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব বো হোক না কেন, আসলে এগুলি প্রা ঐতিহাসিক সত্যের পর্যায়ভুক্ত। তব উপন্যাস কখনই ষোলআনা ইতিহাস নয় তাই এখানে আছে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মেলবন্ধ, সত্যের ভিত্তিভূমির ওপর কল্পনা ইমারত। সেই কারণেই দেখা যায়, চৌধুরী পরিবারের কুমার দর্পনারায়ণ প্রতিবেশী জমিদারী রক্তদহের বিলে পক্ষী শিকা করতে গিয়ে রাজকুমারী ইন্দ্রাণীর প্রণয়াকা হন এবং তাঁরই সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সত্ত্বেও দৈববিধানে তেমাথা উচ্ছৃঙ্খল জমিদার পরন্তপ রায়ের কব থেকে দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা বনমালাকে নি শৌর্যবলে উদ্ধার করবার পরে ব্রাহ্মণে জাতি-কুল-মান রক্ষার জন্যে তাঁকেই ধর্ম পত্নীরূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এবং এর ফলে একদিকে ইন্দ্রাণী হয়ে ও অপমানাহতা ফুঁসিতা নাগিনী, অপর দিকে দর্পনারায়ণের দাদু জমিদার উদয়নারায় পৌত্রের হঠকারিতায় বেদনাহত ও ক্ষিপ্ত

জোড়াদীঘির প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়ে যায় দর্পনারায়ণের মুখের ওপর। অদৃষ্টের অনুকূলতায় পরন্তপ রায় রক্তদহের বার্ষিক ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয় এবং রক্তদহের জমিদার বাড়ীতেই চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী ইন্দ্রাণীকেও লাভ করেন বিবাহ-সূত্রে। এইবার রক্তদহ ও তেমাথা — দুই প্রতিকূলশক্তি মিলিত হয়ে জোড়াদীঘিকে আঘাত হানবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। দুই পক্ষের নিশীথ অভিযানে মেদিনী কম্পিত হয়ে ওঠে। বহু হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তারক্তির মাঝে সস্ত্রীক দর্পনারায়ণ তার দাদুর ক্ষমালাভের পরে যখন আগ্নেয়াস্ত্র হাতে রক্তদহের ইন্দ্রাণীর সম্মুখীন হলেন, তখন কি তাঁরা পরস্পরকে গুলীবিদ্ধ করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠতে পেরেছিলেন? উচ্ছৃঙ্খল পরন্তপ রায়ের স্বরূপ আবিষ্কারের পরেও ইন্দ্রাণী কি দর্পনারায়ণকে ক্ষমা করতে পেরেছিলেন?— এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"-এর চিত্ররূপের শেষের দৃশ্য কটিতে।

সুবিস্তৃত উপন্যাসটি থেকে দর্পনারায়ণ, রূপমালা, ইন্দ্রাণী ও পরন্তপ রায়ের কাহিনী-সূত্রটিকে জমিদার উদয়নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত করে মৃণাল সেন যে চিত্রনাট্যটি রচনা করেছেন, তা যেমন সুসংবদ্ধ, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। মাত্র ছবির একেবারে গোড়ার দিকে দুর্গাপূজো ও বাঈ নাচটি জমিদারী প্রথা এবং ঐশ্বর্যের পরিচায়ক হলেও কাহিনীর অত্যাজ্য অংশরূপে চিহ্নিত হতে পারে নি। নৈশ মশাল অভিযানের দৃশ্যগুলি বিরাট হলেও আসন্ন সংঘাতের ভয়াবহতা-সৃষ্টির দিক দিয়ে আরও হ্রস্বতর ও দ্রুততর হলে ঘটনার গতিবেগ বা টেম্পোকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারত। এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও পটভূমিকার বিরাটতায়, ঘটনা সংস্থানের বৈশিষ্ট্যে, নদীবক্ষের দৃশ্যগুলির চিত্রায়ণে এবং অগণিত জনতার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" চিত্রটিকে অনন্যসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এবং এর সমগ্র কৃতিত্ব ছবির পরিচালক অজিত লাহিড়ীর।

জমিদার উদয়নারায়ণের ভূমিকায় চরিত্রাভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের অন্যতম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। স্নেহময়, কৌতুকপরায়ণ, দরাজ-হৃদয় প্রৌঢ় উদয়নারায়ণ এবং বার্ধক্যপীড়িত, ক্ষীণদৃষ্টি, বধিরপ্রায়, অতীতের স্বপ্ন-লোকচারী মহাস্থবির উদয়নারায়ণ—দুই-ই সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন। নায়ক দর্পনারায়ণবেশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্নেহের পৌত্ররূপে এবং প্রেমের বধূরূপে অত্যন্ত সার্থক অভিনয় করেছেন; কিন্তু যেখানে তিনি বিরাট বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন, সেখানে একজন আরও উন্নতদেহী, আরও সবল, আরও তেজস্বী মূর্তিকে দেখতে পেলে যেন বেশী ভাল লাগত। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র জমিদার পরন্তপের ভূমিকায় তরুণকুমার তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। দেওয়ান রামজয়বেশে অসিতবরণও যথেষ্ট স্বাভাবিক। স্বরূপ সর্দারের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় শৌর্যবীর্যের চেয়ে কারুণ্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন বেশী এবং সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। লাঠিয়াল আলিবর্দীরূপে শেখর চট্টোপাধ্যায় একটি চমৎকার রূপ সৃষ্টি করেছেন; মৃতবেশে যে অমন আকর্ষণীয়ভাবে অতক্ষণ পড়ে থাকতে পারা যায়, তা বিশ্বাস করা কঠিন। রক্তদহের সর্দাররূপে বিকাশ রায় যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (বনলতার বাবা রামকান্ত), জয়নারায়ণ (রায়মশাই), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (বাণীবিজয়), কমল মিত্র (জামাতা হত্যাকারী জমিদার) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

নারীচরিত্রের মধ্যে নায়িকা ইন্দ্রাণী-বেশে মাধবী মুখোপাধ্যায় প্রেমময়ী, বুদ্ধিদীপ্তা, অপমানাহতা, ঘৃণাপরায়ণা, বঞ্চিতা, তেজস্বিনী, দৃপ্তা—চরিত্রের সবক'টি রূপকেই স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রয়োজনানুসারে দৃশ্যের পর দৃশ্যে। ইন্দ্রাণীর সখী চাঁপার ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতা চরিত্রটির অন্তর্দাহকে যে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন, তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করে পারা যায় না। দরিদ্র ব্রাহ্মণকণ্যা • বনলতার ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন সাবিত্রী

চট্টোপাধ্যায়: মৃত আলিবর্দীর পাশে বসে তাঁর শোকোচ্ছ্বাস হৃদয়স্পর্শী। দীপিকা দাস, গীতালি রায় ও ভারতী রায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। শ্রাবণী বসুর নৃত্য চলনসই।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। নৈশভাগে মশাল নিয়ে অভিযানের বিরাট দৃশ্যগুলি এবং নদীবক্ষে নৌকার বিভিন্ন দৃশ্যগ্রহণে বিজয় দে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সম্পাদনাতেও যথেষ্ট মুন্সীয়ানার নিদর্শন আছে। ছবির আবহসঙ্গীত রচনায় বিশেষ করে ঢাকের সুনিয়ন্ত্রিত বাদ্যের ব্যবহারে সঙ্গীত-পরিচালক কালিপদ সেন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত শ্যাডো প্রোডাকসন্স-এর "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার" গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে অকল্পনীয় বিরাট পটভূমিকার মাধ্যমে একটি ভিন্নধর্মী কাহিনীর কৃতিত্বপূর্ণ উপস্থাপনে চিত্ররসিক জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হবে।

—নান্দীকর

ফিরে চল চিত্রে সবিতা বসু

কলকাতা

'ফিরে চল' চিত্রের শুভমুক্তি

অলকানন্দা এণ্টারপ্রাইজ প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'ফিরে চল' চিত্রটি এ সপ্তাহের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে রূপবাণী, ভারতী, অরুণা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। অতনুকুমার পরিচালিত ও অভিনীত এ চিত্রের প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন কমল মিত্র, তরুণকুমার, সবিতা বসু, জহর রায়, অসিতবরণ, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও অতনুকুমার। সঙ্গীত পরিচালনায় ভি. বালসারা।

'আয়ে দিন বাহারকে' চিত্রের শুভমুক্তি

জে. ওমপ্রকাশ প্রযোজিত, রঘুনাথ ঝালানী পরিচালিত এবং লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরকৃত ফিল্মযুগের রঙিন চিত্র 'আয়ে দিন বাহারকে' চলতি সপ্তাহের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে হিন্দ, কৃষ্ণা, মেনকা প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, নাজিমা, রাজেন্দ্রনাথ, বলরাজ সাহনী, সুলোচনা, সবিতা চ্যাটার্জী, লীলা মিশ্র এবং দুলারী।

'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' চিত্রের সঙ্গীতগ্রহণ

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' শিশুচিত্রটির সঙ্গীতগ্রহণ সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে অনুষ্ঠিত হল। শ্রীরায় সুরকৃত ও রচিত সাতটি গানের রেকর্ডিং গৃহীত হয়েছে। এ ছবির নামভূমিকায় গুপী এবং বাঘা-র চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন নবাগত জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। এছাড়া দুটি প্রধান চরিত্রে জহর রায় এবং সন্তোষ দত্ত নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১০ই ডিসেম্বর এ কাহিনীর বহির্দৃশ্যস্থান নির্বাচনের জন্য পরিচালক শ্রীরায় রাজস্থান অঞ্চলে

যাত্রা করেছেন। ছবিটির প্রযোজনা এবং পরিবেশনার ভার নিয়েছেন আর. ডি. বনশল।

'আরোগ্য নিকেতন' চিত্রের শুভ মহরৎ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নতুন ছবি 'আরোগ্য নিকেতন'-এর শুভ মহরৎ গত ৯ই ডিসেম্বর অরোরার নিজস্ব স্টুডিওয় সংগীত-গ্রহণের মাধ্যমে পালিত হল। প্রণব রায় রচিত ও রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকৃত দুটি গানে কণ্ঠদান করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্র জীবন মশাই-র ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন বিকাশ রায়। ছবিটির পরিচালক হলেন বিনয় বসু।

'ময়ূর মহল' চিত্রের শুভ সূচনা

রূপালী সংস্থার প্রথম প্রয়াস 'ময়ূর মহল' চিত্রের শুভ সূচনা গত ২রা ডিসেম্বর ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হবার পর এ ছবির অন্তর্দৃশ্যের কাজ শুরু হয়। শ্রীপান্থ ঘোষ রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক সত্যেন চৌধুরী। ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, কান্তি বসু ও শ্রীভাস্কর। চিত্রগ্রহণের ভার নিয়েছেন প্রভাত ঘোষ।

কখনো মেঘ

চলচ্চিত্র ভারতী নামে এক নবগঠিত চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রথম প্রচেষ্টা "কখনো মেঘ"-এর শুভসূচনা শুরু করেন গত ৯ই ডিসেম্বর রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। উত্তমকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিককে নিয়ে মহরৎ দৃশ্যগ্রহণ করা হয়। ক্যামেরায় সুইচ অন করেন শিল্পপতি শ্রী ডি এন ভট্টাচার্য। প্রশান্ত দেব রচিত এ কাহিনীর নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন উত্তমকুমার। ছবিটির চিত্রগ্রহণ এবং শব্দগ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন বিভূতি লাহা ও যতীন দত্ত।

ছবিটির পরিচালনা করছেন অগ্রদূত এবং সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। উত্তম ও অঞ্জনা ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন বঙ্কিম ঘোষ, প্রসাদ মুখার্জি, অসীম মুখার্জি, কামু মুখার্জি, তরুণ মিত্র প্রভৃতি। এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

বোম্বাই

গোয়া অঞ্চলে 'জবাল' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

পরিচালক মণি ভট্টাচার্য সদলবলে নিউ ওয়ার্ল্ড পিকচার্সের 'জবাল' চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য গত সপ্তাহে গোয়ার পাঞ্জিম অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। প্রায় দেড় মাসব্যাপী এখানে চিত্রগ্রহণের কাজ চলবে। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়কৃত এ ছবির চিত্রনাট্যে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, সুজিতকুমার, করণ দেওয়ান, জনি ওয়াকার, হেলেন, তরুণ বোস, অসিত সেন ও নিরূপা রায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

মোহন পরিচালিত 'দিল নে পুকারা'

মহাবালেশ্বর অঞ্চলে মোহন পরিচালিত দিল নে পুকারা চিত্রের বহির্দৃশ্য সম্প্রতি গৃহীত হল। কল্যাণজী-আনন্দজী সুরকৃত এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন শশিকাপুর, রাজশ্রী, সঞ্জয়, মেহমুদ, হেলেন, মনমোহন কৃষ্ণ, অচলা সচদেব, রামচরণ ও তুনতুন।

'তমান্না' চিত্রের চিত্রগ্রহণ

প্রযোজক-পরিচালক কে পি আত্মা সম্প্রতি রূপতারা স্টুডিওয় কে এস পিকচার্সের রঙিন ছবি 'তমান্না'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ছবির চরিত্রাবলীতে অংশগ্রহণ করেছেন বিশ্বজিৎ, মালা সিনহা, নাজির হোসেন, নাজিমা, দেবেন বর্মা, সজ্জন, কৃষাণ দেওয়ান, অচলা সচদেব, সুলোচনা এবং আগা। সুরজপ্রকাশ শেঠ প্রযোজিত ছবিটির সুরকার কল্যাণজী-আনন্দজী।

জয় মুখার্জি পরিচালিত ও অভিনীত হাম সায়া

প্রযোজক, পরিচালক ও নায়ক জয় মুখার্জি তাঁর নতুন রঙিন ছবি 'হাম সায়া'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন করছেন। এ ছবিতে জয়কে দ্বৈত ভূমিকায় দেখা যাবে।

কখনো মেঘ চিত্রের মহরৎ দৃশ্যে অঞ্জনা ভৌমিক ও উত্তমকুমার। ফটো : অমৃত

সঙ্গে দুই নায়িকা রয়েছেন মালা সিনহা এবং শর্মিলা ঠাকুর। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন ও পি নায়ার।

মঞ্চাভিনয়

শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের ৩৬তম বর্ষোৎসবে 'অতি আধুনিক' মঞ্চাভিনয়

শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের ষষ্ঠচত্বারিংশতম বর্ষোৎসব গত ৯ই ডিসেম্বর রঙমহল মঞ্চে অনুষ্ঠানের ঋত্বিক লালগোলার রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং প্রধান অতিথি নটশেখর শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্রের পৌরোহিত্যে 'অনিল ভট্টাচার্য' ও বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'অতি আধুনিক' প্রহসন নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অনুষ্ঠান আরম্ভে সংস্থার সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধীরকুমার বসু নিমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

পারিতোষিক অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার সভ্যগণ 'অতি আধুনিক' নাটকটি অভিনয় করেন। শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের নাট্যাভিনয় যে কত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা এই নাটক অভিনয়ের উৎকর্ষতা দেখে বোঝা যায়। প্রতিটি অভিনেতার অভিনয়-আন্তরিকতা প্রতিটি দৃশ্যে প্রমাণিত।

এ নাটকে অতি আধুনিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকের সমাজের আধুনিক জীবনকে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মধ্য দিয়ে নাট্যকারদ্বয় স্বর্গীয় অনিল ভটাচার্য ও শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য বলিষ্ঠ বক্তব্য হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন একদা। নাটকটি তাই সার্থক বলব। তবে কয়েকটি দৃশ্য আরও সংক্ষিপ্ত হলে নাটকের গতি আরও ঘনীভূত হতে পারত।

এ কাহিনীর দুই বান্ধবী লোলা আর লীনা এবং লোলার আণ্টি যেন অতি আধুনিক জীবনের প্রতীক। একটি চ্যারিটি অভিনয়ের আয়োজন মহড়ায় সমাজের বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। প্রতিটি চরিত্রের আনাগোনায় বোঝা যায় অভিনয় তাদের উপলক্ষ্যমাত্র। লক্ষ্য হল আপন উদ্দেশ্য সাধন করা। সমাজের দুই ধনী বন্ধু শ্যামল এবং কেবলের উদ্দেশ্য লীনা এবং লোলাকে গ্রহণ করা। মাঝখানে এদের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান লোলার আণ্টি। তিনি চান প্রতিপত্তি। এরি মাঝে সবুজ সংঘের অন্যান্য সভ্যরা মানিক, বেণী, শিশির, রুম্পাটন, মঞ্জু সবাই প্রেমরসে উদ্বেলিত। শেষ পর্যন্ত অনেক আশা, অনেক আনন্দ আর ভুল বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে নাটক অভিনয়ের দিন লেকের জলে আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়ে শ্যামল এবং কেবল লীনা এবং লোলাকে জীবনসঙ্গিনী করার প্রস্তাবটি পাকা করে নেয়। বাগবাজার ক্লাবের সেরা অভিনেতা মানিক আর প্রমটার বেণীর জীবনে কিন্তু প্রেমস্বাদ অপূর্ণই থেকে যায়।

চরিত্রস্ফুটনে দর্শকদের অনাবিল হাসির খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছেন শ্যামল চরিত্রে নির্মল ভট্টাচার্য, মানিক চরিত্রে মুকুল ঘোষ এবং বেণী চরিত্রে মণি বিশ্বাস। এ'দের অভিনয় দেখে কখনই অপেশাদার অভিনেতা বলে মনে হয়নি। বরং যে কোন পেশাদার শিল্পীদের সঙ্গে এ'দের অভিনয় সমতুল্য। তবে শ্যামলের চরিত্রে শ্রীভট্টাচার্যের বয়স বেশী বলে মনে হতে পারে। এ ছাড়া দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। প্রতিটি চরিত্রে সুঅভিনয় করেন রণজিৎ সুর, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, [illegible]

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত 'অতি আধুনিক' নাটকের একটি দৃশ্যে কেবল ও লোলার চরিত্রে অমর চট্টোপাধ্যায় এবং শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায়।

আয়ে দিন বাহারকে চিত্রে আশা পারেখ এবং ধর্মেন্দ্র

মুখোপাধ্যায়, হিমাংশু মিত্র, প্রভাতকান্তি ঘোষ, অসীমরতন গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল মুখোপাধ্যায়, রবীন বিশ্বাস, হৃষীকেশ দাস ও অমর চট্টোপাধ্যায়। মেয়েদের অভিনয়ে আণ্টি, লীনা, মঞ্জু, বলাকা ও লোলার চরিত্রে যথার্থ অভিনয় করেন চিত্রিতা মণ্ডল, রাধা ভট্টাচার্য, কল্পনা ভট্টাচার্য, শুচিতা ভট্টাচার্য ও শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায়। নাটকের দুই নায়িকা লীনা এবং লোলার চরিত্রে শ্রীমতী রাধা ভট্টাচার্য ও শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায়ের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। নাটকটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাটকটির কয়েকটি গানে সুন্দর সুরসৃষ্টি করেছেন সঙ্গীত-পরিচালক নির্মল ভট্টাচার্য। তবে সবকটি গান সুপ্রযুক্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

অভিনয় এবং নাট্যরচনায় শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের 'অতি আধুনিক' প্রহসন নাটকটি সংস্থার পূর্ব সুনামকে বজায় রাখতে পেরেছে। অপেশাদার সংস্থা হিসেবে এমন সুন্দর নাটক পরিবেশন করার জন্য আমরা শিশিরকুমার ইনস্টিট্যুটের প্রতিটি সভ্যদের অভিনন্দন জানাই।

কালচারাল সেমিনারের "বিষ"

গত ৫ই ডিসেম্বর বিশ্বরূপা থিয়েটারে কালচারাল সেমিনার কর্তৃক "বিষ" নাটকটি প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বিশেষ করে নাট্যপ্রয়োগ ও মঞ্চ ব্যবস্থা সবিশেষ প্রশংসনীয় বলা চলে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের অভিনয় সাবলীল। এর জন্য যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন তৃপ্তি দাস, অলকা গাঙ্গুলী, কমলা সুর, সুকুমার দাস, অজিত সান্যাল, গৌরীশঙ্কর লাল, রমেন সরকার প্রভৃতি। মঞ্চব্যবস্থায় দীপক রায়। রচনা ও প্রয়োগে সমর মুখোপাধ্যায়।

নাট্যম্

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যাভিনয়ের ধারার সঙ্গে যাঁদের নিবিড় পরিচিতি আছে 'নাট্যমে'র নাম তাঁদের কাছে নতুন নয়। এই সংস্থার শিল্পিবৃন্দের নাট্যানুশীলনের নিষ্ঠা পূর্ববর্তী প্রতিটি নাটকের অভিনয়েই চিহ্নিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে নতুন দিনের নাট্যচিন্তা বিকাশের পথে এঁদের প্রয়াস পেয়েছে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। কিছুদিন আগে এঁরা 'অন্তরাগ' নাটকের অভিনয় করলেন 'রঙমহল' মঞ্চে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন সংস্থার প্রবীণ সদস্য শ্রীতিনকড়ি ঘোষ। নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংস্থার পূর্ব দীপ্তি অম্লান থেকেছে এবং

কোন কোন জায়গায় নতুনতর আলোকের সংকেত দিতে পেরেছে এ'দের সংঘবদ্ধ অভিনয়নৈপুণ্য। ঘটনাবহুল ও ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ 'অন্তরাগ' নাটকটি পরিচালক তিনকড়ি ঘোষের সূক্ষ্ম প্রয়োগ পরিকল্পনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সবার কাছে।

অভিনয়ে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করতে পেরেছেন। বিশেষ করে মহকুমা উকীল 'মনোজ বসু' ও তার ছোটভাই 'সরোজ বসু'র ভূমিকায় অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অপূর্ব। ব্যারিস্টার শশাঙ্ক চৌধুরী ও জুট মিলের মালিক বিনয়েন্দ্রকুমারের চরিত্রে রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায়চৌধুরী তাঁদের স্বকীয় অভিনয় নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন। শ্যামলী চক্রবর্তীর 'সুনন্দা' একটি সুন্দর চরিত্রসৃষ্টি। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন কমল দত্ত, অতীন রায়চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী, দেবপ্রিয় ঘোষাল, শচীন্দ্রকুমার সেন, সুনীল ঘোষ, শান্তিময় রায়, কানাই কুণ্ডু, পুতুল চক্রবর্তী।

সুন্দরম্

'সুন্দরম্' প্রযোজিত "রাজকীয় মৃত্যুদণ্ড" একাংকটি সম্প্রতি মুক্ত-অংগনে অভিনীত হোল। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। আধুনিক জীবনের অজস্র জটিলতা ও সীমাহীন যন্ত্রণাকে ঘিরে এই নাটকের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের প্রায় অনেকগুলো মুহূর্তই আজকের জীবন-যাত্রার সংলাপে মুখর। আবার সংগে সংগে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বলিষ্ঠ নাট্যকাহিনীটির মঞ্চরূপায়ণে পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সূক্ষ্ম রসবোধ ও অপূর্ব শিল্পী-মনের পরিচয় প্রোজ্জ্বল হয়েছে। উপস্থাপনায় ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য। অভিনয়ের মধ্যেও সামগ্রিক দীপ্তি অটুট থেকেছে। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিণ্টু দফাদার, বেলা সরকার অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এবার থেকে মুক্তঅংগনে প্রতি রবিবার সকালে এই নাটকটি অভিনয় করবেন 'সুন্দরমে'র শিল্পিবৃন্দ।

পথিক

'পথিক' নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি পরশুরামের 'রামধনের বৈরাগ্য' নাটকটির পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে। এই সুঅভিনীত নাটকে যাঁরা সবার প্রশংসা পেয়েছেন তাঁরা হোলেন মণি শ্রীমানি, সনৎ বসু, রবীন ভট্টাচার্য, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল সুর, গোপাল দে, তপন বিশ্বাস, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন ভাস্কর ঠাকুর।

নবান্ন

অ্যাটলান্টিস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা সম্প্রতি "নবান্ন" নাটকটির অভিনয় করলেন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন অনিমেষ রায়চৌধুরী, বীরেন চক্রবর্তী, সরোজ গুপ্ত, কে কে ব্যানার্জি, অসিত পাল, সমীর মিত্র, কালী খাঁ, পুতুল চক্রবর্তী, রানু অধিকারী। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পিনাকী বসু।

সমীকরণ

শিল্প ও শিল্পী নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি মুক্তঅংগনে সুপ্রিয় সেনের হাসির নাটক 'সমীকরণ' মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি একটি বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। প্রতিটি শিল্পীর প্রাণচঞ্চল অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকীয় কাহিনীর নির্মল হাসির প্লাবন মুখর হয়ে উঠেছে। হাসির নাটকের একটি সার্থক প্রযোজনার স্বাক্ষর সেদিন চিহ্নিত হয়েছে। এ ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক নরেশ ভট্টাচার্যের কৃতিত্বই সর্বাধিক।

একাকী

'সুদর্শনম' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ এবার 'একাকী' নাটকের অভিনয় করবেন। নাটকটি একটি বিদেশী নাটকের ভাব অবলম্বনে রচিত। আগামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এ নাটক মঞ্চস্থ হবে। কুমার শোভন নির্দেশিত এই নাটকের প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন দীপালি চক্রবর্তী ও নির্দেশক স্বয়ং।

পঞ্চপল্লব

'বালী'র সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পঞ্চপল্লবে'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটির সার্থক অভিনয় করেন। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন শম্ভু মুখোপাধ্যায়, ললিত রক্ষিত, চম্পক ঘোষ, অরবিন্দ সরকার, সমর চৌধুরী, অরুণ কাঞ্জিলাল, দিলীপেন্দ্র রায়, তরুণেশ ব্যানার্জি, অশোক রায়, অনিল ব্যানার্জি, অমলকুমার মিত্র, কল্যাণ দত্ত, দীপক দত্ত, কাশীনাথ হালদার, দীপান্বিতা দেবী, কৃষ্ণা মুখার্জি। নাটকটি পরিচালনা করেন কার্তিক ব্যানার্জি।

বিবিধ সংবাদ

কহ্লার শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

আগামী ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ একাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে 'কহ্লার' শিল্পীগোষ্ঠীর প্রথম বার্ষিকী উৎসব এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হবে।

প্রথমে "আনন্দ" গীতানুষ্ঠান, তারপর বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হবে। সর্বশেষে "কহ্লার" শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক "নটরাজ" নৃত্যনাট্য অভিনীত হবে। সংগীতের বিশিষ্ট অংশে থাকবেন সর্বশ্রী অনীতা চট্টোপাধ্যায়, এনা দাশগুপ্ত, ইন্দিরা রায়, চিত্রা গুহ, কল্যাণ ঘোষ, সমীর মুখার্জি, মধুসূদন গোস্বামী, প্রশান্ত দত্ত, সন্ধ্যা দত্ত, সবিতা ঘোষ, বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, বাবুল দত্ত, আরতি পণ্ডিত, সনাতন সিনহা, দীপেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

'ফিল্ম'-পত্রিকার ১৩৭৩-এর শারদীয় সংকলন :

চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে বহুমুখী আলোচনা চলছে আজকালকার শিক্ষিত সমাজে। বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটির কল্যাণে পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পকৃতির সংগে পরিচয় এই আলোচনাকে করেছে প্রাণবন্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। একই সংগে যোগ দিয়েছে নানা ফিল্ম সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত ফিল্ম সংক্রান্ত পত্রিকা, ফিল্ম বুলেটিন, প্রোগ্রাম নোটস্ প্রভৃতি। "ফিল্ম" পত্রিকাটি ঠিক এই রকম কোনো সোসাইটির মুখপত্র না হলেও এর পরিচালকমণ্ডলীর অনেকেই সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই দেখা যায়, "ফিল্ম"-এর প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গুলি চলচ্চিত্র-গুণাবধারণে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। "ফিল্ম"-এর ১৩৭৩-এর শারদীয় সংকলনটি বহু কারণে চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে উৎসাহীদের কাছে সমাদর পাবার যোগ্য। এতে নায়ক, বালিকা বধূ, স্বপ্ন নিয়ে এবং ক্যাসানোভার চিত্রনাট্য ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের "আমি ও আমার ছবি", ঋত্বিক ঘটকের "বাংলা ছবি ও বাংলা সাহিত্য" ও "আমার ছবি", মৃণাল সেনের "স্মৃতির স্মরণীতে", জাঁ লুক গদার, ইংগমার বেয়ারম্যান, আন্তনিওনি, আলফ্রেড হিচকক ও গ্রিগরি চুখরাই—এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ পরিচালকের পরিচিতি প্রভৃতি অবশ্যপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। চিত্রনাট্যগুলির পাশে পাশে ঐ ছবিগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করে। পাঠকরা যদি কোনো প্রবন্ধে ব্যক্ত কোনো বিশেষ মতের সংগে মিলতে নাও পারেন, তাতে পাঠকের মন যে যথেষ্ট নাড়া পাবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মতামত গঠনে ও চলচ্চিত্রশিল্পের মূল্যায়ণে এই নাড়া খাওয়ার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

অন্যতম মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। শ্রীদত্ত এবার একটি নতুন মূকাভিনয় পরিবেশন করেন—গুরুদেবের "রাজপুত্র"। এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। সত্যিই কল্পলোকের সেই রাজপুত্রের আজ কর্মচঞ্চল বাস্তব কলকাতায় কি পরিণাম এই মূকাভিনয়টি এবার সকলের কাছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এসেছে। ভিলাই-এ শ্রীদত্ত বিদেশী অতিথিদের নিকট থেকে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। উড়িষ্যায় 'বেকার যুবক' ও 'আমার ডায়েরীর একটি পাতা' স্থানীয় যুবকদের মধ্যে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের মূকাভিনয়ের এই দ্রুত প্রসার খুবই আনন্দের বিষয়। কোনারকের সূর্যমন্দির ও ভুবনেশ্বরের শিবমন্দির দেখে মনে হয় মূকাভিনয়ের পুরাতন ঐতিহ্য আমাদের দেশে ছিল। শ্রীদত্ত বলেন, 'আমরা সেই শিল্পের পুনরুত্থান করছি মাত্র।'

বারবারা স্ট্রেইস্যান্দ
মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ান্নি
—একটি সাক্ষাৎকার

—অজিত দে

দুই বিখ্যাত শিল্পীর অতি অন্তরঙ্গ হার্দ আলোচনায় সেদিনের সন্ধ্যা সুরভিত হয়ে উঠেছিল। মার্কিনী এক হোটেলের কক্ষে শ্যাম্পেনের মধুর উষ্ণতায় সশ্রদ্ধ আলাপে বসেছিলেন মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ান্নি আর বারবারা স্ট্রেইস্যান্দ। স্ট্রেইস্যান্দ মার্কিন মঞ্চের অন্যতমা প্রাইমাডোনা, আর মাস্ত্রোইয়ান্নি ইটালির চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এ্যাকাডেমি পুরস্কারে স্বাক্ষরিত ডি সিকার ইয়েস-টারডে টুডে এণ্ড টুমরো, ফেলিনির সাড়ে আট, ম্যারিও মনিচেল্লির ক্যাসানোভা ৭০ ইত্যাদি ছবির নায়কের চরিত্র-চিত্রণে যে অভিনয়দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা আজ বিশ্ববন্দিত। ম্যারেজ—ইটালিয়ান স্টাইল ছবির নায়কও তিনি।

মাস্ত্রোইয়ান্নি আমেরিকা ভ্রমণে এসে আগের দিন সন্ধ্যায় ব্রডওয়ে মিউজিক হলে 'ফানি গার্ল' গীতিনাট্যে ফানি ব্রাইস্-এর ভূমিকায় স্ট্রেইস্যান্দকে দেখে, তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন; মঞ্চে গিয়ে তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে পরের দিন নিজের হোটেলে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

দুজনে দুজনের ভাষা বোঝেন না, কিন্তু মন বোঝেন; তাই একজন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে স্ট্রেইস্যান্দ এসেছিলেন মাস্ত্রোইয়ান্নির হোটেলে।

স্ট্রেইস্যান্দ সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—কাল মঞ্চে এসে, আমাকে তোমার ভাল লেগেছে জানিয়েছিলে, এতে যে আমার কি ভাল লেগেছে!

মাসত্রোইয়ান্নি বললেন, — শুধু ভাল লেগেছে! তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে! কিন্তু আমার অভিনন্দন সম্বন্ধে তোমার এত উচ্ছ্বসিত হবার কারণ কি?

—কারণ? কারণ আমার এই বেয়াড়া লম্বা ধরনের মুখখানা। শুধু সঙ্গীত-শিল্পীই নয়, ছেলেবেলা থেকে আমার ইচ্ছে ছিল মঞ্চাভিনেত্রী হওয়া; কিন্তু নাট্যমঞ্চে কাজ পাওয়া আমার পক্ষে সোজা ছিল না, আমার এই অদ্ভুত ধরনের লম্বাটে মুখ-খানার জন্যে।

মাস্ত্রোইয়ান্নি বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—অদ্ভুত! কিন্তু তোমার মুখশ্রী তো অপূর্ব! অপূর্ব সুন্দর কারণ অস্বাভাবিক বলে, অপূর্ব সুন্দর কারণ তোমাকে ঐভাবেই তৈরী করা হয়েছে বলে। তোমার মুখশ্রীতে যে অস্বাভাবিক অদ্ভুত সৌন্দর্যের দীপ্তি আছে তা অবিশ্বাস্য, তা প্রাগৈতিহাসিক!

স্ট্রেইস্যান্দ শ্যাম্পেনের পেয়ালায় ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে শুরু করলেন,—কিন্তু আমাদের এই মার্কিন মুলুকে কেউ আমাকে ভাল বলে না, সকলেই নাক সিঁটকে বলে, —না বাপু, মুখখানা তোমার ভাল নয়, কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের! এখানে সবাই ঐ চলতি ধরনের সুন্দরীদেরই পছন্দ করে বেশী।

মাসত্রোইয়ান্নি বললেন, — বুঝেছি। গোড়ার দিকে সুযোগ পেতে তোমাকে হয়ত খুবই বেগ পেতে হয়েছে, কিন্তু এখন যেহেতু তুমি খ্যাতির উঁচু ধাপে উঠে পড়েছ, এখন ঐ মুখই হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমার পরম ঐশ্বর্য, ঐ মুখেই তুমি হয়ে উঠেছ অনন্যা! আর তোমার এই হাত দুখানা—! দোভাষীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—দেখেছ, একবার লক্ষ্য করে, ঐ হাত দুখানা কি লম্বা! কি সুদীর্ঘ! যেন অশরীরী পরীদের মত!

স্ট্রেইস্যান্দ মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন,—তুমি তাহলে বলছো, আমার মুখখানা সত্যিই সুন্দর! কিন্তু আমার নিজের তো ভারী বিশ্রী লাগে! আমার মুখখানা লম্বা ধরনের, হাত দুটোও তেমনি লম্বা, আর নাকটা—! তাও কি কিছু কম লম্বা।

মাস্ত্রোইয়ান্নি যেন লাফিয়ে উঠলেন, কথা শেষ হবার আগেই আবার শুরু করে বললেন,—আর আমার ঠিক তার উল্টো। আমার নাকটা আবার তেমনি ছোট্ট, মুখের সঙ্গে এমন বিশ্রী বেমানান করে বসান! তোমার মত এ নিয়ে আমি নিজেও একটা হীনমন্যতায় জ্বলছি।

মাসত্রোইয়ান্নির কথা শুনে স্ট্রেইস্যান্দ আর দোভাষী দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

এর পর কথায়-কথায় বর্তমান কালের নায়কদের প্রসঙ্গ এসে পড়ল। মাস্ত্রো-ইয়ান্নি এক সময়ে বলেছিলেন আজকের নায়ক আর বিশ-ত্রিশ বছর আগেকার নায়ক —ক্লার্ক গ্যাবল, ক্যারি গ্রান্ট, এদের সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না, আকাশ-পাতাল ফারাক। দোভাষী সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন,—আপনি কি সত্যিই এই ধরনের কোনো কথা বলেছিলেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বলেছিলুম বৈকি। আজ ক্লার্ক গ্যাবলকে দেখলে লোকে নিশ্চয়ই হেসে ফেলতো। না, ব্যক্তি ক্লার্ক গ্যাবল সম্বন্ধে আমি বলছি না; আমি বলছি যেসব নায়কচরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের সম্বন্ধে। আজকের দিনে কোন বিশুদ্ধ খাঁটি চরিত্রের মানুষ আর দেখতে পাওয়া যায় না, তারা ফুরিয়ে গেছে; ক্লার্ক গ্যাবল-এর অভিনীত চরিত্রের মত ষোল আনার মানুষ, জোড়বিহীন একখানি ছাঁচে গড়া, অবিচল, দৃঢ়চিত্ত, আপন কর্তব্যে সপ্রতিভ একটি পুরো অখণ্ড ব্যক্তিসত্ত্বা আজ সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে; পৃথিবী আজ আর তাদের সম্ভাব্য চরিত্র বলে মনে করে না, ঐ জাতীয়

চরিত্রগুলোকে আজ আর রক্ত-মাংসে গড়া সত্যকার মানুষ বলেই মনে হয় না। ক্লার্ক গ্যাবল, গ্যারী কুপার, ক্যারী গ্রান্ট যে চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন আজ আর তারা নেই ; ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে এ সম্বন্ধে সত্যই দুঃখিত, কারণ ইতিহাস তাদের হত্যা করেছে।

বারবারা স্ত্রেইস্যান্দ জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু এর কারণ কি? সেসব মানুষদের কি হল কি?

—হয়েছে তাদের অনেক কিছু; কারণও সুপ্রচুর। মাসত্রোইয়ান্নি দৃঢ়স্বরে মত প্রকাশ করলেন।—নারী-প্রগতি, বিজ্ঞানের নিত্য নব উদ্ভাবন, পুরনো পারিবারিক রীতির বিকেন্দ্রীকরণ, এক কথায় মানব জীবনের একটা সামগ্রিক আলোড়ন, অস্থিরতাই তার কারণ। সেকালের মানুষ প্রত্যেকটি দৈনন্দিন ব্যাপারেও আগ্রহী ছিল, চিন্তা-ভাবনা করত, কিন্তু আজ সেই বস্তুগুলোই তাকে বিভ্রান্ত করে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্র থেকে পলায়নী-মনোবৃত্তি তাকে পেয়ে বসেছে। একটা অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিতব্যে তাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে তার ভয় হয়, সে বুঝতে পারে না কোথায় সে যাচ্ছে, কি তার ভবিষ্যৎ। ঠিক এই সব কারণে তার অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে অর্থহীন, নিরর্থক। আজকের মুহূর্তের, এই বর্তমান কালের নেই কোন স্থিতিস্থাপকতা, নেই কোন অর্থবহতা, একালে আমরা না পারি কোন বিষয়ে কোন পরিকল্পনা করতে, না পারি প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দিয়ে কোন কিছু উপলব্ধি করতে ; আজকের মানুষের মন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে সরষে দানার মত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কৌতূহল তার তীক্ষ্ণ হলেও দূর-দৃষ্টিতে সে কিছুই আঁচ করতে পারে না; আর তাই তার মনে জাগে ভয়, আতঙ্ক! এর কারণস্বরূপ অনেকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, যুদ্ধ। কিন্তু এর পূর্বেও তো বহু যুদ্ধই এ পৃথিবীতে ঘটে গেছে, কিন্তু তার ফলে মানুষের সামগ্রিকতা তো কখনও এমনভাবে বিকেন্দ্রায়িত হয় নি; তার মানেই গত বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা নতুন কিছু প্রলয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে যা নাকি পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটে নি। কে বলতে পারে, এর কারণ হয়ত মানুষের মহাকাশ বিজয় অভিযান বা পরমাণু বিভাজন!

স্যাম্পেনের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মাসত্রোইয়ান্নি বললেন,—আমি তো অনেক কথাই বললুম, এবার তোমার কথা বল।

—কি বলব বল।

—কাল তোমার অভিনয় দেখে, গান শুনে আমার খুব ভাল লেগেছে; গান খুব ভাল গাওয়া আর গাইতে ভাল লাগা দুটোর মধ্যে তফাৎ যে আছে তা নিশ্চয়ই তুমি বোঝ; আচ্ছা, প্রশ্ন করি, গান গাইতে তোমার নিজের সত্যিই খুব ভাল লাগে কি না?

বারবারা স্ত্রেইস্যান্দ উচ্ছ্বাসে যেন ফুলে উঠলেন—খুব, খুব, ভীষণ ভাল লাগে গাইতে। আমার ইচ্ছে করে তোমাদের ইতালীয় ভাষায় গান গাই, এতো মিষ্টি সুন্দর ভাষা তোমাদের!

—ভারী অদ্ভুত তো! তবে তুমি একজন সত্যকার সঙ্গীতশিল্পী বলেই বোধহয় ইতালীয় গান পছন্দ কর বেশী। কিন্তু আজকাল আধুনিক ইতালীয় সঙ্গীত-জগতের যারা জনপ্রিয় শিল্পী তারা প্রায় সবাই গায় তোমাদের ঐ মার্কিনী ঢঙে; এমন কি গানের ভাষাতেও তারা জ্যাক, জিম ইত্যাদি মার্কিনী নাম ব্যবহার করে, ওষ্ঠ চালনা করে যেন ইংরাজি ভাষাই বলছে।

—কিন্তু এ যে অত্যন্ত দুঃখের কথা, অত্যন্ত লজ্জার কথা! ইতালীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাললাগে 'পুসিনি'।

মাসত্রোইয়ান্নি বললেন,—এ বিষয়ে অবশ্য আমিও একমত। হ্যাঁ 'অপেরা' যদি গাইতে হয়, ইতালীয় ভাষাই তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

—তুমি অতি সত্য কথা বলেছ ; মন্তব্য করলেন বারবারা। ইংরেজি ভাষায় কোন শব্দ চিৎকার করে বলতে গেলেই তা অতি বিশ্রী শোনায়। উচ্চ গ্রামে অতি মিষ্টি করে গলা ছাড়া ইংরেজী ভাষায় সম্ভব নয়। কিন্তু ইতালীয় ভাষা কি গানে কি আলাপে ভারী মধুর, ভারী মিষ্টি।

—কিন্তু আমি মিস স্ত্রেইস্যান্দ ইংরাজি খুব ভালবাসি; আমার কানে ইংরাজি শব্দ-গুলোর অদ্ভুত একটা রহস্যময়তা আছে; আর তাই বোধহয় এ ভাষা সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও প্রচুর। কিন্তু কিছুতেই শিখতে পারছি না। ছোট ছেলেদের মত হেসে উঠলেন মাসত্রোইয়ান্নি!

বারবারাও তেমনি হাসতে হাসতে বললেন,—সে তুমি যাই বল না কেন মার্চেল্লো, আমাদের ভাষায় কেমন যেন একটা অনুনাসিক ঢং আছে, একটা নাকী-নাকী সুর।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ! বিশেষ করে তো নিউ ইয়র্কের ভাষায়, তাই না? আমার যেন মনে হয় ওদের কথাগুলো কণ্ঠনিঃসৃত নয়, কথাগুলো নাসিকাস্ফুরিত।

পরস্পরের কৌতূহল ও আগ্রহ নানা কথার প্রসঙ্গ স্পর্শ করে সেই মধুর সন্ধ্যা ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় পৌঁছুলো।

চলচ্চিত্রে অভিনয় সম্বন্ধে কথা উঠতেই বারবারা স্ত্রেইস্যান্দ বললেন,—কি জানি কেন, আমার যেন বড্ড ভয়-ভয় করে। কেবলই মনে হয় ছবিতে, অভিনয়ের ধারাক্রম একেবারেই বজায় থাকে না।

মাসত্রোইয়ান্নি বারবারাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন,—ঠিক বলেছ; গোড়ার দিকে কিছু দিন এই ধারাক্রম বজায় রাখা সম্বন্ধে মনের মধ্যে অতি বিশ্রী একটা অস্বস্তি, সন্দেহ, আর অনিশ্চয়তার কাঁটা অত্যন্ত বিরক্তিকরভাবে খোঁচা দেয়; শুধু সুটিংয়ের সময় নয়, সুটিং চলাকালীন সারা দিনরাত খেতে শুতে বসতে দাঁড়াতে অশান্তি জাগে। চিত্রনাট্যকে এমনই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো অংশে ভাগ করে সুটিং করা হয় যে, মূল কাহিনীর কোথায় যে কি ঘটনা ঘটছে, তার এতটুকু হদিস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণভাবে পরিচালকের 'ও-কে'-র ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কিছু দিন কাজ করার পর ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস জন্মায়; অভিনীত দৃশ্যের পূর্বাপর অংশে কি করেছি, কতটুকু হেসেছি, কোন সুরে কথা বলেছি সব যেন মনের ওপর ভেসে ওঠে ; অভিনয়-ধারার ক্রমগতিটা আপনিই যেন উপলব্ধির মধ্যে এসে যায়। আর ঠিক তখনই নিজের কাজের ওপর নিজের ভালবাসা জন্মায়, সৃষ্টির আনন্দে মন ভরে ওঠে। অভিনয়-ধারার এই বিচ্ছিন্নতাই তখন অভিনীত চরিত্রের রূপারোপে প্রতিমুহূর্তে যেন নতুন প্রাণের স্পর্শ ছোঁয়ায়। এমন কি যদি ভুলও করে ফেলি তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তার দ্বারাই চরিত্রটি জীবন্ত বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। আমাদের এই জীবনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটে ; সব সময়ে সর্ব অবস্থায় আমরা তো ঠিক নির্ভুলভাবে নিজেদের চালনা করতে পারি না; ভুল-ভ্রান্তি ঘটেই থাকে। যে সময়ে যেমনটি উপযুক্ত ঠিক সেইটাই পেরে উঠি না। কিন্তু তা পারি না, পারা যায় না বলেই তো এ জীবন এত বিচিত্র, এত নাটকীয়, এত কান্না-হাসিতে ভরা। কিন্তু এও তোমায় আমি বলে রাখি, প্রেমের দৃশ্যগুলো একেবারেই কিন্তু অবাস্তব, অতি অসম্ভব রকমের বিরক্তিকর।

স্ত্রেইস্যান্দ বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—এ তুমি কি বলছ মাসত্রোইয়ান্নি, বিরক্তিকর।

মাসত্রোইয়ান্নি প্রত্যায়িত স্বরে বললেন,—হ্যাঁ, সত্যিই বারবারা, তুমি বিশ্বাস কর, প্রেমের দৃশ্যগুলো অসম্ভব রকমের বিরক্তিকর। কারণ প্রেমের দৃশ্য সত্যকার না হলেই হাস্যকর হয়ে ওঠে, তাই না? তারপর আমাদের ভাবভঙ্গী আর অঙ্গ-বিন্যাসের প্রশ্ন—যা প্রতিটি প্রেমের দৃশ্যে অতি উদ্ভট, অসঙ্গতিপূর্ণ, হাস্যোদ্রেককারী হয়ে দাঁড়ায়, কারণ, ক্যামেরার এ্যাঙ্গল নির্বাচনে পরিচালকের হাজার রকম সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সব সময়ে সচেতন থাকতে হয়। তার ওপর তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে চুম্বনের দৃশ্যগুলো সর্বক্ষেত্রে নায়িকারই ওপর কেন্দ্রীভূত করা হয়—যা নাকি ততোধিক উদ্ভট, অযৌক্তিক। সমস্ত দৃশ্যটা একটা পূর্ব-কল্পিত ছকে বাঁধা ধারায় তোলা হয় যা নাকি প্রেমের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক; প্রেম কখনো ছকে-বাঁধা গতিপথে এগোয় না, মুহূর্তের আবেগ উচ্ছ্বাসেই তার লীলা-বিহার। বিশেষ করে তো প্রেমের দৃশ্যের ক্লোজ-আপগুলো। কল্পনা করতে পার নায়কের পেছন থেকে প্রেমের দৃশ্য তোলা হচ্ছে! এ যে কি বিশ্রীভাবে অশ্লীল তা ভাবতে গেলেই আমার মন ঘিনঘিন করে ওঠে।

স্ত্রেইস্যান্দের চোখে-মুখে হাস্য-কৌতুকের একটি সমর্থন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

মাসত্রোইয়ান্নি আবার শুরু করলেন,—প্রেম [illegible], স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু [illegible]

প্রেমের দৃশ্যগুলি ঠিক তার বিপরীত—যেমন কষ্টকৃত তেমনি হাস্যকর। এই দৃশ্য অভিনয়ের সময়ে আমার কেবলই হাসি পায়, আমি প্রায়ই হেসে ফেলি। তবে, হবেও বা, যত গ্রেটা গার্বোর অভিনীত প্রেমের দৃশ্যগুলি অতি সুন্দর, অতি মোহময় হয়ে উঠে, আমরা যা অভিনয় করি, তা-তার কাছে ঘেঁষতেও পারে না।

—গ্রেটাকে কি তুমি দেখেছ কখনো?—স্ট্রেইস্যান্দ কৌতূহলী প্রশ্ন করলেন।

মাসত্রোইয়ান্নি বললেন,—হ্যাঁ, এই নিউ ইয়র্কেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ছেলেবেলায় গ্রেটাকে আমার মোটেই ভাল লাগত না, কেমন যেন নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বলে মনে হত। সেদিন কিন্তু মানুষটিকে আমার খুব চমৎকার লাগল। যেমন সুরসিক তেমনি অন্তরঙ্গ। দেখা হতেই প্রশ্ন করলেন, আমার স্যুটো-জ্যাকেট ইতালীর তৈরী কিনা। আমি মিথ্যে করেই বললুম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এ ছাড়া আর কি-ই বা তিনি আমাকে বলবেন? আমি কে, যে আমার সঙ্গে তিনি আলাপ-আলোচনায় সময় নষ্ট করবেন! কিন্তু তাই-ই তিনি করলেন; অত্যন্ত সহজ সাধারণ মানুষের মত হৃদ্যতা-পূর্ণ আলোচনা।

দোভাষী ভদ্রলোক হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কি প্রেমে বিশ্বাস করেন না?

মাসস্ত্রোইয়ান্নি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—না, বিশ্বাস করি না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ভালবাসা হৃদয়বৃত্তিটিকে আমি অস্বীকার করি। মোটেই তা নয়; বরং বলতে পারি অতি গভীরভাবেই স্বীকার করি। মানুষের জীবনে প্রেম যেমনি গভীরে বিদ্ধ তেমনি পরিব্যাপ্ত। জীবনশক্তিকে প্রেম স্নেহময়ী মায়ের মতই বাৎসল্যস্নেহে রক্ষা করে; প্রেম একটি জীবন-জোড়া বিরাট বিস্ময়। ভালবাসা পেলে, ভালবাসতে পারলে মানুষ জীবনের পথে নির্ভয় সাহসে এগিয়ে যায়, অন্তরের মধ্যে সে এমনই এক অমৃত-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে যে, তারই শক্তিতে, তারই রক্ষণাধীনে তার চলার পথ অতিনির্বিঘ্ন, অতিনিরাপদ হয়ে ওঠে। প্রেম জীবনকে পুষ্ট করে, জীবন মহনীয় হয়।

বারবারা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—তবে তুমি বিশ্বাস কর না বললে কেন?

—কারণ আমি আমার নিজের প্রেমে বিশ্বাস করি না। মাসত্রোইয়ান্নি বোঝাতে শুরু করলেন আবার। গভীরভাবে ভাল-বাসতে আমি কিছুতেই পারি না; ও ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

দোভাষী ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—তুমি কি সত্যিই তোমার নিজের সম্বন্ধে এমনি ধারণা পোষণ কর? ভাল-বাসতে কি সত্যিই তুমি পার না?

—হ্যাঁ সত্যিই তাই। আমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বহু রঙিন ঘটনার বিস্ময়কর উপলব্ধিতে এই বিশ্বাসই আমার হয়েছে যে, অপর পক্ষ যখন তাদের সব কিছু আমায় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে, প্রতিদানে আমি কিন্তু তার অতিসামান্য ভগ্নাংশও দিতে পারিনি। অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রে প্রেম অত্যন্তই অকিঞ্চিৎকর, অতীব সীমিতবলয়। কিন্তু যারা পরিপূর্ণভাবে ভালবাসতে পারে, যারা আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে, তাদের অভিনন্দিত না করে পারি না, তাদের আমি ধন্য মনে করি।

দোভাষী ভদ্রলোক স্ট্রেইস্যান্দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আর তুমি? কি ভালবাসা, কি কাজে তোমার আপনাকে যে তুমি সম্পূর্ণ বোল আনাই উজাড় করে ঢেলে দিতে পার, তা কি তুমি বিশ্বাস কর, তা কি তুমি উপলব্ধি কর?

বারবারা একটু ইতস্ততঃ করে বলতে শুরু করলেন,—প্রশ্নটা বড় গোলমেলে কিন্তু। মার্চেল্লোর মত দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও আমার নেই। তাছাড়া আমি নিজে কি পারি, না পারি সে সম্বন্ধেও আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। বর্তমানে আমি প্রেম এবং

হৃদয়বৃত্তি বিষয়ে আত্ম-আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে চলেছি বলা যেতে পারে। তবে আমার মনে হয় মার্চেল্লোর মত শিল্পস্রষ্টাদের মনের কোথাও যেন কোন একটা বিকৃতি, একটা অসম্ভবের জন্য বিকৃত ক্ষুধা আছে; সেই ক্ষুধার তীব্রতায় যে স্বপ্নের তাজমহল তারা কল্পনা করে, রূঢ় কঠিন বাস্তবে তারা তার কিছুই পায় না; আমার বিশ্বাস, মাসত্রোইয়ান্নির স্বপ্ন বোধহয় আকাশের চেয়েও উঁচু, তাই সে স্বপ্ন কোন দিনই বাস্তবায়িত হয়ে উঠছে না। প্রতি পদে-পদে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

দোভাষী জিজ্ঞাসা করলেন,—কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার জ্বালা কি শুধু মাত্র শিল্প-স্রষ্টাদেরই ভোগ করতে হয়?

—না, সাধারণভাবে এ সব সমস্যা সকলের জীবনেই দেখা দিতে পারে, দেখা দেয়ও। কিন্তু যারা শিল্পী, যারা স্রষ্টা তাদের বিকৃত অহমিকাবোধেই যত জটিলতার সৃষ্টি হয়—সেই অহমিকার পরিধি তাদের অসম্ভবের সীমায় পরিব্যাপ্ত। এক কথায় এদের দাম্ভিকও বলা যায়।

এই শিল্পী-শ্রেণীর দাম্ভিকরা সাধারণত দু জাতের হয়। প্রথম দলকে আত্মদম্ভী বলা হয়; এরা কেবল নিজেদের চিন্তায়, স্বার্থে, আলোচনায় ডুবে থাকে; এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু এরা স্বপ্রকাশ। দ্বিতীয় দলীয়রা হচ্ছে ভিন্নপন্থী; বিপদ-আপদের সম্ভাবনা এদের ক্ষেত্রে অপরিসীম; এরা প্রথম দলের মত মুখে কিছু বলে না, এরা অন্তর্মুখীন, এরা ভেতরবোঁদা—এরা নিজের মধ্যেই কেবল গুমরে মরে। তাই প্রেমের ব্যাপারে জড়িত হয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিতে গিয়েও পদে-পদে এরা বাধা পায় তাদের দাম্ভিক সত্তার কাছে।

দোভাষী আবার বাধা দিলেন,—আমার মনে হয় মিস স্ট্রেইস্যান্দ নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা, এই সমস্যা যেন তাঁদেরই বিশেষ করে জড়িয়ে ফেলে, এটা কেমন যেন অদ্ভুত, না?

—হ্যাঁ ঠিক তাই; আপনি ঠিকই বলেছেন। মঞ্চের সঙ্গে যাঁরাই সংশ্লিষ্ট—অর্থাৎ অভিনেতার দল, তাঁদের ভবিতব্যের এ এক অদ্ভুত লিখন। ধরুন একজন লেখকের কথা। তিনি বাড়ি বসে লেখেন; তাঁর শিল্প, তাঁর সৃষ্টিকে তিনি কাগজের বুকে প্রতিবিম্বিত করে পাঠকের টেবিলে পৌঁছে দেন; পাঠক পড়ে, প্রতিভার সৃষ্টি-কর্মে মুগ্ধ হয়; লেখকের সৃষ্টিকর্মকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই পাওয়া যায়। বিশ বৎসর পরেও তা পাঠকের উপভোগ্যতা সৃষ্টিতে সমপরিমাণেই সক্ষম। কিন্তু একজন অভিনেতার পক্ষে তাঁর সৃষ্টিকর্ম একান্তভাবেই ব্যক্তিগত, থাকবার আছে শুধু তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত রক্ত-মাংসে গড়া দেহটি—যার মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রূপায়িত করেন। তাঁর সৃষ্টি প্রাণ পায় একমাত্র অভিনয়কালীন সময়টুকুতে; সেই সময়-টুকুতেই তাঁর প্রতিভা সীমায়িত, সেই-টুকুতেই তাঁর সৃষ্টি কারারুদ্ধ। অভিনেতার সৃষ্টিকে পরবর্তী কালের জন্যে ধরে-বেঁধে রাখা যায় না—অবশ্য চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ছাড়া। যাই বলুন না কেন, অভিনেতার জীবন বড় বেশি গোলমেলে, বড় জটিল সমস্যাসঙ্কুল।

মার্চেল্লো মাসত্রোইয়ান্নি বারবারার জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে এই গভীর বুদ্ধি-দীপ্ত ব্যাখ্যা শুনে সশ্রদ্ধ অভিনন্দনে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বললেন,—তুমি যা বলেছ বারবারা, তার চেয়ে বড় সত্য আর নেই। অভিনেতাকে ব্যক্তিগতভাবে অতি-অপরিণত শিশুই মনে করা যায়; সে এ জীবনের কোন কিছুই তার যোগ্য মূল্যমানে উপলব্ধি করতে পারে না। শিশুর মতই সে যেন সব সময়ে এক অসম্ভবের স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করে। বিভিন্ন চরিত্রের ভেলা ভাসিয়ে বিচরণ করতে-করতে তার নিজের ব্যক্তিগত চরিত্রটি যায় হারিয়ে, তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার মূলটি যায় কেন্দ্রচ্যুত হয়ে।

দোভাষী বললেন,—কিন্তু মিঃ মাসত্রো-ইয়ান্নি 'লা দোলচে ভিতা' ছবিতে যে চরিত্র রূপায়ণ আপনি করেছেন, সেটি যেন, আমার মনে হয়, আপনার নিজেরই প্রতিচ্ছবি, সে যেন আপনি স্বয়ং নিজেই; তাই নয় কি?

মাসত্রোইয়ান্নি বললেন,—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এই জাতীয় চরিত্রগুলো,—'সাড়ে আট' ছবির চরিত্র আরো বেশি করে, আমার ভারি ভাল লাগে, এগুলো অতি অদ্ভুতভাবে চিত্তাকর্ষক। 'সাড়ে আট' ছবিতে চরিত্রটি আরও বেশী স্পষ্ট, রক্ত-মাংসে গড়া একটি জীবন্ত ব্যর্থ মানুষ হয়ে উঠেছে—একজন সুস্থ সবল সম্পূর্ণ অখণ্ড মানুষ হওয়ার অক্ষমতা তার প্রতি কণায় সুস্পষ্ট।

দোভাষী আবার প্রশ্ন করলেন,—এক সময়ে আত্মসমালোচনা প্রসঙ্গে আপনি বলে-ছিলেন যে, আপনি সিংহের মত সবল দুঃসাহসী তো ননই, বরং অতি অস্থিরচিত্ত দুর্বল ভীরু পোষা মেনি বেড়ালের মতই নাকি নিজেকে তুলনা করেছিলেন?

মাসত্রোইয়ান্নি হাসতে-হাসতে বললেন, —হ্যাঁ হয়ত বলেছিলাম, অসম্ভব নয়। জন্তু-জানোয়ারের মত আমি হচ্ছি মুহূর্তের মানুষ, আমার জীবনে ক্ষণটুকুই সত্য, ঐ ক্ষণস্থায়ী ক্ষণটুকু নিয়েই আমার বাঁচা; প্রেম সম্বন্ধে আমার যে অক্ষমতার কথা আমি বলেছি, তার কারণ নানান দিকেই আমার মন ছোটে। হয়ত কোন একটি বিশেষ কারণে—যা নাকি আমি নিজেও জানি না—কোন একটি মেয়েকে আমার খুব ভাল লাগল, তাকে ভালও বাসলাম; কিন্তু তার পরে আবার আর একজন এল, তাকেও আমার ভাল লাগল, তাকেও আমি ভাল-বাসি। তারপর হয়ত এদের দুজনকেই আর আমার ভাল লাগে না, আমি এদের দুজন-কেই হতাশ করে তুলি—কারণ ইতিমধ্যে মঞ্চে নাকি আর একজনের আবির্ভাব ঘটে যায়, যাকে আবার আরো বেশি ভাল লাগে। খাদ্য পানীয়ের ব্যাপারেও ঠিক এই। যখন যা ভাল লাগে তাই নিয়েই আমার ভালবাসা; আমি মুহূর্তের মানুষ, ক্ষণের আনন্দেই আমার জীবনায়ন। প্রতিটি বিভিন্ন ক্ষণই আমার জীবনে বিভিন্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে, অননুভূত রসে আমাকে রসিয়ে তুলতে পারে, আর করেও তাই। আবার ঐ অননুভূতপূর্ব মুহূর্তটি আমার ভুলে যেতেও কোন দ্বিধা লাগে না, সঙ্কোচ আসে না, কারণ, ঠিক পরের মুহূর্তটি আমাকে আরেও অপূর্ব রসায়নে বিমুগ্ধ করে আগেকার সব ভুলিয়ে দেয়।

বারবারা স্ট্রেইস্যান্দ প্রসঙ্গ পাল্টালেন, —যতগুলি ছবি তুমি করেছ তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমার ভাল লেগেছে 'ম্যারেজ, ইটালিয়ান স্টাইল' ছবিটি। ছবিটির অপূর্ব মিলনান্তক সমাপ্তি আমার যে কি ভাল লেগেছে তা বলতে পারি না। তাদের প্রেম-ভালবাসার ছন্দে-দ্বন্দ্বে, মান-অভিমানের জোয়ার-ভাটায়, রাগ-অনুরাগের টানা-পোড়েনে শেষ পর্যন্ত তারা যে মধুর সার্থক সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছিল তার সৌন্দর্য-মাধুর্যের তুলনা হয় না! এ জীবনে এত সুন্দর ছবি আর কখনো দেখিছি বলে আমার মনে হয় না।

মাসত্রোইয়ান্নি বললেন,—তোমার মতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত; এমন সুন্দর ছবি, এমন মন মুগ্ধ-করা সব ভুলিয়ে দেওয়া ছবি এর আগে আমিও কখনও দেখি নি মিস বারবারা, তুমি সহস্রবার সমর্থনীয়। এই ছেলেটি-মেয়েটি জানে কেমন করে ভাল-বাসতে হয়; পরস্পরকে তারা যেমন আঘাত দিয়ে ঠেলে দিয়েছে তেমনি আবার ভালবেসে টেনেও নিয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে আমরা কেউ কাউকে আঘাত দিই না, কারণ কোন দ্বন্দ্বে এগোতে আমরা সাহস পাই না। কিন্তু মিস বারবারা, আমাদের এ সাক্ষাৎ-কার যে এত গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনায় দাঁড়াবে তা কি আগে বুঝতে পেরেছিলুম—তা জানলে ভোজ্য-পানীয়ের আর নাচগানের এক উচ্ছল উৎসবেই হয় তো সন্ধেটা কাটিয়ে দিতুম। ছিঃ ছিঃ এ আমার ভারী অন্যায়! সে যাক—তুমি কি খেতে ভালবাস বল?

বারবারা স্ট্রেইস্যান্দ হাসতে-হাসতে বললেন, — মার্চেল্লো মাসত্রোইয়ান্নি, যিনি আজকের পৃথিবীর ছবির জগতের শ্রেষ্ঠ নায়ক—আমাকে যা-ই খাওয়াবে তা-ই আমার ভীষণ ভাল লাগবে, তা-ই আমার অমৃত-সমান।

গানের জলসা

গীতবিতানে রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ উদ্বোধন

গীতবিতানের সপ্তাহব্যাপী রজত-জয়ন্তী উৎসব সুরু হয়েছে ৮ ডিসেম্বর থেকে রবীন্দ্র সদনে। ঐদিন সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

এই উপলক্ষে পাঠানো এক শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জানান—'গীতবিতান এক বিশেষ সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও সুষমা যথোপযুক্ত ভাবে শিক্ষা ও প্রসারদক্ষতায় সীমাবদ্ধ নয়—চিন্তার যে গভীরতা ও মানসিক আবেদন কবিগুরুর সকল সৃষ্টির মূলে ভিত্তি—তারই অনুধ্যান সকল উৎসবে, কর্মে অনুরণন—এই প্রতিষ্ঠানের ব্রতস্বরূপ। রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে এঁদের এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আমার আন্তরিক শুভ-কামনা রইল।'

অধ্যাপক বসু তাঁর ভাষণে বলেন, রবীন্দ্রসংগীত বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে অমূল্য সম্পদ। এই দুর্লভ রত্নকে শুদ্ধ ও অপরিবর্তিতরূপে উপহার দিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তারা সংগীতরসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

গীতবিতানের সভাপতি শ্রীঅশোক সরকার বলেন, সারা দেশে আজ রবীন্দ্র-সংগীতের এই জনপ্রিয়তা ও প্রসারে গীত-বিতানের অবদান অনস্বীকার্য।

গীতবিতানের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন মজুমদার এবং নীহারবিন্দু সেন—স্বল্প ভাষণেই তাঁদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাকে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন।

মাঙ্গলিক পাঠ করেন ডাঃ সরোজকুমার দাস।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী শিশু-দিবস উপলক্ষে কবি-গুরুর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করে বললেন—সংগীত হোল পূর্ণাঙ্গ শিল্পকলা। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র গীতিকার বা কবি ছিলেন না। তিনি দার্শনিক, শিক্ষক সর্বোপরি মানবপ্রেমিক। শিশুদের শিক্ষায় তিনি জোর দিতেন তাদের শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য বিকাশের দিকে। শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের দেশে নজর খুবই কম। কবিগুরু তাঁর সহজ অন্তর্দৃষ্টির বলে উপলব্ধি করেছিলেন সুন্দর দেহই সুন্দর মনের অধিকারী হতে পারে। তাই নৃত্যের মাধ্যমে শিশুদের দেহ-সুষমা ও গীতের মাধ্যমে মনের কোমল-বৃত্তির বিকাশের সাধনায়—তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিকে প্রবাহিত করেছেন। এই দিক দিয়ে বিচার করলে গীতবিতানের গত ২৫ বছরের উদাম ফলপ্রসূ হয়েছে। শিশু-দিবসে শিশুদের নৃত্য-গীতে সার্থক শিল্পসাধনার পরিচয় স্পষ্ট।

স্বামীজীর ভাষণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবিগুরুর 'কালমৃগয়া' মঞ্চস্থ হোল। শিশুদের হাসি খেলা ও গানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান প্রথম থেকে শেষ অবধি উপভোগ্য হয়েছে। 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া', 'আয় তবে সহচরী', আমার তরে অকারণে'—আরো বহু সংগীত ভাব ও দরদের সঙ্গে পরিবেশিত। শিশুশিল্পীদের নৃত্য যেন তাদের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ। ভাবী শিল্পীরা আমাদের ভবিষ্যৎ শিল্পজগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা ও ভরসা দিতে পেরেছেন। ১৪ ডিসেম্বর অবধি কবিগুরুর নৃত্যনাট্য ও সংগীতের অনাবিল উৎসব চলবে। শেষ দুদিন উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠানে সর্বশ্রী আমীর খাঁ, নিখিল ব্যানার্জি, তারাপদ চক্রবর্তী ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর অংশ গ্রহণ করবেন।

'তানতরঙ্গমে' উপভোগ্য সংগীতাসর

গত সপ্তাহে নব-গঠিত সংগীত প্রতিষ্ঠান 'তানতরঙ্গম'—মহেশ বারিক লেনে তাদের প্রথম অধিবেশনে উপহার দিলেন দুজন নবীন শিল্পীকে।

শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদে ইমন, ধামারে 'ইমনকল্যাণ' এবং 'মালশ্রী রাগে' যথাক্রমে চৌতাল ও ঝাঁপতাল পরিবেশন করে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিত্তি ধ্রুপদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল। জীতেন সাঁতরা পাখোয়াজসঙ্গতে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন।

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য তবলা লহরায় ত্রিতালের ভিত্তিতে একতাল দাদরা ছন্দের রংদার বিচিত্র তেহাই ও লয়সমৃদ্ধ চক্রধার বাজিয়ে আসর জমিয়ে দেন।

শেষ অনুষ্ঠানে শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী বেহাগ রাগে আলাপ গতে একাধারে রাগ-রূপের সৌন্দর্য ও অলংকারদক্ষতায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। ঝটকার সুরসংগতি ও দাপটে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব সুপরিস্ফুট। অন্যান্য অলংকারের তুলনায় গমকের কাজ কিছু কমজোরী—তবে সে ক্ষতি পূরণ করেছে উল্টেঝালার সংগতে আশ ও ঘাসিটের সাঙ্কৃত কাজ। শ্রীঅনিল ভট্টাচার্যের তবলাসংগত অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন

গত ৩ ও ৪ ডিসেম্বর উত্তরী সংগীত সমাজ কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক 'সারা বাংলা শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী সম্মেলন' উত্তর কলকাতাস্থিত বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত হয়। 'সুরচ্ছন্দা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনটি উদ্বো-ধন করে বলেন—অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো সংগীত শিক্ষার্থীদেরও নিজেদের সংগীত শৈলীর উৎকর্ষের জন্য এবং সংগীত বিষয়ক তত্ত্বালোচনার জন্য এবং সর্বোপরি পরস্পরের মধ্যে এক সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিজেদের একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অভাব পূরণের জন্য উত্তরী সংগীত সমাজ প্রতি বছর এই শিক্ষার্থী সম্মেলনের আয়োজন করে থাকেন। প্রতিটা সংগীত শিক্ষার্থী প্রতি বছর এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে সম্মেলনের সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রথিতযশা ধ্রুপদিয়া শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, শিক্ষার্থীরা যেন শিক্ষাবস্তুর ওপর নিষ্ঠা রেখে সাধনায় রত থাকেন। তিনি আরও বলেন যে, কেবলমাত্র শিক্ষাই তাঁদের আহরিত জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে না; তাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রসিক ও গুণী সমাবেশে তাঁদের শিল্পশৈলী প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী বলেন, এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রতিভাবান শিক্ষার্থী-শিল্পীদের সংগীতপ্রেমী জন-সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করানো। এই প্রচেষ্টাকে সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন করার জন্য তিনি কলিকাতা তথা সমগ্র বাংলা দেশের সংগীতজ্ঞদের এবং সংগীত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান জানান।

দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনে বাংলা-দেশের বিভিন্ন জেলার এবং কলিকাতার সংগীত শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ধ্রুপদে—সাধনা মুখো-পাধ্যায় ও ভবানী ভার্গব; খেয়ালে—গীতা বসু, বুলবুল চ্যাটার্জি, শিখা ব্যানার্জি, মায়া মিত্র, গীতা সাহা, নীরা সরকার ও কিশলয় সেনগুপ্ত; ঠুংরীতে—স্বরাজ রায়; তবলা লহরায়—অভিজিৎ চক্রবর্তী, স্বরাজ ভট্টাচার্য ও স্বপন ঘোষ; সেতারে—বিমল দাস, অমরেন্দ্রনাথ ভড় ও বন্দনা বসু; সরোদে—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারত-নাট্যম নৃত্যে—রত্না চ্যাটার্জী।

সম্মেলনে অতিথি-শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী ইরা সরকার প্রথমদিনের অধিবেশনে খেয়াল পরিবেশন করেন। তবলাসংগতে ছিলেন—শ্রীবিমল চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীবেঞ্জামিন গোমেস সেতার বাজান। সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীবিশ্বনাথ বসু ও শ্রীননী চক্রবর্তী।

দুদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানগুলিকে সংগীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল পরিচালনা করেন।

ব্রেজিলের প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় টমাস কক স্বদেশের পরাজয় সত্ত্বেও সাটারডে ক্লাবের উদ্যোগে প্রদর্শনী টেনিস খেলার প্রাক্কালে 'অটোগ্রাফ' প্রার্থীদের অনুরোধ উপেক্ষা না করে স্বাক্ষর দিয়ে খুশী করছেন। তাঁর বাঁদিকে ব্রেজিলের এডিসন ম্যানডারিনো।

ফটো : অমৃত

খেলাধুলা

দর্শক

স্মরণীয় ডিসেম্বর ৬ই

ভারতীয় খেলাধুলোর ইতিহাসে তথা আমাদের জাতীয় জীবনে ১৯৬৬ সালের ৬ই ডিসেম্বরের মধ্যাহ্ন একটি স্মরণীয় শুভক্ষণ। এই সময়ে ডেভিস কাপের ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় ব্রেজিলকে পরাজিত করে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করে। আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৭ বছরের ইতিহাসে ভারতবর্ষকে নিয়ে মাত্র ১০টি দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছে। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে এই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রথম খেলেছে জাপান, ১৯২১ সালে। সুতরাং ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় দেশ।

ভারতবর্ষের এই সাফল্যের মূলে ছিলেন দুজন খেলোয়াড় — রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি। কৃষ্ণানের ভূমিকাই প্রধান এবং অতুলনীয়। কৃষ্ণান দুটি সিঙ্গলসে এবং জয়দীপের জুটিতে ডাবলসে জয়ী হন। ব্রেজিলের টমাস ককের বিপক্ষে কৃষ্ণানের শেষ সিঙ্গলস খেলায় জয়লাভ— ১৯৬৬ সালের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কৃষ্ণান পরাজয়ের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত স্বদেশকে যেভাবে জয়যুক্ত করেছেন তার তুলনা বিরল। কৃষ্ণান বনাম ককের সিঙ্গলস খেলার নাটকীয় পরিণতির সঙ্গে নিঃসন্দেহে তুলনা চলে এই দুটি আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার—১৮৮২ সালের ওভালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ৭ উইকেটে জয় (যে খেলা থেকে ঐতিহাসিক 'এ্যাসেজ' কথার উৎপত্তি) এবং ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে ব্রিসবেন মাঠে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের 'টাইম্যাচ'। ভারতবর্ষ বনাম ব্রেজিলের ইন্টার-জোন ফাইনাল খেলায় যে-কোন দেশের পক্ষে জয়লাভ অপ্রাসঙ্গিক হত না। ঘড়ির দোলন-দণ্ডের মতই খেলার গতি দিক পরিবর্তন করেছে। প্রথম দিনের প্রথম সিংগলসে ব্রেজিল জয়ী হয়ে ১-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। কৃষ্ণান এই দিনের দ্বিতীয় সিঙ্গলসে জয়ী হলে প্রথম দিনের খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে ভারতবর্ষ জয়ী হয়ে ২-১ খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় ব্রেজিল জয়ী হলে পুনরায় খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়। ফলে কৃষ্ণান বনাম ককের শেষ সিঙ্গলস খেলার ফলাফলের উপরই দুই দেশের ভাগ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তৃতীয় দিনে কৃষ্ণান বনাম ককের শেষ সিঙ্গলস খেলাটি আলোর অভাবে অসমাপ্ত থাকে। এই সময়ে কক ২-১ সেটে অগ্রগামী ছিলেন। কক সিংহবিক্রমে খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

চতুর্থ দিনের চতুর্থ সেটে দেখা গেল কক ৩-০ গেমে অগ্রগামী; তারপর ৩-১, ৪-১, ৪-২, ৫-২ এবং ৫-৩ গেমে। নবম গেমেও কক ৩০-১৫ পয়েন্টে এগিয়েছেন, আর মাত্র ২ পয়েন্ট পেলেই ককের জয় তথা ব্রেজিলের জয়। ভারতীয় মহলে তখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঠিক এই সময় কৃষ্ণানের চমক ভাঙল। এবং এই সময় থেকেই নাটকীয় কাণ্ডের সূত্রপাত। অভিজ্ঞ এবং কুশলী কৃষ্ণান তাঁর তূণ থেকে একে-একে মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন— চারিদিকে শক্ত ব্যূহ তৈরী করলেন। তাঁর কাছে কক সম্পূর্ণ ধরাশায়ী হলেন। কৃষ্ণান চতুর্থ এবং পঞ্চম সেটে জয়ী হলেন। তাঁর এই জয়—ভারতেরই জয়; আবার ভারতের এই জয়, কৃষ্ণানেরই জয়। এই জয়লাভে আমরা যতখানি আনন্দিত, ঠিক ততখানি ব্যথিত ব্রেজিলের ভাগ্য বিড়ম্বনায়। ব্রেজিল নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

রাশিয়া বনাম ভারতবর্ষ ভলিবল টেস্ট

মস্কোর সেণ্ট্রাল আর্মি স্পোর্টস ক্লাব ভারত সফরে এসে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৬টি ভলিবল টেস্টেই জয়ী হয়। রাশিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ টেস্টে ভারতবর্ষকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে। ভিলাইয়ের চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় সেটে ভারতবর্ষ ১৫—১১ পয়েণ্টে জয়ী হয়েছিল। প্রতিটি খেলায় রাশিয়ান দল অনবদ্য ক্রীড়-

নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম টেস্ট (নিউ দিল্লী) : রাশিয়া ১৫—১৩, ১৫—১৩ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

দ্বিতীয় টেস্ট (গোয়ালিয়র) : রাশিয়া ১৫—৯, ১৫—৬ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

তৃতীয় টেস্ট (রেওয়া) : রাশিয়া ১৫—৩, ১৫—৮ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

চতুর্থ টেস্ট (ভিলাই) : রাশিয়া ১৫—১১, ১১—১৫, ১৫—১৩ ও ১৫—১৩ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

পঞ্চম টেস্ট (কটক) : রাশিয়া ১৫—৮, ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ষষ্ঠ টেস্ট (কলকাতা) : রাশিয়া ১৫-১৩, ১৫-১১ ও ১৫-১২ পয়েণ্টে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

হায়দরাবাদের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বনাম সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ দলের নির্ধারিত তিন দিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ প্রথম দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি; ফলে তিন দিনের খেলা দুদিনের খেলাতে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৮টা উইকেট পড়ে ২৪৫ রান দাঁড়ায়। এই ২৪৫ রানের উপরই প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল টসে জয়ী হয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেয়। মাত্র ২ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান বাইনো এবং ডেভিস খেলা থেকে বিদায় নেন। দলকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন সেমুর নার্স এবং বেসিল বুচার। তাঁরা ৯০ মিনিটে ৮০ রান সংগ্রহ করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স এবং ডেভিড হলফোর্ড ৭২ মিনিটে দলের ৮৬ রান যোগ করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণার পর খেলার বাকি সময়ে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল ৫৪ রান সংগ্রহ করে (১ উইকেটে)।

তৃতীয় দিনে তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সমান ৮টা উইকেট খুইয়ে তাদের প্রথম ইনিংসের ২৪৫ রান অতিক্রম করে এবং ২৪৯ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলার দান ছেড়ে দেয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১৭১ রান করে।

কলকাতায় ভারতবর্ষ বনাম রাশিয়ার ষষ্ঠ অর্থাৎ শেষ ভলিবল টেস্ট খেলার একটি দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খ্যাতনামা স্পিন বোলারদের কোন রকম ভ্রূক্ষেপ না করে দৃঢ়তার সংগে খেলে বিশেষ সাহসের পরিচয় দেয়। অশোক মানকাদের খেলাই দর্শনীয় হয়েছিল। মানকাদ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উইকেটের চারদিকে নানারকমের মার মেরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়েছিলেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে মানকাদ এবং গাইকোয়াড় ৪৭ মিনিটের খেলায় দলের ৫০ রান যোগ করেন। দলের ১০৮ রানের মাথায় গাইকোয়াড় গিবসের বলে ডেভিসের হাতে ক্যাচ দিয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। তাঁর ৬২ রানে ৯টা বাউণ্ডারী ছিল। গাইকোয়াড়ের বিদায়ের পর মানকাদের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে জুটি বাঁধেন দিল্লীর কেতাদোরস্ত খেলোয়াড় মাইকেল দালভি। এই জুটি মাত্র ৩৬ মিনিটে ৬১ রান তুলে দেয়। দালভির ৩১ রানে ৫টা বাউণ্ডারী ছিল। অধিনায়ক সোবার্সের বলে শেষ পর্যন্ত মানকাদ লাঞ্চের পর বোল্ড আউট হন। তিনি তাঁর ৫৪ রানে ৮টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। হায়দরাবাদের ওয়াহিদ ইয়ার খাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলকে তাদের প্রথম ইনিংসের ২৪৫ রানের (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) থেকে কম রানের মাথায় আউট করা সম্ভব হয়নি। ওয়াহিদ ইয়ার খাঁ ৫০ মিনিটে নিজস্ব ৩৫ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। লাঞ্চের পর ৫২ মিনিট খেলে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক এস পি গাইকোয়াড় দলের ২৪৯ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি—খেলাটি শেষ পর্যন্ত অনুশীলন খেলায় পরিণত হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৭১ রানের (২ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়। রবিন বাইনো ৯৪ রান এবং বেসিল বুচার ৫৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) মেয়েদের মধ্যে কে বেশিবার উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন? (খ) যুদ্ধের পর কোন চ্যাম্পিয়ান উইম্বলেডনে পরাজয় স্বীকার করেছেন কি?

বিনীত
সুজিত মাহাতো
পুরুলিয়া

●

সবিনয় নিবেদন,

হাঙর-এর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের অনুরূপ কোন পদার্থ কুমীর ও অক্টোপাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কি?

বিনীত
নিবারণচন্দ্র বড়াল
মেদিনীপুর

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায় ব্যক্তি কে? তাঁর উচ্চতা কত এবং তিনি কোন দেশের অধিবাসী? (খ) বর্তমানে 'ময়ূর-সিংহাসন' কোথায় আছে? (গ) তাজমহলের উচ্চতা কত? (ঘ) প্যারাসুট আবিষ্কারকের নাম কি? তিনি কোন দেশের অধিবাসী এবং কবে জন্মগ্রহণ করেন?

বিনীত
সৈয়দ জাহির হোসেন
বীরভূম

●

সবিনয় নিবেদন,

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট' সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

বিনীত
সৈয়দ আলতাফ হোসেন
বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ১৯৫৯ লীগের খেলায় মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের দুটি খেলার ফলাফল কি এবং উভয়পক্ষে গোলদাতা ছিলেন কে কে?

(খ) ১৯৫৪ সালে আই-এফ-এ শীল্ড ফাইন্যালে মোহনবাগানের পক্ষে জয়সূচক গোলটি কে করেন?

(গ) করুণা ভট্টাচার্য কোন বছর মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন এবং সে বছর ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার ফলাফল কি।

(ঘ) টেস্ট ক্রিকেটে রমাকান্ত দেশাই কটি উইকেট পেয়েছেন এবং তাঁর বোলিং অ্যাভারেজ কি?

(ঙ) ক্রিকেট টেস্টে সুটে ব্যানার্জী কটি উইকেট লাভ করেছেন?

(চ) ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে হকি খেলায় ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশি গোল কে দেন এবং তিনি মোট কয়টি গোল দেন?

বিনীত
টি. কে. ব্যানার্জী
উত্তরপাড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) শর্টহ্যান্ড প্রবর্তন করেন কে?

(খ) পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কে?

বিনীত
নির্মলকুমার ঘোষ
জলপাইগুড়ি

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) 'ম্যারাথন রেস' বলিতে কি বুঝায়?

(খ) 'বাফার স্টেট' ও 'ওপেন-ডোর পলিসি' বলিতে কি বুঝায়?

বিনীত
তপন ও স্বপন দাশগুপ্ত
আগরপাড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বিখ্যাত লেখক বোকাচিত্তর সুবিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি? ম্যাকিয়াভেলির সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম কি? (খ) ক্রিকেট খেলায় ভারত কত সালে এবং কোন্ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে?

বিনীত
রমেশ ঘোষ
শিলিগুড়ি

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) চার্লি চ্যাপলিন কৃত ছবির সংখ্যা কত এবং ছবিগুলির নাম কি কি? (খ) সেক্সপীয়রের কোন্ কোন্ নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং সেগুলির পরিচালক কে কে? (গ) 'নুভেল ভগ' আন্দোলনের পুরোধা কারা এবং এর তাৎপর্য কি?

বিনীত
অসিত মোদক
হাওড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) প্রখ্যাত খেলোয়াড় 'সালে'র পুরো নাম কি? (খ) ফাউন্টেন পেন প্রথম কে আবিষ্কার করেন? (গ) বাংলাদেশে কটি আর্ট কলেজ আছে এবং এদের অবস্থিতি কোথায়?

বিনীত
বিমলেন্দু পটনায়ক
কলকাতা—৩২

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কোন পত্রিকা সর্বপ্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করেন এবং কবে? (খ) শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কি?

বিনীত কেষ্ট চক্রবর্তী
মেদিনীপুর

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম কি এবং কত সালে উহা প্রকাশিত হয়? (খ) 'রোটারী মোসিন' আবিষ্কারকের নাম কি?

বিনীত
বিমল, রীণা, অমল সরকার
পাণ্ডু, আসাম

●

উত্তর

সবিনয় নিবেদন,

২৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত কল্পনা সরকারের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন চাইবাসা হাইস্কুল থেকে প্রিয়রঞ্জন সেন। ১৯১৩ সালের এই পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রমথনাথ সরকার মোট নম্বর ৭০০ এর মধ্যে পেয়েছিলেন ৬১১। সুভাষচন্দ্র ও প্রিয়রঞ্জনের নম্বর যথাক্রমে ৬০৯ ও ৬০৭।

যতদূর মনে হয়, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি কোন গ্রাম্য কবির রচনা। কারণ প্রকৃত ঘটনার সাথে এই গানে বর্ণিত ঘটনার কোন সাদৃশ্য নেই। যদিও বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাশ তাঁর 'শহীদ ক্ষুদিরাম' নামক জীবনী-পুস্তকে গানটিকে 'ক্ষুদিরামের গান' বলে অভিহিত করেছেন।

ইতি।—

বিনীত
জনরঞ্জন হালদার
নরেন্দ্রনগর, কলকাতা-৫৬

●

সবিনয় নিবেদন,

২৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত ভাস্করদেব চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, LASER কথাটি ইংরেজী বাক্যাংশ Light Amplification by stimulated Emission of Radiation -এর আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত। আলোকতরঙ্গকে কোন কোন স্ফটিকের মধ্যে পাঠালে অতি জটিল আনবিক ও পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় প্ররোচিত বিকিরণের সৃষ্টি হয় তা থেকেই উৎপত্তি হয় অতি শক্তিশালী সুসংহত আলোকরশ্মি। একেই বলা হয় লেসার রশ্মি। আর লেসার অর্থে আমরা বুঝি এমন এক উপায় যাতে উৎসকে উত্তেজিত করে আলোকের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলে দেওয়া যায়। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিজ্ঞানী মায়ম্যান লেসার আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন।

বিনীত
অনির্বাণ দাশগুপ্ত ও শান্তনু সেনগুপ্ত
কলকাতা—৩২

সুর

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশী বাজাতে আজকাল আর কাউকে শোনাই যায় না। কে আর বাঁশী বাজায়, ওটা যেন একটা সেকেলে পৌরাণিক পোষাকের মত প্রায় পরিত্যক্ত হতে চলেছে। যদি বা কেউ বাঁশী বাজায়, তবে কখনো কখনো রেডিও। যন্ত্রের ভেতর দিয়ে বাঁশীর সুর শোনা আর স্তব্ধ কোন প্রহরে দূর থেকে ভেসে-আসা বাঁশীর সুরে আকাশ-পাতাল তফাত।

এ প্রভেদটা হয়ত বুঝতেই পারত না মণিকা, যদি না রোজ সন্ধ্যায় বাঁশীর সুরে তাকে উন্মনা করে টেনে নিয়ে আসত, তাদের ছাতে কিম্বা বারান্দায়।

ছেলেটা বাঁশী বাজায়।

আর কি কোন কাজ নেই মুখপোড়ার! ঠিক সন্ধ্যের পরে সামনের বাড়ির রোয়াকের ওপর বসে বাঁশীটি ঠোঁটে তুলে নেবে। প্রায় নির্জন এই গলিটার বাতাসকে আরও স্তম্ভিত করুণ করে তুলবে।

বাঁশীতে ফুঁ দিলে কার সাধ্যি না শুনে পারে, একটু সময় কান না পেতে পারে।

মণিকার তো সব কাজ পন্ড। কড়ায় তেল গরম হতে থাকলে কড়া নামিয়ে এক ছুটে বারান্দায়। ঘরে যদি মা থাকে, তবে ছাতে।

কি টান! ভেতরটা যেন বেঁধে দেহটাকে টেনে নিয়ে চলে যায়।

ছেলেটা কবে এল এ পাড়ায় কে জানে! এমন কর্মনাশা ছেলে বিদেয় হলে মঙ্গল।

বয়েস কত হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। মণিকার বা কম কি? তেইশ বছর পার হয়ে গেছে গেল ফাল্গুনে, এ বয়েসের ছেলে, আড্ডা নেই, তাস নেই, খেলার মাঠ নেই, পড়াশুনো কি করেছে ভগবান জানেন, সর্বক্ষণ বাঁশী। সন্ধ্যে থেকে একটানা রাত দশটা-এগারোটা অবধি।

মণিকা এ বাড়ির বড় মেয়ে। ওর পরে তিনটি বোন, দুটি ভাই, ভরন্ত সংসার। মা চিররুগী, আজ জ্বর, কাল পেটখারাপ, পরশু মাথা ধরা লেগেই আছে। বাবা মাস্টারী করেন আর ছেলে পড়ান।

মণিকা বাধ্য হয়ে ক্লাস লাইন থেকে ইস্কুলের খাতার নাম কাটিয়ে সংসারের কাজে ঢুকেছে। আজ পর্যন্তও তাই চলছে।

বিয়ের চেষ্টা মাঝে মধ্যে হয়, কিন্তু ওই চেষ্টা পর্যন্ত, তার বেশী দূরে আর গড়ায় না। ভাই-বোনরা পড়ছে, মণিকা একা সংসারের হাল ধরে ভোর থেকে রাত অব্দি খেটে চলেছে। বেশ তো চলছিল। কোত্থেকে এসে জুটল এই হতভাগা ছেলেটা একটা বাঁশী নিয়ে।

আজকালকার দিনে আবার কেউ বাঁশী বাজায়। অমন আন্দামড়া ছেলে, হাতে

একটা বাঁশী। যাদের সঙ্গের মতই মনে হবার কথা।

কিন্তু তা মনে হয় না। ছিপছিপে রোগা চেহারা, নাকটি বেশ চোখা, চোখদুটি একটু যেন বড়, দৃষ্টিটা সর্বদাই বিষণ্ণ। একটা শান্ত কারুণ্য ছড়িয়ে রয়েছে চোখে-মুখে।

মনে হয় কর্ণেট বাজালে মানাত না, গীটার বাজালে মানাত না, ওর হাতে যেন বাঁশীই মানায়। এক-একদিন এমন এক-একটা করুণ সুর ধরে যে, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অকারণেই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। চোখ ছাপিয়ে জল বেরোতে চায়।

এ কি আপদ যে জুটেছে!

মণিকা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

সামনের একতলার বাড়ির বীণার কাছে ওর খবর পাওয়া যায়। বীণাদের বাড়িরই একটা ঘরে থাকে ছেলেটা একা। হ্যাঁ, একেবারে একা থাকে। ত্রিকুলে কি কেউ নেই ওর?

বীণা বলে,—বাপ-মায়ের সঙ্গে বনে নি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে এসেছে।

এ আবার কেমন কথা! বাপ-মায়ের সঙ্গে আবার বনিবনার প্রশ্ন কি করে! নিজের খুশী, নিজের ইচ্ছের সঙ্গে বাপ-মায়ের ইচ্ছের মিল কারই বা হয়।

মণিকার নিজেরই কি মনে মনে বাবা-মায়ের সঙ্গে মিল হয়। মোটেই নয়। তবু হাজার হোক গুরুজন। মুখে কিছু বলা যায় না।

বাপ-মায়ের সঙ্গে আবার কেউ আলাদা হয়! ছেলেটা একেবারেই হতচ্ছাড়া মনে হচ্ছে।

বীণা বলে, — কাশীপুরে না ইছাপুরে কোন একটা কারখানায় কাজ করে। ভোরে বেরোয়, বিকেলে ফেরে। সকালে তো কিছু খেতে দেখি নে ভাই। রাত্তিরে বোধহয় কোন হোটেল-টোটেল থেকে খেয়ে আসে। এ সব কথা কি জানতে পারতুম? ছেলেটা ভীষণ গোমড়া-মুখো। হাসে না, কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। দাদা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, সব কথা বলতে চায় না।

বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে কামড়াতে কামড়াতে মণিকা বলে,—লেখাপড়া কদ্দুর করেছে জানিস?

—লেখাপড়া! মা গঙ্গা! মাথায় হাতুড়ি ঠুকলে 'ক' বেরোবে না। কে জানে গাঁজা-সিদ্ধি খায় কিনা। দু' চক্ষের বিষ!

বলে বীণা ওর ফুলো ঠোঁটদুটো বাংলার চারের মত আরও বেশী করে ফোলায়।

বীণার কথার ঢংটা মণিকার পছন্দ হয় না। ওর সবেতেই যেন দেমাক, তবু যদি না ওর দাদা দু' বারে ম্যাট্রিক পাশ করত!

কিন্তু কি আশ্চর্য। কেউই ছেলেটাকে ভাল চোখে দেখে না। সত্যিই ছেলেটাকে দেখলেই মনে হয় হতচ্ছাড়া। মণিকাই কি ভাল চোখে দেখতে পারে? মোটেই নয়।

বীণা একটু মুচকি হেসে বললে,—ছেলেটা কিন্তু বামুন। চাটুজ্যে।

মণিকারা ব্রাহ্মণ, তাই কি বীণা তামাসা করে কিছু একটা বোঝাতে চাইছে?

মণিকা ভুরু কোঁচকাল,—তার মানে?

বীণা হাসল,—মানে, বলিস তো আমি মাসীমার কাছে সম্বন্ধের কথাটা পাড়তে পারি।

মণিকার বুকটা দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠল। মুখে গায়ে বিরক্তি এনে বললে,—আমাকে তুই কি ভাবিস বল তো?

বীণা আর কথা বলল না।

মণিকার অনেকবার মনে হয়েছিল ছেলেটির নাম জিজ্ঞেস করে, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয় নি, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে বাধা দিয়েছে। বীণা কি ভাববে!

সত্যি তো আর সে ছেলেটা সম্পর্কে কিছুমাত্র দুর্বল নয়, শুধু ওই বাঁশী। বাঁশীর শব্দটা কানে এলে ও আর কোন মতে স্থির থাকতে পারে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মাকে চা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মা বললে—পিঠের ঘামাচিকটা একটু মেরে দিবি? রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না।

সন্ধ্যেবেলা আবার ঘামাচি মারবে কে বসে। মায়ের কথার কোন ছিরিছাঁদ নেই!

তবু নীরবে একটা ঝিনুক নিয়ে বসল মণিকা।

কানে এল বাঁশীর সুর। বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে ছেলেটা।

এক মুহূর্তে মণিকার মনটাকে ধরে যেন টান মারল। প্রতিটি প্রত্যঙ্গে বাঁশীর সুরের ঢেউ এসে যেন আছড়ে পড়ছে। বাইরের সব বোধগুলো যেন ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসে, দেহ-মনের সবকিছু যেন ধীরে ধীরে একমুখী হয়ে ওঠে।

হঠাৎ মায়ের তর্জনে ওর খেয়াল হয়।

—আঁচিলটা ছিঁড়ে দিলি তো মুখপুড়ি!

ঘামাচির বদলে ঝিনুক দিয়ে একটা আঁচিল একটুখানি ছিঁড়ে ফেলেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে জায়গাটায় একটু চুন লাগিয়ে দিতে দিতে বলে,—সন্ধ্যেবেলা কি ঘামাচি দেখা যায়! ভাল করে দেখতে না পেলে কি করব?

বলতে বলতে গলাটা ওর একটুবা কাঁপে। সে জানে মায়ের কাছে ধরা পড়েছে কিনা। ওখান থেকে উঠে নীচে যাবার আগে ছাতের আলসেয় গিয়ে দাঁড়ায়।

ওই তো বসে রয়েছে ছেলেটা। গেঞ্জি পরে—একটা পায়ের ওপর পা রেখে বসেছে। ঘাড়টা একটু কাত করে বাঁশীটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

মণিকা আলসের ওপর দুটো হাত রেখে বুক চেপে দাঁড়ায়। থুতনীটা হাতের ওপর রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাঁশীর সুরটা কি মিষ্টি যে লাগে! কেমন যেন মনে হয়, ইচ্ছে হয় অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে। নয়তো বা ঘুমিয়ে পড়তে, কি যে ইচ্ছে হয়, ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না মণিকা।

ভাল লাগে। সংসারের এই একটানা একঘেয়ে কাজের চাপের ভেতর থেকে একটু সময়ের জন্যে যেন সব ভুলে গিয়ে একটু ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারে।

উদ্ধত যৌবনের জ্বালাটা যেন কিছু সময়ের জন্যে স্তব্ধ হয়। এ আলতো মিষ্টি সুর, সব জ্বালা সব পীড়নকে যেন ধুয়ে-মুছে দেয়।

ছেলেটা বাঁশী নামিয়ে ঠিক তাকিয়েছে ছাতের দিকে। রোজই তাকায়। ওর দৃষ্টিতে কোন কৌতুক কৌতূহল কিছুই নেই। বিষণ্ণ ভাসা-ভাসা চোখদুটো মেলে একটু সময় তাকিয়ে থাকে।

কোনদিনবা দু'বার-তিনবার তাকায়। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে কোন ইসারা নেই, কোন কৌতুক নেই।

মণিকার মনে হয়, সেই ভাসা-ভাসা দৃষ্টিটা যেন শুধু বলে—এসেছ?

মণিকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—ও চায়—এসেছি।

বাঁশীটা কোঁচার খুঁটে মুছে ঠোঁটে তোলবার আগে আর একবার তাকায়—শোন।

মণিকা যেন বলতে চায়—বাজাও, শুনি।

তারপরই বাঁশীতে ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার চোখদুটো আধবোজা হয়ে আসে। সুরের পর সুর বেরোয়।

অনেকটা সময় যেন একটা মুক্তির স্বাদে কেটে যায়।

বাঁশী থামে।

—কেমন লাগল?

মণিকার চোখেমুখে পুঞ্জ পুঞ্জ খুশি, বলতে চায়—বড় মিষ্টি, মুহূর্তগুলো মিষ্টি হয়ে উঠল। যেন স্নান করে উঠলাম।

ছোট ছোট শান্ত দুটো-চারটে নীরব কথাবার্তা। মনে-মনে, ভাবে-ভঙ্গীতে।

এরপর হয়তো মণিকাকে রান্নাঘরে চলে যেতে হয়। ভাত নিশ্চয় ফুটে উঠেছে। এখন আর নীচে না গেলে নয়।

নেমে দেখে দোতলায় ভাই-বোনরা পড়তে বসেছে, বাবা খবরের কাগজে চোখ রেখে বসে আছেন। মা তার অসুখের কথা বলছে। বাবা ডাক্তারবাড়ি যাবেন কিনা চিন্তা করছেন।

করুণা হয় এদের জন্যে।

এই মুহূর্তে যে স্বাদটুকু সে পেল, সে-স্বাদ থেকে এরা বঞ্চিত। এরা পেল না।

সে গোপনে লুকিয়ে তার দিনরাত থেকে কিছুটা সময় চুরি করে মুঠো মুঠো ফুলের মত বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে এল এবং/অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে সুরের স্রোতে একটা ডুব দিয়ে স্নান করে এল। এরা জানল না, এরা অস্নাত উগ্রতায় ভুরু কুঁচকেই রইল চিরকাল।

বীণা এসে সেদিন বললে—মন্টুবাবুর সঙ্গে আজ আলাপ হোল।

—কি রকম? মণিকা কৌতূহল চেপে সহজ স্বরে প্রশ্ন করবার চেষ্টা করল।

বীণা বুকের আঁচলটা টেনে বললে,—আজ ছুটির দিন। বাবু বেরিয়েছিলেন সকালে, ফিরলেন বেলা দুটোয়। তেল মেখে চৌবাচ্চার ধারে এসে চক্ষুস্থির। চৌবাচ্চার জল সব শেষ। তা হবে না কেন বল ভাই। অতগুলি মানুষ, ঘর ধোয়া, বাসন মাজা, চান, আঁচান, জল আর থাকে? দাদা তখন খেয়ে আঁচাচ্ছিল, দাদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললে, একটু জল দিতে পারেন, মাথাটা ধুয়ে গা মুছে ফেলতুম। দাদা আমাকে হুকুম করে ওপরে চলে গেল। এক বালতি জল নিয়ে বাইরে বার করে দিলুম, মুখে হাসি বেরোল। ন'মাসে ছ'-মাসে একবারও তো হাসতে দেখি না, আজ হাসতে দেখলাম। বললে, বাঁচালেন। গা-হাত-পা সব জ্বলছিল। বললুম, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? চান করে বেরোলেই পারতেন? বললে—বাঁশী শিখতে গিয়ে-ছিলুম। আর চান করলেই আমার খিদে পায়, তাই চান করে বেরোই না। বললুম—চান করে না হয় একটু কিছু জল খেয়ে বেরোবেন। কথা বলল না। হাসল। তারপর ওর বাঁশী বাজান অনেক কথা হোল।

মণিকার মুখখানা বিমর্ষ দেখাল। তবু হাসবার চেষ্টা করে বললে—কি কথা হোল?

—সে-সব অনেক কথা।

বীণা কিছু কথা গোপন রাখতে চায়। হতে পারে হয়তোবা মণিকার কৌতূহল বাড়াবার জন্যে। বীণার চোখের সামনে সে কি তার মনোভাব লুকোতে পারছে?

বোধহয় না। মেয়েরা মেয়েদের ভান চট করে ধরে ফেলে। সহজে লুকোন যায় না।

কৌতূহল যে তার প্রচুর ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবু ভাববার চেষ্টা করল। বীণা যদি কিছু না বলে তার ভারী বয়েই গেল।

কথা শুনে কি হবে? ওর মুখে কথা শুনতে মণিকার নিশ্চয় ভাল লাগবে না। ওর বাঁশী ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না, হয়তো বা আলাপ হলে, ওর মুখের বোকা-বোকা কথা শুনলে, ও যে মিষ্টি গোপন স্বাদটি প্রাণভরে উপভোগ করছে, সেটি হয়তো আর পাবে না, আক্ষেপ করে কি লাভ? ওর বাঁশীর আলাপ শুনতে অনেক বেশী ভাল লাগে।

বীণা বললে—দাদা কিছুদিন ধরেই বলছিল, মন্টু হোটেলে খায়। ও না হয় কিছু টাকা দিয়ে আমাদের ঘরে খেতে পারে। মায়ের কিন্তু অমত। বামুনের ছেলে, আমরা কায়েত, আমাদের ঘরে খাবে। দাদা বললে, হোটেলে কি এমন শুদ্ধ বামুনের হাতে খাচ্ছে! তা যদি বলিস ভাই, আমারও অমত আছে। রান্না তো আমিও মাঝে মাঝে করি। শেষকালে নুন বেশী হোল, না ঝাল বেশী হোল, এই ভয়ে আমায় তটস্থ থাকতে হবে।

বীণা একটু অন্যমনস্কভাবে বললে—আজও দাদা বলছিল, ওকে একবার বলে দেখবে।

মণিকা এবার আর হাসতে পারে না। বলে,—বেশ তো, ভাল তো।

মণিকা আর কোনমতেই সহজ হতে পারছে না।

বীণা আরও কিছুক্ষণ ধানাই-পানাই গেয়ে উঠে চলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় মণিকার মনটা ভার-ভার রইল। কোনমতেই ও সহজ হতে পারছিল না। ভাই-বোনদের ওপর অকারণে রেগে উঠছিল। একই বাটনা পাঁচবার করে বাটছিল।

বীণাকে কি মণিকা ঈর্ষা করছে?

মোটেই না। হিংসের কি আছে। বীণাদের বাড়ি থাকে, বীণার সঙ্গে যে এতদিন আলাপ হয়নি এইটেই তো আশ্চর্য্য! হোক আলাপ। না-হয় প্রেমেই পড়ুক, তাতেই বা তার কি আসে যায়! সে তো ছেলেটাকে এমন কিছু পছন্দ করে না। নেহাৎ বাঁশীটা ভাল বাজায়—তাই।

শুনবে না। বাঁশী আর শুনবে না মণিকা।

দুটো-চারটে দিন হয়তো খুব খারাপ লাগবে, তারপর অভ্যেস হয়ে যাবে।

সন্ধ্যেবেলা রান্নাঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে রান্না করবে, আওয়াজটা কানে না এলেই হোল। তাতে যদি একটু গরম লাগে—লাগুক।

তাতেও যদি মনটা ভাল না লাগে, ছোট বোনদুটোর সঙ্গে লুডো খেলতে বসবে। বাঁশীর আওয়াজটা যাতে না শোনা যায়, সেজন্যে বোনদুটোর সঙ্গে খেলা নিয়ে একটু চেঁচামেচি-ঝগড়া বাধিয়ে দেবে!

বয়ে গেল। বাঁশী যেন পৃথিবীতে আর কেউ বাজায় না!

ধুত্তোর, এ-সব ভাববারই বা কি দরকার? কোথাকার একটা ছেলে, চাল নেই, চুলো নেই। রোগা কালো চোয়াল-ভাঙা মুখ! হাতে আবার যাত্রাদলের মত একটা বাঁশী।

মণিকাও ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে বাংলার চারের মত উল্টোতে চায়।

নীচে নেমে যায়।

সন্ধ্যের পর ঠিক বাঁশীর আওয়াজ কানে আসে। আসুক, ও যাবে না। ছাতে যাবে না, বারান্দায় দাঁড়াবে না। হতচ্ছাড়া বাজাক বাঁশী কতক্ষণ বাজাবে! বীণাকে শোনাক, তার শোনবার দরকার নেই।

—না। আর সে বাঁশী শুনতে চায় না।

এমনি করে আটদিন কি দশদিন কেটে গেছে। দিন গোনেনি মণিকা, তাই কতদিন কেটেছে তার ঠিক খেয়াল নেই। সামান্য কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে ও। বাঁশীর শব্দ

কানে আসে, হয়তোবা নিজেরই অজ্ঞান্তে তন্ময় হয়ে যায়, আবার চমক ভাঙলেই অন্য কাজে মন বসাবার চেষ্টা করে।

এমনি করে ধীরে ধীরে কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে রাত গড়াল, বাঁশীর আওয়াজ পেল না মণিকা। বছর-খানেকের ওপর সন্ধেবেলা একটা মিষ্টি আওয়াজ কানে আসাটা ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, সেদিন অকস্মাৎ সন্ধ্যে থেকে একবারও বাঁশীর আওয়াজ না শুনতে পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

কি হোল? তবে কি আজ বাড়ি নেই? না কি অন্য কোথাও চলে গেছে!

বীণাও আর আসেনি ওদের বাড়িতে। কেন আসেনি, সেটা বুঝতে দেরী হয় না।

রোজই তো দেখতে যেতে হয়

নিশ্চয় ওই বাঁশীওলার সঙ্গে আলাপে মশগুল রয়েছে।

কিন্তু আজ এমন অঘটন ঘটল কি করে? বাঁশীর শব্দ শুনতে পায়নি—এমন সন্ধ্যের কথা তার তো মনেই পড়ে না।

তবে কি বীণাকে নিয়ে সিনেমায় গেল, কিংবা কোথাও বেড়াতে?

মণিকা বাজে ভাবনায় বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সেদিন।

কিন্তু একদিন নয়। একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন—না, বাঁশীর শব্দ আর নেই। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যের পর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মণিকা। ছেলেটা নেই। রোয়াকটা খালি। মাঝে একটা কামারশালা, তার পাশে একটা ছোট চায়ের দোকান, গলির মোড়ে মস্ত মিষ্টির দোকানটার সামনে একটা চিনেবাদামওলা ঠিক বসে আছে। ছেলেটা নেই। রোয়াকটা শূন্য।

পরের দিনও নেই, ছেলেটাও নেই, বাঁশীও নেই।

মণিকা অস্থির হয়ে উঠল। ওর দিন-রাতের সব কাজ, সব মানুষ, সব দৈনন্দিন প্রয়োজন ঠিক আছে, শুধু সন্ধ্যের পর একটা কিছু নেই। আর সেই 'কিছু' যে ওর মনে এত বড় একটা জায়গা দখল করেছিল, ও ভাবতেও পারেনি।

সন্ধ্যের পর থেকে ভাল করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। অকারণে ভয়-ভয় করে, বিনা কাজে বারবার ওপরে-নীচে ছুটোছুটি করে অস্থির হয়ে উঠেছে মণিকা।

চারদিনের দিন ও বীণাদের বাড়ি যাবে ঠিক করল। ছুতো একটা আছে। বীণা অনেক দিন আসেনি। এই ছুতোয় একবার যাওয়া যেতে পারে।

গেলও তাই।

বীণা শাড়ি পাল্টে কোথাও বোধহয় বেরোবার উদ্যোগ করছিল। ওকে দেখে বলল, ভাগ্যিস এসেছিস, আর একটু পরেই বেরিয়ে যেতাম।

বলে মায়ের দিকে আর দাদার দিকে তাকিয়ে বলে,—আজ আর তবে আমি যাব না, তোমরাই যাও।

মণিকা জিজ্ঞেস করল—কোথায়?

—হাসপাতালে। ও বাবা, আমাদের বাড়িতে যা কাণ্ড হোল এ ক'দিন! সেই-জন্যেই তো যেতে পারিনি। মন্টুবাবু জ্বর বাধিয়ে বসলো। কি জ্বর, কি জ্বর! মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। ওর বাড়িতে খবর দেয়া হোল। তারা এসে ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার বললে হাসপাতালে দিন। রোজই তো দেখতে যেতে হয়। ওর মা-বাবাও অবিশ্যি দেখতে যায়। বেশ বড় ঘরের ছেলে—ওর বাপ কি একটা মস্ত চাকরি করত। রিটায়ার করেছে।

এবার অসুখ সারলে আর বোধহয় এখানে থাকবে না, বাড়ি চলে যাবে।

মণিকা যা জানতে এসেছিল, সে-কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই বীণা গড় গড় করে সব কথা বলে গেল। মণিকা মাঝে মাঝে একটু-আধটু হুঁ-হাঁ করল মাত্র।

কি বকর বকর করতে পারে বীণা! ছেলেটার গুষ্টির সব খবর সে মুখস্ত বলে গেল।

একটু স্তব্ধ ভাব নিয়ে বিষণ্ণ মনে চলে এল মণিকা।

না, আর নয়। এবারে তাকে বাঁশীর কথা ভুলতেই হবে। আবার সেলাই আরম্ভ করবে। মায়ের হাত-পা টিপে দেবে। তাতেও যদি সময় না কাটে? একটা লাইব্রেরীতে ভর্তি হওয়া যায় না! বই পড়লেও তো সময় কাটে?

আরও দশটা বন্ধ্যাদিন কেটে গেল। এক টুকরো আনন্দ প্রসব করল না একটি মুহূর্তও।

আর বীণাদের বাড়ি যায়নি। বীণাও আর আসেনি।

সেদিনও সন্ধ্যের পর কুমড়ো-আলুর তরকারী একটু কালো জিরে ছিটিয়ে দিয়ে নাড়ছিল মণিকা। কুমড়োটা বেশ আঠার মত হয়ে এসেছে যখন, যখন ও ভাবছে আর একটু জল দেবে কিনা তরকারিতে, সেই সময় হঠাৎ কানে এল বাঁশীর আওয়াজ। ক্ষীণ করুণ একটি সুর বাতাসে ভেসে এল। বুকের ভেতরটা ওর মোচড় দিয়ে উঠল। তক্ষুণি কড়া নামিয়ে ছুটে গেল ও ছাতে, আলসের ধারে।

বাজাচ্ছে। রোয়াকে বসে একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে ঘাড়টা একটু হেলিয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে।

ছেলেটি যেন বার বার তাকাচ্ছে আলসের দিকে। মণিকার দিকে।

বাঁশীর সুর গুমরে গুমরে এসে ওর বুকটা মোচড়াচ্ছে।

মণিকা এক অসহ্য আবেগে ছুটে নেমে এল দোতলায়। একটু টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে খসখস করে লিখল—'তুমি চলে যেও না। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

কাগজের টুকরোটা নিয়ে ছুটে আবার চলে গেল ছাতে। এই কাগজের টুকরোটা ওকে দেখিয়ে ওর কোলে ফেলবে ওপর থেকে।

বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে।

ছেলেটা বাঁশী থামিয়েছে, ওর দিকে তাকাচ্ছে। রুগ্ন বিষণ্ণ চোখদুটো বাঁশীর সুরের সবই করুণ।

মণিকা পারল না। কাগজের টুকরোটা ওর কোলের কাছে ফেলতে পারল না।

শক্ত আঙুলে কাগজের টুকরোটা আরও ছোট ছোট টুকরো করে ছিঁড়ে হাতের ওপর থেকে বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

ওর ছিন্নভিন্ন আবেগের মত থরথর কাঁপতে কাঁপতে পাতলা কাগজের টুকরো-গুলো নামতে লাগল নীচের দিকে।

ছেলেটা তখন বাঁশীতে আবার সুর তুলছে এক মনে ঘাড় কাত করে। ...

অঙ্গনা

প্রমীলা

দিনে দিনে

দিনে দিনে কত তফাৎ। যুগ থেকে যুগান্তরের তো কথাই নেই। যে দিন চলে গেল তাকে ফিরে পাওয়া আমাদের পক্ষে কল্পনাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সবত্রই এই কথাটা সমান সত্যি। পুরনো দিনকে ফিরে পাওয়া যায় না। এ চেষ্টা যারা করেন তাদের পক্ষে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো সার হয়। তবু আমরা চেষ্টা করি পুরনো দিনের রেশ অনুভব করতে—অতীতের মায়াঞ্জন পরে বর্তমানকে মোহময় করে রাখতে। সে প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়। কিন্তু তার ফলে আমাদের পশ্চাৎগামী মনোভাব হয়তো প্রাধান্য পায়। আবার অনেকে বলবেন এ হচ্ছে অতীতের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ঋণস্বীকার। কথাটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। আজকের দিনে সবকিছু অস্বীকার করে দুর্মদ-গতিতে 'শুধু ধাও শুধু ধাও' রবে চারদিক মুখরিত হবার মুহূর্তে এরকম মনোভাব প্রশংসনীয় বৈকি। তবু এরই মধ্যে একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে এবং তার ফলে মনোভাবে মনোভাবে পার্থক্যও বিস্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আর অতীতের কাছে আত্মসমর্পণ করা এক কথা নয়। দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ বিপরীত মেরুতে উভয়ের অবস্থান। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অর্থে অতীতের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ। কিন্তু অতীতের কাছে আত্মসমর্পণ অর্থে অতীতকে শ্রদ্ধা করা নয়। বরং বর্তমানকে অস্বীকার করে অতীতের আলেয়ায় নিজেকে বিভ্রান্ত করা। বর্তমানকে অস্বীকার করার প্রবণতা যদি আমাদের মধ্যে প্রাধান্য পায় তবে সে দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। অতীতের মোহে ডুবে থেকে আমরা বর্তমানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারিনি। এ দায়িত্ব যদি আমরা নিতে না পারি তবে সমস্ত জীবনব্যাপী এক সুদীর্ঘ ব্যর্থতার বোঝা আমাদের বয়ে বেড়াতে হবে।

আমাদের অনেকের মধ্যে এই অতীত-প্রবণতা বিশেষভাবে বিদ্যমান। আমরা যেন অনেক পরিমাণে অতীতের দাস হয়ে গেছি। কথায় কথায় বলতে শোনা যায়, 'আমাদের সময় কিন্তু এরকম ছিল না ভাই।' অথচ কথাটা বলার সময় অবলীলাক্রমে আমরা বলে ফেলি। একবার ভেবে দেখি না সে দিন এবং কাল আজ অনেকদিন গত হয়েছে, অতীতের আলোক থেকে অনেক দূরে এসে আমরা নতুন আলোকে মানুষ হয়েছি। অথবা আজকের ভিন্ন পরিবেশ—রেডিও, টেলিভিশন, স্পুটনিক প্রভৃতি জিনিষ ভেবে দেখি না। সেদিন কে একজন বলছিলেন, 'আজকের মেয়েরা বড় ধিঙ্গি হয়েছে। আমাদের সময় এতটা বাড়াবাড়ি করার যো ছিল না।' কথাটা লক্ষ্য করার মত। মেয়েরা ধিঙ্গি হয়েছে সত্যি কথা। এর তালিকায় হয়তো তার নিজের মেয়েও আছে। কিন্তু তাদের সময় এরকম করার যো ছিল না। কথাটা খুব ব্যঞ্জনাত্মক। সুযোগ পেলে তারাও এরকম ধিঙ্গিপনা করতেন, কথাটায় সেরকম মনোভাবই ধরা পড়ে। তবে কেন আজকের মেয়েদের প্রতি অযথা দোষারোপ? যে সুযোগ এবং সুবিধা তারা পাননি আজ সেই সুযোগ এবং সুবিধা বর্তমান। মেয়েরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে মাত্র। সেটা তাদের পক্ষে দোষের হতে পারে না। বরং যে সুযোগের অভাবে তারা গুমরে ফিরেছেন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারে তাদের উল্লসিত হওয়াই উচিত। তাদের ব্যর্থতাকে আজকের মেয়েরা সার্থকতায় উজ্জ্বল করেছে। এ গৌরব তাদেরও স্পর্শ করবে। কারণ এরা তো তাদের প্রাণপুত্তলি।

শিশু : স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

দীপান্বিতার আলোকমালা শুধু আমাদেরই মুগ্ধ করে না বিদেশীদের হৃদয়েও সমান আনন্দের হিল্লোল তোলে। আলোর এই তপস্যা আমাদের যুগ-যুগান্তরের। হাজার আলোর মালায় সেদিন ঝলমলিয়ে ওঠে গৃহাঙ্গন—মাটির প্রদীপ থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাইয়ে সব অন্ধকার দূরে সরে যায়। উৎসবপ্রমত্ত আমাদের আলোকসজ্জার এই স্বপ্নমোহে যখন মশগুল হয়ে থাকে বিদেশীদের মন তখন হারিয়ে যায় আর এক উৎসবের স্মৃতি-সৌরভে। সে উৎসব বড়দিনের। সেদিনও এমনি চারিদিক আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনায় এই সমন্বয় বিশেষ লক্ষ্যণীয়। উভয়ের সাধনা আলোকের সাহচর্যলাভ — অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের। আলোর পরশে মানুষের হৃদয় সজীব হয়ে উঠবে। অন্ধকার দূরে সরে যাবে। আনন্দগানে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠবে।

শিশুর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সমস্ত জাতির। কারণ শিশুই তো আগামী-দিনের আশা-ভরসা। পৃথিবীর দেশে দেশে তাই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতের প্রতি সবাই সদা সতর্ক। আমাদের দেশেও শিশুদের প্রতি যথাসাধ্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিবস পালিত হয় 'শিশু দিবস' রূপে। এ থেকেই আমাদের দেশে শিশুদের প্রতি দেশ ও জাতির কর্তব্যবোধের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের মত গঠনমূলক দেশে শিশুদের জন্য যথাসাধ্য করা হচ্ছে। সম্প্রতি বৃটেন থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেছে সে দেশে এখন আর কোন শিশুই তার অবস্থা, জাতি এবং পিতামাতার আয় নির্বিশেষে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সকল সুযোগ পেয়ে থাকে। পাঁচ থেকে পনের বছরের শিশুদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে এতটা ব্যবস্থা করা না গেলেও প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আবার কোন কোন প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাও অবৈতনিক করা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের সর্বত্র শিশুদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

বৃটেনের শিশুরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য পায় সেজন্য সমস্ত সরকারী স্কুলে খাদ্য ও বিনামূল্যে দুধ পেয়ে থাকে। ১৯৪৪ সালেই এদেশে স্কুল ছাত্রদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্কুলেই মধ্যাহ্নভোজ করত। সেই বছরেই শিক্ষা আইনে ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য অর্থ নিয়ে এরকম মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করতে বলা হলো। বর্তমানে স্কুল ছাত্রদের শতকরা ৬৫ ভাগ এরকম মধ্যাহ্নভোজের সুযোগ পাচ্ছে। এজন্য সরকারী তরফ থেকে খরচ হচ্ছে নয় কোটি পাউন্ড। আবার ছাত্রদের শারীরিক সুস্থতার প্রতিও কড়া নজর রাখা হয়। এ দায়িত্ব আগে ছিল স্কুল হেলথ সার্ভিসের। এখন এর কাজের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের সহযোগিতায় একে একটি রোগ প্রতিরোধী সংস্থায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে শিশুরা এখন রোগ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারে। এর ফলে শিক্ষার সম্পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে। গত বিশ বছরে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ছেচাল্লিশ থেকে কমে উনিশে এসে দাঁড়িয়েছে। ডিপথিরিয়া, পোলিও, টিটেনাস, হুপিং কাশি, যক্ষ্মা প্রভৃতি যেসব রোগে বৃটেনের শিশুরা আক্রান্ত হতো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং টিকা দেওয়ায় ফলে সেগুলি আর হয় না। আর হলেও খুব মারাত্মক হতে পারে না। অপুষ্টি এখন আর কোন সমস্যা নয় এবং আজকের শিশুরা দেহের দৈর্ঘ্য ও ওজন আগেকার শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি।

আমাদের দেশে অবশ্য এতটা ব্যবস্থা এখনও করা সম্ভব হয়নি। অধিকাংশ প্রাইমারী স্কুলে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্কুলে টিফিন এবং মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কিছু করে ওঠা এখনও যায়নি। তবে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি এখন বেশ যত্ন নেওয়া হয়। শিশুমৃত্যুর হারও স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং আজকের শিশুরা নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তীদের তুলনায় স্বাস্থ্যবান এবং সম্পন্ন ভবিষ্যতের অধিকারী। নানারকম রোগাক্রমণ থেকে শিশুস্বাস্থ্য বাঁচানোর জন্য এখন আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই। গঠনমূলক জাতি হিসেবে এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। ভবিষ্যতে আমাদের এই সাফল্যের সামগ্রিক রূপ যে বিশ্বে নতুন চমকের সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

মায়ের ওপর শিশুর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বৃটেন শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আজ যে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছে তার অন্যতম কারণ মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি সদাসতর্ক মনোভাব। সেদেশে প্রতিটি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক বিনাব্যয়ে একজন ডাক্তার, একজন মিডওয়াইফ, একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও দন্ত চিকিৎসকের সাহায্য পাবার অধিকারী। তাছাড়া দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে মাতৃ ও শিশুসদন যেখানে প্রাক-প্রসব ও প্রসবোত্তর যত্ন নেওয়া হয়। এখানে মায়েদের অতি অল্প মূল্যে কমলালেবুর রস ও কডলিভার অয়েল এবং ভাবী মায়েদের কডলিভার অয়েলের বদলে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' ট্যাবলেট দেওয়া হয়। এর ফলেই সেদেশে শিশুস্বাস্থ্যের এই অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আমাদের দেশে এক্ষেত্রে যথেষ্ট পশ্চাদগামিতা রয়েছে। মায়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা এখনও করে উঠা যায়নি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য চাই সার্বজনীন ব্যবস্থা। তখন সকল মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি সমান লক্ষ্য রাখা যাবে এবং আমাদের শিশুস্বাস্থ্যের ভাবনাও অর্ধেক কমে যাবে।
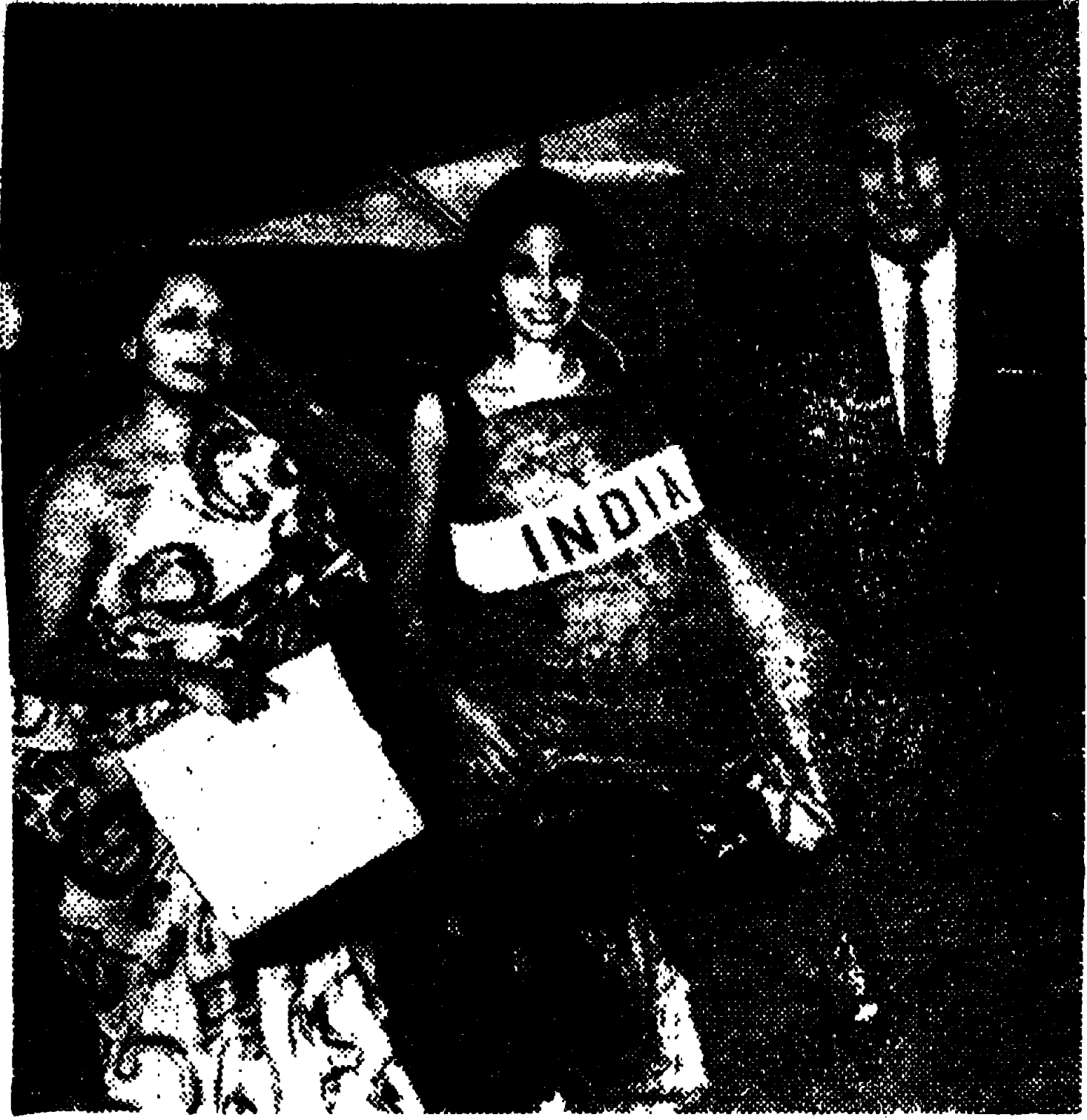
কুমারী নিত্যা ভান্ডারী 'এশিয়া-সুন্দরী' প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য সম্প্রতি ব্যাঙ্কক যাত্রা করেন। সাম্প্রতিক একটি প্রতিযোগিতায় তিনি 'কলকাতা-সুন্দরী' আখ্যা পান। থাই এয়ার ওয়েজের উদ্যোগে ব্যাঙ্ককে এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বর্তমানে শুধু ইংলন্ড ও ওয়েলস-এই সত্তর লক্ষ থেকে আশী লক্ষ স্কুল ছাত্র রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় চাল্লিশ লক্ষ ছাত্র পড়ে তেইশ হাজার সরকারী প্রাইমারী স্কুলে এবং প্রায় ত্রিশ লক্ষ ছাত্র পড়ে ছয় হাজার সরকারী সেকেন্ডারী স্কুলে। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই পড়ে মডার্ণ স্কুলে এবং টেকনিক্যাল স্কুলে। মাত্র এক লক্ষ ছাত্র পড়ে গ্রামার স্কুলে। এছাড়া আছে 'কম্প্রিহেনসিভ স্কুল'— যেখানে ছাত্ররা প্রয়োজনবোধ করলে বিষয় পরিবর্তন করতে পারে। সম্প্রতি এক সরকারী আদেশে সমস্ত সেকেন্ডারী স্কুল 'কম্প্রিহেনসিভ' ধরনে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

অবশ্য সবাই যে ছেলেমেয়েদের এখানে পড়াতে পাঠান তা নয়। সরকারী উদ্যোগে শিক্ষার এই বিরাট ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে রয়েছে সকলের উদার আমন্ত্রণ। যে সব পিতামাতা এসব সরকারী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ান না, তারা নিজ ব্যয়ে সন্তানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। সরকারী স্কুলের পাশাপাশি নানারকম স্বাধীন স্কুলও রয়েছে। যেসব ছাত্র উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাদের জন্য ছত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও দশটি কারিগরী কলেজে অসংখ্য বৃত্তি, অনুদান প্রভৃতির ব্যবস্থা রয়েছে।

শিশুদের প্রতি এই বিরাট কর্তব্য পালনে আমাদের দেশও অঙ্গীকারবদ্ধ। শিশুর স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসূচীর পূর্ণ রূপায়ণের মাধ্যমেই আমরা একদিন সমগ্র দেশ জুড়ে আনন্দনিকেতন গড়ে তুলতে পারবো।

মনোবিকার একটা রোগমাত্র

পূর্বাঞ্চলের একটা সাধারণ ঠাট্টা— 'সুঁচী খাও'—বিহারে বলে 'কাঁকে খাও'। ইঙ্গিতটা যাই হোক না কেন কাঁকে বেড়াতে সকলেরই ভালো লাগবে।

রাঁচী স্টেশন থেকে মাইল-সাতেক উত্তরে গিয়ে ছোট্ট একটা নদী—পোটোপোটো। পার হলেই ডাইনে-বাঁয়ে দেখা যাবে জেলখানার পাঁচিল সুদূরবিস্তৃত। ছায়াঘেরা শান্ত সুনিবিড় পরিবেশ—মনকে কেমন অন্তর্মুখী ক'রে দেয়। ডানদিকে রাজ্যসরকারের মানসিক হাসপাতালের মহিলা বিভাগ—বাঁদিকে পুরুষ বিভাগ। আর একটু এগিয়ে ডানদিকে মোড় নিন, সুন্দর পীচবাঁধানো সোজা রাস্তা চলে গেছে পূর্বদিকে—ডানদিকে জেলের পাঁচিল তখনও দেখা যাবে। সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের মানসিক হাসপাতাল। সামনের রাস্তায় ডানদিকে ঘুরে আবার বাঁদিকে—কাঁকর-বিছানো লাল-রাস্তা চলে গেছে আরও পূবে। এখানে আর একটি মানসিক হোম। আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে আছে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের আবাস। এমন একটি পরিবেশে কথা হচ্ছিল ভারত-বিখ্যাত মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ এক ডাক্তারের সঙ্গে।

মানুষের মনোবিকারের কারণ : পাগল হওয়ার প্রধান কারণ কি কি? জিজ্ঞাসা করলাম, উনি সংশোধন করে বললেন, পাগল বলায় আমাদের আপত্তি। মানসিক রোগ বলি আমরা—শরীরের কোনও অঙ্গ অসুস্থ হলে যেমন সঠিক কাজ করতে পারে না, মনও অসুস্থ হলে ঠিকভাবে কাজ করে না। পাগল কথাটা উকিলরা ব্যবহার করে, ওটা আইনের ভাষা। বলে তিনি বিরাট এক তালিকা আনলেন। প্রায় ষাটটি কারণের উল্লেখ আছে তার মধ্যে। এদের মধ্যে বংশের প্রভাব (হেরিডিটি) ও পরীক্ষার সময় পড়াশুনার চাপ, আকস্মিক আঘাত ইত্যাদিই প্রধান কারণ হিসাবে রয়েছে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটবার। তবে হেরিডিটি নিয়ে ঘাবড়াবার কারণ কিছুই নেই।

বললাম, মনের এ-রোগ সেরে যায় তো? বললেন, ৭০-৭৫ শতাংশ রোগীই সেরে যায়। তবে খুব অল্পবয়সে অসুস্থ হলে সারা কঠিন। তার প্রভাব থেকেই যায়। কি-ভাবে চিকিৎসা করা হয়? জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমরা ওষুধপত্র প্রয়োগ করি, পরিবেশের প্রভাবেও সারে। এখানে আর আজকাল 'ইলেকট্রিক শক' খুব আরামদায়কভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরিবেশের কথা বলতে বললেন, অনেক রোগীকে পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনলেই সুস্থ হয়ে যায়। এখানকার পরিবেশেরও প্রভাব আছে। এখানে এলে একটা আত্ম-প্রত্যয় ফিরে আসে অন্য রোগীকে দেখে। একজন রোগী বলছিল, "আমি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হবো, হতে পারলাম না।" আর একজন বললে, "ক'দিন থাকুন মনেই হবে না ও-কথা। আমিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবো ভেবেছিলাম, হয়ে গেল শাস্ত্রীজী। মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। এখন বেশ আছি।"

চিকিৎসায় প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে বল-লেন, মানসিক রোগ যেন একটা লজ্জার বিষয়। কেন এটা সহজভাবে নেওয়া যায় না? অনেকে রাঁচীতে বাসা করে চিকিৎসা করান গোপনে আউটডোরে। পাগল আইনের সংশোধন দরকার। এ আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের সার্টিফিকেট ছাড়া হাসপাতালে কেউ ভর্তি হতে পারে না। এতে অসুস্থ ব্যক্তির আত্মীয়রা একটু অসুবিধা বোধ করেন এবং রোগী নিজেও চিকিৎসা এড়াতে চান। আইন এমনভাবে সংশোধন করা উচিত যাতে সহজেই এর চিকিৎসা করা সম্ভব।

ম্যাক্স মূলার ভবনে বড়দিনের বাজার বসেছে

সার্টিফিকেটের কথা উঠতে বললাম, অনেকে তো এ-আইনের অপব্যবহারও করে থাকে। মাথাখারাপের দোহাই দিয়ে খুনী আসামীর বিচার থেকে অব্যা-হতি, সম্পত্তির মালিকানা অপহরণ এমন ঘটনা আছে। রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতা একবার দলের বহু অর্থ অপব্যবহার করেছিল। ফৌজদারী মামলা হল। দলের বদনাম—ব্যক্তিরও। তখন দলের প্রভাবশালী ব্যক্তির শরণাপন্ন। তাঁর পরামর্শে পাগলের অভিনয় শুরু। নির্দেশ এল পাগলের সার্টিফিকেট দেওয়ার। বাস্—অপরাধ সব মাপ। বললেন, এসব 'পাগল' আমরা সহজেই ধরতে পারি।

ছোঁয়াচে রোগ হলে অনেকে লুকাতে চায়, মানসিক রোগ তো ছোঁয়াচে নয়—তবু লুকোচুরি মনোভাব অনেকের, বিশেষতঃ অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে মা-বাবা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু চিকিৎসার তো ব্যবস্থা আছে। বিহার রাজ্য সরকারী হাসপাতালে পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রোগীর (দেড় হাজার বেড) বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালে অবশ্য মাসে ৩০০।৪০০ টাকা খরচ লাগে। প্রাইভেট হোমও অনেক আছে সমস্ত রাজ্যে। অনেকে 'আউটডোরে' চিকিৎসা করিয়েও সুস্থ হয়ে ওঠেন। কাজেই লজ্জার কিছু নেই।

বললাম, দশচক্রে ভগবান ভূত হন, দশজনে সুস্থ লোককে অসুস্থ করে তুলতে পারে তার প্রতিকার কি? মানুষের সঙ্গে মতান্তর হলেই একে অপরকে পাগল বলে। স্বার্থে ঘা লাগলেও পাগল বলে উড়িয়ে দিতে চায় সঠিক মতবাদকে। সত্য টি'কে থাকবেই। হেসে বললেন—এই দেখুন সকালে আমার স্ত্রী বললেন, আমি একটা পাগল। দুজনেই হেসে উঠলাম। একজন রোগিণীও বলছিল—"ঐ ডাক্তারবাবু একটা পাগল—বলে কিনা আমি পাগল।" কম-বেশি সবাই পাগল এ-সমাজে। বললেন ডাঃ ডেভিস। উচিত হল মনের মধ্যে কোনও দুশ্চিন্তা 'বোট্‌ল আপ' করে না রাখা। এটাই মনে হল বড় প্রতিষেধক। সমাজকেও সতর্ক হতে হবে—সাময়িক মানসিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে নিছক ঠাট্টা করে ক্ষেপিয়ে এটাকে বড় করে তোলা যায়। মনে রাখা দরকার এটা বিদ্রূপের বিষয় নয়—যেমন নয় মানুষের অন্যান্য রোগ।

—বেলা দেবী

বড়দিনের বাজার

ম্যাক্স মুলার ভবন আজকের কলকাতার অন্যতম একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র। বক্তৃতা, সিনেমা, কনসার্ট প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এর আসর সবসময় সরগরম থাকে। সম্প্রতি এই সংস্কৃতি কেন্দ্র ভিন্ন-রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। গত দুদিন ধরে এখানে বসেছিল বড়দিনের বাজার। কলকাতার বাসিন্দা পশ্চিম জার্মানীর নারী-মহল এ দুদিন সমবেত হন ম্যাক্স মুলার ভবনে। উদ্দেশ্য পছন্দমাফিক জিনিষপত্র কেনাকাটা। সবচেয়ে মজার কথা যে এই বিক্রয়কেন্দ্রের সমস্ত জিনিষপত্র তৈরী করেন এই নারীমহলই। জিনিষপত্রগুলি ক্রেতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়ায়। সব-কিছুতেই বেশ উৎকর্ষমান পরিলক্ষিত হয়। এই বিক্রয়কেন্দ্রে বড়দিনের উপযোগী সব জিনিষই স্থান পেয়েছিল। ছোটদের জামা, খেলনা, এনামেল এবং চামড়া ও কাঠের রকমারী জিনিষে বিক্রয়কেন্দ্রটি ঝলমলিয়ে উঠেছিল। এছাড়া আরও অনেক জিনিষের সমাবেশ ঘটেছিল।

অতল জলের আহ্বান

নির্মলাশিস সেন

"মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা"

—কিন্তু মর্তের সবটাই তো এখনো মানুষের দেখা-জানা হয়নি। তাই আকাশ থেকে মহাকাশে পাড়ি জমাবার যুগে এসেও মানুষ বারবার পিছন ফিরে চায় তার আদি জননীর দিকে। স্থলের মানুষের নাড়ীতে সেই যে কবে থেকে রয়ে গিয়েছিল জলের টান। অগাধ জলের সেই সদা-টলোমল সমুদ্র, তার বিপুল অনিঃশেষ আলোড়ন মানুষের বুকের মধ্যে তোলপাড় বাধিয়ে দেয়। সাগর থেকে ফেরা নয়, সাগরের দিকে ফেরার জন্য আজ এই বিশ শতকের শেষার্ধে মানুষ তাই আবার পণ করে।

তবে, আদি জননীর কাছে এবার ফেরার মধ্যে মানুষের সেই প্রথম শৈশব যুগের সমুদ্র-দেখার আদিম বিস্ময় বোধটাই সবটুকু নয়। এখন বিস্ময়ের সংগে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান। মানুষের ইতিহাসে আজকের যুগ হল প্রকৃতির সামনে শুধু বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে থাকার যুগ নয়, তাকে জানার, প্রকৃতির অসীম বিচিত্র সম্পদকে আবিষ্কারের এবং মানব-প্রগতির জন্য তাকে কাজে লাগাবার যুগ।

বিজ্ঞান সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করে জীবনের উদ্ভবের ইতিহাসকে। আমাদের এই গ্রহপৃষ্ঠের প্রায় ৭৫ শতাংশই হল জলতলে। আর, এই সসাগরা পৃথিবীর সাগর গর্ভ অসংখ্য কোটি কোটি প্রাণীর লীলাক্ষেত্র সাগর জলের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যাকটিরিয়া থেকে বিপুলকায় তিমি, কাদার তালের মত জেলি মাছ থেকে বুদ্ধিমান জলচর ডলফিন বা শুশুক। সাগরিক জৈব-জগতের রহস্য অসীম। সাগর গর্ভে রয়েছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, শর্করা, ভিটামিন, আন্টিবায়োটিক পদার্থ প্রভৃতির বিরাট ভাণ্ডার।

সাগর তলের গভীর রহস্য

তবু সাগর তার গভীর তলের রহস্য আজও মানুষের কাছ থেকে গোপন করে রেখেছে। কি সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে সে তার বিপুল জলরাশির আড়ালে। কয়েক কিলোমিটার ব্যাপী গভীর জলস্তরের নিচে সাগর-তলের মহাদেশের আকৃতি কিরকম?

বিশ্বের সর্বদেশের বিজ্ঞানীরা আজ এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। খ্যাতনামা মার্কিন-বিজ্ঞানী রজের রেভেলে যেমন বলেছিলেন : **আজ চন্দ্রপৃষ্ঠের খবর আমরা যতটুকু জানি তার থেকেও কম জানতে পেরেছি সমুদ্র-তলের খবর।** চাঁদের উল্টোপিঠের ছবিও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে তুলে এনেছেন। তাই চাঁদের মানচিত্র আমরা যতটা জানি, ততটা আজও জানি না সাগর-তলের ভূ-পৃষ্ঠের মানচিত্র ও তার বিচিত্র জগতের কথা।

সমুদ্র মানুষের কাছে একটা রহস্য হয়েই রয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তিন-চতুর্থাংশে যে ৩৩ কোটি ঘন-মাইল জল রয়েছে তার তমসাবৃত তলদেশে যে অনাবিষ্কৃত সম্পদের অজস্র সঞ্চয় রয়েছে তার সন্ধানের উপযুক্ত সময় এসেছে।

সমুদ্রের অতলতলে যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে তা আধুনিক অর্থনীতিকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সোনা, তামা, লোহা, তেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থে সমুদ্রের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এছাড়া আছে গাছ-গাছড়া ও প্রাণী-সম্পদ। আরও মজার কথা, সমুদ্রের তলদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের এক নিরাপদ গুদাম বলা যেতে পারে। বাতাসের সংস্পর্শে এলে কয়লার ক্রমাগত অক্সিজেন মিশতে থাকে এবং ক্রমে এমন একটা বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে তা আপনা থেকেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু জলের নীচে কয়লার এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

মানুষের আহার্যের সংস্থানে সমুদ্রের অবদান বিস্ময়কর হতে পারে। শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ী মাছ প্রভৃতি বহুতর জলজ প্রাণী বিরাজ করছে সমুদ্রের জলতলে। চাষ করলে এই সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। প্রাকৃতিক শত্রুর হাত থেকে এইসব প্রাণীকে রক্ষা করতে হবে। এদের খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে একদিন এরা মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবে। সামুদ্রিক আগাছা মানুষের খাদ্য-তালিকায় স্থান পেতে পারে। বস্তুতঃ জাপানীরা ইতিমধ্যে সামুদ্রিক আগাছা খাদ্যরূপে ব্যবহার করছে। এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও সমুদ্রতলের সম্পদ উদ্ধারে মানুষ এখনও সেরূপ যত্নবান হয়নি।

বিশ্বের সমগ্র দেশের সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের একটি বৃহৎ সম্মেলন সম্প্রতি মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে—**"বর্ষীয়ান্ জাতিক সমুদ্র-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস"**। ইউনেস্কো ও সোভিয়েত সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির উদ্যোগে। পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশের খ্যাতনামা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা এই কংগ্রেসে অংশ নিয়েছিলেন।

এঁদের মধ্যে ছিলেন লেনিনগ্রাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার আলেকজান্দর দুমিত্রিয়েফ। জলের তলায় দীর্ঘ সময় ধরে থেকে এবং সমুদ্রজলের সমস্ত চাপ সহ্য করে সাগরতলে পর্যবেক্ষণ চালাতে পারে এরকম একটি জলযান তৈরী করার কাজে গত এক দশক ধরে তিনি পরিশ্রম করছেন।

জলতলে গবেষণাগার

এই দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ডিজাইন ইনস্টিটিউট যে জলতলের গবেষণা যানটি তৈরী করেছেন তার নাম হল "বেনথোস—৩০০"। সুরক্ষিত কক্ষে দশজন সমুদ্র-বিজ্ঞানীসহ এই গবেষণাগারটিকে জলতলে নামিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা প্রায় দু' সপ্তাহ সেখানে থাকতে পারবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে সামুদ্রিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবেন। এই গবেষণা-যানটির ভিতরে আবহাওয়া সব সময় স্বাভাবিক রাখার
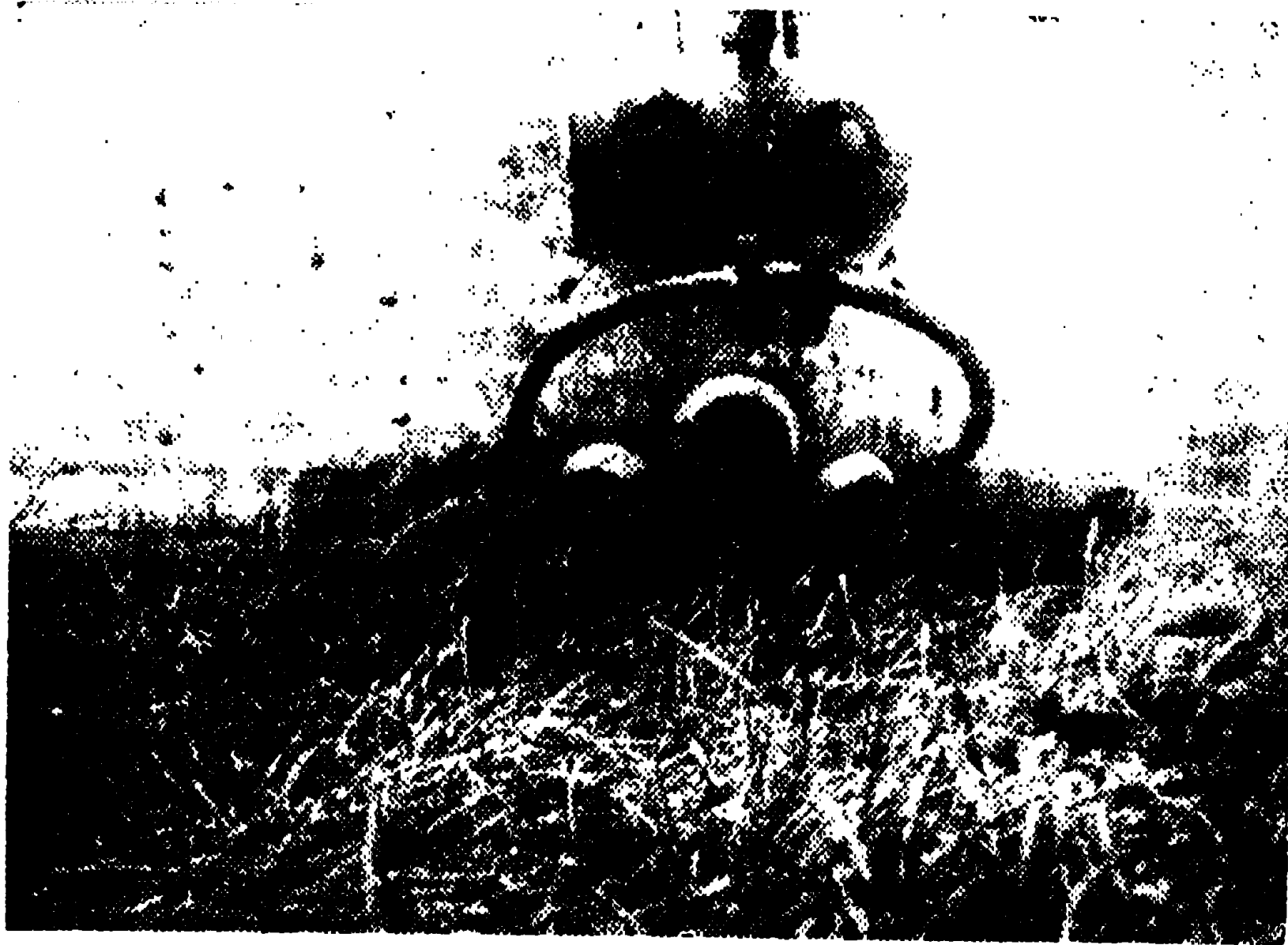
সমুদ্রের তলদেশের মাটি ও উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও অন্যান্য গবেষণা কাজ চালায় এই সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক ডুবো-যন্ত্রাগারটি

ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে অক্সিজেন-এর সরবরাহ, গবেষণা-যানের পর্যবেক্ষণ-কক্ষটিতে টেলিভিশন ক্যামেরা, আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র গ্রহণ-ব্যবস্থা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের যন্ত্রপাতি থাকবে। সেই সংগে বাইরের সংগে যোগাযোগের জন্য এই যানের নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে সব সময় বেতার-সংযোগ ব্যবস্থাটি চালু থাকবে। দরকারমত বিজ্ঞানীরা যানটি থেকে বেরিয়ে বিশেষ ধরণের পোষাক পরে চারপাশ ঘুরে দেখতে পারবেন। এইভাবে তাঁরা আহরণ করবেন সামুদ্রিক জীবন সম্পর্কে সমস্ত তথ্য।

জলতলে এই পর্যবেক্ষণ কাজ চালাবার জন্য প্রথমেই মহাদেশীয় 'শেলফ-জোন' নামে অভিহিত সমুদ্রগর্ভস্থ স্থান বেছে নেওয়া হবে। এই এলাকা হল মহাদেশগুলির স্থলভাগের সেইসব অংশ যা ৩০০ মিটার গভীর পর্যন্ত সমুদ্রগর্ভে ডুবে রয়েছে। এই সমুদ্রমগ্ন ভূভাগের মোট আয়তন প্রায় এশিয়া মহাদেশের মতো। আজকের পৃথিবীতে যত সামুদ্রিক-মাছ প্রভৃতি ধরা হয় তার ৮৮·৭ ভাগই আসে এরই সন্নিহিত সমুদ্রের থেকে।

ভারত মহাসমুদ্রে সোভিয়েত নিরীক্ষা

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার জন্য সবথেকে ভাল গবেষণাগার হল সমুদ্র। কারণ সমুদ্রতলের ত্বক মহাদেশীয় ভূপৃষ্ঠত্বকের চেয়ে আরও পাতলা।

মস্কো সমুদ্র-বিজ্ঞান কংগ্রেসে তরুণ সোভিয়েত বিজ্ঞানী গেনাদ উদিনসভেভের দেওয়া এক বিবরণী বিদেশী সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুবই সাড়া তোলে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীর এ বিবরণীটি ছিল ভারত মহাসমুদ্রের "রিফট-ভ্যালি" বা গ্রস্ত-উপত্যকা-সক্রান্ত বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বিষয়ক।

সম্প্রতি এটা জানা গেছে যে, সারা পৃথিবী জুড়েই সমুদ্র-অভ্যন্তরের মধ্য দিয়ে এক গিরিমালা চলে গিয়েছে। এই নিমজ্জিত গিরিমালা হল মধ্য সামুদ্রিক গিরিমালা। এগুলির মাঝে মাঝে রয়েছে গভীর খাদ, যেগুলিকে গ্রস্ত-উপত্যকা বলা হয়ে থাকে। স্থলভাগে ভূপৃষ্ঠ ও ভূত্বকের মধ্যে ব্যবধান হল প্রায় ৩০ কিলোমিটার। কিন্তু সমুদ্রতলের থেকে ভূত্বকের ব্যবধান আরও কম, মাত্র ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার। তাছাড়া ভূকম্পনগত পর্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গেছে যে, সমুদ্রগর্ভস্থ এইসব গ্রস্ত-উপত্যকাগুলি এমন কি ভূপৃষ্ঠ থেকেও আরও গভীরে নেমে গেছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী গেনাদ উদিনসভেভ সম্প্রতি সোভিয়েত সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণা জাহাজ "ভিতিয়াজ"-যোগে ভারত মহাসমুদ্রে পর্যবেক্ষণ চালান। জাহাজের থেকে এক মাইক্রো যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় ভারত সমুদ্রের গর্ভে এরকম দুটি গ্রস্ত-উপত্যকার একেবারে অতল গভীরে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে ওই যন্ত্রটির সাহায্যে তুলে নেওয়া হয় গ্রস্ত-উপত্যকার থেকে নানারকম ভূ-নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলি থেকে নিচের গঠন সম্পর্কে মূল্যবান প্রমাণাদি পাওয়া গেছে। কংগ্রেসের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা তরুণ সোভিয়েত বিজ্ঞানী এই আবিষ্কারের জন্য অভিনন্দিত হয়েছেন।

সমুদ্র-বিজ্ঞানের দ্বিধারা

আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণা বিভিন্ন দেশে মোটামুটি তিন ধারায় এগিয়ে চলেছে: সামুদ্রিক পদার্থ-বিজ্ঞান এবং সামুদ্রিক জলপ্রবাহের পরিবর্তনের সম্পর্ক; সমুদ্রতল ও সমুদ্রোপকূলভাগের সার্বিক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশেষ করে সামুদ্রিক 'রসায়ন' সম্পর্কে গবেষণা এবং সর্বোপরি সামুদ্রিক জীব-বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক জীবজগৎ বিশেষভাবে মাছ ও জলচর প্রাণী সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা।

সামুদ্রিক প্রবাহ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও জ্ঞান বিশেষভাবে নৌ-চালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দীর্ঘযুগ ধরে এসম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা থাকলেও, বিজ্ঞানসম্মতভাবে এখন সেগুলিকে বিন্যস্ত করা আরও তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ চলেছে। সামুদ্রিক প্রবাহ জানার সংগে বিশেষভাবে জড়িত হল সমুদ্রতলের ও সমুদ্রগর্ভের ভূ-মানচিত্র রচনা। বর্তমানে ভূতাত্ত্বিকরা সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় ভূপৃষ্ঠ সম্পর্কে পার্থক্য স্বীকার করেন। সামুদ্রিক ভূ-পৃষ্ঠ হল প্রায় ৭ কিলোমিটার পুরু এক ব্যাসল্ট স্তর। আর মহাদেশীয় স্থলভাগের ভূ-পৃষ্ঠ ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার ব্যাসল্ট স্তরের ওপর রয়েছে। সামুদ্রিক ও মহাদেশীয় ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাসল্ট গঠনের মধ্যে কোনও বিশেষ ধরণের পার্থক্য রয়েছে কিনা তা আজও গবেষণাধীন ব্যাপার। সমুদ্র-অভ্যন্তরস্থ বহু পরিমাণ আলট্রা-সাউন্ড পদ্ধতির দ্বারা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

যেমন, জানা গেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রতলে বহু আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ভূ-কম্পন তরংগের দ্বারা জানা গেছে যে সমুদ্রতলের আর একটা স্তরও রয়েছে যেটাকে 'সেডিমেন্টারি রক' দিয়ে গঠিত বলা যায়। ভারত মহাসমুদ্রে সোভিয়েত গবেষণা জাহাজ "ভিতিয়াজ" এখনকার সমুদ্র গর্ভের গ্রস্ত উপত্যকা থেকে যেসব ভূ-নিদর্শন আহরণ করতে পেরেছে, তাতে এই গ্রস্ত-উপত্যকার একটি গভীর অংশে "আলট্রা-বেসিক"-এরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি হল নিচের ভূ-ত্বকের একটি উপাদান। ভূ-পৃষ্ঠের নিচেই এই "আলট্রা-বেসিক" শিলাস্তর রয়েছে। "ভিতিয়াজ" এরকম যে শিলা পেয়েছে তার বিশ্লেষণে ক্রোমাইটও পাওয়া গেছে।

মহাদেশীয় "শেলফ জোন" অভিহিত এলাকা প্রচুর ও মূল্যবান খনিজ সম্পদে পূর্ণ। এছাড়া রয়েছে তৈলভাণ্ডার। সমুদ্রতলে সঞ্চিত রয়েছে যুগ-যুগ ধরে পুঞ্জিভূত ফেরো-ম্যাংগানীজ। সমুদ্রজল বিশ্লেষণে পাওয়া যায় ম্যাগনেসিয়াম ও ব্রোমাইন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানী মিখাইল লোমোনোসফ অতলান্তিক মহাসমুদ্রে এক প্রবল ফল্গু-জলপ্রবাহ আবিষ্কার করেছিলেন। মস্কো-কংগ্রেসে এবিষয়ে একটি বিবরণী দেন যুক্রেনীয় বিজ্ঞান আকাদমির সামুদ্রিক জল-পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা আকাডি কোলেশনিকোফ। লোমোনোসফ প্রবাহ নামে অভিহিত এই প্রবাহ অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পশ্চিম থেকে পূবে প্রায় ২৫০০ থেকে ২৬০০ মাইল দৈর্ঘ্যসম্পন্ন। সমুদ্রপ্রবাহ সম্পর্কে মার্কিন বিজ্ঞানী জে. বুজোর্কশনও মূল্যবান তথ্যাদি দেন।

সামুদ্রিক জীবনচক্র

সমুদ্রে জীবন এক চক্রাকারে বিকশিত হয়। এর বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে মস্কো-কংগ্রেসে নিবন্ধ পাঠ করেন সোভিয়েত-বিজ্ঞানী অধ্যাপক বি স্কোপিনতসেভ, বৃটিশ বিজ্ঞানী ডি কুশিং প্রমুখ। সৌর-শক্তি ও সমুদ্রজলে নিহিত মৌলিক পদার্থগুলি শোষণ করে সামুদ্রিক উদ্ভিদকুল সৃষ্টি করে জৈব পদার্থ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণীরা এগুলি খেয়ে বাঁচে। আবার মৎস্যকুল খায় এই উভয়কেই। মৃত্যুকালে বহু মাছ একেবারে সমুদ্রতলে নেমে যায় এবং তাদের মৃতদেহ মাইক্রোব ও অন্যান্য সমুদ্রতলের প্রাণীদের খাদ্য হয়। কোটি কোটি মৃত মাছের দেহ থেকে সমুদ্রে জীবন অব্যাহত থাকার মত মৌলিক পদার্থগুলি সঞ্চারিত হয়।

অধিকাংশ সামুদ্রিক জৈব-পদার্থ সৃষ্ট হয় "প্লাঙকটন" মাইক্রো অর্গানিজমের দ্বারা। সমুদ্রের বিচিত্র জীবলোক এইগুলির সাহায্যে জীবন ধারণ করে। সমুদ্র হাজার হাজার জৈব বস্তুর বাসস্থান। এইসব জীবের শরীর, অংগ-প্রত্যংগ ও দেহতত্ত্ব, জীববিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানীদের কাছে খুবই আগ্রহোদ্দীপক। এবিষয়ে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করছেন।

মানুষের প্রয়োজনে সমুদ্র-সম্পদ : সাগরতলে কৃষিকাজ

সমুদ্র-সম্পদকে মানুষের কাজে লাগানো যায় কিভাবে বৈজ্ঞানিকেরা এ-বিষয়টা নিয়েও যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন।

সমুদ্র ভূপৃষ্ঠে গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজের জন্য আণবিক শক্তিচালিত গবেষণাগারের একটি পরিকল্পনা

সামুদ্রিক বুদ্ধিমান জীব শুশুক বা ডলফিন-কে ট্রেনিং দিয়ে তাকে সমুদ্র গবেষণার নানান ব্যাপারে, সমুদ্রে মাছ ধরার ও অন্যান্য কাজে কি করে লাগান যেতে পারে, সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে সজাগ।

সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জৈব-জগতের অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে মস্কো কংগ্রেসে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমির ভি, বোগোরফ এক বিবরণী দেন। তিনি দেখান যে, সামুদ্রিক উদ্ভিদের উৎপাদন বছরে ৫৫ হাজার কোটি টন করে বৃদ্ধি পায়। সামুদ্রিক জীবজগতে প্রজনন বৃদ্ধির হারও অত্যন্ত দ্রুতগতি।

মার্কিন বিজ্ঞানী জে, স্ট্রিকল্যানডের মতে অচিরেই হোক কিংবা কিছু পরেই হোক মানুষকে একদিন খাদ্যের জন্য সমুদ্রতলেও চাষবাস শুরু করার কথা ভাবতে হবে, যেমন হাজার হাজার বছর আগে স্থলভূমিতে মানুষ কৃষিকাজ শুরু করেছিল। তাছাড়া, খাদ্য হিসেবে সমুদ্রে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য প্রজনন ও ব্যাপকভাবে মাছ ধরার ব্যবস্থার বিষয়টি তো রয়েছেই। এটা সম্ভব হবার আগে মানুষকে জানতে হবে সমুদ্রজগত সম্পর্কে আরও খুঁটিনাটি।

সাগরনগর : মানব-প্রকৃতিতে সমুদ্রের দান

আরও একটি বিষয়ের সম্পর্কেও সোভিয়েত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাচ্ছেন।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যেমন সমুদ্র-গর্ভে গবেষণাগারের বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন ও কাজ করছেন, তেমনি ফরাসী ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জলতলে ১০০ মিটার নীচুতে বিশেষভাবে নির্মিত ভাসমান বাড়ী বানাবার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করছেন।

মার্কিন বিজ্ঞানী জে, আইজাক বলেছেন যে, মানুষ ভবিষ্যতেও জলের নীচে যাতে বসবাস আরম্ভ করতে পারে, সেটির সম্ভাবনাও ভেবে দেখবার দরকার। ফরাসী বিজ্ঞানী জে, পাসের মতে এখনও পর্যন্ত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে মানুষ জলের ১০০-১১০ মিটার নীচে নেমে বেঁচে থাকতে পারে ও ১৫০ মিটার নীচেও দিনে ২ ঘণ্টা ধরে কাজ করে যেতে পারে। অধ্যাপক পার্স 'জলের নীচে শহর বানাবার' এক সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। রুমানিয়ার বিজ্ঞানী এম, বাসেস্কু সমুদ্র-গভীরের বিচিত্র জীবন-রহস্য সম্পর্কে মস্কো কংগ্রেসে এক চমৎকার বিবরণী দেন।

শেষপর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে মহাকাশ অভিযান যেমন, তেমনি সমুদ্র-জগত আবিষ্কারও শুধু এক দেশের বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের যুক্ত উদ্যোগ ও পূর্ণ সহযোগিতা। এইজন্যই আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের মর্মবাণী ছিল এই : 'সমগ্র মানবজাতিরই কল্যাণে হোক সমুদ্র গবেষণা।'

মনে করুন সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট বা তারও বেশী নীচে একটি গ্রাম, আর সেই গ্রামের একটি কুটিরে আপনি গিয়েছেন সপ্তাহান্তিক ছুটিটা কাটিয়ে আসতে। খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না? কিন্তু সেদিন আর খুব বেশী দেরী নেই, যখন আমরা এই নতুন দেশে অবসরযাপন করতে যেতে পারব।

জাপানের অদূরে স্বল্প গভীর এক জলাশয়ে ইতিমধ্যেই জলতলে একটি হোটেল নির্মিত হচ্ছে। হোটেলটির পরিকল্পনা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে হোটেলবাসিন্দারা সেখান থেকে মাছ প্রভৃতির লীলাখেলা উপভোগ করতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে অবসরনিবাস নির্মিত হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। এই অবসর নিবাসের চারিদিক পরিবৃত থাকবে প্রবালের উদ্যানে, আর থাকবে বর্ণাঢ্য সামুদ্রিক প্রাণীজীবনের এক বিচিত্র পরিবেশ। কেমন করে এই অবসরনিবাসে যাবেন, সেটাও কোন সমস্যা হবে না। হয়ত

সমুদ্রের চালাক প্রাণী 'শুশুক'

কোন বে-সরকারী কোম্পানী এজন্য ডুবোজাহাজ চালু করবেন।

যাঁরা অতিউৎসাহী, দুঃসাহসিক অভিযানে যাঁদের রুচি আছে, তাঁরা এই অবসর-নিবাস থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবেন সমুদ্রসন্ধানে। আর যাঁরা অত উৎসাহী নন, তাঁরা জলতলের বালুবেলায় বা পাহাড়ের উপত্যকায় ঘুরে আসতে পারবেন গাইডের সাহায্য নিয়ে।

জলতলে এই ধরনের গৃহনির্মাণ আজ আর কোন সমস্যাই নয়। জলের নীচে ভিত্তি তৈরি করে তাতে এই ধরনের গৃহ নোঙ্গর করে রাখা হবে। এমনভাবে স্থাপিত হবে যে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়া এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া প্রবালের শিখর-রাজি একে সুরক্ষিত করে রাখবে।

মাত্র এই সেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বার্টন আবিষ্কার করলেন বেনথোসকোপ। বেথিসফিয়াসের একটি নতুন সংস্করণ এটি। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, বেনথোসকোপ সমুদ্রের অনেক বেশী নীচে নামতে পারে এবং এর তলদেশে একটি বৃহৎ জানালা থাকায় আরও বেশী স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় এই সময়ই অধ্যাপক অগাস্ট পিকার্ড আবিষ্কার করেন বেথিকাফি। এটি মূলতঃ একটি গ্যাসের থলিসমন্বিত বেলুন। জলের চেয়ে অনেক হাল্কা বলে এটি সহজেই জলের মধ্যে ভেসে থাকে এবং 'গণ্ডোলা' গবেষণা জাহাজ-এর ওপর ভর দিয়ে জলনিম্নে অবস্থান করতে পারে।

যাই হোক, এই সবই হল অগভীর জলে গবেষণার ব্যাপার, অগাস্ট পিকার্ড ও জ্যাকস্ পিকার্ড কর্তৃক 'বেথিসকাফি ট্রিয়েস্ট' আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত গভীর জলের সন্ধান সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীর কাছে কোন সমুদ্রই গভীর নয়—পিকার্ড এ-কথা প্রমাণ করার অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক গভীর সমুদ্রযান নির্মিত হয়েছে। পিকার্ড নিজে তৈরি করলেন 'মেসোকাফি'। এই যান বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রচুর যন্ত্রপাতি নিয়ে দীর্ঘ সময় জলতলে অবস্থান করতে পারে।

এর পরে এল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ডুবোজাহাজ 'অ্যালুমিনট', এ জলের ১৫ হাজার ফুট নীচে নামতে পারে।

১৯৬৩ সালে ক্যাপ্টেন কস্টো পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে লোহিত সাগরের ৩৬ ফুট নীচে একটি ইস্পাতগৃহে একমাসকাল বাস করেন। বর্তমানে তিনি ওয়েস্টিংহাউস ইলেক্ট্রিক কর্পোরেশনের পক্ষে ডীপস্টার ডুবোজাহাজ নিয়ে কাজ করছেন। এই জাহাজটি তিনজন লোক নিয়ে জলের ১৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যাবে। ওয়েস্টিংহাউস বর্তমানে নানা ধরনের ডীপস্টার নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন, গবেষক বিজ্ঞানীসহ জলের ২০ হাজার ফুট নীচে নামিয়ে দেওয়ার জন্যও গবেষণা চলছে।

'ডীপস্টার ৪০০০' সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়ে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করতে পারে।
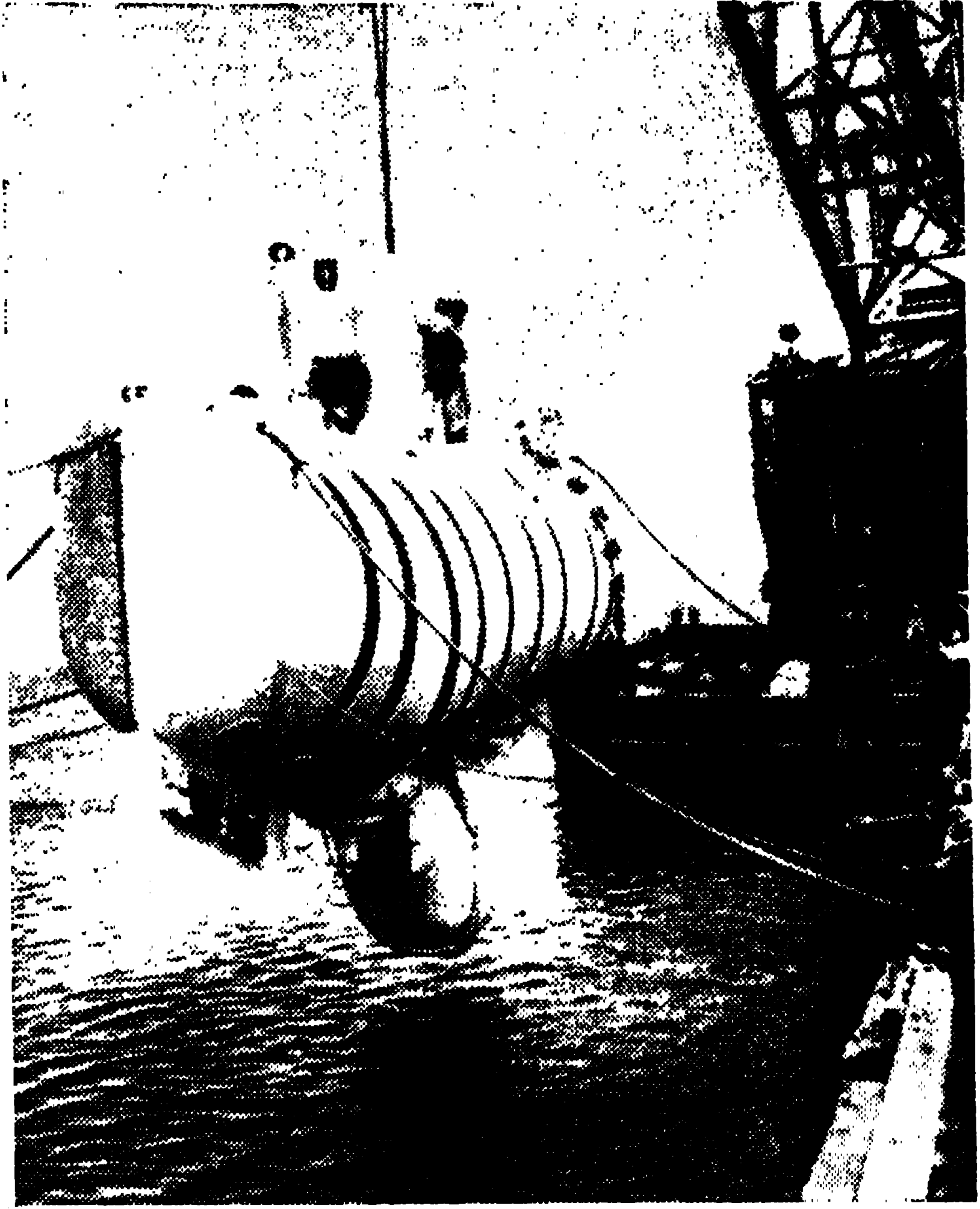
মার্কিন বাথেস্কাপ ট্রিয়েস্ত

এতদিন ধারণা ছিল, ডুবুরীরা জলের ২৫০ ফুটের বেশি নীচে যেতে পারে না। কিন্তু বাতাসের নাইট্রোজেনের স্থলে হিলিয়াম ব্যবহার করে ডুবুরীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক সহজ হয়েছে এবং ডুবুরীদের পক্ষে জলের অনেক নীচে নামা সম্ভব হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ও যন্ত্রপাতি নিখুঁত করার জন্য গবেষণা করে চলেছে ওয়েস্টিংহাউস প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ কেন্দ্রের সমুদ্র-গবেষণা বিভাগ।

ওয়েস্টিংহাউসের ইঞ্জিনীয়াররা হিলিয়াম অক্সিজেন আবহাওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়েও গবেষণা করছেন। জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন ধরনের যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শুধুমাত্র এই যন্ত্রটির সাহায্যেই মানুষ একদিন জলের ৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যেতে পারবে।

জেনারেল ইলেকট্রিক সিলিকেন রবারের একটি মেনব্রেন আবিষ্কার করেছেন যা জলের মধ্যে থেকে শুধু অক্সিজেন টেনে বার করে নিতে পারে। ফলে জলের নীচে জল থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

এসব থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মানুষ বিনা বিপদে জলের নীচে বসবাস করতে পারে। হয়ত একদিন জলের নীচে একটা রাজ্য গড়ে উঠতে পারবে, আর সে-রাজ্যে মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠবে নানা পল্লী। বস্তুতঃ সমুদ্রসন্ধানের কাজে এই-রকম উপনিবেশ গড়ে তোলারই প্রয়োজন হবে।

এজন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল জলতলে বিদ্যুৎ সরবরাহ। ওয়েস্টিংহাউস সে-অভাবও মেটাতে চলেছেন, জলের নীচে ব্যবহারোপযোগী একটি অভিনব পারমাণবিক চুল্লী এঁরা নির্মাণ করেছেন। এই চুল্লীটি ৬ হাজার জনের উপযোগী বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারে। মানুষের সাহায্য ছাড়াই এই চুল্লী ১৮ মাসকাল পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে পারে।

ওয়েস্টিং হাউসের ডিরেক্টর ডাঃ ডবলিউ ই জনসন সঙ্গত কারণেই এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ অচিরেই সমুদ্রতলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে পারবে। অতল জলের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার সময় সত্যিই মানুষের সামনে এসেছে।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

নাগপুর থেকে বোম্বাই মেল ছাড়ল, আর আমি একটা সদ্য কেনা সাপ্তাহিক পত্র পড়তে সুরু করলাম। পাতা উলটাতে উলটাতে একটি প্রবন্ধের নাম দেখে পড়তে সুরু করলাম। এই প্রবন্ধের লেখক বলতে চেয়েছেন, মানুষ যে আজকাল অমানুষ হয়ে যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হল মানুষের পরিচিতের সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। নিজের কাছাকাছি দু চারজন লোককে ছাড়া কেউ কাউকে চেনে না। ফলে দেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা হয় না। আস্তে আস্তে লোকেরা নিজেদের চারদিকে দ্বীপ গড়ে তোলে। তারপর থেকেই সে অসামাজিক হতে সুরু করে। এর প্রতিকারস্বরূপ লেখক বলছেন, মানুষের উচিত সপ্তাহে অন্তত একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে পরিচয় করা। এরকমভাবে পরিচয় করে আস্তে আস্তে পরিচিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব রক্ষার একটি প্রধান উপায়। লেখক বলছেন, এর জন্য সপ্তাহে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় নষ্ট হয় না, কিন্তু এর ফল সুদূরপ্রসারীই বটে।

আরো বলছেন, দূরের ট্রেনে কিংবা লোক্যাল ট্রেনে যে লোকটি আপনার পাশে বসেই যাচ্ছেন তাকে কি আপনি চেনেন? তাঁকে আপনি চেনেন না। কাল এই লোকটিই যখন পার্কে বসে থাকবে আর আপনি পার্কে বেড়াবেন তখন কি এক চিনতে পারবেন? পারবেন না। আপনার ক'জন প্রতিবেশীকেই বা আপনি চেনেন? আজকাল কেউ কাউকে চেনে না এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই রকম কয়েক পাতা চলল। এর মর্মার্থ হল এই যে, মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে, এবং আনন্দ পেতে হলে যথাসম্ভব বেশি বন্ধু এবং পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হবে। প্রথম প্রথম কারুর সঙ্গে আলাপ করতে গেলে হয়ত বিরূপতার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু তাতে ঘাবড়ালে চলবে না। বিরূপ ভাবটা সহজেই চলে যাবে।

প্রবন্ধটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। এর আগে নানা প্রবন্ধ পড়েছি কিন্তু এরকম ভাবে আমাকে ভাবায়নি। সত্যিই তো আমরা কি অন্যায়ই না করছি। কাউকে না চিনে কেবল স্বার্থপরের মত দিন যাপন করছি। আমি অতএব স্থির করলাম পাশের লোকটিকে দিয়েই সুরু করা যাক। লোকটির দিকে তাকালাম। এর আগে এঁকে দেখিইনি প্রায়। পাঞ্জাবি পরা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হাতে একটা মোটা উলের চাদর ভাঁজ করে রাখা। বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে। সত্যিই তো, কালই যদি বিকেলে আমি কোলকাতায় কোনো একটি পার্কে দেখি তাহলে কি আমি চিনতে পারব এঁকে? সত্যিই তো বড় অন্যায় হবে যদি এঁকে চিনতে না পারি। অতএব তাড়াতাড়ি আলাপ জমানোর জন্য সচেষ্ট হলাম। এর আগে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিনি, তাই অভিজ্ঞতা ছিল না। হঠাৎ কেমন যেন মুখ ফসকেই বলে ফেললাম, দাদা কোন পার্কে বসেন? ভদ্রলোক যেন একটু চমকে উঠলেন কথাটা শুনে। বললেন, আপনি আমাকে চেনেন? আমি বললাম, না। ভদ্রলোক বললেন, আমি পার্কে যাই না মশাই। পার্কে কোনো ভদ্রলোক যায় না। শর্টকাট করবার জন্য দু-একবার গিয়েছি, ব্যস!

আমি চুপ করেই গেলাম। এরপর আর কথা হতে পারে বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক কোথায় চাকরি করেন সেটা জিজ্ঞেস করা যায়। কিন্তু আরো একটু পরিচিত হওয়া দরকার। বললাম, আমার নাম হৃদয়হরণ হালদার, আমি দেশবন্ধু পার্কের কাছে একটা রাস্তা আছে সেই রাস্তায় থাকি। আপনি ঐ পার্কে যদি একবার আসেন তো ঠিক চিনতে পারব। আপনি যদি পরশু বিকেলের দিকে পার্কে দিকের কোনো একটি বেঞ্চে বসে থাকেন তাহলে দেখবেন আমি ঠিক উপস্থিত হয়েছি, আর আপনাকে চিনতেও পেরেছি। আপনার নামটা জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক আমার কথায় একটু সরে বসলেন। কোনো জবাব দিলেন না। কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। তখন মনে হল প্রবন্ধে তো ঠিকই লিখেছে প্রথম প্রথম লোকে বিরূপ হয়। বুঝলাম ভদ্রলোককে প্রমাণ করতে হবে আমি তাঁর কোনো অনিষ্ট করব না। আমার কোনো বদ মতলব নেই বুঝতে পারলেই তিনি কথাবার্তা সুরু করবেন।

বললাম, আপনি আপনার নাম বললেন না, তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার নাম না হলেও আমার চলবে। নামে কি এসে যায় বলুন, লোকের মধ্যে যে মঙ্গল করবার শক্তি রয়েছে সেটাই হল আসল।

ভদ্রলোক এবারে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়েছি। বিলাসপুর থেকে আমার স্ত্রী গাড়িতে উঠবেন। এই স্লীপারে তো যায়গা নেই। বাধ্য হয়ে হয় তাঁকে অন্য ভীড় কামরায় উঠতে হবে, নয়ত আমাকে অন্য কামরায় উঠে তাঁকে আমার জায়গাটি দিতে হবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, তাতে কি হয়েছে। বিলাসপুরে আমি নেমে যাব। আমার জায়গায় আপনার স্ত্রী আসবেন, দুজনে মিলে যাবেন

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের দুশ্চিন্তা কেটে গেল। মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা আমাকে অফার পর্যন্ত করলেন।

বিলাসপুরে আমি নেমে গেলাম। তার পর অতি কষ্টে একটা ভীড় কামরায় গিয়ে উঠলাম। ভদ্রলোকের স্ত্রী আমার জায়গায় এলেন। ভদ্রলোক আমাকে প্রভূত ধন্যবাদ জানালেন। ভীড় কামরায় সমস্ত রাত জেগে পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুলাম যখন তখন আমার সমস্ত গায়ে ব্যথা, চোখ দুটো লাল। বোধ হয় জ্বরই হয়েছে।

কোনোক্রমে টলতে টলতে স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাকসির কিউতে দাঁড়ালাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। সমস্ত গা কাঁপতে লাগল। আমি ওখানেই বসে পড়লাম। কিউ এগিয়ে চলল, কিন্তু আমি বসেই রইলাম।

এমন সময় দেখি সেই ভদ্রলোক—কিউতে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এসে পড়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, দাদা—শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আপনি যদি দয়া করে আপনার ট্যাকসি করে বাড়িতে পৌঁছে দেন তবে... ।

ভদ্রলোক তাঁর হাতের ঘড়ি দেখলেন। বললেন, একদম সময় নেই আমার। তাছাড়া আপনাকে আমি চিনি না। বলে এগিয়ে চললেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর গলার আওয়াজ পেলাম, তিনি বললেন চেহারাটা একটা গুণ্ডার মত...বোধহয় ওর উপকার করাটার পেছনে কোন মতলব ছিল। হয়ত ট্যাকসিতে উঠে ছোরা দেখিয়ে টাকা পয়সা কেড়ে নিত, যা দিনকাল দাঁড়িয়েছে আজকাল!

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

ভেষজবিজ্ঞানে এ বছরের নোবেল পুরস্কার

বিশ্বের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডিসেম্বরের দশ তারিখটি একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ প্রতি বছর এই দিনটিতে সুইডেনের রাজধানী স্টকহলম শহরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সাহিত্য, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান ও শান্তির জন্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। শান্তির জন্য পুরস্কারে মাঝে-মধ্যে ছেদ পড়ে, তবে এবছর (১৯৬৬) পাঁচটি বিষয়েই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে ভেষজ-বিজ্ঞানে পুরস্কারপ্রাপকদের মনোনয়ন করেন সুইডেনের ক্যারোলীন ইনস্টিটুটের মেডিকেল ফ্যাকালটি। তাঁরা এবছর ভেষজ-বিজ্ঞানের পুরস্কার প্রদান করেছেন যৌথ-ভাবে দুজন মার্কিন ভেষজ-বিজ্ঞানীকে। এই দুজন বিজ্ঞানীর একজন হচ্ছেন রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ফ্রান্সিস পেটন রাউস্ এবং অপরজন হচ্ছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ চার্লস ব্রেনটন হাগিনস্। ক্যান্সার বা কর্কট-রোগ সংক্রান্ত অনন্য গবেষণার জন্যে তাঁদের উভয়কে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

ডাঃ রাউসের অবদান সম্পর্কে বলা হয়েছে, ১৯১০ সালে ডাঃ রাউস মুরগীর দেহে টিউমার বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং তাঁর আবিষ্কার থেকেই প্রথম জানা যায় ভাইরাসও ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। ১৯৫১ সালে ইঁদুরের দেহে লিউকোমিয়া ভাইরাস পৃথক করার পর থেকে ডাঃ রাউসের প্রাথমিক আবিষ্কারের গুরুত্ব প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। তাঁর এই আবিষ্কারের প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিগত ১০ বছরে যথার্থ উপলব্ধি করা গেছে। আগে ভাবা হত, শুধুমাত্র মুরগীর দেহেই এই ভাইরাস ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ব্যাপক গবেষণার ফলে এখন দেখা গেছে মানুষ প্রমুখ স্তন্যপায়ী প্রাণী সমেত বহু সংখ্যক প্রাণীদেহে এই ভাইরাস টিউমার উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে পূর্ববর্তী ধারণার মূলে গভীর কুঠারাঘাত হয়েছে এবং ক্যান্সার সৃষ্টি সম্পর্কে ভাইরাসতত্ত্ব সমর্থন লাভ করেছে। একসময় ক্যান্সার গবেষণায় বিমাতৃসুলভ মনোভাবে ভাইরাসকে কোনো আমলই দেওয়া হত না।

প্রায় ৫৫ বছর আগে ডাঃ রাউস তৎকালীন একটি 'রহস্যময় বস্তু'র (বর্তমানে ভাইরাস নামে অভিহিত) সাহায্যে এক মুরগীর দেহ থেকে অপর মুরগীর দেহে ক্যান্সার পরিবহনে কৃতকার্য হন। এর ফলে 'ক্যান্সারের জীবাণু তত্ত্ব'-এর উদ্ভব হয়। তারপর থেকে ভেষজ-গবেষকরা ডাঃ রাউসের পথ অনুসরণ করে চলেছেন। অনেক গবেষক আশা করেছিলেন, তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে অন্তত কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সারের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন বা টিকা আবিষ্কৃত হবে। ১৯১০ সালে গবেষকরা 'ভাইরাস' কি বস্তু তা সঠিক ভাবে জানতেন না। তাঁরা এটুকু জানতেন, ভাইরাসের কার্যকলাপের মাধ্যমেই তাদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এখন বহুসংখ্যক ভাইরাস শুধু যে সনাক্ত করা গেছে তা নয়, তাদের চোখে দেখা গেছে (অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে) এবং শ্রেণীবিন্যাসও করা গেছে।) এখন পৃথিবীর সর্বত্রই ভাইরাস সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চলছে।

ক্যান্সার সম্পর্কিত গবেষণা ছাড়া ডাঃ রাউস রক্ত ও যকৃতের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কেও অনুসন্ধান করেছেন। রক্ত সংরক্ষণের উপযুক্ত পন্থা উদ্ভাবনে তিনি সহায়তা করেন এবং তারই ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রে প্রথম রক্ত-ব্যাংক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। ডাঃ রাউস এবছর প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছ থেকে জাতীয় বিজ্ঞান পদক এবং পশ্চিম জার্মানীর পল এর্লিখ্ পুরস্কারও লাভ করেছেন। যদিও তাঁর বয়স ৮৭ বছর, কিন্তু এখনও তিনি রকফেলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর গবেষণাগারে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন।

ডাঃ হাগিনস্-এর অবদানের স্বীকৃতিতে ক্যারোলীন ইনস্টিট্যুট বলেছেন, চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ডাঃ হাগিনসের সর্বোত্তম কৃতিত্ব হচ্ছে ১৯৩০ সালের শেষদিকে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি গবেষণাপত্র যার ফলে মানুষের দেহে কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সার প্রতিকারের পথ উন্মুক্ত হয়। কুকুরের ওপর পরীক্ষার দ্বারা ডাঃ হাগিনস্ প্রমাণ করেন, প্রস্টেট গ্রন্থির কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে যৌনাঙ্গে পুং-হর্মোন অ্যাণ্ড্রোজেনের উৎপাদনের ওপর। ডাঃ হাগিনস্ আরও প্রমাণ করেছেন, স্ত্রী-হর্মোন অস্ট্রোজেন পুং-হর্মোন অ্যাণ্ড্রোজেনের কার্যকলাপ নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। তাঁর এই অনুসন্ধান পুরুষদের মধ্যে প্রায়শ পরিলক্ষিত সাধারণ অর্বুদ চিকিৎসার পথ উন্মুক্ত করেছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় ডাঃ হাগিনসই প্রথম নির্বিষ ও অ-তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করেন, তাই তাঁকে বলা হয় রাসায়নিক চিকিৎসার অন্যতম পথিকৃৎ।
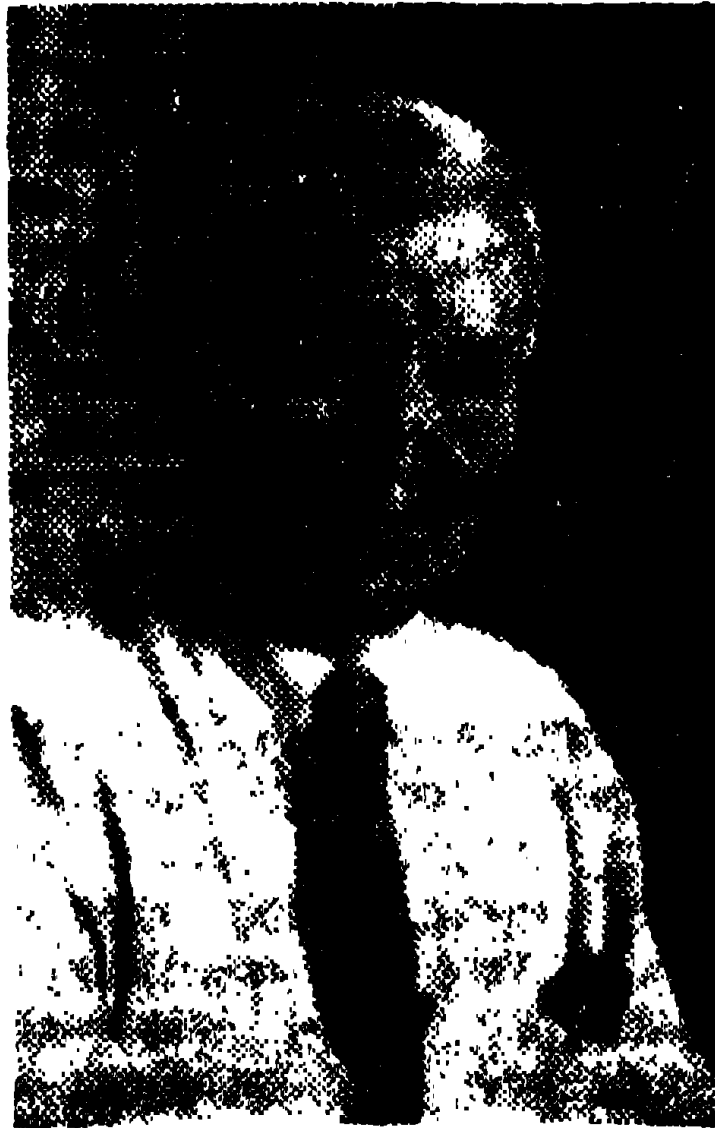
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাঃ হাগিনস্ পুরুষ মানুষের যৌনাঙ্গ-নিঃসৃত তরল পদার্থ নিয়ে অনুসন্ধানকালে লক্ষ্য করেন, এই তরল পদার্থে কোনো অজৈব ফসফেটের সন্ধান পাওয়া যায় না, যদিও মানুষের দেহে এই ফসফেট সর্বদা বিদ্যমান। কুকুরের ওপর এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি দেখেন, মানুষের মতো কুকুরেরও প্রস্টেট ক্যান্সার হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করেন, স্ত্রী-হর্মোনের মধ্যে অজৈব ফসফেট যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং কুকুরের ওপর স্ত্রী-হর্মোন প্রয়োগ করে প্রস্টেট অর্বুদ হ্রাস করা যায়। কিন্তু তার-পর পুং-হর্মোন প্রয়োগ করলে প্রস্টেটের আবার বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪১ সালে ডাঃ হাগিনস্ তাঁর এই পরীক্ষা মানুষের ওপর প্রয়োগ করেন। প্রস্টেট ক্যান্সার আক্রান্ত একজন মানুষের ওপর তিনি কৃত্রিম স্ত্রী-হর্মোন স্টীলবেস্টরল প্রয়োগ করে দেখান, তাতে লোকটির ক্যান্সার লোপ পেয়েছে। এইভাবে চিকিৎসা করে দেখা গেছে, প্রতি দশজন প্রস্টেট ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ন'জনের জীবন এতে রক্ষা পায়। আগে প্রায় সবাই এই রোগে মারা যেত। ২৫ বছর আগে ডাঃ হাগিনস্ই প্রথম দেখান, কৃত্রিম স্ত্রী-হর্মোনের ইঞ্জেকশনের দ্বারা পুরুষ মানুষের প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়।

ডাঃ হাগিনস্-এর বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৭ সালে গঠিত শিকাগো

ডাঃ ফ্রান্সিস পেটন রাউস

ডাঃ চার্লস হাগিনস্
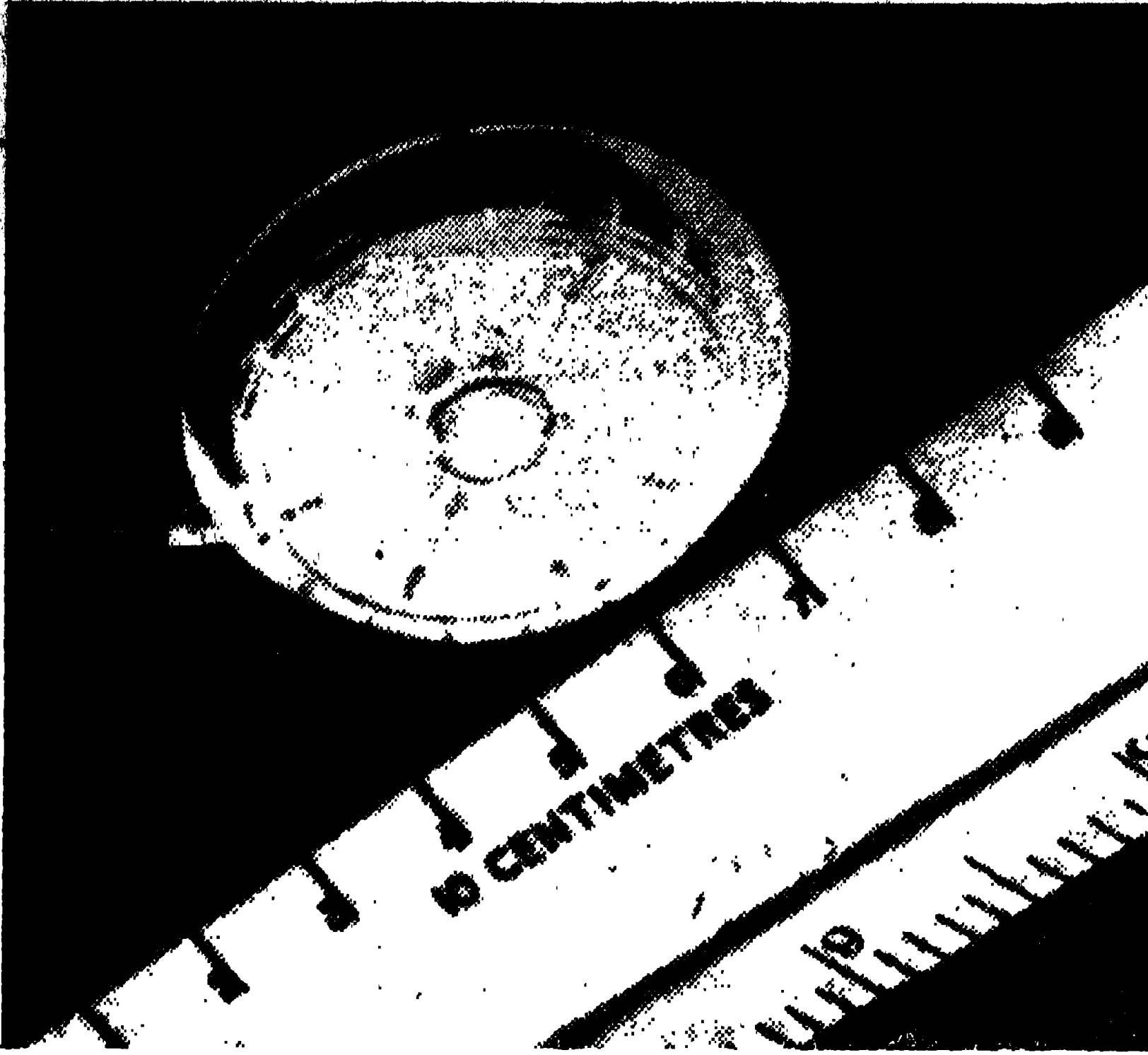
'এথিকোল্ডার' নামে অভিহিত রেফ্রিজেরেটর দুই সেকেন্ডের মধ্যে ঘরের তাপ-মাত্রাকে শূন্যে ডিগ্রীর ১৮৬ ডিগ্রী নিম্নে নামিয়ে দেয়।

মেডিকেল স্কুলের ফ্যাকাল্টিতে তিনি যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বেন মে গবেষণাগারে শল্যবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করেন।

ভারতে ফলিত বিজ্ঞান প্রসঙ্গে

গত ৩০ নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান ও শ্রম-শৈল্পিক গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডঃ আত্মারাম ২৮তম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে ফলিত বিজ্ঞান প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা'।

ডঃ আত্মারাম বলেন : দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর ভারতসহ বহু দেশ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির অভাব থেকে তারা আজও মুক্তিলাভ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক দিক থেকে জগৎ আজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—একদল যারা প্রাচুর্যে বাস করছে, আর একদল যারা অভাব-অনটনের মধ্যে রয়েছে। শেষোক্ত দলে নব-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত জাতিগুলির অধিকাংশই আছে। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ কম নেই। এই সম্পদকে তারা যদি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হতে পারে। তাই নতুন জাতিগুলির আজ কর্তব্য হোল তাদের সম্পদকে উন্নয়নের কাজে লাগানো এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের দক্ষ লোকের সহায়তা গ্রহণ ও উদ্দেশ্যসাধনের পন্থা উদ্ভাবন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিকা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই তাঁরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে এবং অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়।

ভারতের জনগণ আজ অর্থনৈতিক প্রগতিসাধনের উপায় হিসাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু জনগণের মনে বিজ্ঞান-চেতনা তেমন গড়ে ওঠেনি এবং দেশের বিজ্ঞানী, প্রশাসক ও শিল্পপতিদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত নিবিড় সম্পর্ক আজও তেমন স্থাপিত হয়নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দেশের প্রশাসক ও শিল্পপতিরা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অবদান বিচার করেন না। শিল্পপতিরা মনে করেন, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তত্ত্বীয় বিষয় নিয়েই বেশি মাথা ঘামান এবং তাঁদের বাস্তব দৃষ্টি তেমন নেই। এর ফলে একদিকে বিজ্ঞানী এবং অপরদিকে প্রশাসক ও শিল্পপতিদের মধ্যে একটি ব্যবধান রচিত হয়েছে। দেশের স্বার্থের দিক থেকে এই অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং দেশের প্রগতি এতে ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কেও বেশ কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু আজ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ভারতেও আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হবে। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞানী ও কারুশিল্পীদের ভূমিকা কি হবে? আমি মনে করি, দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্যে বিজ্ঞানী ও কারুশিল্পীদের সাহায্য করতে হবে, অর্থাৎ জনগণের কল্যাণের জন্যে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশের সীমিত সম্পদকে কিভাবে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগানো যায়, তার উপায় তাঁদের উদ্ভাবন করতে হবে। দেশের প্রতিটি লোক যাতে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী পায়, সেদিকে তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

যদি আমরা ধরে নিই, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যথা-যথভাবে সদ্ব্যবহার করা, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কোন্ বিষয়ের প্রতি আমরা সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেব? নতুন জ্ঞানার্জনে, না যে জ্ঞান আমরা ইতিমধ্যে সঞ্চয় করেছি, তা-ই অবিলম্বে কাজে প্রয়োগ করব? মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে, এখন আমাদের দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহারের কাজেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এর জন্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞ আমদানির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, আমাদের দেশে দক্ষ কারুশিল্পী যথেষ্টই আছেন। অপর দেশের পন্থা অনুসরণ করেই যে আমাদের চলতে হবে তার মানে নেই। আমাদের দেশের অবস্থা অনুযায়ী আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সুবিশাল জ্ঞান-ভান্ডারকে দেশের সম্পদকে যত শীঘ্র সম্ভব যথোপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহারের জন্যে কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি, সেটাই হচ্ছে আজ ভারতীয় বিজ্ঞানী, কারুশিল্পী ও অর্থনীতিবিদদের কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার ওপরই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে।

ডঃ আত্মারামের এই আলোচনার মধ্যে বহু মূল্যবান বিষয় আছে, যা দেশের বিজ্ঞানী, প্রশাসক ও শিল্পপতিদের চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কারণ, আমাদের সকলেরই তো কাম্য দেশের সামগ্রিক প্রগতি এবং জনগণের আশু উন্নতিসাধন।

নতুন ধরনের বালব

বৈদ্যুতিক আলো যে বিদ্যুৎশক্তিতে জ্বলে, তার বেশীর ভাগই আলোতে রূপান্তরিত না হয়ে তাপশক্তিতে পরিণত হয়। এই অপচয় কিভাবে নিবারণ করা যেতে পারে, তা নিয়ে এই ধরনের আলো আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কিছুটা এগিয়ে গেলেও আসল সমস্যা সমাধানের দিক থেকে এখনও তেমন কিছু করা যায়নি।

আমেরিকার বৈদ্যুতিক আলোর বিশিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে এ-সমস্যা সমাধানে ব্রতী হয়েছেন।

এ-বছরের প্রথম দিকে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এক ধরনের বাল্ব তৈরী করেছেন। এতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে যে-পরিমাণ আলো পাওয়া

যায়, এই পরিমাণ আলো অন্য কোন বাল্বে পাওয়া যায় না। এই নূতন ধরনের বাল্ব ফ্লোরেসেণ্ট বাল্ব থেকে তিনগুণ, মার্কারী ভেপার টিউব থেকে দ্বিগুণ এবং সাধারণ ইনক্যানডিসেণ্ট বাল্ব থেকে ছ'গুণ আলো দিয়ে থাকে।

ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন এবং সিলভ্যানিয়া ইলেকট্রিক প্রডাক্টস কোম্পানী নামে আরও দুটি প্রখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠানও এ-কাজে ব্রতী হয়েছেন।

লিউকালক্স নামে নূতন একপ্রকার সিরামিক বা মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত উপাদান উদ্ভাবিত হওয়ার জন্য এই নূতন ধরনের আলো তৈরী সম্ভব হয়েছে। এ-জিনিসটি উদ্ভাবিত হয় ১৯৫৯ সনে। বিশুদ্ধ এল্যু-মিনিয়াম অক্সাইডই হচ্ছে এর মূল উপাদান। মিহি এল্যুমিনিয়াম অক্সাইড চূর্ণকে চাপের দ্বারা ঘনকেলাসিত বস্তুতে পরিণত করা হয়। লম্বা ধরনের এই নতুন আলোর বাল্বটি দেখতে অনেকটা বড় শসার মত। এই লম্বা কাচের আধারের মধ্যেই থাকে সিগারেট বাক্সের মত বড় লিউ-কালক্স-এ তৈরী বিদ্যুৎ আলোকচ্ছটার আধারটি।

আজ পর্যন্ত রাস্তাঘাট, পার্ক, কল-কারখানার এবং বড় বড় বাড়ীর সামনে আলো দেওয়ার জন্য মাত্র ৪০০ ওয়াটের লিউকালক্স বাল্ব তৈরী হয়েছে। জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী পরে ঘরবাড়ী, অফিসে ব্যবহারের জন্য অল্প ও উচ্চশক্তির বাল্ব তৈরী করবেন।

এই ধরনের বাল্বের বিদ্যুৎ আলোক-চ্ছটার আধারটার মধ্যে থাকে সোডিয়াম বাষ্প। ঐ বাষ্পের মধ্য দিয়ে অতি উচ্চ তড়িৎ-শক্তি প্রেরণ করা হয়। সোডিয়াম বাষ্পের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ প্রেরণ করে আলো সৃষ্টি পূর্বেও করা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোর রং সাদা নয়, হলদে-কমলা রং-এর।

লিউকালক্স বাল্বে তা হয় না, কারণ সেখানে সোডিয়াম বাষ্পকে অতিউচ্চ তাপে তপ্ত করা হয়। ঐ পরিমাণ তাপে অন্যান্য বাল্বের আধার কাচ ও ফটিক গলে যায়।

লিউকালক্স বাল্বের পরমায়ু ৬০০০ ঘণ্টা। ফ্লোরেসেণ্ট ও মার্কারী বাষ্পের বাল্বের তুলনায় অনেক কম। ফ্লোরেসেণ্ট বাল্বের পরমায়ু ১৩০০০ ঘণ্টা এবং মার্কারী বাষ্পের পরমায়ু ১৬০০০ ঘণ্টা। তবে পরমায়ু বাড়াবার জন্য গবেষণা চলছে।

প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের সমস্যা

দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি হচ্ছে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্য। পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই এসকল খাদ্যের অভাব রয়েছে। কিন্তু প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য দেহের পুষ্টিবিধানের পক্ষে অপরিহার্য। পুষ্টি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত, যে-সকল শিশুর বয়স ছ' বছরের কম, তাদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে, তা কেবল দেহের নয়, মনেরও গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে এবং এই ক্ষতি অপূরণীয়।

তবে এই দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই কলা জন্মে, দামেও সস্তা এবং বহু দেশেই শিশুদেরও কলা খাওয়ানো হয়। কলার ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু এতে তো তেমন প্রোটিন নেই যে শিশুর দেহের প্রোটিনের অভাব পূরণ হতে পারে।

এই সমস্যা সমাধানের পথের সন্ধান দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান। বহু ধরনের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের সন্ধান বিজ্ঞানাগারে গবেষণার ফলে ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান বিজ্ঞানের সাহায্যেই হতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আমেরিকার ইন-ক্যাপারিনাতে, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রোনভ্রোতে এবং ইন্দোনেশিয়ার সারিডেলে 'আর্টি-ফেক্ট' নামে একপ্রকার কৃত্রিম খাদ্য সাহায্যে প্রোটিনের অভাব অনেকখানি মেটানো হয়েছে এবং এতে খুব সুফলও পাওয়া গিয়েছে। বিশিষ্ট মার্কিন পুষ্টি বিশেষজ্ঞ জর্জ কে পারনান এবং ডাঃ নেভিন এস স্ক্রিমশ এ-কথা জানিয়েছেন। এ'রা সম্প্রতি ভারতীয় খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে পর্যা-লোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, ভারতেও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে 'আর্টিফ্যাক্ট' জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হতে পারে। এই বিজ্ঞানীরা চীনাবাদামের গুঁড়া কার্পাসবীজের তেল, ডাল এবং অন্যান্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্য-বস্তুর সমবায়ে 'বালাহার' নামে একপ্রকার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য সুপারিশ করেছেন। এতে ধাতব উপকরণ, নানাপ্রকার ভিটামিন ও চীনাবাদামের গুঁড়া ছাড়া থাকবে শতকরা ৬৫ ভাগ গম ও ভুট্টা জাতীয় খাদ্য।

মহীশূরের সেণ্ট্রাল ফুড টেকনো-লজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভারতীয় জন-সাধারণের পুষ্টিবিধানের ক্ষেত্রে বহু রকমের কাজ করে যাচ্ছে। এখানেই বালাহার তৈরী হচ্ছে। ভারতে প্রোটিন সংক্রান্ত অপুষ্টি এবং শিশুদের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে আরও চার বছর পর্যা-লোচনা ও পরীক্ষা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঐ সংস্থাকে ৪৬ লক্ষ টাকা সাহায্য
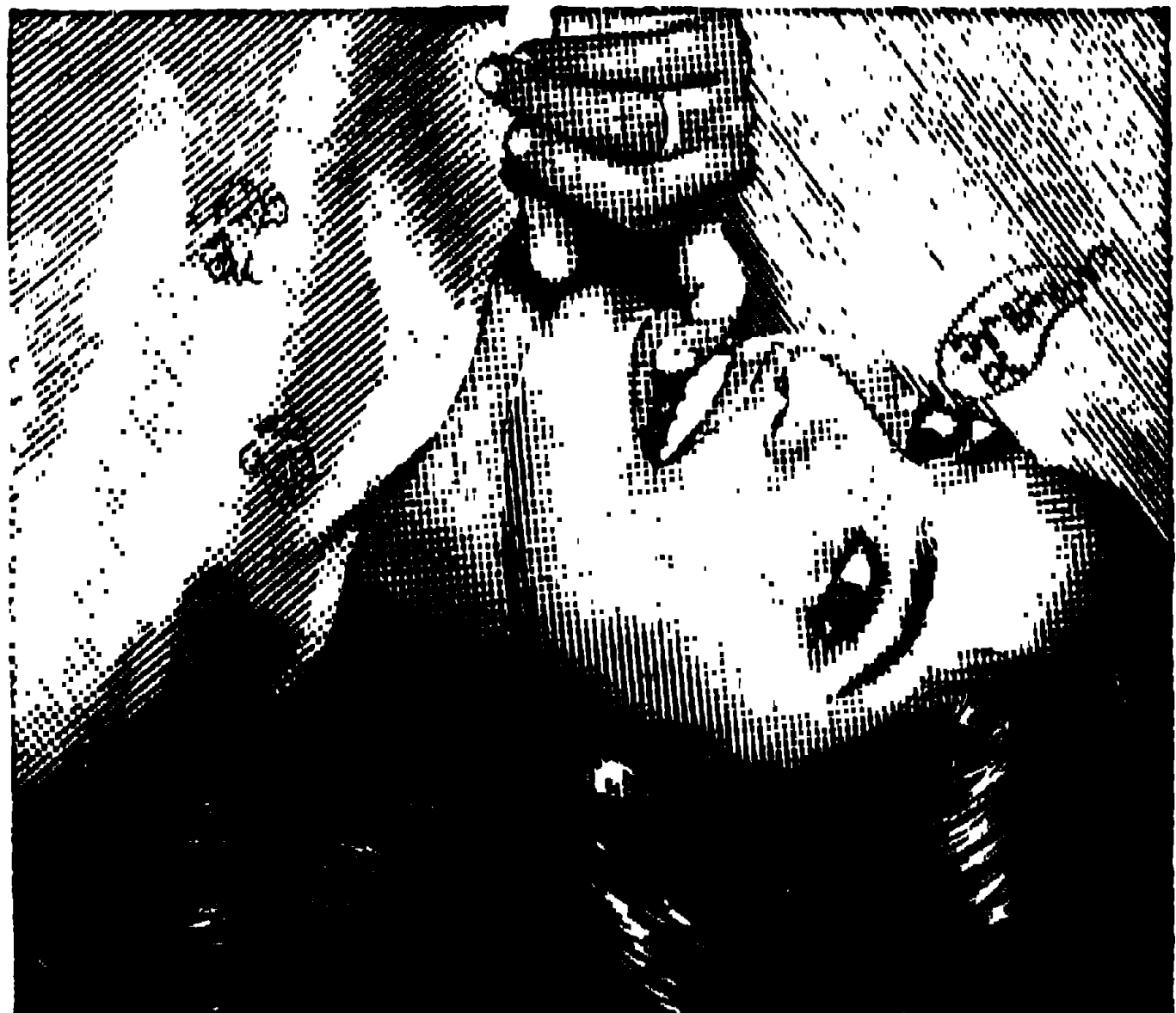
দিয়েছেন এবং সংস্থার এই কাজে আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস্ অব হেল্‌থও সহযোগিতা করছে।

বিভিন্ন শাকসব্জী, শিম, শুটি-বরবটী, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও মাছের মধ্যে কি পরিমাণ প্রোটিন রয়েছে এবং শিশু ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য অনুপূরক খাদ্য হিসাবে মাছ দেওয়া যেতে পারে কিনা, তা নিরূপণ করাই ইনস্টিটিউটের কাজ। তাছাড়া ভারতে শিশু-রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কি কি ধরনের পরিপূরক প্রোটিন খাদ্য শিশুদের দেওয়া প্রয়োজন, সে-বিষয়েও ইনস্টিটিউটে গবেষণা হচ্ছে। প্রোটিন খাদ্যের অপুষ্টির ফলে শরীরের কি প্রকার ক্ষতি হয়ে থাকে এবং তার কি কি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে, তা নির্ধারণ করাও ইনস্টিটিউটে সে-সকল গবেষণা চালানো হচ্ছে, তার অন্যতম লক্ষ্য।

স্ক্রীমশ-পারমান রিপোর্টে এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ভারতে যেমন খাদ্য ও পুষ্টি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানীরা রয়েছেন, সে-ধরনের বিজ্ঞানী পৃথিবীর বহু উন্নতিশীল রাষ্ট্রেই নেই। খাদ্য ও পুষ্টি-বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এরকম বহু ফলপ্রসূ গবেষণা ভারতে চালানো হচ্ছে এবং এ-বিষয়ে ভারত বেশ এগিয়েও যাচ্ছে। মহীশূরের এই সংস্থাটি পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের খাদ্য-পরিস্থিতির, খাদ্য-সম্পদের উন্নতিবিধানে সাহায্য করে থাকে। তবে খাদ্যোন্নয়ন পরি-কল্পনায় সাহায্যদানের ব্যাপারে কার্যকরী ও ব্যবসায়িক দিকটির উপরও বিশেষ গুরুত্ব-দান করা হয়।"

"কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়েল রিসার্চ-এর শাখাসমূহেও এ-বিষয়ে কাজ হচ্ছে। তবে হায়দরাবাদের নিউট্রিশান রিসার্চ লেবরেটরীতে ভারতে পুষ্টি-সমস্যা সম্পর্কে যে-সকল গবেষণা হচ্ছে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

নূতন নূতন খাদ্যের সন্ধান সমগ্র পৃথিবীতেই চলছে। আমেরিকার কৃষি-দপ্তরের বিজ্ঞানীরা নূতন ধরনের প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের সন্ধানে রয়েছেন। পৃথিবীর যে-সকল অঞ্চলে প্রোটিনের অভাব রয়েছে, সে-সকল অঞ্চলে ডাল এবং অন্যান্য যে-সকল খাদ্য পাওয়া যায়, সে-সকল খাদ্যের সংযোগে তাঁরা এক নূতন ধরনের প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যোৎপাদনের চেষ্টা করছেন। এ-উদ্দেশ্যে গবেষণা চালানোর জন্য আমেরিকার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অর্থ সাহায্য দিচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বে পুষ্টি-বিজ্ঞান সম্পর্কে যে-গবেষণা চালানো হচ্ছে, তাতে উন্নতিশীল রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও সাহায্য করছেন। রাষ্ট্রসংঘের জরুরী শিশুরক্ষা তহবিল নামে সংস্থা থেকে তাদের নির্বাচিত করা হয়েছে।

এ-সকল বিজ্ঞানীদের দ্বারা ইতোমধ্যে বহু রকমের প্রোটিনসমৃদ্ধ উপকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে। এঁরা সয়াবীন, গুঁড়া দুধ, শাকসব্জী, ভুট্টা, ফলের রস ভিটামিন এবং ধাতব উপকরণ মিশিয়ে একপ্রকার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরী করেছেন। এটি শীঘ্রই ভারত, ব্রেজিল, তাইওয়ান, হংকং, কোরিয়া ও ফিলিপাইন-এ ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। এছাড়া ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য একপ্রকার চীনাবাদামের বিস্কুট, এবং প্রোটিন সংযোগে বিশেষ ধরনের ময়দা দিয়ে পরিজ জাতীয় খাদ্যও তৈরী করা হয়েছে।

উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব মেটানোতে আমেরিকা বহু দেশকে নানাভাবে সাহায্য করছে। আমেরিকা ৪৮০ পাবলিক ল বা সরকারী আইন অনুসারে গুঁড়া দুধ, গম ও ভুট্টার ময়দা পাঠিয়ে থাকে। পাঠাবার সময়ে ঐ সকল দুধে ভিটামিন এ ও ডি মিশিয়ে দেওয়া হয়, আর ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম, আয়রণ ও বি ভিটামিন। ক্যাল-সিয়াম দাঁত ও হাড়ের বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

ডাঃ আরণ আল্টশুলের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় মার্কিন কৃষিদপ্তর প্রোটিন-সমৃদ্ধ কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত করছেন ও নূতন নূতন খাদ্যও উদ্ভাবিত হচ্ছে। ইনি হচ্ছেন আমেরিকার নিউ অরলিয়নস্থিত ঐ দপ্তরের সিড প্রোটিন পায়োনিয়ারিং রিসার্চ লেবরেটরীর প্রধান রসায়নবিজ্ঞানী। অপুষ্টির ফল যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে, খাদ্য-বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানী হিসাবে ডাঃ আল্টওল সুপরিজ্ঞাত। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর খাদ্যের উৎকর্ষবিধানের জন্য কেবলমাত্র প্রোটিনের পরিমাণের দিকে নয়, কি ধরনের প্রোটিন, তার গুণগত উৎকর্ষের দিকেই প্রধান দৃষ্টি দিতে হবে। গমের খাদ্যমূল্য বাড়াবার জন্য ঐ গমেতে অ্যামিনো এসিড যেমন লাইসিন ও মিথিওনাইন প্রয়োগ করার জন্য তিনি সুপারিশ করেছেন। এক পাউন্ড লাইসিনের দাম সাড়ে সাত টাকা। একজন লোকের এক বছরের খাদ্যে এই পরিমাণ লাইসিন প্রয়োগ করতে হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা অনেকখানি এগিয়েও গিয়েছেন।

আইসোটোপের সাহায্যে ক্যান্সার রোগ নির্ণয়

সানফ্রান্সিসকোর ডাঃ কেনেথ জি স্কট এবং জে এম ভোগেল টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল ক্যান্সার কংগ্রেসের অধি-বেশনে ক্যান্সার রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রুবিডিয়াম আইসোটোপের কার্যকারিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা যে-পর্যায়ে পাকস্থলী ও ফুসফুসের ক্যান্সার এই আইসোটোপের সাহায্যে ধরতে পেরেছেন, ঐ পর্যায়ে মামুলী এক্সরে অথবা প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতিতে তা ধরা পড়ে না। এই রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটি সহজ এবং এতে খরচও খুব কম পড়ে।

ডাঃ স্কট ও ডাঃ ভোগেল পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্তকোষের রুবিডিয়াম আইসোটোপ আত্মসাৎ করতে যে-সময় লাগে, কোন ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তকোষ তার ২০ গুণ কম সময়ে তা আত্মসাৎ করে থাকে। গামা রে স্পেকট্রো-মিটারের সাহায্যে তাঁরা এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বর্তমানে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে যেমন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কেও ভবিষ্যতে রুবিডিয়াম আইসোটোপের সাহায্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

পরমাণুর কেন্দ্রীন নিউট্রনের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয় এবং আইসোটোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে মৌলিক পদার্থের মতই থাকে।

বিমান যাত্রায় লেসারের ব্যবহার

তীব্র লেসার রশ্মির সাহায্যে সুকঠিন হীরার মধ্যেও ছিদ্র করা যায় এবং চোখের অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন রেটিনারও পুনর্সংযোগ সাধিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি বিমানবাহিনীর ওহায়োর রাইট প্যাটার্সন ঘাঁটির বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে লেসারকে বিমান যাত্রায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন্ পথে গেলে ঝড়ঝাপটা, অন্য কোন বিমানের সঙ্গে এবং ভূতলে অন্য কোন কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না, তার নির্দেশ লেসার ব্যবস্থা বিমানচালককে দিয়ে থাকে। আকারে এটি একটি ছোট দেশলাইয়ের মত।

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়িটা বেগে চলেছে।

অস্তিত্বগ্রাসী সেই দামামা থেমেছে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে চেতনার বিদ্যুত-চমক স্থির হয়েছে। ঝাঁকুনি-খাওয়া স্নায়ুগুলো আর ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে না। শিরায় শিরায় রক্ত আর দাপাদাপি করছে না। বুকের স্পন্দনও থেমে আছে বুঝি। আলো নেই, বাতাস নেই, শব্দ নেই, গতি নেই প্রলয়-শেষের এমনি এক নিথর শূন্যতার গভীরে ডুবে গেছেন জ্যোতিরাণী।

গাড়ি বাড়ির সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল।

নামতে হবে। অভ্যাসে হাত বাড়িয়ে এ-পাশ ও-পাশে কি খুঁজলেন তিনি। ভ্যানিটি ব্যাগটা। পেলেন না।...ওখানকার ওই ঘরের টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। সেখানেই ফেলে এসেছেন। মুহূর্তের জন্য ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।...ওই বন্ধ দরজা খুললেই ওটা চোখে পড়বে।

পড়ুক। ভালই হয়েছে। এই ভুলটুকু অন্তত ওপরঅলার সদয় পরিহাস। দরজা খুলে যারা ওটা দেখবে, তারা ভুল ভাববে না, ইচ্ছে করেই রেখে আসা হয়েছে ভাববে। যা জানবার জানবে। যা বোঝবার বুঝবে। কিছু একটা দায় বাঁচল জ্যোতিরাণীর। মস্ত দায়। ওটা দেখার পর বাড়ির মালিক এই রাতে আর বাড়ি ফিরবে না মনে হয়।...তার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেও সে বলে দেবে কে এসেছিল, কখন এসেছিল, কখন চলে গেছে।

নেমে এলেন। এই রাতের মত অবকাশ মিলবে আশা করা যায়। অবকাশ কেন দরকার সঠিক জানেন না।

সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেলেন। কারো চোখের সামনে পড়তে চান না তিনি। কালীদার ঘরে আলো জ্বলছে। ও-ধারে শাশুড়ীর ঘর থেকে সিতুর গলা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ বড় হবার ফলে ওটাই এখন পড়ার ঘর করে নিয়েছে। পড়ে যখন গলা ছেড়ে পড়ে।

ঘোরানো বারান্দা ধরে নিঃশব্দে পা বাড়ালেন জ্যোতিরাণী। ঘরে ঢোকার তাড়া। অলক্ষ্যেই ঘরে ঢুকতে পারলেন। অন্ধকার কাম্য, তবু আলোটা জ্বাললেন। শয্যায় এসে বসার পর অদ্ভুত লাগছে। ষোল বছর বয়সে এই সংসারে এসেছিলেন। মিত্রাদি বলে এ-জীবনে তাঁর আর তেইশ পেরুবে না, কিন্তু আসলে তিরিশ পেরুতে চলল। এর মাঝে অনেক প্রাণান্তক ঘা খেয়েছেন, অনেকবার বুকের ভিতরটা দুমড়ে ভাঙতে চেয়েছে। তবু বাইরে থেকে যখন ফিরেছেন, সংসারের চিত্রটা মুছে যায়নি—সংসারেই ফিরেছেন মনে হয়েছে।

...কিন্তু আজ তিনি কোথা থেকে কোথায় ফিরলেন? ওই সিঁড়ি ধরে উঠে, ঘোরানো বারান্দা পেরিয়ে, এ-যাবৎ কত সহস্রবার এই ঘরে এসে ঢুকেছেন, কত দিন কত মাস কত বছর এই শয্যার আশ্রয়ে কেটেছে। তবু আজ কোথা থেকে কোথায় ফিরলেন তিনি? তাঁর বাড়িতে? তাঁরই ঘরে?

বসেই আছেন। এত দিনের এত কালের সব যোগ যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। অধিকারের সবগুলো গ্রন্থি ঢিলে হয়ে খুলে খুলে পড়ছে। এটা সাজঘর? এখানে থেকে সেজেগুজে অধিকারের অভিনয় করছিলেন? কি করবেন এর পরে, অভিনয়ের এই দখল-টুকুই আঁকড়ে থাকবেন?

চমকে উঠলেন। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। ভেনটিলেটর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।...না। ফিরলে ওই গাড়ির শব্দ অন্তত কানে আসত। শামু বা ভোলা কেউ হবে। কিছু রেখে গেল বা দেখে গেল মনিবের ঘর ঠিক আছে কিনা। চেষ্টা করেও এক সদার জায়গা ওরা দুজনে মিলে জুড়তে পারছে না, সর্বদাই ভয়।

সদা গেল কেন? আশ্চর্য, ক'বছর আগের প্রশ্ন এত তাজা হয়ে ভিতরে লুকিয়েছিল!

ভেনটিলেটারের ও-দিকটা অন্ধকার আবার। যে এসেছিল চলে গেছে। আর একবার এসে মনিবের রাতের খাবার ঢেকে রেখে যাবে। যার জন্যে রাখা আজ তার ফেরা সম্ভব নয়। সম্ভব-অসম্ভবের রাস্তা ধরে আর চিন্তা করার কথা নয় জ্যোতি-রাণীর। তবু ধারণা এই রাতের অবকাশটুকু মিলবে।

...শাশুড়ী গত হবার পর থেকে রাতের বাড়ি ফেরায় ছেদ পড়ছিল মাঝে মাঝে। মা চোখ বোজার পর বাড়ির টান গেছে সেটাই বোঝাবার চেষ্টা ধরে নিয়েছিলেন। তাছাড়া স্বয়ংসফল মানুষের গাড়ি হাঁকিয়ে দূর-পাল্লায় ছোটাছুটি আছে, সংস্কৃতির অনুষ্ঠান আছে, ক্লাব আছে, পার্টি আছে, রাতের মজলিশ আছে—রাতে না ফিরলেও কোনদিন কুৎসিত আঁচড় পড়েনি।

...পড়েনি কেন? না পড়ার কথা নয়, তবু কেন পড়েনি? জ্যোতিরাণীর বড় বেশি আস্থা ছিল নিজের ওপর?

তাঁর চেহারা নিয়ে মিত্রাদি কতদিন কত গর্ব করেছে, কত ঠাট্টা করেছে, কত টীকা-টিপ্পনী কেটেছে। ভালও লেগেছে কত সময়। স্তুতির আড়ালে মিত্রাদি ব্যঙ্গ করেছে

আর নিজে আড়াল নিয়েছে। এ-বাড়ির ঘরোয়া ব্যাপারে তার অনেক দিনের অনেক কৌতূহলের তাৎপর্য অস্পষ্ট নয় আর। বাড়ির মালিকের মেজাজের এত পরোয়া কেন করে, তাও না। ...খেয়াল-খুশি মত প্রভুজীধাম থেকে নিখোঁজ হয়। জানিয়ে যেতে বললেও জানাতে ভুলে যায়। বাড়ির জরুরী কাজে আটকানোর ফলে রাতে আর নাও ফিরতে পারে বলে যায় সেখানে। মাসে ক'দিন ক'রাত এ-রকম জরুরী কাজ পড়ে? সেটা জ্যোতিরাণীকে জানাবার মত বুকের পাটা সেখানকার কোনো মেয়ের নেই। থাকলে বীথি ভেসে যেত না। মিত্রাদিকে চিনেও, জেনেও তার গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। বীথির পরে আরো তিনটে মেয়ে গেছে। বীথি বলেছে তার তুলনায় মিত্রাদির হাতের খেলনা ওরা। খেলনার মতই সহজে বিকিয়েছে।...এখনো মোটামুটি দুটো সুশ্রী মেয়ের ওপর চোখ মিত্রাদির। ওদের সম্পর্কে তাঁর কানে নালিশ তোলা শুরু করেছে, আড়ালে সন্দেহের বীজ ফেলতে শুরু করেছে। যেমন করেছিল শেষের দিকে বীথির নামে। যেমন করেছিল বাসন্তী কমলা রমার নামে। এভাবে সংশয়ের উদ্রেক করে আর সুশ্রী মেয়ে নেবার নামে বিতৃষ্ণা দেখিয়ে চোখে ঠুলি পরিয়ে রেখেছিল জ্যোতিরাণীর।

...শেষের এই মেয়ে দুটো বেঁচে গেল। ভবিষ্যতের কথা জানেন না, আপাতত বাঁচল। মিত্রাদির জরুরী কাজ শিগগীর আর শেষ হবে না আশা করা যায়। ......ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে আসাটা সব দিক থেকেই দামী ভুল। বীথির খবরটা আজ আর জানবে না। কিন্তু শিগগীরই জানবে। জ্যোতিরাণীই ব্যবস্থা করবেন।

স্থির নিশ্চল বসে আছেন। তপ্ত রক্তকণা আবার মুখের দিকে জমাট বাঁধছে।

এর পর প্রভুজীধামের কি হবে প্রভুজী জানেন। তিনি সজাগ থাকলে এ-রকম হবে কেন? তাঁর আশ্রয় থেকে একজনের বিকৃত লোভ এ-ভাবে মেয়েগুলোকে সর্বনাশের রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতে পারল কেন? না, জ্যোতিরাণীর আর কোনো দায় নেই, আর কিছুমাত্র মোহ নেই।

কিন্তু এদিকের এই ব্যাপার কতদিন ধরে চলছে?

বিয়ের পর থেকে ও-ঘরের মানুষ সন্দেহের বিষ ঢেলে ঢেলে জীবন বিষিয়েছে তাঁর। সন্দেহ এখনো ঘোচেনি। অনেক কুৎসিত আচরণের পর মামাশ্বশুর আর কালীদাকে অব্যাহতি দিয়েছে, কিন্তু, বিভাস দত্তকে দেখলে ওই কদর্য সন্দেহের বিষে দু' চোখ ছুরির ফলার মত চকচকিয়ে ওঠে। জ্যোতিরাণী কত দেখেছেন ঠিক নেই। নিজেকে জানে বলেই এত অবিশ্বাস, এমন বিকৃতি। ...কিন্তু এই গোপন উৎসব কত দিনের কত কালের ব্যাপার?

চিন্তাটা নিরর্থক, দশ দিনের হলেই বা কি দশ বছরের হলেই বা কি। একাগ্র নিবিষ্টতায় তবু ভেবে চলেছেন। স্বাধীনতার আগের সন্ধ্যায় বিভাসবাবুর অন্ধতামিস্র পড়ার সময় ছেলের আলো নেভানোর কাণ্ডটা পরদিন চন্দননগরের মজলিশে হাসির ব্যাপার হয়েছিল নাকি। নেহাত হাসির ব্যাপার বলেই মিত্রাদি না বলে থাকতে পারেনি। ...বাড়ির মালিক আগের দিন থেকে অনুপস্থিত কিন্তু জোর তলব পেয়ে মিত্রাদি চন্দননগর ছুটেছিল পরদিন সকালে, সেখানে গিয়ে দেখে এ-বাড়ির মালিকও উপস্থিত। রাতে তার গাড়িতে তার সঙ্গেই পালিয়ে এসেছিল। যোগাযোগ বটে।

...সংস্কৃতির আসরে আর সামাজিক মজলিশে ও-রকম অন্তরঙ্গ যোগাযোগের নজির একটা নয়। জ্যোতিরাণী আগেও শুনেছেন। মিত্রাদিই গল্প করত। বিলেত যাবার কিছু আগে থেকে সংস্কৃতি আর সামাজিক অনুষ্ঠানের যোগাযোগ বেড়েছিল মনে পড়ে। ও-ঘরের ওই লোকের সঙ্গেই তারপর বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার স্বামীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে সম্পর্ক ছিঁড়ে এসেছে। ...ও-ঘরের মানুষের যাবার কথা ছিল অ্যামেরিকা, কিন্তু মিত্রাদিকে সঙ্গে করে গেছেও লণ্ডন হয়ে ফিরেছেও লণ্ডন হয়ে।

সেখান থেকেই সূত্রপাত? এক সম্পর্ক ছিঁড়ে মিত্রাদি আর এক সম্পর্ক বুনেছেন?

কিন্তু আবারও মনে পড়ছে কি। বিলেত যাবার আগে কালীদার মুখে কালীদার কথাবার্তা। ততদিন পর্যন্ত মিত্রাদির যে সিতুর থেকেও বড় মেয়ে আছে জ্যোতিরাণী কেন তার বিলেতের চলনদারও জানত না। কালীদা ঠাস করে জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন, মেয়েকে রেখে যাচ্ছে কিনা। ...সকলে অবাক হয়েছিল আর মিত্রাদি হকচকিয়ে গেছল। আর, তাদের প্লেনে তুলে দিয়ে এসে অত রাতে বাড়ি ফিরেও কালীদা তাঁর কালো বাঁধানো নোটবই নিয়ে বসে গেছলেন মনে আছে। সেই রাতেই কালীদা অত মনোযোগ দিয়ে লেখার কি পেয়েছিলেন?

চিন্তার এক ছায়া আর এক ছায়া টানে বোধ হয়। ...মিত্রাদি বিলেত যাবার অনেক আগে থেকেই তার প্রতি কালীদার ব্যবহার স্বাভাবিক মনে হত না। বিলেত থেকে ফেরার পর সেটা আরো বিসদৃশ লাগত। আবার যে মানুষ টাকার গর্বে আর আত্মগর্বে ধরাকে সরা দেখে, সেই লোক দুনিয়ায় এই একজনকেই ভিতরে ভিতরে সমীহ করে চলে। শুধু কালীদাকে। শুধু তাঁর বিরাগের ভয়ে বিকৃত ক্ষোভের সেই চরম মুহূর্তেও প্রভুজীধামের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আর ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে রফা করতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। কালীদা শুধু বলেছিলেন না দিলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। ওটুকুতেই অমন জাদু-মন্ত্রের মত কাজ হল কেন? কেন কেন কেন?

কেন, এবারে জানতে পারবেন বোধ হয়। জ্যোতিরাণীর ধারালো দু' চোখে পলক পড়ে না। যেখানে জানা সম্ভব সেখান থেকেই কিছু জেনে নিতে পারবেন, বুঝে নিতে পারবেন। কালীদার কাছ থেকেই। আজ আর জ্যোতিরাণীর কোনো দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। আর, ওই ভদ্রলোকেরও কিছু জানা দরকার কিছু বোঝা দরকার। যতটা সম্ভব তিনি জানিয়ে দেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। চোখা-চোখা বাক্যবাণে আর বিদ্রূপবাণে মিত্রাদিকে যতই বিদ্ধ করুক, তার প্রতি এখনো কালীদার টান আছে মায়া আছে দুর্বলতা আছে এ জ্যোতিরাণী বিশ্বাস করেন। সে-জন্যেই সবার আগে তাঁকে জানাবার আক্রোশ। ...জানলে উপকার হবে, মোহ খসে পড়বে।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। সবে আটটা রাত্রি। শীতের রাত, তাও কম নয়। একজন ফিরবে না বলে সমস্ত রাতটাই তাঁর হাতে নেই। উঠলেন। সুটকেস খুলে কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে নিলেন। পোশাক-শাড়ি বা জামার দিকে ফিরেও তাকালেন না। টুকিটাকি কয়েকটা নৈমিত্তিক দরকারি জিনিসও সুটকেসেই পুরে নিলেন। তারপরে সমস্যা।

...টাকা।

আলমারি খুলে গোছা গোছা নোট বার করে নিতে পারেন। ব্যাঙ্কে নিজের নামে চেক-বই পাস-বইগুলো নিলেও টাকার সমস্যা বরাবরকার মত মিটতে পারে। কিন্তু ভাবতেও বিতৃষ্ণা। দু'দশ দিনের জন্যে যা না হলে নয় তাই নিলেন শুধু। গুণে একশ'টি টাকা। এ-বাড়ির এই সাজ-ঘরে বসে একটানা প্রায় পনের বছর অধিকারের অভিনয় করলেন...অভিনয়েরও তো দক্ষিণা মেলে। সেই বিবেচনায়ও বেশি নিতে পারতেন। থাক, ওতেই হবে, বেশিতে রুচি নেই। কিছুদিন চলার মত নিজস্ব কিছুও আছে। ...কোথায় কোন্ ট্রাঙ্কে রেখেছেন সে-সব ঠিক মনে পড়ছে না।

গয়নার ওই ছোট ট্রাঙ্কেই হবে। আরো অনেক দামী গয়না আছে ওতে। ব্যাঙ্কেও কত আছে ঠিক নেই। উপার্জনের প্রথম [illegible]

বন্যার আনুষঙ্গিক ঝামেলা সামলাবার জন্যেই ও-ঘরের মানুষ মাথা খাটিয়ে স্ত্রীর গয়নার আকারে অনেক টাকা আটকে রেখেছিল। আর, তার পরেও এত এসেছে যে ও'দিকে আর তাকানোর দরকার হয়নি। ট্রাঙ্কটা টেনে সামনে আনলেন। নিজের হাত দুটো আর গলার দিকে তাকালেন একবার। গায়ে গয়নার বোঝা নেই অবশ্য, যাও আছে নেহাত কম নয়, কম দামী তো নয়ই।

একে একে সবগুলো খুলে ফেললেন। বাঁধানো শাখা-জোড়া থাকল শুধু। ও'দুটো শ্বশুরের দেওয়া। ট্রাঙ্কে সে-সব গুছিয়ে রাখলেন আর যা খুঁজছিলেন তাও পেলেন! ছোটবড় আর কতগুলো গয়নার কেস-এর পুঁটলি। বাবার অবশিষ্ট টাকা দিয়ে মা সাধ্যমত সাজিয়েগুছিয়ে মেয়েকে বড় ঘরে পাঠিয়েছিলেন। সে-দিনের তুলনায় কম নয় খুব। গয়না-পত্র দেখে শ্বশুরবাড়িতে মায়ের দরাজ হাতের প্রশংসা হয়েছিল মনে আছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়ানোর পর কিছু-কালের অনটনের সময়েও মানী লোক এ-সবে হাত দেয়নি। টাকা আসা শুরুর পর হাত দেবার তো প্রশ্নই ছিল না। উল্টে একের পর এক নতুনের আমদানিতে পুরনোগুলো ওই পুঁটলির আশ্রয়ে গেছে।

বেছে সরু একছড়া হার আর সাধারণ দুটো দুল পরে নিলেন জ্যোতিরাণী। চুড়িগুলো একটাও হাতে ঢুকল না, অনেকটাই মোটা হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। ...সুখে ছিলেন বলতে হবে। সুখ! বুকের তাপ বাড়ছে ক্রমাগত। গয়না বাছা বা গয়না পরার সময় নয় এটা। উল্টে বিরক্তিকর লাগছে। কিন্তু হাত একেবারে খালি করে প্রতিক্রিয়াটা কারো চোখেই বড় করে তোলার ইচ্ছে নেই। নিজের চোখেও নয়। দু'হাতে দুটো বালা শুধু পরা গেল। পুঁটলিটা আবার বেঁধে স্যুটকেসএ ফেললেন। যা থাকল ওতে এ চড়া বাজারে তারও অনেক দাম। দুই-একখানা বিক্রি করে নগদ একশ টাকাও ফেরত পাঠানো যেতে পারবে।

সাড়ে আটটা। জ্যোতিরাণী প্রস্তুত।

এ-সময়েই সিতু খেতে বসে। কালীদার কাছে সময় লাগতে পারে একটু, ততক্ষণে ওর খাওয়া হয়ে যাবে। স্যুটকেসটা খাটের ওপর তুলে রেখে ঘর থেকে বেরুলেন। বুকের ভেতরটা কাঁপছে না, মুখে একটা রেখাও পড়ছে না। কাঁপতে দিচ্ছেন না, পড়তে দিচ্ছেন না।

মেঘনা সিতুর খাওয়ার কাছে দাঁড়িয়েছে। এই রকমই আশা করেছিলেন জ্যোতিরাণী। পায়ে পায়ে কালীদার ঘরে ঢুকলেন।

টেবিলে খোলা কাগজপত্র কিছু। চেয়ারে ঠেস দিয়ে টেবিলের ওপর দু' পা তুলে হাল্কা মেজাজে সামনের দেয়াল দেখছিলেন আর এক-একবার একটু-একটু শিস দিচ্ছিলেন কালীদা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার। টেবিল থেকে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর ভালো করে লক্ষ্য করলেন যেন। নিজেই আগে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, চোখ-মুখ এ-রকম দেখছি কেন?

কি-রকম দেখছেন কালীদাই জানেন, জ্যোতিরাণী অস্বাভাবিক কিছু দেখাতে চাননি। কিন্তু কালীদার দেখার ধার আলাদা, সময়ে এই ধার কাজে লাগালে আজ এই দিনে এসে ঠেকতে হত কিনা কে জানে। বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে—

কালীদার কৌতুক সর্বদাই গাম্ভীর্যে মোড়া। কিন্তু কেন যেন সেটা সহজভাবে এলো না তেমন। চেষ্টা করে লঘু ব্যঞ্জনা মেশাতে হল। —ভয়ের ব্যাপার মনে হচ্ছে, বোসো না...।

জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়েই রইলেন। স্থির নিষ্পলক দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর রেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভুজীধামে বীথি নামে একটা মেয়ে দু' বছর আগে কার সঙ্গে চলে গেছল, আপনি শুনেছিলেন?

আর যাই হোক হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ আশা করেননি কালীনাথ, অবাক তাই। —মামু বলেছিল। তারপরে একে একে আরো ক'টা মেয়ে চলে গেছে বলে তোমরা খুব ভাবনায় পড়েছ শুনেছিলাম—

—হ্যাঁ। বাসন্তী কমলা আর রমা।

বক্তব্য কিছুই বুঝছেন না কালীনাথ। —তা কি হয়েছে, আরো কেউ গেছে নাকি?

—যায়নি। আপনি ব্যবস্থা না করলে আরো দুটো মেয়ে যাবে।

কয়েক নিমেষের জন্য মাত্র হত-চকিত কালীনাথ। তারপরেই কুশাগ্রবুদ্ধি মানুষটার মুখে ঘোরালো ছায়া নেমে আসতে লাগল। সবই দুর্বোধ্য তবু অজ্ঞাত কোনো বিপাকের ঘ্রাণ পেলেন যেন। চেয়ারসুদ্ধ আর একটু ঘুরে ভালো করে তাঁর মুখোমুখি হলেন। —বুঝলাম না, সোজাসুজি বলো।

সোজাসুজিই বলবেন জ্যোতিরাণী। সোজাসুজি বলবেন, সোজাসুজি কিছু শুনতেও চাইবেন। ভাসুর সম্পর্কের কৃত্রিম সংকোচ ছেঁটে দিয়েই ঘরে ঢুকেছেন। খুব ধীরে, খুব স্পষ্ট করে বললেন, বীথি আর তার পরের ওই তিন মেয়ে ইচ্ছে করে কোথাও যায়নি। মিত্রাদি তাদের যেতে বাধ্য করেছে। খুব হিসেব করে বেঁধে-ছেঁধে মিত্রাদি একে একে জালে আটকেছে তাদের, তারপর টাকা নিয়ে বেচে দিয়েছে। বীথির জন্যে পনের হাজার টাকা পেয়েছিল, বাকি তিন জনের জন্য কত পেয়েছে জানি না। এখন আর দুটো মেয়ের ওপর চোখ পড়েছে তার—

কালীদাকে চমকে উঠতে বা আঁতকে উঠতে দেখবেন ভেবেছিলেন। তিনি বিভ্রান্ত বটে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া যতটা আশা করা গেছল ততটা নয়।

কালীনাথ গম্ভীর, নির্বাক খানিকক্ষণ। —এ খবর তুমি কবে জেনেছ?

—আজ। বীথি আর দেশে ফিরতে পারবে মিত্রাদি ভাবেনি। ...আমার সঙ্গে আজ তার দেখা হয়েছে।

—বীথি সত্যি বলেছে?

—হ্যাঁ। আপনি বিশ্বাস করেন না?

—করি।

জিজ্ঞাসা করা মাত্র দ্বিধাশূন্য এই জবাব পাবেন ভাবেননি। চেয়ে আছেন। —মিত্রাদি এ-কাজও করতে পারে আপনি জানতেন?

—না। তবে তার দ্বারা অনেক কিছু সম্ভব জানতাম।

ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, এতবড় একটা কাজে নামা সত্ত্বেও আপনি আমাকে সে-রকম আভাস দেননি তো?

অভিযোগের এই সুরটা কানে লাগল কালীনাথের। নির্লিপ্ত গম্ভীর দু' চোখ তাঁর মুখের ওপর তুললেন। —যতটা সম্ভব দিয়েছিলাম। ঠাট্টা ভেবে হোক বা আর কিছু ভেবে হোক তুমি তা নিয়ে চিন্তা করা দরকার মনে করোনি। যাক, এখন কি করতে চাও?

—পুলিসে খবর দিতে পারেন। জ্যোতিরাণী আরো কিছু বুঝিয়ে দেবেন, কিন্তু তার আগে এখনো দেখে নিতে চান প্রতিক্রিয়া কি-রকম হয়।

কালীনাথ ভাবলেন একটু। —বীথিকে সাক্ষী পাবে?

দুই এক মুহূর্ত সময় নিয়ে জ্যোতি-রাণী মাথা নাড়লেন, পাবেন না।

—আর যারা গেছে তাদের কাউকে?

—তাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

—পুলিস টানলে তুমিই সবথেকে বেশি জড়াবে তাহলে। তোমার প্রতিষ্ঠান, দায়িত্বও তোমার। তা' ছাড়া যারা গেছে তারা না-বালিকা নয়, সাক্ষীপ্রমাণ ছাড়া নালিশ কেউ কানে তুলবে না, মাঝখান থেকে দুর্নামে তোমার প্রভুজীধাম অচল হবে। তার থেকে আর কি করা যায় ভাবো—

এবারে সময় হয়েছে, আরো ঠাণ্ডা আর স্পষ্ট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, প্রভুজী-

ধাম অচল হবে কিনা বা আর কিছু করা দরকার কিনা এখন থেকে সেটা আপনি ভাবুন। আমি আর এখানে থাকছি না।

শেষের উক্তি সঠিক বুঝে উঠলেন না। —কোথায় থাকছ না?

—এখানে। এই বাড়িতে।

নির্বাক বিস্ময়ে কালীনাথ চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যা শুনলেন স্পষ্ট নয় যেন খুব। কিন্তু স্পষ্ট হতে থাকল একটু একটু করে। কিছু একটা সম্ভাব্য ব্যাপার মগজের দিকে ঠেলেই এগিয়ে আসতে লাগল। একজন মেয়ে বেঁচেছে বলেই আর একজনের বাড়ি ছাড়ার কথা নয়। আরো কিছু ঘটেছে। এতক্ষণের স্থৈর্য তোলপাড় করে যে সন্দেহটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এগিয়ে আসছে সেই গোছেরই কিছু ঘটেছে।

সামনে যে দাঁড়িয়ে সম্পর্কে তাঁর ভাসুর তিনি ভুলে গেছেন। ওই কঠিন মুখের অদৃশ্য রেখাগুলোই দেখে নিচ্ছেন বুঝি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ?

—মিত্রাদির বাড়ি থেকে।

—সে জেনেছে এ-সব?

—না।
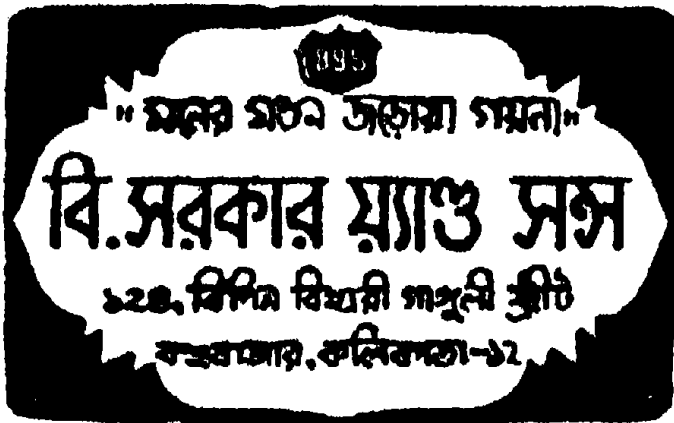
—তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

—না।

—বাড়ি ছিল না?

—ছিল।

কালীনাথ চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না আর। একটা উদ্গত উত্তেজনা সামলাবার চেষ্টায় উঠে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে চলে গেলেন। উত্তেজিত হন না বড়। কিন্তু এ একটা স্বতন্ত্র মুহূর্ত। কত স্বতন্ত্র তিনিই জানেন। বুঝতে সময় লাগে না তাঁর, যা বোঝবার খুব স্পষ্ট বুঝেছেন। তবু ফিরলেন আবার, কাছে এসে দাঁড়ালেন। —শিবুও ওখানে ছিল তাহলে?

জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন না। এটাই জবাব। ভদ্রলোক বুঝেছেন। এত সহজে বোঝার কথা নয় তবু বুঝেছেন। কিন্তু এই স্তব্ধ মুহূর্তেও ভিতরে ভিতরে অবাক তিনি। দুর্ভাবনা নয়, দুশ্চিন্তা নয়, কালীদার দু' চোখ চকচক করছে। এই গাম্ভীর্যের তলায় তলায় কঠিন কৌতুকের আভাস ঝিলিক দিচ্ছে, দাগ ফেলতে চাইছে। জানতেন জানতেন, এই ভদ্রলোক অনেক আগে থেকে অনেক কিছু জানতেন।

অস্ফুটস্বরে কালীনাথ প্রায় স্বীকারই করলেন যেন, মাথা গরম করে কি লাভ, সবই দুর্ভাগ্য...

কিন্তু জ্যোতিরাণী ঠিক দেখছেন? সে-রকম বিচলিত হওয়া দূরে থাক, তিনি ঘর ছেড়ে বেরুলে ভদ্রলোক হাসতেও পারেন মনে হচ্ছে। চেয়ে আছেন। —দুর্ভাগ্যের ব্যাপারটা আপনি কবে থেকে জানেন? ...স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আর টাকা আনতে মিত্রাদি একসঙ্গে যখন বিলেত গেল, তখন থেকে?

কালীনাথ সময় নিলেন একটু, জবাবটা হাল্‌কা না শোনায় সেই চেষ্টা। বললেন, বিলেতে মিত্রাদির স্বামী বলে কেউ নেই, কেউ কোনদিন ছিলও না। সে কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যায়নি, টাকা আনতেও না। ...শিবুর সঙ্গে লণ্ডন হয়ে আমেরিকায় গেছল, শিবুর সঙ্গেই ফিরেছে।

জীবনের এমন এক মর্মান্তিক ক্ষণেও জ্যোতিরাণী হতভম্ব বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। —মিত্রাদির স্বামী নেই?

—আছে। কোয়েমবেটোরের এক হাস-পাতালের আধা চ্যারিটেবল বেডএ পড়ে আছে। কোমর থেকে পা অবধি প্যারালিসিস, আর উঠবে না। বছর আটেক আগে তোমার মিত্রাদি সেই হাসপাতালের মুরুব্বিদের হাতে একবারে কিছু টাকা দিয়ে সম্পর্ক চুকিয়ে এসেছে। ...সেবারে আমি সাউথ্‌এ গেছলাম স্বচক্ষে ভদ্রলোককে একবার দেখে আসতে। তার ফলে টাকাও বেশ খসেছে, ভদ্রলোক বছরের পর বছর টিকে আছে দেখে হাসপাতালের লোকেরা কেউ খুশি নয়।

জ্যোতিরাণীর মনে আছে। দিন পনেরর জন্যে কালীদার হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে আসার কথা মনে আছে। এই মুহূর্তের সব রাগ আর ক্ষোভ কালীদার ওপরে। —দুজনে একসঙ্গে বিলেত যাচ্ছে দেখেও আপনি আমাকে কিছু জানালেন না?

একটু ভাবার মত করে কালীনাথ জবাব দিলেন, তারও বছর দেড়েক আগে জানালে ফল হতে পারত। কিন্তু তখন নিজেই খুব ভালো বুঝে উঠতে পারিনি।

অর্থাৎ জটটা তারও দেড় বছর আগে পাকিয়েছে। ক্ষমা যেন জ্যোতিরাণী কালী-দাকেই করতে পারছেন না। —তবু এতদিনের মধ্যে আপনি আমাকে কিছুই বলেননি কেন?

চেয়ারটা টেনে আবার বসলেন কালীদা। উত্তরে নির্লিপ্তগোছের সাদাসিধে মন্তব্য করলেন, এ-সব ব্যাপার শেষ পর্যন্ত চাপা থাকে না বলেই অশান্তি...।

জ্যোতিরাণী শান্ত থাকতে চেয়েছিলেন, ঠাণ্ডা থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুঃসহ একটা তাপ মুখের দিকে ধেয়ে আসছে, চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করছে। —আপনি এত-সব খবর রাখেন সেটা এদিকেরও জানা আছে বোধহয়?

—কার, শিবুর...?

বিড়ম্বিত গাম্ভীর্যের আড়ালে আবারও একটা কৌতুকতরঙ্গ ঝিলিক দিয়ে গেল কিনা ঠাওর করা গেল না। জ্যোতিরাণী অপেক্ষা করছেন।

—আগে জানত না। বিলেত থেকে ফেরার পর আমার বোকামিতে জেনেছে।

বোকামিটা যেন এখনো মুখে লেগে আছে কালীদার। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণী বলে উঠতে যাচ্ছিলেন সেই বোকামির ফলেই আজ তিনি এ-বাড়ির মালিকের ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে আছেন কিনা। সামলে নিলেন। মনে হল, এই মানুষের ভিতরেও একটা যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, এত বড় নগ্ন ব্যাপারটা লঘু করে তোলার চেষ্টা সত্ত্বেও তারই তাপ থেকে-থেকে চিকচিক করে উঠছে। যাক, অনেক জানা হয়েছে, আর একটু বাকি। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, চল্লিশ বছর কাটিয়ে সদা হঠাৎ এখানকার কাজ ছেড়ে চলে গেছে কেন?

এবারের বিড়ম্বিত মুখে বিব্রত হাসি। বললেন, তুমি তো মুশকিলে ফেললে দেখছি! আজ আর নয়, সময়ে জানবে।

অসহিষ্ণু নীরবতায় জ্যোতিরাণী অপেক্ষা করলেন একটু, তারপর ধীর কঠিন স্বরে বললেন, সময় আর না-ও আসতে পারে, আমি আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

এবারে যথার্থই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেন যেন কালীনাথ। আবার চেয়ার ছেড়ে উঠতে হল। অনুচ্চ অনুশাসনের সুরে বললেন, পাগলামি কোরো না, মিথ্যে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি?

—কার অশান্তি বাড়বে?

—সকলেরই, তোমারও।

—আপনি তাহলে কি করতে বলেন?

—কি বিপদ, ঘরে গিয়ে এখনকার মত মাথা ঠাণ্ডা করো তো, পরে ভেবে-চিন্তে দেখা যাবে।

অসহ্য লাগছে, তবু তেমনি ধীর অনমনীয় সুরে জ্যোতিরাণী বললেন, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া দরকার। আপনি গুরুজন, স্নেহ করেন, বাধা দিতে চেষ্টা করে আমাকে অসুবিধের মধ্যে ফেলবেন না।

সংকল্পের নড়চড় হবে না সেটা স্পষ্টই বুঝে নিলেন কালীনাথ। সে-ভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন না আর। শুধু বললেন, কিন্তু এই রাতে তুমি যাবে কোথায়? প্রভুজীধামে?

জবাব পেলেন না। সেখানে যাবে না ধরে নিলেন। ...বাপের বাড়ি যেতে পারে, কিন্তু মা মারা যাবার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে সেখানকার সঙ্গেও সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ...শমীকে মেয়ের মত দেখে, তা'বলে বিভাস দত্তর ওখানে গিয়ে উঠবে তাও ভাবা যায় না। মুখ-ভাব দ্রুত বদলাচ্ছে কালীনাথের। শান্ত।

—কোথায় যাচ্ছ আমাকে জানানো যায় না?

—দরকার হলে জানাব। ...যেখানেই যাই এর থেকে বে-ঘোরে গিয়ে পড়ব না হয়ত, আপনি ভাববেন না।

—আমার ভাবার ধাত খুব নয়। যাক, এক্ষুনি যাবে?

—হ্যাঁ।

—সঙ্গে কি নিচ্ছ?

—স্যুটকেস।

—টাকা নিয়েছ?

—হ্যাঁ, একশ টাকা। আর মায়ের দেওয়া বিয়ের গয়না ক'টা। বাকি সব ট্রাঙ্কে থাকল, সরিয়ে রাখতে বলবেন।

একটু চুপ করে থেকে কালীনাথ বললেন, এখানকার এই বড় চাকরির ওপর ভরসা কম বলে বাইরের কাজও একটু-আধটু করি, কিছু উপার্জনও হয়।...দেব কিছু?

—দরকার হলে নেব। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কি, মুহূর্তের দ্বিধা সরিয়ে তেমনি শান্ত মুখে বললেন, টাকা নয়, ইচ্ছে করলে আর কিছু দিতে পারেন।

কালীনাথ জিজ্ঞাসু।

—হিসেবের নোট বই ছাড়াও আর একটা কালো নোটবইয়ে আপনি কিছু লেখেন। ...সেটা।

পলকের বিস্ময়। তারপর চোখে মুখে ঠোঁটের ফাঁকে সেই হাসির ঝিলিক। জবাব দেবার আগে হাসিটুকু এবারে ঠোঁটের ডগায় থেকেই গেল। বললেন, আচ্ছা...সেও সময়ে পাবে।

থমথমে মুখে ঘর থেকে বেরিয়েই জ্যোতিরাণীর পা থেমে এলো। ঘোরানো বারান্দার মুখে সিতু দাঁড়িয়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে সিতু তাকালো তাঁর দিকে। কিছু হয়ত শুনেছে, কিছু হয়ত বুঝেছে, কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়েছে। অদূরের আবছা আলোয় মেঘনা দাঁড়িয়ে। তারও [illegible] মূর্তি।

...জেঠুর সঙ্গে মা এত কি কথা বলে জানার কৌতূহলে একটু আগে সিতু দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কানে যেন গোটা কতক গরম শলা ঢুকেছে তার। জেঠুকে মা বলছে আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছে...বাধা দিতে বারণ করছে...একশ টাকা সঙ্গে নিল বলছে... গয়না ট্রাঙ্কে থাকল বলছে!

হঠাৎ একটা ত্রাসে পেয়ে বসেছে যেন তাকে, ছুটে গিয়ে মেঘনাকে জিজ্ঞাসা করেছে কি ব্যাপার।

জ্যোতিরাণীর সর্বশরীরে আবার একটা উষ্ণ স্রোত ওঠানামা করে গেল বুঝি। সেই সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণাও ঠেলে সরালেন তিনি। —মেঘনা!

মেঘনা দৌড়ে এলো।

—শামু বা ভোলাকে বল একটা ট্যাকসি ডেকে দেবে।

দ্রুত ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। নির্দেশ শুনেও মেঘনা বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। অবাক বিস্ময়ে সিতু শুনল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কালীনাথও শুনলেন।

জ্যোতিরাণী পাথরের মতই বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন। কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না। ঘরের কোনো কিছুর ওপর চোখ ফেলছেন না। কোনো স্মৃতির মায়া কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না।

শুধু অপেক্ষা করছেন।

পরদার ফাঁকে ভোলার মুখ দেখা গেল। অর্থাৎ ট্যাক্সি আনা হয়েছে। জ্যোতিরাণী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, স্যুটকেসটা তুলে দাও।

বিভ্রান্ত মুখে ভোলা আদেশ পালন করতে এলো। জ্যোতিরাণী ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সিতু তেমনি দাঁড়িয়ে। মেঘনা তেমনি দাঁড়িয়ে। কালীদাও তেমনি দাঁড়িয়ে।

দাঁড়াতে হল একবার জ্যোতিরাণীকেও। ছেলে যে-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেভাবে চেয়ে আছে—কঠিন নীরবতায় নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসতে পারলেন না তিনি। দাঁড়ালেন। তাকালেন। দেখলেন। তারপরেই বিষম নাড়া-চাড়া খেলেন একটা। ...বিভাসবাবুর ছাড়-পত্রবাহ?

না, তা তিনি এখনো ভাবেন না। তা তিনি এখনো ভাবতে চান না।...তবে অসুবিধে হবে না, মাথা তুলে ঠিকই দাঁড়াবে। দাঁড়াচ্ছে যে দেখেই যাচ্ছেন। তবু বড় দুঃসহ মুহূর্ত যেন।

সিতুও চেয়ে আছে। কলের মূর্তি। বিহ্বল, বিস্ফারিত।

জ্যোতিরাণী কাছে এলেন। মাথায় একখানা হাত রাখলেন। বললেন, ভালো থাকিস্—

সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন। দু'চোখ [illegible] থরথরে।

দরজা খুলে বীথি শুধু অবাক নয়, ঘাবড়েও গেল। জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে। পাশে হোটেলের বেয়ারার হাতে স্যুটকেস। মুখের দিকে চেয়ে কথা সরে না। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থমকালো, বেয়ারাটা বাংলা বোঝে, তাছাড়া অবাক হচ্ছে।

তার ইশারায় স্যুটকেস ভিতরে রেখে বেয়ারা চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে বীথি ঘরে নিয়ে এলো তাঁকে, বুকের ভিতরটা হঠাৎ ঢিপঢিপ করে উঠেছে—জীবনে অনেক দুর্যোগ দেখেছে, এ স্তব্ধতা সে যেন চেনে। তাই জিজ্ঞাসা করতেও ভয়।

ভয়ানক অবসন্ন লাগছে জ্যোতিরাণীর, শ্রান্ত দু'চোখ মেলে বীথির দিকে তাকালেন, নিজে থেকেই বললেন, তুমি তো একা আছ, দুই একটা রাত তোমার কাছে থাকব। অসুবিধে হবে?

জবাব দেবার আগে বীথি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে খানিক চেয়ে থেকে বলল, অসুবিধে একটুও হবে না...কিন্তু এত রাতে আপনি বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকবেন...সঙ্গে স্যুটকেস, কি হয়েছে দিদি?

জ্যোতিরাণী ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, আপাতত আমার বাড়ি বলে কিছু নেই।

বীথির অবাক হওয়াই স্বাভাবিক, অবাক বিস্ময়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করাও স্বাভাবিক। কিন্তু এত শ্রান্ত লাগছে জ্যোতিরাণীর হঠাৎ যে কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না।

বীথি তাও অনুভব করছে যেন। কথা বলছে না, কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে উঠছে না। দেখছে শুধু। বিস্ময়ের সঙ্গে কি-এক অজ্ঞাত আশংকার ছায়া মিশছে। শেষে চুপ করে থাকতে পারল না, আস্তে আস্তে বলল, আমার ঘর নেই...একদিন ছিল... আমিই আপনার সর্বনেশে ক্ষতি কিছু করে বসলাম না তো দিদি?

এখনো কি পাথর হয়ে যাননি জ্যোতি-রাণী...তাপ পেলে এখনো ভেতরে মোচড় পড়ে? আর এখনো হতভাগা মেয়েটা সেই হৃদয় নিয়ে বসে আছে! একখানা হাত ধরে কাছে টানলেন তাকে, অস্ফুট স্বরে বললেন, বীথি, তুমি আমার কত উপকার করেছ জান না, এমন আর কেউ করেনি। সেইজন্যই কিছু না ভেবে প্রথমে তোমার কাছে চলে এলাম। কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত বীথি, ঘুম পাচ্ছে, একটু শোবার ব্যবস্থা করে দাও—

বীথি সচকিত, আপনার খাওয়াও হয়নি বোধহয়?

—হয়েছে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

গালচের ওপর সোফা সেটি গদি পাতা বসার ঘর এটা। বীথি শশব্যস্তে শোবার ঘরের দিকে এগলো।

—বীথি।

ডেকে থামালেন তাকে। দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, এখানে তো অনেক কিছু

আছে দেখছি, এরই একটার ওপর চাদর-টাদর কিছু পেতে দিয়ে তুমি শুয়ে পড়ো গে যাও, আমার অসুবিধে হবে না।

তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকল বীথি। মুখে বিষণ্ণ ছায়া পড়ছে। ওই ঘরের আবিল ভোগশয্যার আশ্রয়ে রাত কাটাতে বিতৃষ্ণা ভাবছে। খুব মিথ্যে নয় বলেই জ্যোতিরাণীর সঙ্কোচ। কিন্তু তিনি এত স্পষ্ট করে ভাবেননি, এত স্পষ্ট করে বোঝাতেও চাননি। রাতটা একলা থাকতে চান এটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন। বললেন, বীথি তোমাকে সত্যিই ভালো না বাসলে এখানে আসতে পারতুম না। যা বললাম কারো—

বীথি তাড়াতাড়ি চলে গেল।

স্নায়ুগুলো সব স্বাভাবিক যোগ হারিয়েছে। ক্লান্তিতে অবসাদে জ্যোতিরাণী বসেও থাকতে পারছিলেন না। রাজ্যের ঘুম ছেয়ে আসছিল চোখে। ভেবেছিলেন, দুঃস্বপ্নের মত এই রাত অচেতন ঘুমের গভীরে ডুবে যাবে। তারপর কালকের কথা কাল, আজ শুধু এটুকু শান্তির আশায় লালায়িত হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতিরাণী।

ঘুম এলো না। একলা ঘরের শূন্যতার ছোঁয়া পেয়ে মৃত্যুর মত গাঢ় ঘন চাপ-চাপ ঘুম যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু ওই ঘুম জ্যোতিরাণী আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করছেন। চোখের সামনে যারা ভিড় করে আসছে, এই রাতটুকুর মত অন্তত সরিয়ে রাখতে চান তাদের।

কিন্তু আসছেই তারা। ঘুরেফিরে বার-বার করে আসছে ছেলে—ছেলের ওই মুখ-খানা। আসার সময় যেমন দেখেছিলেন। ...প্রভুজীধামে খেয়ালী শিল্পীর আঁকা প্রভুজীর সেই মস্ত ছবিখানাও আসছে চোখে। ওই ছবির মুখের সঙ্গে ছেলের মুখের আদল আবিষ্কার করেছিলেন তিনি।...শুধু তিনি, আর কেউ না। মিল নেই। এ-ভুল তিনি দু'বছর আগেই বুঝেছিলেন, শাশুড়ী চোখ বোজার পর ছেলেকে যেদিন স্কুল-বোর্ডিং থেকে ছাড়িয়ে আনা হ'ল—সেইদিনই। অথচ আজ আবার...থাক, ভাববেন না।

শক্ত করে চোখ বুজলেন জ্যোতরাণী। তবু একের পর এক মুখগুলো সব চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে যাচ্ছেই। ওই মুখ-গুলো যেন নতুন করে নতুন চোখে দেখে যাচ্ছে তাঁকে।...ছেলের মুখ, প্রভুজীর মুখ, প্রভুজীধামের মেয়েগুলোর মুখ, মিত্রাদির মুখ, ও-ঘরে বীথির মুখ, রমা কমলা বাসন্তীর মুখ, শমী আর বিভাস দত্তর মুখ, সদা মেঘনা শামু আর ভোলার মুখ, কালী-দার মুখ...

আর একজনের মুখও। শিবেশ্বরের মুখ। সবশেষে এই মুখখানাই সামনে থেকে নড়ছে না। ঘুমের চেষ্টার ফাঁকে কি এক চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল।...আজ এই রাতে ফিরতেও পারে বাড়ি। ফেরাই সম্ভব। কারণ তিনি বেরিয়ে আসার পর কালীদা টেলিফোন না করে পারেন না। টেলিফোনে নিশ্চয় জানানো হয়েছে...

চিন্তাটা সবলে ঠেলে সরিয়ে ছোট মেয়ের মতই আবার শক্ত করে চোখ বুজলেন জ্যোতিরাণী।

কালীনাথ টেলিফোন করেননি। খবরও দেননি। কিন্তু সেই রাতেই বাড়ি ফিরেছেন বটে শিবেশ্বর। একটু বেশি রাতে ফিরেছেন।

কারণ, সেই অনাগত ছায়াটা শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাড়ির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের সঙ্কল্পে যে-রাতে তাকে স্কুল বোর্ডিং-এ পাঠানোর ব্যবস্থার কথা শুনেছিলেন তিনি—সেই রাতে ওই অনাগত ছায়াটা দেখেছিলেন তিনি। স্ত্রী বলেছিল, ছেলে মেয়েছেলে চেনা শুরু করেছে...খারাপ মেয়েছেলে কাদের বলে জেনেছে। সেই কারণেই তাকে দূরে সরানোর অটুট সঙ্কল্প। ছেলের প্রবৃত্তিশাসনের মত আপসশূন্য এমনি কোনো অনাগত ছায়া সেই রাতে তাঁকেও স্পর্শ করে গেছে...অস্থির ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন শিবেশ্বর।

সেটা এই দিনের ছায়া?

প্রবৃত্তিশাসনের নামে ছেলেকে দূরে সরিয়েছিল। তাঁর বেলায় কি করবে?

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগ বেড়েছে, আত্মবোধ টগবগ করে ফুটে উঠেছে, ভ্রূক্ষেপ না করার প্রবৃত্তি দ্বিগুণ দুর্দম হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু সব-কিছুর তলায় তলায় অস্বস্তি বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছে একসময়। থাকতে না পেরে শেষে বাড়ির দিকেই রওনা হয়েছেন তিনি। একটা সময় আসে যখন সব শেষ জানলেও স্বস্তি, তবু না জানলে নয়।

তার আগে সমাধির স্তব্ধতার গ্রাসে ডুবেছে তিন রাস্তার ওপরের ত্রিকোণ বাড়িটা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বারান্দা পরে জ্যোতিরাণী ট্যাক্সিতে ওঠার আর ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

সিতু হাঁ করে দাঁড়িয়েই ছিল। এগিয়ে গিয়ে দেখতেও পারেনি সত্যিই মায়ের কাণ্ড-খানা কি, সত্যিই মা চলে যাচ্ছে কিনা। ট্যাক্সি একটা চলে গেল টের পেল, তবু দাঁড়িয়েই ছিল। খেয়াল হতে দেখে, বারান্দায় সে একলাই আছে, জেঠু ঘরে ঢুকে গেছে। বড় অদ্ভুত লাগছে তার, ভারী অদ্ভুত। যতদূর বুঝেছে মা এ-বাড়িতে আর থাকবে না, মা এ-বাড়ি থেকে চলে গেল।...জন্মের মত নাকি! তা আবার কি করে হয় সিতুর মাথায় আসছে না। অথচ হতে পারার সম্ভাবনাটাই যেন মগজের মধ্যে ঠুক ঠুক ঘা বসাচ্ছে। সবার আগে মেঘনাকে খুঁজে বার করল। হাঁড়িমুখ কালো করে ও-ধারের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবনা চেপে একটু ভারিক্কি সুরে জিজ্ঞাসা করল, মায়ের কি হয়েছে শুনি?

জবাব না দিয়ে মেঘনা শুধু মুখ তুলে তাকিয়েছে তার দিকে।

সিতু খেঁকিয়ে উঠল, মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তার মানে কি? এ-বাড়িতে আর আসবে না? অন্য বাড়ি ভাড়া করে থাকবে?

মেঘনা জবাব দিল, আমি জানি না।

বিরক্ত হয়ে সিতু ফিরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে কি এক অজানা আশঙ্কায় ভেতরটা কি-রকম করতে লাগল। ঠাকুমা মারা যাবার আগে যেরকম হয়েছিল অনেকটা সেইরকম। না, তার থেকেও বেশি। উঠতে বসতে মা তাকে শাসন করত, পারলে এখনো করে—আর সে সব-সময়েই মা-কে জব্দ করার ফিকির খোঁজে। মা-কে আক্কেল দেবার ঝোঁক তার এখনো কমেনি, ওই শমীটাকে অত পছন্দ করে বলে তার এখনো রাগ মায়ের ওপর। কিন্তু মা এখান থেকে চলে গেলে আক্কেল আর কাকে দেবে? চলতে-ফিরতে তো খালি মেঘনার হাঁড়ি মুখ দেখতে হবে।

না, শুধু এ-জন্যে নয়, আরো কি একটা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে সিতু। মা যখন স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠিয়েছিল তাকে, তখন মায়ের থেকে বড় শত্রু আর কাউকে ভাবত না। শাস্তি দিয়ে দিয়ে মা-কে মনে মনে এক-এক সময় প্রায় ধ্বংসই করে ফেলতে চেয়েছে সে। তবু সেই মা—সেই শত্রু এ-বাড়িতে থাকবে না সেও যেন এক অসহ্য রকমের অদ্ভুত ব্যাপার।

জেঠুর ঘরে আলো জ্বলছে। জেঠু হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসে আছে। ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞাসা করল, মা বরাবরকার মত এ-বাড়ি থেকে চলে গেল?

কালীনাথ ফিরলেন তার দিকে, কথার চিরাচরিত ঢংটাই বজায় রাখলেন।—গেলে তোর কি? গোল্লায় যাবার সুবিধে হল আরো?

সিতু হাসতে চেষ্টা করল একটু।

—যা ঘুমোগে যা, রাত হয়েছে।

চলে এলো। ঠাকুমার ঘরে ঘুমোয়। দরজার কাছে বারান্দায় শামু শোয়। শুয়ে আছে। সিতুও ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। ভাবতে চেষ্টা করল, যায়ই যদি, একপক্ষে ভালই হবে। শাসন টাসন আজকাল অবশ্য করছিল না, কিন্তু প্রায়ই যেভাবে তাকাতো তার দিকে, চেয়ে চেয়ে দেখত—তাও শাসনের মতই লাগত। অথচ চেষ্টা করেও এটা এখন খুব একটা সুবিধে বলে ভাবতে পারছে না সিতু। উল্টে এই সুবিধে কি এক আতঙ্কের

মত কাছে এগোতে চাইছে। অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা গোছের আতঙ্ক একটা।

রাত বাড়ছে। সিতুর ছটফটানি বাড়ছে। ঘুমের লেশমাত্র নেই চোখে। মা এ-বাড়িতে থাকবে না ঘরের বাতাসে শুধু এ চিন্তাটাই যেন ঠেসে ঠেসে দিচ্ছে কেউ। ঘরের বাতাসে, তারপর বারান্দার বাতাসে, তারপর সমস্ত বাড়িটার বাতাসে।

শুয়ে থাকা গেল না। ছটফট করতে করতে উঠে বসল একসময়। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দে ঘুমন্ত শামুর পাশ কাটিয়ে এদিকে এলো। জেঠুর ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু এখনো আলো জ্বলছে। ঘোরানো বারান্দাটা আবছা অন্ধকার। পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে একবার পিছনে আর একবার সামনের দিকে তাকালো।

...আশ্চর্য, মা আর এই বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করবে না? অদ্ভুত কথা!

মায়ের ঘরের দিকে এগলো। দরজা-গুলো ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল। আলো জ্বালল।

চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখল।...মা আর এই ঘরেও আসবে না, এখানে থাকবে না, শোবে না? অসম্ভব একটা কৌতুকের মত লাগছে, দেখছে আর হাসিই পাচ্ছে। যে-দিকে তাকাচ্ছে একটা মা-মা ছাপ। পরা শাড়িটা আলনায় ঝুলছে। এগিয়ে এসে ওটা ধরে হাত দিয়ে অনুভব করল।...মা-মা স্পর্শ। অভ্যস্ত নয় বলে মা-কে ছুঁলে যেমন ভালো লাগত আবার অস্বস্তি বোধ করত, তেমনি লাগছে। জোরে নিঃশ্বাস নিল একটা, বাতাসেও মা-মা গন্ধ।

...এই ঘরেও মা আর আসবে না শোবে না থাকবে না?

আচমকা রক্ত উঠল বুঝি সিতুর মাথায়। এজন্যে নিজেও সে প্রস্তুত ছিল না একটুও। ড্রেসিংটেবিলের সুন্দর টেবিল ক্লথটা ধরে জিঘাংসু টান মেরে বসল একটা। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর যা-কিছু ছিল ঝনঝন শব্দে মাটিতে পড়ল, ছড়ালো, ভাঙল।

অন্ধকার বারান্দার ওধারে মুখ চুণ করে মেঘনা বসেছিল। সিতুকে আসতে দেখেছে, ও-ঘরে ঢুকতেও দেখেছে। পড়ার এবং ভাঙার ঝনঝন শব্দ শুনে দৌড়ে এলো।

—ও কি করলে?

সিতু চমকে উঠল একটু। মাথার রক্ত চোখে নামল পরমুহূর্তে। —বেশ করেছি, যা বেরো এখানথেকে—দূর হ বলছি!

মারমূর্তি দেখে মেঘনা সভয়ে সরে গেল।

এরও আধঘন্টা পরে শিবেশ্বরের গাড়ি সিঁড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। নীচে থেকে স্ত্রীর ঘরে আলো দেখে নতুন করে একদফা শক্তি সংগ্রহ করে নিতে হয়েছে। দম্ভের শক্তি। ওপরে উঠেছেন তারপরেই থমকেছেন।

নিজের ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কালীদা। যেন তাঁরই অপেক্ষা করছেন। মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালেন।

কালীনাথ বললেন, জ্যোতি চলে গেছে।

শব্দ তিনটে শিবেশ্বরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বুঝি ওঠা-নামা করল বার-কতক।

—কোথায় গেছে?

—বলেনি।

শেষ শুনেছেন। শেষ জেনেছেন। এবারে রাগে ফেটে পড়তে বাধা নেই, জ্বলে ওঠার মতই মুখ শিবেশ্বরের।—তুমি এত রাতে জেগে আছ কেন? এই সুখবরটা দেবার জন্যে?

—যা ভাবে... আমার দরকার ফুরোলো কিনা সেটা জা... জন্যও হতে পারে।

শিবেশ্বর প্রচণ্ড রাগে জ্বলছেন, ফুঁশছেন। তবু গলার স্বর একটু সংযত করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলে গেছে?

—বলেছে একশ টাকা নিয়ে গেল, আর গয়না-পত্র সব ট্রাঙ্কে থাকল, সরিয়ে রাখা হয় যেন।

আগুনে ঘি পড়ল আর একদফা। প্রবৃত্তি শাসন করা হয়েছে সেই অন্ধ রাগ, অন্ধ আক্রোশ যেন। গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, যেখানে খুশি যাক! দেখা হলে বলে দিও ওর মত মেয়ে অনেক দেখা আছে, শিবেশ্বর চাটুজ্জে কারো তোয়াক্কা রাখে না—বুঝলে?

উত্তেজনায় নিঃশ্বাস রোধ করে দ্রুত নিজের ঘরের দিকে এগোলেন তিনি। এক ঝটকায় ভারী পরদা সরালেন, কিন্তু ঘরে ঢোকা হল না।

ও-ঘরে আলো জ্বলছে। তপ্ত আক্রোশে শূন্য ঘরটাকেই দেখে নেবার জন্যে পা বাড়ালেন।

ঘরে ঢুকে হতচকিত।

মায়ের একটা কোঁচানো শাড়ি বুকে জড়িয়ে সিতু ঘুমুচ্ছে। আর মেঝেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে মেঘনা ঘুমুচ্ছে।

শিবেশ্বর স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে।

(ক্রমশঃ)

ইতর

ইন্দ্রজিৎ

বাংলা ভাষায় 'ইতর' শব্দটি বড় দুর্ভাগা। এর গায়ে এমন একটি মালিন্য লেগে আছে যে অঙ্গারের মত শতধৌতেনাপি সে মলিনতা ঘুচতে চায় না। অথচ শব্দ হিসাব কোনমতেই ওকে অন্ত্যজ বলা চলে না। প্রাকৃতকুলে ওর জন্ম নয়, দেবভাষা সংস্কৃত থেকে ওর উৎপত্তি। তথাপি কালের দৌরাত্ম্যে ওর এই দুর্গতি।

সাধারণতঃ কাল কৌলিন্য দান করে। অনেক ব্যাপারেই দেখা যায় যত প্রাচীন তত প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আবার কাল মর্যাদা অপহরণ করে। বিশেষ করে ভাষার ব্যাপারে দেখা গিয়েছে একদা যে শব্দ ছিল নিষ্কলঙ্ক ক্রমে তার গায়ে কে যেন কলঙ্ক লেপে দিয়েছে। এ শুধু আমাদের ভাষায় নয়, অপরাপর ভাষাতেও ঘটেছে। আমরা আজকে বাংলায় যে অর্থে বলি ইতর, ইংরেজ সে অর্থে বলে Vulgar অথচ Vulgar শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন Vulgas থেকে। Vulgar শব্দের অর্থ the people অর্থাৎ জনসাধারণ। নিতান্তই নির্দোষ অর্থে ব্যবহৃত হত কিন্তু ক্রমে ওরও জাত গেল। কি করে এই অধঃপতন ঘটল একটু ভেবে দেখলেই কারণটা স্পষ্ট হবে। আসলে অর্থই অনর্থ ঘটায়। ঐ যে শব্দটির অর্থ 'জনসাধারণ' তাতেই ওর মানসম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। আমরা জনসাধারণ, সর্বসাধারণ ইত্যাদি কথা মুখে যতই আওড়াই না কেন আসলে জনসাধারণকে আমরা কোন মর্যাদা দিই না। কোন জিনিস যতদিন অল্পসংখ্যকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততদিনই তার কৌলিন্য। যেই মাত্র সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হল অমনি তার কৌলিন্য নষ্ট হল। 'অল্পসংখ্যক' এর মনে সব সময়েই এই অভিমান থাকে যে তারা আলাদা, তারা সর্বসাধারণের দলে নয়। পূর্বোক্ত ল্যাটিন শব্দটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কথাটা আরেকটু স্পষ্ট হবে। খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবল্ হিব্রু ভাষায় লেখা। খৃষ্ট ধর্ম যখন ইয়ুরোপে প্রচারিত হল তখন খুব কম লোকেই হিব্রু ভাষায় বাইবল্ পড়তে পারতেন। অতি অল্পসংখ্যক বিদ্বজ্জনের মধ্যেই তা আবদ্ধ ছিল। ওটাই ছিল তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। লক্ষ্য করবার বিষয় যে আমাদের দেশেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বহুকাল চান নি যে বেদ উপনিষদ দেশজ অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়ে সর্বসাধারণের আয়ত্তে আসে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাইবল্ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হল, সেই প্রথম ইয়ুরোপের পূর্বাঞ্চলে অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবার সুযোগ পেল। সে বাইবল্-এর নাম দেওয়া হল Vulgar অর্থাৎ প্রাকৃতজনদের উদ্দেশে রচিত অর্থাৎ কিনা ওটি বিজ্ঞজনের জন্যে নয়, সাধারণের জন্যে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় ঐ Vulgar কথাটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল। অধঃপতনের শুরু ওখান থেকে। অনুবাদটি অনায়াসেই ল্যাটিন বাইবল্ নামে পরিচিত হতে পারত যেমন ইংরেজি বাইবল্, ফরাসী বাইবল্। আলাদা একটা নাম দেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আসলে উক্ত বাইবল্-এর কৌলিন্যনাশের জন্যেই ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

ইংরেজি Vulgar শব্দটিও এককালে আজকের কদর্থে ব্যবহৃত হত না। পূর্বাশ্রমে Vulgus শব্দের অর্থ ছিল of the common people অর্থাৎ সাধারণজনোচিত, এখন তার অর্থ হয়েছে ইতরজনোচিত। দেখা যাচ্ছে এ কালের সভ্য মানুষেরা সাধারণ মানুষকে ইতর বানিয়ে ছেড়েছে। সভ্যতার এটি এক মহৎ কীর্তি। সভ্য মানুষ কোথায় সকলকে সভ্য করবে, না বারো আনা মানুষকে ইতর নাম দিয়ে জাতে ঠেলে রেখেছে। এখানেও সেই একই মনোবৃত্তি: অল্পসংখ্যকের ভয়, সকল মানুষ সভ্য হলে সভ্যতার আর গরিমা থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সময় যেন ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে; তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং অপভ্রংশ ঘটিয়াছে।" সময়কে দোষ দেওয়া বৃথা। সময় ইতর হয় না, মানুষই ইতর হয়। প্রাচীন ভারতের নদীগিরিনগরীর অতিসুন্দর নামগুলি যে এ যুগে অন্তর্ধান করেছে সেই দুঃখে কবি ঐ উক্তিটি করেছিলেন। দুঃখ করবার কথা বৈকি—কোথায় গেল অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী, রেবা সিপ্রা বেত্রবতী? যে কালে সকল মানুষ একে অন্যের গুণগান করত, প্রত্যেকের মুখে প্রত্যেকের সুনাম শোনা যেত তখন নামমাত্রই সুনাম ছিল। এখন কারো মুখে কারো সুনাম নেই, প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুর্নাম রটাতে ব্যস্ত। মানুষের মান যারা রাখে না, তারা নদনদীনগরীর মান রাখবে কেন? তাহলে কি আর আমাদের ঘরের পাশের কোপবতীর নাম হত কোপাই, খরকায়ার নাম খরকাই, কংসবতীর কাঁসাই? এগুলো নাম না বদনাম? অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? যে 'ইতর' শব্দটি ইতর অর্থে ব্যবহৃত হত না তাকে পর্যন্ত আমরা ইতর করে ছেড়েছি।

'সাধারণ' কথাটা একটা গাল নয়। যে ডেমক্রেসির গর্ব আমরা করি তাকে বাংলা ভাষায় আমরা সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি নাম দিয়েছি। কিন্তু জিগগেস করি, সাধারণ আর ইতর যদি একার্থবোধক হয় তাহলে সাধারণতন্ত্রকে ইতরতন্ত্র বলতে দোষ কি? লক্ষ্য করে দেখেছি 'ইতর' শব্দটি কেউ যখন লেখায় ব্যবহার করেন তখন কেউ গায়ে গেঁথে নেন এই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে বলে নেন (বাংলা অর্থে নয়) সংস্কৃত অর্থে। বাংলা শব্দটির অর্থ আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত থেকে পৃথক। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যাবে, দুই অর্থের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন মিল আছে। সংস্কৃত ভাষায় 'ইতর' শব্দের অর্থ অন্য বা অপর। আগে বিশিষ্টদের কথা উল্লেখ করে পরে যদি বলি এতদ্ব্যতীত অন্যেরা—তাহলেই মনে হবে, এই অন্যরা নির্বিশেষ, এরা বৈশিষ্ট্যহীন অতএব সাধারণ। সাধারণ হওয়াটা নিশ্চয় একটা মস্ত বড় অপরাধ নয় কিন্তু এই নিরপরাধ সাধারণ ব্যক্তিরা জাতিকুল হারিয়ে প্রথমে অশিক্ষিত, পরে নিম্নজাতীয় এবং সর্বশেষে ইতর আখ্যা লাভ করেছে। অর্থাৎ ইংরেজি Vulgar শব্দটি যেভাবে সমাজে পতিত হয়েছে, আমাদের ইতর শব্দটি ঠিক সে ভাবেই জাতিচ্যুত হয়েছে। শব্দের বিবর্তন এইভাবেই ঘটে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে ভাষাবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানে গলাগলি ভাব। যাক্, বিজ্ঞানচর্চার সময় এখন নয়, যে কথা বলছিলাম। সমাজে ইতরজনদের বাদ দিলে ইতরেতর যাঁরা বাকী থাকেন তাঁরা হলেন রাজনৈতিক নেতা, রাজপুরুষ, মন্ত্রী যন্ত্রী, ব্যবসাদার, ঠিকাদার, শিক্ষক ছাত্র ইত্যাদি।

'ঘরে বাইরে' গ্রন্থে একটি উক্তি আছে—সংসারে বারো আনা মানুষ ইতর। —বলা বাহুল্য বাংলা অর্থে উপন্যাসের উক্তিকে লেখকের উক্তি বলে গ্রহণ না করাই সমীচীন। তথাপি রবীন্দ্রনাথ যদি কোন কালে এরূপ মত পোষণ করে থাকেন তাহলেও আজ বেঁচে থাকলে অবশ্যই মত পরিবর্তন করতেন। বলতেন, ভাগ্যিস্ বারো আনা মানুষ ইতর, সংসার তাই বলে এখনও টিকে আছে। বারো আনা মানুষ যদি নেতা বক্তা উজির নাজির অধ্যাপক ছাত্র হতেন তাহলে দুনিয়া রসাতলে যেত। বর্তমানে এ'রা লোকসংখ্যার চার আনা; সেই চার আনার ঠেলাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

এখানে বলে নেওয়া ভালো, আমি যখন 'ইতর' শব্দটি ব্যবহার করি তখন বাংলা অর্থেই ব্যবহার করি, সংস্কৃত অর্থে নয়। যে মানুষের ব্যবহার ইতরতা দোষে দুষ্ট তাকে আমি ইতর বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। আমার বক্তব্য—যারা কালোবাজারি করে না, ঘুষ খায় না, ট্রাম বাস পোড়ায় না, অর্থাৎ ইতরতা যাদের ব্যবহারে নেই তাদের অকারণেই ইতর আখ্যা দেওয়ায় আমার আপত্তি। এরা ইতর নয়, এ'রা প্রাকৃতজন অর্থাৎ কিনা প্রকৃতজন অর্থাৎ এ'রাই খাঁটি মানুষ।

ইদানীংকালে ইতরজনদের একটা ভদ্র নাম দেবার চেষ্টা চলছে। এদের নতুন নামকরণ হয়েছে প্রলিটারিয়েট—বিশেষ বঙ্গভাষায় সর্বহারা। যারা অভদ্র তাদেরই ভদ্র নামের প্রয়োজন। এদের কেন? জীবনের ভদ্রস্থতা এখনও যেটুকু আছে সেটুকু তো ইতররাই রক্ষা করেছে। ভদ্রস্থতা নষ্ট করেছে তথাকথিত ভদ্রলোকেরা। এজন্যে আমি তো মনে করি ইতর বললেই এদের যথার্থ সম্মান দেখানো হয়। এরা ইতর অর্থাৎ অন্যরকম। তার অর্থ ইতিপূর্বে যাদের কথা বলেছি এরা তাদের মত নয়। তাছাড়া প্রলিটারিয়েট বা সর্বহারা বললে এদের সম্মান বাড়ে না। ইতরজনরা সর্বহারা নয়। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের অভাব অবশ্যই আছে; কিন্তু জ্ঞানগম্যির অভাব নেই। ওটা যাদের আছে তারা কোনমতেই সর্বহারা নয়। সর্বহারা নাম দিয়ে এদের প্রতি কৃপা সঞ্চারের কোন প্রয়োজন দেখি না। ইতরজনরা কৃপার পাত্র তো নয়ই, সম্মানের পাত্র
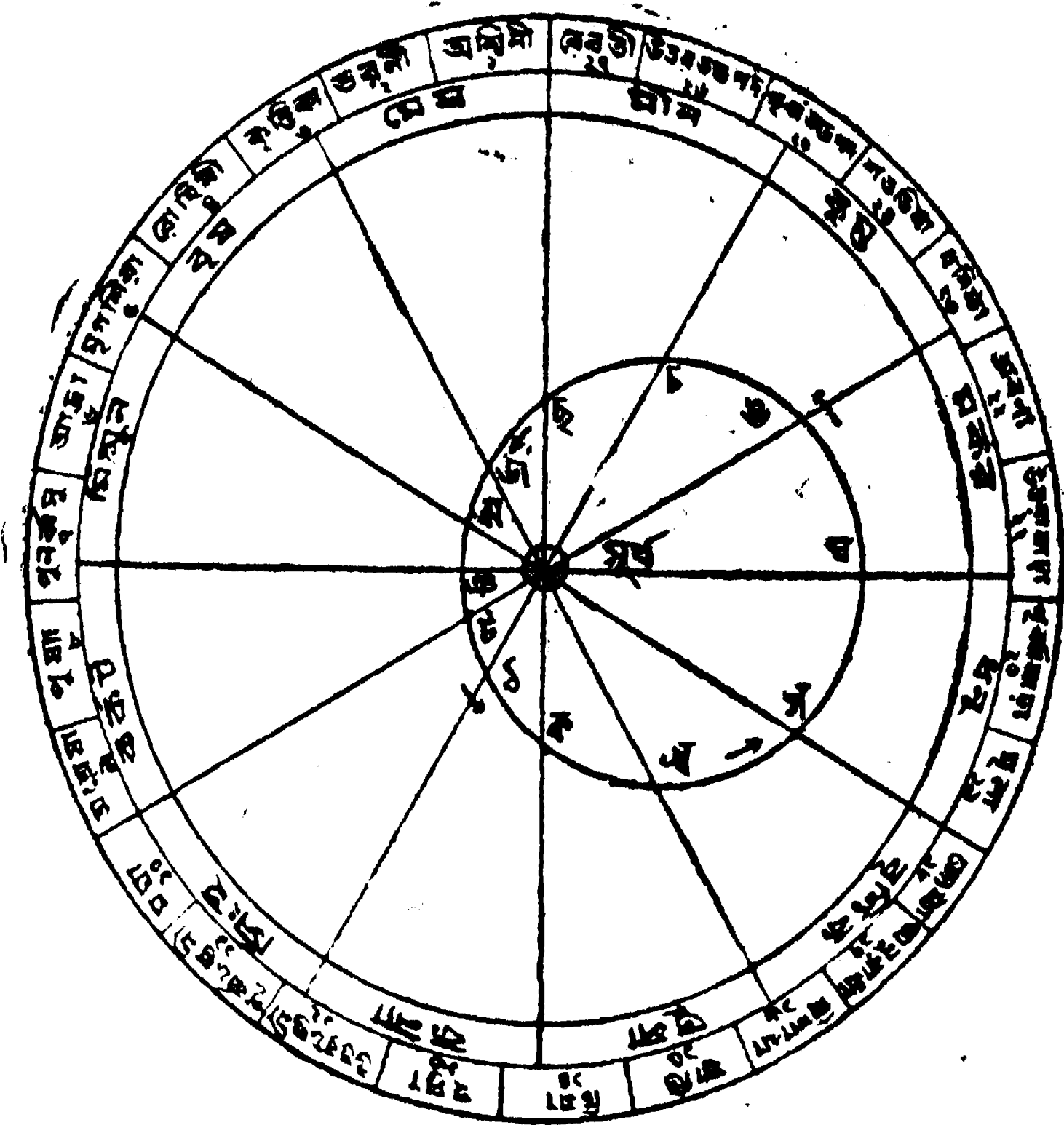
বাংলা মাসের দিনের হেরফের

অরূপরতন ভট্টাচার্য

এ বছর বৈশাখ মাসে কী দিন ছিল বলতে পারেন? জ্যৈষ্ঠ মাসে? আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিনে?

ইংরেজী মাস নয় যে বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যা প্রচলিত আর্যার সাহায্যে সহজে বের ক'রে ফেলতে পারবেন।

তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর,
সেরূপ এপ্রিল, জুন আর নভেম্বর।
আঠাস দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারী ধরে,
বাড়ে তার একদিন চতুর্থ বৎসরে।
অবশিষ্ট মাস হয় একত্রিশ দিনে
ইংরেজী মাসের দিন এইরূপ গণে।

ইংরেজী ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন মাসে দিনের সংখ্যা হয় ৩০ নয় ৩১। শুধু ফেব্রুয়ারীতেই ব্যতিক্রম এবং সে ব্যতিক্রমও সরল রীতি অনুসরণ করে।

বাংলা বছরও ইংরেজী বছরের মতো বারো মাসের সমষ্টি। কিন্তু হলে কী হবে, তার বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যা শুধু ৩০ বা ৩১-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার সম্পূর্ণ বছরে কোন মাসের দিনের সংখ্যা ২৯, ৩০ বা ৩১ দিনেরও একাধিক মাস দেখতে পাবেন এবং বাংলা ক্যালেন্ডারে অন্তত এমন একটি মাস পাবেন যেটি সর্বোচ্চ ৩২ দিনে নির্দিষ্ট রইবে।

কিন্তু কোন্ মাসে ২৯ দিন হবে, কোন্ মাসে দিনের সংখ্যা ৩০ বা ৩১-এ পেঁছোবে, কোন্ মাসে দিনের সংখ্যা সকলের উর্ধ্বে ৩২-এ সীমিত রইবে, এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া যে কোন বছরের বাংলা ক্যালেন্ডারের পক্ষে সহজ নয়।

প্রায় প্রতি বছরেই বাংলা ক্যালেন্ডারের বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। ফলে, যে কোন বছরের যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাসের দিনের সংখ্যা যা দেখলেন, তার পরের বছর বা তার আগের বছরের দিনের সংখ্যার সঙ্গে তার মিল নাও থাকতে পারে। প্রসঙ্গত ১৩৭২ ও ১৩৭৩—এ দুই সনের কথা বলতে পারি। এ দুই বছরের আশ্বিন মাসের দিকে লক্ষ্য করুন। ১৩৭২ সনে আশ্বিন মাসে দিনের সংখ্যা ছিল ৩১, আর ১৩৭৩ সনের আশ্বিন মাস ৩০ দিনে সম্পূর্ণ। সুতরাং ১৩৭৩ সনে অর্থাৎ চলতি বছরে আশ্বিন মাসের দিনের সংখ্যা ১ কমলো। কার্তিক মাসে? —এখানে কোন পরিবর্তন নেই। দুটো বছরেই কার্তিক মাসে ৩০ দিন—সেজন্যে দিনের সংখ্যা সমান রইলো। আর অগ্রহায়ণ মাসটার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরের আশ্বিন মাসে দিনের সংখ্যা ১ কমেছিল। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের বেলায় ঠিক তার উলটো দাঁড়ালো। এবারে দিনের সংখ্যা ১ বাড়লো। ফলে গত বছর অগ্রহায়ণ মাসের ২৯ দিনের সঙ্গে এ বছর ১ যুক্ত হয়ে সে ৩০-এ পেঁছোল।

বাংলা ক্যালেন্ডারের এ অনির্দিষ্টতায় সাধারণ মানুষের অস্বস্তি বোধ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এর পিছনে মহাকাশের যে উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাজ করছে, তার সঙ্গে পরিচিত হলে সে অস্বস্তি নিঃসন্দেহে দূর হবে। শুধু তাই নয়, বাংলা ক্যালেন্ডারের পরিচালন কৌশলে আমাদের গৌরবও বৃদ্ধি পাবে।

বিভিন্ন বছরের একই মাসের দিনের সংখ্যার বিভিন্নতা কেন ঘটে, একই বছরের বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যা ২৯, ৩০, ৩১, ৩২ কেন এই চার রকম হয়, এবারে বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশ্লেষণ করে সে কথা বলবার চেষ্টা করবো।

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড সূর্যকেন্দ্রিক। ফলে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সূর্যকে ঘিরে আপন আপন কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে মহাকাশ পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ করে। পৃথিবীও সে রকম। সেও নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে আবর্তন সম্পূর্ণ করে।

পৃথিবীর এই নির্দিষ্ট কক্ষপথটি কী রকম? আমাদের স্বাভাবিক ধারণা পথটি বৃত্তাকার এবং সূর্য তার কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। পৃথিবীর পথটি বৃত্তাভাস এবং সূর্য তার কেন্দ্রে নয়, Focus বা নাভিতে অবস্থিত। এখন সূর্য পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথের কেন্দ্রে না থেকে নাভিতে বা Focus-এ থাকার জন্যে নানাদিকে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি এবং বছরের বিভিন্ন মাসে দিনের একাধিক হেরফের।

পৃথিবী যখন সূর্যকে ঘিরে মহাকাশ পরিভ্রমণ করে, তখন কী হয়? —সূর্য পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথের কেন্দ্রে না থাকায়, দূরত্ব কখনো বৃদ্ধি পায়, কখনো বা কমের দিকে পেঁছোয়। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কম বেশী হওয়ার জন্যে পৃথিবীর গতিরও পরিবর্তন ঘটে। যখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধি পায়, তখন পৃথিবীর গতি কমে আসে, আবার যখন দূরত্ব কমে তখন গতি উর্ধ্বমুখী হয়।

দূরত্ব আর গতির মধ্যেকার এই সম্পর্ক পরিস্ফুট হয় কেপলারের সূত্র থেকে। সে মাত্র ষোড়শ শতাব্দীর ব্যাপার। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্বিদেরা তার বহু পূর্ব থেকেই পরিষ্কার বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যার ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট ও

সুস্পষ্ট ব্যবহার করে আসছেন। নিঃসন্দেহে সে বাহাদুরির কথা।

মহাকাশের পটভূমিতে সূর্য যে প্রতি মাসে এক এক রাশিতে প্রবেশ করে—বহু প্রাচীন কালেই ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা তা লক্ষ্য করেন। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে বৈশাখ মাসে সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করে জ্যৈষ্ঠের সুরুতে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে—অন্যান্য মাসের বেলায়ও সে রকম। শ্রাবণে কর্কটে, ভাদ্রে সিংহে, আশ্বিনে কন্যায়, কার্তিকে তুলায়, অগ্রহায়ণে বৃশ্চিকে, পৌষ মাসে ধনুতে, মাঘে মকরে, ফাল্গুনে কুম্ভে, চৈত্রে মীনে।

আমরা পার্থিব মানুষ, বৈশাখ মাসে সূর্য যখন মেষ রাশিতে প্রবেশ করে বলে আমাদের মনে হয়, পৃথিবী তখন সুনির্দিষ্টভাবে ক বিন্দুতে অবস্থান করে। লক্ষ্য করুন, পৃথিবীর অবস্থান ক বিন্দুতে ধরে আমরা যদি সূর্যের দিকে তাকাই তাহলেই আমরা সূর্যকে মেষ রাশির পটভূমিতে এবং মেষ রাশির প্রারম্ভেই দেখতে পাই। তারপর পৃথিবী ক বিন্দুর থেকে খ বিন্দুর দিক তীর চিহ্নিত নির্দিষ্ট পথে যতই এগোতে থাকে, মহাকাশের পটভূমিতে পৃথিবী থেকে সূর্যকে ততই মেষ রাশির গভীরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এখন খ বিন্দুতে অবস্থানের সময়ে পৃথিবী থেকে সূর্যের যা দূরত্ব, খ বিন্দুর থেকে গ বিন্দুর দিকে এগোনোর সময়ে সে দূরত্ব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। ফলে খ বিন্দুতে পৃথিবীর যে গতি লক্ষ্য করা যায়, সে গতি পরবর্তী অধ্যায়ে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য ক্রমশ কমে আসে। সুতরাং মেষ রাশি পরিভ্রমণে যে সময় লাগে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে দিনের সংখ্যা যা দাঁড়ায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশি পরিভ্রমণের সময়ে অর্থাৎ খ বিন্দু থেকে গ বিন্দুতে যাওয়ার সময়ে দিনের সংখ্যা তার থেকে বেশী দাঁড়ায়। শুধু জ্যৈষ্ঠ নয়, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই চার মাসেই পৃথিবী আর সূর্যের দূরত্ব সবচেয়ে বেশীতে পেঁছোয়, ফলে পৃথিবীর গতি অন্যান্য মাসের তুলনায় এই চার মাস নিঃসংশয়ে হ্রাস পায়। আর তাই এই চার মাসে দিনের সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়। বৈশাখ মাসে দিনের সংখ্যা ৩০ বা ৩১। পৃথিবীর গতি হ্রাসের জন্যে পরবর্তী চার মাসে সে সংখ্যা ৩১ বা ৩২-এ যায়।

ভাদ্র মাসের শেষে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সুস্পষ্টভাবে পূর্বোক্ত মাসগুলির তুলনায় কমের দিকে এসে পেঁছোয়। ফলে আশ্বিন মাসে পৃথিবীর গতি আবার দ্রুততা অর্জন করে।

এ মাসের সুরুতে সূর্য কন্যা রাশিতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যকে এ মাসে কন্যা রাশির পটভূমিতে মনে হয়। সুতরাং আশ্বিন মাসের সুরুতে পৃথিবীর অবস্থান চ বিন্দুতে থাকে। এবং চ বিন্দু থেকে ছ বিন্দুতে পেঁছোতে পৃথিবীর যতটা সময় লাগে, সেটুকু সময়ই কন্যা রাশি পরিভ্রমণের সময় বলে গৃহীত হয়। আর মূলত সেই সময়ই আশ্বিন মাসের দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্রের বেলায় দেখেছেন, দিনের সংখ্যা ৩১ বা ৩২-এর মধ্যে স্থিরীকৃত, আশ্বিন মাসে পৃথিবীর দ্রুতগতির জন্যে দিনের সংখ্যা কিন্তু ৩২ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। ফলে, এ মাসে দিনের সংখ্যা ৩০ বা ৩১-এর ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

কার্তিক মাসে সূর্য যখন তুলা রাশিতে প্রবেশ করে বলে মনে হয়, পৃথিবী তখন নিঃসন্দেহে ছ বিন্দুতে এসে পেঁছোয়। লক্ষ্য করুন, অন্যান্য মাসে পৃথিবী থেকে সূর্যের যে দূরত্ব, সে দূরত্ব কতটা হ্রাস পায়। ফলে এ মাসে পৃথিবী আরও দ্রুত গতি অর্জন করে।

কিন্তু শুধু কার্তিক মাসেই পৃথিবী যে দ্রুতগতি অর্জন করে তা নয়, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাসেও অর্থাৎ ছ বিন্দু থেকে ঠ বিন্দু পর্যন্ত যাবার সময়েও পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে বলে পৃথিবীর গতির দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই ৫ মাসের প্রতিটি মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয় এবং কম পক্ষে দুটি মাস ২৯ দিনে নির্দিষ্ট থাকে।

চৈত্র মাসে আবার পৃথিবী ঠ বিন্দু থেকে ক বিন্দুর দিকে চলে। দূরত্ব আবার বাড়তে সুরু করে—সুতরাং চৈত্রে দিনের সংখ্যা ৩০ বা ৩১-এ উন্নীত হয়।

বাংলায় বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যার ব্যতিক্রমের পিছনে পৃথিবীর গতি যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবী যদি তার পরিভ্রমণ পথের এক-একটি নির্দিষ্ট অংশে এক-একটি নির্দিষ্ট গতি লাভ করে, তাহলে বিভিন্ন বছরের একই মাসে দিনের সংখ্যার পার্থক্য ঘটে কী করে? আমরা পৌষ মাসে দিনের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ বুঝি, শ্রাবণ মাসে দিনের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণও আমাদের কাছে অজানা নয়, কিন্তু পৌষ মাসের সময়ে পৃথিবী যদি একটি নির্দিষ্ট দ্রুতগতি লাভ করে এবং শ্রাবণ মাসের ক্ষেত্রে পৃথিবী যদি একটি নির্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত মন্দ গতিতে এগিয়ে চলে, তাহলে পৌষ মাসে দিনের সংখ্যা কেন হয় ২৯ বা ৩০ দিনে নির্দিষ্ট থাকবে এবং শ্রাবণ মাস কেন বা ৩১ বা ৩২ দিনের হবে?

এর কারণ আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সূর্যের এক রাশি থেকে আর এক রাশিতে পদার্পণ করার মুহূর্তেই একটি মাস সুরু হওয়ার কথা। আসলে কিন্তু তা নয়। বৈশাখ মাসের কথাই ধরুন। মনে করুন, সূর্য মীন রাশি সংক্রমণ শেষ করে মেষ রাশিতে প্রবেশ করলো কোন এক দিন সকাল দশটা বেজে পনেরো মিনিটে। বৈশাখ মাস সুরু হওয়ার কথা সেইদিন ঐ সকাল দশটা বেজে পনেরো মিনিটেই। কিন্তু তা হবে কেমন কেন? ফলে মাস সুরু হবে ঠিক পরের দিনটি থেকে। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার যে কোন মাসের বেলায় যদি সূর্যোদয় এবং মধ্যরাত্রের মধ্যে সংক্রমণ ঘটে তবে সৌর মাস পরবর্তী দিনেই আরম্ভ হয়। আর যদি দিনের মধ্যরাত্রের পরে সংক্রমণ ঘটে? তাহলে পরবর্তী দিনের পরবর্তী দিনে মাসের সুরু হয়।

মোটামুটিভাবে মাসের সুরু হওয়ার এই নিয়ম। আর এই নিয়মের জন্যেই যে কোন বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর নির্দিষ্ট (দ্রুত বা মন্দ যাই হোক না কেন) গতি সত্ত্বেও মাসের দিনের সংখ্যার কিছুটা হেরফের।

আর যদি সূর্য সংক্রমণের সুরু থেকেই মাসের সুরু হতো? তাহলে প্রতি বছরেই বিভিন্ন মাসের দিনের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকতো এবং পৃথিবীর গতির হেরফেরের জন্যে একই বছরে বিভিন্ন মাসে দিনের সংখ্যার ধারাবাহিক পরিবর্তনটা সহজে নজরে আসতো।

বলা যায় না, ইংরাজী মাসের মতো বাংলা মাস নিয়েও তখন হয়তো একটি আর্যা শুভঙ্করের ধারাপাতে যুক্ত হতো।

পথিক! পথ হারিয়েছ

শশাঙ্ক শেখর সান্যাল

উত্তরবঙ্গের জেলা শহর বন্যাত্রাণ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সরকারী, বে-সরকারী, আধা সরকারী, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সব একমুখী—যে যেভাবে ও যতটুকু পারে তাই নিয়ে বৃহৎ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করছে। অভিজাত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মী পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীরাও পর্দা শিথিল করে আর্তের সাহায্যে বাইরে আসার ইচ্ছায় চঞ্চল ব্যাকুল। তাঁদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই দুপুরে অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তায় পাড়ি দিয়ে ও সন্ধ্যার অন্ধকারে যথাসম্ভব বাড়ী বাড়ী ঘুরে নগদ, খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি সংগ্রহান্তে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে মজুত করেছেন। জেলার ইংরাজ অধিকর্তা প্রায় পাদ্রী-চরিত্র। তাঁর কুঠী সেবা-অফিসে পরিণত। সর্বপ্রকারের প্রার্থী, সরবরাহী, স্বেচ্ছাসেবকদের অবাধ আনাগোনা। কিছুদিন আগে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এই জেলাতেই কয়েকজন উল্লেখযোগ্য দেশী-বিদেশী রাজপুরুষ আহত নিহত হয়েছেন সে কথা সবাই ভুলতে বসেছে।

।। ২ ।।

ত্রাণ-সমিতির আনুষ্ঠানিক সভা। সিদ্ধান্ত হল সাহায্য রজনী অভিযানে বিশেষ অভিনয় হবে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন একাধারে উকিল বারের অন্যতম প্রবীণ সদস্য ও সভাপতি পৌর প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত বনেদী জমিদার রায় বাহাদুর বিশ্বজিৎ। এই রাশভারি প্রবীণপন্থী সমাজপুঙ্গব আবেগে প্রস্তাব করেন যে তাঁর পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা গায়ত্রী কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় মঞ্চ অলংকৃত করবে। কলেজ অধ্যক্ষ রায়সাহেব অটলবিহারীর ভাগ্নে সুকুমার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার নবকুমার চরিত্রে উৎকর্ষ দেখিয়েছে, কিন্তু বিপ্লবী সংস্পর্শ সন্দেহে কিছুদিন সে আত্মগোপনে আছে। জেলা মালিকের হস্তক্ষেপে পুলিশ কার্তারা তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস দিলে তাকে কোনো এক মিশনের পল্লী শাখা থেকে বার করা হল। সেখানেও সে স্বামীজী বেশে বন্যার্তদের জন্য মুষ্টি ভিক্ষা সংগঠনে ব্যাপৃত ছিল। জঙ্গসিদের অনুশীলনেই 'কপালকুণ্ডলার' সার্থক ও সম্ভ্রান্ত রূপায়ণ। নবকুমারের আত্মবিস্মৃত ও অসহায় সমর্পণপ্রয়াসী দৃষ্টি ও বন-বালিকার অশরীরী বাণী 'পথিক, তুমি পথ হারিয়েছ' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী ও মর্মবাণীকে নব-কলেবরে উত্তরবঙ্গের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুকুমার ও গায়ত্রী অভিনেতা স্তরের বহু ঊর্ধ্বে। তারা দেবদুলাল ও দেববালা।

।। ৩ ।।

সুকুমার চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া সমাজের উন্নয়ন বিভাগের বিশেষ সংগঠক। গায়ত্রী এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বধূ ও জননী। স্বামী সুগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পণ্ডিত—সুকুমারের কৈশোরের বন্ধুও বটে। এইসবের যোগাযোগে অভিনয়ের উৎসাহ আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গায়ত্রী এখন ষোল আনা গৃহিণী—পূর্বে কোনকালে অভিনয়-জগতের সংগে তার সংস্পর্শ ছিল বা সেখানে প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিল এসব মনে করতেও তার ইচ্ছা করে না। মেয়েকে তার বাবা গান শেখায়, সে সব সময়ে পড়ার মধ্যে আটকে রাখে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ দূরে থাক অভিনয় বা ছায়াচিত্র দেখবার অবকাশও ছেলেমেয়েরা পায় না। তবু সুকুমারের পদাধিকারের প্রভাবে ও বন্ধুত্বের দাবীতে অনুন্নতদের অধ্যয়নশালা স্থাপনের জন্য গায়ত্রীকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হল।

।। ৪ ।।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক—সুখ্যাত পৌরাণিক—নাটকের বাছাই দৃশ্য সমাবেশ এই অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ। জনসাধারণের অনুগ্রহ ও বদান্যতায় আবেদন বেশি বলেই বোধহয় ভিখারী ও ভিখারিণীর দৃশ্য অধিক—সুকুমার ভিক্ষুক ও গায়ত্রী তার পাল্টা। কখনও একক—কখনও দ্বৈত। রামচন্দ্র ও সীতা। অটবিসকাশে ফল কুড়োচ্ছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মাধুকরীতে দ্বারে দ্বারে করুণাপ্রার্থী—'ভিক্ষা দাও পুরবাসী, সন্তান দ্বারে উপবাসী'—মূর্ছনার তরঙ্গ মঞ্চ উপচে হিল্লোল বিস্তার করছে। মহাদেবের অন্নপূর্ণার দ্বারে দাঁড়িয়ে করজোড়ে আকুতি 'ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বকরী' শ্রোতৃবর্গকে আবেগে মথিত করেছে। অন্ধ ভিখারীর তৃষ্ণাকাতর ব্যাকুলতা 'আমার আঁখি সহ শুধু আছে আঁখিজল' জনতার চোখের জল ঠেলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই রকম নানা পর্যায়ে উচ্চ অনুভূতি ও সমবেদনার সমারোহ। একাধিক সুধীজন মধ্যে মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে আসন ছেড়ে মঞ্চে উঠে ভিখারীযুগলকে অভিনন্দন করে ধন্য হচ্ছে।

।। ৫ ।।

স্বাধীন ভারতবর্ষ। বাংলাদেশ বিভক্ত। শ্রীচৌধুরী দণ্ডকারণ্যে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক। বিপুল সংখ্যায় ছিন্নমূল নর-নারী তাঁর আশ্রিত। সরকার কম-বেশী বসবাসের স্থান, জীবনোপযোগী খাদ্য, রোগ চিকিৎসা, উপার্জন সংস্থা, শিক্ষাসুযোগ ইত্যাদির পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য শ্রীচৌধুরীকে ক্ষমতা দিয়েছেন—কিন্তু দক্ষদ সরবরাহের কোন ইঙ্গিত ধারে কাছে নাই। শ্রীচৌধুরীর মাতৃসুলভ অন্তঃকরণ সর্বদা প্রতিটি শরণাগতের অতীত অন্বেষণে আগ্রহী। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য অন্তে যখন তিনি এই সব নিয়ে মনের পাতা উল্টান তখন দেখেন কত 'দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে' সভ্যতা ও স্বাধীনতাকে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তাঁর অনুভূতিসিক্ত চিত্ত সদাই প্রশ্ন করে, 'এদের অতীত ছিল বর্তমান নাই, ভবিষ্যৎ কোথায়?'

।। ৬ ।।

মানা ক্যাম্পের সর্বজনপ্রিয় অধিবাসিনী অন্নপূর্ণার আস্তানা বৃক্ষতলে। পুনর্বাসনকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজের সম্বন্ধে শরণার্থীর পরিচয় সে ঘৃণা করে।

সরকারের কাছে তার কোন দাবী বা দরবার নাই। তার জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থান সে সন্তানহারা মায়েদের জন্য পৃথক করে রেখেছে। প্রাপ্য অন্ন বস্ত্র অনাকে বিলিয়ে দিয়ে ভিক্ষালব্ধ সামান্য সামগ্রীর উপর নিজের জীবন চালায়। ক্যাম্পের রেজেস্টারীতে যাই নাম থাক, তাকে পাগলিনী মা বলেই সকলে ডাকে। তার সঙ্গে আগত অন্যান্য আশ্রয়প্রাপকের কাছে জানা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসবার পথে তার ছেলেমেয়ে মৃত বা নিহত ও স্বামী নিরুদ্দেশ। সে একাই কোন রকমে এ পারে পৌঁছেছে। তার অন্য পরিচয় কেউ জানে না এবং সেও বলে না। পরিদর্শনকালে ভ্রমণরত শ্রীচৌধুরী এক চৈত্র দুপুরে গাছ-তলায় উপবিষ্ট মহিলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মনে হচ্ছে পাষাণ মূর্তি আশ্রয় করে মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা ধ্বনি মূর্ত হচ্ছে।

'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণেসেবাপ-শিষ্যতে।' শ্রীচৌধুরীর ইঙ্গিতে তাঁর সঙ্গীরা জীপসহ সে স্থান ত্যাগ করলে মন্ত্রাহত চৌধুরীর সম্মুখে পাগলিনী—চোখ মেলে আপাদ-মস্তক যাচাই করে শুধাল, 'কি চাই?'

অর্ধসম্বিতে যন্ত্রচালিতের মত উত্তর উচ্চারিত হল,

'ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বকরি
মাতা পূর্ণেশ্বরী'

ধীরে ধীরে কণ্ঠ থেকে খুলে কপাল-কুণ্ডলা অভিনয়ে পাওয়া ছোট্ট স্বর্ণপদকটি সুকুমারের হাতে দিয়ে পাগলিনী বলল,

'পথিক, তোমরা আবার পথ হারিয়েছ।'

’৬৬ সালের গঁকুর পুরস্কার

দিলীপ মালাকার

বছরের শেষে গঁকুর পুরস্কার ঘোষণার আগে ফরাসী সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের দল উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। নোবেল পুরস্কারের মতনই দুষ্প্রাপ্য এই গঁকুর পুরস্কার। টাকার অঙ্কে এর বিচার হবে না। পুরস্কারের টাকা একশর ওপরে নয়। কিন্তু সম্মানটাই বড়। গঁকুর পুরস্কারের সম্মানের ঠ্যালায় লেখক লক্ষ কেন কোটীপতিও হতে পারেন।

নভেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে গঁকুর পুরস্কার বিতরণের সময় দেখা গেল অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অভাবনীয় ফলাফল। সচরাচর এমন অঘটন ঘটে না। নামকরা প্রবীণ সাহিত্যিকদের ছাপিয়ে নতুনের আবির্ভাব। প্রথম ও একটি মাত্র উপন্যাস লিখে গঁকুর পুরস্কার লাভের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। তার ওপর তিনি আবার মহিলা ঔপন্যাসিক। এইসব ঘটনা মিলিয়ে ফরাসী সাহিত্যমহলে বেশ আলোড়ন এনেছে।

এ বছরের গঁকুর পুরস্কার পেতে পারে এমন কয়েকজন ফরাসী সাহিত্যিক নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল মাস দুয়েক ধরে। কিন্তু কুমারী এডমণ্ড শার্ল-র‍্যুর নাম করতে কাউকে দেখিনি। তাই কুমারী শার্ল-র‍্যু ফরাসী সাহিত্যে নতুন এক বিস্ময়। এবছরের গঁকুর পুরস্কারপ্রাপ্ত কুমারী এডমণ্ড শার্ল-র‍্যু আসলে সাংবাদিক। পোষাক-ফ্যাসনের পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন অনেককাল। তার ওপর তিনি এসেছেন খানদানি পরিবার থেকে। বয়স এখন এর চুয়াল্লিশ। গঁকুর সাহিত্যপুরস্কার ইতি-হাসে এবার নিয়ে পাঁচজন মহিলা সাহিত্যিককে জয়মাল্য দেওয়া হল। মাদমোয়াজেল শার্ল-র‍্যুর আগে পেয়েছেন কবি আরাগঁর স্ত্রী এলজা ত্রিয়োলে (১৯৪৪), বিয়েত্রিস্ বেক্ (১৯৫২), সিমন্ দ্য বোভোয়ার (১৯৬৪) ও আন্না লাংফুস্ (১৯৬২)।

মাদমোয়াজেল শার্ল-র‍্যু তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার ছবি এঁকেছেন তার উপন্যাসএ। মহিলা সাপ্তাহিক "এল্" পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখিকা এবং পোষাকবিলাসের মাসিক পত্রিকা "ভোগ"এর সম্পাদিকার কাজ করেছেন গত ষোল বছর ধরে। এটি আমেরিকান পত্রিকা। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হলে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে উপন্যাস লেখা সুরু করেন। এবং একটি উপন্যাস লিখেই জয়মাল্য লাভ।

উপন্যাসের নাম "উর্বলিয়ে পালার্ম" (পালার্ম ভুলে যাওয়া)। দক্ষিণ ইতালির সিসিলি দ্বীপের একটি জেলার নাম পালার্ম। ওই রক্ষণশীল দ্বীপের জীবন-যাত্রাকে ঘিরে উপন্যাসের উপাদান গড়ে ওঠে। উপন্যাসের নায়িকা আমেরিকান সাপ্তাহিক পত্রিকার সাংবাদিক। তার স্বামী আধা-আমেরিকান আধা-সিসিলিয়ান। তাঁদের জীবনযাত্রা সুরু হয় নতুন পরিবেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে আরেক জগৎ। যান্ত্রিক অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছেচে আমেরিকা। তার সামাজিক জীবনই আলাদা। তাদেরই দুজন এসে বাসা বাঁধে সিসিলির মতন অনগ্রসর দ্বীপে। সেখানে এখনও চলে রক্ষণশীল সামাজিক জীবনধারা। দুই সভ্যতার সংঘাতে রচিত হয়েছে "উর্বলিয়ে পালার্ম" উপন্যাসের কাঠামো।

মদমোয়াজেল শার্ল-র‍্যু যেমন নায়িকা চরিত্রের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাংবাদিক-জীবনের অভিজ্ঞতা তেমনি তিনি ইতালির সমাজজীবন চিত্রটি পরিপাটিভাবে প্রকাশ করেছেন আরেক অভিজ্ঞতা থেকে। মাদমোয়াজেল শার্ল-র‍্যুর পিতা ছিলেন ফরাসী সরকারের রাষ্ট্রদূত। পিতার সঙ্গে তিনি ছোটবেলায় দেশ-বিদেশে কাটিয়েছেন। যখন চেকো-শ্লোভাকিয়ায়—ইতালিতে। ইতালিতে যখন তাঁর পিতা ছিলেন রাষ্ট্রদূত তখন তিনি দক্ষিণ ইতালিকে ভাল করে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তিনি ভাল-ভাবে বর্ণনা করেছেন এই উপন্যাসে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি ফরাসী সামরিক-

শার্ল-র‍্যু

বাহিনীতে যোগদান করে আহত সৈনিক-দের সেবার ভার নেন। ফলে তাকে অতি অল্পবয়সে সরকারি উপাধি দেওয়া হয়।

গঁকুর পুরস্কার নির্বাচনে যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তাঁকে দেওয়া হয় রনোদো পুরস্কার। এবছরের রনোদো পুরস্কার লাভ করেছেন মঁ জোসে কাবানি। ইনি নতুন বা অপরিচিত সাহিত্যিক নন। গত পনর বছরে ছখানা উপন্যাস লিখেছেন। "বাতাই দ্য তুলজে (তুলজের রণক্ষেত্র) উপন্যাসে তিনি বর্ণনা করেছেন সাবলীলভাবে সাধারণ প্রেমের কাহিনী। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, এ যেন রোমান্টিক কবিতা।

সাহিত্যিক জোসে কাবানিকে নিয়ে অনেক সমালোচনা চলেছে সমালোচক-মহলে গত কয়েক বছর ধরে। ভবিষ্যতে কোনো বৃহৎ পুরস্কার লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। জোসে কাবানির বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আইনজ্ঞ। তুলজের বিচারা-লয়ে আইনের ব্যবসা করেন। তুলজে জেলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেন উপন্যাস। ওই জেলার নর-নারীর জীবন-ধারা নিয়েই তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

সুরের সুরধ্বনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

(২৩)

মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবকে গৌরীপুরে দরবারে কয়েকমাসের জন্য লাভ করেছিলাম। সেনী সংগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন তিনি গৌরীপুরে অবস্থানকালেই করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, নতুন শিক্ষার্থীদের প্রথম শিক্ষা থেকে শুরু করে তাদের ওস্তাদে পরিণত করতে সুদীর্ঘ সময় লাগে; কিন্তু আমীর খাঁ ও এনায়েৎ খাঁর তালিমের ফলে আমরা যতটা অগ্রসর হয়েছিলাম, তাতে ছয়মাসের মধ্যেই মহম্মদ আলী খাঁ তাঁর মূল শিক্ষা আমাদের দিতে পেরেছিলেন। আমি ও কালীপুরের দাদা স্বর্গীয় জ্ঞানদাকান্ত খাঁসাহেবের তালিমের সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। এই তালিমের মর্মকথা হচ্ছে তানসেনের ঘরানার সংগীত ধ্রুপদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ধ্রুপদের চলন অনুযায়ী রাগ-আলাপ-বিস্তার প্রভৃতির সৃষ্টি। শুধু ঠাট্ ও অলংকারের পরিচয়েই এই রাগের বিস্তার সম্ভব নয়।—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। এখনও প্রকৃত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন কোন শিল্পীর একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত বলে মনে করি। রাগের আওচার জানা থাকলে ও বন্দেজী ধ্রুপদ শিক্ষা হলে বিস্তার করাও কিছু কঠিন কথা নয়; তিনি আমাকে বলতেন, 'ধ্রুপদগুলি মুখস্ত কর পদ-সুর ও তালসহ; তারপর যতই রেওয়াজ করবে ততই বিস্তারের ক্ষমতা রাখবে ও যন্ত্রেও নূতন নূতন তান সৃষ্টি করতে পারবে। অলংকার শিক্ষাও কিছু কঠিন বিষয় নয়; কিন্তু রাগের ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করা উপযুক্ত গুরু ও মেধাবী শিষ্য ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনি গৌরীপুরে থাকাকালে বেহাগ ও শুদ্ধকল্যাণের বিস্তারযুক্ত আলাপ ও ইমন কল্যাণ, কেদারা, দেশ, মালকোষ, আলাহিয়া, গৌড়সারং এই কয়েকটি রাগের পূর্ণাঙ্গ আওচার-আলাপ শিখিয়েছিলেন। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের সহজ বাদন-পদ্ধতিরও শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ সমস্ত ১৯২৬ সালের কথা; ঐ বৎসর শারদীয় পূজার সময় তিনি তাঁর গিধোড়ের বাড়ীতে রাজার উৎসবে যোগ দেবার জন্য চলে গেলেন।

পূজোর সময় থেকেই আমরা আমাদের পারিবারিক বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলাম। আমার বড় ছেলে তখন দেড় বৎসর বয়সে যকৃৎরোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমত স্থানীয় চিকিৎসকগণ এই রোগের গুরুত্ব ধরতে পারেন নি; অবশেষে ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন কোলকাতায় গিয়ে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দেখাতে পরামর্শ দিলেন। ডাঃ হেমেন বক্সী, যিনি উত্তরকালে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে চিকিৎসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তিনি তখন ময়মনসিংহে সরকারী প্রধান চিকিৎসক, তিনি সর্বপ্রথম আমাদের সাবধান করে ছিলেন যে শিশুর যকৃৎরোগটি সহজেই মারাত্মক হতে পারে। কলকাতায় চিকিৎসার্থে ডাঃ নীলরতন সরকারকে ডাকা হল। তিনি বললেন যে, তিনি এরূপ ব্যাধি জীবনে দুটি মাত্র সারিয়েছেন। আমার সহধর্মিনী ইন্দিরা দেবী স্বর্গীয় বৈদ্যশ্রেষ্ঠ শ্যামাদাস বাচস্পতির কোলে মানুষ। বৈদ্যরাজ শ্যামাদাস বললেন যে, শিশু যকৃৎরোগের চিকিৎসা দুঃসাধ্য; তিনি উত্তরপাড়ার রাজের কোন আত্মীয়ের গৃহে একটি শিশুকে এই রোগ থেকে বাঁচিয়ে উত্তরপাড়ায় একটি বাড়ী ও অনেক বিঘা জমি উপহার পেয়েছিলেন।

মরনোন্মুখী শিশুপুত্রসহ সপরিবারে চিকিৎসার্থে কলকাতায় আসবার পর ১৫ দিনের মধ্যেই সংকটকাল দেখা দিল। গৌরীপুর থেকে পিতাঠাকুর কলকাতায় চলে এলেন; মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবও আমার এই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা জেনে গিধোড় থেকে আমাদের কলকাতার বাড়ীতে এসে আমাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করলেন। এই সময়েও তাঁর কাছ থেকে ধ্রুপদের শিক্ষাগ্রহণের সময় আমি করে নিতাম। অনেক রাগের আওচার-আলাপ খাঁ সাহেব আমাকে শেখাতে শুরু করলেন। নভেম্বরের শেষভাগে শিশুটি বিদায় নিল। আমি এই শোকের সময় খাঁ সাহেবের কাছে সংগীত-চর্চায় ও পন্ডিচেরী আশ্রম থেকে বারীনদার মারফৎ শ্রীমায়ের আশীর্বাদলাভে নিজেকে সামলাতে পারলাম, কিন্তু বাড়ীর সবাই এই শোকের আঘাতে বিশেষভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল, ইন্দিরা দেবীর তো কথাই নাই,—তাঁর পক্ষে প্রথম সন্তানের অকালবিয়োগ নিজের মৃত্যু অপেক্ষাও বোধহয় কঠিন আঘাত হেনেছিল, বাবাও আমার কর্ম-জীবনের আরম্ভকালে এই দুঃসহ আঘাত আমার চেয়েও বোধহয় বেশী অনুভব করে-ছিলেন। বাড়ীতে যখন ক্রন্দনের রোল তখন মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের চোখেও অশ্রুর ধারা অবিরল বর্ষিত হয়েছে। তাঁর পক্ষে আমাদের জন্য এতটা দরদ দেখে আমার পুরানো অভিভাবকগণ বিশেষভাবে বিস্মিত হন। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এই বুড়ো ওস্তাদ এত কাঁদছে কেন? আমি উত্তরে বললাম যে, ইনি অল্পদিনের মধ্যেই আমার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এবং ইনি পেশাদার ওস্তাদ নন, আমার পিতৃতুল্য—দীক্ষাগুরু। সংগীতের ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যের যথার্থ সম্বন্ধ এইরূপই বরাবর ছিল। এরপর থেকে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীটি আমরা বরাবরের জন্য ছেড়ে দিই। মানসিক শান্তিলাভের জন্য দুর্ঘটনার স্থান পরিত্যাগ করে, বাবা আমাদের ও পারিবারিক সকল আত্মীয়গণ-সহ গিরিডিস্থিত বাড়ীতে চলে এলেন। স্থানান্তর বাসের ফলে আমাদের সকলের মানসিক শোক দূর হয়ে গেল।

মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবও আমাদের সঙ্গে গিরিডি এলেন; সোকত আলীসহ তিনি একমাসকাল আমাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন এবং ঐসময় বহু ধ্রুপদ আমাকে শিখিয়েছিলেন। সোকত আলীর রবাব শিক্ষা ঐ সময় শুরু হয়,—তখন তাঁর বয়স বারো বৎসর মাত্র। খাঁ সাহেব তখন প্রতিদিন দুই-তিন মাইল হাঁটতেন। ইতিপূর্বে রামপুরের উজির খাঁ সাহেবের দেহান্ত হয় নভেম্বরের শেষে। উজির খাঁ সাহেব মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের ভাগ্নেয়বংশীয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদে মহম্মদ আলী প্রথমতঃ দুঃখপ্রকাশ করলেন এবং সজল চোখে বললেন, উজিরের তুল্য বীন্‌কারের বাজনা তিনি কখনও শোনেননি ও কখনও শোনা যাবে কি না, তা সন্দেহের বিষয়; তবে মহম্মদ আলীর মতে উজির খাঁ সাহেবের পিতৃদত্ত প্রথম বয়সের শিক্ষার ফলে তাঁর এতটা প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর হতো না। *রামপুরের নবাববংশীয় মহাগুণী হায়দার আলী উজির খাঁর পিতা আমীর খাঁ ও মাতামহ বাহাদুর হোসনের প্রধান শিষ্য ছিলেন। উজির খাঁর সকল উন্নতির মূলে হায়দার আলী খাঁর অবদান অসামান্য। নবাব ছম্মন সাহেব হায়দার আলীর উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং মহম্মদ আলীর নিকট নাড়া বেঁধেছিলেন।* তাঁর আহ্বানেই গিধোড়ের মহারাজার আশ্রয় ছেড়ে সাত বৎসর রামপুরে অতিবাহিত করেন। ছম্মনের মৃত্যুর পর আবার গিধোড়ে ফিরে আসেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে রাজা নবাব আলী ও আমাকেই তিনি সোকত আলীর ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য চিন্তা করতে বলেন; ঐ সময়ে খাঁ সাহেবের বয়স প্রায় নব্বই বৎসর। আমি তাঁর তালিম গ্রহণে সমর্থ দেখে তিনি বিশেষ আশ্বস্ত হন; তবে সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে তখনো আমার হাত বসেনি,—সবে অভ্যাস আরম্ভ করেছি মাত্র। তিনি ব'ললেন যে, ঐ যন্ত্রে যখন আমার আঙুলগুলি অবলীলাক্রমে চল্‌বে—তখন তিনি ইমাম হোসেনের নামে কোনও দরগায় সিন্নি চড়াবেন।

তখনও খাঁ সাহেব বেশ পরিশ্রম করতে পারতেন এবং সবকিছু খেয়ে হজমও করতে পারতেন। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁর কাছে বীণা শিক্ষাও লাভ করা। তিনি বলতেন, বীণাতেও তাঁর বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। সেতারে তিনি বীণার কাজই দেখাতেন। রবাব, সুরশৃঙ্গার, বীণা ও সেতার এই চার-যন্ত্রই তিনি বাজাতে পারতেন; তবে তাঁর কন্ঠের অলাপ অতুলনীয় ছিল। তাঁর কন্ঠস্বর যেমনসুরেলা অথচ উচ্চ ছিল তার তুলনা হয় না। কন্ঠ আলাপে তানসেন-বংশীয় বোলবিন্যাস ও লড়ির তান বিস্তার তিনি উত্তমরূপে দেখাতেন। যাঁরা স্বর্গীয় রাধিকা গোস্বামী বা গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাপ শুনেছেন, তাঁরা মহম্মদ আলীর সঙ্গে, এ'দের মিল খুঁজে পাবেন। অবশ্য প্রতি যন্ত্রই মহম্মদ আলী নিখুঁত সুরে বাজাতেন: জোড়ের তিনি বাদ্‌শা ছিলেন। তিনি আমায় বলেছেন, যে তাঁর পিতা বাসৎ খাঁ তাঁকে গায়করূপে তৈরী ক'রেছিলেন ও তাঁর জ্যেষ্ঠ বোড়কুমিয়া যন্ত্রে বিশেষ ক'রে সুরশৃঙ্গারে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ আলীও রবাব অভ্যাস বাড়িয়ে দেন। তাঁর সময়ে তাঁর ঘরের বাহাদুর হুসেন খাঁ (রামপুর) ও বটুমিয়া (কাশীধাম) *সুরশৃঙ্গারে শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন। রবাবে সাদেক আলী খাঁ (কাশীধাম) ও কাশেম আলী খাঁ (বঙ্গবিখ্যাত) অতুলনীয় ওস্তাদরূপে সম্মানিত হন। বীণা যন্ত্রে তাঁদের আগে উজির খাঁর পিতামহ ওমরাও খাঁ খুবই বিখ্যাত ছিলেন। বিদ্যা সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে নানা রাগে ধ্রুপদ শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন; কিন্তু আলাপের জন্য প্রসিদ্ধ বড় বড় রাগগুলি সারাজীবন ধরে শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সাদেক আলী খাঁ রবাবী কাশীতে বরাবরই ব'লতেন যে প্রচলিত ও সর্বসাধারণের জ্ঞাত নানা প্রসিদ্ধ রাগ নিয়ে সেনীগণ সংগীত সৃষ্টি করেন, তবে তাঁদের সৃষ্টিতে প্রচলিত রাগগুলি সম্পূর্ণ অভিনব রূপ নিয়ে থাকে। তিনি নিজে তাঁর সুদীর্ঘ আশি বৎসর বয়সে প্রত্যহই শুধ্‌কল্যাণ, ইমনকল্যাণ ভৈরব ও দরবারী কানাড়া বাজাতেন,—তবু বলতেন যে ঐসব রাগের সীমা তিনি খুঁজে পাননি।*

গিরিডিতে একমাসের মধ্যে তিরিশ-চল্লিশটি ধ্রুপদ ও গৎ শিখিয়ে তিনি তাঁর নিজ ভবন গিধোড়ে বালক সোকত সহ চ'লে গেলেন; যাওয়ার পূর্বে ব'ললেন যে, তিনি দুই-তিনমাসে তাঁর সামান্য কিছু সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে আবার আমাদের নিকট আসবেন এবং তখন নবাব ছম্মন সাহবের সোনালী কাজ করা বীণাটি সংগ্রহ করে আমার জন্য নিয়ে আসবেন। সেই সময় পরলোকগত ছম্মন সাহবের ছেলে নাবালক ছিল; বৃদ্ধ ওস্তাদ চাইলে তাঁর বীণাটি দিতে কিছুতেই কুন্ঠিত হতেন না। যা... সময় ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য এক্কাগা... যখন উঠলেন, তখন অঝোরে ... লাগলেন। পূর্বেও আমাদের কাছ... কতবার বিদায় নিয়ে গিধোড়ে গিয়ে... কিন্তু এবার কেন হঠাৎ তাঁর হৃদয়ে... মর্মান্তিক বেদনা জেগে উঠলো—তা... বুঝিনি; তবে যাওয়ার সময় আশী... কানে ব'ললেন,—"জোড় আলাপে ... সমকক্ষ হিন্দুস্থানে কেহ থাকবে না।"
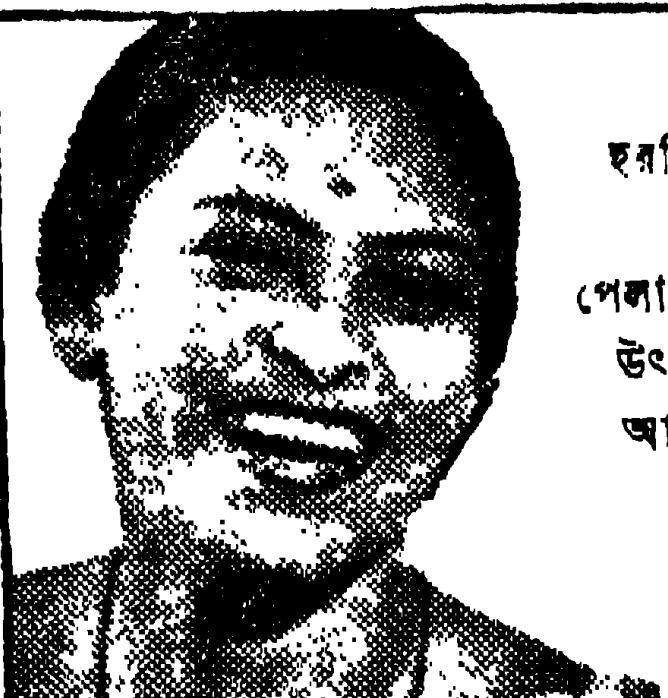
গিধোড় থেকে তিনি লক্ষ্ণৌতে ... নবাব আলীর আশ্রয়ে কয়েক মাস ... সোকতের লেখাপড়া শেখাবার ব্য... জন্য। তারপরে চিঠি এলো যে তাঁর পেটের অসুখ হয়েছে; আমি সপ... তখন গৌরীপুরে ফিরে গিয়েছি। ... গৌরীপুর থেকে এই সংবাদ পেয়ে ... সাহেবকে আমাদের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বা... রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রলেন। ...কাতায় খাঁ সাহেবের শেষ চিকিৎসার ... বর্তমানে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউস্থিত চি...সক সংগীতপ্রেমিক ডাঃ প্রকাশচন্দ্র ... উপরে বাবা চিকিৎসার ভার অর্পণ কর... খাঁ সাহবের কলকাতায় আগমনের পর ...সেন তাঁকে মেডিকেল কলেজের কোনও ডাক্তার দিয়ে দেখালেন। সাত-আট দি... মধ্যেই বোঝা গেল যে খাঁ সাহেবের ... ক্যান্‌সার হয়েছে; তিনি নিজে শারী... অবস্থা খানিকটা বুঝতে পেরেছিলেন ... চিকিৎসকেরা ব্যর্থ হবে জেনে ... গিধোড়ে তাঁর নিজের গৃহে ফিরে গেলে... প্রায় দিনপনের পরেই সোকতের পত্রে ... মৃত্যুসংবাদ গৌরীপুরে পৌঁছায়। সোকত আমাকে লিখেছিল যে তার ঠাকুদ... (মহম্মদ আলী খাঁ) সোকতকে ... গিয়েছিলেন : রাজা নবাব আলী ও ত... তার উন্নতির জন্য চেষ্টিত থাকব; ... বিশ্বাস খাঁ সাহেবের যথেষ্টই ছিল; ... আমার কথা অনেকবার অন্তিম সম... পূর্বে স্মরণ ক'রেছিলেন। তাঁকে তাঁর ... লোকগমনের পর স্বপ্নে অনেকবার দেখে... প্রথম স্বপ্নটিতে তিনি আমার নিকট ... পারলৌকিক শান্তির জন্য কিছু ক... অনুরোধ ক'রেছেন। আমি এই স্বপ্নে... বৃত্তান্ত শ্রীঅরবিন্দের কাছে নিবেদন ক... তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেন, "তো... সংগীতগুরু মহম্মদ আলী তাঁর আ... শান্তির জন্য প্রার্থনা জানাতে ব'লে... আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি,—... আত্মার কোন দুঃখ থাকবে না।"

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 23rd December 1966. শুক্রবার, ৭ই পৌষ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীরঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রসঙ্গে" নামক প্রবন্ধ পড়লাম। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনের সময় ও গতির যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি তার একটা অকাট্য প্রমাণ হঠাৎ বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে, হয়ত অনেক পাঠক ঘটনাটা জানেন, তথাপি যাঁরা এখনও জানেন না, তাঁদের জানানোর জন্যই লিখছি। কারণ এতেই তাঁরা বুঝতে পারবেন বিজ্ঞানাচার্যের সূত্রের অকাট্য সত্যতা। নীচে ঘটনাটি ইংরেজিতে উল্লেখ করলাম বলে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

There was one fascinatinating detail of Gordon Cooper's epic journey into space that hardly any one bothered to consider : The flight made Cooper younger. It also made his watch run slower. Neither Cooper nor his friends will notice difference. In the course of each 90-minute orbit he aged only a millionth of second less than he could have if he had stayed in Cape Canaveral. And in 24 hours of orbiting his watch slowed down by only 1/60,000 of a second. The slow-down in Cooper's aging process, like the slow-down in the mechanism of his watch was due to his speed in orbit. If Einstein's abstract theories are true and most scientists belive that they are then a number of highly improbable things are true about the real world. One of the more bizrre of these truisms is Einstein's "Clock Paradox."

বিগত ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের 'Life' পত্রিকার "A 3,000,000 year trip in one Life-time" নামক প্রবন্ধের লেখক Mr. Albert Rosenfeld মহাশয়ের নিকট উপরে লিখিত সমীক্ষা প্রাপ্তির জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীত
সনৎ মজুমদার
দুর্গাপুর-৫

শহরবাসের ইতিকথা

সবিনয় নিবেদন,

১৬ই ডিসেম্বরের অমৃত সম্পাদকীয় পড়লাম। এই ধরণের সম্পাদকীয় প্রত্যেক শহরবাসীর নিকট একটা অমূল্য সম্পদ।

সাহিত্যিকের ভাষাতেই বলছি, God made the country and man made the town. আপনি লিখেছেন, এটা সাহিত্যিকের আক্ষেপ। সত্যি এটা আক্ষেপেরই বিষয়। কারণ মানুষই তার নিজের [illegible] গড়েছে শহর, গড়েছে সমাজ, গড়েছে গ্রাম। নিজেরই সুবিধার্থে সে নিজের কর্তব্য বেছে নিয়েছে। অথচ কর্তব্য পালনের বেলায় সকল প্রতিজ্ঞা আর কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে—ভবিষ্যতের আহ্বানকে বিস্মৃত হয়ে যথেচ্ছাচার আর বিশৃঙ্খলতার মধ্যে আজ গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই বিশৃঙ্খলতা আর যথেচ্ছাচারকে যতদিন না মানুষ ভুলতে পারবে, যতদিন না অপরের সুবিধা-অসুবিধাকে উপলব্ধি করতে পারবে, ততদিন কোন সমস্যারই সুরাহা হবে না—অনর্থক একটা গোলমাল, আর তার ফলে জাতির মজ্জায় মজ্জায় ধ্বংসের একটা তাণ্ডবলীলা বাসা বাঁধবে। অর্থাৎ কথায় কথায় ধর্মঘট আর কথায় কথায় সম্পত্তি বিনষ্ট করা একটা ট্রাডিশন-এ পরিণত হবে।

এই অভাবনীয় ভবিষ্যত-পরিস্থিতির জন্য সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আজ সরকারের, অর্থাৎ যিনি আমাদের অভিভাবক, তাঁর। 'পিঠে বেঁধেছি কুলো আর কানে দিয়েছি তুলো'—এ মনোভাব নিয়ে চললে দেশেরই ক্ষতি, দশেরই ক্ষতি অর্থাৎ সমগ্র জাতির ক্ষতি। এই জাতিই যদি আজ সর্ববিষয়ে সমাজচ্যুত হয়ে পড়ে, যদি তারা আশা-আকাঙ্ক্ষা, অধিকার আর চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে তবে কেনই বা তারা আজ বিপথগামী হয়ে উঠবে না?—এটাও একটা ভাববার কথা। তবে সব কিছুর পেছনেই ঐ একটা কথা যে, যা কিছু করতে হবে—ভবিষ্যত চিন্তা করে।

বিনীত
বিদ্যুৎ মল্লিক
১৫।১২।৬৬ নিউ-আলিপুর

'পরিচ্ছন্ন কলকাতা' প্রসঙ্গে

গত ২৫ নভেম্বর তারিখে শ্রীসুলেখা চৌধুরী লিখিত 'পরিচ্ছন্ন কলকাতা' চিঠিটি এবং ৩২ সংখ্যা 'শহরবাসের ইতিকথা' সম্পাদকীয়টি পড়লাম।

এ সম্পর্কে আমার সামান্য বক্তব্য সকলের সামনে তুলে ধরছি। কলকাতা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাবার জন্যে জনসাধারণের দায়িত্ব কোনক্রমেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জল সরবরাহ, জঞ্জাল পরিষ্কার, মানুষের মলমূত্র মাটির নীচের পাইপের বা ড্রেনের মাধ্যমেই হচ্ছে। কিন্তু শহরবাসীরা যদি রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ, ফলের খোসা, ময়লা ফেলা বন্ধ করেন, যদি তারা সমস্ত ময়লা নিজের বাড়ীর নির্দিষ্ট পাত্রে জমা করে রাখেন, (অবশ্য এই পাত্রটি ঢাকা দেওয়া হওয়া চাই, তা না হলে মাছি জন্মাবে এবং মাছির সাহায্যে ও পাখীগুলির সাহায্যে রোগ ছড়াতে পারে) এবং যত্রতত্র কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মূত্রত্যাগ করতে না বসেন তাহলে হয়ত এই বৃহৎ শহরের মূল সমস্যাটির সহজ সমাধান অনেকখানি সম্ভবপর হবে। অবশ্য কর্পোরেশনকে ময়লা অপসারণে আরও তৎপর হতে হবে।

কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে পরিকল্পনাহীন ভাবেই। কিন্তু আজ শহর যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে বৃহত্তর কলকাতাকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে তোলা ছাড়া শহর কলকাতাকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ নেই। বিশ্বব্যাঙ্ক বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, আবর্জনা পরিষ্কার প্রভৃতির উন্নতির জন্য ১৯৬০ খৃঃ সুপারিশ করেছিলেন। এর জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। দুর্ভাগ্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে অর্থ মঞ্জুর করতে একেবারেই পরাঙ্মুখ।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৫৯ খৃঃ কলকাতায় এসেছিলেন। শহর পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন : (১) উন্নত দেশগুলির তুলনায় বৃহত্তর কলকাতার পরিশ্রুত জল সরবরাহ অত্যন্ত স্বল্প হওয়ায় বহু সংখ্যক লোক দূষিত জল পান করেন; (২) উন্নত দেশগুলির তুলনায় কলকাতায় নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা কম; স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় বহু পিছনে পড়ে আছে; (৩) মলমূত্রাদি অপসারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই; (৫) বর্ষার সময় রাস্তায় জল জমে। কারণ জল অপসারণের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। নোংরা জলের মধ্যে দিয়েই অধিবাসীদের যাতায়াত করতে হয়; (৫) রাস্তার ময়লা ঠিকভাবে অপসারিত না হওয়ায় মশা মাছির জন্ম হয় এবং রোগ বিস্তার ঘটে প্রবলভাবে এবং (৬) অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থায় কলকাতা থেকে সারা পশ্চিম বাংলায় রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে কলকাতার বস্তি এলাকা থেকে কলেরা রোগের বিস্তার ঘটা একটি বাৎসরিক ঘটনা।

শহর কলকাতার লোকসংখ্যা উনত্রিশ লক্ষেরও বেশী এবং আয়তন আটত্রিশ বর্গমাইল। দশ লক্ষেরও বেশী লোকের বাস হল নোংরা বস্তি এলাকায়। তিন লক্ষ লোকের বাস অননুমোদিত বস্তি এলাকায়। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী এলাকায় বাস করে ১,৭২,০০০ লোক। শহরপ্রান্তে ৪৫০ একর জমিতে যে ২,১৪,০০০ লোক বাস করে ঐ স্থানে পয়ঃপ্রণালীর সুবিধা আছে। তিন লক্ষ লোক যে বস্তিতে বাস করে সেখানে কোন ময়লা জল পরিষ্কারের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া কলকাতায় দৈনিক যে ১৬০০ টন ময়লা জমে তার মধ্যে ৮০০ টন জঞ্জাল লরীতে করে ধাপায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি ময়লা ফেলাবার নির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেই। শহরের বাইরে যেখানে সেখানে ফেলা হয়।

এর থেকে কলকাতা শহরের একটি মর্মান্তিক চিত্রই শুধু ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। আমরা অসহায়ভাবে বিশেষজ্ঞদের বহুকষ্টে আবিষ্কৃত পরিসংখ্যান এবং তথ্যাদি পড়ে অবাক হই মাত্র। এতাবস্থায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পথনির্দেশ করবে কে?

বিনীত
পরেশ দত্ত
কলকাতা—১৯.

সম্পাদকীয়

ধর্মঘটের শিক্ষা

কলকাতা ধর্মঘট ও মিছিলের শহররূপে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। এই শহরের অধিবাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তোয়াক্কা না করে যখন তখন যে কোনো সংগঠনই ধর্মঘটের নোটিশ দেন, ধর্মঘট করেন। ফলে ভোগান্তি যা হয় নাগরিকদের। কারণ, কতকগুলি বিষয় আছে যার সঙ্গে নগরজীবনের স্বাভাবিকতা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, শুধু অর্থনৈতিক দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট করলেই তার জের মেটে না। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে শহরের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায়।

কলকাতার নাগরিকদের তেমনি এক অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়তে হয়েছিল পরিবহন কর্মীদের ধর্মঘটের দরুণ। সরকারী বাসের কর্মীরা ধর্মঘটের পথে নেমেছিলেন। ট্রামশ্রমিকরা ধর্মঘটরত অবস্থাতেই আছেন। (জানি না এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এই ধর্মঘটের কোনো মীমাংসা হবে কি না।) সুখের বিষয়, বাসকর্মীদের সুমতি ফিরে আসে অল্পসময়ের মধ্যেই। দু'দিন ধর্মঘট চালিয়ে তাঁরা বিনাশর্তে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত খুবই সময়োচিত হয়েছে। ধর্মঘটে নামার আগে যদি তাঁরা সমস্ত বিষয়টি ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখতেন তাহলে এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পারতেন না। ট্রামশ্রমিকরা তাঁদের সংকল্পে এখনও অটল। তার ফলে বাস ধর্মঘট মিটলেও কলকাতার ২৩ লক্ষ যাত্রীর ভোগান্তি শেষ হয়নি। প্রতিদিন যাঁরা ট্রামে-বাসে চড়ে আপিসে যান, কলকারখানায় কাজ করতে যান তাঁদের কাছে কলকাতার পরিবহন একটি অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা। তার সঙ্গে ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট যুক্ত হয়ে সেই অভিজ্ঞতাকে আরও দুঃসহ করে তুলেছে।

বাস ধর্মঘটের ব্যর্থতা থেকে ট্রামশ্রমিকদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ শিক্ষা শুধু বর্তমান সময়ের জন্য নয়, ভবিষ্যতেও এই অভিজ্ঞতা তাঁদের কাজে লাগানো উচিত। ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত বলেই যখন তখন ধর্মঘট করা শুধু নির্বুদ্ধিতা নয়, সমাজকল্যাণেরও তা বিরোধী। বিশেষত কলকাতার মতো একটি জনবহুল শহরে যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক ট্রাম-বাসের ভরসায় রাস্তায় বেরোন সেখানে যাত্রীদের কথা একবারও চিন্তা না করে পরিবহনকর্মীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যত শহর অচল করে দেবারই হুমকি। আরও লক্ষ্যণীয় যে, বাস ও ট্রামকর্মীদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কিত বিরোধ মীমাংসার জন্য সরকার সমগ্র বিষয় বিবেচনার জন্য ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়েছেন। ট্রাইব্যুনালের বিচার শ্রমিকদের দাবী মীমাংসার একটি ন্যায্য পথ। সেই পথ বর্জন করে যে সমস্ত নেতা ট্রাম ও বাস কর্মীদের ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন, শ্রমিকদের উচিত তাঁদের কাছে এখন কৈফিয়ৎ তলব করা।

একজন শ্রমিকনেতা বলেছেন যে, বাস ধর্মঘটের ব্যর্থতা বামপন্থী অনৈক্যের প্রথম বলি। এই কথা বলে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, এই ধর্মঘটের পিছনে রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল কাজ করেছিল। চাল ব্যর্থ হওয়াতে ধর্মঘটও ব্যর্থ হল। ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের দায়িত্বহীনতার একটি প্রধান কারণ, তার ওপর রাজনৈতিক দলের অশুভ প্রভাব। শ্রমিকদের দাবী যদি মূলত অর্থনৈতিক হয় তাহলে ট্রাইব্যুনালে যেতে তাদের আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? ট্রাইব্যুনাল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী তাঁদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না, এই মনোভাব তাঁদের মধ্যে আসে কেন? তা আসার একমাত্র কারণ হতে পারে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির রাজনৈতিক মতবাদ যা শ্রমিক স্বার্থ অথবা জনসাধারণের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে।

এই বিষয়গুলি আজ শ্রমিকদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত। যাঁরা অত্যাবশ্যক জন-সংস্থায় কাজ করেন তাঁদের দায়িত্ব অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, জনসাধারণের সমর্থন তাঁদের কাছে মূল্যবান। বাসকর্মীরা সেটা উপলব্ধি করে দুদিনের মধ্যে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন। ট্রামশ্রমিকদের সেই চৈতন্যোদয় হয়নি। এর আগেও বহুবার তাঁরা এমনিভাবে ধর্মঘট করে যাত্রীসাধারণকে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে ফেলেছেন। আশা করি, ধর্মঘটীদের সিদ্ধান্ত থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁদের এই অনমনীয় মনোভাব অবিলম্বে পরিত্যাগ করবেন। এই প্রসঙ্গে পৌরকর্মীদের আসন্ন ধর্মঘট সম্পর্কেও তাঁদের পুনর্বিবেচনার জন্য আমরা অনুরোধ করি। বামপন্থী রাজনীতির শিকার হয়ে তাঁরা যেন আত্মঘাতী পথে পা না দেন। কলকাতার সমস্যা বিরাট, এই সমস্যা সমাধানে সরকার, জনসাধারণ ও শ্রমিক সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। শহর অচল করে দিয়ে যাঁরা মনে করেন যে নিজেদের স্বার্থ আদায় করতে পারবেন তাঁদের এই ভ্রান্তবুদ্ধি পরিত্যাগ করে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার মাধ্যমে দাবীদাওয়ার মীমাংসার পথে আসা উচিত। ধর্মঘট হ'ল শ্রমিকদের শেষ অস্ত্র, একে রাজনৈতিক প্ররোচনায় যখন তখন ব্যবহার করা চরম অদূরদর্শিতা।

বিচিত্র চরিত্র

বিলিতীমাস্টার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(২য়)

নন্দমাস্টার বা বিলিতীমাস্টারের চরিত্র-বৈচিত্র্যের একটি অন্যতম বৈচিত্র হল এক ধরনের নির্দোষ (?) ক্ষুদ্রতা। এই ক্ষুদ্রতা কতখানি তাঁদের সংসারের দারিদ্র থেকে জন্মেছে বা কতখানি জন্মেছে সেকালের সমাজব্যবস্থা থেকে সে বিচার করব না। আমি শুধু বলব, তাঁর যা দৈহিক শক্তি, যা বুদ্ধি, যা মেধা তাতে অনায়াসে এ ক্ষুদ্রতাকে তিনি অতিক্রম করতে পারতেন, ব্যক্তি হিসেবে তো পারতেনই—তাই বা কেন তিনি তাঁর বুদ্ধিশক্তি এবং শ্রমশক্তি দিয়ে তাঁদের সারা সংসারেরই দুঃখ দারিদ্র সব ধুয়ে-মুছে একটি উজ্জ্বল সংসারের প্রতিষ্ঠাতা হ'তে পারতেন। কিন্তু সে কথা থাক। নন্দমাস্টারের জীবনের গল্পই বলতে বসেছি আমি। হিসেব খতাতে বসিনি।

আমার থেকে নন্দমাস্টার বছর সাত-আটের বড় ছিলেন। কিম্বা ছ-সাত বছরের। আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিল তাঁদের বাড়ী, আমি যখন ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি, তখন তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। ছাত্র নন্দমাস্টারকে দেখেছি। মাস্টার নন্দমাস্টারকে দেখেছি। আবার কেরানী নন্দমাস্টারকেও দেখেছি। মাস্টারের বাড়ীতে তামাক খাওয়ার আড্ডা বা ক্লাবও দেখেছি। কিন্তু খাইনি কখনও। আমি ছেলেবেলা দস্তুরমত ভালছেলে ছিলাম; তামাক দূরের কথা, পান এমনকি সুপুরীও খাইনি ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত। এমন কি টেরী কাটাও বারণ ছিল। টেরীও কাটি নি। তবে আমি তামাক না খেলেও গোবিন্দমাস্টারের বাড়ীর ক্লাবের মেম্বারদের দেখেছি। মেম্বারেরা ছেলেবেলায় তামাক খেতেন বলে বখা ছেলে ছিলেন না। একজন বিভূদা ডেপুটি এ্যাকউন্টান্ট জেনারেল হয়েছিলেন, কালিকিংকরবাবু এখনও বেঁচে, তিনি কৃতী ব্যক্তি জীবনে। এমনই আরও অনেকে ছিলেন। গোবিন্দমাস্টারকেও তামাক খেতে দেখেছি। পনেরো-ষোল বছরের নন্দ সরকার তামাক টেনে কল্কে ফাটিয়ে দিত। শুধু তাই বা কেন, মানে, তামাক খেয়ে কল্কে ফাটানো কেন তামাকের সঙ্গে চরস মিশিয়েও মধ্যে-মধ্যে খেতেন নন্দমাস্টার। নন্দমাস্টারের এক ভগ্নিপতি আসতেন রামপুরহাট এলাকা থেকে. তিনি চরস খেতেন; শ্বশুরবাড়ী আসবার সময় তিনি নিয়ে আসতেন এই দ্রব্যটি এবং এখানে শ্যালক থেকে শুরু করে আরও দু-চারজন শিষ্যসেবক তৈরী করে যেতেন। এর জন্য দক্ষিণা তিনি নিতেন কিনা জানি না, তবে নন্দমাস্টার বেশ ভাল দক্ষিণা আদায় করতেন এর জন্য। এক পয়সায় সাদা তামাক যেখানে তিনবার টানতে পাওয়া যেত, সেখানে চরসমিশ্রিত তামাক একবার খেতেই লাগত চার পয়সা কি দু আনা। তখনও আনি ওঠে নি। দো আনি ছিল, সেই রুপোর বাচ্চা দুআনি, প্রায় সিপীর বোতামের মত যার চেহারা।

ওই পর্যন্ত। এর বেশী নেশা কখনও তাঁর ছিল না। এ ছাড়া তিনি সে-আমলের মতে যাকে বলে Idial boy —আদর্শ বালক, তাই ছিলেন। ৪৪" ইঞ্চি বহরের মোটা কাপড় এবং মোটাসোটা একটা কামিজ কি কোট এবং খালি পা. এই ছিল তাঁর বেশ। মাথা আঁচড়াতেন না। চুল কাটতেন সমান করে। আমাদের হেড-মাস্টার বলতেন—

"Comb your hair everyday but dont divide into two parts," হ্যাঁ। You understand? And — you boys, ওই গাড়োয়ানি ছাঁট, ছ আনা, দশ আনা চুল কাটা এ কাটবে না। Understand?

আরও বলতেন— Get up very early in the morning —ভোরবেলা পড়তে বসবে। বুঝলে! হাঁ। Get your lessons by heart. হ্যাঁ।

এসব অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলতেন নন্দমাস্টার। কি শীত, কি গ্রীষ্ম ভোর-বেলা চারটের সময় থেকে নিস্তব্ধ পল্লীটির নিস্তরঙ্গ অন্ধকারের বুকে একটি একটানা শব্দকম্পনের সৃষ্টি করে শব্দ উঠত— "নরঃ নরৌ নরা।" অথবা If two sides of a triangle অথবা My shame in crowd but solitary pride —বা কিছু। মনে পড়ছে অনেক সময় একটা শব্দই বারবার ক্রমান্বয়ে উচ্চারিত হয়ে চলত noun, noun, noun অথবা Lord Conwallis, Lord Conwallis, Lord Conwallis.

ক্রমাগত ওই একটি শব্দই ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিতে তরঙ্গায়িত ভঙ্গিতে বন্ধ বা খোলা জানালার ওধার দিয়ে দূরে দূরান্তে চলে যেত। এবং তার পিছনে পিছনে আসত পিছনের তরঙ্গটি। আমি ঘুমভরা চোখে স্বপ্নাতুর চেতনার মধ্যে শুয়ে থাকতাম। ক্রমে সকালবেলা হত, তখন আরও ছেলেরা তাঁর কাছে বসত, তাঁরা তারই ভাই বা ভাগ্নে। আমিও উঠে দোতলার ওপর দিকের জানালায় দাঁড়াতাম, দেখতাম নন্দমাস্টার দুলে-দুলে পড়েই চলেছে। তারপর বেলা ন'টা হতেই উঠে পড়তেন নন্দমাস্টার বই গুটিয়ে তামাক সেজে তেল তামাক অর্থাৎ তেল মাখার সময় তামাক খেয়ে স্নান করতে চলতেন। পুকুরে স্নান। আগেই বলেছি, চলন ছিল মাতঙ্গের মত। এবং পুকুরে গিয়ে মাতঙ্গের মতই হুড়মুড় করে নেমে পড়তেন। কিছুক্ষণের জন্য জল আলোড়িত করে উঠে আসতেন, হাতে থাকত একটি বড় ঘটি। বাড়ী এসে, কাপড় ছেড়ে, পরতেন কেঁটের কাপড় এবং গিয়ে বসতেন তাঁদের গৃহদেবতা গোপাল নামক শালগ্রামের সিংহাসনের সামনে। ফুল তাঁর বোন পাতু তুলে রাখত, মা চন্দন ঘষে রাখতেন, নন্দমাস্টার আসনে বসে পুজোটি যথাবিধি সেরে উঠেই খেতে বসতেন। তারপর ইস্কুল।

মধ্যে মধ্যে নিজেদের ঠাকুর ছাড়াও গ্রামের অন্য বাড়ীতেও ঠাকুরপুজো করতে হত তাঁকে। পাড়ায় আমাদের ঠাকুরবাড়ী আছে, সাতটি শিব শালগ্রাম সেবা এবং আরও একটি শিবের সেবা, তার সঙ্গে কালী দুর্গার কাঠামো এবং বেদীতে নিত্য পুজো আজও হয়। আমরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমরা ছোটখাট জমিদারীর অধিকারী হিসেবে স্বতন্ত্র জীব। আমাদের দেবতা পুষতে হয়, পুজো করতে নেই নিজে হাতে। তার জন্য মাইনে করা পুজক আছে। নিজের হাতে পুজো করলে পুজুরী বামুন হয়ে যাবার ভয় আছে। এই পুজকের অসুখ হলে, অশৌচ হলে অথবা কার্যান্তরে অন্য কোথাও যাওয়া প্রয়োজন হলে সে-ভার সে দিয়ে যেত নন্দ সরকারকে। তা ভিন্ন করবে কে ? এ কাজ করেছেন নন্দমাস্টার, ছেলেবেলায় ছাত্রাবস্থা থেকে করেছেন; যৌবনে শিক্ষকতা করার সময়ও করেছেন এবং বেশী বয়সে যখন রুগ্ন তিনি, দেহ যখন ভগ্ন, তখনও তিনি চালিয়ে গেছেন সেই একইভাবে। নিজের বাড়ীতে পুজো সেরে হন-হন করে এ ঠাকুরবাড়ীতে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুজো সেরে দিয়ে স্কুলে যেতেন। সেদিন খেয়ে যেতেন না। সাড়ে ১২টার পর ধাঁ করে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে ঠাকুরের

ভোগ দিয়ে দিতেন। এবং ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে স্কুলে চলে যেতেন। সন্ধ্যায় আরতি দিয়ে শীতলের দুধ এবং বাতাসাটুকু নিয়ে বাড়ীতে রেখে রাত্রির আহার সেরে নিয়ে বাড়ী গিয়ে পড়তে বসতেন, অমিত গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলীতরু ঃ অথবা নাদির শাহ, দি শাহ অব পারসিয়া ইনভেডেড ইণ্ডিয়া অথবা অঙ্ক কষতে বসতেন। এর জন্য আমি তাঁকে নিষ্ঠাবান ধার্মিক বা ঈশ্বরে ভক্তিভাজন তা কখনই বলছি না। এ সবের সঙ্গে এ পুজো করার কোন সম্পর্কই ছিল না।

মাসের শেষে এসে বলতেন—আমি এ মাসে আট দিন ঠাকুরের সেবা করেছি, আট দিনের মাইনেটা আমি পাব।

এর মধ্যে পূর্ণিমা বা সংক্রান্তি পড়লে সত্যনারায়ণের সেবা হত অনেক বাড়ীতে, তাও তিনি করে দিতেন। সুর করে পাঁচালী পড়তেন। ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, ইতু এমন কি 'গোষ্ঠ' পুজো থাকলেও তিনি সে সব যাবতীয় পুজোই সমান ভক্তি বা অভক্তি-সহকারে বা যন্ত্রের মত করে দিয়ে, চাল, কলা, নৈবেদ্য, এবং ভোগের অংশ থেকে শুরু করে পৈতে সুপুরী দক্ষিণা সে দু পয়সা থেকে দু আনা পর্যন্ত যা পেতেন তাই সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরতেন।

অল্প হলে কোন মতেই সন্তুষ্ট হতেন না। তবে রূঢ়তা তাঁর কমই ছিল। ওটা যেন ও'র এবং ও'র ভাইদের কারুর মধ্যেই ছিল না, শুনেছি ও'র বাপের মধ্যেও ছিল না, সেই হেতু বলা যায় ওদের বংশগত ধাতুতে বা রক্তেই রূঢ়তা কাকে বলে তা ছিল না।

এই সরকার বংশটির মধ্যে এই তথ্য বা তত্ত্ব, এই অরূঢ়তা বা রূঢ়তার অভাবটা এমনই সত্য যে আজও তাঁদের ছেলেদের মধ্যেই সেই ধারাই সত্য হয়ে আছে। অসন্তোষ প্রকাশ করতে হলে আড়ালে গজ্‌-গজ করে থাকেন। সামনে কিছুই বলতে পারেন না।

এন্ট্রান্স পাশ করে গ্রামের ইস্কুলের মাস্টারী করতে ঢুকলেন। এবং এই সময়েই তিনি নাম পেলেন বিলিতীমাস্টার। নামটা দিলেন আমাদেরই গ্রামের বাসিন্দা বিনোদ-বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আমাদের গ্রামেরই সাব-পোস্টাপিসে পোস্টম্যান ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, জার্মানী থেকে বিনামূল্যে কোষ্ঠী তৈরী করিয়ে আনিয়েছিলেন নন্দমাস্টার। সেই জার্মানীর ডাক-টিকিট মারা জার্মানীর প্যাকিং করা রঙ-চঙে প্যাকেটটি হাতে করে ইস্কুলে ডেলিভারী দিতে এসে বলেছিলেন—ননডা গুপালা সিরকার বিলিতী মাস্টার। এর পর নন্দমাস্টারের ওটা একটা নেশা ছিল। কাগজ খুঁজে-খুঁজে বিজ্ঞাপন দেখে বিনা-মূল্যে নমুনার বিজ্ঞাপন টুকে নিয়ে আসতেন। চিঠি লিখতেন। এবং রোজ পোস্টাপিসে যেতেন বিনামূল্যের দ্রব্যটির জন্য। এতে তিনি ঠকেন নি, এমন নয়; বেশ কয়েক বার ঠকেছেন। একবার যেন বাত বা টাকের একটা ওষুধের নমুনা আনিয়েছিলেন; ছোট একটা তাম্বুল-বিহারের মত কৌটো। কৌটোটা খুলতেই মলম জাতীয় যে ওষুধটা বের হল, তার দুর্গন্ধে যারা-যারাই সেখানে ছিলেন সকলেই বমি করেছিলেন। আর একবার যেন কি একটা আনিয়ে দেখা গেল, সেটার মধ্যে গোরক্ত বা ষাঁড়ের চর্বি বা শুকর চর্বি রক্তের সংস্পর্শ আছে, ফলে বাড়ীঘর গোবর গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে নিকিয়ে শোধন এবং পবিত্র করতে নাকালের একশেষ হয়েছিল। তবু নন্দ-মাস্টার এ নেশা ছাড়তে পারেন নি। তেমনি তিনি রুগ্ন হয়েও নেমন্তন্ন খাওয়া ছাড়তে পারেন নি, জীবনের শেষ পর্যন্ত।

নন্দমাস্টারের উপার্জনের একটা মরসুম ছিল, ইস্কুলে ক্লাস প্রমোশনের পর। ছেলেরা নতুন বই কিনে বইয়ে নন্দ-মাস্টারকে দিয়ে নাম লিখিয়ে নিত। ছাপা হরফের মত হরফে লেখা, আবার বাঁকা-চোরা সাজানো-গোছানো লেখা, এ ছাড়াও মনো-গ্রাম আছে, তাও বানাতে পারতেন নন্দ-মাস্টার। যতদূর মনে পড়ছে, ছাপার মত লেখার জন্য বইপিছু এক আনা হিসেবে মজুরী নিতেন। আর সাজানো-গোছানো, বাঁকাচোরা হরফের বা টানা লেখার মত লেখা লিখতে হলে কিছু বেশী নিতেন; মনোগ্রামে লাগত সবথেকে বেশী। মনে হচ্ছে একটা মাত্র মনোগ্রাম হলে এক টাকা লাগত, দুটো হলে দেড় টাকায় হত, তিনটে হলে হয়ত এক টাকা বারো আনা কি দু টাকা লাগত, চারটেতেও দু টাকার উপরে লাগত বড় জোর চার আনা মাত্র। আবার কমও নিয়েছেন। মনোগ্রাম কদাচিৎ কেউ করাত। তাও একটা করিয়েই খুশী থাকত। এবং নিজেরাই মনোগ্রামটা দেখে অক্ষর অনুকরণ করতে চেষ্টা করত। এ ছাড়া শুনেছি, পরীক্ষায় পাশ করিয়েও দিতেন নন্দমাস্টার। কেউ-কেউ বলে—দশ-বিশ নম্বরের কোয়েশ্চেন বলেও তিনি দিতেন। আমাকে যখন প্রাইভেট পড়াতেন তখন কিন্তু কোয়েশ্চেন বলে দেন নি, কিন্তু যেগুলো ভাল করে পড়িয়েছিলেন সেই-গুলোই এসেছিল কোশ্চেনের মধ্যে।

এর ফল ফলল। আমরা তখন ক্লাস টেন বা ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছি, তখনই ইস্কুলের ব্যবস্থাপনায়, চেহারায়, ধারা-ধরনে, একে-বারে ওলোট-পালোট হয়ে গেল। ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং ইস্কুলের ফাউণ্ডার বাড়ীর ছেলে দুজন বড় হয়ে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বর হলেন। এবং তাঁরাই তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষকদের অনুপযুক্ততা বিচার করলেন। তাঁদের ছাড়ালেন। নতুন শিক্ষক আনলেন। নতুন আইন-কানুন হল। সে বিচার তাঁদের অন্যায় হয়েছিল এ কথা কেউই বলবে না, আমিও বলছি না, তবে দুঃখবোধ না করেও পারি নে, কারণ যে শিক্ষকেরা অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন, তাঁরা শেষজীবনটায় বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। নন্দমাস্টারকেও বিদায় নিতে হয়েছিল সেবার, তবে তাঁর তখন শেষজীবন ছিল না, তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। আমার বয়স তখন ১৫।১৬; সুতরাং নন্দমাস্টারের বয়স চব্বিশের বেশী ছিল না। নন্দমাস্টারের অযোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছিল ওই পরীক্ষায় পাশ করানো এবং প্রশ্ন বলে দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপারটা মার্জনার নয়। এবং নন্দমাস্টার তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জোয়ান, এই বলে তাঁর জন্য দুঃখ কমই হয়েছিল লোকের। জোয়ান ছেলে একটা চাকরী গেল, আর একটা করে নেবে। ছাত্রেরাও মাস্টার হিসেবে নন্দ-মাস্টারের অভাব খুব অনুভব করে নি, কিন্তু তারা দুঃখ অনুভব করেছিল স্কুলের গেমস টীচারের এবং স্কুল টীমের অজেয় ফুলব্যাকের জন্য।

নন্দমাস্টার বিশালকায়; তেমনি দৈহিক শক্তিশালী নন্দমাস্টার। নন্দমাস্টার বালিয়া জেলার, আরা জেলার মুচকুন্দ সিং ও ভূপ সিংদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সহজে

যায় না, রাত্রের অন্ধকারে দুর্যোগের মধ্যে একলা কোন তিলেক পথ হাঁটতে ভয় পায় না, পিছোয় না নন্দমাস্টার। কিন্তু সেই নন্দমাস্টার, সেই অঙ্ক ইংরিজী ভাল জানা নন্দমাস্টার, সেই ছাপার হরফের মত হরফ লিখিয়ে নন্দমাস্টার, সেই মনোগ্রাম আঁকতে পারা নন্দমাস্টার এবং যে নন্দমাস্টার কণ্টকে ভয় করে না, যে কাজ করতে পিছোয় না, সেই নন্দমাস্টার ঘর থেকে বের হয়ে মুক্ত পৃথিবীতে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারল না। গ্রামের সীমানার প্রান্তে এসে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। থর-থর করে সেই ভীমের গদার মত শক্ত পা দুখানি কাঁপতে লাগল।

পৃথিবী কি বিশাল! মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা কি তীব্র!! উঃ কি উদ্দাম কর্মউদ্বেলতা! উঃ! ওর মধ্যে পড়লে যে তিনি হারিয়ে যাবেন, পিষে যাবেন; ডুবে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবেন, তলিয়ে যাবেন কোন অতলে।

না, তিনি, যাবেন না; যেতে পারবেন না। ওখানে এত দূরে, একলা, সহায়হীন-সম্পদহীন—তিনি এক গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান—তিনি যেতে পারবেন না। তিনি সেই গ্রামপ্রান্ত থেকেই ফিরে এসে তাঁর ভারী পদক্ষেপকে যথাসাধ্য সংযত এবং শঙ্কুচিত করে যথাসম্ভব কম শব্দ করে মাথাটি নামিয়ে, গেলেন ওই স্কুলের ফাউণ্ডারদেরই বাড়ী! গিয়ে, তাঁদের কাছারীতে তক্তাপোষের এক ধারে বসলেন। চুপ করে বসেই আছেন। কোন কথা বলতে পারেন না। ও'দের বড়-বাবুরই এক সময় দৃষ্টি পড়ল নন্দ-মাস্টারের উপর।

—নন্দ?

অত্যন্ত খুসী হয়ে নন্দমাস্টার এক মুখ হেসে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বল!

—আজ্ঞে। চুপ করে গেলেন নন্দ-মাস্টার।

—বল।

—মানে, ইস্কুলের চাকরীটা গেল আমার—

—ওর উপর তো আমার কোন হাত নেই। ম্যানেজিং কমিটি যা করেছে তাই হয়েছে। ওরা সব অনেক কথা বলছিল; যা বলেছে তা তো শুনেছ!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে!

—তবে, মানে; মানে আর কখনও এমন, মানে! মানে—চাকরী গেলে আমার চলবে কি করে? খাব কি বলুন?

—আমাদের আপিসে চাকরী করবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব। বর্তে গেলেন নন্দমাস্টার।

—তাই বরং কর।

সেই ও'দের আপিসে চাকরী হল নন্দ-মাস্টারের। পদের নাম করসপণ্ডেন্স ক্লার্ক। খস-খস করে চিঠি লেখেন নন্দমাস্টার; গাঁথা মালার সারির মত পংক্তিতে মুক্তোর দানার মত হরফে চিঠি লেখেন; টাইপ-রাইটিং—তাও শিখে নেন। খট-খট করে টাইপ করেন। এরই মধ্যে ছোটবাবু ডাকেন—নন্দ। কখনও স্নেহ করে ডাকেন, বিলিতী মাস্টার!

—আজ্ঞে যাই।

—দেখ, এই নাটকটা কপি কর তো!

ছোটবাবু নাট্যকার ছিলেন ছোটগল্প লিখতেন। 'রাতকানা' তাঁর বিখ্যাত প্রহসন। 'বীররাজা', 'নবাবী-আমল' তাঁর নাটক; মিনার্ভা, মনমোহনে এসব নাটক অভিনীত হয়েছে। তাঁর সেই লেখাও কপি করতেন নন্দমাস্টার। ছোটবাবুর নামে কত কাগজ আসত; শুধু দেশী কাগজ নয়, বিলেত থেকেও কাগজ আসত। নন্দমাস্টার, বিজ্ঞাপনগুলি পড়ে যেতেন, যত্নে পড়ে যেতেন। তাঁর চোখ সযত্নে খুঁজে বেড়াতো কোথায় সেই শব্দটি আছে—বিনামূল্যে অথবা ফ্রি।

বিনামূল্যে—বিনামূল্যে—বিনামূল্যে
অভূতপূর্ব সুযোগ।

১০,০০০ টাকার ঘড়ি বিনামূল্যে। আমাদের বিখ্যাত ৫২নং বিখ্যাত চুলের কলপ, ডিলুকস—মা-কালী অয়েল, সাদা চুল কালো করে। পাতলা চুল ঘন করে, টাক মাথায় চুল গজায়, সোজা চুল কুঁকড়ে যায়—এক শিশি এক টাকা বারো আনা, তিন শিশি একত্রে, (তিন শিশিতেই এক কোর্স) পাঁচ টাকা। প্রত্যেক তিন শিশির খরিদ্দারকে উৎসাহিত করিবার জন্য বিনামূল্যে একটি হাতঘড়ি ও লণ্ডন গোল্ডের একটি লাল পাথর বসান আংটি উপহার দিয়া থাকি। অবহিত হউন, অবহিত হউন, এই ঠিকানায় অদ্যই পত্র লিখুন।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে নন্দমাস্টার ঠিকানাটার উপর কালী দিয়ে মোটা লাইন টেনে দেন।

ইংরিজীতে চোখে পড়ে free free free distribution লণ্ডনের বিজ্ঞাপন! বিলিতীমাস্টার টুকে নেন।

তারপর তিনি খুঁজে বেড়ান তিন শিশি তেলের খরিদ্দার, পাকা চুলে ঢাকা মাথা, টাক ভর্তি মাথা খোঁজেন।

—এক কাজ কর না। একটা তেল মাখবে?

—তেল?

—হ্যাঁ, মাথার চুলের জন্য বলছি। টাকে চুল গজাবে, পাকা চুল কালো হবে। চুল কোঁকড়া হবে। বুঝেছ?

—ধেৎ ওসব ধাপ্পা—

—ঈশ্বরের দিব্যি, না। (তখন ১৯৩০-শের ওপারের আমল, দিব্যিকে লোকে হেসে উড়িয়ে দিত না।) একেবারে খাঁটি সাত্যি। বড়-বড় লোকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। দেখ না মেখে। তিন শিশি পাঁচ টাকা। ভিপিতে ছ টাকা। না-হয় এক শিশি মেখে দেখ।

তিনজন জোগাড় হয়ে যেত। টাকে চুলের জন্য, পাকা চুল কাঁচা করতে, সোজা চুল কোঁকড়া করতে দু টাকা খরচ করবার লোক, সেকালে কম হলেও, তিন মিলত। ভি-পি আসত। তারা পেতো ভূঁষো গোলা তেল, বিলিতীমাস্টার পেতেন টিনের খেলার ঘড়ি, যা সেকালে চার পয়সা দিয়ে কিনে হাতে পরত।

জীবনের শেষবয়স পর্যন্ত বিলিতী-মাস্টারের এ মোহ যায় নি। টিনের ঘড়ির মত অনেক জিনিস বিনামূল্যে তিনি পেয়েছেন। কিন্তু নিজের যে শক্তি, যে কৃতিত্ব তাঁর ছিল তার মূল্যও তিনি পান নি, বিনা-মূল্যে না হোক, নামমাত্র মূল্যে, তিনি তা অন্যের সেবায় দিয়ে গেছেন আজীবন।

শুধু খেয়ে গেছেন। খেয়ে গেছেন ভীমের মত, রোগ, পেটের অসুখ, তাঁর চুলের মুঠোয় ধরে বকরাক্ষসের মত কিল মেরেছে, তবু নন্দমাস্টার আহার ছাড়েন নি। খেয়ে গেছেন। আনো হে আনো, আরও রসগোল্লা আনো। এ কটাতে কি হবে, আনো। দাও। দাও।

খেয়ে পূর্ণ উদর নিয়ে নন্দমাস্টার ক্লান্ত পদক্ষেপে সে প্রায় কোন রকম করে বাড়ী এসে শুয়ে পড়েছেন।

—আঃ—! অ-বউ, সেই বিলিতী স্যাম্পল ওষুধটা এক দাগ আনো তো। শুনছ?

আঃ আঃ। ওঃ এই খেয়ে যে কি কষ্ট! হে ভগবান!

এই বিলিতীমাস্টার।
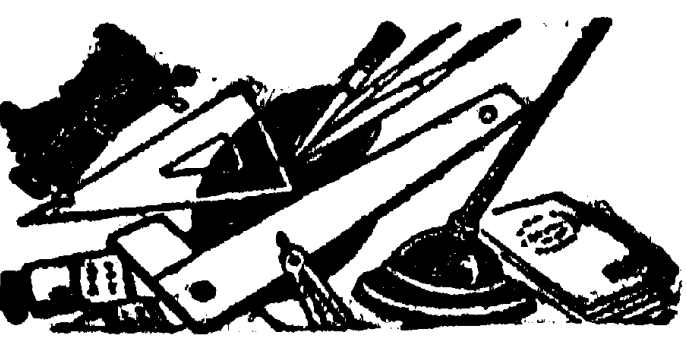
শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য

একটি নৃত্যশীল তরঙ্গ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৬-১৯২৩

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের সংবাদপত্রজগতে একটি জীবন্ত "লিজেন্ড" ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সেকালের শিক্ষিত বাঙালী মাত্রে জানতেন, তিনি যে একজন শক্তিমান সংবাদপত্র সম্পাদক একথা কাউকে বলে দিতে হত না। সংবাদপত্র 'দৈনিক নায়ক' এই কালের মাপকাঠিতে অতি ক্ষুদ্র সংবাদপত্র ছিল, তার প্রচার সংখ্যা বিপুল ছিল না। কিন্তু পাঁচকড়িবাবু কি লিখেছেন, সেকথা জানার আগ্রহ সকলের ছিল। হকার নাকি হাঁকত—"নায়কবাবু—নায়ক, পাঁচুবাবু খুব শাসিয়েছেন"—পাঁচকড়ির এই খ্যাতিটাই সব কিছু ছাপিয়ে আছে তিনি গালাগালি দিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে গালাগালির পিছনে যদি যথেষ্ট যুক্তি না থাকে তাহলে সেই গালাগাল পাগলের প্রলাপে পরিণত হয়। পাঁচকড়ির উক্তি পাগলের প্রলাপ ছিল না। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থে গভীর জ্ঞান, দুর্জয় সাহস, এবং লিপিকুশলতাই তাঁর খ্যাতির সর্বপ্রধান কারণ।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমগোত্রীয় এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁর সেই নিজস্ব ধারা লুপ্ত হয়েছে। তিনি দরিদ্র ছিলেন। নিজের সুবিধা করার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর বৃদ্ধ পিতা জীবিত ছিলেন, এবং তাঁর পুত্র মণীন্দ্রনাথের বয়স অল্প ছিল। পাঁচকড়ির মৃত্যু যে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজকে আকুল করেছিল তা বোধকরি অনেকের স্মরণে আছে।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক মনীষীকে দেখেছেন। দেশবন্ধু, স্যার আশুতোষ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়েছে এবং যে আলোচনা হয়েছে তা যুক্তির দিক থেকে উপেক্ষণীয় নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও লেখনী চালনা করেছেন। শরৎচন্দ্র একদা ভাগলপুরে পাঁচকড়ির ছাত্র ছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রায়ই গল্প করতেন, পাঁচকড়ির সঙ্গে একদিন তাঁর পথে দেখা হয়। প্রাক্তন শিক্ষককে প্রণাম করার পর ছাত্র শরৎচন্দ্রকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—'দেখো শরৎ, তুমি ত' লিখছ, তোমার খ্যাতিও হয়েছে। তবে একটা কথা বলে দিই, যা তুমি নিজের চোখে দেখোনি তা কখনো লিখো না, যা দেখেছ তাই লিখে যাও।" শরৎচন্দ্র বলতেন এই উপদেশটুকু আমি মেনে আসছি।

আমরা বাল্যকালে পাঁচকড়িকে দেখেছি, আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতার একাল ও সেকাল ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখক) মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে তাঁর শুভাগমন ঘটেছে। তিনি সদালাপী পুরুষ ছিলেন এইটুকু মনে আছে। তাঁর আবৃত্তিতে গাম্ভীর্য ছিল কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে 'নায়কে'র অফিস ছিল, সমস্ত সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসিন্দারা তাঁকে চিনতেন। একদিন সন্ধ্যার দিকে পাঁচকড়িবাবু 'নায়ক' অফিসে চলেছেন এমন সময় এক গাড়ি বাঁশ সরু পথটি আটক করে রাখে। পাড়ার লোক তাঁকে সামনে পেয়ে অনুযোগ করেন। পরদিন পাঁচকড়ি প্রবন্ধে লিখলেন "রাজমার্গে বংশচালনা করিতে অগ্র-পশ্চাৎ লোক থাকা প্রয়োজন।"

এই নায়ক অফিস থেকেই পরে 'অবতার' প্রকাশিত হয়। পাঁচকড়ির কিছু কিছু রচনা 'অবতারে'ও প্রকাশিত হয়েছে।

'নায়ক' পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র ছিল, বিজ্ঞাপন থাকত অতি অল্প, প্রায় প্রতিদিনই কাঠের খোদাইকরা ব্লকের কার্টুন থাকত। স্যর আশুতোষকে গোঁফসহ স্ত্রীলোকের বেশে গুঁফো সরস্বতী বানানো ছবি আমরাও দেখেছি। নায়ক পত্রিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথম পৃষ্ঠায় চটকদার ব্যানার হেড লাইন ছড়ায় লিখিত হত, হকাররা সেই ছড়া চীৎকার করে আওড়াত। এমনই একটি ব্যানারের পদ আজো সামান্য স্মরণে আছে—

"মুরারেস্তৃতীয় পন্থা

এশিয়ার ভাগ্যে ছিন্ন কন্থা—" ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ লীগ অব নেশনসের কোনো সিদ্ধান্তের ওপর এই হেড লাইন তৈরী করা হয়েছিল।

'নায়কের' স্বত্বাধিকারীরা বাংলার এক বিশিষ্ট জমীদার বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁরা পাঁচকড়িবাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এই কথা আমরা জানি।

১৫ই নভেম্বর ১৯২৩-এ মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, সাংবাদিক পাঁচকড়ির বিশিষ্ট ভূমিকার তা পরিচায়ক,—১৭ই নভেম্বর ১৯২৩ তারিখে লিখেছিলেন যে, "পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগী ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে পাঁচকড়ির শক্তিশালী লেখনীর অবদান উপেক্ষণীয় নয়।"

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে এসে 'বঙ্গবাসী'তে যোগদান করেন। তিন বছর কাজ করার পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হয়েছিলেন। এরপর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে যোগদান করেন। বসুমতী ছাড়ার পর তিনি 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক হন, তারপর ১৯০৮-এ 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী' কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং সেইকালে বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরের বাঙালীর কাছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল। এইকালে তিনি 'বাঙ্গালী' নামক পত্রিকায় সম্পাদনা করেছেন। 'স্বরাজ' নামক পত্রিকা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হয়, পত্রিকাটি স্বরাজ আন্দোলনের বিরোধী ছিল। শোনা যায়, দেশবন্ধুর ভ্রাতা এস আর দাশ মহাশয় এই পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। পাঁচকড়ি এই পত্রিকারও নিয়মিত লেখক ছিলেন। যে-কালে ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় গরম গরম লেখা প্রকাশিত হত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, 'চাটিম চাটিম' সম্পাদকীয় সেই সময় পাঁচকড়ি 'সন্ধ্যা'য় সম্পাদকীয় লিখতেন।

কিন্তু পাঁচকড়ির খ্যাতি 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে 'নায়ক' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদি তিনি লিখেছেন 'প্রবাহিনী', 'সাহিত্য' 'নারায়ণ' ও 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। এইগুলির মধ্যে

'প্রবাহিনী' ও 'সাহিত্যে'র সঙ্গে তিনি সম্পাদনাসূত্রেও যুক্ত ছিলেন।

পাঁচকড়ির মৃত্যুর পর তাঁর দেশবাসী জানতে পারেন যে, তিনি হিন্দী দৈনিক 'ভারত মিত্রে'রও সম্পাদক ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে হিন্দী দৈনিক পত্র সম্পাদনা করার কৃতিত্ব বোধ করি আর কোনো বাঙালী সাংবাদিকের নেই।

পাঁচকড়ি আর একখানি হিন্দী পত্রিকা 'কলিকাতা সমাচারে'র সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। একই কালে তিনি কলিকাতা সমাচার (হিন্দী), দৈনিক চন্দ্রিকা, সাপ্তাহিক প্রবাহিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেই কালেই সাহিত্য, নারায়ণ ও বিজয়া নামক তিনখানি মাসিক পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "পাঁচুভায়া ষটপদ... ষটপদ বলিয়া নতুন মাসিক ফুটিয়া উঠিলেই, পাঁচু যাইয়া নতুন ফুলে একবার বসেন। প্রমাণ—সঙ্কল্প।"

সেই সময় 'সঙ্কল্প' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ পাঁচকড়ির সাংবাদিক হিসাবে জনপ্রিয়তা ছিল অসীম, সেই কারণে যে-কোনো সাময়িক পত্রিকা তাঁর স্পর্শ ভিন্ন প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। যে অল্পকাল এই ধরাধামে তিনি ছিলেন, তার মধ্যে এত কাজ করা এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা বড় সহজ কথা নয়। সমকালীন সমাজ ও পরিবেশের কথাও এই সূত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

পাঁচকড়িকে আধুনিক মাপকাঠিতে পূর্ণাঙ্গ জার্নালিস্ট বলা যায়, কারণ, সব-রকম লেখাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। যে-রম্যরচনার ইদানীং এত সমাদর, পাঁচকড়ি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অসংখ্য রম্যরচনা লিখে গেছেন। সেই কালের অজস্র সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর অজস্র রচনা ছড়ানো আছে। ছোটদের জন্য 'ধ্রুব' নামে একটি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হত, পাঁচকড়ি 'ধ্রুব' পত্রিকায় শিশুদের উপযোগী করে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, সহজভাবে পৌরাণিক কথাও বলেছেন। তিনি আদর্শে রক্ষণশীল ছিলেন, তাই 'বেদব্যাস', 'ধর্ম', 'প্রচারক' প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন।

পাঁচকড়ি ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর অধিকার ছিল। ভারতবর্ষের কয়েকটি মুখ্য ভাষা বিষয়ে এই জাতীয় জ্ঞান থাকায় তাঁর পক্ষে সংবাদপত্র সেবা সহজ হয়ে উঠেছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত গালাগালির লেখক বলে অনেকের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে, কিন্তু পাঁচকড়ির গালাগাল এমনই চটকদার, তাঁর শ্লেষ এমনই মর্মভেদী এবং ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ছিল চর্মভেদী যে, তাঁর বক্তব্য পাঠ করার জন্য সেকালের সমাজে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। পাঁচকড়ির চরিত্রের প্রধান গুণ এই যে, তিনি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না, ব্যক্তি-জীবনে পাঁচকড়ি বিভিন্ন মানুষ, তাই যাঁরা তাঁর গালি খেতেন, তাঁরাও তাঁর প্রতি কোনো বিরূপ ভাব মনে মনেও পোষণ করতে পারতেন না। আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে-সব মনীষীদের তিনি আক্রমণ করতেন, সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আগেভাগেই সেই কথা জানিয়ে আসতেন। পাঁচকড়ির সৎসাহস ছিল তিনি যা কিছু করেছেন তা যে নেহাৎ পেটের দায়ে একথা বলতে তাঁর বাধতো না। তিনি স্বয়ং আত্মকথনমূলক 'বিকায় যে' নামক প্রবন্ধটিতে অনেক সত্য কথা বলেছেন, আদর্শ সাংবাদিকের সত্যনিষ্ঠাই সর্বপ্রধান গুণ, পাঁচকড়ির 'বিকায় যে' ১৩২১ সনে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে প্রবাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁকে কেউ উত্তেজিত করে থাকবেন তাই পাঁচকড়ি জবাবে, লিখেছেন—

"আমরা ত কলিকাতার সকল বড় সমাচারপত্রের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এঁটো পাত চাটিয়া বেড়াইয়াছি। আমরা জানি আজকাল খবরের কাগজ ব্যবসা হিসাবেই লোকে চালাইয়া থাকে। অধিকারী মহাশয়গণ মনে করেন আমরা ত দশছাড়া নহি, আমার উপকারে দেশের উপকার হইবেই।"

অধিকারী মহাশয়দের স্বরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত করে পাঁচকড়ি নিজের সাংবাদিকবৃত্তি গ্রহণের পটভূমিকায় বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত "পেটের দায়", অথচ "পেটের দায়ে আমি একাজে আসি নাই", তিনি বলেছেন—

"স্কুল মাষ্টারি ছাড়িয়া যখন কলিকাতায় প্রথম খবরের কাগজের চাকরী করিতে আসি, তখন সত্যই মনে করিয়াছিলাম যে দেশের ও দশের কাজ করিতেছি। কিন্তু আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিদ্যারত্ন। তিনি তাঁর 'দৈনিক' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ধীরে ধীরে কলিকাতার ব্যাপার যত দেখিতে লাগিলাম, ততই হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম যে এসব দেশের কাজ নহে, পেটের কাজ, পেটের দায়ে খবরের কাগজ চালান হইতেছে। সেই অবধি ধুয়া ধরিয়াছি—পেটের দায়। যদিচ প্রকৃতপক্ষে গোড়ায় পেটের দায়ে আমি এ কাজে আসি নাই।"

ইঁহারা—খবরের কাগজের ব্যবসাদারগণ—উচ্চাঙ্গের ব্যবসাদার নহেন। সবাই বামুনে ব্যবসাদার, গরু পুষিব, সে গরু খাইবে কম, দুধ দিবে অত্যধিক, না দিবেও ভালো—ইহাই হইল অধিকারীদের রীতি। উঁহারা বেতন দিয়া সম্পাদক রাখিবেন বটে কিন্তু বেতন দিবেন কম; তাহাদের উৎসাহ দিবেন না। কাজেই যেমন দক্ষিণা তেমনই পূজা!"

পাঁচকড়ির এই ঘোষণা অতিশয় সাহসিক, এইভাবেই তিনি সংবাদপত্র সেবা করেছেন, কাউকেই তিনি তোয়াজ করেন নি, তবে নিজের মুখে "পেটের দায়" কথাটি স্বীকার করায় হয়ত রাতা বিবেচিত হয়েছেন। সকলে মুখ ফুটে বলতে পারেন না, পাঁচকড়ি বলেছেন। পাঁচকড়ির এই 'এনালিসিস' বিশেষভাবে চিন্তা করার যোগ্য।

কিন্তু সার্কাসের ক্লাউনের যে মনস্তত্ত্ব সেই মনস্তত্ত্ব সব রসিকতার পিছনে, গভীর রঙ্গরসের পিছনে থাকে মর্মস্পর্শী করুণ রস, সেই হাসি যে কত ব্যথার হাসি তা তা কি সকলে বোঝে! পাঁচকড়ি এই প্রবন্ধের শেষাংশে গভীর ক্ষোভে লিখেছেন—

"বিকায় যে—" কথাটা রঙ্গের নহে, তীব্র বেদনার, বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার। ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাগজে-কলমে এক করিতে হয়। আজ এই কুড়ি বৎসর কাল কলিকাতার খবরের কাগজে ভাঁড়ামী করিলাম; ভাঁড়ামী বিকায় বলিয়া সকলে আমাকে রাখে; আমাকে দেখিয়া, আমার আমিত্বের পরিচয় লইয়া কেহ আমার প্রতিপালন করিল না।

বিকায় যে—! তাই আমার আদর। কাজেই বলিতে হয় আমার ক্ষুধার অন্ন আমাকে নিজে অর্জন করিয়া লইতে হইতেছে।

তোমাদের কাছে বিকায় যে। তাই পাঁটার ঘুঘ্‌নি, হাঁসের ডিমের ডালনা। সাড়ে বত্রিশ ভাজা বেচিয়া উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকি। দেশ কই? দেশের ভাবনা ভাবেই বা কে? দেশ ও দশকে চিনেই বা কে? দেশ ত' আমি, আমি উদ্ধার করিলে দেশ উদ্ধার হইবে, আমাকে পোষণ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

দেশের দোহাই দিয়া কতজনে কোঠা বালাখানা গাড়ল, দশ-পাঁচ লাখ জমাইল, কাঠকুড়ানির বেটা চন্দনবিলাসী হইয়া দাঁড়াইল। তাই ক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে হয়।—এ তো দেশসেবা নহে, সাফ পেটের দায়।

শ্লেষের অন্তরালে যেমন পাথর চাপা কাতর ক্রন্দন লুকান আছে, ব্যঙ্গের পার্শ্বে দীর্ঘশ্বাস ফুটিতেছে,—হে রসহীন, বোধহীন রোগাতুর, তাহা তুমি বুঝিবে কি?

কাঁদিলে কেহ শুনে না, বুঝে না, তাই হাসিতে হয়। হায় বিধি।

হাসিও যে কত ব্যথার হাসি, তাহাও ইহারা বুঝিল না!"

পাঁচকড়ি যখন 'প্রবাহিনী' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন তখন তিনি খুশী হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বিকাশের একটা মাধ্যম এতদিনে পেলেন। পাঁচকড়ির অনেক মূল্যবান রচনা প্রবাহিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে। সাপ্তাহিক জগতে 'প্রবাহিনী' ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম্, তার আকার ছিল বিরাট, আগাগোড়া ইমিটেশন আর্ট পেপারে ছাপা, অজস্র ছবি। ভালো রচনার সমাবেশ। তিনি ১৩২০ সনের ১৭ই মাঘ সংখ্যায় লিখেছিলেন—

"প্রবাহিনীকে বিশ্বজ্জনসমাজের চিত্তবিনোদিনী করিবার আমাদের অভিলাষ। ধর্মকথা, সমাজকথা, কাব্যশাস্ত্রের কথা—চিত্তবিনোদনের জন্য যেসব কথা সভ্য সমাজে চিরকালই নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকল কথা কহিবার জন্যই আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি।" কিন্তু পাঁচকড়ির অভিলাষ

পূর্ণ হয়নি, কয়েক সপ্তাহের পরেই পাঁচকড়িকে সখেদে বলতে হয়েছে যে 'গালাগালি না দিলে কাগজ বিকায় না।'

প্রবাহিনী পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হওয়ায় তিনি একবার পত্রিকার সংস্পর্শ ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি অভিমানশূন্য, তাই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়। তখন তিনি বলেছিলেন "আবার আসিলাম, আমার মান নাই, অপমান নাই, রাগ নাই, রোষ নাই, স্মৃতি নাই, বিস্মৃতি নাই—।"

পাঁচকড়ি এইদিক থেকেও খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সহজেই তাই ক্ষমা করতে পারতেন, কারো ওপর অভিমান বা ক্রোধ জমিয়ে রাখতে পারেন নি। পাঁচকড়ির জীবনাদর্শ গঠিত হয়েছিল ইন্দ্রনাথের আদর্শে। পাঁচকড়ির মৃত্যুর পর আশুতোষের 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রে পঞ্চানন তর্করত্ন পাঁচকড়ি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :—

"ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধবে যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ছিল—পাঁচকড়ি তাঁহাদের সাহচর্যে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।"

পঞ্চানন তর্করত্ন এই বারজনের রচনা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় পাঁচকড়ির মধ্যে পেয়েছিলেন।

'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন। পাঁচকড়ি আশুতোষের আমন্ত্রণে এই মাসিক পত্রে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এবং তাদের অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক, বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক রচনাও 'বঙ্গবাণীতে' প্রকাশিত হয়।

গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ পাঁচকড়িকে দেখেছেন এবং তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাই উত্তরকালে তিনি সজনীকান্ত দাসের সহযোগীতায় প্রবন্ধ সংগ্রহ করে তা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত করেন। সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় জীবনীও ব্রজেন্দ্রনাথের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।

সজনীকান্ত পাঁচকড়ির রচনার গুণ-গ্রাহী ছিলেন। পাঁচকড়ির 'রসালতত্ত্ব' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি—'শনিবারের চিঠিতে প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে শুধু যে সামাজিক আচার এবং সরলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, কৃষি ব্যাপারেও যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচকড়ির বঙ্কিম-প্রীতির কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন। বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এবং হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এই সব কথা পাঁচকড়ি লিখে গেছেন। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে পাঁচকড়ি যে কত সুদক্ষ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' নামক প্রবন্ধটিতে। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও

ঢাকুরিয়া লেক ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

সীতারাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সর্বশেষে বলেছেন—

"কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। Art হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও, উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ। সে উপদেশ-কথা সেই বুঝিবে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। শুশ্রূষু না হইলে তত্ত্বকথা বুঝানো যায় না। এই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালীর সম্মুখে বহুকাল পড়িয়া আছে, উহাদের পর্যাপ্তভাবে অভিনয় হইয়াছে লোকে উহা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ঠিকমত হয় নাই। দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি বলিতে বাধ্য যে, উহাদের বিশ্লেষণের সময় ও শুভ অবসর এখনও দেখা দেয় নাই। যেভাবে 'বন্দেমাতরম' মহাগীতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেইভাবে এই তিনখানা উপন্যাসের তত্ত্বকথাও ফুটিয়া উঠিবে। সেটা বিধাতার কৃপা সাপেক্ষ, তাই আমি উহাদের নাম দিয়াছি ত্রয়ী। ত্রয়ী ইষ্টের করুণা ছাড়া বুঝা যায় না। এই তিনখানিও বুঝিবার দিন কাল আছে, যোগ্য মানুষ আছে।"

পাঁচকড়ি ধর্মতত্ত্ব কি সহজে ব্যাখ্যা করতে পারতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। মাতৃপূজা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

'মাতৃপূজা আত্মার খেলা। দেহী আত্মা বংশানুক্রমের প্রভাবে কোনভাবে সম্মূঢ়া হইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে ও জানিতে হইলে, যাঁহাদের কৃপায় আমি দেহী হইয়াছি, তাঁহাদেরই করুণ প্রার্থনা করিতে হয়। সে করুণা লাভ করিলে, কুণ্ডলিনীকে অকালে জাগাইতেও কোনো বাধা থাকে না। তাই মহালয়ার পরেই দেবীপক্ষ—পররাত্রের উৎসব আরম্ভ হয়।

মাকে জাগাই ভাব দিয়া। মা আমার হিমালয়-কন্যা। এ হিমালয় নেপালের উত্তরের হিমালয় পর্বত নহে, আমার দেহস্থ বাম কোণব্যাপী যে হিমালয় পর্বত আছে, তদ্দেশজাত মনোময়ী কন্যা। দেহের বাম কোণে হৃৎপিণ্ড, তাহারই মধ্যে পর্বে পর্বে বিস্তৃত হিমালয়-ভাব-গিরি আছে। দেহস্থ দক্ষিণ কোণের কৈলাস পর্বত হইতে নামাইয়া হৃদয়ে—হিমালয় আনিয়া বসাইতে হইবে, ইহাই হইল দুর্গোৎসবের অকাল বোধন। দক্ষিণায়নে—স্বাপকালে মা কৈলাসে শিব-সংযুক্তা হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে কৈলাস হইতে মাকে হৃদয় গেহে আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই ভাবময়ীকে আগমনী গান শুনাইতে হয়; মাকে কন্যারূপে আহ্বান করিতে হয়।"

ঠিক এই ভাবের সরল এবং সহজ ভাষায় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আর বিশেষ দেখা যায় না।

পাঁচকড়ি রক্ষণশীল হলেও গোঁড়া ধর্মধ্বজী ছিলেন না, তার সঙ্গে বিবেকানন্দের আলোচনা থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্গামূর্তি সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধেও এই পরিচয় আছে। এতদ্দ্বারা মনে করা যায় যে সমন্বয় সাধনের মত মন তাঁর ছিল।

তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু সমাজপতির সঙ্গে পাঁচকড়ির মতাদর্শের অনেক পার্থক্য ছিল। পাঁচকড়ি নিজস্ব ভঙ্গীতে সাহিত্য সম্পাদনা করেছেন। এই স্বাতন্ত্র্যকে তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বলা যায়।

পাঁচকড়ির উপন্যাস 'উমা', 'সাধের বউ', 'দরিয়া' আজ আর পাওয়া যায় না। একদা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করেন। 'উমা' উপন্যাসটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত উপ-

ন্যাসের কাহিনীগত মিল থাকায় সে সময় কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পাঁচকড়ি আত্মপক্ষ সমর্থনে তার উত্তর দিয়েছিলেন স্মরণে আছে।

বৃহৎ পরিবার পালনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাঁচকড়িকে সাংবাদিকের জীবনে ঘোরতর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনবার বিবাহ করেছিলেন একথা নিজেই উল্লেখ করে পরিহাস করতেন, কিন্তু একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে পাঁচকড়ি ফলের দিকে না তাকিয়ে কাজ করেছেন, পেটের দায়ে কাজ করেছেন একথা স্বীকার করার মত সৎ সাহস তাঁর ছিল। জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত পাঁচকড়ির অকালমৃত্যু তাই তাঁর সমকালীনদের মধ্যে গভীর বেদনার কারণ হয়েছিল। রসরাজ অমৃত-লাল বসু সেদিন লিখেছিলেন—"আমাদের আনন্দ-তটিনী হইতে একটি নৃত্যশীল তরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল।"

পাঁচকড়ির জীবন যেন নৃত্যশীল তরঙ্গ, কিন্তু নৃত্যশীল তরঙ্গ এই কথা বলাই কি যথেষ্ট, পাঁচকড়ির জীবন একটা স্ফুলিঙ্গের মত, মূর্তিমান পাবকের মত শুচিশুভ্র মন নিয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, দারিদ্র্য তাঁকে টেনে নামিয়েছে হাটে-বাজারে। মনে মনে তার জন্য ক্লেশ বোধ করেছেন, কিন্তু নিজের কাজ তিনি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সৈনিকের মত করেছেন।

পাঁচকড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইনস্টি-টিউশন ছিলেন, তাই তিনি স্মরণীয়। তাঁর যে রচনা সংগৃহীত হয়েছে তা যেমন বাঙালীমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য তেমনই যেসব রচনা আজো ছড়ানো আছে তা সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। পাঁচকড়ি বিগত যুগের বাঙালী সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রতীক এই কথা তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণীয়।

কয়েকটি কথা

১৮৬৬ খৃঃ ২০ ডিসেম্বর (৬ পৌষ, ১৭৮৮ শক) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পাটনা কলেজ থেকে ১৮৮৭ খৃঃ সংস্কৃতে অনার্স সহ স্নাতক। সাহিত্যাচার্য উপাধি লাভ করেন কাশীর সংস্কৃত-সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। ভাগলপুরে শিক্ষকতা জীবন আরম্ভ কালে সংবাদপত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেন। বক্তা হিসাবে ছাত্রবস্থা থেকে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ছিলেন সেকালের একজন প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক। পাঁচকড়ি বি-এ পাশ করবার পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। ১৩৫০ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে উল্লেখ আছেঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত এক সময়ে পাঁচুবাবুর খুব মাখামাখি ভাব ছিল। শৈশবকাল হইতেই পাঁচুবাবু,—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের দলে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ভারতবর্ষীয় আর্য ধর্মপ্রচারিণী সভা' এবং 'সুনীতিসঞ্চারিণী সভা'র জন্য পাঁচু-বাবু এক সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন। পাঁচুবাবু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহেই তাঁহার বাংলা লেখায় প্রবৃত্তি জন্মে। এবং তাঁহারই উৎসাহে তিনি 'ধর্মপ্রচারক' (ভূধর চট্টো-পাধ্যায় কর্তৃক ১৮৮৭ সনে প্রথম প্রচারিত) 'বেদব্যাস' প্রভৃতি পত্রে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। কিছুদিন পরে নানা কারণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত তাঁহার মনের অকুলন ঘটে; তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়।

ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পাঁচুবাবু বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট পাঁচুবাবু অনেক শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন।"

১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মানসীতে পাঁচকড়ি লিখেছিলেন :

'বি-এ পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়া-ছিলাম; পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম প্রচার কার্যে লেখক ও বক্তারূপে সহায়তা করিতাম।......১৮৮৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৯১ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্যচর্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে দলের অনুকূলো লাভ করিবার জন্য অনেকে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন।'

সাংবাদিক হিসাবে পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও একাধিক। ১৮৯২ খৃঃ বঙ্গবাসী পত্রিকায় যোগ দিয়ে-ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। তিন বৎসর বাদে ১৮৯৫ খৃঃ তিনি বঙ্গ-বাসীর প্রধান সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে পঞ্চানন তর্করত্ন লেখেন : 'বঙ্গবাসী'র এ সময়ে রক্ষাকর্তা, বাংলা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গ সাহিত্যকেশরী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকেও আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশ বর্ষীয় গৌরবর্ণ যুবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ আপ্যায়ন হইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই, পাঁচকড়িবাবু করিয়া লইলেন এবং আমাকে পৃথকভাবে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবার পথে যাইব কি না? ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আনিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্র লইয়া যোগেন্দ্রবাবুর নিকট যাইব কিন্তু আমার ইহাতে কি উন্নতি হইবে? পাঁচকড়িবাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বাকপটুতা বুদ্ধিমত্তা ও লোক সংগ্রহের সামর্থ্য দেখিয়া ও তাঁহার তাৎকালিক প্রয়োজন বুঝিয়া আমি তাঁহাকে কিছুদিন সংবাদপত্র সেবার পরামর্শ দিয়া-ছিলাম, কিন্তু আইন পরীক্ষা দিয়া উকীল হইবার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্প দিন মধ্যেই 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সংস্রবে পাঁচকড়িবাবু যখন আসিলেন, তখন তাঁহার কর্মপটুতা, লিপি-কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল।

"সেসময় 'বঙ্গবাসী'র সর্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রবাবু তাঁহাকে সর্বগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে ইংরাজি কি বাংলা উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গ সাহিত্য-সিংহ অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার সমক্ষে ও পাঁচকড়ির অসাক্ষাতে পাঁচকড়িবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'—কার্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র টেলিগ্রাফের সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু ছিলেন।"

প্রথম জীবনে 'বঙ্গবাসী'র সাহায্য পাঁচকড়িকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। যোগেন্দ্রচন্দ্রকে স্মরণ করে তিনি রূপ-লহরী'র উৎসর্গপত্রে লেখেন : 'আপনার বঙ্গবাসী'র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাংলা লিখিতে শিখিয়াছি, সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবলে আমি স্বতন্ত্র; কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র ভাব ও ভাষা চিরদিনই আমার হইয়া থাকিবে।'

পাঁচকড়ির সাহিত্য সাধনায় ইন্দ্রনাথের অবদান নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। পাঁচকড়ি এ ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি ইন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "তিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে এবং বুঝাইতে শিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় এবং বলায় যদি কিছু মাধুরী থাকে তবে সে তাঁহার আর বাকী উদ্ভটতা, উৎকটতা—সে সব আমার, এখনও তাঁহারই কথা বেচিয়া খাইতেছি, তাঁহারই সিদ্ধান্ত সকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়া আছি। গুরু, বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক—তিনি আমার সব; অধম, অযোগ্য আমি তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির বিশেষ কিছুই আদায় করিতে পারি নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমার জীবনের অবলম্বন, দারিদ্র্যের তৃপ্তি, নিরাশার সুখ।" এমনভাবে গুরুঋণ স্বীকার করেন কম জনই।

পাঁচকড়ি ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। 'বঙ্গবাসী'র কংগ্রেস বিরোধিতা তিনি স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এই সময় সাপ্তাহিক 'বসুমতী' ছিল কংগ্রেস সমর্থক। ১৮৯৬ খৃঃ ২৫ আগস্ট আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বসুমতীর। পাঁচকড়ি বঙ্গবাসীর সাহচর্য ত্যাগ করে ১৮৯৯ খৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি 'বসুমতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় তাঁকে তাঁর নীচের নিয়োগপত্রটি দিয়েছিলেন :—

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু,—

আমার 'বসুমতী' নামক সাপ্তাহিক বাঙলা সংবাদপত্রের আপনাকে সম্পাদক

নিযুক্ত করিলাম, ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫ সাল হইতে আপনার মাসিক ৪০্ আশী টাকা হিসাবে বেতন নির্ধারিত হইল, প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহেই বেতন লইবেন। সম্পাদকীয় সমস্ত ভারই আপনার উপর নির্ভর রহিল. বসুমতীর আর্থিক ক্ষতি ও স্বার্থের সম্বন্ধ ভিন্ন কোন আপত্তাই আমি করিব না।

ঈশ্বর না করুন যদ্যাপি বসুমতী প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি আপনাকে অন্যান্য কাজ ও পুস্তক রচনা, সংগ্রহ ইত্যাদি দিয়া ঐ বেতনে এক বৎসর নিযুক্ত রাখিব, আপনিও এই এক বৎসর অন্য কোথায় যাইতে পারিবেন না, যদ্যপি এই এক বৎসর মধ্যে আপনি চলিয়া যান অর্থাৎ কার্য পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, এক মাসের বেতন বাদ যাইবে। আমি আপনাকে এই এক বৎসর মধ্যে ত্যাগ করিলে তিন মাসের বেতন ক্ষতি-পূরণস্বরূপ দিব।

বসুমতীর আর্থিক উন্নতির সহিত আপনার বেতন বৃদ্ধি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তিন মাসের পরে আপনি ৯০্ নব্বুই টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন"

কিন্তু পাঁচকড়ির পক্ষে বসুমতীতে দীর্ঘকাল চাকরী করা সম্ভব হয় নি।

মন্মথনাথ ঘোষ 'মানসী ও মর্মবাণী'র ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যায় লিখেছিলেন : 'পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাঁহার মতস্থৈর্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে এক-প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য সকলেরই ভ্রান্তি ঘটিতে পারে এবং মত পরিবর্তন করা কোনও লোকের পক্ষে আশ্চর্য নহে। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন যে, তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।...বাস্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন নাই. সেই জন্য তিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। স্যর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছেন, পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। আমরা আশ্চর্য হইতাম সাহিত্যক-রূপে তাঁহার অপূর্ব ক্ষমতা দেখিয়া: 'বাঙালী'তে একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেই দিনই 'নায়কে' অপর একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া অপূর্ব নিপুণতার সহিত পূর্ব মতের খণ্ডন করিয়াছেন।...

"পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভি-যোগ আনয়ন করা হয়, তাহা এই যে, তিনি সম্পাদকীয় লেখনী সময়ে-সময়ে এরূপ অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে, তাহাতে অনেকে মর্মাহত হইতেন। তাঁহার নামে অনেকবার মানহানির মকদ্দমা হইয়াছে। প্রায়ই তিনি তাঁহার শ্লেষবাণাহত প্রতি-পক্ষের রহস্য-রসাস্বাদন-শক্তি-অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন বাঙলার রসিকতায় যে আধুনিক বাঙালীর মানহানি হইতে পারে, ইহা তিনি আইন সত্ত্বেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল বিবাদ হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হইত। পাঁচকড়ি যথার্থই লিখিয়াছিলেন—"যে আজ আমাকে গালাগালি করে, সে কাল আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। যে আজ আমায় নিন্দায় দুন্দুভি বাজায়, সে কাল প্রশংসায় সানাইয়ে সুর জমাইবার চেষ্টা করে। তোমাদের নিন্দা স্তুতির মূল্য বুঝিয়া আমার কেবল হাসি পায়। আমাকেও চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও না।"

সাংবাদিক হিসাবে পাঁচকড়ির খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। তার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মাসিক আড়াইশত টাকা বেতনে বেঙ্গলি ট্রানস্লেটর টু দি বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ডের পদ লাভ করেন ১৯১৮ খৃঃ ১ অক্টোবর।

১৯০০ খৃঃ মার্চ মাসে ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের 'আইন-ই-আকবরী ও আক-বরের জীবনী' গ্রন্থখানি পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয় বসুমতী কার্যালয় থেকে। এই বৎসরই বসুমতী কার্যালয় থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থখানি পাঁচকড়ির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৯০১ খৃঃ 'উমা' এবং ১৯০২ খৃঃ 'রূপলহরী' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৯ খৃঃ পাঁচকড়ির 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন। ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছিলেন "ইদানীং সিপাহী যুদ্ধঘটিত অনেক পুরাতন কথা, অনেক অজ্ঞাত বিষয়. বিলাতে ও ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল কথা বাঙালী পাঠকগণ জানেন না। আমি তাহাই পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্যে অগ্রসর হইলাম। 'হিতবাদী'র পরিচালকগণের পক্ষ হইতে একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পাঠক-গণকে উপহার দিবার জন্য বহু দিন হইতে উদ্‌যোগ আয়োজন হইতেছিল; আমিও সে পক্ষে একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম। আর সেই চেষ্টার ফলেই এই ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।"

বহু পরিশ্রমে ও কঠোর পড়াশুনার ফল পাঁচকড়ির 'বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়' প্রথম সংখ্যা ১৯১৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে বসুমতী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়ে-ছিল।

১৯১৯ খৃঃ 'সাধের বউ' ও ১৯২০ খৃঃ 'দরিয়া' উপন্যাস দুখানি প্রকাশিত হয়েছিল। দরিয়ার গোড়ার কথায় তিনি লিখেছিলেন "আজ 'দরিয়া' পুস্তকে যাহা লিখিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উহা বাঙলার ও বাঙালীর সর্বজনপরিচিত ভাব ছিল। তাই 'শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাইচরিত' তখন অত বিকাইয়াছিল। এখন শুনিতেছি বাঙালীর পুরুষপরম্পরা-গত ভাব সম্পত্তির কথা আধুনিক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বুঝিতে পারেন না। আমি যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহার যদি ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা হইলে সাধক-তত্ত্বের গোড়ার কথা বুঝাইতে হইবে। সে চেষ্টা না হয় অন্য পুস্তকে করিব।

'দরিয়া'য় পরকীয়া-তত্ত্ব একটু ফুটাই-বার চেষ্টা করিয়াছি। পরকীয়া বলিলে এখন অনেকে যাহা বুঝেন উহা তাহা নহে, উহা পরস্ত্রী গমনের নামান্তর নহে। যাহা পরের ভাব তাহাকে আমার ভাবের সহিত মিলাইয়া পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলে তবে পরকে আপন জন করিতে পারা যায়, তবে বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিকে আমার বলিয়া এক করা চলে। Universal Brotherhood কথার কথা নহে। ভাব-বৈষম্যবশতঃই নর-নারীর মধ্যে, জাতিসকলের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিরোধ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়াবাসী ও ইয়োরোপবাসী—এই যে বিভেদ ও বিচার ও জাতি-পার্থক্য, ইহা ভাবগত বৈষম্যের জন্য ঘটিয়াছে। এ বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা জগতে সর্বাগ্রে বৌদ্ধ প্রচারকগণ করিয়া-ছিলেন। ধর্মের পথে তাঁহারা নর-সমাজের একীকরণ ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরে ইসলাম অন্য রকমে জগৎটাকে মোসলেম বানাইয়া এক করিতে চাহেন। পরকীয়া-তত্ত্ব এই চেষ্টার সাধন-পদ্ধতি। সহজ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ও পথে জগতের বৈচিত্র্য দূর হইবার নহে; ও পথে দেশ, কাল, পাত্রের প্রভাব এড়াইয়া উপরে উঠা যায় না। তাই তাঁহারা পরকীয়া-সাধনার নানা ক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'দরিয়া'য় একটা ক্রম আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুলো ক্রম ভগবান রামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙালী তাহা দেখিয়া ঠিক মত বুঝিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র "নববিধান" ধর্মের প্রবর্তনা করিয়া গোড়ার প্রথম স্তরটা বাঙালীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। সেই তত্ত্বটাকে রোচক ও অর্থবাদে মোড়ক করিয়া 'দরিয়া' পুস্তকে আমি খোলসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা সার্থক হইল কি না বলিতে পারি না।

আধুনিক ইংরেজী-নবীশ সমাজ ছাড়া বাঙলায় এখনও একটা বৃহত্তর ভাবুক সমাজ আছে। তাহাদের কোন সমাচার আমরা রাখি না; কেবল মন্দ টুকুই দেখিতে পাই। যেন সমাজে সহজ-মত, কিশোরী-ভজন, পরকীয়া-সাধন এখনও প্রচলিত আছে। সদগুরুর অভাবে এ সকল মত ও সাধনা অতি মাত্রায় বিগড়াইয়াছে বটে, পরন্তু খোঁজ করিলে এখনও ভাল ভাবুক ও রসিক মানুষ পাওয়া যায়।"

রাইনের মারিয়া রিলকে অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট

সে শুধু, যে পেয়েছে প্রবেশ
পাতালেও বীণা নিয়ে হাতে,
মন্ত্রবলে পারে অনিঃশেষ
বন্দনার ঝংকার জাগাতে।

ধুতুরার স্বাদ যার চেনা—
যা মৃতের নিতান্ত আপন—
সে শুধু কখনো হারাবে না
নম্রতম গানের নিস্বন।

শিখে নাও চিত্রকল্পটিকে ঃ
যদিও পুকুরে প্রতিচ্ছায়া
স'রে যায়, অস্পষ্ট, চঞ্চল।

যার বিচরণ যুগ্মলোকে
শুধু সেই কণ্ঠে যায় পাওয়া
শুদ্ধ সুর, শাশ্বত, কোমল।

*

গুরুদেব, শোনো কি অদ্ভুত
সদ্যতন স্পন্দনের ধ্বনি?
বন্দনায় উন্মুখর দূত
এরও জন্য গায় আগমনী।

সত্য, সব শ্রবণ বিকল
খরতর এই ঝঞ্ঝনায়,
সম্প্রতি আগত যন্ত্রদল
দাবি রাখে তবু বন্দনায়।

দ্যাখো ঃ যন্ত্র যেন উচাটন,
আমাদের ঘটায় বিকৃতি.
ক্লান্ত করে, নষ্ট করে নীতি!

আমাদেরই শক্তির আশ্রয়ে
তবু যেন আক্রোশ হারিয়ে
হয় ক্রমে সেবাপরায়ণ।

এশিয়ার গল্প
(ছয়)
ফিলিপাইন

অর্ধ গোলক

এডিথ এল টিয়েম্পো

কেবু বিমানবন্দরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে কিড লেদারের সুন্দর ব্যাগ; বয়স প্রায় চল্লিশ, রেখাসংকুল ললাট থেকে দীর্ঘ টানা একজোড়া ভ্রূ যেন দুশ্চিন্তার ভারে ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। তাঁর ঘনপক্ষ্ম চোখ যাত্রীদের বিশ্রামাগারের দিকে ধাবিত হচ্ছে বার বার, যেন খুঁজছে কাউকে। দৃষ্টিতে চিন্তাশীলদের ছাপ খুব স্পষ্ট। ম্যানিলার প্লেন ধরবেন বলে অপেক্ষা করছেন। মাঝে মাঝে যে ভঙ্গিতে মাথাটাকে তুলে ধরছিলেন ওপরের দিকে সেটা একটু অদ্ভুত হলেও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। দুই কাঁধের দৃঢ়সন্নিবেশও কারো নজর এড়াবার নয়। কারণ হয়ত তার চেহারার অনমনীয়তার সঙ্গে মুখ-চোখে দুশ্চিন্তার ছাপের বৈসাদৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্য যেন তাঁর পরিচয়পত্র, যেন বলে দিচ্ছে যে এই চিন্তামগ্ন লোকটি জীবনযুদ্ধের জয়ী যোদ্ধা।

হঠাৎ লাউডস্পীকারের ঘোষণা শোনা গেল, 'মিঃ সুয়েনো, আপনার টিকেট নিয়ে যান।'

ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের কেরাণীটির সঙ্গে দু-এক কথা বলে টিকিটটা নিলেন এবং তারপর আবার গেটের কাছে আগের জায়গায় ফিরে এলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই প্লেনেরই যাত্রী একদল আমেরিকান মিশনারীর পেছন থেকে একটি যুবক আর একটি যুবতীকে আসতে দেখা গেল। মিঃ সুয়েনোকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল তারা।

'হঠাৎ আটকে পড়েছিলাম', একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যুবতীটি, মুখে স্মিত হাসি।

যুবতীটি মিঃ সুয়েনোর ভাইঝি আর যুবকটি তার স্বামী। সুসানা আর ফেলিক্স। মিঃ সুয়েনো তাকালেন তাদের দিকে। দৃষ্টিতে যেন নিরাশা আর অব্যবস্থচিত্ততা। নিজের প্রতিও কেমন একটা বিরক্তি। রীতিমত চেষ্টা করে সেই বিরক্তিকে দমন করলেন মিঃ সুয়েনো। মনে হল, উপদেশ দেওয়ার মত সহজ কাজ বোধহয় আর কিছু নেই দুনিয়ায়। সেই কর্তব্য থেকে পালাতে চাইছেন তিনি, অথচ যে কোন লোকই সানন্দে করত একাজ। মিঃ সুয়েনোর মনটা খুশি হল কথাটা ভেবে: সুসানা আর ফেলিক্সের দিকে দরদভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তিনি। সুসানা আর ফেলিক্সও তাকাল তাঁর দিকে। একটু সংকোচ নেই তাদের ব্যবহার বা চাল-চলনে। খুব খুশি-খুশি ভাব। মিঃ সুয়েনোর মনে ভাবনার যে গূঢ় স্রোত বয়ে চলেছে সে সম্বন্ধেও সচেতন নয় একেবারে।

কয়েক মিনিট পরেই চলে যেতে হবে তাঁকে। মিঃ সুয়েনোর মনে হল সুসানা আর ফেলিক্সকে সত্যিই কিছু বলবার আছে তার, গুরুজনরা সাধারণত যে ধরনের কথা বলে তার চেয়ে স্বতন্ত্র কিছু। তিনি যে কেবু অবধি ছুটে এসেছেন সে শুধু সুসানাকে ঐ কল্পনাশক্তিহীন ধর্মভীরু ফেলিক্সের হাতে তুলে দেবার জন্যেই নয়। তিন দিন পরে এখন ফিরে যাবার আগে সেই ভীষণ জরুরী কথা বিশেষ করে সুসানাকে বলে যাওয়া একান্ত উচিত তাঁর পক্ষে।

তাঁর ভাই-এর একমাত্র সন্তান সুসানা: ভাই যুদ্ধে মারা গেছে। সুসানার বয়স যখন মাত্র দু বছর তখন থেকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বড় হয়ে খুব স্বাধীনচেতা হয়ে উঠল সুসানা। অত্যন্ত শান্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে জগতের প্রতি তাকাতে শিখল সে। সুসানার দিকে তাকাতেই মিঃ সুয়েনোর মন স্নেহে দ্রবীভূত হল। কেননা সুসানার কাঠিন্যের অন্তরালে যে সহৃদয়তার ফল্গুস্রোত প্রবহমান তা তাঁর অজানা নয়। এমন কঠিন মনোবলের

অধিকারী যে মেয়ে সে আবার উষ্ণ হাসির গমকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে, গভীরভাবে ভালবাসতেও পারে।

এসব ছাড়া অন্য চিন্তাও ভারী হয়ে জমছিল মিঃ সুয়েনোর মনে। ওদের সেকথাই বলতে চাইছিলেন তিনি। খুব ধীরে ধীরে সুসানাকে বলতে চাইছিলেন; বলতে চাইছিলেন সুসানার মুখের আলো-কে, তার স্বচ্ছ নিটল অহংকারকে তার উজ্জ্বল ন্যায়বোধকে। কিন্তু সুসানার তরুণ স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে কথার তন্তুজালে আবৃত করবেন কি করে—একটা শব্দ এল না তার মনে।

হ্যাঁ, তাই; সুসানার স্বয়ংসম্পূর্ণতাই—ভাবলেন মিঃ সুয়েনো। তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ আরও গভীর হয়ে দেখা দিল। যতদিন যাবে সুসানার এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। এই ভাবনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু মিঃ সুয়েনো এর চেয়ে আর স্বচ্ছ করে ভাবতে পারলেন না। এই ভয়ানক সত্যকেই ওদের কাছে প্রকাশ করতে চাইছেন তিনি।

'একবার চলে এসো আমাদের ওখানে। তোমার কাকীমা তো চলাফেরা করতে পারেন জানোই।' উজ্জ্বল হেসে বললেন, মিঃ সুয়েনো।

সুসানা বিদায় সম্ভাষণ করল। ফোলক্সের নিচু ভারী কন্ঠস্বরও কানে এল তার। সুয়েনো এসে প্লেনে উঠলেন, ওদের দুজনের দিকে ফিরে তাকালেন না আর। ওদের যে কথা বলবেন ভেবেছিলেন তা আর বলা হল না।

মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল প্লেন, মেঘের গদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলল। মেঘগুলো জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন মিঃ সুয়েনো। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে যে কথা ভাবছিলেন এখনো তার ধারা বইছে তার মনে। সুসানাকে যে কথা যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন তিনি তার জন্য প্রয়োজন ছিল আত্মসন্তুষ্টির কঠিন আবরণ ভেঙে ফেলে মনের গভীর স্তর থেকে তার নিজের আসল রূপকে অনাবৃত করা। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু এ ধরনের প্রয়োজনের মুখোমুখী হলে হঠাৎ অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মিঃ সুয়েনো নিজের কাছে স্বীকার করলেন যে আত্মসমালোচনাকে তিনিও চমৎকার এড়িয়ে এড়িয়ে এসেছেন এতকাল। কি ছিলেন তিনি কি হয়েছেন তার হিসেবই যথেষ্ট নয়, এর জন্যে প্রয়োজন নিজের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করা, এখনকার এই বয়স এবং দূরত্ব থেকে তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে তাকান নিজের দিকে। আত্মসমালোচনা না করে অবশ্য উপায় নেই তাঁর, কেননা সুসানা এবং তার আন্তরিক সত্য একই মুদ্রার দুই পিঠ মাত্র।

মিঃ সুয়েনোর জীবনের কিছু কিছু অংশ সমালোচনার কঠিন পরীক্ষায়ও নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হবে। যেমন তার ছেলে ফেরাডি। মাত্র এগারো বছর বয়স ফেরাডির। মহাকাশ অভিযান, মহাবিশ্ব, আর পরমাণু সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে পাগল হয়ে আছে ছেলেটা। ওর ঘর বোঝাই সে সংক্রান্ত বই আর জিনষপত্র। সারাদিন পড়ে থাকে তাই নিয়ে।

'ফেরাডি, আমি ভেবেছিলুম তুমি কুইন্টিনের ওখানে গেছ শনি-রোববারের ছুটি কাটাতে। শুনলাম ওরা নাকি একটা নতুন মোটর বোটও কিনেছে।

...একটি যুবক ও যুবতীকে আসতে দেখা গেল...

ঘরের কোনে একটা বুক শেলফের কাছে বসে একমনে পড়ছিল ফেরাডি। তার ছোট্ট শরীরটা নড়ে উঠল মিঃ সুয়েনোর গলা শুনে। মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে, দুদিকের দেয়াল জুড়ে বইয়ের শেলফ।

'আসছে সপ্তাহে যাব বাবা। আমার মাষ্টারমশাই এই বইটা পড়তে দিয়েছেন আমাকে; তাঁর নিজের বই এটা। দ্যাখো।' ফেরাডি বইর মলাটা তুলে ধরল তার বাবার দিকে; আলো ঠিকরে উঠল তার চশমার কাঁচে।

'বইটা তো ভালই মনে হচ্ছে। চলো না আমার সঙ্গে যাবে অফিসে।' বললেন মিঃ সুয়েনো।

'অফিসে কেন বাবা? আজ তো রোববার।'

'তুমি আর আমি যাব, আর কেউ নয়। আমিই গাড়ি চালাব। কয়েকটা কাজ করে রাখতে হবে আজ।'

ফেরাডি তাকাল মাথা তুলে। কয়েক গোছা নরম চুল তার কপাল ঢেকে আছে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ফেরাডি। হাসছে ছেলেটা।

'না বাবা, এখন নয়। আমি এখন পড়ব বইটা। সত্যি বড় ভাল বই বাবা।'

বড় রোগা ফেরডি। সেই তুলনায় বড় বেশি পড়াশুনো করে ও। মিঃ সুয়েনোর মনে পড়ল ফেরডি একটা গ্লোব চেয়েছিল। কেবু যাবার আগে ড্রাইভারকে বলে গিয়েছিল ফিলিপাইন এডুকেশন কোম্পানী থেকে গ্লোবটা এনে দিতে ফেরডিকে। দিয়েছে কিনা। কে জানে। কোথায় কোথায় এটম বোমা ফাটান হয়েছে খুঁজে খুঁজে দেখছিল ফেরডি। গ্লোব দিয়ে কি করবে জিজ্ঞেস করতে আণবিক ভস্ম সম্বন্ধে কি একটা যেন বলেছিল।

ছেলেটা মায়ের স্বাস্থ্য পেয়েছে, মায়ের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও পেয়েছে। এ্যামেলিটাও চিরকালই রোগা ছিল, তবে অসুখে ভুগত না কখনো; গত তিন-চার বছর ধরে অবশ্যি অসুস্থ হয়ে আছে। এ্যামেলিটার তীক্ষ্ম মুখশ্রীর কথা মনে পড়ল তার, তার উজ্জ্বল চোখের কথা, গাঢ় কালো রংয়ের অজস্র চুলের কথা। অতীতের প্রাণ-প্রাচুর্য যেন এখন চুলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। মিঃ সুয়েনোর মা এ্যামেলিটার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব দুশ্চিন্তায় থাকতেন সর্বদা। দু বছর আগে মারা গেছেন তিনি। মিঃ সুয়েনোর মনে পড়ল, তাঁর শেষদিকের চিঠিগুলোতে এ্যামেলিটার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি রকম উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেত, কত উপদেশ থাকত। অথচ আশ্চর্য, অ্যামেলিটার মানসিক শান্তি সম্বন্ধে তিনি ততটা ভাবিত ছিলেন না যতটা ছিলেন তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

মিঃ সুয়েনো ভাবছিলেন তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য বোধহয় ক্ষয়ের গভীর চেতনা থেকে বা আপনজনের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা থেকে উৎসারিত। যেসব ঘটনা তার জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত সেসব ঘটনা সম্বন্ধে উদাসিনতাও একটা কারণ হতে পারে। শুধু খোলসটা পড়ে আছে এখন; অথচ ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে তার দুঃখ দেবার বা দুঃখ গ্রহণ করবার ক্ষমতা অটুট রয়েছে এখনো। পরিপূর্ণতা বলে কিছু নেই বর্তমানে; অবশ্য সুসানা এবং ফেলিক্সের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা তা ছাড়া। তাহলে কি নব-বিবাহিত এবং শিশু ছাড়া আর কোথাও পরিপূর্ণতা নেই এখন?

প্লেনের শব্দ, অন্যান্য যাত্রীদের কন্ঠস্বর, মৃদু হাসি—সবই কানে যাচ্ছিল মিঃ সুয়েনোর, কিন্তু সে ধ্বনি স্পষ্ট নয়, চাপা, যেন স্বপ্নের গভীর থেকে উঠে আসছে।

মিঃ সুয়েনোর মনে পড়ল এই কিছুদিন আগেই চাক মিলস-এর সঙ্গে তার নতুন মোটর বোটে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। প্লেনের একটানা শব্দই বোধহয় ঘটনাটার কথা মনে করিয়ে দিল তাঁকে। মোটর বোটে বেড়াবার খুঁটিনাটিগুলো মনে পড়তেই মিঃ সুয়েনো একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন তাঁর অনুভবের ওপর সে ঘটনার প্রভাব যেন আবার নতুন করে দেখা দিচ্ছে। প্রবল হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লাগছিল তাদের মুখে, চামড়া ভেদ করে শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল তীব্র রোদ, রক্ত গরম হয়ে উঠছিল, উষ্ণ নীল জলের কণাগুলো ছিটকে এসে তাদের চোখে-মুখে গায়ে চুলে লাগছিল। একটানা গভীর নীল চারদিকে, ওপরে তামাটে আকাশ। চারদিকের সেই অজস্র নীলকে গভীরভাবে অনুভব করবার জন্যে চাক তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে টান করে রেখেছিল। তীব্র গতিতে ছুটে চলেছিল তাদের মোটর বোট। চাক-এর চোখ অর্ধনিমিলিত, তার বাদামী চুল জলে ভিজে কালো হয়ে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। একটা স্টিমার যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে। তাদের মোটরবোট সগর্জনে অতিক্রম করে চলে গেল তাকে। স্টিমারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গত সপ্তাহে পরিচয় হয়েছে তাঁর, নাম রোজো। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় রোজোকে দেখতে পেয়ে হাত

দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। রোজোর মুখেও পরিচয়ের হাসি ফুটে উঠতে দেখে মজা লেগেছিল তাঁর।

'চমৎকার জায়গাটা; খুব ভাল লাগে আমার। লোকগুলোও কত ভাল এখানকার।' চিৎকার করে বলল চাক।

কয়েক সপ্তাহ আগে চাক-এর এক বন্ধুর তিন সপ্তাহের মেয়ের অপারেশন হয়েছিল এখানকার হাসপাতালে। বেঁচে গিয়েছিল মেয়েটি। হাসপাতালের কর্মীরা সবাই ক্রিশ্চিয়ান। চাক-এর স্ত্রীর ধারণা তারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সেই মুহূর্তে সেই তীব্র তপ্ত রোদের মধ্যে চাক-এর জীবন যেন নিটোল পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। চাক যেন সেই রোদ, সেই গাঢ় নীল আর সেই লবণাক্ত জলের স্পর্শকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে চাইছিল, যেন তার একটা কণাও হারাতে রাজী নয় সে।

মিঃ সুয়েনো তাকালেন জানালা দিয়ে। নীচে বৃত্তাকার ছোট দ্বীপটা দেখা যাচ্ছে। তার চারদিকের বেলাভূমির ওপর আছড়ে পড়ছে যে জল তার রং যেন আরো ঘন নীল। নারকেল গাছের নীলাভ সবুজ পাতা ঝলমল করছে রোদে।

বসন্তের দিনগুলোর মধ্যে যেন গূঢ় স্তব্ধতা আছে। প্রতিটি দিনের চব্বিশ ঘন্টার একটি গুচ্ছ তার রোদ এবং উত্তাপ নিয়ে নিজের অন্তর্নিহিত স্তব্ধতার গুণে বছরের অন্যান্য দিনের চেয়ে স্বতন্ত্র। শৈশবে যখন কেবুতে থাকত তারা তখনও তাই মনে হত। একটি শান্ত গভীর নদী ছিল তাদের শহরের গায়ে। ধীরে ধীরে গাছের ঘন ছায়া পড়ত। নদীতে খুব মন্থরগতি নৌকোর ওপর বসে থাকত সে আর তার ভাই, আরও তিনটি আত্মীয় ছেলের সংগে নদীর অন্ধকার ঘোলা জলে লাফালাফি করত। তার নৌকোর নীচে জল প্রায় নড়তই না। সবুজ জল আর জলজ গাছগাছড়ার মধ্যে এক স্থির সংগুপ্ত প্রাণলোককে অনুভব করতে পারত সে। তার স্নেহময়ী মা তখনই প্রায় অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন। একটা গাছের ছায়ায় চেয়ার পেতে বসে বোনার কাজ করতেন তিনি। তার ভাই এবং অন্য তিনটি ছেলে প্রতিবার সেই ঘোলা জল ফুঁড়ে মাথা তুললেই স্নেহ এবং আশঙ্কামিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন এক-একটা।

'ওখানেই কি থাকবি নাকি তোরা? নোংরা আর রোগের বীজাণু গিজ-গিজ করছে জলে...' মা বকতেন তাদের আর তাঁর দীর্ঘ প্রশান্ত ভ্রূর নীচে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যেত আবার। 'অগাস্টো, নেমে এসো নৌকো থেকে'. আমাকে ডেকে বলতেন মা। তাঁর গলার স্বর ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেত ধীরে-ধীরে। জীবনের শেষ ক' বছর ধরে তাঁর প্রাণশক্তিও তেমনি ধীরে ধীরেই মিলিয়ে গেল।

এসব ঘটনা কেন মনে পড়ছিল তা জানেন না মিঃ সুয়েনো। হয়ত তারা জীবন্ত বলেই, হয়ত সেসব স্বপ্রকাশ অভিজ্ঞতা এখনো প্রাণস্পন্দিত বলে। আনন্দের সেই মুহূর্তগুলোকে তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন নি এর আগে, সমালোচনার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখেন নি কখনো। তাঁর এখনকার চরিত্রের সংগে এসবের কিন্তু কোন মিল নেই আর।

কি পরিবর্তন হয়েছে তাঁর চরিত্রে? তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মপ্রাণতা বা চিন্তাশীলতার জন্য লজ্জিত হবার কিছু নেই। সমুদ্রের উচ্ছৃত জলকণা, নদীর ধারে বসন্তের সেইসব অপরাহ্ন বা সুসোনা-ফোলিক্স-এর কথা ভাবলে এসব দৃশ্যমান পরিপূর্ণতাকে তাঁর আপাতঃ মূল্যবান বলে মনে হয়।

আসনের সংগে নিজেকে বেল্ট দিয়ে বাঁধবার জন্যে একটি নিস্পৃহ কণ্ঠের অনুরোধ ধ্বনিত হল। মিঃ সুয়েনো বাঁধলেন নিজেকে। ইতিমধ্যে দু' ঘন্টা সময় কেটে গেছে। তাঁদের বিমান মেঘ ভেদ করে এসে এখন ম্যানিলা বিমান বন্দরের ওপর পাক খাচ্ছে; মিঃ সুয়েনো কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকাতে দেখলেন তার ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি নিয়ে।

অজস্র যানবাহন রাস্তায়। মিঃ সুয়েনোর গাড়িও তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল তাঁর অফিসের দিকে। ইতিমধ্যেই মিঃ সুয়েনো তাঁর সবচেয়ে ঝামেলার মক্কেলের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছেন, ডুবে গেছেন চিন্তার মধ্যে। আধ ঘন্টার মধ্যে গাড়ি এসে তার অফিসের দরজায় থামল। বিকেল দুটোর সময় গাড়ির প্রচন্ড ভীড় থাকে রাস্তায়। সে হিসেবে বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছেন তিনি। তাঁর অফিস এসকোল্টায়, জোন্স ব্রীজ-এর কাছেই। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন মিঃ সুয়েনো। লিফট তিনি কখনোই ব্যবহার করেন না, আজও করলেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর টেবিলে বসে কাজ করতে শুরু করেছেন মিঃ সুয়েনো। এয়ার কণ্ডিসনারের একটানা মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে।

হঠাৎ একটা মোড়কের ওপর নজর পড়ল মিঃ সুয়েনোর, ফিলিপাইন এডুকেশন কোম্পানী থেকে এসেছে। মোড়কের ওপর তাঁর নাম লেখা রয়েছে, লিখেছে তাঁর ড্রাইভার। তার কায়দার হস্তাক্ষর অপরিচিত নয় তার কাছে। ড্রাইভারের অকর্মণ্যতায় খুব বিরক্তি বোধ করলেন মিঃ সুয়েনো। তিনি ভেবেছিলেন ফেরডি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে গ্লোবটা, মোড়কটা ছিঁড়তেই দুটো রঙীন অর্ধগোলক খুলে পড়ল তাঁর টেবিলের ওপর। টুকরো দুটোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন মিঃ সুয়েনো। পাঠাবার সুবিধের জন্য দুটো টুকরোকে আলাদ করে প্যাক করেছে ওরা।

অর্ধগোলক দুটোর দিকে তাকিয়ে মিঃ সুয়েনোর মনে হল তাঁর নির্মম আত্মানুসন্ধানকেই যেন তারা বাস্তব রূপ দিচ্ছে। ঈশ্বর যেন বিদ্রূপ করেই গ্লোবটাকে দুটো গোলকে ভাগ করে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে। যেন তাঁকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। মিঃ সুয়েনো অন্যমনস্কভাবে অর্ধগোলক দুটো দু হাতে তুলে নিয়ে জুড়তে চেষ্টা করতে লাগলেন, কেননা তাঁর মনে হল ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূরণ করছেন তিনি। অর্ধগোলক দুটোকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরস্পরের সংগে মেলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। তাঁর মন কিন্তু তাঁর হাতের সেই বাস্তব জগতে নেই তখন। তাঁর স্বর্গত ভাই একবার ঠাট্টা করে বলেছিল তাঁকে,' হৃদয়কে ফেলে দিয়ে বাক্সটাকে বসিও না তার জায়গায়।' সে কথা অবশ্য তিনি ভাবছিলেন না তখন। কি করে বাস্তবতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে চিন্তার জগতকে অংগীকার করলেন সে কথাও ভাবছিলেন না তিনি। তিনি ভাবছিলেন অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্যতার কথা, দুই অর্ধাংশকে যে কখনই মেলান যায় না সেই অপরিবর্তনীয় সত্যের কথা।

সবাই সব কাজ পারে না, সবচেয়ে ভাল হয় যদি তিনি পুরো দুনিয়াটা ঘুরে আসেন। তাই করবেন তিনি। হয়ত খুব তাড়াহুড়ো করেই করবেন, হয়ত সম্পূর্ণ হবে না। পরে, বহু বছর পরে চিন্তার মধ্য দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তাঁর অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করবেন, প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে নেবেন তাকে।

অর্ধগোলক দুটো মিলে গেল পরস্পরের সংগে। মিঃ সুয়েনো ঘোরাতে লাগলেন গ্লোবটাকে; একটু বিদ্রূপের স্পর্শ আছে যেন তার মধ্যে। যেন যথেষ্ট সময় দিলে এবং ধৈর্য ধরতে রাজী হলে গোলকে যে কোন জায়গা খুঁজে বের করে দিতে পারলেন তিনি এমন একটা আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেল তার মধ্যে।

পাঠকের বৈঠক

বড়দিন

বাঙালীরা বলেন বড়দিন, ক্রিশ্চানরা বলেন ক্রিসমাস। ২৫শে ডিসেম্বর তারিখটি প্রতি বছরেই আসে এক বিশেষ বাণী বহন করে। ক্রিসমাস এক নবজাতকের আবির্ভাব দিবস, নতুন জন্ম মানে নবীন আশা, নতুন সম্ভাবনার জন্ম, পৃথিবীর প্রতিটি নতুন জীবনের মধ্যে আছে নবজন্মের নবজীবনের আনন্দ-সংবাদ।

ভার্জিন মেরী নাজারেথ থেকে বেথেলহেমে চলেছেন। একটি শ্রান্ত গাধার পিঠে চড়ে তিনি চলেছেন। চারদিকের দৃশ্যপট, ধানখেত, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাই-কুঞ্জ কোন কিছুতেই মন নেই মেরীর, এক গোপন তথ্য তার মনকে আন্দোলিত করছে। অবিলম্বে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে—ভগবান যীশুর জন্ম হবে।

ঠিক ন' মাস আগে দেবদূত গাব্রিয়েল তাঁর কাছে এক অমৃতলোকের বার্তা এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ঈশ্বর যাঁকে নির্বাচিত করেছেন এক মহাপুরুষের জননীরূপে। "তোমার সন্তান সম্ভাবনা হবে, একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হবে, তাঁর নাম দিও যীশু। তিনি একজন মহাপুরুষ, সারা জগতের মানুষ তাঁকে এক মহান পিতার পুত্র বলে গ্রহণ করবে। তাঁর সাম্রাজ্যের কোন অন্ত নেই।"

মেয়েটি প্রশ্ন করে — "সে কি করে সম্ভব? আমার ত' সেই মহাপুরুষ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই।"

দেবদূত বললেন—"ঈশ্বরের শক্তি তাঁকে ছায়াবৃত করবে আর তাঁর সন্তানটি ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে স্বীকৃত হবে।"

মেরী ঈশ্বরের নির্দেশ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন—"আমি ঈশ্বরের দাসী, আপনার কথামত ঈশ্বরের বাসনা পূর্ণ হোক।"

এর কিছু পরে তরুণ সূত্রধর যোশেফের সঙ্গে মেরীর বিবাহ হল, মেরী তাঁকে গোপন তথ্যটি জানালেন। সেই সময় রোম সম্রাট আগস্ত এক হুকুম জারী করলেন সবাইকে লোকগণনার উদ্দেশ্যে নাম লেখাতে হবে। তাই মেরী আর যোশেফ দাউদের (ডেভিড) নগরী বেথেলহেমে এলেন। স্থানীয় সরাই যাত্রীর ভিড়ে বোঝাই, তার প্রাঙ্গণে উট আর গাধার ভিড়, অনেক মালপত্র, পোঁটলা-পুঁটলী। যাযাবর মেষপালকরা শহরের বাইরে গুহায় অনেক সময় আশ্রয় নিত। তাঁরা এমনই এক আশ্রয়ে প্রবেশ করলেন, তার এক প্রান্তে পশুদের জাবনা খাওয়ার জায়গা। এইখানেই খ্রীশু-খৃষ্টের জন্ম।

তরুণী জননী কি আর করবেন, সেই জাবনা পাত্রে কাপড় জড়িয়ে শিশু যীশুকে রাখলেন। জননী দেখলেন ক্ষুদ্র শিশু হাসি মুখে নিয়ে নিদ্রামগ্ন, তাঁর হাত-দুটি পৃথিবীর আর সব শিশুর মত মুষ্টিবদ্ধ। জননী জানেন এই শিশু দেবশিশু, একদিন ইনিই হবেন জগতের ত্রাণকর্তা। ধরণীর মানুষ এবং স্বর্গের ঈশ্বরের মধ্যে এক দিব্যসেতু রচনা করবেন এই দেবশিশু।

মেষপালকদের কাছে এক দেবদূত এসে বললেন—"এক মহাআনন্দের সংবাদ এনেছি। আজ দাউদ-নগরীতে আবির্ভূত হয়েছেন পৃথিবীর ত্রাণকর্তা, তিনিই যীশুখৃষ্ট। তোমরা দেখবে তিনি একটি গুহার মধ্যে জাবনা পাত্রে বস্ত্রবিজড়িত অবস্থায় শুয়ে আছেন।"

"A Saviour is born unto you in the city of David....Glory to God in high heaven, and peace on earth to men that are God's friends."

এই ছিল প্রথম ক্রিসমাস রজনীর বাণী।

উপরোক্ত কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা আছে, পৃথিবীর অন্যতম মহৎ গ্রন্থ বাইবেলে যীশুখৃষ্টের জীবনী ও বাণীর সন্ধান পাওয়া যাবে। কাহিনী অংশটুকু উল্লেখ করা হল আর একবার এই এক আশ্চর্য আবির্ভাবের কাহিনী স্মরণ করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু যীশু কি সত্যই ২৫শে ডিসেম্বরের শীতের রাতে জন্মেছিলেন। যীশু কোথায় জন্মেছিলেন তা সকলে জানে কিন্তু ঠিক কোন দিনটিতে যে জন্মেছিলেন তা জানা নেই।

যীশুর জন্মলগ্নের সঙ্গে শুরু হয়েছিল এক নতুন যুগের তাই যীশুর আবির্ভাব দিবস পৃথিবীর মানুষের কাছে এক মহাআনন্দের দিন। যদিও ২৫শে ডিসেম্বর ত্রাণকর্তা যীশুর আবির্ভাব দিবস হিসাবে চিহ্নিত তথাপি এই দিনটি নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। একদা বৎসরের বিভিন্ন কালে তাঁর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হত।

প্রাচ্য দেশের মানুষ বসন্তকালে উৎসব করত, আর পশ্চিম য়ুরোপের জনগণ নভেম্বর-ডিসেম্বরে উৎসব পালন করত। এতে করে অনেক সমস্যা, অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হত, ৩৩৭ খৃষ্টাব্দের সিরিল নামধারী জেরুসালেমের জনৈক বিশপ পোপকে অনুরোধ করলেন একটা সুনির্দিষ্ট দিন স্থির করার জন্য।

তারপর ৩৫৪ খৃষ্টাব্দে রোমের বিশপ লাইবেরিয়স ঘোষণা করলেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর তারিখটি তাঁরা গ্রহণ করলেন। সেই কাল থেকে একমাত্র গোঁড়া প্রাচীনপন্থী ছাড়া আর সকলেই এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখটি যীশুর জন্মদিবস হিসাবে পালন করছেন, যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুসারে যীশুর আবির্ভাব তিথি পালন করেন। আর ইউক্রেনিয়ান, রাশিয়ান ও গ্রীক অর্থডকস চার্চ ৭ই জানুয়ারী ক্রিসমাস প্রতিপালন করেন।

২৫শে ডিসেম্বর তারিখটি বেছে নেওয়া হল কেন এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। রোমক সাম্রাজ্যের মানুষরা ক্রিশ্চান যুগের পূর্বে পেগান দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসব করত। এই জাতীয় উৎসবের অন্যতম স্যাটারনালিয়া শনিদেবতার প্রীতিকামনায় শুরু হত ২৩শে ডিসেম্বর। ইনিই ছিলেন ইতালীর আরাধ্য দেবতা, তাই ক্রিশ্চানধর্ম শুরু হওয়ার অনেক কাল পরেও ইতালীতে এই দিবসটিতে উৎসব পালন করা হত।

হয়ত এই ২৫শে ডিসেম্বর তারিখটিকে নির্বাচন কালে গির্জার কর্তারা পুরাতন উৎসবকে নূতনের বেশে সাজাতে চেয়েছেন, তাই তাঁরা যেটা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তা গ্রহণ করেছেন। রোমান স্যাটারনালিয়া ২৩শে ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২৫শে ডিসেম্বর শেষ হত, তাই এই তারিখটি যীশুর জন্মদিবস হিসাবে পালন করা স্থির হল।

আজ ক্রিসমাস যে আনন্দ উৎসবে পরিণত কয়েক শত বৎসর আগে কিন্তু তা ছিল না, তখন শুধুমাত্র গির্জায় ক্রিসমাস পালিত হত। চার্চের বাইরের মানুষ শীতকালীন উত্তরায়ন নীতি অনুসারেই উৎসব করতেন, প্রকৃত ক্রিশ্চান অর্থ জনসাধারণের ঠিক জানা ছিল না, ধীরে-ধীরে সাধারণ মানুষের কাছে খৃষ্ট আবির্ভাবের মর্ম অনুভূত হয়েছে।

এমন একটি কাল ছিল যখন ক্রিসমাস পালন করার অর্থ ছিল আইন-অমান্য করা। প্রথম এলিজাবেথের আমলে একজন বালক বিশপ নিযুক্ত করার নিয়ম ছিল, তিনিই চার্চের অনুষ্ঠান করতেন। কিন্তু এই বালক বিশপ তাঁর দুই ভাঁড় সহচর নিয়ে অন্যায় এবং অনাচারের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতেন।

যাঁরা শুচিবাগীশ তাঁরা শিউরে উঠলেন, ক্রিসমাস উৎসবের অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতা সদ্-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন না। ১৬৪৩-এ ক্রিসমাস ক্যালেন্ডার থেকে উঠিয়ে দেওয়া হল। ১৬৫৯-এ এই দিনটি প্রতিপালন করার অপরাধে শাস্তিদানের আইন পাশ হল।

দুশ' বছর পরে ক্রিসমাস স্বীকৃতি লাভ করল, আর মার্কিন সিভিল ওয়ারের কালে নিউ ইংলন্ডের রাজ্যগুলিতে সর্বপ্রথম ক্রিসমাসের উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই এই বড়দিনের ঢেউ এসে লেগেছে। বড় বড় ইংরাজ কুঠিয়ালদের কাছে এদেশী ব্যবসায়ীবৃন্দ অনুগ্রহ কামনায় এই বড়দিনে ভেট পাঠাত মুর্গী, টার্কী, কমলালেবু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, নতুন গুড়ের সন্দেশ, কেক, আর সেই সঙ্গে দু-এক বোতল হোয়াইট হর্স বা জনি ওয়াকার। এই রেওয়াজটা শেষপর্যন্ত বড়সাহেবকে বড়বাবু প্রদত্ত ভেট দেওয়া পদ্ধতিতে দাঁড়াল। এখনও এদেশী কালা চামড়ার বা বাদামী চামড়ার সাহেবদেরও বড়দিনের প্রাক্কালে স্বদেশী ঠিকাদাররা ভেটদান করেন।

অন্যদিকে ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা আর মরা সোসাইটি। স্বয়ং বড়লাট দিল্লী থেকে এসে বেলভেডিয়ারে উঠতেন কলকাতায় ক্রিসমাস কাটানোর জন্য, ঘোড়দৌড়ের মাঠ একেবারে গম-গম করত, ক্যালকাটায় ডিসেম্বর কোল্ড তখন নাকি লাভলী ছিল।

তখন ছিল না এত পাৎলুন পায়জামা টেরিলিনের ছড়াছড়ি, বঙ্গসন্তানরা ধুতির ওপর গরম কোট চাপিয়ে তার ওপর আলোয়ান চাপিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত, কমলালেবু আর কেক কিনে বাড়ি ফিরত, ছেলেপুলেদের হাত ধরে (মানব-সন্তানদের তখনও 'বাচ্চা' বলা ফ্যাসন হয় নি, গরু, ছাগলের শাবককে বাচ্চা বলা হত)। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতির এই সময় বিশেষ বড়দিন সংখ্যা প্রকাশিত হত, পুজো স্পেশালের চেয়ে অবশ্য আয়তনে ক্ষুদ্র।

বড়দিনের রঙ্গ ছিল অনেক, ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার পর পটকা এবং ভেঁপু বাজিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানান হত। বাঙালী সন্তানরা চৌরঙ্গীর আশে-পাশে বড়দিনের ছিটে-ফোঁটা প্রসাদ সেবন করে ধন্য হত।

এখন আর ইংরাজ নেই। তথাপি বড়দিন বর্তমান যুগের শাসনযন্ত্রের যাঁরা অধিনায়ক তাঁরা কায়েম করে রেখেছেন। একটু ওপরতলার সমাজের বাড়িগুলিতে এই সময়ে পদার্পণ করলে বেলুন, চীনেম্যানের কাগজের ফুল ও গাঁদা ফুলের মালা দেখা যাবে।

আনন্দ-উৎসব যে-কোন উপলক্ষ্য সন্ধান করে। জগতের ত্রাণকর্তা যীশুর জন্মদিনে যে সর্বদেশের মানুষ সর্বকালে আনন্দ করবে এ আর বিচিত্র কি! কিন্তু সেই সঙ্গে এটা প্রার্থনা করাও প্রয়োজন— "হে আমাদের স্বর্গত পিতা দিনের অন্ন আজ আমাদের দাও; আমরা যেমন আমাদের ক্ষতিকারীকে ক্ষমা করেছি, তুমিও তেমনই আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো; প্রলোভনে আমাদের ফেল না; কিন্তু পাপাত্মার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।" ওই হল বড়দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারে ইংরেজিতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ॥

ভারতীয় সাহিত্যের উপর ইংরেজিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরণের যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার সঙ্গে বাংলার সাধারণ পাঠকদের পরিচয় হয়ত অতি সামান্য। কিন্তু জাতীয় সংহতির দিক থেকে এবং ভারতীয় সাহিত্যকে ভারতের বাইরে পৌঁছে দেওয়ার দিক থেকে এই পত্রিকাগুলির অবদান খুবই উল্লেখ্য। অবশ্য সব কটি পত্রিকাই যে এ দিক থেকে সার্থক হতে পারছে, এমন বলা যায় না।

সাধারণভাবে 'সাহিত্য আকাদমী নিউজ বুলেটিন'-এই ভারতীয় সাহিত্যের সংবাদ পরিবেশিত হয়। 'সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক প্রকাশিত' 'ইন্ডিয়ান লিটারেচারের' কথা অনেকেই জানেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। তবে বেসরকারী প্রচেষ্টা হিসেবেও কয়েকটি পত্র-পত্রিকার অবদান খুবই প্রশংসনীয়। বোম্বে থেকে নিসিম ইজিকিয়েল সম্পাদিত 'পোয়েট্রি ইন্ডিয়া' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, ভারতীয় কাব্য আন্দোলনে তা কিছুটা অভিনব। অনেক আগেই হয়ত এ রকম একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারত। এই পত্রিকাটির তিনটি সংখ্যা এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলা কবিতা ভারতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত একটিও বাংলা কবিতার অনুবাদ এতে প্রকাশিত হয়নি।

মাদ্রাজ থেকে শ্রীনিবাস রায়প্রোল সম্পাদিত 'পোয়েট' বলে ইংরেজিতে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটি 'সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতার' বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই সংখ্যায় একজন অতিথি-সম্পাদক আছেন। তিনি হলেন 'কমনওয়েলথ পোয়েট্রি'র সম্পাদক হাওয়ার্ড সার্জেন্ট। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু জানা বর্তমান আলোচকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে ভবিষ্যতে পত্রিকাটির যে রুমানিয়া, ইটালি, ফ্রান্স সংখ্যা প্রকাশিত হবে, সে ইংগিত পত্রিকাটির মধ্যে আছে। বর্তমান আলোচককে 'পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়ার' সম্পাদক প্যারি গ্রেম জানিয়েছেন, এই পত্রিকাটির একটি 'অস্ট্রেলীয় বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যকে অবাঙালীদের মধ্যে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। এর মধ্যেই পত্রিকাটি বাংলার বাইরে এবং ভারতের বাইরে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। কলকাতা থেকে শ্রীসঞ্জীব দত্ত সম্পাদিত 'লেভান্ত' বলে অপর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য 'এশিয়া আফ্রিকার সৃজনশীল সাহিত্য প্রকাশ'। কিন্তু এই পত্রিকার তিনটি সংখ্যাতেও কলকাতার বাইরের কোনও লেখকের রচনা দেখা যায়নি। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রী এ এইচ গোস্তদা সম্পাদিত 'দি লিটারেরোর হাফইয়ার্লি' বলে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তাতে প্রধানত ভারতীয় সাহিত্যের উপর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে না, কারণ সম্পাদক আমেরিকা ভ্রমণ করছেন। এই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রী সি বি নারায়ণ সিংহনিয়া সম্পাদিত 'দি লিটারেরি হাফইয়ার্লি' বলে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বিভিন্ন কারণে উল্লেখ্য। তবে অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি সাহিত্যের উপর।

মাদ্রাজ থেকে 'ত্রিবেণী' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদনা করেন শ্রীরামকোটিশ্বর রাও ও শ্রীশিবকামায়্যা। দক্ষিণ ভারতে পত্রিকাটি খুবই সুপরিচিত।

এ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ইংরেজিতে যে সব সাহিত্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে দিল্লি থেকে প্রকাশিত, 'কনটেমপরারি ইন্ডিয়ান লিটারেচার', 'কন্ট্রা' 'শক্তি', বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, 'হিন্দি লিটারেচার নিউজ', কলকাতা থেকে 'ট্রান্সজিসন' ইত্যাদি প্রধান। ভারতীয় সাহিত্য প্রচারে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এইসব পত্র-পত্রিকাগুলির অবদান নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য।

একটি হিন্দি অনুবাদ নাটক ॥

চার্লস ইটন রচিত 'রাউন্ড অ্যাবাউট' নাটকটি সম্প্রতি হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীকেশবচন্দ্র বর্মা। এই নাটকটি হিন্দি সাহিত্যিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। প্রখ্যাত হিন্দি নাটকার শ্রীউপেন্দ্রনাথ এই অনূদিত

নাটকটি সম্বন্ধে বলেছেন, "এই নাটকে যে ধরণের কথোপকথন রয়েছে তা পুরোপুরি ভারতীয় নয়। প্রেমের সংলাপ রচনাতেও যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে নাটকীয়তা অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে।" শ্রীবিপিনকুমার এই নাটকটির রচনাত্মক ভাষার কিন্তু প্রশংসা করেন। ডঃ রঘুবংশ এই নাটকটির সৃজনাত্মক তত্ত্ব সম্পর্কে বলেন, "ভাষানুবাদ মে' ভাষা কা সৃজনাত্মক রূপ প্রয়োগ মে' নহি আয়া হৈ, ইঁস লিয়ে অভিব্যক্তি কে স্তর পর রচনাত্মকতা কলাত্মক নহি' হো পায়ী হৈ।" ডঃ সত্যব্রত সিংহ আবার অনুবাদ গ্রন্থটি সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "রংগমংচ কো দৃষ্টি সে উএ অনুবাদ সফল হৈ।" অনুবাদক বলেন, "জিসে কাল কো বিভাজিত করকে পৈদা কো গয়ী নাটকীয় স্থিতি পসন্দ আয়ী থী, ভাবানুবাদ কো বিভাজিত করকে পৈদা কো গয়ী সমীক্ষা-দৃষ্টি ক্যো নহি' পসন্দ আয়ী হোগি।"

একটি হিন্দি প্রবন্ধ গ্রন্থ ॥

শ্রীবিদ্যানিবাস মিশ্র সাম্প্রতিক হিন্দি প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রাবন্ধিক। বিভিন্ন সময়ে নন্দনতত্ত্বের উপর তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তা হিন্দি সাহিত্যেই নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও অমূল্য সম্পদ। সম্প্রতি তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'মৈনে সিল পহুঁচাই'। প্রকাশ করেছেন দিল্লির 'রাজকমল প্রকাশন' সংস্থা। বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ রচনা করেছেন, এই গ্রন্থটি আসলে তার সংকলন। সাহিত্যরসিকদের কাছে গ্রন্থটির অবদান অনস্বীকার্য।

অবশ্য এই গ্রন্থের সব প্রবন্ধই যে উল্লেখ্য, এমন নয়। কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠককে নিরাশ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমত এই গ্রন্থের অনেকগুলি প্রবন্ধ সমকালীন সমস্যাবলীর উপর রচিত। যেমন—'ভারতের উপর চীনের আক্রমণ', 'ভাষা সমস্যা', 'ইংরেজি বিরোধ' ইত্যাদি। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"বর্তমান প্রবন্ধ সংগ্রহ সম্বন্ধে সত্যিকথা বলতে গেলে বলতে হয় অ-প্রবন্ধ সংকলন।" অবশ্য লেখকের এই বক্তব্য সত্ত্বেও গ্রন্থটিতে এমন কিছু কিছু প্রবন্ধ আছে, যা সত্য সত্যই তাঁর খ্যাতিকে আরও প্রসারিত করবে।

প্রাচ্য সম্মেলন ॥

সর্বভারতীয় প্রাচ্য সম্মেলনের ২৩-তম অধিবেশন সম্প্রতি আলিগড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস। সম্মেলনের সভাপতি ডঃ এ. এন. দাশ ভারতে এবং ভারতের বাইরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গবেষণার অগ্রগতির বিবরণ দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমতী রমা চৌধুরী আদি শঙ্করাচার্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত একটি সংস্কৃত নাটক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন।

বিদেশী সাহিত্য

পরলোকে ক্যাসিমির এডস্‌খ্‌মিদ্‌ ॥

লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্মান সাহিত্যিক ক্যাসিমির এডস্‌খ্‌মিদ্‌ গত ৩১শে আগস্ট সুইজারল্যাণ্ডের 'ভালপেরা' অঞ্চলে পরলোকগমন করেন। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন জার্মান অ্যাকাডেমি অব্‌ ল্যাংগুয়েজ অ্যাণ্ড্‌ লিটারেচারের' অবৈতনিক সভাপতি। ফেডারেল রিপাব্লিকের 'পেন' কেন্দ্রেরও তিনি সভাপতি ছিলেন কিছুকাল। জার্মান সাহিত্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত যে 'এক্সপ্রেশেনিজম্‌'-এর উদ্ভব হয়েছিল তার তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৮৯০ সালে জার্মানীর দারমস্‌তাদ অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। ইওরোপের বিস্তৃত ভূভাগ, আফ্রিকা এবং মধ্য-পূর্ব ও দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন তিনি। ১৯১৫ সালে তাঁর 'গল্প-সংগ্রহ' প্রথম প্রকাশিত হয়। সে সব গদ্যভঙ্গিগুলিতে ক্যাসিমির তাঁর 'এক্সপ্রেশেনিজম'-এর অজস্র দৃষ্টান্ত রেখেছেন। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সমালোচনা সংগ্রহ' গ্রন্থটি। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ইতালীকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ট্রিলজিগুলিকে 'নিষিদ্ধ' বলে ঘোষণা করা হয় অবশ্য বিশ্বযুদ্ধের পরে এ বইগুলি আবার যথারীতি প্রকাশের অধিকার পায়। এ ছাড়া ক্যাসিমির কয়েকটি জীবনী-গ্রন্থ, একটি অসমাপ্ত উপন্যাস এবং দিনলিপিরও কিছু কিছু অংশ রচনা করেছেন।

বেস্ট্‌ সেলার ॥

মার্কিন মুলুকে এখন বেস্ট্‌ সেলারের হুড়োহুড়ি। প্রকাশকদের মধ্যেই নয় পাঠকপাঠিকাদের মধ্যেও এ নিয়ে তর্কাতর্কি, মাতামাতি আর হৈ-চৈয়ের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলছেন ১৯৬৭ সালের বেস্ট্‌ সেলর হবেন মহিলা ঔপন্যাসিক জ্যাকলিন স্যুশান। বলাবাহুল্য গত জুন মাসেই তাঁর 'ভ্যালি অব্‌ দি ডলস্‌' বেস্ট্‌ সেলারের বাড়ি ছুঁয়েছিল। বইটির প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল প্রায় ২০ লক্ষ কপি। টুয়েন্টিয়েথ্‌ সেঞ্চুরিফক্স এর চিত্রস্বত্ব কিনেছিলেন ২০০,০০ ডলারের বিনিময়ে। এবং 'ব্যান্টাম বুকস' সংস্থা সুসানকে দিয়েছিল ২০০,০০০ ডলার। কিন্তু এর বিপক্ষে রায় দিয়েছেন আরেকদল। তাঁদের মতে আগামী বছরের বেস্ট সেলার হবেন হ্যারল্ড্‌ রবিন্স্‌। তাঁর 'দি অ্যাডভেঞ্চারাস' প্রকাশ হওয়ার সংগে সংগেই নাকি ২৫ লক্ষ কপি রাতারাতি শেষ। সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে যে বইটি প্রকাশ হওয়ার অনেক আগে, শুধু এর পরিকল্পনার খবরটি পেয়েই, জো লেভিন নামক এক চিত্র প্রযোজক ২০০,০০০ ডলারের বিনিময়ে এর অলিখিত চিত্রস্বত্ব ক্রয় করে বসেন। এ ব্যাপারে ইরিশ মারডখ কম যান না। গত সেপ্টেম্বরেই বেরিয়েছে তাঁর 'দি টাইম্‌ অব্‌ দি অ্যাঞ্জেলস্‌'। উপন্যাসটি প্রথম চোটে ছাপা হয়েছিল মোটে দশ লক্ষ কপি। নিউ-ইয়র্কের এক রেস্তোঁরায় বসে দুই মাতাল উপন্যাসটির 'মরিয়েল' এবং 'লিও'র চরিত্রের সম্ভবপর বাস্তবতা নিয়ে বিরুদ্ধ উক্তিতে এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে উভয়ে উভয়ের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে এর রফা করতে উদ্যত হয়েছিল। এ ঘটনাটির ফলেই মারডখ্‌ হয়ে পড়েন বিখ্যাত লেখিকা। জনসাধারণের অসম্ভব চাহিদার জন্য 'টাইম্‌ অব দি অ্যাঞ্জেলস্‌'-এর পরবর্তী সংস্করণটির মুদ্রণ সংখ্যা দাঁড়ায় আরো ২০ লক্ষ কপি। সুতরাং ইরিশ্‌ মারডখের নাম নিয়েও জোর জল্পনাকল্পনা চলছে। কিন্তু সমস্যায় পড়েছেন পাঠকেরা। আরেকটি নামও ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি হচ্ছেন টড্রইন ও'কনোর। ১৯৫৬ সালে কনোরের 'দি লাস্ট হুর্‌রা' সে বছরের সব কটা বেস্ট্‌ সেলারকে ডিঙিয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতিকালে তাঁর 'অল্‌ ইন্‌ দি ফ্যামিলি'ও চলতি বছরের 'বেস্ট্‌ সেলার' লিস্টে ব্যারোমিটারের পারার মতো উঠছে নামছে। কাজে কাজেই ১৯৬৭ সালের 'বেস্ট'-এর গৌরব তাঁরও প্রাপ্য হতে পারে। এ ছাড়া জন আপ্‌ডাইকের 'দি মিউজিক স্কুল'ও সাহিত্যের বাজারের একটি 'হট্‌-কেক্‌'। মাত্র চার দিনে বইটি বিক্রী হয়েছিল ১০ লক্ষ কপি। রেবেকা ওয়েস্টের 'দি বার্ডস্‌ ফল্‌ ডাউন্‌', ক্যাভেল্‌-এর 'টাই-প্যান' ম্যাকিনস্‌-এর 'দি ডাবল্‌ ইমেজ' প্রভৃতি উপন্যাসও চলতি বছরের 'বেস্ট্‌ সেলার' প্রাপ্ত। সুতরাং আগামী বছরের বেস্ট সেলারের জন্য প্রকাশক মহলে এখন সাজ সাজ রব। লেখকরা অনেকেই বেরিয়ে পড়েছেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নির্জনতার অন্বেষণে বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হবার বাসনায়। শুধু 'বেস্ট' হলেই তো আর চলবে না—হতে হবে 'বেস্ট্‌ অ্যামঙ্‌ দি বেস্ট্‌স্‌'।

জার্মানির ইন্টারনেশেনস্‌ সংস্থার অনুবাদগ্রন্থ ॥

জার্মানির 'ইন্টারনেশেনস' সংস্থা জানিয়েছেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই 'ট্রান্সলেসনস ফ্রম দি জার্মান' নাম দিয়ে বেশ কিছু জার্মান অনুবাদ গ্রন্থের নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশ করবেন তাঁরা। খবরে প্রকাশ, এতে ভারতীয় সংস্করণ থাকবে ২০০টি, আরবীয় সংস্করণ ২০০টি, হাঙ্গেরিয়ান ১০০০টি, ফরাসী ৪০০০টি, এবং ডাচ সংস্করণ ৩০০০টি। জার্মান ভাষা-সাহিত্যের অনুবাদ ছাড়াও যেসব বই জার্মান দেশ ও জার্মানির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত হবে, বিদেশ থেকে প্রকাশিত হলেও, সেগুলি এই সংস্করণের

আওতায় পড়বে। হিসেব করে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে জানতে পারা যায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে পৃথিবীর ভিন্ন ভাষাভাষী প্রায় ৩২টি ভাষাতে এ পর্যন্ত আনুমানিক ৫৫,০০০ জার্মান গ্রন্থের অনুবাদ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে সবচাইতে বেশী অনুবাদ হয়েছে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায়। ইংরেজীতে জার্মান সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে শতকরা ২০% ভাগ এবং ফরাসীতে শতকরা ১০% ভাগ। 'গ্রিমস ফেইরী টেলস' এবং কার্ল মার্ক্সের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। লেখকদের মধ্যে সবচাইতে বেশী অনূদিত হয়েছেন যে দুজন তাঁরা হলেন যথাক্রমে মহাকবি গেয়টে ও এরিক কেসনার।

নতুন বই

সাহিত্য আলোচনার মূল্যবান সংকলন

অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন কুমার-এর 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনা'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমে সাজানো হয়েছে এবং সংগত কারণেই 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' প্রথম প্রবন্ধের মর্যাদা লাভ করেছে। এই প্রবন্ধটি ইতিপূর্বে রসিকজন ও সমালোচকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বর্তমান সংস্করণে তিনি চর্যাপদ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন। এর ফলে প্রবন্ধটির গুরুত্বও যথেষ্ট বেড়েছে। চর্যার বিশ্লেষণে তিনি যে অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় দিয়েছেন 'চণ্ডীদাস সমস্যা' প্রবন্ধটিতেও তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তিনি চণ্ডীদাস-সম্পর্কিত উল্লেখের মূল উৎসগুলির সাহায্যে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন, ব্যক্তিবিশেষের মতামতকে খুব একটা প্রাধান্য দেন নাই।

গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই দুটি প্রবন্ধ সবিশেষ মূল্যবান। 'রোমান্টিসিজম' প্রবন্ধে তিনি রোমান্টিসিজমের লক্ষণ এবং বাংলা সাহিত্যে এর স্থান সম্পর্কে সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বিষয়বৈচিত্র্যে এবং ভাষার নৈপুণ্যে অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও বিশেষ মূল্যবান হয়েছে। 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' এবং 'জ্ঞানদাস' ও 'গোবিন্দদাস' প্রবন্ধ দুইটিতে উভয় কবির তুলনামূলক আলোচনা পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান, বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বাংলা গদ্যে সাময়িকপত্রের দান, বাংলা গদ্য ও বিদ্যাসাগর এবং মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ পাঠক, ছাত্র এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনা' সমানভাবে আদৃত হবে এর আলোচনা-নৈপুণ্যের জন্য। বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত আলোচনায় গ্রন্থটি উজ্জ্বল।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ঃ (আলোচনা) শ্রীমদনমোহন কুমার। প্রকাশক ঃ দাশগুপ্ত কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—৮-৫০।

মহাত্মা গান্ধীর বাণী

মহাত্মা গান্ধী ভারত ইতিহাসে একটি অমর নাম। তাঁর চিন্তা ধ্যানধারণা প্রতিটি ভারতবাসীকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করে আসছে। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা জানতে পারা যায় এই সমস্ত চিন্তার ফলশ্রুতিমূলক রচনায়। বহুদিন পূর্বে শ্রীনির্মলকুমার বসু 'সিলেকশনস্ ফ্রম গান্ধী' গ্রন্থখানি সংকলিত করেছিলেন। সম্প্রতি ঐ সংকলন গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত আকারে 'গান্ধী রচনা সংকলন' নামে প্রকাশ করেছেন গান্ধী স্মারকনিধির বাংলা শাখা। বাংলা সংকলন অনুবাদ করেছেন শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বিষয়ে মহাত্মাজীর বিশ্বাস ও আদর্শ কুড়িটি অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। 'পরমেশ্বর', 'সত্যের সন্ধানে চলিবার বিধি', 'ধ্যান ও ধারণার গোড়ার কথা', 'কাজই ধর্ম', 'মনুষ্যসমাজে শিল্পের স্থান—নূতন ও পুরাতন', 'সমাজে সম্পদের বিভাজন', 'শ্রেণী-সংগ্রাম বিষয়ে', 'রাজনীতিতে স্বায়ত্তশাসন', 'অহিংসা', 'বিশ্বযুদ্ধের কালে করণীয় কি?' 'সত্যাগ্রহ' 'ধর্ম ও নীতি', 'ভারতে নারীর সমস্যা' প্রভৃতি অধ্যায়ে মৌলিক ধ্যানধারণার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মাজীর মতাদর্শ যে সমাজ সম্প্রদায় ও দেশের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়, তা বর্তমান গ্রন্থে ব্যাপক বিষয়ে গান্ধীজীর চিন্তাধারা থেকে সহজে উপলব্ধি করা যায়।

গান্ধী রচনা সংকলন— অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু সংকলিত। শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। গান্ধী স্মারকনিধি। ১৪ রিভারসাইড রোড। ব্যারাকপুর। ২৪ পরগণা। দাম—পাঁচ টাকা।

প্রতিষ্ঠিত কবিতা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কবি হিসাবে অত্যন্ত পরিচিত। চল্লিশের দশকে তাঁর প্রথম প্রকাশ বাঙালী কবিতা পাঠকদের চমৎকৃত করেছিল। মাঝে দীর্ঘদিন তিনি নিয়মিত কবিতা প্রকাশ করেন নি, কিন্তু তাঁর কবিতা রচনা যে নিয়মিতই চলেছে তার সার্থক প্রমাণ 'মায়াবী সিঁড়ি'। লিরিক মেজাজের এই কবির সার্থক চিত্রকল্পে বিধৃত বস্তুবাধর্মী শতাধিক কবিতা এই বইখানিতে আছে। আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজ-জিজ্ঞাসা উভয়ই তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে এসেছে। তাঁর কবিতায় 'করোনারী' বা 'টপলেস' সমান মর্যাদা পেয়েছে রোমান্টিক স্বপ্নচারণার সঙ্গে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় কবিতা চর্চায় নিজের পথে যতটা সার্থক হয়েছেন, বলা যেতে পারে ঠিক ততখানিই সাম্প্রতিক কবিতার জিজ্ঞাসা, ছন্দ-প্রকরণ, বা নিস্প্রয়োজনগুলি যত্ন করে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মিল ইত্যাদিতে তিনি এত অমনোযোগী কেন ? নাকি কোন 'শক' দেবার জনাই তিনি মিল বিষয়ে সন্দিহান? গীতল প্রবণতার অভিব্যক্তি মিলবে এবম্বিধ পঙ্‌ক্তিতে

বাঁচলে পরেই বাঁচে মনের সুর কি ?
সরাইখানার হাওয়াখানা উল্লাসে ভরপুর কি ?
অনেক দ্বিধা কাটিয়ে-ওঠা অনেক মনের স্বাস্থ্য
জীবনসভার বিচারখানায় জমছে ভালোমন্দ
—এমন সময় কারুর কথা পড়ছে মনে
আজ কি ?

সমাজের মধ্যবিত্ত অবস্থান তাঁর চোখে দেখে তিনি বলেন—

মেদবাহী গৃহিণীর বিকট মেজাজ
না জানি কী বড়বাবু বলবেন আজ !
নেশা করে ছেলেটা কি ফিরেছে বাড়ীতে
মশগুল সারারাত শাড়িতে-তাড়িতে ?
(পঞ্চাশোর্ধে)

কিছু কবিতা বইখানিতে আছে, যা বহুদিন পরেও মনের মধ্যে থেকে যাবে। নিরাভরণ প্রাচুর্য কামাক্ষীপ্রসাদের 'মায়াবী সিঁড়ি' বলতে চায় ঃ

শ্রাবণ মেঘের চকমকিতে
আগুনে বুঝি জ্বলবে
যে-কথাটি হয়নি বলা
হয়তো তুমি বলবে।

আর এই প্রতীক্ষাই বেশির ভাগ কবিতার স্পন্দনে সজীব।

মায়াবী সিঁড়ি ঃ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সাহিত্যতত্ত্ব : একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

খুব দুঃখের হলেও স্বীকার করতে হয় যে, বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগটি এখনো তেমন উঁচুস্তরে পৌঁছতে পারেনি। এমনকি, কোন উপায়ে বা পদ্ধতিতে সার্থক সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে, তারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। সাহিত্যতত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্ব নিয়ে কঠোর অনুশীলন এবং বাঙলাভাষায় মাধ্যমে তার বিশ্লেষণ করবার প্রচেষ্টা বিক্ষিপ্তভাবে লক্ষ্যগোচর হলেও, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পবোধের সম্মিলিত ভাবনার অভিব্যক্তি খুবই সীমিত। যাঁরা প্রচেষ্টা করেছেন, তাঁরা নানা কারণে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। সাহিত্যের রূপ ও রীতি, গঠনশৈলী ও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গী বিচারে সাহায্য করবার মত বাঙলা গ্রন্থের একান্ত অভাব বাঙলা ভাষায় অধ্যবসায়ী পাঠকমাত্রেই জানেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীভোলানাথ ঘোষের 'সাহিত্যচারণা' গ্রন্থখানি এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সাহিত্য কাকে বলে, সাহিত্যের উপকরণ, রসতত্ত্ব, শ্রেষ্ঠ কাব্য নির্ধারণের উপায়, সাহিত্যে আদর্শবাদ, বস্তুবাদ, স্টাইল, আর্ট ফর আর্টস্ সেক, ধ্বনিবাদ ও রসবাদ, সাহিত্যের অলংকার, কাব্যের ছন্দ, ট্রাজেডি, কমেডি, ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, মহাকাব্য, গীতিকবিতা, সমাজ-জীবন ও সাহিত্য, সাংকেতিকতা, আধুনিকতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতির তথ্যনিষ্ঠ মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে। যদিও এই ধরনের কয়েকখানি বই বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান গ্রন্থখানি সেক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গ্রন্থকার সাহিত্য-বিষয়ক বিভিন্ন মত উপস্থিত ও ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যথাসম্ভব বিতর্ক এড়িয়ে সর্বকালীন সাহিত্য রুচিকেই প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করেছেন। ভাষা সহজ ও স্বাভাবিক। সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রকেই গ্রন্থখানি আকৃষ্ট করবে।

সাহিত্যচারণা (আলোচনা)—ভোলানাথ ঘোষ। কিতাব পাবলিশিং হাউস। ৫।১, কলেজ রো। কলকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

অভিনয়োপযোগী নাটক

'দশানন' একটি পৌরাণিক নাটক। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে বক্তব্য রেখে ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় তাঁর এই সুদীর্ঘ নাটকখানি রচনা করেছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : "রামায়ণে যে মহাসাধক দশাননের কঠোর সাধনায় পরিতুষ্ট হয়ে বিধাতাপুরুষ তার মৃত্যুবাণ তার হাতে তুলে দিয়ে পরোক্ষে অমরত্ব প্রদান করেছিলেন, যে রাবণের কঠোর তপস্যায় শিব তার সহায় হয়ে তাকে জগতে অজেয় করে তুলেছিলেন—যে সাধকের সাধনায় ফলে খড়্গহস্তে মহামায়া রাবণের পুররক্ষা করতেন, তার অত্যাচারে তপস্যায় তপবিঘ্ন, তপোবন কলুষিত ও দ্বিজ যজ্ঞনাশ প্রভৃতি গুরুতর ব্যভিচারের কালী মেখে যে একটা বীভৎস চরিত্র আঁকা হয়েছে আমার মনে তার একটা প্রতিবাদ বহুদিন থেকেই আস্তে আস্তে দানা বাঁধছিল—বর্তমানে দশানন তারই ফল। আমি রামায়ণের মর্যাদা কোথাও কোনও-ভাবে ক্ষুণ্ণ না করে প্রত্যেকটি চরিত্রকে তার সমুচিত মূল্যায়নে চিত্র করতে চেষ্টা করেছি।" রামচন্দ্রের আবির্ভাব একটি মহাসত্যরূপে উপস্থিত। তাঁর আবির্ভাবেই ঘটেছিল, রাবণের মুক্তি।

নাট্যকারের ভাষা স্বচ্ছন্দগতিময় এবং নাট্যকাহিনীকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে সার্থকভাবে। নাট্যকার নিপুণভাবে দুটি বিপরীতধর্মী সভ্যতার (আর্য ও অনার্য) সংঘাতকে তুলে ধরেছেন। প্রপীড়িত অনার্য সমাজের অন্তরবেদনা অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত গুহরায়ের এই নাটকখানির রচনা-রীতি প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম বিশেষ। মঞ্চে উপস্থাপনায় গভীর অনুশীলন এবং মনো-যোগিতার প্রয়োজন।

দশানন (নাটক)—প্রতাপচন্দ্র গুহরায়। ইস্টার্ন স্টেশনার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। ৪, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

পদার্থবিদ্ ও পদার্থবিদ্যা

বিভিন্ন যুগের পদার্থবিদ্‌দের চিন্তা-ধারা কালানুক্রমে বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে এ বইটি পদার্থবিদ্যায় আগ্রহী-দের একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যপুঞ্জের কাজ করবে। বইটিতে পিথাগোরাস, অ্যারিস্টার্কাস, হিপার্কাস, অ্যাপোলোনিয়াস্ প্রভৃতি গাণি-তিকদের কর্মপদ্ধতির পরিচয় আছে, কিন্তু ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, দ্বিতীয় ভাস্করা-চার্যের নামের উল্লেখ দেখতে পেলাম না। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কথা উল্লিখিত হলে বইটি সম্পূর্ণ হ'তো।

Changes in great views on Physics.
—Apurba Chowdhury
Distributor : Oxford Book and Stationery Co.
17, Park Street, Calcutta-16.

নতুন ডায়েরী

প্রতি বৎসরের মত এবারও সরকারের ডায়েরীর বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য বৎসর থেকে এ বছর ডায়েরীগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃশ্য। চার টাকা ও পাঁচ টাকা মূল্যের ক্রাউন ডায়েরী এবং ডিমাই ডায়েরীর সঙ্গে এবার নতুন সংযোজিত হয়েছে কলকাতার রাস্তাগুলির নাম। এই ডায়েরী দুটির এক টাকা বাঁধাই মূল্যে প্লাসটিক কভারে দেওয়া সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এক পাতায় এক তারিখ দেওয়া বাঙলা ডায়েরীর দাম দু টাকা পঁচিশ। ঐ ডায়েরীর দুরকম সংস্করণের দাম দু টাকা পঁচিশ ও দু টাকা পঁচাত্তর। এর বৈশিষ্ট্য হোল আইন সংক্রান্ত নানান সংবাদ। 'এভরি-ম্যানস্ ডায়েরী'তে নানান বিষয়ের অসংখ্য সংবাদ আছে এবং সকলেরই কাজে লাগবে। দুটি সংস্করণের দাম দু টাকা পঁচিশ ও দু-টাকা পঁচাত্তর। 'লিটিল ডায়েরী'তে নানা-বিধ সংবাদ ও শকাব্দ, সম্বৎ, হিজরি, বাংলা সন প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এক টাকা পঁচাত্তর ও দুটাকা পঁচিশের ঐ দুটি সংস্করণই বেশ আকর্ষণীয়। ছোট 'পকেট ডায়েরী' বেশ সুদৃশ্য ও লোভনীয়। এই ডায়েরীটির দাম এক টাকা পঁচাত্তর। প্ল্যাস্টিক ও রেক্সিনে মোড়া এই ডাইরীগুলি প্রতি বৎসরের মত এবারও সর্বসাধারণের মধ্যে সমাদৃত হবে আশা করি।

আকর্ষণীয় রহস্য কাহিনী

'গুপ্তশত্রু' একখানি কিশোরপাঠ্য রহস্য উপন্যাস। কাহিনী বর্ণনায় লেখকের মুন্সী-য়ানা লক্ষ্যণীয়। একটি বিরাট দুষ্কৃতিকারী দলের ষড়যন্ত্র, দীনেন এবং প্রদীপ্ত নামে দুই ভাই-এর অন্তর্ধান, হিতেনের নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা, 'কালো বহুরূপী' ধীরাজের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে উপকার ঘটনায় তীব্র গতিবেগে চরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লেখক শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের এই কিশোরপাঠ্য উপন্যাসখানি সমাদৃত হবে।

গুপ্ত শত্রু : (রহস্য উপন্যাস)—যোগেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোক প্রকাশন। এ-৬২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা বার। দাম আড়াই টাকা।

সরকারস্ ডায়েরী : (১৯৬৭) এস সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

আর্জেন্টিনার কবি

জর্জ লুই বোর্জেস

কল্যাণ রায়

এক কথায় মেনে নেওয়া চলে যে আর্জেন্টিনার সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমনকি সেদেশেও যে কোনও খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক থাকতে পারেন সেটা যেন ভাবতে পারি না। নইলে যেখানে ইংগ-মার্কিন-ফরাসী কিংবা রুশ-চেক-পোলিশ সাহিত্যের হালফিলের খবর রাখি, দারুণ আলোড়িত হই কখনো কখনো, আবার টেবিল চাপড়েও সহজেই তর্ক জুড়ে দিই, সেখানে অন্য সব দেশের সাহিত্যজগত সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নই কেন? এর পেছনে আর যে সব কারণই খাড়া করা হোক না কেন, আমাদের এক-চোখো মনোভাব যে মস্ত বড় হেতু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য ভাষাটাও দাঁড়িয়ে থাকে অনেক সময় উঁচু দেয়ালের মতো।

কথাগুলো বহুবার শোনা হলেও আবার মনে পড়ল জর্জ লুই বোর্জেসের কথা ভাবতে গিয়ে। আজকের আর্জেন্টিনার সাহিত্যে যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় অথচ ভীষণ অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছেন, তিনি হলেন কবি বোর্জেস। বিষণ্ণতার দেয়ালে মাথা খুঁড়ে পৃথিবীর আলো থেকে তিনি আজ বঞ্চিত, বন্দীজীবনই হল তাঁর বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাই এঁর কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় সেই লাইনগুলো:

চোখের কোটরে বাসা বাঁধে
শতাব্দীর নাস্তিময় সাপ
অনিকেত শোভন উল্লাসে।

দীর্ঘ দশ বছরের অন্ধতা তাঁকে দিল নতুন অভিজ্ঞতা, হাজির হলেন তিনি আরেক পৃথিবীতে। কবির ভাষায় বলা যায় 'অনেকটা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।' কিন্তু সেজন্য তাঁর কবিতা লেখা এখনও শেষ হয়ে যায়নি, বন্ধ্যাভূমির হাহাকারে বুক ফাটিয়ে চীৎকার করতে শোনা যায় না কবিকে।

বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী লুই বোর্জেস তাঁর রচনায় যে সমসাময়িক মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে তুলে ধরেছেন তা আর কোন স্বদেশী কবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা ভাবলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। সেজন্যে মহাকবি হোমার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যেই যেন নিজের কথা বলে ফেলেন। তিনি অতীতের দিনগুলোর অশ্রু টলমল স্মৃতির মধ্যে সহজেই ডুবে যেতে পারেন আর বেঁচেও যান তাই বর্তমানের ভয়ংকর সেই ঘূর্ণিরোগের হাত থেকে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে ফিরে পান, ছবির মতো সামনে এসে হাজির হয় অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতি। আর সেই স্মৃতিকে বলা যায় অনেকটা 'ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে সূর্যের ঝলমলে হাসির মতো।'

ছোটবেলা থেকেই বোর্জেসকে নানা-বাধার মুখোমুখি লড়াই করতে হয়েছিল, বাঁচবার তাগিদেই সইতে হয়েছিল অনেক ঝড়-ঝাপ্টা। জীবনকে তিনি ভালোমতই চিনতে শিখেছিলেন। তারই ফলে মানুষের নৈরাশ্যে আর হাহাকার তাঁর কাছে বিশেষ অর্থ নিয়েই হাজির হত। বহুবার নিজের উপর অগাধ আস্থা রেখে বলেছেন, 'এই পৃথিবীর মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা ঐ ধূসর কংক্রিটের ভেতরও খুঁজে পাওয়া যাবে, কেননা সব কিছুই হল এক ধরণের অ্যাক্সিডেন্ট।......একটু ভুলো মন হলেই আমাদের বোধগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, মানুষ মাত্রেই তখন হয়ে উঠবে নিষ্ঠুর।' বলা বাহুল্য এরকম মনোভাব বোর্জেসের প্রথম দিককার ছোটগল্প-গুলিতেও বেশ সহজভাবেই ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যই হল চিরকালীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনাকে রূপ দেওয়া। বিশেষ করে দুঃখের বর্ণনায় তাঁর জুড়ি লেখক বোধহয় আর্জেন্টিনার সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। শেষ জীবনের যে কোন কবিতা পড়লেই বুকটা হু-হু করে জ্বলে ওঠে, ভীষণ তোলপাড় হয় মনে। ফলে পাঠকহৃদয় কবিকে সহজেই বন্ধু বলে কাছে টেনে নিতে পারে। সার্থক হয় তাঁর কবির সম্মান।

চিত্রসৃষ্টিতে জর্জ লুই বোর্জেস বেশ কিছুটা অভিনবত্বের দাবী রাখেন। তাই বলে চমক দেবার জন্যেই যে নতুন কিংবা যা হোক ধরনের কোন ছবি তৈরী করে বসেন এমন অপবাদ তাঁর ঘোর শত্রুও দিতে পারবেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, কবিতায় যদি ছবি ফুটিয়ে তোলা না যায় তবে সে কবিতা নিঃসন্দেহেই তৃতীয় শ্রেণীর। অবক্ষয়বোধে জর্জরিত কবি একটি পুরনো বাড়ির ছবি এঁকে নিজেকে যেভাবে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা নিছক অভিনবই নয়, বেশ ঈর্ষণীয়।

I know every single object
of this old
Building: the flakes of mica
On the gray stone that
doubles itself ....
Endlessly in the smudgy mirror
And the lion's head that bites
A ring and the stained-glass
windows
That reveal to a child wonders
Of a crimson world and
another greener world.

গোটা বারো গ্রন্থের লেখক বোর্জেসের কাছে মানবজীবন যদিও ক্ষণস্থায়ী আর ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরা, তবু সে শাশ্বত সময়ের বুকে রেখে যায় নিজের পায়ের ছাপ। তিনি জানেন প্রত্যেক মানুষই একে অন্যের চেয়ে বেশ খানিকটা আলাদা ধাঁচের। কারো সংগেই কারো যেন তেমন মিল নেই, অন্যের অন্দর মহলে নেই ঢুকবার অধিকার। আসলে আমরা সবাই হলাম এক-একটা নির্জন দ্বীপের অধিবাসী। মানুষ মারা যাবার সংগে সংগেই বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে মন থেকে মুছে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে। তাই যে লোকটি কিছুক্ষণ আগেও ছিল সকলের মাঝখানে, জীবন্ত, মৃত্যুর পরেই তাকে বেমালুম ভুলে যেতে কেউ কসুর করে না। এ মনোভাবটা তিনি একটি জায়গায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্যাকসন মারা গেছেন, আর সেই কথা ভেবে কবির মনে হল, 'এঁর মৃত্যুর সংগে সংগেই বুঝি বিদায় নিল বিভীষিকায় উল্লসিত বুড়ো ওডেনের মুখ, এবড়ো-খেবড়ো কয়েকটা কাঠের পুতুল, রোমান মুদ্রা, দামী জামা কাপড়, ঘোড়া কুকুর আর নামহীন অসংখ্য কয়েদীর জীবনযাপন।' এমন কথা নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও বলেছেন, 'আমি যখন মারা যাব তখন কি কেউই আমার সংগে যাবে না? হিসেব কষবে না এই পৃথিবীই বা কোন শিল্পীকে হারাল? ভুলেও কি আমায় মনে করবে না কেউ? এমনকি দুফোঁটা চোখের জল ফেলবার লোকেরও অভাব ঘটবে?'

বোর্জেস তাঁর স্মৃতির দর্পণে দেখতে পান শৈশবের অগণিত বন্ধুর মুখ আর স্মৃতির উত্তাপে হন উচ্ছ্বসিত। ভাবের ঘোরে অন্ধ কবি হাতড়ে হাতড়ে বলেন, 'একি ম্যাসিডোনিও ফার্ণান্ডেজের কন্ঠস্বর? সেরানো এবং চার্কাসে সেই ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানো ঘোড়ার প্রতিমূর্তি?'

তাঁর কবিতায় অনেক সময়েই একই শব্দের বড়ো আনাগোনা দেখা যায়। এতে তাঁর রচনায় এক বিশেষ ভাবমণ্ডল সৃষ্টি হলেও সব সময় সেটা যে সুখকর হয়ে ওঠে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে মোটা-মুটিভাবে বলা যায় তিনি শব্দসচেতন কবি। প্রয়োজনমাফিক শব্দ নির্বাচন করে রচনাকে তিনি যে সংহতি ও গাম্ভীর্য দেন তাতে আর্জেন্টিনার কবিদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়।

সবশেষে বলা যায় তাঁর কবিতার সত্যিকারের পুঁজি হল বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং জীবনবোধ। আপাতভাবে অনেকেই তাঁর অবক্ষয়চেতনার জন্যে তাঁকে জীবনবিমুখ বলে সমালোচনা করে থাকেন। সত্যি কথা বলতে কি, একটু তলিয়ে দেখলে এধরনের সমালোচনার অসারতাই প্রমাণিত হবে। মৃত্যুপথযাত্রী কবি লুই বোর্জেস আর্জেন্টিনার সাহিত্যে সত্যিই দুঃসাহসী এবং মহৎ।

মনোজ বসু
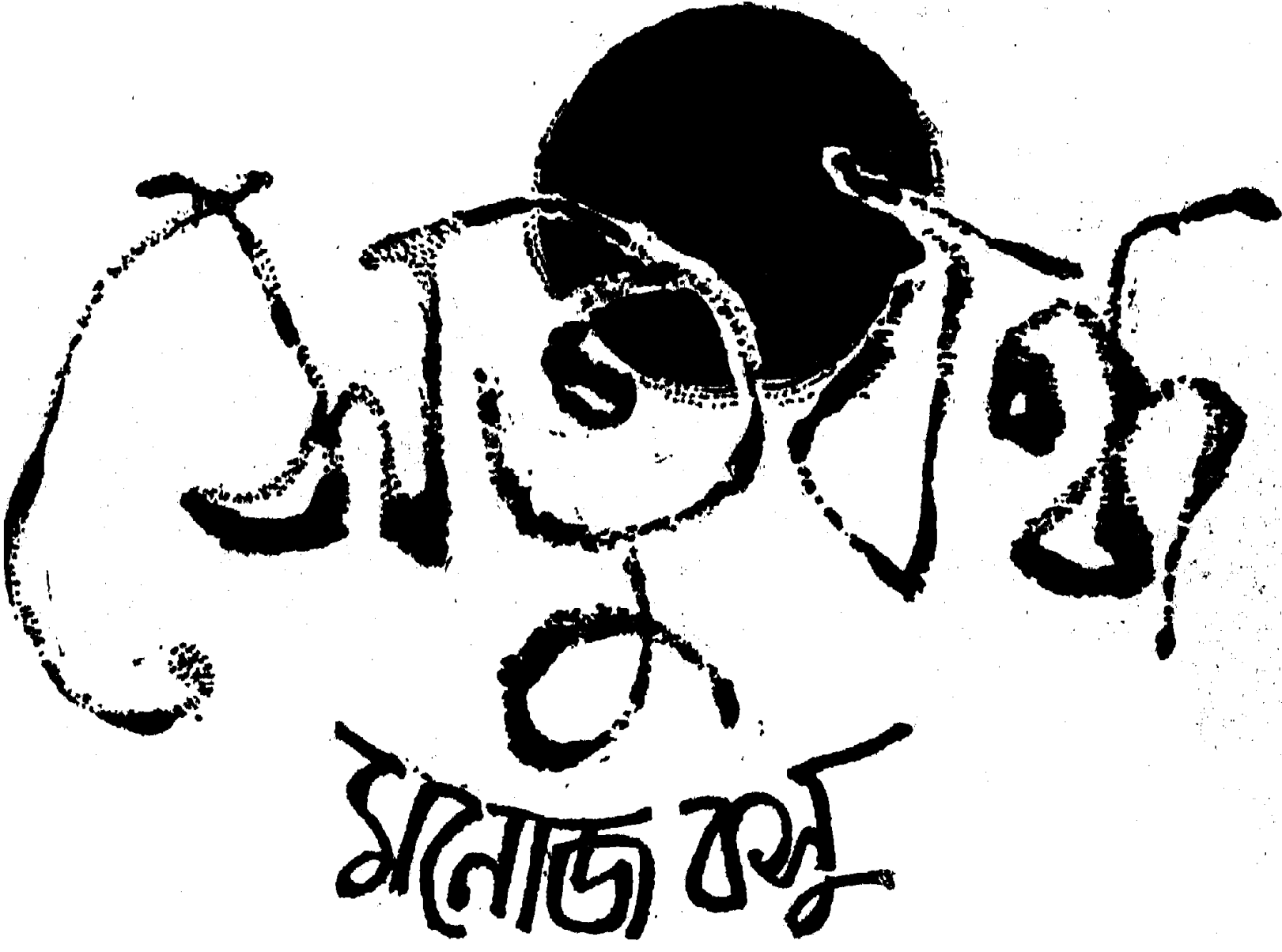
[উপন্যাস]

।। কুড়ি ।।

গভীর নিশীথে নিদ্রাহীন শয্যায় পূর্ণিমার দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। প্রতারণা আজকেই প্রথম নয়—সেই কবে থেকে এ-জিনিস পেয়ে আসছে। সারা দিনমান সকলের সামনে এত প্রতাপ, কিন্তু তার মতন নিঃসম্বল নির্বান্ধব কে আছে দুনিয়ার ভিতর?

বালিশ ভিজে যায় চোখের জলে—এত করে চোখ মোছে, থামে না। ট্যাক্সি করে সেই একদিন বাবা গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নিয়ে হাজির করলেন। কন্দর্পকান্তি তিন তরুণ পুরুষ এসে দাঁড়াল—সারারাত্রি না ঘুমিয়ে স্বয়ম্বর-সভার রাজকন্যার মতো ভাবছি, এই তিনের কোন্‌জনের গলায় মালা দিতে বলবে। হায়রে হায়, মালা নিতে আসেনি তারা—বাবা আর পূর্ণজ্যেঠার অশেষ তদ্বিরে অফিসের দরজার পাশে তারা চেয়ার দিয়ে দিল—ঘরের বনিতা নই আমি, বাইরের খদ্দের টেনে ধরার ফাঁস-কল। সুশ্রী সুন্দর জীবন্ত কল একটা। ঘরের মানুষও কলে পড়বার গতিক—দূর-দূর করে তখন আবার বিদেয় করে বাঁচে। প্রতারণা চাকরির শুরু থেকেই চলছে।

সকালবেলা তাপস এসেছে। কাল ব্যস্ত হয়ে যে পোশাকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক ঠিক সেই পোশাকে। ভাবখানা, কাল দিনমান এবং সমস্তটা রাত্রি যেন এই পোশাকেই ছিল সে, শ্বশুরবাড়িতে দ্বিতীয় এক প্রস্থ পোশাক নেই।

কণ্ঠে যতদূর সম্ভব উদ্বেগ এনে পূর্ণিমা প্রশ্ন করে: মা আছেন কেমন?

তাপস বলে, এই চোটটা সামলে যেতে পারেন। তবে নিশ্চিত হয়ে বলবার সময় আসেনি। রোগ বড় বেয়াড়া—কোন অবস্থাতেই ঠিক করে কিছু বলা যায় না। এই বেশ ভালো দেখা যাচ্ছে, খারাপ হয়ে পড়তে তারপর একটা মিনিটও লাগে না।

পূর্ণিমা ভাইকে তাড়া দিয়ে ওঠে: কু-ডাক ডাকবিনে তাপস। ভারি এক-বারে ডাক্তার হয়ে গেছিস। খারাপ কেন হতে যাবেন—পর পরই ভালো হয়ে উঠবেন এখন। বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন, আহা! শুইয়ে রেখেছিস তো, না উঠে উঠে বেড়াচ্ছেন?

এ-পাশ ও-পাশ করতে দিইনে ছোড়দি। হার্টের উপর এতটুকু চাপ না পড়ে।

পূর্ণিমা বলে, কতবার ভেবেছি দেখে আসি গিয়ে, অফিস থেকে দু-বার ফোন করেছি। তুই ছিলিনে—একবার স্বাতী ধরল, একবার দেবাশিস। দুজনেই মানা করল, দেখাশুনো নাকি একদম বারণ। তেমন অবস্থায় কি করে যাওয়া যায়! বিষম উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। তুই না এলে অফিসে গিয়েই আবার ফোন করতাম।

বলছে পূর্ণিমা আর তাপসের মুখ লক্ষ্য করে যাচ্ছে। ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে, তারই ছোটভাই তো—সেদিনের সেই তাপস পূর্ণিমারই মতন অভিনয় করে যাচ্ছে। খারাপ রোগী সম্পর্কে ডাক্তারের যেমনটি হওয়া উচিত, সেই সুরে তাপস বলে, না গিয়ে খুব ভাল করেছিস ছোড়দি। গেলেই দুটো-একটা কথাবার্তা না হয়ে যায় না। রোগের পক্ষে তা বিষময় হত, এসব রোগীর কাছে ভিজিটর গিয়ে অনিষ্টই করে।

পূর্ণিমা বলে, তার উপরে আমি হেন ভিজিটর। সেদিন এই ঝগড়াঝাঁটি করে গেছেন। আমারও কী রকম মেজাজ চড়ে গেল, গুরুজন বলে রেহাই করিনি। তাই আরও সঙ্কোচ হল, সঙ্কোচ কেন ভয়ই বলব—ভয় হল যে, আমায় দেখে ওঁর উত্তেজনা বাড়বে। এ-জিনিস থাকতে দেবো না। অসুখ থেকে সেরেসুরে উঠুন, তারপরে একদিন গিয়ে মাপ চেয়ে আসব। কি বলিস?

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাপসের উদ্বেগ-ভরা মুখে সোয়াস্তির ছাপ পড়েছে। কিন্তু ধরা দেবে না। মেজাজ দেখিয়ে সে বলে, না ছোড়দি, সেরে গেলেও না। ওদের বাড়ি যাওয়া কোনদিনই তোর হবে না—যেতে দেবো না তোকে। বড়লোক নই বলে বাড়ি বয়ে এসে শক্ত কথা শুনিয়ে যায়—কিসের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে? ডাক্তার মানুষ—অসুখ-বিসুখে ডাক এলে ছুটে গিয়ে পড়তে হয়, আমাদের পেশার নিয়ম এই। তার উপর তুই যেরকম তাড়া লাগালি, না গেলে রক্ষে রাখবিনে—ভয়ে ভয়ে তাই চলে গেলাম। সুস্থ হবার পরে একটা দিনও আর ওদিকে নেই। স্বাতী কি করবে জানি নে, আমার কথা আমি বলে দিলুম।

এ-সমস্ত কী কথার ঢং? গুরুজনের নামে এইরকম বলে বুঝি?

আগেও পূর্ণিমা এমনিধারা ধমক দিয়েছে। হাসি-হাসি মুখ—মনে মনে গরব: ছোড়দির তিলেক অসম্মান ভাই সহ্য করতে পারে না। তাপস সত্যি সত্যি ছিল সেই মানুষ। আজ তাপস অভিনেতা হয়েছে—। এবং পূর্ণিমাও কম অভিনেতা নয়। কথা-গুলি অবিকল সেই আগেকারই বটে, কিন্তু মুখের উপরের সে-প্রসন্নতা কোথায় আজ?

পূর্ণিমা বলে, অতবড় রোগীকে ফেলে এসেছিস তুই কোন্ বিবেচনায়? কম সময়ের জন্য হলেও উচিত হয়নি। নিজেই তো বলছিস, লহমার মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে। কী হয়েছে আমাদের যে, দায়িত্ব ফেলে দেখতে এসেছিস? ঘণ্টা দুই পরে তো আমায় অফিসেই পাবি, উদ্বেগটা ততক্ষণ না হয় চেপে রইলি। অফিসে ফোন করেই দিব্যি খবর নিতে পারতিস।

তাপস বলে, তোদের দেখাটাই শুধু নয়—অবরেসবরে রোগীপত্তর আসেও তো এখানে—

আর যেন না আসে—

তাপস বলে, যায় সবাই ডাক্তারখানাতেই। নিতান্ত সংকট-অবস্থায়—অতক্ষণ সবুর না সইলে তবে বাড়ি অবধি চলে আসে। একজন-দুজন কালেভদ্রে আসে—

এখন থেকে ডাক্তার রায়ের বাড়ি যাবে তারা। সুবিধা রোগীদের—অষুধের জন্য ডাক্তারখানায় তো যাবেই, লাগোয়া বাড়িতে ডাক্তারকে পেয়ে গেলে ছুটোছুটির দায় বাঁচবে।

তাপস বলে, শ্বশুরবাড়ির ঘরজামাই হতে বলছিস ছোড়দি?

একটু থেমে আবার বলে, এ-বাড়ির ভাড়া তুই দিয়ে থাকিস। বুঝেছি, তোর ভাড়ার বাড়িতে আমায় আর থাকতে দিবিনে। তাড়িয়ে দিচ্ছিস।

ওঁদের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাট নিয়ে নে তবে। ফ্ল্যাটের ভাড়া তুই এখন স্বচ্ছন্দে দিতে পারবি। খবর রাখি সব—সে-সঙ্গতি হয়েছে তোর। অবশ্য জামাইয়ের কাছ থেকে ভাড়া যদি নিতে চান তোর শাশুড়ি।

একটু হাসি চিকচিক করে পূর্ণিমার মুখে। বলে, সঙ্গতি হয়েছে—সত্যিই শুনেছি আমি। এত কম্পিটিসন—রোজগার

তবু এরই মধ্যে ভাল দাঁড়িয়েছে। এ তো খুশির কথা রে—দশের মাঝে দেমাক করে বলবার কথা।

তাপসের মনের মেঘও খানিকটা কাটল। বলে, বাহাদুরি আমার তেমন কিছু নেই ছোড়দি। ডাক্তার. রায়ের রোগীপত্তর কিছু পাওয়া গেল—অতবড় একটা ডিস্পেনসারি হাতের মধ্যে, সেদিক দিয়েও সুবিধা হয়েছে।

বাহাদুরি যারই হোক, রোজগার মন্দ হচ্ছে না মোটের উপর। একটা কথা বলব তোকে তাপস, কিছু যদি মনে না করিস।

তাপস রাগ করে বলে, রক্ষে কর্ ছোড়দি। এমন কেষ্টবিষ্টু কিছু হইনি যে, আমার কাছে ভূমিকা করতে হবে।

পূর্ণিমা বলে ফেলল, কিছু কিছু তুই যদি সাহায্য করিস ভাই।

এমন খুশি তাপস কখনো হয়নি। বলে, সে-কথা কতবার ভেবেছি ছোড়দি। কিন্তু তোর হাতে টাকা তুলে দেবো, অতখানি বুকের পাটা আমার নেই। কানে পড়লেই সংসারের এটা-ওটা কিনে আনি, টের পাস কিনা জানিনে। কিনলাম, তারপর বাড়ি এনে নামানোর মুখে বুক ঢিবঢিব করে। ভানুমতীর কাছে খবর নিই, বাড়ি আছিস কিনা তুই। না থাকলে নিশ্চিন্ত। থাকলে তখন আবার শুধাই, মেজাজটা আছে কেমন? তিনটে বছরের বড় হয়ে যা ভয়টা ধরাস তুই ছোড়দি, ছোট বয়সে বাবা-মা'কে এত ভয় করিনি। কত তোর চাই, বলে দে—

মৃদু হেসে পূর্ণিমা বলে, আমার জন্যে নয়—আমি টাকা কি করব? দিদিকে দিতে বলছি। কত আশা নিয়ে বড়লোকের বউ হয়ে গিয়েছিল—এখন ঐ ঘর-ভাড়ার ক'টা টাকার উপরে নির্ভর। আর সামান্য যা-কিছু আমি দিয়ে উঠতে পারি। এ-বাজারে সত্যিই কুলায় না। মা আছেন ওখানে, তার জন্যেও তোর আমার যথাসাধ্য দেওয়া উচিত।

তাপস বলে, দিই না বুঝি? যখনই দরকার পড়ে, দিদি আমার কাছে চলে আসে। যা থাকে নিয়ে যায়।

বটে! আমায় কোনদিন ঘুণাক্ষরে তো বলিসনি।

তাপস বলে, বলবার জো আছে! পই পই করে মানা করেছে, তোর কানে কিছুতে না যায়। এ-বাড়ি যখন আসে, মরে গেলেও পয়সাকড়ির কথা তুলবে না। গিয়ে পড়ে সেই ডাক্তারখানা অবধি—

পূর্ণিমা ফোড়ন দেয় : কিম্বা তোর শ্বশুরবাড়ি—

তাপস প্রতিবাদ করে না। হাসতে হাসতে বলে, আমি একা নই ছোড়দি, তোকে সবাই ডরায়, সিংহরাশিতে বোধহয় জন্মেছিস, মা-কে জিজ্ঞাসা করব। সিংহের মতোই তরাস লাগে তোর কাছাকাছি দাঁড়ালে।

ঠিক এই জিনিসটাই পূর্ণিমা ভেবেছিল, এবারে পরিস্কার হয়ে গেল। পূর্ণিমার অগোচরে নতুন এক আনন্দের সংসার গড়ে উঠেছে। তাপস স্বাতী অনিমা রঞ্জু আছে তার মধ্যে—মা তরঙ্গিণী এবং বিজয়া দেবীও নিশ্চয় বাদ নেই। সেখানে প্রবেশাধিকার নেই কেবল পূর্ণিমার। এবং যেহেতু তারণ পূর্ণিমার কাছে, সঙ্গদোষে তিনিও বাইরে আছেন এখন অবধি।

ছেলেমানুষ ভানুমতী ফ্যান গালতে পারে না। সাহসই করে না—গা-হাত-পা পুড়িয়ে ফেলে পাছে। পূর্ণিমাও মানা করে দিয়েছে। ভানুমতী ডাকতে এসেছে : ভাত নামাবে এসো দিদিমণি—

তাপসকে পূর্ণিমা বলে, দেখতে এসেছিলি আমাদের—দেখা তো হয়ে গেল। রোগীপত্তর কেউ আসেনি, তা-ও দেখলি। তবে আর কি, চলে যা। আমি এবারে খেতে বসব।

তাপস বলে, আমিও খাবো।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, এখন খাবি কি রে? কবে তুই খেয়ে থাকিস এমন সময়?

তাপস জেদ ধরে বলে, আজকে খাব। বাড়ি থাকতে দিবিনে, সে তো জবাব দিয়ে দিলি—ক্ষিধের মুখে খেতেও দিবিনে এক-মুঠো?

পূর্ণিমাও তেমনি। বলে, তোর তো চাল নিইনি—

ভানুমতীর ভাত খেয়ে নেবো। আবার সে রেঁধে নেবে।

নাছোড়বান্দা। পূর্ণিমার সামনাসামনি পিঁড়ি পেতে একটা থালা টেনে নিয়ে বসল। অফিস করতে হয় না—এত সকাল সকাল ভাত সে কোনদিন খায় না। ছুতো করে খানিকক্ষণ ছোড়দির সামনে বসে খাওয়া। খারাপ লাগছে খুব। ছোড়দির মুখভাব আজ যেন ভিন্ন রকম, কথাবর্তা বাঁকাবাঁকা। কণ্ঠস্বর তিক্ত—কেমন যেন অশ্রু-ভেজা মনে হয়। খায় আর ক'টাই বা গ্রাস—গ্রাস তুলতে গিয়ে ছোড়দির মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে পড়ছে।

অফিসে এসেছে পূর্ণিমা। হাসিখুশি সে মানুষটি আজ নয়—যন্ত্রের মতো আপন-মনে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ নিয়ে একবার-দুবার নটবরের টেবিলে আসতে হয়েছে। যা ভাবা গিয়েছিল—অফিসের, এবং সেই-সঙ্গে বাংলাদেশের নৈতিক আবহাওয়া নিয়ে নটবর রীতিমত বিচলিত। পারিষদবর্গ নিয়ে সেই বিষয়ে ঘোরতর শলাপরামর্শ চলছে। পূর্ণিমাকে সামনে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চুপ। মেয়েটা বড় ক্যাটক্যাট করে বলে—ভয় লাগে ওটাকে।

না, আজকে অন্য দিনের মতো নয়। কাজের বাইরে সিকিখানা কথাও উচ্চারণ করে না। আশেপাশে যারা আছে, চোখ তোলে না তাদের দিকে। কাজ সেরে চলে গেলে নটবর মন্তব্য করেন : ভিজে বেড়ালটি—মাছখানা উল্টে খেতে জানেন না! আর রাস্তায় যদি সে-মূর্তি দেখতে!

ভবতোষ বলে, হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন, তাই আজ আলাদা ঢং নিয়েছে। কথা বলার মুখ নেই। দেখলেন না, ঘাড়ই তুলতে পারছে না।

ইস্কুলে হলে রাস্টিকেট করত। অফিসের মুশকিল, দোষ খোঁজে এখানে কেবল ফাইলের মধ্যে। ফাইল ঠিক আছে তো জাহান্নমে যাও না। দশটায় সেই জায়গা থেকে এসে হাজিরা দিও।

বীথির চর আছে—ভবতোষই হয়তো। অথবা দ্বিজদাস। প্রায়ই দেখা যায়, টিফিনের সময়টা নতুন নতুন সংবাদ আহরণ করে আনে। আজ টিফিনে পূর্ণিমা বেরিয়েছিল কয়েকটা মিনিটের জন্য—ক্যাণ্টিনে বসে নিঃশব্দে এক কাপ চা খেয়ে সিটে ফিরে এসেছে। এসেই যে কাজে লেগেছে, তা নয়। চুপচাপ বসে হাতের নখ খুঁটছে।

স্বর্গলোকের কথা জানিনে, দুনিয়ার উপরেও এক-একটা দেব-দেবী থাকেন—বিষম একা তাঁরা। সকলের সব হতে আছে, তাঁদের বেলা শূন্য। আনন্দের মেলামেশার বাইরে তাঁরা। রৌদ্র-ঝড় মাথায় নিয়ে পবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে কল্পতরুরূপে খাড়া আছেন—তলায় আঁচল পেতে বাঞ্ছা প্রকাশ করলেই পূরণ হয়ে যাবে। বাঞ্ছা-পূরণের আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে ভক্তদল যে-যার সুখের ঘরে ফিরে চলল, জনহীন মন্দির থমথম করে তারপরে। ক্বচিৎ বা টিকটিকি একটা টিক-টিক করে কোনদিকে ক্ষীণ আওয়াজ তোলে, শুকনো পাতার মধ্যে কোন একটা সরীসৃপ হয়তো খসখস করে চলে গেল। দেবতার প্রাণবান সঙ্গী এমনি দু'-চারটি।

তারণকৃষ্ণের বড় গর্বের তালুকদার-বাড়ি—সেই বাড়ির লাগোয়া ভাঙা মন্দিরে পূর্ণিমা ঠিক এমনি জিনিস দেখেছিল, প্রায় এই কথাগুলোই মনে হয়েছিল তখন। টিফিনের সময়টুকুতে অফিসের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা তেমন থাকে না—আসছে-যাচ্ছে মানুষ, গল্পগাছা করছে। কিন্তু পূর্ণিমা যেন একাকী রয়েছে, পাথর হয়ে নির্জনতা বুকে চেপে ধরে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

বীথি পাশে এসে ঘুরে ঘুরে করে বলে, দাদুর ওখানে আসর-গুলজার। কী সব বলাবলি হচ্ছে শুনেছ?

আজ পূর্ণিমা একেবারে নিস্পৃহ : বলবারই তো কথা।

বীথি বলে, শুনেছ তুমি সব?

শুনিনি, কিন্তু দোষ আমার। বুড়ো-মানুষ সমস্তটা দিন অফিস করেছেন—ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। রেস্তোরাঁয় ঢোকবার সময় শিশিরবাবুর সঙ্গে ও'কেও ডাকা উচিত ছিল আমার। তাহলে সারাক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছটফট করতে হত না। খাওয়া হত আমাদের ভিতরের কথাবার্তা পাশে বসে শুনতেন। মেজাজ ঠিক থাকত।

বীথি গরম হয়ে বলে, বেয়াদপি কথা কেন বললেন আমাদের জড়িয়ে? কোন্ অধিকারে? গার্জেন নাকি উনি?

পূর্ণিমা বলে, বয়সের বিবেচনায় খানিকটা তাই বই কি। অফিস নিয়ে সারা-জীবন কাটালেন, অফিস ছাড়া কিছু জানেন না। ঘরসংসারের উপর লোকের যে মায়া থাকে, অফিসের উপরে ও'র তাই। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে ঘর ছেড়ে পাশাপাশি বসে অফিস

করবে, সে-আমলে ও'রা ভাবতেও পারতেন না। মেয়েদের অন্যভাবে দেখে এসেছেন বরাবর। দিনকাল বদলে গেছে, তা বলে মানুষের অভ্যাস রাতারাতি পাল্টে যায় না। জিনিসটা মুখে মুখে মেনে নিলেও ভাল মনে নিতে পারেননি। নইলে সত্যি সত্যি তো আক্রোশের কারণ নেই আমাদের উপর।

মোটের উপর তাতিয়ে তোলা গেল না। কী যেন হয়েছে পূর্ণিমার—বড় ঠান্ডা মেজাজ, অতিমাত্রায় বিচারশীল। সেই একদিন ডুরে কাপড়ে বাঘিনী হয়ে নটবরকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল, প্রত্যাশা ছিল আজকেও তেমনি একটা-কিছু হবে। কিন্তু কান পেতে শুনলই না কথা। রসভঙ্গে রাগ করে বাঁথি নিজ টেবিলে ফাইল নিয়ে বসল।

আর শিশিরও ওদিকে নিজ ভাবনায় ডুবে রয়েছে। মমতার চিঠি পড়তে পড়তে আধ-মুখস্থ হয়ে গেছে—সাদামাঠা কথা-গুলোর নীচে গূঢ় অর্থ কি কি থাকা সম্ভব? কাল বেহালার দুটো পাড়ায় বাড়ি ধরে ধরে ঘুরেছে। এর আগে ঠাকুরপুকুর যাদবপুর নারকেলডাঙা উল্টোডাঙা—এমনকি সুদূর কেষ্টপুর অবধি হয়ে গেছে। গঙ্গা পার হয়ে একদিন শালকে এবং সাঁতরাগাছি দেখে এসেছে। আস্ত বাড়ি নাও, আলাদা কথা—খুচরো ঘর একক পুরুষকে কেউ ভাড়া দেবে না। কেন না, অন্য সংসারের সঙ্গে মিলেমিশে এক কল এক পায়খানা নিয়ে থাকতে হবে—তারা সব মেয়েছেলে নিয়ে আছে। ঘর চাই তো বউ নিয়ে এসো। না থাকে বউ, বিয়ে করে ফেল একটা—সেটা কোন কঠিন কর্ম নয়। ঠিক যে-কথা হাতি-বাঁধার অখিল ভদ্র বলেছিল। মানেটা দাঁড়াচ্ছে, পুরুষ হলেই দুশ্চরিত্র—এবং ভিন্ন সংসারের যে-রমণীরা থাকবেন তাঁরাও। স্ত্রী আনতে হবে পুলিশ-কনস্টেবলের কাজে—বর এবং আশপাশের রমণীদের পাহারা দেবে, দুপক্ষ যাতে একত্র জুটে পড়তে না পারে। সেই স্ত্রীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আরও কড়া জবাব বোধহয় মিলবে ঃ পুলিশ-কনস্টেবল কেন হতে যাবো—রোজা-গুণীন। বরের ঘাড়ে পেত্নী না লাগে, সেজন্য মন্তোর পড়ে অষ্টবন্ধন সেঁটে রাখছি।

মমতার চিঠির জবাব দিয়েছে শিশির। অশুভস্য কালহরণম্—শাস্ত্রবাক্য মেনে মাঝের দুটো রবিবার সময় প্রার্থনা করেছে। মামলায় নির্ঘাৎ জেল-দ্বীপান্তর—হেনক্ষেত্রে উকিল যেমন সাবকাশ নিয়ে নিয়ে মামলা পিছিয়ে দেয়, তবু যে-কটা দিন বাইরে রাখা যায় আসামীকে। লিখেছে ঃ শ্রীচরণ দর্শনের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল দিদি, কিন্তু সামনের রবিবারে মেসের এক বন্ধুর বাড়ি বউভাত, সে কিছুতে ছাড়বে না—গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। তার পরের রবিবারে আমরা চাঁদা তুলে বুড়ো ম্যানেজারকে ফেয়ারওয়েল রিসেপসন দিচ্ছি। দুটো রবিবার বাদ দিয়ে একুশে সকালবেলা নিশ্চয় গিয়ে হাজির হব। 'পত্রপাঠমাত্র জবাব দেবেন, আপনাদের কুশল সংবাদের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

জবাবের প্রতীক্ষায় আছে। ছুটি মঞ্জুর হলে যে হয়। তিন সপ্তাহ প্রায় হাতে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কত কি হতে পারে—দুনিয়া উলটাতে পারে, বাসাও জুটে যেতে পারে। না জুটলে কী আর উপায়, যেতে হবে মুখ শুকনো করে। না গিয়ে রক্ষে নেই, ভাগ্যে যা-ই ঘটুক। নইলে সুনীলকান্তিই হামলা দিয়ে পড়বে—সে বড় বিশ্রী। মুখে অনুনয়-বিনয় এবং প্রয়োজনস্থলে নয়ন অশ্রুময় করে বলবে, বিস্তর চেষ্টা করেছি, কিন্তু পেরে উঠিনি বড়দি। দয়ার বোঝা আরও একটি মাস টানতে হবে। মাসান্তে আর খাতির-উপরোধ নেই। হাত পেতে না নিই তো রাস্তার ছুঁড়ে দেবেন। চাকরি পেয়ে গেছি—ফুড়ুত করে কোনখানে যে উড়ে পালাব তেমন উপায় নেই।

ইত্যাদি চিন্তায় অন্তর জর-জর—তার উপরে বাড়তি আতঙ্ক, কোন সময়ে নটবর এত্তেলা পাঠান সামনে হাজির হয়ে হিতো-পদেশ শোনবার জন্য। এবং দ্বিতীয় আতঙ্ক, সর্বচক্ষুর সামনে পূর্ণিমা কখন টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে—আমার নাসিকা থেকে অর্ধেক ইঞ্চি দূরে তার পাউডার-চর্চিত মুখ। স্পোর্টসে টাগ-অব-ওয়ার দেখা আছে—দুই দলে দড়ি টানাটানি করে। শিশিরকে দড়ি বানিয়ে এক বৃদ্ধ আর এক রমণীর টানাটানিটা দেখুন মানসনয়ন মেলে। কে হারে, কে জেতে। বৃদ্ধ ডেকে সামাল করবেন ঃ খবরদার, ওটি রমণী নয়—কুম্ভীর, ভুল করে কুম্ভীরের কবলে পোড়ো না বাপু। আর রমণীটি ছেঁদো কথাবার্তায় না গিয়ে হ্যাঁচকা টানে সিট থেকে টেনে তুলে নিয়ে রওনা দেবেন। এবং কাল যেমন-ধারা হয়েছিল—থপ-থপ করে ক্লান্ত পায়ে অনুসরণ করবেন বৃদ্ধটি। দামসাহেবকে ধরে এত কষ্টে চাকরি জোটাল—গতিক যা দাঁড়াচ্ছে, টিকবে না এ জিনিষ কপালে। ডিরেক্টর বা ম্যানেজারের কিছু করবার আগে নিজেই কোন দিন 'দুত্তোর' বলে ইস্তফা দিয়ে পালাবে।

ভয়ে ভয়ে আছে শিশির। টিফিনের সময় অবধি হাঙ্গামা নেই—বেশ ভালই

গেল। টিফিন সেরে জায়গায় এসে বসেছে। নটবরের কাছে থেকে, স্লিপ নয়—কী আশ্চর্য, বুড়োমানুষটি নিজে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। ঠিক যে জায়গায় পূর্ণিমা এসে পড়ে। শিশির গোড়ায় দেখে নি—ঘাড় নিচু করে কি-একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দেখতে পেয়ে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

নটবর অমায়িকভাবে বলেন, বসো, বসো—কাজ ছেড়ে ওঠাউঠি কী আবার। একটা কথা বলতে এসেছি—

শিশির বলে, আমায় ডেকে পাঠালেন না কেন?

বরাবরই তো ডেকে থাকি।

হেসে কাঁধে হাত রেখে নটবর বলেন, পিওন পাঠিয়ে ডেকে বলার কথা নয় ভায়া, এ জিনিষ নিজে এসে বলতে হয়।

কথার ধরনে শিশির উদ্বিগ্ন হল। এ রকম ভঙ্গিমা আর কখনও দেখে নি। কী না জানি বক্তব্য!

নটবর বলেন, রবিবার দুপুরে আমার ওখানে খাবে। ঠিকানা জান না বোধহয়—লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মেডিকেল কলেজের সামনে নেমে গলির মধ্যে মিনিট তিনেকের পথ।

হেসে বলেন, অবাক হচ্ছ কেন? অফিসে তো কথাবার্তা হয় না—আলাপ-পরিচয় করব। আমি কায়স্থ, তুমিও কায়েতের ঘরের ছেলে। চাই কি সম্পর্কও বেরিয়ে পড়তে পারে।

শিশির ঘাড় নাড়ল। কুসুমডাঙায় সুনীলকান্তির বাড়ি যাবার দায় এই রবিবারে। সময় প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছে সেখানে—মঞ্জুর হবে কি না হবে ঠিক নেই। তবু সেই কথা বলে কাটান দিল। ঘাড় নেড়ে বলল, সে তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু এ রবিবার পারিনে। এক আত্মীয়ের বাড়ি যাব, ঠিক করে রেখেছি। কলকাতার বাইরে। যেতেই হবে, বিশেষ দরকার।

তাহলে পরের রবিবার। এই তাহলে পাকা রইল, কেমন?

নটবর চলে গেলেন। ভদ্রলোক নতুন পালিসি নিয়েছেন দেখা গেল। পিওন পাঠিয়ে ডাকাডাকি অথবা রাস্তায় পিছু পিছু দৌড়ান নয়—বাড়ি নিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে দিবসব্যাপী হিতোপদেশ শোনাবেন। যাকগে, সময় তো দিন দশেক পিছিয়ে নেওয়া গেল। কত কি ঘটতে পারে তার মধ্যে, দুনিয়া উল্টে যেতে পারে।

একটা ফাঁড়া আপাতত কাটল। এর পরে দুই নম্বর—ভীষণতর ফাঁড়া। সারাক্ষণ শিশির ভয়ে ভয়ে আছে। পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট—ঘাড় গুঁজে কোন দিকে না তাকিয়ে গভীর মনোযোগে কাজ নিয়ে বসল। পূর্ণিমা এসে কাগজপত্র টেনে সরিয়ে ধ্যান-ভঙ্গ করবে, সেই লোভেই বোধকরি ধ্যানে বসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। অফিস জনশূন্য। ঘড়ি দেখল—পাঁচটা কুড়ি। উঁকি দিয়ে দেখে পূর্ণিমাও চলে গেছে। শিশিরের সম্পর্কে হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে গেল—ব্যাপারটা কি?

পরের দিনও এই। ছুটির মুখে নিজেই শিশির পূর্ণিমার কাছে গেল।

পূর্ণিমা কিছু অবাক হয়ে বলে, কি শিশিরবাবু?

ঘরের ব্যবস্থা কিছু করতে পারলেন?

মৃদু হেসে পূর্ণিমা বলে, অত কি সোজা! হলে আপনাকে বলব—

ঘোড়ার ডিম! নির্ঘাৎ ভুলে বসেছে। শিশিরের মরণ-বাঁচন অবস্থা—অন্যের কোন দায় পড়েছে, কেন তা বুঝতে যাবে?

ফুরসত পেলেই তাপস বাবা ও ছোড়দিকে দেখতে আসে। শাশুড়িকে নিয়ে নাকি বড় মুশকিল—খাসা আছেন, দিব্যি আছেন, পরক্ষণে সংকট-অবস্থা। সর্বক্ষণ কাছাকাছি থাকতে হয়।

পূর্ণিমা সায় দিয়ে বলে, ছেলে দুটি ছোট-ছোট—জামাই হয়েও তুই তার বড়ছেলে। তার উপরে ডাক্তার। তুই দেখবি না তো দেখবার কে আছে ওঁদের?

তাপস অধীর কন্ঠে বলে, শ্বশুরবাড়ি ঘরজামাইয়ের মতন পড়ে আছি — বাড়ি আসতে পারছি নে—

পরক্ষণে বলে, সেরেসুরে গেলেও এ বাড়ি আর থাকা হবে না। এ পাড়ায় থেকে কাজকর্ম হবে না। তুই ঠিক ধরেছিলি ছোড়দি, এতদিনে আমি সেটা বুঝেছি।

কাজে নেমে এখন বোঝা যাচ্ছে, এত দূরে এই পাড়ায় থেকে প্রাকটিশ জমানো অসম্ভব, প্রতিযোগিতা সাংঘাতিক। ফী বছর গাদা-গাদা ডাক্তার বেরিয়ে আসছে, রোগী বাড়ছে না। সালফা জাতীয় সর্বরোগ-হর নানা ওষুধ বেরুনোর ফলে কমছেই বরঞ্চ দিনকে দিন। অসুখ করেছে তো ডাক্তার-খানা থেকে এক পাতা ট্যাবলেট কিনে খেয়ে নিল, খেয়ে সেরেও যায়। নিতান্ত যার সারল না, সে-ই ছোটে ডাক্তারের কাছে। সত্যি সত্যি ছোটার অবস্থাই তখন। অলিগলি খোঁজাখুঁজির ধৈর্য থাকে না, সময়ও থাকে না। বহুদর্শী প্রবীণ ডাক্তার অপূর্ব রায় জীবিত থাকলে তবু না হয় প্রত্যাশা করা যেত, কিন্তু তাপস একেবারে নতুন ডাক্তার—কলেজের গন্ধ অঙ্গ থেকে ছাড়ে নি, অপূর্ব রায়ের জামাই বলে কপালের উপর শিং গজিয়েছে তা-ও নয়! এমন ডাক্তারের জন্য লোকে আকুপাকু করতে যাবে কেন? বিশেষ করে রকমারী ডাক্তারের দঙ্গল যখন দশ দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে রোগী ধরবার জন্য। শ্বশুরবাড়ি কয়েকটা হপ্তা থেকে স্থানমাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছে—প্রাকটিশ অন্ততপক্ষে ডবল ছাড়িয়েছে। কল এসে রাত্রেও কড়া নাড়ে। শাশুড়ির অবস্থা বিবেচনায় তাপস যেতে চায় না, কিন্তু হাতের লক্ষ্মী ঠেলে দিতে বিজয়া দেবীরই ঘোরতর আপত্তি। বকাঝকি করেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অতএব নিউ আলিপুরের ফ্লাট ভাড়া নেবে, বলে দিয়েছে সে। তবে চুক্তি হল, মাসে মাসে ভাড়া নিতে হবে—আপত্তি করলে তক্ষুনি ফ্লাট ছেড়ে বেরুবে। অন্য বাসা অমিল, উপায় কি—প্রাকটিশ তো গড়ে তুলতে হবে!

সবিস্তারে সমস্ত শুনিয়ে তাপস বলে, তুই অনেক আগেই বলেছিলি ছোড়দি। বাবাও বলেছিলেন। তখন আমি বুঝতে পারি নি, আপত্তি করেছিলাম।

পূর্ণিমা দেমাক করে বলে, তিন বছরের বড় বলে মোটে যে আমায় মানতে চাস নে। কত পাকাবুদ্ধি ধরি, বোঝ এবারে।

বিজয়া দেবীর অসুখের নামে ভোর-বেলা সেই ওরা বেরিয়ে গেল, এ বাড়ি আর কোনদিন ফিরবে না। আসবে কুটুম্বের মতন, খবরবাদ নিয়ে চলে যাবে। যেমন এই আজ এসেছে—ইদানীং যে নিয়মে চলছে।

দু-দুটো রবিবার কাটান দিয়েও সুরাহা কিছুমাত্র হল না। ঘর মরীচিকাবৎ—খবর পেয়ে ছুটোছুটি করে গিয়ে কপালে ঘা দিয়ে ফিরে আসা। দুই রবিবার চলে গিয়ে পুনশ্চ রবিবার এসে গেল। করাল রবিবার—আজকে যেতেই হবে, না যাবার কোন কিছু কারণ থাকতে পারে না।

মেসের ঠাকুরকে বলে সকাল সকাল চাট্টি ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কপালে কি আছে বলা যায় না, পেট ভরতি করে যাওয়াই ভাল। ভরা পেটে সারা দিন-মান লড়ে যাওয়া যাবে। কালীঘাটের ও দক্ষিণেশ্বরের দুই কালীমাতার উদ্দেশ্যে দুই মুখো প্রণাম সেরে মনে মনে 'ত্রাহি মাং মধুসূদনঃ' আউড়ে দমদমা স্টেশনে গিয়ে শিশির সাড়ে দশটার লোকাল গাড়ি ধরল।

(ক্রমশ)

গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক চায়ের বৈঠকে মিঃ এডোয়ার্ড জি ফিলডেন ভাষণ দিচ্ছেন। (বাঁদিক থেকে) মিঃ ফিলডেন, শ্রীজি এন সাহী, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীটি এস কৃষ্ণাণ, শ্রীজি বসু ও শ্রীউপেন্দ্র আচার্যকে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী বক্তব্য

যদিও প্রার্থী মনোনয়নের পালা এখনও বাকী, তবু ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেছে বলা যায়। ইস্তাহারগুলি প্রায় সবই প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং তার ভিত্তিতে দলগুলি তাদের অভিযানও আরম্ভ করে দিয়েছে।

এই ইস্তাহারগুলির বক্তব্য কি? বিভিন্ন দলের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য কতখানি?

একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, ইস্তাহারগুলির ভাষা ভিন্ন, বক্তব্যের ঝোঁকও আলাদা। তাহলেও এদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মিল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। জনসাধারণের সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট লাঘব প্রত্যেক দলেরই মুখ্য লক্ষ্য। দ্রব্য-মূল্যের নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রত্যেকটি দলই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে কোন না কোন রকমের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার বলে অধিকাংশ দলই মনে করে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায়ের আরও প্রসার ঘটানো উচিত এটাও প্রায় সকলেরই সিদ্ধান্ত। কৃষিকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারেও সকলেই একমত।

তবু উল্লেখযোগ্য অমিলও কিছু কম নয়, বিশেষ করে বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষা নীতির ব্যাপারে।

ইস্তাহারের বক্তব্যগুলিকে আমরা এই তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিয়ে দেখতে পারি।

বৈষয়িক নীতি

এই নির্বাচনে কংগ্রেসের শ্লোগান হল, আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে আত্মনির্ভরতা অর্জন। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্যে কংগ্রেস রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দ্রুত প্রসারের পক্ষপাতী। এর জন্যে তাঁরা সমবায় আন্দোলনেরও প্রসার চান। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সমাজ গঠনের প্রস্তুতি হিসেবেই তাঁরা পঞ্চায়েতি-রাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্রমপ্রসার ও শহরাঞ্চলে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি দ্রব্যমূল্য হ্রাসের উপায় হিসেবে ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ, খাদ্যশস্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা, কর হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা সমস্ত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে এবং মার্কিন সাহায্য বন্ধ করে দিতে চান। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, বাগিচা, খনি, জাহাজের ব্যবসায়ে লগ্নী সমস্ত মূলধন রাষ্ট্রায়ত্ত করা তাঁদের কাম্য। প্রয়োজন অনুসারে একচেটিয়া ব্যবসায় এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, বে-সরকারী শিল্প-ব্যবসায়ের মুনাফা নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসারেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ইস্তাহারে বলা হয়েছে, প্রত্যেকেই উপযুক্ত মজুরী ও বেতনের হার দেবার এবং জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধির সামঞ্জস্যবিধানের যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে। রাষ্ট্র ও ধনিকদের খরচে সামাজিক বীমার প্রবর্তন করা হবে।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির মতে কেবল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। কেবল পেট্রোলিয়াম শিল্প ছাড়া আর কোথাও বৈদেশিক লগ্নীর জাতীয়করণ একসঙ্গে এখনই করার দরকার নেই; পরে ভেবেচিন্তে করা যেতে পারে। কৃষির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের ওপর পার্টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা কমিয়ে আনবেন এবং উদ্বৃত্ত জমি চাষীদের মধ্যে বণ্টন করবেন। জন-

সাধারণের করের বোঝা লাঘব করা এবং আমদানী-রপ্তানী-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা পার্টির অন্যান্য লক্ষ্য।

প্রজা-সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপকতর জাতীয়করণের নীতি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তাঁদের কাম্য। আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিলেও এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষপাতী হলেও ধনিকদের উৎসাহ দেবার জন্যে তাঁরা বিশেষ সুবিধা দিতে চান।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপক জাতীয়করণ, সরকারী ও বেসরকারী ব্যয়ের ওপর কুঠারাঘাত, এবং কৃষির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘোচাতে চান।

ভারতীয় জনসংঘের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে কৃষির ওপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর তাঁরা বিশেষ জোর দেবেন। ভূমি রাজস্ব হ্রাস করা হবে। বিদেশী মূলধনের ওপর নির্ভরতা কমানোর জন্যে ক্ষুদ্রায়তন বিকেন্দ্রিত শিল্প-প্রতিষ্ঠা তাঁদের লক্ষ্য।

পররাষ্ট্র নীতি

কংগ্রেসের ইস্তাহারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা ও নিরস্ত্রীকরণের নীতি এবং ঔপনিবেশিকতার অবসানের জন্যে দাবী পুনর্বার ঘোষিত হয়েছে।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যাপক মার্কিন-বিরোধী ফ্রন্টের ভিত্তিতে ভারত-চীন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে চান। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সমস্ত বিরোধের আপোষ-মীমাংসা আবশ্যক বলে তাঁরা মনে করেন।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের "উদ্ধত" আচরণের নিন্দা করেছেন। তবে তাঁরা চান ভারত সরকার চীনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় সমস্ত পথ অনুসন্ধান করুন। আফ্রিকার দেশগুলি সম্পর্কে ভারতের এযাবত অনুসৃত নীতি তাঁরা সমর্থন করেন। যদি মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয় এবং কোনরকম চাপ সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বৈদেশিক সাহায্য নিতে তাঁদের আপত্তি নেই।

প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতিই অনুসরণ করবেন। তবে কম্যুনিজম ঠেকাতে প্রয়োজন হলে ভিয়েৎনামে গিয়েও লড়াই করতে প্রস্তুত।

সংযুক্ত-সমাজতন্ত্রীরাও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ থাকতে চান, তবে চীন ও পাকিস্থানের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী।

প্রতিরক্ষা নীতি

বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্যে আশা প্রকাশ করলেও কংগ্রেস প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করে তোলার বিষয়ে সচেতন এবং এ জন্যে বর্ধিত ব্যয়ের বোঝা তাঁরা স্বীকার করে নেবেন।

মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য হল, অর্থনীতিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস করা উচিত।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার পক্ষপাতী, কিন্তু প্রতিরক্ষার নামে জনসাধারণকে অসহনীয় করভারে জর্জরিত করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়।

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন, প্রতিরক্ষা খাতে এখন যা খরচ হচ্ছে, তার একটা বড় অংশই অপচয় হচ্ছে। তাঁদের ধারণা আরো কম খরচে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

জনসংঘ চীন ও পাকিস্থানের জঙ্গী মনোভাবের দরুণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে চান।

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ইস্তাহারগুলি দেখলে দেখা যাবে, বৈষয়িক নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য দলের যেটুকু তফাৎ আছে সেটুকু কেবল ঝোঁকের। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে মূল তফাৎ কেবল দুই কম্যুনিস্ট পার্টির। কিন্তু সেখানেও তাদের ঐ নীতি কোন সুচিন্তিত স্ট্র্যাটিজি থেকে উদ্ভূত হয়নি, ওটা বাইরের দ্বারা প্রভাবিত। প্রতিরক্ষা নীতি যেহেতু পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে জড়িত, সেই কারণে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিতে নিজস্ব কৃতিত্ব কিছু নেই, আর বাকী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের লক্ষ্যের তফাৎ আবার সেই ঝোঁকের।

শাসক দল হিসেবে কংগ্রেসের পক্ষে এটা কম সুবিধার কথা নয়। বিরোধী দলগুলি এটা ভালোভাবেই বোঝে। সেই জন্যে কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচী নিয়ে তাদের কেউই কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে আসছে না। এক্ষেত্রে তাদের পক্ষে একমাত্র শ্লোগান যা হতে পারে তারা তা-ই দিয়েছেঃ কংগ্রেস তো উনিশ বছর ধরে দেখেও কিছু করতে পারল না, এবার আমাদের একবার সুযোগ দিয়ে দেখতে পারেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

মৈত্রীর নতুন অধ্যায়

ভারত, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ও যুগোশ্লাভিয়ার অর্থনৈতিক মন্ত্রিত্রয় যখন ৪ ডিসেম্বর দিল্লীতে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, সেদিন তাঁরা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দুনিয়ার সামনে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

বৃহৎ শক্তির চাপের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের অধিকারকে তুলে ধরার জন্যে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে এ পর্যন্ত রাজনৈতিক স্তরে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। ঐ সব আলোচনায় এটাও প্রত্যেকবারই স্বীকৃত হয়েছে যে, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে যদি অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্তিশালী করে তোলা না যায় তাহলে তাদের স্বাধীনতা নিরাপদ হতে পারে না।

গত অক্টোবরে দিল্লীতে ঐ তিনটি দেশের রাষ্ট্রনেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রীত্রয় ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

মন্ত্রীত্রয় প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূত্র সন্ধান করেছেন : কারিগরী, বাণিজ্যিক ও শিল্পায়ন। তাঁদের সুচিন্তিত ধারণা, তিনটি দেশেই উৎপাদন বাড়ানোর এত বিরাট সুযোগ রয়েছে যে, এদের প্রত্যেকেই কেবল অপরের প্রাথমিক দ্রব্যাদি, শিল্পের কাঁচামাল, মধ্যবর্তী দ্রব্যাদি ও তৈরী জিনিসপত্রের চাহিদা মেটাতেই সক্ষম তাই নয়, সাধারণভাবে তাদের রপ্তানীর ক্ষমতাও বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির আওতার মধ্যে শুল্কের ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে তাঁরা বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনটি দেশের অফিসাররা শিগ্গিরই এক বৈঠকে মিলিত হবেন। বাণিজ্যিক নিয়মকানুন সরল করার জন্যেও অফিসাররা সুপারিশ করবেন।

এ ছাড়া তিনটি দেশের মধ্যে জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে এবং তিনটি দেশের অবাধ বাণিজ্য এলাকাগুলিকে আরো ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হবে।

বর্তমানে কারিগরী ও শিল্পগত সহযোগিতার যে ব্যবস্থাদি রয়েছে সেগুলিকে নিবিড়তর করা হবে। বিশেষত কৃষি ও খনিজ দ্রব্যাদির প্রসেসিং, মূলধনী ও স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, এবং সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরীর ব্যাপারে সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সহযোগিতার গ্রন্থি বন্ধনের জন্যে তিনটি দেশ পরস্পরের মধ্যে তথ্যাদির ব্যাপকতম আদান-প্রদান করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন পুলিশ গবেষণা পরামর্শ পরিষদের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের ডিরেক্টর পাশে রয়েছেন।

বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের অর্থ সংস্থান এবং পুনর্বীমার ও ধারে কারবারের সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে মন্ত্রীত্রয় তিনটি দেশের ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের সুপারিশ করেছেন। এই তিনটি দেশের মধ্যে যাতায়াতের, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের, সুযোগ-সুবিধা আরো কতখানি বিস্তৃত করা যায় সেটাও ভেবে দেখা হবে।

শিল্প কারিগরী বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যাদি ও বিশেষজ্ঞ বিনিময় ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং একে অপরকে তার শিক্ষণের ব্যবস্থাদি আরো বেশি ব্যবহার করতে দেবে। মন্ত্রীত্রয় এই প্রসঙ্গে তিনটি দেশের উপদেষ্টা ও ডিজাইন সার্ভিসগুলিকে সমন্বিত করবার সুপারিশ করেছেন। তিনটি দেশের মধ্যে ছাত্র ও শিক্ষার্থী বিনিময় আরও ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত করার জন্যেও তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন।

এই সব কাজের তদারক করার জন্যে মন্ত্রীত্রয় মন্ত্রী পর্যায়ে একটি স্থায়ী যুক্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিটি নিয়মিত সময় অন্তর মিলিত হয়ে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন।

দিল্লীর এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, UNCTAD ও GATT প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় বিভিন্ন সময়ে উন্নতিশীল দেশগুলিকে যে সব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে গেছে। আর এইজন্যেই গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ দেশগুলির নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন দৃঢ়তর করা একান্ত দরকার। দিল্লীর ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন সেই পথেরই নির্দেশ দিয়েছে।

আমার জীবন
মধু বসু

(৪৪)

বম্বে থেকে দিল্লী যাচ্ছি। ট্রেণে, সমস্ত রাস্তাটা একই চিন্তা খালি মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল : কে এই কালীদা? যার সঙ্গে চেনা নেই, জানা নেই—দেবতার আশীর্বাদের মত ৫০০্ টাকা চলে এল কাউকে না চাইতে। বহু চেষ্টা করেও ৫০০্ টাকা ধার পাওয়া যায় না—কারণ বেশীভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যার টাকা দেবার ক্ষমতা আছে তার যে দেবার উদার মন নেই, অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। আর যার মন আছে, তার সামর্থ্য নেই। এ অবস্থায় কে এমন মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে আমার সাংঘাতিক দরকারের সময় না চাইতে ৫০০্ টাকা পাঠিয়ে দিলেন! আর তিনি কি করেই বা জানলেন যে আমার টাকার দরকার।

নানা রকমের চিন্তা যখন মনের মধ্যে ভিড় করছে, তখন হঠাৎ মনে হল যে হেম সোমের বাড়ীতে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে ভদ্রলোক কালীদা নন তো? সোম আমাকে তাঁর নাম বলেনি, শুধু বলেছিল গৃহী-সন্ন্যাসী। আর যদি তিনিই হন, তাহলে 'কালীদা' কেন, তাঁকে দেখে তো আমার চেয়ে ছোটই মনে হয়েছিল। অবশ্য তাঁর কাছে থেকে যখন বিদায় নিয়েছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে, 'আপনার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হবে।' তিনি কি সত্যিই—ত্রিকালদর্শী? ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব দেখতে পান?

এই সব নানা চিন্তায় ঘুম আসছিল না—ট্রেণে বসে বসেই হেম সোমকে একখানা চিঠি লিখে জানতে চাইলাম : তাঁর বাড়ীতে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তিনিই কি কালীদা?

সেজদি তখন বরোদায়, কারণ ব্রজেন্দ্রদা, স্যার বি এল, তখন বরোদার দেওয়ানরূপে কাজ করছিলেন। সেজন্য দিল্লীতে আমার ভাগ্নে বুড়োদার (ডাঃ সুশান্ত সেন) তখন ডাক্তার হিসেবে দিল্লীতে খুব নাম-ডাক। আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—অর্থাৎ বুড়োদা, তদনীন্তন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী মিঃ আজিজুল হকের সঙ্গে দেখা করার একটা বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—কিন্তু তাঁর কাছে তখন পর্যন্ত আমার দরখাস্তটি গিয়ে পৌঁছয়নি। তিনি আমাকে কথা দিলেন যে, তাঁর দ্বারা যতখানি করা সম্ভব তিনি করবেন।

বম্বেতেই শুনেছিলাম যে এই বিভাগের খুদে সাহেবদের অর্থাৎ যাদের হাত দিয়ে লাইসেন্সের দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর টেবিলে পৌঁছবে তাদের খুসী করতে না পারলে লাইসেন্স বের করতে পারা যায় না। এবং এই খুসী করতে অনেক কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। সোজা পথে এবং লাইসেন্স প্রার্থীর যোগ্যতা অনুসারে লাইসেন্স পাওনা-না-পাওয়া নির্ভর করে না।

আমার হল খুব মুস্কিল। প্রথমতঃ এই সব 'খুদে সাহেব'দের খুসী করার মত অর্থ আমার নেই, দ্বিতীয়ত এই 'খুসী করার' ব্যাপারটাকে আমি মন থেকে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দিতে পারব না। এখন কি করা উচিত। মন্ত্রীমশাই স্পষ্ট বলছেন যে, যতক্ষণ না দরখাস্তখানি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে ততক্ষণ তিনি কিছুই করতে পারেন না। এই সব দেখে বুড়োদা আমায় বল্লে: মামু, পি এন থাপারের সঙ্গে তো তোমার যথেষ্ট জানাশোনা আছে, তাঁর কাছে যাও না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে মিঃ থাপার তখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে তিনি খুব সমাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। ইনফরমেশন ফিল্মস ছেড়ে দিয়েছি শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ছেড়ে দেবার কারণটা তাঁকে বলতে তিনি আমাকে সমর্থন করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সহানুভূতিও প্রকাশ করলেন।

তারপর আমি তাঁকে বললাম যে, আমি একটা ফিল্মের লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত করেছি—তিনি আমাকে এ বিষয়ে কোন রকম সাহায্য করতে পারেন কি না!

তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, ঐ বিভাগের সেক্রেটারীকে আমার হয়ে বলবেন এবং যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করবেন। তিনি আমাকে একথাও বললেন যে, কোন সংস্কৃতিমূলক ছবি করা নিয়ে লাইসেন্স পাওয়া বিষয়ে আমার ন্যায্য দাবী আছে।

আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি মিঃ থাপারের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

মিঃ থাপারের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলাফল বুড়োকে বলতেই বুড়োটা বলল যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বলে রাখবে দরখাস্তখানি এই বিভাগে এসে পৌঁছুলেই যেন তাকে খবর দেয়। তারপর সে যথাবিধি ব্যবস্থা করবে।

বুড়োর তখন দারুণ পসার—বিশেষ করে যত বিদেশী এমব্যাসী এবং উচ্চ সরকারী মহলে। প্রায়ই সে আমাকে তার ক্লাবে, নয়ত বিভিন্ন 'এমব্যাসী'র দেওয়া ককটেল পার্টিতে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এই হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার বম্বে ফিরে এলাম।

জুন মাসে, হেম সোমের কাছ থেকে আমার সেই চিঠির জবাব এল। উত্তরটা যথারীতি ভাসা-ভাসা—সে লিখেছে 'নাম জেনে আর কি হবে? যিনি তোমায় টাকা পাঠিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন যে তোমার টাকার খুব দরকার, তাই তিনি পাঠিয়েছেন। সোম স্পষ্ট করে কিছু না লিখলেও, আমি তার চিঠি পড়ে যা বুঝলাম তাতে, তার বাড়ীতে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁকে উদ্দেশ করেই লিখেছে—তিনিই তবে, কালীদা!! আমি তখন সোমের ঠিকানাতেই কালীদা'র নামে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলাম, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। কিন্তু দিনের পর দিন চলে গেল—কোন জবাব এল না।

এদিকে কৃষ্ণা দেওলালী থেকে চলে এসেছে বম্বেতে। বম্বেতেই সে এখন থাকবে কিছুদিন। ইতিমধ্যে তার 'ডিভোর্স' হয়ে গেছে—তার স্বামীর দিক থেকে কোনো প্রতিবাদ আসেনি।

জুন মাস শেষ হয়ে জুলাই মাস এল—লাইসেন্স বিষয়ে বুড়োর কাছ থেকে কোন খবরই পাচ্ছি না। টাকার যথেষ্ট টানাটানি যাচ্ছে। লাইসেন্সের কিছু ঠিক না হওয়া পর্যন্ত, অন্য কোনো কাজেরও চেষ্টা করতে পারছি না। মনের যখন এই রকম অবস্থা,

তখন কৃষ্ণার সাহচর্য আমাকে অনেকটা শান্তি দিত।

আগস্ট মাসে টাকা-পয়সার এত টানা-টানি হল যে দিন যেন আর চলে না। তখন আবার সেই অলৌকিক ঘটনা—কালীদার কাছ থেকে এল ৫০০্ টাকার আর একটি মণি-অর্ডার। এবারও এল না চাইতে! সোমকে লিখলাম—কালীদাকেও আবার লিখলাম।

কালীদার কাছ থেকে কোনো জবাব পেলাম না, কিন্তু সোম উত্তরে জানাল: 'তোমার যখন খুব প্রয়োজন হয় সেই সময় যখন তুমি এই সাহায্য পাচ্ছ তখন বুঝতে হবে যে যিনি টাকা পাঠাচ্ছেন, তিনি তোমায় খুবই ভালবাসেন এবং তিনি বুঝতে পারেন তোমার প্রয়োজনের সময়টা। কি করে বুঝতে পারেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। শুধু এইটুকু জানি যে তিনি সব বুঝতে পারেন, সব জানতে পারেন।'

অলৌকিক ঘটনার কথা অনেক পড়েছি এবং শুনেছি, এখন আমার নিজের জীবনেও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। এতদিনে বুঝলাম তাঁর কথার মানে, 'আপনার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হবে।' তাঁর মুখের কথাই যে তাঁর বাণী এতদিনে বুঝলাম!! সত্যিই তিনি ত্রিকালদর্শী।

আগস্ট মাসের শেষদিকে বড়দার কাছ থেকে এল সেই বহু প্রত্যাশিত সু-সংবাদ—আমার ফিল্মের লাইসেন্স মঞ্জুর হয়েছে।

কিন্তু সুখ চঞ্চল, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—অন্ততঃ আমার জীবনে। কৃষ্ণা একদিন এসে আমায় বলল যে তাকে বাঙ্গালোরের কাছে একটা সামরিক হাসপাতালে বদলী করা হয়েছে। কৃষ্ণা যে রেডক্রশ-এ যোগদান করেছিল—একথা তো আগেই বলেছি।

আগে যখন দেওলালিতে থাকতো, তখন প্রায়ই সপ্তাহান্তে এসে ২।৩ দিন করে বোম্বাই-এ কাটিয়ে যেত, কিন্তু এখন বাঙ্গালোর—অনেক দূরে। খুব শিগগির দেখা হবার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। ভগবান জানেন আবার কবে দেখা হবে। সুতরাং এই যে বিচ্ছেদ—এটা আমাদের দুজনের কাছেই খুব মর্মান্তিক রূপে দেখা দিল।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি— তখনও লাইসেন্সটি আমার হাতে এসে পৌঁছয়নি, তবে পাওয়া গেছে এই শুভ খবরটুকুই পেয়েছি। এই সময় আবার এল দেবতার আশীর্বাদের মত কালীদার কাছ থেকে ৫০০্ টাকার মণি-অর্ডার। ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি দিলাম কালীদাকে, কিন্তু এবারও যথারীতি কোনো উত্তর নেই।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি লাইসেন্সটি হাতে পেলাম। সে সময় আবার একটা গুজব রটলো যে আসছে বছর থেকে লাইসেন্স প্রথা একেবারে তুলে দেওয়া হবে। সুতরাং লাইসেন্সের দাম কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু প্রডিউসার আমাকে আশী হাজার থেকে এক লাখ টাকা দিতে চাইল—যদি আমি এটা বিক্রি করি।

তখন টাকার আমার খুবই দরকার। অভাব চারিদিকে। এক এক সময় মরীয়া হয়ে ভাবতাম যে দিই লাইসেন্সটা বিক্রি করে। প্রডিউসারদের সঙ্গে কথা বলে অনেকটা অগ্রসরও হতাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করতাম। তখন মনে হত যে, গভর্ণমেন্ট লাইসেন্স দিয়েছে আমাকে, যাতে আমি, আমার মনোনীত গল্প, শিল্পী ও কলাকুশলী নিয়ে—এবং আমার পরিচালনায় ছবি করি। আর সেই লাইসেন্স কিনা কালো-বাজারে বিক্রি করে দেব?

যে সমস্ত প্রোডিউসার আমার কাছে লাইসেন্স নেবার জন্য এসেছিল তারা আমার কাছ থেকে লাইসেন্সটি নিয়ে তাদের 'ইউনিট' দিয়ে ছবি তুললে—আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না ছবির বিষয়ে—শুধু ছবিটা তৈরী হবে 'মধু বোস প্রোডাকশান্স'—এই নামে।

ছবির পরিচালনা করবে অন্য লোকে—ছবি মাথামুণ্ডু কি হবে সে বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারব না—অথচ ছবি মুক্তি-লাভ করবে 'মধু বোস প্রোডাকশান'-এই নামে। এই যুক্তি আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না—তার ওপর 'কালো-বাজারী' ব্যাপারেও আমি জড়িয়ে পড়ব বা লোকে আমাকে কালো-বাজারী বলে ভাববে—একথা মনে হতেই আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

আমার পরিচিত বহু লোক আমাকে বলল: অমন আদর্শ নিয়ে চললে আর আজকের পৃথিবীতে বাস করা যাবে না, মিঃ বোস। প্রায় লাখখানেক টাকা হাতে পেয়ে ঠেলে দিচ্ছেন? আপনাকে তো কিছুই করতে হবে না—সবই তো প্রোডিউসার করবে, শুধু আপনার নামটা ব্যবহার করবে। আপনি তো কিছু না করে ঘরে বসেই প্রায় এক লাখ টাকা পাচ্ছেন, এতে আপনার আপত্তি করার কি থাকতে পারে?

আমি বললাম: আপত্তি করছি এই কারণে যে সে টাকা ভোগ করার চেয়ে আমার দুর্ভোগটাই বাড়বে বেশী।

* * *

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার লাইসেন্স পাবার কিছু আগে সাধনাও তার নামে লাইসেন্স পেয়েছিল। তখন লাইসেন্সের দাম প্রায় দেড় লাখ টাকা—কালোবাজারে অবশ্য। তার কাছেও যখন প্রোডিউসাররা যাতায়াত করেছিল লাইসেন্সটিকে বিক্রি করার জন্যে তখন সেও দেড় লাখ টাকার লোভ পরিত্যাগ করে বিক্রি করতে রাজী হয়নি। যে কারণে আমি বিক্রি করিনি—সাধনাও ঠিক সেই কারণেই রাজী হয়নি। সত্যিই আমার খুব ভাল লেগেছিল সাধনার এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং নিষ্ঠাকে!

অক্টোবর গেল, নভেম্বর মাসও গেল। আমি এমন একজন প্রোডিউসার পেলাম না যে আমার ছবিতে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু তাদের লাইসেন্সটি বিক্রি করে দিলে তারা সবাই ছবি করতে প্রস্তুত 'মধু বোস প্রোডাকশান' নাম দিয়ে।

এদিকে কালীদা কিন্তু আমাকে প্রতি মাসেই টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন—এমন কি অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসেও তিনি পাঠালেন দেড় হাজার টাকা। এবং সব সময় মণি-অর্ডার কুপনে লেখা থাকত সেই এক বাণী: **'Have faith in God'** অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস রাখো।

ভগবানের উপর আমার কতটা বিশ্বাস হোল জানি না, তবে এই কথাটা ভালভাবেই বিশ্বাস হল যে কালীদা সত্যই অন্তর্যামী—তিনি মহাপুরুষ।

ডিসেম্বর মাস এসে গেল—তখনও লাইসেন্সের কোনো সুরাহা হল না। এদিকে দিল্লী থেকে খবর এল যে ডিসেম্বরের শেষ কিংবা জানুয়ারীর গোড়া থেকেই এই লাইসেন্স প্রথার অবসান ঘটবে।

ঠিক এই সময়ে আমার জীবনে ঘটল দুটি ঘটনা—তার প্রভাব পরবর্তী জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম।

আগামী বারে বলব সেকথা।

(ক্রমশঃ)

অপারেশন বেইরুট চিত্রে রিচার্ড হ্যারিসন

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা:

চলচ্চিত্রের প্রচারমাধ্যমের সেন্সার ব্যবস্থা :

পথচারীদের মধ্যে যাঁরা সিনেমা পোস্টারগুলির দিকে তাকিয়ে দেখাকে অন্যায় বলে মনে করেন না, তাঁরা কিছুকাল ধরে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে আসছেন, প্রধানত যৌন-আবেদনমূলক কোন কোন পোস্টারের অংশবিশেষকে সাদা কাগজ এঁটে চাপা দেওয়া হয়েছে। কে বা কাদের নির্দেশে এই কাজ করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে তাঁদের মনে কখনও কখনও আগ্রহ জাগলেও সে-আগ্রহে তেমন তীব্রতা থাকে না বলেই তা জল-বুদ্বুদের মতই মিলিয়ে যায়। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে ধারণা করে নেন যে, পোস্টারগুলির অংশবিশেষকে চাপা দেওয়ার কাজটি হয় সরকারী, নয় পুলিশী নির্দেশেই হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের এবং পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে, প্রাচীরপত্র বা পোস্টারগুলির এই স্টিল (ফটো), শো-কার্ড, পত্র-পত্রিকা মারফৎ বিজ্ঞাপনসমূহের এই সংশোধনীকার্য পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রব্যবসায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সম্মতিক্রমে সরকার নিয়োজিত একজন সেন্সার অফিসারের নির্দেশে হয়ে থাকে। গেল ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ক্যালকাটা ইনফরমেশান সেন্টার-এ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার চলচ্চিত্রপ্রচার সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে-তথ্য পরিবেশন করেন, তা থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যমে ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই চলচ্চিত্রব্যবসায়ীরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই চলচ্চিত্রপ্রচার সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর এই প্রাক-অনুমোদনে সম্মত হন। কারণ তা না হলে এ সম্পর্কে অপর যে-পথ খোলা ছিল, সেটি হচ্ছে চলচ্চিত্রের প্রচার সংক্রান্ত বিশেষ আইন প্রণয়ন করা। কারণ যৌন-আবেদনপূর্ণ, দৃষ্টিকটু এবং অশ্লীল প্রচারপত্র ইত্যাদি ব্যাপারে তখনই যে প্রবল জনমত গঠিত হয়েছিল, তার পরি-প্রেক্ষিতে এই ধরনের কিছু করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্র এবং শহরের বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতিতে অনুষ্ঠিত ক্যাবারে বা অপরাপর ফ্লোর-শো ইত্যাদি প্রমোদানুষ্ঠান সম্পর্কে প্রচারকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখবার উদ্দেশ্যে এগুলির প্রাক-অনুমোদন বা সেন্সারকার্যের উদ্দেশ্যে ন'জন সদস্য নিয়ে যে একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করা হয়েছে। তাতে আছেন : (১—৪) ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের চারজন প্রতিনিধি, (৫) কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটির একজন প্রতিনিধি, (৬) সিনেমা একজিবিটার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি, (৭) হোটেল অ্যাণ্ড রেস্তোঁরা অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি এবং (৮-৯) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুইজন অফিসার—সেন্সার অফিসার ও হোম (পাবলিসিটি) ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার অব পাবলিসিটি (সম্প্রতি ডিরেক্টার অব পাবলি-সিটির পরিবর্তে ডেপুটি ডিরেক্টার অব পাবলিক রিলেসান্স)। সাধারণত মাসে এক-বার করে এই পরামর্শ সমিতির অধিবেশন হয়ে থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও জন-সাধারণের অনুভূতির প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রেখে এঁরা এই প্রচারবিষয়ক সেন্সার-কার্যের জন্যে একটি সর্বসম্মত নিয়মাবলী প্রস্তুত করেছেন এবং সেই অনুসারে সেন্সার অফিসার তাঁর কাছে উপস্থিত পোস্টার, স্টিল ফটো, প্রচারের জন্যে বিভিন্ন অঙ্কিত ছবির ডিজাইন, স্লাইড, শো-কার্ড, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-চিত্র, বুকলেট প্রভৃতির সেন্সার করে থাকেন; কিছু তিনি অনুমোদন করেন, কোন-কোনটা আবার তাঁর অনুমোদন পায় না, আবার কতকগুলিকে তিনি কিছুটা সংশোধিত আকারে প্রকাশিত করবার নির্দেশ দেন। সেন্সার অফিসারের নির্দেশ যদি কোন ক্ষেত্রে অমান্য করা হয়েছে বলে জানতে পারা যায়, সেক্ষেত্রে অমান্যকারী সংস্থা যে-বিশেষ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, তাঁদের কাছে ব্যাপারটা গোচর করা হয় যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যে। সমস্ত পদ্ধতিটাই

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে সেন্সার অফিসার নিজে থেকে অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না। সেন্সার অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ আবেদন করলে পরামর্শ সমিতি বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করে অধিকাংশের ভোটে ব্যাপারটি মীমাংসা করেন। এই সেন্সার করান ব্যাপারে কোন খরচ নেই।

শ্রীনাহার জানালেন, এই পরামর্শ সমিতিতে বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে একজন প্রতিনিধি গ্রহণের কথা তাঁরা কিছুদিন থেকে চিন্তা করছেন।

চিত্র-সমালোচনা

(১) **ফিরে চল** (বাঙলা) ঃ অলকানন্দা এণ্টারপ্রাইজ-এর নিবেদন; ৩,৩৮৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ অতনুকুমার; কাহিনী ঃ বাসন্তী দেবী; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ ভি বালসারা; গীতরচনা ঃ প্রণব ভট্টাচার্য; চিত্রগ্রহণ ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দানুলেখন ঃ সৌমেন চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্পনির্দেশনা ঃ গৌর পোদ্দার; সম্পাদনা ঃ শিবসাধন ভট্টাচার্য; নেপথ্য কণ্ঠদান ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র; নৃত্য-পরিচালনা ঃ কেনেথ-কুমার; রূপায়ণ ঃ অসিতবরণ, অতনুকুমার, তরুণকুমার, জহর রায়, কমল মিত্র, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, সবিতা বসু, আরতি দাস, সন্ধ্যা দেবী, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় (নৃত্য) প্রভৃতি। অলকানন্দা এণ্টারপ্রাইজ-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ১৬ই ডিসেম্বর থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে।

একটি মেয়ে বিয়ের আগে জানতে পারল, যার সঙ্গে তার বিয়ে হতে চলেছে, সে অসচ্চরিত্র—একটি কুমারী কন্যার সর্বনাশ করার পরে আসছে তাকে বিয়ে করতে। কাজেই এ বিবাহে তার আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক এবং তাই এড়াবার জন্যে বাড়ী ছেড়ে সে পালাল। পথে যে-যুবকের সঙ্গে তার আলাপ হল, তারই আশ্রয়ে সে বাস করতে লাগল। দু'জনের দু'জনকে ভাল লাগল। কিন্তু ভাললাগা যখন ভালবাসায় পরিণত হতে চলেছে, তখন যুবকটি হঠাৎ পিছিয়ে গেল। মেয়েটি অনন্যোপায় হয়ে বাড়ী ফিরে গেল নিজেকে ভবিতব্যের হাতে সমর্পণ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটনা ঘটে গেছে। যে-কুমারী কন্যার সর্বনাশ ঘটেছিল, সে আশ্রয় পেয়েছে যুবকের কাছে এবং তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানবার পরে যুবকটি তার বন্ধুদের সাহায্যে সেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে বাধ্য করে সেই মেয়েটিকে বিবাহ করতে। অতঃপর পলাতকা মেয়েটির বিবাহ-বাসরে অসচ্চরিত্র ব্যক্তিটি মদ্যপরূপে উপস্থিত হয় বরের বেশে এবং অনেক রকম ছলাকলার পরে হঠাৎ ভদ্দর লোক হয়ে গিয়ে জাহির করে ঃ সে এই পলাতকা মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না এবং ইতিমধ্যেই সে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে। অপর দিকে পলাতকা মেয়েটির আশ্রয়দাতা যুবকের বন্ধুরা পুলিশের ছদ্মবেশে বিবাহ-বাসরে উপস্থিত হয়ে মেয়েটিকে যুবকটির রেজেস্ট্রী করে বিবাহিতা পত্নীরূপে দাবী করে এবং মেয়েটি সে দাবী স্বেচ্ছায় স্বীকার করে ধন্য হয়। এর মধ্যে আবার সখের ডিটেকটিভ আছে মেয়েটিকে খোঁজবার জন্যে।

যেমন মামুলী ধরনের গল্প, তেমনই মামুলী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা। দর্শককে অভিভূত করবার মত মুহূর্ত সৃষ্টির প্রয়াসই নেই কোথাও। মাত্র একেবারে শেষের দৃশ্যে যে-চরিত্রটিকে সারা ছবিতে চরিত্রহীনতার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে, সেই কুমার বাহাদুর সনৎ সেন যখন মাতলামির মুখোস খুলে ফেলে অকস্মাৎ ভালভাবে চলবার পণ করে বসেন এবং যে-কুমারী মেয়েটির জীবনকে কলঙ্কিত করেছিলেন, তাকে নিজের বাপের সমানে স্ত্রী বলে স্বীকার করে বসেন তখন দর্শকরা রীতিমত চমকিত হন; হয়ত কারুর কারুর কাছে কুমার বাহাদুরের এই হঠাৎ-সাধু হয়ে পড়া উপভোগ্যও বোধহয়।

মাত্র এই কারণেই কুমার বাহাদুরের ভূমিকায় অসিতবরণ কিছুটা নাটনৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন। এ ছাড়া আর কারুর কিছু করবার নেই। এমন কি সখের ডিটেকটিভ—কানু ও বংশীর ভূমিকায় যথাক্রমে তরুণকুমার ও জহর রায়ও বিশেষ কিছু করবার সুযোগ পান নি। নায়িকা সুজাতা (পলাতকা কন্যা)-রূপে সবিতা বসু এবং নায়ক গৌতমরূপে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অতনুকুমার চলেছেন, ফিরেছেন কথা কয়েছেন এবং প্রথমজন গানের সঙ্গে ঠোঁট নেড়েছেন; কিন্তু ভূমিকা দুটিতে করণীয় কিছু না থাকায় তাঁদের নিজীব মনে হয়েছে। কমল মিত্র, পঞ্চানন ভট্টাচার্য শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, আরতি দাস প্রভৃতি প্রথিতযশা শিল্পী বিভিন্ন ভূমিকায় কাহিনীর চাহিদা মিটিয়েছেন মাত্র।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ চলনসই-এর উর্ধ্বে উঠতে পারে নি; এমন কি রামানন্দ সেনগুপ্তের মত ক্যামেরাম্যান পর্যন্ত অতি-সাধারণ পর্যায়ের কাজ করেছেন। ভি বালসারার সুর-যোজনা বা আবহ-সঙ্গীত রচনাতেও কোনও অভিনবত্বের নিদর্শন পাওয়া গেল না।

(২) **আয়ে দিন বাহারকে** (হিন্দী) ঃ ফিল্মযুগ-এর নিবেদন; ৪,৮৮৫'৯৪ মিটার দীর্ঘ এবং ১৮ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ জে. ওমপ্রকাশ; পরিচালনা ঃ রঘুনাথ ঝালানী; কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ শচীন ভৌমিক; সংলাপ ঃ সর্দার জৈলানী;

সংগীত-পরিচালনা ঃ লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারে-লাল; গীতরচনা ঃ আনন্দ বক্সী; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা ঃ ভি বাবাসাহেব; চিত্রগ্রহণ ঃ কে সি রাজা; শব্দানুলেখন ঃ এ সে পারমার; সংগীতানুলেখন ঃ মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা ঃ সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা ঃ প্রতাপ দাভে; নৃত্য-পরিচালনা ঃ সত্য নারায়ণ ও সুরেশ ভাট; নেপথ্য কণ্ঠদান ঃ লতা মঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফী, আশা ভোঁসলে ও মহেন্দ্র কাপুর; রূপায়ণ ঃ ধর্মেন্দ্র, বলরাজ সাহানী, রাজেন্দ্রনাথ, রাজ মেহরা, সুন্দর, মোবারক, আশা পারেখ, নাজিমা, সুলোচনা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, লীলা মিশ্র, দুলারী প্রভৃতি। অমরজ্যোতি পিকচার্স-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ১৬ই ডিসেম্বর থেকে হিন্দ, কৃষ্ণা, মেনকা, খান্না, কালিকা, ইণ্টালী এবং অন্যান্য চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

মানুষ কি তার জন্মের জন্যে অপরাধী? তার হাজার রূপ-গুণ থাক, তবু সে কি সামাজিক রীতিনীতির বহির্ভূত জন্মের জন্যে সমাজের কাছ থেকে ক্ষমা পাবে না? — এই প্রশ্নটি অবলম্বন করে দর্শকদের নাড়া দেবার মত, তাদের মনে সাড়া জাগানোর মত আবেদনপূর্ণ ছবি তৈরী করা হয়ত সম্ভব ছিল। কিন্তু বোম্বাই চিত্র-জগতের কাছ থেকে সে ধরনের ছবি আশা করাই অন্যায়। তাই ফিল্মযুগ-এর ইস্টম্যান কালারে তোলা বর্ণাঢ্য সুদীর্ঘ চিত্র "আয়ে দিন বাহারকে" এই প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়েছে এবং আরও পাঁচখানি হিন্দী ছবির মত সাধারণ দর্শককে মাতিয়ে তোলবার মত নাচ, গান, হাসি, মস্করা এবং মন দেওয়া-নেওয়ার দৃশ্যে জমজমাট হয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। নায়ক রবি যখন মা যমুনাকে প্রশ্ন করেছে ঃ আমি কি সত্যই তোমার কুমারী অবস্থায় তোমার গর্ভে এসেছিলুম, তখন যমুনা লজ্জায় ভেঙে পড়ে স্বীকার করেছিলেন ঃ হ্যাঁ। কিন্তু পরে রবির পিতা বিচারক রামপ্রকাশ শুক্লা বললেন ঃ যমুনার সঙ্গে তাঁর গোপন বিবাহের ফলে রবির জন্ম হয়। কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকারের রবির জন্ম সম্পর্কে এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের কারণ বুঝলুম না। আজকাল হিন্দী ছবিতে দেখা যায়, নায়কের নিতান্ত বেহায়ার মত, বলতে পারা যায়, অসভ্য বর্বরের মত নায়িকাদের গায়ে পড়ে প্রেম নিবেদন করে। বর্তমান ছবির নায়কও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়।

অভিনয়ে অসামান্য সংযত ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেছেন বিচারক রামপ্রকাশের ভূমিকায় বলরাজ সাহানী; আশ্চর্য তাঁর বাচন এবং অভিব্যক্তি। বহুদিন এমন উচ্চাঙ্গের অভিনয় আমরা হিন্দী ছবিতে দেখি নি। নায়ক রবির ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবিষ্ট অভিনয় করে-ছেন। নায়িকা কাঞ্চনরূপে আশা পারেখ অভিনয় করেছেন সাবলীলভাবে, তাঁর নৃত্য উপভোগ্য—বিশেষ করে চ্যারিটি শো উপলক্ষ্যে সমবেত নৃত্যে "খত লিখ দে সাঁওরিয়া কে নাম বাবু" গানের সঙ্গে। নার্স রচনার ভূমিকায় নাজিমার অভিনয়ও যথেষ্ট উপভোগ্য। যমুনারূপে সুলোচনা অত্যন্ত দরদী অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। হাস্যরস যুগিয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ ও সুন্দর। অপরাপর ভূমিকায় রাজমেহরা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, লীলা মিশ্র, দুলারী, মুবারক প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। দার্জিলিং-এর চা-বাগানের নিসর্গ দৃশ্যগুলি রমণীয়। গানের সুরযোজনা এবং আবহ-সংগীত রচনায় লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। কয়েকটি গান জন-প্রিয় হবার সম্ভাবনাপূর্ণ। সংলাপ ও গানের ভাষা পরিচ্ছন্ন এবং আকর্ষণীয়।

ফিল্মযুগ-এর বর্ণাঢ্য চিত্র "আয়ে দিন বাহারকে" জনপ্রিয়তার দাবী রাখে।

—নান্দীকর

প্রেমচাঁদ রচিত 'গবন'-এর শুভমুক্তি

মুন্সী প্রেমচাঁদ রচিত বি আই প্রোডাক-সন্সের 'গবন' ২২শে ডিসেম্বর থেকে ওরিয়েণ্ট, শ্রী, পূরবী, উজ্জ্বলা প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। বৃটিশের শাসনকালে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের জন্য যে

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'খেয়া' আউটডোরে অনুপকুমার, চিত্রাবলী ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, গৌর কর্মকার ও ক্যামেরা-ম্যান দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

সাহসী যুবক মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেয়, তারই বীরত্বগাথা এ-কাহিনী। দুটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন সুনীল দত্ত এবং সাধনা। ছবিটির চিত্রগ্রহণকালীন পরিচালক কৃষণ চোপরা পরলোকগমন করেন। তাঁর এই অসমাপ্ত চিত্রের অবশিষ্ট অংশ পরিচালনা করেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

রাজেন তরফদার পরিচালিত 'আকাশছোঁয়া'

মহাশ্বেতা দেবী রচিত চলচ্চিত্রায়ণের 'আকাশছোঁয়া' ছবিটি পরিচালনা করছেন রাজেন তরফদার। সার্কাস-জীবনের পটভূমিকায় বিধৃত এ-কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ, পারিজাত বসু, ছায়া দেবী, বিনতা রায় ও শিখা ভট্টাচার্য। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'কমলে কামিনী'

গুরুদ বাগচী পরিচালিত এস ডি পিকচার্সের ভক্তিমূলক চিত্র 'কমলে কামিনী' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। প্রধান চরিত্রাবলীতে অংশগ্রহণ করেছেন শমিতা বিশ্বাস, জয়শ্রী সেন, দীপ্তি রায়, রাজা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান তিলক, জহর রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, গীতা দে ও ভারতী দেবী। সংগীত-পরিচালনায় কালীপদ সেন।

সরকার প্রোডাকসন্সের 'অজানা শপথ'

সলিল সেন পরিচালিত ও রচিত সরকার প্রোডাকসন্সের 'অজানা শপথ' বর্তমানে চিত্রগ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, নবাগত সোমেন চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী ও রেবা দেবী। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বোম্বাই

নতুন জুটি নূতন ও জীতেন্দ্র

ঝংকার পিকচার্সের রঙিন চিত্র 'শুনে রে বালম' চিত্রে নতুন জুটি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন নূতন ও জীতেন্দ্র। ছবিটি পরিচালনা করছেন পরমাত্মাজী এবং বিনয়জী। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ। কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন পৃথিরাজ কাপুর, ওমপ্রকাশ, দিলীপরাজ, বিজয়া চৌধুরী, জাগিরদার ও নবাগত প্রভাত।

আর ভট্টাচার্য পরিচালিত 'সুহগ রাত'

প্রযোজক-পরিচালক আর ভট্টাচার্য তাঁর নতুন ছবি 'সুহগ রাত'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজশ্রী, জীতেন্দ্র, শবনম, প্রকাশ এবং মেহমুদ। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সুরকার।

'কাঁচ অউর হীরা'

বীরেন্দ্র সিন্‌হা প্রযোজিত ও পরিচালিত 'কাঁচ অউর হীরা' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন হচ্ছে। ফিল্মীস্থান স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন রাজশ্রী, শশিকাপুর, জনি ওয়াকর, মনমোহন কৃষ্ণ ও নবাগত সিদ্ধার্থ। ছবিটির সুরকার লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল।

আশা মুভিজের 'এক পহেলি'

কুলদীপ প্রযোজিত ও নরেশকুমার পরিচালিত 'এক পহেলি'র একটানা দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল আর কে স্টুডিওয়। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তনুজা, ফিরোজ খান, মাধবী, মদনপুরী, রাজেন্দ্রনাথ, সাধনা ও কৃষাণ দেওয়ান। সংগীত-পরিচালনায় উষা খান্না।

পরলোকে গীতিকার শৈলেন্দ্র

হিন্দী চলচ্চিত্রের সুখ্যাত গীতিকার শৈলেন্দ্র গত ১৪ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে চলচ্চিত্র-জগৎ শোকাচ্ছন্ন। রাজকাপুর তাঁর শুভ জন্মদিনের অনুষ্ঠান বন্ধ করে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান।

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী চলচ্চিত্রের এক অনন্য সৃষ্টি 'তিসরী কসম'র প্রযোজক ছিলেন স্বর্গত শৈলেন্দ্র। বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত এ-চিত্রটি বাংলাদেশের দর্শক এবং সাংবাদিকগণ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

পরলোকগত শৈলেন্দ্রর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

স্টুডিও থেকে বলছি

বেঁচে থাকার প্রেরণা একটা চাই। এবং সে প্রেরণার উৎস যদি মহৎ হয়, তাহলে মানুষ মহান হতে বাধ্য। অন্তত ডাক্তারবাবুকে দেখে তাই মনে হয়। এমন মানুষ সংসারে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণের জন্যই নিজের জীবনটা বিলিয়ে দিলেন। তাই তো গ্রামের দেহাতী মানুষেরা ডাক্তারবাবুর উদ্দেশ্যে বলে, 'উনি নররূপী দেবতা'।

সারা জীবন ডাক্তারি-চাকরি করার পর তিনি শেষজীবনে রিটায়ার করে বিহারের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। সংসারে আপনজন বলতে তাঁর আর এখন কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী মনু

যৌবনেই মারা গেছেন। সংসার বলতে সেই পুরোনো আমলের মৈথিল ঠাকুর আজবলাল আর ড্রাইভার আলী। একজন ঘরের আর একজন বাইরের সংগী। এ ছাড়া আত্মীয়-স্বজন বলতে যা বোঝায়, তা শুধু নামে মাত্র। কারো মনে ভালবাসা নেই। আছে হিংসা আর পরশ্রীকাতরতা। সবটাই মেকি। শুধু অভিনয়।

অদ্ভুত জীবন ডাক্তারবাবুর। হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়ান। গাড়িটা তাঁর ছোট-খাটো ডিসপেনসারি। বিনি পয়সায় গরীব চাষাভূষোদের তিনি চিকিৎসা করেন। ওষুধ দেন। বিপদে পড়লে বুদ্ধি জোগান। বিবাদ ঘটলে মীমাংসা করেন। এই সব হল ডাক্তারবাবুর প্রাত্যহিক জীবন-পরিক্রমা। একটা কিছু অবলম্বন করে তো বাঁচতে হবে! শুধু শুধু তো আর বসে থাকা যায় না। অনেকের বুড়ো বয়সে ধর্মে মতি হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুর তা হয় নি। ডাক্তারি ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর প্রবৃত্তি নেই।

এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। এ হাট থেকে ও হাটে। এই হাটে-বাজারের মানুষদের মাঝে ডাক্তারবাবুর প্রাত্যাহিকতা। গাড়িতেই তাঁর ডিসপেনসারি। একটা টেবিল আর ফোল্ডিং চেয়ার। ওষুধের প্রকাণ্ড একটা বাক্স। তাতে খোপ-খোপ করা। নানান ওষুধের শিশি। একটা আলাদা বড় ব্যাগে স্টেথোস্কোপ, ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র, থার্মোমিটার, ছোট একটা মাইক্রস্কোপ, স্লাইড, স্টেন এই সব। প্রয়োজন হলে গাছ-তলায় বসেই রক্ত, প্রস্রাব প্রভৃতি পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেন ডাক্তারবাবু।

হাটে-বাজারের বিচিত্র চরিত্রের সংগে ডাক্তারবাবুর জীবনে কত টুকরো টুকরো স্মৃতি গাঁথা হয়ে আছে। হাটের মেছুনী ছিপলি, ছিপলির ভাই শিবু, শিবুর বন্ধু চিনু, ভালিয়া, কমলি মোটর গ্যারেজের মালিক অমল, নটুবিহারী, মিঃ পাণ্ডে (এস-পি) ও তাঁর স্ত্রী থেকে শুরু করে অনেক নগণ্য লোক পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর পরম আত্মীয় হয়ে গেছে। এদের সুখ-দুঃখের সংগে ডাক্তারবাবু জড়িত। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং স্নেহে আপন করে নিয়েছে। শুধু চিকিৎসা করে উপকার করেন বলেই ডাক্তারবাবু এদের ভালবাসা পেয়েছেন তা নয়, এদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যেতে পেরেছেন বলেই সবাই তাঁকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে।

মাঝে মাঝে এ অঞ্চলের গরীব গ্রাম-বাসীরা মোড়ল লছমনলাল ও তার সহকারী-দের অত্যাচারে অস্থির ও ভীত হয়ে ওঠে; অথচ ভয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। পুলিশ পর্যন্ত মুখ বুজে থাকে। কিন্তু সরল গ্রামবাসীদের মুখ চেয়ে ডাক্তারবাবু এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এস-পি এবং ডি-আই-জি'র কাছে না এসে থাকতে পারেন না। কারণ তিনি মনে করেন, অন্যায় অসভ্য-অসুন্দরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। ডাক্তার হয়েছেন বলেই তিনি এ কর্তব্যের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। দেশ এখন স্বাধীন বলেই এ দায়িত্ব আরও প্রবল হয়েছে। বহুকালের পরাধীনতার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

নবদ্বীপের হাটে ডাক্তারবাবু সেদিন একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসলেন। ডাক্তারি-বিদ্যার প্রয়োগ হিসাবে তাতে অসাধারণত্ব কিছুই ছিল না। কিন্তু হাটসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হল। ডাক্তারবাবু একটি লোকের প্রকাণ্ড উদরী থেকে ট্রোকার দিয়ে পেট ছ্যাঁদা করে বালতি বালতি জল বার করছিলেন। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে থেকে লছমনলালের দল ছিপলিকে একা পেয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে নানান কুমন্তব্যে হাসাহাসি শুরু করে। ডাক্তারবাবু আর সহ্য না করতে পেরে লছমনলালের সংগীদের হাট থেকে বার করে দেবার জন্য জনতাদের নির্দেশ দিলেন। সংগে সংগে গ্রামবাসীরা ক্ষেপে উঠে ওদের প্রচণ্ড মার দিয়ে হাট থেকে বার করে দেয়।

দাংগা শেষ হলে কেউ কেউ ভয়ে ডাক্তারবাবুকে এসে জানায়, 'ওদের ঘাঁটিয়ে ভাল করলেন না। একদিন ওরা এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনাকে এবং ছিপলিকে বেইজ্জত করবে। লুটও করতে পারে' — ডাক্তারবাবু সবাইকে অভয় দিয়ে জানালেন, 'কোন ভয় নেই। এখনই থানায় ডায়েরি করে দিচ্ছি। তারপর ডি-আই-জি'র কাছে আমি নিজে যাব।'

কিন্তু অত সহজে লছমনলাল পরাজিত হবার পাত্র নয়। প্রতিশোধ নিতে সে বেশী দিন অপেক্ষা করল না। কয়েক দিনের মধ্যেই এক গভীর রাতে ঘটনাটা ঘটে গেল। ডাক্তারবাবু খবর পেয়ে ছিপলির বাড়িতে গিয়ে দেখেন, যা হবার তা সব হয়ে গেছে। মেজের ওপর বিস্রস্তবাসা ছিপলি পড়ে আছে। ঘরের কোণে একটা লোক লাঠি হাতে তখনো দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবুকে দেখে সংগে সংগে সে মাথায় লাঠি চালাল। ডাক্তার-বাবু মাথায় সজোরে আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

যখন ডাক্তারবাবুর জ্ঞান হল তখন সকাল হয়ে গেছে। ছিপলির কোলের ওপর মাথা রেখে তিনি শুয়ে আছেন। ডাক্তারবাবু কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, চোখের ভেতর হেমারেজ হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আচ্ছন্নের মত তিনি পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছিলেন।

দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। হাটের লোক, বাজারের লোক ভেঙে পড়ল ছিপলির বাড়িতে। কেউ কেউ বললেন, বাহাদুরি করতে গিয়েই মৃত্যু হল লোকটার। কেউ বললেন, আসলে উনি চরিত্রহীন লোক ছিলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা সবাই এক বাক্যে বলল, ডাক্তারবাবু নররূপী দেবতা ছিলেন।

আলী, আজবলাল, ছিপলি এরা সবাই হাউ হাউ করে কাঁদছিল। সকলের চোখে জল। দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবুর প্রলাপও ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেল। একদিন হাটে-বাজারের সরল মানুষগুলোকে একা ফেলে ডাক্তারবাবু স্বর্গলোকে চলে গেলেন। শুধু রেখে গেলেন মহান জীবনের একটা আদর্শ। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রেরণার উৎস যদি মহৎ হয়, তাহলে মানুষ মহান হতে বাধ্য।

বনফুল রচিত এ কাহিনীর নাম 'হাটে-বাজারে'। পরিচালক তপন সিংহ এটি চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন। সম্প্রতি ভুটানী সীমান্তে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু নম্বরে অন্তর্দৃশ্যের কাজ শুরু হয়েছে। বম্বে থেকে অশোককুমার এবং বৈজয়ন্তীমালা এসেছেন এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করতে। অসীম দত্ত প্রযোজিত এ ছবির পরিচালক শ্রীসিংহ পরি-চালনা ছাড়াও সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন। অভিনয় ছাড়াও এ ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার স্বকণ্ঠের গান সংযুক্ত হয়েছে। প্রধান চরিত্রা-বলীতে অভিনয় করছেন : ডাক্তারবাবু—অশোককুমার, ছিপলি — বৈজয়ন্তীমালা, শিবু — পার্থ মুখোপাধ্যায়, আজবলাল—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আলী — নির্মল চট্টো-পাধ্যায়, লছমনলাল — অজিতেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অনিমেষ — অজয় গাংগুলী, নটু-বিহারী — রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, চিনু—চিন্ময় রায়, মনু — শমিতা বিশ্বাস, ভালিয়া—ছায়া দেবী, কমলি—আশা দেবী,

সম্প্রতি মহিলা শিল্পীমহল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' মঞ্চস্থ করেন মহাজাতি সদনে। (ওপরে) শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে আলাপরত দেখা যাচ্ছে। (নীচে) 'কবি' নাট্যাভিনয়ের একটি দৃশ্য।

অমল—সমীর ভঞ্জ, মিঃ পাণ্ডে—সুনীলেশ ভট্টাচার্য, মিসেস পাণ্ডে—গীতা দে, লছমনলালের পিতা — প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কমলির ছেলে—সাধন সেনগুপ্ত। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন দীনেন গুপ্ত।

মঞ্চাভিনয়

জাগো (আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটক) : নাট্যকার ও পরিচালনা : রাসবিহারী সরকার; মূল কাহিনী : বনফুল (রচিত ত্রিবর্ণ); মঞ্চমায়া : প্রহ্লাদ দাস ও রামচন্দ্র সিন্ধে; আলোক-সম্পাত : বংশী সাউ ও সহকারিবৃন্দ; আবহসঙ্গীত : অরুণ দাস; শব্দানুলেখন ও প্রক্ষেপ : চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানী; নৃত্য-পরিকল্পনা : কেনেথ-কুমার; রূপায়ণ : অসিতবরণ, নির্মলকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ গোস্বামী, রূপক মজুমদার, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, সুমিতা সান্যাল, শ্রাবণী বসু, আরতি দাস, বেলা দেবী, সঙ্গীতা কর, গীতা রায় প্রভৃতি। ১৯৬৬ সালের ১২ই অক্টোবর, বুধবার থেকে 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত-ভাবে অভিনীত হচ্ছে।

রঙ্গমঞ্চ সমাজের তথা রাষ্ট্রের দর্পণ-স্বরূপ; একথা বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তার জন্মদিন থেকে বারংবার প্রমাণিত করেছে। "নীল বানরে সোনার বাঙলা করলে এবার ছারে-খার, অসময়ে হরিশ মোলো লং-এর হোলো কারাগার"— নীলবিদ্রোহ সম্পর্কিত এই গানের সুর মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন বাসরে সগৌরবে অভিনীত হল—দীনবন্ধু মিত্র বিরচিত "নীলদর্পণ"। সমাজ-রীতিকে অমান্য করে যে-দিন হিন্দুর অন্তঃপুরে যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডকে অভ্যর্থনা জানান হল, সেদিন বাঙলা রঙ্গ-মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে উপস্থাপিত হল—গজদানন্দ নাটক। এরই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল—১৮৭৬ খৃঃ মার্চ মাসে ড্রামেটিক পারফর্ম্যান্স অ্যাক্ট। আবার যেদিন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সারা বাঙলার আকাশ-বাতাস 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত, সেদিন বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পর-পর অভিনীত হতে থাকল—প্রতাপ-আদিত্য, মেবার পতন, ছত্রপতি শিবাজী, মহারাজ নন্দকুমার, সিরাজদ্দৌল্লা, মীরকাশিম, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি দেশাত্মবোধক নাটক। আবার যখন মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আসমুদ্রহিমাচলকে প্রকম্পিত করছে, তখন বাঙলা রঙ্গমঞ্চ অভিনয় করছে : কারাগার, গৈরিক পতাকা, দেশবন্ধু। এইভাবেই চলে এসেছে স্বাধীনতা অর্জনের দিন পর্যন্ত।

১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার জয়পতাকা—স্বাধীন ভারতের অশোকচক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন হল ভারতের গৃহে-গৃহে। কিন্তু সে কোন্ ভারত? যে ভারত ১৯৪২ এর ৯ই আগস্ট অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছর আগে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ইংরেজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, সেই ভারত কি? না, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—না। ইংরেজের কূটবুদ্ধির কাছে আমাদের দেশনায়করা হেরে গিয়ে যে ত্রিখণ্ডিত ভারতের মধ্যভাগটিকে গভীর বেদনার সঙ্গে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, এ সেই খণ্ডিত ভারত। এই খণ্ডিত স্বাধীন ভারতে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু সমস্যা। মজার কথা এই যে, ভারত ত্রিধাবিভক্ত হবার আগেও এঁরা ভারতবাসীই ছিলেন এবং সেই হিসেবে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে জীবনপণ করে লড়াইও করেছিলেন। আর আজও এঁরা ভারতবাসীই আছেন। তবু এঁদের নতুন নামকরণ হল—উদ্বাস্তু। সেই স্বাধীনতা লাভের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই উনিশ বছর ধরে পুনর্বাসনের নামে এই পূর্ব পাকিস্তান গত উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা চলেছে, প্রধানত তাকেই উপজীব্য করে সুখ্যাত কথা-সাহিত্যিক বনফুল রচনা করেছেন তাঁর 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাস। গণেশ হালদার নামে একজন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট-উদ্বাস্তুর ডায়েরী দিয়ে উপন্যাসের আরম্ভ এবং মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ ঘটনা ও মাঝে মাঝে তার ডায়েরী চিঠি বা যার আশ্রয়ে সে ছিল, সেই ডাঃ সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের ডায়েরীকে আশ্রয় করে এই উপন্যাসের বিস্তৃতি ও পরিণতি। এই উপন্যাস সম্পর্কে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এর লেখক বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) নিজে একজন উদ্বাস্তু নন। কাজেই তিনি যা লিখেছেন,

নির্মল মিত্র পরিচালিত **প্রথম বসন্ত** চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায়

সেটা মাত্র শিল্পীর অনুভূতি দিয়েই লিখেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের একদেশদর্শিতা তাঁর রচনার মধ্যে আবিলতা আনতে পারে নি। তাঁর মানসিকতা দিয়ে তিনি যা সত্য বলে বুঝেছেন, তাকেই তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

এই "বিবর্ণ" উপন্যাস অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বর্তমানে বিশ্বরূপায় অভিনীত নাটক—"জাগো"। নাট্যরূপদাতা এবং পরিচালক রাসবিহারী সরকার কিন্তু উপন্যাসটির শেষ ভাগকে হুবহু অনুসরণ না করে নাটকের প্রয়োজনে একটি ভিন্ন পরিণতির দিকে নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য এই পরিণতির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত মূল-কাহিনীর ভিতরে গণেশ হালদার প্রদত্ত বক্তৃতার (বনস্পতি বিদ্যালয়ে) মধ্যেই দেওয়া আছে। উপন্যাস থেকে যে-সকল ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্র বেছে নিয়ে তিনি তাঁর নাটকটির সুস্পষ্ট বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন, সেগুলি এমনই বাস্তব এবং বর্তমান যুগোপযোগী যে, তাঁর নাট্যচিন্তার সঙ্গে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা না করে উপায় নেই। বর্তমানের সাধারণ মানুষকে ডেকে পূর্ববঙ্গের (পাকিস্তানের) উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে বহু সমস্যার প্রতি অঙ্গুলিপাত করে তিনি এই নাটকের মধ্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন : জাগো।

নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে শ্রীসরকার বরাবরই নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পক্ষপাতী। বর্তমান "জাগো" নাটকেও তাঁর অনুসন্ধানী মনকে তৎপর দেখতে পাওয়া যায়। থিয়েটারস্কোপের [illegible] দেখি, তিনি সম্মুখটা বা কার্টেনকে বর্জন করে মঞ্চকে অনাবৃত ও শূন্য রেখেছেন। নাটকের আরম্ভের নির্দেশের সঙ্গে-সঙ্গে আলোক ধীরে-ধীরে স্তিমিত হতে-হতে সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়ে চোখের সামনে প্রথমে একটি মহাশূন্যের সৃষ্টি করে এবং পরে পশ্চাদপটে ভেসে ওঠে একটি নির্জন বনভূমি। হয় এক অর্ধোন্মাদের প্রবেশ—বাস্তুহারা গণেশ হালদার আজ অর্ধোন্মাদ—বলে তার ব্যথার কথা এবং অসাবধানে ফেলে যায় তার ডায়েরী। তার যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রবেশ ক'রে এক নাট্যকার ও এই ডায়েরীটির কয়েকটা পাতার কয়েক পংক্তি প'ড়ে সে বইটি অবলম্বন ক'রে একটি নাটক রচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, আর তখনি শুরু হয়ে যায় মূল নাটক। দৃশ্যের-পর-দৃশ্য এগোতে থাকে — চরিত্রগুলি কোথাও কথা কইতে কইতে এগিয়ে আসে—কৃষ্ণ যবনিকা দৃশ্যপটকে চোখের আড়ালে পরিবর্তনে সাহায্য করে, আবার কোথাও পিছনে শ্বেতপট উন্মোচিত হয়ে তার ওপর পড়ে স্থান নির্দেশক স্লাইড। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এইভাবে অগ্রসর হয় নাটক দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যতক্ষণ না পুরো দেড় ঘণ্টা বাদে বিশ্রাম ঘোষিত হয় প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠে। দ্বিতীয়ার্ধ চলে আরও এক ঘণ্টা ধরে এবং সব শেষে আবার প্রথম দৃশ্যটিই ফিরে আসে, যেখানে অর্ধোন্মাদ গণেশ হালদার ফিরে আসে তার নতুন ভাবনাচিন্তাকে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে, কিন্তু হঠাৎ দেখে যে, সে তার ডায়েরীটিকে খুঁজে পাচ্ছে না এবং পরে আবিষ্কার করে তার হারানো ডায়েরীকে নাট্যকারের হাতে। গণেশ হালদারের উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

প্রায় প্রতিটি চরিত্রই এমন অসামান্যভাবে সুঅভিনীত হতে বহুদিন দেখি নি। প্রকৃতির বহুবৈচিত্র্যের তন্ময় আদর্শবাদী চরিত্র ডাঃ সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় যে সহজ স্বাভাবিক দরদভরা অভিনয় করেছেন, তা সহজে ভোলবার নয়। উদ্বাস্তু গণেশ হালদারের

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত **দুষ্টু প্রজাপতি** চিত্রে কিশোরকুমার ও তনুজা

চরিত্রে নির্মলকুমারের সংযত স্বতোৎসারিত বাচন ও গতিভঙ্গী অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই দুর্দান্ত, দামাল, শিশু ডাঃ ঘোষালের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ প্রাণপূর্ণ অভিনয় হয়েছে সবচেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক—বলতে পারা যায়, নাটকের উপভোগ্যতার মূলে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। উদ্বাস্তুদের কাণ্ডারী অফিসার মিঃ সেনরূপে বিদ্যুৎ গোস্বামী কথায়, বার্তায়, ভাবে, ভঙ্গীতে এবং কেশবেশের পারিপাট্যে একেবারে জীবন্ত চরিত্র। সুবেদার খাঁর ভূমিকায় রূপক মজুমদার অত্যন্ত দরদী অভিনয় করেছেন। দর্শকরূপে কান্তি দত্ত এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে প্রতিবাদকারী পুলিশ-অফিসাররূপী অভিনেতাও তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশে ত্রুটি করেন নি। অপরাপর পুরুষ চরিত্রও সুন্দরভাবে অভিনীত হয়েছে।

স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে প্রধানা ঝিনুকের ভূমিকায় জয়শ্রী সেন বিস্ময়কর নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। রঙ্গমঞ্চে এমন চরম সার্থক অভিনয় তিনি এর আগে খুববেশী করেন নি। তনিমার চরিত্রে সুমিতা সান্যালকে অপরূপ বললেও অত্যুক্তি হবে না — মঞ্চাভিনয়ে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বেলা দেবীর ঝি অল্পের মধ্যেও প্রাণস্পর্শী। কুন্তীর ভূমিকায় আরতি দাস সুন্দর একটি চরিত্র-চিত্রণ করেছেন। শামুকের ছোট চরিত্রে শ্রাবণী বসু মন্দ নয়। বুলির ভূমিকায় সঙ্গীতা করের একটি চুড়ি পরিহিত করপল্লব মাত্র দেখানোর মধ্যে প্রযোজকের সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়; কি আশ্চর্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল দৃশ্যটি!

একটি পার্টির দৃশ্যে সুমিতা সান্যাল ও শ্রাবণী বসু যুক্তভাবে নেচেছেন টুইস্ট ধরণের নাচ এবং জয়শ্রী সেন ও দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ক্রীতদাসী নৃত্য। এই সঙ্গে ছিল আবহসঙ্গীত।

'নবরূপা'র নতুন নাটক

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ যে-সব প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করছে, তার মধ্যে 'নবরূপা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সার্কুলার রোডের প্রতাপ মেমোরিয়াল হলের ছোট্ট মঞ্চে গঙ্গাপদ বসুর 'জীবনায়ন' নাটকের মঞ্চরূপের মধ্যে এই গোষ্ঠীর শিল্পীদের নিয়মিত নাট্যানুশীলনের স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে। এবার এ'রা অভিনয় করলেন জিতেন ঘোষের 'দাগ' নাটক। প্রথমেই বলি তাদের এই প্রয়াস নাট্যানু-রাগীদের কাছে সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। প্রচুর অসুবিধার মধ্যে নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে যেতে গেলে যে আন্তর নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, তা এই গোষ্ঠীর উৎসাহী সভ্য-সভ্যাদের আছে।

'দাগ' নাটকটির মধ্যে অবশ্য নতুন নাট্যচিন্তা বিকাশের ধারা নেই আর কাহিনীর মধ্যেও তীব্র নাটকীয় সংঘাত তেমন জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি। মধ্যবিত্ত ঘরের অতিসাধারণ একটি ঘটনা এই নাটকের মর্মস্থলে গতিবেগ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। জীবন চৌধুরীর দারিদ্র্য-চিহ্নিত ছোট্ট সংসারে আছে স্ত্রী কল্যাণী, মেয়ে শর্বাণী আর দুই ছেলে ভ্যাবলা আর পিণ্টু। ধনীর ছেলে প্রবীরের সঙ্গে শর্বাণীর ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরেই এই সংসারে দেখা দিয়েছে তীব্রতর অভাব আর তখনই নেমে এসেছে নিঃসীম গ্লানির অন্ধকার। কুমারী শর্বাণীর যৌবনে মাতৃত্বের যে-দাগ চিহ্নিত হোল, উদার-সৌম্য 'প্রশান্ত'র কাছে তা পেলো এক নতুন অর্থ এবং শেষপর্যন্ত প্রবীরের অনুতাপ এসে শর্বাণীর লজ্জা মুছে দিলো। কিন্তু সেই মিলন-মদির মুহূর্তে শর্বাণীর অনুভব হারিয়ে গেলো শূন্যলোকে, হয়তো অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেশে। নাটকের শেষ নিয়ে হয়তো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। শেষের দিকে শর্বাণীর একেবার মৃত্যু না দেখালেই হয়তো ভালো হোত। ব্যাপারটা মঞ্চে একটু রহস্যাবৃত রাখলেই নাটকের আবেদন আরো গভীরতর হোত বলে বিশ্বাস।

সামগ্রিক অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় নির্দেশক বিজয় মুখার্জির আন্তরিক নিষ্ঠার কথা। তিনি যে-নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তকে সজীব ও গভীর করে তুলতে চেয়েছেন, সে-চিহ্ন নাট্যাভিনয়ের বহু জায়গায় রয়েছে। স্বপ্নের দৃশ্যের কম্পোজিসনে, শর্বাণীর প্রতি প্রশান্তর দুর্বলতার মুহূর্তে আশ্রমবাসী ছেলেদের কণ্ঠে গান সংযোগের ব্যাপারে তাঁর মানসিক সূক্ষ্মতা ধরা পড়েছে। আলোক-সম্পাতে স্বরূপ মুখার্জি প্রশংসা পাবেন, আবহসংগীত সৃষ্টিতে রথীন ঘোষ তাঁর চিন্তাকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। নৃত্য-নির্দেশনায় মণি দত্তের কৃতিত্বও অভিনন্দন-যোগ্য।

অভিনয়ে যথার্থ প্রশংসা সৃষ্টিতে যে দুজন অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁরা হোলেন কল্যাণী চরিত্রে মঞ্জুলা মুখার্জি ও জটিল চরিত্রে অমিয়কান্তি। কল্যাণী চরিত্রের কল্যাণীরূপী মঞ্জুলা মুখার্জির পেলব অভিনয়ে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর বাচনভংগিমায় এমন একটা শান্তশ্রী প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত অম্লান ছিল, যা প্রতিটি মনকে মাতৃস্নেহের ফল্গুধারায় ভরিয়ে দিয়েছে। জটিল চরিত্রের হাস্যকর মুহূর্তগুলোতে অমিয়কান্তি যে প্রাণচঞ্চল ভংগিমায় অভিনয় করেছেন, তার তুলনা সত্যি বিরল। প্রবীরের ভূমিকায় জন-প্রিয় অভিনেতা প্রবীরকুমারের অভিনয় আমাদের প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি। লতিকা দাশগুপ্তের 'শর্বাণী' প্রথম দিকে ভালো লাগেনি, শেষদিকে তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটির যন্ত্রণা পরিস্ফুট হয়েছে। শেষ দৃশ্যে আকস্মিকভাবে প্রবীরের উপস্থিতি শর্বাণীর মুখ চোখে কোন পরিবর্তন আনলো না কেন বুঝে উঠতে পারলাম না। দেবেন বন্দ্যো-পাধ্যায় জীবন চৌধুরীর ভূমিকায় তাঁর দক্ষতা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাব-ভংগিমা সব জায়গায় সমতা রাখতে পারেনি। তমাল লাহিড়ীর বলিষ্ঠ অভিনয় 'ভ্যাবলা' চরিত্রকে প্রাণ দিয়েছে। আনন্দ মুখার্জির 'প্রশান্ত' চরিত্রে অভিনয় সমগ্র নাট্যাভিনয়ে একটা প্রশান্তি আনতে পেরেছে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন পিণ্টু ব্যানার্জি, রবীন ঘোষাল, মণি শ্রীমানি, রমেশ রায়চৌধুরী, প্রণব চৌধুরী, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি দাস, লতা চৌধুরী।

লোকসংস্কৃতি সংঘ

বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনকে যথার্থ বিস্তৃতিদানের ব্যাপারে যাদের অনুশীলন সার্থক উন্মাদনায় মুখর হয়ে উঠেছে আজ, 'লোকসংস্কৃতি সংঘে'র নাম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নাট্য-প্রগতিকে প্রতিটি প্রান্তরে প্রবাহিত করে দিতে এই সংঘের শিল্পীরা যে-চেষ্টা করেছেন, তার প্রমাণ তাঁদের পূর্ব-অভিনীত নাটকগুলো। বিভিন্ন জায়গায় নাটক অভিনয় করে এ'রা বাংলার নাট্য-চিন্তাকে সম্প্রসারিত করেছেন সন্দেহ নেই।

এবার এ'রা একটি নতুন পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে কলকাতার বিভিন্ন পার্কে কয়েকটি নির্বাচিত নাটক মুক্তমঞ্চে অভিনয় করবেন, দর্শকদের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের এক আত্মিক যোগসূত্র রচনা করাই এর উদ্দেশ্য। গত ১১ই ডিসেম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীট সংলগ্ন হৃষীকেশ পার্কে এ'রা অভিনয় করলেন রবীন্দ্রনাথের 'দুর্বুদ্ধি' গল্পের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ দিয়েছেন চিত্ত ঘোষাল।

"বিচিত্রা"র নাট্যানুষ্ঠান

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা "বিচিত্রা" ২৩শে ডিসেম্বর '৬৬ ও ৯ই জানুয়ারী '৬৭ যথা-ক্রমে অন্ধ্র হলে ও মুক্ত অঙ্গনে পংকজ বসুর বাস্তবধর্মী বলিষ্ঠ নাটক "সমান্তরাল" মঞ্চস্থ করছেন। আলোকসম্পাতে তাপস

সেন, পরিচালনায় তরুণ মিত্র, শব্দ প্রক্ষেপণে নন্টুবাবু ও আবহসঙ্গীতে সলিল মিত্র আছেন। অভিনয়াংশে থাকবেন :—কবিতা রায়, ধ্রুবী মিত্র, বাদল সমাদ্দার শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সুবিমল দাস, বিবেক সারথী চৌধুরী, সমীর মিত্র, শচীন বসু, দেবু ঘোষ, প্রবীর লাহিড়ী, বিকাশ বসু, নগেন সমাদ্দার শৈলেন চক্রবর্তী, নারায়ণ চক্রবর্তী, অজিত সেনগুপ্ত, সুধীর নস্কর, হীরেন বসু, স্বপন দাশগুপ্ত ও তরুণ মিত্র।

মহিলা শিল্পীমহলের রসোত্তীর্ণ নাট্যনিবেদন

ভ্রাম্যমাণ গ্রাম্য কবিয়াল নিতাইকে কেন্দ্র করে দুটি নারীর নিস্ফল প্রণয়, অন্তর্জ্বালা এবং অবশেষে মৃত্যু। এক নারীর আত্ম-ধ্বংসী প্রেম, আর অন্যের সমগ্র আবেগ দিয়ে দয়িতকে আঁকড়ে থাকার সীমাহীন ব্যাকুলতা— দুটির কোনোটিই রাখতে না পেরে কবিয়ালের বেদনাসমুদ্র-মন্থন-করা গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা, "জীবন এত ছোটো কেনে?" এই বেদনার ইতিহাসকে শিল্পীজনোচিত সংযম, দরদ ও অভিনয় দক্ষতায় "সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী" করে তুলেছিলেন মহিলা শিল্পীমহলের প্রতিটি শিল্পী।

নিকষকালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎছটার মত জমাটবাঁধা বেদনাপুঞ্জের পটভূমিকায় নৃত্য, গীত হাসি-কৌতুকের ঝলকাশীল প্রতিমুহূর্তকে উপভোগ্য করে তুলেছে। মাসীর ভূমিকায় মমতা ব্যানার্জি, প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালের ভূমিকায় গীতশ্রী সৃষ্ট আনন্দে-চঞ্চলতার সঙ্গে সমান তালে সংগত করেছে মিতা চ্যাটার্জির নির্ভুল ঢোল-বাদ্য ও বাসবীর কাঁসর। পার্শ্বচরিত্র রাজনের ভূমিকায় ভোজপুরী উচ্চারণ, আমুদে স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিত্বকে নিপুণ চিত্রকরের মত এক আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলে মলিনা দেবী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি নাট্যাধিরাজ্ঞী-ই।

তরুণ শিল্পীবৃন্দ আত্মবিকাশের উপযুক্ত সুযোগ পেয়েছেন। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে তার মর্যাদাও রেখেছেন। কবিয়ালের নির্বাধ জীবন, শুচিশুভ্র অন্তর প্রতি মানুষকে আপন করে নেওয়ার দ্বিধাহীন মমতা—কাব্য-জীবনের প্রেরণার উৎস-স্বরূপ দুই নারীকে হারানোর বিহ্বল বেদনা ও দ্বন্দ্বকে বিশ্বস্ততার সংগে রূপায়িত করেছেন শিপ্রা মিত্র। সংগীত-প্রধান চরিত্রের সংগীত পরিবেশনও মর্মস্পর্শী ও স্বাভাবিক।

নীলিমা দাস বসনের ভূমিকায় প্রথিতযশা। কিন্তু তাঁর সুন্দর শিল্পীমনের পরিণতির বিকাশে, আলোছায়ার লুকোচুরিতে বসনের জটিল চরিত্রকে তিনি যেন অধিকতর জীবন্ত করে তুলেছেন। কঠিন ব্যামোর যন্ত্রণা ও লজ্জা প্রাণপণে গোপন রেখে জ্বরতপ্ত দেহে হাসি-গানের লীলাভিনয়ে মত্ত হয়ে যাকে পুরুষের লালসার বলি হতে হয় —কবিয়ালকে দেখে তার মনে জাগে ভালবাসার স্বপ্ন। বঞ্চিত জীবনের আত্মধিক্কার ও অভিমানের তীব্র প্রকাশ তার কবিয়ালের প্রতি অকারণ কটুবাক্যের তিক্ততায়, নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গঞ্জনায়। লীলাময়ীর চটুল নৃত্য, বেপরোয়া পানোন্মত্ততা ও উচ্ছল গানের তলে তলে অবমানিত নারীত্বের চাপা কান্নার গোমরানি দর্শকের কাছে গোপন থাকে না। ঠাকুরঝির ভূমিকায় ছন্দা দেবীর অভিনয় চলনসই।

নাটকের যদীস্বর বেদনা। এই বেদনার অশ্রু-হাসির মিশ্রণে যাঁরা উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের নাম আগেই করেছি। এঁরা ছাড়াও উল্লেখের দাবী রাখেন, রেণুকা রায়, বেলারাণী দেবী, আশা বসু, কেতকী দত্ত, সীতা মুখার্জি, গীতা দে এবং আর সবাই। নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূ দেবীর ওঝার ভূমিকায় একটিমাত্র দৃশ্যের অভিনয়ে শুধু নাট্যসম্রাজ্ঞীর উজ্জ্বল স্বাক্ষরই ছিল না—সীমিত পরিসরের মধ্যেও গভীর ব্যঞ্জনা কেমন করে রেখে যেতে হয়, তারই দৃষ্টান্ত তিনি রেখেছেন। তাঁর অভিনয় তরুণতের শিল্পীদের শিক্ষা ও অনুশীলনের বস্তু।

শুধুমাত্র মহিলা শিল্পীদ্বারা অভিনয়ে সাফল্যের বাধা অনেক। সর্বাগ্রে এবং সর্বপ্রধান হলো পুরুষ-চরিত্র ও নারী-চরিত্রে কণ্ঠস্বরের প্রভেদহীনতা। কিন্তু অভিনয় দেখবার সময় সে ত্রুটি বোধগম্যই হয় না। সকল নিপুণতাকে ছাপিয়ে ওঠে রূপসজ্জার কারিগরী এবং অভিনয়ের কৃতিত্ব।

প্রতিরূপ

পলতার বিশিষ্ট সংস্থা প্রতিরূপের শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি অভিনয় করলেন জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'বাগদত্তা' নাটক। প্রতিটি শিল্পীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এই নাট্য-প্রযোজনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিল। নাট্যনির্দেশনা ও সংগীত-পরিচালনায় ছিলেন নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ও সজল ঘটক। নাটকে ভালো অভিনয় করেন কৃষ্ণ কুণ্ডু, অংশুমালী রায়, বিমান চক্রবর্তী, সুজিত রায়, কালিপদ বিশ্বাস, পীযূস দাস, মাঃ তপন দাস, পারুলবালা দাস।

'ঘূর্ণি'

সম্প্রতি ত্রিপুরা দ্বারিকাপুরের উৎসাহী শিল্পিবৃন্দ 'ঘূর্ণি' নাটক মঞ্চস্থ করেন দ্বারিকাপুর নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন হরিহরনাথ শর্মা, কালিপদ দেবনাথ, প্রণব সোম, সিতাংশু বাগচী, নেপাল শীল,
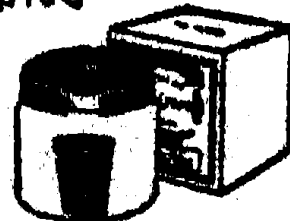
দীপকবন্ধু দাস, কল্যাণ বর্মণ, নীহার দাস, সুবোধ দত্ত, সুনীল শীল, গৌরাঙ্গ শীল, বাবলু দে। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন অশোক দত্ত।

রুপোলি চাঁদ

কিছুদিন আগে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রুপোলি চাঁদ' নাটকের অভিনয় করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেচার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ। দলগত অভিনয়নৈপুণ্যে এঁদের নাট্যানুষ্ঠান সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন হিমাদ্রীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার গুপ্ত, সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ তকরিম, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, পরিমল সরকার, হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তরুণ সেনগুপ্ত, শ্যামল দাস, নিত্যানন্দ শেঠ, গণেশ দাস। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন রণজিত দত্ত।

প্রতিযোগিতা

নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের (ইস্টার্ণ রেলওয়ে, শিয়ালদহ) পরিচালনায় একটি একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এতে শুধু অপেশাদার নাট্যসংস্থা কিংবা অফিস ক্লাবগুলো অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ছাব্বিশে ডিসেম্বর।

* * *

চিত্তরঞ্জন অ্যাথলেটিক ক্লাব আগামী মার্চ মাসে ঐতিহাসিক নাটকের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। বিস্তৃত বিবরণ জানতে গেলে সম্পাদক, চিত্তরঞ্জন অ্যাথলেটিক ক্লাব, শ্রীরামপুর, হুগলী—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

'রঙ্গশ্রী'

সম্প্রতি 'মুক্ত-অঙ্গন' মঞ্চে রমেন লাহিড়ীর ব্যঙ্গধর্মী নাটক 'নেতারঙ্গ' অভিনয় করেন হাওড়ার বিশিষ্ট নাট্য সংস্থা 'রঙ্গশ্রী'র শিল্পিবৃন্দ। আজকের জটিল সমাজজীবনের বিভিন্ন করুণ বিপর্যয়কে হাসির কলরোলের মধ্যে রূপ দেওয়া হয়েছে

রবীন্দ্রসদনে সোসাল এন্টারপ্রাইজের সপ্তম মিলনোৎসবে লোকরঞ্জন শাখা পরিবেশিত **চণ্ডালিকা** নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে উৎপলা ভট্টাচার্য ও দেবশ্রী চ্যাটার্জী।

এই নাটকে। এই নাটকে আছে তীব্র সমাজ-চেতনা আর প্রচ্ছন্ন এক জীবনজিজ্ঞাসা। সংলাপ নাট্যকারের সুগভীর বক্তব্য প্রকাশে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশী। প্রতিটি শিল্পী আন্তরিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে পেরেছেন। বিশেষ করে রমেন লাহিড়ী, নির্মল সরকার, কেষ্ট দাস, শুভেন্দু সিংহ, সূর্য দাস, প্রণব সিংহ, সবিতা মিত্র, অঞ্জলি লাহিড়ী। নাট্য-নির্দেশনায় নাট্যকার রমেন লাহিড়ী যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখেন।

দণ্ডকারণ্যে অভিনয়

পর পর দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে দণ্ডকারণ্যের 'কোনডাগাঁও স্টাফ কলোনী'র শিল্পীরা স্থানীয় অধিবাসীদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছেন। নাটক দুটি হোল পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'চার দেওয়ালের গল্প' আর পরীক্ষিতের 'অন্তরঙ্গ'। দুটি নাটকই অভিনয়ের দিক থেকে সুন্দর হয়েছিল। প্রথম নাটকটি পরিচালনা করেন এস আর দাশগুপ্ত। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন কেশব রায়, সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত, মুকুল বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, হরিশ বিশ্বাস, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এস মজুমদার, পুষ্প সাহা, অলোকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি ভট্টাচার্য। মুকুল বিশ্বাসের পরিচালনায় দ্বিতীয় নাটকটিতে অংশগ্রহণ করেন বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল বিশ্বাস, সমীর সেনগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, তুষার বিশ্বাস, কাশীনাথ ঘোষ, অনিল ঘোষ, বি কে পাল, অমল গোস্বামী, তরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

"জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"-এর ট্রেড-শো প্রসঙ্গে :

ইন্দিরা, সিনেমায় গেল শুক্রবার সকালে "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"-এর ট্রেড-শো উপলক্ষে যত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল, তাঁদের সকলকে এক সঙ্গে একটি প্রদর্শনীতে ছবিটি দেখাতে হলে ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহের অন্তত দ্বিগুণ স্থানের প্রয়োজন হয়, এই তথ্যটুকু আমন্ত্রণকারীদের জানা উচিত ছিল। তাঁদের আরও জানা উচিত, যে প্রদর্শনীতে প্রবেশলাভের জন্যে নিমন্ত্রিতের দল কাতারে-কাতারে উপস্থিত হয়ে ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয়, সে প্রদর্শনীতে চিত্র-সমালোচকদের আহ্বান জানান একেবারেই অযৌক্তিক।

একটি শুভ সংবাদ

৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ বৃহস্পতিবার সাউথ বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীক্ষীরোদভূষণ চক্রবর্তীর কন্যাপ্রতীম ভগ্নী শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তীর সঙ্গে ৩।সি, মাধব দাস লেন, কলকাতা নিবাসী শ্রীরামধন ভট্টাচার্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হয়েছে।

ভিনদেশী ছবি

একটি সফল রুশচিত্র 'এ সোলজারস ফাদার'

গত বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রুশ-জার্মান যুদ্ধকালের বাস্তব কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত রুশ-চিত্র 'এ সোলজারস ফাদার' ভারতীয় দর্শকের কাছে একটি শ্রেষ্ঠ উপহার। এ-ছবির কৃষক-নায়ক বৃদ্ধ পিতা যুদ্ধে আহত তাঁর পুত্রের দুঃসংবাদ পেয়ে যুদ্ধ-অঞ্চলে যাত্রা করেন। সুদীর্ঘ সফরে তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তা এ-চিত্রে বর্ণিত। এ-কাহিনীর যবনিকা বার্লিন যুদ্ধের অন্তিমপর্বে। শেষমুহূর্তে পিতা তাঁর প্রাণহীন পুত্রকে খুঁজে পান। কর্তব্য-রত পুত্রবৎসল পিতার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেন মস্কো ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও লেনিন পুরস্কার বিজয়ী সের্গো জাখারিয়া-দজে। ছবিটির পরিচালক রেজো খেইদজে। এই চিত্রটি বর্তমানে কলকাতার এলিট চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সোলজার্স ফাদার চিত্রের দৃশ্য

ওয়াল্ট ডিজনী

একটী লোকোত্তর প্রতিভা
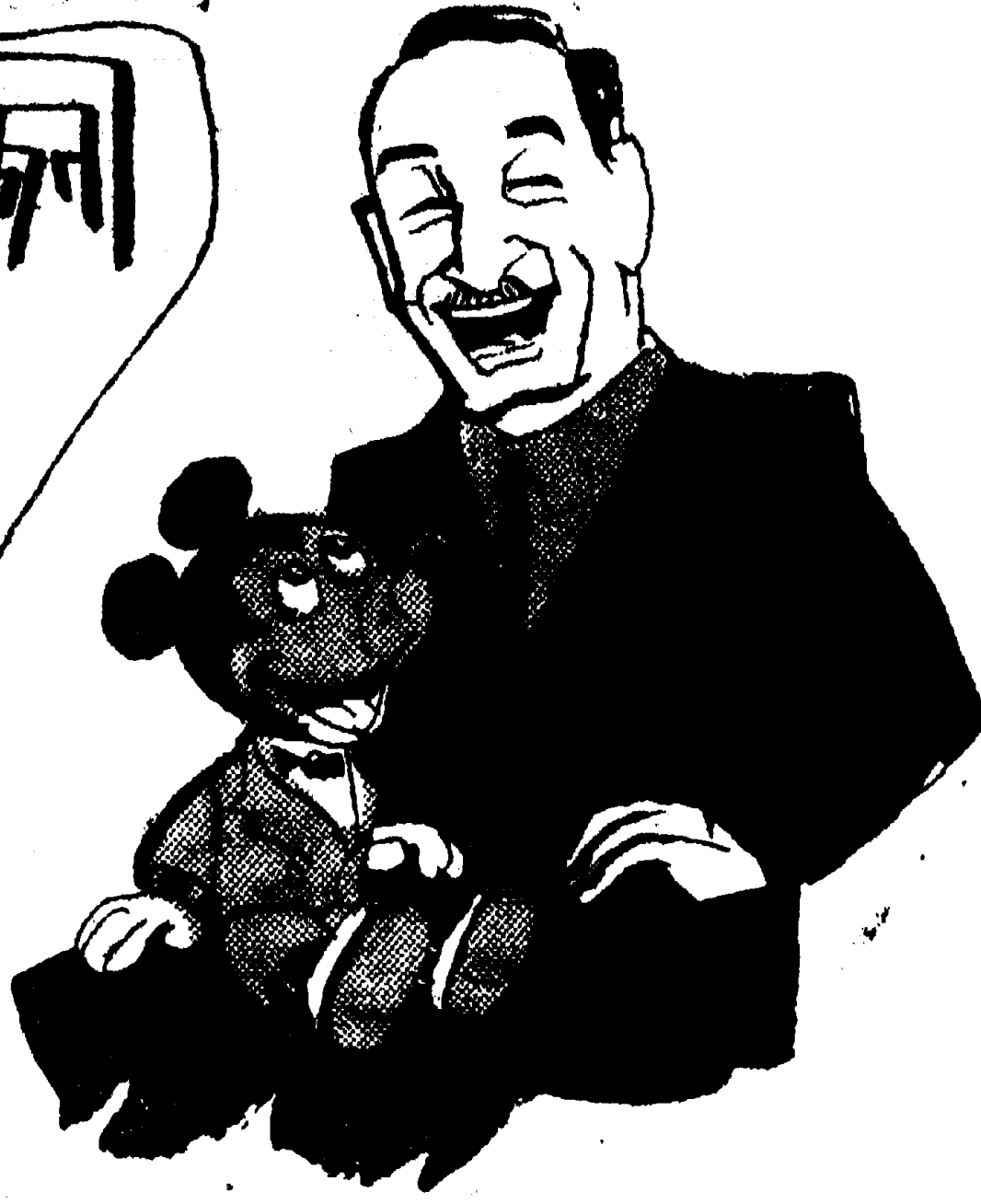
ওয়াল্ট ডিজনী মারা গেলেন বৃহস্পতি-বার ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ১৯৬০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটা আন্দাজ তাঁর ক্যালিফোর্ণিয়ায় বার্বাঙ্ক কার্টুন স্টুডিওতে। কিন্তু সেটা মাত্র সেকেন্ড দশেকের জন্য। তখন তিনি দৌড়াচ্ছিলেন তাঁর বাস্তব ছবির LOCATION শুটিংয়ের জন্য কোনো গ্রামের দিকে। আমায় দেখে প্রায় হাত নেড়েই চলে গেলেন। তখন তাঁর প্রধান ANIMATOR এবং পরে আমার বন্ধু বব ইয়ংকুইস্টের সঙ্গে পরিচয় করানোর পর তাঁর হাতে আমার তৈরী এক বাক্স কাফীস্কোপের চলন্ত কার্টুন ছবি উপহার দিলাম ডিজনীর জন্যে। ভেতরে লিখে দিলাম— In admiration from a friend in the same line from another side of the Planet. PICIEL, Calcutta, India.

ডিজনী যে কতবড় প্রতিভা তা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যাবে না। লস এঞ্জেলসে পৌঁছানোর পর যখন অভিনন্দনকর্তা মিস্টার কুম জিগ্যেস করলেন, হলিউড দেখবেন না? আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর প্রতিটি বড় রাষ্ট্রে তাদের নিজের একটি করে টয় হলিউড আছে। ভারতেরটা আছে বোম্বাইয়ে। কিন্তু যেটা পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই সেটাই আমি দেখতে চাই, ডিজনীর কার্টুন ফিল্ম স্টুডিও। ইয়ংকুইস্ট আমার কাফীস্কোপ দেখেই অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, কোথায় এ ছবি আঁকা শিখলেন আপনি? Your animation is perfect! আমি হেসে বলেছিলাম, আপনাদের এত লোক এই কাজ করচে এখানে, আর আমারটা দেখে এত আশ্চর্য হচ্ছেন? হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে ওদের তো আমরা কজন শেখাই। তারপর শিখে নিয়েই ওরা পালায় বিরাট পয়সা উপায়ের জন্য। আমাদের এখানে ওরা শিখতে আসে শুধু এই জন্যে যে 'Walt is never satisfied until it is perfect!'

উপরে এই নিজের কথাটুকু লিখতে হল এই কারণে নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে একাধারে সাধক ও শিল্পী হওয়া যায় না। ডিজনী ছিলেন তাই।

কিন্তু ডিজনীকে তো পৃথিবীর ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে তাঁর তৈরী চরিত্র মিকি-মাউস, ডোনাল্ড ডাক এগুলোর জন্যে শুধু। আসলে ডিজনী এর চাইতে অনেক বড় এবং শতমুখী প্রতিভার একটি দৈত্য ছিলেন তিনি বলতে গেলে। প্রথম নির্বাকযুগে তিনি কাফীস্কোপের মত খেলনার বই, যার মিকি, ডোনাল্ড ও গুফি চরিত্র এ তিনটির জীবন্ত ছবির প্যাড, আমি তাঁর ডিজনী-ল্যাণ্ডে বিক্রী হচ্চে দেখেচি। সেযুগে তাঁর প্রথম নির্বাক চরিত্র ছিল KRAZY CAT অর্থাৎ পাগলা বেড়াল। তারপরই সবাকের যুগে আরম্ভ হলো মিকি মাউস ও তার গিন্নী মিনি মাউস, ডোনাল্ড ডাক, গুফি কুকুর ইত্যাদি। এগুলো সবই পাঁচ মিনিটের খেলা।

তারপর তাঁর প্রথম চেষ্টা হলো পুরো দুঘণ্টার কার্টুনে আঁকা ছবি। স্নো হোয়াইটের জন্ম হলো। পৃথিবীময় হৈ-হৈ পড়ে গেল। দুর্ধর্ষ সাহস ছিল তাঁর, কেননা হাতে আঁকা ছবি পাঁচ মিনিটের বেশী দেখলে চোখ জ্বালা করে। কিন্তু অসম্ভব খেটে সেটাকে নিখুঁত করে খাড়া করলেন তিনি। তারপর অনেক বড় বড় পুরো ছবি, পিটার প্যান, ঘুমন্ত রাজকন্যা, Cinderella কত নাম করবো? কিন্তু এতেও খুশী নন তিনি। তখন চেষ্টা করলেন জীবন্ত মানুষের ছবির সঙ্গে কার্টুন ছবির মন্তাজ ও কথাবার্তা।

এরপর তাঁর মাথায় ঢুকলো সঙ্গীতের মূর্ছনাকে ছবিতে রূপ দেবেন। তখন দেখা গেল, গাছপালা, কুঁড়েঘর, ব্যাঙের ছাতা, ফুল, ফল সবাই সুখ-দুঃখের কথা বলছে, আদিম যুগের ডাইনোসরের জগতের গান পর্যন্ত। 'ফ্যান্টাসিয়ার' জন্ম হল। ঐ যে আমাদের আকাশবাণীর উদ্বোধনের সুরটা হচ্ছে বাঁশী পান্নালালের সৃষ্টি, তেমনি কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রবিবারের কলকাতা রেডিওতে ইংরাজীতে Auntie Tara প্রোগ্রামে Calling all Children এর উদ্বোধনীটা ছিল Stravinsky -র দেওয়া ডিজনীর ব্যাঙের ছাতার নাচের সুর।

এতেই কি শেষ? ডিজনীর চূড়ান্ত উদ্ভট কীর্তি হলো, অঙ্কে জ্যামিতির

বীজগণিতে ফর্মুলাগুলোর, ত্রিভুজ-চতুর্ভুজের যত রাজ্যের চমৎকার ব্যাখ্যা। যেন খেলা করে বুঝিয়ে দেখাচ্ছে ছবিতে 'Mathemagic'! কী নেই লোকটার মাথায়?

কিন্তু শুধু মূল নতুনত্বে তো আর ব্যবসা চলে না। সম্মান বৃদ্ধি পায় শুধু! এই কারণে ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সেযুগে লিখছিলেন 'Rabindra Nath is a great poet simply because he is not understood'! এ বিষয়ে ডিজনী ভাগ্যবান, তিনি আমেরিকায় জন্মেছিলেন যেখানে প্রতিভার জন্য কখনো অর্থের অভাব হয়নি তাঁর। আর শুধু এই কারণেই পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে হাতে আঁকা কার্টুনের ছবি ব্যবসায় চালানো সম্ভব হল না। আমাকে বন্ধুবর ইয়ংকুইস্ট তাই বলেছিলেন, সিনেমা কার্টুনটা আমাদের একটা প্রেস্টিজের জিনিস। তাই এটাকে রেখেছি। কিন্তু এতে লাভ নেই। অন্যান্য দেশে ওরা পুতুল নাচ দিয়ে সিনেমা দেখায়।

এই সব কারণেই শেষপর্যন্ত ডিজনী আরম্ভ করলেন সাধারণ সিনেমার ছবি। তখন জন্মালো ট্রেজার আয়লণ্ড, পিপলস আণ্ড প্লেসেজ যা আজকাল ট্যুরিজমের পর্যায়ে এসে গেছে ও অন্যান্য ছবি। কিন্তু তাতেও তিনি খুশী নন। তখন বেরুলো আফ্রিকান লায়ন, লিভিং ডেজার্ট, সীল আয়লণ্ড, নেবার্স হাফ একার ইত্যাদি। পৃথিবীর লোক হাঁ করে দেখতে লাগলো তাঁর কাণ্ড-কারখানা। ডিজনীর ছবি? ও, তবে নিশ্চয় ওঁর ছবিতে অনেক নতুন কিছু আছে। অ্যাবসেণ্ট মাইণ্ডেড প্রফেসার বা অন্যমনস্ক মাস্টারমশাই এরই একটা
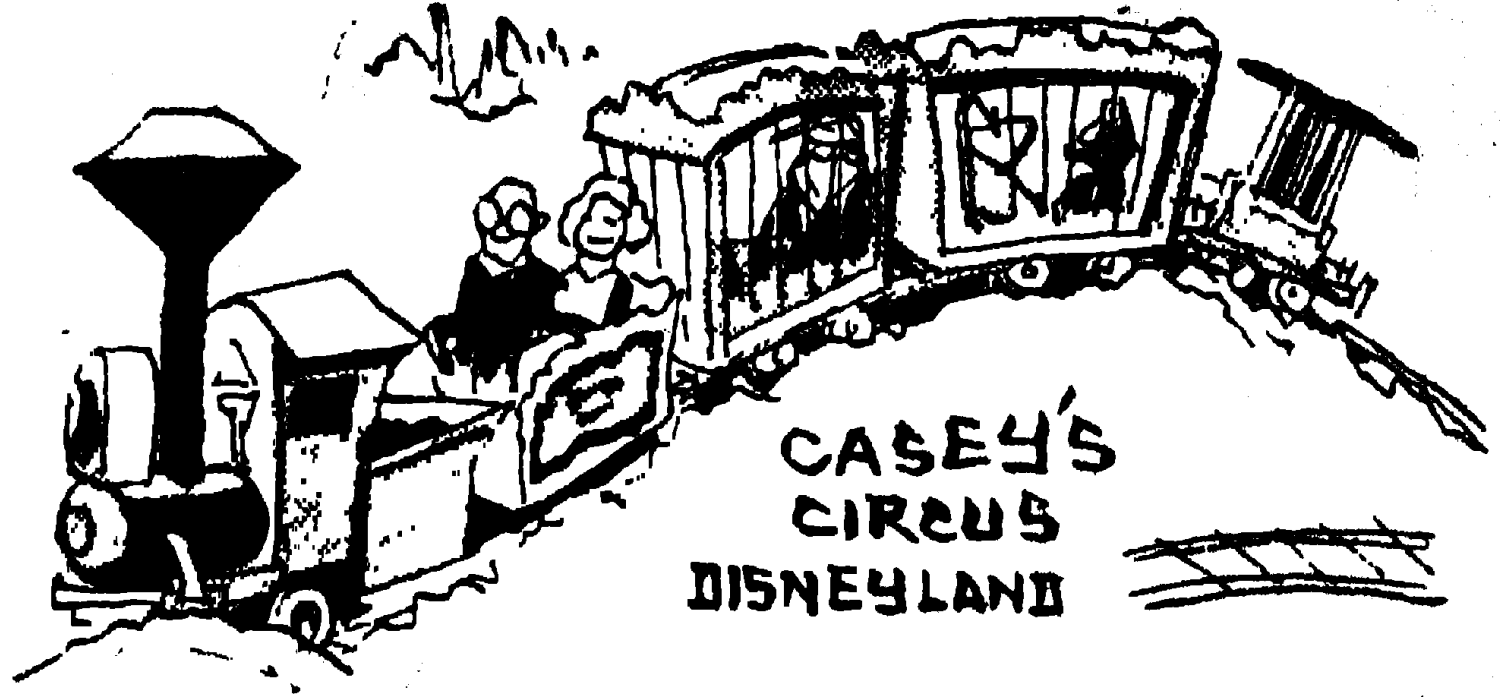
নমুনা—যা Science Fiction-এর পর্যায়ে উঠে গেছে।

শেষপর্যন্ত প্রতিভার মতো তিনি শহরের বাইরে ঘুরে দেখলেন গ্রামের মেলা, নাগরদোলা, মরণকূপ, কোনি আয়লণ্ড ইত্যাদি। তখন এতেও হাত দিলেন তিনি। জন্মালো ডিজনীল্যাণ্ড, অ্যানাহিম, ক্যালিফোর্ণিয়ায়। সারা জগৎ স্তব্ধ হয়ে দেখে
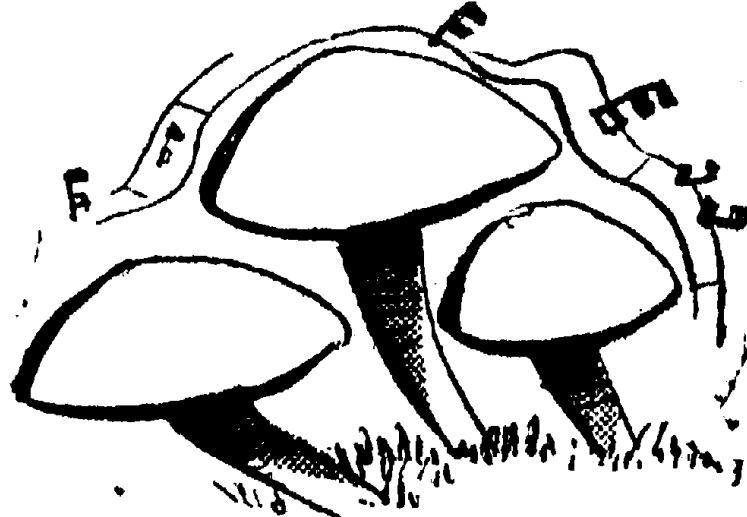
ব্যাঙের ছাতার নৃত্য
(ফ্যান্টাসিয়া)

পুরাকালের মানুষকে, ডাইনোসরের ঝগড়াকে, রেড ইণ্ডিয়ানের দেশ, ভবিষ্যতের দেশ Tomorrowland। সেখানে একটা ছোট্ট প্ল্যানেটোরিয়াম আছে, আর তার ভেতরে ঢুকেই যেন রকেটে চড়ে চাঁদে যাওয়া যায়। অ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ড, ছোটদের গল্পের শেয়াল-পণ্ডিতের দেশ, মিকিমাউসের বাড়ী ইত্যাদি। সবই ব্যাটারীতে ছোট ছোট টয় মডেলে তৈরী। ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা Sleeping Beauty-র প্রাসাদ, রাজকন্যা ঘুমচ্ছে। আবার ডুবুরী জাহাজে চড়ে জলের নিচে গিয়ে মাছের দেশে বেড়িয়ে আসা—কী নেই?

ডিজনীর মন্ত্র অর্থাৎ 'মটো' ছিল এই— Disneyland will never be complete! অর্থাৎ যেদিন এর কাজ শেষ হলো—সেদিন ডিজনীর নটে গাছটিও মুড়োলো।

ডিজনীর আরো দুটো বড় কাজ হলো—প্রথমটা, সার্কারামা, যেটা কলকাতায় দেখানো হয়েছিলো বছর দু'তিন আগে—এক অদ্ভুত কায়দা গোলাকার একটা হলঘরে ঢুকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই যেন আমেরিকায় বেড়াতে এসেছি, গাড়ীতে চড়ে দেখছি চারদিকে বিরাট বাড়ী, তার বিরাট সেতু, তার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ন। যেন দেখতে দেখতে পা টলচে!

তা ছাড়া ১৯৬৪-৬৫ সালের নিউইয়র্ক বিশ্বমেলায়ও তাঁর বহু দান রয়েছে। কিন্তু তাঁর শেষ সৃষ্টি হলো, ডিজনীর জগৎ Disneyworld। এরিজোনার কাছাকাছি একটা বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া জেলা আন্দাজ স্থান জুড়ে পাহাড়, নদী, প্রপাত, বন, জীব-জন্তু, মানুষ, আদিম ও অনাগত ভবিষ্যতের একটা রূপ—সব মিলিয়ে একটা মানুষের জন্য সৃষ্টি—যেখানে স্থান-কাল-পাত্র সব মিলিয়ে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু এটার প্ল্যানও সবে আরম্ভ হয়েছিল! শেষ আর হলো না। বোধহয় এই খাটুনির চাপে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

তবে ডিজনী ভাগ্যবান। তাঁর প্রতিটি চেষ্টায় দেশের মানুষ ও রাষ্ট্র তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, উৎসাহী ব্যবসায়ীরা অর্থ ও সুবিধা দিয়ে, আর বাইরের জগতে তাঁকে প্রচার করে। ভাঙচি দেয়নি কোথাও। নইলে ডিজনীর জন্ম হতো না। আর আমাদের দেশে?

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ

প্রথম টেস্ট

ভারতবর্ষ : ২৯৬ রান (বোরদে ১২১, দুরানী ৫৫, পাতৌদি ৪৪ এবং ভেঙ্কট রাঘবন নট আউট ৩৬ রান। গ্রিফিথ ৬৩ রানে ৩, সোবার্স ৪৬ রানে ৩, হল ৫৪ রানে ২ এবং হলফোর্ড ৬৮ রানে ২ উইকেট)।

ও **৩১৬ রান** (কুন্দরন ৭৯, পাতৌদি ৫১, জয়সীমা ৪৪, বেগ ৪২, সারদেশাই ২৬ এবং ভেঙ্কট রাঘবন ২৬ রান। গিবস ৬৭ রানে ৪, হলফোর্ড ৯৯ রানে ৩ এবং সোবার্স ৭৯ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪২১ রান (হাণ্ট ১০১, লয়েড ৮২, সোবার্স ৫০, হলফোর্ড ৮০ এবং হেণ্ড্রিকস্ ৪৮ রান। চন্দ্রশেখর ১৫৭ রানে ৭, ভেঙ্কট রাঘবন ১২০ রানে ২ এবং দুরানী ৮৩ রানে ১ উইকেট।

ও ১৯২ রান (লয়েড নট আউট ৭৮, সোবার্স নট আউট ৫৩ এবং হাণ্ট ৪০ রান। চন্দ্রশেখর ৭৮ রানে ৪ উইকেট)।

প্রথম দিন (ডিসেম্বর ১৩) :

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬ উইকেট খুইয়ে ২৪১ রান সংগ্রহ করে। অপরাজিত থাকেন বোরদে (১২০ রান) এবং নাদকার্নী (০)।

দ্বিতীয় দিন (ডিসেম্বর ১৪) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা ২৯৬ রানের মাথায় শেষ হয়। বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২০৮ রান করে। খেলায় অপরাজিত ছিলেন হাণ্ট (৭৯ রান) এবং সোবার্স (২ রান)।

তৃতীয় দিন (ডিসেম্বর ১৬) :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৪২১ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ১২৫ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না খুইয়ে ৪৪ রান করে।

চতুর্থ দিন (ডিসেম্বর ১৭) :

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩১৬ রান সংগ্রহ করে ১৯২ রানে অগ্রগামী হয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রান তুলতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ২ উইকেট খুইয়ে ২৫ রান সংগ্রহ সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিন (ডিসেম্বর ১৮) :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯২ রান তুলে ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের পঞ্চম টেস্ট সিরিজের তথা ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২১টি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই একাদশ জয়, বাকি ১০টি টেস্ট খেলার ফলাফল ড্র। বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আগের দুটি টেস্ট খেলার (১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট সিরিজের) ফলাফল ড্র হয়েছিল।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদির নবাব টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। ভাল উইকেটে ব্যাট করার দান প্রথম পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ, খেলায় প্রাধান্য বিস্তারের বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ কিন্তু এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ১০ রানের মাথায় ১ম ও ২য় এবং ১৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। ভারতবর্ষের এই তিনটে উইকেট পান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস বোলার হল (২টো) এবং গ্রিফিথ (১টা)। বোরদের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক পাতৌদির নবাব। পাতৌদির আক্রমণাত্মক খেলায় হল এবং গ্রিফিথ সম্পর্কে ভয়ের ভাব অনেকটা কেটে

চন্দ্রশেখর—২৩৫ রানে ১১ উইকেট

এশিয়ান গেমসের ১০০ মিটার দৌড়ের নাটকীয় সমাপ্তি। অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়েছে উপরের আলোকচিত্রের সাহায্যে। ফটো : শ্যামল বসু

যায়। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৬৭ (৩ উইকেটে)—বোরদের ২০ রান এবং পাতৌদির ৩৫ রান। ৭৬ মিনিটের খেলায় তখন এই চতুর্থ উইকেটের জুটি পাতৌদি এবং বোরদে ৫৩ রান যোগ করেছেন। দলের ১০৭ রানের মাথায় পাতৌদি নিজস্ব ৪৪ রান করে হলফোর্ডের বল কাট করতে গিয়ে বোল্ড হন। তিনি ১১৬ মিনিট খেলে তাঁর ৪৪ রানে ৫-বার বাউন্ডারী করেছিলেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পাতৌদি এবং বোরদে দলের মূল্যবান ৯৩ রান যোগ করেন। দলের ১৩৮ রানের মাথায় ওয়াদেকার মাত্র ৮ রান করে আউট হন। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৭৫ (৫ উইকেটে)। বোরদে ৯১ রান এবং দুরানী ১৯ রান করে নট আউট ছিলেন। বোরদে ২২০ মিনিট খেলে তাঁর সেঞ্চুরী রান পূর্ণ করেন, বাউন্ডারী মারেন ১৩টা। সরকারী টেস্টে বোরদের এই চতুর্থ সেঞ্চুরী, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ভারতবর্ষের ১৪শ সেঞ্চুরী। সরকারী টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় বোরদের সর্বোচ্চ রান নট আউট ১৭৭ (বিপক্ষে পাকিস্তান, মাদ্রাজ, ১৯৬০)। দলের ২৪০ রানের মাথায় দুরানী তাঁর ৫৫ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দুরানী এবং বোরদে দলের মূল্যবান ১০২ রান সংগ্রহ করেন। দুরানী চমৎকার খেলে তাঁর ৫৫ রানে ৮টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী মেরেছিলেন। খেলার শেষে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৪১ (৬ উইকেটে)। বোরদে (১২০ রান) এবং নাদকার্নী (শূন্য) অপরাজিত থাকেন। বোরদের এই ১২০ রান তুলতে ২৯৬ মিনিট সময় লেগেছিল, বাউন্ডারী ছিল ১৫টা।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম দেড় ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষ তার শেষ চার উইকেটে প্রথম দিনের ২৪১ রাণের (৬ উইকেটে) সঙ্গে ৫৫ রাণ যোগ করে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৯৬ রাণের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের প্রথম দিকের খেলায় যখন মাত্র ১৯ রাণের মধ্যে ভারতবর্ষের ৩টি উইকেট পড়ে যায় (২৬০ রাণে ৯ম উইকেট) তখন ভারতবর্ষ যে ২৯৬ রাণ সংগ্রহ করবে এরকম আশা ছিল না। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে ভেঙ্কটরাঘবন (নট আউট ৩৬ রাণ) এবং চন্দ্রশেখর দলের ৩৬ রাণ যোগ করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলও তাদের প্রথম ইনিংসের খেলার গোড়াপত্তন শক্ত করতে পারেনি। তাদের ৮২ রাণের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে। চন্দ্রশেখরের বলে বাইনো, কানহাই এবং বুচার খেলা থেকে বিদায় নেন। দলের রাণ ৮২ (৩ উইকেটে)—খেলার এই সঙ্গীন অবস্থায় হাণ্টের সঙ্গে ৪র্থ উইকেটের জুটি বাঁধেন টেস্টের নবাগত খেলোয়াড় ক্লাইভ লয়েড। এই ৪র্থ উইকেটের জুটি হাণ্ট এবং লয়েড খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। চা-পানের সময় স্কোর ছিল ১২২ (৩ উইকেটে)—অপরাজিত ছিলেন হাণ্ট এবং লয়েড। ন্যাটা এবং চশমাধারী ক্লাইভ লয়েড ৮২ রান করে চন্দ্রশেখরেরই বলে আউট হন। তিনি ১১৫ মিনিট খেলে তাঁর ৮২ রাণে ১৪টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউন্ডারী করেন। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে লয়েড এবং হাণ্ট দলের অতি মূল্যবান ১১০ রাণ সংগ্রহ করেন। তবে চন্দ্রশেখরের বলে তাঁদেরও অনেক সময় দুর্ভাবনায় পড়তে হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ফিল্ডিংয়ে দুবার দারুণ গলতি হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাণ তখন ৯৬ এবং লয়েডের মাত্র ৯ রাণ। এই সময়ে চন্দ্রশেখরের বলে লয়েড ক্যাচ তুলে অজিত ওয়াদেকারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে নবজীবন লাভ করেন। খেলার শেষ দিকে হাণ্টকে আউট করার সুযোগ হাত-ছাড়া করেন কুন্দরণ। তখন হাণ্টের রাণ ছিল ৭০। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪ উইকেট পড়ে ২০৮ রাণ দাঁড়ায়—ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২৯৬ রাণের থেকে ৮৮ রাণ কম, হাতে জমা ৬টা উইকেট। খেলায় অপরাজিত হাণ্ট (৭৯) এবং সোবার্স (২)। দ্বিতীয় দিনের খেলার সমস্ত গৌরব মহীশূরের লেগ-স্পিনার চন্দ্রশেখরের প্রাপ্য। ২৭ ওভার বল করে ৮টা মেডেন এবং ৮৪ রাণে ৪টে উইকেট পান। নিষ্প্রাণ উইকেটে কোন সুবিধাই তিনি পাননি। তাঁর বোলিং কৌশলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তিধর খেলোয়াড়রাও তাঁর বল সমীহ করে খেলেছিলেন। চন্দ্রশেখরের বোলিং সাফল্যের দরুণ দ্বিতীয় দিনেও খেলা ভারতবর্ষের হাতে ছিল।

একদিন বিশ্রামের পর খেলার তৃতীয় দিনে ৪২১ রাণের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তাঁরা ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ২৯৬ রাণের থেকে ১২৫ রাণে এগিয়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় দিনের খেলায় বাকি ৬টা উইকেটে দ্বিতীয় দিনের ২০৮ রাণের (৪ উইকেটে) সঙ্গে ২১৩ রাণ যোগ করে। হাণ্ট (১০১), সোবার্স (৫০), হলফোর্ড (৮০) এবং হেণ্ড্রিকস (৪৮)—এই চারজন খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রাণ সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে হাণ্ট এবং সোবার্স ৫০ রাণ, ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে হলফোর্ড এবং সোবার্স ৫৩ রাণ এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে হলফোর্ড-হেণ্ড্রিকস ৮৩ রাণ যোগ করেন। হাণ্ট ২৭৭ মিনিট খেলে তাঁর ১০১ রাণে ১৬টা বাউন্ডারী করেন। এই সেঞ্চুরী তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ৮ম এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১ম। এই সূত্রে তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০০ রাণ পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেছেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাঁর এই প্রথম ইনিংস খেলার পর টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ৩০৮৭ রাণ (৭৪ ইনিংসে) দাঁড়ায়। হলফোর্ড তাঁর ৮০ রাণ করে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে দেখা যায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের থেকে ভারতবর্ষ কিছুটা দ্রুতগতিতে রাণ সংগ্রহ করেছিল। প্রতি ওভারে ভারতবর্ষের ছিল ২·৭ রাণ, অপরদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের

২-৬ রাণ। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রাণ ছিল ৩০৬ (৬ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ৩৮৮ (৭ উইকেটে)। চন্দ্রশেখরের বোলিংয়ের হিসাব দাঁড়ায়—ওভার ৬১-৫, মেডেন ১৭, রাণ ১৫৭ এবং উইকেট ৭ (প্রথম টেস্টে উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক উইকেটের রেকর্ড)।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে কোন উইকেট না-হারিয়ে ৪৪ রাণ সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনের খেলায় যথেষ্ট উত্তেজনা, উদ্বেগ এবং শিহরণ ছিল। এই দিনে ১২টা উইকেটের পতন হয়—ভারতবর্ষের ১০টা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২টো।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার এক সময়ে ভারতবর্ষের উইকেট পতনের হিড়িক দেখে ভারতীয় মহল ঘাবড়ে যায়। ১৯২-৩ রাণের মাথায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম এবং ২১৭ রাণের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে কুন্দরনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন ভেঙ্কট রাঘবন। এই ৯ম উইকেটের জুটি কুন্দরন এবং ভেঙ্কট রাঘবন শেষ পর্যন্ত ৯৫ রাণ তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের মুখ রাখলেন। তাঁদের এই ৯৫ রাণ—ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ৯ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রাণ। পূর্ব রেকর্ড ছিল ৯৩ রাণ (উমরীগড় এবং নাদকার্নী, পোর্ট অব্ স্পেন, ১৯৬২)।

লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রাণ ছিল ১৩৩ (৪ উইকেটে)—খেলায় অপরাজিত ছিলেন বেগ (৩৪) এবং নবাব পাতৌদি (৫)। পাতৌদি তাঁর আক্রমণাত্মক খেলায় ৭৪ মিনিটে ৫১ রাণ করেন (৩টে বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী)। চা-পানের সময় রাণ দাঁড়ায় ২৮১ (৮ উইকেটে)। তখন উইকেটে ছিলেন কুন্দরন (৫১) এবং ভেঙ্কট রাঘবন (২৩)। কুন্দরন ৯৭ মিনিট খেলে তাঁর ৭৯ রাণে ১৫টা বাউন্ডারী করেন। এই বাউন্ডারী থেকেই তাঁর মারের বহর বোঝা যায়। কুন্দরন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খ্যাতনামা বোলারদের কিছুমাত্র সমীহ না করে সাবলীলভঙ্গীতে যেভাবে ব্যাট করেন তার স্মৃতি বহুকাল দর্শকদের মনে থাকবে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১৬ রাণের মাথায় শেষ হলে এই প্রথম টেস্ট খেলায় জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১৯২ রাণ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। হাতে যথেষ্ট সময়; সুতরাং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান (বে-সরকারী-ভাবে) শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে এই রাণ সংগ্রহ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষ ৩৫ মিনিটের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বাইনো এবং বুচার আউট হলে ভারতীয় মহলে আশার রেখাপাত হয়। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ২টো উইকেট পড়ে মাত্র ২৫ রাণ দাঁড়ায়।

পঞ্চম দিনের একটা পঞ্চান্ন মিনিটে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। জয়সূচক রাণটি সংগ্রহ করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৪৫ মিনিটের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে ১৯২ রাণ সংগ্রহ ক'রে ৬ উইকেটে জয়ী হয়। লয়েড ৭৮ রাণ এবং সোবার্স ৫৩ রাণ ক'রে অপরাজিত থেকে যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ৯০ রাণের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়লে ৫ম উইকেটে লয়েডের সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক সোবার্স। উইকেটে তখন দুজনেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রাণ ছিল ১১৩ (৪ উইকেটে)—উইকেটে ছিলেন লয়েড (৩৮) এবং সোবার্স (১৪)। এই সময়ে জয়লাভের জন্যে তাদের আর ৭৯ রাণের প্রয়োজন ছিল। দলের ১৫৭ রাণের মাথায় হান্টের 'ক্যাচ' কুন্দরণ ধরতে পারেননি। ৫ম উইকেটের জুটিতে লয়েড (৭৮) এবং সোবার্স (৫৩) ১০২ রাণ সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের চারটে উইকেটই (৭৮ রাণে) পান চন্দ্রশেখর। দুই ইনিংসে তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—ওভার ৯২-৫, মেডেন ২৪, রাণ ২৩৫ এবং উইকেট ১১টা। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি একটানা বল দেন, কেবল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয়লাভের মাত্র ৯ রাণ বাকি থাকতে ছাড়ান পান। তাঁকে নতুন বল নিয়েও বল দিতে হয়েছে। সাধারণত টেস্ট ক্রিকেটে লেগ স্পিন বোলাররা নতুন বলে খেলেন না।

শঙ্কর লক্ষ্মণ—অধিনায়ক

বলবীর সিং (রেলওয়ে)

এশিয়ান গেমস

ব্যাংককের পঞ্চম এশিয়ান গেমস সমাপ্তির মুখে। পঞ্চম এশিয়ান গেমসে যোগদানকারী ১৮টি দেশের মধ্যে জাপান এ পর্যন্ত যে পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে তা অপর দেশগুলির সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। ব্যবধান অনেক বেশী। বর্তমানে জাপানের পদক জয়ের সংখ্যা—স্বর্ণ ৭৬, রৌপ্য ৫০ এবং ব্রোঞ্জ ৩১। জাপান সাঁতারের প্রতিটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয় করে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করেছে। সাঁতার, ডাইভিং এবং ওয়াটার পোলো—এই তিনটি অনুষ্ঠানে জাপানের স্বর্ণপদক জয়ের সংখ্যা **২৮টি।** টেবিল টেনিসেও জাপানের বিরাট সাফল্য। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের দলগত খেতাব ছাড়াও ব্যক্তিগত বিভাগের পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বাদে বাকি খেতাবগুলি জাপান পেয়েছে। হকি প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র এবং শেষ পর্যন্ত জাপানের ব্রোঞ্জ পদক জয়—একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হকিতে ভারতের স্বর্ণপদক জয়

হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে গত দুবারের (১৯৫৮ ও ১৯৬২) এশিয়ান গেমসের হকিতে স্বর্ণপদক বিজয়ী পাকিস্তানকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। ফাইনালের নির্ধারিত ৭০ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি, খেলা গোলশূন্য ছিল। অতিরিক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিটে আউট সাইড রাইট বলবীর সিং (রেলওয়ে) ভারতবর্ষের জয়সূচক গোলটি দেন।
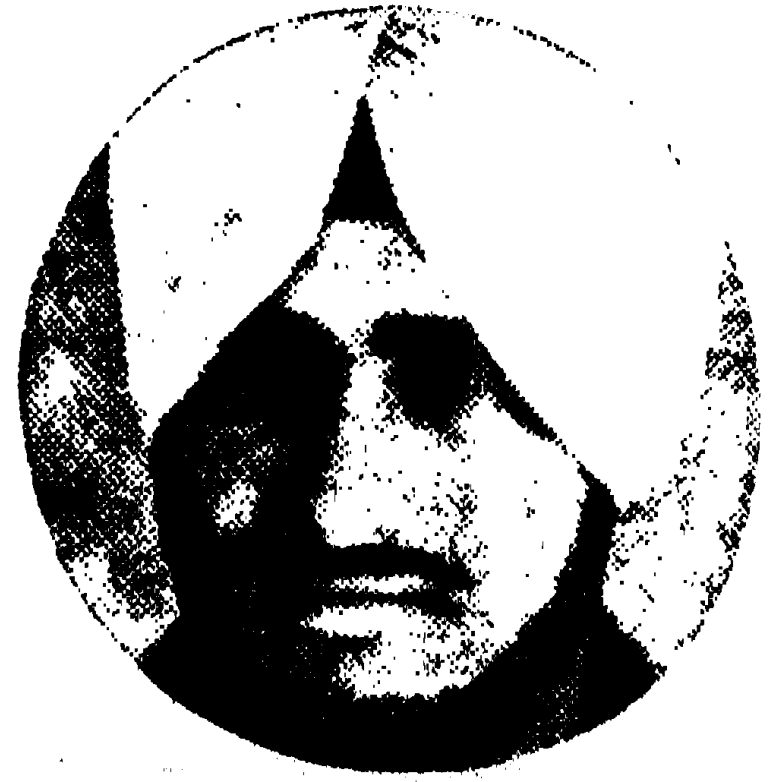
১৯৫১ সালে নিউদিল্লীতে এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন হলেও হকি প্রতিযোগিতা প্রথম তালিকাভুক্ত হয় ১৯৫৮ সালের টোকিও এশিয়ান গেমসে। ১৯৫৮ সালের হকি প্রতিযোগিতা লীগ প্রথায় হয়। লীগের খেলায় ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের সমান পয়েন্ট দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত গোলের ভিত্তিতে পাকিস্তান স্বর্ণপদক জয়ী হয়। ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্তানের খেলা গোলশূন্য ছিল। জাকার্তায় অয়োজিত ১৯৬২ সালের চতুর্থ এশিয়ান গেমসের হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তান ২-০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়।

ফাইনালের পথে (১৯৬৬)

ভারতবর্ষ : ভারতবর্ষ ১-০ গোলে মালয়েশিয়া, ৩-০ গোলে সিংহল, ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়া এবং সেমি-ফাইনালে ৩-০ গোলে জাপানকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

পাকিস্তান : পাকিস্তান ০-০ গোলে জাপানের সঙ্গে খেলা 'ড্র' করে, ৫-০ গোলে হংকং, ১৩-০ গোলে থাইল্যান্ড এবং সেমি-ফাইনালে ৫-০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে।

পদক লাভের তালিকা
প্রথম পাঁচটি দেশ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৭৬	৫০	৩১
দঃ কোরিয়া	১২	১৮	২০
থাইল্যান্ড	১০	১৩	১১
মালয়েশিয়া	৭	৫	৬
ভারতবর্ষ	৭	৩	১১

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

।। সাঁইত্রিশ ।।

"...মহাভারতে একটি বই চরিত্র নেই। চরিত্র অর্থাৎ পুরুষের চরিত্র। সেই মহাযুগে মেয়েরা পাঁচ হাত ঘুরলেও মহাসতী। অতি আধুনিকা বহুবল্লভারা কি দোষ করল আমার মাথায় আসে না। তাদের দুর্ভাগ্য একালের আইনে মহাভারতের নজির অচল। পরাশর-মৎস্যকন্যা ভোগসংযোগের ফলে আবির্ভাব স্বয়ং মহাভারতকারের। সেই কুমারী মাতা অদূরকালের কুরুকুললক্ষ্মী মহাসতী সত্যবতী। আবার ওই মায়ের নির্দেশে মহাভারতকারই প্রয়োগ-জনক পরের কুরু-পান্ডবকুলের। অতএব তাঁর রচনার শত-সহস্র মহাসতীরা মহাভোগ্যা শুধু— রমণী-চরিত্র নিয়ে এর বেশী তিনি মাথা ঘামান নি। তবু এরই মধ্যে গান্ধারীকে নিয়ে আমার একটু খটকা লাগে। অন্ধ রাজার হাতে তাঁকে দিতে আপত্তি করেছিলেন তাঁর বাবা সুবল আর নিরেনব্বুইটি ভাই। কুরু-রোষে কারাগারে তাঁদের নিধন-যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। গান্ধারী নিজের চোখ বেঁধেছিলেন স্বামী অন্ধ বলে না তাঁর মুখ দেখতে চান নি বলে?

যাক, রমণী-চরিত্র নিয়ে টানাটানিতে আমারও রুচি নেই। বলছিলাম, গোটা মহাভারতে একটি বই পুরুষ-চরিত্র মেলা ভার। তিনি পরম কুরুপ্রিয় অবশিষ্ট সুবল-নন্দন শকুনি। তুলনা নেই, তাঁর তুলনা নেই! এ-রকম লক্ষ্য ভেদ অর্জুন করেছেন না এ-রকম প্রতিজ্ঞা ভীষ্ম করেছেন? কর্ণকে এলাউ করলে সে-ই অনায়াসে মাছের চোখ ফুটো করে দিতে পারত, আর, সে-কাল ছেড়ে এ-কালেও কত ভীষ্ম বাপের বিয়ে দিয়ে ভেরেন্ডা ভাজছে ঠিক নেই। কিন্তু শকুনি? তুলনা নেই, তুলনা নেই! উভয়কুলের ইষ্ট করতে এসে স্বয়ং কেষ্ট-ঠাকুরের চক্ষু ছানাবড়া হয়েছিল কার অভীষ্ট টের পেয়ে? এই শকুনির, শুধু শকুনির। শকুনিকে মহাভারতের সহস্র বিশিষ্ট পুরুষদের একজন ভাবলে তাঁর চরিত্রে দাগ পড়বে। আকাশের শকুনিকে পাখি বললে যেমন পাখি আর শকুনি দুয়েরই চরিত্র খোয়া যায়, তেমনি। অমন অমোঘ লক্ষ্য যার সেই শকুনি। আ-হা, চরিত্র বটে একখানা। তাঁর বাপের হাড়ের তৈরি ক্ষুধিত পাশার দান খটখট করে পড়ছিল আর পান্ডবসর্বস্ব গ্রাস করছিল, খটখটিয়ে হাড়ের পাশার দান পড়ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উল্লাস লেগেছিল—সেই উল্লাস ছাপিয়ে শকুনির অট্টহাসির অর্থ সেদিন কেউ বোঝে নি। শুধু রক্ততৃষাতুর ওই হাড়ের পাশারা ছাড়া। কুরুকুলের শেষ রক্তবিন্দু পানের পর সুবলের অস্থির তৃষ্ণার শান্তি, আর শকুনির পিতৃতর্পণ, ভ্রাতৃতর্পণ সাঙ্গ। পান্ডব অপমানের খড়গে সেই লগ্ন আসন্ন।

কুরুপ্রিয় শকুনি, তোমার তুলনা নেই। তোমাকে নমস্কার।"

জ্যোতিরাণীর হাতে কালীনাথের সেই কালো বাঁধানো নোট বই। মনের এক ঝড়ের মুখে, তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বাড়িটা ছেড়ে আসার আগে কালীদার কাছ থেকে জ্যোতিরাণী এই জিনিসটি চেয়ে বসেছিলেন। কালীদা বলেছিলেন, সময়ে পাবে।

...কালীদার সময়ের বিচারও বিচিত্র বটে। সেই সময় আজ হয়েছে। এই তিন বছর বাদে।

মাঝে একটানা তিনটে বছর কেটে গেছে। এই তিন বছর ধরে জীবন যে নতুন রাস্তায় গড়িয়ে চলেছে তার গতি শিথিল। দিনের অবকাশ জীবিকা সংগ্রহের রুটিনে বাঁধা, রাতের রঙ বর্ণশূন্য। স্থির সহিষ্ণুতায় এই দিনগুলি আর রাতগুলি বহন করে চলেছেন জ্যোতিরাণী। তারই মধ্যে আঘাত আসছে এক-একটা, কিন্তু জীবনের তটে সে-আঘাত নতুন করে ভাঙন ধরাতে পারে নি কিছু। স্নায়ু ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারে নি। ওমনি অবিচল সহিষ্ণুতায় সে-আঘাত তিনি গ্রহণ করেছেন, তারপর এক পাশে সেটা সরিয়ে রেখে দিনের কাজে নিবিষ্ট হয়েছেন, রাতের চিন্তা থেকেও সেটা তফাতে রাখতে চেষ্টা করেছেন।

তিন রাস্তার ত্রিকোণ-জোড়া অর্ধচন্দ্র আকারের বিরাট বাড়িটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধভাবে ঘুচেছে মাত্র তিন দিন আগে। এই বিচ্ছেদের বারতা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে জানানো হয়েছে। এটাও আঘাত কিছু নয়। তিন বছর আগে এ সম্পর্ক নিজেই তিনি ছিঁড়ে দিয়ে এসেছেন। সেটা ফিরে আবার জোড়া লাগানোর তাগিদও কখনো অনুভব করেন নি। যে আঘাতে তাঁর আহত সত্তা বিমুখ হয়ে ঘর ছেড়েছে সে-ক্ষত আজও তেমনি আছে। পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা অবশ্য হয়েছে। পরোক্ষ চেষ্টা করেছেন কালীদা আর মামাশ্বশুর। প্রত্যক্ষ চেষ্টাটা যার ঘর ছেড়ে আসা হয়েছে, তার।

শিবেশ্বরের। কিন্তু তাঁর চেষ্টাটা ক্ষিপ্ত বাঘের ফসকানো শিকার ধরার মতই হিংস্র নির্মম। তিনি আপস করতে আসেন নি, দীর্ঘ অপরাধের বোঝায় পিঠ নুইয়ে আসেন

নি, বিবেকের যাতনায় দগ্ধ হয়ে আসেন নি। না, মোটে আসেনইনি তিনি। ঘরে বসেই অপমানের চাবুক চালিয়ে ঘর-পালানো জীবের মতই তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। অধিকার দখলের চরম ব্যবস্থার হুমকি দিয়েছেন, সময় জানিয়েছেন।

তার আগেই জ্যোতিরাণী জবাব পাঠিয়েছেন। সেটা এমনই জবাব যে, শিবেশ্বর চাটুজ্জের আর ফেরানোর চেষ্টা করা দূরে থাক, আক্রোশে একেবারেই থেমে গেছেন তিনি। বিচ্ছিন্নতার যে সাময়িক অধিকার জ্যোতিরাণী লাভ করেছেন, তাতে কোন-রকম বাধা পর্যন্ত পেশ করেন নি। দুর্বার ক্রোধে তার বদলে আরো প্রকাশ্য নগ্নতায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। শুধু ধারণা নয়, জ্যোতিরাণীর বিশ্বাস বাড়ির মালিকের রোষের ইন্ধন যুগিয়ে মৈত্রেয়ী চন্দর সেখানে অবাধ প্রতিপত্তি লাভে বাদ যদি কেউ সেধে থাকে তো সেটা কালীদার কাজ। মেঘনার মুখ থেকে সেই গোছেরই আভাস পেয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু এ নিয়ে কালীদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি তিনি। অপ্রয়োজনীয় একটা গ্লানির প্রসঙ্গ মন থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছেন শুধু।

সম্পর্ক ঘোচার শেষ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে মাত্র তিন দিন আগে। আনুষ্ঠানিক সংবাদও তাঁর কাছে এসেছে। আসবে তার জন্য মাস-কতক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। এসেছে যখন, অদরকারী কাগজ-পত্রের মতই এক পাশে সরিয়ে রেখেছেন। অস্বাচ্ছন্দ্য যদি একটুও বোধ করে থাকেন তো সেটা অন্য কারণে।...এখানকার স্কুলের খাতায় তাঁর নাম লেখানো হয়েছিল জ্যোতিরাণী দেবী। চাকরি বিভাস দত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিচিত। জ্যোতিরাণী চাকরির বাজারের খবর রাখেন না, নইলে এত সহজে চাকরি পেলেন কি করে ভেবে অবাক হতেন। বিভাসবাবু বলেছিলেন, চেনা-জানা ছিল, তায় অনার্স গ্রাজুয়েট বলে আর একটু সুবিধে হল। জ্যোতিরাণী সেটাই সত্যি ধরে নিয়েছেন। জীবনের সংকট মুহূর্তগুলিতেই যেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ যোগ তাঁর।...নতুন বয়সের সেই নতুন সংসারে একজনের বিকৃতির ফলে জীবনের আশা আলো তাপ সব যখন নিঃশেষে ক্ষয় হতে বসেছিল, তখন থেকে। শাশুড়ীর সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে তাঁকে দেখে বিভাস দত্তর মনে হয়েছিল গরদে আর সিঁদুরে সেজে বলির পশুর মতই কোন অন্তিম সমর্পণের দিকে পা বাড়িয়েছেন তিনি। পড়াশুনার রাস্তাটা তিনিই দেখিয়েছিলেন, লিখেছিলেন, মন না টানলে মন্দিরের দরজা খোলে না, কিন্তু আর এক মন্দিরের দরজা সামনে খোলা আছে। আর লিখেছিলেন, ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করবেন ভয়ের পীড়নও ততো সত্যি হয়ে উঠবে। ভয় করবেন না। সেই চিঠি তাঁকে জীবন দিয়েছিল, তিনি পথ পেয়েছিলেন। না পেলে এই স্কুলের দরজাও আজ খোলা পেতেন না।...তারপর সেই দাঙ্গার বিভীষিকা। সেই দুঃস্বপ্ন ভোলবার নয়। সব বিপদ তুচ্ছ করে সেদিনও এই ভদ্রলোকই ছুটে এসেছিলেন, মৃত্যুর তাণ্ডব থেকে জীবন উদ্ধার করে নিয়ে গেছলেন। আর, সব শেষে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এই চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও এই একজনই তাঁকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপমানের এত বড় বোঝা মাথায় নিয়ে আবার তাঁকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হয় নি।

...প্রত্যাশা হয়ত ছিল। হয়ত আছে। সবল পুরুষের প্রত্যাশা হলে আগেই কোন্ জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত কে জানে। সে-প্রত্যাশা কোনদিন অবাধ্য হয়ে ওঠে নি বলেই নিষেধের আবরণটা জ্যোতিরাণী শক্ত-পোক্ত করে তোলার অবকাশ পেয়েছিলেন। কোন-রকম দুর্বলতার আঁচ পেলে প্রকারান্তরে চোখ উল্টে বরং তিনি রাঙিয়েছেন। কিন্তু স্কুলের এই চাকরির বেলায় এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর নাম লিখিয়েছেন জ্যোতিরাণী দেবী। মুখ দেখানো গোছের ইন্টারভিউ একটা হয়েছে, কেউ কোনরকম জেরা করে নি। এমন কি অনার্স পাশের সার্টিফিকেটের তলব পর্যন্ত পড়ে নি। মুখে বলাতেই কাজ হয়েছে। চাকরিটা যেন তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তিনি এসেছেন আর বসে গেছেন। বাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মালিকের পদবীসুদ্ধ বর্জন করে এসেছেন কিনা সেটা মাথায়ও ছিল না।

তাই পদবীশূন্য নিজের নামটা দেখে সচকিত হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। চাকরি যারা দিয়েছেন তাঁদের কাছে বিভাস দত্ত কি বলেছেন বা কতটা বলেছেন জানেন না, পরে সহশিক্ষয়িত্রীদের কেউ-কেউ কৌতূহলী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছে, দেবী বলতে কোন্ দেবী, পদবী কি?

জ্যোতিরাণী পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছেন, বলেছেন, ওটাই পদবী।

এ-রকম পদবী হয় কি হয় না তা নিয়ে লঘু গবেষণায় মেতে ওঠে নি কেউ। সেটা জ্যোতিরাণীর ব্যক্তিত্বগুণেও হতে পারে, এখানে হাল্কা অবকাশ বিনোদনের সময় কম বলেও হতে পারে। স্কুল চলে এক লোকহিত সংস্থার দাক্ষিণ্যে। শিক্ষা বিস্তারের আদর্শই বড় লক্ষ্য, আর পাঁচটা সাধারণ স্কুলের মত নয় এখানকার বিধি-ব্যবস্থা। এখানে মেয়ে বেশি, সে-তুলনায় শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কম। মাইনে ভাল বটে, কিন্তু কাজের চাপও তেমনি। কিছু দিনের মধ্যেই জ্যোতিরাণী এখানে মিসেস দেবী হয়েছেন। খটকা যাদের লেগেছিল তাদেরও মনে হয়েছে এই দেবী মানিয়েছে বটে! মেয়েদের কানও অভ্যস্ত হতে সময় লাগে নি। তারা বলে, ওমুক ঘণ্টায় মিসেস দেবীর ক্লাস, বা ওমুক সাবজেক্টের খাতা দেখবেন তো মিসেস দেবী, নম্বর দেবার হাত কেমন কে জানে।

...সম্পর্ক ছেঁড়ার আনুষ্ঠানিক বার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত পদবীটা বাস্তবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। স্কুলের খাতায় চ্যাটার্জী কেটে দেবী বসানোর বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে না তাঁকে। নিঃশব্দে কত বড় এক দায় থেকে যে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনিই জানেন। তবু খবরটা পাওয়া মাত্র অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিলেন অন্য কারণে। তাঁর নাম থেকে চ্যাটার্জীর অস্তিত্ব ঘোচানো হয়েছিল যখন, হিন্দু বিয়ে নাকচ বিধি তখনো আইনের আলোর কাছাকাছি আসে নি। আসতে পারে সে-সম্বন্ধে জ্যোতিরাণীর অন্তত কোন ধারণা ছিল না। চাকরির খাতায় তাঁর নাম থেকে চ্যাটার্জী উঠে যেতে দেখে তিনি সচকিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর জীবনে এক পুরুষের আবির্ভাবের চিহ্ন-টুকুও মুছে দেবার ইচ্ছা দেখেছিলেন তিনি আর একজনের দিকে চেয়ে। সেই একজনের প্রত্যাশা এখনো দাবীর আকারে হাত বাড়ায় নি। সে-প্রত্যাশা এখনো দুর্বল। কিন্তু আগের মত অস্পষ্ট নয় অত। সেটা প্রকাশের রাস্তা খুঁজছে অনুভব করতে পারেন। ভদ্রলোক ভুগছেন ক্রমাগত। অসুস্থতার আড়ালে মান-অভিমান আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পদবী বিলুপ্তির পরোয়ানা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছে এই দিনের আশায় সকলের অগোচরে একজনই শুধু দিন গুনছিলেন। এর পর তাঁর দুর্বল প্রত্যাশা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

কিন্তু ঠিক এই সময়টাই নোট বই পাঠাবার মত সুসময় বেছে নিলেন কেন কালীদা? এটার কথা তো তিনি ভুলেই গেছলেন প্রায়।

আজ আর এই কালো নোট বই খুব এক বৃহৎ বস্তু নয় তাঁর কাছে। ডাকে এসেছে। প্যাকেট খোলার আগেও বুঝতে পারেন নি জিনিসটা কি। খোলার পর বুঝেছেন। এখন আর ওটার থেকে নতুন করে কিছু সংগ্রহ করার তাগিদ নেই। কি পাবেন বা কি হারাবেন সেই দুর্ভাবনাও নেই আর।...এ-জন্যেই কি কালীদা এ-সময়ে পাঠালেন এটা? স্মৃতির কোন দুর্বলতার ছিটে-ফোঁটাও যদি থেকে থাকে এখনো, তাও নির্মূল করা সহজ হবে বলে?

তবু আগ্রহভরেই খুলেছিলেন ওটা। কালো বাঁধানো এই বস্তুটার সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কৌতূহল জড়িত। গোড়াতেই ছোটখাট একটা ধাক্কা খেয়ে উঠলেন।

শকুন-স্তুতি পড়ে হতভম্ব।

গোড়াতে কটা পাতা সাদা, এই লেখাটার পরেও কটা পাতা সাদা। পরের সব লেখায় তারিখ আছে, এটাতেই শুধু নেই। জ্যোতিরাণীর কেমন মনে হল পরে কোন এক সময়ের লেখা ভূমিকা এটা। ভূমিকা সচরাচর পরেই লেখা হয়ে থাকে। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি নিয়ে জ্যোতিরাণী পাতা উল্টে চলেছেন।

"...মৌমাছি যদি কথা দেয় ফাল্গুনের নেমন্তন্ন শুনবে না, ফুলে-ফুলে ঘুরবে না—বৈশাখের চাঁদটা যদি কথা দিয়ে বসে পূর্ণিমা বুকে করে বসে থাকবে, জ্যোৎস্না ঢালবে না—আর বসন্তের কোকিল যদি কথা দেয় ভরা-সবুজের দিকে তাকাবে না, ডেকে-ডেকে প্রেমিক-প্রেমিকার বুকের

তলায় ঋতুর খবর ছড়াবে না—তাহলে? তাহলে এ-রকম কথা যে আদায় করে সে একটি বদ্ধ পাগল। আর আদায় করার পর সে-কথার খেলাপ হবে না এমন বিশ্বাস নিয়ে যে বসে থাকে সে পাগল ছাড়াও আরো কিছু। সে বোধহয় গাধার মত গরু। কালীনাথ ঘোষাল, আয়নায় নিজের মুখখানা ভাল করে দেখো।

মিত্রা কথার খেলাপ করেছে। মৈত্রেয়ী মজুমদার মৈত্রেয়ী চন্দ হয়েছে। বামুনের মেয়ে কায়েতের ঘরণী হয়েছে। তাতে কি? তোমার মত চাল-কলা মার্কা বামুন ধুয়ে জল খেতে চায় এ-কালের কোন্ মেয়ে? বিয়ে শুনে জ্বলতে-জ্বলতে সটান মিত্রাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, রাগের মুখে তার মা এই গোছেরই কি-যেন বলছিল। আমার অদেখা-বাপের চাল-কলার যজমানির খবরটা শিবুই মিত্রার কানে তুলেছে মনে হয়। আর তার বাপের খড়ম নিয়ে তাড়া করার খবরটাও। মিত্রার সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়ার কথা শিবুই বলেছিল। কিন্তু এ শর্মা কার কাছে কোন্ খবরটা চেপে গেছল. চাল-কলার খবর না চাল-চুলো নেই সে-খবর? শিবুটা ওই রকমই। আমাকে ছাড়া তার চলে না, আবার কোন ব্যাপারে তার ওপর টেক্কা দেওয়াটাও বরদাস্ত করে না। যার সঙ্গে জলজ্যান্ত এক চকচকে মেয়ের হৃদয়ের কারবার সে-যে নিতান্ত করুণার পাত্র তাদের, এটুকু শুনিয়ে নিজের মর্যাদা বড় করার লোভ ছাড়তে পারে নি, শিবুর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় না। যাক, বেশ করেছে। চন্দর জয় হোক। বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে মিত্রা টেলিফোনে জানিয়েছে কারো সংসারে অশান্তি আনতে চায় না, তাই অন্য পথ বেছে নিয়েছে। আর, তার নিজের লেখা চিঠিগুলো ফেরৎ চেয়েছে। সে-ধন পোড়ানো সারা, ছাইটুকুও ধরে রাখি নি যে ফেরৎ দেব। ভাবছি, রেস্তরাঁর ক্যাবিনে আর সন্ধ্যার নিরিবিলি গঙ্গার ধারে, এমন কি কথা দেবার দিনেও যা সে দিয়েছিল তা আর ফেরৎ নেবে কি করে? তবু চন্দর জয় হোক। ঝকঝকে গাড়ি দেখিয়ে সে-যে তার মন জয় করতে পেরেছে সে-জন্য কৃতজ্ঞ: পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ার থেকে আগে পড়লে ক্ষতি কম।

কিন্তু ক্ষতটা আপাতত আর একদিক থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বাড়ির ন্যায়নিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ প্রাচীন কর্তাটির দিক থেকে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভয় করি, ভক্তি করি, আর মনে-মনে ভিক্ষুকের মত তোমার ছেলের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করি। আশ্রিতের চরিত্রশোধনের কর্তব্যে তুমি নির্মম কড়া শাসন করেছ, বেশ করেছ। কেবল জানতে ইচ্ছে করে আমার বদলে তোমার ছেলে যদি কোন ব্রাহ্মণ-কন্যাকে ঘরে আনার জন্য আমার মত এমনি অবিরাম মাথা খুঁড়ত, তাহলেও তুমি ঠিক এমনি কড়া শাসনই করতে কি না...।"

...   .

"...বাল্মীকির বুকে প্রথম কবিতার বান ডেকেছিল ক্রৌঞ্চমিথুন বধ দেখে। হতেই পারে। সেদিন কোথায় যেন পড়লাম না শুনলাম চব্বিশ বছর বয়সের এক বোবা ছেলের ফট করে মুখ দিয়ে কথা বেরুলো নদীর ধারে সুইমিং কস্টিউম-পরা এক যুবতী মেয়েকে দেখে। রমণী-কাণ্ড এমনি অবাক কাণ্ডই বটে। আমাদের শিবুবাবুও প্রেমে পড়েছেন জ্যোতিরাণীকে দেখে। অবাক হব, না হাসব, না কাঁদব! পরীক্ষার প্রশ্ন আর পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া আর কোন দ্রষ্টব্য বা লক্ষ্যের বস্তু ভূভারতে আছে তাই জানত না যে, সেই শিবুবাবু প্রেমজ্বরে অজ্ঞান। ইদানীং অবশ্য বিলিতি ছবির নায়িকাদের দেখে রমণীরহস্য নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল সে, আর তাই দেখেই ওকে জ্যোতিরাণী-দর্শনে নিয়ে আসা আমার—তবুও সতের বছরের একটা মেয়েকে দেখামাত্র এতটা ঘায়েল হবে সেটা এই পাষণ্ডও কল্পনা করেনি। শরবিদ্ধ জন্তুর মত সেই ছটফটানি দেখলে ডাক্তারেরও ঘাবড়াবার কথা। কিন্তু এরকম কিছুই তো আশা করছিলাম আমি।......প্রভুভক্ত মানিকরামের সত্যধ্বজী প্রবীণ প্রাজ্ঞ ন্যায়াধীশ, তোমার এবারের বিচার-খানা কেমন হবে? আশ্রিত দূরাত্মীয়ের চরিত্রশোধনের কঠিন কর্তব্যে পায়ের থেকে খড়ম খুলতে চেয়েছিলে, চাবকে লাল করতে চেয়েছিলে, বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে বলেছিলে, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক না ঘোচালে এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না বলে শাসিয়েছিলে। কিন্তু এবারে কি হবে? এবারে যে স্বয়ং যুবরাজের রোগ! খড়ম খুলবে না চাবুক তুলবে না সম্পর্ক ছাড়বে —নাকি পুরুত ডাকবে?"

...   .

"কালীনাথ, তোমার কালী মুখের হাসি সামলাও! ন্যায়াধীশের অমন অসহায় মূর্তি দেখে তোমার হাসার কি হল? নিতান্ত আশ্রিত দূরের আত্মীয়ের চিকিৎসা আর যুবরাজের চিকিৎসা এক-রকম হবে আশা করেছিলে? হলই বা এক রোগ। তোমার বেলায় খড়ম খোলা হয়েছিল, চাবুক তোলা হয়েছিল, ওইতেই রোগ ছেড়েছে। কিন্তু যুবরাজের রোগে যে পুরুত ডাকা ছাড়া উপায় নেই, উপায় নেই! মজা দেখার আসরে নেমেছ, চুপচাপ বসে মজা দেখো। হেসো না, কাঙালপনা কোরো না। অজ্ঞান বয়েস থেকে এ বাড়ির আশ্রয়ে এসে পিসীকে মা ভেবে আর পিসেকে মনে মনে যুবরাজের মতই বাবা ডেকে মা-বাবা না চেনার ঘাটতি পূরণ করতে চেয়েছ, তাঁদের ব্যবহারে এতটুকু তারতম্য দেখলে তোমার বুকের হাড়-পাঁজর টনটন করে উঠেছে, যুব-রাজের একচ্ছত্র দাবির আসনে মনের মত ভাগ বসাতে না পেরে হিংসেয় কত সময় তাকে তুমি মনে মনে উৎখাত করেছ—তোমার কপালে খড়ম আর চাবুক জুটবে না তো কি শানাই বাজবে? হেসো না, আর কাঙালপনা কোরো না, চুপচাপ বসে মজা দেখো।"

যন্ত্রণার মত এই রাগ, চাপা বিদ্বেষ কার ওপর জ্যোতিরাণী অনুমান করতে পারেন। শ্বশুর-ভাসুরঝির ওপর। বিশেষ করে শ্বশুরের ওপর। ......না, একদিন বিষ শ্বশুর ছিলেন তাঁর ওপর।

...   .

"মামু, তুমি একটি নরাধম, তুমি একটি পাষণ্ড, তুমি তার থেকেও যাচ্ছেতাই, তুমি একটি বর্ণচোরা কলির কেষ্ট! এইটুকু মেয়ে, আমি তবু ফ্রক-পরা থেকে দেখে আসছি—তুমি তো তারও আগে থেকে! এতদিন প্রেমের ফাঁদ পাতা কবির পিণ্ডি চটকেছি এখন যে তোমার পিণ্ডি চটকাতে ইচ্ছে করছে! এত লেখা-পড়া শিখে, এত স্বদেশী করে বীরদর্পে সাহেব ঠেঙিয়ে আর একের পর এক চাকরি ছেড়ে শেষে নদী যথা সাগরে ধায় তুমি তথা জ্যোতি-রাণীর প্রেমে? তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত না পাগলা গারদে চালান করা উচিত না কি ব্রজধামে নির্বাসনে দেওয়া উচিত? রাধাকে নিয়ে কেষ্ট-কংসের মধ্যেও তো লেগেছিল বলে শুনিনি! তুমি বর্ণচোরা কলির কেষ্ট হলেও তোমাকে কংস-বধ করাই উচিত বোধহয়। শিবুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে জ্যোতিরাণীর মা আর জ্ঞাতি দাদাদের হাব-ভাব দেখে আর সকলেই তারা তোমার খোঁজ করছে দেখে খটকা লেগেছিল, বাড়ি ফিরে খবরটা তোমার কানে ঢুকিয়ে মুখের দিকে চাওয়া মাত্র ব্যাপার জল। সতের বছরের জ্যোতি-রাণীর রূপের জোর বুঝতেই পারছি, জল ঘোলা করতে আপত্তি না হলে প্যাঁচ কষে এখনো তাকে তোমার সঙ্গে জুড়ে দিতে রাজি আছি। ছেলের ভাবী বউ দেখে এসে বুড়ো আনন্দে ডগমগ, এই গোছের একটা ম্যাজিক ঘটিয়ে তাঁর মুখখানা দেখার বড় লোভ। কিন্তু তুমি পাষণ্ড উদারতার আগুনে ঝাঁপ দেবে জানা কথাই। তাহলে কি আর করবে। জ্যোতিশূন্য হয়ে তুমি নরকে পচে মরো, আমি স্বর্গে বসে হাসি।"

পড়তে পড়তে দু'কান লাল হয়েছে জ্যোতিরাণীর। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে গেছেন।

...   .

"সন্ধ্যে থেকে বাড়িতে আনন্দের হাট লেগে গেছে। বাড়ির একমাত্র ছেলের বউ-ভাত ফুলশয্যা, ঘটা হবেই তো। ওঘরে সেই সতের বছরের জ্যোতিরাণী সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে মুকুট পরে বসে আছে যেন বালিকা রাজেশ্বরী। মামু পাষণ্ডের দোষ দেব কি, আজ আমিও চোখ ফেরাতে পারছি না। বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। বুড়ীর মুখে হাসি ধরে না, বুড়োর গম্ভীর মুখের ফাটল দিয়ে খুশি ঝরছে। সকলকে ছেড়ে চেয়ে চেয়ে আমি শুধু কর্তার মুখখানাই দেখছি। আমার ওপর কর্তার আজ বড় স্নেহ, এত খাটতে দেখে বার বার করে বলেছেন, পাখার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বোস একটু, দুদণ্ড জিরিয়ে নে, ছোটাছুটি করে অস্থির হলি যে একেবারে! আমি ব্যস্ত হয়ে সরে গেছি, আবার দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকেই দেখেছি।

এমন একটা সুন্দর মেয়ে ঘরে এলো আনন্দ আমারও হওয়া উচিত। অনেক তো

হেসেছি আর অনেক কাজও করেছি। মামুর পিছনেও কম লাগিনি। কিন্তু হাসি আর আনন্দ এক জিনিস? উৎসবের এত হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে আমার ভিতরটা সারাক্ষণ কেবল চিনচিন করেছে। বাড়িতে খুশির বাতাসে আর ফুলের বাতাসে একাকার, সে বাতাস বুক-ভরে টানতে পারিনি। কর্তার খুশি-মুখ সামনে পড়া-মাত্র আমার মেকী হাসির মুখোশ খসে পড়তে চেয়েছে।...... এ বাড়ির ছেলে তো নই-ই, আত্মজন কেউ হলেও এত বড় না হোক ছোটখাট একটু খুশির উৎসবের মধ্য দিয়ে আর একটি মেয়ে কপালে সিঁদুর মাথায় ঘোমটা দিয়ে এই বাড়িতে এসে দাঁড়াতে পারত। তাহলে পিঠময় দগদগে চাবুকের দাগ নিয়ে আজ তাকে প্রাণের দায়ে পালিয়ে বেড়াতে হত না। সে-দাগ আমি নিজের চোখে দেখিনি, বড় গলা করে চন্দ আমাকে বলেছিল। মিস্টার চান্ডা। সেদিন আমার অফিসে এসে হাজির। বিকেলেই বেশ গিলে এসেছিল। পা টলছিল, মুখ তেল-তেলে লাল। মিত্রার নামের আগে একটা অশ্লীল গালাগাল জুড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, হোয়্যার ইজ সী, ডু ইউ নো? আগে আপনার নাম করত আর দাঁত বার করে হাসত, বাট আ-অ্যাম সিওর সী সুন রিপেনটেড ডেসার্টিং ইউ—দ্যাট ফাইন বীচ—সী রিকোয়ার্স সাম মোর ল্যাশেস—ইজ সী উইথ ইউ নাউ? আমার হতভম্ব মূর্তিও চান্ডা সাহেবের হাসির কারণ হয়েছিল, বলেছিল, ইয়েস সার, ইওর লেডি—সে আমাকে মাতাল বলেছিল লম্পট বলেছিল জোচ্চোর বলেছিল, আরো অনেক মধুর কথা বলেছিল—অ্যান্ড সী গট সামথিং ফ্রম মি। আমি তার মুখ বেঁধে নিয়ে পিঠে হান্টার বুলিয়েছিলাম, এচড্ সাম ফাইন আর্ট-ওয়ার্ক অন হার ব্যাক—ভেরি ফাইন ইনডিড, পিঠময় সে দাগ আর জীবনে উঠবে না। অ্যান্ড সী বিকেম আজ মীক আজ বাটার অ্যান্ড টুক মি দ্যাট ভেরি নাইট আজ এ উওম্যান সুড—ওনলি দ্যাট ব্লাডি আর্ট-ওয়ার্ক অন হার ব্যাক ডিস্টার্বড হার ইমেনসলি। বাট আ-অ্যাম এ সোয়াইন ওর মতলব বুঝিনি। এক মাস হয়ে গেল আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, মেয়েটাকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে গেছে—বাট হোয়্যার? নাউ কাম, ডোন্ট প্লীড সাচ ভার্জিন ইনোসেন্স—ইজ সী উইথ ইউ?

দরোয়ান ডেকে লোকটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে বলেছিলাম।

তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দম আটকে আটকে আসছিল। গাড়ির ফাঁদে পা দিয়ে মিত্রা ঠকেছে জানতাম, সুখে নেই তাও জানতাম, তবু এতটা জানতাম না। মিত্রা বলেছিল তার শ্বশুরবাড়ির সকলে উৎকট সাহেব, পিঠে হান্টারের দাগও বসায় বলেনি।...অল্প বয়সে চাকরিতে নেমে তার সুখের লোভ বেড়েছিল আর পুরুষের ওপর বিশ্বাস কিছু কমে গেছল। তবু সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে এ-বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আসতে পেত যদি, জ্যোতিরাণীর মত অত সুন্দর না হোক খুব কি কুৎসিত লাগত? ওটুকু লোভ আর অবিশ্বাস থেকে সহজ সুস্থ একটা মেয়েকে টেনে তোলা যেত না? সে কি মস্ত অনাচারের কিছু হত? যাক, তবু জ্যোতিরাণী তুমি সুখেই থেকো। তোমার মুখ চেয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে যার কাঁধে ঝুলেছ সেও সুখেই থাকুক। কিন্তু ওই সুখ আর কারো মুখে ছড়ালে নরাধম কালীনাথের চোখে সেটা কাঁটা হয়ে বিঁধবে।"

জ্যোতিরাণীর হাত থেমে গেছল, খানিকক্ষণ পাতা ওলটাতে পারেননি। তাঁর মত এত ক্ষতি মৈত্রেয়ী চন্দ আর কারো করেননি। তবু মৈত্রেয়ী চন্দর নয়, কালীদার মুখখানাই সামনে দেখছিলেন জ্যোতিরাণী। এই একজনের মনের হদিস এখনো ঠিকমত পেয়েছেন কিনা জানেন না।

... ...

"পুরুষ প্রেমের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বিয়ের পরেই জেগে ওঠে। শুরু থেকেই শিবুবাবু বড় কড়া রকমের জেগেছেন। অহঙ্কারের শুনি তিন আবাস, প্রথমে স্বর্গ পরে মর্ত্য শেষে পাতাল। শিবুবাবুর অহংকার স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে মর্তের চাকরি চেখে বেড়াচ্ছিল, এখন সেটা পাতালের দিকে ঝুঁকেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর সেই পাতালের নিঃশ্বাস সইছে না বোধহয়, তার সোনার রঙে কালচে ছোপ লেগেছে।...কোনো এক ক্লাউনের সঙ্গে এক রুচিশীলা মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। দুদিন না যেতে খটাখাট। হতাশ হয়ে মেয়েটি এক অভিজ্ঞজনের উপদেশ নিতে গেছল। সে পরামর্শ দিয়েছিল, বিয়ে যখন হয়েইই গেছে, উঠে পড়ে নিজের চরিত্রে ক্লাউনের স্থূলতা আনতে চেষ্টা করো। যদি আসে তো বাঁচলে, না যদি আসে—ঝড় আসবে। অর্থাৎ, পুরুষ যেমন তার রমণীটিও তেমনি না হলে গোল। কিন্তু জ্যোতিরাণীকে এই পরামর্শটা দেয় কে? মামু পাষণ্ড তো কলকাতা থেকেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়, সন্দেহের বিষে-বিষে একেবারে কালী করে দিলে। ছেলেপুলে হবে, কিন্তু চেহারার যা হাল টিকলে হয়। হঠাৎ দুপুরে সেদিন মৈত্রেয়ী একেবারে বাড়ি এসে হাজির। পিঠের দাগ আর কি করে দেখব, মুখে হাসির চটক দেখলাম। তখনই শুনলাম তার স্বামী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাব-যাব করছে। মিত্রা নাকি তাকে ব্যারিস্টারি পাস করে প্রথমেই তার সঙ্গে মামলা করতে বলেছে। স্বামীর সম্পর্কে যে-কটা কথা বলেছে বেশ মিস্টি করে হেসে হেসে বলেছে। মিত্রা নতুন অফিসে চাকরিও করছে শুনলাম। নতুন অফিসের ঠিকানা দিয়ে গেল, যেতে বলল, দরকারী পরামর্শ আছে নাকি। যদি পিঠের দাগ দেখতে হয় আর দরকারী পরামর্শটা যদি তাই নিয়েই হয়—সেই ভয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু মিত্রার পালানোর মিয়াদ শেষ হল কি করে, ভাবী ব্যারিস্টার সাহেবটি কোথায় এখন?

......শিবুবাবুর সন্দেহের ধাক্কায় এবার আমারও পালাই-পালাই অবস্থা। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে অবিশ্বাসী দুটো চোখ আমাকে ছেঁকে ধরে আছে টের পাচ্ছি। বউ আমার সঙ্গে তার রুগ্না মাকে দেখতে যায় তাতেও সন্দেহ আর অবিশ্বাস। মহিলা শেষ পর্যন্ত মরে প্রমাণ করলেন তিনি অসুস্থই ছিলেন। সন্দেহ সকলের আগে নিজেকে বিষোয় তারপর অন্যকে। এই নোট বইয়ের খোঁজে শিবু আমার ট্রাংক খুলেছিল। পায়নি। না যাতে পায় আমার সেদিকে চোখ ছিল। পার্কে সেদিন ডাকলাম ওকে, হাত ধরে বললাম এরকম পাগলের মত করে বেড়াচ্ছিস কেন? শিবু কেঁদেও ফেলতে পারত, বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে যাবে কালীদা। হঠাৎ হাত ধরে অনুনয় করে জানতে চাইল, তার আগে আর কার সঙ্গে জ্যোতিরাণীর বিয়ের কথা হয়েছিল—বলল, শুধু এটুকু জানতে পারলেই তার মন ঠাণ্ডা হবে সুস্থির হবে স্বাভাবিক হবে—গোপনতা চলে গেলে ওদের দুজনেরই মন হাল্কা হবে। আমি মামুর নাম করে দিলাম, সন্দেহটা আমার দিক থেকে মামুর দিকে চালান হয়ে গেল তাও বুঝলাম। মামু তখন এখানেই, মামুকেও বলেছি। কি করব, মামুর সহ্যগুণে আমার থেকে বেশি, এবারে মামু সামলাক।

এদিকটা নিরানন্দের বটে, কিন্তু আনন্দের দিকটাও আমার কাছে একটুও ছোট নয়। আমি দেখছি কর্তার মুখের হাসি গেছে, দুর্ভাবনার ছটফটানি বেশ ভালো রকম শুরু হয়ে গেছে। কর্ত্রীর মনেও শান্তি নেই। আমি নিজেকেই নিজে পাষণ্ড বলি, কারণ তাঁদের দিকে তাকালে আমার কেবল হাসি পায়। কর্তা এক-একদিন আমার কাছে এসে বসেন, জিজ্ঞাসা করেন, কি করা যায় বল তো? আমার কেবল হাসিই পায়, বলতে ইচ্ছে করে, কেন, তোমার আচার নিষ্ঠার জোরে সব কিছু ঠিক করে ফেলতে পারছ না?"

জ্যোতিরাণী পাতা উল্টে গেলেন। এরপর অনেকগুলো লেখা একজনের সন্দেহের সেই ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই। সবটাই মামাশ্বশুরকে কেন্দ্র করে। তার ফলে কালীদাকে নিয়ে শ্বশুরের ডাক্তারের কাছে ছোটা, জ্যোতিরাণীদের বাড়ি ছাড়া। এই লেখাগুলো এসে থেমেছে শ্বশুরের মৃত্যুতে এসে। মৃত্যুর পর কালীদা লিখেছেন, মৃতের সঙ্গে মানুষের বিবাদ নেই, আর যেন এই কালো খাতায় মনের কালী ছড়াতে না হয়।

কিন্তু একটানা বছর দুই বাদে ওই কালো খাতা নিয়ে তিনি আবারও বসেছেন।

... ...

"শিবু টাকা করছে। অনেক টাকা। ওর মাথা আছে, যা ধরছে তাতেই সোনা ফলছে। মাথা আছে বলেই ধরার বাহাদুরী। এই ধন্দটা ওর কাছে আশীর্বাদ। কিন্তু শিবু টাকা করছে বলেই এই কালো খাতায় টান পড়ার কথা নয়। সন্দেহ রোগের জন্যেও নয়, আমাকে আর মামুকে অব্যাহতি দিয়েছে, এখন ওর সামনে বিভাস দত্ত। তা নিয়েও আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু হঠাৎ মিত্রার সঙ্গে ওদের এত সদ্ভাব

হয়ে গেল কি করে বুঝতে পারছি না। তার স্বামী নাকি ব্যারিস্টারি পড়তে চলেই গেছে বিলেতে, ফিরবে কি ফিরবে না ঠিক নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছি মিত্রা চাকরিও করে না এখন, অথচ আছে বেশ বহাল তবিয়তেই।

সন্দেহটা ছোঁয়াচে রোগের মত। শিবুকে দুষতাম। কিন্তু সেটা এখন আমাকেই ছেঁকে ধরছে। ধরে আছে। শিবু আরো বড় বাড়ি ভাড়া করেছে, আরো বড় গাড়ি হয়েছে তার। আর সেই বাড়ি আর গাড়ির সঙ্গে মিত্রার যোগও বাড়ছেই। সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে প্রায়ই ডাক পড়ে নাকি দুজনেরই। খোঁজ-খবর আরো নিয়েছি। মিত্রার সংস্কৃতি-প্রীতির লক্ষ্য কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিবুর সংস্কৃতি-ভক্ত হওয়া আর কষাইয়ের বুকে জীব-প্রেম উথলে ওঠা প্রায় এক ব্যাপারই। মিত্রাই তাকে এই আনন্দের রাস্তায় টানছে অনুমান করতে পারি। মোটা টাকার চাঁদা আদায় করে দিলে কে না মস্ত সংস্কৃতি-রসিক বলে দুহাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে।

কিন্তু ব্যাপারটা এর থেকেও জটিল ঠেকছিল আমার কাছে। কেন ঠিক বলতে পারব না। এই যোগাযোগটাই আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক লাগছিল না হয়ত। জটিলতার রেখাপাত বাড়তেই থাকল। অনেক কিছুই বিসদৃশ ঠেকতে লাগল। শিবুর চেক বই খুলে মিত্রার নামে কাটা কয়েকটা চেকের হদিসও পেয়েছি। একেবারে তুচ্ছ অঙ্কের চেক নয়। রাতের ফাংশনে ডাক পড়লে খোঁজ নিয়ে দেখেছি মিত্রা সেখানে আছেই। নতুন করে আবার অশান্তির আগুন জ্বলেছে আমার মাথায়। আমি কেবল খুঁজে বেড়িয়েছি চন্দ গেল কোথায়। বিলেত যদি গিয়েই থাকে, ব্যারিস্টার যে হয়নি বা হবার জন্যে সেখানে বসে নেই তাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। মিত্রার কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের টিপের ওপরেও আমার বিশ্বাস ছিল না। বিশ্বাস ছিল কেবল ওর পিঠের চাবুকের দাগগুলোর ওপর—যা আমি চোখে দেখিনি কখনো। সেই চাবুক যেন আমার পিঠেও পড়ে আছে। তার যাতনাও আছে, রাগও আছে। ভিতরটা আমার আজও সেই দাগ মুছে দেবার জন্য লালায়িত, কিন্তু কেমন করে যে তা সম্ভব ভেবে পাইনে। ওর স্বামীর অস্তিত্ব যদি মুছে গিয়েই থাকে ও আমাকে জানায় না কেন? আজ তো খড়ম নিয়ে তাড়া করার কেউ নেই। কিন্তু কিছু বলা দূরে থাক, আমাকে দেখলেই ও কেমন সচকিত হয়ে ওঠে, সব থেকে বেশি আমাকেই এড়িয়ে চলতে চায়। কেন? কেন?

চিন্তাটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই একদিন জানাও গেল সব কিছু। দিন কয়েকের জন্য শিবু বাইরে গেছে। পরে শুনলাম মিত্রাও কলকাতায় নেই, বাইরের কি এক ফাংশনে কর্তৃত্বের ভার নিয়েছে। সেই রাতেই বিক্রমকে ধরলাম আমি, বিক্রম পাঠক। শিবুর গুণমুগ্ধ ভক্ত, আবার বিলক্ষণ ভয়ও করে তাকে। হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাকে আকণ্ঠ মদ গেলালাম। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাড়ির অশান্তির কথা তুললাম। বলা বাহুল্য সেই কল্পিত অশান্তি শিবু আর মিত্রাকে নিয়ে। বললাম, এবারও দুজনে এক জায়গাতেই গেছে কে আর না জানে! মদের নেশায় বিক্রম হোঁচট খেল যেন, সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাবীজী জানে? ছেলেটা ভালো, ভাবীজীর ওপর তার টানও আছে। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, দেখো তো, ঘরে এমন বউ থাকতে এরকম নচ্ছাড় মেয়েমানুষের পাল্লায় কেউ পড়ে, দাদার এত বুদ্ধি, কিন্তু চোখ নেই। ভাবীজীর দুঃখে এরপরে গলগল করে অনেক কথাই বলেছে সে। তার প্রত্যেকটা কথা আমার কানে আর মাথায় এক-একটা বিষাক্ত তীরের মত ঢুকেছে। বিক্রম সব জানে বলে, আর এবাড়ির সঙ্গে তার একটু-আধটু যোগ আছে বলে শিবুর অগোচরে মিত্রার সাদর আপ্যায়ন থেকে সেও একেবারে বাদ পড়েনি। জানার যেটুকু জানা হয়েছে, ওঠার আগে বিক্রমকে শাসিয়ে এসেছি, এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে শিবু জানতে পারলে তার বিপদ হবে।

না, শিবু যা করেছে তা আর কেউ করেনি। পিসেমশাইর খড়ম মিত্রাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি, চন্দর চাবুক তাকে বরং আরো আমার কাছে এগিয়ে দিয়েছিল। জীবনে তাকে পাব না জানতুম, তবু সে আমার কাছেই ছিল। কত কাছে সে শুধু আমিই জানি। কিন্তু এবাড়ির সুরেশ্বর চাটুজ্জের ছেলে শিবেশ্বর চাটুজ্জের টাকা তার সব নিয়েছে, সব নিয়ে তাকে ভোগের সঙ্গিনী করেছে। অপমানের সব থেকে বড় চাবুকটা শিবু আমারই মুখের ওপর মেরে দিয়ে গেছে। মনে পড়ছে, ওর বাবার ভয়ে মিত্রাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছিলাম না বলে ও বলেছিল, অত যদি ভয় তো ছেড়ে দাও, আমিই চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি বিয়েটা করে ফেলতে পারি কিনা। শুনে সেদিনও আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু বুঝতে পারিনি মিত্রাকে ঘিরে তখন থেকেই ওর ভিতরে বাসনার খেলা চলছিল। ...জ্যোতিরাণী, তোমাকে সাবধান করার সময় পেলে সাবধান করতাম, আর করে লাভ নেই। যে কদিন পারো সুখেই থাকো। পাপ এলে বিনাশ আসবেই, সেটা এবার কেমন করে কার হাত দিয়ে আসবে আমি জানি না। আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি।"

সর্বাঙ্গ শিরসির করছে জ্যোতিরাণীর। রুদ্ধশ্বাসে পাতা উল্টে চলেছেন। পর পর কটা লেখায় হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও প্রতিশোধের একটা নীরব সঙ্কল্প যেন ঝিলিক দিয়ে গেছে। এমন কি ছেলেটারও যেন অব্যাহতি নেই তা থেকে। বিভাস দত্তকে ঘিরে টিকা-টিপ্পনীও কম নেই।

... ...

"ওরা বিলেত চলে গেল। আমি হাসিমুখে ওদের প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। মিত্রা গেল তার ব্যারিস্টার স্বামীর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে আর টাকা আনতে। আর শিবেশ্বরবাবু যাবেন অ্যামেরিকায়। ভালো ভালো, জমুক নাটক। জমে জমে শেষ অঙ্কে আসুক। আমি যে ওদের মুখের ওপর হা-হা শব্দে হেসে উঠিনি আমার বাবার ভাগ্য। যাবার আগে শিবু আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, জ্যোতির ওপর যেন একটু চোখ রাখি। অর্থাৎ বিভাস যেন এই ফাঁকে আবার বেশি না এগোয়। আমি আশ্বাস দিয়েছি চোখ রাখব। চোখ রাখবার জন্যে সে যে সদাকে মোতায়েন করে গেছে তাও জানি। তবু সাবধানের মার নেই বোধহয়। আমি তো হাবাগোবা ভালোমানুষ, আমাকে নিয়ে ওদের নিজেদের ভয় নেই। টাকা হলে তবে লোকে চালাক হয়। শিবেশ্বর ভারী চালাক, আর জ্যোতিরাণীর মিত্রাদিও। জ্যোতিরাণীকে বলব সব? বললে বিভাস এগোয় কিনা দেখব? কিন্তু তুমি একটি রাম মূর্খ কালীনাথ, জ্যোতির এগনোর সম্ভাবনা দেখলে বলতে পারতে, বিভাস এগোলে কি লাভ? তার থেকে হাতে ছুরি, বুকে ছুরি, চোখে ছুরি, মগজে ছুরি নিয়ে যেমন বসে আছ তেমনি বসে থাকো। গলা যারা বাড়াবার তারা ঠিক একদিন গলা বাড়াবে।"

জ্যোতিরাণীর মনে আছে, যেদিন রওনা হয়ে গেল দুজনে সেই রাতেই ফিরে এসে কালীদা এই কালো খাতা খুলে বসেছিলেন। আর তিনি অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, এই রাতে ভদ্রলোক লেখার মত কি পেলেন আবার। পরের তারিখটা অনেকদিন পরের—দুজনে বিলেত থেকে ফিরে আসারও পরের।

"...মিত্রার কথা-বার্তায়, চাল-চলনে, হাসি-খুশিতে বিলেতের রঙ লেগেছে। ফেরার পরেও ওর গায়ে যেন বিলেতের বাতাসই লেগে আছে। মোটা শরীর বেশ আঁট হয়েছে। কি কাণ্ড, আমার চোখেও লোভ লাগছে নাকি, কালীনাথ সাবধান।... মনের আনন্দে জ্যোতিরাণীকে বিলেতের গল্প শোনাচ্ছে। ওর স্বামীর সঙ্গে মোক্ষম বোঝা-পড়া করে আসার গল্পও। জ্যোতিরাণী হা করে শুনছে। হায় গো জ্যোতিরাণী, তুমি এ-কালে জন্মালে কেন?...থেকে থেকে আজকাল প্রায়ই একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে আমার। বাড়ির কর্তা সুরেশ্বর চাটুজ্জে অনেকদিন বলেছেন, জ্যোতিরাণীকে দেখে-দেখে নাকি নিজের মা-কে মনে পড়ত তাঁর, সেই রকমই মনে হত। সুরেশ্বর চাটুজ্জের মা মানে তো সেই তেজস্বিনী হৈমবতী। আমারও আজকাল সে-রকম ভাবতে একেবারে মন্দ লাগে না। কিন্তু শিবু তাহলে কে? আদিত্যরাম? আদিত্যরাম আর যাই হোক নমস্য বীর্যবান। শিবু তার প্রেত হবে। কিন্তু আমিই বা তাহলে কে? নীলগোপাল নয়তো? আর মিত্রা সৌদামিনী? নীলগোপালের কাছ থেকে আদিত্যরাম সৌদামিনীকে কেড়ে নিয়েছিল বলেই তো আদিত্যরামের কাল হয়েছিল! মিলছে মন্দ না। কালীনাথ তুমি শুধু অপেক্ষা করো, ব্যস্ত হয়ো না।...মৈত্রেয়ী চন্দ ঝকঝকে একটা নতুন বাড়িতে উঠেছে, কোন এক মুসলমান বাড়িঅলার কাছ থেকে

অঙকার লীজ নিয়েছে নাকি। আমি শুধু শুনেছি আর অপেক্ষা করছি।"

জ্যোতিরাণীর সব দীর্ঘনিঃশ্বাস এখনো কি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি? বড় নিঃশ্বাসই বেরিয়ে এলো একটা। পাতা ওলটানো মাত্র উদগ্রীব আবার।

... ...

"শিবেশ্বরের মুখের ওপর যেন আচমকা জোরালো সার্চ লাইট ফেলা হল একটা। প্রথমে সচকিত, তারপর নিমূঢ়।

খাতাপত্র খুলে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বালীগঞ্জের দোতলা বাড়িটা মৈত্রেয়ী চন্দর নামে কেনা হল, এর খরচাপত্র তো কিছু খাতায় নেই দেখছি।

এটুকু সামলাতেই সময় লাগল বিলক্ষণ। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠার দাখিল। কিন্তু সত্যিই ফ্যাকাশে হলে মর্যাদা থাকে না। আমি তার অ্যাটর্নী অথচ চুপচাপ কাজটা করিয়েছে অন্য অ্যাটর্নীকে দিয়ে। ঢোক গিলে গম্ভীর জবাব দিল, ওটা আমার পার্সোন্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে গেছে, খাতায় আনার দরকার নেই। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে বলল?

জানালাম যে অনাটর্নী কাজ করেছে তার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। শুনে শিবেশ্বর মন্তব্য করল, মৈত্রেয়ীর চেনা-জানা অ্যাটর্নী, তাকে দিয়েই করালে। এও যথেষ্ট নয়, আরো একটু কৈফিয়ত দেবার তাগিদ বোধ করল। হাসতে চেষ্টা করে বলল, এমন ধরল যে টাকা না দিয়ে পারা গেল না, একতলাটা ভাড়া দিয়ে শোধ করে দেবে...সস্তার বাড়ি, হাতছাড়া হয়ে যায়, বিলেতে ওর স্বামীর কাছ থেকে তেমন বিশেষ কিছু তো আনতে পারে নি...।

নির্বোধ বিস্ময়ের কারুকার্য নিজের মুখে কতটা ফোটাতে পেরেছিলাম জানি না। হতভম্বের মতই আমি বলে উঠেছি, স্বামী! বিলেতে আবার তার স্বামী এলো কোত্থেকে? তার স্বামী তো সেই ক' বছর ধরে কোয়েমবেটোরের হাসপাতালে পড়ে আছে, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট থেকে প্যারালিসিস—

বড় আফশোস, শিবুবাবুর সেই মুখ আমি ছাড়া আর কেউ দেখল না। আমার ভয় ধরেছিল ও বোবা হয়ে গেল কিনা। না, তারপরেও ও আমার হাতে-পায়ে ধরে নি। আগের দিন হলে ধরত বোধহয়। শুধু মুখের দিকে চেয়ে থেকে যেটুকু পারে বুঝিয়ে দিয়েছে। ধনপতি শিবেশ্বর চাটুজ্জে মুখের দিকে চেয়ে থেকে শুধু দুটো চোখ দিয়েই যেটুকু বলতে পারে—বলেছে। আমি বোকা কালীনাথ তেমনি নিঃশব্দেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি।

এর পর দিনে দিনে আমার কদর বেড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে মাইনে বেড়েছে। ওর টাকা-পয়সার ওপর অধিকার বেড়েছে। সংসারে ওর ওপর কর্তৃত্বও বেড়েছে। ও নির্বোধ না, মিত্রাকে ও কিছু বলবে না আমি জানতাম। আমার মুখ যদি শেলাই করা থাকে তাহলে মিত্রার না জানাই ভাল। জানলে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হবে।... কিন্তু মিত্রা কি আভাস কিছু পেয়েছে? আমার সঙ্গে তার ব্যবহারে আবার সেই ঘনিষ্ঠতার সুর কেন? একটু হাতছানি পেলে ও ছুটে আসতে পারে বোধহয়। সে কি অনেক টাকা নাড়াচাড়া করি বলে নাকি আর কিছু?"

জ্যোতিরাণী উদগ্রীব হয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন, মাঝের এই তিনটে বিচ্ছিন্ন বছরও বুঝি মন থেকে মুছে গেছে।

... ...

"চাবুক মেরে মেরে ছেলেটার ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। বসার ঘরে বিভাস আর জ্যোতিরাণী ছিল, বিভাস পড়ছিল আর জ্যোতিরাণী শুনছিল—ছেলেটা তখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল। এই অপরাধ। নাটক জমছে বই কি, বেশ দ্রুত তালে জমছে। শিবু খবরটা শুনেছে চন্দননগরে মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে। সেখানকার ফাংশান শেষ করে সেই রাতেই কলকাতায় ফিরেছে দুজনে। কালীনাথ, ছেলেটার জন্যে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত, তার ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত, জ্যোতিরাণীর জন্যেও দুঃখ হওয়া উচিত। স্বাধীনতার সকালে মামুর মুখে রাণীর নয়-ফাঁসির আসামীর গল্প শুনে সকলের মুখে আলো দেখেছিলে, সেটা এভাবে নিভল বলে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখ না হলে জোর করে আর দুঃখ করবে কি করে। ছেলেকে চাবুক মারার পরেও বাবুর রাগ পড়ে নি। সদাকে চাবকে লাল করবে বলে শাসিয়েছে। বাড়ি থেকে দূর করে দেবে বলেছে। তারও অপরাধ কম নাকি! সে সঠিক করে বলতে পারে নি আলো নেভার আগে বিভাস দত্ত কতক্ষণ ধরে বসার ঘরে ছিল, সঠিক বলতে পারে নি আলো নেভার কতক্ষণ পরে সে গেছে, তার বউদিমণি কতক্ষণ বাদে ওপরে উঠেছে। এই ব্যাপারে চোখ রাখাই সদার আসল কাজ এখন, আসল কাজে গাফিলতি হলে রাগ হবে না? এর কিছুদিন আগে সদাকে জ্যোতিরাণী কি বই না কি একটা লেখা আনার জন্যে বিভাসের কাছে পাঠিয়েছিল। সদাকে সোজা তিনতলায় বিভাসের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাড়ির লোক। সে-ঘরে বউদিমণি আর সিতুর সঙ্গে শুধু বিভাসবাবুর ছবি টাঙানো দেখে সদা খবরটা তার দাদাবাবুকে দিয়ে পুরস্কার পেয়েছিল, এ-বেলায় তিরস্কার মিলবে না? কিন্তু সদা সেই থেকে গজরাচ্ছে এ-বাড়িতে সে আর থাকবে না, এ-সব ঘেন্নার কাজ তার দ্বারা আর হবে না। ও আর থাকবে না।...চল্লিশ বছরের সদা, গেলে মন্দ হয় না বটে। নাটকের এই অঙ্ক সদায় বিদায় চাইছে।"

চোখের সামনে দিয়ে পর্দায় এক-একটা ছবি সরে-সরে যাচ্ছে যেন জ্যোতিরাণীর। তাঁর চোখ লাল, মুখ লাল। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন। থামলেন, শুরুতে সিতুর কথা।

... ...

"ছেলেটা এক-নম্বরের বিচ্ছু। কখনো মনে হয় মায়ের ছেলে, কখনো বাপের। মায়ের ছেলে মনে হলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শিবুর ছেলে মনে হলে আমার ভেতরের ছুরিগুলো ওর দিকেও উঁচিয়ে উঠতে চায়। বাপের মত বই নিয়ে পড়ে থাকার ধৈর্য নেই, অথচ বাপের মতই মাথা। ওইটুকু ছেলে, পুরুষের চোখ নিয়েই যেন ওই ছোট মেয়েটার দিকে তাকায়—শমীর দিকে। নাকি, ওর বাপের ওপর রাগে এমন মাথা খারাপের মত দেখি আমি! শেষ পর্যন্ত মায়ের মত হবে কি বাপের মত ঠিক বুঝতে পারি না। ছোটদাদুর পোলোরাস জ্যাকের গল্প শুনে ওর চোখে জল আসে, আবার ডাকাতদের চোখের সামনে মানুষ মারতে দেখলেও বীরত্বের উদ্দীপনা—তখন মনে হয় এও আর একটি খুদে শিবু। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। কেন দেখি কে জানে, এক-এক সময় মনে পড়ে, এই ছোঁড়ার মাথায় পাকা চুল দেখেই না ওর ঠাকুমা কাঁপতে-কাঁপতে আর্তনাদ করে উঠেছিল, প্রভুজী এলো!"

... ...

সামনে কালো নোট বই পড়ে আছে। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত বসে। কোন যোগ নেই আর, তবু অগোচরের কি একটা অস্বস্তি ভেতরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। গোড়ার লেখাটা মনে পড়ছে থেকে-থেকে। শকুনি স্তুতি, আরো বার-দুই পড়েছেন ওটা তিনি। শকুনির অট্টহাসির জায়গাটায় এসে প্রত্যেকবার থমকেছেন, অস্বস্তি বেড়েছে। থেকে-থেকে মনে হয়েছে, অট্টহাসি না হোক, ওমনি একটা সর্বধ্বংসী নিঃশব্দ হাসি যেন ছড়িয়ে আছে কালীদার লেখা এই কালো খাতাটার পাতায়-পাতায়।

—মাসি!

হাঁপাতে-হাঁপাতে শমী ঘরে ঢুকল। নীচের কম্পাউণ্ডে মেয়েদের সঙ্গে খেলছিল, ছুটে এসেছে। চৌদ্দ বছর বয়স আন্দাজে এখনো একটু মোটার দিক ঘেঁষা, তাই হাঁপ ধরেছে।

—মাসি, আজও সিতুদা গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল! আজ আবার ট্যাক্সি চেপে এসেছিল! আজ কিন্তু আমি ভয় পাই নি, ও-রকম গম্ভীর মুখ করে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও খেলার দানটা শেষ হলেই ঠিক গেটের সামনে যাব ভেবেছিলাম। তার আগেই ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল—

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

প্রাত্যাহিক শিক্ষা

জীবনে শেখার অন্ত নেই। প্রতি ধাপেই শিখতে হয়। শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। আবার এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যে জাতির মধ্যে শেখার ও জানার কিছু নেই বহু পূর্বেই সে জাতির মৃত্যু হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের কথানুযায়ী আমরা হচ্ছি জীবন-পাঠশালার চিরকেলের পড়ুয়া। এ পাঠশালার পাঠের সমাপ্তি এবং শেষ নেই। আবার স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি অনুসারে বাঁচার আর এক নাম শেখা। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় শিক্ষা মানব-জীবনে এক অন্তহীন বৈচিত্র্যের স্বাদ বহন করে আনে। অবশ্যই আজকের দিনে এই তত্ত্বকথা আওড়ান অবাঞ্ছিত এবং নিষ্প্রয়োজন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষার প্রভাবে সারা দুনিয়া ঝলমল করছে এবং শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও প্রচারের দ্বারা আমাদের যুগ-যুগান্তের আলোকাভিসারের বাসনা সফল করতে চলেছি, ঠিক এই মুহূর্তে এ ধরনের কথা একটু অস্বাভাবিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে কোন সংকোচ এবং দ্বিধা নেই যে, একথা বলার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরিয়ে যায় নি এবং ফুরিয়ে গেলে আমরা অবশ্যই সুখী হতাম এবং আমাদের সব সময়কার কামনা সেরকমই। কিন্তু কামনা এবং বাস্তবে প্রায় সময়ই তফাৎ থাকে, তা সে কামনা যতই আন্তরিক হোক না কেন। এক্ষেত্রেও এই ফারাকটা রয়েছে। বাস্তবের সংগে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনক্রমেই খাপ খাচ্ছে না।

অবশ্যই আমি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা-আঁটা শিক্ষিত এবং সেই শিক্ষার কথা বলছি না। জীবনে প্রাত্যাহিক শিক্ষার কথাই এ স্থলে আলোচ্য। যতই বড় বড় কথা বলি না কেন এদিক দিয়ে কিন্তু আজও আমরা পুরোপুরি শিক্ষিত হতে পারলাম না। শিক্ষিত-অশিক্ষিতনির্বিশেষে এক্ষেত্রে আমরা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলাম। অথচ আমাদের শেখার আগ্রহ আছে এবং সমাজ থেকে শিক্ষণীয় কিছু নেই এমন কথাও নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। তা সত্ত্বেও এই অসম্পূর্ণতা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

প্রায়ই দেখা যায় যে আমরা শিষ্টাচার জানি না। সহবতের কোন বালাই আমাদের নেই। এ ত্রুটি যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই আছে, শিক্ষার কৌলীন্যে এ ত্রুটি থেকে মুক্তিলাভ অসম্ভব। এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিজেদের মার্জিত করা এবং একই উপায়ে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মার্জিত রুচিসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। শৈশবেই যদি শিক্ষার এই ভিত গড়ে তোলা যায় তবে পরবর্তী জীবনে আর পদে-পদে ঘা খেতে হবে না। ঠেকে না শিখে তখন স্বাভাবিক পথেই শিক্ষালাভ হবে। অন্য সব কিছুর মত এক্ষেত্রেও মায়ের দায়িত্ব সর্বাধিক। মা হচ্ছে শিশুর প্রথম পাঠশালা। জীবনের প্রথম পাঠের সংগে সংগেই শিশুকে কায়দা-কানুন এবং সহবত শেখাতে হবে। কালক্রমে সেটাই শিক্ষায় দাঁড়িয়ে যাবে। তখন আর কোন ভাবনাই থাকবে না। এবং সেদিন থেকেই সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের সূচনা হবে। আমাদের সমবেত কামনা সাফল্যের রূপ পরিগ্রহ করবে।

রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে নারী

রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়েদের ঐতিহ্য ঐতিহাসিক ব্যাপার। রাজা-মহারাজার আমলে অনেক রাণী-মহারাণী রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে এরকম নজীরের অভাব নেই। ইতিহাসের কাল ছেড়ে হাল আমলে প্রবেশ করলেও দেখা যাবে যে, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর যোগ্যতার ঘাটতি নেই। আমাদের দেশের উদাহরণই একথার সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট।

অবশ্যই স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব বিলম্বিত অধ্যায়। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তবু অনেকটা অগ্রবর্তী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু ইউরোপীয় দেশ বৃটেন এবং আমেরিকা আমাদের নিদারুণভাবে হতাশ করেছে। অথচ এই দুই দেশের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল বেশী। আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শাসনকার্য পরিচালনায় নারী একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং তাদের দাবীও এক্ষেত্রে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। স্বদেশের প্রশাসনিক ব্যাপারে নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও বিদেশে স্বদেশের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে নারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং তাদের ভূমিকাও খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। দূতিয়ালীর ব্যাপারে নারী এখনও কিন্তু পিছিয়ে আছে। দেশ-বিদেশে তাকালেই এটা স্পষ্ট হবে।

মহিলা রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ব্যাপারে বৃটেন আজও রাশিয়ান এবং আফগানদের মত রক্ষণশীল। কিন্তু তা বলে বৃটিশ রাজধানীতে মহিলা রাষ্ট্রদূতদের আনাগোনার অন্ত নেই। আর এই মহিলা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নাম হচ্ছে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। শ্রীমতী পণ্ডিত প্রথমে রাশিয়া এবং বৃটেনে যথাক্রমে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। পরে অবশ্য তিনি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভানেত্রীও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারত-চীন এবং ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় বিদেশে ভারতের ভ্রাম্যমাণ দূত হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা আমাদের সকলেরই মনে আছে। সেদিক থেকে তিনি দূতিয়ালীর ক্ষেত্রে নিজেই একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ এবং নতুন অধ্যায়। বর্তমানে বৃটেনে মহিলা রাষ্ট্রদূতের সংখ্যা তিনজন। এঁদের মধ্যে আছেন কিউবার শ্রীমতী অল্‌বা গ্রিনান নুনেজ, মরক্কোর শ্রীমতী লাল্লা আইচা এবং কোস্টারাইকার সদ্য-নিযুক্ত শ্রীমতী ক্লডিয়া কাসকান্তা ডি রোজার্স। অবশ্য লণ্ডনে মহিলা রাষ্ট্রদূত নিয়োগের ব্যাপারে কোস্টারাইকার একটা ঐতিহ্য আছে। কারণ বর্তমান রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী রোজার্সের পূর্ববর্তী রাষ্ট্রদূত ছিলেন শ্রীমতী চিটেনডেন।

বৃটেনে এত মহিলা রাষ্ট্রদূতের ঘন-ঘন আনাগোনা এবং পালা-বদল কিন্তু এ

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

গ্রিনান নুনেজ

লাল্লা আইচা

ডি রোজার্স

প্যাট্রিসিয়া হ্যারিস

সম্পর্কে খোদ বৃটেনের একটা মজার ব্যাপার আছে। বৃটেনের রক্ষণশীলতার কথা সুবিদিত। বিশেষত বিবাহিতা মহিলাদের রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের বিধিনিষেধই এক্ষেত্রে বড় বাধা। একবার মাত্র এই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটেছিল। সব সংস্কার দূরে ঠেলে দিয়ে শ্রীমতী বারবারা সল্টকে ইস্রাইলের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। সেটা ১৯৬২ সালের কথা। কিন্তু চিরাচরিত সংস্কারের পক্ষেই হয়ত অলক্ষ্য বিধির সমর্থন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর পক্ষে সে পদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

বিগত দিনের মহিলা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতকীর্তি হয়ে ওঠেন আমেরিকার পার্লে মেস্টা। তাঁকে উপলক্ষ্য করেই রচিত হয় আর্ভিং বার্লিনের বিখ্যাত গীতিনাট্য ‘কল দি মাদাম’। শ্রীমতী পার্লে মেস্টার এই ঐতিহ্য অনেকটা বজায় রেখেছিলেন, শ্রীমতী ইউজিন অ্যান্ডারসন। ১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁকে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অচিরেই ডেনিশ ভাষা আয়ত্ত করেন এবং পাঁচ মাসের মধ্যেই রেডিও-টেলিভিশনে ডেনিস ভাষায় বক্তৃতা করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তিনি অবাধে মেলামেশা করতেন। তাঁর ছেলে পড়ত পাবলিক স্কুলে। এমনকি একবার তিনি প্রোটোকল অগ্রাহ্য করে তাঁর বাড়ীতে কর্মরত আশীজন শ্রমিককে নেমন্তন্ন করেন। সংগে সঙ্গে প্রত্যেকের স্ত্রীও নেমন্তন্ন পান। একথা ডেনমার্কের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চার বছর পর ডেনমার্ক থেকে বিদায় নবার সময় রাজা ফ্রেডারিক ওঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান ‘গ্রাণ্ড ক্রশ ও ডানেব্রগ’ অর্পণ করেন—মহিলাদের মধ্যে এই সম্মান একমাত্র শ্রীমতী ইউজিনেরই ভাগ্যে জুটেছিল। ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাঁকে নিযুক্ত করেন বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রদূত পদে। এখানেও তিনি বুলগেরীয় ভাষা শেখেন এবং সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বুলগেরিয়ার সাধারণ লোক তাঁকে ডাকত ‘বার্বিটচকা’ অর্থাৎ ‘ব্রাভো, ইউজিন’ বলে। ১৯৬৪ সালে তিনি বুলগেরিয়া থেকে বিদায় নেন।

বর্তমানে শ্রীমতী ইউজিন অ্যান্ডারসন আছেন রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টীসিপ কাউন্সিলে—আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে। এখানেও তাঁর পদমর্যাদা রাষ্ট্রদূতের সমান। আশা করা যায় এই নতুন কার্যক্ষেত্রেও তিনি পূর্ব সুনাম বজায় রাখবেন এবং একই রকম দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন।

বিভিন্ন দেশে বর্তমানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সংখ্যা তিনজন। এক্ষেত্রে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র সুইডেন। এ দেশের রাষ্ট্রদূত সংখ্যাও তিনজন।

আমেরিকার মহিলা রাষ্ট্রদূতেরা নিযুক্ত আছেন ডেনমার্কে শ্রীমতী ক্যাথারিণ অ্যালকাস হোয়াইট, নরওয়েতে শ্রীমতী মার্গারেট, টিবেটস এবং লুকসেমবার্গে শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া রবার্ট হ্যারিস।

এ'দের মধ্যে শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া রবার্ট হ্যারিসের নিয়োগই বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শ্রীমতী হ্যারিস জাতিতে নিগ্রো, এবং রাষ্ট্রদূতের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিগ্রো মহিলার নিয়োগ এই প্রথম। এই পদে নিযুক্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউশনাল ল-এর অধ্যাপিকা। তবে শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি একাধিক নাগরিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ন্যাশনাল উওমেন্স কমিটি ফর সিভিল রাইটার্স অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির তিনি ছিলেন কো-চেয়ারম্যান এবং ওয়াশিংটন আর্বান লীগের চেয়ারম্যান। এ ছাড়া প্রথম দিকে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তেরোজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশনের সমস্যা—যাদের বিচার্য বিষয় ছিল ‘স্টেটহুড অব কমনওয়েলথ ফর দি আইল্যান্ড’।

রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে নারীর অবদান এবং কৃতিত্ব আজকের কূটনৈতিক জগতে নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এখনও অনেক দেশ অতীত সংস্কারে আচ্ছন্ন, উচ্চ কূটনৈতিক পর্যায়ে নারীর যোগ্যতা প্রদর্শনের কোন সুযোগ দিচ্ছে না। কিন্তু যুগধর্মকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। এই যুগধর্মের চাপে অনেক দেশ নারীকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদ নিযুক্ত করেছে। কিন্তু কূটনীতির এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁদের স্থান নির্ধারণের সময় এসেছে। যত দিন যাবে ততই এই প্রয়োজনীতা তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। যে সব দেশ আজও এ ব্যাপারে মৌনতাব অবলম্বন করে আছে তাঁদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে নারীর যোগ্য স্বীকৃতি মেনে নিতেই হবে।

ইউজিন অ্যান্ডারসন

সংবাদ

পশ্চিম বাংলা শিক্ষাব্যবস্থায় কোন স্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম থাকবে তা স্থির করার জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি সাবকমিটি গঠন করেছেন। এই সাবকমিটির চেয়ারম্যান হলেন শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী ডঃ ভবতোষ দত্ত, অপর দুজন সদস্য হচ্ছেন সুপরিচিত সমাজসেবিকা শ্রীমতী আরতি দত্ত এবং ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির সেক্রেটারী ডাঃ মৃণাল নন্দী। তবে এই সাবকমিটির সদস্য-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হবে বলে জানা গেছে।

• • •

কলকাতার সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকসের ডঃ শ্রীমতী জ্যোৎস্না চক্রবর্তী ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে সম্প্রতি জাপানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ কংগ্রেসে যোগদান করে দেশে ফিরেছেন। দেশে ফেরার আগে তিনি জাপানের বিভিন্ন গবেষণা-সংস্থা এবং কলকারখানা দেখে এসেছেন।

• • •

লোনলি হার্টস ক্লাবের মোট সত্তরজন অবিবাহিত মহিলা সম্প্রতি তাদের উপযুক্ত অবিবাহিত পুরুষের সন্ধানে রওনা হয়েছেন দুখানি বাসে চড়ে। বৃটেনের উপকূল থেকে রওনা হয়ে ইতিমধ্যে তারা কুড়ি মাইল এই অভিযান চালিয়েছেন। ইতিমধ্যে তারা এক খনি অঞ্চলের গ্রামে অবিবাহিতদের সংগে মোকাবিলা করেছেন। কিন্তু দু দলই হতাশ হয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষদের মনে ধরে নি এই মেয়েদের। তাই আবার পথপরিক্রমা শুরু হয়েছে। এ দলে কয়েকজন বিধবা ও বিবাহ-বিচ্ছেদকারিণী মহিলা আছেন।

জীবনপুরের নীলকুঠি

হেমচন্দ্র ঘোষ

নদীটির নাম পদ্মা। কেন যে এ নাম হল তার বিবরণ পাওয়া এখন সম্ভব নয়। রেণেল সাহেবের বেঙ্গল অ্যাটলাসে এর কোন কথাই নেই। গঙ্গারই এক অংশ পদ্মা। তার সঙ্গে এই নদীর কোন সংযোগ নেই। গঙ্গার পদ্মা এই নদী থেকে বহু দূরে ভিন্ন দেশে—বর্তমানে পাকিস্থানে। বৌদ্ধ যুগে বালবল্লভীপুর ছিল এক বিরাট সাংস্কৃতিক কেন্দ্র—জ্ঞানী শুভংকর এখানে থাকতেন। তাঁর চরণ স্পর্শে এই স্থানটি হয়েছিল পূত পবিত্র ও ধন্য। উত্তরকালে মুসলমান অধিকারে বালবল্লভীপুরের পরিবর্তিত নাম হল—বালান্ডা। তার মুখ্য স্থান খাস বালান্ডা। সেখানকার মসজিদের গাঁথুনী আর ছোট ছোট ইটের অস্তিত্ব মুসলমান আগমনের বহু পূর্বকালের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করছে। এই বালান্ডার উত্তর ভাগে নদী পদ্মা। বাংলায় নীল চাষ আরম্ভ হবার সময় এই নদীর পূর্ব বিরাটত্ব তার শুকনো বিস্তৃত গর্ভ পরিধি প্রমাণ করছে। পদ্মা এখন মৃত। তার স্রোত নেই—তার বুকে আর চলে না পণ্য সম্ভারে ভরা নৌকো। সন্ধ্যায় কর্মবিরত সরল মাঝির ভাঙ্গা গলার ভাটিয়ালী গান বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে শুকনো বুকের ওপর দিয়ে পারাপারের পথ পড়েছে।

তখনকার দিনে এই উন্মত্ত নদীর সরস তীরভূমি ছিল নীল চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আকবরের আমলে আমেদাবাদে ও আগ্রার নিকট বায়নাতে নীল রং তৈরী হত। ইউরোপের বহু স্থানে এই রং-এর চাহিদা ছিল প্রচুর। ডাচেরা এই রং সংগ্রহ করার জন্যে আগ্রায় ওৎ পেতে থাকত। লুই বোনড এলেন চন্দননগরে ১৭৭৭ সালে। বাংলাদেশে তিনিই নীল চাষের প্রবর্তক। নীলের চাষ ছিল খুব লাভজনক ব্যবসা। বোনডের দেখাদেখি ইউরোপের নানা জাতি নীলের ব্যবসা আরম্ভ করল। তারা এল দলে দলে। নীল পরিশ্রুত করতে প্রয়োজন হত সুপেয় নদীর জল। বাংলায় বড় বড় নদীর অভাব ছিল না। এখনও দেশের বিভিন্ন অংশে নীল কুঠির ভাঙ্গা বাড়ী নজরে পড়ে।

বর্ষা চলে গেছে। হেমন্তের রোদে পল্লী বাংলার মনোরম শ্রী ফুটে উঠেছে। তার দিগন্তের কোলে টেনে নিয়েছে সবুজ ধানের একটানা সোনার আঁচল। ঝাঁক বেঁধে উড়ো পাখী নজরের বাইরে চঞ্চল মেঘের কোলে নিরুদ্দেশ যাচ্ছে। সোনার বাংলা সুন্দর অতি সুন্দর। —

সন্ধ্যায় কিষাণ বাড়ীতে মজলিস। গোবর জলে নিকান উঠানে বয়স্ক লোকদের সমাগম—চলছে হুঁকো।

বৃদ্ধ রোমালি হুঁকোতে দুটো টান দিল—ডান হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে—ধরো। তার নাক-মুখ থেকে তখনও ধোঁয়া উড়ছে।

—এবার মা লক্ষীর ভাই ভালাই কীরপা।

—হীরের কুণির জোলের ধারে মোর ধান গাছগুলো বেশ বুকভরা হয়ে উঠেছে। রোমালি বলল—

—মোদের ভাল কেন না হবে! মোরা তো আর কারও ক্ষতি করিনি। রাজা মহাজন আগে থেকেই তো মিটিয়ে দি।

—দেখো চাচা! জমিদারের ঐ কারপরদারটা—ঐ সুন্দরটা মোটেই ভাল না—নজরটা তার বড্ডই নীচ।

—কি আর করা যাবে বলো! সব তো আর সোমান না—তোমার হাতের আঙ্গুলগুলোও না। নাকের ওপর টাকা ধরে দেবো—কি করবে সে!

—চাচা! একটা সাহেবের মত যেন এদিকে আসচে।

রোমালি ঘাড় ফিরে তাকাল।

—তাই তো রে!

—চাচা! তোমার খুব পূনি—সাহেবরা নাকি দেবতা!

—ধুৎ

সাহেব এগিয়ে এল।

—রোমালি পুরবাইত মোড়ল কাঁহা?

বৃদ্ধ এগিয়ে এল, একটা সেলাম করে বলল—

—হুজুর আমি!

বৃদ্ধ যেন অভিভূত হয়ে পড়েছে, গলার স্বর যেন জড়িয়ে গেল।

—হামি বানু সাহেব আছি—ডাচ-ডাচ

পরদিন সকালে বানু সাহেব আবার গ্রামে আসবে রোমালিকে সুন্দর বলে গেল।

পরদিন সকালে সাহেব এল।

রোমালির উঠানে সাহেব দেখতে গাঁয়ের লোকেরা জড় হয়েছে।

নীরস চুপি চুপি বলল—

—চাচা! সাহেব বোধ করি লোকটা ভাল।

কাদের কিন্তু ভাল লাগল না।

—মুখটা যেন কেমন-কেমন। চামড়াটা কুঁচকে হিজিবিজি হয়ে গেছে মনে করি লোকটা খুব কঠিন দয়া-মায়ার লেশ নেই।

—মোদের আর কি করবে।

—লোনা পানি যে ফসল মারে চাচা!

সুন্দর বুঝিয়ে দিল—সাহেব এখানে নীলের চাষ করবে। তাতে খুব লাভ—চাষীরা টাকার মোড়ায় বসে থাকবে। সাহেব বলে, চাষীরা বড় গরীব। তাদের এবার বড়লোক করে দেবো।

রোমালি একটু হাসল—

উত্তরটা কাল পাবে সুন্দরদা!

রোমালির ছেলে রহিম দৌড়ে এল এক-ছড়া কলা নিয়ে।

সাহেবের হাতে দিয়ে রোমালি বলল—

—সাহেব তুমি মোদের বাড়ী এয়েছো—অতীথ। কিছু-না-কিছু না দিলে মোর গুণা হবে!

সাহেব একটু হাসল।

সাহেব আর সুন্দর চলে গেল।

পরের দিনের ভোরবেলা।

ধোঁয়াটে আবহাওয়া নীহার ঝরে গাছের পাতাগুলো ভিজিয়ে দিয়েছে—সবুজ ঘাসে যেন নীহারের নোলক ঝুলছে—শিউলির গন্ধে ভরে উঠেছে মোড়লের উঠোনটা।

রোমালি দাওয়ায় বসে, হাতে হুঁকো, কোলকের আগুনটা তত জোরের না তাই মাঝে মাঝে টিপ দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে। হুঁকোর টান তার কাছে যেন অমৃতের মত, মাঝে মাঝে কাশি উঠলেও টানের বিরাম নেই।

—ওরে ওঠরে! রোমালি হাঁকল।

—পুব যে ফর্সা হলো—মোরগ ডাকে এখনও শুয়ে। কি অলুক্ষণে ঘুমরে তোদের!

তখন কিছুটা বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে—লোক চেনা যায়। রোমালির বড় ছেলে হাল নিয়ে বেরুলো।

—একটু চেপে নাঙ্গল দিবি। জো রয়েছে দু চাষেই হবে।

বৃদ্ধের ছোট ছেলে রহিম কিছুটা আদুরে ও আবদারে।

অল্প কিছুদিন হল তার বিয়ে হয়েছে। পাশের গাঁয়ে বেহাই বাড়ী, তারা খুব বড় গেরস্ত। আনা নেওয়ার সুবিধে হবে, ছেলেটা আদর-যত্ন পাবে এই ভেবেই বৃদ্ধ রোমালি বিয়েতে মত দিয়েছিল। আবার মেয়েটা খুব লক্ষ্মী বেশ ফর্সা। বেহাই বাড়ীর কেউ দেখলে নিন্দে-মন্দ করবে তাই ছোট ছেলেকে হাল ধরতে দেয় না।

—চাচা। ও চাচা!

সুন্দর হাঁক দিল।

রোমালি গাঁয়ের বারোয়ারী চাচা সুন্দর তেমনি বারোয়ারী দাদা।

—কে সুন্দরদা!

—কি ঠিক করলে চাচা?

—দেখ সুন্দরদা! গাঁয়ের ভেতর যে সাহেব কুঠি করবে তা কিন্তু হবে না। বাইরের পাঁচজনে ঘোরাফেরা করবে তাতে মেয়েদের বেইজ্জতী হবে। সব্বাই রাজী তবে ঐ এককথা—কুঠি কিন্তু গাঁয়ে হবে না।

সুন্দর তার সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কুঠি তো হবে জীবনপুরে—পদ্মার ধারে।

—তাতে আর আপত্তি কি!

বিকেলে সাহেব এল—সঙ্গে সুন্দর। গাঁয়ের লোক সব জড় হয়েছে রোমালির বেহাই কুতুব এসেছে।

—বেনো জল ঢোকালে। বেয়াই! মোর কিন্তু ভাল লাগছে না।

—মোদের জমি তো আর সাহেব কেটে নিয়ে যাবে না! সুন্দরদা আছে মোদের দেখচে।

—ধান চালের আর কি বা দাম চাচা! উদয় অস্ত খেটেও পেটের ভাত হয় না—তার ওপর ঝড় আছে, ঝাপটা আছে—খরা তো লেগেই আছে।

—ঠিক বলেছ সুন্দরদা!

রোমালি মুখে বলল বটে কিন্তু তার মনটা যেন গুলিয়ে গিয়ে ঘোলাটে হয়ে গেছে—বেহাই যে অরাজী!

নীলের চাষে তো আর ধান হবে না। মা লক্ষ্মীর কৃপায় তারা তো কেউ অনাহারে নেই।

—বেহাই! তোমার কথাটাই ভাবছি—বেনো জল! নষ্ট দেখলে খাল কেটে আবার বের করে দেবো—তা বলে লক্ষ্মী ঠাকরুণকে রুষ্টু হতে দেবো না।

রোমালি কথা দিয়েছে—সাহেবের সংগে বোঝাপড়া একটা করতে হল।

কিছুদিনের মধ্যে পদ্মার ধারে জীবনপুরে কুঠি উঠল। জাঁকাল বাড়ী, শোবার ঘর, ড্রইং রুম, সামনের ঘরগুলোতে কাছারী, পাশে গুদোমঘর পেছনের ছোট ছোট ঘরগুলো প্রয়োজন মতো কয়েদখানা তার পিছনে ঝি-চাকরদের থাকার ঘর। পাল্কী রাখার জায়গা ও ঘোড়ার আস্তাবল। সাহেবের বাড়ী লোকজনে ভরে গেল। গুদোম ভরে উঠল নীলের বীজে।

রোমালিকে সাহেব তলব দিল। গাঁয়ের লোকেরাও এল তার সংগে। নীল বোনার চুক্তি হল—দাদন নিল গাঁয়ের লোকেরা—মরণ ফাঁদে পা দিল।

ফেরার পথে রোমালি মুখে মুখে একটা ফিরিস্তী করে বলল—

—ধানের চেয়েও এতে বেশী লাভ—কি বলিস রহিম?

—কি জানি, মোর কেমন ভয়-ভয় করছে।

মেটে রাস্তার শুকনো আলে রোমালি একটা টক্কর খেলো। রহিম তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল।

—বাপজী লেগেছে নাকি?

—ওরে না—ছেলেবেলায় কত টক্কর খেয়েছি তার কি ইয়াত্তা আছে। দুধ ঘিয়ে মোদের জন্ম। একটু-আধটু টক্করে মোদের কিচ্ছু হয় না।

—বাপজী!

—কি রে রহিম।

—না কিছু না।

সেবার নীলের চাষ ভাল হল না।

—মোরা নতুন ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

আলের ওপর দাঁড়িয়ে রোমালি—মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

—আরে সাহেব যে!

রোমালি এগিয়ে এল।

—এবার ভাল হোল না সাহেব!

—হোবে হোবে এবার হোবে!

সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

ফেরার পথে সুন্দরের সংগে দেখা।

—দাদনের টাকা তো পুরোল না সুন্দরদা?

—তাতে আর হয়েছে কি! আসচেবারে হবে।

—কিন্তু সে টাকাটা উঠল না!

—পরের বারে কাটা যাবে?

প্রতিবারেই দাঁড়াল একই ব্যাপার। দাদনের কোন কিনারা হল না।

—বাপজী ওজনে কিছু কারচুপি আছে! মালের তো কমতি নেই তবু টাকা ডোজছে না কেন? এটা সুন্দরদার কান্ড।

রোমালি একটু মৃদু ধমক দিল।

—না, না ওকথা বলিসনে রহিম—সুন্দর সে রকম লোকই না।

নীলের চাষ বছরে দুবার। এত পরিশ্রম করেও চাষীর দেনা মিটল না। বছরের পর বছর তাদের মোটা দেনা দাঁড়িয়ে গেল। তারা ঠিক করল আর নীল বুনবে না।

—সুন্দরদা! মোরা আর নীল বুনছি না।

—যা খেয়ে বসেছো—সে দেনাটা তো দিতে হবে। না বোনো অন্যভাবে দেনা শোধ কর।

—কেমন কোরে?

—সাহেবকে জমি লিখে দাও।

রোমালি শিউরে উঠল।

—তুমি কি তাই চাও।

—চাইবো না—সাহেবের দেনাটা তো মেটাতে হবে।

রোমালি গম্ভীর হয়ে বলল।

—হিসেবে বোধহয় ভুল হচ্ছে—মোদের দেনা হতেই পারে না!

—হয়েছে! খাতায় সব লেখা আছে।

কথাগুলো সুন্দর সাহেবের কানে পোঁছে দিল।

চক্কর দিয়ে ঘোরার পথে সাহেব রোমালির বাড়ীতে হাজির।

—টুমি বলিয়েছে নীল বুনবেনি!

রোমালি দীপ্ত স্বরে বলল—

—হাঁ বোলেছি নীল আর বুনব না।

রাগে সাহেবের তামাটে মুখখানা যেন লাল হয়ে উঠল। রোমালির পিঠে দুঘা চাবুক বসিয়ে দিল।

—টোমাকে বুনতেই হবে।

রোমালিকে মারল তাই দেখে রহিম ছুটে এল লাঠি নিয়ে।

সুন্দর বাধা দেয়

—কি করিস রহিম—সাহেব যে মনিব রে!

রহিম তখনও রাগে কাঁপছে।

—এতবড় শয়তান, বাপজীকে মারল, দেখে নেবো।

—আর দেখতে হবে না—যাঃ চলে যা।

রহিমের উগ্রমূর্তি দেখে সাহেবের যে ভয় হয়নি তা নয়। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠল।

পরদিন সকালে দেনার হিসেব নিয়ে সুন্দর গাঁয়ে হাজির।

—কালকের মধ্যে সব টাকা শোধ করতে হবে, নইলে বুঝেছ কান্ডটা কিন্তু দাঁড়াবে খুব সাংঘাতিক।

রহিমের মাথায় তখনও যেন আগুন জ্বলছে—কি করবে সাহেব! মোদের কিসের দেনা। এক লাঠিতে শয়তানী ভেংগে দেবো।

—তাহলে—

শান্তকণ্ঠে রোমালি বলল—দেনা রাখা একটা মস্ত গুণা। আচ্ছা সুন্দরদা মোদের দেনা কেন হোলো বলতে পার?

রোমালি আর রহিম দুজনেই নিরক্ষর। সুন্দরের তা অজ্ঞাত ছিল না।

সুন্দর খাতার একটা পাতা খুলে বলল—এই দেখ—এই দেখ না খাতায় সব লেখা আছে।

লোকজনের মাহিনের হিসাবে পাতাটা সুন্দর আঙুলের টান দিয়ে দেখিয়ে দিল—এই দেখনা সব লেখা রয়েছে।

সুন্দর চলে যাবার আগে রোমালি বলল—সুন্দরদা! সাহেবকে গাঁয়ে ঢুকতে মানা কোরো। লোকজন সব উতলা হয়ে উঠেছে. কি জানি শেষে কি কোরে বসে!

সুন্দরও যেন কিছুটা বুঝতে পারলো, একটা গোলযোগ ঘটবেই—আজ না হয় কাল।

—আঃ বাঁচা গেল—আর মোদের নীল বুনতে হবে না।

—বাপজী, তোমার ভুল। সাহেব কি অমনি ছাড়বে! খাল কেটে যে কুমীর এনেছো বাপজী!

—আর বলিস নে রহিম। যম যদি নিতো তো বাঁচতুম।

কয়েকদিনের মধ্যেই রহিমের কথা খেটে গেল। শীলমারা এক কাগজ নিয়ে মতি হাজির। মতি গাঁয়ের চৌকিদার।

—কিরে মতি, ওটা কি?

—এই দেখনা চাচা! কি যে করি—

মতি একটু থামল,

—কি যে করি চাচা! হাকিমের হুকুম! আমি তো সরকারী লোক—হুকুম মানতেই হবে।

—ব্যাপারটা কি খুলেই বল না কেন?

—হাকিমের হুকুম তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে—তারই পরোয়ানা।

রোমালির দেহটা কেঁপে উঠল। তার অশান্ত মনটা গলাকাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে লাগল, তার সাতপুরুষে কেউ কোনদিন কোর্টকাছারী করেনি--তার দুর্মতির জন্যে আজ তাকে অপরাধীর কাঠগড়ার উঠতে হোল। রোমালি খানিকটা দমে গেল।

—পরোয়ানা কোথার মতি?

—বারাসতের হাকিম্ সাহেব?

রোমালি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না—তার নামে কেন পরোয়ান আসবে।

—বানু সাহেব নালিশ করেছে—তোমরা সাহেবের টাকা ফাঁকি দিয়েছো—দাদন নিয়ে মাল দাওনি। টাকাও নাকি দিচ্ছ না। আবার লোকদের ভয় দেখাচ্ছ নীল বুনতে বারণ করছ।

মতির ক্ষমতাটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। সে কাঁধের দু দিকে ঘাড় ফেরাল, উর্দি-

পরা প্রশস্ত বুকের দিকে একবার নজর দিল। গম্ভীর হয়ে মতি বলল—

—কি করব বল। সরকারী কাজ করতেই হবে। তোমরা এমনি যাবে না অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

—এমনিই যাব। মুই একা না আর কেউ।

—রহিমকেও।

—মুই না হয় দোষী। ঐ বালকটা কি করল?

—আমি আর কি জানি! হাকিম জানে।

বাপ বেটায় মতির সঙ্গে চলল। সুন্দর তখন রাস্তায় অপেক্ষা করছিল।

—কি হল মতি! আসামীদের বাঁধলে না? রোমালি তাকাল সুন্দরের দিকে।

—কে সুন্দরদা?

—কি করব বল। নিমক খেয়েছি যার চাকরী করতে হলে তার হুকুম মানতে হবে—ন্যায়-অন্যায়ের বিচার চলে না।

বারাসতের কোর্ট। বাংলার ছোটলাট স্যর এসলি ইডেন তখন বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাছে নীলকর সাহেবদের বিরাগভাজন বহু হতভাগা চাষীদের বিচার চলছে। প্লান্টার্সরা তাদের গোমস্তা আর পেয়াদা পাইক নিয়ে সাক্ষী দিল। চাষীদের কেউ নেই। তারা নিজেরাই উকিল, নিজেরাই মোক্তার। তাদের সকলেরই এক কথা—জব্দ করার জন্যে সাহেবরা মিথ্যে করে মামলা করেছে। দিনের পর দিন বিচার চলতে লাগল। রায়ের দিন দিয়ে গম্ভীর মুখে ইডেন সাহেব উঠে গেলেন।

রায়ের দিনে কোর্টের মাঠ লোকে ভরে গেছে। উৎকণ্ঠায় ভরা চাষীর দল বিমর্ষ মুখে অপেক্ষা করছে।

ইডেন সাহেব রায় দিলেন—চাষীরাই জমির মালিক। জোর করে তাদের কাছ থেকে চুক্তি নেওয়া অসিদ্ধ। আটক চাষীদের খালাসের হুকুম হল। উল্লাসে ভরে উঠল মাঠ। চাষীরা হাসিমুখে ঘরে চলে গেল।

—কি চাচা! একি তুমি যে!

—ভূত বলে মনে হচ্ছে নাকি সুন্দরদা?

—তাই ভাবছি, কি করে কি হল!

—সাহেব বাদী, বিচার করবে সাহেবে আর আসামী মুক্ষু চাষীর দল ছাড়া পেল কেমন করে তাই না?

সুন্দরের মনটাতে খুব খারাপ লাগছে। তাড়াতাড়ি ছুটল জীবনপুরে। সাহেবের তখন বিশ্রামের সময়। ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে পিটপিটে চোখ দুটো মাঝে মাঝে বন্ধ করে সাহেব শুয়ে আছে, কুঠির একটা জোয়ান মেয়ে তার গোদা গোদা পা দুটো টিপে দিচ্ছে।

—হুজুর!

সাহেব সুন্দরের মুখের দিকে তাকাল।

—হুজুর রোমালি আর তার ছেলে খালাস হয়ে বাড়ী এসেছে।

সাহেব লাফিয়ে উঠল। সুন্দরের কথা যেন তার কাছে বিশ্বাসের যোগ্য বলে মনে হল না। লোক পাঠাল খবর নিতে। সাহেবের মনটা খুবই খারাপ।

প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বারাসত রাঞ্চ। মিটিং হল। জেলার বিভিন্ন নীলকুঠির সাহেবরা হাজির। ইডেন সাহেবের বিরুদ্ধে রক্তমুখী সমালোচনায় স্থির হল—তাঁকে বারাসত থেকে সরাতে হবে। একটা অর্বাচীন অপদার্থ যুবক এত বড় জেলার ভার বহনে অক্ষম। ছোটলাট স্যর পিটার গ্রান্ট প্লান্টার্সদের আবেদন অগ্রাহ্য করে দিলেন। মর্মাহত সাহেবরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পড়ল। লাটসাহেবের দরবারে কোন ফল হবে না। এবার তারা নিজেদের পথ নিজেরাই বেছে নিল। নদীয়া যশোর আর বারাসতের প্লান্টার্সরা কোন পথে চলবে তা ঠিক করে ফেলল। মিঃ বানু সুন্দরকে হুকুম দিল—ঘর জ্বালিয়ে সব উৎখাত কর—মেয়েদের ধরে এনে চরম শাস্তি দাও।

সুন্দরের কোন কিন্তু কিন্তু ভাব নেই। সে সোৎসাহে মনিবের হুকুম তামিল করতে উঠে-পড়ে লেগে গেল।

অন্ধকার রাত। পোষের গোড়ার দিক—শীত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। চাষীদের গরম কাপড়ের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা—তাই জড়িয়ে কুঁকড়ে কুঁকড়ে শীত কাটায়।

নীল চাষে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে—ঘরে খড় নেই—তালপাতা দিয়ে চাল ঢাকা।

কুঠি থেকে মশালচীরা বের হল। সুন্দর চলেছে আগে আগে—তার হাতেও মশাল। মাঠের পর মাঠ তারা পার হল। রবি শস্যের কোন চিহ্নই নেই—সোনার মাঠে উলু খড়।

—ফসল নেই কি পোড়াব!

সুন্দর ধমক দিয়ে বলল—চুপ! যা বলি তাই করবে!

রোমালিদের গ্রাম। বড় না হলেও একেবারে ছোট না। মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে—তার দু পাশে বিক্ষিপ্ত কুটীর। মশালচীরা গাঁয়ে ঢুকল। গাঁয়ের কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে উঠল কিন্তু এত শীতে কেউ তার কোন হদিশ নিল না।

—শেষ মুড়ো থেকে!

নরিমের ঘরটা একেবারে শেষে, ছোট্ট ঘর—একটা কুঁড়ে। আগুন ধরাল সেই ঘরে। চড়-চড় করে আগুন বেড়ে উঠল। বাঁশ ফাটার শব্দে সজাগ হয়ে নরিমের বাড়ীর
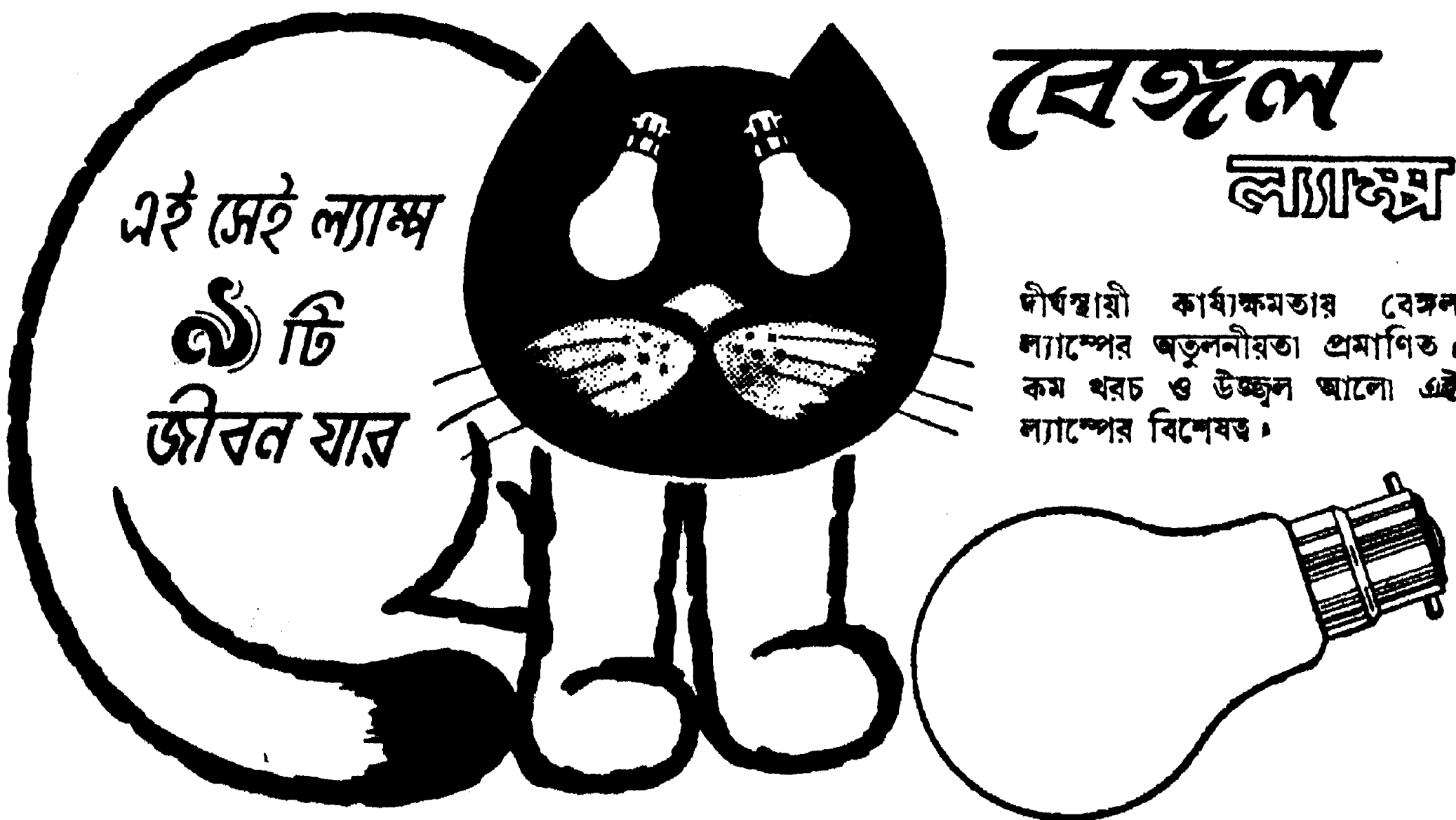
দিকে সকলে ছুটল—এই অবকাশে অন্য ঘরগুলোতেও আগুন ধরাল। নরিমের বউ কোলের ছেলেটাকে জাপটে ধরে বার হবার সময় টক্কর খেয়ে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল।

রোমালি আর তার ছেলেরা এসেছে। এই গনগনে আগুনে কিছুই করার নেই। রোমালি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আগুনের হলকার দিকে। আকাশ লালে লাল। মাঝে মাঝে দু-একটা ফুলকি তার পায়ের গোড়ায় এসে পড়ছে। নরিম কাঁদছে।

—চাচা বৌটা বোধহয় বেরুতে পারে নি।

কোন উত্তর নেই। রোমালির মনে শুধু এই কথাটাই জাগল—এত বড় সর্বনাশটা কে করল।

রোমালি একটু এগিয়ে এল। বীভৎস দৃশ্য তার সমস্ত দেহটাকে মাতালের মত টলিয়ে দিচ্ছিল।

কোন কথা না বলেই সে নরিমের হাতখানা চেপে ধরল—সকাল হলে সব বোঝা যাবে।

—দাদু মোদের ঘরেও আগুন!

রোমালির নাতি ছুটে এসে জানাল—তখন সে হাঁপাচ্ছে।

রোমালি আর রহিম নিজেদের বাড়ীর সামনে। সুমুখের দুখানা বড় বড় ঘর বেশ ধরে উঠেছে—আগুন আকাশ রাঙা করে দিয়েছে। ছেলেকে ডেকে রোমালি বলল—কারও যে সাড়া-শব্দ নেই—সব পুড়ে মল নাকি? দেখ না এগিয়ে। পুকুর ধারের ঘরখানা তখনও ধরে নি। রহিম সেদিকে গেল। ঘাটের ধারে রহিমের মা হত-চৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। জ্ঞান হলে রহিমের মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলল—সহরাকে রাখতে পারলুম না। জড়িয়ে ধরেছিলুম—লাথি মেরে ফেলে দিল। তাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল। সুন্দরকে মুই দেখেছি।

সে সময়ে বেছে-বেছে চাষীর ঘরে আগুন দেওয়ার একটা হিড়িক পড়ে গেছে। নদীয়া যশোর বারাসত এই কটি জেলায় নীল না বোনার জোটবদ্ধ চাষীদের দুর্গতির সীমা ছিল না। চাষীদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। কলকাতার সাহেব-ঘেঁষা বাবুরা তাদের বিরুদ্ধে ফোড়ং কাটতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—নীল চাষে দেশের মহৎ উপকার হয়েছে।

"There may be partial injury done by the indigo planters, but on the whole they have performed more good to the generations of natives of this country".

নদীয়া আর যশোরে নীল কুঠির সংখ্যা ছিল অনেক। অত্যাচারের মাত্রাটা সেখানে ছিল অধিক। অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী যশোরের শিশিরকুমারকে যেন পাগল করে দিল, তিনি গ্রামের পর গ্রামে পায়ে হেঁটে সংবাদ জোগাড় করতে লাগলেন। হরিশচন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়ট তখন কলকাতায় চলছে। ইংলিশম্যান আর হরকরা সাহেবদের কাগজ—প্লান্টার্সদের সমর্থক। পেট্রিয়ট ও ইংলিশম্যানে সব সময়েই বিপরীত কাহিনী ছাপা হত। বিচার বড় একটা ছিল না। প্লান্টার্সরা হত অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। নীল কুঠী সংক্রান্ত সমস্ত বিচারের ভার ছিল তাদের ওপর—সেখানে হত বিচারের নামে অবিচার। শিশিরকুমার প্রায়ই যেতেন হাঁসখালিতে রামধন বিশ্বাসের বাড়ী। সেখান থেকে খবর জোগাড় করায় সুবিধে হত। উত্তরকালে শিশিরকুমার হাঁসখালির বিশ্বাসবাড়ীর নিবিড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। শিশিরকুমার এসেছেন হাঁসখালি। বিশ্বেসবাড়ী লোকে লোকারণ্য। চাষীদের দুঃখের কথা শুনে চলেছেন। মাঝে মাঝে উত্তেজিত ভাব—কখন বা তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

—সিন্নিবাবু! মোদের একটা বিহিত কর—আর যে মোরা বাঁচিনে।

শিশিরকুমার বাক্যহীন।

—হুকুম দাও মোরা সাহেবগুলোকে মেরে ফাঁসি কাঠে ঝুলি।

শিশিরকুমার ধীরে ধীরে বললেন—তোমাদের কথা কাগজে দি — লাটসাহেব যাতে জানতে পারেন। কি জান—কাগজটা তো আমার না—সব কথা যে ছাপা হয় না।

ভাইসরয় তখন লর্ড ক্যানিং। প্লান্টার্সদের কার্যকলাপে তিনি খুব বিরক্ত। ইংরেজ শাসনকালে লর্ড ক্যানিং-এর মত এতখানি হৃদয়বান রাজপুরুষ আর এদেশে আসে নি। ক্যানিং খুব চিন্তায় পড়লেন।

"I felt that a shot fired in anger or fear by some foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames".

কলকাতার বাবুরা যাঁরা একদিন গাঁয়ের লোক ছিলেন তাঁরা গ্রামের সঙ্গে সংযোগ রাখতে ঘৃণাবোধ করতেন, তাঁরা সবাই হয়ে গেছেন আধা-সাহেব। বড় বড় ফার্মের মুচ্ছুদ্দী আর বড়বাবু হয়ে অপিস-যানে কাজে যান—বুকে আধ ফোটা গোলাপের বোকে। গাঁয়ের জঙ্গলী লোকদের জন্যে তাঁরা সাহেব চটাতে চান না। সাহেব চটলে চাকরী যাবে—আবু হোসেনী ঠাট ঘুচে যাবে। চাষীরা কলকাতার বাবুদের কাছে কোন সাহায্য পেল না—খাজনা আদায় হল তাদের জমিদারী ঠিক বজায় রেখে।

রোমালি যে কি করবে ঠিক করতে পারল না। তার বুকটাকে যেন একটা বড় পাথরের চাপে পিষে দিচ্ছে—নিঃশেষ বন্ধ হবার উপক্রম। রোমালি গেল মতির বাড়ী—বৌমার কোন খবর রাখ?

মতি সবই জানত। নীলকুঠির টাকায় তার মোটা পেটটা যে আরও বড় হয়ে গেছে। কিছুই সে বলল না।

—বৌমার কি হয়েছে? আমি তো কিছু জানি না?

রোমালি বুঝল মতি সুন্দরের চেলা। রোমালি ফিরল, রহিম জওয়ান ছেলে। হাসি-খুশীতেই তার দিনগুলো কাটছিল। তার মুখে আর হাসি নেই। সবল সরল দেহটা যেন নুইয়ে আসছে—পা যেন আর চলে না। সহরার নিগ্রহ তার নিষ্কলুষ দেহে কলঙ্কের ছাপ তার জীবনটাকে অভিশাপে ভরিয়ে চির ব্যর্থতায় ডুবিয়ে দেছে। রহিমের মাথায় চিন্তাগুলো চরকীর মত পাক দিল—তার মাথাটাকে উত্তপ্ত করে তুলল। সে ছুটল জীবনপুরে।

নদীর ঘাট নীল কুঠির সামনে। রহিম ঘাটের ধারে চুপ করে বসল।

—তুমি একটা কাগজ কর না সিন্নিবাবু!

—ইচ্ছে আছে। যদি পারি তাতে তোমাদের কথাই থাকবে। আর যতদিন আমার কাগজ থাকবে সেটা হবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীক হাতিয়ার।

সব লোক হৈ-চৈ করে চেঁচিয়ে উঠল। হরিশচন্দ্র মারা গেলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট উঠে গেল। চাষীর কথা বলার আর কেউ রইল না। রোমালিদের সারা গাঁটা পুড়ে গেল। আগে-পাশের কেউ আর টুঁ-হাঁ করল না পাছে তাদের ঐ দশা ঘটে। চাষীরা নীল বুনল বটে কিন্তু পরিপাটী করল না। ফলে হল আরও ঋণ বৃদ্ধি। তাগিদ মত টাকা না দিতে পারলে হালের গরু নিয়ে যেত—দেখে দেখে বাছাই করা মেয়েদের টেনে নিয়ে যেত। ইণ্ডিগো কমিশন মিঃ হর্সেল সাক্ষী দিয়ে বললেন— "abductions seemed very clearly proved.

রহিম ভাঙা মন নিয়ে কুঠিরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায় যদি সহরার কোন হদিস করতে পারে এই আশায়।

রোমালি গেল সুন্দরের বাড়ী।

—সুন্দরদা, সহরাকে কোথায় রেখেছে?

বুড়োর জিজ্ঞাসু মুখের ওপর খেঁকিয়ে উত্তর দিল সুন্দর—দেখছি ভীমরতি হয়েছে তোমার—আমার ওপর দোষারোপ করলে সুখে থাকতে পারবে না কিন্তু।

—আর কি করতে চাও! ঘর পুড়িয়ে দেছো—আজ মুই সব্বস্বান্ত। এর ওপর মান-ইজ্জৎ নষ্ট করলে—এতেও তোমার মন উঠলো না।

সুন্দর চিৎকার করে উঠল—চলে যাও—নইলে লাঠির আগায় খাইয়ে দেবো।

রোমালি কোন কথা বলল না, তাকাল সুন্দরের দিকে। অতি দুঃখে তার মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। প্লাণ্টার্সরা অতি শক্তিমান। তাদের সংযত করার শক্তি তখন দেশে ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেটরা তাদের চটাতে সাহস পেতেন না। আবার কেউ কেউ ভাবতেন, তারা যে তাঁদের একই রক্তের লোক। তাদের নবাবী চাল অল্প মাইনের ম্যাজিস্ট্রেটগুলোকে তাক লাগিয়ে দিত। খানাপিনা, হৈ-চৈ, জাঁকজমকে তাদের দিনগুলো বেশ সুখে কাটত। তারা এদেশের লোকদের বলত—নেটিভ, নিগার আর মনে করত ভেড়ার পাল।

ভরা জোয়ারে নৌকোগুলো ছুটে আসছে তীরবেগে। কোনটা আবার চলছে উজোন—গুণ টেনে।

রহিম নদীর দিকে তাকিয়েই আছে। সন্ধ্যে তখনও হয় নি। শীতের বিকেল—রোদের ঝাঁজ মরে গেছে। কুঠি থেকে বেরুলো একটা মেয়ে কাঁকে কলসী। রহিম ছুটল তার দিকে।

—সহরাকে দেখেছো?

মেয়েটি দাঁড়াল, রহিমের মুখের দিকে তাকাল, দেখল চোখ দুটো জলে ভরা।

—একটা মেয়ে কমবয়েসী — সে তো এখানে নেই। বাবু তাকে নিয়ে গেছে।

—বাবু! কে বাবু?

—তুমি বাবুকে জান না! সুন্দরবাবু।

রহিম আর কিছু না বলেই ছুটল সুন্দরের বাড়ী।

—সুন্দরদা! সহরাকে কোথায় রেখেছ বল?

রহিমের ভাবগতিক সুন্দরের ভাল লাগল না। সে একটু ভয় পেয়ে গেল।

—আমি কি জানি! ওসব সাহেব জানে!

একটু থেমে বলল—কাল একবার যেও! সাহেবকে জিজ্ঞেস করি। সাহেবের জানা থাকলে ছেড়ে দিতে বলব।

সুন্দরের কথায় রহিমের একটু আশা হল। যে যাই বলুক সহরাকে পেলে সে আবার তাকে ঘরে নেবে। নিন্দে—কিসের নিন্দে! সে নিন্দের ভয় করে না। সহরার ডাগর চোখের সরল চাহনি—তার ছোট ছোট মিষ্টি কথাগুলো রহিমের বুকখানা ভরে আছে। কতদিন যে সে তাকে দেখে নি—সে যেন একটা যুগ। ঘরের বাইরে যেতে তার পা যেন উঠত না—সহরার মৃদু তিরস্কার তার বেশ ভাল লাগত। সদাস্নাতা সহরার রূপশ্রী তার চোখের সামনে যেন ভাসছে। সুখবরের কথা রহিম তার মাকে বলল।

—কেমন করে নিবি রে! চাষী বলে কি মোদের সমাজ নেই।

মায়ের কথায় রহিম ভারী বিরক্তবোধ করল।

রোমালি বলল—আগে উদ্ধার হ'ক তারপর ওকথা।

সুন্দর নিশ্চিন্তে বসে ছিল না। রহিমের কথাবার্তা তার কাছে ভাল লাগে নি। সাহেবকে জানিয়ে দিল—

—রোমালি আর রহিম ছাড়া পেয়েছে এখন তারা প্রতিশোধ নিতে পারে!

—সুন্তর! হামারে তো লাঠিয়াল আছে!

রোমালি আর রহিম পর দিন এল জীবনপুরের কুঠিতে। শীতের সকাল: সূর্যি যেন রোগা রোগা-পাংশু। রোদের তেজ নেই—যেটুকু আছে তা বেশ মিষ্টি মিষ্ট। ছোট ছোট ঝোপের মাথাগুলো যেন নীহারের টুপি পরেছে। কুঠির সামনে সরু পথ—সুরকী বিছান। যে সে লোকের সে পথে যাবার হুকুম নেই। শুধু সাহেবের লোকরা যাওয়া-আসা করে। কুঠির পিছনে সারি সারি খেজুর গাছ, সংখ্যায় প্রচুর। সাহেবের গেছোরা দুধারে ভাঁড় ঝুলিয়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে হন-হন করে ছুটছে—বেলা হলে রস মেতে যাবে। কুঠিরের সামনে বাঁধান চাতাল। পাশে একটা ঝাঁকড়ানো আম গাছ, তার তলায় সাহেবের চেয়ার—সুমুখে একটা ছোট টেবিল তার এক কোণে মাটি-লেপা মসিপাত্র আর কুইল পেন। অভ্যেস মত সাহেব ঘোড়ায় চড়ে চক্কর দিতে গেছে। তার আসার সময় হয়েছে। নবাবী কেতা তখনও চলছে—সকাল থেকে দুপুর তারপর বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজকর্মের রীতি ছিল। সুন্দরকে অতি সকালেই আসতে হত। এদিনটা সুন্দরের ভাল ঠেকছিলো না। বাড়ীর বার হবার সময় একটা শিয়াল বাঁদিকে দৌড়ে গেল — সেই থেকে সুন্দরের মনটা যেন খুঁত-খুঁত করছিল।

সাহেব বেড়িয়ে এসেছে। চেয়ারে বসে ডাক দিল—সুন্তর।

সাহেবের ডাকে সুন্দর দৌড়ে এল—খাতাপত্র নিয়ে হাজির। সুন্দর দাঁড়িয়ে। সে ঘন-ঘন রাস্তার দিকটা এক নজরে দেখে নিচ্ছে—রোমালিরা আসে কিনা।

—এইরে দু ব্যাটাই আসছে!

—সাহেব—তার মুখ দিয়ে যেন কথা ফুটল না। তার ভয়কাতুরে মনটা লুকোতে পাওয়ার মত অস্থির হয়ে উঠল।

রোমালি আর রহিম একেবারে সাহেবের কাছে।

মোটা মোটা চোখে রহিম বলল—সাহেব সহরাকে ফিরিয়ে দাও—নইলে—তার কণ্ঠস্বর রুক্ষ্ম এবং জোরাল।

—সুন্তর! কাহে তোম ইনিকো আনে দিয়া?

—আমি কিছু জানি নে—ওরা এমনি এসেছে।

সাহেব ইঙ্গিত করল।

চারজন লেঠেল ছুটে এল লাঠি নিয়ে।

রহিম বুঝল—এবার আর রক্ষে নেই। লাঠির ঘায়ে জীবন যাবে। সে লাঠি কেড়ে নিয়ে সুন্দরের মাথায় সজোরে আঘাত করল। সুন্দর দূরে ছিটকে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে রহিম বলল—শয়তান! মারো!

এই সঙ্গেই রহিমের ওপর লাঠি পড়তে লাগল। সে সুন্দরের দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তখনও তার ওপর লাঠি চলছে। রোমালি যে কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। সে তখন সাহেবের খুব নিকটে প্রায় গায়-গায়।

সাহেব সজোরে এক লাথি দিল। পড়ে যাবার আগেই রোমালি সাহেবের পাটা চেপে ধরেই সাহেবকে ফেলে দিল। রোমালির পিঠে লাঠি পড়ল।

সাহেব রোমালির দংশনক্ষতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল—তার পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। সাহেব ডাকল—সুন্তর।

কোন সাড়া নেই। লাঠির আঘাতে রোমালির দেহ তখন প্রাণহীন। লাথি দিয়ে রোমালির দেহটাকে সরিয়ে দিল—সুন্দরের কাছে গিয়ে তার হাতটা তুলে ধরল—কোন স্পন্দন নেই। দংশনবিষে সাহেবও আর বেঁচে রইল না। জীবনপুরের নীলকুঠি—বানু সাহেবের পাপের পুরী। সেখানে কত শত নিরীহ চাষীর তাজা রক্ত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বানুর কুঠি—নারী নিগ্রহের লীলাভূমি। ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদ রুদ্ধ কক্ষের গবাক্ষহীন দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে বিষাক্ত বাতাসে লীন হয়েছে—তাদের প্রতিটি অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়েছে—নির্মম অভিশাপে। ভগ্ন কুঠিরের বাঁধানো চত্বরের কিছুটা অংশ নিয়ে এখনও তার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে। আশে-পাশের লোকেরা বানু সাহেবের নামে ভয়ে শিউরে ওঠে। তাদের ধারণা সাহেবের অশরীরী আত্মা মহা দাপটে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শিল্প সমাচার

৮৪ বছর বয়সে শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন পরলোকগমন করলেন। পূর্ণচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বাংলা বিজ্ঞাপন-চিত্রের গোড়াপত্তনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল থাকবে। আর থাকবে 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রভৃতি বইয়ের বিখ্যাত ইলাস্ট্রেটার হিসেবে। পরশুরামের লেখার সঙ্গে তাঁর ছবির এমন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল যে পরে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা-বশতঃ তিনি যখন আর আঁকতে পারতেন না তখন পরশুরাম তাঁর পরবর্তী বইয়ের জন্যে কোন চিত্রকরকেই আর নিযুক্ত করেননি। মলাটের লেখাটুকু যেন যতীন্দ্র-কুমারের স্টাইলে হয়—এইটুকুই ছিল লেখকের প্রার্থনা। রাজশেখর বসুর সঙ্গে শিল্পীর দীর্ঘ ৬৬ বছরের ঘনিষ্ঠতার ফলে অনেক ছবিতে বসু-পরিবারের ব্যক্তিদের চেহারা এসে গিয়েছে। যেমন কচি সংসদের 'হোয়াট হোয়াট হোয়াট......' ছবিতে স্বয়ং লেখক ও তাঁর গৃহিণীকে দেখা যায়। একটা জায়গায় রাজশেখর বসুর সঙ্গে যতীন্দ্রকুমারের শিল্পী-মেজাজের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েই ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রাচীন মাসিক পত্রিকাগুলির পাতা ওল্টালে যতীন্দ্রকুমারের বহু সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রের নিদর্শন দেখা যাবে। 'শেষ কালেতে মাথার রতন, নেপ্টে রইলেন আঠার মতন' ইত্যাদি সিরিজের ছবিগুলি এবং ইলাস্ট্রেশন হিসেবে 'রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন' ইত্যাদি গোড়ার দিকের ছবি হয়ত এখনো অনেকের মনে আছে। তাঁর আঁকা বইয়ের মলাটের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্য-সঞ্চয়নের' মলাটটি আজও বাতিল হয়ে যায়নি। তাঁর সময় পেন অ্যান্ড ইঙ্কের কাজে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। পার্শীবাগানের বিখ্যাত আড্ডার অন্যতম প্রবীণ আড্ডাধারী ছিলেন তিনি। এই আড্ডার কাহিনী তাঁর কাছ থেকে কেউ লিখে রেখেছেন কিনা জানি না। যদি তা না হয়ে থাকে ত বাংলাদেশের সাহিত্যিক আড্ডার একটা ইতিহাস তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্যে সকলের অজ্ঞেয় থেকে গেল।
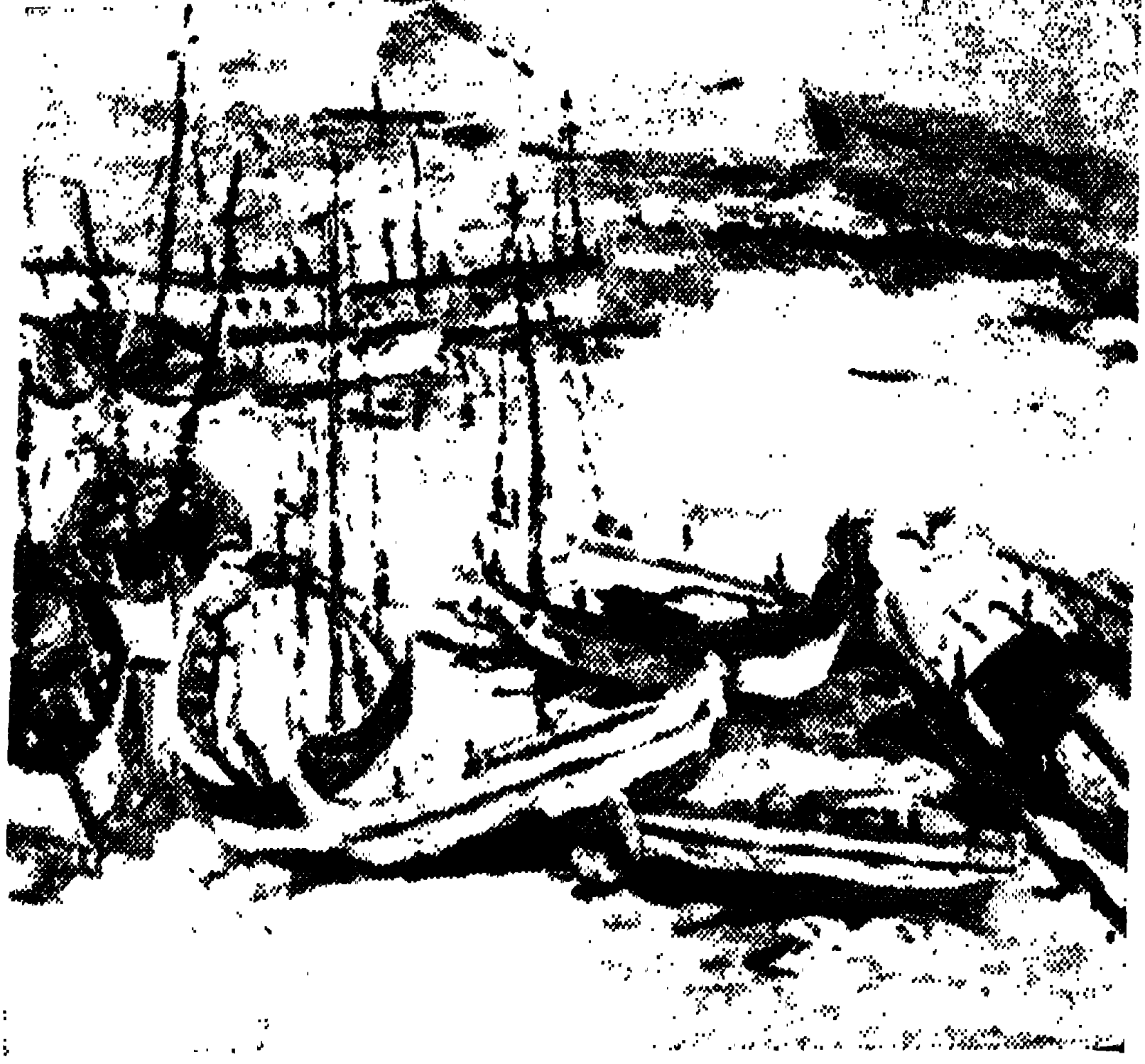
কোত দাজুর

শিল্পী : চিত্রা দত্ত

*

গত ১৭ই ডিসেম্বর শিল্পী কিশোরী রায়ের মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হল। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে এই শিল্পীর মৃত্যুর শোক অনেকেই ভুলতে পারেননি। ১৯১১ সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। শালকিয়ার স্কুলে পড়বার সময় স্কুলের এক সভায় সভাপতি ডব্লু. এস আরকুহার্টের (তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার) একটি ক্ষিপ্রহাতে নিখুঁত প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়ায় বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন এবং তাঁর আনুকূল্যে সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। নানা বৃত্তি ও পুরস্কার পেয়ে ১৯৩৭ সালে তাঁর চারু-কলা শিক্ষার সমাপ্তি হয় এবং অল্পকাল পরেই বরোদার শিক্ষা অধিকর্তা গুরুবন্ধু ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি আঁকার কাজ পান। পরে তিনি সার এন এন সরকার ও চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিকৃতি এঁকে সুনাম অর্জন করেন।

শিল্পশিক্ষাকালে ও তারপরেও গুরু যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যামিনীপ্রকাশ অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ অনেক সময় তাঁর ওপর ছেড়ে দিতেন। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের স্টেট ব্যাঙ্কুয়েটের ছবির কাজে (১৫ ফুট লম্বা

মুরিংস

শিল্পী : কিশোরী রাউল

৮ ফুট চওড়া) তিনি গুরুকে সাহায্য করেন।

তেল রং ও জল রং এই উভয় কাজেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। ইউরোপের বিখ্যাত রূপেদী শিল্পীরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি প্রায়ই আলমোড়ায় বেড়াতে যেতেন। কোন এক সময় তিনি স্বামী অভেদানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আলমোড়ায় থাকতে একবার তিনি আমেরিকান দার্শনিক ও চিত্রকর ই এইচ ব্রুস্টারের একটি অয়েল স্কেচ মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করে তাঁকে অবাক করে দেন। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বহু পুরস্কার ও সম্মান লাভ করলেও অকৃতদার মার্জিতরুচির এই শিল্পী কখনো সে সব তাঁর বৈষয়িক উন্নতির কাজে লাগাবার চেষ্টা করেননি। এমনকি ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি যে আর্ট কলেজের কাজে নিযুক্ত ছিলেন সে কাজেও বোধহয় বন্ধুদের কাছ থেকে তাগাদা না পেলে দরখাস্ত করতেন কিনা সন্দেহ। আজকাল অনেকে শিল্প-শিক্ষা সমাপনের আগেই একক প্রদর্শনী করে বসেন। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্রদের বহু অনুরোধেও শ্রীরায়কে দিয়ে তাঁর একক প্রদর্শনী করানো যায়নি।

নিজের সাজ-পোষাক, চলাফেরা, কথাবার্তায় তিনি অত্যন্ত মার্জিতরুচি ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ছিলেন। অনেকে বাইরে থেকে তাঁকে একটু রূঢ় অহংকারী বলে মনে করত। কিন্তু আসলে তিনি ছাত্রদের অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং তাদের ভালবাসাও পেয়েছিলেন। কোন কোন দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভারও তিনি গোপনে বহন করতেন—যে খবর তাঁর বাড়ির লোকেও তাঁর মৃত্যুর আগে জানতে পারেননি। শ্রীরায়ের শিল্পকর্মের কোন সামগ্রিক প্রদর্শনী করা সম্ভব কিনা তা তাঁর অনুরাগীরা বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশা করা যায়।
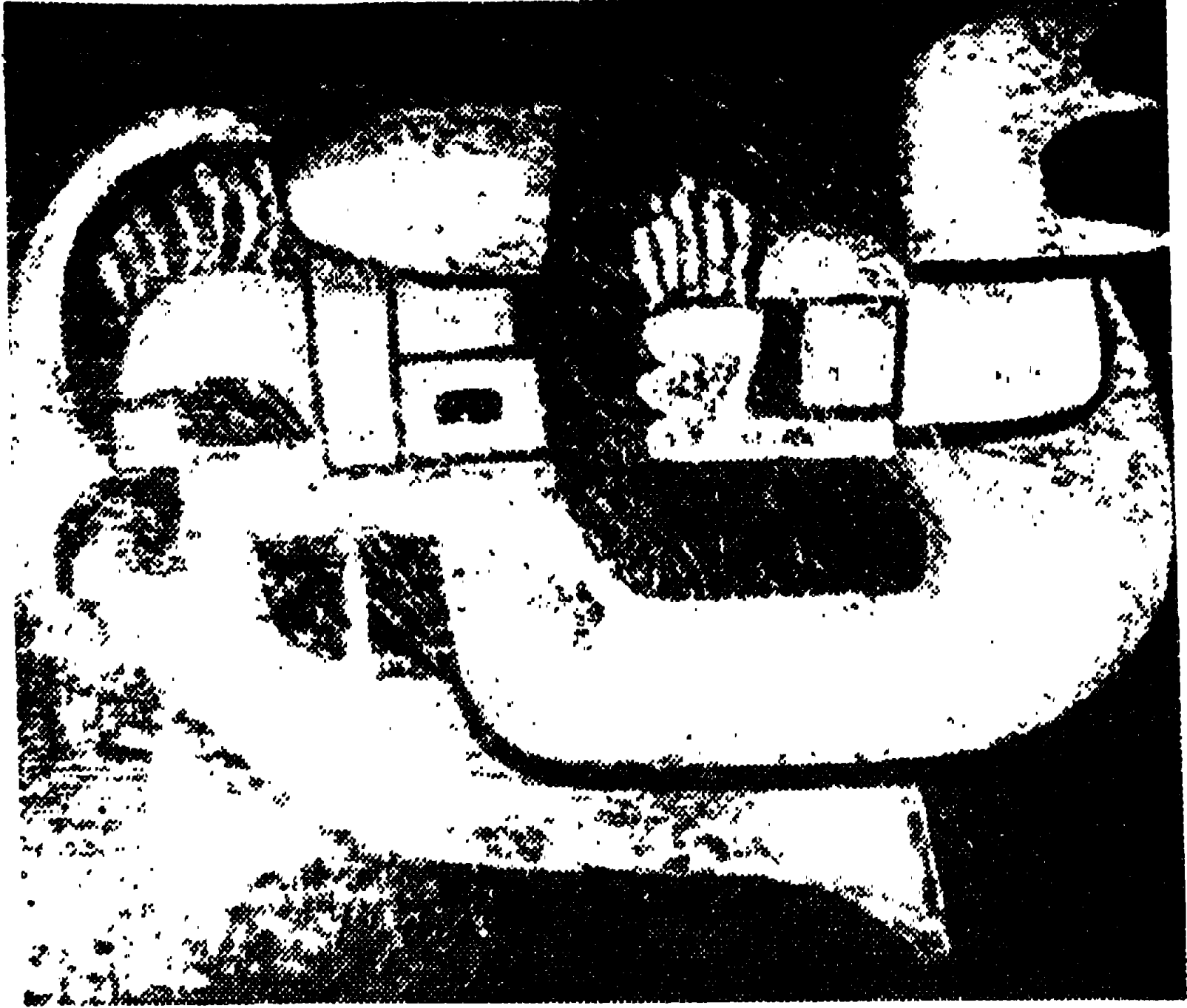
ডেসপট　　শিল্পী : অজয় মুখার্জি

*

সদ্য-বিগত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করবার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে কয়েকজন শিল্পী ও শিল্পামোদী মিলে সভা আহবান করেছিলেন। এ'দের একটি কমিটি এই প্রচেষ্টায় নিযুক্ত আছেন। শিল্পী মিলু ব্যানার্জি তাঁর বিগত শিল্পীবন্ধুর ছবি যাতে কমনওয়েলথ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় তার জন্যে ব্রিটিশ হাই-কমিশনের সামনে মিঃ ফ্রীম্যানের সংগে সাক্ষাৎ লাভের জন্যে নিখিল বিশ্বাসের জর্মান প্রদর্শনীর ক্যাটালগ ও সাক্ষাৎকার অভিপ্রায়ে পোস্টার নিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কি কারণে জানি না মিঃ ফ্রিম্যানের সংগে সাক্ষাৎকার তাঁর সম্ভব হয়নি।

*

গত একমাসে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, আর্টিস্ট্রি হাউস আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস ও কেমুল্ড গ্যালারীতে অনেকগুলি প্রদর্শনী হয়ে গেল। তার মধ্যে ২০শে নভেম্বর অ্যাকাডেমিতে বাংলাদেশের শিল্প-সাধনার প্রায় সত্তর বছরের ইতিহাস নিয়ে যে স্থায়ী প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হল সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু প্রভৃতি প্রবীণ শিল্পী থেকে সোমনাথ হোড় প্রভৃতি নবীনদের কাজের একটা ধারাবাহিক সমাবেশ করবার চেষ্টা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নব্যভারতীয় চিত্রকলা ও যামিনী-প্রকাশ, অতুল বসু যামিনী রায় প্রভৃতির ইউরোপীয় শিল্প-অনুপ্রাণিত কাজ এবং এসবের ক্রমপরিণতি হিসেবে আধুনিক চিত্রকলা অনেকটা ধারাবাহিকভাবে সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকে তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবি দিয়ে গ্যালারীটি সমৃদ্ধ

স্টর্ম　　শিল্পী : জ্ঞানব্রত ঘোষাল

প্রেস বেন্ডিং শিল্পী : পি চন্দ্র
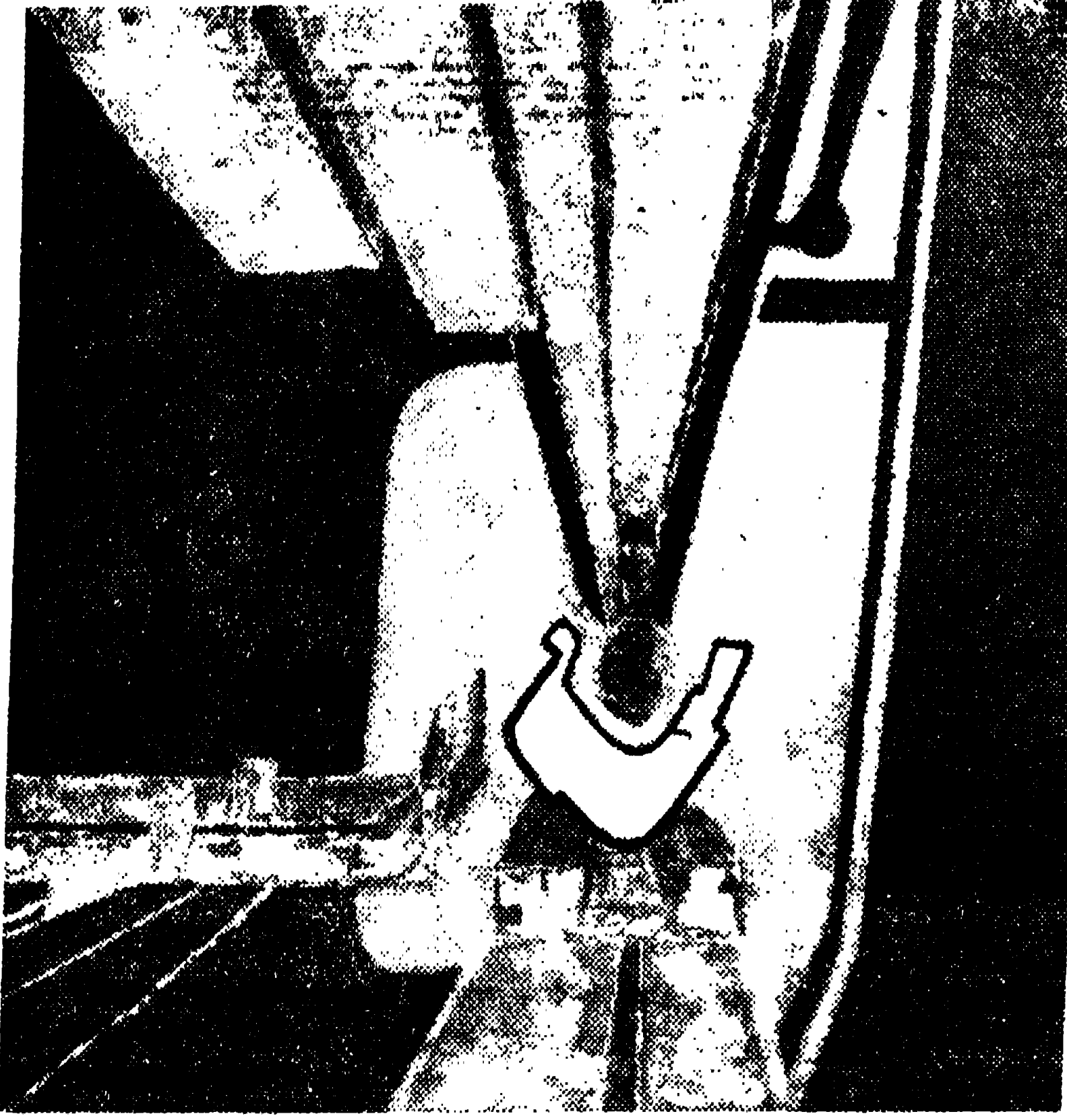
করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের 'অপর্ণা', 'মুসাফির', প্রভৃতি ছবিগুলির ভেতর তাঁর শিল্পরীতির একটা ক্রমবিবর্তনের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা আছে। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি এবং কিউবিজম অনুপ্রাণিত 'সাতভাই চম্পা' প্রভৃতি ছবিগুলিতে তাঁর রীতি বোঝাবার চেষ্টা আছে। নন্দলালের গোড়ার দিকের আঁকা 'মূর্তি কার' ও শেষের দিকের কতকটা আধুনিক রীতির পূর্বচ্ছায়াধর্মী 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'বসন্ত' ছবিতে তাঁর বহুমুখী বিবর্তনের হদিশ মিলবে। এছাড়া দেবীপ্রসাদ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বিনোদবিহারী, সারদা উকিল, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতির ছবিতে তাঁদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নন্দলালের গড়া গণেশের মূর্তিটার একটু ইতিহাস আছে। এলমহার্স্ট সাহেবকে তিনি যে মাটির মূর্তি তৈরী করে দেন সেটি এলমহার্স্ট ব্রোঞ্জে ঢালাই করে অ্যাকাডেমিকে উপহার দিয়েছেন।

অন্যদিকে যামিনী রায়ের আঁকা ফ্রাঙ্ক হালস-অনুপ্রাণিত আত্মপ্রতিকৃতি থেকে তাঁর আধুনিক পটচিত্রের ক্রমবিবর্তনের কয়েকটি নমুনা অনেকের কৌতূহলের খোরাক যোগাবে। অতুল বসুর নিজস্ব রীতির ড্রয়িং ও পোর্ট্রেটগুলি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সতীশচন্দ্র সিংহের মাত্র একটি কাজের মধ্যে তাঁর পরিণতি বোঝবার কোন উপায় নেই।

পরবর্তী যুগের শিল্পীদের মধ্যে গোপাল ঘোষ, রথীন মৈত্র, সুনীলমাধব সেন, নীরোদ মজুমদার প্রভৃতি শিল্পীদের কাজের কয়েকটি নমুনা দেখা যায়। গ্রাফিকস বিভাগে মুকুল দে, রামকিঙ্কর, হরেন দাস, সোমনাথ হোড়, শ্যামল দত্তরায় প্রভৃতি উপেক্ষিত থাকেননি। তরুণ শিল্পীদের আরো অনেকে স্থান পেয়েছেন। শতাধিক শিল্প ও ভাস্কর্য নিয়ে এই স্থায়ী প্রদর্শনী দিয়ে অ্যাকাডেমি একটা বহুদিনের প্রতীক্ষিত কাজ শুরু করলেন। এখনো অনেক শিল্পীর কাজের নিদর্শন সংগ্রহ বাকি রয়েছে। আশা করি অবিলম্বে এই শিল্পসংগ্রহটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হবে।

*

অ্যাকাডেমিতে অন্যান্য যে সব প্রদর্শনী হয়ে গেল তার মধ্যে বংশী পরিমু, নির্মল দত্ত, কিশোরী কাউল, সুকুমার দাস ও সংগীত শ্যামলা গোষ্ঠীর প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। শিল্পী বংশী পরিমু বাইশখানি বিমূর্ত ও বর্ণাঢ্য নক্সার ছবি উপস্থিত করেছিলেন। শ্রীপরিমুর কাজের ডিজাইন ও রঙের বাহার বিশেষভাবে চোখে লেগেছিল।

শিল্পী নির্মল দত্ত যদি পুরোপুরি ৬০ খানি ছবি না দিয়ে একটু সযত্নে বাছাই করে তার অর্ধেক ছবি প্রদর্শিত করতেন তবে তাঁর প্রদর্শনীটি আরো আকর্ষণীয় হত। শ্রীদত্ত ভারতীয় রীতির চর্চা করতেন পরে সেখান থেকে সরে আধুনিক রীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। যদিও তাঁর কাজে পরিপূর্ণ বিমূর্ততার নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়নি তবু অদূর ভবিষ্যতে তার সাক্ষাৎ মিলতেও পারে। তাঁর ফিগারেটিভ কাজের মধ্যে 'চড়ক ফেস্টিভ্যাল' 'নর্তকী' এবং কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য বেশ ভাল লাগল।

*

শিল্পী সুকুমার দাস সরকারী চাকরী করতে করতে শিল্পচর্চা করেছেন। ৭১ খানি ছবির মধ্যে তাঁর তেল রং, জল রং প্যাস্টেল, গ্রাফিকস প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমের নমুনা উপস্থিত করেছেন। তাঁর ভারতীয় রীতির কয়েকটি ছবি দৃষ্টিগ্রাহী হয়েছে। কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ সম্বন্ধেও সেকথা বলা চলে। ফিগারেটিভ থেকে অ্যাবস্ট্রাকশান পর্যন্ত সবরকম রীতির মধ্যেই তিনি বিচরণ করেছেন। তাঁর চিন্তার বিস্তার যতটা, গভীরতা ততটা নয় বলে মনে হয়েছে।

*

প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের সংগীত শ্যামলা প্রতিষ্ঠান তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের চারু ও কারু শিল্পের যে প্রদর্শনী করেন তাতে কিছু বৈচিত্র্য ও সরসতার আমেজ ছিল। সবিতা সায়গল, কুসুম খেমকা, রমেশ সায়গল ও আরো কয়েকজনের আঁকা অতি সরল কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ এবং শিশু বিভাগের আঁকা ছবিগুলি ভাল হয়েছিল। এঁদের করা বাটিক ও অন্যান্য হস্তশিল্পের নিদর্শনগুলিও ভাল হয়েছিল।

*

কাশ্মীরের শিল্পী কিশোরী কাউল রোগশয্যায় শিল্পশিক্ষা সুরু করেন। পরে তিনি বরোদা কলেজ অব ফাইন আর্টসে রীতিমত শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। অল্পদিন আগে সরকারী বৃত্তিলাভ করে প্রফেসর এস এন বেন্দ্রের কাছে আরো কিছুদিন শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। বোম্বে এবং বরোদার শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি সংযুক্ত আছেন। অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীতে তাঁর সাতাশখানি ছবি দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। তাঁর বেশির ভাগ ছবির উপজীব্য হল কাশ্মীরের নিসর্গ দৃশ্য। তাঁর তেল রং ব্যবহারের পরিচ্ছন্নতা ও সতেজ সুমিষ্ট ভাব সকলেরই ভাল লাগে। 'মুরিং', 'লেক লাইফ', 'দি ইভনিং 'রিফ্লেকশানস', 'রিভার সাইড মুরিংস' প্রভৃতি ছবিগুলির মধ্যে তিনি বেশ সুন্দর একটি মুড ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশনগুলি রঙের বাহারে ও নক্সার সরলতায় কান্দিনস্কির গোড়ার দিকের কাজের সমগোত্র বলে মনে হয়।

*

কেমল্ড গ্যালারীতে সুনীল দাস তাঁর হালআমলের করা চৌদ্দখানি ছবির

প্রদর্শনী করেন। কয়েকটি বেশ বড় মাপের। ইদানীং তিনি ক্যানভাসের ওপর বিভিন্ন কায়দায় জমি তৈরী করে কতকগুলি বিমূর্ত নক্সার ওপর চুড়ি, বালা, বাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষের টুকরো বসিয়ে বিশেষ এফেক্ট তৈরীর সাধনায় মগ্ন। তিনি তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ক্যাটালগে যা লিখেছেন তা তাঁর বক্তব্য বা ছবি কোনটাই বোঝবার সহায়ক নয়।

*

আর্টিস্ট্রি হাউসে তপন ঘোষ বারোখানি ছবির প্রদর্শনী করেন। শ্রীঘোষের ছবির মধ্যে সুররিয়্যালিজমের গন্ধ খানিকটা পাওয়া যায়। ফর্মের বিকৃতিসাধনের চেষ্টা কিছুটা মামুলী।

জ্ঞানব্রত ঘোষাল আর্টিস্ট্রি হাউসে যে প্রদর্শনী করেন তার মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র্য ছিল। শ্রীঘোষাল আধুনিক রীতির যতরকম টেকনিক আছে সেগুলিকে রিয়্যালিস্টিক ছবির কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো চুড়ি, বালাও বাদ পড়েনি। ফল স্থানে স্থানে মন্দ হয়নি। 'রাত্রের ফারাক্কা', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কতকগুলি ছবি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

*

চারুকলা সংস্থা ষড়ঙ্গ গোষ্ঠীর ১১ জন শিল্পী ও ভাস্করের ৪৪টি কাজ আর্টিস্ট্রি হাউসে প্রদর্শন করেন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপে যে আধুনিক রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে তার কিছু কিছু প্রতিধ্বনি এই প্রদর্শনীতে পাওয়া গেল। ক্যাটালগে ইংরিজির সঙ্গে ছবির বাংলা নাম দিয়ে এঁরা ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

*

শিল্পী পি চন্দ্র অনিল ভট্টাচার্যের স্টুডিও আলফা-বীটার অন্যতম ছাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৪ থেকে ইতিমধ্যে তিনি কলকাতা ও দিল্লীতে দুটি একক প্রদর্শনী করেছেন। তাঁর তৃতীয় একক প্রদর্শনীতে তিনি এঞ্জিনীয়ার হিসেবে যন্ত্রের সঙ্গে যতখানি আত্মীয়তা বোধ করেছেন তার একটা চিত্র উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীচন্দ্রের রঙের প্রয়োগ বিশেষ উজ্জ্বল এবং কম্পোজিশনের দিকে সজাগ থাকবার চেষ্টা তিনি করেছেন। যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নিয়ে ছবি আঁকার দরুণ তাঁর ছবিতে অ্যাবস্ট্রাকশনের আবহাওয়া সৃষ্ট হলেও তার দুর্বোধ্যতা পরিহার করা অসম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তিনি ছবিকে কমার্শিয়াল ডিজাইন হয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন।

*

শ্রীমতী চিত্রা দত্ত সরকারী বৃত্তি নিয়ে প্যারিস ঘুরে আসার পর ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটিতে বাইশখানি তেল রং ও প্যাস্টেলের প্রদর্শনী করেন। শ্রীমতী দত্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ফিগারেটিভ কাজ করবেন বলেই স্থির করেছেন। তাঁর প্যাস্টেলে আঁকা পোর্ট্রেট ও প্যালেট নাইফে আঁকা কয়েকটি সমুদ্রের দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বোটস', 'দি ব্লু সী', 'মাই আয়া', 'কুলু উয়োম্যান' প্রভৃতি ছবিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

*

দক্ষিণ কলকাতার রমণী চ্যাটার্জি রোডের আর্ট অ্যাকাডেমি শিল্পী লালের ১৭ খানি জল রং ও টেম্পেরার প্রদর্শনী করেন। তাঁর কয়েকটি ফ্লাওয়ার স্টাডি ও নিসর্গ দৃশ্যের বর্ণ প্রয়োগরীতি ভারি সুন্দর হয়েছিল। হাল্কা হাতে আঁকা দুটি স্কেচও উল্লেখযোগ্য।

*

আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টসে কুমারী রমা ঘোষ ও ঝর্ণা চৌধুরীর একুশখানি ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই দুই শিল্পীর দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব ও একত্রে কাজ করার অভ্যাসের দরুণ ছবিগুলির মধ্যে কতকটা এক ধরণের কাজের ছাপ পাওয়া গেলেও শ্রীমতী ঘোষের শীতল বর্ণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও শ্রীমতী চৌধুরীর উষ্ণবর্ণ-প্রীতি চোখ এড়ায় না। উভয়েই মনুষ্যমূর্তি-বর্জিত নিসর্গ দৃশ্য এঁকেছেন। এবং উভয়েরই কাজের সরলীকরণের দিকে ঝোঁক দেখা যায় যেটা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এঁদের বিমূর্ততার দিকে নিয়ে যাবে।

*

গত ১৬ই ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অ্যাকাডেমির ৩১তম বার্ষিক চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করলেন শিল্পী যামিনী রায়। এবারে প্রায় দু হাজার শিল্পকর্ম থেকে বাছাই করে ৩২৪টি শিল্পনিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। আগামীবারে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হবে।

—চিত্ররসিক

রাণীভবানীর মন্দির জিয়াগঞ্জ   ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) 'হুমায়ুননামা'র রচয়িতা কে? (খ) নবাব সিরাজদৌলার মা ও বাবার নাম কি? (গ) জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে এবং এই অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (ঘ) আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেণ্টার কি?

বিনীত
মহম্মদ আবুল কাশেম সামশুল হক মণ্ডল
রাজীবপুর, বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাজ্য কোনটি? (খ) পৃথিবীর সর্বোত্তর ও সর্ব-দক্ষিণে কোন্ শহর অবস্থিত? (গ) ইউরেনিয়াম ও অ্যাটম চূর্ণীকরণ কে আবিষ্কার করেন?

বিনীত
অপূর্ব চক্রবর্তী
ব্যাণ্ডেল, হুগলী

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) Esso কথাটির পূর্ণাঙ্গ রূপ কি? (খ) সাঁতারু মিহির সেনের জন্মদিন কবে?

বিনীত
প্রদীপ মুখার্জী
খড়দহ

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পনির ও পাউরুটি কিভাবে প্রস্তুত হয়? (খ) কিভাবে কাঁচা ফিল্ম ধোলাই করা হয়?

বিনীত
সফিক আহম্মদ
বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) র‍্যাডার আবিষ্কারক কে? (খ) মাইক্রোওয়েভ কি? (গ) ভারতে সর্বপ্রথম কোথায় ফুটবলের শীল্ড বা ট্রফি খেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ খেলার ফলাফল কি?

বিনীত
দিলীপকুমার বৈরাগ্য
রাঙামাটি, বর্ধমান

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) এপর্যন্ত কোন কোন সাহিত্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছে? (খ) টর্চ লাইটের আবিষ্কারক কে? (গ) O. K পুরো কথাটি কি? (ঘ) ভারতে রকেট তৈরীর প্রয়াস কবে থেকে শুরু হয়? (ঙ) বৌদ্ধযুগের আম্রপালী কে ছিলেন? (চ) প্রাচীন ভারতের মহিলা গণিতবিদ লীলাবতীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে চাই।

বিনীত
সন্তোষকৃষ্ণ গুপ্ত
টিকর, সিংভূম

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ভারতের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে ব্রীজ 'শোন ব্রীজ'এর দৈর্ঘ্য কত এবং এটি কবে স্থাপিত হয়?

বিনীত
শ্রীমোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবিনোদ
হাইলাকান্দি, আসাম।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীতে রেডিয়ম কতটুকু আছে?

(খ) পৃথিবীর বৃহত্তম নগর, দীর্ঘতম রেলপথ, বৃহত্তম রেলস্টেশন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিমানক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?

(গ) মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা প্রথম কখন আরম্ভ হয়।

(ঘ) দৈর্ঘ্যে ভারতীয় রেলপথ পৃথিবীতে কোন্ স্থানের অধিকারী?

(ঙ) পার্শীরা কিভাবে মৃতদেহ সংকার করে?

বিনীত
শিখা ও মান্তু দাশগুপ্ত
আলিপুরদুয়ার।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর কোথায় সর্বপ্রথম রেলগাড়ী চলাচল শুরু করে?

(খ) ভারতে কয়টি পার্বত্য রেলপথ আছে এবং কি কি?

বিনীত
রমা, শুক্লা ও ইতু দাশগুপ্তা
আলিপুরদুয়ার।

●

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

২২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হিমাদ্রি সেনগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, (ক) উল্লিখিত খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই বিভিন্ন দলে খেললেও, একটা নির্দিষ্ট দলে খেলে খ্যাতির মধ্যগগনে উঠেছিলেন। পজিশন অনুযায়ী তাঁদের নাম পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল ঃ

ব্যাক ঃ গোষ্ঠ পাল (মোহনবাগান)
প্রমোদ দাশগুপ্ত (ইস্টবেঙ্গল)

ফরোয়ার্ড ঃ সামাদ (ই, বি, রেল)
সুনীল ঘোষ (ইস্টবেঙ্গল)
দুলাল গুহঠাকুরতা (ঐ)
ভেংকটেশ (ঐ)
সত্তার (মোহনবাগান)
ধনরাজ (ইস্টবেঙ্গল)
আমেদ (ঐ)

এঁদের মধ্যে গোলদাতা হিসাবে সামাদ নিঃসন্দেহে কীর্তিমান। তাঁর সহকর্মী শ্রীপ্রভাত মুখার্জি রচিত 'ফুটবল যাদুকর সামাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে জানতে পাই যে, ১৯২৯ সালে এফ এ অফ ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার অরথি সাহেব সামাদের খেলা দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, ইংলণ্ড কেন সমগ্র ইওরোপে এরকম খেলোয়াড় বিংশ শতাব্দীতে জন্মায়নি। পরপর সাতজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে সামাদ যখন গোল করলেন, তখন তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাই নাকি বেরিয়েছিল; সে কথাটা হল 'wizard'.

(খ) পজিশন অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ এগারজন ফুটবল খেলোয়াড় হলেন ঃ থঙ্গরাজ; অরুণ ঘোষ, জার্নেল সিং ও নাইম; পি সিংহ ও ফার্নাণ্ডেজ; রাজেন্দ্রমোহন, অশোক চ্যাটার্জি, গুরুকৃপাল সিং, পি দে ও অরুময়। এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত এবং এই ব্যাপারে মতান্তর থাকা বিচিত্র নয়।

(গ) ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো খেলোয়াড় হলেন রামবাহাদুর। তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে একাদিক্রমে ঐ দলে খেলে চলেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে থঙ্গরাজ ও রামবাহাদুর মুক্ত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

২৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অশোক মুখোপাধ্যায় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, পেলের আসল নাম এডসন আরানটেস দো ন্যাসিমেণ্টো। ফুটবলের এই মুকুটহীন সম্রাটকে অনুরাগী বিশ্ব নানা নামে ভূষিত করেছে। ইতালীতে তাঁর পরিচয় 'দি কিং'। ফ্রান্সে তিনি 'ব্ল্যাক টিউলিপ', চিলিতে 'এল পেলিগ্রো' বা 'পেরিল'। আর ব্রেজিলবাসীদের কাছে তিনি শুধু 'পেলে' নন, 'ব্ল্যাক পার্ল' বা 'কালো মানিক' নামেও পরিচিত। এই সমস্তই তাঁর ক্রীড়ামুগ্ধ জনসাধারণের দেওয়া নাম; যদিও 'পেলে' নামটির প্রচার বিশ্বব্যাপী হওয়ায় বর্তমানে তিনি ঐ নামেই পরিচিত। তিনি জাতিতে নিগ্রো এবং খেলেন ব্রেজিলের স্যান্টোস ক্লাবে।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত গঙ্গেশকুমার চক্রবর্তীর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, আকস্মিক যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধের জন্য ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে ক্রেমলিন ও হোয়াইট হাউসের মধ্যে এক সরাসরি টেলিফোন ও টেলিপ্রিণ্টার যোগাযোগ প্রবর্তিত হয়। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বদা সচল থাকায় ইহা 'হট লাইন' নামে পরিচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি ভারত ও পাকিস্থানের সেনানায়কদ্বয়ের মধ্যেও একটি 'হট লাইন' স্থাপিত হয়েছে।

বিনীত
জয়ন্ত হালদার
নরেন্দ্রনগর, কলিকাতা—৫৬

অতসীর সংসার

সুনীল ভট্টাচার্য

আশ্চর্য, অতসী আমাকে চিনতে পেরেছিলো! অতসী—সেই অতসী। যাকে আমি উনপঞ্চাশের শিয়ালদা স্টেশনে দেখেছিলাম। আজ আবার সেই অতসী—সেই অতসীর কথাটাই খুব বেশী করে মনে পড়ে যাচ্ছে। আর মনে পড়ছে সেদিনের সেই দৃশ্যটা—।

শিয়ালদার মেন স্টেশন। সামনের চত্বরে পর পর লরিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। লরি-গুলোয় স্তূপাকার মালপত্তর। বাক্স প্যাটরা, পোঁটলা পুঁটলিগুলো। মানুষ-গুলো কয়েদীদের মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। খোঁয়াড়ের গরু গুনতির মত গোনা শেষ হলো। এরপর গুনতিবাবুর হাঁকে যে যার ট্রাকে গিয়ে উঠে পড়লো। আমরা স্বেচ্ছা-সেবকরা মালপত্তরগুলো তুলে দিতে সাহায্য করলাম। এক সময় যাত্রা সুরু হলো—।

সেদিনের সেই দৃশ্যটা আজো আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার চোখের পর্দায় সচল চলচ্চিত্রের মত ভেসে ওঠে—সেই আথালি-পাথালি দৌড়দৌড়ি। সেই ফ্রকপরা মেয়েটার আমসি আমসি মুখটা—।

আজো আমি দেখি—দেখি চলন্ত লরির পেছনে মেয়েটা ছুটে ছুটে যাচ্ছে। ও হাপুস নয়নে ডাকছে—কাকীমা ও কাকাবাবুগো—।

শোনে না, কেউ শোনে না। আমি বুঝলাম ডেকে ডেকে গলা চিরে গেলেও কেউ শুনবে না। ও গভীর জলে ডুবছে। ও অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে জলকেই আঁকড়ে ধরে ভেসে উঠবার চেষ্টা করছে। বৃথাই চেষ্টা করছে।

শ্যামলা রং। মুখে একটা অসহায় ছল-ছলে ভাব। তবু ফুটফুটে ঢলঢলে মুখখানি। ছোট্ট কপাল। মাথা ভর্তি চুল। চোখ দুটোর তুলনা নেই। এমন ভীরু ভীরু ভাসা ভাসা দৃষ্টি—!

এমন মেয়েকে কেইবা না ভালোবাসে! তা সব্বাই তো ভালোবাসতো। ডেকেডুকে খাওয়াতো। আহা উহু জানাতো। খোঁজ-খবরও করতো।

মেয়েটাও এদের যৎপরনাস্তি ভালো-বেসেছিলো। প্রাণপণে এদের মন যুগিয়ে সেবা করতো। বৌ-ঝিদের খাটনা খেটে দিতো। নূতন মাদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। ঘুম পাড়াতো। ঘুমপাড়ানি ছড়া কাটতো। আরো কত কিই না করতো!

আসলে মেয়েটা জানতো, ও বড় একা। আর এই একা পৃথিবীর হাত থেকে এই বড় নিষ্ঠুর পৃথিবীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে মনে মনে এদের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতো।—কিন্তু সংসার। আবার সংসার। সংসারের চাকাটা আবার চালু হলো। সংসারের এই-ই রীতি। কেউ কারো নয়। তাই খড়কুটোর মত একসংগে ভেসে আসার যে জীবন—সেই কূলকিনারাহীন জীবনের যে সমভাব—সেই সমব্যথীর মনটা আজ আবার বাঁধা ঘাটের কল্পনায় মরে গেল—!

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। কাজে বিন্দু-মাত্র উৎসাহ ছিলো না। মন আমার বিষিয়ে উঠেছিলো। ওই সর্বহারা মানুষগুলোর ওপরেই বিষিয়ে উঠেছিলো। আশ্চর্য! মেয়েটার কথা ওরা একেবারেই ভাবলো না! আশ্চর্য।

মেয়েটার ভাব দেখে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। ও আর কাঁদছে না। চোখের জলও শুখিয়ে গেছে। আমসি গালে আটা আটা জলের দাগ। ও চলাচলের একপাশে সিঁড়ির ওপরে বসে পড়েছে। সবচেয়ে করুণ—থেকে থেকে ও এমন ফ্যাল ফ্যাল করে চারধারে চাইছে, যে বুকের ভেতরটা, বুকের মর্মস্থলটা হাহাকার করে উঠছে। ওর ওই চাউনি দেখে বুঝে নিলাম, ও বুঝতে পেরেছে ও বড় একা। এই কলকাতায়, এই বাংলায়, এই বিশাল পৃথিবীর জনারণ্যে ও বড় একা, ও বড় একা—!

মরণ মরণ! হতচ্ছাড়ির রকম দ্যাখো না! বলি ও অতসী, ওলো ও অতসী, বলি এমনি করে বসে থাকলেই চলবে। বাবা, ও বাবা, বলি ও ভালোমানুষের ছেলে, বাবা বোনা মেয়েটাকে একটু তুলে দাওনা বাবা।

আমি অবাক, আমি অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলাম। এত আতঙ্কিত! এমন অকল্পনীয়! এত আলো এই অন্ধকারে—!

ছুটে গিয়ে মেয়েটাকে তুলে দিলাম! এত আনন্দ এত আনন্দ! বুকের ভেতরটা আমার ভরা ভাদ্দরের মত ভরে উঠলো!

ঘটনাটা আমার মনের মণিকোঠায় চির-কালের জন্যে তোলা রইলো। জানি, পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর। এর পরেও এই পৃথিবীর কত নিষ্করুণ ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। তবু মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারাতে পারিনি। মানুষ আছে, মানুষ আছে। আজো দুঃখীর দুঃখে প্রাণ কাঁদে, প্রাণ কাঁদে—।

॥ ২ ॥

কে জানতো অতসীর সংগে আবার দেখা হবে! দেখা হবে আন্দামানের এক পল্লীতে। ও যখন আমার পায়ের কাছে এসে ঢিপ করে প্রণাম করলো, তখন আমি তো অবাক! অবাক হবারই কথা। চিনতে পারিনি। চিনবো

কি করে! এ যে সেই অতসী—যাকে আমি শিয়ালদা স্টেশনে ছেলেমেয়ে কোলে-কাঁকে করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি. সে যে এমন লক্ষ্মীঠাকুরুণের মত জ্বলজ্বলে মুখে তুলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, একি কখনো কল্পনাও করেছি। অতসীর মুখেই শুনলাম, সে আমার কপালের কাটা টিপের মত দাগটা দেখেই নাকি চিনে ফেলেছে! আশ্চর্য, মেয়েরা এত খুঁটিনাটিও মনে রাখতে পারে!

অতসীর সংসার। অতসীর সংসারে এসে বড় শান্তি পেলাম। ছোট সংসার। অতসী, অতসীর স্বামী শংকর, আর ওদের দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ে দুটি কি সুন্দরই না দেখতে হয়েছে। মেয়েটিও অব্যয় তার মা—তার মার মতনই দেখতে হয়েছে। মায়ের মত চুল, মায়ের মত ছোট্ট কপাল। এমনকি মেয়ের চোখের চাউনিটা পর্যন্ত তার মা'র মতনই হয়েছে। অতসীর চোখের তুলনা মেলা ভার। এমন ভাসাভাসা এমন মায়া-জড়ানো যে দেখলে বুকের ভেতরটা স্নিগ্ধ হয়। আর চুল, অতসীর চুলের ঐশ্বর্য দেখলেও অবাক হতে হয়। কি ঘন! চুলের কি গোছা! পিঠ ছাড়িয়ে নেমে গেছে। অতসী সামলাতে পারে না।

মেয়ের নাম রাধা। রাধাই বটে! শ্যামল মেয়ে। কিন্তু কি লাবণ্য! ঠিক ঠিক যেন ছোটবয়সের অতসী। মেয়ের হাব-ভাবও তার মায়ের মতন। হাসলে, মার মতনই গালে টোল পড়ে যায়। ভারি, ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে রাধা।

অতসীর ছেলের বয়েস মাত্র চার। নাম গোবিন্দ। ভারি দুষ্টু। হটর হটর করে সারাদিনই অপাট করে বেড়াচ্ছে। ওর দৌরাত্ম্যে অতসী অস্থির। দিনে কতবার যে বলে—উঃ খোকা, তুমি কি দুষ্টুই না হয়েছে! ছেলের বন-ঝোপের ওপরে বেশী টান। সামনে অতসীর হাতের বাগান। বাগানে নটে শাখ, কুমড়োলতা, চাঁড়শ গাছ। কুমড়ো গাছে অজস্র ফুল ধরেছে। ফুলের লোভে ফড়িং, প্রজাপতিগুলো উড়ে আসে। খোকা বড় বড় চোখ করে উপু হয়ে বসে নটে শাকের মাথায় না হয় কুমড়ো ফুলের গায়ে ফড়িং প্রজাপতিদের বসে থাকতে দ্যাখে। খোকা অমনিতে বড় দুষ্টু হয়েছে। কিন্তু বন-ঝোপের কাছে গিয়ে সেও যেন কেমন মুগ্ধ মুগ্ধ হয়ে পড়ে। খোকার চোখে বিস্ময়। সে তার নতুন চোখ জোড়া নিয়ে সবে মাত্তর এই বিশ্বভুবনের বর্ণালী ছবিগুলো দেখতে সুরু করেছে। বিশ্বও তার খেলার সাথী, তার খেলাঘরখানি সাজিয়ে ওই নটের বনে, কুমড়োলতায়, ঝিঙে মাচানের ঝিঙে ফুলে, আর ওই স্থলকমলীর তুচ্ছ দামে এসে খোকার সঙ্গে এক আসনে জুড়ে বসেছেন।

অতসীর বনে-বাদাড়ে বড় ভয়। খোকাও তেমনি! সেও বন-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। অতসী খুঁজে খুঁজে সারা হয়। খোকাও এমন দুষ্টু হয়েছে যে অতসীর শত ডাকেও সাড়া দেয় না। অতসীর মুখ থমথম করে ওঠে। আহা তা ত হবেই। খোকা যে তার সাগরছাঁচা ধন সাত রাজার ধন এক মানিক! কিন্তু খোকাও এমন! খোকা তার মাকে ভাবিয়ে, কাঁদিয়ে একশেষ করে তবে এক সময় কু-কু করে ডেকে ওঠে। অতসী ছুটে যায়। বন-ঝোপের মধ্যে থেকে খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসে। তারপর খোকার পিঠে দুম দুম করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে তাকে টিপ করে মেজের ওপরে বসিয়ে দিয়ে, ঘরের বাইরে চলে এসে দরজাটা টেনে দিয়ে বলে ওঠে—থাক, সারা-দিন এই ঘরেতে আজ বন্ধ থাকো। যেমন দুষ্ট তেমনি সাজা। মায়ের আদরটাই তো শুধু দেখেছে শাসন তো আর দেখনি। খোকাও তেমনি! মার খেয়েও খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর ঘরের ভেতর থেকে হুবহু মার রকম নকল করে ভয় দেখিয়ে বলে—মা যেও না, মা-মণি যেও না। ওই বনেতে হুম আছে ।

অতসী দিনের মধ্যে চোদ্দবার করে ছেলেকে ওই কথা বলেই ভয় দ্যাখায়। বলে, যেও না খোকা, যেও না ওই বনেতে হুম আছে! ছেলেও ওই কথা বলে তার মাকে এখন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভয় দ্যাখায়। বলে যেও না, মা-মণি যেও না। ওই বনেতে হুম আছে......।

এমন মিষ্টি ছেলেমেয়ে দুটি হয়েছে, যে আর বলবার নয়। দেখেশুনে যেন বুক জুড়িয়ে যায়। শুধু কি তাই! অতসীর সেবা-যত্ন! আমার জন্যে তার কি ব্যস্ততা! কখন কি খাই না খাই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে। এমন করে কাছে এসে দাঁড়ায়, ডাকে, দাবী জানায়, ধমকায়, যেন আমি ওর কত কালের চেনা, কত আপনার। বড় ভালো লাগে। ও আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে আনন্দ পায়। আজকাল আমিও কত ফাই-ফরমাশ খাটাই। বলি, ও অতসী, আজকে তোমাদের সেই বাঙালে পদটা রান্না করে খাওয়াও না!

অতসী কপট রাগ দেখিয়ে অনবদ্য ভঙ্গী করে বলে— বেশ বেশ বাঙাল তো বাঙাল, অত বেশী বেশী করবেন না—।

অতসীর রাগ। তার মান-অভিমান সবই আমার ভালো লাগে। ওর জ্বলজ্বলে মুখখানা দেখলে বড় আনন্দ হয়। বুকের ভেতরটা কি শান্তিতেই না ভরে ওঠে।

তবু অতসীর ওপরে এক-এক সময় ভারী রাগ হয়। ও থেকে থেকে এমন অবুঝের মত কাজ করে যে, অপ্রস্তুতে পড়ে যাই। তখন রাগ হয়। সত্য সত্যই রাগ করি। আবার মায়াও লাগে। সে যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অতসী আমাকে ভারী অপ্রস্তুতে ফেলেছিলো।—চাষের সময় সারাদিন মাঠে মাঠেই কেটে যায়। কি হাড়-ভাঙ্গাই না খাটনি। শংকর সবেমাত্র বাড়ী ফিরেছে, এমন সময় অতসীর গলার স্বর শুনতে পেলাম। ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে বসেছিলাম। রাধাগোবিন্দ গল্প শুনছিলো। শুনলাম অতসী তার স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে—উঃ, এমন হুশো। আচ্ছা তোমাকে নিয়ে কি করি বলো তো? সেই পই পই করে বলে দিলাম যে ফেরার পথে সিদু মন্ডলের বাড়ী হয়ে ফিরো। কিছু না পাও দুটো চুনোপুঁটিও সংগে করে এনো। তা তোমার মাথায় কি কিছুই থাকে না! এখন দাদাকে কি দিয়ে খেতে দিই বলো তো?

শংকরকে অপ্রস্তুত গলায় বলতে শুনলাম—এই যা! কি ভুলই না হয়ে গেছে। আচ্ছা এখন কি করি বলো তো?

অতসীর বিন্দুমাত্র দয়া নেই। কি পাষাণ মেয়েরেই না বাপু। বলে কিনা—ওঠ ওঠ। এই বসলে কেন? উঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। কই উঠলে—।

শংকরকে ক্লান্তগলায় বলতে শুনলাম—বড্ড ক্লান্ত লাগছে অতসী।
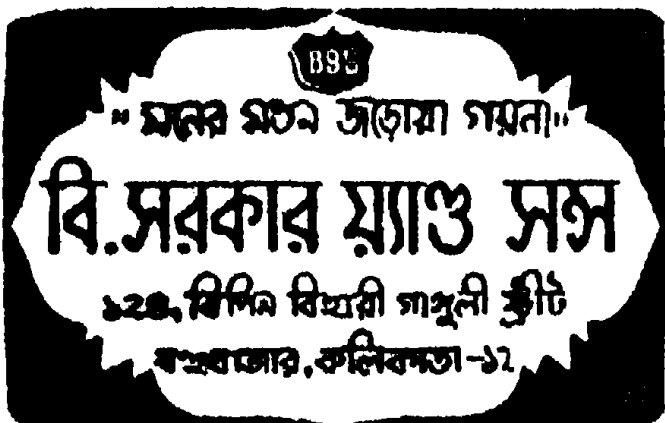
লক্ষ্মীটি, একটু জিরিয়ে নিই। তারপর তোমার মাছের ব্যবস্থা করতে যাবো।

এবারও অতসীকে যা বলতে শুনলাম তাতে রাগে গা পিত্তি জ্বলে উঠলো। বলে কিনা—না না জিরোতে হবে না। কুড়ের বাদশা। আচ্ছা দাঁড়াও। আমি এনে দিচ্ছি।

একটু পরেই শুনতে পেলাম—ধর, কি জ্বালা, জালটা ধর না গো।

গল্প বলা মাথায় উঠলো। ঘরের ভেতর থেকেই ধমক দিয়ে বলে উঠলাম—উঃ কি জ্বলুম! মানুষটা যে তেতেপুড়ে ঘরে ফিরে এলো সেদিকে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই। এমন বেআক্কেল বাঙালে কান্ডকারখানা কস্মিনকালে দেখিনি বাবু! যেও না। শংকর যেও না বলছি। বলি ও অতসী। আমি তো তোমাদের মত বাঙাল নইগো যে মাছ না হলে রুচবে না!

কিন্তু কে কার কথা ধারে! শংকরও তেমনি। অম্লান বদনে বউয়ের হুকুম তামিল করতে ছুটলো।

একটু পরে, অতসী চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। ফিরেও দেখলাম না। রাগে গুম হয়ে বসে রইলাম। ছেলেমেয়ে দুটোও ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেয়ে রইল। অতসী চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে ভালমানুষের মত সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর যেন কিছুই জানে না, এমন ভংগী করে বলল—কি হল, কথা বলছেন না কেন? রাগ হয়েছে, রাগ! উঃ, কথায়-কথায় এত রাগ করতেও পারেন! দাদা, ও দাদা! লক্ষ্মীটি, ও দাদা!—উঃ, ধরুন-ধরুন। হাত যে পুড়ে গেল। উঃ কি গরম! আপনি এত নিষ্ঠুরও হতে পারেন!

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে পেয়ালাটা টেনে নিলাম। ও হাততালি দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল—কেমন জব্দ, কেমন জব্দ! কেমন ঠকালাম, কেমন ঠকালাম! রাধাগোবিন্দও মার দেখাদেখি হি-হি করে হেসে উঠল।

উঃ কি শয়তান মেয়ে! তলে-তলে এত বুদ্ধি! তপ্ত ঘিয়ে যেন জল পড়ল। একেবারে তড়বড়িয়ে জ্বলে উঠলাম। কিন্তু রাগ করব কি, এমন মেয়ে যে রাগ করবার উপায় পর্যন্ত রাখে না। এমন ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষেরও বেহদ্দ। দ্যাখ না ছেলেমেয়ে দুটোর সংগে কি রকম খুনসুড়ি করছে। খুনসুড়ি করে জায়গা দখল করে বলে কিনা—দাদা, ও দাদা, কি গল্প বলছিলেন, বলুন না।

আচ্ছা বলুন ত, এবারও কি রাগ পুষে রাখা চলে! রাগ জল হয়ে যায়। হয়েও গেছিল। তবু নিজের কোটা বজায় রেখে গম্ভীর গলায় বলি—দ্যাখ অতসী—

অতসী কথার পিঠে কথা বলে, কথার রকম নকল করে বলে ওঠে—দ্যাখ অতসী, হ্যাঁ অতসী, জো অতসী। আচ্ছা দাদা, এত করেও কি রাগ পড়ল না? সেই থেকে ত কত বকলেন। বাঙাল, বাঙালে কান্ডকারখানা, আমি তো তোমাদের মত বাঙাল নই গো। বেশ, এত করেও যদি সাধ না মিটে থাকে। তবে এই আমার মাথাটা এগিয়ে দিচ্ছি। বেশ সাধ মিটিয়ে দেয়ালে ঠুকে দিন।

অতসী আমার হাতের কাছে তার মাথাটা এগিয়ে দেয়। কেন জানি না কেন, বুকের ভেতরটা হঠাৎ টনটন করে ওঠে। ভারী মায়া লাগে। মুখে কিছু বলি না। শুধু ওর মাথার ওপরে ডান হাতটা রেখে

খোকা বড় বড় চোখ করে...প্রজাপতিদের বসে থাকতে দেখে

মনে মনে বলি—ওর ওপরে আর কোনদিনও রাগ করব না। ওর যা প্রাণ চায় তাই করুক। আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে যদি ওর তৃপ্তি হয়, তবে আমিই বা বাধ সাধব কেন। তাছাড়া এমন যত্নআত্তি, এমন সমাদর আর কোথায় গেলেই বা পাব!

কথায় কথায় একদিন যশোদা বামনীর কথা জিজ্ঞাসা করি। যশোদা বামনীর কথায় অতসীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। অতসীর মুখে তার দিদিমা, দিদিমাকে জড়িয়ে তার জীবনের সব কথা শুনি।

অতসী বলে—উঃ, সেদিনকার কথা মনে পড়লে আজও বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে ওঠে। উঃ সেদিন কি ভয়ই না পেয়েছিলাম। ভাগ্যিস দিদিমা ডেকে তুলে নিয়েছিলেন, তা না হলে সেদিন যে কি করতাম, কোথায় যেতাম, মনে করলেই ভয়ে শিউরে উঠি। অথচ দিদিমা, মানুষ যে এমনও হয় তা ত জানতাম। দিদিমার নথ নাড়া দেখে ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যেত। তাঁর বাইরের আচার-আচরণ দেখে কাঠ হয়ে যেতাম। কি বাক্যি! ত্রিসীমানায় ঘেঁষতাম না। একসংগে, এক কামরায় সেই গোয়ালন্দ থেকে এসেছি। কিন্তু একবারও কি ভাল কথা বলতে শুনেছি। বামনীর দশাসই চেহারা আর তার কথার দাপটে সবাই জুজু। সত্যি, এমন রাশভারী চেহারা আর এমন অপক্ষপাত ব্যবহার আগে কখনও দেখি নি। সাত বেটা, সাত বেটার বউ, মেয়ে-জামাই, এত বড় সংসার। কিন্তু কোথাও কি এতটুকু এধার-ওধার হবার জো আছে। তাহলে কুরুক্ষেত্র করবেন না। দিদিমার দাপটে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেত।

দিদিমার সংসারে এক দিনের জন্যেও কারুর কাছ থেকে অসমাদর পাই নি। সবাই ভালবাসতেন। মামীমা-মামাবাবু সবাই ভাল। তাঁরা একদিনও আমাকে পর-পর করেন নি। মিথ্যে কথা বলব না। ওদের সংসারেরই একজন হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দিদিমা! দিদিমার স্বভাব, কটর-কটর করে শুনিয়ে দিতেও ছাড়তেন না। বলতেন—তা তোমরা যাই মনে কর না বাপু, যশোদা বামনী স্পষ্ট কথা বলতে পেছপা হয় না। তোমাদের চক্ষুশূল ওই অতসীর জন্যেই আমার যত ভাবনা, তোমাদের কারুর ওপরেই আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। এখন বেঁচে থাকতে

থাকতে ওর একটা ছিল্লে করে যেতে পারির তো বুঝি!

দিদিমাই দেখে-শুনে শঙ্করের সঙ্গে অতসীর বিয়ে দিয়েছিলেন। লোক-লৌকিকতা একবিন্দুও কম করেন নি। নিজের মেয়ের বেলারও যা অতসীর বেলায়ও তাই। বরং বেশী। দিদিমা শঙ্করকে সাত বিঘে জমি কিনে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। শঙ্করেরও তাই হয়েছিল। জেদ ধরেছিল আন্দামানে যাব। বড় স্বাধীন-চেতা। আর বড় ডাকাবুকো। তাই একদিন সব্বাইকে কাঁদিয়ে শঙ্কর অতসীকে নিয়ে আন্দামানে চলে এলো।

অতসী বলে—দিদিমার চোখে সেই প্রথম জল দেখেছিলাম!

দিদিমার কথায় অতসীর আর কথা ফুরোয় না। কত কথা! কত স্মৃতি! আমি অতসীর মনের আর এক দিককার খবর পাই...।

অতসীর বড় সাধ ছিল তার সংসারে দিদিমার পায়ের ধুলো পড়ুক। শঙ্কর অতসীর সে সাধটা মিটিয়েছিল। দিদিমা এসেছিলেন। শঙ্কর নিজে গিয়ে নিয়ে এসে-ছিল। পুজোর সময়। দিদিমা মাস চারেক অতসীর সংসারে ছিলেন। ওই সময়ই গোবিন্দ হয়। রাধা, গোবিন্দ দিদিমারই দেওয়া নাম।

অতসী বলে—জানতাম কি সেই হবে আমাদের শেষ দেখা! যেন বুঝতে পেরে-ছিলেন। তাই শেষ দেখা দিতেই যেন কয়েক মাসের জন্যে চলে এসেছিলেন। দেশে ফিরে দিদিমা আর বেশী দিন বাঁচেন নি। দিদিমা নেই। কিন্তু ভাবতেও যেন পারি না। ভাবলে বড় ভয় হয়। যেমন ভয় পেয়েছিলাম শিয়ালদা স্টেশনে। মনে হয়েছিল একা, কত একা। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। ভাগ্যিস দিদিমা সেদিন ডেকে নিয়েছিলেন। তা না হলে কি যে হত। কিইবা করতাম। হয়ত, ভয়ে মরেই যেতাম। দিদিমা নেই। ভাবতেও পারি না দিদিমা নেই। কেমন গা যেন ছম-ছম করে ওঠে। কিন্তু সত্যই তো দিদিমা নেই।

দিদিমার কথা বলতে বলতে অতসীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ে। গলা রুদ্ধ হয়। কিন্তু ও আমার কাছে লুকোয় না। ও আমাকে বড় আপনার জন হিসাবে ধরে নিয়েছে—।

এইখানেই আমার ভয়, বড় ভয়। অতসী আমাকে বেঁধেছে। বড় কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে। এ বাঁধন ছেঁড়া বড় দুঃখের, বড় দুঃখের! বুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। বুকের ভেতরে চিরকালের জন্যে একটা গভীর দাগ কেটে যায়—।

তবু একদিন না একদিন আমাকে যেতেই হবে। অতসীকে আজকাল সেই কথাটাই বোঝাই—।

আজ নয় কাল করে করে দিনগুলো আমার চলে যাচ্ছে। অতসীকে কিছুতেই মত করিয়ে উঠতে পারছি না। অতসী আজ-কাল নিজের কথা কিছুই বলে না। যাবার কথা উঠলেই ম্লান মুখে ভাসা ভাসা চোখ দুটো তুলে ভারী করুণ করুণ করে চায়। বলে—জানি, আপনাকে ধরে রাখতে আমি পারবো না। সে জোরও আমার মোটেই নেই। বেশ, আমি আর আপত্তি করবো না। তবে যাদের জিজ্ঞাসা করবার তাদের জিজ্ঞাসা করেই দেখুন।—আচ্ছা, রাধা গোবিন্দকে কাঁদিয়ে আপনি যেতে পারবেন? তা হয়ত পারেন! কিন্তু আপনাকে এত নিষ্ঠুর আমি ভাবতেও পারি না!

অতসী বুঝতে পেরে আমাকে আমার মোক্ষম জায়গায়ই ঘা দিয়েছে। সত্যি, ছেলে মেয়ে দুটোর মায়া কাটিয়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। রাধা গোবিন্দ আমাকে তরুলতার মতই আঁকড়ে ধরেছে। এর পেছনে অতসীর ষড় আছে বুঝতে পারি। সে জেনেশুনেই ছেলে মেয়ে দুটোকে আমার জিম্মায় ঠেলে দিয়েছে। দিনের কথা বাদ দিই। রাতের বেলায়ও পালা করে এক একজন আমার কাছে শোয়। এই নিয়ে রাধা গোবিন্দের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কোন কোনদিন দুজনেই আমার বিছানা দখল করে শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে অতসী একটাকে বুকে করে নিয়ে যায়। তখন ওর মুখের ভাবে যে কথাটি ব্যক্ত হয়, তার সার মর্ম হচ্ছে—কেমন জব্দ। এবার যান দেখি!

নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে যাই। এত স্নেহের কাঙাল, এত মায়া মমতার ভিখারী, এ পরিচয় আমার জানা ছিলো না! অথচ, এই দুর্বলতা তো আমারি। আমার মধ্যেই গোপন ছিলো। —এই দুর্বলতার স্থানেই অতসী বড় ঘা দিয়ে চলেছে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়ে যায়। অতসী মুখ থমথম করে বলে ওঠে—বেশ ত যান না। আমি আটকাবার কে! সে অধিকার তো আমাকে দেননি। তাছাড়া, আপনি ইচ্ছে করলেই যে কত নিষ্ঠুর হতে পারেন—সে কথাও আমার অজানা নেই—!

আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত লিখি। রাধা না হয় গোবিন্দ, যে কেউ একজন আমার কাছে বিছানায় শুয়ে থাকে। আমি আলোটাকে আড়াল করে রাখি।

গভীর রাত। এক একদিন কি অপরূপ জোছনা! সাদা আকন্দ ফুলের ধপধপে জোছনা। জানলার ধারে এসে দাঁড়াই। বাইরের দিকে চেয়ে দেখি—অতসীর বাগান। তারপরে বন ঝোপ, পাহাড়। পাহাড়গুলির অরণ্য। আকাশে জ্বলজ্বলে চাঁদ, অজস্র নক্ষত্র। সব নীরব। অথচ কি ভাবগম্ভীর। —তখন কত কথা, কত স্মৃতিই না মনে পড়ে! রাতের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সে বিস্মৃতির পর্দা তুলে ধরে। তখন কত কথা, কত স্মৃতিই না মনের আনাচে কানাচে উঁকি মারে!

বাইরের দিক থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি, দেখি রাধা না হয় গোবিন্দ। কি অকাতরেই না ঘুমোচ্ছে। ভাবি—ঘুম ভেঙে ওরা যদি দ্যাখে আমি নেই, আমি কোন ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছি। তখন—! বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে ওঠে।

ঘরের কুলুঙ্গির দিকে নজর পড়ে। অতসীর সাজিয়ে রাখা ফুলকাটা রেকাবীর ওপরে সাদা ধপধপে ফুলগুলো। ঘর ভুর-ভুর করে উঠছে। রেকাবীর পাশেই ধুপদানি। রাধা রোজ-রোজ আমার জন্যে গর্জন গাছের আটা সংগ্রহ করে আনে। ভারি সুগন্ধ হয়। অতসী নিজের হাতেই ধুপ-ধুনো তৈরী করে। অতসী আমাকে বোঝে। ও জানে ফুল, ধুপধুনো আমি ভালোবাসি। সন্ধ্যায় গা ধুয়ে পোশাক বদলে ও তুলসী-তলায় প্রণাম করে শাঁখ বাজিয়ে আমার ঘরে এসে ঢোকে। ধুপধুনো জ্বালিয়ে ফুল-কাটা রেকাবীতে ফুলগুলোতে জলের ছিটে দিয়ে কুলুঙ্গির ওপরে সাজিয়ে রেখে দিয়ে যায়। তখন ওকে দেখে আমার বড় সম্ভ্রম জাগে। আমার মধ্যেও এক বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে, আমিও ভাবগম্ভীর হয়ে উঠি!

আজ আবার সেই ধপধপে কাক-জোছনা। বাইরে গাছপালা বন-বাদাড় সব ভেসে গেছে। সব নীরব। অথচ কি সংগীত-মুখর! সুন্দরের এই অপরূপত্বের তুলনা নেই।

আজ রাধা আমার পাশে এসে ঘুমোচ্ছে। পাশ ফিরে। বালিশের ওপর হাতের তালুর ওপরে মুখখানি রেখে। আশ্চর্য হয়ে দেখছি। অতসী, ঠিক যেন অতসী। ছোট বয়েসের অতসী। যাকে আমি শিয়ালদা স্টেশনে দেখেছিলাম। একা ত্রি-সংসারে যার কেউ নেই। —অথচ কি অদ্ভুত শক্তিই না ওর ভিতরে লুকিয়ে ছিলো! মেয়েরা শক্তিরই অংশ। অতসীকে দেখে আজকাল তাই মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

ভাবি অতসীর কথা লিখবো। লিখবো যে অতসীকে আমি পরের ছেলেমেয়ে কোলে-কাঁকে করে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, আজ আবার তাকে দেখলাম। দেখলাম সে তার নিজের সংসারে লক্ষ্মীপ্রতিমার মত বিরাজ করছে।

ঐতিহাসিক কৃতঘ্নতা: ফ্রান্সিস বেকন

সুধাংশু দাশগুপ্ত

১৬২৬ সালের ৯ এপ্রিল সকালে ইংলণ্ডবাসী একটা করুণ ক্রন্দনের মত শুনল সেই সংবাদ—'ফ্রান্সিস বেকন আর নেই।' এ মুখ থেকে ওমুখ, এপাড়া থেকে ওপাড়া ছড়িয়ে পড়তে পড়তে একটা সংবাদ এক পরমাত্মীয় বিয়োগের মত সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল—'ফ্রান্সিস বেকন আর নেই।' লণ্ডনের কিছু দূরে হাই গেটের বাড়ীতে লর্ড অরুণ্ডেল বাইরের অপেক্ষমান সুধীজনকে যখন এ সংবাদ জানালেন তখন কয়েকবারই তাঁকে বলতে হল—"believe me, he is no more".

লর্ড অরুণ্ডেলের ব্যথা সেদিন ক'জনা বুঝতে পেরেছিল জানা নেই। মাত্র একমাস আগে যেদিন অসুস্থ হয়ে নিজে থেকেই বেকন তাঁর বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন সেদিন তিনি ঘুনাক্ষরেও জানতেন না যে এমনিভাবে তাঁকে বন্ধুকৃত্য করতে হবে একদিন মাত্র একমাস পরে। ৯ এপ্রিল সকালে লর্ড অরুণ্ডেলের মনে পড়ছিল এক মাস আগের সেই সকালটির কথা, আর বেকনের "Of Death" প্রবন্ধের একটি অভিলাষ—

> "I wish to die in an earnest pursuit, which is like one wounded in hot blood, who for the time scarce feels the hurt".

কি মহান, কি করুণ! বেকনের ডাক্তার তাই যখন শেষ সংবাদ জানালেন, লর্ড অরুণ্ডেল বিশ্বাস করতে পারেননি, ছুটে গিয়েছিলেন বেকনের ঘরে। চেয়ে দেখলেন—সেই শয্যা, সেই ডানহাতের কাছে নিজের বইগুলো, একগোছা আলগা কাগজের উপর ব্রোঞ্জের পেপার ওয়েট—যেখানে যে জিনিষটা যেমনটি ছিল তেমনি আছে। ছুটে বাইরে এলেন অরুণ্ডেল, ডাক্তার এবার বললেন,—'গুডবাই এভরিবডি।' অরুণ্ডেল কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু উপস্থিত বহুজনার ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে সেকথা চাপা পড়ে গেল।

সেদিন রাত্রে লর্ড অরুণ্ডেল একা থাকতে চেয়েছিলেন। এটর্ণি জেনারেল থেকে ব্যারন, ব্যারন থেকে চ্যান্সেলর, বিচার বিভাগের অন্যতম সর্বোচ্চ পদে আরোহণের প্রতি পদক্ষেপেসংস্ট বেকনের অগণিত বন্ধু ও স্তাবকের দল সেদিন হাইগেটের বড় বাড়ীটায় ভীড় করে এলেও, সকলের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন লর্ড অরুণ্ডেল। ঐ বন্ধু আর স্তাবকদের মধ্যে বসে সত্যিকারের নিঃসঙ্গ একাকী যুদ্ধক্লান্ত বিপ্লবী বন্ধুর শেষ সময়কার কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে বাজছিল, বাজছিল ব্যথা-বেদনার কত অসংখ্য মুহূর্তের কান্না। মনে পড়ছিল কয়েকদিন আগের সেই অবিস্মরণীয় রাত্রের কথা, যেদিন বেকন তাঁর উইলখানা সই করে বলেছিলেন—'অরুণ্ডেল—এই ভাল।

> I bequeath my soul to God . . . My body to be buried obscurely. My name to the next ages and foreign nations".

ভাবতে ভাবতে অরুণ্ডেলের চোখে জল এল—গত এক মাসের বহু আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত তাঁকে বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল—

> "but he is no more, Francis Bacon has passed away".

সেদিন রাত্রে অরুণ্ডেল যখন ভাবছিলেন বন্ধু-গৌরবের কথা, তখন ইংলণ্ডের এক নিভৃত কবরে আর এক বন্ধুর আত্মা নীরবে হাসছিল। কবরে শুয়ে শুয়ে আর্ল অফ এসেক্স তখন তাঁর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন আর ভাবছিলেন—এই সেই ৯ এপ্রিল। যেদিনের জন্য তিনি প্রায় দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে জেগে আছেন। এই ৩০ বছরের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি অপেক্ষা করেছেন এই ৯ই এপ্রিলের জন্যে—বেকনের মৃত্যুর জন্যে তিনি প্রতি পল অপেক্ষা করেছেন কারণ তাঁর মৃত্যুর জন্য তো বেকনই দায়ী।

১৫৭৯ সালে বেকনের বাবা যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। বেকন তখন প্যারিসে ইংরাজ এম্‌ব্যাসীতে সামান্য মাইনের কেরানী। কতই বা রোজগার! বাবা নিকোলাস্ বেকন ছিলেন রানী এলিজাবেথের অধীন এক বিখ্যাত লোক। মা লেডি অ্যানি কুক্ ছিলেন মহারানীর খাস কোষাধ্যক্ষ লর্ড বার্লের শ্যালিকা। সুতরাং আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বেকন পরিবারের অভাব বলতে কিছুই ছিল না। ফ্রান্সিস বেকন তাই নিজের রোজগারের পরোয়া করতেন না। কিন্তু বাবা মারা যেতেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দীর্ঘকাল লালিত বড়মানুষী অভ্যাসের সঙ্গে তাঁর সামান্য রোজগার কোনভাবেই পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না। চাকরী ছেড়ে তিনি তাই আইন ব্যবসায় নেমে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করতে পারলেন না। এ-কালের অভিজ্ঞতায় দেখি যে, ন্যায়াধ্যক্ষ ও প্রভাবশালী রাজপুরুষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষণা না হলে নতুন আইনজীবীদের প্রতিষ্ঠা লাভ কত দুরূহ ব্যাপার। বিশ-শতকি গণতান্ত্রিক যুগে যদি এ-অবস্থা হয়, তবে ষোড়শ শতাব্দীর অবস্থা কি ছিল সহজেই অনুমেয়। বেকনের আত্মীয়স্বজন অনেকেই তখন পদস্থ—তাঁদের সামান্য পৃষ্ঠপোষণা বেকনের প্রতিষ্ঠালাভে অনেকখানি সাহায্য করতে পারত। কিন্তু কেউ করেননি। টিউডর ইংলণ্ডে স্বার্থপরতা তখন প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে। বেকন আত্মীয়দের দরজায় দরজায় ঘুরলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু পেলেন না। এই তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে ধীরে ধীরে করল সাহসী, আত্মনির্ভর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সম্পূর্ণ নিজের প্রতিভা ও চেষ্টায় তিনি বাইশ বছর বয়সে পার্লামেন্টের সদস্য হলেন। Taunton ছিল তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র—এখানকার অধিবাসীরা তাঁকে একবার নয়, পর পর কয়েকবার নির্বাচিত করল পার্লামেন্টে। কিন্তু জনসেবায় তো পেট ভরে না! আজন্ম লালিত অমিতব্যয়িতা আর বিলাস, জনসেবায় কতটুকুই বা আস্বস্ত হয়? পরমবন্ধু আর্ল অফ এসেক্স ছিলেন বেকনের গুণগ্রাহী ও বন্ধুগতপ্রাণ। তিনি অবস্থাটা বুঝেছিলেন—"One should at all times give, but at no time all. Gratitude is nourished with expectation." বেকনের মত প্রতিভা তখন তাঁর একান্তভাবে দরকারও। রানীর বিরুদ্ধে তাঁর ভবিষ্যৎ ষড়যন্ত্র, যার জন্য তিনি নিপুণভাবে দীর্ঘকাল ধরে জাল পেতে চলেছেন, তার প্রয়োজনেই বেকনের মত প্রতিভাধরদের তাঁর প্রয়োজন।

> "For the multiplication of his own and his supporters' offices was an integral part of his political offensive"

—তবু বেকনের ক্ষেত্রে এটা ছিল না' অন্যতর—বেকনও তাই জানতেন। নিজের টুকেনহামের সুন্দর ছোট্ট একটা জমিদারীর দলিল যেদিন তিনি বেকনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেদিন বেকন তাই কথা বলতে পারেননি। বন্ধুপ্রেমের অকৃত্রিমতায় তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। সুপুরুষ এসেক্সের গুণমুগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল, এক বিরাট পুরুষকে—যে মহৎ, যে বন্ধুবৎসল, যে ঐ বিরাট বক্ষজুড়ে এক অশান্ত মস্তবায়ুর প্রত্যাশায় দিন গুণছে। বেকন দলিলখানা হাত পেতে নিয়েছিলেন, ভবিষ্যৎ বন্ধুকৃত্যের অকৃত্রিম প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে বেকনের সেদিন দিতে হয়নি। কেনই বা দেবেন? সত্যিকারের বন্ধুকৃত্যে কৃতজ্ঞতা কতটুকু? কিন্তু ইংলণ্ডবাসী সবাই সেদিন জেনেছিল —

> "It was a magnificent gift . . . would bind Bacon to Essex for life"

বেশ কিছুদিন বাদে, এসেক্স সেদিন হাসছিলেন। হাতে সদ্য-পাওয়া বেকনের চিঠি—"I would put loyalty to my Queen above even gratitude to my friend". কে এই Queen? মহারানী এলিজাবেথ? কিন্তু কেন? রাজানুগত্য কি বন্ধুপ্রেম থেকেও বড়? এসেক্স হয়ত তাই বিশ্বাস করতে পারেননি। অবিশ্বাসের হাসি হেসে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন বেকনের কথা। এসেক্স ষড়যন্ত্র করছিলেন তখন, এক বিরাট ষড়যন্ত্র—রানীকে বন্দী করে ইংলণ্ডের সিংহাসন লাভ। কিন্তু শেষমুহূর্তে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

ফটো: অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

হল. আর্ল অফ এসেক্স ধরা পড়লেন। বেকন সেদিন পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী লোক—একদিকে পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, আর একদিকে রাজদ্রোহ। বিচারে ষড়যন্ত্র প্রমাণ হলে এসেক্সের দীর্ঘ কারাবাস অবধারিত, অথচ সামান্য রাজানুগ্রহ হলে সমস্ত ব্যাপারটাকে এক হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে আদালতে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এমনিভাবেই ভাবছিলেন বেকন সেদিন, ভাবাবেগে আরও অনেকদূর এগিয়েও ভাবছিলেন—রানী এলিজাবেথ এককালে আর্ল অফ এসেক্সকে ভালবাসতেন, বহু পদোন্নতি আর দাক্ষিণ্য এই ভালবাসার দৌলতেই এসেক্সর জুটেছে একদিন। সে-ভালবাসা এখন নেই, ঘৃণা ষড়যন্ত্রের মুখোমুখী তা থাকবারও কথা নয়। তবু ভাল করে বললে রানী কি বেকনের কথা শুনবেন না? ঠিক এমনি-ভাবেই ভাবছিলেন বেকন, ভাবছিলেন রানীর অশেষ অনুকম্পার কথা, তাঁর পরিবার, তাঁর মা Lady Auny Cook -এর সঙ্গে রানীর ঘনিষ্ঠতার কথা। বেকন কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। রানীর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে, অনেক অনুনয়-বিনয় করে তিনি এসেক্সের কথা পাড়লেন—ক্ষমা ভিক্ষা করলেন বন্ধুর জন্যে, উদারপ্রাণ, বন্ধুগত-প্রাণ আর্ল অফ এসেক্সের জন্যে। রানী এলিজাবেথের হৃদয়ে এসেক্সের জন্য তখন আর বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই—প্রত্যাখ্যান আর অবহেলায় যা ছিল কুণ্ঠিত, ষড়যন্ত্রের মুখোমুখী তা এখন ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি বেকনকে তাই সাফ্ বলে দিলেন— "Speak of any other subject".

সেদিন বেকনের সত্যই বড় দুর্দিন। এসেক্স যা করতে চেয়েছিলেন, তা অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়—তবু সে তো বন্ধু! তাই এসেক্স যেদিন জামিনে খালাস পেলেন, সেদিন বেকন ছুটে গিয়েছিলেন বন্ধুর কাছে। ইচ্ছা—এসেক্সকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে নিবৃত্ত করা। কিন্তু এসেক্স সেদিনও হেসেছিলেন, হয়ত ভবিষ্যতে বন্ধুকৃত্যের আরও বড় পরীক্ষার প্রত্যাশা করেছিলেন সেদিন মনে মনে। সুযোগও জুটে গেল—সুযোগ যে জুটবে এসেক্স তা আগেই জানতেন।

সামান্য কিছুদিন বাদেই এসেক্স সশস্ত্র-বাহিনী নিয়ে লণ্ডনে প্রবেশ করলেন, খেপিয়ে তুলতে লাগলেন সাধারণ মানুষকে রানী এলিজাবেথের বিরুদ্ধে। সংবাদটা যখন বেকনের কাছে পৌছোল, তখন তিনি খেপে গেলেন—বন্ধুত্বের বিন্দুমাত্র দাবী আর তখন রইল না। এসেক্সের সশস্ত্র বিদ্রোহ এবারও ব্যর্থ হল—তিনি আবার ধরা পড়লেন। এবারের চক্রান্ত প্রত্যক্ষ, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না—বিচারে প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত। রানী এলিজাবেথের ঘৃণা তখন নতুনতর রূপ নিয়েছে—আর্ল অফ এসেক্স, সুদর্শন এসেক্স এখন রাজদ্রোহী, ইংলণ্ডের আইনে তখন জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী। ষোড়শ শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর মামলার বিচারের দিন তাই দেখা গেল, ইংলণ্ডের লোকের কি আগ্রহ, আদালত-কক্ষে তিল-ধারণের যায়গা নেই। লোকে লোকারণ্য। অপরাধপ্রমাণে সরকারপক্ষের কৌঁসুলীর যখন ডাক পড়ল, তখন উঠে দাঁড়ালেন—একি, ফ্রান্সিস বেকন? এসেক্স হয়ত বিশ্বাস করতে পারছিলেন না নিজের চোখকে। বেকন সরকারী কৌঁসুলী হয়েছিলেন কিছুদিন আগে, এ-খবর তিনি জানতেন; তবু সে তো বহুর মধ্যে একজন। আর সেই একজনই যে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি। তবু বেকনকে দেখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় দেখা গেল না তাঁর চোখেমুখে, শুধু দেখা গেল মৃদু এক কৌতুকের হাসি। কিন্তু সমবেত অসংখ্য দর্শক হাসতে পারলেন না সেদিন। এসেক্সের শত দোষ ছাপিয়ে তখন ফুটে উঠেছে এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর চেহারা—যার সামনে এসেক্সকে দেখাচ্ছে কত অসহায়, কত করুণ। তাই বেকন যখন উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে সওয়াল করছিলেন, তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলী এই প্রথমবার মনে মনে ধিক্কার দিল তাঁকে। অথচ এই হচ্ছে সেই ফ্রান্সিস্ বেকন যাঁর সম্বন্ধে Ben Jenson বলেছিলেন— "No man ever spoke more nearly, more compressedly, more weightily, or suffered less emptiness, less idleness in what he uttered . . His hearers could not cough or look aside from him without loss. He commanded where he spoke. No man had their affections more in his power. The fear of every man that heard him was lest that he should make an end".

বিচারে এসেক্সের প্রাণদণ্ড হল। এসেক্সের সুন্দর মুখখানার দিকে কেউ সেদিন তাকাতে পারেনি। স্বাভাবিক অবস্থায় যে-দণ্ড সামান্য সহানুভূতিও সৃষ্টি করতে পারত, বেকনের হস্তক্ষেপে সে-দণ্ড ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ইংলণ্ডের লোক সেদিন চীৎকার করে উঠেছিল ক্ষোভে, ধিক্কার দিয়েছিল বেকনকে "monster of treachery and ingratitude" বলে। এমনকি মহামান্য পোপও সেদিন বেকন সম্বন্ধে বলেছিলেন, "The wisest and meanest of mankind". দণ্ডাজ্ঞা শুনে এসেক্স কি ভেবেছিলেন সেদিন জানা যায়নি, কিন্তু লর্ড অরুণ্ডেল ভাবছিলেন অন্য কথা। রাজার দরবারে যে-আইন কঠোর ও নির্মম, হৃদয়-দরবারে তার রূপ তো ভিন্নতর। সে-দরবারের বিচার তো আরও নির্মম—সেখানে তো এসেক্সের বিচার হয়নি। অথচ সবাই জানত সেখানে বেকনের বিচার হবে, একদিন না হয় একদিন। হওয়াটাই নিয়ম—সে-বিচারে দণ্ডদাতার দণ্ড যার উপর পড়বে, সে হবে আরও অসহায়। স্বাভাবিক নিয়মনীতির বাঁধা সওয়ালে তাকে তখন মুক্ত করবে কে?

বেকন তখন লর্ড চান্সেলর—১৬২১ সাল। এসেক্সের মামলার পর যেসব অসংখ্য লোক বেকনের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা সুযোগ খুঁজছিল—কোন একটা সুযোগ, যাতে করে জনসমক্ষে বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে বেকনের। এসেও গেল সে-সুযোগ—বেকনের বিরুদ্ধে ঘুষ নেবার অভি-যোগ উঠল। প্রকাশ্যেও সে-অভিযোগ উঠল—জনতা দাবী জানাল বেকনকে পদচ্যুত করা হক। হায়রে বিশ্বনিয়ম, অ্যারিস্টটলের পর যে-প্রতিভার নাম করা চলে, যে-প্রতিভা সৃষ্টি করেছিল,

"Advancement of learning," "Novum organum", "New Atlantis"

—তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এল দুর্নীতির, দাবী উঠল শাস্তির। ৯ই এপ্রিল রাত্রে

লর্ড অরুণ্ডেল সেদিন ভাবছেন এসেক্সের বিচারের সেই শেষ দিনের কথা—তার সেই ভাবনার কথা—হৃদয়-দরবারের নির্মম বিচার কাউকে রেওয়াত্ করে না, তা সে যত বড়ই হক।

ইংলণ্ডের রাজা তখন জেমস্—বেকন তাঁর কাছে দোষ স্বীকার করলেন। কিন্তু পার্লামেণ্টের চাপে বেকনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দুই-ই হল। কারাভোগের সময় বেকন সম্রাটের দয়াভিক্ষা করে আবেদন পাঠালেন, মঞ্জুরও হল। দু'দিন কারাভোগের পর তিনি মুক্ত হলেন, অর্থদণ্ড থেকেও রেহাই পেলেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের সুকৃতির ফলস্বরূপ তিনি যা পেলেন, তাতে তাঁর মুক্তি ঘটল সত্য। কিন্তু মানুষের দরবারে যে-গ্লানি তিনি এসেক্স মামলার সময় থেকে শুরু করে উৎকোচ-অভিযোগের কারাদণ্ড-আদেশ পর্যন্ত বয়ে এনেছিলেন, তা থেকে তিনি মুক্ত হলেন না।

লর্ড অরুণ্ডেল ভাবছিলেন সেদিন, এতদিনে হয়ত এসেক্সের আত্মা নিশ্চিন্তে ঘুমাবার সুযোগ পাবে। যদিও সে জানবে না ভাবীকালের উদ্দেশ্যে বেকনের সেই উইলের কথা—"My name to the next ages and foreign nations".

ভাবীকাল আর ভাবীকালের মানুষ সে উইলের মর্যাদা রেখেছে। ফ্রান্সিস বেকন আজ তাই বিশ শতকের সবচেয়ে শক্তিশালী দার্শনিক মতবাদের পিতা। তিনি বস্তুবাদের আদিগুরু।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

পুলক একদিন টেলিফোন করে বলল, ক্রিসমাস ইভে এ বছর কি করছিস? ক্রিসমাস ইভে? আমি কথাটা মনে-মনে ভাবলাম। বললাম, ক্রিসমাস ইভে কি আবার করব, প্রত্যেক বছর যা করে থাকি তাই করব! পুলক বলল, প্রত্যেক বছর তুই কি করিস? আমি বললাম, প্রায় প্রত্যেক দিনে যা করি তাই করব। ছাত্র পড়িয়ে বাড়িতে ফিরে ঘুম মারব। পুলক বলল, ঐ দিন বিকেল নাগাদ আমাদের বাড়িতে আসিস, ক্যামেরাটা আনিস, বেশ সুন্দর ছবি তুলতে পারবি। আসবি তো?

আমি বললাম, দেখি — যদি ছাত্রের বাবাকে রাজি করিয়ে একদিন ছুটি নিতে পারি। পুলক বলল, যদি-টদি নয়, সেদিন আসতেই হবে।

রীসিভার রেখে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ক্রিসমাস — আমরা এখনো ক্রিসমাস নিয়ে এত হৈ-হৈ করি কেন? যখন সায়েবরা চাকরী দিত, তখন 'ক্রসমাসের বিকেলে মুর্গী, টার্কি, কপি আর মটর সুঁটি, সবোতল, বড়-ছোট-মাঝারী যে কোন সায়েবের বাড়িতে ভেট পাঠানোর হয়ত প্রয়োজন ছিল, কেননা তখন চাকরীতে উন্নতি করবার ওটা একটা পদ্ধতি ছিল। এখন তো আর তা নেই। প্রায় সব সায়েবই এখন ভারত ত্যাগ করে চলে গেছে, যাঁরা সাম্প্রতিক আমদানী, তাঁরা কারুর বিশেষ পদোন্নতিও করতে পারেন না, চাকরী থেকে বরখাস্তও করতে পারেন না, অতএব বড়-দিন উৎসব আমাদের জীবন থেকে চলে গিয়েছে বলে আমার ধারণা। কিন্তু এখনো যে বড়দিন আমাদের মধ্যে টি'কে থাকবে আমি আশা করি নি।

ক্রিসমাস ইভে পুলকের বাড়িতে গিয়ে দেখি জমজমাট ব্যাপার। প্রায় ত্রিশটি ছোট ছেলেমেয়ে এসেছে। বুঝলাম এরা পুলকের এবং তার বন্ধু-বান্ধবের। তারা হাতে বেলুন নিয়ে প্রচন্ড হৈ-চৈ করছে। কেউ নাচছে। একটা টেপ রেকর্ডার থেকে সঙ্গীত ধ্বনি সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে। বড়-দেরও দেখা গেল। তারা ক্রিসমাসের জন্য বিশেষ সমস্ত পোশাক পরেছে। চারিদিক ঝকঝক করছে। লাল নীল সবুজ আলোয় ক্রিসমাস গাছটি সমুজ্জ্বল।

পুলক আমাকে বলল, তোর মনে হচ্ছে আমরা হিন্দু হয়ে বড়দিনের উৎসব পালন করি কেন, এই তো?

আমি বললাম, আমাদের তো প্রচুর উৎসব রয়েছে নিজেদেরই। সে অবস্থায় পরের উৎসব ধার করার কি দরকার?

পুলক বলল, এ উৎসব ঠিক যে আমাদের তা নয়। মানে, এই উৎসবে ছোট-বড় সবাই মাতে বটে, কিন্তু এটা আসলে ছোটদেরই উৎসব। দেখছিস না সবাই কেমন আনন্দ করছে, হৈ-হৈ করছে। উৎসবের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। যে উৎসবে ছোটরা এমন হৈ-চৈ করতে পারে সে উৎসব সর্বজনীন। ক্রিসমাসের যে স্পিরিট...।

পুলক আরো অনেক কথা বলে গেল। তার কথার অধিকাংশ অবশ্য গোলমালে কানে গেল না। তবে তার কথার সারাংশ এই দাঁড়ালো যে ক্রিসমাস উৎসব আসলে ছোট-দেরই উৎসব। ছোটরা কল্পনার জগতে বিচরণ করে। ফাদার ক্রিসমাস তাদের জন্য বরফের দেশ থেকে হরিণটানা গাড়িতে করে নিয়ে আসে উপহার।

আমি বললাম, বিলেতে বহু দোকানে লোকেরা ফাদার ক্রিসমাস সেজে থাকে।

পুলক বলল, ওদের আইডিয়া আছে। ওরা যদিও ক্রিসমাসটাকে একটি বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত করেছে, কিন্তু কত সুন্দর-ভাবে ওরা উৎসব করে। ফাদার ক্রিসমাস ব্যাপারটা যে কেবল খৃষ্টানদের প্রিয় হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও যদি ফাদার ক্রিসমাসকে চাক্ষুষ দেখতে পায় তাহলে খুব ভাল হয়। আর এই ভেবেই আমি এক সেট ফাদার ক্রিসমাস পোশাক আনিয়েছি। যখন এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যেবেলা কেক আর ডালমুট খাবে স্যান্ডউইচের সঙ্গে, তখন আমি হঠাৎ এদের অবাক করে দেব। উপ-হারের থলি পিঠে করে আমি আসব। চারি-দিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যাবে। সেই সময় সেই আনন্দের ছবি তুই তুলবি।

আমি দেখতে লাগলাম ছোটদের ছুটো-ছুটি আর চিৎকার। হাসাহাসি এবং কথা-বার্তা। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল চারি-দিকে। ছোটরা সবাই মেঝেতে লাইন করে বসে গেল খেতে। পুলক চলে গেল পোশাক করতে। ফাদার ক্রিসমাস সেজে সে যখন আসবে তখন যে আনন্দের বন্যা বইবে সেই ছবি তুলবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে রইলাম, ক্যামেরা বাগিয়ে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আর আনন্দের বন্যার ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। কেননা পুলক যখন ফাদার ক্রিসমাস সেজে বিরাট এক থলে নিয়ে আচমকা দেখা দিল তখন দুটি বাচ্চা একযোগে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তারও দেখাদেখি আরো কয়েকটি বাচ্চা চিৎকার জুড়ে দিল, এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ কোলাহলের বদলে এক আতঙ্ক আর্তনাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটি বছর তিনেকের ছেলে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, আর বাচ্চাদের মা-বাবা ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে তাদের ছেলেমেয়েদের ধরতে চেষ্টা করতে লাগল এবং সেখানে দু মিনিটের মধ্যে প্রলয় না হলেও ছোটখাট কুরুক্ষেত্র দেখা দিল।

পুলকই শেষপর্যন্ত হঠাৎ বুদ্ধি করে তার ফাদার ক্রিসমাসের খোলস খুলে ফেলল। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। বাচ্চারা কেঁদেই চলল এবং শেষপর্যন্ত ঐ অবস্থাতেই প্রত্যেককে বাড়িতে নিয়ে যেতে হল।

বড়দিন শিশুদের উৎসব, এরপর আরও অনেকেই বলেছে, কিন্তু পুলক কখনো বলেনি।

ফুলের স্বর্গ গুলমার্গ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জাঁহাপনাকে সেলাম। হাজার কুর্নিশ ইউসুফ শাহ চককে। খুঁজে-পেতে জবর জায়গাটি বের করেছিলেন তিনি।

আজ থেকে কয়েকশো বছর আগেকার কথা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিককার কাহিনী। কাশ্মীরে চকদের শাসন চলছে তখন। দেড় বছরের নির্বাসন থেকে ইউসুফ শাহ চক সবে ফিরে এসেছেন। শাহজাদার মন ভাল নেই। নির্বাসনের গ্লানিকে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তিনি। পারিষদরা পরামর্শ দিলেন, বদলা নিন। দুষমনদের সায়েস্তা করুন।

শাহজাদা বললেন, থাক ওসব। মন ভাল নেই।

—কি উপায় তবে? পারিষদরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

শাহজাদা জানালেন, উপায় একটা আছে। ভাবছি, বিশ্রাম নেব কয়েকদিন। পরী-পাঞ্জালের ফুলবাগিচা গুলমার্গে গিয়ে কিছুদিন থাকব।

কথা শুনে অবাক হলেন নবীন পারিষদরা। মাথা হেঁট করে দাঁড়ালেন সব। কিন্তু যারা প্রবীণ, জাঁহাপনার মর্জি বুঝে নিতে তাদের এতটুকু কষ্ট হল না। ওরা ঠিক বুঝলেন, হারান জায়দাদে নয়, কুঞ্জ-বনে মন পড়ে আছে জাঁহাপনার। প্রতাপ নয়, প্রেম খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিরালায় বেগমসাহেবার আশনাই চাইছেন।

সবাই ভুলতে পারেন গুলমার্গকে। কিন্তু ইউসুফ শাহ পারেন না। তাঁর যৌবনের অনেক সুখস্বপ্ন জড়িয়ে আছে ওখানে। ওখানকার মাঠ-ময়দান আর বন-পর্বত তাঁর অনেক প্রেম-মদির মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে আছে। তা' ছাড়া গুলমার্গ নামটিও তাঁরই দেওয়া। আগে ও জায়গাটির নাম ছিল গৌরীমার্গ। লোকে বলত, শিব-জায়া গৌরী এই মার্গ বা মাঠ ধরেই স্বামী-সন্দর্শনে যান।

ইউসুফ শাহ বললেন, অনেক ফুল ফোটে এই পথে। এই মাঠে হাজার ফুলের জেল্লা। তাই এর নাম দিলাম, 'ফুলের ময়দান'—গুলমার্গ।

প্রেয়সী হব্বা খাতুন পাশেই ছিলেন। নামটিকে মনে ধরল তাঁর। বললেন, হক কথা খোদাবন্দ। এমন ফুলবাগিচা আর আর নেই কোথাও। পরী-পাঞ্জালের আর কোথাও এমন ময়দান নেই। গুলমার্গ নামেই ডাকব একে।

সেই থেকে নাম হল গুলমার্গ। আমীর-ওমরাহ থেকে শুরু করে নফর-বাঁদী অবধি সবাই এই একই নামে ডাকল।

প্রতি গ্রীষ্মে গুলমার্গে ছুটে আসতেন ইউসুফ শাহ। পাশে থাকতেন হব্বা খাতুন। এর পর থেকে কত গ্রীষ্ম পেরিয়ে গেছে। ইউসুফ শাহের পথ ধরে কত যে সৌন্দর্য-রসিক এসেছেন এখানে, সীমা-সংখ্যা নেই তার। কত যুগের কত যে প্রেমিক এখানকার আনন্দমদিরায় মাতাল হয়েছেন, কেউ তার হিসেব রাখে নি। শুধুমাত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার নয়। নুরজাহানের স্মৃতি আজও গুলমার্গের পথে-পথে আলো ছড়ায়। মুঘল বাদশাহের কাহিনী অনেকেরই মুখে-মুখে ফেরে। কিন্তু গুলমার্গের ঝর্ণাধারার কথা অনেকেই হয়ত জানেন না। হয়ত অনেকেই ভাবেন না, ওই ঝর্ণাধারার পাশেই বেগম-সাহেবাকে সঙ্গে নিয়ে জাঁহাপনা চড়ুইভাতি করতেন। জল আসত ঝর্ণা থেকে। কাঠ আসত সামনের ওই বন থেকে। পাহাড়ীয়ারা জাফরান দিয়ে যেত। কোপ্তা-কাবাব আর কালিয়া-কোর্মার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত এখানকার বাতাসে।

এর পর কেটে গেছে বহু যুগ। রাজ্যের হাত-বদল হয়েছে। পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে কাশ্মীরের উপর দিয়ে। অনেক কিছুর কথাই ভুলে গেছে মানুষ; কিন্তু গুলমার্গকে ভুলতে পারে নি। তাই আজও ওখানে আনন্দের তুফান ওঠে। ইউসুফ শাহ আর জাহাঙ্গীরের পথ ধরে আজও শত-শত লোক যায় ওখানে।

গিয়েছি আমরাও। দেখেছি বাদশাহী প্রেমের স্মৃতি-জড়ান ময়দানটিকে।

মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। বাতাসে পপলার গাছ থেকে ভেসে আসছে স্নিগ্ধ সৌরভ। ভূস্বর্গের চারিদিকে তুষারে ঢাকা পাহাড় ঝকমক করছে। চলেছি গুলমার্গের পথে, পপলার অ্যাভিন্যুর ভিতর দিয়ে।

বড় মনোরম সেই অ্যাভিন্যু। ঘন সবুজ পপলারগুলো বেড়ে উঠেছে; অগুণতি তোরণ রচনা করেছে পথে-পথে। আলোতে-ছায়াতে মিলে পথটি হয়ে উঠেছে অপরূপ। পপলার গাছের ফাঁক দিয়ে ভূস্বর্গের মাঠ-ঘাট দেখতে পাচ্ছি।

জাঁহাপনাকে আবার মনে পড়ল, ঠুকলাম সেলাম। ইউসুফ শাহকে হাজার কুর্নিশ। তিনি ছিলেন বলেই গুলমার্গের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার দুঃখ-শোকের মধ্য দিয়েও দিন-গুজরান করার সুযোগ পেয়েছে অনেক লোক।

আজও গুলমার্গের পথ ধরে চলেছে ওরা। আমরাও চলেছি। হয়তো সেই একই পথ ধরে চলেছি, যে পথে জাঁহাপনারা যেতেন। কয়েক শো বছরে পথের চেহারা হয়ত বদলেছে; যা ছিল অপ্রশস্ত ও এবড়ো-খেবড়ো, তা এখন চওড়া ও মসৃণ হয়েছে। আশে-পাশের পাইন গাছগুলোও বুড়ো হয়েছে নিশ্চয়। নিশ্চয় অনেক নবীন গাছ প্রাচীনদের স্থান দখল করেছে। কিন্তু আর সবই ঠিক তেমনি আছে। সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, সেই প্রাণান্তকর চড়াই, সেই ছায়াঘন নিবিড় অরণ্য এতটুকু বদলায় নি।

চলেছি সেই অরণ্যের গা ঘেঁষে। আমাদের এক পাশে পাইন আর ফারের সমারোহ। অপর পাশে গভীর খাদ। খানিকটা দূরেই বরফে-ঢাকা পাহাড়। সূর্যের আলোকে ঝলমল করছে তার শ্বেত-শীর্ষ। তুষারকিরীটের চকমকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দৃষ্টিকে তাই সরিয়ে আনছি এক-একবার। দূরের পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সবুজ পাইনগুলোর দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু এত সুন্দর ওই পরিবেশ যে, কোন একটা বিশেষ জায়গায় চোখ থাকছে না। নীচের উপত্যকার শ্যামলিমা মন ভোলাচ্ছে কখনও, কখনও আবার নীল আকাশের গায়ে শুভ্র যবনিকা টেনে দিয়ে তুষারধবল পাহাড় সৌন্দর্যের মায়াজাল বুনছে। পথের পাশের বনভূমির দিকে তাকাচ্ছি কখনও, কখনও আবার রঙবেরঙের বুনো ফুলের মহোৎসব দেখছি।

পাশের পাইন আর ফার বন থেকে অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছে। ঝর্ণার কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি থেকে-থেকে। আশে-পাশে অনেক প্রস্রবণ নজরে পড়ছে। অপরূপ এই পথ। মনে হল, ঠিক এই রকম না হলে জাঁহাপনার ফুলবাগিচার মর্যাদা অটুট থাকত না বুঝি। বুঝি রাজকীয় মহিমায় আঘাত লাগত। কিন্তু সে সুযোগ বিন্দুমাত্র নেই এখানে। রহস্যময় হিমালয় এখানে তার সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন এমনভাবে খুলে ধরেছে, যা' দেখে অতি বড় বস্তুবাদীও থমকে দাঁড়াবে। অন্তত একটি মুহূর্তের জন্যেও কবি হয়ে উঠবে সে। ক্ষণিকের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। জগতের কেউ জানবে না একথা। সংসার-চক্রের বিচিত্র জমা-খরচ কষতে গিয়ে সে নিজেও কালক্রমে হয়ত ঠিক আগের মতই নিশ্ছিদ্র বস্তুবাদীতে পরিণত হবে। কিন্তু তবু একটি বিশেষ মুহূর্তে তার বক্ষ জুড়ে যে আলোক ছড়িয়ে পড়েছিল, সেকথা কোন দিন সে অস্বীকার করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে অনেক দূরে এলাম। আমরা কয়েকজন মাত্র পায়ে হেঁটে পথ চলছি। বাকী প্রায় সবাই 'পনি'তে। কেউ-কেউ ডাণ্ডি চেপে চলেছেন, যেলান এক-একটা চেয়ারে বসে আছেন দু-একজন।

গুলমার্গ : বসন্তের দিনে

চারজন করে কুলি ওদের বইছে। কুলি আমাদের সঙ্গেও রয়েছে। আর রয়েছে 'পনি'। কিন্তু 'পনি'তে চাপবার প্রয়োজন বোধ করি নি এখনও। এখনও নিজের ভারটা অপর কারও উপর চাপিয়ে দেবার মত অবসন্ন হইনি।

অথচ পথ সহজ নয় মোটেই। বরং বেশ খাড়াই। টানমার্গ থেকে গুলমার্গ যাওয়া মানে, চার মাইল পাহাড়ী পথে প্রায় দু হাজার ফুট উঠে আসা। গুলমার্গ দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮,৭০০ ফুট উঁচুতে। আর টানমার্গের উচ্চতা ৭,০০০ ফুটের চেয়ে কিছু কম।

লক্ষ্য করলাম, কুলিদের অনেকেই কোণাকুণি পথ ধরে যায়। চলতে চলতে পাশের বনে অদৃশ্য হয় হঠাৎ। খানিকক্ষণ পরে আবার পথের গা বেয়ে উঠে আসে। এইভাবে চলে পথের দূরত্বকে অনেকখানি কমাতে পারে ওরা। সেই সঙ্গে বাড়াতে পারে বিশ্রামের সময়টুকু।

আমরাও বিশ্রাম নিচ্ছি মাঝে মাঝে। পথের পাশে বসে পড়ছি কখনও। কখনও আবার কোন পাহাড়ী ঝর্ণার জল পান করছি। এক-একবার ঝর্ণার তিরতিরে প্রবাহকে দেখে ভাবছি, এর সমস্তটুকু আত্মসাৎ করলেও তৃষ্ণা মিটবে না। কিন্তু সে জল এত ঠান্ডা যে, হাত দিয়েই মনে হচ্ছে, অর্ধেক তৃষ্ণা মিটে গেল।

এইভাবে থেমে থেমে পথ চলছি আমরা। হিমশীতল হাওয়া আমাদের সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, এই পথের যেন শেষ নেই। যেন অনাদি-অনন্তকাল ধরে চলছি আমরা। চলতে চলতে থামব গিয়ে দূরের ওই আকাশের গায়ে।

আকাশ আশ্চর্য এক দাক্ষিণ্য নিয়ে আমাদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। তার এখানে-সেখান দু-এক খণ্ড মেঘ চোখে পড়ছে। সে মেঘ থেকে থেকে স্পর্শ করছে আমাদের চারিপাশের বনভূমিকে। দূরের পাহাড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মেঘ ও রৌদ্রের আনাগোনা। আকাশ আমাদের মাথার উপরেই নেই শুধু। আমাদের পাশের পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাতালের দিকে নেমে গেছে।

একবার মনে হল, স্বর্গলোক ছাড়িয়ে চলে আসি নি তো? ভূলোককে পিছনে ফেলে নতুন কোন নক্ষত্রলোকের পথে যাত্রা করি নি তো?

হঠাৎ সুন্দর একটি ঝর্ণা চোখে পড়ল। মাটির পৃথিবীর স্পন্দন কানে এল আবার। পাইন বন থেকে ভেসে-আসা মিষ্ট সুবাস মধুগন্ধভরা ধরিত্রীর কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

ঝর্ণাটি বড় অপরূপ। পাশের বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পথের উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে এগিয়ে গেছে। যেন কোন চঞ্চল শিশু। নিষেধের গণ্ডীটুকু মাড়াতে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করছে না।

ঝর্ণাটিকে পেরিয়ে এলাম আমরা। আবার একটা বাঁক ফিরে উন্মুক্ত এক ফালি জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি, অনেকেই বিশ্রাম নিচ্ছে ওখানে। যাত্রীদের কেউ কেউ হাত-পা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। কুলিরা বসে বসে ধুঁকছে। পনিগুলো দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান এক-একটি অসহায়ের মত। দেখলেই বোঝা যায়, বিশ্রাম নেবার এই হল একটি চিরস্থায়ী জায়গা। শুনেছি, এখানে এসে পনি আপনার থেকেই থমকে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ জিরিয়ে না নিয়ে কিছুতেই নড়তে চায় না।

কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার পা বাড়াই আমরা। আবার নতুন করে পথ চলি। সিডার বন চোখে পড়ে এবার। আর চোখে পড়ে রাশি-রাশি বুনো ফুল। বসন্তের বরফ-গলা জল আরণ্যক হিমালয়ে ফোটা-ফুলের মহোৎসব লাগিয়েছে। মাটির উপর বিছিয়ে দিয়েছে রাশি-রাশি ইন্দ্রধনু।

ইন্দ্রধনুর দু-এক জায়গায় মেঘের মত সাদা-সাদা কী যেন চোখে পড়ছে। ভাল করে তাকাতেই দেখি, জমাট তুষার। বোঝা গেল, ছায়াচ্ছন্ন কোন কোন আশ্রয়ে শীত এখনও স্তব্ধ। যাই-যাই করেও এখনও যাওয়া হয় নি তার। তার জমান সঞ্চয়টুকু এখনও নিঃশেষিত হয় নি।

আর মাত্র কয়েকদিন। তার পরেই ঋতুরাজের একাধিপত্য চলবে এখানে। শীতের শেষ চিহ্নটুকুও থাকবে না। বসন্তের একটানা বন্দনায় প্রকৃতি মুখর হবে। গ্রীষ্মের দহন ও বর্ষার ধারাবর্ষণের মধ্যেও এই মুখর প্রকৃতিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তার রঙবদল শুরু হবে সেই শরতে। ফোটা-ফুলের মহোৎসব বন্ধ হবে তখন। আসবে ঝরা-ফুলের দিন। তখন পাতা-ঝরাবার গান গাইবে এই উঁচু পাহাড়ের বার্চ, ফার আর সিডার। নীচের উপত্যকায় সবুজ পপলার ধূসর রঙ ধরবে।

এখন এই বসন্তে সব সবুজ, সব রঙীন। পথের জায়গায় জায়গায় অবধি সবুজ বাসা বেঁধেছে। রঙ ধরেছে বনভূমি। দেখতে দেখতে ওই রঙীন পথ বেয়ে আরও খানিকটা দূর উঠে এলাম। হঠাৎ একটা বাঁক ফিরতেই দেখি, ঢেউ-খেলান, ঘন সবুজ ঘাসে-ঢাকা অপরূপ এক প্রান্তর। এই হল গুলমার্গ।

গুলমার্গ ঠিক সার্থকনামা নয়। গুল অর্থাৎ গোলাপ ফুল ফোটে না এ ময়দানে। ফোটে হাজার রকমের বাহারী ফুল। তা হোক। এই ফুলবাগিচাকে গুলমার্গ নাম দিয়ে জাঁহাপনা অন্যায় কিছু করেন নি। গুল বলতে সাধারণভাবে সবরকম ফুলকেও বোঝান হয়ে থাকে।

তাই বলে শুধুমাত্র ফুলের মেলা দেখবার বাসনা নিয়ে কেউ ওখানে যায় না। বসন্তের গুলমার্গ রঙের খেলা নয় শুধু, রসেরও প্রস্রবণ চোখে পড়ে। সবুজ মাঠ, দেবদারু আর পাইনে ঢাকা অরণ্য, ফুল-বাগিচা, ঝর্ণাধারা সব কিছুর মধ্য থেকেই রস উচ্ছ্বসিত হয়। গুলমার্গকে দেখে রঙে-রসে ভরা জাঁহাপনার কথাই মনে আসে বারবার। মনে হয়, এ যেন জাঁহাপনার এক কুঞ্জবন। সবুজ ঘাসের বিরাট একটি গালিচা পাতা আছে এখানে। গালিচার এখানে-ওখানে ছড়ান রাশি-রাশি ফুল। অনেক প্রহরী আশে-পাশে। পাইন আর দেবদারু বন অতন্দ্র। খানিকটা দূরেই খিলানমার্গ ও আফরবত। প্রাসাদ-শীর্ষের মণিমাণিক্য ঝলমল করছে ওখানে। রাজা আসছেন।

সুন্দর, বড় সুন্দর ওই রাজকুঞ্জ। তার ঢেউ-খেলান প্রান্তরে অহরহ সৌন্দর্যের ঢেউ উঠছে। ফুলবাগিচা রঙ ছড়াচ্ছে সেই কবে থেকে। সৌন্দর্যের এ এক রঙমহল। এখানে এলে স্থবিরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অক্ষমেরও প্রাণে জাগে ক্রীড়া-কৌতুকের উন্মাদনা। বুঝি এই উন্মাদনা থেকেই গুলমার্গে খেলার আসর জমে উঠেছে।

একটি গোলো ময়দান আছে এখানে। আর আছে দ্'টি গলফ খেলার মাঠ।

বারো-মেসে খেলার আসর কাশ্মীরের একটি ময়দানেই বসে শুধু। আর সে ময়দান আছে গুলমার্গে। বসন্তে যেমন বর্ষায়ও তেমনি গুলমার্গ চঞ্চল, শরতে যেমন শীতেও তেমনি ওখানে পর্যটকের আনাগোনা। গুলমার্গের গলফ ময়দান বছরে একটি দিনের জন্যেও ছুটি পায় না। যে কোন দিন, যে কোন মুহূর্তে ওখানে খেলা জমে উঠতে পারে।

শুনেছি, এত উ'চুতে পৃথিবীর আর কোথাও এমন গলফ খেলার মাঠ নেই। কথাটা কতটুকু সত্যি তা জানি নে, তবে এটা বলতে পারি, এমন মাঠ সচরাচর দেখা যায় না। বন-পাহাড়ের কোলেও এমন অপরূপ ক্রীড়াঙ্গন চোখে পড়ে না বড় একটা। গুলমার্গ তাই পর্বত-অভিযাত্রীদের কাছেও প্রিয়। দুরবগাহ পর্বতের রহস্যময় গিরিকন্দরে পা দিয়েছেন যাঁরা, তাঁরাও এর মহিমার কথা ভেবে বিস্মিত হন।

বিস্ময়ের কারণ হল, গুলমার্গে হিমালয় তার বৈচিত্র্যের অনেকখানি এক সঙ্গে তুলে ধরেছে, ছড়ান অনির্বচনীয়কে মেলে ধরেছে এমন একটি সীমানার মধ্যে, দুর্লঙ্ঘ নয় যা, ইচ্ছে করলেই আমরা যার স্পর্শ পেতে পারি। যে স্পর্শ অনেক আয়াসে পেতে হয়, অল্পায়াসেই এখানে তা মেলে বলে দূর-পাহাড়ের যাত্রীরা এর প্রশংসায় মুখর। আর কাছের গণ্ডীটুকুর মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে রাখতে যারা অভ্যস্ত, এখানে এসে তারা খোলস থেকে বেরিয়ে আসার ডাক শুনতে পায়। কাছের এই সবুজ মাঠ, পাশের অরণ্য আর দূরের ওই বরফে-ঢাকা পর্বত থেকে অহরহ দূরের বাঁশী বেজে ওঠে। সব যেন এক সুরে বলে ওঠে, আর কেন; বেরিয়ে এসো এবার। চেনা-জানা পথের নিশ্চিন্ত নির্ভয়টুকু ছেড়ে অচেনার পথে এবার পা বাড়াও। অন্তত একটি বারের জন্যেও নিরুদ্দেশ হও তুমি। তোমার অতিপরিচিত আশ্রয় থেকে একবারের জন্যেও হারিয়ে যাও।

কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কী এত সহজ! নিরুদ্দেশ হওয়া কী সোজা কথা! লোভ-ক্ষোভ, লাভ-লোকসান, জমা-খরচ সব সময় পিছু নেয় যে! ঘর-ছাড়া মনটাকে বন্দী করে এনে গার্জেনী করে।

গুলমার্গ চিরকাল মানুষকে ভুলিয়ে রাখার গান গাইছে। রূপে ভুলছে কেউ, কেউ ভুলছে রসে। রঙ চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে কারও। কারও আবার রূপতীর্থের নিরুদ্দেশ-সঙ্গীত শুনে ঘর-ছাড়া হতে মন চাইছে।

বসন্তের গুলমার্গে সবুজের সমুদ্র, শ্যামলের অভিসার, তার পাইন বনে আদ্যিকালের শ্যামলিমা বাসা বাঁধে তখন। দেবদারু বন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘাসের রাজ্যে জীবন স্পন্দিত হতে থাকে; ফুল-বাগিচায় উচ্ছ্বসিত হয় রঙের ঝর্ণাধারা।

বসন্তের গুলমার্গকে আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়ে, এক স্তব্ধ দুপুরে। গুলমার্গের পথ ধরে চলেছি। আঁকাবাঁকা, উ'চুনীচু পথ। মাঝে মাঝে দু-একজন পর্যটক চোখে পড়ছে, ঘোড়ায় চেপে চলেছেন কেউ। কেউ চলেছেন পায়ে হে'টে। সূর্য আমাদের ঠিক মাথার উপরে। কিন্তু অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে না তা থেকে। মিঠে রোদ আশীর্বাদের মত নেমে আসছে। চারিদিক আলোয় আলোয় ভরা। গুলমার্গ ঝলমল করছে। পথের দু পাশে রাশি-রাশি ফুল। ঘন লাল কোনটি, কোনটি হলুদ, কোনটি আবার নীলে-সাদায় মেশান।

পথের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ঝর্ণাধারা। সে ধারা পথটিকে ছু'য়ে-ছু'য়ে উপর থেকে নীচে নেমেছে। মৃদু একটা গুঞ্জন ভেসে আসছে তা থেকে। অনেক দূরের অস্পষ্ট কোন সঙ্গীতের মত শোনাচ্ছে।

বসন্তের গুলমার্গে সর্বত্র এই সঙ্গীত। সর্বত্র এমন পথের গা-ঘে'ষে এগিয়ে-চলা ঝর্ণাধারা। পথ ঝর্ণার পিছু নিয়েছে, না ঝর্ণা এগিয়েছে পথের পিছু-পিছু, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক ধরা যায় না।

গুলমার্গের ঘর-বাড়ীগুলোও কেমন যেন রহস্যময়। পথের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ওদের; সম্পর্ক অরণ্যের সঙ্গে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অরণ্যের গাছপালার মতই ওরা যেন মাটি ফু'ড়ে বেরিয়ে এসেছে। আর সে মাটি সমতল নয় মোটেই; কোথাও উ'চু, কোথাও নীচু। বাড়ীগুলোও ঠিক তেমনি; কোনটি যেন পাতালে নেমে গিয়েছে। কোনটি আবার বিনা আড়ম্বরেই হয়ে উঠেছে স্কাইস্ক্র্যাপার। বাড়ীগুলোর প্রায় সবই কাঠ দিয়ে তৈরী। বুঝতে কষ্ট হয় না, এদের মাল-মশলার পনেরো আনাই এসেছে স্থানীয় বন থেকে। গৃহ নির্মাণে গুলমার্গ বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুনের চেয়ে প্রাকৃত রসদের উপরে অধিকতর বিশ্বাসী। অর্থাৎ, প্রয়োজনের খাতিরে হয়ে ওঠাই সেখানে বড় নয়, কী হল এবং কতটুকু সুন্দর হল, তা নিয়েও ভাববার অবকাশ আছে। মনে হয়, পথের বেলায় যেমন, ঘরের বেলায়ও তেমনি গুলমার্গ অকৃত্রিম হবার সাধনা করছে। আদিকালের প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে প্রাকৃত হবার আয়োজন চলেছে ওখানে। বলতে পারি, আধুনিক যুগের নগর-পরিকল্পনা নিয়ে মাথা ঘামান যাঁরা, এ জায়গাটি তাঁদের হয়ত মনে ধরবে না। গুলমার্গের আঁকাবাঁকা পথ ও অদ্ভুতদর্শন সব বাড়ী দেখে তাঁরা ভ্রূ কুঞ্চিত করবেন। কিন্তু যাঁরা বিশ্বাস করেন, প্রকৃতির রঙ-মহলে রসসৃষ্টির কাজটা সব সময় পরিকল্পনা-মাফিক চলে না, এই রমণীয় জায়গাটি সহজেই আকর্ষণ করবে ওদের।

চলতে চলতে অনেক দূর উঠে এসেছি। পাইনের আড়াল থেকে গুলমার্গের ঢেউ-খেলান ময়দানটি চোখে পড়ছে। দেখতে পাচ্ছি, ময়দানের এক কোণে কুলিরা বসে। ঘোড়াগুলো আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। অনেক মেঘ চরে বেড়াচ্ছে মাঝ মাঠে। সবুজ প্রান্তরে আশ্চর্য এক রমণীয়তা, অদ্ভুত এক জীবন-স্পন্দন ছড়িয়ে দিচ্ছে। ছবি ছাড়া এমন একটা দৃশ্য দেখা যায় না বড় একটা। বোধ করি, ছবিতেও ঠিক এমনটি খুব কমই নজরে পড়ে।

গুলমার্গের ভিতরে ছবি, বাইরেও ছবি। উপত্যকাটিকে বাইরে থেকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে যে-পথটি, তা-ও যেন একসঙ্গে অনেক ছবির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সে-পথে পা বাড়াতেই স্পষ্ট মনে হয় এ-কথা। মনে হয়, অগুণতি চিত্রকর নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করে এদের এ'কেছে।

বৃত্তাকার ওই পথটির এক পাশে দাঁড়াতেই রাশি রাশি ছোট-বড় পাহাড় চোখে পড়ে। মনে হয়, এ এক নিশ্চল সাগর। মন্ত্রবলে অসংখ্য ঢেউ এখানে চির-কালের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে। আর সেই স্তব্ধও নিশ্চল পর্বত-সমুদ্রের মাঝখানে বাতি-ঘরের মতো সোজা খাড়া উঠে গেছে নন্দা দেবী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ-পর্বতটির উচ্চতা ছাব্বিশ হাজার ফুটেরও বেশী। পৃথিবীর পর্বত-সমাজে নন্দা দেবীর কৌলীন্য অবিসংবাদিত। উচ্চতার দিক দিয়েই নয় শুধু, গাম্ভীর্যে এবং মহিমায়ও এর সমগোত্র গিরিশৃঙ্গ খুব অল্পই আছে।

এছাড়া হরমুখ, মহাদেও এবং আফর-বতকেও ও-পথ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। নন্দা দেবী গুলমার্গ থেকে ৯৬ মাইল দূরে। কিন্তু সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উ'চু আফরবত উপত্যকাটির কোল ঘে'ষে দাঁড়িয়ে আছে যেন। যেন কয়েক পা এগোলেই তার তুষারধবল শৃঙ্গটিতে পৌঁছুন যাবে।

আশ্চর্য সুন্দর গুলমার্গের ওই চক্রাকার পথ। তার প্রতিটি বিন্দুতে বিচিত্রের সিংহদ্বার খোলা আছে যেন। যেখানে খুশি, যখন খুশি একটু দাঁড়িয়ে দেখে নিলেই হল। সে-পথে চলতে গিয়ে দাঁড়িয়েছি অনেকবার; দেখেছিও অনেক। বুঝেছি গুলমার্গ শুধু নিজে সুন্দর নয়, আরও অনেক কিছুকে সুন্দর করে দেখাবার এক অতি প্রাকৃতিক রঙ্গমঞ্চ।

এই রকম আর একটি মঞ্চ হল খিলানমার্গ। গুলমার্গ থেকে আরও প্রায় হাজার-দুয়েক ফুট উ'চুতে, মাইল-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওই উপত্যকা। বসন্তে ও গ্রীষ্মে লোক-সমাগম ওখানে লেগেই থাকে। গুলমার্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বিশেষ একটি সরু আঁকাবাঁকা পথ সকলেরই প্রিয় হয়ে ওঠে তখন; সবাই খিলানমার্গের দিকে এগোয়।

মনে পড়ে, আমরাও এগিয়েছি একদিন। বসন্তের এক মনোরম প্রভাতে সে পথ ধরে চলেছি। অপ্রশস্ত অমসৃণ পথ। বরফ জমে আছে তার আশেপাশে। পাইনের ছায়ায় ছায়ায় জমাট বরফের স্তূপ চোখে পড়ছে। ফুলের সমারোহ শুরু হয়েছে সে-পথে।
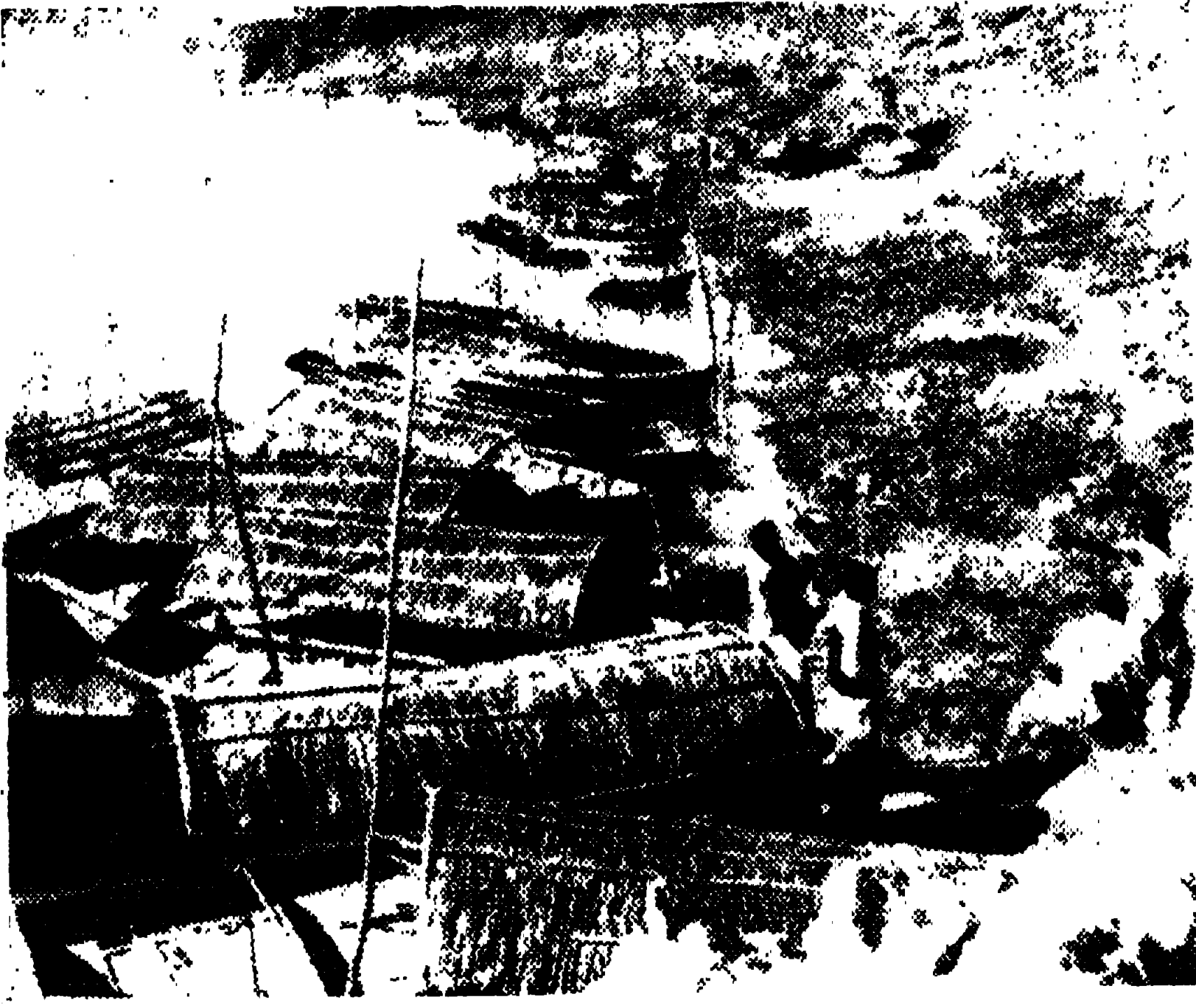
সাগর সঙ্গমে : এলাহাবাদ ফটো : এস. এম হায়দার

গুলমার্গের স্পর্শে খিলানমার্গের পথও শ্যামল হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে এগোচ্ছি আমরা। খুব সাবধানে চলছি। খাড়াই পথ। টানমার্গ-গুলমার্গ পথের তুলনায় এ-পথ অনেক দুর্গম। অনুমতি মিললে গুলমার্গের পথে জীপ চলতে পারে। কিন্তু এখানে সে-প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এমনকি ওস্তাদ ঘোড়াও এ-পথ ধরে পা টিপে টিপে এগোয়। আর আমাদের মতো অনভিজ্ঞরা নিজেদের পায়ের উপর বিশ্বাস রাখাই অধিকতর নিরাপদ মনে করে। লক্ষ্য করলাম, খিলান-মার্গ-যাত্রীদের অনেকেই পায়ে হেঁটে চলেছেন। হাঁটছি আমরাও। অপরিসীম ক্লান্তি এক এক সময় আমাদের ঘিরে ধরছে। এই দারুণ শীতেও ঘাম ঝরছে দেহ থেকে। পাদুটো অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু তবু হার মানছি না আমরা। কী এক অনাস্বাদিতপূর্ব নেশায় মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে চলেছি।

ঘন পাইন অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ। দেখতে দেখতে খাটো হয়ে এল। গাছের সংখ্যা কমে এল ক্রমশ। যত উপরে উঠলাম, ততই জমাট তুষারপুরীর নিঃস্তব্ধ আতিথেয়তা চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

খিলানমার্গ পেঁছে দেখি, সাদার রাজ্যে সবুজ অনধিকার প্রবেশ করেছে। ওখানকার মাঠে মাঠে অনেক ঘাস। মেষ চরে বেড়াচ্ছে সে-মাঠে। মনে হল, খিলানমার্গ নামটি সার্থক। শীতের শাসনের পর বসন্তের দাক্ষিণ্য খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসে ওখানে। জায়গাটি মেষ চরাবার উপযোগী বটে।

লক্ষ্য করলাম, ১০,৫০০ ফুট উঁচু ওই অপরূপ ময়দান চারিদিকে শীতের চিহ্নকে ধরে রেখে সৌন্দর্যের সাধনা করছে। জমাট তুষার-স্তূপে খিলানমার্গ পরিবেষ্টিত। ঘরবাড়ী নেই ওখানে। গুলমার্গের মতো পথ-ঘাট নেই। অনেক উঁচুতে আছে বলে স্থায়ীভাবে বসবাসের কোনো প্রশ্ন ওঠে না খিলানমার্গে। কখনো হয়তো ওখানে ট্যুরিস্টদের একটা-দুটো তাঁবু চোখে পড়ে। কিন্তু সে-তাঁবু অস্থায়ী। কোনোটিরই মেয়াদ দু'-চার দিনের বেশি নয়। সবুজের সন্ধানে মেষপালকেরাও এগিয়ে আসে এদিকে। বসন্তের শুরু থেকে শরতের শেষ অবধি এখানকার প্রান্তর ওদের আনাগোনায় মুখরিত হয়।

শরতে অন্য এক চেহারা খিলানমার্গের। ওখানকার তুষার-ভাণ্ডার তখন নিঃশেষিত হয়ে যায়। আশে পাশের পাহাড়গুলো ধূসর রঙ ধরে। লোকজনের আসা-যাওয়া কমে। আর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে থেকে জানিয়ে দেয়, শীত এলো বলে। মেষ-পালকেরা সময় থাকতেই সাবধান হয়। দল বেঁধে নীচে নেমে আসে। আর পরিত্যক্ত খিলানমার্গ অদ্ভুত এক শূন্যতা নিয়ে শীতের প্রতীক্ষা করে।

বসন্তে অন্য এক প্রতীক্ষা খিলান-মার্গের। ওখানকার প্রান্তর তখন রসের মহোৎসবে সকলকে আহ্বান জানায়। আনন্দিত অতিথি-সমাগমের প্রতীক্ষা করে।

খিলানমার্গের মার্গ বা ময়দানটি আয়তনে গুলমার্গের চেয়ে ছোট; কিন্তু আড়ম্বরে ও মহিমায় ছোট নয় মোটেই। ওখানে দাঁড়ালে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাটি নজরে পড়ে। মনে হয়, অপরূপ এক দেশের একটা পুরো ছবি যেন চোখের সামনে মেলে ধরল। কিন্তু মেলে-ধরা সেই সৌন্দর্যকে তারিয়ে ভোগ করার সময় ছিল না। খিলানমার্গে থাকবার প্রশ্নও ওঠেনি। তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে হল।

ফিরে এলাম আবার সেই গুলমার্গে। সন্ধ্যের আগেই ফিরলাম। ফিরে এসে পিছনের কথা মনে হল একবার। তাকালাম ফেলে-আসা পাহাড়পুরীর দিকে। দেখি, খিলানমার্গের পাহাড় রক্তিম রঙ ধরেছে। অস্তগামী সূর্যের বন্দনা গাইছে ওই রূপ-তীর্থ।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় গুলমার্গের আকাশে-বাতাসে এই একই বন্দনা-গান। রক্তিম রঙ-ধরা গুলমার্গ উপত্যকায়ও সূর্য-প্রণামের ঘনঘটা।

গুলমার্গে ছিলাম মাত্র তিনদিন। প্রতি-দিনই এই সূর্য-প্রণাম দেখেছি। দেখেছি, প্রসন্ন উপত্যকাটিতে কেমন করে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। কেমন করে ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে চারিদিক। অন্ধকারের মধ্যে গুলমার্গের সমস্ত অতীত ইতিহাস স্পন্দিত হতে থাকে। ইউসুফ শাহ, হব্বা খাতুন, জাহাঙ্গীর, নুরজাহান—সকলের স্মৃতি একসঙ্গে আবর্তিত হয়। মনে হয়, এখানকার ঝর্ণাধারায়, বনে, পাহাড়ে সর্বত্র খুঁজে পাবো ওঁদের। কত আশনাই, কত সোহাগ! কত পুলক, কত উল্লাস! ফুল-জান, বিবিজান, খোদাবন্দ, শাহেনশাহ—কত নামে কতদিন ডাকা! সব কি এত সহজেই হারিয়ে যায়?

গুলমার্গ থেকে ফিরে আসার সময়েও এ-কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল, সব কি এত সহজেই হারিয়ে যায়? এত আশনাই, এত সোহাগ, এত পুলক, এত উল্লাস,—সব?

জানি নে।

এইটুকু শুধু জানি, জাঁহাপনারা রসিক ছিলেন। অপরূপা বিবিজানকে যেমন খুব-সুরতী ফুলদানিচাটিকেও ঠিক তেমনি চিনেছিলেন ওরা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

		কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা	২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা	১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা	৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 30th December 1966. শুক্রবার, ১৪ই পৌষ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

সবিনয় নিবেদন,

অমৃতের 'প্রেক্ষাগৃহে' স্তম্ভে চলচ্চিত্র-জগৎ সম্বন্ধে 'আজকের কথা' নিয়মিতই প্রচারিত হয় এবং তা প্রকৃতই সাময়িক। কিন্তু সুদূর অতীত আর বর্তমান ছাড়াও যে-কোন জিনিসেরই একটা ভবিষ্যৎ আছে। আজকের বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-জগতের সেই ভবিষ্যৎটাকেও আলোচনা করার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে প্রথমেই বলতে হবে, আজকের চলচ্চিত্র নিতান্ত একটা চোখের নেশা ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত অনেকে বলবেন, চলচ্চিত্র-মাত্রেই চোখের নেশা। এটা ঠিক কথাই। কিন্তু তাই বলে কি চলচ্চিত্রের মধ্যে আর কিছুই নেই? মানুষের জীবনের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রুচি, প্রাত্যহিক আর সাংসারিক জীবনের একটা ধারাবাহিকতা, হৃদয়ের গভীরতা, মানবতা আর যোগাযোগ—এটাই যেখানে রইল না, সেখানে চলচ্চিত্রের সার্থকতা কোথায় বুঝতে পারি না। সব-কিছুকে বাদ দিয়ে যদি অন্তত একটা বাস্তবতাও থাকত, তাহলেও না হয় চলচ্চিত্রের মধুভাণ্ড থেকে কিছু সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকের চলচ্চিত্র-জগৎ একান্তই নীরস। কর্ণের মতই আপন কবচকুণ্ডল হারিয়ে বাংলার এই বর্তমান চলচ্চিত্র মৃত্যুপথগামী।

প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও পত্রিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, নদীর স্রোতের মতই ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে একের পর এক দেশী-বিদেশী চিত্র এগিয়ে আসছে। এমন একটা সপ্তাহ খুব কমই দেখা যায়, যে-সপ্তাহে একটিও ছবি মুক্তি পায় না। এবং আরও দেখা যায় যে, এই সমস্ত চিত্রের অধিকাংশই অতি অল্পকাল চিত্রগৃহে স্থায়ী হয়। এত ছবি, অথচ আধুনিক বাংলার চলচ্চিত্র-জগৎ সেই একই অন্ধকারে নিমজ্জমান। বাংলা চলচ্চিত্রের যে ঐতিহ্য, তা ক্রমশই ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে।

চলচ্চিত্র-জগতের এই অভাবনীয় অবনতির জন্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশী দায়ী, তাঁরা হলেন নির্মিত ছবির পৃষ্ঠপোষক। আজকের চলচ্চিত্র-জগতকে উচ্চাসনে স্থান দিতে হলে প্রথমেই সচেষ্ট হতে হবে পরিচালককে। যে-কোন ছবির ভাল-মন্দ দুই-দিকই নির্ভর করে তাঁরই হাতে। পরিচালকের মনোভাব যদি পবিত্র না হয়, তবে নির্মীয়মান ছবিও হয়ে উঠবে কদাকার ও আদর্শভ্রষ্ট। নিতান্ত মামুলি আর কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে পর্দার বুকে ঝাঁপাঝাঁপি না করে যদি তাঁরা আজকের চলচ্চিত্রকে সুষ্ঠৃ ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলার ব্রত নেন, তবেই আজকের চলচ্চিত্র-জগৎ তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

অপরিমেয় অর্থব্যয় করে এবং সহজ ও সরলতার মাঝে চোখ ঝলসানো জটিলতা এনে ছবির জন্ম দিলেই সে-ছবি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না। জনপ্রিয় করে ছায়াছবি গড়তে হলে যে-কোন ছবিরই প্রথম উপাদান হওয়া চাই সরলতা—যাতে বাংলার অসংখ্য নিরক্ষর মানুষেরও তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। বিদেশে দেখা যায়, ছায়াছবিকে তাঁরা শিক্ষা-দানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। আর আমাদের দেশে 'ছায়াছবি' জিনিসটা আনন্দ-বিনোদনের একটা সুন্দর উপাদান—আর কিছুই নয়। ছায়াছবির অন্তর্গত শিক্ষা আর আদর্শকে আজকের বাঙালী আর গ্রহণ করতে পারে না। এর পেছনে প্রধান কারণ, বাঙালী-হৃদয়ের যে-নমনীয়তা আর সৌকুমার্যবৃত্তি, তা জটিলতা আর কদর্যতার চাপে পড়ে নীরস হয়ে উঠেছে। বাঙালীর যে গ্রহণশক্তি, তা নিস্তেজ হয়ে গেছে। এর জন্যে দায়ী কে, তা বোধহয় আর না বললেও চলবে।

রাজ্যের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীবিজয়-সিং নাহার একবার জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি চিত্রগৃহে বছরের কয়েকটা দিন বাংলা ছবির প্রদর্শনী বাধ্যতা-মূলক করা হবে। এ-উদ্দেশ্য সৎ। আজকের চিত্র-প্রদর্শনীতে জাতির ক্ষতি বই লাভ কিছুই হবে না। তাই সরকারকে আহ্বান জানাব—তিনি যেন প্রথমেই ছায়াছবির চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তারপর যেন প্রদর্শনীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ঘটে। নচেৎ আজকের চলচ্চিত্র-জগতের যে দুর্দশা, সে-দুর্দশা চিরন্তন হয়ে উঠবে।

বিনীত
বিদ্যুৎ মল্লিক
নিউ আলিপুর

(২)

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা ছায়াছবির বিভিন্ন সমস্যার কথা অমৃতে যেভাবে সমালোচনা করা হয় তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ৩০শে অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বিদেশীর চোখে হিন্দী সিনেমা' খুবই ভালো লেগেছে।

তবে একটা কথা। তিনি যে লিখেছেন হিন্দী সিনেমাতে দৈহিক প্রেমটাই বিশেষ দ্রষ্টব্য, কথাটা খুবই সত্যি। আর বড় সাংঘাতিকভাবে। নৈতিক দিক দিয়ে আলো-চনা করতে গেলে ঐগুলির মান খুবই নীচু, তবে ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক দিয়ে মান খুবই উঁচু।

সিনেমার ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে যে এর মূল্য দিন দিন কতো বাড়ছে। মনো-রঞ্জনের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। বিদ্যার্জন, খেলাধুলা ইত্যাদিতে সিনেমার স্থান আজ সবার উপরে। আর সেইজন্যই ছবি যে তৈরী হয় তার লক্ষ্যও থাকে বিভিন্ন দিকে। সাধারণ যে কাহিনী নিয়ে 'ফিচার' ছবিগুলি তৈরী হয়, তার লক্ষ্য থাকে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত যেভাবে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড্' হয়েছে বা হচ্ছে, সেই অনুসারে ওয়ার্কিং ক্লাস-এর সংখ্যাও বেড়েছে। কলকারখানা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকদেরও সংখ্যা বেড়েছে। তাই তারা যে ছবি দেখতে চায় তার মধ্যে মনোরঞ্জক কিছু থাকা দরকার নিশ্চয়ই। হোতে পারে নাচগান খুবই শস্তা ধরনের মনোরঞ্জন কিন্তু আমাদের দেশে 'বিদ্বানদের' সংখ্যা নিতান্ত কম বলেই সেই নাচগানই অতি উপাদেয়। আর সেইদিক দিয়ে বিচার কোরতে গেলে হিন্দী ছবি অবশ্যই দ্রষ্টব্য। আজ নিশ্চয়ই কোন শ্রমিকের কাছ থেকে আশা করা যবে না যে সে সারাদিন খেটে পর্দার উপর চলচ্চিত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার কোরতে যাবে। অর ঠিক বাংলা সিনেমার প্রযোজকরা বা পরি-চালকেরা তাই করেন, পর্দার উপর নিজের বিদ্যা জাহির করেন আর বই না চললে পর দর্শকদের দোষ দেন, যে তাদের কোন টেস্ট নেই স্টাণ্ডার্ড নেই। তবে আমি বোলতে চাইছি না যে, প্রত্যেক বইই নাচগানে ভর্তি হোক, কিন্তু প্রযোজকদের দৃষ্টি রাখতে হবে 'মনোরঞ্জনের' দিকে। দর্শক রুপোলী পর্দার উপর কিছুটা আনন্যাচারাল খোঁজে, সময় কাটাতে চায়। নিজের সমাজের দীনতা, ক্লিষ্টতা এসবের প্রতিফলন দেখতে চায় না। আর ঠিক এইজন্যই সারা পৃথিবীতে আজ স্টান্ট ফিল্ম, অ্যাকশন ফিল্ম এগুলি ক্রমেই জনপ্রিয় হতে চলেছে। খরচ হয়তো বেশী পড়বে, কিন্তু আজকের দর্শকের মন বিচার কোরলে জনপ্রিয় অবশ্যই হবে।

বিনীত
স্বপনকুমার মৈত্র
পাটনা—১

'অতল জলের আহ্বান'

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩২শ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অতল জলের আহ্বান' প্রবন্ধটির জন্য লেখক শ্রীনির্মলাশিস সেন অজস্র ধন্যবাদের পাত্র। তিনি যেমনভাবে রত্নাকরের বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যই অভিনব। আমরা ছুটে চলেছি অন্তরীক্ষের দিকে কিন্তু গ্রহপৃষ্ঠের চার-ভাগের তিনভাগ জলতলের প্রতি কিঞ্চিৎ উদাসীন। সাগরতলের রহস্য আরও গভীর-ভাবে জানার সময় এসেছে। বিজ্ঞান সক্রিয়-ভাবে চেষ্টা করছে তা উন্মোচন করার।

লেখক যেসব তথ্য বর্ণনা করেছেন তা ভাষা ও অন্যান্যদিক দিয়ে হৃদয়গ্রাহী। 'মানুষের প্রয়োজনে সমুদ্র-সম্পদ' এই আলো-চনাটি যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হয়েছে। পৃথিবীতে খাদ্যাভাব দূর করতে সমুদ্র আমাদের সহায়ক।

বিনীত
প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
পাটনা—১

অমৃত
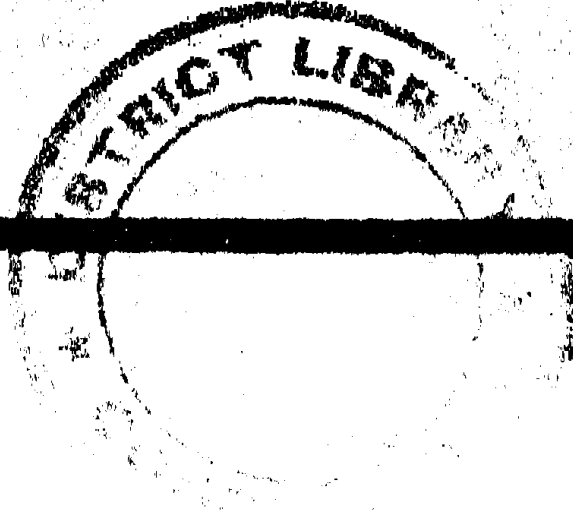
সম্পাদকীয়

খেলা শুধু খেলা নয়

খেলা যদি শুধু খেলাই হত তাহলে এর আকর্ষণ খেলার মাঠ ছাড়িয়ে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ত না। এর আগ্রহ শুধু খেলোয়াড়কেই টানে না, যাঁরা খেলা দেখেন এবং যাঁদের খেলা দেখার সুযোগ হয় না তাঁরাও এর প্রতি সমান আগ্রহ অনুভব করেন। স্পোর্ট সভ্যতার একটি মাপকাঠি। খেলোয়াড়ী মনোভাব যে-জাতের নেই, সভ্য জগতে সে ব্রাত্য। এই মনোভাব খেলার মাঠে জন্ম নেয়, পরে তা সমাজের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। খেলায় জয়পরাজয় বড় কথা নয়, বড় কথা হল খেলায় যোগ দেওয়া। হার-জিৎ তো আছেই, কিন্তু তাকে প্রকৃত খেলোয়াড়ী মন নিয়ে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন, আসল জিৎ তাঁদেরই। এই কারণেই, খেলার জগতে কোনো অন্যায় বা অসংগতি দেখলে আমরা দুঃখিত হই। বলি, এটা ঠিক খেলা হল না।

ভারতবর্ষে আমাদের বাংলাদেশে খেলার প্রতি অনুরাগ বেশি। আমরা যেমন কবিতা ভালবাসি, গান ভালবাসি তেমনি খেলাও ভালবাসি। এদেশের যুবকরা কবিতা লেখেন, উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে সারারাত জেগে গান শোনেন এবং হিম মাথায় করে দাঁড়িয়ে থেকে ক্রিকেট খেলার টিকিট কেনেন। আমাদের ক্রীড়ানুরাগীরা বিস্মৃতিপ্রবণ নন। তাঁরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছেন মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়, ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্বপূর্ণ রেকর্ড, মহামেডান স্পোর্টিং-এর চৌখস খেলা। তাঁদের মুখে মুখে ফেরে রণজির নাম; মুস্তাক আলী, বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারের খেলার কথা তাঁরা ভোলেন নি। গোষ্ঠ পাল, সামাদ, ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং-এর নাম আজও স্মরণীয়। এঁরা এবং এঁদের সহযাত্রী আরও বহু কৃতী খেলোয়াড় তৈরী করেছেন আমাদের দেশের ক্রীড়ানুরাগের ট্রাডিশন। তারুণ্যের দীপ্তিতে এই স্মৃতি উজ্জ্বল।

কলকাতার ময়দান, তার ইডেন উদ্যান, তার সাউথ ক্লাব ভারতের খেলার জগতে তীর্থভূমির মতো। কলকাতা ও বাংলাদেশের মানুষ খেলার কদর জানে, খেলোয়াড়দের আদর করতে জানে, খেলার জন্য দাম দিতেও জানে। এই তারুণ্য ও প্রাণপ্রাচুর্য আমাদের আশার কথা। চারদিকে যখন নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনায়মান তখন খেলার মাঠের কর্মচাঞ্চল্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে এ আশা করা যায় যে, আমাদের যৌবন নিঃশেষিত হয়নি, তার কাছ থেকে অনেক কিছুই প্রত্যাশিত আছে।

এ বৎসর খেলার জগতে ভারতের সুনাম বেড়েছে। এই কলকাতাতেই ভারতীয় টেনিস দল ব্রেজিলের চৌখস খেলোয়াড়দের পরাজিত করে ডেভিস কাপের ফাইন্যালে খেলার গৌরব অর্জন করেছে। টেনিসে ভারতের এটি বিশেষ সম্মান। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। এদিকে এশীয় গেমসেও ভারতীয় দল হকিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বীর গৌরব অর্জন করে ফিরে এসেছে প্যাকিস্থানকে হারিয়ে। ১৯৬৪ সালে টোকিও ওলিম্পিকে ভারত বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে বিশ্বজিৎ হয়। এশীয় গেমসে তারই পুনরাবৃত্তি করে হকির গৌরব শিখরে দেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। দুঃখের বিষয়, ফুটবলে ভারতের স্থান এখনো নিচে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই খেলাতেও ভারতকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। কারণ, ভারতে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। কলকাতার দর্শক তো ফুটবল পাগল। অথচ আন্তর্জাতিক মানে এখনো আমাদের খেলোয়াড়রা পৌঁছুতে পারেন নি। এর জন্য প্রয়োজন অনুশীলন এবং খেলার উৎকর্ষ বৃদ্ধি। আগামী ওলিম্পিকের জন্য এখন থেকেই আমাদের খেলোয়াড়দের তৈরী হওয়া দরকার।

কলকাতায় এ সপ্তাহে আকর্ষণীয় খেলা অনুষ্ঠিত হবে ইডেন উদ্যানে বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ। প্রথম টেস্টে ভারত পরাজিত হয়েছে বোম্বাইয়ে। কিন্তু খেলার ইতিহাসে দেখা গেছে ইডেনের খেলাই আসল খেলা। জগতের অন্যতম সেরা ক্রিকেট মাঠ হল ইডেন। এখানে অনেক বিজয়ীর গৌরবের পুনর্বিচার হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী ক্রিকেট দল। ইডেনে এঁরা নবাগত নন। এঁদের স্বাগত জানাবে কলকাতার অগণিত ক্রিকেট অনুরাগী দর্শক। ভারতীয় দলের তরুণরাও উৎসাহভরে খেলতে পারবেন তাঁদের চেনা মাঠে এবং দরদী দর্শকদের সামনে। দ্বিতীয় টেস্টের ফলাফলে এই সিরিজের খেলার মোড় ফিরবে। কলকাতা তার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

খেলার মাঠে একটি জাতির তারুণ্য, তার শৃঙ্খলাবোধ, সাহস এবং কৌশল বোঝা যায়। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ক্রীড়ানুরাগীরা নিশ্চয়ই তা প্রত্যাশা করবেন। তার চেয়েও বেশি প্রত্যাশা করবেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দর্শনীয় ক্রীড়াকুশলতা। খেলার ফলাফল যাই হোক না কেন, খেলার মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌভ্রাত্র গড়ে উঠবে তাকে আমরা বরণীয় সম্পদ বলে মানি। কারণ, খেলা শুধু খেলা নয়। এর দ্বারা চিত্তবিনোদন যেমন হয় তেমনি হয় চিত্তের প্রসার। আজকের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুনিয়ায় এই হৃদয়-প্রসারতার মূল্য কে অস্বীকার করবে?

ক্রিকেটের কবিতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সুবোধিনী না মেলে, সুহাসিনীই ভালো। ক্রিকেটের সমস্ত আনাচ-কানাচ আঁদাড়-পাঁদাড় কার নখদর্পণে? কে জানতে এসেছে কোন বলটা ইনসুইং, কোনটা আউটসুইং, কাকে বলে গুগলি কাকে বা ইয়র্কার? মাঠের কোন জায়গাটা ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, কোনটা বা মিড-উইকেট, ক'জনের স্পষ্ট ধারণা আছে? এক ভদ্রমহিলা তো সিলি মিড অফকে মূর্খ ধাত্রী বা সিলি মিডওয়াইফ ভেবেছিল। বলেছিল ধাই বোকা হলেই তাকে মাঠের মধ্যে মারতে হবে নাকি? সেই ইংরেজ মহিলার বিখ্যাত বিলাপ মনে করো। হায় এরা কী করে খেলবে? এদের একজন লং লেগ, একজন শর্ট লেগ, একজন লং লেগ, আরেকজন একেবারে স্কোয়ার লেগ! মাঠে গেলে এমনি কত সাহিত্য শুনতে পাবে। বোলার পায়ের ঘষায় ক্রিজ নষ্ট করে দিচ্ছে এই অভিযোগ উঠলে একজন বলেছিল, বোলার যদি তার নিজের ট্রাউজার্সের ক্রিজ নষ্ট করে তা হলে আম্পায়ারের কী বলবার আছে?

কিন্তু আউট হয়ে যাওয়াটা কে না বোঝে! কে না বোঝে বাউন্ডারির মার! কে না বাম্পার-বাউন্সার দেখে শিউরে ওঠে আপনা থেকেই।

মেয়েটি সারাক্ষণই হাসি ঝরাচ্ছিল আর হাততালি দিচ্ছিল। কেন যে হাততালি দিচ্ছিল, মারের জন্যে না রান সেভ করার জন্যে, ওভার মেডেন গেল বলে, না, এটা ব্যারাকিংএর হাততালি, কোনো খোঁজখবরের তার দরকার নেই। সে যে হাততালি দিতে পারছে এতেই সে ভরপুর।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু শাসন বা সমালোচনার সুরে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

হঠাৎ ব্যাটসম্যান বোল্ড আউট হয়ে গেল।

চকিতে মেয়েটির মুখ শোকে ঝুলে পড়ল, কালো হয়ে গেল। চোখ উঠল কান্নায় ছলছল করে।

তারপর নতুন ব্যাটসম্যান যখন নামছে তখন আবার তার সাহ্লাদ হাততালি। সঙ্গের ভদ্রলোক বললে, খুশির ঢেউ তুলে কাজ নেই, বিমর্ষ হয়ে বসে থাকো। কেন? বলতে-বলতেই মেয়েটি বিমর্ষ হয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললে, 'তুমি বিমর্ষ হলেই তোমার দু গালে সুন্দর দুটি টোল পড়ে।'

নর্ম্যান গেল-এর কবিতার নাম 'ক্রিকেট অ্যান্ড কিউপিড'। তার ভাবানুসরণ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

এ-বি-সি খেলার বোঝেনা কিছুই,
সব তার আন্দাজ
কিছু বললেই প্রতিবাদে দিশেহারা,
তার কাছে ওই বোলার ডাকাত
দৈত্য গোলন্দাজ
কাজ শুধু তার মাথা তাক করে
ছুঁড়ে-ছুঁড়ে বল মারা।
পুলিশ লাগিয়ে কমানো যায়না বেগ?
স্লিপ তো দাঁড়ায় যেখানে স্কোয়ার লেগ।
কিন্তু যখন স্টাম্প যায় ছিটকিয়ে
নিমেষেই বোঝে একজন হল বলি
তখন কী সোনা দেখায় তোমায় প্রিয়ে,
রাগে রাঙা গাল, গলা ভার-ভার
চোখ দুটি ছলছলি।
ফিরতি ওভারে দূরে সরে গেল
কেন যে আম্পায়ার
শুধায় সে মেয়ে উদ্বেগে উন্মনা,
কারু সাথে তার ঝগড়া হলকি,
একি বলো ব্যবহার,
নাকি গেল সরে করতে নীরবে
নির্জন প্রার্থনা।
নির্লেপ মুখ, সনাতন সোনা খাঁটি
প্রাণ উসখুস বুক শুধু ধুকপুক
কী হবে সূক্ষ্ম জেনে সব খুঁটিনাটি
না-জানায় আছে অন্তবিহীন সুখ।।

যারা রান করার ঝুঁকি নেয় না শুধু টিঁকে থাকে তাদেরকে 'স্টেয়ার' বলে। 'স্টেয়ার'রা ক্রিকেটের ঔজ্জ্বল্য হরণ করে নিচ্ছে, ক্রিকেটকে নিষ্প্রাণ করে দিচ্ছে, এমনি

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় ধারাবাহিক রচনা এবং কয়েকটি বিভাগীয় রচনা প্রকাশিত হোল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে।

নালিশ অনবরত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বিশেষ খেলার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু টিঁকে থাকাটাই কখনো-কখনো জিতে যাওয়া। তা-ছাড়া বিপক্ষের ক্যাপটেন যদি শুধু 'নেগেটিভ' বোলিংএ জোর দেয় তাহলে এ পক্ষের ব্যাটসম্যান রান তোলে কী করে? অত শত শাস্ত্রকথা বুঝতে চায় না জনতা। তারা শুধু মার চায়, রান চায়, চায় ব্যাটের ঝলস দেখতে। তাদের বুলি হচ্ছে পেটো নয় হটো। হিট আউট আর গেট আউট। ব্যাটসম্যান নিরুপায় হয়েই ব্লক করছে কিনা কিংবা দলের স্বার্থেই তাকে খেলা হচ্ছে হচ্ছে অত বোঝবার মত ধৈর্য নেই জনতার। তারা পয়সার বদলে শিহরন চায়। ব্লকে শিহরন নেই, বরং ব্যারাকিংএ শিহরন আছে। ব্লকিং-এর প্রত্যুত্তরই ব্যারাকিং।

এরিক পার্কার আরেক ইংরেজ কবি। তাঁর কবিতা 'ব্লক, ব্লক, ব্লক'-এর ভাবানুবাদ দিচ্ছি :

আম্পায়ারের সাধ্য কী তোলে উদ্ধত তর্জনী
ব্লক করে যাও, ব্লক করে যাও,
শুধুই নিরেট ব্লক,
জনতার বুকে কঠিন শব্দে জাগছে প্রতিধ্বনি
ঠক তুমি ঠক, ঘোরতর ঠক, ব্যাটেও কেবল ঠক।
খোলে না দরজা, ভাঙে না দরজা
দুর্গ কী ভয়াবহ
জানলাও দেখি হয়না একটু ফাঁক
ভান্ডারে তাই ফুটো পয়সাও হয় না তো সংগ্রহ
শুধু টিঁকে থাকা ঠুকে থাকা ঠিকঠাক।
আশা করে আছি হয়তো এখনি
আলো হবে সংসার
অরুণ ভাগ্যোদয়
পুলে-হুকে কাটে ড্রাইভে-সুইপে
চারে চারে সোচ্চার
সাতরঙ রামধনুকের মত উঠবে বিপুল ছয়।
তা না হয়ে শুধু নাটক নিরর্থক
ঠক শুধু ঠক শুধুই ঠুকুস ঠক।
এই বা কী কম ক্রিজে বসে থেকে
দিন করা অবসান—
মানি না কিছুই চেঁচাই সরবে
না রেখে লজ্জালেশ।

'তোমার একটি হপ্তার চেয়ে অনেক মূল্যবান
এক ঘণ্টার গ্রেস।।' (Grace)

তারপর অঘটনের রাজা ক্রিকেট কত আশাভঙ্গ ঘটিয়ে দেয়। কত তোড়জোড় কত তুকতাক কত আটসাট—তবু দুই হাতে দুর্ধর্ষ ব্যাট নিয়েও এক বলেই আউট। সর্বাঙ্গে তাগা বাঁধা, কিন্তু একেবারে শিরে সর্পাঘাত। বলটা যে কী কারচুপি করে স্ট্যাম্পে এসে লাগল বোঝাই গেল না। ব্যাকরণে-প্রকরণে কিছু ভুল ছিল না, শর্ট পিচে নরম দুর্বল বল, তার মনে কিনা এত কু! নইলে মনে করো শেষ টেস্টে ব্র্যাডম্যানের শূন্য করা! সেই টেস্টে মাত্র চার করলেই ব্র্যাডম্যানের টেস্ট এভারেজ একশো হয়ে যায়। কিন্তু হোলিস-এর দ্বিতীয় বলেই ব্র্যাডম্যান ব্যাড-ম্যান—তার উইকেট ছত্রখান। হোলিস-এর এমন কী বল যা ব্র্যাডম্যানকে ঘায়েল করতে পারে, যার চার রান শুধু একটা নিশ্বাসের ওয়াস্তা। কিন্তু হোলিস-এর সাদামাটা বলও দুর্গম দুর্গ ভেদ করে। যতই যেতে নাহি দিব' বল না কেন, 'তবু যেতে দিতে হয়।'

ক্রিকেটে কে না শুন্যদৃষ্টিতে চেয়েছে? কে না দৌড়েছে শূন্যমার্গে? আর বাস্তব শূন্যবাদ তো এই ক্রিকেটেই।

এই নিয়েই কারডিউ রবিনসনের কবিতা, 'দি অনেস্ট ব্যাটসম্যান।' তার ভাবানুবাদ এই প্রকার :

এক ইঞ্চিও তুলিনি তো মাথা,
যা কিনা খেলার প্রথা—
বাঁ কনুই ছিল কোণাচে বাঁকানো ঠিক
সিধে লাইনেই খেলেছি, সত্য কথা,
বলেও ছিলনা প্রথম দিকের পালিশের ঝিকমিক,
বিশেষ কোনো সে দেখায়নি কুটিলতা।।

ঘনমন্থর তেমন সবুজ ছিলনা মাঠের ঘাস,
ছিলনা আঁটালো, হাওয়া ছিল ঝিরিঝিরি
সব দিক থেকে যাকে বলে
ব্যাটসম্যানের স্বর্গবাস
কিন্তু হায় সে স্বর্গে ছিলনা সিঁড়ি।
প্রথম শ্বাসেই পড়ল দীর্ঘশ্বাস।।

বল বাম্পার নয় বা বাউন্সার
অফ-লেগে কোনো খায়নি জটিল ব্রেক
না লেগকাটার নয় তো ইয়র্কার
পলক ফেলতে দেয়নি মুহূর্তেক,
সম-ব্যবসায় ব্যাট-বলে তবু
হল না অংশীদার।।
ভাগ্য মানিনা, বলব না ব্যাড লাক,
তবুও আমার পকেটে জুটল
একটি নিটোল ডাক।
চুপি চুপি বল বললো আমাকে,
হে বীর, প্রবল মারো,
আর আমি তাই মারলাম তারে,
ভাবলাম পোয়া বারো।
লাল সে মাকাল এড়িয়ে নাগাল
ভেঙে দিল তিন-কাঠি
পত্রপাঠেই চললাম নিজ বাটি।।

'ক্যাচেস উইন ম্যাচেস'। আর ক্যাচ ফেলে দেওয়া মানেই নিজের হৃৎপিণ্ড ফেলে দেওয়া। তবু ক্ষুরধার সতর্কতা সত্ত্বেও দুহাতের মধ্যে সুগোল হয়ে পড়েও ক্যাচ মাটিতে পড়ে যায়। কখনো বা ছুঁয়ে যায় আঙুলের ডগা। যেন জয়লক্ষ্মীই ছুটে পালাল। আর একটু হাত বাড়াতে পারলেই তাকে আটকানো যেত, তখন করতলে তো বল নয়, করতলে আমলকী!

তবু কখনো-কখনো অভাবনীয়কে বুকে পাবার মত একেকটা ক্যাচ স্বপ্ন হয়েই ধরা পড়ে। যেমন ধরো গত বম্বে টেস্টে ওয়াদেকারের আকাশছোঁয়া ক্যাচটা গিবস কেমন পিছনে তাড়া দিয়ে ছুটতে ছুটতে এক হাতে লুফে নিলে। আর হলকোম্বের দুহাতের মধ্যে দুরানির মসৃণ ক্যাচটা বাসা নিয়েও কেমন খসে পড়ল মাটিতে।

কখনো দিন বড়, কখনো রাত বড়। কখনো আদরমণি হয়ে আপনা থেকেই ধরা দেয়, কখনো মুখ থুবড়ে হাতে-পায়ে পড়ে ধরতে চাইলেও ধরা যায় না।

এবার হার্ভের কবিতা 'দি ক্যাচ' নেওয়া যাক। তার ভাবানুসরণ করে বলা যায় :

আগুনের শিখা খোলা আঙুলের মুখে
করে গেল চুম্বন,
বুলেটের মত এসেছিল দ্রুত ছুটে
চারদিকে তুলে হর্ষের কম্পন।
সহসা জাগালো অতীত দিনের ক্ষত
ছুঁয়ে চলে যাওয়া প্রথমা প্রিয়ার মত।।

কোথা চলে গেল সেই নীল পাখি
অধরা বিহঙ্গমা
সুগোল সুগোল হাতে এসে দেয় ফাঁকি,
নিঃস্বের ঘরে ক্ষমাও করে না জমা।
চপলা তরলা নারী
ধরা দিতে এসে ছুঁয়ে চলে গেল
পেরিয়ে বাউন্ডারি।।

ক্যারিবিয়ান ট্রেডিশন

প্রবীর সেন

দু দলে ক্রিকেট খেলা চলছে। একটি ছেলেকে কিছুতেই প্রতিপক্ষ দল আউট করতে পারছে না। একে একে দলের সবকটি উইকেটের পতন হয়ে গেলেও সে শেষ পর্যন্ত টিকে রইল। দলের রাণসংখ্যা মোট ৬৮ এবং তার ভেতর ছেলেটির নিজস্ব রাণসংখ্যা নট-আউট ১৯। বন্ধু-বান্ধবরা সবাই তাকে নিয়ে মাতামাতি করল—বাহবা দিল। আনন্দে-খুসীতে একরকম নাচতে নাচতেই বাড়ী এলো তার ক্রিকেট-প্রেমিক বাবাকে এই সাফল্যের খবর দিতে। খুব আশা করেছিল তার এই সাফল্যের জন্যে বাবার কাছে অনেক বাহাবা পাবে। সব কিছু বলা হয়ে গেলেও যখন বাবার কাছ থেকে কোন রকম মন্তব্য শোনা গেল না, তখন সেটা তার কাছে বেশ একটু অস্বাভাবিকই মনে হল। উৎসাহের প্রাবল্যে প্রথমটায় বাবার মুখের দিকে ভালো করে তাকাবার সুযোগ ঘটেনি, এবারে দেখলো। আষাঢ় মাসের মেঘের মত গুরু-গম্ভীর থমথমে।

একটু অবাক হয়েই ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল—'বাবা! তুমি কি খুসী হওনি?'

'না! খুসী হওয়া দূরে থাক্ বরঞ্চ তোমার সম্বন্ধে আমি রীতিমত নিরাশ হয়েছি।'

কিছু বুঝতে না পেরে বোকার মত বাবার মুখের দিকে বিনাবাক্যব্যয়ে তাকিয়ে রইলো ছেলেটি।

একটু পরে বাবা বললেন—

'দুঘন্টা ধরে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার খেলা দেখেছি। দেখেছি কেমন করে তুমি তোমার সময় নষ্ট করেছ। দলের রাণসংখ্যা বাড়াবার জন্যে তোমার হাতে যে ব্যাট্ দেওয়া হয়েছিল, তুমি সেটিকে সে উদ্দেশ্যে না লাগিয়ে—লাগিয়েছ নিজে তুমি কেমন করে নট-আউট্ থাকবে সেই চেষ্টায়। একে তুমি ক্রিকেট বলতে পার—কিন্তু আমি বলি না।'

সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পৃথিবীর ক্রিকেট জগতে এক নূতন মহান দিক্‌পালের জন্মের সূচনা হ'ল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো ক্রিকেট খেলোয়াড় লিয়ারী কন্‌স্টেন্‌টাইন তার নাম।

বাবার সেদিনকার চাপা তিরস্কারের কথা মনে রেখে অসাধারণ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন লিয়ারী। শুধু ব্যাটিং নয়, ফিল্ডিং এবং বোলিংয়েও নিজকে করে তুললেন বিশেষ পারদর্শী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট তখন শুধু শ্বেতাঙ্গ-প্রধানই নয় শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিতও বটে।

তখন বর্ণবৈষম্যের যুগ। অশ্বেতকায় কেউ ভাল ক্রিকেট খেলতে পারে এটা যদিওবা সহ্য করা যায়—নিগ্রো কেউ পারবে—এটা অসহ্য। তাই লিয়ারীর আবির্ভাব অনেক মনোবেদনার কারণ হলেও শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট এসোসিয়েশন ইংলন্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের দলের মান-সম্মান রক্ষার প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে দলভুক্ত করতে বাধ্য হলেন।

পৃথিবীর ক্রিকেট-জগতে তখন দুজন ক্রিকেট-সম্রাটের একচ্ছত্র আধিপত্য—একজন ডন ব্রাড্‌ম্যান অপরজন ওয়ালি হ্যামন্ড।

ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম পা দিয়েই যখন লিয়ারী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"আমি আসলাম—আমি দেখলাম—আমি জয় করলাম"—তখন প্রথমটায় একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেও তাদের মোহভঙ্গ হতে বেশী দেরী হলো না।

পরিসংখ্যান দিতে গেলে রীতিমত একটা বই হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া পরিসংখ্যান দেওয়াটাও আমার উদ্দেশ্য নয়। লিয়ারীর আবির্ভাবে ক্রিকেট-জগতে সেদিন যে বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার খানিকটা আভাস দেওয়াটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিখ্যাত ক্রিকেট-সমালোচক এবং পরিসংখ্যক ওয়াইজডেন লিখেছেন—"চিরাচরিত রীতিনীতি সমূলে ধ্বংস করে টেস্ট্-ক্রিকেটে এক অভূতপূর্ব আনন্দময় আবহাওয়া সৃষ্টির অগ্রদূত এই কন্‌স্টেন্‌টাইন! নতুন ধরণের আক্রমণাত্মক জোরদার মারের কায়দায় তিনি ব্রাডম্যানকে পর্যন্ত অনেক, অনেক ছাড়িয়ে গেছেন।"

আরো অনেক উচ্ছ্বসিত প্রসংশার ভেতর এটুকু উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

লিয়ারী কন্‌স্টেন্‌টাইন
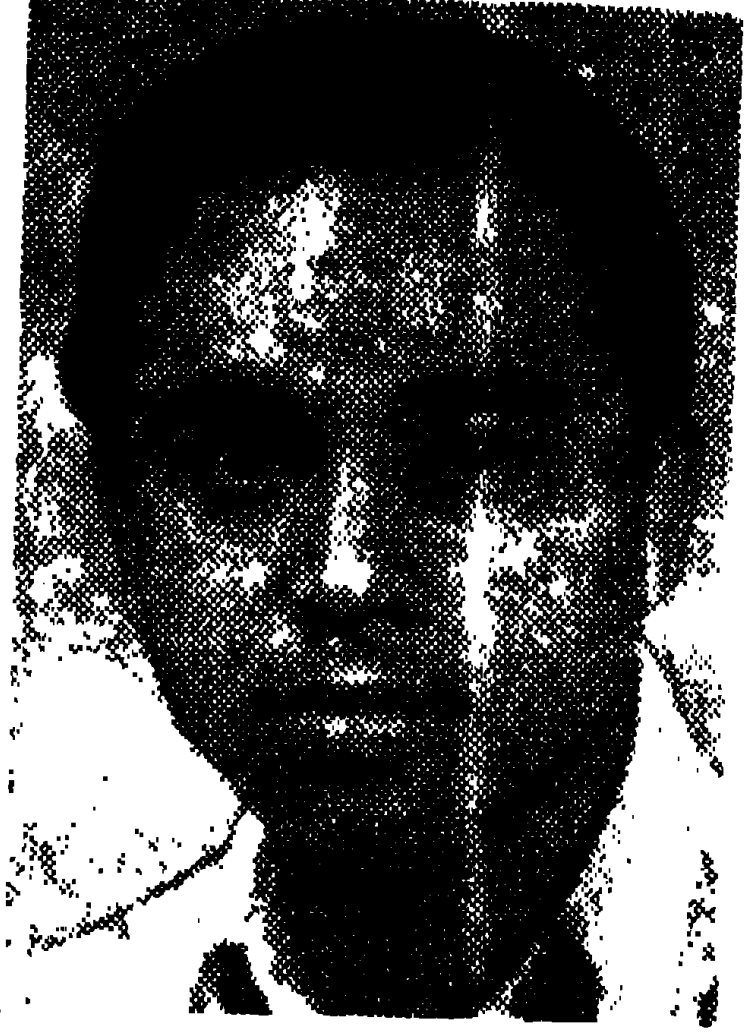
লেখক

"ব্যাটিংয়ে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির প্রবলতা, ফিল্ডিংয়ে নিপুণ-শিল্পীর অপূর্ব শৈলী এবং বোলিংয়ে যাদুকরের কারিগরী—এই নিয়েই লিয়ারী। খেলার সুরুতে ফাস্ট বোলিং এবং পরে প্রয়োজনমত স্লো বোলিংয়ের অত্যাশ্চর্য সংমিশ্রণের বাহাদুরীতে, একটা হাত আর একটা বল যে কি যাদুর সৃষ্টি করতে পারে তা লিয়ারীকে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।"

লিয়ারীর অতুলনীয় কৃতিত্বকে আরো বেশী মহান করে তুললো খেলার মাঠের ভেতরে-বাইরে তাঁর খেলোয়াড়ী স্বভাব এবং মনোবৃত্তি। বর্ণবৈষম্যকে এক নিমেষে জয় করে নিলেন। বৈদেশিক এবং কৃষ্ণকায় আর কোন ব্যক্তি এমন করে ইংরাজের প্রাণমন জয় করতে পেরেছে কিনা তার নজীর আমার জানা নেই। ব্রিটিশরাজের কাছ থেকে পেলেন সম্মানিত "স্যার" উপাধি আর স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে নিজের দেশের কাছ থেকে পেয়েছেন ইংল্যান্ড রাজ-দরবারে প্রথম "হাই-কমিশনার" হবার দুর্লভ সম্মান।

লিয়ারীকে ঘিরে ধীরে ধীরে যে প্রবল শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল গড়ে উঠছিল তার ভেতরে ছিলেন দ্বিতীয় যুগ-প্রবর্তককারী নিগ্রো ক্রিকেটিয়ার জর্জ হেড্‌লী। লিয়ারী যে নূতন ধরনের ক্রিকেট খেলার সূচনা করেছিলেন তাকে সর্বপ্রকারে সাফল্যময় করে তোলার অনেকখানি কৃতিত্ব জর্জ হেডলীর।

১৯২৯—৩০ সালে ইংল্যান্ড দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এলো। বারবাডসে প্রথম টেস্ট খেলায় জীবনের প্রথম সুযোগ পেলেন একুশ বছরের হেডলি। ইংল্যান্ড দলের বোলারদের মধ্যে রয়েছেন সর্বকালীন বিখ্যাত বোলারদের অন্যতম ভোস, রোডস, স্টিভেন্স। অত্যন্ত অল্প রাণের ভেতর দলের সেরা আটজন ব্যাটস্‌ম্যান আউট হয়ে গেলেন একে একে—শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন হেডলি

নির্বিকার উদাসীনতায়। ইনিংস শেষে তাঁর ব্যক্তিগত রাণসংখ্যা দাঁড়াল ১৭৬। দ্বিতীয় টেস্টে অবিশ্যি তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। কিন্তু সুদে-আসলে সে ক্ষতিপূরণ করে নিলেন তৃতীয় টেস্টে পর পর দুটি ইনিংসেই দুটি সেঞ্চুরী করে। চতুর্থ টেস্টে একটি ডবল সেঞ্চুরী করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-জগতে নিজের আসনের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এলো ইংল্যান্ড সফরে। এ পর্যন্ত যা সম্ভব হয়নি সে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন হেডলি, টেস্ট ম্যাচ খেলায় উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করে লর্ডস মাঠের ইতিহাসে তিনিই হলেন বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড়।

সাধারণ খেলায় তাঁর রাণের সংখ্যার হিসেব রাখা একমাত্র ওয়াইজডেন ছাড়া কারো পক্ষেই সহজ নয়। তবে তাঁর টেস্ট ম্যাচের রাণসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৯০। এর ভেতর আছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আটটি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরী। ১৯৩২ সালে জ্যামাইকাতে লর্ড টেনিসনের টিমের বিরুদ্ধে ৩৪৪ নট-আউট তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ রাণসংখ্যা। কিন্তু রাণ-সংখ্যার প্রাচুর্য দিয়েই হেডলির বিচার করতে গেলে বিরাট ভুল করা হবে।

কনস্টেনটাইন লিখেছেন— "সংখ্যার হিসেবে হেডলির মূল্যায়ন করতে যাওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে একটা বিরাট প্রতিভার চিহ্ন। একমাত্র ব্রাডম্যান ছাড়া আর কারো সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে সে কথা আমি ভাবতেই পারি না।"

বিখ্যাত ইংরাজ ক্রিকেট-সমালোচক নেভিল্ কারডাস্ লিখেছেন—"ক্রিকেট সাম্রাজ্যের বর্তমান দুই রাজা—ব্রাডম্যান এবং হ্যামন্ডের সঙ্গে আরো একজনকে রাজার আসনে বসানো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অনেকদিন থেকেই তিনি ঘা দিচ্ছিলেন তাঁর ন্যায্য আসনের দাবীতে। এবারে মহাসমারোহে অভিষেকের আয়োজন হোক—তৃতীয় রাজা জর্জ হেড্লির জন্যে।"

কনস্টেনটাইন-হেডলির পরে এলো বিশ্ববিখ্যাত 'থ্রি মাস্কেটিয়াস'—ওরেল-উইকস্-ওয়ালকটের যুগ। পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবতম অধ্যায়। এ'দের সবাইর কীর্তির কথা আজ কারো অজানা নয়। তবু এর মধ্যে উইকসের একটি বিশ্বরেকর্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ পর্যন্ত তিনিই হচ্ছেন একমাত্র খেলোয়াড় যিনি পর পর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। ভালো হোক্ মন্দ হোক্, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, উইকসের আকাশচুম্বী সাফল্যদীপ্তি স্তিমিত হয়ে রইলো সমসাময়িক একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে। তিনি হচ্ছেন তাঁর দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল।

জর্জ হেডলি

খেলাকে খেলার মাঠের ভেতরে-বাইরে সবরকম নীচতা, দৈন্যতার অনেক উর্ধে তুলে নিয়ে যেতে পারার মত মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ওরেলের চরিত্রে যতটা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে, বোধকরি তার দ্বিতীয় নজীর মেলা ভার। দেশ-জাতি-ধর্মনির্বিশেষে লোকের অকৃপণ ভালবাসা-শ্রদ্ধা ওরেলের মত খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটেছে।

উইকস্-ওয়ালকট খ্যাতির শীর্ষে থাকতে থাকতেই সসম্মানে বিদায় নিলেন ভবিষ্যতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারীদের সুযোগ দেবার জন্যে।

রইলেন শুধু ওরেল। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কত্বই শুধু নয় ভবিষ্যতের জন্যেও একটা সুস্থ সবল দল গঠন করে যাবার গুরুদায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে চাপানো। পাকা জহুরীর সত্যিকারের মুক্তো চিনে নিতে দেরীও হলো না, ভুলও হলো না। অশান্ত, দুর্দান্ত, প্রাণবন্যায় উচ্ছল উদ্দাম একটি তরুণকে রেছে নিয়ে সুযোগ্য শিক্ষক তাঁর মানসপুত্র তৈরী করায় মন দিলেন। তাঁর নির্বাচনে ভুল হয়নি এ সম্পর্কে যেদিন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, সেদিন ওরেল ঘোষণা করলেন যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সম্মান রক্ষা করবার মত ক্ষমতাশালী উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি আজ পেয়েছেন। তাঁরই হাতে সে দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি আজ বিদায় চান। আশায়-নিরাশায়-উদ্বেগে স্তব্ধ দেশবাসী আর বিশ্ববাসীরা শুনলো সেই ভাগ্যবান তরুণের নাম—গারফিল্ড সোবার্স।

এত অল্পবয়সে, এত অল্পসময়ে, এত প্রচুর খ্যাতি এবং সম্মান আর কেউ পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

সোবার্সের খেলোয়াড়ী কৃতিত্বের ফিরিস্তি দেবার সময় এখনও হয়নি। আজ থেকে হয়ত আরো দশ বছর পরে সে কথা ভাববার সময় আসতে পারে। ক্রিকেট-ঐতিহাসিকরা তখন বিশেষ আনন্দসহকারেই সেই মূল্যায়নে ব্রতী হবেন একথাটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সোবার্সকে তাঁর গুরু ওরেল কি চোখে দেখেছেন তার খানিকটা আভাস দিয়েছি। কিন্তু সোবার্স তাঁর গুরুকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। গুরুদক্ষিণা বোধকরি ঠিক এমনিই হওয়া উচিত।

সোবার্স লিখেছেন—"ওরেলের নেতৃত্বা-ধীনে খেলা—খেলা তো নয়—খেলা শেখা। আমার জীবনকে এত প্রভাবান্বিত বোধকরি আর কোন অধিনায়কই করতে পারেন নি। এর অর্থ এই নয় যে আমি অন্য কোন অধিনায়ককে ছোট করছি। একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিপুল অভিজ্ঞতানৈপুণ্য, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁকে আর সবাইর চাইতে অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছে একথা নিশ্চিত। এই ধরনের নেতৃত্বের প্রভাবেই একটা সাধারণ দলও অসাধারণ হয়ে ওঠে।

একজন দলপতি যেহেতু তিনি দলপতি সেহেতুই তিনি দলপতি হয়ে উঠতে পারেন না। আমার এই কথাটা হেঁয়ালির মত মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলে তার সত্যিকারের অর্থটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সত্যিকারের দলপতি হতে গেলে যত রকমের গুণাবলী প্রয়োজন তার সব কিছুর সংমিশ্রণেই তৈরী এই ফ্রাঙ্ক ওরেল।

কঠিন নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন যেখানেই তিনি মনে করেছেন, সেখানেই সংযত অথচ দৃঢ়ভাবে তা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেন নি কখনও। ওরেলের প্রথম উপদেশ এবং কঠিন আদেশ ছিল যে আম্পায়ারের বিচারে যদি সন্তুষ্ট নাও হই তবুও বিনা আপত্তিতে উইকেট ছেড়ে চলে আসতে হবে। নিজেদের দলের খেলা যতই সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে থাকুক না কেন—কোন রকম ছল-চাতুরী করে সময় নষ্ট করা চলবে না। ঘরমুখী আউট-খেলোয়াড় মাঠের মাঝামাঝি থাকাকালীনই বহির্মুখী খেলো-

য়াড়কে তার উইকেটের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। খেলার ফলাফল হার-জিত যাই হোক না কেন—স্পোর্টসম্যানসিপ তার চাইতে অনেক বড়। জেতার অজুহাতে বালসুলভ উচ্ছলতা একান্তই নিষিদ্ধ। হারার অপরাধে কোনরকম দোষারোপ বা গালাগালি নয়। শুধু শান্তভাবে বসে কেন হার হোল তারই কারণ নির্ণয় এবং ভবিষ্যতে যাতে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারই উপায় নির্ধারণ—এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র।"

কনস্টেনটাইন-হেডলি-ওরেলের গৌরবময় ঐতিহ্য তাঁদের উত্তরসূরী সোবার্সের হাতে পূর্ণমর্যাদায় শুধু রক্ষিতই নয় সুপ্রতিষ্ঠিতও বটে। এটা সোবার্সের যুগ। সোবার্সও হয়ত একদিন এমনি করেই নূতন কোন আগন্তুকের হাতে সঁপে দেবেন সেই মহান গুরুদায়িত্ব। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই ঐতিহ্য হয়ত এমনিভাবেই চলবে অনাদিকাল ধরে।

লিখতে লিখতে বারবার শুধু একথাটাই মনে হয়—পঞ্চাশ কোটি ভারতবাসীর মাঝ থেকে একটিমাত্র কনস্টেনটাইন—একটিমাত্র ওরেলের জন্ম কি ভারতবর্ষে কখনও হবে না?

---

* লেখক ভারতীয় টেস্ট দলে প্রথম বাঙালী খেলোয়াড় এবং বাঙলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক
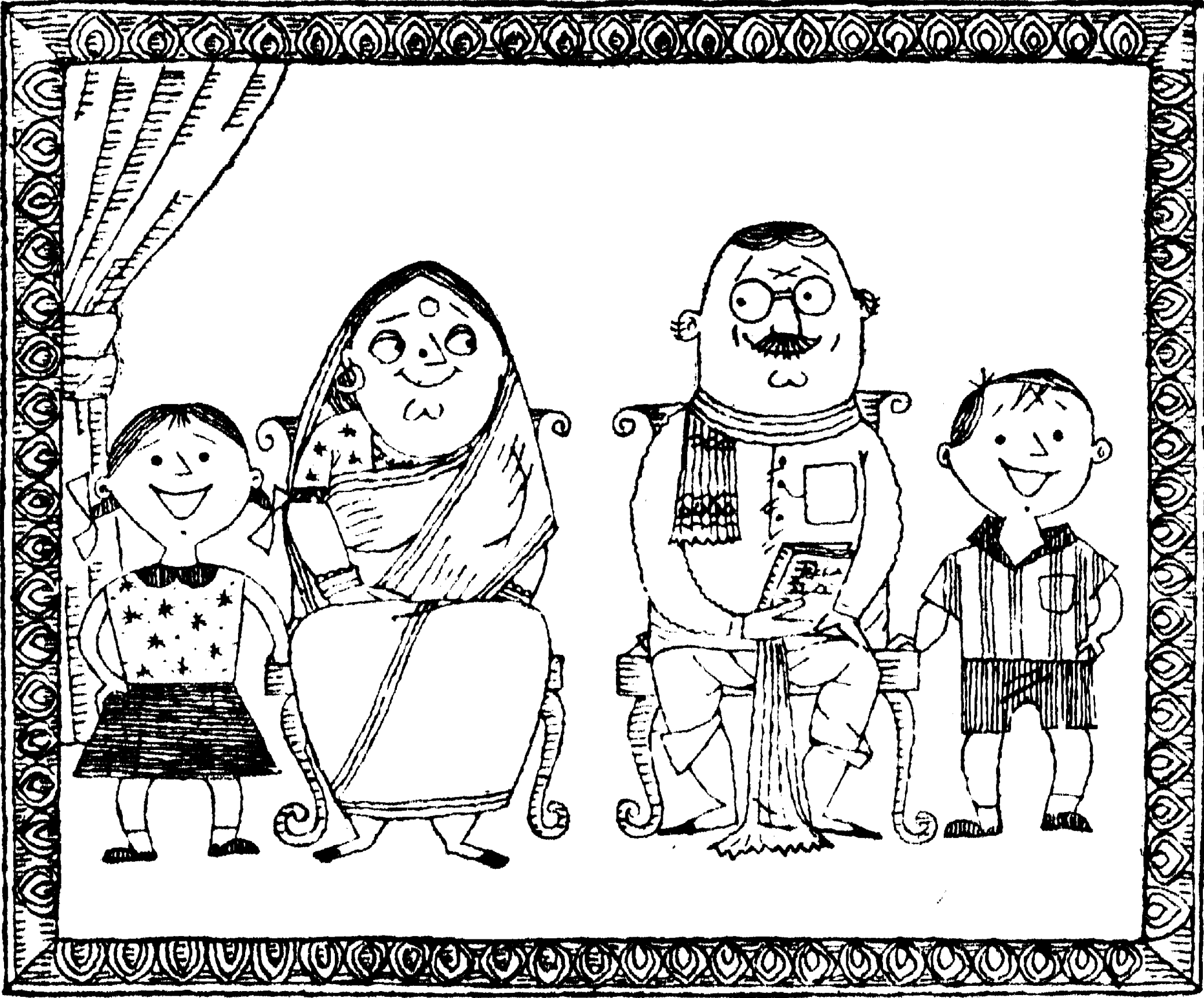
ব্রিসবেনের স্মরণীয় 'টাই'
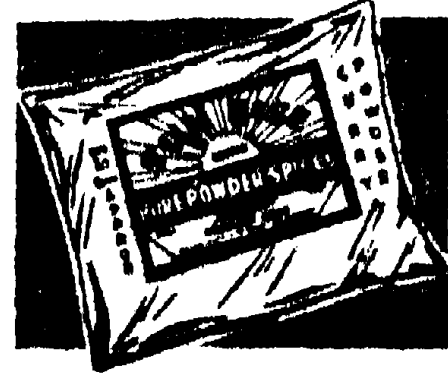
কৃষ্ণ ধর

দল তো নয় যেন পিঞ্জর-খোলা বাঘ। যেমন তার ক্ষিপ্রতা তেমনি তার বুকের পাটা। অকুতোভয় তার আক্রমণ, দর্শনীয় তার প্রতিরোধ। এর নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যেমন তার সমুদ্র, খরকিরণ সূর্যসখাও তার তেমনি। তাই তার এক হাতে খেলে তরঙ্গিত সমুদ্র, অন্য হাতে মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপমালার কৃষ্ণ সন্তানদের এই অনন্য পরিচয় পেয়েছে ক্রিকেট-জগতে বহুবার। কালোয় আলো হয়ে যায় মাঠ। কালো হাতে ঝিলিক মারে বল, গর্জন করে ওঠে ব্যাট। তুলনাহীন তার ক্রীড়া দীপ্তি। এই হল খেলা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম শুনলেই মাঠ নড়েচড়ে সজাগ হয়ে বসে। এমন তীব্র তার আকর্ষণ। হারজিৎ তো হাতের ময়লা। এ খেলায় কখনো জোটে রাজদাক্ষিণ্য, কখনো ফকিরের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য। ভাগ্য থাকে রাণে রাণে দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ভাগ্য বিরূপ হলে ফিরে যেতে হবে নতনেত্রে শূন্য হাতে। কপোত হৃদয়ের জন্য এই খেলা নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হৃদয় জানে সমুদ্রের বিস্তার, জানে আকাশের উদার সীমাহীনতা। তাই তার খেলার জয়পরাজয় বড় কথা নয়, বড় কথা হল খেলা।

এই খেলার এক স্মরণীয় ইতিহাস বুকে করে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন ক্রিকেট গ্রাউন্ড। অনেক উজ্জ্বল খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়তো হয়েছে ক্রিকেট অনুরাগীদের। কিন্তু ব্রিসবেনে আজ থেকে ছ'বছর আগে যে-খেলা দেখিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ তার তুলনা একমাত্র সেই খেলাই। অদ্বিতীয়সম্ভব সেই খেলার পর ক্রিকেট খেলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন : দি গ্রেটেস্ট টেস্ট ম্যাচ অব অল টাইম।

এই খেলার পুনরাবৃত্তি আর হয় নি। আলংকারিক ভাষায় বললে, ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। হতে পারে একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই হাতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমুদ্র আর সূর্যের তন্ময় সাধনা ছাড়া এই জাদুমন্ত্রের পুনরুচ্চারণ আর সম্ভব নয়।

সেই জাদুর ঊর্ধ্বশিখা চকিতে আলোকিত করে দিয়েছিল ব্রিসবেনের নম্র বিকেলের শান্ত ছায়াচ্ছন্নতাকে। রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল দর্শকের সংখ্যা। তারা অনেক আশা করে এসেছিল মাঠে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে এমন জাদুর খেলা দেখাবে তা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যাশা করে নি।

হ্যাঁ একে জাদু ছাড়া আর কোনো নামেই চিহ্নিত করা যায় না। হার নয়, জিৎ নয়; ক্রিকেট খেলায় যা প্রায় অপরিহার্য সেই চিরাচরিত 'ড্র'ও নয়। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে যা আজ পর্যন্ত আর কোনো দিন হয় নি ব্রিসবেনের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শালপ্রাংশু মহাভুজ খেলোয়াড়রা তাই করলেন। মাত্র এক রাণ বেশি করতে পারলেই অস্ট্রেলিয়া বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদে ধন্য হত। সময় ছিল আর আট মিনিট। মোট সাত রাণ করতে পারলেই জিৎ। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন বেনোর হাতে তখনো তিনটি উইকেট। উত্তেজিত হয়ে উঠল ব্রিসবেন মাঠের প্রতিটি তৃণকণা। ঝুঁকে পড়ল ডিসেম্বরের শীতার্ত আকাশ তার নীলাম্বরী একাগ্রতায়।

অসম্ভব। ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের কপালে সেই শীতেও দেখা দিল স্বেদবিন্দু। ওয়াটারলুর মাঠেও এমনি এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন নেপোলিয়ন। ওরেলের অবস্থা তার চেয়েও সঙ্গীণ। এই হারের হাত থেকে কে বাঁচায়?

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এমনি বিপদের সময়ে ডাক পড়ত বীরষণ্ড অর্জুনের। কিন্তু সপ্তরথীর ব্যূহভেদের সময়ে পার্থ ধনঞ্জয়কেও হাতের কাছে পাওয়া যায় নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেয়েছিল তার সব্যসাচী বীর ওয়েসলি হলকে। ক্রিকেটের ইতিহাস যতদিন থাকবে, ওয়েসলি হলের সেই অন্তিম আলোকে খেলার কথা লিখিত থাকবে জ্বলের অক্ষরে। পারল না অস্ট্রেলিয়া। হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল তার
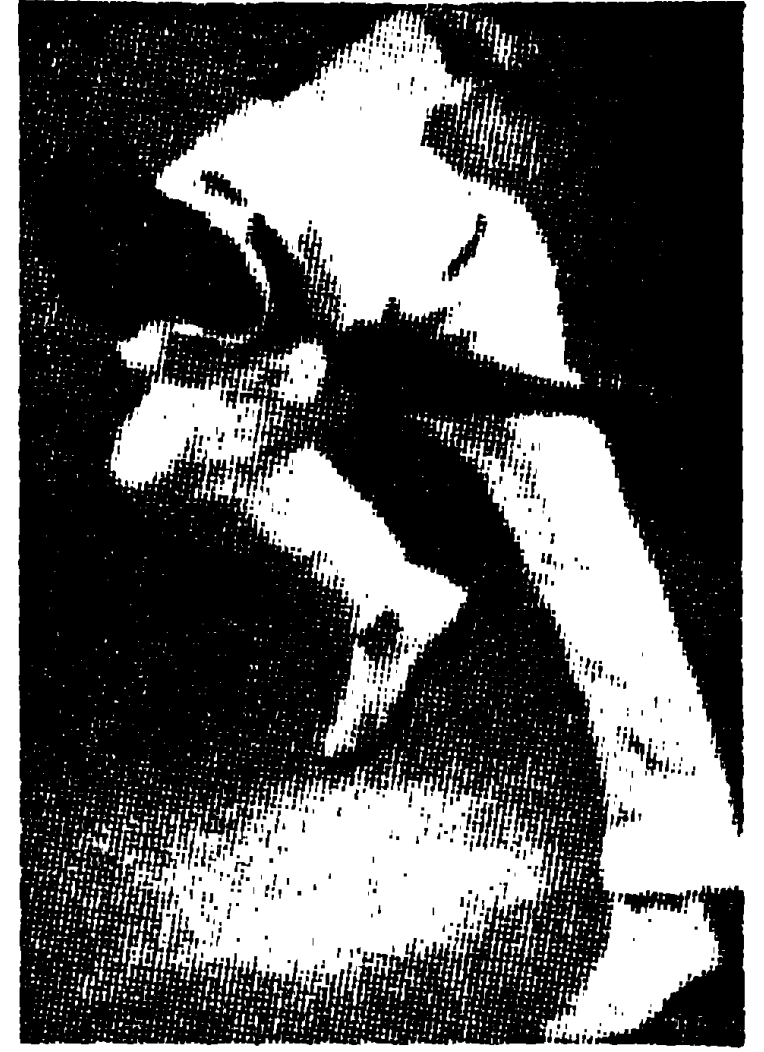
বিকেলের যাই যাই আলোকে ওয়েসলি হলের আগুনে বোলিং।

আকাঙ্ক্ষিত বিজয়। নক্ষত্রের অনন্ত গতি-বেগের মতো সেই মুহূর্ত কয়টি নিরবধি কালের মধ্যে গেল মিলিয়ে। ধূলিসাৎ হয়ে গেল উইকেট।

না জিৎ, না হার, না 'ড্র'। **It's a tie.** টায় টায় টাই। না-কম, না-বেশি। কানায় কানায় পূর্ণ। কাঁটায় কাঁটায় সমান। সময়, উইকেট আর রাণ—এই তিনের এমন অতুলনীয় সামঞ্জস্য টেস্টের ইতিহাসে আর হয় নি।

খেলার শেষে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন রিচি বেনো বললেন :

> The greatest Test I have ever played in. It had everything — fabulous batting, fabulous personal performances and a fabulous finish.

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল যোগ করলেন : এমন খেলা এর আগে আর কোনোদিন খেলিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজই এই খেলা দেখাতে পারল। এর আগে আর কেউ দেখায় নি, পরেও না। ১৯৬০ সাল। তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বুধ-

ব্রিসবেনের মাঠে ও'নীলের আত্মরক্ষা। বল আসছে দুর্ধর্ষ হলের হাত থেকে
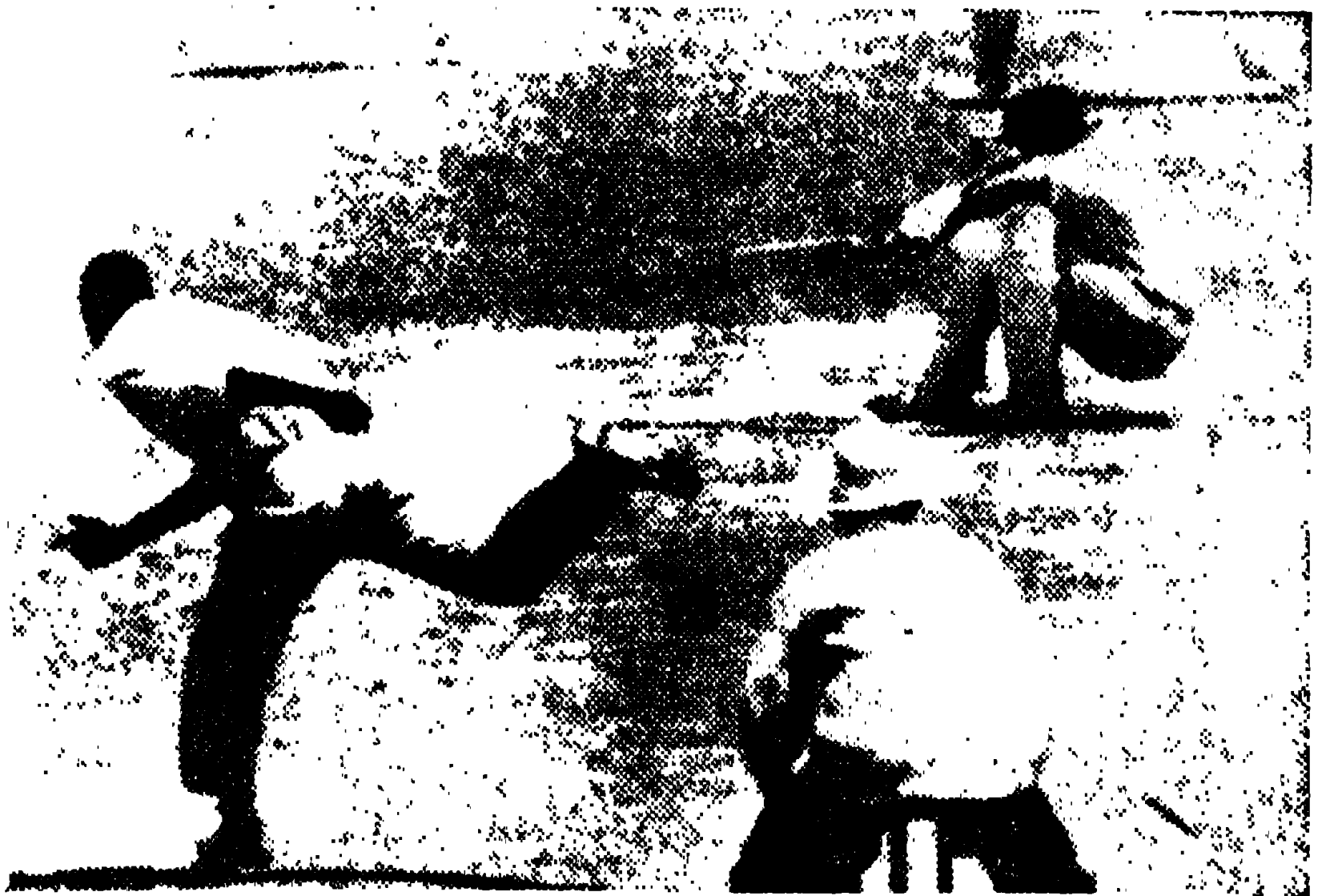
দিনের শেষ বলে হলের হাতে রাণ আউট হলেন মেকিফ, তৈরী হল টেস্ট ক্রিকেটের রেকর্ড 'টাই'।

বার ছিল সেদিন। সময় ছয়টা পার হয়ে চার মিনিট। দীঘল বিকেলে খেলা হচ্ছে। ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছিল ব্রিসবেনের মাঠে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টের শেষ দিনের খেলা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্রাণ্ড টোট্যাল ৭৩৭ রাণ। প্রথম ইনিংসে ৪৫৩। দ্বিতীয়তে ২৮৪। শতাধিক রাণ করেছেন সোবার্স। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া তার জবাব দিল ৫০৫ রাণ তুলে। ও'নীলের একাই ১৮১ রাণ। সিম্পসন মাত্র আট রাণের জন্য শতকিয়ার গৌরববিচ্যুত। চলছে দ্বিতীয় ইনিংস। রাণ উঠেছে আর শঙ্কিত হচ্ছেন ফ্র্যাংক ওরেল। ডাকো হল-কে। দুর্ধর্ষ বোলার ওয়েসলি হল। দীর্ঘদেহী সেই কৃষ্ণকায় খেলোয়াড় বল হাতে নিতেই চাকা ঘুরল।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ২৩৩ রাণ তুলতে পারলেই জিৎ। পাঁচ উইকেট জলাঞ্জলি দিয়ে রিচি বেনোর দল মাত্র ৫৭ রাণ ঘরে আনতে পেরেছে। এই পাঁচের মধ্যে চারটিই হলের করতলগত। সিম্পসন শূন্য হাতে বিদায়। হার্ভে পাঁচ রাণের বেশি তুলতে পারলেন না। প্রথম ইনিংসের বিজয়ী বীর ও'নীলকে মাত্র ২৬ রাণে ফিরিয়ে দিলেন হল। পাঁচের পর এলো ছয় উইকেটের জুটি। ৯২ রাণে তাদের পতন। ডেভিডসন ও বেনোর জুটি সপ্তম উইকেটে জেড়ে রাণ তুলতে লাগল। জয়ের কাছাকাছি এসে এ'রা তুখোড়ভাবে খেলে যোগ করল ১৩৪ রাণ।

এই সময়েই এল খেলার তুঙ্গ মুহূর্ত। ৩১ বৎসর বয়স্ক তরুণ ডেভিডসন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এগারোটি উইকেট নিয়ে ব্যাটে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল। খেলার মাত্র মিনিট আটেক বাকী। অস্ট্রেলিয়াকে তুলতে হবে মাত্র সাত রাণ। বেনো-র হাতে তখনো তিনটি অনাঘ্রাত উইকেট শিবিরে অপেক্ষ-মাণ। মেঘে বিদ্যুৎ যখন খেলে আকাশ তখনি বুঝতে পারে ঝড়ের সংকেত। কিন্তু এই ঝড় কোন দিক থেকে কীভাবে আসবে বহু রণক্ষেত্রের অজেয় যোদ্ধা রিচি বেনো তা বুঝতে পারেন নি। কারণ ওয়েসলি হলকে তখনো চিনতে বাকী ছিল। ৮০-তে এসে ডেভিডসনের দৌড়ে কুলোল না। হলের বলে রাণ তুলতে গিয়েই তিনি রাণাস্ত হলেন। সবাই ঘড়ির দিকে তাকাল। হল অকম্পিত দীপশিখার মতো দাঁড়িয়ে। দিনের এবং খেলার শেষ ওভারে বল দিচ্ছেন ওয়েসলি হল। আর মাত্র সাত রাণ করতে পারলেই জয়সীমা স্পর্শ করবে অস্ট্রেলিয়া। উইকেট-কীপার ওয়ালি গ্রাউট আত্মরক্ষার জন্য ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে। তখন আর মাত্র ছয় রাণ হলেই জিৎ। জেট বিমানের গতিতে হল বল করলেন। কোনো রকমে ছুঁয়ে দিল ওয়ালি সেই বল। এই ফাঁকে তিনি একটি রাণ তুললেন।

জয়ের জন্য তখন আর মাত্র পাঁচটি রাণ দরকার। হলের হাতে আরও সাতটি বল। এবার বেনো আর হল পরস্পরের প্রতিপক্ষ। অমিতবিক্রম বেনো আকাশ-লিপ্ত বল মারলেন। চমকে উঠল সারা মাঠ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইকেট কীপার গেরী আলেক-জাণ্ডার প্রস্ফুটিত কমল-কোরকের মতো লুফে নিলেন সেই বল। অস্ট্রেলিয়ার ইন্দ্র-পতন ঘটল তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্রিসবেনের বিকেলে।

আরও পাঁচ রাণ চাই। হলের হাতে রয়েছে ছ'বারের বল। অস্ট্রেলিয়ার আশ্রয়ে আরো দু'টি আনকোরা উইকেট।

ক্রীজে এলেন ইয়ান মেকিফ। ভয়ে তাঁর দুরু দুরু বক্ষ। কুমারী মেয়ের মতো। প্রথম ইনিংসে মাত্র তিনে তিনি রাণান্ত। হল আজ গোলিয়থ বিজয়ী ডেভিডের মতো স্থিরপ্রত্যয়ী, অচঞ্চল দৃষ্টি, অকম্পিত বাহু। প্রথম বল আটকালেন মেকিফ। হল না কিছু। দ্বিতীয় বল এল বিদ্যুৎগতিতে। নিষ্ফলা হল না মেকিফের প্রচেষ্টা। একটি বাই রাণ ঘরে তুললেন তিনি।

আর মাত্র চার রাণ হলেই অস্ট্রেলিয়া জয়ের মুকুট পরে ঘরে ফিরবে। হলের হাতে এখনো রয়েছে চার বারের বল।

এবার হলের মুখোমুখি গ্রাউট। আকাশে তুলে দিলেন সেই [illegible] বল। মনে হল করধৃত হয়ে মৃত্যু ঘটবে আরেকটি উইকেটের। হল না। একটি রাণ করলেন গ্রাউট।

বাকী রইল আর মাত্র তিন রাণ। হলের হাতে তখনো তিন বারের বল অবশিষ্ট ওভার শেষ হতে। জয়ের আশায় চনমন করে উঠলেন মেকিফ। হল ছুঁড়লেন তার আগুনে বল। অসীম স্পর্ধায় দিগন্ত-সীমার দিকে চোখ বুজে সেই লাখো ডলার দামী বলকে পাঠিয়ে দিলেন মেকিফ। জয় সুনিশ্চিত। সারা মাঠে লক্ষ দর্শকের নিঃশ্বাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এখুনি হাত তুলবেন আম্পায়ার। না, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা নারী চরিত্রের মতোই। দেবা ন জানন্তি, মানুষ তো তার কাছে শিশু। পরমাশ্চর্য উপায়ে দিগন্তের পূর্ব-প্রান্তেই সেই বল থামালেন হাণ্ট। তারপর মুহূর্তেই এক দর্শনীয় নিক্ষেপ। দুরন্ত দৌড়ে তিন রাণের মুখে গ্রাউটের উইকেট কচুকাটা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল!

দুই দলের রাণ সংখ্যা সমান। আরও দু'টি বলের ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে হলের করতলে। সর্বশেষ উইকেটের মানুষ তরুণ ক্লিনে এসে দাঁড়ালেন সেই বিধ্বস্ত রণাঙ্গনে।

বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল সারা মাঠে। এমন উত্তেজনা, এমন বুক কাঁপানো আশা নিরাশায় মুখরিত ক্রীড়াঙ্গণ।

আর একটি রাণ করতে পারলেই মার দিয়া কেল্লা! হল তৈরী হলেন তাঁর একাগ্রী বল নিক্ষেপের জন্য। ফাস্ট বল ছুঁড়লেন তিনি। না, ক্লিনে থামিয়ে দিলেন সেই বল। আর সময় নেই। ডু অর ডাই। আরও একটি রাণ চাই। এক মিনিট সময় বাকী। কোনো দিকে না তাকিয়ে ছুটলেন মেকিফ। এই দৌড় যেন শেষ দৌড়। বিজয়লক্ষ্মী মালা নিয়ে অপেক্ষ-মান।

কিন্তু না, মাঝ-উইকেটে সলোমন সেই বল থামিয়ে মারলেন উইকেটের দিকে। ব্রিসবেনের বিকেলের আলোয় বিষণ্ণতা গভীরতর করে ঘাসে মুখ দিয়ে পড়ল স্টাম্পগুলি। এর নাম টাই। কানায় কানায় সমান। না-কম, না-বেশি।

টেস্টের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। এই ইতি-হাসের রচয়িতার নাম ওয়েসলি হল— কালো ছেলের হাতে আগুনে বল।

ক্রিকেটের জাদুপুরী : ওয়েস্ট ইন্ডিজ

শঙ্করবিজয় মিত্র

উন্নত-শীর্ষ ওক, তমাল ও পামের সারি ঘেরা কয়েকটি দ্বীপ অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে ছড়ানো রয়েছে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলের কাছাকাছি। খানিকটা এগিয়ে এসে পানামা খাল পেরিয়ে এলেই প্রশান্ত মহাসাগর। ত্রিনিদাদ, বার্বাডোজ, গায়না আর জামাইকা দ্বীপ নিয়ে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবিয়ন সাগর এদের ঘিরে রেখেছে বলে এদেশের অধিবাসীরা নিজেদের ক্যারিবিয়ানের লোক বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে। এদের মধ্যে ঘটেছে নানা জাতের সংমিশ্রণ—নিগ্রো, রেড-ইন্ডিয়ান, চীন আবার কিছু কিছু ইংরেজ। কর্কটক্রান্তি সমান্তরাল এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে চলে গেছে। জলহাওয়ার দিক দিয়ে উষ্ণমন্ডলে এদের অবস্থান, ভারতের জলহাওয়ার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। তবে সমুদ্রের মাঝখানে থাকার ফলে গ্রীষ্মের প্রচন্ডতা অনেক কম। চারিত্রিক দিক দিয়ে এদেশের লোকেরা প্রাণখোলা, সাদাসিধে—অর্থাৎ যাকে বলে আন সফিস্টেকেটেড। তাদের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খেলার মাঠেও ছড়িয়ে পড়ে—ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে তাই এই প্রাণখোলা মেজাজ। এই মেজাজই এদেশের ক্রিকেটকে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদেশের মানুষগুলো যেমন সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে এদের ক্রিকেটেও তেমনি সেই সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ছন্দময় হয়ে উঠেছে। এদের হাতের ব্যাটে তাই বৈদ্যুতিক দীপ্তি, বোলিং'এ ঝঞ্ঝার বেগ আর ফিল্ডিং'এ চমকপ্রদ সতর্কতা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট গড়ে উঠেছে পল্লীর আবহাওয়ায়। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া বা ভারতের শহরের ধাঁচে এদেশের ক্রিকেট প্রতিপালিত হয় নি। হেডলি, কনস্ট্যানটাইন, ওরেল, উইকস, ওয়ালকট বা সোবার্সের মত দিগ্বিজয়ী ক্রিকেটাররা বেরিয়ে এসেছে গ্রাম্য ক্রিকেটের আনন্দময় পরিবেশ থেকে। রোলার চালান সুবিন্যস্ত মাঠ, ক্রিকেট-বিজ্ঞানের ছকবাঁধা কেতায় ব্যাট চালানো বা বল ছোঁড়ার বালাই সেখানে নেই। সপ্তাহের মধ্যে ছয় বা সাত দিনের অনুশীলনও নেই। ক্ষেতে খামারে কলকারখানায় সপ্তাহটা কাজে কাটিয়ে রবিবারে মাত্র তাদের খেলার অবসর। সেদিন গ্রামে গ্রামে বসে ক্রিকেটের মেলা, খেলোয়াড়েরা সজোরে ব্যাট হাঁকড়ায়, ঝড়ের বেগে বোলারদের হাত থেকে বল ছোটে। সেখানে চলে চার আর ছয়ের মারের পাল্লা। যেমন ঝঞ্ঝার মত বল, তেমনি বিদ্যুতের মত মার। বল ছুটে যায় গাছের মাথা ডিঙিয়ে আর সোচ্চার হয়ে ওঠে গ্রাম্য দর্শকের দল, হাততালি দিয়ে তারিফ করে, আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। এই আনন্দের মাঝেই জন্ম নেয় এদেশের প্রচন্ড শক্তিধর ব্যাটসম্যান এবং ফাস্ট বোলিং'এর উপযোগী কৃতিত্বসম্পন্ন বোলার। এদেশেরই ব্যাটসম্যান—জর্জ হেডলি এমন সহজ ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যে তাঁকে সব-কালের সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান, ইংলন্ডের ফ্রাঙ্ক উলি বা ভারতের রণজিৎ সিংহজীর মত তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজন স্বীকৃত।

যুদ্ধোত্তর যুগে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এভারটন উইকস ও ক্লাইড ওয়ালকট—তিন ডব্লিউ অভিধায় চিহ্নিত—ত্রয়ী ব্যাটসম্যান, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিংকে দুর্দমনীয় করে তোলে। আর বর্তমান অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স অধুনা বিশ্বের সেরা চৌকস খেলোয়াড়। সবচেয়ে বড়কথা, যে-বোলার দিয়ে ম্যাচ জেতা যায়, তেমন বোলারের অভাবও ওয়েস্ট ইন্ডিজে কোনদিন হয় নি। প্রচন্ড গতিবেগ সম্পন্ন ফাস্ট বল করবার মত বোলার এদেশে সব সময়েই আবির্ভূত হয়েছে। লিয়ারী কনস্ট্যানটাইন, জর্জ ফ্রান্সিস, জন থেকে সুরু করে বর্তমান যুগের হল বা গ্রিফিথ বিশ্বের যে কোন ব্যাটসম্যানকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে।

খেলার জন্য খেলা, আনন্দের জন্য খেলা, সখ্যতার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য খেলা; শুধু জেতা বা দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে পরাজয় এড়ানোই খেলার মূল মন্ত্র নয় বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়েরা বিশ্বাস করে। তাই ক্যারিবিয়ান সাগরের কালো মানুষেরা আজ বিশ্ব ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ক্রিকেটের পদচিহ্ন পড়ে। ১৮৯৫ সালে আর লুকাসের অধিনায়কত্বে ইংলন্ড থেকে একটি ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজে যায়। ব্রিটিশ দলের এই সফরের ফলে সারা দেশে এমন সাড়া পড়ে যায় যে, ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের তীরে তীরে ক্রিকেটের ক্রীড়াভূমি গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ ক্রিকেট কর্তারা ১৯০০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে আমন্ত্রণ জানায়। অবশ্য তখনও ইংলন্ডের খ্যাতনামা দলগুলোর সঙ্গে খেলার যোগ্যতা হয় নি, তবু ছোটখাটো দলের সঙ্গে খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখে আসে। এর পর ১৯০৬ সালে তারা আবার যখন ইংলন্ড পরিভ্রমণে যায় তখন তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে এবং তাদের দুজন খেলোয়াড় সিডনী স্মিথ ও চার্লি অলিভিয়ের ইংলন্ডের কাউন্টি দলে স্থান পায়।

১৯০৬ সালের দলটির অধিনায়কত্ব করেন এইচ বি জি অস্টিন। অস্টিন ছিলেন বারবাডোজের অধিবাসী। বার্বাডোজের লোকেরা ক্রিকেট-পাগল, ক্রিকেট তাদের ধ্যান-জ্ঞান। অতীতে এই দ্বীপের যেসব ধুরন্ধর ক্রিকেটার ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোজ্জ্বল করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—অস্টিন, গুডম্যান, কক্স, চ্যালেনার, টি ফ্রান্সিস ও

এইচ সি গ্রিফিথ। বর্তমান যুগের স্যর ফ্রাঙ্ক ওরেল, এভারটন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট, হান্ট, সেমুর নার্স, ওয়েসলে হল, চার্লি গ্রিফিথ এবং জি এস সোবার্স এই বার্বাডোজের অধিবাসী। ১৯১২-১৩ সালে এ ডব্লিউ এফ সামারসেটের নেতৃত্বে ইংলন্ডের একটি ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসে। এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে উভয় দেশের মধ্যে আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেটের অনুশীলন পূর্ণোদ্যমেই চলতে থাকে। বার্বাডোজ, ত্রিনিদাদ, গায়নার মধ্যে দল গঠন করে প্রতিযোগিতামূলক টুর্ণামেণ্ট সুরু হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে জামাইকা প্রথমে এই টুর্নামেন্টে যোগদান করতে না পারলেও পরে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

১৯২৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার ইংলণ্ডে খেলতে যায়। ইংলণ্ডে তখন প্রতিভাধর ক্রিকেটারদের যুগ—জ্যাক হবস, টিচ ডিসলি, চ্যাপম্যান, রোডস, গিলিগ্যান প্রভৃতি খেলছেন। এই সমস্ত ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সমানে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৯৩৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়। আর ই এস ওয়াটের অধিনায়কত্বে ব্রিটিশ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে দুটি টেস্টম্যাচ খেলায় পরাজিত ও একটিতে বিজয়ী হয়। আর একটি খেলা শেষ হয় সমানে সমানে। এবারের ব্রিটিশ দলটি ছিল খুবই শক্তিশালী। দলে ছিলেন—ওয়ালি হ্যামণ্ড, জ্যাক ইডডন, লেস্‌লি এমস, কেন ফার্নেস, ডব্লিউ ফ্যারিমণ্ড, প্যাট্সি হেণ্ড্রেন, এরিক হোলিজ, এরল হোমস, মরিস লেল্যাণ্ড ও জিম স্মিথ। এই সফরে ইংলণ্ডকে ক্যারিবিয়ানের ফাস্ট বোলার ই এ মার্টিন ডেলের বলে নাস্তানাবুদ হতে হয়। তাঁর একটি বল মারতে গিয়ে অধিনায়ক ওয়াট চোয়ালে আঘাত পান। ঐ আঘাতে ওয়াটের চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে যায়।

১৯৩৩ সাল থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে তাদের দাপট সুপ্রতিষ্ঠিত করে। জর্জ হেড্‌লি তখন অধিনায়ক আর তাঁর নেতৃত্বে ফাস্ট বোলাররা বিপক্ষ দলকে তছনছ করতে থাকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দলে তখন ফাস্ট বোলার ছিলেন—এল জি হিল্টন, মার্টিন ডেল, এ ফুলার ও লিয়ারি কনস্টানটাইন।

১৯৪৭-৪৮ সালে জি ও এ্যালেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ক্রিকেট দলকেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দুটি খেলায় বিজয়ী হয় এবং দুটি খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। এই পর্যটনে অ্যালেনের দল একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। ক্রমশঃই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটারদের শক্তি ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। ১৯৫০ সালে ইংলণ্ড পর্যটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দুর্বার গতিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাটিংয়ে ত্রয়ী—উইক্‌স, ওয়ালকট ও ওরেল দুর্ধর্ষ। এবার ফাস্ট বোলারদের সঙ্গে আবির্ভাব ঘটে স্পিনারদের। রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের মত বোলারদের আবির্ভাব ঘটে। তারা খেলার পর খেলায় ইংলণ্ডের মত শক্তিশালী দলকেও পর্যুদস্ত করতে দ্বিধাবোধ করে নি। ১৯৫০ সালে প্রথম টেস্টম্যাচ ব্যতিরেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অন্য সমস্ত ম্যাচে বিজয়ী হয়।

ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্টম্যাচ পর্যায়ে জয়লাভের সূত্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বিশ্বের সেরা দলগুলির সমান মর্যাদা পায় এবং ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাঁচটি করে টেস্ট ম্যাচ খেলার অধিকার পায়। এ মর্যাদা অনুগ্রহ নয়, শক্তির প্রতিযোগ্য সম্মান প্রদর্শন।

১৯৫৩-৫৪ সালে স্যর লেন হাটনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর্যটনে এলে উভয় দলের শক্তি সমান সমান প্রমাণিত হয়। ইংলণ্ড দল দুটি টেস্টে জয়ী হয়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল জয়ী হয় দুটিতে এবং বাকী একটি খেলা শেষ হয় সমানে সমানে।

১৯৬৩ সাল থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের সূচনা। ফ্রাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ানের অধিবাসীরা এক নতুন উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইংলণ্ড পর্যটন সাফল্যে ও ক্রীড়াশৈলীর দ্যুতিতে বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সকল বিভাগে অতুলনীয় দক্ষতা দেখিয়ে গারফিল্ড সোবার্স ক্রিকেট দুনিয়াকে চমৎকৃত করেন। ব্যাটিং-এ সফল সহযোগিতা করেন কনরাড হান্ট, রোহন কানহাই, বেসিল বুচার ও জো সলোমন। দ্রুততার সঙ্গে বল করে ওয়েস্লি হল ও চার্লি গ্রিফিথ এবং স্পিন বোলিং'এ ল্যান্স গিবস বিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিনটি টেস্টে জয়ী হয়। ইংলণ্ড বিজয়ী হয়েছে একটি মাত্র টেস্ট খেলায়। সফল নেতৃত্বের পুরস্কার-স্বরূপে অধিনায়ক ওরেল স্যর উপাধিতে ভূষিত হন।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদের প্রথম টেস্ট ম্যাচ পর্যায়ের খেলা সুরু হয় ১৯৩০-৩১ সালে। জি সি গ্রাণ্টের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অস্ট্রেলিয়ায় একটি মাত্র টেস্টে জয়লাভ করে এবং বাকী চারটিতে পরাজিত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে জে ডি গডার্ডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে-দলটি অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় সে-দলটিও একটি খেলায় জয়লাভ করে এবং পরাজিত হয় বাকী চারটিতে। ১৯৫৪-৫৫ সালে আয়ান জনসনের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়ান দল আসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয় তিনটিতে, এবং দুটি খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে।

তারপর ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায়। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে এসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন নজীর সৃষ্টি করে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অস্ট্রেলিয়া দুটি টেস্টে জয়ী হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ী হয় একটিতে। দুটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ঐ দুটির মধ্যে একটি খেলায় সমান রাণ হওয়ায় "টাই" হয়। এর আগে ক্রিকেট ইতিহাসে "টাই"-এর নজীর নেই।

১৯৬৪-৬৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিজ দেশে অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ম্যাচে হারিয়ে দিয়ে বে-সরকারীভাবে বিশ্বের চ্যাম্পিয়ান দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ববি (আর বি) সিমসনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার যে-দলটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এসেছিল তারা প্রথম ও তৃতীয় টেস্টে পরাজিত হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ টেস্টম্যাচ শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। শেষ টেস্টে (পঞ্চম) অস্ট্রেলিয়া কোনক্রমে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তরুণ অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স সমগ্র দলকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে অস্ট্রেলিয়ার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। হলের ফাস্ট বোলিং-এর গুণে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে বিজয়ী হয়। গিবসের অফ-স্পিন বোলিং-এর গুণে তৃতীয় টেস্টে প্রাধান্য লাভ করে। হল প্রথম টেস্টে একাই নটি উইকেট দখল করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

ক্রিকেট-জগতে সোবার্সের মত সর্ব-বিভাগে পারদর্শী খেলোয়াড় খুবই কম দেখা গিয়েছে। তিনি বলে দুরকম স্পিন ধরাতে পারেন। সূচনায় বল করাতেও তাঁর সমান দক্ষতা আছে। মাঠে যে-কোন স্থানেই তিনি সমান দক্ষতার ফিল্ডিং করতে পারেন। অসাধারণ কৃতিত্বে দুরূহ ক্যাচ ধরে ধুরন্ধর ব্যাটসম্যানদের তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সোবার্স একাই তিনজন খেলোয়াড়ের সমান। অধিনায়ক হিসেবে দল পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তারও তুলনা বিরল।

বিশ্বজয়ের পথে বোলিংয়ের ভূমিকা

ধ্রুব রায়

বর্তমান ভারতসফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সদস্যদের নাম ঘোষিত হবার পর দলনেতা গ্যারী সোবার্স মন্তব্য করেছিলেন যে, এই দলটিই সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সোবার্সের এ উক্তি যুক্তিপূর্ণ নয়—যে দলে তিন ডবলিউর একজনও নেই, যে দলে রামাধিন, ভ্যালেনটাইন নেই সেই দল সম্পর্কে সোবার্সের এই উক্তি শুধু প্রচার মাত্র। কিন্তু না, একটা শক্তিশালী ক্রিকেট দল গঠন করতে হলে যা কিছু সংগ্রহের প্রয়োজন দলটিতে তার সব কিছু বর্তমান। গত গ্রীষ্মে ইংল্যান্ড সফরকারী দলটির থেকে এর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ইংল্যান্ডে যাঁরা সাফল্যলাভ করেছেন তাঁদের কেউ বাদ পড়েননি—নতুন যাঁরা দলে যোগ দিয়েছেন, সোবার্স জানেন বর্তমান সফরে ও আগামী দিনে এইসব নবাগতদের কাছ থেকে অনেক কিছু পাবার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বিশ্বক্রিকেটের প্রাধান্য নিয়ে লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্থান ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট মান পূর্বোক্ত দুই প্রধানের তুলনায় অনেক দুর্বল। যদিও এইসব দেশে বিভিন্ন সময়ে এমন অনেক খ্যাতিমান ক্রিকেটার ছিলেন যাঁরা নিঃসন্দেহে বিশ্বক্রিকেট ইতিহাসের গৌরব, কিন্তু সামগ্রিক দল হিসাবে এইসব দেশ কখনও অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের শক্তির সমকক্ষ হতে পারেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বক্রিকেটের আঙিনায় এল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। নতুন অধ্যায়ের বিস্ময়—ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। ব্যাটিংয়ের প্রাচুর্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যুদ্ধোত্তর কালে সবসময়েই বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জর্জ হেডলির উত্তরসাধক ওরেল, উইক্‌স, ওয়ালকট, রে, স্টলেমায়ার ব্যাটিং-এ বানের বান ডাকিয়েছেন। বর্তমানে সোবার্স, কানহাই, হান্ট, বুচার, নার্স ও অন্যান্যরা তাঁদের পূর্বসূরীদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু যে কোন দলের পক্ষেই ম্যাচ জিততে হলে ব্যাটিংই তার সব মূলধন নয়; চাই প্রয়োজনীয় বোলার, যার অভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৯৬৪-র আগে বিশ্ববিজয়ীর সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আর ঠিক সেই কারণেই ব্যক্তিগত ভাবে দলের অনেকেই ব্যাটিং-এ যথেষ্ট সাফল্যের নিদর্শন রাখলেও, ১৯৪৮ সালের ভারতসফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল মাত্র একটি টেস্টম্যাচ জিতেছিলেন—ভাগ্য অপ্রসন্ন না থাকলে শেষ টেস্ট ম্যাচে ভারত শেষ মুহূর্তে জয়ের গৌরব থেকে হয়তো বঞ্চিত হোত না। আর তাহলে উইক্‌স, ওয়ালকট, স্টলেমায়ার, রে, হেডলী প্রভৃতি বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড়েরা থাকা সত্ত্বেও সেদিন তাদের টেস্ট-সিরিজ অমীমাংসিত রেখেই দেশে ফিরে যেতে হোত। বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করার অন্যতম কারণ,—দলের ব্যাটিংয়ের শক্তির তুলনায় বোলিংয়ের ধার ছিল নিতান্ত নগণ্য।

এই দুর্বলতার কথা স্মরণে রেখেই প্রথম দুটো টেস্টে অধিনায়ক গডার্ডকে বিরাট রান সংখ্যার ভার চাপিয়ে ভারতকে দুর্বল করে দেবার পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। কিন্তু ছ'শর ওপর রান করেও গডার্ড ম্যাচ জিততে পারেননি, কারণ ম্যাচ জেতার প্রয়োজনীয় ব্যাটিং ফিল্ডিং থাকা সত্ত্বেও আসল অস্ত্র তাঁর তূণে ছিল না—যার নাম ম্যাচ জেতার বোলিং। কারণ গোমেজ ছাড়া জোন্স, ট্রীম, ফার্গুসন, গডার্ড, ক্যামেরণ কেউই প্রথম শ্রেণীর বোলার হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য নন।

১৯৫০ সাল,—এবারও জন গডার্ডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাড়ি দিল ইংল্যান্ডে।

সনি রামাধিন

আলফ ভ্যালেনটাইন

ব্যাটিংয়ের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল যখন দুই ডবলিউ—উইক্‌স ও ওয়ালকটের সঙ্গে যোগ দিলেন তৃতীয় ডবলিউ ওরেল; এখানেই শেষ নয়—এবার দলে আছেন দুজন দুর্ধর্ষ বোলার, রামাধিন ও ভ্যালেনটাইন। গডার্ড জানতেন ১৯৪৮ সালের দল আর ১৯৫০ এর দলের শক্তির পার্থক্য কতখানি; তাই প্রথম টেস্টে প্রতিকূল আবহাওয়ায় হেরে গিয়েও গডার্ড দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পেরেছিলেন যে তাঁর দল সিরিজ জিতবে।

১৯৫০ সালের রামাধিন এক আশ্চর্য বোলার। ডান হাতে অফব্রেক ও লেগব্রেক বল করতেন কিন্তু তাঁর বল করার ভঙ্গীতে অফব্রেক আর লেগব্রেকের তফাৎ ধরা যেত না—অন্ততঃ ১৯৫০ সালের ইংল্যান্ডের ব্যাটস্‌ম্যানদের এটাই ছিল দারুণ সমস্যা। অসহায়ের মত সব আউট হয়েছেন। পায়ে অস্ত্রোপচার করায় ডেনিস কম্পটন সেই সিরিজের প্রথম দুটো টেস্ট খেলতে পারেন নি। টেলিভিশনে রামাধিনের বল বোঝার চেষ্টা করেছিলেন—সমাধান পাননি। মাঠে নেমেও তিনি একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সিরিজের শেষে স্বীকার করেছেন যে, তিনি বোঝেন না রামাধিনের কোনটা অফব্রেক কোনটা লেগব্রেক। পরবর্তী কালে রামাধিনের সেই অসামান্য সাফল্যের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাইনি। তার কারণ, কেউ বলেন রামাধিনের সেই অফব্রেক, লেগব্রেকের ধাঁধা পরবর্তীকালে ব্যাটসম্যানদের কাছে অনেক স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল; আবার কেউ বলেন, অন্যান্য স্পীন বোলারদের মত রামাধিন ব্যাটসম্যানকে বল মারার জন্য আহবান করাটা পছন্দ করতেন না তাই কেউ তাঁর বল পিটিয়ে খেললেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো এবং তখন তিনি এলোমেলো বল ফেলতে শুরু করতেন। এই রহস্য প্রকাশ

ওয়েসলি হলের বোলিংয়ের ভঙ্গী

পাবার পর থেকে প্রতিপক্ষ সবসময়ই রামাধিনের এই মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছে। তাছাড়া ইংল্যান্ড ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য ক্রিকেট মাঠের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক বেশী সূর্যালোকে আলোকিত। এই উজ্জ্বল আলোতে রামাধিনের আঙুলের কাজ ব্যাটসম্যানেরা অনেক স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন।

রামাধিনের সঙ্গে ছিলেন ন্যাটা অফস্পিনার ভ্যালেন্টাইন। নিখুঁত লেংথের বলে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। যুদ্ধোত্তর কালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, বোলিংএ ভ্যালেন্টাইনের সাহায্যেই পেয়েছে সব থেকে বেশী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অফস্পিনারদের মধ্যে তিনি অন্যতম বলে স্বীকৃত।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিং এদের ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। যদিও এই সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অনেক টেস্ট ম্যাচে জিতেছে, ১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ডে সিরিজ জিতেছে কিন্তু তখন পর্যন্ত দলে বর্তমান ক্রিকেটের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী প্রয়োজনীয় ফাস্ট বোলার ছিল না। ১৯৫৫-র পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একাধিক ফাস্ট বোলারদের সমাগম হোল, যাঁদের মধ্যে অন্যতম গিলক্রীস্ট, হল, গ্রিফিথ, কিং, স্টেয়ার্স, ওয়াটসন। ফাস্ট বোলার হিসাবে গিলক্রীস্ট এদের মধ্যে অধিকতর কুশলী। স্পিডের সঙ্গে সুইংএর ওপর তাঁর দখল ছিল। ফাস্ট বোলাররা সাধারণতঃ তাঁদের বলের গতির ওপরেই বেশী নির্ভরশীল। ব্যাটস্‌ম্যানকে আউট করার ব্যাপারে সেইটাই তাঁদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। তার সঙ্গে থাকে বাম্পার ও বীমার। ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে যত নিকটে পিচ ফেলে বল তোলা যায় বাম্পার তত কার্যকরী হয়। গিলক্রীস্ট লেংথ—থ্রীকোয়ার্টার থেকে বল তুলে দিতে পারতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ইয়র্কারে সিদ্ধহস্ত। ফাস্ট বোলারের সবরকম গুণের সমন্বয় ঘটেছিল গিলক্রীস্টের মধ্যে। এছাড়া ছিল ফাস্ট বোলারের 'ফায়ার'—তাঁর হাবেভাবে, বল করতে আসার ভঙ্গীতে, বল করার রীতিতে, মোটকথা মাঠের মধ্যে সব কিছুতেই তাঁর একটা সংহারমূর্তি ছিল—ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফায়ার'। কিন্তু অকালে তাঁকে ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতে হোল। কারণ তাঁর মাথাতেও 'ফায়ার' ছিল। বদমেজাজী ক্রিকেটার হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বিশ্বক্রিকেটের আঙিনা থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ওয়েসলি হল, বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার। হল প্রথম বিশ্বক্রিকেটের আঙিনায় আসেন ভারতসফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ১৯৫৮ সালে। তখন হলের বলের গতি ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বেশী, বিশেষতঃ বল মাটিতে পড়ার আগে। কিন্তু সুইংয়ের ওপর দখল ছিল না। বর্তমান হলের বলে গতি অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু সুইং তাঁর দখলে এসেছে। আর সেই কারণেই হলকে এখন শ্রেষ্ঠ বোলারের আখ্যা দেওয়া হয়।

চার্লি গ্রিফিথ। হল গিলক্রীস্টের তুলনায় গ্রিফিথের বলের গতি কিছু কম, অনেক কম দৌড়ে এসে বল করেন। কম দৌড়ে এসে তিনি যে গতিতে বল করেন ব্যাটসম্যানের কাছে সেটা অতর্কিত আক্রমণের মতন। তাছাড়া গ্রিফিথের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছে ইয়র্কার। পিচ যখন ফাস্ট বোলারের সহায়ক নয় ইয়র্কার তখন তার একমাত্র অস্ত্র। গ্রিফিথের বল করার পদ্ধতি নিয়ে সারা বিশ্বে এক বিতর্কের আলোড়ন উঠেছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত অস্ট্রেলিয়া দলের গত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের পর থেকে। শুরু করলেন নরমান ওনীল, গ্রিফিথের বিরুদ্ধে আর কখনও খেলবেন না এই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে। পরে অধিনায়ক সিমসন তাঁর সদ্য প্রকাশিত বিতর্কমূলক বইতেও (ক্যাপটেনস্‌

স্টোরি*) মোটামুটি একই প্রতিবাদের পুনরাবৃত্তি করেছেন। গ্রিফিথের বিরুদ্ধে সিমসন এখন ব্যাট ছেড়ে কলম ধরেছেন। ফিংগলটন বলেছেন যে, সিমসন আসলে গ্রিফিথের বলে খেলতে ভয় পান। তাঁর খেলা দেখলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে লেগ সাইডে আচমকা বাম্পার বা দ্রুতগতি সম্পন্ন হঠাৎ-নেমে-পড়া ইয়র্কারে তিনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না।

গ্যারফিল্ড সোবার্স। সোবার্স বিশ্ব-ক্রিকেটের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অল রাউন্ডার। বাঁ হাতে বল করেন। মোটামুটি সবরকম বলই তাঁর দখলে। নতুন বলে উভয় দিকে সুইং করান ও পুরোন বলে অফস্পিন, লেগস্পিন, চায়নাম্যান বল করেন। তার চেয়ে বড় কথা কখন কোন বল পিচের উপযোগী হবে, কোন বলে ব্যাটসম্যান বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হবেন এ বিচারে তিনি সিদ্ধহস্ত। সোবার্স প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন স্লো স্পিনার হিসাবে। সোবার্স এখন দলের বোলিং শক্তির সুদৃঢ় যোগসূত্র। হাওয়ায় আদ্রতা বেশী থাকলে, পিচ সুইংয়ের উপযোগী হলে নিজেই নতুন বলে আক্রমণ শুরু করেন। হল, গ্রিফিথকে বিশ্রাম দিয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত রাখতে নিজে বল করে সাহায্য করেন। পিচ স্পিনের উপযোগী হলে গিবস বা হলফোর্ডের সহযোগিতায় স্পিন আক্রমণ রচনা করেন। যে কোন দলের পক্ষে বোলার সোবার্স মূল্যবান সামগ্রী।

লান্স গিবস। ডান হাতে অফস্পিন বল করেন। ১৯৫৮ সালে ভারতসফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে প্রথম এদেশে আসেন। সেদিনের তরুণ অনভিজ্ঞ গিবস্ আজ কৃতী অফস্পিনার। টেস্ট ম্যাচে যে অল্প কয়েকজন হ্যাটট্রীক করার গৌরব অর্জন করেছেন গিবস্ তাঁদের মধ্যে একজন। হল, গ্রিফিথ যখন উইকেট থেকে সাড়া না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন গিবস তখন হাল ধরেছেন আর খুব কম ক্ষেত্রেই এ কার্যে তিনি অসফল হয়েছেন। এটাই তাঁর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় অবদান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিজয় অভিযানে এই ক'জন বোলারের কৃতিত্ব দলকে পূর্ণতা দিয়েছে। ব্যাটিং এবং ফিল্ডিংয়ের সঙ্গে বোলিংয়ে শক্তির এই সমন্বয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দলের সম্মানে ভূষিত করেছে।

---

* অস্ট্রেলীয়ার ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফ লেখকের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করার পর বইটির প্রকাশক বইটি বিক্রয় করা স্থগিত রেখেছেন।

অদ্বিতীয় সোবার্স

অনন্য রায়

আজকের দিনে কোনো ইস্কুলের ছেলেকেও যদি প্রশ্ন করা যায় : ক্রিকেটের রাজ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকোস খেলোয়াড় কে, তৎক্ষণাৎ উত্তর শোনা যাবে—সোবার্স। এবং জবাবটা হবে তার খুবই সঠিক। বোলিঙে, ব্যাটিঙে, ফিল্ডিঙে এবং দেশের অধিনায়কত্বে গারফিল্ড সোবার্স এক-ডাকে সকলের সেরা। তাঁর মতো খেলোয়াড় অতীতে কখনও দেখা যায় নি, ভবিষ্যতেও যাবে কিনা সন্দেহ। প্রতিভা আর অনুশীলনের এত সার্থক সমন্বয় বড় সহজ ব্যাপার নয়। ক্রীড়া-কৌশলের এমন উৎকর্ষ 'কোটিকে গুটিক মেলে' বললেও যেন তা বাড়িয়ে বলা মনে হবে। সোবার্স অদ্বিতীয়।

কিন্তু তাই বলে সোবার্স আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নন। প্রতিভার কথা আগেই বলেছি, তবু তার চেয়েও যা বড় কথা তা হল তাঁর সাধনা এবং আত্মবিশ্বাস। নিজের ওপর বিশ্বাস তাঁর এতই বেশি যে, প্রতিভাবান মানুষেরা সাধারণত যা করে থাকেন—অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ দিকে চর্চা ক'রে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা—সেইভাবে নিজেকে একটি সাধনাতেই আটকে না রেখে সোবার্স নতুন-নতুন দিকের উৎকর্ষ অর্জনের জন্যেও সাহসী হয়েছেন। আর তাঁর এই আত্মবিশ্বাসের সুফলও পেয়েছেন তিনি হাতে-হাতেই।

তাছাড়া আরও একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। সোবার্স প্রথম থেকেই একেবারে আত্মশিক্ষিত খেলোয়াড়, কখনো তিনি কোনো কোচিং গ্রহণ করেন নি। এবং ভাগ্যও তাঁকে কোনোদিক থেকে খুব একটা সুবিধে দেয় নি। সোবার্স জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৩৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বারবাডোজ-এ। তাঁর বাবা ছিলেন সদাগরী জাহাজের নাবিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ-ডুবি হয়ে মারা যান তিনি। সোবার্সের বয়স তখন মাত্র চার বছর। অবস্থা তাঁদের মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। সোবার্সের মা বেশ কষ্ট করেই তাঁকে এবং তাঁর তিন ভাই আর দুই বোনকে মানুষ করে তোলেন।

তবে টানাটানির সংসারে বেড়ে উঠলেও একটা দিকে সোবার্স ছিলেন ভাগ্যবান। ক্রিকেট খেলার দিক দিয়ে বারবাডোজের পরিবেশ ছিল খুবই অনুকূল। সেইজন্যে আমাদের পূর্ববঙ্গের নদীনালার দেশের ছেলেরা যেমন প্রায় নিজের অজান্তেই সাঁতার শিখে যায়, সেইরকম বছর দশেক বয়সে সোবার্সও রীতিমত ক্রিকেট খেলা শিখে যান। তখন তিনি ছিলেন কেতাদুরস্ত ন্যাটা স্লো বোলার, এবং খেলতেন নিজের শিক্ষাস্থান বে স্ট্রীট ইস্কুলে। চোদ্দ বছর বয়সে ইস্কুলের পাট শেষ করে তিনি একটা জাহাজী আপিসে কেরানির কাজে ঢুকে পড়েন। অবসর সময়ে খেলাও অবশ্য চলতে থাকে ক্লাবের দলে। ষোল বছর বয়সে সফররত ভারতীয় দলের বিপক্ষে খেলার জন্যে 'বারবাডোজ একাদশে' মনোনীত হন তিনি। তারপর ১৯৫৪ সালে, বয়স যখন

টেস্ট ক্রিকেটে গারফিল্ড সোবার্স

১২ই ডিসেম্বর (১৯৬৬) পর্যন্ত সংশোধিত

	ব্যাটিং				বোলিং	
বিপক্ষ দেশ	টেস্ট খেলা	মোট রান	ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী সংখ্যা	মোট রান	মোট উইকেট
ইংল্যান্ড	২১	২১১৩	২২৬	৭	১৯০৮	৫৮
অস্ট্রেলিয়া	১৪	১০১৩	১৬৮	২	১২৯২	৩৩
ভারতবর্ষ	১০	৯৮১	১৯৮	৫	৭৬৫	৩৩
পাকিস্তান	৮	৯৮৪	৩৬৫*	৩	৪৫৫	৪
নিউজিল্যান্ড	৪	৮১	২৭	০	৪৯	২
মোট :	৫৭	৫১৭২	৩৬৫*	১৭	৪৪৬৯	১৩০

তাঁর আঠারো বছরেরও কম, তখনই তিনি মনোনীত হন টেস্ট ক্রিকেট খেলার জন্যে। ইংলন্ডের বিপক্ষে সেটা ছিল হারের খেলা। তবু তিনি ৭৫ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট নিতে সক্ষম হন, আর এইটেই ছিল সে খেলার সব থেকে উল্লেখযোগ্য বোলিং-সাফল্য।

কিন্তু সোবার্সের কাছে কোনো সাফল্যই যেন শেষ কথা নয়, আজীবন তিনি চির-নতুন অভিজ্ঞতার পূজারী। প্রথম টেস্টের বোলিঙের ব্যাপারে মোটেই তিনি খুশি হতে পারলেন না। চলে এলেন এবার তাই ব্যাটিঙের দিকে। তারপর ১৯৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে লিন্ড-ওয়াল আর মিলারের মতো বোলারের হাত থেকে মিনিট পনেরর মধ্যেই ছিনিয়ে নিলেন ৪৩ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এর পর ১৯৫৬ সালে যায় নিউজিল্যান্ডে এবং ১৯৫৭ সালে ইংলন্ড সফরে, বলাবাহুল্য সোবার্সও ছিলেন সে দলে, এবং তখনই তাঁর শিক্ষানবীশীর পর্বও শেষ হয়, বলা চলে। ইংলন্ড সফরের সময়ে তাঁকে দেখা গিয়েছিল উৎসাহে ভরপুর একটি তেজী ঘোড়ার মত—ক্রীড়াকৌশল আয়ত্তের জন্যে যেমন সজাগ, তেমনি সাবলীল আর অপ্রতিরোধ্য। উচ্চাশা যে তাঁর কত প্রবল তাও বোঝা গিয়েছিল তখনই সুনিশ্চিত-ভাবে।

বোলিঙ ও ব্যাটিঙে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করার পর সোবার্স এবার মন দিলেন ফিল্ডিঙের দিকে। তাঁর অত্যন্ত

সজাগ দৃষ্টি, অসাধারণ ক্ষিপ্রতা এবং নির্ভুলভাবে বল ধরার কায়দায় কঠিন ক্যাচও মনে হ'তে লাগল যেন কতই না সহজ। এর পর তিনি স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের কাছ থেকে পেলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব। এবং দল-নায়ক হিসাবেও তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

বিভিন্ন দিকে তাঁর সাফল্যের পরিসংখ্যান এই সঙ্গেই দেওয়া হল। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্বের সেই তালিকা অবাক করে দেবার মতো হলেও আসল মানুষটির ব্যক্তিত্ব কিন্তু তাতে কিছুই প্রায় বোঝা যাবে না। সোবার্স লম্বায় ছ ফিট, এবং তাঁর চলাফেরা যেন মস্ত একটি কালো বাঘের মত দ্রুত, অথচ স্বচ্ছন্দ। তাঁর কাঁধ দুটি বেশ চওড়া, পা দু-খানি লম্বা, গায়ে এক ছিটেও বাহুল্য মেদ নেই কোথাও। শরীরের চওড়া হাড়ের সঙ্গে ছিমছাম সুগঠিত পেশীগুলি যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। তাঁর কপাল বেশ উঁচু, মুখখানি তিরু-তিরে, চোখের দৃষ্টি ক্ষিপ্র এবং কেমন যেন রহস্যময়, আর গলার স্বর রীতিমত সুরেলা। তাছাড়া কথা বলার সময় জোরে চিৎকার করাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। দলের অধিনায়ক হিসাবে তিনি সাধারণত অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করার চেয়ে নিজের বিচার-বিবেচনাকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করেন। তাঁর দলের এক-

জন সতীর্থ তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বলেছিলেন, "অধিনায়কত্বের ক্ষমতা যেন তাঁর একেবারেই সহজাত ব্যাপার। খেলার গতি কোন দিকে তা তিনি অতি সহজেই ধরতে পারেন, এবং সেটা ঘটে মাঠের অন্য খেলোয়াড়দের আগেই। তাছাড়া বোলার হিসাবে তিনি নিজেকে এমনভাবে কাজে লাগান যেন মনে হয় নিজের অধিনায়কত্বেই তিনি অন্য এক-জন খেলোয়াড়ের মত খেলছেন।"

অথচ সোবার্সকে এমনিতে দেখলে অনেকের হয়ত মনে হবে না যে, ক্রিকেট তাঁর কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মাঠের বাইরে তিনি রীতিমত গল্পে আর আমুদে মানুষ। স্বভাবের মধ্যে তাঁর ঔদ্ধত্য বা কর্কশতার লেশমাত্রও নেই—অত্যন্ত ভদ্র, সহৃদয় আর বন্ধুত্বপূর্ণ তাঁর আচরণ। দলের অধিনায়কত্ব করার সময়েও ড্রেসিং-রুমে তিনি অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করেন, তাঁরা কেউ ঠাট্টা ফিরিয়ে দিলে রীতিমত উপভোগও করেন, আর মাঝে-মাঝে বেশ আড্ডাও জমিয়ে তোলেন।

কিন্তু মাঠে নামলে তিনি অন্যরকম। দর্শনীয় মার বা উপভোগ্য বল করার দিকে তাঁর নজর অবশ্য অন্য অনেক খেলোয়াড়ের চাইতেই বেশি, তবু যখন হার-জিতের সমস্যা সূক্ষ্মসূত্রে দোদুল্যমান তখন সোবার্স সৈনিকের মত সীরিয়াস। তখন কারো মনেই হবে না যে এই মানুষই কখনো-সখনো ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে বাজি ধরেন বেপরোয়াভাবে। কারণ, ক্রিকেট নিয়ে তিনি জুয়ো-খেলার মত বাজি ধরেন না। শুধু, দরকার মত ঝুঁকি নেন, তাও বুঝেসুজে—যখন তিনি অনুভব করেন যে. তাতে প্রতিপক্ষের চেয়ে নিজের দলের সুবিধে হবে অনেক বেশি। আর একথা তো আগেই বলা হয়েছে যে, ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বিচার করে দেখা আর ভবিষ্যৎ আঁচ করার ক্ষমতা সোবার্সের অন্য অনেকের চেয়েই ঢের বেশি।

পারিবারিক দিক দিয়ে সোবার্স খুবই সাদাসিধে আর নির্ভরযোগ্য মানুষ। প্রায় ৩০ বছর বয়স হলেও সোবার্স এখনো অবিবাহিত। বাড়ী বলতে এখনো সেই বারবাডোজের গৃহটি—যেখানে আছেন তাঁর মা। পৃথিবীর যে কোনো দেশেই থাকুন না কেন, মায়ের কাছে ফিরে আসা তাঁর কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার।

সামান্য একজন জাহাজ-কর্মীর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে অকালে পিতৃহীন সোবার্স আজ নিজের প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফলে সমাজের উচ্চতম মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিজের ক্ষমতার বিষয়ে অচেতন না হলেও তিনি আন্তরিকভাবেই বিনয়ী এবং নিরহঙ্কার। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে তিনি সার্থক শিল্পীর মতই গভীর আত্মমর্যাদায় সদা-প্রসন্ন।

তিনি তাঁর জননীর আনন্দ এবং জন্ম-ভূমির মুখ উজ্জ্বল করেছেন বলে ক্রীড়া-মোদী মানুষ হিসেবে আমরাও সোবার্সকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে পেরে আনন্দিত।

ক্রিকেটে থ্রি ডবলিউ

ভবতোষ সাহা

একটি মাত্র ইংরেজী অক্ষর 'ডবলিউ', কিন্তু মহিমা অপার। সাধারণ এই অক্ষরটি অসাধারণ তিনটি নামের মহিমায় মুখর। নামের পেছনে কীর্তি অবশ্য আরও মহনীয়। আর এই কীর্তি থেকেই ক্রিকেট জগতে বিখ্যাত 'থ্রি ডবলিউ'-এর আবির্ভাব। সেটা ১৯৪৮ সাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসেছে পোর্ট অব স্পেনে। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারী। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে খেলতে নামলেন উইকস, ওরেল এবং ওয়ালকট। ওদের রানসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬, ৯৭ এবং ২০। টেস্টে ওরেলের এই প্রথম আবির্ভাব এবং প্রথম আবির্ভাবেই চমক। সে তুলনায় উইকস-ওয়ালকট খুব একটা প্রত্যাশার ঢেউ তুলতে পারলেন না। ওরা দুজনে আবার ওরেলের আগে টেস্টে হাতেখড়ি নেন। অবশ্য এই সিরিজেই—প্রথম টেস্টে। উইকস-ওয়ালকট ছিলেন দুই ডবলিউ। এবার ওরেলের আগমনে তিন ডবলিউ পূর্ণ হলো। ক্রিকেট জগতে

ওয়ালকট

'থ্রি ডবলিউ'-এর অভ্যুদয় হলো। কিন্তু প্রত্যাশিত কীর্তিগাথা রচিত হতে আর একটু সময়ের দরকার ছিল। কারণ 'কীর্তি-র্যস্য সঃ জীবতি' সে কীর্তি অত সহজে আসে না। আসে ধীর পায়ে, মৃদু গতিতে। কিন্তু টেস্ট ম্যাচের এই সিরিজেও চমকের কিছু কমতি ছিল না। ওরেল করলেন তাঁর **টেস্ট জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী। জর্জটাউনের** তৃতীয় টেস্টে। রানসংখ্যা ছিল ১৩১ নট আউট। কিংসটনের চতুর্থ টেস্টে উইকসও ভেলকি দেখালেন। ১৪১ রান দিয়ে জীবনে সেঞ্চুরীর উদ্বোধন করলেন। ওরেলের জন্য কিন্তু এখানে আরও সম্মান অপেক্ষা করে ছিল। ব্যাটিংয়ের গড়পরতায় তিনি উভয় দলের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেন। ওরেলের সংগ্রহে ছিল ২৯৪ রান। গড় দাঁড়ালো ১৪৭·০০। আবির্ভাবেই বাজিমাৎ করলেন। 'থ্রি ডবলিউ'-এর বিরাট কীর্তি-সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ওরেল-উইকস।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষা বুঝি তর সয় না। সাফল্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য তার আগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। কেউ জানতো না যে সাফল্য ওদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রয়োজন শুধু অভিনয়ের। সে অভিনয়ের আসর বসলো ইংল্যান্ডে। ১৯৫০ সালে জন গডার্ডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এলো ইংল্যান্ড সফরে। রানের বান ডাকলো। জোরসে ব্যাট হাকড়ালেন ওরেল-উইকস-ওয়ালকট। ওরেল একটি ডবল সেঞ্চুরী (২৬১) এবং একটি সেঞ্চুরী (১৩৮) করে দলের জয়লাভের পথই শুধু প্রশস্ত করালেন না। 'থ্রি ডবলিউ'-এর কীর্তি রচনার সফল নেতৃত্ব দিলেন। উইকস এবং ওয়ালকট তাঁকে সাহায্য করলেন একটি করে সেঞ্চুরী করে—যথাক্রমে ১২৯ রান এবং ১৬৮ রান নট আউট। এছাড়া প্রতিটি টেস্টেই এই ত্রয়ীর রানসংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। এই

উইকস্

সিরিজেও ওরেল করলেন সর্বাধিক মোট ৫৩৯ রান। যার গড় দাঁড়ালো ৮৯·৯৩। এই সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করলো ৩-১ খেলায় এবং উইকস-ওরেল-ওয়ালকটের নাম ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বব্যাপী—ক্রিকেট-জগতে 'থ্রি ডবলিউ' প্রবাদে পরিণত হলো।

কিন্তু এই তো সবে গোড়াপত্তন, পরের ইতিহাস আরও রোমাঞ্চকর, আরও অনেক বেশি উত্তেজনায় ভরা। প্রতিপক্ষের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ালেন উইকস-ওয়ালকট-ওরেল। এ'দের শেষজনকে উইকেট থেকে বিদায় না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এ'রা যে কখন কি ভেলকিবাজি দেখাবেন তার ঠিক নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর কার্ডে এই 'থ্রি ডবলিউ'-এর স্থানও নির্দিষ্ট হয়ে গেল এইভাবে : ওয়ালকট-উইকস-ওরেল অথবা উইকস-ওরেল-ওয়ালকট আবার কখনও ওরেল-উইকস-ওয়ালকট। এগিয়ে চললো 'থ্রি ডবলিউ'-এর বিজয় অভিযান, ক্রিকেটে রচিত হলো নয়া ইতিহাস।

১৯৫০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নটিংহাম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে মোট রান ওঠে ৫৫৮। এর মধ্যে 'থ্রি ডবলিউ'-এর অবদান হচ্ছে ৩৯৮ রান। ব্যক্তিগত সংগ্রহে ওরেল ২৬১ রান, উইকস ১২৯ রান এবং ওয়ালকট ৮ রান। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ত্রিনিদাদে আর এক অত্যাশ্চর্য স্কোর বোর্ড রচিত হলো। প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে উইকস-ওরেল-ওয়ালকট করলেন যথাক্রমে ২০৬ ও ১, ১৬৭ ও ৫৬ এবং ১২৪ ও ৫৩। আশ্চর্যের বুঝি আর শেষ নেই। ১৯৫৪-

ওরেল

৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কিংসটনে প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়ালকট-উইকস-ওরেল রান তুললেন যথাক্রমে ১৫৫ ও ১১০, ৫৬ ও ৩৬ নট আউট এবং ৬১ ও ১২। এই সিরিজেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আর এক চমক। সে আসরে ওরেল অনুপস্থিত। কিন্তু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ত্রিনিদাদে ওয়াল-কট-উইকস এক অবিশ্বাস্য ভূমিকা নিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে এ'রা করলেন যথাক্রমে ১২৬ ও ১১০ এবং ১৩৯ ও ৮৭ নট আউট। সকলের আগে বলা উচিত ছিল, কিন্তু সকলের শেষে বলি ভারতের বিরুদ্ধে ও'দের রানসংখ্যার কথা। একটি উদাহরণই অবশ্য যথেষ্ট। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতের বিপক্ষে কিংসটন টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬ রানের মধ্যে 'থ্রি ডবলিউ' করলেন ৪৬৪ রান এবং ওদের ব্যক্তিগত সংগ্রহটা লক্ষ্য করার মত। ওরেল-উইকস-ওয়ালকট রান তুললেন যথাক্রমে ২৩৭, ১০৯ এবং ১১৮। উদাহরণ আরও দেওয়া যায়, সে চেষ্টা করে লাভ নেই। কারণ যেখানে এই ত্রয়ীর সমাবেশ সেখানেই নতুন ইতিহাস।

WEST INDIES	
1st INNINGS	576
2nd INNINGS	
	RUNS
1 B. PAIRAUDEAU	58
2 J. STOLLMEYER	13
3 F. WORRELL	237
4 E. WEEKES	109
5 C. WALCOTT	118
6 R. CHRISTAINI	4
7 G. GOMEZ	12
8 R. LEGALL	1
9 F. KING	0
10 A. SCOTT	5
11 A. VALENTINE	4
12 N. BONITTO	

১৯৫২-৫৩ সালে ভারতের বিপক্ষে কিংসটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ১ম ইনিংসের রানসংখ্যা

উইকস-ওয়ালকট-ওরেল প্রসঙ্গে এবার কিছুটা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের হিসেবনিকেশ করা যাক। ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ উইকসের জীবনের শেষ টেস্ট খেলা। তারপরই তিনি অবসর নেন। 'থ্রি ডবলিউ'-এর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম বিদায় নিলেন। একসময়ে এভার্টন উইকস ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক মোট রান (৪৪৫৫ রান ৪৮টি টেস্টে) করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে এই কৃতিত্বের অধিকারী স্বদেশেরই গারফিল্ড সোবার্স (৫২৭৫ রান)। তবে উইকস আজও এক অনবদ্য কৃতিত্বের অধিকারী। টেস্ট ক্রিকেটে উপর্যুপরি পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরী আজও তাঁর অক্ষুণ্ণ অম্লান বিশ্বরেকর্ড। ১৯৪৭-৪৮ সালে টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৪১ রান করে কিংসটনে তিনি এই গৌরবময় রেকর্ডের সূচনা করেন। সম্পূর্ণ করেন পরবর্তী সফরে (১৯৪৮-৪৯ সাল) ভারতে এসে। দিল্লী টেস্টে ১২৮, বোম্বাই টেস্টে ১৯৪ এবং কলকাতা টেস্টে উভয় ইনিংসে করলেন ১৬২ ও ১০১—এইভাবে উপর্যুপরি ইনিংসে পাঁচটি সেঞ্চুরী উইকসের খেলোয়াড় জীবনের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। হয়তো ষষ্ঠ সেঞ্চুরীর গৌরবও তিনি লাভ করতেন কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল। তাই মাদ্রাজ টেস্টে ৯০ রান করে তিনি রান আউট হয়ে যান।

১৯৫৮-৫৯ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ সমাপ্ত করে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ওয়ালকট। 'থ্রি ডবলিউ' অনেক পরিমাণে রিক্ত হয়ে পড়লো। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে বিদায় নিলেন উইকস এবং ওয়ালকট। 'থ্রি ডবলিউ'-এর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে একা রইলেন ওরেল। খেলোয়াড় জীবনে ৪৪টি টেস্ট খেলেছেন ওয়ালকট। সর্বমোট রান করেছেন ৩৭৯৮। টেস্টের একটি সিরিজে ব্যক্তিগত মোট ৮০০ বা তার বেশি রান করার নজীর আছে মাত্র সাতটি। এই তালিকায় ওয়ালকটের স্থান চতুর্থ। তাঁর রানসংখ্যা হলো ৮২৭ এবং গড় ৮২·৭০। ১৯৫৪-৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে এই রান সংগ্রহ করেন। এই সিরিজেই তিনি করেন দুটি বিশ্ব-রেকর্ড। একই সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী এবং দু'বার উভয় ইনিংসে শত রান। দ্বিতীয় ও পঞ্চম টেস্টে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে রান তোলেন ১২৬ ও ১১০ এবং ১৫৫ ও ১১০ রান। ব্যাটসম্যান ওয়ালকটের পরিচয়ের অন্তরালে কিন্তু তার উইকেটকীপারের পরিচয়ও উজ্জ্বল। এক্ষেত্রেও তিনি সমান দক্ষ। ৪৪ জনকে কট এবং ১১ জনকে স্টাম্পড করে তিনি সফল উইকেট-কীপারের যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

'থ্রি ডবলিউ'-এর সবশেষ দায়িত্বটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন করেন ওরেল। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতের বিপক্ষে ৫-০ খেলায় (১৯৬১-৬২ সালে) এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩-১ খেলায় (১৯৬৩ সাল) বিজয়ী হয়ে 'রাবার' বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। কেবলমাত্র হার হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। কিন্তু সে পরাজয়ও মহিমায় উজ্জ্বল। ক্রিকেট-রসিকরা কোনদিন ভুলতে পারবেন না ব্রিসবেন টেস্ট ম্যাচ এবং পরাজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরাট সম্বর্ধনার কথা। 'থ্রি ডবলিউ' সিরিজে তিনিই সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। মোট ৫১টি টেস্টে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রান করেন ৩৮৬০। অলরাউণ্ডার ক্রিকেটার ওরেল মোট উইকেট পান ৬৯টি। সেঞ্চুরী করার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব 'হোয়াইট ক্রিকেটে' এক অতুলনীয় নজীর। জন গডার্ডের নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৫০ সালের টেস্ট সিরিজের কথা আগেই বলেছি এবং সেই সঙ্গে ওরেলের সাফল্যের কথাও। এই সিরিজেই তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে নাটিংহামে তিনি একদিনে তোলেন ২৩৯ রান। এক্ষেত্রে তাঁর মোট রান ছিল ২৬১। এই ২৬১ রানে তিনি ৩৫টি বাউণ্ডারী এবং দুটি ওভার-বাউণ্ডারী মারেন। আবার ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে কিংসটন টেস্টে ২৩৭ রানে ৩৫টি বাউণ্ডারী মারেন ওরেল। একই ইনিংসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খেলার কৃতিত্বেও ওরেল অম্লান। ১৯৫৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে নটিংহামের তৃতীয় টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেটের জুটিতে খেলতে নেমে শেষ পর্যন্ত ১৯১ রান করে নট আউট ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেট থেকে 'থ্রি ডবলিউ'-এর গৌরবজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ওরেল অবসর নিলেন। ওভালে তাঁর শেষ টেস্ট খেলা, সেটা ১৯৬৩ সাল, ২৬ আগস্ট।

বিশ্ব-ক্রিকেটে ৬০০ বা তার বেশি রান করেছেন এপর্যন্ত মাত্র কুড়িজন ক্রিকেটার। এ'দের মধ্যে ওয়ালকট এবং উইকস অন্যতম। অবশ্য এক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান সর্বাপেক্ষা কীর্তিমান। তিনি একাই ছয়বার এই রানসংখ্যা স্পর্শ বা অতিক্রম করেছেন। ওয়ালকট ১৯৫৪-৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮২৭ রান এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে করেন ৬৯৮ রান। আর উইকস ভারতের বিপক্ষে দু'বার ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫২-৫৩ সালে করেন যথাক্রমে ৭৭৯ রান এবং ৭১৬ রান।

ক্রিকেট জগতে এই 'থ্রি ডবলিউ' ছিলেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। একই দেশে এবং একই সময়ে এরকম ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। মাত্র আঠার মাসের মধ্যে বিশ্বখ্যাত এই তিন ক্রিকেটারের জন্ম। বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ত্রয়ী ক্রিকেটার একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়। আগত এবং অনাগতকালের সকল ক্রিকেট খেলোয়াড় ও রসিকদের কাছে এ'রা সমান শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের পাত্র। বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা একই সঙ্গে আকর্ষণ করা খুব সহজ কথা নয়।

উইকস-ওরেল-ওয়ালকট
টেস্টের খতিয়ান

	টেস্ট খেলা	ইনিংস সংখ্যা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী সংখ্যা	গড়
উইকস	৪৮	৮১	৪৪৫৫	২০৭	১৫	৫৮·৬১
ওরেল	৫১	৮৭	৩৮৬০	২৬১	৯	৪৯·৪৮
ওয়ালকট	৪৪	৭৪	৩৭৯৮	২২০	১৫	৫৬·৬৮

ক্রিকেটে বোলিং

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ভারতীয় সফর এক সময়ে তো অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। অন্ততঃ গত বছর এই নিয়ে যে বাক-বিতণ্ডার ঝড় বয়ে যায়, তারপর অনেকেই এই অতি-আকাঙ্ক্ষিত সফরটিকে বাতিল বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তবে সুখের কথা, প্রস্তাবিত সফর বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং আমাদের কর্তা-ব্যক্তিদের চেষ্টা কিছু বেড়ে যায়। ব্যাপারটা অনেকটা এই-রকম দাঁড়িয়েছিল, এতবড় ক্রিকেটের আসর যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে না জানি ক্রিকেট রসাতলে যাবে। এ হেন সম্ভাবনায় ক্রিকেট-রসিকরা আরও অস্থির হয়ে পড়লেন। সকলেই একমত, এককথা, খেলা হওয়াটাই বড় কথা। কেননা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দলের সেরা সেরা খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাসে চলে। বিশেষ করে, সোবার্সকে না দেখলে, গ্রিফিতের মত মারাত্মক ফাস্ট বোলারকে না দেখলে জীবনের মত বড় একটা সাধ বাকি থেকে যায়। তাই দেশের অনেক অভাব-অনটনের মধ্যেও অনেক অসম্ভবকে ডিঙিয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে আনান চাই-ই, চাই এবং সে-ইচ্ছা পূর্ণ হল। এখন সবাই খুশি। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শুধু এক কথা—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ।

এবার আমাদের কথা। প্রথম টেস্ট শেষ হোল। এই খেলার মাত্র কয়েকদিন আগে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেন। অর্থাৎ কোনরকমে সেইসব তথাকথিত খেলোয়াড়দের একজোট করে নাম সাজিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য কর্তৃপক্ষ এর আগে ইরানী কাপ ও দলীপ ট্রফির খেলায় ভারতীয় দল গঠনের প্রস্তুতি হিসাবে ধরেছিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কার্যসিদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ দল গঠন দেখে সে-কথা স্বীকার করা যায় না। ভারতীয় দলে একটিও ফাস্ট বোলার ছিল না। এমনকি জয়সীমা ছাড়া আর একটি ওপনিং বোলারও ছিল না। প্রথম টেস্ট খেলায় দলের সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি নিয়েছিলেন অজিত ওয়াদেকার। কিন্তু তিনি যে বল করতে পারেন সে-কথা জানা ছিল না। এমনকি টেস্ট ম্যাচে তাঁর বোলিং ছিল নিতান্ত হাস্যাস্পদ। আমাদের ভারতীয় দলের অধিনায়ক পাতৌদি মাত্র এক ওভারের মধ্যেই ফাস্ট বোলিংয়ের ইচ্ছাটি সংবরণ করে তাঁর দক্ষ স্পিন্ বোলারদের হাতে নতুন বলটি তুলে দেন। ভাগ্য ভাল যে, স্পিন্ বোলার চন্দ্রশেখর আশার অতিরিক্ত ভাল বোলিং করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ফেলেছিলেন। কিন্তু এত সাফল্যেও শেষ রক্ষা হল না। কেননা, গলদটা ছিল শুরুতেই।

ক্রিকেটে নতুন বল একটা মারাত্মক অস্ত্র। যতবড় ব্যাটস্‌ম্যান হোন না কেন, এমন অস্ত্রে সহজ হতে তাঁর সময় লাগবে। নতুন বলটি যদি আবার তেমন জাঁদরেল ফাস্ট বোলারের হাতে পড়ে, তাহলে ত কথাই নেই। তাই দল গড়তে সবাই ফাস্ট বোলার খোঁজে, মনের মত নতুন বলের বোলার তৈরী করে নেয়। বিশেষ করে আজকের দিনে—ক্রিকেট দল বলতে ফাস্ট বোলার।

এতবড় দেশ যেখানে একাম্ন কোটি লোকের বসবাস, আর ক্রিকেট বলতে যে-দেশে মুখ দিয়ে জল পড়ে, সে-দেশে একটা ফাস্ট বোলার হয় না। জানি না, এতদিনের অন্বেষণের শেষেও আমরা একটা ওপনিং বোলার গড়ে নিতে পারলাম না। অথচ এরই নামে কত না অর্থব্যয় হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা গেল। অবশ্য এই প্রতিবন্ধকতার কারণ আছে।

ফাস্ট বোলিং করবার যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, তা আমাদের দেশের খেলোয়াড়-দের নেই। অনেক চেষ্টা করেও একটা সাধারণ চেহারার মানুষকে সত্যিকারের ফাস্ট বোলারের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। এবং সে-চেষ্টা করেও অনেক খেলোয়াড় ব্যর্থ
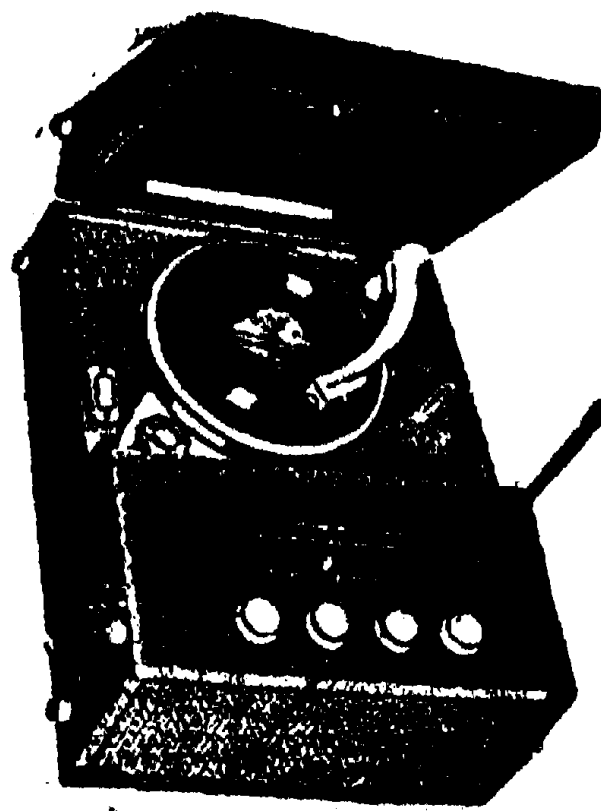
হয়েছে। দীর্ঘ পরিশ্রমে তাদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটেছে। এর কারণই হোল আমাদের খেয়ালীপনা আবহাওয়া। ইতিহাস খুললে দেখা যায়, অতীতে যত ফাস্ট বোলারের আবির্ভাব ঘটেছিল, তারা বেশীর ভাগই পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী।

সেখানকার ঠান্ডা-গরমের আধিক্য এত বেশী যে, মানুষদের দৈহিক শক্তি বাড়াবার পক্ষে ভাল। কিন্তু আজ সে-দেশে অবশ্য এই বিশেষ গুণেরও ভাঁটা পড়েছে। তার কারণ, মানুষ অধিক পরিশ্রম আর করতে চায় না। সহজে যে-বস্তু আয়ত্তে আসে, তাই নিয়েই সবাই মশগুল। বলা বাহুল্য, বোলার বাইশ পা ছুটে এসে যে-বল করলেন, তার সার্থকতা যদি না পায়, তাহলে আর জোর বল করা কেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাটস্‌-ম্যানরা সহজ খেলা খেলে অনেক বেশি নাম পান। শুধু তাই নয়, ফাস্ট বোলাররা উইকেট থেকে কোন সাহায্য পায় না। প্রাণ-হীন উইকেট আজ সব জায়গায়। ব্যাটস্‌-ম্যানদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে প্রতিটি রাজ্য আজ বদ্ধপরিকর। তাই বোলাররা আজ সহজ উপায় বেছে নিয়েছে। তার ফল রাশি রাশি স্লো-মিডিয়ম পেস বোলার। মোট কথা, ফাস্ট বোলিংয়ের ভয়াবহ পরিণামকে সবাই এড়িয়ে চলে। ক্রিকেটের সবজায়গায় যেখানে ফাস্ট বোলিংয়ের গুরুত্ব বেশি, সেখানে আমাদের দেশে সে-নামে ভয়ানক অরুচি। সাধ করে শরীর নষ্ট করতে কে চায়?

যে-দলে ফাস্ট বোলার নেই, সেদেশে কি ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলাও কি অসম্ভব? ব্যাটস্‌ম্যানরা কিন্তু ইচ্ছা করলে কতকগুলি সহজ উপায় অবলম্বন করে ফাস্ট বোলিংয়ের খেলার অভ্যাস অনায়াসে রাখতে পারেন। যেমন পাঁচকে আমরা 'স্লো' করতে পারি, তেমনি ইচ্ছা অনুযায়ী সেই পাঁচকে 'ফাস্ট' করে নেওয়া যেতে পারে। আবার এমন উপায়ও আছে, বোলাররা যেমন ধরনেরই হোক না কেন, ইচ্ছা করলে ব্যাটস্‌ম্যানদের গায়ে বল মারতে পারেন। এমনকি বোলাররা দু' গজ এগিয়ে এসেও বলের 'স্পিড' বাড়াতে পারেন। এতে সুবিধে অনেক। ব্যাটস্‌ম্যানদের ভয় ভাঙত। এবং নিজেকে সামলেও নিতে পারত।

একটা উপায় করতেই হবে। খুব জোরে বল করে পাল্টা আক্রমণ কর, নয়ত দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলিংকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। এমন না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে আমরা কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না।

কিন্তু দুঃখের কথা—এ-ধরনের কোন পরিকল্পনাই আমাদের ছিল না। এতদিন সময় পেয়েও ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করেননি। এমনকি কথায় কথায় যে-রেশে খেলোয়াড়দের ক্যাম্প গড়ে ওঠে, সেইরকম একটা অনুশীলনের ক্যাম্পও তৈরি হয়নি।

ফাস্ট বোলিংয়ের এই লজ্জাজনক অবস্থার হাত থেকে আমরা বাঁচবার কোন উপায় রাখিনি। দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটস্‌ম্যানদের পরাভূত করতে আমাদের হাতে যে-বোলাররা আছেন, তাঁরাও খুব যথেষ্ট নন। আমরা আগেও দেখেছি, আজও দেখলাম, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটস্‌-ম্যানরা লেগ স্পিন বোলারকে সমীহ করে খেলেন। কিন্তু আমাদের দলে সুভাষ গুপ্তের মত একজন নির্ভরযোগ্য বোলারও নেই। চন্দ্রশেখর যা করেছেন সেটা তাঁর পক্ষে অনেক। কিন্তু দ্বিতীয় বোলারের কোন হদিস নেই। এখন আমরা সেই অভাবকে ঢাকতে গিয়ে দলের এগারটি ব্যাটস্‌ম্যান নিয়ে সেই ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করে চলেছি। অন্ততঃ কর্তৃপক্ষ প্রথম টেস্টের দল গঠন সেইভাবেই করেছিলেন। তবে আশার কথা, দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে বাংলার বোলার সুব্রত গুহকে দলে নিয়ে বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'অল রাউন্ডার' গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলতে এসেছে। বলতে ১৯৬৬-৬৭ সালের সফরটি ভারতবর্ষের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের তৃতীয় সফর। তাদের প্রথম ভারত সফর ১৯৪৮-৪৯ সালে জন গডার্ডের নেতৃত্বে এবং দ্বিতীয় সফর ১৯৫৮-৫৯ সালে এফ সি এম আলেকজান্দারের নেতৃত্বে। প্রধানতঃ দুটি কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের বর্তমান ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের গুরুত্ব এবং আকর্ষণ বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমতঃ এই সোবার্সের নেতৃত্বেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজে ২-১ খেলায় (ড্র ২) অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ওরেল কাপ এবং পরবর্তী ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে ৩-১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে উইসডেন ট্রফি জয়ী হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া এই দুই দেশই ক্রিকেট খেলার ধারক এবং বাহক। এই দুই দেশের ক্রিকেট খেলা উপলক্ষ্য করেই টেস্ট ক্রিকেটের জন্ম। টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষ্যে বর্ত-

নিউ দিল্লীতে ১৯৪৮-৪৯ সালের ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলার সময় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক জন গডার্ড (বাঁ দিকে) এবং ভারতবর্ষের অধিনায়ক লালা অমরনাথ।

*

ভারতসফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্ষেত্রনাথ রায়

মানের যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং সেই সঙ্গে খেলার মাধ্যমে ভাব-বিনিময়ের বিস্তীর্ণ মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছে, তার পথ-প্রদর্শক ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার শতাধিক বছরের টেস্ট খেলা। ক্রিকেটের ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির মূলে এই দুই দেশের অবদান অপরিমিত। সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে সেই ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় বরণের ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের পদ-মর্যাদা আজ বিশ্বখেতাব জয়ের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের মহা সৌভাগ্য যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বে-সরকারী বিশ্ব খেতাব জয়ের পরই ভারতবর্ষ তাদের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে প্রথম নেমেছে। ইতিমধ্যে ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় (বোম্বাই) ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী হয়ে ১-০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। বাকি আছে দুটি টেস্ট খেলা।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ক'লকাতার ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা সুরু হবে। ইডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারতবর্ষের এই তৃতীয় সাক্ষাৎ। আগের দুটি টেস্ট খেলার ফলাফল—১৯৪৮-৪৯ সালের টেস্ট ড্র এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় এক ইনিংস এবং ৩৩৬ রানে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটে নবযুগ

১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের অধিনায়কত্ব লাভ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক নব-যুগের সূচনা। ফ্রাঙ্ক ওরেলই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নিয়মিত প্রথম নিগ্রো অধিনায়ক। তিনিই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বদলে দেন। ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি টেস্ট সিরিজে দল পরিচালনা করে ক্রিকেট অনুরাগী মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, নিস্তেজ ক্রিকেট খেলায় প্রাণ সঞ্চার করা—খেলায় জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে একান্ত গৌণ। তাঁর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ১৯৬২ সালে ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষকে এবং ১৯৬৩ সালে ৩—১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয় করে। তাঁর নেতৃত্বে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের একমাত্র পরাজয় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই পরাজয় মোটেই অগৌরবের হয়নি। ভাগ্যদেবী অস্ট্রেলিয়ারই পক্ষে ছিলেন। ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে (ব্রিসবেন) উভয় দলের রান সংখ্যা সমান (৭৩৭ রান করে) দাঁড়ায়—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী হয়। সিডনির তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২২ রানে জয়ী হলে সেই সময়ের মত খেলার ফলাফল সমান (১—১) দাঁড়ায়। এডিলেডের চতুর্থ টেস্ট ড্র যায় এবং মেলবোর্নের পঞ্চম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে কপাল জোরে 'রাবার' জয়ী হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রতিটি টেস্ট ম্যাচ দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ের থেকেও

ওরেলের বড় জয় হয়েছে—অস্ট্রেলিয়ার জনগণের হৃদয় জয় এবং তাঁর ক্রিকেট খেলার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে যে নাগরিক সম্বর্ধনা পান, তা একমাত্র রাজকীয় সম্বর্ধনার সমতুল্য। অস্ট্রেলিয়ারই উদ্যোগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ী দলের পুরস্কারের নামকরণ হয়েছে 'ওরেল ট্রফি'। ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয় করার পর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়াকে এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল চারটি টেস্ট সিরিজ (ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ২ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১) খেলে আজও অজেয়।

ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তির তুলনায় ভারতবর্ষ খুবই দুর্বল। ভারতবর্ষের প্রধান অভাব ফাস্ট বোলারের। ফলে বিপক্ষের ফাস্ট বোলারের বল ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে মস্ত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে আছেন তিনজন ফাস্ট বোলার—হল, গ্রিফিথ এবং কিং। এ'দের মধ্যে হল এবং গ্রিফিথ শক্তিধর বিশ্ববিখ্যাত ফাস্ট বোলার। তাঁরা নিজরূপ ধারণ করলে ভারতীয় দলের অবস্থা সঙ্গীন হতে কতক্ষণ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের কোন টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের জয়ের আশা কম। ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ০-৫ খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণের পর স্বদেশের মাটিতে ১৯৬৪ সালে ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার সংগে টেস্ট সিরিজ ড্র করে এবং ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ী হয়।

বর্তমান ১৯৬৬-৬৭ সালের ভারত সফর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের তৃতীয় সফর; আগের দু'টি সফর ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে। ১৯৪৮-৪৯ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের কোন খেলোয়াড়ই বর্তমান দলে নেই। তবে ১৯৫৮-৫৯ সালের এই ৮জন খেলোয়াড় বর্তমান সফরে এসেছেন—সোবার্স, কানহাই, হাণ্ট, বুচার, হল, গিবস, হেণ্ড্রিক্স এবং বাইনো। এই ৮ জনের মধ্যে হেণ্ড্রিক্স এবং বাইনো গত দ্বিতীয় সফরে (১৯৫৮-৫৯) ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। ১৯৬৬-৬৭ সালের ভারত সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ৯জন বর্তমান ভারত সফরের (১৯৬৬-৬৭) আগে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন : দশটি ক'রে টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন চারজন—সোবার্স, কানহাই, হাণ্ট এবং হল, ৬টি গিবস, ৫টি বুচার এবং একটি করে ম্যাচ—হেণ্ড্রিক্স, কিং এবং নার্স। বর্তমান ভারত সফররত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে দু'জন—লয়েড এবং কলিমুর এই সফরের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি।

খেলোয়াড় পরিচিতি

গারফিল্ড সোবার্স (বার্বাডোজ)

জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৮শে জুলাই, ব্রিজটাউনে। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে তিনি নিঃসন্দেহে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌখস খেলোয়াড়। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—ক্রিকেট খেলার এই তিন প্রধান বিভাগে তাঁর সমান দক্ষতা অপর কোন টেস্ট খেলোয়াড়ের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সরকারী টেস্টে তাঁর রান সংখ্যা ৫১৭২ এবং উইকেট ১৩০। তিনি ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৩০০০ রান এবং ১০০ উইকেট সংগ্রহ করতে পারেননি। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় তাঁর নট আউট ৩৬৫ রানের বিশ্ব রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ন আছে। অধিনায়ক হিসাবে তাঁর দক্ষতা তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের আর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজে ২—১ খেলায় (ড্র ২) অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ওরেল ট্রফি এবং ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে ৩-১ খেলায় (ড্র ১) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে উইসডেন ট্রফি জয় করার সূত্রে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক
গারফিল্ড সোবার্স

ভারতের অধিনায়ক
পাতৌদির নবাব

বে-সরকারীভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের খেতাব লাভ করেছে।
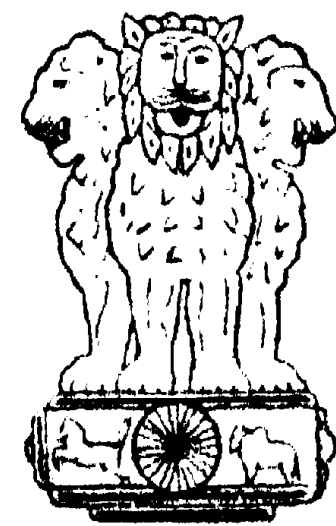
সোবার্স একজন সহজাত ক্রিকেট খেলোয়াড়—কোনদিন কোচের কাছে ক্রিকেট খেলার পাঠ গ্রহণ করেননি। বার্বাডোজের ক্রিকেট খেলার অনুকূল পরিবেশ (যে পরিবেশে বিশ্ববিশ্রুত তথাকথিত ত্রয়ী—উইকস, ওরেল এবং ওয়ালকটের আবির্ভাব) এবং বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে খেলার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা—এই দুই সম্পদ তাঁর খেলোয়াড় জীবনে বিরাট সাফল্য লাভের প্রধান সহায়ক। মাত্র ১৬ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব (১৯৫২-৫৩ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলেরই বিপক্ষে)। পরের বছর, ১৯৫৪ সালে ১৭ বছর বয়সে স্লো লেফট আর্ম বোলার হিসাবে তিনি তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, জামাইকার ৫ম টেস্ট)। ১৯৫৩-৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে তাঁর প্রথম আবির্ভাবের অধ্যায়ে তিনি মাত্র একটা ম্যাচ খেলেন। রান ছিল ৪০ এবং ৮১ রানে ৪টে উইকেট। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৬টা, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪টে এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৪টে—মোট ১৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলেও সোবার্সের টেস্ট সেঞ্চুরীর ঘর শূন্য থেকে যায়। তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের আসরে বিশ্ববিশ্রুত 'তিন ডবল্‌উ'—উইকস, ওয়ালকট এবং ওরেলের স্বর্ণ যুগ চলেছে। অতি সাধারণভাবেই সোবার্সের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের সূচনা। ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের সূত্রেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের ইতিহাসে সোবার্স যুগ আরম্ভ। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্টে (কিংস্টন) তিনি ইংল্যাণ্ডের লেন হাটনের টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড (১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ৩৬৪ রান) ভঙ্গ করে শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

তাঁর এই নট আউট ৩৬৫ রানই টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী এবং তা তিনি তাঁর ১৭তম টেস্ট খেলায় অর্জন করেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের এই বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে পরবর্তী চতুর্থ টেস্টের (জর্জটাউন) উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী (১২৫ ও নট আউট ১০৯ রান) করেন। ফলে উপর্যুপরি তিন ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজে সোবার্সের রানের গড় দাঁড়ায় ১৩৭·৩৩ (মোট ৮২৪ রানের উপর)—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড।

সোবার্স প্রকৃত ন্যাটা খেলোয়াড়, বাঁ হাতেই ব্যাট এবং বল করেন। স্লো লেফট আর্ম বোলার হিসাবে তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবন আরম্ভ হলেও ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ব্যাটিংয়েও বিশেষ মন দেন। বোলিংয়ের তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তক: ইচ্ছামত ফাস্ট মিডিয়াম বোলিং থেকে চায়নাম্যানে রূপান্তরিত করতে পারেন—ব্যাটসম্যানের কাছে সে এক ভেল্কির খেলা। এর উপর হাতের পাঁচ লেফট আর্ম স্পিন বোলিং তো আছেই। ক্রিকেট খেলায় একজন বোলারের জীবনে বোলিংয়ের এমন সমন্বয় আর দ্বিতীয় নেই। পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ খেলায় এবং অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেফিল্ড শীল্ডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে তাঁর বিরাট সাফল্যের সূত্রে জনপ্রিয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

৩৬৫ নট আউট (বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮), সময় ১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট।
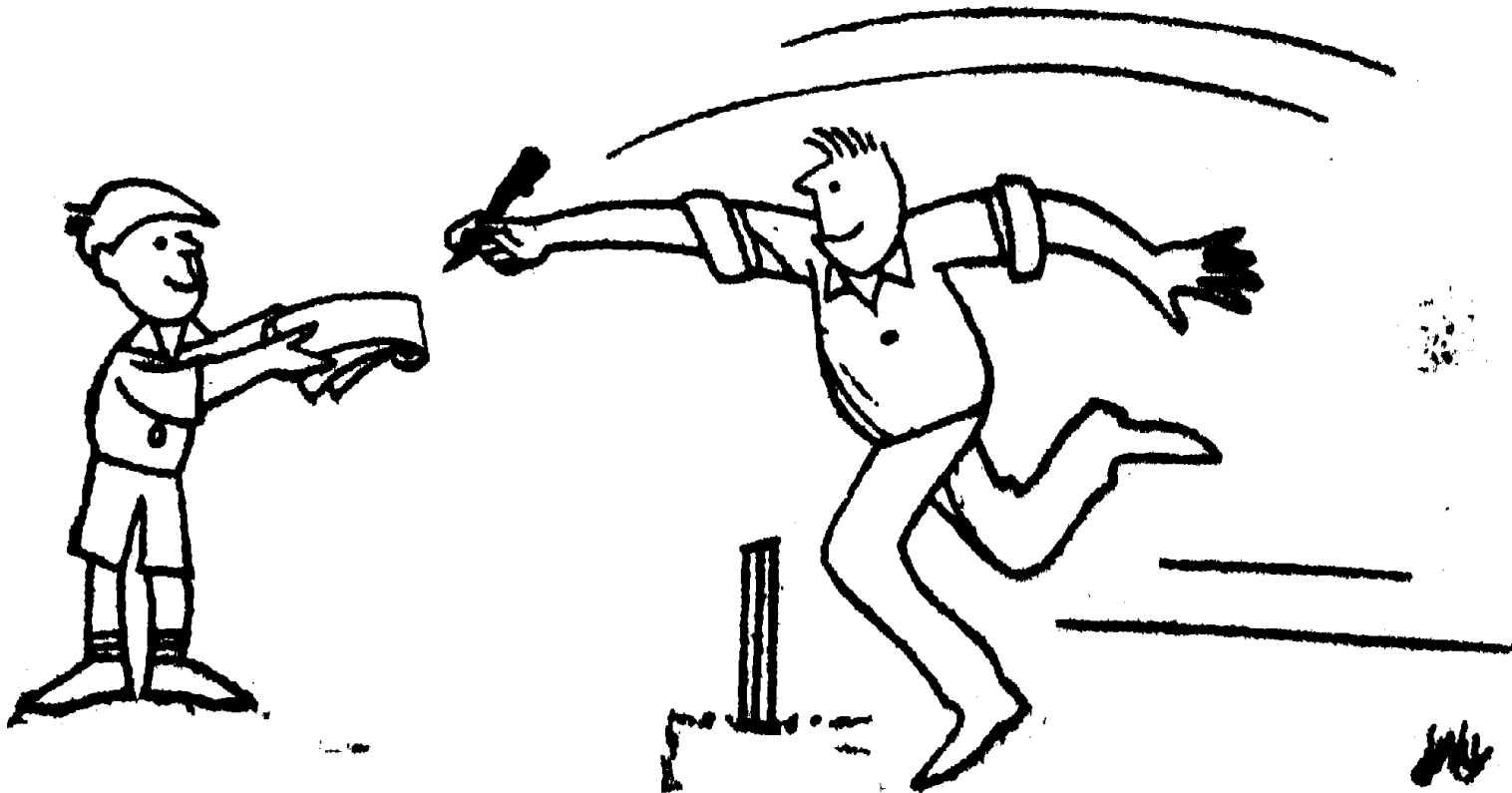
একটি সিরিজে মোট রান

৮২৪ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নট আউট ২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট-আউট ৩৬৫, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১৩৭·৩৩), বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮। একটি টেস্ট সিরিজে যাঁরা উল্লেখযোগ্য মোট রান (৮০০ রানের ভিত্তিতে) করেছেন সেই ক্ষুদ্র ৭ জনের তালিকায় সোবার্সের এই ৮২৪ রান ৫ম স্থানে আছে। এই ৮২৪ রান সংগ্রহের সূত্রে তাঁর যে গড় ১৩৭·৩৩ রান দাঁড়ায় তা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সর্বোচ্চ গড়ের রেকর্ড।

৭০৯ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নট-আউট ১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৬, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০১·২৮) বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৫৯-৬০।

৭২২ রান (খেলা ৫, ইনিংস ৮, নট-আউট ১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭৪ এবং গড় ১০৩·১৪), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৬৬

এক সিরিজে অল-রাউন্ড সাফল্য

মোট ৪২৪ রান (গড় ৭০·৬৬) এবং মোট উইকেট ২৩ (গড় ২০·৫৬), বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ১৯৬১-৬২।

মোট ৭২২ রান (গড় ১০৩·১৪) এবং মোট উইকেট ২০ (গড় ২৭·২৫), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৬৬। উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ে ১ম এবং বোলিংয়ে ২য় স্থান।

খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১২৫ ও ১০৯ **নটআউট:** বিপক্ষে পাকিস্তান, জর্জটাউন, ১৯৫৭-৫৮।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী

৩৮টি (নটআউট ৩৬৫ রানের মধ্যে) বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮। এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক বাউন্ডারীর বিশ্ব রেকর্ড (৪৬টি)—স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের। এই তালিকায় সোবার্সের স্থান ৪র্থ।

উপর্যুপরি ইনিংসে সেঞ্চুরী

৩টি: নটআউট ৩৬৫ (কিংস্টন), ১২৫ ও নটআউট ১০৯ (জর্জটাউন), বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৫৭-৫৮।

উপর্যুপরি ইনিংসে অর্ধ-শত রান

৬ বার: ৫২, ৫২, ৮০, ৩৬৫ নট-আউট, ১২৫ ও নটআউট ১০৯ রান (পাকিস্তানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮)।

উপর্যুপরি টেস্টে সেঞ্চুরী

৬টি: ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে উপর্যুপরি ইনিংসে ৩টি সেঞ্চুরী—৩৬৫ নটআউট (কিংস্টন), ১২৫ ও নট-আউট ১০৯ (জর্জ টাউন) এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে উপর্যুপরি টেস্ট ম্যাচে ৩টি—নট-আউট ১৪২ (১ম টেস্ট, বোম্বাই), ১৯৮ রান-আউট (২য় টেস্ট, কানপুর) এবং নট-আউট ১০৬ (৩য় টেস্ট, কলকাতা)।

টেস্ট সেঞ্চুরী

১৭টি: বিপক্ষে ইংল্যান্ড ৭, অস্ট্রেলিয়া ২, ভারতবর্ষ ৫ এবং পাকিস্থান ৩।

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

২০৮ রান (নট-আউট ৩৬৫ রানের মধ্যে), বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮।

টেস্ট ক্রিকেটের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত—সোবার্সকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের পালা চলেছে। স্থান কিংস্টনের স্যাবিনা পার্ক—১৯৬৫ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার আসর। এই খেলার পঞ্চম দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্সের বলে কানহাই অস্ট্রেলিয়ার ফিলপটের 'ক্যাচ' ধরলে সোবার্সের শত উইকেট পূর্ণ হয় এবং সেই সূত্রে সোবার্স সরকারী টেস্টের ইতিহাসে ব্যক্তিগত ৩০০০ রান এবং ১০০ উইকেট পাওয়ার প্রথম বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

টেস্ট খেলায় যোগদান

৫৭টি টেস্ট খেলা (ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক টেস্ট খেলায় যোগদানের রেকর্ড)—বিপক্ষে ইংল্যান্ড ২১, অস্ট্রেলিয়া ১৪, ভারতবর্ষ ১০, পাকিস্তান ৮ এবং নিউজিল্যান্ড ৪।

পার্টনারসীপ রান

৪৪৬ রান (২য় উইকেটের জুটিতে): হান্ট এবং সোবার্স, বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮। এই রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেটে যে-কোন উইকেট-জুটির সর্বোচ্চ রান এবং ২য় উইকেট-

জুটির বিশ্ব-রেকর্ড রানের (৪৫১ রান) থেকে মাত্র ৫ রান কম।

৩৯৯ রান (৪র্থ উইকেটের জুটিতে): সোবার্স এবং ওরেল, বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ব্রিজটাউন, ১৯৫৯-৬০, তাঁদের এই ৩৯৯ রান ৪র্থ উইকেট জুটির বিশ্ব-রেকর্ড রানের (৪১১ রান) থেকে ১২ রান কম।

কনরাড হাণ্ট (বার্বাদোজ) : জন্ম ১৯৩২ সালের ৫ই মে, বার্বাদোজে। দলের সহ অধিনায়ক। ডান হাতে ব্যাট করেন। একজন অতি নির্ভরশীল ওপনিং ব্যাটস-ম্যান। একাধিকবার দলের সঙ্কটকালে পরিত্রাতার ভূমিকায় বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে ব্রিজ টাউনে পাকিস্থানের বিপক্ষে নিজ খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসেই সেঞ্চুরী (১৪২ রাণ) করেন। এবং তৃতীয় টেস্ট খেলায় সোবার্সের সহযোগিতায় ২য় উইকেটের জুটিতে যে ৪৪৬ রান সংগ্রহ করেন

কনরাড হাণ্ট

তা আজও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে-কোন উইকেটের সর্বোচ্চ রেকর্ড রান হিসাবে অক্ষুন্ন আছে। পাকিস্থানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিংয়ের পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—খেলা ৫, ইনিংস ৯, নট আউট ১, মোট রান ৬২২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৬০, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৭৭·৭৫ (ব্যাটিংয়ের গড়পড়তার তালিকায় ২য় স্থান)। একজন দক্ষ ফিল্ডার। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ঐতিহাসিক 'টাই' ম্যাচে (ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট) হাণ্টের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। বাউণ্ডারীর দিকে বিদ্যুৎ-গতিতে ধাবিত অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকিফের হাতে মার খাওয়া বলটি হাণ্ট অবলীলাক্রমে সংগ্রহ করে সরাসরি উইকেটে নিক্ষেপ করেন, তাতেই ম্যাকিফ রান আউট হন এবং উভয় দলের রান সংখ্যা সমান দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডের সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্রিকেট খেলায় তিনি এনফিল্ড দলের একজন সার্থক পেশাদার খেলোয়াড়। ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান (গড় ৬১·১১) লাভ করেন।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪১, ইনিংস ৭৩, নট আউট ৬, মোট রান ২৯৮৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৬০ (বিপক্ষে পাকিস্থান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮), সেঞ্চুরী ৭ এবং গড় ৪৪·৫৬।

রোহন বাবুলাল কানহাই (ত্রিনিদাদ) : জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, বারবাইসে (ব্রিটিশ গায়না)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজপ্রবাসী ভারতীয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অন্যতম স্ট্রোক খেলোয়াড়। ডানহাতে ব্যাট করেন। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাব ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে। ১৯৫৭ সালের সফরে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম তিনটি টেস্টে উইকেট-কীপার ছিলেন। ১৯৬০-৬১ সালে ওরেলের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালের ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজে দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ২য় স্থান (গড় ৫০·৩০) পান। এই সিরিজেরই ৪র্থ টেস্টের (এডিলেড) উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী (১১৭ ও ১১৫ রান) তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যের এক বড় পরিচয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের ভারত সফরে কলকাতার তৃতীয় টেস্টে তাঁর ২৫৬ রান—কলকাতার মাঠে অনুষ্ঠিত সরকারী টেস্টের

রোহন কানহাই

এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। তাঁর এই ২৫৬ রানের ২০৩ রান উঠেছিল একদিনের খেলায়। গত চারটি টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ১৯৬১-৬২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে উভয় দলের পক্ষে ১ম স্থান (গড় ৭০·৭১), ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে উভয় দলের পক্ষে ২য় স্থান (গড় ৫৫·২২), ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে উভয় দলের পক্ষে ৫ম স্থান এবং নিজ দলের পক্ষে ২য় স্থান (গড় ৪৬·২০) এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তাঁর গড় আগের তুলনায় অনেক নীচে নেমে যায়—নিজ দলের পক্ষে ৪র্থ স্থান (গড় ৪০·৫০)। ১৯৬৩ সালে দৈহিক আঘাতের কারণে তাঁর স্বাভাবিক খেলা যথেষ্ট ব্যাহত হয়। ইংল্যাণ্ডের সেন্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ, নদার্ণ লীগ এবং অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ডের খেলায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ওয়েসলী হল

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪৮, ইনিংস ৮৪, নট আউট ২, মোট রান ৩৯২৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৫৬ (ভারতবর্ষের বিপক্ষে, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯), সেঞ্চুরী ১০ এবং গড় ৪৭·৮৪।

ওয়েসলী হল (বার্বাদোজ) : জন্ম ১৯৩৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর, ব্রিজটাউনে। ডানহাতে বল দেন। ফাস্ট বোলার হিসাবে তাঁর দৈহিক শক্তি এবং দ্রুত গতিতে বল দেওয়ার ধরন অতুলনীয়। তাঁর নিক্ষিপ্ত বলের গতি ঘণ্টায় ৯১ মাইল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুই ফাস্ট বোলার—হল এবং গ্রিফিথের মারমুখী বল ব্যাটসম্যানদের ত্রাসের কারণ। উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যান

হিসাবে হলের খেলোয়াড়-জীবন সুরু। তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচ, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৭ সালে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর খেলা বিশেষ সুবিধার হয়নি। সারা সফরে মাত্র ২৭টি উইকেট (গড় ৩৩·৫৫)। ১৯৫৮-৫৯ সালের ভারত এবং পাকিস্থান সফরেই হল আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই সফরের ৮টি টেস্টে হল ৪৬টি উইকেট পান (ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫টি টেস্টে ৫৩০ রানে ৩০টি, গড় ১৭·৬৬)। ভারতবর্ষের বিপক্ষে কানপুরের ২য় টেস্টে হল ১২৫ রানে ১১টা উইকেট পান। পাকিস্থানের বিপক্ষে লাহোরের ৩য় অর্থাৎ শেষ টেস্টে হল 'হ্যাটট্রিক' করেন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পক্ষে টেস্টে প্রথম 'হ্যাটট্রিক)। অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐতিহাসিক 'টাই' ম্যাচে (১৯৬০ সালের ব্রিসবেনের ১ম টেস্ট) ওয়েসলী হলের ভূমিকাই প্রধান ছিল। এই প্রথম টেস্টের ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনে ২৮৪ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় ৩১০ মিনিট সময় হাতে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। জয়ের জন্যে তাদের ২৩৩ রানের প্রয়োজন। দেখা গেল, অস্ট্রেলিয়া জয়-সীমানায় পৌঁছে গেছে, মাত্র ৬ রানের ব্যবধান এবং হাতে ৩টে উইকেট। ঠিক এই সময়ে হলের হাতে অধিনায়ক ওরেল বল তুলে দিলেন—হল তুমিই আমাদের শেষ ভরসা। এই প্রথম টেস্টের শেষ ওভারের বল দিতে সুরু করলেন হল। তাঁর সে কি ভীষণ সংহার মূর্তি এবং ওরেলের ব্যূহ রচনা। হলের বলে অধিনায়ক বেনো (কট-বিহাইন্ড) এবং গ্রাউট (রান আউট) খেলা থেকে বিদায় নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার রান তখন দাঁড়িয়েছে ২৩২ (৯ উইকেটে) মাত্র ১ রান সংগ্রহ করলেই অস্ট্রেলিয়ার জয়। হলের বলে এই জয়সূচক রানটি সংগ্রহ করতে গিয়ে মেকিফ রান আউট হলেন; ফলে ২৩২ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় এবং উভয় দলের মোট রান সংখ্যা সমান (৭৩৭) দাঁড়ায় – টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম 'টাই' ম্যাচ। হলের এই শেষ ওভার টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ব্রিজবেনের এই ঐতিহাসিক টেস্টে ওয়েসলি হলের ব্যাটিং এবং বোলিং সাফল্য : ৫০ ও ১৮ রান এবং উভয় ইনিংসে ২০৩ রানে ৯টা উইকেট (১৪০ রানে ৪ ও ৬৩ রানে ৫)। গত চারটি টেস্ট সিরিজে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান : ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২১ উইকেট (গড় ২৯·৩৩) নিজ দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট এবং ২য় স্থান, ১৯৬২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২৭ উইকেট (গড় ১৫·৭৪), নিজ দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট এবং ২য় স্থান, ১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৬ উইকেট (গড় ৩৩·৩৭), নিজ দলের পক্ষে ৪র্থ স্থান, ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৬ উইকেট (গড় ২৮·৩৭), নিজ দলের পক্ষে ১ম স্থান এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ উইকেট (গড় ৩০·৮৩), নিজ দলের পক্ষে ৩য় স্থান।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩৮, ইনিংস ৫১, নট আউট ১০, মোট রান ৬৬১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ৫০ (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ১৯৬২) এবং গড় ১৬·১২। বোলিং : ৪০৮০ রানে ১৬৬ উইকেট (গড় ২৪·৫৭)।

চার্লস গ্রিফিথ (বার্বাদোজ) : জন্ম ১৯৩৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর, বার্বাদোজে।

চার্লস গ্রিফিথ

ফাস্ট বোলারের উপযোগী দেহের গঠন। ১৯৬২ সালে ভারতীয় দলের বিপক্ষে একটি খেলায় তাঁর সম্পর্কে মাত্র একবার যে থ্রোয়িং-এর অভিযোগ উঠেছিল তার জের অনেক দূর গড়িয়েছিল। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬০)। ১৯৬৩ সালের ইংল্যান্ড সফরই তাঁর ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে প্রথম বিদেশ সফর এবং এই সফরেই তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন। গত তিনটি টেস্ট সিরিজে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান : ১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩২টি উইকেট (গড় ১৬·২১), উভয় দলের গড়-পড়তা তালিকায় ১ম স্থান, ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৫ উইকেট (গড় ৩২·০০) এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৪ উইকেট (গড় ৩১·২৮)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৬, ইনিংস ২৩, নট আউট ৬, মোট রান ২৫৩ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৫৪ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ৪র্থ টেস্ট বার্বাদোজ, ১৯৬৫) এবং গড় ১৪·৮৮। বোলিং : ১৫৩৯ রানে ৬২ উইকেট (গড় ২৪·৮২)।

ল্যান্স রিচার্ড গিবস (বৃটিশ গায়না) : জন্ম ১৯৩৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর, জর্জটাউনে। বিশ্বের অন্যতম অফ-ব্রেক বোলার। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা পাকিস্থানের বিপক্ষে, ১৯৫৭-৫৮ সালে। এই সিরিজেই ১৭টি উইকেট (গড় ২৩·০৫) নিয়ে গড় পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পান। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এডিলেডের ৪র্থ টেস্টে 'হ্যাটট্রিক' করেন এবং সিডনির ৩য় টেস্টে চার বলে ৩টি উইকেট পান। এই সিরিজে ১৯টি উইকেট (গড় ২০·৭৮) পেয়ে গড় পড়তা তালিকায় নিজ দলের পক্ষে প্রথম এবং উভয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। গত তিনটি টেস্ট সিরিজে তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান : ১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৬ উইকেট (গড় ২১·৩০), উভয় দলের পক্ষে ২য় স্থান, ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৮ উইকেট (গড় ৩০·৮৩), নিজ দলের পক্ষে ২য় স্থান এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২১ উইকেট (গড় ২৪·৭৬), উভয় দলের পক্ষে ১ম স্থান।

১৯৬২ সালে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট খেলাটি (ব্রিজ-টাউন) গিবসের নামেই উৎসর্গীকৃত। পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর বল করতে এসে তিনি এক ভেল্কীর খেলা দেখান। মাত্র ১·৩ ওভার

বল করে এবং মাত্র ১ রান দিয়ে গিবস ভারতীয় দলের ১৫৮ রানের মাথায় ৩টে উইকেট (সরদেশাই, মঞ্জরেকার এবং পাতৌদি) নেন। খেলার এক সময়ে দেখা গেল, ১৫·৩ ওভার বল দিয়ে ১৪টা মেডেন এবং মাত্র ৬ রান দিয়ে পর পর ৮টা উইকেট পেয়েছেন।

ল্যান্স গিবস

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩১, ইনিংস ৪৩, নট আউট ৮, মোট রান ২৪৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২ এবং গড় ৭·০৫। বোলিং : ৩১৪৭ রানে ১৩০ উইকেট (গড় ২৩·৬৬)।

সেমুর নার্স (বার্বাদোজ) : জন্ম ১৯৩৩ সালের ১০ই নভেম্বর, বার্বাদোজে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ। ডান হাতে ব্যাট করেন। রকমারি দর্শনীয় মারের অধিকারী। তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচ—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে স্বদেশের মাটিতে। এই সিরিজে তিনি মাত্র একটা টেস্ট খেলে ৭০ ও ১১ রান করেন। ১৯৬৩ সালে দলের সংগে ইংল্যান্ড যান কিন্তু আহত হয়ে টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী ২০১ রান (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ব্রিজ টাউন, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৫)। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের পক্ষে তৃতীয় স্থান পান (মোট রান ৫০১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩৭ এবং গড় ৬২·৬২)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৪, ইনিংস ২৬, নট আউট ১, মোট রান ১১০১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০১ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজ টাউন ১৯৬৫), সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৪৪·০৪।

বেসিল বুচার (বৃটিশ গায়না) :

জন্ম ১৯৩৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, ধার্বিসে (বৃটিশ গায়না)। ডান হাতে ব্যাট করেন। স্ট্রোক যথেষ্ট আছে। প্রখ্যাত সি এল ওয়ালকট তাঁর ক্রিকেট খেলার গুরু। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা—ভারতবর্ষের বিপক্ষে (বোম্বাই ১ম টেস্ট, ১৯৫৮-৫৯)। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সূত্রেই তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুপরিচিত হন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিং সাফল্য দাঁড়ায় : খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ১, মোট রাণ ৪৮৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪২, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৬৯·৪২—উভয় দলের পক্ষে ৩য় স্থান। এই সিরিজে তিনি ভারতবর্ষের বিপক্ষে উপর্যুপরি টেস্টের ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন—১০৩ (কলকাতা) এবং ১৪২ (মাদ্রাজ)। ১৯৬৩ সালে ইংলন্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি দলের এক দারুণ

বেসিল বুচার

সংকটকালে খেলতে নেমে যে ১৩৩ রাণ করেন (উভয় দলের পক্ষে একমাত্র সেঞ্চুরী) তারই দৌলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে খেলা ড্র করে। গত তিনটি টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিং সাফল্য : ১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মোট রান ৩৮৩ (গড় ৪৭·৮৭)—দলের পক্ষে ৩য় স্থান, ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মোট রান ৪০৫ (গড় ৪০·০৫)—দলের পক্ষে ৩য় এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মোট রান ৪২০ (গড় ৬০·০০)—দলের পক্ষে ৩য় স্থান। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর নটআউট ২০৯ রানই উভয় দলের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২৫, ইনিংস ৪৩, নটআউট ৪, মোট রান ১৮৫৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ২০৯ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ট্রেন্টব্রিজ, ১৯৬৬), সেঞ্চুরী ৫ এবং গড় ৪৭·৬৪।

জ্যাকি হেন্ড্রিকস

জ্যাকি হেণ্ড্রিক্স (জামাইকা) :

জন্ম ১৯৩৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর। উইকেটকিপার। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে এসেছিলেন, কিন্তু টেস্ট দলে স্থান পান নি। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা ভারতবর্ষের বিপক্ষে (পোর্ট অব স্পেন, ১৯৬২)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৮, ইনিংস ১২, নটআউট ৩, মোট রান ১৭৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৪ (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, ১ম টেস্ট, ত্রিনিদাদ, ১৯৬২) এবং গড় ১৯·৬৬।

ডেরিক মারে (ত্রিনিদাদ) :

জন্ম ১৯৪৩ সালের ২০শে মে। উইকেট-কিপার। ১৯৬৩ সালের ইংল্যান্ড সফরে তিনিই ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বয়োকনিষ্ঠ (বয়স ১৯) খেলোয়াড়। তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচ, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (ওল্ডট্রাফোর্ড, ১৯৬৩)। ১৯৬৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেই তিনি যা পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকায় ১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ২, মোট রান ৯৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৪ এবং গড় ১৫·৫০। **উইকেট-কিপিং :** ক্যাট ২২ এবং স্টাম্পড ২।

ডেভিড হলফোর্ড

ডেভিড হলফোর্ড (বার্বাডোজ) :

বয়স ২৬। অধিনায়ক সোবার্সের সম্পর্কিত ভাই। লেগ-ব্রেক বোলার। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় প্রথম আবির্ভাব। ১৯৬৬ সালের ইংল্যান্ড সফরে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে দলভুক্ত হন। তাঁর প্রথম টেস্ট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (ওল্ডট্রাফোর্ড, ১৯৬৬)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ২, মোট রাণ ২২৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১০৫ নটআউট, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৩৭-৮৩। বোলিং : ৩০২ রাণে ৫ উইকেট (গড় ৬০-৪০)।

ব্রায়ান ডেভিস (ত্রিনিদাদ) :

জন্ম ১৯৩৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ওপনিং ব্যাটসম্যান। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬৫ সালে (পোর্ট অব স্পেন)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ২৪৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৮ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিজটাউন, ১৯৬৫) এবং গড় ৩০-৬২।

লেস্টার কিং (জামাইকা) :

জন্ম ১৯৩৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ফাস্ট বোলার। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬১-৬২ সালে (কিংস্টনের ৫ম টেস্ট)। তিনি তাঁর এই প্রথম টেস্ট খেলার এক সময়ে (১ম ইনিংসের খেলায়) ৬ ওভার বল দিয়ে মাত্র ২০ রানে ৫টা উইকেট পান। এই খেলায় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় : ৪৬ রানে ৫ এবং ৬৮ রানে ২ উইকেট। বর্তমান সফরের আগে আর কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেননি।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১, ইনিংস ২, নটআউট ০, মোট রান ১৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩ এবং গড় ৬-৫০।

বোলিং : ৬৪ রানে ৭ উইকেট (গড় ৯-১৪)।

রবিন বাইনো (বার্বাডোজ) :

ওপনিং ব্যাটসম্যান। ছাত্রাবস্থায় ১৯৫৮-৫৯ সালে দলের বয়োকনিষ্ঠ খেলোয়াড় (বয়স ১৭) হিসাবে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান সফরে এসে মাত্র একটা টেস্ট ম্যাচ (পাকিস্তানের বিপক্ষে) খেলেছিলেন। সেই মাত্র একটা টেস্ট খেলার পুঁজি নিয়েই বর্তমান ভারত সফর।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১, ইনিংস ১, নটআউট ০, মোট রান ১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১ এবং গড় ১-০০।

বর্তমান (১৯৬৬-৬৭) ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে দু'জন খেলোয়াড়—ক্লাইভ লয়েড এবং রেক্স কলিমুর বর্তমান সফরের আগে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি। দু'জনেই বৃটিশ গায়নার খেলোয়াড় এবং ন্যাটা। লয়েড ন্যাটা ব্যাটসম্যান এবং কলিমুর ন্যাটা স্পিন বোলার। লয়েড দলের বয়োকনিষ্ঠ সদস্য (বয়স ২১)। তিনি লান্স গিবসের অতি নিকট আত্মীয়।

রবিন বাইনো

ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়

নবাব পাতৌদি (হায়দরাবাদ) :

জন্ম ১৯৪১ সালের ৫ই জানুয়ারী। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (নিউদিল্লী, ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২)। ১৯৬১-৬২ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর-কালে বার্বাদোজের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় গ্রিফিথের বলে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কন্‌ট্রাক্টর মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হন এবং সফরের বাকি খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফলে দলের সহ-অধিনায়ক পাতৌদির নবাব তাঁর ২১ বছর বয়সে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে পরবর্তী তিনটি টেস্টে ভারতীয় দল পরিচালনা করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। তাছাড়া বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে পিতা-পুত্রের অধিনায়কত্ব লাভের সূত্রে তিনি হলেন দ্বিতীয় নজির। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজের
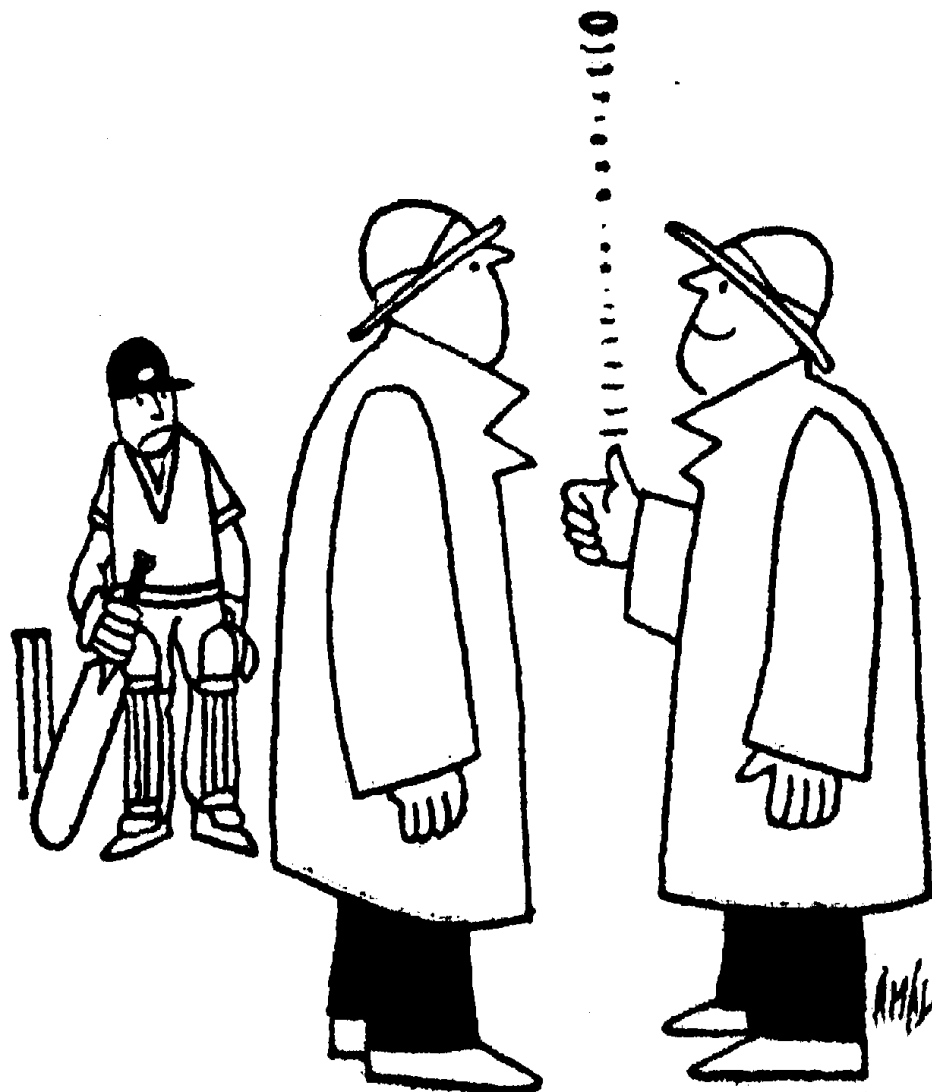
ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় তিনি ৩য় স্থান পান (মোট রান ৩১৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫৩, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৫২·৮৩)।

১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পান (মোট রান ২৭০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ১২৮ এবং গড় ৬৭·৫০)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৮, ইনিংস ৩১, নট আউট ২, মোট রান ১২৩১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ২০৩ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ৪র্থ টেস্ট, নিউ-দিল্লী, ১৯৬৪), সেঞ্চুরী ৫ এবং গড় ৪২·৪৪।

চান্দু বোরদে (মহারাষ্ট্র) :

জন্ম ১৯৩৪ সালের ২১শে জুলাই। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে একজন দক্ষ খেলোয়াড়। প্রথম টেস্ট খেলা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৫৮-৫৯ সালে। ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পান (মোট রান ৩৭১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৯, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৬১·৮৩)।

বর্তমানের ভারতীয় টেস্ট দলে তিনিই সর্বাধিক টেস্টম্যাচ (৪০টি) খেলার এবং সর্বাধিক মোট রানের (২২২৮ রান) অধিকারী।

চান্দু বোরদে

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৪০, ইনিংস ৬৮, নটআউট ৯, মোট রান ২২২৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ১৭৭ (বিপক্ষে পাকিস্থান, মাদ্রাজ ১৯৬০), সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ৩৭·৭৬। বোলিং : ২৪১৬ রানে ৫২ উইকেট (গড় ৪৬·৪৬)।

হনুমন্ত সিং (রাজস্থান) :

জন্ম ১৯৩৯ সালের ২৯শে মার্চ। নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। হাতে যথেষ্ট মার আছে। ১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টে নিজ খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসেই সেঞ্চুরী (১০৫) করেন এবং ভারতবর্ষের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ৩য় স্থান পান (গড় ৫০·৬৬)।

হনুমন্ত সিং

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৯, ইনিংস ১৪, নটআউট ২, মোট রান ৪৭১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৫, (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, নিউদিল্লী ১৯৬৪), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৩৯·২৫।

বাপু নাদকার্নী (বোম্বাই) :

জন্ম ১৯৩২ সালের ৪ঠা এপ্রিল। অল-রাউন্ডার। প্রথম টেস্ট খেলা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৫৫-৬ সালে। ১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে উভয় দলের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ২য় স্থান পান (মোট রান ২৯৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ১২২, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৯৮·০০)। বোলিংয়ে নিজ দলের পক্ষে ২য় স্থান (গড় ৩০·৮৮)। ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান পান (১৭ উইকেট, গড় ১২·৯৪)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৩৩, ইনিংস ৫৫, নটআউট ১২, মোট রান ১২৬৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ১২২ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, কানপুর, ১৯৬৪), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৩০·২১। বোলিং : ২০৫০ রানে ৭১ উইকেট।

ই এ এস প্রসন্ন (মহীশূর) :

জন্ম ১৯৪০ সালের ২২শে মে। অফ্-স্পিন বোলার, তাঁর প্রথম টেস্ট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (মদ্রাজ, ১৯৬১-৬২)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২, ইনিংস ৪, নটআউট ২, মোট রান ৩৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭, গড় ১৬·৫০। বোলিং : ১৬১ রানে ৪ উইকেট (গড় ৪০·২৫)।

রুসী সুর্তি (গুজরাট) :

জন্ম ১৯৩৬ সালের ২৫শে মে। স্পিন-বোলার। প্রথম টেস্ট ম্যাচ পাকিস্থানের বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালে (বোম্বাই)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১১, ইনিংস ১৮, নটআউট ২, মোট রান ৩৮৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৪ (বিপক্ষে পাকিস্তান, ১৯৬০) এবং গড় ২৪·১৮। বোলিং : ৮০৮ রানে ১১টি উইকেট।

দিলীপ সারদেশাই (বোম্বাই) :

জন্ম ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট। দলের একজন নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বোম্বাইয়ের ৩য় টেস্টে নটআউট ২০০ রান তাঁর ক্রীড়াচাতুর্যের এক বিশেষ পরিচয়। তাঁর প্রথম টেস্ট ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২)। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৫ সালের টেস্ট সিরিজের ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের পক্ষে প্রথম স্থান পান (মোট রান ৩৫৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ২০০, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ১১৯·৬৬)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৫, ইনিংস ২৮, নটআউট ৩, মোট রান ১০৬০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ২০০ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, বোম্বাই, ১৯৬৫), সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৪২·৪০।

দিলীপ সারদেশাই

সেলিম দুরানী (রাজস্থান) :

জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৫ই আগস্ট। অল-রাউন্ডার। লেফট-আর্ম স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে। ১৯৬১-৬২ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয়ের মূলে ছিল দুরানীর বোলিং সাফল্য। পরপর তিনটি টেস্ট ম্যাচ ড্র হওয়ার পর ৪র্থ এবং ৫ম টেস্টে ভারতবর্ষ জয়ী হয়। ৪র্থ টেস্টে দুরানী ৪৭ রানে ৫ ও ৬৬ রানে ৩ এবং
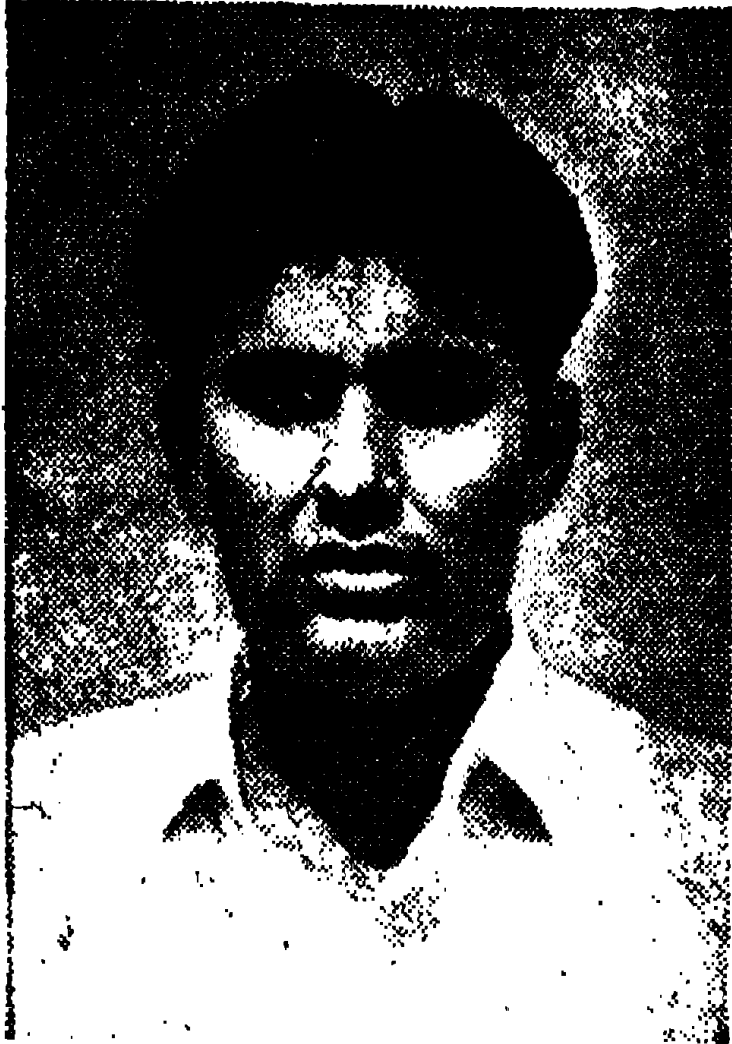
সেলিম দুরাণী

৫ম টেস্টে ১০৬ রানে ৬ ও ৭২ রানে ৪ উইকেট পান। টেস্টের বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় তিনি উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (২৩) এবং শীর্ষস্থান পান (গড় ২৭·০৪)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২২, ইনিংস ৩৮, নটআউট ২, মোট রান ৮৬৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৪ (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২), সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ২৩·৯৭। **বোলিং :** ২৩১২ রানে ৭০ উইকেট।

বি এস চন্দ্রশেখর (মহীশূর) :

জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুন। লেগ স্পিন বোলার। তাঁর প্রথম টেস্ট ম্যাচ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে (বোম্বাই, ১৯৬৪)। এই সিরিজে ১০টা উইকেট পান (গড় ৩৩·৯০)। ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি বোলিংয়ে নিজ দলের পক্ষে ২য় স্থান লাভ করেন (৯টা উইকেট, গড় ২১·০০)।

বি এস চন্দ্রশেখর

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৮, ইনিংস ৭, নটআউট ২, মোট রান ২৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৬ এবং গড় ৫·০০। **বোলিং :** ৮২০ রানে ২৭ উইকেট।

আব্বাস আলী বেগ (হায়দরাবাদ) :

জন্ম ১৯৩৯ সালের ১৯শে মার্চ। প্রথম টেস্ট খেলা ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালে। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই তিনি সেঞ্চুরী (১১২ রান, ম্যাঞ্চেস্টার) করেন। এবং ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় নিজ দলের পক্ষে প্রথম স্থান পান (গড় ৪১·২৫)।

আব্বাস আলীবেগ

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ৮, মোট রান ৩৭৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১২, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ২৬·৮৫।

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (বোম্বাই) :

জন্ম ১৯৩৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। উইকেট-কিপার। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে (কানপুরে, দ্বিতীয় টেস্ট, ১৯৬১-৬২)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১১, ইনিংস ১৯, নটআউট ১, মোট রান ৪২০, এক

ফারুক ইঞ্জিনিয়ার

এম এল জয়সীমা

ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯০ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ, ১৯৬৫) এবং গড় ২৩·৩৩। **উইকেটকিপিং :** কট ১৫ এবং স্টাম্পড ১।

এম এল জয়সীমা (হায়দরাবাদ) :

জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩রা মার্চ। নির্ভরশীল ওপনিং ব্যাটসম্যান। প্রথম টেস্ট খেলা ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৯ সালে। ১৯৬১-৬২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নিজ দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ৩য় স্থান পান (মোট রান ৩৯৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৭ এবং গড় ৪৯·৮৭)।

টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ২৭, ইনিংস ৪৯, নটআউট ২, মোট রান ১৬১৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৯ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৪), সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৩৪·৫৭। **বোলিং :** ৬৩৬ রানে ৭ উইকেট।

এস ভেঙ্কটরাঘবন (মাদ্রাজ) :

জন্ম ১৯৪৫ সালের ২১শে এপ্রিল। অফ-স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা
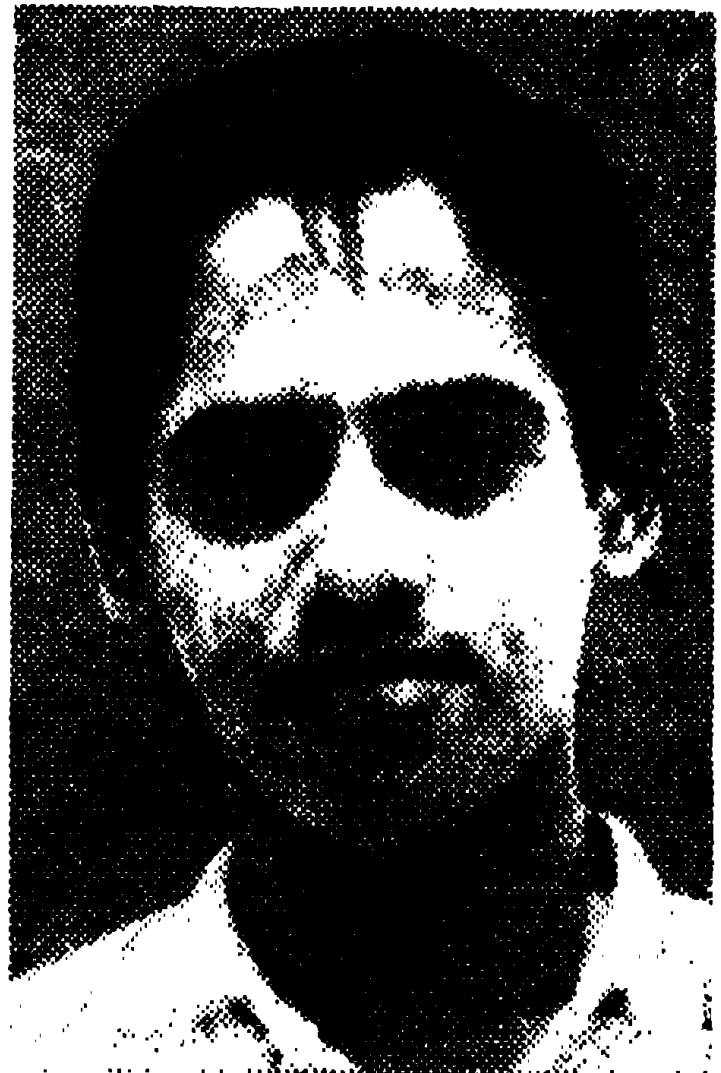
এস ভেঙ্কটরাঘবন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৯৬৫ সালে। এই সিরিজে উভয় দলের বোলিংয়ের গড়-পড়তা তালিকায় তিনি সর্বাধিক উইকেট (২১টি) এবং শীর্ষস্থান পান (গড় ১৯·০০)।

টেস্ট পরিসংখ্যান ঃ খেলা ৪, ইনিংস ৪, নট আউট ১, মোট রান ১৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৭ এবং গড় ৬·০০। **বোলিং ঃ** ৩৯৯ রানে ২১ উইকেট।

রমাকান্ত দেশাই (বোম্বাই) ঃ

জন্ম ১৯৩৯ সালের ২০শে জুন। ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। তাঁর প্রথম টেস্ট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৮ সালে। বোলিংয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঃ ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (২১টি) লাভ। এবং ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩০৫ রানে ১৩টি (গড় ২৩·৪৬) —উভয় দলের পক্ষে ৩য় স্থান।

রমাকান্ত দেশাই

টেস্ট পরিসংখ্যান ঃ খেলা ২৬, ইনিংস ৪১, নটআউট ১১, মোট রান ৩৫৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮৫ (বিপক্ষে পাকিস্তান, বোম্বাই, ১৯৬০) এবং গড় ১১·৯৬। **বোলিং ঃ** ২৬২৩ রানে ৭২ উইকেট (গড় ৩৬·৪৪)।

বি কে কুন্দরন (মহীশূর) ঃ

জন্ম ১৯৩৯ সালের ২রা অক্টোবর। দক্ষ উইকেটকিপার। তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে। ১৯৬৪ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তিনি উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট ৫২৫ রান এবং এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ১৯২ রান সংগ্রহ করেন। ব্যাটিংয়ের গড়-পড়তা তালিকায় নিজ দলের পক্ষে ২য় এবং উভয় দলের পক্ষে ৪র্থ স্থান পান (মোট রান ৫২৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯২, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৩২·৮০)।

টেস্ট পরিসংখ্যান ঃ খেলা ১৮, ইনিংস ২৬, নটআউট ৪, মোট রান ৭৫১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯২ (বিপক্ষে ইংল্যান্ড, মাদ্রাজ, ১৯৬৪), সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৩৪·১৩। **উইকেট-কীপিং ঃ** কট ২০ এবং স্টাম্পড ৭।

বি কে কুন্দরন

১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্টে হলফোর্ডের বলে পুল করতে গিয়ে বোরদে অকৃতকার্য হয়েছেন।

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

সরকারী টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান

(১৯৬৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, এই সিরিজের দুটি টেস্ট খেলা বাকি। সেই কারণে ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলার ফলাফল নীচের তালিকার গ্রহণ করা হয়নি।

টেস্ট খেলার সূচনা : ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৮, নিউদিল্লী

সাল	স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	খেলা	রাবার জয়ী
১৯৪৮-৪৯	ভারতবর্ষ	০	১	৪	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫২-৫৩	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	১	৪	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৫৮-৫৯	ভারতবর্ষ	০	৩	২	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৬১-৬২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	০	৫	০	৫	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
মোট :		০	১০	১০	২০	

প্রতি টেস্ট সিরিজে দুই দলের মোট রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান			ভারতবর্ষের রান		
সাল	রান	উইকেট	সাল	রান	উইকেট
১৯৪৮-৪৯	৩০৯৭	৬৫	১৯৪৮-৪৯	২৮১৪	৮০
১৯৫২-৫৩	২৬৪৩	৬৬	১৯৫২-৫৩	২৯৪২	৯২
১৯৫৮-৫৯	৩১৪১	৫৯	১৯৫৮-৫৯	২২৪৪	৯৫
১৯৬১-৬২	২৫৬৬	৬০	১৯৬১-৬২	২৩৯১	১০০
মোট :	১১৪৪৭	২৫০	মোট :	১০৩৯১	৩৬৭

মোট রানের হিসাব

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান			ভারতবর্ষের রান		
স্থান	রান	উইকেট	স্থান	রান	উইকেট
ভারতবর্ষে	৬২৩৮	১২৪	ভারতবর্ষে	৫০৫৮	১৭৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে	৫২০৯	১২৬	ওয়েস্ট ইণ্ডিজে	৫৩৩৩	১৯২
মোট :	১১৪৪৭	২৫০	মোট :	১০৩৯১	৩৬৭

একটি খেলার মোট রান

(দুই দলের সম্মিলিত রান)

সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষে : ১৩৩৪ রান ২৮ উইকেটে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬৪৪, ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড এবং ভারতবর্ষ ৪১৫ ও ও ২৭৫ রান), নিউদিল্লী, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ১৪২৪ রান ৩৪ উইকেটে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৭৬ ও ৯২—৪ উইকেটে এবং ভারতবর্ষ ৩১২ ও ৪৪৪ রান), কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩।

সর্বনিম্ন রান

(পুরো চার ইনিংস অর্থাৎ ৪০ উইকেটের খেলায়)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৯০৬ রান ৪০ উইকেটে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৯৬ ও ২২৮ এবং ভারতবর্ষ ২৫৩ ও ১২৯ রান), বার্বাদোজ, ১৯৫২-৫৩।

ভারতবর্ষে : ১১০১ রান ৩৮ উইকেটে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৮৬ ও ২৬৭ এবং ভারতবর্ষ ১৯৩ ও ৩৫৫—৮ উইকেটে), বোম্বাই, ৫ম টেস্ট, ১৯৪৮-৪৯।

দ্রষ্টব্য : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজের কোন টেস্টেই এপর্যন্ত পুরো চার ইনিংস অর্থাৎ ৪০ উইকেটের খেলা হয়নি—৩৮ উইকেট পর্যন্ত খেলা হয়েছে।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন রান

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১০টি সরকারী টেস্টে প্রতি দলের এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রান এবং পুরো এক ইনিংসের (১০ উইকেটে) খেলায় দলগত সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড :

ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলা

সর্বোচ্চ রান			সর্বনিম্ন রান		
নিউদিল্লী			নিউদিল্লী		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	৪৫৪	১৯৪৮-৪৯	ভারতবর্ষ	২৭৫	১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫৮-৫৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬৩১	১৯৪৮-৪৯
বোম্বাই			বোম্বাই		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	৩৫৫ (৮ উইঃ)	১৯৪৮-৪৯	ভারতবর্ষ	১৫২	১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৪৮-৪৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২২৭	১৯৫৮-৫৯
কলকাতা			কলকাতা		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	৩২৫ (৩ উইঃ)	১৯৪৮-৪৯	ভারতবর্ষ	১২৪	১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬১৪ (৫ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫৮-৫৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩৬৬	১৯৪৮-৪৯
মাদ্রাজ			মাদ্রাজ		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	২৪৫	১৯৪৮-৪৯	ভারতবর্ষ	১৪৪	১৯৪৮-৪৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫৮২	১৯৪৮-৪৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫০০	১৯৫৮-৫৯
কানপুর			কানপুর		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	২৪০	১৯৫৮-৫৯	ভারতবর্ষ	২২২	১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪৪৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৫৮-৫৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২২২	১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১০টি সরকারী টেস্টে প্রতি দলের এক ইনিংসের খেলায় দলগত সর্বোচ্চ রান এবং পুরো ইনিংসের (১০ উইকেটে) খেলায় দলগত সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড :

সর্বোচ্চ রান			সর্বনিম্ন রান		
পোর্ট অব স্পেন			**পোর্ট অব স্পেন**		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	৪২২	১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	৯৮	১৯৬১-৬২
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪৪৪ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৬১-৬২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৮৯	১৯৬১-৬২
ব্রিজটাউন			**ব্রিজটাউন**		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	২৫৮	১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	১২৯	১৯৫২-৫৩
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪৭৫	১৯৬১-৬২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২২৮	১৯৫২-৫৩
জর্জটাউন			**জর্জটাউন**		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	২৬২	১৯৫২-৫৩	ভারতবর্ষ	২৬২	১৯৫২-৫৩
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩৬৪	১৯৫২-৫৩	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩৬৪	১৯৫২-৫৩
কিংস্টন			**কিংস্টন**		
দল	রান	সাল	দল	রান	সাল
ভারতবর্ষ	৪৪৪	১৯৫২-৫৩	ভারতবর্ষ	১৭৮	১৯৬১-৬২
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	১৯৬১-৬২	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৫৩	১৯৬১-৬২

প্রতি সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে				ভারতবর্ষের পক্ষে		
সাল	মোট রান	গড়	খেলোয়াড়	মোট রান	গড়	খেলোয়াড়
১৯৪৮-৪৯	৭৭৯	১১১·২৮	এভার্টন উইকস	৫৬০	৫৬·০০	রুসী মোদী
১৯৫২-৫৩	৭১৬	১০২·২৮	এভার্টন উইকস	৫৬০	৬২·২২	পলি উমরীগড়
১৯৫৮-৫৯	৫৫৭	৯২·৮৩	গারফিল্ড সোবার্স	৩৩৭	৪২·১২	পলি উমরীগড়
১৯৬১-৬২	৪৯৫	৭০·৭১	রোহন কানহাই	৪৪৫	৪৯·৪৪	পলি উমরীগড়

প্রতি সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে				ভারতবর্ষের পক্ষে		
সাল	উইকেট	গড়	খেলোয়াড়	উইকেট	গড়	খেলোয়াড়
১৯৪৮-৪৯	১৭	২৮·১৭	পি জোন্স	১৭	৪৩·৭৬	ভিনু মানকাদ
১৯৫২-৫৩	২৮	২৯·৫৭	ভ্যালেনটাইন	২৭	২৯·২২	সুভাষ গুপ্তে
১৯৫৮-৫৯	৩০	১৭·৬৬	ওয়েসলী হল	২২	৪২·১৩	সুভাষ গুপ্তে
১৯৬১-৬২	২৭	১৫·৭৪	ওয়েসলী হল	১৭	৩৫·২৯	সেলিম দুরানী

টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বিপক্ষে	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	পরাজয়	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ড	৩৪	৩	১৫	১৬
অস্ট্রেলিয়া	১৬	২	৯	৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২০	০	১০	১০
নিউজিল্যাণ্ড	৯	৩	০	৬
পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট	৯৪	১০	৩৫	৪৯

টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বিপক্ষে	মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের সিরিজ জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যাণ্ড	৯	১	৬	২
অস্ট্রেলিয়া	৪	০	৩	১
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪	০	৪	০
নিউজিল্যাণ্ড	২	২	০	০
পাকিস্তান	৩	১	০	২
মোট	২২	৪	১৩	৫

টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বিপক্ষে	খেলা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়	পরাজয়	খেলা ড্র
ইংল্যাণ্ড	৫০	১৬	১৭	১৭
অস্ট্রেলিয়া	২৫	৫	১৪	৬*
নিউজিল্যাণ্ড	৬	৪	১	১
ভারতবর্ষ	২০	১০	০	১০
পাকিস্তান	৮	৪	৩	১
মোট	১০৯	৩৯	৩৫	৩৫

* এই ৬টি অমীমাংসিত খেলার মধ্যে আছে ১৯৬০-৬১ সালের ব্রিসবেন মাঠের ঐতিহাসিক 'টাই' ম্যাচ।

টেস্ট সিরিজের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

বিপক্ষে	সিরিজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সিরিজ জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যাণ্ড	১২	৫	৫	২
অস্ট্রেলিয়া	৫	১	৪	০
নিউজিল্যাণ্ড	২	২	০	০
ভারতবর্ষ	৪	৪	০	০
পাকিস্তান	২	১	১	০
মোট	২৫	১৩	১০	২

বিভিন্ন মাঠে টেস্ট সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষে

স্থান	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে	ভারতবর্ষের পক্ষে
নিউদিল্লী	৭	২
কলকাতা	৬	১
বোম্বাই	৩	৩
মাদ্রাজ	৩	০
কানপুর	১	০
মোট :	২০	৬

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

স্থান	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে	ভারতবর্ষের পক্ষে
কিংস্টন	৭	৩
পোর্ট অব স্পেন	৫	৪
জর্জটাউন	১	০
ব্রিজটাউন	০	০
মোট :	১৩	৭

টেস্ট খেলোয়াড়দের ব্যাটিং এবং বোলিং পরিসংখ্যান

ভারতবর্ষ

	ব্যাটিং							বোলিং		
	খেলা	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়	রান	উইকেট	গড়
বোরদে	৪০	৬৮	৯	২২২৪	১৭৭*	৩	৩৭.৭৬	২৪১৬	৫২	৪৬.৪৬
নাদকার্ণী	৩৩	৫৪	১২	১২৬৫	১২২*	১	৩০.১১	২০৫০	৭১	২৮.৮৭
জয়সীমা	২৭	৪৯	২	১৬২৫	১২৯	২	৩৬.৭০	৬৩৬	৭	৯০.৮৫
দেশাই	২৬	৪১	১১	৩৫৯	৮৫	০	১১.৯৬	২৬২৪	৭২	৩৬.৪৪
দুরাণী	২২	৩৮	২	৮৬৩	১০৪	১	২৩.৯৭	২৩১২	৭০	৩৩.০২
পতৌদি	১৮	৩১	২	১২৩১	২০৩*	৫	৪২.৪৪	৫৯	১	৫৯.০০
সরদেশাই	১৫	২৮	৩	১০৬০	২০০*	২	৪২.৪০	৩৩	০	—
কুন্দরন	১৪	২৬	৪	৭৫১	১৯২	২	৩৪.১৩	কট ২০ এবং স্টাম্পড ৭		
ইঞ্জিনীয়র	১১	১৯	১	৪২০	৯০	০	২৩.৩৩	কট ১৫ এবং স্টাম্পড ১		
সুর্তি	১১	১৮	২	৩৮৭	৬৪	০	২৪.১৮	৮০৮	১১	৭৩.৪৫
হনুমন্ত	৯	১৪	২	৪৭১	১০৫	১	৩৯.২৫	২৪	০	
চন্দ্রশেখর	৮	৭	২	২৫	১৬	০	৫.০০	৮২০	২৭	৩০.৩৭
ভেঙ্কটরাঘবন	৪	৪	১	১৮	৭	০	৬.০০	৩৯৯	২১	১৯.০০
বেগ	৮	১৪	০	৩৭৬	১১২	১	২৬.৮৫			

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

	ব্যাটিং							বোলিং		
	খেলা	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়	রান	উইকেট	গড়
সোবার্স	৫৭	৯৭	১১	৫১৭২	৩৬৫*	১৭	৬০.১৩	৪৪৬৯	১৩০	৩৪.৩৭
কানহাই	৪৮	৮৪	২	৩৯২৩	২৫৬	১০	৪৭.৮৪	১১	০	—
হান্ট	৪১	৭৩	৬	২৯৮৬	২৬০	৭	৪৪.৫৬	৫৩	১	৫৩.০০
হল	৩৮	৫১	১০	৬৬১	৫০*	০	১৬.১২	৪০৮০	১৬৬	২৪.৫৭
গিবস	৩১	৪৩	৮	২৪৭	২২	০	৭.০৫	৩১৪৭	১৩৩	২৩.৬৬
বুচার	২৫	৪৩	৪	১৮৫৮	২০৯*	৫	৪৭.৬৪			
নার্স	১৪	২৬	১	১১০১	২০১	২	৪৪.০৪			
গ্রিফিথ	১৬	২৩	৬	২৫৩	৫৪	০	১৪.৮৮	১৫৩৯	৬২	২৪.৮২
হেণ্ড্রিকস	৮	১২	৩	১৭৭	৬৪	০	১৯.৬৬			
হলফোর্ড	৫	৮	২	২২৭	১০৫	১	৩৭.৮৩	৩০২	৫	৬০.৪০
মারে	৫	৮	২	৯৩	৩৪	০	১৫.৫০			
ডেভিস	৪	৮	০	২৪৫	৬৮	০	৩০.৬২			
বাইনো	১	১	০	১	১	০	১.০০			
কিং	১	২	০	১৩	১৩	০	৬.৫০	৬৪	৭	৯.১৪

একটি খেলায় দলগত মোট রান

(দুই ইনিংসে দলগত মোট রানের সমষ্টি—সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন)

সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৬৯০ (২০ উইঃ), নিউদিল্লী, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৭৫৬ (২০ উইঃ), কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৭০২ (১৯ উইঃ), কলকাতা, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

সর্বনিম্ন রান

(পুরো দুই ইনিংস অর্থাৎ ২০ উইকেটে)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২৭৮ (২০ উইঃ), কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৩০১ (২০ উইঃ), ত্রিনিদাদ, ১৯৬২-৬৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৫৫৩ (২০ উইঃ), বোম্বাই, ১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৫২৪ (২০ উইঃ), বার্বাদোজ, ১৯৫২-৫৩

এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৫৬০ রান — রুসী মোদী (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১১২, সেঞ্চুরী ১ এবং গড় ৫৬.০০)—১৯৪৮-৪৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৫৬০ রান — পলি উমরিগড় (টেস্ট ৫, ইনিংস ১০ নট আউট ১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩০, সেঞ্চুরী ২ এবং গড় ৬২.২২) — ১৯৫২-৫৩।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৭৭৯ রান — এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৭, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৯৪, সেঞ্চুরী ৪ এবং গড় ১১১.২৮)—১৯৪৮-৪৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৭১৬ রান — এভার্টন উইকস (টেস্ট ৫, ইনিংস ৮, নট আউট ১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৭,

সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১০২·২৮) — ১৯৫২-৫৩।

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২২টি উইকেট — সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩১২·৩, মেডেন ৭১, রান ৯২৭ এবং গড় ৪২·১৩) — ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৭টি উইকেট — সুভাষ গুপ্তে (ওভার ৩২৯·৩, মেডেন ৮৭, রান ৭৮৯ এবং গড় ২৯·২২) — ১৯৫২-৫৩।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৩০টি উইকেট — ওয়েসলী হল (ওভার ২২১·৪, মেডেন ৬৫, রান ৫৩০ এবং গড় ১৭·৬৬) — ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২৮টি উইকেট — এ এল ভ্যালেনটাইন (ওভার ৪৩০, মেডেন ১৭৯, রান ৮২৮ এবং গড় ২৯·৫৭)— ১৯৫২-৫৩।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে : ৯টি (১০২ রানে) — সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৮টি (৩৮ রানে) —ল্যান্স গিবস, বার্বাদোজ, ১৯৬১-৬২।

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষের পক্ষে : ১০টি (২২৩ রানে)— সুভাষ গুপ্তে, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ১১টি (১২৬ রানে) — ওয়েসলী হল, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৪৫৪, নিউদিল্লী, ১৯৪৮-৪৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৪৪৪, কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ৬৪৪ (৮ উইঃ ডিক্লে), নিউদিল্লী, ১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লে), কিংস্টন, ১৯৬১-৬২

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংস অর্থাৎ ১০ উইকেটে)

ভারতবর্ষের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ১২৪, কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ৯৮, ত্রিনিদাদ, ১৯৬১-৬২

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

ভারতবর্ষে : ২২২, কানপুর, ১৯৫৮-৫৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে : ২২৮, বার্বাদোজ, ১৯৫২-৫৩

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রাণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৮৪৯ রান—ইংল্যাণ্ড, কিংস্টন, ১৯৩০
ভারতবর্ষের বিপক্ষে : ৬৭৪ রান—অস্ট্রেলিয়া, এডিলেড, ১৯৪৭-৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৭৯০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ); বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮
ভারতবর্ষের পক্ষে : ৫৩৯ রান (৯ উইঃ ডিক্লেঃ), বিপক্ষে পাকিস্তান, মাদ্রাজ, ১৯৬০-৬১

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৭৪ রান — নিউজিল্যাণ্ড, দুনেদিন, ১৯৫৫-৫৬
ভারতবর্ষের বিপক্ষে : ১০৫ রান—অস্ট্রেলিয়া, কানপুর, ১৯৫৯-৬০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৭৬ রান (বিপক্ষে পাকিস্তান), ঢাকা, ১৯৫৮-৫৯
ভারতবর্ষের পক্ষে : ৫৮ রান (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২
৫৮ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ব্রিসবেন, ১৯৪৭-৪৮

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে : ৩৬৫ নট-আউট — গারফিল্ড সোবার্স (পাকিস্তানের বিপক্ষে) কিংস্টন, ১৯৫৮— টেস্টে বিশ্বরেকর্ড
ভারতবর্ষের পক্ষে : ২৩১—ভিনু মানকাদ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড), মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে : ৩৩৭—হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), বারবাদোজ, ১৯৫৭-৫৮
ভারতবর্ষের বিপক্ষে : ২৫৬—রোহন কানহাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), কলকাতা, ১৯৫৮-৫৯

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সাল	স্থান	খেলার ফলাফল
১৯৪৮-৪৯	নিউ দিল্লী	অমীমাংসিত
	বোম্বাই	অমীমাংসিত
	কলকাতা	অমীমাংসিত
	মাদ্রাজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ১৯৩ রানে জয়ী
	বোম্বাই	অমীমাংসিত
১৯৫২-৫৩	ত্রিনিদাদ	অমীমাংসিত
	বার্বাদোজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪২ রানে জয়ী
	ত্রিনিদাদ	অমীমাংসিত
	জর্জটাউন	অমীমাংসিত
	কিংস্টন	অমীমাংসিত
১৯৫৮-৫৯	বোম্বাই	অমীমাংসিত
	কানপুর	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে জয়ী
	কলকাতা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে জয়ী
	মাদ্রাজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে জয়ী
	নিউ দিল্লী	অমীমাংসিত
১৯৬১-৬২	ত্রিনিদাদ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয়ী
	কিংস্টন	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ১৮ রানে জয়ী
	বার্বাদোজ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে জয়ী
	ত্রিনিদাদ	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়ী
	কিংস্টন	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৩ রানে জয়ী

টেস্ট খেলা উদ্বোধনের তারিখ

ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সরকারী টেস্ট খেলার উদ্বোধনের তারিখ এবং প্রতিটি টেস্ট কেন্দ্রের মোট খেলার হিসাব।

ভারতবর্ষে

খেলার স্থান	উদ্বোধন তারিখ	মোট খেলা
নিউ দিল্লী	১০ই নভেম্বর, ১৯৪৮	২
বোম্বাই	৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮	৩
কলকাতা	৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮	২
মাদ্রাজ	২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪৯	২
কানপুর	১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮	১

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

খেলার স্থান	উদ্বোধন তারিখ	মোট খেলা
ত্রিনিদাদ	২১শে জানুয়ারী ১৯৫৩	৪
বার্বাদোজ	৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩	২
জর্জ টাউন	১১ই মার্চ ১৯৫৩	১
কিংস্টন	২৮শে মার্চ ১৯৫৩	৩

বিভিন্ন কেন্দ্রে টেস্ট খেলার ফলাফল

ভারতবর্ষে

স্থান	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
নিউ দিল্লী	০	০	২	২
বোম্বাই	০	০	৩	৩
কলকাতা	১	০	১	২
মাদ্রাজ	২	০	০	২
কানপুর	১	০	০	১
মোট :	৪	০	৬	১০

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে

স্থান	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
ত্রিনিদাদ	২	০	২	৪
বার্বাদোজ	২	০	০	২
জর্জ টাউন	০	০	১	১
কিংস্টন	২	০	১	৩
মোট :	৬	০	৪	১০

মোট খেলার ফলাফল

	খেলা মোট	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	খেলা ড্র
ভারতবর্ষে	১০	৪	০	৬
ওয়েস্ট ইণ্ডিজে	১০	৬	০	৪
মোট :	২০	১০	০	১০

পলি উমরীগড়

সুভাষ গুপ্তে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (সেঞ্চুরীর ভিত্তিতে)

ভারতবর্ষের পক্ষে

স্থান	রান	খেলোয়াড়	মরশুম
নিউদিল্লী	১১৪*	হিমু অধিকারী	১৯৪৮-৪৯
বোম্বাই	১৩৪*	বিজয় হাজারে	১৯৪৮-৪৯
কলিকাতা	১০৬	মুস্তাক আলী	১৯৪৮-৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

স্থান	রান	খেলোয়াড়	মরশুম
নিউদিল্লী	১৫২	সি এল ওয়ালকট	১৯৪৮-৪৯
বোম্বাই	১৯৪	এভার্টন উইকস	১৯৪৮-৪৯
কলিকাতা	২৫৬	রোহন কানহাই	১৯৫৮-৫৯
মাদ্রাজ	১৬০	জে বি স্টলমেয়ার	১৯৪৮-৪৯
কানপুর	১৯৮	গারফিল্ড সোবার্স	১৯৫৮-৫৯

দ্রষ্টব্য : ভারতবর্ষের প্রতিটি টেস্ট কেন্দ্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান (সেঞ্চুরীর ভিত্তিতে)

ভারতবর্ষের পক্ষে

স্থান	রান	খেলোয়াড়	মরশুম
পোর্ট অব স্পেন	১৭২*	পলি উমরীগড়	১৯৬১-৬২
কিংস্টন	১৫০	পঙ্কজ রায়	১৯৫২-৫৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে

স্থান	রান	খেলোয়াড়	মরশুম
পোর্ট অব স্পেন	২০৭	এভার্টন উইকস	১৯৫২-৫৩
কিংস্টন	২৩৭	ফ্র্যাঙ্ক ওরেল	১৯৫২-৫৩
জর্জটাউন	১২৫	সি এল ওয়ালকট	১৯৫২-৫৩

ক্রিকেটে ব্যাটিং ও বোলিং

কমল ভট্টাচার্য

ক্রিকেটের উৎপত্তি ইংল্যান্ডে। বহু-কালের কথা। তখন ক্রিকেট বলতে কিছু ছিল না। চওড়া আকারের ব্যাট। দুটো স্টাম্প। আর আন্ডারহ্যান্ড বোলিং। এই নিয়েই সাহেবরা সোরগোল তুললো। এমন মজার খেলা আর হয় না। ব্যাট-বল খেলা বলতে সবাই অজ্ঞান।

একেবারে রাজসূয় ব্যাপার। ভদ্র পরিবেশের খেলা। লর্ডেরা সব বো-টাই পরে, মাথায় ফেল্ট হ্যাট চড়িয়ে মাঠে খেলতে আসতেন। খেলার কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। লর্ডস প্লেয়াররা চওড়া ব্যাট দিয়ে যত্রতত্র বল হাঁকিয়ে যেতেন। ফিল্ডিংয়েরও তেমন বাঁধন ছিল না, বল ধরতে পারলেই হল। আর কোনরকমে বলটা বোলারের হাতে পৌঁছে দেওয়া। আন্ডারহ্যান্ড বোলিংয়ের যতই কায়দা থাকুক না কেন, ব্যাটসম্যানদের কাবু করতে বোলারদের চোখে জল আসত।

কিন্তু এমন খেলার ঢংটি সাহেবদের মনে ধরল না। খেলাটাকে আরও আকর্ষণীয় করতে হয়। এবং তার জন্যে বোলারদের প্রাধান্য দরকার। যেমন কথা তেমনি কাজ। আন্ডারহ্যান্ড থেকে ওভারহ্যান্ড বোলিং সুরু হল। বোলাররা হাত ঘুরিয়ে কেউ জোরে, কেউ আস্তে বল করতে লাগলেন। আর ফিল্ডাররাও জায়গা বুঝে দাঁড়াতে শিখলেন।

কিন্তু এত সত্ত্বেও খেলায় তেমন উত্তেজনা বাড়লো না। ব্যাটসম্যানদের একাধিপত্য কিছুতেই কমানো গেল না। আবার কমিটি বসল—কর্তাব্যক্তিরা আলোচনায় বসলেন। ব্যাপারটা হল এই যে, বোলারদের ক্ষমতা না বাড়লে ক্রিকেট ঠিক জমবে না।

ইতিমধ্যে ব্যাটসম্যানরা অনেক কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছে। বোলিংকে ঘায়েল করবার যতকিছু কায়দা সবই তারা রপ্ত করেছে।

যেমন ডিফেনসিভ ব্যাক খেলা। ব্যাক খেলার সময় বলের লাইনে ডান পায়ের টো আড়াআড়িভাবে উইকেটের কাছ বরাবর এসে খেলতে হয়। ফরোয়ার্ড খেলবার সময়ে বলের লাইনে বাঁ পায়ের টো নিয়ে মাথাটা নীচু করে খেলতে হয়। নিখুঁত কায়দা, ব্যাটটি থাকবে পায়ের কাছ বরাবর। বাঁ হাতটি থাকে শক্ত মুঠিতে। বলের আঘাতে ব্যাটটি যেন ঘুরে না যায়। অফের দিকে ড্রাইভ মার। ফরোয়ার্ডের মত বাঁ পায়ের টো বলের দিকে থাকে। ব্যাটটি সেই অবস্থায় চালিয়ে মারে। মারবার সময় আপনা থেকেই দুটি হাত কাছাকাছি চলে যায় যাতে মারতে অসুবিধা না হয়। অন্য ড্রাইভের বেলাতেও তাই। বলের লাইনে যাওয়া এবং শরীরটাকে সেই অনুপাতে ঘুরিয়ে নেওয়া। সবচেয়ে মজার মার হল ব্যাকফুট ড্রাইভ। এই সটটি সচরাচর ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়েরা ব্যবহার করে থাকেন। ব্যাক খেলবার ভঙ্গিতে এসে ডান পায়ের ভর করেই জোরে মারা। এরপরও কিছু বাকি রইল না। স্কোয়ার কাট মারতে সবাই সিদ্ধহস্ত। লোভ সামলানো দায় আর কি! অফ স্টাম্পের বাইরের বলগুলি পিছিয়ে এসে বলের লাইনে গিয়ে বলের ওপর দিয়ে ব্যাট চালিয়ে এক্সট্রা কভার ও কভার দিকে মারগুলিকে কাট সট বলে। কিন্তু বিপদও আছে। ব্যাটটি বলের ওপর দিয়ে না চালালেই ক্যাচ ওঠার সম্ভাবনা। গ্লান্স সটটি আরও দেখতে ভাল। ব্যাক খেলা অথবা ফরোয়ার্ড খেলার সময়ে লেগের বলগুলিকে হাতের কব্জি ঘুরিয়ে মারকেই গ্লান্স বলে। হুক সট মানে হয় বহুকালের আবিষ্কার। কেননা ক্রিকেটের শুরু থেকেই ফাস্ট বোলিংয়ের কখনো অভাব হয় নি। বাম্প বল ও হঠাৎ উঁচু ওঠা বলগুলিকে পিছিয়ে বুকের কাছে এনে ওপর থেকে ব্যাট চালিয়ে হুক সট

গ্যারফিল্ড সোবর্সের একটি প্রিয় মার—হুক

ইন-সুইংগার গ্রিপ
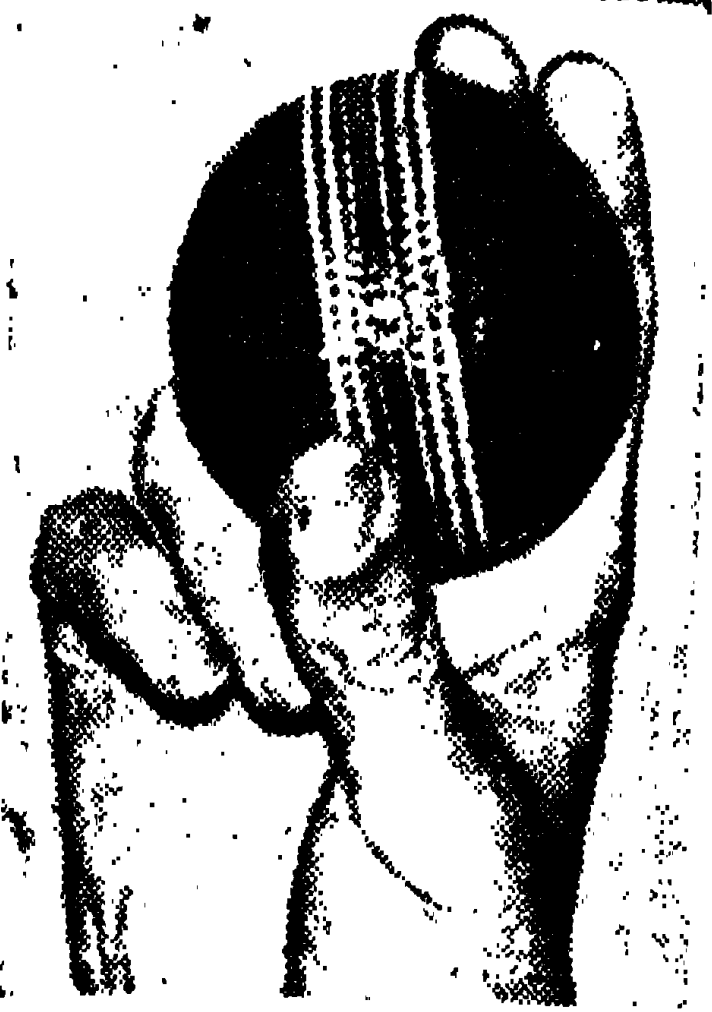
মারতে হয়। ঠিক তরোয়ালের কোপ দেওয়ার মত আর কি! ক্রিকেটের গালভরা সটের নাম হল লেট কাট। এমন সট নেওয়ার ঝুঁকি অনেক। তবে সাধনায় কি না হয়। অফের বাইরের বলগুলিকে শেষ সময়ে পিছিয়ে গিয়ে ডান পায়ের ওপর ভর করে বলটির ওপর ছুঁয়ে মারতে হয়। এতে দৈহিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এমন মারের বাহবা পাওয়া যায় খুব।

বোলাররা সেদিক দিয়ে পিছিয়ে রইল। তবে বেশি দিন নয়। কেননা এই খেলা তখন দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছে গিয়েছে। বলতে গেলে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি অধিবাসী ক্রিকেট খেলা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছে। সব জায়গায় ব্যাটসম্যান-দেরই প্রাধান্য। কিন্তু বোলার তেমন নেই। বোলাররা বোলিংয়ের নতুন কায়দা দেখালেন। বল বাতাসে ঘুরতে লাগল। সুরু হল সুইং বোলিং। ইন সুইং এবং আউট সুইং। পরীক্ষামূলকভাবে নানান দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হল। বল বাতাসে ঘুরবে কেন? উড়ন্ত পাখী আকাশে উড়তে উড়তে হঠাৎ বাতাসের চাপে হেলে পড়ে। আবার আকাশের পানে ঢিল ছুঁড়লেও সেটি হাওয়ায় এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। নতুন চকচকে বল সেই কারণেই ঘুরবে। বলা বাহুল্য বোলাররা সহজেই এই কায়দা রপ্ত

আউট-সুইংগার গ্রিপ

করলেন। বলের মসৃণ দিকটা বাঁদিকে রেখে হাতটি মাথা থেকে পাশে রেখে বোলিং করলে আউট সুইং হবে। এবং ডাইনা ব্যাটসম্যানের লেগের দিকে নির্দেশ করে ছুঁড়লে বল আউট সুইং হয়ে ব্যাটসম্যানের সোজা অথবা তার ডানদিক দিয়ে বলটি বেরিয়ে যাবে। তেমনি নতুন বলের চকচকে দিকটা ডানদিকে রেখে মাথার কাছ ঘেঁষে বোলিং করলে ইন সুইং হবে। বলটি ফেলতে হবে ডাইনা ব্যাটসম্যানের অফের দিকে লক্ষ্য করে। বলটি বাতাসে 'ইন সুইং' হয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে অথবা তার লেগের দিকে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সুইং বোলিংয়ের অন্যান্য কায়দা-গুলো বোলাররা সহজেই শিখে নিতে পেরেছিল। যেমন অফ ব্রেক, লেগ ব্রেক। আঙুলের মোচড় দিয়ে ব্রেক করা যায়। ঠিক আঙুল দিয়ে লাট্টু ঘোরানোর মত। 'অফ ব্রেক' বলে ডাইনা বোলারদের সুবিধে কিছু বেশি। বলের সিমটাকে আঁকড়ে ধরে মাথার ওপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে বল করলে অফ ব্রেক হয়। লেগ ব্রেক বোলারদের বলটিকে বিপরীত দিকে ঘোরাতে হবে।

সবশেষে বোলাররা মোক্ষম অস্ত্র ধরল। কেননা ব্যাটসম্যানরা বোলিংয়ের কায়দা-গুলোকে বুঝে নিতে বেশি সময় নেয় নি। সেই অস্ত্রটি হল গুগলী বোলিং। বল লেগ ব্রেক দেখিয়ে অফ ব্রেক করান। বোলিংয়ের ভঙ্গিমা দেখে সহজে এই ধোঁকা বোঝা যায় না। তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গুগলী বোলিংয়ে বোলারদের হাতের কনুই ওপরের দিকে উঠে যাবে। কিন্তু লেগ ব্রেকের বেলা তা হয় না।

তারপরও আছে। বোলাররা আবিষ্কার করলেন কাটার বলটি। সুইং বোলিংয়ের ভঙ্গিমাতেই কাটার হয়। অফ কাটার, লেগ কাটার। এই বলগুলি মারাত্মক। এবং এটি রপ্ত করতে যথেষ্ট পরিশ্রমের দরকার। শুধু তাই নয়, বোলিংয়ের চূড়ান্ত অস্ত্র আবিষ্কার হল। ফাস্ট বোলিংয়ের দাপা-দাপিতে ব্যাটসম্যানরা ত্রাহি ডাক ছাড়তে সুরু করল। এবং এই মারাত্মক ফাস্ট বোলিংয়ের সঙ্গে বাম্পার ও বীমার অস্ত্রে ফাস্ট বোলিংয়ের রূপ শুধু মারাত্মক নয় ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু এত সত্ত্বেও ব্যাটসম্যানরা নির্ভাবনায় ব্যাটিং করে চলছেন। হুক সট, পুল সট, স্কোয়ার কাট মারের তুবড়ি ছড়িয়ে পড়ল সারা ময়দানে। ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরীর ছটা কি বোলাররা রুখতে পেরেছে। নিশ্চয়ই না। এই ব্যাটিং-বোলিংয়ের চিরন্তন যুদ্ধ নিয়েই বুঝি আজকের ক্রিকেট। এই দ্বন্দ্ব কি কখনো শেষ হয়?
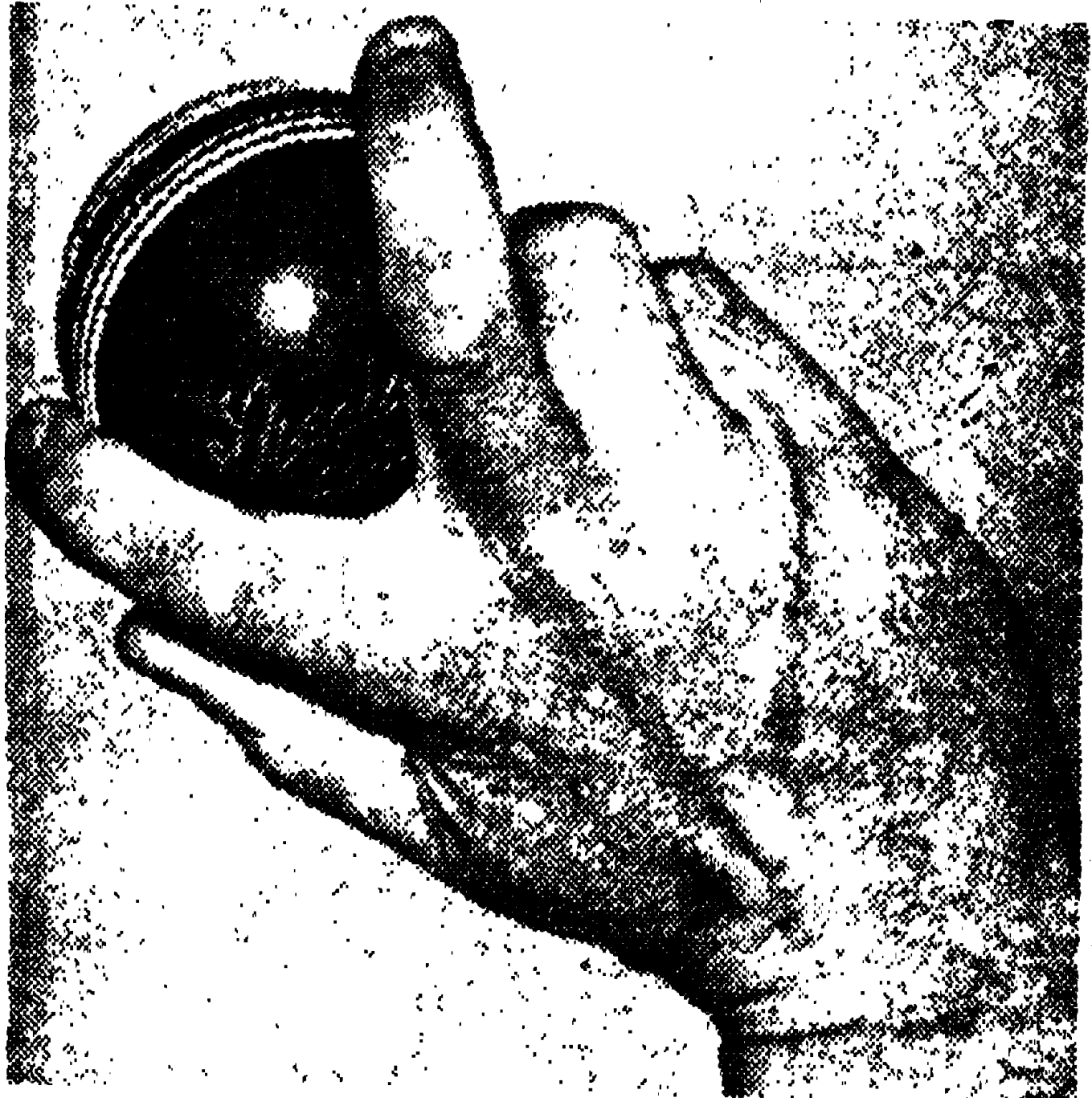
লেগ-ব্রেক গ্রিপ (ছবি পিছন থেকে নেওয়া)

অফ-ব্রেক গ্রিপ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই মহারথী

কমল গঙ্গোপাধ্যায়

আজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তাঁরাই আজ ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটকে সর্বপ্রথম জাতে তুলেছিলেন দুই দিকপাল—লিয়ারী কন্সটাণ্টাইন এবং জর্জ হেডলী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের ইতিহাসে লিয়ারী কন্সটাণ্টাইন সর্বকালের অন্যতম স্মরণীয় খেলোয়াড়। বিশ্ব ক্রিকেটেও তিনি সেরা চৌকস খেলোয়াড়দের একজন।

ত্রিনিদাদের অন্তর্গত পোর্ট অফ স্পেনে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। পুরো নাম লিয়ারী নিকলস কন্সটাণ্টাইন।

ব্র্যাডম্যান, ফ্র্যাঙ্ক উলী বা ওয়ালী হ্যামণ্ড যখন ব্যাট হাতে ক্রীজে এসে দাঁড়াতেন, তখন সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হতো তাঁদের দিকে; বোলিং-এ লারউড, গ্রিমেট, ফ্রিম্যান এবং বিল ওরেইলী ছিলেন এই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী। কিন্তু কন্সটাণ্টাইন যখনই মাঠে নামতেন, তখনই—ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সর্বক্ষেত্রেই খেলার মূল আকর্ষণ হতেন তিনি। প্রতিটি খেলাতেই কন্সটাণ্টাইন যেন নব নব রূপে আবির্ভূত হতেন। প্রতিবারই কোন-না-কোন অভিনবত্বের রোমাঞ্চ-শিহরন অনুভব করতেন তাঁর অনুরাগী দর্শকবৃন্দ।

জন্ম থেকেই ক্রিকেট-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন তিনি। পরিবারের সকলে মিলে ক্রিকেট খেলতেন; এমনকি মেয়েরাও। ছেলেবেলা থেকেই তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি। তাঁর বাবা এবং কাকা, দুজনেই বেশ ভালো ক্রিকেটার ছিলেন। বাবা এল· এস· ছিলেন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান; কাকা পাসক্যাল ছিলেন ন্যাটা বোলার।

প্রথমবার ইংল্যাণ্ডে এসেই ছন্দোময় ফাস্ট বোলিং, অপূর্ব ফিল্ডিং, মারমুখী ব্যাটিং এবং হর্ষোৎফুল্ল ও প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি দর্শকদের মন জয় করলেন। লর্ডস টেস্টে হার্বার্ট সাটক্লিফকে গালিতে সন্দেহ ক্যাচ ধরে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সাটক্লিফ ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে মেরেছিলেন; লিয়ারী মাথার ওপর দু' হাত তুলে লাফিয়ে বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে সেই আগুনের গোলাটিকে মুঠোর মধ্যে ধরে নিয়েছিলেন।

১৯২৮-এ তাঁর ক্রিকেট জীবনের মধ্যাহ্ন পর্ব। অতুলনীয় ফিল্ডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন পরিণত শৈলীর সবল মার; তা' ছাড়া প্রয়োজনে ফাস্ট বোলিং করে বিপক্ষ দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন।

সব থেকে উন্মাদনাপূর্ণ খেলা হয়েছিলো মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে। কয়েক-দিন আগে সারের বিপক্ষে কভারে ফিল্ডিং করবার সময় পেশীতে টান পড়েছিলো। দিন পনেরো পরে আবার আঘাত পেয়েছিলেন একই জায়গায়। তারপর থেকেই কন্সটাণ্টাইন অসুস্থ। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে শক্তিহীন আয়র্ল্যাণ্ডের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। সংবাদপত্রে বিরূপ সমালোচনা, কটু মন্তব্য শুরু হয়েছে। তাই মিডলসেক্সের সঙ্গে খেলাটি ছিলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ দলের চিকিৎসক কন্সটাণ্টাইনকে বললেন—'এখনো অন্তত এক হপ্তা বল ছোঁয়া নিষেধ; অন্যথায় শরীর সারতে আরো দেরী হবে।'

'তোমার ওপরই আমাদের সব থেকে বেশী আস্থা, তোমার খেলা দেখতেই দর্শকরা ভিড় করে। কিন্তু ডাক্তার যখন বলেছেন, তখন......' ম্যানেজার মিঃ ম্যালেট তাঁর কণ্ঠস্বরে হতাশার ভাব গোপন করতে পারেন না।

'তা' ছাড়া মনে রাখা উচিত, এ খেলায় খেলতে গিয়ে আবার আঘাত পেলে টেস্ট ম্যাচে কোন মতেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না'—ডাক্তার জোর দিয়ে বলেন।

যাঁকে নিয়ে এত কথা, সেই কন্সটাণ্টাইন কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'আমি খেলবো।'

প্রথম দিন মিডলসেক্সের অধিনায়ক এফ· টি· ম্যান টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন। পরের দিন সকালে ৬ উইকেটে ৩৫২ রান তুলে মিডলসেক্স ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলো। হেইগ করলেন ১১৯, হেনড্রেন অপরাজিত ১০০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংসের সূচনাতেই বিপর্যয়—৫ উইকেটে মাত্র ৭৯ রান। এই সঙ্কট-মুহূর্তে এলেন কন্সটাণ্টাইন। এসেই বেপরোয়া পেটাতে শুরু করলেন। অ্যালেন, পাওয়েল কাউকেই রেহাই দিলেন না। ১৮ মিনিটে ৫০ রান। প্রতি বলেই মার। ৫৫ মিনিটে ৮৬ রান করে পেবলস-এর বলে আউট হলেন কন্সটাণ্টাইন। তার মধ্যে আটটি বাউণ্ডারী এবং দুটি ওভার বাউণ্ডারী। তাঁর খেলা দেখে সেদিন জেসপের কথাই বারবার মনে পড়েছিলো। কন্সটাণ্টাইন আউট হওয়ার অল্প পরেই ২৩০ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হলো।

মিডলসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংস। বোলিং-এ সংহারমূর্তি ধারণ করলেন কন্সটাণ্টাইন—১৪·৩ ওভার, একটি মেডেন, ৫৭ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট। কন্সটাণ্টাইন সেদিন লারউডের চেয়েও তীব্রগতিতে বল করে-ছিলেন। মিডলসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো মোট ১৩৬ রানে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ২২০ মিনিটে ২৫৯ রান তুলতে পারলে জয়ী হবে এই অবস্থায় (যা' মোটেই সহজসাধ্য নয়) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে এলো। এবারেও ১২১ রানের মধ্যে প্রথম পাঁচজন ব্যাটসম্যান ফিরে গেলেন। জয়লাভের জন্য ৯০ মিনিটে ১৩৮ রান প্রয়োজন। এমন কি পরাজয়ও অসম্ভব নয়। কন্সটাণ্টাইন এলেন; প্রথম বলেই চার। ফিল্ডারদের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। শর্ট রান নিতে লাগলেন তিনি। ২৪ মিনিটে ২৪ রান। হার্নের বলে চার, ওভার বাউণ্ডারী। ৩৭ মিনিটে অর্ধশত রান পূর্ণ হলো। এবার হাত খুলে মারতে লাগলেন। কাউকেই সমীহ না করে সহজ-ভাবে খেলে একঘণ্টার একটু বেশী উইকেটে থেকে দুটি ওভার বাউণ্ডারী এবং বারোটি বাউণ্ডারীর সাহায্যে ১০৩ রান করে আউট হলেন কন্সটাণ্টাইন। শেষ পর্যন্ত এই খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজই তিন উইকেটে পরাজিত করলো মিডলসেক্সকে।

সে-বছরই শীতকালে ল্যাঙ্কাশায়ার ক্রিকেট লীগে নেলসন ক্লাবের হয়ে খেলবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং [illegible]
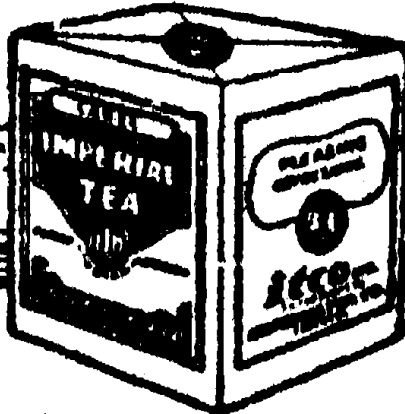
স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। এই সঙ্গে আইন পড়তে আরম্ভ করলেন।

১৯৩৩-এ এম· সি· সি'র বিরুদ্ধে ২৭ মিনিটে ৫৯ রান করেছিলেন। তাঁর এই ইনিংসের প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এমন মন-মাতানো খেলা সত্যিই দুর্লভ। অ্যালোমের বলে ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন, বল হারিয়ে গিয়েছিলো। ১৯৩৯-এ শেষবারের মত টেস্ট ম্যাচে অবতীর্ণ হয়ে মিডিয়াম-পেস বোলার হিসেবে ৭৫ রানে ৫টি উইকেট নিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করলেন। ওভাল মাঠের চমৎকার পিচে হ্যামণ্ড, হার্ডস্টাফ, উলডরিজ সেদিন তাঁর বলে পরাজিত হয়েছিলেন। ব্যাটিং-এও সেই চোখ-ঝলসানো দীপ্তি। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলিং বিধ্বস্ত করলেন মারমুখী ব্যাটিং-এ। ৭৯ রান করলেন কন্সটাণ্টাইন। তাঁর মারের দাপটে সেদিন সারা মাঠ কেঁপে উঠেছিলো।

অস্ট্রেলিয়ার মাঠেও (১৯৩০-৩১) তিনি বেপরোয়া ব্যাটিং-এ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। টাসমানিয়ার বিপক্ষে ৫২ মিনিটে সেঞ্চুরী করেছেন। নিউসাউথ ওয়েলস-এর বিরুদ্ধে ৪টি ওভার বাউণ্ডারী এবং ৪টি বাউণ্ডারীসহ ৫৯ রান করেছেন ৩৫ মিনিটে। জ্যাক ফিঙ্গলটন বলেছেন, বুলেটের মত তীব্রগতিতে বার বার তিনি প্রান্তসীমার বাইরে বল পাঠিয়েছেন।

১৯৩৪-এ ভিজিয়ানাগ্রামের রাজ-কুমারের আমন্ত্রণে গোল্ড কাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণের জন্য কন্সটাণ্টাইন ভারতে এসেছিলেন।

ব্রিসবেন টেস্টে প্রথম দিনের শেষে ব্র্যাডম্যান [illegible]শোর ওপর রান তুলেছেন। পরের দিন সকালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ড্রেসিং রুমে সকলের মুখেই এক কথা—কিভাবে ব্র্যাডম্যানকে আউট করা যায়। হঠাৎ ব্র্যাডম্যান ভেতরে এসে দাঁড়ালেন; তারপর বললেন, 'গ্রাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক), কিছু মনে করো না, আজ আমি নিজের ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড ভাঙবো।' ব্র্যাডম্যান এ-কথা বলেছিলেন বিপক্ষ দলকে স্নায়ু-যুদ্ধে দুর্বল করবার জন্য। কিন্তু তাঁর কথায় কন্সটাণ্টাইনের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। খেলা শুরু হোলো। দিনের প্রথম ওভার বল করতে এলেন কন্সটাণ্টাইন। সমস্ত শক্তি সংহত করে বল করলেন তিনি; ব্র্যাডম্যানের গলার কাছাকাছি বল লাফিয়ে উঠলো এবং হিসেবে ভুল হয়ে গেলো তাঁর। মাথা নীচু করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন ব্র্যাডম্যান।

স্বল্পস্থায়ী ক্রিকেট জীবনে খুব কম খেলোয়াড়ই তাঁর মত খ্যাতি অর্জন করেছেন। যাঁরা কন্সটাণ্টাইনের খেলা দেখেছেন, তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান।

ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ছিলেন জর্জ হেডলী। শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের নয়, তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ছিলেন তিনি। স্বদেশে এবং বিদেশে সমান জনপ্রিয়।

১৯২৮-এ মাত্র উনিশ বছর বয়েসে শক্তিশালী এম· সি· সি-র বিরুদ্ধে জন্মভূমি জ্যামাইকার হয়ে ২১১ রান করে ক্রিকেট জগতে নিজের দীপ্ত আবির্ভাব ঘোষণা করলেন হেডলী। পরের বছর ইংল্যাণ্ড দল আবার খেলতে এলো ওয়েস্ট ইন্ডিজে। হেডলীর ডাক পড়লো প্রথম টেস্টে।

আনন্দ হলো যতখানি, চিন্তা হলো তারচেয়ে বেশী। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন তো?

প্রথম টেস্টে দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরী করলেন হেডলী। তাঁর অবিচল ধৈর্য, আত্ম-প্রত্যয় এবং তীক্ষ্ম আক্রমণাত্মক খেলা দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। চারদিকে তখন তাঁর জয়-জয়কার। চতুর্থ টেস্টে আবার ২২৩ রান করে রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত হলেন হেডলী।

১৯৩০-৩১-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের হয়ে সর্বপ্রথম বিদেশ সফর—অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার বোলিংশক্তি তখন ক্রিকেট জগতে আলোচ্য বিষয়। গ্রিমেট, অক্সেনহাম এবং ন্যাটা বোলার আয়রন মংগার-এর দুর্দান্ত বোলিং-এর সম্মুখীন হয়েও এতটুকু বিচলিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না হেডলী। ব্রিসবেন টেস্টে দলের মোট ১৯৩ রানের মধ্যে হেডলী একাই করলেন ১০২ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রবীণ খেলোয়াড়রা কেউই সেদিন অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণের তোড়ে দাঁড়াতে পারেন নি। কিন্তু তরুণ হেডলী অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা বোলারদের বিপক্ষে সাহস-বিস্তৃত বক্ষে সবল হাতে খেলে সেঞ্চুরী করেও অপরাজিত ছিলেন।

ব্রিসবেন টেস্টে পরাজিত হলেও সিডনী টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়েছিলো। এই জয়লাভের মূলেও হেডলীর দান বড় কম নয়। এই টেস্টেও তিনি সেঞ্চুরী করেছিলেন।

পরের বছর লর্ড টেনিসনের নেতৃত্বে একটি ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে এলো। এই দলে অনেক কৃতী বোলার ছিলেন। কিন্তু হেডলীর বিরুদ্ধে তাঁরা কেউই সুবিধা করতে পারলেন না। প্রতিটি খেলায় হেডলীর অগ্নিগর্ভ ব্যাটিং প্রাণভরে উপভোগ করে-ছিলেন দর্শকরা।

অতঃপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সংগে ইংল্যাণ্ড সফর। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে হেডলী ১৬৯ রান করে অপরাজিত রইলেন (ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোট রানসংখ্যা ছিলো ৩৭৫)। লর্ডস টেস্টে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেঞ্চুরীর মুখে এসে অ্যালেনের ইয়র্কার বলে আউট হয়েছিলেন। সেদিন সেঞ্চুরী না হওয়ায় হেডলী নিজে যতখানি দুঃখিত হয়ে-ছিলেন, তারচেয়ে অনেক বেশী দুঃখ পেয়ে-ছিলেন সমাগত দর্শকবৃন্দ। সেই বছরই ইংল্যাণ্ডে নর্দার্ন ক্রিকেট লীগে যোগদান করলেন হেডলী।

১৯৩৯-এ আবার আমন্ত্রণ পেলেন টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করবার। লর্ডস মাঠে প্রথম টেস্টে ২২৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ হলো। হেডলী একাই করেছিলেন ১০৬। দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি; মাত্র ২২৫ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়েছিলো। এই ইনিংসেও হেডলী সেঞ্চুরী করেছিলেন (১০৭)।

বাইশটি টেস্ট ম্যাচে চল্লিশ ইনিংসে তিনি মোট ২১৯০ রান করেছিলেন; সর্বোচ্চ রান ২৭০ অপরাজিত; গড় রান ৬০·৮৩। শুধু রান সংখ্যা জেনে আজকের ক্রিকেট অনুরাগীরা হেডলীর ব্যাটিং-এর সুষমা, সৌন্দর্য; তাঁর ধৈর্য, একাগ্রতা বা চাতুর্য কিছুই অনুমান করতে পারবেন না। পূর্ণ-পরিণত ব্যাটসম্যানের সমস্ত গুণই তাঁর ছিল; শক্তি ও সৌন্দর্যের সার্থক সমন্বয়ে, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের চারু প্রয়োগে তৎকালীন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

সোয়াডি ব্যাঙ্কক!
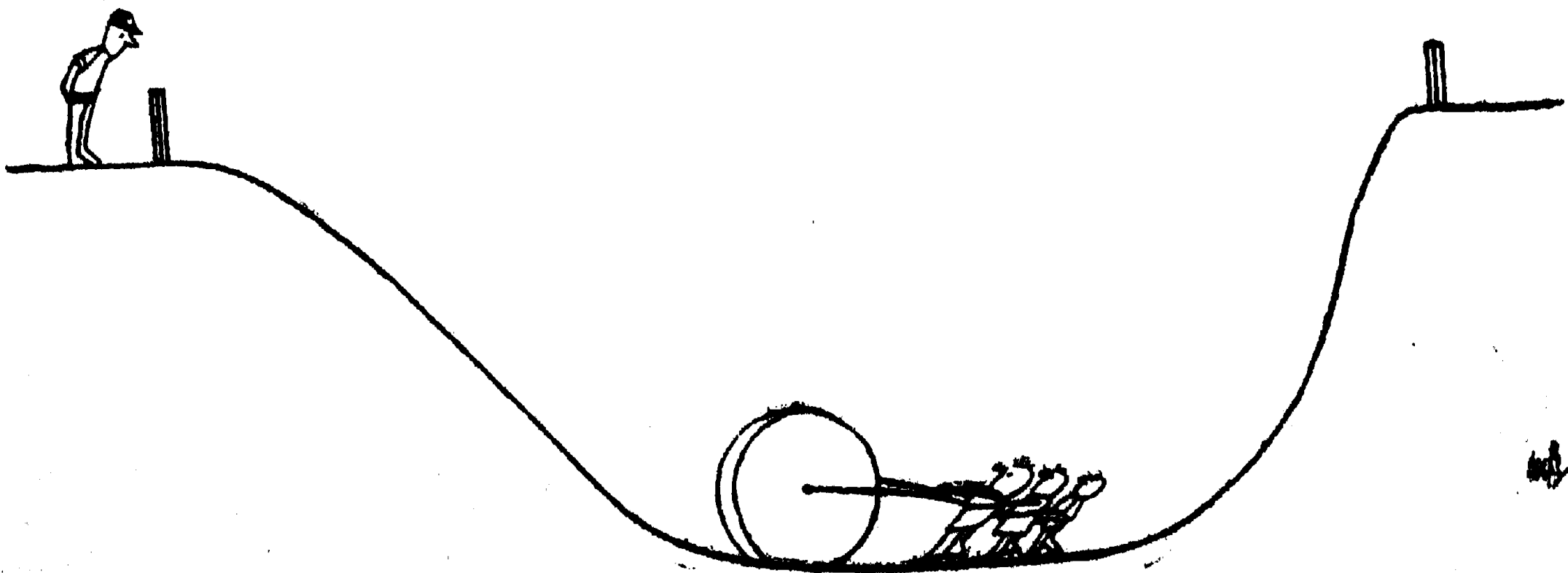
অজয় বসু

১৯ই সুরু। সমাপ্তি ২০শে ডিসেম্বর—বারোটি দিন যে কেমন করে কেটে গেল টের পাইনি। ওই বারোদিন ব্যাঙ্কক শহরে উৎসবের মেজাজ। নগরসজ্জায় যেমন ঘটা, তেমনি জন-জীবনেও মেলার স্ফূর্তি। এশীয় ক্রীড়ার আনন্দ যেন সারা শহরটাকে মাতিয়ে রেখেছিল। হেথা থেকে হোথা, রামা রোডের মূল স্টেডিয়াম থেকে হুয়া মাকের বক্সিং রিং অনেক দূরে। প্রায় মাইল পনেরো হবে। তবু এখান থেকে ওখানে দলে দলে লোক ছুটেছে। সকাল, সন্ধ্যে, রায় দুপুর-রাত পর্যন্ত ঠায়পায় জেগে প্রতিদিন খেলাধূলার অনুষ্ঠান দেখেছে।

অবশ্য রাতদুপুর পর্যন্ত জেগে থাকাই আধুনিক ব্যাঙ্কক শহরের স্বভাব। অগুন্তি নাইট ক্লাবে শহরের অলিগলি ভর্তি। ভিয়েৎনামে বোমা ফেলে মার্কিন সেনানীরা খাস শহর ব্যাঙ্ককে জিরোতে আসে। নাইট-ক্লাবের বারে মুঠো মুঠো ডলার ছড়ায়। নাচ গান, পানপর্বে রাত কাটায়। দিব্যি মাইফেলের আয়োজন। ওদের দেখে ব্যাঙ্ককের আদি-বাসীরা নাইটক্লাবের পাড়ায় জমায়েৎ হচ্ছে। রাতেই যখন ক্লাবের কাজ-কারবার তখন রাত জাগতে ওদের আপত্তি হবেই বা কেন? রাত জাগতে অভ্যস্ত বলেই দুপুর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে ওদের অসুবিধে হয়নি।

বক্সিং ফাইনাল ভাঙলো রাত একটা নাগাদ। ইনডোর স্টেডিয়ামের বাইরে এসে দেখি রাস্তার দুধারে পিলপিল করে লোক হাঁটছে। কতো লোক? তা পাঁচ-সাত হাজার হবে। ব্যাঙ্কক শহরের যে অঞ্চলে ইনডোর স্টেডিয়াম গড়া হয়েছে সেই অঞ্চলে বসতি নেই বল্লেই চলে। ফাঁকা। আশপাশে চাষের জমি পড়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। শহর ওখান থেকে অনেক দূরে। যানবাহনের যা ব্যবস্থা, তাতে রাস্তার অর্ধেক লোকেরও বাসে জায়গা হবে না। বাকী কয়েক হাজার বাড়ী ফিরবে কি করে? কি করে আর, জিজ্ঞাসা করতেই এক স্থানীয় ভদ্রলোক বল্লেন স্রেফ্ পায়ে হেঁটেই!

বুঝুন ব্যাপারখানা! আর সেটুকু বুঝলেই জানা হয়ে যাবে যে এশীয় ক্রীড়ার এবারের অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্ককের জন-জীবনে উৎসাহের কতোবড় প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল।

আমরা সাংবাদিকের দল চোদ্দ রকম খেলার একশচোদ্দ কি তারও বেশি সংখ্যা-তত্ত্বের ফিরিস্তি কাগজের পাতায় পাতায় টুকে রাখতে এবং সকাল বিকেল সন্ধ্যায় স্টেডিয়াম করতে করতেই ফুরিয়ে গিয়েছি। তবু তো আমাদের জন্যে মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ওরা? আরাম বিরাম, নাওয়া খাওয়ার ধার ধারেনি। যেখনে যখন খুশি হাজিরা দিয়েছে। গাড়ীঘোড়ার তোয়াক্কা রাখেনি। লক্ষ্য মজার মজে থাকা। বারোটি দিন তাই ওরা শুধু এশিয়ান গেমস ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই আমলে আনে নি। সত্যিই উৎসাহ বটে!

আর এই উৎসাহে শুধু তথাকথিত লোকপ্রিয় খেলার আসর ঘিরেই নয়। উৎ-সাহের লক্ষণ সর্বত্র। ফুটবল মাঠে আর ভলিবল কোর্টে, সাইক্লিং ভেলোড্রোমে আর ভারোত্তোলন কেন্দ্রে কোথায়ও ফারাক নেই। সব অঞ্চলেই জনসমাবেশ রীতিমতো ঘন। আরও বোঝা যায় যে সে জনতা তেমনি জীবন্ত। ঘন-ঘন করতালি, হাসিখুশীর প্রকাশ্য অভিব্যক্তি, এক প্রতিযোগীকে উৎসাহ যোগাতে, অন্যকে দমিয়ে দিতে জনতার উদ্যমে ঘাটতি নেই এতোটুকু।

দ্বাদশ দিনে শেষপ্রহরের ঘন্টাটিও যেন বেজে উঠলো বিনা নোটিশেই। আসর ভাঙবে একথা জানা ছিল। কিন্তু কখন তা অজানা।

আচ্ছাদিত ছাদের নীচে পাকা গ্যালারির প্রশস্ত সিটে বসে মাঠের মাঝের অনুষ্ঠান দেখছি। বহুবিধ, বিচিত্র অনুষ্ঠান। সতেরোটি দেশের প্রতিনিধিরা রং-বেরঙা জামা গায়ে দিয়ে কুচকাওয়াজ করলেন। শোভাযাত্রার শোভাবর্ধনের জন্যে অভিজ্ঞান-পত্রটি হাতে নিয়ে দলের পুরোবর্তিনী ছিলেন থাই সুন্দরীর দল। যিনি যে-দলের পুরো-ভাগে তাঁরই পরনে সেই দেশের পোষাক। মেরুন রঙের বেনারসী পরিহিতা তরুণীটিকে দেখে কে বলবে যে তিনি ভারতীয় নন! প্রতিনিধিদের পোষাকের সঙ্গে ব্যাণ্ড বাদকদের পোষাকের রং মিশে চতুর্দিক রংয়ে রংয়ে একাকার। পায়ের নীচে আরও জীবন্ত রং, ঘাস বিছানো কার্পেটের গাঢ় শ্যাম-লিমা। দেখতে দেখতে বিকেল উৎরে সন্ধ্যা উঁকি দিতেই স্টেডিয়ামের আলোগুলো দপ্ করে জ্বলে ঠিকরে পড়লো। আলোয় আলোকিত হলো চতুর্দিক। সেই পরিবেশে পতাকা ওড়ানো হলো, ব্যাঙ্ককের মেয়রের হাতে অর্পণ করা হলো এশীয় ক্রীড়ার নিজস্ব পতাকা। পরক্ষণেই অনির্বাণ পূত শিখাটি নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামের সবকটি বাতিও। চতুর্দিক অন্ধকার। সব শেষ কি?

না তখনও বাকী ছিল। এবার এলো মশালধারীর দল। একে একে অনেকে। অসংখ্য তরুণ। আস্তে আস্তে ছুটে তারা সব বৃত্তাকারে দাঁড়ালো ক্রীড়াঙ্গনটিকে ঘিরে। কারুর মুখে কথা নেই। আলো নেই এতো-টুকু শুধু জ্বলন্ত মশালের বৃত্তটিই জেগে রয়েছে ছবির মতো। তারপরই ঊর্ধ্বাকাশে ফুটে উঠলো হরেকরকম আতসবাজীর খেলা। সে খেলা শুধু রংয়েরই খেলা। অন্ধকার আকাশ চিরে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা, মুঠো মুঠো রং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো স্টেডিয়ামে। কতোক্ষণ এই খেলা চলেছিল জানি না। চোখ ভরে দেখতে দেখতে যখন অচৈতন্যপ্রায়, তখন হুঁশ ফিরলো, সহস্র কন্ঠের উচ্চারণে—সোয়াডি!

স্টেডিয়ামের বড় স্কোর বোর্ডটার গায়েও আলোর অক্ষরে লেখা সোয়াডি (SWAD) অর্থ গুডবাই। শেষ। যবনিকাপাত। বিদায় লগ্ন। তাই এতোকাণ্ডের পরও বিষন্ন। ছন্দ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার আশ্বাস। স্কোরবোর্ডের গায়ে—আবার দেখা হবে সিওলে। এশিয়ার তরুণ-তরুণীরা আবার মিলবেন, পরস্পরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে মৈত্রীর পাকা সড়ক গড়বেন চার বছর পর এশীয় ক্রীড়ার ষষ্ঠ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে।

১৯৭০ সালে সিওল হয়তো এশীয় ক্রীড়ার আসরটিকে ভাল করে সাজাতে পারবে। কারণ দিনে দিনে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ছে। কিন্তু ব্যাঙ্কক যা করেছে তার তারিফ যদি না করি তাহলে অপরাধ বাড়ানো হবে। সুষ্ঠু সংগঠনে, পরিচ্ছন্ন পরিপাটী অনুষ্ঠান উপহার দিয়ে ব্যাঙ্কক সমাগত প্রায় সকলকেই খুশী করতে পেরেছে।

ব্যাঙ্কক পরিচ্ছন্নতার মূল্য বোঝে এবং সেই মূল্য ধরে দিতে তার চেষ্টারও অন্ত নেই। রাস্তাঘাট, বাড়ী-ঘর, পরনের পোষাক সবই পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী। যে মজুর মাথায় মোট বইছে, যে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝেঁটিয়ে ময়লা সাফ করছে, যে ট্যাক্সী চালাচ্ছে বা যে পুলিশ চৌমাথায় দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে, তারও পায়ে চকচকে জুতো, পরনে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। রাস্তার ওপরে পড়ে থাকা কাগজের একটি টুকরো খুঁজে পেতে হলে যে ক' মাইল হাঁটতে হবে তা কে জানে? মাইলের পর মাইল হাঁটলেও যে তা পাওয়া যাবে তারও কোনো স্থিরতা নেই।

এশীয় ক্রীড়া দেখতে বিদেশীরা আসছে বলেই তাদের দেখাতে ব্যাঙ্কক পরিচ্ছন্ন থাকতে চেয়েছে হঠাৎ, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। হঠাৎ চেষ্টা করলে অমন পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠা যায় না। স্বভাবেই ব্যাঙ্কক শ্রীময়। শহরবাসীদের স্বভাবেই। ছেলে মেয়ে, ছোট বুড়ো সবাই ফিটফাট থাকতে চায়। থাকেও। খরচ যোগাতে পারেও। কারণ এরা সবাই আজকের দিন-টিকে নিয়েই ব্যস্ত। ভবিষ্যতের ভাবনায় চিন্তিত নয়। এই মনোভাব ভাল কি মন্দ অথবা ভবিষ্যৎ নিরাপদ কিনা তা জানার সুযোগ আমার ঘটেনি। অতো কথা জানতে হলে সময়ের প্রয়োজন। আর প্রয়োজন গভীর দৃষ্টি মেলা। সে সময় আর গভীরে প্রবেশ করার পর্যাপ্ত সুযোগ কোথায়? যদিও সুযোগ আসে তো ভাষার ব্যবধান বোঝাবুঝির পথে মস্তো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যতোটুকু দেখা সবই ওপর ওপর। আর সেই

পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে থাই ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় স্টেডিয়ামে পতাকার সাহায্যে ভারোত্তোলনের চিত্রাকৃতি গড়ে তুলেছে।

টুকু দেখার মোদ্দা উপলব্ধি, ব্যাংকক শহর ও শহুরে মানুষেরা ভারী পরিচ্ছন্ন। আর সেই পরিচ্ছন্নবোধে উজ্জীবিত থেকেই তারা এশীয় ক্রীড়াভূমিকে যত্নে ও নিষ্ঠায় পরিপাটী করে সাজাতে চেয়েছে। পেরেছেও।

ব্যাংককে একসময় বলা হোতো প্রাচ্যের ভেনিস। তখন শহর জুড়ে শুধু খাল আর খাল! নৌকোতেই যাতায়াত। এখন সব বদলে যাচ্ছে। খালের বদলে চওড়া চওড়া আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলি এদিক থেকে ওদিকে, চতুর্দিকে চলে গিয়েছে। কলকাতার একটা ভি আই পি রোড নিয়ে আমাদের গর্ব। অমন কতো ভি আই পি রোড যে ব্যাংককে আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। অথচ জনসংখ্যার নিরিখে ব্যাংকক কলকাতার অর্ধেকও নয় বুঝি। এশীয় ক্রীড়া উপলক্ষেও নতুন রাস্তা, নতুন সাঁকো বানানো হয়েছে। শহরের একমাত্র ফ্লাইওয়েটিও মূল স্টেডিয়ামের কাছে। টোকিওর অনুকরণে গড়া এই ফ্লাইওয়ে একতলা, দোতলায় রাস্তা। আর সেই রাস্তা দিয়ে দিবারাত্র সাঁ-সাঁ করে মোটর ছুটছে। মোটরের সংখ্যাও ব্যাংককে কম নয়। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কোনো বড় রাস্তায় 'মোটরকেড'এ বড় একটা ছেদ পড়ে না বল্লেই চলে।

রাস্তার দু'ধার, মাঝখানের দ্বীপ, সুবিধেমাফিক সব জায়গাই এশীয় ক্রীড়ায় যোগদানকারী দেশগুলির পতাকা দিয়ে মোড়া। রাত্রে এইসব অঞ্চলকে রঙিন আলোয় সাজিয়ে রাখা হয়। নতুন নতুন ক্রীড়াঙ্গন, নতুন গ্রামভবন গড়া হয়েছে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের এবং প্রতিযোগীদের বসবাসের সহায়তায়। শ'দুয়েক বিদেশী সাংবাদিকের থাকার ব্যবস্থা নতুন গড়া সাততলা প্রাসাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। বিদেশীদের প্রতিটি চাহিদা মেটাতে 'গ্রামে', 'প্রেসহাউসে' দিবারাত্র দপ্তর খোলা। দপ্তরের কর্মী হলেন ছাত্র-ছাত্রীদল। সবিনয়ে, স্মিতহাস্যে সকলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁরা সদাই উদগ্রীব। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার নিখুঁত করে তুলতে থাই সরকার অকৃপণ মেজাজে পয়সা ঢেলেছেন। বিদেশীদের তারিফ আদায় করাই অর্থব্যয়ের মূল লক্ষ্য। অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে যেহেতু প্রেসহাউস ছাড়ার আগে দলে দলে বিদেশী সাংবাদিক লিখিত মন্তব্যে ব্যবস্থাপনার প্রশংসা রেখে গিয়েছেন।

দু'-একটি বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার সংগঠন ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ করার কিছুই নেই। অভিযোগ ব্যাংককের হকি ও ফুটবল মাঠের অসমান জমি। ওপরে ঘাস যথেষ্ট। কিন্তু ঘাসের তলায় জমি সমান নয়। স্টেডিয়াম, পুল, জিমনাসিয়াম, কোর্ট ইত্যাদির অঙ্গসজ্জা আড়ম্বরপূর্ণ। হুয়ামাকের ইনডোর স্টেডিয়ামটির রূপ সত্যিই চোখ-ধাঁধানো। কিন্তু সেই অনুপাতে হকি ও ফুটবল মাঠের জমির দুরবস্থাও নজরে পড়ার মতো। দ্বিতীয় অভিযোগ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচী প্রণয়নে পক্ষপাতিত্ব দেখানো সম্পর্কে। সংগঠক থাইল্যান্ডের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নীতি অবলম্বনে কোনো কোনো প্রতিযোগীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদও জানানো। ভলিবলের বাছাই তালিকা রচনার সময়ও থাইল্যান্ডের কোলে ঝোল টানা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। তবে বাছাইরূপে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও থাইল্যান্ড ভলিবলের ক্ষেত্রে কোনো বাড়তি সুবিধে আদায় করতে পারে নি। তাই ভলিবল বাছাই পর্বে সংগঠকরা যা করেছেন সেটা তেমন বড় অপরাধ নয়।

এছাড়া আর অলক্ষণে কান্ড ঘটেছিল দল সমর্থকদের দাপাদাপিতে ফুটবল মাঠে ও বাস্কেটবল কোর্টে।— তবে থাই দর্শকদের উগ্র জাতীয়বোধের উৎকট প্রকাশের জন্যে সংগঠকদের দায়ী করা চলে না। বাস্কেটবল কোর্টে দক্ষিণ কোরিয়া বনাম থাইল্যান্ডের খেলার দিনে যে গন্ডগোল হয় সে সম্পর্কে সিওলের পত্রপত্রিকায় থাই সংগঠকদের এক হাত নেওয়া হলেও অন্য দেশের প্রতিনিধিরা সাংগঠনিক কাজে বড় একটা খুঁত ধরেন নি। খুঁত ধরতে চানও নি।

খুঁত ধরতে চাইলে ধরা যে চলতো ভুক্তভোগী সাংবাদিকমাত্রেই তা স্বীকার করবেন। কারণ ব্যাংকক থেকে অন্য দেশে, কাছাকাছি ভারতেও অল্পসময়ে তারবার্তা পেঁাছে দিতে থাইল্যান্ডের তার-বিভাগ সফল হয় নি। কিন্তু যে আন্তরিকতায় তার-অফিসের কর্মীরা তাড়াতাড়ি কাজ করতে চেয়েছেন তার কথা ভেবে সাংবাদিকেরা অভিযোগে ফুঁসিয়ে উৎসাহ বোধ করেন নি। আসলে তাড়াতাড়ি তারবার্তা অন্যত্র পেঁাছে দেওয়ার ব্যাংককের তার-বিভাগের অভিজ্ঞতা তেমন পরিণত নয় এবং এশীয় ক্রীড়াকালে কাজের চাপ যে কতো দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাও স্বচ্ছ
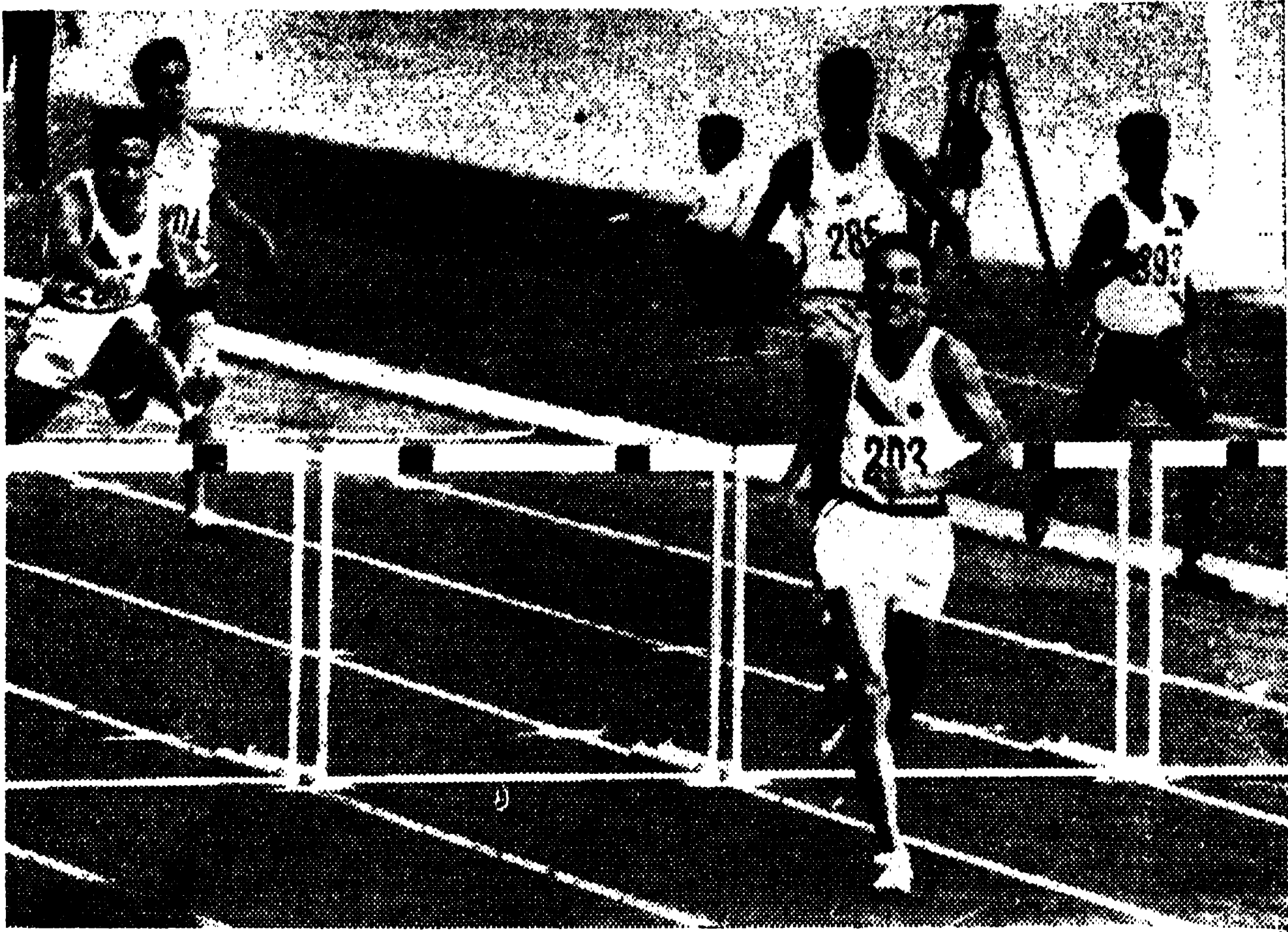
ব্যাংককে পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার ৪০০ মিটার হার্ডেলসের অন্তিম মুহূর্ত।

ছিল না। আগের ধারণা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন আর করার বিশেষ কিছু নেই। প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তাড়াতাড়া তারবার্তা হয় কেন্দ্রীয় তার-অফিসে বা ব্যাংককের স্টেডিয়ামে ও প্রেসহাউসে বসানো সাময়িক ছোট্ট কেবল কাউন্টারে জমা পড়ছে তো পড়ছেই। দপ্তরের কর্মীরা তার পাঠাতে যতোই হিমসিম খাচ্ছেন ততোই লজ্জাবনত মুখে তাঁদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইছেন। এমন অসহায়ভাবে ক্ষমা চাওয়ার পরও কি কেউ ওঁদের কাজে দোষ ধরার প্রেরণা পেতে পারে? ত্রুটি যা ছিল দোষ স্বীকার করে এবং প্রতি পদক্ষেপে কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়ে ব্যাংকক তা পুষিয়ে দিতে চেয়েছে।

ব্যাংককে এশীয় হকির ফাইনালে ভরত বনাম পাকিস্তানের খেলায় বিরতির সময়ে ভারতের সেন্টার ফরোয়ার্ড হরবিন্দার ও হাফব্যাক ফ্র্যাংক জুতোর ফিতে কষে দিচ্ছেন।

এই নিষ্ঠা ও ভদ্র সবিনয় আচরণই হলো পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার সংগঠকদের মূল সম্পত্তি। এই সম্পত্তির বিনিময়ে তাঁরা অন্যের মন পেয়েছেন, পেয়েছেন ভালবাসা। আর এশীয় ক্রীড়ার মতো প্রতিনিধিমূলক অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই যখন প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়-করা, তখন বলতে হয় যে, মাঠের মাঝখানে অন্যপক্ষের বিশেষ করে জাপানের ভূমিকা যতোবড়ই হোক্ না কেন ভিন্নতর চিন্তার নিরিখে থাই সংগঠকদের ভূমিকা ছিল সত্যিই খেলোয়াড়চিত।

এই উপলব্ধি থাঁটি পরম সত্য। তাই গত ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ব্যাংককের মূল স্টেডিয়ামে থাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের আবেগে আবেগ মিশিয়ে অগুন্তি বিদেশীও ধরা-গলায় বলে উঠেছিলেন সোয়াডি ব্যাংকক, ধন্যবাদ! যে থাই তরুণী এক ভারতীয় অ্যাথলিটের কাছ থেকে হাত পেতে তাঁর মাথার পাগড়ীটি নিজের মাথায় পরিয়েছিলেন তাঁর মুখেও 'সোয়াডি,' চোখের কোণে চিক্‌চককরা জলকণা!

প্রাণে প্রাণে সেতুবন্ধন, এশীয় ক্রীড়া-ভূমি তাই সার্থক মিলনভূমি!

চিত্রচিন্তা

নির্মলকুমার ঘোষ (এন, কে, জি)

নির্বাক ও সবাক এদুটি যুগ মিলিয়ে বাংলা ছবির বয়স অর্ধ-শতাব্দীকে কয়েক বছর আগেই অতিক্রম করে এসেছে। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমাটি যে নিশ্ছেদ ও নিরাপদ হয়েছে এমন কথা পরম আশাবাদীরাও বলবেন না, বলবেন না যে আজন্মকাল এই রসশিল্প উত্তরোত্তর তার শিল্পমর্মিতা ও কলাসৌন্দর্যের একটানা অগ্রগতি সাধনই করে এসেছে। তবে একথা অস্বীকার্য নয় যে এই শিল্পের অনুবৃত্তির মধ্যে যেমন ছিল না ছেদ, তার সাধনার একটা সূক্ষ্ম রসধারাও তেমনি হাজার বাধাবিপত্তি ও শিল্পমানসিকতার সংকটের মধ্য দিয়ে তার অন্তরদীপটিকে, ঠিক প্রোজ্জ্বল শিখায় না হোক, একটা মৃদুলাবণ্য-দীপ্তির সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজ কিন্তু বাংলা ছবি এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে তাকে থমকে দাঁড়াতে হবে, চিন্তা করতে হবে সামনের চৌমাথা থেকে সে কোন পথটি বেছে নিয়ে ফের চলার গতি ও ছন্দের একটা সমন্বয় সাধন করে তার অভিযাত্রাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। আজকে সে সত্যিসত্যিই ক্রস রোড-এ দাঁড়িয়ে চিন্তাচ্ছন্ন। গভীর আত্মানুসন্ধান করে তাকে নির্ণয় করতে হবে—কি হবে এই নতুন যুগের বাংলা ছবির শিল্পভাবনা। কি হবে তার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। কেননা যে-কেউ এর শিল্পেতিহাসকে অনুসরণ করে এসেছেন তিনিই স্বীকার করবেন নানা বিরুদ্ধ রূপের শিল্পমানসিকতা ও শিল্পদ্যোতনার সংঘাতের আবর্তে পড়ে ছায়াচিত্রের সমগ্র শিল্পসত্তাটাই একটা বৈপ্লবিক রূপপরিবর্তনের সম্ভাবনাচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কতটা তার চিন্তা ও প্রয়াসের সাধ্যায়ত্ত, কতটা তার সৃজনীশক্তির সীমা তা সে জানে না। কিন্তু এ সত্য সে বুঝে গেছে যে গতানুগতিক পথে চলে আর সে তার প্রাণধর্মকে বেশীদিন স্বচ্ছন্দ সক্রিয়তায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। প্রত্যেক শিল্পকেই—তা সে সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, অঙ্কনশিল্প বা অন্য যেকোন চারুশিল্পই হোক না কেন—একদিন না একদিন এই রসপ্রেরণার উৎস ও ব্যাপ্তিমূলক মৌল চিন্তায় এবং সমীক্ষায় নিজেকে তত্ত্বান্বেষী করে তুলতে হয়।

আমার এই আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আমি অর্থনৈতিক প্রসঙ্গকে টানছি না। সেটা হল তার ব্যবসায়িক দিক, যা নিয়ে মস্তিষ্ককে চালিত করে এ শিল্পের পথনির্দেশ করবার মত বহু ওজনদার শিল্পাধিপতি আছেন। তবে এ কথা ঠিক যে, বর্তমানে যে-প্রবল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে দেশীয় চিত্রশিল্প দিনাতিপাত করছে তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার কালোছায়া এ শিল্পের আত্মজিজ্ঞাসাকে অনেকখানি প্রভাবিত করবেই।

নায়িকা সংবাদ চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার।
ফটো : অমৃত

এতকাল চলছিল উগ্রনবীনপন্থী ও সনাতনপন্থীদের মধ্যে মধ্যপন্থীদের গোল্ডেন মীন রূপ একটা সম্পূর্ণ সাময়িক সমাধান, যার একমাত্র নীতিই ছিল দুই বিরুদ্ধ ভাবধারার মধ্যে আপোসরফা। এঁরা মুখে নবীন যাত্রিকদের যথেষ্ট তোষণ করে, তাঁদের শিল্পরসজ্ঞানের ভূয়সী প্রশস্তি গেয়ে তার পরেই বলতেন :—'তবে বোঝেন তো ভাই, আমাদের দর্শকশ্রেণী, যার বেশীরভাগই গ্রামীণ এবং তারও বেশীরভাগই প্রমীলারাজ্যের অন্তর্গত, তাঁদের বিদ্যার, বুদ্ধির ও রসগ্রাহিতার দৌড় কদ্দুর! তাই তাদের মোটামুটি তুষ্ট করবার মত মাল-মসলা বেশ কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে তার পরে দেখান না আপনাদের সত্যজিতরূপী শিল্পরসসৃষ্টির যা-কিছু কেরামতী।' একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীর পরিচালক আছেন যাঁদের মনের ভাবটা হল এই যে—প্রোডিউসার মরুক বাঁচুক আমার তাতে বয়েই গেল, আমার উঁচাঙ্গের সৃজনীরসের সঙ্গে তো দর্শকপরিচিতি ঘটিয়ে দেই আগে আমার শিল্পের এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে! তারপর দর্শক যদি সে পরম শিল্পরসামৃতের আস্বাদ ঠিকমতো গ্রহণ করতে না পারে, যদি বদহজম করে তো আমি নাচার! তাদের হজমের চিকিৎসা করুক তারা। তবে ভরসার কথা, এমন নিরেট নিশ্ছিদ্র শিল্পপাগলরা সংখ্যায় অতি কম। বেশীর ভাগই ভাবের ঘরে চুরি করে তেলে-জলে মিশিয়ে যে 'রসব্যঞ্জন' প্রস্তুত করেন তার মধ্যে থাকে কি? কিছু বড়ো বড়ো তত্ত্বকথা, কিছু ইজম-এর বুলি, তারই সঙ্গে সঙ্গে যৌনরসাশ্রয়ী কিছু উদ্ধত ও চমকলাগানো দুঃসাহসিক 'শট' এবং অনুরূপ সংলাপ, যা মানবজীবনের প্রতিটি সংগুপ্ত কামনাভাবনা ও মানসিক আশ্লেষকে তার চেতনার তলদেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত করে তার নগ্নরূপ দিয়ে মানবদৃষ্টিকে ও শ্রবণশক্তিকে আবিল করে তুলবে। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে চলবে জোড়াতালি দেওয়া একটা কাহিনীর নাট্যসন্নিবেশ যা আমাদের মামুলি দর্শকচিন্তাধারা ও রসকল্পনারই চর্বিত-চর্বণ হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে থাকবে সস্তা কৌতুক ও হাস্যরসের সুড়সুড়ি, থাকবে প্রণয়ী-প্রণয়িণীর অবিশ্বাস্য রূপে উৎকট প্রণয়লীলা ও সেই লীলাকে খেলিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলবার মত সঙ্গীতসুধা ('সুরা' বললেই বোধ হয় আরো ঠিক হয়), এবং শেষপর্যন্ত বাংলার মেয়েদের

পাতিব্রত্যধর্ম ও পরিণতিতে বাংলার স্বামীকুলের একক ও শুদ্ধিকৃত পত্নী-প্রেমের লহরী।

যাকিছু তাই নবীন স্রষ্টার বাহাদুরী, যাকিছু তার উচ্চ শিল্পসৃষ্টির নয়া দৌড় তা তাকে দেখাতে হবে উদ্ভট ধরণের আধুনিক 'সেট্' সৃষ্টির মাধ্যমে, দার্জিলিং-সিমলা বা পুরী-ওয়ালটেয়ার বা আরো নতুন নতুন জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য-সৌন্দর্যের প্রাণোন্মাদকারী রূপের ঢেউ দিয়ে দর্শকচিত্তে দোলা দিতে। যার দরুণ আজকাল প্রায়ই সিনেমাপত্র-পত্রিকায় দেখে থাকবেন কোন ডিরেকটার—কোন প্রোডিউসার কতো দূরপাল্লার উদ্দেশে তাঁদের লোকেশন শুটিং-এর তাঁবু গাড়বেন, কতজন শিল্পী ও যন্ত্রী নিয়ে, তারই প্রচার-মহিমা। সেখানে আরো পাবেন উত্তেজক সংবাদ—কোন লোকেশানের তাঁবুতে রাত্রি-বেলায় বাঘ এসে পড়েছিল (ভেতরকার বাঘিনীদের দেখে তারা লজ্জায় বা ঘৃণায় স্থান পরিত্যাগ করে কিনা সে সংবাদ পাওয়া যায় না), কোন নায়ককে বাস্তবধর্মী সুটিং-এর জন্য সর্পদংশন সহ্য করতে হল, এই সব।

একথা বোধ করি বলা চলে যে, যে-কয়েকজন সত্যিকারের প্রতিভা-ধর নবীন পরিচালক বাংলা ছবিকে একটা ভিন্নজাতের নন্দন-শিল্পের স্রোতে রসোত্তরণ করাতে চাইছেন, তাঁরা খুবই সাম্প্রতিককালের। মারাত্মক- রকমের উদ্ভট কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে না গিয়েও তাঁরা নিঃসন্দেহে বাংলা ছবির সুরটা পালটে দিয়েছেন, এনে দিয়েছেন একটা নতুন চিন্তাধারা, অভিনব এক শিল্পকর্মের সন্ধান। এদের বাদ দিয়ে

মাধবী মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

দেখলে বলা যায় যে, ১৯৫০-৫৫ সাল পর্যন্ত বাংলা ছবির যে ঐতিহ্য চলে এসেছিল তা হলো গতদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-রচয়িতা যুগপ্রতিনিধি যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই উত্তরসাধনা। প্রথমেশ বড়ুয়া ও দেবকী বসুর নাম এ'দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। ১৯৩২ সাল থেকে শুরু করে দেবদাস, চন্ডীদাস, গৃহদাহ, বিদ্যাপতি, মুক্তি প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে এই দুই অসামান্য শক্তিধর তৎকালীন জনচিত্তে যে প্রবল রসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তারই রীতিনীতি ও শিল্প-শৈলীকে মোটামুটি অনুসরণ করে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।　　ফটো : অমৃত

চলে এসেছিল গত দশকের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ চিত্র-সাধকদের শিল্পযাত্রা। এ'রা বাংলা ছবির মন্থরতাকে, স্থির ও সংলাপী নাট্যাশ্রয়ী সুরকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে দেবকী-প্রমথেশের প্রভাবে একটা চলচ্চিত্রধর্মী চরিত্র ও অভিব্যক্তি দিয়ে ছবির আপন সত্তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁরা সমাজ-কল্যাণের কথাও চিন্তা করে গেছেন ছবির মাধ্যমে। যে নীতিটা আজকের যুগের 'আর্ট ফর ট্রুথ্‌স্ সেক্' বিশ্বাসী চিত্র-নায়ক ও শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি বাতিল করতে চাইছেন। তাঁদের মতে নতুন দিনের বন্ধনমুক্ত চিত্র-শিল্পের একমাত্র প্রতিবন্ধক হল শাকি সেন্সার-পুলিশী মনোবৃত্তির শাসনদণ্ড। যাই হোক, যা বলছিলাম, ঐসব বড়ুয়া-বসুর প্রভাবান্বিত চিত্র-স্রষ্টারা এমন ছবি করবার জন্য নিজেদের শিল্পশৈলী ও চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করতেন যার প্রয়োগরীতি, আঙ্গিক ও উপজীব্যতার মধ্যে আছে নতুন ধারার শিল্পকর্ম ও সজীবতা, অথচ যার অন্তরের রূপটি হবে খাঁটি বাংলার ভিজে মাটির নরম, সরস গন্ধে আকুল। এক কথায় যা হবে পিক্‌চার অফ দি সয়েল।

ঠিক আজকের এই দিনটিতে বাংলা ছবির স্রষ্টাদের ভাবনালোককে তিন দিক থেকে এই তিনটি বিপরীতমনা দৃষ্টিমানস অধিকার করে আছে, প্রবন্ধের শুরুতে যে কথা বলছিলাম। আর এই বিরুদ্ধধর্মী ত্রয়ীর ভাবসংঘাতের ফলে বাংলা ছবির সামগ্রিক বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতি ও ধর্ম নিরূপণ পরম অনিশ্চয়তায় আকীর্ণ। সবচেয়ে মুস্কিলের কথা এই যে, এমন কোন অনন্য ও অনস্বীকার্য দর্শকরুচির মান আমাদের দেশে অন্ততঃ মেজরিটির বিচারেও নেই যাকে চিত্র-নির্মাতারা দিক-নির্দেশের যন্ত্র রূপে ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্য চলচ্চিত্রের বিশেষ তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত মৌল নন্দনতত্ত্বের বিশ্লেষণটা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকশ্রেণী অনেকটা আজ বুঝতে শিখেছেন। তাই তাঁদের বিচারের মানটা আজ অনেকটা উন্নত। যদিও সেটা ঠিক বৈপ্লবিক কোন রূপান্তর পরিগ্রহ করেনি এখনো। তবু একথা ঠিক, জাতির কৃষ্টি ও শিল্পজীবনের এক অচ্ছেদ্য অংশ ও অঙ্গ রূপে চলচ্চিত্রকে আজ দেশের মানুষ স্বীকার করছে, তার মনের মধ্যে চলচ্চিত্রের জন্য একটা বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। বৈদেশিক ভাল ভাল ছবিগুলি দেখবার সুযোগও এই সুচারু রসলিপ্সাকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। অসংখ্য ফিল্ম সোসাইটিরূপ নবজাতকেরাও এই রসবোধকে উজ্জীবিত বা উদ্দীপ্ত করার ব্যাপারে সমগ্র কৃতিত্বের অনেকখানি দাবী করছেন। এই সব নানা বিভিন্ন জাতের ও রুচের রসজ্ঞ চিত্রস্রষ্টা ও বিচারকদের প্রভাবে আমাদের চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ পথযাত্রা কোন্ বিশেষ সংজ্ঞায় ও নীতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করবে সেটা নিশ্চয় প্রকৃত চিত্র-রসিকদের পক্ষে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে অনুশীলনের যোগ্য।

আমাদের ফিল্ম সোসাইটি

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিনের জন্যে লাহোর প্রবাসের পরে কলকাতা ফিরে এসে বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে দু'টি নতুন প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করেছে দেখতে পেলুম। এক, সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল এবং দুই, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। এটা হচ্ছে ১৯৪৫ কি ১৯৪৬ সালের কথা। বলা বাহুল্য, দু' জায়গা থেকেই সাদর আহবান এল যোগ দেবার জন্যে—প্রথমটিতে সক্রিয়ভাবে; দ্বিতীয়টিতে বন্ধু অতিথি হিসেবে। পরিচালকরূপে চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় সিনে টেকনিসিয়ান্স আসোসিয়েশান অব বেঙ্গল-এর একজন সক্রিয় কর্মী আমাকে হয়ে পড়তে হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই এবং চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগের জন্যে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতেও বন্ধু অতিথি হিসেবে যোগ না দিয়ে পারিনি। এই দ্বিতীয় সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং তাঁর সহকর্মীদের সুমধুর ব্যবহার আমাকে এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ করেছে। যেমন পরবর্তীকালে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে রাম হালদার এবং তাঁর সহকর্মীদের মধুর ব্যবহার গুণে।

পৃথিবীতে কারণ ব্যতিরেকে কোনো কার্যই হয় না। সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল এবং ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিও অকারণে জন্মগ্রহণ করেনি। বাঙলা চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী এবং অপরাপর কর্মীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় প্রথমটির সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয়টির উদ্ভব হয় কিছুসংখ্যক চলচ্চিত্রানুরাগীর

অজানা শপথ চিত্রে সৌমেন চক্রবর্তী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

মধ্যে শহরের বিভিন্ন সিনেমায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলির একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার অভিপ্রায় থেকে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শহরের মেট্রো, লাইটহাউস, এলিট, গ্লোব, নিউএম্পায়ার প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রধানত দেখানো হয়ে থাকে আমেরিকার হলিউডের মেট্রো-গোল্ডউইন-মায়ার্স, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, প্যারামাউন্ট, ইউনিভার্সাল, কলাম্বিয়া ওয়ার্ণার ব্রাদার্স প্রভৃতি ব্যবসায়ী চিত্র-প্রতিষ্ঠানের ছবি। এ'রা ছবি তৈরী করেন বক্স-অফিসের দিকে লক্ষ্য রেখে; কাজেই সাধারণ দর্শকের মনকে মাতিয়ে তোলবার জন্যে যতরকম পন্থা সম্ভব, সবগুলিকেই তাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের ছবিতে। তাঁদের ছবিতে চিত্তাকর্ষক কাহিনী তো থাকেই, তার সঙ্গে থাকে যথাসম্ভব যৌন-আবেদন, মানুষে মানুষে যতরকম সম্ভব লড়াই, ঘুষো-ঘুষি, রিভলবার নিয়ে খুনোখুনি অর্থাৎ আদিম বীভৎসতা, আর তার সঙ্গে ঝলমলে দৃশ্যাবলী।

কিন্তু অভিনয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মতোই চলচ্চিত্রও একটি বিশিষ্ট শিল্প ব'লে সুধীমহলে স্বীকৃত। হলিউডেও যে শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র তৈরী হয়নি, এমন নয়। তবে হলিউডই যে চলচ্চিত্র সৃষ্টির একমাত্র কেন্দ্র নয়, এ-কথাটা বিদেশী ছবির সাধারণ দর্শকরা মনেই করতে পারতেন না। কিন্তু চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে চিন্তা করেন, তার শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করেন, এমন কিছুসংখ্যক লোক এ হলিউডী ছবি দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি নামে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করলেন; তাঁদের উদ্দেশ্য ঃ কোনোরকম লাভের আশা না ক'রে, রাজনীতি হ'তে দূরে থেকে যে-সব চলচ্চিত্র সাধারণ সিনেমা-হাউসে দেখতে পাওয়া যায় না, সেই সব চলচ্চিত্র দেখা এবং দেখে আনন্দ পাওয়া। ইংলন্ডে এ-ধরনের ফিল্ম সোসাইটির অস্তিত্ব ১৯২৫ সাল থেকে থাকলেও ভারতবর্ষে এই সংস্থাটিই সম্ভবত প্রথম।

উনিশশো কুড়ি দশকের মধ্যভাগ থেকেই এই বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র দেখাবার জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত চিত্রগৃহের জন্ম হয় ইয়োরোপের বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতি শহরে। কারণ তখনই এইসব শহরে ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাবের উদ্ভব ঘটেছে। চলচ্চিত্রকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির হাত থেকে মুক্ত ক'রে বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টিরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার তাগিদে আভাঁ-গার্দ বা চলচ্চিত্রে নবতরঙ্গ আন্দোলন তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। নবভাবনায় ভাবিত হয়ে যাঁরা ছবি তৈরী করতে থাকলেন, তাঁদের ছবি এবং যে-সব কন্টিনেন্টাল ছবি কোনোদিনই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবার সম্ভাবনা নেই, সেই সব ছবি লন্ডন শহরের আকাদামিতে দেখানোর ব্যবস্থা করেন এলসি কোহেন

নাবিক প্রোডাকসন্সের 'দিবারাত্রির কাব্য'র সেটে পরিচালক নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক, শিল্পী অসীমকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

বিকাশ রায়

১৯২৯ সালে। ঠিক একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে জে. এস. ফেয়ারফ্যাক্স-জোন্স ১৯৩০ সালে হ্যামস্টেডে এভরিম্যানের উদ্বোধন করেন; ১৯৩৪ সালে খোলা হয় কার্জন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্রগুলির সাধারণ প্রদর্শনীর জন্যে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ১৯৫২ সালে লন্ডন শহরে খোলেন ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটার। লন্ডনের মতো প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি কয়েকটি ইয়োরোপীয় শহরেও বিশেষ ধরনের—যে-সব চলচ্চিত্র ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেখানো হয় না, সেই 'আর্ট-ফিল্ম'গুলি দেখাবার জন্যে বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত চিত্রগৃহ আছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রায় বছর কুড়ি ধ'রে ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাবগুলির মারফৎ চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কিত আন্দোলন সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, আমাদের কলকাতায় বিভিন্ন দেশীয় শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রগুলি দেখবার জন্যে একমাত্র অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহটিই ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া 'পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', 'রাশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' প্রভৃতির অনুষ্ঠানের জন্যে নিউ এম্পায়ার, প্রাচী, প্রিয়া বা জ্যোতি সিনেমা কখনও কখনও পাওয়া গেছে। সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা কখনও কখনও জনতা, মাজেস্টিক, সোসাইটি প্রভৃতি চিত্রগৃহে প্রাতঃকালীন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু সম্প্রতি সভ্যসংখ্যা প্রচুর বর্ধিত হবার ফলে এঁরা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে প্রতিটি ছবি দু'বার ক'রে দেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালকাটা ইনফর্মেশন সেন্টারে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি তাঁদের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন। কিন্তু হলিউড বা ইংলন্ড ছাড়া অপরাপর দেশের

তরুণ মজুমদার পরিচালিত **বালিকা বধূ** চিত্রে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

ছবি এবং বিভিন্ন দেশের পরীক্ষানিরীক্ষা-মূলক চিত্র নিয়মিতভাবে দেখাবার সঙ্কল্প নিয়ে আমাদের শহর কলকাতায় আজও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী চিত্রগৃহ নির্মিত হয়নি।

নিজেদের পছন্দমত বিভিন্ন দেশের ছবি দেখা এবং দেখে আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মতো আরও বহু ফিল্ম সোসাইটি বা ক্লাব গড়ে

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

উঠেছে এবং এখনও উঠছে এই কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরতলীতে ও দূর মফস্বল শহরে। কিছুদিন আগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এদের সংখ্যা ছিল অন্ততঃ সাতাশটি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, বিহার প্রভৃতি রাজ্যেও এই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন বিস্তৃতিলাভ করায় ভারতের ফিল্ম সোসাইটিগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়ার জন্ম হয় ১৯৬১ সালে। এই প্রতিষ্ঠানটি বহি-ভারতস্থ বিভিন্ন দেশের এমব্যাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে প্রয়োজন হ'লে ভারত সরকারের সহায়তায় তাদের অতীত ও বর্তমানের নামকরা ছবিগুলিকে এদেশের ফিল্ম সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আনাবার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। শুধু তাই নয়, সেই সব ছবি যাতে সেন্সারের উৎপাত বর্জিত হয়ে অক্ষত অবস্থায় দেখানো যেতে পারে এবং সেগুলিকে আনাবার জন্যে যাতে আমদানী-কর দিতে না হয়, সে-সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনা করবার পরে সাফল্য লাভ করেছেন।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইন্ডিয়া তাঁদের মুখপত্রস্বরূপ 'ইন্ডিয়ান ফিল্ম কালচার' নামে যে একটি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেন, বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-চিন্তা সম্পর্কে সেটি একটি মূল্যবান দলিল। এ-ছাড়াও চলচ্চিত্র বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সোসাইটি বা ক্লাবগুলির প্রতি-নিধিদের নিয়ে গঠিত একটি ফিল্ম-স্টাডি গ্রুপ স্থাপিত হয়েছে এই বছরের (১৯৬৬-র) মে মাস থেকে। ফেডারেশন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র সোসাইটি বা ক্লাবও বুলেটিন প্রকাশ, প্রোগ্রাম নোট রচনা এবং আলোচনা-

সত্তার প্রবর্তনে ব্রতী হয়েছেন। এ-বিষয়ে অবশ্যই সিনেক্লাব অব ক্যালকাটা বিশেষ অগ্রণী।

ফিল্ম সোসাইটিগুলির জনপ্রিয়তা দিন দিন যে-ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে বুঝতে কষ্ট হয়না যে, চলচ্চিত্রের শিল্প-স্বরূপ আমাদের সমাজ দ্বারা ক্রমেই বেশী করে স্বীকৃত হচ্ছে। চলচ্চিত্রকে মাত্র প্রমোদ-মাধ্যমরূপে দেখবার জন্যে এখনও ভারত-বর্ষে লক্ষ লক্ষ সাধারণ দর্শক থাকলেও শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, রসজ্ঞ সম্প্রদায় এখন আর চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন নন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন চলচ্চিত্রের শিল্পসত্তা নিয়ে রীতিমত জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং বিভিন্ন দেশের পরিচালকদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির বিশেষত্ব ও গুণাগুণ বিচার করেন। চলচ্চিত্র যে আজ কাব্য, নাটক, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি সুকুমার কলার পর্যায়ভুক্ত হয়ে 'দশম শিল্পকলা' (টেনথ্ মিউজ) আখ্যালাভ করেছে, তার জন্য ফিল্ম সোসাইটিগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন চলচ্চিত্রের আমাদের ব্যবসায়িক জগতকে পর্যন্ত প্রচুর-ভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ বাংলাদেশের ক্যামেরাম্যানরা অগ্রণী হয়ে ফিল্ম সোসাইটি ধরনেরই একটি ক্লাব স্থাপন করেছেন বিভিন্ন দেশের চিত্রগ্রহণরীতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। বহু পরিচালকই আজ কোনো না কোনো ফিল্ম সোসাইটির সদস্যপদভুক্ত। আর একথাটা নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে যে, যে সত্যজিৎ রায় তাঁর অনু-ট্রিলজি 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার'—অপু-জীবনীর তিন অধ্যায় সংক্রান্ত এই তিনটি চলচ্চিত্র মারফত বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই সত্যজিৎ রায় ছিলেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি।

চলচ্চিত্রের গুণাবধারণ বা ফিল্ম-অ্যাপ্রি-সিয়েশন নামে যে কথাটা আজ বিশেষভাবে চালু হয়েছে এবং পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউট যে বিষয়ে একটি রীতিমত শিক্ষণব্যবস্থা শুরু করতে মনস্থ করেছেন, এও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনেরই ফল। সঙ্গীতের সমঝদার হতে গেলে যেমন কান তৈরী হওয়া দরকার, সাহিত্যের বিচারক হতে হলে যেমন রসবোধ এবং সমালোচনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার, ঠিক তেমনই চলচ্চিত্রের গুণাবধারণের জন্যে চল-চ্চিত্রের রূপ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞানলাভের পথকে ফিল্ম সোসাইটিগুলি যে উন্মুক্ত করেছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

জগৎব্যাপী ফিল্ম সোসাইটি আন্দো-লনকে সমন্বয়ের পথে আনবার জন্যে ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশান অব ফিল্ম সোসাইটিজ স্থাপিত হয়েছে থরল্ড ডিকিনসনের নেতৃত্বে। ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশান অব ফিল্ম আর্কাইভস্-এর সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। বিশ্বে আজ পর্যন্ত যত ছবি শিল্পসৃষ্টিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, তার সব-কটিকেই পৃথিবীর বিভিন্ন সোসাইটির সভ্যরা যাতে সহজেই দেখতে পারেন, তারই সুব্যবস্থা করা এঁরা এঁদের প্রাথমিক কাজ বলে ধরে নিয়েছেন। এঁরা দেখতে পেয়েছেন, যে-সব ছবি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচারিত হয়, সেগুলি যোগাড় করা সহজ। কিন্তু যে-সব ছবি বিভিন্ন দেশে মাত্র শিল্পসৃষ্টি হিসেবে নির্মিত হয়ে থাকে, তাদের হদিস পাওয়া নিতান্তই কঠিন। অথচ এই ছবিগুলিকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে না পারলে চলচ্চিত্রগুলির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সেন্সার কর্তৃপক্ষ নানা কারণে ছবিতে যে-সব কাটছাঁট করে থাকেন, সেই বর্জিত অংশ পুনরুদ্ধার করে অটুট ছবি সংগ্রহ করাই এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। কারণ পুরো ছবি দেখতে পেলেই পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক পরিচয়লাভ ঘটে।

চলচ্চিত্রশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে এই ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

রবি ঘোষ

জাতীয় কল্যাণে চলচ্চিত্র

গুরুদাস ভট্টাচার্য

আমাদের ফিল্ম ডিভিশনের তথ্য ও সংবাদ চিত্র প্রসঙ্গে দর্শকদের এক ধরনের অনীহা আছে। এ অনীহা অকারণ নয়। এবং নয় বলেই কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত বেতার ও তথ্য বিষয়ক অনুসন্ধান কমিটি এই বছরের গোড়ার দিকে চলচ্চিত্র-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ছবিগুলিকে কিভাবে উন্নত আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় করে তোলা যায়, তা নিয়ে ফিল্ম ডিভিশনের সেমিনারও হয়েছে। জাতীয় চরিত্র ও কল্যাণের দিক থেকে এই আত্ম-বিশ্লেষণ তথা আত্ম-সমালোচনা অসীম মূল্যবান।

চলচ্চিত্র প্রমোদের উপকরণ এবং প্রচার (ও বিজ্ঞাপনেরও) একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার। এছাড়া, তার আরও একটি ভূমিকা আছে—চলচ্চিত্র গণশিক্ষার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিরক্ষর তো বটেই, সাক্ষর মানুষের চিত্তেও সে নতুন আলো জ্বালাতে পারে। পাশ্চাত্যদেশে এই শিল্প-মাধ্যমটিকে, এই উদ্দেশ্যে, নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভূমিকা এখনও উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে নি। অথচ সে ব্রিটিশ তথ্যচিত্রের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী।

১৯২৯ সালে জন গ্রীয়ারসনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ তথ্যচিত্র নতুন শক্তি ও রূপ লাভ করে। জাতীয় কর্মসূচী ও জাতি-গঠনের কাজে বই-পোস্টার ইত্যাদির মতো, তার চেয়েও বেশি, চলচ্চিত্র যে অনন্ত সহযোগিতা দিতে পারে, সে সম্বন্ধে জনতা ও নেতাদের তিনিই প্রথম সচেতন করে তোলেন। তথ্যচিত্রের একটি শিল্পতত্ত্বও তিনি দিলেন, যাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ব্রিটিশ তথ্যচিত্রে এল স্বর্ণযুগ। যুদ্ধশেষে পুনর্গঠনের পালা। খাদ্য-বস্ত্র-বাড়ি-স্বাস্থ্য ইত্যাদি জরুরী জাতীয় প্রয়োজনে, এবং গণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভূমিকা ব্যাপক হয়ে উঠল। সংবাদ ও তথ্যচিত্রের গায়ে গায়ে ফুটে উঠল পোস্টার ফিল্ম, আর্ট ফিল্ম, বিজ্ঞাপন-চিত্র, ভ্রমণচিত্র ইত্যাদি। ডকুমেন্টারীর শিল্প কাহিনী-চিত্রের দেহেও প্রভাব বিস্তার করল। চলচ্চিত্রে বাস্তব নতুনতর রূপ পেল।

শুধু ব্রিটেন নয়, সাগরপারের অন্যান্য প্রগত দেশের তথ্যচিত্রেরও মোটামুটি সমান ইতিহাস। একদিকে আনন্দদান ও প্রচার-কুশলতা, অন্যদিকে জাতির সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ—এই বিশিষ্ট শিল্পমাধ্যমটি জীবনসংগ্রাম ও জনসংস্কৃতির ওতঃপ্রোত হয়ে গেছে।

আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রতাপ প্রায়-সর্বগ্রাসী। প্রতি মুহূর্তে সে মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে নতুন নতুন শক্তি ও জ্ঞান। এই তথ্যকে জনগোচর করার দায়িত্বও আজ চলচ্চিত্র নিয়েছে গণশিক্ষা-প্রসারের কর্মসূচী হিসেবে, সহজ সুন্দর ছোট ছোট ছবির মাধ্যমে। যেমন ধরুন—নক্শা: কাপড়ে জামায় চাদরে কার্পেটে কাগজে দেয়ালে মানুষ কতো-রকম নক্শা আঁকছে: আবার মাটির দেহে, পাথরের গায়ে, গাছের শরীরে, চামড়ায় পালকে বিচিত্র প্যাটার্ন-ডিজাইন তৈরী করে চলেছে প্রকৃতি: কাছ থেকে দেখুন, কিরকম একটা ভালোলাগার, আবিষ্কারের নেশা পেয়ে বসবে।

স্কাইস্ক্রেপার চিত্রের দৃশ্য

এক্সপ্লোরিং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এনার্জি চিত্রের দৃশ্য
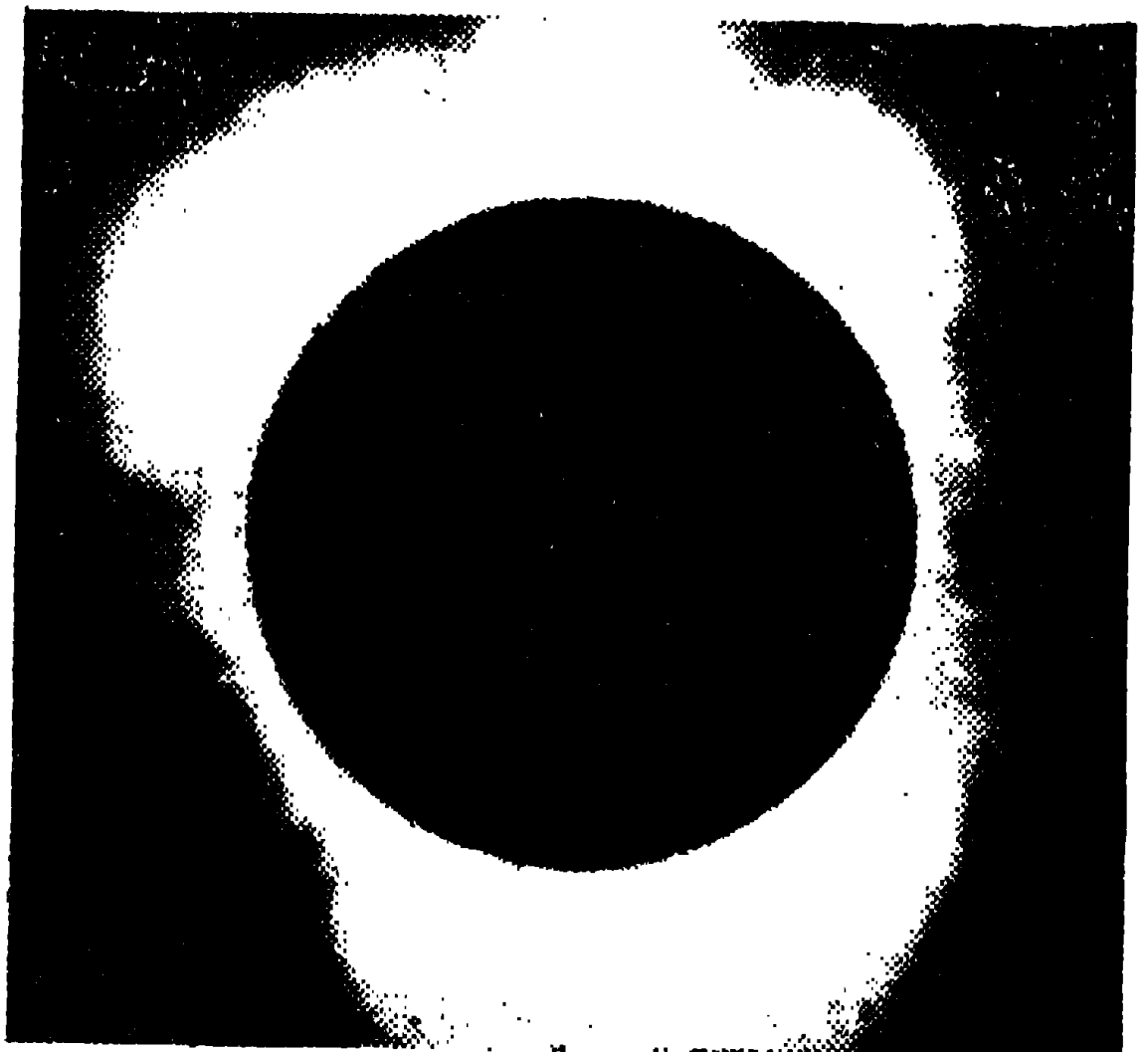
মেশিনস্ দ্যাট মুভ আর্থ চিত্রের দৃশ্য
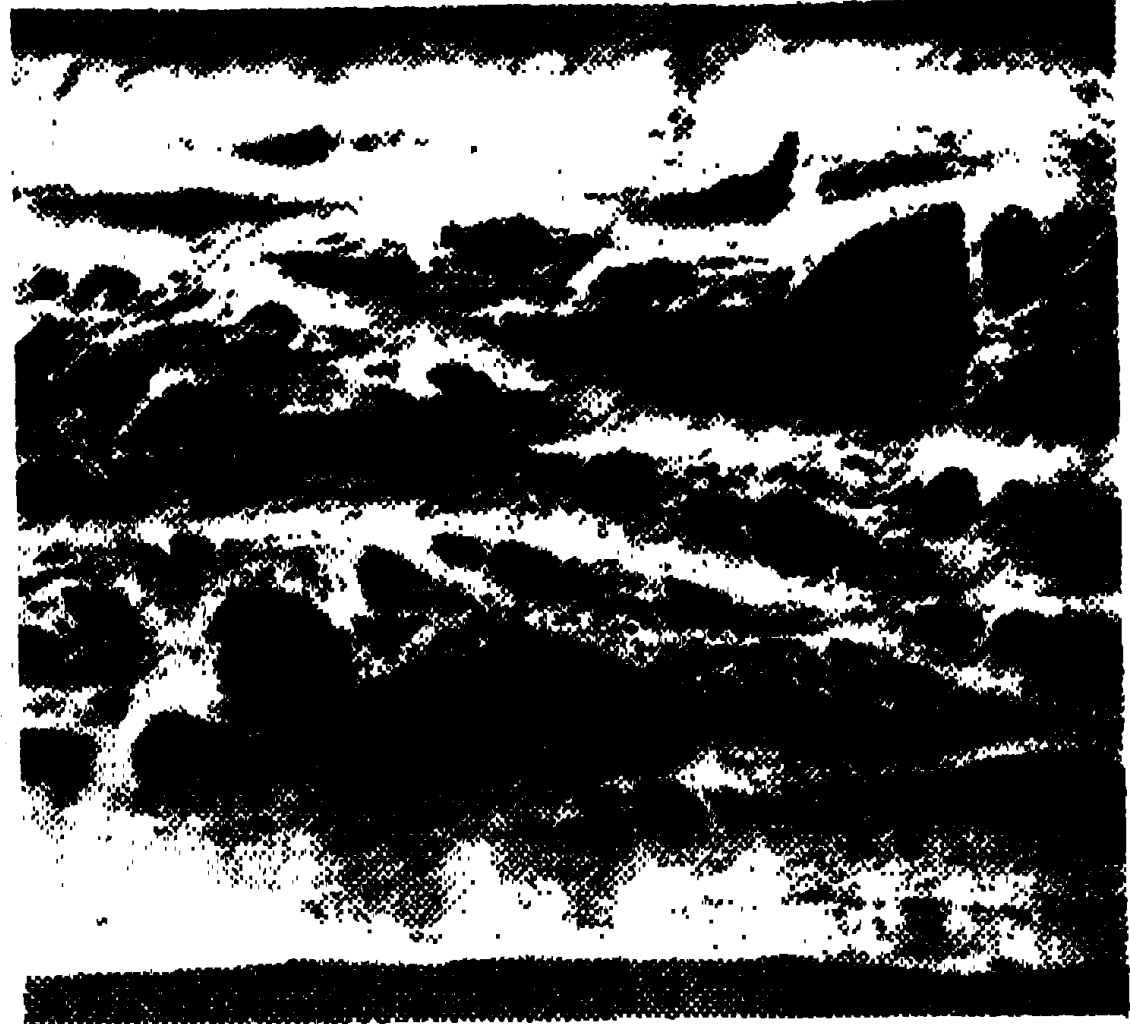
ডিসকভারিং পার্সপেকটিভ চিত্রের দৃশ্য

এই আশ্চর্য খবরটি আপনাকে দেবে সাড়ে সতেরো মিনিটের রঙীন ছবি 'ডিস্কভারিং টেক্সচার'।

মানবসভ্যতার বিবর্তিত ইতিহাস, ভৌগোলিক তত্ত্ব, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, মহাশূন্য-মহাসমুদ্র-পৃথিবীর রহস্য, মাধ্যাকর্ষণ-গতি-আলো-তাড়িৎচুম্বক শক্তি, এমনকি আপেক্ষিকতাবাদ নিয়েও অসংখ্য ছবি তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। জড়ের পাশে প্রাণ। প্রাণতত্ত্ব, প্রাণীজগৎ, মানুষ, শারীরবিদ্যা, স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক, মনস্তত্ত্ব এমনকি অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপকেও সে পর্দার বুকে তুলে ধরছে। এইসব ছবি পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক, এবং একইভাবে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের উপযোগী করে তৈরি। প্রত্যেকটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, এমনকি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীও। বেশিরভাগই অ্যানিমেশন-কার্টুন-পাপেট ও নানান ট্রিকশটের সাহায্যে তোলা, কঠিন বিষয়কে যতোদূরসম্ভব শিল্পসুন্দর রূপ দেওয়া। একটা দৃষ্টান্ত : কানাডার জাতীয় চলচ্চিত্র বোর্ড প্রযোজিত 'দ্য লিভিং মেশিন' : বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জ্ঞানের নতুন দিগন্তের বিষয় এতে বলা হয়েছে। ছবিটির দুটো ভাগ, সময় এক ঘণ্টা। প্রথমভাগে দেখান হয়েছে : একটা কম্পুটার মেশিন মানুষের সঙ্গে খোশমেজাজে দাবা খেলছে; তারপর, একটা ইংরেজি, একটা রাশিয়ান, দুটো টাইপরাইটার জুড়ে দিব্যি অনুবাদ করে গেল। দ্বিতীয় ভাগে : কম্পুটারটা মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাজ করে, নকল চোখ দিয়ে পরিষ্কার দেখে! এমন একদিন আসবে, এই মেশিনই হবে মানুষের চেয়ে উন্নততর জীব, শহরের অর্থনৈতিক বাজারে প্রভুত্ব করবে; কে বলতে পারে, একদিন খোদ পৌরপিতাই হয়ে বসবে!

হয়তো; হয়তো নয়। কিন্তু শেষের সেদিন এখনও বেশ দূর অস্ত্। আপাতত, মানুষ ব্যস্ত গ্রাম ও শহরের নানান সমস্যা আর ঝামেলা নিয়ে, খাওয়া-পরা আর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। ঘরদোর-পথঘাট কি করে পরিষ্কার রাখতে হয়, সেকথা ছবি আপনাকে বলে দেবে; দাঁত-চোখ-কান-গলা কি করে সাফ্ রাখতে হয়, সেকথা বলে দেবে আপনার ছেলে-মেয়েদের। আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস মাটি; মাটির গুণাগুণ, উর্বরতাবৃদ্ধি, জলসেচন ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রামের চাষী অভিজ্ঞদের পরামর্শ পাবেন 'দি ওয়াটার অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড্' ছবিতে। এতে, হল্যান্ডের ও আমেরিকার জল-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাও করা হয়েছে দৃশ্য-পরম্পরায়। এই বছরে ব্রিটেনে একটা ছবি উঠেছে 'দ্য রিভার মাস্ট লিভ' : কিভাবে নদীর জল দূষিত ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে, এবং কেন ও কেমন করে নদীকে মুক্ত ও স্বাস্থ্যবান রাখতে হবে, তার খুঁটিনাটি আলোচনা এটির বিষয়। 'মেশিনস্ দ্যাট মুভ দি আর্থ' মাটির বুকে ট্র্যাক্টরের সৃষ্টিলীলার তথ্য, সেইসঙ্গে আছে মানুষ ও যন্ত্রের আত্মীয়তা এবং সমষ্টি-চেতনার কথাও। আমেরিকার বিখ্যাত টেনেসী-ভ্যালী প্রোজেক্ট সম্পর্কে তৈরি হয়েছিল : 'দ্য প্লাউ দ্যাট ব্রোক দ্য প্লেনস্' এবং 'দ্য রিভার'। দুটি ছবিতেই প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংস এবং মানুষের লড়াই ও নবসৃষ্টিকে প্যারে লোরেন্জ্ রূপ দিয়েছেন কাব্যমণ্ডিত ক'রে। কমেন্টারী ও মুক্তছন্দের। দুটিই আমেরিকান তথ্যচিত্রে ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। মাটি-জল-চাষ, তারপরেও অনেক তদ্বির-তদারক করতে হয় শস্যদের, বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে গোলায় বা গুদামে রাখতে হয়, সুষ্ঠু বণ্টন করতে হয়। এই বিষয়ে ব্রিটিশ ছবি 'ফোর সীসনস্' মূল্যবান সহায়ক।

চাষ-আবাদের পাশে পাশে গড়ে ওঠে ছোট-বড় নানান শিল্প। যেমন, কাঁচ। কাঁচ-শিল্প নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক ছবি উঠেছে; তার মধ্যে সম্প্রতি ব্রিটেনে তৈরি 'দ্য বেস্ট অব বোথ ওয়ার্ল্ডস্'এর উপস্থাপনা-পদ্ধতিটা বেশ মজার : মহাশূন্যের এক অজ্ঞ কৌতুকশীল গ্রহ থেকে দুজন পর্যবেক্ষককে পৃথিবীতে পাঠানো হচ্ছে—একটা নতুন জিনিসের খবরাখবর করতে; ওরা মহাশূন্য পাড়ি দেওয়ার উপযুক্ত পোষাক পরল—গাঢ় রঙের স্যুট, বাউলার হ্যাট, আর ছাতা! পৃথিবীতে এসে আলাপ হল এক প্রণয়ী-যুগলের সঙ্গে, ওরাই ঘুরে ঘুরে কাচের জন্ম-জাতি-শ্রেণী সব বুঝিয়ে দিল। নানান পেশা ও নেশা বা হবি সম্পর্কে এমনি সব ছবি। কয়েক মিনিটের কিন্তু অনেক কাজের।

ভারতে এখন সুপার-মার্কেটের যুগ শুরু হয়েছে। ওদেশে বিগতযৌবনা। এই বড়ো বড়ো বাজারের যবনিকার অন্তরালে যে বিপুল প্রস্তুতি ও মানুষী শ্রম নিত্য নৈমিত্তিক, তা নিয়ে জোসেফ লেসার একদা তুলেছিলেন 'বিহাইন্ড দ্য সীন্স্ অ্যাট্ দ্য সুপার-মার্কেট', এগারো মিনিটের ছবি। গত বছর ইংলণ্ডের বার্মিংহামে ১০·৭ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে 'বুল রিং শপিং সেন্টার'; এর মধ্যে গোটাকতক সুপারমার্কেট অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে; তাছাড়াও আছে এয়ারকন্ডিশন্ড দোকান, কাফে, সন্তরণিকা, নাচঘর, ডাইনিং হল, বার ইত্যাদি। বহুতল

যন্ত্রের সাহায্যে চার একর জমিকে পরিণত করা হয়েছে ২৩ একর আয়তক্ষেত্রে। এই রাজকীয় হাট-বাজারের তিরিশ মিনিটের ছবি তুলেছেন জন লোডিং অ্যান্ড মুন ফ্লুরিং-চার্ট এবং সেন্টারের প্রতিচিত্র দিয়ে। সুপারমার্কেট, বুক ব্রিং, শহরের কমল। গ্রামের সেই ছোট্ট মুদি-খানা, যেমন শক্ত শক্তে তেমনি একালেও গ্রামীণজীবনের হৃৎপিন্ড। এটি সুপার-মার্কেটের ক্ষুদ্রে সংস্করণ, ডাকঘর, দাবাখানা আড্ডাখানা, পরচর্চা, রাজনীতি ও সমাজ-নীতি চর্চার কেন্দ্র। ইতিহাস একথা ভোলে নি; তারই নিদর্শন ঃ স্টুয়ার্ট রেডের 'দ্য কান্ট্রি স্টোর'।

শহর ও গ্রাম। তার বাইরেও জীবন বহমান আরেক স্বতন্ত্র রূপে ও ধারায়।

যাদের আমরা বলি আদিবাসী, উপজাতি, ট্রাইব, তারা নৃতত্ত্ব-সমীক্ষার বিষয়। এই সমীক্ষা নিয়েও অনেক ছবি তোলা হয়েছে। পশ্চিম নিউগিনির দানী-উপজাতিদের নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট গার্ডনার তুলেছেন 'ডেড বার্ডস্'। দানীদের মধ্যে থেকে এ-ছবি তোলা, রূপকথার গল্প বলার মতো; ছবি হয়েছে কবিতা।

গ্রাম থেকে শহর। শহরে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে আকাশ ছুঁয়ে—এরও যে একটা ছন্দ আছে, তা বোঝা যায় (নাচের ছবি তুলে যিনি প্রখ্যাত সেই) শার্লী ক্লার্কের 'স্কাই-স্ক্যাপার'-এ। পুরো শহরটার চেহারা কেমন বদলে যাচ্ছে, তার দৃষ্টান্ত কানাডার 'দ্য চেঞ্জিং সিটি'। শহুরে জীবন নিদারুণ ব্যস্ত খুঁড়িং জটিল এলোমেলো দলাদলির নির্জনতার জঞ্জালের পেট্রলের—এ তথ্যের বাহন ভ্যান ডাইক ও স্টেইনারের প্রসিদ্ধ ছবি 'দি সিটি'। কৃষি-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সমস্যা এবং তার মোকাবিলায় ইউনেসকো, ইউনিসেফ প্রভৃতি কিভাবে সহযোগিতা করছে; এই বিষয়ে পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুটি ছবি তুলেছেন পল রোথা ও বেসিল রাইট; একজন মেক্সিকোয়, অন্যজন থাইল্যান্ডে; দুটো জুড়ে হল একটা ছবি 'ওয়ার্ল্ড উইদাউট এন্ড', যার প্রধান লক্ষ্য আন্তর্জাতিক চেতনার ও সহযোগিতার বিস্তার।

শুধু আজকের দুনিয়া নয়। আদিম মানুষ ধীরে ধীরে সভ্য হল, সমাজ গড়ল, গ্রাম-নগর-শহর বানাল, পৃথিবীর বুকে তৈরি করল দ্বিতীয় ভুবন। পাঁচ হাজার বছর পরে আজ তার সেই দ্বিতীয় ভুবন ধ্বংসোন্মুখী। শহর বেড়ে বেড়ে শহরতলী, প্রাসাদের পাশে বস্তি, ট্রামে-বাসে ঠাসাঠাসি, খাবার নিয়ে টানাটানি, ভিড় একঘেয়েমী, বন্ধ্যাত্ব—নিত্য প্রাণশক্তিকে ক্ষয় করে চলেছে। আবার তারই মধ্যে জমে উঠেছে অস্তিত্বের লড়াই, শহরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আধুনিক জীবনের শারীর-তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা-অন্তে লুই মামফোর্ড লিখেছেন তাঁর অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'দ্য সিটি ইন হিস্ট্রি'। এই গবেষণাকে কানাডার জাতীয় চলচ্চিত্র বোর্ড ছটা পর্বে চলচ্চিত্র-রূপ দিয়েছেন; প্রত্যেক পর্ব আটাশ মিনিটের।

কিন্তু শুধুমাত্র বইয়ের অনুসরণ নয়। তথ্যচিত্রকার প্রত্যক্ষ বাস্তব ও স্বগত অভিজ্ঞতাকেও নিয়ে আসছেন তাঁর সৃষ্টির এলাকায়। তিনিও গবেষক। হারলো ডেভে-লপমেন্ট কর্পোরেশনের পক্ষে উত্তর-লন্ডনের উঠতি শহরতলীর একটি তথ্যচিত্র তুলবেন বলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এক্সপেরি-মেন্টাল গ্রুপের ডেরেক নাইট হারলোতে মাসের পর মাস বসবাস করেছেন, জলবায়ুর সংগে বোঝাপড়া করেছেন, এবং মানুষদের বোঝার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর আধঘন্টার ছবি 'ফেসেস অফ হারলো' এই শহরতলীটির অন্তর-দর্পণ হয়ে উঠেছে। এই জাতীয় রীতির প্রবক্তা একদা—হলিউডের রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। এইভাবেই তিনি তুলেছেন 'নানুক অফ দ্য নর্থ', 'মোআনা', 'টাবু'। প্রত্যেকটা ছবিই তাঁর কাছে একটা আবিষ্কার, এবং তাঁর প্রত্যেকটা সৃষ্টিই এক-একটি কবিতা। 'ম্যান অফ আরাণ' নাটক। নিছক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিল্মও যে একটি সুন্দর গল্প হয়ে উঠতে পারে, স্টান্ডার্ড অয়েল-এর হয়ে তোলা 'লুইসিয়ানা স্টোরী' তার প্রমাণ।
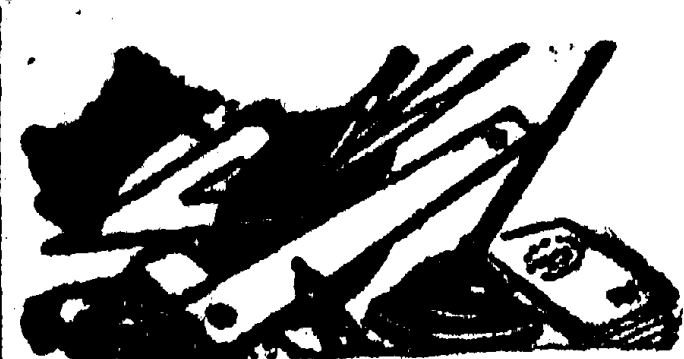
ফ্ল্যাহার্টির প্রথম ছবি ১৯২২-এ। দশ বছর পরে তিনি চলে এলেন ইংলন্ডে, জন গ্রীয়ারসনের কাছে। ব্রিটিশ তথ্যচিত্র আন্দোলনের এই নেতার প্রথম ছবি 'ড্রিফটার্স', যার বিষয় নর্থ সী-তে হেরিং মাছধরা ঃ সমুদ্র আকাশ জেলে মছ নৌকো বাতাস পাল ঢেউ, সব মিলিয়ে কঠিন বাস্তব অথচ আশ্চর্য নরম সুন্দর ছান্দসিক। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেসিল রাইট তাঁর গীতিকাব্যিক ছবি 'সঙ্গ অফ সিলোন'-এর জন্যে। হ্যারি ওয়াটের 'নাইট মেল'-এর কমেন্টারী কবিতায় লিখেছেন ও পড়েছেন কবি অডেন। সুই-ডেনের আর্নে শুক্সডর্ফ শহরের ছন্দকে ধরবার জন্যে, উড়ন্ত পাখির ডানার কয়েকটি ক্লোজআপের জন্যে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত, তথ্যচিত্রকে নতুনতর শিল্প-রূপ দিচ্ছেন ডাচ চলচ্চিত্রীরা, বিশেষত হারম্যান ভ্যান ডার হর্স্ট ও বার্ট হান্সট্রা। সমুদ্র বাঁধ জাহাজ বন্দর—উইন্ডমিল এইসব বাস্তব উপকরণ নিয়ে তোলা এ'দের ছবি বারবার দেখার মতো। হান্সট্রার কাচশিল্পের ওপর ছবি 'গ্লাস' চলচ্চিত্র-কবিতা বলে আখ্যাত হয়েছে, এবং তাঁর সাম্প্রতিক 'দ্য হিউম্যান ডাচ' তথ্যচিত্রের নতুন সীমান্ত খুলে দিয়েছে।

অতলান্তিকের এপারে-ওপারে, তথ্য ও সংবাদ চিত্র, বিজ্ঞাপন ও শিক্ষামূলক চিত্র, ছোট ছোট ছবির অজস্র ভিড়। জরুরী প্রয়োজন থেকে সুদূরপ্রসারী কল্পনা, বাস্তব ঘটনা থেকে রূপকথার কাহিনী, ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম, কলা ও বিজ্ঞান, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, সমস্ত দিকে ও দিগন্তরে সে আজ অবাধে বিচরণ করে। প্রযোজক নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ী, কিন্তু ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোটিকে গুটিক। দর্শকের শ্রেণী ও স্তরভেদে, বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা মেপে অনেক যত্নে এক-একটি ছবি সৃষ্টি হয়। প্রতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকে। আর থাকে, উপ-দেশ বা প্রচারের উগ্রতা পরিহার করে, কথা অনেক কম বলে, বাস্তব বা কার্টুন-অ্যানিমেশন - পাপেট - ক্যামেরার কারুরোজ-ট্রিক্শট্ ইত্যাদির সাহায্যে চিত্রবস্তুকে যথাসম্ভব সুন্দর শিল্পমন্ডিত করে তোলার সমবেত চেষ্টা। যাতে ভালো লাগে, যাতে কাজে লাগে। সরকারী ও বেসরকারী, দুই পক্ষই এক্ষেত্রে অগ্রণী। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—এইসব শিক্ষামূলক তথ্যচিত্রের কোন জাত নেই, যেমন নেই শিল্পের সাহিত্যের গানের। তাই রাজনৈতিক পার্থক্য সত্ত্বেও এক দেশের তৈরি ছবি অন্য দেশেরও 'পাঠ্য-চিত্র' তথা দৃশ্যচিত্র।

যে-কোন দেশ, বিশেষত ভারতের মতো উন্নয়নশীল জাতির পক্ষে চলচ্চিত্রের এতাদৃশ ব্যবহার সামষ্টিক প্রচেষ্টা ও কল্যাণকেই ত্বরান্বিত করে তুলবে। সরকারী ও বেসরকারী, উভয় পক্ষই এক্ষেত্রে তৎপর হতে পারেন। অবশ্য, আমাদের ফিল্ম ডিভিশন ভালো ছবিও মাঝেমাঝে তোলে; ডঃ পাথী, বিমল রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, শান্তি চৌধুরী, শুকদেব প্রভৃতির সৎ ও সুন্দর চেষ্টার নিদর্শনও কম নয়। তবু, এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ এগোতে পারি নি অনেক কারণে। বেতার ও তথ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক সচেতনতায় যদি সত্যিই নতুন পথ মেলে, তাহলে দেশ ও জাতি যেমন উপকৃত হবে, তেমনি আন্তর্জাতিক বোঝা-পড়াও বাড়বে, এবং বিদেশী মুদ্রা অর্জনের একটা নতুন সড়কও তৈরি হবে।

কারণ, শিক্ষা ও তথ্যচিত্রকে গ্রীয়ারসন দেখেছিলেন বিশ্বমানবের সেতুবন্ধরূপে এবং শ্রীমতী ফ্ল্যাহার্টি এর সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ঃ 'জীবন-চিত্র', ফিল্মস্ অফ লাইফ।

নির্মীয়মান বাঙলা ছবি

আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস নিয়ে কোন গৌর-চন্দ্রিকার প্রয়োজন নেই। উনিশশো ছেষট্টি সালের নির্মীয়মাণ বাংলা চলচ্চিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, চলতি বছরে চলচ্চিত্রকররা সাহিত্যের প্রতি বেশী অনুরাগী হয়েছেন। কারণ আজকের দর্শক নিছক ছবির গাল-গল্পে সন্তুষ্ট নয়। সাহিত্যের জনপ্রিয় কাহিনীর চিত্ররূপ দেখার জন্য তারা উদগ্রীব। তাছাড়া বর্তমানের দর্শক এখন অনেক সচেতন। চলচ্চিত্র-মায়ায় তারা মোহিত নয়। চমকিত নয়। এমনকি জনপ্রিয় চিত্র-তারকাদের আকর্ষণও তাদের কাছে দিন দিন কমে আসছে। সাধারণ দর্শকরা এখন কাহিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছেন।

পরিচালকদের তাই স্বরচিত কাহিনীর পরিবর্তে বাংলা সাহিত্যের বহু পঠিত জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবার একটা বিশেষ আগ্রহ চলতি বছরে দেখা যাচ্ছে। কারণ নাটক-অন্তপ্রাণ বাংলা দেশ। কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় উপাদান না থাকলে বাঙালীর হৃদয় সহজে আকৃষ্ট হয় না। বিগত বাংলা চলচ্চিত্রেও একদিন এমনি শরৎ-সাহিত্যের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু সেই শরৎচন্দ্র-সমাজ আজ পরিবর্তিত। আজকের দর্শক বর্তমান সমাজজীবনের কাহিনী বেশী পছন্দ করে।

অবশ্য সমাজজীবনের দর্পণ বলতে সাহিত্যকেই বোঝায়। সুতরাং চলচ্চিত্রের মূল উপাদান সাহিত্যআশ্রয়ী। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, তাহলে কি চলচ্চিত্র সাহিত্যের দাস হয়ে পড়বে? যা মোটেই চলচ্চিত্রিক নয়। উত্তরে একটা কথা বলা যায়, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম হলেও উভয়ের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। অনেকটা রক্তের সঙ্গে নাড়ির। এ নিয়ে অনেক আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু এটি এখন আলোচ্য বিষয় নয়।

প্রথমেই বর্তমান বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের অন্যতম শ্রীসত্যজিৎ রায়ের নির্মীয়মাণ ছবি সম্পর্কে বলি। শ্রীরায় তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী রচিত শিশুকাহিনী 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ফিল্ম লাবরেটরির সঙ্গীত-গ্রহণ স্টুডিওয় শ্রীরায়ের পরিচালনায় ছবির সাতখানি গান গৃহীত হয়েছে। কাহিনীর নাম-ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন নবাগত শিল্পী জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনপ্রিয় অভিনেতা রবি ঘোষ। এ ছবি সম্পর্কে শ্রীরায়ের অভিমত হল, 'এটা আমি তুলছি আমার এগারো বছরের ছেলেকে খুশি করতে। ওর মতে, ওর বাবার ছবি দুঃখের। তাই ওর ইচ্ছে, ঠাকুর্দার লেখা ছোটদের একটা রূপকথা নিয়ে যেন আমি ছবি তুলি। এটা হবে গানে ভর্তি ফ্যানটাসি। দেব, দৈত্য, গাইয়ে, বিদূষক এর পাত্রপাত্রী। দুটো জাতির মধ্যে ওরা যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করছে। একটা ভাল রাজা, একটা খারাপ রাজা। মহামারীতে দুজনেই বোবা হয়ে এক অজানা ভাষায় কথা বলে। এটা হবে আমার নিরীক্ষামূলক ছবি। অনেক টেকনিক্যাল এফেক্ট থাকবে। উড়ন্ত স্লিপারের দৌলতে সারা ভারত ভ্রমণ আছে। ছবির কিছু অংশ তোলা হবে হেলিকপ্টারে, যেখান থেকে ছবির নায়করা নামবে মোঘল প্রাসাদে, মহারাজদের দুর্গে, ঐতিহাসিক কেল্লায় এবং তাজমহলে। তবে নিস্তব্ধ ফতেপুরসিক্রী আমার বেশি পছন্দ।'

নতুন পট পরিবর্তনের দিকচিহ্ন 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম শিশুচিত্র হিসেবে নাম করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে যে কটি শিশুচিত্র নির্মিত হয়েছে সেগুলি যথার্থ শিশুচিত্ররূপে আখ্যা দিলে ভুল করা হবে। শিশুচিত্র বলতে যা বোঝায় তার সবকটি ধর্ম এই প্রথম এ ছবিতে যুক্ত হতে চলেছে। সুতরাং শ্রীরায়ের এই নবতম প্রয়াসের জন্য প্রথমেই অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে এ ছবির প্রযোজক এবং পরিবেশক আর ডি বনশালকে অভিনন্দিত করি।

নির্মীয়মাণ বাংলা চলচ্চিত্রের আর এক নতুন রসাস্বাদনের চিত্র 'চিড়িয়াখানা'। শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের রহস্যকাহিনী ব্যোমকেশ পর্বের এটি অন্যতম। নবগঠিত পরিচালকগোষ্ঠী 'নায়ক'র অন্তরালে রয়েছেন সত্যজিৎ রায়ের কয়েকজন সুযোগ্য সহকারী। এ ছবির চিত্রনাট্য, সঙ্গীত-পরিচালনা এবং উপদেষ্টা রয়েছেন শ্রীরায়। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে এটির অন্তর্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হতে চলেছে। খুন, জখম আর মেলিং-র কেন্দ্রস্থল গোলাপ কলোনীর রোমাঞ্চকর বহির্দৃশ্যটি গৃহীত হবার পর ছবির সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে। প্রতিটি চরিত্রকে ঘিরে সংশয়, আশংকা আর কৌতূহল ছড়িয়ে রয়েছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্র ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সীর ভূমিকায় বাংলাদেশের একমাত্র রোমান্টিক নায়ক উত্তমকুমারকে দেখতে পাওয়া যাবে। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন জহর গাঙ্গুলী, সুশীল মজুমদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, গীতালি রায় প্রভৃতি শিল্পীরা। ইতিমধ্যে অ্যামেরিকান টেলিভিশন

কোম্পানী টেলিভিশন প্রদর্শনের জন্য এ ছবির বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন নবগঠিত পরিবেশক সংস্থা বলাকা পিকচার্স।

কাহিনীর বৈচিত্র্যে এবং সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রে বাংলা ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশের সুখ্যাত পরিচালক শ্রীতপন সিংহ যে নতুন ছবিটির দায়িত্ব নিয়েছেন তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনফুল রচিত বাংলাদেশের বহুল পঠিত জনপ্রিয় উপন্যাস 'হাটে বাজারে'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে শুরু করেছেন শ্রীসিংহ। এ ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ বৈজয়ন্তীমালা এবং অশোককুমার। কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রে ডাক্তারবাবু এবং দেহাতী ছিপলি-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন অশোককুমার ও বৈজন্তীমালা। বাংলা চলচ্চিত্রে শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালার এই প্রথম অভিনয়। সম্প্রতি ভুটান সীমান্তে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে অন্তর্দৃশ্যের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে অভিনয় ছাড়াও এ ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার স্বকণ্ঠের গান শুনতে পাওয়া যাবে। ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন পরিচালক শ্রীসিংহ। মানবিক আবেদনের মহান চরিত্র ডাক্তারবাবুর ভূমিকায় যথার্থভাবে রূপায়িত করেছেন সুদক্ষ অভিনেতা অশোককুমার। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, গীতা দে, শমিতা বিশ্বাস, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। ছবিটির প্রযোজনা করছেন অসীম দত্ত।

বাংলা চলচ্চিত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' একটি উল্লেখযোগ্য

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত নতুন ছবি
গুপী গায়েন বাঘা বায়েন

সংযোজন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ রচনার বর্তমানে চিত্ররূপ দিচ্ছেন নবগঠিত নাবিক প্রোডাকসনের তরফ থেকে পরিচালকদ্বয় নারায়ণ চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমিক। এমন আশ্চর্য প্রেমের কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। হয়তো এমন সাহিত্যও আর রচিত হয়নি। গ্রামবাংলার পটভূমিকায় আর উন্মুক্ত সমুদ্রসৈকতে বাংলাদেশের বহু পুরাতন এক প্রেমকথা এই উপাখ্যানের একমাত্র উপজীব্য বিষয়। এ কাহিনীর নায়ক হেরম্ব-চরিত্রে অভিনয় করছেন বাংলাদেশের নবনাট্যের বলিষ্ঠ নাট্যকার এবং অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই নায়িকা সুপ্রিয়া ও আনন্দ-র চরিত্রে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং অঞ্জনা ভৌমিক। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ওস্তাদ বাহাদুর খান। সম্প্রতি পুরী সমুদ্রসৈকতে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

দুঃসাহসিক প্রয়াস হিসেবে অভিনেত্রী-পরিচালিকা মঞ্জু দে'র 'অভিশপ্ত চম্বল' একটি স্মরণীয় চিত্র। চম্বল অঞ্চলে দুর্ধর্ষ দস্যুজীবনের এ কাহিনীটি রচনা করেছেন সাহিত্যিক তরুণকুমার ভাদুড়ী। লোমহর্ষক এ কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়া একজন মহিলার পক্ষে নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাধ্য প্রয়াস বলব। কিন্তু অভিনেত্রী-পরিচালিকা শ্রীমতী দে তা সম্ভব করেছেন। ভারতের মানচিত্রে দস্যুঅধ্যুষিত চম্বল উপত্যকা নরহত্যা, লুন্ঠন আর সংঘর্ষে ভয়াবহ। এখানে মানবতা নেই। আছে শুধু প্রতিহিংসা। তাই এর নাম 'অভিশপ্ত চম্বল'। এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা সাধারণ নয়। অসাধারণ। দস্যু-নায়ক সুলতান সিং, দস্যু-নায়িকা পুতলী বাঈ, সর্দার বাবু লোহার, মান সিং, রূপা, তহশীলদার প্রভৃতি চরিত্র সমাবেশে রচিত এ কাহিনী। প্রামান্য ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করে দস্যুপরিব্যাপ্ত মধ্যপ্রদেশের ভিণ্ড ও মোরেণা অঞ্চলে সিকিউরিটি আর্মড ফোর্সের সহযোগিতায় এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী দে। উল্লিখিত চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন প্রদীপকুমার, মঞ্জু দে, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, পংকজ চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার দাস এবং রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপদসংকুল চম্বলে এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ

তরুণ মজুমদার পরিচালিত নতুন ছবি
বালিকা বধূ

তপন সিংহ পরিচালিত নতুন ছবি
হাটে বাজারে
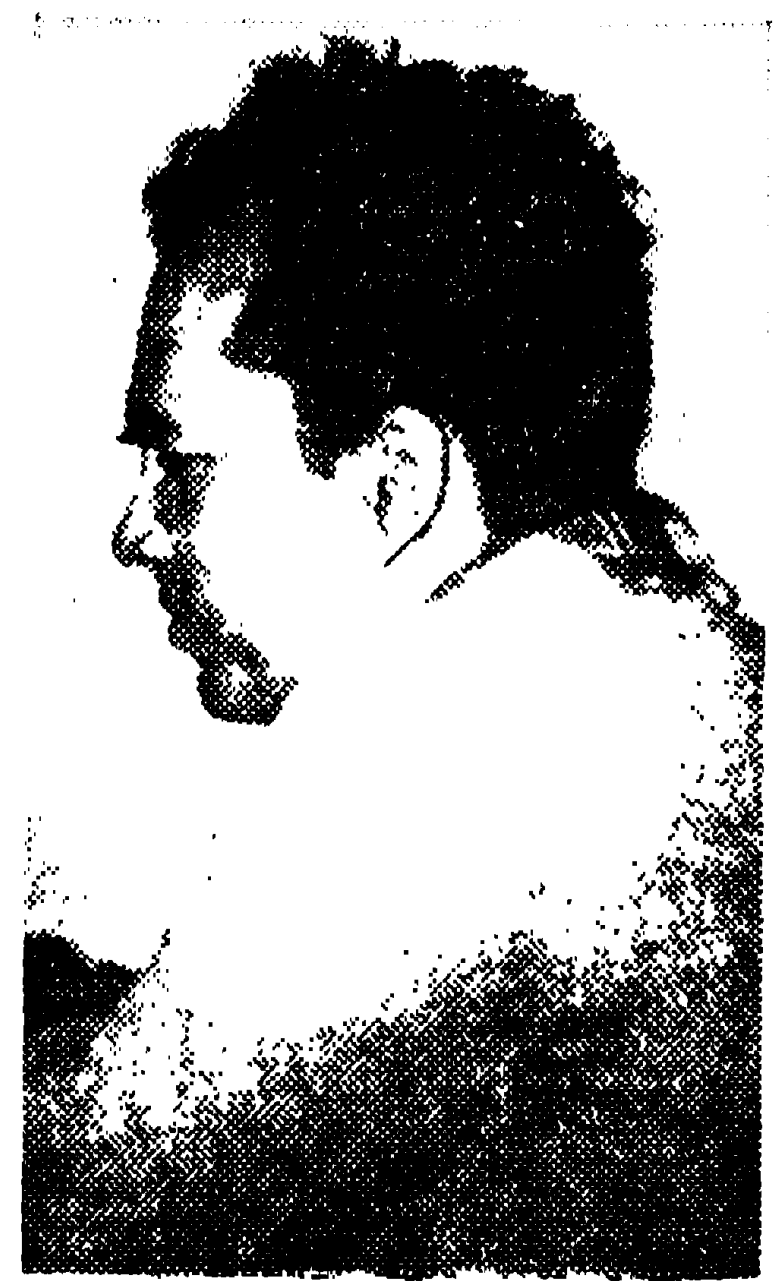
সলিল সেন পরিচালিত নতুন ছবি
অজানা শপথ

সুনীল ব্যানার্জি পরিচালিত নতুন ছবি
অ্যান্টনী ফিরিংগী

বাংলা চলচ্চিত্রে একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। বর্তমানে অন্তদৃশ্যগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে।

বিচিত্র জীবনের মানুষ কত বৈচিত্র্যময় জীবিকায় আবদ্ধ। এ সংসারে কত খেলা। মানুষ নিয়েও এখানে খেলা চলে। সার্কাস পার্টির কথাই ধরুন না কেন। কত ভয়াবহ খেলা দেখিয়ে জীবনকে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার পথে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন এ জগতের মানুষেরা। এ'দেরও সংসার আছে। ভালবাসা আছে। কিন্তু জীবনের নিরাপত্তা? স্বাধীনতা? এই চিরন্তন প্রশ্নের জীবন-জিজ্ঞাসার কাহিনী হল 'আকাশছোঁয়া'। মহাশ্বেতা দেবী রচিত সার্কাস পার্টির বহু বাস্তব ঘটনা নিয়ে এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রতিষ্ঠিত পরিচালক শ্রীরাজেন তরফদার। ইতিমধ্যে সার্কাস পার্টির নানান খেলা এবং কাহিনীর নাটকীয় দৃশ্যগুলি টালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'পানামা সার্কাস'-এ গৃহীত হয়েছে। কাহিনীর বিচিত্র চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পারিজাত বসু ও শিখা ভট্টাচার্য। বর্তমানে ছবির শেষ কাজটুকু ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। ছবিটির প্রযোজক হলেন অভিনেতা দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কাহিনী বৈচিত্র্যে এটি একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস বলা চলে।

বাংলাদেশের তরুণ পরিচালকদের মধ্যে প্রগতিশীল এবং প্রতিষ্ঠাবান পরিচালকরূপে শ্রীতরুণ মজুমদার অন্যতম। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের সনাতন বাল্যবিবাহের ওপর যে মিষ্টি প্রেমের ছবি নির্মাণ করেছেন তার নাম 'বালিকা বধূ'। এটির কাহিনীকার

বিজয় বসু পরিচালিত নতুন ছবি
বাঘিনী

বিমল কর। আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার এ-কাহিনী। তখন বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের চলন ছিল। বাল্যবিবাহ সমাজ এবং সংসারের পক্ষে মঙ্গলকর বলে সংসার-পিতা শশধর সিংহ তাঁর কিশোরী কন্যা

মঞ্জু দে পরিচালিত নতুন ছবি
অভিশপ্ত চম্বল

রাজেন তরফদার পরিচালিত নতুন ছবি
আকাশছোঁয়া

চন্দ্রার সংগে বিয়ে দিলেন শরতের এবং কিশোর পুত্র অমলের সংগে বিয়ে দিলেন রজনীর। অমলের বয়েস তখন আঠারো। রজনীর তেরো। আজকের বিচারে এ বিয়ে হাস্যস্কর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিন সমাজে বাল্যবিবাহের এমনি চলন ছিল। অনেকের চোখে হয়তো এ কাহিনী পুরনো বলে মনে হবে। প্রেম সে তো যুগে যুগে। পৃথিবীর নানান পরিবর্তনের মধ্যে প্রেমই একমাত্র অনন্ত। বিবাহের অর্থ সম্বন্ধে অচেতন দুটি কিশোর-কিশোরীর অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞতার সংগে বাংলাদেশের রাঙা-মাটির-পথ, ধান-কাটা-মাঠ, বন-খেজুরের-ঝোপ, বাঁশ-ঝাড়ের-মর্মর, কোকিল-ডাকা দুপুর আর জ্যোৎস্না-মাখা-রাত, সব মিলিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে। চরিত্রানুযায়ী রজনী, অমল, চন্দ্রা এবং শরতের ভূমিকায় নবাগতা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপকুমার যেন কাহিনীর সংগে মিশে গেছেন। এ ছবির অধিকাংশ শিল্পীই নবাগত। নতুনদের দিয়ে অনবদ্য অভিনয় করিয়েছেন পরিচালক শ্রীমজুমদার। এই সংগে পুরনো দিনের বাংলা গানের একটা আত্মিক মিলন ঘটিয়েছেন সংগীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ফেলে-আসা বাংলাদেশের জীবনচেতনায় এ ছবিটি বাংলা চলচ্চিত্রের একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে বলে বিশ্বাস। ছবিটির সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়েছে। চিত্রদীপ প্রোডাকসন্সের পক্ষ থেকে এ ছবিটি পরিবেশনা করছেন মানসাটা পরিবেশক সংস্থা। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষিত।

বিভিন্ন স্তরের কাহিনী নির্বাচনে আর একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র 'বাঘিনী'। বাগুদি-

পাড়ার বাঘিনী মেয়ে দুর্গা আর বামুন-পাড়ার স্বদেশী-করা ছেলে চিরঞ্জীবের বেপরোয়া জীবিকায় চোলাই মদ চালানের যে জীবন প্রত্যহ, তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত সমরেশ বসুর জনপ্রিয় কাহিনী 'বাঘিনী'।

এটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক শ্রীবিজয় বসু। সম্প্রতি রামপুরহাট অঞ্চলে এ-ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হল। যথার্থ পরিবেশের মধ্যে গোপনে গোপনে এ-রসের জোগান চলে। রাত-বিরেতে পাড়াগাঁয়ের পথেঘাটে দিব্যি মাল পাচার হতে থাকে। গরু-গাড়ির খড়ের গাদার নিচে কিংবা মেয়েদের শাড়ির ভেতর সরাসরি চোলাই মদের ব্লাডার কিংবা টিউব সাজিয়ে ব্যবসার লেনদেন চলে। কিন্তু বড় সজাগ থেকে এ-কাজ করতে হয়। আবগারির চোখে ধুলো দিয়ে পা না বাড়ালে রক্ষে নেই। একবার ধরা পড়লেই এ-কারবার চিরদিনের জন্য বন্ধ। এই দুঃসাহসিক জীবনের প্রতিটি ঘটনা এ-চিত্রে ধাপে ধাপে বর্ণিত। প্রধান দুটি চরিত্রে দুর্গা এবং চিরঞ্জীব-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্ধ্যা রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ছায়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় গাঙ্গুলী। বর্তমানে ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় ছবির অন্তর্দৃশ্যের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। এস এম ফিল্মস নিবেদিত ছবিটির পরিবেশক চণ্ডীমাতা ফিল্মস।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত সুখ-পাঠ্য কাহিনী 'শিলাপটে লেখা' চলচ্চিত্রে 'প্রস্তরস্বাক্ষর' নামে রূপায়িত করছেন পরিচালক শ্রীসলিল দত্ত। পাহাড়ী জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ কাহিনীর পরিবেশ। সারি সারি পাহাড়ের গায়ে যে পৃথিবী, তার প্রাত্যহিকতা বড় বিচিত্র। এই পাহাড়ের সম্পদলোভে যে-সব মহাজন এখানেই ঠাঁই নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী তিনকড়ি চাটুজ্যে অন্যতম। বাইরে থেকে দেখলে এ'কে ঠিক চেনা যায় না। মনে হয়, পাথরের ব্যবসা করতে করতে তাঁর মনটাও যেন কবে পাথর হয়ে গেছে। অথচ কড়িবাবুরও সংসার ছিল। স্ত্রী ছিল। ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী কুন্তলা দেবী তাঁর ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখন বাপের বাড়ি আছেন। কড়িবাবু শুধু মাসোহারাটা পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

কড়িবাবু তাই নিঃসঙ্গ। কিন্তু নারী-জাতির প্রতি তাঁর আর বিশ্বাস নেই। এমনকি ম্যানেজার বিনয়েন্দ্রকেও তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সম্পত্তিলোভে কুন্তলা দেবী তাঁর উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একদিন কড়িবাবুর সংসারে এসে হাজির হলেন। শুরু হয় সংঘাত। ঘটনার ঘনঘটায় এটি খুবই চিত্রপোযুক্ত কাহিনী। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, বনানী চৌধুরী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, তরুণকুমার ও গীতালি রায়। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলা ছবির বহু আলোচিত এবং একমাত্র রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা উত্তম-কুমার ও সুচিত্রা সেনকে বহুকাল যাবৎ এক-সঙ্গে কোন বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যায় নি। এই দুর্লভ জুটিকে আবার একত্র করেছেন প্রবীণ সম্পাদক-পরিচালক শ্রীসুবোধ মিত্র তাঁর 'গৃহদাহ' ছবিতে। চলতি বছরে এটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরি-চালক শ্রীমিত্র। শরৎচন্দ্র রচিত এ কাহিনীর মহিম, অচলা, সুরেশ ও মৃণালের চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, প্রদীপকুমার এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে এটির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। 'স্টার কাস্টিং' হিসেবে এটি একটি সুবৃহৎ ছবি বলা চলে। প্রযোজনায় রয়েছেন স্বয়ং উত্তমকুমার। ছায়া-বাণী এটির পরিবেশক। বাংলা দেশের দর্শকদের কাছে এটি নিশ্চয়ই একটা মস্তবড় খবর। তবে আজকের যাঁরা প্রবীণ দর্শক তাঁদের কাছে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া পরি-চালিত এটির প্রথম চিত্ররূপ কম আকর্ষণীয় ছিল না।

বাংলা চলচ্চিত্রের দিকচিহ্ন 'পথের পাঁচালী'র কাহিনীকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের আর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'কেদার রাজা'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সমাপ্ত-প্রায়। বাংলা দেশের মাটি এবং মানুষের কথা এ চিত্রে বিধৃত। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন

পরিচালক শ্রীতপন সিংহ। তাঁর সুযোগ্য সহকারী শ্রীবলাই সেন এ ছবিটির পরিচালক। কিস্মৎরাই জিন্দেল প্রযোজিত এ ছবির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, তমাল লাহিড়ী, মমতাজ আমেদ, অসিতবরণ, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী ও গীতা দে। মুভিউইন ছবিটির পরিবেশক।

অভিনয় ছাড়াও বাংলা ছবিতে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে যে কজন মহিলা শিল্পী এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অভিনেত্রী শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী। তিনি বর্তমানে বিমল কর রচিত 'খড়কুটো' অবলম্বনে 'ছুটি' ছবিটি পরিচালনা করছেন। তেইশ বছরের অমল এবং সপ্তদশী ভ্রমরের প্রথম প্রেম-র এ কাহিনী। এ দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নবাগত নায়ক-নায়িকা মৃণাল মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিনী মালিয়া। নতুন শিল্পীদের নিয়ে ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করানো অরুন্ধতী দেবীর একটি বিশেষ প্রয়াস বলা যেতে পারে। তাছাড়া এ ছবিতে তিনি সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেছেন। পূর্ণিমা পিকচার্সের এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন নেপালচন্দ্র দত্ত। ত্রিশ দশকের দুটি বাংলা গান এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এ ছবিতে যুক্ত হয়েছে।

আজকের সাহিত্যে ছোটগল্প এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। উপন্যাস ছাড়াও ছোটগল্প থেকে চলচ্চিত্র-কাহিনীর উপাদান গৃহীত হচ্ছে। বর্তমানে সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের 'আবিষ্কার' গল্প থেকে 'পঞ্চশর' ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রকর শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় ছবিটি নির্মীয়মাণ। প্রেম এ কাহিনীর উপজীব্য। দুই নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণ অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও জনপ্রিয় অনিল চট্টোপাধ্যায়। নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন রুমা গুহঠাকুরতা। এ ছবিতে তিনটি রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। ছায়ালোক ছবিটির পরিবেশক।

বাংলা ছবিতে নবাগত শিল্পী সমাবেশের দিক থেকে এ বছরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। নির্মীয়মাণ বহু ছবিতে এখন অনেক নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছেন। পরিচালক শ্রীপীযূষ বসু তাঁর নতুন ছবি 'অসামাজিক'-এ তিন নায়কের মধ্যে দুই নায়কের চরিত্রে নবাগত প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুযোগ দিয়েছেন। আর এক নায়ক চরিত্রে রয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। নায়িকার ভূমিকায় রূপদান করছেন শমিতা বিশ্বাস। বাংলা দেশের এক শিল্পাঞ্চলে একটি মোটর গ্যারেজের বিচিত্র ঘটনা এ চিত্রে বর্ণিত হবে।

পরিচালক শ্রীসলিল সেন তাঁর জনপ্রিয় বেতার-সফল নাটক 'সন্ন্যাসী' অবলম্বনে 'অজানা শপথ' ছবিতে তিন বন্ধুর এক বন্ধুর চরিত্রে নবাগত নায়ক সোমেন চক্রবর্তীকে নিয়েছেন। শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'দুরন্ত চড়াই' ছবিতেও শ্রীচক্রবর্তী অভিনয় করছেন। এঁর অভিনয় খুবই আশাপ্রদ। অপর দুই বন্ধুর চরিত্রে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়। নায়িকার ভূমিকায় রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। সরকার প্রোডাকসন্সের তরফ থেকে এ ছবিটি প্রযোজনা করছেন দিলীপ সরকার।

চিত্র-তারক-তারকাদের সম্পর্কে জনসাধারণের একটা বিশেষ কৌতূহল বরাবর দেখা গেছে। এমন কি নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খবর সাধারণ মানুষের মুখে-মুখে শুনতে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে নায়কের জীবন নিয়ে 'নায়ক' ছবি করেছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। এবার বলেশ চিত্র-জগতের এক জনপ্রিয় নায়িকার জীবন নিয়ে 'নায়িকা সংবাদ' চিত্র নির্মাণ করেছেন পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠী। বাংলা দেশে একটি ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবার যাত্রালগ্নে আকস্মিকভাবে দল-ছাড়া হয়ে গিয়ে তিন দিন তিন রাত্রি কিভাবে এক অপরিচিত জায়গায় নায়িকাটিকে বিচিত্র জীবন যাপন করতে হয়, তারই এ কাহিনী। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জনা ভৌমিক। নায়ক চরিত্রে রয়েছেন উত্তমকুমার। বি কে প্রোডাকসন্সের প্রযোজনায়

মুক্তি-প্রতীক্ষিত এই ছবিটি পরিবেশনা করছেন চিত্রালী ডিসট্রিবিউটার্স।

জীবনী-চিত্র হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য নির্মীয়মাণ ছবি হল, 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ', 'চারণকবি মুকুন্দদাস' এবং 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিপ্লবী-বীর শ্রীঅরবিন্দর জীবনাদর্শ তুলে ধরার জন্য এ কে বি ফিল্মসের তরফ থেকে 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবিটি বর্তমানে পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক শ্রীদীপক গুপ্ত। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন দিলীপ রায়।

প্রযোজক-পরিচালক শ্রীনির্মল চৌধুরী কবি মুকুন্দদাসের জীবনাবলম্বে বিধৃত 'চারণ কবি মুকুন্দদাস' ছবিটি নির্মাণ করছেন। নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সবিতাব্রত দত্ত। শ্রীদত্তের স্বকণ্ঠের গান এ ছবিতে যুক্ত হয়েছে।

কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গীর কিংবদন্তী-মূলক জীবনকে কেন্দ্র করে 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' ছবিটি পরিচালনা করছেন পরিচালক শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে এটির চিত্রগ্রহণ ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নাম-ভূমিকায় রূপদান করছেন উত্তমকুমার। নিরুপমার চরিত্রে রয়েছেন বম্বের অভিনেত্রী তনুজা। সংগীত-বহুল এ ছবির সুরকার অনিল বাগচী।

শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন'র চলচ্চিত্র রূপ দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। সম্প্রতি রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে এ ছবির দুটি গান গৃহীত হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন শ্রীবিজয় বসু। এ কাহিনীর জীবন মশাই-র চরিত্রে রূপদান করবেন বিকাশ রায়।

নিরীক্ষামূলক ছবি হিসেবে চলতি বছরে দুটি ছবির নাম করা যেতে পারে। প্রথমটি শ্রীভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল পরিচালিত 'ছায়াপথ' এবং দ্বিতীয়টি শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কৃত 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'। আজকের আধুনিক শহর-জীবনে যে শূন্যতার ছবি, যে অন্তরশূন্য আন্তরিকতা তারই বাস্তব পরিবেশে 'ছায়াপথ'-র বলিষ্ঠ বক্তব্য। এ ছবিটি সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে নির্মিত হচ্ছে। কলকাতার পথ-ঘাট এ ছবির পরিবেশ। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, এন বিশ্বনাথন, কণিকা মজুমদার, সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরঞ্জনা পরিবেশিত এ ছবির সুরসৃষ্টি করছেন পন্ডিত রবিশংকর।

মাতৃহারা একটি শিশুর শূন্যতাকে কেন্দ্র করে যে দুঃখভরা পৃথিবী তারই ঘটনায় বিধৃত 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'। শিশু-নায়ক চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করছে বিশ্বজিৎ-পুত্র শ্রীমান প্রসেনজিৎ। দুটি মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বজিৎ।

কাল, তুমি আলেয়া চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী

চলচ্চিত্র যেগুলি বাদ পড়লো, তা স্বল্প পরিসরের মধ্যে সবক'টি চিত্রের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না বলে প্রবন্ধকার আন্তরিক দুঃখিত। তবে মোটামুটি ছবি-তালিকার গতিপথ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, আজকের বাংলা চলচ্চিত্র যদি এইভাবে সাহিত্যের জনপ্রিয় নিটোল কাহিনীকে আশ্রয় না করে স্বাধীনভাবে চলচ্চিত্রিক শিল্প-বিকাশের পথে রূপ নেয়, তাহলে অন্যান্য ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় ক্রমশঃ বাংলা ছবির বাজার সংকুচিত হয়ে আসবে। বিশেষ করে বর্তমানের হিন্দী ছবি যেভাবে দর্শক-আসর জমিয়ে বসছে, তাতে করে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ কতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। আজকাল ছবিঘরের মালিকরা কেউ কেউ নাকি বাংলা ছবির পরিবর্তে হিন্দী ছবি প্রদর্শনের কথা ভাবছেন, এ-কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, অযুত-নিযুত দর্শক যে-ছবি দেখে বেশি আনন্দ পান, তার প্রদর্শনের ব্যবস্থা না রাখলে ব্যবসার ক্ষতি করে প্রেক্ষাগৃহগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে সৎ-চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ কি হবে? এ-কথা বিশেষভাবে চিন্তা করার সময় আজ এসে গেছে। চলচ্চিত্র শুধুমাত্র যে কাহিনীর চিত্রানুবাদ নয়, দর্শক মনোরঞ্জনের প্রমোদ-মাধ্যম নয়, তার যে নিজস্ব শিল্পসৃষ্টির

দিলীপ নাগ পরিচালিত **বধূবরণ** চিত্রে গীতা দত্ত ও প্রদীপকুমার

বিশ্বজিৎ-জায়া শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায় ছবিটির প্রযোজিকা।

উল্লিখিত বেশ কয়েকটি নির্মীয়মাণ বাংলা চলচ্চিত্রের তথ্য থেকে বোঝা যায়, ঊনিশশো ছেষট্টি সালের চলচ্চিত্র মূলতঃ সাহিত্যাশ্রয়ী। ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা চিন্তা করে অধিকাংশ পরিচালকরাই এখন জনপ্রিয় কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। ভাল কথা, ছবির তালিকা থেকে অন্যান্য নির্মীয়মাণ বাংলা

একটা বিরাট ক্ষমতা আছে, তা কে প্রমাণ করবেন? সরকার, না চলচ্চিত্রকর। কে সেই ক্ষমতাবান শিল্পী, যাঁর আবির্ভাবে আজকের বাংলা চলচ্চিত্র নতুন পথের সন্ধান পাবে? চলচ্চিত্র নিজেকে আরও নতুন করে কিভাবে প্রকাশ করবে? আজকের দর্শককে সে নতুন কী দেখাবে—কী শোনাবে?

এ জিজ্ঞাসা এখন আপনার, আমার এবং সকলের।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

খেলা আর ধূলা

ঈশ্বর নাকি খেলার ছলে এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এ-কথা কেউ না বলে দিলেও বেশ হাড়ে হাড়ে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরের খেলার অন্ত নেই, তিনি কারো হাতে তবিলদারী দিয়ে অন্যকে ভিখারী বানিয়ে হ্যান্ড আর হ্যান্ড নটের খেলাটাই ইদানীং যেন বেশী পছন্দ করছেন। সেখানে তিনি গ্যালারীর দর্শক মাত্র।

সব দেশেই সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু হয়েছে খেলাধূলা। ইংরাজীতে 'স্পোর্ট' কথাটি বেশ, শিকার থেকে শুরু করে পিঙ-পঙ খেলা, সবটাই এই স্পোর্টসের অন্তর্ভুক্ত।

আসোসিয়েশন ফুটবল, রাগবী ফুট-বল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, বক্সিং, ল্যাকরোস, ফেন্সিং (তরোয়াল খেলা), নেটবল, ব্যাড-মিন্টন, ক্রোকেট, টেবল টেনিস, আইস-হকি, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট রেসিং, মোটর রেসিং, পোলো, ওয়াটার পোলো, মোটর-সাইকেল রেসিং, ফাইভস্, গলফ, কারলিং, বোলস, বেসবল, আর্চারি, রাউন্ডার্স, রেশলিং প্রভৃতি বহির্বিভাগীয় খেলাগুলি স্পোর্টস তালিকাভুক্ত।

মানুষ চিরদিনই একধারে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, অপরদিকে নিজের চিত্ত-বিনোদনের জন্য সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে রেখেছে। জীবনধারণের সংগ্রাম যেমন কঠিন, জীবন ধরণের সংগ্রাম আনন্দদায়ক হলেও কম কঠিন নয়। অনেক খেলাধূলা প্রকৃতি ক্রিয়াকলাপের অনুকৃতি মাত্র, সেইভাবেই তার সূত্রপাত। একটা প্রতিযোগিতা, তার এক প্রতিপক্ষ, সেই প্রতিপক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়ে তাকে পরাজিত করতে হবে, বিজয়ী হতে হবে।

কালক্রমে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে মানুষের আচরণের বিকাশ ঘটেছে, মনো-ভংগী পালটেছে। তার ফলে খেলাধূলার আইন-কানুন গড়ে উঠেছে, শুধু খেললেই হবে না, খেলার মত খেলতে হবে, খেলাটা একটা আর্টে পরিণত করতে হবে, শিল্প-সংগত খেলাই খেলা, আনাড়ীর খেলা খেলা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফুটবলের কথা ধরা যাক, ফুটবলকে পা দিয়ে শুধু আঘাত করতে হবে ক্রমাগত, কিক্ করে তাকে প্রতিপক্ষের গোলে নিয়ে যেতে হবে। সেই অপরপক্ষের সবক'টি খেলোয়াড় প্রাণপণে আত্মরক্ষা করছেন। সেই ফুটবল খেলা বর্তমানে বেশ জটিল আর্টে পরিণত, অনেক খেলোয়াড় খেলার পদ্ধতিতে যথেষ্ট সৌন্দর্য এনেছেন, একটি পাশ, বা একটি গোল যে কত সূক্ষ্ম হতে পারে, তা একজন সার্থক ফুটবল-শিল্পী দেখাতে পারেন।

এক একজনের খেলার এক একরকম ভংগী।

আমাদের পূর্বপুরুষরা লড়াই করেছেন—হাতাহাতি, তারপর হাতিয়ার নিয়ে, জীব-জন্তু থেকে মানুষ নামক জন্তু সবায়ের সঙ্গে তাঁদের লড়তে হয়েছে, বাঁচার প্রয়োজনে জীবনমরণের যুদ্ধ। তারপর জীবনের গতি যখন সহজ এবং সরল হয়ে এল, তখন লড়াই শুধু লড়ায়ের আনন্দের জন্য। অনেক আগেই মানুষ বুঝে নিয়েছিল যে, একটা ভারসাম্য-বিশিষ্ট জীবনের পক্ষে কাজের যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন খেলা। সব সময়ে কাজ করাটাই ভালো কথা নয়, খেলাধূলা করারও প্রয়োজন আছে। মানসিকবৃত্তির বিকাশে রিক্রিয়েশন বা চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজন আছে।

জুস্টিং—অশ্বপৃষ্ঠে অনুষ্ঠিত একটা কৃত্রিম দ্বন্দ্বযুদ্ধ—মধ্যযুগের প্রধানতম স্পোর্ট হিসেবে গণ্য ছিল। তাছাড়া তরোয়াল খেলা বা তীর-ধনুকের খেলা—ইতিহাসের প্রথম পাতা থেকেই শুরু হয়েছিল এবং আজো আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম অনেক হ্রাস পেয়েছে—শরীরটাকে সুস্থ রাখতে কিছু-না-কিছু ব্যায়াম করা প্রয়োজন। মনটাকে এবং দেহটাকে পরিষ্কার রাখতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন কোনোরকম ব্যায়ামের। নইলে মনকে শান্ত করা কঠিন।

লড়াই করার প্রবণতা বক্সিং (মুষ্টি-যুদ্ধ) এবং রেশলিং (কুস্তিযুদ্ধ) মারফৎ আজো কি আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তাই কৃত্রিম ভংগীতে হলেও প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই-লড়াই খেলা খেলতে বেশ লাগে।

বল খেলা একটা প্রাচীনতম খেলা। সূর্যদেবের সম্মানে মিশরীয়রা বল খেলতেন, আর গ্রীক ও রোমানরা হ্যান্ডবল খেলতেন—এই খেলা অনেক দিন পর্যন্ত টিঁকে ছিল এবং শোনা যায় আধুনিক টেনিসের জনক এই প্রাচীন খেলা।

১১০০ খৃষ্টাব্দের সময় থেকে টেনিস খেলা ফ্রান্সে প্রচলিত ছিল। একটা স্পেশাল কোর্টে এই খেলা হত। বল খেলা হতো

দেয়ালের মাধ্যমে, যেমন 'ফাইভসে' হয়ে থাকে। মধ্যভাগে একটা দড়ি টাঙানো থাকত, তার নীচে দিয়ে বলটা যাতে চলে যায় তা রোখবার জন্য এই দড়িটা থাকত।

বল নিয়ে যত রকমের খেলা হয়, তা এখন সংখ্যায় সর্বাধিক। সকল রুচির উপযুক্ত খেলাই আছে। বল নিয়ে যে-সব খেলা হয়, তার মধ্যে এসোসিয়েশন ফুটবল, রাগবী ফুটবল, নেটবল, ওয়াটার পোলো জনপ্রিয়।

কয়েকটা খেলায় আবার অন্য কিছু দিয়ে বলটাকে আঘাত করতে হয়। সেটা মুগুর-জাতীয় বস্তু। যেমন বেসবল এবং রাউন্ডার্স, ল্যাকরোসের ক্রোস, হকির স্টিক, ব্যাডমিন্টন বা টেনিসের র‍্যাকেট, গল্ফের ক্লাব, ব্যাগেটেল এবং বিলিয়ার্ডের কিউ, পোলোর স্টিক। পোলো অবশ্য ঘোড়ায় চড়ে এই স্টিক দিয়ে খেলতে হয়। কলকাতার 'এলেনবরা কোর্স' পোলো খেলার মাঠ।

এছাড়া অনেক খেলা আছে যার জন্যে বলের কোনো প্রয়োজন নেই। সেখানে শক্তি ও গতির বলে আমাদের জয়লাভ করতে হয়। তার নাম এ্যাথলেটিকস্‌। তার মধ্যে ভ্রমণ এবং দৌড় প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত। সবরকমের লাফ-ঝাঁপ, লং, হাই এবং হার্ডলস, কিংবা প্রকান্ড লম্বা বাঁশের সাহায্যে যে লম্ফদান, তার নাম পোলভল্ট।

এইসব খেলার জন্যই প্রচুর জায়গা প্রয়োজন। মাঠ কিংবা প্রশস্ত হল। যাঁরা অবশ্য বাড়ি বসে খেলাধুলো করতে চান, তাঁদের অল্পস্বল্প জায়গা হলেই চলে। একটা টেবলই যথেষ্ট, তার ওপর তাস, পাশা, দাবা, ডোমিনো, ড্রাউটস, লুডো, ব্রিজ প্রভৃতি বহুবিধ খেলা করা যায়।

কিন্তু শুধু কি খেলা? খেলা ছাড়া আরো কিছু আছে, জল, ঝড় ইত্যাদির দিনে কি খেলা হবে, তাই যা চিত্তবিনোদন করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে তার নাম 'পাসটাইম, বা অবসরযাপন, দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য অবশ্য সামান্যই। তাছাড়া 'পাসটাইমে' কোনো প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই। তাই পাসটাইমে যখন একজনের চেয়ে অপরে একটু বেশী কিছু করার চেষ্টা করে, তখন তার নাম হয় স্পোর্টস।

সুইমিং, গ্লাইডিং, সাইটসিইং, বোটিং, ক্লাইম্বিং, সাইক্লিং, মোটরিং, ইন-ক্যারাভান, হাইকিং, ফিসিং, স্কেটিং, পিকনিকিং, রাইডিং, ক্যাম্পিং প্রভৃতির সংজ্ঞা কি হবে?

পাসটাইম ব্যয়বহুল ব্যাপার। সবরকম রুচির মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী পাসটাইম আছে। তবে কতকগুলিতে যেমন খরচ বেশী, তেমনই অল্প-খরচার খেলাও আছে। ছুটির অবসরে এদিক-ওদিক চলে যেতে, এবং সেই অবসরটুকু আনন্দ ও খেলায় ভরে রাখতে সকলেই চেষ্টা করেন। যখন মনে হয় 'কোথায় আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা—' তখন এই পাসটাইম আমাদের মনটাকে ভরে রাখে।

আজ টুরিজমের কল্যাণে দেশে দেশে গজিয়ে উঠেছে হোস্টেল, রেস্ট হাউস প্রভৃতি, ছোটখাটো হোটেলের ছড়াছড়ি চারদিকে, তাই পাসটাইম হিসাবে সময় কাটানোর কোনো অসুবিধাই নেই।

তাজমহল, কুতুব, খাজরাহো, কোনারক, হরিদ্বার, দ্বারকা প্রভৃতি দেখার জন্য হাজার হাজার ব্যক্তি এদিক-সেদিকে উন্মত্তের মত ধাবিত হন। চিত্তকে প্রফুল্ল রাখতে হলে তাই চাই খেলাধুলো, স্পোর্টস যদি খেলা হয়, তাহলে পাসটাইমকে বলতে হবে ধুলো।

আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই পৃথিবীর স্পোর্টসের মানচিত্রে একটা নাম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ফুটবল, হকি, টেনিস, সাঁতার, রেসলিং, হাইজাম্প, লং জাম্প, পোলভল্ট ইত্যাদিতে ভারতবর্ষের রেকর্ড প্রশংসনীয়। স্বাধীন ভারতে খেলাধুলার অনুশীলন অনেক বেড়ে গেছে।

কিন্তু একটি জিনিসের অভাব আছে। অন্য আঞ্চলিক ভাষার কথা জানি না, বাংলা-ভাষায় খেলাধুলার ওপর গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছে যৎসামান্যই। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজয় বসু, শংকরীপ্রসাদ বসু, রাখাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি সুলেখকগণ খেলাধুলো সম্পর্কে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের অনুসরণে আরো অনেকের এগিয়ে আসা উচিত।

বাংলা নাটক, উপন্যাস বা গল্পে খেলোয়াড়দের কথা নেই বল্লেই চলে। রবীন্দ্রনাথ তবু ফুটবল এবং মোহনবাগান কয়েকবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু টেনেসী উইলিয়ামসের 'ক্যাট অন দি হট টিন রুফ' নাটকের নায়ক ছিল ফুটবল খেলোয়াড়, আর ফুটবল খেলার ফলেই তার জীবনে একটা ট্রাজেডি ঘনিয়ে আসে। এই ধরনের প্রয়োজনে খেলাধুলোকে আজো আমরা নিজস্ব করে তুলতে পারিনি। দু'-একখানি খেলাধর্মী উপন্যাস হলে হাওয়া-বদল ঘটতে পারে।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

হিন্দিতে নেহরু জীবনী ॥

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় জহরলাল নেহরুর কয়েকটি জীবনী-গ্রন্থ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দীতেও এর আগে নেহরুর জীবন এবং কর্ম সম্বন্ধে যে দু'-একটি গ্রন্থ রচিত হয়নি, এমন নয়। তবু বর্তমান গ্রন্থটি বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এবং হিন্দী জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম সংযোজন। গ্রন্থটির নাম 'জওহর ভাই', রচয়িতা হলেন রায় কৃষ্ণদাস। এতে জওহরলালের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপক চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়নি, বরং কাছ থেকে দেখা মানুষ জওহরলালকে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর কর্মময় জীবনের অন্তরালে যে একজন সাধারণ মানুষ লুকিয়েছিল, গ্রন্থটিতে তাই তুলে ধরা হয়েছে।

একটি সাহিত্য সভা ॥

প্রখ্যাত হিন্দী সাপ্তাহিক 'দিনমান'-এর পক্ষ থেকে ক'দিন আগে দিল্লীতে একটি

কবি লিওনার্ড নাথন

সাহিত্য-সভার আয়োজন করা হয়। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীর একটি প্রখ্যাত রেস্তোরাঁয়। এতে যোগ দিয়েছিলেন মালয়ালম কবি শ্রীশঙ্কর কুরুপ, রুশ-কবি গ্রমজাতীব, আমেরিকান কবি লিওনার্ড নাথন এবং 'দিনমান'-এর সম্পাদক প্রখ্যাত হিন্দী কবি 'অজ্ঞেয়'। সভায় গ্রমজাতীবকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সমালোচকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক হচ্ছে অনেকটা গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের সম্পর্কের মত।" নিজের দু'টি কবিতা পাঠ করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন—"এই কবিতা দু'টিই তাঁর কবিতার মূল স্বাদ বহন করছে। মদটা কেমন, তা জানবার জন্য যেমন পুরো মদ খাওয়ার প্রয়োজন নেই, তেমনি সাহিত্যের স্বাদ লাভ করবার জন্যও পুরো সাহিত্য পাঠ সর্বদা দরকার হয় না।" আলোচ্য কবি তাঁর 'দূরের নক্ষত্র' নামক কাব্য-সংগ্রহের জন্য লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

লিওনার্ড নাথন হিন্দী কবিতার উপর গবেষণার জন্য বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। বিদ্যানিবাস মিশ্র সম্পাদিত 'আধুনিক হিন্দী কবিতা' নামক হিন্দী কাব্য সংকলনটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবী কবি অমৃত প্রীতম, হিন্দী কবি বচ্চন, রঘুবীর সহায়, ভারতভূষণ অগ্রবাল, প্রভাকর মাচওয়ে, মনোহরশ্যাম যোশি, শ্রীকান্ত বর্মা, সর্বেশ্বর দয়াল শকসেনা, প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

একজন তরুণ তামিল কবি ॥

সমকালীন তামিল কাব্য-জগতে কবি টি রাজাগোপালনের নাম খুবই পরিচিত। সম্প্রতি তাঁর একটি নতুন কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জন্ম হয় ১৯২১ সালে মাদ্রাজের পঝয়নুরে। প্রখ্যাত তামিল কবি ভারতী দসন-এর কাব্য ভাবনার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। দৃশ্যমান বস্তুজগতের আলো-অন্ধকার যে তাঁর কবি-মনে ঝংকার তুলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্য দর্শনে তিনি ব্যক্তিগত অনুভবকেই প্রাধান্য দেবার পক্ষপাতী। তিনি তামিল ভাষায় প্রথমে একটি কবিতা-পত্র 'কবিকুম্' সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর পরে তিনি 'ইলক্কিয়ম' বলে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাতেও তাঁর কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ ॥

সোভিয়েত-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ভ্যাদিমির বালাবুশেভিচ্ সিংহল ও ভারত সফরে এসেছেন।

১৯০০ সালে বালাবুশেভিচ্ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে মস্কো প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদের তিনি স্নাতক। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান আকাদমীর এশীয় জাতি পরিষদের ভারত, পাকিস্থান, নেপাল ও সিংহল বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি গত দশ বৎসর যাবত নিযুক্ত আছেন। ভারতের আধুনিক ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও সিংহলের বিষয়ে বহু পুস্তক ও নিবন্ধে তিনি সম্পাদনা করেন।

সিংহল সফরের পর তিনি ভারতে দুই মাস কাটাবেন। এই সময় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে চার খণ্ডে ভারতের ইতিহাস প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্ডিতদের সংগে অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ আলোচনা করবেন। তা ছাড়াও সোভিয়েত-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ ভারতের বিভিন্ন শহরে ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির শাখাগুলি পরিদর্শন করবেন।

অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্

মস্কো ত্যাগ করার প্রাক্কালে এ পি এন সংবাদদাতাকে অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ এক প্রশ্নোত্তরে ১৯৬৬ সালে এশীয় জাতি-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারততত্ত্ব সম্পর্কিত এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় গ্রন্থের বিষয়ে উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ বলেন, "আমাদের বিভাগ প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত চার খণ্ডে ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের ওপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। এই কাজে বহু সোভিয়েত-ভারততত্ত্ববিদ নিযুক্ত আছেন এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের ৫০তম বার্ষিকীতে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আমরা আশা করি। 'ভারতের আধুনিক ইতিহাস' এবং 'ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাস' ইতিমধ্যেই রুশ ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতের প্রাচীন ইতিহাস' ও 'ভারতের মধ্য-যুগীয় ইতিহাস' নামে দুটি বই আগামী বছর প্রকাশ করা হবে।"

অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ সর্বশেষে বলেন, "এই বছর প্রকাশিত ভারততত্ত্বের বিষয়ে আমি কতগুলি নিবন্ধের কথা বলতে চাই। এ ডি লিট্‌ম্যান 'স্বাধীন ভারতের দার্শনিক চিন্তা' নামে একটি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন। এই ধরণের বই বেদেশী ও সোভিয়েত সাহিত্যে এই প্রথম প্রকাশিত হল।" অধ্যাপক লিট্‌ম্যান বর্তমানে ভারত সফর করছেন।

তিনি আরও বলেন, "এল আই রেইজনার এবং জি কে সিরোকোভ "স্বাধীন ভারতের ধনিকশ্রেণী" নামে যে বইটি লিখেছেন সেইটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বইতে ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্রমবিকাশ ও স্তর-বিন্যাসের ধারা দেখান হয়েছে। ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ও পুঁজির ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণের পটভূমিকায় জাতীয় ধনিক-শ্রেণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তা এই বইটিতে দেখান হয়েছে।"

অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ জানান যে, জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধের দুটি সংকলন এই বছরেই প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া "বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি" নামেও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

অধ্যাপক বালাবুশেভিচ্ বলেন, "বর্তমানে আমাদের পরিষদের কর্মীরা ভারততত্ত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত গবেষণা চালাচ্ছেন তার সম্পূর্ণ তালিকার সামান্য অংশের কথাই আমি বলেছি।"

উপসংহারে তিনি বলেন, "ভারতীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করার ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি। আমাদের ও তাঁদের মধ্যে আলোচনার ফলে আমরা উভয়পক্ষই উপকৃত হব। আমার বর্তমান ভারত সফরের লক্ষ্য হল ইতিহাস-বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করা।"

হিন্দি পাঠ্যপুস্তক ॥

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অ-হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে হিন্দী পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন গঠিত হয়। এর নাম 'পূর্বাঞ্চলীয় হিন্দী পাঠ্য-পুস্তক সংস্থা'। সংস্থার প্রধান অফিস বর্তমানে কলকাতায়। এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর প্রধান শ্রী কে এন লোধা। প্রথমত এই সংস্থা বাংলা, ওড়িশা, আসাম প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় অ-হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে হায়ার সেকেণ্ডারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহজ পাঠ্য-পুস্তক রচনার সাহায্য করবেন। এছাড়াও পাঠ্য-পুস্তক রচনার জন্য অন্যান্য পরিকল্পনা তাঁদের আছে।

বিদেশী সাহিত্য

কোরিয়ার কবিতা ॥

সম্প্রতি কোরিয়ান কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এটি ইংরেজীতে সম্পাদনা এবং অনুবাদ করেছেন পিটার এইচ লি এবং প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্কের 'জন ডে কোম্পানী'। এই সংকলনটিতে মোটামুটিভাবে কোরিয়ার কাব্য-সাহিত্যের সামগ্রিক দিকটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে সংকলিত হয়েছে প্রায় দুই হাজার বছরের কোরিয়ার কবিতা। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। শিলা-সাম্রাজ্যেই কোরিয়ান কবিতার প্রথম উন্মেষ হয়েছে বলা যেতে পারে। এর পরে অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে কোরিয়ান কবিতায় নতুন ধারা প্রবাহিত হয়।

বিংশ শতকই হচ্ছে কোরিয়ান কবিতার আধুনিক কাব্য-ধারার যুগ। অন্যান্য সাহিত্যের মতই এই সময়ে কোরিয়ান সাহিত্যের ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া অধিকার করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানের অধিকারে থাকে। এই সময়ের কোরিয়ান কবিতায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং পরা-ধীনতার বেদনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এর-পর কোরিয়া বিভক্ত হয়ে যায়। নতুন কোরিয়ান কবিদের কণ্ঠে সেই বেদনাও বিধৃত। বাংলাদেশের মতই কোরিয়ার কবি-দের রচনাতেও অনেকটা দেশ-বিভাগের যন্ত্রণা স্পষ্ট। সিওল থেকে কোরিয়ান কবিতা পরিষদ 'কোরিয়ান কবিতা' নামে অপর একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেছে। এই কাব্য-সংকলনটি প্রধানত তরুণ কবি-দের।

ইংরেজিতে ইসলামী সাহিত্য ॥

আরবীয় পণ্ডিতরা আরবী ভাষায় অনুবাদের ফলে গ্রীক ও রোমক সাহিত্য রক্ষা পেয়েছিল। রেনেশাঁসের পরবর্তীকালে প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা সেগুলোকে আবার নতুনভাবে উদ্ধার করেন। অথচ আশ্চর্য এই যে, আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলের বাইরে ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। ডঃ জেমান ক্রিৎজেক এই সাহিত্যকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এর ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে ইসলামী সাহিত্যের যোগাযোগ আরও নিবিড় হবে বলে আশা করা যায়।

ইন্দোনেশিয়ার কবিতা ॥

সম্প্রতি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কবিতার কয়েকটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক শহরের এশীয় সোসাইটির উদ্যোগে বার্টন রাফেলের সম্পা-দনায় প্রকাশিত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার কবিতা। এতে ইন্দোনেশিয়ার ষোলজন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিদের আবির্ভাব-কাল মোটামুটিভাবে বর্তমান শতকের চতুর্থ দশক থেকে বর্তমান দশক পর্যন্ত।

বস্তুতপক্ষে ষোলজন কবির অনুদিত কবিতা এতে স্থান পেলেও, পাঁচজন কবির কবিতাই সংকলন-গ্রন্থটির অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। এঁরা হলেন আমীর হামজা, চৈরিস আনোয়ার, রৈভাই অপিন, সিটর সিটুমরাও এবং রেণ্ড্রা। হামজা মালয়ালম ভাষায় কবিতা রচনা করেন এবং তাঁর কবিতা প্রধানত পার্শী কবিতা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি দেশে ও বিদেশে কবিখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তিনি ইন্দোনেশীয় সাহিত্যের অন্যতম প্রধান এবং এই সাহিত্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। তাঁর একক গ্রন্থেরও একটি ইংরেজি অনুবাদ নিউইয়র্কের 'নিউ ডাইরেকশান প্রকাশন সংস্থা' প্রকাশ করেছে। আধুনিক ইউ-রোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ খুবই নিবিড়। রৈভাই অপিনের কবিতাও ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত। বিশেষত তাঁর কাব্যে ছন্দ এবং ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠককে মুগ্ধ করে। রেণ্ড্রার জন্ম হয়েছে ১৯৩৫ সালে। স্বাধীনতার স্বাদ সে জীবনে লাভ করেছে। তাই তাঁর কবিতায় অধ্যাত্মবোধ এবং প্রেম সর্বদা অনুরণিত।

সাহিত্যিকের ধর্ম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এই জগতের আসরে যখন গাওনার পালা শেষ করে ছুটি নেবার সময় হয়েছে, তখনই আপনারা এই সর্বভারতীয় সম্মেলনটির বৃহৎ আসরে আমাকে ডাক দিয়েছেন এবং এখানে মূল সভাপতির আসনে বরণ করে যে সম্মান দিলেন, তা সেকালের ভাষায় বলতে গেলে, বলব, এ আমার কাছে বিদায়ী শিরোপা হয়ে রইল। নাগপুর ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু পতন-অভ্যুদয়ে চিহ্নিত ক্ষেত্র। পুরাকালেও বিদর্ভের পরিচয় ভারত-মহিমাময়ী পঞ্চ-সতীর অন্যতমা দময়ন্তীর জন্মভূমি। দেবী সাবিত্রীর সাধনভূমি মাল্যবান ও পম্পা হ্রদ নাগপুরের অনতিদূরে। আমার প্রণতি রাখলাম সেখানে। এইবার নমস্কার জানাচ্ছি সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে এবং সমাগত অন্য ভাষাভাষী সাহিত্যিকবৃন্দকে। এই সম্মানিত মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আমার শেষ উপলব্ধির কয়েকটা কথা বলে যাবার সুযোগ পেলাম। এর আগে আরও দুবার ১৯৪৪-এ কানপুরে এবং ১৯৪৭-এ বোম্বাইয়ে এই সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি হিসেবে সেকালের সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে আমার উপলব্ধির কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই দুবারই আমার সঙ্গে ছিলেন আমার অন্যতম প্রিয় অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাংলা সাহিত্যের অমৃত সাধক, অমর সাহিত্যিক স্বর্গীয় বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরও একবার দাঁড়িয়ে-ছিলাম ১৯৪৭ সালেরই এক বিশেষ অধি-বেশনে—কলকাতায়। এ অধিবেশনে আমার উপর ভার ছিল সম্মেলন উদ্বোধনের। কলকাতায় এবং বোম্বাই অধিবেশনে আমার যা বক্তব্য ছিল, তা মিথ্যা এবং অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে বলে আজ আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি, এবং অন্তরের সঙ্গে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান সকলের ঈশ্বরকে প্রণাম জানাচ্ছি। দেশ তখন ভাগ হচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ কলহের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সরকারের শেষ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা নিষ্ঠুর নির্মম হাতে বাংলা দেশের মাতৃকামন্ত্রী অঙ্গের উপর শেষ টান টেনে চলেছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। মানুষের নাড়ীবন্ধনে টান পড়ছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে বন্ধন। সাত পুরুষের ভিটে, জমি-জেরাত, বৃত্তি ফেলে মুসলমান বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে চলেছে পাকিস্তান। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে হিন্দুরা চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে। সে ক্রন্দন, সে আপসোসের আজও শেষ হয় নি। মধ্যে-মধ্যে এ ক্রন্দন আজও সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন আমি আশঙ্কা করে এক রকম বিলাপই করেছিলাম যে, আমাদের বাংলা ভাষাও আজ দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। রামমোহন রায় থেকে—তাই বা কেন—আরও অতীত কাল, সেই দ্বিজ চণ্ডীদাস ও মঙ্গলকাব্যের কবি-দের কাল থেকে যে বাংলা ভাষা এ দেশের মাটি ও মানুষের সহজ উদার লালনে ও প্রেমে পুষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা এবং তৎপরবর্তীদের সেবায় যে অপরূপ শ্রীতে
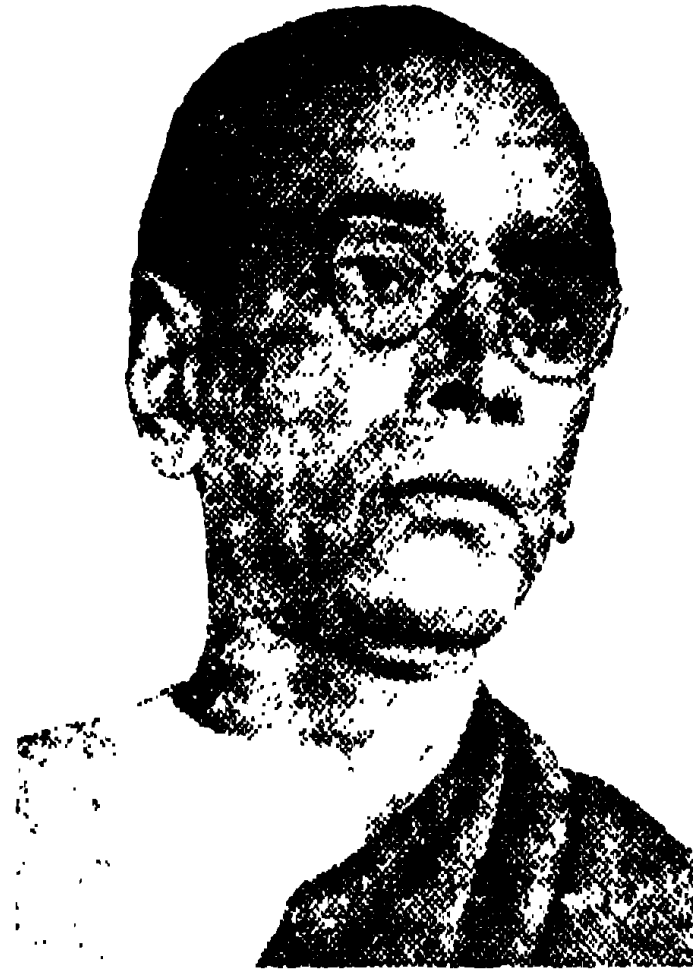
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোহারিণী দেবীর মত রূপ গ্রহণ করে-ছিলেন—সে রূপ, সে শ্রী সম্ভবত আর পাকিস্তানের ভাষায় থাকবে না। আশঙ্কা করেছিলাম, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা রাজনৈতিক প্রেরণায় সচেতন চেষ্টার ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করবে—যাকে একালের বাংলা ভাষা বলে আর চেনা যাবে না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ পশ্চিমবঙ্গনিবাসী এক বাঙালী ভাইয়ের সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানিয়ে বলছি—"আপনারা বাংলার মাটির বাঙালীর ভাষায় সম্মান রক্ষা করেছেন, বৃদ্ধি করেছেন, আপনারা ভাষা-জননীর সেবায়, বক্ষরক্তের যে অঞ্জলি তাঁর চরণে ঢেলে দিয়েছেন তা ইতিহাসে এক মহত্তম দৃষ্টান্ত ও কীর্তিরূপে অম্লান ও উজ্জ্বল হয়ে রইল।" তাঁদের আমি এই মঞ্চের উপর থেকে ভাইয়ের শ্রদ্ধা, ভাইয়ের প্রেম নিবেদন করছি।

এইটুকু নিবেদন করার পরই আমাকে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

কারণ সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস শিশু মহিলা প্রভৃতি শাখায় প্রতিটি বিষয় নিয়েই তো বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এইসব বিভাগে যাঁরা এ বৎসর সভাপতি তাঁরা বয়সে আমাপেক্ষা নবীন হলেও বাংলাদেশে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত বরেণ্য ব্যক্তি, জ্ঞানে, যোগ্যতায় আমাপেক্ষা যোগ্য-তরই হবেন। ঐ সকল শাখার সভাপতিদের মতামতের গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য কি হবে এই চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই চিন্তায় চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে দেশের বর্তমানের দিকে তাকিয়ে আছি। তার রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সাহিত্যধর্ম শিল্পধর্ম সামগ্রিকভাবে জীবন-ধর্মের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে সেই সম্পর্কেই কিছু নিবেদন করব ভেবেছিলাম। কিন্তু কি নিবেদন করব? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছি—এ কি সত্য? এবং সত্যই যদি হয় তবে প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন হল? সহজ উত্তর আছে কালধর্ম।

কাল কলি। কলিকালের ধর্ম।

কলির নামটি মনে হতেই মনে হচ্ছে, এই তো পেয়েছি বর্তমানের স্বরূপ। মনে পড়ে যাচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভিক উপা-খ্যানটি। রাজা পরীক্ষিৎ তখন ভারতসম্রাট। একদা তিনি মৃগয়ায় বের হয়ে পথে এক আশ্চর্য নীতিবিগর্হিত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বিচিত্র বেশধারী, মাথায় মুকুট, অঙ্গে রাজবেশ কিন্তু অবয়বে আকারে এক শূদ্র একটা দণ্ড দিয়ে একটি গোমিথুনের মধ্যে বৃষটিকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করছে। বৃষভটির তিনটি পা ভেঙে গেছে, বাকী আছে মাত্র একটি পা, সেই পায়ে ভর দিয়ে সেই শুভ্রবর্ণ বৃষটি কোন রকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং এই রাজবেশধারী শূদ্র সেই পা'টির উপরেই দণ্ড দিয়ে আঘাত করছে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, ওই শেষ পাখানিকে ভেঙে দিয়ে ওই বৃষটিকে বধ করবে সে। গোমিথুনের গাভীটিও জীর্ণা-শীর্ণা। সে সজল নেত্রে নির্যাতিত বৃষটির দিকে তাকিয়ে আছে।

বৃত্তান্তটি ভারতবর্ষের মানুষের অজ্ঞাত নয়।

ভাগবত-মহাভারতের পরবর্তী যে কাল ইতিহাসের কাল, সে কালকে কলি নামে নির্ধারিত করে শাস্ত্রকারগণ সেই কালের যে লক্ষণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ব্যাসদেব সেই বৃত্তান্তটিকেই রূপকের আকারে লিখে-ছিলেন। পুরাণের কালকে আমি বলব কল্পনার কাল, সেই কাল ও বাস্তব কালের মধ্যে যে প্রভেদ তাই কালে-কালে মানুষকে পীড়া দেয়। ব্যাসদেবও সে পীড়ন থেকে রক্ষা পান নি।

তাঁর রচিত রূপকের নায়ক মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করে জানলেন, ওই রাজবেশ-

ধারী শূদ্র যুগাধিপতি কলি এবং গোমিথুনের বৃষভটি হলেন ধর্ম এবং গাভীটি হলেন পৃথিবী।

পরীক্ষিৎ কলিকে হত্যা করতে উদ্যত হলে কলি তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল। তাঁর শরণ নিয়েছিল। রাজধর্মে ও ক্ষাত্রধর্মে নিষ্ঠাবান পরীক্ষিৎ, শরণার্থীকে হত্যা না করে সাময়িকভাবে স্থান দিয়েছিলেন কয়েকটি অনাচারের ক্ষেত্রে। শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপানের প্রমত্ততায়, বারনারীর প্রমোদালয়ে ব্যভিচারের কদর্যতায়, নরহত্যার কালে মানুষের হৃদয়ে নৃশংসতায় এবং জুয়া খেলার আসরে তঞ্চকতায় কলির আশ্রয় নির্ণয় করে দিলেন। ধর্মরূপী বৃষের চারটি পায়ের একটি হল তপ, দ্বিতীয়টি শুচিতা, তৃতীয়টি দয়া, চতুর্থটি সত্য। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সঙ্গে প্রথম তিনটি পদ সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয়ে বিকল হয়ে গেছে। চতুর্থটি প্রায় অর্ধভগ্ন। অর্থাৎ ধর্ম আজ বা কলিকালে মাত্র অর্ধসত্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। নতুবা কলিকালটাই নাকি পুরোপুরি অধর্মের কাল।

অর্থাৎ মহর্ষি বেদব্যাস ভবিষ্যৎকালের মানুষদের মানসিক গতি-প্রকৃতির বাস্তবাভিমুখিনতাকে প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, অতীত কাল থেকে তাঁর কালের বর্তমান পর্যন্ত বা সত্য ত্রেতা দ্বাপর পর্যন্ত রাষ্ট্রে সমাজে যে বিধি বিধান আচার আচরণ সৎ শুদ্ধ ও সুনীতিসম্মত বলে ধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছিল, ভাবীকালের মানুষ বা কলিকালের মানুষ কালমাহাত্ম্যে বা কলিমাহাত্ম্যে তাকে স্বীকার করবে না, করতে পারবে না, বাস্তবতার সংঘাতে তাকে বর্জন করতে বাধ্য হবে, ত্যাগের পরিবর্তে গ্রহণ করবে ভোগকে। শূদ্র হবে যুগাধিপতি। তারপর আসবে বিধর্মী বা ভিন্নধর্মী। সুতরাং ধর্মের প্রতীক ওই শ্বেতবর্ণ বৃষভটির মতই মুখ থুবড়ে পড়বে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র। যে-সব গুণে মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে চিহ্নিত হয়েছিল, তা একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের মত পথপার্শ্বে পরিত্যক্ত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

শুধু বেদব্যাসের কথাই নয়। এ কালে বিগত শতবৎসর ধরে আমরা এক ক্রান্তিকালের কথা শুনে আসছি। নতুন কাল আসছে। নতুন কাল এসে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়েছে। বিগত কালের সকল কিছু তার সামনে খুলে খসে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।

চোখেও আজ তাই দেখছি।

রাষ্ট্র ও সমাজ, সাহিত্য ও শিল্প, ব্যক্তি ও গৃহের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, সব যেন অক্ষরে অক্ষরে, বর্ণে বর্ণে, সত্য হয়ে উঠেছে। সে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে। বাংলা দেশে বাঙালীর জীবনে ও সমাজে সে-সত্য যেন উগ্রতম রূপে প্রকটিত হয়েছে। বিগত সুদীর্ঘ কালের শুচিতা শুদ্ধতা সহিষ্ণুতা উদারতা প্রভৃতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশাসনগুলি আমাদের কাছে পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হয়েছে।

একটা প্রচণ্ড কোলাহল এবং কলহ জীবনকে দিবারাত্রি অসহ্য জর্জরতায় জর্জরিত করে রেখেছে; মানুষের উদরের ক্ষুধা, জীবনের সকল প্রয়োজন আজ উপেক্ষিত; সুতরাং একটি দুর্নিবার অস্থিরতায় মানুষের চিত্ত অস্থির এবং অধীর।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বিরোধী দলের দলগত স্বার্থের কলহে উত্তপ্ত। সাধারণ মানুষেরা উভয় পক্ষের কাছেই গৌণ হিসাবে উপেক্ষিত। রাজার কালে রাজ্যে প্রজার স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়া ছিল মহাপাপ—আজ মানুষের রাজ্যে মানুষগুলির স্বার্থ মানুষের প্রতিনিধিদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েও পাপ বা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ভোটাধিক্যে পাপকে পুণ্য করা যায়। ন্যায়কেও অন্যায় প্রতিপন্ন করা যায়।

সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্বই আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। যেটুকু আছে সেটুকু পুরাতন কালের আশ্চর্য এক সৌধের ধ্বংসস্তূপ মাত্র। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর যে কয়খানা ছিটে বেড়া খড়ের চালের

> নাগপুরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪২তম অধিবেশনে মূল সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণ

সাময়িক বসতি আমরা গড়ে তুলেছি, তাকে শরণার্থীর আশ্রয়-শিবির ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। ঝড়ে উড়ছে, বন্যায় ভাসছে, কখনও ইটের উনোনের খড়কুটোর আগুনে পুড়ছে, কখনও আমরা নিজেরাই নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি। তবে একথা ঠিক যে, প্রাচীন সমাজকে ভাঙতেই আমরা চেয়েছিলাম এবং প্রাচীন সমাজ-সৌধে অনেক কিছু হেজে মজে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধু ভাঙাই হ'ল—সে আর গড়া হ'ল না। রাষ্ট্র এসে তার সকল অধিকার নিজে আত্মসাৎ করে সাধারণ মানুষ যারা দেশের আসল অধিকারী তাদের নিঃসহায় নিঃসম্বল করে দিলে।

সমাজের পর মানুষে, সমষ্টির পর ব্যষ্টি ব্যক্তি। ব্যক্তির আশ্রয় গৃহ, সেই গৃহে পরিবার নিয়ে ব্যক্তির বিকাশ। সেই গৃহও আজ বিলুপ্তির মুখে। গৃহ ইতিমধ্যেই পক্ষীনীড় বা বাসায় পরিণত হয়েছে। পারিবারিক বন্ধন আজ জীর্ণ থেকে অতিজীর্ণ, ছিন্নপ্রায় বললেই সত্য বলা হবে, যেটুকু আছে তা সামান্যতম টানেই দু টুকরো হয়ে যাবে।

এবার হৃদয়, অন্তর-লোক।

মানুষ সেখানেও নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বান্ত। একান্তভাবে আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির জন্য হয় ভিক্ষুকের মত নয় চোর বা ডাকাতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষে মানুষে দেওয়া-নেওয়ার কথা থাক; এ-সৃষ্টির যে আদিম দেওয়া-নেওয়া নর-নারীর মধ্যে তা দেহবাদের সীমানা পার হয়ে এক আশ্চর্য রাজ্যের দ্বার খুলে দিয়েছিল মানুষের সম্মুখে। নর-নারীর দেহ-দেওয়া-নেওয়া মন-দেওয়া-নেওয়ায় পরিণতি লাভ করে মানুষ মানবীয় জীবনে ফুটিয়েছিল এক চিরঅম্লান অমলকমল; আজ তা আকাশকুসুম নামক অলীক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র বিন্দুবিহীন আকাশের মত মানুষের মন আজ নীরন্ধ্র অন্ধকার; মানুষের জ্বালা বাতি বা মাটির প্রদীপের দেওয়ালী একান্তভাবে আর্থিক সামর্থ্য-নির্ভর। এবং ঈশ্বর পুণ্য ইত্যাদি থাক বা না থাক ভালবাসাহীন চুক্তিসর্বস্ব নর-নারীর মিলনকে নিষ্প্রাণ বলতেই হবে। আজকের জীবনের পথ যেন সেই মুখেই ছুটেছে। কালের সঙ্গে সঙ্গে একে একে যেন হৃদয়-আকাশের নক্ষত্র বিন্দুগুলি নিভে যাচ্ছে।

হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে আর একটি আলো। প্রেমের আলোর সঙ্গে জ্ঞানের আলো। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সামাজিক ক্ষেত্র পারিবারিক ক্ষেত্র হৃদয় ক্ষেত্র তারপর শিক্ষার ক্ষেত্র। আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুকরণ এবং দীক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। আজকের শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন মুখ্য নয়, মুখ্য জীবিকার্জনের যোগ্যতা। আজকের শিক্ষায় বৃহস্পতি সর্বাধ্যক্ষ নন, আজকের শিক্ষায় শুক্রাচার্যের সর্বাধিনায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য বড়, তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানসিদ্ধি অপেক্ষা বস্তুবিদ্যা ও বাস্তবতায় পারঙ্গমতার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদীসম্মতরূপে স্বীকৃত।

আমরা, শুধু বাঙালীরাই নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষেরই আজ এই অবস্থা। আর্থিক সম্পদের সচ্ছলতার মধ্যেই থাক বা অসচ্ছলতার মধ্যেই থাক, সব মানুষেই আজ সমান অস্থির সমান অতৃপ্ত সমান অধীর সমান অশান্ত।

কেন এমন হল? আজ দিশাহারা মানুষ ভেবে পাচ্ছে না কেন এমন হল? শুধু তাই বা কেন আমরা বুঝতে পারছি না কিসে আমাদের তৃপ্তি? কি আমরা চাই? কেন এমন হল? ব্যাসদেবের ওই কথাই কি ধ্রুবসত্য?

প্রশ্ন জাগছে, অসংখ্য প্রশ্ন। কলিযুগ কি ভ্রষ্টতার যুগ? কলিযুগ কি খর্বতার যুগ? কলিযুগ কি অজ্ঞানতার যুগ? কলিযুগ কি দুর্বলতার যুগ? কলিযুগ কি নৈবীর্যের যুগ? সংকীর্ণতার যুগ? অশান্তির যুগ? কলিযুগে কি দিন ক্রমশঃ ছোট হয়ে এসে রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে? কলিযুগ কি ভোগসর্বস্বতার যুগ?

সেকালের রীতিনীতি ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য সত্যাসত্যের বিচারে ব্যাসদেবের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে আমরা সেকাল থেকে অনেক পৃথক। সেকালের সকল বিচারকেই আমরা আমাদের

কালের দৃষ্টিতে বিচার করে নতুন মানের সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তার জন্য এ যুগের মানুষ ভ্রষ্ট নয়, এ যুগ ভ্রষ্টতার যুগ নয়, খর্বতার যুগ নয়, সংকীর্ণতা বা দুর্বলতা বা নৈবীর্যের যুগ নয়—এ যুগ সেকালের বা সকল কালের যুগের মতই স্বধর্মে অধিষ্ঠিত, সে স্বধর্মের যে গৌরব সে গৌরব কোন কালের গৌরব অপেক্ষা খর্ব নয়।

এ যুগ রাজার যুগ নয়, মহারাজার যুগ নয়, সম্রাটের যুগ নয়। এ যুগ ব্রাহ্মণের যুগ নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, বৈশ্যের নয়, এ যুগ সর্বজনের সার্বজনীনতার যুগ। এ যুগ আচারসর্বস্ব ধর্মের গোঁড়ামির বা ধর্মধ্বজীর যুগ নয়, এ যুগ সকল মানুষের মানবিকতার যুগ; এ যুগ অধর্মের যুগ নয়, এ যুগ পর পর সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ধর্মের তিনটি স্তরের উপর নির্মিত চতুর্থ স্তর নিয়ে সম্পূর্ণ এক নব-ধর্মের যুগ। সে যুগের বীর্য এবং বলের সঙ্গে এ যুগের বীর্য বলের তুলনা করব না। এ যুগ অজ্ঞানতার যুগও নয়। এ যুগের জ্ঞান তার প্রদীপ্ত আলোকরশ্মিকে হৃদয়ের গভীরে প্রেরণ করেছে, মৃত্তিকার গভীরতম হৃদয়দেশকে গিয়ে স্পর্শ করেছে, সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে আলোকিত করেছে, মহাকাশে গ্রহগ্রহান্তর পর্যন্ত জ্ঞানরশ্মির ইশারায় বার্তা আদান-প্রদান করেছে। সর্বশেষে এ যুগ অশান্তির যুগও নয়। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে এ যুগ অশান্ত, এ যুগ ক্ষুব্ধ, এ যুগ উত্তপ্ত। এবং এ যুগে ভোগও মানুষ অনেক করেছে কিন্তু ভোগকে সে বর্জন করেনি। ভোগস্পৃহার মাত্রা কিছুটা ভারী তাও স্বীকার করব। এ যুগে নারী মুক্তি পেয়েছে, শূদ্র মুক্তি পেয়েছে, প্রজা মুক্তি পেয়েছে, পরাধীন মানুষেরা স্বাধীনতা পেয়েছে, পাচ্ছে; পেতে চলেছে; তবু এ যুগ অশান্ত অতৃপ্ত উত্তপ্ত ক্ষুব্ধ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কেন? প্রশ্ন বারবার মনে আসছে—কেন?

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তার উত্তর দেবে। মানুষের সভ্যতার মধ্যে আজ একটা অস্থির অধীর পরিবর্তনশীলতা দ্রুততম বেগে ঘূর্ণমাণ। কোন একটা বিশ্বাসে বা তত্ত্বে বা ধর্মে সে স্থিতি পাচ্ছে না। ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানুষের মন বিশ্বাসে স্থিত হতে পারছে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুত থেকে দ্রুততর, দ্রুততম গতিতে সে ধাবমান। দেড়শো বছর আগে জড়বিজ্ঞানের বলে শিল্পবিপ্লবের কাল থেকে মানুষের গতিবেগের হার নির্ণয় করে দেখলে দেখা যাবে এই বিপ্লবের আগে মানুষের গতিবেগ পায়ে হেঁটে গরুর গাড়িতে ঘোড়ায় হাতীতে ঘণ্টায় আট দশ মাইলের বেশী ছিল না। স্টীম-ইঞ্জিনের সঙ্গে সেই গতিবেগ কুড়িতে উঠে ক্রমে ক্রমে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে উঠেছিল। তারপর মোটরের যুগ। তারপর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গতিবেগ একশো মাইলে তুলে মানুষ মাটি ছেড়ে আকাশে উঠেছে। সেই গতিবেগ আজ মরুভূমির দ্বিপ্রহরে তাপমান যন্ত্রে পারদের দাগের মত বেড়েই চলেছে। আজ সে ঘণ্টায় পাঁচশো মাইলে আছে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেড় হাজার মাইলে উঠবে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই মহাকাশে সে রকেটের বেগে ছুটছে।

গতির সঙ্গে তার ঘরের দেওয়াল ভেঙে বিস্তৃত হচ্ছে, পৃথিবীর বিপুল পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে ঘরের আঙিনার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে দাওয়ার উপর পাত্তা পেড়ে বসছে। গৃহস্থের জন্যে নিয়ে আসছে উত্তর মেরুতে দক্ষিণ মেরুর জীবন-স্পন্দন, দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুর বক্ষের উত্তাপ। কিন্তু মানুষের মন স্থির স্থিত নয়। হয়তো বা প্রস্তুতও নয়।

চিত্ত তার অস্থির অধীর, কোন বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। কেমন করে বিশ্বাসী হবে! তার ঘর ভাঙছে, তার বন্ধন ছিঁড়ছে।

যেন একটা ভূমিকম্পে অতীত কালের সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। একালে সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপরের আচার বিচার সংস্কার বিশ্বাস, সেকালের ঘর, সেকালের বিধিবিধান, সেই মন্ত্রের তপস্যা, সেই শ্রেয়বোধের বোধ কেমন করে থাকবে বা থাকতে পারে? এ পরিবর্তন চিরকাল আছে, এই পরিবর্তনের মহাকাব্যই তো

মহর্ষি বেদব্যাস রচনা করেছেন তাঁর মহাভারতের মধ্যে। তাঁর ভবিষ্যৎ নির্দেশও অভ্রান্ত। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বেদ বিধি বিধানে আমূলে পরিবর্তন হবে। তবে এই পরিবর্তনের বেদনায় তিনি দীর্ঘনিশ্বাস-কম্পিত কণ্ঠে আক্ষেপ করেছেন, মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে বলেছেন, সুবর্ণমূল্যময় এবং সুবর্ণতুল্য দিবসগুলি চলে গেল—আর ফিরে আসবে না। তার সঙ্গে এ কথাও সত্য যে কোন একটি ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে কোন একটি সভ্যতার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতার সংঘাত ও সংস্পর্শ বাঁচিয়ে আপন গতিতে আপন পথে বিবর্তিত হয়ে রূপান্তর লাভ করা আজ অসম্ভব। তাকে পৃথিবীর সব জাতির সব সভ্যতার সংস্পর্শে আসতেই হবে। সংমিশ্রণ হবেই হবে।

আজ সমগ্র বিশ্বের সকল সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সভ্যতার আচার বিচারকে সমন্বিত করে একটি নূতন আচারে বিচারে আসতে হবে। আসতে চেষ্টাও করছে। আমাদের রাষ্ট্রে সমাজে গৃহে ব্যক্তিজীবনে নূতন রূপ নেবার যে চেষ্টা চলছে, তার মধ্যে একটি অসহনীয় যন্ত্রণা আছে, একটি সীমাহীন অতলান্ত উদ্বেগ আছে, একটি প্রাণান্তকর আকুতি আছে। নিদারুণ এক ঘূর্ণাবর্তে-পড়া মানুষের মত শ্বাসরোধী কষ্টের মধ্যে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি।

এ ঘূর্ণাবর্ত পার না হতে পারলে কালসমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মানুষের সমাধি অনিবার্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতিকায় জীবদের একটি কাল ছিল। সেই অতিকায় মহাবলশালী জীবেরা মস্তিষ্কের স্থূলতার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিগত হয়েছে।

প্রকৃতি বড় নিষ্ঠুরা। সে ক্ষমাহীনা। সে শুধু বাইরে থেকেই মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে না, সে মানুষের অন্তরের মধ্যে আদিম জীবপ্রকৃতির স্বার্থপর হিংস্রতা নিয়ে ভিতর থেকেই যুদ্ধ করছে।

তাকে পরাজিত করতে না পারলে সে পরাজিত করেই ক্ষান্ত থাকে না, সে ধ্বংস করে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে দেবী কৌষিকী-রূপিণী মহাশক্তির একটি অপূর্ব উক্তি আছে—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে
দর্পংব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে
ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।"

মানুষ তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েই মানুষের ইতিহাস রচনা করেছে। মানুষের সংগ্রাম মানুষে মানুষে নয়—মানুষে প্রকৃতিতে। পৃথিবীর মাটিতে আকাশে জলে বাতাসে এবং পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী জীবজগৎ যে নিয়মে চলে সে হল প্রকৃতির বিধান বা 'নেচারস্ ল'। মানুষও জীব। কিন্তু মানুষ মানুষ এই কারণে যে সে এই 'নেচারস ল'কে অমান্য করে তার শাস্তি বা প্রতিক্রিয়াকে বুদ্ধিবলে প্রতিহত করে নিজের বিধান—'ম্যানস ল'কে প্রবর্তিত করেছে।

তার সেই সংগ্রামের পথেই এতদূর সে এগিয়ে এসেছে। এতদূরে আসার পথে ক্রমান্বয়ে তার আচার আচরণ উপলব্ধির পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিবর্তন না হলে সে বাঁচত না, বিলুপ্ত হত।

মূল কথাটি এইখানেই। মৃত্যুকে ব্যাহত করে বংশধারার মধ্য দিয়ে মানবজাতির অমৃতময় জীবন লাভ করে চলেছে মানুষ। কিন্তু সে সত্যের পথে।

ব্যাসদেবের মহাভারতেই আছে দু-দুবার কৌরব বংশ যখন বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়াল তখন এই বংশধারাকে সম্মুখে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করবার জন্য ক্ষেত্রজপুত্রের ব্যবস্থা করা হল। ব্যাসদেব নিজেই তাতে অংশ নিয়েছেন। এ আপদ্ধর্ম। ব্যাসদেবের নিজের জন্ম কুমারীর গর্ভে। সে আপদ্ধর্ম নয়; সে জীবনের প্রয়োজনের ধর্ম। কিন্তু সে অশ্লীল নয় বা সে পাপও নয়—সে অত্যন্ত সহজ, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সেখানে লুকোচুরির বা গোপনতার প্রয়াসের মধ্যে যে অশ্লীলতা উদ্ভব হয় তা অনুপস্থিত।

অর্থাৎ বাঁচার দাবিতে, বাঁচার ধর্মে মানুষ যাই করুক তা যখন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তার উপর গোপন করার কৃষ্ণচ্ছায়া পড়ে তাকে কালো করে না তখন সে পাপ নয়, অশ্লীল নয়, অধর্ম নয়। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণের বিধবা এক স্বৈরিণীর অনাথা কন্যার মৃত্যুকালে তার মা সেজে বসে, স্বর্গ থাকলে, অনন্ত স্বর্গের অধিকারিণী হলেন। মানুষের ধর্মই হল বাঁচা, কিন্তু বাঁচে সে তপস্যার জন্য। সে তপস্যা তার সকল কালে বিভিন্ন আচারের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অসত্যতা থেকে সত্যতায় বা অসৎ থেকে সত্যে যাবার জন্য, অন্ধকার থেকে আলোয় যাবার জন্য। এ নইলে তার বাঁচাই ব্যর্থ হয়, নিরানন্দ সে বাঁচা। মানুষ দেহে বাঁচে না, বাঁচে মনে।

যোগবাশিষ্ঠে আছে ঃ

"তরবো হি জীবন্তি, জীবন্তি
মৃগপক্ষিনঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি
জীবতি।"

উদ্ভিদ থেকে পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে। কিন্তু প্রকৃতরূপে জীবিত কে?—যে মনের দ্বারা জীবিত। যে মনের দ্বারা জীবিত—সে মানুষ। মনের দ্বারা বাঁচাই মানুষের বাঁচা।

সাধারণ জান্তব বাঁচা বা পশুপক্ষীর যে বাঁচা—সে বাঁচা শুধু দেহে বাঁচা। দেহ বাঁচতে চায় দেহের তাগিদে। মানুষ বাঁচে মনে—চিত্তলোকে সে অহরহ সত্যতার অভিমুখে সত্যের মুখে চলমান। সে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে। সত্যের সত্যতার সংজ্ঞা নিয়ে যুগে যুগে বিরোধ হয়, পরিবর্তন হয়, কিন্তু ওই মূল সূত্র অর্থাৎ তার চিত্তের মনের সত্যঅভিমুখিনতার কোন পরিবর্তন হয় না।

মানুষের জীবনসত্য মৃত্যুকে স্বীকার করে না। মৃত্যু থেকে সে অমৃতে যেতে চায়।

জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে একটি বিরামহীন অহরহ সংগ্রাম প্রাণসৃষ্টির সেই আদি দিন থেকে চলে আসছে। এবং জীবন অহরহ ঘোষণা করছে—মৃত্যু থেকে আমি অমৃতত্বে যাব। এই অমৃতত্বের পথ সত্যের পথ। তার ক্ষেত্র চির-আলোকিত, জ্যোতির দ্বারা বিভাসিত এবং এই অমৃতত্ব অহরহ মৃত্যুমুখরতার যে কঠোর বাস্তব চরম সত্য তার উপরেও আরও সত্য—পরম সত্য মানুষের জীবনে, তার সকল কর্মের মধ্যে তার বাঁচার সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই বাণী—অসতো মা সদ্গময়—যন্ত্রসংগীতের মত কর্মের কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে ধ্বনিত।

এই ধ্বনি বা এই অভিপ্রায় যেখানে আছে—যে জ্ঞানে আছে, যে বিজ্ঞানে আছে

যে শিল্পে আছে, যে সঙ্গীতে যে সাহিত্যে যে সংগ্রামে আছে তাতেই আছে অমৃতের স্পর্শ; তাই সত্য, তাই শুদ্ধ, তাই সত্যকার আনন্দে স্থিত; তাতেই সত্যকারের মঙ্গল; তার নির্দেশিত পথই প্রগতির পথ, মঙ্গলের পথ; তাই অনন্ত অপার কৌতূহলের অজ্ঞেয়ের মুখে প্রসারিত ধাবিত। তাই মানব-সমষ্টিকে একদিন চরমতম সার্থকতায় পৌঁছে দেবে। এ যে মনুষ্যকুল বা জাতির মধ্যে আছে সেই জাতিরই ভবিষ্যৎ আছে—সেই অমৃতের অধিকারী হয়েছে, যে জাতি একে পরিত্যাগ করে বা যারা পারেনি, তারা থাকবে না। মহাভারতের পৌরব বংশরক্ষার মধ্যে যে বাঁচার তাগিদ ছিল তার মধ্যে তার সঙ্গে এই ধ্বনি এই ঘোষণা ছিল বলেই এই পৌরব বংশের কৌরব পান্ডবেরা হয়েছেন মহাভারতের নায়কবৃন্দ; কলুষ এখানে এতটুকু মালিন্য সঞ্চার করতে পারে নি।

সাহিত্যের বিচার এবং জাতির বিচার এইখানেই। কান পেতে শোনো, জাতির জীবনকর্মে ওই ধ্বনি বা ঘোষণাটি প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীতের সহচারী যন্ত্রসঙ্গতের মত ধ্বনিত হচ্ছে কি না। সাহিত্যে শিল্পে কি সেই ধ্বনি বেজে চলছে? শোনো, বিচার করে দেখ। অন্যায় বা পাপ বা ব্যভিচারকে বাস্তবতার দাবিতে সাহিত্যে বড় আসন দিয়ে লালসার পণ্যকে কামনার ধন না করে তুলি এইটেই দেখার কথা, বিচার্য বিষয়।

এখন বাঙালী জাতির বর্তমান বিচারে কি পাই আমরা? বাংলার ভূগোলের যত বদল হয়ে থাক, যত ঝলমলানি তার অঙ্গ ঘিরে গড়ে উঠে থাক, তার ইতিহাস—প্রথম রাজনৈতিক ইতিহাস ব্যর্থতায় এবং স্বার্থ-কলঙ্কিত ইতিহাস। এই ধ্বনি কি সেখানে উঠছে? তার ব্যর্থ ও কলঙ্কিত ইতিহাস কি মহাভারতের কর্ণের জীবনসত্যের মত করুণ মহিমায় মহিমান্বিত? না, সে-ইতিহাস কপট দাতের নায়কের উপাখ্যানকে স্মরণ করিয়ে দেয়?

আর সাহিত্য?

সাহিত্যে কি এই নিষ্করুণ জীবনসত্য সার্থক হয়ে উঠেছে? গল্পে উপন্যাসে কাব্যে নাটকে ছায়াছবিতে কি জীবনের মর্মান্তিক লজ্জাকর আচার-আচরণের মধ্যে জীবনের বাঁচার দাবিটা বড় হয়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে কি সেই ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে? অসতো মা সদ্‌গময়—আমি বাঁচতে চাই, শুধু বাঁচা নয়—আমি সৎ হয়ে বাঁচতে চাই, আমি শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচাও।

এ সম্পর্কে আমি নিজের বক্তব্য বলবার আগে একজন মনীষীর বিচারের মন্তব্য নিবেদন করতে চাই। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বাঙ্গালোর অধিবেশনের মূল সভাপতি হিসাবে কলকাতা মহা-বিচারালয়ের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি—এক-কালের সাহিত্যের অধ্যাপক এবং নিজের সারাজীবনে যিনি সাহিত্যরসিক ও নিরপেক্ষ বিচারক, সেই শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন—

"আধুনিক কথাসাহিত্যে বাঙালী অথবা ভারতীয় মনের তেমন কোন বিশিষ্ট ছাপ দেখা যায় না—তার দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শন স্পষ্টতঃই ইংরিজী সাহিত্য থেকে গৃহীত। একজন বিদেশী পর্যবেক্ষক সম্প্রতি বলেছেন যে, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে গেলেও ভারতীয়দের মন থেকে অপসৃত হয়নি, তাদের চিন্তারাজ্যের রাজ-ধানী এখনও লন্ডন, সে-কথাটা বোধহয় একেবারে মিথ্যা নয়।...তার প্রধান অবলম্বন অশান্ত বা আহত প্রেম, অধিকাংশ চরিত্রেরই নারীমৃগয়া অথবা নরমৃগয়া আদি অন্ত। পড়লে মনে হয়, এ যেন এমন কোন দেশের সাহিত্য, যেখানকার স্ত্রী-পুরুষ যৌন কামনায় এবং প্রেম পিপাসায় অতৃপ্ত।"

কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "এরপর কাব্যসাহিত্যের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি যে, কাব্যের আধুনিক অভি-ব্যক্তিটা অত্যন্ত জটিল।" কয়েকজন শক্তিমান লেখকের কথা স্বীকার করে আশা প্রকাশ করেও তিনি বলেছেন, "কয়েকজন শক্তিমান লেখকের পশ্চাৎবর্তী হয়ে এত অধিক সংখ্যক শক্তিহীন লেখকমন্য ব্যক্তি অভূত-পূর্ব কিছু করবার বাসনায় মত্ত হয়ে উঠেছেন।"

একস্থানে তিনি পরিতাপ করে বলেছেন, "এমন যে বাঙালীর পরমপ্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তাঁরও একখানা পূর্ণাঙ্গ জীবনী একজন ইংরেজ এসে প্রচুর অর্থব্যয় এবং প্রভূত শ্রমস্বীকার করে ইংরিজী ভাষায় লিখছেন, আমরা মাতৃভাষায় মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করতে সমর্থ হইনি। কম্যুনিজম নিয়ে যে বাংলাদেশে এত চিন্তার দ্বন্দ্ব ও রাজ-নৈতিক সংঘাত, সেই কম্যুনিজম-এরও ভারতে বিস্তৃতির ইতিহাস লিখেছেন দুজন বিদেশী গবেষক। বিশিষ্ট বাঙালী লেখকদের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে English men of letters-এর মত কোন গ্রন্থ-মালা রচনা আমাদের দিয়ে সম্ভবপর হয়নি।"

শেষের অভিযোগ তাঁর শুধু এই অভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয় না, এই অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সাহিত্য ও সাহিত্যিকও আজ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, না, তারও থেকে বেশী কিছু হয়েছে, রাজনীতি তাকে কবলগত করেছে। না হলে নেতাজীর জীবনী রচনার জন্য দেশের সরকার উদ্যোগী হতেন। এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, তার সমিধ্ সংগ্রহের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনে রচনার সময় পরিত্যক্ত হত না।

কম্যুনিজমের বিস্তৃতির কথা নিয়ে গ্রন্থ রচনা হয়নি ঠিক অনুরূপ কারণে, অর্থাৎ ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ বিরোধ-বিবাদের জন্যই হয়নি যদি বলি, তাহলেও সম্ভবত মিথ্যা বলা হবে না। এ-ইতিহাস প্রকাশিত হোক এ তাঁরা চাননি।

এখন মূল কথায় আসি।

মূল কথা—সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর জীবনের মহিমা গরিমা, তার শ্যামল কোমল মনের সুষমা বেদনা, মুখের হাসি, চোখের জল, তার বীর্য, তার দুর্বলতা, তার দারিদ্র্য, অভাব, তার ভিক্ষাবৃত্তি, কাঙালীপনা, তার রুদ্রমূর্তি, তার বিদ্রোহীরূপ, তার প্রেমের সাধনা, প্রেমের জন্য ত্যাগ, তার কামার্তঁতা, তার ভোগলোলুপতা, তার গ্লানি, তার কলুষ সঠিক অনুপাতে সঠিক আলোছায়ার মধ্যে সঠিক পরিচয়ে পরিস্ফুট হয়েছে কি? এবং তার স্বরূপ যাই হোক না কেন—ওই রূপের সঙ্গে মানুষের মনুষ্যত্ব সাধনার ওই মন্ত্রোচ্চারণটি স্তব্ধ হয়নি তো?

সম্প্রতি রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রে একটি আলোচনার আসরে শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকর—একজন অধ্যাপক এবং কোন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক—নানান প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নটিই তুলেছিলেন। তুলেছিলেন শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাতে সন্তোষজনক উত্তর পাইনি।

বলবার কথা আরও অনেক আছে। তার দু-একটির উল্লেখ করতেই হবে। তার প্রথমটি হল এই যে, আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মহাকরণ এবং দপ্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আজ উনিশ বছর বিগত। আজও আমাদের মা বঙ্গভারতী সরকারী এলাকার দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা। উনিশ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে কর্তৃত্বের আসনে বসে আছেন, যিনি ছিলেন তিনিই। উচ্চতম বিচারালয়েও অবস্থা তাই। সেখানেও তিনি মাত্র নিম্ন আদালতগুলিতে অধিকার পেয়েছেন। রাজবাড়িতে মূল ভাঁড়ারের সর্বেশ্বরী বিদেশিনী রাজকন্যার অধীনে বাড়িঘর ও গরীবগুনোদের সিধে দেবার ছোট ভাণ্ডারটির ভারপ্রাপ্ত মৃত গুরুর বিধবা কন্যার মত অবস্থা তাঁর। তার থেকে অধিক কিছু না।

মহাবিদ্যালয়গুলিতেও একই অবস্থা। সেখানেও ওই বিধবা গুরুকন্যার মত নিরামিষ রন্ধনশালায় হাতা-বেড়ি হাতে তিনি বসে আছেন, তাঁর আওতায় শুধু বাংলা-সাহিত্য অর্থাৎ বাংলা কাব্য, কথা-সাহিত্য, নাটক ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয়নি।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়ো-জনীয়তা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মনীষী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাব উপেক্ষিত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বলে তিনি যে মত দিয়েছেন, তা ইংরেজী পণ্ডিতেরা মানতে প্রস্তুত নন।

এই কারণেই দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য দীনার মত একান্ত-ভাবে লজ্জিতা। তার ভাণ্ডারের দারিদ্র্য

সেখানে সুপ্রকট। সরস্বতীর আরতির জন্য একটু ঘৃত চাইলে লজ্জিতা হয়ে তাঁকে বলতে হয়—আমার ভাণ্ডারে ঘি ফুরিয়েছে, দালদা ছাড়া নেই বাবা। কি করব বল, গরীব গৃহস্থ। তেল আছে, তবে তা ভেজাল, ওতে কি আরতির প্রদীপ জ্বালা হবে? থাক অভিযোগ, অভাব অনেক। কিন্তু সে-তালিকার ছেদ টানব এইখানে।

এই অভাব যোগের সকল সত্যকে বাস্তব এবং হিসাবের অংক বলে স্বীকার করে নিয়েও বলব, এই বাস্তব সত্য এবং হিসাবের অংকই সব নয়। এর পরেও আছে ইতিহাসের সেই পরম সত্য, যা চিরকাল অংকফলকে ভুল প্রতিপন্ন করে আসছে। যে সভ্য বলে, মানুষ মরে না; মানুষের সভ্যতা অমৃতাভিমুখী; নৈরাশ্যের মত বিষ নেই; এ বিষ পান করা বা পরিবেশনের তুল্য পাপ নেই; এবং এতবড় মিথ্যাও নেই। এ আমার স্তোকবাক্য নয়, এ ঐতিহাসিক সত্য। বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর ইতিহাস স্মরণ করতে বলি। বৌদ্ধ গান ও দোহা, বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্তপদাবলী, নানান মঙ্গলকাব্য কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, মনসামঙ্গল বিভিন্ন চণ্ডীমঙ্গল চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে তার অন্তরলোকের এক আশ্চর্য পরিচয় ফুটে উঠেছে। পৌরাণিক যুগের অবসান ঐতিহাসিক যুগের আবির্ভাবকে বিস্ময়কর মানবীয় সচেতনতার সংগে সে গ্রহণ করেছে। এই সচেতনতার মধ্যেই শাসক ও শাসিত মুসলমান সুলতানেরা এবং হিন্দু কবিরা ও মানুষেরা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন। একসংগে রসাস্বাদন করেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত যে সব পুণ্যবানেরা শুনেছেন, তাঁরা শুধু হিন্দু নন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলমান এবং অনেক সাধারণ মুসলমান ছিলেন। তারপর ঐতিহাসিক যুগের অবসানে রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গিরীশ-চন্দ্র শরৎচন্দ্র পরশুরাম কেদারনাথ বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক কালের আবির্ভাবকে নিজেদের সাধনাবলে অভ্যুদিত করে সেই সামাজিক পটভূমিতে স্বাধীনতা লাভের কাল পর্যন্ত বাঙালী জীবনের যে বাঙ্ময় ও প্রাণময় জীবন-বিকাশকে প্রকাশমান করেছেন, তাতে যদি প্রত্যাশা করি যে, বাংলার সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং জীবনক্ষেত্রে শতাধিক বর্ষে একটা ঢল নামার পর সাময়িকভাবে একটা কুয়াশাঘন প্রভাত এসেছে, তার বেশী কিছু নয়, তবে তা মিথ্যা আত্মতোষণ হবে না। বাঙালী জীবনের মর্মলোকের যে গভীরতম দেশ থেকে সৃষ্টিস্রোত এবং জাতীয় জীবন উৎসারিত হয়েছে, তাতে সে স্রোত কখনই শুষ্ক হয়ে যেতে পারে না।

বাঙালী জীবনের চরিত্রের ধাতুর মধ্যে আশ্চর্য মহামূল্যতা আছে, আশ্চর্য একটি স্বাতন্ত্র্য শক্তি আছে, যা সে সেই অতীতকাল থেকে তাকে রক্ষা করে এসেছে। কখনও তাকে বিসর্জন দেয়নি, তাকে বিস্মৃত হয়নি।

উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ ধর্মের বাংলা-দেশে প্রবেশ করতে দীর্ঘকাল লেগেছে। প্রবেশ করেও সে বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও সংস্কারকে স্বীকৃতি দিয়ে তবে নিজের আসন পাততে পেরেছিল। তার কৌলিক দেবতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মাতৃ-রূপিণী শক্তি দেবতাই তার প্রধান কৌলিক দেবতা। উত্তরে অমরনাথ, দক্ষিণে রামেশ্বর, পশ্চিমে সোমনাথ প্রধান, ঈশ্বর এখানে পিতৃরূপে অবস্থান করছেন। কিন্তু বংগ-দেশে তিনি কালিকা। মাতৃরূপিণী। অযোধ্যা থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত রামসীতার রাজত্ব। বাংলায় নওলকিশোর কৃষ্ণ প্রধান। সর্ব বিষয়ে সে উত্তরভারতের সংগে এক সংস্কৃতির মধ্যে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে এসেছে। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত কৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মের সংগে ভারতের অপর প্রদেশের কৃষ্ণকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রভেদও এই শক্তির এক বিশেষ পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথ এবং নেতাজী পর্যন্ত তার অভ্যুদয় কাঞ্চনজঙ্ঘার মত বিস্ময়কর এবং মহিমান্বিত। রাজনৈতিক খণ্ডনে খণ্ডিত হয়ে এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্য প্রকারান্তরে রাজনৈতিক দণ্ডে দণ্ডিত হলেও এই জাতির হিমালয়োপম উচ্চতা সমতলে বা গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারে না। তাকে উঠতে হবে—সে উঠবে। হয়তো বা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিরোধানের পূর্বে সভ্যতার সংকট নিবন্ধে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলা দেশের মর্মান্তিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক শোচনীয় অবস্থা দেখে যে বেদনাবাণী উচ্চারণ করে পরিশেষে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "আশা করব মহা-প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের দিগন্ত থেকেই"...সেই সুকঠিনতম দায়িত্ব পালনের ভার বহনের উপযুক্ত সচেতনতা আমরা কোন ক্ষোভে, কোন মোহে, কোন ক্রোধে, যন্ত্রণার মধ্যে যেন না হারাই।

পরিশেষে এই দেশের এক অমৃতধন্যা মহীয়সী মনীষিণীর বাক্য স্মরণ করিয়ে দেব বাংলার সাহিত্যকারদের।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন ব্রহ্ম সন্ধানে সংসারের বস্তুজগৎকে তাঁর দুই পত্নী—কাত্যায়নী এবং দেবী মৈত্রেয়ীর মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে যাবার সংকল্প করেছিলেন, তখন দেবী মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, তুমি আমাকে যে বস্তু দিয়ে রেখে যাচ্ছ, কথং তেন অমৃতা স্যাম? তার মধ্য থেকে কি অমৃত পাব?

যাজ্ঞবল্ক্য মিথ্যা স্তোক দেননি তাঁকে। বলেছিলেন, না, এ অমৃত নয়। দেবী মৈত্রেয়ী সে কথা শুনে স্বামীকে বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

এই কথাই চিরকাল পাঠক প্রশ্ন করে লেখককে—কথং তেন অমৃতা স্যাম্? যাতে অমৃত না থাকে, তাকে কয়েক মুহূর্ত বা স্বল্প কিছুকাল লুব্ধদৃষ্টিতে দেখে হয়তো বা নেড়েচেড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরিত্যাগ করে বলে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। অমৃতহীন দান গন্ধহীন বর্ণাঢ্য পুষ্প ধুলোয় মিশিয়ে যায়। যেতে বাধ্য। শত পরিবর্তন হবে, সহস্র পরিবর্তন হবে। আমাদের সামনে একটা কল্লোলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—সে ধ্বনি আমাদের আগামী ভবিষ্যতের উত্তর-পুরুষের। তারা আসছে। তারা আসছে সহস্র হয়ে লক্ষ হয়ে। বন্যার মত। বন্যার মত মানুষের প্রবাহ এ সমাজ, এ বসতি, এ জীবনধারণ-ভঙ্গি সব উল্টে দেবে। না দিয়ে সে বাঁচতে পারবে না। কিন্তু মানুষ বাঁচবে, বাঁচতেই সে এসেছে, বাঁচবার জন্যে সে বদলাতে জানে। বাঁচা তার ধর্ম। সে বাঁচবে নতুন জীবন-ধারণের ভঙ্গিতে, নতুন আচারে, যা কল্পনা করতে আমরা দিশাহারা হই। কিন্তু দিশাহারা না হয়ে যদি কান পাতি, তবে শুনব সে বাঁচবার জন্য বদলাবে বটে কিন্তু সে বাঁচবে চিরন্তন অভিপ্রায়কে সার্থক করবার জন্য, মৃত্যু থেকে অমৃত লাভের জন্য। সেই ধ্বনি কখনও নীরব হবে না।

বিশ্বের মানবসমাজ চিরকালই সেই অমৃতভিক্ষু। সেই অমৃত চায় তারা আপনাদের কাছ থেকে। কারণ মানবচিত্তের গভীরে অনন্তকাল ধরে সেই একই বাণী ধ্বনিত হচ্ছে—

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে চল। অমৃতই আমি চাই, অমৃতই আমার কাম্য। এই বাণী সে আদিতে উচ্চারণ করেছে, মধ্যে আজও উচ্চারণ করছে, পূর্ণতার মধ্যেও সেই হবে তার শেষ বাণী।

সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

সুকমলকান্তি ঘোষ

...সমাজই বলুন আর সংস্কৃতিই বলুন, কোনটারই তো রূপ নেই। ওরা আজ এক রকম, কাল ছিল আর এক রকম, আবার বিনা দ্বিধায় বলা চলে, আসছে কাল তার রূপ হবে ভিন্ন। আমরা যতই সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করি, আমাদের সনাতন সমাজকে আর যত গর্বই না করি আমাদের সংস্কৃতির, তা কি থাকবে! আমরা যারা জীবনের বৈকালে পৌঁছে গেছি, তারা যখন পেছন ফিরে তাকাই আমাদের জীবনের প্রত্যুষের দিকে, তখন দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়, ঠাহর হয় না কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম। কোন্ ফাঁকে আমরা হারিয়ে বসেছি আমাদের সেই যুক্ত পরিবার, সেই পাতলা জলের মতন মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়া। কোন্ ফাঁকে নথ-রঞ্জনী দখল করে বসেছে আমাদের যুগের আলতা-পরা পদযুগল। আমার জিজ্ঞাসা, আপনারা কোন্ সমাজের কথা শুনতে চাইছেন, যে সমাজে ব্রাহ্মণ পুত্র, কন্যার মান রক্ষার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়ে করে বেড়াত, না আর এক সমাজের কথা যেখানে ব্রাহ্মণ কন্যা এক শূদ্রের হাত ধরে রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে তিন ধারায় বিবাহ সমাপণ করে মা-বাবাকে হাসি মুখে এসে বলে এই তোমাদের জামাই। আপনারা নিপুণ হাতে তৈরী লক্ষ ফোঁড়-তোলা কাঁথার কথা শুনতে চান না বম্বে ডাইংয়ের নক্সা আঁকা বিছানার চাদরের কথা?

আমি বলতে চাইছি এই দুই-ই সত্যি। তখনকার সমাজই বলুন আর সংস্কৃতিই বলুন সেটাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য আজ আমরা আমাদের চারিদিকে যা দেখছি। বিবর্তন জগতের নিয়ম। যুগে যুগে সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টাচ্ছে তার সংগে পাল্টাচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধ্যান আর ধারণা।

আজ আমরা যাঁরা অর্ধশতাব্দী পার করে এসে দাঁড়িয়েছি, তাঁদের সংগে অনেক তফাৎ যারা পঁচিশে পা দিয়েছে। আমি ভাল-বাসি রবীন্দ্রসংগীত, আমার ছেলে লুকিয়ে শোনে বিবিধ ভারতীয় প্রোগ্রাম। ওদিকে আমার মেয়ে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে দুপুরের খাওয়া জলাঞ্জলি দিয়ে এক মনে শুনে যায় ও টুকে যায় রবিবার দুপুরের বিলাতী কলরব যা তাদের মতে সংগীত। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা তো উঠেই যাচ্ছে, সেই জায়গায় যদি আপনি আশা করেন বৌমা গলায় আঁচল দিয়ে আপনাকে প্রণাম করবেন তাহলে আপনি আশাহত হবেন।

আমি মনে-প্রাণে বাঙালী — আমাদের সুটই বলুন আর কোঁচান কাপড়ই বলুন সবই আমার প্রাণের জিনিস। কিন্তু তাহলে কি হবে — চীনে সুপ্ (চীন আমাদের শত্রু হলেও) আর পাতলুনে টাই নিয়েই তো আমার দিন কাটছে। বছর-দুই আগে আমি পাথুরেঘাটার ঘোষেদের বাড়ীতে গান শুনতে গিয়ে আর একবার বিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করেছিলাম যে, কলকাতাটা বাঙালীর শহর আর বাঙালীরা আজও ধুতির সঙ্গে শীতের দিনে শাল পরে।

আমার মনে পড়ে একবার বিদেশে বেশ কদিন বাংলা না বলে জিহ্বা অসাড় হয়ে যাচ্ছে যখন, তখন দূরে দেখলাম একজন বাঙালী — দৌড়ে গিয়ে অনর্গল বাংলাতে তাকে কত কি বলে গেলাম, তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে দেরী হল না তিনি বাঙালী নন। আর আজ ঘরে কি দেখছি, পুত্র-কন্যা অক্লেশে বলে চলেছে ইংরাজী, আর পরীক্ষার পর এসে বলছে— সব এক রকম হল, শুধু তোমাদের বেংগলী! আমাদের নেতারা চেঁচিয়ে বলছেন হিন্দী শেখ, কেউ বলছেন আমাদের রাজ্যে শুধুই বাংলা চলবে। রেমিংটন কয়েকটা মেশিন ঝড়ের মত বেচে গেল। আর ওদিকে সংগোপনে আমাদের বাপধনেরা ইংরাজীতে তালিম দিচ্ছে।
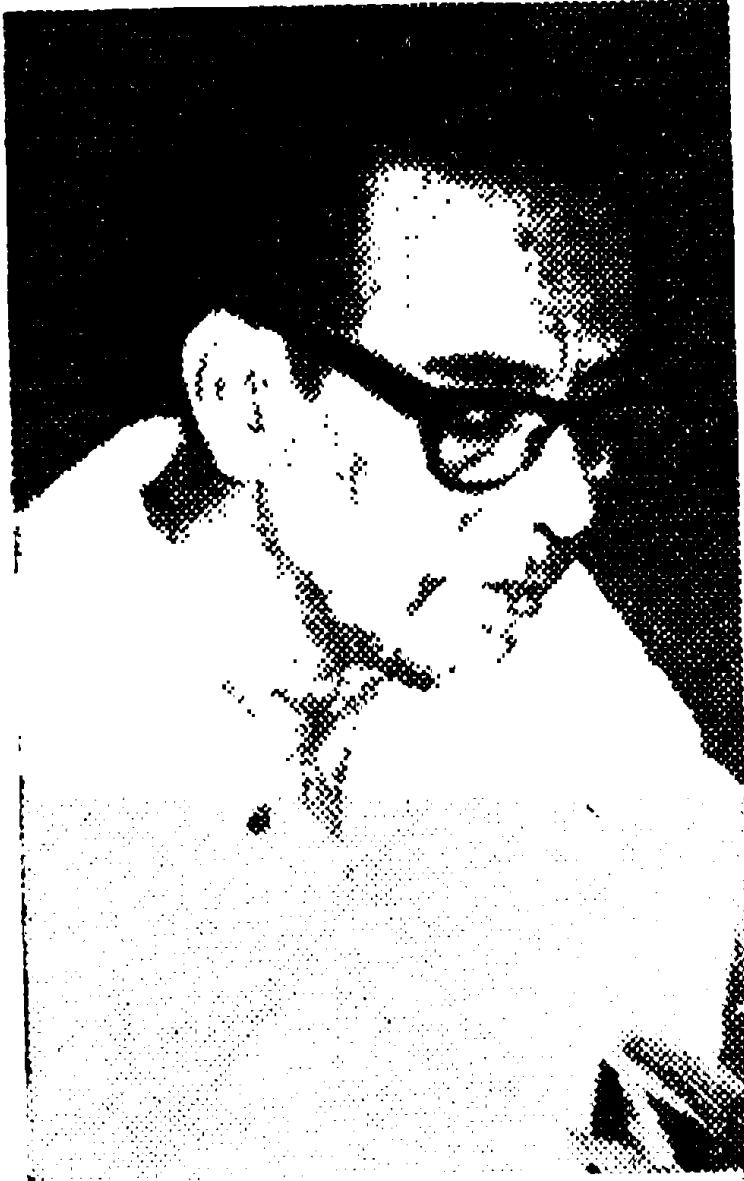
সুকমলকান্তি ঘোষ

আমি খুঁজে বেড়াই মেমসাহেবের মুখে লক্ষ্মীশ্রী আর আমাদের ঘরের মেয়েরা করে হেয়ার ডু। একেবারে ভুলে যায় এটা গরম দেশ। হন্দ-মুন্দ একদিন বাদ দিয়ে মাথায় জল ঢালতেই হবে, তখন ডু আনডু হয়ে যাবে। অবশ্য তাতে সেলুনের দু পয়সা বেশীই হবে।

কিন্তু এ সব ঠাট্টার কথা নয়—এই যে আমাদের সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, তার প্রথম কথা, এটা ভাল না মন্দ? তারপর আমাদের জানতে হবে আমরা এই ফাটল জুড়তে পারি কি না।

যতই হাল্কা মেজাজে আজকের সভায় মোকাবিলা করব ঠিক করেছি, ভেতরের সেই রক্ষণশীল সত্তাটা ততো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তা না হলে আমূল পরিবর্তনের কথাই বা তুলব কেন, আর ফাটল জোড়বার অবান্তর চেষ্টার কথাই বা মনে আসবে কেন।

আমার মনে হয় যুগে-যুগে মানুষ ভালবেসেছে সৃষ্টি করতে, রেখে যেতে চেয়েছে তার নিজস্ব ছাপ—তাইত বদল হচ্ছে আমাদের সমাজব্যবস্থা, আর রূপপরিবর্তন হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের।

ক'একদিন আগে সংবাদপত্রের পাঠক-দের লেখা একটি চিঠি মনে পড়ছে। একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান টাকা তোলবার জন্য আজকের ফ্যাশানমাফিক 'ফান্‌ফেয়ার' খাড়া করেছিলেন—উদ্দেশ্য সৎ টাকা তুলে আর্তের সেবা, অতএব তাঁরা সেখানে বার খোলবার অনুমতি পেয়েছিলেন এবং সমানে গলা ফাটিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন সকলকে, এসো সুরা পান কর। পত্রলেখক প্রশ্ন তুলেছেন আমরা কোথায় যাচ্ছি।

বাড়ীতে পুরোনো ছবির অ্যালবাম ঘাঁটলে বোধহয় সকলকার চোখে পড়বে ধুতি, শার্ট আর তার সংগে রঙীন টাই। খুব পুরোনো পরিবারের পিছন দিকের ঘর খুঁজলে চোখে পড়বে পাল্কী, খবর করলে জানা যাবে বাড়ীর গিন্নী সেই পাল্কীতে চড়ে সোজা চলে যেতেন গংগা-স্নানে — বেয়ারা তাঁকে যাকে বলে ডাকিং অর্থাৎ পাল্কীসুদ্ধ জলে ডুবিয়ে তাঁর পুণ্যেই বলুন আর আনন্দই বলুন চরিতার্থ করত। আজকাল যান কোন ক্লাবে, দেখবেন বিকিনি পরিহিতা তরুণীর দল জলক্রীড়ামগ্ন সান-বাঁধানো পুলের ভেতর, যার দেওয়াল থেকে ঝরছে ফিকে নীল রঙের আলোর ঝর্ণা।

কিন্তু তবুও বলব আমি ভালবাসি আমাদের সমাজব্যবস্থা, ভালবাসি আমি আমাদের আদি সাংস্কৃতিক জীবন। ভালবাসি কিন্তু এই বিবর্তন ঠেকাতে পারি না, যেমন পারেন নি আমার পূর্বপুরুষেরা। একটু ভেবে দেখা যাক কি অবস্থায় আজ আমরা বাস করছি। আজ সমাজ কি আমাদের খান্-খান্ হয়ে যাচ্ছে না? উত্তরসূরীদের পুণ্যের ফলে যে সমাজ ফলে-ফুলে, লতায়-পাতায় একটি সুন্দর বাগানের রূপ ধরেছিল, সে কি আজকে দরদী হাতের জলসিঞ্চন পাচ্ছে! সবচেয়ে বড় আঘাত এল আমাদের সমাজ-

জীবনে যখন আমাদের মাতৃপ্রতিম বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল। পল্লীসমাজ এক কলমের খোঁচায় অন্তর্হিত হল। তার বদলে দেশ ভরে গেল ছিন্নমূল হতভাগ্যের দলে। আমরা তাঁদের এক কথায় বলি রিফিউজী। ভেবে দেখুন, সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায় আমাদের পল্লীসমাজ জীবন্ত রূপ নিয়ে-ছিল। অনেক দোষ সেখানে ছিল—কিন্তু ছিল সেখানে সমাজব্যবস্থার মূল কান্ড। গাঁ ছিল একটা জায়গা যেখানে সকলে সকলকে চিনত পুরুষানুক্রমে। কারুর উপায় ছিল না অন্যায় করার লোকচক্ষুর অন্তরালে। ছিল গ্রামে জমিদার হয়ত বা চরিত্রহীন, অত্যাচারী, কিন্তু উৎসব অনুষ্ঠানে তাকেও সর্বজনীন মণ্ডপে এসে দাঁড়াতে হত, এই সমাজ থেকে তারও বিচ্ছিন্ন থাকার উপায় ছিল না। ছিল টোল, প্রাইমারী ইস্কুল, ছিল মোড়ল, ছিল পণ্ডিত, ছিল কবিরাজ, কামার, মোক্তার চাই কি হাকিম। গ্রামের ছেলে বড় হলে হয়ত বা শহরে কি বিদেশে চলে যেত উচ্চ শিক্ষালাভ করতে, আবার ফিরে আসত গ্রামীণ সমাজের বুকে। সমাজ তাকে নিয়ে আনন্দ করত, করত গৌরব; হত দুর্গোৎসব, দোল, কালী পূজো। আপামর সকলে উপভোগ করত বাইচ খেলা, চড়ক চাই কি হাড়ু-ডুডু। সকলে ঘুরত যে যার খুশীমত, কিন্তু বাঁধা ছিল যেন একই ডোরে। সমাজের নেতা ছিলেন সকলের নেতা, তাঁর নিজের বিচ্ছিন্ন সত্তা ছিল না বললেই হয়। এক বড় পরি-বারের বড় কর্তা ছিলেন তিনি। সমাজব্যবস্থায় যাতে চিড় না খায় তার দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি। নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে তিনি সমাজকে দিতেন তার চেতনা। তাঁর নিজের বলতে কিছুই ছিল না। শুধু কি পল্লীতে, যখনই কোন কৃতী সন্তানকে কর্ম উপলক্ষে যেতে হত দূর দেশে, তিনি নিয়ে যেতেন কালী বাড়ী, পুরুতঠাকুর উৎসাহ দিতেন বার মাসে তেরো পার্বণে। পারলে স্থাপন করতেন স্কুল, ক্লাব। আজ তাঁরা কোথায়—আজ আত্মচেতন কৃতী বাঙালীরা কি ভাবেন সমাজের কথা, দশের কথা?

বলতে পারেন আবার কবে ফিরে পাব আমাদের সত্তা? আমি কিছুতেই মানতে প্রস্তুত নই, আমাদের সমাজব্যবস্থা আর আমাদের সুদূরবিস্তারী সাংস্কৃতিক জীবন আমরা হারাব। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের আদিতে উপনিষদ তারপর বেদ, গীতা। তার সংগে আছে প্রাচীন আর সুপ্রাচীন সংস্কৃত কাব্যমালা — তাঁদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যে অসম্ভব। আমরা যে অমৃতের পুত্র।

নাগপুরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪২তম অধিবেশনে সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতি শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষের অভিভাষণ

তারপর ইদানীংকালে ভেবে দেখুন আমরা কাদের পেয়েছি। প্রেমের অবতার গৌর-সুন্দর আবির্ভূত হয়েছিলেন আমাদেরই বাংলাতে, এসেছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংগে নিয়ে বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ গভীর জ্ঞানী ও প্রজ্ঞার প্রতিমূর্তি। এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, শ্রীঅরবিন্দ, এদিকে ছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার, বিপিন পাল, যাঁরা সৃষ্টির আর চেতনার ললিত-কঠোর হাতে সমাজের ক্লেদ মুক্ত করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আবার তাঁরা আনলেন নন্দলাল, যামিনী রায়—শব্দের মাধ্যমে শিল্পের ধারাতে বইয়ে দিলেন প্লাবন। ভুলে যাবেন না আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন শুধু কাব্য আর শিল্পে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের সংস্কৃতি অন্তর-প্রসারী। কি খাব, কোন্ আধারে, কবে কোন্ তারিখে, পরিধেয় বস্ত্র তাও বা কত রকম। আচার-ব্যবহার, চালচলন সবই তাঁরা শিখিয়ে গেলেন আমাদের সযতনে। কবে কোন সমাজে দেখেছেন, দাদা-মেজদা আছে। কোথায় আছে দেবর-বৌদির মধুর সম্পর্ক। পিশেমশাই-মেসোমশাই আরও কত 'ক'। পশ্চিম বলে কাজিন্ কিম্বা আঙ্কল্ বা আন্টি। দাদাকে ওরা নাম ধরে ডাকে, বৌদিকেও তাই। ভাবুন আমাদের প্রণাম করার ভঙ্গী আর আশীর্বাদ করার ছবি। কোথায় পাবেন এই জগতে। ওরা ভাবতেই পারে না, পরের বাড়ীর মেয়ে এসে কি করে সংসারে নিজের সত্তা বিলীন করে এক হয়ে যায়। ওরা বলে ইন লজ। ওদের বৌ কখনো কন্যা হয়ে ওঠে না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ওদের চোখে ভারতবর্ষ একটি ডেভেলপিং দেশ — কিন্তু ওরা মুখব্যাদন করে শোনে আমাদের সমাজব্যবস্থার কথা, গভীর শ্রদ্ধার সংগে বলে আমাদের সংস্কৃতির কথা। আমরা ভুলব কি করে, আমরা সব হারালেও "বন্দেমাতরম্" আর "জন গণ মন" এসেছে আমাদেরই বাংলা থেকে। ভাবুক বাঙালী, উদার বাঙালী বুকে টেনে নেয় সকলকে, সকলকে দেয় তাদের আদর্শের ভাগ। অপরের ভাল তারা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে, করে নেয় নিজের। তাইত সবচেয়ে বাংলাতেই আগে এসেছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারা—কোন ভাল জিনিস, কোন নতুন ভাব-ধারণা আমরা গ্রহণ করতে ভয় পাই না—আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনও ক্ষণভঙ্গুর নয়। এই মহামানবের সাগর তীরে আমরা হব অবিনশ্বর।

আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এবং মনে পড়ছে প্রেসিডেন্সী কলেজ। ট্রাম, বাস স্ট্রাইক আর কত কি! কোন নেতা যেন বলেছিলেন, কলকাতা প্রসেশনের নগরী। এ সবই সত্যি। কি করে উড়িয়ে দিই বলুন। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, বর্তমানের এই সব অসামাজিক কার্যকলাপ যদি সত্যি হয় তাহলে আমার এই ভাষণ সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। হয়তো বা তাই। কিন্তু কেন জানি আমার এ মন কিছুতেই যুক্তি মানতে চায় না। মন বলে এর পরেও কিছু আছে। যেমন রাতের পর দিন। আপনারা জানেন গরুর দুধ আমাদের সমাজ-জীবনেই বলুন আর সাংস্কৃতিক জীবনেই বলুন, একটি অপরি-হার্য জিনিস। দুধ যেমন শিশুর খাদ্য, তেমনি দুধ থেকেই তৈরী হত আমাদের অতি প্রিয় ভীমনাগের সন্দেশ আর বাগ-বাজারের রসগোল্লা। ভুলবেন না দধি আর পরমান্নের কথা। আমাদের যাত্রাই বলুন, বিবাহই বলুন আর জন্মদিনেই বলুন, ওরা হলেন অপরিহার্য। এমন যে দুধ, তাকে আমরা জ্বাল না দিয়ে খেতে পারি না। এখানে উপস্থিত মায়েরা, মেয়েরা ও বোনেরা জানেন দুধ জ্বাল দেবার সময় কি কাণ্ডই হয়! কড়ায় দুধ চাপিয়ে যদি অন্যমনস্ক হয়েছেন, সে যাবে উতলে পড়ে। দুধ যখন ফুটতে আরম্ভ করে তখন তার কি অশান্ত মূর্তি। ফলে উঠছে, ফেঁপে উঠছে, টগবগ করছে। আপনি যদি হাতা চালাতে ভুলে যান, সে রেগে উপছে উঠে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবে। উত্তাল তরঙ্গের মত, সে-ই আবার পরম উপাদেয় শান্ত, শিশুর পানীয় দুধ, অথচ অবহেলায় বা অনবধানে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। ওটা কিছু নয়—

আপনি নাড়ুন এবং ঠিক সময়ে নামিয়ে নিন, সে আবার উপাদেয় হয়ে উঠবে।

আমার সেই বিখ্যাত কবিতা ল্যামিয়া মনে পড়ছে। একটি সাপ রূপ গ্রহণ করল একটি সুন্দরী তরুণীর। কিন্তু কি ভয়াবহ বর্ণনা করেছেন কবি সেই পরিবর্তন যখন এল। সাপ বাঁকছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, ফণা তুলে বিষোদ্গার করছে। কিন্তু পরিণতি তার সুন্দরী রমণীতে।

আমার মন বলে এই ফুটন্ত দুধের মত, এই ল্যামিয়ার রূপ পরিবর্তনেরই মত আপনারা দেখবেন আমাদের সমাজ আবার শান্ত সমাহিত হয়ে উঠবে। আগামী দিনের সমাজ, আমি স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, হবে আরও সুন্দর, আরও মহিমাময়। মানুষ পাবে খেতে, পাবে পরতে পাবে বাসস্থান—হয়ে উঠবে মহান।

এখানে অনেক সাহিত্যিক আছেন, সাহিত্য-অনুরাগীও আছেন। সমাজের শত রূপ-বদলের মধ্যেও এক অনাবিল শাশ্বত রূপ খোঁজাই যাঁদের তপস্যা। কিন্তু তার বদলে আজকের সাহিত্যও কি সমাজের এই অশান্ত রূপের সঙ্গে সুর মেলাতে চলেছে? আমি জানি না—এ যদি আমার বোঝার ভুল হয়, খুশী হব। সব-সুন্দর আর সব-কুৎসিতের মধ্যেও জীবন-সোনা ছেঁকে তোলার বায়না নিয়েছেন যাঁরা—তাঁদের কাছে আমার শুধু অনুরোধ, সাহিত্যের দুধ জ্বাল দিতে বসে হাতাটি যেন তাঁরা হাতেই রাখেন। আমাদের সংস্কৃতি আর শাশ্বত মানস-সমাজ বিশেষ করে তাঁদের দিকেই চেয়ে আছে।

আসুন, আমরা যারা যাত্রা পথের পথিক, জীবনের বাকী দিনগুলি আত্মচেতন মুক্ত হই, আর প্রার্থনা করি আগামী দিনের ছেলে-মেয়েদের সুন্দর সফল জীবনের। রেখে যাই আদর্শ, উঠি ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে।

ছেলেরা, মেয়েরা, আমার বক্তব্য শেষ করবার আগে বলে যাই, তোমাদের সমাজ আর তোমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিও না। জেনে রাখ আজ যা দেখছ তা সত্যও না শাশ্বতও নয়। আগামী দিন হোক তোমাদের মধুময়, সৃজন কর নিজ হাতে সুন্দর সমাজ, ভুলে যেও না তোমাদের উত্তরসূরীদের কথা। মনে রেখো, কোনো দেশে কোনো সমাজে জন্মায় নি এতগুলি মহৎ প্রাণ—তাঁরা তোমাদের আশীর্বাদ করছেন প্রতিনিয়ত। রাস্তা পাবে তাঁদেরই জীবন-দর্শনের মধ্যে। তোমাদের সমাজের মহত্তর করে তোল। তোমাদের সংস্কৃতিকে ভালবাস। ধন্যবাদ।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি সরেজমিনে তদন্তের জন্য আগত মার্কিন খাদ্য প্রতিনিধি দল গত ২০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবিতে (বাঁদিক থেকে) দলের নেতা মিঃ পোজ, মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ চেস্টার বোলজ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

ধর্মস্থানের আড়াল থেকে

অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দির এবং পুরীতে হিন্দুদের গোবর্ধন মঠ—ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের এই দুই ধর্মস্থানের প্রাচীরের অন্তরাল থেকে দুই ধর্মগুরু ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর আর কোন দেশের সরকারকে ইদানীংকালে এমন ধরনের সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়নি।

রাজনৈতিক সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে অনশন আমাদের দেশে নতুন নয়। ভিয়েৎনামীদের অনুকরণে ভারতবর্ষেও ইদানীংকালে সরকারী ভাষার প্রশ্নে কয়েকটি তরুণকে আগুনে পুড়ে মরতে দেখেছি। কিন্তু সন্ত ফতে সিং বা জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের ন্যায় এমন উচ্চ পর্যায়ের ধর্মনায়ক রাজনৈতিক অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন অথবা সন্তের ন্যায় প্রবীণ, সুপরিচিত নেতা বা শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের ন্যায় দায়িত্বশীল মানুষ নিজেদের দাবী আদায় করার জন্য আগুনে পুড়ে মরার প্রকাশ্য সংকল্প ঘোষণা করেছেন এবং সেই সংকল্প কার্যে পরিণত করতে এগিয়ে চলেছেন—ঘটনা হিসাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটা অভূতপূর্ব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, এই ধরনের চাপের কাছে তাঁরা কিছুতেই নতি স্বীকার করবেন না। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ধর্মস্থানের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্টের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন সাম্প্রদায়িক বা আধা-সাম্প্রদায়িক দাবী আদায় করার জন্য সেই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু অনশন করবেন এবং আত্মবিসর্জন দেবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট সেই দাবী মেনে নেবেন—এই যদি রীতি হয়, তাহলে এদেশে কোন নীতিজ্ঞ সরকার চালানো যাবে না। কেননা, এদেশে ধর্মেরও অভাব নেই, ধর্মগুরু ও তাঁদের গোঁড়া চেলা-চামুণ্ডারও অভাব নেই।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, শ্রীমতী গান্ধীর সরকার মুখে যতটা দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন কাজে ততটা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারছেন না। শ্রীমতী গান্ধী স্বীকার করেছেন যে, এই ধরনের অনশন আত্মহত্যার চেষ্টার সামিল এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তথাপি শ্রীমতী গান্ধী সন্তজীকে বা গুরুজীকে এই বিধির আওতায় ফেলতে নারাজ।

প্রধানমন্ত্রীর এই অনিচ্ছার কারণ বোঝা কঠিন নয়। সন্ত ফতে সিং ও জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য, দুজনেই নিজ নিজ অনুগামীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী। তাঁদের কারও যদি কিছু হয়, তাহলে এই অনুগামী মহলে দারুণ প্রতিক্রিয়া হবে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সন্ত ফতে সিংয়ের প্রতিপত্তির প্রকৃত উৎস হচ্ছে এই যে, তিনি শিখ-ধর্মের একজন "উপদেশক।" অথচ আশ্চর্যের কথা, সন্ত ফতে সিং জন্মসূত্রে শিখ নন। তিনি একজন ধর্মান্তরিত শিখ। যে-ধর্ম তাঁর পিতৃপুরুষের নয়, কোন মানুষ সে-ধর্মেরও নেতা হয়ে গেলেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সন্ত ফতে সিং এই বিরল দৃষ্টান্তেরই অন্যতম।

৫৬ বছর আগে তিনি রাজস্থানের এক মুসলমান কৃষকের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিখ-ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি

রাজস্থান, বিশেষ করে বিকানীরে, এই ধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

রাজনীতিতে সন্তজীর প্রবেশ কতকটা আকস্মিকভাবে। মাত্র আট বছর আগেকার কথা। তখনও বৃদ্ধ মাস্টার তারা সিং অকালীদের অবিসম্বাদিত নেতা। তিনি সন্ত ফতে সিংকে অকালী রাজনীতিতে ডেকে নিয়ে এলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে অকালী রাজনীতির ভিতরে মাস্টারজী ও সন্তজী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। ১৯৬২ সালে অকালী দল দুই ভাগ হয়ে গেল। একটির নেতা হলেন সন্ত ফতে সিং, আর একটির নেতা রইলেন মাস্টার তারা সিং। সন্ত ফতে সিংয়ের দলটিই সংখ্যায় ভারী হলেন, শিখ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির নেতৃত্বও তাঁদের হাতে চলে গেল।

আজ সন্ত ফতে সিং নিজেকে গুরু-গোবিন্দ সিংয়ের ছাঁচে শিখদের ধর্মীয় তথা-রাজনৈতিক নেতারূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। মাস্টার তারা সিংয়ের "শিখি-স্থানের" পাল্টা স্লোগান তুলে তিনি পাঞ্জাবী সুবা (ধর্মের ভিত্তিতে নয়, ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাজ্য) আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু তা করার আগে গত ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁকে একবার অনশন করতে হয়েছে এবং দুবার অনশনের ও আগুনে আত্মবিসর্জন দেওয়ার হুমকি দিতে হয়েছে।

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের রাজনৈতিক জীবন এমন ঘটনাবহুল না হলেও তাঁর অতীত জীবন একেবারে রাজনীতি-সংস্রব-বর্জিত নয়।

পুরীর এই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য ওরফে স্বামী নিরঞ্জন দেবতীর্থের গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম ছিল চন্দ্রশেখর দ্বিবেদী। এই দ্বিবেদী মহাশয় এক সময়ে রামরাজ্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন এবং হিন্দু-কোড বিলের বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য নিখিল ভারত হিন্দু-কোড বিরোধ সমিতি গঠন করেছিলেন। আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি সে সময়ে একাধিক বার কারাবরণও করেছিলেন।

ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ বিক্রম সরাভাই ও ভারতে কানাডার হাইকমিশনার মিঃ ডি রোল্যান্ড রাজস্থান পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র সম্প্রসারণের জন্য স্ব স্ব সরকারের পক্ষ থেকে চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্র, বারাণসীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং জয়পুর ও গুজরাটেও সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এই মানুষটি যদিও মাত্র দুই বৎসর আগে পুরীর গোবর্ধন-পীঠের প্রধান হয়েছেন, তথাপি তাঁর পদমাহাত্ম্যেই তিনি একজন প্রচণ্ড প্রতিপত্তিশালী ধর্মনেতা। আদি শঙ্করাচার্য ভারতের চার প্রান্তে যে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন পুরীর গোবর্ধনপীঠ তাদের অন্যতম। অন্য তিনটি মঠের একটি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিম ভারতে সারদা মঠ এবং উত্তর ভারতে যোশী মঠ। এই চারটি মঠের অধ্যক্ষরাই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য নামে পরিচিত এবং আধুনিক কালে তাঁরাই হচ্ছেন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গুরু।

এহেন সন্ত ও সন্ন্যাসী একটা নতুন এবং বিপজ্জনক সম্ভাবনায় পূর্ণ আন্দোলনে নেমেছেন। সন্তজীর দাবী মোটামুটি দুটি : (১) পাঞ্জাব ও হরিয়ানার জন্য এক রাজ্য-পাল, এক হাইকোর্ট, এক রাজ্য বিদ্যুৎ-পর্ষৎ ইত্যাদি রেখে দুই রাজ্যের মধ্যে এখনও যে সাধারণ যোগসূত্র বজায় রাখা হচ্ছে সে যোগসূত্র ছিন্ন করতে হবে। (২) চণ্ডীগড় সহ সেব পাঞ্জাবীভাষী অঞ্চল হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি পাঞ্জাবকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই দুটি দাবী সম্পর্কে ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে : (১) সাধারণ
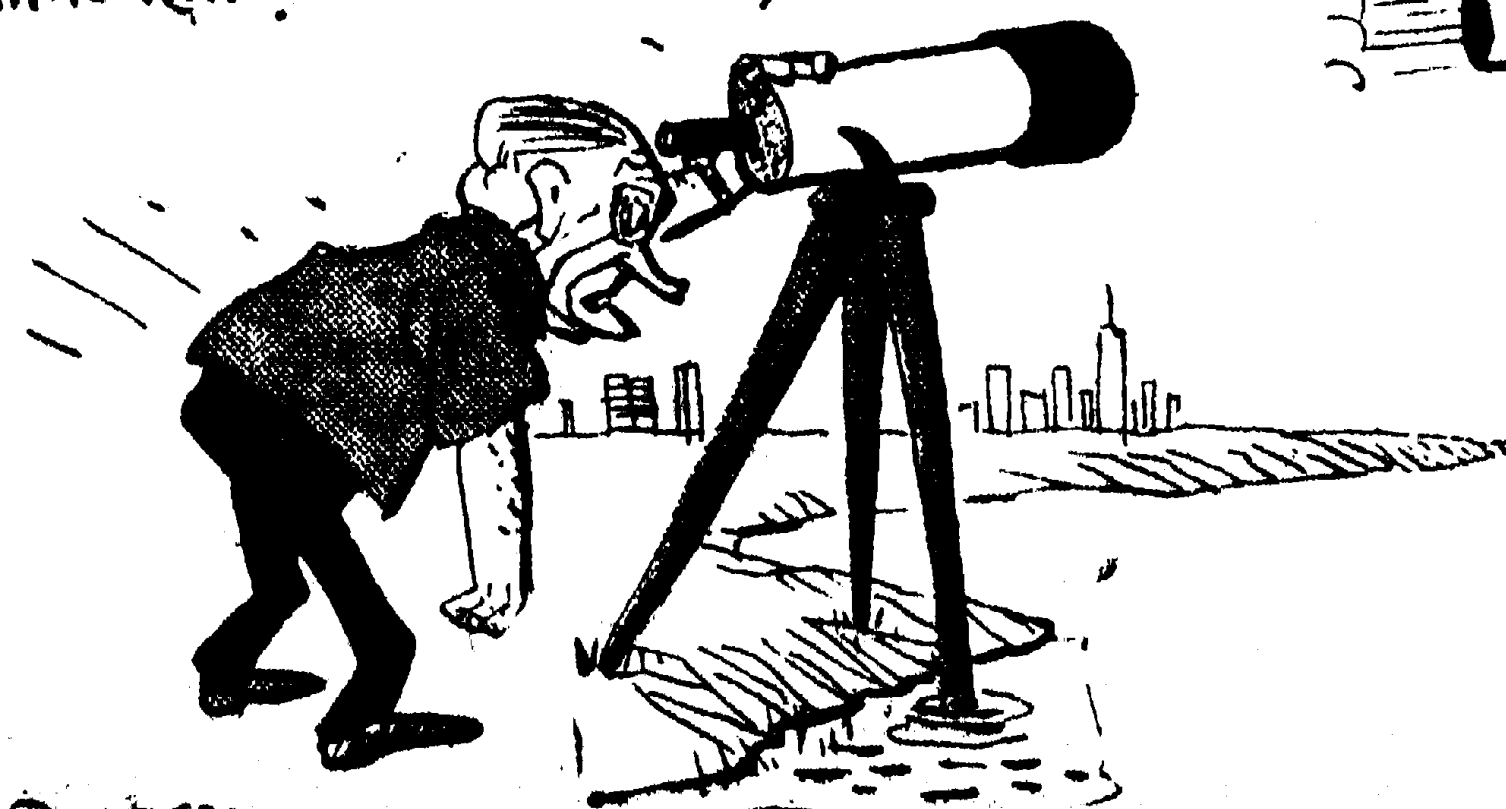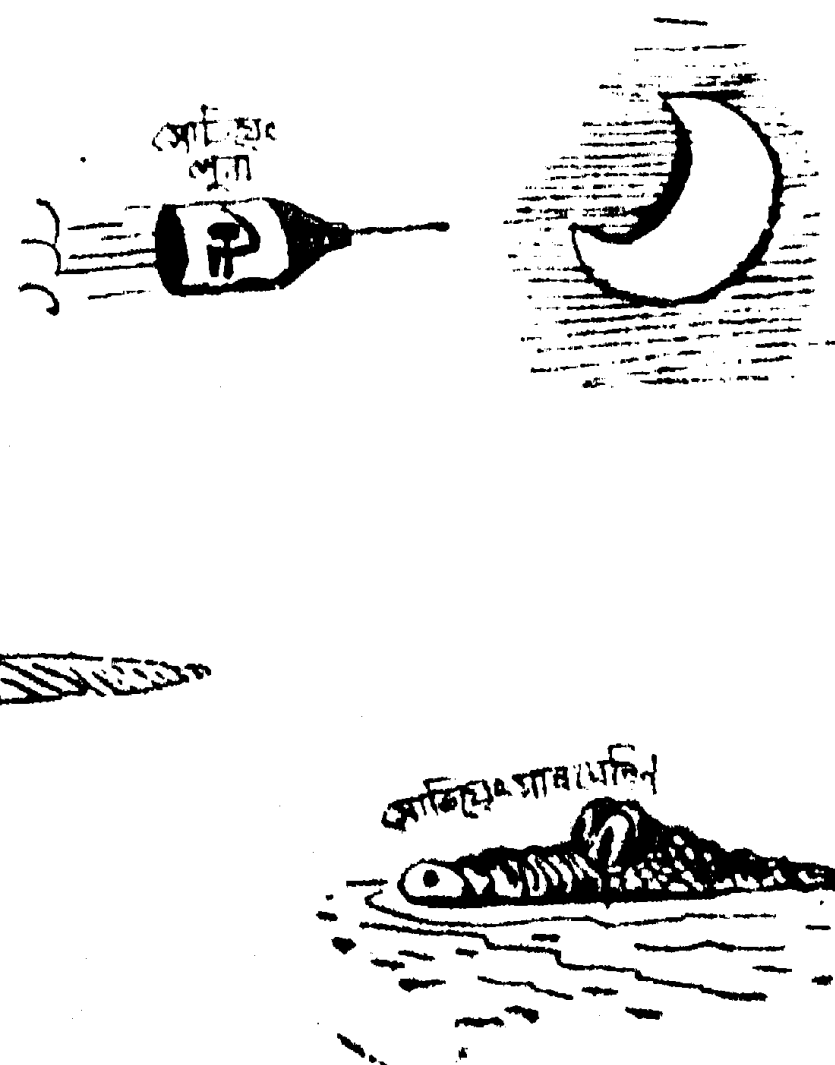
যোগসূত্রগুলি নিতান্তই সাময়িক এবং (২) বিচারপতি জে সি শাহের সভাপতিত্বে গঠিত সীমানা কমিশন যে রোয়েদাদ দিয়েছিলেন, প্রধানতঃ সেই রোয়েদাদ অনুসারেই দুই রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে। এখন যদি সেই সীমানার অদল-বদল করতে হয়, তাহলে উভয় রাজ্যের সম্মতি ছাড়া তা করা চলবে না।

পুরীর জগদ্‌গুরুর দাবী—আইন করে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে হবে। এবিষয়ে সরকারী বক্তব্য হচ্ছে—ভারতবর্ষের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির একটি হচ্ছে এই যে, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হবে। এই নীতি অনুসারে ভারতবর্ষের অনেকগুলি রাজ্যের সরকার ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আইন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে এই আইন চালু করেছেন। যেসকল রাজ্য সরকার এখনও এই আইন করেননি, তাঁদের এই আইন করতে বলা হয়েছে; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে তাঁদের বাধ্য করতে পারেন না। কেননা সংবিধান অনুসারে বিষয়টি রাজ্যের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতার আওতার মধ্যে পড়ে, কেন্দ্রের নয়।

দুই ধর্মগুরুর আন্দোলন দেশকে কোন্ পরিণতির পথে টেনে নিয়ে যায় সেদিকে এখন সারা দেশের মানুষ আগ্রহ ও উদ্বেগের সঙ্গে তাকিয়ে আছেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

ভারত ও চীন

এদেশে এবং বিদেশে সাধারণ ধারণা এই যে, বৈষয়িক উন্নয়নের পাল্লায় চীন ভারতবর্ষকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মত চীনকে আজ আর খাদ্য ও অর্থের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না—একথা ত' স্পষ্টই প্রতীয়মান।

কিন্তু সম্প্রতি বরদায় ব্যবসায়ীদের এক সভায় ভারতবর্ষস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌জ্‌ এবিষয়ে একটি বিপরীত চিত্র দিয়েছেন। সম্প্রতি দেড় বৎসরকাল চীনে কাটিয়ে এসে ভারতেও দীর্ঘকাল রয়েছেন এমন একজন তরুণ ইউরোপীয়ান সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ সাংবাদিকটির ধারণা হয়েছে, জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থানের দিক দিয়ে যদি বিবেচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, চীন ও ভারত মোটামুটি একই রকম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। ভারত ও চীন, দুই দেশেই উক্ত সাংবাদিক কদর্য বস্তী অঞ্চল দেখেছেন, হাজার হাজার অর্ধভুক্ত মানুষ দেখেছেন। আবার তিনি দেখেছেন, দুই দেশই নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

উক্ত সাংবাদিক বোল্‌জ্‌ সাহেবের কাছে নাকি এই মন্তব্য করেছেন যে, চীন পারমাণবিক অস্ত্রনির্মাণের যে বৃহৎ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে তার পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, সার উৎপাদনের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক শিল্পের উন্নয়নের প্রয়াস ব্যাহত হতে বাধ্য।

কিন্তু মিঃ বোল্‌জ্‌ বলছেন, উক্ত ইউরোপীয়ান সাংবাদিক একটি বিষয়ে মারাত্মক পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। চীনের সর্বত্রই তিনি লক্ষ্য করেছেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড আস্থা। এই আস্থা মতান্ধতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে; কিন্তু এটা উদ্দীপনাপূর্ণ। অথচ ভারতবর্ষে তিনি প্রায়শঃই লক্ষ্য করেছেন একটা হতাশার মনোভাব। সাংবাদিকটি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে প্রশ্ন করেছেন, "ভারতবর্ষ যখন অন্ততপক্ষে চীনের সমান অগ্রগতি করেছে তখন সে তার নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে অধিকতর গর্ব বোধ করে না কেন? চীন এত আত্মপ্রত্যয়শীল কেন? ভারতবর্ষ এমন উৎকণ্ঠিত কেন?"

এই প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর বোলজ সাহেব দেননি। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ যা করেছে তার তালিকা উপস্থিত করে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যদি ঠান্ডা মাথায় কেউ চিন্তা করেন তাহলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের উপর একটা সতর্ক আস্থা রাখার ভিত্তি তাঁরা খুঁজে পাবেন।

এই কৃতিত্বগুলি কি? চেষ্টার বোলজের মতেঃ—

১৯৫২ সালে যেখানে ১০ কোটি ম্যালেরিয়া রোগী ছিল সেখানে ১৯৬৬ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার।

১৫ বৎসর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যত ছাত্রছাত্রী পড়ত এখন তার তিন গুণ ছাত্রছাত্রী পড়ছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৫000-এর বেশী ডাক্তার ও ১0000-এর বেশী ইঞ্জিনীয়ার পাশ করে বেরোচ্ছে।

ভারতবর্ষে ইস্পাতের উৎপাদন বেড়ে ছয় গুণ হয়েছে।

১৯৫৩ সালের তুলনায় ভারতে বিদ্যুতের উৎপাদন এখন পাঁচ গুণ হয়েছে এবং আগামী পাঁচ বৎসরে বর্তমানের দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের রেলপথগুলির অধিকাংশের আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে, রাজপথের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ভারী শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করছে।

মিঃ বোল্‌জের মতে, ভারতের দ্রুততর উন্নয়নের কোন সূত্র উদ্ভাবন করলে তাতে প্রথম স্থান দিতে হবে কৃষি-উৎপাদনকে, দ্বিতীয় স্থান দিতে হবে শিল্পকে, তারপরে গুরুত্ব দিতে হবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর এবং চতুর্থ গুরুত্ব দিতে হবে "ব্যক্তিগত উদ্যোগ'-এর উপর।

এই চতুর্থ বিষয়টির উল্লেখ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, "একটা আধুনিক গণতন্ত্র যে গণতন্ত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ম্ভর, সেই গণতন্ত্র কখনও বকেয়া মতাদর্শগত স্লোগানের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে না। সেই গণতন্ত্রকে বাস্তব উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।"

ভারতবর্ষের অর্থনীতি সম্পর্কে চেষ্টার বোল্‌জের এই সমীক্ষাটি চিত্তাকর্ষক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন যখন কৃষির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কৃতিত্বের বিশদ পরীক্ষা না নিয়ে খাদ্যসাহায্য দিতে চাইছেন না, ভারতবর্ষের বৈদেশিক সাহায্যকারীরা যখন পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি যাচাই না করে কোনরকম আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে চাইছেন না তখন তিনি ভারত সরকারের কৃতিত্বের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। নিছক কূটনৈতিক সৌজন্যবশেও যদি তিনি এই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন তাহলেও আজকের হতাশা ও বিশ্বজোড়া বিরূপতার মধ্যে এই প্রশংসাপত্র ভারতবর্ষের পক্ষে প্রীতিকর হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু মিঃ বোল্‌জের একটা কথা বোঝা গেল না। ভারতবর্ষ চীনের মত আপন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যয়শীল নয় বলে আক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার ভারতবর্ষকে ব্যক্তিগত উদ্যমে উৎসাহ দিতে পরামর্শ দেন কি করে? চীনের এই আত্মপ্রত্যয় কি এসেছে ব্যক্তিগত উদ্যম লোপ করার দরুণ? না, তৎসত্ত্বেও?

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতের' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতের' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 6th January, 1967. শুক্রবার, ২১শে পৌষ, ১৩৭৩ **40 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

চিঠিপত্র

এশিয়ার গল্প প্রসঙ্গে

'এশিয়ার গল্প' পর্যায়ে জাপান, ভিয়েৎনাম, ফিলিপাইন, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের গল্পগুলি প্রকাশের জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাঙলা দেশের অন্য কোন পত্রিকায় ঠিক এই ধরনের কোন গল্প প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। সব গল্পগুলিই যে উন্নত মানের তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকসাধারণের যে ক্ষুদ্র জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে, তার তুলনা বিরল। কাহিনীগুলির সার্থকতা এখানেই সব থেকে বেশী। বেশ কিছুকাল পূর্বে আপনাদের পত্রিকায় 'প্রতিবেশী সাহিত্য' পর্যায়ে যে গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্য সাধনার গতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পেরেছিলাম। বর্তমান পর্যায়ের গল্পগুলিও ঠিক সেই উপকারই আমাদের করছে। আপনাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে যে সাধু উদ্দেশ্য রয়েছে তা সার্থক হোক।

শ্যামল গুপ্ত
হাবড়া

সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

অপানাদের ১৪ই পৌষ সংখ্যার 'অমৃত' পত্রিকাতে প্রকাশিত শ্রীযুত সুকমলকান্তি ঘোষ ৪২তম অধিবেশনে সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়াছেন তা প্রত্যেক মানুষের মনেই গভীর রেখাপাত করবে। আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রীযুত ঘোষকে তাঁর এই মূল্যবান ভাষণের জন্য। আমরা যারা আজ জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি—শ্রীযুত ঘোষের বক্তব্য সম্বন্ধে তাদের ভাববার অনেক কিছুই রয়ে গেছে। বিবর্তন ও পরিবর্তন জগতের নিয়ম। সমাজ-জীবনে ও জীবনের অন্যান্য স্তরে এর সুস্পষ্ট ধারা বয়ে চলেছে। পুরোনকে আঁকড়ে ধরে নতুনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারাটা যতই কষ্টকর হোক না কেন—বিবর্তন আমাদের মেনে নিতেই হবে। সব রসাতলে গেল বলে চীৎকার করে কোন লাভ হবে না। যা চিরসুন্দর, শাশ্বত, সনাতন এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণময়, তা কোনদিনই নষ্ট হয় না—হতে পারে না এবং হবে না—এই আশা নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। সেই চিরসুন্দরের গান গেয়েই আমাদের জীবনের পথে অগ্রসর হতে হবে। এবং এই ভাঙ্গা-গড়ার মাধ্যমে আমরা ফিরে পাব আমাদের গ্রামীন সমাজের চির-সুন্দর কল্যাণময় দিনগুলির। শ্রীযুত ঘোষ সুন্দরভাবে বলেছেন যে, "উত্তরসূরীদের পুণ্যের ফলে যে সমাজ ফলে-ফুলে, লতায় পাতায় একটি সুন্দর বাগানের রূপ ধরেছিল, সে কি আজকে দরদী হাতের জলসিঞ্চন পাচ্ছে। না তা ঠিকমত পাচ্ছে না। আমাদের দরদ এই সমাজকে পুনরায় গড়ে তুলতে হবে। আজ শেষ করি শ্রীযুত ঘোষের সুন্দর ভাষণের শেষ অংশ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে "জেনে রাখ আজ যা দেখছ তা সত্যও না শাশ্বতও নয়। আগামী দিন হোক তোমাদের মধুময়, সৃজন কর নিজ হাতে সুন্দর সমাজ, ভুলে যেও না তোমাদের উত্তর-সূরীদের কথা।"

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলকাতা—৩৯

ক্রিকেটের কবিতা প্রসঙ্গে

গত ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'ক্রিকেটের কবিতা' অফুরন্ত হাসির খোরাক জোগাল। নাতিদীর্ঘ এই রম্যরচনায় অচিন্ত্যবাবু তাঁর সাহিত্যশিল্পের স্বাক্ষর রেখে গেলেন। গূঢ় বাস্তবের মধ্যে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের যেভাবে বিলুপ্তি সাধন করলেন, তা সত্যই ধন্যবাদার্হ।

আজকের মানুষ (বিশেষ করে উগ্র-আধুনিক যাঁরা) যে কেমন ব্যক্তিত্বহীন এবং হুজুকে হয়ে পড়েছে তার একটা সুন্দর প্রতিচ্ছবি পেলাম লেখকের রচনায়। কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা থাক আর নাই থাক তবু বাহ্য প্রভাবের তাড়নায় মেতে ওঠা যেন আজকের প্রতিটি মানুষের কাছে একটা নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা বস্তুর ওপর খবরদারী করতে গিয়ে অপ্রস্তুতে পড়ে, তবু অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করতে কেউ ছাড়ে না। এমনকি অবোধ্য তথ্যটির প্রতি যুক্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ করতেও তারা বেশ অভ্যস্থ। কিন্তু এটুকু বুঝতে তারা পারে না যে, ঐ এতটুকু মন্তব্যই সুন্দর তথ্যের সুঠাম রূপকে কতখানি বিকৃত করে তোলে। এ সম্বন্ধে লেখকের পরিবেশিত উদাহরণই উপযুক্ত। কারণ, ক্রিকেটের মাঠে মহিলার ভীড় সম্পূর্ণ একটা অপ্রয়োজনীয় এবং ভিত্তিহীন ব্যাপার। আমার তো মনে হয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাদে (যাঁরা ক্রিকেটের সামান্যতম কিছু বোঝে) বাকী প্রায় সকল মহিলাই মাঠে উপস্থিত হন কেবল শূন্য আসনগুলিকে পূর্ণ করতে এবং হৈ-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া আর হাসি-ঠাট্টার একটা বান ডাকাতে। নচেৎ খেলা সম্বন্ধে একটা আন্তরিকতা এবং আগ্রহ বলে তাঁদের মধ্যে কিছুই নেই। যাইহোক একটা কিছু (সে সুখকরই হোক আর অসুখকরই হোক) ঘটলেই যে হাততালি দিতে হয় এবং যে কোন প্রকারেই যে আনন্দ প্রকাশ করতে হয়, এইটুকুই তাঁদের জানা আছে এবং সেই পাথেয়টুকু নিয়েই উদয়-অস্ত খেলার মাঠে অবস্থান করেন এবং আর পাঁচজনের সাথে সহযোগিতা করে পাঁচজনের সহযোগিতা আর মন্তব্য কুড়িয়ে যে যার নিজের নিজের ঝোলা ভর্তি করেন। এছাড়া নিজস্ব সত্তা, নিজস্ব মতামত এবং ব্যক্তিত্ব বলে তাঁদের কিছুই নেই। আর এদিকে যাঁরা প্রকৃতই ক্রীড়ানুরাগী তাঁরা একটা টিকিটের অভাবে পড়েন ফাঁকিতে।

বিদ্যুৎ মল্লিক,
নিউ আলিপুর।

ওয়াল্ট ডিজনী প্রসঙ্গে

ওয়াল্ট ডিজনীর বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পর্কে অমৃতের ৩৩ সংখ্যায় কাফী খাঁ লিখিত প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। ডিজনী ল্যাণ্ডের নানারূপ কাহিনী আমরা শুনেছি এবং ছবিতেও দেখেছি। বর্তমান প্রবন্ধকারও সে সম্পর্কে বলেছেন যে, "সেখানে একটা ছোট্ট প্ল্যানেটোরিয়াম আছে, আর তার ভেতরে ঢুকেই যেন রকেটে চড়ে চাঁদে যাওয়া যায়। অ্যাডভেঞ্চারল্যাণ্ড, ছোটদের গল্পের শেয়াল পণ্ডিতের দেশ, মিকিমাউসের বাড়ী ইত্যাদি"। ডিজনীল্যাণ্ডের পরিচয় আরও পরিব্যাপ্ত। বহুদিন আগে 'অমৃতে'র কোন এক সংখ্যায় ডিজনীল্যাণ্ড সম্পর্কে একটি সচিত্র কাহিনী পড়েছিলাম। এত বড় একজন প্রতিভাধর মনীষী বিংশ শতাব্দীতে খুব কমই জন্মেছেন। অথচ তাঁর পরলোকগমনের পর অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় স্মৃতিতর্পণ করা হয়েছে খুবই দায়সারাভাবে। ওয়াল্ট ডিজনী কেবলমাত্র একজন আমেরিকানই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীরই প্রিয়পাত্র। তাঁর সম্পর্কে আরও আলোচনা প্রকাশিত হলে সকলেই উপকৃত হবেন।

আলো বসু
কলকাতা-৯

অমৃত সম্পাদকীয়

নববর্ষের সম্ভাষণ

আরেকটি ইংরেজি বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। দুঃখজর্জর, সমস্যাসংকুল নববর্ষের আবাহন তবুও আজ পৃথিবীর সর্বত্র। প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে এই নতুনকে আমরা বরণ করি। সকলের কল্যাণ, পৃথিবীর কল্যাণ নববর্ষকে স্মরণীয় করে তুলুক আমাদের জীবনে।

বিগত বৎসরের দিকে তাকালে আমাদের আনন্দিত হবার কোনো কারণ নেই। ভারতবর্ষেই হোক, বা পৃথিবীর অন্যত্রই হোক শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশা অত্যন্ত নির্মমভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বিগত বৎসরের গোড়ায় ভারতবর্ষ হারিয়েছিল তার জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীকে। তাসখন্দ শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করার অব্যবহিত পরেই দূরপ্রবাসে তাঁর পরলোকগমন অতি শোকাবহ স্মৃতি বহন করে আনে আমাদের মনে। শাস্ত্রীজীর স্থলাভিষিক্ত হলেন শ্রীমতী গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বিঘ্নে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন ভারতের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের শক্তির পরিচয়। আর কিছু না হোক, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র যে আমাদের দেশের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছে এটা খুবই আশার কথা। অন্যান্য দিক দিয়ে বিগত বৎসরে ভারতের সমস্যার অন্ত ছিল না। তার মধ্যে প্রধান হল খাদ্য সমস্যা। খাদ্যে স্বয়ংভর হবার জন্য ভারতের চেষ্টা এখনও সফল হয়নি। তার ফলে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে আমাদের। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছি আমরা নানাদেশে খাদ্যের সন্ধানে। অন্যান্য দেশ সাহায্য দিয়েছে, কিন্তু যতটা আমাদের প্রয়োজন এবং যত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন তা পাওয়া সম্ভব না হওয়াতে বৎসরের শেষ দিকে গভীর উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে আমাদের। বলা বাহুল্য, সেই উদ্বেগ এখনো কাটেনি।

খাদ্যাবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে ব্যাপক অনাবৃষ্টি বা খরা। প্রথমে ওড়িষ্যায় এবং পরে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খরার ফলে ব্যাপক শস্যহানি ঘটেছে। তার মধ্যে বিহারের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। খরাক্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ত্রাণকার্য এখনো চলছে। এদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতে গত বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভাষাভিত্তিক পাঞ্জাবী রাজ্য গঠন। পাঞ্জাবের পাঞ্জাবীভাষী রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে পাঞ্জাব, তার হিন্দীভাষী অঞ্চল আলাদা করে নিয়ে গঠন করা হয়েছে হরিয়ানা। নূতন রাজ্য গঠনের পরও বিরোধ সম্পূর্ণ মেটেনি। সেই বিরোধ মীমাংসার দাবীতে অকালী দলের নেতা সন্ত ফতে সিং অনশন ও আগুনে আত্মাহুতির হুমকি দিয়েছিলেন। আত্মাহুতির আগের দিন গত ২৬ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায় বিরোধ মীমাংসার সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় আপাতত পাঞ্জাবের অবস্থা শান্ত। নাগাল্যাণ্ডে শান্তি আলোচনা এখনো চলছে। মীমাংসার স্থায়ী সূত্র, দুর্ভাগ্যবশত, এখনো অনাবিষ্কৃত। আসামের পার্বত্য অঞ্চল নিয়েও সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ এক সর্বনাশা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। চীন একটার পর একটা পরমাণু বোমা ফাটিয়ে পৃথিবীকে যুদ্ধের কিনারার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে সে এখনো নামেনি, কিন্তু যে কোনো দিন ভিয়েৎনামকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ বাধতে পারে। সোভিয়েট-চীন আদর্শগত লড়াই প্রায় খোলাখুলি শত্রুতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তার ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে সজাগ রাখতে হচ্ছে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। এই আক্রমণ আকস্মিক হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ, পাকিস্থানের মতিগতি খারাপ এবং সে চীনের বন্ধু। সুতরাং আক্রমণটা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ দুভাবেই হতে পারে যেমন হয়েছিল ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে। ইয়োরোপে স্নায়ুযুদ্ধ বরং এখন শীতল। জার্মানী নিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত। রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার সদ্ভাব ইয়োরোপকে শান্ত করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। কিন্তু ভয় আছে এশিয়ায়। অবস্থা দেখে আশঙ্কা হয় এই মহাদেশেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলতে পারে।

পৃথিবীর শান্তিরক্ষক রাষ্ট্রসঙ্ঘ বহু চেষ্টা করেও এশিয়ার এই বিপজ্জনক অবস্থার কোনো সুরাহা করতে পারেনি। আশার কথা এই যে, উ থাণ্ট দ্বিতীয়বারের জন্য সেক্রেটারী-জেনারেলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শান্তির সূত্র আবিষ্কারের জন্য। বিগত বৎসরে শান্তি ছিল আলেয়ার ধাবমান আলোর মতো, নববর্ষের সূচনায় যদি উ থাণ্ট সেই আলোককে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলেই জগতের শান্তি। সেই আশা নিয়েই আমরা নববর্ষকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই।

ইডেনে পুলিশী তাণ্ডব

এবারের নববর্ষের প্রথম দিনে কলকাতার ইডেন উদ্যানে পুলিশের হামলাবাজির জন্য ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলা পণ্ড হয়। একদিন পর সেই খেলা আবার অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু পয়লা জানুয়ারীর ঘটনা যে খেলার জগতে ভারতের সুনাম নষ্ট করে দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কলকাতা চিরকালই খেলা পাগল। বিশ্ববিখ্যাত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা দেখার জন্য জনতা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে ঐ দিন পুলিশের হাতে লাঠির মার ও কাঁদানে গ্যাস খেয়েছে অভাবিতভাবে। এই ঘটনায় স্বভাবতই সমস্ত দর্শক বিক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তার প্রতিক্রিয়ায় মাঠে আগুন ধরেছে, খেলাও পণ্ড হয়েছে। বলাবাহুল্য, এর জন্য মূলত দায়ী পুলিশের অদূরদর্শিতা এবং ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের চরম অপদার্থতা। ক্রিকেট জগতে ভারতের সুনাম নষ্ট করার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাঁদের কৈফিয়ৎ দাবী করা যায়। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, তদন্তের ফলে এই শোচনীয় অব্যবস্থা ও পুলিশী জুলুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কাছ থেকে জবাবদিহি দাবী করে এর প্রতিকারের পথ বের করা হবে।

বিচিত্র চরিত্র

নারীচরিত্র

মলি

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন পাঠিকা পত্রাঘাতে প্রশ্ন করেছেন—"বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে পুরুষ চরিত্রের বহু বৈচিত্র্যেরই পরিচয় পাচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের পরিচয় পাইনি বললেই হয়। এর কারণ কি, আপনি মেয়েদের চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজে পাননি, না মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই আপনার নেই। সেটা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়; কারণ, আপনার রচনাবলীর মধ্যে নারীচরিত্র তো অনেকই পেয়েছি আমরা। তারা অনেকেই দীপ্তিময়ী এবং বিশিষ্ট দুই-ই বটে। তারা পুরোপুরি আপনার মানস-কন্যা এ-কথা বিশ্বাস কেউই করবে না, এমনকি আপনিও তা বলবেন না বলেই আমার ধারণা।"

চিঠিখানি অনেক বড়; অনেক আলোচনা আছে। আমার উপন্যাসের নায়িকাদের নিয়ে আমার অতীত যৌবনের ফেলে-আসা কুঞ্জ-বনের উপান্তে গিয়ে উপনীত হতে চেয়েছেন। আমার পায়ের ছাপ-আঁকা পথ-খানিকে চিনে-চিনে চলতে তিনি সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এবং কাচের চুড়ির টুকরো, আংটি থেকে খসে-পড়া একটি লাল পাথর, কিম্বা কোন কাঁটাগাছের কাঁটার ডগায় লেগে-থাকা শাড়ি কাপড়ের পাড় খুঁজে বের করতেও সক্ষম হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, এসবগুলি কাদের? এরা কারা?

তাকে চিঠির জবাবে লিখেছি—বিচিত্র চরিত্র পর্যায়ের লেখার মধ্যে যে-সব চরিত্রেরা আপনাদের সামনে এসেছেন, তাঁরা আমার উপন্যাসের মধ্যে উঁকি মারেননি বলেই মনে করি। এ-বিষয়ে আমি সতর্ক থাকতে চেষ্টা করেছি। কোনরকমে দু-একজনের আভাস উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে পড়ে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশেরই পড়েনি। এই চরিত্র-বিচিত্রার চরিত্রগুলিকে আমি অবিকৃতই রাখতে চেয়েছি। একটু-আধটু রিট্যাচ করেছি মাত্র; তাহলেও এ ফটোগ্রাফই, পোর্ট্রেটও নয়, পেন্টিংও নয়।

বন্ধুবর শ্রীপরিমল গোস্বামী একবার আমার একখানা ছবি তুলেছিলেন। সে সেই ১৯৪১ সালে রেডিয়ো আপিসে ১নং গার্স্টিন প্লেসে, একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার একটা টক ছিল; তিনি 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলে ক্লিক শব্দ করে ছবি তুলে নিয়ে বললেন, 'হয়ে গেছে'। সে-ছবি যখন দেখলাম, তখন আমার লজ্জা এবং গোপন অহংকারের আর সীমা রইল না। কারণ, সে-ছবি এমনই এক সুপুরুষের ছবি যে, সে-পুরুষটি চিড়িয়া-খানা গিয়ে অনায়াসে দাবী জানিয়ে বলতে পারে, আমার বাহন ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে এসেছে, ফিরিয়ে দিন। লজ্জা হয়েছিল পরিমলের কাছে। ভেবেছিলাম, তাই বা কেন, আজ সে-কথা ভাবি। ভাবি এমন জোর ঠাট্টা আমাকে জীবনে আর কেউ করেনি। মুখে স্নো-পাউডার ঘষে সেণ্ট মেখে রাস্তায় বের হতেও এত লজ্জা কখনও পাইনি। থাক। বেশী হয়ে যাচ্ছে। শিল্পের আসরে মাত্রাজ্ঞানটাই সবথেকে বড় গুণ। আমার বলার কথা এই যে, উপন্যাসের কোন্ চরিত্র কোথা থেকে পেয়েছি, এ বলার জন্য চরিত্র-বিচিত্রা বা বিচিত্র চরিত্রের অবতারণা নয়। যথাসম্ভব এ-দুয়ের সম্পর্ক-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। সংসারে বাল্যকাল থেকে যে-সব মানুষদের দেখেছি, তারা আজ সবাই তাদের চরিত্রের এক-একটি বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নিয়ে আমার চোখে ধরা দিচ্ছে। বা ধরা পড়েছে। যেটা আগে পড়েনি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বোধ করি নিজের ভালমন্দ বোধ নিজের আদর্শের গোড়ামি গোঁয়ারতুমি লজ্জিত হয়ে খসে পড়ে বা অভিমান ভরে ত্যাগ করে চলে যায়। বলে যায় লোকটার জাত গিয়েছে, অথবা বলে রি-এ্যাকশনারি হয়ে গেছে। তবে পরিণত বোধ-বুদ্ধিতে বুঝতে পারছি যে, এক নিজের বিচার ছাড়া পরের বিচার করবার তার কোন অধিকারই নেই মানুষের।

সাধু-সন্ন্যাসী সাধকদের বেলায় এই বোধটি কালে কালে ধরা পড়েছে এবং সব-কালের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সব পথই—এ-মুখে, ও-মুখে বা সে-মুখে বা ডাইনে কি বাঁয়ে কি সমুখে চলে, কোথাও আস্তাকুঁড় মাড়িয়ে, কোথাও অন্ধকার বনপথ ভেঙে, কোথাও বা রাজপথের চেহারা নিয়ে, কখনও বা পুবমুখে ঈশ্বরের মন্দিরের পাশ দিয়ে, কখনও পশ্চিম মুখে নামাজের বেদীর ধার দিয়ে, কখনও একেবারে উল্টোমুখে ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই, মানিনে, মানিনের পথ হয়ে একসময় একটা জায়গায় এসে সব পথ মিলে যায়। এবং সব পথের পথিকেরা সেইখানে জড়ো হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখে—বিস্মিত হয়—আর ভাবে, কিছুই ঝুটো নয়, পথের কোনটাই নরকের দিকে যায়নি। নরক থাকলে পথের মধ্যিখানে মাঝ-বরাবর কোথাও আছে; মাঝপথে পড়ে কালঘুমে পড়লেই সর্বনাশ, সেইটেই নরকে পতন। বিচিত্র চরিত্রের চরিত্রগুলি সবাই চলেছে—মৃত্যুকাল পর্যন্ত চলেছে থামেনি, তাদের জীবনকালে সবাই যেটাকে অন্যায় বলেছে, সেটাকেও আমি অন্যায় বলিনি।

পাঠিকা আমাকে বারবার প্রশ্ন করেছেন, কবির বসন্তকে এবং ঠাকুরঝিকে কোথায় পেলেন? তাদের কথা, তাদের সত্য চেহারাটা বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে বলেন না কেন? ধাত্রী-দেবতার ডোম-বউয়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন—সে কি সত্যই মেস থেকে রিভল-বার তার জমাদারনীর বালতির মধ্যে পুরে আবর্জনা ঢাকা দিয়ে স্পাইটার মুখের কাছে হাত নেড়ে নাক নেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল?

এ-প্রসঙ্গগুলিই অন্য প্রসঙ্গ। বিচিত্র চরিত্রের আওতায় আসতে পারে না। একটা হল, পাশে গ্রীণরুম রেখে মেক-আপ নিয়ে মঞ্চে এসে যতটুকু পার্ট ততটুকু বলে যাওয়া, আর একটা হল, আমাদের নাম-কীর্তনের আসর, সেখানে বেশভূষার আড়ম্বর নেই, এমনকি দাড়ি না-কামানো অবস্থা হলেও বাধে না, দলের সঙ্গে মত্ত রাজপথ বা পল্লী-পথে—হরি হরয়ে নমঃ হরিবোল হরিবোল বলে গান করা। তোমার গলা যেমনই হোক, গানে দখল যেমনই হোক, বিচার নেই, তুমি যেমন পারবে, তাতেই হবে, শুধু যেন কপটতা না থাকে।

তবে বলব। পাঠিকারা যখন এঁদের কথা জানতে চেয়েছেন তখন ওদের স্বরূপে আর একবার বৃদ্ধ বয়সের আসরে দেখা দিতে বলব। কিন্তু আজই নয়, সদ্যসদ্যও নয়। পরে।

উত্তরে আরও বলব যে, মেয়েদের কথা একবারে বলিনি, তা নয়। বলেছি। বলেছি হাতার-ডান্ডাধারিণী বিবাহবাসরে বিধবা-মহাজন পিসীর কথা বলেছি। তারপরই বলেছি কাল-বউয়ের কথা। আরও দু-একজনের কথাও বলেছি মনে হচ্ছে। মেয়েদের কথা আরও অবশ্যই বলব। তবে অনুপাতে সমান সংখ্যা রাখতে পারব কিনা বলতে পারি না। পারা সম্ভবপর নয়। নারী-চরিত্র বিচিত্র রহস্যপূর্ণ। পুরুষ সেখানে চিরকাল দিশা হারায়। মাতৃরূপে তাকে চিনতে পারি, কন্যা হিসেবেও তাকে চেনা যায়, কিন্তু নারী হিসেবে নারীর স্বরূপ আবিষ্কার সৃষ্টিতে কঠিনতম ব্যাপার; উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর তুষারঝড়-রহস্য বা অরোরা বোরিয়ালিসের দীপ্তি-রহস্য থেকেও জটিলতর রহস্যময় নারীর নারী-মন, নারী-জীবন, নারী-চরিত্র।

আমার এক-এক সময় মনে হয় নারী-রূপের পরম সম্পদ যে দুটি মোহিনীমায়া রহস্যভরা চোখ, সে-চোখদুটি ট্যারা। সে যখন রামের দিকে চেয়ে থাকে বলে রাম পুলকিত হয় এবং শ্যাম হিংসেয় জ্বলে মরে, তখন সে রামের দিকেও চায় না, হয়তো শ্যামের দিকেও তাকায় না, তখন সে মধুর দিকে তাকিয়ে থাকে। এবং বিস্মিত হয়ে ভাবে, আমি কাকে চাই? একে, না ওকে, না এই মধুকে? মন তার গান ধরে মনে মনে—

"মন জানে না মনের কথা
দিশেহারা পায় না কুল—
ভুল করে সই কূল হারলাম
অকূল দহে ফুটল ফুল।"

তাহলে একটি মেয়ের কথা বলি। কিন্তু প্রথমেই বাধছে। বাধছে এই কারণে যে, নামটি প্রকাশ করতে পারছিনে। না, তিনি কোন জানা-চেনা কেউ নন, খ্যাতিমতী নন, বিবাহিতাও নন—তবুও নাম প্রকাশ করতে দ্বিধা হচ্ছে। তাঁর বয়স আজ অন্তত পঞ্চাশের কাছে এসে থাকবে, হয়তো শ্যাম্পু-করা চুলের মধ্যে রুপোলী রেখার অসংখ্য ঝিকিমিকি ফুটে উঠে থাকবে। হয়তো বা মসৃণ ললাটে, মুখে দু-একটি শীর্ণ রেখাও পড়েছে। বিষণ্ন মনে তিনি আজ অতীত কালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

নাম ধরুন—'মলি'।

নাম থেকে বুঝতে পারছেন, মলি নগরের মেয়ে নাগরিকা। একালের মেয়ে সে, চুলে তেল দেয় না, শ্যাম্পু করে। মেয়েটি এক সময় আমার কাছে এসেছিলেন পরিচিত হতে। কালটা হাঁসুলীবাঁকের উপকথার কাল। সদ্য ৪৭ সাল পার হয়েছে—দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে। আমার কাছে এলেন অনেক প্রশ্ন নিয়ে। ঠিক ওইসব প্রশ্ন। একে কোথায় দেখলেন? পেলেন? এ বাস্তব, না কল্পনা? আপনি বলছেন সত্যি সত্যিই এইরকম ছিল সে? এইরকমই বলত সে?

মেয়েটিকে ভাল লাগত', তার কথার উত্তর দিতাম। চিঠিতেই বেশী প্রশ্নোত্তর চলত। কখনও আমার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাসায় এসে দেখা করতেন। কিন্তু তখন আমার জীবনের প্রতিটি দিনই ব্যস্ততা-প্রগলভ কর্মমুখর দিন। এবং ওই বাড়ীটি ছোট ছিল বলে একান্তে বসে কথাবার্তা বলার স্থানেরও অভাব ছিল। তাই কোনমতে কিছুক্ষণ বিশ-পঁচিশ মিনিট কি আধঘণ্টার বেশী কথাবার্তা হত না। এবং এর মধ্যে যাকে বলে নারী-পুরুষ সম্পর্কে সচেতনতা তাও ঠিক ছিল না। ঠিক ছিল না এই কারণে বলছি যে, এ সম্পর্কে চেতনাটা সহজাত, ওটা থাকেই, তবে উগ্রতাটাই হল প্রশ্ন।

একদিন খানকয়েক বই নিয়ে এল মেয়েটি। খানতিনেক। একখানা ছোট উপন্যাস অপর দুখানা ছোট গল্পের বই।

বললে—পড়ে দেখবেন।

—তুমি লেখ নাকি?

আরক্ত মুখে সে বলেছিল—লিখি। তবে ওই সামান্য। লেখা হয়েছে কিনা আপনি বলবেন। পড়ে দেখবেন তো?

—নিশ্চয় দেখব। এবং ভালই হবে বলে আমার বিশ্বাস। তোমরা এত লেখাপড়া শিখেছ—লেখা খারাপ হবে কেন? ভালই হবে।

—জানি না। দেখবেন পড়ে। তবে আমাকে খুশি করবার জন্যে যেন ভাল বলবেন না।

ছোট উপন্যাসখানা পড়তে বসে পৃষ্ঠা-কয়েক পড়ে আমার কৌতূহল যেন অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারের মত প্রবল হয়ে উঠল। মলির জীবন-কথা যেটুকু জানি বা শুনেছি, তার সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছিল।

বাইরে থেকে মলিকে কুমারী দেখালেও মলির বাল্যবয়সে বিয়ে হয়েছিল এবং সে-বিয়ে কোন কারণে নাকচ করে দিয়েছিল উভয় পক্ষ। পাত্র আবার বিয়ে করেছিল। পাত্রী বিয়ে করেনি, সে পড়াশুনো করে এম-এ পাশ করে মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করছিল। অধিকাংশ লোকেই জানত না যে, মলির বিবাহ হয়েছিল। মলি বিবাহিতা এ-কথাটাই লেখা যায় না বলেই লিখলাম—"মলির বিবাহ হয়েছিল।" মলি চিরকুমারী এইটেই তার প্রকৃত পরিচয়।

মনে হয়তো ক্ষুধা ছিল—তৃষ্ণা ছিল, হয়তো নিঃসঙ্গ অবসরে, বিনিদ্র রজনীতে দু-চার ফোঁটা কি অনর্গল অশ্রু বিসর্জন বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেও থাকতে পারে, কিন্তু কোন উতলা আচরণের বা এতটুকু আত্ম-

নিবেদনের আভাসও তার কাছে কেউ পেয়েছেন বলে আমি মনে করি না। আরও একটা বিশ্বাসের কথা বলি। তার কাছে অ্যাগরেসিভ হয়ে কোন লাভ ছিল না, সে দংশনের ক্ষমতা রাখত এবং তার ফণা ছিল।

উপন্যাসখানার গোড়ার দিকটায় তাকে খুঁজে পেয়ে গভীর আগ্রহসহকারে পড়ায় অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়েই মনে হল—নায়িকা—যার আত্মকথা, সে হারিয়ে গেল বা বদলে গেল।

পেলাম এক সন্ন্যাসিনীকে। যা তার বাস্তব অবস্থার এবং মনের চেহারার একদম বিপরীত। এবং যে-সন্ন্যাসিনী অবস্থা বা পরিণতিটা লেখার দিক দিয়ে আদৌ সহজ হয়নি বা ছন্দে মেলেনি।

অনেক গৃহাভিলাষিণী, পতিপুত্র-তপস্বিনী, আঘাতের ফলে গৃহাভিলাষে বা পতি-পুত্র তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বার্গাভিলাষিণী হয়ে কৃচ্ছ্রতাসাধনরতা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকেন, এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার মধ্যে যে ছন্দটি আছে লেখার মধ্যে সেই ছন্দটি পাইনি বলেই বুঝতে পেরেছিলাম, মলি পাঠক-পাঠিকাকে ঠকাতে চেয়ে নিজে ঠকেছে লেখিকা হিসেবে।

এরপর বেশ কয়েকদিন সে এলই না। কয়েকদিন পর তার একখানা চিঠি পেলুম। লিখেছে—"ক'দিন থেকে শরীরটা আদৌ ভালো যাচ্ছে না। সর্দি, তার সংগে একটু একটু জ্বর হচ্ছে। সারা শরীরে ব্যথা, ডাক্তারে বলছেন—ফ্লু হয়েছে। মাথা যেন চব্বিশ ঘণ্টা ভার হয়ে রয়েছে। তার সংগে মনে যে কি হয়েছে। মনে মনে যেন একেবারে ভেঙে পড়ছি আমি।"

সে-সময়টায় কলকাতায় ফ্লু হচ্ছিল। বেশ ব্যাপকভাবেই চলছিল। আমার নিজের বাড়ীতেও বাদ ছিল না। অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু চিঠির শেষটায় এসে খটকা লাগল। শেষদিকে লিখেছে—"এর মধ্যে আপনার কথা ভেবে যে কি উদ্বেগ হচ্ছে তা কি বলব? কেবলই ভাবছি, লেখাটা পড়ে কি বলবেন—কি বলবেন? আচ্ছা কেমন লেগেছে, লিখে জানাবেন আমাকে?

আমি চিঠির উত্তরে লিখেছিলাম—"যা তুমি জানতে চেয়েছ, তার উত্তরে আমার জবাব, 'সংসারে মানুষকে ঠকানো কি এতই সোজা মলি? এতে তুমি নিজেই ঠকেছ।' এর বেশী আলোচনা সাক্ষাতে হবে।"

ঠিক তিনদিনের দিন চিঠি পেলাম—"স্টার থিয়েটারে আপনার কালিন্দী নাটক দেখতে যাব—শনিবার। আপনি আসবেন? আপনার চিঠি পেয়েছি।"

শনিবার ছিল সেই দিনই। চিঠি পেলাম বেলা চারটেতে। অভিনয় সন্ধ্যে ছ'টায়। অসময় হয়নি, সময় ছিল। থিয়েটারে একটু আগেই গেলাম। দাঁড়ালাম রাস্তার ধারে গাড়ী-বারান্দার নিচে।

স্টারে কালিন্দী খুব ধুমের সংগে চলেছিল। মহেন্দ্র গুপ্ত খুব জমিয়েছিলেন বইখানা। অভিনয় হত, একস্ট্রা চেয়ার দিয়ে। লোকজনের প্রচুর ভিড়। তারই মধ্যে মলিকে এক সময় দেখতে পেলাম। সে ট্রাম থেকে নেমে তার ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই আমাকে যেন চ্যালেঞ্জ করলে—"আমি আপনাকে ঠকিয়েছি? আপনাকে আমি ঠকাব? বলুন কিসে ঠকেছেন—কি ঠকিয়েছি আমি?"

বললাম—তোমার ওই আত্মজীবনের ছাপপড়া ওই উপন্যাসখানায় তুমি হঠাৎ নিজেকে এমন করে গেরুয়া কাপড়, চুলে জটা মনে বৈরাগ্যের গোবরের লেপন বুলিয়ে খুব সযত্নে হারিয়ে দিয়েছ বা ঢেকেছ কেন?

মুহূর্তে মুখখানা তার শাদা হয়ে গেল। ওদিকে থিয়েটারের বেল বেজে উঠল। মিনিট-কয়েকের মধ্যেই যবনিকা উঠবে। আমার অবশ্য একটা বক্স নেওয়া ছিল। বললাম—চল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে একটু হাসল। সে-হাসির একটা আলাদা জাত আছে। সে-জাতের হাসি সব সময়ে বা ইচ্ছে করলেই হাসা যায় না। এবং সে-হাসির রব নেই। নীরবে নিঃশব্দে হাসে সে-হাসি। রাত্রের শিউলি ফোটা এবং ঝরার মত। হেসে বললে—চলুন।

(আগামী সংখ্যায়)

।। ভ্রম সংশোধন ।।

গত সংখ্যার বিচিত্র চরিত্র বিভাগে একটি মুদ্রণ-প্রমাদ সম্পর্কে লেখক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠিতে জানিয়েছেন :

সবিনয় নিবেদন,

আমার বিচিত্র চরিত্র পর্যায়ের বিলিতী মাস্টারের মধ্যে একটি গুরুতর ছাপার ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ-ভুল কার দ্বারা হয়েছে, তা জানি না। কম্পোজিটার অথবা প্রুফ-দেখিয়ে কে 'গোঁজ' শব্দটিকে সম্ভবতঃ বুঝতে না পেরে 'গোষ্ঠ' করে দিয়েছেন। লাইনটায় ছিল—"ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, ইতু এমনকি 'গোঁজ' পুজো থাকলেও তিনি সে-সব পুজো সমান ভক্তি বা অভক্তি-সহকারে যন্ত্রের মত করে দিয়ে চলে যেতেন।" সেখানে গোঁজকে গোষ্ঠ করেছেন; সম্ভবতঃ সন্দেহ হয়েছে। 'গোঁজ' যার সংস্কৃত অর্থ—'কীলক' সাদা বাংলায় যে কাষ্ঠখণ্ড বা বংশখণ্ডটিকে ঠুকে মাটিতে প্রোথিত করে তাতে গরু বাঁধা হয়—তাই। এবং এই সুপবিত্র বংশখণ্ডটির পুজোও অনেকে গোবংশ বৃদ্ধির জন্য বা গো-কল্যাণের জন্য বা গৃহের কল্যাণের জন্য করে বলে কথিত আছে। এবং এক ব্রাহ্মণ বালক তার পুরোহিত বৃত্তিধারী পিতার অনুপস্থিতিতে যজমান দ্বারা আহূত হয়েছিলেন এই 'গোঁজ' পুজার জন্য। 'গোঁজ'কে কোন্ মন্ত্রে পুজো করবে ভেবে না পেয়ে বালকটি নিজেই এই মন্ত্র রচনা করে নিয়ে তাই বিড় বিড় করে বলে পুজো শেষ করে দক্ষিণা নিয়ে চলে এসেছিল। মন্ত্রটি এইরূপ—

আমি জানি না, এসব আমার বাবা জানে
তবু যজমান আমাকেই আনে—
ন দোষং ন রোষং ন পাপং ন শাপং—
গোঁজ গোঁজ গোঁজায় নমঃ, গোঁজ গোঁজ
গোঁজায় নমঃ।

অর্থাৎ বিলিতী মাস্টারের পুজো অনেকটা এইরকমই ছিল।

নমস্কারান্তে। ইতি—

ভবদীয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
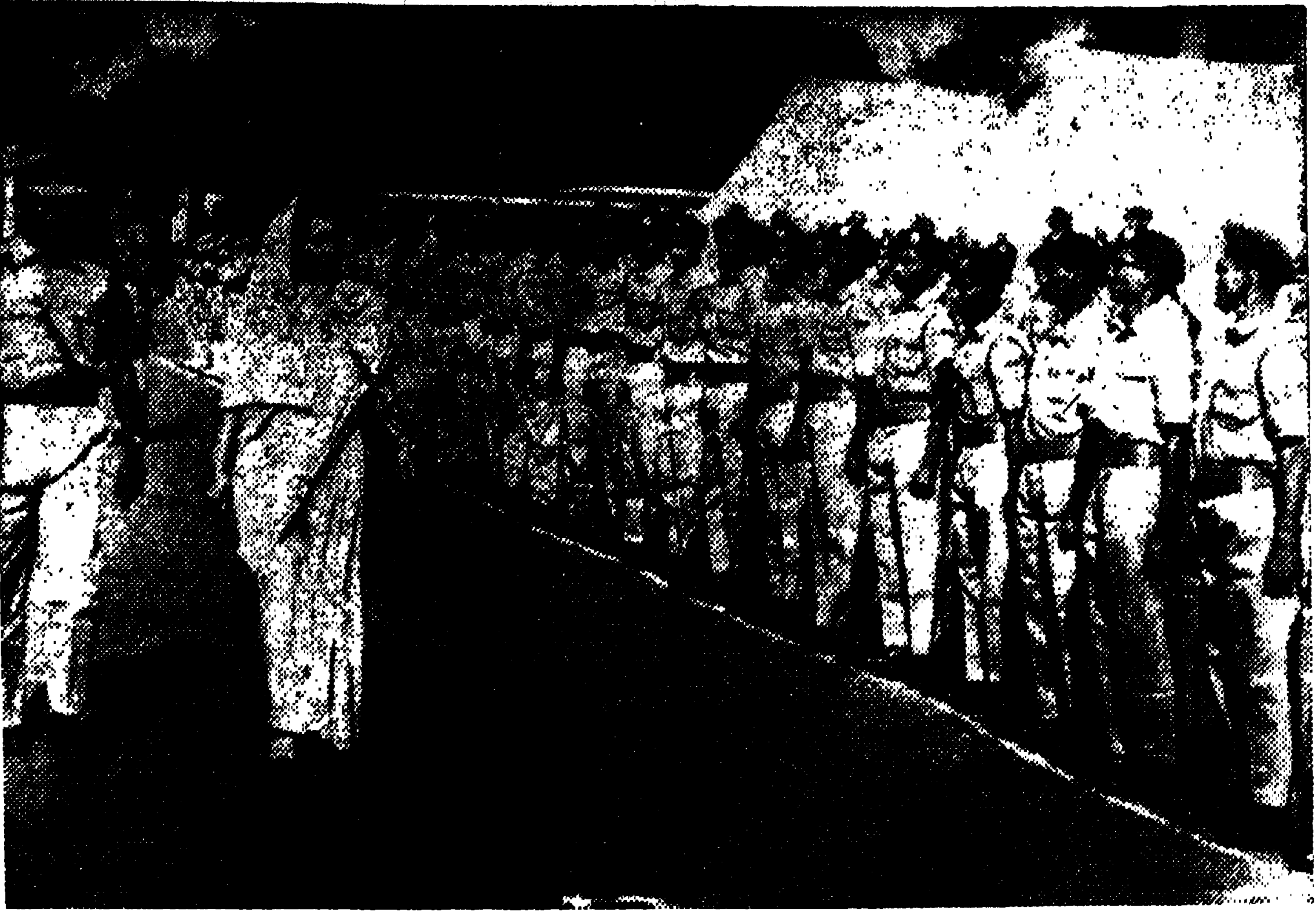
শান্তিনিকেতনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্বর্ধনা।

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব

অচিন রায়

শান্তিনিকেতনের পৌষ উৎসব বাংলার উৎসবগুলির মধ্যে আরেকটি উৎসবের সংযোজন। বলা যায় সর্বশেষ প্রবর্তনা। এই তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ হলেও, শান্তিনিকেতনের মেলা—এর পরি-পরিকল্পনা ও অনুমোদন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। এর জন্যে একটি 'ট্রাস্ট-ডিড্'-ও করে গিয়েছিলেন তিনি। বাংলার তথা ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের ভেদাভেদহীন মিলনকেই তিনি চেয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধ করতে। মেলার উৎসবে সম্মিলিত মানুষের "ধর্মভাব উদ্দীপন"-ই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। মহর্ষির 'ট্রাস্ট ডিড'-এ এই বিশেষ কথাটি স্পষ্টাক্ষরে আজো লেখা রয়েছে।

পৌষের সাত হচ্ছে উৎসবের শুরু। উৎসব চলে তিনদিন। অন্যান্যবারের মতো এবারেও সাতুই পৌষের উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সাতুই ভোররাত্রির সাড়ে চারটেয় বৈতালিক দলের পথপরিক্রমার মধ্যেই উৎসবের সূচনা হোল। গানের সুরে ভোরের আলো ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠতেই ছাতিমতলার ব্রহ্মোপাসনার বেদির চারপাশে জমে উঠল মানুষের ভিড়। মহর্ষির সাধনপীঠ এই ছাতিমতলা। ঐ দিনটি হোল তাঁর দীক্ষার বাৎসরিক উৎসব। শুরু হোল প্রার্থনাসভা। বৈদিক স্তোত্র থেকে মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রনাথের গান—সব মিলে একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই দিনটি আবার আশ্রমেরও প্রতিষ্ঠাদিবস। আত্মার মুক্তিই হচ্ছে সাত পৌষের মর্মবাণী। তাই এই স্মরণীয় পুণ্য-দিনটিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহর্ষির সাধনক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে। "তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যে প্রকৃতির কোলে ভূমার আলিঙ্গনে ভক্তজীবনের মঙ্গলময় প্রভাবে সুকুমারমতি বালকেরা বেড়ে উঠে মুক্তির আভাস পেয়ে ধন্য হবে।" (আমাদের শান্তি-নিকেতন—সুধীরঞ্জন দাশ)

আট পৌষ ছিল আশ্রমের সমাবর্তন ও প্রাক্তন ছাত্রদের মিলনোৎসব। আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি এর পূর্ব গৌরব বজায় রেখেছিল। গোবরমাটি দিয়ে মঞ্চে প্রবেশের জায়গাটি আগে থাকতেই নিকিয়ে মুছে পবিত্র করা হয়েছিল। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা তার উপর আলপনা এঁকে শুচি-সুন্দর করে রেখেছিল। এবারের আচার্য ইন্দিরা গান্ধী। ভিড় যেন তাই অন্যান্যবারের চেয়ে কিছু বেশী। হাজার হাজার মানুষ আম্রকুঞ্জের সর্বত্র ছড়িয়ে বসেছে। মাটিতেই

বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে একজন ছাত্রী অভিজ্ঞান-পত্র নিচ্ছেন।

সবার আসন। মঞ্চের একপাশে উপাধিগ্রহণ-কারীরা জড়ো হয়েছে। হল্দমণ্ডের উত্তরীয় ছাত্রদের চন্দনের তিলকে বরণ করা হোল। একে একে সকলে আচার্যের হাত থেকে পেলেন অভিজ্ঞানপত্র—সপ্তপর্ণীর একটি শাখা। মন্ত্রে, উপদেশে ও সংগীত পার-বেশনে অনুষ্ঠানটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যায় বিচিত্রার নাট্যঘরে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদের মিলনোৎসবটি উপস্থিত সুধীজনের পরস্পর প্রীতিময় আলিঙ্গনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

নয় পৌষ ছিল উৎসবের তৃতীয় ও শেষদিন। এই দিনটিকে বলা হয় স্মরণ-উৎসব। সকালবেলায় আম্রকুঞ্জে মিলিত হয়ে এইদিন সকলে আশ্রমের পরলোকগত ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মীদের স্মরণ করেন। তাঁদের শ্রাদ্ধতিথি উপলক্ষ্যে এদিন হবিষ্যান্নগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। উৎসবের এই তিনটি দিন আশ্রমবাসীদের অবশ্যপালনীয় ও পরম শ্রদ্ধা-ভরে স্মরণীয় পুণ্যদিন।

কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ বুঝি পৌষ মেলা। মন্দিরের উত্তর পূর্বদিকে বর্তমান রতনকুঠির গা ঘেঁসে যে বিরাট মাঠ সেখানে মেলা বসে। নাম ভুবনডাঙা। বীরভূমের গাঁয়ের মানুষ বুঝি তাই নাম দিয়েছিল ভুবনডাঙার মেলা। ধারেকাছের এবং দূরপাল্লার গ্রামবাংলার গরীব মানুষেরাই আগে আসত পসরা নিয়ে। কালনা-কাটোয়া-লাভপুরের মাটির মানুষে গিজ গিজ করত মেলাপ্রাঙ্গণ। এখন তার রূপান্তর ঘটেছে। শহরের মানুষের ভিড়ে গাঁয়ের মানুষকে খুঁজে পাওয়া ভার। শহরের শৌখিন জিনিসপাতি আড়াল করেছে গ্রাম-বাংলার কুটির শিল্পকে। ক্যামেরা, ট্রান-জিস্টার, আর ল্যান্ডমাস্টারে মেলা জম-

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে দেশিকোত্তম উপাধিপত্র গ্রহণ করছেন।

জমাট। কাফে-রেস্তোরাঁ-ফোটো স্টুডিও আর বড়ো বড়ো কোম্পানীর বিজ্ঞাপন কাউন্টার। নিওনের আলোয় মেলা ঝলমল। দোকানে দোকানে 'টাই' পরা সেলস্‌ম্যান।

অবশ্য একথাও ঠিক যে এখনও পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা ভারতবর্ষের অন্যসব মেলা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য কিছুটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। ছোটদের জন্য ছিল চিড়িয়াখানা, পুতুলনাচের আসর, ম্যাজিক, নাগরদোলা—আর ছিল জি বি সার্কাসের মনমাতানো খেলা। সাঁওতালদের খেলাধূলো, কবির লড়াই, কৃষ্ণকীর্তনের পালা, মনসামঙ্গল আর যাত্রাগানের জমাটি আসর মেলাপ্রাঙ্গণকে জীবন্ত করে তুলেছিল। বাউলগানের আসরটি সত্যিই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবার বাউলেরা সংখ্যায়ও ছিল বেশী। শুকনো তালপাতায় ঘেরা তাদের খুপরির চারপাশে সবসময়ই একটা ছোট-খাটো ভিড় থাকতে দেখা গিয়েছে। কয়েকজন চিত্রশিল্পীকে দেখলাম বাউলদের ছবি আঁকতে ব্যস্ত। কেউ কেউ টুকে নিচ্ছিল গানের কলি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শুক্রবার শান্তিনিকেতনে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন।

ফার্স্ট ক্লাস

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আসানসোল স্টেশনে হাওড়া পর্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে বেশ নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানতে-টানতে পত্রিকার স্টলে নানা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। প্রায় চার ঘণ্টার পথ অন্তত যে বসে যেতে পারবো তাতে সন্দেহ ছিল না। প্রথম ধাক্কা খেলাম তিন ঘণ্টা লেট করে ট্রেন আসবার খবরে। আমরা যারা সভ্য মানুষ, অর্থাৎ সকালে বাজার করা, র‍্যাশনের দোকানে কিউ দেওয়া, নাকেমুখে গুঁজে কোনরকমে বাস-ট্রামের পাদানিতে পা ছুঁইয়ে এক হাতে প্রাণ আর অন্য হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে প্রত্যহ আপিস করা যাদের কাজ তাদের কাছে আর যেটাই সমস্যা হোক না কেন সময় কাটাবার সমস্যা সচরাচর হয় না। তাই হঠাৎ এই ফালতু তিন ঘণ্টা পেয়ে গিয়ে বেশ হকচকিয়েই উঠলাম। সময় কাটানোও একটা সমস্যা বৈকি! আমরা যখন আরো সভ্য হয়ে উঠবো, অধিকাংশ কাজই যখন মানুষের বদলে যন্ত্র করবে, মানুষ যখন অঢেল সময় পাবে তখনকার অবস্থার কথা ভেবে মনে-মনে শিউরে না উঠে পারলাম না। তখন হয়তো মানুষকে এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করার জন্য মাথা খাটাতে হবে যার বোতাম টিপলে সংগে সংগেই তিন ঘণ্টা কেটে গিয়ে তিন মিনিট হয়ে যায়!

কিন্তু দুর্দিনের রাত এক সময় ভোর হয়। অনেক ভাঁড় চা খেয়ে, অনেক সিগারেট টেনে, প্ল্যাটফর্মে অসংখ্যবার পায়চারি করে আমারও দুঃখের তিন ঘণ্টা কাটলো। ট্রেন এলো। কিন্তু তখনো যে কপালে আরো দুঃখ আছে কে জানে! কামরাগুলো মানুষ দিয়ে কাঁঠাল-ঠাসা। থার্ড ক্লাস আর ফার্স্ট

ক্লাসের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। সব যাত্রীই সমান। কিন্তু সমান হলেও ভাই-ভাই নয়। একে গরম, তায় ট্রেন লেট, তায় অধিকাংশই চলেছে দাঁড়িয়ে। বহু কষ্টে কোনরকমে একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় সেঁধলাম, তারপর বাকি চার ঘণ্টা আরো কষ্টে কোনোরকমে নিজের মেজাজ আর ব্যালেন্স বজায় রেখে এক সময় হাওড়ায় যখন পৌঁছলাম তখন আমার মধ্যে আমি আছি কিনা উপলব্ধি করার মতো মনের অনুকূল অবস্থা নয়।

আমার দুর্গতির কথা অনিলদাকে বলছিলাম। অনিলদা সর্বজনীন দাদা। পরের কথা শুনতে তিনি ভালোবাসেন। আরো ভালোবাসেন নিজের কথা বলতে। অন্যের কাহিনীর সঙ্গে নিজের জীবনের অনুরূপ কাহিনী বানাবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। মন দিয়ে আমার কথা শুনে নিজের অতীত জীবনের যে-ঘটনার কথা তিনি বললেন তাই লিখে আমি খালাস—বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার দায় আপনাদের।

"প্রায় কুড়ি বছর আগে আমার জীবনেও অনেকটা এ-রকম ঘটনা ঘটেছিল। একটা মামলার ব্যাপারে আমাকে যেতে হয় বর্ধমান। সেখানকার কাজ সেরে আসানসোলে গিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে গিন্নিকে নিয়ে ফেরার কথা। মামলার ঝামেলায় বর্ধমানে আমার দেরী হয়ে যায়। ইস্টিশানে গিয়ে দেখি আসানসোলে যাবার শেষ ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। আমি না পৌঁছলে গিন্নি ভাববে বলে দুর্ভাবনা হচ্ছিল না। কারণ তোমরা যাই বল না কেন, ভায়া, আমি ঠেকে শিখেছি গিন্নিরা আর যার কথাই ভাবুক না কেন, কর্তাদের নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নয়। আমার আসল দুর্ভাবনা—তখন শীতকাল আর আমার কাছে বিছানাপত্তর নেই। মনমরা হয়ে ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে পথের পাশের একটা চায়ের দোকানের সামনেকার নড়বড়ে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম।

"উদাস গলায় গরম এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে জুলজুল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। মন ভালো হবার মতো কিছুই চোখে পড়ে না। পাশের খোলা নালার দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসার জোগাড়। বাঁ পাশের বুড়ো অশত্থ গাছে পেরেক দিয়ে আটকানো রঙচটা ত্যাবড়া লেটার-বক্সটা যেন চোখ মটকে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে। পথের ধুলোয় ঘেয়ো একটা লেড়িকুত্তা পাকিয়ে শুয়ে ঘুমতে ঘুমতে মাঝে মাঝে ল্যাজ নাড়িয়ে মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছে।

"আচমকা যেন মাটি ফুঁড়ে অদ্ভুত এক জীব বেরিয়ে এসে ধপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। তারপর গায়ের নোংরা কুটকুটে কোটের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে চায়ের দোকানের দেয়াল থেকে ঝোলানো জ্বলন্ত দড়ি থেকে ধরিয়ে নিলে। সশব্দে মোক্ষম এক টানে আধখানা বিড়ি শেষ করে এমন একটা শব্দ করে সে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল যেন মনে হয় বিশ্বসংসারের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। তারপর যেন তাঁর হুঁস হল পাশে একটা লোক বসে আছে। ধূর্ত চোখে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকাল।

"প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা দালাল-টালাল গোছের। কিন্তু আমার ভুল ভেঙে সগর্বে জানাল সে বাস কণ্ডাক্টর, অল্প

চোখ মটকে মধু ঝরিয়ে হাসল

পরেই তার বাস যাবে আসানসোলে। প্রথমে তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। এ যে মেঘ না চাইতেই জল! লোকটার মুখে যেন তুবড়ি ফুটছে। অনেক খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ করলাম। জানলাম তার বাসে তিনটে ক্লাস : ফার্স্ট, সেকেন্ড আর থার্ড। আমাকে জোর দিয়ে বলল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটতে। টিকিট কিনে সিটে গিয়ে বসলাম, হাঁ ভায়া, যাস্তবিকই বসলাম।

"সে-বাসের তুলনা নেই। একবার চড়লে পিলে থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চমকে ওঠে। খুব নোংরা বললে খুব কমিয়েই বলা হয়। সিটগুলো ছেঁড়া, স্প্রিঙের বালাই নেই। কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে তো আর চলে না। তাই হাসি-হাসিমুখে বসে মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম গিন্নির জন্যে প্রচণ্ড আত্মত্যাগ করতে চলেছি। শুধু সেটা যদি তিনি জানতেন।

"ক্রমশ বাস বোঝাই হতে লাগল : স্ত্রী-পুরুষে, বাচ্চা-বুড়োয় আর হরেক রকম জিনিসে—একজোড়া সাইকেল থেকে পচা মাছের চুবড়ি পর্যন্ত। ভীড়ের চাপে সরতে-সরতে কোণে গিয়ে পৌঁছলাম। যে-মোটা লোকটা আমার গা ঘেঁষে বসল মনে হল সে যেন মানুষ নয়, পচা খসখসে একটা গোবরের গাদা। সবিনয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট তার আছে কিনা। মুচকি হেসে আমাকে অবাক করে দিয়ে সে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বার করল। আমার সর্বাঙ্গ রাগে রি-রি করে উঠল। আমাকে ঠকানো! আমার সঙ্গে জোচ্চুরি! গলা সপ্তমে তুলে কণ্ডাক্টরকে লক্ষ্য করে আমি চেঁচাতে লাগলাম। সে কিন্তু একটুও উত্তেজিত হল না। তার হাসি থেকে যেন মধু ঝরছে। চোখ মটকে চাপা গলায় আমাকে অনুরোধ করল খানিক ধৈর্য ধরে থাকতে।

"কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে তা খণ্ডাতে পারে? হাল ছেড়ে চুপচাপ বসে রইলাম। বাস ছাড়ল। তার সর্বাঙ্গ ঝরঝর করছে, কেঁপেকেঁপে উঠছে। বাসের যাত্রীরাও ম্যালেরিয়া রোগীর মতো সেই সঙ্গে কাঁপতে লাগল। আমি ছাড়া অন্য যাত্রীরা এ-সব তুচ্ছ অসুবিধে ভ্রুক্ষেপও করল না। কেউ নির্বিকারভাবে বিড়ি টানছে, কেউ পান চিবচ্ছে। কেউ-কেউ নিজেদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া করছে। কেউ-কেউ এমন কি ঢুলতেও শুরু করে দিল—ভগবানই জানেন এই আবহাওয়ায় ঘুমতে পারল তারা কী করে।

"ঘণ্টা দেড়েক পরে হঠাৎ ভয়ঙ্কর রকম থরথর করে কেঁপে একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ করতে করতে বাসটা থেমে গেল। আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। শীতের গোটা রাত পাণ্ডবশূন্য জায়গায় এইসব যাত্রীদের সঙ্গে এই জঘন্য বাসের মধ্যে কাটাবার কল্পনায় মনে তো পুলক লাগার কথা নয়! উদ্বিগ্ন হয়ে কণ্ডাক্টারের দিকে তাকালাম। আবার সে চোখ মটকে মধু ঝরিয়ে হাসল তারপর একেবারে অন্য সুরে বজ্র-গম্ভীর গলায় হুংকার ছাড়ল : 'ফাস্ কিলাস্ বৈঠিয়ে......সিকন্ কিলাস উতর যাইয়ে......থাড কিলাস ঠেলিয়ে!'

"বার তিনেক বাস থেমেছিল। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস টিকিটের দৌলতে শেষ পর্যন্ত বসে-বসেই আসানসোলে পৌঁছেছিলাম।"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

মোরারজী-দর্শন

শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই বর্তমান ভারতের একজন প্রথম সারির রাজনীতিবিদ। তিনি দু'বার পরাজিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর দৌড়বাজিতে কিন্তু তৃতীয়বারে তিনি যে বিজয়মাল্য লাভ করবেন না তা হলফ করে বলা যায় না। সম্প্রতি তাঁর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং এই দেশে 'মেজর পলিটিশিয়ান' হিসাবে স্বীকৃত এই মোরারজী-দর্শনের অনেক প্রকার ভাষ্য ও টীকা এদিক-ওদিকে নজরেও পড়ছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যাঁরা সে-যুগের অর্থাৎ স্বাধীনতাপূর্বকালের প্রথম সারির নেতা ছিলেন তাঁরা একে একে সবাই সরে পড়েছেন অন্যলোকে নয়ত অন্যদলে। বর্তমানের রাজনৈতিক নায়করা তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নবীন এবং তাঁদের খ্যাতিও সীমিত।

মোরারজী দেশাই কিন্তু স্বল্পখ্যাত মানুষ নন। তিনি অর্থমন্ত্রী হিসাবে যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তারচেয়ে বেশী খ্যাতিলাভ করেছেন এইবার ইন্দিরাজীর কাছে পরাজিত হয়ে। আর একটি কারণে তাঁর প্রবল খ্যাতি, তাঁর উৎকট নৈতিক মতামত সম্পর্কে সকলের একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে, তিনি কঠোর নীতিবাগীশ, তাই তাঁর আর এক নাম 'মরালজী'। মোরারজীর মতবাদ অনেকেরই জানা আছে, সেইসব বক্তব্য দু'টি মলাটের মাঝখানে একত্রে গ্রথিত করে পরিবেশিত হয়েছে 'ইন মাই ভিউ' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে।

রাজনীতিবিদদের হাতে প্রচুর অবসর থাকে না, তিনি তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, তাই নেহরুজী তাঁর গ্রন্থাদি লিখেছেন কারাগারে বসে। মোরারজীর রাজনৈতিক দর্শন হয়ত রচিত হয়েছে তাঁর মন্ত্রিত্বের গদী থেকে নেমে আসার পর। বিভিন্ন কালে বা প্রসঙ্গে নেতারা যেসব কথা বলে থাকেন সেইগুলিকে একত্রিত করে পরিবেশন করলেও গ্রন্থ হয়। কিন্তু সেই জাতীয় গ্রন্থে কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনোভঙ্গী বা মতবাদ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সকল রকমের উক্তিকেও আবার সর্বজনোপযোগী করা যায় না। আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁরা যা বলেছেন তার একত্রিত সমাবেশ বিশেষ কোনো একটা সংহত এবং সংলগ্ন মতবাদ প্রকাশ করবে না। উক্তির মধ্যে গ্রহণযোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহ্য কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। মোরারজীর কিন্তু মত বেশী পরিবর্তিত হয়নি। স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন, রাজন্যবর্গের প্রিভি-পার্স, মদ্য নিবারণী ব্যবস্থা কিংবা কাশ্মীর নীতি ও ভারত-পাক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মতবাদ একটি বাঁধা জায়গায় আটক আছে। কোনো নড়চড় নেই। ভাষা প্রশ্নে তাঁর মতবাদ সুস্পষ্ট, তিনি উৎকট হিন্দীপ্রেমী হিসাবে খ্যাত।
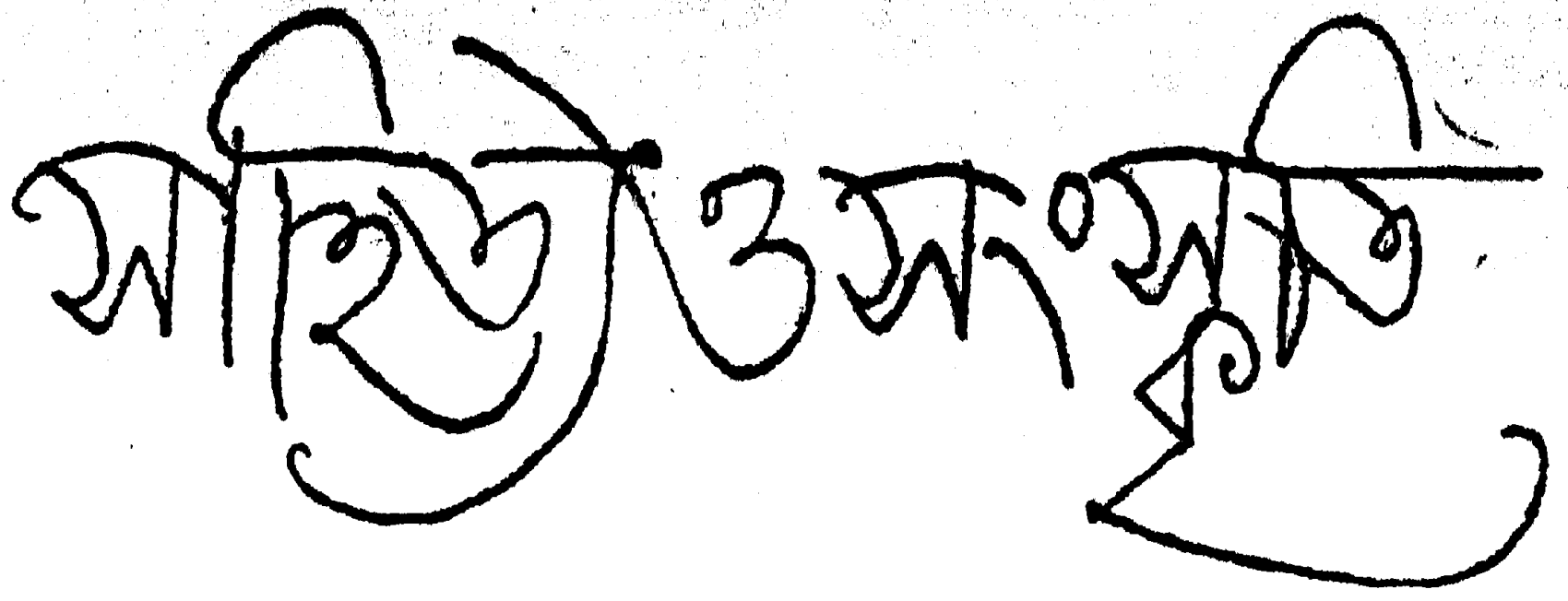
মোরারজীর এই যে অবিচল দৃঢ়তা তার মূলে আছে তাঁর শক্তি এবং দুর্বলতা। এই শক্তির কারণ তাঁর একগুঁয়েমি, কারণ কোনো কিছুতেই তিনি নিজের বাঁধা মত থেকে এক-চুল সরে আসবেন না কোনোমতেই। প্রয়োজন হলেও একটা সামঞ্জস্য সাধনেও তাঁর আগ্রহ নেই। আবার তাঁর এই আবিলতা, এই ধরনের মনোভঙ্গীকে অবাধ্যতা বা নিছক এক-গুঁয়েমি ছাড়া কিছুই মনে করা যায় না। যে অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার মধ্যে দেশ এখন দিনাতিপাত করছে তার মধ্যে রাজনীতি একটা চলতি সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন আর্ট মাত্র। সম্ভাব্য পরিণতি বিষয়ে যে বিশ্লেষণ বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল—এবং যে নেতার সেই পরিবর্তনজনিত মতপার্থক্য বা বিপরীত মত গ্রহণের মতো মানসিক ঔদার্য নেই তাঁকে তাঁর বিশ্বাস নিয়ে অবিচল থাকার একটা চড়া মূল্য দিতেই হয়।

মোরারজী দেশাই সে চরমমূল্য দানে সর্বদাই প্রস্তুত। বিগত জুলাই মাসে বাঙ্গালোরে এ আই সি সি সভায় মেরারজী যে ভাষণ দান করেন তার মধ্যে এই অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। তাঁর বক্তব্য ছিল প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদ যা বিধিবদ্ধ আছে তার বিলোপসাধন না করা, মেরারজী জানতেন তাঁর স্বমতে তিনি কিছুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবেন না। তবু তিনি নিজের মত থেকে নড়ে আসেন নি। তিনি জানতেন এই মতবাদের বিরোধীদের যুক্তিও প্রবল, এমন কি তাঁর এই চেষ্টার পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থজড়িত এমন ভুল বোঝাবুঝিরও অবকাশ ছিল, রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড এইদিক থেকে মোটেই লাভজনক নয়, তথাপি তিনি মনের কথা বলতে পিছু হটেন নি। এই যে দুর্দমনীয় আবেগ, মনে যা জেগেছে তা প্রকাশ করার আকুলতা, এর মধ্যে অবশ্যই একটু মানুষের জীবনের ভিত্তিগত বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য মেরারজীকে প্রশংসা করা যায়।

অবশ্য এই মনোভঙ্গীর পিছনে আছে এমন এক আদর্শবাদ যা প্রতিটি খাঁটি গান্ধীভক্তের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে বর্তমান। মোরারজী আজো যে এই আদর্শ আঁকড়ে ধরে আছেন তার একটা কারণ হয়ত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রভাব। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে মোরারজী বল্লভভাই প্যাটেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন প্রবলভাবে। সর্দার বল্লভভাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাই "the Sardar, the name of action" সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ ব্যয় করে মোরারজী লিখেছেন :

> "Men like Sardar Patel are destined to be favourably Judged by historians of the future and misunderstood, more or less, by their contemporaries".

হয়ত স্বয়ং মোরারজী দেশাই সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

এই গ্রন্থটির মধ্যে নিজস্ব মতবাদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সাধনের প্রচেষ্টা আছে। তিনি যে একজন কঠিন, গোঁড়া, অবাধ্য, অনমনীয় এবং বাতিকগ্রস্ত মানুষ এইরকম একটা বাজার-চলতি ধারণা আছে, সেই ধারণাকে যথাসম্ভব চুনকাম করে একটা সংস্কৃত রূপদান করাও মোরারজীর উদ্দেশ্য। তিনি একজন যুক্তিবাদী রাজনৈতিক নেতা, অপরের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধাশীল নন, এই ধারণা ভ্রান্ত, তিনি সত্য এবং নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এই ধরনের একটা চিত্র এঁকে সকলের সামনে ধরাই মোরারজীর উদ্দেশ্য। তিনি একজন আত্মবিশ্বাসী, নিজ মতবাদে দৃঢ়সংকল্প মানুষ, সেই সত্য এবং আদর্শনিষ্ঠার বলেই অজস্র প্রতিবাদ এবং ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তিনি নিজস্ব মত আঁকড়ে

ধরে আছেন এই কথাটা প্রকাশ করাও এই গ্রন্থের একটা উদ্দেশ্য।

মোরারজী কিন্তু একটু ভুল করেছেন, এই ত্রুটির কারণ সম্ভবত একটি এবং সেই একটি কারণই মহামূল্যবান। এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে রাজাজী, গান্ধীজী, নেহরুজী, নেতাজী, আবুলকালাম আজাদ প্রভৃতি যাঁরা নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের সকলেরই হাতে ছিল সাহিত্যিকের লেখনী। সাহিত্যিকের লেখনীর ইন্দ্রজাল স্পর্শে এ'দের সকলের রচনাই পাঠকচিত্তকে আকুল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। মোরারজী সাহিত্যিক নন, তিনি একজন রাজনীতিবিদ, এবং সেই রাজনীতির ক্ষেত্রেও যেন তাঁর শিক্ষানবীশীর কাল এখনও অতিক্রান্ত হয়নি। ফলে তাঁর গ্রন্থ "ইন্ মাই ভিউ". তাঁর মত হিসাবে মন্দ মনে হবে না, কিন্তু সব জড়িয়ে একটা হযবরল হয়ে উঠেছে, সুবিন্যস্ত এবং সুপরিকল্পিত ভঙ্গীতে এই বক্তব্য পেশ করতে পারলে তা অনেক মূল্যবান হত। গ্রন্থটি সুসম্পাদিত নয়, তাই এর মধ্যে আছে বহু পুনরুক্তি, বহু বাহুল্যজনক উক্তি এবং মাঝে মাঝে আছে পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য।

মোরারজী মদ্যনিবারণী প্রসঙ্গ, স্বাধীন সংবাদপত্র, ইংরাজী হটিয়ে হিন্দি, নিরামিষবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজস্ব মতবাদ বেশ জোর গলায় বলেছেন। তিনি জাতি-বর্ণনির্বিশেষে বিবাহবিধির সমর্থক, তবে সেইসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাস আঁকড়ে থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাঁর মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তবে কৃত্রিম উপায়ে যদি সন্তান জনন রোধ করার ব্যবস্থা করা হয়, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। তিনি দলনিরপেক্ষ নীতির সমর্থক, তবে কেউ কেউ যে তাঁকে 'মার্কিন অভিমুখী' নেতা বলেন তার প্রতিবাদও করেছেন।

আদিগন্তব্যাপী জরিপ করে মোরারজী সর্ববিষয়ে অভিমত দিয়েছেন, তাঁর মতে—

"it is incumbent upon us to recognise Israel" পিকিং যা খুশি মনে করুক, ফর্মোসার স্বাতন্ত্র্য ভারতের স্বীকার করা উচিত। ভারতের প্রধান শত্রু তিনটি—দারিদ্র্য, পাকিস্থান, চীন। এই তিনের একমাত্র মহৌষধ বা প্রতিষেধক— "Defence through development" —

উন্নয়নই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। মানুষকে আরো ক্লেশ স্বীকার করতে হবে, একেবারে গলা টিপেও তাদের দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করাতে হবে—

"the only way out for us is the path of austerity. Unless this is done and done ruthlessly.

আমাদের উন্নতি নেই, মুক্তি নেই, নিস্কৃতি নেই। দেশাইজীর গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় বার বার তিনি 'রুথলেশ' হয়েছেন এবং 'মাস্ট' কথাটিরও ছড়াছড়ি। অর্থাৎ তিনি নিজে নরম নন, তিনি চান যে, একেবারে নির্মম নির্মোহ হয়ে শাসনযন্ত্রের চাকা চালাতে হবে। সর্দার বল্লভভাই-এর এই মন্ত্রশিষ্য সর্দারজীর সদ্গুণের অধিকারী না হলেও, তাঁর অন্য গুণের কিছুটা বোধহয় পেয়ে থাকবেন। পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁর মন্তব্য বেশ স্পষ্ট এবং সহজ, যেমন আজাদ কাশ্মীর উদ্ধার করতে হবে। পিকিং-এর কাছ থেকে আমাদের অঞ্চল ফিরিয়ে নিতে হবে। তবে আকশাই চীন সম্পর্কে একটা সমঝোতা করা যেতেও পারে। কমনওয়েলথে থাকা উচিত, ইউনাইটেড নেশনেও তবে—

"Can we describe definitely the gain that we have obtained by being a member?"

সবচেয়ে চমকপ্রদ উক্তি সরকারী চাকুরে এবং সংবাদপত্র সম্পর্কে। তিনি বলেছেন—

"Any member of the Services found talking disparagingly of the Government or its policies should be removed from Service".

সুতরাং সরকারী চাকুরেরা অফিসে পেঁৗছেই প্রতিদিন যেভাবে মন্ত্রীদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ আধঘন্টা আলোচনা করে তবে কাজে বসেন, তাঁর আমলে তা চলবে না।

মোরারজী সম্পর্কে অভিযোগ যে, তিনি মাদকদ্রব্য বিরোধী, সুরাপান নিবারণী প্রসঙ্গে তাঁর মনোভঙ্গী অতিশয় কঠোর, কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠে জানা গেল যে, 'এলকহ্যল' একেবারে অসার বস্তু নয়, বাতের ব্যাধিতে অব্যর্থ, যদি অবশ্য অঙ্গে মালিশ করা হয়। এর কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা তখন থাকবে না—গাত্র মার্জনা করার উদ্দেশ্যে এলকহ্যল ব্যবহার করা চলতে পারে। অনেকে পিসিমার বাতব্যাধির নাম করে এলকহ্যল পারমিট পেয়ে যাবেন।

এতবড় একখানি গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে সমালোচনা করা কঠিন। নেপোলিয়ান-জননীর মতো পাঠককে বলা উচিত—'বৎস, পাঠ করো, তবেই জানতে পারবে।' তবে সংবাদপত্র সম্পর্কে উক্তিটি চুপি চুপি বলাই ভালো। মোরারজী ফ্রী প্রেসে বিশ্বাসী, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পবিত্র বস্তু। তবে যদি কোনও সংবাদপত্র বেয়াদবি করে, তাহলে

"the press ought to be forfeited. This alone with act as a deterrent".

গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী (তাঁর নিজের মতে) মোরারজীর এই জীবনবেদ সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং ইতিহাসে আগ্রহশীল মানুষ মাত্রেরই পড়া উচিত। গুরুভার গ্রন্থের ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে পাঠক অনেক মজা উপভোগ করতে সক্ষম হবেন।

—অভয়ঙ্কর

IN MY VIEW : (Personal Essays) — By Morarji Desai. (Thacker & Co Bombay 1 : Price Rs. 13.50 only.

ভারতীয় সাহিত্য

অমৃত ও যুগান্তর পুরস্কার ॥

সদাসমাপ্ত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনের সমাপ্তি-দিবসে 'অমৃত' ও 'যুগান্তর' পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। সাহিত্যিকদের সম্মান ও স্বীকৃতিদানই হচ্ছে এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য, নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সেবা করার জন্যে এ-বছর 'অমৃত' পুরস্কার পেয়েছেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'যুগান্তর' পুরস্কার লাভ করেন মারাঠী সাহিত্যিক শ্রী বি আর চরঘড়ে। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

শুদ্ধ কবিতার সন্ধানে ॥

বিভিন্ন আদর্শ এবং কাব্য অনুভবের সংঘাতে সাম্প্রতিক কবিতার জগৎ ভয়ানক মাত্রায় চঞ্চল। এরই মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এক শ্রেণীর কবি কবিতাকে একমাত্র আত্মগত শিল্প হিসেবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করে চলেছেন। কবিতার ইতিহাসে এই কাব্যধারার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রতি প্রখ্যাত হিন্দি কবি শ্রীদিনকর এই কাব্যধারার উপর হিন্দি ভাষায় একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটির নাম, 'শুদ্ধ কবিতা কি খোঁজ'।

আলোচনার আরম্ভ করেছেন তিনি বোদলেয়র, এডগার অ্যালান পো-র কাব্য-চেতনা থেকে এবং ক্রমশ মালার্মে, র‍্যাঁবোর কবি-কৃতী আলোচনা করে তিনি সমকালীন জার্মান, রুশ, ইংরেজি সাহিত্যে তাঁদের প্রভাবের উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। এর পর তিনি ভারতীয় সাহিত্যে এই আধুনিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অবশ্য ভারতীয় সাহিত্যের দু'একজনের নাম করলেও তাঁর রচনা মূলত হিন্দি সাহিত্যের উপর। তাই লেখক যদি এই অধ্যায়ের নাম 'ভারতীয় সাহিত্য' না রেখে 'হিন্দি সাহিত্য' রাখতেন, তাহলে খুবই যুক্তিযুক্ত হত। কেননা, ভারতীয় কবিতার ইতিহাসে বাংলা ও তামিল কবিতা যখন উচ্চতম স্থান অধিকার করে আছে, তখন ভারতীয় সাহিত্যের নামে কেবল হিন্দি কবিতার আলোচনা একদিক থেকে ক্ষতিকর ও পক্ষপাতদুষ্ট।

কবি হিসেবে দিনকর জাতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত। এদিক থেকে তাঁর 'সংস্কৃতি কি চার অধ্যায়' নামক গ্রন্থটি খুবই উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি বোম্বে থেকে ইংরেজিতে তাঁর পঁয়ত্রিশটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংকলন 'ভয়েস অব দি হিমালয়াম' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কাব্য-অনুভবের দিক থেকে জাতীয়তাবোধ প্রচারের

প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'শুদ্ধ কবিতার সন্ধানে' গিয়েও তাই তাঁর অভিমান খুব সীমিত হয়ে পড়েছে। তাঁর কাব্য-বিচারও সংস্কৃত আলংকারিক আদর্শের দ্বারাই সীমাবদ্ধ। শুদ্ধ কবিতা বলতে তিনি মনে করেন—

> "Pure poetry is alienating itself from life and its problems, metaphysically and otherwise, and it will need nowhere".

যাই হোক, তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থটি যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কবিতা অনুরাগী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি অপরিহার্য।

কানাড়ি সাহিত্যে হাস্যরস ॥

হাস্যরস যে-কোনও সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কানাড়ি সাহিত্যেও এর কোনও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। সম্প্রতি কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কানাড়া সাহিত্যডালি হাসা' নামে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির রচয়িতা ডঃ এম এস সুনকাপুর।

গ্রন্থটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। এতে অষ্টম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন উদাহরণসহযোগে কানাড়ি সাহিত্যের হাস্যরসের পরিচয় পরিস্ফুট করা হয়েছে। তবে সমকালীন সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা আলোচনাটি খুবই খণ্ডিত, তাছাড়া কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশেও তিনি খুব সংযত মনের পরিচয় দেননি। যেমন প্রখ্যাত কানাড়ি সাহিত্যিক 'কুভেম্পু'কেই তিনি কানাড়ি সাহিত্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ কানাড়ি সাহিত্যের ইতিহাসে পাঠ করলে জানা যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হচ্ছেন শ্রী বি এম শ্রীকান্তিয়া। এ ছাড়াও আরও কিছু তথ্যের ভুল গ্রন্থটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু সাম্প্রতিক কানাড়ি প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটির অবদান উল্লেখ্য।

একজন মালায়লম লেখক ॥

সাম্প্রতিক মালয়ালম সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল শ্রীপনকুন্নাম ভার্কি'র নাম মালয়ালমভাষী অঞ্চলের বাইরে প্রায় অপরিচিত বলা যেতে পারে। বাঙালী পাঠকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও সীমিত, অবশ্য তাঁর একটি গল্প এর আগে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতীয় গল্প সংকলনে' স্থান পেয়েছে। এই গল্পটি জার্মান ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, ভার্কি'র নাম তেমন পরিচিত নয়।

কেরলের কোয়াট্টাম জেলাকে কবিতীর্থ বলা যেতে পারে। প্রখ্যাত কবি শ্রীকুঞ্জিরমন নায়ার এখানেই একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। ভার্কি'র জন্মও এই জেলাতেই ১৯১২ সালে। ছোটবেলায় তিনি একটি মিশনারি স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে তিনি 'বিদ্বান' উপাধি লাভ করেন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সেই তিনি একটি বিদ্যায়তনে মালয়ালম ভাষার শিক্ষকরূপে কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি মালয়ালম ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প পাঠ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জবানী থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিই তাঁকে প্রথম সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে।

ত্রিশের দশক কেরলের জীবনের ভয়াবহ সময়। তৎকালীন দেওয়ানের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশ ক্ষুব্ধ, এর আত্মপ্রকাশ কিন্তু ঘটেছিল সাহিত্যে এবং শিল্পে। ভার্কিও এই সময় গল্প, প্রবন্ধের মাধ্যমে সেই অভিব্যক্ত চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে থাকেন। চার্চের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী তখন জনমনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবেই একদিন ভার্কি তরুণ প্রগতিশীল মালয়ালম কবি-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন এবং কিছুকাল তিনি কারাবরণও করেন।

ভার্কি'র রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে যে-সমস্ত চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে। অবশ্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি অধিকাংশই গ্রামীণ। মূলত কৃষক-জীবনের সংগ্রাম, ভালোবাসা ইত্যাদিই তাঁর রচনার প্রধান প্রস্থানভূমি। এখন পর্যন্ত তাঁর ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্প্রতি তাঁর একটি নির্বাচিত গল্প-সংকলন প্রকাশ করেছেন কেরলের এস পি সি এস লিমিটেড।

বিদেশী সাহিত্য

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পুস্তক প্রদর্শনী ॥

'ইণ্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার' তাঁদের অষ্টাদশ পুস্তক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানটি প্রতি বছরের মতো এবারও, মাত্র কিছুদিন আগে, জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। পৃথিবীর প্রায় ৩৯টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রকাশক সংস্থার সংখ্যা ছিল মোট ২,৪৯১টি। সংখ্যায় প্রায় ১৮০,০০০টি বই ছিল প্রদর্শনীতে। ফলে এপর্যন্ত পৃথিবীর 'সর্ববৃহৎ পুস্তক প্রদর্শনী'র গৌরব অর্জন করেছেন এরা। এ-বছর নতুন যে-দুটি দেশ এতে যোগদান করেছেন, তাঁরা হলেন গ্রীস এবং আরব লীগ। ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি এবং রুমানিয়া ছিল। এছাড়া ভারত, চীন, জাপান এবং আফ্রিকার দেশগুলিও এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

এ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জার্মান বুক ট্রেডের 'শান্তি পুরস্কার' দেওয়া হয় রোমের কার্ডিনাল অগাস্টিন বি এবং জেনেভার উইলিয়াম এ ভিসার্টিস্ হুফ্ট-কে। এঁরা দুজনেই তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যম, মনীষা ও আন্দোলনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় চার্চগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে ব্রতী ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক মানুষের মনে ধর্মকেন্দ্রিক বৈষম্য দূর করতে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

রেবেকা ওয়েস্টের সাম্প্রতিক উপন্যাস ॥

প্রধানত উপন্যাস, সমালোচনা, আত্মজীবনী এবং ইতিহাসের গবেষণা—এই ছিল রেবেকা ওয়েস্টের গতানুগতিক জীবন। প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলি কাঁচা, লোক-সমাজে অনাদৃত এবং অপঠিত। কিন্তু হঠাৎই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন রেবেকা ওয়েস্ট—'ট্রিজন্ ট্রায়ালের' রিপোর্ট লিখে। 'দি বার্ডস ফল ডাউন' হল তাঁর অতি-সাম্প্রতিক উপন্যাস, বইটি ১৯৬৬ সালের 'বেস্ট সেলার' পেয়েছে। ইতিহাসের পটভূমিকায় 'গুপ্তচর' কাহিনী' উপন্যাসের ঘটনাবৃত্ত রচনা করেছে। 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা বইটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ "বইটিতে এক-দিকে আছে টলস্টয়ের ঐশ্বর্য বর্ণনার জাঁক-জমক, অন্যদিকে আছে শেখভীয় বিষাদ।" ওয়েস্টের আন্তরিক বিবরণে উপন্যাসটিতে বিস্মৃত ইতিহাসের ঐশ্বর্যময় যুগ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বইটির বিশ্বব্যাপী চিত্রস্বত্বের জন্য হলিউডের দুই প্রযোজকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার খবরটিই হচ্ছে সবচেয়ে গরম খবর।

কবি সম্মেলন ॥

আমেরিকার তরুণ কবিরা সম্প্রতি কবিতা বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সাম্প্রতিক আমেরিকান কবিতার যে চেহারা, যে বর্ণহীন জৌলুস, তাতে তাঁরা আর মোটেই খুশি নন। 'কবিতা সম্পর্কে আমাদের আরো নতুন করে কিছু ভাবতে হবে, সাময়িক জনপ্রিয়তার লোভ ভুলতে হবে, নতুন নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করতে হবে।' অধিকাংশ কবিরই এই মত। সম্মিলিতভাবে এ-বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভার জন্য সম্প্রতি আমেরিকার 'পোয়েটিক সোসাইটি অব শিকাগো' কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তরুণ কবিরা সাম্প্রতিক কবিতার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন।

তরুণ কবি টেড্ হিউজ বলেন, 'আমাদের কবিরা অতি অল্প আয়াসেই

জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। এবং সেই জনপ্রিয়তা তাকে সংবাদপত্রগুলি যেভাবে গুঞ্জনমুখর করে তোলে, তাতে কবি তাঁর 'কবি-ব্যক্তিত্ব' প্রকাশের মুখেই মারা যান।' প্যাট্রিসিয়া বীয়ার সরাসরি উপস্থিত কবিদের আক্রমণ করেন। তাঁর মত হচ্ছে যে, এখনকার তরুণ এবং তরুণতর আমেরিকান কবিরা ধৈর্যহীন, জীবনের গূঢ় অভিজ্ঞতা কারোই নেই. প্রত্যেকেই যেন একটা চলমান স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন—তাই নতুন কোন আবর্ত সৃষ্টির দায়িত্বও কবিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে কবি টম গান, পিটার পোর্টার, লেসলি এমস্ প্রভৃতি ছিলেন। তরুণ কবিরা অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত জানালেন। অতঃপর উদ্যোক্তারা টম গানকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। টম গান কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন, "এটা খুবই আশার কথা যে, তরুণ কবিরা এখন নতুনভাবে কবিতা লেখার পক্ষপাতি। হালে আমেরিকায় যে এক ধরনের 'দায়িত্বহীন কবিতা চর্চা' চলছে, তার পথ এভাবেই বন্ধ হবে।" পিটার পোর্টার বলেন, "এখন ক্যাম্পাসে 'বিট' কবিদের পাগলামি কমে এসেছে। তাঁদের জনপ্রিয়তার চালাকি লোকে এখন ধরে ফেলেছে। তাই ভালো কবিতা লেখার উপযুক্ত সময় হচ্ছে এখন।"

উপস্থিত কবিরা তাঁদের কবিতা পাঠ করে শোনান। সমালোচকদের মত হচ্ছে যে, কবিতাগুলি এক্দুনি এর পূর্ব ধারাকে সরাসরি কাটাতে না পারলেও একটা পরিবর্তনের বাঁক যে প্রত্যেকের কবিতায় দেখা গেছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

নতুন বই

সুনির্বাচিত অনুবাদ

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখা ইদানীং অবহেলিত। যে কোনো কারণেই হোক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকের উৎসাহের অভাব আছে, পাঠকেরও তেমন আগ্রহ নেই। সম্ভবতঃ এর প্রধানতম কারণ বৈদেশিক সাংস্কৃতিক দপ্তরের নির্দেশে এবং আনুকূল্যে প্রকাশিত অজস্র অনুবাদ। এইসব অনুবাদ অনেক সময় সুযোগ্য অনুবাদকের হাতে পড়ে না। কারণ এইসব অনুবাদকের একটা বৃহৎ সংখ্যার নাম অপরিচিত, দ্বিতীয়তঃ অনুবাদ সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ নয়, তৃতীয়তঃ মূল গ্রন্থের এলোপাথাড়ি নির্বাচন। এইসব কারণে আজ অনুবাদ এক অবজ্ঞাত সাহিত্য-কর্মে পরিণত। এর ফলে উৎকৃষ্ট অনুবাদগুলির দীপ্তি ম্লান হয়ে পড়েছে।

সুখের বিষয় সুপণ্ডিত দেবব্রত রেজ্ মহাশয় সম্প্রতি অলডাস হাক্সলীর 'Literature and Science' নামক গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। একে হাক্সলীর রচনা তায় দেবব্রতবাবুর অনুবাদ যেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ। দেবব্রতবাবু বহুভাষাবিদ, বৈজ্ঞানিক অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই এই অনুবাদকর্ম সার্থক হয়েছে। অলডাস হাক্সলি ১৯৬৩-র নভেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। এই গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর বৎসরেই প্রকাশিত, অনেকের স্মরণে থাকতে পারে যে, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'আইল্যান্ড'ও এই বছরেই প্রকাশিত হয়। অনন্যসাধারণ মনীষার অধিকারী হাকসলী জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও তাঁর চিন্তার তীক্ষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হননি, তাই এই গ্রন্থটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুই বিশ্ব দৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা সম্ভব হয়েছে। এই পৃথিবী ও তার মনোজগতের ব্যাখ্যা নিয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্য তাদের বাঁধা রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীর মন যুক্তিনিষ্ঠ, সে বস্তুর স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত। আর সাহিত্যশিল্পী আপন মনের মাধুরী দিয়ে এক কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলার দিকে আগ্রহশীল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রগতি ঘটেছে তার ফলে এই দুই ধারার জীবন-দর্শনের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর মনীষীরা চিন্তার ক্ষেত্রে দুটি বিচ্ছিন্ন শিবিরে বিভক্ত। অলডাস হাক্সলীর দেহে ও মনে বিজ্ঞানীর চেতনা, তাঁর পিতামহ হাক্সলী বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তাঁর ভাই জুলিয়নও বিজ্ঞানী। তিনি এই সড়ক ছেড়ে অন্য সড়ক ধরেছেন বটে কিন্তু অন্তরে আছে বিজ্ঞানচেতনা। তাই যে "বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি" তারই রহস্যময় মর্মলোকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে প্রবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন হাক্সলী, নতুন জগতের নতুন চেতনার, নতুন চমকের দ্বার খুলে দেওয়ার আহ্বান। ছাপা, বাঁধাই, সৌষ্ঠব ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রন্থটি প্রকাশে প্রকাশক কোনো কার্পণ্যের পরিচয় দেননি।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান— (অনুবাদ) মূলঃ অলডাস হাক্সলি ।। অনুবাদ—দেবব্রত রেজ ।। প্রকাশক—রূপা ।। কলিকাতা-১২॥—দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

তরুনিমা-র শিশুসংখ্যা

'তরুনিমা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি এবারে শিশুসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। হরিদাস ঘোষ সম্পাদিত এই সংখ্যায় শিশু-উপযোগী রচনাগুলি লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, যতীন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ মিশ্র, অমূল্যকুমার মিত্র, এ-পি-এল ভাষ্যকার, মিহিরকুমার মুরারি, তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কণক দাস, বেলা দে ও স্বপনবুড়ো। দাম—এক টাকা। ঠিকানাঃ ৪০।১, বনমালি সরকার স্ট্রীট, কলকাতা—৫।

মহাকালের সাক্ষী হিমালয়

শুধু হিমালয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশপথে। রণবিজয় চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'সম্ভবামি যুগে যুগে' গ্রন্থের কেদারখণ্ড। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কেদার-বদরী দর্শনে গিয়েছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ মিলে যায়, তাঁদের অমৃতময় বাণী তিনি চলারপথে শুনেছেন, তিনি দেখলেন মহাকালের সাক্ষী 'দুরন্ত হিমালয়'কে। সাধুদের বাণীকে সরলতর ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রণবিজয়বাবু। এই গ্রন্থে তিনি মৌনী মহারাজ, পালধী মহাশয়, স্বামী হরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণময় স্বামী, পওয়ারী বাবা (কেদারনাথ) ও শ্রীদুর্গাস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের কাছে দিব্য-জীবনের যেসব কথা জেনেছেন তা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। রণবিজয়বাবু সুনিপুণ সাহিত্য-শিল্পীর মতো অনায়াসভঙ্গীতে অতিশয় সূক্ষ্মভাবে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' রচনা করেছেন। হিমালয়ের পারে যে দিব্যলোক, তার সন্ধান তিনি এনেছেন। অমৃতলোকের বার্তা অতি সহজেই পরিবেশন করেছেন রণবিজয়বাবু, তার জন্য তিনি বিশেষভাবে আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভক্তির সংযোগ ঘটেছে, তাই গ্রন্থটি মনোরম। গ্রন্থটিতে কয়েকটি চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিসঙ্গত।

সম্ভবামি যুগে যুগে— (২য় খণ্ড—কেদার)—(ভ্রমণ ও ধর্ম) রণবিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—সুরভি প্রকাশনী। কলেজ রো। কলিকাতা—৯। দাম— ছয় টাকা মাত্র।

সেতুবন্ধ

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। একুশ ।।

কামরার অন্য প্রান্ত থেকে ভবতোষ চেঁচিয়ে উঠল : শিশিরবাবু যে! আসুন, আসুন—এখানে জায়গা আছে।

অফিসের ভবতোষ, নটবরের একতম পারিষদ। পাশে বসিয়ে ভবতোষ প্রশ্ন করে: কোথায়?

আত্মীয় আছেন এদিককার এক গ্রামে।

গ্রাম কোথায় এদিকে? কাঠার দরে জমি বিক্রি—আর কি এখন গ্রাম রয়েছে! বিলকুল শহর। কোথায় বাড়ি আত্মীয়ের, কোন্ স্টেশনে নামবেন?

নাম শুনে ভবতোষ হৈ-হৈ করে উঠল : কুসুমডাঙার সুনীলকান্তি হালদার—খুব জানি তাঁকে। খুব—খুব। তিনি ডেলি-প্যাসেঞ্জার, আমি ডেলি-প্যাসেঞ্জার—একশ এগারো নম্বরের যাত্রী। গাড়িতে হরবখত দেখা হয়। একশ এগারো নম্বর বুঝলেন না—এক-এক-এক কামরার বাইরে লেখা দেখুন। তার মানে থার্ড ক্লাস। সময়ের অপব্যয় করিনে আমরা ভাই। দু-বেঞ্চির মাঝে কোঁচার কাপড় টান-টান করে তাস খেলতে খেলতে যাই। যাবার সময় খেলি, ফেরার সময় খেলি—খাতির না জমে যায় কোথায়! সুনীলকান্তি-বাবুকে বলবেন তো আমার নাম—চেনেন না চেনেন তখনই বুঝবেন।

সারাক্ষণ নিজের কথা। অফিসের গল্পও আছে : আগে ভাই বেলুড়ের এক কারখানায় চাকরি করতাম। থাকলে এদ্দিনে অঢেল উন্নতি হত। আটটার সময় হাজিরা, বাড়ি থেকে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-পাঁচটায় বেরুতাম। ট্রেন বদলাবদলি, শিয়ালদা টু হাওড়া ট্রাম—ঐ সময়ে না বেরুলে লেট হয়ে যায়। বাড়ি ফিরতেও রাত আটটা বেজে যায়। দেখ, ছেলেপুলে বাপ চিনতে পারছে না। কাছে আসে না, ধরতে গেলে কেঁদে পড়ে। বউ বলে, দেখল কবে তোমায় যে চিনবে? যখন বেরিয়ে যাও ওরা ঘুমিয়ে থাকে, যখন ফেরো ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ছুটিছাটার দিনে বাড়ি দেখতে পাবে, তা-ও তো নয়। তা সত্যি, অফিস করে করে এমন অবস্থা ভাই, রবিবারের দিনটা বাড়িতে শুয়ে বসে কাটাব তা যেন গায়ে জল-বিছুটি মারে। এই আজকেই যেমন—

আজকের ব্যাপার বলছে। ভোর-রাত্রে কলকাতা অভিমুখে বেরিয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য সিনেমার টিকিট কাটা।

একটা সুবিখ্যাত ছবির নাম করল—খবরের কাগজের পুরো পাতা জুড়ে যার বিজ্ঞাপন চলেছিল। সে টিকিট জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। লাইন দিয়েছিল তখনও রাস্তার আলো নেভায় নি। অসাধ্য-সাধন করে এই ফিরছে—

ভবতোষ সগৌরবে টিকিট বের করে দেখাল। একলা একজনের টিকিট। বউ আসে না—সংসার আর ছেলেপুলে ছাড়া বোঝে না অন্য কিছু। স্বামীটি তার একেবারে বিপরীত। সে এই দেখতেই পাচ্ছেন। মাইনের টাকার সেভেণ্টিফাইভ পার্সেণ্ট বউয়ের হাতে দিয়ে দায়িত্ব শেষ। অফিস-টাইমে আর রাত্রি-বেলা চাট্টি করে ভাত দেবে এই চুক্তি, তা ছাড়া তোমরা মরলে না বেঁচে রইলে জানিনে। খেতে যাচ্ছি এখন বাড়িতে—আড়াইটের শো, নাকে-মুখে গুঁজেই আবার ছুটব। মান্থলি টিকিটের সুবিধা যতবার খুশি ওঠানামা করো—বাড়তি মাশুল লাগে না। সিনেমার টিকিট পেয়ে গেল তাই—নইলে করতে হত ঠিক সেই জিনিস। ইতিপূর্বে বহুদিন করেছে। খেয়েদেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির কামরায় বৈঠকখানা করে বসল। চলে গেল শিয়ালদা অবধি, কত লোক উঠছে নামছে—ফিরল আবার শিয়ালদা থেকে। পুনশ্চ শিয়ালদা-মুখো। এই চলল যতক্ষণ না অফিসের ছুটির সময় হয়ে যায়। নিত্যিদিনের রুটিনে পড়ে গেল—গুটগুট করে এইবারে বাড়ি ফেরা।

নটবরবাবুর কথাও উঠল। ভদ্রলোকের বিশাল সংসার। দুটো নাতনী একেবারে মাথায় মাথায়—বিয়ে দিলেই হয়, পাত্র জুটছে না। শিশিরের উপরেও তাক পড়েছে—তার সম্বন্ধে কতদূর কি জানা আছে, ভবতোষকে জিজ্ঞাসা করছিলেন সেদিন। গাঁয়ের ভাল-মানুষ ছেলে, কোন কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে যাবে—পুরোপুরি কবলে পড়বার আগে ভাল ঘরের পাত্রী দেখে সুব্যবস্থা করে দেওয়া সকলের উচিত।

কথাবার্তার মধ্যে নিজ স্টেশনে এসে ভবতোষ নেমে পড়ল। হাত বাড়িয়ে বাড়ি দেখিয়ে দিল—লাইন থেকে দূরবর্তী নয়। শিশির পরের স্টেশনে নামবে।

ঠিক দুপুর। হাতঘড়িতে দেখল বারোটা দশ। সুনীলকান্তিদের বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুক ঢিবঢিব করছে। কোনদিকে কেউ নেই। রবিবারের দিন মেয়েদেরও কাজ-কর্মে ঢিলেমি। রান্নাই শেষ হয় নি মনে হচ্ছে—ছ্যাঁত-ছোঁত আওয়াজ রান্নাঘরের দিক থেকে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে রোয়াকে উঠে পড়ল। দেবুটা দেখতে পেয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'মেশোমশায়' 'মেশোমশায়' কলরব করে উঠল।

ভাইবোন সবকটি ছুটে আসে। আজকে শিশিরের শূন্য হাত। বিষম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে, তবু খেয়াল করা উচিত ছিল বড়রা যে ব্যবহারই করুক বাড়ির ছোট ছোট ছেলেপুলের তাতে কী? এদের হাতে দেবার মতো কিছু আনা উচিত ছিল। খারাপ লাগছে খুব।

মমতাও এলো। রান্না করছিল, বাটনা বাটছিল বোধহয়, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এলো। বলে, পথ ভুলে যাওনি, দেখা যাচ্ছে। উঃ, আমরা না হয় পর, নিজের মেয়েটা অবধি ভুলে বসেছিলে। চিঠি লিখে তবে আনাতে হল।

সেই চরম ক্ষণ। চুক্তির মাস শেষ হয়ে গেছে—মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে হয়তো বা ধুলো-

জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। এবং সেই জনপ্রিয়তা তাকে সংবাদপত্রগুলি যেভাবে গুঞ্জনমুখর করে তোলে, তাতে কবি তাঁর 'কবি-ব্যক্তিত্ব' প্রকাশের মুখেই মারা যান।' প্যাট্রিসিয়া বীয়ার সরাসরি উপস্থিত কবিদের আক্রমণ করেন। তাঁর মত হচ্ছে যে, এখনকার তরুণ এবং তরুণতর আমেরিকান কবিরা ধৈর্যহীন, জীবনের গূঢ় অভিজ্ঞতা কারোই নেই, প্রত্যেকেই যেন একটা চলমান স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন—তাই নতুন কোন আবর্ত সৃষ্টির দায়িত্বও কবিদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে কবি টম গান, পিটার পোর্টার, লেসলি এমস্ প্রভৃতি ছিলেন। তরুণ কবিরা অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত জানালেন। অতঃপর উদ্যোক্তারা টম গানকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। টম গান কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন, "এটা খুবই আশার কথা যে, তরুণ কবিরা এখন নতুনভাবে কবিতা লেখার পক্ষপাতি। হালে আমেরিকায় যে এক ধরনের 'দায়িত্বহীন কবিতা চর্চা' চলছে, তার পথ এভাবেই বন্ধ হবে।" পিটার পোর্টার বলেন, "এখন ব্যাপাটে 'বিট' কবিদের পাগলামি কমে এসেছে। তাঁদের জনপ্রিয়তার চালাকি লোকে এখন ধরে ফেলেছে। তাই ভালো কবিতা লেখার উপযুক্ত সময় হচ্ছে এখন।"

উপস্থিত কবিরা তাঁদের কবিতা পাঠ করে শোনান। সমালোচকদের মত হচ্ছে যে, কবিতাগুলি এক্‌নি এর পূর্ব ধারাকে সরাসরি কাটাতে না পারলেও একটা পরিবর্তনের বাঁক যে প্রত্যেকের কবিতায় দেখা গেছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

নতুন বই

সুনির্বাচিত অনুবাদ

বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখা ইদানীং অবহেলিত। যে কোনো কারণেই হোক অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকের উৎসাহের অভাব আছে, পাঠকেরও তেমন আগ্রহ নেই। সম্ভবতঃ এর প্রধানতম কারণ বৈদেশিক সাংস্কৃতিক দপ্তরের নির্দেশে এবং আনুকূল্যে প্রকাশিত অজস্র অনুবাদ। এইসব অনুবাদ অনেক সময় সুযোগ্য অনুবাদকের হাতে পড়ে না। কারণ এইসব অনুবাদকের একটা বৃহৎ সংখ্যার নাম অপরিচিত, দ্বিতীয়তঃ অনুবাদ সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ নয়, তৃতীয়তঃ মূল গ্রন্থের এলোপাথাড়ি নির্বাচন। এইসব কারণে আজ অনুবাদ এক অবজ্ঞাত সাহিত্য-কর্মে পরিণত। এর ফলে উৎকৃষ্ট অনুবাদগুলির দীপ্তি ম্লান হয়ে পড়েছে।

সুখের বিষয় সুপণ্ডিত দেবব্রত রেজ মহাশয় সম্প্রতি অলডাস হাক্‌সলীর 'Literature and Science' নামক গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। একে হাক্‌সলীর রচনা তায় দেবব্রতবাবুর অনুবাদ যেন মণি-কাঞ্চন সংযোগ। দেবব্রতবাবু বহুভাষাবিদ, বৈজ্ঞানিক অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাই এই অনুবাদকর্ম সার্থক হয়েছে। অলডাস হাক্‌সলি ১৯৬৩-র নভেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। এই গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর বৎসরেই প্রকাশিত, অনেকের স্মরণে থাকতে পারে যে, তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'আইল্যাণ্ড'ও এই বছরেই প্রকাশিত হয়। অনন্যসাধারণ মনীষার অধিকারী হাকসলী জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও তাঁর চিন্তার তীক্ষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হননি, তাই এই গ্রন্থটিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই দুই বিশ্ব দৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা সম্ভব হয়েছে। এই পৃথিবী ও তার মনোজগতের ব্যাখ্যা নিয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্য তাদের বাঁধা রাস্তায় এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীর মন যুক্তিনিষ্ঠ, সে বস্তুর স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত। আর সাহিত্যশিল্পী আপন মনের মাধুরী দিয়ে এক কল্পনার স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলার দিকে আগ্রহশীল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রগতি ঘটেছে তার ফলে এই দুই ধারার জীবন-দর্শনের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর মনীষীরা চিন্তার ক্ষেত্রে দুটি বিচ্ছিন্ন শিবিরে বিভক্ত। অলডাস হাক্‌সলীর দেহে ও মনে বিজ্ঞানীর চেতনা, তাঁর পিতামহ হাক্‌সলী বিখ্যাত বিজ্ঞানী, তাঁর ভাই জুলিয়নও বিজ্ঞানী। তিনি এই সড়ক ছেড়ে অন্য সড়ক ধরেছেন বটে কিন্তু অন্তরে আছে বিজ্ঞানচেতনা। তাই যে "বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি" তারই রহস্যময় মর্মলোকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে প্রবেশ করার আহ্বান জানিয়েছেন হাক্‌সলী, নতুন জগতের নতুন চেতনার, নতুন চমকের দ্বার খুলে দেওয়ার আহ্বান। ছাপা, বাঁধাই, সৌষ্ঠব ইত্যাদি সম্পর্কে গ্রন্থটি প্রকাশে প্রকাশক কোনো কার্পণ্যের পরিচয় দেননি।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান— (অনুবাদ) মূল: অলডাস হাক্‌সলি।। অনুবাদ—দেবব্রত রেজ।। প্রকাশক—রূপা।। কলিকাতা-১২।।—দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

।। সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ।।

তরুনিমা-র শিশুসংখ্যা

'তরুনিমা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি এবারে শিশুসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। হরিদাস ঘোষ সম্পাদিত এই সংখ্যায় শিশু-উপযোগী রচনাগুলি লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, যতীন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ মিশ্র, অমূল্যকুমার মিত্র, এ-পি-এল ভাষ্যকার, মিহিরকুমার মুরারি, তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কণক দাস, বেলা দে ও স্বপনবুড়ো। দাম—এক টাকা। ঠিকানাঃ ৪০।১, বনমালি সরকার স্ট্রীট, কলকাতা—৫।

মহাকালের সাক্ষী হিমালয়

শুধু হিমালয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আরো অনেক গ্রন্থ প্রকাশপথে। রণবিজয় চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'সম্ভবামি যুগে যুগে' গ্রন্থের কেদারখণ্ড। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কেদার-বদরী দর্শনে গিয়েছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ মিলে যায়, তাঁদের অমৃতময় বাণী তিনি চলারপথে শুনেছেন, তিনি দেখলেন মহাকালের সাক্ষী 'দুরন্ত হিমালয়'কে। সাধুদের বাণীকে সরলতর ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রণবিজয়বাবু। এই গ্রন্থে তিনি মৌনী মহারাজ, পালধী মহাশয়, স্বামী হীরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণময় স্বামী, পওয়ারী বাবা (কেদারনাথ) ও শ্রীদুর্গাস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের কাছে দিব্য-জীবনের যেসব কথা জেনেছেন তা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। রণবিজয়বাবু সুনিপুণ সাহিত্য-শিল্পীর মতো অনায়াসভঙ্গীতে অতিশয় সুক্ষ্মভাবে 'সম্ভবামি যুগে যুগে' রচনা করেছেন। হিমালয়ের পারে যে দিব্য-লোক, তার সন্ধান তিনি এনেছেন। অমৃত-লোকের বার্তা অতি সহজেই পরিবেশন করেছেন রণবিজয়বাবু, তার জন্য তিনি বিশেষভাবে আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভক্তির সংযোগ ঘটেছে, তাই গ্রন্থটি মনোরম। গ্রন্থটিতে কয়েকটি চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিসঙ্গত।

সম্ভবামি যুগে যুগে— (২য় খণ্ড—কেদার)—(ভ্রমণ ও ধর্ম) রণবিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—সুরভি প্রকাশনী। কলেজ রো। কলিকাতা—৯। দাম— ছয় টাকা মাত্র।

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। একুশ ।।

কামরার অন্য প্রান্ত থেকে ভবতোষ চেঁচিয়ে উঠল ঃ শিশিরবাবু যে! আসুন, আসুন—এখানে জায়গা আছে।

অফিসের ভবতোষ, নটবরের একতম পারিষদ। পাশে বসিয়ে ভবতোষ প্রশ্ন করে ঃ কোথায় ?

আত্মীয় আছেন এদিককার এক গ্রামে।

গ্রাম কোথায় এদিকে? কাঠার দরে জমি বিক্রি—আর কি এখন গ্রাম রয়েছে! বিলকুল শহর। কোথায় বাড়ি আত্মীয়ের, কোন্ স্টেশনে নামবেন ?

নাম শুনে ভবতোষ হৈ-হৈ করে উঠল ঃ কুসুমডাঙার সুনীলকান্তি হালদার—খুব জানি তাকে। খুব—খুব। তিনি ডেলি-প্যাসেঞ্জার, আমি ডেলি-প্যাসেঞ্জার—একশ এগারো নম্বরের যাত্রী। গাড়িতে হরবখত দেখা হয়। একশ এগারো নম্বর বুঝলেন না—এক-এক-এক কামরার বাইরে লেখা দেখুন। তার মানে থার্ড ক্লাস। সময়ের অপব্যয় করিনে আমরা ভাই। দু-বেঞ্চির মাঝে কোঁচার কাপড় টান-টান করে তাস খেলতে খেলতে যাই। যাবার সময় খেলি, ফেরার সময় খেলি—খাতির না জমে যায় কোথায়! সুনীলকান্তি-বাবুকে বলবেন তো আমার নাম—চেনেন না চেনেন তখনই বুঝবেন।

সারাক্ষণ নিজের কথা। অফিসের গল্পও আছে ঃ আগে ভাই বেলুড়ের এক কারখানায় চাকরি করতাম। থাকলে এদ্দিনে অঢেল উন্নতি হত। আটটার সময় হাজিরা, বাড়ি থেকে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-পাঁচটায় বেরুতাম। ট্রেন বদলাবদলি, শিয়ালদা টু হাওড়া ট্রাম—ঐ সময়ে না বেরুলে লেট হয়ে যায়। বাড়ি ফিরতেও রাত আটটা বেজে যায়। দেখি, ছেলেপুলে বাপ চিনতে পারছে না। কাছে আসে না, ধরতে গেলে কেঁদে পড়ে। বউ বলে, দেখল কবে তোমায় যে চিনবে? যখন বেরিয়ে যাও ওরা ঘুমিয়ে থাকে, যখন ফেরো ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ছুটিছাটার দিনে বাড়ি দেখতে পাবে, তা-ও তো নয়। তা সত্যি। অফিস করে করে এমন অবস্থা ভাই, রবিবারের দিনটা বাড়িতে শুয়ে বসে কাটাব তা যেন গায়ে জল-বিছুটি মারে। এই আজকেই যেমন—

আজকের ব্যাপার বলছে। ভোর-রাত্রে কলকাতা অভিমুখে বেরিয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য সিনেমার টিকিট কাটা।

একটা সুবিখ্যাত ছবির নাম করল—খবরের কাগজের পুরো পাতা জুড়ে যার বিজ্ঞাপন চলেছিল। সে টিকিট জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। লাইন দিয়েছিল তখনও রাস্তার আলো নেভায় নি। অসাধ্য-সাধন করে এই ফিরছে—

ভবতোষ সগৌরবে টিকিট বের করে দেখাল। একলা একজনের টিকিট। বউ আসে না—সংসার আর ছেলেপুলে ছাড়া বোঝে না অন্য কিছু। স্বামীটি তার একেবারে বিপরীত। সে এই দেখতেই পাচ্ছেন। মাইনের টাকার সেভেন্টিফাইভ পার্সেন্ট বউয়ের হাতে দিয়ে দায়িত্ব শেষ। অফিস-টাইমে আর রাত্রি-বেলা চাট্টি করে ভাত দেবে এই চুক্তি, তা ছাড়া তোমরা মরলে না বেঁচে রইলে জানিনে। খেতে যাচ্ছি এখন বাড়িতে—আড়াইটের শো, নাকে-মুখে গুঁজেই আবার ছুটব। মান্থলি টিকিটের সুবিধা যতবার খুশি ওঠানামা করো—বাড়তি মাশুল লাগে না। সিনেমার টিকিট পেয়ে গেল তাই—নইলে করতে হত ঠিক সেই জিনিস। ইতিপূর্বে বহুদিন করেছে। খেয়েদেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির কামরায় বৈঠকখানা করে বসল। চলে গেল শিয়ালদা অবধি, কত লোক উঠছে নামছে—ফিরল আবার শিয়ালদা থেকে। পুনশ্চ শিয়ালদা-মুখো। এই চলল যতক্ষণ না অফিসের ছুটির সময় হয়ে যায়। নিত্যিদিনের রুটিনে পড়ে গেল—গুটগুট করে এইবারে বাড়ি ফেরা।

নটবরবাবুর কথাও উঠল। ভদ্রলোকের বিশাল সংসার। দুটো নাতনী একেবারে মাথায় মাথায়—বিয়ে দিলেই হয়, পাত্র জুটছে না। শিশিরের উপরেও তাক পড়েছে—তার সম্বন্ধে কতদূর কি জানা আছে, ভবতোষকে জিজ্ঞাসা করছিলেন সেদিন। গাঁয়ের ভাল-মানুষ ছেলে, কোন কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে যাবে—পুরোপুরি কবলে পড়বার আগে ভাল ঘরের পাত্রী দেখে সুব্যবস্থা করে দেওয়া সকলের উচিত।

কথাবার্তার মধ্যে নিজ স্টেশনে এসে ভবতোষ নেমে পড়ল। হাত বাড়িয়ে বাড়ি দেখিয়ে দিল—লাইন থেকে দূরবর্তী নয়। শিশির পরের স্টেশনে নামবে।

ঠিক দুপুর। হাতঘড়িতে দেখল বারোটা দশ। সুনীলকান্তিদের বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুক ঢিবঢিব করছে। কোনদিকে কেউ নেই। রবিবারের দিন মেয়েদেরও কাজ-কর্মে ঢিলেমি। রান্নাই শেষ হয় নি মনে হচ্ছে—ছ্যাঁত-ছোঁত আওয়াজ রান্নাঘরের দিক থেকে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে রোয়াকে উঠে পড়ল। দেবুটা দেখতে পেয়েছে। ঘর থেকে বেরিয় এসে 'মেশোমশায়' 'মেশোমশায়' কলরব করে উঠল।

ভাইবোন সবকটি ছুটে আসে। আজকে শিশিরের শূন্য হাত। বিষম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে, তবু খেয়াল করা উচিত ছিল বড়রা যে ব্যবহারই করুক বাড়ির ছোট ছোট ছেলেপুলের তাতে কী? এদের হাতে দেবার মতো কিছু আনা উচিত ছিল। খারাপ লাগছে খুব।

মমতাও এলো। রান্না করছিল, বাটনা বাটছিল বোধহয়, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এলো। বলে, পথ ভুলে যাওনি, দেখা যাচ্ছে। উঃ, আমরা না হয় পর, নিজের মেয়েটা অবধি ভুলে বসেছিলে। চিঠি লিখে তবে আনাতে হল।

সেই চরম ক্ষণ। চুক্তির মাস শেষ হয়ে গেছে—মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে হয়তো বা ধুলো-

পায়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেবে। ছেলেপুলে সবক'টাকে দেখা যাচ্ছে, কুমকুম নেই। তাকে কোথায় রেখেছে—কী অবস্থায় আছে মেয়েটা? মাস শেষ হয়ে গেছে দেখে আদাড়ে-ভাগাড়ে ছুঁড়ে দেয় নি তো?

ছেলেমেয়েদের মমতা জিজ্ঞাসা করে : কুমকুমকে দেখতে পাচ্ছি নে—গেল কোথায় যে?

বড় মেয়ে জয়া বলে, দীঘির ঘাটে গেছে বাবাকে ডাকতে। পিশি নিয়ে গেছে।

অধিখ্যেতা দেখ একবার!

শিশিরের কাছে মমতা অনুযোগ জানায় : তোমার বড়দা একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা জলে গিয়ে পড়েছে—এতখানি বয়স হল, ছেলেমি ভাব তবু গেল না। ঠাকুরঝিকে তাই বললাম, একটিবার যাও ভাই—ডেকে তুলে আনো। রোদ্দুরের মধ্যে এতটা পথ—তা-ও ঠাকুরঝি মেয়ে ঘাড়ে করে চলে গেছে। তোমার মেয়ের সর্বক্ষণের বাহন—কোল থেকে লহমার তরে নামাবে না।

জয়াকে বলে, মেসোমশাইকে বারান্ডায় বসিয়ে জল-গামছা দিগে যা। হাত-পা ধুয়ে ঠান্ডা হোক, জামা-টামা ছাড়ুক। যে পেয়াদা পাঠিয়েছি, এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে।

সত্যি তাই, অনতিপরেই ঊর্মিলা এসে গেল। কলকল করে সে বলে, যা করে ওঠাতে হল! ডুবসাঁতার দিচ্ছে, চিৎসাঁতার দিচ্ছে—উঠতে কি চায়?

মমতা বলে, রোদ্দুরের মধ্যে কুমকুমকে কেন নিয়ে গেলে বলো তো? এতগুলি এরা রয়েছে, খেলাধুলো করত—

ঊর্মিলা অসহায়ভাবে বলে, চেষ্টা করিনি? কোল থেকে নামলই না বউদি। জোর করে নামাতে গেলাম তো ভ্যাক করে কেঁদে পড়ল।

নামাতে তোমার বয়ে গেছে। তোমায় আর জানিনে—এত বইতেও পারো! দেখে রাখছেন সব বিধাতাপুরুষ, বিয়ের পর ফি বছর একটি করে দেবেন। বাচ্চা বয়ে বেড়ানোর সখ ভাল করে মিটিয়ে দেবেন, কত বইতে পারো দেখা যাবে তখন।

মিটিমিটি হাসে ঊর্মি বলে, যাও—

শিশির এসেছে, ঊর্মি জানে না। জামা খুলে গেঞ্জি গায়ে এতক্ষণে সে এদিকে এলো। ঊর্মির কোল থেকে কুমকুম বাপের দিকে পিটপিট করে তাকায়। চিনেও যেন চেনে না

কাছে এসে শিশির মেয়ের দিকে হাত বাড়াল : এসো—

আসবে কি আসবে না—কুমকুমের দোমনা ভাব। এলো শেষটা নিতান্ত নিরুৎসুক ভাবে—বয়স্ক লোক হলে বলতাম, নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে।

মেয়েকে আদর করে শিশির বলে, মহারাণী হয়েছ তুমি—শুনতে পাচ্ছি। সিংহাসনে সর্বক্ষণ বসে থাকো, পায়ে মাটির ছোঁয়া লাগতে দাও না—

কুমকুম আঁকুপাঁকু করছে বাপের কাছ থেকে আবার ঊর্মির কোলে যাবার জন্য।

মমতা হেসে বলে, কুমকুমকে দুষছ কেন ভাই, তার কি দোষ? ঠাকুরঝি কোল থেকে নামতে দেয় না। মেয়ে যেন মিষ্টিমিঠাই, নামিয়ে রাখলে পিঁপড়েয় ধরে যাবে।

যে কান্ড কুমকুম করছে, দিতেই হল ঊর্মির কাছে। মেয়ে নিয়ে লজ্জিত ঊর্মি রান্নাঘরে পালায়। স্নান সেরে সুনীলকান্তি গামছা মাথায় ঘাট থেকে ফিরল। স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁক পাড়ছে : রোজই তো কাক-স্নান সেরে ভাত খেতে বসি, ছুটির দিনে আরাম করে দুটো-পাঁচটা ডুব দেবো তা-ও তুমি পেয়াদা পাঠাবে। দুনিয়ায় দুটো মানুষকে আমি সবচেয়ে ভয় করি—অফিসের কৃষ্ণমাচারী আর বাড়িতে ওই ঊর্মিলা। চেঁচামেচি করে জল থেকে ঘাটে উঠিয়ে তবে ছাড়ল।

উঠানে নেমে শিশির প্রণাম করতে যায়।

হতে দিল না সুনীলকান্তি : থাক, থাক। পথের উপরে কি—ভিজে কাপড় ছেড়ে ভদ্রলোক হয়ে যাই, তখন। এসে গেছ তা হলে! তোমার দিদিকে বলছিলাম তাই—ও চিঠির পরে না এসে পারবে না।

শিশিরের হাত জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি চলল। বলে, হ্যাঁ, ঘাট মানছি। ছোটভাইয়ের ক্ষমতার আন্দাজ করতে পারিনি, ভুল বলে-ছিলাম সেদিন।

শিশির সবিস্ময়ে বলে, কার কথা বলছেন বড়দা?

তোমার—আবার কার? মফস্বল জায়গা থেকে নিঃসহায় নিঃসম্বল এসেছ—সেই মানুষ চট করে চাকরি বাগিয়ে ফেললে—আজেবাজে ফক্কুড়ি চাকরি নয়, হার্মান প্লাম্বার্সের চাকরি—

শিশির বলে, আমি কিছু করিনি বড়দা। ক'জনের সঙ্গেই বা চেনাজানা—আমার কী ক্ষমতা!

শিশিরকে থামিয়ে দিয়ে সুনীলকান্তি আগের কথার জের ধরে বলে যাচ্ছে, হার্মান কোম্পানির চাকরি—তা-ও নেমে এলো উপরতলা থেকে। আমরা চাকরি জুটিয়ে-ছিলাম নিচের মানুষের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে, সবাই এই পথে যায়—তোমার বেলা দরখাস্ত করতে হল না, খোদ ডেপুটি ম্যানেজার হাত ধরে নিয়ে সেকসনে বসিয়ে দিল। চাকরি দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে এমনি-তরো ভাব।

শিশির প্রশ্ন করে : এত সমস্ত কোথা শুনলেন?

পরক্ষণে মনে পড়ে গেল। বলে, আমাদের অফিসের ভবতোষবাবু বলেছেন বোধহয়। ও'রা বাড়িয়ে বলেন, অতদূর বিশ্বাস করবেন না। তাছাড়া যা-ই কিছু হয়েছে, একফোঁটাও আমার বাহাদুরি নেই। দাম-কাকা সব করেছেন।

রাখো তোমার দাম-কাকা। ভূ'ইফোঁড় কাকা-জেঠা মামা-মেশো আমাদেরও ডজন ডজন আছে। সকলেরই থাকে। মুখে আধখানা মিষ্টি কথার উপর কাউকে তো কখনো উঠতে দেখলাম না।

সুনীলকান্তি ভিজা কাপড় ছাড়ছে। বারান্ডায় শিশির মোড়া টেনে নিয়ে বসল। বিস্ময়ের পারাপার নেই। সেই একদিন প্রত্যূষে উঠে পালাচ্ছিল শিশির। পারে নি, সুনীলকান্তিও ঘুম ভেঙে উঠে ধরে ফেলল। কড়া শাসানি দিয়েছিল : এই মাসটা কেবল রাখছি তোমার মেয়ে। বাসা হোক আর না-ই হোক, নিয়ে যেতে হবে। সেই মানুষটার মুখেই আজ মোলায়েম কথার ফুলঝুরি ফুটছে। কিসে কি হল—চাকরি হয়েছে বলেই সম্ভবত এই পরিবর্তন। চাকরি করে করে সুনীলকান্তিদের ধারণা হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই মানুষ সবচেয়ে কৃতী যে চাকরি জোটাতে পারে। সেই নিরিখে শিশির আজ সার্থক পুরুষ ওদের চোখে। সেইজন্যে সমাদর।

সমাদরের নানা পরিচয় মিলতে লাগল। চুল আঁচড়ে চটিজুতো ফটফট করে সুনীলকান্তি এসে ডাকে : ওঠো, খেতে যাই—

খেয়ে এসেছি বড়দা।

সুনীল আকাশ থেকে পড়ে : খেয়ে এলে কি রকম? এত সকাল সকাল খেয়ে বেরুনোর হেতুটা কি? এ বাড়িতে চাট্টি ভাত জুটবে না, এই তোমার ধারণা?

উত্তরোত্তর অধিক গরম হচ্ছে। শান্ত করবার জন্য শিশির বলে, তা কেন বড়দা। সেবারে কি খাইনি? স্টেশন থেকে ধরে এনে কত আদরযত্ন করলেন—

সেবারে আর এবারে! তখন ছিলে বেকার। ঠাঁই না পেয়ে পথে পথে ঘুরছ। এবারে চাকরে মানুষ—হার্মান কোম্পানির অফিস-এ্যাসিস্টান্ট।

কায়দা পেয়ে তাড়াতাড়ি শিশির শুনিয়ে রাখে : ঠাঁই কিন্তু এখনো পাইনি বড়দা—

মমতা মাঝখানে এসে পড়ে বলে, অত ঝগড়াঝাটি কিসের? খেয়ে এসে থাকো, গাড়ির ঝাঁকাঝাঁকিতে সে কি এতক্ষণ পেটে বসে আছে! আবার খাবে।

শিশির ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, আলবৎ খাবো। বড়দা'র যখন মনে লেগেছে—একশ বার খাবো। পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমরা খাওয়াকে ডরাইনে।

মমতা বলে, মনে তো লাগবারই কথা। আমার চিঠিটা ডাকে ফেলে দিয়ে উনি বললেন, এ চিঠির পর না এসে পারবে না, এই রবিবারে আসবে ঠিক দেখো। কাল অফিস-ফেরতা শিয়ালদা বাজার থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে এলেন—ভেজে রাখা হয়েছে, একটি টুকরো কাউকে মুখে তুলতে দিলেন না। বললেন, যার নাম করে এনেছি সে আগে খাবে, তারপর সকলে তোমরা। কখন তুমি এসে পড়ো—সকাল থেকে ঠায় বাড়িতে। বলেন, দু জনে একসঙ্গে চানে যাবো। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে শেষটা আমি ঠেলেঠুলে পাঠালাম।

কী কথা শুনি, এ কোন আজব কান্ড রে বাবা! চাকরি পাওয়া যেন রণবিজয় করে আসা—দিগ্বিজয়ী বীরের খাতির দিচ্ছে। এগিয়ে এসে শিশির সুনীলকান্তির সামনা-সামনি দাঁড়ায় : ঘাট হয়েছে—এই নাক মলছি, কান মলছি বড়দা। মিটল রাগ? দু পায়ে নইলে আছাড় খেয়ে পড়ব।

রান্নাঘরের দাওয়ায় পাশাপাশি ঠাঁই—মমতা দেওয়া-থোওয়া করছে। ছেলেপুলেরা কলরব করে ভিতরে খাচ্ছে। একনজর উঁকি দিয়ে দেখে শিশির। ঊর্মি সেইখানে, তাদের মধ্যে। কুমকুমকে কোলের উপর বসিয়ে খাওয়াচ্ছে—ভাত মেখে দলা দলা পাকিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আগডুম-বাগডুম বকে এক এক দলা মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। দুটো চোখ সর্বক্ষণ কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ের চোর-ডাকাত-গুলোর দিকে। বেসামাল হলে আর রক্ষে নেই। অপছন্দের জিনিসটা টুক করে অন্যের পাতে ছুঁড়ে দেবে, অথবা নিজের থালার তলায় বেমালুম লুকিয়ে ফেলবে। ভাল জিনিসটা ছোঁ মেরে অন্যের পাত থেকে তুলে নেবে। ডান হাতের এইসব, বাঁ-হাতও নিশ্চল নয়—এ ওকে চিমটি কাটে, অধিক রাগের কারণ হলে খিমচানিও দেয়। এ-পাশে ও-পাশে চোখ পাকিয়ে এইসব সামলাচ্ছে ঊর্মি। পারেও বটে মেয়েটা। কুমকুম যা আদরযত্নটা পাচ্ছে—পূরবী থাকলে কি হত জানি নে, ঠাকুরমা ধরাগিন্নির কাছে এর সিকির সিকিও পায় নি। ইচ্ছা থাকলেও বুড়োমানুষের ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠত না। এক মাসের উপর আছে এখানে, রোজই কি এমনি আদর পেয়ে আসছে? না, আজকেই শুধু? চাকরি পাওয়ার পর শিশির এই প্রথম এসেছে, চিঠি লিখে আনিয়েছে মেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য—কিন্তু সম্পর্কটা তিক্ত ভাবে শেষ হোক এমন ইচ্ছা নয়। কিছু চিনির প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছে।

অপরাহ্নে চা খাচ্ছে সুনীল মমতা আর শিশির, এ-গল্প সে-গল্প হচ্ছে। সুনীলের মেজাজ বড় প্রসন্ন। এই সুযোগ, কথাটা এইবারে পেড়ে ফেলবে নাকি? বাসা মেলে নি বড়দা, বাচ্চাটা আরও এক মাস রাখতে হবে। শেষ কথা বলে যাচ্ছি, এর পরে আর আপিল চলবে না। বাসা হোক চাই না হোক, মেয়ে তোমরা ঘাড়ে চাপিয়ে দিও, ঘাড় না পাতলে রাস্তায় ছুঁড়ে দিও তখন। সত্যিই তো, পরের বোঝা কদ্দিন আর টেনে বেড়ানো যায়! আশ্রম-টাশ্রম আছে নাকি অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্যে—বাসা না জুটলে তারই কোন একখানে রেখে দেবো। আরও একটা মাস সময় চাইছি বড়দা।

প্রস্তাব পাতবার আগে গলা খাঁকারি দিয়ে নিল। বুক ঢিব ঢিব করছে। মমতা

মেয়েমানুষ, মনটা কোমল। তারই নাম ধরে শুরু করে দিল : এই সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যাচ্ছি দিদি—

মেয়েলোকের যেমন বলা স্বাভাবিক : রাতটুকু থেকে যাও না। সকালবেলা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে সোজা একেবারে অফিসে চলে যেও।

না দিদি, মেসে বলে আসিনি. রাতের খাবার নষ্ট হবে। সকালেও নিশ্চয় চাল নিয়ে নেবে। দু-দুটো মিল বরবাদ, এ বাজারে সেটা ঠিক হবে না।

আবার কবে আসবে বলে যাও—

আসব বই কি—আসতেই তো হবে। কণ্ঠস্বরে মধু ঢেলে দিয়ে শিশির বলে, বিদেশ-বিভূঁয়ে আপনজন বলতে আপনারাই। না এসে যাবো কোথায়?

সুনীলকান্তি টিপ্পনী কেটে বলে, এই যেমন এসেছ। চিঠি লিখে হুমকি দিয়ে তবে আনতে হল। চাকরি আমিও করি, সময়ের অজুহাত আমায় দেখাতে যেও না।

ভূমিকা ভালই হল, আসল কথা এইবারে। মনে মনে শিশির দুর্গানাম জপছে : দুর্গে দুর্গতিনাশিনী—। কেশে গলা সাফ করে নেয়। বলে, একটা কথা বলব দিদি, কিছু যদি মনে না করেন।

মমতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, সব কিছু বলতে পারো একটা জিনিস ছাড়া। বললে রাখতে পারব না ভাই।

বলবার আগেই বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিল। জানা কথা। শিশিরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। মেয়ে নিয়ে শহরে এসে পড়ল, সেই গোড়ার দিনগুলো ফিরে আসে আবার। আজকের এই সন্ধ্যা থেকেই। তখন তবু চাকরির হাঙ্গামা ছিল না, সর্বক্ষণ খেদমত করতে পারত। এবারে কি হবে?

এত সমস্ত চকিতে মনের উপর খেলে যায়। হেসে মমতা কথা শেষ করল : কুমকুমকে দেবো না। সে তুমি যা-ই বলো। ননদ শাসাচ্ছে : ধর্মঘট করবে—সংসারের কুটোগাছটি ভাঙবে না তাহলে। একলা আমাকে সব করতে হবে। সে তো পেরে উঠব না ভাই। ছেলেপুলেরাও কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। মেয়ে এখানে থাকুক—অযত্ন হবে না।

কান দিয়ে শুনে গেল শিশির, কিন্তু মাথায় ঢোকে না। বলছে কি। কল্পতরুর তলায় যেন বসে পড়েছে, মনের বাঞ্ছা ফল হয়ে টুপ করে কোলের উপর পড়ল।

জবাব না পেয়ে মমতা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে : মেয়ের কোনরকম কষ্ট হবে না বলছি আমি। পাঁচ ছেলেমেয়ে আমার খেলা-ধুলো করে বেড়ায়, নতুন আর একটি সাথে-সঙ্গে ঘুরছে। এই যে এতক্ষণ এসেছ—সাড়াশব্দ পাও কিছু?

শিশির বলে, দেখছি তাই দিদি, যত দেখি অবাক হয়ে যাই। কান্নায় কান্নায় পাগল করে তুলত, এ বাড়ি আসাব সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ। এদ্দিন পরে এলাম—তা মেয়ে আমার কাছে আসতেই চায় না। সাধ্যসাধনা করে কোলে তুললাম তো সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল। মায়া জানেন আপনারা—মেয়ে আর আমার কিসের, আপনারাই নিজের করে নিয়েছেন।

মমতা বলে, সে যদি বলো, মায়াবিনী আমার ননদটি। ছেলেপুলে বশ করতে ওর জুড়ি নেই। দেখলে না, তোমার কোলে গিয়ে মেয়ে ছটফট করতে লাগল—কে যেন চাবুক মারছে। নেমে পড়ে উর্মির কোলে গেল। গিয়ে একেবারে ঠান্ডা। জোঁকের মতন গায়ে লেগে রইল।

হাসতে হাসতে বলে, আগে তবু যা-হোক পেরেছ—এবারে যে স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে, ও মেয়ে সামাল দেওয়া বড্ড কঠিন হবে। পারবেই না তুমি।

সুনীলকান্তি বলে, তা বললে তো হবে না। বাসা পেয়ে গেলে তখন কি আর মেয়ে আমাদের কাছে ফেলে রাখবে? আমরাই বা সে কথা কেমন করে বলব?

শিশির মুখ শুকনো করে বলে, কত খোঁজাখুঁজি করছি বড়দা, বাসা কিছুতেই পাইনে।

পাওয়া শক্ত, তা বলে পাচ্ছে না কি আর লোকে? খরচা করলে কলকাতা শহরে বাঘের দুধ অবধি মেলে। আর তোমার তো পুরো বাড়িও নয়—সামান্য একটা-দুটো ঘর—

একটা-দুটো ঘর বলেই তো বেশি মুশকিল। একলা পুরুষ আর বাচ্চা মেয়ে শুনে ঘর দিতে কেউ রাজি হয় না। মেয়ে-লোক নেই বলে আস্থা করতে পারে না, এই আমার ধারণা হয়েছে। অন্যায়টা দেখুন—মা নেই বলেই কি বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে চালান করতে হবে?

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উর্মি আদ্যো-পান্ত শুনল। কুমকুমকে বুকে চেপে ধরে মুখের উপর মুখ নিয়ে এসেছে। বলে, ষড়যন্ত্রটা শুনলে কুমকুম? বাসা খুঁজছে তোমার বাবা—বাসা করে নিয়ে চলে যাবে।

কুমকুম বলে, হুঁ—

হুঁ কি রে বজ্জাত পাষণ্ডী মেয়ে? আমরা কেউ যাবো না তো সেখানে, কষ্ট হবে না তোমার?

হুঁ—

তবে মানা করে দাও। বাবাকে গিয়ে বলো, যাবো না তোমার বাসায়। যাবো না, না—না—না—

শেখানো কথা কুমকুম বলে, না না-না—

মনের আনন্দে উর্মি এবার মমতাকে ডাকে : ও বউদি, কুমকুম কি বলে শোন। তার মতামতটা নেবে তো একবার--

বিজয়গর্বে উর্মিলা কুমকুমকে নিয়ে বাইরে ওদের তিনজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মজা পেয়ে গেছে কুমকুম. ঘাড় দুলিয়ে অবিশ্রান্ত হাততালি দিচ্ছে : না—না—না—

উর্মিলা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় : বাসা করলে ও যাবে কি না যাবে, তাই বলছে। যাবে কুমকুম?

না—না—না—

ঐ খেলারই খেলুড়ে হয়ে শিশির কচি মেয়ের কাছে অনুনয় বিনয় করে : হ্যাঁ, যাবে তুমি কুমকুম। যাবে বই কি, লজেন্সের পাহাড় বানিয়ে তার উপর বসিয়ে রাখব।

না—না—না—

হাত জোড় করল শিশির : বকব না কখনো। ভালবাসব। আদর করব, তোমার পিশি কক্ষনো তেমন পারবে না।

কুমকুম অবিচল। জাপানি পুতুলের মতো এদিক ওদিক ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে, আর চিকচিকে দাঁত মেলে হাসি। এই হাসির সঙ্গে মাণিক ঝরে পড়ে বোধহয়—মাটিতে খুঁজে দেখলে ঠিক পাওয়া যাবে।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে উর্মি মিটিমিটি হাসে। হাল ছেড়ে দিয়েছে যেন শিশির—তেমনি একটা হতাশ ভাব। মমতা বলে, দেখলে তো? দিনরাতের সিংহাসন ছেড়ে মেয়েকে আর নড়াতে পারবে না। বাসা করে মেয়ে নিয়ে তুলবে তো ঠাকুরঝিকেও নিয়ে যাবে।

চমক লাগে শিশিরের। কথার কোন গূঢ় অর্থ নেই তো? নটবরের নিমন্ত্রণের মতো অন্য কিছু নেই তো কুমকুমের সমাদরের পিছনে।

(ক্রমশঃ)

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

ধনঞ্জয়টার জন্যই বিরিঞ্চির সঙ্গে রমা চাকলাদারের বিয়েটা হয়নি। অথচ সবই ঠিক ঠাক ছিল। বিরিঞ্চির সঙ্গে রমা চাকলাদারের পরিচয় হয় কোনো এক হেমন্তে জুহুর সৈকতে। বিরিঞ্চি বেড়াতে গিয়েছিল বোম্বাইতে এম-এ পরীক্ষা দেবার পর। সেখানে কেবল বেড়ানো নয়, অবসর সময়ে চাকরীরও সন্ধান করত সে। সে খবর পেয়েছিল তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় একটা বড় অফিসের কেবল বড়সাহেব তাই নয়, তাঁর হাতে প্রভূত পরিমাণে চাকুরী এবং তিনি প্রতি রবিবার সকাল সাতটার সময় জুহুতে গিয়ে থাকেন, কখনো একা, কখনো সপরিবারে। বিরিঞ্চি সোজাসুজি তাঁর অফিসে দেখা করতে পারত অবশ্যই, কিন্তু তার মনে হল, হঠাৎ দেখা হওয়াই ভাল। হঠাৎ দেখা হলে তার যে কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে তা তার আত্মীয়ের মনে হবে না, এবং আলাপ সহজে জমে উঠবে। আলাপ জমে উঠলে আস্তে আস্তে চাকুরীর কথা উঠতেও পারে। এই আত্মীয়টিকে বিরিঞ্চি কোলকাতায় বহুবার দেখেছে, অতএব তাকে চিনতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

অসুবিধে হতও না, যদি বিরিঞ্চি ঠিক সময় জুহুতে পৌঁছুতো। কিন্তু বিরিঞ্চির কপাল। সেদিনই তার সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল, তাই যে ট্রেনে গেলে ভাল হত সেটায় যাওয়া হল না। যে ট্রেন সে শেষ পর্যন্ত ধরল সে ট্রেন জুহুতে যখন পৌঁছুল তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। সেখানে সে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু তার আত্মীয়ের দেখা পেল না। একা একা খানিক সে নারকেল গাছের ছায়ায় আর রোদ্দুরে ঘুরল। অবশেষে সে বালি নিয়ে দুর্গ গড়তে লাগল। এই দুর্গ গড়তে গড়তে সে হঠাৎ দেখতে পেল আস্তে আস্তে দর্শক সমাগম হচ্ছে। এদিক ওদিক থেকে দু' একজন দু' একজন করে ভীড় জমিয়ে ফেলছে। এই ভীড়ের মধ্যেই সে দেখতে পেল দুটি মহিলা। দুজনই বাঙালি। বাঙলায় কথা হচ্ছে। একজন আর একজনকে বলছে, লোকটা নিশ্চয় গোয়ার লোক, আর একজন বলছে, না না মনে হয় কেরলার লোক।

বিরিঞ্চি তখন বাঙলায় বলল, আজ্ঞে আমি বাঙালি। তারপর বলল, আপনারা বালি দিয়ে কিছু করুন না, দেখবেন খুব মজা আছে।

তারপরকার ঘটনা সংক্ষেপে বলা যায়। একজনের নামই এখানে প্রয়োজন, রমা চাকলাদার। তার সঙ্গে বিরিঞ্চির এমন পরিচয় হয় যে তারপর সে যে প্রায় তিন সপ্তাহ বোম্বাইতে ছিল, সেই তিন সপ্তাহ সে একটি চাকুরীও খুঁজতে বেরয়নি। তাকে বোম্বাইএর নানা স্থানে রমা চাকলাদারের সঙ্গে দেখা গেছে।

তারপরও কেটে গেছে তিন বছর।

রমা চাকলাদার এবং বিরিঞ্চির মধ্যে যে সমস্ত চিঠি ইতিমধ্যে চলাচল করেছে তার পরিমাণ কত ঠিক বলা যায় না, তবে একথা বলা যায়, যদি এই পরিমাণ চিঠি না চলাচল করত তাহলে ডাকবিভাগের গুরুতর রকম অর্থসংকট হত।

এই তিন বছরের মধ্যে রমা চাকলাদারের কোলকাতা আসা সম্ভব হয়নি, তবে বিরিঞ্চি দুবার বোম্বাই ঘুরে এসেছে। কেবল তাই নয় বিরিঞ্চি মাস ছয়েক আগে, বছর আড়াই চেষ্টা করবার পর একটা ভাল মাইনের চাকুরীও জুটিয়েছে এবং চাকুরী জোটানোর পর বেশিদিন যায়নি, বিরিঞ্চি রমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি পাঠানো যায় কিনা তাই নিয়ে তার বিশিষ্ট বন্ধু চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞেস করেছে। চিরঞ্জীব বলেছে, তা তোমার যখন মনে হচ্ছে বিয়ে করা দরকার তখন আমি তো ঠেকাতে পারব না। বিয়ে তুমি করবেই—আমার পরামর্শ নেবার কোনো অর্থ হয় না। তবে হ্যাঁ, মেয়েটির বয়স কত জানো?

—মেয়েটির বয়স? বিরিঞ্চি কখনো জিজ্ঞেস করেনি।

—আন্দাজ? না, কোনো আন্দাজ নেই। পোনের? না, বেশি।

—ত্রিশ? বিরিঞ্চি ভাবতে থাকে। তাইতো, মেয়েটির বয়স কত?

বিরিঞ্চি বলল, ঠিক বলতে পারছি না। কখনো জিজ্ঞেস করিনি।

চিরঞ্জীব বলেছে, জিজ্ঞেস করলেও সঠিক উত্তর পেতে না। মেয়েদের সঠিক বয়স জানা যায় না। তবে হ্যাঁ আন্দাজ করা যায়। যেমন ধরো কোন বয়সে সে ম্যাট্রিক পাস করেছে, বা কাদের সঙ্গে পড়েছে এসব জানলেই অনেকটা কাছাকাছি বয়স পাওয়া যায়। এরপরই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে বিরিঞ্চির দেখা হয়। ধনঞ্জয়রা বহুদিন বোম্বাইবাসী। বিরিঞ্চি ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করে যে রমা চাকলাদারকে সে চেনে কিনা? না, চেনে না—তবে নামটা একটু পরিচিত মনে হয়। ছবি আছে? বুক পকেটে রাখা পার্স থেকে একটা ছবি বেরয়। ওঃ এর কথা? এবারে ধনঞ্জয় চিনতে পারে। এ মেয়েটি তো আমার বড় মামার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত, চিনতে পেরেছে এবার।

ধনঞ্জয়ের বড় মামার বয়স অন্তত পক্ষে বেয়াল্লিশ বছর। খবরটা বিরিঞ্চির জানা ছিল।

এরপর থেকে হঠাৎ ডাক বিভাগের আয় কমে গেল। বিরিঞ্চি কেমন যেন উদাস হয়ে গেল, আর দুম করে একদিন ভালমানুষের মত বাড়ির লোকের কথামত জলপাইগুড়ি থেকে একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনল। কিন্তু বহুদিন পর সে জানল আসল ব্যাপার। মেয়েটির বয়স বাইশের বেশি কিছুতেই নয়। ধনঞ্জয় কিন্তু মিছে কথা কিছু বলেনি। ধনঞ্জয়ের বড় মামার সঙ্গে মেয়েটি ঠিকই পড়ত, তবে ফরাসী এমব্যাসি থেকে যে ফরাসী শেখানোর ব্যবস্থা করা হয় সেই ফরাসী ক্লাসে, যেখানে পোনের থেকে ষাট বছর পর্যন্ত বয়সের নরনারীকে হামেসাই দেখা যায়।

তুম্বুনিতে সারা দুপুর ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

তুম্বুনিতে সারা দুপুরে ধান পাকছে ধান পাকছে
মনের মধ্যে কী আশ্চর্য আরো কী সব কথা জাগছে।
আলোর রোদ ছায়ায় রোদ হাওয়ায় গান গাওয়ার রোদ
ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে।

"দুমকা যাবো, দুমকা পাহাড়"—বাস বলেছে "পথ তো ভারি!"
মাসানজোর না আসানবুনি? পথ তো ভারি, পথ তো ভারি!
বুংকাতলা লালপাহাড়ী কাচপাহাড়ী শ্যামপাহাড়ী—
পাতাবাহারী শাড়ীর চোখে আরো যেন কী কথা থাকছে
ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে।

পথের মধ্যে আরেকটা পথ মনের মধ্যে আরেকটা মন,
মাঠের মধ্যে বনের মধ্যে আরেকটা মাঠ আরেকটা বন,
সারাটা দিন গানের মধ্যে আরো যেন কী মানে থাকছে,
তুম্বুনিতে ধান পাকছে মাটিতে রোদ ছবি আঁকছে
ভালো লাগছে ভালো লাগছে ভালো লাগছে।

কন্যাকীর্তন ॥

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

চরণযুগল সিক্ত কর নি তুমি
ক্ষণবর্ষণ শৌখিন ধারাজলে
নদীর নিতল অবগাহনের ভূমি
ছুঁয়েছিলে চলাচলে।

দূরে উড়ে যায় ক্রমাতিদূর যে পাখি
ছিলে না অমন বায়ুদাস উড়ালিয়া,
স্বয়ংক্রিয় সে বাতাসে বেঁধেছ রাখী
উড্ডীন, সহজিয়া।

স্পষ্ট কখনো ডাকো নি তোমার ঘরে
কিন্তু সকলে অভ্যাসে সমাগত...
জ্যোৎস্না তোমার পুষ্পিত চরাচরে
অনায়াসে উদ্যত।

কেবলি মন্দভাগ্য করেছি আমি
চেয়েছি কণ্ঠে ও দুটি বাহুর ফাঁসি
এবং তোমারে—জানে অন্তর্যামী,
প্রকাশ্যে ভালোবাসি।

জর্নাল থেকে ॥

রবিন পাল

কাল আমি চলে গেছি দুপুরের ট্রেনে
তোমার জলের থেকে দূরে আছি এই বোধ চোখ ঘিরে,
পুলিন্দা-মস্তক নেড়ে
বারংবার ভয় ছুঁড়ে দিয়েছিলো অবসাদ-অমারেখা মেনে
কাল আমি শরীরের রং, কিছু স্মৃতি, ধোয়া জ্যোৎস্নার জল
রেখে এসেছি আঁধারে...
দুপুরের ট্রেন কাল গিয়েছিলো একা একা শাল জঙ্গলের পাড়ে।

বুকের ওপারে আছে সরোবর, তুমি তার কোন্ পারে থাকো
আমি ভুলে গেছি সেই সাঁকো,

পাখিরা মাথায় বেঁধে নিয়েছিলো লাল মুন্ডা ফল
পথজুড়ে জেগেছিলো সারারাত অনন্ত ধবল।

পশুপক্ষীসমাজে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

শিশির রায়

শুনে আশ্চর্য হবারই কথা। এমনকি হেসে উড়িয়ে দেবার কথাও অনেকে ভাবতে পারেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধিহার নিয়ন্ত্রণে মানুষ যখন প্রায় ব্যর্থ তখন পশুপক্ষীরা বৃদ্ধিহার নিয়ন্ত্রিত করবে কিভাবে? জনসংখ্যাবৃদ্ধিনিয়ন্ত্রণ মূলতঃ বুদ্ধিজীবী সমস্যা। বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রেই জনসংখ্যা-সমস্যার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন। পশুসমাজে এত মাথাব্যথা থাকতে পারে একথা কেউই হয়ত ভাবতে রাজি নন। তাদের বুদ্ধিগত সারাংশই বা কতটুকু? অথচ এই সমস্ত যুক্তিসত্ত্বেও মানুষের চেয়ে পশুপক্ষী-বৃদ্ধিহার তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত। পশ্চিমবঙ্গের কথা বিচার করেই দেখা যাক। ১৯২১ সাল থেকে প্রত্যেক দশকের প্রথম বছরে এ অবধি পাঁচবার আদমসুমারী গৃহীত হয়েছে। পাঁচবারের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৭৫ লক্ষ, ১৯০ লক্ষ, ২৩৩ লক্ষ, ২৬৪ লক্ষ এবং ৩৫১ লক্ষ। এ থেকে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, যাকে বলা যায় 'লং টার্ম আপ-ওয়ার্ড ট্রেনড্'। কিন্তু এই কথা পশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ধরা যাক, গবাদি পশু-সংখ্যার কথা (পশ্চিমবঙ্গের পশুসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই গবাদি পশুজাতীয়)। ১৯২০ সাল থেকে এ অবধি আটবার গৃহীত (পাঁচ বছর অন্তর) আদমসুমারীতে তাদের সংখ্যা হিসেব ৮৩ লক্ষ, ৯২ লক্ষ ৮৮ লক্ষ, ৭৮ লক্ষ, ১০৪ লক্ষ, ১০২ লক্ষ—স্পষ্টতঃ এটা লক্ষ্য করা যায় যে গবাদিপশুসংখ্যা বৃদ্ধি সব-সময় ধনাত্মক থাকেনি, বরং হ্রাসবৃদ্ধির পর্যায়ক্রম একধরনের সমতা প্রমাণিত করে। এধরনের সমতা সমগ্র পশুসমাজে লক্ষ্য করা যায়, সে তুলনায় বরং মানুষই পিছিয়ে আছে। আমরা আজও সর্বত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধির পৌনঃপুনিকতা রোধ করা তো দূরের কথা, বাঞ্ছনীয়ভাবে হ্রাসও করতে পারিনি। এদিক থেকে অ-মনুষ্য জীবনসমাজের জনসংখ্যার এক ধ্রুব গড়পড়তা (কনসট্যাণ্ট অ্যাভারেজ ভ্যালু) বজায় রাখা বরং কৃতিত্বপূর্ণ।

কিন্তু এরা কিভাবে সাফল্যলাভ করছে তার হিসেব দেখলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। আমাদের মনুষ্যসমাজের বিজ্ঞানীরা পন্থানিরূপণ করলেও, সর্ব-ব্যাপী সাফল্য এখনো সুদূরপরাহত। অথচ পশুপক্ষীরা সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট সফল। বলাবাহুল্য যে সমষ্টিবদ্ধ জীবনযাত্রার মধ্যে এই বোধ স্বভাবিকভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। কিভাবে হয় দেখা যাক তার বিচারবিশ্লেষণ।

অনেক পশুপক্ষী আছে যাদের সংখ্যা ঋতুপরিবর্তন, সনপরিবর্তন অথবা দশকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ভবঘুরে পঙ্গপালেরা এরকম জীব, তবু আরও ধ্রুব গড়পড়তা আছে, যদিও সময়ের হেরফেরে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়, জন-সংখ্যা যদি অবিচ্ছিন্নভাবে কিছুকাল বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে থাকলেও তা চিরস্থায়ী হয় না। অচিরেই এক স্থিতাবস্থায় আবার জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অনেকে ভাবতেন যে, একরকম 'ঋণাত্মক প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ' বা 'নেগেটিভ্ ন্যাচারাল কন্ট্রোল্'-ই এই ধ্রুব সংখ্যা বজায় রাখে। অনেকের মতে পশুদের মধ্যে শিকার-প্রবৃত্তি, অনাহার, দুর্ঘটনা এবং রোগ-জীবাণু সংক্রমণ এই নিয়ন্ত্রণের কারণ। এগুলির দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধিহার নিশ্চয়ই হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বেশীরভাগ পশুপক্ষীসমাজেই নিজেদের মধ্যে শিকারপ্রবৃত্তি দেখা যায় না। যেমন সিংহ, ঈগল প্রভৃতি। রোগভোগেও বিরাট রকমের হ্রাস হয় না। এমনকি, এ কথাও সত্য যে, অধিকাংশ জীবজন্তুর মধ্যেই অনাহার বড়ো একটা দেখা যায় না। সাধারণতঃ যূথবদ্ধ জীবেরা পর্যাপ্ত-পরিমাণ খাদ্য পেয়ে থাকে। অবশ্য কাচিৎ কখনো অনাবৃষ্টি বা অত্যধিক শীত পড়লে দুর্ঘটনাবশতঃ অধিক মৃত্যুহার দেখা দেয় না তা নয়, তবে সেগুলিকে কেবলমাত্র দুর্ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং ঋণাত্মক প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তাদের জনসংখ্যা স্থিত সম্ভব এধারণার যুক্তিগত ভিত্তি মোটেই সুদৃঢ় নয়।

বরং জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার নির্ভর করে সেই জনসংখ্যার খাদ্যসংস্থানক্ষমতার পরে। সংখ্যাতাত্ত্বিকেরা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পশুসংখ্যা এবং খাদ্যসংস্থান-ক্ষমতার মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক প্রতিপন্ন করে থাকেন কখনো কখনো। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে অনাহারে মৃত্যু ঘটে না, কারণ খাদ্যসংস্থানক্ষমতার সঙ্গে সমতা রেখেই এদের সংখ্যাবৃদ্ধিহার নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই সমতা রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চললেও সাফল্য আজও আসেনি।

খাদ্যসামগ্রীর পরিমাপ অনুসারে আমাদের বৃদ্ধিহার মোটেই সমানুপাতিক নয়, এদিকে পশুপক্ষীদের কুশলতা অনস্বীকার্য। অনেক পাখী আছে যারা বীজ অথবা ফলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তারা শীতকালে অভিনব উপায়ে খাদ্যসংরক্ষণ করে। ফলনের সময় যখন প্রচুর ফল হয় তখন সেই ফল তারা মাসের পর মাস সংরক্ষণ করে রাখে এবং তাদের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত রাখে। এমনকি যেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য-সংস্থান বারোমাস থাকে, তারাও আগের থেকেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা আগামী দিনের অনাহার ভীতির জন্য বর্তমানে ক্ষুধায় সংযমী হয়ে থাকে। ফলে, অনাহার-সম্ভাবনার বহু পূর্বেই তারা তাদের বৃদ্ধি-হার সীমিত হয়ে আসে। এ বিষয়ে এদের অনুসৃত পথও অভিনব; অনেকটা আমাদের মৎস্যশিকারের জলাশয় সংরক্ষিত করার মতো। অবশ্য প্রত্যেক প্রকারের পশুপক্ষীর প্রথা বিচার করে দেখা সম্ভব নয়। এজন্যে নমুনা স্বরূপ আঞ্চলিক প্রথায় জীবনধারণকারী পাখীদের কথাই ধরা যাক।

এই পাখীগুলির প্রত্যেকে বাসা বাধার জন্য এক একটি অঞ্চল বেছে নেয় স্ব স্ব পরিবারের ভরণপোষণের জন্য। সন্তানধারণ-কালে ওদের পুরুষসঙ্গীরা ন্যূনতম এলাকা দাবী করে বসে, সে এলাকায় এক অধিকার সীমাবদ্ধ থাকে। এভাবে যূথবদ্ধ পাখীদের দল প্রত্যেকে এক একটি এলাকার দাবীদার হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধির সীমাও বেঁধে দেয়। এই পথ অনুসৃত হয় শুধুমাত্র খাদ্য-সংস্থানের কথা ভেবে। এভাবে পরোক্ষভাবে তারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে।

এলাকা সীমাবদ্ধ করাই একমাত্র পথ নয়। সামুদ্রিক পাখীরা তো আর এরকম করতে পারে না, তাদের পথ আবার অন্যরকম। সেই পথ আরো চমকপ্রদ। তারা মাছধরার জন্য তীরবর্তী বাসার সংলগ্ন এলাকার স্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখে। এক একটি অঞ্চলের পরিমাপ কয়েক বর্গফুট। কিন্তু সামুদ্রিক অঞ্চলে মোটামুটি স্বত্ব দলের দ্বারা সংরক্ষিত থাকে। এক একটা এলাকা রাজনৈতিক সীমান্তরক্ষার মতো সুরক্ষিত থাকে। যদি কোন পুরুষ বাকি থেকে যায়, তাকে অন্যত্র যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। অনেক স্থানে আবার সদস্যসংখ্যাও সীমিত। এ সম্পর্কে জনৈক পক্ষীতত্ত্ববিদের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

> ....'The effect is to limit the density of the group living in the given habitat and unload any surplus population to a safe distance".

সবথেকে বড় কথা, এর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকলেও তার উপ-স্থাপনা প্রমূর্ত, বুদ্ধিমত্তাপ্রসূতও বটে। তারা এজন্য রক্তপাত ঘটায় না। অবশ্য মুখো-মুখি যে হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা নেহাৎই অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং মুখ থাকতে হাতাহাতি কেউই পছন্দ করে না।

জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতি সামা-জিক সূত্রের উৎস। জীবজন্তুর মধ্যে সমাজ-গঠনপ্রবণতা সেই প্রথম দেখা দেয়। মানুষের সমাজধর্মও এভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজসংগঠন কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা সেদিকে কিছুই চিন্তা করেননি। এদিকে নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, 'এ সোসাইটি ইজ্ এ ব্রাদার-হুড্ টেম্পারড্ বাই রাইভ্যালরি'। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একক অধিকার নিয়ে বসবাসকারী দলবদ্ধ পাখীদের সমাজবদ্ধ জীব নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে। বিশেষ করে, যখন তাদের মধ্যে সমাজধর্মের বহু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তখন এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। স্কটল্যান্ডের রেডগ্রোজ পাখীদের সম্পর্কে বছর দুয়েক আগে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। এদের প্রত্যেকে সুষ্ঠু-ভাবে সমাজবদ্ধ থাকে। পুরুষপাখীরা এক একটি স্থান অধিকার করে রাখে। তাদের মধ্যে যে সবথেকে শক্তিশালী তার এলাকা সবথেকে বড়ো। এরা অবশ্য কর্তৃত্বাধীন কিছু পুরুষপাখিদের বাইরে থেকেও নিজেদের দলে প্রবেশ করতে দেয়। কিন্তু শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে অথবা খাদ্যসংগ্রহ কমে যাবার লক্ষণ দেখা দিলেই এদের স্থায়িত্বের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। অবশ্য নিম্ন ক্রমিকসংখ্যাবিশিষ্ট কিছুসংখ্যককে কতদিন
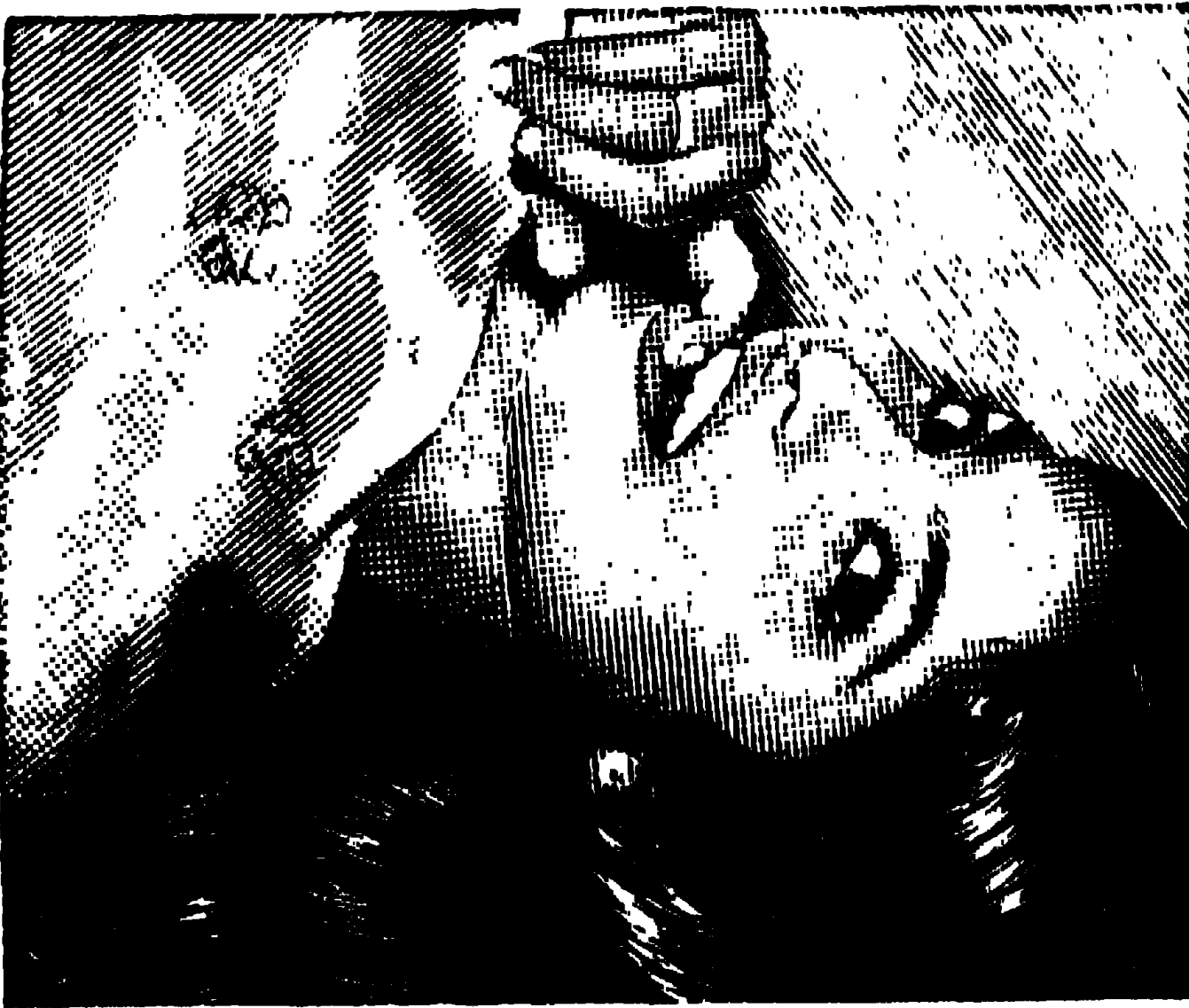
সম্ভব স্থান দেয়। সুতরাং সামাজিক বংশানুক্রমই তাদের খাদ্যসংস্থানের অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে সহায়তা করে। যাদের সভ্য হিসাবে ক্রমিকসংখ্যা নীচের দিকে তারা অতিরিক্ত সভ্যের মতো স্থান পায়। যখন কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা কোন কারণে বহিষ্কৃত হয়, তখন তাদের ক্রমিকসংখ্যা অনুসারে স্থায়ী সভ্য করে নেওয়া হয়।

রেডগ্রোজ পাখীদের প্রতিযোগিতাও নিয়মচালিত। এই প্রতিযোগিতা মূলতঃ অঞ্চল স্বত্ব এবং ক্রমিকসংখ্যা নিয়েই। সাধারণত সকালের দিকে আলো দেখা দিলেই এদের চেঁচানি এবং শাসানি শুরু হয়; ঘন্টা দুই-তিন ধরে এরকম চলে। অবশেষে অনেকেই হেরে গিয়ে দলছাড়া হয়ে যায়। কেউ কেউ আবার দুর্বল হয়ে যায় অথবা শিকারী কোন অধিক শক্তিশালী পাখি এদের হত্যা করে। কিন্তু এরকম খুব কমই ঘটে। যাই হোক, ঘন্টা তিনেক পরে তারা আবার শান্তিতেই থাকে এবং একত্রেই। আবার সন্ধ্যের সময় প্রত্যুষের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অর্থাৎ আলো-অন্ধকারের পারস্পরিক পরিবর্তনের সময়েই এদের বচসা এবং কলহ। এই সময়সন্ধি পশুপক্ষী জগতে বিশেষ প্রভাবময়। যেমন প্রত্যুষে পাখিদের গান, গোধূলিবেলায় হাঁসদের উড়ে যাওয়া ইত্যাদি একারণেই ঘটে থাকে। এদের মধ্যে আবার জনসংখ্যা-বৃদ্ধি নিয়মমতো চলে। যদি সংখ্যাবৃদ্ধি এদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে, তখন খাদ্যসঙ্কুলানের স্বার্থে সংখ্যা-হ্রাস কার্যকরী হতে বাধ্য। উদ্বৃত্তসংখ্যক পাখিদের চলে যেতে হয়। এটা শুধু রেড-গ্রোজ নয়, সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সন্তান-ধারণের সময় এদের স্ত্রী-পুরুষের মেলা-মেশাও সে অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। এ একধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণ বললে বোধহয় ভুল হবে না। সে সময় তাদের নানারকম শারীরিক ক্রীড়া-কৌশলে সময় কাটাতে দেখা যায়। বায়ুমন্ডলে তখন সৃষ্টি হয় এক সুদৃশ্য সার্কাসের। জন্মনিয়ন্ত্রণের এও এক উপায়। যেখানকার সংখ্যা যত বেশী, যত উদ্বৃত্তের দিকে, সেখানে তত জিমন্যাসটিকস্ চলে। কারণ সন্তানসৃষ্টির অর্থ খাদ্যসংগ্রহের ক্ষমতায় চাপ দেওয়া। সার্কাস খেলাতে অংশ নেয় কেবল পুরুষপাখিরা।

কিন্তু অন্যান্য রকমের পশুপক্ষী আবার অন্যধরনের প্রজননক্রিয়া থেকে বিরত হয়। যেমন ঝিঁঝি পোকা, ব্যাং প্রভৃতি সুরেলা কন্ঠস্বরে প্রতিযোগিতায় পুরুষদের আহ্বান করে। প্রণয়ের উদ্দেশ্যে সঙ্গিনীদের আহ্বান করে এটা একেবারেই ভুল ধারণা। কেবল প্রজননের মরশুমেই সার্কাস, গুঞ্জন প্রভৃতি দেখা যায়। সুতরাং প্রজননে বিরতি তাদের স্বেচ্ছাকৃত এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই। চামচিকে, উচ্চিংড়ে প্রভৃতিদের মধ্যেও এই 'ন্যাচারাল সিলেকস্যান্' প্রথা প্রচলিত। মুরগীর লড়াইয়ের কথা বাদই দিলাম।

এইসব গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, খাদ্যসংস্থান অনুসারে এক নির্দিষ্ট জন-সংখ্যা বজায় রাখাই তাদের সংখ্যানিয়ন্ত্রণের মূলকথা। ধ্রুব গড়পড়তায় দীর্ঘসূত্রতা থাকে, একথাও অনস্বীকার্য। হেরফের ঘটবে এও স্বাভাবিক। 'ভ্যারিয়েশ্যন্ ইজ দ্য রুল অব য়ুনিভার্স'। কিন্তু আবার গড়পড়তা ধ্রুব পর্যায়ে অচিরেই উপনীত হয়। পশুপক্ষীদের আতিথেয়তা বা ভদ্রতা ইত্যাদি প্রয়োজন-নির্ভর। যখন যেরকম অবস্থা, সেভাবে এই মানবিক গুণাবলীর ব্যবহার তাদের সমাজে প্রচলিত। মোটামুটিভাবে তাদের জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের সূত্রগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

(১) নবাগতদের দলভুক্তি নিয়ন্ত্রণ, (২) প্রয়োজনানুসারে উদ্বৃত্তসংখ্যক সভ্যদের দলত্যাগে বাধ্য করা এবং (৩) কখনো কখনো কলহ, রক্তপাতে সংখ্যাহ্রাস।

তৃতীয়োক্ত উপায় নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় উপায় দুটি বিস্ময়কর একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিশেষতঃ পশুসমাজে বাস্তববুদ্ধি যে পাশবিক না হয়ে এত মানবিক হতে পারে। একথা অন্ততঃ অনায়াসে বিশ্বাস করা যায়

অথচ মানুষ এখনো জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণে ব্যাপক সাফল্যলাভ করেনি। অশিক্ষার দোহাই দেওয়া সবসময় যে খাটে না পশুপক্ষী-দের জীবন থেকে আমরা তা' বুঝতে পারি। আমরা অবশ্য প্রয়াসী হয়েছি, একথা অনস্বীকার্য। এমনকি বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্যসংস্থান বৃদ্ধিও সম্ভব করতে পেরেছে মানুষ। আদিম যুগের মানুষের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ছিল না সেকথা বলা ভুল। তাদের অনুসৃত বহু প্রথার মধ্যে, শিশুপালনরত জননীর কোন পুরুষের সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ ছিল। গর্ভপাতও প্রচলিত ছিল। এমনকি নিষ্ঠুর শিশুহত্যাও অনুমোদিত ছিল।

যুগ অবিরত পরিবর্তিত হচ্ছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ এখন সমষ্টিগত ব্যাপার নয়, ব্যষ্টিগত কর্তব্য। পশুপক্ষীরা আদিম মানুষের মতো এখন সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে গোষ্ঠীর প্রয়োজনে। একদিন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সবকিছু চালিত হবে। বাঁচার প্রশ্নই আগে। অনাহার যখন অনাকাঙ্ক্ষিত, তখন জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী। জীব-জগতের সর্বত্রই তা প্রযোজ্য।

জাকার্তায় বিশেষ আদালতে সামরিক প্রহরাধীনে ইন্দোনেশীয় বিমানবাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক ওমর ধানি (মাঝখানে)। কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করার অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

দেশে বিদেশে

কথা বনাম কাজ : ভিয়েৎনামের দৃষ্টান্ত

ভিয়েৎনামের মাটিতে বড়দিনের ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধবিরতি যেরকম ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় বিদায় নিয়েছে, তাতে ইংরিজি নববর্ষ উপলক্ষে আরো ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধ-বিরতির সম্ভাবনায় কেউই উৎসাহ বোধ করছেন না। যুদ্ধ আবার পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে, ভিয়েৎনামে মার্কিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড বলেছেন যুদ্ধ বছরের পর বছর চলতে পারে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাণ্ট ওয়াশিংটনের নিরঙ্কুশ ফতোয়া পাওয়া সত্ত্বেও শান্তির সন্ধানে এখনও কেবল জঙ্গলে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। এইভাবে ভিয়েৎনামে শান্তির আশা সম্পর্কে যখন সবাই নিরাশামগ্ন হতে চলেছেন, ঠিক সেই সময়েই **নিউ ইয়র্ক টাইমস** কাগজে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ শান্তির জন্যে মার্কিন সদিচ্ছাকে এবং পৃথিবীর সামনে মার্কিন সরকারের প্রতিচ্ছবিকে নতুন ও মারাত্মকভাবে আঘাত করল।

ঐ সব প্রবন্ধে পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজিং এডিটার মিঃ হ্যারিসন সল্সবেরী সরাসরি হ্যানয় থেকে উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন, উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণের লক্ষ্যবস্তু কেবল "ইস্পাত, কংক্রীট আর মর্টার" এই বলে মার্কিন সমরকর্তারা যে দাবী করে থাকেন সেটা অত্যন্ত বাজে কথা; হ্যানয় শহরের অ-সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপরেও বোমা বর্ষিত হচ্ছে এবং এর ফলে বহু বসতবাড়ীও বিধ্বস্ত হয়েছে।

মিঃ সল্সবেরী তাঁর একটি প্রবন্ধে হ্যানয়ের দক্ষিণাঞ্চলে এক নম্বর সড়কের পাশে অবস্থিত ভ্যান্ডিয়েন এলাকার একটি ট্রাক পার্কের ওপর মার্কিন আক্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন :

"মার্কিন মানচিত্রে দেখানো হয়েছে যে ট্রাক পার্কটি এক নম্বর সড়কের ঠিক পূর্বে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ট্রাক পার্কের কম্পাউন্ড বলে যা বলা হচ্ছে সেটা সড়কের সম্ভবত এক মাইল পূর্বে অবস্থিত এবং মাঝখানের খোলা জায়গাটায় হাল্কা ধরনের বাড়ীঘর রয়েছে।

"বোমার আঘাতে ট্রাক পার্ক বলে কথিত জায়গাটি বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু বোমার ক্ষতি কেবল কম্পাউন্ডের মধ্যেই সীমিত ছিল না। সড়কের দু' পাশে প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে এই ক্ষতির চিহ্নগুলি ছড়িয়ে ছিল। যে বাড়ীগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে তার মধ্যে আছে সড়কের পশ্চিমে এবং মার্কিন লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রায় পোনে এক মাইল দূরে অবস্থিত একটি

ভিয়েৎনাম-পোলিশ মৈত্রী সিনিয়ার হাই-স্কুল।

"সরেজমিনে তদন্ত করলে একথা মনে হবে যে, হয় মার্কিন বোমা বর্ষণের মধ্যে নিখুঁত দক্ষতার কোন পরিচয় নেই, আর না হয় যেখানে ইচ্ছা পড়ুক, যাকে খুশি আঘাত করুক এই নীতিতেই বোমাগুলি ফেলে যাওয়া হচ্ছে। উত্তর ভিয়েৎনামীরা বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে অসামরিক জনগণের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে যাচ্ছে যদিও তার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল "সামরিক লক্ষ্যবস্তু"।

"মাটিতে দাঁড়িয়ে সাধারণ ভিয়েৎনামী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর যুক্তি খাড়া করা অত্যন্ত কঠিন। সব দেখেশুনে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না যে, কারণ যা-ই হোক, সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যতগুলি বোমা ব্যয়িত হচ্ছে, তার চাইতে অনেক বেশি বোমা অসামরিক জনগণকে আঘাত করেছে।"

মার্কিন রেডিও ও টেলিভিশন কোম্পানীগুলি মিঃ সল্সবেরীর রিপোর্ট-গুলিকে লুফে নিয়ে ফলাও করে প্রচার করছে। পেণ্টাগণ যদিও অনেক দেরীতে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, বোমার আক্রমণে কিছু কিছু অসামরিক লক্ষ্যবস্তু বিধ্বস্ত হলেও হয়ে থাকতে পারে, তবু সরকারের সুনাম তাতে বাড়েনি। কেননা এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ যতখানি সংযমের দাবী করে থাকেন ততখানি সংযতভাবে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে না, এবং মিঃ সল্সবেরীর রিপোর্ট প্রকাশিত না হলে তাঁরা সেটা আদৌ স্বীকার করতেন না।

যদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীসত্যব্রত বৈদ্যনাথ শংকরণ চ্যান্সেলার শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছ থেকে ছয়টি পদক গ্রহণ করছেন।

সুসময়ের কংগ্রেসী

গত ৬ ডিসেম্বর সাতটি রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও কেরল) বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসীরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে জন কংগ্রেস নামে একটি নতুন দল গঠন করে কংগ্রেসের ভাঙনের রূপটিকে তুলে ধরেছিল। ২২ ডিসেম্বর শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন কংগ্রেস থেকে তাঁর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ঐ রূপকে একটা নাটকীয়তা দান করে-ছিলেন। এখন বিহার ও রাজস্থান থেকে যে-সব খবর আসছে তাতে মনে হবে ঐ ভাঙন শুধু গভীর নয় ব্যাপকও বটে। কিন্তু ঐ সব খবর থেকে এই কথাটাও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এরা সবাই ভগ্ন-মনোরথ, সুসময়ের কংগ্রেসী। মনোমত সুবিধা আদায় করতে না পেরে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, যদিও এ'দের বিরোধিতা সরকারী কংগ্রেসকে বেগ দিলেও দিতে পারে।

বিহারে গত ২৮ ডিসেম্বর রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান এম-এল-সি শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহের নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার কংগ্রেসী এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, তাঁদের মতে, বর্তমান নেতৃত্ব যদি রাজ্য

ভাঙনের মুখে

কংগ্রেসে কায়েম থাকে তাহলে জনগণের কল্যাণ কখনই সম্ভব নয়।

প্রকাশ, সম্মেলনে কংগ্রেসের "জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির" বিবরণ দেবার সময় শ্রীসিংহের চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছিল।

কিন্তু শ্রীসিংহের চোখের জলের চাইতেও বড় আশঙ্কার কারণ কংগ্রেসের পক্ষে ঘটবে যদি রামগড়ের রাজা শ্রীকামাক্ষ্যা-নারায়ণ সিংহ ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসীদের মদৎ দেন। রামগড়ের রাজা ২৮ ডিসেম্বরের সভায় উপস্থিত ছিলেন, যদিও নতুন দলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করার জন্যে তিনি আরো কয়েকদিন সময় চেয়েছেন। আর দলের নেতৃত্ব করার জন্যে শ্রীঝার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানানো হয়েছে।

আবেদনের উত্তরে শ্রীঝা কি বলবেন সেটা এখনো অনিশ্চিত, কিন্তু এটা লক্ষ্যণীয় যে, দু'দিন পরেই, ৩০ ডিসেম্বর, নতুন দলে যোগদানেচ্ছু কংগ্রেসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫০০ এবং বলা হয় যে, অন্তত ৬০ জন এম-এল-এ নতুন দলের সঙ্গে হাত মেলাতে ইচ্ছুক।

রাজস্থানের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীকুম্ভরাম আর্যের নেতৃত্বে পাঁচজন মন্ত্রী গত ২০ ডিসেম্বর শ্রীসুখাড়িয়ার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। পরে ২৫ ডিসেম্বর তাঁরা এবং তাঁদের অনুগামীরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা যে নতুন দল গঠন করেছেন তার নাম দেওয়া হয়েছে জনতা পার্টি। দলের লক্ষ্য : দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গঠন এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রীআর্য তাঁর গোষ্ঠীর কংগ্রেস ত্যাগের দু'টি কারণ দেখিয়েছেন : এক, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাড়িয়া এবারও বিধানসভার একটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। দুই, তিনি আর্য-গোষ্ঠীর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে নির্বাচনী তালিকা থেকে বেছে বেছে আর্য-সমর্থকদের বাদ দেবার মতলব করেছেন। এই অবস্থায়, শ্রীআর্যের বক্তব্য, কংগ্রেসের মধ্যে থাকার আর কোন সার্থকতা নেই, কেননা সেখানে তাঁদের ভাগ্যের দরজায় তালা পড়ে গেছে।

বাইরে গিয়েও কি আর্য-গোষ্ঠীর খুব একটা সুবিধে হবে? শ্রীসুখাড়িয়া অবশ্য এই ভাঙনের ঘটনাকে আমলই দিতে চাননি এবং বলেছেন যে এর ফলে রাজস্থানে কংগ্রেসের ভাগ্যের কোনরকম হেরফের হবে না। তবু এটা মনে রাখা দরকার যে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস রাজস্থানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সেদিন শ্রীআর্য-সমর্থক নির্দলীয় সদস্যদের সহযোগিতা তাদের দরকার হয়েছিল। সেদিক থেকে শ্রীআর্যের দলত্যাগ সরকার গঠনের সময় জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে শ্রীআর্যের পকেটে যখন অন্তত ২৫ জন এম-এল-এ রয়েছেন, তখন অসুবিধাটা খুব সামান্য হবে না এটা বলা যায়।

তার চাইতেও বড় কথা, জনতা পার্টি স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। গত নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র দল রাজস্থানে আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী এবার সরকার গঠনের সঙ্কল্প প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ-যোগ্য যে, তিনি এবার লোকসভায় দাঁড়াচ্ছেন না। তাছাড়া এবার স্বতন্ত্র দল জনসংঘের সঙ্গে ফ্রণ্ট করেছে। এখন যদি জনতা পার্টিও এসে এই ফ্রণ্টে যোগ দেয় তাহলে অবস্থাটা খুব সুবিধের না-ও হতে পারে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

সালতামামি

পুরাতন বৎসর শেষ হয়ে যখন নতুন বৎসর আসছে ভারতবর্ষ তখন একটা কঠিন বৈষয়িক অবস্থার মধ্যে পড়ছে। ১৯৬৬ সালের শেষে এই দেশের আর্থিক পরি-স্থিতির যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, যাঁরা ভারতবর্ষের অর্থনীতি পরিচালনা করেন, তাঁদের আগামী বৎসর অত্যন্ত সতর্কভাবে পদক্ষেপ করতে হবে।

আগামী বৎসরের অর্থনৈতিক পরি-স্থিতির প্রধানতম দুর্লক্ষণগুলি হচ্ছে:— (১) সরকারী আয়ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতি বাড়ছে, (২) বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা চলছে এবং (৩) ভাল ফলন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

এখন অনুমান করা হচ্ছে যে, চলতি আর্থিক বৎসর সরকারী আয়-ব্যয়ের মধ্যে ঘাটতির অঙ্ক ৩০০ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছবে। যখন বাজেট তৈরী করা হয় তখন অনুমান করা হয়েছিল, ৩২ কোটি টাকা ঘাটতি হবে। টাকার বাট্টা হ্রাস করার পর অনুমান করা হল যে, ঘাটতি বেড়ে ৪০ কোটি টাকা হবে। কিন্তু তারপর কতকগুলি খাতে সরকারী ব্যয় অনুমানের অতিরিক্ত বেড়েছে। যেমন, খরাক্লিষ্ট এলাকায় ত্রাণ-কার্যের বাবদ বৎসরের আরম্ভে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি টাকা। এখন অনুমান করা হচ্ছে যে, এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির দরুণ ব্যয় বাড়বে ৩৯ কোটি টাকা। সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ করতে সরকারকে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখ থেকে আমদানী করা গমের বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে এই বাড়তি ব্যয়ের বোঝা অবশ্য কিঞ্চিদধিক ১৫ কোটি টাকা কমবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হচ্ছে এই যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে রাজ্য সরকারগুলির ওভার-ড্র্যাফটের দায় উদ্ধার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থসাহায্য দিতে হয়েছে। জুন মাসের শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ৯৫ কোটি টাকা দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির ওভারড্র্যাফটের দেনা শোধ করেছেন। কিন্তু তারপর আবার রাজ্য সরকারগুলি ওভারড্র্যাফট্ নিতে আরম্ভ করেছেন এবং ইতিমধ্যে তার পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

আয়ের দিকে, রপ্তানী কর বৃদ্ধির ফলে মাসে অতিরিক্ত ১৫ কোটি টাকা রাজকোষে আসবে। তাছাড়া, প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করার ফলে এবং টাকার বাট্টা হ্রাসের দরুণ পি এল—৪৮০ তহবিল থেকে ভারত সর-কারের প্রাপ্তি বাড়বে অন্ততঃ ১০০ কোটি টাকার মত।

এইসব যোগ-বিয়োগের ফলে, মোটের উপর, সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ বাজেটের অঙ্কের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে যে অনিশ্চয়তা এখনও চলছে তার কথা সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর পুনরায় উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যতে যাই হোক না কেন, বর্তমান আর্থিক বৎসরের যে কয়েক মাস সময় অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে যে বৈদেশিক সাহায্যের অনেকখানি অংশই ব্যয় করা সম্ভব হবে না এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৬৬ সালের ভারতীয় অর্থনীতির তৃতীয় দুর্লক্ষণ এই যে, কৃষির, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের, ফলন বৃদ্ধির আশা এই বৎসর কার্যে পরিণত হয়নি। তার প্রধান কারণ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এবং মধ্য-প্রদেশ ও গুজরাটের কতকগুলি অংশে অনাবৃষ্টি। সম্প্রতি কিছু বৃষ্টি হওয়ায় রবি ফসলের আশা উজ্জ্বলতর হয়েছে; কিন্তু মোট ৮ থেকে ৮ কোটি টনের বেশী খাদ্যশস্য পাওয়ার আশা দুরাশা। অথচ বৎসরের গোড়ায় অনুমান ছিল যে, ৯ কোটি টন খাদ্যশস্যের ফলন হবে।

এইসব কারণে, ১৯৬৬ সালে ভারত-বর্ষের অর্থনীতির প্রায় সর্বাঙ্গীণ অবনতি ঘটেছে। আশা করা হয়েছিল যে, টাকার বাট্টা হ্রাসের পর রপ্তানী বাড়বে এবং বাট্টা হ্রাসের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বাজারদর চড়বে না। কিন্তু এই দুই আশার কোনটিই সত্য হয়নি। রপ্তানী বাড়েনি এবং বাজারদর ক্রমাগত চড়ছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও রসায়ন শিল্পে কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও, সাধারণভাবে শিল্পের উৎপাদন বাড়েনি। তুলার অভাবে অনেকগুলি সুতাকল এবং আখের অভাবে অনেকগুলি চিনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সরকার তুলা ও আখের দর বাড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। কয়লার দর বাড়াবারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এইসব মূল্যবৃদ্ধির চাপে বাজার ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী হয়েছে।

এক ফোঁটা বৃষ্টি

এশিয়ার গল্প
॥ সাত ॥
ইন্দোনেশিয়া

পিয়ার ডি সিলভা

প্রচণ্ড খরা হয়েছিল সে বছর। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল মাটি। কাদা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়ে পায়ের তলার শক্ত চামড়ার মত ফেটে ফেটে গিয়েছিল। এমন হয়েছিল যে কাজকর্ম ফেলে বৃষ্টির জন্যে পুজো দিতে শুরু করেছিল সবাই। রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলে চাকার টানে ধুলোর ঝড় উঠে অন্ধকার হয়ে যেত চারদিক। পাতার ওপর এতো পুরু হয়ে ধুলো জমত যে পাতার আসল রং আর চেনা যেত না।

ধানের জমিগুলো শুকিয়ে গেল একে একে। মোষগুলো পর্যন্ত অনায়াসে চলে বেড়াতে লাগল তার ওপর দিয়ে; বিশাল শরীরের ভারে ডুবে গেল না কাদার মধ্যে, যেমন আগে যেত।

পিপাসায় অস্থির হয়ে বনজঙ্গল থেকে জলের খোঁজে বেরিয়ে এল জন্তু জানোয়াররা। মানুষের বসতিতে এসে হাজির হল, কিন্তু তাড়া খেয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল আবার। কিছুদিন যেতে না যেতেই ফের এসে হাজির হল আবার। এবার আর তারা মানুষের মারের ভয়ে ফিরে গেল না। খানাডোবার কাদামাখা একটু জলের জন্যে মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে শুরু হল মারামারি।

সেই তীব্র তাপে অস্থির হয়ে উঠত বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলো; ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ত। খরার শুরুতে ঘাম হত প্রচুর। এখন ঘামও নেই শরীরে। বাচ্ছাগুলো ছায়ায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করছে যন্ত্রণায়। আর তাদের মায়েরা ব্যথাভরা চোখে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে।

অসীম ক্লান্তিতে উঠে দাঁড়াল লোকটি, তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হাঁটতে হাঁটতে তার ধানের জমিতে এসে দাঁড়াল। তার সবচেয়ে বড় জমি এটা। শুকিয়ে ফেটে গেছে মাটি। ছোট ছোট ধানের চারাগুলোকে মেরে ফেলেছে গলা টিপে। অথচ কী আশ্চর্যরকম তেজিয়ান হয়ে উঠেছিল চারাগুলো।

জমির মাঝখানে ছোট টিলা একটা। লোকটি গিয়ে তার চুড়ায় উঠল। হাত দিয়ে কপাল ঢেকে তাকাল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেদিক থেকে মেঘ উঠে এসে বৃষ্টি হয় চিরকাল। এবার একি হল। বহু দূর অতীতের দিকে তাকিয়েও এর নজির পেল না সে। টিলা থেকে জমিতে নেমে এল লোকটি। একটা লাঠির ডগা দিয়ে বিঁধে এক টুকরো মাটি তুলল হাতে। থাবার চাপে গুঁড়িয়ে ফেলল। ধুলো হয়ে গেল মাটির টুকরোটা, হাওয়ায় ভেসে গরম মাটির ওপর গিয়ে নামল আবার।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এল লোকটি। তার স্ত্রী এগিয়ে এল তাকে দেখতে পেয়ে, বৃষ্টির জন্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে

কি হবে?' বলল সে, 'যা হবার হবে। সে কথাই ভাবো। তাতেই শান্তি।'

স্ত্রীর ঈষদুন্নত মুখের দিকে তাকাল লোকটি। তার প্রেয়সী, স্ত্রী। কিন্তু অনুর্বর। গত দশ বছর অপেক্ষা করছে তারা। দশ বছর। ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করেছে। কিন্তু সন্তান হয়নি।

'চাল ফুরিয়ে গেলে কি খাব?' বলল লোকটি, 'আমাদের তো বন্ধুবান্ধবও কেউ নেই যে সাহায্য করবে।'

'জানি না', মৃদুকণ্ঠে বলল তার স্ত্রী, 'সন্তানহীনা মেয়েরা বন্ধুবান্ধব ছাড়াই বাঁচতে শেখে। কিছু একটা উপায় বের করা যাবেই। না খেয়ে তো আগেও দিন কাটিয়েছি।'

ঘরে ফিরল তারা; পাশাপাশি বসে রইল একটা বেঞ্চির ওপর। আকাশের চূড়ায় উঠে এল সূর্য। হাওয়ার ঝাপ্টায় ধুলো আর কাঁকর উড়ে যেতে লাগল ফাটা মাঠের ওপর দিয়ে।

লোকটি ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। স্বপ্নে তার বিয়ের উৎসবমুখর দিনে ফিরে গেল। এই ছোট্ট গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল তার। বন্ধু-বান্ধবদের উল্লসিত চীৎকার আর হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল তার কানে। অন্য কোন দিকে বিশেষ নজর ছিল না তার। থেকে থেকেই তার দৃষ্টি গিয়ে মিলছিল তার প্রেয়সীর দৃষ্টির সঙ্গে। আনন্দে ভরে উঠেছিল বুক। কেননা, গ্রামের সবাই ভালবাসত তাদের। তাছাড়া তাদের জমির মত এমন উর্বর জমি ধারে কাছে আর কারোও ছিল না। ভবিষ্যৎ স্বর্ণাভ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল।

সে যখন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেছে তার স্ত্রী তখন বসে বসে অতীতের কথা ভাবছে। তাদের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করছে। বিয়ের পর এক বছর পার হয়ে গেল কিন্তু কোন সন্তান হল না দেখে তার মায়ের কি রকম দুশ্চিন্তা হয়েছিল মনে পড়ল তার। তৃতীয় বছরে বন্ধু-বান্ধবরাও আর সহজভাবে নিতে পারল না তাদের। তাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। এমন উর্বর দেশে মানুষের অনুর্বরতা কেমন যেন বেমানান, ব্যাখ্যা করা যায় না।

তারপর থেকে তারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। দুজনে মিলে দৈনন্দিন কর্তব্য করে যাচ্ছে নিঃশব্দে। তারই মধ্যে কখনো কখনো হয়ত স্বপ্ন দেখছে। একটি ফুটফুটে সন্তানের স্বপ্ন। কিন্তু বেশিক্ষণ না, বেশিক্ষণই গা ভাসিয়ে দেয়নি সে স্বপ্নের মধ্যে।

এই কিছুদিন ধরে কিন্তু তার শরীর কি রকম ভারি বোধ হচ্ছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে সেকথা ভেবেছে সে। কিন্তু তার স্বামীকে বলেনি কিছু।

আকাশের চূড়া ছুঁয়ে সূর্য আবার পশ্চিমের আকাশ বেয়ে সমুদ্রের দিকে নামতে শুরু করল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল ছায়া, ঢেকে ফেলল তাদের বাড়িটা এবং তারপর বাড়ি ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল আরও। পাখীরা তাদের বাসায় ফিরতে শুরু করল। সন্ধ্যার রক্তাভা নেমে এল ঝোপঝাড়ের ওপর। দিগন্তরেখায় তীব্র সোনালী আলো দুলে উঠে মুহূর্তেই আবার সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

যেমন বসেছিল তেমনিই চুপ করে বসে রইল তারা। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল একে একে তারা উঠছে। তারার আলো এসে তাদের ছোট বাড়িটার ওপর নামল।

তার স্ত্রী উঠে ভেতরে গেল এবং এক বাটি ভাত আর কিছু শুকনো মাছ নিয়ে এল। সোজা হয়ে বসল সে, হাত-পাগুলো টান-টান করে ছড়াল একবার, খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিল। থুথু ফেলল মাটিতে। ধুলোয় জড়িয়ে ছোট একটা বল হয়ে গেল থুথুটা, গড়িয়ে চলে গেল খানিকটা দূরে, তারপর শুষে গেল মাটিতে।

খাওয়া শেষ করে উঠোনে এল তারা। একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা।

রাত্রে তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। কেমন একটা ব্যথার অনুভূতি। একটু পরেই আবার। কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা একটা। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে স্বামীর কাঁধে হাত রাখল।

মুখ ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল সে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। অশ্রুর ফোঁটা জমেছে চোখের কোণে স্বামীর কানে কানে ফিস-ফিস করে বলল, 'এসেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। সন্তান এসেছে আমার।'

স্ত্রীকে নিজের বাহুবন্ধে টেনে নিল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাড়ির ছাতের ওপর বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা পড়ল।

অসময়ে মধুবন্ধু

(৪৫)

নিজস্ব প্রোডাকশানের জন্য গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে চিত্রনির্মাণের জন্য লাইসেন্স তো পেলাম, কিন্তু কোন ফাইনান্সিয়ারই এগিয়ে এলেন না আমার ছবিতে টাকা লগ্নী করতে—বরং সবাই লাইসেন্স কিনে নিতে চাইলেন। বলা বাহুল্য সেটা ১৯৪৫ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ হবে। এবং মাত্র মাসদুয়েক পরেই লাইসেন্স প্রথা উঠে যাবে, তবু কালোবাজারে এই লাইসেন্সের দাম ছিল ৭০,০০০ হাজার টাকা।

খুবই মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল। এত কষ্ট করে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে লাইসেন্সটা যদিও বা পাওয়া গেল, তবু টাকার অভাবে শেষপর্যন্ত ছবি করতে পারব কিনা, তার ঠিক নেই। কালোবাজারে যে লাইসেন্স বিক্রী করব না—এটা মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছিলাম। একে তো এই মানসিক অশান্তি, তার ওপর কৃষ্ণার কাছ থেকে এমন একখানা চিঠি পেলাম যা অশান্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল।

আগেই বলেছি যে, রেডক্রশ বিভাগ থেকে কৃষ্ণাকে বাঙ্গালোরের কাছে একটা সামরিক হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তার সঙ্গে মাসদুয়েক দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি আমার, তবে চিঠির আদান-প্রদান ছিল। ইদানীং তার চিঠিও ক্রমশ কমে আসতে লাগল। প্রথমে কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে চিঠি পড়ে মনে হোত যে, কৃষ্ণার চিঠির ভাষার মধ্যে যেন সে আগের মত উত্তাপ আর নেই—কিরকম যেন মামুলি নিষ্প্রাণ ভাব। পরে অবশ্য আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম।

কৃষ্ণা আমায় লিখে জানাল যে, হাসপাতালের যিনি প্রধান ডাক্তার, তিনি একজন আই-এম-এস—খুব ভালো লোক, তাঁর প্রেমে পড়েছে সে। সেই সঙ্গে প্রেম এবং প্রেমিক-প্রেমিকা সম্বন্ধে একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে। তার পড়াশুনা ছিল ভালো এবং লিখতেও পারত মন্দ না। সে আমাকে সুন্দর ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করেছিল—ডাক্তারের সঙ্গে তার ভালবাসা এবং আমার সঙ্গে তার ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কতখানি? যাই হোক, মোদ্দা কথা হল, তার চিঠি থেকে যা বুঝলাম, তা হল এই যে, তার বয়েস হয়ে আসছে, এদিকে শরীরও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। এখন সে চায় স্থিতি—একটা নিশ্চিত আশ্রয় এবং জীবনের বাকি দিনগুলোর জন্যে একান্ত নির্ভরতা। এসব বিবেচনা করেই সে ঠিক করেছে যে, এই ডাক্তারকেই সে বিয়ে করবে। এর পরেও সে লিখেছে যে, আজ হয়ত আমরা উভয়ে উভয়কে খুবই ভালবাসি, কিন্তু আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের পেশা, আমাদের জীবন-দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রথমত সাধনার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনত সম্পূর্ণ হয়নি—তারপর একজন চিত্র-পরিচালকের জীবনে কোন নিশ্চিত নির্ভরতা বলে কিছু নেই, কোন বাঁধাধরা আয় নেই। এমনকি কাজকর্মেরও ঘড়ি-ধরা কোনো আইন-কানুন নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হোল ছবির সাফল্য বা অসাফল্যের ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। 'বক্স-অফিসে' ছবির সাফল্য মানেই আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ আরও কয়েকটা নতুন কণ্ট্রাক্ট, আর ছবির ভাগ্য খারাপ হলে আমরাও খতম।

চিঠিখানাতে আমি অত্যন্ত আঘাত পেলেও তার মনের ভাবটা বুঝলাম। মনে মনে এও বুঝলাম যে, সে এখন আর তরুণী নেই—ক্রমশ বয়েস হয়ে আসছে। সুতরাং এখন যদি এমন কাউকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে পায়, যাতে সে বাকি জীবনটা নিরুদ্বিগ্ন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে, তবে সেটাই হবে তার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং কাম্য।

যুক্তি দিয়ে, তর্ক দিয়ে মনকে যতই বোঝাতে চেষ্টা করি, মন কিন্তু বোঝে না। বিশেষ করে যারা আমাদের মত ভাবপ্রবণ, তাদের কাছে এ-ধরনের আঘাত খুব বেশী করেই লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিঃসঙ্গ জীবনে কৃষ্ণার এই চিঠি অশান্তির মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল।

মনের যখন এইরকম অবস্থা, চারিদিকে হতাশার সাগরে কোন কুলকিনারা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে কালীদার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম—এই প্রথম চিঠি। চিঠিখানা খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তাতে যা লেখা ছিল, তাই মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিঠির হুবহু ভাষাটা এখন ঠিক মনে নেই, তবে মোটামুটি ভাবটা এইরকম : "You are a born fighter, you will have to fight against all odds —অর্থাৎ তুমি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছ, আরও স্বহু

সংগ্রাম করতে হবে। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তিনি যে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। এতদিনে আমি বুঝেছিলাম যে, তাঁর মুখের কথাই তাঁর বাণী। সুতরাং তিনি যখন বলেছেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে"—তখন আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। মনে খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম।

এর কিছুদিন পরেই একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

আর-কে-ও রেডিও পিকচার্সের ম্যানেজার মিঃ ক্র্যাস্টো আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়াতে আমার প্রায়ই দেখা হত। সে জানত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে আমি একটা লাইসেন্স পেয়েছি ছবি করবার জন্যে। কিন্তু ব্ল্যাক-মার্কেটে সে-লাইসেন্স বিক্রী করতে আমি রাজী নই বলে সেটার এখনও কোনো সুরাহা হয়নি, আমার কাছেই পড়ে আছে। সে একদিন আমাকে টেলিফোন করে বলল যে, আমি যেন একবার তার অফিসে গিয়ে দেখা করি—বিশেষ জরুরী দরকার আছে।

গিয়ে দেখা করতে ক্র্যাস্টো বলল : একজন বিরাট ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সেদিন আমার আলাপ হয়েছে, সে একটা হিন্দী ছবি করতে চায়। ভদ্রলোকের বাড়ী হল হায়দ্রাবাদ। তাকে আমি তোমার কথা বলেছি, সে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায়—কবে তুমি দেখা করতে পারবে তার একটা দিন ঠিক করে ফেল। সে তোমার 'রাজনর্তকী' এবং 'কোর্ট ড্যান্সার' দুই-ই দেখেছে এবং তার ভাল লেগেছে। আমি তাকে বলেছি যে, গভর্নমেণ্ট তোমাকে একটা লাইসেন্স দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ছবি করার জন্যে।

তখন আমি ক্র্যাস্টোকে বললাম : শোনা যাচ্ছে যে, আসছে বছর থেকে এই ফিল্মের লাইসেন্স প্রথা গভর্নমেণ্ট একেবারে তুলে দিচ্ছে—তখন আর এর কোনো মূল্যই থাকবে না। রয়েছে আর মাত্র একটা মাস।

ক্র্যাস্টো বললে : ফিল্ম লাইসেন্স প্রথা উঠে গেলেও কিছুদিন এখন সেইসব প্রোডিউসাররাই ফিল্ম পাবে, যারা এর আগে স্বাধীনভাবে ছবি করেছে, একেবারে নতুন যারা, তারা তাদের নামে ফিল্মের 'কোটা' পাবে না। সুতরাং তোমার লাইসেন্স এখন এ-সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

দু'দিন পরে ক্র্যাস্টো সেই ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার দিনস্থির করল। প্রথম আলাপেই মনে হল ভদ্রলোকটি বেশ ভাল—সুন্দর পড়াশোনা আছে। প্রথমটা আমি বেশ অবাক হলাম যখন শুনলাম তিনি একজন মুসলমান। নাম মিঃ কলকাতাওয়ালা। তবে একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলাম তখনই, যখন দেখলাম, বড় ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কবি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন মুগ্ধ ভক্ত। আমি যখন তাঁকে বললাম, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম জীবনে লেখাপড়া শুরু হয় এবং পরে তাঁর সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁর দুটি ছোট গল্প—'ডালিয়া'র মঞ্চরূপ এবং 'গিরিবালা'র চিত্ররূপ (নির্বাক) দিয়েছি এবং গুরুদেব নিজে সে-চিত্রনাট্য সংশোধন করে দিয়েছিলেন—তখন তিনি আমার প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, তিনি তখন 'গিরিবালা'র মোটামুটি গল্পটি আমার কাছ থেকে শুনতে চাইলেন। আমি বললাম—তিনি খুব আগ্রহসহকারে শুনলেন এবং আমাকে গল্পটির একটি সারাংশ লিখে দিতে বললেন।

দিন-দুই পরে 'গিরিবালা'র একটা সারাংশ তাঁকে লিখে দিলাম। পড়ে ও'র খুব ভাল লাগল। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'গিরিবালা'র সবাক চিত্রস্বত্ব পাওয়া যেতে পারে কিনা।

আমি বললাম : বিশ্বভারতীর কাছ থেকে এই গল্পটির প্রথমে চিত্রস্বত্ব আমারই নেওয়া ছিল, পরে আমি সেটা ম্যাডান থিয়েটার্সকে দিয়ে দি। কিন্তু সেটা মাত্র নির্বাক সংস্করণের জন্য। সুতরাং বিশ্বভারতীর কাছে সবাক সংস্করণের স্বত্ব পাওয়ায় কোন অসুবিধে হবে না। যদিও গুরুদেব এখন জীবিত নেই, কিন্তু তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন। তিনিও আমায় খুবই স্নেহ করেন।

তারপর টাকাকড়ির বিষয় কথাবার্তা হল এবং তাঁর সলিসিটর কণ্ট্রাক্টের খসড়া তৈরী করে ফেলল। তাঁর সঙ্গে দেখা হবার ৮।১০ দিনের মধ্যে আমাদের কণ্ট্রাক্ট সই হয়ে গেল। যেদিন সই করলাম, সে-তারিখটা হল ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫। সে-তারিখটার কথা আমার আজও মনে আছে, কারণ টাকার দিক থেকে ও অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারের দিক থেকে এইটিই আমার চিত্র-জীবনের শ্রেষ্ঠ কণ্ট্রাক্ট। এই ছবির প্রোডাকশানের সমস্ত দায়িত্ব আমার—স্টুডিও, কলাকুশলী, শিল্পী, সংগীত-পরিচালক এবং যাকিছু প্রয়োজন সব নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব একমাত্র আমার।

আশ্চর্য, লাইসেন্স পেয়েছি প্রায় মাস-তিনেক আগে, এত চেষ্টা করেও একজন ফাইনান্সিয়ার যোগাড় করতে পারিনি আর চিত্র-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ কণ্ট্রাক্ট-এর জন্যে কোন চেষ্টা করিনি—হঠাৎ মিঃ ক্র্যাস্টোর টেলিফোন এল এবং ৮।১০ দিনের মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ করে ছবি তৈরীর সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হয়ে গেল! তাও আবার তিনি ফিল্ম-জগতের লোক নন, হায়দ্রাবাদের একজন ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে, যিনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে আমার হাতে কয়েক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন!

ভগবানের লীলা সত্যই আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বারবার কালীদার কথা মনে হতে লাগল—"ঘাবড়াবার কিছু নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

প্রোডাকশানের তোড়জোড় শুরু করে দিলাম।

মনটা অন্যদিকে ব্যাপৃত থাকায় কৃষ্ণার সঙ্গে সম্প্রতি এই বিচ্ছেদের যন্ত্রণাটা অনেকটা লাঘব হল।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি—মিঃ কলকাতাওয়ালা কণ্ট্রাক্টে শুধু একটা বিষয় লিখিয়ে নিয়েছিলেনে যে, সংগীত-পরিচালক হিসেবে হয় পঙ্কজ মল্লিক, নয় কমল দাশগুপ্ত যেন নিশ্চয়ই থাকে। তিনি ছিলেন এ'দের দুজনেরই মুগ্ধ ভক্ত। প্রমথেশের 'জবাব' ছবি দেখার পরে কমল দাশগুপ্তের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা অসম্ভব বেড়ে গেছে। সংগীত-পরিচালক হিসেবে কমল দাশগুপ্তের ওপরই তিনি বেশী জোর দিলেন, কণ্ট্রাক্ট সই হবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমায় বললেন, কলকাতা গিয়ে বিশ্বভারতীর সঙ্গে গল্পটির চিত্রস্বত্ব এবং কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে আসতে।

[ক্রমশঃ]

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা ঃ

আমাদের পৌরাণিক চিত্র ঃ

বাইবেলের প্রথম খণ্ড "জেনেসিস" (সৃষ্টিতত্ত্ব)-এর প্রথম বাইশটি পরিচ্ছেদ অবলম্বন করে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীফক্স "বাইবেল" নাম দিয়েই একটি বিরাট ছবি তুলছেন। বিখ্যাত কবি-নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই লিখেছেন এর চিত্রনাট্য, জন হাস্টন এর পরিচালক এবং দাঁনো দ্য লরেন্টাইস হচ্ছেন এর প্রযোজক। ছবির পটভূমিকাকে যথাসম্ভব জাঁকজমকপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় করার প্রতি হলিউডী প্রযোজকদের চেষ্টার অন্ত থাকে না। বিষয়বস্তুর প্রতি যথাসম্ভব আনুগত্যের প্রতিও এঁরা দৃষ্টি দেন। তবে ওরই সঙ্গে দর্শক-সাধারণকে যৌন-আবেদন দ্বারা সম্মোহিত করবার কোনো সুযোগকেই এঁরা সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেন না এবং এর জন্যে রমণীদেহকে যতটা আকর্ষণীয় করে সজ্জিত করা যায়, তা' তাঁরা করেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বাংলা পৌরাণিক চিত্রের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। কাহিনী রচনায় মূল আখ্যানভাগের প্রতি আনুগত্যের বালাই নেই, বিরাট পটভূমিকা রচনার সামর্থ ও মনোবৃত্তি নেই, যুগোপযোগী পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট, আসবাবপত্র, আয়ুধাদি নির্মাণের জন্যে উপযোগী অনুসন্ধিৎসা এবং আগ্রহ নেই, চরিত্রোপযোগী শিল্পী নির্বাচনের জন্যে যথেষ্ট শ্রমব্যয় ও প্রেরণা নেই। বর্তমান যুগের 'লবকুশ'-এর প্রযোজনার দৈন্যের কথা ছেড়েই দি; এমনকি গত যুগের 'দক্ষযজ্ঞ'-এর শিব উড়ে যাওয়ার হাস্যকর দৃশ্যের কথা স্মরণ করে আজও হাসি পায়। অথচ রামায়ণ, মহাভারতের বহু কাহিনী অবলম্বন করে এমন আকর্ষণীয় বর্ণাঢ্য ছবি তৈরী করা সম্ভব, যা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে পৌরাণিক ভারত সম্পর্কে চলচ্চিত্রের দর্শককে আগ্রহান্বিত করতে সমর্থ হবে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন যথেষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রযোজকের এবং ততোধিক অনুভূতিশীল ও কল্পনাপ্রবণ পরিচালকের। রামায়ণ বা মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের শৌর্যবীর্য, দুঃসাহসিকতা, মানবধর্মিতা প্রভৃতি গুণাবলী ঠিকভাবে চিত্রিত করতে পারলে, তার যুদ্ধবিগ্রহ, সমরাভিযান রাজসভার উত্তেজক ঘটনা, পরিণয়সভা প্রভৃতি যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে পারলে জগতকে এমন ছবি উপহার দেওয়া যেতে পারে, যা ভারতের সুবিদিত ঐতিহ্যের যথার্থ পরিচায়ক হয়ে প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল, সত্যজিৎ রায় 'মহাভারত' অবলম্বনে একখানি চিত্র নির্মাণের কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু কোনো প্রযোজকই তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে অগ্রসর না হওয়ায় তাঁকে এ-ব্যাপারে নিবৃত্ত হ'তে হয়েছে। ভারতবর্ষে 'মুঘল-এ-আজম' বা 'চন্দ্রলেখা' ছবির জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব, কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের 'মহাভারত' নির্মাণের পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্যে অর্থ মেলে না। এরচেয়ে আফশোসের কথা কি হতে পারে!

প্রস্তর স্বাক্ষর চিত্রের নায়িকা সন্ধ্যা রায়। ফটো ঃ অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

কাল তুমি আলেয়া (বাঙলা) ঃ শ্রীলোকনাথ চিত্রম্-এর নিবেদন; ৪,৪৭৮·১২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ দেবেশ ঘোষ; পরিচালনা ঃ শচীন মুখোপাধ্যায়; কাহিনী ও চিত্রনাট্য ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা ঃ উত্তমকুমার; গীতিরচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ ঃ কানাই দে;
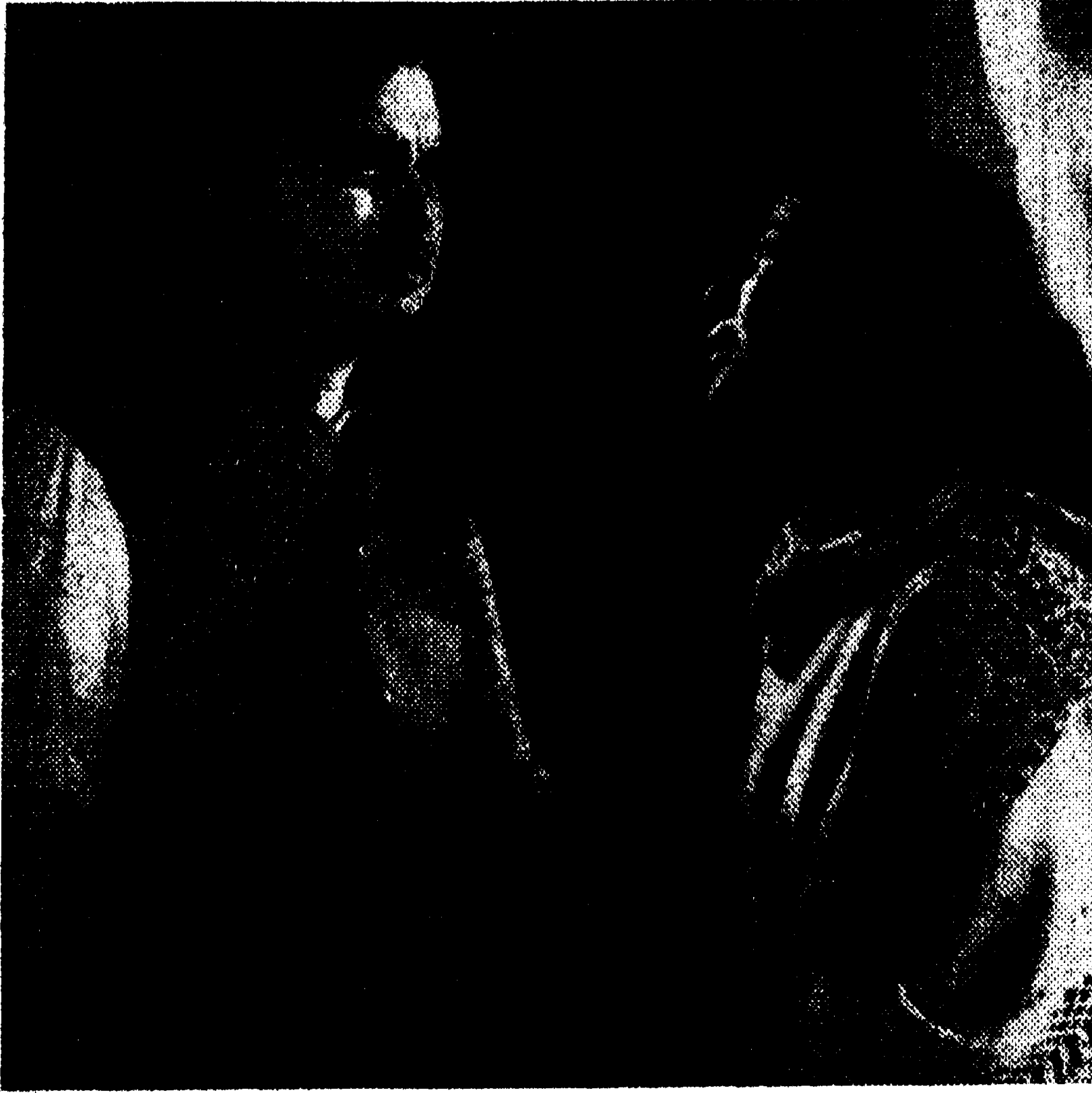
আকাশ ছোঁয়া চিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া দেবী

শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, অতুল চট্টোঃ, ইন্দু অধিকারী ও সৌম্যেন চট্টোঃ; সঙ্গীতানুলেখন : বি এন শর্মা ও মিনু কাত্রাক; শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, কমল মিত্র, তরুণকুমার, অজিত গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, জহর রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, প্রেমাংশু বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, দীপ্তি রায়, সুমিতা সান্যাল, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স'-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার ৩০-এ ডিসেম্বর থেকে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখান হচ্ছে।

"কাল তুমি আলেয়া" হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি রসোত্তীর্ণ রচনা। বর্তমানের উৎকেন্দ্রিক নাগরিক বাঙালী জীবনের বিভিন্ন স্তরের যুগযন্ত্রণা এর পত্রে-পত্রে বিধৃত। বিশাল এর পরিধি, বিচিত্র চরিত্রের ভীড় এতে। নিজেদের চলার পথে তারা কখনও-বা একে অপরের সান্নিধ্যে এসে পড়েছে, আবার কখনও পরস্পরের সংগে সংঘর্ষ ঘটিয়েছে। এরই ফলে কাহিনীর নায়ক ধীরাপদ চক্রবর্তী ওরফে ধীরু তার গ্রাম-সুবাদে চারুদিদির অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে ধনী হিমাংশু মিত্রের বিরাট ভেষজ প্রতি-ষ্ঠানে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ঐ প্রতিষ্ঠানের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ লাবণ্য সরকারের সান্নিধ্যে আসে। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী হিসেবে জড়িয়ে আছে কেমিস্ট অমিতাভ বসু ও পার্বতীর কথা, গণেশদা ও সোনা বৌদির বৃত্তান্ত, কাঞ্চনের অভিশপ্ত জীবনকথা এবং আরও ছোট-বড় ব্যথা-বেদনার ইতিবৃত্ত।

"কাল তুমি আলেয়া"তে শচীন মুখো-পাধ্যায় এই প্রথম স্বাধীনভাবে পরিচালক-রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। প্রথম উদ্যম হিসেবে তাঁর কাজের প্রশংসাই করব, তবে এত বড় একটি বিষয়বস্তুর প্রতি সম্যক সুবিচারের জন্যে প্রযোজক কোন অভিজ্ঞ পরিচালকের সাহায্য গ্রহণ করলেই সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন। বিশেষ করে কোন কোন দৃশ্যে কাহিনীকার কি প্রকাশ করতে চাইছেন, তার প্রতি সম্যক লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী কি বিশেষ মুড-এ ও ভাবভঙ্গীসহকারে অভিনয় করবে, তা নিশ্চয়ই শিল্পীদের বুঝিয়ে দেবার ত্রুটি ঘটেছে। তাই দেখি, একমাত্র উত্তমকুমার ছাড়া আর কেউই প্রায় সঠিক অভিনয় করেন নি সবকটি দৃশ্যে। এ-ছাড়া ফ্ল্যাশ-ব্যাকের উপস্থাপনাও দোষমুক্ত নয়। ধীরাপদ যখন শুয়ে-শুয়ে অতীত সম্বন্ধে চিন্তা করছে—'তার চারুদি হারিয়ে গেল', তখন চারুদির সঙ্গে হিমাংশু মিত্রের ছবি ভেসে ওঠে কি করে?

আগেই বলা হয়েছে, নায়ক ধীরাপদ চক্রবর্তীর ভূমিকায় উত্তমকুমার চরিত্রটির অন্তর্নিহিত রূপটিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ের মাধ্যমে। ডাক্তার লাবণ্য সরকারের ভূমিকাটিকে সুপ্রিয়া চৌধুরী অনায়াসেই একটি ব্যক্তিত্ব দান করতে পেরেছেন। গণেশদার স্ত্রী, সোনা বৌদির 'বিষমুখ পয়োকুম্ভ' রূপটি সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের নাটনৈপুণ্যের গুণে চমৎকার-ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তবুও বলব, মুখরার সংলাপগুলি কোনো কোনো স্থানে মাত্রাকে অতিক্রম করেছে। চারুদির ভূমিকায় দীপ্তি রায়ের অভিনয় হয়েছে স্বাভাবিক। চারুদির 'বডি-গার্ড' পার্বতীরূপে সুমিতা সান্যাল চরিত্রটির অন্তর্বেদনা ও ভীতির ভাবকে সহজেই পরিস্ফুট করেছেন। ধনী ব্যবসায়ী হিমাংশু মিত্রকে কমল মিত্র মূর্ত করে তুলেছেন। হিমাংশু-পুত্র সীতাংশুর চরিত্রে অজয় গাঙ্গুলীকে মানিয়েছে চমৎকার, কিন্তু তাঁর বাচনকে আরও ছন্দোময় হতে হবে। রিসার্চ কেমিস্ট অমিতাভের চরিত্রে তরুণকুমারও সময়ে অসময়ে অযথা চীৎকার করেছেন; মানসিক ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে চাপা কণ্ঠের আবেদন ঢের বেশী। গণেশের ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় হয়েছে চরিত্রোচিত! এ ছাড়া রবি ঘোষ (রমেন হালদার), জহর রায় (ম্যানেজার), বঙ্কিম ঘোষ (গণৎকার), প্রেমাংশু বসু (তরুণ যক্ষ্মারোগী), শেখর চট্টোপাধ্যায় (ব্যারিস্টার) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের সর্বত্র একটি উচ্চমান রক্ষিত হয়েছে। প্রথমেই কাহিনী উপযোগী দৃশ্যপট রচনায় সবিশেষ যত্ন ও শ্রমস্বীকারের জন্যে শিল্পনির্দেশক ভূয়সী প্রশংসালাভের যোগ্য। আলোকচিত্রের কাজও সমগ্রভাবে কৃতিত্বপূর্ণ। সঙ্গীত-পরিচালকরূপে আবহ-সঙ্গীত রচনায়

উল্লেখ্য অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন উত্তমকুমার; কাহিনীর মূড অনুযায়ী আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে তারের যন্ত্র ও পার্কাসান যন্ত্রের ব্যবহারে প্রচুর নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল।

বিরাট পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত শ্রীলোকনাথ চিত্রম্-এর "কাল তুমি আলেয়া" উত্তমকুমারের অভিনয়দীপ্ত হয়ে জনসাধারণকে খুশী করবে বলেই আমাদের ধারণা।

গবন (হিন্দী) : বি আই প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৪,৪০১-৬২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : বি এন সোন্থালিয়া এবং আর কে শোরাল; পরিচালনা : কৃষণ চোপড়া ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়; কাহিনী : মুন্সী প্রেমচাঁদ; চিত্রনাট্য : ভানুপ্রতাপ ও কৃষণ চোপড়া; সংলাপ : বৈজ শর্মা এবং আখ্তার-উল-ইমান; সঙ্গীত-পরিচালনা : শঙ্কর জয়কিষণ; গীতরচনা : হসরৎ ও শৈলেন্দ্র; চিত্রগ্রহণ-পরিচালনা : কে বৈকুণ্ঠ; চিত্রগ্রহণ : ভি কেশব; শব্দানুলেখন : জর্জ ডিক্রুজ; সঙ্গীতানুলেখন : মিনু কাত্রাক; শব্দপুনর্যোজনা : এ কে পার্মার ও মঙ্গেশ দেশাই; শিল্পনির্দেশনা : সুধেন্দু রায়; সম্পাদনা : দাস ধয়মাড়ে; নৃত্যপরিচালনা : বি সোহনলাল ও সত্যনারায়ণ; নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত : লতা মঙ্গেশকর ও মোহম্মদ রফি; রূপায়ণ : সুনীল দত্ত, কানহাইয়ালাল, আনওয়ার হোসেন, পি কৈলাশ, বদরীপ্রসাদ, কমল কাপুর, আগা, বি বি ভল্লা, সাধনা, জেবারহমান, লীলা মিশ্র, মিনু মমতাজ প্রভৃতি। ডি লুক্স ফিল্মস- ডিস্ট্রিবিউটার-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার ২৩-এ ডিসেম্বর থেকে ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, প্রভাত, শ্রী, পূরবী, উজ্জ্বলা, পার্কশো হাউস, ভবানী, আলোছায়া এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত কাহিনীকার পরলোকগত মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর 'গবন' উপন্যাসের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন : মানুষ নিজের আর্থিক অবস্থানুযায়ী না চলে যদি নিজেকে অধিকতর বিত্তশালী বলে জাহির করতে চায়, তাহলে অতিশীঘ্রই তাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং এক মিথ্যা থেকে হাজার মিথ্যার চাপে শেষপর্যন্ত তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এলাহাবাদের জেলা আদালতের মুন্সীর ছেলে রমানাথ ঠিক এই কাজ করে মিথ্যার জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স-কালেক্টারের সামান্য চাকরী করতে করতে সে তহবিল তছরূপ করতে বাধ্য হয় এবং পুলিশের ভয়ে কলকাতায় পালিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশে ধরা পড়বার ভয় থেকে সে কোনোক্রমেই অব্যাহতি পায় না। তাই শেষপর্যন্ত পুলিশের ফাঁসে ধরা দিয়ে সে এক স্বদেশী বোমার মামলায়

পিনাকী মুখার্জি পরিচালিত **মহাশ্বেতা** চিত্রের মহরত দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অঞ্জনা ভৌমিক

তিন অধ্যায় চিত্রে অনুপকুমার ছন্দা দেবী ও অজয় গাঙ্গুলী

অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

রাজসাক্ষী হয়ে নিজেরই সহপাঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দুর্নামের ভাগী হয়। অবশেষে স্ত্রী জলপার সাহায্যে সে নিজেকে কেমনভাবে মোহমুক্ত করতে সমর্থ হয়, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ গঠিত হয়েছে।

ছবির চিত্রনাট্যের মাধ্যমে কাহিনীটি যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে বহু ত্রুটি থেকে গেছে। কাহিনীর অনেক পরিস্থিতিকেই কৃত্রিম ও বাস্তববিরোধী বলে মনে হয়েছে। প্রথম দিকে ঘটনাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট নয় এবং এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েনি। বরং যেখানে রমানাথ কলকাতায় দেবীদিনের আশ্রয় গ্রহণ করে, তারপর থেকে শেষপর্যন্ত কাহিনী অধিকতর ক্ষিপ্রবেগে বিশ্বাস্যপথে অগ্রসর হয়েছে।

অভিনয়ে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দেবীদিনের ভূমিকায় কানহাইয়া-লাল। দরদী, সহানুভূতিশীল, আবিলতাহীন দেবীদিনকে তিনি তাঁর স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলেছেন। দেবীদিনের স্ত্রীর ভূমিকায় লীলা মিশ্রও অত্যন্ত সাবলীল এবং উপভোগ্য অভিনয় করেছেন। নায়ক রমানাথরূপে সুনীল দত্ত যখন ধরা পড়বার ভয়ে সদাই আতঙ্কগ্রস্ত এবং সবশেষে নিজের মিথ্যার মুখোস খুলে সত্যের প্রকাশ করে নিজেকে হাল্কা ও মুক্ত অনুভব করছে, এ দুই ক্ষেত্রেই তিনি স্বাভাবিক নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। গোড়ার দিকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর অভিনয়কেও মনে হচ্ছিল কৃত্রিম। জলপার ভূমিকায় সাধনাও শেষের দিকে স্বামীর শুভাকাঙ্ক্ষিণী ও পরিত্রাত্রীরূপে সুন্দর; কিন্তু প্রথমদিকে গহনার প্রতি অতিশয় মোহগ্রস্তরূপে তাঁকে ততটা সহজ বলে বোধ হয়নি। স্বর্ণকার গঙ্গুকে সত্যই একটি দুরাত্মা বলে বোধ হয়েছে। রমেশবাবুর চরিত্রটি নিখুঁতরূপে চিত্রিত হয়েছে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে শিল্প-

তরুণকুমার

নির্দেশনার কাজ ভূয়সী প্রশংসালাভের যোগ্য। ছবির সঙ্গীতাংশে বিশেষ অভিনবত্ব নেই এবং বহু গানই সুপ্রযুক্ত নয়।

মুন্সী প্রেমচাঁদ রচিত 'গবন'-এর অধিকতর সার্থক চিত্ররূপ দেখব বলে আশা করেছিলুম।

১ গ্লিম্পসেস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ক্যালকাটা (ইংরাজী) :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর (ডিরেক্টরেট অব টুরিজ্‌ম্‌) সম্প্রতি ইস্টম্যান কলারে দু'খানি তথ্য ও প্রচারমূলক ছবি তুলিয়েছেন দু'টি ভিন্ন সংস্থাকে দিয়ে। 'গ্লিম্পসেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' তুলেছেন গ্র্যাফিক ডকুমেন্টারিজ; তত্ত্বাবধান ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায় এবং পরিচালনা করেছেন প্রসিদ্ধ শিল্পনির্দেশক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বংশী চন্দ্রগুপ্ত। এই ৩,৩০৪ ফুট দীর্ঘ ছবিখানির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র রূপটিকে ফুটিয়ে তোলবার একটি প্রশংসনীয় চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উত্তরে হিমালয়ের তুষারধবল গিরিরাজী ও দক্ষিণে তটচুম্বী ঊর্মিমালার মাঝে বাঙলার সমতলভূমি তার শহর ও গ্রাম, নগর ও প্রান্তর নিয়ে আশ্চর্য বিচিত্ররূপে বিরাজিত। এই বৈচিত্র্যের অনেকখানিই ধরা পড়েছে আলোচ্য ছবিতে। Chance directed, Chance erected শহর কলকাতার উদ্ভব থেকে শুরু করে বর্তমানের রূপ, দার্জিলিং, জলদাপাড়া পশুসংরক্ষণাগার, বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-নির্মিত মন্দির, দীঘার সমুদ্রতট, শান্তির নীড় শান্তিনিকেতন প্রভৃতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং কিছু কিছু কৌতুকউদ্রেককারীভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিছু কিছু দৃশ্য কিন্তু যে-কারণেই হোক রঙের প্রতি সুবিচার করেনি। আবহ-সঙ্গীত দৃশ্যাবলীর বৈচিত্র্য অনুযায়ী। ইংরাজী নেপথ্যভাষণ সুরচিত ও সুকথিত।

২০০০ ফুট দীর্ঘ 'ক্যালকাটা' ছবিখানি তুলেছেন লিটল সিনেমা জ্যোতির্ময় রায়ের পরিচালনায়। এর মধ্যে বর্তমান শহর কলকাতার বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য রূপটি সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। শহরের ময়দান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ঘোড়দৌড়, রবীন্দ্রভারতী, টালিগঞ্জ ফিল্ম স্টুডিও, রাতের চৌরঙ্গী, বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতিকে দেখে এই শহরের বর্ণালী রূপটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে সুন্দর ইংরাজী নেপথ্যভাষণ দৃশ্যাবলীর উপভোগ্যতাকে যথেষ্ট বর্ধিত করে।

আবহসঙ্গীত রচনার সময়ে কিন্তু আরও যত্ন ও সতর্কতার সুযোগ ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণত যে-মানের তথ্য ও প্রচারচিত্র তৈরী করে থাকেন, আলোচ্য ছবি দু'খানি তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

—নান্দীকর

কলকাতা

'মহাশ্বেতা' চিত্রের শুভমহরৎ

বি কে প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'মহাশ্বেতা'র শুভমহরৎ গত ২৭শে ডিসেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় সুসম্পন্ন হয়। জরাসন্ধ রচিত এ কাহিনীর চিত্র-পরিচালক হলেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। মহরৎ-অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক এবং ক্যামেরার শুভ সূচনা করেন শ্রীদেবকীকুমার বসু ও শ্রীবিভূতি লাহা। ছবির প্রধান তিনটি চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন সঙ্গীত-পরিচালক রাজেন সরকার। চিত্রালী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

ইকনমিক প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'পরিশোধ'

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত ইকনমিক প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'পরিশোধ'র সঙ্গীত-গ্রহণের পর সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় অর্ধেন্দু সেনের পরিচালনায় ছবির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাধনা মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, সুলতা চৌধুরী, তরুণকুমার ও শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্না প্রোডাকসন্সের হাসির ছবি 'বিবাহ বিভ্রাট'

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত স্বপ্না প্রোডাকসন্সের হাসির ছবি 'বিবাহ বিভ্রাট'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় গৃহীত হচ্ছে। ছবির প্রধান অংশে রূপদান করছেন অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায় ও উৎপল দত্ত। শ্যামল মিত্র ছবিটির সুরকার।

মিত্র চিত্রমের নতুন ছবি 'শচী মায়ের সংসার'

'সাধক রামপ্রসাদ' চিত্রের সফল পরিচালক বংশী আশ বর্তমানে মিত্র চিত্রমের পক্ষ থেকে নতুন ছবি 'শচী মায়ের সংসার'র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ভূমিকালিপি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। জয়া ফিল্মস ছবিটি পরিবেশনা করবেন।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র 'বধূবরণ'

দিলীপ নাগ পরিচালিত ডি এস প্রোডাকসন্সের 'বধূবরণ' ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত। শ্যামল গুপ্ত রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রদীপকুমার, গীতা দত্ত, অভি ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, অজয় বিশ্বাস, রাখী বিশ্বাস, এন বিশ্বনাথন, জহর রায়, ভারতী দেবী,

অঞ্জনা ভৌমিক　　　ফটো : অমৃত

গীতা দে, গীতাঞ্জলি রায় ও জয়শ্রী কর। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কমল দাশগুপ্ত।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'তিন অধ্যায়'

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালনায় শৈলেশ দে রচিত 'তিন অধ্যায়' চিত্রের দৃশ্য গ্রহণ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অনুপকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, নবীন মজুমদার, ছন্দা দেবী ও প্রতিমা চক্রবর্তী। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। পরিবেশনায় অপ্সরা ফিল্মস।

বোম্বাই

দেব আনন্দ পরিচালিত নতুন ছবি

পরিচালক হিসেবে নতুন বছরে নতুন ছবির ঘোষণা করেছেন অভিনেতা দেব আনন্দ। ছবির নামকরণ এখনও ঘোষিত হয়নি। তবে প্রধান তিনটি চরিত্রে অভিনয় করবেন দেব আনন্দ, ওয়াহিদা রেহমান এবং জাহিদা হুসেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শচীনদেব বর্মন।

রাজ খোসলা পরিচালিত 'অনিতা'

রাজ খোসলা পরিচালিত রঙিন ছবি 'অনিতা'র এক রহস্যময়ী নায়িকা চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন জনপ্রিয় সাধনা। নায়ক চরিত্রে রয়েছেন মনোজকুমার। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় রূপদান করছেন আই এস জোহর, সজ্জন, ধুমল, মুকরী, চাঁদ ওসমানি, মধুমতী, বেলা বোস ও কৃষাণ মেহতা। লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

'প্যার হি প্যার' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা-ধর্মেন্দ্র

আর এস প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি 'প্যার হি প্যার'র নায়ক-নায়িকা হিসেবে বৈজয়ন্তী-মালা ও ধর্মেন্দ্র আত্মপ্রকাশ করছেন। অন্যান্য চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন হেলেন, রাজ
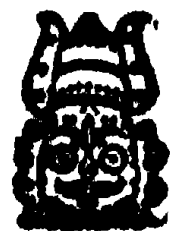
মেহরা, ধুমল, মনমোহন ও মেহমুদ। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরকৃত ছবিটি পরিচালনা করবেন ভাপ্পি সোনী।

টি প্রকাশ রাও পরিচালিত 'সুনিয়া'

টি প্রকাশ রাও পরিচালিত রঙিন ছবি 'সুনিয়া'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে মেহবুব স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন দেব আনন্দ, বৈজয়ন্তী-মালা, বলরাজ সাহনি, ললিতা পাওয়ার, সুলোচনা, নানা পালসিকর ও লতা বোস। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবির সুরকার।

মঞ্চাভিনয়

অনামী

বেশ কিছু দিন ধরে জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বাঙলা দেশে নাটক রচিত হচ্ছে এবং সমাজ সমস্যামূলক নাটক হিসাবে সেগুলোর মঞ্চ-রূপায়ণ স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কিন্তু রহস্যঘন নাটক যার চারপাশে ঘিরে আছে একটা দুর্বার 'সাসপেন্স' তার সংখ্যা খুব বেশী আছে বলে মনে করি না। অলৌকিক ঘটনা নয়, সমাজ জীবনের ঘটনার আবর্ত দিয়েই যে অশান্ত কৌতূহলসমৃদ্ধ রহস্যমূলক নাটক গড়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন 'অনামী'র 'পিপাসা' নাটকের অভিনয় দেখে। নীলোৎপল দে'র লেখা এই নাটক মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকের গতি উদ্দাম থেকেছে, অনাবশ্যক ঘটনার ভারে কোথাও শ্লথ হয়ে যায় নি। নাট্যকারের সুগভীর অনুভবের পরিচয় মেলে প্রতিটি দৃশ্যের পরিকল্পনায়, নাটকীয় কৌতূহল সব সময়ে অটুট রাখতে তাঁর নিষ্ঠা অভি-নন্দনযোগ্য। বলা যেতে পারে 'প্রতিচ্ছবি'র নাট্যকার 'পিপাসা'তে বলিষ্ঠতর হতে পেরেছেন।

তরুণ নায়ক সর্বেন্দ্র ও জনপ্রিয় নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক। ফটো : অমৃত

দুরন্ত গতিবেগ সমৃদ্ধ এই নাটকের সামগ্রিক অভিনয়ের মান খুব একটা উচ্চাঙ্গের হতে পারে নি। প্রতিটি শিল্পীর চরিত্রচিত্রণে যে সমতা থাকা উচিত ছিল তার অভাব বহু জায়গায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেই জন্য একটা অখণ্ড, সংহত পরিণতির পথে শিল্পীদের সঙ্ঘবদ্ধ অভিনয় যে পৌঁছতে পেরেছে তা মনে হয় না। এর মধ্যে ভাল অভিনয় যাঁরা করেছেন তার প্রথমেই নাম করতে হয় বিশু চট্টো-প্যাধ্যায়ের। তাঁর 'সুরজিৎ' চরিত্র একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। চরিত্রটির অতলে ডুব দিয়ে শিল্পী তার প্রাণকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন এবং সেই সূত্রে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন প্রচুর। তাঁর স্বরক্ষেপণের সূক্ষ্ম ভঙ্গিমাগুলো সত্যি প্রশংসনীয়। নীলোৎপল দে'র প্রাণবন্ত অভিনয়ের ছোঁয়া পেয়ে ডাঃ বিমান ঘোষালের চরিত্র মঞ্চে অপূর্বভাবে বিকশিত হয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য যে ভাবটি তিনি নিয়েছেন তা সত্যি অনবদ্য। সত্য গোস্বামীর অভিনয়ে শৈবাল চরিত্র প্রাণ পায়। রতন চরিত্রে শ্যামল লাহিড়ী ও অরিন্দমের ভূমিকায় মন্টু গোস্বামী প্রত্যাশিত অভিনয় করতে পারেন নি। এই দুই শিল্পীর অস্ফুট চরিত্র-চিত্রণের জন্য সমগ্র নাটকের অভিনয় শেষ পর্যন্ত একটা বলিষ্ঠ পরিণতির পথে পৌঁছতে বাধা পেয়েছে। বনানী চরিত্রে শিপ্রা সাহা অসাধারণ অভিনয় করেন, বলা যেতে পারে এটা তাঁর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। এ ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক রূপ দেন রাণু রায়, আশীষ মিত্র, ভারতী চক্রবর্তী, সুধাংশু চক্রবর্তী, সমীর কুণ্ডু। কাশী পালের

আলোকসম্পাতে নাটকটির সৌন্দর্য অনেক গভীরতর হয়। শেষ দৃশ্যে তাঁর আলোর কাজ সত্যি প্রশংসনীয়। অশ্বিনী প্রামাণিক ও মিলন দত্তের মঞ্চসজ্জায় সূক্ষ্ম রুচির পরিচয় মেলে। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং।

"খর নদীর স্রোতে"

সম্প্রতি 'যাযাবর ইউথ এসোসিয়েশনে'র শিল্পীবৃন্দ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সুনীল বসু রচিত 'খর নদীর স্রোতে' মঞ্চস্থ করেছেন। এই তরুণ শিল্পীগোষ্ঠীর প্রাণচঞ্চল অভিনয়ে অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে মনে হয়। বিভিন্ন চরিত্রকে যাঁরা মঞ্চে প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন তাঁরা হলেন প্রদ্যুৎ ঘোষ, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্টু ভট্টাচার্য, জানকী মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার দত্ত, রঞ্জন লাহিড়ী, অমলেন্দু সেন, বিমল মল্লিক, সুভাষ দে, শঙ্কর রায়, অজয় চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদীব সরকার, অনিলা ভট্টাচার্য, ভারতী চক্রবর্তী।

দক্ষিণায়ন

'দক্ষিণায়ন' গোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি নৈহাটি এল এম এ সি 'পঞ্চ মণ্ডপে' নারায়ণচন্দ্র দাসের 'বখরা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্য নির্দেশনা আর আবহসংগীতে ছিলেন শ্রীঅরূপকান্তি, শ্রীসুনীল দত্ত।

শ্রাবণী

'শ্রাবণী'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'এটেকু বাসা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। সামগ্রিক অভিনয়কে একটি উন্নত মানে উন্নীত করতে শিল্পীদের নিষ্ঠা সত্যি প্রশংসনীয়। মঞ্চে চরিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত অভিনয়ে মূর্ত করে তুলেছেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সুজিত সেনগুপ্ত, অলোক দাশগুপ্ত, সুতপা ভট্টাচার্য, মায়া রায়, কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন সেন, হর্ষ চট্টোপাধ্যায়, বিরাজ দত্ত। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন অলোক দাশগুপ্ত।

সাহানা

'সাহানা'র সভ্যবৃন্দ তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে অনিল দাশগুপ্তের 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে' ও বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অপারেশন ফাউন্টাস' অভিনয় করলেন। শ্রীরামপুর রবীন্দ্র ভবনে এই দুটি অভিনয় অনুষ্ঠিত হল। দুটি নাট্যাভিনয়েরই শিল্পীদের আন্তরিকতা চিহ্নিত হয়েছে। নাটক দুটির নির্দেশনায় ছিলেন যথাক্রমে বিশু চট্টোপাধ্যায়, অমল গুপ্ত।

'দশরূপকে'র আগামী নাটক

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা 'দশরূপকে'র শিল্পিবৃন্দ 'ডানা ভাঙ্গা পাখী' নাটকের অসামান্য মঞ্চসাফল্যের পর এবার একটি সাংকেতিক একাংকিকার মঞ্চরূপায়ণে ব্রতী হয়েছেন। এই নতুন সংকেতধর্মী নাটকের নাম 'একটি স্বপ্নের ইতিহাস'। নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীপরেশ ধর, নির্দেশনায় আছেন ভরদ্বাজ। পয়লা জানুয়ারী এই নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।

নাট্যোৎসব

রাজনারায়ণ নাট্য পরিষদ তাঁদের রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। তিনদিনব্যাপী এই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে এই মাসে।

অন্যরূপ

বাঙলা দেশের নাট্যানুরাগীদের কাছে 'অন্যরূপে'র নাম পরিচিত নয়, কিন্তু এই সংস্থার শিল্পিবৃন্দের সাম্প্রতিক নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নতুন পরিচিতি প্রথমেই নিবিড় হয়ে উঠতে পেরেছে। কিছু দিন আগে এঁরা প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'নিশিযাপনে'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছেন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রশান্ত পাঠক এবং তাঁর এই প্রয়াসে সূক্ষ্ম, সৃষ্টিশীল, শিল্পীমনের পরিচয় নিহিত রয়েছে। উপন্যাসের বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে নাটকীয় গতি আর সংঘাত সৃষ্টিতে তাঁর নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য।

সংঘবদ্ধ নাট্যাভিনয় খুব যে একটা উন্নত ধরনের হয়েছে একথা বলা যায় না, কেননা প্রতিটি শিল্পী চরিত্রের প্রাণস্বরূপকে ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই নাটকের অগ্রগতিতে একটি অখণ্ড সুরের অভাব অনেক জায়গাতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। তবুও এর মধ্যে যাঁরা সুন্দর অভিনয় করেন তাঁরা হলেন মুকুল মুখোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, মোহন চট্টোপাধ্যায়, দীপিকা দাস। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন সমরভূষণ চট্টোপাধ্যায়, কয়েকটি দৃশ্যের উপস্থাপনায় তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা চিহ্নিত হয়েছে।

জাগো। নাটকে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দাগ নাটকে প্রবীরকুমার ও লতিকা

দাশগুপ্তা

মৌচোর

সম্প্রতি এ ডবলু ফিগিস স্টাফ লাইব্রেরীর শিল্পী সদস্যরা বিশ্বরূপায় সলিল সেনের 'মৌচোর' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্য নির্দেশনায় হরিপদ রায়চৌধুরী অনেক জায়গায় তাঁর সূক্ষ্ম মনের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। সুঅভিনয় করেছেন গুরুচরণ চক্রবর্তী, পরিমল গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দাস, বীরেন বোস, হিমাদ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সরোজ চট্টোপাধ্যায়, রবীন চক্রবর্তী, পরিচালক স্বয়ং। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করেন কল্পনা বাগ ও লীলাবতী।

নতুন মঞ্চ

কলকাতা শহরে আর একটি নতুন স্থায়ী মঞ্চের আবির্ভাব সূচিত হল। মঞ্চের নাম 'প্রদেশের নাট্যমঞ্চ'। এই নতুন নাট্যমঞ্চের ঠিকানা ৭১সি, ডবলিউ সি ব্যানার্জি রোড। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম রবিবার থেকে অভিনয় আরম্ভ হবে।

কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটার

সম্প্রতি কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটারের শিল্পিবৃন্দ বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' ও তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকদুটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এই দুটি নাট্য-প্রযোজনায় তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ
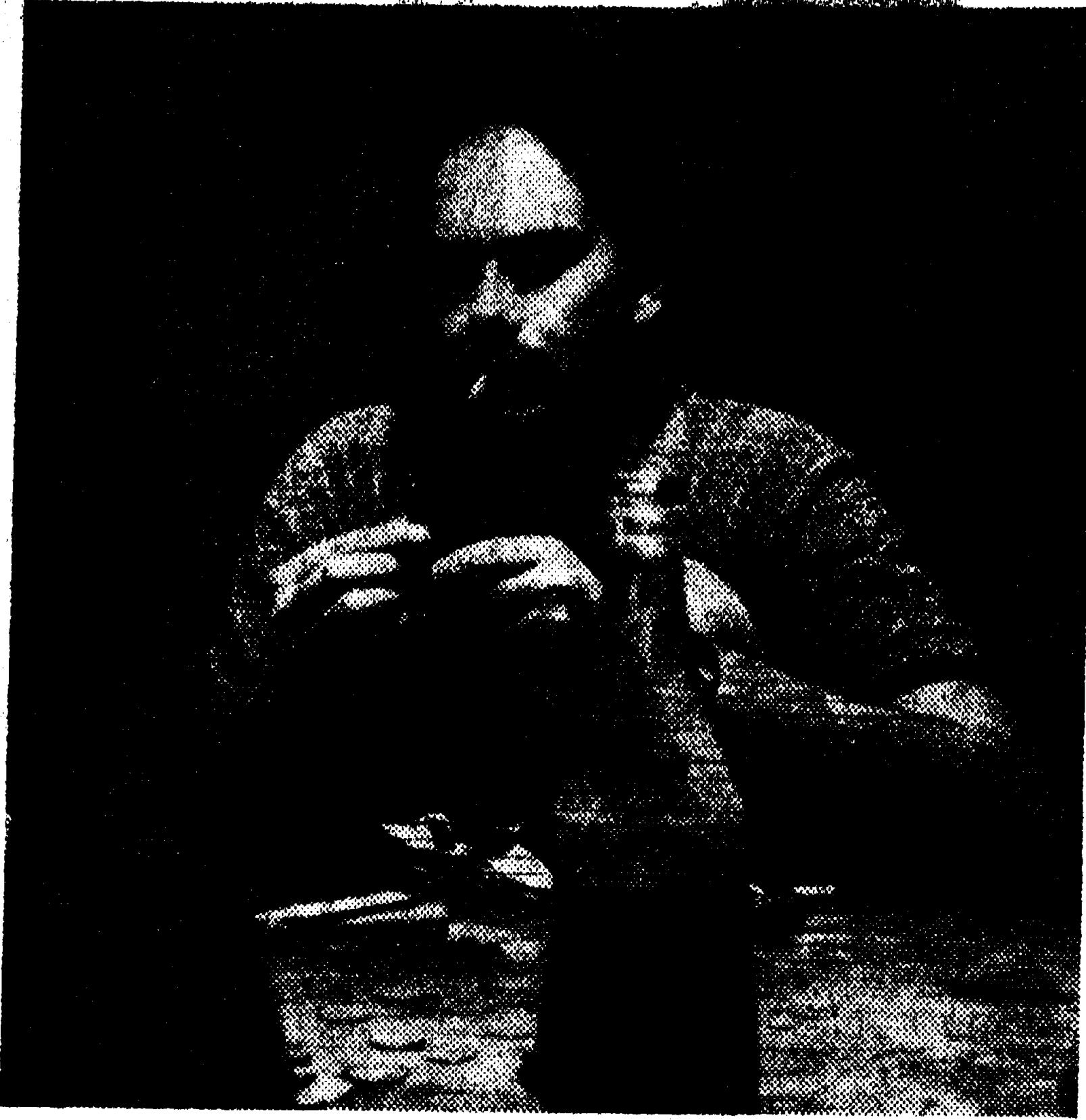
পীযূষ বসু পরিচালিত অসামাজিক চিত্রে অরুণ মুখোপাধ্যায়

ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রমেন চট্টোপাধ্যায় (আর্ট ইউনিট)। সুনীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান টিঙ্কু, ধীরঞ্জন দত্ত, অমল ভট্টাচার্য অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন।

আদর্শ হিন্দু হোটেল নাট্যাভিনয়

গত ১৫ই নভেম্বর '৬৬ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কর্মচারী সমিতির গড়িয়াহাট শাখা কর্তৃক 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকটি রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয়নৈপুণ্যের দিক থেকে বিচার করলে, বলতে হয় যে অভিনেতা ও অভিনেতৃগণ সবাই উন্নত মানের অভিনয়ের দাবী করতে পারেন। ফলতঃ সামগ্রিক উৎকর্ষতাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সৌখীন নাট্যমোদী হিসাবে এ'দের মধ্যে শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী, শ্রীরাণা চ্যাটার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না।

নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ও নাট্য-পরিচালক শ্রীজ্ঞানেশ মুখার্জি।

বিবিধ সংবাদ

এস্ এফ্ সিনে ক্লাবের বর্ষশেষ

সত্যজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম ও একমাত্র সায়ান্স-ফিকশান (সংক্ষেপে এস্ এফ্) সিনে ক্লাবের প্রথম বর্ষশেষ উপলক্ষ্যে গত ৪ ডিসেম্বর, রবিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার প্রিয়া সিনেমা হলে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের সিনেমাস্কোপ ডিলক্স মনোরম রঙীন ফিল্ম 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড' দেখানো হয়। বর্ষশেষ অনুষ্ঠানে সমবেত সহস্রাধিক সদস্যের প্রত্যেকেই একবাক্যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল রচিত গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত এই অনবদ্য ছায়াছবির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

বর্তমান বৎসরের ২৬শে জানুয়ারী ক্লাবটির উদ্বোধন হয় এবং তিন মাসের মধ্যে সহস্রাধিক সদস্য ক্লাবের তালিকাভুক্ত হয়ে এর অতুলনীয় জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেন। ক্লাবটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রমোদকর থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে, এস্ এফ্ সিনে-ক্লাবের সভাপতি সত্যজিৎ রায় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠামুহূর্ত থেকেই গভীর কার্যকরীভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ক্লাবে প্রদর্শিত প্রতিটি ফিল্ম নির্বাচন ও সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যত্ন নিয়ে থাকেন।

জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই ক্লাবের আটটি ফিল্ম অধিবেশনে মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার, ওয়াল্ট ডিসনী প্রোডাকসন্স, ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশন্যাল, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, গুড়উইন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া গণতন্ত্রের সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। অধিবেশনগুলির মধ্যে প্রথমটিতে প্রদর্শিত 'ভিলেজ অফ দি ড্যামড্', তৃতীয় অধিবেশনে প্রদর্শিত আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত 'অ্যামফিবিয়ান ম্যান' এবং অষ্টম ও শেষ অধিবেশনে প্রদর্শিত বিশ্ববিখ্যাত কোনান ডয়াল কাহিনী 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড'-এর চিত্ররূপ—এইগুলি সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান বৎসরের সেরা ক্লাব ফিল্ম হিসেবে প্রশংসা অর্জন করেছে। অন্য পাঁচটি ফিল্ম 'ম্যান অফ দি ফার্স্ট সেঞ্চুরী', 'ইনক্রেডিবল শ্রিংকিং ম্যান', 'চিলড্রেন অফ দি ড্যামড্', 'ভয়েজ টু দি বটম অফ দি সী' এবং 'সন অফ ফ্লাবার'—প্রত্যেকটি ছবি কল্পনারঙীন বিজ্ঞান-সুবাসিত নতুন স্বাদের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত এবং উচ্চপ্রশংসিত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় অন্যান্য ফিল্ম ক্লাবের মত এস এফ সিনে ক্লাবে প্রতিমাসে একাধিক ফিল্ম দেখানো হয় না। এই ক্লাবের নীতি অনুসারে স্বল্পসংখ্যক সেরা ফিল্ম সংগ্রহ করে মেট্রো, প্যারাডাইস, প্রিয়া, সোসাইটি, ম্যাজেস্টিক প্রভৃতি কলকাতা

সেতুবন্ধ চিত্রের একটি গান রেকর্ড করছেন সুরকার শ্যামল মিত্র—গান গাইছেন শিপ্রা বসু

শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে কেবলমাত্র ছুটির দিনে দেখানো হয়।

ক্লাবটির উপ-সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বহু সদস্যের মধ্যে সাঁতারু মিহির সেন, পাহাড়ী সান্যাল, সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ, প্রদীপ ব্যানার্জি (অর্জুন পুরস্কার-প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ), চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-অধ্যাপকসহ অনেক চিত্রামোদী এই ক্লাবের সদস্যতালিকাভুক্ত এবং তাঁরা প্রতিটি অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগ দিয়ে এই নতুন ধরনের ফিল্মচর্চায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ক্লাবটি কেবল এদেশে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে অল্পদিনের মধ্যেই ফিল্ম ক্লাব আন্দোলনের ধারায় নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং জানুয়ারী মাসে ক্লাব উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রেরিত ওয়াল্ট ডিসনী, আর্থার সি ক্লার্ক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভেচ্ছাবাণীতেই তা স্বীকৃত হয়েছে।

গত মার্চ মাস থেকে ক্লাবে নতুন সদস্য নেওয়া বন্ধ ছিল। বর্তমানে কিছুসংখ্যক সদস্য নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তন সমাজ

অষ্টাহব্যাপী রজত-জয়ন্তী উৎসব সমাপ্ত

চোরবাগানের প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তন সমাজ কলকাতায় বিশেষভাবে পরিচিত। অপেশাদার এই কীর্তন সমাজটির এ বৎসর পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি ১৪৫নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে অষ্টাহব্যাপী একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠান ৪ঠা ডিসেম্বর শুরু হয় ও ১১ই ডিসেম্বর শেষ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখার্জি। শ্রীমুখার্জি বলেন দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে অবিরাম নাম-গান প্রচার করে এই কীর্তন সমাজ কীর্তন জগতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বর্তমান জগতে এঁদের মত আরও বহু ব্যক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে পাপনাশের জন্য। পরে কীর্তন গান করেন সমাজের সভ্যগণ। পরবর্তী দিনগুলিতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায় ও প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন বসু। কীর্তন ও ভক্তিমূলক গান পরি-বেশন করেন শ্রীরথীন ঘোষ ও সহশিল্পি-বৃন্দ, শ্রীশ্রীরাধাদামোদর কীর্তন সমাজ, শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীদিলীপকুমার রায়, অনঙ্গমোহন হরিসভার সভ্যগণ প্রমুখ বহু শিল্পী। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, ১৯৪১ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে চোরবাগানের চট্টোপাধ্যায় বংশের বধূ স্বর্গীয়া সরোজসুন্দরী দেবী এই সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আদর্শ অনুযায়ী এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অকৃপণভাবে নাম বিলিয়ে চলেছে এই সমাজ। এ সমাজে অর্থের প্রবেশাধিকার নেই। ষষ্ঠ দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ গোরীনাথ শাস্ত্রী। শ্রীঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের এই দুই ভায়ের কীর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এঁদের আবেগ ও গানের ছন্দ। এ ছন্দ অন্য কোন শিল্পীর কাছে পাওয়া সম্ভব নয়। পরে কীর্তন করেন সমাজের সভ্যগণ। সপ্তম দিনে অখণ্ডতারকব্রহ্ম নাম শুরু হয় ও অষ্টম দিনের প্রত্যুষে নগর-কীর্তনের সঙ্গে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে কল-কাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন ও সভার সাজসজ্জা বড়ই মনোরম হয়।

বোম্বাইনী দিদি চিত্রের নায়িকা রাখী বিশ্বাস

যাদুবিদ্যা প্রদর্শনী

গত ৯ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ আয়োজিত বার্ষিক মিলনোৎসবে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন যাদু-কর সমীরণ এবং যাদুকর ধ্রুব মিত্র। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এই যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীটি সুন্দর হয়ে ওঠে। এই যাদুবিদ্যা প্রদর্শনীতে সাহায্য করেন সুশীল চক্রবর্তী, সুতারা মজুমদার, স্বপ্না দাস, মঞ্জুলা সেন এবং আরো কয়েকজন।

কহ্লারের প্রথম বার্ষিকী উৎসব

গত ১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে "কহ্লার" শিল্পী-গোষ্ঠীর প্রথম বার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ পরি-লক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম প্রয়াস হিসেবে প্রশংসাজনক বলা চলে। সংস্থার শিল্পীবৃন্দ কর্তৃক "আনন্দ" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রসংগীতের [illegible] চিন্তাধারার সঙ্গে অনুষ্ঠানটির পার্থক্য লক্ষিত হয়। দ্বৈত-সংগীতে পরস্পর কণ্ঠের কোন সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তারপর আবার মাইকের অব্যবস্থা। এদিনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিলীপকুমার রায়ের একক সংগীত। "নটরাজ" নৃত্যনাট্যটি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে অভিনীত হয়নি। কিন্তু এঁরা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে করে আগামীদিনে সাফল্যের আশা আছে। সংগীতের বিভিন্ন অংশে যাঁরা প্রচুর পরিশ্রম করেন তাঁরা হলেন—সর্বশ্রী অনীতা চট্টো-পাধ্যায়, এনা দাসগুপ্তা, চিত্রা গুহ, লাবণ্য সরকার, সবিতা ঘোষ, সন্ধ্যা দত্ত, ইন্দিরা রায় প্রভৃতি।

মেদিনীপুর জেলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা

'রূপছায়া' আয়োজিত "মেদিনীপুর জেলা একাংক নাটক প্রতিযোগিতা হয়ে গেল গত ১৮ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর। এবারের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সংস্থা ও দলগত অভিনয়ের পুরস্কার লাভ করেছে 'গিধনী সঙ্গীতগোষ্ঠী' (নাট্যম)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক : নারায়ণ ভট্টাচার্য। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক : কনক দে ও বলাই দে। শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জা : যাদবেশ দেব। শ্রেষ্ঠ আলোক-সম্পাত : অরবিন্দ দে (কলাতীর্থম)। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : সুন্দরেশ্বর রায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : হেনা আনসারী (ঘাটাল মিতালী ক্লাব)। শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা : নীলমণি মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় নাট্য সংস্থা পুরস্কার পেয়েছেন ঝাড়গ্রামের "কলা-তীর্থম্"।

বোম্বাই শহরে মলয় গীতবীথির নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি কলকাতার খ্যাতনামা সংগীত সংস্থা মলয় গীতবীথি বোম্বাইয়ের বাঙালী

মহিলা সমিতির রৌপ্য-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কবিগুরুর 'শাপমোচন ও শ্যামা' নৃত্যনাট্য রবীন্দ্রনাট্য মন্দিরে মঞ্চস্থ করে সমাগত দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন শ্রীমতী শেলী সান্যাল।

শ্রীমতী সান্যালের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর এ অনুষ্ঠান নৃত্য সুরের মায়াজালে দর্শকবৃন্দকে সম্মোহিত করে রাখে।

দু দিনের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নরেশকুমার, শক্তি নাগ, কল্পশ্রী মৈত্র, তপতী দাশগুপ্ত, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ দাস, পূর্ণাশা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন রাখাল রক্ষিত, নিখিলেশ সেন, স্বপন রায়, বাসনা দাশগুপ্ত, মনীষা গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দনা দাশগুপ্ত, স্নিগ্ধা মুখার্জি ইত্যাদি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সমরেন দত্ত, অজিতকুমার সান্যাল।

শৌভিকের অনুষ্ঠান

'বকুল গন্ধে বন্যা এলো' ছদ্মনামে কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই' ও জগমোহন মজুমদারের করুণা করো না নাটক দুটির সার্থক অভিনয় করেন শৌভিক নাট্য সংস্থা গত ৭ই ডিসেম্বর বুধবার প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে।

একটি সুন্দর অভিনয়

শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বিদিশা' ও 'ভেঙেও বা ভাঙেনি' দুটি নাটক বাগমারী সি, আই, টি বিল্ডিংসের যুবকবৃন্দ কর্তৃক সি, আই, টি প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মধ্য দিয়ে মঞ্চস্থ হয় গত ১১ই ডিসেম্বর রাত্র ৭ ঘটিকায়। বেতারশিল্পীদের ছোট ক্ষুদ্র সংগীতানুষ্ঠানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, সর্বশ্রী স্বপন বাগচী, স্বপন সেনগুপ্ত, চিত্ত রায় গুহ, বীরেশ্বর সাহা,অলোক চৌধুরী, রতন মৈত্র, মাঃ বাবলু, মাঃ অমর, ভরত ভট্টাচার্য ও শ্যামল কাঞ্জিলাল ও পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন শ্রীসুবল দে ও শ্রীসুহাস চক্রবর্তী।

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ

মহানগরীর শীতকালীন সঙ্গীত মরশুমের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত সম্মেলন সর্বভারতীয় সংগীত সমাজের উদ্যোগে ৮ই জানুয়ারী থেকে ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। আটদিনব্যাপী এই সম্মেলনের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশন বসবে সারারাতব্যাপী। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ কারী বহু নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে আছেন : সর্বশ্রী তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী, মুনাব্বার খান, নারায়ণ রাও যোশী, সারাফৎ খান, নাসির আহমেদ খান, ওয়াহিদ খান, এম, আর গৌতম, উষারঞ্জন মুখার্জি, রবি কিচলু, গোপাল ব্যানার্জি, সুধীর ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, নিতাইদাস সান্যাল, শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক, মালবিকা কানন, কৃষ্ণা ও ভারতী (দিল্লী), শিপ্রা বোস, মীরা মুখার্জি, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, রেখা চ্যাটার্জি প্রভৃতি। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবেন পণ্ডিত রবিশংকর, ভি জি যোগ, রাধিকামোহন মৈত্র, নিখিল ব্যানার্জি, বাহাদুর খান, কল্যাণী রায়, যতীন ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, হিমাংশু বিশ্বাস, বলরাম পাঠক, মণিলাল নাগ প্রভৃতি। নৃত্যে অংশ নেবেন শ্রীমতী শ্রীলেখা মুখার্জি, শর্মিলা পালচৌধুরী, শতাব্দী রায়, রূপা গুপ্তা ও ভরতনাট্যমে অংশ নেবেন বাংলার লিপিকা গুপ্তা ও মাদ্রাজের শ্রীমতী বাসন্তী। বিভিন্ন আসরে সঙ্গত সহযোগিতায় থাকবেন পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ, বিশ্বনাথ বোস, শ্যামল বোস, অমিয় মুখার্জি, অনিল ভট্টাচার্য, নবকুমার পান্ডা প্রভৃতি। সম্মেলনের শিল্পী তালিকায় নবাগত শিল্পীদের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে রসিকদের মনোরঞ্জনে সহায়ক।

সংগীত-নাটক আকাদামির ফেলোশিপ

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সঙ্গীত ও নৃত্যে বিশিষ্ট পন্ডিত চার ব্যক্তিকে ১৯৬৬ সালের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর ফেলোশিপ এবং সাতজনকে পুরস্কার দিয়েছেন গত ২রা জানুয়ারী।

ফেলোশিপ পেয়েছেন সর্বশ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, জয়চামরাজ ওয়াদিয়ার এবং ই কৃষ্ণ আয়ার।

নৃত্যের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন সর্বশ্রী কেলুচরণ মহাপাত্র (উড়িষ্যা), শাস্ত্রীয় নৃত্যের শিক্ষক ভি বি রামাইয়া পিল্লাই (তাঞ্জোর) ও শ্রীমতী স্বর্ণসরস্বতী (ভরত নাটাম)।

সঙ্গীতের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন সর্বশ্রী শকুর খান (যন্ত্র), এম আর শ্রীরঙ্গম (কন্ঠ), পি এস বীরুস্বামী (যন্ত্র) এবং শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী (কন্ঠ)।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এবৎসর ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে : সভাপতি—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ্র, সহঃ সভাপতি—সর্বশ্রী হিরণ সান্যাল, সত্যজিৎ রায় ও এস আর হেমাদ, সাধারণ সম্পাদক—শ্রীপ্রদীপ্তশঙ্কর সেন, যুগ্ম সম্পাদক—সর্বশ্রী প্রবোধকুমার মৈত্র ও মৃগাঙ্কশেখর রায়, কোষাধ্যক্ষ শ্রীঈশানীপ্রসাদ বসু, গ্রন্থগারিক—শ্রীঅমলেন্দু বোস। সভ্যদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী চিদানন্দ দাশগুপ্ত, মৃণাল সেন, ডি প্রামাণিক, বি পি ব্যানার্জি, অমিয় গুপ্ত, অসীম সোম, অমিতাভ ঘোষ, সমীর রায়চৌধুরী ও মিহির সেন।

'শূদ্রক'-এর নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৫শে ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতার 'শূদ্রক'গোষ্ঠী আকাদেমী অব ফাইন আর্টস্ হলে তাদের প্রথম নাটক রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন পরিতোষ সোম, সন্দীপ সোম, সন্তু চক্রবর্তী, রনেন ভট্টাচার্য, সজল চক্রবর্তী, মানিক বসু, শিখা সেন, সুপ্রতিম সোম, শ্যামল রায়চৌধুরী, মহাশ্বেতা সোম, সুভদ্রা চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ বসুঠাকুর ও বাদল সমদ্দার। নাটকটি পরিচালনা করেন পরিতোষ সোম। নেপথ্য সঙ্গীতে ছিলেন প্রণতি বসু ও প্রতাপ মিত্র। আবহসঙ্গীতে ছিলেন শঙ্কর দাস, সংহিতা সোম ও শ্রীকান্ত রায়চৌধুরী, রূপসজ্জায় ছিলেন ডাঃ শচীন ব্যানার্জি।

মধু বোস ফিল্ম সপ্তাহ

ভারতের সিনেমা জগতে মধু বোস একটি স্মরণীয় নাম। এই প্রবীণ চিত্র-পরিচালক ভারতীয় সিনেমার গোড়াপত্তনের যুগে একটি যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে এসেছিলেন। প্রবীণ বয়সেও তাঁর ছবি নির্মাণের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তিনি তাঁর উঠতি যৌবনে অনায়াসলব্ধ অর্থের লোভ ছেড়ে ছবি নির্মাণে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর তিরিশ বছর আগেকার তৈরী ছবি 'আলিবাবা' এখনও চিত্রমোদীদের কাছে সমান জনপ্রিয়। তাছাড়া, মধু বোসের নির্মিত ছবি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', 'মাইকেল মধুসূদন', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' প্রভৃতি ছবিগুলিও জনপ্রিয়তায় অম্লান। তিনি সর্বপ্রথম এক্ষেত্রে একটি দুঃসাহসিক কাজ করেন। 'রাজনর্তকী' (কোর্ট ডান্সার) ছবিটিকে তিনি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে রূপান্তরিত করেন। তাঁর আগে কোন ভারতীয় পরিচালক এধরনের কোন বলিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণে সাহসী হননি।

মধু বোস ফিল্ম সপ্তাহ ৫ জানুয়ারী থেকে ১১ জানুয়ারী পর্যন্ত টাইগার সিনেমায় অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে আলিবাবা (৫ জানুয়ারী), শেষের কবিতা (৬ জানুয়ারী), অভিনয় (৭ জানুয়ারী), মাইকেল মধুসূদন (৮ জানুয়ারী), মহাকবি গিরিশচন্দ্র (১০ জানুয়ারী)। সর্বশেষ দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারীর ছবি সম্পর্কে পরে ঘোষণা করা হবে।

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনের হাঙ্গামায় অচৈতন্য এক বালক। ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

টেস্ট ক্রিকেটে কলঙ্কজনক অধ্যায়

ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে যে অভূতপূর্ব দর্শক সমাবেশে এবং উদ্দীপনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি আরম্ভ হয়েছিল তা দ্বিতীয় দিনে (১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে) এক ভয়াবহ পরিস্থিতির আবর্তে পড়ে ভণ্ডুল হয়ে যায়—খেলা আরম্ভই হয় নি। নির্বিচারে দর্শকদের উপর পুলিশের নির্মম লাঠি চালনা, মাঠের মধ্যে কাঁদানে গ্যাসের সেল নিক্ষেপ এবং অগ্নিকাণ্ড—ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের প্রশান্ত রূপ মুহূর্তের মধ্যে নারী ও শিশুদের অসহায় আর্তনাদে এবং চতুর্দিকে প্রাণরক্ষার তাগিদে এক বীভৎস রূপ ধারণ করে। সি এ বি কর্তৃপক্ষের চরম অব্যবস্থা এবং পুলিশ বাহিনীর অবিমৃশ্যকারিতার ফলে এই দিনের অপ্রীতিকর এবং বিপজ্জনক ঘটনাবলী ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় যোজনা করেছে। টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে পৃথিবীর কোথাও এই রকম বিশৃঙ্খলা ঘটে নি এবং দর্শক এমন কি টেস্ট খেলোয়াড়দেরও প্রাণরক্ষার জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মাঠে-ময়দানে ছুটতে হয় নি। ইংরাজী নববর্ষের শুভ প্রথম দিনে সকলেই শান্ত পরিবেশে খেলা দেখার উদ্দেশ্যেই মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের জীবনে নতুন বছরের এই শুভ দিনটিই অভিশপ্ত দিন হয়ে রইল।

খেলার প্রথম দিনেই দেখা গেল, ২৫ টাকার সিজন টিকিটের গ্যালারীর মধ্যে দর্শকদের প্রচণ্ড চাপে মাঠের মধ্যে লোক ছিটকে পড়ছে। আত্মরক্ষার তাগিদেই হাজার হাজার দর্শক মাঠে আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার ধারে মাটিতে বসেই খেলা দেখতে বাধ্য হন। পয়সা দিয়ে সিজন টিকিট কিনে তাঁদের মাটিতে বসে খেলা দেখার কথা নয়। সি এ বি কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে তাঁদের এই চরম দুর্ভোগে পড়তে হলেও তাঁরা কিন্তু বিনা প্রতিবাদে হাসি মুখেই মাটিতে বসে খেলা দেখেছিলেন। দ্বিতীয় দিনেও অবস্থার চাপে পড়ে ২৫ টাকার সিজন টিকিটধারী দর্শকেরা মাটিতে বসে খেলা দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সে আবেদন অগ্রাহ্য করে বাধা দেন। দ্বিতীয় দিনের গোলমালের সূত্রপাত এই নিয়েই। এদিকে মাঠের মধ্যে জনৈক বর্ষীয়ান ভদ্রলোকের উপর দশ-বারজন সশস্ত্র পুলিশের বেপরোয়া প্রহারের দৃশ্য দেখে দর্শকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই পুলিশ এবং বিক্ষুব্ধ দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আমরা অবাক হচ্ছি, সি এ বি কর্তৃপক্ষের কাণ্ডজ্ঞান দেখে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না করেই তাঁরা পিছনের দরজা দিয়ে অন্তর্ধান হন। চমৎকার দায়িত্বজ্ঞান এবং আতিথেয়তার পরিচয়! খবরে প্রকাশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স, গিবস, গ্রিফিথ প্রভৃতি খেলোয়াড়রা দলচ্যুত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে মাঠে ছুটোছুটি করেন এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের সাহায্যে হোটেলে ফিরেছিলেন।

এই বেদনাদায়ক ঘটনার মধ্যে ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে একটি সুখবর যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কালক্ষেপ না করে ঘটনার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগিয়ে এসেছেন। সংবাদে প্রকাশ, সরকারী মহল থেকে খেলা আরম্ভের চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারতীয় খেলাধূলার পীঠস্থান কলকাতার বুকে টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষ্যে যে কাণ্ড ঘটে গেল তার জের সুদূরপ্রসারী। এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হলেই কলকাতার এই কলঙ্ক মোচন হবে।

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ১৩৬ রান (ডি এল মারে ৩১ এবং সি লয়েড ২৬ রান। সুব্রত গুহ ৬৪ রানে ৪ এবং চুণী গোস্বামী ৪৭ রানে ৫ উইকেট)।

ও ১০৩ রান (লয়েড ২৬ এবং কানহাই ২৪ রান। সুব্রত গুহ ৪৯ রানে ৭ এবং চুণী গোস্বামী ৫০ রানে ৩ উইকেট)।

মধ্য এবং পূর্বাঞ্চল দল : ২৮৩ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হনুমন্ত সিং ৫২, আর সাকসেনা ৪৯ এবং সুব্রত গুহ ৪৬ রান। হল ৭০ রানে ৩, কিং ৬০ রানে ৩ এবং লয়েড ৪৯ রানে ২ উইকেট)।

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার দ্বিতীয় দিনে পুলিশের হাতে নিপীড়িত দর্শক সাধারণের একাংশের প্যাভিলিয়ন আক্রমণ। ফটো : অমৃত

ইন্দোরের নেহরু স্টেডিয়ামে সম্মিলিত মধ্য এবং পূর্বাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ৪৪ রানে ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ১৯৬৬-৬৭ সালের ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই প্রথম পরাজয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে সোবার্স, হান্ট এবং বুচার এই তিনজন প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান যা খেলেন নি। মধ্য এবং পূর্বাঞ্চল দলের এই জয়লাভের মূলে ছিল সুব্রত গুহ এবং চুণী গোস্বামীর বোলিং: সুব্রত গুহ এই খেলায় ১১৩ রানে ১১টা এবং চুণী গোস্বামী ৯৭ রানে ৮টা উইকেট পান।

প্রথম দিনের খেলায় ১৩৬ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে খেলার বাকী সময়ে সম্মিলিত মধ্য ও পূর্বাঞ্চল একাদশ দল ৩ উইকেট খুইয়ে ১১৪ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে ২৮৩ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় সম্মিলিত মধ্য ও পূর্বাঞ্চল দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৪৭ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়—৯টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১০৩ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিনে মাত্র একটা বল খেলা হয়েছিল। সুব্রত গুহের বলে কিং যে 'ক্যাচ' তুলেন তা চুণী গোস্বামী ধরে ফেলেন। পূর্ব দিনের ১০৩ রানের মাথাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

ডেভিস কাপ

১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ৪—১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৩ বার এবং মোট ২১ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই খেলাটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩৫ বারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনাল খেলা; অপরদিকে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সরকারী নাম—আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯০০ সালে। আমেরিকার প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ডিউইট ফিলে ডেভিস আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড এই দুই দেশের দলগত লন টেনিস খেলার উদ্দেশ্যে বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে একটি মূল্যবান সুদৃশ্য কাপ উপহার দেন। তাঁরই নামে পুরস্কারের নামকরণ এবং পরবর্তীকালে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড ব্যতীত অন্যান্য দেশের যোগদানের ফলে প্রতিযোগিতাটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করে। বর্তমানে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৬টি। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৬৭ বছরের ইতিহাসে (১৯০০-৬৬) মোট ১২ বার খেলা বন্ধ ছিল। দু'বার (১৯০১ ও ১৯১০ সালে) ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ—যথাক্রমে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি—অর্থাৎ প্রতিযোগিতাই হয়নি। তাছাড়া দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে ১০ বছর খেলা বন্ধ ছিল (১৯১৫-১৮ এবং ১৯৪০-৪৫)।

অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকার প্রাধান্য

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৯ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুণ মাঝে ৬ বছর (১৯৪০-৪৫) খেলা হয়নি। ফলে ২৩ বার খেলা হয়েছে। এই ২৩ বারের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া প্রতিবারই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলে ১৫ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে এবং বাকি ৮ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে আমেরিকা। অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা উপর্যুপরি ১৬ বার (১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৬-৫৯) চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে একটানা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই ১৬ বারের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয় ৯ বার এবং আমেরিকার জয় ৭ বার।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ

১৯৬৬ সালের অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলার আসর

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

১৯৪৬ সাল থেকে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

বৎসর	বিজয়ী			বিজিত	
১৯৪৬	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া	০
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া	১
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা	১
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা	০
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ইতালী	১
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	ইতালী	০
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	মেক্সিকো	০
১৯৬৩	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া	২
১৯৬৪	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা	২
১৯৬৫	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	স্পেন	১
১৯৬৬	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ভারতবর্ষ	১

বসেছিল মেলবোর্নে। (২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর)। প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়ে ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় ভারতীয় জুটি কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ডাবলসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জুটি টনি রোচ এবং জন নিউকমকে পরাজিত করে দর্শক এবং টেনিস খেলার পন্ডিত ব্যক্তিদের হতবাক করেন। তৃতীয় দিনের বাকি দুটি সিংগলসে অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়ার ২নং খেলোয়াড়) ৬—৩, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

রয় এমার্সন (১নং খেলোয়াড়) ৭—৫, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

রমানাথন কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৪—৬, ৭—৫, ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে টনি রোচ এবং জন নিউকমকে পরাজিত করেন।

রয় এমার্সন ৬—০, ৬—২ ও ১০—৮ গেমে রমানাথন কৃষ্ণানকে পরাজিত করেন।

ফ্রেড স্টোলে ৭—৫, ৬—৮, ৬—৩, ৫—৭ ও ৬—৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়

উপর্যুপরি ডেভিস কাপ জয়ের রেকর্ড আমেরিকার। তারা উপর্যুপরি ৭-বার (১৯২০—২৬) ডেভিস কাপ জয়ী হয়ে এই রেকর্ড করে। আমেরিকার এই রেকর্ডের পর ফ্রান্সের উপর্যুপরি ৬-বার (১৯২৭—৩২) ডেভিস কাপ জয় উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সের এই একটানা ৬-বার ডেভিস কাপ জয়লাভের মূলে ছিলেন এই চারজন খেলোয়াড়—কোশে, বোরোত্রা, ল্যাকস্ত এবং ব্রুক'ন।

অভিশপ্ত ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইডেন উদ্যানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় পুলিশ এবং হোমগার্ডদের হাতে জনৈক প্রবীণ দর্শকের প্রহার লাঞ্ছনা।

ডেভিস কাপ চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

(১৯০০—১৯৬৬)

	জয়	পরাজয়	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	২১	১৪	৩৫
আমেরিকা	১৯	২৪	৪৩
গ্রেটবৃটেন	৯	৭	১৬
ফ্রান্স	৬	৩	৯
ইতালী	—	২	২
বেলজিয়াম	—	১	১
জাপান	—	১	১
মেক্সিকো	—	১	১
স্পেন	—	১	১
ভারতবর্ষ	—	১	১

চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে শেষ খেলা

অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৬ সালে, আমেরিকা ১৯৬৪ সালে, ইংল্যান্ড ১৯৩৭ সালে, ফ্রান্স ১৯৩৩ সালে, বেলজিয়াম ১৯০৪ সালে, জাপান ১৯২১ সালে, ইতালী ১৯৬১ সালে, মেক্সিকো ১৯৬২ সালে, স্পেন ১৯৬৫ সালে এবং ভারতবর্ষ ১৯৬৬ সালে শেষ চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলেছে।

শেষ ডেভিস কাপ জয়

শেষ ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৬ সালে, আমেরিকা ১৯৬৩ সালে, ইংল্যান্ড ১৯৩৬ সালে এবং ফ্রান্স ১৯৩২ সালে।

একটি সিঙ্গলস খেলায় সর্বাধিক গেমস

৭৮টি — ১৯৪৮ সালে বোস্টনে (আমেরিকা) অনুষ্ঠিত ইন্টার-জোন ফাইনালে এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় যখন জে ড্রবনি (চেকোস্লোভাকিয়া) ৬-৮, ৩-৬, ১৮-১৬, ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে এ কে কুইস্টকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

একটি 'সেটে' সর্বাধিক 'গেমস'

৪৩টি — ১৯৫৭ সালে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত ব্রেজিল বনাম ইসরাইলের ডাবলস খেলার পঞ্চম সেটে এই রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বজয়ী ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়েরা বৃহস্পতিবার ব্যাংকক থেকে পালাম বিমানঘাঁটিতে (দিল্লী) এসে পৌঁছুলে এই ছবি তোলা হয়। ভারত এশীয় হকির ফাইনালে পাকিস্থানকে ১—০ গোলে হারিয়ে এশীয় ক্রীড়ায় হকি ট্রফি লাভ করেছে।

অনেক দামী সোনার মেডেল!

অজয় বসু

চাপা উত্তেজনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লগ্নটি সত্যিই কি মধুর! এই উত্তেজনায় ভুগবো না, মনে মনে কতোবার এই প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেছি। তবু কি ছাই রেহাই আছে! একদিকে মর্যাদার লড়াই, অন্যদিকে সোচ্চার পারিপার্শ্ব। দুয়ে মিলে আমাকে, আমাদের সকলকেই অবস্থার দাস বানিয়ে রেখেছিল। মুখের ভাবে, চোখের দৃষ্টিতে যতোই কেন না নির্লিপ্ত আকার থাকুক না, মনের কোণে উত্তেজনা যে টগবগ করে ফুটছিল সেকথা নিজের কাছে স্বীকার না করে উপায়ই বা কি! মুক্ত পেলাম অতিরিক্ত সময়ে, সোয়া একঘন্টা খেলার পর, যেই রেলওয়ের বলবীর প্রায় একার সামর্থ্যেই পাকিস্থানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে বলটিকে ও-পক্ষের গোলের মধ্যে ঠেলে দিলেন।

একটিমাত্র গোল। তাতেই প্রচন্ড এক ধাক্কায় হৃদপিন্ডটা যেন লাফিয়ে উঠলো। ধাক্কা আনন্দের। বিস্ময়েরও। আনন্দের হেতু, দুবারের এশীয় হকি চ্যাম্পিয়ন পাকিস্থানকে তাহলে ভারত হারাতে পেরেছে। অন্যের কাছে না হোক, আমাদের কাছে এই জয়ের মূল্য মস্তো। ভারত ওলিম্পিক হকি জয় করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান পেয়েছে। হকিতে ভারতীয় কীর্তি অতুলনীয়। তবুও ভারত এতোদিন এশীয় হকির শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞায় ভাগ বসাতে পারেনি। বলবীরের এক গোলে সেই স্বীকৃতির শিরোপা অর্জন করা গেল। কাজেই আনন্দের কারণ স্বাভাবিক ও সংগত।

আর বিস্ময় ভিন্নতর চিন্তায়।

এই গোলের আগে পর্যন্ত খেলা যেভাবে চলেছে তা দেখে ভারত যে জিতবেই এমন ধারণা দৃঢ় হয়ে ওঠার সুযোগ ঘটেনি। দু-পক্ষেই চুলোচুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেঁধেছে। রক্ষণ কাজে দু দলেরই দক্ষতা অশেষ। তবু বোঝাপড়ার সূত্র ধরে প্রতিযোগী দু দলের মধ্যে পাকিস্থানী ফরোয়ার্ডেরাই যা কিছু আক্রমণাত্মক ক্রীড়ারীতির পরিচয় রাখতে পারছিলেন। অন্ততঃ বিরতির পর তো বটেই। পক্ষান্তরে ভারতীয় ফরোয়ার্ডেরা বিচ্ছিন্নপ্রায়।

দেখে নতুন নতুন সম্ভাবনায় পাক সমর্থকদের বুক ফুলে উঠছে। হাজার পাঁচসাত ভারতীয় দর্শকের 'জয় ভারত' ধ্বনিতে সেই অপরাহ্নে ব্যাংককের হকি স্টেডিয়াম মুখরিত হলেও এশীয় হকির ফাইনালের দ্বিতীয় পর্বটি যেন পাকিস্থানের অনুকূলেই ঢলে পড়ছিল। তবু সত্তর মিনিটব্যাপী নির্ধারিত সময়ে গোল হোলো না। গোল হোলো আরও ছ' মিনিট পরে বলবীর সিংয়ের কৃতিত্বে। অনেকটা খেলার গতির বিরুদ্ধে। তাই আনন্দের সংগে বিস্ময়ও মিশে যেতে সময় নেয় নি।

আরও বিস্ময়ের খোরাক স্বয়ং বলবীর সিং। ভারতের অতি ক্ষিপ্র রাইট উইং রেলওয়ে কর্মী বলবীর সেদিন যেন জয়লক্ষ্মীর প্রসন্নতা আদায়ে একাই বহু-জনের ভূমিকা নিয়েছিলেন। খাপছাড়া ফরোয়ার্ড লাইনের যা কিছু ঘাটতি একা বলবীর নিজের সামর্থেই পুষিয়ে দিচ্ছেন। যেমন গতি তাঁর, তেমনি স্টিকে-বলে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা অনন্যসাধারণ। যখনই বলবীরের কাছে বল তখনই পাকিস্থানের আঁটোসাঁটো রক্ষণব্যূহে ভয়ের কাঁপন। কাঁপনের লক্ষণটি অতি প্রকট পাকিস্থানী খেলোয়াড়দের বেপরোয়া প্রচেষ্টাতে।

বলবীরের দক্ষতাকে এঁটে ওঠা সাধ্যাতীত জেনেই পাকিস্থানের লেফট হাফব্যাক খেলার শুরুতে সবিক্রমে একবার স্টিক ছুঁড়েছিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বলবীরের পায়ে হাঁটুর নীচে গাঢ় রঙের

একটি কালশিরে এ'কে ছোঁড়া স্টিক তার কাজ 'সুসম্পন্ন' করেছিল

বলবীর খোঁড়া হয়ে পড়লেন। খোঁড়াতে খোঁড়াতে একসময় মাঠও ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। দেখে ভারতীয় সমর্থকদের মনটা ভারী হয়ে এলো। হয়তো শঙ্কার ও নিরাশার টুকরো টুকরো মেঘও জমতে লাগলো মনের কোণে। বলবীরকে আহত করে তোলার ধরনে সতীর্থদের মধ্যে সবচেয়ে রুষ্ট হয়েছিলেন গুরবক্স সিং। বলা কওয়া নেই, হঠাৎ তিনিও অখেলোয়াড়, বিসদৃশ হতে চাইলেন স্টিক উ'চিয়ে পাকিস্থানের লেফট ইনসাইড ফরোয়ার্ডকে এক ঘা বসিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মাঝে তুলকালাম বেধে ওঠার উপক্রম। স্টিককে লাঠি বানাবার অপচেষ্টায় দু' দলের অনেকেই ছুটে এলেন ঘটনাস্থলে। দুই আম্পায়ার, ভারত-পাকিস্থানের জেন্টল-দারারা ছুটলেন। তাঁদের দৌত্য শেষ পর্যন্ত সফল হলো। মারমুখী খেলোয়াড়েরা হাতে হাত রেখে আশ্বাস দিলেন, আর এমনটি হবে না। সুখের কথা, এ প্রতিশ্রুতি তাঁরা উত্তরপর্বে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

বলবীরের কি হোলো?

পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মাঠে ফিরলেন তিনি ছ' মিনিট পর। ফিরেই বুঝিয়ে দিলেন যে স্টিকের এক ঘায়ে অকেজো হওয়ার মতো হাল্কা ধাত তাঁর নয়। পরিস্থিতি যতোই প্রতিকূল, বলবীরের কার্যকারিতা যেন ততোই! সত্যিই, আশ্চর্য ভূমিকা তাঁর।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় অতিরিক্ত সময়ে। একেবেঁকে, হেলেদুলে বল নিয়ে ছুটছিলেন বলবীর। লোক কাটিয়ে ওপক্ষের পড়ন্ত স্টিকগুলির বাধা টপ্‌কে অবাধে। যেতে যেতে ডাইনে কোণে পড়ে গেলেন বলবীর। পাক্ গোলরক্ষক কোণটুকু আগলে জোরালো হিট রোখার আশায় কোমর কষে দাঁড়ালেন। ওই কোণ থেকে গোল? অসম্ভব!

তবু বলবীর অসম্ভব কান্ডটিই সম্ভব করে তুল্লেন। জোরালো হিটে নয়। সন্তর্পণে, বুদ্ধি করে আস্তে বলটি ঠেলে দিয়ে। স্থির কিন্তু এতো ধীর পুসের জন্যে পাক্ গোলরক্ষক প্রস্তুত ছিলেন না। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাঁর দেহের ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হোলো, আর সেই ফাঁকেই বলবীরের স্টিক দিয়ে আস্তে ঠেলা বলটিও গড়িয়ে গড়িয়ে টুপ্ করে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

গোল! গোল! হাজারো কণ্ঠের উল্লাস সেই মুহূর্তে ব্যাঙককের হকি স্টেডিয়ামের পরিধি ডিঙিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল দূরে দুরান্তে।

দুরান্তে ভারতেও তখন লক্ষ মানুষের কান রেডিও সেটে বাঁধা। ব্যাঙকক থেকে ভেসে আসা চক্রপাণির কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছে। গোল, জয়—দুটি শব্দ ব্যাপ্তিতে তখন কতোখানি! বুঝতে পারি, আশা পূরণের আনন্দে ও তৃপ্তিতে সারা ভারত উচ্ছ্বাসে রোমাঞ্চিত, আনন্দে উদ্বেল। আমাদের (পি, টি, আইয়ের জয়ন্ত বসু ও আমার) আনন্দ তখন ঘনীভূত। কিন্তু উচ্ছল প্রকাশের রাস্তা রুদ্ধ। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে স্টেডিয়ামের যে অঞ্চলে আমরা জায়গা পেয়েছিলাম তার আশেপাশে সবাই পাকিস্থানী সমর্থক। বড্ড বেহায়াপনা হবে ভেবেই সংযমের কিঞ্চিৎ শাসানি ছিল। তবু মনের গভীরে, হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে তৃপ্তির যে ফল্গুধারা বইছিল তার স্বাদ কে অস্বীকার করতে পারে!

একটু আগে ব্যাঙককের হকি স্টেডিয়াম দলসমর্থকদের রণহুংকারে কাঁপছিল। এবার ভারতের জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। গাওয়া হলো জনগনমন অধিনায়ক হে। কানে যেন মধু বর্ষিত হলো। সেই সঙ্গে জাতীয় পতাকা উড়লো আকাশে এবং বিজয়মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়ালেন লক্ষ্মণ। ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক লক্ষ্মণ যেন ভারতীয় হকির উ'চু মাথার জ্বলজ্বলে প্রতীক। মুখখানা খুশীর হাসিতে ভরে উঠেছে। মাথার ওপর দুটি হাত তুলে অনুরাগীদের প্রত্যাভিবাদন জানাচ্ছেন।

পরলোকে মনোতোষ অধিকারী

'অমৃত' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের সুপরিচিত ও জনপ্রিয় কর্মী-বন্ধু শ্রীমনোতোষ অধিকারী তিপান্ন বৎসর বয়সে বিগত শনিবার, ২৪শে ডিসেম্বর রাত দশটায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পরিমিতবাক, বিনয়ী, সত্য ও কর্মনিষ্ঠ কর্মী-বন্ধুর আকস্মিক অকাল বিয়োগে আমরা স্বজনবিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি। পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

চোখজুড়ানো ছবি সেসব। সাংবাদিক হিসেবে বাস্তবানুগ রিপোর্ট লেখার কাজ নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েও কখন যে সেদিন ব্যাঙককের হকি স্টেডিয়ামের হাজারো ভারতীয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম টের পাই নি।

হুশ হলো এক বিদেশীর মন্তব্যে।

তখনও মাঠের ধারে নাচানাচি চলছে। বলবীরকে কাঁধে তুলে বীরপুজোয় মেতে আছেন অগুন্তি অনুরাগী। এমন সময় ওই মন্তব্য,

বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? খেলা তো খেলাই, যুদ্ধ নয়। কতো মেডেল তো এহাত ওহাত হয়ে গেল। জাপান তো গণ্ডায় গণ্ডায়, ডজন ডজন মেডেল পেলো এ কদিনে। কিন্তু কই? এমন মাতামাতির উৎসাহ তো জাপ ক্রীড়ানুরাগীদের পেয়ে বসে নি?

দোষ দিতে পারি নি ও'কে। ও'র পক্ষে একথা বলা সাজে। কারণ, উনি জানেন না যে এশীয় হকির সোনার মেডেলটিকে আমরা কি চোখে দেখি! শুধু আমরাই নই, খেলায় হার হলো দেখে এক পাকিস্থানী ভদ্রলোককে সেদিন আমি মাঠের কিনারে অঝোরে কাঁদতে পর্যন্ত দেখেছি। যেমন কান্না আমরা ভারতীয়রা কেঁদেছিলাম ট্র্যাকের ধারে ভারতীয় অ্যাথলিট এডওয়ার্ড সিকোয়েরার পতন উপলক্ষ্যে।

বেচারী সিকোয়েরা! পড়ে গিয়ে আঘাত পেলেন। কিন্তু আঘাতে নয়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় হাতপা ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। দেখে নির্বিকার সাংবাদিক আমিও নিজের চোখের জল রাখতে পারি নি। আমার কান্না সমবেদনার। কিন্তু সিকোয়েরার কান্না তো বীরের অশ্রুপাত! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি অনুশীলন করেছেন। শিক্ষাশিবিরে খেটেছেন। লক্ষ্য, এশীয় ক্রীড়ায় পনেরোশ মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক। অনুশীলনের সময় যদি অর্থব্যঞ্জক হয় তাহলে বলতে পারি যে সে স্বর্ণপদক সিকোয়েরার মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সে পদক যে কেমন করে সিকোয়েরার মুঠো থেকে ফসকে পড়লো তার করুণ কাহিনী কেই বা ভুলতে পারে?

দৌড়তে দৌড়তে সিকোয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ট্র্যাকের ধারে। পায়ে লাগলো চোট্। যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলেন। শুশ্রূষাকারীর দল তাঁকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে সিকোয়েরা ফোঁকিয়ে কেঁদে উঠলেন। এতো নিষ্ঠা, এতো-দিনের মেহনত, সবই বৃথায় গেল! জীবনের অর্থ বুঝি তাঁর কাছে শূন্যে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল ওই অশুভ লগ্নে।

সিকোয়েরার পতনে আমরা শোকাহত হয়েছিলাম। স্টেডিয়ামের অন্য অনেকেও মর্মাহত। অনেকেই বল্লেন, এ ঘটনা আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, পেছনের প্রতিযোগী তাঁর পায়ে পা বাধিয়ে তাঁকে ফেলে দিয়েছেন। মার্কিন অ্যাথলেটিক কোচ বিল মিলারের অভিমতও তাই। 'ব্যাংকক পোস্ট' পরের দিন আরও প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলে বলেছেন যে সিকোয়েরাকে ট্রিপ করা হয়েছে। কে বা কারা ট্রিপ করতে পারেন সে সম্বন্ধেও ব্যাংকক পোস্ট হদিশ জানাতে ছাড়ে নি।

কিন্তু সে কথা থাক্। হচ্ছিল হকি ফাইনালের কথা। তাতেই ফিরে আসা যাক্। ফিরে আসি সেই পাকিস্থানী ভদ্রলোকের

কথায় যিনি জাতীয় দলের হার দেখে আর স্থির থাকতে পারেন নি। ভীড় থেকে সরে গিয়ে নিজের রুমালে চোখ মুছছিলেন।

আলাপ ছিল। কাছে গিয়ে সমবেদনায় বল্লাম, কি আর করবেন বলুন! খেলায় তো হারজিৎ থাকবেই। গুড্ আর ব্যাড্ লাক থাকাও বিচিত্র নয়।

অতো দুঃখেও ভদ্রলোক হাসলেন। বল্লেন, তা সত্যি। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তো আর লড়াই করা যায় না!

এই ভদ্রলোকের চোখের জলেরও দাম আছে। সিকোরেয়ার জন্যে আমাদের যেমন তেমনি হকি মাঠে পাকিস্থানের বিপর্যয় ঘিরে ওঁর বেদনা, দুইই এক, কোনোটিই নিরর্থক নয়। হয়তো এ সর্বকিছুর উৎসই উগ্র জাতীয়তাবোধ। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কেতাবী আলোচনা ফাঁদলে সুস্থ মেজাজে কেউই ক্রীড়াক্ষেত্রে এই উগ্র জাতীয়তাবোধকে সমর্থন করার উৎসাহ পাবেন না। তবু আজকের দিনে যখন ওলিম্পিক ক্রীড়া-ভূমিতে এশীয় ও অন্য আঞ্চলিক খেলার আসরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীর জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় তখন কোনো দর্শকই বুঝি জাতীয়তাবোধের উগ্রতায় অসম্পৃক্ত থাকতে পারেন না।

যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা একদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, দেশে দেশে প্রতিযোগিতার আয়োজনে তাই উগ্র জাতীয়তাবোধেরও ভূমিকা রয়েছে। সে ভূমিকা স্বীকৃত হোক্ বা না হোক্, তার অস্তিত্ব সত্য।

আর সেই সত্যের প্রভাবে জাতীয় দলের সাফল্যে সবাই হেসেছে। বিপর্যয়ে মনমরা হয়ে নেপথ্যে মুখ ঢেকেছে। হাসিখুশীর একটি নজীর আজও আমার চোখে ভাসছে। শুধু আমারই বা বলি কেন? ২০শে ডিসেম্বরে পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার সমাপ্তি আয়োজনে যাঁরা মূল স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন তাঁদের সকলের অভিজ্ঞতাই অভিন্ন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের ঠিক আগে ওই স্টেডিয়ামে ফুটবল ফাইনাল খেলা হলো। খেলা ইরানে ও বর্মায়। ইরান অনেক প্রতিশ্রুতি জানিয়ে খেলা শুরু করলো। দেখে ইরানীয় সমর্থকদের মন সম্ভাবনায় ভরপুর। স্টেডিয়ামের দক্ষিণ ধারে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে তাঁরা সব দল বেঁধে বসেছিলেন। গায়ে আকাশী রঙের জ্যাকেট, মাথায় হ্যাট, দূর থেকে দেখেই চেনা যায়। কণ্ঠস্বর আরও চেনা। সমস্বরে তারা হাততালি দিচ্ছে আর এক একবার ইরান, ইরান বলে হাঁক তুলছে।

দেখতে দেখতে পঁয়তাল্লিশ কেটে গেল। প্রথমপর্বের পঁয়তাল্লিশ মিনিট ইরানেরই প্রাধান্যের যুগ। দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকেও তাই। তারপর ধীরে ধীরে খেলার মোড় ঘুরলো। বর্মীরা ফিরলেন প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে। এতোক্ষণ সাধ্যমতো পরিশ্রম করার দরুণ ইরানীয় খেলোয়াড়েরা হাঁফিয়ে পড়ছিলেন। বর্মীদের দম ছিল সংরক্ষিত। সেই দম শেষপর্বে কাজে লাগিয়ে বর্মী সেণ্টার ফরোয়ার্ড এক মুহূর্তের একটি সুযোগ ছোঁ মেরে গোল করে বসলেন।

আর যাবে কোথায়! যেই না বর্মা গোল করলো অমনি ঢাক, ঢোল, বাঁশীর শব্দে স্টেডিয়ামের আর একধার মুখর হয়ে ভরে উঠলো। সেই সঙ্গে এক বর্মী তরুণী স্টেডিয়ামের উপরেই নাচ শুরু করে দিলেন। বর্মী নৃত্যের অবিমিশ্র পরিবেশন। দর্শকদের দৃষ্টি মাঠ ছেড়ে নাচের আসরেই কেন্দ্রীভূত হয়ে রইলো। ফুটবল স্টেডিয়ামের উত্তেজনা-মাখানো পরিবেশে এই নাচ সত্যিই সেদিন রুচিস্নিগ্ধ পরিপার্শ্ব গড়ে তুলেছিল।

এসব দৃষ্টান্তই জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত। কোনো নজীর নরম। কোনোটি আবার তেমনি উগ্র। বাস্কেটবল কোর্টে থাইল্যাণ্ড বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার খেলার দিনে যেসব অলক্ষ্যে কাণ্ড ঘটেছে তা উগ্রতারই প্রতীক। হাতাহাতি, মারামারি, চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি, পুলিশের লাঠিচালনা কিছু বাদ পড়েনি। আনন্দময় ক্রীড়াভূমিতে এই উগ্র মেজাজ বেমানান। তাই বলছিলাম যে খেলার আসরে উগ্র জাতীয়তাবোধ মুস্কিল আসানের পথ নয়।

ভারত-পাক্ হকি ফাইনালের দিনে এই বোধই আকাশ-ফাটানো আওয়াজ তুলেছে। দু' পক্ষই যেন মর্যাদার প্রশ্নে জীবনপণ করে বসেছিল। কিন্তু কিঞ্চিৎ তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করলেই কি বোঝা যাবে না যে দু' পক্ষই কি অকারণে ভারত-পাক্ হকি খেলার ওপর বাড়তি মর্যাদা আরোপ করছে না?

হকিতে ভারত চিরদিন বিশ্বশ্রেষ্ঠ। পাকিস্থান তো অবিভক্ত ভারতেরই কর্তিত অংশ। উঁচু মানের হকির যা কিছু ঐশ্বর্য তা ভারত ও পাকিস্থান, এই দুটি অঞ্চলেই ধরা রয়েছে। দক্ষতা, যোগ্যতার নিরিখে দু' দলই প্রায় সমান সমান। এক্ষেত্রে একপক্ষ যদি অপরপক্ষের কাছে হারে তাহলে অবাক হবার কিই বা আছে? এবং সে হারে কেনই বা মনে করা হবে যে বিজিত পক্ষের মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! যোগ্যের কাছে পরাজয় কি প্রকৃত খেলোয়াড়ের কাম্য নয়? জেতা যদিও আরও বাঞ্ছিত।

বলতে দ্বিধা নেই, ভারত-পাকিস্থানের হকি খেলার ওপর অধুনা দু' পক্ষ থেকেই যে অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা সুস্থতার লক্ষণ নয়। মর্যাদার লড়াই এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের আগে, দু'পক্ষ পরস্পরের সামনে আসছেই না। পাছে পরস্পরের ক্রীড়াকৌশল পরস্পরের কাছে জানাজানি হয়ে যায়! কিন্তু প্রশ্ন এই যে আগেভাগে সামনাসামনি এলে এবং পরস্পরের সঙ্গে খেললে কি দু'পক্ষের মান আরও উঁচুতে উঠতো না?

ভারত আর পাকিস্থান, দু'পক্ষ আজ নিজেদের নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে অন্য মহলের হকি দল যে এই ফাঁকে কতোটা শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে তার খবর পর্যন্ত দু' দল রাখছে না। ব্যাঙ্ককে জাপান পাকিস্থানের সঙ্গে খেলা অমীমাংসিত রেখে দিয়েছে। সিংহল, মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত নামমাত্র একটির বেশি গোল করতে পারেনি, এ থেকে কি বোঝা যায় না যে অন্য দলগুলিও হকির ক্ষেত্রে ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে?

ও'রা এগোচ্ছেন সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে ইওরোপের কয়েকটি দলও। তার ওপর স্টিকস সংক্রান্ত আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে পেনাল্টি কর্নার হিটের সুবিধেও কমে গিয়েছে। সব মিলিয়ে ভারত-পাকিস্থানের প্রাধান্য কমতির মুখে। নিজেদের খেলা ঘিরে মর্যাদার প্রশ্নে বুঁদ হয়ে না থেকে অতঃপর দু'পক্ষেরই ক্রীড়া-মানে আরও শান্ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এবং এই উচিত কাজে যদি অবিলম্বে হাত না পড়ে তাহলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক হকিতে ভারত বা পাকিস্থান শীর্ষাসন অবিচল রাখতে পারবে কিনা তাও সন্দেহের বিষয়।

দু' দলের খেলার ধার বাড়বে কিসে তা আগেই বলেছি। আবার বলছি যে ধার বাড়বে যদি ভারত ও পাকিস্থানে হকি দলের সফর বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়। নিয়মিত সফরের ব্যবস্থা হলে দু' মহলের চাপা উত্তেজনাও শিথিল হতে পারে।

পঞ্চম এশীয় ক্রীড়ার হকি মাঠ থেকে ভারত ও পাকিস্থান যদি সং-শিক্ষা ও সত্যিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায় তাহলে দু' দলের উচিত অবিলম্বে সফর বিনিময় করা। মর্যাদার প্রশ্নে উত্তেজনা জিইয়ে রাখা কোনো কাজের কথা নয়। আসল মর্যাদা খেলার মাঠে দু' দলের শ্রেষ্ঠত্ব ঘিরেই। সেই শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখায় দু' দলকেই নিষ্ঠাভরে চেষ্টা করতে হবে। অন্য অনেক দেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ জানাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, তাদের উপেক্ষা করা, ছোট ভাবা আত্মঘাতী নীতিরই সামিল হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব হুঁশিয়ার!

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[আটত্রিশ]

শমী আগেও লক্ষ্য করেছে, সিতুদার এ-রকম হঠাৎ আসা আর কারো সঙ্গে দেখা না করে কথা না বলে চলে যাওয়ার খবর শুনলে মাসির মুখখানা কি-রকম হয়ে যায়। দিনকয়েক আগেও এই কান্ড হয়েছিল। সেই সকালেই মাসির মুখে সিতুদার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো খবরই শুনেছিল। শুনে শমী খুব যে খুশি হয়েছিল তা নয়। কারণ পরীক্ষার ফল নিয়ে তারও আজকাল মাথা ঘামাতে হচ্ছে। মাসি যে-ভাবে লেগে থাকে কোনো বিষয়ে খারাপ করে পার পাবার উপায় নেই। খারাপ হোক না হোক খারাপ হবার ভয় লেগেই থাকে। সেদিন সকালে খুব মন দিয়ে মাসি স্কুল ফাইন্যালের রিপোর্ট দেখছিল। শমীর ধারণা, স্কুলের মেয়েরা কে-কেমন করল তাই দেখছে। রিপোর্ট দেখা শেষ করে মাসি বলল, তোর সিতুদা ভালো পাস করেছে, স্টার পেয়েছে দেখছি।

সিতুদা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে সেটা শমীর আর স্মরণের মধ্যে ছিল না। একে দেখা সাক্ষাৎ নেই, তায় মুখ ফুটে মাসিকে সিতুদার কথা কখনো বলতে শোনেনি। গোড়ায় গোড়ায় সিতুদার সম্পর্কে এটা-সেটা বরং সে-ই জিজ্ঞাসা করত। আর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবত যত দুষ্টুই হোক নিজের ছেলেকে মাসি এভাবে ভুলে গেল কি করে। আর এই কারণে মাসিকে একটু ভয়ও করতে শুরু করেছিল, পাছে নিজের পরীক্ষার ফল-টল খারাপ হলে তার ওপরেও বিগড়ে যায়। বাইরে যত নরম-সরমই দেখুক, ভিতরে ভিতরে তাকে কড়া ভাবার অনেক নজির দেখেছে। অত বড় বাড়ি অমন গাড়ি অত টাকা-পয়সার মায়া কেউ এভাবে ছেড়ে আসতে পারে এ তার কাছে এখনো এক প্রচন্ড বিস্ময়।

সিতুদার ব্যাপারে মাসির চাপা আগ্রহ শমী সেইদিনই শুধু টের পেয়েছিল। আর সেদিনই সিতুদা স্কুল গেটে এসে হাজির। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়নি তখনো। কি একটা ব্যাপারে স্কুল ছুটি। মাসির চোখে ধুলো দিয়ে শমী নিচে নেমে এসেছিল। বোর্ডিংএর আরো গোটাকতক মেয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছে। শমীকে বোর্ডিংএর প্রায় পুরনো বাসিন্দাই বলা চলে এখন। আড়াই বছর ধরে এখানে মাসির কাছে আছে। তাই অদূরের ওই অতবড় গেটটা আর ভালো লাগে না এখন। ফাঁক পেলে ওর বাইরে পা দেবার জন্য ভেতর উসখুস করে। কিন্তু সেদিন ওই গেটের ভেতর দিয়ে চোখ চালাতেই পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছল। গেটের ওধারে সিতুদা দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে এদিকেই চেয়ে আছে।

আনন্দের ঝোঁকে তারপর কয়েক পা এগিয়ে গেছল শমী। কিন্তু তারপর সভয়ে দাঁড়িয়ে গেছল আবারও। এগিয়ে এসে সিতুদা গেটের গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর তার মুখের দিকে চেয়ে শমীর বেশ ভয় ধরেছিল। একবারও মনে হয়নি পরীক্ষা-পাশের ভালো খবর নিয়ে এসেছে। এতদিন পরে ওকে দেখে একটুও হাসেনি। আর এমন করে তাকাচ্ছিল যে শমীর কাছে আসার সাহস উবে গেছে। তার কেবল মনে হয়েছে মাসিকে ও একলা দখল করে বসে আছে সিতুদার চোখে মুখে সেই রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। তাকে হাতের কাছে পেলে গন্ডগোলের ব্যাপার হতে পারে। চৌদ্দ বছর হল শমীর, ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে নাগালের মধ্যে পেলে তাকে সে খাতির করবে বলে মনে হল না।

সে এগোচ্ছে না বলে সিতুদা হাত তুলে তাকে কাছে ডেকেওছিল। আর তক্ষুনি খুব মুশকিলে পড়ে গেছল শমী। কিন্তু ইতিমধ্যে ও-ধার থেকে মালির তাড়া খেয়ে সিতুদা আস্তে আস্তে গেট ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে। আক্রোশ ভরে মালিটাকে দেখেছে, তারপর তাকে দেখেছে, তারপর চলে গেছে।

শমী সেদিনও মাসির কাছে ছুটে এসেছিল, খবর দিয়েছিল। মাসির আগ্রহ শমীর চোখে খুব স্পষ্ট করে ধরা পড়েছিল। মাসি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? ডাকলি না কেন? চলে গেল?

শমী বলেছিল, ডাকব কি করে, যে-মুখ করে তাকাচ্ছিল হাতের কাছে পেলে আমাকে ধরে ঠিক মারত—

বিরক্তির সুরেই মাসি সেদিন বলেছিল, তোকে শুধুমুদু মারতে যাবে কেন?

কিন্তু আজ আবার তার আসার খবর শুনে মাসি একটা কথাও বলল না। শমীর কেবলই মনে হল খবরটা শোনার পর কি-রকম যেন হয়ে গেল মাসির মুখখানা।

শমী কাছে কাছে ঘুর ঘুর করল খানিক। বার দুই নীচ-ওপর করে এলো। তারপরেও মাসিকে একভাবে বসা দেখল। শেষে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল, আজ কাকুর ওখানে যাবে বলেছিলে......যাবে না?

আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলেন জ্যোতি-রাণী। কালীদার নোটবই পড়ার ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তার ওপর

এই দিনেই ছেলের আসার আর ট্যাক্সি করে চলে যাওয়ার খবর শুনে ভিতরের কি এক অজ্ঞাত অস্থিরতা আরো বেড়েছিল। আজ আর মুখ ফুটে বলতে পারেননি, ডাকলি না কেন। তিন বছর আগের বিচ্ছেদ গত তিন দিন আগে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তফাতটা জ্যোতিরাণী এখন অনুভব করতে পারেন। ছেলে এতবড় খবরটা জানে না মনে হল না। উল্টে জেনেই এসেছিল মনে হল।

শমীর কথা কানে আসতে নিজেকে গোটাতে চেষ্টা করলেন আবার। বেরুবার আগ্রহ একটুও নেই, থাকেও না বড়। তবু বেরুতে হয়। যে বাস্তবের মধ্যে এসে পড়েছেন তার মুখোমুখি না দাঁড়ালেও অব্যাহতি নেই। যাবেন বলে না গেলে বিভাস দত্ত রাগ করেন না, অসুস্থ শরীরে অভিমান নিয়ে বসে থাকেন। এড়াতে চেষ্টা করলেই বরং গন্ডগোল বাড়ে দেখেছেন। আজ বছর আড়াই হল, বাড়ি ছেড়ে দু' ঘরের একটা আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছেন তিনিও। বাড়িতে একসঙ্গে থাকা পোষালো না নাকি। সেই সমস্যার মুখেই জ্যোতিরাণী শমীকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। আপত্তি করা দূরে থাক, বিভাস দত্ত উল্টে বরং খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, একটা দুর্ভাবনা গেল।

কিন্তু জ্যোতিরাণীর দুর্ভাবনা বেড়েছিল। পোষালো না বলে এতকালের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসাটা খুব সাদা মনে নিতে পারেন নি তিনি। শরীর তখন থেকেই ভালো যাচ্ছিল না ভদ্রলোকের, তবু বাড়িতে থাকা নাকি আর চলেই না বলেছিলেন। বলে-ছিলেন শমীকে নিয়ে সমস্যায় না পড়লে ও-বাড়ি আরো অনেক আগেই ছাড়তেন। কিন্তু মুখের কথা আর মনের কথা এক ভাবার দিন গেছে জ্যোতিরাণীর, তাই সদা সংশয়। নিজে তিনি বাড়ি ছেড়ে আসার পর প্রথম ছ' মাসের মধ্যে একদিনও আর বিভাস দত্তর পৈতৃক বাড়িতে যাননি। শমীর রাগ অভিমান বায়না সত্ত্বেও না। তারপর বিভাস দত্ত বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট নিলেন। তখন আর না গিয়ে উপায় ছিল না। মাঝে শমী আছে, কৃতজ্ঞতার ব্যাপারও আছে কিছু। আর, বিভাস দত্তর এখানে এই মেয়েদের হস্টেলে ঘন ঘন আসা বন্ধ করার তাগিদও আছে।

পরের দু' আড়াই বছরে ভদ্রলোকের শরীর আরো বেশি ভেঙেছে। ভেঙেছে সত্যিই। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছেন। অসুখটা কি বার করতে জ্যোতিরাণীর সময় লেগেছিল। মুখ ফুটে সহজে বলতে চাননি। ডায়বেটিস। এরই ওপর খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। জ্যোতিরাণীর মনে মনে ধারণা অসুখটাকে ভদ্রলোক প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওটা তাঁর দুর্বলতার দিকও বটে আবার জোরের দিকও বটে। রবিবার বা ছুটির দিনের প্রত্যাশার জবাবে শমীকে সঙ্গে করে তাঁকে যেতে হয়, বসতে হয়, কথাবার্তা কইতে হয়। তাঁর এই ফ্ল্যাটে টেলিফোন নেই যে না এসেও কর্তব্য সারা যেতে পারে। টেলিফোনের কথা জ্যোতিরাণী বলেওছিলেন। একা মানুষ অসুখ লেগে আছে, টেলিফোন একটা থাকা দরকার। বিভাস দত্ত বলেন, লাইন ট্রান্সফারের অনেক ঝামেলা আজকাল, চাইলেই মেলে না। তাছাড়া ওটা থাকলেই বড় উত্যক্ত করে সব—নেই এই বেশ আছেন। কতটা সত্যি জ্যোতিরাণী জানেন না। আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকার ফলে খরচ অনেক বেড়েছে, ফোন সম্পর্কে নিস্পৃহ হওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

শমী হাঁ শুনবে কি না, সেই অপেক্ষায় আছে। বললেন, যাব, তুই তৈরি হয়ে নে। মুখ হাত ধুয়ে নে, চান করবি নে।

শমী ছুটল। তারপরেই জ্যোতিরাণী অন্যমনস্ক আবার। ......ছেলে আজও এসেছিল। আজও এসে চলে গেছে।

গত তিন বছরের মধ্যে মাত্র দু'টিবার চোখে দেখেছেন তাকে। সেই দেখার দাগ থেকেই গেছে। প্রথম দেখা বাড়ি ছেড়ে আসার দিনকতকের মধ্যে। বীথির কাছে থাকার ইচ্ছে নিয়ে তিনি আসেন নি। পরদিনই জায়গা খুঁজতে আরম্ভ করে-ছিলেন। বীথি অসহায়, ছাড়তে মন চায় না আবার থাকতেই বা বলে কি করে। উল্টে জায়গা খোঁজার কাজে মুখ বুজে সহায় না হয়ে পারেনি। আন্দাজে ঘোরাই সার হচ্ছিল কেবল। এই বাস্তবে দুজনের কেউ কোন-দিন পা দেয়নি, জানবে কি করে কোথায় কি আছে। অনেকক্ষণ দিশেহারার মত ঘোরাঘুরির পর একটা ছোট রেস্তরায় ঢুকেছিলেন চা খেতে। সেখানকার একটা ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করতে সে একটা আস্তানার হদিস দিয়েছিল।

বড় রাস্তা থেকে দূরে নোংরা গলির মধ্যে একটা বাড়ি। স্বল্প আয়ের মেয়েরা থাকে সেখানে। স্কুল মাস্টার, হাসপাতালের নার্স, টেলিফোন অপারেটার, গানের শিক্ষয়িত্রী—এ'রা পদস্থ বাসিন্দা সেখান-কার। একতলায় ধাত্রী ঝিয়ের পর্যায়ের বাসিন্দাও আছে। পরে জেনেছেন কিছু করে না এমন মেয়েছেলেও আছে সেখানে। খাওয়া-থাকার মাশুল জোগায় কি করে সেটা বুঝতে সময় লেগেছিল। দু' চারজন মাত্র এক-একখানা ঘর নিয়ে আছে, বেশির ভাগ ঘরেই তিন চারটে করে মেয়ে। জ্যোতিরাণীও আলাদা একটা ঘরই নিয়ে-ছিলেন। সম্পূর্ণ ঘর নেওয়াটা কারো বিস্ময় কারো বা কৌতূহলের কারণ হয়েছিল। তারা প্রথম হতবুদ্ধি হয়েছিল এই চেহারার একজন এখানে থাকতে চায় শুনে। পরের বিস্ময়, এখানে থেকে চাকরি খুঁজে নেবার আশা, অথচ আলাদা একটা ঘরের মাশুল গুনতে প্রস্তুত শুনে। ঘর দেবার মালিক যে, সে আগাম এক-মাসের খাওয়া-থাকার নগদ মূল্য হাতে না নিয়ে কথা কয়নি।

সে-ঘর দেখে শুধু বীথির বুকেই মোচড় পড়েছে। বলেছিল দিদি, সত্যিই এখানে আপনি থাকবেন কি করে?

ঘর পেয়ে জ্যোতিরাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তখনকার মত। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত দেখেছিলেন বীথিকে। তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি একাই থাকব বলছ?

প্রশ্নটা বীথির মাথায় ঢোকেনি, অবাক মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, আর কে থাকবে?

জ্যোতিরাণী পুনরুক্তি করেননি, শুধু চেয়ে ছিলেন মুখের দিকে। অপেক্ষা করে ছিলেন। বীথি বুঝেছে। হঠাৎ-খুশির ঢেউ লেগেছে বুকের তলায়। চোখে মুখে সেটা উপছে ওঠার আগেই মিলিয়েছে আবার। আমন্ত্রণের এই লোভ নাকচ করার জন্য যুঝতে হয়েছে খানিক। ফলে ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখিয়েছে মুখখানা। আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলেছে, তা আর হবে না দিদি। বীথি আবারও হারাবে...কথা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

জ্যোতিরাণীর চাউনি তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে উঠেছিল। মুখে বিতৃষ্ণা জমাট বাঁধছিল। সাদা কথায় ভোগের প্রতিশ্রুতির মধ্যেই ফিরে যাবে ও। সেই চাউনি আর বিতৃষ্ণা বীথিকে আরো বেশি আঘাত করেছিল বোধহয়। আস্তে আস্তে অনেক কথা বলেছিল সে। বলেছিল, আমি আপনার কাছে মিত্রাদির বিচার চেয়েছিলাম, আমার যা গেছে তা আর ফিরবে না। .. বিশ্বাস-ঘাতকতা আমার সঙ্গে আর একজনের করার কথা ছিল। বিদেশে সে বিশ্বাস-ঘাতকতার চেহারা আমি দেখেছি। হাড়-জমানো শীতে, হিমে, মাঝরাতেও অলিতে গলিতে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, বাঁচার চেষ্টায় দু' চোখ দিয়ে কেমন করে মানুষ টানতে চায় দেখলে আপনার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত, সে-রকম পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, একজন ইউ, পি'র একজন করাচীর একজন সীলোনের আর দুজন ইন্দোনেশিয়ার, সীলোনের মেয়েটা বলেছিল ওরা তিনজন ছিল, দুজন মরে গেছে। ওই দেশেরও এ-রকম কত আছে ঠিক নেই। মিত্রাদি আমাকে এই বিশ্বাসঘাতকতার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু এ লোকটা তা করেনি, উল্টে আমাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে আপত্তি ছিল পাছে আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করি, আমি তাকে আজও ঘৃণা করি, কিন্তু মিত্রাদির থেকে বেশি শ্রদ্ধা করি। আপনার কাছে ফেরার ভাগ্য যদি হয় কোনদিন, বলে আসব, পালিয়ে আসব না।

জীবন নিয়ে এই বিচার জ্যোতিরাণীর বুঝতে পারার কথা নয়। সে চেষ্টাও আর করেননি। বিতৃষ্ণা আর ছিল না। ওর মুখের দিকে চেয়ে সত্তার ক্ষতটাই শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন।

নতুন বাসস্থানে আসার দ্বিতীয় দিনে কালীদা এসে হাজির। জ্যোতিরাণী অবাক। এখানে আছেন সেই হদিস পেলেন কি করে! বীথির কাছ থেকে নিশ্চয়। কিন্তু বীথির নাগালও তাঁর পাবার কথা নয়। সেই রকমই কৌতুক-ঠাসা গাম্ভীর্য মুখ কালীদার। দুনিয়া একভাবেই চলছে বোঝানোর চেষ্টা।

বললেন, ড্রাইভারটার দোষ নেই, যে রাতে তুমি চলে এলে সেই সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক ধরে বীথির সঙ্গে তুমি কোন্ হোটেলে বসে গল্প করেছিলে জিজ্ঞাসা করলে সেটা আর না বলে পারে কি করে। আর তুমি আবার ঘরে ফিরবে সেই আশায় বীথিও শেষ পর্যন্ত ঠিকানাটা না দিয়ে পারেনি।

আধঘণ্টা ছিলেন কালীদা। যেন গল্প করতে এসেছিলেন, গল্প করে চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলেছিলেন, যে জায়গায় এসে উঠেছ, রাগ পড়তে সময় লাগবে মনে হচ্ছে।

জবাবে জ্যোতিরাণী বলেছিলেন, পারেন তো একটা কাজ দেখে দিন, এখানে থাকার ইচ্ছে নেই।

চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে কালীনাথ উঠে গেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, আপোষে আপোষে বছর দুই যে মেয়েটা ঝিমিয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে নতুন করে স্ফুলিঙ্গ দেখছেন আবার।

তার পরদিন এসেছেন বিভাস দত্ত। তাঁকে দেখা মাত্র কালীদার ওপর যথার্থ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। কালীদা সত্যিই মজা দেখছেন কিনা ঠাওর করে উঠতে পারেন নি। কথা তাঁর সঙ্গেও বেশি হয়নি। চুপচাপ বসে থেকে এই দুর্যোগের ভাগ নিতে চেয়েছেন যেন। শেষে বলেছেন, এভাবে তো থাকা যায় না, কি করবেন এখন?

এই সহানুভূতির ওপর জ্যোতিরাণীর

সেদিন অন্তত বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁর তির্যক দৃষ্টি ঘুরে ফিরে ভদ্রলোকের মুখের ওপর এসে পড়েছিল, যা ঘটে গেছে তার ফলে খুশি মাত্র একজনেরই হওয়া সম্ভব। এই একজনের। জবাব দিয়েছিলেন, দেখা যাক। আপাতত খবরের কাগজ দেখে কয়েকটা চাকরির দরখাস্ত করছি। সবকটাই কলকাতার বাইরে।

চিন্তিত মুখে বিভাস দত্ত মন্তব্য করে-ছিলেন, দরখাস্ত করে কবে চাকরি হবে সে আশায় বসে থাকা...ওতে সহজে হয় না।

—তাহলে কি করতে বলেন?

প্রশ্নটা নিজের কানেই ঝাঁঝালো ঠেকেছিল জ্যোতিরাণীর, কিন্তু বিভাস দত্ত কিছু মনে করেন নি, ওটুকু সমস্যাজনিত অসহিষ্ণুতা ধরে নিয়েছিলেন হয়ত।

বাড়ি ছাড়ার ঠিক তের দিনের দিন অ্যাটর্নি'র কড়া নোটিস পেয়েছেন জ্যোতিরাণী। অ্যাটর্নি কালীনাথ, তাঁর সম্মানী ক্লায়েন্ট শিবেশ্বর চ্যাটার্জি'র নির্দেশ মত তাঁকে জানানো হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের সুনাম ব্যাহত করে আর গৃহশান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে তিনি যে ইচ্ছেমত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন সম্মানী ক্লায়েন্টের পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। এই নোটিস হস্তগত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে তিনি যদি শান্তিমত গৃহে বসবাস করার জন্য স্বেচ্ছায় ফিরে না আসেন তাহলে স্বামীর অধিকারে সম্মানী ক্লায়েন্ট আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে ফেরাবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। সম্মানী ক্লায়েন্ট আশা করছেন এই অপ্রীতিকর ব্যবস্থায় অগ্রসর হবার আগে জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জি উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁর স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন।

জ্যোতিরাণীর প্রতিক্রিয়া যা হয়েছিল সেটা কালীনাথ ঘোষালের নাম সই দেখে। কালীদা আর অ্যাটর্নি কালীনাথকে আলাদা করে দেখে অভ্যস্ত নন বলেই। টাকা যার আছে তার উকিলের অভাব নেই—এ-কাজ কালীদা নিজের হাতে না করলেও পারতেন। জ্যোতিরাণীর সেই রূপ আর সেই সঙ্কল্প এখন। সেই আঠের উনিসের রূপ আর সঙ্কল্প। যে রূপ আর যে সঙ্কল্প নিয়ে অনমিত বলে একজনের বিকৃত স্বেচ্ছা-চারিতার বিরুদ্ধে যুঝেছিলেন, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নিজেকে উদ্ধার করে-ছিলেন, আপন সত্তার ওপর ভর করে নিজের দু' পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফিরে আবার আপোষের রাস্তায় হাঁটার চিন্তা আগেও মনে ঠাঁই দেননি। কিন্তু এই অপমানকর পদাঘাতের ফলেই রুখে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও দ্বিগুণ হয়ে উঠল বুঝি।

বিকেল পর্যন্ত ভাবলেন। চারটের আগেই বেরিয়ে পড়লেন। একটা টেলিফোন করার জন্যে বাইরে বেরুতে হয় অনভ্যাসের ফলে সেটাও কম বিরক্তিকর নয়। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা দোকান থেকে টেলিফোন করার সুযোগ পেলেন। অফিসে কালীদাকে ধরলেন। বললেন, আমি জ্যোতি, অফিস ফেরত একবার আসতে হবে।

ওধারে কালীদার গলার সুরে কৃত্রিম দুশ্চিন্তা, কি ব্যাপার, খুব জরুরী?

—হ্যাঁ।

—অফিস ফেরত যেতে বলছ, খাওয়াবে তো?

—না, খেয়ে আসবেন।

খেয়ে এসেছিলেন কিনা জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেন নি। নবাগতা বেকার কিন্তু পরম রূপসী বাসিন্দার ঘরে মাঝে মাঝে পুরুষের পদার্পণ দেখে অন্য মেয়েদের বক্র কৌতূহল বাড়ছে, জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করছিলেন। কালীদা আসতে অনেকে উঁকিঝুঁকি দিল।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রেজিস্ট্রি নোটিসটা হাতে নিয়ে কালীদার সামনে বসলেন। —এটা আজ পেলাম।

—ও। কালীনাথ যথাসম্ভব নির্লিপ্ত।

—এটা পাঠাতে রাজি না হলে আপনার চাকরি যেত?

ছদ্ম বিস্ময়ে দু' চোখ কপালে তুলতে চেষ্টা করলেন কালীনাথ, আমি আবার কে! ও তো পাঠিয়েছে শিবেশ্বর চ্যাটার্জি'র অ্যাটর্নি।

সমস্ত মুখ ছেড়ে জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটাও গনগনে। অপেক্ষা করলেন একটু। —আমি এরপর শিবেশ্বর চ্যাটার্জি'র অ্যাটর্নি'র সঙ্গে কথা বলব না দাদার সঙ্গে?

কালীনাথ এবারে হাসলেন মুখ টিপে। জবাব দিলেন, বিপক্ষের অ্যাটর্নিকে ডাকলেই সে ছুটে আসে না।

অর্থাৎ দাদার সঙ্গেই কথা বলছেন জ্যোতিরাণী। এই জবাবই চেয়েছেন। এই জবাবই বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। —আমি এখন কি করব?

একটুও না ভেবে কালীনাথ তক্ষুনি জবাব দিলেন, আমি ট্যাক্সি ডাকি আর তুমি ফেরার জন্য রেডি হও, আমার মতে ওটাই সব থেকে সোজা কাজ।

অনুচ্চ কঠিন সুরে জ্যোতিরাণী বললেন, অত সোজা কাজ করার ইচ্ছে নেই।

—তাহলে তুমিও এক পাল্টা হুমকি দাও।

—কিছু যদি না করি?

—তাহলে শিবু তো কেস করবে বলে শাসিয়েছে। কেসে হারলে যেতে হবে।

—না গেলে?

—যাতে যাও কোর্ট সেই চেষ্টাই করবে।

জ্যোতিরাণী তেতে উঠলেন, কি চেষ্টা করবে, ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

কালীনাথ হেসে ফেললেন, অতটা নাও করতে পারে।

জ্যোতিরাণী চুপচাপ চিন্তা করলেন একটু। —জুডিসিয়াল সেপারেশন কি ব্যাপার? এই প্রশ্নটার জন্যও বিভাস দত্তর কাছেই কৃতজ্ঞ তিনি। তার কোন্ বইয়ে পড়েছিলেন হিন্দু বিয়েতে তখনো ডাইভোর্স নেই, কোর্টে নায়ক-নায়িকার জুডিসিয়াল সেপারেশনের কেস্ উঠেছে।

কালীনাথের হাসি মুখে বক্র আঁচড় পড়তে লাগল। দৃষ্টিও বদলাল একটু। জবাবে সেটা প্রকাশ পেল না। —শব্দ দুটোর অর্থ যা তাই ব্যাপার, আইনের আশ্রয় নিয়ে পৃথক থাকা। কিন্তু এ আবার তোমার মাথায় কে ঢোকালে?

—কেউ না। জুডিসিয়াল সেপারেশন পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?

—কোর্টে স্যুট ফাইল করতে হবে। মুখ গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকলেন কালীনাথ। —শিবু ঢিল ছুঁড়েছে, বদলে পাটকেল না ছুঁড়ে তুমি একেবারে বন্দুক ছুঁড়বে?

—আপনি সেই ব্যবস্থা করে দিন।

কালীনাথ ফাঁপরে পড়লেন যেন। —আমি এ-পক্ষের অ্যাটর্নি আর ব্যবস্থা করব বিপক্ষের হয়ে?

খুব ঠাণ্ডা গলায় জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, একটু আগে আপনি বলেছেন, আমি কারো অ্যাটর্নি'র সঙ্গে কথা বলছি না। যাকে ভার দেওয়া দরকার আপনি দিন, আর কি করতে হবে তাও তাকে বুঝিয়ে দেবেন।

কালীনাথ চুপ খানিক। তারপর বললেন, অত তাড়াহুড়ো করার দরকার কি, দিন কয়েক ভেবে নাও না।

—ভাবা হয়েছে। যদি সম্ভব হয় কালই আপনি কেস্ ফাইল করার ব্যবস্থা করুন।

পরদিন না হোক, তিন দিনের মধ্যে কেস্ ফাইল করা হয়েছিল। কাগজপত্র রেডি করে জ্যোতিরাণীর উকিলসহ কালীনাথ আবার এসেছেন। বিচ্ছেদ প্রার্থনার অনুকূলে শিবেশ্বর চ্যাটার্জি'র বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে, তাতে মৈত্রেয়ী চন্দর অথবা অন্য কোনো মেয়ে-ছেলের নাম নেই বটে, তবু পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণীর কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সইটা করে দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন যেন তিনি।

এর দু'দিন বাদে বিভাস দত্ত আবার এসেছেন। এসেই বলেছেন, শরীরটা ভালো ছিল না বলে এ ক'দিন খবর নিতে পারেন নি। জ্যোতিরাণী আগের দিনও খুশী হতে পারেননি, এই দিনেও না। এখানে ঘন ঘন খবর নিতে এলে সেটা অসুবিধের কারণ হতে পারে ফাঁক পেলে এই আভাসও দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর আসার উদ্দেশ্য শুনে অপ্রস্তুত একটু। একটা স্কুলে তাঁর চাকরির ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ভাঙ্গা স্কুল। জ্যোতিরাণীর আপত্তি না হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে।

জ্যোতিরাণী তখনো আশা করতে পারেননি। তবু ভদ্রলোকের সুতৎপর চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করতে চেষ্টা করেছেন। গেছেনও। বিভাস দত্তই সঙ্গে করে এই স্কুলে নিয়ে এসেছেন। হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আর,

দু'চার কথার পর জ্যোতিরাণীর চাকরি হয়েছে। হবে যে, সেটা যেন স্থির হয়েই ছিল। হেডমিসট্রেস তাঁকে কি-কি বিষয় পড়াতে হবে জানালেন, অনার্স গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রীর মাইনে কত জানালেন, আর পর-দিনই তাঁকে কাজে জয়েন করতে বললেন। ব্যস, আর কিছু না।

হেডমিসট্রেসের সংগে কথা বলে স্কুল বোর্ডিং-এ তাঁর থাকার ব্যবস্থাও বিভাস দত্তই করেছেন। তাতেও আপত্তি ওঠেনি। হেডমিসট্রেস শুধু জানিয়েছেন, আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে দিনকতক সময় লাগবে।

বাইরে এসে বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, যাক্ কিছুটা নিশ্চিন্ত তো?

তখনকার মত কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না জ্যোতিরাণীর। নিশ্চিন্ততার এই স্বাদ ভোলার নয়। অনেক হীনমণ্যতা আর অনেক তিক্ত সম্ভাবনার থেকে নিশ্চিন্ত। দু'দিন আগেও তাঁর নতুন ঘরে এই এক-জনের পদার্পণে মন বিরূপই হয়েছিল। সেই হেডমিসট্রেস যে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না, বা তাঁর ঘরবাড়ি নিয়ে দুটো মৌখিক আলাপসুলভ প্রশ্নও তুললেন না সেটা স্বাভাবিক ঠেকেনি। ভদ্রলোক কত-দূর কি জানিয়ে রেখেছেন জানেন না, কিন্তু যন্ত্রণার মত একটা বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বলে কৃতজ্ঞ তিনি। একটু চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছেন আপনাকে কি আর বলব...।

খুশিমুখে বিভাস দত্ত তাড়াতাড়ি মাথা নেড়েছেন, বলে কাজ নেই, উক্ত কথার থেকে অনুক্ত কথার সার বেশি।

যেখানে ছিলেন, দিন-কতক আরো সেখানেই থাকতে হয়েছিল। সেখানকার প্রতিটি দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে হাঁটাপথে বেশ খানকটা পেরিয়ে ট্রামে ওঠা পর্যন্ত আসতে যেতে পুরুষের প্রতীক্ষারত বা অনুসরণরত লোভাতুর দৃষ্টির সংখ্যা বেড়ে উঠছিল। ওই একটা বাড়িতে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অনেকগুলো মুখ সজাগ হতে দেখেছেন তিনি। এলাকাটা খুব ভালো না বুঝে-ছিলেন, বাড়িটাও না। বাড়ির যত কাছে এগোতেন ততো যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। তখন বিভাস দত্তকে দেখে যথার্থ খুশি হতেন তিনি, মনে বল পেতেন। আর স্কুলে আসতে আসতে রোজই আশা করতেন হেড-মিসট্রেস ডেকে বলবেন তাঁর ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে।

দুর্যোগের দিন সেটা। সে-দিনটা শুধু নয়, পর পর কয়েকটা দিনই। তুচ্ছ কারণ থেকে কলকাতার শান্তি লন্ডভন্ড হয়ে গেল, আগুন জ্বলে উঠল। বাহান্ন সালের কথা, প্রায় তিন বছর আগের কথা। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানো নিয়ে ইংরেজ মালিকানার ট্রাম কোম্পানীর সংগে দেশের মানুষের তুমুল লেগে গেল। দেখতে দেখতে পরিস্থিতি চরমে গড়ালো। স্বাধীন দেশের শান্তিরক্ষকরা অস্ত্রহাতে তার মোকাবিলা করতে এলো। একদিকে ট্রাম জ্বলতে লাগল, সরকারী সম্পদও বিনষ্ট হতে লাগল। অন্যদিকে লাঠি চলল, টিয়ারগ্যাস ছুটল, বুলেট ছুটল। কাগজে তেরটি মৃত্যুর খবর বেরুলো আর তার কয়েকগুণ আহতের। শহর তখনকার মত মিলিটারির দখলে ছেড়ে দেওয়া হল।

শহরের জীবন-যাত্রা স্তব্ধ। পথে জন-মানব নেই। বিকেল তখন চারটে। অন্য-মনস্কের মত জ্যোতিরাণী জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়ির পিছন দিকে বিশ তিরিশ গজ দূরে ছাদ তোলা উঠোনের মত ছোট্ট পার্ক একটা। সেদিকে চোখ পড়তে আচমকা বিষম এক ঝাঁকুনি খেলেন জ্যোতি-রাণী। একটা বেঞ্চির গায়ে ঠেস দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সিতু। চারদিকের থমথমে নির্জনতার মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ঠিক দেখছেন কি ভুল দেখছেন জ্যোতি-রাণীর প্রায় সেই বিভ্রম। ঠিক যে দেখছেন সন্দেহ নেই। এই জানলার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে সিতু। দু'হাত বগলে গোঁজা চৌদ্দ বছরের ছেলের দৃপ্ত ভঙ্গি।

আবারও একটা ঝাঁকুনি খেয়েই যেন সচেতন হলেন জ্যোতিরাণী। দুশ্চিন্তায় অস্থির, ব্যাকুল পর মুহূর্তে। এইদিনে বেরুলো কি করে? বাড়ি থেকে কম করে আড়াই মাইল পথ, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি কিছুই নেই—এলো কি করে? ফিরবে কি করে? বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তায় মিলিটারি টহল দিচ্ছে, কি বিপদ ঘটবে কে জানে!

বুকে ঠাস ঠাস হাতুড়ীর ঘা পড়ছে, কি করবেন ভেবে না পেয়ে জ্যোতিরাণী জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারায় ডাকলেন তাকে। ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে আসতে বললেন। সিতু তেমনি চেয়ে আছে, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বুঝলেন ও আসবে না, বিপদ হতে পারে জেনেই ও এই দিনে এসেছে। বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাধ্য হবার জন্যেই এসেছে। বাড়ির লোকের ওপর এমন কি মেঘনার ওপর পর্যন্ত আগুন হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। এইদিনে তো কেউ বেরুতে পারেনি, ছেলেটা বাড়ি নেই চোখে পড়ল না কারো! অসহিষ্ণু তাড়নায় প্রায় শাসনের মত করেই আরো জোরে হাত নেড়ে চলে আসতে ইশারা করলেন তাকে।

আর একটু সময় পেলে জ্যোতিরাণী হয়ত ছুটে বেরিয়েই যেতেন। দুই গালে দুই চড় বসিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসতেন। কিন্তু সিতু সে সুযোগ দিল না। বগল থেকে হাত নামাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে পার্ক পেরিয়ে ফিরে চলল।

জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে।

ঘন্টা দেড়েক বাদে এখানকার ঠাকুরকে এক টাকা বখশিস দিয়ে বাইরে থেকে বাড়িতে কালীদার ঘরে ফোন করিয়েছেন। সিতু ফিরেছে। কিন্তু এই খবর পাওয়ার পরেও সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেন নি জ্যোতিরাণী।

বোর্ডিং-এ যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় গৌরবিমলকে সঙ্গে করে কালীনাথ এসে-ছিলেন। এসেই বলেছেন, মামুর আর ফুরসতই হয় না, আজ ধরে নিয়ে এলাম।

ফুরসত না হওয়ার কারণ জ্যোতিরাণী অনুমান করতে পারেন। এখনো ধরে নিয়ে আসতে হয়েছে শুনে খুব খুশি হতে পারলেন না। অথচ বাড়ি থেকে বেরুবার পর কিভাবে দিন চলতে পারে ভেবে না পেয়ে এই একজনের কথাই সবার আগে মনে হয়েছিল তাঁর। বিভাস দত্ত ইতিমধ্যে চাকরির ব্যবস্থা না করে দিলে আলোচনার জন্য হয়ত তাঁকেই একবার আসতে অনুরোধ করতেন।

ভিতরে ভিতরে বিরূপ কিনা বা কত-খানি বিরূপ গৌরবিমলের মুখে তা প্রকাশ পেল না। হেসেই বললেন, সময় পেলাম কোথায়, প্রভুজীধাম গোটানোর তাড়ায় তো অস্থির করে মেরেছিস এ ক'দিন। জ্যোতি-রাণীর দিকে তাকালেন।—পারলে ও ওখানকার মেয়েগুলোকে সুদ্ধই তালা আটকে চলে আসে, আর রোজই শাসায় দেরি হলে খরচা বন্ধ করে দেবে।

জ্যোতিরাণী সংকোচ ভুলে উৎসুক হয়ে উঠলেন। কম মেয়ে নেই সেখানে, আশ্রয়চ্যুত হয়ে তারা কি করতে পারে ভেবে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, সব চলে গেছে?

কালীনাথ জবাব দিলেন, প্রভুজীধামের পরমায়ু শেষ জেনে প্রাণের দায়ে অনেকে নিজেরাই সরেছে। জনা-কতকের সদ্গতি মামু করেছে। আর যে ক'জন আছে তারা যদি এ-মাসের মধ্যে না যায় তো মামুর কাঁধে ঝুলিয়েই বিদেয় করব।

জ্যোতিরাণীর মুখে কথা সরল না। কেঁদে যারা পারছে না জোর করে আর তাড়াহুড়ো করে তাদের তাড়ানো দরকার কি, এ কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। কত ধকল কত যত্ন কত দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে একটা জিনিস গড়ে উঠেছিল, কিন্তু ভাঙতে সময় লাগল না। ভিতে টান পড়েছে, আর সবই হুড়মুড় করে ভেঙেছে।

প্রভুজী-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করে দিলেন কালীনাথ। জ্যোতিরাণীর উদ্দেশে বললেন, তোমার ব্যাপার যথাসময়ে যথাস্থানে পেশ করা হয়েছে, মাননীয় ক্লায়েন্টের কাছে নোটিসও এসেছে কোর্ট থেকে। ক্লায়েন্ট এবারে কি করবেন তাঁর অ্যাটর্নির কাছে সে নির্দেশ এখনো আসেনি। এলে যথাসময়ে তুমিও আবার কোর্টের নির্দেশ পাবে।

কথা ক'টা কালীদা জলভাতের মত সহজে করে বললেও কানের কাছটা গরম ঠেকছে জ্যোতিরাণীর। মামাশ্বশুরও সবই জানেন সন্দেহ নেই, তবু তাঁর সামনে এ আলোচনা উঠুক, চাননি। কোর্টের নির্দেশ এলে এ-ঠিকানায় পাবেন না জানানো দরকার। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল থেকে আমি আর এখানে থাকছি না।

স্কুলের চাকরির খবর জ্যোতিরাণী কালীদাকে বলেননি। মাঝে দেখা হলে বলতেন হয়ত। দেখা হয়নি। কিন্তু খবর কালীদা রাখেন দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, স্কুল-বোর্ডিং-এ ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে? ঠিকানাটা দাও তাহলে, তোমার কাগজপত্রে তো এখানকার ঠিকানা লেখা হয়ে আছে।

বিভাস দত্তর সঙ্গে কালীদার দেখা এবং কথা হয়েছে বোঝা গেল। হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, তবু জ্যোতিরাণীর মনে হল এই দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ আগে কমই হত। ঠিকানা লেখার জন্য কাগজ-কলম নিলেন। কালীদা মামাশ্বশুরের দিকে ফিরলেন, জ্যোতি কোন্ একটা স্কুলে কাজ নিয়েছে তোমাকে বলেছিলাম?

গৌরবিমল মাথা নাড়লেন। বলা হয়েছে। জ্যোতিরাণীর ঠিকানা লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে থাকার ব্যবস্থা-ট্যবস্থা ভালো?

জ্যোতিরাণী ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, এখান থেকে ভালো।

গৌরবিমল চিন্তাচ্ছন্ন একটু। কিছু বলার ইচ্ছে। বললেন, ছেলেটার মুখ চেয়েও বাড়ি ফেরা চলে না?

আর কেউ এ-প্রস্তাব তুললে বিরক্তি ছেড়ে বিতৃষ্ণার কারণ হত। যিনি বললেন তাঁর মনের গভীরতা জানেন বলেই চুপ একটু।...দুর্যোগের দিনে ছেলের পার্কে এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা মনে লেগে আছে। চৌদ্দ বছরের ছেলের সেই অবাধ্য বেপরোয়া মুখ ভোলার নয়। ঠাণ্ডা সংযত জবাব দিলেন, ছেলের মুখ চেয়ে কিছু যদি করতে চান, তাহলে আমাকে ফিরতে না বলে ওকে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি ফিরলে ওর মুখ চাওয়া হবে না। এরপর আরো ক্ষতি হবে।

গৌরবিমল বলতে যাচ্ছিলেন, মেয়েদের বোর্ডিং-এ ওই বয়সের ছেলে নিয়ে থাকতে দেবে না হয়ত। বললেন না। কারণ ছেলে এলে তাকে নিয়ে কোথায় থাকবে সেটা কোনো সমস্যা নয়। এই ব্যবস্থায় তার বাপকে রাজি করানো যাবে না জানা কথাই। গেলে গৌর-বিমল সেই চেষ্টাও করে দেখতেন হয়ত।

এই আলোচনার মধ্যে কালীনাথ অনেকটা নির্লিপ্ত। গৌরবিমল তাঁকে বললেন, চল্ ওঠা যাক—। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ দু'চোখ জ্যোতিরাণীর দিকে ফেরালেন—তোমাদের ব্যাপার যে-দিকে গড়িয়েছে কি-যে বলি কিছুই মাথায় আসছে না। এরপর আমিও কলকাতায় বিশেষ থাকব না। ছেলেটার জন্যেই ভাবনা...। যাক, যা অদৃষ্টে আছে, হবে।

চলে গেলেন। শেষের উক্তিটুকু ক্ষোভের মত। ক্ষোভ ছেলের বাবা-মা দুজনার ওপরেই হতে পারে, আবার অদৃষ্টের ওপরেও হতে পারে। কিন্তু জ্যোতিরাণী হঠাৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন অন্য কারণে। প্রভুজীধামে তালা লাগানো হয়ে গেলে মামাশ্বশুরের কলকাতায় বসে থাকার কথা নয় বটে। এ অবস্থায় তাঁরও না থাকাটা ছেলেকে গোটা-গুটি অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতই। এই শূন্যতা আগে অনুভব করেননি, এখন করছেন। কিন্তু নিজে বাড়ি ছেড়ে এসে ছেলের জন্য তাঁকে বরাবর এখানে থেকে যেতে বলা সম্ভব নয়।

স্কুল বোর্ডিং-এ আসার মাস-কয়েকের মধ্যে পৃথক বাসের একতরফা ডিক্রি পেয়েছেন কোর্ট থেকে। এর মধ্যে কালীদার হাত কতখানি জানেন না। শিবেশ্বর চাটুজ্জে রুখে দাঁড়ানো দূরে থাক, জ্যোতিরাণীর আবেদনের প্রতিবাদও করেননি। বিভাস দত্তর ধারণা অ্যাটর্নির চিঠির জবাবে তিনি যে সোজা কোর্টে হাজির হবেন মানী ভদ্রলোক সেটাই নাকি কল্পনা করেননি। বিভাস দত্তর ধারণা শোনার ব্যাপারে জ্যোতি-রাণী এতটুকু উৎসাহ দেখাননি। তাঁর চাপা আগ্রহও ভালো লাগেনি। ইদানীং কালীদার সঙ্গে যে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ বেড়েছে কথাবার্তার ফাঁকে তাও টের পান। কেস্ সম্পর্কে জ্যোতিরাণী নিজে থেকে তাঁকে একটি কথাও বলেননি। যা শুনেছেন কালীদার কাছেই শুনেছেন।

যাই হোক, জ্যোতিরাণী যেমন চেয়ে-ছিলেন তেমনি হয়েছে, নিঃশব্দে মিটেছে।

এক ছুটির দিনের দুপুরে হঠাৎ মেঘনা এসে হাজির। দোরগোড়ায় তাকে দেখে জ্যোতিরাণী চমকে উঠেছিলেন, সাগ্রহে ঘরে ডেকেছেন তারপর। মাদুর পেতে তাকে বসতে দিয়েছেন, নিজেও সামনে বসেছেন। দেখে খুশি হব কিনা ভেবে মেঘনা ভয়ে ভয়ে এসেছিল, বউদিমণির এই আপ্যায়নে চোখে জল এসে গেল তার। হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। বলল, কালীদার থেকে ঠিকানা নিয়ে লুকিয়ে এলাম, বাবু শুনলে আবার কোন্ মূর্তি ধরবে কে জানে।

—এত ভয় তো এলি কেন?

—না এসে থাকতে পারলাম না যে গো। সেই কবে থেকে আসার ফাঁক খুঁজছি। তুমি ফিরে চলো বউদিমণি, কি-যে লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি হয়ে গেল, না দেখলে বুঝতে পারবে না।

মুখরা মেঘনার এই মুখও দেখার বস্তু যেন। আজ তিনি বাড়ি গাড়ি আর লক্ষ লক্ষ টাকার কর্ত্রী নন বলেই যেন এই মেঘনাও অনেক কাছের মানুষ। চোখ মুছতে মুছতে বলল, সেই ক'বছর আগে সদা-দাদাকে সাবধান করেছিলাম, এ-বাড়ির ভালো চাও তো বউদিমণির কাছে সব খুলে বলো, বুবুর মাথার ঠিক নেই—পরে আর সামলানো যাবে না। সদাদাদা তখন ভয় পেল, সমিসেয়ও পড়ল, দাদাবাবুর সঙ্গে বেইমানী করবে কি করে। এখন কি হয়ে গেল জানলে চোখের জল রাখতে পারত!

সংকোচ সত্ত্বেও একটু স্বস্তি বোধ করলেন জ্যোতিরাণী। কেন এতবড় ব্যাপারটা ঘটে গেল মেঘনা সঠিক জানে না মনে হল। না জানলেও দু'দশ কথার পর মিত্রাদির সম্পর্কে তপ্ত অভিযোগ শুনলেন।

যথা, বউদিমণি বাড়ি ছেড়ে আসার কদিন পর থেকেই 'ঠাকুরোণে'র আনাগোনা বাড়ছিল। ইদানীং তো সকালে এসে রাতে যেতে শুরু করেছিলেন। বউদিমণির গাড়ি-খানা পর্যন্ত আগলে বসেছিলেন। যেন তেনারই ঘর বাড়ি, তেনারই সব। কালীদাদা একদিন কি বলতে আগুন-পানা মুখ করে বেরিয়ে গেলেন। সেই রেতেই কালীদাদার সঙ্গে বাবুরও কি-সব চটাচটির কথা-বার্তা হল যেন, বাবুর রাগ দেখে ওরা ভাবল এবারে কালীদাদারও এখানকার বাস উঠল বুঝি। তারপর থেকে ঠাকরোণের আসা-যাওয়া একটু কমেছে দেখা যাচ্ছে। বউদি-মণির গাড়ি গ্যারেজে তালাবন্ধ রেখে কালী-দাদা ড্রাইভারকে একেবারে বিদেয় করে দিয়েছেন।

মেঘনার মুখ থেকে এ-সব শুনতে সংকোচ জ্যোতিরাণীর, তবু সন্তর্পণে আগ্রহেই শুনেছেন। কালীদার প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। মৈত্রেয়ী চন্দকে কি বলেছেন বা ওদের মনিবের সঙ্গে চটা-চটির কি কথা হয়ছে না শুনলেও অনুমান করতে পারেন। কালীদা কোন্ প্রয়োজন কাকে কি বলতে পারেন তাঁর জানা আছে।

মনিবের মেজাজ থেকে মেঘনার সমাচার বিস্তার ছোটমনিবের অর্থাৎ সিতুর প্রসঙ্গে ঘুরেছে। বলেছে, দিনকে দিন কি-যে হচ্ছে বউদিমণি, সামনে এসে দাঁড়ালে পর্যন্ত ভয়ে বুকের ভেতর গুড়্গুড় করে। ভাত খেতে এসে একটু এদিক-ওদিক হল কি থালা-বাসন ছুঁড়ে মারবে, শুতে গিয়ে বিছানার চাদর একটু কোঁচকানো দেখল কি ওমনি সব তুলে ঘরের বাইরে ফেলে দেবে। এক কালীদাদাকে যা একটু সমীহ করে, আর সকলের ওপর মারমুখো হয়েই আছে। স্কুলের আগে সময় মত খেতে আসে না, শেষে আধপেটা খেয়ে ছোটে, ফিরে এসেও যে ঠাণ্ডা হয়ে বসে খাবে পেট ভরে তা নয়। কিছু বললে তেড়ে মারতে আসে। মেঘনা তবু বলতে ছাড়ে না বলে তার ওপরেই সব থেকে বেশি রাগ। ধুমসী বলে, কানে আঙুল দেবার মত গালাগাল করে ওঠে এক-এক সময়, দিনে ক'বার করে যে বাড়ি থেকে বার করে দেয় ঠিক নেই। সর্বদা রাগে ছনছন করছে, সেদিন আবার বাইরের কার সঙ্গে মারামারি করে চোখ-মুখ ফুলিয়ে এসেছিল। বড় হলে কি-যে হবে ওই ছেলে, ভাবতে বড় খারাপ লাগে বউদিমণি।

জ্যোতিরাণীর বুকের তলায় একের পর এক মোচড় পড়ছে মেঘনা সেটা টের পাচ্ছে না। ছেলের কথা মনে হলেই সেই দুর্যোগের দিনে মাঠে এসে দাঁড়ানোর মূর্তি চোখে ভাসে। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর ছোট দাদু কোথায়?

—তিনি তো দু'মাস ধরেই বাড়ি ছাড়া, কোথায় আছেন এক যদি কালীদাদা খপর রাখেন।

মাঝে একটা কোর্টের ব্যাপার হয়ে গেছে মেঘনার তা জানার কথা নয়। আবারও অনুনয় করল, বাড়ি ঘর ছেড়ে আর কতকাল রাগ করে থাকবে বউদিমণি, ভালয় ভালয় এবারে ফিরে এসো। তুমি চাকরি করছ শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। এ-রকম ইস্কুল করে নিজেই ইচ্ছে করলে কত লোক পুষতে পারো!

আবেদন বা স্তুতিতে ফল হবে না মনে হতে মেঘনারও মেজাজ বিগড়বার উপক্রম।

ধকল, আর দিনকতক দেখে আমিও যেখানে হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেব, এত ধকল পোহানো আমাকে দিয়ে আর পোষাবে না।

ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণীর আবার সেই শূন্যতা আর সেই চাপা অস্থিরতা। মামাশ্বশুর কলকাতায় কমই থাকবেন শুনে যেমন হয়েছিল, তিনি নেই, মেঘনারও না থাকাটা বুকের ওপর চেপে বসছে। তাঁকে যা বলতে পারেননি মেঘনাকে তাই বললেন।—পাগলামী করিস না মেঘনা, আমাকে সত্যি ভালবাসিস তো ও-বাড়ি ছেড়ে নড়বি না।... আর এক কাজ কর্, সিতুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে, বলিস আমি ডেকেছি।

মুখ ভার করে মেঘনা মাথা নাড়ল।—ও-ছেলেকে আমি কিছু বলতে-টলতে পারব না, একবার বলে প্রাণে বেঁচেছি। প্রাণে বাঁচার সমাচারও গোপন রাখল না মেঘনা। কালীদা বাড়িতে না থাকলে ছোট মনিব আজকাল ঘরে বসেই সিগরেট খায়—বাপের ভয় করবে কি, তার সঙ্গে তো দেখা একরকম হয়ই না। বেশি দিনের কথা নয়, সেই তখন একসময়ে রাগ করে মেঘনা বলেছিল, বউদিমণি ফিরলে তোমার পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট খাওয়া বার করবে। তাই শুনেও ছোট মনিব হেসে জিব ভেঙচে বলেছিল, তোর বউদিমণি এখানে আর ফিরছে না, ফিরলে তাকে দেখিয়ে তোর মাথার ওপর পা তুলে সিগারেট খেতাম। ছোট মনিবকে হাসতে দেখে মেঘনা একটু নরম হয়েই পরামর্শ দিয়েছিল, চুপি চুপি গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে জোরজার করে ধরে নিয়ে আসতে। শোনামাত্র মুখখানা যা হয়ে উঠল ছোট-মনিবের, বলার নয়। মাথায় যেন খুন চাপল। সিগারেটের ছাই ফেলা পাত্রটা তুলে এমন ছুঁড়ে মারল যে লাগলে রক্ষা ছিল না। কান ঘেঁষে ওটা গিয়ে দরজায় লাগতে দরজার কাচ খান্-খান্।

জ্যোতিরাণী নির্বাক। বাতাস দিতে ফেলতে লাগছে কোথায়। মাঠে দাঁড়ানো সেই রাগত মূর্তি মনে দাগ কেটে আছে। আর, এই রাগের বার্তাও তেমনি দাগ কেটে বসেছে। ওকে আসতে বলার জন্য মেঘনাকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে পারলেন না। মায়ের ওপর এমনি রাগ এমনি বিদ্বেষ তো স্বচক্ষেও দেখেছেন। বাপের চাবুকের ঘায়ে জ্বর এসে গেছল যে-রাতে, সেই জ্বরের ঘোরেও তাঁকে দেখে ন'বছরের ছেলের দু' চোখের যে ঝাপটা খেয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এসেছিলেন, ভোলেননি। তাঁর ধারণা, মেঘনা না জানলেও কোর্টের ব্যাপারটা সিতু জানে। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে আর চৌদ্দ বছর ভাবেন না তিনি। অনেক আগে থেকেই ভাবতেন না। সিতু জানে বলেই ওই মূর্তিতে সেদিন মাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর কোর্টের ফয়সালাও জানে বলেই মেঘনাকে বলেছিল মা আর ফিরবে না।... না, মা বলেনি, বলেছিল, তোর বউদিমণি আর ফিরবে না।

তবু, এই ছেলেকে নিয়েই সব-থেকে বেশি বিভ্রান্ত তিনি। মেঘনা চলে যাবার পরেও থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে, রাগ ছাড়াও ওর ভিতরে ভিতরে আরো কিছু আছে যা তিনি ধরতে ছুঁতে পারছেন না। তক্ষুনি শমীকে নিয়ে ওর হিংসের ব্যাপারটা মনে পড়েছে। মায়ের ওপর ভাগ বসালে ও যে হিংসেয় জ্বলত, অনেক দিনই লক্ষ্য করেছেন।

মনে পড়া-মাত্র দুর্বোধ্য একটা অস্থিরতা ভোগ করেছেন তিনি।

ওকে আবার দেখেছেন গেল বছর, চুয়ান্ন সালে। সেও এক দুর্যোগেরই দিন। সেকেন্ডারি স্কুলের টিচারদের মাইনে কম, যা পায় তাতে গ্রাসাচ্ছদন চলে না। অনেক-দিনের অনেক জটলা আর আবেদন-নিবেদনের পর মাইনে বাড়ানোর উদ্দেশে তারা শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছিল—পীসফুল ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণামও আগুন জেল লাঠি বুলেট। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সাত-জন নিহত, বহু আহত।

এই সংগ্রামের সঙ্গে জ্যোতিরাণীদের প্রতিষ্ঠান-চালিত স্কুলের কোনো যোগ ছিল না। এখানকার শিক্ষিকারাও কোনরকম দাবি ঘোষণা করেনি। শহরের সব স্কুল যখন বন্ধ, দূরের বিচ্ছিন্ন এই স্কুলের শান্তি খুব ব্যাহত হয়নি। অর্ধেক মেয়ে কম্পাউন্ডের ভিতরে বোর্ডিংএ থাকে, তাই গোলযোগের আশংকা আরো কম।

কিন্তু গণ্ডগোল হল। কোথা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছেলে এসে স্কুল-গেট খোলার দাবি জানালো, স্কুল বন্ধ করার দাবি জানালো। হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি বাড়তে টিচাররা বেরিয়ে এসেছে, মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে। হেডমিস্ট্রেস ছেলেদের জানালেন স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছেলের দঙ্গল নড়ল না, তারা চায় গেট খোলা হোক, টিচাররা তাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসুক। জনকয়েক পাণ্ডার উত্তে-জনার ইন্ধন পেয়ে বাকি ছেলের দঙ্গল মারমুখি হয়ে উঠতে লাগল।

পাণ্ডাদের একজন সাত্যকি। সিতু।

বিচ্ছিন্ন করে শুধু জ্যোতিরাণী দেখেছেন তাকে। দেখছেন। শমী ভয়ে এ-ধারে আসেনি, তার চোখে পড়েনি।

সিতুর হাতে ফ্ল্যাগ। রক্তবর্ণ মূর্তি। পারলে শুধু স্কুল-গেট নয়, পারলে ও স্কুলের এই ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার করে দেয়। বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে শেকলে ঝোলানো গেটের পেল্লায় তালার ওপর ঘা বসাতে লাগল।

হঠাৎ ছেলেরা দেখল ধীর পায়ে গেটের দিকে এক মহিলা এগিয়ে আসছেন। টিচাররা আর সামনের দিকের বড় মেয়েরা দেখল ওই মারমুখি অবুঝ ছেলেদের দিকে এগিয়ে চলেছেন তাদের মিসেস দেবী।

সিতুর হাতের পাথর হাতে থেকে গেল। ক্ষিপ্ত আক্রোশে মায়ের দিকে চেয়ে আছে সে। মা-কে একেবারে গেটের গায়ে এসে দাঁড়াতে দেখে সরোষে দু'পা স'রে দাঁড়িয়েছে। জ্যোতিরাণী নিষ্পলক চেয়ে আছেন তার দিকে। অবাধ্য বেপরোয়া আক্রোশে সিতুও। ব্যাপারটার ফলে হক-চকিয়ে যাওয়ার দরুন ছেলের দলের চেঁচামিচিও শমে নেমেছে।

তারপর যে কাণ্ডটা হল সেটা তাদের কাছে আরো অপ্রত্যাশিত। এত করে উদ্দীপনা জুগিয়ে আর খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে যে-খোদ পাণ্ডাটি তাদের নিয়ে এই হামলায় এসেছে—হঠাৎ সে হাতের পেল্লায় পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে ফিরে চলল।

একবার করে গেটের ও-ধারে নিঃশঙ্ক গম্ভীর আগুন-রঙা মহিলাকে দেখে আর ফিরে ফিরে এক-একবার পাণ্ডাটিকে পায়ে পায়ে মাটি আছড়ে চলেই যেতে দেখে তারাও আস্তে আস্তে সরতে লাগল।

এধারে টিচাররা আর মেয়েরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে যেন দৃশ্য দেখছে একটা। গেট ধরে স্থির একখানা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস দেবী, ছেলের দঙ্গল চলে যাচ্ছে।

ছেলের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের মানসিক ধকল কাটিয়ে উঠতেও সময় লেগেছিল জ্যোতিরাণীর। কোর্ট থেকে পৃথক থাকার অনুমতি পাবার পর সেই প্রথম আবার তিনি ভেবেছেন কালীদাকে ডেকে পাঠিয়ে ছেলেকে নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব আর একবার দিয়ে দেখবেন কিনা। লাভ হবে না জানেন, ছেলের বাপ রাজি হবে না। তবু জ্যোতিরাণী ভেবেছেন, শুধু ভেবেছেন।

তারপর এই পঞ্চান্ন সাল।

নির্লিপ্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে গোড়ার দিকটা মন্দ কাটেনি। স্কুলের সহকারী হেড-মিস্ট্রেস অন্য স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের চাকরি পেয়ে চলে যেতে জ্যোতিরাণী সহকারী হেডমিস্ট্রেস হয়েছেন। তিনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট, কাজের রিপোর্ট অনবদ্য, তবু দু'তিনজনকে ডিঙিয়ে ওই শূন্য আসন পেলেন বলে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হয়ে গেল। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই কোর্টে আইন-গত বিচ্ছেদ দাবি করেছেন একজন, জ্যোতি-রাণী সে-খবর পেলেন কোর্টের নোটীস আসার আগেই। খবরটা দিলেন বিভাস দত্ত। তারপর যথাসময়ে কোর্টের নোটীস এসেছে, শিবেশ্বর ডাইভোর্সের মামলা রুজু করেছেন।

পৃথক থাকার মামলায় শিবেশ্বর যা করেছিলেন, জ্যোতিরাণীও এবারে ঠিক তাই

করলেন। তিনি জবাব দিলেন না, উকিল দিলেন না, মামলায় লড়লেন না। তিনদিন আগে এক-তরফা ডিক্রী পেয়েছেন শিবেশ্বর চাটুজ্জে। নিয়ম-মাফিক তাঁকে কোর্টের ফয়সালা জানানো হয়েছে।

এরই দিন-কতক আগে, স্কুল ফাইন্যালে ছেলের পরীক্ষার ফল দেখে যেদিন তিনি অবাক হয়েছিলেন, সেদিনও সিতু স্কুল-গেটএ এসে দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সেদিনও শমী এসে খবরটা দিয়েছিল। জ্যোতিরাণী হঠাৎ-ঝোঁকে বলে উঠেছিলেন ডাকলিনে কেন। তারপরেই মনে হয়েছে ছেলে পরীক্ষা-ফলের সুখবর দিতে আসেনি। এসেছিল হয়ত পরীক্ষার ফল ভালো করে তাঁকে জব্দ করার আক্রোশ মেটাতে। সেটা শুনিয়ে যাবে বলেই হাত তুলে শমীকে কাছে ডেকেছিল সেদিন।

...কিন্তু আজ কেন এসেছিল? বিচ্ছেদের রায় বেরুবার ঠিক এই তিন দিনের মুখে আজ কেন এসেছিল?

...শুধু সিতু নয়, কালীদার এতদিনের রহস্য-ছোঁয়া ঝকঝকে কালো চামড়া-মোড়া ডায়রীও রেজিস্ট্রি-ডাকে আজই এসেছে। যা পড়ার পর দুর্বোধ্য অস্বস্তি আর আশঙ্কায় ভিতর ছেয়ে আছে।

শমীকে নিয়ে ট্যাক্সিতেই উঠতে হল। কম করে সাড়ে তিন টাকা খরচ হবে। কিন্তু কি করা যাবে, ট্রাম-বাসের এই ভিড়ের চাপ এখনো বরদাস্ত করে উঠতে পারেন না।
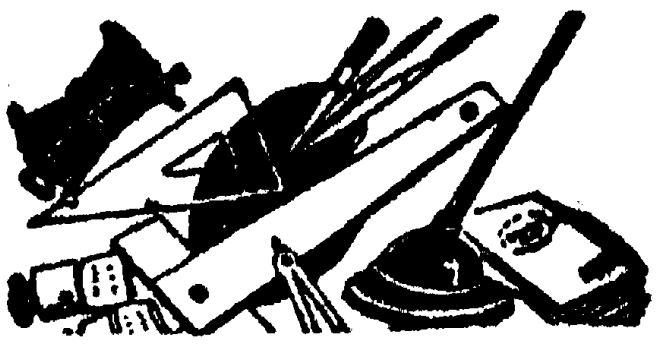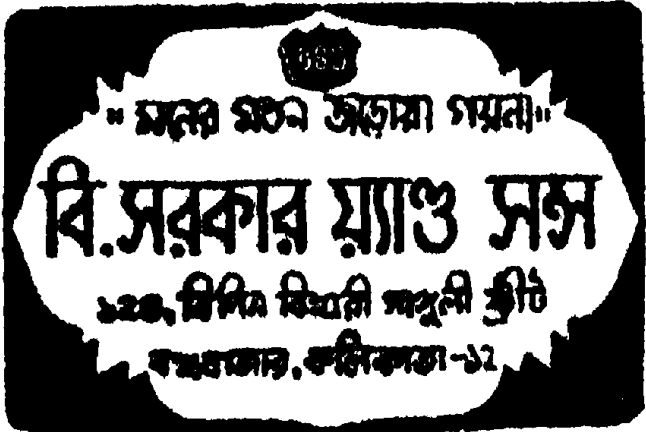
শমীর দরকারী জিনিসপত্র কিনে, ওর মাইনে দিয়ে, বোর্ডিংয়ের চার্জ মিটিয়ে আর এই ট্যাক্সিভাড়া গুনে মাসের শেষে ফাঁপরে পড়েন জ্যোতিরাণী। স্কুল থেকে যে-টাকা হাতে পান গোড়ায় গোড়ায় সেটা টাকাই মনে হয়নি। অন্য আর দশজন তাইতেই দিব্বি চালাচ্ছে ভেবে তিনিও নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মাসের শেষে একই হাল। সহকারী হেডমিস্ট্রেস হবার পরেও। টাকা ক'টা কিভাবে যে নিঃশেষ হয়ে যায় ঠাওর করে উঠতে পারেন না। অথচ খরচ যখন করেন নিতান্ত দরকার ভেবেই করেন। কিছু সঞ্চয় হওয়া দূরে থাক, গয়না যা ছিল সংগোপনে তার থেকে দু'চারখানা কমেছে।

সপ্তাহে একদিন অন্তত শমীকে নিয়ে বিভাসবাবুর ফ্ল্যাটে যেতে হয়। সুস্থ থাকলে বিভাস দত্তর আসতে আপত্তি ছিল না। গোড়ার দিকে ঘন ঘনই আসতেন। শমীকে আনার পরেও। এটা স্কুল। জ্যোতিরাণী অসুবিধেতেই পড়তেন। শেষে এই অসুবিধের আভাস বিভাস দত্তকে না দিয়ে পারেননি। ঘুরিয়ে আর মোলায়েম করেই বলেছিলেন, ফাঁক পেলে শমীকে নিয়ে তিনিই যাবেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে এত-দূর আসা, তাছাড়া স্কুলেরও কে কি ভাবে ঠিক নেই—।

আগে হলে বিভাস দত্ত অভিমানের একটা দেয়াল খাড়া করাতেন সামনে। কিন্তু আগের সঙ্গে অনেক যেন তফাৎ হয়ে গেছে। রাগ করা দূরে থাক, উল্টে হেসেছেন। বলেছেন, বুঝি তো, আবার না এসেও পারি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একলা কাটে—

তাঁর ওখানে যাওয়া আসার জন্যেই জ্যোতিরাণীর ট্যাক্সি খরচ। এও বাঁচাবার চেষ্টাই করেন তিনি। কিন্তু ট্রাম-বাসের অত ভিড় অসহ্য লাগে। সেই চাপাচাপির মধ্যে অনেক নীরব হ্যাংলামিও দেখেছেন তিনি। গা ঘিন ঘিন করে। এখন অন্তত জ্যোতি-রাণী চান এই রূপের বাঁধন ভেঙে পড়ুক, মুছে যাক। এরই জন্যে পায়ে পায়ে অসুবিধে এখন। এ আর না থাকলে অনেক দিক থেকে স্বস্তির কারণ হতে পারে এখন। কিন্তু তিনি চাইলে কি হবে। বয়েস চৌত্রিশে গড়ালো, হ্যাংলামি যারা করে তারা চব্বিশের বেশি দেখে না তাঁকে। স্কুলের এক সহশিক্ষয়িত্রীও চৌত্রিশ শুনে ঠাট্টা করে নিজের বয়েস বলেছিল চৌষট্টি।

দোতলায় ফ্ল্যাট। তর তর করে উঠে শমী আগে ঘরে ঢুকেছে। একটু বাদে জ্যোতিরাণী। ঘরে ঢুকে দেখলেন উঠে বসে বিভাস দত্ত বালিশের তলায় রাখলেন কি। বালিশজোড়া উঁচিয়ে রইল। তারপর হাসি মুখে সেই বালিশে ঠেস দিয়ে এদিকে ফিরলেন।

—আজ এত দেরি দেখে ভাবলাম এলেন না।

শমী জানান দিল, আরো দেরি হত, মাসি দুপুর থেকে কেবল বসেই কাটালো, আমি ঠেলে তুলে নিয়ে এলাম।

হাল্‌কা টিপ্পনীর সুরে বিভাস দত্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্যাক্সিতে এলি তো?

ঠেসটা যে মাসির উদ্দেশে শমী ভালই জানে। মাসির খরচের হাত নিয়ে কাকুকে মাঝে-সাজে ঠাট্টা করতে শোনে। তাই মাসির হয়ে সে পাকা মেয়ের মত জবাবদিহি করল, কি করব, যে ভিড় ট্রামে-বাসে, আর লোক-গুলোও যে আ-দেখলের মত চেয়ে থাকে মাসির দিকে—

মাসির রুষ্ট চোখ দেখে শমী থেমে গেল। কিন্তু চৌদ্দ বছরের শমীরই বা দোষ কি, তারও তো চোখ বাঁধা নেই।

শমীর কথায় ঠোঁটে হাসি নিয়ে বিভাস দত্ত তাঁর দিকে ফিরেছেন। ঠিক দেখছেন কিনা জ্যোতিরাণী জানেন না, ভদ্রলোকের চোখেমুখে চাপা খুশিই চোখে পড়ছে আজ। ...এক নজর তাকিয়েই জ্যোতিরাণী বুঝে নিয়েছেন কোর্টের রায় তাঁরও জানা হয়ে গেছে। কেস্ ওঠার আগে যে-খবরটা তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন, এই তিন ধরে তার ফল না জেনেও তিনি বসে নেই। জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল, অনেক দিন ধরে কে-যেন তার চারদিকে একটা জাল ফেলে রেখে প্রায় অলক্ষ্য কিন্তু ধীর অমোঘ গতিতে গোটাতে শুরু করেছে এখন।

গম্ভীর। চিন্তাটা সবলে ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন ছিলেন এ ক'দিন?

—বেশ ভালো।

এই জবাবটুকুর মধ্যেও কি আলগা ব্যঞ্জনার ধাক্কা খেলেন জ্যোতিরাণী?

এদিকে চারদিন আগেও রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন বিভাস দত্ত, ব্লাড-সুগার হাই। যা শুনলে ফিরে আবার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত মেজাজ বিগড়েই থাকে তাঁর। অথচ জবাব দিলেন, বেশ ভালো।

জ্যোতিরাণী বললেন, বেশ ভালো তো বিকেলে হেঁটে চলে বেড়ালেও তো পারেন, বন্ধ ঘরের মধ্যে একলা শুয়ে বসে কাটান কেন?

বিভাস দত্তর ঠোঁটের হাসি আর একটু বিস্তৃত হয়েও হল না, শিথিল আলস্যে আরও একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর হাল্‌কা গোছের জবাব দিলেন, একেবারে একলা ছিলাম না।

বিভাস দত্তর দু'চোখ শমীর বিস্মিত মুখের দিকে ঘুরল। আর সেইটুকুর ফাঁকেই জ্যোতিরাণী সচকিত। মুহূর্তের মানসিক বিড়ম্বনার ধাক্কা একটা। নড়াচড়ার ফলে বিছানার বালিশ জোড়া সামান্য সরেছে।

তার ফাঁক দিয়ে মোটা ওমর খৈয়ামের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে।

বিভাস দত্ত ওমর খৈয়াম পড়ছিলেন না। তাহলে ওটা বালিশ-চাপা দেওয়ার দরকার হত না। ওতে জ্যোতিরাণীর দুটো ফোটো আছে।

...বিভাস দত্ত একা ছিলেন না।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

উৎসব সমাপ্তির শেষে

সারা দেশ জ্বড়ে সম্প্রতি মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়েছে নিবেদিতা শত-বার্ষিকী। ভারত কল্যাণে নিবেদিতা-প্রাণ এই বিদেশিনীর কর্মক্ষেত্র গোটা ভারত জ্বড়ে হলেও ম্লকেন্দ্র ছিল কলকাতা তথা বাংলাদেশ। তাই বাংলাদেশের প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতা নিবেদিতার শত-বার্ষিকীকে বরণ করেছিল অন্তরের গভীরে। এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল নিবেদিতা জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি। মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি। বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতার জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপনে তাদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ঘটনা।

বাগবাজার মেটাল ইয়ার্ডে এক স্ববৃহৎ ও স্বসজ্জিত মন্ডপে গত ২ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে নিবেদিতার জীবনালেখ্য একটি মৃন্ময় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন রাজ্যমন্ত্রী শ্রীফজলুল রহমান। প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভগিনী নিবেদিতা মানব-কল্যাণের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবিচলিতভাবে এই পথ অনুসরণ করেছেন। এই জন্যই আমরা তাঁকে স্মরণ করি এবং ভক্তি ও মানব-প্রেমের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণতা মুক্ত বৃহত্তর জীবনের সন্ধান করি। দেশ এবং দশের সেবাকে তিনি জীবনের পরম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা প্রদর্শিত এবং অনুসৃত এই পথই আমাদের সংকীর্ণতার উর্ধে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান দিতে সক্ষম।' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মল বসু এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি স্বামী চিদাত্মানন্দজী।

শ্রীঅমল সরকার রচিত 'সেবিকা নিবেদিতা' নাটকে স্বামিজীর ভূমিকায় শ্রীসব্যসাচী হাজরা, নিবেদিতার ভূমিকায় শ্রীগীতা দে ও সদানন্দের ভূমিকায় শ্রীকুমার ভাদুড়ী (ডাইনে)।

দশদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। মৃন্ময় আলেখ্য প্রদর্শনী, শিশু উৎসব এবং সংগীতানুষ্ঠান ও নাট্যানুষ্ঠান। এছাড়া বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিবেদিতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়ে শ্রোতৃবৃন্দের নিবেদিতা-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করেন।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন নিবেদিতার জীবনী সম্বলিত মৃন্ময় আলেখ্যের কথা। নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী মৃন্ময় মূর্তির সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শক নিবেদিতার জীবনের মৃন্ময় রূপ দর্শন করে তৃপ্ত হন। প্রদর্শনীটি দর্শক সাধারণের অজস্র প্রশংসা লাভ করে।

এরপর আসতে হয় শিশু উৎসব এবং শিশু অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে। অনুষ্ঠানসূচীর বিরাট একটা অংশ জুড়ে ছিল শিশু উৎসব এবং শিশু অনুষ্ঠান। দশদিনের মধ্যে চারদিন ছিল এই উৎসব ও অনু-ষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট। বিভিন্ন শিশু উৎসবে অংশ গ্রহণ করে আজাদী সংঘ, জাতীয় যুব সংঘ, নন্দন, ছোটদের পাততাড়ি এবং পরিচালনা করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমানিকদাস রায়।

এর পরের প্রসঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

আর্তের সেবায়

নিবেদিতার জীবনালেখ্য : মৃন্ময় প্রদর্শনীর দুটি চিত্র

মাহাত্ম্য কীর্তন করেন বারাণসী কালী কীর্তন সমিতি। দ্বিতীয় দিন আবার বসে লোকসংগীতের আসর। শ্রীকেশব রায় ও শিবনাথ রায় লোকসংগীত পরিবেশন করেন। তারপর শিবপুর কল্পনা মজলিস কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ গীতিনাট্য' অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীপূর্ণেন্দু রায়ের পরিচালনায় 'শীতল তব পদছায়া' সংগীতানুষ্ঠান দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। পঞ্চম দিনে শ্রীভাস্কর ভট্টাচার্যের পরিচালনায় গীতি আলেখ্য এবং দশম ও সর্বশেষ দিনের অনুষ্ঠানে 'উদীচী' কর্তৃক 'মাতৃবন্দনা' গীতিবিচিত্রা পরিবেশিত হয়। উদীচীর অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীশৈলেশ ভড়।

সংগীতানুষ্ঠানের পর নাট্যানুষ্ঠান। সংগীতানুষ্ঠান প্রায় রোজই ছিল। নাটকের অনুষ্ঠানও ছিল জমজমাট। চতুর্থ দিবসে গিরীশ নাট্যসংসদ কর্তৃক অভিনীত হয় 'রাজলক্ষ্মী'। নাট্যানুষ্ঠানের কথা বলতে গেলে নিবেদিতার 'জীবনী' বিষয়ক একাধিক নাটকের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। ষষ্ঠ দিবসে হাওড়ার শিল্পীমহল অভিনয় করেন 'ভগিনী নিবেদিতা' এবং পরদিন ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচালনায় প্রাচ্যবাণী কর্তৃক অভিনীত হয় 'নিবেদিতা নিবেদিতম'। অষ্টম দিবস অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনী 'সেবিকা নিবেদিতা' মঞ্চস্থ করেন। পরের দিন রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি অভিনয় করেন 'চণ্ডীদাস' এবং 'সবার রাজা' সংগীত অভিনয় পরিবেশন করেন আনন্দলোক। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে অভিনীত হয় 'নিবেদিতা'। পরিচালনা করেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

সবশেষে বলতে হয় যে, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি একটি সফল উৎসব অনুষ্ঠানে কৃতিত্ব অর্জন করলেন। অধিকাংশ দিনই দুবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার শতবার্ষিকী সারা দেশে যে প্রাণ সমারোহের সৃষ্টি করতে পেরেছিল তার সবটুকু কৃতিত্ব এ'দেরই প্রাপ্য। সমিতির প্রাণ শ্রীধীরাজ বসুর পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠা সার্থক হয়েছে।

আলো আঁধারি

বারবার কথাটা মনে করবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। অথচ কথাটা খুব জরুরী এবং ততোধিক প্রয়োজনীয়। পথ চলতে চলতে তাই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। হুঁশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছি এরকমভাবে পথ চলা খুব বিপজ্জনক। বড়দিনের আলোকমালা পরে শহর সেদিন অপরূপ। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম এই আলোর শোভায় তন্ময় হয়ে যেতে। দু'একবার সফল হলেও তালভঙ্গ হতে হচ্ছিল না। এমনি সময়ে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অনেকদিনের বন্ধুত্ব। এমন আকস্মিক সাক্ষাৎকারের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। আমি এই শহরের বাসিন্দে হলেও বন্ধু থাকে হাজার মাইল দূরের আর এক শহরে। ওকে প্রথম আবিষ্কারের আনন্দে মত্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই মত্ততার রেশ না কাটতেই একটা বিরাট জিজ্ঞাসাবোধক চিহ্ন মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করলো। আজকের দিনে এমন আনন্দময় পরিবেশে বন্ধুটি এই শহরে তাও আবার একা! কেন? মনে নানাকথার ভীড়। কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলি, স্বামী বেচারাকে বাদ দিয়ে এমন একা একা যে? আমার কথা শেষ না হতেই কলকলিয়ে হেসে ওঠে বন্ধুটি, তুই জানিস না বুঝি, আমাদের তো ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটু আধটু নয় বেশ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই। কথাটা ঠিক বোধগম্য হলো না। আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে ওর বিয়ের ব্যাপারটা একবার মনের মধ্যে ঝালিয়ে নেই। বেশ ভাল ঘর এবং বরে ওর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরও ওর বরের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। প্রতিবারই ভদ্রলোককে আমার সমান ভাল লেগেছে। তাই কথাটা শুনে খুব খারাপ লাগছিল। বন্ধুটি আবার বললো, বনিবনা হচ্ছিল না, তাই এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখন বেশ ভালই আছি। বলেই ও পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই হারিয়ে যাওয়া কথাটা আমার মনে পড়লো।

এও আমার এক বন্ধুর কাহিনী। সেই ডিভোর্স কেস। তবে এক্ষেত্রে উদ্যোগী স্বামী পুংগব। ওর কাছে সব শুনেছি। দোষটা যে ঠিক কার বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু বন্ধুর অবস্থা দেখে দুঃখ হয়েছিল। বিষাদমলিন মুখে ও বলেছিল, এবার কি হবে বলতো? এর উত্তর আমার অজানা। পরে খবর পেয়েছিলাম বন্ধুটি এখন চাকরী করছে। ওদের যা অবস্থা তার পক্ষে চাকরী বেমানান। এই চাকরী হয়তো পূর্ব স্মৃতি ভুলে থাকার অন্য নাম।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। এত আলোর সমারোহ তবু জমাট অন্ধকার। তাই আলোকমালা পেরিয়ে অন্ধকারের বুকে আত্মসমর্পণ করার জন্য দ্রুত ছুটতে লাগলাম।

সংবাদ

নাগপুর নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সমাপ্তি দিবসে মহিলা বিভাগের অধিবেশন হয়। মহিলা বিভাগের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী সারদাদেবী শর্মা এবং সভানেত্রীত্ব ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন যথাক্রমে মহাশ্বেতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবী। ডঃ উমা রায় বলেন মায়েদের হতে হবে সুন্দর ও বিশ্বস্ত। সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেন, জীবনকে আশ্রয় করে জীবনবোধ প্রকাশিত হোক। প্রধান অতিথি মৈত্রেয়ী দেবী বলেন, সাহিত্য যেন মিথ্যার ব্যবসা না হয়। অহংয়ের আলোক অনেক সময় জ্ঞানের আলোক আড়াল করে দাঁড়ায়। সভানেত্রী মহাশ্বেতা দেবী বলেন, সাহিত্য শুধু কথা সাহিত্য নয়, তাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা উচিত।

* * *

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী এম এস এইচ ঝারওয়ালা সম্প্রতি বালেশ্বরে সম্মেলনের ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ বর্তমান। অসন্তোষ ও শৃঙ্খলাহীনতার অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এতে ছাত্রদেরই ক্ষতি বেশি। তারা যেভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা থেকে তাদের সরিয়ে আনার দায়িত্ব মায়েদেরই নিতে হবে।

* * *

বিমানবাহিনীর তেইশজন প্রতিভাসম্পন্ন অফিসার ও এয়ারম্যান—যাঁরা গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন—বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার চীফ মার্শাল অর্জন সিং সম্প্রতি তাঁদের প্রশংসাপত্র দান করেন।

এদের মধ্যে অসামরিক অফিসার ও স্কোঃ লীডার শ্রীমতী গীতা ঘোষও আছেন। শ্রীমতী ঘোষই প্রথম ভারতীয় মহিলা যাকে ছত্রীধারীর ট্রেনিং দেওয়া হবে।

* * *

মেয়েদের একশত মিটার বুক সাঁতারে জাপানের ওয়াই মরিজামে এক মিনিট ২২·৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে স্বদেশের এন ইয়ামমোতোর এক মিনিট ২৩·৯ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

বিজ্ঞানের কথা

শুভঙ্কর

হায়দ্রাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন

৩ জানুয়ারী থেকে হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন শুরু হয়েছে এবং ৯ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে। এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতিপদে বৃত হয়েছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এমারিটাস্ অধ্যাপক ডঃ টি আর শেষাদ্রি, এফ আর এস।

অধ্যাপক শেষাদ্রি মাদ্রাজ রাজ্যের কুলিত্তালাই-তে ১৯০০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হন এবং ১৯২৯ সালে মাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। শেষোক্ত শিক্ষায়তনে নোবেল-পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে তিনি 'ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক' এবং 'অ্যান্থোসায়ানিন' সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও কাজ করেন। এরপর এডিনবরায় মেডিক্যাল কেমিস্ট্রি ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক জি বার্জার-এর সঙ্গে এবং অস্ট্রিয়ার গার্জ-এ মেডিক্যাল কেমিস্ট্রি ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক এফ প্রেগল্-এর সঙ্গে গবেষণা কাজ করেন। ১৯৩০-৩৩ সালে তিন বছর কোয়াম্বাটোরে কৃষি গবেষণা-মন্দিরে কাজ করার পর তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন রসায়ন বিভাগের রীডার ও প্রধানরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ সালে উক্ত বিভাগের অধ্যাপকপদে বৃত হন। তিনি রসায়ন প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের প্রধানরূপেও পাঁচ বছরকাল কাজ করেন এবং উক্ত বিভাগের উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধানের পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের এমারিটাস অধ্যাপকপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

অধ্যাপক শেষাদ্রির অধীনে প্রায় ১০০ জন গবেষক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। সহযোগী গবেষকদের সঙ্গে তাঁর ৭০০টি মৌলিক গবেষণানিবন্ধ ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ভিটামিন ও হর্মোনের রসায়ন' নামে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রকৃতিজ উপাদানের জৈব রসায়ন—ভেষজ, রঞ্জক, কীটঘ্নরূপে যেগুলির গুরুত্ব অসীম। বিভিন্ন প্রকারের বহুসংখ্যক নতুন যৌগিক পদার্থ পৃথক করা হয়েছে, তাদের গঠন বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সংশ্লেষণ সম্পাদন করা গেছে। এই উপাদানগুলির শারীরতাত্ত্বিক ধর্ম এবং দেহাভ্যন্তরে তাদের সংশ্লেষণ ও তাদের উপযোগিতা সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধান করেছেন।

অধ্যাপক শেষাদ্রি কয়েক বছর পূর্বে লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং জার্মান প্রকৃতিজ দ্রব্য আকাদেমির সদস্যও তিনি। ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার অন্যতম উপ-সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রি। ভারতীয় রসায়ন সমিতি এবং ভারতীয় ভেষজ কংগ্রেসের সভাপতিপদেও তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির কোচবিহার বক্তৃতা, ভারতীয় রসায়ন সমিতির আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বক্তৃতা, ইনস্টিট্যুট অফ কেমিস্টির হেমেন্দ্রকুমার সেন বক্তৃতা, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি কে সিং স্মারক বক্তৃতা ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কে ভেঙ্কটরামন ষষ্ঠীবর্ষপূর্তি বক্তৃতা তিনি প্রদান করেছেন এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা তাঁকে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পদকে ভূষিত করেছেন। ১৯৬৩ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মাননায় এবং ১৯৬৫ সালে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন।

অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি

মূল সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রি ছাড়া বিজ্ঞানের ১৩টি বিভিন্ন শাখায় সভাপতিরূপে এবার মনোনীত হয়েছেন—গণিতে বরদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউ এন সিং, পরিসংখ্যানে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ভি এস হুজুরবাজার, পদার্থবিদ্যায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ সি আকলাক্, রসায়নে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর সি মেহরোত্রা, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলে বারাণসীর ডঃ আর এল সিং, উদ্ভিদ বিদ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর এন ট্যান্ডন, প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্বে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এ কে মিত্র, চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান কলকাতার ডাঃ এ বি চৌধুরী, কৃষিবিজ্ঞানে ভুবনেশ্বরের ডঃ বি এ সাহু, শারীরতত্ত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সুশীলরঞ্জন মৈত্র, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিজ্ঞানে নয়াদিল্লীর ডঃ এইচ সি গাঙ্গুলী এবং যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুবিজ্ঞানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডি ব্যানার্জি। প্রতি বছরের মতো এবারের অধিবেশনেও বিদেশের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যোগদান করেছেন।

অনন্য গণিতপ্রতিভা রামানুজন

(১)

পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিশীল দেশেই কোনো না কোনো বিষয়ে দু'-একজন প্রতিভাধর মানুষের আবির্ভাব সব সময়েই হয়ে থাকে, কিন্তু অনন্য প্রতিভা মনীষীর আবির্ভাব কোনো দেশেই সচরাচর ঘটে না। তার জন্যে দেশ ও জাতিকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়, বহু সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ইংলণ্ডে একজন শেক্সপীয়র ও একজন নিউটনেরই আবির্ভাব হয়েছে, জার্মানীতে জন্মেছেন একজন গোটে ও একজন আইনস্টাইনই, ফ্রান্সে এসেছেন একজন গালোয়া ও একজন মাদাম কুরী, ইতালীতে জন্মেছেন একজন মিকেলাঞ্জেলো ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাশিয়ায় এসেছেন একজন টলস্টয় ও একজন লমোনসভ্, আর ভারতবর্ষে জন্মেছেন একজন রবীন্দ্রনাথ ও একজন রামানুজনই।

বিশ্বের অনন্য প্রতিভার ইতিহাসে ভারতীয় গণিতবিদ্ রামানুজন সত্যই এক

পরম বিস্ময়। মাত্র ৩২ বছরের জীবনকালে তিনি গণিতে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তার তুলনা বিরল। ফারমেট, পাস্‌ক্যাল, নিউটন, অয়লার, লাগ-রাঞ্জ, গস্‌ প্রমুখ বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞদের সঙ্গেই বোধহয় সে-প্রতিভার তুলনা করা চলে। অথচ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে পরিণত জীবনকাল, পর্যাপ্ত শিক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা ও অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন, তার কোনোটিই রামানুজনের ভাগ্যে জোটেনি। যে স্বল্প ক'টি বছর তিনি জীবিত থেকে গণিত-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তার অধিকাংশ সময়েই তাঁকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রামানুজনের কথা আলোচনা করতে গেলে তাই তাঁর অকালপ্রয়াণের আক্ষেপ আমাদের মনে বিশেষভাবে জেগে ওঠে। তাঁর জীবনাবসানে লন্ডনের 'টাইমস্‌' পত্রিকা যথার্থই বলেছিলেন :

> 'There is something peculiarly sad in the spectacle of genius dying young, dying with the first sweets of recognition and success tasted, but before the full recognition of the powers that lie within.'

(প্রতিভাধর মনীষীর অকালপ্রয়াণের দৃশ্য একান্ত আক্ষেপের বিষয়; আক্ষেপ এজন্যে যে, কেবলমাত্র প্রথম স্বীকৃতি ও সাফল্যের স্বাদ লাভ করেই তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটলো না)।

রামানুজনের পুরো নাম শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গার। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের তাঞ্জোর জেলায় কুম্ভকোনম শহরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের রামানুজনের জন্ম। তাঁর পিতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং পিতামহ উভয়েই কুম্ভকোনমের বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দোকানে গোমস্তা বা হিসাব-রক্ষকের কাজ করতেন। তাঁর মা ছিলেন তাঞ্জোরের সন্নিহিত কোয়াম্বাটুর জেলার এরোদ শহরে মুন্সেফ কোর্টের জনৈক আমিন বা বেলিফের কন্যা। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সঙ্গে বিবাহের পর কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্তান হয়নি। তখন তাঁর পিতা পাশের শহর নামকালে জাগ্রতা দেবী নামাগিরির কাছে কন্যার সন্তান-কামনায় প্রার্থনা জানান। কিছুকালের মধ্যেই দেবী নামাগিরি তাঁর সে মনস্কামনা পূর্ণ করলেন।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রামানুজনের মা তাঁর প্রথম সন্তান প্রসবের জন্যে এরোদে পিতৃগৃহে গমন করেন। সেখানে সম্বৎ সর্ব-জিতের মার্গশীর্ষের নবমী তিথিতে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বরে তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানুজন ভূমিষ্ঠ হয়। দেবী নামাগিরির আশীর্বাদে প্রথম পুত্র-সন্তান হওয়ায় তাঁর পিতৃগৃহে ও শ্বশুরকুলে স্বভাবতই পরম আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। তাঁর পিতা প্রথমেই ছুটলেন দেবী নামাগিরির কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পূজা অর্পণ করতে।

শিশু রামানুজনের চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না যাতে তাকে আর পাঁচজন শিশুর থেকে অসাধারণ মনে হত। কিন্তু তার চোখদুটি ছিল প্রখর উজ্জ্বল আর সে-দুটি চোখের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ প্রতিভা ছিল অন্তর্নিহিত। সমসময়ের ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রথা অনুযায়ী রামানুজন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বছর বয়সে স্থানীয় পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তিনি দু' বছর শিক্ষালাভ

শ্রীনিবাস রামানুজন

করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মুখে মুখে সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ, ও এক-ষোড়শাংশ লাভের গাণিতিক নামতা আয়ত্ত করেন এবং জিনিসের ওজন, বিশেষত সোনার ওজন, ধান ও জমির পরিমাপ শিখে ফেলেন।

এর দু' বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রামানুজন পাঠশালা ছেড়ে কুম্ভকোনমের টাউন হাইস্কুলে ভর্তি হন আর এখানেই তার স্কুল-জীবনের পাঠ শেষ করেন। স্কুল-জীবনের প্রথম দশ বছরের মধ্যে তার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি প্রাইমারী পরীক্ষায় তাঞ্জোর জেলার সকল উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এই কৃতিত্বের ফলে স্কুলে অর্ধেক বেতনে পড়ার সুযোগ পান এবং এতে আর্থিক দিক থেকে তার পরিবারের পক্ষেও কিছুটা সুবিধা হয়।

ছোটবেলা থেকেই রামানুজনের স্মৃতি-শক্তি ছিল অসাধারণ। যখন তার বয়স মাত্র ৬ বছর, তখনই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ধাতুরূপ নির্ভুলভাবে বলতে পারতেন এবং 'পাই' (পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত)-এর মান এবং ২-এর বর্গমূল বেশ কয়েক ঘর দশমিক পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলে দিতেন।

ছোটবেলায় ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ ভালবাসে খেলাধুলা করতে, কেউ ভালবাসে ছবি আঁকতে, কেউ ভালবাসে গান গাইতে, কেউ ভালবাসে গল্পের বই পড়তে, আবার কেউ বা ভালবাসে পড়াশোনা করতে। সারাক্ষণ অংক কষতে ভালবাসে এমন ছেলের কথা কদাচিৎ শোনা যায়। রামানুজন ছিলেন এমনি এক অদ্ভুত ছেলে। তিনি ভালবাসতেন শুধু অংক কষতে আর অংক নিয়েই মেতে থাকতেন সব সময়।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রতি বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে পুরস্কার পেতেন। যে-সব বই তাকে পুরস্কার দেওয়া হত, সেগুলোর বেশির ভাগই গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধের বই। কিন্তু গল্প, উপন্যাস বা কবিতা পড়তে তার বিশেষ ভাল লাগত না। ক্লাশে বসে বেশির ভাগ সময়েই তিনি অংক কষতেন। অংকে যে তিনি প্রতি বছরই ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন, তা বলাই বাহুল্য।

রামানুজনের অংক কষার এই অদ্ভুত নেশা দেখে ক্লাসের মাস্টারমশাইরা তেমন গুরুত্ব দিতেন না (এ-দেশে যা সচরাচর ঘটে থাকে)। কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবেরা এ-ব্যাপারে তাকে প্রচুর প্রেরণা যোগাত, তারা নানারকম অংকের বই তার কাছে এনে দিত। সে-সব বই পেয়ে রামানুজনের আনন্দের সীমা থাকত না। জানা-অজানা সবরকম অংকের প্রশ্ন নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন। তার একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল, অংকের বই-এর কোনো অংকই সে বই-এ যেভাবে কষে দেওয়া আছে, তা না দেখেই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করার চেষ্টা করা।

অংক সম্পর্কে রামানুজন ক্লাশে এমন সব প্রশ্ন করতেন যে, মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত ভেবে তার কূলকিনারা পেতেন না। রামানুজন তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক্লাশ টু) ছাত্র। একদিন ক্লাশের অংকের মাস্টারমশাই বললেন, 'যে-কোনো সংখ্যাকে সেই একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তার ফল হবে ১।' মাস্টারমশায়ের এ-কথা শুনে রামানুজন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, '০-কে যদি ০ দিয়ে ভাগ করি তার ফলও কি ১ হবে?' এমন অদ্ভুত প্রশ্ন মাস্টারমশাই এর আগে কোনো ছাত্রের কাছে কখনও শোনেননি। রামানুজনের এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে তিনি হকচকিয়ে গেলেন! কি যে উত্তর দেবেন মনে মনে ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। তাই রামানুজনের প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

নিগ্রো আর্ট

দিলীপ মালাকার

মার্কিন সিনেমা ছবির মারফৎ নিগ্রো জীবনের সঙ্গে আমাদের যে স্বল্প পরিচয় আছে তাকে আমরা কোনো মতেই নিগ্রো সংস্কৃতি বলতে পারি না। নিগ্রোদের দেশটাও আবার কয়েক শ' বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গোটা আফ্রিকা মহাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে নিগ্রো সংস্কৃতির খনি "নিগ্রো আর্ট"। কয়েক শ' বছরের বিদেশী শাসকদের শৃঙ্খলিত নাগপাশ ছিন্ন করে প্রায় সমগ্র আফ্রিকা আজ মুক্তি পেয়েছে। বলাবাহুল্য সে সময়কার শৃঙ্খলিত জীবনে নিগ্রো সংস্কৃতির কোন সম্মান ছিল না দেশে, ছিল না বিদেশেও। জাহাজ বোঝাই হাত-পা বাঁধা ক্রীতদাস যখন চালান যেত আমেরিকায়, তখন তাদের হাতে গলায় ঝুলত সোনার-রুপোর গহনা। কখনো বা তাদের বাক্স-পেটরার মধ্যে থাকত কাঠের খোদাই মূর্তি বা মুখোশ। সেগুলো দেখে কিছু কিছু আমেরিকান পণ্ডিত নিগ্রো আর্টের হদিশ দিয়েছিলেন বিগত শতাব্দীতে। সে সবই গুটিকয়েক পণ্ডিতের আলোচনার মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। নিগ্রো আর্টের সত্যিকারের মূল্যায়ন শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক বছর আগে। এবং ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে আফ্রিকার সেনেগাল রাষ্ট্রের ডাকার শহরে বসে নিগ্রো আর্টের প্রথম আন্তর্জাতিক মেলা। নিগ্রো আর্টের ঐতিহাসিক নিদর্শন-গুলোর অধিকাংশই চালান গেছে জলের দরে ইউরোপ-আমেরিকায়। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন মিউজিয়ম হতে এসেছিল এই প্রদর্শনীতে আট শ' জিনিস। তাছাড়া ছিল আফ্রিকার বিভিন্ন মিউজিয়মে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলো। ডাকার-এ অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক মেলায় শুধু নিগ্রো আর্টই দেখানো হয়নি, সঙ্গে ছিল নিগ্রো নাচ-গান, নাটক অভিনয়ও। এই আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করেন নিগ্রো কবি ও সেনেগালের রাষ্ট্রপতি মঃ লেওপোল্ড সেংঘর। ডাকার-এ নিগ্রো আর্ট প্রদর্শনী শেষ হলে গত বছরের অক্টোবর মাসে প্যারিসের গ্রাঁ পালেতে আবার এই

পাহুয়াঁদের তৈরি কাঠের তেল মাখান মূর্তি।

নোংগুেদের তৈরি নারী মুখোশ। চৈনিক শিল্পকলার প্রভাব নিয়ে গবেষণা চলছে.

বাকোতাদের তৈরি ব্রোঞ্জের মানুষ মূর্তি

লারলোদের তৈরি কাঠের মুখোশ দেখে মনে হবে যেন পিকাশো শিল্পের কোন নিদর্শন

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর আগে নিগ্রো সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্বেতকায়দের কাছে অনেক কৌতুককর কাহিনী শুনেছি, কিন্তু নিগ্রো আর্টের এই প্রদর্শনীটি দেখে সত্যিই সেদিন তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। নিগ্রো সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমার মত অনেকেরই ভুল ভেঙে গেল, লাভ করলাম নতুন জ্ঞান।

ভারতীয় চিত্রকলায় যেমন ভৌগোলিক বিরোধ রয়েছে, রয়েছে স্টাইলের ফারাক, আফ্রিকার আর্টেও এর ব্যতিক্রম নেই। উত্তর ভারতের চিত্রকলার স্টাইলের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের স্টাইলের যতটা তফাৎ রয়েছে, তারচেয়েও বেশী তফাৎ দেখা যাবে আফ্রিকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে। ইকুয়েটারের উত্তরে ও দক্ষিণে আফ্রিকান আর্টে দু'শ রকমের স্টাইল দেখা যাবে। তবে নিগ্রো আর্টের খানগুলোর সন্ধান মিলবে পশ্চিম আফ্রিকায়। একেবারে উত্তর আফ্রিকায় যেমন দেখা যায় আরব সংস্কৃতির প্রভাব, তেমনি পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা যাবে সত্যিকারের নিগ্রো আর্ট। সেখানে কোনো বিদেশী প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় না।

আর্ট হল মানুষের সুকুমার চিন্তার প্রতিফলন। শিল্পী তাঁর নিজের চেহারা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর রূপই সাধারণত ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সৃষ্টিতে। নিগ্রো আর্টের ক্ষেত্রেও এ কথা পুরোপুরি খাটে। নিগ্রো শিল্পী তাঁর পরিবেশ ও প্রতিবেশীর প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তুলেছেন প্রথমে কাঠের ওপর, তারপর পাথর ও বিভিন্ন ধাতুতে গড়া মূর্তিতে। এগুলো অবশ্য কয়েক হাজার বছরের পুরোনো জিনিস। হাতীর দাঁতের ওপরে তাঁরা যে শিল্পের নমুনা রেখেছেন সেটাও নিগ্রো আর্টের এক মূল্যবান সম্পদ।

খৃষ্টপূর্ব ছয় শতকের নক্ পুতুলের মাথা

বছর আটেক আগে নাইজেরিয়ার নবং জেলার এক খনিতে শ্রমিকরা মাটি খুঁড়তে গিয়ে কয়েকশ মাটির মূর্তি পায়। তাদের কোদালের নির্মম আঘাতে তখন অনেকগুলি মাটির পুতুলই ভেঙে যায় এবং দুশো পুতুলের মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক পাওয়া গিয়েছিল একেবারে অক্ষত অবস্থায়। আর্ট বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকেরা তো ওই সংবাদ শুনে মাথায় হাত দিলেন। কোদালের আঘাতে এমন মূল্যবান মূর্তিগুলো ভেঙে গেল! তাঁরা অবশেষে গবেষণা করে বলেছেন, ওগুলো খৃষ্টপূর্ব ছয় শতকের। অর্থাৎ ওই অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব কয়েকশত বছরে চলেছে এক সভ্য জাতের আর্ট চর্চা। অনেকে মনে করেন যে ওটাই হচ্ছে নিগ্রো সভ্যতার প্রথম রাজ্য। ওখানেই তখন আর্ট চর্চা হত পুরোদমে।

ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা প্রাচীন নিগ্রো আর্টের প্রথম সন্ধান পান ১৮৯৭ সালে। ওই বছরে কয়েকজন শিল্পসংগ্রহকারী ইউরোপে চালান দেন পনেরো শতকের বেনী প্রদেশের ব্রোঞ্জ মূর্তি। সেই সময়কার বেনী ব্রোঞ্জ মূর্তির আজো কিছু সংরক্ষিত আছে বৃটিশ মিউজিয়ম আর প্যারিসের 'মুজো দ্য লোম্' (নৃতত্ত্ব মিউজিয়ম)এ। ১৯০০ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে ইউরোপে চালান আসে প্রচুরসংখ্যক ধাতুর ও কাঠের মুখোশ। অনেক শিল্প সমালোচকই বলেন, সেই সব দেখেই নাকি পিকাশো ও মদ্‌লিয়ানি তাঁদের শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। অর্থাৎ কিউবইজম্।

নিগ্রো আর্ট শুধু কাঠ খোদাই, ব্রোঞ্জ মূর্তি বা হাতীর দাঁতের কাজেই আবদ্ধ ছিল না। মূল্যবান ধাতুর গহনা—মুখোশ নির্মাণও তারা করত নিয়মিত। মূল্যবান ধাতুর মধ্যে তারা সোনার ব্যবহারটাই করত বেশী। সোনার গহনাগুলো আসলে অঙ্গ-সৌষ্ঠবের জন্যে ব্যবহার করত না তারা। অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিদ্রিত আত্মার চিহ্নস্বরূপ মুখোশের লকেট গহনায় ঝোলাত। এমন কী পশু-পাখির মুখোশও।

ইংরেজদের দেশে এখনও গিনির প্রচলন আছে। গিনি মানেই স্বর্ণমুদ্রা। ডিভ্যালু-য়েশনের পর গিনির দাম বেড়েছে। আগে

ছিল চোদ্দ টাকা। গিনির চলন হয়েছে কোত্থেকে জানেন? পশ্চিম আফ্রিকার গিনি রাজ্য থেকে সোনার গহনা ও মুখোশ পাচার করত ইংরেজ বণিকেরা। সে প্রায় কয়েক শ' বছর আগের কথা। তিন-চার শ' বছর আগে যখন ইংরেজ বণিকেরা পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে এবনি কাঠের চালান দিত আর দিত শৃংখলিত ক্রীতদাস, আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় তখন তাঁরা ওখানে স্বর্ণ নির্মিত গহনা ও মুখোশ লুঠ করত ক্রীতদাসদের কাছ থেকে। বলাবাহুল্য সেগুলো খনির অপরিশুদ্ধ সোনা ছিল না, ছিল পরিশুদ্ধ ও গালানো সোনার গহনা। সেই সোনা থেকে তখন খাস ইংলণ্ডে নির্মিত হত স্বর্ণমুদ্রা। সেই থেকেই ওই স্বর্ণমুদ্রায় নাম হয় গিনি। যে সময়ে ইংরেজ বণিকেরা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এবনি কাঠ ও সোনা পাচার করত সে সময়ে তাদের প্রধান বাণিজ্য ছিল, শৃংখলিত ক্রীতদাসের ব্যবসা করা। তিন শ' বছরে তারা আমেরিকায় চালান দেয় পঞ্চাশ মিলিয়ন অর্থাৎ পাঁচ কোটি ক্রীতদাস।

প্যারিসে প্রদর্শিত নিগ্রো আর্টের মেলায় ঐতিহাসিক ও সূক্ষ্ম কাজের আর্ট নিদর্শন দেখেছি বেশীর ভাগই নাইজেরিয়া আর কংগোর। কাঠের খোদাই এবং তার ওপর বিভিন্ন রঙের সমাবেশ দেখা যাবে কংগোর শিল্পগুলিতে। বলাবাহুল্য অধিকাংশ নিগ্রো আর্টই নির্বাক নয়। শিল্পীর নিখুঁত শিল্পপ্রচেষ্টায় তাই মনে হবে কাঠের মুখোশগুলোও যেন কিছু একটা বলতে চাইছে। তাদের মুখভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে সবাক প্রতিধ্বনি। মুখোশ-গুলো আপাতভাবে বীভৎস হলেও বেশ জীবন্ত, আর এখানেই হল নিগ্রো আর্টের সার্থকতা। কোনো কোনো শিল্পসমালোচক মনে করেন যে, একালের ইউরোপীয় কিউবিজম আর্ট অনেকটা নিগ্রো মুখোশ আর্টেরই নকল। জানি না এর পেছনে কতখানি সত্য লুকিয়ে রয়েছে, তবে নিগ্রো আর্টের প্রভাব যে কিউবিজমে বিস্তার করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নিগ্রো আর্টের যতই প্রচার হচ্ছে ইউরোপে ততই নিগ্রো আর্টের ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। গত পাঁচ-দশ বছরে এই ব্যবসা এতই ফেঁপে উঠেছে যে, পুরোনো নিগ্রো আর্টের নিদর্শন প্রায় বাজার থেকে উধাও। তাই একদল ব্যবসায়ী পুরোনো আর্টের নকল নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। কাঠের খোদাই ও মুখোশ আজকাল পশ্চিম আফ্রিকার অনেক গ্রামেই তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলোর গায়ে ধুলো বালি ইত্যাদি মাখিয়ে পুরোনো নামে অভিহিত করে ইউরোপ-আমেরিকার আর্ট গ্যালারিতে বেশ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। প্যারিসের কলেজ পাড়ায় র‍্যু দ্য সেন্ এর এক অন্ধ গলিতে একদিন দেখেছি এক গুদামে জমা করে রাখা কয়েকশত কাঠের খোদাই ও মুখোশ। ওগুলো সদ্য চালান এসেছে আফ্রিকার গ্রাম থেকে। সেগুলো কিনবে ইউরোপীয় বণিকেরা। এবং তারা সেগুলো বেচবে চড়া দামে ইউরোপ-আমেরিকার সৌখিন সংগ্রাহকদের কাছে।

বাম্বারা জাতির কোন এক অজ্ঞাত শিল্পীর তৈরি নারীমূর্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে প্যারিসে মাত্র চারটি আর্ট গ্যালারি নিগ্রো আর্টের ব্যবসা করত। আর এখন সেখানে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে পঁচিশে। দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন চিত্রপটের মতই আজকাল কিছু প্রাচীন নিগ্রো মুখোশ লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই সেদিনও বিক্রি হল আড়াই লাখ টাকায় পনেরো শতকের বেনী মুখোশ। জনৈক মার্কিন শিল্পপতি মিঃ টিশ্‌ম্যান বছরের মধ্যে দু' মাস কাটান প্যারিসে শুধু এইসব দুষ্প্রাপ্য নিগ্রো আর্ট সংগ্রহার্থে। ইনি নিউইয়র্কে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহশালার জন্য অনেক দুষ্প্রাপ্য নিগ্রো আর্টের জিনিসপত্র কিনেছেন। তাঁর মতে, রোমান বা গ্রীক শিল্প সংগ্রহের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এখন নিগ্রো আর্ট সংগ্রহের দিন। এর থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে নিগ্রো আর্টের ব্যবসায়ীদের বেশ সুদিন এসেছে। তাদের ব্যবসাটা ফেঁপে উঠেছে। তবে চিত্র-সমালোচকরা বলেছেন যে, তাঁদের ব্যবসা খুব বেশী দিন টিঁকবে না। কারণ একালের নিগ্রো আর্টিস্টরা তাঁদের সেকেলে শিল্প-প্রথা ছেড়ে ইউরোপের অতি আধুনিক স্টাইলের অনুকরণ শুরু করে দিয়েছেন।

নিগ্রো আর্টের কাঠ খোদাই, কাঠের মূর্তি ও মুখোশগুলো আজকাল তৈরী হয় অতি নরম কাঠে। একটু ধাক্কা লাগলেই ভেঙে যায়। আগেও হাল্কা কাঠে নির্মিত হত। তবে কিছু হত এবনি কাঠে। কাঠের পুতুল ও মুখোশগুলো কিন্তু শিল্প চর্চার জন্যে নির্মিত হত না। ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্যে, আত্মা বা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে প্রতীকস্বরূপ মূর্তি ও মুখোশ নির্মিত হত। এই শিল্পগুলিকে মোটা-মুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা চলে। সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত কিছু কাঠের পুতুল ও মুখোশ যেমন ধান কাটা উৎসব, সন্তান লাভের উৎসব ও মৃত্যু উৎসব। আরেকটা উৎসব ছিল মৃত আত্মাদের নিয়ে।

নিগ্রো আর্টের সংগ্রহশালার মধ্যে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম ও প্যারিসের কলোনিয়াল মিউজিয়মই উল্লেখযোগ্য। প্যারিসের কলোনিয়াল মিউজিয়ম-এর নাম বদলে রাখা হবে মিউজিয়ম অব আফ্রিকা অ্যান্ড ওসেনিয়ান।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

(ক) ফরাসী, রুশ, আমেরিকান, চীন বিপ্লব এবং আগস্ট আন্দোলনের তারিখ কি কি?

(খ) কারা সর্বপ্রথম কংগ্রেস সভাপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সেনাপতি (বিমানবাহিনী), ইঞ্জিনীয়ার এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সম্মান পান?

বিনীত
শিখা দাশগুপ্তা
আলিপুরদুয়ার।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) লাইডিস্টেটর, ইনকিউবেটর, ইনসিনারেটার, স্পেটোমিটার এবং ল্যাক্টো-মিটার কি?

(খ) কলকাতা, গোহাটি, কাশ্মীর, উত্তরবঙ্গ, ওসমানিয়া এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

বিনীত
মান্তু দাশগুপ্ত
আলিপুরদুয়ার।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পৃথিবীর কোন্ দেশে সর্বপ্রথম কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত হয়?

(খ) ভারতে কবে আনুষ্ঠানিকভাবে রেলগাড়ীর প্রবর্তন হয় এবং কোথা থেকে কোন্ পর্যন্ত?

বিনীত
সুভাষ, স্বপন, রঞ্জু দত্ত
বাদামপাহাড়, ওড়িষা।

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) কসমিক রশ্মি ও বেতার-তরঙ্গ কি?

(খ) পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার কে প্রথম পেয়েছেন এবং কি জন্য?

বিনীত
শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা—৩১।

●

সবিনয় নিবেদন,

ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেতারকেন্দ্র কোনগুলি এবং কবে স্থাপিত হয়েছে?

বিনীত
বাবলু দাস ও বাচ্চু গুহঠাকুরতা।

সবিনয় নিবেদন,

(ক) শিয়ালদহ স্টেশন কত সালে তৈরি হয়? (খ) বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ফুটবল স্টেডিয়াম কোনটি? (গ) ঝরিয়া কয়লাখনির আবিষ্কর্তা কে?

বিনীত
দীপক মুখার্জি
সাকচী, জামসেদপুর

●

সবিনয় নিবেদন,

কলকাতা শহরে মোট কয়টি হাসপাতাল আছে এবং সর্ববৃহৎ কোনটি?

বিনীত
সুপ্রভাত মুখার্জি
বসিরহাট

●

সবিনয় নিবেদন,

রিজলী, রিভারলি, শেরিং ও ওলডহাম সাহেব কে ছিলেন? তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে উৎসুক।

বিনীত
সাধনকুমার মণ্ডল
হাওড়া

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) পশ্চিমবঙ্গে মোট কয়টি পলিটেক-নিক স্কুল আছে?

(খ) কোন কোন বোলার টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেছেন?

(গ) লন টেনিস ও টেবিল টেনিস খেলার প্রবর্তক কে?

(ঘ) টেস্টে টেড ডেক্সটারের ব্যাটিং ও বোলিং-এর হিসাব কি?

বিনীত
সুশান্ত বসু, রূপময় রায়, রবি বসু
বেলিয়াতোড়

●

সবিনয় নিবেদন,

(ক) গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য কত?

(খ) পূর্বে ভারতের অঞ্চলগুলিতে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত কত ইঞ্চি?

(গ) "কম্যান্ডো-এল্" এই কথাটির সম্পূর্ণ মানে কি?

(ঘ) "লিটিল্ ডাচ্ গার্ল" এবং "নর্থ টু এলাস্কা" এই দুটি আধুনিক ইংরেজী গান কে গেয়েছেন?

(গ) ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়কবৃন্দ "কাসকেসড"-এর প্রথম রেকর্ড কোনটি?

(চ) "ম্যারিনা"-রচয়িতা ডাচ সুইং কলেজ ব্যাণ্ড এবং "কাম সেপ্টেম্বর" রচয়িতা গীটারীস্ট গ্রুপ জেট-লাইনার এদের মধ্যে কোন দল শ্রেষ্ঠ?

(ছ) চীফ্ অব স্টাফ্ এয়ার মার্শাল স্যার চার্লস এলস ওয়ার্দি কোন দেশের বিমানবহরের সর্বাধিনায়ক?

বিনীত
রাহুল বর্মন,
ত্রিপুরা

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১৮ই কার্তিকের অমৃততে শ্রীরাহুল বর্মণের (ক) এবং ২৫শে কার্তিকের অমৃততে আবার ওঁর (১) নম্বরের প্রশ্নের উত্তরে জানাই 'এ্যান্টি-পোডস' কথাটা এ্যান্টি-পোড্-এর বহুবচন। এ্যান্টি-পোড কথাটির অর্থ হলো পৃথিবীর এক স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক তার বিপরীত স্থান। উত্তর-মেরুর এ্যান্টি-পোড হলে দক্ষিণ মেরু। অবিভক্ত বাংলার ঠিক কেন্দ্রস্থলের এ্যান্টিপোড্ হলো প্রশান্ত মহাসাগরের সালে গোমেস নামে একটি দ্বীপ। নিউজিল্যাণ্ডের কিছুটা উত্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে এ দ্বীপ অবস্থিত। এই শব্দটির ইংরেজীতে একই বানানে (Anti-podes) দুটি উচ্চারণ রয়েছে, একটি এ্যান্টি-পোডস্ ও অপরটি 'এ্যান্টি-পোডিজ'। এ্যান্টি-পোডিজ কথাটি ব্যবহার হয় মানুষের ক্ষেত্রে যেমন ভারতীয়দের এ্যান্টিপোডিজ হবে আমেরিকীয়রা (দক্ষিণ) আবার অপরপক্ষে তাদের এ্যান্টিপোডিজ হচ্ছে ভারতীয়রা। আবার দু-দলকেই একত্র করেও বলা যায় এরা এ্যান্টি-পোডিজ। এর একটি বিশেষণও আছে এ্যান্টি-পোডাল।

অস্কার ওয়াইল্ড্ তাঁর বিবাহের পর স্ত্রীকে লেখা একটি পত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ছিলেন আইরিশ, ডাব-লিনের মানুষ কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল লণ্ডন। বিবাহের পরই কিছুদিন স্ত্রীকে তাঁর মার কাছে ডাবলিনে রেখে দেন। তিনি তখন পত্রে লিখেছিলেন,— Here am I and you are in the antipode. এটা অবশ্য নিতান্তই কবি-কল্পনা শুধু বিরহী প্রেমিকের ভাব প্রকাশ, তা নইলে লণ্ডন আর ডাবলিন এ্যান্টিপোডস্ নয়।

বিনীত
শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত
মাদ্রাজ

●

সবিনয় নিবেদন,

৩০ সংখ্যার শ্রীমৃণালচন্দ্র দত্তের (৪) প্রশ্নের উত্তরে জানাই, পাঁচ-এ পঞ্চবাণ হইল মদনের পঞ্চশর—যথাঃ—সম্মোহন, উন্মাদন, স্তম্ভন, শোষণ ও তাপন। এবং আটে অষ্ট বসুর অর্থ হইল—অষ্ট গণদেবতা যাঁহারা শান্তনু-গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ভীষ্ম একজন।

৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্যামল সান্যালের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সূর্যরশ্মি তড়িৎ অনুযুক্ত বায়ুস্তরগুলির ভিতর দিয়া পৃথিবীতে আসিবার সময় উহার নীল আলো বায়ুর স্তরগুলি শুষিয়া লইয়া তাহা বিকিরণ করে। ইহার ফলে নীল দেখায়।

বিনীত
শ্রীরমাকান্ত মণ্ডল
তালদি, ২৪-পরগণা

লবন পারাবারের তীরে

আব্দুল আজীজ আল আমান

।।এক।।

হারুণ আল ভেঙে এগুচ্ছিল। দারুণ ফুর্তিতে এগুচ্ছিল। যেমন কিনা মাথায় গাঁজলা নিয়ে ঝোরা জল লাফিয়ে লাফিয়ে নামে জোলে। যেমন কিনা কদম কেটে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটে। বর্ষার মাঠে কাদা ছিল আর তাতেই হারুণের ফুর্তির লাগামে টান পড়ছিল।

হাই—এত জোরে ছুটছিস কেন? কার কাছে যাবি?

নিজের মনকে শাসাল হারুণ, তার মানে? কী বলতে চাস? তবুও মনটা বাঁকা পথে মোড় নিয়ে তাকে শুধোয়, কে আছে তোর? আব্বা?

না।

আম্মা আছে?

না।

ভাই আছে?

না।

বোন আছে?

না।

তবে? তবে যে কাদা মাঠ ভেঙে অত জোর ছুটছিস? কাকে এ সংবাদ দিবি?

চিন্তার টুঁটি চেপে ধরল হারুণ, যেমন পাটবনের ধারে শিয়াল এসে গপ্ করে মুরগী ধরে।

আছেই ত। আমার সব আছে।

হাতের মুঠোয় তিনটে মেডেল। ছিল গলায়। ছুটতে অসুবিধা [illegible] বলে এখন হাতে নিয়েছে।

এ মেডেল কার?

তার।

তার?

হ্যাঁ—তার।

কার মেডেল?

তার।

কার মেডেল?

তার। তার। তার।

আঁধার রাতে বটগাছের তলা দিয়ে যাবার সময় আকাশের তারা দেখার মত এসব কথা তার মনে ভাসছে আর ডুবছে। জ্বলছে আর নিবছে।

অ, সে বুঝি তোমার—

হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। বাস হল ত?

তবে দৌড়োয়।

দৌড়োবই ত।

আর কী আশ্চর্য, মনে হওয়া মাত্রই, সেই মেঠো আল পথে দৌড় শুরু করল হারুণ মোহাম্মদ।

ইমতাজ চাচা মাদ্রাসার মিটিং-এ গিয়েছে। তার ফিরতে দেরী হ'বে। হেড মৌলানার সঙ্গে কী-সব কথাবার্তা আছে। সেক্রেটারী অনাথবাবুও আজ এসেছিলেন মিটিং-এ। আর অত লোক?

মাদ্রাসাটা নাকি এবার সরকারী সাহায্য পাবে।

কে—বাবা হারুণ নাকি গ?

গাঁয়ের সড়কে পা দিতেই ওমজেল শেখ শুধাল।

হাত তুলে সালাম করে মুঠো খুলল হারুণ। আর তিনটে মেডেল একসঙ্গে ঝিকমিকিয়ে উঠল।

এই তিনটে পেয়েছ বুঝিন?

আর একটা সোনার মেডেল পাব পরে।

অ।

আহ্দ দিলে দেরী করে।

আল্লা তোমার হায়াত দরাজ করুক। গাঁর মুখ উজ্জালা করেচ। দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে মেঠো পথে নামল ওমজেল শেখ, আর আমার তিনটে হয়েচে বুনো শোর। দুটো ত ও মুখোই হ'ল না। যদি বা একটা গেল—কাদায় থেবড়ে বসে আছে চার বছর।

যেন চান্নী রাতে চোখ জেবলে আম কুড়োনো। পাতার ফাঁক দিয়ে চাকা চাকা আলো আছড়ে পড়েছে আমতলায়। উল্লাসে মার চোখ শেষ রাতে নেচে উঠল একসঙ্গে, ঐ ত পাকা আম। না পাতা। ঐ ত আম গ। না—ঢিল। ঐ ত পাকা আম। এবার হাত দিয়ে না ধরে পায়ে ঠেলে দিলে। হ্যাঁ আম ত। না—ও পিঠটা পাখীতে খেয়ে আঁটি সার করে দিয়েছে।

দিষ্টি বিব্ভোম্। হারুণ যেমন বল্লে। বলে আর ব্যথা পায়। এই মরা বিকেলে চোখ জেবলে হারুণ মোহাম্মদ মনের কলমবাগানে আম কুড়ুচ্ছে।

ঐ ত সখিনা!

সেবার বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুনোর দিন সখিনা সারা বেলাটা ঐ গাছটার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক বুক উল্লাস বয়ে

দ্রুত পায়ে ফিরছিল হারুণ। 'চোপ্' বলে দারুণ চমকে দিয়ে হাসতে হাসতে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সখিনা।

ও-রে—

না, সখিনা নেই ওখানে।

ঐ ত সখিনা।

ঠিক বলেছি। দুপুরের এককাঁড়ি এঁটো থালা-বাসন নিয়ে মাজতে বসেছে পুকুর-ঘাটে। ঠিক চাচী পাঠিয়েছে। হাতের মেডেল-গুলো একবার দেখে নিয়ে হারুণ এগুল।

সখিনা নয়—শাম্মু ভাবী।

পানকৌড়ি-ভাবনারা আবার ভেসে উঠে মুখ তুলল, ঐ ত সখিনা।

গোয়াল ঘরে সাঁজাল ঠিক করতে পাঠিয়েছে চাচী। ঠিক ঠিক। বড় উঠোন পেরিয়ে বাড়ী যাবার আগে সাঁ করে গোয়াল ঘরে ঢুকে হক-চকিয়ে গেল হারুণ। গাইয়ের বাঁটে মুখ লাগিয়ে দুধ টেনে টেনে খাচ্ছে উত্তরপাড়ার লুৎফর। চমকে উঠে হারুণের পা জড়াল, ছোট্ ভাই—চাচাকে বল না। আর কখনো খাব না। কখনো—

সখিনা নেই ওখানে।

ইচ্ছে হ'ল বুক ফাটিয়ে ডাক দেয়।

চাচীর ভয়। সৎ না হ'লে মেয়েটার ওপর অমন আজাব চালাতে পারে। মরুক গে—তার কী? সখিনা কে? চাচা কে? চাচী কে? দয়া করে বাড়ীতে থাকতে দেয়, খেতে দেয়—এই ত? তা' না হ'লে আজকে এমন দিনে—

বাড়ীর ভিতরে এসে হারুণ সত্যই রেগে উঠ্‌ল। গেল কোথায় সব! মরা বাড়ীটার ওপর কেউ কাফন চাঁড়িয়ে দিয়েছে। চাচা গেছে মিটিং-এ, তাই চাচী এখন উদোম গরু। কিন্তু সখিনা?

জামাটা খুলতে খুলতেই ঘরের ভেতর ঢুকল।

আই—সখিনা!

বুকটা ধক করে উঠে যেন লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে।

আই—সখিনা!

নামাজের পাটিতে বসে সেজদায় গেছে। শোক্‌রানার নামাজ (শুভ সংবাদের পর যে নামাজ পড়া হয়) আদায় করছে সখিনা।

নিমেষে এই এত কথা বৃত্তপথে চক্কোর দিয়ে ঘুরছে। মালার মত তার কণ্ঠদেশকে বেষ্টন করে কথাগুলো বারবার উঠ্‌ছে আর নামছে। ঠিক সেই কথামালার গপ্পের মত, শিয়ালের টুনটুনি পাখীর ছানা খাওয়ার মত। ছিলাম রাখাল, গেলাম পাঠশালায়, এলাম মাদ্রাসায়, পেলাম মেডেল। ছিলাম—। এর মাঝখানের সবটুকু শূন্য জায়গা জুড়ে সখিনা। জামা, খাতা, কাপড়, বই, চোখের জল—সবতাতেই ওর স্পর্শ। সখিনা আর চাচা। চাচার সহানুভূতি আর সখিনার প্রাণ।

সালাম ফিরাতেই সেই নামাজের পাটিতে জড়িয়ে ধরল হারুণ, বা বেশ মানিয়েছে—না?

আঃ ছাড়। মোনাজাতটা (প্রার্থনা) করি।

গলায় দিয়েই মোনাজাত কর্। ও মেডেল তোর। আমি ত নাম মাত্তর—

বুকের ভিতর আবেগ উল্লাসের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আজ সারাদিন ধরেই ত এই মুহূর্তের প্রতীক্ষা। কিন্তু কিছুই প্রকাশ পেল না। যেমন অন্য সময় প্রকাশ পায় না। মেয়েটা চিরকালই এমনি।

কাবা শরীফের দিকে দু'টি কোমল হাত তুলে প্রথমে কাঁপাল। তারপর মোনাজাত করবে কী কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। শব্দ হচ্ছে না। শুধু আনারের দানার মত পরিষ্কার জলের ফোঁটা পড়ছে টপ্‌টপ্। আজ মা থাকলে!

চাচী মেরেছে বুঝি?

বোকার মত প্রশ্ন করে হারুণ আরো বোকা হ'য়ে গেল। স্পষ্টতই সে উপলব্ধি করল এই মহৎ পরিবেশে তার প্রশ্নটা একটা কুৎসিত পোকার মত মুখে ময়লা ঠেলে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু একটা বলতে হয়।

সখিনা তেমনি হাত তুলে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

হারুণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল। সে যেন পুতুল। বাজিকর আর তাকে নাচাচ্ছে না। বাজিকর এখন কাঁদছে। আর পুতুল, ঠিক তার পাশে, তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কান্নার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছে। করতে করতে সে নিজেও ভিতর থেকে কেমন ভিজে যাচ্ছে। হারুণ বুঝল, তার চিন্তারা আবেগের তাড়নায় ক্রমাগত সংকুচিত-প্রসারিত হ'য়ে, রক্তের কণাগুলোকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। তারপর ভরা কোটালে, গাঙের জল ফুলে যেমন সাঁড়াসাঁড়ির বান ডাকে, পা থেকে হাটু বুক-গলা পেরিয়ে সেই বানের ঠেল লাগল চোখে।

হাই—তুই কাঁদলে আমি কাঁদব।

আর মনে হ'ল না সখিনা কে? হাত নয়—একেবারে সখিনাকে জড়িয়ে ধরে বেয়াড়া পুরুষালি শব্দে কেঁদে উঠ্‌ল।

আঁচল দিয়ে সখিনা চোখ মুছাল, অই দেখ—সন্ধ্যে বেলাটা কাঁদে কী করে? বলেই সে নিজে আরো জোরে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ল।

এমন হওয়াটা উচিত ছিল না—অথচ কেমন করে আপনি-আপনি হ'য়ে যাচ্ছে।

হাত দিয়ে চোখ মোছাল হারুণ, আগে তুই থাম্।

ও জাহান্নামী (নরকের জীব), কোথায় গেলি উড়ে পুড়ে।

চাচী ফিরল বাড়ীতে। মগরিবের সময় হ'য়ে আসছে। চাচা বাড়ীতে ফিরবে। তাই এল।

হাঁস-মুরগী, বাঁস উঠান, সাঁজ-বাতি —অ রে, অ ওলাউঠা—

আগে বেরিয়ে এল সখিনা। তারপর সুড়ুত করে ঘর থেকে বাঁশতলার দিকে মুখ করল হারুণ। বড় ছোটর মিলিয়ে সাতটা গরু বাঁধা রয়েছে।

গোয়াল ঘরে গরু তুলতে তুলতে হারুণ বুঝল ঝড় এখনো থামেনি। শাখা-প্রশাখা ঝাপ্টা দোলায় আন্দোলিত হ'চ্ছে।

আসুক সে লোক বাড়ী। মুচি-খাদাল বা হোক একটা দেখুক। মা গ—সারা বেলটা। আঁ—সারা বেলাটা দু'জনে—ছিঃ ছিঃ। স্বভাব যায় না মলে, ইল্লত যায় না ধূলে। রাখালের ছেলে রাখাল—আবার মৌলবী কোলেছে (হ'য়েছে)। মুখে মারি ঝাঁটা—

।। দুই ।।

অপরিচিত পরিবেশ। তা' হোক।

অসুবিধে হ'চ্ছে কোন?

হারুণ মনে মনে খতাল, একটা গ্রাম্য ছেলে সেই পরিবেশের মধ্যে মণি—রাজকুমার। শেকুল বনের মধ্যে কতবারের দেখা সেই অপরিচিত ফুল, সুবাসে-ঘ্রাণে একপাল প্রজাপতি আকৃষ্ট হ'য়ে জমেছে। ঘুর-ঘুর করছে চারপাশে। সবাই হারুণের সঙ্গে আলাপ করবে। প্রথম প্রথম, প্রথম দিনটাতে বিশেষ করে, ভর্তির ব্যাপার শেষ করে, অনাথবাবু চলে যেতে হারুণ কিছুটা বিব্রত আর অসহায় বোধ করেছিল, এখন সামলে নিয়েছে।

ভীড় বাড়ছে। আরো বাড়বে। দশমীর চাঁদ। তাকে ঘিরে এক আকাশ তারা মিট-মিট করছে। নির্জন সন্ধ্যায় ফিস-ফিস করে কথা কইছে, হারুণ ভাই—বাড়ীতে তোমার কে?

হারুণ সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসল।

অনাথবাবু সব ঠিক করে দিয়ে গেছেন। মাইনে লাগবে না। স্কলারশিপ পাওয়া যাবে; সামান্য কিছু টাকা মাসে মাসে হোস্টেলে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

হারুণ অত সব ভাবে না। এ ভার যাঁরা নিয়েছে তারা ভাববে। কেবল, কেবল—

একটা মৃদু শ্বাস মোচন করল হারুণ।

অনাথবাবু আর চাচার কথা মনে পড়ল। কবুতরের মত আলতোভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে অনাথবাবু বলেছিলেন, মানিক, আমার মানিক। এই ছেলেকে যদি ভাসিয়ে দিলা! আমাকেও যদি ভিক্ষে করতে হয়—যা' তাঁর ইচ্ছে!

পাশে বসে রুদ্ধ আবেগে চাচা বলেছিল, আল্লাহু। ভিজে ভিজে শব্দে অশ্রুর স্পষ্ট ছাপ ছিল।

সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে এতসব কথা মুহূর্তে মনে পড়ল। মনে পড়ে মেঘের তলায় ঢাকা পড়ল। স্মৃতির মেঘ। মেঘ কাটলে যেমন সূর্য বেরোয়—সখিনা বেরুল। হায়, হায়—

বাড়ীতে হ'লে, দলুজে বসে পড়তে পড়তে কতদিন এমন হয়েছে, সখিনার কথা দুলে উঠতেই, হ্যারিকেনটা কমিয়ে দিয়ে, আঁধার-আঁধার ঘরে বিছানায় গড়াগড়ি খেত।

এখানে, হোস্টেলের এই ছোট ঘরে আরো তিনজন পড়ছে। তারা কী ভাববে! হারুণ সংযত হ'ল। আর সংযত হ'তে গিয়ে তার খুশীরা দারুণ চড় খেয়ে কিছুটা আহত আর নিস্তেজ হ'ল।

কোনার ঐ ছেলেটির বাড়ী পশ্চিম দিনাজপুর। আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লিখছে বসে বসে। পাশের ছেলেটি কাত হ'য়ে বসে কী একটা মস্ত কেতাব দেখছে। হারুণ আবার নিজের বইয়ের দিকে চোখ ফেরাল। আর সেই—

মেঘ ফেটে রোদ বেরুল। সখিনা কাঁদছে।

কোত্থেকে এই এতোগুলো খুচরো টাকা ন্যাকড়ায় বেঁধে বাক্সে ফেলে দিল। তার ওপর খাতা-বই, চাদর, বালিশের ওয়াড়, 'আল্লা'—একটা ফুলের পাশে লাল সুতোয় গাঁথা শব্দটা টকটক করছে। সারা সপ্তা ধরে ওয়াড়টাকে একটু একটু করে রূপ দিতে দেখেছে হারুণ।

অই—কী দিলি এক পোঁটলা?

দুটো লুঙ্গি আর একটা গেঞ্জি দিয়ে বাক্স বন্ধ করল সখিনা। কথাটা কানে করল বুঝি। বলল, আমার ভারি ভয় করে।

কেন ভয় করে?

তারপর কখন দেখলাম?

হ্যাঁ বাড়ী থেকে বেরুনোর সময়। এক বাড়ী মানুষের মধ্যে সখিনাকে দেখা যায় নি। কলম আনতে ঘরে এসে এই মূর্তিকে দেখলাম।

সখিনা কাঁদছে।

কেন ভয় করে বললি না ত?

চুপ করে বসে পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াল। সারা গা-হাত-পা শির শির করে হারুণের। উষ্ণ অশ্রুর ফোঁটা তখন পাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

কই বললি না ত—কেন ভয় করে?

অনেক চেপে চেপে সখিনা বলল, বিসমিল্লা বলে পা তোল। উঠোন বোঝাই মানুষ—যাও।

সখিনা হাসছে। হো হো করে হাসছে।

হারুণ দেখতে পায় নি—কেবল শব্দ শুনেছিল। হাসির শব্দ—বেশ মজার হাসি। আর হাসতে হাসতেই বলেছিল, কুপোকাত।

ইমতাজ চাচা ঘর থেকে বার হ'য়ে এল। হারুণের চাচা, গ্রাম সম্পর্কে চাচা। শুধাল, কী হ'ল তোদের? হারুণ কই?

ইস্ কত জোরে যে সখিনা হাসছিল!

ঐ যে আব্বা—কুপোকাত। ডিগবাজী খেয়ে একেবারে—

সন্ধ্যেবেলা রোয়াকে পড়তে বসেছিল দুজন। খুব ধার ঘেঁষে বসেছিল হারুণ। শরীরের বেশ কিছু অংশ ঝুলেছিল। তারপর পড়তে পড়তে এক সময়, গোড়া কাটা গাছ যেমন ধীরে ধীরে কাত হয়, বিছানা সরে গিয়ে হারুণ তেমনি করে কাত হ'ল। তারপর সামলাবার চেষ্টা করতে করতে বে-কায়দা রকম হাত-পা ছুঁড়ে ঝুপ করে রোয়াক থেকে নীচেয়। বিছানা ঝুলে গেছে। হারিকেন উল্টে গেছে। আর হো হো করে হাসছে সখিনা, কী মজার ডিগবাজী!

নিজের পৌরুষবোধের সঙ্গে যুদ্ধ করে এতক্ষণ যন্ত্রণা সামলাচ্ছিল হারুণ। এবার কাতরে উঠলো।

হ'ল কী—আঁ? সখিনা ততক্ষণে লাফিয়ে নীচেয় পড়ছে। উঠছ না কেন?

জাবনা-কাটা বঁটি ছিল ঠেস্ দেওয়া। হাঁটুর নীচেটা কেটে একাকার। রক্ত দেখে পাগলী মেয়েটা যেন কবুতর হ'ল। জবাই করা কবুতর। তাকেই জবাই করে মাটিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডানা ঝাপ্টাতে ঝাপ্টাতে চেঁচাল, মরে গেছে গ—

খুব বড় একটা শ্বাস চেপে চেপে একেবারে মিহি করে ফেলল হারুণ। পড়া আজ হয়েছে। কোন দিন-ই বা হয়? এসে থেকে এই অবস্থা। বইগুলো, এই এত বড় বড় চামড়ায় বাঁধান কেতাবগুলো, সব সখিনা বানু। গোটা কলকাতাটাই সখিনা বানু। তওবা, তওবা—

দু'পা ঘরে এসে হারুণ আবার পড়তে বসল।

ছিলাম রাখাল, গেলাম পাঠশালায়—

কী ছিলাম?

রাখাল। হ্যাঁ—রাখালই ত। বাপ-মা মারা যাবার পর খেতে পেতাম না। ঐ ইমতাজ চাচাই বাড়ীতে ঠাঁই দিলে। শুধু গরু-বাছুরগুলো চরাতাম, দু'বেলা ভাত পেতাম। খেয়ে বাঁচলাম।

তারপর?

হ্যাঁ—ঐ দখিনের মৌলভী এল। যেমন ইমতাজ চাচার বাড়ীতে আসে ফি বছর। সেবার—সেই সন্ধ্যেবেলা উনিই জোর করে কাছে বসিয়ে একটা আরবী কায়দা দিলেন হাতে। তারপর থেকে—

হুঁ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে হারুণ।

সেই থেকে পাঠ শুরু।

ছিলাম রাখাল, গেলাম পাঠশালায়—

ষাট্—রাখাল কেন, বাড়ীর কাজ কী কেউ করে না? এই গত বছরেও সখিনা বলেছিল।

ছিঃ, কে বললে রাখাল, আমি শাহাজান। দেখি খুঁজে পেতে একটা মমতাজ যদি পাই—

কুল গাছের পাতা কাঁপছিল। শীতের হাওয়ায় তির তির করে উঠছিল পাতাগুলো।

ঠিক জানলার পাশেই গাছটা। নারকুলে কুলের গাছ। ভারি মিষ্টি কুল। আঁটিগুলো এই এত্তোটুকু। আর এই আঁটি নিয়ে কী কাণ্ড!

কী কাণ্ড?

সখিনা তার হাতের দাগটা দেখল। বয়সকালে নাকি মিলিয়ে যাবে—কই মিলিয়েছে গ?

মনটা যেন কাঁসার ঘণ্টা। কখন বেজে গেছে। অথচ কান পাত। কেমন টাটকা আওয়াজ। ঠিক ওপরের বাতাসটায় কাঁপন

ঝাঁপির ঝিঁ ঝিঁ করে বাজছে। কান পাত। হ্যাঁ—ঠিক শুনতে পাবে।

কই উঠবে ত, ভাত খাবে না। মা ডাকে।

অকাতরে ঘুমোচ্ছিল হারুণ। সারাদিন মাঠে খাটাখাটনি করে। অতটুকু দেহ ধকল সইতে পারে না। সখিনা যে তা বোঝে না এমন নয়। কিন্তু ঘুমোর ঘুমুক—গাল হাঁ করবে কেন। মা গ—অমন করে ঘুমুলে কী ঘিচ্ছিরি লাগে। ঘুমন্ত হারুণের গাল ধরে আগে কয়েকবার বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ছেড়ে দিলেই যে কে সেই। যেন টানা দেওয়া আছে। অদৃশ্য সেই টানে গালটা আপনি হাঁ হ'য়ে খুলে যাচ্ছে।

মা গ। ইস্—টাকরা পর্যন্ত দেখা যায়।

আজ সখিনা গালটা বন্ধ করল না। প্রথমে একটু হাসল। তারপর উঠে গিয়ে কুলের আঁটি নিয়ে এল। আজ দুপুরেই এই এত্তো কুল খেয়েছে দু'জনে। নুন দিয়ে ঐ দোরাকে বসে।

দ্বিতীয় আঁটি ফেলেও বেশ আমোদ পাচ্ছিল সখিনা কিন্তু তৃতীয় আঁটি ফাঁকা গালে চালান করে ঈষৎ ভয় পেল, গলায় বেধে যাবে না ত?

গালটা তেমনি হাঁ হ'য়ে আছে। ঘুম ভাংছে না হারুণের। ভয়ে আর কৌতুকে দোল খেতে খেতে চতুর্থ আঁটি উন্মুক্ত মুখবিবরে দিয়ে প্রথমে শঙ্কিত হ'ল, তারপর ঠেলা দিল, কী ঘুম। একেবারে পাথর।

ঘুম থেকে উঠে বসে প্রথম হকচকিয়ে গেল হারুণ। এমন করে হাসছে কেন সখিনা। ঘুমের আমেজে তখনো চোখ শিব নেত্র হয়ে আছে। তারপর গাল বন্ধ করতে গিয়ে কিছুটা বুঝল। বারকয়েক চিবুতে গিয়ে ঘুমের আমেজটা নষ্ট হ'ল। আর তখন—

আই।

খিল খিল করতে করতে সখিনা ছুটে পালাচ্ছে।

আঁটিগুলো তখনো গালে রয়েছে। তীর বেগে ছুটে চুল ধরে হেঁচ্‌কা টান দিতেই উল্টে পড়ল সখিনা। ঐ ইটটার ওপর। রেশমী লাল চুড়ি ভেঙে, যেমন মাটিতে পেরেক গাঁথে, বাবা গ—

ইমতাজ চাচা এল। জায়দা চাচী এল। কী সব্বোনাশ। একেবারে খুন।

চড় তুলেছিল ইমতাজ চাচা। টুনকুচি পাখীর মত হারুণের পরাণটা এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। আমি গ আব্বা, ও নয়—আমি। হাত ধরে কাতরে উঠল সখিনা, ছুটতে গিয়ে পড়ে গিচি—

ধড়ে জান ফিরল এতক্ষণে। সুড়ুত করে পাখী যেমন বাসায় ঢোকে। গাল থেকে এবার আঁটিগুলো ফেলে দেবার কথা স্মরণ হ'ল। আপনিই পড়ে গেল।

মরেল কালে মিলিয়ে যাবে। কই গ?

হাতের গড়িছিতে দাগটা এখনো জ্বল-জ্বল করছে।

সেই কুল গাছ। সেই জানালা। কুল গাছে কত কুল। দখিনের মৌলভী বলেন বোরই। বোরই পেকে একাকার।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল সখিনা।

তুমি কবে আসবে গ? রোজার ছুটিতে? ততদিন বোরই থাকবে? রাখতে পারব ত?

ওপর লাল, ভিতর কালো,
তার মানেডা আমায় বলো।
—বল দেখি ছোঁড়ারা, বল।

জানি গ জানি। পিছনে লেগে থাকা ছেলের দল সমস্বরে চেঁচাবে, তার মানে—মাকাল ফল।

ধ্যুস্—কুত্তা। ছোট লাঠিটা নিয়ে একপাল ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে পাগলী বুড়ী। বলবে, তোমাদের মাথা। তার মানে, জায়দা বেটি।

সে কী গ?

কওসরের ব্যাটা ইমতাজ। ইমতাজের বৌ। আজও ভিক্ষে দিলে নে।

অ—তাই বলো। হ্যাঁ—তা' পরে?

পাগলী বুড়ি রেগে গেলে ঠিক কথা বলে। আর একটু ঘাটাও। বলবে—

জামাই এয়েছে? আচানক—দুকুরবেলা? তায় কী? আনাজ লেবে? যাও আমানত বুড়োর কাছে। মাছ লেবে? যাও মধু জেলের কাছে। কিন্তু ডিম আর মুরগী?

হুঁ হুঁ। তার বেলাটি যাও সখিনার কাছে। সখিনা খাতুন। হাঁস বলে হাঁস। এক্কেরে এক কুড়ি।

পাগলী আরো কী বলে। তজ্জাটের ছবি ওর নখদর্পণে।

ছোঁড়াটার ভাগ্যি ভাল। বড় বোন পেয়েছে।

অই দেখ কথা, আমিনা খালা আপত্তি করে, বড় বোন লয় মা। চরম কথা বলে আমিনা খালা, হারুণ আলীর মা। মা যেমন মানুষ করে। আহা গ—

সেই মাসে হেড মৌলানার হাতে এক বোতল কুলের আচার আর এক টিন মুড়ি পেয়ে হারুণ মোহাম্মদ চিঠি লিখল, "চাচাজী—দশ টাকা পাইয়াছি। বড় উপকারে আসিয়াছে। কয়েকটি কিতাব কিনিতে এখনো বাকী, গত মাসের জন্য হোস্টেলে আরো আঠারো টাকা দিতে হইবে। এমত অবস্থায়—

সেই শংকাতুর পরিবেশে এল সবাই। হেড মৌলানা, সেক্রেটারী, দখিনের মৌলভী, পাড়াপ্রতিবেশী, আর দু' একজন নিকটবর্তী আত্মীয়।

ইমতাজ চাচা সবাইকে ডাকিয়েছে। রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে ডাকিয়েছে। জ্বরটা ক্রমেই বাড়ছে—উপশমের লক্ষণ নেই। গত রাতে একবার অজ্ঞানও হ'য়ে গিয়েছিল।

ম্লান সন্ধ্যার কিছু আগে এলেন সবাই। অনাথবাবু ডাকলেন হারুণকে, বাবা—তোমার চাচার ইচ্ছা তো সব শুনেছ—তোমার অমত থাকলে বল।

অতগুলি সম্মানীয় মানুষের মাঝে হারুণ নত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকল। খুশীতে তার বাক রোধ হয়ে গেছে। সখিনার সঙ্গে বিয়ে! সব বলে কী! বুক উথাল-পাতাল। মন ঝোরা জল। সে কিছু বলল না। বলতে পারল না।

ইশারায় কাছে ডাকল ইমতাজ চাচা, জমি-জায়গা যা আছে, নষ্ট করো না—ঐ দেখেশুনে খেলে চলে যাবে। আর বাবা—সখিনা রইলো, সঙ্গে-সাথে রেখ—যেন কষ্ট না পায়।

দখিনের মৌলভী বললেন, অ ইমতাজ—তুমি যেন বড্ড কাতর হয়ে পড়েছ। এমন তো জ্বর-জারি কতজনেরই হয়। আগে সেরে ওঠ।

না ভাই। ম্লান মুখে হাসি উঠেই ফুরিয়ে গেল ইমতাজের, বেঁচে উঠি ভাল—মরে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু এ শুভ-কাজের আর একমুহূর্ত বিলম্ব নয়।

সখিনা যেন শ্রাবণের কাশ ফুল। মাথার উপর মেঘমেদুর আকাশ—ঘন দুর্যোগ। সেই মেঘ-গম্ভীর ম্লান আকাশের তলায় দামাল কাশের মত সখিনার মনটা দুলছে। ম্লান-বিষন্ন মুখ দেখে সজল হাওয়ায় খুশীতে লুটোপুটি খাওয়া কাশের খবর কেউ জানবে না।

মগরিবের পরই বিয়েটা হয়ে গেল। সামান্য আয়োজন, এক গ্লাস করে সরবত আর পান।

আমিনা খালা বলল, আহা—মেয়েটার হাত-পা বেঁধে যেমন চুবিয়ে দিলে।

জায়দা চাচী বলল, বেঁচে গেলুম—বোন, বেঁচে গেলুম। কেলেঙ্কারী থেকে বেঁচে গেলুম। দিনরাত—

দখিনের মৌলভী বললেন, সখিনা যেন আমার মা সখিনা। বিয়ে দিলাম যেন কারবালায়। মহরমের ইতিবৃত্ত স্মরণ করলেন দখিনের তিনি। সেই যে মেয়ে সখিনা, সবে যৌবনে পা দিয়ে চঞ্চলা হরিণী। চারদিকে এজিদ সৈন্য, হোসেনের তাঁবুতে শোকের ছায়া, জল দাও গো—

কাসিম যাবে যুদ্ধে। এজিদ সৈন্যের মোকাবিলা করতে। চাচার সাধ, তাই যুদ্ধের বেশে সাজল নওশা। এক মিনিটেই হ'ল বিয়ে। আল্লা সাক্ষী, মরুর বাতাস সাক্ষী—আমি বিয়ে করলাম সখিনাকে। তারপর—

মরুর বালু উড়িয়ে দুরন্ত ঘোড়া শত্রু-সৈন্যের মোকাবিলায় মিলিয়ে গেল।

দখিনের মৌলভী আশীর্বাদ করলেন, কারবালার ইতিহাসের মত তোমাদের জীবন নিত্য স্মরণীয় হোক।

বুঝি এ মোনাজাত আল্লা কবুল করলেন। কারবালার মাতন নামল সখিনার নতুন সংসারে।

ভোরবেলা, সুবেহ সাদেকের সময়, মসজিদে তখন ফজরের আজান হচ্ছে, লু হাওয়া সখিনার নতুন সংসারে লাগল ভাঙন।

ইমতাজ চাচা মারা গেল।

আবার প্রাইজ।

আবার মেডেল—সোনার, রুপোর। আর মানপত্র।

এবার কাগজে ফটো বেরিয়েছে।

পরীক্ষা দিয়ে হারুণ বাড়ী এসেছিল। আজ বললে, আর বাড়ী থেকে যাব না।

তখন তখন আর কিছু বলে নি সখিনা। যেমন অন্য সময় বলে না। তা' ছাড়া অতগুলো লোকের সামনে। আর ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে কে যেন হারুণকে ডেকেছিল।

সারা দিন এক রকম ছুটোছুটি করে কাটল হারুণের। সারা বেলাটা তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। লোকজন আসছে, যাচ্ছে। একেবারে নিরালায় কাছে পাওয়া গেল রাতে। কিন্তু বাইরের সব কাজ মিটিয়ে সখিনা ঘরে এসে দেখল হারুণ ঘুমিয়ে পড়েছে। সখিনা বুঝেছিল, সারা দিনের ছুটোছুটিতে হারুণ ক্লান্ত। তাই ডাকতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু মানুষটা বলে কী? লোকে বলবে কী? সব থেকে ভয় জায়দা বিবির—নিজের মায়ের। হারুণের মুখে ওকথা শুনে বিকেলে এক প্রস্থ হয়ে গেছে, বিয়ে করে বৌয়ের ভেড়ো হয়েছে। মুখে ঝাঁটা, মুখে ঝাঁটা।

হারুণের ঘুম ভাংল। চোখ মেলতেই দেখল, দু' পায়ের ওপর মাথা রেখে সখিনা কাঁদছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে। আর সেই উষ্ণ অশ্রু পায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচেয় পড়ছে।

পলকে আপন চিত্তে দারুণ আলোড়ন অনুভব করল হারুণ। বুকটা, মনটা কেমন যেন আঁকু-পাঁকু করে। মেয়েটাকে কী আমি শান্তি দিতে পারলাম না?

সবলে বুকের ওপর তুলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, তুই কেন কাঁদিস্ বল তো। কেবল কাঁদিস। জানিস না, কাঁদলে আমি ব্যথা পাই।

ভিজে মাটির মত কোমল নরম দেহ নিয়ে বুকের ওপর কেবল মোচড় খায় সখিনা। কিছু বলে না। ভিজে ভিজে মাটি যেমন নরম হয়, গলে যায়—দেহটা যেন ক্রমাগত তেমনি নরম হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অ ই কী হল—কিছু বলবি ত?

কত, কত পরে সখিনা কথা কইলো। রুদ্ধ শ্বাসে বললো, যাবে ত?

দূর্‌স্ পাগলী। নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে হারুণ বললো, এই জন্যে কান্না। একলা থাকতে পারবি?

একলা কেন—মা আছে ত।

কিন্তু টাকা, যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বললো হারুণ, অত টাকায় বই পাবো কোথায়?

সখিনা এবার নিজে চোখ মুছে উঠে বসল। বললো, ভয় কী—আল্লা আছে।

ডিম-মুরগী-হাঁস বিক্রির টাকা আর উপেক্ষার নয়। হারুণ মনে মনে খতাল, হোস্টেল আর অন্য টুকি-টাকি খরচ ওতেই হয়ে যাবে। কিন্তু ভর্তি আর বই?

সখিনা বললে, হালের গরু দুটো বিক্রি করে দাও—দরকার হয় এক বিঘে জমি।

এতক্ষণে সখিনা হারুণের বুকের ভিতর মিশে গেল। বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সখিনার মন জোনাকি হয়ে জ্বলছে। উড়ছে, বসছে, নিভছে, জ্বলছে। জ্বলছে, নিভছে, বসছে, উড়ছে। বৃত্তপথে দোল খেতে খেতে বুঝি আকাশে মিলিয়ে যেতে চায়।

তুমি দশজনের একজন হলে আমার বুকটা, মনটা—

দিনে দিনে রূপ পাল্টে সখিনা এখন অপরূপ। অঙ্গে-প্রতঙ্গে লাবণ্যের ঝিলিক। অবয়বে যেখানে যা অপূর্ণতা ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। ভরাট অঙ্গে যৌবনের মৌজ। এ অঙ্গ আর পাল্টালে বুঝি সৌন্দর্য ঝরে যাবে। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন রূপ হারায়। সারা দেহে যৌবন এমন থমকে থাক। দেখলে আর পলক পড়ে না।

আহা এমন যুবতীর স্বামী ঘরে নেই। শাহেদ আলী ঘুর ঘুর করে। ওদের একটা গাই দুয়ে দেয় সখিনা। মাসে তিন টাকা। গাই দুইতে যাবার সময় মাঠের কাজ ফেলে বাড়ীতে এসে বসে থাকে। সখিনা গেলে শুধোয়, ও সখিনা—ভাই কবে আসবে?

একলা থাক—ভয় করে না?

এই ধর একদিন রাতে গিয়ে আমিই যদি ভয় দেখাই?

সখিনা—তা একটা কথা বল।

আহা তোর গায় কী সোনা দেওয়া? এমন ঝিলিক মারে কেন?

শেষ পর্যন্ত শাহেদ আলীর গাই দোওয়াটা ছেড়েই দিলে সখিনা। ওর থেকে দুটো হাঁসের পিল বেশী পুষবে। কিন্তু তাতেও কী নিস্তার আছে। পুকুরে শামুক তুলতে গেলে কখন চুপিসাড়ে ঠিক কাছটিতে এসে হাজির, যেমন পাড়ের ঝোপ থেকে বুকে হেঁটে নিঃশব্দে পুকুরে নামে সরীসৃপ, সখিনা—দিই তোকে দুটো শামুক তুলে।

ভিজে কাপড়ে ছোপ খেয়ে যৌবন যেন আরো জেগে-নেচে ওঠে। শিকারী বাঘের মত চোখ জেবলে তাই লেহন করতে থাকে শাহেদ। একদিন। দু-দিন। তিন দিনের মাথায় এক তাল পাঁক তুলে সখিনা চকিতে ছুঁড়ে মেরেছিল ওর চোখে।

বাড়ীর পাশেই মাঠ। অলস মধ্যাহ্নে সমগ্র গ্রামখানি যখন আতুর হয়ে ওঠে, রোয়াকে বসে কাঁথা সেলাই করে সখিনা। নানান নক্‌সা করা কাঁথা। সব ফরমেসে নেওয়া কাজ। কাঁথা পিছু তিন টাকা, চার টাকা। কাঁথা সেলাই করতে করতে মাঠের দিকে তাকায়। নজরে পড়ে, মধ্যাহ্নকালীন রিক্ত প্রান্তরের শূন্য একাকিত্ব। সখিনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ধু ধু প্রান্তরের নগ্ন শূন্যতা দিগন্তে উধাও। এই পথেই মিলিয়ে গেছে হারুণ আবার এ পথ দিয়েই ফিরে আসবে।

কে বটে? ছাতি মাথায় দিয়ে কে আসছে যেন?

কাঁথা সেলাই পড়ে থাকে। সখিনা অপলকে শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল হয়। ইদানিং বাড়ীতে আসতে বড় দেরী করছে হারুণ। তিন-চার মাস পর পর কখনো সখনো আসে। কাদের বাড়ীতে যেন ছেলে-মেয়ে পড়ায়—নইলে খরচ চলে না। আর এই দীর্ঘ কটি মাস ধরে চলে সখিনার ব্যাকুল প্রত্যাশা। তিন মাস গত হলে ও যেন পাগল হয়ে পড়ে। তখন এই শূন্য প্রান্তরটুকুই বুঝি ওর কাছে আরফাতের ময়দান। প্রতিটি দিন তখন কী গভীর প্রত্যাশায় যে কাটে!

না—কেউ নয়। ছাতি মাথায় দিয়ে লোকটা হিজলডাঙ্গার দিকে চলে গেল।

সখিনা আবার কাঁথায় ফোঁড় তোলে।

আমি ত ধরে রাখব না—কেবল মুখটা দেখিয়ে চলে যাও। আসবে আর যাবে।

ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্ম ফুরিয়ে বর্ষা নামে। আকাশ সজল হয়। মেঘ জমে। ধান পাট বড় হয়। তবু একবার এলে না? আমি কি কখনো ধরে রেখেছি?

অতি দ্রুত কয়েকটা ফোঁড় তুলে ধাতস্থ হয় সখিনা, আসা বললেই আসা? যাতাযাতেই কত টাকা—?

হারুণ এল না। তার চিঠি এল। লিখেছে: অর্থের জন্যে সারা কলকাতা সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। পড়াশুনোর এত বড় সুযোগ সে জীবনে আর কখনো পায়নি। এ সুযোগ হাতছাড়া হলে—

চিঠি পড়ে উদাস হয় সখিনা। টস টস করে চোখের জল কোমল বুক স্পর্শ করে। একবার এলে না? না এসে চিঠি লিখলে? কী সুযোগ? কত টাকার দরকার?

সন্ধ্যার কিছু আগে উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা নিয়ে হারুণ এল। একেবারে অপ্রত্যাশিত। সখিনাকে দেখেই ও হাসল কিন্তু সখিনা হাসতে পারল না। একী চেহারা? সোনার অঙ্গে কালি? পলকে এক অমঙ্গল চিন্তা তার সমগ্র চেতনাকে বিদ্ধ করে বেদনায় স্থবির করে দিল। হাতের কাজ ফেলে ঘরে উঠে এল। এ ঘরে আগে ইমতাজ চাচা থাকত। এখন ওরা থাকে। জায়দা চাচী থাকে পাশের ঘরে। যে ঘরে আগে সখিনা থাকত।

ঘরে গিয়ে কুশল-সংবাদ নেবে কী নিজেকে সামলাতে অস্থির হয়ে পড়ে সখিনা।

সুন্দর প্রকৃতি

ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

আলোক লতার মত একেবারে বুকের ওপর তুলে নিয়েছে হারুণ, কী সুন্দর হয়েছিস তুই।

পুরুষের উষ্ণ পরশে গলে যেতে যেতে বুকের ওপর মাথা রেখে মৃদু কণ্ঠে শুধোয়, এতদিনে মনে পড়ল?

বল তা' হলে আর ফিরে যাব না।

পা ধোয়ার জল দিল।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে উঠে এসেই দেখল সরবত তৈরী। তক্তপোষের ওপর বসতেই আঁচল দিয় পা মোছাল সখিনা। হারুণ দেখল লম্বা দীঘল চুলের গুচ্ছ কোমর ছাপিয়ে হাঁটু স্পর্শ করেছে। আরো অবাক হ'ল হারুণ। দেখল, সেই চুলের গুচ্ছ এক হাতে ধরে পা মুছিয়ে দিচ্ছে সখিনা। আই আই—করিস কী, করিস কী! দারুণ পোষণে অস্থির করতে করতে হারুণ বললো, তুই যে বিবি রহিমা হয়ে গেলি।

তৃপ্তিতে বিভোর হয়ে স্বামীর বুকে লুটিয়ে বললো, দিলাম একদিন মুছিয়ে—মনে থাকবে তবু।

নইলে ভুলে যাব বুঝি?

ভুলেই ত ছিলে। আজ পাঁচ মাস।

কী খুশি! কী খুশি!!

মুরগী জবাই করলে। ঘরে ডিম আছে। জাল হাতে দিয়ে হারুণকে পুকুরে নামিয়ে দিলে সেই সন্ধ্যেবেলায়, যা' হোক ধর ছোট-মোট।

এতদিনে এক পরিপূর্ণ সংসারের গৃহিণী সখিনা। সকল কাজ আজ খুশির হিল্লোলে আন্দোলিত। যেমন কিনা আতসবাজি। এত আলো, এত ফুল, এত খুশি। দেহটা আজ হালকা হয়ে উড়ে যেতে চায় কেন? পুলকে পলকে সারা শরীরটা শিউরে ওঠে।

বেশ একটু রাত হয়ে গেল রান্না-খাওয়া করতে। শুতে এসে এই এতগুলো সিকি-আধুলি ছড়িয়ে দিল বিছানার ওপর। একেবারে এক পোঁটলা। কিছু এক টাকার নোটও আছে। হারুণ অবাক। এত টাকা জমিয়েছ—অ্যাঁ।

এক শো আঠার টাকা। গুনে গেঁথে হিসাব হ'ল।

আরো চাও? ডিমালোগুলো বাদ দিয়ে ধাড়ীগুলো বিক্রি করলে পঞ্চাশ টাকা হতে পারে। কিন্তু কেন?

এই প্রথম বিবরটা জানতে চাইল সখিনা।

আলো নিভিয়ে দিয়েছে। চাঁদের আলোয় পৃথিবী প্লাবিত। জ্যোৎস্নার জল ছিটিয়ে স্বর্গের ধোপা যেন আজ কুমারী পৃথিবীর বুকের বসন খুলে নিয়ে সাফ করে দিয়েছে। সেই উজ্জ্বল আলোর কিছু কণারা ঘরের কোণে আত্মগোপন করতে চাইছে। আর তারই আভাসে হারুণকে স্পষ্ট দেখা যায়। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে এই প্রথম জানতে চাইল, কেন গো—তোমার আরবী পড়া শেষ হয়েছে।

কিছু পরে, যেন তন্ময় হয়ে, হারুণ বলল, হ্যাঁ পাশ করলাম। আরবীতে এম-এ। মেডেলে ঘর বোঝাই। কিন্তু পেট বোঝাই হল কই? একটু থেমে হারুণ বলে, বিউটির আব্বা ত সব সময় এম-এ পড়ার কথা বলে। বলে, ও-সব মৌলানা হলে ভাত জুটবে না। এম-এ পড়। আইন পড়। হারুণ আরো যোগ করে, বিউটির আব্বা ত হাইকোর্টের মস্ত বড় উকীল।

জিবটা আন্দোলিত হ'ল কিন্তু কথাটা আটকে গেল। স্বর হয়ে ফুটে বাতাসে সাঁতার দিল না। সখিনা বলতে যাচ্ছিল, বেশ ত যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু বলা হল না। বলতে গিয়ে মনে হল সে যেন কোন গহন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। আর সে যেন ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সোঁ সোঁ করে নীচেয় নামছে। এই কিছু দিন আগে ঠিক ঐ রকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল সখিনা। সে যেন উড়তে শিখেছে। উড়ে উড়ে আকাশের কত উপরে উঠল। তারপর তার পাখা দুটো নষ্ট হল। সে সাধারণ মানুষ। উড়তে পারে না। আর অমনি সোঁ সোঁ করে নীচেয় পড়ছে। দেহের রক্ত বুকে আটকে মরণ-যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে গিয়ে সখিনার ঘুম ভাঙল। ঠিক সেই যন্ত্রণা, সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে অনুভব করল সখিনা। বুঝতে পারছে, অনুভব করতে পারছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। বলা যাচ্ছে না। সারা শরীরটা যন্ত্রণায় কাতর, শিথিল হয়ে গেছে।

তানজিলার কথা মনে পড়ল। রইসদ্দি চাচার মেয়ে। সই। আহা—চোখের সামনে দিনে দিনে শুকিয়ে গেল। কী সুন্দর স্বামী পেয়েছিল। কিন্তু ঐ আরবী লাইন ছেড়ে যেই ইংরেজীতে এল, অমনি—

দু' বছর দেখতে পায় না তানজিলাকে। এখন নাকি একটু সুখী হয়েছে।

আর ঐ কি যেন নাম—বিউটি। আরো দু-একবার ওর কথা বলেছে হারুণ। দারুণ ভাল মেয়ে। যেমন পড়াশুনোয়, তেমনি রূপে। সেবার বাড়ী এসে হারিকেন দেখিয়ে বলেছিল, ঐ যে যেমন আলো জ্বলছে। ঠিক অমনি। একেবারে আগুন। নাক, চোখ, মুখ, হাত যেন জ্বলছে সব সময়।

সেদিন বিউটির কোন কথা মনে থাকে নি। কিন্তু আজ লোহা কেটে নাম লেখার মত তার চেতনায় বিউটির নাম খোদাই হল। দূর সীমান্তবর্তী কোন রণোন্মাদিনী নারী যেন জীবনধ্বংসী নানান অস্ত্রে শান দিচ্ছে।

ক্লান্ত হারুণ ঘুমিয়ে পড়েছে—কিন্তু সখিনা?

কী নাম বললে যেন? বিউটি। ওর আব্বা কী? উকীল। কোথাকার? হাইকোর্টের। কী নাম যেন? বিউটি। আর কী নাম? তানজিলা। আর কী নাম? হারুণ। বিউটি তানজিলা হারুণ সখিনা। বিউটি তানজিলা হারুণ সখিনা। আল্লা গ—

চাঁদের আলোয় পৃথিবী প্লাবিত। জানলা দিয়ে আব্বার কবরটা দেখতে পেল সখিনা। আর সংগে সংগে যেন এইমাত্র কে

বাঁধ ভেঙে দিলে, বুকের আবরণ ভিজে একাকার।

আজ যদি তুমি থাকতে?

বড় বেশী করে আব্বার কথা মনে পড়ল সখিনার। সেই বিশাল পুরুষ। যার স্নেহ-ছায়ায় নিবিড়-নিরাপদ জীবনের ইশারা।

কত রাতে উঠে নামাজের পাটিতে বসল সখিনা। বসে বসে তাহাজ্জদ নামাজকে চোখের জলে ভিজিয়ে দিলে। ইমতাজ চাচা বলত, যখন কিছু দিশা পাবে না—তাহাজ্জদ নামাজ পড়বে। দেখবে মনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছে, ঠিক পথ টের পাচ্ছ—

তৃতীয় প্রহরের মাঝামাঝিতে একবার অস্পষ্টভাবে হারুণের ঘুম ভেঙেছিল। দেখল, কাত হয়ে বসে সখিনা মাথায় হাত বুলুচ্ছে। অন্য হাতে হাওয়া করছে।

॥ চার ॥

আবার শুরু হয় প্রতীক্ষার পালা।

প্রতিদিন, প্রতি পল। কেবল অনন্ত প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকা। কেবল পথ চাওয়া আর কাল গোনা। সেই ধু ধু প্রান্তর—আদিগন্ত যার বিস্তার। রিক্ত এবং শূন্য। সখিনা তাকায় আর চোখ মোছে। মনে হয় যেন কী হারালাম।

অথচ এই ভয় আগে ছিল না। আগের প্রত্যাশায় কুসুমের সম্ভাবনা ছিল। এখন তা সন্ধ্যা। বিষন্ন সন্ধ্যার এক ব্যথাতুর ম্লানতা সকল সময় ঝরে পড়ছে। ঝরে ঝরে মুকুলের সম্ভাবনাকে গলিয়ে নিচ্ছে। সকল সময় মনে হয় যেন কী হারালাম।

একটা বড় কাল সাপ চকিতে সারা দেহটা পেঁচ দিয়ে জড়িয়ে ধরছে, পরক্ষণে পাক খুলে বিবরে যাচ্ছে, আবার কোন মুহূর্তে এসে জড়িয়ে মুখের ওপর ফণা তুলে ক্রূর কুটিল-কালো জিভ বার করছে। আর সেই বিষে চিন্তারা ক্লীব বেদনাতুর।

সেই ক্লীব চিন্তারা অরূপ মাথা তোলে আর মনে হয়, কী যেন হারালাম।

বড় করে একটি শ্বাস ছেড়ে মুহূর্তটাকে সচকিত করে দিল সখিনা, আল্লা-রসুল।

দেখতে দেখতে দু' মাস কেটে গেল। একটা চিঠি পর্যন্ত না। দারুণ উতলা হয়ে পড়ে সখিনা। মনে মনে কত কথার উত্থান-পতন। নদীতে যেমন ঢেউ ওঠে। ঢেউয়ের মত চিন্তারা মাথা তোলে, দাঁড়ায়, উদ্ধত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে গিয়ে নতুন চিন্তার জন্ম দেয়। চিন্তায় চিন্তায় দেহটা পুড়ে, মনটা জ্বলে তামা হয়ে গেল।

অস্থির হয়ে পড়ে সখিনা। কেন চিঠি দাও না তুমি? বিপদ-আপদ, জ্বর-জাড়ি। তওবা, তওবা—

হেমাত চাচা যাবে? বসির ভাই? আমানত দাদা? যাও না একবার, দেখে এসো। খরচের পয়সা দিচ্ছি। হেড মৌলানা? সেক্রেটারী। বসির ভাই—অর একবার ও'দেরই খবরটা দাও।

আকবর চাচার কথা মনে পড়ল। উত্তরপাড়ার আকবর চাচার কথা ভেবে পুলকিত হল সখিনা। আব্বার কাছে আসত, সেবার আব্বার সংগে গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছে।

হ্যাঁ, তারপর?

আচার পেয়ে খুব খুশী। আর মুড়ির মোয়াগুলো—জান মা কুঁড়ো গোলা মালসায় যেমন হাঁস পড়ে—ওহ্ সেই ঘরের একপাল হুদো হুদো ছেলে—। যেমন খাওয়া, তেমন হাসি।

তোমার যেতে কোন কষ্ট হয়নি ত? কোন অসুবিধা?

প্রায় ক্ষেপে উঠল আকবর চাচা, বল কী? সারা কলকাতা শহর আমি গুলে খেয়ে ফেললুম। আর পথ বেভুল হবে আমার?

তাড়াতাড়ি প্রসংগটা পাল্টে নিল সকিনা, তারপর চাচা?

আমাকে ত ছাড়তেই চায় না। হারুণ ধরে টানাটানি। বলে, কতদিন পর এয়েছ—থেকে যাও।

তারপর?

তোমার নাম ধরে, জান মা, সেই হুদো হুদো ছেলেরা কী চেঁচান। হারুণ বাবাজী ওদের কাছে তোমার নাম বলে দিয়েচে।

আর কী হল চাচা?

আবেগে উল্লাসে সকিনা এই মুহূর্তে চাচা সম্পর্কটা ভুলেই গেল। আকবর চাচার কাছে বার বার জিজ্ঞাসা রাখল, তারপর?

সব বন্ধু-টন্ধু হবে। আমার সামনেই তোমাকে নিয়ে কত রকম ঠাট্টা-বটকারা। তা' আসবার সময় হারুণ এল স্টেশান পর্যন্ত। জান মা—স্টেশানে এসে কত কথা জিজ্ঞেস করলে। শেষকালে আমার হাত দুটো ধরে বললে, দেখো চাচা—একটু দেখো। ওরা দু'টি প্রাণী থাকে। আমি পড়ে রইলুম শহরে, দায়-বি-দায়ে দেখো। একটু থেমে আকবর চাচা ছেড়ে দেওয়া কথার পিছন ধরল, তা' যখন দরকার হবে মা—আমাকে খবর দিও। এই ত' এ-পাড়া আর ও-পাড়া।

এই প্রথম সচকিত হ'ল সখিনা। সংযত হ'ল। এক পাঁজা তুলোয় আগুন দিলে যেমন এতটুকু হয়। পেঁজা পেঁজা ব্যাকুল উল্লাসে আগুন লাগল, তোমার আসার সময় নেই! পাড়ার লোককে সংবাদ দেব আমার বিপদে। তারা দেখতে আসবে তোমার যুবতী বৌ-কে। আড়চোখে তাকাবে, ঠাট্টা করবে—আর আমি স্বর্গে যাব। আক্কেল-জ্ঞানের মাথা খেলে শেষকালে।

তলানি পড়া চিন্তা আবার বিস্তারিত হতে চায়। দুধ যেমন উথলে ওঠে। প্রশংসা আর সোহাগের পরশ মনটা আঁকু-পাকু করে। একপাল ছেলে সবাই মোয়া খেয়ে খুশী? অ্যাঁ? টাটকা জিনিস ত? আর তোমারই বা আক্কেলখানা কী? অতগুলো ছেলের সামনে নাম বলেছ? কেউ কখনো বলে? নিজের ইজ্জত না? আচ্ছা কী বোকা তুমি। যেমন ছেলেমানুষ তেমনি বোকা। এবার কী পাঠান যায়? অতগুলো মানুষ যখন—সবাই খাবে। কবে পাঠান যায়? পাঠাব? কেন পাঠাব? না এলে এই শেষ। আগে এস—

কবে আসবে গ?

অনন্ত প্রতীক্ষার পালা আর শেষ হয় না।

একদিন, দুদিন। এক মাস। এক বছর। ঋতুচক্রের আবর্তনে দু'টি বছর শেষ হ'ল। কোথায় হারুণ? গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল। শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে আধো-অন্ধকারে চোখের জলে ঘুম ভাঙে সখিনার।

একবার এলে না?

মনটা যেন আকাশ। কখনো নির্মেঘ, কখনো হালকা উত্তরীয়ের আনাগোনা, কখনো ঘনকৃষ্ণ মেঘে গম্ভীর। ভই সখিনা কাঁদিস না—তুই ত' রাজার বৌ। তানুজিলা বলে। অনেকদিন পর বাপের বাড়ী বেড়াতে এসে তানজিলা হাঁক দেয়। কোলে সোনার টুকরো। সখিনা ছাড়ে না। কেবল রাত-টুকুর জন্য। ভোরের আলো ফোটার আগেই তানুজিলা হাঁক দেয়, কই গ—আবার এলাম জ্বালাতে।

সখিনা কাজ ফেলে ছুটে এসে ছেলেটাকে কোলে নেয়। আদর করে। তানুজিলা কাগজটা সামনে ধরে, এই দ্যাখ—কাল বলছিলুম। তুই ত বিশ্বাসই করলি নে।

হারুণ। হারুণ মোহাম্মদ। ছবিতে হাসছে।

এম এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। ল-এর ফাইনাল সামনে।

দু' হাতে আঁকড়ে ধরে বুভুক্ষার মত তাকাল। একটু যেন মোটা হয়েছে না! সখিনার চোখ জ্বল জ্বল করে। আরো সুন্দর হয়েছে। দেখতে দেখতেই কেঁদে ফেললে সখিনা। কিন্তু আসছে না কেন বল ত?

আবার সেই কথা। পুরুষ মানুষকে আঁচলের তলায় ঢেকে রাখবি। তান্‌জিনা রাগ করে, কতবড় ভাগ্য হ'লে এমন বর মেলে। আমার উনি ত হারুণ বলতে অজ্ঞান। বলে, এমন ছেলে এ দিয়ারে নেই। জানিস—

রহস্যপূর্ণ চোখে তাকায় তান্‌জিলা, মেয়ে হলে উনি হারুণকেই বিয়ে করতেন।

তিন দিন শোকরানার রোজা রাখল সখিনা। শুক্রবারে পাড়ার ছেলে আর মসজিদের মুসল্লিদের খাইয়ে দিল।

পরদিন আকবর চাচা ফিরে এসে সংবাদ দিল, হারুণ আর সেই ঘরে থাকে না। কী সব আইনের পরীক্ষা সামনে—তাই কোন বড় উকীলের বাড়ীতে থাকে। আর ওগুলো—জান মা, সেই ছেলের পাল কেড়েকুড়ে খেয়ে নিলে।

শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল সখিনা। কী যেন নাম? বিউটি। কী যেন নাম? বিউটি। কী যেন নাম? বিউটি। কথা এমনি কম বলে সখিনা। কিন্তু এখন চেষ্টা করলেও বলতে পারত না। চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি-রক্ত-মাংস-দেহ সব গলে একতাল লৌহপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। চেতনাহীন এবং জড়পদার্থ। গড়িয়ে দাও—গড়িয়ে গেল। থামিয়ে দাও—থেমে গেল।

আই সখিনা কী ভাবছিস? এত নীরব কেন? হ'ল কী তোর? গোসল করবি না? কে এসেছে দেখ!

ঘুম ভাঙলে দেহে যেমন আত্মা আসে, এই মুহূর্তে নিশ্চল দেহে তেমনি একটু একটু করে চেতনা ছড়াল। আর তখনি ভেজা চোখটা মুছে নিল সখিনা। কে বটে?

শাহাদাৎ। জায়দা চাচীর ছোট ভাই।

সখিনা! আঁ—কতদিন পর দেখলাম। তা' তুই যে একেবারে আস্ত যুবতী হ'য়ে গেছিস্।

জায়দা চাচী এই মুহূর্তে যেন অনেক কোমল হয়ে এল। অন্য মানুষ। ভাই বলে কথা।

সম্পর্কে মামা। সখিনা চমকে উঠল, কিন্তু বলে কী? আটকাল না মুখে?

জায়দা চাচী হেসে বললে, তা' তোদের ভাগ্নী। একবার ত এসে দেখলি নে।

এই ত এলাম বুবু। দেখতেই এলাম। ভাল করে দেখে যাব। তা' একটু পানি-টানি দাও গ সখিনা বিবি।

জল-ভরা লোটাটা এগিয়ে দিল। এক গ্লাস সরবৎ তৈরী করে মা-কে ডাকল সখিনা, আমার হাতটা নোংরা—সরবৎটা নিয়ে যাও।

তখনই কটাক্ষ করল জায়দা চাচী, কেন, আমার ভাই বলে। হাতে করে দিলে মান যাবে।

সখিনা জানে—উত্তর দিলেই দশ গুণ। সুতরাং নিজের ইজ্জত নিজের কাছে। শরীরটাই হয়েছে কাল। এমন স্বাস্থ্য, এমন দীপ্তি। তাই বলে সম্পর্ক উঠে যাবে। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ থাকবে না! সমাজ-সংসার-আত্মীয়তা!—

দুপুরে ভাত খাবার সময় মামার সেই জ্বলন্ত পৈচাশিক দৃষ্টি স্পষ্ট দেখল সখিনা। সেই দৃষ্টি—যেমন করে শাহেদ তাকায়। বুঝি তার থেকেও তীক্ষ্ম, তার থেকেও ধারাল। শাহেদ আর শাহাদাৎ! সখিনা ভেবে আকুল হয়, ঐ নামের মানুষগুলিই বদ! অ্যাঁ!

দিনের আলোয় সারাক্ষণ রাতের অন্ধকারের কথা চিন্তা করে বিচলিত হয়েছে সখিনা। সম্পর্কে মামা। কী আর বলা যায়।

কোনক্রমে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দরজায় খিল দিল সখিনা। পাশের ঘরে আগেই ভাইবোনের শোওয়ার ব্যবস্থা করে রেখে এসেছিল। জায়েদা চাচী ডাকল, তুই খাবি নে?

জায়দা চাচী শুতে গেলে শাহাদাৎ উঠে দরজায় ঘা দিল, কই গ সখিনা—কতদিন পর এলাম, একটু গপ্পসপ্প করব—তা' তুই খিল দিলি।

কান পাতল কিছুক্ষণ। উত্তর না পেয়ে বলল, সে শালা যেমন গাড়োল। এমন বৌ বাড়ী রেখে শালা কেতাব পড়ছে। মাথায় ঝাঁটা—

যতটা এড়ান যায়। সখিনা খুব সতর্ক হয়ে পা ফেলল। আর তিন দিন মুলে দাঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঝুলে কাটল শাহাদাৎ, যেমন গাদি খেলায় কাটে—যদি পরাস্ত করে ঘরে ঢোকা যায়।

তিন দিন পর ক্ষুণ্ণ মনে শাহাদাৎ বাড়ী ফিরে গেল। শাহাদাৎ চলে যেতেই ফণা তুলল জায়দা বিবি, তার সামনে এলিনে, কথা বললি নে। কেন—আমার ভাই বলে? ক'দিন পর জায়দা চাচী যেন স্বরূপ ফিরে পেল। আমার বুকে বসে আমার চোখে ঠোকর।

এই তন্বী যুবতীর মান-ইজ্জতের ধারণা কত সূক্ষ্ম, কতদূর বিস্তৃত—তা' ত জায়দা চাচীর জানার কথা নয়। তা' এই মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন একজন—যিনি অন্তরীক্ষে থেকে সকলের অলক্ষ্যে সকলের আদি-অন্ত ভাবনার শরীক হন।

আবার নলেন গুড়ের মরশুম এল। যেমন আসে ফি বছর। দখিন থেকে মলদার ছল। শিউলে দা নিয়ে খেজুর গাছে চাঁচ দিল।

দুটো চারাগাছে নতুন চাঁচ পড়ল। পুরনো গাছ ছিল সাতটা। মোট ন'টা গাছে ভাঁড় ঝুলল। মলদার কেটে দিয়ে যায়। আকবর চাচা পেড়ে আনে। ভাঁড় পাল্টে দেয়। কপালি পরিষ্কার করে। গুড় জ্বাল দেয়।

হাওয়ার শীতের আমেজ। সারা শরীরে কিলিবিলি দিয়ে উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। মৃদু পরশ গায়ে লাগতেই মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায় সখিনার। এই ত ক বছর আগে—এ সব কাজ হারুণই করতো। সকালে ঘাসের ওপর বিছিয়ে থাকা শিশিরের টোপ মাড়িয়ে মাড়িয়ে ভাঁড় খুলে আনত হারুণ। তারপর রোদে বসে আধখানা রসই শেষ করত দু'জনে।

প্রায় এক ভাঁড় রস হ'ল প্রথম দিনেই। একবারে টাট্‌কা স্ফটিকের মত জিরেন রস। সেই ভাঁড় বোঝাই রসের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল সখিনা। তাকিয়ে থাকা মানেই ব্যথা পাওয়া। লাভ কী? কিন্তু মন মানে কই।

নলেন গুড়ের সৌরভে ঘর ভরে যায়। বুকের সৌরভ বুঝি তার থেকে বেশী। তুমি এমন নিঠুর হলে শেষকালে।

আকবর চাচাকে ফিরতে দেখে একেবারে নিশ্চল হ'ল সখিনা। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মূর্তি যেমন দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক তেমনি।

কলকাতা আমার গুলে খাওয়া। আমি যদি খুঁজে বার করতে না পারলুম—তাইলে মা জানবে, ও আর কারো কর্ম নয়। কিন্তুক ও বাড়ীতে আমি আর যাব না মা। বাব্‌বা—জান যাবার যোগাড়।

একবার থেমে, সখিনার দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলে আকবর চাচা। তারপর সূত্রধরের মত আবার কথার সূচনা করলে, কুকুর লয় যেন হাতীর বাচ্চা। ইয়া বড় বড়। বাবার জন্মেও অমন কুকুর দেখিনি। তা' জান মা—যেমন করে বাঘ লাফায়, বাপ্‌রে বাপ্—ডাক কী!

গেটে দারোয়ান ছিল তারাই থামালে। তা' মা—যেন নবাবের বাড়ী। সাদা ধব্‌ধবু করছে। বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সাহেবের মত একটা রাঙা লোক এসে তাতে চেপে হুস্ করে কোথায় চলে গেল। আমার হারুণ বাবা এল তারপর। কিন্তুক মা—

চোখ দুটো যেন ছলছল করে উঠল আকবর চাচার। কী যেন বলতে গিয়ে প্রথমে বাধল। তৃতীয় চেষ্টায় বলে ফেলল, ওসব আর পাঠিও না মা, কোনদিন না। আমার সামনেই সে সব দারোয়ানদের ধরে দিলে। নিজে একবার খুলেও দেখলে না। সারারাত জেগে তুমি করলে মা—

স্নেহ-প্রবণ বৃদ্ধ সত্যই কেঁদে ফেললে এবার। কিন্তু সখিনা? ঠিক সেই মূর্তি। রোদ-বৃষ্টি-ঘূর্ণি-ঝড়—তবু সেই মূর্তি। মান-অভিমান, অপমান-অবহেলা, হিংসা-দ্বেষ এ সবের যেন অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে সে।

যেন রাগ রাগ। নিজেই নিষেধ করে দিলে শেষকালে। তাইলে বল মা—কী মুখে সেখানে পাঠাবে আর।

ক্লান্ত আকবর চাচা আর দাঁড়াল না। কলকাতায় ঘুরে ঘুরে দারুণ ক্লান্ত। যাবার সময় বলে গেল, পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছে।

সামনে কী যেন একটা পরীক্ষা—ফি না কী জমা দেবে।

জায়দা চাচী এসে ডাকল, ঢং দেখে বাঁচি নে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই—মেঝেয় শুয়ে ঘুম। অই—

সেই ডাকেই চেতনা ফিরে পেল সখিনা। যেন ঘুম ভাঙল। সে নিজেও বুঝতে পারল না ঘুম না অন্য কিছু। একবার শুধু মনে করতে পারল, আকবর চাচা দুপুরে যখন চলে যায় তখন সে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সন্ধ্যা। তওবা, তওবা। কী কাল ঘুমে পেয়েছিল—

এই এত প্রশংসা পেলে হারুণ।

জীবনে অনেক প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু এর স্বাদ যেন অন্য। বিশেষ করে এই পরিবেশে। সেই দুধে আমতলায় দাঁড়িয়ে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যেমন টপাটপ পাকা আমে ঝোলা বোঝাই করত, কতকটা যেন তেমনি। তবে ঐ—স্বাদ আলাদা। সে ছিল মনের উত্তেজনা এ হল রক্তের। দেহমন উথাল-পাতাল।

কিন্তু হারুণ তুমি যদি জানতে—

পুরো দশ টাকা হ'ল।

আগের সপ্তার খুচরো পয়সার সংগে আজকের ডিম বেচা পয়সা মিলিয়ে পুরো দশ টাকা হ'ল। দু-দিন ঘরে আনাজ নেই—কিছু কেনা দরকার। খেতে বসে জায়দা চাচী রোজ গাল পাড়ে। কিন্তু সখিনা নির্বিকার। ঐ যে—ঐ মূর্তি। রোদ-জল-ঝড় সব সময় একরকম। আস্ত টাকা ভাঙব কী করে। আর এই দশ টাকা আগের টাকায় ফেলতেই পুরো পঞ্চাশ হ'য়ে গেল। কত টাকা চেয়েছিল যেন? তা হলে আকবর চাচা যেতে পারে?

এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। চিন্তায় পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বারবার মনে পড়ছে। ঠিক মধ্য স্রোতে দাঁড়িয়ে চিন্তার জলকে দু'পাশ দিয়ে বইয়ে দিচ্ছে। অল্প স্রোতে বুনো মোষ যেমন কাদামেখে বসে থাকে। জায়দা চাচী গাল দিচ্ছে, পয়সা জমাবি—তুই খাবি, তোর বর খাবে। আমার কী? যাক—ভাইয়ের বাড়ী চলে যাব। সেথায় গিয়ে পান্তা ভাত জুড়িয়ে খাব। আর—

হ্যাঁ—সে কথাটা জায়দা চাচী ইদানিং জোর করে প্রচার করে, আমার অংশ বেচে দোব। ভিটেয় ঘুঘু চরাব।

সুতরাং কিছু আনাজ কেনা দরকার। ভাতে ভাত দিয়ে নিজের চললেও জায়দা চাচীর চলবে না। কিন্তু টাকাটা ভাঙব? আস্ত টাকাটা?

চার আনার পটল?

না।

দু' আনার বেগুন?

না।

ছ' পয়সার ওল?

না। আস্ত টাকাটা গা।

কিছু কুচো চিংড়ী আছে জাল দেওয়া। একটা কিছু হ'লে হয়। ডাল আর একটা তরকারী। আজকের দিনটা চলুক। কাল ডিম-টিম যা হোক কিছু করা যাচ্ছে।

অন্য কী করা যায়? লাউ শাক? কুমড়ো শাক? না—এই বাড়ন্তের ডগা কাটলে ক্ষতি হবে। তবু হেসোটা নিয়ে পায় পায় উঠে এল সখিনা। বাঁশ বাগানটা পেরিয়ে নিজের ছোট কলা বাগানটার দিকেই পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু রামবাবুর বিরাট কলা বাগানটার দিকে নজর পড়তেই পুলকিত' হ'ল সকিনা। বিরাট কলাবাগান—ভিতরে নিবিড় অরণ্য ছায়ার স্তব্ধতা। অনেকগুলো কলা গাছ কাটা। আজ হাটবার। কলা হাটে নিয়ে যাবে—তাই। একটা গাছের থোড় হ'লেই দু-বেলা। মায়ে-ঝিয়ে খুব চলে থাকে। কিনারাতেই একটা গাছ পড়েছিল—কিন্তু ওটা পাকা। থোড় বড়ুটে হয়ে গেছে—সিদ্ধ হবে না। একটু ভিতরে গিয়ে একটা কাঁচ গাছ বেছে নিল। কতক্ষণই বা লাগবে ছাড়াতে! একেবারে পথের কিনারায়। তবু কেমন যেন ভয় ভয় করে। ভিতরে জমাট নৈঃশব্দ। ঐ যে—আরণ্যক নীরবতা।

হেসো দিয়ে দ্রুত বাকল ছাড়াতে থাকল সখিনা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই পথ হাঁটছিল সেই আদিম জানোয়ার। পলকে দেখে ঘুর পথে বাগানের ভিতরে এসে ঢুকল। একেবারে সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে—নীরবে। সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে, আড়াল থেকে, একেবারে দু'চোখ ভরে যেন যৌবনের মেলা দেখতে থাকল। সখিনার যৌবন-পুষ্ট দেহে অবিন্যাস্ত শাড়ীর আবরণ ছিল মাত্র। সে আবরণ কখনো নামছিল, কখনো উঠছিল। কাজের মাঝে যেমন বসন স্খলিত হয়। আর এই ওঠা-নামার মাঝে পুরুষ্ট যৌবন যেন ঝলক দিয়ে উঠছিল। এক-সময় আঁচলটা চকিতে খসে পড়তেই ক্ষণউদ্ভাসিত নিটোল যৌবন জানোয়ারের রক্তে আগুন ধরল। এতক্ষণ সে কালো কুটিল জিব মেলে দূরে থেকে যৌবন লেহন করছিল। এবার ছুটে এল। আঁচল ঠিক করার আগেই শক্ত পুরুষালি হাতে সখিনাকে, সখিনার যৌবনকে বুকের উপর নিয়ে এল শাহেদ। একেবারে পাথর—ঠিক ঐ মূর্তির মত। কিন্তু ক্ষণিক। হাতে হেসো আছে না।

কী করে যে নিজেকে উন্মুক্ত করেছিল—সেকথা ভাবতে ছলছলিয়ে ওঠে সখিনা।

সেই পঞ্চাশ টাকায় এত প্রশংসা পেলে হারুণ। প্রাইজ পাওয়া মেডেল ছিল—বাণীর টাকা দিয়ে গেল আকবর চাচা। সেই সোনা গালিয়ে তৈরী হল এই অপূর্ব প্রেজেণ্টেশান। যা এই মুহূর্তে বিউটির জন্মদিনে, বিউটির গলায় ঝিকমিকিয়ে সবার প্রশংসা কুড়ুচ্ছে। আর তাতেই হারুণ কী যেন এক অনাস্বাদিত স্বাদ চাকছে, তাঁর রক্তের কণারা উত্তেজনার রোদে তপ্ত হয়ে উঠছে পলে পলে।

এ ওয়ান্ডারফুল গীফ্‌ট।

তীব্র বৈদ্যুতালোকে ঝিকমিকিয়ে উঠতেই বিউটির টেনিস-খেলার পার্টনার, রউফ শেখ হাততালি দিল। লাইলীর দাদী আম্মা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল নিজ হাতে।

সারা বাড়ীটায় লাল-নীল আলোর ফোয়ারা। বিউটির জন্মদিন। দারোয়ানদের পরণে নতুন বেশ। গেটে আলোর ফুলঝুরি। নানানরকম গাড়ী যাচ্ছে আসছে কত লোকের আনাগোনা।

মধ্যরাতে, বিউটির স্বাস্থ্যপান করার পর, বাড়ীটা নীরব হয়ে এল ধীরে ধীরে। একসময় জন্মদিনের সেই অপূর্ব বেশেই, বিউটি এল হারুণের বেডরুমে, ইউ সুইট ডার্লিং—আই ওয়াণ্ট ইউ এ্যান্ড নট দিজ্‌ টোকেন—

তীব্র এবং উজ্জ্বল আলোয় বিউটির লম্বা রঙীন নখ, লিপস্টিকের গাঢ় রং-এ রাঙানো ঠোঁট, উদ্ধত যৌবন, সেই প্রেজেণ্টেশান এবং তার মধ্যে সেট করা কবুতরের চোখের মত লাল চুনি একসংগে উন্মাদের মত ঝিকমিকিয়ে উঠল। আর বিউটি ঝুঁকে পড়ে, কতকটা আধবোজা কণ্ঠে, যেন চেতনার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কথা কইল, ইউ লাভিং ম্যা-ন—

তারা কেউ জানল না, ঐ রক্ত-লাল চুনির মধ্যে, অন্তরালবর্তী আর এক সাধ্বী রমণীর কতখানি বুকের খুন মিশে আছে। মানুষের হাতে কী গভীর লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করার পর, কী কঠিন মর্মবেদনার উত্তাপে যে বুকের রক্ত জমাট বেঁধে চুনীর রূপ নিয়েছে তা তারা কেউ জানতেই পারল না।

একেবারে ঝড়ের মত হারুণ এসে হাজির হল একদিন। একেবারে আকস্মিক। সখিনা ত পাথর। খুশীর পাথর। ঐ যে—

অল্পে কাতর

বিস্তরে পাথর।

খুশীর পাথর। তারপর সেই খুশীর পাথরে চেতনা এল। পাথর গলে গেল অভিমানে। আর সেই তরল অভিমান, পানীর ফোঁটা যেমন বাষ্প হয়, নিশ্চিহ্ন হল এক সময়।

এতদিন পর মনে পড়ল?

চোখের জলে দু'পা ভিজিয়ে কদমবুসি করে উঠে দাঁড়াল সখিনা। অল্প একটু আদর করল হারুণ।

খুব অল্প কথায় বক্তব্য রাখল হারুণ। তার কিছু বুঝল সখিনা, কিছু বুঝল না। ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেতে যাবে হারুণ। এ্যাডভোকেট সাহেব খুববড় একটা সরকারী স্কলারশিপ পাইয়ে দিয়েছেন তাতে সব খরচ মিটে যাবে। কিন্তু যাবার আগে সামান্য কিছু কেনাকাটা—

কিছু খুচরো পয়সা রেখে দিল হারুণ। পুরো চারশো টাকাই নিল। এত আশা করেনি—কিন্তু পেয়ে গেল।

অরে কাঁদিস—না। হ্যাঁ কাল ঠিক দশটার সময় তোর মাথার উপর দিয়ে যে উড়োজাহাজটা উড়ে যাবে আমি ওতে করেই বিলেতে যাব। এই যাব আর আসব। কাঁদিনই বা। আর এবার এসো আমার এই সখিনা-

বিবিকে কলকাতা শহরে রাজরাণী করে রাখব। এই সামান্য কটা দিন—পারবি নে থাকতে, অ্যাঁ!

বলতে বলতেই মাঝ উঠোনো নেমে গেল হারুণ। তারপর সেই শূন্য মাঠের উপর দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে, ক্রমশ মিলিয়ে যেতে যেতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুই বলতে পারল না সখিনা। কিছুই বলা হ'ল না। যেমন আকস্মিক এসেছিল, তেমনি করেই চলে গেল। যেমন কালবৈশাখী। দমকা বাতাস, বড় ডালটা মট করে ভেঙে দিয়ে, চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে পড়ে থাকল ছিন্ন গুল্মলতার সকরুণ হাহাকার।

ডালই ভেঙেছে। বুকের হাড় যেন মট মট করে ভেঙে গেল সবকটা। কিছুই বলা হ'ল না। সোনার কৌটোর কালোভ্রমরের মত কত কথা, একান্ত গোপন নিবিড় আলাপনের জন্য সযত্নে সাজান ছিল। তেমনি থাকল। তার উপর বাড়ল হাহাকার।

আবার সেই অনন্ত প্রতীক্ষার পালা। শূন্য প্রান্তরের দিকে উদাস চোখে চেয়ে চেয়ে থাকা।

।। পাঁচ ।।

সবাই আলোর প্রতীক্ষায় জটলা করছিল। মেঘে ঢাকা ছিল তাই দেখা যায়নি। আকাশ ফাটল আর অমনি আলোর ফিন্‌কি বেরুল।

আবার রোশনাই ফুটল। আর তাতেই হারুণের শেষ কৃতিত্ব যেন ঝলমল করল। হারুণ মোহাম্মদ। ব্যারিস্টার হারুণ মোহাম্মদ। ডক্টর অব ল।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে স্বদেশে ফেরার মুখেই কথাটা মনে হয়েছিল হারুণের। আকাশে যেন প্লেনখানা গর্জাচ্ছিল, বুঝি হারুণের মনটাও।

টাকা দিয়েছে?

ঠিক কথা।

পড়িয়েছে?

ঠিক কথা।

রাখাল থেকে মানুষ করেছে?

ঠিক, ঠিক।

স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা?

কই তা' ত অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলে কী আমি বিকিয়ে গেলাম? এক গ্রাম্য সখিনা হবে মিস ডরোথি? অথবা বিউটি? সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে জীবনের দাসখত?

এতসব কথা হারুণের চিন্তায় ভাঁজে তাপ ছড়াচ্ছিল, আর সেই তাপে সখিনার মোমের মত মুখটা গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তারপর?

হ্যাঁ—তারপর সেই সস্তায়, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে, আলোর পিছনে ছায়া যেমন, পূর্ব পরিকল্পনায় যেমন ছিল, বিবাহপর্ব সমাপ্ত হল। দীর্ঘদিনের আনন্দঘন প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে ওরা হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

ব্যারিস্টার আর বিউটি।

সুদূর পল্লীর এক শ্যামল-স্নিগ্ধ [illegible] আগমন প্রতীক্ষায় ব্যাকুল, অধীর আগ্রহে দিনের পর দিন প্রহর গুনছে একথা হারুণের একবার মনেই হল না।

বড় আশাবাদী।

আপন কর্মদক্ষতার ওপর এতটুকু অবিশ্বাস নেই। এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সম্বল করে হারুণ উন্নতির সোপানশ্রেণী ভাঙছে। প্রথম দিনেই হাইকোর্টে আলোড়ন জাগল। অনেক জাঁদরেল উকীল উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দিয়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বীকে যেন দেখে গেল চকিতে। সে আলোড়ন আর থামে নি। এখন আর হারুণের চেম্বারে ক্লায়েণ্ট ধরে না।

যশ-অর্থ-মান লুটের জিনিস। হারুণ বলে, দু' হাতে লুটব আমি, কিন্তু—

এই কিন্তুর সূচনা হয়েছিল বিয়ের দিন থেকে। বর সেজেই বুঝল, বিউটির পার্টনার বেড়েছে। অনেক বেড়েছে, বিলেতে যাবার আগে ঠিক এত ছিল না। কত নতুন মুখ, সারিবন্ধ এবং কৌতূহলী।

অনেক পার্টনার, নতুন পার্টনার।

হানিমুনের প্রোগ্রাম। তাই নিয়ে বিউটি প্রথম হাসল। হেসেই শুধাল, কোথায় যাবে?

মৃদুকণ্ঠে হারুণ বলল, চল না পুরী থেকে ঘুরে আসি।

পুরী! খিলখিলিয়ে হেসে উঠল বিউটি। অতদূরে? তার থেকে বল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

আব্বা-আম্মাও মুখ টিপে হেসে পাশের ঘরে চলে গেল। আর এই চলে যাবার মধ্যকার রহস্যটুকু শেল হয়ে হারুণের বুকে বিঁধল। যেন শায়ক বেঁধা পাখী। বুকে অপরিসীম যন্ত্রণা নিয়ে অতগুলো লোকের মাঝে বসে তেমনি কাতর চোখে তাকাল হারুণ। তাকে বড় অসহায় মনে হল।

মিঃ বাসির পাশে ছিল। বিউটি বললে, ইউ—মিঃ বাসির, জাস্ট চুস দ্য প্লেস, অন মাই বিহাফ এণ্ড অন বিহাফ অব মাই সুইট হার্ট।

বিউটি হাসতে হাসতে হারুণের পাশে বসল।

যশ-অর্থ। লুটের জিনিস। সুখ-শান্তি। লুটের জিনিস। আমি দু' হাতে লুটব।

আত্মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হারুণ থমকে দাঁড়ায়। কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে সব জিনিস লুট করা যায় না। লুট করার আগে জয় করতে হয়। পৌরুষ দিয়ে জয় করতে হয়। জয়ই আনন্দ। আর বিউটি? এনজয়বেল এ্যাট দ্য সেম-টাইম রিজেনবল। সুতরাং—

এমততর আরো কত কথা মনে ভীড় করছিল। সেই সব কথার ভার বয়ে নিয়ে কোর্ট থেকে ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরল হারুণ। এই মুহূর্তে আর স্বামীরা যা [illegible]—হারুণ তার জন্যে লালায়িত ছিল।

কিন্তু বিউটি তখন, ড্রেসিং কেসের সামনে, লেডিজ শার্টের কালার ঠিক করছে। ঠোঁটে গাঢ় রং, আঙুলের ডগাগুলো ছুরির রক্ত ফলা। পরনে অতি সংক্ষিপ্ত প্যাণ্ট। নির্লজ্জ যৌবনোচ্ছল নগ্ন উরু। সে উরুতে মাদকতা। সে রেশ পূর্ণ হয়েছে বুকে। উদ্ধত যৌবন দুলছে।

মুখে দারুন এক ঝলক হাসি চেপে ঘুরে দাঁড়াল বিউটি। এ স্মার্ট টিন-এজার। পাখাটা খুলে দিল। আলতোভাবে টাই খুলে নিল। তারপর সোহাগ ভরে দু হাতে গলা জড়িয়ে শুধাল, চা, না কফি?

এবং উত্তর না শুনেই এক টুকরো তাজা আনন্দের মত নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিউটি।

ঠিক ঠিক—এই ত। এ জন্যেই লালায়িত হওয়া। প্রাণপূর্ণ এবং সৌন্দর্য-ময়। পলকে হারুণের সমগ্র চেতনা দারুণ ভাবে আন্দোলিত হল। জীবনের সংগে বিউটির যোগটা যে কত গভীর তা এই মুহূর্তে হারুণ একান্তভাবে উপলব্ধি করল। এবং এ প্রয়োজন সখিনার দ্বারা কোন দিন পূর্ণ হবার নয়। হতে পারে না। বিল যেমন নদী হয় না। কোকিল যেমন ময়ূর হয় না। হারুণ যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। প্লেটে গরম খাবার সাজিয়ে নিয়ে ঝি এল, সংগে বিউটি। হাতে কফির সরঞ্জাম, সেগুলি টেবিলের ওপর রেখেই শুধাল, তুমি কী আজ যাবে আমার সংগে?

সংগে সংগে হারুণ বললে, না।

না—তার কারণ হারুণ টেনিস খেলতে জানে না। তা ছাড়া ওর পার্টনারের দল ভাববে কী? এই শতাব্দীতেও বৌ-কে পাহারা দিতে এসেছে খেলার মাঠে।

তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও—ওরা সবাই অপেক্ষা করছে।

কোমল মৃদু নাচের ভংগীতে হাতটা আন্দোলিত করে ততোধিক কোমল কণ্ঠে সংগীতের রেশ টেনে বিউটি বলল, বাই—বাই।

বিউটি টেনিস খেলতে চলে গেল। আজ ওর খেলার পার্টনার কে? কে জানে।

বিদায় দিতে গিয়ে হারুণ হাসল। এমন সময় হাসতে হয়। এটা নিয়ম। এটাই এটিকেট। আর এই এটিকেট জ্ঞানই সভ্যতা। এটা না জানলে গ্রাম্য হতে হয়। এ

খাবার টেবিলে বসে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হল হারুণের। একটু আগে যে চেতনায় সমগ্র অন্তর পূর্ণ হয়েছিল—এখন যেন সে রেশ কেটে গেছে। তার কোন বৃহত্তর অর্থই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিজের কাছে নিজেকে বড় একা একা মনে হল।

অ আমানত চাচা—তোমরা না শুনেছ?

করীম ভাই, তুমি ঠিক জান ত?

আকবর চাচা—তুমিও মিছে কথা বললে?

সবাই মিলে আমাকে মারতে চাও। কেন, আমি কী অন্যায় করেছি তোমাদের কাছে? গেছে—নয় দু-দিন পরেই আসবে? আমি

ত সবলে বুক বেঁধেছি। কিন্তু তোমরা সে বাঁধ ভেঙে দাও কেন?

এসেছে? ঠিক বলছ? কত দিন? তবে গাঁয়ে আসে না কেন? তা কী হয়? ঠিক মিছে কথা বলছ তোমরা।

সখিনা অভিযোগ করে। সখিনা ভাবে। সখিনা কাঁদে। কাঁদে আর কাঁদে। একটা বড় স্বপন যেন তার ভেঙে যাচ্ছে। সাফল্যের মুখে এসে স্বপনটা কেমন কদাকার হয়ে গেল। এ স্বপন আর কোন দিন প্রজাপতি হবে না। কুদর্শন শুঁয়োপোকার মধ্যেই আটকে গিয়ে বীভৎস হয়ে যাবে।

সেই সব সাত-পাঁচ নিয়ে আকবর চাচা এল। প্রায় ছ-সাত রকম খাদ্যসম্ভার। হারুণ যেগুলি ভালবাসে। সারা রাত জেগে সখিনা করেছে। একটি একটি করে। সযত্নে।

সেই সব নিয়ে আকবর চাচা এল। আর তাতেই বিউটির ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

আকবর চাচাকে সহ্য করতে পারে নি হারুণ। যেমন চাকরকে ধমক দেয়, তেমনি কঠোর হয়ে উঠল হারুণ। ভংগী ও স্বরে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে বলল, পিঠে খাওয়াতে এনেছ? নিয়ে যাও—নিজে বাড়ীতে বসে গিলবে। একবার নিষেধ করেছি না।

চোখ মুছে আকবর চাচা বলল, তা বাবা—নিয়েই চললাম। কিন্তুক এমন করে ধর্ম খেলে।

আই। ফুঁসে উঠল হারুণ, ছোট মুখে বড় কথা।

বাবা বড় কথা বলব কেন—মোরা বড় কথা বলতে পারি। মা আমার দেনায় ডুবে, সব ত তোমার জন্যে বাবা। যাগ্‌গে—জায়দা বিবিকে আর রাখা যাবে না, এ মাসেই ভিটে বিক্রি করবে। তা যদি দয়া-ধর্ম হয়, সাত শ টাকা পাঠিও। ঐ টাকায় দাম মিটেছে।

এক সপ্তা পর হাজার টাকার ইন্সিওর? ফিরে এল। সখিনা নেয় নি সে টাকা। অবশ্য এ ভয় হারুণের ছিল। এই অশিক্ষিত গ্রাম্য রমণীর আত্মসম্মান জ্ঞান যে কত প্রখর তা আর কেউ না জানুক হারুণের অজানা ছিল না।

পিওনের কাছ থেকে টাকাটা ফেরৎ নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল হারুণ।

হাতে ময়লা?

জল দাও। উঠে যাক্।

কাপড় ময়লা?

ধোপায় দাও। সাফ হোক।

মনে ময়লা?

তা বটে। ও ধোপাখানা পাবে কোথায়? জল দিলে উঠবে না। আর ও মেঘ জমতেই থাকবে। বৃষ্টি হয়ে ঝরবে না। জমে জমে গাঢ় হবে। ঝড় উঠবে। বিদ্যুতের ছোবল পড়বে। শব্দ হবে। বীভৎস কালবৈশাখীর দাপাদাপি চলতেই থাকবে।

আই—মনে ময়লা কেন তোর? কচি বাঁশে ঘুন? আসলে ওটা দুর্বলতা। মনকে সবল কর—সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ঘুরেফিরে সেই চিন্তা। একটা সুকোমল বিষণ্ণ মুখ, অশ্রুসিক্ত পেলব মুখ—ডাইনে- বাঁয়ে- সামনে- পিছনে, যেদিকে তাকাও—অশ্রুমুখী শকুন্তলার মত কেবল কাঁদছে আর কাঁদছে।

মা-মরা মেয়েকে ঠাঁই দিলাম। বাপ-মরা অনাথাকে বুকে নিলাম! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারুণ কত কথা ভাবতে থাকে।

জায়দা চাচীকে হারুণ জানে।

কিন্তু তুই টাকা ফেরৎ দিলি? অপমান করলি? কী করে বাস্তুভিটে রক্ষে করবি? অরে পোড়ারমুখী?

ঘূর্ণি ঝড়ে দিগন্ত আঁধার হতে চায়। কালবৈশাখীর দোলন লাগে বুঝি। আই পোড়ারমুখী—টাকা ফেরৎ দিলি তুই? এত তেজ কেন রে?

সব জমি রাখতে পারল না, ধার ধোর করে কেবল ভিটেটুকু রক্ষে করল সখিনা।

ছোট ভাই শাহাদাৎ গাড়ী এনেছিল। টাকাকড়ি আঁচলে বেঁধে স্বামীর ভিটের সংগে সম্বন্ধ চুকিয়ে, জায়দা বিবি গাড়ীতে উঠতে যাবে, কোত্থেকে ছুটে এল সখিনা। একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, যেও না মা। আমি থাকব কার কাছে। ও ঘর-বাড়ী যেমন তোমার ছিল, এখনো তেমনি রইল। মা গ—আমায় ফেলে যেও না।

পা ছাড়াবার চেষ্টা করল জায়দা বিবি, দেখ কাণ্ড। এতকাল জবলুনির ভাত খেলুম—আবার থাকব তোর কাছে। মুখে ঝাঁটা।

বড় বুবুকে থামিয়ে শাহাজাৎ বললে, তা চল না সখিনা—আমার বাড়ীতেই থাকবে।

ছিন্নলতার মত ধুলোয় পড়ে কান্নাকাটি করল সারা বেলা। যেন মূল কেটে গেছে। পাতা শুকিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে লতাটাও শুকিয়ে যাবে, গুটিয়ে যাবে। ঝগড়া না করে ভাত গালে তুলত না জায়দা বিবি। তা হোক। আজ সখিনার মনে হল পৃথিবীতে অতবড় নিরাপদ স্থান তার আর কোথাও নেই। শত দুঃখের মধ্যে ঐ তপ্ত কোলে মাথা রেখে সে যেন শান্তি পেত। সেই শেষ সম্বলটুকুও তার আর রইল না।

পাড়ার মেয়েরা আসে। সান্ত্বনা দেয়, কথা বলে। আগে সোনার প্রতিমা—ধুলোয় গড়াগড়ি। আজ রাজার বৌ হয়ে—। অ ধম্মো খেকো—এ পাপ আল্লা সইবে।

কত লোক গেল, এলো। গ্রামের সবাই এল একবার করে। যে শোনে সেই বলে, সোনার প্রতিমা—ভেসে গেল। কেউ কেউ কাঁদে।

কিন্তু সখিনা! আস্তে আস্তে সেই পাথর। অনেক রোদ-বৃষ্টি-ঘূর্ণি-ঝড়ের মধ্যে আর একটা ঝড় গেল। কিন্তু সন্ধ্যে যতই কাছাকাছি হয়, তত বিচলিত হয় সখিনা। এত সন্ধ্যা নয়—যেন ঘন বন। নিবিড় অরণ্য। ঐ আরণ্যক অন্ধকারে আছে সম্বর, আছে চিতা, আছে ময়াল। ভয়ার্ত সম্বরী নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে ব্যাকুল।

থাকবে মা আমায় এক মুঠো হলে—তোমার হবে।

আকবর চাচা তার বুড়ী মাকে সংগে করে এনেছে।

ও কী কথা মা। আল্লা আছে।

ঘূর্ণি স্রোতে একটা কুটো। তা হোক।

কুটো নয়—পরশ কাঠি। ওতেই পুনরুজ্জীবনের ইশারা।

ভয়ার্ত সম্বরী সেই কুটোর আড়ালে আত্মগোপনের নিরাপত্তা পেতে চাইল।

ঐ যে কী বলে—মনের মেঘ। যা জমে, জমে ঘন হয়। বষণে ঝরে না। ডাকে, গর্জায়। কিন্তু কমে না। বাড়ে। ঘন হয়। ঘন হয়ে দিগন্ত আঁধার করে।

ফেরৎ দিলি? ফেরৎ দিয়ে আমায় অপমান করলি?

বড্ড বিষণ্ণ বোধ করল হারুণ। চারদিকে রুপসীর ঐ বেদনাতুর মুখ। আই—তোকে কে বলেছে এমন করে থাকতে? টাকা পাঠাই নি আমি। আর তুই কী না—

এমন সময় বিউটি এল।

আর সংগে সংগে রক্তে যেন আদিম বন্যা ঢেউ খেলে গেল। একটুকরো আনন্দ। এক দেহ তাজা যৌবন। এই বিষণ্ণতার ফাঁকে বুঝি বিউটির এই মদালস আবির্ভাব কামনা করছিল ও।

কেন গ? পাশে বসে এক হাতে গলা জড়াল বিউটি, এত গম্ভীর আর বিষণ্ণ মনে হচ্ছে? তারপর বিউটি কতকটা রহস্য করে বলল, জানি আমি টাক বিয়ে করেছি। কিন্তু সে টাক চল্লিশের পর পড়ুক। এত তাড়াতাড়ি তার আবির্ভাব ঘটলে বড্ড ব্যথা পাব।

হারুণ স্মিত হাসলো। বিষণ্ণতা মরে যাচ্ছে যেন। সূর্য ফুটে ছায়াকে তাড়া করছে। এমন কতদিন দেখেছে, ধান খেতের উপর দিয়ে টাটকা সূর্য ছায়াটাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে ছায়া, প্রাণ ভয়ে খানা খন্দক ডিঙিয়ে, ছুটছে ছুটছে আর ছুটছে।

বিউটি সূর্য, সখিনা মলিন। বিষণ্ণতা পুষতে নেই। প্রশ্রয় দিতে নেই। দিলে, ঐ যে—ঘন হবে, কালো হবে—বিদ্যুতের বিষাক্ত ছোবল পড়বে তার পর।

সূর্য ফুটল। বিউটি হাসছে।

কী?

গাড়ী এল। চল—নতুন গাড়ী করে একটা শো দেখে আসি। বিউটি বলল, এই ত ক' দিনের জীবন। তাতে অর্ধেকটা কাল যদি চিন্তায় চিন্তায় কাটল।

ঠিক কথা। সব বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে যেন একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেল হারুণ। ভাবলেই ভাবনা। খুশী হও—খুশী। আসলে থাকতে হয়। খুশী অর্জন করা যায় না। এতসব কথা পলকে ভাবছিল হারুণ।

বিউটি কোলে মাথা রেখে, যেমন ফুলের মালা গলায় থাকে, দুই শুভ্র হাতে গলা বেষ্টন করে, হারুণের মুখটা রক্তরঞ্জিত ঠোঁটের উষ্ণ আওতার মধ্যে নামিয়ে নিয়ে এল। হারুণের হাত দুটি নিবিড় হয়ে এগিয়ে এল। আর মুহূর্তে পৃথিবীটাকে কী অপূর্ব মনে হল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জ্যাঁ জেনে

বিজয় দেব

আত্মজীবনী "থিফস্ জার্ণাল"এর কোথাও জ্যাঁ জেনে উল্লেখ করেছেন সেই ব্যক্তিটির কথা যে সুদর্শন, সুদীর্ঘ, একহস্ত বিশিষ্ট সার্বিয়ান স্তিলিতানো। সে ছিলো অবৈধ মেয়ে সংগ্রাহক, চোর এবং মাদকদ্রব্যের ফেরিওয়ালা। একদিন সে একটি বিশালদর্পণ কক্ষে হারিয়ে যায়। সে বাড়ীটি ছিলো সাক্ষাৎ গোলকধাঁধা। আংশিক স্বচ্ছ কাচ ও আংশিক দর্পণে তৈরী সেই গোলকধাঁধা থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে গেলেই সেখানে একটি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি ফুটে ওঠে। জেনে সেই স্তিলিতানোকে পাশবন্ধ জীবের মত সেখানে হারিয়ে যেতে দেখলেন। কোন শব্দ নয়, কোন ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত নয়। মঞ্চের বাইরে দর্শকদের ভীড় তখন উচ্চহাসিতে তলিয়ে গিয়েছে।

সেই প্রতিবিম্বই জেনের মঞ্চের সত্ত্বাকে প্রকাশ করেছে। মানুষের প্রতিবিম্বই ধরা পড়েছে দর্পণে। সেখানে তার বিকটমূর্তি আটকে আছে, যেখান থেকে অন্যদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে গিয়ে বারবার সে নিজেকে চারদিকে দেখছে এবং রূঢ়ভাবে কাচের বাঁধা ওকে থামিয়ে রাখছে। জেনের নাটক মুখ্যতঃ মানুষের নিজের নিঃসহায় অবস্থা ও নিঃসঙ্গতাকে বেঁধে রেখেছে। যখন হতাশায় মানুষের একাকীত্বকে মানুষের অবস্থার দর্পণকক্ষে আবদ্ধ করা হয় তখন সেখানে অসীম প্রতিবিম্বের সমষ্টি এবং আত্মপ্রকৃতির বিকৃতরূপের প্রতিফলন হয়, মিথ্যে মিথ্যেকে আড়াল করছে, উদ্ভট কল্পনা উদ্ভট কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখছে আর দুঃস্বপ্ন দুঃস্বপ্নের মধ্যে পুষ্ট হচ্ছে।

জ্যাঁ জেনে ভবঘুরেদের মধ্যেও বিতাড়িত, অপরাধী। তিনি প্যারিসে ১৯২০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় এক কৃষক দম্পতিদ্বারা জেনে পালিত। একুশ বছর বয়সে প্রথম তাঁর হাতে নিজের জন্মপত্রিকা আসে। তা' থেকে জানতে পারেন তাঁর মা'র নাম গ্যাব্রিয়েল জেনে এবং জন্মঠিকানা রয়েছে লুক্সেমবুর্গ গার্ডেন্সের পেছনে ২২ রু দ্য আসাস্। পরে সে ঠিকানায় অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন একটি মাতৃসদন ছাড়া অন্যকোন বাসস্থান সেখানে নেই।

সার্ত্রের স্মৃতিরক্ষকের দলিল এ যুগের একটা বিস্ময়কর বই। তিনি সেখানে দশমবর্ষীয় সেই ছোটবালক যে এককালে বাধ্য ও ধর্মপ্রবণ ছিল বলে ধারণা করেছেন। তাকেই আবার চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অভিযুক্ত এবং পরিশেষে চোরে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রে বলেছেন : "অস্তিত্ববোধের সর্বোৎকৃষ্ট কীর্তি"। জেনে যেখান বলছেন : "জীবনের কোন পর্যায়ে আমার চোর হবার বাসনা ছিলো না। আমার কুড়েমী ও দিবাস্বপ্নঘোর আমাকে "মেত্ত' কারেক্শনেল" এ একুশ বছর অবধি অন্তরীণ করে রেখেছিলো, সেখান থেকে চলে আসার বহুদিন পর কোন এক নিগ্রো কর্মচারীর স্যুটকেশ নিয়ে পালিয়ে যাই। মুহূর্তের জন্য চুরি করতে ভাল লেগেছিলো। কিন্তু যখন বেশ্যাগৃহে আমাকে সহজভাবে চলাফেরা করতে প্রেরণা জুগিয়েছিলো তখন আমি কুঁড়ের কোঠায়......"

জ্যাঁ জেনে

সার্ত্রে জেনের ঘটনাবলীকে অস্তিত্ববাদের পটভূমিকায় সমাদৃত করেছেন। "পরিবার পরিত্যক্ত অবস্থায় যা' স্বাভাবিক ছিলো তা' হলো ভালবাসা, চুরির প্রতি মোহ এবং অপরাধজনিত চৌর্যবৃত্তি। এইভাবে পৃথিবী আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেই আমি সে জগতকে পরিত্যাগ করি।"

জেনে যখন মঞ্চের জন্য কিছু লেখেন তখন তিনি সচেতন থাকেন, যেন তাঁর রচনা কাহিনীসর্বস্ব বা শুধুমাত্র আমোদের উপকরণ অথবা মঞ্চের জন্য নিছক দর্পণ সৃষ্টি না হয়ে পড়ে। তাঁর নাটকের বক্তব্য হবে সমাজের বিরুদ্ধে দস্যুর মত প্রতিবাদ। সেখানে ধারাবাহিক অঙ্গভঙ্গী অথবা অনুরূপ বিপক্ষতাচরণই প্রধান। অথচ কোন সামাজিক প্রতিবাদ জেগে ওঠেনি এই চূড়ান্ত অবমাননার বিরুদ্ধে।

জেনের প্রয়োজন হল বস্তুর অস্তিত্ব বিন্যাস। তিনিই সেই দুঃসিক্কাম, যিনি শয়তানে রূপান্তরিত। বিপরীত পৃথিবীর অসতের মধ্যে অভিজাত আবাসিক হয়ে সামাজিক কাঠামোকে বিপন্ন না করে তার সংঘাত চিন্তা সত্যই অসম্ভব ছল। "এখনো তুমি অসৎ সম্বন্ধে কিছুই জান না সেটা কি? কিন্তু আমি জানি যা' একমাত্র আমার কলমে প্রেরণা উৎসকে সঞ্জীবিত করে। একটা চিহ্ন যা' এক্ষেত্রে আমার প্রাথমিক আনুগত্য (নিষ্ঠা)"—দি ক্রিমিন্যাল চাইল্ড।

ফরাসী সাহিত্যের "পোয়েতেস্ মানদিতুস্" এর দীর্ঘ ইতিহাসে জ্যাঁ জেনে একটি বিস্ময়কর প্রতিভা।

১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল অবধি জেনে ভ্রাম্যমাণ অপরাধীর জীবন যাপন করেন। বার্সিলোনার 'ব্যারিও চিনো'তে ভিক্ষুক ও অবৈধ মেয়ে সংগ্রাহকদের সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যান এবং সেখানে প্রথম ফরাসী কয়েদীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর ইতালীতে চলে আসেন। তা' ছাড়া রোম, নেপলস্, ব্রিনদিসি, আলবেনিয়ায় পালাবার কালে জালনোটের ব্যবসা করতে গিয়ে ধরা পড়েন ও বহিষ্কৃত হন। হিটলারের জার্মেনীতে থাকাকালীন অবস্থায় বলেছেন : "এখানে আমি দস্যু পরিচালিত শিবিরে আছি। আমি অনুভব করছি এরা হল একটা চোরের জাত। এখানে যদি আমি চুরি করি তাহলে স্বতন্ত্র কোন কাজ বলে গণ্য হবে না যা' আমাকে নিজের সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করবে। তাছাড়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল আমি স্বভাবজনীতিকে পালন করেছি মাত্র। সেগুলো ধ্বংস করতে তো পারি না।"

ফ্রান্স যখন জার্মান অধিকৃত ছিল তখন জেনে জেলের বাইরে। অথচ এই জেলই তাঁকে কবি বলে প্রখ্যাত করেছে। তিনি সার্ত্রকে একদা বলেছেন : "একবার আমাকে তদন্তসাপেক্ষে হিসেব ভুল করে জেলের পোষাকে আবৃত করে সেলে ঢুকিয়ে দেয়। সেখানে দণ্ডিত অপরাধী নয় এমন সব কয়েদীরাও রয়েছে। তারা সবাই স্ব-স্ব পোষাকে সজ্জিত।' এইভাবে তিনি তাকে ঘৃণায় ও ব্যঙ্গে প্রকাশ করেন। "এদের মধ্যে একজন কবিতা রচনা করেছিল, যা মূর্খতাপূর্ণ ও আত্মকরুণার সমতুল্য ও প্রশংসিত হয়েছিল। সবশেষে আমি ঘোষণা করলাম যে, আমি একটি ভাল কবিতা রচনা করেছি। সে কবিতা ছিল ("কাঁদমনে অ্যা মরতে") মরিস পিলোজ-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকসঙ্গীত। যিনি ব্রিয়'র কারাগারে ১৯৩৯ সালের ১৭ই মার্চ বন্ধু হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জেনে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সাল অবধি 'আওয়ার লেডি অব দি ফ্লাওয়ার্স" (ফ্রেসনেস্ প্রিজন্ : ১৯৪২), "মিরাক্‌ল্ দ্য লা রোজ' (লা সান্তে এন্ড ত্যুরেলে প্রিজন : ১৯৪৩), "পোম্পে ফেনেব্রে এন্ড কোয়েরেলে দ্য ব্রেস্ত" রচনা করেন। এগুলোকে উপন্যাসের চেয়ে বরং গদ্যকবিতা বলাই যুক্তিসংগত। এই রচনাগুলো সমাজ

বহিষ্কৃত সহকামী জগতের গল্পের আকারে পুষ্ট। জেনে এ প্রসঙ্গে সাত্রে'কে বলেছেন: "আমার কোন চরিত্রই নিজের সম্বন্ধে আজও সামান্য সিদ্ধান্তটুকুও নিতে পারেনি।' এই রচনাগুলো ছিল মূলতঃ জেনের জীবনের কামজ কল্পনা ও সমাজ বহির্ভূত নিঃসঙ্গ জীবনের দিবাস্বপ্ন।

জেনের বর্ণনামূলক গদ্য, ব্যাধিগ্রস্ত এবং একই সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে কাব্যময়। বিপরীত দিকে নিঃসঙ্গ ধর্মীয় পরিবেশ বিপর্যস্ত এবং পরিত্যক্তের উৎসর্গীকৃত বৃত্তিকে সেখানে পবিত্রতার প্রতি প্রার্থনায় চিহ্নিত বলে দেখান হয়েছে। সার্ত্রে সেন্ট জেনেকে সেন্ট তেরসা অব আভিলা'র সঙ্গে তুলনা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি।

সার্ত্রে আরো বলেছেন : "জেনে আমাদের মধ্যে তাঁর পাপকে সংক্রামিত করে নিজকে মুক্ত করে নিয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি বই হলো মনোদৃশ্য কাব্য বিশোধক আচ্ছন্নতার সংকটকাল। প্রতিটি রচনায় ভূতাবিষ্ট মানুষ সেই শয়তানের উপর প্রভুত্ব করছে যে তার এই অবস্থার জন্য দায়ী। গুরুত্বপূর্ণভাবে লক্ষ্যণীয় যে, জেনে তাঁর আবিষ্টতায় পাণ্ডিত্যের প্রক্রিয়া তাকে কাব্য থেকে বর্ণনামূলক গদ্যের দৃশ্যকাব্যে রূপান্তরিত করেছে।"

জেনের প্রথম একাঙ্ক নাটক "ডেথওয়াচ" জেলের ক্ষুদ্র কক্ষে বসে রচনা। নাটকটি অনেকাংশে আত্মজীবনীমূলক। এর বিষয়বস্তু জেনের অপরাধের সর্বোচ্চ শ্রেণী বিভাগ ও কাহিনীমূলক গদ্যকে পরিব্যাপ্ত করেছে। তাঁর দিবাস্বপ্নে কারাগার রাজপ্রাসাদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। "রাজপ্রাসাদ যেমনি রাজঅতিথির নিরাপদ আশ্রয় তেমনি কয়েদীদের কারাগার!" এখানে কঠোরতা, আইনের কাঠিন্য অপরিহার্য অঙ্গ যা' রাজপ্রাসাদেও প্রচলিত।

"ডেথওয়াচ" এ বই-এর উপর সর্বোচ্চ ঘণ্টার যে দখলকারী সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে ছিলো নিগ্রো স্নোবল। একজন হত্যাকারী। সেই কক্ষের আবাসিকরা উপাস্য দেবতার প্রতিফলিত গৌরবে অবগাহন করছে। এখানে মোট তিনটি চরিত্র। গ্রীনআইজ একজন হত্যাকারী, তবে স্নোবলের মত উঁচুদরের নয়। স্নোবল লাভের জন্য হত্যা করে। গ্রীনআইজ মুহূর্তের আত্মপ্রত্যয়হীনতার জন্য বেশ্যাকে খুন করে বসে। লে ফ্রাংক চোর। মরিস সতেরো বছরের কিশোর অপরাধী। এখানে কাহিনী তিনজন কয়েদীর সম্পর্ককে আশ্রয় করে আবর্তিত হচ্ছে। মরিস গ্রীনআইজকে শ্রদ্ধা করে, যে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। লে ফ্রাংক, গ্রীনআইজ অশিক্ষিত বলে তার স্ত্রীকে চিঠিপত্র লিখে দিচ্ছে। গ্রীনআইজ মরিস সম্বন্ধে ঈর্ষাপরায়ণ। সে গ্রীনআইজের স্ত্রীকে লিখিত চিঠিগুলোর সদ্ব্যবহার করে তার স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে যাতে তার কাছ থেকে স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। যখন গ্রীনআইজ সবকিছু আবিষ্কার করলো তখন সে মরিস ও লে ফ্রাঙ্ককে অনুরোধ করল যে, তাদের মুক্তির পর দু'জনের একজন যেন তার স্ত্রীকে হত্যা করে। তাদের মুক্তি দু' একদিনের মধ্যেই হবে। এদের মধ্যে কে তাদের উপাস্য দেবতার জন্য গিলোটিনে যাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারপরই গ্রীনআইজ ভেঙে পড়ে। সে তার হত্যার কাহিনী বলতে সুরু করে। কি করে সেই বেশ্যাকে একটা ধর্ষণ কাজের উত্তেজনায় খুন করে বসলো (যেখানে তার সংযমের কোন হাত ছিলো না), যখন রক্ষী খাঁটী খুনী স্নোবলের কাছ থেকে সিগারেট উপহার এনে দিলো তখন সে তার স্ত্রীকে রক্ষীর কাছে দান করে বসলো। তরুণ বীরপূজক তার নায়ককে খণ্ডিত দেখে গভীর হতাশায় ভেঙে পড়লো। লে ফ্রাঙ্কও যে কঠিন নির্মম খুনী হতে পারে তা' সে দেখাতে চায়। মরিস তাকে তাদের মত বালককে ঠাণ্ডামাথায় হত্যা করতে পারবে না বলে ব্যঙ্গ করে। লে ফ্রাঙ্ককে এখনো খাঁটী খুনী বলে অস্বীকার করে। সে বলে উঠলো : "আমি খুন করতে চাইনি। খুনই আমাকে গ্রহণ করেছে।" লে ফ্রাঙ্ককে অন্যভাবে বলতে শুনি : "আমার দুর্ভাগ্য গভীর থেকে উৎসারিত এমনকি আমার ব্যক্তিত্ব থেকে উঠে এসেছে।" নাটকটি শেষ হয় লে ফ্রাঙ্ক-এর উপলব্ধির শেষ সীমায় : "আমি সত্যিই অনুক্ষণ নিঃসঙ্গ।"

জেনের প্রথম নাটক গীতিধর্মী বর্ণনায় জেলের অপরাধী ও দণ্ডিত অপরাধী জীবনকে গভীরভাবে চিত্রিত করেছে। জেনে কোন বাস্তব ঘটনাকে বর্ণনা করতে চাননি। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য জেলে দিবাস্বপ্ন ও কয়েদীদের জীবন্ত উদ্ভট কল্পনা ও উত্তেজনার আচ্ছন্নতাকে রূপদান করা। এখানে স্পষ্টতঃই টমাস মান ও কাফকার স্বপ্নপ্রবণতার সঙ্গে যেন যথেষ্ট মিল রয়েছে।

"দি মেইড"

এই নাটকে দু'জন পরিচারিকা ভালবাসা, ঘৃণায় একে অপরের দর্পণ প্রতিকৃতিতে সংযুক্ত। তাই ক্লেয়ারকে বলতে শুনি : "আমি আমার দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দেখে অসুস্থ বোধ করছি। এ যেন অনেকটা উৎকট বিশ্রী গন্ধের মত। তুমি আমার দুর্গন্ধময় অস্তিত্ব।" একই সঙ্গে ক্লেয়ার গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে দেখতে পাচ্ছে যেমনি সারা পরিচারকগোত্রকে তেমনি উচ্চশ্রেণীকে সেই দর্পণে : "তোমাদের আতঙ্কিত অপরাধী মুখমণ্ডল, কুঞ্চিত কনুই, অপ্রচলিত ঢং-এর পোষাক তোমাদের ক্ষীয়মান দেহ হোল পরিত্যক্ত। তোমরা হলে আমাদের বিকৃত দর্পণে জঘন্য অভিব্যক্তি (পোষাকে), আমাদের লজ্জা, পঙ্কিলতা।" এমন কি জেনের বিশাল দর্পণ কক্ষ এর চেয়েও কুটিল। প্রভুদের বিরুদ্ধে পরিচারিকাদের বিদ্রোহ সামাজিক সঙ্কেত নয় এটা হোল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা ও বাড়ী ফেরার জন্য ব্যাকুলতা। এ বিদ্রোহের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে আছে অভিশপ্ত দেবদূতে রূপান্তরের (রূপান্তরিত) বিদ্রোহ ঘোষণা, যখন তার সম্মুখ থেকে আলো চিরদিনের মত সরে গিয়েছিল। যার জন্য এখানে আত্ম-অনুষ্ঠানের মধ্যে সবকিছু প্রকাশ লাভ করেছে।

জেনের নাটক বিশ্লেষণ সহজে মেলেই দুরূহ হয়ে ওঠে। কি করে জেনের দর্পণে প্রতিফলিত গোলকধাঁধায় প্রবেশ করা সম্ভব? তাঁর সবকটি রচনাকে বলা যেতে পারে প্রহেলিকার রঙ্গভূমি। তিনি কোন একটা উজ্জ্বল বা তীব্র অনুভূতির নৈষ্ঠ সত্তাকে প্রকাশ করার জন্য সাধারণতঃ সাজসজ্জার অনুষ্ঠানকে সর্বদা প্রয়োগ করতেন—যেমন ঘৃণায়, ভালবাসা, অবজ্ঞায়, হিংসা। তার 'দি মেইড' নাটক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই নাটকে প্রথম দেখতে পাওয়া যায় ক্লেয়ার ও সোলাজ' দু' বোন যখন তাদের কর্ত্রী বেরিয়ে যান তখন তার পোষাকে তারা সজ্জিত হয়। দু' বোনের একজন আনুষ্ঠানিকভাবে সজ্জায় রূপান্তরিত গৃহকর্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করে অন্যজন পরিচারিকা। তারপর যখন পরিচারিকা উপুড় হয়ে জুতোর ধুলো ঝেড়ে দেয় তখন গৃহকর্ত্রীরূপী তার স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রমোদজনিত আড়ম্বরে উন্মত্ত। হঠাৎ সে ম্যাডামের উপর থুথু ফেলে এবং আঘাত করে মেঝেতে ফেলে দেয়। পরিচারিকা দু'জনের মধ্য দিয়ে কর্ত্রীর উপর তাদের মনোভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ যথাযথ হয়েছে। এমনকি তারা তাকে হত্যা করার কথাও ভাবছে। যখন কর্ত্রী বাড়ী ফিরে আসে তখন আমাদের প্রত্যাশিত কুৎসিতরূপে সজ্জিত দেখা যায় না, তার বদলে সাধারণভাবে সাদাসিধে, বিত্তশালিনী, কল্পনা বিলাসিনী এ জগতেরই সামান্য নারী মাত্র। পরিচারিকা পরিবেশিত বিষমেশানো চা পান না করেই উপহাসযোগ্য আবেগপ্রবণ প্রেমিকের পশ্চাদধাবন করতে কর্ত্রী ছুটে গেল। পরিচারিকারা আবার তাদের অনুষ্ঠানে প্রত্যাবর্তন করল। ক্লেয়ার তখন অনুভব করল কর্ত্রীর মধ্যে কপটাচারীর ভ্রষ্টতা ও আত্মশ্লাঘার উপাদান যা তারা ঘৃণা করে সেগুলোকে হত্যা করার এল প্রথম প্রচেষ্টা। কর্ত্রীর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ক্লেয়ার সোলাজকে বাধ্য করল বিষমিশ্রিত চা তার হাতে তুলে দিতে এবং সে তাই পান ক'রে ফেলল। সোলাজ' এর শেষ কথা এই প্রথম কেমন শান্ত ও সরল বলে প্রকাশ পেল। জেনের এই নাটক (একাঙ্ক) 'দি মেইড' সত্যিই প্রশংসনীয়। কারণ নাটকখানি অত্যধিক সংহত।

জেনে নিজে একজন অনাথ ছিলেন। তরুণ বয়সে তাঁকে পাঠান হয় একটি কয়েদখানায় এবং তারপর বারবার চুরির অপরাধে তাঁকে দশবার জেলে যাওয়া-আসা করতে হয়। সমাজচ্যুত হয়ে এটুকু উপলব্ধি করেছেন যে, একমাত্র কপটতাই মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে তাঁকে পৃথক করে রেখেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে অলক্ষ্যে অদ্ভুত কাজ-

রাণী ভবানীর মন্দির, জিয়াগঞ্জ

ফটো : সুনীলচন্দ্র পোদ্দার

ছেন তাই এ জগতের বাস্তব ধর্ম। তার চৌর্যবৃত্তি হল সমাজের কপটতার নৈতিকতার বিরুদ্ধে সুসজ্জিত প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু উত্তর তিরিশে পেঁৗছে সেই প্রতিবাদ রূপান্তরিত হল সাহিত্যে। 'দি মেইড' জেনের নৈতিকবোধের বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে।

নাটকের পরিণতিতে সোলাঞ্জে'র সরলতা এক হিসেবে অধর্মের সারল্য এবং সেখানে অকপটে নির্লজ্জভাবে বোনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কজনিত অপরাধ (লেস্‌বিয়ানিজম-জনিত) সে প্রথম নির্মম সত্যকে প্রকাশ করে। তবুও বিষণ্ণভাবে নীতিবাদী দর্শকদের নীতিবহির্ভূত নাটক চরম আঘাত করে। পুনর্জন্মের প্রস্তাবনার জন্য ঘনিষ্ঠভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়ে ছলচাতুরীকে বিবস্ত্র করা।

'দি ব্যালকনি' নাটক জেনের রচনায় আঙ্গিক ও বক্তব্যে পূর্বের রচনাগুলোর চেয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নাটকটি সুরু হয় বিশপের পোষাকে সজ্জিত হয়ে একজন আত্মম্ভরণে ব্রহ্মবিদ্যাতত্ত্ব নিয়ে বক্তৃতা করছে। ম্যাডাম ইরমার পতিতালয় হল 'গ্র্যান্ড ব্যালকনি' যাকে বলা যায় 'মায়াপ্রাসাদ' বা 'দর্পণকক্ষ'। এখানে মানুষ তার গোপন বাসনা, সুখ-স্বপ্নকে নিয়ে অন্য জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। তারা নিজেদের বিচারক হিসেবে কোন একটা মেয়ে চোরকে পরিমিত সাজা দিচ্ছে। সেনাপতি হিসেবে অনুভব করতে পারে যে প্রিয় তেজী ঘোড়াকে ভালবাসে সে আবার সুন্দরী মেয়েও হতে পারে। ম্যাডোনা সেজে কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতে, মৃত্যুপথযাত্রী বিদেশী কূটনীতিবিদকে অপরূপ আরব রমণী কর্তৃক উদ্ধার করা। মহনীয়তার চির-আবৃত্ত উদ্ভট কল্পনার অবলম্বন হিসেবে রয়েছে ম্যাডাম ইরমার জীবনযাত্রা বা গৃহস্থালী যাকে রূপকশোভিত অর্থে নয় যথার্থভাবে বলা যেতে পারে একটি প্রশস্ত দর্পণকক্ষ বা এক ধরনের মঞ্চ এবং সেখানে প্রযোজক, সংগঠক হিসেবে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ম্যাডাম ইরমা।

'দি ব্যালকনি' স্পষ্টতঃ উদ্ভট কল্পনার জগতকে প্রতিনিধিত্ব করছে। জেনের স্বপ্নে মিশে আছে ক্ষমতা ও যৌন প্রবৃত্তি। তাঁর কল্পলোকে ছড়িয়ে আছে বিচারক, পুলিশম্যান, কর্মচারী, ধর্মযাজক যারা স্পষ্টভাবে আলোকিত।

জেনে ব্যক্তির অক্ষমতার বোধশক্তিকে সমাজের জালে ধরে রেখে অভিযোগ করেছেন 'নিঃসঙ্গ আমি'র দমিত ও অবচেতন স্তরের ক্ষিপ্ততাকে যা তাঁর রচনায় বস্তুতঃ লক্ষ্যণীয়। এবং 'তাদের' বেনামী অস্পষ্ট প্রভাবে আতঙ্কিত হয়েছেন। এই সেই অসহায় অবস্থা, অক্ষমতা যা অতিকথা ও দিবাস্বপ্নের প্রতিকল্প ব্যাখ্যায় নির্বাসনের পথ অনুসন্ধান করেছেন।

'অতিকথা' ও 'স্বপ্নের' বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবেই স্বপ্ন ও অতিকথায় সীমিত। এমনকি 'ডেথওয়াচ' এবং 'দি মেইড' নাটকের ঘটনাগুলো পাঠকরা বাস্তব বলে গ্রাহ্য করেন না। 'দি ব্যালকনি'তে প্রচলিত চরিত্র সেখানে অনুপস্থিত শুধু মৌলিক আবেগ, প্রেরণার প্রতিকৃতির সমষ্টি ছিল। সেখানে কোন কাহিনী নেই। সারা রচনা জুড়ে রয়েছে শ্রেণীবদ্ধ অনুষ্ঠান। কাহিনীর গঠনপ্রণালী আচার-অনুষ্ঠানকে অনেকখানি দুর্বল করেছে। জেনের রচনা বিশুদ্ধ যুক্তিবাদে চিহ্নিত নয় তাই সেখানে নিঃসঙ্গ অতিকথার জগতকে যথাযথভাবে অভিক্ষেপ করা হয়েছে।

জ্যাঁ জেনের 'দি ব্যালকনি' নাটকটি সর্বজনবিদিত। জেনে এখানে অস্তিত্বকে দেখেছেন দর্পণের অসীম স্থির প্রতিবিম্বরূপে। প্রত্যেকটি রূপকল্পনা বাস্তবে ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এটাও সত্যি যে অনুসন্ধানের শেষে তা সবসময় মায়া বলে প্রমাণিত হয়। জেনের চরিত্রগুলো নির্দিষ্ট ভূমিকায় অন্তর্ভুক্ত কিন্তু যখনই সে ছদ্মবেশ অপসারণ করে, তখন আসল পুরুষকে আর আবিষ্কার করা যায় না। কারণ ততক্ষণে সে অন্য কোন নতুন মুখে রূপান্তরিত। জেনের এ সব উপকরণ আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত রীতিকে আঘাত করেছে এবং এমনকি অন্য 'অ্যাবসার্ডিস্ট'-দের মত তিনিও কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দ্বারা প্রাচীন প্রচলিত রীতিকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হন নি।

সার্ত্রে জেনের বিস্ময়কর জীবন সম্বন্ধে বলেছেন : "স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তিনি সীমার চরম পর্যায়ে 'চোর' আখ্যায় ভূষিত। তিনি স্বপ্নে নিমজ্জিত হয়েছেন। নিজকে কবি করে তুলেছেন। ভাষার কাব্যকে সাফল্যের শীর্ষদেশে তুলেছেন।"

সবশেষে জেনেকে কাছে পাব তাঁর বক্তব্য অনুধাবন করলে : 'অসংখ্য পরস্পর বিরোধী দৃষ্টান্তের দীর্ঘপথে আমার ব্যবহৃত শব্দগুলো উৎপীড়নের সংজ্ঞায় যা প্রকাশিত তা কোন ঘটনা বা নায়ককে বর্ণনা করা নয়, সে হল আমাকে নিয়ে আমার নির্দেশ। আমাকে উপলব্ধি করার জন্য চাই পাঠককে কুকর্মের সঙ্গে মিতালী করা।'

(—জ্যাঁ জেনে-থিফ্‌স্‌ জর্নাল)

বোলতা-ভীমরুল

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

বোলতা ও ভিমরুল একই জাতীয় পক্ষযুক্ত ক্ষুদ্র প্রাণী। ক্ষুদ্র হলেও এদের দংশন-বিষ বড়ই ভীতিপ্রদ। ক্ষুদ্রতম একটি বোলতা বা ভিমরুল এক ইঞ্চির ১০০ ভাগের এক ভাগ, আর বৃহত্তমটি পক্ষসমেত চার ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রতম এই জীবের দংশন এত তীব্র বিষযুক্ত যে, যে কোন বয়স্ক লোককে সে মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিকল করে দিতে পারে। দেখা গেছে ক্ষুদ্রতম বোলতার দংশনে একজন বয়স্ক লোক মুখমণ্ডল যন্ত্রণায় প্রথমে নীল এবং ক্রমে অবসন্ন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ক্ষীণতর হয়ে কিছুক্ষণের ভেতরই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছেন।

বোলতার দংশন বিষ এত শক্তিশালী যে বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিষের এক ভাগ ২০০,০০০,০০ ভাগ রক্তের সংস্পর্শে এসে আহত ব্যক্তিকে অবশ করে দিতে পারে। তবে সময়মত চিকিৎসকের সাহায্য পেলে সুস্থ ব্যক্তি বোলতা বা ভিমরুলের দংশনে মৃত্যুবরণ করেন না।

সুখের কথা এই যে বোলতা ও ভিমরুল প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের সংগে শত্রুতা পোষণ করে না। বোলতা ও ভিমরুলের প্রজাতি রয়েছে ১০,০০০। এই দশ হাজার জীব ভীষণ যন্ত্রণাদায়ী বিষের ফ্যাক্টরী সংগে নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়ায়।

কীটতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন—"পক্ষযুক্ত কীটের ভেতর বোলতা-ভিমরুলের মত বুদ্ধিমান চটপটে স্মার্ট কীট খুবই দুর্লভ। এরা মানুষের সংগে অকারণ কোন শত্রুতা তো করেই না বরংচ মানুষের ক্ষতিকারক ও শত্রুতাকারী অনেক কীট ধ্বংস করে মানুষের উপকারই করে থাকে।"

গ্রীষ্মের প্রারম্ভ থেকেই এদের পক্ষ শব্দে আগমনবার্তা ঘোষণা করে থাকে। গ্রীষ্মের গোধূলি লগ্নে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে শ্রীমতী বোলতা মাঠের ও বাগানের কিম্বা মেটে ঘরের আনাচেকানাচে গর্ত খুঁড়ে বেড়াচ্ছে। গর্ত খোঁড়ার ব্যাপারে দুটি পা ও মুখ ব্যবহার করে থাকে। গর্তের গভীরতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটি প্রায় আট ইঞ্চি। চক্রাকার ব্যাসটি কত হবে সেটা নির্ভর করছে যে প্রাণীটি অবশ করে ইনি তাঁর ভবিষ্যত সন্তানসন্ততির আহারের জন্য নিয়ে আসবেন তার মাপ অনুযায়ী।

অথচ আশ্চর্য এই যে বোলতা-ভিমরুল সম্পূর্ণ নিরামিষ আহারী। এদের জীবন-চক্র একবার মাত্র আমিষ আহার করে সঞ্চালিত হয়। নবজাত শিশুর প্রথম আহার আমিষ। নবজাত শিশু-বোলতা প্রথম আমিষ আহার করে যে শক্তি সঞ্চয় করে সেইটিই পরবর্তী জীবনে তাকে সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

স্ত্রী বোলতা সন্তান-সম্ভবা হলেই তার ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য আমিষ আহারের সন্ধানে বাগানের ভেতর ও ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে স্ত্রী বোলতাটি এই সময় যে ঘুরে বেড়ায় তার চারদিকে কত কীটপতংগই না রয়েছে, কারো দিকে তার নজর নেই। সে যেন "বিশেষ কাউকে" খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই বিশেষ জীবটিই তার চাই। সেই জীবটি হল একটি বিশেষ মাকড়সা। এই বিশেষ মাকড়সাটি তার নবজাতক সন্তানদের প্রথম আহারের সামগ্রী হবে—ঐ মাকড়সাটি না হলে তার সন্তান প্রসব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই মাকড়সাটি হচ্ছে 'টেরাণ্টুলা' জাতীয় একটি ঊর্ণনাভ।

'টেরাণ্টুলা' ঊর্ণনাভের সন্ধান পাওয়া মাত্র শ্রীমতী বোলতা এতকাল যে গর্ভধারণ করেছিল তা সার্থক হয়ে উঠলো। শ্রীমতী বোলতা আনন্দে অধীর হয়ে উঠল—তার জীবনচক্রে এক বিরাট ও বিচিত্র পরিবর্তন দেখা গেল। শ্রীমতী এক অপূর্ব 'মৃত্যু নৃত্যের' আয়োজন করল। এই নৃত্যে দুপক্ষেরই প্রবল আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমতী বোলতা যেমন ঊর্ণনাভের উপর আশ্চর্য অভূতপূর্ব এক আকর্ষণ বোধ করে, ঊর্ণনাভও ঠিক তদ্রূপ আকর্ষণে শ্রীমতীর দিকে এগিয়ে যায়। যেন কত যুগের পরিচয় —কত বিচ্ছেদের পর—বিরহের পর আবার নতুন করে মিলনের পাত্রটি পূর্ণ হয়ে এসেছে। কীটতত্ত্ববিদরা এই আকর্ষণের রীতিনীতি ও কার্যকারণ নিয়ে আজও রহস্যাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। যদি কেউ 'সুন্দরী মনোনয়নে'র আধুনিক অনুষ্ঠান দেখে থাকেন—সেখানে প্রতিযোগিনীকে যে ভাবে বিচারকরা চারদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেন, তেমনিভাবে শ্রীমতী বোলতা 'টেরাণ্টুলা'কে পরীক্ষা করে দেখে। 'টেরাণ্টুলা'টিও সেই সময় তার আট পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে শ্রীমতী বোলতাকে চতুর্দিক পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ যেমন হঠাৎ এইবার শ্রীমতী বোলতা টেরাণ্টুলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার সমস্ত অংগপ্রত্যংগ তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজে দেখে। এরপর এক নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়। শ্রীমতী বোলতা ধীরে ধীরে মাকড়সাটিকে যেন সম্মোহিত করে ফেলে। সম্মোহিত মাকড়সার দেহে এইবার শ্রীমতী বোলতা আপনার সুতীক্ষ্ন সূচিকাটি থেকে অবশকারী তীব্র বিষ সূচিকাভরণ করে তাকে অবশ করে ফেলবার চেষ্টা করে। একটুক্ষণের ভেতরই মাকড়সাটির সম্মোহিত অবস্থা আর থাকে না—সে যেন তার ইচ্ছা-শক্তির সংগে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে আত্মস্থ হয়ে ওঠে—সে তার বিপদ বুঝতে পেরে সজাগ হয়ে উঠবার চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাকড়সাটি মুহূর্তের ভেতর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যুযুৎসু হয়ে ওঠে। মাকড়সা দৈহিক দিক থেকে বড়—তুলনায় বোলতা ছোট। কিন্তু যুযুৎসু দুই প্রাণীই কেউ কারো কাছে ছোট হতে রাজি নয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাংঘাতিক সম্মুখযুদ্ধ। যেন "কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আকড়ি দুইজনা দুইজনে।" কিন্তু বেচারা 'টেরাণ্টুলা' দৈহিক দিক থেকে বৃহত্তর ও বলশালী হলেও বিষধর বোলতার কাছে তার পরাজয় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের ভেতরই মাকড়সাটি অবশ ও অচৈতন্য হয়ে যায়, মৃত্যু ঘটে না। মাকড়সার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়—জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না—তাকে মৃত বলেই মনে হয় কিন্তু আসলে সে মরে না—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে নিশ্চল হয়ে থাকে তার জীবনপ্রবাহ। এইবার শ্রীমতী বোলতা সেই অবশ-অচৈতন্য মৃতপ্রায় মাকড়সাটিকে একটি কবরের ভেতর টেনে নিয়ে যায়। এই কবরটি তিনি আগেই খুঁড়ে রেখেছিলেন এর জন্যে। সেখানে মাকড়সার রোমশ উষ্ণ উদরের উপর শ্রীমতী বোলতা তার অণ্ডজ ভাবী সন্তানদের শয্যা তৈরী করে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে মাটি দিয়ে আপনার অণ্ডজ ভাবী সন্তানসহ মাকড়সাটিকে কবরস্থ করে। কিছুদিনের ভেতরই ডিম-গুলি ফুটে শূককীট হয়। শূককীট হয়েই বোলতা-শিশু ক্ষুধায় অস্থির হয়ে ওঠে—আহার অন্বেষণে তৎপর হয়ে ওঠে। আহার্য বস্তু একেবারে মুখের উপর। বোলতার শূককীট তখন সেই 'টেরাণ্টুলা' মাকড়সা-টিকে রক্তমাংস রোঁয়াসহ খেয়ে ফেলে। এইবার মাকড়সাটি মরে সত্যিই প্রমাণ করে যে পূর্বে সে মরে নাই। একটি জীবের আস্বাদনে অন্য এক জীবের জীবনপ্রবাহ সুগম করে দেয়ার এ এক প্রকৃতির বিচিত্র লীলা।

বোলতার বিষে মানুষের মৃত্যু ঘটে না বটে, কিন্তু কীট জাতীয় জীবের পক্ষে বোলতা-ভিমরুলের বিষ প্রাণঘাতী। ডাক্তার রাইমন এল বেয়ার্ড নামক একজন কীটতত্ত্ববিদ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে বোলতার সামান্য একটু বিষ মুহূর্তের ভেতর ১,৬০০ শুঁয়োপোকাকে অবশ-বিকল করে দিতে পারে। বোলতা-ভিমরুলের বিষ কিভাবে জীবদেহে কাজ করে এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মতামত দিতে দ্বিধা করলেও কীটতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে এই বিষ জীবদেহে স্নায়ু ও পেশীর সুষম কাজকে ব্যাহত করে।

বোলতা বা ভিমরুলের যে হুলটি দৃশ্যমান সেটি কিন্তু বিষ প্রয়োগের যন্ত্র নয়। ঐ হুলটির আরো অভ্যন্তরে তার কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ যন্ত্র রয়েছে যা দিয়ে সে তার শত্রুকে আক্রমণ করে ঘায়েল করে। বোলতা ও ভীমরুল অত্যন্ত দ্রুত আক্রমণ করতে পারে, আক্রমণের বস্তুর কোন স্থানটি সবচেয়ে দুর্বল প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে সে সেই স্থানটিতেই সহজে আক্রমণ করে। করাতের মত দুটি ধারালো হুল তার লুকোনো থাকে, সেই দুটি ধারালো যন্ত্রই তার দংশনের প্রধান অস্ত্র। দেহের আয়তন ও ওজন অনুযায়ী বোলতার পেশীশক্তি অত্যন্ত বেশী—এই শক্তিমান পেশীর সাহায্যে সে সেই যন্ত্র দুইটি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে। করাতের মত এই দংশন হুলের গায়ে আরো ছয়টি অববাহিকা বিষদন্ত আছে—দংশনের সংগে সংগে তড়িৎগতিতে এই সব কয়টি যন্ত্র বিষপ্রয়োগে সাহায্য করে।

প্রকৃতি এর দেহে অসীম শক্তি দিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টার ভেতর একটি বোলতা তার দেহের আয়তনের দশগুণ একটি গর্ত তৈরী করে ফেলতে পারে। মানুষের পক্ষে তার দেহের দশগুণ একটি গর্ত করতে কত সময় লাগবে?

ভারোত্তলনের ক্ষমতাও এর কম নয়। ওর দেহের ওজনের অনেক বেশী ওজনের কোন বস্তুকে নিয়ে ও সহজে উড়ে যায়।

একটি ভীমরুল একটি বেশ বড় গাছ কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে। বোলতা ও ভীমরুল বেশ বড় বড় কাঠ চিবিয়ে তা দিয়ে কাগজ তৈরী করে ফেলে এবং সেই কাগজের সংগেই আবার মাটি ও আটা জাতীয় জিনিস মিশিয়ে নিয়ে গাছের ডালে বা ঘরের আনাচে-কানাচে ঘর তৈরী করে।

ডাঃ জর্জ ডি সাফার প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি বোলতা ও ভিমরুল পোষ মানিয়েছেন। তিনি একটি বোলতাকে তার হাতের আঙ্গুলে বসিয়ে মধু খাওয়ান। তিন সপ্তাহ তিনি সেই বোলতাটিকে এড়িয়ে চল্লেন। তিন সপ্তাহ পর দেখলেন যে সেই বোলতাটি হাতের যে আঙ্গুলটিতে বসিয়ে মধু খাইয়েছিলেন সেই আঙ্গুলে এসে বসলো। তাঁর মতে মাটি খুঁড়ে যারা গর্ত করে সেই জাতীয় স্ত্রী বোলতার একটি বিশেষ ধরনের স্নায়ুবিক কেন্দ্র আছে। এই জাতীয় বোলতার স্মৃতিশক্তি বেশ প্রবল এবং এরা ব্যক্তিত্বেরও পরিচয় দিয়ে থাকে। ডাঃ সাফারের মতে বোলতা পোষ মানে এবং সেই পোষমানা বোলতা স্নেহ ভালবাসা ও আদর করলে সাড়া দেয়।

বোলতার চিন্তাশক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখলে অনেক সময় অবাক হতে হয়। ওরা যখন বাসা তৈরী করে তখন একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বোলতা কিভাবে খড়কুটো থেকে ধীরে ধীরে বেছে বেছে ঠিক যেটি তার দরকার হবে সেটিই মাত্র তুলে নেয়। এই বেছে নেবার সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায় কিভাবে বোলতা একজন দক্ষ কারিগরের মত মেপেজুকে তার কাজ করে। এই মাপাজোকার ভেতর একটুও গলতি থাকে না। একজন ইঞ্জিনীয়ার স্থপতিবিজ্ঞানী যে কাজটি শেষ করতে দু ঘণ্টা অঙ্ক করে কাটিয়ে দেবে বোলতা আধ ঘণ্টার ভেতর তার স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে সে কাজ সমাধা করে দেয়।

ডিম প্রসব করবার সময় স্ত্রী বোলতা যেভাবে মাকড়সা অবশ করে আপনার বাসায় রেখে গিয়ে অনেক দূর থেকে আবার উঠে এসে নিজেরই তৈরী করা বাসায় ঠিক জায়গায় গিয়ে আবার বসে তা পরীক্ষা করে কর্নওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডাঃ ই লরেন্স পামার বলেছেন—"বোলতার আচরণ লক্ষ্য করলে তার যে স্মৃতিশক্তি রয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ জাগে।"

বোলতা সত্যিই খুব স্মার্ট। তাহলে বোলতা মানুষকে মাঝে মাঝে হুল ফোটায় কেন? পরীক্ষা করে এরও হদিশ পাওয়া গেছে। যেসব বোলতা ও ভিমরুল 'অসামাজিক'—অর্থাৎ একা একা একক বাসা তৈরী করে আলাদা থাকে তাদের ভেতরই হঠাৎ মেজাজ খারাপ করে হুল ফুটিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই 'অসামাজিক' বোলতা ও ভিমরুলেরা বড় বদমেজাজী হয়ে থাকে। যেসব বোলতা বা ভিমরুল অনেকে মিলে বেশ বড় বাসা তৈরী করে একসংগে থাকে তারা 'সামাজিক' বোলতা। তাদের মেজাজ বেশ ঠান্ডা। হঠাৎ হুল ফুটিয়ে দেবার প্রবণতা তাদের নেই। তবে ওরা আত্মরক্ষা করবার জন্যে অনেকসময় দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এবং এই দলবদ্ধ আক্রমণ অনেক সময় মারাত্মক অবস্থা ধারণ করতে দেখা যায়।

বোলতা ও ভিমরুলের দংশন বিষের বিষক্রিয়া নিয়ে চিকিৎসক মহলে কিছুদিন আগেও বেশ বিভ্রান্তি ছিল। বোলতা ও ভিমরুলের বিষ দেহে প্রবেশ করলে—প্রথমেই চিকিৎসক বিভ্রান্ত হন হৃদযন্ত্রের সাড়া না পেয়ে; সংগে রক্তের চাপও এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, চিকিৎসক প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে আজকাল খুব শীগ্গিরই ব্যাপারটা ধরা পড়ে, এবং চিকিৎসায় তড়িৎ ফল পাওয়া যায়। তবুও তাঁরা বলেন—প্রথমবারের দংশনে যদিও বিষক্রিয়া খুব মারাত্মক নাও হতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় বারের জন্যে রোগীকে সাবধান থাকতে হয়। দ্বিতীয় দংশনের জন্যে কাউকে প্রস্তুত না থাকাই সংগত, কারণ কীট দংশনের বিষ যেভাবে স্নায়ু ও কোন কোন গ্রন্থিকে এমন অবশ ও স্পর্শকাতর দুর্বল করে রাখে যে দ্বিতীয় দংশনের বিষ রোগীর পক্ষে মারাত্মক হবার আশংকা থাকে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 13th January, 1967 শুক্রবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

গত ১৪ই পৌষের 'অমৃতে' চিন্তাশীল লেখক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষের 'সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' নিবন্ধটি পাঠ করে অত্যন্ত খুশী হলাম। লেখকের গভীর চিন্তাশীলতা ও স্বচ্ছ সুন্দর-সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা না করে পারছি না। বর্তমান ভঙ্গুরে বাঙালী সমাজের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি এমনতর প্রবন্ধের প্রয়োজন আছে আরও। ওই বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বাঙালীসমাজের দিকে তাকালে আমরা কি দেখব? দেখব—আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বহুদর্শী ঋষি প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থাকে অসার মনে করে তাকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করে য়ুরোপীয় সমাজব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছি আমরা। স্বাধীনতা লাভ করেও আমরা মনে-প্রাণে থেকে গেছি পরাধীন। স্বাধীন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে, রুচি থাকবে, ভাবধারা থাকবে, থাকবে সামাজিক নিয়ম-নীতি। সেসব আমাদের কোথায়?

আমরা একবারও আমাদের নিজেদের দিকে ফিরে তাকাই না। আমরা কম কিসে! কোথায় আমাদের দীনতা! আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি আমাদের সংস্কৃতি এবং সমাজব্যবস্থার কোথাও এতটুকু গলদ নেই। পৃথিবীতে এমন কোন জাতির সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা নেই যা আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের! পরানুকরণে আমরা অন্ধের মত গা এলিয়ে দিয়েছি, বিদেশী আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, বসন-ভূষণকে আমরা নিজেদের করে নিতে চাইছি। কিন্তু যা আমাদের মজ্জাগত নয়, তা কি কখনও আমাদের হতে পারে? এই অন্ধ অনুকরণের ফাটল দিয়ে আমাদের জীবনা-কাশে অমঙ্গল গ্রহ দেখা দিয়েছে। পদে-পদে আমরা হোচট খাচ্ছি। লেখক অবশ্য আশা-বাদী। তিনি আশা করেন আমাদের জীবনাকাশের এই সীমাহীন কাল মেঘ এক-দিন কেটে যাবে। তিনি মন্তব্য করেছেন... 'আগামী দিনের সমাজ, আমি স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, হবে আরও সুন্দর, আরও মহিমময়। মানুষ পাবে খেতে, পাবে পরতে, পাবে বাসস্থান — হয়ে উঠবে মহান।' আমি মনে-প্রাণে এই-ই চাই। কিন্তু ওই অবস্থায় পৌঁছুতে গেলে আমাদের নিজেদের সনাতন সমাজব্যবস্থা, আচার-বিচার, নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপকে সস্নেহে অতি আদরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে জীবনে মূর্ত করে তুলতে হবে।

আজ আমাদের মধ্য থেকে জাতীয়তা-বোধ ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। অতীতের ঐতিহ্য, গৌরব আমরা ভুলতে বসেছি। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়েছি। আমাদের সামাজিক বনিয়াদ আজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে দিনকে-দিন। বাঙালী জাতি আজ মরণের কোলে ঢলে পড়েছে প্রায়। জাতীয় কৃষ্টির ওপর অটুট বিশ্বাস ও ঐকান্তিক টানই এই মুমূর্ষু-প্রায় অবস্থায় নবজীবনের সন্ধান দিতে পারে। লেখকের সুরে সুর মিলিয়েই আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের বলব..."আগামী দিন হোক তোমাদের মধুময়, সৃজন কর নিজ হাতে সুন্দর সমাজ, ভুলে যেও না তোমাদের উত্তরসূরীদের কথা। মনে রেখো কোন দেশে, কোন সমাজে জন্মায় নি এত-গুলি মহৎ প্রাণ—তাঁরা তোমাদের আশীর্বাদ করছেন প্রতিনিয়ত। রাস্তা পাবে তাঁদেরই জীবন-দর্শনের মধ্যে।" সৎ যা, সত্য যা, যা যা আমাদের জীবনতরীকে বইয়ে নিয়ে যেতে পারে মহিমময় জীবন-সাগরতীরে তাই-ই আমাদের সমাজব্যবস্থায় ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। য়ুরোপীয় সমাজব্যবস্থার অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই আমাদের।

অসিতবরণ হালদার
দেওঘর

'ইতর' প্রসঙ্গে

গত ৩২শ সংখ্যা অমৃতে ইন্দ্রজিৎ মহাশয়ের 'ইতর' রচনাটি খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করি; মনে আশা ছিল অনেক কিছু নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে একটি রসাল ও নিটোল রচনা পাব বলে, কিন্তু রচনাটি শেষ করবার পর খুবই নিরাশ হয়েছি। তিনি শুরু করেছেন ইতর শব্দটির বর্তমান অর্থাবনতি নিয়ে। কিন্তু কেন এই অর্থের অবনতি ঘটল সে সম্বন্ধে তিনি যদিও প্রশ্ন তুলেছেন কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে পাশ কাটালেন কেন ঠিক বুঝলাম না। তিনি মাত্র একটি কারণ দেখিয়েই রচনাটি শেষ করেছেন।

শব্দার্থতত্ত্ব আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় শব্দের অর্থ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় শব্দের অর্থ কোথাও হয়েছে সংকুচিত, কোথাও বা প্রসারিত, আবার কোথাও বা ভিন্ন-অর্থ লাভ করেছে। এই সবগুলিরই আবার কোথাও ঘটেছে উন্নতি, আবার কোথাও বা অবনতি। কিন্তু কেন শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয় বা হয়েছে?

প্রথমতঃ জ্ঞানের প্রসারতা। পূর্বে একটি মাত্র শব্দে সমষ্টিগত জিনিসকে বোঝান হত। কিন্তু জ্ঞানের প্রসারতার ফলে আমরা ইদানীং সমস্ত কিছুকেই আলাদা-আলাদা নামে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করছি। ফলে যে শব্দে পূর্বে একটি সমষ্টিকে বোঝাত এখন তা কেবল মাত্র নির্দিষ্ট কোন একটিকে বোঝায়। যেমন 'মৃগ'। মৃগ শব্দ সংস্কৃতে বা তারও আগে সমগ্র পশুকেই বোঝাত। বর্তমানে মৃগ কেবল হরিণকেই বোঝায়। মৃগ অর্থে যে সমগ্র পশু-মন্ডলীকেই বোঝাত তার প্রমাণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি 'শাখামৃগ' 'মৃগয়া' শব্দ দুইটিকে। প্রথমটির অর্থ বানর আর দ্বিতীয়টির অর্থ পশুশিকার। আবার ইংরাজী meat শব্দকেও এই ব্যাপারে উল্লেখ করা যায়। meat অর্থে পূর্বে সমস্ত রকম খাদ্যবস্তুকেই বোঝাত। কিন্তু বর্তমানে meat কেবলমাত্র 'মাংস'। meat অর্থে যে খাদ্যবস্তু ছিল তার প্রমাণ আমরা এখন Sweetmeat শব্দে পাই। বর্তমানে ইতর শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটেছে, ঠিক সেই রকম পাষণ্ড শব্দেরও ঘটেছে, কিন্তু পাষণ্ড আগে ইতর শব্দের মতই নিষ্কলুষ ছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকেই পাষণ্ড বলা হত। কিন্তু এখন আর পাষণ্ড আমরা সেই অর্থে ব্যবহার করি না। আগে জনসাধারণের মধ্যে বা অন্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিল যাদের আমরা বর্তমানে ইতর বা পাষণ্ড নামে চিহ্নিত করেছি, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য বা পালি সাহিত্যে তাদের আলাদা কোন নামে চিহ্নিত না করে ইতর ও পাষণ্ড বলে অভি-হিত করা হয়েছে, পাষণ্ডের মত ইংরাজী-তেও একটি শব্দ আছে—Villain. Villain শব্দ বর্তমানে যে অর্থে আমরা ব্যবহার করি পূর্বে সে অর্থ ছিল না। Villain শব্দের উৎপত্তিতে আছে Villa খামারবাড়ী বা গোলাবাড়ীকে Villa. বলা হত। এখানে শস্যাদি ঝাড়াই-মাড়াই করা হত। এই খামার বাড়ীতে যারা বাস করত তাদের বলা হত Villain. কিন্তু এখন Villain সেই অর্থে ব্যবহার করা হয় না। Villain এর বর্তমানে অর্থাবনতি ঘটেছে ঠিক ইতর ও পাষণ্ড শব্দের মত।

দ্বিতীয়ঃ আগে ভাষা ছিল Synthetic, কিন্তু এখন ভাষা প্রায়ই হচ্ছে Analytic. এই বিশ্লেষণাত্মক হওয়ার দরুণও অনেক শব্দ আগের অর্থ ত্যাগ করে নতুন অর্থ লাভ করেছে।

তাছাড়া লেখক এক জায়গায় দুঃখ করে বলেছেন—"এখন কারও মুখে কারো সুনাম নেই; প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুর্নাম রটাতে ব্যস্ত।...তাহলে কি আর আমাদের ঘরের পাশের কোপবতীর নাম হত কোপাই, খর-কায়ার নাম খরকাই, কংসবতীর নাম কাঁসাই?" এই অপভ্রংশের জন্য লেখকের দুঃখ করা সাজে না। কেননা ভাষা কিছু কিছু ক্ষয় হয় বলে অনেক ভাষা-বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করে-ছেন। কিন্তু এই ক্ষয়ের ফলে ভাষার গতি যায় বেড়ে। এ যুগের ভাষায় কোপবতী খরকায়া বা কংসবতীকে চালান সম্ভব না। যদি তা করতে যাই, তবে সে চলা হবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তাই যুগোপযোগী করে কোপবতীকে কোপাই, খরকায়াকে খরকাই এবং কংসবতীকে কাঁসাই করা হয়েছে।

শ্রীহৃষীকেশ
গৌহাটি-৯

অমৃত

সম্পাদকীয়

মগজ রপ্তানীর দুর্ভাবনা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫০তম বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের দেশের অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অপরিহার্য সহযোগিতা বিষয়ে সময়োচিত আলোচনা হয়েছে। মজার কথা এই যে, স্বাধীনতালাভের পর প্রতিটি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনেই এ বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক মূল্যায়নে বিজ্ঞান কতখানি আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে প্রকৃত সত্য যাচাই হয়নি। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রি বলেছেন যে, টাকা পয়সা দিয়েই একমাত্র সত্যিকারের বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না। এগুলোর প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু আসল প্রয়োজন মানবিক উপাদান। দুঃখের বিষয় বিজ্ঞান গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রেরণার জন্য যে মানবিক পরিবেশ দরকার সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

ভারতের মতো অগ্রসরমান ও উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রয়োজন প্রতি পদেই আমাদের অনুভব করতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই আমরা এখনো পরনির্ভরশীল। বিজ্ঞান-প্রকল্পেও বৈদেশিক সহযোগিতার দায় থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। অথচ আমাদের লক্ষ্য হল, আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা উপার্জন এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে সর্ববিধ বৈদেশিক সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে সমাজের সর্বস্তরেই স্বনির্ভরশীলতার আবেদন প্রচার করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে নতুন বিজ্ঞানীদের নিয়েই। গত কুড়ি বৎসরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ যথাসাধ্য অর্থব্যয় করছেন। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বহু বিজ্ঞানী বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন উন্নততর সুযোগের আশায়। তাঁদের অনেকেই আর দেশে ফিরছেন না। আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-দেশে বিজ্ঞানকর্মের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সে-দেশের বিজ্ঞানীরা চলে যাচ্ছেন বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে এবং তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ইয়োরোপ, আমেরিকার মতো উন্নত দেশগুলি লাভবান হচ্ছে। এই বিসদৃশ ঘটনা আমরা দুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করছি। অথচ আমাদের যা সম্পদ অর্থাৎ বিজ্ঞানীর মগজ ও বুদ্ধি তা বিদেশে রপ্তানী করছি—এ ঘটনা বাস্তবিকই দুঃখের এবং দুর্ভাবনার বিষয়। অধ্যাপক শেষাদ্রি বলেছেন যে, অধিকাংশ ভারতীয় বিজ্ঞানী বিদেশে গিয়ে বি-জাতীয় হয়ে গেছেন। দেশের প্রতি তাঁদের কোনো মমতা নেই। উন্নত দেশে, সচ্ছল জীবনযাত্রার প্রাচুর্যে তাঁদের জাতীয়তাবোধ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, এঁদের অনেকেই বিদেশে কোনো উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানকর্ম করছেন না। তা সত্ত্বেও দেশে আসতে এঁদের প্রবল অনীহা। বিজাতীয় বোধই এর জন্য দায়ী বলে অধ্যাপক শেষাদ্রি মন্তব্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এতটা কঠোরভাবে বলেননি। কিন্তু এই মগজ রপ্তানীর ফলে যে আমাদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন।

ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞানের সহযোগিতা আজ অপরিহার্য। ইংলন্ডের মতো উন্নত দেশও তার বিজ্ঞানীদের আমেরিকা যাত্রায় বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করছে। একথা ঠিক নয় যে, সমস্ত বিজ্ঞানীই বি-জাতীয় হয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। বহু বিজ্ঞানকর্মী এমন অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা অনেক আশা নিয়ে দেশে ফিরে এসে বিদেশের তুলনায় অল্প পারিশ্রমিকেও উপযুক্ত কাজের সুযোগ বা পরিবেশ পাননি। তার ফলে আবার তাঁরা বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। স্বভাবতই এই সব দৃষ্টান্ত দেখে অনেকে দেশে আসতে চান না। অর্থের চেয়েও কাজের সুযোগ পাওয়া বিজ্ঞানীর কাম্য। আমাদের গবেষণাগারগুলিতে ও অন্যান্য প্রকল্পে বিজ্ঞানীর কাজের উপযুক্ত পরিবেশ কতখানি আছে এবং বিজ্ঞানীকে কতটা সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয় তা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, বিজ্ঞানের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক ও মেধা যে সামাজিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য, এই বোধ না জাগাতে পারলে প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না। স্মরণ থাকতে পারে যে, বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী লোকান্তরিত অধ্যাপক জে বি এস হলডেন এ নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন যে, আমাদের বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলিতে আমলাতন্ত্রের দাপট বেশি। তার ফলে প্রকৃত বিজ্ঞান-সাধকের পক্ষে স্বাধীনভাবে গবেষণা করা কঠিন। আমাদের সমাজে এখনো রাজনীতিক ও আমলাদেরই প্রাধান্য। বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী, শিল্পীদের স্থান অনেক পিছনে। এই হতাশাবোধ থেকেই বিজ্ঞানীরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন কিনা, আজ তা বিচার করে দেখার সময় এসেছে। কারণ, এইভাবে মগজ রপ্তানী অব্যাহত থাকলে সমাজের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হবে।

নারীকন্ঠ

মলি

(২য়)
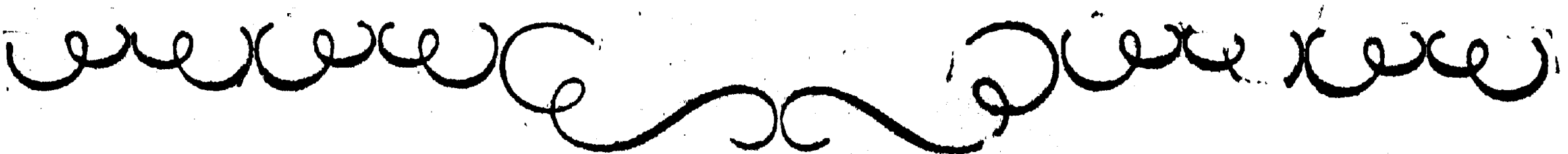
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

মলির কথা বলছি। সম্ভবতঃ পাঠিকার মনে আছে যে, মলি কালিন্দী অভিনয় দেখতে এসেছিল। আমি তাকে নিয়ে বক্সে এসে বসলাম যখন ঠিক তখনই ড্রপটি উঠছে। বলতে গেলে আমরা বসবামাত্রই অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমটা শুকনো ফ্যাকাসে মুখে কিছুক্ষণ স্টেজের দিকে তাকিয়ে রইল মলি। স্টেজের ফুটলাইটের আলোর সবটা উপরে স্টেজ-বক্সের উপরে পড়েছে। মলির মুখখানার দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেল আমার। বুঝলাম সে এখনও নৈরাশ্যের বা আশাভঙ্গের বেদনার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। অভিনয় সে দেখছে না, দেখার ভান করে তাকিয়েই আছে, চোখে তার কিছু পড়ছে না। দৃষ্টির মধ্যে দেখার ক্রিয়াটা হচ্ছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন লাগছে?

সে মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনি ওকথা কেন বললেন?

—কি কথা?

—উপন্যাসটা আমার আত্মজীবনী-মূলক?

—নয়?

—না।

—তা হ'লে যা বলেছি ওটা ধরো না। তবুও ওই যে নায়িকা তার ওই সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়ার পরিণতিটা আদৌ স্বাভাবিক হয় নি!

—বাঃ আমি যে দেখেছি।

—দেখে তুমি থাকতে পার। কিন্তু দেখেও তুমি ঠিক ঠিক লিখে বা এ'কে স্বাভাবিক মানে রিয়েল করতে পার নি।

সে চুপ ক'রে গেল। অভিনয় সেদিন ভাল হচ্ছিল। সারীর অভিনয় যে করছিল—সেই সময় তার গান ছিল। চরে একটা প্রকান্ড বড় অজগর সাপ মারা পড়েছে—অহীন গুলি মেরে সেটাকে ছররায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে, অন্যদিকে সারীর ভাবী বর সেও তীর দিয়ে বিঁধেছে। সারী ঠিক তারপরই গাইছে—

"অজগরের মাথার মণি
কে দিবে এনে গো—কে দিবে এনে।
রাজার বেটা ধনুক বান
নিয়ে এল বনে সে নিয়ে এল বনে।"

গানটার মাঝখানে সে বললে—

—এ গানটা রিয়াল হয়েছে?

—আমাদের নাটকের যে ট্রাডিশন আছে তাতে আনরিয়াল হয়নি।

—সাঁওতালেরা এমনি ভাল গান বাঁধে?

—তা বাঁধে। এর থেকে অনেক ভাল বাঁধে। বরং এ গানটাই ওদের মত ভাল হয় নি।

আবার মলি চুপ করলে। আবার অভিনয় তার মায়া বা ছায়া বিস্তার করে আমাদের আত্মস্থ করে দিলে।

আত্মস্থ আমি হয়েছিলাম। কিন্তু মলি হয় নি। প্রথম অঙ্কের ড্রপ নেমে এল—আলো জ্বলে উঠল অডিটোরিয়ামে, আমি নাট্যকার, খুব খুশী মনে মলিকে বললাম—কেমন লাগল ফার্স্ট অ্যাক্ট?

মলি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আজ আমি বাড়ী যাই। ভাল লাগছে না কিছু।

বিস্মিত হয়ে বললাম—সে কি? কেন? সত্যিই কোন কারণ আমি ধরতে পারি নি। একটু হতভম্বের মতই প্রশ্ন করেছিলাম—ভাল লাগছে না?

—বড় মাথা ধরেছে।

বললাম—অ্যাসপিরিন খাবে?

—নাঃ—আমি বাড়ী যাই।

কি বলব—বললাম, চল তুলে দিয়ে আসি তোমাকে।

—না। আপনি বসুন। আমি যাই। বড় খারাপ লাগছে। আমিই আপনাকে আসতে বলেছিলাম। কিছু মনে করবেন না তো?

—না—না। কি মনে করব?

—তা হলে আপনি বসুন। আপনি আমাকে উঠিয়ে দিতে যাবেন—সে আমার ভারী খারাপ লাগবে। না—না—।

আমি অগত্যা বললাম—বেশ আমি যাব না। তুমি যাও।

মলি হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে চলে গেল। আমি বসে রইলাম। অভিনয় সেদিন সত্যিই খুব ভাল হচ্ছিল। মলি চলে গেল বলে আমারও উঠে আসতে ইচ্ছে হল না।

ড্রপ উঠল, দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হল। বেশ কয়েক মিনিট চলে গেছে তখন, সুইং-ডোরটা ঠেলে কে যেন বক্সে ঢুকে পিছনে দাঁড়াল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মলি। মলি আবার ফিরে এসেছে।

—মলি! তুমি? বাসে ট্রামে উঠতে পারলে না বুঝি?

—না।

—তবে?

—যেতে খারাপ লাগল। মনে হল আপনাকে বোধ হয় অমান্য করা হবে। আপনাকে তো আমিই আসতে বলেছিলাম!

ব'লে সে পাশের চেয়ারটায় বসল। বললে—অ্যাসপিরিন আছে আপনার কাছে?

—তা আছে। কিন্তু এ্যাসপিরিন খেয়ে কষ্ট করে কেন দেখবে বল?

—না—না, আপনি এ্যাসপিরিন দিন।

তারপর দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ পর্যন্ত বেশ দেখে গেলাম দুজনে। অসংখ্য নিঃশব্দ মুগ্ধ দর্শকদের সঙ্গে আবেগের এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ও ধারা দিব্যি মিলে মিশে গেল। অন্ততঃ আমার গেল। দ্বিতীয় অঙ্কের ড্রপ পড়ল।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে রামেশ্বরের মুখে কিছু মেঘদূতের শ্লোক আছে।

জাতং বংশে ভুবন বিদিতে পুষ্করা
বর্তকানাং—
জানামি ত্বাং প্রকৃতি পুরুষং
কামরূপং মঘোনং
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাং
দূরবন্ধুর্গতোহহং
যাচ্ঞা মোঘাঃ বরমধিগুণে নাধমে
লব্ধকামাঃ।।

আর আছে উমার মুখে রবীন্দ্রনাথের "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে" কবিতা আবৃত্তি। দৃশ্যটি খুব জমাট। বহুদিনের দুটি বিবদমান আত্মীয়-গৃহের মধ্যে পুনর্মিলনের মাধুর্যে মধুর এবং আবেগকম্পিত।

চোখে জলও আসে অনেকের। মলির চোখেও জল এসেছিল।

চোখ মুছে মলি বললে—আপনি খুব ভাল ক'রে সংস্কৃত পড়েছেন—না?

হেসে বললাম—না।

সে বিস্মিত হল, সবিস্ময়েই বললে—না? কি বলছেন? ঠাট্টা করছেন?

—না। ঠাট্টা করি নি। জান তো ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে পড়তে এসেই পুলিশের কবলে পড়েছিলাম। পড়বার সময় হয় নি। তার পরই তো শ্বশুরেরা চেষ্টা করতে লাগলেন লাগলে গতাক্তে—আমি চেষ্টা করলাম দড়ি ছিঁড়ে গুঁতোগুঁতিতে মাতুতে।

একটু চুপ করে থেকে বললে—একদিন আপনার জীবনের গল্প শুনব। বলবেন আমাকে?

—আমার জীবনের গল্প?

—বলতে বাধা আছে?

—কিছু না। বলব। কেন বলব না।

সেদিন অভিনয় শেষে চোখ মুছতে মুছতে সে বাড়ী গিয়েছিল। অভিনয় তার খুব ভাল লেগেছিল।

দুদিন পরই বোধ হয় অর্থাৎ এর পর খুবই তাড়াতাড়ি চিঠি পেয়েছিলাম,—আপনার নিজের কথা বলব বলেছেন। মনে আছে তো? আজই বিকেলে যাব এবং কোন একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আপনার কথা শুনতে চাই। যেন বাড়ী থাকবেন।

মলি।'

চিঠিখানা যখন পেলাম তখন মলির জন্য সত্যিই আমি নিজেই ব্যগ্র হয়ে আছি। তার একখানা গল্পের বইয়ের একটা গল্প আমার খুব ভাল লেগেছে। গল্পটার বিষয়-বস্তু অসাধারণ। এবং আমাদের পক্ষে কল্পনাতীত। তাকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাতে চাচ্ছিলাম। চিঠিখানা পেয়ে আমার খুব ভাল লাগল—আমি খুশী হলাম এই কারণে যে, মলি ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই এসে হাজির হবে। ঠিক মনে নেই চিঠিখানা কখন পেয়েছিলাম, সকালের না দুপুরের ডাকে।

বিকেলে মলি এল।

মলির বেশভূষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাকে রঙীন শাড়ী বা রঙীন জামা পরতে আমি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। এমনকি রঙীন পোষাকে সজ্জিতা মলিকে আমি কল্পনায় ছবিতে আঁকতে পারি নে। সে শাদা জমি শাড়ী পরত—তাও অধিকাংশ শাড়ীর পাড় ছিল নীলাভ কালাপেড়ে, তার মধ্যে জরির কাজও থাকত। জামাও ছিল শাদা কাপড়ের, তাতে কিছু হাতের কাজ থাকত। এই পর্যন্ত। চুল খুব বেশী ছিল না তার, অন্ততঃ লম্বায় তো ছিলই না। এবং কিছুটা কোঁকড়ানো আভাস ছিল। বেশীর ভাগ সময় চুল এলানো থাকত এবং নিত্যই বোধহয় শ্যাম্পু করত। বাঁ বগলে বই খাতায় একটা গোছা। এবং বাঁ হাতেই একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতের মুঠোয় থাকত একটা রুমাল।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাসার দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, কথা বলছিলাম একজনের সঙ্গে। সে অমৃতবাজার বাড়ীর ওখানে মোড় ভেঙে দেখা দিল। সে থমকে দাঁড়াল। তারপর চট করে ঢুকে গেল স্বনামধন্য চিত্রকলা-সাধক শ্রীযুক্ত যামিনী রায়—আমাদের যামিনীদা'র বাড়ী। বাড়ীটার দরজা খোলাই থাকত। মানুষেরা এসে ঘরে ঢুকে, ঘুরে ফিরে ছবি দেখে, চলে যেত। বুঝলাম আমি অন্যের সঙ্গে কথা বলছি দেখে মলি যামিনীদা'র বাড়ী ঢুকল ছবি দেখতে।

লোকটিকে বিদায় দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর যামিনীদা'র বাড়ী গিয়ে ঢুকলাম। মলি ছবির সামনে দরজার দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়েছিল। বুঝলাম—আমাকেই সে প্রত্যাশা করছিল। আমাকে দেখেই সে হাতের রুমালে ঠোঁট এবং মুখ বিশেষ করে নাকের নিচেটা মুছতে মুছতে এগিয়ে এল। বললে—চিঠি পেয়েছেন?

বললাম— হ্যাঁ। এস।

—অসুবিধা হবে না।

—কেন হবে?

—আমি ভাবছিলাম। একটু হাসলে সে।

বাড়ীতে চা খেয়ে সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলাম বাগবাজারে গঙ্গার ঘাটে। ওখানেই একটা বেঞ্চে ব'সে আমার নিজের গল্প বলতে বসে শুরুতেই বলেছিলাম—দুটো চারটে প্রশ্ন ক'রে সুতো ধরিয়ে দাও।

—সে আবার কেমন?

—ধরনা, জিজ্ঞেস কর আপনাদের আদি বাড়ীই কি লাভপুরে?

—বেশ তাই বলছি।

—তা হলে শোন—আমার ঠাকুরদার বাবা প্রপিতামহের নাম ছিল রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন কুলীন, লাভপুরে বিয়ে করেছিলেন ওখানকার জমিদার সরকারবাবুদের বাড়ী।

এই আরম্ভ হয়ে গেল কথা।

শুনতে শুনতে বলতে লাগল—এ তো ধাত্রীদেবতাতে আছে!

—হ্যাঁ আছে।

খুব ঝগড়া হয়েছিল বিয়ের পর? ধাত্রীদেবতায় যা আছে সেই রকম—ততখানি না তার থেকে কম—বাড়িয়ে লিখেছেন।

—না বাড়াই নি। তবে গ্রাম্য কর্কশতা অনেক ক্ষেত্রে মেজে পালিশ করে দিয়েছি।

—আপনার স্ত্রী কতদূর লেখাপড়া করেছেন?

—বেশীদূর না। তাতে তার দোষ নেই। দোষ আমারই বলতে গেলে। এগার বছর বয়সে মাঘ মাসে বিয়ে হল—মার্চ কি এপ্রিলে—লোয়ার প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দেবার কথা ছিল তার। কিন্তু আমি বললাম—সে কি কথা? বউমানুষ পরীক্ষা দিতে যাবে সিউড়ি—সে কি করে হবে। তা ছাড়া বিয়ের পর আমার সম্পর্কিত এক দাদা গার্লস ইস্কুলের মেম্বর হিসেবে ইস্কুলে গিয়েছিলেন, ও বসেছিল বেঞ্চে, পড়ছিল; দাদাকে দেখে এই এতখানি ঘোমটা টেনে চুপ ক'রে গেল। এর পর আর পড়া কি ক'রে চলে বলো।

খুক-খুক শব্দে হাসলে মলি। এই মলিকে শব্দ করে হাসতে শুনলাম। মলি খুব সোফিস্টিকেটেড মেয়ে, কথাবার্তা কইত তাও এত আস্তে যে মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নড়ার ভঙ্গি না দেখলে ঠিক ধরা যেত না, সে কি বলছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল ওপারে গঙ্গার পশ্চিমতটে বেলুড়ের বাড়ীঘর, গাছপালার মাথায় গাঢ় লাল রঙ ছড়ান আকাশটার কথা মনে পড়ছে। গঙ্গার জলেও লাল ছটা লেগে-ছিল। আমার মনে তার ছটা অবশ্যই লেগে-ছিল কিছুটা তবে কতটা তা স্মরণ করতে পারব না। তবে সতর্ক ছিলাম এ বলতে পারি। এবং অপরপক্ষে মলি সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা ছিল। খুব মর্যাদাময়ী ছিল সে।

গল্প শেষ হয়ে গেলে চুপ করে বসে রইলাম দুজনেই।

হঠাৎ আমিই বললাম—এবার তোমার কথা বল!

—আমার কথা!

—হ্যাঁ।

—সে তো ঠিক ধরেছেন আপনি। ওই উপন্যাসটাতে আমার কথাই লিখেছি আমি। কিন্তু আপনি তো বলছেন—হয় নি।

—হ্যাঁ উপন্যাস হয় নি। এবং আমার বিশ্বাস শেষটা তুমি নিজেকে ঢেকেছ। বাইরে সন্ন্যাসিনী না হয়ে মনে-মনেও অনেকে সন্ন্যাসিনী হয়, কিন্তু তুমি কি তাই? তুমিই বল না।

—না। নই। অকপটে স্বীকার করলে মলি।

—সেইজন্যেই বইখানা ঠিক ওতরায় নি। বাস্তব নায়িকার গায়ের মাপের সঙ্গে কল্পনা টেলার এ্যান্ড আউটফিটার্স'-এ তৈরী রেডিমেড গেরুয়া জামা আলখাল্লার মাপে মেলে নি।

একটু হাসলে সে। কিন্তু কিছু বললে না। আমি বললাম, তোমার লেখা একটা গল্প কিন্তু আমার ভারী ভাল লেগেছে। জান। খুব ভাল লেগেছে।

—কোনটা বলুন তো?

—ওই যে অভিনেত্রীর গল্পটি। আশ্চর্য গল্প।

গল্পটি সত্যিই বড় সুন্দর। সেই কবে পড়েছি, আজও ভুলি নি। আজ মলির স্মৃতির সামনে আবরণ পড়ে আসছে, সে স্মৃতি ঝাপসা হয়েছে খানিকটা, কিন্তু গল্পটা আজ মনে আছে।

এক প্রবীণা অভিনেত্রী। শুধু প্রবীণা নন, খ্যাতিমতী। অনেক খ্যাতি। প্রথম যৌবন থেকেই তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন এবং তখন থেকেই তিনি সুদুর্লভা।

আজ প্রবীণা হয়েও খ্যাতিতে তিনি ম্লান হন নি। খ্যাতি তাঁর সমান আছে। তাই বা কেন, খ্যাতি তাঁর বেড়েছে। অধিক-তর খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠায় এখন তাঁর অধিষ্ঠান। তিনি বসে আছেন তাঁর ঘরে, খাটের উপর বালিশে হেলান দিয়ে। পাশে ছোট একটা টেবিলের উপর টেলিফোন।

চুপচাপ বসে ভাবেন, অহরহই যেন ভাবেন। হঠাৎ তুলে নেন টেলিফোন।

হ্যালো। কে? ওটা কি...নম্বর? আপনি কি রাজেনবাবু, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। এক কালের থিয়েটার ওয়ার্ল্ডের রাজু মিত্তির? আপনি? অ! কেমন আছেন? ভাল? আচ্ছা আজকাল আর নামেন না কেন? নতুন কালে আপনাদের লোকে চায় না? না-না চায়-চায়। নিশ্চয় চায়। কি যে বলেন? আপনার মত প্রতাপ কি আর কেউ করতে পারবে? যে শৈবালিনীর পার্ট করেছে আপনার সঙ্গে—। কি? আমি কে? বলুন না! আন্দাজ করুন। করুন না মশায়। বাবাঃ কি করে আন্দাজ করবেন? সংসারে এমন করে ডুবেছ রাজু মিত্তির! ছি-ছি-ছি! হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি গো। আমি! আমিই বটে! একেবারে ভুলে গেছ? শুধু ভোলা নয়, মুছে ফেলেছ বোধহয়। না? এসো না, একদিন! আসবে? সময় করা মুস্কিল? রোজগারের ধান্ধায় ঘুরতে হয়! ও! আচ্ছা ভাই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নামিয়ে দেয় টেলিফোন।

আবার টেলিফোন তোলে। হ্যালো। এটা কি রাণাবাবু অ্যাক্টরের বাড়ী? আপনি কে? আপনিই রাণাবাবু? ও! আমি কে? কে বলুন তো! না। বলতেই বলছি! বল তো আমি কে? তুমি শুধু রাণা, আমাকে এক সময় থিয়েটারের লোকে শুধু রাণী না মহারাণী বলত!

হেসে উঠলেন।

—রাণা। রাণা। রাণা। শোন! নামিয়ে দিয়ো না, শো-নো! কি শুনবে? আমি কেমন আছি, তাই শুনবে! শুনবে না। কোন গরজ নেই, ইন্টারেস্ট নেই। আচ্ছা বেশ।

আস্তে আস্তে টেলিফোন নামিয়ে দেয়।

মধ্যে মধ্যে টেলিফোন বাজে।

মনে পড়ে যায়, প্রথম যৌবন থেকে মধ্য-যৌবন তাই বা কেন, তারপরও কত টেলিফোন এসেছে, সন্ধ্যেবেলা ঘন্টা দুয়েকের মত আপনার ওখানে যদি যেতে চাই। অভিনেত্রী অভিনয় করত—কি নাম? কত বয়স? কি করা হয়? কত টাকা খরচ করতে পারবেন? তারপর হঠাৎ নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে উঠতেন, ননসেন্স! রাস্কেল। পাঁঠা কোথাকার!

অবশ্য তেমন লোক বুঝলে নেমন্তন্ন নিশ্চয় করতেন।

আজকাল তেমন টেলিফোন আর আসে না। এ আবার কে টেলিফোন করছে।

'কে আবার বাজায় বাঁশী ভাঙা এ কুঞ্জ বনে!'

—কে? চম্পা থিয়েটার। কি? এক রাত্রি নামতে হবে? কি বই? চন্দ্রশেখর? শৈবলিনী করতে হবে? না? তাহলে কোন পার্ট? শৈবলিনীই তো বরাবর করেছি আমি। ও! সেই শুচিবায়ুইওয়ালা এককালের [illegible] মেয়েটার সেই এক সিনের পার্টটা? না-না-না। ও আমি করব না। বলতে আপনাদের মুখে বাধল না? না। মাপ করবেন। সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে দেয়।

আবার কিছুক্ষণ পর আবার রিসিভার তোলে।

ভাবে চম্পা থিয়েটারকে ডেকে বলবে, দেখুন ম্যানেজারবাবু আচ্ছা ওটাই করব আমি। এক সিনের পার্ট, কত ভাল করা যায় তাই দেখিয়ে দেব আমি। টাকা? যা দেবেন। হ্যাঁ। তবে গাড়ী পাঠাবেন।

কিন্তু ওতেও মন ভরে না।

হঠাৎ মনে পড়ে শিবদাসবাবুকে। তার থেকে বয়সে বেশ ছোট। সেকেন্ড ক্লাশ এ্যাকটর ছিল। কিন্তু চেহারাটা বড় ভাল ছিল। তার দিকে আড়চোখের দৃষ্টিতে তাকাত। তার নিবেদন বুঝতে পারত। মনে মনে খিলখিল করে হাসত। কত ফন্দী করে নাচাত লোকটাকে। লোকটা এখন একটা আপিসে কাজ করে। কেরানী। সেদিন নরেন বলে গেল শিবদাসের কোম্পানীর নাম। তাকে টেলিফোন করবে নাকি? বলবে, এস না শিবদাস ভাই। একদিন এস না! সকরুণ সুন্দর একটি বিলাপ!

মলিকে প্রশ্ন করলাম, এ গল্প কি করে লিখলে— এ মনের খবর কি করে জানলে? কল্পনা?

—না।

—বাস্তব?

—হ্যাঁ।

একজন অভিনেত্রীর নাম করলে সে। বললে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে! আমাদের বাড়ীর কাছেই বাড়ী। তাঁর কাছে যাই। ভারী ভাল লোক। তিনি এইভাবে টেলিফোন করেন। বলেন—জান মলি, আজ ঘরে বসে কিছুই ভাল লাগে না, মন আর হাসে না, উল্লাস আর যেন উথলায় না। থিয়েটারে গিয়েও না। কেউ তাকায় না। অথচ সেকালে—মলি, জান, আমি চলে গেলে আমার পায়ের ছাপের উপর শুয়ে রাজ-পুত্তুরে বলেছে, আঃ আমার তপ্ত বুকটা ঠাণ্ডা হল। ধনী ধন দিয়েছে পায়ে ঢেলে, মানী মান দিয়েছে পায়ে ঢেলে, আমি পায়ে করে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছি। আজ আমাকে তারা গ্রাহ্য করে না। ফিরে তাকায় না।

আমি বলেছিলাম, এই দেখ সত্য বলে এ গল্প জীবন পেয়েছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। খুব ভাল হয়েছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মলি বলেছিল, উঠলাম আজ। বিকেলটা চমৎকার কাটল।

পরের দিনের পরের দিন একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে সে লিখেছিল, সে একজনকে ভালবাসে। সেও তাকে ভালবাসে। ইস্কুলমাস্টার লোকটি। মাস্টারটি তাকে বলেছে, তার ভালবাসার কথা কিন্তু মলি বলে নি। বলা কি উচিত হবে?

লিখলাম, নিশ্চয়। যদি তোমার বাধো-বাধো ঠেকে তো আমি তাকে জানাবার ভার নিতে পারি।

কয়েক দিন পরে এল মলি।

লজ্জায় একটু আনত মাথায় সামনের চেয়ারে বসল।

বললাম, জবাব দাও নি কেন?

—তার সঙ্গে হঠাৎ সেদিন দেখা হল। আমার বান্ধবীর দাদা সে।

—কথাবার্তাও হল নাকি?

—আপনার পত্রখানা থেকে মনের জোর পেয়েছিলাম। মুখ নামালে!

—খুব ভাল। তাহলে কথাবার্তা হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—মন যখন জানাজানি হল, তখন দেওয়া-নেওয়াটাও সেরে নাও।

হঠাৎ আমার গৃহিণী নীচের কলতলায় বাসন মাজার জায়গাটায় এসেছিলেন লক্ষ্মীর ঘরের প্রদীপ এবং পিলসুজটা নিয়ে স্বহস্তে মাজতে! আমাকে দেখতে পেলেন, আমি বসে আছি দরজার সামনে।

বললেন—জল খেয়েছ?

বললাম—না।

—বেলা হয়েছে জল খাও, কেমন মানুষ তুমি—

—এই মলির সঙ্গে কথা বলে যাই—

—মলি? কই মলি? মলিও জল খান। কই? এসে ঘরে ঢুকলেন তিনি। আমি বলতে যাচ্ছিলাম এই মলি। আর মলি এই তোমার বউদি' কিন্তু বিচিত্র ঘটনা ঘটল। মলি হঠাৎ যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত উঠে দাঁড়াল। এবং আমার স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে শুধু আমি আজ যাই! বলে হন-হন করে সে একরকম প্রায় ছুটেই সে যেন পালিয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রীও অবাক কম হন নি। তিনি বললেন—এ কি?

আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—মলি-মলি। মলি।

তখন আনন্দ চাটুজ্জের পুরনো বাড়ীটাকে ডাইনে রেখে উত্তর মুখ থেকে পুব মুখে মোড় ফিরে মলি অদৃশ্য হয়েছে, শুধু দেখা যাচ্ছিল তার আঁচলের আঁচলাটা।

এর পর আর মলি আমার কাছে আসে নি।

তবে এটুকু খবর জানি যে, মলি যেমন ছিল তেমনি আছে। জীবনে কোন বাঁধনে সে নিজেকে বাঁধে নি।

মলির চরিত্রে বৈচিত্র্য যে কি তার স্বরূপ যে কি তা আমি ধরতে পারি নি।

ঠিক এক বছর আগে!

অপ্রত্যাশিত সেই অশুভ দিনটি এখনও আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই নিদারুণ শোকাবহ সংবাদ ছিল চিন্তার অতীত; মৃত্যুর নিঃশব্দ পদক্ষেপ আমাদের সমস্ত সত্তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল সেদিন।

জাতির পরমপ্রিয় নেতা শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আমাদের প্রত্যেকের বিবেককে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন শান্তির পবিত্র বাণী। যুদ্ধে ও শান্তিতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশ্বের এক মহান জাতির। হৃদয়ের বিরাটত্বে তিনি শুধু ভারতের নন, মানবজাতির অন্যতম মহৎ নেতারূপে সারা পৃথিবীরই বরেণ্য।

চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের মুহূর্তে যথাযথ কর্তব্য পালন করে গেছেন তিনি। পরশ্রীকাতর প্রতিবেশীদের দুষ্ট অভিলাষকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ভারত রাষ্ট্রের নৈতিক মানকে এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

শান্তিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ বাণী। মহাত্মাজীর প্রিয় শিষ্য এবং নেহরুজীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর পক্ষে শান্তির প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ কোন বাইরের ব্যাপার নয়, জীবনের সর্বাঙ্গীণ আদর্শেরই বহিঃপ্রকাশ। মানুষের প্রতি অপার মমতা ছিল তাঁর স্বভাবগত। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের প্রতি ছিলেন তিনি সদাজাগ্রত। বস্তুত তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষেরই অপরাজেয় নেতা। ভারতের আবালবৃদ্ধ সাধারণ নরনারী উজাড় করে দিয়েছিল হৃদয়ের প্রীতি ও আনুগত্য তাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি।
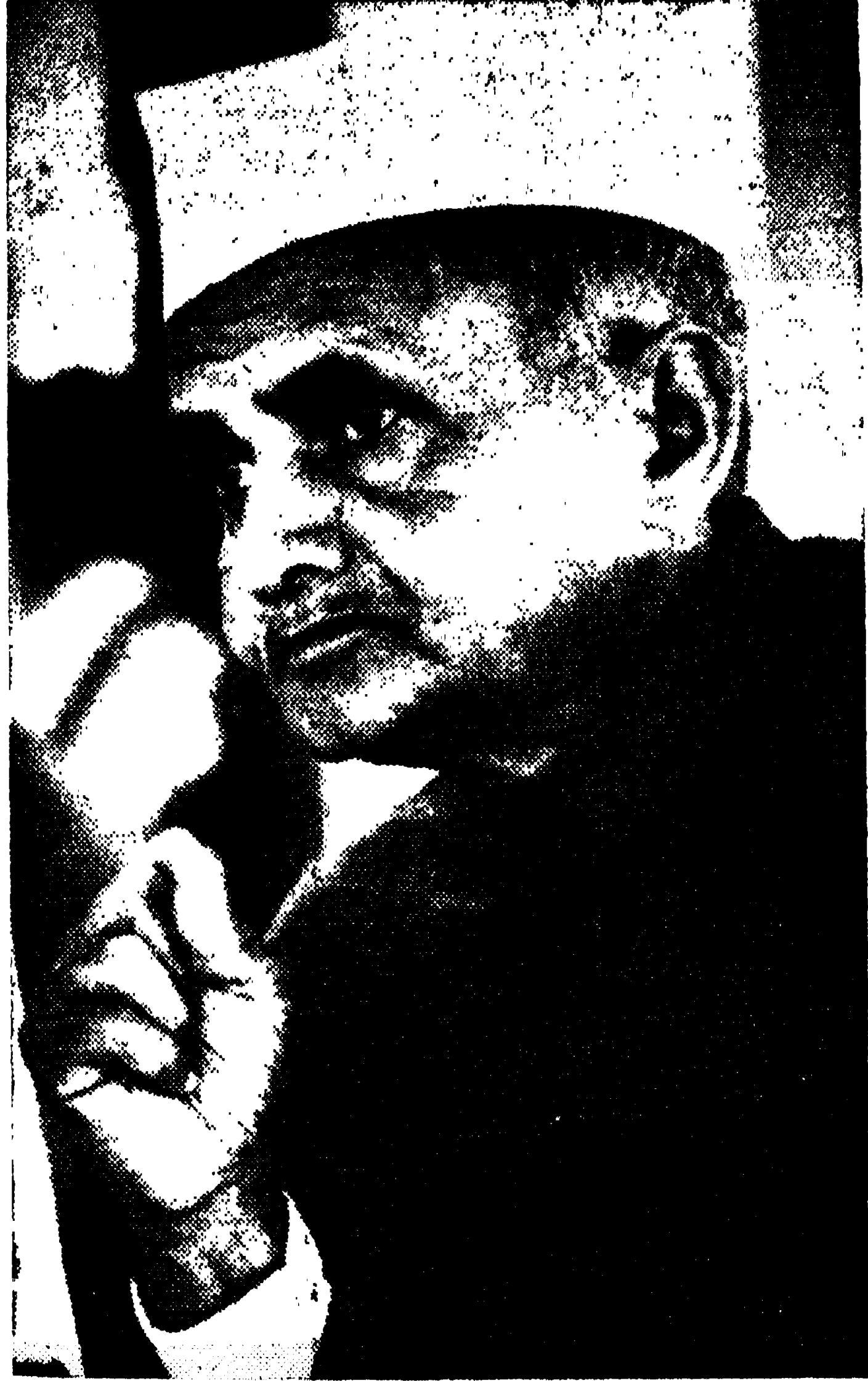
শান্তির দীপশিখা : লালবাহাদুর

আমাদের জাতি এক গভীর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রীজী অকুতোভয়চিত্তে এই দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন। নিরাশার বাণী তিনি কোনদিন শোনান নি। চরমতম সংকটের দিনেও তিনি দেশবাসীর মনে দৃঢ়-সংকল্প ও গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাকিস্তানের আক্রমণ ও চীনের ক্রমবর্ধমান বৈরিতার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীজী যে নির্ভীকতা, রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, দেশবাসী আজও কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করে। তিনি নেতৃত্বের নতুন বনিয়াদ তৈরী করে গেছেন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে। সেই উত্তরাধিকারের মর্যাদা দেওয়াই হবে শাস্ত্রীজীর স্মৃতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন।

জাতীয় সংগ্রামের সাধারণ সৈনিক শাস্ত্রীজী দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারাবরণ, ক্লেশ স্বীকার এবং আত্মত্যাগের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন জাতির সর্বোচ্চ নেতৃপদে। রাজনৈতিক দলাদলি, তুচ্ছ স্বার্থ-সংঘাত কোনদিন এই শান্ত মানুষটিকে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। আজ সেই আদর্শের উত্তরাধিকার যেন বিপথগামী না হয়।

শাস্ত্রীজির মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশিত ডাক টিকিট

লালবাহাদুর ছিলেন একজন কাজের মানুষ। তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর জীবনবোধ এবং ভারতের বৃহৎ সমস্যার মূল্যায়নে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। নেহরু-রীতি থেকে শাস্ত্রী-রীতির পার্থক্য ছিল এখানেই। জীবনের শেষ দিকে শাস্ত্রীজী একটি অত্যন্ত সুন্দর শ্লোগান তুলে ধরেছিলেন, 'জয় জওয়ান, জয় কিষাণ'। দেশকে বাঁচাতে হবে শক্তি দিয়ে এবং শ্রম দিয়ে। এক প্রতিরক্ষা, অস্ত্রের, অন্য প্রতিরক্ষা খাদ্যোৎপাদনের। আজকের ভারতবর্ষে এ দুটিই অত্যন্ত বাস্তব, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরস্পর-সম্পর্কিত। কাজের মানুষ শাস্ত্রীজী এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর উপলব্ধিতে কোন ভুল ছিল না।

জলপ্রপাতের শব্দ ॥

অনন্ত দাস

দূরে থেকে দেখ তার শিখিপুচ্ছচূড়া
সমুদ্র প্রমাণ ব্যাপ্তি—
হৃৎপিণ্ডে কাঁপে এক ব্যাকুল বাসুকি;
চারদিকে জলপ্রপাতের শব্দে
বয়সের ঘূর্ণি ভেঙে যায়
উত্তরে, দক্ষিণে আর কোনদিকে পথ নেই
চতুর্দিকে জলমালা......
দেখ ঐ ঝর্ণাগুলি হাসে।

বুকের বিবন থেকে তুমি কেন দুঃখ টেনে আলো
এখন চরায় জাগে জাহাজের মুখ
সূর্যাস্তের ক্ষতচিহ্নগুলি
আমার শরীরে, চোখে, হৃৎপিণ্ডে হাহাকার করে।

প্রপাতের শব্দগুলি দূরে চলে যায়......
চতুর্দিকে ছায়া নামতে থাকে
দিনের উচ্ছ্বাস শেষে ওরা কেন হাঁক দেয়
আমার মন্দির থেকে কেন আজ অর্চনার আলো
চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে না!

হায়রে শৈশব!
জলপ্রপাতের শব্দগুলি দূরে চলে যায়।

ডাক বিনিময় ॥

তারাপদ রায়

এখন আমার চিঠি
ছেঁড়া ক্যানভাসের ডাক ব্যাগে হরকরার পিঠে চড়ে
বনগ্রামের রেললাইন পেরিয়ে হরিদাসপুরের হাঁটাপথে
এখন আমার চিঠি আর-ও দশ হাজার চিঠির সঙ্গে
সীমানার তারকাঁটার বেড়ার পাশে কাদাজলে
ভাদ্র মাসের বৃষ্টিতে গাছতলায় ভিজছে।

এখন হরিদাসপুরের গাছতলায় বৃষ্টিতে
আমার চিঠি আমার বাড়ির চিঠির সঙ্গে
দশ হাজার অশোক সিংহের সঙ্গে
দশ হাজার চাঁদ তারার
দশ হাজার নীল চিঠির ভালোবাসার সঙ্গে
দশ হাজার সবুজ চিঠির কেমন-আছো
হরিদাসপুরের মাঠে জলকাদায় অঝোর বৃষ্টিতে
এখন দুই দেশের দুই হরকরার ডাক বিনিময়।

এখন যশোরের সড়ক ধরে
বেনাপোলের ডাক হরকরার কাঁধে
আমার চিঠি আমার বাড়ির দিকে
এখন যশোরের সড়ক ধরে
বনগ্রামের ডাক হরকরার কাঁধে
আমার বাড়ির চিঠি আমার দিকে
এখন এক রাস্তার দুই দিকে
দুই হরকরার কাঁধে ছেঁড়া ক্যানভাসের ব্যাগে
আমার চিঠি ও আমার বাড়ির চিঠি এখন বৃষ্টিতে।

স্বপ্নের সবুজ পিরামিডেরা ॥

ফিরোজ চৌধুরী

পরম নরম ঘাস মাড়িয়ে
অনেক হেমন্তের বিকেল পেরিয়ে
ওরা এলো। প্রস্তর মূর্তিগুলো
একটু নড়ে উঠলো
তারপর আবার পড়ে রইলো তেমনি করে
অনেক কালের সেই সব সাদা বিছানায় :

ঘোড়ার খুরের শব্দ
আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল
দূর বনান্তের অন্তরালে।

আকাশ-জোড়া শূন্যতা তখন
সারা প্রান্তরে
আর বাইরে শুধু বরফ ঝরার শব্দ।।

একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যত

দেবাংশু সেন

মানুষের খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে দিনকে-দিন। প্রতি মিনিটে ৮৫ জন নতুন আগন্তুক জন্ম নিচ্ছে পৃথিবীতে। একদিনেই আসছে ১২০,০০০ জন। বৎসরে কত দাঁড়ায় একবার ভেবে দেখুন! কিন্তু জমির পরিমাণ তো বাড়ছে না! সুতরাং ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য আসবে কোথা থেকে! গত ষাট বৎসরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ঠিক দ্বিগুণ হয়েছে। আগামী চল্লিশ বৎসরে এই সংখ্যা হবে দ্বিগুণিত। সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে গেলেই সমস্ত দৃশ্যটাই অন্ধকারময় হয়ে ওঠে। ২০০০ খৃষ্টাব্দে যখন লোক-সংখ্যা হবে ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ তখন! তখন কোথায় মিলবে এদের মুখের গ্রাস! যদিও অনেকে বলে থাকেন চেষ্টা করলে আমরা এই পৃথিবীর বুকেই ৮,০০০,০০০,০০০,০০০ লোকের মাংস, শাকশব্জী ও অন্যান্য খাদ্যের জোগান দিতে পারি! কিন্তু তারপরও তো অনেক কিছু বাকী থেকে যায়! কারণ ছ'শ বৎসর বাদে পৃথিবীর অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে জানেন? তখন প্রতিটি মানুষ পাশাপাশি দাঁড়ালে তবে স্থান সংকুলান সম্ভব হবে! খাওয়া ত পরের কথা।

স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলিতে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন এবং যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে ব্যবধান অনেক এবং এই ব্যবধান দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। মাত্র এক পুরুষ আগেও এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ বাইরে থেকে কৃষিপণ্য আমদানি তো করতোই না —বরং তারা উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে, প্রধানত পশ্চিম ইউরোপে প্রতি বছর ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪০ সাল থেকে যে দশক শুরু হয় সেই দশকে এ অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। ঐ দশকের শেষের দিকে দেখা যায় পৃথিবীর শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ স্বল্পোন্নত অঞ্চলে প্রতি বছর ৪০ লক্ষ টন হারে খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছে। তারপরের দশকে ১৯৫০ সাল থেকে প্রতি বছর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের এই আমদানির পরিমাণ বাড়তে থাকে। ঐ সময়ে ঐ সকল রাষ্ট্র শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ থেকে প্রতি বছর গড়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করেছে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ শস্য এ সকল দেশ আমদানি করেছে তারও পুরো হিসাব ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ঐ সময়ে দেখা যায় ঐ সকল দেশের প্রতি বছর আমদানির গড় পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টনে এসে পৌঁচেছে। ১৯৬৬ সালে আমদানির মোট পরিমাণ কোথায় গিয়ে যে দাঁড়িয়েছে তা না জানলেও ঐ সময়ে তা যে কয়েক লক্ষ টন বেড়ে গেছে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে।

মাত্র এক পুরুষের মধ্যে নীট ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটল। যেখানে ১ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঐ সকল দেশ রপ্তানি করত সেখানে তাদের ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। অর্থাৎ মোট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টনের মত। কেবল তাই নয় বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্য আমদানি করেও তাদের প্রয়োজন মেটানো যাচ্ছে না। এই বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। গত কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রে খাদ্যশস্যের মূল্য হু-হু করে বেড়ে গেছে। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির পরিমাণ থেকে যতটুকু বোঝা যায়, তাতে মনে হয় খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ এবং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ব্যবধান পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেই হারে খাদ্যোৎপাদন বাড়ছে না। তবে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও তাদের নেতৃবৃন্দ এই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বর্তমানে যে রকম সচেতন হয়েছেন তাদের এরকম সচেতনতা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নানা দেশেই আজ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। পরিবার নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও আজ স্বীকৃত এবং এই প্রশ্নটি বর্তমানে যুক্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচিত হতে পারে। তারপর খাদ্য সমস্যা সমাধানের প্রধান পথ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নটিকে পৃথিবীর সকল উন্নতিশীল রাষ্ট্রেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা, পরিবহণ ও কৃষিপণ্য প্রণালীবদ্ধ করার ব্যবস্থা এবং কৃষিপণ্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা যে সম্প্রসারণশীল কৃষি অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ সে সকল সমস্যা সমাধানের উপরও বর্তমানে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

পৃথিবীর ২৬টি উন্নতিশীল রাষ্ট্র ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে তাদের শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করায় কৃষি-ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছে, সম্প্রতি তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় ২৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে মেক্সিকো, কস্টারিকা ভেনেজুয়েলা, ব্রেজিল, ইজরায়েল, তুরস্ক, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, তাইওয়ান, সুদান, তানজানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া এই বারটি রাষ্ট্রের বার্ষিক ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ঐ সময়ে শতকরা চার ভাগেরও বেশী বেড়েছে। জমি, আবহাওয়া, ঐতিহাসিক জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ—জনসংখ্যা এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণের হার বিচার করে দেখলে দেখা যায় একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে আর একটির কোন মিলই নেই এবং যে সকল বিষয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল সে সকল এই বারটি রাষ্ট্রের একটিরও ছিল না।

কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমি, শ্রম ও মূলধন প্রয়োজন, অনুকূল ভৌগোলিক আর্থিক ও সামাজিক পরি-

দেশেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু জাতি উদ্যোগী না হলে এ সকল থাকলেই সেই দেশের কৃষির এবং সাধারণভাবে বৈষয়িক উন্নতি ঘটে না। এই সকল সম্পদ ও পরিবেশকে কাজে লাগালেই এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে নীতি ও কার্যসূচী গ্রহণ করলেই সেই দেশ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে থাকে তা এই পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে। এই সাফল্যের মূলে ছিল ঐ সকল রাষ্ট্রের কৃষির উন্নতি সাধনের সংকল্প। সুতরাং সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেলে আগামী ১০ অথবা ২০ বছরের মধ্যে বুভুক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহ যে জয়ী হবে তা হলফ করে বলা যেতে পারে।

তবে তাদের প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হয়েই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হবে। যে সকল রাষ্ট্রে অন্নাভাব রয়েছে সে সকল দেশে এমন পতিত জমি নেই যা উদ্ধার করে অতিরিক্ত ফসল ফলানো যাবে। তাদের প্রায় সকল জমিই চাষের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে একর পিছু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এ খুবই কঠিন কাজ সন্দেহ নেই।

কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কাজে লাগানোর জন্য চাষীদের শিক্ষা-দীক্ষা কিছুটা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে হলে কৃষি-সার, রাসায়নিক উপকরণ এবং চাষের যন্ত্রপাতির বিশেষ প্রয়োজন। বিদেশ থেকে এ সকল আমদানি করতে হলে, অথবা দেশে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই বৈদেশিক মুদ্রা। অন্নাভাবগ্রস্ত অধিকাংশ রাষ্ট্রের অর্থের ও বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ অভাব রয়েছে। এ সকল বাধা অতিক্রম করা ছাড়া ঐ সকল রাষ্ট্রের চাষীরা অধিকতর ফসল উৎপাদনে যাতে অনুপ্রাণিত হয় এবং চাষীরা তাদের কঠিন পরিশ্রমের সুফল সম্পর্কেও যাতে নিশ্চিত হতে পারে সে রকম সমাজও গড়ে তুলতে হবে।

তখন এই অতিমূল্যবান কৃষিসার এবং রাসায়নিক উপকরণের প্রয়োগ সার্থক বলেই বিবেচিত হবে।

ঐ সকল দেশে কৃষকেরা যাতে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিঋণ পেতে পারে এবং তাদের উৎপন্ন কৃষিপণ্য বণ্টনের, কৃষিপণ্য মজুত ও সংরক্ষণের এবং ক্রয়-বিক্রয়ের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজটি কঠিন হলেও এই সমস্যা সমাধানের পথ ইতিপূর্বে নানা দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পথের সন্ধান দিতে হবে কৃষকদের। উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতি তারা যাতে আয়ত্ত ও প্রয়োগ করতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী কৃষি উন্নতির জন্য গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। কয়েকটি নতুন উন্নতিশীল রাষ্ট্র দেখিয়ে দিয়েছে যে, উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে—অতি উন্নত রাষ্ট্রের চেয়েও তারা বেশী ফসল ফলিয়েছে।

তবে খাদ্যাভাবগ্রস্ত রাষ্ট্র এ সকল কাজে যাতে আত্মনিয়োগ করতে পারে তারই উদ্দেশ্যে তাদের সাময়িক অভাব—খাদ্যের দিক থেকে যে সকল রাষ্ট্রে প্রাচুর্য রয়েছে সেসকল রাষ্ট্র মেটাতে পারে। এজন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিসহায়ক খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই খাদ্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ঐ সকল রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে কৃষি ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের এবং খাদ্যাভাবজনিত মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উদ্দেশ্যে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর ১১৫টি রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষকে ১৪ কোটি টন খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছে।

খাদ্যের অভাব শুধু সাময়িকভাবে মেটানোই নয়, ঐ সকল দেশের শিক্ষার উন্নতি সাধনে এবং হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট নির্মাণে, কৃষিসারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সামগ্রিকভাবে বৈষয়িক উন্নতি সাধনে বিদেশী রাষ্ট্র সাহায্য করলেও প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই উদ্যোগী হয়ে নিজ নিজ উন্নতির পথে অবস্থানুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে।

মোট খাদ্যের উৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে অসামঞ্জস্য ঐ সকল দেশের সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। এই অসামঞ্জস্য দূর করা সহজ নয়। ১৯৮০ সালে যে দশক শুরু হবে এবং তখন যে সকল মেয়ে সন্তান-ধারণক্ষম হবে তারা ইতোমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। জন্মের হার অতি শীঘ্রই উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে—এরকম আশা অবশ্য এখনই করা যায় না। তাছাড়া কৃষি-ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। তবে খাদ্য-ঘাটতি হ্রাস পাওয়ার আগে এই অসামঞ্জস্য অনেকখানি বেড়ে যাবেই।

আগামী পনের বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা আরও একশ কোটি বেড়ে যাবে। আর যে সকল অঞ্চল স্বল্পোন্নত, যেখানে খাদ্যাভাব রয়েছে সে সকল অঞ্চলেই এর চার-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পাবে। ঐ সকল অঞ্চলে জমির ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় ঐ অঞ্চলবাসীদের সন্তান উৎপাদন বৃদ্ধির হার অধিকতর। এ বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অতিরিক্ত একশো কোটি লোকেরও অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের অর্থ—পৃথিবীর মোট অধিবাসীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক এতকাল যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তাদের সেই জীবন-যাত্রা ও মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন।

খাদ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সময়সাপেক্ষ। যে সকল দেশে চাষ করার মত নতুন জমি অতি অল্পই আছে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি-জনিত সমস্যা সমাধান করতে হলে খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। উন্নতিশীল দেশে কোন বিষয়ে পরিবর্তন সাধন করতে হলে যেখানে একশ বছর লাগত সেই পরিবর্তন দশ বছরের মধ্যে করতেই হবে এবং আগে যা করতে দশ বছর লাগত তা এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

তবে অবস্থা নিরাশ হয়ার মত কিছু নয়। ইতোমধ্যেই কোন কোন উন্নতিশীল রাষ্ট্র কৃষি-ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে এবং জন্মহার হ্রাস করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তাইওয়ান, ইজরায়েল এবং মেক্সিকো খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। অনেকগুলি দেশ পরিবার কল্পনার দিকেও বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে।

স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে যেভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে তাতে মনে হয়, এই সমস্যা সুরাহা হওয়ার আগে প্রকৃত খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ এবং মোট কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর বেড়ে যাবে। কয়েকটি রাষ্ট্র এখন থেকে সম্পূর্ণ সমাধানের পূর্ব পর্যন্ত, খুবই খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হবে।

সময় থাকতে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্যে আমাদের তৎপর হতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত খাদ্য-উৎপাদন শক্তি ক্রমে ব্যয়িত ও নিঃশেষিত হয়ে গেলে—ভবিষ্যতে তা গুরুতর বিপদ ডেকে আনবে।

দুর্ভিক্ষও এ পৃথিবীতে নতুন নয়। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় খৃষ্টের জন্মের ৪৩৬ বছর পূর্বে রোমের হাজার হাজার অধিবাসী টাইবার নদীতে আত্মবিসর্জন করে ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়েছে। ১০১৬ সালে সমগ্র ইওরোপের অধিবাসীরাই অন্নাভাবে কমবেশী কষ্ট পেয়েছে। আর ভারতে বারবার দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং আজও খরার দরুন শস্যোৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ও বহুলোক অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ১৮৪৬ সালে আয়ার্লণ্ডেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সে সময়ে বহু আয়ার্লাণ্ডবাসী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বিশ্বের খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞজনেরা এখন প্রায়ই বলছেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাচ্ছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় জনৈক সাংবাদিক লিখেছেন যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে প্রতি বছর আমেরিকা থেকে বিভিন্ন দেশে ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানী হয়েছে। ১৯৬৫ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ৬ কোটি টনে এসে দাঁড়ায়। পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ জমিতে কৃষি-উৎপাদন করা হয় বলে এই সংখ্যাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি

১৯৬০ সালে প্রায় ৪৫ লক্ষ টন কৃষিপণ্য সরবরাহ করে পৃথিবীর স্বল্পোন্নত অঞ্চলের খাদ্যাভাব মেটানো হয়েছিল। ১৯৮০ সালে তা ৭৫ লক্ষ টনে এসে পৌঁছবে বলে অনেকেই অনুমান করছেন। এর অর্থ বর্তমানে যে পরিমাণ কৃষিপণ্য

সরবরাহ করা হচ্ছে অতিরিক্ত বছরে আরও ৩০ কোটি টন সরবরাহ করতে হবে। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের পশ্চিমখণ্ডে মোট যে পরিমাণ কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে এ তারই সমান। পৃথিবীর আরও দুটি রাষ্ট্র কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐ দুটি রাষ্ট্র তাদের লোকসংখ্যানুপাতে সাধ্যানুযায়ী খাদ্য উৎপাদন করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র বছরে আরও চার কোটি শস্য-উৎপাদন বাড়াতে পারে। এজন্য তার উপর অতিরিক্ত কোন চাপ পড়বে না। তবে যেখানে বছরে ৩০ কোটি টন খাদ্যের প্রয়োজন সেখানে চার কোটি টন তো কিছুই নয়।

পৃথিবীর খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমেরিকার কৃষিপণ্য আমদানি-রপ্তানির ইতিহাস থেকেও পাওয়া যেতে পারে। ১৮০০ সাল থেকে ১৮০৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকা গড়ে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করেছে। এ ছিল আমেরিকার মোট রপ্তানির ৭৫ শতাংশ। ১৯০০ সাল পর্যন্ত অবস্থা ঐ রকমই ছিল। ঐ সময় থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানিলব্ধ অর্থের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যায়। কিন্তু আমেরিকার মোট রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে দেখা যায় মোট রপ্তানি-পণ্যের মূল্যে শতকরা ২২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ঐ সময় থেকেই আবার রপ্তানির গতি উর্ধ্বমুখী হয়। ১৯৬৪ সালে মোট রপ্তানির পরিমাণ শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকা ১৮০০ সালে মাত্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করেছিল। তারই অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৬৪ সালে সেই স্থলে এই দেশটিই বিভিন্ন দেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি করেছে প্রায় ৬১০ কোটি ডলার মূল্যের। ডলারের মূল্যের কথা বিবেচনা করলেও এই বৃদ্ধি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে নিজের দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খাদ্য-চাহিদা মেটানোর জন্য আমেরিকার একর পিছু উৎপাদন যেমন বাড়াতে হবে তেমনি নতুন নতুন জমিও চাষের আওতায় আনতে হবে। উদ্বৃত্ত শস্যের মূল্য এককালে ৭০০ কোটি ডলারে এসেও পৌঁছেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ৪০০ কোটি ডলারের কিছু উপরে এসে দাঁড়িয়েছে।

খাদ্য সরবরাহ বাড়াতে হলে, সর্বপ্রথম বড় প্রয়োজন চাষের উপযোগী আরও জমি খুঁজে বের করা। প্রতিটি মানুষের জন্য এক একর আবাদী জমি আছে এই পৃথিবীতে। মানুষ আছে ছড়িয়ে, কিন্তু জমি সেভাবে নেই। যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দুই একর, ইউরোপে সেখানে এক একর, আর এশিয়ায় মাথাপিছু আধ একর।

কিন্তু চাষের জমি খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়? মরুভূমি ও বনাঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যেতে পারে। মানুষ ইতোমধ্যে মরুভূমিকে জয় করেছে। জনসংখ্যায় বিব্রত মানুষ মরুভূমির বুকে জল সেচন করে মরুভূমির বুকে ফলের বাগান তৈরি করেছে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে খাদ্য সংগ্রহ ব্যতীত সমুদ্রের অ্যালজী, নানা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি? অথবা সমুদ্রের নোনা জলকে পানীয় জলে পরিণত করে, সেই জলের সাহায্যে মরুভূমি অঞ্চলকে উর্বর করে তাতে কতটুকু ফসল ফলানো যাবে—খাদ্য সমস্যারই বা কতটুকু সমাধান করা যাবে? এ প্রসঙ্গে এ সকল প্রশ্নও এখন অনেকের মনে জেগেছে।

পৃথিবীর সদাবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করার কল্পনা মানুষের বহুদিনের। অন্তত জুলভার্নের সময় থেকে কিম্বা তারও বহু আগে থেকে মানুষ এবিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু আসল বিষয়টি একই অবস্থায় রয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, শতকরা ৯৯ ভাগ শক্তির জন্য মানুষ এখনও সেই কৃষির উপরেই নির্ভরশীল। মাছ এবং সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য খাদ্য শতকরা মাত্র ১ ভাগ শক্তি জুগিয়ে থাকে।

অনেকেরই ধারণা সমুদ্রে বুঝি অফুরন্ত মাছ রয়েছে—প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় মাছ রয়েছে। জাপান, নরওয়ে, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে সকল দেশের বিরাট মাছ ধরার ব্যবস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে সমুদ্রের যে সকল অঞ্চলে মাছ রয়েছে সেই সকল অঞ্চল নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। কতগুলি জায়গায় অত্যধিক পরিমাণে

মাছ ধরা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া ও শ্যাওলা জাতীয় গুল্ম অ্যালজী থেকেও খাদ্য প্রস্তুত করার সম্ভাবনার কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। অ্যালজী থেকে খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হলেও বাজারে কেনাবেচা হতে পারে এরকম কোন সুখাদ্য আজ পর্যন্তও অ্যালজী থেকে তৈরী হয় নি। ভবিষ্যতে হয়ত এরকম খাদ্য উদ্ভাবিত হবে।

এছাড়া পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি থেকে কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত করাও এখন আর অসম্ভব কিছু নয়, তবে কৃষি পদ্ধতিতে যে সকল সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায় তাদের তুলনায় সস্তা বা সমমূল্যের পুষ্টিকর বা সুস্বাদু কৃত্রিম খাদ্য এখনও বিপুল পরিমাণে তৈরী করা যায় নি। এ সকলের সাহায্যে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের আশাই করা যেতে পারে না।

সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে সুস্বাদু জলে পরিণত করার পর ঐ জল দিয়ে মরুভূমি সেচন করে ফসল ফলাবার কথাও বলা হচ্ছে। সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করা এখন সম্ভব এবং তা সেচ কার্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। এমন দিনও হয়ত আসবে যখন আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অথবা অস্ট্রেলিয়ার বিরাট বন্ধ্যাভূমি লবণমুক্ত জলের সাহায্যে উর্বর জমিতে পরিণত করা হবে, তাতে ফসল ফলবে। সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করার এবং পরমাণুশক্তি প্রয়োগের খরচ এখন অনেক কম পড়লেও মরুভূমিতে ব্যাপকভাবে চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে করতে বহু সময় কেটে যাবে—এক পুরুষের মধ্যে তা সম্ভব হবে না। সুতরাং আগামী বহু বছর পরেও খাদ্যের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের প্রচলিত কৃষি-ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করতে হবে।

ভারতে যে পরিমাণ ভূমি ও জলসম্পদ রয়েছে তা সারা বছর খাদ্যোৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। বিচার-বিবেচনাসহকারে এই সম্পদ কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে ভারতের খাদ্যসমস্যার সমাধান হবে। বিশিষ্ট ভূমি-সমীক্ষক বিজ্ঞানী ডাঃ এন আর দত্তবিশ্বাস সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ভারতে ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "ভারতে বহু পরিমাণে জলাজমি রয়েছে যা লবণাক্ত হওয়ার দরুণ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তাছাড়া এদেশে মোট যে ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি আছে, তার মধ্যে অবক্ষয়ের দরুণ নষ্ট হয় প্রায় ২০ কোটি একর। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন জমির উপরের স্তরের মাটি জলে ধুয়ে নিয়ে যায়। বায়ু-প্রবাহের দরুণ অবক্ষয়ের আওতায় রয়েছে মরুভূমির ৪০ হাজার একর জমি এবং এ সকল মরুভূমির সীমানার মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা সর্বদাই মরুভূমির বিস্তৃতি যাতে আর না ঘটে তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন।"

ডঃ দত্তবিশ্বাস নয়াদিল্লীস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সর্বভারতীয় মাটি ও জমি সমীক্ষা কার্যসূচী রূপায়ণের সংগে যুক্ত রয়েছেন। গত ছ বছর ধরে তিনি কৃষির উপযোগী নতুন জমির সন্ধান লাভে সাহায্য করছেন।

সমগ্র ভারতের জন্যই ভূমি ও জল সংরক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৯৫৬ সাল থেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজও শুরু হয়েছে। সমগ্র ভারতে এ জন্য চারটি দপ্তর আছে—একটি আছে দিল্লীতে, একটি নাগপুরে, একটি বাঙ্গালোরে, আর একটি কলকাতায়। যে অঞ্চলে যে দপ্তর রয়েছে সেখানে সেই অঞ্চলের জমি ও মাটি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা হয়ে থাকে। সংগৃহীত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল নয়াদিল্লীর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। সেখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রেরিত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ ও প্রণালীবদ্ধ করা হয়। ফলাফল রাজ্য-সরকারসমূহের কৃষিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

পৃথিবীর শ্রমশক্তির অর্ধেকেরও বেশী খাদ্যোৎপাদনে ও বন্টনে, এই চিন্তা নিরাকরণে নিয়োজিত হয়ে থাকে। আর ফসলের পক্ষেও জলই যে জীবন এ সত্যও সেই সুদূর অতীতেই বিভিন্ন দেশবাসী উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা জেনেছিলেন যথাসময়ে জলসেচনের উপযোগিতা। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন দেশে হাজার হাজার বছর আগে সে অঞ্চলবাসীদের উদ্ভাবনী শক্তির বলে যে বিরাট সেচব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল; তাই এখনও প্রচলিত আছে। সেই ব্যবস্থার সাহায্যেই আজও ঐ সকল অঞ্চলের জমিতে জল সেচন করা হয়। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী পূর্ব দিকের দেশসমূহে দু হাজার বছর আগে রোমানেরা এক সেচব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আর প্রাচীন পারসিকেরা সেচের জল পরিবহনের ব্যবস্থা করেছিলেন মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খনন করে। মাটির নীচের এই খালসমূহকে বলা হত কানাত টানেল। হাজার হাজার বছর ধরে ঐ সকল দেশের চাষীরা পুরুষানুক্রমে তাদের চাষের জমিতে ঐ সকল ব্যবস্থার সাহায্যেই জলসেচন করে এসেছে। খৃষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতির লোকেরাও কলোরোডো নদী উপত্যকায় যে সেচব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তার ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশেই বর্তমান সভ্যতার বহু পূর্বেই সেচব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল।

সমগ্র পৃথিবীতে আজ প্রায় ৪০ কোটি একর জমি সেচের অধীনে রয়েছে—এ কর্ষণোপযোগী জমির এক-অষ্টমাংশ।

জলসেচের জন্য জলসংরক্ষণ ব্যবস্থার ওপরও মানব বহুকাল থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এর ফলে অন্যান্য বহু কল্যাণকর দিকও উদ্ভাবিত হয়েছে। মিশরের নীল নদের তীরবর্তী অধিবাসীদের মতো বহু দেশবাসীর অস্তিত্ব নির্ভর করে জল সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জল সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাভিজ্ঞতার উপর। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির কথা বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে ঐ অঞ্চলে প্রথমে যাঁরা উদ্যোক্তা হয়েছিলেন তাঁরা বহু শতাব্দী পূর্বের মিশরের সেচ-বিজ্ঞানীদের মতো কোন বছরে এবং বছরের কোন সময়ে কি পরিমাণ জল হয়েছে তার হিসাব রাখতে আরম্ভ করলেন। সে যুগের সেচব্যবস্থা গড়ে তোলায় যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরাই নিজ-নিজ অঞ্চলে নদী-নালার জল এবং বর্ষার জল কি পরিমাণে রয়েছে ও পাওয়া যেতে পারে তার হিসাব নিয়েছিলেন এবং জল সংরক্ষণ ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। এ জন্যই তাঁরা নদী নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত ভেষজ বিজ্ঞানী ডঃ ই এল ট্যাটাম তাঁর একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে লিখেছেন : ...যথাসম্ভব দ্রুত পৃথিবীর জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকবে না। দুর্ভিক্ষের, অশিক্ষার, অশান্তির অন্ধকার নেমে আসবে। যার ফলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আতঙ্ক উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে ও বাঁচার সামান্য সম্বল আত্মসাৎ করার সংগ্রাম যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে।

তিনি আরও বলেছেন : "জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে, জীব-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় মানুষের জেনেটিক হেরিটেজের বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণে প্রকাশ পেতে পারে তার উপরেই মানুষের বিবর্তন নির্ভর করছে। বংশানুক্রম বিজ্ঞান অনুসারে শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী মানুষের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ ও তার পরিবেশের বিবর্তনিক ক্রমোন্নতির জন্যই এর প্রয়োজন। কিন্তু এ সকল আয়ত্ত না করলে, এদের বিকাশ না ঘটলে এ সকল গুণ থাকারও কোন অর্থ হয় না। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও বাসস্থান, সর্বোপরি বুদ্ধিবিকাশ ও মানসিক উন্নতির এবং মানুষের নিজের ও নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও শিক্ষার ব্যবস্থা কতখানি রয়েছে। তারই দিকে দৃষ্টি ও সামঞ্জস্য রেখে, অর্থাৎ তারই অনুপাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হলেই এ সকল গুণের বিকাশ ঘটা, এ সকল গুণ আয়ত্ত করা সম্ভব। এ যদি বিফল হয় তা হলে এর পরিবর্তে অবশ্যম্ভাবীরূপে পৃথিবীতে নেমে আসবে এক অন্ধকার যুগ। সেখানে মননশীলতা, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।"

অনটন সরকারের গৃহপ্রবেশ

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

অনটন সরকারের গৃহপ্রবেশের দিন যে এমন একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটবে, কেউ তা অনুমান করতে পারেনি। অফিসের বন্ধুবান্ধব পাড়াপড়শী যে শুনেছে, সে-ই দুঃখ প্রকাশ করেছে, আহা বেচারা, এত-দিনের সাধ! চিরকালের কৌতুক-চরিত্রের এ-ধরনের বিয়োগান্ত পরিণতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না তারা।

অথচ এই অনটন সরকারকে নিয়ে কত হাসি-ঠাট্টা রঙ-তামাসাই না হতো! সেই সূত্রে পিতৃদত্ত নামটা পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে হাস্যকরভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অটল সরকার বললে আজ আর কেউ চিনবে না, কিন্তু অনটন সরকারকে এক বাক্যে ছেলে-বুড়ো সবাই চিনবে। পাড়ার বুড়ো-বুড়ীরা ঐ নাম শুনলে বিরক্ত হন, বলেন—'সক্কাল বেলাই ঐ নাম শোনালে বাপু! ভগবান বোধহয় আজ আর অন্ন মাপেননি।' ছেলেছোকরারা ওসব মানে না; কোন অপরিচিত লোক অনটন সরকারের খোঁজ করলে সকৌতুক মৃদু হাস্য করে বলে—'আর একটু এগিয়ে যান, খানিকটা গিয়ে ছোট্ট একটা গলি পাবেন; সেই গলিতে ঢুকে ডানদিকে দেখবেন দুটো পাশাপাশি বাড়ি, সেই দুটোর মাঝখান দিয়ে ফুট দুয়েক চওড়া রাস্তা, সেইটে দিয়ে নাক-বরাবর হেঁটে যাবেন; দেখবেন একটা খাটাল, সেই খাটালের বাঁ পাশে একটা একতলা বাড়ি। ঐ বাড়িতে শুনেছি ঝাড়া বাইশ বছর আছেন সরকারমশাই।'

অফিসের সহকর্মী কেউ হয়ত বলেছে, 'কী জন্যে এত কষ্ট করছেন সরকারমশাই?'

'কষ্ট না করে কী করব ভায়া!' নির্বিকারভাবে বলেন অনটন সরকার 'যা দিনকাল পড়েছে, অভাব-অনটন—'

'একটা ভালো বাড়িটাড়ি দেখে উঠে গেলেই তো পারেন।'

'ভাড়াটে বাড়ির আবার ভালোমন্দ! মাকুন্দের গোঁফ, তার আবার ঘন আর পাতলা।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছিলেন। তারপর একটু দম নিয়ে যেন মস্ত গোপন কথা বলছেন এমনি একটা ভাব করে বলেছিলেন, 'তা ভায়া। এমন বিনি পয়সায় বাড়ি আর কোথায় পাচ্ছি বলো?'

'সে কী! এই যে সেদিন বললেন পঁচিশ টাকা করে ভাড়া দেন!'

'দিই তো।' জোর দিয়ে বলেছিলেন তিনি। 'ভাড়া তো দিচ্ছি পঁচিশ টাকা। এমনি একখানা বাসাবাড়ি আজকাল পঞ্চাশ টাকার কমে খুঁজে বার করো দিকিনি। তাহলেই দেখ, এই বাড়িতে থেকে মাসে মাসে যেমন পঁচিশ টাকা খরচ হচ্ছে তেমনি পঁচিশ টাকা করে বাঁচছেও। কী বলো, বিনি ভাড়ার বাড়ি হলো না?'

অনটন সরকারের এই বিচিত্র অঙ্কের হিসেব শুনে কেউ হয়ত অসাক্ষাতে মন্তব্য করে, 'বাড়ি ছেড়ে শেয়ালদার ইস্টিশানে রাত কাটালে তো পঞ্চাশ টাকা করে বাঁচে।'

লোক-পরম্পরায় কথাটা কানে এলে বলেন, 'ওরা তো বলবেই, গায়ে তো আর আঁচ লাগে না। আরো কিছুদিন যাক, তখন বুঝবে অনটন কাকে বলে।'

'অনটন' শব্দটির প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব আছে সরকারমশায়ের। কথায় কথায় বলবেন, 'ভারি অনটন পড়েছে হে, একটু বুঝেসুঝে না চললে চলে!' পয়সা বাঁচাবার নানা কলাকৌশল জানা আছে তার। এ-ব্যাপারে রীতিমত গবেষণা করেছেন তিনি। বারো আনার মোজাজোড়া চার আনায় কেনার রোমাঞ্চকর গল্প নিজের মুখেই সহকর্মীদের শুনিয়েছেন।

ছোট ছেলেটা একজোড়া মোজার বায়না ধরেছে। এসব চালিয়াতি আদপে পছন্দ করেন না তিনি। অথচ বলতেও পারেন না কিছু, ছেলের মা ছেলের পক্ষে। ওদের আস্কারাতেই তো ছেলেগুলো অমিতব্যয়ী হয়, বাবুগিরি শেখে। আজ দেব, কাল দেব করে কয়েকদিন কাটিয়েছেন, যদি ভুলেটুলে যায় ছেলেটা। কিন্তু মা কি তার ভুলতে দেবে? পাছে ওরা নিজেরাই চার আনার জিনিস বারো আনা দিয়ে কিনে বসে এই ভয়ে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে চৌমাথার মোড়ে যেখানে ফেরিওয়ালারা গাদা গাদা মোজা নিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে বিক্রী করে, তার কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে লাগলেন। এর-তার কাছে গিয়ে দরদস্তুর করে কিছুক্ষণ সময় কাটালেন, আর সেই পরম ও চরম মুহূর্তটির অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ফেরিওলা দাম চেয়েছিল বারো আনা, মাত্র চার আনায় এনেছেন অনটন সরকার।

গল্পের মধ্যে একজন অল্পবয়েসী ছোকরা ফোড়ন কাটে,—'একপাটি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সরকারমশাই, সবাই বুঝলো রাগ করেছেন। মুখ নীচু করে দু' হাতে দু' পকেট হাতড়াচ্ছেন। এ-ও এক কৌশল। ঠিক কাজ হল, একজন একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন সরকারদা, খান।'

পরের সিগারেট মৌজ করে ধরিয়ে বাকিটা বললেন তিনি।—'অনেকদিন এই রাস্তায় যেতে আসতে দেখেছি ঠিক সন্ধে নাগাদ পুলিশের গাড়ি আসে, আর ঐ গাড়ি দেখলেই ফেরিওলাগুলো যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। দূরে হল্লা-গাড়ি আসছে দেখেই আমি যেন পছন্দ করে ফেলেছি, কিনবো, এমনি ভাব করে একজোড়া মোজা মুঠো করে ধরলাম। যেই দেখেছে পুলিশের গাড়ি আসছে, অমনি ফেরিওলাটা পালাবার ফিকির করছে, আমার হাত থেকে মোজা-জোড়া ছাড়িয়ে নিয়েই ভাগবে। আমি কী আর ছাড়ি! এই তালেই তো ছিলাম। একবার আমি টানি, একবার ও ব্যাটা টানে। ওদিকে হল্লা-গাড়ি প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, মোজা ছেড়ে লোকটা পালায় আর কী! আমি বললাম, এই—পয়সা নিয়ে যাও। লোকটা ততক্ষণ অনেকদূরে চলে গেছে. তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা সিকি বার করে ছুঁড়ে দিলাম। একটু ফিরে ফুটপাত থেকে তাই কুড়িয়ে নিয়ে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তোমাদের কারো মোজার দরকার হলে বলো, সস্তায় কিনে দেব।'

গল্প শেষ করে আধখানা সিগারেট নিভিয়ে রাখলেন। নিজের পয়সায় বিড়ি খান তিনি, তা-ও নিভিয়ে নিভিয়ে রাখেন। দেশলাই কাঠি জ্বালেন অতি সন্তর্পণে. অফিসের সীটে বসে ধরান না, ফ্যানের হাওয়ায় পাছে নিভে যায়। আধখানা বিড়ির জন্যে একটা দেশলাই কাঠি! পারলে বুঝি দেশলাইকাঠিও নিভিয়ে রাখতেন। ধারালো ব্লেড দিয়ে দেশলাইকাঠি চিরে দু'ভাগ করে দু'বার জ্বালাবার চেষ্টা করে দেখেছেন, পারেননি।

চেরা দেশলাইকাঠি দিয়ে বিড়ি ধরাতে চেষ্টা করছেন দেখে অফিসের কে যেন বলেছিল, 'দাদা, আধখানাতে কাজ হলে কোম্পানী গোটা কাঠি দিত না।'

'ঠিকই বলেছ, তাই জ্বলছে না।' হার স্বীকার করেছিলেন অনটন সরকার। 'তাহলেই দেখ, এতবড় কোম্পানী, লাখ লাখ টাকার কারবার, তারাও কত হিসেব করে চলে। আর আমরা? সব বিষয়ে অমিতব্যয়ী। একটা মানুষের পিঠের বা বুকের মাপ আর কত যে তিন হাত প্রস্থ তোষক না হলে তার শোওয়া হবে না? হাত-দেড়েক চওড়া হলেই হয়, দু'ধারে বাকিটা তো পড়েই থাকে।'

মিতব্যয়িতার প্রসঙ্গ উঠলে আর থামতে চান না অনটন সরকার। বলেন, 'আমাদের মধ্যবিত্তের অনটন কী আর সাধে! সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি।' নিজে যে তা করেন না তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত তাঁর অফিসের চেয়ারখানা। প্রমাণ সাইজের চেয়ার, মানুষটি তিনি ছোটখাটো, বহরে ছোট. কৃচ্ছ্রসাধনে কৃশ। পা মুড়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেও চেয়ার ভরবে না, তবু আলুতো করে হাতলের একটি ধার ঘেঁষে বসবেন তিনি। তাতেই অতবড় চেয়ারের মাঝখানে নয় এক পাশে খানিকটা জায়গায় ছোপ ধরে গেছে। বিলাসিতা করে হাত-পা ছড়িয়ে কোন কিছুতে বসার কোন মানে হয় না, যতটুকু না হলে নয় চেয়ারের ততটুকুই চিরকাল ব্যবহার করে এসেছেন। বলেন, 'অত ঢলে-ঢালা হয়ে বসার কী দরকার বাপু! ঢিলেমি মানেই বড় চেয়ার, বড় চেয়ার মানেই বাড়তি খরচ। ওতে কি অনটন ঘোচে?'

এ হেন অনটন সরকার প্রথম যেদিন পাড়ার কয়েকজনার ইলেকট্রিকের বিল নিয়ে অফিসে ঘোষণা করলেন, 'মাসের শেষ, ওরা দিতে পারছে না, তাই—' সেদিন অবাক হয়েছিল পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা। বলে কী লোকটা! মাসের শেষে এতগুলো টাকা নিজের পকেট থেকে খরচ ক'রে পরোপকার করছেন অনটন সরকার!

দেখা গেল, পর পর কয়েক মাসই এ-কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ভরসা করে একজন সমবয়সী সহকর্মীও তার ইলেকট্রিকের বিলটা নিয়ে এলো, বললো, 'এ-মাসে বড় আটকে গেছি, আমার বিলটাও পেমেণ্ট করে দে ভাই অটল।'

বিলটা হাতে নিয়ে কী যেন পরীক্ষা করে দেখলেন অনটন সরকার, তারপর বললেন, 'রিবেট তো মোটে দেড় টাকা।'

'দেড় টাকাই বা কম কিসে!'

'সে তো বটেই।' মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন অনটন সরকার। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'দেড়টা তো টাকা, তার তুমিই বা কী পাবে, আমিই বা কী পাবো! ঠিক আছে, তুমি বন্ধুলোক, এক টাকা না, বারো আনাই নিও।'

রিবেট-বখড়ার ব্যবসা ভালোই চলেছিল।

এত যে করেন সেজন্যে সংসারের কারো সহানুভূতি নেই তার ওপর। যেমন ঘন দাড়ি, তেমনি মাথায় টাক। অনটন সরকার যত কষেন, গৃহিণী তত আলগা দেন। সব সময় বিরক্ত স্বামীর ওপর, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দল পাকাচ্ছেন; কথায় কথায় দাবী, খাওয়া-দাওয়া ভালো করতে হবে, ভালো বাড়ি দেখে উঠে যেতে হবে।

প্রথম প্রথম অনটন সরকার বলতেন, 'আর একটু টেনেটুনে চল; ভাড়াটে বাসায় ভদ্দরলোক থাকে! হাতে কিছু পয়সা হলে একেবারে বাড়ি করে উঠে যাব দেখো।'

'অত সুখে আর কাজ নেই।' ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন গিন্নী। 'হাত দিয়ে জল গলে না, তুমি করবে বাড়ি!'

দিন-দিনই বেড়ে যাচ্ছে দেখে এখন অনটন সরকার বলেন, 'এ-বাড়ি পছন্দ না হয় থেকো না, যার যেখানে মন চায় চলে গেলেই পারো।'

'তা তো বলবেই।' প্রায় কেঁদে ফেলেন স্ত্রী। 'তাতে তোমার ভাত বাঁচে, পয়সা বাঁচে। সাধে লোকে তোমার নাম মুখে আনে না।'

এমনি কথা-কাটাকাটি থেকেই একদিন ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছিল।

অফিস থেকে ফিরেই অনটন সরকার দেখলেন স্ত্রী পাট-ভাঙা কাপড়-চোপড় পরে বসে আছেন, বাপের বাড়ি যাবেন। বুঝলেন সকালের ঝগড়ার জের। কিছু বললেন না। স্ত্রী কাছে এসে দাঁড়ালেন, গম্ভীর গলায় জিগেস করলেন 'বাপের বাড়ি চলে যাবার হুমকি তো দিয়েই গেছলে, বল, কদিন থাকব?'

রাগের কথা অনটন সরকারও রেগেই বললেন, 'যদ্দিন খুশি।'

হাতে শাঁখা আর কপালে সিঁদুর নিয়ে [illegible] জন্যে তো আর কেউ বাপের [illegible] ঝাঁঝিয়ে বললেন [illegible] দিন-দশেক থেকে আসবো।' [illegible] চৌকির নীচে থেকে একটা টিন টেনে [illegible] করলেন।

'এ কি, চাল মাপছ যে? বাপের বাড়ি চাল নিয়ে যেতে হবে নাকি?'

কুড়ি কৌটো চাল মেপে রেশনের থলিতে ভরে স্ত্রী বললেন, 'আমার বাপ-ভাইয়ের সংসারে তোমার মত এত অনটন নেই।'

'তবে?'

কোন উত্তর না দিয়ে চাল-ভর্তি থলিটা নিয়ে গিয়ে খাটালের সামনেকার দুর্গন্ধ নালিতে উপুড় করে ঢেলে দিলেন অনটন সরকারের স্ত্রী। ফিরে এসে বললেন, 'দশ-দিনে কুড়ি কৌটো চাল দু' বেলায় খেতাম তোমার সংসারে থাকলে। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে সাশ্রয় করবে, তা আমি করতে দেব না। আমার খোরাকী আমি নর্দমায় ফেলে দিয়েছি।'

সেই থেকে স্ত্রীকে ভয় করেন অনটন সরকার।

যতদিন চাকরি করেছেন, পুরনো ভাড়াটে বাড়ি ছাড়েননি। রিটায়ার করেই বাড়ি করতে মেতে উঠলেন। কাছাকাছি কাঠা-তিনেক জমি কেনাই ছিল; কে এক বন্ধু আছে তার ড্রাফট্সম্যান, তাকে দিয়ে বিনা পয়সায় প্ল্যান করিয়ে আনলেন, অনেক হাঁটাহাঁটি করে সেটা পাশও করালেন। কিন্তু স্ত্রী বেঁকে বসলেন, বাড়ির কাজে কিছুতেই তাঁকে হাত দিতে দেবেন না। দাবী করলেন, 'পোস্টাপিসের টাকা আমার নামে করে দাও, অফিসের পাওনাগণ্ডা যাতে আমার হাতে আসে তার ব্যবস্থা করে দাও। আমি নিজে দেখেশুনে—খোকাকে দিয়ে চুনবালি ইট সুরকি আনিয়ে কাজ করাবো। তুমি যে কথায় কথায় বাগড়া দেবে তা হবে না; যদ্দিন না বাড়ির কাজ শেষ হবে তুমি তদ্দিন গিয়ে বুলুর বাড়িতে থাকো।'

মেয়েদের খরচে হাত, বিশ্বাস নেই; অথচ এ-প্রস্তাবে রাজী না হলে বাড়িও হবে না। মেয়ে-জামাই এরই মধ্যে চিঠি লিখতে শুরু করেছে, তাদের ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবার জন্যে। অনটন সরকার বুঝলেন, অনেকদূর পর্যন্ত জাল ছড়ানো হয়েছে। বললেন, 'পোস্টাপিসে যা আছে তাতেই আমার বাড়ি হয়ে যাবে, অফিসের টাকা-গুলো—'

কী যেন পরীক্ষা করে দেখলেন

'কেন, আমাকেও বিশ্বাস হয় না বুঝি?' স্ত্রী গম্ভীর হলেন।

আবার একদিন ড্রাফট্সম্যান বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন অনটন সরকার। বললেন, 'তুমি যে প্ল্যান করে দিয়েছ, মেয়েদের হাতে খরচখরচা হলে তাতে কত পড়বে বলতো?'

'এস্টিমেট তো দিয়েইছি, ওর বেশি আর কী পড়বে?' মৃদু হেসে বন্ধু বললেন, 'তুমি তো পাখির বাসা করছো ভাই।'

রান্নাঘরের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন অনটন সরকার। ওটা যেন এমন হয় যে, একজনের বেশি দু'জন একসঙ্গে না ঢুকতে পারে। দু'জন হলেই হাত-পা মেলিয়ে গল্প, টুকিটাকি বিশ পদ রান্না। রান্নাঘর কখনও বড় করতে আছে? ছোট-খাটো হলে নড়তে-চড়তে কষ্ট হবে, অল্পতেই ঘেমে নেয়ে উঠবে, ভাত-ডাল বেঁধেই বেরিয়ে পড়বে।

সবদিক ভেবে প্ল্যান করিয়েছেন অনটন সরকার, স্ত্রীর সাধ্য কী যে অপব্যয় করবেন! অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকাকড়ি স্ত্রীর নামে করে দিয়ে বুলুর বাড়িতে চলে গেলেন তিনি। করুক, বাড়ি ওরাই করুক। পাড়ায় সবাই কানাকানি করল, এতদিনে শক্ত হাতে জব্দ হয়েছেন অনটন সরকার।

বড় ছেলের চিঠি পেয়ে গৃহপ্রবেশের দিন এলেন। বুলু এল, জামাই এল, এল নাতি-নাতনীরা। যেন এদের মত তিনিও কুটুম্ব। নতুন বাড়ির সামনে গিয়েই স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন একবার। এ কী, এ-বাড়ি তার! এরকম প্ল্যান তো তিনি করাননি।

'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?' স্ত্রী বললেন, 'চল, ভেতরে চল।'

এত বড় ঘর! এত বড় বড় জানলা! এত উঁচু! ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় হেঁটে যেতে কয়েক মিনিট লাগবে। এই নাকি পাখির বাসা!

বুলু ঘরে ঘরে দেখছিল, ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকে বলল, 'আর তোমার রান্না করতে কষ্ট হবে না, মা, রান্নাঘরখানা ভারি সুন্দর হয়েছে—বড়সড়, খোলামেলো।'

মুহূর্তে বুঝে ফেললেন অনটন সরকার, প্ল্যান ওরা বদলে নিয়েছে, দেদার টাকা ঢেলেছে। এই অনটনের দিনে কী মারাত্মক অপব্যয়! যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই বসে পড়লেন তিনি, এই খোলামেলা নতুন বাড়ি, তবু তার নিশ্বাস আটকে আসছে। তাড়াতাড়ি জামাই ধরে ফেলল তাঁকে।

'আমাকে পুরনো বাড়ির ছোট্ট ঘরটায় নিয়ে চল।' টেনে টেনে বললেন অনটন সরকার। 'এ-ঘরে আমার দম আটকে আসছে।'

'রান্নাঘরটা দেখবে না?' স্ত্রী বললেন।

চোখ বুজে আসছিল, জোর করে তাঁর দিকে একবার চাইলেন অনটন সরকার। এরপর বেশিদিন আর বাঁচেননি।

নববর্ষে জাপানে কবিতা-পাঠ উৎসব

রাসবিহারী রায়

জাপান উৎসবের দেশ। মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র সুন্দর উৎসব অনুষ্ঠানে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে এই চেরী-ফুলের দেশ। বছরের প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত জাপানের নরনারীদের মধ্যে নানা উৎসবকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় আনন্দোচ্ছ্বাস। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে অতীতের বহু উৎসব অনেকাংশে হয়তো প্রাণহীন হয়ে গেছে। কিন্তু আজও দেব-দেউলে জমে পূজারীর ভীড়, ফুল আর পুতুলকে ঘিরে বসে বর্ণাঢ্য মেলা, সমারোহে পালিত হয় বুদ্ধের জন্মোৎসব।

নববর্ষকে বরণ করার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে। নববর্ষকে কেন্দ্র করে নানা উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় দেশে দেশে, কিন্তু সমারোহের সঙ্গে রাজদরবারে কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান করে নববর্ষকে স্বাগত জানানোর প্রথা একমাত্র জাপানেই দেখা যায়। এই অনুষ্ঠান জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, জাপানীদের কাব্য-প্রীতির সুন্দর নিদর্শন। নববর্ষে কবিতাপাঠের এই অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে জাপানে।

জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে জাপানের মিকাডো কবিতাপাঠ উৎসবের আয়োজন করেন। রাজকুমার, রাজকুমারী, অভিজাত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এই দরবারে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানান হয়। চিরাচরিত রীতি অনুসারে সকাল দশটায় এই কবিতা পাঠের আসর বসে। যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রের কোন সঙ্কট বা অন্য কোন গুরুতর ঘটনা ঘটলে এই প্রথার ব্যতিক্রম হয়, তা না হলে নয়।

সারাদেশের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয়। হাজার হাজার কবিতা স্তূপীকৃত হয় রাজ দরবারের কবিতা সংগ্রহশালায়। দেশের সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সামনে যাঁর কবিতা পঠিত হয় তিনি হন সম্মানিত। তাই সারা বছর ধরে জাপানে চলে কাব্য-চর্চা, কবিযশপ্রার্থীদের কাব্যসাধনা।

কবিতার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় আগের থেকেই। খেয়াল খুশীমত যে কোন বিষয়ে কবিতা রচনা করলে তা গ্রাহ্য হয় না। কি বিষয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তা অক্টোবর মাসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সর্বসাধারণকে জানান হয়। সরকারী গেজেটের মাধ্যমেই এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

কবিতার বিষয়বস্তু যেমন সুনির্দিষ্ট থাকে তেমনি থাকে কবিতার আকৃতি। এই সকল কবিতা পাঁচ পঙক্তির বেশী দীর্ঘ হয় না। এই পাঁচ পঙক্তির কবিতায় একত্রিশটি মাত্রা থাকে—৫-৭-৫-৭-৭। ছন্দমাত্রাভিব সবই এই ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে সীমিত। জাপানী ভাষায় এই কবিতাগুলিকে 'তানকা' বলে। জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে 'তানকা'র বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী, এমনকি এরও পূর্ব থেকে জাপানের কবিরা এই ছন্দেই কবিতা রচনা করে আসছেন। আজও জাপানে এই 'তানকা'র জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। অনেকের মনে হতে পারে পাঁচ পঙক্তি আর একত্রিশ মাত্রার এই সীমিত গন্ডীর মধ্যে কবিপ্রতিভার কোনও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে না। কিন্তু জাপানী কবিরা এই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় ও রসসৃষ্টিতে অপরূপ শিল্প সৃষ্টি করেন।

এইসব ক্ষুদ্র কবিতা জাপানী ভাষা থেকে অনুবাদ করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। অন্যভাষায় রূপান্তরিত করলে এদের অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েকটি জাপানী 'তানকা'র সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন। 'তানকা'র আকৃতি-প্রকৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর অনূদিত এই দুটি ক্ষুদ্র কবিতায়।

(১)

কুয়ার দাঁড়িটি
বেড়িয়া ঝুমকালতা
বেড়েছে নিশীথে,
আমি তৃষার্ত হেথা,
জল ভিখ্ মাগি কোথা!

(২)

নিথর রাতে,
ফুটফুটে জোছনা!
আকাশ-যাত্রী
হাঁসগুলি যায় গোনা,
পেঁজা মেঘে পাখা বোনা!

অসংখ্য কবিতার মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয় কয়েকটা মাত্র কবিতা। আর এই কবিতাগুলি একটি সুদৃশ্য আধারে সম্রাটের সামনে রাখা হয়। এর মধ্যে কিন্তু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কবিতা রাখা হয় না। যাঁর ওপর এই উৎসব পরিচালনার ভার দেওয়া হয় তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন।

এরপর আরম্ভ হয় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। প্রথমে ঘোষণাকারী সুস্পষ্ট কণ্ঠে সমবেত সুধীমণ্ডলীর কাছে কবিতার বিষয়-বস্তু ঘোষণা করেন। প্রতিটি কথা তিনি সুস্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করেন।

এই ঘোষণার পর সাধারণ লোকের রচিত পাঁচটি কবিতা এই আসরে পঠিত হয়। কবিতা পাঠ করারও রীতি নিয়মনির্দিষ্ট। ছন্দ, মাত্রা, বিরতি, সুর সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়। এই সব কবিদের 'তানকা'গুলি দরবারে একবারই পঠিত হয়। কিন্তু রাজপরিবারের রচিত কবিতাগুলি একাধিকবার পঠিত হয়। রাজকুমার ও রাজকুমারীদের কবিতা দুবার পড়া হয়। সম্রাজ্ঞীর কবিতা পড়া হয় তিনবার। সকলের শেষে পড়া হয় সম্রাটের কবিতা এবং তা পঠিত হয় পাঁচবার। রাজপরিবারকে এই বিশেষ মর্যাদা আজও দেওয়া হয়।

এই কবিতা পাঠ উৎসবের পেছনে আছে এক ইতিহাস। তা জানতে হলে প্রায় পাঁচশ বছর আগের ইতিহাসের ধূসর পাতা উল্টোতে হবে, যেতে হবে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে। এই বছর ১৭ জানুয়ারী জাপানের সম্রাট Gotsuchi মিকাডো প্রথম এই কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান করেন। এর পর থেকেই এই অনুষ্ঠান চলে আসছে, মাঝে মাঝে অবশ্য বিরতি ঘটেছে নানা কারণে। কিন্তু এই উৎসব বর্ণাঢ্য বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট Maiji র রাজত্বকালে।

অতীতে কেবলমাত্র যাঁরা কাব্যরচনায় সিদ্ধহস্ত, যাঁদের কবি-প্রতিভা জনসাধারণের মধ্যে স্বীকৃত তাঁরাই সুযোগ পেতেন এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে। কিন্তু যাঁরা সাধারণ লোক তাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারতেন না। তাঁদের কোন অধিকার ছিল না এই উৎসবে। এই বাধানিষেধ থাকার ফলে উৎসবের মর্যাদাহানি হত বলে অনেকেই মনে করতেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন সাধারণ লোকই রাজদরবারে কবিতা পাঠাতে পারতেন না। তাঁদের কবি-প্রতিভা থাকলেও তা উপেক্ষিত হত। আজকের দিনে কিন্তু অতি সাধারণ লোকও এই আসরে সমাদৃত হয়। নানা উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে নববর্ষের এই কবিতার আসর আজও জাপানে অতীত সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে।

পাঠকের বৈঠক
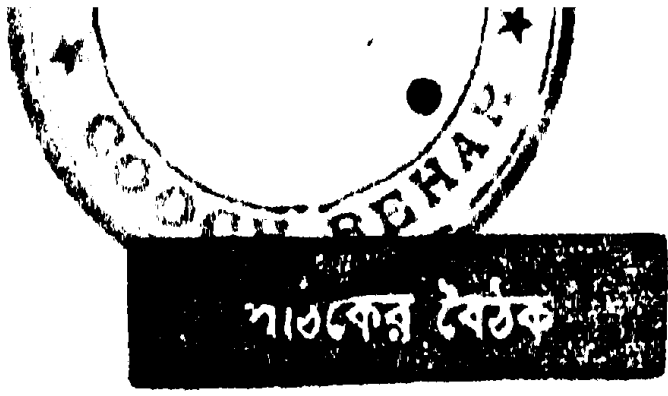
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

দেবতার দুঃসময়

যদি বিশ্বাস না থাকে তা হলে জীবনের কি অর্থ?

কিসে যে আপনার বিশ্বাস তাতে কিছু আসে যায় না যতক্ষণ আপনার কোনো না কোনো রকম একটা মত থাকে। যেমন সর্পকে রজ্জু ভ্রম করা যায় এবং সেই ভ্রান্তিবশতঃ তাকে রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করাও যায়। সেই সর্প দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল এবং একটা মানুষ ঠিক ঠিকানায় পৌঁছেছিল। এমন নয় যে যুক্তি মৃত—বরং যুক্তি অনাহূতের মত দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে। যথাকালে যুক্তি ফিরে এসেছে এবং মানুষটাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়েছে, নইলে সে কিছুই করতে পারত না।

এইটুকু আনন্দ আছে চোখের বাইরে, অলীক কল্পনায়। যুক্তি যাকে বলবে অগভীর, অগ্রাহ্য করবে মূল্যহীন বলে। এই দিক থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অবশ্য অনেক ভাগ্যবান ছিলেন। পৃথিবীর মাটিতেই তাঁদের সদ্গুণের পুরস্কার মিলেছে অনেক সময়—তাঁরা পরমানন্দে বেঁচেছেন এবং সেই আনন্দ নিয়েই পরপারে চলে গেছেন। এই মাটিতে যদি যথাযোগ্য পুরস্কার না মিলে থাকে তাহলে তাঁরা আশা করতেন অন্য লোকে অন্য কোনোখানে তা নিশ্চয়ই মিলবে। নর-নারী সকলেই চাইতেন বাঁচার মত বাঁচতে এবং কিছু সংখ্যক মানুষ সাফল্যও অর্জন করতেন সেই দিক থেকে। এমন কি যখন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যেত, এখানে আশার দিগন্ত অন্ধকার হয়ে যেত তখন আলোর রেখা দেখা যেত অন্যত্র—যেখানে মৃত্যু অমৃত এবং আলো অনির্বাণ, সূর্যাস্তের উজ্জ্বল গরিমার মত জীবনের যা কিছু আনন্দ তাই যে অনন্ত এই বিশ্বাস অধিকাংশের ছিল।

এই পর্যন্ত পাঠ করে এ যুগের বিদগ্ধ পাঠক নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন—বীর্যময় সদগুণ শুনেও। মানুষের যা আনন্দ, যা সুখ তা শুধু একটা ভ্রান্তি একটা মায়া—হ্যামেলিন শহরের শিশুদের দল যে ধরনের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিল বংশীওলার ঐন্দ্রজালিক বাঁশীর সুরে।

বিগত দিনের দেবতারা পরাভূত, মৃত। মানুষের মনকে আর তাঁরা সেভাবে নাড়া দিতে পারেন না। তাঁদের এন্তেকাল হয়েছে—আর মানুষের মাঝে তাঁদের নিরন্তর মৃত্যু ঘটছে—গুহাবাসী মানবের আদিম দেবতাদেরও এই দুর্দশা ঘটেছিল। তাদের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁরা নতুন দেবতার জন্য আসন ছেড়ে দেন, তাঁরাই তখন সত্য, যা মিথ্যা তারই শুধু মৃত্যু ঘটে। বিশ্বাসী মানুষের দল তাদের বিশ্বাসের পতাকা হাতে নিয়ে অচঞ্চল।

বর্তমানে কিন্তু প্রাচীন এবং মৃত দেবতাদের স্থান গ্রহণ করার যোগ্য দেবতারা আর সুলভ নন। তাঁদের কেউ বলিদান করে না, কেউ তাঁদের আত্মনিবেদন করে না, কেউ ক্ষমা, তিতিক্ষা, ভক্তির দীক্ষা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন না। এখন প্রীতির শিকড়ের কোনো শাখা-প্রশাখা বা চারা নেই। আত্মার মধ্যে পবিত্রতা নেই—পবিত্রতা নেই আত্মীয়তায়। কোনো-রকম বিরাট উচ্ছ্বাস নেই—কোনো ভাবাবেগ নেই। মানুষকে উপযুক্ত মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত করার মতো উপযুক্ত হেতু নেই, প্রেরণা নেই। যুক্তি এখন সর্প এবং রজ্জুর মধ্যে পার্থক্য দেখতে পায়। এই জগতে সততা ও সদ্গুণের কোনো পুরস্কার নেই, আর অপর লোক সম্পর্কে কোনো দৃঢ় বিশ্বাস নেই। নবজগতে যা পাওয়া যায়নি তা যে পরজগতে পাওয়া যাবে তার গ্যারান্টি কে দেবে? সব কিছুরই নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, প্রতিমার মধ্য থেকে খড় বেরিয়ে পড়েছে, গরু তাই টেনে টেনে ক্ষুধা মেটাচ্ছে। নিষিদ্ধ সীমানা আজ অবিস্তৃত। কোনো রকম রহস্য নেই, এমন কোনো কিছু নেই যা বিস্ময়ে ভয়ে, আতংকে মানুষের চক্ষুকে চড়কগাছে রূপান্তরিত করতে পারে। আত্মা নয়, চেতনাটাই আসল, প্রাণশক্তি নয়, পদার্থটাই যা কিছু অর্থসূচক, একটা মানে আছে ম্যাটারের, স্পিরিটের নয়।

নিরালা, নিঃসঙ্গ, ঈশ্বরহীন, কোনো কিছুতেই বিশ্বাস ন্যস্ত করার নেই, তার ফলে মানুষ আজ নিজের বাঁচতে এক অরণ্যে পথহারা। একটা ভ্রান্তি একটা ছলনা থেকে আরেক ছলনায়, আধুনিক কালের জলাভূমিতে পরিক্রমণ চলেছে। সব রকম ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ আজ একটা ক্ষুদ্র জীব মাত্র, মাঝে মাঝে নিজের অবস্থাটা বুঝে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পালাবার পথ নেই। আজ আর ইডিপাস নেই, আমাদের মধ্যে প্রমিথিউসও নেই। আজ আমাদের ভেতর নেই একজন জুলিয়াস সীজার, একজন এন্টনি, একজন লীয়র বা একটা ওথেলো। শৌর্যহীন সামান্য মানুষ যা কিছু বিরোধী মনে করে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে—কিন্তু পরিণামে একটা সর্বগ্রাসী অন্ধকার তাদের গিলে ফেলে।

এই হল টেনেসি উইলিয়ামসের জগৎ—

"Is there no mercy left in the World any more? What has become of passion and understanding? Where have they all gone to? Where is God? Where is Christ?"

টেনেসি উইলিয়ামের একটি গোড়ার দিকের নাটকে একজনের মুখে উপরোক্ত বিলাপ শোনা গেছে!

এই যন্ত্রণা ও হতাশার ক্রন্দনই টেনেসি উইলিয়ামের সব সাহিত্যকর্মেরই মূলসত্ত্ব। যারা নিঃসঙ্গ, আতংকিত, জাতিচ্যুত—যাদের কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই—ভগবান নেই, মানুষ নেই, আদর্শ নেই, তারা অন্ধকারে আর্তবেদনায় কেঁদে মরে তারপর আর তাদের ক্রন্দন শোনা যায় না। এই জগতের তারাই অধিবাসী। এ জগত তাদের।

এই ক্রন্দন অতিশয় করুণ। কারণ তাদের হতাশা সর্বগ্রাসী এবং সেই অবস্থা থেকে ত্রাণলাভের সম্ভাবনা নেই। মানুষের জন্মই হয়েছে এক ভগ্ন অবস্থায়, অক্ষত অবস্থায় নয়। আবেদন করার মত কোনো কিছুই তার সামনে নেই। কার কাছে আবেদন জানাবে? কে সেই সিংহাসনে সমাসীন বিচারক? যার কাছে বলবে শান্তি চাই, বিচার চাই। এই পূর্ণাঙ্গতার অভাব-বোধ করে মাঝে মাঝে সামান্য সংখ্যক মানুষ সম্পূর্ণতা লাভের জন্য প্রয়াসী হন—কিন্তু সাফল্য লাভ করেন না। তাঁরা অক্ষম, তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয় না, কারণ বিশ্বজগৎ অসীম শক্তিসম্পন্ন—অন্ততঃ তাই মনে হয়—আর যে মানুষ তার ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছে সে সংগ্রাম করে চলে অপূর্ণতাকে পূর্ণতর করার জন্য। কিন্তু ঘটনাচক্রের অর্থে সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে সে শুধু ইতস্ততঃ ভাসমান। টেনেসী উইলিয়ামসের নতুন নাটক "The Milk Train Doesn't Stop Here Any More" এর নাটকের প্রধান চরিত্র 'মিসেস গোফোর্থ' তাঁর অতীতের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর বর্তমানকে গ্রহণ করতে পারছেন না, কারণ, অতীত অতিশয় পীড়াদায়ক। বৃদ্ধ বয়সকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারছেন না, কারণ, আজীবন তিনি জড় জীবনের নীচের স্তরে শুধু উত্তেজনার সন্ধানে ফিরেছেন। এর ফল হল স্বপ্ন,

পুরুষের ভগ্নাংশ মনের কোনে উঁকি দেয়, আতংক ও বিভীষিকাময় অনুভূতি এবং জীবনকে তার প্রকৃত আকৃতি অনুসারে গ্রহণ করার অক্ষমতা। তাঁর ধারণা, তাঁর প্রেমজীবন ছিল অনবদ্য। সারা জীবনে ছটি স্বামী তাঁর পরলোকগমন করেছে তাঁকে এপারে রেখে ওপারে পাড়ি দিয়েছেন। এখন বার্ধক্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অবসরের মুহূর্তে ভূমধ্য সাগরস্থ একটি দ্বীপে সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করে ফেলে আসা প্রেম-জীবনকে রোমন্থন করার প্রয়াস করেন, তারপর একদিন সেই অবস্থার মধ্যে তরুণ ক্রিসের আবির্ভাব। সে মোটরগাড়ি তৈরী করে। মিসেস গোফোর্থের উদগ্র কামনার উত্তাল জোয়ারে আলোড়ন সৃষ্টি করে ক্রিস আর এই জোয়ারের আকুল স্রোতে শেষ পর্যন্ত মিসেস স্বয়ংও নিমজ্জিত হয়ে যান।

ক্রিস তাঁকে জানতে পারে। তাঁর মধ্যে এমন সব বস্তু এবং পদার্থ আছে যার দ্বারা পৃথিবীর মহিয়সী রমণীরা প্রস্তুত। তাই ক্রিস বলে:

"I admire you, admire you so much that I almost like you; almost. I think of that old Greek Explorer, Pytheas, hadn't beat you to it by centuries. You would have sailed up through the gates of Hercules to map out the Western World, and you would have sailed up further and mapped it out better than he did. No storm could've driven you back or changed your course; oh, no, you are nobody's fool, but you are a fool, Mrs Goforth, if you don't know that finally, sooner or later, you need somebody or something to mean God to you, even if it is cow on the streets of Bombay, or carved rock on Eastern islands or ....."

মিসেস গোফোর্থ কিন্তু ঈশ্বরের সন্ধান পান না, কারণ বিভ্রান্তিকর স্বপ্নের ভিতর দিয়েও তিনি সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারেন। তিনি তাই বলে ওঠেন—

"I heard what you said, you said God, my eyes are out of focus but not my ears! Well bring him, I am ready to lay out a carpet for him, but how do you bring Him? Whistle? Ring a bell for Him?"

ক্রিস তাঁকে এই ঈশ্বর এনে দিতে পারেনি, কেউই পারেনি। এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদের কালেও কেউ শাঁখ দিয়ে বা ঘন্টার বোতাম টিপে ঈশ্বরকে আনতে পারেনি। পার্থক্য হল দৃষ্টিভঙ্গীতে—যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে স্পর্শ করা যায়। আর সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কোনো ধর্মবিশ্বাস কাউকে জোর করে চাপানো যায় না। সে তিনি মিসেস গোফোর্থই হোন বা অন্য আর কোনোজন।

—অভয়ংকর

THE MILK TRAIN DOESN'T STOP HERE ANY MORE (PLAY) — TENESEE WILLIAMS. Published by SECKER AND WARBURG (London) — Price 18 Shillings only

ভারতীয় সাহিত্য

তামিল লেখক সঙ্ঘের অনুষ্ঠান ॥

তামিল লেখক সঙ্ঘের বিশেষ অনুষ্ঠান গত রোববার, ১ জানুয়ারী, সন্ধ্যায় ন্যাশনাল হাই স্কুল হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীকে পি থেতান। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী।

সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীপি এন থংগরাজন উদ্বোধনী ভাষণে সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি জানান যে, তামিল লেখক সঙ্ঘের একটি প্রধান কাজ হলো বাংলা সাহিত্যের তামিল অনুবাদ এবং তামিল সাহিত্যের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ। এছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি সঙ্ঘের অন্যতম উল্লেখ্য কাজ। এর দ্বারা একদিকে যেমন জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে বাংলার সঙ্গে তামিলের নিকটতর সম্পর্ক হচ্ছে।

সভাপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে সঙ্ঘের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তবে তিনি মন্তব্য করেন যে, এই সঙ্ঘ যদি তরুণ প্রতিভাশালী বাঙালী লেখকদের সম্মানিত করেন, তাহলে এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আরও দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্য সরকারী সাহায্যের বিরোধিতা করেন। প্রসঙ্গত তিনি ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি দুর্বলতার কথা বলেন। ভারতীয় সাহিত্যে কোনও মৌলিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় যে সব সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই প্রতীচ্য সাহিত্যের অনুকরণ। এর দ্বারা ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি হবে না বলে তাঁর বিশ্বাস।

সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীকুপ্পুস্বামী সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানান।

স্বাধীনতা আন্দোলনে জওহরলাল ॥

জওহরলালের জীবনী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে এর মধ্যে অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে। তবু লর্ড বার্টলার সম্প্রতি জওহরলাল সম্বন্ধে যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তার কিছুটা অভিনবত্ব আছে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জওহরলাল সম্পর্কে একজন ইংরেজবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

লর্ড বার্টলার হলেন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি গত ১০ নভেম্বর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা করেন। বর্তমান গ্রন্থটি, সেই সব ভাষণের সংকলন। লর্ড বার্টলার ছিলেন রক্ষণশীল দলের একজন প্রখ্যাত নেতা। এই দলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তিনি জওহরলালের প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা যাবে।

হিন্দি ঔপন্যাসিক ভারতভূষণ আগরওয়াল ॥

ভারতভূষণ হচ্ছেন প্রধানত কবি। হিন্দী কবিতা সম্পর্কে যাঁরা কিছুমাত্র খবর রাখেন তাঁরা জানেন ভারতভূষণ হিন্দী কাব্য আন্দোলনে পথিকৃৎদের একজন অন্যতম কবি। সম্প্রতি তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির নাম 'লাউতাড়ি লহরে কি বাঁশরী'। উপন্যাসটির মাধ্যমে এখন তিনি কাব্যচর্চা থেকে সরাসরি উপন্যাস রচনায় অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠেছেন বলে প্রকাশ। একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী এর মূল প্রতিপাদ্য। বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যদিও এর একটি বড় দিক, অন্যদিকে চেতনাপ্রবাহের মাধ্যমেই আগাগোড়া এর কাহিনীর বিস্তার। চরিত্র চিত্রণ বইটির আরেকটি সম্পদ। সমকালীন হিন্দী সাহিত্যে যে একধরনের প্রথানুবর্তন দেখা যায়, এ বইটি তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বইটি শুধু কাহিনীর দিক দিয়েই নয়, বিশ্লেষণ ও এমন কি অন্তর্দৃষ্টিতেও পুরোপুরি সমকালীন বাংলা উপন্যাস চর্চার ধারাটিকে অনুসরণ করেছে বলেই মনে হয়।

হিন্দি কবি সম্মেলন ॥

গত ২৭ ডিসেম্বর রাঁচী হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশনের ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত হিন্দী কবি সম্মেলন। এতে বচ্চন, তিওয়ারি, নীরজ, কাকা হাথরাশি, বেধড়ক বাণারসী, জানকীবল্লভ শাস্ত্রী প্রমুখ প্রখ্যাত কবিরা যোগদান করেন। রাঁচীতে এ ধরনের কোন সম্মেলন এর আগে হয়নি।

ওড়িয়া যুব লেখক সম্মেলন ॥

বালেশ্বর জেলার ভদ্রক শহরের অনতিদূরে শান্ত পল্লীপরিবেশে গত ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ওড়িয়া যুব লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে কয়েক শত তরুণ লেখক-লেখিকা এই সম্মেলনে উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমবেত হন। পূর্ববর্তী দুবছর এই সম্মেলন ভুবনেশ্বর ও কটকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে প্রস্তাব পাশ করার চাইতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে লেখকের সমস্যা প্রভৃতি আলোচনা হয়। এ সম্মেলনের প্রথম দিনে উদ্বোধনের সঙ্গে একটি কবি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'সাহিত্য ও সমাজচেতনা'। তৃতীয় দিনে কথাশিল্পের উপরে আলোচনা হয়, এবং ঐদিন সন্ধ্যায় আধুনিক চিত্রকলার উপরেও আলোচনা হয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, আবেগগত ঐক্যকরণ বিষয়টিকে সামনে রেখে উড়িষ্যার বিশিষ্ট প্রতিবেশী এই পশ্চিমবঙ্গের তরুণ লেখক ও শিল্পীদেরও তাঁরা আমন্ত্রণ করেন। ঐ সম্মেলনে শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী যোগ দেন। শ্রীতরুণ সান্যাল বাংলা কবিতায় আধুনিকতা, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্য এবং তরুণ সাংবাদিক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যিকের সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনটি বিশেষভাবে সাফল্যলাভ করেছিল।

বিদেশী সাহিত্য

জেমস্ জয়েসের পত্রাবলী ॥

জয়েস সাধারণত তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশ করতে ভালবাসতেন না। সাধারণো নিজের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে কোনদিনই তিনি কিছু বলতে চাননি। কিন্তু পত্র মাধ্যমে তিনি তাঁর বিশেষ ধরনের প্রকরণশিল্প বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গেও কিছু পত্রালাপ তাঁর হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে তাঁর বেশ কিছু চিঠিপত্রের এক সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন স্টুয়ার্ট গিলবার্ট। কিন্তু তা ছিল একরকম অসম্পূর্ণ। সম্প্রতি রিচার্ড এলমান এই পর্বের আরো দুটি খণ্ড সম্পাদনা করে একে এক পূর্ণতার অবয়ব দিয়েছেন। পত্রগুচ্ছের এই দুটি খণ্ডে একত্রে মোট আছে ১,১৩৬টি চিঠিপত্র। এই পত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল যে, এগুলি জীবনের সঙ্গে শিল্পের সহযোগকে চমৎকার আলোয় আলোকিত করেছে। বিশেষতঃ জয়েসের জীবনের সঙ্গে শিল্পের নিবিড় অবিচ্ছেদ্যতা বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারা যায়। জীবনে স্টেন্স বুবেল্টী নীল বুম এবং জয়েসের সংক্ষিপ্ত যৌনতাত্ত্বিক একসময় যেরকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ের দুর্লভ সংলাপগুলি জানতে পারা যায় তাঁর স্ত্রী নোরার সে সময়কার একটি দাঁড়ি-কমা-জ্ঞানহীন পত্র মাধ্যমে। নোরা এবং জয়েসের দাম্পত্য জীবন পরস্পরের ভালবাসায় সংহত, প্রেম-উদ্ভুক্ষা, অন্য পুরুষে আসক্ত নোরার প্রতি জয়েসের ঈর্ষা, ক্ষোভ ইত্যাদি বিষয়ে জয়েসের বহু চিঠিপত্রও বইটির অন্যতম আকর্ষণ। রিচার্ড এলমান এই পরিশ্রমসাধ্য বইটির সম্পাদনা কাজের জন্য সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

জ্যাক্ ক্যারুয়াক ॥

ফ্রান্সের 'বীট' সম্প্রদায়ের নাটের গুরু ক্যারুয়াক এখন কি করছেন—এ জিজ্ঞাসা হয়তো অনেকেরই। 'অন দি রোড' লিখবার পরই 'অশ্লীল উদ্দণ্ড ও দুঃসাহসী লেখক' হিসেবে তিনি কিংবদন্তী হয়েছিলেন। অবশ্য প্রবীণ ও সুস্থ বিবেকবান লেখকদের কাছে তিনি ছিলেন নিতান্তই অবজ্ঞার পাত্র। তাঁর দীর্ঘকালীন এই নীরবতায় এখন তাই সব সম্প্রদায়ের মানুষই বিস্মিত।

ক্যারুয়াক তাঁর চারপাশে ফ্রান্সের তরুণতর একপাল রাগী ছোকরাকে জড়ো করেছিলেন। বর্তমানে গুরুহীন এই সব 'ক্রুদ্ধ কবিকুল' যথার্থ গুরুর সন্ধানে ঘুরে মরছেন। কিন্তু ক্যারুয়াক কোথাও পালাননি। ফ্রান্সেই আছেন—তবে সংগোপন জায়গায় আত্মগোপন করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। এই দীর্ঘকাল তিনি এক অসামান্য গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। বইটির নাম 'স্যাটোরি ইন প্যারিস'। বইটিতে ক্যারুয়াক কিন্তু ফিরে গেছেন তাঁর অতীতদিনের পথ পরিক্রমায়। এমন কি ক্যারুয়াক পরিবারের উৎস সন্ধানে। এ প্রসঙ্গে ক্যারুয়াক বলেছেন,—'এ বইটি লেখার আর কোন উদ্দেশ্য নেই—কেবল নিজের নিঃসঙ্গতা দূর করা। এ বইটিতেই জানা যাবে যে লেখার জন্যে আমি আর তেমন পাগল নই।' বর্তমানে ক্যারুয়াক 'বীট' আন্দোলনের পাগলামো ছেড়েছেন। পরিণামে ভদ্র, নম্রনীয় জীবনযাপনই তাঁর উদ্দেশ্য। 'ভবিষ্যত নয়, অতীতচারিতাই এখন আমার সংগী—আমার জীবনের সত্য।' —বলেন ক্যারুয়াক।

লেখকের ভূমিকায় বিচারক ॥

বিচারক হিসেবেই লুই নাইজার ছিলেন নিজের দেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে আইন-আদালতই ছিল তাঁর একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র। অবশেষে একদিন বিচারকের ভূমিকা থেকে তিনি বিদায় নিলেন। তিনি ঢুকে পড়লেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে। সবাই তাজ্জব বনেছিলেন সেদিন। ১৯৬২ সালে বেরোল তাঁর প্রথম গ্রন্থ—মাই লাইফ ইন কোর্ট। এতে আটটি জনপ্রিয় মামলার কাহিনী স্থান পেয়েছিল। বলা-বাহুল্য, বইটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। হট কেকের মত বিক্রী হয়েছিল হাজার হাজার বই। লুই নাইজার সে বছর পেয়েছিলেন বেস্ট সেলারের মর্যাদা। সম্প্রতি তাঁর আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এতে রয়েছে চারটি জনপ্রিয় মামলার কাহিনী, আর এসব ঘটনা প্রথম-গ্রন্থটির থেকেও দারুণ চিত্তাকর্ষক। চারশো আটত্রিশ পৃষ্ঠার এই বইটির নাম হল 'দি জুরি রিটার্নস'।

ভারতবিদ্ লুই রেনু

গত বৎসরের ১৮ আগস্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভারত-তত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক লুই রেনু মারা গেছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর প্যারীতে রেনুর জন্ম। ছাত্রজীবনে প্যারীর উচ্চতর শিক্ষা বিধায়ক মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯০৫) ও অধ্যাপক জুল ব্লখের (১৮৮০-১৯৫৩) কাছে সংস্কৃত শিখেছিলেন রেনু। লেভি আজীবন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা ছাড়াও হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্র এবং বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপ্তি বিষয়ে আলোচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। অধ্যাপক জুল ব্লখ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিদ পণ্ডিত। উত্তরকালে রেনু এই দুই গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রেনু বৈদিক মন্ত্র-গুলির ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করেন। এই উপাধি লাভের জন্য একটি পরিপূরক গবেষণা হিসাবে তিনি গ্রীক ভাষায় লিখিত টলেমির ভারত-বিবরণ অনুবাদসহ সম্পাদনও করেছিলেন।

শিক্ষা শেষে রেনু লিঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত হয়েছিলেন প্যারীর উচ্চতর শিক্ষা বিধায়ক মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (সরবোন) ভারতীয় ও দক্ষিণ এশীয় সভ্যতা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

বেদ-চর্চার মধ্য দিয়ে রেনুর কর্মজীবন আরম্ভ। এইটিই ছিল রেনুর গুরু-পিতামহ অর্থাৎ সিলভাঁ লেভির গুরু এবেল বের্গেইন (১৮৩৮-১৮৮৯)-এর অতি প্রিয় বিষয়। জীবনের প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ধরে রেনু বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করেছেন, এর মধ্যে আছে বৈদিক গ্রন্থপঞ্জী (১৯৩১), বেদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গঠন (১৯৪৭), বৈদিক ব্যাকরণ (১৯৫২), বৈদিক অনুষ্ঠানের শব্দসূচী (১৯৫৪), ঋগ্বেদের শব্দমালা (১৯৫৮), নির্বাচিত বৈদিক মন্ত্রের ফরাসী অনুবাদ (৩ খণ্ড)। বৈদিক ও পাণিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে রেনু গবেষণামূলক যে আলোচনা করেন তা তেরটি সুদীর্ঘ খণ্ডে প্যারীর ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। রেনু এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভারতবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে সিলভাঁ লেভির উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। বৈদিক সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে রেনু যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন সেগুলি বেদ-আলোচনার ক্ষেত্রে অমূল্য বলে পরিগণিত হয়েছে। বর্তমানকালে বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলে স্বীকৃত।

বৈদিক ব্যাকরণ আলোচনা সূত্রে রেনু পাণিনি এবং তার পরবর্তী ব্যাকরণগুলির বিষয়েও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রেনু অনেকগুলি খণ্ডে পাণিনির ব্যাকরণ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী-ভাষীদের জন্য দুই খণ্ডে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখেছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে অভিধানের আকারে তিনি একটি সংস্কৃত শব্দকোষও রচনা করেন।

১৯৪০ থেকে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শরণদেব রচিত 'দুর্ঘট বৃত্তি' ব্যাকরণ গ্রন্থ কয়েকটি খণ্ডে ফরাসী অনুবাদসহ সম্পাদন করে তিনি প্রকাশ করেন। স্বীয় শিষ্য জাপানী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক ওজিহারার সহযোগিতায় রেনু বামন ও জয়াদিত্যের কাশিকা বৃত্তির একাংশও ফরাসী অনুবাদসহ সম্পাদন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বৈদিক যুগ থেকে লৌকিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন বৈয়াকরণিক সম্প্রদায়ের সাধনার ফলে কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার হৃদয়গ্রাহী পরিচয় ব্যাখ্যা করে রেনু "সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস" (১৯৫৬) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ছাড়াও এই বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি নিবন্ধ প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ও ফরাসী ভাষাতত্ত্ব সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাষাতাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণ রেনু সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যেরও চর্চা করেছেন। কালিদাসের "রঘুবংশম" কাব্যটি তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন (১৯২৮)। তাঁর এক সতীর্থ ফরাসী সংস্কৃতজ্ঞ F. Locote ভারতীয় সাহিত্যের আদি কথাকোষ "বৃহৎ কথা শ্লোক সংগ্রহের" অনুবাদ ও সম্পাদন আরম্ভ করে পরলোকগমন করেন, রেনু এই কাজটি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে রেনু "সংস্কৃত সাহিত্য সংগ্রহ" নামে একটি পুস্তক সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তাঁর "বেতাল পঞ্চবিংশতিকার" অনুবাদটিও উল্লেখযোগ্য (১৯৬৩)। ফরাসীভাষী সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য কয়েকজন পণ্ডিতের সহযোগিতায় রেনু একটি ফরাসী-সংস্কৃত অভিধান সংকলন করেন। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বহু নিবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছিলেন, এর মধ্যে তাঁর 'হিন্দুধর্ম' (১৯৫১), 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা' (১৯৫০), ও 'ভারতীয় সাহিত্য' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বইগুলি ইংরাজীতেও অনূদিত হয়েছে। রেনু রাজশেখর রচিত কাব্যমীমাংসা, বেদান্তদর্শন ও পালিদীঘনিকায়ের একাংশের ফরাসী অনুবাদ ও মূলসহ সম্পাদন করে প্রকাশ করেছিলেন। বের্গেইন ও লেভির কয়েকটি পুস্তকের নতুন সংস্করণও তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সহ সম্পাদন করে প্রকাশ করেছেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে রেনু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে স্বয়ং গবেষণা করেছেন আবার অধ্যাপকরূপে বহু ছাত্রকে তিনি সংস্কৃত চর্চায় ও গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন। সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব চর্চাই যেন ছিল তাঁর জীবনের মূল-মন্ত্র। সংস্কৃত শিক্ষার্থী ও ভারততত্ত্ব জিজ্ঞাসু মাত্রই ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়জন, এঁদের সাহায্যের জন্য তিনি সবদাই উন্মুখ থাকতেন।

রেনু কয়েকবার ভারতে এসে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সংস্কৃত কেন্দ্রে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। কয়েক বৎসর তিনি আমেরিকার য়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপকরূপে সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। জাপানের টোকিও শহরে কিছুকাল তিনি একটি গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। রেনু বহু প্রখ্যাতনামা ভারতীয় পণ্ডিতের শিক্ষাদাতা ছিলেন, বহু ভারতীয় গবেষক ছাত্র তাঁর শিক্ষায় উপকৃত হয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেনু বিশেষ সৌহার্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একবার কলকাতায় এসে তিনি সপরিবারে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য রেনু ফরাসী সরকার কর্তৃক 'শেভালিও' দ্য লা লিজিও দ্য অনর' অর্থাৎ 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ফরাসী দেশের সর্বোচ্চ বিদ্বৎ-সংস্থা 'ইনস্টিটিউট'ও তাঁকে সদস্য শ্রেণীভুক্ত করে সম্মানিত করেছিল। প্যারীর 'সোসাইতে এশিয়াটিক'-এর সঙ্গেও রেনুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

রেনুর মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বে সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই একনিষ্ঠ ভারতবিদ্যা সাধকের মৃত্যুসংবাদে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, "তাঁর মৃত্যু ভারত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে একটি অপূরণীয় ক্ষতি।" ভারতে ও ভারতের বাইরে রেনুর অসংখ্য শিষ্য ও সতীর্থেরা প্রতিনিয়ত তাঁকে স্মরণ করবেন। ভবিষ্যতে যারা সংস্কৃত ও ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে চর্চা করবেন, রেনুর আজীবন সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতায় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হবেন—এতে কোন সন্দেহ নেই।

—গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

নতুন বই

স্মরণীয় লেখক বরণীয় মানুষ

ফিনল্যাণ্ডের লেখক ফ্রান্স এমিল সিল্লানপা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মাঝখানেই নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন, তখন ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধরত। তাঁর নাম নাকি সাত আট বছর ধরে প্রস্তাবিত হয়েছিল, ১৯৩৫-৩৬-এ বিবেচিতও হয়, কিন্তু ১৯৩৯-এ তিনি নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার বা ঐ জাতীয় যে কোনো সাহিত্য পুরস্কারই সুপারিশের জোর থাকলে তবে লেখককে দেওয়া হয়, বার্নার্ড শ ও সার্ত্রে দুজনেই নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু পুরস্কারের আর একদিক আছে, পুরস্কৃত লেখক সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মনে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যেমন সিল্লানপা এদেশে নোবেল পুরস্কার লাভের আগে পরিচিত ছিলেন না, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পর এদেশে তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি হয়। সিল্লানপা লেখেন ফিনিস ভাষায় কিন্তু কথা বলেন সুইডিস ভাষায়। ফিনল্যাণ্ডে দুটি ভাষাই প্রচলিত। ফিনদেশীয়দের সুইডিশ ভাষার প্রতি যে উৎকট বিতৃষ্ণা আছে সিল্লানপা তা সমর্থন করেন না। সিল্লানপার পূর্বপুরুষরা ছিলেন চাষী এবং তাঁর পিতা ভূমিহীন চাষী। অনেক ক্লেশ স্বীকার করেও তাঁর বাবা তাঁকে লেখাপড়া শিখতে পাঠান। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু লেখকবৃত্তি গ্রহণের

অভিলাষে ডিগ্রী না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসেন। হামসুন, মরিস মাতারলিংক, আগস্ট স্ট্রীনবার্গ প্রভৃতি লেখকের রচনা তাঁকে প্রভাবিত করে। সিল্লানপার রচনার মধ্যে আছে বাস্তবতা ও আদর্শবাদের সুন্দর সংমিশ্রণ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়, সেই বছরেই তিনি এক পরমাসুন্দরী দাসী সিগ্রিড মারিয়া সালোমাকিকে বিবাহ করেন। সিল্লানপার আর পরিচয় তিনি দীর্ঘদেহ, বিরলকেশ, ২৫০ পাউণ্ড ওজনবিশিষ্ট বিরাট পুরুষ, সাতটি সন্তানের স্নেহময় পিতা, তাদের তিনি কঠোরহস্তে পালন করেন, সকল-প্রকার জন্তুকেই নির্ভয়ে গ্রহণ করার শিক্ষাও তাদের তিনি দিয়েছেন। তাঁর মদ্যপানের শক্তি সম্পর্কে স্বদেশের মানুষের কাছে বিস্ময়কর সুনাম আছে।

সিল্লানপার উপন্যাস 'মীক হেরিটেজ' (১৯১৯) ফিনিস বিপ্লবে শাদা এবং লালের সংঘর্ষের ইতিহাস। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর তিনি স্বদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ফিনিস সরকার তাঁকে একটি রাষ্ট্রীয় পেনসন সেই সময় থেকে দিয়ে আসছেন। সিল্লানপার যে দুটি উপন্যাস এ যাবৎ ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে তাদের নাম 'মীক হেরিটেজ' এবং 'ফলেন এস্লিপ হোয়াইল ইয়ং'। সম্প্রতি আমাদের দেশের সুবিখ্যাত প্রকাশক রূপা অ্যাণ্ড কোং এই দুটি মহাগ্রন্থের সুলভ পেপার ব্যাক সংস্করণ প্রকাশিত করেছেন। গ্রন্থ দুটি পূর্ণাঙ্গ এবং সংক্ষেপিত নয়।

'মীক হেরিটেজ' সিল্লানপার দ্বিতীয় উপন্যাস। সিল্লানপা এই উপন্যাসে শাদা এবং লালের ফিনিশ গৃহবিপ্লবের কাহিনী অসাধারণ সহানুভূতির সঙ্গে লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব যে তিনি এই উপন্যাসে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। তিনি উভয় দলকেই নিন্দা করেছেন। লর্ড ভিক্সজানেন এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলেছেন:

> "The temperamental lyricist had become the stern objective historian. With a pitying eye Sillanpaa lays bare the tragedy of elemental man".

'মীক হেরিটেজ' উপন্যাসের কাহিনী জীবনের উন্মীলন থেকে সুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ছুঁয়েছে, রচনা-রীতি কাব্যধর্মী এবং বিয়োগান্ত।

'মীক হেরিটেজের' মত 'ফলেন এস্লিপ হোয়াইল ইয়ং' (১৯৩১) ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফিনিশ গৃহ-বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত। নতুন ভাবধারার অভ্যুদয়ে কিভাবে সমাজ-জীবনে বিভেদ এসেছে তা সিল্লানপা এই উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। এই উপন্যাসের গ্রাম্য অনাথা বালিকা সিলজার মাধ্যমে লেখক নিষ্পাপ মানবতার সংকট রূপায়িত করেছেন, একটা বিপুল সংঘর্ষের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে সরলা বালিকা দুপক্ষেই তাদের জীবন-মরণ রণে সাহায্য করেছে। এই উপন্যাসের প্রথমেই সিলজার মৃত্যুবর্ণনা দিয়ে লেখক কাহিনী সুরু করেছেন। তবু লেখক শেষে বলেছেন গাছের মৃত্যু আছে কিন্তু জীবন বৃক্ষের মৃত্যু নেই, বংশানুক্রমে তা এক জীবন থেকে অন্য জীবনে সঞ্চারিত। রূপা অ্যাণ্ড কোং এই মূল্যবান গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করার জন্য অভিনন্দন-যোগ্য। তবে গ্রন্থটির—অঙ্গসৌষ্ঠব এবং প্রচ্ছদ রূপার ঐতিহ্য অনুযায়ী হলে আমরা আরো আনন্দিত হতাম।

(1) MEEK HERITAGE, (2) FALLEN ASLEEP WHILE YOUNG — BY F. E. SILLANPAA (Complete and unabridge). Rupa Paper Back Edition — Price Rs. 6.00 each. Published by RUPA & Co : 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.

একটি অসাধারণ উপন্যাস

বাংলাসাহিত্যে সম্প্রতিককালে নানান ধরনের উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। অধিকাংশ উপন্যাসে একটা গতানুগতিকতার ছাপ স্পষ্ট। সেক্ষেত্রে ভিন্ন স্বাদ ও ভিন্ন রূচের স্পর্শ পেলাম 'ভারতপুত্রম' বিরচিত সম্প্রতি প্রকাশিত জীবনধর্মী উপন্যাস : 'সান্ত্রী'তে। 'ভারতপুত্রম' এই ছদ্মনামের আড়ালে যিনি আছেন নিঃসন্দেহে তিনি সম্প্রতিককালের একজন প্রতিশ্রুতিবান কথাশিল্পী। 'সান্ত্রী' সেই প্রতিশ্রুতিময় স্বাক্ষর। লেখার জন্যে যাঁরা লেখেন এবং যাঁদের তৃতীয় নয়ন দেশ জাতি ও সমাজের শুভ ও হিতের দিকে আবদ্ধ তাঁরা নিশ্চয়ই স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যিক বলে সাহিত্য-সমাজে সম্মানিত ও চিহ্নিত। আজকের কথাসাহিত্যে এঁরা বিরল হয়ে এসেছেন। তবু একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান নি। 'ভারতপুত্রম'ই তার দৃষ্টান্ত। সেজন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

উপন্যাসের মূল পটভূমি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বাংলা ও ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রারম্ভিক সূচনা নিয়েই এই উপন্যাসের সমাপ্তি। শুরুতে পূর্ব-বাংলার মমতাময়ী নদী ধলেশ্বরী—তারই ঢেউ এসে মিশেছে সমাপ্তিতে বঙ্গোপসাগরের অশান্ত তরঙ্গে। এই অতল জলের কলরোলে অশান্ত জীবনের হাতছানি কত অপরিচিতকে নিকটাত্মীয় করে তুলেছিল একটি মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায়। পূর্ববঙ্গের একটি ভুলে যাওয়া গ্রামের নাম কদমতলী—ধলেশ্বরীর লালিত কন্যা। এই গ্রামেরই প্রাচীন বনেদী পরিবার সেনবাড়ির তরুণ নিরঞ্জনকে ঘিরেই অতীত বাংলা-ভারতের অগ্নি-আখরের বিস্ময়কর ইতিহাস সুদক্ষ শিল্পীর মতো পরম মমতায় এবং বিরল মুন্সিয়ানায় আশ্চর্যভাবে বাস্তব ও অতি জীবন্ত করে তুলেছেন 'ভারতপুত্রম' পাঠকের চোখের সামনে। এই কাহিনী-সূত্র ধরেই স্বাভাবিকরূপেই এসেছেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, সুরেন বাঁড়ুজ্জে রবি ঠাকুর প্রমুখেরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন যাঁরা। এসেছেন অগ্নিমন্ত্রের সাধকরা যুক্তপ্রদেশের জগদীশ গুপ্ত, মহারাষ্ট্রের গোপাল দেশপাণ্ডে, পাঞ্জাবের কৃপাল সিংহ, মাদ্রাজের নথুরালিঙ্গম চেট্টি প্রভৃতি দুরন্ত তরুণেরা। অতীত ইতিহাসের বাংলা-ভারতের আগুন-ঝরা দিনগুলি এমন জান্তব বাস্তব অনুভূতিময় এর আগে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। নিরঞ্জন সেন এই কাহিনীর নায়ক, এর জীবনকে ঘিরে কাহিনীর স্বাভাবিক সূত্র ধরে যাদের আনাগোনা তারা কেউই আমাদের অপরিচিত নয়। কোন চরিত্রকেই 'আরোপিত' 'প্রোথিত', 'প্রক্ষিপ্ত' বা কৃত্রিম বলে মনে হয়নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ গ্রামের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা বাস্তব এবং স্বাভাবিক। আক্কুদা, রাঙাদি, পুলক মজুমদার, হারান মাস্টার, গোপা সেন, নটেশ্বর বড়াল, অনিরুদ্ধ দাস, মৃন্ময় বসু, ইয়াকুব ব্যাপারী, চাকরি-অন্ত-প্রাণ শ্রীকণ্ঠ সরখেল অবিস্মরণীয় চরিত্র—এমনকি 'বারনারী' পুতুলি, দারোগা রমণী গাঙ্গুলী, পুলিশের টিকটিকি কানাই বসুকেও ভোলা যায় না। নিরঞ্জন সেনের বাবা প্রাণনাথ, মা কুসুমলতা, ছোটভাই সুরঞ্জন প্রমুখের চরিত্রচিত্রণের মধ্যে হারানো বাংলার বিস্মৃত ভারতের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতদের বাবা-মা-ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি হৃদয়কে আপ্লুত করে। লেখকের আশ্চর্য মুন্সিয়ানা কাহিনীর বিন্যাসে বিস্তারে এবং ঘটনার টানা-পোড়েনে। বিস্ময়ে কৌতুকে, আনন্দ-বেদনায় তিনি কাহিনী বুনেছেন পরম নিষ্ঠায়; পাঠকের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য শুরু থেকে শেষপর্যন্ত বজায় রেখেছেন। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে 'সান্ত্রী' শুধু একটি বলিষ্ঠ সংযোজনই নয়—নবদিকনির্দেশারীও। এমন সার্থক বলিষ্ঠ উপন্যাসের জন্য 'ভারতপুত্রম'কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রচ্ছদ, মুদ্রণ এবং বাঁধাই সুরুচিসম্মত।

সান্ত্রী : (উপন্যাস)—ভারতপুত্রম। প্রকাশক সুকান্ত প্রকাশন : ১৫৭বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা : ৪। পরিবেশক : ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা : ১২। দাম : ৬·০০।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক, দিল্লী সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির 'ফেলো', বিখ্যাত সাহিত্যগবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অক্লান্তকর্মী পুরুষ। মাত্র কিছুদিন পূর্বে তাঁর 'বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকরে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তারই স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত হয়েছে "রবীন্দ্র নাট্যধারা"। এই গ্রন্থটি অনেক দিক থেকে মূল্যবান। ডঃ ভট্টাচার্য ভূমিকাংশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল ও বাংলা নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক ও রবীন্দ্রনাথ, জোড়াসাঁকোতে অভিনয়, শান্তি-নিকেতনে নাট্যাভিনয়, কলিকাতায় রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয়, প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ধারাবাহিকত্বের দিক থেকে শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাবধারার ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটেছে সুপণ্ডিত লেখক তা বিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তারপর আটটি বিভিন্ন অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গীতি-নাট্য, নাট্য-কাব্য, নাট্য-কবিতা, রঙ্গনাট্য, ঋতুনাট্য, রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক, গদ্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা বাদ পড়েনি এবং প্রতিটি আলোচনা স্বয়ং-সম্পূর্ণ। গ্রন্থটির পরিশিষ্ট অংশে রবীন্দ্রনাট্য-গ্রন্থপঞ্জীর কালানুক্রমিক সূচী, রবীন্দ্রনাথের অভিনয় এবং শব্দসূচী সংযোজিত। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রতিটি অধ্যায় বিশ্লেষণ ও বিচারে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ আছে এই অসামান্য গ্রন্থটি তাঁদের কাছে অবশ্যপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক রচনার একটা উল্লেখযোগ্য সুবৃহৎ অংশ হল তাঁর নাটকাবলী। তাঁর নাটকের নানা বৈচিত্র্য, ইঙ্গিত এবং বৈশিষ্ট্য। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের তিনি প্রথমতম প্রতিনিধি। যে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'রুদ্রচণ্ড' নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তিনি সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ৪৬খানি বিভিন্ন রীতির নাটক রচনা করেছেন। আঙ্গিকের দিক থেকে প্রায় প্রতিটি নাটক অপরের সঙ্গে বিভিন্ন। এই যে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য। অত্যন্ত সহজবোধ্য ভঙ্গীতে রচিত ডঃ ভট্টাচার্যের এই আলোচনা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যে এক নতুন দিকনির্দেশ করবে এই বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সংশয় নেই।

রবীন্দ্র নাট্যধারা— (আলোচনা)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক—সংস্কৃত প্রকাশন, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা—১। দাম—দশ টাকা মাত্র।

মুক্তির সন্ধানে আলজিরিয়া

আলজিরিয়া মুক্তিযুদ্ধের নিরলস প্রচেষ্টায় পৃথিবীর মানচিত্রে যেমন একটা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে তেমনই সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় বেন বেল্লা, বুমেদিয়েন বেন খেদা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নামও দিনের পর দিন দেখা দিয়েছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বেন বেল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন নায়ক বুমেদিয়েন রাষ্ট্র পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন, তখন পশ্চিম রাষ্ট্রগুলি বুমেদিয়েনকে অভিনন্দিত করলেন। বুমেদিয়েনই যে আলজিরিয়ার বিপ্লবের প্রধান পুরোহিত একথাও অনেকে বলেছেন। এই বিতর্ককর অবস্থার মূল অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে তরুণ সাংবাদিক পবিত্র পাল প্রচুর শ্রম সহকারে আলজিরিয়ার গণ-অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে তার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আকৃতির পরিচয় পর্যন্ত লিপি-বদ্ধ করেছেন তার সদ্যপ্রকাশিত 'বিপ্লবী আলজিরিয়া' নামক গ্রন্থে। আলজিরিয়ার বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করে সেই দেশ এবং তার রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য সাধারণ পাঠকের চোখে তুলে ধরা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়, পবিত্র পাল অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতায় সেই দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতালাভের পূর্বমুহূর্ত ছিল গুরুত্ব-পূর্ণ, ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে যেদিন আলজেরিয়ার মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল জীবন-মরণ সংগ্রামে সেদিন তাদের অন্তরে ছিল মুক্তির কামনা, আলজেরীয় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বেন বেল্লার নেতৃত্বে সেদিন বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল। ১৯৬২-র ৩রা জুলাই ফরাসী সরকার তাদের স্বাধীন ঘোষণা করেন। সমগ্র আন্দোলনটি সুদীর্ঘ সাতবছর কাল স্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পরিচালিত। উভয়পক্ষের লোক ও শক্তি ক্ষয় হয়েছে প্রচুর। রাজনীতির এই জটিল ঘূর্ণাবর্ত পবিত্র পাল কুশলী কথাকারের মত ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল ধারা সম্পর্কে লেখক যথেষ্ট সচেতন এবং আফ্রো-এশিয় রাজনীতির জটিল তত্ত্ব তাঁর করায়ত্ত তাই এত সহজে এবং সুন্দর ভঙ্গীতে তিনি অজস্র চিত্রপটের মত একের পর একটি ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যুক্তিবাদী এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন তাই গ্রন্থটিতে কোনো আবেগ নেই, বাহুল্য নেই, আধুনিক পদ্ধতিতে তিনি এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ঘটনার ইতিহাস রচনা করেছেন। এই জাতীয় কর্মে তিনি বর্তমানে একক, তাই তাঁর নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করা কর্তব্য। গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আগ্রহশীল পাঠকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থটির মূল্যও অনেক কম করা হয়েছে।

বিপ্লবী আলজিরিয়া : (আলোচনা)—পবিত্র পাল। প্রকাশক : ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ২৬।২এ, তারক চ্যাটার্জি লেন, কলি : ৫। মূল্য : দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

নতুন কবিতার বই

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্তের 'মুক্তি-ধারা' কাব্য-পুস্তিকা আসলে একটি দীর্ঘ কবিতা। এই সুদীর্ঘ কবিতায় কবি সমসাময়িক পৃথিবীর কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সমস্ত প্রসংগই স্বাভাবিক-ভাবে এসে পড়েছে। দেশ জুড়ে মানুষ যে দুঃসহ জীবনযাপন করে চলেছে কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে একথা সোচ্চার। তা সত্ত্বেও কবিতাটি শুধুমাত্র প্রচারের বাহন হয়নি,—কাব্যিক উৎকর্ষেও উৎরেছে সুন্দর-ভাবে। এজন্য কবির পরিণত কাব্যচিন্তাই দায়ী।

মুক্তিধারা : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত। প্রকাশক : শ্রীধ্রুবেশ গুহ, ৪০ সাউথ রোড, কলকাতা—৩২। দাম : ৫০ পয়সা।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কোন বিদ্যালয়ের পক্ষে পঁচিশ বছর অতিক্রম করা কম গৌরবের নয়। সেদিক থেকে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যায়তনের কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়টির রজতজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যায়তনের দ্বিভাষী বার্ষিক মুখপত্র 'স্মরণী'র রজতজয়ন্তী সংখ্যা। বিপুল আয়তন এই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় গল্প, কবিতা, নাটিকা, প্রবন্ধ ও নানাধরনের স্মৃতিকথা স্থান পেয়েছে। লিখেছেন প্রায় ছিয়াত্তরজন লেখক-লেখিকা। বলাবাহুল্য এঁদের সকলেই বিদ্যালয়ের সংগে বিভিন্ন সূত্রে জড়িত। শিশিরকুমার দাস, নিরেন্দ্র গুপ্ত, লীলা গুহ, সঞ্জীবকান্তি গুহরাজা, সুব্রত সেনগুপ্ত, শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, অনিমা চট্টোপাধ্যায়, জিতেন দাস ও প্রদ্যোৎ ঘোষের আলোচনা; রত্নেশ্বর হাজরা গণেশ বসু, বিশ্বনাথ চৌধুরী, সঞ্জয় সেন-গুপ্ত, বলরাম বসাক, মন্দিরা সেনগুপ্ত প্রভৃতির কবিতা আর সতীশচন্দ্র মাইকাপ, অনিল দে ও কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যের নাটিকা তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে।

স্মরণী (রজত জয়ন্তী সংখ্যা) সম্পাদক : সুনীল জানা ও জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যায়তন; ১৯৬এ—১৯৮বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা—২৬।

মনোজ বসু
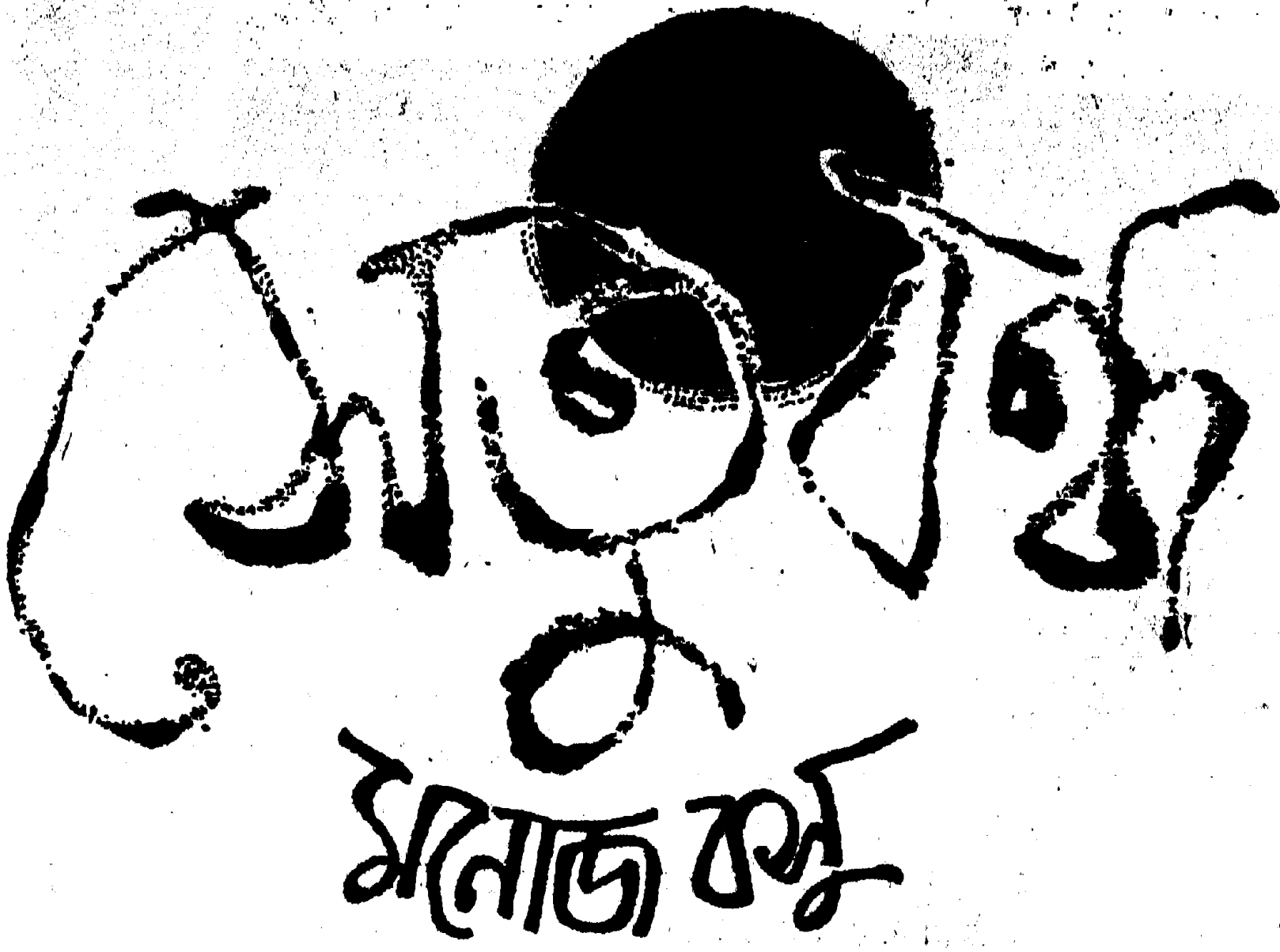
[উপন্যাস]

।। বাইশ ।।

কলকাতায় ফিরছে শিশির। ট্রেনের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঐ চিন্তা। কুমকুমের জন্য বাড়িশুদ্ধ সকলের মায়া উথলে উঠছে, সেদিনের উগ্রভাষী সুনীলকান্তি দুর্লভ ইলিশ মাছ কিনে আনে এবং অস্নাত অপেক্ষা করে বসে থাকে—একসঙ্গে এত অঘটন এমনি এমনি ঘটে না। চাকরি পেয়ে বিয়ের বাজারে হঠাৎ বিষম চাহিদা হয়েছে—হায় রে বঙ্গদেশ, পুরুষের সকল গুণের সেরা গুণ হল চাকরি। জঙ্গলের লতায় লতায় টুকটুকে মাকাল ফল ঝোলে, কাকে শালিখে বুলবুলে ঠোকরায়—শিশিরেরও তেমনি নটবরের গৃহে নিমন্ত্রণ, কুসুমডাঙার সমাদর এবং পূর্ণিমার—। পূর্ণিমা বাজ পাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে একগাদা খরচ করল। বহুদর্শী নটবর যা বলেন, সে কি ষোল আনা মিথ্যে? তা দিব্যি হয়েছে—এই কাড়া-কাড়িটা এবার কুমকুমের উপর গিয়ে পড়ুক। আছে সে কুসুমডাঙায়—ধরো, অসুবিধে ঘটল সেখানে। কানে শুনে নটবর আহা-ওহো করে উঠলেন : নিয়ে এসো আমার বাড়িতে, আমার নাতনি ছেলেপুলে চোখে হারায়—থাকুক সেখানে। এবং ধরা যাক, কোন এক সূত্রে পূর্ণিমাও জেনে ফেলেছে : আমার কাছে দিন না এনে—। বছরে মোটমাট মাস বারোটি—তিন জায়গায় চার মাস করে ভাগে পড়ল। কুমকুম, তোর বড্ড মজা রে—কুসুম-ডাঙায় চার মাস, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে চার মাস, ভবানীপুরে চার মাস কুটুম্বভাতা খেয়ে খেয়ে বেড়াবি। আদর-আহ্লাদের প্রতিযোগিতা—কারণ যার উপর কুমকুমের সকলের বেশি টান, আমিও তো সেইদিকে ঝুঁকব।

সকৌতুকে আরও ভাবছে, চাকরি পেতে না পেতে তিন উমেদার। সবুর করো, চেনা-জানা বাড়ুক, কত দিক থেকে আরও কত এসে পড়বে। সেকালের স্বয়ম্বরসভায় পাত্রেরা নানারকম লক্ষ্যভেদ করে রাজকন্যা জিনে নিত, আমার বেলা কন্যাদের পরীক্ষা—কে আমার কুমকুমকে বেশি করে মায়ায় টানতে পারে। কনে-পছন্দ নয়, মা-পছন্দের ব্যাপার—বরের গার্জেন রূপে কুমকুমই সেটা করবে।

কামরার এক পাশে আধেক চোখ বুঁজে শিশির মনের খুশিতে এইসব আবোল-তাবোল ভাবছে। উমেদারের পর উমেদার—পরীক্ষা চলতে থাকুক তাদের নিয়ে। মেয়ে তার মধ্যে বড় হয়ে উঠবে। ইস্কুলে দেবো, বোর্ডিংএ থাকবে—আর আমার ভাবনা কি তখন?

দমদম স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে শিশির মেসে ফিরল। বাসে চড়ে আসতে ইচ্ছে হল না, কিঞ্চিৎ নবাবির শখ হয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখে, আড্ডা স্তিমিত—দুটো বাজি শেষ করে ছক-গুটি গুটিয়ে ফেলছে এবারে।

শিশির বলে, একি, এখনই ইস্তফা?

ক'টা বেজেছে?

হাতে ঘড়ি—তবু শিশির আন্দাজি বলে, ন'টা—

অমিতাভ আপত্তি করে বলে, এখন আবার বসলে বাজি শেষ হতে বিস্তর রাত হয়ে যাবে।

শিশির বলে, বা রে ছুটোছুটি করে ফিরলাম—আমি যে একদান খেলব।

সমস্ত আড্ডা তাকিয়ে পড়ে তার দিকে : আপনি খেলবেন—জানেন আপনি খেলা?

পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ—তাস-দাবা-পাশা জানিনে তো দিন কাটত আমার কেমন করে?

কারো অপেক্ষায় না থেকে ছক-গুটি নিজেই সে সাজিয়ে ফেলল : বসে পড়ুন, কে কোন দিকে বসবেন।

জানে খেলা সত্যিই—ভালো না হলেও চলনসই। অমিতাভ বলে, তবে পালিয়ে বেড়ান কেন? সাংঘাতিক লোক আপনি—খেলুড়ে অভাবে আড্ডা বন্ধ হয়েছে, তবু কখনো ধরা-ছোঁওয়া দেন নি।

খেলা ভাঙতে সাড়ে দশটার উপর। বরাবর শিশির চুপচাপ থাকে, আজ তারই গলা প্রচণ্ড। দানের মুখে এমন চিৎকার দেয়, মুঠোর পাশাও বুঝি থরথর কাঁপে। এত স্ফূর্তি কোন দিন কেউ দেখেনি।

অমিতাভ বলে, কি হয়েছে, বলুন দিকি? কোথায় আজ বেরিয়েছিলেন, সারাদিন কোথায় ছিলেন?

মেয়ে দেখতে—

কথাটা বলল কুমকুমকে ভেবে, এরা ধরে নিয়েছে বিয়ের কনে দেখতে গিয়েছিল সে। তা-ও অবশ্য পুরোপুরি মিথ্যে নয়।

অমিতাভ কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলে, বললেন না একবার? তা দেখলেন কেমন, হল পছন্দ মেয়ে?

মেসের জনৈক শ্রীপতিবাবু বললেন, পাকাপাকির আগে আমার ভাগনীকে একবার দেখুন না। অতি সুশ্রী মেয়ে, বি-এ পড়ে, তিলসোলার মিত্তির বাড়ির মেয়ে—রীতিমত বনেদি ঘর।

দেখতে পারি। কিন্তু আমি নয়, দেখবে আমার মেয়ে।

অমিতাভ সবিস্ময়ে বলে, কোন মেয়ে? কুমকুম ছাড়া মেয়ে কোথায় আপনার?

হ্যাঁ, কুমকুম পছন্দ করবে—

সকলের হাসি দেখে শিশিরও হেসে বলে, মাস তিন-চার থাকবে কুমকুম কনের কাছে। তারপরে যদি দেখা যায়—আঁকড়ে আছে কুমকুম, ছেড়ে আসতে চাচ্ছে না, সেই কনে সে পছন্দ করেছে বুঝব। পরীক্ষায় কনে পাশ হয়ে গেছে।

তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে শিশির আর অমিতাভ পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে। তক্তাপোষ সরিয়ে দিয়ে মেজের উপর বড় কষ্টের শোওয়া—জায়গা এত সঙ্কীর্ণ, পাশ ফিরতে গেলে গায়ে গায়ে ঠেকে যায়। অমিতাভকে ভাল বলতে হবে—সামান্য পরিচয়সূত্রে এত কষ্ট করছে এতদিন ধরে। তবে আর বেশিদিন নয়—ইদানীং প্রায়ই বলছে কোন একটা ব্যবস্থা করতে। এবং তার জন্য দোষও দেওয়া যায় না।

দেখা যাচ্ছে অমিতাভর হাতেও পাত্রী মজুত। পাশাপাশি শুয়ে আরম্ভ করল : মজাটা দেখেছেন—বাংলাদেশে চলনসই মাঝারি মেয়ে নেই, সবই পয়লানম্বরি। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেও দেখুন—সুন্দরী, সুশ্রী, সুদর্শনা, লেখাপড়া এবং নৃত্যগীতবাদ্যে পটিয়সী, রন্ধন ও গৃহকর্মে নিপুণা, সর্বগুণসম্পন্না। চুলোয় যাকগে। যা বলছি—আমার এক ভাইঝি, মামাতো ভাইয়ের মেয়ে—নাগপুরে থাকে তারা, বর্ণনা কিছু দেবো না, কোন এক ছুটিছাটায় মেয়ে

এনে দেখিয়ে যাবে তারা। শ্রীপতিবাবু হোন আর যিনিই হোন, সে মেয়ে না দেখা পর্যন্ত কোনখানে পাকা কথা দেবেন না। এই আমার অনুরোধ রইল।

অমিতাভ ঘুমিয়ে পড়ল। পাত্রীর ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কিতে চিন্তিত হয়ে পড়ছে শিশির। অবস্থা দিনকে-দিন সঙ্গীন হচ্ছে। তাদের সিঁদুরে আমগাছে বৈশাখের গোড়াতেই আম সিঁদুরবর্ণ হয়ে ঝোলে, পাখ-পাখালি এসে ঠোকরায়। সেই ডাঁসা অবস্থায় পেড়ে ফেলতে হয়, নয় তো ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। শিশিরের উপরেও তেমনি ঠোক্কর পড়ছে। আঙুল গুণে পাত্রী-গুলোর গুণ-গরিমা হিসাব করছে :

মেসের শ্রীপতিবাবুর ভাগনী—ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই দিন চারেক রাবড়ি ও মিষ্টি খাইয়েছেন, উদ্দেশ্য তখন জানত না। প্রবীণ মানুষটাকে তিক্ত কথায় ঘাড় নেড়ে দিতে চক্ষুলজ্জা লাগে। অমিতাভর ভাইঝি—বন্ধু-লোক অমিতাভ, অসময়ে বড্ড উপকার করেছে, তার ভাইঝি বাতিল করা কৃতঘ্নতা। সুনীল-কান্তির বোন ঊর্মি—করো বরখাস্ত, কুম-কুমেরও অমনি পত্রপাঠ বিদায়। নটবরের নাতনি—যতই হোক সেকসনের মাথা নটবর, অফিসমাস্টার বিগড়ে থাকলে মনিবের কান ভাঙিয়ে চাকরির ক্ষতি করবে। এবং পূর্ণিমা —বড় গোলমেলে ব্যাপার ঐখানটা—পূর্ণিমা উমেদারই কিনা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মোটের উপর অগোণে এসপার-ওসপার করা উচিত, যত দেরী হবে ঝামেলা তত বাড়বে, শেষকালে হয়তো খেরো-বাঁধা পাকা খাতা বানাতে হবে পাত্রীর লিস্টি রাখবার জন্য। নতুন আইনে একের অধিক বিয়ে করলে জেলে নিয়ে পোরে। সেকালে ভালো ছিল—যতজনকে খুশি তুষ্ট করা চলত।

সকৌতুকে ভাবতে, ভাবতে শিশিরও এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু অফিসের মধ্যে পূর্ণিমা মৌন, বিষণ্ণ—ঘাড় গুঁজে নিজমনে কাজ করে যাচ্ছে। শিশির বহুবার তাকিয়েছে, ঐ এক অবস্থা। হঠাৎ পূর্ণিমা এ কেমন হয়ে গেল!

বাইরে যাচ্ছিল শিশির। দেখল, পূর্ণিমা ফোনের কাছে। ফোনে অসুখের খবর জিজ্ঞাসা করছে। এই অসুখ-বিসুখের জন্যেই বোধকরি পূর্ণিমার মন খারাপ। শিশির কাছে এসে দাঁড়াল।

ফোন রেখে পূর্ণিমা বলে, আমার ভাইয়ের শাশুড়ির বিষম হার্টের অসুখ। কোন দিন বাড়ে কোন দিন বা একটু কম থাকে। আজ ক'দিন বিষম বাড়াবাড়ি চলছে।

বলে ফিক করে হেসে পড়ল। ক'দিনের মধ্যে পূর্ণিমার মুখে হাসি এই দেখা গেল। তাজ্জব কিন্তু, আত্মীয়ের অসুখ বেড়েছে বলে হাসি। সহসা পূর্ণিমা যেন সম্বিত পেয়ে যায়, শিশিরকে বলে, ঘর? অনেককে বলে রেখেছি। ব্যস্ত হবেন না, জুটে যাবে একটা। খোঁজ-খবর পেলেই জানাব।

শিশির আহত কণ্ঠে বলে, ঘরের জন্য কে বলছে? ঘর ছাড়া অন্য কথা যেন থাকতে নেই!

বিনি কাজে কেউ কথা বলেছে আমার তো কই মনে পড়ে না। দেখতে মানুষ বটে আসলে মেশিন, হাত-পা নড়াচড়া মানেই কাজ—সকলে এই জেনেবুঝে রেখেছে আমার সম্বন্ধে।

শিশির বলে, আমি যা জানি সে জিনিষ উল্টো। হাত ধরে হিড়হিড় করে রেস্তোরাঁয় টেনে এক গাদা খরচা করা—কাজ নয় সেটা, খেলা। বুড়ো নটবরকে ধোঁকা দেওয়া।

প্রশ্ন ঘুরিয়ে পূর্ণিমা বলে, আপনার তো বেশ কথা ফুটেছে—

শহরের গুণ যাবে কোথা! বোবাও এখানে বকবক করে। কিন্তু যে জন্যে এসেছি—আজকে আমি নিয়ে যাবো আপনাকে রেস্তোরাঁয়। কিম্বা রেস্তোরাঁই বা কেন—

কাল ভবতোষের কাছে যে নাম-করা ছবির কথা শুনেছে, সেই প্রসঙ্গ তোলে : চলুন ছবিটা দেখে আসিগে—

পূর্ণিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিশ্বাস ফেলে তারপর বলে, বিশ্বাস করুন শিশিরবাবু, কোন রকম আমোদ-আহ্লাদে আমায় কেউ ডাকে না। দোষ দিইনে সেজন্য। ভরসা পায় না। ঐ সব তুচ্ছ জিনিষের অনেক উপরে আমার বিচরণ। আপনার সঙ্গে সামান্য চেনা-জানা, আপনি সেই জন্যে ডাকতে পারলেন।

সেদিন অবশ্য কিছু নয়। সিনেমার টিকিট বাঘের দুধ নয় যে চিড়িয়াখানায় গিয়ে পয়সা ফেললেন আর পোয়াটাক দুয়ে এনে ঘটিতে করে দিয়ে দিল। বিস্তর কাঠখড় পোড়ানোর আবশ্যক। আগে-ভাগে গিয়ে লাইন দেবেন, অথবা বুকিং অফিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত রাখবেন। ইচ্ছামাত্রেই এ জিনিষ হয় না।

তা ছাড়া পূর্ণিমারও বাধা আছে। ভানু-মতীকে ভাল করে তালিম দিতে হবে, বাপের কাছাকাছি সর্বক্ষণ যাতে সে হাজির থাকে। এবং তারপরে কাছেও বলে আসতে হবে—বানিয়ে-বানিয়ে বলতে হবে একটা-কিছু। ধরুন : অফিস থেকে দেরীতে ফিরব আজ বাবা, কোম্পানীর সে-আমলের এক ডিরেক্টর বিলেত থেকে এসেছে—দেখতে চায় এদের হাতে ফ্যাক্টরি কেমন চলছে। আমাকেও ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। বাড়ী ফিরতে ন'টা-দশটাও হয়ে যেতে পারে।

চিরকালের পীঠভূমি ছেড়ে দেবী যাচ্ছেন অস্থানে সিনেমা-দর্শনে — কত হাঙ্গামা! ঘড়ি দেখে শিশির ব্যস্ত হচ্ছে : দেরী হয়ে গেল—চলুন, চলুন। পূর্ণিমা বলে, দাঁড়ান, পান খেয়ে যাই। ঐ গলিতে পানের দোকান আছে একটা—শ্যামবাজার-বেলেঘাটা থেকেও লোকে গাড়ি করে পান খেতে আসে। অগত্যা খেতে হল সেই সুবিখ্যাত দোকানে—পান কিনল, মশলা চেয়ে নিল, চুন নিল বোঁটার আগায় করে। অথচ পূর্ণিমার দু পাটি দাঁত সাদা চিকচিক করে, পানের ছোপ দাঁতের উপর কোন দিন কেউ দেখে নি। পানের উপর ঝোঁক আছে, সিনেমার পথে প্রথম এই জানা গেল।

সিনেমা-হলে সত্যি-সত্যি অবশেষে প্রবেশলাভ—সরকার হেনো করেছেন, তেনো করেছেন, দুধ-মধুরে গঙ্গা-গোদাবরী বইয়ে দিচ্ছেন, ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকা সমাধা হয়ে মূল-ছবিরও অনেকটা তখন এগিয়ে গেছে। শিশির মনে মনে ফুঁসছে; মেয়েলোক নড়ান আর পাহাড় নড়ান একই কথা—দেখ দিকি, অফিস থেকে এইটুকু পথ আসতে কত সময় লাগিয়ে দিল।

পূর্ণিমার কিন্তু ভারি সোয়াস্তি : লাউঞ্জ প্রায় নির্জন—ছবি দেখার মানুষরা ঢুকে পড়েছে, যারা এসে গুলতানি করে তারাও আর নেই। চেনা মানুষের মুখোমুখি পড়বে, বড্ড ভয় ছিল : দেখ-দেখ পূর্ণিমা হেন মেয়েও সিনেমা দেখতে আসে—দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কি? কেউ কোন দিকে নেই—চুপিসাড়ে এবারে অন্ধকার ঘরে নিজে-দের সিটে গিয়ে বসে পড়া। টর্চ ধরে সিট দেখিয়ে দিল—পরিপূর্ণ হল নিঃশব্দ এবং একেবারে নিভৃত। জগৎসংসার শূন্যে মিলিয়ে গেছে, পর্দার ছবির পানে সকলের দৃষ্টি—ছবিরা হাসে কাঁদে, তাই নিয়ে মজে আছে হলভরা মানুষ।

তাই কি? বেশী দূরে নয়, দূর হলে নজরই চলত না—সামনের সারিতে ঐ যে দুটি। ছবি দেখতে এসেছে মনে হয় না—টিকিট কেটে ঢুকেছে দুটো সিট নিয়ে বসতে পাবে বলে। ফিসফিসানি অবিরত। ছবি থেকে পূর্ণিমার নজর ফিরল ঐদিকে। পার্শ্ববর্তী শিশিরও কি আর দেখে নি? কখনো মাথায় মাথা রাখছে, হাত বেড় দিয়ে ধরছে একে অন্যকে। গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে কখনো বা—কী করছে আর কী করছে না! ওরে হতভাগী এবং ওরে হতভাগা, চার দেয়ালের একটা নিরালা ঘর নেই তোদের? অথবা এই জিনিষই হয়তো চেয়েছে ওরা—সকলের চোখের উপর দিয়ে চুরি করায় যে বাহাদুরি, তাই হয়তো চেখে চেখে উপভোগ করছে। অন্ধকার ঘর, মানুষ-জন অস্পষ্টমূর্তি, মধুর একটা স্বপ্নের আবহাওয়া চারিদিক ছেয়ে আছে। অন্ধকারে কে দেখবে, ভাবছে হয়ত ওরা। কিম্বা ভেবেছে, পর্দার দিকে সকলের দৃষ্টি—হলের ভিতর অন্য দ্রষ্টব্য কিছু থাকতে পারে, সে খবর কেউ জানে না। সেই কতকাল আগে বিশাখা যে সব উপাখ্যান বলত, তারই একটা যেন চোখের উপর চলে এসেছে।

ইন্টারভ্যালে আলো যেই জ্বলেছে, পূর্ণিমা আতকে উঠল। বাঘ দেখেছে না ভূত দেখেছে — তারও চেয়ে ঢের-ঢের সাংঘাতিক, সামনের লাইনের সেই যুগলকে চেনা যাচ্ছে এবারে আলোয়। দম যেন আটকে আসে—ব্যাকুল হয়ে পূর্ণিমা শিশিরকে বলে, বাইরে চলুন, শিগগির—

শিশিরের ইচ্ছা নয়। ভবতোষ বাড়িয়ে বলে নি, ছবিটা দস্তুরমত ভাল। গড়িমসি করে শিশির বলে, এক্ষুনি তো আবার আরম্ভ হবে। বাইরে কোথায় যাব, বৃষ্টি হচ্ছে শুনছেন না—

কথা নয়, হাত ধরে টান এবারে। উঠতে হয় শিশিরকে, পিছু-পিছু চলতে হয়। হলের ভিতর এখন আলোর বন্যা—মহিলার সঙ্গে হাত-টানাটানি করা চলে না।

লাউঞ্জে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যাবেলা মেঘ করেছিল বটে। শহরে কে আর আকাশে তাকাতে চায়—এক-আধবার দৈবাৎ নজরে এসেছিল, গ্রাহ্য করে নি। ছবি দেখবার সময় আন্দাজ পেয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়-বাতাস। সে-যে এমন প্রলয়ংকর কান্ড কে ভাবতে পেরেছে। খুব বেশী তো ঘন্টা দেড়েক ছিল হলের ভিতর—ইতিমধ্যে পিচ-দেওয়া বড়-রাস্তাটা পুরো-পুরি নদী হয়ে গেছে, খরবেগে স্রোত বইছে। সে নদীর জলে নৌকো না-ই থাক, এখানে-ওখানে অর্ধেক-ডোবা মোটর গাড়ি। ইঞ্জিনে জল ঢুকে অচল—পথের ছোঁড়া-গুলোর নতুন রোজগারের পথ হয়েছে, সেই সব গাড়ি ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাওয়া। বৃষ্টি এখনো চলেছে। কলকাতা শহরের রাস্তা-ঘাটের আশ্চর্য ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল—আকাশে মেঘ উঠলেই জলে ডুবে যাবে, বৃষ্টি পড়া লাগে না। কিন্তু আজকের যা ব্যাপার—অক্টারলোনি মনুমেন্টই ডুবে না যায় জলের নিচে!

আর এই লাউঞ্জ অবধি শেষ নয়, রাস্তার জলের মধ্যে পূর্ণিমা দেখ নেমে পড়ছে। শিশিরকে ডাকে, চলে আসুন—

হঠযোগীর মতন জলের উপর দিয়ে হাঁটার প্রক্রিয়া পূর্ণিমার হয়ত জানা আছে, শিশির জানে না। সবিস্ময়ে সে বলে, ছবি দেখবেন না আর? ভাল ছবি তো।

রুখে ওঠে পূর্ণিমা : না, দেখব না। না যাবেন তো বলে দিন, একলা চলে যাচ্ছি।

এত বড় পাগল, জানা ছিল না। বৃষ্টি বাঁচানোর জন্য মাথার উপর শাড়ির আঁচল দিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে পূর্ণিমা চলল। এমনি সাধারণ অবস্থায় একলা ছাড়লে দোষ ছিল না। ট্যাক্সি ডেকে দিলে কিম্বা দু'-পা এগিয়ে বাসস্ট্যান্ড অবধি গেলে ভদ্রতার চরম হত। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির এখন তো কথাই ওঠে না। যান-বাহনের মধ্যে রিক্সা—তাদেরও আজ বিরাট মরশুম, রাস্তার শেষ অবধি তাকিয়েও রিক্সাওয়ালার টিকি দেখা যায় না।

পায়ের জুতো হাতে করে নিয়ে বেজার মুখে শিশিরও অগত্যা জলে নাবে। কী রকম অধঃপতন তার! গাঁয়ে ছিল জবরদস্ত জোয়ানপুরুষ—এখানে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, পোষা কুকুরের মতন রমণীর কিছু-পিছু চলল।

রমণী বলে কিন্তু ললিত লবঙ্গলতা হয়ে হেলে-দুলে চলা নয়! যেন হিংস্র জন্তুতে তাড়া করেছে পূর্ণিমাকে, হাঁটুভর জল হলেও তীরের বেগে ছুটেছে। শিশির তাল রেখে পেরে না—প্রাণপণ করেও পিছিয়ে পড়ছে।

একটা গাড়ি-বারান্দা পেয়ে সেইখানে পূর্ণিমা শিশিরের অপেক্ষায় দাঁড়াল। উপরে আচ্ছাদন বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে জলের মধ্যে। শিশিরের মতন জুতো খুলে হাতে নেয় নি, জলতলে জুতোর অবস্থা বোঝার জো নেই। গায়ের কাপড়-চোপড় মাথার আঁচল ভিজে লেপটে আছে—বেশ কেমন বউ-বউ দেখাচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের বউটি পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে যেন ঘাটের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। নতুন চেহারায় দেখছে পূর্ণিমাকে।

একটা ছবি। জাঁকিয়ে জগদ্ধাত্রীপুজো হত ঝুমঝুমপুর পোদ্দারদের বাড়িতে। কোন এক কালে পোদ্দাররা জমিদার ছিলেন, সেই থেকে চলে আসছে। কুমকুম হয় নি তখনো, পূরবীকে দেখিয়ে আনবে। মাকে বলে নি—মা জানলে ঠিক আপত্তি উঠবে। বিলপারে ঝুমঝুমপুর—যাবে কেমন করে সেখানে? ডোঙা জোগাড় করল। ডোঙা জিনিষটা সহজলভ্য শিশিরদের অঞ্চলে। তালগাছ ফেড়ে ভিতরের শাঁস ফেলে দিয়ে ডোঙা বানায়—সেই ডোঙায় চেপে টুক-টুক করে লোকে বিলের এপার-ওপার করে। শহরের ফ্যাসান-দুরস্ত মেয়ের টিবি নয় পূরবী, ডোঙায় এই প্রথম চেপেছে তা-ও নয়। ডোঙার উপর কাঠের পুতুলের মতন বসে থাকবার নিয়ম। কিন্তু নিয়ম কে মানতে যাচ্ছে—একবার এদিক, একবার সেদিক ঢলে-ঢলে পড়ে পূরবী, যৌবনের বোঝা সামলাতে পারে না যেন এটুকু দেহে। ফল পেতে দেরী হল না—কাত হয়ে জল উঠে ডোঙা ডুবল। মারাত্মক কিছু নয়—এখন এই রাস্তার উপর যা জল, বিলের জল কিছু বেশী হয়ত এর চেয়ে। এবং সাঁতারে দুজনাই দক্ষ। ঠেলে-ঠুলে ডোঙা আরও কম জলে নিয়ে জল সেঁচে ফেলে সেই ডোঙাতেই ফিরল তারা। ভিজে-জবজবে কাপড়চোপড় গায়ের সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে আঁটা। কাদা-জল অপথ-কুপথ ভেঙে বাড়ি ফিরছে। কাছাকাছি মানুষজনের সাড়া

পেলেই ঝুপ করে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে বসে পড়ে। তেমনি জিনিস আজও। ঠিক এইরকম, হুবহু এই ছবি।

পূর্ণিমা বলে, কি দেখছেন অত করে?

মাথায় ঘোমটা বেশ দেখাচ্ছে আপনাকে।

আবার চলল, এবারে পাশাপাশি। পূর্ণিমা বলে, জুতো হাতে নিয়েছেন কেন? খালি পায়ে যাওয়া ঠিক নয়। রাস্তায় কত কি থাকে, পায়ে ফুটে বিষাক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শিশির ভ্রূভঙ্গি করে বলে, খুব বেশি তো জীবনটা যাবে। কী আর এমন! জীবনের চেয়ে জুতোজোড়া বেশি আক্রা।

বৃষ্টির আর শেষ নেই। এক একবার প্রবল হয়ে নামে—বেশ কমে যায়, কিন্তু একেবারে থামে না। রাস্তার জল আরও বেড়েছে। উপরের আকাশের জল—আর মনে হচ্ছে ঝাঁঝরির মুখে একটি ফোঁটাও নর্দামায় না গিয়ে নিচের পাতালের জল চক্রাকারে পাক দিয়ে উপরে উঠে আসছে। ওল্ড-টেস্টামেন্টের মহাপ্লাবনের ব্যাপার—আকাশ ফুটো, পাতালও ফুটো, দুদিকের জল এসে জমছে।

হঠাৎ শিশির প্রশ্ন করে : আপনাদের শহরের লোক নৌকো রাখে না কেন?

হাঁটতে হাঁটতে কিছু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল পূর্ণিমা। শিশিরের দিকে তাকিয়ে পড়ে বলে, কেন?

ছোট ডিঙিনৌকো কিম্বা তালের ডোঙা? ছাতের উপর উপুড় করে রেখে দিল, বর্ষার সময়টা নামিয়ে নেবে। এ তো নিত্যি-দিনের ব্যাপার। মোটরগাড়ি মাস আষ্টেক চলে, বর্ষার চারমাসের জন্য নৌকো।

এতখানি পথ এসে রিক্সা অবশেষে একটা পাওয়া গেল। পাশের এক বাড়িতে প্রকাণ্ড এক দঙ্গল নামিয়ে দিয়ে সবেমাত্র খালি হয়েছে। হাঁটতে পারছে না আর পূর্ণিমা, জল ঠেলে ঠেলে পা ভেঙে আসছে। উঠে পড়ে রিক্সার দখল নিয়ে নিল। শিশিরকে ডাকে : আসুন—

আমি কোথা যাবো? আপনি দক্ষিণে যাবেন, আমার তো ঠিক উল্টোদিকে—বেলগাছিয়ায়।

পূর্ণিমা বলে, যাবেন কি করে? রিক্সা পেলেও এই দুর্যোগে অতদূর কেউ নিয়ে যাবে না। জল ভেঙে পায়ে হেঁটে যেতেও রাত কাবার হবে।

শিশির বলে, পায়ে হাঁটব কেন। বড় রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াইগে—গাড়ি তো আসবেই এক সময়।

বৃষ্টি ধরবে, জল সরে যাবে, গাড়ির চলাচল শুরু হবে—সে আর এ রাতের মধ্যে নয়। কপাল ভালো হলে সকালের দিকে পেতে পারেন। ভিজে কাপড়-জামা নিয়ে জলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

শিশির উড়িয়ে দেয় : পাড়াগাঁয়ের লোক—ভিজে শুকনো একসমান আমাদের কাছে। জল আমরা ডরাইনে।

আমরা ডরাই। এই অবস্থায় সারা রাত্তির থাকলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়ায় ধরবে।

ক্লান্ত পূর্ণিমা আর পারে না। ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তবু দাঁড়িয়ে রইলেন?

তা বটে! আপনাকে একলা ছাড়া ঠিক নয়—

রিক্সাওয়ালাকে উদ্দেশ করে শিশির বলে, চলো তুমি, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। তুমি হাঁটবে তো আমিই বা কেন পারব না? কম কিসে তোমার চেয়ে?

এবারে কলহ দস্তুরমতো। পূর্ণিমা বলে, আসল কথা কি বলুন তো? পাশে বসতে ঘৃণা—গায়ে দুর্গন্ধ বুঝি আমার?

শিশির হেসে ব্যাপারটা লঘু করতে চায় : আসল কথা হল, দুয়ের ভারে রিক্সা ভেঙে পড়বে। পুরুষছেলে একলা আমি হাঁটতে চাচ্ছি, রিক্সা ভাঙলে পুরুষমেয়ে দুজনকেই হাঁটতে হবে তখন।

পূর্ণিমা বলে, বর্ষার দিনে আজ চার-গুণ ভাড়া। রিক্সা মানুষ নয়—সেইজন্যে আক্কেল-বিবেচনা আছে। চারগুণ ভাড়া দিয়ে বোঝা যত খুশি চাপান, ভাঙবে না। এই রিক্সা চেপেই তো জনআষ্টেক এসে নামল—কী হয়েছে, একটা ইস্ক্রুপও ঢিলে হয় নি।

এক-পা নেমে এসে পূর্ণিমা হাত ধরল শিশিরের। হেন ব্যাপার আগেও হয়েছে—প্রতিকার কিছু নেই। জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুর যেন শিশির—টেনে তাকে রিক্সার উপর তুলল।

চলল রিক্সা ঠনঠন ঘণ্টি বাজিয়ে। খারাপ লাগে না। বৃষ্টির জন্য মাথার উপর ঢাকা তুলে দিয়েছে। দুজনে উঠে বসতে সামনে একটা ক্যাম্বিসের পর্দা খাটিয়ে দিল গায়ের উপর দিয়ে, বৃষ্টি গায়ে লাগবে না। সঙ্কীর্ণ এক বস্তার ভিতর দুজনকে পুরে যেন মুখ এঁটে দিল। ভালই লাগে।

কৌতূহল অনেকক্ষণ মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, শিশির প্রশ্ন করে : হঠাৎ এমন ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এলেন—ছবি তো খারাপ নয়, কি হয়েছিল?

চেনা লোক ওখানে—

শিশির বলে, চেনা হলে তো ডেকে নিয়ে আলাপসালাপ করি আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। পাওনাদার হলে আলাদা কথা। —পালাই।

পূর্ণিমা বলে, আমার ছোটভাই বউ নিয়ে সিনেমায় এসেছে—সামনের সারির সেই দুটি। আমায় দেখে না ফেলে মুখ ঢেকে তাই পালিয়েছি।

একটু থেমে আবার বলে, দেখেই ফেলেছে ঠিক। নইলে ইণ্টারভ্যালে তারাই বা মুখ ফিরিয়ে থাকে কেন? কী লজ্জা, কী লজ্জা!

কিন্তু লজ্জার কিছু থাকলে সে তো সেই তরুণ দম্পতির, আবছা অন্ধকারে সিনেমা-হলকে যারা নিভৃত প্রকোষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছিল। পূর্ণিমার কেন জল ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়—ব্যাপারটা শিশিরের মাথায় আসে না। সিনেমা দেখায় লজ্জার কি আছে? তার জন্য পালাতেই বা হবে কেন?

আমার হয়। শুধু তো দিদি নই, দেবী আমি। সকলে মিলে দেবী বানিয়েছে। দেবী আবার সিনেমা দেখবে কি, সংসারের মঙ্গল করে বেড়াবে। মরণদশা হল, কলেজে পড়তে গেলাম—তখন থেকেই মঙ্গল করে আসছি, চিরকাল আমায় করে যেতে হবে।

হাহাকারের মতো শোনায়। কণ্ঠ বুঝি অশ্রুভারে বুজে আসে। বলে, দেবীর কত খাতির-সম্মান! শতেক মুখে প্রশংসা, সবাই তার মুখাপেক্ষী। নিজের বলে কিছু থাকতে নেই, সর্বজনের পালয়িত্রী সে। দুহাত ভরে তার কাছ থেকে নেবে, কিন্তু আমোদ-উৎসবে সে বাদ। ভাবখানা যেন রুক্ষ নজর লেগে উৎসব তাদের জ্বলেপুড়ে যাবে।

দুর্যোগ রাতে হঠাৎ পূর্ণিমার কী যেন হয়েছে, বিস্তর দিনের জমানো ব্যথা উজাড় করে বলে যাচ্ছে। শিশির কতক বোঝে, কতক বোঝে না। এরই মধ্যে কেমন করে ঠাহরে এলো, বাড়ির গলির কাছাকাছি এসে পড়েছে, পর্দার বাইরে মুখ নিয়ে পূর্ণিমা গলিতে ঢোকবার নির্দেশ দিয়ে দেয়।

শিশিরকে বলে, রাতটুকু আমাদের বাড়িতে থেকে যান, তা ছাড়া উপায় কি! বেলগাছিয়া যাওয়া অসম্ভব, এ বৃষ্টি রাতের মধ্যে ধরবে না।

গলিপথটুকুতেও আবার সেই দেবীর উপাখ্যান। বলে, যে গাঁয়ে আমাদের তালুক ছিল, ছোটবেলা একবার সেখানে যাই। পুরানো অট্টালিকা মন্দির রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ গ্রামের এখানে সেখানে। একটা ভাঙাচুরো মন্দির দেখেছিলাম, চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে। অশ্বত্থগাছ মন্দিরের গা বেয়ে উঠে চারিদিকে শত শত ঝুরি নামিয়েছে, নাটার জঙ্গলে এঁটে আছে জায়গাটা। দিনদুপুরেও অন্ধকার থমথম করে, ঝিঁঝি ডাকে। সে মন্দিরে বিগ্রহ একটি ছিলেন—নিরম্বু দিন কাটত তাঁর, পুজোআচ্চা পড়ে পড়ুক, দূর থেকে প্রণামও কেউ একটা করত না। আর আমি যে দেবীর কথা বললাম, তাঁরও এখন সেই দশা। আমি জানি, আমি জানি।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা চুপ হয়ে যায়। বাড়ির দরজায় এসে গেছে।

(ক্রমশঃ)
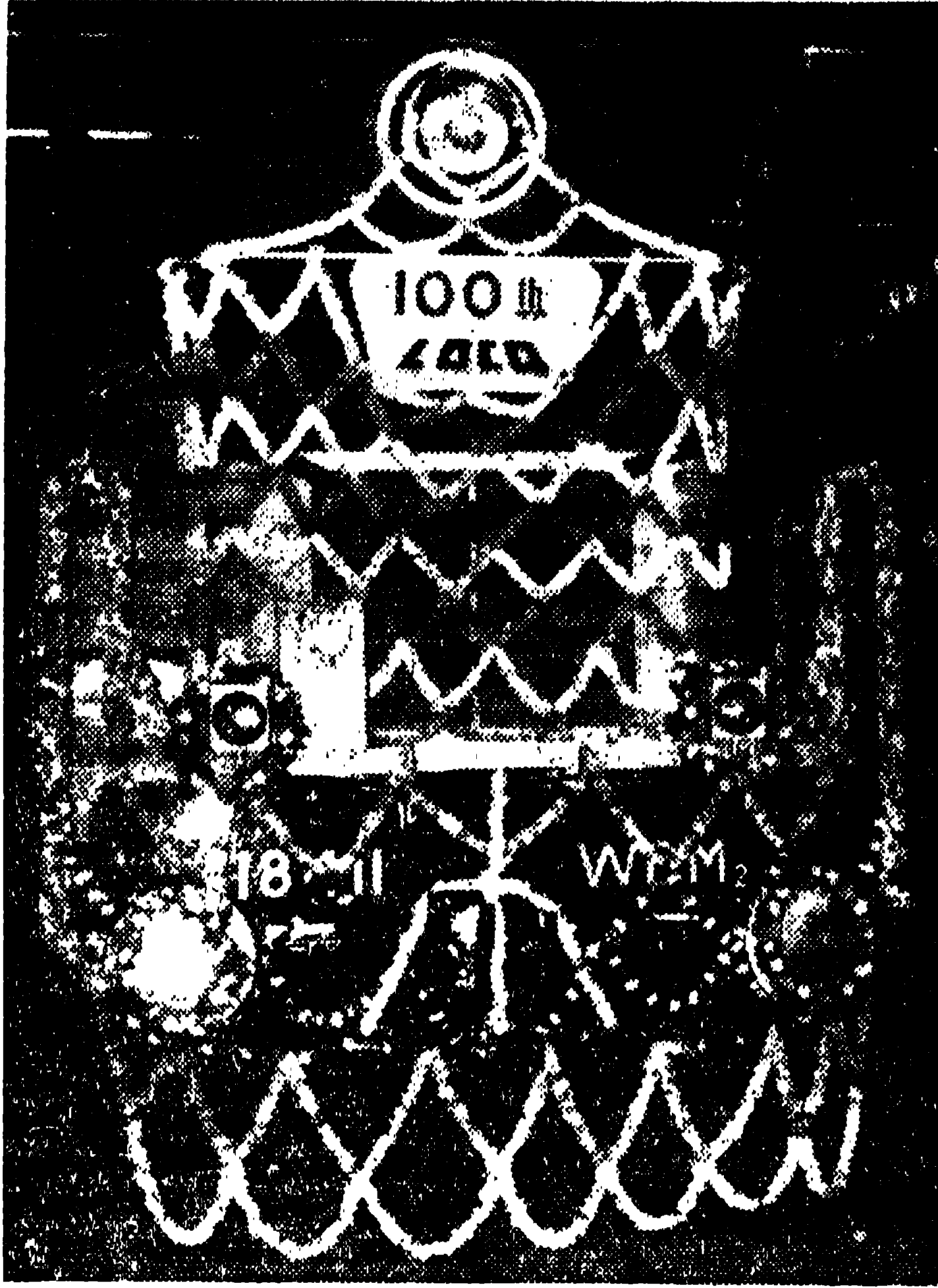
বারাণসীতে নির্মিত একশততম ডিজেল লোকোমটিভ। লোকোমটিভটির নাম রাখা হয়েছে পরলোকগত শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নামানুসারে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে তিনি এই প্রথম ডিজেল লোকোমটিভটির উদ্বোধন করেন।

দেশে বিদেশে

হ্যানয়ের হ্যাঁ!

হ্যানয় কি 'হ্যাঁ' বলেছে? অথবা এখনও 'তা নয়', 'তা নয়' বলে যাচ্ছে? নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজিং এডিটর হ্যারিসন সল্স্বেরির হ্যানয় থেকে পাঠান সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে, হ্যানয় 'হ্যাঁ' বলেছে, এখন সাড়া দেওয়ার পালা আমেরিকার। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের সহকারী বিল ময়ার্স বলেছেন, সাড়া দেওয়ার মত কোন ডাক তাঁরা এখনও শুনতে পাচ্ছেন না।

উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভ্যান ডংয়ের সঙ্গে হ্যারিসন সল্সবেরির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণটি গত ৪ জানুয়ারী নিউইহর্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকেই এই নূতন জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব। এই বিবরণে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী ফাম ভ্যান ডং সল্স্বেরিকে বলেছেন, ভিয়েতনামে একবার যদি যুদ্ধ বন্ধ হয়, তাহলে 'আমরা পরস্পরকে সমীহ করে সব প্রশ্নের মীমাংসা করব।'

উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করার দাবী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ফাম ভ্যান ডং সল্স্বেরিকে বলেছেন, 'এর পর আমাদের তরফ থেকে উদারতার কোন অভাব হবে না, সে-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, যুদ্ধ ছেড়ে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য এতদিন উত্তর ভিয়েতনাম যে চার-দফা সর্তের কথা বলে আসছিল, সেগুলির উপর এবার উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী আদৌ জোর দেন নি। তিনি বলেছেন, ঐ চারটি দফাকে শান্তি আলোচনায় সর্তরূপে গণ্য করার প্রয়োজন নেই, ঐগুলি আলোচনার ভিত্তি মাত্র।

উত্তর ভিয়েতনামের এই চারটি দফা হচ্ছে:—(১) ভিয়েতনামের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, একতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা স্বীকার করে নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে এবং উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। (২) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের একীকরণ না হওয়া পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী সামরিক মৈত্রী-চুক্তি ও বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করতে হবে। (৩) ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্টের (ভিয়েৎকং-এর রাজনৈতিক শাখা) কার্যসূচী অনুযায়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির মীমাংসা করতে হবে এবং (৪) বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশের দুই অংশের সংযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

উত্তর ভিয়েতনামের এই চার-দফা দাবী এতদিন যাবৎ ভিয়েতনামের প্রশ্নটিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে টেনে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসার পথে প্রধানতম অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। সেই অন্তরায় আজ দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এমন ইঙ্গিত আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবাদপত্র মহল সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন এবং আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখবে এমন একটা আশার সঞ্চার হল।

এই আশার পটভূমিকায় আরও কিছু ছিল। উত্তর ভিয়েতনামের উপর বিমান আক্রমণ বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর যে চাপ আসছিল তার সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে কিছুটা নতিস্বীকার করেছে। আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য ছিল যে, উত্তর ভিয়েতনাম তার সামরিক তৎপরতা বন্ধ করবে এমন আশ্বাস দিলে তবেই আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা-বর্ষণ বন্ধ রাখবে। কিন্তু পরে আমেরিকা তার এই বক্তব্য সংশোধন করে বলেছে যে, উত্তর ভিয়েতনাম যদি প্রকাশ্যে বা গোপনে, সরাসরি অথবা তার পছন্দমত কোন কূট-নৈতিক সূত্রে জানিয়ে দেয় যে, মার্কিন বিমান আক্রমণ বন্ধ হলে তারা উত্তেজনা হ্রাসের জন্য উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তাহলেই আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করবে। এটাই হচ্ছে এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হালের বক্তব্য। সে উত্তর ভিয়েতনামের কাছ থেকে প্রকাশ্য আশ্বাস চায় না, শুধু কিছু ছেড়ে কিছু পাবে, এমন নিশ্চয়তা পেলেই সে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমা-নিক্ষেপ বন্ধ করবে। এটাই আমেরিকা এতদিন সারা পৃথিবীকে বুঝিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে। রাষ্ট্রসংঘে

আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি আর্থার গোল্ডবার্গ গত ১৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্টকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামিয়ে শান্তির আলোচনা আরম্ভ করার একটা উপায় সন্ধান করতে বলেছেন। এই অনুরোধ পাবার কিছুদিন পর উ থান্ট আমেরিকাকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, তিনি ইঙ্গিত পেয়েছেন, আমেরিকা যদি উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণে বিরত হয়, তাহলে উত্তর ভিয়েতনামও পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

উ থান্টের এই পরামর্শের কয়েক দিনের মধ্যেই উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রীর হ্যারিসন সলসবেরির সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হল। দুটি মিলিয়ে দেখলে এই অনুমানই দৃঢ় হয় যে, আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের তরফ থেকে যে ধরনের পরোক্ষ ইঙ্গিত চাইছিল হ্যানয় এখন বিভিন্ন সূত্রে সেই ইঙ্গিত দিতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ হ্যানয় "হ্যাঁ" বলছে। আমেরিকা বলবে কি? উ থান্ট যা বলেছেন এবং সলসবেরির মারফৎ উত্তর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তারপর আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখবে কি?

দুঃখের কথা এই যে, সংবাদপত্রের জল্পনা-কল্পনায় যে আশার ক্ষীণ আলোকসম্পাত দেখা যাচ্ছে আমেরিকার সরকারী মহল থেকে এখনও তার কোন সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও এমন কোন ইঙ্গিত নেই যাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিন বিমানহানা বন্ধ হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সহকারী বিল ময়ার্স গত ৫ জানুয়ারী বলেছেন, "আমরা কিছু ছাড়লে উত্তর ভিয়েতনামও কিছু ছাড়তে রাজী আছে এমন কোন ইঙ্গিত কোন সূত্র থেকে পাওয়া গেছে বলে আমি জানি না।"

ভারতবর্ষ একথা অনেক আগে থেকেই বলে আসছে যে, উত্তর ভিয়েতনামের উপর মার্কিন বিমানের হানাদারী বন্ধ হলেই ভিয়েতনামে শান্তি আলোচনা আরম্ভ করার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হবে। আজ উ থান্টের দৌত্য ও হ্যারিসন সলসবেরির রিপোর্টের পর সেই বিশ্বাস সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও একটা প্রভাবশালী অংশে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিমানহানা আরও কতদিন চালিয়ে যেতে পারবেন সেটা লক্ষ্য করার মত। একমাত্র ভরসার কথা এই যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ভিয়েতনামের নববর্ষ উপলক্ষে যে যুদ্ধবিরতি হবার কথা আছে তার মেয়াদ বাড়িয়ে এক সপ্তাহ করার প্রস্তাব আমেরিকা বিবেচনা করে দেখছে। প্রস্তাবটি এসেছে ভিয়েতকংয়ের তরফ থেকে এবং আমেরিকা এখন সেই প্রস্তাব নিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছে।

গোরক্ষার গোঁ

শ্রী এস কে পাতিল কয়েক দিন আগে পরিহাস করে বলেছিলেন যে, গো-রক্ষা আন্দোলনকারীরা শুধুমাত্র গো-মাতার হত্যা বন্ধ করতে চাইছেন না, তাঁরা গো-মাতার পুত্র-কন্যা-স্বামীদেরও হত্যা বন্ধ করতে চাইছেন।

কিন্তু সে পরিহাস গায়ে না মেখেই কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করতে হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের ও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত এই কমিটি "গরু ও তার বংশজাত"-দের হত্যা নিষিদ্ধ করার প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখবেন।

এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃতপক্ষে দুটি বিষয়ে বর্তমান সংবিধানের নির্দেশকে অতিক্রম করলেন। প্রথমত, সংবিধানের ৪৮ অনুচ্ছেদে যে নীতি-নির্দেশ রয়েছে তাতে গো-হত্যা নিষেধের কথা বলা হয়েছে সত্য; কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায়ে এই অনুচ্ছেদের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ অকেজো বুড়া ষাঁড় হত্যা করতে চায় তাহলে তাকে নিষেধ করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। অর্থাৎ গো-রক্ষা আন্দোলনকারীরা এখন যে ধরণের "সম্পূর্ণ গো-বধ নিষেধের" দাবী তুলছেন সেই ধরণের নিষেধাজ্ঞা আরোপের উদ্দেশ্য সংবিধানপ্রণেতাদের ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবীটিও প্রস্তাবিত কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রশ্নটি উন্মুক্ত করে দিলেন। দ্বিতীয়ত সংবিধানের বর্তমান বিধান অনুযায়ী গো-বধ নিষেধের প্রশ্নটি রাজ্য বিধানসভাগুলির আইন-প্রণয়নক্ষমতার এক্তিয়ারভুক্ত। গো-রক্ষা আন্দোলনকারীদের দাবী হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দ্বারা সারা দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কমিটি গঠন করে এই বিষয়েও সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

"সর্বদলীয় গো-রক্ষা মহাভিযান সমিতি"র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবনের আলোচনার পর এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আশা করা গিয়ে-

মশা মারতে
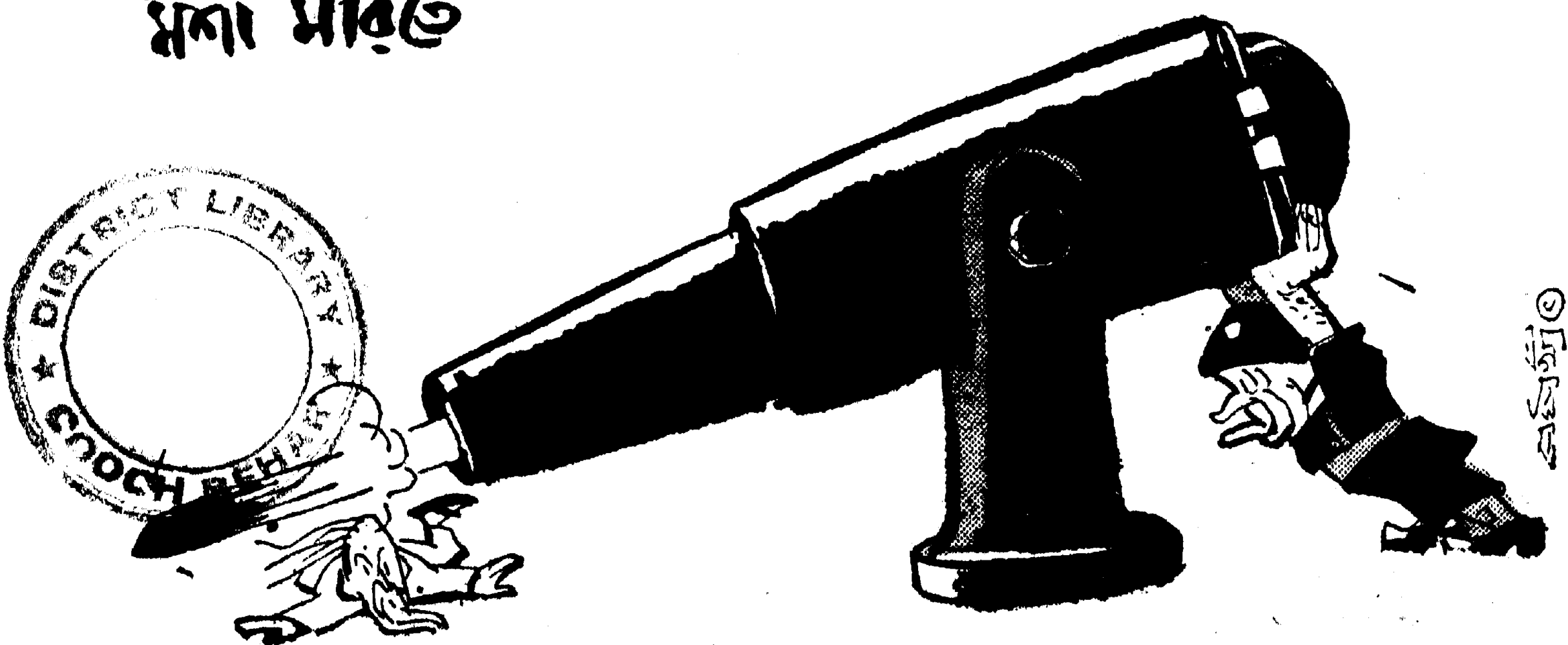
ছিল যে, এই কমিটি গঠনের পর গো-রক্ষা আন্দোলন বন্ধ হবে এবং পুরীর জগদ্গুরু শংকরাচার্য ও অন্য যাঁরা এই প্রশ্নে অনশন করছেন তাঁরা অনশন ত্যাগ করবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নি। গো-রক্ষা সমিতির মুখপাত্র বলেছেন যে, সরকার পক্ষ থেকে তাঁদের বলা হয়েছিল, সারা দেশে গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার কতকগুলি অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাগুলি কি তা বিবেচনা করে দেখার জন্য এবং সেগুলি প্রতিকারের পথ নির্দেশ করার জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাবে গো-রক্ষা সমিতি রাজী আছেন। কিন্তু আগে সরকারকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিতে হবে যে, গো-বধ আইন করে নিষিদ্ধ করা দরকার। কিন্তু ভারত সরকার আগে থেকেই এমন কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে পারেন না।

(৭-১-৬৭)

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

খাদ্য চিন্তা

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন বছরে দেশবাসীর জন্যে একটি উদ্বেগজনক চিত্র পেশ করেছেন। কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের একটি পর্যালোচনায় বলা হয়েছে যে, ১৯৬৭ সালে, বিশেষ করে মার্চের পরে খাদ্যের অবস্থাটা মোটেই ভাল যাবে না এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশ ছাড়া আর সমস্ত ঘাটতি রাজ্যে খাদ্যের সরবরাহ কমান ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এক সপ্তাহ চাল ছাড়া কাটাবার পর পশ্চিমবঙ্গের রেশন এলাকার মানুষ যখন মাত্র ৩০০ গ্রাম চাল (বেড়ে ৩৫০ হবার সম্ভাবনা রয়েছে) নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, তখন এই রিপোর্টটি অন্তত এই রাজ্যে যে কি ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করবে সেটা না বললেও চলে। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, ঘাটতি এবার সারা দেশের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে।

পর পর দু' বছর প্রচণ্ড খরায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শস্যহানি ঘটায় সঙ্কট আমরা আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু অবস্থা যে এতটা খারাপ সেটা অনেকেই বুঝতে পারেন নি।

কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়া থেকে খাদ্য সরবরাহের যে সব প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে হয়ত জনসাধারণের সর্বনিম্ন প্রয়োজন টায়ে-টায়ে মেটান সম্ভব হবে। কিন্তু মার্চে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব হবে না। তার পরের মাসগুলির অবস্থা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এর ফলে বর্তমান সরবরাহ বণ্টন করাটাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমদানীর একটি হিসাব দিয়ে পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, ফসলের বর্তমান বছরটি স্বাভাবিক হবে এই ধারণায় ১৯৬৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চোদ্দ মাসের জন্যে প্রায় ১ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানীর একটি পরিকল্পনা গত আগস্ট মাসে রচনা করা হয়েছিল। এই এক কোটি টনের মধ্যে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া গেছে মাত্র নয় লক্ষ টন। কানাডা ৫৫ হাজার টন দেবে বলেছে এবং অস্ট্রেলিয়া দেড় লক্ষ টনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই নিয়ে এ পর্যন্ত ১১ লক্ষ ৫ হাজার টনের হিল্লে হল। বাকী পরিমাণ কবে নাগাদ পাওয়া যাবে কিম্বা আদৌ পাওয়া যাবে কিনা তা কেউ বলতে পারে না।

সেই সঙ্গে, পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, দেশের খাদ্য উৎপাদনের পরিস্থিতিও খুব ভাল নয়। ১৯৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ আগে ধরা হয়েছিল ৯ কোটি টন। এখন দেখা যাচ্ছে ৮ থেকে সাড়ে ৮ কোটি টনের বেশী উৎপাদনের কোন আশাই নেই। অর্থাৎ দেশের বার্ষিক প্রায় এক কোটি টনের মত চাহিদা মেটাবার জন্যে এবার আরো বেশী মাত্রায় খাদ্য আমদানীর ওপর নির্ভর করতে হবে। খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের হিসেবে আমদানীর বোঝা এখন গিয়ে দেড় থেকে দু কোটি টনে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু দপ্তরের মতে, এই পরিমাণ ঘাটতি আমদানীর দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়, কারণ কেবল যে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে না তা-ই নয়, এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশেরও রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত ফুরিয়ে গেছে।

'অতএব', পর্যালোচনার ভাষায়, 'যে সব ঘাটতি রাজ্যের অবস্থা বিহার ও উত্তর প্রদেশের মত খারাপ হয় নি, সেই সব রাজ্যে বরাদ্দের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমান ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

আমদানীর ওপর আমাদের কি রকম অসহায়ভাবে নির্ভর করতে হয়, সেটা এর চাইতে পরিষ্কারভাবে বোধহয় আর কিছুতেই বোঝান যেত না।

খাদ্য দপ্তর অবশ্য বলেছেন, বরাদ্দ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভেতরে বিপণন-যোগ্য উদ্বৃত্তের যতটা সম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু এই কাজে তাঁরা কতদূর সফল হবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে সে কথা প্রমাণ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধিবদ্ধ ও আংশিক রেশন এলাকার জন্যে প্রয়োজনীয় ধান-চাল সংগ্রহের দায়িত্ব ভারতীয় খাদ্য কর্পোরেশনের ওপর অর্পণ করেছেন এবং ধানের সংগ্রহ-মূল্য বেঁধে দিয়েছেন গুণানুসারে ১৬, ১৭ ও ১৮ টাকা মণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুরো লেভী তুলে দিয়ে ৫০ শতাংশ লেভী ধার্য করেছেন এবং কলওয়ালারা বাজার থেকে কি দরে ধান কিনতে পারবে সেটা ঠিক করে দেন নি। ফলে নির্দিষ্ট দামে সরকারে ৫০ শতাংশ লেভী দেবার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে এই আশায় ব্যবসায়ীরা চড়া দাম দিয়ে চাষীর কাছ থেকে ফসল কিনে নিচ্ছে। চাষীও ফসল ওঠার মুখে চড়া দাম পাওয়ায় ফসল ব্যবসায়ীদের কাছেই বিক্রি করে দিচ্ছে। ধানের দাম ইতিমধ্যেই মনপ্রতি ২৫ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এত বেশী দাম দিয়ে ধান কেনার উপায় খাদ্য কর্পোরেশনের নেই, কেননা তার দাম বাঁধা। ফলে যা হবার তা-ই হচ্ছে : ১২ ডিসেম্বর থেকে খাদ্য কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গে ধান-চাল সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মাত্র কয়েক হাজার টনের বেশী ধান সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

এই অবস্থায় কঠোরতর ব্যবস্থা ছাড়া খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের পরিকল্পনা কিভাবে সফল হতে পারে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। এর অর্থ একটিই : অন্তত ১৯৬৭ সালে খাদ্য ঘাটতির হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই। নতুন বছর আরম্ভ করার উপযুক্ত ভাবনাই বটে।
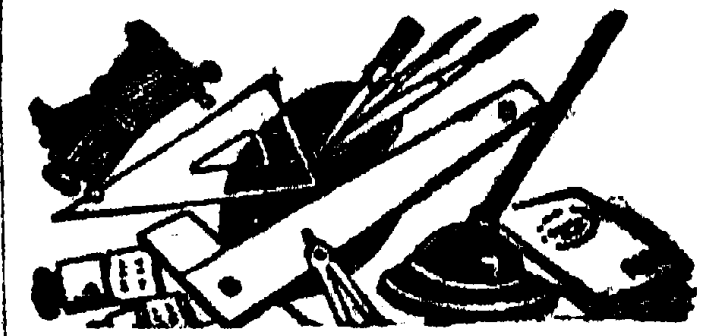
সংবাদ প্রসঙ্গ

ছাত্রসমাজের প্রসংগ :

শিক্ষাক্ষেত্রে সারাভারত জুড়ে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে তার জন্য কেবল মাত্র ছাত্রদেরই উপর ষোলআনা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে দিল্লীর উঁচু মহল আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না। সম্প্রতি বিশ্বভারতী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে নেতৃবৃন্দের ভাষণেও তার স্পষ্টোক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে যে, তাদের ভূমিকা তরুণ সমাজের চিন্তা ও কর্মধারায় কতটুকু নতুন দিক নির্দেশ করতে পেরেছে, জাতির উচ্চ চিন্তাধারাকে তারা কতখানি আদর্শানুগভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে, অথবা যুগের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির উপযোগী করে তুলেছে?......আর যাদবপুরের ভাষণে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ গজেন্দ্র গদকর বলেছেন যে, দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনে আধ্যাত্মিকতা কিম্বা মহত্বের লেশ মাত্র নেই এবং ওই জীবন কুৎসিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং ছাত্র সম্প্রদায় যখন পথে নেমে ওই পদ্ধতিরই অনুকরণ করে ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে মেতে ওঠে তখন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ছাত্র বিক্ষোভ বয়স্কদেরই আচরণের প্রতিরূপ।

মোট কথা এটা এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বয়স্ক যাঁরা, যাঁরা অভিভাবক পর্যায়ের মানুষ তাঁদের আচরণ যদি সংযত না হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ আরও অবনত হতেই থাকবে। বিশৃংখলা ক্রমেই সমাজের সর্বস্তরে সর্বকর্মে ছড়িয়ে পড়া অনিবার্য।

উড়িষ্যায় নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছেঃ বহরমপুর আর সম্বলপুরে। কিন্তু সেখানেও ছাত্ররা মন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণের সময়ে হল্লা কিছু কম করেনি।

রাঁচীতে পাঁচশো ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের অফিসের সামনে ৩ জানুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে—হেতু, মজঃফরপুরে পুলিশী গুলী চালনার প্রতিবাদ। তারপর তাদের সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের সংঘর্ষ। ইট-পাটকেলে বিনিময় থেকে পুলিশ শেষে লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সারা শহরে ত্রাসের ছায়া পড়ে। এবং ৪ জানুয়ারী থেকে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বন্ধ। ওদিকে ৪ঠা পাটনার কাছাকাছি বাড় রেলস্টেশনের ওপর বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের আক্রমণ সামলাবার জন্য পুলিশ গুলী চালিয়েছে। পাটনাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনেও ছাত্রদল হাজির হয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছে। খাগড়িয়া এবং পূর্ণিয়াতেও ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে।

আবার ৫ই জানুয়ারী পাটনার বাঁকীপুর এলাকায় হাংগামা শুরু হয়, বিহার-শরীফেও ব্যাপকভাবে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গুলী চালায়। তাতে দশজন নিহত ও ৫৪ জন আহত হয়। এর ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত শিক্ষায়তন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ খোলার বিরুদ্ধে ছাত্রদের এক সভায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, ৯ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তারা এক সভা করবে। তারা বলেছে যে, সরকার যদি পুলিশের সাহায্য নিয়ে কলেজ খোলার চেষ্টা করে তাহলে সরকারকে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে। আগামী ১৮ জানুয়ারী সারা বাংলাব্যাপী ধর্মঘটের জন্য তারা আহ্বান জানিয়েছে। আশুতোষ হলের এই সভায় ৫৫টি কলেজের ইউনিয়ন প্রতিনিধি সমবেত হয়েছিল।

এই সব দেখে-শুনে মনে হয় যে, ভারতের সনাতন নীতি 'শিষ্যাৎ পুত্রাৎ পরাজয়ম' নীতি অনুসরণ করলে হয়ত পন্ডিতের মতোই কাজ করবেন কর্তৃপক্ষ। আমরা হয়ত ভুলে যেতে বসেছি যে, ছাত্ররা আমাদেরই দেশের ছেলে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ বা সৈন্য প্রয়োগ করা নিজেদের অক্ষমতাকেই ফলাওভাবে জাহির করা।

খাদ্য পরিস্থিতি :

পশ্চিমবাংলার বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় নববর্ষের শুরু হয়েছে হ্রস্ব খাদ্য বরাদ্দ দিয়ে। সরকার আপন অক্ষমতা এমন অকপটে ইতিপূর্বে স্বীকার করেননি। অবশ্য এর ফলে নানাস্থানে বিক্ষোভও ঘটেছে। তবে মোটের ওপর অবস্থা যতটা খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল তা হয়নি। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের মানুষ আজ গম খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাও ত পেট ভরে জুটছে না। প্রকাশ্যে চোরাইভাবে আমদানী-করা চাল দ্বিগুণ দামে বিক্রী হচ্ছে। কাজটা আইনবিরুদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু যেখানে ক্ষুধার দাবি সেখানে আইনও পরাস্ত। পুলিশ দমদম জংশনে বাধা দিয়েছিল, এই চোরাই চাল আমদানীর বিরুদ্ধে। গুলীও চলেছিল। চার-পাঁচ ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। অবশ্য বিরাট রেশনিং এলাকার পক্ষে এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। অনেকের মতে, যতদিন পর্যন্ত সরকার শিল্পাঞ্চলকে পূর্ণ বরাদ্দ সরবরাহে সমর্থ না হবে ততদিন এই কৃত্রিম 'চাল—চলাচলের' বাধা প্রত্যাহার করা সরকারের উচিত। অবশ্য দমদমে ২ জানুয়ারী গুলী চলার ফলে চাল-পাচার কিছুমাত্র কমেনি। যারা ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে পারে না তারা মাছ এবং আনাজের পাঠ তুলে দিয়ে দু-টাকা কিলোগ্রাম দরের চাল কিনছে।

কোনো কোনো মহল থেকে সংবাদ আসছে যে, চালের চোরাকারবার ফলাওভাবে চলছে এবং তাতে অনেক পুলিশের লোকও প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, সামনের দু-এক সপ্তাহ ধরে চালের বরাদ্দ কিছু কিছু করে বাড়িয়ে জানুয়ারীর শেষে পূর্ণ বরাদ্দ সরবরাহে সরকার সক্ষম হবে। কিন্তু দিল্লীর ৪ জানুয়ারীর খবরে বলা হয়েছে যে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ ছাড়া নিতাকার ঘাটতি রাজ্যগুলিতে অচিরেই কেন্দ্র থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহের পরিমাণ কঠোরভাবে হ্রাস করা হবে।

সিকিম প্রসংগে :

দিল্লী ৫ জানুয়ারীর এক সংবাদে জানা গেছে যে, পাকিস্তানী এবং চীনা সংবাদপত্রগুলি একযোগে ভারত ও সিকিমের সৌহার্দপূর্ণ ঘনিষ্ঠতায় ফাটল ধরাবার জন্য প্রচার অভিযানে নেমে পড়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-কথা :

জানুয়ারীর ৪ তারিখ থেকে মিজো অঞ্চলকে বিদ্রোহমুক্ত করার জন্য 'সিকিউরিটি ফোর্স' পুর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেছে। এই অভিযানের কার্যকাল হবে দেড় মাস। মোট ৮০০০ বর্গ মাইলের আনুমানিক ৬০০০০ গ্রামবাসী এর দ্বারা উপকৃত হবে। মিজো পাহাড়ের আয়তন অবশ্য ১৬০০০ বর্গ মাইলের কাছাকাছি। শান্তিপ্রিয় মিজোবাসীদের নিরাপত্তা-বিধানই এই কর্ম-প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। মিজো পাহাড়ের ১৯৬ মাইল লম্বা প্রধান সড়কের দুই পাশ দশ-বিশ মাইলের মধ্যে শান্তিপ্রিয় মিজোবাসীদের বসবাসের জন্য নতুন গ্রাম বানানো হচ্ছে। এবং এই কাজের জন্য সরকার অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। এই সব গ্রামকে নিরাপদ করার জন্য বেড়া দিয়ে বা অন্যভাবে ঘেরা হবে। যারা এই সব গ্রামে বসতি করবে তাদের প্রাথমিক অবস্থায় বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হবে, চিকিৎসা ব্যবস্থা, ঘর তৈরীর মাল-মশলা বিনামূল্যেই দেওয়া হবে। বসতি গড়ে উঠলে চাষের জমি বিলি করা হবে, স্কুল এবং উপাসনাগার বানানো হবে।

পূর্বাঞ্চল সেনাবাহিনীর সেনাপতি লেঃ জেনারেল মানেকশ সাংবাদিক বৈঠকে (৩ জানুয়ারী) বলেন যে, বিদ্রোহীরা গত ১৯৬৬-র মার্চ সব কটি 'পোস্ট' দখল করে নেওয়ার ফলে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। কুড়ি দিনের মধ্যে সব কটি ঘাঁটিই সরকার নিজের দখলে আনে এবং অনেক নতুন পোস্ট বসায়। কিছু সংখ্যক বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাকী বিদ্রোহীরা এখন ছোট ছোট দলে

বিচ্ছিন্ন হয়ে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। গ্রামগুলি বিচ্ছিন্ন থাকার এবং পথঘাট দুর্গম হওয়ার দরুন তাদের ধন-সম্পত্তি এবং জীবন বিপন্ন। সেই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্যই এই নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৫ জানুয়ারী অবধি ১৩টি গ্রামের মোট ২৫০০ অধিবাসী নিরাপদ অঞ্চলে চলে গেছে।

শিলং-এর ৩ জানুয়ারীর এক খবরে জানা জায় যে, বিদ্রোহী মিজো নেতা জন এফ ম্যানলিয়ানাকে সম্প্রতি কাছাড় সীমান্তের কানমুনের এক গোপন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইজল থেকে ইনি আসামের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য। ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারীতে তিনি বিদ্রোহে নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে গা-ঢাকা দেন। নিরাপত্তা বাহিনী মিজো-ন্যাশনাল ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ও প্রধান প্রকাশক লিয়ান-জয়ালা এবং আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ৫ জানুয়ারী অবধি ২০ জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করেছে। হাজার তিনেক টাকা এবং দলিলপত্রও তাদের কাছে পাওয়া গেছে।

* * *

দিল্লীতে ১লা জানুয়ারী থেকে আত্মগোপনকারী নাগা নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীর নাগা সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পাঁচ তারিখে এই আলোচনা আপাততঃ শেষ হয়েছে। পরিশেষে নাগা নেতা কুখাতো সুখাই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশাই পোষণ করেন, এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন। অপর নেতা রামিয়ো অবশ্য বলেন—নাগাভূমি কোনোদিনই ভারতের অঙ্গ ছিল না, তাই ভারত থেকে তার বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে উভয় দেশের স্বার্থে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার বলে আমরা মনে করি। সেই সম্পর্কের ধরণটা কি হতে পারে তাই আমরা ভেবে-চিন্তে বার করতে চাই।

নির্বাচনী প্রসঙ্গ :

বোম্বাই-এর শিবাজী পার্কের মহতী জনসভায় ভি কে কৃষ্ণমেনন ১ জানুয়ারী ঘোষণা করেছেন যে, তিনি উত্তর বোম্বাই থেকে লোকসভায় নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবেন।

* * *

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ওই দিন দিল্লীতে বলেছেন যে, তিনি ১৯৬৭-র নির্বাচনের ফলাফল দেখে পুনরায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতৃত্বের জন্য লড়াই করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করবেন। নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি শীঘ্রই কলকাতা সফরে আসছেন।

* * *

কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের বিরুদ্ধে এক তরুণ ছাত্রনেতা ভিরুদুনগর কেন্দ্রে মাদ্রাজ বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে ডি-এম-কে দল ঘোষণা করেছেন। এই তরুণ নেতা পি শ্রীনিবাসন ১৯৬৫-র হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের সেক্রেটারী ছিলেন এবং মাদ্রাজের দাঙ্গায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

* * *

কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শাহ নওয়াজ খানের বিরুদ্ধে আচার্য কৃপালনী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভারতের বাইরের কথা :

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ বছরের প্রথম মাসিক ঘোষণায় জানিয়েছেন যে, দেশের সর্বত্র খাদ্যাভাব ঘটেছে এবং এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছে। অনাবৃষ্টির দরুন অজন্মাই এর জন্য দায়ী, উপরন্তু বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানীও নাকি ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছে।

করাচীতে ২ জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে, প্রায় সত্তরজন রাজনৈতিক নেতা অবিলম্বে বয়স্ক ভোটাধিকারের দাবিতে এক বিবৃতি দিয়েছেন। নানা সূত্রে থেকে জানা যাচ্ছে যে, সমগ্র পাকিস্তানেই আয়ুব-বিরোধী সংগঠন জোরদারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

* * *

পিকিংয়ের জাপানী সাংবাদিকদের প্রেরিত সর্বশেষ সংবাদ থেকে জানা যায় চীন বর্তমানে একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। পিকিং-এর জনজীবনে নেমে এসেছে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। নানকিং ও সাংহাই-এ মাও সমর্থক ও মাও বিরোধীদের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে। বহু শান্তিপ্রিয় চীনা নাগরিক পিকিং-এ এসে আশ্রয় নিচ্ছে। নানকিং বিরোধীদের অধিকারে চলে গেছে এবং এখানেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে বহু সম্পত্তিও বিনষ্ট হয়েছে বলে সংবাদ থেকে জানা যায়।

নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত সংবাদ থেকে আরও জানা গেছে যে, চীনের সঙ্গে গুরুতর যুদ্ধের সম্ভাবনায় সোভিয়েত সরকার জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে প্রস্তুত রাখছেন। নিউজ উইক ম্যাগাজিনে খবর বেরিয়েছে যে, চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে বলে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি রুশ সৈন্যগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

চীনে সম্প্রতি মুসলমানদের অবস্থা খুব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। চীনের রেড-গার্ডদের জেহাদ হল—'যা কিছু পুরনো ভাবধারা, অভ্যেস, সংস্কৃতি, প্রথা' তাই ধ্বংস করতে হবে। এই নয়া বৈপ্লবিক সংস্কৃতির বলি হিসেবে অনেকগুলি মসজিদ তারা ধ্বংস করেছে। চীনে বর্তমানে যে এক কোটি মুসলমান রয়েছেন তাঁদের বিবাহাদির ব্যাপারেও রেড-গার্ডদের শাসানী শুরু হয়ে গেছে বলে, পিকিং-প্রত্যাগত এক সাংবাদিকের মুখ থেকে ১ জানুয়ারী এক সংবাদ পাওয়া গেছে। তারা নাকি কোরান পাঠও নিষিদ্ধ করেছে।

* * *

মস্কোর ৪ জানুয়ারী এক খবরে প্রকাশ যে, ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটেনের মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে অগ্রহণীয় বলে ভিয়েৎনামের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রক অগ্রাহ্য করেছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, উত্তর ভিয়েৎনাম বরাবরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করে আসছেন। কোনও আলোচনা করতে হলে সর্বাগ্রে বিদেশী সেনাবাহিনী অপসারণ করতে হবে। ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার যুদ্ধের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং ভিয়েৎনামী জনগণকে তাদের নিজেদের বিষয় ঘরোয়াভাবে নিষ্পত্তির সুযোগ দিতে হবে—তাহলেই শান্তি স্থাপিত হবে। এরপর ৫ জানুয়ারী প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে ভিয়েৎনামকে শান্তির সম্ভাব্য শর্তগুলি স্পষ্টভাবে জানাবার জন্য আহ্বান করেছেন।

* * *

৩ জানুয়ারী কায়রোতে আফ্রো-এশিয় এবং ল্যাতিন আমেরিকান জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ সিবাই এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে চৈনিক প্রতিনিধি লিয়াং কেং তীব্রভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ বর্ষণ শুরু করেন।

পূর্ব ইউরোপের সাংবাদিকেরা এতে আপত্তি জানালে সম্পাদক ওই প্রতিনিধিকে থামিয়ে দেন। তারপর চীনের তরফ থেকে অন্য একটি বিবৃতি পাঠ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। তাতেও ওই একই ধরনের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিধ্বনিত হতে দেখে জনৈক বুলগেরিয় প্রতিনিধি পাঠককে ধিক্কার দিতে থাকেন। কেং তাঁকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় অভিহিত করেন। অতঃপর রুশিয় প্রতিনিধি এবং সমর্থকরা চীনকেও অনুরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন। সভায় অনেকে কেং-কে বসিয়ে দেবার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার ফলে, সাধারণ সম্পাদক সহ আরও বহু ব্যক্তি সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন।

* * *

কায়রোর এক সংবাদে জানা গেছে যে, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র আগামী মার্চের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে ২৫০০০০ টন গম কিনবেন বলে চুক্তি বদ্ধ হয়েছেন।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

—ক্রিকেটের মত খেলা পৃথিবীতে আর নেই, কি বলেন? একটা সাহিত্য-সভায় গিয়ে পড়েছিলাম, আর কেমন করে সেখান থেকে সরে পড়া যায় ভাবছিলাম—একটা সুযোগও পেয়ে গিয়েছিলাম পালিয়ে যাবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলাম। ক্রিকেটের মত খেলা পৃথিবীতে আর নেই কথাটা শুনেই এক মুহূর্তের মধ্যে থমকে দাঁড়ালাম, আর সেই আমার কাল হল। থমকে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বক্তা আমার একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, আপনি চুপ করে রইলেন যে, জবাব দিন!

এইবার বক্তাকে দেখলাম। এইমাত্র তিনি দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তারস্বরে পটলের দর নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ভদ্রলোকের নামটা জানি না, তবে শুনেছি তিনি নাকি বেজায় সাহিত্যিক। তাঁর টাক পড়েছেও বলা যায়, আবার একটা পাশ থেকে দেখলে বলা যায়, পড়েনি। তাঁর বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ নিশ্চয়, অথচ চল্লিশ বললেও তেমন দোষের হয় না। তাঁর পটলের দর নিয়ে আলোচনা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম তিনি কত খবর রাখেন! তাঁর প্রতি কথায় তারুণ্যের জয়গান যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কেবল পটল নয়—তার কিছু আগে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কবিতা সম্বন্ধেও প্রচণ্ড সুচিন্তিত একটা ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য দুবারেরও বেশি প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোকের নামটা ভুলে যাওয়াটা দুঃখের কথা, কেননা তার জন্য প্রত্যেকবারই তাঁকে ভদ্রলোক বলে উল্লেখ করতে হচ্ছে, যেটা করা আমার ঠিক অভিপ্রেত ছিল না।

ভদ্রলোকের কথায় কি জবাব দেব বুঝতে পারছিলাম না। আমি সাহিত্যিকও নই, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা আমার কোনদিনই সহ্য হয় না। তবে হ্যাঁ পটলের ব্যাপারটা [illegible] বুঝতে পারি। ক্রিকেট [illegible] আমার [illegible] আসে না, অতএব আমি বললাম, তা...তা...খেলাটা নিশ্চয়ই মন্দ নয়, নইলে অতগুলো লোক বাস পোড়ালেই বা কেন, কেনই বা পুলিশ অতগুলো লোককে পিটল। অত লোক সব ক্রিকেট ভালবাসে যখন তখন সেটার মত খেলা পৃথিবীতে নিশ্চয়ই নেই। বলে আবার সরে পড়ার চেষ্টা করলাম একবার।

ভদ্রলোক বললেন, আরে তা বলা হচ্ছে না—কথাটা হচ্ছে যে ক্রিকেটের মধ্যেকার গ্রেস, ডিভিনিটি, স্পোর্ট। এরকম আর কোন খেলায় আছে। আর কোন খেলায় লোকেরা ক্যাচ লোফে, আর কোন খেলায় কে বাউণ্ডারি মারে, ওভার বাউণ্ডারি করে। আর কোন খেলায় মিড অন, মিড অফ, সিলি মিড অন, সিলি মিড অফ থাকে। আহা, কোন খেলাতেই বা এত রেকর্ডের ছড়াছড়ি?

—রেকর্ডের ছড়াছড়ি? এ খেলায় আবার গান-বাজনা আছে নাকি? ভদ্রলোক এবারে ক্ষেপে যান প্রায়।

তিনি বেশ চেঁচিয়ে বলেন, এ সে রেকর্ড নয়। গান-বাজনার রেকর্ড নয়—দস্তুরমত খেলার রেকর্ড। ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন জানেন আপনি?

আমি বললাম, কক্ষনো না। কোনো আইন-কানুনই আমি জানি না—এমন কি একজন লোককে গলা টিপে মারলে সেটা অপরাধ হয় কিনা আমার জানা নেই। আমি আইন জানি না, এমন কি নিউটনের আইন পর্যন্ত নয়।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি লেকারের নাম শুনেছেন?

ক্রিকেটের মত খেলা পৃথিবীতে আর নেই....

—লেকার? [illegible] নামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করি।

ভদ্রলোক বলেন, লেকার ১৯৫৬ সালে একটা বিরাট রেকর্ড করেন—আই মীন, খেলার রেকর্ড।

আমি বললাম, লেকার কি খেলার রেকর্ড তৈরি করেন নাকি?

ভদ্রলোক বললেন, তৈরি করেন না, খেলার রেকর্ড তৈরি করার মনোপলি কারুর নেই। যেমন ধরুন ক্যাচ লোফা। একটি টেস্ট ম্যাচে পাঁচজন লোক আটবার ক্যাচ লুফেছেন। এখন কেউ যদি এ'দের রেকর্ড ভাঙতে পারেন...।

আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা—একটি টেস্ট ম্যাচে যদি পাঁচজন লোক আটটি করে ক্যাচ লোফেন তাহলে অত খেলোয়াড় পাওয়া যায় কোত্থেকে? এক-একটা টিমে তো এগারো-জন করে খেলোয়াড়। তবে যদি দর্শকদেরও দলের মধ্যে ধরেন...।

ভদ্রলোক বললেন, আহা, তা বলছি না আমি। একটি খেলায় নয়—এক-একটি টেস্ট ম্যাচের কথা বলছি। অর্থাৎ কিনা, পাঁচটা বিভিন্ন টেস্টে, পাঁচটি বিভিন্ন লোক প্রত্যেকে আটটি বিভিন্ন ক্যাচ লুফেছেন। এরকম করা ভয়ানক শক্ত কাজ। কেউ করব বললেই যে করতে পারবে তা নয়। ভগবান সহায় না হলে এসব হয় না।

আমি বললাম, কেন হয় না—পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা...।

ভদ্রলোক বললেন, পাঁচজনে পারলেই যে ষষ্ঠজন পারবে তার কোন মানে নেই। অন্তত ক্রিকেটে তা করার সম্ভাবনা কম। ডন ব্র্যাডম্যান, ডবলিউ জি গ্রেস, দলীপ সিংজী এ'রা বড়-বড় খেলোয়াড় হয়েও টেস্ট ম্যাচে আটটা করে ক্যাচ লুফতে পারেন নি।

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যি, ক্রিকেট জগতের মধ্যে আমি এখনো ঢুকতে পারলাম না। চেষ্টা যে করি নি তা নয়, কিন্তু কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্র-লোক বললেন, মনে হচ্ছে আপনি ক্রিকেটের ক-ও জানেন না। বলে আমাকে করুণার চোখে দেখলেন কয়েকটি মুহূর্ত। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। এক-পা এক-পা করে আমি গেটের দিকে যাচ্ছি, তখন ঐ ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ পেলাম—লোকটা একেবারেই মূর্খ মশাই, একে সাহিত্যের সভায় নেমন্তন্ন করে কে? লোকটাই বা কে—ক্রিকেটের কিছু জানে না, ছ্যাঃ......

আমার জীবন

মধু বসু

(৪৬)

আমি কলকাতায় এলাম ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। এসেই গেলাম শান্তি-নিকেতনে। সেখানে তখন পোষের মেলা হচ্ছে। সেখানে বহু পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হল। রথীদার (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে দেখা করে 'গিরিবালা'র সবাক চিত্রস্বত্বের কথা বললাম। আসল গল্পটির নাম হল 'মানভঞ্জন', কিন্তু ছবি মুক্তিলাভ করেছিল 'গিরিবালা' নামে, অবশ্য গুরু-দেবের নির্দেশে।

রথীদা আমাকে একটা চিঠি দিলেন কলকাতায় তাঁদের সলিসিটর শ্রীনৃপেন মিত্রের নামে। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং কয়েক দিনের মধ্যেই চুক্তিপত্র সই হয়ে গেল।

বন্ধুবর হেম সোম কমল দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—তাকেই আমি সংগীত-পরিচালকরূপে নির্বাচিত করে ফেললাম।

সব কাজ সেরে একদিন গেলাম কালীদার সঙ্গে দেখা করতে।

'গিরিবালা'র কণ্ট্রাক্ট সই করে বেশ মোটামুটি কিছু টাকা অগ্রিম পেয়েছিলাম। কালীদা আমাকে প্রায় ৪০০০ টাকার মত পাঠিয়েছিলেন। আমি জানতাম যে, এ-টাকা তাঁর নিজের নয়—নিশ্চয়ই কারু কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পাঠিয়েছেন। অবশ্য তাঁর এমন সব ভক্ত ছিল যাদের কাছে টাকার অঙ্কটা কিছু নয়, যত টাকাই হোক চাইলেই পাওয়া যেত। কিন্তু কালীদা নিজের জন্য কখনও এক পয়সাও চাননি কারু কাছ থেকে।

টাকাটা কালীদাকে ফেরৎ দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম : আপনার পাঠানো টাকা বোম্বায়ে আমাকে যে দুর্দিনের সময় কতখানি সাহায্য করেছে তা বলবার নয়।

তিনি মৃদু হেসে বললেন : এতে ধন্যবাদ দেবার কি আছে মধুবাবু। আপনার তখন টাকার দরকার পড়েছিল, আর আমি ভগবানের দয়ায় তা যোগাড় করে পাঠাতে পেরেছিলাম, তাই পাঠিয়েছিলাম।

আমি বললাম : কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে, আমার টাকার খুব টানাটানি যাচ্ছিল কালীদা। আমি তো কলকাতার কাউকে জানাইনি, অথচ আপনি—

তিনি আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না—বাধা দিয়ে সে-প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন : থাক, থাক, ও-সব কথা ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, হেমদা বলছিল যে, আপনি বোম্বায়ের একজন খুব বড় ফাইনান্সিয়ারের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট সই করেছেন। ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর কলকাতায় যে-ক'দিন ছিলাম, প্রায় রোজই কালীদার ওখানে যেতাম। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ-আলোচনা করে খুব ভাল লাগত। এখন যদিও টাকাকড়ির টানাটানি আর নেই, তবে মনের দিক থেকে যে শূন্যতা ছিল, তা কালীদার নানা আলো-চনার মাধ্যমে যথেষ্ট সান্ত্বনা লাভ করতাম।

কিন্তু কলকাতায় আমার বেশী দিন থাকা হল না। কমল দাশগুপ্তকে গানের সিচুয়েশানগুলো মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে

বম্বে ফিরে গেলাম। মন্মথ রায় আমার সংগে গেল।

নির্বাক 'গিরিবালা'র চিত্র-নাট্য আমার কাছেই ছিল, গুরুদেবের লেখা অনেক সংলাপও তার মধ্যে ছিল। হিন্দী দর্শকের জন্য মন্মথ কিছু কিছু অদল-বদল করল। হিন্দী চিত্রনাট্যও মোটামুটি তৈরী হয়ে গেল। বম্বে টকীজের সংগে ঠিক হল যে, ওখানেই শুটিং হবে। কয়েকজন বড় বড় শিল্পীর সংগে প্রধান ভূমিকাগুলির জন্য কথাবার্তাও হল।

ইতিমধ্যে কমল দাশগুপ্ত আমাকে চিঠি দিয়ে জানাল যে, গানের সুরগুলি সব হয়ে গেছে, তারপর আমাকে গিয়ে গানের সুর এবং প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকাদের অনুমোদন করে দিয়ে আসতে হবে।

কলকাতায় এলাম। প্লে-ব্যাক গাইয়েদের নির্বাচন করতে বেশ কয়েকদিন সময় গেল। এদিকে বম্বে টকীজ থেকে তাগাদা এল—কবে থেকে আমি ওখানে শুটিং শুরু করতে চাই, সে-সময় বম্বেতে সমস্ত স্টুডিও-গুলিতেই প্রচুর ছবি হচ্ছে—প্রত্যেকেই দিন-রাত কাজ করছে। শুধু আমার সংগে স্বর্গীয় হিমাংশু রায় ও দেবিকারাণীর সম্বন্ধ অন্যরকম ছিল বলে বম্বে টকীজের ম্যানেজার আমাকে সেই স্টুডিওতে শুটিং করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেজন্য স্বভাবতই তারা শুটিং-এর দিন জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি বম্বে টকীজের ম্যানেজারকে লিখে জানালাম, আমার বম্বে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কি জানি কেন বম্বেতে ছবি করতে আমার মন একে-বারেই চাইছিল না। কৃষ্ণার সংগে বিচ্ছেদের জন্যই হোক, কিংবা কলকাতায় বহু পুরনো বন্ধুদের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে অনিচ্ছার জন্যই হোক, কিংবা কালীদার আকর্ষণী-শক্তির জন্যই হোক—কোনটা যে আসল কারণ সেটা বলা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়—হয়ত সবগুলো মিলে। যা হোক, একদিন ঠিক করে ফেললাম যে, বম্বেতে শুটিং না করে কলকাতাতেই শুটিং করব।

আজ যখন স্থির মস্তিষ্কে এই সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করি, তখন মনে হয় জীবনে বোধহয় এতবড় ভুল আর করিনি। আর এই ভুলের কি সাংঘাতিক মাশুল দিতে হয়েছিল—এ-বিষয় বলব আগামী সংখ্যায়।

কলকাতায় 'গিরিবালা'র (হিন্দী) গানগুলি গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করালাম। কমল দাশগুপ্তের সুর এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর অর্কেস্ট্রা। 'জবাব'-এর অভাবনীয় সাফল্যের দরুন সঙ্গীত-পরিচালকদের মধ্যে কমল দাশগুপ্তের স্থান তখন সবার উপরে। আর সত্যি কথা বলতে কি 'গিরিবালা'র গানগুলির সুরও কমল অপূর্ব দিয়েছিল। প্রথমেই গান রেকর্ড করার আরও একটা কারণ ছিল—প্রোডিউ-সারকে সুরগুলো শোনাতে হবে—বোম্বেতে গিয়ে, কারণ তিনি তো কলকাতায় আসছেন না। যাই হোক, রেকর্ডগুলির নমুনা নিয়ে বম্বে চলে এলাম।

আগেই বলেছি যে কলকাতায় থাকতে স্থির করেছিলাম যে 'গিরিবালা'র শুটিং কলকাতায় করব। বম্বেতে আমার বন্ধুরা এবং হিতৈষীরা যখন একথা শুনল তখন সকলেই একবাক্যে আমাকে নিষেধ করল। এমন কি শ্রীচন্দুলাল শাহের সংগে দেখা হতে তিনিও আমাকে একদিন বললেন: এটা কি করছেন মিঃ বোস? হিন্দী ছবির শুটিং করতে যাচ্ছেন কলকাতায়? মিসেস বোসও এই ভুল করলেন। তিনি লাইসেন্স পেলেন—আমি তাঁকে বললাম বোম্বাইতে ছবি করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও চলে গেলেন কলকাতায় হিন্দী ছবি 'অজন্তা' করতে। আবার আপনিও সেই ভুল করতে যাচ্ছেন। সেখানে ভাল হিন্দী বলার শিল্পী পাবেন কোথায়? আর দেখতেই তো পাচ্ছেন এখন 'স্টারের যুগ—জানি না আপনাদের বাংলাদেশে এরকম 'স্টার প্রথা' চালু হয়েছে কিনা। মুস্কিল কি জানেন—হিন্দী ছবিতে ২।১ জন 'স্টার' না থাকলে ডিস্ট্রিবিউটার পাওয়াই শক্ত। আর বড় 'স্টার'দের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—ছোট ছোট 'স্টার'দেরও আপনি এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে শুটিং করাতে পারবেন না—কারণ তারা এখন এত ব্যস্ত সকলেই একসংগে ৩।৪ খানা ছবিতে অভিনয় করছে। আমার কথা শুনুন—আপনি মস্ত ভুল করতে যাচ্ছেন। ভাল ফাইনান্সিয়ার পেয়েছেন বম্বেতেই ছবি করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। এবং আপনার ছবিও ভাল হবে।

বম্বে টকীজের ম্যানেজারও আমায় ঠিক একই কথা বললেন: আপনি স্থির করেই ফেলেছেন যে কলকাতাতেই শুটিং করবেন, তখন আর আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, কাজটা ভাল হবে না মিঃ বোস। আপনি খুব ভুল করছেন। আপনার সংগে আমার সম্বন্ধ শুধু স্টুডিও ম্যানেজার ও প্রোডিউসারের নয়। আপনি তো জানেন মিঃ হিমাংশু রায়কে আমি কি রকম শ্রদ্ধা করতাম। আপনার সংগে মিঃ রায়ের কি সম্বন্ধ ছিল তাও আমি জানি, তিনি আপনাকে কত ভালবাসতেন। আপনাকে আমিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি—আপনার খাতিরে আমি এখন পর্যন্ত শুটিং-র তারিখ খালি রেখেছি যে মাস থেকে—মাসে ৭ দিন করে। এই তারিখগুলি পাবার জন্যে ৫।৬ জন প্রোডিউসার উদগ্রীব হয়ে আছে। এই তারিখগুলি বাতিল করলে এবছর আর বম্বে টকীজ স্টুডিওতে 'ডেট' পাওয়াই সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় অন্য কোন স্টুডিওতেই শুটিং-এর তারিখ পাবেন না। যাক, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কাল আমায় জানিয়ে দেবেন শেষ পর্যন্ত কি স্থির করলেন।

আমি তো মনে মনে স্থির করেই ফেলেছি যে বম্বেতে শুটিং করব না—কলকাতাতেই করব। এর কারণ মোটামুটি দুটো—একটা হল কৃষ্ণার সংগে বিচ্ছেদ হওয়ার জন্যে এক মুহূর্তের জন্য বোম্বাইতে আমার মন টিকছিল না—খালি মনে হচ্ছিল যে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। আর একটা কারণ হল কলকাতায় কালিদার দুর্দান্ত আকর্ষণ! যাই হোক, পরদিন আমি বম্বে টকীজের ম্যানেজারকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম আমার যে সমস্ত 'ডেট'গুলি নেওয়া ছিল তা বাতিল করে দিতে।

মিঃ ক্রাস্টো, যিনি এই প্রোডিউসারের সংগে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন, তিনি বললেন যে, চিঠি লিখে মিঃ কলকাতাওয়ালাকে সব বলার চেয়ে হায়দ্রাবাদ গিয়ে তাঁর সংগে মুখোমুখি এ বিষয়ে আলোচনা হওয়াই ভালো। যাই হোক, তিনিই তো প্রোডিউসার—আপনি কোথায় ছবি করবেন এ বিষয়ে তাঁর কথাই হবে শেষ কথা। সেই সংগে গানগুলি রেকর্ড তো আপনি সংগে এনেছেন—সেগুলোও শুনিয়ে দেবেন।

ক্রাস্টোর কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ। গেলাম হায়দ্রাবাদে।

(ক্রমশঃ)

মঞ্জু দে পরিচালিত অভিশপ্ত চম্বল-এর একটি দৃশ্যে মঞ্জু দে ও প্রদীপকুমার

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা:

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত চিঠিপত্র প্রসঙ্গে:

গেল ৩০-এ ডিসেম্বরের 'অমৃত'-এ (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা) চিঠিপত্র স্তম্ভে 'চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে' প্রকাশিত চিঠি দুখানির জন্যে পত্রলেখকদ্বয়কে প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা যে 'প্রেক্ষাগৃহ'-স্তম্ভের 'আজকের কথা'র নিয়মিত পাঠক এবং তাতে প্রকাশিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছেন, এর থেকেই অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা চলচ্চিত্রের বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে রীতিমত চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র এমনই একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পমাধ্যম যে, নিয়মিত দর্শকরূপে এর সঙ্গে নিত্য প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না রাখলে এর সম্বন্ধে কোনো কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, এর সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তাগুলো অলীক বলে প্রতিপন্ন হয়। নিউ আলিপুর থেকে যে ভদ্রলোক বাংলার বর্তমান যুগের চলচ্চিত্রকে 'মৃত্যুপথগামী' বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমার কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য ব'লে মনে হয়। ভদ্রলোক কবে থেকে বাংলা ছবি দেখা শুরু করেছেন এবং বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শক হিসেবে আজ পর্যন্ত কতগুলি ও কি কি ছবি দেখেছেন, সে সম্পর্কে কিছু জানা না থাকলেও আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বলতে পারি, 'বাংলা চলচ্চিত্রের যে ঐতিহ্য, তা ক্রমশই ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে,' তাঁর এই উক্তি নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তব অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিগত যুগে নিউ থিয়েটার্স-এর আমলে দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া ও নীতীন বসু—এই তিনজন যশস্বী পরিচালক চণ্ডীদাস, মীরাবাঈ, বিদ্যাপতি, দেবদাস, মুক্তি, অধিকার, রজতজয়ন্তী, ভাগ্যচক্র, দিদি জীবন-মরণ, দেশের মাটি প্রভৃতি বাংলা ছবি উপহার দিয়ে সে-যুগের চলচ্চিত্রামোদী দর্শকদের যে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত করেছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে সগর্বে একথাও স্বীকার করতে হয়, এ'রাই বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পকে সর্বভারতীয় মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এ'দের সৃষ্ট পুরাণভকত, রাজরাণী, মীরা, ধরতীমাতা, বিদ্যাপতি, দেওদাস, জিন্দগী, ধুপছাঁও, প্রেসিডেন্ট, দুশমন প্রভৃতি ছবির মাধ্যমে। পরবর্তী যুগেও এ'দের সোনার সংসার, কবি, রত্নদীপ, শাপমুক্তি, শেষ উত্তর, নৌকাডুবি, বিচার প্রভৃতি বাংলা ছবি এবং সীতা, লাইফ ইজ এ স্টেজ, জবাব, দীদার, গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি হিন্দী ছবি সার্থক চলচ্চিত্র-সৃষ্টিরূপে দর্শকদের উল্লসিত করে তুলেছে। এ'রা ছাড়া আর যে সব পরিচালকের বিভিন্ন ছবি বাংলার চলচ্চিত্র-জগতে ঐতিহ্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন হেমচন্দ্র চন্দ্র (মিলিওনিয়ার, মাই সিস্টার, ওয়াপস, প্রতিশ্রুতি), বিমল রায় (উদয়ের পথে, হামরাহী, অঞ্জনগড়, পহেলা আদমী), কার্তিক চট্টোপাধ্যায় (রামের সুমতি, মহাপ্রস্থানের পথে, নীলাচলে মহাপ্রভু), হেমেন গুপ্ত (ভুলি নাই, '৪২), সুশীল মজুমদার (রিক্তা, ভাঙ্গাগড়া), নীরেন লাহিড়ী (ভাবীকাল), নরেশচন্দ্র মিত্র (কঙ্কাল, স্বয়ংসিদ্ধা), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (বন্দী, শহর থেকে দূরে, অভিনয় নয়, মানে-না-মানা), মধু বসু (আলিবাবা, অভিনয়, শেষের কবিতা, মাইকেল মধুসূদন), পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (পরিণীতা, অরক্ষণীয়া, প্রিয়তমা, নিষ্কৃতি) প্রভৃতি।

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রজগতের বিগত যুগে সৃষ্ট ঐতিহ্য যে বর্তমানে ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে, একথা বলি কোন যুক্তি-বলে? ইতিহাস যে অন্য কথা বলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় আজ বিশ্ববন্দিত। তাঁর অপু-চিত্রত্রয়ী (পথের পাঁচালী, অপরাজিত এবং অপুর সংসার) সারা জগতের প্রশংসাধন্য। তিনিই ভারতকে বিশ্বের চলচ্চিত্র-দরবারের সামনের পংক্তিতে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পরশ পাথর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অভিযান, চারুলতা, নায়ক প্রভৃতি ছবি সার্থক শিল্প-সৃষ্টিরূপে চিহ্নিত। 'নায়ক'-এর মতো বাস্তব ছবি বাংলাদেশের বিগত যুগে কটি নির্মিত হয়েছে? 'চারুলতা'য় চলচ্চিত্রের কলাকৌশল যে নিখুঁত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তার তুলনা বিগত যুগে কেন, এ-যুগেরও কটা ছবিতে মেলে? সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে ক'জন সার্থক-নামা পরিচালকের দর্শন আমরা পেয়েছি, তাঁদের অবদানই কি কম? তপন সিংহের 'অতিথি'র মতো একখানিও ছবি কি আমরা বিগত যুগে দেখতে পেয়েছি? তাঁর কাবুলীওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ, লৌহকপাট প্রভৃতি ছবি কি আমাদের কম আনন্দ দিয়েছে? ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখা, মেঘে-ঢাকা তারা, অযান্ত্রিক, মৃণাল সেনের বাইশে শ্রাবণ, অসিত সেনের চলাচল, জীবনতৃষ্ণা, রাজেন তরফদারের গঙ্গা, অগ্রগামীর ডাক-হরকরা, হেড মাস্টার, বিজয় বসুর ভগিনী নিবেদিতা, রাজা রামমোহন, সুধীর মুখোপাধ্যায়ের দাদাঠাকুর প্রভৃতি ছবি কি বাংলার চলচ্চিত্রজগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে না? বাংলা চলচ্চিত্রজগতের 'অভাবনীয় অবনতি' তিনি দেখলেন কোথায়? বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক দিয়েও আজ যে বহুমুখিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা বিগতযুগে প্রায় অজ্ঞাত ছিল বললেই হয়। আজ 'হাটে-বাজারে', 'আকাশ ছোঁওয়া', 'বালিকা বধূ', 'বাঘিনী', 'চিড়িয়াখানা', 'গোপী গায়েন বাঘা বায়েন' প্রভৃতি কাহিনীকে চিত্রায়িত করতে আমাদের পরিচালকরা সোৎসাহে এগিয়ে এসেছেন। বিগত যুগের কোনো পরিচালক এসব কাহিনীর চিত্ররূপ দেবার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারতেন না।

পত্রলেখক বলেছেন, 'পরিচালকের মনোভাব যদি পবিত্র না হয়, তবে নির্মীয়মান ছবিও হয়ে উঠবে কদাকার ও আদর্শভ্রষ্ট।......সরকারকে আহ্বান জানাব—তিনি (?) যেন প্রথমেই ছায়াছবির চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।' পবিত্র মনোভাব অর্থে তিনি কি বলতে চাইছেন, পরিচালককে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে সংযতেন্দ্রিয়

যুধিষ্ঠির হতে হবে? লেখক, কবি, নর্তক, গায়ক, অভিনেতা প্রভৃতির মতো পরিচালকও শিল্পী। তিনি তাঁর বিশেষ শিল্প-মাধ্যমের রূপরীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকবেন এবং শিল্প-সৃষ্টিতে অনন্যমনা হবেন, এইটুকুই লোকে আশা করে। কিন্তু তিনি পরমহংস দেব বা শুকদেব গোস্বামী হবেন, কোনো শিল্পীর কাছে এ দাবি করা শুধু অযৌক্তিক নয়, রীতিমত হাস্যকর। বর্তমান যুগের ছবিকে পত্রলেখক 'কদাকার ও আদর্শভ্রষ্ট' হতে দেখলেন কবে ও কোথায়? তার চরিত্রহানি ঘটেছে, এর প্রমাণ তিনি কোথায় পেলেন? ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছেঃ একটি কুকুরকে মন্দ বলে জাহির কর এবং তাকে ফাঁসিতে লটকে দাও। বর্তমানের বাংলা ছবি সম্পর্কে নিউ আলিপুরের পত্রলেখক সমান কাজই করেছেন।

পাটনাস্থিত দ্বিতীয় পত্রলেখকের মত কিন্তু প্রথমজন থেকে আশ্চর্যভাবে বিপরীত। তিনি বলেছেন, 'বাংলা সিনেমার প্রযোজকরা বা পরিচালকেরা তাই (অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করেন, পর্দার উপর নিজেদের বিদ্যা জাহির করেন আর বই না চললে পর দর্শকদের দোষ দেন, যে তাদের কোন টেস্ট নেই স্ট্যাণ্ডার্ড নেই।' তাঁর মতে 'প্রযোজকদের দৃষ্টি রাখতে হবে 'মনোরঞ্জনের' দিকে। দর্শক রূপালী পর্দার উপর কিছুটা আনন্যাচরোল খোঁজে, সময় কাটাতে চায়। নিজের সমাজের দীনতা, ক্লিষ্টতা এসবের প্রতিফলন দেখতে চায় না। আর ঠিক এই জন্যেই সারা পৃথিবীতে আজ স্টান্ট ফ্লিম, অ্যাকশন ফিল্ম—এগুলি ক্রমেই জনপ্রিয় হতে চলেছে।' স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় পত্রলেখকের মতে বাংলা ছবি জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী মনোরঞ্জনের কাজ করতে পারছে না, দর্শকদের মান থেকে উচ্চতর মানের হচ্ছে এবং তার কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, বাংলা ছবির পরিচালকরা দর্শকদের চিত্তবিনোদনের দিকে নজর না রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছলে ছবি তৈরীর ব্যাপারে নিজেদের বিদ্যে জাহির করতে ব্যস্ত। এদিক থেকে তিনি হিন্দী ছবিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে বলেছেন, 'নৈতিক দিক দিয়ে আলোচনা করতে গেলে ঐগুলির মান খুবই নীচু, তবে ব্যবসায়িক সাফল্যের দিক থেকে মান খুব উঁচু।' এই ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণ দর্শিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভারত যেভাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হয়েছে বা হচ্ছে, সেই অনুসারে......শ্রমিকদেরও সংখ্যা বেড়েছে। তাই তারা যে ছবি দেখতে চায় তার মধ্যে মনোরঞ্জক কিছু থাকা দরকার নিশ্চয়ই।......কোন শ্রমিকের কাছ থেকে আশা করা যাবে না যে সে সারাদিন খেটে পর্দার উপর চলচ্চিত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিচার করতে যাবে।' না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচার করতে যাওয়া কোনো কল-কারখানার শ্রমিকেরই সাধ্যয়ত্ত নয়। কিন্তু তাই বলে সাধারণ হিন্দী ছবিতে যে উদ্ভট কাহিনীর অবতারণা করা হয়, ফর্মুলা অনুযায়ী হিরো ও ভীলেনের মধ্যে ঘুষি, ছোরা এবং পিস্তলের আদান-প্রদান করানো হয়; যেভাবে নায়ক-নায়িকার প্রথম পরিচিতি ঘটানো হয় এবং উদ্দাম নাচ-গানের ভিতর দিয়ে প্রেমের দৃশ্য দেখানো হয়, তাতে স্বভাবতই ছবিগুলির প্রযোজক ও পরিচালকদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। অধিকাংশ দর্শকই নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের দুঃখদায়ক রূঢ় বাস্তবতাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভোলবার বাসনাতেই যে ছবি দেখতে যান, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—তাদের সকলেরই 'এসকেপিস্ট' মনোবৃত্তি। কিন্তু তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাই বলে বাস্তবের নামে উদ্ভট কিছু করতে হবে, যা-হয়না-তাই দেখাতে হবে, এই বা কি কথা? ছবিতে নাচ-গান থাকা অন্যায়, একথা কেউই বলবেন না; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই চাইবেন তাদের সুষ্ঠু প্রয়োগ। ক্ষুধা না থাকলে যেমন অত্যন্ত সুখাদ্যেও লোকের রুচি হয় না, ঠিক তেমনই ছবির ভিতর অপ্রয়োজনে যত্রতত্র নাচ-গান থাকলে দর্শকের মন বিরূপ হতে বাধ্য। তার ওপর যদি ঐ সঙ্গে যৌন আবেদনের আত্যন্তিক অপপ্রয়োগ থাকে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। হিন্দী ছবির তুলনায় বাংলা ছবি নিশ্চয়ই কিছুটা ক্ষীণপ্রভ; এতে হাস্যলাস্য ও জাঁক-জমকের পরিমাণ কম। কিন্তু শিল্পসৃষ্টি হিসেবে কৃতী পরিচালকদের বাংলা ছবি যে অধিকাংশ হিন্দী ছবি থেকে হাজার গুণে ভালো, একথা অনস্বীকার্য। এবং ওরই সঙ্গে বাঙালী দর্শকের রুচিও যে হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শক থেকে বহুল পরিমাণে উন্নত, একথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হবার যোগ্য।

চিত্র-সমালোচনা

দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা (বাংলা): পি এ ফিল্মস-এর নিবেদন; ৩,৬৫৭·৬০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ; পরিচালনাঃ মানু সেন; চিত্রনাট্যঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; সঙ্গীত-পরিচালনা : অনিল বাগচী; আবহ-সঙ্গীত-পরিচালনা : কালিপদ সেন; গীতরচনা : প্রণব রায়; চিত্রগ্রহণঃ বিভূতি চক্রবর্তী; শব্দানুলেখনঃ অনিল দাশগুপ্ত; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : সুনীল সরকার; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অনীত মুখোপাধ্যায়; নেপথ্যকণ্ঠসঙ্গীত : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য; রূপায়ণঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মহেন্দ্র গুপ্ত, গঙ্গাপদ বসু, শিশির মিত্র, দিলীপ রায়, প্রবীরকুমার, রাজা মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানি, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ননী মজুমদার, ভারতী দেবী, যমুনা সিংহ, শর্মিতা বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী, গীতা দে, রেণুকা রায়, রত্না ঘোষাল, কৃষ্ণা, প্রফুল্লবালা, বেলা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। মিতালী ফিল্মস প্রাঃ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ৬ই জানুয়ারী থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

পুরাণে কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞে স্বামী-নিন্দা শ্রবণে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগের পরে উন্মত্ত প্রমথেশ যখন সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বিভ্রান্ত চিত্তে ভারতময় প্রলয় নৃত্য করে বেড়াচ্ছিলেন, তখন পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দিয়ে সতীদেহকে ছিন্নভিন্ন
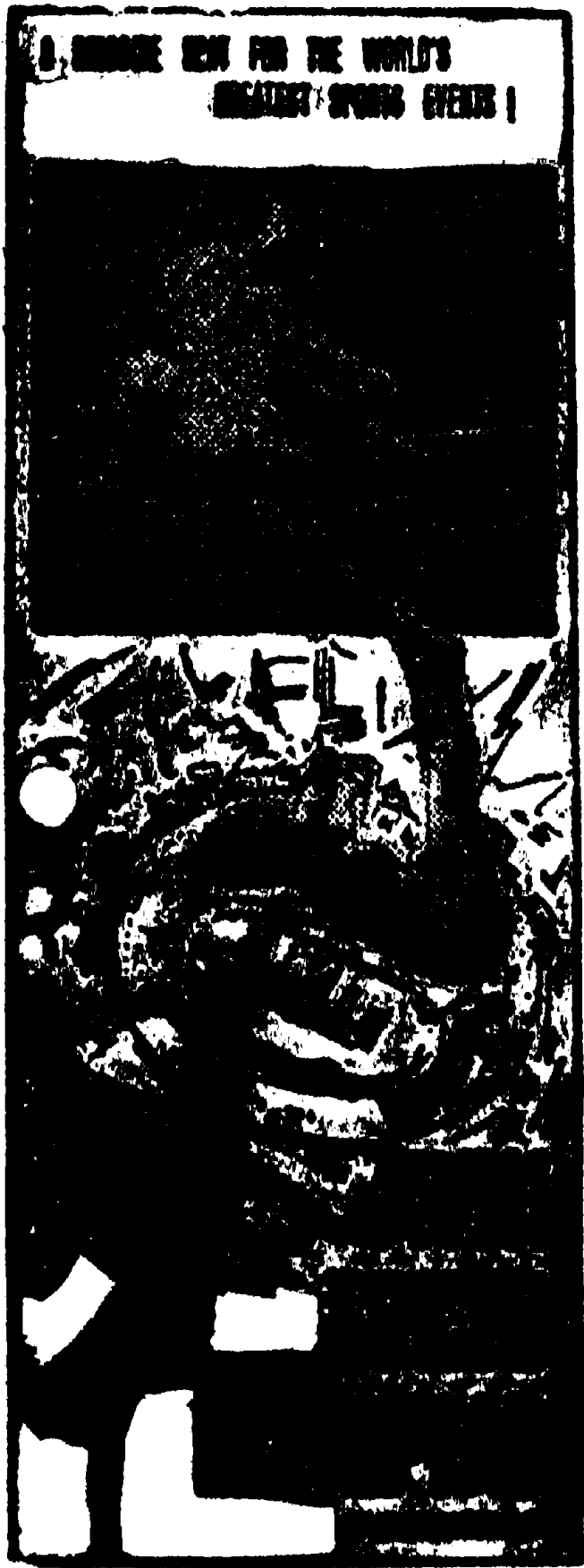
'দেবীতীর্থ' কামরূপ কামাখ্যা চিত্রে
বেবী গুপ্তা

করেন; সতীদেহ একান্ন অংশে বিভক্ত হয়ে প্রাচীন ভারতের যে একান্নটি স্থানে পতিত হয়, তার প্রত্যেকটিই ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে এক-একটি পীঠস্থান বলে পূজিত। কামরূপ কামাখ্যাও এইরূপ একটি পীঠস্থান—এখানে দেবীর যোনি পতিত হয়েছিল।—কামরূপ কামাখ্যা সম্পর্কে আর একটি পৌরাণিক কাহিনী হচ্ছে এই যে, শিব যখন সতীহারা হবার পরে তপস্যামগ্ন, তখন হিমালয়-দুহিতা গৌরীর বিবাহকে সম্ভব করবার জন্যে মদন ও রতি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করেন। এতে শিব বিরক্ত হয়ে রোষকষায়িত নেত্রে মদনকে দগ্ধ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রতির বিলাপে দয়াপরবশ হয়ে তিনি মদনকে পুনর্জীবিত করেন এই পর্বতের উপরেই। মদনের অপর নাম কাম বলেই এই ভূখণ্ডের নাম কামরূপ বা কামাখ্যা।

কিন্তু কামরূপ কামাখ্যা সম্পর্কে আরও যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত। এবং এই ঐতিহাসিক কাহিনী কামাখ্যাদেবীর মন্দির নির্মাণকে উপলক্ষ করেই জন্মলাভ করেছে। কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহের ভক্তিপরায়ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবসিংহ দেবীর প্রত্যাদেশ পেয়ে জ্যেষ্ঠের আপত্তি সত্ত্বেও কেমনভাবে শত বাধা-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে দেবীর মন্দির নির্মাণকার্যে সফলকাম হয়েছিলেন, প্রধানত সেই কাহিনীই চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে আলোচ্য ছবির মাধ্যমে। ভক্তপ্রাণ শিবসিংহকে দেবীর দর্শনদান এবং অবিশ্বাসী বিশ্বসিংহের সঙ্গে শিবসিংহের মতানৈক্য ছবির অর্ধেক স্থান জুড়ে থাকলেও বাকী অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে পরম সাধক কেন্দুকেলাইয়ের দেবীর প্রতি অবিচলিত ভক্তির কাহিনী ও তাঁর বিরুদ্ধে কুটচক্রী রামেশ্বরের কার্যকলাপ। এর ফলে 'দেবীতীর্থ কামরূপ কামাখ্যা' হয়ে উঠেছে কিছুটা ঐতিহাসিক এবং কিছুটা ভক্তিমূলক। প্রচলিত কিংবদন্তীর সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যে চিত্রনাট্য গড়ে তুলেছেন, তাকে যথাযথ চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক মানু সেন।

এ ছবিতে অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ভক্তসাধক কেন্দুকেলাই চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অভিনয়গুণে; তাঁর সৃষ্ট রামকৃষ্ণ চরিত্রের সকল আকুতি তিনি এই চরিত্রটির মধ্যে সফলভাবে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর পরেই ভক্তপ্রাণ শিবসিংহের ভূমিকায় অসিতবরণের দরদী অভিনয় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্বসিংহের ভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্তের অভিনয় কিছুটা মন্দের ভালো। কুটিল রামেশ্বর চরিত্রটিকে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন গঙ্গাপদ বসু। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ রূপে দিলীপ রায় অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। নরকাসুরের ভূমিকায় কমল মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ অত্যন্ত অল্প। তবে ওরই মধ্যে গীতা দে (সন্তানহারা জননী), ভারতী দেবী (বিশ্বসিংহের স্ত্রী), মমুনা সিংহ (শিবসিংহের স্ত্রী করুণা), রেণুকা রায় (রামেশ্বরের স্ত্রী), প্রফুল্লবালা (বৃদ্ধারূপে দেবী), অমিতা বিশ্বাস (মনোহারিণী রূপে দেবী), বনানী চৌধুরী (নরকাসুরের স্ত্রী) প্রভৃতি নিজ নিজ ভূমিকায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অপরাপর ভূমিকায় শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, রাজা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে যে সব চাতুর্য (ট্রিক)

সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী চিত্র 'সগাই'-র একটি রোমান্টিক মুহূর্তে বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী

দেখানো হয়েছে তা ছবির আকর্ষণকে অনেকখানি বর্ধিত করবে। ছবির তিনখানি গানই ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গেয়েছেন অনিল বাগচী-সৃষ্ট সুরে; কাজেই সেগুলি যে সুখশ্রাব্য, একথা বলাই বাহুল্য। আবহ-সঙ্গীতও ছবিটির ঘটনানুযায়ী। বেশভূষা ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে বলে বোধ হয় না।

ভক্তপ্রাণ বাঙ্গালী দর্শকের কাছে কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য সংবলিত 'দেবী-তীর্থ কামরূপ কামাখ্যা' চিত্রটি নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে।

—নান্দীকর

কলকাতা

'দুরন্ত চড়াই' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

ইতিপূর্বে গিরিডি অঞ্চলে ক্যাপিটল ফিল্মসের 'দুরন্ত চড়াই' চিত্রের বহির্দৃশ্য গৃহীত হবার পর সম্প্রতি ম্যাসাঞ্জোরে দ্বিতীয় দফায় ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণ করলেন পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সমরেশ বসু রচিত এ কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, দিলীপ রায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পদ্মা দেবী, জহর রায়, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগত সোমেন চক্রবর্তী। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র।

'প্রথম বসন্ত' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

পরিচালক নির্মল মিত্র প্রতিভা বসু রচিত 'প্রথম বসন্ত' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ করলেন ঘাটশীলা অঞ্চলে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল ও বিকাশ রায়। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

উত্তমকুমার-তনুজা অভিনীত 'এন্টনী ফিরিঙ্গী'

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'এন্টনী ফিরিঙ্গী' চিত্রের অন্তর্দৃশ্য সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হয়। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তম-কুমার। নিরুপমা চরিত্রে রূপদান করছেন বম্বের অভিনেত্রী তনুজা। অনিল বাগচী সুরকৃত ছবিটির পরিবেশক ছায়ালোক।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'প্রতিদান'

পরিচালক অজিত গাঙ্গুলী তাঁর স্বরচিত চিত্র-কাহিনী 'প্রতিদান'র প্রথম চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, অনুপকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় ও রুমা গুহঠাকুরতা। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র '৮০-তে আসিও না'

শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত রুদ্রাণী ফিল্মসের '৮০-তে আসিও না' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। গৌর শী রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রাবলীতে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অসিতবরণ, কমল মিত্র, তরুণকুমার, রুমা গুহঠাকুরতা, অনুভা গুপ্তা ও গীতা দে। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

বোম্বাই

সুকদেব পরিচালিত রঙীন ছবি 'মাই লাভ'

ইস্ট আফ্রিকায় গৃহীত প্রথম হিন্দী ছবি 'মাই লাভ'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পূর্ণ করছেন পরিচালক এস সুকদেব। ছবির উল্লেখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শশী-কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, রাজেন্দ্রনাথ, আজরা, লক্ষ্মীছায়া, ইফতেকর, মদনপুরী, জয়ন্ত ও নিরুপা রায়। ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়।

'এ্যারাউন্ড দি ওয়ার্লড' চিত্রের বহির্দৃশ্যগ্রহণ

প্রযোজক-পরিচালক পাচ্ছির রঙীন ছবি 'এ্যারাউন্ড দি ওয়ার্লড' চিত্রের বহির্দৃশ্য-

গ্রহণের জন্য গত ১০ জানুয়ারী ছবির নায়ক-নায়িকা রাজকাপুর-রাজশ্রী মস্কো যাত্রা করেছেন। এখানে সপ্তাহব্যাপী বহি-দৃশ্য গৃহীত হবার পর ছবিটির সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে। পরিচালক পাচ্ছি এর পর ইউরোপ যাত্রা করবেন ছবির রঙীন প্রিন্টের জন্য। আগামী এপ্রিল মাসে ছবিটি মুক্তি-লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

নতুন রঙীন ছবি 'নৈনা'

পরিচালক কে মিশ্রর নতুন রঙীন ছবিটির নাম 'নৈনা।' খাজা আহম্মদ আব্বাস রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন শশীকাপুর, রাজশ্রী, ওমপ্রকাশ ও ডেভিড। এ ছাড়া দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে ফরাসীর মার্টিনা লুইসা এবং রোমের এ্যাঞ্জোলিনা সাউন্ডেজ্রলী শিল্পীদ্বয়কে এ চিত্রে দেখা যাবে। এ ছবির বেশীর ভাগ দৃশ্য ইউরোপে গৃহীত হবে। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।।

'পরিবার' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু

প্রযোজক-পরিচালক পি কাশ্যপ'র নতুন ছবি 'পরিবার'র অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। অঞ্জনা রাওয়াল রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করছেন জীতেন্দ্র, নন্দা, রাজীন্দ্রনাথ, ওমপ্রকাশ, সুলোচনা, মাধবী, মনমোহন ও মদনপুরী। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবিটির সংগীত-পরিচালক।

স্টুডিও থেকে বলছি

ঐ যার নাম চিড়িয়াখানা তারই নাম গোলাপ কলোনী। আজব জায়গা। আজব মানুষ। অমন চিড়িয়াখানা আলিপুরেও নেই। শিয়ালদা থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে এই গোলাপ কলোনী। তা যাবার আর কষ্ট কি? স্টেশন-প্রাঙ্গণে জীর্ণকায় ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে মুস্কিল মিঞা বসে আছে। এই চিড়িয়া-খানার রথে চড়ে বসুন, গড়গড় করে চলে যাবেন।

ফুলের বাগান থেকেই এই গোলাপ কলোনীর উৎপত্তি। মালিক নিশানাথ সেন। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। আকৃতি মধ্যম। চাঁচা-ছোলা ধারালো মুখ। ছিমছাম চেহারা। সেসন জজ থেকে অবসর নিয়ে গত দশ বছর হল এই গোলাপ কলোনীতে ফুল, শাক-সব্জি, ডেরি ফার্মের ব্যবসা করছেন।

গোলাপ কলোনীতে যারা কাজ করে, তারা সবাই বিচিত্র ধরনের লোক। কাউকে ঠিক সহজ সাধারণ মানুষ বলা যায় না। স্বাভাবিক পথে জীবিকা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই পরিশ্রমের বিনিময়ে সবাই এখানে অন্ন জোগাবার এবং মাথা গোঁজবার স্থান পেয়েছে। অনেকটা মঠের মত ব্যবস্থা।

এই বিচিত্র মানুষের মধ্যে দুরকমের লোক আছে। একদল আছে যাদের শরীরে কোন না কোন খুঁতের জন্য স্বাভাবিকভাবে জীবনধারণ করতে পারে না। অন্য দলের অতীত জীবনে কলঙ্কের দাগ আছে। প্রথম দলের মধ্যে রয়েছে পানু গোপাল। স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু কানে ভাল শুনতে পায় না। গো-শালার ভার এর ওপর।

দাগী দলের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম, তিনি হলেন ভুজঙ্গধর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক। ডাক্তার ছিলেন। সার্জারীতে অসা-ধারণ হাত ছিল। কিন্তু দুর্নৈতিক কাজের জন্য তাঁর ডাক্তারি লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। সেই থেকে তিনি কলোনীর ডাক্তার-খানার কম্পাউন্ডার হয়ে আছেন।

তারপর বনলক্ষ্মী। এই কলোনীর দর্জিখানার পরিচালিকা। বনলক্ষ্মী রূপসী না হলেও তার মুখে একটা কাঁচ স্নিগ্ধতা আছে। বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। নিটোল স্বাস্থ্য। এক লম্পট ওকে পাড়াগাঁ থেকে ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে। তারপর ফেলে পালায়। গাঁয়ে ফিরে যাবার মুখ নেই বলে এই কলোনীতে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছে।

কলোনীর কেমিস্ট হলেন প্রফেসার নেপাল গুপ্ত। এক কলেজের কেমেস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। ঘটনাচক্রে ল্যাবরেটরীর এক বিস্ফোরণে তিনি গুরুতর আহত হন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে বোমা তৈরীর অভিযোগে পুলিশে দিলেন। বেশ কয়েক বছর জেল খেটে নেপালবাবু আর কোথাও চাকরি না পেয়ে তাঁর মেয়ে মুকুলকে নিয়ে এখানে হাজির হলেন। মুকুল রন্ধনশালার কর্ত্রী। বেশ কাজের মেয়ে। পিতার নৈষ্কর্ম্য সে নিজের পরিশ্রম দিয়ে পুরিয়ে দেয়।

এখানকার প্রবীণ ব্যক্তিটির নাম ব্রজদাস। তিনি গো-বদ্যির কাজ করেন। আগে জজ-সেরেস্তার কেরানী ছিলেন। নিশানাথবাবুর অধীনেই কাজ করতেন। কিন্তু এক গুরুতর দুষ্কার্যের জন্য তাঁর জেল হয়। শেষে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা এখানে চলে আসেন।

নীচু জাতের মানুষ মুস্কিল মিঞা। আগে মোটর ড্রাইভার ছিল। কিন্তু বারবার র‍্যাশ-ড্রাইভিংয়ের জন্য তার লাইসেন্স চিরদিনের জন্য বাতিল হয়ে যাওয়ায় তার স্ত্রী নজরবিবিকে নিয়ে সে এখানে আছে। মুস্কিল এখন ঘোড়ার গাড়ির চালক। আর তার স্ত্রী কলোনীর হাঁস-মুরগীর ইনচার্জ।

আর আছেন রসিকবাবু। মুনিসিপ্যাল মার্কেটের স্টল ইন-চার্জ। তিনিও কলোনীর বাসিন্দা। রোজ দুবেলা এখান থেকে কলকাতায় যাতায়াত করেন। আগে কটন মিলের মিস্ত্রি ছিলেন। কিন্তু কারখানার দুর্ঘটনায় তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো নষ্ট হয়। আর কোথাও কাজ জোটাতে না পেরে তিনি দিব্যি এখানে বহাল তবিয়তে আছেন।

এছাড়া এখানে নিশানাথবাবুর আপন জন বলতে আছেন স্ত্রী দময়ন্তী দেবী এবং ভাইপো বিজয়।

এই বিচিত্র মানুষের চিড়িয়াখানার কলোনীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় তেমন কোন নতুনত্ব নেই। দিনের পর দিন একই কাজের পুনরাভিনয় হয়। ফুল ফোটে, শাক-সবজি গজায়, মুরগী ডিম পাড়ে, দুধ থেকে ঘি-মাখন তৈরী হয়। তারপর কলোনীর ঘোড়া-টানা ভ্যানে রোজ সকালে মাল স্টেশনে যায়। সেখান থেকে শহরে। এইভাবেই ব্যবসার চাকা ঘোরে।

বেশ চলছিল। হঠাৎ মাস ছয়েক হল এই গোলাপ কলোনীতে একটা ভৌতিক কাণ্ড শুরু হল। প্রায় রাতে কে যেন মোটর-পার্টসের এক-একটা টুকরো কলোনীতে ফেলতে শুরু করে। কিন্তু কার যে এ কীর্তি তা ধরা গেল না। শেষ পর্যন্ত এই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য নিশানাথবাবু প্রাইভেট ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সীর শরণাপন্ন হলেন। ব্যোমকেশবাবু এবং তাঁর সহকারী সাহিত্যিক বন্ধু অজিতবাবু এই রহস্যের জাল উন্মোচন করার জন্য নিযুক্ত হলেন।

নানান রোমাঞ্চিত ঘটনার মধ্যে রহস্যের কিনারা খুঁজে বার করার আগেই গোলাপ কলোনীতে দু'-দুটো খুন হয়ে গেল। প্রথমে পানুগোপাল এবং পরে নিশানাথবাবু খুন হলেন। কিন্তু খুবই রহস্যজনক মৃত্যু। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্যোমকেশ বক্সী এই রহস্যময়ী খুনীকে আবিষ্কার করলেন। চলচ্চিত্রের বিশ্বকোষ রমেন মল্লিক এবং পুলিশ ইনসপেকটার মিঃ বরাটের সাহায্যে। এই ভৌতিক এবং হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে দুজন আসামী ধরা পড়ল, তারা এই কলোনীরই বাসিন্দা।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ব্যোমকেশ পর্বের এই রহস্য কাহিনীটির নাম 'চিড়িয়াখানা।' বর্তমানে এটি চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন নায়ক প্রোডাকসন্সের তরফ থেকে শ্রীসত্যজিৎ রায়। এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা এবং সুর সৃষ্টি করেছেন শ্রীরায়। ছবি-মুক্তির পর হত্যাকাণ্ডের দুই আসামী কে তা জানতে পারবেন। অন্তর্দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে। খুন, জখম এবং মেলিং-এর কেন্দ্রস্থল গোলাপ কলোনীর রোমাঞ্চিত বহির্দৃশ্যটি গৃহীত হলেই ছবির সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে। কৌতূহলদীপ্ত প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন, ব্যোমকেশ বক্সী—উত্তমকুমার, অজিতবাবু—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, নিশানাথবাবু—সুশীল মজুমদার, দময়ন্তী দেবী—কণিকা মজুমদার, বিজয়—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভুজঙ্গধর—শ্যামল ঘোষাল, বনলক্ষ্মী—গীতালি রায়, ব্রজদাস—বঙ্কিম ঘোষ, মুস্কিল মিঞা—নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নজরবিবি—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রসিক—কালীপদ চক্রবর্তী, মুকুল—সুবীরা রায়, পানুগোলাপ—চিন্ময় রায় ও রমেন মল্লিক—জহর গাঙ্গুলী।

ছবিটির পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন বলাকা পিকচার্স।

মঞ্চাভিনয়

আনন্দলোক

নিবিড় নাট্যানুশীলনে যখন কলকাতার সৌখিন আসরে আর একটি শিল্পীগোষ্ঠীর নাম সম্প্রতি সংযোজিত হোল। নাম 'আনন্দলোক।' নাট্য প্রযোজনার মহত্তর শিল্পচিন্তা আর নাট্যচর্চায় জীবনের ধ্রুব-সত্যের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করাই যে এই নবাগত শিল্পীদের একমাত্র উদ্দেশ্য তা তাদের সাম্প্রতিক নাট্য প্রযোজনা 'ব্যাপিকা বিদায়' আর 'শতাব্দীর স্বপ্ন' থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বসুশ্রী সিনেমা' হলে এই নাটকের অভিনয় দেখে মনে হয়েছে বাংলা-দেশে যথার্থ নাট্যচর্চার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

রসরাজের 'ব্যাপিকা বিদায়' বাংলা-দেশের একটি অতি পরিচিত প্রহসন। তৎকালীন যুগের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করে এই প্রহসনের যাত্রা শুরু। আনন্দলোকে'র শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বিদ্রূপের নেপথ্যে রসের অফুরন্ত ধারা দুর্বার হয়ে উঠেছে। নাটকীয় গতিকে অটুট রাখার জন্য সংগীতের প্রয়োগ শিল্পসম্মত হয়েছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় বঙ্কিম ঘোষের কথা। ঘনশ্যাম চরিত্রকে তিনি এমন সহজভাবে মঞ্চে রূপ দিয়েছেন যা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। তরুণ মুখোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, 'পুষ্প-বরণ' ও জটিলেশর চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেন। কালিন্দী সেন, অনুরাধা দাশগুপ্ত, বীণা দাস, প্রতিমা চক্রবর্তী, মীরা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রাখার মতো। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন সমীর সেনগুপ্ত, পুষ্পনারায়ণ চক্রবর্তী, দুলাল আঢ্য, শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়।

'শতাব্দীর স্বপ্ন' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা নাটক। চারদিকের হিংসার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই এই নাটকের সুগভীর বক্তব্য। এই নাটকের পরিবেশনে গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ আধুনিক অভিনয় ভঙ্গিমাকেই অবলম্বন করেছেন সুন্দরভাবে। ইতিহাসের অনুভব আর নাটকের অশান্ত-গতি দুই-ই মিলেছে এর সঙ্গে সমান তালে। এই নাটকের কৃতী শিল্পীরা হোলেন ভবরূপ ভট্টাচার্য, সুদর্শন বসু, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মুখোপাধ্যায়, প্রলয়-শংকর রায়চৌধুরী, বারীন লাহিড়ী, শ্যামসুন্দর মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মুখোপাধ্যায়।

শৌভিক

সম্প্রতি 'প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে' কিরণ মৈত্রের 'নাম নেই' ও জগমোহন মজুমদারের 'করুণা কোরনা' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন শৌভিক নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। সামগ্রিক নাট্য প্রযোজনায় পরিচ্ছন্ন রুচির চিহ্ন অটুট ছিল। দুটি নাটকের কৃতী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শিবাজী সেনগুপ্ত, কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, তপন ঘোষ, হারাধন দে, মীরা

বোস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শঙ্কর দে, অমর পাল, বিপুল সান্যাল, রতন মজুমদার, সমর বোস। শিবাজী সেনগুপ্তের নাট্য-নির্দেশনায় উন্নত মানের পরিচয় মেলে।

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

বন্ধু সংঘের পরিচালনায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ১২১তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে জয়নগর মজিলপুর বাসন্তী নাট্য-মন্দিরে 'রূপ ও অরূপ' মঞ্চে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে একাঙ্ক নাটক প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিশদ বিবরণের জন্য সাংস্কৃতিক বিভাগ, বন্ধু সংঘ, জয়-নগর, মজিলপুর, ২৪ পরগণা এই ঠিকানায় ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

সারা বাঙলা নাট্য প্রতিযোগিতা :

থিয়েটার সেণ্টার (কলিকাতা) কর্তৃক আয়োজিত সারা বাঙলা নাট্য প্রতিযোগিতায় অষ্টাশীটি দল যোগদান করেছে। পশ্চিম-বঙ্গে এই প্রথম জেলাওয়ারি নাট্য প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা। বিভিন্ন জেলার নাট্য-মোদীরা এই প্রতিযোগিতাকে সাগ্রহ অভি-নন্দন জানিয়েছেন। অধিক সংখ্যায় প্রতি-যোগী দল যোগ দিয়েছে—বর্ধমান, মুর্শিদা-বাদ, হুগলী, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা থেকে। যেসব জেলায় তিনটির কম দল প্রতিযোগী, তাঁদের নিকটবর্তী অন্য জেলার প্রতিযোগী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আশা করা যায়, বাছাই করা নাটকগুলির একটি নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা কলকাতার শহরে করা সম্ভব হবে।

'মুকুর'-এর 'থানা থেকে আসছি' অভিনয় :

থিয়েটার সেণ্টার রঙ্গমঞ্চে 'মুকুর' নাট্যসংস্থা অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' নাটকটি প্রতি মাসে একবার করে অভিনয় করবেন বলে স্থির করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানসূচীর প্রথম অভিনয় আজ ১৩ই জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায়।

রূপদক্ষ প্রযোজিত দুটি একাংকিকা

গত ২৭শে ডিসেম্বর '৬৬-তে মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাইরের দরজা' এবং কল্লোল মজুমদারের 'ইস্পাত ও গোলাপ' একাংকিকা দুটি দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ করেন রূপদক্ষ নাট্যগোষ্ঠী।

আমাদের জীবনের পট-ভূমিকায় পাপ-বোধের উপস্থিতি সর্বত্র ব্যাপ্ত। আমাদের প্রেমে-অপ্রেমে এই পাপবোধ প্রহরীর মতো ইতস্ততঃ সঞ্চারিত থাকে। মঞ্জু-অশোক-কমল—তিনজনই পাপবোধের তাড়নায় শংকিত। মঞ্জু তার প্রণয়ী কমলের অপেক্ষায় থাকাকালীন অশোকের অকস্মাৎ প্রবেশ : সে মঞ্জুকে প্রেম নিবেদন করে, মঞ্জুর কাছে তার অর্থ প্রলাপে পর্যবসিত হয়। অশোক তখন তাদের দুজনের মধ্যে অতিশায়ী সূক্ষ্ম অসঙ্গতিগুলি প্রকটভাবে ব্যক্ত করে। আত্মযন্ত্রণার শায়কে বিদ্ধ মঞ্জু অশোকের প্রস্থান চায়। সে মুহূর্তে কমলের আগমন আভাষ শোনামাত্র বিমূঢ় মঞ্জু তাকে অন্তরালে যেতে বলে। কিন্তু অসহিষ্ণু অশোক কমল ও মঞ্জু ঘরে প্রবেশ করে। ত্রিভুজের তিন কৌণিক অবস্থানে থেকে তারা তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পাপ-বোধের তীব্রতা অনুভব করে। পাপবোধের প্রতীক পাহারাওয়ালা প্রবেশ করতে তারা চক্রান্ত করে তাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়। সেই উত্তেজনার বশে মৃত প্রায় পাহারাওয়ালাকে মৃত ভেবে অশোক ও কমল কাপুরুষতায় আত্মসমর্পণ করে। মঞ্জু তখন একান্ত একাকী। সেই মুহূর্তে পাপবোধ ও মঞ্জুর অস্তিত্বে 'বাইরের দরজা'র সমাপ্তি। মঞ্জুর ভূমিকাভিনেত্রী সন্ধ্যা বসু শক্তিময়ী অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অভিনয়ে মনে হয়েছে মঞ্জু একটি 'নিউরোটিক পেসেন্ট।' অশোকের ভূমিকায় পবিত্র চক্রবর্তী উদাত্ত অভিনয় করেছেন, সে তুলনায় কমলের চরিত্রাভিনেতা বলু ভট্টাচার্যের নৈরাশ্যজনক অভিনয় সমগ্র প্রযোজনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অবশ্য এই দায়িত্বের অন্ততঃ অর্ধেক নির্দেশক কমল ঘোষ দস্তিদারের প্রাপ্য। কাব্য-নাটকের গুণে সমৃদ্ধ এই নাটক অভিনয়ে ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি তেমন। তথাপি মঞ্চ পরিকল্পনায় অবি সরকার ইদানীংকালে স্মরণীয় স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন।

ইস্পাত ও গোলাপ যথাক্রমে অটো-মেশ্যান এবং মানসিকতার প্রতীক। আমাদের পৃথিবীতে এই দুয়েরই অবিমিশ্রতা অনিবার্য। অটোমেশ্যান প্রথাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন নাট্যকার কল্লোল মজুমদার। যুগোপযোগী বিষয়-

বস্তুর উপর স্থাপিত এই নাটকটির নেপথ্যে হৃদ্‌যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র উদ্ভাবনায় গবেষক এক টেকনিককে ঘিরে আখ্যানভাগ গ্রথিত। এই যন্ত্রের সাফল্যের মুখ চেয়ে ছিল অগণিত ব্যক্তি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যর্থ হন। হৃদ্‌যন্ত্র-নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়; অসহায়তার গহ্বরে তলায়মান হয় সেই বৃদ্ধ, তাপসী, বৈজ্ঞানিক, প্রতিমা, সঞ্জয়, পরেশ এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি। অথচ এমন একটি নাটক অভিনয়োত্তীর্ণ হতে পারল না আদৌ। পরেশের ভূমিকায় নিখিল চক্রবর্তী ব্যতীত আর সকলে হতাশ করেছেন। সঞ্জয়ের ভূমিকায় তুষার মুখোপাধ্যায়কে অক্ষম কৌতুকাভিনেতা মনে হয়েছে। বৃদ্ধের ভূমিকায় অরূপ ভট্টাচার্যের অতি-নাটকীয়তা নাটকের গতিকে শ্লথ করেছে বহুলাংশে। প্রতিমার ভূমিকায় সন্ধ্যা বসু এ নাটকেও অর্ধসফল। তাপসীর ভূমিকাভিনেত্রী শিপ্রা চক্রবর্তী আলোচনার সুযোগ দিতেও পারেননি। পূর্বোক্ত নাটকের নির্দেশক কমল ঘোষ দস্তিদার একটি ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন। এই নাটকের নির্দেশক তড়িৎ চৌধুরী চরিত্র নির্বাচনেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি। যদি উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত করতে না পারেন তাহলে এ নাটকের অভিনয়ে তাদের বিরত হওয়াই শ্রেয়। সংগীত, আলোক, মঞ্চ পরিকল্পনা (তড়িৎ চৌধুরী-কৃত) মোটামুটি প্রশংসনীয়।
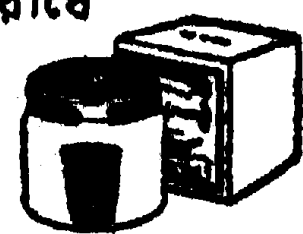
পরিশেষে এমন দুটি নাটক নির্বাচনের জন্য রূপদক্ষ নাট্যগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না, যদিও প্রযোজনার বিষয়ে গভীরতর মনোযোগ একান্তই আবশ্যক।

বিবিধ সংবাদ

সুরতীর্থের বার্ষিক উৎসব

কলকাতার অন্যতম সংগীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠান সুরতীর্থের চতুর্দশ বার্ষিক উৎসব গত ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী সিংহী পার্কে বিশেষ সাফল্য ও উদ্দীপনার সংগে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রথম দিনে সুরতীর্থের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ভারত-নাট্যম, বিভিন্ন লোকনৃত্য ও কবিগুরুর শ্যামা নৃত্য-নাট্য মঞ্চস্থ করেন। ভারত নাট্যমে শ্রীমতী জয়া মেনন ও অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং পরিচালিকা হিসাবে শ্রীমতী থঙ্কমণি কুট্টীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোক-নৃত্যের মধ্যে জেলে রমণীর সহজ, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত রূপকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন শ্রীমতী শান্তি কুরুডিলা। মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় ফসল কাটার নৃত্য লাওনি ও বেহুলা-লখিন্দরের চিরমধুর কাহিনী অবলম্বনে বেদেনী নৃত্যাংশটি দর্শকদের মুগ্ধ করে। রাধা ও কৃষ্ণের মানভঞ্জনের কাহিনীটি কথক-নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় ও কৃষ্ণের ভূমিকায় সন্দীপকুমারের সুষ্ঠু নৃত্যভঙ্গী এ'র উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত দেয়। আড়াল থেকে সুরের ঝরণাধারায় যাঁরা নৃত্যগুলিকে আরও রমণীয় করে তোলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর ও সুদীপ্ত রায় অন্যতম।

সুরতীর্থের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'লাওনি' লোকনৃত্যের একটি মনোরম ভূমিকায় শান্তি বসু ও রিনি মুখার্জি

কবিগুরুর শ্যামা নৃত্য-নাটিকাটি জনপ্রিয় হলেও এর সার্থক রূপায়ণ বড় একটি দেখা যায় না। শ্যামা ও বজ্রসেনের ভূমিকায় আরতি মজুমদার ও গোবিন্দম কুট্টী অপরূপ দক্ষতা প্রকাশ করেন। দলগত সংহতি সমগ্র নৃত্যাংশটিকে ভাবগম্ভীর করে তোলে। সংগীতাংশ প্রশংসনীয়, বিশেষ করে অরবিন্দ বিশ্বাস ও কমলা বসুর কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত বৈশিষ্ট্যে মূর্ত হ'য়ে ওঠে।

দ্বিতীয় দিনে রাগ-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক সরস্বতী রাগে খেয়াল ও একটি জনপ্রিয় ভজন গেয়ে দর্শকচিত্তে আলোড়ন তোলেন। এর সংগে তবলায় ও সারেঙ্গীতে সহযোগিতা করেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ ও মহম্মদ সগীরুদ্দীন খাঁ। সর্বশেষে দ্বৈত যন্ত্র-সংগীতের অনুষ্ঠানে বেহাগ রাগে বেহালা ও সেতার বাজিয়ে শোনান শ্রীভি জি যোগ ও শ্রীমতী কল্যাণী রায়। দীর্ঘদিন শ্রীযোগের এমন মনমাতান, প্রাণভরান বাজনা শোনা যায়নি। এ'দের সংগে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

অথ বিবাহ-প্রস্তাব সংবাদ ঃ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র ছ' হপ্তার জন্যে এসেছেন ভারতবর্ষে খেলতে। কিন্তু আসার সংগে সংগেই দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স হিন্দী চলচ্চিত্রজগতের উদীয়মানা অভিনেত্রী গীতাঞ্জলি ওরফে অঞ্জু মহেন্দ্রকে ভালোবেসে ফেলেছেন এবং তাঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করেছেন। অঞ্জু মহেন্দ্রের প্রথম ছবি 'উস্‌কী কহানী' এখনও মুক্তি-প্রতীক্ষায়। এর পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য যখন তাঁর প্রথম ছবি 'তিসরী কসম'-এর মুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর মুখ থেকেই গীতাঞ্জলি মহেন্দ্রের কথা আমরা প্রথম শুনেছিলাম। এখন কুমারী মহেন্দ্র অভিনেত্রীরূপে সাধারণের সংগে পরিচিত হবার আগেই সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ আকর্ষণ—বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্সের প্রণয়িনীরূপে। একেই বলে 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।'

বাগবাজার সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসব

গত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ এক আনন্দময় ও বর্ণাঢ্য পরিবেশে বাগবাজার সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীলকুমার দাশগুপ্ত ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীস্বররাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাল্যদান পর্ব, সভাপতি ও প্রধান অতিথির ভাষণ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের পর এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

বাগবাজার সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উৎসবে সংগীত পরিবেশন করছেন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলরাম দাস, অশোক দাস, নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়, আরতী মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দ। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্ত এবং বহুবাদ্য সমন্বয়ে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন ডি সুজা ও ব্যানার্জি পার্টি।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুরকার শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য ও শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গানের জলসা

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

এবারের তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল আলোচনাচক্র। ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতবিদ ও শিল্পীবৃন্দ মিলিত এই অনুষ্ঠানে—বেশ জমকালো শ্রোতৃবৃন্দ আকর্ষণ করতে পেরেছিলো। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের বিভিন্ন অলঙ্কার ও প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ কিছু অংশ দীপালি নাগ বিশ্লেষণ করলেন। পরে সেগুলি কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিলেন সর্বশ্রী শৈলেন ব্যানার্জি, ভি জি যোগ ও শ্যাম গাঙ্গুলী। বহু বিতর্কিত এই আলোচনা-চক্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় এই অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়েছিল—এবং বিশ্লেষণ কিছু সংখ্যক শ্রোতার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করে তোলার সহায়ক হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে শ্রোতার সংখ্যা যত, সত্যিকারের অভিজ্ঞ ওয়াকিবহাল শ্রোতার সংখ্যা ততটা নয়। যদি জিজ্ঞাসু কোনো শিক্ষার্থী বা শ্রোতা উপস্থিত থেকে থাকেন—তবে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সমস্যা ও তত্ত্বের আলোচনা তাঁদের কৌতূহলকে জাগ্রত করেছে এবং কৌতূহল যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে একদিন তাঁরা এর উত্তর খুঁজে পাবেনই। এইদিক দিয়ে বিচার করলে এঁদের প্রথম প্রচেষ্টা দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনন্দনযোগ্য। কে সি ডি বৃহস্পতির পৌরোহিত্যভাষণ জ্ঞানগর্ভ।

এবারের সঙ্গীতাসরে কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের কথাই প্রথমে মনে আসে। তরুণ প্রতিভার মধ্যে গৌর গোস্বামীর নীলাম্বরী রাগে পরিবেশিত বংশীবাদন—রাগমাধুর্য ও পরিবেশনভঙ্গী এই উভয় বিচারেই বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই রাগটি পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছিল। আজ তাঁর দুঃখলগ্নে সেই কথাটিই বার-বার মনে আসে।

আলাউদ্দিন ঘরানার রবীন ঘোষের রাগেশ্রী রাগে পরিবেশিত বেহালা শিল্পীর পরিণততর ধ্যান ও ধারণার ক্রমাগ্রসারী প্রকাশ। তানের স্পষ্টতা ও পরিশুদ্ধতা আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

এনায়েত খাঁ ঘরানার ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁর 'ময়ূরবসন্ত'—মাধ্যমের সুষ্ঠু প্রয়োগে—বাজের গাম্ভীর্যে এবং রংদার মীড়ের ঐশ্বর্যে ও কূটতানের দক্ষতায় আসর মাতিয়ে তুলেছিলো। এই ঘরানারই কল্যাণী রায় পরিবেশিত 'শ্রী' রাগ—তাঁর প্রতিষ্ঠিত মান অক্ষুন্ন রেখেছে।

সরোদে যতীন ভট্টাচার্য ঝিনঝোটি ও পাহাড়ী ঝিঁঝিট বাজালেন। তাঁর লয়-দক্ষতা সুপরিচিত। এবার তার সঙ্গে মিশেছে—সুরের রং। অন্যান্যবারের বাজনাকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে তাঁর এবারের বাজনা।

ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ কৌশিকী কানাড়ায় মালকোশ ও বাগেশ্রী দুই অঙ্গকেই সুপরিস্ফুট করেছেন। সঙ্গীতবোধ ও আঙ্গিকজ্ঞান উভয়ের সমন্বয়ের সঙ্গে মিশেছে ছন্দবৈচিত্র্য। ধৈবতের প্রয়োগও মর্মস্পর্শী। তবে ছন্দের খেলায় বড় বেশী মেতে ওঠায় প্রথমের দিকের জমাটি সুর-গাম্ভীর্য কিছু ক্ষুন্ন হয়েছে।

যন্ত্রসঙ্গীতের আসরের একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ও পদ্মশ্রী বিসমিল্লা খাঁর সেতার ও সানাই। 'পুরবী' দিয়ে সুরু করে চৈতী ও ধুন বাজিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন এঁরা। বিসমিল্লা খাঁর সিদ্ধরাগধ্যান পরিণত বিস্তার ও গাম্ভীর্যে বিলায়েতের রঙিন মনের ঐশ্বর্যে মিলিত হয়ে যে ছবি রচনা করেছে তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছে প্রথম থেকে শেষ অবধি। তবু বলব গত-বারের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের বাজনা কিছু ম্লান।

একক বাদনে পণ্ডিত রবিশঙ্করের বাজনায় 'পুরিয়া' রাগের আলাপ তাঁর উপযুক্ত ধ্রুপদী মহিমায় পরিবেশিত। পিলু রাগের বিলম্বিত ও দ্রুতগতেও নতুনত্ব ছিল যথেষ্ট। 'পিলু' রাগ সাধারণত ঠুংরী অঙ্গেই গাওয়া বা বাজান হয়ে থাকে। কিন্তু পণ্ডিতজী বিলম্বিত অংশে 'ভৈরবী' অঙ্গের ওপর জোর দিয়ে পুরোপুরি খেয়ালের ঢং ও আভিজাত্য অক্ষুন্ন রেখে বাজিয়ে গেছেন। দ্রুতের অংশে বিদ্যুৎস্পর্শের মত কাফির রঙিন ইসারা ও ভৈরবীর মাদকতার শিল্প-সম্মত মিলনে যথাযোগ্য রসাবেশ ঘনীভূত হয়ে 'সহৃদয়-রসিক সংবেদ্য'ই হয়ে উঠেছে তাঁর বাজনা।

ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর 'বসন্ত-মুখারী' মীড়ের মাধুর্যে, তানের ত্বরিতগতিতে বিলায়েতী বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। 'ভৈরবী'তে তিনি যেন রসের উৎসবে মেতে উঠেছিলেন।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে ওস্তাদ আমীর খাঁর 'রামকেলী' তাঁর কণ্ঠস্বরের বর্তমান স্বরত্রুটীকে ছাপিয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যে মনোহর হয়েছে।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর 'দরবারী কানাড়া' বহুশ্রুত ও বহু আলোচিত বস্তু। এ সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই।

শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী গাইলেন 'গুঞ্জ-কানাড়া'—তাঁর বর্তমান অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি যা গেয়েছেন তা আশাতীত। তানের বৈশিষ্ট্যে, দাপটে তাঁর পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর খোদিত।

আগ্রা ঘরানার সরাফৎ খাঁর 'হোসেনী কানাড়া' কণ্ঠের ওজন, স্বরশুদ্ধতা ও ঘরানার বৈশিষ্ট্যে শ্রুতিসুখকর। তবে পরিমিতি জ্ঞানের অভাবে তাঁর অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

শ্রীশচীন দাস মতিলাল 'সুগ্রাই কানাড়া' ভালই গেয়েছেন। তবে আরো ভালো হয়েছে তার ঠুংরী।

মালবিকা কাননের সুরেলা কণ্ঠে পরি-বেশিত 'কলাবতী'তে শিল্পীর পরিশীলিত রাগজ্ঞান ও মৌলিকতা শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

মীরা ব্যানার্জির 'কৌশি কানাড়া' তাঁর অভিজাত গায়কী মেজাজ ও মান অনাহত রেখেছেন।

গায়িকা শ্রীমতী শান্তা সাহা

সম্প্রতি শ্রীমতী শান্তা সাহা শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয়, লঘু ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরি-বেশন ও শিক্ষকতার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী শান্তার 'শাস্ত্রীয়' সঙ্গীত-গুরুদের মধ্যে আগ্রা ঘরানার বিশিষ্ট গায়ক শ্রীকালীদাস দে (এম, মিউজ)-র নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত সঙ্গীতায়তন 'গীতালি' (শ্যামবাজার)-র ইনি অন্যতম অধ্যাপিকা।

হবি রিদম্ অর্কেস্ট্রা

উত্তর কোলকাতার অপেশাদার বাদ্য সংস্থা হবি রিদম অর্কেস্ট্রা কর্তৃক আয়োজিত ৫ম বার্ষিক যন্ত্র-সঙ্গীত সম্মেলন আগামী ১৫ই জানুয়ারী সকাল ৮-৩০টায় মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন, সর্বশ্রী মুকুল দাস, হিমাংশু বিশ্বাস, ভি বালসারা, বটুক নন্দী, দিলীপ রায়, রজত নন্দী, কাজী অনিরুদ্ধ ও লিট্‌ল বিট্‌ল অর্কেস্ট্রা। অনুষ্ঠানের শেষে হবি রিদম অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করবেন মাস্ প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন শ্রীঅরূপ গাইন।

দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান

আগামী ২২শে জানুয়ারী '৬৭, রবি-বার, সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে।

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা এবং দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রসংগীতসহযোগে 'আনন্দ' শীর্ষক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে যাতে দক্ষিণীর ত্রিশজনের অধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন।

এলোমেলো ব্যাটিং, নড়বড়ে অস্তিত্ব

অজয় বসু

ক্রিকেটের নন্দন কাননে ভারতকে ইনিংস ও পঁয়তাল্লিশ রানে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'রাবার' নিজের ঘরেই তুলেছে। বিশ্বশ্রেষ্ঠ ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে জয়লাভ করা বা 'রাবার' রেখে দেওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। সোবার্সের নেতৃত্বে যে দলটি বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করছে সেই দলের সঙ্গে এঁটে ওঠা ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, কারুরই সাধ্যে কুলোয় নি। সাধ্য, সামর্থ্য ভারতেরও ছিল না। কাজেই ভারতের পরাজয়ে চমক জাগানো কোনো ঘটনা ঘটে নি। তবু এবার ইডেনে হাজির থাকার অভিজ্ঞতা আমাদের চমকে দিয়েছে।

চমকের কারণ, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের করুণ ভূমিকা। তাঁদের অনেকে দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখতে পারেন নি। কেউই লড়াই বাধাবার মানসিকতায় উজ্জীবিত হতে চান নি। নিজেদের আচরণে প্রকরণগত ঘাটতি ঘটিয়ে টেস্ট স্ট্যান্ডার্ডের সুনাম নষ্ট করেছেন। দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ভারত হারবে, একথা ধরে নিয়েও কেউ কি আশা করেছিলেন যে পাতৌদির দল লড়াই বাধাবার চেষ্টা না করে হারার আগেই হাল ছেড়ে দেবে?

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হাতে ভারতের হারকে খুব বড় চোখে দেখার কারণ নেই। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যে অবিন্যস্ত ভূমিকা ভারতীয় ক্রিকেটের শুভানুধ্যায়ীদের নিরাশ করেছে সেই নজীরকে ছোট করে দেখাও চলে না। ইনিংস ও পঁয়তাল্লিশ রানের ব্যবধান বড়। ১৯৫৮ সালে এই ইডেনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ আরও বড়সড় ব্যবধানে ভারতকে পরাজিত করেছিল। সেদিন ও এদিনের ফাঁকে ভারতীয় ক্রিকেট কতোটা এগোতে পেরেছে নিজের মাঠে মাঝারি পর্যায়ের ইংলন্ডকে হারানোর দৃষ্টান্তে কিন্তু সে তথ্যের সঠিক হদিশ নেই, আছে এবারের ইডেনে উপস্থিত থাকা প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টিতে এবং ক্রিকেট বোদ্ধাদের উপলব্ধিতে।

১৯৫৮ সালে পেস বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অসহায় ভাবটি সবাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এবার স্পিনের সামনে তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা সত্যিকারের ফাস্ট বোলিং খেলতে পারেন না এবং উঁচু দরের স্পিনের সামনে পড়লেও তাঁদের নাকাল হতে হয়। তাহলে তাঁদের যথার্থ সামর্থ্য কতোটুকু? বিপক্ষ দল মাঝারি পর্যায়ের হবে নিউজিল্যান্ড, সিংহল বা ভাঙাচোরা ইংলন্ডের মতো এবং উইকেটে কোনো প্রাণের লক্ষণ থাকবে না, তা হলেই ভারতীয় দল হয়তো সর্বদিক বজায় রাখতে পারবে। এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে পরিস্থিতিটা সত্যিই করুণ। এবং করুণ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বছর বছর ক্রিকেটের আকাশ ফাটানো হাঁক তোলাও অর্থহীন। এর জন্যে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও আমাদের হাতছাড়া করতে হয়েছে কোন্ সান্ত্বনায় তার ঘাটতি পোষানো যাবে?

অনেকদিন পর ইডেনের পিচে এবার স্পিন ধরেছিল। আর সেই স্পিনের ফাঁসটিই রীতিমতো শক্ত হয়েই ভারতীয় ব্যাটিংয়ের গলায় চেপে বসে। পিচে স্পিন ধরলেই পিচটি ব্যাটসম্যানদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় না। বল যদি হঠাৎ লাফায় বা অপ্রত্যাশিত গতিপথে দৌড়দৌড়ি, লাফা-লাফি করে তবেই উইকেটে বিপদের সংকেত থাকে। কিন্তু যে পিচে শুধু স্পিন ধরে, যতো দিন এগোয় ততোই স্পিনের নাগাল হয়তো বাড়তে থাকে। তবে সেই পিচের চরিত্রও ব্যাটসম্যানদের জানা হয়ে যায়। এসব কথা জেনে এবং স্পিনের বহর স্বচক্ষে দেখেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা স্পিনের মোকাবিলা করতে পারেন নি বলেই তাঁদের ব্যর্থতার বোঝা পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে। প্রাণহীন পিচে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করেও সেই বোঝার ভূত কাঁধ থেকে নামানো যাবে না।

সন্দেহ জাগে যে, পাতৌদি এবং সতীর্থদের মধ্যে ব্যাটসম্যান হিসেবে যাঁদের নামডাক আছে, তাঁরা পিচের অবস্থা দেখে নিজেদের ওপর ভরসা রেখে সাধ্যমতো খেলার চেষ্টা করেছিলেন কিনা। একজন নিষ্ঠাভরে সে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। তাঁর নাম ভেঙ্কটরাঘবন। অথচ ব্যাটসম্যান হিসেবে ভেঙ্কটরাঘবন অস্বীকৃত। চেষ্টা ও আন্ত-রিকতা যে বৃথায় যায় না, অস্বীকৃত ব্যাটস-ম্যান ভেঙ্কটরাঘবন যদি তার জ্বলন্ত প্রমাণ রাখতে পারেন, তাহলে নামডাক-ওয়ালা ব্যাটসম্যানেরা সেই পথ আঁকড়ে ধরলেন না কেন?

নামীরা কি জাতীয় দলের মর্যাদা, টেস্ট ম্যাচের গুরুত্ব অস্বীকার, উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন? পাতৌদি কি বলেন?

ব্যাটসম্যান পাতৌদিকেই এবার সবচেয়ে দায়িত্বহীন বলে মনে হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে, দু'-দুবারই। প্রথমবার গিবসের বলে বারবার ঠকে যাবার পর নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে জায়গায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ অন্ধ ব্যাটখানি আধা-জোরে ঘোরালেন। ক্যাচ উঠলো লেগের দিকে। বেশিক্ষণ তাঁকে উইকেটে থাকতে হয়নি। দ্বিতীয়বারের মেয়াদ আরও সংক্ষিপ্ত। নবাব-তনয় এলেন ও গেলেন। আসতে যতো তাড়া, ফিরতে যেন আরও বেশি। যেন প্যাভিলিয়নে কতো কাজ পড়ে রয়েছে! আর বিদায় নেবার দৃশ্যটিই বা কি বিচিত্র!

লেগ-স্পিন বল অফের বাইরে পিচ খেয়ে কিঞ্চিৎ উঠে আরও বাইরের দিকে চলে যাচ্ছিল। পাতৌদির শখ চাপলো কাট্ মারার। তা মারুন, আপত্তি নেই। কিন্তু মারের ব্যাকরণসম্মত একটা রীতি তো আছে, সেই রীতি পাতৌদি অস্বীকার করলেন। ক্রিকেটের শিক্ষানবীশ যাঁরা, তাঁরাও জানেন যে, ঘুরন্ত বল যখন ওপরের দিকে ওঠে, তখন কাট্ মারা উচিত নয় এবং কাট্ মারতে হলে ব্যাটটিকে ওপর থেকে নামাতে হয় কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটার মতো। কিন্তু পাতৌদি কি করলেন? ঘুরন্ত বল যখন ওপর দিকে উঠছে, তখনই তিনি ব্যাটে-বলে করলেন এবং হাতের ব্যাট ওপর থেকে নামলো না, পাশ থেকে এসে বলের গতিপথ স্পর্শ করলো। ফলে সহজ ক্যাচ উঠলো। উঠবে না তো কি! প্রথমবারের ব্যর্থতার পরও দ্বিতীয়বার এই ধরনের এলোমেলো খেলা নিশ্চয়ই টেস্ট স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে মানানসই নয়।

আমাদের মনে থাকার কথা এই যে, ব্যাটসম্যান হিসেবে পাতৌদির জাত আছে। ইংলন্ডের মাঠে তিনি ক্রিকেটে হাত পাকিয়ে-ছেন। ইংলন্ডের নিরপেক্ষ উইকেটে স্পিনও জমে। কাজেই স্পিন বোলিং খেলার অভিজ্ঞতা পাতৌদির যেমন পরিণত, অন্য ভারতীয়ের তেমন নয়। কাজেই তাঁর কাছে স্বাভাবিক কারণে খেলার মতো খেলা অনেকেই আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি খেলার কোনো চেষ্টাই করলেন না। অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তা তাঁর দলের কাজে লাগলো না। আসলে বোধহয় খেলায় তিনি মন বসাতে পারেননি। মন যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, তা কেই বা বলতে পারে?

আর এক দায়িত্বহীন ব্যাট জয়সিমার। দ্বিতীয় ইনিংসে বার-তিনেক ক্যাচ তুলে জীবন পাওয়া সত্ত্বেও তিনি উইকেটে নিজের অস্তিত্বের শিকড় নামাতে চাননি। পরক্ষণেই জায়গায় দাঁড়িয়েই সোবার্সের ফুলটসটি বোলারের হাতে তুলে দিয়েছেন। অথচ কে না জানে যে, জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পিন বোলিং খেলার রীতি আত্মঘাতী নীতিরই সামিল। কিন্তু তাবড় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের অনেকেই, যথা—জয়সিমা, পাতৌদি, হনুমন্ত (প্রথম ইনিংসে), সুর্তি সেই নীতিই আঁকড়ে ধরছিলেন। কারুরই অভিজ্ঞতা কম নয়। তবুও ওঁদের কেউ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পায়ের বেড়ীটিকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেননি। পারলে গিবস-সোবার্স-লয়েডের পাক-ধরানো বলের বিষটুকু জলঢোঁড়া সরীসৃপে পর্য-বসিত হওয়ার রাস্তা সাফ্ হোতো।

একমাত্র বোরদে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্ত সিংই যা স্পিন বোলিংয়ের মোকা-বিলায় সুস্থ পথ ধরেছিলেন। কিন্তু বিশ্বস্ত বোরদে দ্বিতীয় ইনিংসে নিজের দোষে রান-আউট হলেন এবং প্রথম ইনিংসে যেভাবে আউট হলেন, তা দেখে শিক্ষা-

নবীনেরাও চোখ কপালে তুলতে বাধ্য হলেন। একটি লেগ-ব্রেক বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ পড়ে অফের দিকে আসছিল। বোলার বলটি ছেড়ে দেন। কিন্তু পা দিয়ে উইকেট আড়াল করেননি। উইকেটটিকে ফাঁকায় রেখে দেন।' আর বহিমুখী ঘুরন্ত বল সেই ফাঁকেই নিজেকে গলিয়ে বোলদেকে বধ করে। যাকে বলে ছেলেমানুষের মতো আউট হওয়া—এ ঠিক তাই।

আর ছেলেমানুষী করেছেন দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্ত সিং ও জয়সিমা। হনুমন্তের অনের দিকে মারার ঝোঁক আছে জেনে অনে অনেকগুলি ফিল্ডসম্যান সাজিয়ে লেগ স্টাম্প ও তার বাইরে বল ফেলতে থাকেন সোবার্স। সোবার্স কি করতে চাইছেন, তা মাঠশুদ্ধ দর্শক আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলেন। হনুমন্তেরও তা না বোঝার কথা নয়। তবু হনুমন্ত সেই বল-গুলিকেও জোরে ড্রাইভ ও পুল-ড্রাইভ করতে এগোলেন। সুবিধে করতে পারলেন না। পরক্ষণেই লেগ স্টাম্পের বাইরে থেকে অফের দিকে ঘুরন্ত একটি বল হনুমন্তকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিলো।

বোলার যা চেয়েছেন, হনুমন্ত তা করতেই ঝোঁক দেখিয়েছেন। জয়সিমাও দ্বিতীয় ইনিংসে তাই। গিবস যেন বলে-কয়ে ফাঁদ পাতলেন আর জয়সিমার সাধ জাগলো সেই ফাঁদেই পা বাড়ানো। ও'দের দু'জনের এই ছেলেমানুষীর মূলে বাহাদুরি দেখানোর ইচ্ছে থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু এতোসব বিচিত্র কাণ্ড জয়লক্ষ্মী বরদাস্ত করতে রাজী থাকেননি। তাই শোচনীয় পরাজয়ে ভারতীয় দলকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। এ-তিরস্কার যোগ্য পুরস্কার। যাঁরা টেস্ট খেলার আসরে দলের সংকট জেনেও উইকেটের পর উইকেট বিলিয়ে দেবার বিলাসিতায় মাতেন, তাঁরা আর অন্য কি-ই বা আশা করতে পারেন? নিজের সম্পত্তি কেউ যদি নিজেই উড়িয়ে দিতে চান তো শুভানুধ্যায়ীর সৎ পরামর্শ ও প্রজ্ঞা কি তাঁকে রুখতে পারে? কিন্তু দলের সম্মান ও ইষ্ট কি কোনো খেলোয়াড়ের নিজস্ব সম্পত্তি? নয়। তাই বেহিসেবী ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের উড়নচণ্ডীভাবে জাতীয় প্রত্যাশা প্রচণ্ড মার খেয়েছে।

ভারতীয় দলে শৃংখলা, সংহতি অটুট ছিল কিনা, তা নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠেছে। খেলার সময় রাত-দুপুরে হোটেলে ফেরার কথা স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শৃংখলা ভাঙা হয়েছে কিনা তা তদন্তের জন্যে প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় দুসি মোদী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে আবেদন রেখেছেন। প্রসংগগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। খতিয়ে তদন্ত করা উচিত। কারণ, সবাই জানে যে, উঁচু দরের খেলাটা সাধনাসাপেক্ষ এবং দিবা-রাত্র, মাঠে-ঘাটে, রাত-দুপুরে প্রজাপতিদের সংগদানের সংগে একাগ্র সাধনা মনঃসংযোগ ও আত্মসংযমের সম্পর্ক নেই। যদি কেউ, তা তিনি যতো নামীই হোন না কেন, দলের শৃংখলা [illegible] এবং ব্যক্তিগত আচরণে [illegible] শিথিল করে দিয়ে [illegible], তাহলে তাঁর কেন দণ্ডবিধান হবে। এইভাবে তাঁরা আরও [illegible] জন্যে যদি আগামী দিনের খেলোয়াড়দের ভুল পথে ঠেলে দিয়ে থাকেন।

ভারতীয় দলের সংহতি অটুট ছিল কিনা সে-প্রশ্নও তোলা যেতে পারে। অফ স্পিনার ভেঙ্কটরাঘবন সম্পর্কে ইডেনে পাতৌদি যে-রীতি অনুসরণ করেছিলেন, তা দেখে দলগত সংহতি ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার কথা।

প্রথম দিনের খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছিল যে, ইডেনের উইকেটে স্পিন ধরছে এবং যতো দিন যাবে, ততোই স্পিন আরও জমবে। স্পিন যে জমেছিল, উত্তরপর্বে তার সন্দেহাতীত প্রমাণও পাওয়া যায়। তাই সোবার্স নিজের, লান্স গিবসের স্পিন বোলিংয়ে যতো বেশি পারেন, ততোই ব্যবহার করেছেন। এই উইকেটে স্পিনের কার্যকরীতার সম্ভাবনা সিম্ বোলিংয়ের চেয়ে বেশি বুঝতে পাতৌদিরও দেরী হয়নি। তাই তিনি চন্দ্রশেখরকে দিয়ে ছেচল্লিশ, বিষণসিং বেদীকে দিয়ে ছত্রিশ ওভার বল করিয়েছেন। তাছাড়া রুসি সুর্তিও যে ত্রিশ ওভার বল করেন, তার বেশির ভাগই ছিল স্পিন। অথচ ও'দের অনুপাতে ভেঙ্কটরাঘবন বল করেছেন কম মাত্র চোদ্দ ওভার।

এই চোদ্দ ওভারের মধ্যে ন' ওভার বল করেছিলেন তিনি প্রথম দিনে এবং বাকি পাঁচ ওভার খেলার তৃতীয় দিনে, যে-দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রান করে আরও ১৭৮। মূলতঃ বোলার হিসেবেই ভারতীয় দলে ভেঙ্কটরাঘবনের জায়গা হয়েছিল। উইকেট না পান, অন্য ভারতীয় বোলারদের অনুপাতে তাঁর বলে তেমন কিছু রানও (চোদ্দ ওভারে তেতাল্লিশ) ওঠেনি। উইকেটে স্পিন ধরছিল তবু পাতৌদি ভেঙ্কটরাঘবনকে ব্যবহার করেননি। কেন?

তৃতীয় দিনের দর্শকদের মনে থাকার কথা যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ দিকে গ্যারি সোবার্স যখন তাঁর স্বকীয় সংহার মূর্তি নিয়ে ইডেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর ব্যাটের যখন খুনে মেজাজ, বেদী, চন্দ্রশেখর, সুর্তি কাউকেই তিনি যখন ক্ষমার চোখে দেখতে রাজী নন, ঠিক তখনই পাতৌদির ভেঙ্কটরাঘবনের কথা মনে পড়ে। তার আগে ভেঙ্কটরাঘবন নামে যে একজন অফ স্পিনার দলে রয়েছেন, সে কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। সোবার্সের মারমুখী ব্যাটের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যে কোনো বোলারের পক্ষেই অগ্নিপরীক্ষার সামিল। তবু তরুণ ভেঙ্কটরাঘবন সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সোবার্সকে তাঁর বল সমীহ করে খেলার বাধ্য করে।

এই ফাঁকে ও প্রান্তে সোবার্স ও গিবস যেই আউট হলেন, অমনি পাতৌদি শেষ [illegible] বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভেঙ্কটরাঘবনের [illegible] হাতে তুলে দেন। কেন? পাছে [illegible] এবং একটি মাত্র [illegible] ভেঙ্কটরাঘবনের [illegible]? [illegible] আশঙ্কা। [illegible] সুযোগ-সুবিধে দিয়ে, উৎসাহ জুগিয়ে যাঁর পক্ষে-পিঠে তোলার কথা, তিনিই কিনা পাছে অনুকূল পিচের সুযোগ ভেঙ্কটরাঘবন সদ্ব্যবহার করে ফেলেন এই আশঙ্কায় যেন তাঁকে তেমনভাবে ব্যবহারই করলেন না। পাতৌদির সুর্তি ও বেদী-প্রীতি ও ভেঙ্কট-রাঘবন-বিরাগের নজীর দেখে স্বভাবতই তাই এ প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কি দলের মধ্যে আরও একটি দল ছিল? পাতৌদিকে অধিনায়ক নির্বাচন করে যাঁরা তাঁর হাতে দলগত সংহতির সমস্ত ভার তুলে দিয়েছেন, তাঁদের দেখা উচিত যে, নির্বাচিত দলপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা। দলের মধ্যে বাছা বাছা ক'জনের সংগে মেলামেশা করা এবং অন্যদের উপেক্ষা করাও দলপতির ধর্ম নয়। দলপতি ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন কিনা তার তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একদিকে এক উঠতি বোলারের প্রতি দলনায়কের সৎ-মার মতো আচরণ, অন্যদিকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আগমন ও নিষ্ক্রমণ, অফ স্পিনের ধাক্কায় ঝড়ের মুখে বেতের মতো নুইয়ে-পড়া অথবা বিত্তবানের আদুরে দুলালের মতো নিজের উইকেট ছুঁড়ে ফেলা নজীর দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল য, ঢের হয়েছে, আর খেলা দেখার কাজ নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের এমন হীনবল মূর্তি কেই বা দেখতে চেয়েছিল! তবু আসন ছাড়তে চাইনি, পারিও নি সোবার্স, গিবস, লয়েডদের মুখ চেয়ে। পাতৌদির নেতৃত্বে আমাদের খেলোয়াড়েরা আমাদের নিরাশ করলেও বিদেশীরা আমাদের একেবারে ফাঁকিতে ফেলেননি। ইডেনে দক্ষযজ্ঞ ও জনতার যন্ত্রণা, ভারতীয় দলের বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী উপহারই পরম পুরস্কার। এই পুরস্কারের মূল্যায়নে আর একদিন চেষ্টা করবো। আজ নয়। আজ এইখানেই যতি।

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় হান্ট এবং বাইনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে খেলতে নামছেন।

ফটো : অমৃত

ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৯০ রান (কানহাই ৯০, সোবার্স ৭০, নার্স ৫৬ এবং হান্ট ৪৩ রান। চন্দ্রশেখর ১০৭ রানে ৩, বেদী ৯২ রানে ২ এবং সুর্তি ১০৬ রানে ২ উইকেট)।

ভারতবর্ষ : ১৬৭ রান (কুন্দরন ৩৯ এবং জয়সীমা ৩৭ রান। গিবস ৫১ রানে ৫, সোবার্স ৪২ রানে ৩ এবং হল ৩২ রানে ১ উইকেট)।

ও ১৭৮ রান (হনুমন্ত সিং ৩৭, জয়সীমা ৩১ এবং সুর্তি ৩১ রান। সোবার্স ৫৬ রানে ৪, গিবস ৩৬ রানে ২, লয়েড ২৩ রানে ২ এবং হল ৩৫ রানে ১ উইকেট)।

প্রথম দিন (ডিসেম্বর ৩১) :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে ২১২ রান সংগ্রহ করে। এই দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন কানহাই (৭৮ রান) এবং নার্স (২৩ রান)।

খেলাধূলা

দর্শক

দ্বিতীয় দিন (জানুয়ারী ১) :

সি এ বি'র চরম অব্যবস্থা, পুলিশের নির্মমভাবে লাঠি চালনা ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার এবং নিপীড়িত দর্শকদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষ এবং গ্যালারীতে অগ্নি-সংযোগের ফলে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয় নি।

তৃতীয় দিন (জানুয়ারী ৩) :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৩৯০ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ বাকী সময়ে প্রথম ইনিংসের খেলায় এক উইকেট খুইয়ে ৮৯ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন জয়সীমা (৩৪ রান) এবং সুর্তি (১০ রান)।

চতুর্থ দিন (জানুয়ারী ৪) :

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৬৭ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষ 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অপরাজিত থাকেন হনুমন্ত সিং (১৬ রান) এবং সুব্রহ্মণ্যম (৭ রান)।

পঞ্চম দিন (জানুয়ারী ৫) :

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে বেলা ১১টা ৫ মিনিটে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৮ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৪৫ রানে জয়ী হয়।

কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের পঞ্চম টেস্ট সিরিজের অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৪৫ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। বোম্বাইয়ে এই টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছিল। বর্তমান টেস্ট সিরিজের মাত্র তৃতীয় টেস্ট খেলা বাকী। মাদ্রাজে আগামী ১৩ই জানুয়ারী থেকে সেই তৃতীয় টেস্ট খেলা শুরু হচ্ছে।

বর্তমানের অসমাপ্ত ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজ নিয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পাঁচটি টেস্ট সিরিজেই 'রাবার' জয়ী হল। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯ সালে ১-০ খেলায় (ড্র ৪), ১৯৫২-৫৩ সালে ১-০ খেলায় (ড্র ৪), ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩-০ খেলায় (ড্র ২) এবং ১৯৬১-৬২ সালে ৫-০ খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' জয়ী হয়েছিল।

টেস্ট ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মূল্যায়ন

১৯৬০ সালে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের (পরবর্তীকালে স্যার) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব লাভ এবং তাঁর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের সাফল্যই

ল্যান্স গিবস

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ টসে পরাজিত হয়ে পাতৌদির নেতৃত্বে ফিল্ডিং করতে নেমেছে। ফটো : অমৃত

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নব-যুগের সূচনা। ফ্র্যাংক ওরেলই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের প্রথম নিয়মিত নিগ্রো অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বেই ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। ফ্র্যাংক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলে মাত্র ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজে ভাগ্যদোষে ১-২ খেলায় ('টাই' ১ এবং ড্র ১) পরাজিত হলেও তাদের এ পরাজয় কোন মতেই অগৌরবের হয় নি। ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের 'রাবার' জয়—১৯৬২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৫-০ খেলায় এবং ১৯৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩-১ খেলায় (ড্র ১)। টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে ওরেলের অবসর-গ্রহণের পর গারফিল্ড সোবার্সের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এ পর্যন্ত তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলে তিনটিতেই 'রাবার' জয়ী হয়েছে—১৯৬৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২-১ খেলায় (ড্র ২), ১৯৬৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩-১ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ২-০ খেলায় (তৃতীয় টেস্ট খেলা বাকী)।

ইডেন উদ্যানে ১৯৬৬-৬৭ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা নিয়ে মোট ১৪টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হল। এই ১৪টি সরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল : ড্র ১০ (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২টি করে মোট ৬টি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে একটি খেলা), জয় ১ (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালে ১৮৭ রানে) এবং পরাজয় ৩ (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯৪ রানে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৮-৫৯ সালে এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে এক ইনিংস ও ৪৫ রানে)।

ইডেন উদ্যানে আয়োজিত ১৯৬৬-৬৭ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স টসে জয়ী হয়ে দলের পক্ষে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ব্যাটিংয়ে সুনাম রক্ষা করতে পারে নি। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২১২ রান (৪ উইকেটে) উঠেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সুনাম অনুযায়ী এ রান নয়—খুবই মন্থরগতিতে রান উঠেছিল। এই দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের যে চারটে উইকেট পড়ে তার মধ্যে নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় বেদী (লেফট-আর্ম স্পিনার) ৭১ রানে দুটো উইকেট পান। বাকী দুজন (ওপনিং ব্যাটসম্যান হান্ট এবং বাইনো) রান-আউট হন। লাঞ্চের সময় এক উইকেট পড়ে মাত্র ৬৬ রান সংগৃহীত হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫৫ মিনিটে ৩০ রান এবং ২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে ১০০ রান পূর্ণ হয়। চা-পানের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ১৪১ (৩ উইকেটে)। অপরাজিত ছিলেন কানহাই এবং লয়েড। চা-প্যানের পরই দলের ১৪৪ রানের মাথায় কানহাইয়ের 'ক্যাচ' সুর্তি ফেলে দেন। তখন কানহাইয়ের রান ছিল ৩৯। এই দিন কানহাই তিনবার 'ক্যাচ' তুলে সুর্তির অক্ষমতার দৌলতে খেলায় টিকে যান। কানহাইয়ের মত শক্তিশালী খেলোয়াড়ের পক্ষে তিনবার 'জীবন' পাওয়া কম নয়। এই কানহাই কলকাতায় ইডেন উদ্যানেই ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্টে যে ২৫৬ রান করেছিলেন তা ভারতবর্ষ বনাম যে-কোন দেশের টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এই দিন পাতৌদি দর্শনীয়ভাবে বুচারের 'ক্যাচ' ধরলে বেদী তাঁর প্রথম টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেট পান।

প্রথম দিনের শম্বুকগতির খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৪ উইকেট খুইয়ে ২১২ রান (৯২ ওভারের খেলায় ৯টি এক্সট্রাসহ) সংগ্রহ করে। এই দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন কানহাই (৭৮ রান) এবং নার্স (২৩ রান)। কানহাইয়ের ৭৮ রানে ছিল ৮টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী।

তৃতীয় দিনে ৩৯০ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের বাকী ৬ উইকেটে ১৭৮ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। প্রথম ইনিংসের এই ৩৯০ রান তুলতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ৪৭৬ মিনিট ব্যাট করতে হয়েছিল।

পঞ্চম উইকেটের জুটিতে কানহাই এবং নার্স দলের ১০৫ রান সংগ্রহ করেন। এ'রা দুজনে ৯৩ মিনিটের খেলায় ১০০ রান তুলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুর্তিরই বলে কানহাই 'ক্যাচ' তুলে পাতৌদির হাতে ধরা পড়েন। কানহাই ২৬৯ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ৯০ রানে ৮টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী করেন। যে সুর্তি তিন-বার কানহাইয়ের 'ক্যাচ' ফেলে দিয়ে তাঁর জীবনদান করেছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত কানহাইয়ের সেঞ্চুরী লাভের নিকট-সীমানায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান। তৃতীয় দিনে সোবার্সের প্রাণবন্ত খেলাই ছিল দর্শকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭টা উইকেট পড়ে ৩২৭ রান দাঁড়ায়। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন সোবার্স (৪৫ রান) এবং হল (১৪ রান)। দলের ৩৬২ রানের মাথায় সোবার্স তাঁর ৭০ রান সংগ্রহ করে চন্দ্রশেখরের বলে জয়সীমার হাতে 'ক্যাচ' দেন। সোবার্স ৮৯ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ৭০ রানে ১১টা বাউন্ডারী করেছিলেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং হল ৪৯ মিনিটে ৩২ রান তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ৮ম উইকেট জুটির রেকর্ড রান ৮০ (কানহাই এবং ওরেল, কিংস্টন ১৯৬২)। লাঞ্চের পরবর্তী এক ঘণ্টার খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ৫৯ রান সংগ্রহ করেছিল। হল তাঁর ৩৫ রানের খেলায় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেন।

রোহন কানহাই

চা-পানের সময় ৪৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৭ (কোন উইকেট না পড়ে)। এই ২৭ রানের মধ্যে কুন্দরণেরই ছিল ২৩ রান। দলের ৬০ রানের মাথায় কুন্দরণ নিজস্ব ৩৯ রান করে হলের বলে বোল্ড হন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ৮৯ (১ উইকেটে)। অপরাজিত থাকেন জয়সীমা (৩৪ রান) এবং সুর্তি (১০ রান)। তৃতীয় দিনের খেলায় যেদীর বলে নার্সের এবং গিবসের বলে কুন্দরণ ও জয়সীমার ছক্কা মার দর্শকদের খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এই দিন হলের খেলায় চার বার নো-বল হয়।

এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনটি ভারতবর্ষের পক্ষে চরম ব্যর্থতার দিন, এই দিনে ভারতবর্ষের ১৪টা উইকেট পড়ে যায়—প্রথম ইনিংসের ৯টা এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা। এই ১৪টা উইকেটের বিনিময়ে ভারতবর্ষ মাত্র ২১১ রান সংগ্রহ করেছিল—প্রথম ইনিংসের বাকী ৯ উইকেট খুইয়ে ৭৮ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৫ উইকেটে ১৩৩ রান। ব্যাটিংয়ের কি শোচনীয় ব্যর্থতা! ভারতবর্ষের এই হাঁড়ির হাল করেছিল গিবস এবং সোবার্সের বোলিং। প্রথম ইনিংসের খেলায় গিবস ৫১ রানে ৫ এবং অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রানে একটা উইকেট পান। অপর দিকে সোবার্স পান প্রথম ইনিংসে ৪২ রানে ৩টে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪ রানে একটা। টেস্টের নবাগত খেলোয়াড় লয়েড দ্বিতীয় ইনিংসে দুটি মূল্যবান উইকেট (বোরদে এবং পাতৌদি) পান। এ'রা তিনজনেই এই উইকেটগুলি পান চতুর্থ দিনের খেলায়। তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র একটা উইকেট পড়েছিল—হলের বলে কুন্দরণের বোল্ড আউট।

চতুর্থ দিনের লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৮ উইকেট পড়ে ১৬১। লাঞ্চের আগেই গিবস ২৩ ওভার বল দিয়ে ১১টা মেডেন পান এবং মাত্র ২১ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পান। দলের ১১৯ রানের মাথায় বোরদে মাত্র ১১ রান করে

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে সোবার্সের বলে সুর্তির এল বি ডবলিউ।

যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে রান সংগ্রহ করতে গিয়ে রান-আউট হন। লয়েড দূরে থেকে বল নিক্ষেপ করে তাঁর উইকেট ভেঙে দেন। তখন দলের ১১৯। বোরদের বিদায়ের পর থেকেই ভারতীয় দলের ব্যাটিং বিপর্যয় শুরু হয়। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২ মিনিট টিকে ছিল। এবং আরও দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬ রান যোগ হয়। ১৬৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ২২৩ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা-তেই বিপর্যয় দেখা দেয়। হলের বলে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা হয়। হলের প্রথম বল বাউন্ডারীতে পাঠিয়ে কুন্দরণ নিজের এবং দলের ৪ রান সংগ্রহ করেন। কিন্তু হলের দ্বিতীয় বলটি ঠেকাতে না পেরে কুন্দরণ এল-বি-ডবলিউ হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। ওপনিং ব্যাটসম্যান জয়সীমা দীর্ঘ ৪৫ মিনিট খেলে প্রথম রান সংগ্রহ করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা একাধিক 'ক্যাচ' নষ্ট করেন। ফলে জয়সীমা এবং সুর্তি আউটের হাত থেকে একাধিকবার রক্ষা পান। সুর্তি ৭১ মিনিট খেলে নিজস্ব ৩১ রানের (বাউন্ডারী ৬) মাথায় আউট হন। সুর্তি এবং জয়সীমার ২য় উইকেটের জুটিতে দলের ৫৮ রান উঠেছিল। তৃতীয় উইকেটের জুটি জয়সীমা এবং বোরদে গিবসের বল খেলতে গিয়ে চোখে সরষে ফুল দেখছিলেন। জয়সীমা তিনবার সহজ 'ক্যাচ' দিয়ে ছাড়ান পান। বোরদে দেন একবার। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৮১ (২ উইকেটে)। তখন খেলায় অপরাজিত ছিলেন জয়সীমা (২৮ রান) এবং বোরদে (১৩ রান)। চা-পানের পর গিবস নিজেরই বলে জয়সীমার 'ক্যাচ' ধরে তাঁকে আউট করেন। জয়সীমা ১১৭ মিনিট খেলে মাত্র ৩১ রান সংগ্রহ করেছিলেন। দলের ৮৯ রানের মাথায় ৩য় উইকেট (জয়সীমা) পড়ে। ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদি মাত্র ২ রান করে লয়েডের বলে 'ক্যাচ' তুলে গ্রিফিথের হাতে ধরা পড়েন। প্রথম ইনিংসেও পাতৌদি মাত্র এক রান করে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাতৌদির উইকেট লয়েডের পক্ষে টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেট লাভ। লয়েডের বলেই বোরদে বোল্ড আউট হন। তিনি ৬৪ মিনিট খেলে ২৮ রান (বাউন্ডারী ৪) করেন। আলোর অভাবের জন্য চতুর্থ দিনের খেলা নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে বন্ধ হয়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পড়ে ১৩৩ রান দাঁড়ায়। খেলায় অপরাজিত থেকে যান হনুমন্ত সিং (১৬ রান) এবং সুব্রহ্মণ্যম (৭ রান)। হিসাবে দেখা গেল, ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও ভারতবর্ষের আরও ৯০ রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন।

ইডেন উদ্যানের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল (ডান দিকে)। ফটো : অমৃত

খেলার পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট স্থায়ী ছিল। বেলা ১১-৫ মিনিট সময়ে ১৭৮ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৪৫ রানে জয়ী হয়। পঞ্চম দিনের এই এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ তাদের বাকী পাঁচ উইকেটে মাত্র ৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল। এই পাঁচটা উইকেটের তিনটে পান সোবার্স এবং একটা গিবস। একজন (সুব্রহ্মণ্যম) রান-আউট হন। পঞ্চম দিনের ৬৫ মিনিটের খেলায় সোবার্স ১১ ওভার বল দিয়ে ২টো মেডেন এবং ৩২ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান। দুই ইনিংসের খেলায় সোবার্স ৭টা উইকেট পান ৯৯ রানে এবং গিবস ৭টা উইকেট ৮৭ রানে।

ইডেন উদ্যানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। খেলায় হার-জিত আছে, এই পরম সত্যকে গ্রহণ করে ভারতবর্ষের শোচনীয় ইনিংস পরা-জয়কেও দর্শকরা না-হয় ক্ষমা করলেন। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলার ধরণ দর্শকদের কাছে এক অমার্জনীয় ত্রুটি। ভারতবর্ষ ফাস্ট বল সহজভাবে খেলতে পারে না। ভারতবর্ষের নিজেরও ফাস্ট বোলার নেই। সবে ধন নীলমণি স্পিন বোলিং। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দুই আছে এবং তা পৃথিবীর সেরা। এখন দেখা যাচ্ছে টেস্ট খেলায় স্পিন বোলাররাও ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভীতির কারণ। দলের সঙ্কট-কালে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলবার মত আত্ম-বিশ্বাস এবং দক্ষতা নামকরা ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের যে নেই, সদ্য-সমাপ্ত দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। সবচেয়ে হতাশ করেছেন ভারতবর্ষের অধিনায়ক পাতৌদি। তিনি দ্বিতীয় টেস্টে যথাক্রমে ১ ও ২ রান করেন এবং দলের সংকটকালে চরম উদাসীনতা ও দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দেন। অধিনায়কের ভূমিকায় তিনি আদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ফাস্ট বোলারদের ভয়াবহ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় স্পিন বোলারদের মুখ চেয়েই নাকি ইডেনের পীচ এবার বিশেষ তত্ত্বা-বধানে তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের স্পিন বোলাররাই তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বাজিমাৎ করেন। পাঁচ দিনের বরাদ্দ টেস্ট খেলা দ্বিতীয় দিনের (১লা জানুয়ারী) দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুণ শেষ পর্যন্ত চার দিনের খেলাতে দাঁড়ায়। প্রকৃত-পক্ষে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয় তিন দিন এবং ৬৫ মিনিটের (চতুর্থ দিনের) খেলায়। ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে এই ইডেন উদ্যানেই দেড় দিনের খেলার সময় হাতে থাকতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কাছে ভারতবর্ষ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করেছিল। সে খেলাতে কানহাই উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান (২৫৬ রান) করেছিলেন এবং এবারও করেছেন (৯০ রান)।

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

আণবিক বোমার বহিরাবরণ কি কি ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত এবং একটি বোমাতে সর্বনিম্ন খরচ কত হয়, তাহা জানতে চাই।

সলিলকুমার ভট্টাচার্য
দলমামারা চা-বাগান
আসাম

ইংল্যাণ্ডকে বাংলায় বিলাত, সাহেব বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ফিরিঙ্গী এবং চার্চকে গির্জা বলবার ঐতিহাসিক কারণ কি? শব্দগুলি কিভাবে উদ্ভূত?

বিনায়ক সেনগুপ্ত
মাদ্রাজ

●

পিউট্রিনো টেলিস্কোপ কি? এর ব্যবহার কি? কত সালে এবং কে আবিষ্কার করেন?

বিনয়রঞ্জন পাল
মেদিনীপুর।

●

ক্রিকেট, ফুটবল ও হকিতে বিশ্বশ্রেষ্ঠ কোন্ কোন্ দল?

দীননাথ মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান।

●

(১) স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী বাদে অন্যান্য মন্ত্রীমহোদয়দের নাম (দপ্তরসহ) জানতে চাই।

(২) কোলকাতা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা কোন বছরে, এই কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র ও ডেপুটি মেয়র কে ছিলেন?

(৩) বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার আদি নিবাস কোথায়? তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কি? তাঁর লেখা কি-কি বই আছে?

(৪) দাবা খেলার প্রচলন সর্বপ্রথম কোন্ দেশে হয়?

(৫) এপর্যন্ত কোন কোন দেশের "ক্রিকেট দল" ভারত সফরে এসেছিলেন? এবং অলিম্পিক হকিতে যোগদানকারী প্রথম ভারতীয় হকি দলের অধিনায়কসহ অন্যান্যদের নাম কি?

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
ধনঞ্জয় ঘোষ
মুর্শিদাবাদ

●

১। ভারতীয় রেলওয়ের সর্বমোট দৈর্ঘ্য কত মাইল এবং উহা (ক) কয়টি জোনে বিভক্ত? (খ) প্রত্যেক জোনের প্রধান কার্যালয় ও প্রধান কর্মকর্তার নাম কি? (গ) ব্রডগেজ কত মাইল ও মিটারগেজ কত মাইল?

২। ভারতের সর্ববৃহৎ রেলওয়ে সেতু "শোন নদীর ব্রীজ"-এর দৈর্ঘ্য কত এবং কত খৃঃ অব্দে মোট কত টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়?

৩। নিম্নলিখিত নামগুলির পূর্ণ নাম জানিতে চাই:—

(ক) আচার্য জে, বি, কৃপালনী।
(খ) টি, টি, কৃষ্ণমাচারী।
(গ) এ, কে, গোপালন।
(ঘ) জেনারেল কে, এম, ক্যারিয়াপ্পা।
(ঙ) কে, এম, মুন্সী।
(চ) পি, পি, কুমারমঙ্গলম্।

শ্রীমোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবিনোদ
হাইলাকান্দি (কাছাড়)

(ক) ভারত কোন্ বছর থেকে ডেভিস কাপ খেলছে?

(খ) পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় কে?

(গ) এশিয়ার শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় কে?

অনুপকুমার চক্রবর্তী
তিনসুকিয়া, আসাম।

●

(ক) হাওড়া ব্রীজের নক্সা কে প্রস্তুত করেন? কবে কাজ শুরু হয় এবং কবে শেষ হয়?

(খ) প্রথম ছাপাখানা কত সালে এবং বিশ্বের কোথায় স্থাপিত হয়?

জ্যোতির্ময় বিশ্বাস
চব্বিশ পরগণা।

(উত্তর)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত অপূর্ব চক্রবর্তীর (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাজ্য হচ্ছে মালে দ্বীপপুঞ্জ। (খ) প্রশ্নের উত্তর হলো—পৃথিবীর সর্বোত্তর ও সর্বদক্ষিণে অবস্থিত শহর হল যথাক্রমে হ্যামারফেস্ট ও পুন্টে আরেনাস্। (গ) প্রশ্নের উত্তর হলো—ইউরিনিয়াম আবিষ্কার করেন অটোহ্যাম এবং চূর্ণীকরণ আবিষ্কার করেন মিঃ কসি।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত দিলীপকুমার বৈরাগ্যের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, রাডার আবিষ্কার করেন একাধিক বৈজ্ঞানিক, যেমন ১৯৩৫ খৃঃ বৃটিশ ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর রেডিও ব্রাঞ্চের গবেষকগণ এবং ১৯৩৮ খৃঃ রাজকীয় বিমানবাহিনীর গবেষকগণ।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত সন্তোষকুমার গুপ্তের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, O-K-এর পুরো কথাটি হল All correct.

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত শিখা ও মান্তু দাশগুপ্তের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, পৃথিবীর বৃহত্তম নগর টোকিও, বৃহত্তম রেলস্টেশন গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাস, বৃহত্তম রেলপথ হল ট্রান্স সাইবেরিয়ান। (ঘ) প্রশ্নের উত্তর হলো—দৈর্ঘ্যে ভারতীয় রেলপথ পৃথিবীতে চতুর্থস্থানীয়।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম গ্রেটব্রিটেনে রেলগাড়ী চলাচল করে।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত বিমলেন্দু পট্টনায়কের (খ) প্রশ্নের উত্তর হলো—ফাউন্টেনপেন আবিষ্কার করেন ১৮৮৪ খৃঃ আমেরিকার ওয়াটারম্যান।

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত নির্মলকুমার ঘোষের (ক) প্রশ্নের উত্তর হলো—১৮৩৭ খৃঃ ইংরাজ গবেষক আইজাক পিটম্যান শর্টহ্যাণ্ড প্রবর্তন করেন।

মোহান্ত গুরুসদয় বিদ্যাবিনোদ
হাইলাকান্দি, আসাম।

●

বিগত ৩১ সংখ্যায় প্রকাশিত বেলা চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির নাম যথাক্রমে বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্থান মালয়েশিয়া, সিংহল, নাইজেরিয়া, সাইপ্রাস, ঘানা, কেনিয়া, জ্যামাইকা, টাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, উগান্ডা, সিয়েরালিয়ন, মালবী (নিয়াসাল্যাণ্ড)।

ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্যামল সান্যাল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার জন্ হল্যাণ্ড সাবমেরিন আবিষ্কার করেন। (খ) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুলের নাম "এমোরফোফ্যাল্লস,সলিটানাম"। এটি দেখতে কচু ফুলের মত। লম্বায় ১৬।১৭ ফুট। এটি সুমাত্রার ফুল, ঐ দ্বীপেরই আর একটি বড় ফুলের নাম 'র‍্যাফলেসিয়া'—এটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় আড়াআড়িভাবে প্রায় ৩ ফুটই।

একই সংখ্যায় প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতির প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল হতে ২১ জুন পর্যন্ত আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা "রাষ্ট্রসংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন ও এর সনদে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৫ এর ২৪ অক্টোবর এই প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

দিলীপকুমার পাত্র
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান।

●

গত ২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হাসিমোহন নস্করের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে বাংলাদেশে প্রথম ট্রামগাড়ী চলে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়। তখন শিয়ালদহ, চৌরঙ্গী ও চাঁদপুর অঞ্চলে প্রথম ট্রাম লাইন খোলা হয়। অবশ্য এ ট্রামগাড়ী ঘোড়ায় টানত। বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রচলন হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৪ খৃঃ আগস্ট মাসে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। বাংলাদেশে প্রথম ইলেকট্রিক আলো জ্বলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায়। প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। বাংলাদেশে প্রথম টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে।

দিলীপকুমার পাত্র
জকুলপাড়া, রাণীগঞ্জ।

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। ঊনচল্লিশ ।।

মৃতদেহ বিভাস দত্তর।

জ্যোতিরাণী সামনে বসে আছেন। দেখছেন চেয়ে চেয়ে। কাঁপছেন। তাঁর সত্তাসুদ্ধ কাঁপছে। মৃত বিভাস দত্ত তাঁর সামনে শয়ান। শবের জীবন্ত অভিযোগ দেখছেন তিনি। অভিযোগ তাঁরই ওপর, তাঁরই প্রতি। দুর্বহ নিঃসঙ্গতার অভিযোগ, অপরিপূর্ণ বাসনার অভিযোগ, জীবনের বহু-ব্যর্থতা বহু-সংকট থেকে তাঁকে টেনে তোলার বিনিময়ে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত অবজ্ঞার অভিযোগ, উত্তর-যৌবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা আকুতি আমন্ত্রণ উপেক্ষার অভিযোগ—অসময়ে এই জীবনান্ত ঘটানোর অভিযোগ। আভাসে আচরণে এই অভিযোগ বিভাস দত্ত গত ছ' মাস ধরে করে আসছেন। কোর্টের বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণার তৃতীয় দিনে বালিশের তলায় ওমর খৈয়াম চাপা দিয়ে বলেছিলেন ঘরে তিনি একলা ছিলেন না। প্রত্যক্ষভাবে সেটাই শুরু। তারপর এই ছ' মাস ধরে কখনো অসুস্থতার আড়াল থেকে নির্বাক ব্যথাতুর আবেদনে তাঁকে বিচলিত করতে চেয়েছেন, কখনো বা কঠিন দুর্ভেদ্য অভিমানের আড়াল থেকে। কখনো কালীদার মুখে শোনা তিন-রাস্তার ত্রিকোণ দালানের মালিকের অনেক ব্যভিচারের নগ্ন-বার্তা সামনে তুলে ধরে বিগত স্মৃতি নির্মূল করে দিতে চেয়েছেন, কখনো বা কলমের ডগায় ক্ষোভ ঢেলে রমণীর ছিন্ন-ভিন্ন ভগ্নজীবনের আত্মবঞ্চনাকারী অন্ধ অবুঝ সংস্কারের প্রতি নির্দয় আঘাত হানতে চেষ্টা করেছেন।

জ্যোতিরাণী কাঁপছেন থরো-থরো, আর সত্তা-দুমড়নো শবের অভিযোগ দেখছেন। দেখছেন, ওই অব্যক্ত অভিযোগ কানেও শুনছেন। তিনি দেখতে চান না, শুনতে চান না। তবু দেখতে হচ্ছে, তবু শুনতে হচ্ছে। অভিযোগের এই রূপ এই বাণী তিনি কল্পনাও করেন নি। চিৎকার করে তিনি ওই ঘুম ভাঙাতে চান, ওই নিষ্প্রাণ দেহ ঠেলে তুলে দিতে চান, আত্ম-হননের এই মর্মান্তিক দায় থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে বলতে চান। কিন্তু বাইরে তিনি পাথর হয়ে গেছেন, টুঁ শব্দটিও করতে পারছেন না। তিনি শুধু দেখছেন। অভিযোগ দেখছেন। চরম প্রতিশোধ দেখছেন।

...আরো কি-যেন দেখছেন জ্যোতি-রাণী। আরো কাদের দেখছেন। দেখছেন না, ওই নিশ্চল দেহ তাঁর দু' চোখ আগলে রেখেছে—দেখার মত করে অনুভব করছেন। শমীটা আর্তনাদ করে কাঁদছে, অথচ কান্নার এতটুকু শব্দ তাঁর কানে আসছে না। কারা সব কথা বলছে, কিন্তু জ্যোতিরাণী কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। শব্দ এখানে অনুভূতির গ্রাসের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, স্পর্শবাহী নৈঃশব্দের গভীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক চেয়ে-চেয়ে জ্যোতিরাণী দেখছেন শুধু। দেখছেন আর কাঁপছেন থর-থর করে। কাঁপুনিটা সত্তার এত গভীরে যে বাইরে তারও প্রকাশ নেই। কিন্তু আর পারছেন না তিনি দেখতে, আর পারছেন না এই শব্দশূন্য অভিযোগ শুনতে।

প্রাণপণে একবার ডেকে দেখবেন ওই নিস্পন্দ দেহে সাড়া জাগান যায় কিনা? শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখবেন ওই আত্মবিনাশী দেহটাকে ডেকে তোলা যায় কিনা?

ধড়মড় কর উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী। কোথা থেকে কোথায় উঠে বসলেন ঠাওর করতে পারলেন না। ঘর ভর্তি আবছা অন্ধকার। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। বুকের কাঁপুনি ঠাস-ঠাস করে কানে বাজছে এখন। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সত্রাসে সামনে খুঁজছেন কি। না, কিছু না, শমী ঘুমুচ্ছে। তিনি শয্যায় বসে আছেন। বোর্ডিং-এ, নিজের ঘরে। আঁচলে করে কপালের আর গলার ঘাম মুছে নিলেন। তারপর চোখ বড় করে চারদিক দেখলেন আবার। কাঁপুনির রেশ লেগেই আছে তবু।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার ছাঁত করে উঠল ভিতরটা। পুবের আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। একটু বাদে ভোর হবে। ভোর রাতে এ-কি দেখে উঠলেন তিনি। ভোরের স্বপ্ন সম্পর্কে ছেলেবেলার সংস্কার ভয়াবহ চিত্রটা মুছে যেতে দিল না। কিছু ঘটে গেল?

সকাল হয়েছে। মেয়েদের ঘুম ভেঙেছে। বোর্ডিং-এ সাড়া জেগেছে। চা-টা খেয়ে শমী পড়তে বসে গেছে। দিনের আলোয় স্বপ্নের বিভীষিকা মুছে ফেলতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু মোছা যাচ্ছে না। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনলে চমকে উঠছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সচকিত হয়ে উঠছেন। একটা কিছু দুঃসংবাদ আসতে পারে যেন। আসা সম্ভব নয়। বিভাস দত্তর ভাল-মন্দ কোন খবর এখনে পেঁছে দেবার মত পরিচিত কেউ নেই। তাঁর বাড়ির বাদ-বাকী ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সব অবাঙালী। তেমন মুখ-চেনাও নেই কারো সঙ্গে। কিন্তু এ

আবার কি ভাবছেন জ্যোতিরাণী? স্বপ্ন স্বপ্নই—খবর আবার কি আসবে?

কিন্তু ভাবনার কারণ আছে। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ও বাড়ছে। স্বপ্নটা বাস্তবের মতই ভিতরে ভিতরে ছায়া বিস্তার করে চলেছে।

...দিন আঠার-কুড়ি আগে একটা বড় রকমের বোঝাপড়া হয়ে গেছে বিভাস দত্তর সঙ্গে। কোনরকম সোরগোলের বোঝাপড়া নয়, প্রত্যাশা বিলোপের বোঝাপড়া। আর মাত্র গত সন্ধ্যায় বিভাস দত্তর কিছু অব্যবস্থিত চিত্ত হাব-ভাব কার্যকলাপ দেখে এসেছেন।

কোর্ট থেকে বিচ্ছেদের রায় বেরুবার পরে এই একটানা ছ' মাস ধরে যথার্থই বুঝে আসছিলেন জ্যোতিরাণী। এই এক-জনের অবুঝ প্রত্যাশার সঙ্গে। নিবিড় প্রতীক্ষার সঙ্গে। প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা দিনে-দিনে উন্মুখ হয়ে উঠছিল। কথায়-বার্তায় মানে-অভিমানে, অসহিষ্ণুতায় অস্থিরতায়, কলমের আঘাতে-আবেদনে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আর সেই তাড়নায় ভদ্রলোক আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কোন কোন ছুটির দিনে জ্যোতিরাণী শমীকে নিয়ে আসা বন্ধ করতে শুরু করে-ছিলেন। তার জবাবে বিভাস দত্ত নিজেই পর-পর ক'দিন বোর্ডিং-এ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্কুল ছুটির পরে গেছেন, শমীর পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে সেই আভাস ব্যক্ত না করা পর্যন্ত ওঠার নাম করেন নি। ওঠার সময় বলে গেছেন পরদিন আবার আসবেন। তখন পর্যন্ত জ্যোতিরাণী মুখ ফুটে বলেন নি কিছু। কারণ এবারের এই আসাটা তাঁর অসুবিধের কথা না জেনে না বুঝে আসা নয়। জেনেই আসা, বুঝেই আসা। প্রতিরোধ ভেঙে দেবার সংকল্প নিয়ে আসা।

তবু বলার সময় এলো। দিন কুড়ি আগের কথা। সেদিন শমীকে নিয়ে জ্যোতি-রাণী এসেছিলেন তাঁর ফ্ল্যাটে, একটা ছুটির দিন এড়িয়ে গেলে সপ্তাহের মধ্যে কম করে তিন-চারদিন নিজে হাজির হয়ে তার শোধ তুলবেন।...দু' পাঁচ মিনিট থেকে শমী ওধারের ফ্ল্যাটে চলে গেছল। পাশের ফ্ল্যাটের সমবয়সী অবাঙালী মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মনে হয়, ইদানীং এই মেয়েটার চোখেও কিছু ব্যতিক্রম ধরা পড়ছে বলেই পালায়—তাঁর সামনে বসে থাকতে পারে না।

ও বেরিয়ে যেতে বিভাস দত্ত নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে বলেছিলেন, ট্যাক্সি খরচ করে আসার কি দরকার ছিল, খানিক বাদে আমিই তো যেতাম।

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি অনুভব করে-ছিলেন বলার সময় এলো। চুপচাপ চেয়ে-ছিলেন একটু, তারপর বলেওছিলেন, সেটা ভাল হত?

মুহূর্তে অশান্ত মুখ বিভাস দত্তর। —কেন? কেউ কিছু ভাববে? ভাবলেও লজ্জা পাওয়ার মত এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে সেটা?

—হবে না?

—না। অশান্ত হাতে পকেট হাতড়ালেন, বালিশ ওলটালেন। সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালেন।

জ্যোতিরাণী সেইটুকু সময় অপেক্ষা করলেন।—আপনার ব্লাড সুগার কত এখন?

বিভাস দত্ত সচকিত। অনুকূল ফয়সালার তাড়নার মুখে প্রশ্নটা আঘাতের মত। চঞ্চল দৃষ্টিটা জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর দু-চার মুহূর্ত নড়েচড়ে বেড়াল। —মিগগীর দেখাই নি।...বেশি হলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন?

—আমি নিশ্চিন্তই আছি, দুর্ভাবনা যেটুকু তা আপনাকে নিয়ে। জীবনে আপনি যত উপকার করেছেন ততো আর কেউ করে নি, আপনার ভাল ছাড়া আর কি চাইতে পারি?

সিগারেটে অসহিষ্ণু টান পড়েছে বার কয়েক। তেমনি অশান্ত গাম্ভীর্যে সামনে ঝুঁকেছেন হঠাৎ।—ভাল চান? সত্যি ভাল চান?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমি কি চাই সেটা না বোঝার এত চেষ্টা কেন?

ধীর ঠাণ্ডা মুখে জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, না বোঝার চেষ্টা নয়, বুঝতে আমি চাই না। আপনার ভাল চাই বলেই চাই না।

বিভাস দত্ত বসে থাকতে পারেন নি। উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা করেছেন বার কয়েক, অসুস্থ মুখের কালচে ছোপ ঘন হয়েছে। সিগারেট ফেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।—ভাল চাওয়ার এটাই লক্ষণ তাহলে?

—হ্যাঁ, আমি ঘর করব বলে কারো ঘর ছেড়ে আসি নি। এই ভাঙা-জীবন জুড়তে চেয়ে আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন না, আমাকে কষ্ট দেবেন না।

...চোখের দৃষ্টি তখনই অস্বাভাবিক উদগ্র হয়ে উঠেছিল বিভাস দত্তর। পায়চারি করছিলেন। অস্থিরতা বাড়ছিল, সিগারেট ফেলে নতুন সিগারেট ধরিয়েছিলেন। ফিরে আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন যখন, দুই চোখ ঘোলাটে, প্রায় ক্রুর।—আপনার নিজের কথা থাক, আমার সম্পর্কে আপনার এটাই শেষ চিন্তা?

—হ্যাঁ।

—আর আজকের আসাটাও এটা জানাবার জন্যেই বোধহয়?

—হ্যাঁ, যত দেরি হচ্ছিল ততো আপনার ক্ষতি হচ্ছিল।

—আমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি? বিভাস দত্ত হেসে উঠেছিলেন। হাসি ঠিক নয়, হাসির মতই কিছু। তাও তক্ষুনি মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, আচ্ছা, ক্ষতি আর তাহলে করব না।

প্রত্যাশা বিলোপের ওই আঘাত মুছে দেবার জন্যে জ্যোতিরাণী আরো কিছু বলতে পারলে বলতেন, অশান্ত অবুঝ ক্ষোভ দূর করার হাত থাকলে করতেন। কিছুই বলতে পারেন নি, কিছুই করতে পারেন নি। শমী ফিরতে নিঃশব্দে উঠে এসেছিলেন।

সময় ভোলায়। তাই সময়ের প্রতীক্ষা করেছেন। আঘাত দিতে হয়েছে, কিন্তু সব থেকে উপকারী মানুষকে পরিত্যাগ করে অপমান করতে চান নি। বরং দুই-একবার আসা-যাওয়ার পর ফিরে আবার প্রত্যাশা-শূন্য সহজ যোগাযোগ স্থাপন করার আশা পোষণ করেছেন। তাই শমীকে নিয়ে পরের সপ্তাহে আবার যথারীতি এসেছিলেন। না আসার মত তাঁর দিক থেকে অন্তত বড় কিছুই ঘটে নি বোঝাবার চেষ্টা।

কথা বিভাস দত্ত কমই বলেছেন। মুখে কালচে ছাপ, চোখ বসা, ক' রাত ধরে ভাল ঘুমোন নি মনে হয়। সেদিন শমীকে আর অন্য ঘরে যেতে দেন নি জ্যোতিরাণী। বলেছেন, কাকুর শরীর ভাল না দেখছিস, বোস্।

এতেও বিভাস দত্তর অসহিষ্ণুতা গোপন থাকে নি। শমীর সামনেই ঘোলাটে দু চোখ তাঁর মুখের উপর আটকেছে। —শরীর ভাল না আপনাকে কে বলল?

—দেখতে পাচ্ছি।

জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছিল ভদ্রলোক এবার বলবেন, কর্তব্যের দায় সারার জন্য কষ্ট করে আসার আর প্রয়োজন নেই। বললেন না। একটু বাদে উঠে টেবিলের ড্রয়ার খুলে কি একটা ছাপা কাগজ বার করলেন। ইশারায় শমীকে কাছে ডেকে কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে নাম সই কর।

বিমূঢ় মুখে শমী আদেশ পালন করল। কাগজ আর কলম বিভাস দত্ত জ্যোতিরাণীর সামনে ধরলেন। ছাপার অক্ষরে গার্জেন লেখা জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, আপনি এখানটায় সই করুন।

ছাপা ফর্মের উল্টো দিকে সই করার ঘর। ছাপার অক্ষরে কি-সব লেখাও আছে। কিন্তু ভদ্রলোকের সহিষ্ণুতায় আরো চিড় খাবার ভয়ে জ্যোতিরাণী পড়ে দেখার অবকাশ পেলেন না।—কি এটা?

বিড়বিড় করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, শমীর গার্জেন হিসেবে নামটা শুধু সই করুন, ভয়ের কিছু না। অবশ্য গার্জেন হতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আলাদা কথা—

জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি সই করে দিয়ে বাঁচলেন। যত দূর মনে হল ভদ্রলোক শমীর ব্যাপার বৈষয়িক কিছু চিন্তা করছেন।

তার পরের সপ্তাহেও এসেছেন। দেখা হয় নি। ঘর তালা-বন্ধ ছিল।

গতকাল স্কুলে তাঁর টেলিফোন।...স্কুল ছুটির পর সন্ধ্যার দিকে একবার এলে ভাল হয়, দরকারী কথা আছে। টেলিফোনে বিভাস দত্তর গলায় হাসির রেশও কানে এসেছে একটু, বলেছেন, আপনার ভয় পাওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়ার মত কোন কথা নয়, নিশ্চিন্ত মনেই আসতে পারেন।

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি কথা দিয়েছেন যাবেন।

যেতে-যেতে সন্ধ্যা গড়িয়েছিলে। শমীকে পড়তে বসিয়ে একাই বেরিয়েছিলেন। একলা যেতে অস্বস্তি বোধ করেছেন, কিন্তু দরকারী কথা আছে শুনেও ওকে সঙ্গে নেওয়াটা আর একজনের চোখে নিশ্চিন্তে যেতে না পারার নজির হবে।

বিভাস দত্ত বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়েছিলেন। পাশের অ্যাশপট সিগারেটের টুকরোয় ভরে গেছে। মাঝে ডাক্তারের সতর্কতায় সিগারেট খাওয়া কমাতে হয়েছিল। অন্য দিন হলে অত খাওয়া সিগারেট দেখে জ্যোতিরাণীও বলতেন কিছু, আগে বলেছেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়েছে ও-সব সতর্কতার যেন দিন ফুরিয়েছে। ঝড়ের পরে ঠান্ডা মূর্তি।

—শুয়ে যে, শরীর কেমন?

ফ্যাকাশে মুখে বিভাস দত্ত হাসতে চেষ্টা করেছেন একটু। জবাব দেন নি। অর্থাৎ শরীর সম্পর্কে আগ্রহ নেই। জিজ্ঞাসা করেছেন, এ-সময়ে ডেকে অসুবিধেয় ফেলেছি বোধহয়?

—না অসুবিধে আর কি।

—ট্যাক্সিতে এলেন?

জ্যোতিরাণীরও সহজ হবার চেষ্টা। হেসে জবাব দিয়েছেন, শেষের অর্ধেকটা—ট্রাম বদল করতে নেমে আর ওঠা গেল না।... রোববারে কোথায় ছিলেন, এসে দেখি ঘর তালা-বন্ধ?

বিভাস দত্তর মুখে সেই রকমই নিষ্প্রভ নির্লিপ্ত হাসি। পাবলিশারদের বাড়ি-বাড়ি পাওনা কুড়াবার নোটিস দিতে গেছলাম।

জ্যোতিরাণী প্রাচুর্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিন বছরের ওপর হয়ে গেল। তবু অনটনের কথা বলা বা শোনায় ব্যাপার সহজ হতে পারেননি। হঠাৎ বেশি টাকার কেন দরকার হল জানেন না। এই দরকারে আরো কিছু গয়না অনায়াসে বার করে দিতে পারেন। কিন্তু আভাসেও তা ব্যক্ত করলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। কোন্ দরকারী কারণে তাঁকে ডাকা হয়েছে শোনার প্রতীক্ষা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিভাস দত্ত আঙুলের ইশারায় ঘরের কোণের স্যুটকেসটা দেখিয়ে বলেছেন, ওটা খুলুন একটু, ওপরেই একটা খাম আছে দেখুন—

জ্যোতিরাণী অবাক, ভিতরে ভিতরে সচকিতও। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করা থেকেও যা বললেন সেটা করা সহজ। উঠে স্যুটকেস খুললেন। কাপড়-জামার সঙ্গে আরো কি একটা চোখে পড়ল, ওষুধের ফাইল। মন বাদামী রঙের লম্বাটে খামটার দিকে, তাই দেখেও খেয়াল করলেন না। খাম হাতে নিয়ে ফিরলেন।

—আপনার কাছে রেখে দিন, ওটা শমীর। দরকার মত ভাঙাবেন নয়তো বছর-বছর বদলে নেবেন।

জ্যোতিরাণীর দ্বিগুণ বিস্ময়। কিছু না বুঝে খামে হাত ঢোকালেন। কিছু দিন আগে কি একটা ফর্ম সই করেছিলেন মনে পড়ল।

খামের মধ্যে ছাপা-কাগজসহ তিন হাজার টাকার সরকারী বন্ড একটা শমীর নামে। তিনি তার গার্জেন।

—কি ব্যাপার?

—সামান্যই। ওর দায় তো সব আপনিই নিলেন। মেয়েটার ভাগ্য ভাল, সব গেলেও শেষ পর্যন্ত আবার মা পেয়েছে। তবু নিজের সান্ত্বনার জন্যে যেটুকু করা গেল... আমার ক্ষমতা তো আপনি ভালই জানেন।

—কিন্তু এই সান্ত্বনার ব্যবস্থাও পরে করলে চলত না? সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল?

বিভাস দত্তর নির্লিপ্ত হাসি নরম মনে হয় নি একটুও। জবাব দিয়েছেন, যাচ্ছে না এই গ্যারান্টিই বা কে দেবে। কিছু হয়ে বসলে তো মেয়েটা এক পয়সাও পাবে না।... শিগগীরই কোথাও পাড়ি দেবার মতলব আছে, কবে আর দেখা হবে না হবে ঠিক কি।

সেই বোঝাপড়ার পর গত পনেরো দিন ধরে ভদ্রলোককে সুস্থ ঠান্ডা মেজাজে ফিরিয়ে আনার তাগিদ বোধ করেছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু এই শুনে নিজের মেজাজই তেতে উঠেছিল। এও আর এক ধরনের প্রতিশোধ ভিন্ন আর কিছু ভাবা সম্ভব হয় নি।—কোথায় যাচ্ছেন?

—দূরেই বোধহয়, তবে কত দূরে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না।

এও পুরুষের জবাব মনে হয় নি জ্যোতিরাণীর। প্রতিশোধের ছকে-বাঁধা দুর্বল অস্ত্র ভিন্ন সেই মুহূর্তে আর কিছু ভাবেন নি। নিজেকে সংযত করে কিছু বলতেন হয়ত। হাতের খামটা তাঁর শয্যার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলেও যেতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই দোরগোড়ায় অচেনা আগন্তুকের সাড়া পাওয়া গেল। বিভাস দত্ত ভিতরে ডেকে বসতে বললেন তাঁকে। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে অপ্রস্তুত একটু।

জ্যোতিরাণীর তক্ষুনি মনে হল, এ-যাবত তাঁর উপস্থিতিতে ঘরে পরিচিত বা অপরিচিত কোনো আগন্তুকের পদার্পণ ঘটেনি। বিভাস দত্তর আচরণে আরো একটু ব্যতিক্রম অনুভব করলেন। গম্ভীর মুখেই তাঁর দিকে ফিরে বলেছেন, রাত হল, অনেকদূরে যাবেন, আপনার আর দেরি করা উচিত নয়।

অর্থাৎ তাঁর দরকারী কথা ফুরিয়েছে। নিজে থেকে কখনো যেতে বলেছেন মনে পড়ে না। অগত্যা খামটা হাতে করেই উঠতে হয়েছে। —আপনি কবে যাচ্ছেন?

—শিগগীরই বোধহয়। যাবার আগে জানাব।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়েই জ্যোতিরাণী ঘরে ফিরেছিলেন। আত্মপীড়নের এই রাস্তা বেছে নেওয়া হবে ভাবেননি। শরীর সুস্থ নয় বলেই দূরে যাওয়ার অনড় অভিমান, আর টাকা-পয়সার অবস্থা স্বচ্ছল নয় বলেই
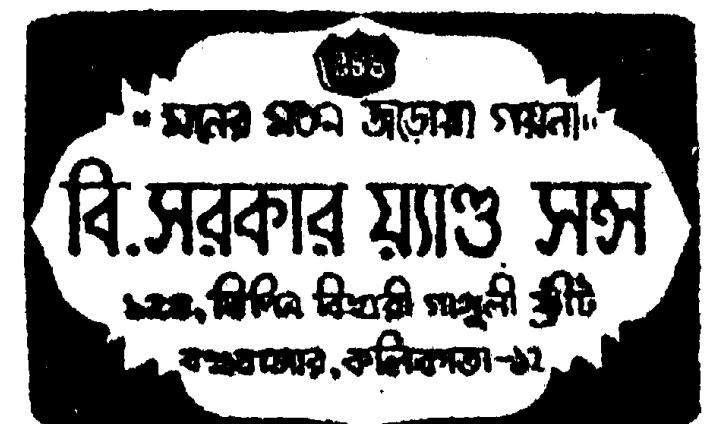
শমীর নামে তিন হাজার টাকার বন্ড কিনে দিয়ে তাকে বেঁধার চেষ্টা। এই করে তাকেই শুধু আক্কেল দেওয়া হল। এর থেকে আর একটু বলিষ্ঠ আচরণ অন্তত জ্যোতিরাণী আশা করেছিলেন।

কিন্তু ঘরে ফেরার পর বিরক্তি আর ক্ষোভের তলায় কি এক অজ্ঞাত অশান্তি উকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। রাতের নিরিবিলি শয্যায় সেই অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ আরো বেড়েছে, অথচ তিনি ধরতে পারেননি এ-রকম লাগছে কেন। জীবনের গোড়া থেকে একটা লোক উপকারের বিনিময়ে অবুঝ আক্রোশে যে আত্মপীড়নের পথে চলেছে তার নির্মম ফলাফলের সম্ভাবনা চিন্তা করে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর রাতের এই স্বপ্ন। রাতের নয়, ভোর রাতের।

বেলা বাড়ার পরেও অস্থিরতা দূর হয়নি। স্বপ্নের দৃশ্য যতবার মনে পড়েছে ততোবার কেঁপে উঠেছেন তিনি। কিছু ঘটেই গেল? খবর পাবেন কি করে? ...থেকে থেকে মানুষটার বিগত সন্ধ্যার কথা-বার্তা হাব-ভাব মনে পড়েছে। অশান্তির তাড়নায় শমীকে আড়াল করে এক-একবার জানলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন তিনি। যেন ওই জানলা দিয়েই কাউকে দেখতে পাবেন, কিছু একটা খবর পাবেন।

...বলেছিল কবে আর দেখা হবে না হবে ঠিক কি। এ কথার অর্থ তো অনেক কিছুই হতে পারে।

...কোথায় যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, দূরেই বোধহয়, তবে কত দূরে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না।

এ-কথারই বা অর্থ কি? দূরে মানে কত দূর? এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না বলার অর্থ আরো কি হতে পারে?

যা হতে পারে ভাবতে গিয়ে চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘন হয়ে উঠল আরো। সঙ্গে সঙ্গে আবার কি মনে পড়তে চমকেই উঠলেন। বন্ড-এর খাম বার করার জন্য ভদ্রলোকের স্যুটকেস খুলতে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়েছিল তা ঠিক এই মুহূর্তেই মনে পড়ল কেন? ঘুমের ওষুধের ফাইল একটা। অত ঘুমের ওষুধ কেন? ওটা স্যুটকেসেই বা কেন? বিলিতি বইয়ে স্লিপিং পীল্-এর অনেক মর্মান্তিক ভূমিকার কথা পড়া আছে। বিভাস দত্তর কি মতলব?

স্কুলে যেতে পারলেন না। গেলেন না। শমীকে বললেন, শরীরটা ভালো লাগছে না। ও স্কুলে চলে গেলো যত ভাবছেন রাতের দৃশ্য ততো কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে। খবর দেবার কেউ নেই, থেকে থেকে তবু উৎকর্ণ সচকিত হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। কেউ যেন কিছু একটা খবর দিয়ে যেতে পারে। অঘটন কল্পনা করে বেদনা বা অনুকম্পায় অস্থির হয়ে উঠছেন না তিনি। উল্টে চোখে মুখে শুকনো কঠিন ছাপ পড়ছে একটা। এত বড় আঘাতের বোঝা যদি কেউ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয় তাকে তিনি কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

একটায় শমী টিফিন খেতে আসবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। টিফিন খেয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরে ভিড় কম, অনায়াসেই ট্রাম-বাসে যেতে পারতেন। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ট্যাক্সিতে উঠলেন।

ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াবার পর এতক্ষণের আচ্ছন্ন ভাব কেটে আসতে লাগল। না কিছু হয়নি। যা দেখেছেন তা স্বপ্নই। অবচেতন মনের নানা ভাবনা-চিন্তার প্রতিক্রিয়া। এবারে সংকোচ। যেমন নিঃশব্দে এসেছেন তেমনি ফিরে যাবেন কিনা ভাবলেন একবার। কিন্তু অস্বস্তি একেবারে মিলিয়ে যায়নি। আর দেখা না হতে পারে বলেছেন, অনেক দূরে পাড়ি দেবার কথা বলেছেন, স্যুটকেস-এ এক-গাদা ঘুমের ওষুধ রেখেছেন। ...আর ভোর-রাতের ওই স্বপ্ন। ওটা পূর্বগামিনী ছায়া কিনা কে জানে?

দরজার কড়া নাড়তে হবে ভেবেছিলেন। তার আগে ঠেলে দেখলেন। ভেজানো ছিল, খুলে গেল।

বিভাস দত্ত অপ্রস্তুত। অবাক।

তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় ভিতর সুস্থির নয় একটুও। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। উসকো-খুসকো মূর্তি। চোখের কোণে কালি। ভিতরে ভিতরে অশান্ত কিছুর বোঝাপড়া চলছিল। মানসিক অস্থিরতার মুখে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন যেন।

জ্যোতিরাণীর মনে হল তিন সপ্তাহ আগে সেই প্রত্যাশা নাকচের দিনেও অনেকটা এই গোছের অসহিষ্ণুতা, এই-রকম উদ্‌ভ্রান্ত মুখ দেখেছিলেন। আজ তার থেকে বেশি দেখছেন। গতকাল তিনি আসবেন জেনেই নিজেকে তিনি সংযত রেখেছিলেন, এই চেহারাটা গোপন রেখেছিলেন।

—কি ব্যাপার, এ সময়ে যে......স্কুল নেই?

—যাইনি।

—ও, আমারই ভাগ্য . বলতে হবে, বসুন।

বললেন বটে, কিন্তু স্নায়ুর যে নিপীড়নে মানুষ দোর বন্ধ করে একলা থাকতে চায় সেই গোছের বিরস মুখ এখনো। জ্যোতিরাণীর মনে হল স্বপ্নের অঘটন এই মানুষই শুধু ঘটাতে পারে। ঘরের চেয়ার দুটো দেয়ালের কোণে সরানো, শয্যার এক-ধারে বসলেন তিনি। বললেন, কাল লোক এসে যেতে আপনার মনে কি আছে শোনা হল না। তাই এলাম।

বিভাস দত্ত হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। হাসির বদলে মুখে বিদ্রূপের দাগ কেটে বসল। বালিশ উল্টে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিলেন। সিগারেট ধরালেন। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার তাগিদ। কিন্তু পেরে উঠছেন না। কয়েক পা এগিয়ে একটুও খেয়াল না করেই দরজা দুটো ঠেলে ভেজিয়ে দিলেন। ঘরে একলা থাকলে যা করতেন। তারপর বললেন, আপনার অশেষ অনুকম্পা।

জ্যোতিরাণীর নিষ্পলক . দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থেকে নড়ে নি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল তো মোটামুটি ভালই দেখে গেছলাম, আজ খারাপ দেখছি কেন?

বিড়বিড় করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, ও কিছু না, রাতে ভাল ঘুম হয় নি।

জ্যোতিরাণীর দৃষ্টি ওই মুখের ওপর আরো এঁটে বসছে। বললেন, না ঘুমিয়ে শরীর খারাপ করার থেকে এক-আধটা ঘুমের ওষুধ-টষুধ খেয়ে ঘুমুলেও তো পারতেন।

ঘরের কোণ থেকে চেয়ার মাঝখানে টেনে এনে বসলেন বিভাস দত্ত। সহজতার বিবর ঢোকার চেষ্টার ত্রুটি নেই। বললেন, খেয়েছিলাম, কাজ হয় নি। খেয়ে-খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে বোধহয়—

ভিতরের একটা জমাট-বাঁধা শঙ্কা হাল্কা হতে থাকল। বললেন, তাহলে ও-সব না খাওয়াই ভাল।

সিগারেট মুখে তুলতে গিয়েও তোলা হল না। সহিষ্ণুতায় চিড় খেল হঠাৎ। —আপনি আমার ভাল-মন্দ নিয়ে উতলা হতে চেষ্টা করছেন কেন?

উক্তিটা কানে লাগার মত। জ্যোতিরাণী চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?

জবাব দেবার আগে আবার ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা। চেষ্টাই শুধু। কিন্তু ক্ষোভের জবাবটা আপনিই ঠেলে বেরুলো।—যাবার ইচ্ছে তো অনেক দূরে, এত দূরে যে ভাবতে নিজেরই খারাপ লাগে, বুঝলেন?

জ্যোতিরাণী কি ভিতরে ভিতরে নাড়া খেলেন একপ্রস্থ? বাইরে বোঝা গেল না। দু চোখের আওতা থেকে ওই মুখের একটা রেখাও অলক্ষ্যে নেই। বললেন, আপনি পুরুষ মানুষ তার ওপর এত বড় লেখক, একথা আপনার সাজে?

এই সামান্য কথা-কটার মধ্যে কি-যে ছিল জ্যোতিরাণী জানতেন না। নিজের ওপর দখল আনার শেষ ঐকান্তিক চেষ্টাও হঠাৎ ধূলিসাৎ বুঝি। কালি-পড়া দু চোখের

গভীরের এক অনাবৃত তপ্ত যাতনা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আসছেই। সিগারেট ফেলে বিভাস দত্ত উঠে এসেছেন। কাছে। ঈষৎ ঝুঁকে তাকিয়েছেন। স্নায়ুর তাড়নায় দুই ঠোঁট কাঁপছে।—পুরুষ মানুষ...এত বড় লেখক...সাজে না...না? গলার স্বরও হিস-হিস শব্দের মত।—সাজে না বলেই তাকে আমি ক্ষমা করতে চাই না, তাকে আমি শাস্তি দিতে চাই...এক-এক সময় এত কঠিন শাস্তির কথা মনে হয় যা শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। কিন্তু পারি না কেন? কেন পারি না? কেন পারি না? তিলে-তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছি, বুকের হাড়-পাঁজর সব বরফ হয়ে গেল তবু কেন পারি না?

জ্যোতিরাণী নিশ্চল নিস্পন্দ।

আরো কাছে এগোলেন বিভাস দত্ত, আরো ঝুঁকলেন। দু হাত তাঁর দুই কাঁধে উঠে এলো। ঠোঁট দুটো শুধু নয়, ওই হাতের স্পর্শে মানুষটার সর্বাঙ্গ কাঁপছে টের পেলেন। গলার স্বর, কথাগুলো কানের পর্দায় বিঁধেই চলল।—আজ থেকে নয়—সতেরো বছর ধরে এই যন্ত্রণা পুষছি আমি। শিবেশ্বরের ছোট্ট বাড়িতে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিন থেকে—কালীঘাটের মন্দিরে যে-দিন দেখেছিলাম, তখন থেকে—। যেদিন চিঠি লিখেছিলাম, তখন থেকে—দাঙ্গার কাটাকাটির মধ্যে গ্রাসে ভিম হয়েও যখন ছুটে না গিয়ে পারি নি তখন থেকে—প্রতিদিন প্রত্যেক দিন। এ-যন্ত্রণার খবর তুমি জান না? বোঝ না? যখন উপায় ছিল না তখন জেনেও জানতে চাও নি কেন বুঝি, কিন্তু এখনো চাও না কেন?

কাঠ হয়েই ছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু সচকিত হঠাৎ। হাত দুটো তাঁর কাঁধে, কিন্তু মানুষটা টলছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন যেন। বাতাসের অভাবে যেন চেহারা কি-রকম হয়ে যাচ্ছে। মনে হল মাটিতেই পড়ে যাবেন। সামলাতে চেষ্টা করে শয্যায় বসে পড়লেন বিভাস দত্ত। তারপর শুয়ে পড়লেন। মুখ ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে। ইশারায় পাখাটা দেখালেন।

ত্রস্তে উঠে জ্যোতিরাণী সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলেন। তারপর কাছে এসে সামনে ঝুঁকলেন। বিবর্ণ মূর্তি দেখে বিষম ভয় পেয়েছেন, বুকে হাত রাখতে গিয়েও পারলেন না। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

জবাব দেবার আগে বিভাস দত্ত বড় করে দম নিতে চেষ্টা করলেন একটা। এবারে নিতে পারলেন। তারপর এক হাত বাড়িয়ে জ্যোতিরাণীর ঝুঁকে-পড়া কাঁধের দিকটা সজোরে আঁকড়ে ধরলেন, অন্য হাতে তাঁর হাত ধরে তাঁকে কাছে টেনে বসালেন। তেমনি অসহিষ্ণু উত্তেজনায় বললেন, ও কিছু না, কদিন ধরে মাঝে মাঝে এ-রকম হচ্ছে। আমার কথার জবাব দাও, এই যন্ত্রণা নিয়ে আমি থাকব কেন? বাঁচতে চাইব কেন? শিবেশ্বরের ঘর ছাড়তে হল বলে আমি দুঃখিত হতে চেষ্টা করেছি, তোমার দুঃখটা বড় করে দেখা উচিত বলে নিজেকে আমি চোখ রাঙিয়েছি—পারি নি। এত কাল ধরে ভিতরে যার তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সে পিপাসার জল দেখে উল্টে লাফিয়ে উঠেছে। এখনো তুমি তাকে ফেরালে সে কি করবে? কি করবে?

শুধু কথার নয়, তপ্ত নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগছে জ্যোতিরাণীর চোখে-মুখে। সর্বাঙ্গ অবশ পঙ্গু যেন। দুটো হাত নয়, এক উদভ্রান্ত তপ্ত বুভুক্ষ যাতনা অমোঘ আকর্ষণে তাঁকে কাছে ধরে রেখেছে। টেনে রেখেছে। অপ্রকৃতিস্থ জ্বলজ্বলে দুটো চোখ আধ-হাতের মধ্যে তাঁর মুখের ওপর স্থির হতে চেষ্টা করছে। বিচলিত আবেগে গলার স্বর কাঁপছে।—জ্যোতিরাণী আমাকে তুমি বাঁচাতে পার না? আমাকে দয়া করতে পার না? আমি কেমন বড় লেখক জান তুমি? বই বিক্রি অর্ধেকের বেশি নেমে গেছে, প্রকাশকরা এখন আর দৌড়ে আসে না, সকলে বলে আমার লেখা পড়ে গেছে। আমি জানি মিথ্যে বলে না, ঠাণ্ডা মাথায় আমি দু ঘণ্টা বসে লিখতে পারি না, ভাল লিখব কি করে? তোমার জন্যে আমার লেখার এই হাল, শরীরের এই হাল, শুধু তোমার জন্যে! তোমার শুকনো কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমি কি করব? কৃতজ্ঞতার কোন কাজ আমি করি নি, যেটুকু করেছি নিজের প্রাণের দায়ে করেছি—তোমার ওই স্কুলের চাকরির ব্যবস্থাও আমি করি নি, সব করেছে তোমার মামাশ্বশুর গৌর-বিমল—ওদেরই প্রতিষ্ঠানের স্কুল ওটা। আমাকে বলতে নিষেধ করেছিল—আর তোমার কৃতজ্ঞতা চাইনে বলেই বললাম। আমি শুধু তোমাকে চাই, বাঁচতে চাই, তুমি রক্ষা কর, আমাকে বাঁচতে দাও—

দুই হাতের প্রবল তাড়নায় আধ-হাতের ব্যবধান ঘুচে গেল। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ তেমনি। বাধা দেন নি, বাধা দিতে পারেন নি। নিজের অস্তিত্বের বৃন্ত থেকে এক অন্ধ আবেগের আবর্তের মধ্যে খসে পড়েছেন। যে আবেগ এই অস্তিত্বের অণুতে-অণুতে আশ্রয় খুঁজছে, কাঁপছে থরো-থরো। ওই কাঁপুনি জ্যোতিরাণী টের পাচ্ছেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছেন। অধরে, বক্ষপঞ্জরে, কোটিদেশে। তৃষ্ণার এই উদভ্রান্ত নিপীড়নে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে মানুষটা আর কাঁপছে।

জ্যোতিরাণী অসহায়।

কতক্ষণ কেটেছে, একটা যুগের অবসান হয়ে গেল কিনা জানেন না। কাঁপুনি থেমেছে, কিন্তু আশ্রয় পেল কিনা সেই সংশয় এখনো ঘোচে নি। দুটো চোখ তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে দেখলেন, স্থির কিন্তু সেই দৃষ্টির গভীরে অস্থিরতার ঢেউ। ফিসফিস কথাগুলো বুঝি কানের পর্দা কুরে-কুরে মগজে ঢুকল।

—জ্যোতিরাণী, তোমাকে ছেড়ে আমি কোনদিন দূরে যাই নি, এই সতেরো বছরের মধ্যেও যেতে পারি নি। আমি দূরে যেতে চাই না, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি তোমাকে চাই, তোমাকে নিয়ে সংসার গড়তে চাই—গত তিন বছর ধরে এই সংসারের তৃষ্ণা আমাকে পাগল করেছে। এই সংসার পেলে আমি আবার সুস্থ হব, আবার লিখতে পারব, তুমি বলো, বলো—

আস্তে আস্তে উঠে বসেছেন জ্যোতিরাণী। নিজের অগোচরে স্রস্ত বসন সংবৃত করেছেন একটু। তবু আত্মস্থ হতে সময় লেগেছে। আচ্ছন্নতার ঘোর কাটতে সময় লেগেছে। এখনো কেটেছে কিনা জানেন না। দুটো ব্যগ্র চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে। তাঁকে আগলে রেখেছে, ব্যাকুল তৃষ্ণার তাপ ছড়াচ্ছে।

অনেক—অনেকক্ষণ বাদে কিছু বলেছেন তিনি। কি বলেছেন সঠিক জানেন না। নিজের জ্ঞাতসারে বলেন নি যেন। বলেছেন, সে সংসার থেকে কি পাওয়া যাবে, আনন্দেই শেষ, নতুন কেউ আসবে না...।

কোন কথা তলিয়ে বোঝার মত মানসিক অবস্থা নয় বিভাস দত্তর। কিন্তু এই উক্তির তাৎপর্য মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিলেন। প্রথম সন্তান আসার পর অপারেশনের খবরটাও অজ্ঞাত ছিল না তাঁর। জ্যোতিরাণীর এই কথা কটাই সব সংশয় ঘোচার মত, হাতের মুঠোয় অপ্রত্যাশিত উত্তাপ পাওয়ার মত। নিবিড় আবেগে দু হাত বাড়িয়ে আবার তাঁর কাছ থেকেই তাঁকে ছিনিয়ে আনলেন যেন। বলে উঠলেন, চাইনে, তোমার বাইরে আর কিচ্ছু চাইনে আমি—কিছু না—বুঝলে?

সদ্য-পাওয়া আশ্রয়ের উৎস দু হাতে আগলে রেখে তার মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যাবার তাড়না, নিঃশেষে হারিয়ে যাবার আকূতি।

জ্যোতিরাণী তেমনি অসহায়। ভবিতব্যের হাতের তিনি কি পুতুল একখানা?

ডান চোখটা কাঁপছে থেকে থেকে। মাঝের কতগুলো দিন একটা আচ্ছন্নের ঘোরে কেটেছে। আজ হঠাৎ ডান চোখটা কাঁপছে কেন বিকেল থেকে? তিন রাস্তার ত্রি-কোণ-জোড়া বড় দালানের এক বৃদ্ধা বলতেন, মেয়েদের ডান চোখ কাঁপলে অশুভ। মন বলে নিজস্ব কিছু আর তো ধরে রাখতে চান না জ্যোতিরাণী, তবু মনে পড়ল কেন?

কাগজে-কলমে সই হয়ে গেছে। লোকে তাঁকে মিসেস দত্ত বলবে। এখনো কেউ বলে নি, বলবে। খুব নিঃশব্দে মিসেস বিভাস দত্ত হয়েছেন তিনি। জনা-দুই সাক্ষী ভিন্ন বাড়তি কেউ ছিল না। বাড়তি কাউকে চান নি, সেটা মুখ ফুটে বলতেও হয় নি। যাঁর

বোঝবার তিনি বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু গোপন থাকার ব্যাপার নয়। যাঁর ঘরে এসে-ছেন তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ আছে জানতেন না। দেখা গেল আছেই দু'দশজন। অন্তত এই ব্যাপারের পর সানন্দ আগ্রহ দেখাবার মত কেউ-কেউ আছে। তাদের ডেকে একদিন আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করলে বিসদৃশ দেখায় শুনেছেন।

বিভাস দত্ত অনুমতি নেবার মত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জ্যোতিরাণী আপত্তি করেন নি। তাঁর যাই হোক, একজনের জীবনের উৎসব যে, সেটা অস্বীকার করবেন কি করে?

লেখকের অন্তরঙ্গজনেরা রাত্রিতে আসছেন। শমী ব্যস্ত, তার কাকু ব্যস্ত। কিন্তু বিকেল থেকে ডান চোখটা কঁাপছে।

তিনি মিসেস দত্ত, জ্যোতিরাণী দত্ত... এ সত্যটায় অভ্যস্ত হতে আর কত দিন লাগবে? অভ্যস্ত হতে হবে ভাবতেও অদ্ভুত লেগেছে। বসন্ত প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় বাসরে পুরুষ এসেছে। তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। একজনের হাসি মিইয়ে যায় দেখেই তাঁকে হাসতে হয়েছে। অতনু-সান্নিধ্যের প্রথম পুরুষ হিংস্র নগ্ন নির্দয় অত্যাচারী ছিল। তুলনায় দ্বিতীয় বাসরের দ্বিতীয় পুরুষের অনেক ভদ্র অনেক সদয় ভীরু সচেতন পদ-ক্ষেপ। অথচ এই দ্বিতীয় অধ্যায়টাই ব্যভিচারের মত লেগেছিল। বিলিতি উপন্যাসে পড়া যুদ্ধ অঙ্গনের এক নার্সের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। অকরুণ শীতের হিমেল রাতে পর্যাপ্ত আচ্ছাদনশূন্য এক আহত সৈনিককে সমস্ত রাত নিজের নগ্ন দেহের তাপ ছড়িয়ে জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল। সেখানে কোন নীতির প্রশ্ন আঁচড় ফেলে নি। এও তাই। জীবন যুদ্ধের এক মুমূর্ষুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার মতই।

কিন্তু আজ আবার ডান চোখটা কাঁপছে কেন থেকে-থেকে?

...তিন রাস্তার ত্রিকোণ-জোড়া বাড়ির ক'জনে জেনেছে খবরটা? কালীদা জানেন। মাঝে তাঁরই সঙ্গে শমীর কাকার প্রীতির সম্পর্কটা আগের থেকে বেশি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালো মেট বইয়ে কালীদার সেই লেখাগুলো পড়ার পর এই প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাটা একেবারে উদ্দেশ্যশূন্য মনে হয় নি জ্যোতিরাণীর।...কালীদার সঙ্গে নাকি কোথায় দেখা হয়ে গেছল, বিয়ের খবরটা তাঁকে জানান হয়েছে। বিভাস দত্তর কাছে সবার আগে ও-বাড়িতে পৌঁছে দেবার মতই খবর বটে এটা। জ্যোতিরাণী দোষ ধরেন নি। আজকের প্রীতির অনুষ্ঠানে কালী-দারও নেমন্তন্ন হয়েছে নাকি? জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেন নি। তবে মনে হয় না, অতটা নির্দয় হবার সম্ভাবনা কম।

অতীতের যোগ সবই ছিঁড়েছে, তবু কালীদার ওই লেখাগুলো আর তাঁর শকুনি-স্মৃতি পড়ার অস্বাচ্ছন্দ্য মনের কোথাও লেগেই আছে। খবরটা কালীদা ও-বাড়ির কার-কার কানে দিয়েছেন? সবার আগে ও-বাড়ির মালিকের কানেই দেবার কথা। গম্ভীর মুখে কালীদার সেই খবর দেবার প্রহসন জ্যোতিরাণী কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছেন কেন?

সেখানকার আর একজনের জানাটা জ্যোতিরাণী বড় আচমকা অনুভব করে-ছিলেন। তার আগে ওই ভদ্রলোকও কালীদার কাছ থেকেই শুনেছিলেন নিশ্চয়।...মামা-শ্বশুর গৌরবিমল। কি আশ্চর্য। এখন আবার মামাশ্বশুর ভাবছেন কেন! সেই অসহ্য বিড়ম্বনার ছাপ এখনো মুছে যায় নি।

দিন দশেক আগের কথা।

টানা দু মাসের ছুটি নিয়েছিলেন স্কুল থেকে। বিশ দিনও কাটে নি। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কেমন করে আবার ওই স্কুলে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই অস্বস্তি মনের তলায় গোপন ছিল। তিনি লম্বা ছুটি নিলেও শমীর স্কুল আছে। ওকে নিয়েই সমস্যা। মাঝে ট্রাম বদল করা আছে। এই কদিন জ্যোতিরাণী ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছিলেন। একেবারে স্কুল গেট পর্যন্ত নয়। ট্রাম থেকে নেমে স্কুলের রাস্তার মোড়ে ওকে ছেড়ে দিতেন। ছুটি হলে বিভাস দত্ত নিয়ে আসতেন।

ঘটনাটা ঘটল বিয়ের ঠিক দশ দিনের মাথায়। শমীকে ছেড়ে দিয়ে ডিপো থেকে ফাঁকা ট্রামেই উঠেছিলেন জ্যোতিরাণী। পাঁচ-সাতজনের বেশি লোক ছিল না ট্রামে। পরের স্টপেজে যিনি উঠলেন, দেখা-মাত্র জ্যোতিরাণীর হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম।

গৌরবিমলবাবু।

লেডীস সীট ছাড়িয়ে সামনে বসেছেন, তারপর খেয়াল হতে ফিরে তাকিয়েছেন। ধরণী দ্বিধা হলেও জ্যোতিরাণী তখন স্বস্তিতেন বোধহয়।

গৌরবিমল চেয়েই রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে বসলেন আবার। গম্ভীর ঠাণ্ডা দু' চোখ সামনের দিকে ফেরালেন। তাঁর এত গম্ভীর নিস্পৃহ মুখ জ্যোতিরাণী আর দেখেন নি।...টিকিটের পয়সা দেবার জন্য ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন দেখলেন। পয়সাও বার কর-লেন। কিন্তু সামনেই স্টপেজ আর একটা।

গৌরবিমল উঠে পড়লেন। দু' সারির সরু ফাঁক দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন। আর ফিরেও তাকালেন না। চেনেন না কাউকে, চেনার ইচ্ছেও নেই। কণ্ডাক্টরের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে ট্রাম ভাল করে থামার আগেই নেমে গেলেন।

জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখ লাল। কানের দু' পাশ গরম ঠেকছে। নিশ্চল বসেছিলেন তিনি। তার পরেই মনে পড়েছে, ওই ভদ্র-লোকের অনুকম্পাতেই সাড়ে তিন বছর ধরে স্কুলে চাকরি করছেন তিনি। অনায়াসে সহকারী হেডমিস্ট্রেস হতে পেরেছেন।... ছুটির পরে আবার তাঁরই দেওয়া অনু-গ্রহের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।

সেই দিন আর তার পরের পাঁচ-সাত দিনের জন্য আচ্ছন্নতার ঘোর কেটে গেছল জ্যোতিরাণীর। আবার তিনি সজাগ হয়ে উঠেছিলেন, তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিলেন। ধমনীতে উষ্ণ স্রোত অনুভব করেছিলেন।

ফ্ল্যাটে ফিরেই বিভাস দত্তকে বলেছেন, ওই স্কুলের চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কালই। আর শমীকেও দু-চার দিনের মধ্যে এদিকের কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভাস দত্ত বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। বক্তব্য শুনে নয়, তাঁকে দেখেই।—কি ব্যাপার?

—কিছু না। চেষ্টা করলে এদিকের কোন স্কুলে কাজ পাওয়া অসম্ভব হবে না বোধহয়, একটু সময় লাগতে পারে। অসুবিধে হবে?

—আমার! আমার কি অসুবিধে! ওই তপ্ত মুখ দেখে তিনি শঙ্কা বোধ করে-ছিলেন, কিন্তু ভালও লেগেছিল। কিছু যে হয়েছে বুঝেছেন, কিন্তু আর জেরা করেন নি। বলেছেন, এ-সময়ে স্কুল ছাড়লে শমীর অসুবিধে হবে না?

—আমি ঠিক করে নেব। আর বাস আছে এ-রকম একটা ভাল স্কুলে দেব তাকে। ওর ক্ষতি হতে দেব না।

পরদিনই চাকরি ছাড়ার চিঠি পাঠিয়ে-ছেন তিনি। তার দুই-এক দিনের মধ্যে বিভাস দত্ত গিয়ে শমীর ট্রান্সফার সার্টি-ফিকেট নিয়ে এসেছেন।

ক'টা দিন একটু চঞ্চল্যের মধ্যে কেটেছে জ্যোতিরাণীর। নিজে গিয়ে দেখাশুনা করে শমীকে একটা ভাল স্কুলেই ভর্তি করতে পেরেছেন। স্কুলের বাসের

ব্যবস্থাও হয়েছে। বিভাস দত্ত সানন্দে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর এই পক্ষকালের স্ত্রীটি কিছু করার সংকল্প নিয়ে সশরীরে গিয়ে হাজির হলে দুরূহ কাজও সহজে সম্পন্ন হয়।

জ্যোতিরাণীর মনের তলায় এবারে চাকরি সংগ্রহ করার সংকল্প। নতুন ব্যবস্থার ফলে শমীর জন্যেই দ্বিগুণেরও বেশি খরচ হবে। তাছাড়া নিজস্ব একটা অবলম্বনের তাগিদও আছে। চাকরি করতে না পারলে বড় বেশি ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে। কাগজের বিজ্ঞাপন পড়া শুরু করেছিলেন আবার। এই তাগিদে হঠাৎই একজনের কথা মনে পড়েছে। যে মহিলা অন্য স্কুলে হেডমিস্ট্রেস হবার ফলে তিনি সহকারী হেডমিস্ট্রেস হতে পেরেছিলেন, তাঁর কথা। ভদ্রমহিলা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, কাজের নিষ্ঠা দেখে তাঁর ওপর খুশিও ছিলেন।

জ্যোতিরাণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন। প্রত্যাশার থেকেও বেশি ফল পেয়েছেন। তাঁর স্কুলে আসতে চান শুনে ভদ্রমহিলা খুশি। কিন্তু পাকা-পোস্ট কিছু খালি নেই। এক টিচার সবে ছুটিতে গেছেন, তাঁর জায়গায় তক্ষুনি তাঁকে নেবার ব্যবস্থা করলেন। আশ্বাস দিলেন হামেশাই কেউ-না-কেউ ছুটি-ছাটায় যাচ্ছে, তাদের জায়গায় কিছুদিন লেগে থাকলে পাকা ব্যবস্থা একটা তিনিই করবেন।

নতুন স্কুলে সামনের সপ্তাহ থেকে কাজে লাগা স্থির।

আগের স্কুলের চাকরি ছাড়ার খবরটা ইতিমধ্যে যথাস্থানে অর্থাৎ বিভাস দত্তর মারফৎ যিনি চাকরি দিয়েছিলেন তাঁর কানে পৌঁছবার কথা। কেন চাকরি ছেড়েছেন, বুঝবেন। এই নতুন চাকরির খবরও ওই একজনকে জানাতে পারলে ভাল লাগত।

কিন্তু তাপ কমেছে। অসহিষ্ণু চাঞ্চল্য কমেছে দু দিন ধরে ফিরে আবার এই নতুন বাস্তবের আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটছে। সন্ধ্যা পেরুলেই অভ্যাগতরা আসবেন। নতুন জীবনের নতুন অভ্যাগত। তাদের মধ্যে গিয়ে বসতে হবে, হাসতে হবে, নতুন জীবনের শুভেচ্ছা নিতে হবে। আমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নয়। খাওয়া-দাওয়ার ভার কেটারারের হাতে দেওয়া হয়েছে। শমী আর তার কাকা ও-পাশের ঘরটা গোছগাছ করে তোলার উৎসাহে ব্যস্ত। তাঁরও সরে থাকা ভাল দেখায় না।...এই দিনেই ডান চোখটা কাঁপছে কেন এত?

হাসিমুখেই ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিরাণী। শমীর উৎসাহ দেখে ভ্রূকুটিও করলেন একটু। শমী লজ্জা পেল। মাসিমা কাকিমা হয়েছে, খুশিও যেমন ওর লজ্জাও তেমনি। লজ্জায় প্রথম দু দিন কাছে ঘেঁষতে চায় নি। আজও দুপুরে বলছিল, কাকিমা ডাকতে বড় বেশি লজ্জা করছে, আগের মত মাসি ডাকলে কি হয়।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কি ডাকবি ঠিক করলি?

শমী লজ্জা পেয়ে শাড়ি সামলাতে-সামলাতে পালাল। মাঝে-মাঝে শখ করে শাড়ি পরছে এখন। শাড়ি পরলে দিব্বি বড়-সড় দেখায়। বিভাস দত্ত হাসছেন। শুধু তাঁকে খুশি করার জন্য এভাবে নিজের সঙ্গে যুঝে জ্যোতিরাণীর সহজ হবার চেষ্টা। গত ক' দিনের মধ্যে অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন তাঁকে, বলেছেনও, এত বছরের মধ্যে তোমার মুখের হাসি আমার বরাতে কমই জুটেছে দেখা যাক আরো কতকাল অপেক্ষা করতে হয়।

শমী চলে যেতে হাসিমুখে আলমারি খুলে কাগজে মোড়া কি একটা বার করলেন বিভাস দত্ত। কাগজ সরাতে দেখা গেল হাজারীবাগের সেই বাঁধানো ফোটো। নিজের, সিতুর আর জ্যোতিরাণীর। নতুন ফ্ল্যাটের কোন দেয়ালে ওটা আর চোখে পড়ে নি বটে।

জায়গা বেছে বিভাস দত্ত দেয়ালে টাঙালেন ওটা। তারপর ছদ্ম গাম্ভীর্যে ফিরলেন তাঁর দিকে। বেই মা ভাবুক এখন এটা টাঙাতে আপত্তি নেই তো?

আবার একটা বড় বোঝা সুন্দরে হল নিঃশব্দে। বোঝার অবকাশ কম বলে আরো মুশকিল। ততোখানি চেষ্টা করেই ঠোঁটের ডগায় হাসি ফোটাতে পারলেন জ্যোতিরাণী। মাথাও নাড়লেন একটু। আপত্তি নেই। বললেন, এর পর ওমর খৈয়ামের ফাঁকের ফটো দুটোও টাঙাবে নাকি?

বিভাস দত্ত অপ্রস্তুত কয়েক মুহূর্ত। বিস্ময় আর খুশির আতিশয্যে আটখানা তারপর।—ও ছবির খবর তুমি কি করে জানলে? এর মধ্যে বইটা খুলেছিলে বুঝি?

—এর মধ্যে নয়, বছর আটেক আগে। ওই ফটো যেদিন দেয়ালে দেখেছিলাম, সেদিনই।

—কি কাণ্ড! আর আমি বোকার মত ও দুটো তোমার চোখের আড়ালে রাখার জন্য আগলে-আগলে বেড়াচ্ছিলাম।

বোকামির অবসান করে দেবার আগ্রহেই যেন আলমারি খুলে ওমর খৈয়ামের ফাঁক থেকে ফটো দুটো বার করলেন। তারপর নির্নিমেষে একবার দেখে নিয়ে তাঁর সামনে ধরলেন। ওই ফটো দুটোর নীচে লিখে রেখেছেন কিছু, তাই দেখালেন।

জ্যোতিরাণী দেখলেন। পড়লেন। একটার নীচে লেখা, "বিশ্বের পালনীশক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে-চুপে, মাধুরীর রূপে।" অপরটার নীচে লেখা, "আমার মন চুরি গেছে, মন চুরি যাবার পর দু চোখ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি কোথায়?"

ফটো দুটো হাতে নেন নি জ্যোতিরাণী। বিভাস দত্তর হাত থেকেই দেখেছেন, পড়েছেন। শরীরের ভিতরটা কেমন সিরসির করছে তাঁর। নিজের অগোচরে এখনো বুঝি কোথাও একটা প্রতিরোধ বাসা বেঁধে আছে—সেটাতে ধাক্কা লাগছে।

হাল্কা মেজাজে বিভাস দত্ত আবার বললেন, সত্যি এই চুরির কথা এতদিন ধরে জানতে তুমি?

জ্যোতিরাণী হাসলেন। হাল্কা কথার হাল্কা জবাবই দিলেন।—শুধু আমি কেন, শমীও জানত। ছেলেমানুষ, এত দিনে ভুলে গেছে। লজ্জা পেতে না চাও তো ও দুটো কোথাও সরিয়ে রেখে দাও, টাঙিয়ে কাজ নেই।

লঘু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন বিভাস দত্ত। বাধা পড়ল।

—মাসি, মাসি!

শমীর এই উত্তেজিত গলা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি-এক ষষ্ঠ চেতনা তাঁকে বলে দিল কি হতে পারে, কেন ওভাবে ডাকতে-ডাকতে এমন হন্তদন্ত হয়ে আসছে শমী। এতটা উত্তেজিত না হলেও ওর এই গোছের আচমকা ডাক আগে আরো বার কয়েক শুনেছেন। কিন্তু আজ বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে জ্যোতিরাণীর।

—মাসি, সিতুদা! সিতুদা নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে!

বিমূঢ় মুখে বিভাস দত্ত শমীর দিকে তাকালেন, তারপর জ্যোতিরাণীর দিকে। তার পরেই কর্তব্য স্থির করে তাড়াতাড়ি বললেন, কই? চল ডেকে নিয়ে আসি—

বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে শমীও।

জ্যোতিরাণী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে। শুধু তিনিই জানেন, এই বাড়িতে ঢোকার জন্যে ও এসে দাঁড়ায়নি। ডাকলেও আসবে না। কাছে গিয়ে ডাকার সুযোগও দেবে না।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

চিত্রজগতে নতুন তারকা

প্রমীলা

চিত্রজগতে মজার ছড়াছড়ি। এক কথায় চিত্রজগৎকে বলা যায় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। এখানে যে কি মজা লুকিয়ে আছে আর কখন যে কি অঘটন ঘটে যাবে তা আগে থেকে আঁচ করা ভীষণ শক্ত। যে ছিল একান্ত অপরিচিত, চিত্রজগৎ তাকে এনে দিল বিরাট খ্যাতি। তরুণ-তরুণীর মনে মনে তার নিত্য আনাগোনা,—অনেকে হয়তো তাকে 'আইডল' করেই বসে রইলো। দেশ-বিদেশের চিত্রজগতে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছে। সে দেশের ফিল্ম সাম্রাজ্যে এক নতুন চিত্রতারকার আবির্ভাব হয়েছে। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জনচিত্তে আলোড়ন তুলেছেন। শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা ক্লুগের এই আত্মপ্রকাশকে স্বদেশবাসী স্বাগত জানিয়েছে।

শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রার চিত্রজগতে আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক—প্রত্যাশিত নয় কোন প্রকারেই। তার বয়স ঊনত্রিশ। রূপসী হিসেবে তার খ্যাতি ছিল না কোনকালেই। সঙ্গীতে তার অনুরাগ হয়তো ছিল কিন্তু সঙ্গীতসাধিকা হিসেবে তার কোন নাম-ডাক ছিল না। চিত্রাবতরণের পূর্বে ফিল্মে অভিনয়ের জন্য তিনি কোথাও শিক্ষানবিশীও করেননি। তিনি ছিলেন ডাক্তার। পশ্চিম জার্মানীর কোন একটি হাসপাতালে রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। কোন একটি ফিল্মে ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি ভবিষ্যৎ অভিনেত্রী জীবনের পথ প্রশস্ত করেন। ফিল্মের নাম ছিল 'ফেয়ারওয়েল টু ইয়েস্টারডে।' ছবিটি ভেনিশ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং তিনিও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রার এই কৃতিত্বে জার্মান চলচ্চিত্র শিল্পেও বেশ খুশি-খুশি ভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ এতদিনে জার্মানীর এই শিল্পও নানা কারণে বেশ ম্লান হয়ে পড়েছিল এবং এই অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। যদিও জার্মানীর কয়েকজন অভিনেত্রী আন্তর্জাতিক কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন তবুও তারা হলিউডে এত ব্যস্ত হয়ে থাকেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের দিয়ে দেশের নতুন তারকার আবির্ভাব শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা দেশ ও দেশবাসীর এই প্রত্যাশা পূর্ণ করলেন।

মজার কথা যে, শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা যে চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন, এখবরটা অনেকেরই অজানা ছিল। শুধু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব এবং খবরের কাগজের নিবিষ্ট পড়ুয়ারা এই খবরটা জানতেন। তারা জানতেন যে শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা তার ভাইয়ের সঙ্গে একটা ছবিতে অভিনয় করছেন। বোন ডাক্তার আর ভাই হলেন ব্যবহারজীবী এবং একই সঙ্গে লেখক এবং উচ্চাভিলাষী চিত্র পরিচালক। তিনি সাধারণত স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রই পরিচালনা করেন। কিন্তু বোনকে নিয়ে এবার তিনি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী করলেন। ছবিটি প্রস্তুতও হলো ঠিক ভেনিশ চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাক্কালে। সঙ্গে সঙ্গে জার্মান থেকে ছবিটিকে উৎসবের জন্য মনোনীত করা হলো এবং সেখানেই ছবিটি প্রথম প্রদর্শিত হয়। ছবিটি প্রদর্শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক, বিচারক এবং সমালোচক মহলে সাড়া পড়ে যায়। সবাই কিরকম হকচকিয়ে গেল। শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা আটটি পুরস্কার পেলেন। আন্তর্জাতিক বিচারকদের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বুঝি বেশি অবাক হলেন শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা নিজে। কারণ তিনি কোনদিন অভিনয়ের শিক্ষা পর্যন্ত পাননি। তাছাড়া এই সাফল্যের সবটাই ক্লুগে পরিবারের নিজস্ব ব্যাপার। পালাজো ডেল সিনেমায় যখন ছবিটি প্রদর্শিত হয় তখন উৎসাহীদের তুলনায় বেশি অবাক দর্শক ও সমালোচককুল।

একজন খ্যাতনামা মার্কিন সমালোচক তো ছবিটিকে টুকরো টুকরো করে বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

কিন্তু ফরাসী এবং ইতালীয় সমালোচকরা ছবিটিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন। 'ফিল্মে ডেলিকেসী' ছিল ছবিটির সবচেয়ে বড় কথা। এনিটা জি ক্লুগে নিজের একটি ছোট গল্পের চিত্ররূপ দিয়েছেন 'ফেয়ারওয়েল টু ইয়েস্টারডে' নামে। এই গল্পটি তিনি সংগ্রহ করেন কোর্ট রেকর্ড থেকে। নিজের যৌবনে সে বুর্জোয়া মরালিটি এবং ল'-এর সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছে। ১৯৩৭ সালে তার জন্ম। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজের পরিচিতি এবং আত্মীয়তা আবিষ্কার করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে যাদের কাছে নিরাপত্তা এবং আশ্রয় প্রার্থনা করেছে তারা কেউ তা দিতে পারেনি এবং প্রতিবারই তার মনে হয়েছে নিজের অনুসৃত পথের তুলনায় এপথ ভাল হতে পারে না। ব্যর্থতা তার অবশ্যম্ভাবী। কারণ নিজের দোষ সে ঢাকতে পারছে না; কিন্তু অন্যরাও তো দোষমুক্ত নয়। তার আক্ষেপ এখানেই।

লেখক-পরিচালক ক্লুগে একইসঙ্গে দর্শকদের কল্পনা এবং চিন্তার মূল ধরে নাড়া দিতে চেয়েছেন। সমগ্র ছবিতে দৃশ্য পরম্পরা এমনইভাবে সাজান—অথচ একটি দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যকে যোগসূত্রহীন মনে হয়। এছাড়া মনে রাখবার মত অভিনয়

করেছেন শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রা। তিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এনিটার চরিত্রটি এবং তার মানসিকতাকে। গত দুই দশকের মধ্যে জার্মান চলচ্চিত্রে এরকম অভিনয় দেখা যায়নি। এনিটার চরিত্রের সঙ্গে তিনি প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কোন শিক্ষিতা অভিনেত্রীর পক্ষেও এরকম বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়-কুশলতা প্রদর্শন করা সম্ভব হোত কিনা সন্দেহ আছে।

চলচ্চিত্র জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত অভিনেত্রীর এধরনের অভিনয়ে ইতালীয় সমালোচকরা এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে তারা শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত করার প্রস্তাব করেন। শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রার পক্ষে ভোট ছিল পঁয়ত্রিশটি। তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান হিসেবে পান "গোল্ডেন রো"। অপ্রত্যাশিতভাবে এই শ্রীমতী আলেক্সান্দ্রার দাদা ডঃ ক্লুগেন পক্ষে এরকম চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এবং চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে অভিনয় করার মত অভিনেত্রী খুঁজে না পেয়ে বোনকেই চরিত্রটি রূপায়িত করতে অনুরোধ করেন। বোনটি অবশ্য ইতিপূর্বে অনেক ফিল্ম করার ব্যাপারেই ভাইকে সাহায্য করেছেন। তাই ভাইয়ের কাছ থেকে এই আহবান পেয়ে তিনি ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর সময় অভিনয়ের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে তার বুক হয়তো কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু এই সাফল্যে এবার নিশ্চয়ই তিনি আনন্দের আবেশে তন্ময়। দাদার গড়া চরিত্রটিকে তিনি জানতেন। তাই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের অভিনয় ক্ষমতার কথা তার জানা ছিল না। এবার তিনি নিজে নিজেকে চিনলেন এবং সেইসঙ্গে আমরাও। এটা তার আত্ম-আবিষ্কার এবং আমাদের পাওয়া।

নতুন ধরনের পরিবার

প্রেম ও বিবাহ

সামাজিক সকল সংগঠনের মধ্যে পরিবারই প্রাচীনতম: এমন কি জাতি, শ্রেণী, রাষ্ট্র প্রভৃতি ধারণার চেয়েও প্রাচীনতর। তবু পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতি এমন সুবিপুল হয়েছে যে পরিবারও বিপুল সুবিধা পেয়েছে।

সোভিয়েত বিপ্লব দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্কে গভীর সামাজিক পরিবর্তন এনেছে। এইসব সম্পর্ক ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে, পরিবার ও সমাজে পুরুষ ও নারীর পূর্ণ সমানাধিকার ঘোষণাকারী আইনসমূহের সঙ্গে, নারীদের গৃহস্থালির বন্ধন শিথিল করার সঙ্গে (যাতে নারী এখন সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম) এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে নতুন নৈতিক সম্পর্কের অভ্যুদয়ের সঙ্গে যুক্ত।

নীচ বৈষয়িক ভাবনার সংস্রবমুক্ত প্রেমই ক্রমে বেশি পরিমাণে পারিবারিক সম্পর্কের মান হয়ে উঠছে।

ঘরকন্নার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে মেয়েদের ঘাড়ে এবং এর জন্য দরকার তার অনেক সময় ও উদ্যম। সেইজন্যই গৃহস্থালির কাজ হ্রাস করার জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কিছু করা হচ্ছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এমন পরিবেশ সৃষ্টি যেখানে প্রতিটি পরিবারই ঘরকন্নার দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে।

দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজের ক্রমেই বেশি অংশভাগ গ্রহণ করছে সরকারী সংস্থাসমূহ। সমাজতন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল যে, আগে যেসব কাজ পরিবারের কাঁধে ছিল সমাজ তা ক্রমেই বেশি করে গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একাজের জন্য মাশুল দিতে হয় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে মাশুল সামান্য। হোটেল রেস্তোরাঁ ইত্যাদির সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে কিণ্ডারগার্টেন, নার্সারি প্রভৃতির সংখ্যা।

কার্যত প্রতিটি পরিবার যাতে গৃহস্থালির অপ্রয়োজনীয় বোঝা থেকে ও প্রাক-বিদ্যালয় বয়সের ছেলেমেয়েদের শুধুমাত্র বাড়িতেই দেখাশোনার প্রয়োজন (ছেলেমেয়েকে প্রাক-বিদ্যালয় কেন্দ্রে পাঠানো হবে কিনা তা পিতা-মাতারই

নতুন মন্ত্র

চোখের সামনে যে ঘটনাগুলো নিত্য ঘটে যাচ্ছে তাতে আর যাই হোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব একটা আশা এবং উৎসাহবোধ করতে পারছি না। এ যেন অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার মশাল শোভাযাত্রা চলেছে। এই মশাল আগুনের ফুলকি এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ে প্রায়ই ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি করছে। বিক্ষোভের এই তপ্ত চুল্লীতে বাস করে নতুন দিনের নতুন কথা চিন্তা করা শুধু অসম্ভব নয় অবাস্তবও। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়েই সমস্ত 'এনার্জি' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—নতুনের ধ্যান করার অবসর কোথায়! সম্প্রতি বালেশ্বরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে সমস্যা-সংকুল এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতির কথাই প্রাধান্য পায়। স্বাভাবিকতা বিরোধী এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাই উদ্বিগ্ন বোধ করেন। এই ভয়াবহতার আওতা থেকে মুক্ত সুন্দর ও সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আন্তরিক বাসনা সকলের কণ্ঠেই সোচ্চার হয়ে ওঠে।

সুন্দর এবং সুস্থ সকলেই কামনা করেন। এখানেও একটা 'কিন্তু' বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই 'কিন্তু'টাকে অতিক্রম করা ছিল একান্ত সহজ। অথচ সহজ এই ব্যাপারটাকেই অতিক্রম করা তো সম্ভবই হয়নি বরং দিনে দিনে ঘোরালো হয়ে উঠেছে। প্রদেশে প্রদেশে আজ কত না ফারাক। মূল্যমান থেকে শুরু করে খাদ্য পরিস্থিতি—সর্বত্রই দেখা যাবে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের বিস্তর তফাৎ। একই বিরাট দেশের অধিবাসী হয়েও একই পরিবারের ভাব-ভাবনায় আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারিনি। প্রদেশে প্রদেশে সীমানা নিয়ে বিরোধ তাই তিক্ততম অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, সবাই সকলের কথা ভাবছে, কেউ কারো কথা ভাবছে না। এই যদি অবস্থা চলতে থাকে তবে সুখী ও সুস্থ ভবিষ্যৎ স্বপ্ন হয়েই থাকবে—অসংখ্য মাঙ্গলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনার অকালে সমাধি ঘটবে। সবাই সবার জন্য ভাবো এই সংকল্প যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি তবে সমবেত প্রচেষ্টা লোক-দেখানো বিরাট ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। সম্মেলনে এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা হয়। ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা এবং বিভেদ কাটিয়ে উঠতে পারলেই বৃহৎ সমস্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও নতুন দিনের ভাবনা সম্ভব। সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী ঝাবওয়ালা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে সমস্যায় ভেঙে পড়লে আমাদের চলবে না। এই অশান্ত পরিবেশে বাস করেই সন্তানদের নতুন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ এক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হোক। মায়ের সুকঠোর দায়িত্বের নব মূল্যায়নের এই মহাসত্যকে যেন আমরা হেলায় না হারাই। ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মাতৃত্বের মহিমায় যেন চির অম্লান থাকতে পারি। তাহলেই কল্যাণালোক নতুন দিনের হাতছানি বাস্তবে ধরা দিবে।

সুশানো হিসাও-এর বয়স খুবই স্বল্প। ভাল পপসঙ্গীত জানেন, থিয়েটার পছন্দ করেন। সাঁতার দেওয়া ও নৌকা চালনায়ও সিদ্ধহস্ত। সাজতে পারেন বেশ আধুনিকার মতই। 'ফ্যানি হিল' চিত্রে অভিনয় করবার পর তিনি 'চেঙ্গীজ খান' চিত্রে অভিনয় করেন। পলিটিক্যাল ইকনমিতে ডিগ্রী লাভ করে চাকরীতে যোগ দেন স্টেনোগ্রাফার হিসাবে। বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতে তিনি খ্যাতি লাভ করছেন।

বিচার্য বিষয়) থেকে রেহাই পায় সেজন্য রাষ্ট্র সম্ভাব্য সবকিছুই করছে।

এইভাবে পরিবারের সকল সদস্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের, তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বার্থসমূহ পরিপূরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

পরিবারের ঘরকন্নার কাজ হ্রাসের পাশাপাশি তার বৈষয়িক অবস্থার, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অবিচল উন্নতি ঘটছে।

উচ্চতর প্রকৃত আয় অধিকতর অবসর সময় ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন এর সহায়ক।

সমাজতন্ত্রে স্নেহ ও বোঝাপড়ার স্থান অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের আগে। ব্যক্তির মুক্ত অর্জনে এটা সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সাফল্য।

সমাজতান্ত্রিক সমীক্ষাসমূহে দেখা গেছে যে, বিবাহের মূলে প্রবৃত্তি প্রেম। মস্কোর লিখাচোফ মোটর কারখানার শ্রমিক-দের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যাদের মত গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের ৯৪ শতাংশই পুরোপুরি স্থিরপ্রত্যয় যে প্রেমই শুধু বিবাহের ভিত্তি হওয়া উচিত। বৈষয়িক ভাবনা থেকে সম্পাদিত বিবাহ-বন্ধনকে তাঁরা নৈতিক দিক থেকে অননু-মোদনীয় বলে বর্জন করেছেন। স্বভাবতই এই প্রত্যয়ের ভিত্তি হল ব্যক্তির ও সমগ্রভাবে বর্তমান পুরুষের অভিজ্ঞতা।

আর একটি ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল। মস্কোর দুটি জেলা রেজিস্ট্রি অফিসে ৩৪ বা তার কম বয়সের যে মেয়ে-দের বিবাহ হচ্ছে তাদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ৭ বছরের বেশি নয়। এসব সংখ্যা থেকে আরও দেখা যায় যে অপরিহার্যভাবেই ব্যক্তি-গত পছন্দ অনুসারে পুরুষ ও নারী বিবাহ করেন, বৈষয়িক সুবিধার জন্য নয়।

পরিবারের নৈতিক ভিত্তির প্রশ্নের রয়েছে আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক—সামাজিক দিক। বস্তুত, যখন বৈষয়িক ভাবনা থেকে বিবাহ হয় তখন তা অপরিহার্যভাবেই গোটা সামাজিক কাঠামোকেই প্রভাবিত করে। সেজন্যই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তির উপর স্থাপিত সমাজে বিবাহের আগে ও পরে অবৈধ সম্পর্ক, যৌন নষ্টাচার, বেশ্যাবৃত্তি, অস্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি, যৌন অপরাধ, যৌনব্যাধি প্রভৃতি এত ব্যাপক।

একবার লিও তলস্তয় উল্লেখ করে-ছিলেন যে, নারীর কাছে সন্তান কি এবং তার জীবনে সন্তান কি ভূমিকা পালন করে তা বোঝে এমন পুরুষ বিরল; আর পুরুষের কাছে সম্মান ও সামাজিক কর্তব্যের অর্থ কি তা বোঝে এমন নারী আরও বিরল। সত্যিসত্যিই বিপ্লবের আগে পারিবারিক সম্পর্কের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল পুরুষ ও নারীর আত্মিক অনৈক্য।

অর্ধশতাব্দীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক বদলে গেছে। বর্তমানে সাধারণতই নৈতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মনোভাব একইরূপ। এবং স্থায়ী ও সুখী পরিবারের এটা অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত।

লিখাচোক মোটর কারখানায় সংগৃহীত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পারিবারিক সম্পর্কে ঔদাসীন্য বা আত্মিক অনৈক্য বিরল হয়ে গেছে। মোট পরিবারসমূহের ৭১ শতাংশই সুখী পরিবার।

পরিবারে একযোগে কাজ করার মনো-ভাব সমাজতন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বহু ভাবে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে—ঘরকন্নার ব্যাপারে পরস্পর সাহায্য থেকে পড়াশোনায়, উৎপাদনে ও সামাজিক কাজ-কর্মে পরস্পরকে সাহায্য করা পর্যন্ত। লিখাচোফ শ্রমিকদের পরিবারের কোন কোন জিনিসে আগ্রহ সে সম্পর্কে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যথেষ্ট পরিমাণ প্রবণতা রয়েছে উৎপাদন, সামাজিক কার্যকলাপ ও শিল্প-কলার প্রতি।

একযোগে কাজ করার মনোভাব ও প্রেম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং পরিবারের স্থিতি-শীলতা ও সুখের ভিত্তি।

নারীশিক্ষা দেশের অগ্রগতির প্রতীক

কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএম সি চাগলা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এস-এন-ডি-টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণদান প্রসঙ্গে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, নারীশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশেরই অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশের অগ্রগতির একটা প্রধান প্রমাণ হচ্ছে নারীর সামাজিক মর্যাদা। এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে ভারতকে বিশ্বের প্রগতিশীল দেশসমূহের অন্যতম বলতেই হবে। কারণ এদেশে মেয়েরা সকল শিক্ষার সমান সুযোগ পেয়ে থাকে এবং কোনরকম বৈষম্য করা হয় না।

পড়ুয়া ছেলে ও মেয়ের সংখ্যায় যে তারতম্য আছে তার অবসান ঘটানো উচিত। নারী মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু এবং মহর্ষি কার্ভে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। সেই পথ অনুসরণ করে আমাদের দেশের নারীর গৌরব আজ তুঙ্গে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে সে সত্যই প্রমাণিত হয়। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ভারত সমতার নীতিতে বিশ্বাসী এবং নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নারীর প্রতি ভারতের এই সম্মাননা বহির্বিশ্বে তার মর্যাদা অনেক বাড়িয়েছে।

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

চুল পাতলা হওয়া

তরুণ ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও হয়ত দেখবেন যে চুল ক্রমে উঠে যাচ্ছে আর আপনার মাথায় অকালে টাক পড়ছে। এর কারণ হ'ল আপনার চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব।

মাথায় খুস্কি হওয়া

[illegible]

চুল সম্পর্কে অবহেলা আর অজ্ঞতা কি ভাবে [illegible] তার যথাযথ নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়। এরা বিপদের সঙ্কেত পাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিবিধান করছেন না এবং এরা চুলের যত্ন নিতে অবহেলা করেই চলবেন। আর ফলে অবশেষে একদিন এর জন্য এদের আক্ষেপ করতে হবে। চুলের গোড়া একবার নষ্ট হয়ে গেলে কোন চিকিৎসাতেই তার জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। আপনিও কি বিপদের সঙ্কেতের লক্ষণ দেখে তাকে অবহেলা করেছেন? তাহলে এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে জানেন? এই সমস্যার একমাত্র উত্তর হ'ল—পিওর সিলভিক্রিন।

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। এটি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিতভাবে মালিশ করলে পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবন দান করে।

সুতরাং আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এর চেয়ে সঠিক উপায় কিছু নেই।

চুলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হলে আপনি আজই 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য এই ঠিকানায় লিখুন: ডিপার্টমেন্ট, A-৭ সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরী সার্ভিস, পোষ্ট বক্স ৭২৭, বোম্বাই-১।

পিওর সিলভিক্রিন

Pure Silvikrin

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, এতে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস আছে। একমাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

HAIR DRESSING

সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখবার জন্য একটি সুন্দর ড্রেসিং। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এতে পিওর সিলভিক্রিন আছে।

Silvikrin

সিলভিক্রিন—সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

SP/1/P/2/66

এশিয়ার গল্প
।। আট ।।
ফরমোজা

বয়লার

অচীন পাঞ্জাবন

নারকীয় গরম বয়লারের সামনে। বয়লারে কাজ করে যেসব 'ফায়ারম্যান' তাদের কাছে জায়গাটা নরক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেটাই জীবিকা তার। খুবই কষ্টকর জীবিকা সন্দেহ নেই। তাছাড়া ফায়ারম্যানের কাজ করতে দক্ষতারও প্রয়োজন, অভিজ্ঞতারও। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধৈর্যের। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মত অসীম ধৈর্য চাই।

এ সবই ছিল বেন-এর। কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সারাদিন বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত বেন। বয়লারের দরজা দিয়ে জ্বালানি কাঠ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া তার কাজ। তাক করে ঠিক জায়গায় ফেলতে হবে কাঠ। একটা কাঠের টুকরোর ওপর এমনভাবে আড়াআড়ি করে ফেলতে হবে আর একটা কাঠের টুকরোকে যেন আগুনটা নিভে না যায়। কাঠের টুকরোগুলো যদি পরস্পরের গা ঘেঁষে পড়ে তাহলে নিভে যাবে আগুন। যদি দূরে দূরে পড়ে তাহলে বয়লারের ভেতরের অনেকটা জায়গা অকেজো থেকে যাবে, তাপ কমে যাবে, ফলে আরো বেশি কাঠ দিতে হবে। সুতরাং কাঠ এবং সময় দুইয়েরই অপচয় হবে।

কাজ ঠিক করে করতে না পারা মানে বার বার কাঠ দিতে হবে বয়লারে, বার বার

খুলতে হবে বয়লারের দরজা; কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না, কাজ বাড়বে শুধু।

বেন-এর কাজটা সত্যিই খুব কঠিন। ওর পোষাক দেখলেই তা বোঝা যায়। সামান্য একটা নেংটি পরে সে; আগুন থেকে পা বাঁচাবার জন্যে রবারের জুতো পায়ে দেয় আর ছেঁড়া টুপি মাথায় দেয় একটা। টুপির ধারটা টেনে নাবান থাকে নিচের দিকে। টুপি না ব্যবহার করলে মাথার তালু তেতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ভ্রূদুটো পুড়ে যেতে পারে। অবশ্য এসব সত্ত্বেও ফায়ারম্যানদের চোখের পাতা থাকে না, পায়ের চুলও না। চোখদুটো শুষ্ক নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, কারণ ভেতরের সব রস শুকিয়ে যায় আগুনের তাপে। যেমন বেন-এর হয়েছে।

বেন-এর মত ফায়ারম্যান হয় না। শরীরটা রোগা, যেন এক ফোঁটা জল নেই শরীরে। যেন ফায়ারম্যান হয়েই জন্মেছিল ও। ঈশ্বর জানেন কতকাল ধরে ও একাজ করছে। যুদ্ধের সময় যখন খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন ক্ষেতমজুরের কাজ করত বেন। চারা বসাত মাঠে। কাজটা মোটেই পছন্দ হত না ওর। বলত, 'মেয়েমানুষের কাজ।' আবার যখন খনি চালু হল বেন তখন ফিরে এল আবার। খনির প্রথম ফায়ারম্যান হল সে। সবাই চাইত বেন তাদের শিফটে কাজ করুক। কেননা, বেন বয়লারে থাকা মানে আগুনের তাপ চরম থাকবে সবসময়, সুতরাং বাষ্পের চাপও থাকবে সবচেয়ে বেশি।

আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল সেবার। বেন আমাদের শিফটে কাজ করছিল। কাজে এক-দম ফাঁকি দিত না বেন, তবে মাঝে মাঝে নানারকম ছেলেমানুষী খেলায় যে মেতে উঠত না তা নয়। যেমন একগুঁয়ে ছিল বেন তেমনি হঠাৎ কাউকে আক্রমণ করে বসতেও তার জুড়ি ছিল না।

ছুটির দিনে যখন কেউ লাগতে যেত না তার সংগে তখন সবকিছুই বিস্বাদ ঠেকত বেন-এর কাছে। অতএব হঠাৎ হয়ত নিজেই গিয়ে লাগত কারো পেছনে। ফল হত—ধমক খেয়ে ফিরে এসে গজর গজর করত আর অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে থাকত। কিন্তু বেন যখন বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছে তখন কেউ তাকে ঘাঁটাতে যেত না।

মনে পড়ছে একবার বেন যখন কাজ করছে একটা লোক গিয়েছিল তার সংগে ইয়ার্কি করতে। কয়লার খোঁচাবার টকটকে লাল লোহার ডান্ডাটা হাতে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বেন। লোকটা প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল। আর প্রাণ-ভরে হেসেছিল বেন।

বেন রীতিমত জোয়ান হলে কি হবে মেয়েরা কিন্তু পছন্দ করত না তাকে। আমার মনে হয় সেজন্যেই মনমরা বেন বিয়ে করে নি। দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করার ফলে তার শরীরও বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বেন ছিল মালয়ের লোক। থাই-ল্যান্ডের ভাষা একেবারেই বলতে পারত না।

দক্ষিণ থাইল্যান্ডের এই খনিগুলিতে অবশ্য মালয়ের ভাষাই চলত। মালয়ের ভাষায় কথা বলে বেনকে হারাবে এমন লোক ছিল না। সুতরাং সেজন্য বেন-এর বেশ খানিকটা মর্যাদাও ছিল খনিমহলে।

অনেক জল লাগত আমাদের। তিরিশ জন লোকের একটা শিফটের জন্য দু' বালতি জল লাগত। ফায়ারম্যানদের অবশ্য আরো বেশি লাগত। কারণ, সারাদিন দরদর করে ঘামত তারা। তাদের প্রত্যেকের প্রতি শিফটে এক বালতি করে জল লাগত।

রমজান এলো। এ সময় সারাদিন উপোষ করে থাকে মুসলমানরা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছুই খেতে পারে না তারা, খাবারও না জলও না। এমন কি থুথু পর্যন্ত গিলতে পারে না। চল্লিশ দিন ধরে এমনি উপোষ করতে হয় তাদের। সুতরাং প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর বেন প্রাণভরে খাবার আর জল খেয়ে নিত যাতে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত বয়লারের সামনে দাঁড়িয়ে আবার কঠিন পরিশ্রম করতে পারে সে।

...তারপর হাত বাড়াত...

রমজানের সময়েই দিনে ডিউটি পড়ল বেন-এর। তাকে দিনে ডিউটি দেবার জন্যে যারা দায়ী তারা বেন-এর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই করল এটা। অতীতে বেন কবে তাদের পেছনে লেগেছিল তারই শোধ নিল তারা।

বেন-এর সামনেই খোসা ছাড়িয়ে কমলা-লেবু খেতাম আমরা। বরফের বড় বড় টুকরো এনে ওর সামনেই জলের বালতির মধ্যে রেখে দিতাম। ধীরে ধীরে চেখে চেখে জল খেতাম। নিজেদের চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দিতাম, গায়ে দিতাম।

আমাদের মধ্যে একজন কাপে করে জল নিয়ে বেন-এর কাছে গিয়ে খেত। বেন মুখ ফিরিয়ে থাকত। আমরা আশা করে থাকতাম বেন তার উপোষ ভাঙবে আর খুব মজা হবে তাহলে।

তারপর হঠাৎ একদিন আমাদের মনে হল, এসব করা মোটেই উচিত হয়নি। আমাদের ইয়ার্কির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বেন-এর জন্য কষ্ট হত আমাদের। আমরা চাইছিলাম সে জল খাক। তাকে অনুরোধও করেছি খেতে। অন্য কোন কারণে নয়, আমাদের মনে হয়েছিল দিনের পর দিন জল না খেয়ে থাকা খুবই খারাপ হচ্ছে তার শরীরের পক্ষে। ও জল খাক না, আমরা যেন দেখিনি এমন ভান করে থাকব—ভাবতাম আমরা। বেন-এর সামনে জল রেখে আমরা সরে যেতাম। ভাবতাম, চুরি করে খাবে ও। বেন যেত জলের কাছে, তাকিয়ে থাকত জলের দিকে, তারপর হাত বাড়াত। আমরা উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাক-তাম। কিন্তু না, বেন ছুঁতও না সে জল, ফিরে এসে বয়লারে কাঠ দিতে শুরু করত।

আমরা যে শুধু বেনের জন্যেই চিন্তিত হয়েছিলাম তা নয়, নিজেদের জন্যেও দুশ্চিন্তা হয়েছিল আমাদের। বেন যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে (যে কোন লোকই পড়ত) তাহলে বেন-এর মত এমন করে আর কে কাজ করবে বয়লারে? কেউ না, কেউ নেই সেরকম। সুতরাং বয়লারের তাপ কমে যাবে, সুতরাং বাষ্পশক্তিও কমে যাবে সেই সংগে। আমাদের শিফটের তো বদনাম হবেই তাছাড়া ফোরম্যানও গালাগাল করবে আমাদের।

একবার ভাবলাম পাল্টে নেব বেনকে। ওকে রাত্রের শিফটে দিয়ে সে শিফটের ফায়ারম্যানকে নিয়ে আসব আমাদের শিফটে। রাত্রে কাজ করলে ও যতখুশি জল খেতে পারবে।

কিন্তু রাত্রের শিফটের লোকগুলো অল্প ক'দিনের জন্যে বেনকে নিতে রাজী হল না। ও যদি চিরকালের মত কাজ করতে রাজী হয় ওদের সংগে তাহলে ওকে নেবে তারা। সুতরাং রাত্রের শিফটে যাওয়া হল না বেন-এর।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম আমরা। বেন কিন্তু এসবের কিছুই জানত না। বেন-এর জন্য তখন খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছি আমরা। দিনের পর দিন খাবার না খেয়ে জল না খেয়ে ঘামতে ঘামতে শেষ হয়ে যাবে লোকটা, অথচ কিছু করার নেই। মহা সমস্যায়ই পড়ে গেলাম আমরা।

পরের দিন খুব গম্ভীর দেখাল বেনকে। রাত্রে নিশ্চয়ই প্রচুর খেয়েছে ও, জলও খেয়েছে গলা পর্যন্ত। কিন্তু তবু কেমন মনমরা দেখাল ওকে, খুব কষ্ট হল আমাদের। আমরা তো খাবারও খাচ্ছি, জলও

খাচ্ছি। মনের অবস্থা এমন হল যে আমাদেরও আর খাওয়া-দাওয়ার কোন বাসনা রইল না। কি করা যায় ভাবতে লাগলাম সবাই। বেনকে কি কোন সাহায্যই করতে পারব না আমরা?

হঠাৎ একজনের মাথায় চমৎকার বুদ্ধি এল একটা। বেনকে জলভর্তি চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলে দেব। জল না থাক, ঠান্ডা জলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আরাম তো করতে পারবে খানিকটা। আনন্দে নেচে উঠলাম আমরা। কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বেন।

বেনকে বললাম সব কথা। কিন্তু ধর্মভীরু বেন রাজী হল না। সুতরাং ওকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে চৌবাচ্চার মধ্যে ফেলে দিলাম আমরা।

আমরা সবে পয়লা কাঠের টুকরোটা তুলেছি বয়লারের মধ্যে ছুঁড়ে দেব বলে, লাফিয়ে উঠে এল আমাদের দিকে। আমাদের মনে হল, বেন-এর মাথাটা বোধহয় বিগড়ে গেছে। তৎক্ষণাৎ সরে দাঁড়ালাম সবাই। হো হো করে হেসে উঠল বেন, লোহার ডান্ডাটা একপাশে রেখে দিয়ে নিজের কাজে লেগে গেল আবার।

এবার আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। বেন দ্বিগুণ উৎসাহে কাঠ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে বয়লারে। একটা কাঠও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না। বেন হাসছে।

সেবার যতদিন রমজান ছিল ততদিন বয়লার যেন দাউ দাউ করে জ্বলেছে।

রাজস্থানের শিল্প নিদর্শন

নির্মল দত্ত

রাজস্থান দুর্গ-মন্দিরে-মসজিদে ভরা। রাজস্থানীদের বীরত্ব-গাথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে। তাদের ধর্মপ্রবণতা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অনুরণিত। জয়পুর-চিতোর-আজমীর-উদয়পুর-আবু - যোধপুর - বিকানীর, সর্বত্র সেই নিদর্শন আজও জাজ্বল্যমান। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রাজস্থান। পাহাড়, হ্রদ, প্রাসাদ আর উদ্যান মনোরম করে তুলেছে সমগ্র রাজস্থানকে। বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে রাজস্থান যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাঙালী কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাজস্থানের গান গেয়েছেন তাঁর কবিতায় আর নাটকে। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের মানুষের মিলনসূত্র গেঁথে দিয়েছেন যেন চারণকবি।

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর। মহারাণা দ্বিতীয় জয়সিংহ গড়ে তোলেন জয়পুর। সেটা ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ। জয়সিংহের নাম অনুযায়ীই শহরের নাম হয় জয়পুর। কিন্তু জয়পুরের পুরোন রাজধানী হল অম্বর। জয়পুরের পাশেই পাহাড়ের ওপর অম্বর। মহারাজা মানসিংহ যশোর থেকে যে কালীমূর্তি এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আজও আছে। নিত্য পূজোর ব্যবস্থাও রয়েছে দেবীর।

জয়পুরের মহারাজার প্রাসাদটি একটি দুর্গের মত। মহারাজারা এখানে এখন আর থাকেন না। এটি হয়েছে এখন চিত্রশালা। প্রাসাদের মধ্যে চন্দ্রমহল হল সাততলা বাড়ী। প্রাসাদেরই একটি অংশ। এই প্রাসাদে আছে দেওয়ানী খাস, ঘন্টাঘর, তোপখানা প্রভৃতি। জয়পুর শহরের মধ্যে রাস্তার ধারেই 'হাওয়া মহল'। পাঁচতলা। তৈরী করেন মহারাজা মাধো সিং (১৭৫১-৬৮)। প্রাসাদের উত্তরে গোবিন্দজীর মন্দির। শহরের আর একদিকে পাহাড়ের ওপর সূর্যমন্দির।

অম্বর প্রাসাদ ঠিক দুর্গের মত। হ্রদের ধারে পাহাড়ের ওপর এই অম্বর ফোর্ট বা প্রাসাদ। এই অম্বর প্রাসাদে আছে শিবমহল, দেওয়ানী খাস বা জয়-মন্দির, সুখনিবাস, দেওয়ানী আম, কালী মন্দির বা শীলা দেবীর মন্দির।

জয়পুর থেকে বিরাশি মাইল দূরে আজমীর শহর। জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অজয়পাল চৌহানরা আজমীর গড়েছিলেন। পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর মহম্মদ ঘোরী আজমীর ধ্বংস করেন (১১৯৩)। তৈমুরলঙ্গও এর কিছু ক্ষতি করেন। মেবারের রাণা কুম্ভ কিছুদিন আজমীর অধিকার করে রেখেছিলেন। শেষে সম্রাট আকবর আজমীর দখল করেন। সম্রাট আকবর মুসলমান সাধু খাজা মইনুদ্দিন চিশ্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে একবার আজমীর আসেন (১৫৭০)। স্যার টমাস রো এই আজমীরেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। আজমীরে খাজা সাহেবের দরগা আর ফকির খাজা মৈনুদ্দিন চিশ্তির সমাধি বিশেষ খ্যাত। হিন্দু-মুসলমান সকল নর-নারী দর্শক আসেন এই মসজিদ আর সমাধি দেখতে।

আজমীর থেকে আট মাইল দূরে হল পুষ্করতীর্থ। পুষ্কর শুধু মন্দিরে ভরা। ব্রহ্ম মন্দির, গায়ত্রী মন্দির, রঙ্গজী মন্দির—আরও। এখান থেকে তিন মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর সাবিত্রী মন্দির। পাহাড়ের নামও সাবিত্রী পাহাড়। নারীদের ভিড় এই মন্দিরে বেশী।

দিল্লী থেকে জয়পুর ও আজমীর হয়ে ৬৩১ কিলোমিটার দূরে হল চিতোর গড়। এখানেই হচ্ছে চিতোর দুর্গ। বহু দূর থেকেই দেখা যায় পাহাড়ের ওপরের এই চিতোর দুর্গকে। রাজপুত বীরত্বের বহু গৌরবময় গাথা এই চিতোরগড় থেকেই রচিত হয়েছে। এককালে মেবারের শিশুদিয়া রাজপুতদের প্রাচীন রাজধানী ছিল চিতোরগড়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মোরি রাজপুতদের প্রধান চিত্রাঙ্গ গড়েছিলেন এই চিতোর দুর্গ। তিনি এর নামকরণ করেছিলেন চিত্রকোট। চিতোরে যে সব রাজারা রাজত্ব করে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মহারাণা কুম্ভ, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আর মহারাণা প্রতাপ সিংহের নাম দেশজোড়া। তাঁদের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব আর নির্ভীক দেশপ্রেম চিতোরের মাটিকে তীর্থ করে রেখেছে।

চিতোর দুর্গে সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়েছে অনেক: জয়স্তম্ভ, কুম্ভ প্রাসাদ, পদ্মিনী প্রাসাদ, জহরব্রতের জায়গা, গোমুখী প্রভৃতি। মন্দিরের মধ্যে মীরাবাঈ মন্দির, কুম্ভ মন্দির, অমিধেশ্বর বা ত্রিমূর্তি মন্দির, কালিকা মাতার মন্দির প্রভৃতি আরও অনেক মন্দির আছে।

পুষ্কর : আজমীর
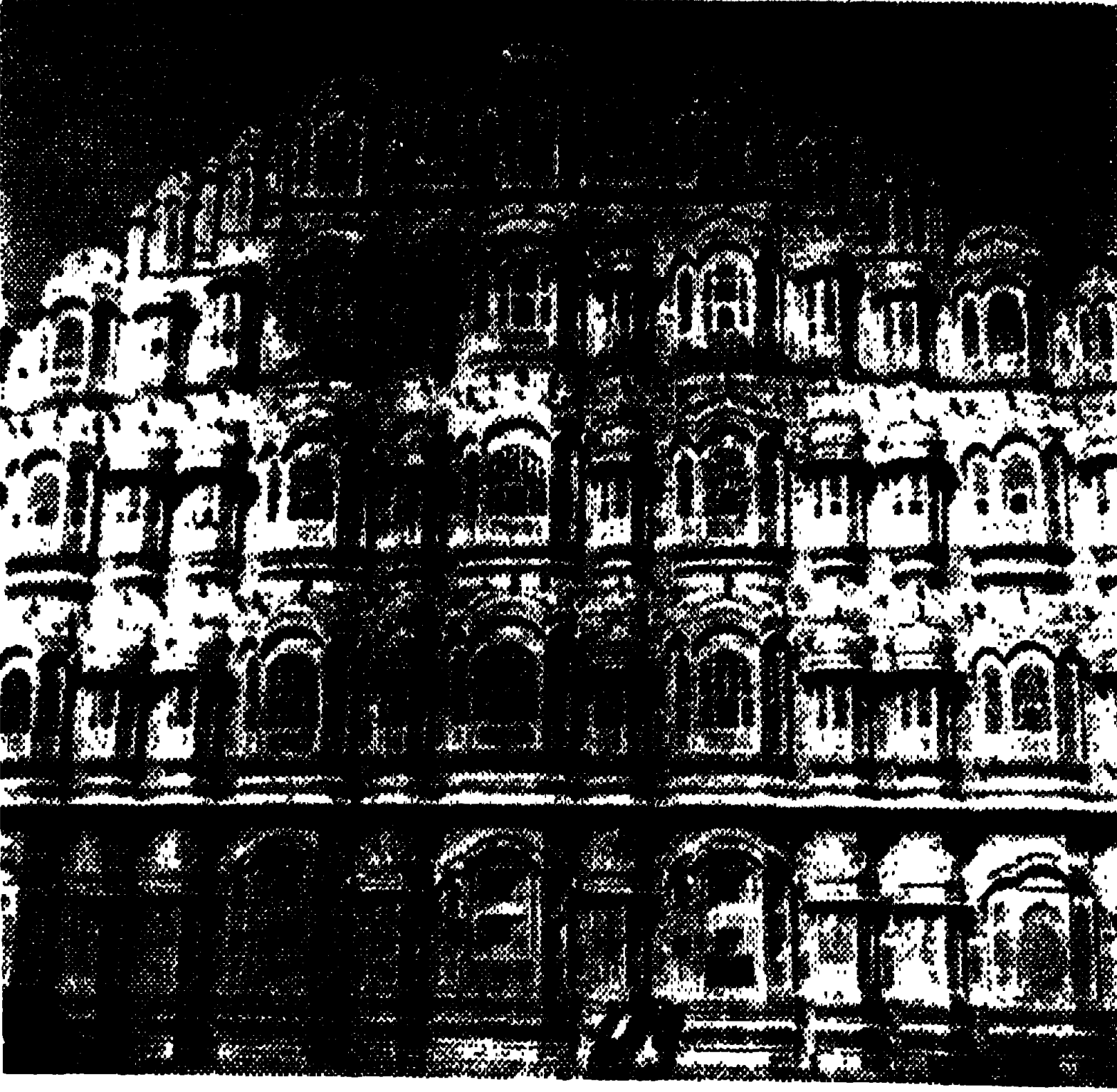
হাওয়া মহল ঃ জয়পুর

চিতোরের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি প্রথম চিতোর আক্রমণ করেন। রতন সিংহের অপূর্ব-সুন্দরী স্ত্রী পদ্মিনীকে হরণ করার উদ্দেশ্যেই চিতোর আক্রমণ করেন আলাউদ্দিন। বহুদিন অবরোধের পর চিতোর দুর্গের পতন হয়—দুর্গের সেনানীরা বীরের মত যুদ্ধ করে নিহত হন। আর রাজপুত রমণীরা জহরব্রত পালন করেন। আলাউদ্দিনের পর রাণা হাম্বীর চিতোর পুনরধিকার করেন। রাণা কুম্ভ তারপর এখানে আরও কয়েকটি দুর্গ তৈরী করান। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর চিতোর দুর্গ আক্রমণ করেন। রাণা উদয়-সিংহের দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি জয়মল্ল আর পাট্টা যুদ্ধে নিহত হন। সম্রাট আকবরও তাঁদের বীরত্বে মুগ্ধ—ধন্যি ধন্যি পড়ে যায় দুই বীরের মোগল সেনানী মাঝেও।... উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ সিংহ আকবরের আনুগত্য স্বীকার না করে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যান—ইতিহাসের সেকথা সকলেরই জানা আছে। প্রতাপের বীরত্বের কীর্তি আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে।

পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত চিতোর দুর্গ। উত্তর-দক্ষিণে তিন মাইল লম্বা ও চওড়া আধ মাইল। দুর্গে উঠতে হলে একটা ঘোরানো রাস্তা আছে পাহাড় বেয়ে—সেই রাস্তায় উঠতে হয়। প্রথম প্রবেশদ্বারের নাম 'পাড়ল'। তারপর ভৈরব পোল, গণেশ পোল, জোড়লা পোল, লক্ষ্মণ পোল, রাম পোল প্রভৃতি পেরিয়ে যেতে হয়। এক-একটি পোল দুর্গে ওঠার এক-একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা শত্রুর হাত থেকে।

চিতোর দুর্গে জয়স্তম্ভ তৈরী করিয়ে-ছিলেন রাণা কুম্ভ। মালব বিজয়ের পর ১৪৫৮ থেকে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। স্তম্ভেত উচ্চতা ১২২ ফুট। নয়টি তল আছে স্তম্ভের। আলাউদ্দিন দুর্গের যে ঘর থেকে ও যে আয়নার ভেতর দিয়ে পদ্মিনীকে দেখেছিলেন তা আজও আছে পদ্মিনী মহলের সামনে।

চিতোর থেকে উদয়পুর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা উদয়পুর। পিচোলা হ্রদ, ফতেসাগর, উদ্যান, পাহাড় আর জল-প্রাসাদ এর সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উদয়পুর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে শ্রীনাথজীর মন্দির। পাহাড় ঘুরে ঘুরে পথ। সুন্দর পিচের রাস্তা গাড়ী চলার। শ্রীনাথজী হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কালো পাথরের তৈরী সুন্দর ঢল-ঢলে মূর্তি। নাথদ্বারে কৈলাসপুরীতে অবস্থিত এই মন্দির। সদাই দর্শনার্থী নর-নারীর ভিড়। বৈষ্ণবদের পবিত্র মন্দির এটি। মন্দিরের মূর্তিটি মহারাণা রাজসিংহ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ থেকে বাঁচাবার জন্যে মথুরা থেকে এখানে নিয়ে আসেন। অবশ্য এর আগে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাধু বল্লভাচার্য এই মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ করেন।

উদয়পুরের উত্তরে ১৪ মাইল দূরে একলিঙ্গজীর মন্দির। মেবারের মহারাণাদের বংশের দেবতা হলেন একলিঙ্গজী। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাপা রাওয়াল এই মন্দির গড়া সুরু করেন। কিন্তু বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন মহারাণা রায়মল (১৪৭৩-১৫০৯)। মন্দিরে আছেন নিকষ কালো পাথরের চতুর্মুখ শিবের মূর্তি। মন্দিরটি তৈরী শ্বেত-পাথরের।

রাজস্থানে সব চাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে দিলওয়ারার মন্দির। আবু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই দিলওয়ারার মন্দির। জৈনদের পীঠস্থান এই আবু। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে আবু অবশ্য শৈব সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ছিল।

জৈন সম্প্রদায়ের এই দিলওয়ারা মন্দিরের শ্বেতপাথরের ওপর কারুকার্য অপূর্ব। বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। এখানকার পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে বিমলশাহী ও তেজপালের মন্দিরই বিখ্যাত। গুজরাটের সোলাঙ্কী বংশের রাজা ভীমদেবের মন্ত্রী বিমলশাহ তৈরী করান (১০৩১) এই মন্দির। মন্দিরে প্রধান দেবতা হলেন প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদি-নাথ। মন্দিরের দেওয়ালের চারপাশেও বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। সবই শ্বেত-

জয়স্তম্ভ ঃ চিতোর
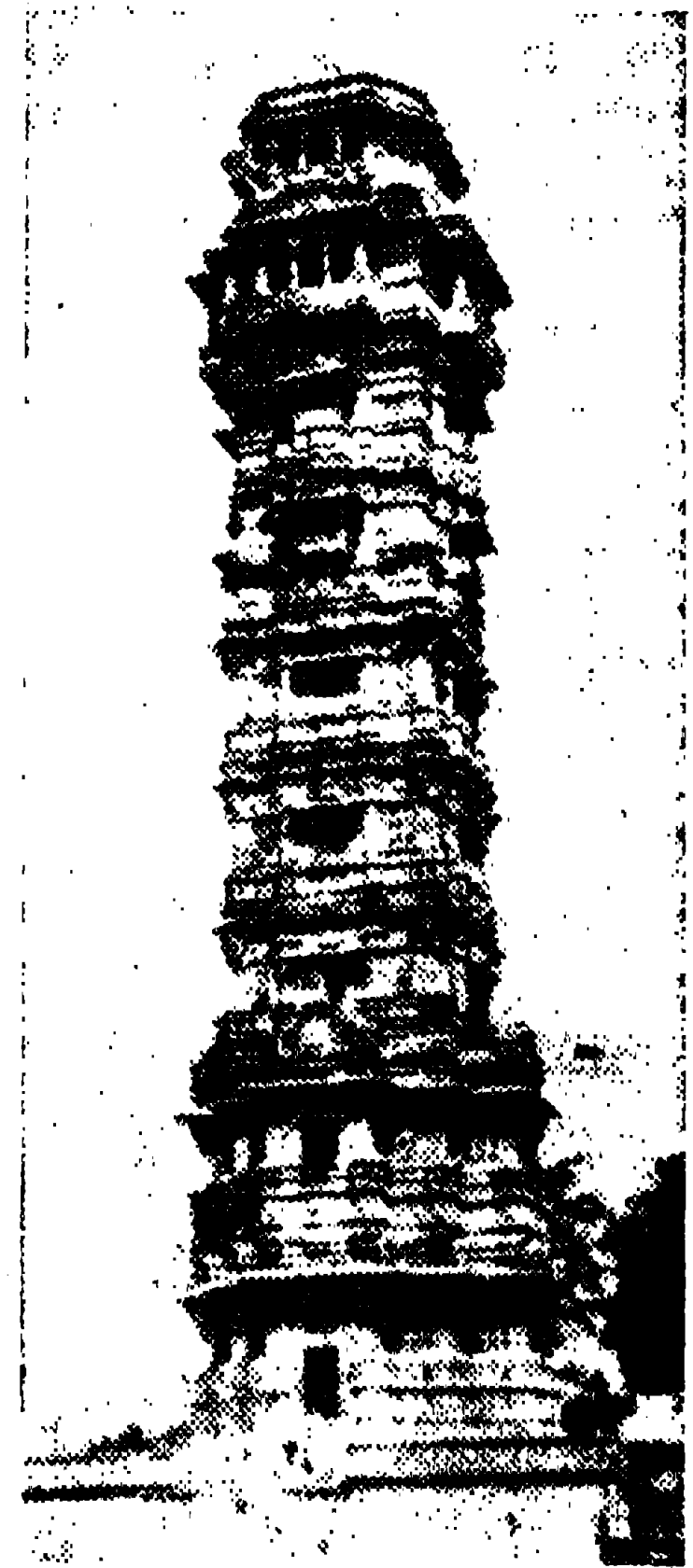
পাথরের তৈরী আর কারুকার্যে ভরা। মন্দিরের ভেতর শুধু জৈন কাহিনীই খোদাই করা নেই—হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীরও নিদর্শন আছে। তখনকার দিনেই এই মন্দিরটি তৈরী করতে খরচ পড়েছিল নাকি আঠারো কোটি টাকা। আর তেজপাল মন্দির তৈরী করতে খরচ পড়েছিল সাড়ে বারো কোটি টাকা বলে জানা যায়। বিমলশাহী মন্দিরের প্রায় দুশো বছর পরে ১২৩১ সালে তেজপাল মন্দিরটি নির্মিত হয়। গুজরাটের এক শাসকরাজা বিরাধাবালার দুই মন্ত্রী বস্তুপাল ও তেজপাল এই মন্দির তৈরী করেন। তেজপালের স্ত্রী অনুপমা দেবী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই মন্দির তৈরীর কাজ তদারক করেন। মন্দিরে মূর্তি আছে দ্বাবিংশ তীর্থংকর নেমিনাথ ভগবানের।

দিলওয়ারা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অচলগড়। এখানে আছে একটি শিব-মন্দির।

আবু থেকে ১৪ মাইল দূরে অম্বাজীর মন্দির। বাসের পথ। যেতে অসুবিধা নেই। অম্বাজী হলেন দুর্গা। অম্বাজীকে দেখতে নর-নারী দর্শনার্থীর ভিড়ের অন্ত নেই। জাঁক-জমকও কম নয় পুজোর।

দিলওয়ারা মন্দিরের একটি সুপরিচিত কারুকার্য : আবু

জয়পুর থেকে ৩৭০ কিলোমিটার বা ২৩০ মাইল দূরে যোধপুর। এখানকার দুর্গটি রাজস্থানের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। শহর থেকে ১২২ মিটার (৪০০ ফিট) উঁচুতে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত দুর্গটি। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সমগ্র দুর্গের এলাকা। প্রাচীরের গায়ে কোথাও গোলাকার কোথাও বা চতুষ্কোণ গম্বুজ। দুর্গের মধ্যে আছে প্রাসাদ, সৈন্যাবাস আর মন্দির। দুর্গ ছাড়াও যোধপুরের গণ্গাশ্যাম মন্দির আর একশোটি স্তম্ভবিশিষ্ট মহামন্দির দর্শকদের কাছে কম আকর্ষণীয় নয়।

আরাবল্লী পাহাড়ের পশ্চিম দিকের ঢালুতে মনোরম উপত্যকায় হল রণকপুরের সুপ্রসিদ্ধ জৈন মন্দির। ৩,৭২০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে মন্দিরের অবস্থিতি। স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন মন্দিরের গায়ে গায়ে।

পদ্মিনীপ্রাসাদ : চিতোর

হলুদ রঙের বালুকাময় প্রান্তরে হলুদ রঙের পাথরে তৈরী মন্দিরে। দুর্গ আর প্রাসাদশ্রেণীতে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে আছে জয়শলমীরে। রাজস্থানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত জয়শলমীর। ভারতের থর মরুভূমি নামে পরিচিত। ভারতের এক প্রান্তে জয়শলমীর যেন স্বপ্নের প্রহরী। এর দক্ষিণে পাহাড়ের ওপর দুর্গটি চিতোরের পরই রাজস্থানের প্রাচীনতম সুরক্ষিত দুর্গ। দুর্গের মধ্যে ভাস্কর্যে খোদিত জৈন মন্দিরশ্রেণী।

কিরাড়ু আর বারোলীর মন্দির, রণথমভোর আর ভরতপুরের দুর্গ রাজস্থানের অন্যতম আকর্ষণ। থর মরুভূমির অভ্যন্তরে অবস্থিত মধ্যযুগের ভারতের কলা ও শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বিকানীর। বিকানীরের দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন আকবরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজা রায় সিং। দুর্গের মধ্যে চন্দ্রমহল, ফুলমহল, শীষমহল, ছত্তরমহল, সুর্যনিবাস (দরবার গৃহ), করণ মহল প্রভৃতি প্রাসাদের শ্রেণী। জৈন মন্দির আর মঠ বিকানীরের আর এক শোভা।

একদিকে বীরত্বগাথার নিদর্শন দুর্গ আর প্রাসাদশ্রেণী, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মপ্রাণ মানুষের পীঠস্থান এই রাজস্থান। এই নিয়ে তীর্থ হয়ে আছে রাজস্থান তার ঐতিহাসিক দুর্গশ্রেণীতে আর মন্দিরে-মসজিদে। রাজস্থানের প্রতি মানুষের তাই এত আকর্ষণ।

লবন পারাবারের তীরে

আব্দুল আজীজ আল আমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই ত জীবন।

বিকেলে নাস্তা করে, দু-জনে হাসি-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে ড্রেসিং পর্ব শেষ করল। নীচেয় গাড়ী তৈরী। দুজনে নেমে এল দ্রুত পায়ে—এ স্মার্ট ইয়ুথ অ্যান্ড এ শ্লিম টিন এজার—

শো-এর দেরী ছিল। আর সময়টা যখন অত্যন্ত মনোরম মনে হচ্ছে, কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে ওরা গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল। এলো চুল। সারা দেহটা যেন বিউটি এলিয়ে দিয়েছিল। পাঁপড়ি মেলে পদ্ম যেমন বিকশিত হয় এ সময় দুজনের গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। আপনা থেকেই গলায় সুর ফুটছিল।

সাঁথনা দিত এই সঙ্গ! ধ্যুৎ—

জোর করে ও মুখটাকে চাপা দিতে চাইল হারুণ। আমি তোমায় কষ্ট দেব না কোন দিন। সুখেই রাখব। যা চাইবে তাই পাবে। যখন চাইবে—

হাতের উপর সুরক্ষিত কুসুম। বিউটি গান গাইছে। যেমন করে ও কুসুমকে তুমি ব্যবহার কর। যেমন ইচ্ছা।

আকাশে শরতের মেঘ ছিল। মেঘটা ক্রমে জটলা করছে। হয়তো বৃষ্টি হবে। হয়তো [illegible]—একটু এগিয়ে [illegible] কাছে ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়তে দেখল হারুণ। গুঁড়ি গুঁড়ি ভিতরে আসছে। মুখে পড়ছে, চুলে পড়ছে। অদ্ভুত হিমেল আমেজ।

একটু চেপে আসতেই দ্রুত হাতে বিউটি উইন্ডো গ্লাস তুলে দিল।

আরে করছ কী—থাক না। হারুণ গ্লাসটা নামাতে যাচ্ছিল। এক হাত দিয়ে ওর হাত চাপল বিউটি আর অন্য হাতে রুমাল নিয়ে মেক-আপ করা মুখ চেপে ধরল। রুমাল দিয়ে মোছা নয়, চেপে চেপে ধরা। চাপ দিয়ে বৃষ্টির ছাট গুলোকে রুমালে অদৃশ্য করা।

একটুকাল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল হারুণ। সব বুঝল কিন্তু কিছু বলল না। বৃষ্টির ছাটে মুখ ধুয়ে যাবে, রং উঠবে। আর পালিশ উঠলেই কাঁচ বেরুবে।

শত চেষ্টা করেও ও মুখটাকে আর দূরে সরাতে পারল না হারুণ। বিষন্নতায় ম্লান নয়—হাসিখুশী এক কিশোরী মুখ। দুধে আমতলায় আম কুড়ুতে গেছে। উঠল ঝড়, এল বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টিতে দু-জনে ভিজে একাকার। আত্মহারা সাঁথনা। হাত পেতে বৃষ্টির জল ধরে আর মুখে ছিটে মারে। দু-হাতে মুখ ঘষে. উজ্জ্বল খুশী চোখে পিট পিট করে তাকায়, কপালে ঝাঁপিয়ে এলিয়ে পড়া চুল তুলে দেয়। আবার জল ধরে, আবার ছড়ে। আবার ধরে—

জং উঠে গেলে পয়সা যেমন পরিষ্কার হয়, মেঘ ঝরে গেলে আকাশ যেমন নির্মল হয়। সাঁথনার মুখটা তেমনি উজ্জ্বল আর স্পষ্ট হল।

দশ মিনিট—ব্যাক কর। সুগোল হাত তুলে মাছি-ঘড়ি দেখল বিউটি। আর সেই হাতের শেষ প্রান্তে রক্ত-রঙীন পাঁচটি ছুরির ফলা ঝিকমিকিয়ে উঠল এক সঙ্গে।

গাড়ী ব্যাক করতে করতে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল হারুণ।

হলে প্রবেশের আগে অত্যন্ত খুশী-খুশী লাগছিল বিউটিকে। হারুণের হাতটা ধরে চঞ্চল পদে এগুচ্ছিল। প্রবেশের মুখেই একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিউটি যেন গানের সুরে কথা কইল, অ্যান্ড ইউ—

হারুণ দেখল ভীড়ের মধ্য থেকে অত্যন্ত সুসজ্জিত এক যুবক হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে আসছে। হারুণ কী করবে বুঝতে পারল না। এই উজ্জ্বল মুহূর্তে, এই সিনেমাতেও! সে মনে মনে অত্যন্ত তপ্ত হল। বিচলিত হল। এমন করে এই সুন্দর পরিবেশটাকে নোংরা করার, কুৎসিত করার অধিকার ওকে কে দিল।

পরিচয় পর্ব। বিউটি মধ্যস্থতার কাজ করল। হাতের তালুটা মৃদুভাবে আন্দোলিত করে বলল, মিঃ আবিদ হোসেন—মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই বেটার হাফ্—

আবার সেই এটিকেটের প্রশ্ন। তাই হারুণ হাসল। ভব্যতাজ্ঞানের প্রতি-যোগিতা। তাই হারুণকে হাসতে হল। হাউই বাজী যেমন হাসে। মুখে আগুন, বুকে বারুদ। তবুও হাসে। হেসে হেসে ফুল ঝরায়। হারুণ এখন হাউই বাজী। জ্বলে জ্বলে হাসল। জ্বলাটা দেখা গেল না।

কুল গাছে আবার কুল ধরেছে।

মৌমাছিরা গুঞ্জন করছে। পাতায় পাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীতল হাওয়া বইছে ঝির ঝির করে। উত্তুরে হিমেল হাওয়া। প্রসন্ন নীল আকাশ। সেই আকাশ থেকে এক নৈঃশাব্দিক বিষণ্ণতা ঝরে ঝরে যেন সমগ্র পৃথিবীকে ব্যথাতুর করে তুলছে।

এই সেই কুল গাছ! একটি একটি করে কুড়িয়ে সঞ্চয় করত সখিনা। আজকাল ফিরেও তাকায় না। কত পাকা কুল। পাড়ার ছেলেরা এসে লুট করে নিয়ে যায়। কিছু বলে না ও।

সে হাঁস নেই। সে মুরগী নেই। কার জন্যে পুষবে। কী জন্যে এত কষ্ট! অতবড় বিরাট বাড়ীটা পৃথিবীর নৈঃশব্দে খাখা করে। ব্যথা বুকে নিয়ে শূন্যে রোয়াকে বসে থাকে সখিনা। রোয়াকে বসে কাঁদে। কান্নাই জীবনের সার হল। মাঝে মাঝে নীরব মুহূর্তগুলিকে সচকিত করে এক অন্তহীন মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে সখিনা। সেই শ্বাসে বুঝি আল্লার আসমান টলে যায়।

এই ছিল তোমার মনে?

প্রতি নিঃশ্বাসের জিজ্ঞাসা। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে দেহমন তোলপাড় হয়। প্রতি লোমকূপ থেকে সকরুণ ধ্বনি ওঠে, এই ছিল তোমার মনে?

সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত—যেন এক অন্তহীন সংগ্রামের ইতিহাস। সামান্য কটা পয়সার জন্যে কত লাঞ্ছনা, কত অপমান। সখিনা স্মরণ করে সেসব কথা। স্মরণ করে বেদনাতুর শ্বাস ফেলে।—

রোয়াকে বসে শূন্যে প্রান্তর চোখে পড়ে। ফসল শূন্য রিক্ত প্রান্তর। দুপুরের রোদে কখনো দাউ দাউ করে জ্বলে। বুভুক্ষুর মত খা খা করে কখনো। আর সেই দাহন লাগে সখিনার বুকে। চোখ সজল হয়ে ঝাপ্সা হয়। প্রান্তর অবলুপ্ত হয়। মাঠ ভেঙে কেউ আর এই স্নিগ্ধ গৃহাঙ্গনের দিকে এগিয়ে আসবে না।

কখন সন্ধ্যা নেমেছে। সখিনা জানতেও পারে নি। আজকাল প্রায়ই এমন হয়। টুপ করে কোন ফাঁকে দিনের সূর্য তলিয়ে যায়। অঝোরে সন্ধ্যা নামে। ঘন হয়, কালো হয়। তারপর হঠাৎ এক সময় সচেতন হয় সখিনা। কিন্তু আগে এমন হতো না। এমন হবার অবকাশই ছিল না। সন্ধ্যার কত আগে থেকেই হাঁস-মুরগীর দল বাড়ী মাথায় করে তুলত। সে হাঁস গেছে, সে মুরগী গেছে—সব গেছে।

অ গ—আমার সোনার সংসার বিরান হল।

চোখের জল বাঁধ মানে না।

একটা পটকা ফাটল। বোধহয় পাশের বাড়ী থেকে। আর তাতেই হুঁস হল সখিনার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু পটকা ফাটে কেন। আজ শবেবরাত। আর শবে-বরাতের কথা মনে হতেই চমকে উঠল সখিনা। আজকের রাতে ত কাঁদতে নেই। বড় ফজিলতের রাত আজ। অন্য বছর এই দিনটিতে কত ফকির মিসকীন আসত সখিনার বাড়ী। রুটি করত, সিমুই রাঁধত। তাদের খাওয়াত। পাড়ার বেওয়া ছেলে-মেয়েরা আসত। এ বাড়ীতে যেন হাট বসে যেত। শবেবরাতের কথা মনে হতেই, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সখিনা, যেন অনেক কাজ করার আছে, যেন অনেক কাজ করা হয়নি। ছুটে গিয়ে আলো জ্বালল। তারপর সেই পরিচিত ঘরের চার পাশ তাকিয়ে আর কোন কাজ খুঁজে পেল না। হঠাৎ যেন কিছুটা উন্মাদনা এসেছিল। সেই উন্মাদনা এখন চোখের জলে ঝরে পড়ছে।

আকবর চাচার মা ডাকল, শবেবরাতের রাত—তা একটু নামাজ রোজা করলি নে।

তা বটে। একটু পড়লে হয়। আব্বার রূহের জন্যে মাগফেরাত কামনা করা। ওজু করে নামাজের পাটিতে কোরান শরীফ খুলে বসল সখিনা। পড়বে কী—চোখ মুছে মুছেই হয়রান। এক সময় আকবর চাচার মাও কেঁদে ফেলল। কোরান শরীফ পড়া শেষ হলে দুজনেই নামাজ পড়তে বসল। নামাজের পাট চুকিয়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করল দুজনে। সবই দুপুরের রান্না। তরকারী আজকাল প্রায়ই থাকে না। কখনো কখনো ভাতও বাড়ন্ত হয়।

বুড়ী মানুষ। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সখিনা?

চাঁদের আলোয় ইমতাজ চাচার কবর দেখা যায়। কবরটাকে ভারী হেফাজত করে রেখেছে সখিনা। চার পাশে কিছু ফুলের গাছ পুঁতে দিয়েছে। গাছগুলিতে এখন ফুল ধরেছে। আস্তে আস্তে কবরের কাছে উঠে এলো সখিনা।

আস্তে আস্তে আব্বার কবরের কাছে উঠে গেল সখিনা। অনেকক্ষণ বসে থাকল কবরের পাশে। আকাশে চাঁদের আলো। উত্তুরে হিমেল হাওয়ায় সে জ্যোৎস্না আরো পরিচ্ছন্ন হয়েছে। অল্প অল্প শিশির পড়ছে। সমগ্র গ্রামখানি নিস্তব্ধ। কবরের কাছে কাঁদতে নেই তাই। কিন্তু মন বাঁধ মানে কই। এতদিন যা করেনি, আজ তাই করে ফেলল সখিনা। কবরের উপর উপুড় হয়ে এক অন্তহীন কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল, আব্বা গ—তোমার সাধের সখিনা কী সুখে আছে একবার দেখে যাও।

—বর পেয়েছে, ঘর পেয়েছে, সংসার পেয়েছে—অ আব্বা গ

চোখের জলে কবরের মাটি ভিজে গেল।

আরগুমেন্টে জজেরা পর্যন্ত বিচলিত হয় মাঝে মাঝে। আইনসমর্থিত জোরাল যুক্তি। সুতরাং কোন কেসে বিফলের নজীর বড় একটা নেই। আর সে কারণেই, ট্যাক্সীর মিটারের মত ব্যারিস্টার হারুণ মোহাম্মদের ফিসও ঊর্ধ্বগতি হয়। তবুও ক্লায়েন্ট ধরে না। অনেক সিনিয়র উকীল এখন তার অধীনে কাজ করছে।

টাকা যেন বন্যার স্রোত। দু হাতে লুটে ঘরে তুলছে।-অভিজাত পাড়ায় এই বিশাল গৃহটি এখন তার নিজের। সামনে বিরাট লন। মাঝে মাঝে ফুল গাছের ঝোপ। পাচিল ঘিরে আইভি লতার গুচ্ছ।

সুলতানকে পাঠিয়ে দিয়ে আজ সারা দিনটাই ঐ ঝোপের আশে-পাশে ঘুরে বসে কাটাল। চাকর-বাকর মহলে দারুণ কানাঘুষো পড়ে গেল। সাহেবের আজ হল কী? কই—কোনদিন ত এমন করে বাইরে থাকেন না।

দিন যত শেষ হয়ে আসে—হারুণের উৎকণ্ঠা ততই বাড়ে। ততই ছটফট করে।

কে—সুলতান?

না, আমি সাব।

অ—যাও, কাল এসো।

সুলতান এলি নাকি?

কে রে, সুলতান?

এই, সুলতান এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস ত।

চাকর মহলে আরো জোর কানাঘুষো চলে।

হারুণ আজ পরাজিত। পরাজিত বলেই আপন জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে সেই গ্রাম্য 'পোড়ারমুখীর' সামনে দাঁড়াতে পারল না। সে সাহস আজ তার নেই। তার কেবলই মনে হয়েছে, সখিনা কেন—সারা গ্রামখানি তার মুখে থুতু লেপন করছে। এতটুকু শিশু যেন বলছে, ঐ দেখ নিমকহারাম যায়।

এক সময় সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সুলতান এসে জানাল, স্যর—তিনি আসবেন না।

ব্যাকুল কণ্ঠে হারুণ শুধাল, আমার চিঠি তাকে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ স্যর।

অ।

সুলতান চলে যেতে সেই নির্জন লনে বসে, পাগল যেমন নিজের মনে কথা বলে, হারুণ বলল, সে আসবে না—আমি জানতাম। সে যে বড় অভিমানী। বড় অভিমানী।

(ছয়)

বিউটি কখনো ভুল করে না।

অন্ততঃ আজ পর্যন্ত ভুল হয়নি। তার জীবন-দর্শন তাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এ দর্শনকে তার নির্ভুল মনে হয়েছে। নিখুঁত এবং নির্ভুল। যেমন পূব দিকে সূর্য ওঠে। যেমন অস্ত গেলে সন্ধ্যা হয়।

জীবন কী?

একটা গভীর অরণ্য। ভবিষ্যৎ জান তুমি? না। ঐ অরণ্য যেমন। ভিতরে ঢুকে যেদিকে ইচ্ছে যাও। কেবল ঐ ইচ্ছেশক্তি থাকা চাই। ওটি হারালে সব শেষ।

তা হলে জীবনে প্রেম-মমতা-ভালবাসা—এ সবের অর্থ? রাবিস। প্রেম-ভালবাসা? ছোঃ। ননসেন্স টক।

তা হ'লে সত্য কী?

হাঁ সে কথাই বল। সত্য হচ্ছে নর-নারীর সম্পর্ক। তা বলে, ঐ কী বলে তোমার, প্রেম-ভালবাসা নয়। কেবল নর-নারীর সম্পর্ক। বিশুদ্ধ সম্পর্ক। বল দেখি বুকে হাত দিয়ে, একটা পরিপাটি যুবতীকে দেখে তোমার রক্ত কেমন করে। তারপর দুজনে চলে যাও নির্জনে, একান্ত নিরালায়। তোমার সামনেই, সেই যুবতী অংগবাস ত্যাগ করে তাজা যৌবনে ঢেউ তুলল। বল. বুকে হাত দিয়ে বল, আমি ওসব প্রতিজ্ঞা-প্রতীজ্ঞায় বিশ্বাসী নই, বল, তোমার মন যা বলে তাই বল। রক্ত যে কথা কয়—তা বল। সাবধান মিথ্যে বল না। একটু কাল আগেও ত তুমি ঐ নারীকে কথনো দেখনি। হঠাৎ পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার বুকের প্রেম উথলে উঠল! আই—নাক চেপে যাও কোথায়। খবরদার মিথ্যে বল না।

হ্যাঁ, এ সম্পর্ক সত্য। নর-নারীর এই সম্পর্ক। এই খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। এক-জন খাদ্য আর একজন খাদক। একজন ভক্ষ্য আর একজন ভক্ষক। খাদক খাবে খাদ্য। এ ত চিরন্তন কথা। আদিম নিয়ম। কোন ব্যতিক্রম নেই।

বিউটি তাই ভাবে। এ সত্য বিউটির জীবন-সত্য। এ দর্শন বিউটির জীবন-দর্শন। গত রাতে তা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে।

হারুণ বলল, হেসেই বলল, আমাদের মান-সম্ভ্রম আমাদেরই বাঁচিয়ে চলা উচিত। নয় কী?

বিউটি বলল, তুমি জেলাস। সন্দেহ-পরায়ণ।

সিনেমা হলে আবিদকে দেখার পর থেকে কিছুটা বিচলিত হয়েছিল হারুণ।

বিউটির যে রূপে হারুণ ভুলে ছিল, মেলা-মেশা, হাস্যালাপ, সামাজিক হওয়া—সে ভাল কথা। কিন্তু নিজেদের ত একটা প্রাইভেসী, একটা গোপনীয়তা আছে। সেই গোপন দুর্লভ মুহূর্তগুলিতেও হ্যাংলা মাস্তাবাজ ছেলেরা এসে হামলা করবে। বিউটিকে কিছু সতর্ক করা প্রয়োজন। ও সম্পর্কেই কথা বলতে যাচ্ছিল হারুণ। কিন্তু বিউটির উত্তরে, মুহূর্তে সমগ্র ব্যাপারটা, অত্যন্ত কুৎসিত ও নগ্ন হয়ে প্রকাশ পেল।

হারুণ যে পরিমাণ তপ্ত হয়েছিল তাতে এই মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিউটির অতসব ভাবতে বয়ে গেছে। তাই ভাবতে হল হারুণকে। কিছুকাল নীরব থেকে, কন্ঠের উত্তাপকে যতদূর সম্ভব শীতল করে, হারুণ বলল, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান টান কী ঠিক নয়।

কিন্তু বিউটি বিউটি। স্বর-তানকে মান রেখেই উত্তর দিল, আসলে তুমি সেই ম্যাই রয়ে গেছ। সোসাইটিতে মেলামেশার এখনো পাওনি।

এই মুহূর্তে একটা বন্দুক হাতে পেলে! অন্ধ ক্রোধ দারুণ আক্রোশে গর্জাচ্ছিল ওর ভেতর। একটা নয়, দুটো নয়—সারা অঙ্গকে ও গুলিতে বিদ্ধ করত। টুকরো টুকরো করত। হারুণ কিছু না বলে, ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। রাগটাকে চাপার চেষ্টা করল। উত্তাপকে ছাড়তে চাইল। এবং বেশ কিছু পরে উপলব্ধি করল, চলন্ত উত্তেজনারা নিস্তেজ হয়ে রক্তের কণায় চেপে বসছে। কিন্তু বিউটি। কী করতে চায় বিউটি?

প্রথমে অল্প অল্প কাঁদছিল। এখন একটু একটু করে শব্দ বাড়ছে। চাকর-বাকরেরা এখনো জেগে আছে। আই—কী করতে চাস তুই?

বিউটি উঠে দাঁড়াল। উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে হাল্কা নীল আলোটা জ্বালল। আর তাতেই মনে হল, মুহূর্তে ঘর থেকে অনেকখানি উত্তেজনা নিভে গেল।

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ড্রেসিং কেসের সামনে দাঁড়াল বিউটি। তারপর প্রতিদিন যেমন করে, একটি একটি করে অঙ্গবাস ত্যাগ করল। হারুণ অপলকে তাকিয়ে থাকল। যেন পদ্ম গোখরো। দুধ-রং সুঠাম দেহে সোনালী আলপনা। শেষ অন্তর্বাসটি ত্যাগ করে বিউটি মৃদু পায়ে পালঙের দিকে এগিয়ে গেল। চলার ছন্দে যৌবনের হিন্দোল। কিন্তু অন্য দিনের মত শুয়ে পড়ল না। দু' হাতে পালং ঠেস দিয়ে কাঁদতে থাকল। শব্দটা ক্রমেই জোর হচ্ছে। দেহটা ফুলছে, নামছে।

হারুণ উঠল, এই বিউটি—হচ্ছে কী? চাকর-বাকরেরা সব জেগে। শেষকালে ওদেরও হাসাহাসি করার সুযোগ দেবে?

বিউটি জানে, এবার অষুধ ধরেছে। নেশাগ্রস্তের তর্জন—স্বর শুনলেই বুঝতে পারে। কিছুটা ফল কান্নার অভিনয়ে আর বাদবাকী সবটুকুতে ঐ দেহের টান।

বিউটি বললে, সেই কান্না-কান্না অভিনয়-গলায় বললে, মিথ্যে দোষ দিচ্ছ। একেবারে অন্ধের মত। আজ পর্যন্ত তুমি আমায় বোঝার চেষ্টাই করলে না।

পায় পায় এগুচ্ছে হারুণ। বিউটি দেখল। যেমন চিতা এগোয়। সম্বরীকে দেখে চিতার পায়ে যে দৃঢ় চাঞ্চল্য ফোটে। হারুণের দেহের রক্ত আবার গর্জাচ্ছে। আদিম উত্তেজনায়। ঐ চিতার রক্ত যেমন টলমলায়।

আই বিউটি—হচ্ছে কী? হারুণ প্রথম গায়ে হাত দিল। তারপর যৌবন-ভরা একটা টাটকা দেহ যেন এলিয়ে পড়ল তার ওপর। শিথিল কবরীর মত—মুদু হয়ে, কোমল হয়ে।

তারপর?

হ্যাঁ—ঐ খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। এর থেকে চিরন্তন কোন সম্পর্ক নেই।

বিউটি তাই বলে।

তুই বেহায়া?

আই, এত নির্লজ্জ হ'তে পারলি তুই?

তুই পশু? তুই ইচ্ছার দাস? তা হ'লে তোর শিক্ষা-সংস্কৃতি? আই হারুণ, বেহায়া—

রাত গভীরে যেন আস্তে আস্তে পাগল হয়ে উঠল হারুণ। রেত ঠেলে যেমন বান আসে, গাঙের জল ফুলে ফেঁপে যেমন দামাল হয়—হারুণের সেই অবস্থা। আকাশে সর্ব-নাশা কাল-বৈশাখীর ভাঙন। সেই ভাঙনে ধ্বংসের ইশারা। এ কী হল? এ কী করলাম?

সারা রাত ঘুমুতে পারল না হারুণ।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বিউটি হাসছিল। মুখোমুখী বসে বিউটি হাসল। হয়তো বিগত রাতের কথা স্মরণ করেই বলল, হাউ সুইট নাইট। আর হারুণের মনটা, মুখটা সেই হাসির আগুনে পুড়ে ঝলসে কদাকার হয়ে গেল। যেমন ড্রাগন হাসে। ঠিক ড্রাগনের হাসি। সেই হাসিতে বিষ আর আগুন। অথচ চেয়ে দেখ, কী শুভ্র মুখ। কী মার্জিত দেহ। কী উদ্দাম যৌবন। ঐ পদ্ম গোখরো। দুধ বরণ দেহে সোনার আলপনা। চামড়াটা তুললেই কাল-কূট, কালো বিষে টলমল। আই সর্বনাশী, হাসি থামা।

প্রতিবারই হারুণের মন হয়, ঘুষি মেরে মুখটা বিকৃত করে দিই। কিন্তু ঐ মনে হওয়া মাত্র। সেই মনে হওয়া চেপে রেখে হাসতে হয়। এটিকেট বজায় রেখে সভ্য হতে হয়। অথচ তাকিয়ে দেখ, উত্তেজনার আদিম পশুটা মনের মাঠে কী উন্মত্ততায় বিচরণ করছে! ঐ শোন, কেমন গর্জাচ্ছে—

সেই জন্তুটার উন্মত্ততায় বিপর্যস্ত হতে হতে চায়ের কাপটা তুলে নিল হারুণ। চায়ে চুমুক দিল। ওদিকে বিউটি আরো নিবিড় হয়ে কাছে এল। কিশোরীর মত গলায় আদর ফুটিয়ে বলল, আজ আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

দুদিন ধরে ঐ কথাটা নিয়ে ঘুন-ঘুন করছে। তার কোন এক স্মার্ট পার্টনার বিলেতে ছিল। সবে দেশে ফিরেছে। সেই উপলক্ষে পার্টি।

বিউটি ক্রমেই নিবিড় হচ্ছে। গায়ে এলিয়ে পড়ছে। সম্ভবতঃ গত রাতের কথা স্মরণ করে নানান অভিনয়ের মত বলছে, হাউ সুই-ই-ট। সেবারের মত, দুটি হাত তুলে, লতা যেমন গাছকে জড়ায়, দুটি বাহুলতা কন্ঠলগ্ন হলো। গলায় তেমনি আদর ফুটল, আজ আমার সঙ্গে না গেলে খু-উ-ব ব্যথা পাব।

গা-টা কিলবিল করে ওঠে হারুণের। সরীসৃপ উঠলে যেমন হয়। পদ্ম গোখরটা পাকে পাকে জড়াচ্ছে। আর তাতেই উত্তেজনারা দামাল হচ্ছে। চায়ে চুমুক দিয়ে-ছিল হারুণ। কাপটা তখনো হাতে ছিল। হঠাৎ কিছুটা চা পড়ল ওর মুখে। বিউটির মুখ বেয়ে সে চা পলকে গড়িয়ে চলল। ঠিক যেন সাপের লেজে পা পড়ল। লেজের ওপর ভর দিয়ে ফণা তুলে দাঁড়াল একটা আস্ত শঙ্খচূড়। দূরে দাঁড়িয়ে তেমনি ফুলে ফুলে শ্বাস ফেলছে বিউটি, ইডিয়েট—অসভ্য কোথাকার।

তারপর চায়ে ভেজা আবরণটা একরকম টান মেরেই খুলে ফেলল। তবে কী বিউটি, নিজেকে ছাড়া, আর কাকেও ভালবাসে না? হবে হয় তো।

সারা দিনটা যে কী করে কাটল! কোর্টে কয়েকটা জরুরী কেস ছিল—সুতরাং যেতেই হল। কিন্তু ঐ যাওয়া মাত্র। হারুণ যেন

দাহ্য পদার্থ। এখন সে পদার্থে আগুন ধরেছে। জ্বলছে। তপ্ত উত্তেজনায় পুড়ছে কিন্তু ছাই হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে না। কেবলই উত্তাপের মাত্রা বাড়ছে।

অ সর্বোনাশী রে—

হারুণ সশব্দে শ্বাস ছাড়ল। দুপুরে খড়পোড়া মাঠে যেমন ভাপ ওঠে, হারুণের সারা অঙ্গ দিয়ে এখন তেমনি ভাপ উঠছে। অশরীরী ভাপ ধিকিধিকি নাচছে।

সেই জ্বলন্ত দেহ নিয়ে হারুণ এক সময় বাড়ী ফিরল। পরিচ্ছন্ন লনে পা দিয়েই দেখল বিকেলের কমলা-আলোয় বাড়ীখানা স্বপ্ন হয়ে উঠেছে।

এই আমার বাড়ী, আমার শান্তির আলয়—

মনে মনে এমনতর ভাবল হারুণ, হয়ত কালনাগিণী কাঁদছে। উপুড় হয়ে কাঁদছে। মন বলে একটা জিনিষ তারও ত আছে। আর বিবেকের শাসানি খেয়ে সে এখন অনুতপ্ত। গেলেই ছুটে এসে পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইবে।

হারুণ এখনো আশা করে। এবং এক-বুক আশা নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে আস্তে আস্তে উপরে উঠে এল। আর উঠে এসেই—

কে কাকে জড়িয়ে—বিউটি না? আর ওটি—

নিমিষে নিভন্ত আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আগুনে কেবল হারুণ নয়, সারা বাড়ীটা জ্বলছে।

আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে সেই স্মার্ট ইয়ুথ ছুটে এল। তারপর সহাস্যে দু হাতে হারুণকে জড়িয়ে বলল, ইউ—লাকি চ্যাপ, তুমি আমার আঙুর কেড়ে নিয়েছ।

ক্ষিপ্ত সিংহের মত নিজেকে মুক্ত করে স্থির হয়ে দাঁড়াল হারুণ। জ্বলন্ত চোখ দুটো স্থির। শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার আগে সিংহ যেমন নিশানা নিয়ে স্থির হয়। চোখ দুটো যেমন স্থির হয়। তেমনি।

তখন সবল ধাক্কায় কার্পেটের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে স্মার্ট পার্টনার। দূরে দাঁড়িয়ে বিউটি। একটি অসহায়, কিংকর্তব্য-হীন তাজা যৌবন।

জ্বরটা আবার চেপে এলো।

ক'দিন থেকে এমনি হচ্ছে। মাঝে মাঝেই কোর্টে যাওয়া বন্ধ হয়। কদিন থেকে আর কোথাও যাচ্ছে না হারুণ। যেতে পারছে না। নিঃসঙ্গ জীবন। নির্জনতাই তার ভাল লাগে। আর সেই নির্জনতায় ডুবে-ডুবে অনন্ত চিন্তার মাঝে তলিয়ে যাওয়া। চিন্তারা যেন পোকা। কাঁচা বাঁশে যেন ঘুন লেগেছে। ভিতর থেকে সার টেনে বাঁশটাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

শঙ্খচূড় চলে গেছে?

গেছে।

একেবারে?

না। তার কোন যিকর নেই। এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়া গায় লাগাচ্ছে। খোলস উঠলে আবার ফিরবে। বিষের থলি তখন পরিপূর্ণ।

ও।

হারুনের চিন্তা পূর্ণচ্ছেদে থামল।

কী যেন এক গভীর অপরাধবোধে আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছে হারুণ। তার কেবলই মনে হয়, কী যেন হয়ে গেল। কী যেন পেলাম না।

অ সাখিনারে—

দীর্ঘশ্বাসের পর বুকটা খালি হয়। তারপর আবার চারদিক থেকে বিষন্নতা এসে ভরাট করে আর তাতেই সারা দেহটা পাষাণের মত জমাট বেঁধে ওঠে।

আমায় বন্দী করলি? আই পাষাণী আমায় জেলে পাঠালি? ও সর্বোনাশী, জেল থেকে দীপান্তর—অ্যাঁ?

হারুণ দেখল সে নিজের ঘরে নিজেই বন্দী। কয়েদীরও হয়ত কিছু স্বাধীনতা থাকে। হয়ত কিছু স্বকীয়তা। কিন্তু হারুণ। মাটির গড়া কলসী যেমন। তোল—উঠল। রাখ—থাকল। আছাড় মার—ভাঙ্গল। মেরুদন্ডহীন মাংসপিন্ড। তার পরিধির চারদিকে দেওয়াল। আর সেই দেওয়ালের চাপে একটি পরাজিত আত্মা ধুকছে।

চলে গেছে?

ভাল কথা।

সাথে স্মার্ট পার্টনার?

ভাল কথা।

আর যদি কখনো না ফেরে?

আরো ভাল কথা। কিন্তু—

কী বিশাল বিশ্ব অথচ কী অনন্ত কারাগার! হারুণ ফিস-ফিস করে নিজের মনকে শোনাল।

আই বেহায়া! নিমকহারাম! লজ্জা করে না! তুই অধম। তুই মরবি না! এখনও মরিস নি? ভেবে দেখ—একটা ফুলকে, একটা চাঁদকে—। সে ত তুই। আই নিমকহারাম—

দারুণ উত্তেজিত হয়েছিল হারুণ। আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা রাখল। বালিশে মাথা না রাখলে পড়ে যেত। তাই চোখ বন্ধ করে কাত হল।

কতক্ষণ পরে ঘোরটা কেটে যেতে আস্তে চোখ মেলল হারুণ। দেওয়ালে বড় ক্যালেন্ডার। তার মধ্যে চোখ ফেলে একটা তারিখ অন্বেষণ করল। আর সেই সময় নীচেয় শব্দ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে হারুণ জানালায় এসে দাঁড়াল।

আই সাখিনা—এলি নাকী!

জানালায় চোখ রেখে সেই স্বল্পবাক প্রশান্ত মেয়েটিকে দেখতে চাইল। সুলতানকে সকালে পাঠিয়ে কতবার যে সে এখানে এসে দাঁড়াল! পালং আর জানালা, জানালা আর পালং। ছটফট করছে হারুণ। শ্বেত পাথরের মেঝের এই এলাকা-টুকুতে যেন নতুন পথ পড়ে গেছে। ড্রাইভারকেও গাড়ী দিয়ে স্টেশনে পাঠিয়েছে। তারই আওয়াজ না? তবে কী ওরা এসে গেল? গাড়ী দেখে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছে সাখিনা? হবেই ত। আহা—তাই হোক। আমি ত তাকে চিরদিন কাঁদিয়েছি!

কে?

জুনিয়র উকীল। নিশ্চয়ই কোন জটিল কেস। অসম্ভব, অসম্ভব। হ্যাঁ তাই বল বল সাহেবের শরীর খারাপ। কথা বলতে ডাক্তারের নিষেধ।

দারোয়ান চলে যেতে আবার পালং-এ গা এলিয়ে দিল হারুণ। ব্যাকুল প্রত্যাশা বন্ধ্যা হতেই সে যেন আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভীষণ ক্লান্ত। দেওয়ালে সেই ক্যালেন্ডার। তার মধ্যে শিথিল দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে সেই তারিখটা দেখার চেষ্টা করছিল হারুণ। হঠাৎ তার মনে হল যদি সে এক দমে ক্যালেন্ডারের তারিখ গুলো তিনবার গুনতে পারে তবে সাখিনা আসবে। যেমন মনে হওয়া—অমনি গুনতে শুরু করা।

এক পাতায় দুটি মাসের তারিখ। তা হোক—কোন অসুবিধা হবে না। ছোটবেলায় হারুণ দুশো পর্যন্ত গুনতে পারত। ঐ সাখিনার সঙ্গে পাল্লা রেখে কতবার গুনেছে। সুতরাং—

এক-দুই-তিন-চার—একশো দশ। তৃতীয় বার শুরু করার মুখে দম ফুরিয়ে গেল হারুণের। আর ফুরিয়ে যেতেই সে দারুণ-ভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তীক্ষ্ম মধ্যাহ্নে লতান সতেজ ঝিঙে গাছের গোড়া কেটে দিলে পাতাগুলো যেমন দুমড়ে ম্লান হয়—ঠিক তেমনি। এই অদৃশ্য মানসিক প্রতি-যোগিতায় হেরে গিয়ে তার মনে হল সে আর কোন দিন সাখিনাকে পাবে না। এমনি করে চিন্তার উত্থান-পতনে এক সময় হারুণ ভাবল, তিনবারের চেষ্টায় যদি বিফল হয় তবেই এটা সত্য হবে—নইলে নয়। এমনতর ভাবনা মনে ভাসতেই সে দ্বিতীয়বার গোনার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু এবারেও অল্পের জন্য পরাজিত। আর একটি বার বাকী। এবার হেরে গেলেই সর্বনাশ। মনকে প্রবোধ দেওয়ার মত আর কিছুই থাকবে না। সুতরাং তৃতীয়বার গোনার আগে হারুণ খুব সতর্ক হল। নানান কথা ভাবল নিজের মনে। এক সময় সাখিনার ওপর দারুণ অভিমান হল। নিজে বাড়ীতে বসে থেকে আমাকে এমনি কষ্ট দেওয়া! চিন্তাগুলো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। একবার ভাবলে আর গুনবে না। তৃতীয়বারটা তার হাতেই থাক। হাতে রেখে সে সময়টাকে দীর্ঘায়িত করুক। অন্ততঃ এই শেষ সান্ত্বনার সম্বলটুকু তার হাতে থাক। কিন্তু—। ঐ, মন উথাল-পাথাল।

কী করলাম!

কী হল!

আহা, আমার সোনার সংসার—

ঠিক যেন সাখিনার স্বর। হারুনের বুকের মধ্যে যেন সেই অশ্রুমুখী সাখিনা কথা কইছে।

আর কোন রকমেই বিলম্ব করতে পারল না হারুণ। একটু জিরিয়ে, লম্বা করে দম নিয়ে—তৃতীয় এবং শেষবারের মত গুনতে শুরু করল হারুণ। এক-দুই...। প্রায় শেষ হয়-হয়। আর একটু, সামান্য একটু। আহ। শেষ করে দম ছাড়ল হারুণ। আর কী আশ্চর্য সাফল্যের আনন্দে

কোথায় ক্লান্তি আর কোথায় বিষণ্ণতা! একটু আগে যে পাতাগুলি তীক্ষ্ণ মধ্যাহ্নে দুমড়ে ভেঙে পড়েছিল—হিমেল হাওয়ায় তারা আবার মাথা দোলাচ্ছে। আনন্দে আর খুশীতে।

আয় সখিনা, আয়, আয়। আমার বুকে আয়। একটা যদি ভুল হয়ে থাকে—একটা যদি ভুল করে থাকি। তাই বলে—

অনেকদিন পর বড় আরামে একটা শ্বাস ফেলল হারুণ।

মনটা এমনি।

আমার, তোমার সকলের। কিসে কী হয়।

সন্ধ্যার একটু আগে নতমুখে সুলতান এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দেই এলো। কিন্তু ওকে দেখেই চঞ্চল হয়ে উঠল হারুণ। শুয়েছিল—উঠে দাঁড়াল। তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোল, কই তারা? নীচেয় রেখে এলি বুঝি? যা উপরে নিয়ে আয়—

তবুও সুলতানকে নতমুখে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হারুণ আস্তে আস্তে নীরব হয়ে এল। তবুও একবার নম্রকণ্ঠে শুধাল, তাকে আমার অসুখের কথা বলেছিলি?

জি।

ওঃ!

তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, যেন অনন্ত বিশ্বের কাছে অভিযোগ রেখে, শিথিলকণ্ঠে বলল, আজও এল না!

প্রান্তরের বাতাস, দূর বন্ধুর তপ্ত ব্যাপকতার উপর দিয়ে বয়ে এসে যেমন খাঁ খাঁ করে—বুকটা তেমনি করছে।

কেন আসবে?

কী করেছি তার?

তৃপ্তি? শান্তি?

কেন এমন হল—

সেই একলা-ঘরে হারুণের চোখটা আজ সত্যই ভিজে এলো। কত কথা মনে পড়ছে। ফেলে আসা অতীতের কত গুঞ্জরণ! সেই সোনালী দিনগুলি! গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত অতিক্রান্ত সেই গ্রামীণ জীবন! সেই সখিনা! চাচা মারা যাবার পর সেই সংগ্রামী সন্ধ্যা-দুপুর! মেয়েটাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কেবলই কাঁদিলাম! কেবলই—

কে?

বিউটি ল ল করে ঘরে এল। একটা লতান সরীসৃপ যেমন মাজায় বাঁক খাইয়ে ঘরে আসে। বিউটির কোমরে তেমনি দোলন। আর সেই দোলনটা আজ কী কুৎসিত মনে হচ্ছে।

পালঙে বসল না। হারুণের মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর অত্যন্ত কটুকথায় বিষ ঢালল, তুমি যে এত নীচ তা ত জানতাম না। ক'দিন কানাঘুষা শুনছিলাম। আজ পরিষ্কার হল।

তারপর অকস্মাৎ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল, এই বুঝি সেই ভিখিরী মেয়েটা? আবার ফুল দেওয়া হয়েছে?

সেবার পরীক্ষায় প্রথম হতে এক বন্ধু গ্রামে গিয়ে হারুণ-সখিনার এই ফটোটি তুলেছিল গোপনে। সেই ফটোটি এনলার্জ করে টাঙিয়ে দিয়েছে।

বিউটিকে ওদিকে এগিয়ে যেতে দেখেই উঠে দাঁড়াল হারুণ, খবরদার ওদিকে এগুবে না। তোমার অনেক অপমান আমি সহ্য করেছি—আর নয়—

দুই উচ্চশিক্ষিত সভ্য আত্মা পরস্পর পরস্পরের সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল।

ও। বিউটি ঠোঁট বাঁকাল, ঐ ভিখারিনীর গায় হাত দিলে বড় ব্যথা লাগে বুঝি—

ব্যথা নয়, তোমার মত নোংরা মেয়ে ওর ছবিতে হাত দিলে সমগ্র নারী জাতির অপমান হয়।

তীক্ষ্ণধার তরবারির মত ধারাল হাসি ফুটে উঠল বিউটির চিকন রঙীন ঠোঁটে। বলল, আসলে একটা গেঁয়ো রাখালের কাছ থেকে আর কী আশা করতে পারি। ছিলে রাখাল। আজও তাই আছ। কিন্তু—

বিউটি আরো কিছু এগিয়ে গেল।

হারুণ যেন কী হয়ে গেল। তার মনে হল গ্রামের নিভৃত কোণে সাধ্বী সখিনা যেন লাঞ্ছিত-অপমানিত হচ্ছে। আর সে হারুণের দিকে চেয়ে ক্রমাগত চীৎকার করছে, আমায় এই শেষ অপমানের হাত থেকে বাঁচাও। আমি আর কিছু চাই না, কিছু না—

উত্তেজিত হারুণ ফটো ধরার জন্যে বিউটির উত্তোলিত নোংরা হাতটা, যেন দুমড়ে ভেঙে দিল। তারপর জোর করে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে বলল, ঐ পবিত্রতায় হাত দেবার জন্যে তোমার মত ভ্রষ্টা মেয়ে-মানুষের আরও বহুকাল তপস্যার দরকার।

শিরদাঁড়া ভাঙা সরীসৃপ—তবুও ফণা আছে। সেই ফণায় কালকূট। বিউটি চীৎকার করল, আমি ভ্রষ্টা—না তুই। নীচ, চরিত্রহীন, কোথাকার। প্রবঞ্চক, মিথ্যুক, লম্পট কোথা-কার। কোর্ট থেকেই এ তপস্যার জবাব পাবি।

তার বহু আগেই হারুণ তার দুর্বল দেহকে পালঙের ওপর এলিয়ে দিয়েছে।

আঁধার আর আলো। আলো আর আঁধার। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না—কিন্তু কিছু যেন বোঝা যায়। কেন এমন হচ্ছে? কোথায় আমি? মাথায় হাত দিচ্ছে কে? চুলের মধ্যে বিলি কাটছে কে? বহু-কালের, সুদূর কোন অতীতে ফেলে আসা একটা পরশ যেন?

চোখটা বন্ধ করেই আস্তে আস্তে মাথার দিকে হাত বাড়াল হারুণ।

একেবারে মুখের গোড়ায় মুখটা নামিয়ে এনে মাখনের মত কোমল কণ্ঠে সখিনা বলল, একটু তাকাও।

কে কে কথা বললে? অ্যাঁ?

মুহূর্তে যেন হাঁফিয়ে উঠল হারুণ।

রাত তখন গভীর। নার্স এগিয়ে এসে সখিনাকে নিষেধ করল, মাত্র জ্ঞান ফিরছে—এখন ওকে উত্তেজিত করবেন না।

সখিনা উঠতে গিয়ে দেখল হারুণ তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর সবলে বুকের ওপর টেনে নিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, আমাকে এত শাস্তি দিলি!

নার্স এগিয়ে এসে বলল, এ কী করছেন। ছাড়ুন। পাশের ঘরে ডাক্তার আছে সংবাদ দিই—

পাগল ছেলের মত তেমনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে হারুণ বলল, নার্স তুমি চলে যাও। আর ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। আমি বাঁচব।

নার্স চলে যেতে সখিনার বিশীর্ণ ক্লান্ত মুখটা দু' হাত দিয়ে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল। তারপর উন্মত্তের মত বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওরে—আমি সোনার প্রতিমাকে মেরে ফেলেছি—

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, হারুণ দেখল, তার শিয়রের অদূরে বসে, সখিনা কোমল-নম্র মধুর কণ্ঠে কোরাণ শরীফ পড়ছে। কোরাণ শরীফ পড়ে তারই ক্লেদ-ক্লিষ্ট আত্মার কল্যাণ কামনা করছে। ঘরের মধ্যে বুঝি ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল—সুবাসে-ঘ্রাণে যেন এক স্বর্গীয় দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। ভোরে, স্নিগ্ধ পবিত্র দিনের সূচনায়—কোন অতীতে ফেলে আসা এক মহান স্মৃতির পুনরুজ্জীবন দেখল হারুণ।

কতদিনের ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে তার আত্মাটাও যেন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

এক অন্তহীন সুখ-ভাবনায়, কুঁড়ির মধ্যে গোলাপ কলি যেমন বন্ধ থাকে, তেমনি সুবাস বুকে নিয়ে চোখ বন্ধ করল হারুণ।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে হারুণ।

স্বামীর পরিচর্যা শেষ করে দুপুরে চাকর-বাকরদের খাবার দিকটা লক্ষ্য রাখে সখিনা। দুঃস্থ পরিজনের ছেলেমেয়েরা খুব খুশী। তারা যেন একটা নতুন মা পেয়েছে। মাত্র ক'টি দিন অথচ এর মধ্যেই মানুষ মানুষের কাছে কত না অনুগত হতে পারে। হারুণ সব দেখে। সব বোঝে। এই সেই সখিনা! সাজান বাগানের কলিগুলি আবার ফুটতে শুরু করেছে।

চাকরদের খাবার তদারকে বেরিয়ে গেলেই আকবর চাচার মাকে কাছে ডেকে নেয় হারুণ। জিজ্ঞেস করে। কত কথা শোনে। আকবর চাচার মাকে ফেলে আসেনি—সঙ্গে করে এনেছে সখিনা।

বুড়ী মাঝে মাঝে রাগ করে, হাই বাবা, তোমার আক্কেলখানা কি! নিজের বৌকে আনতে পাঠালে এক অচেনা পর-পুরুষকে। মা নয় গরীব কিন্তুক সে ত তোমার বৌ! ঐ লোকটার সঙ্গে এলে তোমার ইজ্জতের লাঘব হত কতখানি। তা বাবা—শুধু তোমার জ্বরের কথা শুনল তাই। লইলে—

হারুণ বুঝল এসব সখিনার কথা। তার মান-অপমানবোধের সঙ্গে সে ত দীর্ঘদিন পরিচিত।

হ্যাঁ—তারপর?

বুড়ী বলে, ঐ শোন কথা। তুমি যাও না। জাহদা বিবি তো বিক্রি করে চলে গেল। যুবতী মেয়ে থাকে কার কাছে। তাই বাবা এই বুড়ী—

তারপর?

বুড়ী বলে, তুমি বাবা বুঝি দু'গাছা বাতেপা দিয়েছিলে?

হারুণের মনে পড়ে সব। সেবার স্কলারশিপের টাকা থেকে সখিনার জন্যে দু'গাছা বাতেপা গড়িয়ে দিয়েছিল। হারুণ বলে, হ্যাঁ।

তা বাবা—সেই বাতেপা দুটোই ধ্যান-জ্ঞান। দিনের মধ্যে যে কতবার হাতে দেয়, আর কত বার খোলে। আর ঐ এক কাজ—তোমার চাচার কবরকে হেফাজাত করা। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই সব সময় ঐ করছে।

তারপর?

আবার গল্প জুড়েছে। ক্লান্ত দেহ ও মন—একটু ভাল হয়ে ওঠার অবকাশ দেবে না। সখিনা এসে বুড়ীর ওপর রাগ করে। লক্ষ্য হারুণ। হারুণ হাসল। বলল, যে গল্প শুনে মানুষ আনন্দ পায়— তাতে শরীর ভাল হয়, মন ভাল থাকে।

একেবারে উছল মেয়ের মত বুড়ীর কাছটাতে এসে বসে সখিনা। বলে, দেখ চাচী—বাড়ীটা কী বড়!

বুড়ী বলে, পেরকাণ্ড মা—পেরকাণ্ড। কী অরিবোদ বাড়ী।

নীচেয় মোজাইক করা রঙীন মেঝেয় হাত ঘষতে ঘষতে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোয়, এগুলো কী গ?

সখিনার কথায় পৌরুষ অনুভব করে হারুণ। বলে, এসব ত তোমার জন্যেই।

দিন যায়।
দিন যায়।
দিন যায়।

হারুণ এখন সুস্থ। ইতিমধ্যে একদিন কোর্টেও বেরুল। কোর্টে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনল, বিউটির আব্বা কেস করবে। ফৌজদারী কেস।

ওটাকে কোন একটা আমলই দিল না হারুণ। অমৃতের পর বিষে কী ভয়! জীবনটা আবার দারুণ সংগ্রামী হ'য়ে উঠছে!

আর সঙ্গ কামনার লালসা নেই। এবার সে সঙ্গী পেয়েছে।

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙল হারুণের। ঘুম ভাঙতেই দেখল সখিনা তার পায়ের ওপর মাথা রেখে উপুড় হ'য়ে শুয়ে আছে। দেখল তার পা দু'টো ভিজে। নাড়া পেয়ে চমকে উঠে পড়ল সখিনা। মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে সোজা হ'য়ে বসল। চোখ দুটি কান্না-জাগরণে অস্বাভাবিক লাল। বুঝল, আজ সারা রাত সখিনা ঘুমোয় নি। হারুণ চকিতে ওকে কাছে টেনে নিল। ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাল, জ্বর-টর হয়নি ত?

ম্লান হাসি হাসল সখিনা। বলল, না।

তবে?

নতমুখী হ'য়ে তাকিয়ে ছিল সখিনা। মুখটা তেমনি নীচু করেই বলল, তুমি ত একটু সুস্থ হ'য়ে উঠেছ। অনেক দিন হ'য়ে গেল। এবার—

রুদ্ধশ্বাসে হারুণ শুধোল, তার মানে?

তেমনি নতমুখী হ'য়ে মৃদু কণ্ঠেই বলল, মা শয্যাশায়ী — আমি না গেলে তিনি মারা যাবেন।

মা — অর্থাৎ জায়দা বিবি। হারুণ শুনেছে সব। বুড়ীর মুখ থেকেই শুনেছে। জমি-জায়গা বিক্রি করে দিয়ে ভাইএর বাড়ী উঠেছিল জায়দা বিবি। কিছু দিন পর হ'ল প্যারালিসিস। ডান-হাত ডান-পা অবশ। টাকা পয়সাগুলো আত্মসাৎ করে ভাই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে। আবার এসে উঠল সখিনার কাছে। তা' সখিনা ফেলে নি। হাজার হোক মা ত।

তেমনি রুদ্ধশ্বাসে হারুণ বলল, আমি আজকেই লোক দিয়ে চাচীকে এখানে আনাচ্ছি। এখানেই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

সখিনা বলল, তা' হয় না গ। তোমার হাতে গড়া ঘর রয়েছে, আব্বার কবর রয়েছে। জীবনে আর যে কটা দিন বাঁচি—ঐ ভিটে ছেড়ে—

আব্বার কবরের কথা বলেই উন্মনা হ'য়ে উঠল সখিনা। কিন্তু পরক্ষণেই সুকঠিন সংযমে সে ভাবটা চেপে ফেলল। ঐ সেই বিশাল পুরুষ — যার পদচ্ছায়ায় জীবন মরণে শান্তি!

হারুণ আর কী বলবে ভেবে পেল না। সখিনা ত কোন জিদ করে নি। অথচ সেই স্থির প্রত্যয়-নিষ্ঠ কণ্ঠ অতিক্রম করার কোন যুক্তিই খুঁজে পেল না হারুণ।

কাল রাতে আকবর চাচা এসেছে। সখিনাই চিঠি লিখে আনিয়েছে। এই উবা-লগ্নে—আকবর চাচার আগমন, সখিনার এই আকস্মিক প্রস্তাব সকলে মিলে হারুণের চিন্তাকে যেন বিপর্যস্ত করে দিল।

ব্যাকুল কণ্ঠে হারুণ শুধাল, তা' হ'লে কী তুমি—

সখিনা বলল, না গ। আমি তোমায় ফেলে যেতে পারি। তোমার ঘরে বসে আমি তোমার প্রতীক্ষা করব।

সেই কোমল দেহটা তখনো হারুণের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ছিল অথচ হারুণ তার নাগালই পেল না। মনে হ'ল, সখিনা যেন কোন অসীম লোক থেকে কথা কইছে। যার কথা কেবল শোনা যায়, ধরা যায় না।

সখিনাকে দারুণ কুহেলীময় মনে হ'ল! সব কিছু যেমন রহস্যময় তেমনি আকস্মিক। অন্ততঃ হারুণের তাই মনে হয়।

বাইরে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আকবর চাচা আর বুড়ী।

সখিনা বলল, কাল রাতে আব্বাকে স্বপ্ন দেখলাম। একটু থেমে বলল, বাড়ীতে মায়ের বড় কষ্ট হ'চ্ছে। আর এ সময় চাকর-বাকরদের ডেকে না। ওরা ঘুমুচ্ছে ঘুমুক।

এতসব কথার মধ্যেও সখিনা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিদায়-কালে কদমবুসি করতে গিয়ে হারুণের দু' পা জড়িয়ে অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হারুণ যখন তাকে হাত ধরে তুলল, তখন তারও চোখ সজল হ'য়ে উঠেছে। এ যেন কোন অতীতে ফেলে আসা সেই দুই অবোধ শিশুর কান্না। কিন্তু আজ হারুণ কিছুই বলতে পারল না। বলতে পারল না যে, তুই কাঁদলে আমি কাঁদব।

বিশ্বনিখিলের যত বেদনা যেন এই মুহূর্তে এই ঘরটিতে এসে জমাট বেঁধেছে। সেই বেদনা বুকে নিয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে সখিনা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোমার ঘর, তোমার বাড়ী। সেখানে বসে আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব অ গ জীবনে-মরণে আমি তোমার।

বাইরে থেকে আকবর চাচা ডাকল, কই গ মা—বড় দেরী হ'য়ে গেল যে—

হারুণের ডান হাতটা দু' হাতে ধরে সখিনা একটা চুমো খেল। আর তাতেই হারুণ দেখতে পেল সখিনার হাতে সেই দু' গাছি বাতেনা। তার দেওয়া একমাত্র উপহার —তাও দুমড়ে কদাকার হ'য়ে গেছে।

সখিনার চোখের জলে হারুণের শিথিল হাতটা ভিজে গেল।

আবার ডাকল আকবর চাচা, কই গ মা—

আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে কণ্ঠটাকে যত দূর সম্ভব পরিষ্কার করে সখিনা উত্তর দিল, যাই।

তারপরই শেষবারের মত সালাম জানিয়ে, কোমল হাতে দরজা খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল সখিনা। পিছনে পড়ে রইল তার কত দিনের, কত জীবনের কত সাধ, কত ইচ্ছা।

আস্তে আস্তে ওরা তিনজনে পথে নামল।

হারুণ তখনও যেন ঠিক মত ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওরা তিনজন এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে সখিনা—নিখিল বিশ্বের এক প্রশান্ত বেদনাতুর মূর্তি। শাড়ীর ওপর বুঝি একটা চাদর জড়িয়ে নিয়েছে। তাতে সখিনাকে আরো বেশী সংযত মনে হ'চ্ছে!

এখনো মনে হয় সখিনাকে পাওয়া কত সহজ। ঐত ঐ ত যায়।

হারুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

এক সময় ওদের আর দেখা গেল না!

আর তখনই অকস্মাৎ যেন পাগল হ'য়ে গেল হারুণ। এ কী—সত্যই সখিনা চলে গেল? আমার ঘরের সৌন্দর্য? আমার গর্ব? আমার গৌরব?

হারুণ যখন আস্তে আস্তে উপলব্ধি করল সখিনা সত্যই চলে গেছে, এক অবোধ অভিমানী আত্মাকে ফিরে পাবার আর কোন পথ নেই, তখন সে অসহায় পাগলের মত বেদনাতুর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

(সমাপ্ত)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩, হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।
২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৭শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 20th January, 1967. শুক্রবার, ৬ই মাঘ, ১৩৭৩ **40 Paise**

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

গত ৩০শে অগ্রহায়ণের 'অমৃতে' 'প্রেক্ষাগৃহ' বিভাগে প্রকাশিত 'জনৈক বিদেশীর চোখে হিন্দী ছবি' রচনাটি পড়ে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। সমালোচনাটিতে বর্তমান হিন্দী চলচ্চিত্রের যে অবস্থা ও পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা যেমন বাস্তব তেমনই নিখুঁত। বিদেশী পর্যবেক্ষক যে হিন্দী চলচ্চিত্রের আসল রূপ চিনে নিতে পেরেছেন—তা থেকে তাঁকে সার্থক বিচারকের মর্যাদা দেওয়া যায়। এই গতানুগতিকতার হাত থেকে হিন্দী ছবি মুক্ত না হলে তার উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়। তবে অধিকাংশ হিন্দী-চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকই দর্শকজনের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু নিকৃষ্ট উপায়ে। যদিও কোন কোন হিন্দী ছবিতে কিছু আদর্শ থাকে—তবুও যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়েই হয়ত কিছু পরিমাণ নাচ-গানের সমাবেশ করা হয়—যাতে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লীলতার অভাব চোখে পড়ে। হিন্দী ছবি যে জনগণকে রাহুর মত গ্রাস করেছে—বেতার-কেন্দ্র থেকে 'বিবিধ ভারতী'র বহুল প্রচার কি তার সাক্ষ্য দেয় না? বর্তমানে কিছু কিছু বাংলা ছবিতেও হিন্দী-চিত্রোচিত নাচ-গানের সমাবেশ করে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে। জানি না এতে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? যাই হোক, উক্ত রচনাটিতে সমালোচক নিজেকে সত্যদ্রষ্টা হিসেবে জোর গলায় দাবী করতে পারেন।

কার্তিক চক্রবর্তী
মেদিনীপুর

(২)

আপনাদের পত্রিকার 'চিঠি-পত্র' বিভাগে (তাঃ—৩০শে ডিসেম্বর '৬৬) চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে শ্রীস্বপনকুমার মৈত্রের মতামত সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। আশা করি মতামত প্রকাশ করবার অনুমতি দেবেন। সিনেমা দেখতে গিয়ে প্রত্যেক দর্শকই মনোরঞ্জনের কথা প্রথমেই ভেবে থাকেন। স্বীকার করছি, ক্লান্ত শ্রমিক মনোরঞ্জনের আশা নিয়ে ছবি দেখতে যান, ছবির শিল্প-কলা বিচার করতে নয়। কিন্তু আজকালকার তথাকথিত অধিকাংশ হিন্দী ছবির মহানুভব পরিচালক ও প্রযোজকবৃন্দ মনোরঞ্জনের নামে উদ্ভট মাথামুণ্ডহীন গল্প ও নারীর সৌষ্ঠবকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অভিনেত্রীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখানোই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বপনবাবু বলতে চেয়েছেন "প্রযোজকের দৃষ্টি রাখতে হবে মনোরঞ্জনের দিকে। দর্শক রূপালী পর্দার উপর কিছুটা আনন্যাচারাল খোঁজে সময় কাটাতে চায়।" কেন 'সুজাতা,' 'দিল এক মন্দির,' 'দোস্তি', 'মেরে লাল', 'আদার ইন্ডিয়া', 'বন্দিনী', 'বুট-পালিশ', "সাহেব বিবি আউর গুলাম," ইত্যাদি, আমি যতদূর জানি (যদি ভুল হয় ত্রুটি মার্জনা করবেন) এই ছবিগুলি দর্শককে প্রচুর মনোরঞ্জন দিয়েছে, কাহিনীর দিক, নাচ-গানের দিক থেকেও। এইরূপে আরো অনেক হিন্দী ছবি আছে যেগুলি দর্শকের মনোরঞ্জনের খোরাক হতে পেরেছে, প্রযোজকও আর্থিক দিক থেকে সাফল্যলাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে শৈলেন্দ্র প্রযোজিত ও বাসু ভট্টাচার্য পরিচালিত "তিসরি কসম"এর নাম না উল্লেখ করলে খুবই অনুচিত হবে। আর্থিক সাফল্যের কথা প্রথমে না ভেবেই দর্শককে এমন একটি ছবি উপহার দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় প্রযোজক ও পরিচালক চিরদিন "নমস্য" হয়ে থাকবেন। অনেকটা এই একই গুণে থাকার জন্য প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়কেও দর্শক চিরদিন মনে রাখবে।

কিছুসংখ্যক প্রযোজক ও পরিচালক আছেন, যাঁরা উপরোক্ত ধরনের ছবি করতে মোটেই প্রস্তুত নন। শুধু আজে-বাজে গল্প ও দৈহিক-প্রেম পর্দায় না প্রদর্শিত করতে পারলে, তাঁরা ছবি করতে প্রস্তুত নন। দুঃখের বিষয়, দর্শকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর পয়সা উপার্জন করার জন্য এঁরা যে দেশের কতখানি ক্ষতি করছেন, পয়সার আসনে বসে সেটা কখনও উপলব্ধি করতে পারবেন না। আজ এই হিন্দী সিনেমার পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন কিভাবে দেশের কিশোর-কিশোরীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

শংকর সিংহ
বারাউনি।

(৩)

অমৃত'র ৩৪ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত শ্রীবিদ্যুৎ মল্লিকের লেখা 'চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে' যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে চিত্র-জগতের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য নিবেদন করছি।

জন্মের থেকেই বাংলা ছবি অন্যান্য আঞ্চলিক চিত্র-জগতের কাছে আদর্শ স্থানীয়। যদিও এই চিত্রজগতের প্রতি কি সরকারী কি বেসরকারী সকলেরই বিমাতৃসুলভ মনোভাব। অত্যাধুনিক ফটোগ্রাফি, সম্পাদনা ও রসায়নাগারের কোন মাল-মশলাই বাংলা চিত্র--জগতের কর্মীরা ব্যবহারের সুযোগ পান না। তা সত্ত্বেও দেবদাস থেকে শুরু করে পথের পাঁচালী পার হয়ে নায়ক-এর মাধ্যমে আজ কলা-কুশলীবৃন্দ যা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা অভিনন্দনীয়। সব বাংলা ছবিই যে প্রথম শ্রেণীর তা বলব না, তবে সব ছবিতেই যে মানুষের জীবনের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, প্রাত্যহিক আর সাংসারিক জীবনের একটা ধারাবাহিকতা, হৃদয়ের গভীরতা, মানবতা আর যোগাযোগ—অন্তত একটা বাস্তবতা'রও নিতান্ত অভাব তা স্বীকার করব না। কেনই বা করব? অতীতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বর্তমানের কথাই বলি, আমরা কি ছিন্নমূল, পথের পাঁচালী, বাইশে শ্রাবণ, অপুর সংসার, অভিযান, কোমল গান্ধার, ক্ষণিকের অতিথি, নির্জন সৈকতে'র মত প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের ধারাবাহিকতা বহনকারী উন্নত রুচির ছবি পাইনি?' আমরা কি এতই অকৃতজ্ঞ যে কাঁচের স্বর্গ, অতিথি, সুবর্ণরেখা, চারুলতা'র মত ছবিতে হৃদয়ের গভীরতাকে অস্বীকার করব। আমরা যেখানে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের মত দরদী শিল্পী, ঋত্বিক ঘটকের মত মরমী শিল্পপ্রধান মানুষ, তপন সিংহ, মৃণাল দত্ত, অসিত সেনের মত বলিষ্ঠ পরিচালকদের পেয়েছি, সেখানে কে বলে আমরা আমাদের ঐতিহ্য হারাচ্ছি। বরং উত্তরোত্তর বিশ্ব-চলচ্চিত্র জগতে বাংলা ছবির মান ক্রমোর্ধগামী। তবে একথা অনস্বীকার্য যে যে হারে হিন্দী ও অহিন্দী বিদেশী ছবি সস্তা প্রমোদ-উপকরণ উপাচারে বাংলা ছবির বাজারকে গ্রাস করছে তাতে অচিরেই এর অকাল-মৃত্যু অসম্ভব নয়। এ বছরে তো মাত্র ২৮টা ছবি মুক্তি পেল। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে একমাত্র উপায় আমাদের টলিগঞ্জেই বাংলার চিত্র-প্রযোজকদের স্থানীয় কলা-কুশলী ও বোম্বের শিল্পীদের দিয়ে ছবি তোলা। সেইসকল ছবি থেকে পাওয়া মুনাফা বাংলা ছবির কাজে লাগানো। এর ফলে বাংলার পরিচালক প্রযোজক বা প্রদর্শক কাউকেই 'অডিয়েন্স' কি চায়?' এ ধরনের চিন্তায় মাথা ঘামাতে হবে না। অতীতেও তো এন-জি, কালী, অরোরার অনেক বোম্বে-মার্কা হিন্দী ছবি হয়েছে এবং সেসব ছবির বাজারও ছিল 'সর্বভারতীয়'।

পত্র লেখক একস্থানে লিখেছেন, 'আজকের চলচ্চিত্র নিতান্ত একটা চোখের নেশা ছাড়া আর কিছুই নয়।' অন্যস্থানে লিখেছেন—'আমাদের দেশে ছায়াছবি জিনিস আনন্দ-বিনোদনের একটা সুন্দর উপাদান—আর কিছুই নয়।' শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই ছায়াছবি প্রমোদ-উপকরণ। তবে যাঁরা নিষ্ঠাবান, রসজ্ঞ, শিল্পীমনন-সুলভ তারা তাঁদের চিন্তা, ভাবনা, দর্শন চেতনাকে সেলুলয়েডে রূপ দিতে সচেষ্ট। তাঁদের সব ছবিই যে সর্বজনগ্রাহ্য তা না হলেও সব ছবিই 'চোখ ঝলসানো জটিলতায়' পূর্ণ নয়। আমাদের চারুলতা, পথের পাঁচালী, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নায়ক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার, বাইশে শ্রাবণ, পুনশ্চ, গঙ্গা, জতুগৃহ, অতিথি' জটিলতায় ভারাক্রান্ত নয় আবার বিদেশের রশোমন লা নওে, লাভেন্তুরা লা দলচে ভিতা, হিরোসিমা, মাই লাভ, জুলে অ্যান্ড জিম, ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ, উইন্টার লাইট, ভার্জিন স্প্রিং এমনকি কুল দ্য সাক'ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কচকচানিতে দুর্বোধ্য নয়।

তা যাই হোক, একথা সর্বজনবিদিত যে মুমূর্ষু বাংলা চিত্র-জগতকে বাঁচাতে হলে সাধারণ দর্শক ও চিত্র-জগৎ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে, শুধুমাত্র লোক-দেখানো আইন রচনা করে কোন ফল হবে না।

নির্মল ধর
শিবপুর, হাওড়া।

অমৃত

সম্পাদকীয়

ফেডারেশনের পথে আসাম

দিল্লীতে গত সপ্তাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আসামের পুনর্গঠন বিষয়ে। আসামের পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেটাবার জন্য এক অভিনব ফেডারেশনের প্রস্তাব করা হয়েছে আসামে। এই ফেডারেশনের দুটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য থাকবে—একটি হবে আসামের সমতলভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কাছাড়; অন্যটি হবে গারো পাহাড়, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, সংযুক্ত উত্তর কাছাড় ও মিকির জেলা এবং মিজো পার্বত্য জেলাকে নিয়ে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, সীমান্ত রাজ্য হিসাবে আসামের সম্পূর্ণ বিভক্তিকরণ এড়াবার জন্যই এই ফেডারেল পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে আসামকে একই প্রশাসনের অধীন রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এতে পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না বলেই নতুন ধরণের ফেডারেশনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পার্বত্য নেতারা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন। আসামের এই সমস্যা নিয়ে বহুদিন ধরেই নানারকম আলোচনা চলছিল। নেহরুর জীবদ্দশায় তিনি আসামের পার্বত্য জাতিসমূহের জন্য স্কটিশ ধরণের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন। সেই সময়ে আসামের একশ্রেণীর নেতার বিরোধিতার ফলে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পরে পটাশকর কমিশন আসামের পার্বত্যজাতির সমস্যা আদ্যোপান্ত বিবেচনা করে বিস্তৃততর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ আসাম সরকার এবং পার্বত্য নেতৃবৃন্দ কারোরই মনঃপূত হয়নি। ততদিনে পার্বত্য এলাকায় স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবীতে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। আগে এদের অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দিলেই সমস্যার সমাধান করা যেত, কিন্তু আসাম সরকারের বিরোধিতার ফলে তা হয়নি এবং ফলে পার্বত্য অধিবাসীদের মনেও স্বাতন্ত্র্যের দাবী আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই পুনরায় এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে হয় এবং ফেডারেশনের প্রস্তাব সেই আলোচনারই ফল। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব খুবই অভিনব। সংবিধান মতে ভারতবর্ষ বহু রাজ্য সমবায়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র। কার্যত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকলেও রাজ্যসমূহ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। এই বৃহত্তর ফেডারেশনের মধ্যে আবার একটি ক্ষুদ্রতর ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব সংবিধান সংশোধন ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব নয়। আসামকে একেবারে দেউলে না করে পার্বত্য জাতিসমূহের দাবী যাতে মেটাতে পারা যায় তার জন্যই এই অভিনব ব্যবস্থা সন্দেহ নেই। কিন্তু এতে অবস্থার কতটা উন্নতি হবে এবং পার্বত্য এলাকার প্রশাসন ঠিকভাবে চলবে কিনা তা চিন্তার বিষয়।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, ফেডারেশনের (অথবা সাব-ফেডারেশনের) অন্তর্ভুক্ত রাজ্য দুটি কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হবে। সরকার আশা করছেন যে, ভবিষ্যতে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও নেফা অঞ্চলকেও এই ফেডারেশনের আওতায় আনার চেষ্টা হবে।

পার্বত্য নেতাদের দাবী পূরণের জন্য এই প্রস্তাব করা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে পার্বত্য অধিবাসীরা এই নতুন ব্যবস্থায় তাদের স্বাতন্ত্র্যের দাবী আদায় করে নিয়েছে বলে মনে করছে। কিন্তু এই ফেডারেশন চালাতে যে ব্যয় হবে এবং যে প্রশাসনিক সতর্কতার প্রয়োজন হবে তার মূল দায়িত্ব গিয়ে পড়বে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে। তাছাড়া সমতল আসামের সঙ্গে পার্বত্য এলাকার প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় না থাকলে এই ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি পরিচালনাও দুষ্কর হয়ে উঠবে। ফেডারেশন গঠিত হলে শিলং-এ যুক্ত রাজধানী রাখা সম্ভব হবে কি? পার্বত্য নেতা ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা বলেছেন সাময়িকভাবে তা থাকতে পারে, কিন্তু পরে আসামের রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। এদিকে পার্বত্য জেলাগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সংলগ্নতা নেই। মিজো জেলা এদের থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং স্বায়ত্তশাসিত পার্বত্য রাজ্যের এই সংযোগের সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তা এখনো জানা যায়নি। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল এই যে, এর দ্বারা সত্য সত্যই পার্বত্য অধিবাসীদের সমস্যা মিটবে কি না। কারণ, পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের এই স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবীর সঙ্গে সমস্ত পার্বত্য অধিবাসী একমত নয়। কাছাড় ও মিকির পাহাড়ের অধিবাসীরা আসামের সঙ্গেই থাকতে চায়। মিজো, গারো কিংবা খাসিয়াদের মধ্যেও রাজনৈতিক বিষয়ে একমত হবার কথা জানা যায়নি। সুতরাং এই ফেডারেশনের প্রস্তাব দিয়েই আসামের পার্বত্যজাতির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়ে গেল, একথা বলার সময় আসেনি। বিশেষত, মিজো এলাকায় বৈরীদলের তৎপরতা দমন না হওয়া পর্যন্ত এবং নাগাল্যান্ডে স্থায়ী শান্তির সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কিছুসংখ্যক পার্বত্য নেতার আন্দোলনের মুখে ফেডারেশন প্রস্তাব দিয়ে দাবী থামানোর এই চেষ্টা রাজনৈতিক জোড়াতালির নিদর্শন মাত্র। কারণ, সীমান্ত রাজ্য আসামের প্রশাসনিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষার সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবী মেটাতে গিয়ে এই ফেডারেশনের প্রস্তাবও সে কারণেই গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। নাগাল্যান্ড প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ঘটনাবলী দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে খুবই সতর্ক হয়ে চলা উচিত।

বিচিত্র গল্প

কৃষ্ণা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মলির কথা লিখবার জন্য পুরনো চিঠি খুঁজছিলাম। মলির চিঠিগুলোর খান কয়েক রাখা ছিল! রেখে দিয়েছিলাম। সেই চিঠি খুঁজতে বসে মনে হল কেন খুঁজছি? মলিকে নিয়ে যেটুকু লেখার কাজ ছিল; তার চরিত্রের মধ্যে থেকে নারীপ্রকৃতির একটি বিশেষ দিক বা রূপকে আবিষ্কার করে তুলে ধরায় যে প্রয়োজন ছিল তা তো হয়ে গেছে। তবে? আবার কেন?

মনই আমার উত্তর দিলে, হয়তো কথাটা ঠিক হল না। মানে সেইটেই ঠিক হয় নি।

—কেন?

—যে রূপটি তুমি ফুটিয়েছ সেটিই কি তার সত্যরূপ? যে রূপটি ফুটল, সেটি তোমার তুলির টানে রঙের গুণে এমনটি হয়ে ফুটল না তো? ধর না, দুর্গাপ্রতিমার দুদিকে দুটি কন্যা থাকেন। ডাইনে লক্ষ্মী বাঁয়ে সরস্বতী। দেখেছ, মাপে এক ভঙ্গিতে এক—সেই পদ্মাসনে পায়ের ওপর পাখানি সেই এক ছাঁদে রেখে দুখানি হাত সেই এক ভঙ্গিতে তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রতিমা গড়ার সময় লক্ষ্য করলে দেখেছ দুটি প্রতিমারই মুখের ছাঁচ এক ছাঁচ। তফাৎ শুধু রঙের, আর রঙের তফাতের জন্য ডাকসাজের রঙেরও তফাৎ হয়ে যায়। তার পর তুমি এর হাতে পদ্ম ওর হাতে বীণা দিয়ে আরও তফাৎ কর। এবং ওখানেই আসল তফাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

—তা বটে। ইনি থাকেন ঘরকন্না নিয়ে, উনি থাকেন বিদ্যা এবং চৌষট্টি কলা নিয়ে।

—ব্যাখ্যাটা আর একটু ঘুরিয়ে কর। উনি ঘরণী গৃহিণী জীবনে পরম পরিতুষ্ট নারায়ণী, আর এই শ্বেতবরণী কন্যাটির বিয়ে হয় নি বা স্বামীর ঘর পান নি তাই সারাজীবন বিদ্যে আর রোমান্টিক কল্পনা নিয়েই থেকে গেলেন। থাকুন বা না-থাকুন আমরা সেই কল্পনা ক'রে খুশী হ'লাম। মলিকে নিয়ে তোমার যে নিজস্ব কল্পনা, যা থেকে তুমি রঙ ডাকসাজ বানিয়ে তাই দিয়ে রঞ্জিত করে ও সজ্জিত করে সাহিত্যের আসরে পাঠক-পাঠিকারূপ পাত্রপক্ষের সামনে সলজ্জিতা কন্যার মত এনে দাঁড় করিয়ে দিলে তাতো তোমার নির্দেশে হল।

বল? তুমি যা বললে সে মুখ বুজে তাই করে গেল। গেল কিনা প্রশ্নটা শক্ত! স্বীকার করলাম উত্তর আরও শক্ত। একবার বললাম, আমার মনকেই বললাম, দেখ, ঠিক সেই জন্যেই তার পত্রগুলো খুঁজছি। পত্রে তো তার প্রমাণ থাকবে। সে প্রমাণ তো জাল হবে না।

—তা হবে না। কিন্তু পত্র লেখার পিছনেও তো মোটিভ থাকতে পারে। থমকে গেলাম। তা থাকতে পারে বইকি?

কিন্তু মলির চিঠিগুলি লেখার পিছনে কোন মোটিভই ছিল না। এখানে মলি অত্যন্ত উঁচুস্তরের মানুষ। তৃষিত হৃদয়ের তৃষ্ণা তার আছে, সে কার না-থাকে, কিন্তু তাই বলে পঙ্কপল্বনের অনির্মল অশুদ্ধ জলের প্রতিও তার লোভ হবে এমন রুচি তার নয়। নির্মল জলের পরিবর্তে অন্য কোন পানীয়ই সে পান করবে না। একথা আমি নিজের জীবনের সকল মূল্যকে বাজী রেখে বলতে রাজী আছি।

*　　*　　*

নিজের সঙ্গে কথা: এ সকল মানুষেরই হয়। এর প্রতিলিপি যেখানে থাকে সেখানে সাক্ষাৎ সত্যের আসন চোখে দেখা যায়। আমার দিক থেকে আজ বলতেই হবে যে মলি নিজেকে প্রকাশ করতে এতটুকু কিছুর আড়াল দেয় নি। আড়াল সম্ভবতঃ আমিই খানিকটা দিয়েছিলাম নিজেকে।

এইখানেই থেমে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে: অর্থাৎ চিঠি খোঁজার কাজে ভিতরের এবং উপরের মনের যে কথাবার্তা চলছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল: এবং কথোপকথনরত মনের দুই শঙ্কাকে পাশে রেখে আমার হাত এবং চোখ যে চিঠি খোঁজার কাজ করে চলেছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেল।

এ একটা বিচিত্র অবস্থা। এ অবস্থা মধ্যে মধ্যে হয় মানুষের। একটা অন্ধকার শূন্যতার মধ্যে কয়েকটা নীরব শুব্ধ নিথর নিস্পন্দ সুদীর্ঘ মুহূর্ত। মনে হয় পৃথিবী যেন থেমে গেছে।

কোনক্রমে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল; পড়ল অনেকটা আপনিই। নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে হঠাৎ একটা বড় লম্বা নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস মধ্যে মধ্যে যেমন পড়ে তেমনিই: তবে তার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটা কম্পন যেন: না: যেন নয়, নিশ্চয় ছিল। নিশ্বাস নেবার সময়ও বটে, ফেলবার সময়ও বটে কয়েকবার কেঁপে উঠেছিল। কোন অজ্ঞাত বিষণ্ণতার ছাপ লেগেছিল নিশ্চয়। কিন্তু সে সম্পর্কে সচেতন ছিলাম না আমি। এরপরই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমরা যেমন বলি, হঠাৎ ঝপ ক'রে মনে পড়ে গেল, ঠিক তাই। হঠাৎ ঝপ ক'রে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল একটা নাম। কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা। কৃষ্ণা কি? অর্থাৎ উপাধি? সেন? বা গুপ্তা? বা সেনগুপ্তা? মনে পড়ছে না ঠিক। কৃষ্ণা এক সময় আমার মনের কাছাকাছি এসে তার অঞ্চল বীজনে আমার অন্তর বাহিরের বায়ুস্তরকে চঞ্চল করে দিয়েছিল।

না। অঞ্চল বীজনে বায়ুস্তর চঞ্চল করা ব্যাপারটা খুব বড় ব্যাপার নয়। ওটা সামান্য ব্যাপার। সামান্য ব্যাপার যদিই বা না হয়, যদি কোন স্বর্গপুষ্প-গন্ধবাহী হওয়ার জন্য অসামান্যই হয়, তবুও স্থায়িত্বের দিক থেকে তো সামান্য সময়ের ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেদিক থেকেও ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা খুব বাস্তব, স্বর্গপুষ্পের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এবং সময়ের দিক থেকেও কৃষ্ণার সঙ্গে আমার মনের সম্পর্ক অল্প সময়ের নয়: প্রায় বছর দুই আড়াই ছিল এ-সম্পর্ক।

বারবার বলছি, মনের কথা অর্থাৎ সম্পর্কের বেলা সম্পর্কটা মনের সঙ্গে বলে যাচ্ছি। তার কারণ কৃষ্ণাকে চোখে কখনও দেখি নি আমি। অথচ সে আমাকে দেখেছে এতকাল পর আজ নিজের মনে হচ্ছে, আশ্চর্য! আমি তখন সভাসমিতি করতাম; অনেক সভাসমিতিতে কৃষ্ণা এসেছে এবং পরে আমাকে পত্রযোগে সংবাদ দিয়েছে। প্রশ্ন করেছে সভায় কেন একথাটা বললেন কেন? এটা কি ঠিক বলেছেন? ফল হ'ত, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, প্রতি-প্রতিধ্বনি, প্রতি প্রতি প্রতিধ্বনি ওঠার মত। অর্থাৎ ঠিক হয়েছে, কি, হয় নি এই নিয়ে পত্রের পর পত্র আসতো, যেতো। সপ্তাহে হয়তো, এক এক তরফ থেকে দু-দুখানা ক'রে চারখানা পত্র আসা-যাওয়া করত। প্রথম প্রথম দেখাশুনা না হওয়াটা কোন বিস্ময়ই উদ্রিক্ত করে নি।

*　　*　　*

আর একটু গুছিয়ে বলি। বুঝবার পক্ষে সুবিধে হবে। সময়টা মলির সঙ্গে পরিচয়ের বেশ কয় বছর আগের সময়। ১৯৪৩।৪৪ সাল। আমার জীবনে তখন রথারোহণের কাল এসেছে।

না। মোটরগাড়ীর কথা বলছিনে। ওটা নিতান্তই গাড়ী। পয়সা থাকলে যে কেউ কিনতে পারে এবং কর্মের থেকে অপকর্ম বেশীই করা হয় মোটরগাড়ী চড়ে। আমি যে রথারোহণের কথা বলছি, সে হ'ল জীবনের সেই রথারোহণ যাতে মানুষকে রথীর মত বর্ম পরতে হয় এবং জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাগে এসে দাঁড়াতে হয়। ১৯৪২ সালে এ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যাণ্ড আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিত্ব থেকে এর সুরু; ১৯৪৪ সালে তখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন থেকে সাহিত্যশাখায় সভাপতিত্বের নিমন্ত্রণ পেয়েছি। আমি এই রথারোহণের কথা বলছি।

তখন নানাজনের কাছ থেকে চিঠি আসতে শুরু করেছে। এবং সেসব চিঠির প্রশস্তি থেকে মনে শক্তি পেতাম উৎসাহ পেতাম। আবার বাদের সুর থাকলে প্রতিবাদ করতাম। বয়স তখন আমার ৪৫ থেকে ৪৬এর মধ্যে। বলতে আজ দ্বিধাও নেই সঙ্কোচও নেই যে, মেয়েদের চিঠির প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশী। তাদের প্রশস্তিতে প্রীত হতাম বেশী। হয়তো বা 'প্রীত' শব্দটা ঠিক হল না এখানে; এখানে 'পুলকিত' হতাম বললেই ঠিক বলা হবে।

একদিন একখানা খামের পত্র পেলাম। খামখানা একটু বেশ মোটা। হাতের লেখায় যে পরিচয়ের আভাস দেয় তাতে নারী হস্তাক্ষর বলেই মনে হল। খাম খুলে পেলাম রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজের দু'পিঠ ভরে লেখা একখানা পত্র। সর্বাগ্রে নামটা দেখে নিয়ে দেখলাম, কৃষ্ণা সেন বা সেনগুপ্তা। ঠিকানাটা মনে নেই। তবে অস্বাভাবিকতা ছিল ঠিকানায়। বাড়ীর নম্বর এবং লেনের নামের নিচে থাকত গিরীশ পার্কের পশ্চিমে। লেখার হরফে এবং অঙ্গসজ্জায় তেমন কোন মনোহারিণী শ্রী নেই, কিন্তু লেখা পড়ে খুশী এবং বিস্মিত হলাম। সেখানে পেলাম দীপ্তি এবং লাবণ্য দুইই।

কি লিখেছে, সে কথা পরের কথা কি ভাবে কি ছাঁদে কি সুরে বলছে, সেইটের মাধুর্য এবং দীপ্তি লেখাটির সঙ্গে লেখিকাকেও একটি লাবণ্য ও দীপ্তিময়ী মূর্তিতে আমার মনশ্চক্ষুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, যার কিছুটা যেন আজও স্মরণ করতে পারি। ছিপছিপে একটি ছোটখাটো মেয়ে। যারা লাবণ্যময়ী দীর্ঘাঙ্গী হয়, তারা রূপসী। তনুদেহের ঈষৎ দীর্ঘতা রূপকে একটি মহিমা দেয়, সে মহিমা এর ছিল না। এ যেন ছিপছিপে মাথায় একটু খাটো এবং দেহে অনুপাতিক রূপে একটু কৃশাঙ্গী একটি মেয়ে। যাকে তলোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তুলনা করতে গেলে, অস্ত্রের মধ্যে পাতলা ছোরাকে মনে পড়ে, বেশী কাব্য করা হয়ে যাবে নইলে বলতাম, বিলের ধারের টলটলে জলভরা একটি প্রণালী।

থাক। একটি সুন্দর রূপ নিয়েই আমার মনে তার ফুটবার কথা, আর তাই সে ফুটেও ছিল।

পরে তর্ক তুলেছিল, এবং আমার বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েও তর্কচ্ছলে বা মৃদু প্রতিবাদ করে লিখেছিল, 'আপনার বক্তব্যকে আরও জোর দিয়ে কেন বললেন না। আরও অনেক বেশী জোর দিয়ে বলা উচিত ছিল আপনার।'

সুতরাং সে প্রথম দিনেই সহযোগিনী হয়ে আমার রথরজ্জু ধ'রে বলেছিল, দিন আমাকে দিন, আমি আরও জোরে চালাই। আপনি সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে বাণক্ষেপ করুন।

তার পত্রের সর্বাঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল। রচনা-সৌকর্যের কথা বাদ দিয়ে স্থানকালের সাক্ষ্য যাকে সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স (Circumstantial evidence) সেই সাক্ষ্যকেই বড় করছি। যে বক্তব্যের কথা নিয়ে প্রসঙ্গ, সে বক্তব্য আমি উপস্থিত করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত একটি মিটিংয়ে।

এই মিটিংয়ের কথাটি কৃষ্ণার পত্রের জন্যই আমার মনে আজও চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বিশেষভাবে মনে রয়েছে। এমনকি যা বলেছিলাম তার ভাব এবং সুর তাও মনে করতে পারছি।

একটা লাইন ছিল, "আমরা জানি ভূমিকম্প কেন হয়, আমরা জানি আকাশে গ্রহণ কেন লাগে, তবুও সব জানাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভূমিকম্পের সময় শঙ্খনাদ ক'রে বাসুকীনাগকে শান্ত হতে প্রার্থনা জানাই এবং গ্রহণের সময় খোল করতাল সহযোগে সংকীর্তনের দলের সমবেত কণ্ঠে বেসুরে এবং বেতালে নাম করার নামে একটা কলরব তুলে নৃত্য করি। রন্ধনশালের তৈজসপত্রের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ফেলে দিয়ে গঙ্গাস্নানের জন্য গামছা কাধে নিয়ে গঙ্গাতীরে ছুটে চলি।"

রচনাটুকু আজকের রচনা হয়ে গেল, তবে ভাব ও সুর এইই ছিল। এবং এই

> # আত্মচরিতে সমাজচিত্র : ভারতখণ্ড
>
> **শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু**
>
> পৃথিবীর প্রায় সব মনীষীদের আত্মচরিতেই সমসাময়িক সমাজজীবনের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। 'নেহরু পুরস্কার বিজয়ী' কৃতী সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশের মনীষীদের আত্মচরিতের আলোয় তাঁর সমকালীন সমাজচিত্র তুলে ধরছেন 'যুগান্তর' পত্রিকায়। আগামী সংখ্যা থেকে এই জনপ্রিয় লেখকের 'আত্মচরিতে সমাজচিত্র : ভারত খণ্ড' নিয়মিতভাবে 'অমৃতে' প্রকাশিত হবে।

ধরনের একটি প্রবন্ধও আমার প্রবন্ধের বইয়ের মধ্যে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে মিটিং যেদিন হ'ল তার ঠিক তৃতীয় দিনে পত্রখানি পেলাম। স্বভাবতই মনে হল, লেখিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। এবং তার সঙ্গে প্রায় তিন বছর পত্রালাপ হয়েছিল আমার। এই তিন বছরের মধ্যে এই ধারণা পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটে নি। আজও সেই প্রত্যয় আমার মনের মধ্যে রয়েছে।

যাক। এখন সামনে এগিয়ে চলি। জীবনের পথ দীর্ঘ। এই পথকে যত ছোট পায়ে এবং মন্থর গতিতে চলে মাপতে যাবে ততই সে দীর্ঘতর মনে হবে; তার থেকে দ্রুতগতিতে চলবে ততই পদক্ষেপও বড় হবে —অন্যদিকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পার হবে আসা যাবে, অতীতের এই স্মৃতির পথ বা প্রান্তর যাই বলি না কেন। প্রান্তর বলাই ভাল। পথ হলে এই সব স্মৃতিচিহ্নিত অতীতলোকে ঠিক ফিরে যাওয়া চলত না। ভুলেই বসে থাকতাম। এ যেন প্রান্তরের মধ্যে পাকখাওয়া। সারাজীবন ধরে চক্রাকারে পাক খেয়ে ঘুরছিই—ঘুরছিই। সেই ঘোরার মধ্যে হঠাৎ কোন একসময় সে কালের পরিত্যক্ত এবং চিহ্নিত কোন একটা কিছুতে ঠোক্কর খেয়ে, মনে পড়ে যায় অতীতকালের কথাগুলো। মানুষের পক্ষে পরশপাথর খুঁজে বেড়ানোর উপমাই সত্য। যাকে চাই তাকে খুঁজেই বেড়াই। সংসারের চক্রের মধ্যে ঘুরি। পেলে আর ঘুরতাম না। কোন স্থলে দুজনে মিলে বসে পড়তাম কোন গাছের তলায় বা কোন শিলাতলে এবং তখন সারা সংসারটাই মিলিত দুটি প্রাণীর ওই আসনখানিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। আরতি করত।

পত্রখানার উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিলাম। এবং তার উত্তরও পেয়েছিলাম ঠিক তার তৃতীয় দিন বা চতুর্থ দিনেই। সেই রুলটানা ফুলস্ক্যাপ কাগজ, সেই দু পৃষ্ঠা লেখা। নানান প্রশ্ন নানান আলোচনায় ঠাসা। এবং তার মধ্যে একটি বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণধার মনের অদৃশ্য অস্তিত্ব অনবরত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল একটি ছিপছিপে পাতলা মাথায় খাটো শ্যামলা রঙের একটি মেয়েকে।

অত্যন্ত সাদামাঠা পোশাক। সম্ভবতঃ বেশভূষাতে একটি ঔদাসীন্য এবং ঈষৎ একটি ধূলিধূসরতা আছে যা তাকে এই দেহজ জগতের নাগালের বাইরের একটি মহিমা দিয়েছে।

যাই হোক—এই ভাবেই তত্ত্ব আর মতবাদঘটিত প্রশ্ন যত কিছু থাকতে পারে তার সবকিছুকে নিয়ে একটা জটপাকানো সুতোর তালের একটা দিক কৃষ্ণা এবং একটা দিক আমি ধরে ওই জট খোলার জন্য অবিরাম এগিয়ে দিয়েছি আমার হাতের প্রান্তটা কৃষ্ণার হাতে এবং কৃষ্ণাও দিয়েছে তার হাতের প্রান্তটা আমার হাতে তুলে। চিঠি লিখেই গেছি, লিখেই গেছি। উত্তর এসেছে—প্রতিটির উত্তর। হয়তো একখানার পর আর একখানাও এসেছে।

কিছুকাল; মাস কয়েক পর তাকে লিখলাম—তুমি একদিন এসো না কেন? সাক্ষাতে আলোচনা করব।

সে লিখলে—যাব, কিন্তু এল না।

মিটিং একটা হয়ে গেল এর মধ্যে। সে ঠিক এসেছিল সে-মিটিংয়ে এবং আমাকে লিখলে সে কথা। আমার বক্তব্যের আলোচনাও করলে চিঠিতে। আমি লিখলাম—দেখা করলে না কেন?

সে লিখলে—মিটিংয়ের মধ্যে দেখা করা কি উচিত হত? আপনার জন্মদিনে যাব।

জন্মদিন ৮ই শ্রাবণ তখন কাছে। বোধহয় অল্প কয়েকদিন, দিন পনের পরেই।

জন্মদিনেও কৃষ্ণা এল না, এল এক বাক্স মিষ্টি। কিছু গোলাপফুল আর একটি তার নিজের হাতে লেখা কবিতা

নিয়ে একটি ছোট বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে। বললে—কৃষ্ণা দিদির শরীর খুব খারাপ হয়েছে।

এর আমার পত্র গেল।

উত্তরে তার পত্র পেয়ে মনে হল—আমি যে পত্র তাকে লিখেছিলাম তাতে কিছুটা বেশী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ফেলেছি। সে কথা লিখে কৃষ্ণা লিখেছে—না—না। এত ভাবনার অসুখ কিছু হয় নি। যে অসুখটুকু করেছিল তা দিব্যি উপেক্ষা করে যাওয়াও চলত। এই তো এই দেহেই মহিলা সমিতি নিয়ে অনেক খাটাখাটনি করলাম। ভেবেছিলামও, যাব। কিন্তু কেমন যেন আটকে গেল। কোথায় যে আটকালো ঠিক বুঝলাম না। রাগ করবেন না। এর পর একদিন যাব।

তত্ত্ব এবং মতবাদের এলাকার সংবাদ আদান-প্রদান-সর্বস্ব চিঠিগুলোর সুর ফিরে গেল বোধহয় এইখান থেকেই।

উপরের ওই চিঠির মধ্যে ফুল নিয়ে কিছু কথা ছিল। যে গোলাপফুলগুলি সে পাঠিয়েছিল, সে তার ছাদের উপর টবে টবে লাগানো গাছের যে একটি ছোট বাগান সেই বাগানের ফুল। লিখেছিল—ওই ফুল তুলতে গিয়ে অসাবধানতার মধ্যে একটা টব পড়ে ভাঙল তার উপর বর্ষার সময় পিছল হয়েছিল—পিছলে আমি পড়লাম। পায়ে লেগেছে আর একটা গোলাপের ডালের কাঁটা বিঁধে গেল ঠিক চোখের নিচে। খানিকটা রক্ত পড়ল। এর পর যেতে লজ্জা করল।

আরও একটা জিনিস হল।

জন্মদিনে যে কবিতাটি সে লিখে পাঠিয়েছিল সেটি তার সেই পেটেণ্ট রুল-টানা ফুলস্ক্যাপে লেখা নয়। চমৎকার একখানি কার্টিজ পেপারে লেখা এবং তার চারিদিকে সুন্দর নক্সা কাটা ছিল। ছেলেটি বলেছিল—ও কৃষ্ণাদিদির আঁকা। কৃষ্ণাদিদি আঁকতে পারে।

ওই অঙ্কনবিদ্যারও প্রশংসা করেছিলাম আমি, ফলে, এর পর থেকে চিঠিগুলোর মধ্যে কিছু আল্পনা থাকত।

প্রায় তিন বছর চলে গেল। চিঠির আদানপ্রদানে মানসিক অন্তরঙ্গতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল—কিন্তু কৃষ্ণা কোন দিন এল না। আমি লিখলাম—আমি তোমাদের বাড়ী যাব একদিন।

সে লিখলে — না। কোন দিন আসবেন না।

সে চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

লিখলাম— কেন? তোমার পত্রে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি।

সে লিখলে—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমার অভিভাবকেরা খুব পছন্দ করেন না। আপনাকে যে ঠিকানা থেকে পত্র লিখি সে ঠিকানা আমার এক বান্ধবী সহপাঠিনীর। যে ছেলেটি আপনার জন্মদিনে ফুল চিঠি নিয়ে গিয়েছিল তারই দিদি সে। আমার দাদা আছে—ছোট ভাই নেই।

একটু বেশ বিভ্রান্ত হলাম।

মনে একটা সন্দেহ এসে উঁকি মারলে। মনে হল—এই পত্রালাপের আগাগোড়া সবটাই একটা প্রতারণা। কোন তরুণ বা কোন কৌতুকপরায়ণ জটীল চরিত্র কুটীল ব্যক্তি আমার বিগলিত ভাবের সুযোগ নিয়ে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে একটি জাল রচনা করেছেন এবং আমার দুখানি পদই ওই ফাঁদের মধ্যে অর্পণ করে আমি বিভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছি। এখন ওই নেপথ্যবর্তী সূত্রধরটি সূত্রাগ্র ধরে টান মারলেই হল। বিশ্বসংসারের সম্মুখে আমাকে চরম উপহাসাস্পদ করে ছেড়ে দেবে।

কয়েকটা দিন আমার স্বস্তি ছিল না। অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে কাটালাম।

হঠাৎ আর একটি মেয়ের পত্র আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ আমার কৃষ্ণার চেয়েও আগের। তখন তার বয়স ছিল বারো চৌদ্দ, নাম মনু। গোটা নামটা মনে নেই। ওদের বাড়ী ছিল হাওড়া সালকেতে। বাপ ছিলেন সে কালের অর্থাৎ দানীবাবুর আমলের একজন অ্যাক্টর। আমাকে পত্র লিখত সে, দাদা বলত। প্রতি বছর ভাইফোঁটার সময় আসত, আমায় ফোঁটা দিতে। সঙ্গে তার বাপও আসতেন। মনু এখন একজন ইঞ্জিনীয়ার গৃহিণী। এখনও স্মরণ করে মধ্যে মধ্যে। তখন সম্মুখে ভাই-দ্বিতীয়া। মনুর পত্র এল। সে খবর দিয়েছে ভাইদ্বিতীয়ার দিন এবার আমাকে যেতে হবে। সে আসতে পারবে না।

আমি পথ পেলাম। এবং তৎক্ষণাৎ তাকে পত্র লিখলাম। লিখলাম—জীবনে আজ থেকে তুমি বোন আমি ভাই। ভাইদ্বিতীয়ায় ফোঁটা দেবার জন্য তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গেই তিন দিনের দিন উত্তর এল।

"আজ থেকে আপনার সঙ্গে সকল সম্পর্কের শেষ হল। এরপর আর যেন দয়া করে পত্র লিখবেন না।"

এইখানেই কৃষ্ণার পর্ব শেষ।

একটা নিরন্ধ্র কৃষ্ণ যবনিকাই যেন সে টেনে দিলে তার এবং আমার মধ্যে।

* *

হয়তো বা এমনিই সংশয় থেকে যেত চিরদিন। মনে হত, প্রতারণা করে গেল কেউ। কিন্তু সুদীর্ঘ বারো চৌদ্দ বছর পর। একদিন যাচ্ছিলাম লাভপুরে। হাওড়া স্টেশনে দানাপুর প্যাসেঞ্জারে উঠলাম। সময়টা কোন পুজোর, সম্ভবতঃ কালীপুজোর ঠিক আগে। গাড়ীতে খুব ভিড়। আমি সস্ত্রীক যাচ্ছিলাম। ফার্স্ট ক্লাসে তিনখানা বেঞ্চ ছিল। আমরা দুজন ছাড়া একটি দল মেয়েরা যাচ্ছিলেন, বোধহয় আট দশ জন। সকলেই প্রায় একবয়সী। যাবেন শান্তি-নিকেতন। টিকিট ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের কিন্তু ভিড়ের জন্য উঠলেন ফার্স্ট ক্লাসে। ফার্স্ট ক্লাসে আরও জন চারেক প্যাসেঞ্জার ছিলেন। তাঁরা উঠে আমার স্ত্রীর পাশেই বসলেন, আমি একটু ধার নিলাম।

আমার সঙ্গে কয়েকজনে কথাবার্তাও বললেন। সঙ্গে কতকগুলো পুজাসংখ্যা ছিল, সেগুলো টেনে নিয়ে যেন হাতাহাতি ভাগ করে নিলেন।

সেই মেয়েদের চিরন্তন প্রশ্ন চলতে লাগল—গৌরী কি উনি?

আমার স্ত্রীকে দেখালেন।

বেশ হাসি আলাপের মধ্যে সারাটা পথ অতিক্রম করে এলাম আমরা। ওঁরা বোলপুরে নেমে গেলেন। সকলেই শিক্ষয়িত্রী। কেউ কলেজের কেউ ইস্কুলের। জন তিন চার বিবাহিতা। বাকী সকলেরই সিঁথি সাদা।

বোলপুরে নমস্কার করে নেমে গেলেন সকলে।

ওঁরা নেমে গেলেন, তার আগেই অন্য প্যাসেঞ্জারেরা বর্ধমান থেকে গুস্করার মধ্যে নেমে গেছেন। গাড়ী খালি। বোলপুর থেকে গাড়ী যখন ছাড়ল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার স্ত্রী সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা বা ইষ্ট-প্রণামে বসলেন। আমি পশ্চিমের রাঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গাড়ীখানা চলছিল, টানা পর পর প্রান্তিক—কে পাই দুটো স্টেশন পেরিয়ে আমদপুরের দিকে আমদপুরে আমি নামব।

কোপাই পার হয়ে পুজা সংখ্যাগুলো টেনে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল একখানা পুজা সংখ্যায় একটি দেশলাইয়ের কাঠি গোঁজা রয়েছে। কেউ যেন পৃষ্ঠা চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। এমনিই উল্টে ফেললাম, দেখলাম—আমারই লেখা রয়েছে পৃষ্ঠাটায়।

সেখানে লেখা রয়েছে—"কৃষ্ণাকে মনে আছে? আমি কৃষ্ণা। সেই কৃষ্ণা। গিরীশ পার্কের পশ্চিমে।"

ঝট করে মনে পড়ে গেল।

আমার জীবনে আর কোন কৃষ্ণাও আসে নি। কিন্তু—কে কৃষ্ণা? ওদের মধ্যে কে? সেখানে সেই কৃষ্ণ যবনিকাটা আজও ঝুলছে এবং সমান কালো হয়ে রয়েছে। ছোটখাটো মাথায় কৃশাঙ্গী কালো মেয়ে তো তিনজন ছিল।
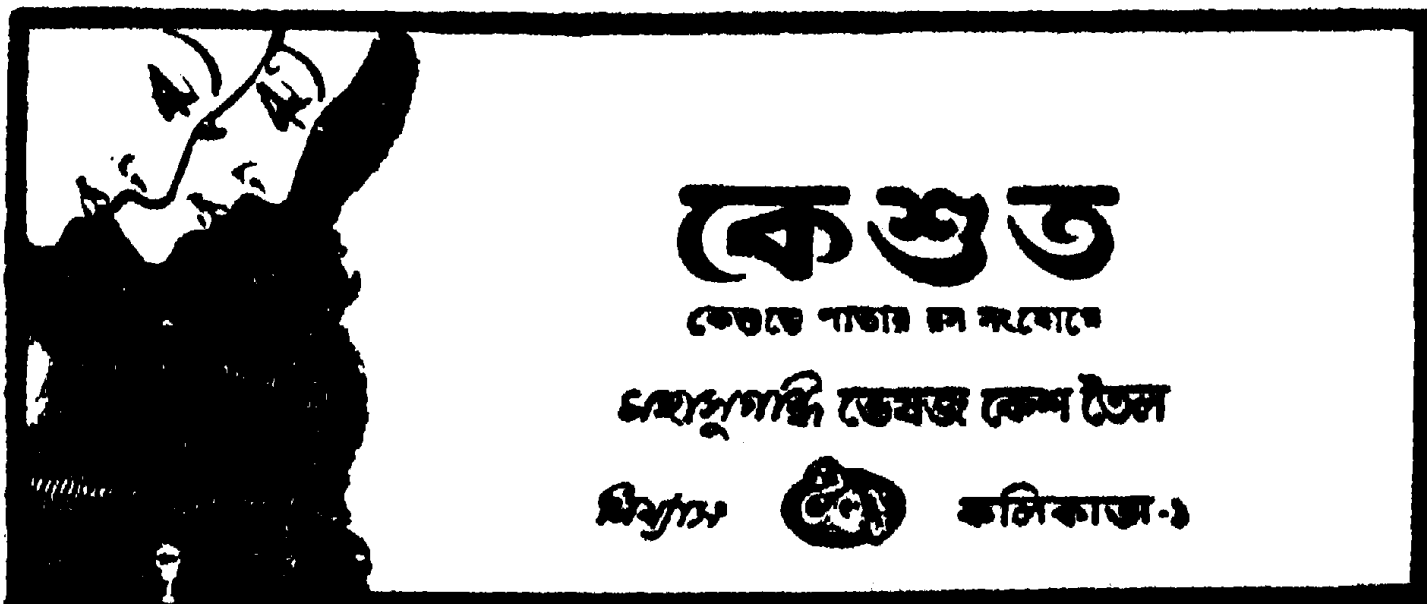
মহাত্মা শিশিরকুমার

"কর্ম আমাদের রথ, ভগবদকৃপা তাঁর কাছে রথী। কৃপাভিক্ষা সবার জন্য। কৃপালাভ করে পরের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার নাম প্রেম। কর্ম সে-ও মানুষের জন্যে, ধর্ম তা-ও মানুষের...কল্যাণের জন্যে, কর্মের সাধনার মধ্যেই ধর্মের আরাধনা। ব্যবহারিক জীবনের উর্ধ্বে পরম ভাগবতকে ধারণ করে রাখতে হবে। এই ধারণা করাই ধর্ম।"

—শিশিরকুমার ঘোষ

মহৎ কাজের জন্যই মানুষকে স্মরণ রাখে ভাবীকাল। শিশিরকুমার জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অশুভ শক্তির চক্রান্ত বিনষ্ট করতে তাঁর আত্যন্তিক প্রয়াস জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নবজাগ্রত চেতনা বাঙালীর জীবনপ্রবাহে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর এই চেতনায় সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে-কয়েকজন লোকোত্তর-পুরুষ একালেও স্মরণীয় হয়ে আছেন, মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁদের অন্যতম।

শিশিরকুমারের সত্যদৃষ্টিই ছিল জীবনব্যাপী সাধনার মূল লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের অত্যাচারিত জীবনের বেদনায় তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। রাজরোষের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন, তা আজও পরমবিস্ময়ের সঙ্গেই স্মরণযোগ্য। সেদিনের কথা ভোলবার নয়। নীলকর সাহেবদের নির্দয় অত্যাচার চলেছে। দুঃসাহসী শিশিরকুমার ইংরেজের সমস্ত প্রকার প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে সহায়-সম্বলহীন অত্যাচারিত মানুষের মর্মন্তুদ জীবনকে তুলে ধরলেন অমৃতবাজার পত্রিকার মধ্য দিয়ে। সে-সময়কার বিভিন্ন লেখকের রচনায় এবং পত্রপত্রিকায় তাঁর শ্রান্তিহীন কর্মকথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ইংরেজ সরকার প্রেস অ্যাক্টের সাহায্যে কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার সম্ভাবনাতে শিশিরকুমার রাতারাতি ইংরেজিতে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করে এক ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেন। এই ঘটনা সারা বিশ্বের বিপ্লব আর জাতি-মুক্তির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিশিরকুমারের এ-প্রচেষ্টা মুক্তিপ্রয়াসী জাতির চেতনামূলে যেমন শক্তি সঞ্চার করেছিল, তেমনি বিদেশীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের স্বরূপকে।

শিশিরকুমারের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃতিপ্রেম, আর সঙ্গীত-প্রিয়তা। প্রকৃতির নির্মল, মুক্ত স্বচ্ছ পরিবেশের মধ্যে তিনি জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন জীবনের চরম সত্য ও পরম প্রেমকে সঙ্গীতের আনন্দসুন্দর আবেদনের মধ্যে। বৈষ্ণব-ভক্তিবাদকে জীবনের ভিত্তিমূলে স্থান দিয়ে তিনি কর্মের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন ধর্মের মহাসত্য আর কর্মের মহত্তম উদ্দেশ্যকে। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা, বিনয়াবনত চিত্তের উন্মুখতা এসেছিল বৈষ্ণবভক্তিবাদ থেকে। মানবজীবনের সার্বিক অভিপ্রায়ের অন্তরালে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভগবৎ প্রেম। যে প্রেমবন্যায় "রাজনীতিবদ শিশিরকুমার, তত্ত্ববিদ্যা-অনুশীলনকারী শিশিরকুমার, সাংবাদিক শিশিরকুমার" ভেসে গিয়েছিলেন। পরম এই ভগবৎ চিন্তার পূর্ণোতালাভের জন্য তিনি প্রতিটি ধর্মক্ষেত্র পরম আকুলতার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ সময়ে তাঁর এই চঞ্চলতা আর অস্থিরতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নিঃসীম নীলিমায় মিলিয়ে গিয়ে ভগবানকে উপলব্ধির প্রয়াসের মিল দেখা গিয়েছিল।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তিরোভাব মহোৎসব

৬ই ও ৭ই মাঘ (ইং ২০ ও ২১ জানুয়ারী, শুক্রবার ও শনিবার দুইদিবসব্যাপী বাগবাজার ১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেনস্থ অমৃতবাজার পত্রিকা ভবনে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের তিরোভাব মহোৎসব উদযাপিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ, শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ জীউর বিশেষ পূজার্চনা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ, শ্রীগৌরকথা, বৈষ্ণব সম্মেলন, স্মৃতি-সভা, বাউল গান, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও গৌরলীলা কীর্তন, শ্রীরামায়ণ গান অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানসূচী :—৬ই মাঘ (শুক্রবার) বিকেল ৪টায় শ্রীমৎ কেশবানন্দ গিরিজী কর্তৃক শ্রীমদ ভাগবত পাঠ। বিকেল ৫টায় শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের পদকীর্তন। সন্ধ্যা ৬টায় কীর্তন গীতি-ভারতী শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীগৌর-গীতি, সন্ধ্যারাত্রিক অন্তে—শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকীর্তনে কীর্তনশ্রী কুমারী বীণা ঘোষ। ৭ই মাঘ (শনিবার) মঙ্গলারাত্রিক অন্তে—শ্রীশ্রীনামসংকীর্তন আরম্ভ। পরিচালনায় অনিলবরণ রায় ও শ্রীভজহরি সাহা। মৃদঙ্গ সঙ্গতে শ্রীনিতাই দাস ও শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা। সকাল ৮টায় শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত পাঠ—শ্রীমতী গৌরী লাহিড়ী। মধ্যাহ্নে — শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দজীর বিশেষ অভিষেক ও পূজার্চনা। বিকেল ৪টায় মৃদঙ্গভূষণ শ্রীগৌরাঙ্গ দাসের পরিচালনায় অমৃত সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক ভক্তিমূলক পল্লীগীতি। বিকেল ৫টায় অধ্যাপিকা শ্রীরমা বন্দ্যোপাধ্যায় কথিকা সরস্বতী কর্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়—স্মৃতি-সভা ও বৈষ্ণব সম্মেলন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রধান অতিথি — মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, উদ্বোধক—প্রভুপাদ শ্রীল জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী। মঙ্গলাচরণে — শ্রীপাদ বিনোদকিশোর গোস্বামী। উদ্বোধন সঙ্গীতে — শ্রীমৎ চিন্ময়ানন্দ (গৌর মহারাজ), শিশিরায়ন বন্দনায়—কবিরঞ্জন শ্রীপান্নালাল মাইতি। সম্মেলন অন্তে—শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর বাউল গান ও শ্রীতরুণ মুখোপাধ্যায় ও কুমারী কাজল ঘোষের ভজনগীতি। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় রামায়ণ কণ্ঠহার—শ্রীঅনাথবন্ধু অধিকারী ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামায়ণ গান।

—আনন্দকুমার সেন

রাইনের মারিয়া রিলকে অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

অর্ফিয়ুসের প্রতি সনেট

তুলো না স্মরণস্তম্ভ। গোলাপেরা হবে প্রস্ফুটিত
তারই জন্য, প্রতি গ্রীষ্মে ফিরে-ফিরে, অফুরান।
কেননা সে অর্ফিয়ুস। সে-ই হয় রূপান্তরিত
এতে কিংবা ওতে। অন্য কোনো নামের সন্ধান

আমাদের অকর্তব্য। একবার, চিরকাল ধ'রে,
গান যদি জাগে, তা-ই অর্ফিয়ুস। সে আসে, এবং চ'লে যায়।
তা-ই কি পর্যাপ্ত নয়, মাঝে-মাঝে, গোলাপেরও পরে
সে যদি কয়েক দিন আমাদের সংসর্গে কাটায়।

তাকে লুপ্ত হ'তে হবে, তুমি অর্থ বুঝে নেবে ব'লে,
এই ক্ষণস্থায়িতাকে যদিও নিজেরই তার ভয়।
সে যখন আমাদের অগম্য দূরত্বে যায় চ'লে

তখনই পেরিয়ে যায় বাণী তার মর্ত্যের সীমানা।
তার হাত অবাধ, বীণার জালে অবরুদ্ধ নয়.
যত সে সীমাতিক্রান্ত, বাধ্যতাও তত তার জানা।

× × ×

আরো একবার আমি তোমাকে স্মরণ করি : সেই তুমি, যাকে
আমি জেনেছিলাম অনামী ফুল, অথচ রঙিগণী;
দেখাবো ওদের কাছে—অপহৃত, বিলুপ্ত তোমাকে,
যে-তুমি অপরাজেয় চীৎকারের সুন্দরী সঙিগনী।

প্রথমে নর্তকী : কিন্তু দেহ, দ্বিধান্বিত কোন অভিমানে
অকস্মাৎ স্তব্ধ হ'লো—যেন তার যৌবন কাঁসায় গড়া, শ্রুতিময়,
এবং বিহ্বল শোকে।—তারপর ঋদ্ধিশালী ঈশ্বরের দানে
সংগীতে সবীজ হ'লো তার পরিবর্তিত হৃদয়।

ব্যাধি হ'লো আসন্ন। এখনই যেন ছায়াচ্ছন্ন। তবু, প্রায় সন্দেহজনক
রক্ত তার তিমিরকম্পনে আরো দ্রুত হ'লো, উৎসাহী খনক
স্বাভাবিক বাসন্তিক আদি উৎসে তার।

বার-বার—বাধাপ্রাপ্ত তিমিরে, পতনে—
পার্থিবে হ'লো সে দীপ্ত। অবশেষে ভীষণ স্পন্দনে
খুঁজে পেলো আর্তিময় উন্মুক্ত দুয়ার।

মৃত্যুনীল মাদক : আফিং

বনবিহারী মোদক

অপোগণ্ড ভাগ্নেটার একটা হিল্লে করার আশায়, প্রবল প্রতাপান্বিত বড়বাবু শ্রীঅধমতারণ অধিকারীকে একদিন নেমন্তন্ন করেছিলাম। খেতে বসে, চাটনীটার খুব তারিফ করতে করতে ভদ্রলোক শুধোলেন—ওটা কিসের চাটনী? উনি আফিং খান, এটা জানা ছিল। তাই, খুশি হবেন ভেবে বললাম—আফিঙের বিচির। ব্যস্! মুখ-চোখ লাল করে সেই যে ভদ্রলোক উঠে গেলেন, আর কখনও আমাদের মুখদর্শনও করলেন না! অথচ, কথাটা কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। চাটনীটা সেদিন সত্যি সত্যি আফিঙের বিচি অর্থাৎ পোস্ত দিয়েই করা হয়েছিল।

পোস্ত বস্তুটা যে আসলে আফিং-ফলেরই বিচি, এ-কথাটা বোধহয় খুব কম লোকেরই জানা আছে; যদিও পোস্ত খাই আমরা সবাই। পাশ্চাত্যে জলপাই-তেলের খুব কদর, এটা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু এই আফিং-বিচির তেলও যে স্বাদে এবং উপকারীতায় এই জলপাই-তেলেরই সমকক্ষ—এ-কথাটা আমাদের একেবারেই অজানা। সমগ্র ফরাসী দেশ এবং তার ধারে-কাছের এলাকাগুলোতে রান্নার কাজে মোট যত তেল ব্যবহৃত হয়, তার অর্ধেকই হল এই আফিং-বিচির তেল! শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, কথাটা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এ-তেলের আরও একটি উল্লেখ্য ব্যবহার হল, চিত্রশিল্পীদের ব্যবহৃত তেল-রঙ প্রস্তুতের কাজে। বস্তুতঃ আফিং-বিচির তেল, অয়েল-কালার তৈরির একটি অপরি-হার্য উপাদান। শুধু নেশা, খাদ্য বা শিল্পোপকরণ হিসেবেই নয়, আফিংগাছের ফুলও পশ্চিমী দুনিয়ার সর্বত্র পরম যত্ন ও সমাদরের জিনিস।

রেসের ঘোড়াকে চাঙ্গা করার জন্যে গোপনে আফিং খাওয়ানো হয়। সদ্যোধৃত বুনো জানোয়ারকে পোষ মানাতেও ঐ আফিঙেরই ব্যবহার। সার্কাসের জীবজন্তুর জন্যে আফিং ব্যবহারের প্রচলনটাও বিশ্ব-ব্যাপী। ভাল জাতের অনেকরকম চুরুট ও সিগারেটের তামাকই আফিঙের সলিউশনে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। দুরন্ত বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে, পাশ্চাত্যের দীন-দুঃখী ও মজুর পরিবারে আগেকার দিনে আফিং ছিল নিত্যব্যবহৃত বস্তু।

হাল আমলের বহুল-ব্যবহৃত ট্রাঙ্কু-লাইজার ও পেন-রিলিভারগুলোর অধি-কাংশের মধ্যেই আফিংজাত উপাদান আজও বিদ্যমান। হেকিমী চিকিৎসাপ্রণালী থেকে শুরু করে হোমিওপ্যাথী পর্যন্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি শাখায় আজও এ-বস্তুটির একচ্ছত্র অধিকার। আন্ত্রিক রোগে ও বেদনাপ্রশমনে আফিঙের মহোপকারী ভেষজগুণ সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা রয়েছে। একদিকে যেমন জীবনরক্ষা-কারী ওষুধ হিসেবে এর আদর, আরেকদিকে তেমনি সংসারজ্বালা থেকে রেহাই পাবার সোজা উপায় হিসেবে জীবনবিতৃষ্ণ তিক্ত-বিরক্ত মানুষদেরও এটা প্রায় চিরকালীন অবলম্বন। পরীক্ষায় ফেল-করা ছাত্র-ছাত্রী থেকে হতাশ প্রেমিক পর্যন্ত অনেকেই এর গুণগ্রাহী ভক্ত।

শুধু ব্যক্তির জীবনেই নয়, গোটা একটা জাতির ভাগ্য-বিবর্তনের ইতিহাসেও ভয়ংকর এই বস্তুটি মূর্তিমান কুগ্রহের মতো, সুদীর্ঘ আড়াই শতাব্দীকাল সর্ব-নাশের কালো ছায়া ফেলে রেখেছিল। আফিঙের কৃষ্ণচ্ছায়া সাহিত্য-সংস্কৃতিরও বড় কম ক্ষতি করেনি। 'বুড়ো নাবিকের গাথা' (দি রাইম্ অব দ্য এন্শ্যাণ্ট মেরিনার) প্রমুখ অত্যল্প কয়েকটি কবিতা ছাড়া, আর বিশেষ কোনো কালজয়ী রচনা কোলরিজ যে রেখে যেতে পারেননি, প্রতিভার ন্যূনতা তার কারণ নয়; তারও একমাত্র কারণ—মৃত্যুনীল এই মাদকটিরই নেশা!

॥ ২ ॥

মাদক হিসেবে আফিং ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন মিলছে মেসোপোটে-মিয়ায়। পেরেক-আকৃতি প্রাচীন লিপির (Cunneiform) পাঠোদ্ধার করে জানা গিয়েছে যে, মানবসভ্যতার সেই ঊষালগ্নেও অ্যাসিরিয়ায় আফিঙের প্রচলন ছিল। সব-চেয়ে মজার কথা—সেখানে আফিঙের একটি নাম ছিল 'সিংহের চর্বি'। কৌতূহলো-দ্দীপক এই নামটি কি আফিঙের তেজ-কারকতারই সপ্রশংস স্বীকৃতি?

ভেষজউদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক ডায়ো-স্কোরাইডস্ সেই প্রাচীন যুগেই যে-আফিঙের বিশদ বর্ণনা করেছেন, আজকের প্রচলিত আফিঙের সঙ্গে সর্ববিষয়েই তার হুবহু মিল। তার মানে এই যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকেরও আগে থেকে গ্রীসের জন-সমাজে আফিং শুধু সুপরিচিতই ছিল না; প্রস্তুতপ্রণালীর অনগ্রসরতা সত্ত্বেও, এ-মাদকটি সে-যুগের গ্রীক-সমাজে তার বর্তমান চেহারা ও স্বভাবধর্মের খ্যাতি নিয়েই বহুল-ব্যবহৃত হতে পেরেছিল।

আমাদের দেশে আফিঙের প্রাচীনতম উল্লেখ পাই সুশ্রুতে। কিন্তু এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। কেবলমাত্র নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাদক হিসেবেই আফিং কাজে লাগানো হয়েছে—এরকম কোনো প্রমাণ ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির কুত্রাপিও নেই। এর ভেষজগুণ ভারতীয় আর্য-ঋষিগণের জানা ছিল; আয়ুর্বেদীয় ওষুধ হিসেবে তাঁরা এ-বস্তুটির সদ্ব্যবহারও করতেন; কিন্তু নেশা হিসেবে, সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই এটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত না। নিছক মাদকদ্রব্যরূপে আফিঙের বহুল প্রচলন, ষোড়শ শতকের আগে এদেশে ছিল না বলেই সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ অনুমান করে থাকেন।

লোকপ্রচলিত মাদক হিসেবে এ-বস্তুটির জাঁকিয়ে বসার সন্দেহাতীত প্রমাণ প্রথম মিলছে মঙ্গলকাব্যে। চণ্ডীমঙ্গলে পাচ্ছি :

> "অস্থি চর্ম করি শেষ
> আফিঙে নাশিবে দেশ..."

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও দেখছি—শিব ভিক্ষায় বেরুলে,

> "কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল
> কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল।"

পণ্ডিতদের অনুমান এই যে, তান্ত্রিক আচার ও গূঢ় ক্রিয়াকাণ্ডের কেন্দ্রভূমি বাংলায় ঐ সময় থেকেই আফিঙের ঢালাও অপব্যবহারের আরম্ভ। পরবর্তী সমাজ-ইতিহাসে এরই বিস্তৃতির ইতিবৃত্ত।

॥ ৩ ॥

যে-গাছের ফল থেকে আফিং নিষ্কাশিত হয়, উদ্ভিদবিদ্যায় তার নাম 'Papaver Somniferum'। 'ওপিয়াম পপি' নামেই এ-গাছ সর্বত্র সুপরিচিত। পরিণত অবস্থায় গাছটি তিন থেকে চার ফিট পর্যন্ত উঁচু হয়। এর আয়ুষ্কাল কিন্তু মাত্র এক বছর। রাসায়নিক পরীক্ষায় এ-গাছের ছোট্ট চারা, এমনকি কুঁড়িতেও মর্ফিনের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এর বিচিতে কিন্তু মর্ফিন বা মাদকগুণ মোটেই নেই।

শাখা-প্রশাখা এ-গাছে কম। মূল কাণ্ডটিতেই সবচেয়ে বড় ফুল ফোটে। ডাল যে দু-একটি থাকে, তাতে ফুল ও ফল দুটোই হয় ছোট ছোট। শাখার ফল থেকে আফিংও পাওয়া যায় কম। এর ফুলগুলো কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর, আকারেও বেশ বড় বড়; ব্যাস চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। গাছের জাত এবং অঞ্চলবিশেষের জল-হাওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুসারে, পপিফুলে নানা-রকম রঙেরই দেখা যায়—সাদা, গোলাপী, লাল, ফিকে লাল, নীলাভ-লাল বা ল্যাভেণ্ডার এবং বেগুনী। রঙীন পপির পাপড়িগুলোর গোড়ায় সাধারণত সাদা বা বেগুনী ছোপ থাকে। এতে ফুলগুলো আরও সুন্দর দেখায়।

পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশে, সব জাতের পপিফুলই অত্যন্ত সমাদৃত। ওপিয়াম পপি সরকারী আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ফুলের এই অনুপম শোভার জন্যেই এ-গাছও সর্বত্র সযত্নপালিত হতে দেখা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জনকারীর ইংরেজ সেনাদের পবিত্র প্রতীকরূপে নির্বাচন

কোরে কবি জন্ ম্যাকক্রাও' নির্মল শোভাময় এই পপিফুলকে উদ্দেশ করেই গেয়েছেন :

"দিকচক্রবালে লীন ফ্ল্যান্ডার্স প্রান্তর,
উড়িছে বিজয়ধ্বজা, প্রোথিত ক্রুশের;
পপির স্বর্গীয় হাসি মাঝে শোভে তার,
মৃত্যুঞ্জয় চিহ্ন এরা অমৃত-যাত্রার।" ১

পপি গ্রীষ্মের ফুল। অত্যন্ত কোমল ও নমনীয় এই ফুল, উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়াতেই ভাল হয়। বেশী বৃষ্টিপাত কিন্তু এরা সইতে পারে না।

উর্বর মাটি ছাড়া আফিংগাছ ভাল হয় না; তদুপরি পর্যাপ্ত সারও এ-গাছের জন্যে দরকার হয়। ফলের যে-রস থেকে আফিং তৈরি হয়, শুষ্ক আবহাওয়ায় সে-রসের পরিমাণ কমে যায়। বেশী আর্দ্র আবহাওয়াও গাছের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়।

এ-দেশে আফিং চাষের জমি তৈরি করা আরম্ভ হয় জুলাই থেকে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যেই বীজ বোনা শেষ হয়। জানুয়ারীর শেষে বা ফেব্রুয়ারীর প্রথমেই গাছে ফুল আসে; ফুলের সঙ্গে 'ঢেঁড়ি'-ও দেখা দেয়। আফিংগাছের ফলকেই বলে 'ঢেঁড়ি'। খুব ছোট আকারের গোলগাল এক জাতের ঝিঙে আছে, আফিঙের ঢেঁড়ি অবিকল সেই ঝিঙের মতই দেখতে। ফুল ফোটার তিন বা চার সপ্তাহের মধ্যেই ঢেঁড়িগুলো প্রায় মুরগীর ডিমের মত বড় হয়ে ওঠে। ফুলের পাপড়িগুলোও ইতোমধ্যেই খসে পড়ে। পাপড়ি পড়ে যাওয়ার ৯ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই ঢেঁড়িগুলো আঁচড় কেটে রস বের করার উপযুক্ত হয়।

রস-সংগ্রাহকরা বিকেলে আফিং-ক্ষেতে গিয়ে, লোহার তৈরি ছোট্ট একটা যন্ত্রের সাহায্যে ঢেঁড়িগুলোর গায়ে আঁচড় কেটে দেয়। যন্ত্রটা খুবই সাদাসিধে; ডালের বড়িতে দেবার চালকুমড়ো কুঁড়বার জন্যে যেরকম কুঁড়ুনি ব্যবহৃত হয়, অনেকটা সেইরকমই দেখতে। আমাদের দেশে ঢেঁড়ির গায়ে পাশাপাশি অনেকগুলো আঁচড় লম্বালম্বি খাড়াভাবে টেনে দেওয়া হয়। তুরস্কে কিন্তু একটা আঁচড় কাটা হয়, তাও উপরে-নীচে নয়, পাশের দিকে, আড়াআড়িভাবে।

বড় বড় মাটির ভাঁড় কোমরের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধে, পরের দিন সকালেই লোকগুলো আবার ক্ষেতে যায়। প্রতিটি আঁচড়ের গায়ে ঢেঁড়ির আঠা জমে জমে শুকিয়ে থাকে। সেগুলো তারা চেঁছে তুলে নেয় এবং ভাঁড়ের মধ্যে ভরে। তুরস্ক এবং বলকান রাষ্ট্রগুলোতে, অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও গ্রীসে সাধারণত একবারই আঁচড় কাটা হয়। অন্য সর্বত্র কিন্তু যতদিন রস বেরোয়, ততদিনই আঁচড় কাটা চলতে থাকে। প্রথমবার আঁচড় কাটার পর যে-পরিমাণ আফিং পাওয়া যায়, পরবর্তী আঁচড়গুলোতে সে-পরিমাণ কিন্তু ক্রমেই কমতে থাকে। এই আঠা যখন বেরোয়, তখন দুধের মত সাদা থাকে, হাওয়ার সংস্পর্শে আসায় একটু পরেই সেগুলো কালো এবং আধা-শক্ত হয়ে যায়। সূর্যালোকহীন মেঘলা দিনে কিন্তু আঠা বিশেষ বেরোয় না।

এরপর ডিপোয় ফিরে এসে, আঠাগুলো বড় বড় অগভীর পেতলের থালায় ঢেলে ফেলে। জলীয়াংশ কিছু থাকলে, সেগুলো যাতে বেরিয়ে যেতে পারে, এই উদ্দেশ্য থালাগুলো এইবার কাৎ করে রাখা হয়। এই থালের মধ্যেই আঠাগুলো প্রায় চার সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। ভালোমত শুকোবার জন্যে রোজই এগুলো উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়। শুকোনোর পর মাটির জালায় ভরে ওগুলো সব ফ্যাক্টরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বড় বড় নাদার মধ্যে আঠাগুলো দলা পাকানো হয়। শেষপর্যন্ত কালো বা ঘন বাদামী রঙের কেক বা বলের আকারে, আফিংরূপে ওগুলো বাজারে ছাড়া হয়।

।। ৪ ।।

মধ্য এবং পূর্ব ইয়োরোপই হল আফিংগাছের আদি জন্মভূমি। কালক্রমে গাছটি ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার সমগ্র নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং উত্তর আফ্রিকারও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজের ঠাঁই নিয়েছে। আরব বণিকরাই বস্তুটিকে প্রাচ্য ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

১৯৫৫ সালে ইরান সরকার এর চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে, এখন আন্তর্জাতিক বাজারে আফিং যোগান দিচ্ছে মোট ৬টি দেশ : ভারত, তুরস্ক, গ্রীস (এদেশের উৎপাদন একমাত্র ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, গ্রীসের আফিং এইজন্যে 'ম্যাসিডোনিয়ান ওপিয়াম' নামেই পরিচিত), বুলগেরিয়া, চীন এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। কিন্তু 'পার্শিয়ান ওপিয়াম' নামে পরিচিত আফিংও আন্তর্জাতিক বাজারে অবাধেই লেন-দেন হচ্ছে। ইরান যদি এর উৎপাদন সত্যি সত্যি বন্ধই করে থাকে, এ-আফিংটা তাহলে আসছে কোত্থেকে? আফিঙের চোরাকারবার সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা সে-রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব।

সারা দুনিয়ায় যত আফিং তৈরি হয়, তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তৈরি হয় ভারতে। এই বিপুল পরিমাণ আফিঙের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয় মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত মাত্র দুটি জেলায়—মন্দোসর আর রতলামে।

এদেশে আফিং চাষ হয় মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে। ১৮৫৭ সালের ওপিয়াম অ্যাক্ট অনুযায়ী লাইসেন্স নিলে, তবেই আফিঙের চাষ করতে পারা যায়। কোন্ কোন্ এলাকার কতটা জমিতে চাষ হতে পারবে, ভারত সরকারের গেজেটে সে-সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এক মধ্যপ্রদেশেই ১৯৬০-৬১ সালে মোট ১৮৭১২·২৯৮৫ হেক্টার জমিতে আফিঙের চাষ হয়েছিল। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় আফিঙের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবং আগের বছরের উৎপাদনের অনেকটা অবিক্রীত পড়ে থাকায়, ১৯৬৪-৬৫ সালে চাষ হয়েছিল মাত্র ৮০৮২·১৯০০ হেক্টার জমিতে। ১৯৫৮-৫৯ সালে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই উৎপন্ন হয়েছিল ৩৯২৩০২·০৮১ কিলোগ্রাম আফিং। ১৯৬৩-৬৪ সালে হেক্টার-প্রতি প্রায় সাড়ে তেত্রিশ কিলোগ্রাম আফিং উৎপন্ন কোরে মন্দোসর সম্ভবত সমগ্র বিশ্বে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সে-তুলনায় তুরস্কের হেক্টার-প্রতি উৎপাদন মাত্র ৯ কিলোগ্রাম।

সরকারী হিসেবে 'আফিং বর্ষ' ধরা হয় ১ অক্টোবর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এক এক বছরের জন্যে এক একরকম দর নির্দিষ্ট কোরে, উৎপাদিত সমস্ত আফিং সরকার নিজেই কিনে নেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদকরা তাঁদের সম্পূর্ণ উৎপাদন এই দরে সরকারের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য থাকেন। ১৯৫৯-৬০ সালে একমাত্র মধ্যপ্রদেশেই সরকার আফিঙের দাম বাবদ চাষীদের মোট ১·৪০ কোটি টাকা দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে এবং মধ্যপ্রদেশের নীমাচ ও মন্দোসরে সরকার-পরিচালিত তিনটি আফিং কারখানা আছে। এই ফ্যাক্টরীগুলোর ওপরেও সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রয়েছে। সংগৃহীত সমস্ত আফিং এখানে রাসায়নিক পরীক্ষা কোরে, বিদেশে চালান দেবার উপযুক্ত করা হয়; দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাবার জন্যেও আলাদা করে রাখা হয়। কারখানাগুলো মোট ৪ রকমের আফিং তৈরি করে :

1. Soft Excise Opium
2. Hard Ball Opium
3. Biscuit Opium
and 4. Medicinal Opium Powder

১৯৫৯-৬০ সালে নীমাচের কারখানাটি একাই মোট তিন হাজার নয় মণ আফিং তৈরি করেছিল।

Biscuit Opium এবং Hard Ball এবং Opium প্রায় সবটাই বিদেশে রপ্তানি হয়। কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারগুলোকে তাঁদের চাহিদামাফিক শুধুমাত্র Soft Excise Opium and Medicinal Opium Powder-ই সরবরাহ করেন। নিজেদের প্রাপ্ত কোটা থেকে রাজ্য সরকারগুলো, এজেন্সিপ্রাপ্ত ওষুধ-বিক্রেতাদের মারফৎ নেশাখোরদের ব্যবহার্য আফিং নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রী করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ওষুধ তৈরির জন্যেও তাঁরা আফিং সরবরাহ করতে পারেন। আবগারী বিভাগের অনুমতিপত্র নিয়ে, ওষুধ তৈরির বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো গাজীপুরের ফ্যাক্টরী থেকে সরাসরিও আফিং কিনতে পারে। রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট, রসায়নবিদ, বৈদ্য বা কবিরাজ, হেকিম এবং সরকারী হাসপাতালও (জেলা-সদর হাসপাতাল পর্যন্ত; তার নীচের অর্থাৎ মহকুমা প্রভৃতির হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্থ্ সেণ্টার বা ডিস্পেন্সারী নয়) এই

১। বাংলা তর্জমা প্রবন্ধকারের

ভাবেই তাঁদের দরকারমত আফিং পেতে পারেন।

ভাল গোলাপজল প্রচুর পরিমাণে তৈরি করে বলেই গাজীপুরের খ্যাতি—এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু, শুধু গোলাপজল নয়, আফিং এবং আফিংজাত বহুরকম ওষুধ উৎপাদনেও গাজীপুর যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম কেন্দ্র, এ-কথাটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। বিদেশে রপ্তানি-যোগ্য আফিং ছাড়াও, গাজীপুরের কারখানাটি আফিংজাত আর যেসব ওষুধ তৈরী করে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এইগুলো:

ক) মর্ফিন
খ) মর্ফিন হাইড্রোক্লোরাইড
গ) মর্ফিন সালফেট
ঘ) কোডেইন
ঙ) কোডেইন ফসফেট
চ) কোডেইন সালফেট
ছ) ডায়োনিন
জ) থিবেইন
এবং ঝ) নার্কোটিন

এছাড়া সাধারণ আফিংচূর্ণ তো আছেই।

বিদেশের কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে কী পরিমাণ আফিং আমরা রপ্তানী করি, তার হিসেবটা তাজ্জব বনে যাবার মতো! পরিষ্কার একটা ছবি পাবার জন্যে, ১৯৬১ সালের হিসেবটাই দেখা যাক:

দেশের নাম	রপ্তানীকৃত আফিঙের মোট পরিমাণ
১। বৃটিশ যুক্তরাজ্য	২,২২,৫১৫ মণ
২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,৯৪,১৩৮ "
৩। ফ্রান্স	৯১,৪৪৫ "
৪। সোভিয়েট ইউনিয়ন	৬০,০০০ "
৫। পশ্চিম জার্মানী	৩৬,০০০ "
৬। ইটালী	২৫,০০০ "
৭। জাপান	১৫,২৪১ "
৮। বেলজিয়াম	৭,৫০০ "
৯। আর্জেন্টিনা	৪,০০০ "
১০। পাকিস্থান	২,০৫৩ "
১১। সুইজারল্যাণ্ড	১৯৯ "
১২। সিংহল	৪৫ "
১৩। সিকিম	২ "
বৎসরব্যাপী রপ্তানীর সর্বমোট পরিমাণ=	৬,৫৮,১৩৮ "

এ তো গেল শুধু বিক্রীর পরিমাণ। এ ছাড়া বিদেশের রাষ্ট্র সরকার, গবেষণা সংস্থা, ভেষজউৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে নমুনা হিসেবেও বেশ কিছু পরিমাণ আফিং দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ডবলিউ, এইচ, ও) এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে কিছু আফিং বিদেশে দান-খয়রাতিও করতে হয়েছিল। তাছাড়া, দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্যে বিপুল পরিমাণ তো ছিলই। সুধী পাঠক এইবার শুধু কল্পনা করুন—একচেটিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের ছত্রছায়ার আড়ালে, নিরন্ন খাদ্য-ভিখারী এই দেশ কী অবিশ্বাস্য পরিমাণ আফিং উৎপাদন করতে বাধ্য হয়!

* * *

আফিং সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করতে গেলে, চীনদেশের কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। বস্তুতঃ জাতীয় জীবনের সঙ্গে, ওদের ইতিহাসের সঙ্গে এই বিষ নেশাটি অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িয়ে গিয়েছে।

আফিং বা আফিং-দিয়ে-তৈরী অন্যান্য ভেষজ চীনদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হত। তখন এটা ব্যবহৃত হত দু ভাবে। যেসব মজুর ও চাষী কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করত, অল্পমাত্রায় আফিং খেয়ে তারা শরীরকে চাঙ্গা করত। আফিং-

এর নিদ্রাকর্ষক ও বেদনানাশক গুণ দুটির জন্যে অনেকে এটা খেত বেশী মাত্রায়। এর থেকেই আফিং খাওয়া এবং আফিং-এর ধূমপান করার রেওয়াজ ক্রমে সর্বসাধারণের মধ্যেও বহুব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল।

অষ্টাদশ শতকে আফিং-এর ব্যবহার এত বেড়ে গেল যে, চীন সরকারও বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত না হয়ে পারলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চীনদেশে প্রচুর ভারতীয় আফিং রপ্তানী করত। বেগতিক দেখে, আমদানীকৃত সমস্ত আফিং-এর ওপর চীন সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। অতিলোভী ইংরেজ বেনেরা তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না। চীন সরকার বিদেশাগত সমস্ত আফিং বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করে ফেললেন। এমন লাভের ব্যবসা—হোক না সে-কারবার বেআইনী এবং জনগণকে বিষ খাওয়ানোর সামিল—এটা হাতছাড়া হবে, বেনের জাত ইংরেজ কি তা সইতে পারে? ১৮৩৯ সালে ওরা চীন আক্রমণ করল; জ্বলে উঠল যুদ্ধের আগুন। আফিং-এর জন্যে সঙ্ঘটিত হয়েছিল বলে, ইতিহাস এ যুদ্ধকে 'ওপিয়াম ওআর' নামেই আখ্যাত করেছে।

সে যুগের দুনিয়ার প্রবলতম নৌশক্তি ইংরেজের সঙ্গে চীন এঁটে উঠতে পারল না। নানকিং-এর সন্ধিতে, বস্তুতঃ ইংরেজ বণিকদের যথেচ্ছচারের অধিকারই চীন মেনে নিতে বাধ্য হল। ক্যান্টন, সাংহাই, নিংপো, অ্যাময়, ফু-চাউ, ওয়েঙ্গাউ প্রভৃতি বন্দর ও শহরে ইংরেজ বেনেরা আবার পূর্ণোদ্যমে আফিং আমদানী ও বিক্রী করতে আরম্ভ করল। বিশাল চীনদেশের সুদূরতম প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে ছড়াতে থাকল মারাত্মক এই বিষ-নেশা। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে চীন সরকার ১৯৩৫ সালে সারা দেশে আফিং-পীড়িতদের জন্যে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে দিলেন।

বর্তমান কমিউনিস্ট সরকার বহু শতাব্দীর এই দৃঢ়মূল পাপকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে পেরেছেন বলেই দাবী করেন। কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে, অনুমান করে নিলেও, সে দাবী যে মূলতঃ সত্যভিত্তিক—অতি বড় নিন্দুককেও একথা স্বীকার করতেই হয়। একমাত্র রোগ-নিরাময়ের প্রয়োজনে ছাড়া, অন্য যে-কোনভাবে যে-কোন পরিমাণ আফিং মাদক হিসেবে গ্রহণ করলে, এখন ওদেশে শুধু একটিমাত্র পরিণাম-ফলেরই মুখোমুখি হতে হয়। সে-পরিণাম—অমোঘ মৃত্যুদণ্ড!

শোনা যায়—হংকং থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ আফিং চোরাপথে এখনও নাকি চীনের মূল ভূখণ্ডে চালান হয়; ফরমোজার ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের অনেকটাই নাকি রহস্যময় কোন্ গোপনীয়তার আড়ালে শেষ পর্যন্ত ওদের শত্রুদের ভোগেই লাগে। এগুলোর সম্ভাব্যতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

।। ৫ ।।

নেশা করার উদ্দেশ্যে আফিং ব্যবহৃত হয় তিনভাবে : (ক) গলাধঃকরণ, (খ) হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জের সাহায্যে, আফিং-জাত তরল ওষুধ দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ এবং (গ) ধূমপান

(ক) পূর্বোক্ত তিন রকম উপায়ের মধ্যে, আফিং খেয়ে নেশা করার রেওয়াজটাই প্রাচ্যের সর্বত্র সর্বাধিক দেখা যায়। ব্যবহারকারী তার দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণের আফিং দিয়ে ছোট ছোট গুলি তৈরী করে, কৌটোয় ভরে রাখে। গুলিগুলো যাতে পরস্পরের গায়ে লেপ্টে লেগে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে কৌটোর মধ্যে খানিকটা ময়দা দেওয়া থাকে। নেশাখোরদের কাছে আফিং-এর এই কৌটোটা রূপকথার প্রাণ-ভোমরার চেয়েও মহামূল্যবান। প্রাণ থাকতে এটা ওরা হাতছাড়া হতে দেয় না।

সচরাচর দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে, এককালীন একটা করে গুলি খাওয়া হয়। সকাল-বিকেল দু-বেলায় দু-ডেলা না খেয়ে শানায় না, এমন তালেবর ব্যক্তিও সংসারে আছেন; তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। এই 'গুলি' গিলে নেশা করে বলেই, চলতি কথায় এদের বলে 'গুলিখোর'। যাদের নতুন অভ্যাস, তাদের ডোজ বা গুলিগুলো হয় সর্ষে-পরিমাণ; পোক্ত গুলিখোরদের গুলিগুলো হয় পাটনাই মটরের মত, কখনও বা তার চেয়েও বড়!

(খ) তরল আফিং-এর ইঞ্জেকশন নিয়ে নেশা করার প্রথাটা বেশী দেখা যায় পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। এদেশের ধনীদের মধ্যেও এই প্রক্রিয়ার অনুরাগীর সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। পদ্ধতিটা অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল বলেই বোধহয় এটার প্রচলন এদেশে খুব বেশী ব্যাপক হতে পারে নি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অসাধু উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হচ্ছে—এরকম দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এই প্রক্রিয়াটিও তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

ইঞ্জেকশন-রীতির সুবিধে হল দুটো :
(১) দারুণ তিতো গুলিগুলো গিলবার কষ্ট এতে পোহাতে হয় না, (২) সর্বকিছু বাদ দিয়ে, আফিং-এর আসল নির্যাসটুকুই এতে শরীরে ঢোকে। ফলে নেশাটাও বেশ জমজমাট হতে পারে।

(গ) ধূমপানের মাধ্যমে আফিং-এর নেশাটা দু রকম ভাবে করা হয় : (১) সাধারণ কল্কে বা হুঁকোর সাহায্যে, (২) চণ্ডুরূপে।

(১) হুঁকো-কল্কে বা শুধু কল্কে দিয়ে আফিং-এর ধূমপান করার প্রথাটা সাধারণত যাযাবর, বেদে এবং ফকিরদের মধ্যেই দেখা যায়। প্রক্রিয়াটির মধ্যে কোন জটিলতার বালাই নেই; তামাকের মধ্যে আফিং-এর ডেলা পুরে, আগুন দিয়ে স্রেফ টান। ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় মড়া-পোড়া গন্ধের মত উৎকট একটা চিমসে দুর্গন্ধে চতুর্দিক একেবারে ঘুলিয়ে ওঠে। গুলিখোর নিজে কিন্তু সে দুর্গন্ধ একেবারেই টের পায় না। একজন মোহন্ত মহারাজকে দেখেছি, অম্বুরি বা বালাখানার মত সুগন্ধী তামাক এবং কল্কের আগুনে চন্দনকাঠের কুঁচ দিয়ে পরম ভক্তিভরে তিনি দেবতার প্রসাদ পাচ্ছেন। আফিং-এর ধোঁয়ায় তাঁর দেবতা কতটা তৃপ্ত হতেন, জানি না; তবে ভূত-পালানো গন্ধটা কিন্তু তাতেও বিশেষ চাপা পড়ত না! তামাক-টামাকের কোন বখেড়া না রেখে, শুধু নারকেলের ছিবড়ের গোলা পাকিয়ে, তার মধ্যে আফিং-এর ডেলা পুরেও বেদেরা এই পরমবস্তু আস্বাদন করে থাকে।

(২) সবশেষে চণ্ডুর কথা। দুনিয়ার তাবৎ নেশার মধ্যে এঁর স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে। একাধারে এমন বিদঘুটে এবং এমন মারাত্মক নেশা বিশ্বসংসারে আর দ্বিতীয় নেই। চীনেরাই এর সেরা সমঝদার। কলকাতার চীনে পাড়ায়, এমন কি বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটেও এর গোপন আড্ডা সগৌরবে বিরাজমান। লোকচক্ষু এবং আইনের আড়ালে, পাপ ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের যত গুপ্ত আড্ডা আছে, চণ্ডুর আড্ডাই তার মধ্যে সবচেয়ে বনেদী।

আফিং উপভোগ করা হয় এককভাবে; চণ্ডু কিন্তু যৌথ সেবনের মাদক। বেশ বড় একটা হলঘরের মাঝখানে থাকে সিমেন্ট-বাঁধান উঁচু একটা ছোট্ট বেদী, চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে মেঝেতে খুব নীচু, ঢালু এবং সরু বেঞ্চির মত করা থাকে। মফস্বলের বেসরকারী 'বাস'গুলোর বেঞ্চিতে যে রকম নারকেলের ছিবড়ের আলগা গদি থাকে, এ ধাপগুলোতেও ঠিক তেমনি গদি লাগান হয়। মেঝেটার আগাগোড়া থাকে ফরাস পাতা। মাঝখানের সেই উঁচু বেদিটির ওপর বসান হয় বিচিত্রদর্শন বিরাট একটা আলবোলা। পেট-মোটা একটা চ্যাপ্টা কল্কের মধ্যে, মশলা-মেশানো আফিং-এর বিরাট একটা দলা দিয়ে, তার ওপর আগুন দেওয়া হয়। ধোঁয়াটা যাতে বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে কল্কেটার ওপর সুন্দর নক্সাকাটা একটা ঢাকনা দেওয়া থাকে। আলবোলাটার পেটের চতুর্দিকে থাকে অনেকগুলো ছেঁদা; প্রত্যেকটি ছিদ্রের সঙ্গে লাগান থাকে লম্বা লম্বা নল। বেদির চতুর্দিকে ফরাসের ওপর গোল হয়ে বসে, চণ্ডুখোররা এক-একজন এক-একটা নল নিয়ে পরমানন্দে টানতে থাকে। টানতে-টানতে তারা মড়ার মত সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। নেশার উত্তেজনা যত বাড়তে থাকে, তত এরা মাটিতে মুখ ঘষে, মুখের দু-পাশ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে থাকে; ধোঁয়া টানটা কিন্তু তখনও বন্ধ হয় না। পোক্ত নেশাখোররা এর পর নিজেরাই দেওয়াল সংলগ্ন সেই গদী-আঁটা ধাপটার ওপর মাথা তুলে দিয়ে, অসাড় হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকে। অপটু নেশাখোররা ঠিক জায়গায় মাথা দিয়ে শুতে পারে না; আড্ডাধারী বা তার সাগরেদরা তাদের টেনে-হিঁচড়ে শুইয়ে দেয়। মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়া সত্ত্বেও, চণ্ডুর নলটা কিন্তু ওরা মুখ থেকে ছাড়ে না। ঘণ্টা কয়েক এইভাবে পড়ে থাকার পর, আড্ডাধারী এবং তার সাকরেদরা এদের একে একে তুলে মুখ-চোখ ধুইয়ে দেয়। সাকরেদদের সঙ্গে অথবা নিজেদের দলভুক্ত রিক্সাওলাদের জিম্মায় এর পর ওদের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এত লটবহর সাজিয়ে যে-নেশার আড্ডা বসাতে হয়, পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টির আড়ালে সে আড্ডা গোপন থাকে কী করে? এ প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। আসলে এদের সুচতুর কৌশলই পুলিশকে বোকা বানায়।

গলির মোড়ে এবং রাস্তার মাথায় এদের চর মোতায়েন থাকে। পুলিশের গন্ধ পেলেই তারা আড্ডায় সঙ্কেত পাঠায়। আড্ডাধারী সঙ্গে সঙ্গে আলবোলার মাথার কল্কেটা নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলে। সুগন্ধী সাধারণ তামাকভরা আরেকটি জ্বলন্ত কল্কে তৎক্ষণাৎ আলবোলার মাথার বসিয়ে দেওয়া হয়। লুকোনো তাকিয়া এনে, সাকরেদরা চোখের পলকে অধিকাংশ চণ্ডু-খোরকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেয়। বসবার ক্ষমতা যাদের একেবারেই নেই, এরকম এক-আধজনকে পাঁজাকোলা করে মুহূর্তে চোরা কুঠুরীতে পাচার করা হয়। শিন্টো বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত পুস্তিকা অথবা চীনে ভাষা শেখার প্রাইমার চোখের পলকে সকলের হাতে হাতে গুঁজে দেওয়া হয়! ভেল্কির মত, এক দিকের দেওয়ালের পর্দা সরে যায়, মুহূর্তের মধ্যে সেখানে দেখা দেয় সাধনোপদেশ বা লেসন-নোট-লেখা ব্ল্যাকবোর্ড, হয়ত বা মহাত্মাজীর একটি ছবিও!

পুলিশ এলে, আড্ডাধারী বিনয়ে বিগলিত হয়ে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করে। আইন-গ্রাহ্য কোন প্রমাণ বা সাক্ষী না পাওয়ায়, সব বুঝেও নিরুপায় পুলিশ অসহায়ের মত ফিরে যেতে বাধ্য হয়। দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, সবিনয়ে বিদায়-নমস্কার জানিয়ে আড্ডাধারী বলে—"আমাদের এই শিক্ষাকেন্দ্রকে একটু আনুকূল্য করবেন সার; একটু কৃপাদৃষ্টি রাখবেন, হেঁ হেঁ..."!

* * *

অন্যভাবে আফিং ব্যবহার করলে, দেহ-মনে যেসব ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, চণ্ডুখোরদের শেষ দুর্গতিটা হয় তার চেয়েও শোচনীয়। মারাত্মক এই নেশাটি দীর্ঘদিন অভ্যাস করলে, মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। নীচের ঠোঁটটি ফুলো-ফুলো, সর্বদা রসাসিক্ত ও থলথলে; মনে হয়, ঠোঁটটা যেন সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে এবং ঝুলে পড়তে চাইছে; রগের দু-পাশের শিরাগুলো উঁচু হয়ে ফুটে বেরিয়েছে, দুই কশে প্রায়ই লালরঙের ঘা—এই লক্ষণ কয়েকটি দেখলেই সুধী পাঠক নিঃসংশয়ে বুঝবেন—এ-মহাজন পাঁড় চণ্ডুসেবী।

।। ৬ ।।

যে-জিনিস মানুষের প্রভূত উপকার করতে পারতো, দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত অপ-ব্যবহারের ফলে তাই-ই মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে — মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এরকম নজীর আমরা ভূরি ভূরি দেখতে পাই। আফিংও ঠিক এইরকমেরই একটি সামগ্রী।

প্রায় দেড়শো বছর আগেকার কথা। ইংরেজী ভাষায় লেখা অতি-সাধারণ একখানা বই২ সারা ইয়োরোপের মানুষকে সেদিন রীতিমত চমকে দিল। রোগযন্ত্রণা প্রশমনের উদ্দেশ্যে আফিং ব্যবহার শুরু কোরে, শেষে নেশাসক্ত হয়ে পড়ার বেদনাময় করুণ আত্ম-কাহিনী এ-বইয়ের প্রতিটি ছত্রের মধ্যে দিয়ে চিন্তাশীল পাঠকের বিবেকে চাবুক মারতে লাগল। 'আঙ্কল টমস্ কেবিন'-ও বোধহয় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে এত তাড়াতাড়ি এবং এত দৃঢ়ভাবে জনগণের বিবেক জাগ্রত করতে পারেনি। এই একখানিমাত্র বইয়ের অবদানের ফলশ্রুতি হিসেবে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ অচিরেই বুঝতে শিখলো—এই মাদকটি মূর্তিমান অকল্যাণ। শুরু হল আফিং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা। ভেষজ-তত্ত্ব এবং ফার্মাকোপিয়ায় এর সুনির্দিষ্ট গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করতেও তারা আর দেরী করল না।

আফিঙের ভেষজগুণ আজ বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। আফিং আজ বহুরকম ওষুধেরই অপরিহার্য ও অন্যতম উপাদান। যেসব ওষুধের নাম আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া আরও অনেকরকম ওষুধই আফিং সহযোগে তৈরি হয়। ইঞ্জেক-শনরূপে বা খাওয়ার ওষুধ হিসেবে বিশ্বের সর্বত্রই সেগুলো আজকাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'লাওডিনাম' নামে আরেকটি বহুল-ব্যবহৃত ওষুধও স্পিরিটের সঙ্গে আফিং মিশিয়েই তৈরি।

অপরপক্ষে, মাদক হিসেবে আফিঙের ক্ষতিকারিতা সম্পর্কেও আবার বিজ্ঞান এখন দ্বিধাহীন। বিষের ক্রিয়ায় মানবশরীরের যে-সব অপকারক লক্ষণ প্রকাশ পায়, আফিঙের নেশাখোরদের দেহেও তার অধিকাংশগুলোই সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। শরীরের অভ্যন্তরে শোষিত হওয়া মাত্রই এ-বিষ মেডুলা অবলঙ্গেটার শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রকে অসাড় করে দিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় অস্বাভাবিক নিদ্রালুতা, অতিক্ষুদ্র চক্ষুতারকা, খসখসে, ঠাণ্ডা অথচ সামান্য ঘামযুক্ত চটচটে আঠালো গাত্রত্বক, ঠোঁট ও কানের ডগার অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে অবসন্ন ও শিথিল। রোগী সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে; সে-ঘুম আর কখনও ভাঙে না। এ-মৃত্যু, শ্বাসক্রিয়াটা বন্ধ হওয়ার দরুণই ঘটে।

২। ১৮২২ সালে প্রকাশিত, টমাস ডি-কুইন্সীর 'কনফেশনস অব্ অ্যান্ ইংলিশ ওপিয়েম-ঈটার'

এখন প্রশ্ন হল—নেশার উদ্দেশ্যে যারা রোজ অল্প পরিমাণে আফিং খায়, পূর্বোক্ত-রূপ আশঙ্কাজনক অবস্থা কি তাদের বেলাতেও ঘটে? এ-প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, অতি ধীরে ধীরে আসে বলে, সে-মৃত্যু হয় আরও অমোঘ, আরও ভয়াবহ। এদের শ্বাস-কেন্দ্রটাও ক্রমে ক্রমে স্তিমিত ও অসাড় হয়ে পড়তে আরম্ভ করে। আগের পরিমাণে আর মৌজ আসে না বলে, নেশাখোরকে তখন মাত্রা বাড়াতেই হয়। ফলে, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র হয়ে পড়ে আরও দুর্বল। অলক্ষ্যে তখন থেকেই দেখা দিতে থাকে মৃত্যুর হাতছানি। নেশাসক্ত লোকটি তখন অধিকাংশ সময়েই অর্ধ-অচৈতন্যের মতো পড়ে থাকে, চোখ মেলে তাকাতেও তার কষ্ট হয়; পরে আর তাকানোর শক্তিটুকুও থাকে না। মৃত্যু কখন যে তার শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, তা বুঝে উঠবার আগেই, সে-দুর্ভাগার অতি-স্তিমিত শ্বাসক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়।

সংস্কৃতে আফিংকে বলে 'অহিফেন'। রাজশেখর বসুমশাই অবিশ্যি এই শব্দটিকে 'নকল সংস্কৃত' বলে মত প্রকাশ করেছেন। গ্রীক ভাষায় এ-বস্তুটির নাম 'ওপিয়ন'। অনুমিত হয় যে, প্রাচ্যভাষাগুলো এই গ্রীক শব্দটি থেকেই আফিঙের নামটি গ্রহণ করেছে; যেমন, আরবীতে—'অফিয়ুন', 'আফিয়ুন' বা 'আফয়ুন'; মারাঠীতে—'আফুন'। সংস্কৃত নামটির উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, কথাটির আক্ষরিক অর্থ কিন্তু 'সাপের লালা' বা 'সর্প-গরল'। তাহলে দেখা যাচ্ছে—আফিং বস্তুটি যে

সর্পবিষতুল্য, সে-পরিচয় এমনকি এর নামের মধ্যেও প্রকট।

আফিং জিনিসটা আসলে যে বিষ ছাড়া আর কিছুই নয়, সাধারণ মানুষেরও এটা অজানা নয়। আত্মহত্যার কথা ভাবলে, আফিঙের কথাটা মানুষের সর্বাগ্রেই মনে পড়ে। পাঁড় আফিং-খোরকে বিষধর সাপে কামড়ালে সাপই মরে যায়, লোকটির কিছুই হয় না—এরকম একটা বহুলপ্রচারিত বিশ্বাস যেসব কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছে, তার মূলেও আফিঙের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতাই প্রকাশ পায়। কথাটা যতই অসার গাল-গল্প হোক না কেন, এটুকু কিন্তু বিজ্ঞান-স্বীকৃত সত্য যে, দীর্ঘদিন নিয়মিত আফিং খেলে, অন্য যে-কোনো মারাত্মক বিষের আকস্মিক সংক্রমণও সহজে সে-লোককে কাবু করতে পারে না। আগেকার দিনের রাজ-অন্তঃপুরে যেসব মায়াময়ী বিষকন্যার গল্প শোনা যায়, শিশুকাল থেকে নিয়মিত আফিং প্রভৃতি খাইয়েই তাদের দেহের বিষাক্ততা এবং বিষপ্রতিরোধশক্তি যুগপৎ বাড়িয়ে তোলা হত।

অস্ত্রচিকিৎসা এখন হয় অ্যানাস্থেসিয়ার সহায়তায়। আগেকার দিনে আফিংই ছিল সে-উদ্দেশ্য সাধনের প্রধানতম উপকরণ। রোগীর দেহমন অসাড় করে ফেলার জন্যে, পাশ্চাত্যদেশে আফিঙের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল ষোড়শ শতকে। দেহ-মনের এই অসাড়তা, আসলে বিষক্রিয়ার আচ্ছন্ন ও ঝিমুনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যথা-বেদনা প্রশমনে, বিশেষত খিল-ধরা (Spasmodic) বেদনা, আন্ত্রিক ব্যথা, পেটের অসুখ, পিত্তশূলে বা কলিক্ পেইনে আফিং যে মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করে, সেটাও বিষক্রিয়াজনিত ঐ নিস্তেজ ভাবটা আসার জন্যেই।

"আফিং খেলে দুধ খেতে হয়"—এ-কথাটা আপনি অজ্ঞ একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মুখেও শুনতে পাবেন। কিন্তু কেন? অন্য কোনো নেশার বেলায় তো দুধ-মাখন-ডিম কোনোকিছুকেই এতটা অপরিহার্য মনে করা হয় না? আসলে কিন্তু এটা আফিঙের ক্ষতিকর বিষক্রিয়ায় জর্জরিত দেহযন্ত্রকে পুষ্টিকর খাদ্য যুগিয়ে একটু পুনর্সঞ্জীবিত করার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। আফিং আর দুধের এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কবোধটা ভ্রান্ত অথচ বহুল-প্রচলিত একটা বিশ্বাসমাত্র। সুদীর্ঘকালের লোকপ্রচলনের ফলে, বিশ্বাসটা এখন দুরপনেয় একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দুধের সঙ্গে আফিঙের কার্যকারকতার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্কই কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়নি।

আমাদের আয়ুর্বেদ এ-বস্তুটি সম্পর্কে কী বলে, এখানে সেটাও একটু দেখে নিই আসুন। কী অলোকসামান্য প্রজ্ঞা নিয়ে ভারতীয় আর্যঋষিগণ সেই সুদূর অতীতেই এ-বস্তুটির ভেষজগুণাবলী নির্ণয় করে-ছিলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বর্তমান সমুন্নতির যুগেও তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আফিঙের রোগনাশক গুণ সংখ্যায় বড় কম নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কোনোটিই তাঁদের সত্যসন্ধানী ধ্যানদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

আয়ুর্বেদ আফিং সম্পর্কে বলেছে :

"...খসফলক্ষীরমাফুকমহিফেনকম্।
আফুকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্।।
আক্ষেপশমনং নিদ্রাজননং মদকারিচ।
স্বেদনং বেদনাহৃচ্চ মূত্রাতিসারনুৎপরম্।।
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতস্রুতি-নিবারণম্।
তথা খসফলোদ্ভূতং বল্কলং প্রায়মিত্যপি।।"

অতএব দেখা যাচ্ছে—আফিং বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা ও আক্ষেপবিনাশক, নিদ্রাজনক, মদকারী, স্বেদ ও বেদনাহরক। প্রবল বহুমূত্র, অতিরিক্ত শ্বাস, কাশি ও রক্তস্রাবেও আফিং সুফলদায়ী।

এতগুলো ব্যাধির ক্ষেত্রে একটিমাত্র ওষুধের কার্যকারীতা সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-গবেষকদের কত শতাব্দী লাগত?

* * *

আন্তরিক দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করলে, অন্য সব নেশা ছেড়ে দেওয়া যায়। আফিঙের নেশা কিন্তু ছাড়া দুষ্কর। কারণ, অন্যান্য মাদক কেবল নেশার সময়টুকুতে স্নায়ু-গুলো উত্তেজিত রাখে; শরীরাভ্যন্তরে চিরস্থায়ী কোনো পরিবর্তন ওরা ঘটাতে পারে না। আফিং কিন্তু আভ্যন্তরীণ দেহ-যন্ত্র ও টিসুগুলোর ওপর অতি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে রাখতে, শেষে ওগুলোর স্বভাবধর্মই অনেকটা পাল্টে ফেলে। এই-জন্যেই, এ-নেশা ছাড়তে গেলে জীবনমরণ সমস্যা দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের আফিংখোর এ-নেশা প্রায় ছাড়তে পারে না বললেই চলে। বিজ্ঞ চিকিৎসকের দীর্ঘদিনব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসাও অহিফেনসেবীর বিষজর্জরিত দেহযন্ত্রকে সহজে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারে না। সরকার এইজন্যেই আফিং চিকিৎসার ক্লিনিক খুলতে বাধ্য হন। আফিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পরেও, সরকার যে নেশাখোরদের জন্যে স্বল্প-পরিমাণ আফিঙের কোটা-ব্যবস্থা রাখতে বাধ্য হয়েছেন, সেটাও এই কারণেই।

অলীক চিন্তাবিলাস আফিঙের নেশার স্বভাবধর্ম। স্বয়ং বঙ্কিম যে কমলাকান্তের জবানীতে এ-বস্তুটির এত গুণগান করেছেন, সে শুধু এর ঐ গুণটির জন্যেই।

মনোবিজ্ঞানের মতে, অভ্যাসের পৌনঃ-পুনিকতাই হল নেশামাত্রেরই অন্যতম কারণ। এ-সত্য দুনিয়ার সমস্ত নেশা সম্পর্কেই কম-বেশী প্রযোজ্য। একমাত্র আফিঙের বেলায় এইটিই কিন্তু নেশা-বোধের প্রধান-তম নিয়ামক। এইজন্যেই দেখা যায়, ঠিক নেশার সময়টিতে আফিং না পেলে, গুলি-খোররা একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এমন কোনো দুষ্কর্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই, আফিং সংগ্রহের তাড়নায় যা তারা করতে না পারে। কিছুদিন আগে নিউ আলিপুরে অনুষ্ঠিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডে, আফিংখোর গৃহভৃত্য নকুল জানার কার্য-কলাপের কথা পাঠক-পাঠিকাকে এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি।

আফিংখোর আগে তো মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে, যেভাবেই হোক, আফিং যোগাড় করতে; কিন্তু শেষপর্যন্ত একান্তই যদি যোগাড় না হয়? তাহলেই আর এক বিপদ! কিছুক্ষণ পরেই বেচারা একেবারে ম্রিয়মান, অবসন্ন, শিথিলদেহ, এমনকি মৃতপ্রায় হয়ে একেবারে ধুঁকতে শুরু করবে। অভ্যাস যাদের বহুদিনের পুরনো, এ-অবস্থায় তাদের সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। এই সময় ছোট একটা ময়দার গুলি, কালো রং কোরে দিলেও বেচারীদের ধড়ে প্রাণ আসে। সবচেয়ে তাজ্জব কথা এই যে, তাতে নাকি ওদের নেশাও জমে!

দুনিয়ার অন্য যে-কোনো নেশা মানব-শরীরে যা-কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আফিঙের প্রতিক্রিয়া কিন্তু মূলতঃ তার সবগুলোর থেকেই স্বতন্ত্র। অন্য সব নেশাতে মানুষ বাচালতা করে, হাসে, কাঁদে, প্রলাপ বকে। নেশাটা সেসব ক্ষেত্রে বহির্মুখী হয়; কথা, কাজ বা action-কে অস্বাভাবিক করে দেয়। আফিঙের নেশাটা কিন্তু চিন্তাশক্তি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মচাঞ্চল্য, এ্যাকসান প্রভৃতি সর্বকিছুকে অন্তর্মুখী করে নেয়। এই জন্যেই, আফিং-খোরকে কখনও হৈ-হুল্লোড় বা লম্ফ-ঝম্প করতে দেখা যায় না।

।। ৭ ।।

আফিংকে বলা হয় 'কালো সোনা'। এ-বস্তুটির চোরাই চালান ও গোপন বেচা-কেনায় যে রকম অবিশ্বাস্য লাভ, সোনার চোরাকারবারও বোধহয় ততটা লাভজনক নয়। এই কারণেই এই পাপচক্রটি এখন সমগ্র বিশ্বে এর গোপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছে। সভ্য জগতের প্রতিটি রাষ্ট্রই আজ এই অপরাধ দমনে গলদঘর্ম।

মদ পাচারকারীদের যেমন "Boot-leggers" বলা হয়, আফিং-এর চোরা-কারবারীদেরও তেমনি একটা মজার নাম আছে; সেটা হল—"Dope peddlers" রীতিমত সুসংগঠিত দল নিয়ে, সারা দুনিয়াব্যাপী এদের ফলাও ব্যবসা। আবগারী বিভাগ, শুল্ক বিভাগ এবং পুলিশের সম্মিলিত শক্তিকেও এরা পরোয়া করে না। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ আইন-কানুন, আন্ত-র্জাতিক সংস্থাসমূহের কঠোর সতর্ক-দৃষ্টি ও বিধিনিষেধ—সবকিছুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সীমান্তে সীমান্তে, বন্দরে বন্দরে এদের গোপন ঘাঁটি। পাচার-পদ্ধতির নিত্য-নতুন ফন্দি-ফিকিরের উদ্ভাবনকুশলতায়, প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদেরও এরা হার মানায়। শুধু আফিং নয়, সেই সঙ্গে অন্য হরেক-রকম নিষিদ্ধ বস্তুও এদের ভেল্কির স্পর্শে সর্বত্রগামী হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এদের দমনের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, সক্রিয়ভাবে এবং সর্ব-প্রথম আরম্ভ হল প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের উদ্যোগে। ফলে, ১৯০৯ সালে ১৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সাংহাইতে একটি সভায় সমবেত হলেন। এঁদের রিপোর্টের

ভিত্তিতেই ১৯১২ সালে দি হেগ-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'ফার্স্ট ওপিয়াম কনভেনশান' বিধিবদ্ধ হল। পরে ঐ একই স্থানে আয়োজিত হল আরও দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, প্রথমটি ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে, দ্বিতীয়টি পরের বছরের জুনে। এর পরে বেজে উঠল প্রথম মহাযুদ্ধের রণদামামা। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালের প্যারিস শান্তি চুক্তিতেও এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, স্থির হল—অতঃপর এ দায়িত্ব নেবে লীগ অব নেশনস।

লীগ তার প্রথম বৈঠকেই এ বিষয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করল। এতদিনে এ সম্পর্কে প্রকৃত কিছু কাজ হল। আমদানীকারী দেশের সরকারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট না পেলে, কোন দেশ তার রাষ্ট্রসীমার বাইরে কোথাও এক রতি আফিংও চালান দিতে পারবে না—এই বাধ্যবাধকতাটা কমিটি সাফল্যের সঙ্গে বলবৎ করতে সক্ষম হল। এর পর ১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত হল আরও দুটি সম্মেলন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি এগুলোতে দেখা গেল না।

আফিং-এর চোরাই চালান নিয়ন্ত্রণের কর্মপন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এল ১৯৩১ সালের পর থেকে। শুধু আফিং নয়, অন্য সব মাদক এবং তদ্জাতীয় ওষুধের আন্তর্জাতিক চোরাকারবারকেও ঐ বছরের আন্তর্জাতিক সম্মেলন একটা সামগ্রিক সমস্যা হিসেবে পর্যালোচনা করল। কালক্রমে ইউ এন ও, লীগ অব নেশনসের কার্যভার গ্রহণ করায় পূর্বতন 'ওপিয়াম অ্যাডভাইসারী কমিটি'র দায়িত্ব বর্তালো নবগঠিত 'কমিশন অন নার্কোটিক ড্রাগস'-এর ওপরে।

১৯৫০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এই কমিশনের ৬ষ্ঠ সভা এ সম্পর্কে আবার একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপের শুভসূচনা করল। স্থির হল যে, আফিং ব্যবহারকারী ও আফিং-জাত ওষুধ প্রস্তুতকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাটির মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের সঠিক পরিমাণ জানালে আফিং উৎপাদক দেশগুলো (ভারত, তুরস্ক, ইরাণ ও যুগোশ্লাভিয়া) তদনুযায়ী তাদের উৎপাদনের পরিমাণ সীমিত রাখবে। পরবর্তীকালে কিছু কিছু রদবদল হলেও মূলতঃ এই ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত নীতিনিয়ামকরূপে কার্যকরী রয়েছে।

* * *

ভারতে এই মাদকটির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি রকম—এইবার সে সম্পর্কে উল্লেখ করছি। আফিং সংক্রান্ত অপরাধসমূহের শাস্তি বিধানের জন্যে, ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে মাত্র তিনটি আইনের সাহায্য পাওয়া যেত :

(১) ওপিয়াম ল্যান্ড অ্যাক্ট, ১৮৫৭,

(২) ওপিয়াম অ্যাক্ট, ১৮৭৮,

এবং (৩) ডেঞ্জারাস ড্রাগস্ অ্যাক্ট, ১৯৩০' বলা বাহুল্য, দুষ্কৃতকারীরা অল্প আয়াসেই এগুলোর ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারত।

এ-বিষয়ে সুসংহত উদ্যোগ আরম্ভ হল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ১৯৫৬ সালে সিমলায় অনুষ্ঠিত হল অল ইণ্ডিয়া নার্কোটিক্স কনফারেন্স। এই সম্মেলনের রিপোর্টের ভিত্তিতে দেশের সমস্ত রাজ্যকে মোট ৩টি জোন বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হল এবং চোরাই চলাচল বন্ধের তদারকী প্রভৃতির জন্যে প্রতিটি জোনে কয়েকটি করে কমিটি গঠিত হল।

১৯৫৭ সালে পাস হল 'ওপিয়াম ল' (সংশোধনী) আইন'। বৃটিশ আমলের পূর্বোল্লিখিত আইন তিনটির দ্বারা, আফিং সংক্রান্ত সমস্ত অপরাধকে আদালতের আওতায় আনা যেত না। এই সংশোধনী আইনটির বলে, ঐ ধরনের সব দুষ্কার্যই আদালতের বিচারের এখতিয়ারের মধ্যে (cognizable) আনা গেল। আগে অপরাধীদের শুধু অর্থদণ্ডের বিধান ছিল; এই আইনে কারাদণ্ড প্রভৃতি কঠোরতর শাস্তিরও ব্যবস্থা হল। পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে চোরা লেনদেন বন্ধের জন্য ১৯৫৭ সাল থেকেই স্থলশুল্ক বিভাগের চেকপোস্ট এবং আবগারী বিভাগের ভ্রাম্যমাণ ইউনিটগুলোকে অনেক বেশী শক্তিশালী করা হল।

১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত হল আরেকটি 'অল ইণ্ডিয়া নার্কোটিক্স কনফারেন্স'। এবারের সভাটি আরও এক ধাপ অগ্রসর হল। আফিঙের নেশা দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত এই সভাতেই সর্বপ্রথম গৃহীত হল। স্থির হল যে,—প্রতি বছর কিছু কিছু কমিয়ে, পরবর্তী এক দশকের মধ্যে মাদকরূপে আফিঙের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে। এঁদের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারত সরকার Preventive Wing and Intelligence Wing নামে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দুটি সংস্থাও গঠন করলেন।

আফিং গাছের চাষ, আফিং উৎপাদন, বন্টন ও রপ্তানী; আফিংজাত ওষুধ আমদানী—সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর দায়িত্বভার, ভারত সরকারের 'নার্কোটিক্স ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো'-র ওপর ন্যস্ত। গোয়ালিয়রে অবস্থিত দপ্তর থেকে নার্কোটিক্স কমিশনারই এসব কাজ পরিচালনা করে থাকেন। বিদেশ থেকে আফিংজাত ঔষধাদি আমদানীর সার্টিফিকেট এবং এদেশ থেকে আফিং রপ্তানীর অনুমতিপত্রও এই অফিসের মাধ্যমেই ইস্যু করা হয়। কোন্ এলাকার কতটুকু জমিতে আফিঙের চাষ হবে—সেটাও সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয় এবং তদনুযায়ীই চাষীরা লাইসেন্স নিতে পারে। এই লাইসেন্সের শর্তগুলোও আবার ক্রমেই কঠোরতর করা হয়।

গাছে ঢেঁড়ি ধরবার সময়টিতে ক্ষেত, ডিপো এবং বিশেষ করে নির্গমন-পথগুলো বিনা নোটিশে হঠাৎ পরিদর্শন ও চেক করা হয়। রাজপথে চলমান যানবাহন পরীক্ষা করে দেখা হয়। উৎপাদন-কেন্দ্র ও ডিপোগুলো থেকে গোপন পাচার ধরবার উদ্দেশ্যে, সেসব এলাকায় সর্বত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ধানী কুকুরও নিয়োগ করা হয়। নার্কোটিক্স বিভাগ, আবগারী বিভাগ এবং পুলিশ সম্মিলিতভাবেই এগুলো করে থাকেন।

নদী-বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, বিমানঘাঁটি, সীমান্তপথ প্রভৃতির উপরও সদা-সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। পুলিশ-বিভাগীয় বেতারের সহায়তায়, সম্ভাব্য চোরাই চালানের সংবাদ আগেভাগেই যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত বিভাগের সমস্ত ইউনিট এসব বিষয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সহযোগিতার মাধ্যমে ঐসব গোপন অপরাধের ওপর অতর্কিতে আঘাত হানে।

বড় বড় যেসব চোরাচালান এইভাবে ধরা পড়ে, নার্কোটিক্স ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ১৯৩১ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী, ইউ-এন-ও'র সদর দপ্তরকে সেগুলোর বিবরণ জানায়। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর মাধ্যমে, প্যারিসস্থিত 'ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পোলিশ অর্গানিজেশন'-এর সেক্রেটারী-জেনারেলকেও এসব সংবাদ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নার্কোটিক্স সংস্থার সঙ্গেও আফিং পাচারসম্পর্কিত খোঁজখবর এবং সন্ধানসূত্র আদানপ্রদান হয়ে থাকে।

এখানে পাঠকমনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, শুধু কি জনস্বাস্থ্যের খাতিরেই আমাদের সরকার এতসব আটঘাট বেঁধে আফিং দমনের কাজে নেমেছেন? বস্তুত এটা একটা কারণ বটে, তবে একমাত্র কারন নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির শর্ত রক্ষা করাটাই হল এতসব বায়নাক্কার প্রধানতম কারণ। ১৯৫৩ সালের প্রোটোকলের ১৯নং ধারানুযায়ী, ভারত সরকার ঐ বছরেরই ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রেজেস্ট্রিকৃত এবং ২১ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক আফিংখোর ছাড়া আর কাউকেই অন্তত ধূমপানের মাদক হিসেবে আফিং ব্যবহার করতে দেবেন না বলে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব, এসব প্রচেষ্টা না চালিয়ে উপায় নেই। আর, শুধু আমাদের দেশ নয়, দুনিয়ার অনেক দেশই অনুরূপ সমস্ত কাজে এখনও দস্তুরমত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

প্রচেষ্টা যে বহুরকমেই হচ্ছে, তা তো বোঝা গেল। কিন্তু যে-উদ্দেশ্যে এত কিছু পাঁয়তারা, সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি? মাদক হিসেবে আফিঙের ব্যবহার কি সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়েছে? হতাশাদ্যোতক একটি বিরাট "না" ছাড়া এর উত্তরে আর কিছুই বলবার মতো নেই। তাহলে উপায়?

উপায়ের আলোচনায় আসবার আগে, একটা সহজ কথা আমরা বুঝবার চেষ্টা করি আসুন। আফিঙের নেশাটা আমরা যদি সত্যি সত্যিই নির্মূল করতে চাই, তাহলে এর চাষটা আমরা সম্পূর্ণ বন্ধ করি না কেন? তার্কিকরা এর উত্তরে মাত্র দুটি যুক্তি দেখাতে পারবেন :

ক) বন্ধ করলে, ওষুধ তৈরী এবং গবেষণার জন্যে আফিং পাব কোথায়?

খ) ব্যক্তিগতভাবে অনেকে যেমন

লুকিয়ে-চুরিয়ে গাঁজা গাছ লাগায়, আফিংও তো সেইভাবেই তৈরী হতে থাকবে।

উত্তম কথা। আগে প্রথম যুক্তিটা বিচার করা যাক। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে আজও কি বিজ্ঞান এতটাই পশ্চাৎপদ রয়েছে যে বিকল্প কোনো ভেষজ সে কস্মিনকালেও আবিষ্কার করতে পারবে না? তাছাড়া, ওষুধ হিসেবে একে টিকতে দেওয়া মানেই কি এর অপরিহার্যতাকে চিরকালের মতো জীইয়ে রাখা নয়? অপব্যবহারের রন্ধ্রপথটাও কি এইজন্যেই খোলা থেকে যাচ্ছে না?

দ্বিতীয় যুক্তি : ব্যক্তিগত উৎপাদন। ধরে নেওয়া গেল, কিছুসংখ্যক লোক আড়ালে-আবডালে এ-গাছ লাগাবে। কিন্তু ফ্যাক্টরীতে প্রসেসিং করতে পারবে না বলে, এদের আফিং হবে অত্যন্ত নীরেশ মানের। তাছাড়া, এদের উৎপাদনের পরিমাণও হবে নামমাত্র। লাভজনক চোরাকারবার চালানোর মত প্রচুর আফিং এরা কোনোক্রমেই তৈরী করতে পারবে না। সমগ্র রাষ্ট্রে বিশ-পঞ্চাশজন যদি শাস্তির ঝুঁকি নিয়ে এ-কুকর্ম করেও তাহলে সমগ্র সমাজের পক্ষে মারাত্মক কোনো ক্ষতি হবে কি? এছাড়া আরও একটা কথা আছে। গাছ পোঁতা থেকে আফিং তৈরী পর্যন্ত সবকিছু তো আর রাতারাতি সেরে ফেলবার মতো ব্যাপার নয়। দীর্ঘদিনব্যাপী গাছ-পরিচর্যা, ঢেঁড়ি আঁচড়ানো প্রভৃতি সবকিছুই তো ওদের করতে হবে। ততদিনে ওগুলো হাতে-নাতে ধরে ফেলাটা পুলিশের পক্ষেও নিশ্চয়ই কঠিন হবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সরকার আফিং উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে, একমাত্র আবগারী আয় হ্রাস পাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতিই হবে না। পরন্তু আমাদের বহুঘোষিত উদ্দেশ্যও তাতে ষোলো আনাই সফল হবে।

সর্বোপরি আরও একটা মজার হেঁয়ালী আছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে উৎপাদিত এবং সরকারের রপ্তানীব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশে প্রেরিত বিপুল পরিমাণ আফিঙের কিয়দংশও যে চোরাপথে আবার এদেশেই ফিরে আসে—একথা আমরা সহজভাবে স্বীকার করতে চাই না কেন? এই ধরনের উল্টো বিপত্তি অবিশ্যি অন্য দেশেও ঘটে। চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে, এ-পাপচক্রটাও যে আপনা থেকেই লোপ পাবে—এই সহজ কথাটাই বা আমরা বুঝতে চাই না কেন?

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথানুগত্যই সহজ সত্যগুলোকে আমাদের চোখের আড়াল করে রাখে। নেশামাত্রই অকল্যাণজনক—আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্যনিয়ন্তারা যে একথা বোঝেন না, এমন নয়। নেশার প্রচলন রোধ করার জন্যে চেষ্টারও তাঁরা কসুর করেন না। তবু জনগণের ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস এই যে, পরোক্ষে সরকারই আবার সেসব নেশার পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। আবগারী শুল্কের আয় কমে যাবার আশঙ্কায়, মদ বিক্রী তাঁরা বন্ধ করতে চান না। বৃহদায়তন ও ক্ষমতাশালী ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারকে ছেলে-ভুলোনো যুক্তি দেখায়—"তাদের তৈরী আফিংজাত ওষুধে, অভ্যাস সৃষ্টি করে না"। একথা মিথ্যা জেনেও, সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানকে নিষেধ করতে সাহস করেন না। উপরন্তু, স্বার্থের খাতিরে অনেক সময় তাদের আনুকূল্যও করেন। তারাও এইসব বিষ ওষুধ অবাধেই চালাতে থাকে।

॥ ৮ ॥

সর্বশেষে আরেকটি মৌল প্রশ্নের সমাধান খুঁজে নিয়েই আমরা বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করব। আফিং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী মানুষের, বিশেষত রাষ্ট্র কর্ণধারদের এতবেশী মাথাব্যথা কেন? কারণ, এর ক্ষতিকর কুপ্রভাব থেকে মানুষকে আমরা বাঁচাতে চাই; এই তো? তাই-ই যদি হয়, তাহলে আরও বেশী ক্ষতিকর মাদকগুলোকে আমরা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ করি না কেন?

সমাজবিজ্ঞান বলে—ব্যবহারকারীর শারীরিক ক্ষতি ছাড়াও, মাদকমাত্রেই সমাজে এমন একটা অসুস্থ মানস-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পরিণামে যা অপরাধ-প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তোলে, দুষ্কর্মের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। এই সত্যের কষ্টিপাথরে আফিংকে যাচাই করলে দেখা যাবে—এ-নেশা ব্যক্তিস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ঠিকই, কিন্তু মদ প্রভৃতির মতো, সমাজের পক্ষে সামগ্রিকভাবে এটা "মহতী বিনষ্টি"-র কারণ ঘটায় না। একমাত্র চণ্ডুটা অপরাধ-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপিত করে থাকে; হয়ত সেটা দলবদ্ধভাবে ভোগ্য বলেই। কিন্তু আফিং যারা গিলে খায়, আজগুবী চিন্তা তারা যতই করুক না কেন, খুন-খারাপী বা হাঙ্গামা-হুজ্জোতের মধ্যে পরাতপক্ষে তারা নিজেদের জড়াতে চায় না। কল্কেয় করে যারা আফিঙের ধোঁয়া টানে, তারা যাযাবর শ্রেণীর; অর্থাৎ মূলতঃ সমাজবহির্ভূত মানুষ। তাদের কুপ্রবৃত্তি প্রত্যক্ষভাবে সমাজদেহে কোনো স্থায়ী দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে না।

অতএব দেখা গেল—অন্য নেশা এর চেয়েও সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করে। তাহলে আফিঙের ওপরেই কোপটা এত-বেশী কেন? কারণ, এটা "কালো সোনা"; অর্থাৎ আসল রহস্যটা স্রেফ অর্থনৈতিক। চোরা আফিং সত্যি সত্যি সোনার দামেই বিকোয়। একদিকে নেশাখোরের পক্ষে আফিঙের অপরিহার্যতাবোধ, অন্যদিকে সরকারী কড়াকড়ি—সবকিছু মিলিয়ে নিষিদ্ধ আফিঙের চোরা লেনদেন হল বিশ্বের সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসাগুলোর অন্যতম! অতএব আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোতে পর্যবসিত হবে—এতে আর অবাক হবার কি আছে? মহামনীষী মার্কস ঠিকই বলেছিলেন—সমাজদ্বন্দ্ব ও সমস্যার প্রতিটি জট-ই কোনো-না-কোনো অর্থনৈতিক সুতোয় বাঁধা।

তবু যদি আমরা সত্যি সত্যিই এ-পাপ দূর করতে চাই, তাহলে এর prevention-এর দিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। অর্থাৎ সর্বাগ্রে আফিঙের চাষ বন্ধ করা চাই। কিন্তু সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী ও অবলম্বিত ব্যবস্থাদি যন্ত্রের মতো রুটিন-বাঁধা পুনরাবৃত্তির পথ ধরে চলে; মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে বিশেষ আমল পায় না। কাজেই prevention-যে সত্যিই সফল হবে, সে আশা খুবই সুদূরপরাহত।

কিন্তু prevention- যদি করা না যায়, cure কি তাহলে করা সম্ভবপর? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, অন্তত এটুকু মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ আফিংই বোধহয় একমাত্র মাদক, সমাজ-মানসের সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় কোনো মূল্যবোধের সঙ্গে যা আজও যুক্ত হয়নি। মদ, গাঁজা প্রভৃতি অন্যসব নেশার উপকরণ কোনো-না-কোনোভাবে মানুষের সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে কার্যকারণসূত্রে জড়িয়ে গিয়েছে। মদ নিয়ে স্বাস্থ্য কামনা করতে হয়, পর্বদিন উদ্‌যাপনেও ওদেশে মদ লাগে। গাঁজা দিয়ে হয় 'ত্রিনাথের মেলা' 'বাবাহরের ব্রত'। এমনকি শুভযাত্রা করে কোথাও যেতে হলেও সিদ্ধির দরকার।[৩] আফিং কিন্তু আজও এরকম কোনো বিশ্বাস বা সংস্কারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারেনি। তা পারলে আর একে সমাজজীবন থেকে হঠানো যেত না। পারেনি বলেই এখনও আশা আছে।

অতএব prevention না হোক, অন্তত cure-এর চিন্তা আমাদের করতেই হবে। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে, এ-পাপ ক্রমে আরও বেশী দৃঢ়মূল ও বহুবিস্তৃত হতে থাকবে। মানুষের অন্তরের সুপ্ত শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করার সুপরিকল্পিত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসই, আত্মঘাতী এই মাদকপ্রিয়তা থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারবে। এ-কাজ অতি দুরূহ, তাতে সন্দেহ নেই। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো সর্টকাট্‌ও নেই—একথাও সমাজতত্ত্বের সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু হতাশার এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেই স্মরণ রাখতে হবে কবির বাণী—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। এই বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়েই, অনাগত দিনের সেই প্রবুদ্ধ কল্যাণ-শক্তির অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্যে আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। "Our world must come to wisdom slowly but surely" — যুগন্ধর জননায়কের এই প্রত্যয়দৃপ্ত আশ্বাসবাণীই, সুকঠোর এই সাধনায় আমাদের নিরলস রাখবে। পথ-প্রস্তুতির এই প্রয়াসে যদি সত্যিই কোনো ফাঁকি না থাকে, মানবচৈতন্যের কলুষমুক্তির সেই পরমলগ্নটি কি তাহলে বিলম্বিত হতে পারে?

৩। 'অমৃত' ৫ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা এবং ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যায়, বর্তমান লেখকের যথাক্রমে 'বিশ্বব্যাপী ব্যসন : সুরা' ও 'বিচিত্র মাদক : গাঁজিকা' শীর্ষক নিবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

শুরুতেই সুমিতা বুঝেছিল এ চাকরি তার বেশি দিন নয়!

সকাল থেকেই কি ঝামেলা আরম্ভ হয়! তারে-বেতারে একাকার হয়ে সব যেন কেমন তালঘণ্ট পাকিয়ে বত্রিশ-নাড়িতে পাক দিয়ে ওঠে! কি জ্বালাতন!

তিনুমাসিমা বাড়ি বয়ে চাকরিটার খবর এনে বলেছিলেন, কাজ কিচ্ছু না, সারা দিন কেবল বসে থাকা! খুব মজার কাজ!

মা তিনুমাসিমাকে খুব খাতির করে বসিয়ে বলেছিলেন, তোমরা পাঁচজনে দেখো ভাই, সুমি তো আমার কখনো কোথাও বেরোয় নি। চাকরি করার নামে মেয়ে আমার কেমন হয়ে গেছে!

তিনুমাসিমা অভয় দিয়ে বলেছিলেন, চাকরিতে আবার ভয় কি, মেয়েরা আজকাল অমন কত চাকরি করছে! ভয়ের কি আছে?

মেয়ের চেয়ে মায়েরই ভয় বেশি। মা বলেছিলেন, সে তো আমি ওকে বলেছি। ওই তো, ওর সংগে পড়ত কত মেয়েই চাকরি করছে! হাতি-ঘোড়া কিচ্ছু নয়, একবার আপিসে গিয়ে বসলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তিনুমাসিমা বলেছিলেন, হ্যাঁরে, সত্যি তোর ভয় করছে না কি চাকরি করতে? এখনো বল—

সুমিতা মাথা নেড়ে বলেছিল, না-না, মার কথা শোন কেন মাসিমা! মা-ই ভয় পাচ্ছেন।

তিনুমাসিমা বোধহয় মা-মেয়ের ভয়ের কারণটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, না-না, সে-সব কিছু না। সময় মত যাবে, সময় মত চলে আসবে, ভাববার কিছু নেই!

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কাজ শক্ত নয় তো? ও পারবে ঠিক?

তিনুমাসিমা বলেছিলেন, বলছি তো কাজ কিছু নয়! খুব সোজা কাজ, একেবারে যাকে বলে—

বার-বার সোজা কাজ সোজা কাজ শুনে-সুমিতার কেমন লজ্জা হয়েছিল। মাকে থামিয়ে বলেছিল, তুমি থাম না মা, মাসিমা বলছেন যখন, তখন—

সঙ্গে সঙ্গে মা বলেছিলেন, সে আমি জানি, তিনু যখন আছে তখন কোন শক্ত কাজ কি তোর ঘাড়ে চাপাবে!

তিনুমাসিমা হেসে বলেছিলেন, না-না শক্ত কাজ নয়, খুব সোজা কাজ! কত মেয়ে কাজটা পাবার জন্যে ধর্না দিয়েছে! আমি সতীনাথবাবুকে বলে রেখেছি ও কাজটা আমার বোনঝিকেই দিতে হবে, ওসব ফাইল-টাইল সে ঘাঁটতে পারবে না! নতুন চাকরি, একটু দেখে-শুনে যেন দেওয়া হয়!

মার তবুও ভয় যায় নি, সংশয় ঘোচে নি মেয়েকে চাকরি করতে পাঠিয়ে! জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন, তোর কাছাকাছি রাখতে পারিস না?

তিনুমাসিমা হেসেছিলেন। তাঁর কাজ কি সোজা যে বোনঝিকে সেই কাজে তালিম দেবেন? তার চেয়ে অনেক সহজ কাজ তিনি সুমিতার জন্যে ঠিক করেছেন! দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই!

হয়ত মায়ের মন বুঝতে পারে কিসে ছেলেমেয়ের স্বাচ্ছন্দ্য। বিশেষ করে তাদের ভাল-মন্দটা আগে থেকে যেন টের পান তাঁরা।

প্রথম দিনই চাকরি করে ফিরে আসতে মা সুমিতার সঙ্গ ছাড়েন নি। কাপড়-চোপড় ছাড়তে তর দেন নি, মুখ-হাত ধোবারও অবসর দেন নি।

"কি রে কোন কথা বলছিস না যে! কেমন চাকরি করলি।" মেয়ের পিছনে পিছনে মা কলতলা পর্যন্ত এগিয়ে এসে-ছিলেন।

সুমিতা আঁচলা করে জল নিয়ে চোখে-মুখে দিয়ে অস্ফুটে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। মা তেমনি উৎসুক মুখে চেয়ে আছেন।

চোখে মুখে জল দেওয়া যেন সুমিতার শেষ হয় না। আবার মাথায় জল দিচ্ছে কেন? কপালের চুলগুলো ভিজে জব-জব করছে।

মা ব্যস্তভাবে বললেন, "কিরে মাথায় জল দিচ্ছিস কেন?"

সুমিতা এবার যেন বিরক্ত হল, বললে, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বক-বক করবে সেই?"

তবু মা সঙ্গ ছাড়েন না। মেয়ের চাকরির খোঁজ-খবর না নিয়ে ছাড়বেন না। কি চাকরি, কেমন চাকরি, কি তার পরিশ্রম সব তাঁর জানা চাই।

তারপর মেয়ের মুখের সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "খুব খাটুনী হয়েছে বুঝি? মুখটা তোর শুকিয়ে গেছে যেন!"

এবার সুমিতা হাসলে, চা-জলখাবার কোলের কাছে নিয়ে বললে, "তোমার সব তাতে ভাবনা! মুখ শুকিয়ে গেছে, খাটুনী হয়েছে, কত কি বললো। চাকরি যেন আর কোন মেয়ে করে না!"

মাও হাসলেন। মনে মনে যেন বললেন, নিজে মা হলে বুঝতিস মায়ের মনোভাব।

মেয়ের শুকনো মুখকে তাজা করতে শ্রান্তি অপনোদন করতে মায়ের সেদিন আঁকপাকানি কম ছিল না। সুমিতার কেমন লজ্জা করেছিল কি যেন কি রাজকার্য মেয়ে করে এলেন! দিগ্বিজয় যেন!

নতুন চাকরির সম্বন্ধে মার মনের সংশয়কে শান্ত করতে পারলেও নিজের মনে সুমিতার নিত্য-নূতন ভয়-ভাবনা আর সংশয় যেন ঘনিয়ে ওঠে। তার মত আরো মেয়ে চাকরি করতে এলেও সে-যেন সবার থেকে ভিন্ন, কেমন যেন দলছাড়া।

অফিসে সারা দিনে তিনুমাসিমাকে যদি একবার দেখা যায়। তাছাড়া দেখা হবারও সম্ভাবনা কম, তিনুমাসিমা দোতলায়, সে একতলায়। অবশ্য ইচ্ছে করলেই মুহূর্তে একতলা-দোতলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, তিনুমাসিমাকে সুবিধা-অসুবিধার কথা বলা যায়।

কিন্তু সুমিতার কেমন লজ্জা করে এখানে তিনুমাসিমাকে অভিভাবক ভাবতে—চাকরি করে দিয়েছেন বলে সে চাকরির দায়িত্ব কেন এখনো তাঁর থাকবে? মা-মাসির আঁচল ধরে থাকবে?

প্রথম দিন কাজে বসিয়ে দিয়ে তিনু-মাসি বলেছিলেন, দরকার-টরকার হলে আমাকে বলিস! সতীনাথবাবুকে আমার বলা আছে!

আরো লজ্জা, মাসিমার হয়ে সতীনাথ-বাবু নিজে থেকে এসে বললেন, অসুবিধে-টুবিধে হলে বলো! তুমি মিস রায়ের আত্মীয়—

আত্মীয় বলে' বন্ধু বলে' ওই দু-এক-দিন, তারপর এত বড় অফিসে কে-কার খবর রাখে। যে-যার কাজ নিয়ে আছে, মুখ তোলবার সময় নেই কারো।

"কি করছেন, তখন থেকে লাইনটা দিতে পারলেন না? ডবল টু থ্রি নাইন জিরো জিরো!"

"দুবার এনগেজড পেলুম স্যার!"

"আর একবার দেখুন!" ওদিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ আসে।

ডায়েল ঘোরাতে-না-ঘোরাতে ওদিক থেকে বোর্ডের দু নম্বর চাবির ঘরটা গোঁ-গোঁ করে উঠল। সুমিতা চাবি টিপে কম্পিত কণ্ঠে বললে, "ইয়েস স্যার!"

ডেপুটি সেক্রেটারীর ফোন। জানতে চাইছেন আজকে ছটা-নটা অমুক সিনেমার দুখানা টু-টয়েনটির টিকিট মিলবে কিনা? ক' সস্তা হলো হাউস ফুল যাচ্ছে!

কান থেকে রিসিভার নামাবার আগেই আর একটা চাবি যেন বিকল হয়ে শব্দ করতে লাগল, কানে পালক গোঁজার মত ফর্-র ফর্-র করছে!

"ডবল ফোর জিরো টু ওয়ান নাইন,... হ্যাঁ...হ্যাঁ লায়ন কোম্পানী!"

এক-এক সময় এমনি হয় চারদিক থেকে বাণ-খাওয়ার মত অবস্থা; এটা টেনে ছাড়াতে গেলে ওটা এসে লাগে, আবার ওটা ছাড়ালে আর একটা কোথা থেকে এসে পড়ে সম্পূর্ণ অতর্কিতে—কান-মাথা ভোঁ-ভোঁ করে, হাত-মুখের বিরাম থাকে না।

ঐ, আবার দু নম্বর ঘরের চাবিটা যেন বিকল হয়ে উঠল গোঁ-গোঁ করছে! আবার বাইরে থেকে একটা 'কল' এসে বিরক্ত করছে।

মুহূর্তের জন্যে সুমিতা নিজেও যেন বিকল হয়ে যায়—রিসিভার কানে তুলতে চায় না, ঠিক চাবিতে হাত দিতে চায় না। যেন সাড়া দিয়ে ঠিক-ঠিক জায়গায় ডাকা-ডাকিটা পৌঁছে দেওয়া তার দায়িত্ব নয়। এত বড় চারতলা অফিসের একটা ছোট্ট ঘরে বন্দী হয়ে যত রাজ্যের আবোল-তাবোল কথা সে শুনবে কেন? পাতালপুরীর রাজ-কন্যার মত সে যদি হতচেতন হয়ে যেত তা হলে অনেক ভাল হত!

"ইয়েস স্যার!"

"কই, পেলেন?"

কথাটা যেন সুমিতা কিছুতে বুঝতে পারে না। কি পাওয়ার কথা ডেপুটি সেক্রেটারী বলছেন? সুমিতা আমতা-আমতা করতে থাকে, ওদিকের গলার স্বরটা যেন বিকৃত হয়ে ওঠে—"দু-খা-না টি-কি-ট ডিলাইটে!"

সুমিতা কম্পিত কণ্ঠে বললে, "না স্যার! তিন দিনের জন্যে হাউস ফুল!"

ওদিকে রিসিভারটা যেন ঝনাৎ করে রাখার শব্দ হল। সুমিতা আরো সন্ত্রস্ত হল—স্পষ্টই রেগে গেছেন ডেপুটি সাহেব! কিন্তু সে রাগটা কার ওপর, কিসের জন্যে, ভাবতে পারে না। কেমন অস্বস্তি বোধ করে। আবার বোর্ডে শব্দ উঠল।

"হ্যালো! হ্যালো?"

না, কোন সাড়া নেই, যেন মরা মানুষের কানের কাছে ডাক পাড়ছে—হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?

বাইরের লাইন একেবারে ডেড! একটু তর সয় না, সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে দিয়েছে? রিসিভার নামিয়ে সুমিতা মনে মনে বললে, দিক গে! দরকার হলে আবার ডাকবে, তার কি! একটা শেষ করে আর একটা, না কি? একটা মানুষে এক সঙ্গে কটা কাজ করতে পারে? মুখ একটা, না পাঁচটা?

মনে মনে বললেও সুমিতা স্থির হয়ে থাকতে পারে না। কলটা যদি বড়সাহেবের হয়? যদি কোন কমপ্লেন করে? বললেই হলো একটা বানিয়ে — অপারেটরের দোষ দিলেই হলো! কে শুনছে? টেলিফোন গার্ল না হলেও অফিসের টেলিফোন অপারেটর তো সে!

সুমিতা ভয়ে ভয়ে রিসিভারটা তুলে মুখের কাছে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, "হ্যালো?"

একি! লাইনে কারা যেন কথা কইছে—সুমিতা স্পষ্ট শুনলে, মেয়েলী কণ্ঠ বহু-দূরাগত।

সুমিতা রিসিভারটা কানে চেপে ধরলে, কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ করলে।

কতক্ষণ সুমিতার খেয়াল নেই, রিসিভার নামাতে গিয়ে মাথাটা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। সমস্ত দেহ-মনে একটা মাদকতার আক্রমণ যেন! পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার মনে কোন স্বপ্ন জাগে নাকি?

আশ্চর্য, কোন কনেকশন নেই তবু দুই বিপরীত কণ্ঠের আলাপ কেমন স্পষ্ট শোনা গেল! মাঝখান থেকে সব বোঝা না গেলেও এটা বেশ বোঝা গেল, দূর-ভাসে ওরা পরস্পরের নিকটবর্তী হবার জন্যে স্থান-কাল ঠিক করে নিচ্ছে! পুরুষের চেয়ে নারী কণ্ঠটি ত্রস্ত, কম্পিত, ভয়-চকিতও বুঝিবা!

"না-না, আমি আসতে পারব না, তুমি এসো!...না না না..."

রিসিভারের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত শোনাচ্ছিল মেয়েটির গলার স্বর! "না-না" যেন 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' শুনেছে সুমিতা, এখনো কানে বাজছে!

ওদের মিলনের জায়গাটা যেন খুব চেনা-চেনা! সুমিতা যেন জায়গাটা যাওয়া-আসার পথে দেখেছে অনেকবার! নির্জন একটা পুকুরের পাড়ে বুঝি ওদেরই দেখেছে ট্রাম-বাসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। কত কালের গাছগুলো কিভাবে জড় হয়ে ডাল-পালায় সমাচ্ছন্ন, বেশ আড়াল-আড়াল বিশ্রম্ভালাপের জায়গাটা!

কোন দিন বুঝি সুমিতার ট্রাম বা বাস থেকে নেমে জায়গাটায় যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। মনের কোনখানে একটা বাসনা জেগেছিল। কিন্তু মাঝপথে কোনদিন নেমে পড়ে সে-বাসনা চরিতার্থ করা হয় নি। কেমন সংকোচ আর নিজের মনে কেমন যেন লজ্জা-বোধ করেছিল সুমিতা। না না, লজ্জা নয়, সুমিতা মাঝপথে নেমে যেতেই ভয় পেয়েছে, তার সাহসে কুলোয় নি। গঙ্গার ওপারে যখন সূর্য ডুবেছে এপারে তখন মাঠের মধ্যে ছায়ায় কুঞ্জটি বিশেষ আলোকিত হয়ে উঠেছে, পুকুরের কালো জলের ঢেউ শান্ত হয়েছে, বাতাস পড়ে গেছে। চুপ করে চেয়ে থাকতে থাকতে মনটাও হঠাৎ সুমিতার নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে।

উড়ো টেলিফোনে মেয়েটি উভয়ের সাক্ষাতের স্থানটির যে বর্ণনা দিচ্ছিল হুবহু মিলে গেছে পথের ধারে পুকুর-পাড়ের ঐ জায়গাটির সঙ্গে। সুমিতার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে উঠেছে ছবির মত, মনে-মনে অনেক নিকটবর্তী হয়ে গেছে সে। অদ্ভুত, গাছগুলো জড়াজড়ি হয়ে নির্জনতা যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে জায়গাটার।

ইচ্ছে করলেও সুমিতার কোনদিন মাঝ-পথে নামা হ'বে না। কেবল ভিড় নয়, মা-ও কত করে' বলে দিয়েছেন, খুব সাবধানে চলা-ফেরা করতে। ট্রাম-বাসের কথা কিছু বলা যায় না। তার ওপর নির্জন মাঠে বিজনতার সম্মুখীন হওয়া কম দুঃসাহসের কথা নয়; মা শুনলে আর রক্ষা রাখবেন না। অনেক করে' বলে দিয়েছেন পাখি-পড়ানর মত, আপিস থেকে কোথাও যাবি না, সোজা বাড়ি ফিরে আসবি!

মা'র বড় ভাবনা সুমিতাকে রোজগার করতে আপিসে পাঠিয়ে। তিনমাসিমাকে অনেক ভাবে মায়ের আতঙ্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে হ'য়েছে। মা জিজ্ঞেস করেছেন, পথ দীর্ঘ কিনা, বক্র কিনা, গোলমেলে কিনা। তিনমাসিমা বলেছেন, না না খুব সহজ, সরল আর ঋজু পথ সুমিতার অপিস! ওঠা আর নামা, কোন গোলমাল নেই! একটা ছোট ছেলেও যেতে পারে চোখ বুজিয়ে!

সুমিতার এত লজ্জা করেছিল মা'র প্রশ্নে, যেন সুমিতা একেবারেই শিশু, কলকাতার পথ-ঘাট কিছুই জানে না, মায়ের আঁচলই ছাড়েনি এখনো।

তবু তিনমাসিমা বলেছিলেন, বেশ, আপনার যদি বিশ্বাস না হয় আমি না হয় ওকে সঙ্গে ক'রে দুদিন নিয়ে যাব!

সুমিতা কিছুতে রাজী হয়নি। বি-এ পাশ-করা মেয়ে কি এতই নাবালিকা, অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে চলা-ফেরা করতে হ'বে? মা অমন করলে সে চাকরিই করবে না।

তিনমাসিমা হেসেছিলেন, বোধহয় মা-মেয়ের মনের দ্বন্দ্বটা বুঝেছিলেন। কৌতুক বোধ করেছিলেন।

মা'কেই সুমিতার বেশি ভয়। মা'র জন্যে ছুটির পর এক মিনিটও সে দাঁড়ায় না কোথাও। মা একেবারে হৈ-চৈ আরম্ভ করেন। পাড়ার লোকে জানতে পারে বোসেদের বাড়ির মেয়েটা চাকরি করে ফিরে এল।

এর মধ্যে মা'র সবাইকে বলা হ'য়ে গেছে, সুমিতা এই চাকরি করছে সেই চাকরি করছে, এই অপিস সেই অপিস, এই মাইনে সেই মাইনে! মা'র মুখের একটুও যদি ঢাক আছে! সব কথা সবাইকে বলা চাই! বড় লজ্জা করে সুমিতার!

যেন চাকরি করায় সুমিতার বিশেষ বাহাদুরী আছে বি-এ পাশ করার মত। চাকরিটা সুমিতা নিজের যোগ্যতায় যেন যোগাড় করেছে! মা পরিচিত সবাইকে বলেছেন, তিন হাজার মেয়ে দরখাস্ত করেছিল, কত ধরাধরি খোসামোদি, ঐ সুমিকেই তারা বেছে নিয়েছে! কি সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন করেছিল! কই রে, বল না সুমি?

লজ্জার এক শেষ! দুশো টাকার চাকরি যেন ভূ-ভারতে আর কেউ কখনো পায়নি!

আড়ালে মা'কে সুমিতা বলতে তিনি বলেছিলেন, কেন কি হ'য়েছে? বলিছি তা দোষের কি? ওরা যখন বলে, পাঁচ-সাত শ'র কমে যখন ওদের কেউ চাকরি করে না? তার বেলা দোষ হয় না! কেন মিথ্যে বলিচি না কি?

মিথ্যে না হোক, বলবার মত কিছু নয়। অনেক কষ্টের তার চাকরি, অনেক বলে-কয়ে তবে তার ভাগ্যে একটা চাকরি জুটেছে! তাও ঐ তিনমাসিমা ছিলেন বলে! না হ'লে তার মত একটা অখ্যাত, অনাগত ঘরের মেয়েকে কে চাকরি দিতো!

আরো লজ্জাটা সুমিতার এই ভেবে, মা'ও তাঁর অসহায় অবস্থাটা কি ভাবে যেন ঢাকতে চাইছেন। তার চাকরি না হ'লে কোথায় তারা ভেসে যেত! উঃ, সেদিনের কথা মা বোধহয় ভুলেই গেছেন। আজো স্পষ্ট করে সুমিতা ভাবতে পারে না, তার বাবা হঠাৎ কি করে' মারা গেলেন। কেবল সেই দিনের উত্তেজনার কথাটা মনে আছে, কয়েকজন অফিসের বন্ধু মিলে বাবার মৃতদেহটা তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন! শোকের আঘাতে তারা মূর্ছা গিয়েছিল! অফিসেই বাবা স্ট্রোক হ'য়ে মারা গিয়েছিলেন!

সুমিতা দু'চার দিন পরেই বুঝতে পেরেছিল, দিনের হিসেব তাদের একেবারে পাল্টে গেছে; এর পর দিন-রাত্রির হিসেব বোধহয় আর সহজ করে' করা যাবে না। ভাগ্যে সেই বছর সবে বি-এ পাশ করেছিল সে, দু একটা ট্যুশানিতে কোন রকমে চলেছিল। মা পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছিলেন, সব সময় এমন চুপ-চাপ করে' থাকতেন, দেখে সুমিতার ভয় ধরে যেত, আবার বুঝি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে যায় মাকে নিয়ে!

সে নিজে অনেক চেষ্টা করেছে, কিছু সুবিধে করতে পারেনি—এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে তেমন কিছু হয়নি। তাকে কোন অফিস থেকে গত দু বছরের মধ্যে কেউ ডেকেছে বলে মনে পড়ে না। সত্যিই তো কি যোগ্যতা আছে চাকরি করার! বি-এ পাশ আজকাল অমন হাজার হাজার মেয়ে করছে!

তিনমাসিমা তার আপন মাসিমা নন, মা'র আলাপী বন্ধু। মা কি করে' যেন আলাপ করে' মেয়ের চাকরির জন্যে বলেছিলেন। শেষে মা'ই তার চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন! তার চেয়ে মা অনেক কাজের। সুমিতা দেখেছে দুঃখে অভাবে পড়ে মা নিজেকে কি ভাবে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন, কি রকম সুযোগ-সন্ধান করতে শিখেছেন! নিজের আত্ম-সম্মান, মর্যাদা আর ব্যক্তিত্ব খুইয়ে ফেলেছেন! অথচ এই মা, তার মা, বাবা বেঁচে থাকতে কি আত্মসচেতন আর রাসভারি ছিলেন। বাবাও যেন মাকে ভয় ক'রতেন সময়-সময়। পড়শীরা অনেকে আড়ালে বলতেন, দেমাকে বোস-গিন্নীর মাটিতে পা পড়ে না! বড় অহংকার!
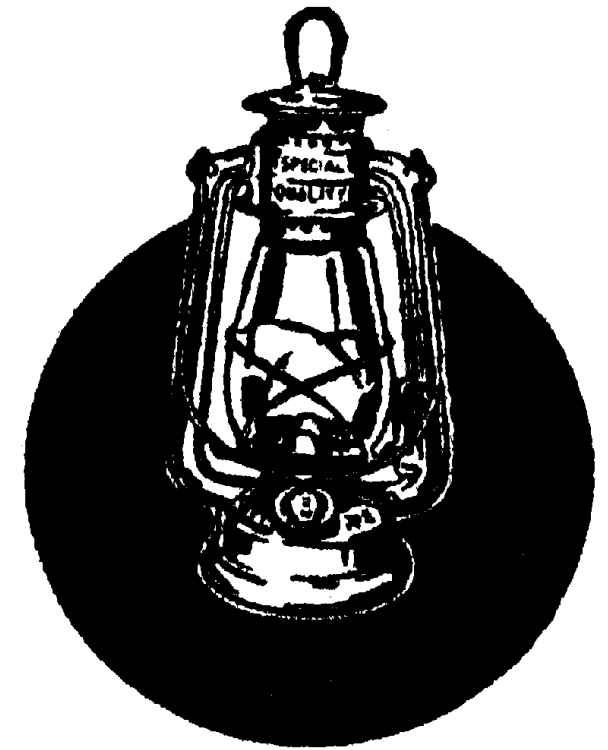
সেই মা কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে গেছেন, কেমন যেন সাধারণ হ'য়ে গেছেন। হঠাৎ একদিন তিনুমাসিমাকে বাড়ীতে ডেকে এনে কি খাতির করেছিলেন। অথচ এই তিনুমাসিমা কতকাল তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কত হাজারবার যাওয়া-আসা করেছেন, মা কোনদিন চোখ ফিরিয়েও দেখেননি! তিনুমাসিমার সম্বন্ধে কত কথাই না পাড়ার প্রৌঢ়া, বৃদ্ধারা বলাবলি করতেন, কিনা এত বয়স পর্যন্ত তিনি বিয়ে করেননি, চাকরি করেন, স্বাধীনভাবে থাকেন। সুমিতাদের তাঁর সম্বন্ধে কেবল কৌতূহল ছিল!

সেদিন মা'র তিনুমাসিমাকে এত খাতির সুমিতার ভাল লাগেনি। আলাপ করতে হবে বলে এত কেন! আর যেদিন মা তার চাকরির কথা বললেন সেদিন সুমিতা লজ্জায় মরে গিয়েছিল। মা'র সম্বন্ধেও তার ধারণা যেন বদলে গিয়েছিল। তিনুমাসিমা চলে যেতে মা খুব উৎসাহ আর আগ্রহ করে বলেছিলেন, জানিস, তিনু তোর চাকরির যোগাড় করে' দেবে বলেছে! খুব হাত আছে ওর! বললে এ্যাদ্দিন বললে নাকি কবে তোর চাকরি হ'য়ে যেত!

সুমিতা কিন্তু মা'র মত উৎসাহ বোধ করেনি। কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ হ'য়েছিল। তিনুমাসিমাকে তার ভাল লাগেনি। তারপর মা কতবার তিনুমাসিমার সুখ্যাতি করেছিলেন নিজে নিজে। সুমিতা কোন মন্তব্য করেনি।

হঠাৎ বোঁ-বোঁ করে' দু নম্বর ঘরের খোপটা শব্দ করে' উঠলো। সুমিতা রিসিভার তুলে সাড়া দেবার আগেই শব্দটা মিলিয়ে গেল। ওদিক থেকে ডেপুটি সাহেব কিছু না বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। সুমিতা দু-একবার 'ইয়েস স্যার-ইয়েস স্যার' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলে।

এই এক খেলা সাহেবদের টেলিফোন নিয়ে! হঠাৎ রিসিভার তুলেই সাড়া-শব্দ না করেই ছেড়ে দেন। এখন তুমি বোঝ তাঁদের মেজাজ মর্জি!

আর অফিসের কাজের চেয়ে প্রাইভেট কাজেই টেলিফোনটা ব্যবহার হয় বেশি। কটাই বা 'কল' আসে বাইরে থেকে, হাতে গোনা যায় বুঝি! তার জন্যে একটা শিক্ষিত মেয়েকে খাঁচার মধ্যে পুরে বুলি শেখাতে হ'বে। 'ইয়েস স্যার' থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। গুড্ মর্ণিং স্যার! হোল্ড অন প্লিজ! অন্ দি লাইন।' কত কি! সব সময় মনেও থাকে না, গোলমাল হ'য়ে যায়! আর বোর্ডটা? কি নাম যেন, পি-বি-এক্স! ভাগ্যে 'ইন্টারভিউ'-এর সময় তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি! তিনুমাসিমা সব ব্যবস্থা করে' রেখেছিলেন। বড়সাহেব, মেজসাহেব, সতীনাথবাবু, সবাই তিনুমাসিমার হাতের লোক।

অফিসে ঢোকবার আগে তিনুমাসিমা বলে দিয়েছিলেন, সুমিতা কাউকে যেন না বলে তার সংগে তিনুমাসিমার পরিচয় আছে। কেন? তা অবশ্য স্পষ্ট করে' তিনুমাসিমা বলেননি।

কিন্তু ঢোকার আগে থেকেই সবাই জেনে ফেলেছে সুমিতা বোস মিস্ রায়ের আত্মীয়া, সতীনাথবাবুর জানাশোনা! এখনো সবাই বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে-চেয়ে নিঃশব্দে কি সব যেন বলাবলি করে। সুমিতার খুব রাগ হয়—ইচ্ছে করে চাকরিটা ছেড়ে চলে যায়, ভারি তো চাকরি, তার জন্যে এত ইঙ্গিত, ইশারা রেষ-বিক্ষোভ! আরো মিস্ রায়ের লোক বলেই যেন সুমিতার সংকোচ বেশি!

আবার বোর্ডটা শব্দ ক'রে উঠলো। হঠাৎ কানে কাঠি দেওয়ার মত ঝন্‌ঝন্ করতে লাগল। সুমিতা যেন ইচ্ছে করে রিসিভারটা তুলতে চাইলে না। বাজুক যত বাজতে পারে, যতক্ষণ পারে।

না, এই খাঁচার ভেতর থেকে এই সংকুচিত বন্দী অবস্থার মধ্যে থেকে খানিক বিশ্রাম চায় সুমিতা। মুক্তি? হ্যাঁ, তা-ও সে-চায়! চাকরি করার প্রথম উত্তেজনা তার কেটে গেছে! চাকরিতে 'চার্ম' চলে গেছে। এরি নাম চাকরি? হায়!

না, বাইরের 'কলটা' বড় জ্বালাতন করছে! এক নাগাড়ে বেজেই চলেছে—নেই-আঁকড়ে।

"হ্যালো? হ্যাঁ, বলুন! কাকে চাই?"

আবার প্রাইভেট কল! তাও কোন মহিলা চাইছেন ডেপুটি সাহেবকে! দিনে কত কল আসে ডেপুটির? ছোকরা সাহেব বেশ আছেন!

সুমিতা কৌতূহল দমন করতে পারে না, রিসিভারটা কানেই চেপে থাকে। আড়ি পেতে সুমিতা শুনতে শুনতে যেন বিভোর হ'য়ে ওঠে। কত বিচিত্র, মনোরম কথা যেন হ'চ্ছে ছায়াছবির মত! মনে মনে রোমাঞ্চিত বোধ করে। সেই 'রং-কনেকশনের' কথার মত, যদি সিনেমা না হয় তা হ'লে আর কোথায় ওরা গিয়ে পরস্পরের সংগে মিলিত হ'বে—সে জায়গাটা কোথায়, তার নির্দেশ। এবারে কিছুতে সুমিতা আন্দাজ ক'রতে পারে না।

একি! এক নম্বর ঘরের সংকেতটা কখন স্পষ্ট হ'য়ে গেছে! অদ্ভুত একটা গোঁ-গোঁ শব্দ হচ্ছে।

সুমিতা টেলিফোন ধরতে ওদিক থেকে একটা ধমক খেলে, "কি করেন? কখন থেকে লাইন চাইছি! ডবল ফোর, টু টু—"

তাড়াতাড়ি কল টিপে সুমিতা চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ মনে হল তার আশপাশটা সত্যিই অদ্ভুত। সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, সবাই কিন্তু তাকে দিয়ে কেমন দেখাশোনা করে' নিচ্ছে। কাজের কথা, অকাজের কথা, লাভের কথা, কত কি তার মনের ওপর দিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে, কত রূপ-রস স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। ঐ বোর্ডের মধ্যে থেকে কখনো কলের গানের মত কত সুর ভেসে আসছে—তার মনটাকেও বিচলিত করে' দিচ্ছে।

মেয়েটি বা মহিলাটি কে হ'তে পারেন ডেপুটি সাহেবের? কথাবার্তা শুনে মনে হল প্রিয়-বান্ধবী। নবপরিণীতাও তো হ'তে পারেন? কে জানে! যাই হোক, সম্বন্ধ খুব মধুর, অন্তরঙ্গ, তাতে কোন সন্দেহ নেই!

বাবা-মা এক সময় তার বিয়ের কথা খুব ভেবেছিলেন। সুযোগ হ'লে বি-এ পাশ করবার আগেই তার বিয়ে দিয়ে দিতেন। কয়েকবার তাকে দেখানও হ'য়েছিল। সুমিতা আপত্তি করলেও টেকেনি। তাকে পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হ'তে হ'য়েছে। সত্যি বিশ্রী লেগেছিল! অপমানিত বোধ করেছে যখন তাকে দেখে পাত্র-পক্ষ পছন্দ করেনি।

তারপর অনেকদিন আর কেউ তাকে দেখতে আসেনি, বধূবরণের জন্যে কারো মাথা ব্যথা করেনি, কথাটা যেন কেমন করে' একেবারে চাপা পড়ে গেছে!

অনেকদিন পরে সুমিতার মনে পড়ল। তার বিয়ের কথা সে যেমন ভুলেছে, তার মা'ও কি তেমনি ভুলে গেছেন? না কি আজকাল দেখে-শুনে কথা বলে পছন্দ ক'রে কোন মেয়ের বিয়ে হয় না? কে জানে?

এর চেয়ে বাবা যদি তার বিয়ে দিয়ে যেতেন তা হ'লে বোধহয় ভাল হতো। এই চাকরির চেয়ে বিয়েই ভাল ছিল। আশ্চর্য, মা আর একবারও বিয়ের নাম উচ্চারণ করেন না। কেন তিনি কি তিনুমাসিমাকে কন্যাদায়ের কথা বলতে পারতেন না? চাকরির কথাই বা বললেন কেন?

কিন্তু এমন দিনও ছিল যখন মা মেয়েদের চাকরির নামে জ্বলে উঠতেন : আর কি, এবার যাচ্ছেতাই কাণ্ড করবে! চাকরি করে' বাপমার মাথা কিনবে!

কে জানে মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে চাকরির কথাটা সবার আগেই আজকাল মনে হয়। তখন মনে হ'তো, ভাল বরের কথা, এখন মনে হয় চাকরির কথা—বাপ-মার আশ্রয়ের কথা!

বাবা অবশ্য কোনদিন কিছু বলেননি। সুমিতা একমাত্র সন্তান বলে' ছেলেমেয়ের সব ভাবনাটাই তার মধ্যে আরোপ করেছিলেন। খুব ইচ্ছে ছিল মেয়ে তাঁর লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'য়ে উঠুক!

মানুষ? বড় যেন অদ্ভুত কথাটা। মানুষ আবার মানুষ হ'য়ে উঠবে কি ক'রে? লেখাপড়া শিখলে কি চাকরি-বাকরি করলেই কি মানুষ হয়? কে জানে।

তাহ'লে এই ডেপুটি সাহেব কি মানুষ? আর বড় সাহেব? কিংবা তিনুমাসি? কি, সতীনাথবাবু?

তিনুমাসিমার সঙ্গে সতীনাথবাবুর খুব খাতির আছে। দুজনের মধ্যে—

না, অফিসের সবাই বুঝি তাই মনে করে। একটা নিঃশব্দ আলোচনা যেন দেয়ালের কান ফুঁড়ে সুমিতার কানে এসে পোঁছয়। দুজনেই প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করেছেন; সতীনাথাবু চুলে কলপ দিয়ে মাথার টাক ঢাকা দিয়ে টেরিলিন পরে নিজেকে যুবক-যুবক দেখাতে চান। আর তিনুমাসি? সে কথা না বলাই ভালো।

সুমিতা দুহাতে মুখ ঢেকে খানিক চুপ ক'রে স্বপ্নের মত আবোল-তাবোল ছবি দেখলে যেন। বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বিচ্ছিন্ন ভাবনা সব!

মুখ তুলে চোখ চাইতে কিন্তু কঠিন বাস্তব আবার ফিরে এল। সেই ছোটঘর, সেই পি-বি-এক্স বোর্ড! সেই তারে-তারে ছয়লাপ শব্দাধার যন্ত্রটা।

"শরীর খারাপ হ'য়েছে নাকি মিস্ বোস?" সোনা-বাঁধান দাঁতটা বার করে সতীনাথবাবু হাসতে লাগলেন।

অপ্রস্তুতের মত সুমিতা বললে, "না!"

সতীনাথবাবু বললেন, "ঘরটা বড্ড ছোট, বড় সাহেবকে বলেছি বোর্ডটা এখান থেকে রিমুভ করতে! বুঝতে পারি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে!"

তেমনি অপ্রস্তুতের মত মাথা নেড়ে সুমিতা বললে, "না।"

সতীনাথবাবু চোখ-মুখ অদ্ভুত করে হাসতে লাগলেন। সুমিতা বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

হঠাৎ সুমিতার যেন খেয়াল হ'লো সতীনাথবাবুর উদ্দেশ্য ভাল নয়। সিট ছেড়ে উঠে পড়ে ব্যস্ত ভাবে বললে, "আপনি বসুন, আমি একটু আসছি।"

পিছন থেকে সতীনাথবাবু বললেন, "সেকি? সেকি! আমি যে বোর্ডের কিছু জানি না! কোন চাবিতে কি খোলা যায়? "

ছুটতে ছুটতে সুমিতা এসে তিনুমাসিমার টেবিলের সামনে দাঁড়াল। এইটুকু আসতে হাঁপ ধরে গেছে যেন।

তিনুমাসিমা মুখ তুলে বললেন, "কিরে?"

সুমিতা আরো যেন হাঁফাতে লাগল।

তিনুমাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, "বোর্ডে কাকে বসিয়ে রেখে এলি? কে দেখছে।"

ক্লান্ত, রুষ্ট এবং বিরক্তিভরা কণ্ঠে সুমিতা বললে, "সতীনাথবাবু আছেন!"

তিনুমাসিমা কি ভাবলেন কে জানে, আর কোন কথা বললেন না—মাথা নিচু করে' কাজ করতে লাগলেন। সুমিতা বসে বসে অস্বস্তি বোধ করে' উঠে গেল।

দূর থেকে খুব চেনা হ'লেও কাছে আসতে সুমিতার খুব ভয় করতে লাগল। পুকুরের পাড়ে দুটো কৃষ্ণচূড়ার গাছ যেন যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের তলায় ঘাসগুলো যেন পা টেনে টেনে ধরছে। আবছা-আবছা অন্ধকার যেন পুকুরের জলে ভেসে আছে। বাতাস একেবারেই নেই।

সুমিতা ঘাসের মধ্যে পা ঘষে ঘষে চলতে চলতে বার বার ত্রস্ত-চকিত হ'য়ে উঠতে লাগল। কিন্তু একবারও ভাবলে কারো জন্যে কেউ যদি অপেক্ষা করে' থাকেও সে সুমিতা নয়। এ আবার কি খেয়াল হ'লো সুমিতার আজ?

...শরীর খারাপ হয়েছে নাকি মিস...

ওদিকে গঙ্গার পারে সূর্য পাটে বসলেও এ ধারে মাঠের কুঞ্জে বেশ আলো ছিল। সুমিতার চোখের ভুল হয়, মনেরও বি-ভুল ভাব নয়। মাঠের দিকে সামনে চোখ পেতে সতীনাথবাবু অপেক্ষা করছেন—না না, অপেক্ষা নয় গুহাশ্রয়ী শ্বাপদ যেন ওৎ পেতে আছে শিকারের আশায়।

মুখোমুখি সুমিতা বুঝি মুহূর্তের জন্যে পাথর হয়ে গেল। তারপর পিছন ফিরে ছুটতে লাগল। সতীনাথবাবু খ্যাক্ খ্যাক্ করে' বললেন, "ভয় কি, এস এস!" না, সামনে যেখানে সে যাবে বলে মনে মনে ঠিক করে মাঝপথে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছে সেখানে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই। সতীনাথের সোনা-বাঁধান দাঁতটা সুমিতার চোখের ওপর তখনো জ্বলছে যেন।

বাড়ি ফিরে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সুমিতা দুজনের গলা পেলে। মা আর তিনুমাসিমা আলাপ করছেন। খুব জরুরী যেন।

তিনুমাসিমা বললেন, "...সতীনাথই তো সব। ওর সঙ্গে একটু ইয়ে ক'রে না চললে কখনো হয়! ও'র কথায় বড়সাহেব, মেজসাহেব সবাই ওঠ-বস করে। তা ছাড়া, উনি যখন চাকরিটা ক'রে দিয়েছেন—তখন একটু আধটু যদি, মানে বুঝতেই পারছেন তো!"

উত্তরে মা কি বললেন সুমিতা শুনতে পেলে না। হঠাৎ সুমিতা খুব জোরে চিৎকার করে' উঠতে চাইলে। পারলে না, মূর্ছিত হ'য়ে সশব্দে দোরগোড়ায় পড়ে গেল।

শব্দ পেয়ে মা-মাসী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না। হৈ-চৈ করতে লাগলেন দিশাহারা হ'য়ে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

পাঠকের বৈঠক

বীর-বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র

২৩শে জানুয়ারী একটি পুণ্যাহ—

এই দিনে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষ প্রতিদিন হাজারে হাজারে জন্মায়, হাজারে হাজারে প্রতিদিন যমরাজের সদনে চলে যায়, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মত মানুষ প্রত্যহ জন্মগ্রহণ করেন না। আদর্শ বিপ্লবী, আদর্শনিষ্ঠ, অকুতোভয়, আপোষ-বিরোধী এমন মানুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে। যে রাজনীতির বুনিয়াদ হল আপোষ, সেই রাজনীতি সুভাষচন্দ্র করেছেন আপোষহীন নিজস্ব ধারায়, সুতরাং তাঁকে সংজ্ঞানুসারে কি রাজনীতিবিদ কূটকুশলী বলা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'আইসোলেশন' বা একঘরে হয়ে থাকাটাও কোনো রাজনৈতিক নেতার কাম্য নয়, কিন্তু সুভাষচন্দ্র 'একলা চলো রে—' নীতির পূজারী। তিনি বলেছিলেন—'যদি তুমি সঙ্গে থাকো তোমাকে নিয়ে, নইলে তোমাকে বাদ দিয়েই হবে পথচলা—' তিনি তাই করেছেন।

গান্ধিজীর প্রিয় গান ছিল 'জীবন যখন শুখায়ে যায়', নেতাজীর প্রিয় গান ছিল 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে—'। আমাদের সাহিত্যিক-বন্ধু সরোজকুমার রায়চৌধুরী যে সময় প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন সেই সময় তাঁর পাশের কামরায় সুভাষচন্দ্র থাকতেন, সরোজকুমার বলেন যে, গভীর রাত্রে সুভাষচন্দ্র 'একলা চলো রে' গানখানি গুণ-গুণ করে গেয়ে সেই স্বল্পপরিসর কামরায় অস্বস্তিভরে পদচারণা করতেন।

সুভাষচন্দ্র পারতেন, তিনি একলা চলার শক্তি আহরণ করেছিলেন, কংগ্রেসের দু-দুবার সভাপতি হয়েও তাঁকে কংগ্রেস থেকে অপসারিত করা হয়, জানতেন তিনি তার প্রতিক্রিয়া তথাপি সুগভীর আত্মবিশ্বাস, ও কঠিন সংকল্প তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। সুভাষচন্দ্র তাই জাতির চিত্তে নিত্য স্মরণীয়।

সুভাষচন্দ্রের ছিল দুর্দমনীয় সাহস, সেই প্রচণ্ড সাহসই তাঁকে চালিত করেছে, তাঁর জীবনের আদর্শ পরিপূরণে সহায়তা করেছে. মানুষের ভ্রূকুটি, প্রলোভন, গুলিগোলা, উৎকোচ কিছুই তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ তাই সুভাষ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

'সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে।...

আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত—তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই। মধ্যদিনের তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ।'

সুভাষচন্দ্র আজো তাই জীবিত, তিনি শারীরিক দিক থেকে সত্যই আজো হিমালয়ের-গহনে, কি সাইবেরিয়ার কারাগারে, বা শৌলমারীর আশ্রমে তা আমাদের জানা নেই, তবে তিনি জীবিত আছেন সহস্রজনের মনের মন্দিরে। তাঁর দুর্জয় সাহস, তেজস্বিতা এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগ তাঁকে এই অমরত্ব দান করেছে। দেশে ও বিদেশে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণার আর অন্ত নেই। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নিন্দা করতে গিয়েও ব্রিটিশ গোয়েন্দা হিউ টয় তাঁর 'দি স্প্রিংইং টাইগার' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের একটা বাস্তব মূর্তি এঁকেছেন। আর এই সেদিন মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর 'দি লাস্ট ইয়ার্স অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ভারতবর্ষের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নেতা হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ এবং বাস্তবানুগ। তিনি তাই বলতে পেরেছেন—

> **"India owes more to NETAJI BOSE than to any other man—even though he seemed to be a failure."**

ব্রিটিশের বেতনভুকের দল নেতাজীকে ফ্যাসিস্ত বলেছে, কিন্তু নেতাজী অক্ষশক্তির চেয়ে রাশিয়াকেই মনে-প্রাণে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাচক্র তাঁকে অন্যপথে যেতে বাধ্য করেছে। নেতাজীর আই-এন-এ বাহিনীর অবদানের সামরিক মূল্যায়ন যখন হবে তখন দেখা যাবে বৃটিশ রাজত্বের প্রকৃত অবসানের জন্যে কার সংগ্রাম সার্থক হয়েছে।

নেতাজীর অনেক জীবনী রচিত হয়েছে, বাংলা ভাষাতেই আছে অজস্র গ্রন্থ, সম্প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন 'উদ্যত খড়্গ', নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী লিখেছেন 'নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ'। সেই গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হয়েছে বাংলা জীবনীসাহিত্যে গ্রন্থ দুটি মূল্যবান। সম্প্রতি নেতাজীর পবিত্র জীবনকথা মহাকাব্যের আকারে রচনা করেছেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে 'জালালাবাদের যুদ্ধ' ও 'গান্ধীজীবনী' মহাকাব্যাকারে রচনা করেছেন, 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' তাঁর তৃতীয় অবদান। এই ত্রয়ী মহাকাব্য ভারতের মহাজাগরণের সামগ্রিক ইতিহাস।

'আজাদ হিন্দ নেতাজী'—মহাকাব্যের আঙ্গিকে রচিত প্রায় ৭৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থ। বিরাট মানুষের বিচিত্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাহিনী নাটকীয় ভঙ্গীতে অতি দ্রুততালে ঘটে গেছে, সমকালীন ইতিহাসের এই এক অবিস্মরণীয় পর্যায় কালীপদ ভট্টাচার্য আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন এই সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থে সুললিত ভঙ্গীতে। এই মহাকাব্যের ভাষার সজীবত্ব, ছন্দের মাধুর্য ও উপমা-বৈচিত্র্য বিশেষভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রচনা করার পর অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি বাঙালী কবি ও নাট্যকারদের মনে এক প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি কবিবৃন্দ আমাদের স্মরণীয়।

কালীপদ ভট্টাচার্য সেই মহাজন পথ অনুসরণ করে একালের এক সর্বজনবরেণ্য নেতাকে পুরাকালের মহান নেতাদের মতই আকৃতি দান করে 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে নেতাজীর জীবনের অনেক অপরিচিত অধ্যায়, অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী ও রাজনৈতিক জীবনের নেপথ্য ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ অবদান। আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাহিনীর মধ্যে আছে বীরত্বের ইতিহাস। প্রবীণ কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রন্থটি সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন—

'আজাদ হিন্দু নেতাজী' মহাকাব্য বঙ্গ-সাহিত্যের কাব্যলোকে কোহিনূর রূপে সমুদ্ভাসিত। বঙ্গ সাহিত্যে 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' জাতীয় মহাকাব্যরূপে এক কথায় অনন্যসাধারণ সৃষ্টি।'

এই মহাকাব্যের মধ্যে—পূর্বসূরীদের অনুসৃত ভাব ও আদর্শ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত। কালীপদ ভট্টাচার্য মহাশয় জালালাবাদের যুদ্ধ নামক গ্রন্থে চট্টগ্রাম

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইতিহাস মহাকাব্যের আঙ্গিকে বিধৃত করেছেন, এরপর তিনি লিখেছেন গান্ধিজীর অমর জীবনী আর সম্প্রতি প্রকাশিত এই 'আজাদ হিন্দ নেতাজী' এই ত্রয়ী কাব্যগ্রন্থকে নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' ও 'রৈবতকের' সমধর্মী বলা যায়। 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' ও রৈবতকে'র মধ্যে বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রথম যুগের একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। কালীপদ ভট্টাচার্যে'র এই মহাকাব্যগুলির মধ্যে একালের কথা সেকালের ভঙ্গীতে বলা হয়েছে। একালের কাব্যদর্শ অনারূপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানকালে এই জাতীয় কষ্টসাধ্য ছন্দ প্রকরণের নিগড়ে কাব্যলক্ষ্মীকে শৃঙ্খলিত করার পক্ষপাতি এই যুগের কবিরা নন, এখন গতির যুগে তাই জড়যুগের উপযোগী কবিতায় সূক্ষ্ম কারুকার্য অনেক বেশী, আভরণ কম। কালীপদ ভট্টাচার্য কিন্তু তাঁর আঙ্গিকের মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত করেননি, তিনি যে পুরাতন রীতিকে গ্রহণ করেছেন তা সর্বতোভাবে অক্ষুন্ন রাখার জনাই চেষ্টা করেছেন এবং সেইক্ষেত্রে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী এই কাব্যে স্থানলাভ করেছে. দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতভেদ, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা. যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে নেতাজীর কারাবরণ, স্বাস্থ্য অবনতির অজুহাতে জেল থেকে মুক্তি, নাটকীয় অন্তর্ধান, অক্ষ-শক্তির সঙ্গে মৈত্রী, ইতালী থেকে জাপানে সাবমেরিণযোগে দুঃসাহসিক অভিযান, আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা ও তার সর্বাধিনায়কের পদগ্রহণ এবং তাঁর সেই বাহিনীকে ভারতবর্ষের পূর্বদুয়ার মণিপুর, ইম্ফল, কোহিমা পর্যন্ত নিয়ে আসার নাটকীয় ঘটনাবলী সবই পদাছন্দে 'আজাদ হিন্দ নেতাজী'র মধ্যে বিধৃত।

বিদেশীর বন্ধনের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্রের যে প্রচেষ্টা তার একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি 'আজাদ হিন্দ নেতাজী'র মধ্যে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষ ১৯৪৭-এ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, যেভাবে ইংরাজ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে গেছে তার পিছনে নেতাজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কাছে অনস্বীকার্য। শ্রীযুক্ত হরিবিষ্ণু কমাথ বলেছেন—

'প্রকৃতপক্ষে লোকমান্য তিলককে যদি ভারতীয় জাগরণের এবং মহাত্মা গান্ধীকে ভারতীয় আন্দোলনের জনক বলা যায়, তবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় বিপ্লবের জনক।'

এই মহাবিপ্লবীর জীবনেতিহাস কালীপদ লিখেছেন আশ্চর্য অধ্যবসায় ও শ্রম সহকারে। তাই হোকুর বিমান দুর্ঘটনার পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তিনি নীরব, সুভাষপ্রেমী মানুষ হিসাবে তিনি উপযুক্ত কাজই করেছেন। আজো যে তথ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২৯শে জুন ১৯৪০-এ একটি ইস্তাহারে বলেছিলেন—

'ভাগ্যলিপি জাতির ললাট-ফলকে খোদিত হতে চলেছে। আমাদের চোখের সামনে রচিত হয়ে চলেছে নবতম ইতিহাস। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের সমগ্র ধ্যান ও ধারণা জুড়ে থাকে একটি মাত্র কথা—ভারতবর্ষ। কোনো দল নয়, ব্যক্তি নয়, সম্প্রদায় নয়। ভারতবর্ষের মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও দল বা ব্যক্তির ত্যাগ ও দুঃখবরণই যথেষ্ট নয়, এই কথাটা আমরা যেন সর্বক্ষণ জপ করতে পারি।'

নেতাজীর ছিল এই চিন্তা, দল নয়, ব্যক্তি নয়, সম্প্রদায় নয়, দেশ সবার ওপরে। তাই তিনি নেতাজী, তাই অবিস্মরণীয়, তাই তিনি অমর।

কালীপদ ভট্টাচার্য 'আজাদ হিন্দ নেতাজী'র মাধ্যমে সেই অমৃতময় মহাপুরুষের মহাজীবনের কথা মহাকাব্যের আঙ্গিকে রচনা করে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

—অভয়ংকর

আজাদ হিন্দ নেতাজী (মহাকাব্য)—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট প্রেস (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা—১৭, দাম কুড়ি টাকা মাত্র।

কলকাতায় দুজন বিদেশী সাহিত্যিক

রাইটার্স গিল্ডের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র ভারতী হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গত ১০ই জানুয়ারী দুজন বিদেশী সাহিত্যসেবীকে সম্বর্ধিত করা হয়। এঁরা হলেন মঙ্গোলিয়ার লেখক শ্রীএস এরডেন ও যুগোস্লাভিয়ার লেখিকা শ্রীমতী গ্রোজদানা।

সভাপতির ভাষণে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারতীয় সাহিত্যিকরা পৃথিবীকে বহুকাল ধরে শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী শুনিয়ে আসছেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র কপিরাইট ও আয়করের নাগপাশ এবং কিছুসংখ্যক অসৎ ব্যবসায়ীর কবল থেকে সাহিত্যিকবৃন্দকে রক্ষা করতে রাইটার্স গিল্ড-এর যে কোন প্রচেষ্টায় প্রবীণ সাহিত্যসেবীদের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। গিল্ডের পক্ষে শ্রীরমেন্দ্র মল্লিক ও শ্রীশেখর সেন ভাষণ দেন। স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

লেখক দুজনের উদ্দেশ্য ভারত সফর ও ভারতীয় শিল্প সাহিত্য বিষয়ে সম্যক সংবাদ সংগ্রহ। ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে বাংলা-সাহিত্যের প্রতি উভয়েরই আগ্রহ খুব

রবীন্দ্র ভারতী ভবনে রাইটার্স গিল্ডের তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলনে যুগোস্লাভিয়ার লেখিকা শ্রীমতী গ্রোজদানাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে রয়েছেন মঙ্গোলিয়ার লেখক শ্রী এস এরডেনে।

বেশী। বাংলাদেশের তরুণ এবং তরুণতর কবিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্য এবং তাঁদের কবিতার সংগ্রহের জন্য ওলুজিক এবং এরডেনে' বিশেষ উৎসাহী। গ্রোজদানা ওলুজিক বলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'গীতাঞ্জলি', পড়েছেন ছাত্রবয়সেই। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'মহানগর' 'সাগরসঙ্গম' ইত্যাদির রাশিয়ান অনুবাদের কথাও তিনি বলেন। কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, যথেষ্ট পরিমাণ বাংলা সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ হয় না বলেই সেগুলি তাঁদের হাতে পৌঁছুতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মঙ্গোলিয়ান লেখক এরডেনে' বলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'মেঘদূতের' কালিদাসের নাম শুনেছেন। কিন্তু ইংরাজী ভাষা জানেন না বলে সেসব গ্রন্থ পড়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

গ্রোজদানা ওলুজিক যুগোশ্লাভিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় মহিলা ঔপন্যাসিক। এঁর উপন্যাসগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠকদের কিছু কিছু পরিচয় আছে। ১৯৩৪ সালে তাঁর জন্ম। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। স্কুল-জীবনেই সাহিত্যচর্চা শুরু। মাত্র উনিশ বছর বয়সে যুগোশ্লাভিয়ার প্রখ্যাত দৈনিক 'বার্বা' আয়োজিত ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ২000 প্রতিযোগীর মধ্যে তাঁর 'মাইনিউটস্' গল্পটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'অ্যান্ এক্সকারশন্ টু দি স্কাই' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। সেটি সে বছরের 'অ্যানুয়াল প্রাইজ' প্রাপ্ত এবং বেস্ট সেলারেরও মর্যাদা পেয়েছিল। বইটি বহু ভাষায় অনূদিত, চলচ্চিত্রায়িত। এছাড়া প্রবন্ধগ্রন্থ 'দি রাইটার্স অ্যাবাউট দেমসেলভস্' (১৯৫৯), উপন্যাস 'আই ভোট্ ফর লভ্' (১৯৬৩); 'লেট্ শ্লিপিং ডগস্ লাই' (১৯৬৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ওয়াইল্ড সীড্' নামে তাঁর আরেকটি উপন্যাস ১৯৬৭তে যুগোশ্লাভিয়া, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি শহরে একসঙ্গে প্রকাশিত হবে। ওলুজিক আন্তর্জাতিক "PEN" সংস্থার একজন সদস্য এবং যুগোশ্লাভ রাইটার্স এসোসিয়েশন-এর পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম। থাকেন বেলগ্রেডে—ফ্রিলান্স লেখিকা।

মিঃ রবার্ট ম্যাক্সওয়েল

এস্ এরডেনে মঙ্গোলিয়ার দিকপাল সাহিত্যরথীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। জন্ম ১৯২৯ সাল। তাঁর বাল্য এবং কৈশোর অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। পেশাতে ইনি ডাক্তার। প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক এবং গল্পের যাদুকর বলেই তিনি খ্যাত। ১৯৫৯ সালে সর্বপ্রথম তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ১৯৬৫ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ও ছোটগল্পের জন্য মঙ্গোলিয়ার 'জাতীয় পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি 'মঙ্গোলিয়ান রাইটার্স ইউনিয়ান কমিটি'র সেক্রেটারী। এবং এই সংস্থা প্রকাশিত সংবাদপত্র 'লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট'-এর সম্পাদক।

ভারত ভ্রমণে বিদেশী প্রকাশক

সত্যি কথা বলতে মিঃ রবার্ট ম্যাক্সওয়েলের নাম আমাদের অনেকের কাছেই তেমন পরিচিত নয়। অথচ বর্তমানে ইনি যে কাজটিকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে ব্যস্ত সেটি যেমন মহৎ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বটে। মাত্র সপ্তাহখানেক আগেই তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। তার আগে তিনি হাজির হন দিল্লীতে। বহুমূল্যবান গ্রন্থ 'চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়া'র নতুন সংস্করণের সূচনার উদ্দেশ্যে যে বিশ্বসফর সূচী তিনি নিয়েছেন, তারই একেবারে প্রথম দফায় ছিল ভারতভ্রমণ। আর সেজন্যই ঘটেছিল তাঁর এই আগমন। দিল্লীতে তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, উপহার দেন এনসাইক্লোপিডিয়ার নতুন সংস্করণের একটি গোটা সেট। অন্যান্য যেসব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে তাঁদের মধ্যে শ্রীচাগলা ও শ্রীফকরুদ্দীন আলি আমেদ অন্যতম। কলকাতায় অবস্থানকালে মিঃ ম্যাক্সওয়েল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর এক সভায় ভাষণ দেন।

বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে সকল সংস্থার আজ বেশ নাম-ডাক রয়েছে তার মধ্যে পারগামন প্রেস বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। বর্তমান ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য রবার্ট ম্যাক্সওয়েল হলেন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে। তখন তিনি ছিলেন যুবক। ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রু-নিধনে। বিখ্যাত ডেজার্ট র‍্যাটস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য লাভ করলেন মিলিটারী ক্রশ। বীরত্বের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে একদিন রক্তক্ষয়ী সর্বনাশা যুদ্ধের শেষ হল। শুভ বুদ্ধির উদয় হল। ম্যাক্সওয়েল ভুলতে

চাইলেন বিভীষিকাময় সংঘর্ষের স্মৃতি। সেনাবাহিনীর কাজে ইস্তফা দিলেন। যোগ দিলেন প্রকাশনার কাজে। ঢুকলেন একেবারে নতুন জগতে। আর একেবারে নিজের দক্ষতায় পারগামান প্রেসকে তুলে ধরলেন গোটা পৃথিবীর সামনে। প্রথম দিককার সারিতে নিজের জায়গা করে নিল পারগামান প্রেস। পৃথিবীর অন্যতম ও অগ্রণী বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিষয়ক প্রকাশনা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললেন প্রেসটিকে। বর্তমানে এই সংস্থা থেকে ফি-বছর দু'শো বই ও একশো কুড়িটি জার্ণাল বেরোয়। কর্মীর সংখ্যাও এখানে নেহাৎ কম নয়। কাজ করেন প্রায় আড়াই হাজার লোক। উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ১২৩টি দেশে রপ্তানী করা হয়।

একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন যে পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ৫৪ জনের কাছেই ইংরেজী ভাষা হয় জাতীয় ভাষা, নইলে সর্বপ্রধান বিদেশী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আর এটাও সত্যি যে, একালে দেশ ভ্রমণ ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারেই শুধু নয়, ভাব লেনদেনের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের বই, ম্যাগাজিন, সিনেমা ও টেলিভিশন বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এবং তার আবার বেশির ভাগ জিনিসই হয়ে থাকে রাজভাষা ইংরেজীর মাধ্যমে।

এনসাইক্লোপিডিয়া জিনিসটি হল আসলে একটা ছোটখাটো বিশ্ব-লাইব্রেরী। হাতের কাছে যদি এরকম ধরনের একটা বই থাকে, তবে যে কোন সমস্যারই মুখোমুখি হওয়া যায় সহজে। আর তার থেকে উৎরে যেতেও খুব দেরী লাগে না। সত্যিকথাই, এনসাইক্লোপিডিয়া হল একদিকে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; অন্যদিকে সিনেমা হল আর আড্ডাখানাও বটে। এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করা তাই চারটিখানি কথা নয়। এর জন্যে যেমন মেহনতের দরকার তেমনি প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ জ্ঞান আর অর্থের। বলা বাহুল্য সেই মহৎ ও দুরূহতর কাজটিই সম্পূর্ণ করেছেন মিঃ ম্যাক্সওয়েল।

পারগামন প্রেস প্রকাশিত এই পনেরোটি খণ্ডের বিশ্বকোষ বের করতে খরচ হয়েছে দশ লাখ পাউন্ড, আর সময় লেগেছে কম করে হলেও পুরো পাঁচটি বছর।

পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে ৩০০০০ এরও বেশী প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এই সর্বাধুনিক তথ্যগ্রন্থ রচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই বইটি হল এখন ব্রিটেনের একমাত্র মুখ্য বিশ্বকোষ। ১৪,৫০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে জ্ঞাতব্য প্রতিটি বিষয়ের প্রচুর তথ্য জোগাড় করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে শুরু ক'রে গত বছর চাঁদে অবতরণের বিষয়টিও এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে। ৪০০০ রঙীন ও সাদা-কালো ছবি, শ'য়ে শ'য়ে মানচিত্র, রেখাচিত্র এবং তথ্যপঞ্জী বইটিতে রয়েছে। ৪১১ পৃষ্ঠা জুড়ে ২,২৫,০০০ তথ্যের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচীও এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। মিঃ ম্যাক্সওয়েল কলকাতা ছেড়ে এখন থাইল্যাণ্ড গিয়েছেন। পরে তিনি একে একে জাপান, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকো, ইউ-এস-এ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও কানাডা সফর করবেন।

—কল্যাণ রায়

ভারতীয় সাহিত্য

পঞ্চাশের হিন্দী সাহিত্য প্রসংগে ॥

আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চাশের দশকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দশকেই লক্ষ্য করা যায় যে, হিন্দী সাহিত্য প্রাঙ্গণ বিভিন্ন বোধ এবং আদর্শের সংঘাতে কলবর মুখর। গল্পে, কবিতায়, নাটকে এবং সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখা-প্রশাখাতেই আধুনিকতার একটা সুস্পষ্ট অগ্রগতির চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্যের এই দশকের উপর বেশ কটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত তিনটি গ্রন্থ খুবই উল্লেখ্য। এই গ্রন্থ তিনটি হচ্ছে—'নই কবিতা : সীমাঁ আউর সম্ভাবনা,' 'নই কহানী কি ভূমিকা' এবং 'অধুরে সাক্ষাৎকার।'

প্রথম গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীগিরিজাকুমার মাথুর। পঞ্চাশের হিন্দী কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে—'তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক কবিতার আঙ্গিক এবং বোধের পরিবর্তনের প্রতি সচেতন। আলোচ্য গ্রন্থটিতেও তিনি কবিতার এই বিবর্তনের কথাই পরিবেশন করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন একজন তরুণ গল্পকার। নাম শ্রীকমলেশ্বর। পঞ্চাশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর আবির্ভাব এবং নতুন রীতির গল্পকারদের মধ্যে তিনি অন্যতম। হিন্দী 'নই কহানী' গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল কিন্তু পূর্বসূরীদের রচনা রীতি অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে। পঞ্চাশের দশকটিকে এই গোষ্ঠীর সুবর্ণ যুগ বলা যায়। কেননা, ষাটের দশকের প্রারম্ভে আবার আর একদল তরুণ সাহিত্যিক এই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। কমলেশ্বর কিন্তু এই উভয় আক্রমণের বিরুদ্ধেই নিজ সাহিত্য গোষ্ঠীর জন্য রচনা চালিয়ে যান। তৃতীয় গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন শ্রীনবীনচন্দ্র জৈন। তিনিও একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে হিন্দী কথা-সাহিত্যের সাফল্য এবং অসাফল্যের নিরপেক্ষ বক্তব্যই তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে পেশ করেছেন। তাঁর মতে, 'এই নতুন কথা-সাহিত্য জীবনের সঠিক পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন কাহিনীকার বিভিন্নভাবে জীবনের আংশিক সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য শিল্পগত উৎকর্ষ যে খুবই উল্লেখ্য এমন কথা বলা যায় না। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে যত চাঞ্চল্যই আসুক, এই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করতে না পারলে তার মুক্তি অসম্ভব।"

অসমীয়া সাহিত্যিক লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার স্মৃতি শতবর্ষ ॥

অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার স্থান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর মৃত্যু শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষে এক সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তাছাড়া একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেজবড়ুয়ার পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার জন্য এক হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া পাঁচশো টাকা মূল্যের আরও দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে শিশু উপযোগী জীবনী রচনা এবং তাঁর জীবনী-নাট্য রচনার জন্যে।

আধুনিক আসামী সাহিত্যের আবির্ভাবের সময় ধরা হয়ে থাকে ১৮৮৯ সাল। প্রকৃতপক্ষে জোনাকি নামক পত্রিকাটির প্রকাশনা কাল থেকেই এর আরম্ভ। আসামের সাহিত্যে এই পত্রিকাটির প্রভাব অপরিসীম। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক রিভাইভ্যাল আন্দোলন তখন বাংলার সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছে। কলকাতায় যে সব আসামী ছাত্র পড়তে আসতেন, তাঁরাও এই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এই প্রভাবিত তরুণরাই 'জোনাকি পত্রিকাটি প্রকাশ করেন এবং আসামী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য একটি পরিষদ গঠন করেন। 'জোনাকি' পত্রিকার সঙ্গে তিনটি নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এঁরা হলেন—লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়াল ও হেমচন্দ্র গোস্বামী। এঁদের মধ্যমণি ছিলেন আবার লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া।

সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তাঁর অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্য

লন্ডন ম্যাগাজিনের কবিতা সংকলন ॥

সম্প্রতি লন্ডন ম্যাগাজিন তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত গত পাঁচ বছরের কবিতাবলীর একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম "লন্ডন ম্যাগাজিন পোয়েমস্ ১৯৬১-৬৬"। প্রায় ৭০ জন কবির কবিতা এই সংকলনে স্থান লাভ করেছে। অধিকাংশ কবিই বয়সে তরুণ এবং তরুণতর। দুই-একজন স্বল্পখ্যাত কিন্তু প্রতিভাবান কবির কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে ব্রেন জোনস্ ও মার্গারেট স্যান্ডস্ বয়সে এবং কবি-খ্যাতিতে সবার ছোট। সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন হুগো উইলিয়াম রস্।

লেমন্ট পোয়েট্রি সিলেকশন ॥

আমেরিকার তরুণ কবি হিসেবে কেনেথ ও হ্যানসন মোটামুটি সকলেরই পরিচিত। পোর্টল্যান্ডের রিড কলেজ-এর ইংরেজী বিভাগের সদস্য হিসাবেও তিনি বেশ খ্যাতির অধিকারী। তাঁর কাব্যগ্রন্থ "দি ডিসটান্স্ এনিহোয়্যার" বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে গত বছর। আমেরিকার বিভিন্ন পোয়েটিক্ সোসাইটি থেকে এ বইটিকে বিশেষ সম্মানে অভিনন্দিত করার প্রশ্ন উঠেছিল—প্রস্তাব এসেছিল পুরস্কারের। ১৯৬৬ সালের লেমন্ট পোয়েট্রি সিলেকসন-'এর পুরস্কার তাই সারাবছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে কবি হ্যানসনকেই দেওয়া হয়েছে। হ্যানসনের কবিতাগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়েছিলেন 'ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস'। অন্যান্য মোট ৩৫টি প্রকাশক সংস্থার পাঠানো পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাঁরটিই নির্বাচিত হয় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায়। এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ভাগ্য-নিয়ন্তা হচ্ছেন 'অ্যাকাডেমি অব আমেরিকান পোয়েটস'। মিসেস্ টমাস্ ডবল্যু লেমন্ট-এর উইল অনুসারে এই অ্যাকাডেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থের ১,০০০ কপি কেনেন এবং সদস্যদের মধ্যে তা বিলি করেন।

রাশিয়ান ডাইজেস্ট ॥

রুশ সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে কোন ডাইজেস্ট পত্রিকা এপর্যন্ত বেরিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বর্তমান বছরের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৬৭-র জানুয়ারীতে মস্কো থেকে একটি পকেট-মাপের ডাইজেস্ট পত্রিকা বেরিয়েছে। পত্রিকাটি মাসিক। আরো আনন্দের খবর যে এটি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত। এতে কেবলমাত্র রুশদেশের শিল্প সাহিত্য বিষয়েই রচনা থাকবে। গল্প, উপন্যাস, রম্য-রচনা, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, চিকিৎসা-বিজ্ঞান সবই এর অন্তর্গত থাকবে। সম্পাদক জানাচ্ছেন এ উদ্যোগ পৃথিবীতে এই প্রথম। পত্রিকাটির নাম 'রাশিয়ান ডাইজেস্ট'।

নতুন বই

গ্রাম-নগর-মানুষ

নতুন উপন্যাস এবং আকারে বৃহৎ 'বিপ্রলব্ধ'। লেখকের নাম বিনয় চৌধুরী। উপন্যাসটি নতুন রীতির, নতুন তার বক্তব্য, নতুন তার পরিবেশনভঙ্গী। গতানুগতিক সেই চিরন্তন ত্রিভুজের কাহিনী নয়, সেই চটুল যৌন-বিকারের ইতিহাস নয়, অথচ এ কাহিনী এ কালের, এই কাহিনীর নর-নারী আমাদের সকলের পরিচিত এবং আপন-জন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতা নগরী, এই উপন্যাসের নায়ক পুষ্কর চক্রবর্তী, ব্যাঙ্কের কেরানী, গল্প লেখে—স্বপ্ন দেখে। আর পাঁচটি নিম্নমধ্যবিত্ত সুশিক্ষিত বাঙালী সন্তানের মত তার অন্তরে আছে বৈদগ্ধ্যের একটা সূক্ষ্ম ছাপ। লেখকমন্য তরুণ পুষ্কর—বহু তথাকথিত বিদগ্ধ মানবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তারা সবাই সাহিত্য ভালবাসে, সাহিত্যপ্রীতিই এই যোগাযোগের সূত্র, তবে তারা আবার কল্পনাবিলাসী রোমান্টিক উদ্ভট প্রবৃত্তির মানুষ। পুষ্করের সঙ্গে তাদের মনের মিল তাই সম্পূর্ণ নয়, পুষ্করের প্রবৃত্তি বিভিন্ন। সে শহরে বাস করেও গ্রামকে ভুলতে পারেনি, গ্রামের সঙ্গে তার সংযোগ অবিচ্ছিন্ন। গ্রামের সঙ্গী সহচরদের সঙ্গে তাই সে মেলামেশা করে, তাদের সুখ, দুঃখ, ব্যথা ও বেদনার অংশভাগী হয়, তার মনের মধ্যে উন্নাসিকতার ঔদ্ধত্য সঞ্চারিত হয়নি। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগের ফলে গ্রামের মানুষকে সে ভালবাসে। তার নাগরিক জীবনেও গ্রাম এসে ধরা দেয়। সুভদ্রা বিবাহিতা মহিলা, একদিন গ্রামে সে ছিল তার খেলার সাথী আজ সে কলকাতার গৃহবধূ। দুজনের মনের কোণে একটা স্বচ্ছ প্রেমও প্রবাহিত। অতি শৈশব থেকে পুষ্কর যে স্বপ্ন দেখে আসছে সুভদ্রার মধ্যে যেন সেই স্বপ্ন একটা আকৃতি নিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বাল্যকালে পল্লী-পরিবেশে যে স্বর্গীয় আনন্দে দুজনে দিন কাটিয়েছে আজ নাগরিক জীবনেও তা যেন উভয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একটা মোহ-অঞ্জনের মায়া-তুলিকা দুজনের চোখে। "সুভদ্রা প্রশ্ন করে, ভালোবাস বুঝি কাউকে? পুষ্কর মাথা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ। কাকে গো? পুষ্করের হাতদুটো মুঠোর মধ্যে ধরে সুভদ্রা বললে—বলবে না আমাকে কাকে ভালবাস? খামকা পুষ্করের গলা বুজে এল, তখনই পারল না, একটু পরে বলল—তোমাকে। হাতে হাত ধরে চোখাচোখি তাকিয়ে রইল সুভদ্রা একটুখানি। তারপর আস্তে আস্তে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল—জানি। যেন খুব জানা কথাটা কেবল মনে পড়ছিল না, এখন মনে পড়ে গিয়ে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠার অবস্থা হয় পুষ্করের। কি আশ্চর্য সুভদ্রা জানে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সুভদ্রার মুখের দিকে।" এই উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যে কি স্বচ্ছন্দগতিতে দুটি সরল হৃদয়ের প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিতা তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিচিত্র প্রেমেরও অবসান ঘটে। পরিশেষে একটা করুণ পরিণতি এই বিচিত্র প্রেমকাহিনীর সমাপ্তি ঘটায়। মূল কাহিনী-টুকু মাত্র বলা হল, বৃহৎ উপন্যাসের অনেক শাখা-প্রশাখা। অনেক উপকাহিনীর সমাবেশে একটা বৃহৎ উপন্যাস সম্ভব, তাই এই উপন্যাসেও আছে অজস্র মানুষ, বিচিত্র নর-নারীর ভীড়, সব কাহিনী অংশ যে ঠিক ঠিক প্রযুক্ত হয়েছে তা বলা যায় না, সামান্য কিছু অংশ এদিকওদিক বর্জন করলে উপন্যাসটি সার্থকতর হয়ে উঠত, তথাপি দেবযানী, জি দাস, কৃপাল সিং, ভবেশ গুপ্ত, সুজাতা বেশ বলিষ্ঠ তুলিতে আঁকা। এই উপন্যাসের নায়ক পুষ্কর চক্রবর্তীর মতো সুভদ্রা, ষোড়শী, অমৃত, বরদা রায়, চাটুজ্যে-মশাই প্রভৃতির জীবনসূত্র গ্রাম ও নগরে বিজড়িত। তাদের চরিত্রগুলি নিখুঁত হয়েছে, কোথাও অতিরঞ্জন নেই। যেমন সুন্দর মনে হয়েছে তেমনই বাস্তবভিত্তিক হয়েছে সুদেব মিত্রের কাগজের আড্ডা। সুমন্ত্র, শান্তনু চৌধুরী প্রভৃতির মধ্যে অনেক পরিচিত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ যুগে এই জাতীয় সম্পাদকীয় আড্ডা প্রায় বিরল হয়ে এসেছে। নগর এবং গ্রামজীবনের মধ্যে আছে সংস্কৃতি এবং সংঘাত। বিনয় চৌধুরী একজন বিদগ্ধ লেখক, তাঁর 'বেত্রবতী মরানদী' নামক উপন্যাসটিতে যে শক্তিমত্তার ছাপ ছিল 'বিপ্রলব্ধ' উপন্যাসে তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এতগুলি চরিত্রকে এইভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের আশ্চর্য লিপি-কুশলতার পরিচায়ক। বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন লেখক এই উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের পরিচয় দিয়েছেন, বর্তমান যুগে এমন সুরুচিসঙ্গত প্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়। বিনয় চৌধুরী লেখেন কম, এই উপন্যাস তাঁকে একটা মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপন্যাসটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ রমণীয়।

বিপ্রলব্ধ : (উপন্যাস)—বিনয় চৌধুরী। পরিবেশক : আনন্দ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ। কলিকাতা—৯। দাম : দশ টাকা মাত্র।

সেতুবন্ধ

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। তেইশ ।।

রিক্সা সবে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘণ্টি একটু বেজেছে কি না বেজেছে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে গেল। খুললেন তারণকৃষ্ণ, ভানুমতী নয়। ভানুমতীর নিশ্ছিদ্র নিরেট ঘুম, তারণের ঠিক বিপরীত। ঘুম দস্তুরমতো সাধ্যসাধনা করে আনতে হয়। আজ তার উপরে মনের উদ্বেগ—এত রাত্রি হয়েছে এমন দুর্যোগ, মেয়েটা এখনো বাড়ি ফেরে না কেন?

দোর খুলে তারণ দাঁড়িয়েছেন। রিক্সার পর্দাটা খুলে দিয়ে পূর্ণিমা ও শিশির নেমে পড়ল। তাড়াতাড়ি পূর্ণিমা পরিচয় দিচ্ছে : আমাদের সঙ্গে কাজ করেন বাবা—শিশিরকুমার ধর। অনেক দূরে বেলগাছিয়া থাকেন। বৃষ্টিতে ট্রাম-বাস বন্ধ, সেই জন্যে বললাম—

কথা শেষ হওয়া অবধি তারণ সবুর মানলেন না। শিশিরও পায়ের নিচে প্রণাম করছিল, কিন্তু কোথায় কি—এমনি তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন, ছিটকে হাত পাঁচ-সাত দূরে গিয়ে পড়লেন তিনি। পদধূলি নিতে শিশির হাত বাড়িয়েছিল—সে যেন হাত নয়, কেউটেসাপ। বাগে পেলে ছোবল দিত পায়ে, সরে গিয়ে বড় রক্ষে হয়েছে। ত্রিসীমানার মধ্যে নেই আর তিনি, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেছেন।

পূর্ণিমার মুখ আরক্ত হল। কিন্তু অতিথি কিছু মনে না করে — হাসির ছায়া সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর এনে সহজ কণ্ঠে বলল, বাড়িতে দুজন মাত্র আমরা—বাবা আর আমি। বাবা শয্যাশায়ী, দাঁড়াতে পারেন না—উঠে কোন রকমে দরজা খুলে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সে যাকগে, কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলুন আগে। আমি আসছি।

সাঁ করে ভিতরে চলে গেল। সামলে নিতে একটু অন্তরাল প্রয়োজন। চলে গেল উপরে—নিজের ঘরে। ক্ষণপরে পাট-ভাঙা শাড়ি আর গামছা হাতে করে ফিরল।

কলঘর দেখিয়ে দিল : ঢুকে পড়ুন। শাড়ি পরতে হবে আপনাকে। বাবার একটা লুঙি-টুঙি হলে হত—কিন্তু খুঁজে পেলাম না। তা পরলেনই বা শাড়ি—রাত্রিবেলায় কে দেখছে!

আপনারও ভিজে কাপড়চোপড়। ছেড়ে ফেলুন গে—

উপদেশ দিয়ে শিশির কলঘরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কাপড় ছাড়ার আগে জরুরী কর্ম ভানুমতীকে ডেকে তোলা। অতিশয় কঠিন কর্ম। বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে বাইরের ঘরের মেজেয়। পূর্ণিমা এলে দোর খুলে দিতে হবে, নিশ্চয় সেই কর্তব্যের তাড়নায় এ-ঘরে আস্তানা নিয়েছে। পূর্ণিমা বলেও গিয়েছিল তাই : বাবার কখন কি লাগে না লাগে—আজ তুই বাড়ি যাস নে ভানু। বাবার খাবার দিয়ে তুইও খেয়ে নিস। ফিরতে আমার রাত হবে একটু। ততক্ষণ জেগে থাকবি, দোর খুলে দিবি আমি এসে ডাকলে।

সবগুলো কথাই রেখেছে, শেষটুকু কেবল পারে নি—জেগে বসে থাকা। এ জিনিষ অসাধ্য তার পক্ষে। কমবয়সী মেয়ের ঘুমটা কিছু বেশীই হয়, কিন্তু এ বড় সর্বনেশে ঘুম। পূর্ণিমা প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে,—ঈষৎ চোখ মেলে ভানুমতী, পুনশ্চ চোখ বুঁজে যায়। ধরে বসিয়ে দিল—যতক্ষণ ধরে আছে ঠিক আছে, ছাড়লেই গড়িয়ে পড়ে।

কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে শিশির দেখছে। হেসে বলে, পারবেন না। এখনো ভিজে কাপড়ে আছেন—চলে যান আপনি।

পূর্ণিমা বলে, আমি হারিনে কখনো।

বড় শক্ত লড়াই,—আজ হারবেন।

বসিয়ে হচ্ছে না তো পূর্ণিমা খাড়া দাঁড় করিয়ে দেয়। এবারে শোওয়া নয়, বসে পড়ল ভানুমতী। চোখ ঠিক বুজে আছে। পুনশ্চ দাঁড় করাল, ছেড়ে দিতে ঝুপ করে বসে পড়ে। অনেক উন্নতি—শোওয়া অবধি আর যাচ্ছে না। বার কয়েক এমনি উঠ-বোস করানোর পর হঠাৎ ভানু চাঙ্গা হয়ে উঠল। চোখ মেলে বলে, এসে গেছ ছোড়দি?

পূর্ণিমা শিশিরের দিকে চেয়ে সগর্বে বলে, কই হারলাম?

শিশির বলে, দেখছি তাই। অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা আপনার। ঘুমে আর মরণে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। আমার তো বিশ্বাস, মরা মানুষকেও এমনি ধারা উঠ-বোস করে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন।

ভানুমতী এসব কানে নেয় না। সহজভাবে বলে, এতক্ষণে এলে ছোড়দি? দোর খুলে দিল কে?

পূর্ণিমা হাসিমুখে বলে, তুমিই তো দিলে ভানু। আবার কে?

আমি?

ঘুমের ঘোরে দিয়েছ, টের পাও নি। চট করে স্টোভটা ধরিয়ে আমাদের একটু চা করে খাওয়াও দিকি। বড্ড ভিজে গেছি। চা করে দিয়ে তারপর উপরের ঘর থেকে তোষক-বালিশ এনে তক্তাপোষের উপর ভাল করে বিছানা করে দাও। ইনি থাকবেন এখানে।

ভানুমতীর ঘুম কেটেছে। তাড়াতাড়ি স্টোভ ধরাতে গেল। পূর্ণিমা পিছনে চলেছে, বাইরে এসে নিচু গলায় বলল, আমার জন্যে যে ভাত আছে, ভদ্রলোককে দিয়ে দে। রাত্রে আমি খাব না। চায়ের সঙ্গে বরঞ্চ দুখানা বিস্কুট খেয়ে নেব।

ভানুমতী বলে, ভাত যখন দেবো সে তখনকার ভাবনা। আগে তুমি ধুয়ে-মুছে সাফ-সাফাই হয়ে এস ছোড়দি।

তারও আগে বাপের ঘরে যাবে একবার। কিছু কথাবার্তা হওয়ার দরকার। এক রিক্সা থেকে দুজনকে নামতে দেখে মুখ হাঁড়ি করে সরে গেলেন, পুরুষের গায়ে গা ঠেকে গিয়ে ঠুনকো মেটে-হাঁড়ির মতন চরিত্র আমার চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু এতই যদি ছুঁয়েছে-ছুঁয়েছে বাই, ঘর থেকে আমায় অফিস-পাড়ায় তুলে দিয়ে এসেছিলে কেন? চাকরি পেয়ে সারা রাত ধরে কত কেঁদেছিলাম, খবর রাখ পূজনীয় জনক-জননী?

এমনি কয়েকটি কথার জিজ্ঞাসা।

তারণ বিড়ি টানছেন চুপচাপ এক দিকে তাকিয়ে। আলো জ্বলছে। পূর্ণিমাকে দেখেও দেখেন না।

পূর্ণিমাই তখন ডাকল : বাবা!

তারণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন : কি—কি চাই? আবার এ ঘর অবধি জ্বালাতে এসেছ?

চমক লাগে। দেবী হওয়া সত্ত্বেও বাবার মুখে তুই-তোকারি ছিল। এখন থেকে মান্যগণ্য 'তুমি'। কলহ করতে এসে পূর্ণিমাই এবার নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে অফিসের ভদ্রলোকটি বাড়ি এলেন। চোখে দেখলে তুমি, ভালমন্দ একটি কথা বললে না—এটা কি ঠিক হল বাবা?

ক্ষিপ্ত হয়ে তারণ চেঁচামেচি করেন : ভদ্রলোক এসে কৃতার্থ করেছে—পদতলে ফুল-চন্দন দাও গিয়ে তুমি। আমার ডাকাডাকি কি জন্যে শুনি? চাকরি ঢের-ঢের মেয়ে করে, তোমার মতন কেউ নয়। চাকরি করে দিয়ে পূর্ণদা'রও পস্তানির পার ছিল না—নাক মলেছে, কান মলেছে আমার কাছে। পূর্ণদা কলকাতা ছেড়েছে, আমিও ঘরের বার হইনে, কান-চোখ বন্ধ করে কোন রকমে আছি—কুলোজ্জ্বলকারিণী হতে দেবেন তাই। বাইরের আপদ টেনে ঘর অবধি আনা হয়েছে। আবার হুকুম : আজ্ঞে হুজুর করো তার কাছে বসে-বসে। বয়ে গেছে আমার! অনেক লাঞ্ছনা হয়েছে, আর নয়।

হাত জোড় করে পূর্ণিমা বলে, এই অবধি থাক আজ বাবা। বাইরের লোক বাড়িতে। উনি চলে যান, আমার কথা তখন আমি বলব।

বলবার কী আছে! রোজগারের ক'টা টাকা দিয়ে মাথা কিনেছ নাকি? সে রোজগারও যদি বলবার মতন হত! তোমার এক মাসের মাইনে তাপস কোন কোন সময় এক দিনে নিয়ে আসে। ঝাঁটা মারি তোমার টাকার মুখে। ও টাকা গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত, ঐ টাকার অন্ন বিষ। মুখ দেখলে ঘা ঘিনঘিন করে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে—

যাবে কি না যাবে সে ভরসায় না থেকে তারণকৃষ্ণ সুইস টিপে ঘর অন্ধকার করে দিলেন। মুখ দেখতে হচ্ছে না আর।

পরের দিন। বাপে মেয়ের কথাবার্তা আর হয় নি—কতটুকুই বা বাকি ছিল আর কথাবার্তার! পূর্ণিমা যথারীতি অফিস করতে গেছে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখে তারণকৃষ্ণ নেই। বাড়িতে একা ভানুমতী।

তাজ্জব ব্যাপার। বারান্ডার ঘর থেকে বাইরের ঘরে যে মানুষকে দেয়াল ধরে ধরে সতর্কভাবে আসতে হয় তিনি নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। চিরদিনের মত গেছেন, আর ফিরবেন না।

ফিরবেন না—ট্যাক্সিতে তুলে দেবার পর তারণকৃষ্ণ প্রকাশ করে বললেন। মতলবটা ভানুমতীকে আগে বুঝতে দেন নি, মনে মনে রেখেছিলেন।

পূর্ণিমা ব্যস্ত হয়ে বলে, তুলে দিলেই তো হল না—ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে নেবার হাঙ্গামা আছে তো আবার। তাছাড়া অসুস্থ মানুষ, কত রকম কি ঘটে যেতে পারে—এখন আমি কি করি! তোর এ মাতব্বরিতে কী দরকার ছিল ভানু। বললেই হত অফিস থেকে ফিরে এসে যা করতে হয় আমিই সব করব।

বড়দি ও'দের জন্যে মন উতলা হয়েছে, তক্ষুনি যেতে হবে—কী কান্ড করতে লাগলেন, সে যদি দেখতে ছোড়দি। অতিষ্ঠ করে তুললেন। রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি—শেষটা হাউ হাউ করে কান্না। চাকরিবাকরি নেই বলে অগ্রাহ্য করছি নাকি ও'কে, হেনস্থা করছি। রিক্সায় গলি পার করে বড়রাস্তায় নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম, তবে ঠান্ডা। একটা জিনিস দেখলাম ছোড়দি, খুব জেদ হয়েছে কিনা—জেদের বশে দিব্যি আজ হাত-পা খেলছে। রিক্সা থেকে ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় আমায় এমন-কিছু ধরতে হল না, একরকম নিজে নিজেই উঠে পড়লেন।

আরও প্রবোধ দিয়ে ভানুমতী বলে, বড়দির বাড়ির গায়েই তো ট্যাক্সি দাঁড়াবে। হাঁক দিলে তাঁরা এসে নামিয়ে নেবেন। ওখানে কোন ঝঞ্চাট নেই।

চিন্তিত মুখে পূর্ণিমা বলে, দিদির বাড়িতে দোতলার উপর নিয়ে তোলা। আমরা আলগোছে ধরে তুলি—ওদের তো অভ্যাস নেই, তেমন ওরা কখনো পারবে না। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি আর কান্নাকাটির ভয় তো নিজেই তুই আড়ালে সরে যেতে পারতিস, আমার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দেরি করানো যেত। আমাকেই তবে অগ্রাহ্য করা হল কিনা, বল তুই ভানু।

অবস্থা বুঝে ভানুমতীর এখন মনে হচ্ছে, তারণের কথা শুনে তাড়াহুড়ো করা ঠিক হয়নি।

পূর্ণিমা বলে, আমি যাব না। তুই কাশীপুর গিয়ে খবর নিয়ে আয়, ঠিক-মতো পৌঁছে গেছেন কিনা, আছেন কেমন। রাগ কমে থাকে তো কবে ফিরবেন, তা-ও জেনে আসবি।

উদ্বেগের ছায়া পূর্ণিমার চোখেমুখে। উপায় থাকলে নিজেই সে চলে যেত। কিন্তু তাকে দেখে তারণ ক্ষেপে উঠবেন, ওখানেও অকথা-কুকথা শুরু করবেন। মা-ও ফোড়ন কাটবেন বাবার সঙ্গে। বঙ্কু ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে পূর্ণিমার বিষণ্ণ মুখ দেখে। অনিমা মুখ টিপে হেসে অকৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করবে। সে বড় অসহ্য অবস্থা।

ভানুমতীই যাক চলে : খুব তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু, আমি এই বসে রইলাম—তুই ফিরে এলে তারপরে অন্য কাজকর্ম।

কাছে-পিঠে নয়—সেই কাশীপুরে অবধি যাওয়া ও ফিরে আসা—বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল। ভানুমতী এসে দেখে সেই এক জায়গায় পূর্ণিমা ঠায় বসে রয়েছে—মুখে যা বলেছিল, অক্ষরে অক্ষরে একেবারে তাই।

আসবেন না কর্তামশায়। এ-বাড়িতে কোনদিন আর আসবেন না, কাশী চলে যাবেন বড়দির ওখান থেকেই। গিন্নিমা-ও যাচ্ছেন। বাবা বিশ্বনাথ পায়ে টেনেছেন।

ঘোড়ার ডিম! টানছেন পূর্ণ-জেঠা আর তাঁর দাবা, আর কাশীধামের খাঁটি মালাই। আর মিঠেকুমড়োর সাইজের বেগুন। টানা-টানি অনেক দিন ধরে চলছে, এবারে এই মওকা পেয়ে গেলেন।

তিক্তকণ্ঠে পূর্ণিমা আবার বলে, যার যেখানে খুশি চলে যান। আমার তো ভালোরে! দায়-দায়িত্ব নেই, পুরোপুরি স্বাধীন। খাসা থাকা যাবে। দুটো ঠাই করে নে ভানু, ক্ষিধে পেয়ে গেছে, খেতে বসা যাক আরাম করে।

অতএব দেখা গেল, মুখে ঠায় বসে থাকার কথা বললেও, কাজে সেটা করেনি। তাহলে তো মাথা খারাপ হয়েছে বলতাম। রান্নাবান্না ইতিমধ্যে পারিপাটিরূপে সমাধা করে পূর্ণিমা আবার সেই জায়গা নিয়ে একাকী বসে ছিল।

কাশীপুরে অনিমার ঘরে সকলে তাপসের অপেক্ষায় আছে। বাচ্চা চাকর আছে একটা, তার হাতে অনিমা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে :

বাবা রাগ করে চলে এসেছেন—পুনির কাছে আর ইহজীবনে যাবেন না, কাশীবাস

করবেন। আমার এখানেও হুলস্থুল—নিচের তিন গুন্ডা সকালবেলা সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়ে লাঠি নিয়ে পড়েছিল। দরজা বন্ধ তো কপাটের উপর দমাদম লাঠি মারতে লাগল। মা আর রঞ্জু কান্না জুড়ে দিল, আমি দিশে করতে পারিনে। অপরাধ, রাত্তিরবেলা ছাতের এক চাংড়া চুনবালি খসে পড়েছিল নাকি। পুরানো জরাজীর্ণ বাড়ি—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু ওরা বলে, আমাদেরই কারসাজি—দোতলার মেজেয় নাচানাচি করে কাণ্ডটা ঘটিয়েছি। সবাই ঘুমুচ্ছিলাম—এর মধ্যে আচমকা কে উঠে পড়ে নৃত্যলীলা জুড়ে দিল, আমরা তো কিছু জানিনে। নিত্যিদিন এই চলেছে, থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। চলে এসো তুমি, ভেবেচিন্তে একটা এস্পার-ওস্পার করতেই হবে—

রোজগারে নেমেছে তাপস, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি মস্তিষ্কের কুলুপ খুলে গিয়ে বিস্তর জ্ঞান-বুদ্ধির হদিস মিলে গেছে। যুক্তি-পরামর্শের জন্য ইদানীং হামেশাই তার ডাক পড়ে।

লিখেছে : সম্ভব হলে আজই এসো। এই অবস্থার মধ্যে আবার বাবা এসে পড়লেন। ছেলেমানুষের বাড়া—পুনির নাম কানে শুনতে পারেন না। পারলে আজকেই টিকিট কেটে কাশীর ট্রেনে উঠে বসতেন। তাঁকে ঠেকাতে জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে আমার।

সন্ধ্যার পরেই তাপস এসে পড়ল স্বাতীকে নিয়ে। বাড়ির সবাই উপস্থিত শুধু এক পূর্ণিমা ছাড়া। ভাড়াটে ঠান্ডা করবার দাওয়াই মোটামুটি ব্যবস্থা করে এসেছে, নির্ঘাৎ কাজ দেবে। কিন্তু যে প্রসঙ্গ ওষ্ঠাগ্রে আনতে দেন না তারণ—ঘরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই একশ'খানা করে নিজের কথা—

পুনির টাকা গোরক্ত বলে এসেছি, তার ভাত আমার গলা দিয়ে নামবে না। কাশী-বাস করব—বার্ধক্যে বারাণসী শাস্ত্রের বিধান। পূর্ণদা রয়েছেন—চিঠির পর চিঠি দিচ্ছেন, একা-একা তাঁরও মন টেঁকে না! তোদের কাছে প্রত্যাশী নই—মাস মাস পেন্সনের টাকা যাবে, তাতে যদি অকুলান পড়ে, পূর্ণদা-ই পূরণ করবেন। লিখেছেন তাই আমায়।

তাপস ঘাড় নেড়ে রায় দিল : হবে না—

ক্ষেপে গিয়ে তারণ বলেন, হবে না মানে? শেষবয়সে পরকালের চিন্তা করব, খবরদার ঝাগড়া দিবিনে। ভেবেছিস কি, শিকলি বেঁধেও ঠেকাতে পারবি নে—জোর করে বেরিয়ে পড়ব।

বাপের পাদস্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে হাসিমুখে তাপস বলে, কাশীবাসের যাবতীয় খরচা আমার। তোমার পেন্সনের টাকা জমিয়ে রেখো, ইচ্ছে হয়তো দানসত্র করে দিও। পূর্ণ-জেঠার কোনকিছু তুমি ছুঁতে পারবে না বাবা—

অণিমা জুড়ে দিল : শুধু দাবা-বড়ে ছাড়া—

তারণ প্রসন্ন হয়ে চুরুট ধরালেন। তরঙ্গিণী বলেন, উনি যাবেন আর আমি বুঝি জনমভোর সংসারের পাঁকে পচে মরব? সে হবে না, পরকাল আমারও আছে, আমি যাবো ওঁর সঙ্গে।

তাপস সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় : যাবে। কুসমি-দি'রও নিশ্চয় মন টিঁকছে না। তোমায় পেলে বর্তে যাবে। এক কাজ কোরো মা, দুজনে তোমরাও দাবাটা শিখে নিও। বাইরে বাবা আর পূর্ণ-জেঠা খেলছেন, ভিতরে তুমি আর কুসমি-দি। দিন তরতর করে কেটে যাবে। কাশীতে পর-লোকের জন্য তো কিছু করতে হয় না, চোখ বুজলেই শিবলোক। দিন কাটিয়ে সেই অবধি পৌঁছানো নিয়ে কথা।

অনিমা বলে, বাবা চললেন মা চললেন—আমি কোন্ চুলোয় যাই বলো তো। এই অবস্থায় এখানে আর থাকা যায় না।

অতিথ এসে গৃহস্থ তাড়ায়, সত্যি সত্যি সেই ব্যাপার। তুলসীদাস যতদিন ছিল, শাসনে ছিল ভাড়াটেরা। ইদানীং বিশ্রী-রকম বাড়িয়েছে। তিন হুটকো ছোঁড়া—রোয়াকবাজি আর ব্ল্যাকমার্কেটিং-এ মজবুত—ইয়ারবন্ধু নিয়ে ছলেছুতোয় হামলা দিয়ে এসে পড়ে। বাধা বিন্দুমাত্র নেই—বাড়িতে বৃদ্ধা জননী, স্বামীত্যক্তা কমবয়সী মেয়ে এবং বাচ্চা ছেলে, বীরত্ব যতক্ষণ এবং যত প্রকারে ইচ্ছা চালানো যায়। উদ্দেশ্য বোধহয় ভাড়া কমানো। অথবা জঘন্যতর কোন মতলবও থাকতে পারে।

ভেবে এসেছে তাপস। বলে, তোমাদের এখানে থাকা চলবে না দিদি। পছন্দসই ভাড়াটে দেখে উপরতলাটাও ভাড়া দিয়ে যাও। যাও চলে আপাতত, সুবিধা হলে পরে ফিরবে।

লুফে নিয়ে অণিমা বলে, আমিও তাই ভাবছি। একদণ্ড এখানে আর থাকতে চাইনে। ভাড়াটে দেখ তাহলে। এদের মত বদমায়েস ছ্যাঁচড়া নয়, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষ—

শিকলি কেন, পা জড়িয়ে পড়ে থাকব। লাথি মেরে সরিয়ে দেবে, তেমন সাধ্য নেই তোমার বাবা। তার চেয়ে যা বলছি ভালোয় ভালোয় শোন—

তাপস হেসে বলে, সম্ভ্রান্ত মানুষ একটা দিনও টিকতে পারবে না—'বাপ' 'বাপ' করে পালাবে। ওরা তখন দল বেঁধে উপরতলাও দখল করবে। তাড়ানো মুশকিল হবে তারপর।

চিন্তিত মুখে অণিমা বলে, তবে?

ভাড়াটে চাই ঘাগি, ত্যাঁদোড়—বুনো-ওলের পাল্টাপাল্টি বাঘা তেঁতুল। উপরে নিচে যাতে ধুন্দুমার লেগে যায়। পেয়েছি তেমনি একজনকে—কথাবার্তাও বলে এসেছি। পুলিশের কাজ করতেন, রিটায়ার করেছেন। শ্বশুরমশায়ের পেসেন্ট—চিকিচ্ছে করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সেই থেকে ওঁদের সঙ্গে বড্ড খাতির। কথায় কথায় প্রাণ দিতে চান—আমি বললাম, প্রাণ দিতে হবে না—পারেন তো প্রাণ নিয়ে নেবেন ঐ গুন্ডা-তিনটের।

তরঙ্গিণী বলেন, ভাড়া তো হয়ে গেল। তারপরে? উঠবে কোথায় অনি?

সে-ও কি আর ভেবে আসেনি তাপস? অণিমার দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে মায়ের কথার জবাব দিল : আমাদের বাড়ি তো একেবারে ফাঁকা। তোমরাও কাশী চলে যাচ্ছ। দু বোনে বেশ একসঙ্গে থাকতে পারবে। ছোড়দি বাঁচবে রঞ্জুকে সর্বক্ষণ কাছে পেয়ে।

কথা পড়তে দেয় না অণিমা, ফোঁস করে উঠল : রক্ষে করো। সে হল শিক্ষিতা রোজগেরে বোন—মুখ্যুসুখ্যু তুচ্ছ মানুষ আমি, কপালের ফেরে তারই কাছে নিয়ে হাত পাততে হয়। ভিক্ষের মত টাকা ছুঁড়ে দেয়, ক্যাট-ক্যাট কথাও শোনায় সেইসঙ্গে। তবু এদ্দিন নিজের জায়গা ছিল, দুড়দাড় করে পালিয়ে আসতাম—সব কথা কানে শুনতে হত না। মুঠোর মধ্যে পেলে পুনি তো দাঁতে ফেলে চিবোবে।

তাপস চিন্তিত হল। বলে, আমি তো এইরকম ভেবে এসেছি। একসঙ্গে থাকবে তোমরা। তুমি সব গড়বড় করে দিচ্ছ দিদি, কী তোমার করেছে ছোড়দি জানি নে—

অণিমা বলে : আমার কথা থাক। নিজেকে নিয়েই বা কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে! স্বাধীন জেনানা কত তার বন্ধুবান্ধব!

দিনমানে বাইরে বাইরে—রাত্রে তারা এখন ঘর অবধি হানা দিতে লেগেছে। যার জন্যে বাবা পর্যন্ত টিকতে পারলেন না। এই পোড়া-কপালে আমার—সমস্ত গিয়েও ইজ্জতটুকু তবু আছে। পুনির সঙ্গে থেকে আমারও মুখ পুড়বে, সে-জিনিস আমি হতে দেবো না।

বলতে বলতে গর্জন করে উঠল : ছেলে নিয়ে ফুটপাথে পড়ে থাকব, শিয়ালদা স্টেশনে বিছানা পেতে নেবো—পুনির সঙ্গে কিছুতে নয়।

স্বাতী সমাধান বাতলে দেয়। তাপসকে বলে, বড়দি আমাদের সঙ্গে থাকবেন—নিউ আলিপুরে। তুমি তো বাইরে বাইরে রোগ তাড়িয়ে বেড়াবে। একলা থাকতে হলে ঘরের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব আমি।

তাপস বলে, যে-যার পথ দেখে নিচ্ছি—ছোড়দি তবে একলা পড়ে থাকবে?

অণিমা টিপ্পনী কাটে : একলা সে এখনো থাকে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কথা আমার মিলিয়ে নিও।

স্বাতীর ইদানীং গলায় গলায় ভাব অণিমার সঙ্গে। অণিমার প্রতিটি কথায় সে সায় দেয়। মুখ টিপে হেসে সে বলে, কাল সিনেমায় দেখলাম, সেখানেও ছোড়দি একলা ছিলেন না।

তারণের কোটরগত চোখদুটো দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুরণ হয়। বললেন, পুনি কাল ছবি দেখতে গিয়েছিল? ডাহা মিথ্যে আমায় বলে গেল—নাকি কোন সাহেব এসেছে বিলেত থেকে ফ্যাক্টরী দেখতে, ফিরতে রাত হবে। এতবড় ঘরের মেয়ে হয়ে কোথায় নেমেছে বোঝ এইবার। কম দুঃখে আমি মরে আসিনি।

তরঙ্গিণী বললেন, তোমার জন্যেই তো! বিয়েথাওয়া না দিয়ে মেয়ের রোজগার খেতে গেলে।

অণিমা করকর করে ওঠে : রোজগেরে মেয়ে ঢের ঢের আছে মা, কিন্তু পুনির মতন কেউ নয়। কত কাণ্ড করল! বাবার কাছে ধাপ্পা দিয়ে কাল তো এই আরব্য উপন্যাস করে বেড়িয়েছে। অফিসের মনিব অবধি হাত বাড়িয়েছিল—ভাইয়ে ভাইয়ে কুরুক্ষেত্তোর, কোম্পানির গণেশ-উল্টানোর গতিক, কায়দা করে অফিস থেকে সরিয়ে দিয়ে শেষটা তারা 'বাপ' 'বাপ' বলে বাঁচে। কেন মা, তুমিই তো গোড়ার আমলে ধরে ফেলেছিলে—যখন কোচিং ইস্কুলে পড়াত, টাইপরাইটিং শিখবার নাম করে বেরুত। কাশীপুর থেকে গিয়ে তোমার হয়ে শাসানি দিয়ে আসতাম। সেইসব থেকেই তো আমার উপর আক্রোশ পুনির।

ঠিক কথাই বটে। তরঙ্গিণীর বলবার মুখ নেই, চুপ হয়ে যান।

তাপস বলে, আসল দোষটা কোথায় আমি জানি। ছোড়দির কিছু নয়, দোষ তালুকদারি রক্তের।

একটুখানি থেমে আবার বলে, বড্ড পাজি রক্ত—রক্তের বিষ কিছুতে যেতে চায় না। তালুকমুলুক চলে গিয়ে বাবা অফিসের কেরানী হলেন, রক্ত ঠান্ডা ছিল তখন। চাকরি গিয়ে বাবা বাড়িতে গদিয়ান হয়ে বসেছেন, স্বাধীন বৃত্তি নিয়ে আমিও দু-পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি—পুরানো রক্ত চনমন করে মাথায় চড়েছে, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ছোড়দির দেবী-পদ খারিজ করে তাকে নরকে চালান করতে বসেছি।

হেনকালে ভানুমতী এসে ঘরে ঢুকল। মেয়েটা কতক্ষণ এসেছে, কোথায় ঘরঘর করছিল, কদ্দুর কি শুনতে পেয়েছে, জানা নেই। তারণ খিঁচিয়ে উঠলেন : গোড়া কেটে আগায় জল—বেইজ্জত করে আবার খবর নিতে পাঠানো হয়েছে! বলবি যে বেঁচে নেই আমি। পথে পড়ে গিয়ে মরি নি—তার আগে, বাড়ি থেকেই মরে এসেছি।

পাশাপাশি খেতে বসেছে পূর্ণিমা আর ভানুমতী। ভানু বর্ণনা দিচ্ছে : একটুখানি জায়গার মধ্যে বাড়ির সকলে গোল হয়ে বসেছে। মায় রঞ্জু—সকলের মধ্যে সে-ও কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে ছিল।

পূর্ণিমা বলে, হাইকোর্টের নিয়মই তাই। খুব শক্ত কেস উঠলে ধুরন্ধর জজেরা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে একত্র বসে। ফুলবেঞ্চের বিচার এর নাম।

সবাই ছিল, তুমি কেবল বাদ।

আমি যে আসামী। এটা হাইকোর্টের নয়, ও'দের নিজস্ব বিশেষ নিয়ম। আসামীর আড়ালে বিচার। আসামী উপস্থিত থাকলে চোখাচোখা অপরাধগুলো বেপরোয়া বলে যেতে চক্ষুলজ্জা লাগত।

ভানু বলে, কাল তুমি ছবি দেখতে গিয়েছিলে ছোড়দি?

কে দেখেছে? আমার ভাই আর ভাজ কক্ষনো নয়। শাশুড়ির এখন-তখন অবস্থা—ফোনের মুখে শুনি অসুখের কথা, ভাইও এসে এসে অসুখের লক্ষণ শুনিয়ে যায়। অমন সাংঘাতিক রোগী ফেলে ওরা কখনো সিনেমায় যাবে না। সাক্ষী কে দিল তাহলে?

(ক্রমশঃ)

দেশে বিদেশে

চীনে গৃহযুদ্ধের ভূমিকা

১২ই জানুয়ারী দিল্লীতে আন্তর্জাতিক শিখ ভ্রাতৃ সংঘ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের ত্রিশত জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং।
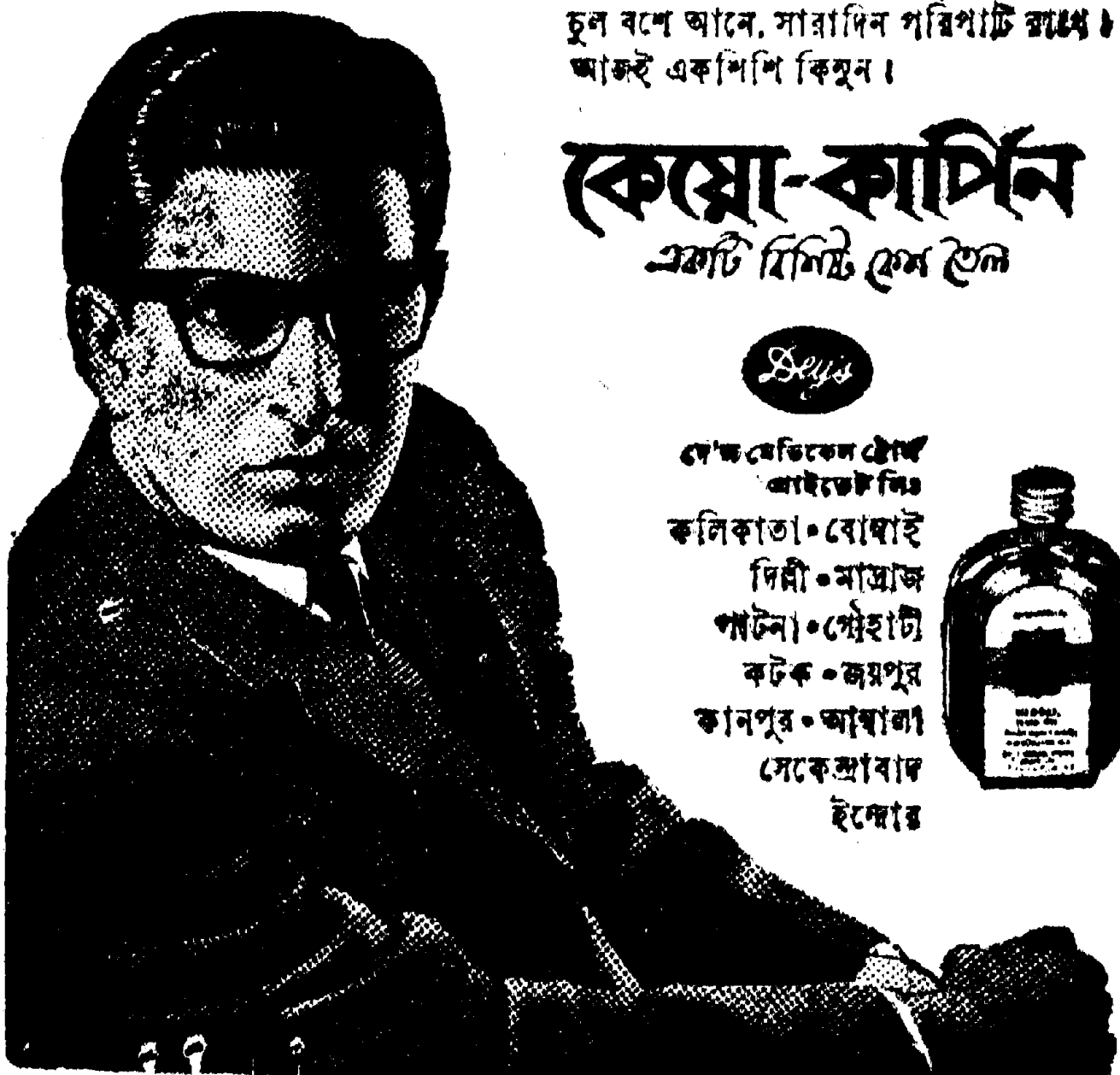
চীনের আভ্যন্তরীণ গোলমাল যে ক্ষমতা দখলের একটা চক্রান্তের পরিণতি, এটা আমরা পূর্ববর্তী একটি লেখায় বলেছিলাম। এই কথাটা সম্প্রতি আরো প্রামাণ্য এবং নাটকীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

গোলমালের শেষ কোথায় এবং কিভাবে হবে, সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। চীন থেকে পাওয়া সর্বশেষ খবরে জানা যায় মাও-পন্থীয় এবং মাও-বিরোধীদের লড়াই সশস্ত্র-বাহিনীকেও স্পর্শ করেছে এবং পশ্চিম চীনের কানসু প্রদেশের লাঞ্চৌ শহরে দু' দল সৈন্যের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সৈন্যদলের মধ্যে এই ভাঙনের পরিণতি অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু এর পর একটা কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি : এই গোলমাল সহজে থামবে না। সশস্ত্রবাহিনীর ওপর একাধিপত্য মাও সে-তুং গোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন ছিল। সেই অবলম্বন এখন অন্তত কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ল। এটা সুলক্ষণ নয়।

১২ জানুয়ারী যখন চীন সরকারের পক্ষ থেকে সৈন্যবাহিনীর ওপর নতুন আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথা ঘোষণা করা হয়, তখন এটা মনে করা অসংগত ছিল না যে, মাও সে-তুং ও লিন পিয়াও বুঝি এ-যাত্রা বিক্ষোভের ঝড় কাটিয়ে উঠলেন। "সৈন্যবাহিনীই জনগণের স্বৈরতন্ত্রের শিরদাঁড়া এবং মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারক ও বাহক", **লিবারেশন আর্মি ডেইলির** এই মন্তব্যে অনেকে এই আশংকাও করেছিলেন যে, মাও-চক্র বুঝি এবার সমস্ত বিরোধিতা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে উচ্ছেদ করবার আয়োজন করছেন। এ-ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ ও পরামর্শ দেবার জন্যে একটি সামরিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক মার্শাল সু সিয়াং-চিয়েন এবং উপদেষ্টা হচ্ছেন মাও সে-তুংয়ের পত্নী মাদাম চিয়াং চিং। এই ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষকরা বিরোধী পক্ষকে উৎখাতে মাও-র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফল বলে মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু লাঞ্চৌ-এর সংঘর্ষ প্রমাণ করছে যে, মাও-লিন গোষ্ঠীর প্রতি সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য সম্পূর্ণ নয়, এবং রাষ্ট্রপতি লিউ শাও-চি ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী তেং শিয়াও-পিংয়ের নেতৃত্বে বিরোধী পক্ষ এখনও রঙ্গমঞ্চে অবস্থিত আছে। এর ফলে চীনে গৃহযুদ্ধের পথ প্রশস্ততর হল।

এর সূত্রপাত হিসেবে কিছু কিছু বিবরণ চীনের 'বাঁশ যবনিকা' পার হয়ে বাইরের পৃথিবীর কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁচেছে যা থেকে মনে হওয়া কঠিন যে, বর্তমান গোলমালের অনেকটাই প্রচার-যুদ্ধ। এইসব বিবরণ যে পশ্চিমী রঞ্জনে অতিরঞ্জিত এমন কথাও বলা চলে না; কেননা অধিকাংশ বিবরণই জাপানী, রুশ, চেকোশ্লোভাক ও যুগোশ্লাভ সাংবাদিকদের হাত দিয়ে আসছে। লাঞ্চৌ-এর সংঘর্ষ তো পরে এসেছে। তার আগে নানকিং থেকে সন্ত্রাসের রাজত্বের খবর পাওয়া গেছে। প্রকাশ, নানকিংয়ে রক্তাক্ত সংঘর্ষে অন্তত ৪০ জন নিহত ও ৫০০ জন আহত হয়েছে, দু' পক্ষে প্রায় ৬০,০০০ লোক বন্দী হয়েছে এবং বন্দীদের অনেককেই নাক, কান, আঙুল কেটে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাও-সমর্থক রেড-গার্ডদের সঙ্গে কল-কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের মজুতদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। চীনের বৃহত্তম শহর সাংহাই এক ব্যাপক ধর্মঘটের ফলে অচল হয়ে পড়ে। পিকিং রেডিওর এক প্রচার-বার্তায় স্বীকার করা হয় যে, ধর্মঘট কেবল সাংহাইয়ের সমস্যাই নয়, সারা দেশেরই সমস্যা। একাধিক শহরে কল-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে ট্রেন চলাচল, ভীষণ রকমে ব্যাহত হয়। আন্তঃ-বিভাগীয় গোলমালের দরুণ বিমান উৎপাদন দপ্তরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ক্যান্টনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাবার উপদেশ দিতে গিয়ে রেড-গার্ড ও সৈন্যরা নিগৃহীত হয়েছে। এমনকি পিকিংয়ে পুলিশের সঙ্গেও রেড-গার্ডদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। মাও-গোষ্ঠী প্রকাশ্যভাবেই অভিযোগ করেছে যে, বিরোধীরা ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বানচাল করে, বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিয়ে এবং কল-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাইছে।

এই দুই বিবদমান পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই রেড-গার্ডদের জেহাদী উল্লাসকে খানিকটা সংযত করবার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি রেড-গার্ডরা কেবল রাষ্ট্রপ্রধান লিউ শাও-চি ও পার্টি-সেক্রেটারী তেং সিয়াও-পিংকে নিন্দা করেই ক্ষান্ত ছিল না। তাদের আক্রমণের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে প্রচার বিভাগের প্রধান তাও চু-কেও তাদের শিকার করেছিল। কিন্তু সেখানেও তারা থেমে থাকেনি। শেষের দিকে তারা পাঁচজন উপ-প্রধানমন্ত্রীকে নিয়েও পড়েছিল। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌ এক আবেদন প্রচার করে আক্রমণ লিউ, তেং ও তাও-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে এবং পাঁচজন উপ-প্রধানমন্ত্রীকে রেহাই দেবার জন্যে রেড-গার্ডদের পরামর্শ দিলেন। তাতে কাজ হওয়া দূরে থাক, মাঝখান থেকে চৌ নিজেই আক্রমণের শিকারে পরিণত হলেন। পিকিংয়ে রেড-গার্ডদের পোস্টারে স্পষ্টই অভিযোগ করা হয়েছিল যে, মিঃ চৌ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অগ্রগতিকে শিথিল করবার চেষ্টা করছেন। আরেকটি পোস্টারে বলা হয়েছিল : 'চৌ এন-লাইকে পুড়িয়ে মারো।'

মাও-লিন গোষ্ঠীর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় লিউ-তেং গোষ্ঠী জয়ী হতে পারবে কি? আমরা জানি না। এর আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধাক্কায় পিকিংয়ের মেয়র পেং চেন, পিকিং **পিপলস্ ডেইলির** অন্যতম সম্পাদক তেং তো সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লো জুই-চিং প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পতন ঘটেছে। তাঁরা সবাই কারান্তরালে; গুজব রটেছে তাঁদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করে অব্যাহতি পেয়েছেন। লিউ, তেং ও তাও এখনো বাইরে আছেন। তাঁদের ভাগ্যেও কি ঐরকম অগৌরব নির্বাসন অপেক্ষা করছে? আমরা জানি না। কিন্তু এটা বলা হয়ত কঠিন নয় যে, তাঁদের সরানো খুব সহজ হবে না। কারণ, তাঁরা সকলে শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিই নন, চীনা সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত আছেন। তাছাড়া এঁদের বিরোধিতা শুধু ব্যক্তিগত রেষারেষির লড়াই নয়, এর সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গীগত বিরোধের সূত্রপাত, মনে হয়, ১৯৬২ সালে 'বিরাট অগ্র লম্ফন' পরিকল্পনার শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ কৃষিক্ষেত্রে ও কারখানায় উৎপাদন ভীষণ রকমে ব্যাহত হয়, দেশব্যাপী কৃষক ও মজুরদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়, কঠোর নিয়ন্ত্রণের জগদ্দল পাথর শিথিল করবার জন্যে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। মাও চিন্তাধারা ও নীতি সম্পর্কে তারপর থেকেই সন্দেহ উচ্চারিত হতে থাকে। এই অসন্তোষ ও সন্দেহকে চাপা দেবার জন্যেই মাও-র নেতৃত্বে জনসাধারণের মনে সমাজ-বাদের আদর্শ আরো ভালোভাবে ঢুকিয়ে দেবার জন্যেই একটা ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করা হয়। এই অভিযানই রেড-গার্ড আন্দোলনের মধ্যে নাটকীয় পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু একটা অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী মহল 'বিরাট অগ্র লম্ফনের' ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে রাজী ছিলেন না। এঁরাই এখন মাও-বিরোধী প্রতিবিপ্লবী নামে পরিচিত।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই মহল মাও-র গোঁড়া নীতি সম্পর্কে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। কারণ, এই নীতি বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে দ্বিধা-বিভক্ত করে কম্যুনিজমের শক্তি দুর্বল ও অনেকাংশে অক্ষম করে দিয়েছে। এই অক্ষমতার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ ভিয়েৎনাম যেখানে আমেরিকার সব-রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও চীন কিছু করতে পারছে না। এবং এই নীতি বিভিন্ন দেশে চীনের চরম কূটনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক লো জুই-চিং চীনকে সামরিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

যদিও ঘটনাবলী এখনও অনেকখানি রহস্যাবৃত, তবু দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্য এবং গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর দিকে নজর রেখে চারটে সিদ্ধান্তে আসা যায় :

এক, চীনের ঘটনাবলী একটা চূড়ান্ত মোকাবিলার পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে।

দুই, এই মোকাবিলার ফল যা-ই হোক, চীনের রাষ্ট্রনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আমরা আশা করতে পারি। কারণ,

তিন, যদি লিউ-তেং-তাও গোষ্ঠী জয়ী হয়, তাহলে একটা উদারতর পরিবর্তন অবধারিত। আর,

চার, যদি মাও-লিন গোষ্ঠীই প্রাধান্য বজায় রাখতে পারে, তাহলেও প্রথম দিকে দমন-নীতির একটা বন্যা বয়ে গেলেও, শেষ-পর্যন্ত তাঁদের গোঁড়া নীতিকে শিথিল করতে হবে। কেননা, এটা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে যে, মাও-র বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিক্ষুব্ধ জনমত রয়েছে, যা দরকার হলে প্রকাশ্যে ফেটে পড়তে দ্বিধা করবে না।

তাছাড়া আরও একটি কারণে মাও-গোষ্ঠীর পক্ষে আগেকার গোঁড়া নীতিতে ফিরে যাওয়া বা ফিরে গিয়ে টি'কে থাকা কঠিন হতে পারে। চীনের এই আভ্যন্তরীণ গোলমাল চীনকে খুব সুন্দর প্রতিচ্ছবিতে জগতের সামনে প্রতিফলিত করছে না। যে দুয়েকজন গোঁড়া চীন-সমর্থক দেশ ছিল, তাদের মনেও দ্বিতীয় চিন্তা দেখা দিচ্ছে। আলবেনিয়ার কাগজে ইতিমধ্যেই রেড-গার্ড আন্দোলনের সমালোচনা করা হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে রাশিয়া এবং এই সুযোগে বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলন ডেকে চীনকে একঘরে করার কাজ তার পক্ষে

মার্চ টাইম —
.... লেফট্
রাইট্ লেফট্!
.... লেফট্
রাইট্ লেফট্!!

সহজ বই কঠিন হবে না। যদি এই কাজে রাশিয়া সফল হয়, যদি একটি বিশ্ব সম্মেলনের মঞ্চ থেকে চীনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দাবাদ ধ্বনিত হয়, তাহলে মা-ও সে-তুংয়ের নীতির বিরুদ্ধে আরেক দফা অভ্যুত্থান হতে বাধ্য এবং হলে তখন সেই অভ্যুত্থানের জোয়ার সামলানো মাও-র পক্ষে আরো কঠিন হবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পাটের দাম

এর আগে বোম্বাইয়ের সুতাকল বিহার ও উত্তর প্রদেশের চিনিকলে যা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চটকলেও তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তুলোর দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং তুলো না পাওয়ায় বোম্বাইয়ের সুতাকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। চিনিকলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল চড়া দামে আখ কিনে কলওয়ালারা পোষাতে পারছিল না বলে। ভারত সরকার তুলো এবং আখ, উভয় কাঁচা মালেরই দাম বাড়াবার অনুমতি দিয়েছেন।

এখন পশ্চিমবঙ্গের চটকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পাটের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে। সরকার কি এই 'সংকট' দূর করার জন্য কাঁচা পাটের দাম বাড়াবার অনুমতি দেবেন? ভারত সরকারের পাট সংক্রান্ত কমিশনার শ্রীপি সি ভগৎ বলেছেন, দেশের রপ্তানী-বাণিজ্যের স্বার্থে তিনি কাঁচা পাট ও পাট-জাত দ্রব্যের চড়তি দর আয়ত্তে আনার জন্য সাধ্যমত সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেন। তিনি বলেছেন যে, প্রয়োজন হলে গবর্ণমেণ্ট মজুত কাঁচা পাট হুকুম-দখল করে সরকারী বাঁধা দরে বাজারে বিক্রী করে দিতেও পিছপাও হবেন না।

শ্রীভগতের মতে পাটের অভাবের অজুহাত খাটে না। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, যদিও ভারতীয় চটকল সমিতির মতে এই বৎসর দেশে ৬৭ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হবে এবং পাট-ব্যবসায়ীদের মতে ৬৫ লক্ষ গাঁট। তথাপি সরকারী হিসাবে ফলনের পরিমাণ হবে ৭৩·৫ লক্ষ গাঁট এবং "কমনওয়েলথ ইকনমিক কমিটি"র হিসাবে আরও বেশী—৭৫ লক্ষ গাঁট। গত মরশুমের যে পাট এখনও মজুত আছে—যার পরিমাণ ১১·৬ লক্ষ গাঁট—সেটা হিসাবে ধরলে এতে চটকলের চাহিদা (৭৬ লক্ষ গাঁট) মিটে গিয়েও উদ্বৃত্ত থাকা উচিত। চাহিদার তুলনায় বাজারে যে কাঁচা পাটের ঘাটতি নেই সেটা প্রমাণ করার জন্য শ্রীভগৎ উল্লেখ করেন যে, নতুন মরশুমে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কলগুলিতে যে মোট ৪৬·৮৪ লক্ষ গাঁট পাট মজুত করা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৩৫·৪২ লক্ষ গাঁট তোলা হয়েছে।

শ্রীভগতের হিসাব যদি ঠিক হয় তাহলে বাজারে পাটের এই সংকট কেন? শ্রীভগৎ বলেছেন, উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীরা বেশী দর পাওয়ার আশায় পাট ধরে রাখছেন। কিন্তু তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেননি। সেটা হচ্ছে এই যে, টাকার বাট্টা হ্রাসের ফলে আমদানী করা পাট ও দেশী পাটের দামের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তাতে এই ধরণের মজুতদারি করতে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হচ্ছেন। ডি-ভ্যালুয়েশনের ফলে পাকিস্তান ও থাইল্যান্ড থেকে আমদানী করা পাটের দাম টাকার অঙ্কে বেড়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে আমদানী করা পাটের দর গত ডিসেম্বর মাসে ছিল প্রতি মেট্রিক টনে ভারতীয় মুদ্রায় ২৮৩৫ টাকা। এই দর অত্যন্ত চড়া বলে এবং এই চড়া দরে পাট কিনে কলগুলি যে জিনিস তৈরী করবে তার পড়তা খরচ খেড়ে যাওয়ার ফলে বিদেশের বাজারে ভারতীয় চট বিক্রী করা কঠিন হবে এই কারণে ভারত সরকার আমদানী করা পাটের দামের উপর সাবসিডি দিয়ে থাকেন। এই সাবসিডির পরিমাণ মেট্রিক টনপিছু ৫০০ টাকা। এই সাবসিডির অংক বাদ দিয়ে ভরতের বাজারে বিদেশী পাটের দাম দাঁড়ায় টনপিছু ২৩৩৫ টাকা। সেই জায়গায় দেশী সরেস পাটের দাম টনপিছু ১৬০৭·৫০ টাকা অর্থাৎ টনপ্রতি ৭০০ টাকারও বেশী কম। ভারতীয় পাট-ব্যবসায়ীরা যদি পাটের দর চড়াবার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে তাঁরা এই পার্থক্যের কিছুটা কমিয়ে নিজেদের কোলে ঝোল টানবারই চেষ্টা করছেন।

আসল উদ্বেগ ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে। শ্রীভগৎও সেকথা বলেছেন। ডি-ভ্যালুয়েশনের ফলে রপ্তানী বাড়বে, এই আশা ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি। শ্রীভগৎ বলেছেন যে, এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে একমাত্র কানাডা ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য সব অঞ্চলেই ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী কমে গেছে। চটকলগুলি থেকে মাসের পর মাস যে পরিমাণ পাটজাত দ্রব্য পাঠান হচ্ছে তার হিসাবেই এই দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে চটকলগুলি থেকে ৮৫১০০ টন পণ্য পাঠান হয়েছিল, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে পাঠান হয়েছে ৬০ হাজার টন। পরবর্তী মাসগুলিতেও একই অবস্থা দেখা গেছে—আগস্ট মাসে ৮১৭০০ টনের স্থলে ৬৮৬০০ টন, সেপ্টেম্বর মাসে ৮৮০০০ টনের স্থলে ৫৬০০০ টন, অক্টোবর মাসে ৭৪৬০০ টনের স্থলে ৬৫৩০০ টন এবং নভেম্বর মাসে ৭২৫০০ টনের স্থলে ৬৫৯০০ টন।

শ্রীভগৎ ঠিকই বলেছেন, পাটজাত দ্রব্যের দর না কমলে রপ্তানী বাড়বে না। কিন্তু ডি-ভ্যালুয়েশনের ফলে আমদানী করা পাটের দাম বেড়ে গেছে, দেশীয় ব্যবসায়ীরা সেই চড়া দরে ভাগ বসাবার চেষ্টা করছেন, পড়তা খরচ বেড়ে যাওয়ায় (চটকলগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের দামের শতকরা ৬০ ভাগই হচ্ছে কাঁচা মালের খরচ) পাটজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ভারতীয় চটের রপ্তানী কমে যাচ্ছে—এই দুষ্টচক্রটিকে কোথায় ভাঙবেন তার কোন হদিশ জুট কমিশনার দেন নি।

বিশেষ ঘোষণা

অমৃতের ১০ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যাটি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ গ্রন্থ-সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে।

সংবাদ প্রসঙ্গ

শিক্ষায় ব্যয় সংকোচের আশংকা :

আগামী ১৯৬৭-৬৮র ব্যয়-বরাদ্দে ভারত সরকার যে ৬৫ কোটি টাকা শিক্ষায়তনের জন্য মঞ্জুর করবেন ব'লে আশা দিয়েছিলেন, সম্প্রতি তা কমে ৪০ কোটিতে আনার খবর শুনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলী আমেদ অর্থ-মন্ত্রীর কাছে এক পত্রে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে যেসব কার্য-সূচী শুরু হয়ে গেছে তার সুষ্ঠু রূপায়ণে অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যায়তনগুলির গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আরও কতকগুলি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন—তার অভাবেই ছাত্র-মহলে অভাব-অভিযোগ দানা-বেঁধে ওঠে এবং বিক্ষোভ দেখা দেয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

ছাত্র বিক্ষোভ :

বারাণসীতে ১২ই জানুয়ারী একদল ছাত্র সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও কোষাধ্যক্ষের অফিসে হানা দিয়ে দরজা-জানলা ভেঙে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে। অবশ্য পুলিশ হস্তক্ষেপ করার ফলে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে নি। গতকাল সকালে এলাহাবাদের এক প্রকাশ ভবনের উপরও একদল ছাত্র চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করেছে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এখনো খোলা হয়নি। এরকম আশংকাও দেখা দিয়েছে যে, এই অচল অবস্থা আর বেশি-দিন চললে হয়ত কলেজই উঠে যাবে।

নদীয়ার বগুলা কলেজের একদল ছাত্র ১৩ই জানুয়ারী বলপূর্বক অধ্যক্ষকে দিয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে।

প্রাক্তন লেঃ জেনারেলের বইতে কুৎসা :

চীনা আক্রমণের পূর্বে এবং পরবর্তী কাহিনী অবলম্বনে লেঃ জেনারেল কাউল 'দি আনটোল্ড স্টোরি' নামে যে বই লিখেছেন তাতে স্বর্গত জওহরলাল নেহরু, ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন এবং মোরারজী দেশাইকে ভারতের দুরবস্থার জন্য দায়ী করেছেন। বস্তুতঃ তিনি নিজের মনের রং চড়িয়েই অনেক কথা লিখেছেন। এ ধরণের বই লেখার জন্য তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কোনও অনুমতি পূর্বাহ্নে নেওয়া প্রয়োজনও মনে করেন নি।

যাঁরা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক তাঁরা অনেকেই জানেন যে, চীনা আক্রমণের কালে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এড়াবার জন্যই লেঃ জেনারেল কাউল অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগত বিপদ এড়াবার ফিকির গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। ভারত সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার বলেন, যে, কাউল চীন যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতাই অর্জন করেন নি। এই ধরণের শস্তায় হাততালি পাওয়ার লোভ তাঁর সংবরণ করা উচিত ছিল। হয়ত বিদেশীরা এই বইকে সত্য-নির্ভর ভেবে ভারতের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করবে, এমন আশংকাও রয়েছে। কাউল বর্তমানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তিনি টোকিওতে এখন বেসরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের চাকরী নিয়ে নিরাপদে রয়েছেন।
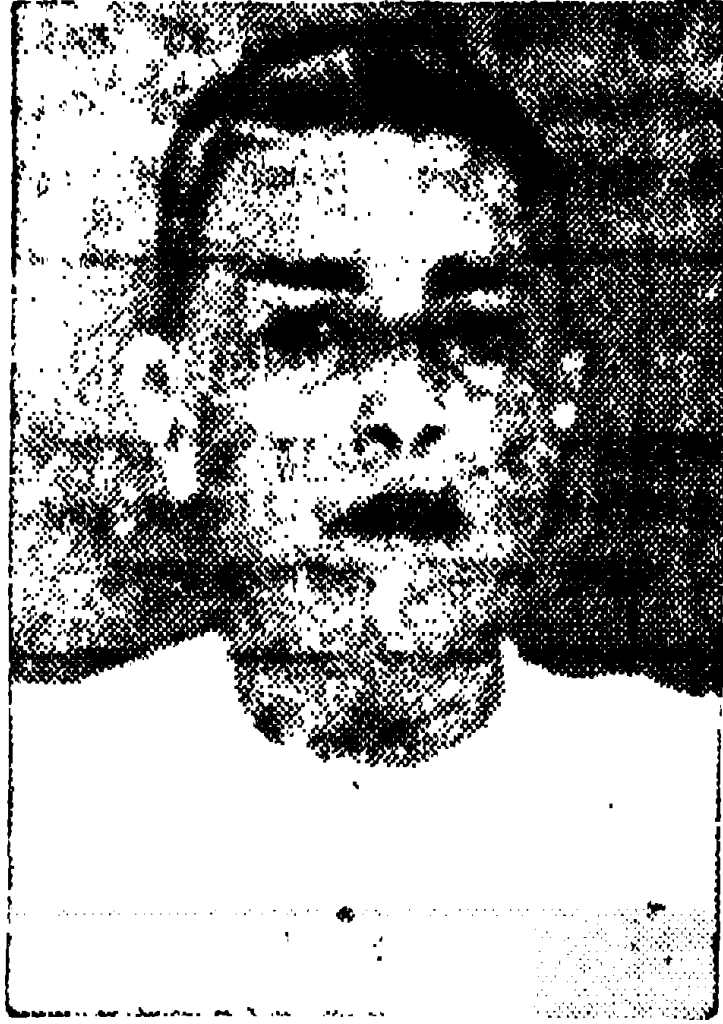
পরলোকে রাধাবিনোদ পাল :

খ্যাতিমান আইনবিশারদ এবং আন্তর্জাতিক আইন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ রাধাবিনোদ পাল ১০ই জানুয়ারী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮১ বৎসর হয়েছিল।

নির্বাচনী প্রসঙ্গ :

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১৪ই জানুয়ারী কাম্নানোর এক নির্বাচনী ভাষণে বলেন যে, বাম-কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

মঙ্গোরে ওইদিন মোরারজী দেশাই-এর নির্বাচনী সভা জনতার আক্রমণে পণ্ড হয়। কলকাতায় বাম-কমিউনিস্ট নেতা ওইদিন বলেন, সংযুক্ত বাম ফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোষ হতে পারে না : হয় কংগ্রেস থাকবে না হয় আমরা থাকব।

খাদ্যবন্টন ব্যবস্থা :

জাতীয় খাদ্য বাজেট চতুর্থ যোজনার মতোই নির্বাচন শেষ হওয়ার আগে পাকাপাকিভাবে স্থির হবে না, দিল্লীর খাদ্য-মন্ত্রক ১৪ই জানুয়ারী একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ধান্যক্রয় নিষিদ্ধ :

১৩ই জানুয়ারী পঃ বঙ্গ সরকার এক নির্দেশে ঘোষণা করেছেন যে, সরকারী প্রতিনিধি কিম্বা সমবায়কারী সংস্থা ছাড়া রাজ্যের অন্য কেউ পাইকারীভাবে ধান কিনতে পারবে না।

ভারতের জন্য সোভিয়েট গম :

নয়াদিল্লী ১২ জানুয়ারীর এক খবরে প্রকাশ যে সোভিয়েট ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে জানানো হয়েছে—অবিলম্বে ভারতকে পাঁচ লক্ষ টন গম দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ভারতের বাইরের খবর

আয়ুবের মন্ত্রিসভায় রদ-বদল :

১৯৫২-তে সেনাদল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর নাগরিক অধিকার থেকে যেসব বিরোধী নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তাঁদের কয়েকজনকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব সম্ভবতঃ মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করবেন। সম্প্রতি যে বিক্ষোভবহ্নি আয়ুবশাহীর দখলকে সংশয়পন্ন ক'রে তুলেছে এবং ব্যাপক খাদ্যাভাব তার সহায় হয়েছে—তা থেকে ত্রাণের আশায়ই এই পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে ব'লে অনুমিত হয়।

পাক জেল থেকে মুক্তি :

রাজনৈতিক নেতা কুমুদবন্ধু গুহ সম্প্রতি বরিশাল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

টোগোতে সামরিক কর্তৃত্ব :

দায়হামে, ১৩ই জানুয়ারীর খবর : টোগো সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল এয়াডেমা আজ সকালে বেতারের মাধ্যমে সেনাবাহিনী কর্তৃক শাসন ক্ষমতা অধিকারের সংবাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন যে, এখানে পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ার ফলেই সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে।

কটৌনি থেকে জানা গেছে যে, টোগোর প্রেসিডেন্ট নিকোলাস গ্রুসিনস্কি গতকাল রাত্রে পদত্যাগ করেছেন। টোগোর সঙ্গে রাজধানী লোমের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে—এখানে এখন আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হবে। একথা সামরিক বিভাগ জানিয়েছে।

সোমালি হামলাদার ও কিনিয়া পুলিশে সংঘর্ষ :

সীমান্তের অধিকার নিয়ে দুইশত সোমালি হানাদারের সঙ্গে কিনিয়ার পুলিশ এবং বাহিনীর সংঘর্ষের খবর ১০ই জানুয়ারী থেকে এসেছে। সরকারী সংবাদে বলা হয়েছে যে, ৪৭জন সোমালি গেরিলা এতে নিহত হয়েছে।

জেরুসালেম :

আবার ইস্রাইল এবং সিরিয়ার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ প্রকট হয়েছে। এর আগে গুলী বিনিময়ই চলছিল, উভয়পক্ষ এখন ট্যাংকও ব্যবহার শুরু করেছে।

রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে

সম্প্রতি রঙ্গমঞ্চ বেশ জমে উঠেছিল। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ছিল একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। নয়াদিল্লী কালীবাড়ী বেঙ্গলী ক্লাব উদ্যোক্তা ছিলেন।

২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর আইফ্যাকস হল ছিল জমজমাট। রাজধানীর সতেরটি নাট্যকে দল সতেরটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। এ'রা সকলেই সখের দল, কারো কারো অভিনয়ের মান বেশ উন্নত। লোকে শীত উপেক্ষা করে প্রতি সন্ধ্যায় আইফ্যাকস্ হলে ভিড় করতেন—এটা সুলক্ষণ।

প্রতিযোগিতা শেষে একটি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। যাঁরা পুরস্কার পান নিচে তাঁদের কয়েকজনের নাম দিলাম—শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পুরস্কার পান শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, বিনয়-নগর বেঙ্গলী ক্লাব কর্তৃক 'কয়েকটি পাখীর বিবৃতি'তে তিনি অভিনয় করেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে পুরস্কার পান শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র চক্রবর্তী। কালীবাড়ী বেঙ্গলী ক্লাব কর্তৃক 'সমাজসেবী বিজয়হরি' নাটকটি তিনি পরিচালনা করেছিলেন। কেরোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ কর্তৃক 'মনের বনে ফাগুনে' অভিনয়ের জন্য শ্রীমতী উমা বীট শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান আর শ্রেষ্ঠ বালক অভিনেতা হিসাবে পুরস্কার পান শ্রীমান পিণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই নাটক প্রতিযোগিতা ছাড়াও আর একটি নাটক অভিনীত হোল আইফ্যাকস হলে। এটি ছিল কাশ্মীরী গেট বেঙ্গলী ক্লাবের 'রাইকমল'।

নাটকটির মূল চরিত্রগুলি থেকে পার্শ্ব-চরিত্রগুলির অভিনয় সবল হয়। বিশেষতঃ কাদম্বিনির ভূমিকায় ঝর্ণা ঘোষের, তিলকা বষ্টুমীর ভূমিকায় স্মৃতি বসুর এবং পরীর ভূমিকায় রীমার অভিনয় মনে বেশ দাগ কেটেছে। রসিকদাস বাবাজির ভূমিকায় জ্যোতিনাথ এবং রাইকমলের ভূমিকায় নন্দিতা চ্যাটার্জি দুজনেই দলের নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী। দর্শকরা এ'দের কাছ থেকে আরও একটু ভালো অভিনয় আশা করেছিলেন। যাই হোক এ'দের গাওয়া বাউল এবং কীর্তনগুলি বেশ ভালো হয়েছিল, বিশেষতঃ জ্যোতি নাগের পদাবলীটি।

নাটকটির পরিচালনা দুর্বল ছিল। অস্বাভাবিক ধীরগতিতে চলার জন্য এবং অত্যধিক ড্রপসীন ব্যবহার করার জন্য অনুভূতির রেশ বার বার ছিঁড়ে যেতে থাকে, অভিনয় দানা বাঁধতে পারেনি।

শিল্পী বিমল ব্যানার্জি

●

এবারে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ললিতকলা আকাদমির বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে কলকাতায় তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীবিমল ব্যানার্জি পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে প্রতিযোগীদের মধ্যে এবং বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র পুরস্কার লাভ করেছেন, পুরস্কারের মূল্য নগদ এক হাজার টাকা ও একটি বিশেষ প্রশংসাপত্র সেই সঙ্গে।

শিল্পী শ্রীব্যানার্জি এখন দিল্লীবাসী, ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে একটি গবেষণামূলক কাজে লিপ্ত আছেন। শিল্পী-জগতে তিনি সুপরিচিত, ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে তিনি দশটি একক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় দিয়েছেন। জাতীয় চিত্রশালায় ভারতের বাইরে নানা চিত্রশালায় তাঁর চিত্র সংরক্ষিত আছে।

শ্রীব্যানার্জি কলকাতায় ইন্ডিয়া আর্ট কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

আর এক ব্যানার্জি শিল্পী মানবকুমারের একক চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল আইফ্যাকস্ প্রদর্শনী হলে।

শিল্পী মানবকুমার ব্যানার্জির জন্ম উত্তরপাড়ায় কিন্তু শৈশবে তিনি দিল্লী চলে আসেন এবং দিল্লী আর্ট কলেজে শিল্প শিক্ষা করেন। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ডিপ্লোমা পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন।

শিল্পী মানবকুমার ইতিপূর্বে কয়েকটি সর্বভারতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে ছবি টাঙালেও দিল্লীর একক প্রদর্শনীটি ছিল তাঁর প্রথম। মোট ২০।২২টি ছবি তিনি টাঙিয়েছিলেন। ছবিগুলি অনেকে প্রশংসা করেছে, আশা করা যায় এই তরুণ শিল্পী ভবিষ্যতে আরও উন্নত ধরনের কাজ দেখাতে পারবেন।

বিনয় চট্টোপাধ্যায়

রাইকমলের একটি দৃশ্য

আমার জীবন

মধু বসু

(৪৭)

মিঃ কলকাতাওয়ালা আমাকে গেস্ট-হাউসে রেখে খুব খাতির করলেন। অতি সুস্বাদু মোগলাই খানার সঙ্গে বহুমূল্য পানীয় আমার জন্য নিয়মিত বরাদ্দ ছিল।

প্রথমে ঠিক করলাম তাঁকে আগে গানের রেকর্ডগুলো শোনাব, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গানগুলো তাঁর ভালো লাগবেই কারণ গুরুদেবের কয়েকটি গানের মূল ভাবধারা দিয়ে গানগুলি লেখা হয়েছিল, আর তাছাড়া কমল সুরও দিয়েছিল অপূর্ব। গানগুলো ভাল লাগার পর কলকাতায় শুটিং-এর কথাটা পাড়ব, বলে ঠিক করলাম।

আমার অনুমান ঠিকই হল। গানগুলো শুনে তাঁর এত ভালো লেগে গেল, যে যখন আমি কলকাতায় শুটিং করার কথা বললাম, তখন তিনি প্রতিবাদ অবশ্য করলেন, কিন্তু যতটা প্রবল প্রতিবাদ আশা করেছিলাম ততটা নয়। বম্বেতে চন্ডুলাল শাহ, জে বি এইচ ওয়াদিয়া এবং অন্যান্যরা যা বলেছিলেন তিনিও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করলেন। তিনি আরও বললেন : এত জোরালো গল্প, গানগুলির সুর এমন সুন্দর হয়েছে—ভাল শিল্পী-সমাবেশ হলে ছবি নিশ্চয়ই 'হিট' করবে। ভাল করে ভেবে দেখেশুনে ঠিক করুন। হাজার হোক, আপনি পরিচালক—আপনার সিদ্ধান্ত আমি সব সময় সমর্থন করব।

আমি তখন বললাম : আমি একরকম স্থির করেই ফেলেছি মিঃ কলকাতাওয়ালা যে আমি কলকাতাতেই শুটিং করব। আমার পক্ষে এখন বোম্বায়ের স্টারদের নিয়ে শুটিং করা সম্ভব হবে না। প্রথমতঃ তাদের টাকাও দিতে হবে প্রচুর, তার ওপর আমার কাজের সময় সকলকে ঠিকমত পাওয়া যাবে না। এরকম ভাবে কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই। আমি বহু নতুন শিল্পীকে সুযোগ দিয়ে 'স্টার' করেছি, সে আত্মবিশ্বাস আমার আছে—এবিষয়ে আপনি সম্পূর্ণভাবে আমার ওপর ভরসা করতে পারেন।

এরপর মিঃ কলকাতাওয়ালা আর কিছু বললেন না—শুধু বললেন : আপনার ওপর নির্ভর করতে আমি সব সময় প্রস্তুত মিঃ বোস। যাই হোক, শুটিং-এর সময় কলকাতা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না—তবে আমি আমার এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারী হাজি সাহেবকে পাঠিয়ে দেব। সেই আপনাদের সব টাকাকড়ি দেবে ওখানে।

এই বলে তিনি হাজি সাহেবকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমৎকার লোক এই হাজি সাহেব। তিনি 'হজ'-তীর্থে গিয়েছিলেন বলেই তাঁকে হাজি সাহেব বলা হোত।

মিঃ কলকাতাওয়ালার কাছ থেকে এত সহজে সমর্থন পাব তা আশা করিনি। যাই হোক, মনটা খুবই প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এরপর হায়দ্রাবাদে যে কয়দিন ছিলাম খুব আনন্দেই কেটেছিল। একদিন সেকেন্দ্রাবাদ গেলাম, সেখানে যেতেই টিপু সুলতানের স্মৃতি মনে ভেসে উঠল।

হায়দ্রাবাদ থেকে বম্বে ফিরে কলকাতা আসবার তোড়জোড় করতে লাগলাম। আবার সেই সমস্ত জিনিসপত্র পাঠানোর হাঙ্গামা যাবতীয় আসবাব, গাড়ীটা—সবই পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম।

আসবার কয়েকদিন আগে বাঙ্গালোর থেকে কৃষ্ণা এসে পৌঁছল বম্বেতে। এসেই সে আমাকে টেলিফোন করে অনুরোধ করল তার সঙ্গে দেখা করতে।

গেলাম দেখা করতে। দুজনে অনেক কথা হল—অনেকদিন পরে দেখা, সুতরাং কথা আর ফুরোতে চায় না। সে তো মনস্তত্ত্ববিশারদ—বিশেষ করে প্রেমের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা সে বলল, সে যা বলল তার সারমর্ম হল এই : প্রথমতঃ আমরা দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালবাসি ঠিকই—কিন্তু এভাবে তো চির-জীবন বাস করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের বিয়ে করতে হবে, আর আমার মনে হয় মধু, যে তাহলেই সংঘর্ষ অনিবার্য। তার চেয়ে আমাদের এই মধুর সম্বন্ধটাই চিরদিন বজায় থাকুক—বন্ধু হয়ে থাকি আমরা চিরদিন দুজনে। আমাদের আজকের এই বিচ্ছেদ উভয়ের কাছেই খুব কণ্টকর জানি, কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সেটুকু আমাদের সহ্য করতেই হবে।

সব শুনলাম, তারপর বললাম : তোমার মত এতখানি তলিয়ে দেখিনি—দেখলে হয়তো এতখানি কষ্ট পেতাম না। তুমি ঠিকই বলেছ যে আমাদের স্বভাব এবং মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। তুমি হলে বাস্তবপন্থী, তোমার মনও সেইভাবে তৈরী—আর আমি হলাম ভীষণ ভাবপ্রবণ, যাকে বলে সুপার-সেন্টিমেন্টাল। থাক তুমি তো সবই বললে কিন্তু এটা তো বললে না যে তুমি চেয়েছিল এমন একজন লোক যার একটা বাঁধাধরা আয় আছে, যে সমস্ত নিশ্চিত নির্ভরতা শান্তি এবং আশ্রয় দিতে পারবে যাতে তোমার জীবনের বাকী দিন-গুলোর জন্যে ভাবতে হবে না।

এ কথার সে কোনো উত্তর দিল না।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম।

কলকাতায় এলাম—সমস্ত আসবাবপত্র উঠিয়ে নিয়ে। এসে উঠলাম গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। তখনকার দিনে হোটেলের খুব কম ঘরেই টেলিফোন যোগাযোগ ছিল একমাত্র বিশেষ কয়েকটি 'সুইট' ছাড়া। দেখেশুনে আমি সেইরকম একটা 'সুইট' নিলাম।

আর্টিস্টদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হবে, তাদের রিহার্সাল আছে—টেকনি-সিয়ানদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে হবে ইত্যাদি। হোটেলের দক্ষিণদিকে ঢাকা বারান্দা ছিল, সেইটাকেই আমি আমার অফিসে রূপান্তরিত করলাম। রিহার্সালও সেইখানেই হোত।

শুটিং-এর জোগাড়যন্ত্র চলতে লাগল। রাধা ফিল্ম স্টুডিও ঠিক করলাম শুটিং-এর জন্য। শিল্পীদের মধ্যে ঠিক হল নায়করূপে ধীরাজ ভট্টাচার্য। বম্বে থেকে একটি শিল্পীকে ঠিক করেছিলাম, ভাগ্যক্রমে তার নামও কৃষ্ণা! নায়িকার মা-র ভূমিকায় তাকে নির্বাচন করেছিলাম। আর তার মেয়েকেই নায়িকারূপে নির্বাচন করেছিলাম। বয়স তার খুব কম, বড়জোর আঠারো বছর, কিন্তু তার মুখখানি ছিল ভারী মিষ্টি এবং সরলতা মাখানো। 'গিরিবালা'র ভূমিকায় এইরকমই একটি মেয়ে খুঁজেছিলাম। অহীনবাবুকে দিলাম পিতার ভূমিকা। মূল কাহিনীতে এই চরিত্রটি ছিল না, কিন্তু মন্মথ মহীনবাবুর উপযোগী করে এই চরিত্রটি তৈরী করেছিল। ক্রমে ক্রমে সব ভূমিকাই নির্বাচিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে রিহার্সালও মোটামুটি শেষ হল। মে মাসের শেষদিকে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে বেশ সুষ্ঠুভাবে শুটিং হল।

আমার হোটেলে তখন আবার পুরাতন বন্ধুদের আনাগোনার মজলিশ সরগরম হয়ে উঠল। সেই জজি, জ্ঞানাঙ্কুর, হেম সোম এবং আরও কয়েকজনের সান্নিধ্যে ও আন্তরিকতাময় পরিবেশে আমি আমার সেই মনমরা ভাবটা খুব শিগ্‌গীরই কাটিয়ে উঠলাম। কৃষ্ণার সঙ্গে বিচ্ছেদের দরুণ মনের মধ্যে যে অশান্তি ভোগ করছিলাম এতদিন—এইসব অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে এসে আবার ধীরে ধীরে মনের শান্তি ফিরে পেতে লাগলাম।

আগেই বলেছি যে, সাধনাও ভারত সরকারের কাছ থেকে সংস্কৃতিমূলক একটি ছবি করার জন্য লাইসেন্স পেয়েছিল। ছবিখানির নাম "অজন্তা"। বোম্বায়ে থাকতেই আমি শুনেছিলাম যে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে এই ছবিখানি নির্মাণের উদ্দেশ্যে সাধনা কলকাতায় চলে এসেছে।

কলকাতায় আমি যখন "গিরিবালা" (হিন্দি) তুলতে এলাম, তখন সে কলকাতায় মার সঙ্গে গড়িয়াহাটের বাড়ীতে থাকে। আমার সঙ্গে অবশ্য দেখাশোনা হত না। এপ্রিলের শেষদিকে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে "গিরিবালা"র শুটিং শুরু হল। মে মাসের মাঝামাঝি একদিন মিসেস মিত্র (ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের স্ত্রী ও জজির মা) আমায় ফোন করে জানালেন যে, সাধনা তাঁর বাড়ীতে চলে এসেছে এবং সেইখানেই সে

থাকতে চায়। কারণ তার ছোট বোন নীলিমার অসুস্থতার জন্য তার মাকে সিমলা চলে যেতে হয়েছে। মাস দুয়েক আগে সাধনাও নিউমোনিয়াতে ভুগেছিল বেশ কিছুদিন। সে অসুখের দরুণ এখনও তার শরীরটা পুরোপুরি সারেনি।

আমি তাকে এ অবস্থায় এখানে না রেখে সিমলাতেই পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলাম। মিসেস মিত্র এবং জর্জিও আমার এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন। নীলিমা কাপুরথালার মহারাজার ভাই, রাজা চারণজিৎ সিংহের একমাত্র পুত্রকে বিবাহ করেছিল। সাধনার মা ছিলেন এইখানে। তাঁর মেয়ের কাছে। কিন্তু সাধনা তার বোনের শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে রাজী হল না। আমি তখন কস্টোফিন হোটেলে একটা ঘর তার জন্যে 'বুক' করলাম। তখন সিমলায় বহিরাগতদের দারুণ ভীড়, কোন হোটেলেই স্থান নেই। কিন্তু কস্টোফিন হোটেলের মালিক মিঃ ওবেরয় খুব দয়া-পরবশ হয়ে তাঁর নিজের অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য রাখা একটি ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হোটেল তো বন্দোবস্ত হল—এখন সমস্যা দাঁড়াল [illegible]র সঙ্গে কে যাবে? আমার তখন "গিরিবালা"র শুটিং চলেছে পুরোদমে, সুতরাং আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। এই সময় আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে থেকেই কে একজন এক মহিলার সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিলেন যিনি সাধনার সঙ্গে যেতে পারেন। তিনি আবার একলা যেতে রাজী নন, তাঁর স্বামীও সঙ্গে গেলেন। এদের সঙ্গে আমি আমার পুরাতন ভৃত্য চামানের ছোটভাই আসগরকেও সঙ্গে দিলাম। আসগরও আমার কাছেই কাজ করত।

"গিরিবালা"র শুটিং বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। জুলাই মাসে সাধনা তার মার সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়। এসে উঠল গ্র্যান্ড হোটেলে।

এই সময় কালীদা এসে মাঝে মাঝে আমার হোটেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন, কত গল্প করতেন। কত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হত। কলকাতায় আসার পর এই প্রথম তিনি আমার হোটেলে আসতে শুরু করলেন। প্রথমে এর কারণ কিছু বুঝতে পারিনি, কারণটা বুঝলাম কিছুদিন পরেই যখন আমার জীবনের সবচেয়ে সংকটময় সময় এল।

এল সেই ঐতিহাসিক আগস্ট ১৯৪৬—শুরু হয়ে গেল ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। রাস্তায় বেরুনো যায় না—কলকাতা শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত—ঠিক এই সময় সাধনা আবার সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। 'কল' দিলাম কর্নেল ডেনহাম হোয়াইটকে। তিনি কিছুদিন চিকিৎসা করার পর বললেন : মিঃ বোস, এই রোগীকে গ্র্যান্ডে না রেখে এখুনিই পি জি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মিসেস বোসের যা অবস্থা তাতে সব সময় ডাক্তার এবং নার্সের দেখা-শোনা করা দরকার। হাসপাতালের মত খাঁড়ি ধরে নার্সিং বাড়ীতে সম্ভব নয়।

সাধনা কিছুতেই পি জি হাসপাতালে যেতে চায় না—শেষে অনেক কষ্টে তাকে রাজী করালাম। পি, জি'র তখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মেজর অ্যালিনসন। তিনি এবং কঃ ডেনহাম হোয়াইট সাধনার জন্যে যা করেছিলেন তা আশাতীত, এজন্যে চিরদিন আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কর্নেল এণ্ডারসন এবং ডাঃ মণি সেনও দু'তিন দিন এসেছিলেন, কঃ ডেনহাম হোয়াইটের সঙ্গে কনসাল্টেশানের জন্যে।

সে ঐতিহাসিক আগস্ট দাঙ্গায় ভারতবর্ষের চেহারা বদলে গেল—ভারতের মানচিত্রের পরিবর্তন হল—হাজার হাজার নরনারী তাদের জীবন বিসর্জন দিল—ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠতে লাগল। সকলেই তখন নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। চারিদিকে শুধু ভয় আর অবিশ্বাস—মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে চায় না। সে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি।

'গিরিবালা'র শুটিং বন্ধ হয়ে গেল। ছবির নায়িকা ও তার মা এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে তারা কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বোম্বায়ে চলে গেল।

আগেই বলেছি, আমি তখন থাকি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। ওখানে আমার সমস্ত আসবাবপত্রের স্থানসংকুলান না হওয়ায় ওয়েলেসলী স্ট্রীটে একটা ফার্নিচারের দোকানে আমি আমার সমস্ত বাড়তি ফার্নিচার রেখেছিলাম। একদিন খবর পেলাম যে সে দোকানটি দুর্বৃত্তের দল পুড়িয়ে দিয়েছে এবং বাকীটা লুটপাট করেছে। তখন কলকাতার এমন অবস্থা যে দিনের বেলাতেও ওয়েলেসলীর দিকে যাওয়া অসম্ভব—এমন কি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনেই কয়েকটা ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটতে দেখা গেল।

কিন্তু প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে পি, জি,-তে যেতেই হত। কারণ রাত্রের নার্সকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া এবং দিনের নার্সকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হত। নইলে তারা কেউ আসতে চায় না। এদিকে আমার গাড়ীর ড্রাইভারও আসে না। অগত্যা বাধ্য হয়ে আমাকে নিজেকেই গাড়ী 'ড্রাইভ' করতে হল। এই সময় গাড়ীতে আমার সঙ্গে থাকত চামান—কখনও বা তা ভাই আসগর।

এই দাঙ্গার সময় সন্ধ্যা হতে না হতেই বেশীর ভাগ দোকানপাট রেস্তোঁরা সব বন্ধ হয়ে যেত। সেজন্যে বহু লোক গ্রেট ইস্টার্নে আসত খেতে। এদের মধ্যে অনেক মিলিটারী এবং পুলিশ অফিসারও আসত। একজন মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, ফলে সে ভদ্রলোক প্রায়ই আমার 'সুইটে' এসে গল্পগুজব করতেন এবং মাঝে মাঝে পানাহারও চলত। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি পি, জি-তে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি এমন সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন—এই যে আমি সন্ধ্যার সময় বেরুই সঙ্গে একটা রিভলবার রাখি কি না! আমি বললাম যে আমার রিভলবার নেই, আর রিভলবার রাখার লাইসেন্সও নেই। এই কথায় তিনি হেসে বললেন : আজকের দিনে রিভলবার রাখতে কি লাইসেন্স দরকার হয় মিঃ বোস? যেভাবে মানুষ নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করছে ধর্মের জিগীর তুলে—তাতে মনে হয় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সভ্যতা শিক্ষা বলে আর কিছু থাকবে না। চোখের সামনে আপনি যদি কখনও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেন—যদি দেখেন পথের স্তূপীকৃত মৃতদেহ পড়ে আছে আর তার পূতিগন্ধে চারিদিক ভারী হয়ে উঠেছে, তখন আপনার রক্তও টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে। আমি মিলিটারীর লোক—যুদ্ধে বহু হতাহত দেখেছি কিন্তু এরকম মর্মান্তিক দৃশ্য আমার চোখে কখনও পড়েনি। যদি আপনি কোনদিন যেতে চান তবে আপনাকে আমি আমার জীপে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারি, কি ভয়াবহ, কি হৃদয়বিদারক সেসব দৃশ্য।

একদিন সে ভদ্রলোক আর ৪।৫ জন মিলিটারীর সঙ্গে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার জীপে করে। আমরা গিয়েছিলাম নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে। সে দৃশ্য আজও আমি ভুলিনি। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরে যখনই সে সব দৃশ্যের কথা মনে পড়ে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ি। মুমূর্ষুর সে বুকফাটা আর্তনাদ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের কান্না, সে যে কি দৃশ্য তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

থাক, যা বলছিলাম। আমি তাকে বললাম যে এত অল্প সময়ে রিভলবার কিনে তার লাইসেন্স জোগাড় করা কি সম্ভব?

তিনি তখন হেসে তাঁর নিজের রিভলবারটি বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন : আপনি আমার এই রিভলবারটা সঙ্গে রাখুন। কলকাতায় অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি আপনাকে খুব শীগ্‌গিরই রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে দেব। এখন কলকাতায় কোন রকম আইন বা শৃঙ্খলা বলে কিছু আছে কি? রাত্রে আপনি শুধু একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে করে

নার্সদের বাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছেন, বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছেন—তাদের জীবনের দায়িত্বও তো আপনার হাতে।

কথাটা ঠিকই বলেছেন তিনি। আমি তখন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে রিভলবারটি নিলাম এবং দুজেনে মিলে কিছু পানীয়ের সদ্ব্যবহার করলাম।

আমি পি, জি'র উদ্দেশ্যে বেরুতে যাচ্ছি তিনি হঠাৎ তাঁর কোটটি খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন : পরে দেখুন তো, আপনার গায়ে হয় কি না! মনে হয় হবে—আপনার ও আমার চেহারার গড়ন এবং উচ্চতা প্রায় একরকম।

পরে দেখলাম—আমাকে সুন্দর 'ফিট' করল। মনে হল যেন এই মিলিটারী অফিসারের কোটটি যেন আমার জন্যেই তৈরী। কাঁধে মেজরের ব্যাজ আঁটা। তিনি তাঁর মিলিটারীর টুপিটাও আমাকে দিয়ে বললেন : আপনি নিজেই যখন গাড়ী চালাবেন তখন এই কোট আর টুপি পরে থাকবেন—আপনাকে কেউ আক্রমণ করতে সাহসই করবে না। আর যখন হাসপাতালের ভেতরে যাবেন তখন এই সামরিক কোট ত্যাগ করে অসামরিক কোট পরে নেবেন।

এই সামরিক অফিসারটির সংগে আমার পরিচয় মাত্র কয়েকদিনের—সে যে আমার জন্যে এতখানি উদ্বেগ অনুভব করছে—আমার নিরাপত্তার জন্যে সে যে কতখানি চিন্তান্বিত তা ভেবে সত্যই তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে উঠল।

যাহোক, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি পি, জি'র উদ্দেশ্যে বেরুলাম। সঙ্গে নিলাম চামানকে। সাধনার 'ডিনারটা'ও আমি রোজ হোটেল থেকে নিয়ে যেতাম। কারণ এই দাঙ্গার জন্যে হাসপাতালে মাছ-মাংস নিয়মিত পাওয়া মুস্কিল হয়ে উঠেছিল।

একদিন রাত্রে দিনের নার্সকে খিদির-পুরে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরছি—রাত্রি তখন প্রায় ৯টা হবে। কিন্তু রাস্তায় চারিদিকে এমন ভয়াবহ নির্জনতা এবং অন্ধকার যে মনে হচ্ছিল অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। রেস কোর্সের পাশ দিয়ে সেই জনহীন রাস্তা দিয়ে যখন 'ফুল স্পীডে' গাড়ী চালিয়ে আসছি হঠাৎ দুজন লোক লাঠি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাড়ী থামাতে বলল। তাদের ঐ চেহারা আর ঐ জনহীন পরিবেশ দেখে সংগে আমার রিভলবার থাকা সত্ত্বেও আমি বেশ ভয় পেয়েছিলাম। মনে মনে তখুনি ঠিক করে ফেললাম যে এদের সামনে ভয় পেলে চলবে না। মুখে সাহস দেখিয়ে এদের সামনে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

গাড়ী থামিয়ে নামলাম গাড়ী থেকে ভগবানের নাম স্মরণ করে। মুখে যথেষ্ট সাহস দেখিয়ে বললাম : কি হয়েছে, ব্যাপার কি?

তারা আমার মিলিটারী পোশাক দেখে 'স্যালুট' করলে। প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম তারপর বুঝলাম যে এরা আমায় মিলিটারী অফিসার ভেবেছে। এদের মধ্যে একজন আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে : স্যার, আমরা পুলিশের লোক। সকাল থেকে এখানে প্লেন ড্রেসে ডিউটীতে রয়েছি—আপনি যদি দয়া করে আমাদের লালবাজার পৌঁছে দেন। এই দেখুন আমাদের ব্যাজ।

দেখলাম তাদের সি, পি, ব্যাজ অর্থাৎ ক্যালকাটা পুলিশ। আমি তাদের বললাম যে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিতে পারি—বলে তাদের গাড়ীর ভিতর উঠে আসতে বললাম। আমারও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

তারপর অক্টোবর মাসে এল খানিকটা সাময়িক বিরতি। কিছুটা শান্ত ভাব দেখা দিল চারিদিকে।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর—এই তিনটে মাস যে আমার কি সাংঘাতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে কাটল তা জানেন একমাত্র ভগবান। সাধনার অসুখে জীবন-মরণ নিয়ে টানাটানি, 'গিরিবালা'র শুটিং বন্ধ - ভবিষ্যত একেবারে অন্ধকার। কোনদিকেই কোনো আলোর ইংগিত নেই।

আমার জীবনে বরাবরই দেখেছি – Whhen afflictions come, they come in battalions. অর্থাৎ বিপদ যখন আসে তখন দল বেঁধে আসে। কিন্তু সেই সংগে দেখেছি আবার কার যেন অদৃশ্য হস্ত আমাকে এই বিপদ-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে। বিপদের মেঘ কেটে যায়!

এবারও তাই হল আবার। অক্টোবরের শেষে সাধনা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠল। ভগবানের অনেক দয়া যে সে সময় আমার হাতে টাকা ছিল—তাই ভালভাবে সাধনার চিকিৎসা করাতে পেরেছিলাম। 'গিরিবালা'র শুটিংও শুরু হল—দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় আবার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হল।

(ক্রমশঃ)
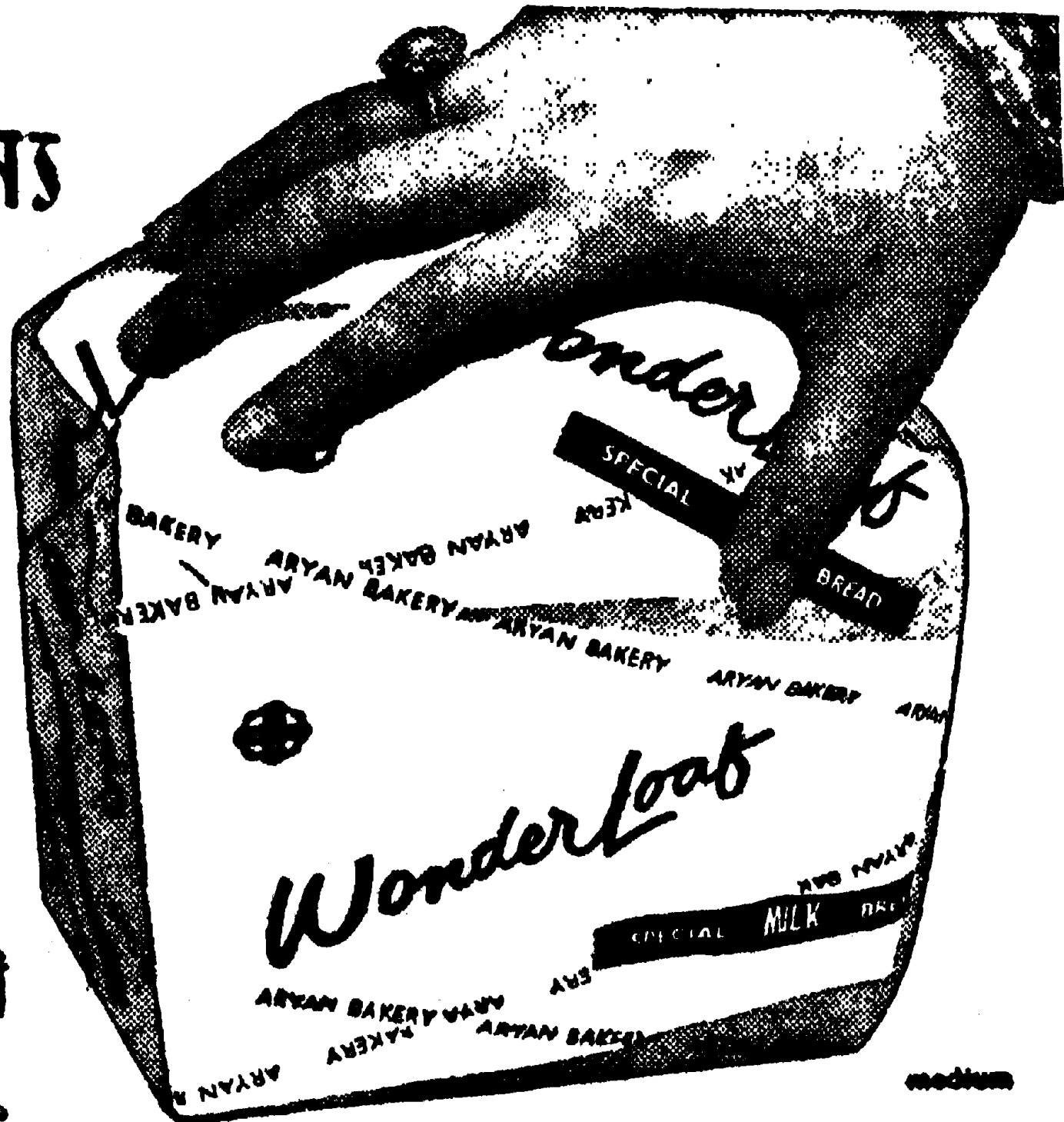
প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

বাঙলা ছবির বাজার :

বাঙলা ছবির বাজার ক্রমেই ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসছে। এই ছোট হওয়া শুরু হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি থেকে এবং আরও পরে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ভারত থেকে বাঙলা ছবির আমদানী সীমিত করবার পর থেকে। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে হিন্দী ভাষার প্রচার-প্রচেষ্টার ফলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বাঙলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী দুটি রাজ্য—আসাম এবং উড়িষ্যাতে নিজস্ব চলচ্চিত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ছবির প্রদর্শনীক্ষেত্র যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে পড়ে। এবং সব শেষে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেও ২৯০টি স্থায়ী চিত্রগৃহ ও ৩০০টি ভ্রাম্যমাণ চিত্রগৃহের মধ্যে অধিকাংশই দর্শকের চাহিদা ও মালিকদের অর্থগৃধ্নুতার ফলে ধীরে ধীরে হিন্দী ছবির প্রদর্শনীকে কায়েম করে তুলেছে। এবং বাঙলা ছবির বাজার ক্রমেই ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে আসছে।

অথচ দশ বছর আগেও একখানি বাঙলা ছবি তুলতে সাধারণত যে-খরচ পড়ত, আজ তার অন্তত পাঁচ গুণ পড়ে। দর্শক-সাধারণের মুখ চেয়ে ছবিতে একজোড়া দ্বিতীয় কি তৃতীয় পর্যায়ের জনপ্রিয় শিল্পীকে অবতরণ করাতে চাইলেই এক থেকে সোয়া বা দেড় লক্ষ টাকা লেগে যাবে। অথচ এই টাকাটাই তখন একখানা পুরো ছবির 'নেগেটিভ' মূল্য ছিল অর্থাৎ ছবিটি চূড়ান্তভাবে শেষ করতে এই খরচ লাগত। কলাকুশলীরাও তাঁদের চাহিদামতো পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করেছেন। ছবির সঙ্গীতাংশের খরচ তো দশগুণ হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত-পরিচালক থেকে শুরু করে প্রতিটি নেপথ্য গায়ক-গায়িকা ও প্রতিটি যন্ত্রীকে আজকাল দশ বছর আগের তুলনায় আট দশগুণ 'অর্ঘ' দিতে হয়। তার ওপর আছে 'এক্সাইস' কর এবং সাম্প্রতিক মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন কাঁচা ফিল্মের দামের অন্তত শতকরা ষাট ভাগ বৃদ্ধি। কাজেই আজ একখানি সাধারণ স্তরের বাঙলা ছবি নির্মাণ করতে লাগছে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা।

এই খরচের টাকা ফেরত পেয়ে একখানি ছবিতে যৎসামান্য কিছু লাভ করতে হলে বাঙলা ছবির এই ক্রমসংকুচিত বাজারকে বিস্তৃততর করবার পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। এবং এর প্রথম পন্থা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী চিত্রগৃহের সংখ্যাকে অন্তত ৭০০।৭৫০ করা ও শহর বা মফস্বলের বাঙালী অধ্যুসিত অঞ্চলের প্রতিটি চিত্রগৃহকে মাত্র বাঙলা ছবি দেখাতে বাধ্য করা। এ ব্যাপারে অনায়াসেই শর্তমূলক লাইসেন্স বিলির ব্যবস্থা করতে পারেন আমাদের রাজ্য সরকার। দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, বাঙলা ছবিতে হিন্দী সংলাপ 'ডাব্' করে তার সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। বাঙলায় 'ডাব্' করা তামিল 'পাণ্ডবের বনবাস' যদি আমরা দেখতে পারি, তা হলে হিন্দীতে 'ডাব'-করা বাঙলা ছবিই বা অবাঙালীরা দেখবেন না কেন? এ-কথা তো অবিসংবাদীভাবে সত্য যে, শুধু ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকেরাই নয়, পৃথিবীর

হিন্দী ছবির নায়িকা নিবেদিতা। ফটো : অমৃত

যেখানেই চলচ্চিত্র-ভক্ত আছে, সেখানেই বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে আগ্রহের অভাব নেই।

এইখানেই আসে বাঙলা ছবির বাজার সম্প্রসারিত করবার জন্যে তৃতীয় পন্থা অবলম্বনের কথা। ঠিক সাধারণ ব্যবসায়ীদের সাহায্যে বহির্ভারতে বাঙলা ছবির প্রদর্শনী ব্যবস্থা এখনই হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু ইংলণ্ড এবং ইয়োরোপের যে-সব রাজ্যে ফিল্ম সোসাইটির অস্তিত্ব আছে, সে-সব জায়গাতেই ভালো বাঙলা ছবির চাহিদা আছে। সত্য বটে, ফিল্ম সোসাইটিগুলি তাদের সীমিত প্রদর্শনীর জন্যে খুব বেশী ভাড়া দিতে পারে না, তবু আজ ইয়োরোপে এত বেশী ফিল্ম সোসাইটি আছে যে, প্রতিটি প্রদর্শনীর জন্যে ১০০৲।১৫০৲ টাকা ভাড়া পেলেও আমাদের ভালো ছবিগুলি ঐ অঞ্চল থেকে কয়েক লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। কোনো উৎসাহী প্রযোজক বা পরিবেশক যদি একসঙ্গে পাঁচ-ছ'খানি বা তারও বেশী যথার্থ ভালো বাঙলা ছবি নিয়ে উপযুক্ত ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় সাবটাইটেল যোগ করায় ও সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলি সম্বন্ধে সুন্দর পরিচয়-পুস্তিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করে ঐ ফেডারেশনের মারফত ইয়োরোপের ফিল্ম সোসাইটিগুলিতে ছবিগুলি প্রদর্শনের জন্যে তৎপর হন, তা'হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ছবির প্রচার ও চাহিদা বৃদ্ধির পথও প্রশস্ততর হয়।

অবশ্য বাঙলা ছবিকে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সকল দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হলে একদিকে আমাদের প্রযোজনা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, অপরদিকে আমাদের প্রয়োগশালা অর্থাৎ ফিল্ম স্টুডিও ও ল্যাবরেটরীগুলিকে আধুনিকতমভাবে সুসজ্জিত করতে হবে। ১৯৫১ সালের ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির একটি সুপারিশ ছিল, একটি ফিল্ম কাউন্সিল গঠন করা। এই ফিল্ম কাউন্সিলের কাজ হবে : কোনো প্রযোজকের প্রস্তাবিত কাহিনীর চলচ্চিত্রোপযোগিতা স্থির করা, চিত্রনাট্য অনুমোদন করা, আনুমানিক ব্যয় নিরূপণ করা এবং চিত্রটির প্রস্তুতিপর্বে শুটিং প্রভৃতি পরিদর্শন করা। —একটি অভিজ্ঞ সমিতি দ্বারা চিত্র-প্রযোজনা নিয়ন্ত্রিত হওয়াকে আমরাও সমর্থন করি। কারণ বহু চিত্র-প্রযোজনাতেই এমন অকল্পনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, যাকে জাতীয় অর্থ, শ্রম ও সময়ের অহেতুক অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আজ ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনই হোক বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারই হোক, কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের অগ্রসর হয়ে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন চলচ্চিত্র-প্রযোজনার সমাপ্তি ঘটানো উচিত বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের মঙ্গল তথা জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যে। অব্যবসায়ীর অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটলে বাঙলা চলচ্চিত্রজগৎ সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে অগ্রসর হবার একটি চমৎকার সুযোগ পাবে। ঐ সঙ্গে এর প্রদর্শনীক্ষেত্র বিস্তৃততর হ'লে বাঙলা ছবি দুর্গতির হাত থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রতিভাবান শিল্পী ও সমালোচক :

পৃথিবীর চলচ্চিত্রজগতে চার্লি চ্যাপলিন হচ্ছেন একটি বিস্ময়কর শিল্প-প্রতিভা। তিনি হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর বেঁকানো জুতো, ছড়ি, ঝোলা প্যাণ্ট ও কানা-বের-করা বেতের টুপি-পরা 'ট্রাম্প'-চরিত্র চলচ্চিত্রজগতে চিরদিন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঊনিশ শো খৃষ্টাব্দের প্রথম দশক থেকে তিনি সেই যে এক রীলার বা দু' রীলার ছবির মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের অসঙ্গতির বৈচিত্র্যময় সমালোচনা শুরু করেছেন দর্শকদের মধ্যে হাসির বন্যা বইয়ে দিয়ে, আজ সাতাত্তর বছর বয়সেও তিনি তা থেকে বিরত হননি। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য তাঁকে আগেও যেমন, আজও তেমনই পীড়া দেয়, যদিও তিনি নিজে আজ একজন ধনকুবের বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর আত্মজীবনী পড়লে বোঝা কঠিন নয় দারিদ্র্য ও সামাজিক অসাম্যের কশাঘাতকে তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া রীতিমত অসম্ভব।

চ্যাপলিনের সদ্যসমাপ্ত ছবি 'এ কাউণ্টেস ফ্রম হংকং' সম্প্রতি লণ্ডন ও প্যারিস শহরে মুক্তিলাভ করেছে। দু' জায়গাতেই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে চার্লি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। ১২ই জানুয়ারী প্যারিসে উদ্বোধন প্রদর্শনীর পরে প্যারিস অপেরাতে একটি পার্টি দেওয়া হয়। এই ভোজসভায় প্যারিসের ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা, প্রিমিয়ারের স্ত্রী ম্যাডাম জর্জেস পম্পিদু এবং প্যারিসের সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত সুধীজনেরা নৃত্যগীতে মেতে উঠেছিলেন। চার্লির ছেলেমেয়েরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন। লণ্ডনে ছবিটির উদ্বোধন হয়েছিল ৫ই জানুয়ারী লিস্টার স্কোয়ারের এম্পায়ার সিনেমায়। প্রদর্শনী অন্তে প্রেক্ষাগৃহে উচ্ছ্বসিত হাততালির অভাব দেখা গিয়েছিল। যেটুকু হাততালি উঠেছিল, সেটুকু নাকি চার্লির সম্মাননার জন্যে। "এ কাউণ্টেস ফ্রম হংকং" হচ্ছে চার্লির একাশিতম চিত্র। এর আগে ১৯৫৭ সালে তিনি 'এ কিং ইন নিউইয়র্ক'' নামে যে ছবি করেছিলেন, তা আমরা আজও দেখিনি। এই ছবিটিই বা কবে দেখতে পাব, তা জানিনা। এই ছবিতে আছে আমেরিকার একজন ধনীর দুলালের সঙ্গে হংকংয়ের এক বারবনিতার প্রণয়কাহিনী। চার্লি বলেছেন : "জীবনের মতোই প্রয়োজনীয় ও দুর্বার হচ্ছে রোমাণ্টিসিজম্। সেক্স, ভালোবাসা বা মনঃসমীক্ষণের মতোই রোমাণ্টিসিজম্ হচ্ছে আধুনিক ও জীবন-ধারণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়।" তিনি নিজে এই ছবিতে একটি কেবিন স্টুয়ার্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শকদের সামনে আসেন মাত্র দু'বার। নায়ক মার্লোন ব্র্যাণ্ডো, নায়িকা সোফিয়া লোরেন থেকে শুরু করে ছবির প্রতিটি শিল্পীই চার্লি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অভিনয় করেছেন।

ছবির বিষয়বস্তু নাকি লণ্ডনের চিত্র-সমালোচকদের খুশী করতে পারেনি। তাঁরা বলেছেন—ছবির কাহিনী অত্যন্ত মামুলি, সেকেলে। কেউ কেউ আবার একে চার্লির বৃদ্ধবয়সের ব্যর্থ প্রয়াস বলে মন্তব্য করেছেন। স্বভাবতই চার্লি সমালোচকদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"লক্ষপতির সঙ্গে রূপসী বারনারীর প্রণয়-এর চেয়ে ভালো গল্প আর কী হতে পারে? —এ যদি ওদের ভালো না লাগে, তবে আমার মতে ওরা গণ্ডমূর্খ!" তিনি আরও বলেছেন : "আমার 'সিটি লাইটস' ও 'গোল্ড রাশ' ছবি দু'খানিকেও সমালোচকরা নিন্দা করেছিলেন; কিন্তু দর্শকরা তবুও ছবি দু'টি দেখেছেন এবং দেখে তাঁদের ভালোও লেগেছে। আমি দর্শকসাধারণের জন্যেই ছবি করি।" জানিনা, লণ্ডন ও প্যারিসের দর্শকসাধারণ চার্লির পক্ষে ভোট দিচ্ছেন কিনা।

তবে চার্লি চ্যাপলিন হচ্ছেন জাত-শিল্পী। এই পরিণত বয়সেও তাই তিনি আলস্যের মধ্যে দিন গুজরান করতে পারেননি। নিজের আত্মজীবনী লেখবার পরে তিনি বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করবার জন্যে তাঁর চিরা-চরিত শিল্পমাধ্যমেরই সহায়তা নিয়েছেন এবং "এ কাউণ্টেস ফ্রম হংকং" আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমরা সেই উপহার সসম্ভ্রমে গ্রহণ করব। তিনি আমাদের বহুদিন আগেই জানিয়ে রেখেছেন : "যতদিন বাঁচব, ততদিন ছবি করে যাব,

থামব না।" তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করে চলেছেন।

মধু বসু চলচ্চিত্র উৎসব ঃ

আমাদের বাঙলাদেশে কোনো একজন পরিচালকের বিভিন্ন শিল্পসৃষ্টি নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসব এর আগে কখনও হয়নি। সিনে টেকনিশিয়ানস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তাঁদের সভাপতি মধু বসুর সাতখানি ছবি নিয়ে কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে টাইগার সিনেমায় এক সপ্তাহ-ব্যাপী প্রদর্শনী ব্যবস্থা করে বাঙলার চলচ্চিত্রজগতে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ধারাবাহিকভাবে যে-সৌভাগ্যবান দর্শকেরা (১) আলিবাবা, (২) অভিনয়, (৩) কুমকুম, (৪) রাজনর্তকী, (৫) শেষের কবিতা, (৬) মহাকবি গিরীশচন্দ্র ও (৭) মাইকেল মধুসূদন দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চলচ্চিত্রের পরিচালকরূপে মধু বসুর শিল্পপ্রতিভার ক্রমবিকাশকে লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন এবং শ্রীবসুর প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শহরে প্রথম ক'দিন বিরূপ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও টাইগার সিনেমায় যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছিল বলে খবর পাওয়া গেছে।

চিত্র-সমালোচনা

পতিপত্নী (হিন্দী) ঃ মমতাজ ফিল্মস-এর নিবেদন; ৪,৪৫৬·০৮ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ উসমান আলি; পরিচালনা ঃ এস, এ, আকবর; চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ বি. এইচ. মুখারী; সঙ্গীতপরিচালনা ঃ রাহুল দেববর্মণ; গীতরচনা ঃ আনন্দ বক্সী; চিত্রগ্রহণ ঃ দারা ইঞ্জিনীয়ার; শব্দানুলেখন ঃ মোহমেদ ভাই; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ কৌশিক ও মিনু কাত্রাক; শিল্পনির্দেশনা ঃ এস, এস, সামেল; সম্পাদনা ঃ ভীষণ ব্যাঙকার; নৃত্যপরিচালনা ঃ সুরেশ; নেপথ্য-কণ্ঠদান ঃ লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, সুরেন্দ্র ও মহম্মদ রফী; রূপায়ণ ঃ নন্দা, শশীকলা, মমতাজ, লীলা মিশ্র, সঞ্জীবকুমার, সুজিতকুমার, মেহমুদ, ওমপ্রকাশ, জনি ওয়াকার, এস, এন, বন্দ্যো-পাধ্যায়, কেশব, জানকীদাস, মুলচাঁদ প্রভৃতি। জগৎ এণ্টারপ্রাইজার্স-এর পরি-বেশনায় গেল শুক্রবার, ১৩ই জানুয়ারী থেকে রক্সী, প্রিয়া, গণেশ, প্যারামাউণ্ট ইণ্টালী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

পতি ও পত্নীর মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক কি হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আধুনিকা ও সনাতনপন্থী স্ত্রীদের ভিতর যতই মতদ্বৈধতা থাকুক না কেন, মমতাজ ফিল্মস-এর "পতিপত্নী" যে একটি চমৎকার উপভোগ্য কমেডি চিত্র, এ সম্পর্কে বোধকরি কেউই ভিন্ন মত হবেন না।

ধনপ্রসাদ শেঠ ধনী হয়েছেন পরলোক-গত দাদার উপার্জিত অর্থে। কিন্তু তাঁর অতি-আধুনিকা স্ত্রী সুন্দরী সে-কথা মনে রাখতে চান না এবং সেই কারণেই ধন-প্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র অমর যখন অতি-আধুনিকা চাচীর (কাকীমার) অতি-আধুনিকা কন্যা কলাকে হীনচরিত্র লালীর সঙ্গে মেশবার জন্যে তিরস্কার করে, তখন তিনি তাকে তাঁদের প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যেতে বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অমর সনাতনপন্থী মেয়ে গৌরীকে বিবাহ করে অল্প আয়ের মধ্যেই যা-হোক করে দিন গুজরান করছিল; কিন্তু তার স্পষ্টবাদিতা আবার তার বিপদ ডেকে নিয়ে এল। সে তার যুবক মনিব মিঃ গুপ্তকে লালীর প্রণয়াসক্ত হতে দেখে তাকে সাবধান করতে গিয়ে নিজের চাকরিটা হারাল এবং কিছু-কাল পরেই দৈবদুর্ঘটনায় নিজের ডান পা-টিও হারাতে বাধ্য হল। এদিকে ধনপ্রসাদ-কন্যা কলা নানা ঘটনার পরে তার সঙ্গীতশিক্ষক পশুপতিকে বাধ্য হয়ে বিবাহ করে, কিন্তু নিজের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা বন্ধ করে না। ধনপ্রসাদও তাঁর বর্ষীয়সী স্ত্রী সুন্দরীর আধুনিক চালচলনে মনে মনে অত্যন্ত অসুখী। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক তাঁর নায়েব পদমপৎ-এর সহায়তায় কি করে তাঁর স্ত্রীর অতি-আধুনিকতা রোগের পরিসমাপ্তি ঘটালেন, উগ্রা কলাবতী কি করে তার স্বামী পশুপতির বশ্যতা স্বীকার করল এবং অমর সস্ত্রীক আবার কি করে তার কাকা-কাকীর দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে স্বগৃহে ফিরে এল, তাই চিত্রিত হয়েছে ছবির শেষাংশে।

বোম্বাই-চিহ্নিত ছবির মত কিছুটা নাচ-গানের প্রাচুর্য ও চড়া পর্দায় ভাব-প্রবণতা এবং রসিকতা থাকলেও পরিস্থিতি ও ঘটনাবৈচিত্র্যে ছবিটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ছবির সংলাপও এই উপভোগ্যতা সৃষ্টির পথে কম সহায়ক হয়নি। 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি' কথাটা অনেকেরই জানা আছে, কিন্তু স্ত্রীর উগ্র আধুনিকতা ও গৃহকর্মে অরুচি মূর্খতারই নামান্তর কিনা, তা জানি না। কাজেই কলাবতীকে সায়েস্তা করতে পশুপতির বংশদণ্ড প্রয়োগ যতই হাসির উপাদানরূপে

কাজ করুক না কেন, তাকে সজ্ঞানে সমর্থন করা কঠিন। তবে প্রধানত হাসির ছবিতে যুক্তির দিকটা চিরকালই উপেক্ষিত হয় এবং "পতিপত্নী" ছবির ক্ষেত্রেও উপেক্ষিত হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

প্রাণবন্ত অভিনয় এই ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। মেহমুদ চিরকালই ভালো অভিনয় করে থাকেন। কিন্তু এই ছবিতে ভণ্ড সঙ্গীত-শিক্ষক এবং আসলে একটি 'ট্রাম্প' রূপে পশুপতির ভূমিকায় তিনি যে আশ্চর্য উপভোগ্য অভিনয় করেছেন, তাতে যে-কোনো প্রশস্তিকেই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে। শেঠ ধনপ্রসাদ ও তাঁর মুনীমজী পদমপৎ-এর ভূমিকায় যথাক্রমে ওমপ্রকাশ ও জনিওয়াকারের জুড়ী দর্শকদের সামনে হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছেন। স্ত্রীর দুঃখে ওমপ্রকাশ যখন দুঃখিতচিত্তে সহানুভূতির সঙ্গে অশ্রুবর্ষণ করছেন, তখনও প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফেটে পড়ছে। শুধু নায়ক অমর ও তার স্ত্রী গৌরীর সঙ্গে হাসির সম্পর্ক নেই। তাদের চরিত্র সিরিয়াস এবং গুরুগম্ভীরভাবেই অভিনীত হয়েছে সঞ্জীবকুমার ও নন্দা দ্বারা। প্রেমময়ী, মৃদুস্বভাবা, স্বামীসোহাগিনী গৌরীকে আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন নন্দা। ঠিক বিপরীত চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন মমতাজ। চটুল, বেপরোয়া, অবাধ্য, আধুনিকা কলাকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন। বিপথগামিনী, অতি-আধুনিকা লালীর ভূমিকায় শশীকলা তাঁর স্বাভাবিক নাটনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। প্রৌঢ়া আধুনিকা ও পরে অনুতপ্তা গৃহিণীরূপে লীলা মিশ্রও সাবলীল সার্থক অভিনয় করেছেন। মুনীমজী পদমপৎরূপে জনিওয়াকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল তুলেছেন। অফিস-বস মিঃ গুপ্তের কঠিন ভূমিকায় সুজিতকুমার বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এ-ছাড়া অপর দুটি নাতিবৃহৎ ভূমিকায় এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় (রসিক কাকা) ও মূলচাঁদ (আপিসের অস্থায়ী ম্যানেজার) উল্লেখযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান বজায় রাখবার চেষ্টা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ছবিটি যে মূলত হাসির তা প্রথমেই বোঝা যায় এর কার্টুন পরিচয়-লিপি থেকে; অত্যন্ত সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ হয়েছে এই কার্টুন চিত্রগুলি। সাদা-কালো ফোটোগ্রাফীর মাধ্যমেও নয়নানন্দকর বহির্দৃশ্য এতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর্দৃশ্যগ্রহণেও দারা ইঞ্জিনিয়ার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির গানগুলি সুগীত ও সুপ্রযুক্ত। "আল্লা জানে ম্যয় হুঁ কোন? ক্যা হ্যায় মেরা নাম?", "পত্নী মুঝে সতাতী হৈ," "মার ডালেগা দর্দে জিগর" প্রভৃতি গান যে অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবহ-সঙ্গীত পরিমিতভাবে ব্যবহৃত হলেও কাহিনীর অত্যন্ত উপযোগী। ছবির শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

মমতাজ ফিল্মস-এর "পতিপত্নী" বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং অভিনয়গুণে উপভোগ্য চিত্র।

—নান্দীকর

কলকাতা

'এই তীর্থ' চিত্রের সঙ্গীতগ্রহণানুষ্ঠান

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'এই তীর্থ'-র শুভ সূচনা গত ১১ জানুয়ারী ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরির সঙ্গীতগ্রহণ স্টুডিওয় অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীতগ্রহণের মাধ্যমে। সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপে ছবির কয়েকটি গান গৃহীত হয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতিকার সুনীলবরণ রচিত দুটি আধুনিক গানে কণ্ঠদান করেন সুরকার-শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী ও প্রেমাংশু বসু।

'কখনো মেঘ' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ শুরু

অগ্রদূত গোষ্ঠীর নতুন ছবি 'কখনো মেঘ'-র দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় শুরু হয়েছে। চলচ্চিত্র ভারতী সংস্থা প্রযোজিত এ-কাহিনীর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণ মিত্র ও আনন্দ মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্রগ্রহণে রয়েছেন বিভূতি লাহা। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন সঙ্গীত-পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র 'হঠাৎ দেখা'

তরুণ পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত 'হঠাৎ দেখা' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষিত। তীর্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সুমিতা সান্যাল, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্যামল মিত্র ছবিটির সুরকার।

মুক্তি-প্রতীক্ষিত চিত্র 'নায়িকা সংবাদ'

বি কে প্রোডাকসন্সের 'নায়িকা সংবাদ' শীঘ্রই শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা প্রভৃতি চিত্রগৃহে শুভমুক্তি লাভ করছে। অগ্রদূত পরিচালিত এ-ছবিটির মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, সর্বেন্দর, অনুভা গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এ-ছবিটির পরিবেশক চিত্রার্পী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স।
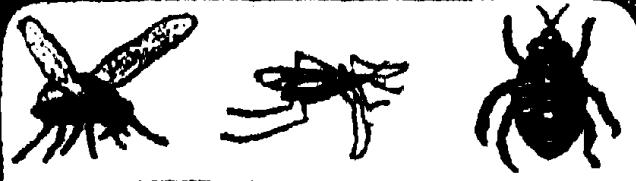
তপন সিংহ পরিচালিত **হাটে বাজারে** চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা। ফটো : অমৃত

উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'গৃহদাহ'

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওয় বর্তমানে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'-র অন্তর্দৃশ্য

গ্রহণের কাজ শেষ করছেন পরিচালক সুবোধ মিত্র। বহু জনপ্রিয় এ-কাহিনীর মহিম এবং অচলা-র চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। এছাড়া সুরেশ, মৃণাল, কেদারবাবু, রামবাবু ও রাক্ষসীর চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গীতালি রায়। উত্তমকুমার প্রযোজিত এ-চিত্রের পরিবেশক ছায়াবাণী।

বোম্বাই

বাসু ভট্টাচার্যের আগামী ছবি 'দেবী'

'তিসরী কসম'-খ্যাত পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য তাঁর দ্বিতীয় চিত্র 'উসকী কহানী' শেষ করে আগামী যে নতুন ছবিটির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেটির নাম হল 'দেবী'। এইচ এম শেঠিয়া প্রযোজিত এ-চিত্রের নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অঞ্জু মহেন্দ্র। পরীক্ষামূলক প্রয়াস হিসেবে এটির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শিলং বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে।

এ-ভি-এম'র রঙিন চিত্র 'মেহেরবান'

এ-ভি-এম'র প্রথম রঙিন চিত্র 'মেহরবান' বর্তমানে পরিচালনা করছেন ভীম সিং। একটি জনপ্রিয় তামিল ছবির এটি হিন্দী চিত্ররূপ। কিন্তু মূলে কাহিনীটির রচয়িতা হলেন আশাপূর্ণা দেবী। প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন আশাকুমার, নূতন, সুনীল দত্ত, শশিকলা, মেহমুদ, শ্যামা, অসীমকুমার, সুলোচনা ও রাজ মেহরা। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সঙ্গীত-পরিচালক রবি।

সমীর গাঙ্গুলী পরিচালিত 'শাগিদ'

সুবোধ মুখার্জি প্রোডাকসন্সের রঙিন ছবি 'শাগিদ' পরিচালনা করছেন সমীর গাঙ্গুলী। বর্তমানে ফিল্মীস্তান স্টুডিওয় ছবির অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন জয় মুখার্জি ও সায়রাবাণু। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

চিত্রমিত্র-র নতুন ছবি 'জ্যোতি'

চিত্রমিত্র সংস্থার নতুন রঙিন ছবি 'জ্যোতি'-র বহির্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি পানভেল অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এই বহির্দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার কণ্ঠে একটি রোমান্টিক গান গ্রহণ করেছেন পরিচালক দুলাল গুহ। নিরঞ্জন পাল রচিত 'ফেইথ অফ এ চাইল্ড' অবলম্বনে এ-কাহিনীর চিত্রনাট্য বিধৃত। ছবির মূলে চরিত্রে অভিনয় করছেন সঞ্জীবকুমার, নিবেদিতা, অভি ভট্টাচার্য, জগদীপ এবং নবাগত কিরণ। সঙ্গীত-পরিচালনায় রয়েছেন শচীনদেব বর্মণ।

মঞ্চাভিনয়

বহুরূপী

সুগভীর বক্তব্যসমৃদ্ধ নাটকের মঞ্চরূপায়ণ আজ আর হয়তো খুব বিরল নয়, সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে বহুমুখীর প্রযোজনায় রতন ঘোষের 'ফেরা' নাটকের অভিনয় দেখে এ বিশ্বাস স্থির প্রতিষ্ঠার ভাষা পেয়েছে। কর্মে নিষ্ঠাবান, প্রতিজ্ঞায় কঠোর আধুনিককালের বিজ্ঞানী 'ঋত্বিক' গবেষণাগারে নিজেকে বিলীন করে রেখেছে অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু এই সাধনায় ধর্ম, আনন্দ, বিবেককে স্তরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, ভালোবাসাকে করা হয়েছে বন্দী। ভালোবাসার মূর্তিমতী প্রতিমা 'শর্বরী' কান্নায় আকুল হয়ে উঠে মুক্তি চাইছে ঋত্বিকের কাছে। যন্ত্রের বেগ নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চাইছে বিজ্ঞানীকে। ইতিহাসের চেতনা নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে 'সর্বকাল,' দর্শনের প্রদীপ জেবলে 'নির্বোধ' বোঝাতে চাইছে, অমৃতলাভের পথ এ নয়। ঋত্বিক তবু সাধনায় অটল। ধর্মহীন আলোর গোলক আকাশে সে ছুঁড়ে মারবেই। নামে গোত্রহীন '৩৪৭' যৌবনের সতেজ ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ জানালো। আকাশ, বাতাস, সমুদ্রকল্লোলে 'না, না, না' ধ্বনি উঠলো। প্রেমহীন আলোর গোলক ছুঁড়ে মারতে তবু সে উন্মাদ। নিষ্ঠুর উন্মাদনায় সে কাজ হোল। গোলকের আঘাতে অনেকদিনের সভ্যতার সৌধ চূর্ণ হোল। কিন্তু এই ধ্বংসই তো শেষ কথা নয়। এরপর এলো মৃত্যুশীতল মৌনতা। তারপর আবার নতুন সৃষ্টি, মানুষের আবার নতুন করে আত্মবোধন। এবার কিন্তু বিজ্ঞানী 'শর্বরী'র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভালোবাসার কাছে, দর্শনের কাছে, ইতিহাসের কাছে নিজেকে এনে সে ফিরে পেলো অমৃতময় জীবনের মাধুর্যকে।

রতন ঘোষের 'ফেরা' নাটকে অমৃতলাভের জন্য আগামীকালের সংগ্রাম ভাষা পেয়েছে। সে সংগ্রাম হোল মৃত্যুর মৌনতা থেকে জীবনের মুখরতায় উত্তরণ। রূপক-সাংকেতিক নাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যই এই নাটকে চিহ্নিত। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের মৌল সম্পদ 'ফেরা'র নাট্যকারকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাই ঋত্বিকে জালে ঘেরা রাজার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে. 'নন্দিনী'র কিছু আভাস ভাষা পেয়েছে 'শর্বরী'র সংলাপে। তবু বলবো নতুন সভ্যতার সৃষ্টিসংকেতের মধ্যে নাট্যকারের নিষ্ঠা, আর সূক্ষ্ম মানসিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী।

এই বক্তব্যনিষ্ঠ নাটকের সফল মঞ্চরূপায়ণের জন্য প্রতিটি শিল্পীর উপলব্ধি যে স্তরে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন তা হয়নি। তাই অভিনয় আর নাটকের বক্তব্যের মধ্যে গুরুত্ব থেকেছে অনেক। এ বিষয় সম্পর্কে নাট্যনির্দেশক রণজিৎ বসুর আরো বেশী সচেতনতার প্রয়োজন ছিল। তাঁর প্রয়াসে রূপক নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনার আভাস খুব একটা মূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। অভিনয়ের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'সর্বকাল' চরিত্রে সুভাষ আচার্য। তাঁর অভিনয় অত্যন্ত সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক। 'ঋত্বিকে'র ভূমিকায় অসিত রায় ঐতিহাসিক নাটকের নাটকীয় আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। প্রভাস চাটার্জী 'নির্বোধে'র ভূমিকায় প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেননি। নীনা ঘোষের অভিনয়ে প্রেমের

গভীরতা আর আনন্দের উন্মাদনা, কোনটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন পশুপতি দে, অভিজিৎ ব্যানার্জী, নীলু ব্যানার্জী, শংকর মুখার্জী, শঙ্কর নারায়ণ।

পুতুল নাচের ইতিকথা

সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে বার্ণস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাবৃন্দ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র নাট্যরূপ পরিবেশন করেছেন। সমগ্র নাটকের অভিনয়ে সার্থক নাট্য-প্রযোজনার ছাপ ছিল। যাঁরা অভিনয়ে সবার প্রশংসা পান তাঁরা হলেন কাঞ্চন চট্টোপাধ্যায়, অজিতকুমার পাল, রবীন সুর, পুস্কর মুখোপাধ্যায়, উপেন ভট্টাচার্য, মোহন মল্লিক, শ্যামল ভট্টাচার্য, গোপাল সরকার, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়। নাটকের অন্যান্য শিল্পীরা হোলেন কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দাস, অনিল দত্ত, সুকুমার সিংহ। সলিল দত্তের নাট্যনির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার আভাস আছে।

"মাটির ঘর"

কিছুদিন আগে 'বলাকা'র শিল্পিবৃন্দ মুক্তঅংগনে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' অভিনয় করলেন। দিলীপ চৌধুরী পরিচালিত এ নাটকের অভিনয় সবার স্বীকৃতি পেয়েছে। নাটকের প্রধান মুহূর্ত-গুলো শিল্পীদের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপ চৌধুরী, শ্যামলকুমার, রমেশ রায়, নবকুমার, অরুণকুমার, বিশ্বনাথ রায়, অচিন রায়, বংকিম দাস, নবীন সেন, সীমা গুহঠাকুরতা, স্মৃতি দত্ত, রমা সান্যাল, পদ্মা মিত্র।

জংগম নাট্যসংস্থা

সম্প্রতি চন্দননগর 'নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে' স্থানীয় 'জংগম নাট্যসংস্থা' 'নোতুন নাটক' মঞ্চস্থ করেছেন। এ নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে সৌখীন নাট্য-সংস্থার সুখ-দুঃখের বিভিন্ন মুহূর্ত নিয়ে। কাহিনীর বিস্তারে আর নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টিতে কিছু দুর্বলতা স্পষ্ট হোলেও, নাটকটির আবেদন সর্বজনগ্রাহী হয়েছে। শিল্পীদের দলগত অভিনয় নৈপুণ্য নাটকের কাহিনীগত অনেক অভাবকে ঢেকে দিয়েছে। ভালো অভিনয় করেছেন শিশির দাশগুপ্ত, অনিল চক্রবর্তী, উৎপল গুপ্তবিশ্বাস, শিশির মুখোপাধ্যায়, বীণা সেন। নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেন অমর মুখোপাধ্যায়।

নব চতুরঙ্গ

'নব চতুরংগে'র শিল্পীরা কিছুদিন আগে 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট' মঞ্চে সমীর ঘোষের "জিজ্ঞাসা" নাটক অভিনয় করেছেন। এই নাটকের কাহিনীতে প্রচুর সংঘাতের মুহূর্ত ছিল, সংঘাতকে মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেন সতীশ সামন্ত, তুষার সরকার, রবীন্দ্র মান্না, সুনীল সরকার, বিপ্লব দাস, বিমলেন্দু মজুমদার, সমীর ঘোষ, স্বপ্না ভট্টাচার্য, সবিতা দাস প্রভৃতি। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন কুমারেশ দাস।

বাণীরূপা

সম্প্রতি রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে দুটি নাটকের অভিনয় করলেন 'বাণীরূপা'র শিল্পিবৃন্দে। নাটক দুটির প্রথমটি হোল সৌরীন সেনের 'আখের স্বাদ নোনতা' কাহিনীর নাট্যরূপ। কিউবা বিপ্লবের পট-ভূমিতে রচিত এই গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন ভোলা দত্ত। দ্বিতীয় নাটকটির নাম 'ঝুমুর'। দু'টি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী, বাচ্চু ভট্টাচার্য, দীপক গুহ, বাসুদেব লাহিড়ী, প্রদ্যোৎ গংগোপাধ্যায়, চঞ্চল দত্ত, কানু ভট্টাচার্য, বেলা রায়, বাবলু দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

রংগপ্রিয়

উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'রংগপ্রিয়ে'র শিল্পিবৃন্দ 'প্রতাপ মেমো-রিয়াল হলে' দুটি নাটক সম্প্রতি মঞ্চস্থ করেছেন। দুটি নাটকের নাম হোল 'অতীত ফিরে আসে', 'অথ ত্রিকালযজ্ঞ কথা'। নাটক দুটি রচনা করেছেন রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী। নির্দেশনার দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। দু'টি নাটকে সুঅভিনয় করেন সুধাংশু ভট্টাচার্য,

এই তীর্থ চিত্রের সংগীত গ্রহণকালে সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পরিচালক অরবিন্দ মুখার্জি ও গীতিকার সুনীলবরণ।
ফটো : অমৃত

মৃদুল চট্টোপাধ্যায়, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ গুপ্ত, কানাই দে, রামসদয় মুখোপাধ্যায়, অনিমেষ মল্লিক।

শালিমার গ্রুপ রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি 'রংমহলে' শালিমার গ্রুপ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর' নাটকটি অভিনয় করেছেন। সংঘবদ্ধ অভিনয় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন অবনীকুমার ব্রহ্ম, সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস, আশুতোষ মাইতি, মোহিত মণ্ডল, অমর চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, মন্মথ সান্যাল, নিতাইপদ ঘোষ, প্রভাত কোলে, সুভাষ মণ্ডল, অনিল রায়চৌধুরী, জহর দত্ত, তপন গুপ্ত, মায়া দাস, মণিকা ঘোষ, গীতা মুখার্জী, প্রীতিকণা পাল।

ভূপালে বাংলা নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি ভূপালে ভারী বৈদ্যুতিক কারখানার বাঙালী ক্লাবের সভাবৃন্দ 'অলীকবাবু', 'মো-চোর,' 'এক পেয়ালা কফি' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। প্রবাসী বাঙালী শিল্পীদের এই তিনটি নাটকের অভিনয় সবার স্বীকৃতি পায়। এই তিনটি নাটকের কৃতী শিল্পীরা হোলেন শান্তা মুখোপাধ্যায়, সুনীল ভট্টাচার্য, চিন্ময়ী নাগ, দীপক দাস, আরতি দাস, হিরন্ময় ভট্টাচার্য, প্রবোধ সেন, তুষার বাগচী, অনিল মিত্র।

নাট্য প্রতিযোগিতা

'বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ' আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক 'গিরিশ পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২৭শে জানুয়ারী। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ 'বিশ্বরূপা'র কার্যালয়ে জানা যাবে।

চুঁচুড়ার 'কল্লোল গোষ্ঠী' এবারেও একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী। যোগাযোগের ঠিকানা : কল্লোল, সত্যেশ্বরতলা, পালগলি, চুঁচুড়া।

নাটমহলের 'কেউ দায়ী নয়'

অন্তরাল, তরঙ্গ, বাস্তুভিটা, মোকাবিলা, মশাল প্রভৃতি নাটক দিয়ে একদা যিনি বাংলার নাটজগতে আলোড়ন এনেছিলেন এবার মঞ্চে আসছে তাঁরই একটি আশ্চর্য নাটক 'কেউ দায়ী নয়'। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ নাটক তাঁরই নির্দেশনায় ও নাটমহলের প্রযোজনায় মঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে আগামী ৩১শে জানুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। নির্দেশনায় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণে থাকবেন চিত্রিতা মণ্ডল, মায়া ঘোষ, মঞ্জুলা মুখার্জী, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল ঘোষ, নীহার তালুকদার, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সুনির্মল ঘোষ। আবহসংগীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন খ্যাতনাম্নী মার্গসংগীত গায়িকা শ্রীমতী অর্পণা চক্রবর্তী।

সাহিত্যিকদের অভিনয়

২৯এ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে সব-পেয়েছির আসরের একবিংশ বার্ষিক সম্মেলনে প্রথিতযশা কথা-সাহিত্যিকা আশাপূর্ণা দেবীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পর বাংলাদেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ চিত্রিতা দেবীর 'বেকার সংঘ' কৌতুক-নাট্যটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করেন। এতে অংশ গ্রহণ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, জরাসন্ধ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিমল রায়, হিমালয় নির্ঝর সিংহ, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব গুপ্ত, ধীরেন বল, দিলীপ দাশগুপ্ত, রমেন মল্লিক, রমেন মজুমদার, হরেন ঘটক, কুমারেশ ঘোষ, বেলা দেবী, দেবী মুখোপাধ্যায় ও স্বপন-বুড়ো। নাটকটি পরিচালনা করেন কথা-সাহিত্যিক —শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ নাট্য-প্রতিযোগিতা

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ৬ষ্ঠ বার্ষিক পূর্ণাঙ্গ গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আসছে ২৭এ জানুয়ারী '৬৭'। ১৮টি বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হবে। নিয়মাবলীসহ আবেদনপত্র বিশ্বরূপা থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

সুরভারতী

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের প্ল্যাটিনাম জুবিলীতে সুরভারতী সংস্কৃত সংস্থা অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষের সংস্কৃত নাটক 'ধর্মাশোকম' সাফল্যের সংগে পরিবেশন করেন। সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসা পান জগৎপতি, কানাই, বীথিকা ও শ্রীমান শঙ্কর, সরল চন্দ্র, লোকনাথ, ইলা ও অন্যান্য শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন নাট্যকার স্বয়ং।

আজকাল

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিসিন ডিলার্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সম্প্রতি 'আজকাল' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি'র বিভিন্ন ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সুভাষ শ্রীমানী, বিমল রায়, রাবু দত্ত, অনুপ বিশ্বাস, হীরেন রায়, মদন শর্মা, বলরাম দে, সন্ন্যাসী বাগ, ইন্দ্রজিৎ জৈন, মদন কুণ্ডু, তৃপ্তি দাস, কল্পনা ভট্টাচার্য।
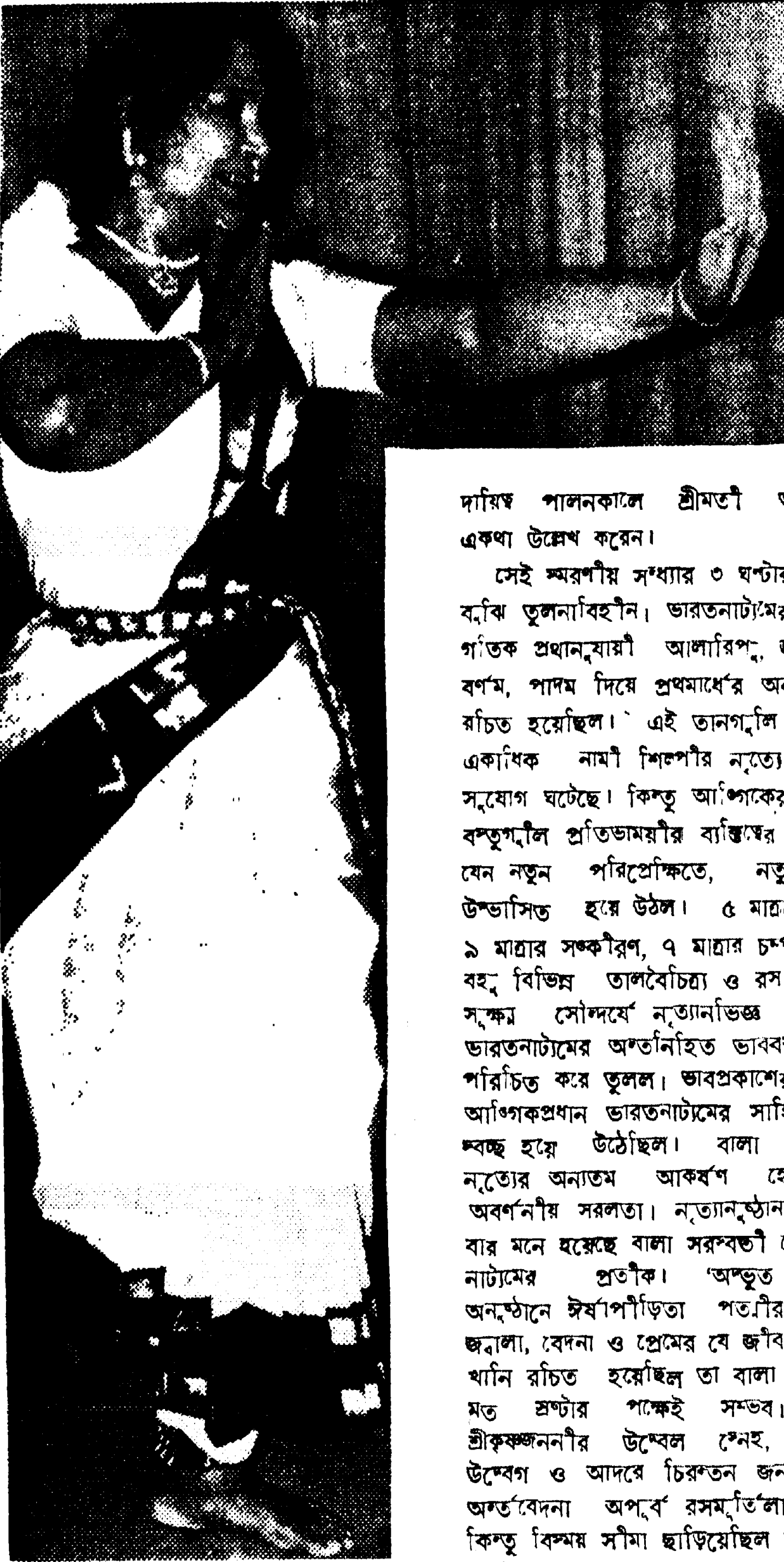
বালা সরস্বতী

গানের জলসা

'ধর্মের সঙ্গে যদি ভারতনাট্যমের কোনো যোগ থাকে, পদ্মভূষণ বালা সরস্বতী তাঁর শিল্পী-জীবনের সাধনা দিয়ে সে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সরলতার সঙ্গে শিল্পের যদি কোনো সম্পর্ক থাকে—সে সত্যও বালাই আমাদের স্মরণ করিয়েছেন'—পাঠভবনের সাহায্যার্থে আয়োজিত রবীন্দ্রসদনে বালা সরস্বতীর নৃত্যানুষ্ঠানের পূর্বে দর্শকবৃন্দের সামনে শিল্পী পরিচিতির গুরু-দায়িত্ব পালনকালে শ্রীমতী অমলাশংকর একথা উল্লেখ করেন।

সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার ৩ ঘণ্টার অনুষ্ঠান বুঝি তুলনাবিহীন। ভারতনাট্যমের গতানুগতিক প্রথানুযায়ী আলারিপ্পু, জাতিস্বরম, বর্ণম, পাদম দিয়ে প্রথমার্ধের অনুষ্ঠানসূচী রচিত হয়েছিল। এই তানগুলি এর আগে একাধিক নামী শিল্পীর নৃত্যে দেখবার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু আঙ্গিকের নিয়মবন্ধ বস্তুগুলি প্রতিভাময়ীর ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে যেন নতুন পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ৫ মাত্রার খণ্ডম, ৯ মাত্রার সঙ্কীরণ, ৭ মাত্রার চম্পু আরো বহু বিভিন্ন তালবৈচিত্র্য ও রস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যে নৃত্যানভিজ্ঞ দর্শককেও ভারতনাট্যমের অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর সঙ্গে পরিচিত করে তুলল। ভাবপ্রকাশের দক্ষতায় আঙ্গিকপ্রধান ভারতনাট্যমের সাহিত্যও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। বালা সরস্বতীর নৃত্যের অন্যতম আকর্ষণ হোল তাঁর অবর্ণনীয় সরলতা। নৃত্যানুষ্ঠানকালে বার-বার মনে হয়েছে বালা সরস্বতী যেন ভারতনাট্যমের প্রতীক। 'অদ্ভুত সলুবল' অনুষ্ঠানে ঈর্ষাপীড়িতা পত্নীর অন্তর্দাহ, জ্বালা, বেদনা ও প্রেমের যে জীবন্ত ছবিখানি রচিত হয়েছিল তা বালা সরস্বতীর মত স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। 'কৃষ্ণায়ম'এ শ্রীকৃষ্ণজননীর উদ্বেল স্নেহ, ব্যাকুলতা, উদ্বেগ ও আদরে চিরন্তন জননী-হৃদয়ের অন্তর্বেদনা অপূর্ব রসমূর্তিলাভ করেছে। কিন্তু বিস্ময় সীমা ছাড়িয়েছিল তাঁর নবরস পর্যায়ে। শৃঙ্গার, লাস্য, অদ্ভুত ইত্যাদি রসরূপায়ণে দেহসৌন্দর্য ও যৌবনসুষমার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এর আগে খ্যাতনামা শিল্পী সৌন্দর্যময়ীদের নবরস রূপায়ণ দেখে আনন্দ পেয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি এক-একটি ভঙ্গী ও চাউনীর বিদ্যুতে এই জড়দেহকে ভাস্কর্যসৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে দেখে। কিন্তু সে ভাবমূর্তিকে সৌন্দর্যঘন করে তোলায় যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির অবদান কম নয়। তাই সে সৌন্দর্যরূপ দর্শকের কাছে নয়নাভিরাম। কিন্তু রূপের দেউল পেরিয়ে শিল্পী যখন অপরূপের অন্তরে পৌঁছে যান তখন দর্শকবৃন্দকেও দৃশ্যআনন্দের সীমা ছাড়িয়ে শব্দ উপলব্ধিলোকে পৌঁছে দেন। সে অনুভবের আলোয় যে আনন্দঘন মুহূর্তের দেখা মেলে—তার কাছে ম্লান হয়ে যায় দেহ-সৌন্দর্যের চমক। গতানুগতিক সীমার বন্ধনমুক্ত করে বালা সরস্বতী আমাদের আনন্দের অমৃতলোকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁর অঘটনাঘটন পটীয়সী শক্তির বলে নৃত্যের মর্মবস্তুর সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টি ঘটিয়েছেন, চেতনার রূপান্তর এনেছেন—তার জন্য আমরা ঋণী এই মহাশিল্পীর কাছে এবং পাঠভবনের উদ্যোক্তৃবৃন্দের কাছেও।

নৃত্যনাট্যে বৈজয়ন্তীমালা

ভারতনাট্যমের আঙ্গিকে রচিত নৃত্যনাট্য দেখবার সুযোগ বড়একটা মেলে না। কিন্তু মহিশোর অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই রকম একটি ব্যালে আমরা সম্প্রতি দেখেছি। বিখ্যাত তামিল কবি কুঞ্জভারতী রচিত 'অজাগর কুরাভঞ্জী' আখ্যানভিত্তিতে এই নৃত্যনাট্য পরিকল্পিত। স্থানীয় এক দেবতার প্রতি রূপময়ী তরুণীর প্রেমসঞ্চার, মিলন-বাসনা এবং পরিশেষে মিলন—এককথায় জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একাত্মতা—এই নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু।

বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যরচনাশক্তির ওপর উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করেছে এই ব্যালে। অভিনয়, নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে পরিবেশিতব্য বস্তুর আবেগ, কল্পনা ও মেজাজকে তিনি কিছু পরিমাণে পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। অন্যান্য সহশিল্পীবৃন্দও নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। স্থানীয় দৃশ্যাবলী, পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্যপট এবং প্রধান দৃশ্যগুলির ধর্মানুষ্ঠানের আবেগ এই ব্যালেকে আকর্ষণীয় করেছে।

নায়িকারূপিণী বৈজয়ন্তীমালা প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর অনুরাগীবৃন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছেন। জাতিস্বরম, রেচক ও আলারিপ্পুর সম্মিলনে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের আনন্দ পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার, মিলন-ব্যাকুলতা ও মিলন—অনুভূতির এই তিনটি স্তরের মধ্যে যদি দ্বিতীয় স্তর তথা দুর্নিবার আকুলতা ও বেদনার দিকটির ওপর জোর দিতেন তবে অন্তর্মুখীন গভীরতায় তাঁর শিল্পীপরিচয় মুদ্রিত হত। জিপসী মেয়ের ভূমিকায় সুশীলার প্রাণবন্ত নৃত্য আনন্দদায়ক। দক্ষিণ ভারতীয় লোক-নৃত্যগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবন-বেদনা ও চিন্তাভাবনার বিশ্বাসযোগ্য রূপ প্রতিফলিত।

কেদারগোলী, ঝিনুকোটি, বেগেটা ইত্যাদি দক্ষিণভারতীয় রাগে পরিবেশিত রূপক, আদি, খন্দ ও তিস্র তালের সংগীত খুব উপভোগ্য হয়েছে। মাদুরাই এন, কৃষ্ণানরচিত 'মধ্যমাবতী' রাগ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

ব্যাট বলের মহিমা

অজয় বসু

চারিদিকে অব্যবস্থার অভিশাপ। তারই জের টানতে মাঝপথে পুলিশী লাঠি-গ্যাসের সবিক্রম আস্ফালন। শেষ পর্যন্ত অসহায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের পলায়নী মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইডেনে এবার যে টেস্ট খেলা হয়ে গেল তার সামগ্রিক স্মৃতি মনে ধরে রাখার দরকার বিশেষ নেই। এ স্মৃতি দুঃস্বপ্ন। বেদনায় ভারাক্রান্ত। কিন্তু তাই বলে সাগ্রহে দু-হাত বাড়িয়ে দু-একটি মুহূর্তকেও কি ধরে রাখতে চাইবো না? নিশ্চয়ই চাইবো। খেলা, নিছক খেলা দেখতেই যাঁদের মাঠে আগমন তাঁরা চাইবেন। না চাইলে প্রতিভার অবদানের অমর্যাদা ঘটানো হবে যে!

টেস্ট খেলা খেলাই। বাড়তী মূল্যের। টিকিটের হাঁক তুলে এবং সেই টিকিটের জন্যে হাহাকারে গগন ফাটিয়ে খেলা ছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ অন্যকিছুর নামাবলী সেই খেলার অঙ্গে চাপানো গেলেও, রং-বেরংয়া প্রজাপতিদের বর্ণচ্ছটায় মাঠের অঙ্গ-সজ্জার রূপ উছলে পড়লেও, তারকা আর ক্রীড়াবিদদের জীবনকাব্যের রোমান্টিক দৃশ্য ঘিরে অনুষ্ঠানকেন্দ্র ম্যারেজ রেজিস্ট্রি দপ্তরে পরিণত হলেও এবং কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, বিদগ্ধজন-সমাবেশে পরিপার্শ্ব খেলা ছেড়ে মেলার মেজাজে জড়িয়ে পড়লেও আসলে ইডেনে মূল আয়োজন ছিল খেলারই --ক্রিকেটের।

ব্যাট ও বলের দ্বন্দ্ব ঘিরে যে ক্রিকেট বেগবান প্রাণের উত্তাপে উষ্ণ, দক্ষতার, প্রতিভার স্পর্শে আকর্ষণীয়, রমনীয়। যে ক্রিকেট ব্যাট কখনো সবলের হাতের হাতিয়ার, কখনো শিল্পীর হাতের তুলি অথবা উড়ন্ত, ঝুলন্ত, ছুটন্ত বলের বিচিত্র গতি ও প্রকৃতিতে যে ক্রিকেটে বুদ্ধি ও সামর্থ্যের জোয়ার বয়ে যায় সেই ক্রিকেটই ছিল ইডেনের দেবালয়ে জাগ্রত বিগ্রহ। কে বা কারা ভক্তিভরে অর্ঘ্য সাজিয়ে বিগ্রহের পায়ে তা রাখতে পেরেছে, বিচার্য তাই। বিচারের ভার দর্শককুলের, ক্রিকেট-অভিজ্ঞ রসিকজনের। তাঁরা নানাজন। নানা মুনির নানা মতও থাকতে পারে। কিন্তু আমার মতে ইডেনে এবার ক্রিকেটের দেবতার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছেন মাত্র দুজন—গ্যারি সোবার্স ও লান্স গিবস। বাড়ন্ত ছোকরা, উঠতি লয়েডও পারতে পারতেন। এ অধিকারে একদিন তিনি নিশ্চয়ই ভাগ বসাবেন। কিন্তু ইডেনে প্রথম আবির্ভাবে তিনি শুধু দেবালয়ের দোড়গোড়াতে গিয়েই থেমে পড়ছেন।

গারফিল্ড সোবার্স! একাল ও সর্বকালের নিরিখে এক দিক্‌পাল ক্রিকেটার। খেলার আনন্দে মেতে থেকেও বিশ্ব-বিজয়ের সঙ্গতি জোগাড় করে নিতে পারে বলে যার সুনাম সর্বজনবিদিত সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কর্ণধার এই সোবার্স। যুদ্ধজয়ী বীর তিনি। ইংলণ্ডের মাঠ, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলার সময় স্বদেশের মাঠও তাঁর বীরত্ব প্রত্যক্ষ করেছে। কলকাতারও অভিজ্ঞতা অনুরূপ। তবে দলের জয়ে যতো না হোক্, দলের হারানো নাম ফিরিয়ে আনার সাফল্যেই সোবার্সের মহিমা আরও সপ্রকাশ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা ঝড়ের আগে ছুটতে, ঘড়ির কাঁটাকে হার মানিয়ে রান তুলতে অভ্যস্ত, এই কথাই আমরা শুনে আসছি। সে কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আমরা অতীতে স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু এবার ইডেনে হান্ট, বুচার, নার্স এবং আগেকার সেই দিল্‌খোলা ব্যাটসম্যান রোহন কানহাইকে দ্রুত রান তোলায় সক্রিয় থাকতে দেখিনি বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে ধারণায় জট পাকিয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ উইকেটে থাকার পরও যখন কেউ নিজেদের দিলদারিয়া স্বভাব ও দলের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারলেন না, তখন মনে হয়েছিল যে বিশ্ব-বিজয়ীর স্বীকৃতি বুঝি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ঘাড়েও ভূত হয়ে চড়েছে। চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা রাখতে তাই বুচার, নার্স, কানহাইয়েরা উইকেট আঁকড়ে থাকতে চাইছেন, খেলার আনন্দে মেতে উঠতে না।

আশ্চর্য পরিবর্তন রোহান কানহাইয়ের! ১৯৫৮ সালে এই ইডেনেই কানহাই রকমারি মারের মণি-মুক্তা ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। কি সহজ, সাবলীল ভঙ্গী ছিল তাঁর। কেতাবী মারগুলি কানহাইয়ের নিজস্ব তূন থেকে ঠিকরে পড়ছিল আরও পরিচ্ছন্ন চেহারা নিয়ে। দু-চোখ ভরে কানহাইয়ের খেলার সেই শ্রীময় রূপ দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল মাঠ ছেড়ে মন বুঝি কেন্ স্বপ্নলোকে ঠাঁই নিয়েছে।

কিন্তু সেদিনের কানহাইয়ের সঙ্গে আজকের কানহাইয়ের কতো তফাৎ! সেদিন ৩৯০ মিনিটে ২৫৬ রাণ করতে কানহাইয়ের ব্যাট বলকে বিয়াল্লিশবার সীমানার পারে রেখে এসেছিল। আর আজ? নব্বইটি রান কুড়োতেই প্রায় পুরো একটি দিন (২৯৫ মিনিট) কেটে গেল। গতি মন্থরতার বাঁধনে কানহাই আজ ভারাক্রান্ত। প্রয়োগরীতির পুরোনো অধিগত বিদ্যাও হাতছাড়া। অনেক ক্ষেত্রে জড়োসড়ো ভাব। কখনো বা ক্রীড়ারীতি পরিপাটি বিন্যাসের অভাবে রীতিমতো এলোমেলো। সে কানহাই হারিয়ে গিয়েছেন তাঁর ব্যাটে আজ বাঁশীর সুর নেই। উচ্ছিষ্টের মতো যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা অতি সাধারণ খেলোয়াড়েরই মূলধন। এ মূলধন দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটের আবেগময় সনাতন চরিত্রটুকু অটুট রাখা যায়নি। যায়ও নি।

কানহাই বদলে গিয়েছেন বলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ব্যাটিংয়ের ধরণও অনেকখানি পালটে গিয়েছে। শুধু রূপান্তর ঘটেনি গ্যারি সোবার্সের। ব্যাটের দাপট আগের মতোই। মারে জোরও তেমনি। বরং আগের চেয়ে তাঁর ব্যাটের দায়িত্ববোধ বেড়েছে। বাড়বে বৈকি। এখন সোবার্স শুধু দলের একজনই নন, দলের অধিনায়ক। এই দায়িত্ববোধ বোধহয় সোবার্সের ব্যাটকে আরও পরিণত ও আরও ছিমছাম করে তুলেছে। আগে ব্যাটের আস্ফালন ছিল বেশি। এখন আস্ফালন কম, কিন্তু মারে জোর সমানই এবং পেছনের পায়ে ভর রেখে স্কোয়ার ড্রাইভ মারার মেজাজটি আগের চেয়ে অনেক পরিশীলিত, শ্রীমণ্ডিত।

সোবার্স যখন ব্যাট হাতে মাঠে এসে দাঁড়ান, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সব চালু ব্যাটসম্যানই রান তোলার নিরিখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। পিচে বল পড়ে তেমন জোরে বল ছুটছে না কিন্তু নিজেরাও ওঁরা পিচের মুখে ছুটে যেতে পারছেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম, মান সব তখন যেতে বসেছে। রান উঠছে কিন্তু খেলায় প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা মাঠে থাকতেও না। দেখে বীতশ্রদ্ধ দর্শক ধিক্কার ছুঁড়ে ব্যারাক পর্যন্ত করলেন।

কিন্তু যেই এলেন সোবার্স অমনি ইডেনের মেজাজ ফিরে গেল।

একই পরিস্থিতি এবং অভিন্ন বোলারদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই সোবার্স খেলার মতোই খেলা খেললেন। রান ওঠার গতি বাড়লো। মারের মতো মার পড়লো। দলের নাম হারিয়ে যাওয়ার মুখে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো। গ্যারি সোবার্স সতীর্থদের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করে তুলে জানিয়ে দিলেন যে, একা তিনিই দলের অনেকখানি।

অনেকখানি মানে। রান তুলবেন, ব্যাটের ঘায়ে প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত হানবেন। পেস ও স্পিন বোলিংয়ের ফাঁদে জড়িয়ে বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের নাকাল করে তুলবেন। আবার উইকেটের কাছে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে ফুল পাড়ার পদ্ধতিতে ছোঁ মেরে শক্ত ক্যাচগুলিও লুফে নেবেন। কিন্তু এই একজন খেলোয়াড়কে পরিত্রাণ কর্তা বলে ধরে নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আর কতোদিনই বা শীর্ষাসন অবিচল রাখতে চাইছে? মারাত্মক ডবলিউ ত্রয়ীর স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন কানহাই ও সোবার্স। তাঁদের দুজনকে ঘিরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দীর্ঘদিন ক্রিকেটে তুঙ্গীভাব বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এখন কানহাইয়ের সুরে দাঁড়াবার পালা। তাই সবদিক সামলাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আবার নতুন প্রতিভার সন্ধানে ফিরতে হবে। কোথায় সেই প্রতিভা? হয়তো উত্তরকালে বলতে পারবে সেই প্রতিভা ক্লাইভ লয়েড কিনা।

প'চাশী মিনিটে সত্তরটি রান করে একমাত্র সোবার্সই বুঝিয়ে দিলেন যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেকী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি। তাঁর ব্যাটিংই জাতীয় ক্রিকেটের উজ্জীবনের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি। এই সোবার্স এর আগে যতোবার ইডেনে খেলেছেন ততোবারই তিন অঙ্কে সাজবার পর তাঁর ইনিংস থেমেছে। এবারে অতোদূর এগোনো সম্ভবপর হয়নি বটে

কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বিচারে তাঁর এবারের রানের মূল্য ও প্রভাব আগের অনেকবারের সেঞ্চুরীর চেয়ে কম নয়। যেহেতু পঁচাশী মিনিটে সংগৃহীত ওই সত্তরটি রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নাম, মান, দুই রাখতে মস্তো ভূমিকা নিয়েছে। সোবার্সের কাছে আজ তাঁর নিজের চেয়ে দলের নাম নিশ্চয়ই আরও প্রিয়। কারণ তিনিই দলপতি।

মারের খেলা খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা দ্রুতগতিতে রান করতে পারেন এবং তাঁদের বোলারেরা তেমনি জোরে বল ছাড়তে পারেন—এই দুটি বাক্যেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটের মূল পরিচয় বোঝানো যায়। কিন্তু এবার ইডেনে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যদিও বা সোবার্স দলের পরিচয়ের কিছুটা নমুনা দর্শকদের সামনে রাখতে পেরেছিলেন কিন্তু পেস বোলারদের মধ্যে কেউই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিংয়ের মাহাত্ম্য বোঝাতে পারেন নি। অবশ্য তার অতি সংগত কারণও ছিল।

সেরা ফাস্ট বোলার ওয়েসলি হলের পায়ে ব্যথা। সারাক্ষণ পায়ে ব্যাণ্ডেজ—নিক্যাপ জড়িয়ে তিনি মাঠে চলাফেরা করেছেন। কাজেই তিনি তেমন জোরে বল তো করেননি এবং সোবার্সও তাঁর আঘাতের কথা ভেবে তাঁকে বিশেষ বল করতে ডাকেনও নি। তাছাড়া ইডেনের উইকেট ফাস্ট বোলিংয়ের অনুকূল ছিল না। বল পড়ে গদাই লস্করী চালে ছুটেছে। এ উইকেটে ফাস্ট বোলারদের মেহনত বৃথায় যায় বলে না হল, না গ্রিফিথ, কেউই প্রাণ ঢেলে জোরে বল করতে চাননি। তা বলে উঁচু মানের বোলিংয়ের নমুনা দেখার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখেননি লান্স গিবস এবং স্বয়ং সোবার্স।

ক্রিকেটার মহলে একদা হাসি-ঠাট্টার ছলে বলা হোতো যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলাররা তো শুধু জোরেই বল করতে জানেন। স্লো-স্পিনের ধার কেউই ধারেন না। তাঁদের কাউকে দিয়ে আস্তে স্পিন বল করানোর ইচ্ছে থাকলে তাঁর পিতামহকে প্রথম সেই কাজে নামাতে হবে এবং তিন পুরুষের নিষ্ঠা যদি থাকে তবেই সে দেশের কেউ স্লো স্পিন বোলার হতে পারেন। নইলে নয়। কথাটা হয়তো এক সময় খাটতো, কিন্তু আজ সে কথার আধখানাও খাঁটি নয়। রামাধিন-ভ্যালেন্টাইনেরা পথিকৃৎ। উত্তরসূরী গিবস, সোবার্স সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রমাণ করেছেন যে পেসের মতো স্পিন বোলিং করার বিষয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলারদের আজ জুড়ি পাওয়া ভার। রামাধিন-ভ্যালেন্টাইনের জুড়ি ছিল না। গিবস-সোবার্সেরও. নিদেনপক্ষে লান্স গিবসেরও জুড়ি নেই।

ল্যান্স গিবস একালের সর্বশ্রেষ্ঠ অফ-স্পিনার—বহু কণ্ঠে ঘোষিত এই অভিমত সম্পর্কে কণামাত্র সংশয় থাকতে পারে না। বল পড়ে দ্রুতগতিতে ছোটেনি, তবু স্পিন ধরা উইকেট সামনে পেয়ে তিনি স্পিনের পাকে পাকে প্রায় সমস্ত ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বেঁধে রেখেছিলেন। এই বাঁধন কাটার বেপরোয়া চেষ্টায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা (কুন্দরন ও জয়সিমা) বার-দুয়েক গিবসের বলে ছক্কা হাঁকিয়েছেন বটে তবু এক মুহূর্তের জন্যে গিবসের অফ স্পিনের ফাঁস আলগা হয়নি। দু ইনিংসে গিবস একটি আলগা ধরনের বল করেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর বল ববং ওভারপিচে পড়তে চেয়েছে কিন্তু খাটো লেংথে কদাপি নয়। যে স্লো-স্পিনার খাটো লেংথের সংগে জন্মের মতো আড়ি পাতাতে পারে তাঁর কৌলীন্য সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে। কারণ হাতে রকমারি কাজ থাকা সত্ত্বেও চন্দ্রশেখর রীতিমতো দরাজ মেজাজেই খাটো লেংথে বল ঠুকে থাকেন। চন্দ্রশেখরের গুগলি ও টপ-স্পিনকে অনেকেই সব সময়ে চিনতে পারেন না (স্বয়ং কানহাইও পারেন নি), তাই বাড়তী অস্ত্র চন্দ্রশেখরের হাতেই রয়েছে। কিন্তু খাটো লেংথে বল ফেলে চন্দ্রশেখর নিজেই অনেক সময় সে অস্ত্র হাতছাড়া করে বসেছেন।

বোলার যদি নিশানা ও লেংথ মেনে না চলেন তাহলে তাঁর বল করা যে নিরর্থক এ কথাটা লান্স গিবস মনে-প্রাণেই জানেন। তাছাড়া স্পিনের রকমফেরে, ফ্লাইটের বৈচিত্র্য আনা এবং বোলিং ক্রিজটি পুরোপুরি ব্যবহার করে বলের গতিপথের মোড় বঁকানোতে তিনি ওস্তাদ। কতোরকম চেষ্টা তিনি করেছেন। মাথার ওপর থেকে বল ছেড়েছেন, কানের পাশ থেকেও। কখনো ক্রিজের মাঝখান থেকে। কখনো ডাইনে আবার কখনো বাঁ দিকে সরে গিয়েও। সব মিলিয়ে লান্স গিবস জীবন্ত বুদ্ধির প্রতীক। বুদ্ধির খেলাতেই তিনি প্রতিপক্ষকে ঠকিয়েছেন।

ভারতীয় দলে যাঁদের স্বীকৃতি ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁদের মধ্যে বাছা বাছা পাঁচজনকে তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরিয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি তেমন উইকেট পাননি। তবু কেউ তাঁর বোলিংয়ের প্রভাব অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে পারেননি। এক প্রান্তে তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছিল বলেই অন্য প্রান্তে সোবার্স দ্বিতীয় ইনিংসে গণ্ডাখানেক উইকেট পেয়েছেন। আর সতীর্থরা যদি তাঁর বলে ওঠা এক গণ্ডা ক্যাচ ফেলে দেন তাহলে গিবসের উইকেট ভাগ্য নিরাপদ থাকেই বা কি করে! ব্যাটসম্যানদের ভুল করিয়ে ক্যাচ তুলতে বাধ্য করানোর দায়িত্ব গিবসের। কিন্তু ক্যাচ ধরায় যদি তিনি দলের অন্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সহযোগিতা না পান তাহলে তিনি কিই বা করতে পারেন? এই গিবসের বোলিং এবং সোবার্সের ব্যাটিংই এবারের ইডেনের ঐশ্বর্য। ওঁরা না থাকলে কেই বা নন্দন কাননের বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে পারতো?

দল হিসেবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গড়ানো বল ধরতে ও মাটি থেকে তা কুড়িয়ে নিতে কসুর করেননি কিন্তু সাধারণ এবং সময়ে সময়ে অতি সহজ ক্যাচ ধরায় তাঁরা হিমসিম খেয়েছেন। অনুপাতে ভারতীয় ফিল্ডসম্যানেরা একাধিক কঠিন ক্যাচ বজ্রমুঠিতে আঁকড়ে ধরেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জগৎজোড়া নামের প্রাপ্তিপ্রেক্ষিতে ক্যাচ পড়ার এইসব নজীর কেমন যেন বিসদৃশ।

সবশেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের একজন খেলোয়াড়ের দিকে নজর ফেরাই। জাতীয় দলে এই সবে ঢুকেছেন। বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। ইডেনে ব্যাটে-বলে তেমন কিছু করতে পারেন নি। কিন্তু ব্যাটিং করার সংক্ষিপ্ত সুযোগে এবং ফিল্ডিংয়ের প্রশস্ত অবকাশে তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষদর্শীদের তাঁর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। অনেক জাত খেলোয়াড়ের সমাবেশে একজন উঠতি তরুণের হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা তিনি যেন বারেবারে ব্যক্তিত্বের পরম প্রকাশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁর নাম ক্লাইভ লয়েড।

ব্যাট হাতে বেশিক্ষণ উইকেটে ছিলেন না। কিন্তু তারই ফাঁকে লয়েড তাঁর আশাপ্রদ ভবিষ্যতের কথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে গিয়েছেন। পুরোপুরি আক্রমণাত্মক মেজাজে তাঁর ব্যাটিং রীতি গড়া। রক্ষণাত্মক পদ্ধতিও বিনাস্ত। তাড়াতাড়ি আউট হলেন তাই রক্ষে! নইলে এই দীর্ঘকায় তরুণটি হয়তো ইডেনের ঘাসে ঘাসে আগুন জ্বালাতে পারতেন। পাল্টা আক্রমণের জন্যে নিজের ব্যাট শানাতে গিয়েও লয়েড প্রায় প্রতিবারই ব্যাটের মাঝখান দিয়ে বল খেলেছেন। বলের গতিবিধি আন্দাজ তাঁর বড় একটা ভুল হয়নি। তাছাড়া তাঁর হাবভাবে এমন একটি চড়া ধাত ছিল তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই ধাতকেই বোলাররা ভয় করেন। জানি না এতো কম বয়সে আর কজন খেলোয়াড় এমন সম্ভাবনা নিয়ে টেস্ট খেলার মাঠে হাজির হতে পেরেছেন। মনে হয়, এই লয়েডই একদিন ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঐতিহ্য আগলাতে মস্তো ভূমিকা নিতে পারবেন। ১৯৪৮ সালের ক্লাইড ওয়ালকটের সঙ্গে এবারের লয়েডের অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে ওয়ালকট সেদিন ছিলেন আরও পরিণত ও প্রাজ্ঞ। লয়েড কিঞ্চিৎ ছটফটে। হয়তো ওটা বয়সেরই স্বভাব।

আর ফিল্ডিং? ও মহলে লয়েড ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সোবার্স উইকেটের কাছে অবশ্যই আরও বড়। কিন্তু আউট ফিল্ডিংয়ে লয়েডই সেরা। যেমন ছুটতে পারেন, তেমনি তৎপরতায় নীচু হয়ে বলটিকে ছোঁ মেরে কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিতেও। দেখে মনে হচ্ছিল যে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে লয়েডের শরীর যেন রবারের মতো বেড়ে যায়! একেবারে অভিনব দৃশ্য নয়। একসময় আমাদের দেশেই সি এস নাইডু, মুস্তাক আলিরা এমনি রবারের শরীর নিয়েই মাঠে নড়াচড়া করতেন। লয়েড তাঁদের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

লয়েড দীর্ঘজীবি হোন্। তিনি থাকলে ক্রিকেটের ঐশ্বর্য বাড়বে। এ ঐশ্বর্য শুধু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটেরই নয়, দুনিয়ার ক্রিকেটেরই।
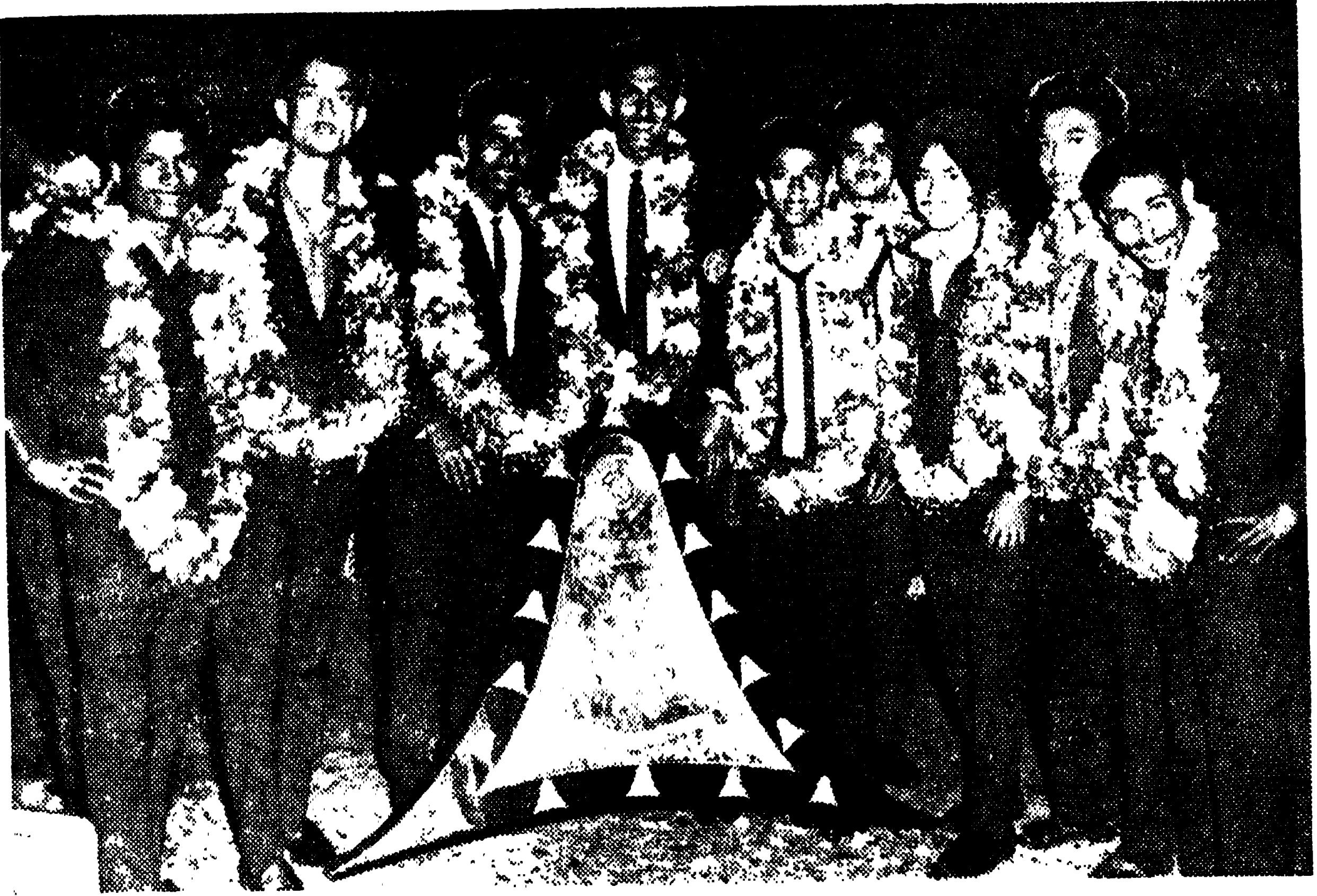
১৯৬৬ সালের অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাবের বিপক্ষে ২-১ গোলে বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল। এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপর্যুপরি ৪ বার এবং ১৩ বার ফাইনালে খেলে মোট ১১ বার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হল। ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট

অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৬৬-৬৭ সালের বে-সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের বর্তমান ফলাফল সমান দাঁড়িয়েছে—দুই দেশই একটি করে টেস্ট খেলায় জয়ী। জোহানেসবার্গের প্রথম টেস্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ২৩৩ রানে এবং কেপটাউনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

জোহানেসবার্গের প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার শোচনীয় ব্যাটিংয়ের পর এই খেলায় তাদের ২৩৩ রানে জয়লাভ রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের ১৯৯ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩২৫ রান সংগ্রহ করে ১২৬ রানে অগ্রগামীও হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৬২০ রান করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতে অস্ট্রেলিয়কে ২৬১ রানের মাথায় নামিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত ২৩৩ রানে জয়ী হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভের মূলে ছিলেন উইকেটকিপার ডেনিস লিন্ডসে। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৬৯ ও ১৮২ রান করেন (উভয় ইনিংসেই উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান)। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬টা 'ক্যাচ' লুফে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই মাঠেই ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ওয়ালী গ্রাউটের বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। লিন্ডসে ১৮২ মিনিটে সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়ে পরবর্তী ৮২ রান সংগ্রহ করেন ৭৯ মিনিটের খেলায়। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসের এই ৬২০ রান যে-কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটের এক ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড।

কেপটাউনের নিউল্যান্ডস গ্রাউন্ডের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ উইকেটে পরাজয় খুব অগৌরবের নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার তিনজন নামকরা খেলোয়াড়—পিটার পোলক, গ্রেমি পোলক এবং ডামড্রিল খেলায় আহত হন। ফিল্ডিংয়ের এক সময়ে দেখা যায়, এই তিনজনের বদলী খেলোয়াড় মাঠে নেমেছেন।

অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৫৪২ রান উঠেছিল—কেপটাউনের নিউ ল্যান্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসন ৩৮৬ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ব্যক্তিগত ১৫৩ রানে ১২টা বাউন্ডারী করেন। অস্ট্রেলিয়ার ২৫ বছরের খেলোয়াড় কিথ স্ট্যাকপোল ১৯২ মিনিট খেলে ১৩৪ রান করেন—টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁর এই ১৩৪ রানে ছিল ১৮টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউন্ডারী। সপ্তম উইকেটের জুটিতে স্ট্যাকপোল এবং গ্রেমী ওয়াটসন দলের যে ১২৮ রান সংগ্রহ করেছিলেন, তার জোরেই প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৫৪২ রান সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের মাত্র ৮৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দলের এই সংকটকালে গ্রেমী পোলক তাঁর মাংসপেশীর টান নিয়েও দৃঢ়তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার স্পিন এবং স্পিড বোলারদের নির্মমভাবে পিটিয়ে ব্যক্তিগত যে ২০৯ রান করেন, তা নিউল্যান্ডস মাঠের টেস্ট খেলায় যে-কোন দেশের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। গ্রেমী পোলক ৩০২ মিনিটের খেলায় তাঁর ২০৯ রানে ৩০টা বাউন্ডারী করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংস ৩৫৩ রানের মাথায় শেষ হলে 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩৬৭ রান করে। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ১৮০ রান সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে আয়োজিত ২৮তম জাতীয় এবং ইণ্টার-এসোসিয়েশন টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র পুরুষ, মহিলা এবং জুনিয়র—এই তিনটি দলগত বিভাগেই খেতাব জয়ী হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৫ সালের প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র এইভাবে তিনটি খেতাব জয়ী হয়েছিল। একই বছরে জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনটি দলগত খেতাব জয়ের রেকর্ড একমাত্র মহারাষ্ট্র দলেরই। এইবারের খেতাব জয়ের ফলে মহারাষ্ট্র পুরুষ বিভাগে উপর্যুপরি ১৩-বার বার্না বেলাক কাপ, মহিলা বিভাগে উপর্যুপরি তিনবার জয়লক্ষ্মী কাপ এবং জুনিয়র বিভাগে উপর্যুপরি দু'বার রামানুজন কাপ জয়ী হল।

দলগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ (বার্না বেলাক কাপ) : মহারাষ্ট্র 'এ' ৫—৩ খেলায় রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১৩-বার বার্না বেলাক কাপ জয়ের রেকর্ড করে।

মহিলা বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : মহারাষ্ট্র ৩—১ খেলায় রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৩-বার জয়লক্ষ্মী কাপ জয়ী হয়।

জুনিয়র বিভাগ (রামানুজন কাপ) : মহারাষ্ট্র ৩—০ খেলায় অন্ধ্রপ্রদেশকে পরাজিত করলে উপর্যুপরি দু'বার রামানুজন কাপ জয়ী হয়।

ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : ফারুক খোদাজি (মহারাষ্ট্র) ২১—১৬, ১৬—২১, ২১—১৪ ও ২১—১৩ পয়েণ্টে মণ্টি মার্চেণ্টকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করে পিথপুরম কাপ জয়ী হন।

মহিলাদের সিংগলস : উষা সুন্দররাজ (মহীশূর) ২১—৮, ২১—৯ ও ২১—১০ পয়েণ্টে প্রিস্কা রোজারিওকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করে উপর্যুপরি ৩-বার ত্রিবাঙ্কুর কাপ জয়ী হন।

পুরুষদের ডাবলস : নিকোলাই নোভিকোভ এবং রোমন্ড মিখনেভিচ (রাশিয়া) ২১—১০, ২১—১১ ও ২১—৯ পয়েণ্টে কল্যাণ জয়ন্ত এবং সৈকুমারকে (দিল্লী) পরাজিত করে পিথপুরম কাপ জয়ী হন।

মহিলাদের ডাবলস : জাইমা ও বেল্লা (রাশিয়া) ২৩—২১, ২১—১২ ও ২১—১৬ পয়েণ্টে প্রিস্কা রোজারিয়ো এবং কে চার্জম্যানকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করে খোরনা কাপ বিজয়িনী হন।

পরলোকে নীরজা রায়

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় নীরজা রায় ৬৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে মাঠে যাওয়ার পথে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা দেশের ক্রিকেট খেলার জনক অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জন রায়ের পুত্র।

ভারতবর্ষ বনাম রাশিয়া

টেবল টেনিস টেস্ট

ভারত সফরে রাশিয়ান টেবল টেনিস দল ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় বিরাট সাফল্যলাভ করেছে। এখানে মনে রাখা দরকার, টেবল টেনিস খেলায় রাশিয়ার আবির্ভাব মাত্র কয়েক বছরের, ভারতবর্ষের থেকে অনেক বছর পরে। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে রাশিয়া নবাগত দেশ। ভারতবর্ষ বনাম রাশিয়ার পাঁচটি টেস্ট খেলায় রাশিয়া প্রতিটির মহিলা বিভাগে জয়ী হয়। পুরুষ-বিভাগে রাশিয়ার একমাত্র পরাজয় ২—৩ খেলায়, নিউদিল্লীর পঞ্চম টেস্টে। বাকি চারটি টেস্টের প্রতিটিরই পুরুষ-বিভাগে রাশিয়া ৩—১ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। বর্তমান ভারত সফরে রাশিয়ার পক্ষে যাঁরা খেলেছেন, তাঁরা কিন্তু সকলেই রাশিয়ার সেরা খেলোয়াড় নন। সকলেই অবিশ্যি মাস্টার অব স্পোর্টস উপাধি লাভ করেছেন। কুমারী লাইমা বোলাসাইত (বয়স ১৮) ১৯৬৬ সালের সিংগলস চ্যাম্পিয়ান। ১৯৬৬ সালের জাতীয় সিংগলস খেলায় কুমারী বেল্লা এ্যানিসিনোভা (বয়স ১৮) তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন। নিকোলাই নোভিকোভ (বয়স ২১) রাশিয়ার ডাবলস চ্যাম্পিয়ান জুটির একজন।

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম টেস্ট (মাদ্রাজ) : রাশিয়া পুরুষ-বিভাগে ৩—১ এবং মহিলা-বিভাগে ৩—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

দ্বিতীয় টেস্ট (বোম্বাই) : রাশিয়া পুরুষ বিভাগে ৩—১ এবং মহিলা বিভাগে ৩—০ খেলায় জয়ী হয়।

তৃতীয় টেস্ট (কলকাতা) : রাশিয়া পুরুষ-বিভাগে ৩—১ এবং মহিলা-বিভাগে ৩—০ খেলায় জয়ী হয়।

চতুর্থ টেস্ট (ডিব্রুগড়) : রাশিয়া পুরুষ-বিভাগে ৩—১ এবং মহিলা-বিভাগে ৩—১ খেলায় জয়ী হয়।

পঞ্চম টেস্ট (নিউদিল্লী) : ভারতবর্ষ পুরুষ-বিভাগে ৩—২ খেলায় এবং রাশিয়া মহিলা-বিভাগে ৩—০ খেলায় জয়ী হয়।

মহিলা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

গোয়ালিয়রে আয়োজিত ২০তম মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ১—০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৭-বার লেডি রতন টাটা ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

সেমি-ফাইনালে মহীশূর ৪—০ গোলে বোম্বাইকে এবং মহারাষ্ট্র ২—০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজ বনাম বাংলার খেলা প্রথম দিনে ১—১ গোলে ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাদ্রাজ ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে।

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬৭ সালের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ৬নং বাছাই খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রমানাথন কৃষ্ণান। চতুর্থ সেটের খেলার সময় মাংসপেশীর টানে কৃষ্ণান খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলে প্রেমজিৎলাল সিংগলস খেতাব পেয়ে যান। এই সময়ে কৃষ্ণান ২—১ সেটে (৬—৩, ৫—৭ ও ৭—৫ গেমে) অগ্রগামী ছিলেন এবং চতুর্থ সেটে ১—২ গেমের পিছনে ছিলেন। প্রেমজিৎলাল কোয়ার্টার ফাইনালে ২নং বাছাই টমাস ককৃকে (ব্রেজিল) স্ট্রেট সেটে (৬—৪, ৬—৩ ও ১৪—১২ গেমে) পরাজিত করে সকলকে হতবাক করেন। সেমি-ফাইনালে তিনি প্রতিযোগিতার ৩নং বাছাই এবং এশিয়ান ও জাতীয় চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জিকে ৬—৩, ৭—৫, ২—৬, ০—৬ ও ৬—২ গেমে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন। কৃষ্ণান এই নিয়ে ১২-বার জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠলেন। প্রথম উঠেছিলেন ১৯৫৩ সালে (জুনিয়র খেলোয়াড় হিসাবে)। এই ১২-বারের ফাইনাল খেলায় কৃষ্ণানের পরাজয় মাত্র ৪-বার। পীঠের ব্যথার দরুণ গত বছর জাতীয় টেনিস খেলা থেকে তিনি নাম প্রত্যাহার করেছিলেন। রাশিয়ার কুমারী আইভানোভা সিংগলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে জয়ী হয়ে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : প্রেমজিৎলাল ৩—৬, ৭—৫, ৫—৭ ও ২—১ গেমে (অসমাপ্ত) রমানাথন কৃষ্ণানকে (খেলা থেকে অবসর গ্রহণ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : কৃষ্ণান এবং জয়দীপ মুখার্জি ৬—৩, ৬—২ ও ৬—২ গেমে টমাস কক্ এবং এডিসন ম্যানডারিনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : মেত্রেভেলী এবং কুমারী আইভানোভা (রাশিয়া) ৬—৩ ও ৬—১ গেমে কুকুলিয়া এবং শ্রীমতী আবজানডেজকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী আইভানোভা এবং শ্রীমতী আবজানডেজ (রাশিয়া) ৩—৬, ৬—০ ও ৬—১ গেমে বেগম খান এবং রিতা সুরাইয়াকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : কুমারী আইভানোভা (রাশিয়া) ৮—৬ ও ৬—৩ গেমে শ্রীমতী আবজানডেজকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্ট খেলার ঠিক আগে বাংগালোরে ভারত সফররত ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এ-বছরের দলীপ ট্রফি বিজয়ী দক্ষিণাঞ্চল দলকে নাটকীয়ভাবে ৯৪ রানে পরাজিত করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই জয়লাভের মূলে ছিল পেস-বোলার কিং এবং গ্রিফিথের মারাত্মক বোলিং। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের ২২৪ রানের (প্রসন্ন ৮৭ রানে ৮ উইকেট) উত্তরে দক্ষিণাঞ্চল ২৩৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। কুন্দরন ১০৪ রান এবং গিবস ৫৪ রানে ৩ উইকেট) সংগ্রহ করে ১২ রানে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলাতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে খেলার বাকি সামান্য সময়ে দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের এক উইকেট খুইয়ে ৭ রান সংগ্রহ করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে দক্ষিণাঞ্চল দলের আরও ১৫০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ৯টা উইকেট এবং তৃতীয় দিনের খেলা।

তৃতীয় দিনের ৮৫ মিনিটের খেলাতেই দক্ষিণাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৬৩ রানের মাথায় শেষ হয়। গ্রিফিথ এবং কিংয়ের আগুনমুখী বলের সামনে দক্ষিণাঞ্চল দলের খেলোয়াড়রা দাঁড়াতে পারেননি। প্রথম ১৫ মিনিটের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দলের আরও তিনটে উইকেট পড়ে মাত্র ১৪ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় গ্রিফিথ ৩৩ রানে ৫ এবং কিং ১৬ রানে ৩টে উইকেট পান।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

বোম্বাইয়ে আয়োজিত ১৭তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার পুরুষ-বিভাগে সার্ভিসেস দলের সাফল্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তারা ফাইনালে জয়ী হয়ে উপর্যুপরি ১১-বার টড মেমোরিয়াল ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ-বিভাগ : সার্ভিসেস ৬৩—৬১ পয়েন্টে রেলওয়েকে পরাজিত করে।

মহিলা-বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৩০—২৭ পয়েন্টে গত দুবারের বিজয়ী বাংলাকে পরাজিত করে প্রিন্স বাসলাংবাঁ ট্রফি জয়ী হয়।

বালক বিভাগ : পাঞ্জাব ৫৮-৫০ পয়েন্টে গত বছরের বিজয়ী মহীশূরকে পরাজিত করে আব্রাহাম ট্রফি জয়ী হয়।

চার্লস গ্রিফিথ

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

জয়পুরের জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলসে এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্না খেতাব জয়ী হয়েছেন। পুরুষদের সিংগলসে তাঁর এই প্রথম খেতাব লাভ।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : ১নং বাছাই খেলোয়াড় দীনেশ খান্না (পাঞ্জাব) ১৪—১৭, ১৫—৯ ও ১৫—১১ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েলকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস : ১নং বাছাই সরোজিনী আপ্তে (রেলওয়ে) ১১—৬ ও ১২—১১ পয়েন্টে তাঁর ভগ্নী সুনীলা আপ্তেকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : খোর চেং চী এবং লী গুয়ান চুং (মালয়েশিয়া) ১৮—১৬ ও ১৫—১১ পয়েন্টে নান্দু নাটেকার এবং শেখকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নান্দু নাটেকার এবং এম কেলকার (মহারাষ্ট্র) ১৫—১১ ও ১৫—২ পয়েন্টে দীপু ঘোষ এবং সরোজিনী আপ্তেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

জয়পুরে আয়োজিত ২২তম আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র গত দু' বছরের মতই তিনটি বিভাগের

লেস্টার কিং

ফাইনালে খেলে কেবল একটি বিভাগে (মহিলা বিভাগ) দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। গতবার তারা জুনিয়র বিভাগে জয়ী হয়েছিল।

বাংলা দল পুরুষ এবং জুনিয়র বিভাগের সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল। বাংলা দল পুরুষ বিভাগের সেমি-ফাইনালে ০—৫ খেলায় রেলওয়ে এবং জুনিয়র বিভাগের সেমি-ফাইনালে ১—২ খেলায় মহারাষ্ট্রের কাছে পরাজিত হয়।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ : রেলওয়ে ৫—০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনবার রহিমতুল্লা কাপ জয়ী হয়।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ২—১ খেলায় গত চার বছরের বিজয়ী রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে ছাদা কাপ জয়ী হয়।

জুনিয়র বিভাগ : রাজস্থান ২—১ খেলায় গত দু' বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে নারাঙ্গ কাপ জয়ী হয়।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

সেদিন মধ্য কোলকাতার একটি চায়ের দোকানে সন্ধ্যের সময় ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ কে যেন আমার পাঞ্জাবী ধরে টানতেই ইঞ্চি দেড়েক ছিঁড়ে গেল। আমি প্রথমে ভাবলাম আবার কোনো আন্দোলন শুরু হল বুঝি। কোলকাতা শহরে এত বিবিধ আন্দোলন হচ্ছে যে, রাস্তায় কি যে ঘটতে পারে না আজকাল সেটাই খুঁজে বার করা মুস্কিল। যখন দেখলাম আমার পাঞ্জাবী ধরে টেনে ছিঁড়েছেন তারেশবাবু তখন বুঝলাম এটি কোনো আন্দোলনের অঙ্গ নয়, কেননা, তারেশবাবু যে কোন আন্দোলন থেকে কয়েক শো গজ তফাতে থাকতে অভ্যস্ত।

আমি রাগতভাবে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, সরি পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু আপনাকে বাঁচানোর জন্যই এটা করতে হল।

—আমাকে বাঁচানোর জন্য? আমার শখের পাঞ্জাবী ছিঁড়ে আমাকে বাঁচাচ্ছেন আপনি? আমার কন্ঠে একটু রাগও প্রকাশ পেল। তারেশবাবু বললেন, আপনি কি জানেন, ঝন্টুবাবু একজন স্পাই?

—ঝন্টুবাবু একজন স্পাই? আমার আর কথা বেরুল না। ঐ ফুটপাথেই বসে পড়তে যাচ্ছিলাম, কোনোক্রমে সামলে নিলাম। তারপর ক্ষীণ কন্ঠে বললাম, ঝন্টুবাবু তো খুব রসিক লোক। রোজ মজার মজার গল্প করেন। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে সময়টা কাটে মন্দ না। কিন্তু তিনি যে স্পাই তা কখনো ভাবতে পারিনি।

তারেশবাবু বললেন, আমি কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই সন্দেহ করেছি। আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি করেছি, খেয়াল করেছেন কি—উনি প্রায়ই রাস্তা দেখেন?

—রাস্তা দেখেন? আমি অবাক হলাম। তারপর বললাম, রাস্তা তো সবাই দেখে। বলতে নেই, আমিও দেখি—রাস্তা দেখার জন্য আমার এক অদম্য কৌতূহল হয়।

তারেশবাবু বললেন, না না স্বাভাবিক ভাবে দেখা নয়—দেখবেন ঝন্টুবাবু যখন রাস্তা দেখেন তখন প্রায়ই তিনি একটু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে তারপর বাঁ-দিকে, তারপর হঠাৎ একটু রাস্তা দেখে নেন। অবশ্য এতেই প্রমাণ হয় না তিনি স্পাই—এছাড়াও আমি প্রমাণ পেয়েছি আরো কিছু।

—আরো কিছু? আমি বললাম, রাস্তা অমনভাবে দেখাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

তারেশবাবু বললেন, না মশাই, যথেষ্ট প্রমাণ নয়। ওসব প্রমাণ আদালতে চলে না। তাছাড়া গণতন্ত্রে রাস্তা দেখা একটা বেসিক রাইটের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও লক্ষ্য করেছেন কি তিনি সর্বদা হাসি-খুসি?

আমি বললাম, সর্বদা হাসিখুসি থাকাটা কি বেসিক রাইটগুলির অন্যতম নয়?

তারেশবাবু বললেন, ঐ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে একটা কথার উত্তর দিন তো—আপনি কখনো কোনো লোককে সর্বদা হাসিখুসি অবস্থায় আর কাউকে দেখেছেন?

আমি বললাম, না দেখিনি, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় ঝন্টুবাবু একজন স্পাই?

তারেশবাবু বললেন, আরো আছে। আমার কাছে আরো দু-চারটে প্রমাণ আছে। আপনি দেখেছেন কি ঝন্টুবাবুর পকেটে একটা লম্বা পেন্সিল থাকে সর্বদা?

আমি বললাম, খেয়াল করিনি।

তারেশবাবু বললেন, খেয়াল করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হত। খেয়াল করতে হয়—চারদিক দেখে চলবেন তো, না কি অন্ধের মত চলবেন।

আমি বললাম, আমার ধারণা ছিল তো আমি খেয়াল করেই চলি। প্রচুর খেয়াল করি। তবে এখন দেখছি, আমার ধারণা ভুলই ছিল।
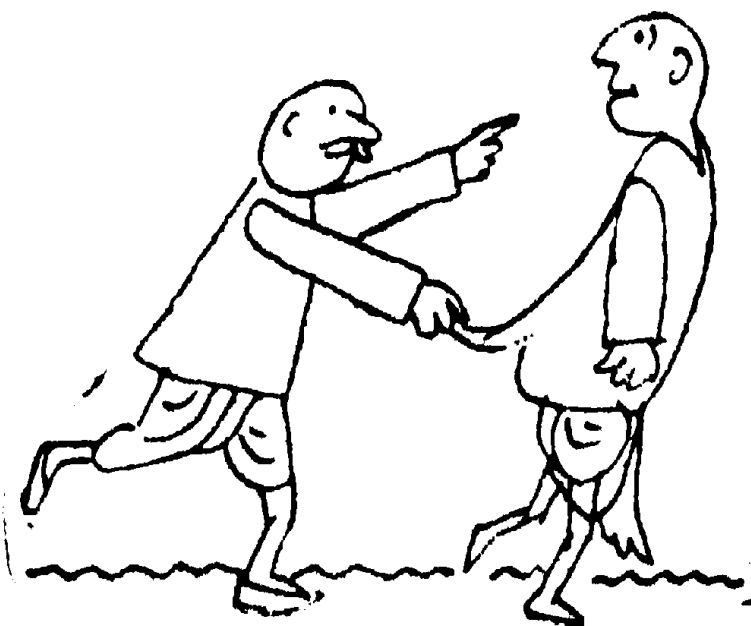
তারেশবাবু বললেন, ভুল বলে ভুল! আর কিছুদিন গেলে ঐ ঝন্টুবাবু আপনার সমস্ত গোপন কথা শত্রুপক্ষকে চালান করে দিতেন হাসতে হাসতে, আর আপনি বোকার মত তাকে সমস্ত খবরই দিয়ে দিতেন।

এইবার আমার ভয় হল। আমি বললাম, তাই তো—আমি বোধহয় কিছু গোপন খবর তাঁকে দিয়েছি। ঝন্টুবাবু আমাকে সেদিনও বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন আমাদের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় কিনা। আমিও উত্তর দিলাম এমনিতে পাওয়া যায় না, তবে খোঁজে থাকতে হয়।

তারেশবাবু বললেন, শত্রুর কাছে কি যে গোপন নয়, আর কি যে গোপন, তাই তো জানা নেই। শত্রু আমাদের সব খবরই রাখতে চেষ্টা করছে কিনা।

আমি বললাম, তা আমরা তো এখন ঝন্টুবাবুকে বিভ্রান্ত করতে পারি। ওঁকে সব আজগুবী খবর সরবরাহ করলেই তো কেল্লা ফতে!

তারেশবাবু বললেন, আমারও তো ঐ মতলব। ঐ ব্যাটকে আমরা ঘোল খাইয়ে ছাড়ব। উনি যা জিজ্ঞেস করেন তার এলো-মেলো উত্তর দেব। তাহলেই ব্যাটার স্পাই-গিরি ঘুচে যাবে।

আমি বললাম, তাহলে এবারে ওঁর কাছে যাওয়া যেতে পারে।

তারেশবাবু বললেন, চলুন!

আমরা দুজনে গিয়ে উপস্থিত হতেই ঝন্টুবাবু আমাদের সহাস্য অভ্যর্থনা করলেন। আরে আরে আসুন, আজ দেরি যে?

আমি ঝন্টুবাবুকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বললাম, দেরি কোথায়, এই সময়েই তো রোজ আসি।

ঝন্টুবাবু কিছু বললেন না। বুঝলাম তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। তারপর বললেন, এই শীতের মধ্যে কিরকম বিশ্রী লাগে বিষ্টি বলুন তো?

তারেশবাবু বললেন, শীত কোথায়? এটা কি শীত নাকি। তাছাড়া বৃষ্টি তো ভাল। প্রচণ্ড ভাল লাগে আমার বৃষ্টি।

ঝন্টুবাবু একটু চুপ করে রইলেন। এই প্রথম দেখলাম তাঁর অসহাস্য মুখ। বুঝলাম আমাদের কথায় তিনি সত্যি বিভ্রান্ত হয়েছেন। ঝন্টুবাবু এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পকেট থেকে পেন্সিলটা বার করে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তারেশবাবু আমার হাঁটুতে চিমটি কেটে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বহুক্ষণ চুপচাপ। প্রায় দশ মিনিট অস্বস্তির মধ্যে কাটল। তারপর ঝন্টুবাবু হঠাৎ উঠে পড়লেন। বললেন, আজ আসি—গুডনাইট!

আমরা দুজনে, ঝন্টুবাবু চলে যাবার পর, নিজেদের সাফল্যে গদ-গদ হলাম। সেই উপলক্ষ্য আমরা সেলিব্রেট করবার জন্য দু কাপ স্পেশাল চা-এর অর্ডার দিলাম।

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। চল্লিশ ।।

সিতু জ্বলতে-জ্বলতে ফিরে গেল।

নেমে এসে কলা দেখবে। দোতলা থেকে বিভাস কাকা তাকে দোতলায় চলে আসতে বলছিল। অশ্লীল গোছের একটা কটূক্তি করে রাগের মুখে সিতু হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠল একটু।...বিভাস কাকা বলবে না বিভাস বাবা বলবে এখন? মরুকগে। বিভাস কাকার হাসি-হাসি মুখ দেখেই তার পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। তার ওপর কিনা তাকে ওপরে ডাকার সাহস! ওই বজ্জাত মেয়েও বেড়ালের মত মুখ করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আর দেখছিল তাকে। ওর ওই ড্যাবডেবে চোখ দুটোও গেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। কাকাকে ডেকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেন ওদের দেখাতেই গেছল সিতু। শমীকে যাও সহ্য করতে পারত, ওর কাকাকে সহ্য করা অসম্ভব। সিতু আসছে না দেখে বিভাস কাকা হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে নীচে নেমে আসছিল নিশ্চয়। আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে যাবার ইচ্ছে। এই ইচ্ছের মনের মত জবাব দেওয়া সম্ভব নয় বলেই সিতু চলে এসেছে। সামনে পেলে কি আবার করে বসত রাগের মাথায় কে জানে। বয়েস সতেরো পেরোতে চলল, আই, এস্‌সি পড়ছে, আর দু দিন বাদে সেকেণ্ড ইয়ার হবে—তবু সব তছনছ করে ওলট-পালট করে দেবার সেই ছেলেবেলার আক্রোশ যেন মাথায় উঠে দপদপ করতে থাকে।

...শমীটা একলা থাকলেও ও কিছুক্ষণ দাঁড়াত হয়ত। দেখতে এসেছিল অবশ্য মা-কেই—না মা ভাবছে কেন, দেখতে এসেছিল 'ওই একজনকে'। বিয়ের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার পর মাকে চিন্তার মধ্যেও 'ওই একজন' বলা শুরু করেছে। ছ' মাসে ন' মাসে বছরে হঠাৎ-হঠাৎ যেমন এক-একদিন হয়, তেমনি হয়েছিল। মাথায় আগুন জ্বলে। তখন মা-কে দেখতে ছোটে। ভস্ম করতে ছোটে। কিছুই করতে না পেরে দ্বিগুণ আক্রোশে ফেরে। আবার হাসিও পায় এক-এক সময়ে। বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি পেকেছে, তাই নিজেরই মনে হয় মা-রোগে পেয়েছে ওকে। কিন্তু রোগটা চাড়িয়ে ওঠে যখন তখন আর বয়েস বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নিজের বশে থাকে না। তখন আর ছুটে না বেরিয়ে পারেই না।

আজকের আসার তাড়নাটা আগের থেকে অনেক বেশীই ছিল। তবু শমীটাকে খারাপ লাগে নি খুব। বাদামী ডুরে শাড়ি পরেছে আজ। শাড়ি-পরা শমীকে এই প্রথম দেখল। বেশ মেয়ে-মেয়েই লাগছিল। কোঁকড়া চুলের একদিক গলার পাশ দিয়ে বুকের যেখানটায় এসে ঠেকেছিল, সেদিকটা বেশ ভাল করে দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একটু হাঁ করে চেয়ে থেকেই পাজী মেয়ে ছুটে গিয়ে কাকাকে ডেকে নিয়ে এলো। তার কাকা সব করবে আমার। ছুটে যখন চলে গেল তখনও খারাপ লাগে নি, শাড়ির আঁচল খসে গেছল—ও-দিক ফিরে দৌড়েছিল বলেই ভাল দেখতে পারে নি।

মেয়েদের নিয়ে এখন তার বিশ্লেষণ অনেক পাকা-পোক্ত। শাড়ি পরে এখনই যেমন দেখাচ্ছিল, আর একটু বড় হলে ওটা না ধুমসি হয়। ওই একজনের কাছে একলা আদর পাচ্ছে, দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, মোটা হবে না কেন? মায়ের ওপর ওর একলার দখল মনে হতেই রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল সিতুর। মাকে নির্মম রকমের কিছু একটা আক্কেল দেবার সুযোগ পেলে ও আর কিছু চায় না। গেল ক'টা বছর ধরে এই আক্রোশই পুষছে সে। এত বড় হয়েছে, পাড়ার সমবয়সীরা ছেড়ে বড়রাও সমীহ করে তাকে এখন। কলেজের ছেলেরা তাকে তোয়াজ-তোষামোদ করে চলে, মাথা খেলানোর ব্যাপারে ওস্তাদ ভাবে তাকে। কিন্তু মায়ের ওপর আক্রোশ মেটাবার রাস্তাটা অনেক মাথা খাটিয়েও পেয়ে ওঠে না। আজ হঠাৎ একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল মাথায়। ওই শমীটার কিছু একটা প্রচণ্ড রকমের ক্ষতি করে বসতে পারলে মা জব্দ হতে পারে। শমীর তো শাস্তি পাওনাই, একলা আদর খাওয়ার শোধ নেবার সংকল্প সেই ক' বছর আগে থেকেই ঠিক করা ছিল—সিতুকে যখন স্কুল বোর্ডিং-এ পাঠান হয়েছিল, তখন থেকে। ওকে শাস্তি দিতে পারলে মায়ের ওপরেও মোক্ষম শোধ নেওয়া হবে মনে হতেই বেশ একটা ক্রূর উদ্দীপনা বোধ করল। এই উদ্দীপনার মুখে বড় হবার কথা, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা কিছুই আর মনে থাকল না। ছেলেবেলায় পায়ের তলার চেয়ার সরিয়ে নিয়ে ওর থুতনি কেটে দু'-খানা করে দিয়েছিল, সেই কাটা দাগ চিবুকটাকে এখনও দু ভাগ করে রেখেছে। এবারে আর চেয়ার সরিয়ে নয়, হাতে পেলে দাঁতে করেই ওখানটা আবার ডবল করে ছিঁড়ে দিতে পারে সে। মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিশোধের নেশাটা মগজ থেকে নেমে শরীরের পেশীর ভিতর দিয়ে, শিরাগুলোর ভিতর দিয়ে হাড়ের ভিতরে ছড়াতে লাগল।

ট্রাম-বাসে উঠতে ভুলে হেঁটেই চলেছে। রাস্তায় এত লোকজন গাড়ি-টাড়ি কিছু চোখেও পড়ছে না, তার সামনে শুধু দুটো মুখ। মায়ের আর শমীর। শাড়ি-পরা শমীর।

গত কয়েকদিন ধরে বাড়ির বাতাসের রকমফের টের পাচ্ছিল সিতু। ও যে কি করে টের পায় বাড়ির কারও ধারণা নেই। এমন কি অত সেয়ানা জেঠুরও না। একটা সুবিধে বাড়ির সকলে তেমনি ছেলে-মানুষই ভাবে ওকে। জেঠুও বাবাও, আর ছোট দাদুর তো কথাই নেই। আরও সুবিধে ওই মেঘনা বজ্জাত আর ছোট দাদু ছাড়া আর কারও চোখই নেই তার ওপর। চোখ থাকলেও এখন কাউকে পরোয়া করে না। তবু নেই যে সেটা আরও ভাল। তাছাড়া ছোট দাদু বছরে কটা মাসই বা থাকে এখানে। যাই হোক, কুকুরের মত বাতাস টেনে বাড়ির বাতাস বুঝতে পারে সে। অন্তত গণ্ডগোল কিছু হলে টের পায়। তারপর কি গণ্ডগোল সেটা বার করতে আর কতক্ষণ? ঠিক-ঠিক কি না জেনেছে সে, মা বাবার নামে উকীলের নোটিস পাঠিয়েছিল জেনেছে, মা কখন কোথায় বাস করছে জেনেছে, বাবার ডাইভোর্সের মামলায় খবর জেনেছে, কোর্টের রায়ের খবর জেনেছে—আর এখন কি নিয়ে বাড়ির বাতাস অন্যরকম তাও ঠিক টেনে বার করেছে।

...ক'দিন ধরে জেঠু ছোট দাদুকে কি-যেন ফিস-ফিস করে বলে লক্ষ্য করছিল। এখন আর ছেলে-মানুষটি নয় যে আড়ি পেতে শুনবে। শোনার ব্যাপারে অনেক রকম বয়সোচিত ছল-চাতুরির রাস্তা নিতে হয়। ভোলা তার খুব পেয়ারের লোক হয়েছে এখন। এ-জন্যে ব্যাটা কম পয়সা খায় না ওর থেকে। কাজের অছিলায় হঠাৎ-হঠাৎ ঢুকে কি ঘটছে না ঘটছে ও-ই অনেক সময় সুতো ধরিয়ে দেয়। এই শেষের ব্যাপারটায় অন্তত দিয়েছিল। জেঠুকে একরকমই দেখত সিতু, কিন্তু ছোট দাদুকে হঠাৎ বড় বেশীরকম গম্ভীর মনে হয়েছিল তার। আর বাবার মুখের চেহারাও হঠাৎ কি-রকম যেন হয়ে গিয়েছিল। ক'দিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি, হঠাৎ মৌনী নিয়েছে মনে হচ্ছিল।

সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে সিতু আবার সময় আর সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল। এ-রকম হলেই সে অবধারিত ধরে নেয় মায়ের ব্যাপারে বা মাকে নিয়ে কিছু ঘটেছে। জেঠু বাড়ি না থাকলে তখন নিরিবিলি অবকাশে তার ঘর তল্লাসী শুরু করে দেয় সে। আলমারি খোলে, তালা-বন্ধ ড্রয়ার খোলে, সুটকেস খোলে। এই বাড়ির সব-কিছুই তার নখ-দর্পণে এখন। অফিসে বেরুবার সময়েই শুধু জেঠু এ-পকেট ও-পকেট বা বিছানার তলা থেকে হাতড়ে চাবি নিয়ে যায়। বিকেলের দিকে বা অন্য সময়ে বেরুলে এক-জায়গায় রাখা চাবি স্বাভাবিক আর এক জায়গায় সরিয়ে রাখলেই হল। তখন আর খোঁজ পড়বে না। তাছাড়া ফিরতে দেরি হলে জেঠু যাকে সামনে পায় তাকে বলেই যায় দেরি হবে। কখন আবার বাবার ডাকাডাকি শুরু হবে সেই জন্যেই জানান দিয়ে বেরোয় বোধ হয়। আর বাবার চাবির গোছার বাসস্থান তো বিছানার তলায়। ওটা বাবার সঙ্গে সঙ্গে কমই ঘোরে। তবে চাবি বলতে জেঠুর চাবির ওপরেই লোভ সিতুর। বিশেষ করে বাড়ির এই গোছের হাওয়া বদল দেখলে। বাবার চাবির প্রয়োজন শুধু টাকার দরকার হলে। সিন্দুক বোঝাই নোট আছে, আলমারিতেও কম নেই। টাকা দেখলে এখন আর সিতুর সে-রকম একটা উত্তেজনা হয় না। দু'-চারখানা করে নোট সরাতে হাতও কাঁপে না।

জেঠুর ড্রয়ার বা সুটকেস খুলে এবারে একটা জিনিসেরই সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছিল। সেই কালো মোটা বাঁধান ডায়েরী বইটা। মাস আষ্টেক আগে যেটা হাতে পেয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সেটা পড়ে জেঠুকে ভারী মজার মানুষ মনে হয়েছিল তার। জেঠুর হাতে ওই বস্তুটা অনেকদিনই দেখেছিল। আর ওটার সম্পর্কে একটু যেন কৌতূহলও ছিল বাড়ির লোকের। জেঠু যে ওটা খুব সাবধানে রাখত তাও টের পেত। কিন্তু মা চলে যাবার পর আর সব-কিছু ছাড়া-ছাড়া হয়ে যাবার পর জেঠু আর ওটা সেভাবে আগলে রাখার দরকার বোধ করে নি বোধহয়। নইলে ডাইভোর্সের কাগজপত্র দেখার লোভে তাঁর দেয়াল-আলমারি খুলেই ওটা হাতে পেয়েছিল কেন? হাতে পেয়েও অত লেখা পড়ার ধৈর্য থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রথমেই মহাভারতের শকুনির ওপর জেঠুর অত টান দেখে অদ্ভুতই লেগেছিল। আর তারপর যত পাতা উল্টেছে ততো চমক। একের পর এক গো-গ্রাসে গিলেছে। এক-একটা লেখা ভাল করে বোঝার জন্য অনেক বারও পড়তে হয়েছে। বাবা যে মাকে বিয়ের আগে দেখেছিল আর তারপর বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল সেটা তার কাছে একটা খবরের মত খবর। ছোট দাদুর সম্পর্কে কি-সব লিখে রেখেছে জেঠু, সেটা তেমন স্পষ্ট হয় নি। মা-কে বিয়ের আগেও ছোট দাদুর ভাল লাগত বোঝা যায়, সে-তো এখনও লাগে নিশ্চয়—কিন্তু সে-জন্যে ছোট দাদুকে জেঠু মরতে লিখছে কেন ঠিক বোঝা গেলই না। সবই বোঝার মত পাকা-পোক্ত সে ঠিকই হয়েছে, কিন্তু এই দুজনকে কাছাকাছি আনার চিন্তাটা তার মনে আসে নি। তারপর যত এগিয়েছে ততো বিস্ময়, ততো রোমাঞ্চ। মিত্রা মাসির সঙ্গে জেঠুরই তাহলে দিব্যি জট-পাকান ব্যাপার ছিল একটা! আর তারপর মা-কে নিয়ে বাবার এ-কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত সন্দেহের কাণ্ড। জেঠু, ছোট দাদু, বিভাস কাকা কাউকে সন্দেহ করতে বাকি রাখে নি বাবা! এমন সন্দেহ যে দাদু বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিল বাবাকে! ও হবার আগে আর পরে মায়ের ওপর বাবার অত অত্যাচারের ফিরিস্তি পড়ে বাবার ওপর রাগ হয়েছিল, আর নিজের অজ্ঞাতেই মায়ের ওপর সদয় হয়ে উঠেছিল সিতু। ও জন্মাবার আগে মা-তো মরেই যেতে পারত দেখছে! কিন্তু তার পরেই মনে পড়েছে, মা নেই, মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—আর আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ। বাবা ঠিক করেছে, আরও করা দরকার ছিল।...কিন্তু তারপর মিত্রামাসির এ-কি কাণ্ড! কাণ্ডটা ষোল আনা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নয়, তবু যতটুকু বুঝেছে তাতেই অদ্ভুত অস্বস্তি। মিত্রা মাসিকে কোনদিন দু-চক্ষে দেখতে পারে না সে। মা চলে যাবার পর আরও চক্ষুশূল হয়েছিল। হাসিমুখে আসত, ওকে আদর করতে চেষ্টা করত, বাবার ঘরে ঢুকত। একদিন মায়ের ঘরেও গিয়েও জাঁকিয়ে বসেছিল যখন তখন তো ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে ইচ্ছে করেছিল সিতুর। নোট-বইটা হাতে পাবার অনেক আগেও বাবার সঙ্গে মিত্রা মাসির সেই হঠাৎ-ভাব দেখে রাগ হত সিতুর। মিত্রা মাসিকে আরও খারাপ লাগত তখন। জেঠুর এই লেখা পড়েছে, যখন তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া সারা, মা-কে ঠকিয়ে বাবার সঙ্গে মিত্রা মাসির বিলেত যাওয়ার তাৎপর্য খুব দুর্বোধ্য ঠেকে নি তাই। আরও স্পষ্ট হয়েছে জেঠুর পরের লেখাগুলো থেকে। মায়ের প্রতি সমবেদনা এসেছে আবার। আর তক্ষুনি সেটা নির্মূল করেছে। যাই করুক বাবা, মা কেন যাবে এখান থেকে, কেন আসবে না? জেঠুর শেষ লেখাটা পড়ে খুব মজা লেগেছে তার। যেটাতে তার কথা আছে। বাপের ছেলে ভাবলে রাগ হয় আর মায়ের ছেলে ভাবলে ভাল লাগে নাকি। আর সেয়ানা বটে জেঠু, শমীটার দিকে ও ওই বয়সে কিভাবে তাকাতো তাও লক্ষ্য করেছে! কিন্তু সব-থেকে আশ্চর্য লেগেছিল তার জেঠুর লেখাগুলোই। সেগুলোর ভিতরে যেন জেঠুর কি একটা মন দাঁড়িয়ে আছে যার অনেকখানি ধোঁয়াটে তার কাছে, অথচ বেশ ধারাল গোছের কিছু একটা আছে তার তলায়। প্রত্যেকটা লেখার পিছনে দাঁড়িয়ে জেঠু যেন হাসছে মুখ টিপে, অথচ সে-হাসির সবটুকুই কৌতুক নয়।

বাড়ির এ-বারের হাওয়া-বদল অনুভব করে সিতু হদিস মেলার মত অন্য কাগজপত্র না পেয়ে ওই ডায়েরীটাকেই খুঁজল তন্নতন্ন করে। কি ঘটেছে জেঠু হয়ত ওতেই লিখে রেখেছে। ওটা যে ততদিনে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেছে তার ধারণা নেই। ওর চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় ওটা রাখা সম্ভব ভেবে পেল না। ফলে কৌতূহল বাড়ল আরও। ওদিকে বাবার ঘরের টেলিফোন ধরেও সেদিন কম অবাক হয় নি। ওধারে কথা বলছিল মিত্রা মাসি, বাবা নেই শুনে জেঠুর খোঁজ করল মিত্রা মাসি। জেঠু ছিল। ডাকবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে তাড়াতাড়ি বলল, ডাকতে হবে না। তারপরেই হেসে জিজ্ঞাসা করল, তোদের নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন হয় নি কোথাও?

সিতুর মাথায় ঢোকে নি কিছু, জবাব দেবে কি। মা চলে যাবার পরে গোড়ায়-

গোড়ায় মিত্রা মাসি তার সঙ্গেই সব থেকে বেশী ভাব করতে চেষ্টা করেছে। বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে পর্যন্ত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মায়ের সম্পর্কে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছে ঠিক নেই। তখনো অকারণেই গা জ্বলত সিতুর। জেঠুর ওই লেখাগুলো পড়ার পর তো সামনা-সামনি দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফোনের কথাগুলো শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মিত্রা মাসির কিছু খবর জানার ইচ্ছে। হেসে নেমন্তন্নের কথা বলার পরেই গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করেছে, হ্যাঁ রে, তোর মায়ের কিছু খবর-টবর এসেছে? সিতু চুপ করে ছিল, আর মিত্রা মাসি আরও আপনজনের মত বলেছে, বল্ না, মাসির কাছে লজ্জা কি—

কিছু একটা ঘটেছে সিতু তক্ষুনি ধরে নিয়েছে। জানার কৌতূহলও কয়েক গুণ বেড়েছে। তবু মিত্রা মাসির মুখে মায়ের নাম শুনেই তার মাথা গরম। সেও যে কলেজে পড়ছে, ছেলে-মানুষ নয়, সেটা বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছে। জবাব দিয়েছে, আমি কিছু জানি না, অত করে জানতে চাও যখন, ধরে থাকো, জেঠুকে ডেকে দিচ্ছি।

যা আশা করছিল তাই ঘটল তক্ষুনি। জেঠুকে যে কতখানি ডরায় সিতুর জানতে বাকী নেই। নইলে এতদিনে নিজের বাড়ি ছেড়ে হয়ত এ-বাড়িতেই থাকা শুরু করত মিত্রা মাসি। ফোন ছাড়তে পারলে বাঁচে। —না না, ডাকতে হবে না, অনেকদিন খবর-টবর পাই না তাই জিগ্যেস করছিলাম। তুই তো ভুলেও আসিস না আজকাল, আসিস একদিন, বুঝলি?

ফোন ছেড়ে সিতু হাসতে গিয়েও হাসতে পারে নি।...মায়ের কি খবর জানতে চায়? তার আগে নেমন্তন্ন-টেমন্তন্নর কথা কি বলছিল? ছোট দাদুর সঙ্গেই বা জেঠুর চুপি-চুপি এত কি কথাবার্তা চলছে? জেঠু সেদিন বাবার ঘরে গিয়েও খানিকক্ষণ ধরে কি কথাবার্তা বলে মিটিমিটি হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এসেছিল। আর তারপর থেকেই বাবাকে বেশ অন্যরকম দেখছে সিতু। অনেক রাত পর্যন্ত খুব মদ চালাচ্ছে। ভোলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দোর গোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মোটকথা বাড়ির বাতাস রীতিমত গোলমেলে লেগেছে আবার।

তারপর গত সন্ধ্যার পরে ভোলার দৌলতে ব্যাপারটা টের পেয়েছে। ইশারায় তাকে ডেকে ভোলা নীচের এক নিরিবিলিতে চলে গেছল। চাপা উত্তেজনায় তার দু চোখ কপালে। বলেছে, বউদিমণি আবার বিয়ে বসেছে গো ছোট মালিক, বিভাসবাবুর সঙ্গে—আমি নিজের কানে শুনলাম—

ফ্যাল-ফ্যাল করে সিতু ভোলার মুখের দিকে চেয়ে ছিল খানিক। আর তারপরেই যা ঘটে গেল তার জন্য ও নিজেও প্রস্তুত ছিল না, ভোলাও না। আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে ও-বাবা-গো বলে ভোলা তিন হাত দূরে গিয়ে বসে পড়ল। তার পরেও ছোট মালিক আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে আসছে দেখে চোখের নিমেষে উঠে প্রাণ নিয়ে পালাল সে।

সিতু দোতলায় উঠে এলো। সামনেই মেঘনা। এধারের ঘরে ছোট দাদু আর জেঠু। বাবার ঘরে এতক্ষণে যে লোকটা বসেছিল চলে গেছে, কিন্তু বাবা ঘরেই আছে। মাথায় হঠাৎ যে-আগুন জ্বলে উঠেছে সেটা নেভাবার মত নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজছে সিতু। এই তিন বছর ধরে সে বাবার পাশের ঘরে, অর্থাৎ, মা যে ঘরে থাকত সেই ঘরে থাকে। কিন্তু ওদিকে যেতেই ভাল লাগল না। ঠাকুমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বসল। ভোলা কি বলল ভাবতে চেষ্টা করল।

ঘণ্টাখানেক বাদে মেজাজ বশে এলো। হঠাৎ মাথার মধ্যে এ-রকম হয়ে গেল কেন নিজেই জানে না। ভাল করে শোনা বা জানার আগে ভোলাটাকে মেরে বসল। এ-বাড়িতে ও-ই সব থেকে অনুগত। আর বলবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে না জানা পর্যন্ত স্থির থাকে কি করে। আবার তারই খোঁজে চলল।

দূরে থেকে তাকে দেখেই ভোলা সচকিত। পালাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার আগেই ভরসার কারণ ঘটল। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি-যোগের আশ্বাস। ছোট মালিক তাকে দশ টাকার একটা নোট দেখাচ্ছে। এক টাকা দু টাকা পেয়ে অভ্যস্ত, দশ টাকা অবিশ্বাস্য।

তার কাছ থেকে যেটুকু শোনার সিতু শুনেছে। সন্ধ্যায় বিক্রমবাবু এসেছিল। কয়েক গেলাস করে দুজনেই সাবাড় করেছে। ভোলা দরজার ধারে মোতায়েন ছিল, তার দরকার মত সোডার বোতল খুলে দিয়ে আসছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভোলা বাবুকে বলতে শুনেছে বউদি-মণি বিভাস-বাবুকে বিয়ে করেছে।

রাতটা ভাল ঘুম হয় নি। বাবা ঘরে না থাকলে বোতলের জিনিস সেও খানিকটা গলায় ঢেলে আসত। মাঝে-সাজে এই কর্ম করেও থাকে। প্রথমে বিচ্ছিরি লাগে, গলা-বুক জ্বলে। তারপরে মন্দ লাগে না। সজারু-মাথা সুবীরের সেই নেশার পর্ব এখনো আছে। হোমিওপ্যাথী শিশির নাসার কাল গেছে, বিড়ি-সিগারেট ছেড়ে পয়সা হাতে থাকলে মাঝে-মাঝে গাবদা চুরুট টেনে দেখায়। তার কাছে জাহির করার জন্যেই বাবার বোতল থেকে সিতুর প্রথম মদ গলায় ঢালা। শুনে প্রায় হার মেনে তাকেও একটু খাওয়াবার জন্য ধরেছিল সুবীর। সিতু বাবার বোতল থেকে খাওয়াতে না পারলেও দোকানে নিয়ে গিয়ে দুই-একদিন খাইয়েছে। সেই প্রসাদ থেকে চালবাজ দুলুও বাদ পড়ে নি।

পরদিন কলেজ পালিয়ে মায়ের আগের স্কুলে এলো সে। গেটের বাইরে দারোয়ানকে ডেকে খোঁজ নিয়ে জানল মা এখানে নেই। কি এক ঝোঁক বেড়েই চলল সিতুর। ভেবে-চিন্তে বিভাস কাকার পুরনো বাড়িতে এলো। সেখান থেকে তার ফ্ল্যাটের সন্ধান মিলেছে।

তারপর ওই ফ্ল্যাটের সামনে এসেও না দাঁড়িয়ে পারে নি। যাকে দেখতে এসেছিল তার দেখা মেলে নি। শমী আর তার কাকাকে দেখে এসেছে। ওকে ডাকার অর্থই মা ভিতরে আছে। অর্থ হোক না হোক, ভিতরে যে আছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বাড়ি ফেরার পরেও দুর্বার আক্রোশটা ঘুরে-ফিরে শমীর ওপর। শাড়ি-পরা শমীর ওপর। ওকে ঢিট করতে পারলে মায়ের ওপর শোধ নেবার সাধ মেটে।

স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়ে পাস করার পর সিতু নিজস্ব একটা ছোট গাড়ির দাবী পেশ করেছিল। দাবীটা বাবা আর জেঠুর কানে তোলার জন্য জানানো হয়েছিল ছোট দাদুকে। খেতে বসে ছোট দাদু জেঠু আর বাবার কানে কথাটা তুলেছিল বটে, কিন্তু সে-রকম গুরুত্ব দিয়ে নয়। ভাল পাস করার জন্য এদের সকলকেই একটু খুশি-খুশি দেখেছিল সিতু। কিন্তু সিতু কাউকে খুশি করার জন্য পরীক্ষার এক বছর আগে থেকে আদা-জল খেয়ে লাগে নি, ভাল পাস করে শুধু একজনকেই জব্দ করার ইচ্ছে ছিল, যে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাকে দেখানোর ক্রুদ্ধ তাগিদ ছিল, ভাল সে ইচ্ছে করলেই করতে পারে, তাই দেখিয়েছে। এদের খুশি হবার কথা ভাবেও নি। তবু হলই যখন, সেটা কাজে লাগানোর ইচ্ছেটাই প্রথমে মনে এসেছিল।

বাবা আপত্তি করত না হয়ত। করবে কেন, কত টাকা আছে বাবার সে আর তার জানতে বাকী নেই। কিন্তু জেঠু সাফ না করে বসল। বলল, গাড়ির সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না, অ্যাক্সিডেন্ট লেগেই আছে—

মুণ্ডু আছে। মনে-মনে জেঠুর মুণ্ড-পাতই করেছিল সিতু। ভিতরটা অবিরাম ছোটাছুটি করছে। আধ-ঘণ্টা এক জায়গায় একভাবে থাকতে ইচ্ছে করে না। নিজের একটা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটিয়ে বেড়াতে পারলে ভাল লাগত। ছোট দাদু ঠাট্টা করেছিল, হাত তো কম বাড়ায় নি দেখি, এরই মধ্যে গাড়ি চাই!

তার হাত বাড়ানোর সঠিক খবর এঁরা কেউ রাখেন না। গাড়ি চোখে ধুলো দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হলে কাউকে না জানিয়েই কিনে ফেলার কথা ভাবত সে। মা চলে যাবার পর রাগের বশেই একদিন তার আলমারি খুলেছিল। থাকে-থাকে অত টাকা দেখে প্রথম দু' দিনই যা দোটানার মধ্যে মধ্যে পড়েছিল। খরচ করতে-করতে খরচের হাত বেড়েছে। ঝোঁকের মাথায় টাকা নিয়ে খরচ করেছে, যে নেই তার ওপর আক্রোশেও। শেষে আলমারির সব টাকাই অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে, পাছে বাবা বা আর কেউ সন্ধান

পায়। তখন মনে হয়েছিল ও টাকায় সারা জীবনের হাত-খরচ চলে যাবে। কিন্তু এই ক' বছরের মধ্যে অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই সে-টাকা শেষ। পরীক্ষার পর টাকা আরও বেশী দরকার হয়েছে। মায়ের এক বাক্স গয়না আছে দেখে রেখেছে। ওগুলোকেও নির্মূল করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি-যে হল, পারা গেল না শেষ পর্যন্ত। ওগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে।

চাইলে জেঠুর কাছে যা পায় সে-টাকা নস্যি; অতএব তাঁর অনুপস্থিতিতে সুযোগ মত একদিন সরাসরি বাবাকে যাচিয়ে দেখেছিল। সুফলই পেয়েছে। বাবা তখন নীচে তাঁর বসার ঘরে কি কাজে ব্যস্ত। সোজা গিয়ে বলেছিল, জেঠু বাড়ি নেই, আমার কয়েকটা টাকা দরকার।

সেই প্রথম টাকা চাওয়া আর সেই শেষ। শিবেশ্বর চাটুজ্জে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবেছিলেন তিনিই জানেন। ওর প্রতি মনোযোগের অভাবের কথা মনে হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

—কত টাকা?

—গোটা পঞ্চাশেক।

দেবার ব্যাপারে পঞ্চাশ ছেড়ে পাঁচশ হাজারও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবু জানার কর্তব্য হিসেবে জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হবে?

—দরকার আছে, পছন্দমত দুই একটা বইটইও কিনব। সিতুর আসার উদ্দেশ্য তখনো শেষ হয়নি। বলেছে, আজই নয়, প্রায়ই এরকম অসুবিধেয় পড়তে হয়।

দাবির এই স্মার্ট মূর্তিটাই শিবেশ্বর মনে মনে পছন্দ করেছিলেন বোধহয়। অসুবিধেয় পড়তে হয় শুনে খারাপ লেগেছে। নিঃসঙ্গ ছেলেটা হঠাৎ যেন বড় হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে কারণেই হোক, যা চাওয়া হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি উদার হবার তাড়না অনুভব করেছেন তিনি। বলেছেন, বিছানার তলায় সেফ-এর চাবি আছে, যা লাগে নিয়ে নিও। বুঝে শুনে খরচ কোরো।

ঠিক এতবড় পরোয়ানা আশা করে আসেনি সিতু। পেল্লায় সিন্দুক খুলে দু চোখ স্থির তার। একসঙ্গে এত কাঁচা নোট দেখেনি। ওর থেকে খাবলা খাবলা সরালেও কেউ টের পাবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া এর থেকে টাকা যাচ্ছেও যেমন আসছেও হয়ত তেমনি। অতএব নিশ্চিন্ত। জেঠুর আলমারি খুলে এরপর আরো অবাক হয়েছিল। সিতুর নিজের নামের পাস বই কটাতে যে এত টাকা আছে তাও কি কল্পনা করা যায়। মায়ের নামের পাস বইতেও কম নেই, আর বাবার নামে যে কত, ধারণাই করা যায় না।

অতএব সিতুর একটা গাড়ি চাওয়ার হাত হবে সে আর বেশি কি? ওর ভিতরের ছোটার তাড়নাটা কেউ অনুভব করতে পারে না। অন্য নেশা গিয়ে সিতুর এখন ছোটার নেশা। শাড়ি-পরা শমীকে দেখার পর নতুন করে আবার নিজের গাড়ির কথা কেন মনে হয়েছে, সিতু জানে না।

সুবীরের উস্কানিতে সিগারেট বিড়ি-চুরটের স্বাদ দুদিনে পুরনো হয়েছে। বাবার বোতলের জিনিস গলায় ঢালার বৈচিত্র্যও। কিছুদিন হল আর এক নেশায় মেতেছে। ছাপার অক্ষরের সরু চটি বই। বিশ-তিরিশ পাতার বেশি নয়। কোন্ অন্ধকার থেকে ওগুলো আসে আবার পড়া হয়ে গেলে কোন্ অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সিতু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ-বইয়ের জোগানদার সাইকেলের দোকানের নিতাইদা। সিতুর স্কুল ছুটির দরখাস্তয় তার বাবার নাম সই করত যে। প্রত্যেকটা বই পড়ার জন্যে তাকে এক টাকা করে দিতে হয়। ওরকম বই একসঙ্গে তিনটে-চারটে করেও হাতে আসে। নিতাইদার কাছ থেকে সংগ্রহ করে সুবীর সেগুলো সিতুর হাতে দেয়। দুজনেই গোগ্রাসে পড়ে। পড়ার দামটা শুধু সিতু একা দেয়।

ফেরত-বই আর টাকাই নয়, নতুন বইয়ের ঘন-ঘন তাগিদ আসে নিতাইদার কাছে। মুচকি হেসে নিতাইদা বলে, এসব বই ধীরে সুস্থে রসিয়ে-টসিয়ে পড়তে হয়, এ-বইয়ের কি আড়ত আছে যে কাঁড়ি-কাঁড়ি এনে হাজির করব! যেরকম লাভের ব্যবসা, ছাপাখানা থাকলে কি আর এ শালা সাইকেলের দোকানে পড়ে থাকতুম! নিজেই ওর থেকে ঢের ঢের ভালো বই লিখতাম, ছাপতাম আর বেচতাম।

বাবার বোতলের জিনিস গলায় ঢেলে যা হয়নি, গোড়ায় গোড়ায় এ বই হাতে পেয়ে তার থেকে বেশি কাজ হতে লাগল। ভোগের এক বিচিত্র স্বাদের কল্পনায় রক্ত ফোটে, মাথার ঘিলুগুলি গরম হয়ে হয়ে শেষে অসাড় হতে চায়। পাতায় পাতায় লাইনে লাইনে মেয়ে-পুরুষের কি বিষম নগ্ন ভোগের মাতামাতি। মেয়েদের নিঃশেষে ধ্বংস করে করে পুরুষের ভোগের উল্লাস। মেয়ে দেখলে এই গোছের একটা ধ্বংসের আগুন সিতুর শিরায় শিরায় আর মগজের মধ্যেও জ্বলে জ্বলে ওঠে। সে-মেয়ে দেখতে ভালো হলে কথাই নেই। না হলেও ভালো আর সুন্দর কল্পনা করে নেয়। ওর ভিতরের ধ্বংসের ওই জ্বলন্ত কামনা কেবল সুন্দরকে ঘিরে।

কিন্তু বই পড়ার উত্তেজনা স্বাভাবিক নিয়মেই ঠাণ্ডা হতে লাগল। একই ব্যাপারের চর্বিত-চর্বণ। শেষে আবার এক-একটা পড়ে গা ঘুলোয়ও। ভালো লাগে না! ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। অথচ সিতুর মাথার আগুন উদগ্র আক্রোশের মত জ্বলতেই থাকে। বইয়ের টান কমে আসছে দেখে নিতাইদা এবারে ছবি সংগ্রহ করে দিতে লাগল। ছবি দেখার খরচা বই পড়ার থেকেও বেশি। এই দেখার ব্যাপারেও একমাত্র সুবীরই দোসর, নীলিদির ভাই চালিয়াত দুলু নয়। তৃতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল টপকে কোন এক ফ্যাক্টরীর অ্যাপ্রেন্টিস হয়েছে, কলেজের মুখ দেখার রসদ জোটেনি। দুলুর সঙ্গে খাতির কমেনি কিছু, কিন্তু সিতু অন্তত এখন আর সম-পর্যায়ের ভাবে না ওকে। ভাবে না কারণ, নীলিদির ও অনেক ছোট। নীলিদি তলায় তলায় সিতুকে দস্তুরমত খাতির করে এখন। টাকা-পয়সার দরকার হলে নীলিদি চুপি-চুপি এসে ওর কাছেই চায়। হলে কেন, টাকার দরকার নীলিদির প্রায়ই হয়। কোনো ভালো সিনেমা এলে নীলিদি ফাঁক খুঁজে এসে জিজ্ঞাসা করে, দেখবি নাকি, খুব ভালো হয়েছে শুনছি।

সিতু টিকিট কেটে রাখে। পাশাপাশি বসে দেখে। থিয়েটারে খরচা অনেক বেশি। তাও দেখে। নিতাইদার বই পড়ে বা ছবি দেখে এই নীলিদিকে নিয়েও মনে মনে কিছু বিশ্লেষণ করেছে সে। কিন্তু মগজের ধ্বংসের আগুনে তাতে যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটে পড়ে। তার থেকে ভীতু অতুলের দিদি রঞ্জুদির ওপর বরং আক্রোশ কিছুটা তাতিয়ে তুলতে পারে। পঁচাত্তর না একশ টাকা মাইনেয় কোন এক বিদেশী কোম্পানীতে প্যাকিং আর কি সব জোড়া-টোরার চাকরি করে নাকি। ওই পঁচাত্তর একশ'র দেমাকেই এখনো আগের মতই গম্ভীর মেজাজ রঞ্জুদির। নীলিদির মুখেই সিতু শুনেছে, এ পর্যন্ত বার তিনেক মেয়ে অর্থাৎ রঞ্জুদিকে দেখানো হয়েছে। কারো পছন্দ হয়নি, কারো সঙ্গে বা টাকায় বনেনি। শেষে রঞ্জুদি নাকি তার মাকে সাফ বলে দিয়েছে, আর সে সঙের মত নিজেকে দেখাতে বসতে পারবে না।

সিতু গম্ভীর মুখে ঠাট্টা করেছে, আমার থেকে যে বছর চারেকের বড় রঞ্জুদি, নইলে আমিই ভেবে দেখতে পারতাম।

নীলিদি প্রথম চোখ পাকিয়েছে পরে হি-হি করে হেসেছে। —তুই ভয়ানক দুষ্টু, দাঁড়া রঞ্জুকে বলে দিচ্ছি।

বললে সিতু অখুশি হত না। কিন্তু রঞ্জুদিকে কিছু বলার সাহস যে নীলিদির হবে না সেটাও খুব ভালো করেই জানে।

চুপি-চুপি সুবীর একদিন এক বিচিত্র প্রস্তাব কানে দিল। এত বিচিত্র যে সিতু চমকেই উঠেছিল। নিতাইদা তাদের এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। খুব ভালো আর ভদ্র ঘরের। মেয়েটা অভাবে পড়ে দিনকতক মাত্র এই রাস্তায় এসেছে। তাই টাকা কিছু বেশি লাগবে।

তখনকার মত প্রস্তাব নাকচ করেছে বটে, কিন্তু দুই বন্ধুর আলাপ-আলোচনায় বাসনা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবে এবার, বয়েস আঠের। ভয়-ডর আরো কমেছে। শেষে সুবীর একদিন হেসে জানালো নিতাইদা এখনো আশা ছাড়েনি। নিতাইদা নাকি

ঠাট্টাও করেছে, বলেছে বাপ হয়ে ছুটির দরখাস্ত সই করার পর থেকেই সিতুর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে তার, তাই ওর সামনে হেঁজি-পেঁজি কিছু ধরে দেবে না।

বাপ হয়ে ছুটির দরখাস্ত সই করার কথাটা শোনামাত্র মাকে মনে পড়েছে সিতুর। ধরা পড়ার পর মায়ের ব্যবহার মনে পড়েছে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ওকে স্কুল বোর্ডিং-এ ঠেলে পাঠানো হয়েছিল। ওর ভালোর জন্য পাঠিয়েছিল নাকি। মনে পড়তে মাথায় আগুন জ্বলা শুরু হয়েছে। বাবে।

নিতাইদার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে। গেছে।

কিন্তু সত্রাসে পালিয়ে এসেছে সিতু। কোথাও থেকে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে আর বুঝি কখনো পালায়নি। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটা মেয়ের সামনে গিয়ে বসেছিল এক সন্ধ্যায় মনে পড়ে। একা নয়, তিনজন। কিন্তু সিতু একাই পঙ্গু হয়ে গেছল বোধহয়। শরীরের রক্ত সিরসির করে জল হয়ে যাচ্ছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, কে বুঝি তাকে গ্রাস করতে আসছে। সিতুর সর্বাঙ্গ অবশ। নিতাইদার ইশারায় হেসে মেয়েটা তার হাত ধরেছিল। আর তক্ষুনি সিতু যেন মুহূর্তের জন্য প্রাণ বাঁচানোর শক্তি খুঁজে পেয়েছিল। উঠে ঝড়ের মতো ছুটে বেরিয়ে গেছল। তারপরেও কাঁপুনি থামনি। গা ঘুলনো থামেনি। একধার থেকে চান করেছে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে হাড় শুদ্ধ ঠান্ডা করতে চেয়েছে। আর তারপরেও এক অদ্ভুত কান্ড হয়েছে। বুকের তলা থেকে জমাট-বাঁধা একটা অচেনা কান্না গুমরে গুমরে ওপরের দিকে আসতে চেয়েছে।

কদিনের মধ্যে এ ভাবটা আবার কেটে গেল বটে। কিন্তু মারমূর্তি দেখে সুবীরও তার পালানো নিয়ে ঠাট্টা করতে ভরসা পেল না। এই বন্ধু বিগড়লে তার অনেক লোকসান।

বই না, ছবি না, বাবার বোতলের জিনিস না, সুবীর আর নিতাইদার পাল্লায় পড়ে যেখানে গিয়েছিল সেই জায়গাও না—কিছুই উত্তেজনার ইন্ধন জোগাতে পারেনি। অথচ উত্তেজনাশূন্য জীবন এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। মগজের মধ্যে বাসনার একটা ক্রূর আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছেই। সেই ধ্বংসের আগুনেই টেনে আনতে চায় কাউকে। কিন্তু কাকে? একখানা মুখ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়েছে ক্রমশ। যত স্পষ্ট হয়েছে রক্ত ততো উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে। চোদ্দ-পনের বছরের একটা মেয়ের মুখ। তার পরনে বাদামী ডুরে শাড়ি, এক-দিকের কোঁকড়া চুলের গোছা সাপের মত এঁকেবেঁকে গলা ঘেঁষে বুকে এসে পড়েছিল। যে মেয়েটাকে 'ওই একজন' এখন খুব ভালবাসে—খুব।

পড়ার বইপত্রগুলোতে ধুলো পড়ে গেল। সেকেন্ড ইয়ার গড়িয়ে চলেছে, এখারে ওগুলো ঝেড়ে-মুছে নিয়ে বসা দরকার। খোলা দরকার। বসেছে, খুলেছে। কিন্তু দুচোখ বইয়ের অক্ষরে আটকে রাখা দায়। ঘরে হাঁপ ধরে, বাড়িতেও। বেরিয়ে পড়ে। অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে। কল্পনায় অদৃশ্য মানুষ হয়ে যায়। সেই অদৃশ্য মানুষের অবধারিত গন্তব্যস্থল ওই ফ্ল্যাট বাড়ি। যেখানে 'ওই একজন' আছে আর কোঁকড়া চুল, ডুরে-শাড়ি-পরা একটা আদুরে মেয়ে আছে। অদৃশ্য মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি দেখে ঠিক নেই, হাসে মুখ টিপে, হিংস্র ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দের চিত্রটাকে রক্তাক্ত করে দেবার মুহূর্ত কল্পনা করে।

কিন্তু কাল্পনিক মুহূর্ত নিয়ে কতক্ষণ তুষ্ট থাকা যায়? কল্পনা ভাঙে যখন বাস্তব খোরাক না পেয়ে হিংসা তখন নিজেকেই বিধ্বস্ত করতে চায়। অদৃশ্য মানুষ হতে না পারুক, নিজে অদৃশ্য থেকে কিছু সন্ধান-পর্ব সম্পন্ন করেছে। যেমন, মা আর আগের স্কুলে যায় না, ঠিক সাড়ে নটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে উল্টো দিকের ট্রামে উঠে মাইলটাক দূরের এক নতুন স্কুলে যায়। বাড়ি ফেরে পৌনে পাঁচটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। শমী বাসে চেপে স্কুলে যায়, বাড়িতে বাস আসে সকাল পৌনে নটায়। ফেরে সাড়ে চারটার মধ্যে। সেও মাইল খানেকের মধ্যে একটা নতুন স্কুল। বাসটা এক গাদা মেয়ে নিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শমী স্কুলে আসে স্কার্ট ফ্রক পরে, কোমরে টাইট করে রিবন-বাঁধা, মাথার ঝাঁকড়া চুলও সেই রং-এর রিবনে টেনে হর্স-টেল করে বাঁধা। চুলের বিন্যাস বোধহয় 'ওই একজনই' করে দেয়।

অদৃশ্য থেকে দৃশ্যে আসার তাগিদ ঠেকিয়ে রাখা গেল না। স্কুলে ঢোকার মুখে বাসটা প্রায় থেমেই যায়। দু-তিন দিন সে-সময় ওখানটায় ঘোরাঘুরির পর শমী দেখল ওকে। সিতুর ভাবখানা যেন স্কুলের গা-ঘেঁষা ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, বাসটা ফটকে ঢুকছে বলে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাকে দেখামাত্র শমীর দু চোখ উৎসুক হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সিতু যা করেছে আর কোনদিন তা করেনি। হাসিমুখে তার উদ্দেশে হাত নেড়েছে। আর অপ্রত্যাশিত খুশির ব্যস্ততায় শমীও হাত নেড়েছে। তার সত্যিকারের আনন্দ হয়েছে। কম্পাউন্ডের মধ্যে বাস আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সাগ্রহে এদিকেই ঘাড় ফিরিয়ে ছিল। তার মনে হয়েছিল, সিতুদার শুধু খুশি-মুখ দেখেনি, হাত নেড়ে কিছু যেন একটা আশ্বাসও দিল।

এর দুদিন বাদে স্কুল কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকেছে সিতু। দুপুরে, ঠিক টিফিন টাইমে। ভিতরের কম্পাউন্ডে গাদা গাদা মেয়ে ঘুরছে মাঠে বাগানে এদিক-ওদিকে। চারদিক চোখ চালিয়ে একজনকে ছেঁকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল তার বোন শমী বোসকে ডেকে দিতে পারে কিনা। তারপরেই ফ্যাসাদ, দরোয়ান প্রশ্ন করেছে কোন ক্লাসের মেয়ে। মেয়েদের একটা দঙ্গলের দিকে ফিরে সিতু যেন কোনো চেনা মেয়েকেই দেখে নিচ্ছে, কিন্তু আসলে সে দ্রুত চিন্তা করছে কোন্ ক্লাস হতে পারে। প্রথম যে ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল মনে আছে, কিন্তু কোন্ বছরে ভর্তি হয়েছিল সঠিক মনে পড়ছে না। এই ফাঁকেই মুশকিল আসান হয়ে গেল। কোথা থেকে তাকে দেখে শমীই ছুটতে ছুটতে আসছে। অতএব দরোয়ানের প্রশ্নের আর জবাব দেবার দরকার হল না।

আনন্দে আর উত্তেজনায় এত জোরে ছুটে এসেছে যে শমীর মুখ লাল। একটু মোটা-সোটা বলে হাঁপ ধরেছে। —সিতুদা তুমি!

সমান তালে চোখে-মুখে খুশি ছড়ালো সিতুও। দীর্ঘ অদর্শনের পর সামনাসামনি দেখার আনন্দের মতই। বলল, আমি তো প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে যাই, সামনেই এক ইয়ং প্রোফেসারের বাড়ি, তার সঙ্গে পড়া-শুনোর আলোচনা হয়, আড্ডা হয়। তা তুই আজকাল এই স্কুলে পড়িস?

ওকে বুঝতে না দিয়েই কথার ফাঁকে সামনের গাছটার আড়ালে এসে দাঁড়াল। শমী বলল, হ্যাঁ, মাসি আর আমি দুজনেই আগের স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। আনন্দে কি যে বলবে শমী ঠিক পাচ্ছে না, মুখে লজ্জা মেশানো সঙ্কোচ। —আমি আগের মতই মাসি ডাকি, মাসি বলে দিয়েছে কাকীমা ডাকতে হবে না।

বেড়াল নখ গোটায় কি করে সিতুর দেখা আছে। সেও সেই চেষ্টাই করছে। খুশিতে টান ধরতে দেবে না। শব্দ করেই হাসল, হোয়াট ইজ ইন এ নেম—বুঝলি কিছু? কোন ক্লাস হল তোর?
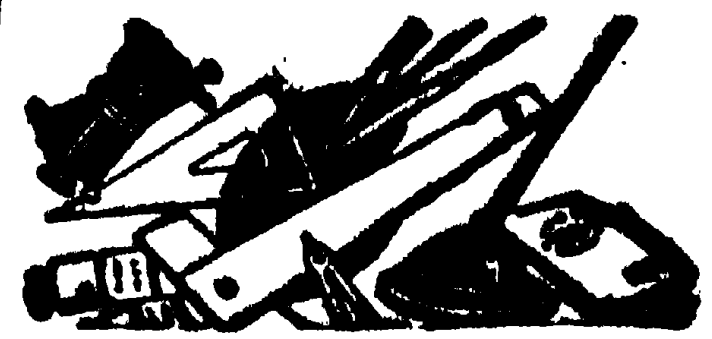
—নাইম, এবারে ট্রেন-এ উঠব। তুমি স্কুলে এলে যে?

পকেটে হাত ঢুকিয়ে মস্ত বড় একটা দামী চকোলেট বার করল সিতু। —নে খা।......সেদিন বাসে তোকে দেখে আজ ঢুকে পড়লাম। কেন, কেউ কিছু বলবে নাকি তোকে?

শমী চকোলেট পেয়ে খুশি, ওটা সিতুদার দেওয়া বলে খুশি, আর সিতুদার এমন অপ্রত্যাশিত ভাবসভ্য হাসিমুখ দেখে আরো খুশি। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কে আবার কি বলবে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি বলব আমার দাদা। হ্যাঁ সিতুদা, আমার ওপর আর তোমার একটুও রাগ নেই আর, না?

হাসি বজায় রাখা এত কঠিন সিতু জানত না। চেষ্টার ত্রুটি নেই। বলল, রাগের বয়েস আছে? তাছাড়া তোর ওপর রাগতে যাব কেন? সেই একবার অন্য স্কুল গেট থেকে তোকে ডেকেছিলাম তুই এলিই না।... বাস থেকে আমাকে পরশু দেখলি বাড়ি গিয়েই মা-কে বলেছিস তো?

ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখ করে শমী মাথা নাড়ল। বলেছে। সিতুদা তাকে দেখে হাসি-মুখে হাত নেড়েছিল সেটা তার কাছে আনন্দের দিনই তো।

—মা শুনে কি বলল?

—কিছু বলেনি। শমীর উৎসুক আগ্রহ। —তুমি বাড়িতে আস না কেন? যতবার দেখা হয় পালিয়ে যাও। এজন্যে মাসির কত কষ্ট হয় জানো?

সিতু প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছে এটা স্কুল। মাসির ওপর দরদের কথা শুনে দু'হাত নিশপিশ করছে, রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করতে চাইছে। যে বলছে, এক চড়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আবার নিজেই ভাবছে, শমীর এতটুকু সন্দেহ হলে সেটা গাধার মত কাজ হবে। দুর্বার রাগ সত্ত্বেও মাথা দ্রুত কাজ করছে তার। বড় নিঃশ্বাস ফেলল, আমারই কি কম কষ্ট হয় ভাবিস? মায়ের কষ্ট হয় জানলি কি করে, কিছু বলে?

শমী মাথা নাড়ল, বলে না। কিন্তু পাছে মাসির কষ্টের ব্যাপারে সিতুদার সন্দেহ হয় তাই তাড়াতাড়ি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করল। —না বললেও আমি ঠিক বুঝতে পারি। মাসি যে এখনো তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি একবারটি বাড়িতে এলেই বুঝতে পারবে। আসবে?

ভালবাসার কথা শোনামাত্র আবার নিজেকে সংযত করার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকাতে হল। ভিতরের ক্রুর তাপ মুখের মেকী হাসিটুকু শুষে নিচ্ছে বুঝি। অতএব বিমর্ষ মুখ করে ভাবতে হল একটু। জবাব দিল, যেতে পারি, কিন্তু তোর জন্যেই যাওয়া হবে না।

প্রতিদ্বন্দ্বী ফটো : অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

—কেন, কেন? শমীর মুখে শংকা।

—আজও তুই বাড়ি গিয়েই মাকে বলবি তো সিতুদা স্কুলে এসেছিল?

প্রশ্ন শুনে শমী হকচকিয়ে গেল কেমন। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

সিতু বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা, বলল, তোর জন্যেই বোধহয় মায়েতে ছেলেতে আর এ জীবনে দেখা হবে না।

শমী রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, এক ভয়ানক জায়গায় গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। নইলে গিয়ে গিয়েও কেন ফিরে আসি বুঝতে পারছিস না? আর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞার সময় ফুরোবে তখন যেতে পাব। কিন্তু তার আগে যদি মা জেনে ফেলে আমি দেখা করার জন্য হাঁক-পাঁক করছি, তোর এখানে এসেছি, বা শিগগীরই যাব ভাবছি—তাহলে এ জীবনে আর দেখা তো হবেই না, উল্টে আমার মরা মুখ দেখতে হবে তোদের।

শমী পনেরয় পা দিয়েছে বটে কিন্তু সিতুর তুলনায় অনেক সরল। তার বড় বড় চোখে রাজ্যের বিভ্রম। দুর্বোধ্য ভয়ও। শেষে উদগ্রীব মুখে মাথা ঝাঁকালো, তাহলে আমি বলব না, মাসিকে কিছু বলব না—বুঝলে?

—হুঁঃ, তোর পেটে আবার কথা থাকবে, কোনো একটা কথা উঠলেই গলগল করে বলে ফেলবি।

—কখখনো না! বলছি তো বলব না, কিন্তু তুমি কতদিনের মধ্যে যাবে?

—খুব শিগগীরই। তার আগে এক-আধদিন তোর এখানে এসে বুঝে যাব মাকে কিছু বলেছিস কিনা।......হঠাৎ এক-দিন তোর সঙ্গে গিয়ে হাজির হব, মা একেবারে আকাশ থেকে পড়বে, খুব ভালো হবে না? আর আমাকে নিয়ে যাওয়ার ক্রেডিটটাও তো তোরই হবে। আগে কিছু বলবি না তো?

শমী সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বাস দিল, কিছু বলবে না।

হাসিমাখা দু'চোখ আর একবার ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে সিতু বিদায় নিল। দুটো দিন ধৈর্য ধরে কাটালো কোনরকমে। দুটো দিন দুটো বছরের মত। তৃতীয় দিনে সেই টিফিন টাইমে আবার এলো। শমীকে খুঁজে বার করতে হল না। টিফিন হতে এ দু'দিন ও-ই দশবার করে গেটের দিকে তাকিয়েছে।

—বলিসনি তো কিছু?

শমী বিশ্বাসযোগ্যভাবেই মাথা নাড়ল। বলেনি তো বটেই, মাসির সামনে সিতুদার কথা মনে হলেও বুকের ভিতরটা ধুকপুক করেছে।

হৃষ্ট মুখে সিতু এদিনও পকেট থেকে দামী চকোলেট বার করে ওর হাতে দিল। প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আবারও সাবধান করল। আর ফেরার আগে আশ্বাস দিল আর তিন-চার দিনের মধ্যেই হুট করে এক-দিন ওকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হবে।

আবারও একে একে তিনটে দিন বাড়িতে বসে কেটেছে সিতুর। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কি এক অস্থির তাড়না। নিতাইদার বই পড়ে, ছবি দেখে বা তার সঙ্গে সেই এক জায়গায় যাবার সময়ও এরকম হয়নি। এই দুনিয়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করার মত মেজাজ। অথচ বাইরেটা একেবারে স্তব্ধ।

ঠিক চার দিনের দিন শমীর স্কুলে এলো আবার। টিফিন টাইমে নয়। ঘড়ি দেখে টিফিন টাইমের আধ ঘণ্টা বাদে। ফিরে আবার স্কুল বসেছে তখন। শুকনো খরখরে মুখ সিতুর। গেটের দরোয়ানের কাছে গিয়ে স্কুল-অফিসের খোঁজ করল। দারোয়ান অফিসঘর দেখিয়ে দিল।

...মিনিট পাঁচ-সাত বাদে ক্লাস থেকে অফিস-ঘরে ডাক পড়ল শমীর। দরোয়ানের মারফত তাকে বইখাতা নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। বিলক্ষণ অবাক হয়েই এসেছিল শমী, অফিস-ঘরের লেডি-ক্লার্কের সামনে সিতুদাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বুক দুরু দুরু।

লেডি ক্লার্ক অর্থাৎ ওদের কনকদি জিজ্ঞাসা করল, এ তোমার দাদা?

বিমূঢ় মুখে শমী মাথা নাড়ল: তাই। সিতু বলল, বাড়ি চল্, মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

আকাশ থেকে পড়ার মুখ শমীর। কনকদি গেট পাস সই করে তার হাতে দিতে হতভম্ব মুখে সিতুদার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সিতুদা হনহন করে আগে আগে গেটের দিকে চলেছে। একবার ফিরে তাগিদ দিল, তাড়াতাড়ি, এক্ষুনি ট্যাক্সি ধরতে হবে--

দ্বিগুণ ঘাবড়ে গিয়ে শমী হন্তদন্ত হয়ে এগলো, তবু বাইরে আসার আগে সিতুদার নাগাল পেল না।

গেট পেরিয়েই চলন্ত ট্যাক্সি থামালো সিতু! দরজা খুলতে আগে শমী উঠল, পরে ও। ঠাস করে দরজা বন্ধ করল।—সিধা।

শমীর বুকের কাঁপুনি বেড়েই চলেছে। ঘুরে বসল। —মাসির কি হয়েছে?

—খুব অসুখ।

—তোমাকে কে বলল?

—বিভাস কাকা বাড়িতে ফোন করেছিল। আমি বললাম তোকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞার সময়ও শেষ হয়েছে, যেতে আর বাধা কি।

—কিন্তু মাসি তো সকালেও ভালো ছিল, কাকুরই শরীর ভালো ছিল না।

সিতু তেতে উঠল, তোর মাসির শরীর কি মা-দুর্গার শরীর, খারাপ হতে পারে না?

শমী চুপ মেরে গেল। এই মুখ দেখেও ভয়-ভয় করছে তার। মাসির হঠাৎ এমন কি সাংঘাতিক অসুখ করতে পারে ভেবে পাচ্ছে না।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছুটেছে। এই রাস্তা শমীর চেনার কথা নয়, চিনলও না। নির্দেশ মত ট্যাক্সি আর একটা বড় রাস্তার বাঁক ধরে চলেছে। বেশ খানিক চুপচাপ থাকার পর সিতু বিরক্ত মুখ করে বলে উঠল, পনের বছর বয়েস হল, এখনো ফ্রক পরিস কেন, শাড়ি পরতে পারিস না?

শমীর বড় বড় দু'চোখ তার মুখের ওপর, এই পরিস্থিতিতে ফ্রক-পরা হেতু বিরাগ কল্পনাও করতে পারে না। এ দু'-দিন টিফিন টাইমে যে সিতুদাকে দেখেছে, সে-রকম লাগছে না একটুও।

—খোলা চুলে শাড়ি পরে সেদিন বাড়ির রেলিংএ দাঁড়িয়েছিলি—এর থেকে ঢের ভালো লাগছিল দেখতে।

তাকে খুশি করার জন্যেই শমী হাসতে চেষ্টা করল একটু, স্কুলে ওরকম আসা যায়!

—ও-রকম না হোক শাড়ি পরে তো আসা যায়!

খানিক বাদে এক বড় রাস্তার ফুট-পাথের পাশে ট্যাক্সিটা দাঁড় করানো হল আর সিতুদা সেখানে নেমে তাকেও নামতে বলল দেখে শমীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। গম্ভীর মুখে ট্যাক্সি-ভাড়াও মেটাতে দেখল। শমী চারদিক তাকাচ্ছে। সামনেই ঝকঝকে মস্ত দালান একটা, তার দেয়ালে সাহেব মেম-সাহেবের বড় বড় রঙিন ছবি। দালানের মাথায় নাম পড়ে বুঝল এটা একটা ইংরেজি সিনেমা হল। সামনের বারান্দায় লোকের ভিড়।

ঘুরে এতক্ষণে সিতুদার চোখে মুখে চাপা হাসি দেখল। তবু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করল, এখানে নামলে যে?

এবারে সিতুদা হেসে উঠল। দু'দিন স্কুলে যেমন দেখা গেছে তেমনি হল মুখখানা। সস্নেহে তার একখানা হাতও ধরল, বলল, তুই ভারী বোকা তো, এতক্ষণ তোর দিকে চেয়ে কি মজাই না লাগছিল।

শমী অপ্রস্তুত, কিন্তু শঙ্কার ছায়া মিলায়নি।

—তোকে বলেছিলাম না হুট করে এক-দিন তোকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হব! স্কুলে ও-রকম না বললে তোকে আনতে পারতুম? ঘড়ি দেখল, আয়, তিনটে বাজে—

সিতু এগিয়ে গেল। উদ্দেশ্য না বুঝে বিমূঢ়ের মতই শমী তার পাশে এলো আবার। —মাসির কিছু হয়নি?

মনে মনে একটা কটূক্তি করে সিতু হেসেই মাথা নাড়ল। কিছুই হয়নি।

—তাহলে বাড়ি যাচ্ছ না কেন, এখানে কোথায় যাচ্ছ?

চাপা অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে ওঠার আগেই সিতু আবার হাসল, কি-রে বুদ্ধি তোর, দু'দিন' বাদে না ক্লাস টেনএ উঠবি? এখন বাড়ি গেলে মা-কে পাব? মা স্কুলে না এখন!

শমীর মনে হল তাই বটে। কিন্তু এ-ভাবে অসুখের কথা বলে কেউ তাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে পারে সেটা যেন এখনো কল্পনা করতে পারছে না।

সিতু বলল, তার থেকে ফুর্তি করে সিনেমা দেখি চল্, ইংরেজি ছবি তো দেখিস না কখনো, দুজনের টিকিট আমি কেটেই রেখেছি। তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, মা বাড়ি ফেরার সময়-সময়ই ফিরব'খন, দুজনকে একসঙ্গে দেখে একেবারে হাঁ হয়ে যাবে।

হাঁ আপাতত শমীই হচ্ছে। লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গালচে পাতা তক-তকে সিঁড়ি ধরে তাকে দোতলায় এনে তোলা হল। তার একখানা হাত তখনো সিতুদার হাতে ধরা। চারদিকের চোখ-ঠিকরনো সাজ-সজ্জা আর আলো দেখেই কিনা বলা যায় না। শমী বিহ্বল।

একটা লোক টিকিট দেখে হলের এক কোণে নরম তুকতুকে দুটো গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। চেয়ার যে তখনো বোঝেনি। সিতুদা হাতে করে টানতেই ও-দুটো চেয়ার হয়ে গেল। পাশাপাশি বসল দুজনে। পিছনের সারি, সামনে আর আশ-পাশে জোড়া জোড়া আরো কতগুলো মেয়ে পুরুষ, সাহেব-মেমসাহেবই বেশি। সামনের সাদা পর্দা থেকে সুন্দর বাজনা আসছে।

তবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তেমন মন বসছে না শমীর। গলা খাটো করে বলল, বাড়ি ফিরে আমাকে না দেখলে কিন্তু মাসি ভাববে—

চাপা রাগে সিতু বলে উঠল, কিচ্ছু ভাববে না।

একটু বাদেই চঞ্চল হয়ে উঠল সে। মাথায় আরো কিছু এসেছে। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চুপ করে বসে থাক একটু, আমি তোর ভাবনা দূর করে আসছি—

হন হন করে তাকে হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল। কোথায় যেতে পারে শমীর মাথায় ঢুকল না। একলা থাকার অস্বস্তিতে উন্মুখ হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল।...ওমা, দরজা যে বন্ধ হয়ে গেল, লাইট নিভে ঘর অন্ধকার হচ্ছে—একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকারই হয়ে গেল—তাকে ফেলে রেখে সিতুদা গেল কোথায়?

আর একটু দেরি হলে ঘাবড়ে গিয়ে শমী চেয়ার ছেড়ে উঠেই পড়ত হয়ত। ওদিকে অর্থাৎ দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, হঠাৎ কাঁধে হাত দিয়ে পাশে কে বসে পড়তে আঁতকে উঠল।...যাক সিতুদাই। খুশিমুখে ফিস-ফিস করে সিতুদা বলল, মা-কে ফোন করে

জানিয়ে এলাম, দেরি হলেও আর ভাববে না। নিশ্চিন্ত?

—ফোন করলে! কোথায়?

—আস্তে। ওই ইয়ে—স্কুলে।

—মাসি কি বলল?

—বলবে আবার কি, তোকে নিয়ে যাচ্ছি শুনেই আনন্দে আটখানা। বললাম, সিনেমা ভাঙলে রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে ফিরতে একটু দেরিই হবে। কলকাতার বড় রেস্টুরেন্টে তো খাসনি কখনো। এই দিনে একটু ফূর্তি করে বাড়ি ফিরছি শুনে মা খুশিই হল—

অন্ধকার চোখে সয়েছে খানিকটা, তবু সিতুদার মুখ দেখা গেল না ভালো। রেস্টু-রেন্টে খাবার লোভ যে নেই তা নয়, কিন্তু সিতুদার কাণ্ড দেখে ও আপাতত খাবি খাচ্ছে। সব-দিকেরই ফয়সালা হল বলে নিশ্চিন্ত একটু বটেই, তবু ভয়ানক অদ্ভুত লাগছে তার। এতদিন বাদে ছেলেকে পাবে, মাসির আনন্দে আটখানা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে গোঁয়ার ছেলে, কিছু বললে পাছে বিগড়ায় সেই জন্যেই হয়ত টেলিফোনে যা বলেছে তাতেই রাজি হয়েছে।

প্রথমে হিজিবিজি কি-সব দেখানোর পর আলো জ্বলেছে, তার খানিক বাদে আবার আলো নিভেছে—এবারে আসল ছবি শুরু নাকি। ছবি চলেছে, শমী এক বর্ণও বুঝছে না, হাঁ করে দেখছে শুধু। মাঝে মাঝে এ-দিক ওদিক থেকে হাসির শব্দ কানে আসছে। এক শমীই বোকার মত দেখে চলেছে। এক জায়গায় ছবির সাহেবটা মেমসাহেব মেয়েটাকে জাপটে ধরে চুমু খেতে লাগল। শমী মনে মনে বলে উঠল, কি অসভ্য!

তার পরেই সচকিত। সিতুদার এক-খানা হাত তার কাঁধে, আঙুলে করে অল্প অল্প চাপ দিচ্ছে। খানিক বাদে ছবিতে আর একবার ওই রকম হতে কাঁধ ছেড়ে হাঁটুর ওপর সিতুদার হাতের চাপ টের পেল। অন্ধকারে শমীর মুখ লাল, কি-রকম একটা অস্বস্তি লাগছে তার।

ছবি শেষ হল একসময়। আলো জ্বলল। অত আলোর জন্যে কিনা বলা যায় না, সিতুদার মুখখানাও লালচে ঠেকছে। সিঁড়ি ধরে নীচে নামল, বাইরে বেরিয়ে এলো। বিকেল পেরিয়ে আবছা অন্ধকার নেমেছে।

—চল্ এখানে খেয়ে নিই ভালো করে।

খাওয়ার স্পৃহা কেন যেন কমে গেছে শমীর। বইয়ের ব্যাগটা একবার হাতে দুলিয়ে বলল, এখন আর দেরি না করে একেবারে বাড়ি গিয়েই খাবে চলো না—

বাড়িতে তো পোলাও-কালিয়া রেঁধে বসে আছে তোর জন্যে, অমন জায়গায় কখনো খাসনি, চল্—

যেতে হল। লোকের ভিড়, তবু সিতুদা হাত ধরে আছে বলে কেমন-কেমন লাগছে। বড় রেস্তোরাঁই বটে। শমীর হাঁ হয়ে যাবার দাখিল। তার মধ্যে একটা খুপরি ঘরে ওরা দুজনে গিয়ে বসল। অর্ডার-মত অনেক খাবার এলো। ভালও লাগছে খেতে, কিন্তু ও যত চটপট খাচ্ছে, সিতুদা তত নয়। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে, দু'চোখ অত চকচক করছে কেন, বুঝছে না। সিতুদা কথাও বেশি বলছে না এখন।

প্রায় তিন-পো-ঘণ্টা বাদে পকেট থেকে এক-গোছা নোট বার করে খাবারের দাম দিল সিতুদা। বেরিয়ে এলো যখন সন্ধ্যা পার। কোন্ দিকে যেতে হবে শমী জানে না, তার হাত ধরে সিতুদা সামনের বড় রাস্তা পার হল। তারপর ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে ময়দানের দিকে পা বাড়ালো।

—ওই মাঠে একটু বসব।

—এই অন্ধকারে! শমী আতকেই উঠল, না না রাত হয়ে গেল, বাড়ি চলো। তাছাড়া শীত-শীত করছে।

—শীত করবে না, চল্ না। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে, একটু খোলা হাওয়ায় বসব। টেলিফোন তো করা হয়েছে, তোর ভয় কি?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, শমীর বাধা দেবার শক্তি নেই। অথচ এখনো বাড়ি না ফেরাটা তার ভয়ানক খারাপ লাগছে। নির্জন অন্ধকারের মাঝে একজায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। —আর হাঁটতে পারি না, এবার চলো!

সিতু থমকালো। হাত ছেড়ে দিল। —তাহলে একাই যা, আমি যাব না।

একা যাওয়ার নামে শমী চমকে উঠল। ব্যাগে অবশ্য টাকা আছে একটা, মাসি দিয়ে রাখে, আর কত নম্বর বাসে যেতে হয় তাও জানে। কিন্তু একা কোনদিন ট্রামে বাসে ওঠেনি। তাছাড়া এরপর সিতুদা সত্যি না গেলে কি হবে?

অগত্যা আরো খানিক এগিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসতে হল। সিতুদাও গা ঘেঁষে বসল। এত বেশি গা ঘেঁষে যে শমীর অস্বস্তি। কাঁধ ধরে আছে, নড়ার উপায় নেই।

খানিক চুপচাপ থেকে সিতু বলল, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস?

ভয়ে ভয়ে শমী তার দিকে তাকালো।

—খুন করতে।

মুখ শুকিয়ে আমসি শমীর।—কাকে?

—তোকে আমাকে মা-কে সক্কলকে।

সক্কলকে শুনে তবু স্বস্তি। কি-যে গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ছে বুঝছে না।

—ও-দিকে সরতে চাস কেন, কাছে আয় না। জোর করেই আরো কাছে টানল।—বিয়ে হলে তখন তো কাছে আসতেই হবে, অত লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি।

—ধেৎ। ভয়ে সংকোচে শমী সর[illegible] চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে কি-যে হল নিজেও বোঝ[illegible] অবকাশ পেল না। অস্ফুট আর্তনাদ ক[illegible] উঠল শমী। প্রথমে ভাবল সিতুদা খ[illegible] করার জন্যেই তাকে ভুলিয়ে এনেছে। প[illegible] ক্ষণে আরো ত্রাস, গালে ঠোঁটে তার দাঁত ব[illegible] গেল। যে-ভাবে ধরেছে নড়তে পারছে ন[illegible] অসহ্য যন্ত্রণা। শমী প্রাণপণে চেষ্টা কর[illegible] ছাড়াতে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গর্জন, চু[illegible] করে থাক, নইলে খুনেই করব তোকে আজ-

ভয়ে ত্রাসে দুই চোখ বিস্ফারিত শমী[illegible] বুঝতেও পারছে। শুধু গালে ঠোঁটে দা[illegible] বসে যাচ্ছে না, গায়ের মাংসও যেন ছিঁ[illegible] খুবলে নিচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে[illegible] পারছে না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট দিয়ে তার মু[illegible] চেপে রেখেছে। আর দু'হাতে তাকে টে[illegible] টেনে নিজের শরীরটার সঙ্গে মিশিয়ে দি[illegible] চাইছে।

—ছাড়ো সিতুদা, ছাড়ো মরে গেলাম!

—জোর করলে মরবি, ছাড়ব বলে তো[illegible] এ-পর্যন্ত এনেছি!

এলোমেলো টানা হেঁচড়ার ফাঁকে এ[illegible] ঝটকায় তাকে ঠেলে শমী উঠে দাঁড়াল[illegible] দিশেহারা ভয়ে এক মুহূর্তের জন্য তা[illegible] দেখল। তারপরেই ব্যাগটা তুলে নি[illegible] অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছু[illegible] সে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছোটা।

ছোটাছুটি বাড়িতেও শুরু হয়েছে[illegible] স্কুলে হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করে বিভা[illegible] দত্ত এবার থানায় গেছেন। তারপর [illegible] করবেন জানেন না। আর দুর্ভাবনায় [illegible] জ্যোতিরাণী ক্রমাগত ঘর বার করছেন। স্কু[illegible] যখন খোঁজ করা হয়েছে তখন সেখানে [illegible] নেই। তারপর থেকে প্রতিমুহূর্তেই [illegible] পাগল-করা ছটফটানি।

দরজা ঠেলে শমী ঘরে ঢুকল। [illegible] দিকে চোখ পড়তে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে[illegible] পারলেন না। অজানা আশংকায় স্তব্ধ ক[illegible] মুহূর্ত। টলতে টলতে শমী এগিয়ে এলো[illegible] ঠোঁটে গালে ক্ষতচিহ্ন। হাতের ব্যাগ ফে[illegible] শমী দু'হাতে জ্যোতিরাণীকে জড়িয়ে ধরল[illegible]

সম্বিত ফিরল যেন। —কি হয়েছে[illegible] কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই চেহারা কে[illegible] বল্ না?

—সিতুদা...!

আর্তনাদের মত শুধু এই একটা শব্দ[illegible] বেরুলো মুখ দিয়ে। দু'হাতে তাঁকে জড়ি[illegible] ধরে কোলে মুখ গুঁজে শমী ফুঁপিয়ে কেঁ[illegible] উঠল।

জ্যোতিরাণীর সর্বাঙ্গ অবশ [illegible] মুহূর্তে। এক অকল্পিত আঘাতে বু[illegible] স্পন্দনও থেমে এলো বুঝি।

[ক্রমশঃ

অঙ্গনা

প্রমীলা

বাস্তব সচেতন

অবস্থা তলিয়ে দেখলে দায়িত্ব সকলের ওপর এসে পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্বে সকলের দায়িত্ব সমান। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাই সবাইকে এগিয়ে যেতে হয়। 'সকলের তরে সকলে আমরা' কথাটা এমনিভাবে সার্থক হওয়া সম্ভব। স্বপ্ন ঢুলুঢুলু দু' চোখে কল্পনার মিনার গড়ে লাভ নেই। কারণ তার কোন সার্থকতা নেই। অহিফেনসেবীর মতই তা ক্ষণিক আনন্দে তুঙ্গশীর্ষ করে তোলে। কিন্তু নেশা ফিকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বোকামি ধরা পড়ে যায়, আর তখন নিজের কাছে নিজেকে অত্যন্ত নির্বোধ মনে হয়। সান্ত্বনা পাবার জন্য কেউ কেউ নিজের বোকামিতে হেসে ওঠেন। এটা আসলে সান্ত্বনা নয় বোকামির ভার লাঘব করা। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আত্মগোপন এর নামান্তর। এভাবেও মানুষ বাঁচে এবং সবচেয়ে আশ্চর্য যে, বেঁচে থাকা যায়। এ এক ধরনের মরে বেঁচে থাকা। কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে সাহসনিষ্কৃত বজ্রপটে আঘাত-সংঘাতকে বুকের মধ্যে ধারণ করে থাকাই যথার্থ পৌরুষ। এ পৌরুষ সকলের নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু কিছু লোকের আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই সংখ্যাল্প। কিন্তু চিরকাল তাঁরাই আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। আমরা সেই নেতৃত্ব মেনে এসেছি। অবজ্ঞা করতে পারি নি এবং সে সাহসও ছিল না। নতমস্তকে তাঁদের নির্দেশ মেনে চলেছি। এ সম্পর্কে ভাল-মন্দের বিচার জটিল তর্কে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সর্বত্র বিরাট পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। সবাই এখন বুঝতে চায়, জানতে চায়। কাজেই পূর্বোক্ত নেতৃত্ব এখন অনেকাংশে অচল। সাদা চোখে পরিস্থিতিকে তলিয়ে দেখতে অনেকেই উৎসুক। কিন্তু বেশী দূরে এগোতে চায় না। এগিয়েও হয়ত মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরই মধ্যে এক দল আবার নেশায় বুঁদ হয়ে স্বপ্ন-মঞ্জিল গড়ে তোলে।

কিন্তু বাস্তবের সুষ্ঠু পর্যালোচনা এবং পথনির্দেশ আমাদের প্রয়োজন। আর এ ব্যাপারে সকলের দায়িত্ব সমান। সারা দেশ জুড়ে বর্তমানে যে অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজমান তা থেকে মুক্তি পেতে হলে সকলের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। প্রদেশে প্রদেশে ফারাক, ভাষা-সংহতির দ্বন্দ্ব, সীমানা ও স্বাধিকার সমস্যা আজ আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। সকলের উপরে রয়েছে অন্নচিন্তা চমৎকারা। সমস্যার এই জটিলতা আমাদের যেন সেই পুরাণ-কথিত নাগপাশে বদ্ধ করেছে। অস্থিরতা বাড়ছে কিন্তু মুক্তি ঘটছে না। আমরাও দমবার পাত্র নই। মুক্তি আমাদের অর্জন করতেই হবে তা যে কোন মূল্যেই হোক। 'এক মন এক প্রাণ' হয়ে দেশের জাগ্রত নারীসমাজ সকলের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসবে। কারণ দায়িত্বের গুরুত্ব এবং সমস্যার তীব্রতা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সমস্যা ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশ হয়ে উঠবে আনন্দনিকেতন।

• • • • নিজের পায়ে • • • •

আপনার পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ আজ সবাই অনুভব করেন। এ তাগিদটা খুবই আন্তরিক। এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকাটাই নেহাৎ বোকামি। আর্থিক স্বাধীনতার জন্য সবাই ব্যাকুল। কেউ কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চায় না। তাতে মান-ইজ্জৎ যায় এবং স্বাধীনতা-সকীয়তা ধুলোয় মিশে যায়। মাথা তুলে কথা বলার শক্তিও থাকে না। এই অধীনতা বরদাস্ত করা আর সম্ভব হচ্ছে না। সবাই তাই আর্থিক স্বাধীনতালাভের জন্য উদ্বেগাকুল। অতীত-সংস্কার অবশ্য মাথা তুলে প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্মিলিত দাবীর কাছে তার সে প্রতিবাদ টেঁকে নি। যুগ থেকে যুগান্তরে আজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে নারী-সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠার দাবী। দিনে-দিনে এই দাবী সোচ্চার হয়েছে। মহৎ প্রাণধর্মে উজ্জীবিত হয়েছে। নানান পেশা নানান নেশায় আজ তাই নারীর বিচিত্র অভ্যুদয়। জগতের বিরাট কর্মযজ্ঞে আমাদের মেয়েরাও আজ যোগ্যতা এবং মর্যাদার অন্যতম শরিক। সাহসের সঙ্গে তাঁরা সর্বত্র নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। তাই দেখা যায় সাধারণ অফিস থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর স্থান। এমন কি নানা দুরূহ কর্মেও মেয়েদের আত্মপ্রকাশ আজ আর বিস্ময়ের কিছু নয়। আর্থিক স্বাধীনতার সঙ্গে কর্ম-ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যও তাঁরা তৎপর। বিদেশের কথা বাদ দিয়ে আমাদের দেশ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কাল থেকে মেয়েদের বন্ধন-সচেতন মন নিজ শক্তি সম্বন্ধে ক্রমশ সজাগ হতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কথা বলা বাহুল্যমাত্র। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা নিজেদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সব দিক থেকেই নারীর আসন আজ সুনির্দিষ্ট। শুধু চাকুরীক্ষেত্রে নয়, যে কোন ব্যাপারেই আজ তাঁরা বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

বিশেষ ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণভাবে বলা যায় মেয়েদের এই আত্ম-সচেতন মনোভাব সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে পারিবারিক অর্থকৃচ্ছতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। পুরুষের একক আয়ে গোটা পরিবারের প্রতিপালন ইদানীংকালে এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশে এই সমস্যা আজকাল অনেক পরিবারেই সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি তো ঘটলই আবার সেই সঙ্গে এই বিরাট বাধা অতিক্রম জীবন-সংগ্রামে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু একটা সমস্যা তবু প্রকট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করল। জীবিকা আর গৃহাঙ্গনের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। যত দিন যাচ্ছে এদিকটা ততই মাথাচাড়া দিয়ে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছে! ছোট্ট শিশু তার মাকে সবসময়ের জন্য কাছে পাবার জন্য উদগ্রীব। সংসারের সঙ্গে জীবিকার এই সংঘাতে মা দিশাহারা হয়ে পড়ছেন। সংসার না চাকুরী এই সমস্যায় সে একান্ত বিভ্রান্ত। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যও হচ্ছে না অথচ চাকুরী ছাড়লে সংসারও অচল হবার উপক্রম। এই সংঘাতে পড়ে

বিভ্রান্ত মা যেমন অসহায় এবং দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তেমনি আমাদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তাই নতুন কোন কিছুর কথা ভাবতে হচ্ছে। কুটির-শিল্পগুলি এক্ষেত্রে আমাদের কাছে একমাত্র বিকল্প। এরই মাধ্যমে আর্থিক সমস্যার সাগর সাঁতরানো সম্ভব এবং সুচারুভাবে সংসার চালানোর কোন ঝামেলা নেই।

সংসার এবং জীবিকার সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য অনেক মেয়েই আজকাল কুটির-শিল্পের দিকে ঝুঁকেছে। এটা সব দিক থেকেই স্বস্তিকর। সামঞ্জস্যবিধান এক্ষেত্রে আর খুব একটা সমস্যা নয়। এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রবর্তনে এবং ব্যাপক প্রচলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চরকার দৌলতে 'ঘর ঘর ক্ষীরসর'-এর স্বপ্ন দেখে-ছিলেন। গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষা এবং কবির কল্পনা সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি কিন্তু একে-বারে ব্যর্থও হয় নি। সারা দেশে আজ অসংখ্য মেয়ে এবং গৃহস্থ বধূ চরকার দৌলতে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত চিরাচরিত চরকার ঘর্ঘরে একদিন পল্লীর সুপ্তি ভেঙে গিয়ে-ছিল। সেদিন নতুন দিনকে আমরা বরণ করে নিয়েছিলাম সাদরে। কিন্তু চিরাচরিত চরকার উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ছিল না। তাছাড়া এই চরকায় কাটুনীর ব্যক্তিগত দক্ষতারও বিশেষ প্রয়োজন হত। তাই গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন এক লক্ষ টাকা পুরস্কারের বিনিময়ে এমন একটি চরকার জন্য যাতে ঘন্টায় এক হাজার গজ সুতো তৈরী হবে। সেই চরকা প্রস্তুত হল কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে তা দেখে যাওয়া সম্ভব হয় নি। মাদ্রাজের একেম্বরনাথ নামে গৃহস্থ-ঘরের এক ব্যক্তি এই চরকা নির্মাণ করেন। তাঁর তৈরী চরকাটি ছিল লোহার কাঠামোর। ১৯৫৪ সালে নয়াদিল্লীতে একটি প্রদর্শনীতে চরকাটি প্রদর্শিত হয়। সরকার পরীক্ষা-মূলকভাবে ছ' হাজার চরকা বিভিন্ন কেন্দ্রের সাহায্যে প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে লোহার কাঠামো কাঠে পরিবর্তিত হয়েছে। খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্য-লাভ করে এবং সরকার এইবার প্রচলিত চরকার সঙ্গে এই চরকার প্রবর্তন করেন। ইতিমধ্যে চরকায় অবশ্য পরিবর্তনের ছাপও লেগেছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে অম্বর চরকা এখন ঘর-ঘর শব্দে পড়শীর ঘর মুখরিত করে তুলছে। অম্বর চরকা বর্তমানে ছয় টেকু সমন্বিত। চারটি টেকুতে স্পিনিং এবং দুটি টেকুতে প্রি-প্রসেসিং হয়। আর এতে ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন

হয় না। প্রসেসিং-এর উপর সুতোর সরু-মোটা নির্ভর করে। আবিষ্কারক একেশ্বর-নাথের নামে এই চরকার নামকরণ করা হয় 'অম্বর চরকা'। এর চেয়েও আবিষ্কারকের বড় পুরস্কার অজস্র দেশবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পথ করে দেওয়া। সারা দেশে আজ প্রায় ১০৬ থেকে ১০৮টি কেন্দ্রে অম্বর চরকায় সুতো এবং বস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, এর দ্বারা অনেকের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ঘটেছে। সংসারের কাজের ফাঁকে মেয়েরা যেটুকু অবসর পায় চরকা-কেন্দ্রে এসে সেই সময়টুকু কাজ করে। তাতেই তাদের মাসিক আয় প্রায় ত্রিশ টাকা। অনেকে আবার মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকাও রোজগার করে থাকেন।

অম্বর চরকায় বেশ উৎকৃষ্ট সুতো প্রস্তুত হয়। এই সুতোর নাম হয়েছে অতীত ঐতিহ্যবাহী 'মসলিন'-এর নামানুসারে। স্বদেশে-বিদেশে এই বস্ত্রের চাহিদাও বেশ, সিল্কের চাহিদা তো বিদেশে বেশ সন্তোষজনক। স্বদেশেও মন্দ নয়। গত পুজোয় অন্তত তাই প্রমাণিত। বাঙলা দেশে অম্বর চরকার আরও ব্যাপক প্রচলনে দুঃখ-দারিদ্র্য আত্মগোপন করুক, অর্থাভাব দূর হোক এবং কবির স্বপ্নকল্পনা সার্থক হোক।

লেডিস্ কার্ডিগান—প্রমাণ সাইজ

মাপ :—

ঝুল—১৯½ ইঞ্চি

ছাতি—১৮"

হাতা—২০"

সরু থেকে বগল পর্যন্ত—১৩"

বগল থেকে শেষ পর্যন্ত—৬½"

হাতা, বগল পর্যন্ত—১৬"

বগল থেকে শেষ পর্যন্ত—৪"

প্রয়োজনীয় জিনিস :—

চার প্লাই উল—১১ আউন্স

১১নং কাঁটা—১ জোড়া

বোতাম—৬টি

কার্পেটের সূচ—১টি

বোনার নিয়ম :—

পিছন :—১২৪টি ঘর নিয়ে ১ লাইন ব্যাক স্টিচ বুনে, ১ সোজা, ১ উল্টো ২" বোনার পর ১ কাঁটা সোজা ও ১ কাঁটা উল্টো শেষ পর্যন্ত বুনতে হবে। ১" ইঞ্চি অন্তর দু' পাশে দুটি করে ঘর বেড়ে যাবে যতক্ষণ না ১৩৪টি ঘর হয়েছে। মোট ১৩" বোনার পর বগলের জন্য ঘর বন্ধ হবে।

বগল—১ম লাইন—৬টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

২য় লাইন—৬টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৩য় লাইন—৪টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

৪র্থ লাইন—৪টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৫ম লাইন—৩টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

৬ষ্ঠ লাইন—৩টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৭ম লাইন—২টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

৮ম লাইন—২টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৯ম লাইন—১টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

১০ম লাইন—১টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

১১শ লাইন—১টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

১২শ লাইন—১টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে। দু' পাশে মোট ১৭+১৭=৩৪টি ঘর বন্ধ হয়েছে। বাকী ১০০ ঘর আরো ৬½" ইঞ্চি বোনার পর পুটের জন্য ঘর বন্ধ হবে। পুটের ঘর বগলের নিয়মেই বন্ধ হবে।

পুট—৮+৯+১০=২৭টি ঘর, ২ পাশে ২৭+২৭=৫৪টি ঘর বন্ধ হবে। বাকী ৪৬টি ঘর গলার পটীর জন্য রাখা হয়েছে।

ডান বুক—৭২টি ঘর নিয়ে ১ লাইন ব্যাক স্টিচ বুনে, ১ সোজা, ১ উল্টো, ২" ইঞ্চি বোনার পর ১ কাঁটা সোজা ও ১ কাঁটা উল্টো শেষ পর্যন্ত বুনতে হবে। ১" ইঞ্চি অন্তর পাশের দিকে ১টা করে ঘর বেড়েছে যতক্ষণ না ৭৮টি ঘর হবে। বোতাম পটীর জন্য (১ সোজা, ১ উল্টো) বুনে মোট ১৩টি ঘর রেখে দিতে হবে। বগল পর্যন্ত পিছনের নিয়মেই বুনে, বগলের জন্য ঘর বন্ধ হবে। বগলের জন্য ঘর বন্ধ করে আরো ৪" ইঞ্চি বুনে গলার শেপ্ দিতে হবে। গলার শেপ্ গোল হয়েছে।

গলা : ১০+৬+৪+৪+৩+২+১+১ ১+১+১=৩৪টি ঘর বন্ধ হবে। বাকী ঘরগুলি পিছনের নিয়মেই পুটের জন্য বন্ধ করে ডান-বুক শেষ হবে।

বাঁ-বুক—ডান বুকের মতই বোনা হয়েছে। বোনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বোতাম পটী যেন মুখোমুখি থাকে।

হাতা—৮০টি ঘর নিয়ে ১½" ইঞ্চি ১ সোজা, ১ উল্টো বুনে ১ কাঁটা সোজা, ১ কাঁটা উল্টো বোনা হবে। প্রতি ১ ইঞ্চি অন্তর দু' পাশে দুটি করে ঘর বাড়বে যতক্ষণ না ১০২টি ঘর হয়। ১৬ ইঞ্চি বোনার পর প্রতি কাঁটির সুরুতে ২টি করে ঘর বন্ধ হয়েছে যতক্ষণ না ২২টি ঘর হয়েছে। শেষে ২২টি ঘর জোড়া বুনে বুনে যখন ১টি ঘর হয়েছে তখন বন্ধ করে দিতে হবে। অপর হাতাটিও এইভাবে বুনতে হবে।

গলার পটী—সামনের ডান-বুক ২০ ঘর৷ পিছনের ৪৬ ঘর+বাঁ-বুকের ২০টি ঘর তুলে নিয়ে, ১ সোজা ১ উল্টো ৬ লাইন বোনার পর ঘরগুলি সব বন্ধ করে দিতে হবে। এবারে জামাটি সেলাই করে শেষ করুন ও বোতামগুলি বোতাম পটীতে বসিয়ে দিয়ে জামাটি ইস্ত্রি করে নিলে দেখতে ভাল লাগবে।

—মলয়া ধর

সংবাদ

সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী এস এস শুভলক্ষ্মীকে জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন 'সঙ্গীতের রাণী' আবার রাষ্ট্রসংঘের একবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে নিউইয়র্কের কেন্দ্রীয় দপ্তরে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় গান গেয়ে তিনি আখ্যা পেলেন 'ভারতের নাইটিঙ্গেল'। এবার এই সঙ্গীতশিল্পীকে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অবশ্য তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি।

* * *

ভারতে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ডঃ জোহানা নেগটর সম্প্রতি কলকাতা আসেন। তিনি চার দিন কলকাতায় অবস্থান করেন। রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় আসেন। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন।

'আমার দেশ—আমার বাড়ী' চিত্রটি এঁকে এবার আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে শ্রীমতী মীনা গুপ্ত। এর উদ্যোক্তা ছিল মস্কোর 'পাইওনীয়র প্রাভদা'। শ্রীমতী মীনা ইতিপূর্বে শঙ্করস উইকলি পরিচালিত একটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। তাছাড়া সে শঙ্করস উইকলি পরিচালিত 'সামনে বসে আঁকো' চিত্র প্রতিযোগিতায়ও পুরস্কৃত হয়।

* * *

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা পরিবার পরিকল্পনা প্রাঙ্গণে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্বন্ধে এক শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। এই শিক্ষণ শিবিরটি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের নিয়েই পরিচালিত হয়।

বিভ্রান্ত মা যেমন অসহায় এবং দিশাহারা হয়ে পড়েছেন তেমনি আমাদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সংসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তাই নতুন কোন কিছুর কথা ভাবতে হচ্ছে। কুটির-শিল্পগুলি এক্ষেত্রে আমাদের কাছে একমাত্র বিকল্প। এরই মাধ্যমে আর্থিক সমস্যার সাগর সাঁতরানো সম্ভব এবং সুচারুভাবে সংসার চালানোর কোন ঝামেলা নেই।

সংসার এবং জীবিকার সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য অনেক মেয়েই আজকাল কুটির-শিল্পের দিকে ঝুঁকেছে। এটা সব দিক থেকেই স্বস্তিকর। সামঞ্জস্যবিধান এক্ষেত্রে আর খুব একটা সমস্যা নয়। এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই মহাত্মা গান্ধী চরকার প্রবর্তনে এবং ব্যাপক প্রচলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চরকার দৌলতে 'ঘর ঘর ক্ষীরসর'-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষা এবং কবির কল্পনা সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি কিন্তু একেবারে ব্যর্থও হয় নি। সারা দেশে আজ অসংখ্য মেয়ে এবং গৃহস্থ বধূ চরকার দৌলতে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছেন। আমাদের দেশে প্রচলিত চিরাচরিত চরকার ঘর্ঘরে একদিন পল্লীর সুপ্তি ভেঙে গিয়েছিল। সেদিন নতুন দিনকে আমরা বরণ করে নিয়েছিলাম সাদরে। কিন্তু চিরাচরিত চরকার উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ছিল না। তাছাড়া এই চরকায় কাটুনীর ব্যক্তিগত দক্ষতারও বিশেষ প্রয়োজন হত। তাই গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন এক লক্ষ টাকা পুরস্কারের বিনিময়ে এমন একটি চরকার জন্য যাতে ঘণ্টায় এক হাজার গজ সুতো তৈরী হবে। সেই চরকা প্রস্তুত হল কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে তা দেখে যাওয়া সম্ভব হয় নি। মাদ্রাজের একেম্বরনাথ নামে গৃহস্থ-ঘরের এক ব্যক্তি এই চরকা নির্মাণ করেন। তাঁর তৈরী চরকাটি ছিল লোহার কাঠামোর। ১৯৫৪ সালে নয়াদিল্লীতে একটি প্রদর্শনীতে চরকাটি প্রদর্শিত হয়। সরকার পরীক্ষা-মূলকভাবে ছ' হাজার চরকা বিভিন্ন কেন্দ্রের সাহায্যে প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে লোহার কাঠামো কাঠে পরিবর্তিত হয়েছে। খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্য-লাভ করে এবং সরকার এইবার প্রচলিত চরকার সঙ্গে এই চরকার প্রবর্তন করেন। ইতিমধ্যে চরকায় অবশ্য পরিবর্তনের ছাপও লেগেছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে অম্বর চরকা এখন ঘর-ঘর শব্দে পড়শীর ঘর মুখরিত করে তুলছে। অম্বর চরকা বর্তমানে ছয় টেকু সমন্বিত। চারটি টেকুতে স্পিনিং এবং দুটি টেকুতে প্রি-প্রসেসিং হয়। আর এতে ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন

হয় না। প্রসেসিং-এর উপর সুতোর সরু-মোটা নির্ভর করে। আবিষ্কারক একেম্বর-নাথের নামে এই চরকার নামকরণ করা হয় 'অম্বর চরকা'। এর চেয়েও আবিষ্কারকের বড় পুরস্কার অজস্র দেশবাসীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের পথ করে দেওয়া। সারা দেশে আজ প্রায় ১০৬ থেকে ১০৮টি কেন্দ্রে অম্বর চরকায় সুতো এবং বস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, এর দ্বারা অনেকের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ঘটেছে। সংসারের কাজের ফাঁকে মেয়েরা যেটুকু অবসর পায় চরকা-কেন্দ্রে এসে সেই সময়টুকু কাজ করে। তাতেই তাদের মাসিক আয় প্রায় ত্রিশ টাকা। অনেকে আবার মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকাও রোজগার করে থাকেন।

অম্বর চরকায় বেশ উৎকৃষ্ট সুতো প্রস্তুত হয়। এই সুতোর নাম হয়েছে অতীত ঐতিহ্যবাহী 'মসলিন'-এর নামানুসারে। স্বদেশে-বিদেশে এই বস্ত্রের চাহিদাও বেশ, সিল্কের চাহিদা তো বিদেশে বেশ সন্তোষজনক। স্বদেশেও মন্দ নয়। গত পুজোয় অন্তত তাই প্রমাণিত। বাঙলা দেশে অম্বর চরকার আরও ব্যাপক প্রচলনে দুঃখ-দারিদ্র্য আত্মগোপন করুক, অর্থাভাব দূর হোক এবং কবির স্বপ্নকল্পনা সার্থক হোক।

লেডিস্ কার্ডিগান—প্রমাণ সাইজ

মাপ :—

ঝুল—১৯½ ইঞ্চি

ছাতি—১৮"

হাতা—২০"

সুরু থেকে বগল পর্যন্ত—১৩"

বগল থেকে শেষ পর্যন্ত—৬½"

হাতা, বগল পর্যন্ত—১৬"

বগল থেকে শেষ পর্যন্ত—৪"

প্রয়োজনীয় জিনিস :—

চার প্লাই উল—১১ আউন্স

১১নং কাঁটা—১ জোড়া

বোতাম—৬টি

কার্পেটের সূচ—১টি

বোনার নিয়ম :—

পিছন :—১২৪টি ঘর নিয়ে ১ লাইন ব্যাক স্টিচ বুনে, ১ সোজা, ১ উল্টো ২" বোনার পর ১ কাঁটা সোজা ও ১ কাঁটা উল্টো শেষ পর্যন্ত বুনতে হবে। ১" ইঞ্চি অন্তর দু' পাশে দুটি করে ঘর বেড়ে যাবে যতক্ষণ না ১৩৪টি ঘর হয়েছে। মোট ১৩" বোনার পর বগলের জন্য ঘর বন্ধ হবে।

বগল—১ম লাইন—৬টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

২য় লাইন—৬টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৩য় লাইন—৪টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

৪র্থ লাইন—৪টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৫ম লাইন—৩টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

৬ষ্ঠ লাইন—৩টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৭ম লাইন—২টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

৮ম লাইন—২টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

৯ম লাইন—১টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

১০ম লাইন—১টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে।

১১শ লাইন—১টি ঘর সোজা বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি সোজা বোনা হবে।

১২শ লাইন—১টি ঘর উল্টো বুনে বন্ধ করে, বাকী ঘরগুলি উল্টো বোনা হবে। দু' পাশে মোট ১৭+১৭=৩৪টি ঘর বন্ধ হয়েছে। বাকী ১০০ ঘর আরো ৬½" ইঞ্চি বোনার পর পুটের জন্য ঘর বন্ধ হবে। পুটের ঘর বগলের নিয়মেই বন্ধ হবে।

পুট—৮+৯+১০=২৭টি ঘর, ২ পাশে ২৭+২৭=৫৪টি ঘর বন্ধ হবে। বাকী ৪৬টি ঘর গলার পটীর জন্য রাখা হয়েছে।

ডান বুক—৭২টি ঘর নিয়ে ১ লাইন ব্যাক স্টিচ বুনে, ১ সোজা, ১ উল্টো, ২" ইঞ্চি বোনার পর ১ কাঁটা সোজা ও ১ কাঁটা উল্টো শেষ পর্যন্ত বুনতে হবে। ১" ইঞ্চি অন্তর পাশের দিকে ১টা করে ঘর বেড়েছে যতক্ষণ না ৭৮টি ঘর হবে। বোতাম পটীর জন্য (১ সোজা, ১ উল্টো) বুনে মোট ১৩টি ঘর রেখে দিতে হবে। বগল পর্যন্ত পিছনের নিয়মেই বুনে, বগলের জন্য ঘর বন্ধ হবে। বগলের জন্য ঘর বন্ধ করে আরো ৪" ইঞ্চি বুনে গলার শেপ্ দিতে হবে। গলার শেপ্ গোল হয়েছে।

গলা : ১০+৬+৪+৪+৩+২+১+১ ১+১+১=৩৪টি ঘর বন্ধ হবে। বাকী ঘরগুলি পিছনের নিয়মেই পুটের জন্য বন্ধ করে ডান-বুক শেষ হবে।

বাঁ-বুক—ডান বুকের মতই বোনা হয়েছে। বোনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বোতাম পটী যেন মুখোমুখি থাকে।

হাতা—৮০টি ঘর নিয়ে ১½" ইঞ্চি ১ সোজা, ১ উল্টো বুনে ১ কাঁটা সোজা, ১ কাঁটা উল্টো বোনা হবে। প্রতি ১ ইঞ্চি অন্তর দু' পাশে দুটি করে ঘর বাড়বে যতক্ষণ না ১০২টি ঘর হয়। ১৬ ইঞ্চি বোনার পর প্রতি কাঁটার সুরুতে ২টি করে ঘর বন্ধ হয়েছে যতক্ষণ না ২২টি ঘর হয়েছে। শেষে ২২টি ঘর জোড়া বুনে বুনে যখন ১টি ঘর হয়েছে তখন বন্ধ করে দিতে হবে। অপর হাতাটিও এইভাবে বুনতে হবে।

গলার পটী—সামনের ডান-বুক ২০ ঘর+পিছনের ৪৬ ঘর+বাঁ-বুকের ২০টি ঘর তুলে নিয়ে, ১ সোজা ১ উল্টো ৬ লাইন বোনার পর ঘরগুলি সব বন্ধ করে দিতে হবে। এবারে জামাটি সেলাই করে শেষ করুন ও বোতামগুলি বোতাম পটীতে বসিয়ে দিয়ে জামাটি ইস্ত্রি করে নিলে দেখতে ভাল লাগবে।

—মলয়া ধর

সংবাদ

সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী এস এস শুভলক্ষ্মীকে জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন 'সঙ্গীতের রাণী' আবার রাষ্ট্রসংঘের একবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে নিউইয়র্কের কেন্দ্রীয় দপ্তরে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় গান গেয়ে তিনি আখ্যা পেলেন 'ভারতের নাইটিঙ্গেল'। এবার এই সঙ্গীত-শিল্পীকে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অবশ্য তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি।

* * *

ভারতে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ডঃ জোহানা নেগটর সম্প্রতি কলকাতা আসেন। তিনি চার দিন কলকাতায় অবস্থান করেন। রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় আসেন। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন।

'আমার দেশ—আমার বাড়ী' চিত্রটি এ'কে এবার আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে শ্রীমতী মীনা গুপ্ত। এর উদ্যোক্তা ছিল মস্কোর 'পাইওনীয়র প্রাভদা'। শ্রীমতী মীনা ইতিপূর্বে শঙ্করস উইকলি পরিচালিত একটি প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। তাছাড়া সে শঙ্করস উইকলি পরিচালিত 'সামনে বসে আঁকো' চিত্র প্রতিযোগিতায়ও পুরস্কৃত হয়।

* * *

সম্প্রতি কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা পরিবার পরিকল্পনা প্রাঙ্গণে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্বন্ধে এক শিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। এই শিক্ষণ শিবিরটি সম্পূর্ণভাবে মহিলাদের নিয়েই পরিচালিত হয়।

দেশভ্রমণ বিশ্বশান্তির সহায়

রুদ্র পাল

ইতিহাস, ভূগোল ও ভ্রমণ কাহিনী পড়ে দেশ-বিদেশের সম্পর্কে জানা যায় অনেক কথা—কিন্তু তাকে পুরোপুরি চেনা যায় কি? এর উত্তর ছোট্ট একটি শব্দ 'না' দিয়েই দেওয়া যায়। তাই দেখা যায় প্রতি বছরে লক্ষ লক্ষ ভ্রমণ-বিলাসী দেশ থেকে দেশে চলেছেন জানার ইচ্ছাকে তৃপ্ত করতে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মন-প্রাণ দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে—দেখতে দু চোখ ভরে। ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে তাই চলেছে পরস্পরকে চেনা-জানা ও সম্যকভাবে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা এবং সেই সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হচ্ছে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্পর্ক।

শিক্ষা, সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ভ্রমণের ব্যাপকতা ঘটছে এবং ভ্রমণ-কারীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ক্রমান্বয়ে। তাকে সহযোগিতা করছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ্য অগ্রগতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক ও রাজ-নৈতিক সম্পর্ক। সকল মহলই আজ নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবেন যে, এই ভ্রমণ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ-সম্পর্ককে কেবল দৃঢ়ই করছে না, পরস্পরকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হতেও যথেষ্ট সাহায্য করছে। তাই আজ বিশ্বের প্রায় সকল দেশই টুরিজম-এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কিভাবে স্বদেশে বিদেশের মানুষদের আরও বেশী ভ্রমণের জন্য আকর্ষণ করা যায়—সেই কথা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন।

টুরিজমের মাধ্যমে প্রত্যেক দেশেরই কয়েকটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে এবং হয়েও থাকে। যেমন :

(১) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন; (২) ভিন দেশে স্বদেশের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় ও স্থানের পরিচিতি; (৩) সাংস্কৃতিক রুচির বিনিময় ও মানের প্রচার; (৪) দেশের সামগ্রিক পরিচয়ের প্রত্যক্ষ-প্রচার; (৫) বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা ও প্রয়োজন সম্পর্কে অনুভূতির সৃষ্টি; (৬) পারস্পরিক বোঝাপড়া ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে টুরিজমের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সেই দিকে তাকিয়ে ইউনেস্কো (ইউ-নাইটেড নেশনস ইমনমিক অ্যাণ্ড সোস্যাল কাউন্সিল) ১৯৬৭ সালকে 'আন্তর্জাতিক যাত্রিক বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এ বছরের পয়লা দিন থেকেই এই যাত্রিক বর্ষের শুরু হয়েছে। ১৯৬৩ সালে রোমে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এ্যাণ্ড টুরিজম' সম্মেলনের ৯৯৫নং সিদ্ধান্ত অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব অফিসিয়াল ট্রাভেল অর্গানাইজেশন-এর উনবিংশতিতম সাধারণ সভায় ১৯৬৭ সালকে 'আন্তর্জাতিক যাত্রিক বর্ষ' হিসাবে পালন করার কথা বলা হয়।

'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব অফি-সিয়াল ট্রাভেল অর্গানাইজেশন' (IUOTO) এর ৯৫টি সদস্য দেশের সরকারী টুরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলি জাতীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে এ-বছরকে 'আন্তর্জাতিক যাত্রিক বর্ষ' হিসেবে পালন করার জন্য তৎপর হয়েছেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন যানবাহন প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা সংগঠন প্রভৃতিও এই কাজে সব রকমের সহযোগিতা করার ইচ্ছা জানিয়ে-ছেন। এই বিষয়-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচার-ব্যবস্থায় '১৯৬৭, আন্তর্জাতিক যাত্রিক বর্ষ' এবং 'দেশভ্রমণ বিশ্বশান্তির সহায়' এই কথাগুলির ব্যাপক ব্যবহারের প্রস্তাবও করা হয়েছে। সেই সঙ্গে IUOTO আরও জানিয়েছেন যে, সদস্য দেশগুলি আন্ত-র্জাতিক যাত্রিক বর্ষকে সুপরিচিত ও আকর্ষণীয় করার জন্য যেন নিজ নিজ দেশের লেখক ও সাংবাদিকদের উৎসাহ দেন। এ-বিষয়ে কর্মীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেবার কথাও বলা হয়েছে এবং এ-বছরে টুরিস্টদের জন্য যতদূর সম্ভব ভিসা ও পাশপোর্ট সংক্রান্ত বিধি-নিষেধগুলি যাতে কিছুটা শিথিল করা যায় তাও বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

ভারতের কার্যসূচী

ভারতবর্ষ ঐ ৯৫টি সদস্য রাষ্ট্রের অন্যতম। ভারতবর্ষের 'টুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' এ-দেশে যথাযথভাবে 'আন্ত-র্জাতিক যাত্রিক বর্ষ' পালনের ও ভারতে টুরিজমের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। এর দ্বারা আমাদের দুটি বিষয়ের উল্লেখ-যোগ্য উপকার হবে :

(১) ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতার উন্নয়নে তার উল্লেখ্য ও ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকায় আরও ভালভাবে অংশ নিতে পারবে এবং (২) বহির্বিশ্বে ভারত যাত্রী আকর্ষণের দেশ হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি উপহার দিতে পারবে। তাই সমগ্র দেশ জুড়ে সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে এই 'আন্ত-র্জাতিক যাত্রিক বর্ষ' পালন করা হবে।

এই সম্পর্কে ভারতের টুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখ্য হল :

(১) 'টুরিজম পাশপোর্ট, টু পীস'-এর ব্যাপক ব্যবহার।

(২) ১৯৬৭ সালের একটি মাসকে (মাসের নাম পরে ঘোষণা করা হবে) 'জাতীয় যাত্রিক মাস' হিসাবে পালন করা হবে। এই সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে। এর আগে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি 'যাত্রিক সপ্তাহ' পালন করবেন।

(৩) টুরিজমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁদের কাজের মানোন্নয়নে সাধ্যমত সচেষ্ট থাকবেন।

(৪) ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ভ্রমণ উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

(৫) এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন যানবাহন সংগঠন কনসেসন ভাড়ার ব্যবস্থা করবেন।

(৬) সীমান্ত সংক্রান্ত ও ভিসা ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা সাধ্যমত শিথিল করা হবে।

(৭) হোটেলগুলি এই বছরে টুরিস্টদের জন্য তাদের মূল্যমান হ্রাস করবেন এবং এই বছরটিকে স্মরণীয় করার জন্য বিভিন্ন ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

(৮) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে টুরিস্টদের বাসস্থানের উন্নয়ন ও নতুন বাসস্থান ও হোটেল নির্মাণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে।

(৯) দেশীয় ও বিদেশীয় লেখক ও সাংবাদিকদের টুরিজমের উন্নয়ন সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

(১০) ১৯৬৭ সালে যে সকল ভারতীয় ভ্রমণকারী বিদেশে বেড়াতে যাবেন তাঁদের সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা সম্ভবত শিথিল করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ ব্যবস্থা

প্রসঙ্গতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রিক প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কলকাতা ও দার্জিলিং-এ দুটি টুরিস্ট ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দীঘা, শিলি-গুড়ি ও নতুন জলপাইগুড়িতে টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। কলকাতা, দুর্গাপুর, দীঘা, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং শান্তিনিকেতনে লাক্সারী টুরিস্ট বাস ও ট্যাক্সির ব্যবস্থা আছে।

দীঘায় টুরিস্টদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করার জন্যে বিবিধ আকর্ষণীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং ও দুর্গাপুরে লাক্সারী টুরিস্ট লজের ব্যবস্থা আছে। শান্তিনিকেতনে সম্প্রতি একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত লাক্সারী টুরিস্ট কটেজ তৈরী হয়েছে। ডায়মণ্ড-হারবারেও এই ব্যবস্থা শীঘ্রই কার্যকরী করা হবে।

দীঘা, বিষ্ণুপুর, মালদা এবং বহরম-পুরে আন্তর্জাতিক যাত্রিক বর্ষের মধ্যে কয়েকটি টুরিস্ট লজ তৈরী করা হবে। বক্রেশ্বরে টুরিস্টদের বাসস্থানের সুব্যবস্থার আয়োজন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের উপর ইস্টম্যান রঙে রঞ্জিত দুটি প্রচার-চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেগুলি বিভিন্ন হাউসে প্রদর্শিত হচ্ছে।

আলোচনা

আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় খণ্ড, ৩১শ সংখ্যায় শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক আইনস্টাইন দূরে থাক, নিউটনের তত্ত্বগুলিও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। প্রবন্ধের ভুলগুলি আমি এক এক করে উল্লেখ করছি।

(১) ৪৬১ পৃঃ ২য় কলমে লেখক লিখছেন, 'আইনস্টাইন তখন বুঝিয়ে বলতে সুরু করলেন 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন গতিই পরম নয়, সব গতিই আপেক্ষিক (অল মোশন ইজ রিলেটিভ) এবং এই জন্যই আইনস্টাইন তাঁর মতবাদের নাম দিয়েছিলেন 'আপেক্ষিক মতবাদ'।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'সব গতিই আপেক্ষিক' এ তথ্য নিউটনের জানা ছিল, এটা আইনস্টাইনের নতুন আবিষ্কার নয়।

(২) ঐ পৃষ্ঠাতেই ২য় কলমে তিনি লিখেছেন, 'যে বস্তু যেদিকে যতটা বেগে অগ্রসর হচ্ছে, আশেপাশের ইথারও ঠিক ততখানি বেগে সেই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে ইথার-কারেন্টের আপেক্ষিক বেগ সর্বদাই শূন্য থেকে যাচ্ছে।' এটাকেই তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলেছেন। কিন্তু এটা হলো ইথার ড্র্যাগ তত্ত্ব। আইনস্টাইনের আগে এইভাবেই মাইকেলসনের পরীক্ষার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আলোর 'অ্যাবারেশনের' ব্যাখ্যা না দিতে পারায় এই তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়। আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা মাইকেলসনের পরীক্ষা ও আলোর অ্যাবারেশন দুয়েরই ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ।

(৩) তারপর তিনি ফিট্‌জেরাল্ড-লোরেনট্‌জ সংকোচনের কথা তুলেছেন। লেখক জানেন না যে, আইনস্টাইনের সংকোচনবাদ লোরনট্‌জের সংকোচনবাদ থেকে ভিন্ন। আইনস্টাইন যদিও দৈর্ঘ্যের সংকোচনের কথা বলেছেন তবুও সংকোচন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ফিটজেরাল্ড লোরেনট্‌জের ধারণা থেকে আলাদা।

ধরা যাক একটা ট্রেন চলছে। সেই ট্রেনে এক ভদ্রলোক একটা লোহার রড নিয়ে বসে আছেন। ট্রেন না চলার সময় সেই রডের দৈর্ঘ্য ধরি পাঁচ ফিট। সংকোচনের মতবাদ অনুযায়ী ট্রেন চলার সময়ে এর দৈর্ঘ্য পাঁচ ফিটের থেকে কম হবে—ধরা যাক চার ফিট। **ফিটজেরাল্ড-লোরেনট্‌জ সংকোচন অনুযায়ী যিনি ট্রেন বসে আছেন, তিনিও দেখবেন চার ফিট, যদি কেউ ট্রেনের বাইরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনিও দেখবেন চার ফিট। কিন্তু আইনস্টাইনের সংকোচন মতবাদ অনুযায়ী যিনি ট্রেনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু তিনি দেখবেন চার ফিট, যিনি ট্রেনের মধ্যে বসে আছেন তিনি আগের মতই পাঁচ ফিট দেখবেন।**

কি করে এটা সম্ভব আমি একটু পরে তার ব্যাখ্যা করছি।

(৪) ৪৬২ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে তিনি সময়ের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি যা বলছেন তা হল যে সময় নির্ভর করে দর্শকের অবস্থানের উপর। অর্থাৎ আমি যদি সকাল সাতটায় চা খাই আর সেখান থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে বৃহস্পতি গ্রহে যদি আটটায় পেঁছায়, তাহলে বৃহস্পতি গ্রহের লোক বলবে আমি আটটায় চা খেয়েছি। এটাকেই তিনি আইনস্টাইনের সময় সংক্রান্ত আপেক্ষিকতা বলেছেন; কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আলো আসতে যে সময় লাগে সেটুকু বাদ দিয়ে নিলেই অবস্থানজনিত এই আপেক্ষিকতা দূর হয়ে যায় এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানেও আইনস্টাইনের আগে থেকেই তাই করা হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন, তাতেও গোলমাল মেটে না, অর্থাৎ আলো আসতে **যে সময় লাগে তা বাদ দিলেও যে সময় থাকে তাও আপেক্ষিক, তবে এই আপেক্ষিকতা অবস্থানের উপর নয়, গতির উপর নির্ভর করে।**

কি করে এই আপেক্ষিকতা আসে তাই আমি এখানে বলছি।

'আমি সাতটার সময় চা খেলাম' এর মানে কি? এর মানে এই যে, 'আমার চা খাওয়া' এবং 'ঘড়িতে সাতটা বাজা' এই দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু এক সঙ্গে ঘটা কাকে বলে? প্রশ্নটা উঠেছে এইজন্য যে, আলো আসতে যে সময় লাগে, সে সময়টা বাদ দিয়ে নিতে হবে।

×——————×——————×

ক খ গ

ধরা যাক ক, খ, গ একই সরলরেখায় অবস্থিত এবং ক থেকে খ-এর দূরত্ব আর খ থেকে গ-এর দূরত্ব সমান। ক এবং গ-তে দুটো আলো জ্বলল। এই দুটো আলো জ্বালা যদি খ-তে একই সঙ্গে দেখা যায় তাহলেই আমরা বলব যে, আলো দুটো একসঙ্গে জ্বলছে তাই নয় কি? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এইভাবে হিসাব করলে কোন দুটো ঘটনার একই সঙ্গে ঘটা আর দ্রষ্টার উপরে নির্ভর করবে না। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন যে তাও করবে। কিভাবে তাই বলছি।

ধরা যাক একটা ট্রেন একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। কগ একটা কামরা। খ নামে

→ট্রেনের গতি

ক খ গ

। ঘ
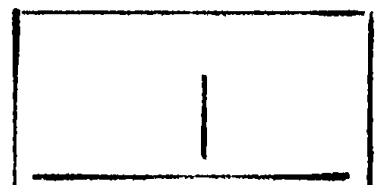
ব্যক্তি কামরার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার পাশে ঘ নামে এক ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে ক এবং গ খ থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত, ঘ থেকেও তাই। এখন ধরা যাক ট্রেনটা চলতে সুরু করল। ক এবং গ-তে এমনভাবে দুটো আলো জ্বলল যে ঘ-তে আলো দুটো একই সংগে পেঁছালো। কিন্তু আলো পেঁছানোর মধ্যে খ এগিয়ে গেছে; তাহলে খ-তে আলো ক থেকে পরে আসবে, গ থেকে আগে আসবে। অথচ ট্রেনের হিসাবে খ-ই প্রকৃত মধ্যবিন্দু এবং প্ল্যাটফর্মের হিসাবে ঘ-ই প্রকৃত মধ্যবিন্দু। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যবিন্দুতে একই সঙ্গে দেখা গেলে তবে দুটো ঘটনাকে একই সঙ্গে ঘটছে বলবো একথা মেনে নিলেও আপেক্ষিকতা কাটে না; কেননা উপরোক্ত উদাহরণে খ এং ঘ উভয়েই মধ্যবিন্দু, কিন্তু উভয়ে আলো একই সংগে পেঁছাচ্ছে না। দ্রষ্টা খ অথবা ঘ কোনটিকে মধ্যবিন্দু ধরবে তা নির্ভর করে দ্রষ্টা প্ল্যাটফর্মে আছে অথবা ট্রেনে আছে তার উপরে অর্থাৎ দ্রষ্টার গতির উপরে। প্ল্যাটফর্মের যেখানেই দ্রষ্টা থাকুক না কেন সে যদি প্ল্যাটফর্মের উপরেই থাকে সে ঘ-কেই মধ্যবিন্দু বলে মনে করবে এবং ঘ-তে একসঙ্গে দেখা গেলে দুটো ঘটনাকে একসঙ্গে ঘটেছে বলে মনে করবে। অনুরূপভাবে দ্রষ্টা যদি ট্রেনে থাকে তাহলে সে ট্রেনের যেখানে থাকুক না কেন খ-কে মধ্যবিন্দু বলে মনে করবে এবং খ-তে একসঙ্গে ঘটলে দুটো ঘটনা একই সংগে ঘটলো বলে বলবে।

এবার আমি দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতার প্রশ্ন আসছি। কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপতে হলে আমাকে একই সংগে ঐ জিনিসের দুটো মাথার অবস্থান মাপতে হবে। এখন কোন দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটছে কিনা তা যখন আপেক্ষিক তখন দৈর্ঘ্য আপেক্ষিক হতে বাধা কোথায়?

(৫) ৪৬৬ পৃষ্ঠার ২য় কলমে তিনি লিখছেন, 'বস্তুর বেগ প্রযুক্ত বলের আনুপাতিক'; এ ভুল অমার্জনীয়। লেখক আইনস্টাইনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। তিনি নিউটনের তত্ত্বও সঠিকভাবে জানেন না। বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষার্থীও জানে, 'বস্তু ত্বরণ (অর্থাৎ বেগের পরিবর্তনের হার) প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক'।

দীপঙ্কর রায়
কলকাতা : ৩২

॥ লেখকের কথা ॥

শ্রীদীপঙ্কর রায়ের পত্রখানি পড়লাম। তিনি আমার লেখা 'আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পড়ে গোড়াতেই মন্তব্য করেছেন, 'লেখক আইনস্টাইন দূরে থাক, নিউটনের তত্ত্বগলিও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি।' এবং তারপরে প্রবন্ধের অন্তর্গত কতকগুলি ভুলের উল্লেখ

করেছেন। পত্র-লেখকের মতে যেগুলি ভুল, সেগুলি যে আসলে তা নয়, সেটা আমি একে একে বুঝিয়ে বলছি এবার।

(১) পত্র-লেখক লিখেছেন যে, 'সব গতিই আপেক্ষিক, এ তথ্য নিউটনের জানা ছিল, এটা আইনস্টাইনের নতুন আবিষ্কার নয়।'

এই তথ্যটা যে নিউটনের জানা ছিল না, এমন কথা আমি আমার প্রবন্ধে কোথাও বলি নি এবং এটা যে আইনস্টাইনের একটা নতুন আবিষ্কার—সে কথাও না। আমি শুধু বলেছিলাম, '...সব গতিই আপেক্ষিক (অল মোশন ইজ রিলেটিভ)—এবং এই জন্যেই আইনস্টাইন তাঁর মতবাদের নাম দিয়েছিলেন 'আপেক্ষিক মতবাদ'—।' উপরোক্ত বিষয়টির তাৎপর্য এই হচ্ছে যে, যেহেতু আইনস্টাইনকে আপেক্ষিক গতি নিয়েই কারবার করতে হয়েছিল, সেই জন্যেই তিনি তাঁর নতুন মতবাদের নাম দিয়েছিলেন 'আপেক্ষিক মতবাদ'—এবং এই নয় যে, সবাবিশেষ সব গতিই আপেক্ষিক, এই জিনিসটা তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। পত্র-লেখকের বুঝতে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। সমালোচনায় নামার আগে আলোচ্য রচনাটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করাটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

(২) পত্র-লেখক এবার আমার প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'যে বস্তু যেদিকে যতটা বেগে অগ্রসর হচ্ছে, আশে-পাশের ইথারও ঠিক ততখানি বেগে সেই দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে, যার ফলে ইথার ড্রাগেন্টের আপেক্ষিক বেগ সর্বদাই শূন্য থেকে যাচ্ছে। এইটাকেই তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব বলেছেন। কিন্তু এটা হল ইথার ড্র্যাগ তত্ত্ব।'

নিঃসন্দেহে। এটা যে ইথার ড্র্যাগ তত্ত্ব সেটা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুল বার করতে গিয়ে পত্র-লেখক এবারও নিজেই একটা ভুল করে ফেলেছেন। এটাকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আমি কোথাও বলি নি। ইথারের ওপর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ-এর প্রথম প্রতিজ্ঞা (যে জিনিসটা আমি ঐ পৃষ্ঠায়ই শেষের দিকে উল্লেখ করেছি) হচ্ছে :

'ইথার ধরা যাবে না (দি ইথার ক্যান নট বি ডিটেক্টেড)।'—এই উক্তিটির নির্ভু-লতা সম্বন্ধে পত্র-লেখকের যদি কোনও সন্দেহ থাকে তাহলে তিনি রিলেটিভিটির ওপর লেখা যে-কোনও প্রামাণ্য পুস্তক একবার দেখে নিতে পারেন।

(৩) ফিটজেরাল্ড-লোরেনট্জ সংকোচনের প্রসঙ্গে এসে পত্র-লেখক মন্তব্য করেছেন, 'লেখক জানেন না যে, আইনস্টাইনের সংকোচনবাদ লোরেন্ট্জ-এর সংকোচনবাদ থেকে ভিন্ন।'

লেখকের অজ্ঞানতা সম্বন্ধে পত্র-লেখকের প্রতিবার এত দ্রুতগতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়জনক! এই গতি যেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদকে উপেক্ষা করে আলোকের দুর্বার গতিকেও হার মানিয়ে দিচ্ছে বার বার!

আইনস্টাইনের সংকোচন মতবাদ যে লোরেনট্জ-এর মতবাদ থেকে ভিন্ন, এটা আমার প্রবন্ধটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে, অর্থাৎ 'অমৃত'র ৩০শ সংখ্যায় ৩৯৭ পৃঃ লোরেনট্জ-এর মতবাদ সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করেছি। আইনস্টাইনের সংকোচন-মতবাদের উল্লেখ রয়েছে 'অমৃত'র পরবর্তী সংখ্যায় ৪৬২ পৃষ্ঠায় একেবারে গোড়াতেই। যেখানে আমি বলেছি, 'গতির প্রভাবে স্থান নিজেই সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে এই স্থান-এর মধ্যে অবস্থিত সব-কিছুই আকারে হ্রাস পায়।' সন্দেহ নিরসনের জন্যে এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন নিজেই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে যা বলেছিলেন সেটা এখানে তুলে ধরছি :

"We deal here with the contraction of space itself, and all material bodies moving with the same speed contract in the same way simply because they are imbeded in the same contracted space".

সুতরাং যা কিছু সংকোচন হচ্ছে সেটা গতির প্রভাবেই হচ্ছে, এবং যেহেতু এই সংকোচনটা সর্বব্যাপী (যেটা আমি আমার প্রবন্ধে একাধিকবার উল্লেখ করেছি) সেই জন্যে এই গতির বাইরে অবস্থিত দর্শকদের কাছেই যে কেবল সেটা পরিলক্ষিত হবে—এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। শুধু বোঝা যাচ্ছে না—লেখকের অজ্ঞানতাটা কোথায়!

(৪) এবার সময়-এর আলোচনায় আসা যাক। এই প্রসঙ্গে পত্র-লেখক প্রথমেই বলেছেন, '৪৬২ পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে তিনি সময়ের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভুল।'

কিন্তু মজাটা হচ্ছে এই যে, এখানে আমি সময়ের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা মোটেই করি নি। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—সময়ের সঙ্গে স্থানের যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে সেটা, কতিপয় দৃষ্টান্ত সহযোগে, সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজ কথায় বুঝিয়ে বলা, যাতে করে গতির প্রভাবে স্থানের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারটা মোটামুটি উপলব্ধি করা যেতে পারে। সময়ের আপেক্ষিকতার ওপর আমি আলোচনা করেছি আরো অনেক পরে, ৪৬৩ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে।

(৫) এখানে 'অনুপাতিক' শব্দটা নিয়ে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনুপাত কথাটার গাণিতিক অর্থ অবশ্য, ইংরিজিতে যাকে আমরা বলি—রেশিয়ো। কিন্তু অনুপাতের আরো একটা মানে আছে, যেটা শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকায়' পাওয়া যায় এবং সেটা হচ্ছে এই যে, "এক বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে অন্য বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি"। এই হ্রাস অথবা বৃদ্ধি দ্বিতীয় বস্তুর হ্রাস অথবা বৃদ্ধির সঙ্গে ভাগ-সম্বন্ধ (রেশিয়ো) না রাখতেও পারে, কিন্তু প্রথম বস্তুর যখন হ্রাস হবে, দ্বিতীয় বস্তুর তখন হ্রাসই হবে এবং প্রথম বস্তু বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুও বৃদ্ধি পাবে। এই অর্থেই 'অনুপাতিক' কথাটা আমার প্রবন্ধের উল্লিখিত অংশে আমি ব্যবহার করেছিলাম এবং উদ্দেশ্যটা শুধু এই ছিল যে, বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর বেগও যে বেড়ে যাচ্ছে—এইটে দেখানো। কিন্তু পত্রলেখক এটাকে আমার অজ্ঞানতা ধরে নিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে লিখেছেন, "বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষার্থীও জানে বস্তুর ত্বরণ (অর্থাৎ বেগের পরিবর্তনের হার) প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক।" কিন্তু 'সমানুপাতিক' কথাটার মানে হচ্ছে, "দুই রাশির অনুপাতের সহিত অন্য দুই রাশির অনুপাতের সমতা" (চলন্তিকা, পৃষ্ঠা ৫৩৯)। অর্থাৎ সমানুপাতের জন্যে প্রয়োজন অন্তত চারটে জিনিস, কিন্তু এখানে আমরা পাচ্ছি মাত্র দুটি—বল এবং ত্বরণ। সুতরাং পত্রলেখকের উপরোক্ত বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। তবে, এ-থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে কখনোই উপনীত হব না যে, বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষার্থীও যেটা জানে, সেটা তিনি জানেন না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে তিনি 'অনুপাতিক'-এর স্থলে 'সমানু-পাতিক' শব্দটা ব্যবহার করে ফেলেছেন অসতর্কতার ফলে।

রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়,
দমদম।

লিফট

নমিতা চক্রবর্তী

দে সাহেব ম্যানেজার হলেন। রায় অ্যাণ্ড কোং'র পুরনো কর্মচারী পরমেশ দে। খুব খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে অফিসে। কর্মক্ষমতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরমেশ। সামান্য চাকরি থেকে পৌঁছেচেন কোম্পানীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদে। সভা ক'রে তাই বললেন বড়সাহেব, বললেন পরমেশকে সবার আদর্শ বানাতে। খুশীর হাসি দেখা দিল বড়সাহেবের ছেলে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ কর্ণধার অজিত রায়ের ঠোঁটে। তাঁর অনুরোধ এড়াতে না পেরেই বড়সাহেব পরমেশকে ম্যানেজার করলেন। না হ'লে তো সেল্‌স ম্যানেজার অনন্ত সমাদ্দারের দিকেই নজর ছিল বড়সাহেবের।

উঁচু টুলে গালে হাত দিয়ে বসে নীলকণ্ঠ দেখছিল ক্যান্‌টিন্ বয়দের ট্রে হাতে ব্যস্ত পায়ে আনাগোনা। সাহেবরা খাচ্ছেন নানারকম ইংরেজী নামের খাবার। নীলকণ্ঠরাও খাবে, তিনটের পর রেকর্ড রুমের পাশের বারান্দায় ব'সে তারা খাবে লুচি, মাংস মিষ্টি। ঢালাও হুকুম দিয়েছেন ম্যানেজার, যত টাকা লাগুক, পেট ভরে খুশী হয়ে খাবে সবাই। বিশু ছেলেমানুষ, বারে বারে দেখে আসছে রান্নার ব্যবস্থা, খবর দিচ্ছে অন্যদের। ইস্, চার গামলা মাংস, যা ঘিয়ের গন্ধ বেরিয়েছে! একদম খাঁটি ভয়সা, দালদার নামও নেই। এই এত বড় বড় পান্তুয়া। যা ভোজ হবে একখানা। নীলকণ্ঠ ভাবছিল আরো একবার, অনেক বছর, প্রায় তিরিশ বছর আগে একবার খুশীর খাওয়া খেয়েছিল তারা। না না বিশ্বনাথ খায়নি, ও তো কুড়ি বছরের ছেলে, কাজে ঢুকেছে সেদিন, ও কি করে খাবে। ও কি-বা জানে, সেদিনের অফিসের হালচাল। তখন কেবল একতলাতেই অফিস হ'ত, পিয়নরা পেত খাকি শার্ট প্যান্ট আর ছাতা। জুতো? না জুতো দেবার নিয়ম ছিল না তখন। নীলকণ্ঠ আট আনা দিয়ে কিনতো টায়ার কেটে বানানো চটি, সারা বছর চলে যেত সেই চটিতে। তা সেই খাওয়া খেয়েছিল নীলকণ্ঠ, রামভুজ দরোয়ান আর অন্য দুজন পিয়ন—রামনাথ, হরিবিষ্ণু। গেলাসে গরম চা, নিমকি দানাদার। আজকের লোভনীয় ভোজের চেয়ে কম ভাল লাগেনি সেদিনের খাবার।

কিন্তু সেদিন খেল কেন তারা? বয়েস হয়েছে, চুপচাপ বসে থাকলেই ঝিমুনি আসে নীলকণ্ঠের আজকাল। একটা ঝাপসা পর্দা পড়ে যায় মনের উপর। উঃ! একটা মশা না-কি পোকা কামড়ালো পায়ে। দিনে দু'বার সাফাই, তবু পোকা কামড়ালো পায়ে! পোকা মশা তো থাকতো সেই তিরিশ বছর আগের একটু অন্ধকার, ময়লা-ময়লা একতলাটিতে। কাজ-না-থাকা বেলা একটায় ঝিমুতে ঝিমুতে অনেকদিন আগের অফিসটাকে দেখতে চাইল নীলকণ্ঠ। দেখল—একটি ছেলে, বাইশ বছরের রুক্ষ চুল, করুণ মুখ ছেলে—নতুন এসেছে। ছ'মাস আগে ঢুকেছে চাকরিতে, এখন পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি। স্থায়ী না হ'লে মাইনে তো বাড়বেই না, খেয়াল হ'লে কলমের এক আঁচড়ে খসে যাবে চাকরি। বাপ নেই; মা, পঙ্গু ছোট ভাই, আবার একটা কালোকোলো মেয়ে এসেছে বউ হয়ে। মুরুব্বী ধরেছে নীলকণ্ঠকে। চার বছর ধরে চাকরি করছে সে। জানে অফিসের অন্ধি-সন্ধি, খেয়াল-খুশীর খবর:

—একটা বুদ্ধি দাও নীলুদা। ম্যাট্রিক পাশ, ভদ্রলোকের ছেলে পিয়নগিরি করছি, তাও কি থাকবে না?

বুদ্ধি!

একটা চোখ বুজে পায়জামার পালক দিয়ে কান চুলকালো নীলকণ্ঠ।

—কিছুতেই কিছু হবে না। অন্য উপায় চাই।

—অন্য উপায়?

—হ্যারে। নয়তো চাকরি পাকা হবে না। তুই ম্যাড্রিক পাশ কি দেখাচ্ছিস! দুটো আই-এ পাশ, তিনটে বি-এ ফেল ছেলে মুখিয়ে আছে তোর চাগরিটার জন্য।

—আমিও আই-এ পাশ করতাম। ঐ জন্যেই তো বিয়ে। তা শ্বশুর মরে গেল, পড়বার খরচা দেয় কে?

—আরে তা-কি বুঝবে মনিব! তুই এক কাজ কর, পায়ে ধরে পড়্‌গে বড়সাহেবের গিন্নির। মেয়েছেলের মর্জি হ'লে তোর চাগরি নেয় কে।

এই ব্যাপার! বুদ্ধিমান ছেলে পরমেশ, হদিস বুঝে গেল ইসারায়। কিন্তু নীলুদা ঠিক জানে না। বড়সাহেবের বউ গিন্নি নয়, মেমসাহেব। পায়ে হাত দিলে চটে যাবে! হয়তো রেগে গিয়ে চাকরিই খেয়ে দেবে। ভাবতে লাগল পরমেশ। ভগবান দয়া করলেন, কানে গেল বড়সাহেবের কথা:

—একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে আধা ভদ্রঘরের মেয়ে দিতে পারেন গাঙ্গুলী

মশাই? বেবীটার আয়া ছুটি নিয়েছে এক-মাসের, ভারি মুস্কিলে পড়েছি।

বাতাসে ভাসতে ভাসতে বাড়ী ফিরল পরমেশ। চোখ চকচকে, কান গরম। রুটি-গুড়ের জলখাবার খেতে খেতে বৌয়ের দিকে চাইল পরমেশ। নাক বোঁচা, উঁচু কপাল, পুরু ঠোঁট, আর রং কালো মেয়েটি স্বাস্থ্য-বতী, বয়সের লাবণ্য আছে মুখে। একটা অসুবিধে, বৌটা ভারি সোজা মানুষ। অবশ্য তাতে সুবিধেও আছে বিস্তর। স্বামীর কথা মতই চলে আভা। বৌয়ের সঙ্গে কথা বলল পরমেশ।

—তোমার বুঝি ভাল লাগে রূপসী শাড়ী?

বাজারে নতুন-ওঠা মিলের রূপসী শাড়ী? গোলাপী রং, সবুজ রং দিয়ে বোনা লতানো পাড়; অমনি একখানা শাড়ী ভাল লাগে না? কিন্তু কে দেবে আভাকে? বাবা মারা যাবার পর একখানাও নতুন শাড়ী কেউ দেয়নি তাকে।

—শোনো, আমি তোমাকে এমাসের মাইনে পেয়েই একখানা শাড়ী কিনে দেব, যদি তুমি একটা কাজ কর।

কাজ! আভার মুখ মলিন হয়ে গেল। নিশ্চয়ই এ মাসে ও কয়লার গুঁড়ো আনাবে আর মাটি ছেনে ছেনে গুল পাকাতে হবে আভাকে। কি যে শ্রী হয়েছে হাত দুটোর বাসন মেজে, কাপড় কেচে! আবার গুল। বৌয়ের মুখ দেখেই বুঝল তার চিন্তা পরমেশ।

আরে না না, সংসারের কাজ নয়। কেবল একটু বুদ্ধি ক'রে চলতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হবে মাকে ম্যানেজ করা। ভ্রূ-কুঁচকে মাকে ম্যানেজ করবার উপায় ভাবতে লাগল পরমেশ এবং একটা উপায় বেরও করে ফেলল। তিন রাত বৌকে তালিম দিয়ে ঠিক করল, তারপর মা।

—মা, ইয়ে, বুঝেছো কিনা, শাশুড়ী ঠাকরুণের চিঠি এসেছে, অসুখ। বৌকে পাঠাতে হয়, একবার।

পাঠাতে হয়! তার মানে পাঠাবেই। মা অগ্নি-দৃষ্টিতে চাইল ছেলের দিকে। বলবার কিছু নেই, রোজগারী ছেলে পালছে মা আর পঙ্গু ভাইকে। জিজ্ঞেস করতে হয়, তাই করল।

—কি অসুখ করেছে?

—ঐ আমবাত গো, একেবারে শয্যাধরা হয়ে পড়েছে।

আমবাত! বাতের ব্যথায় জ্বলছে নিজের মা; হাতরে, পারে, কোমরের বিষ হয়ে থাকে সর্বক্ষণ ব্যথায়। সংসার তার ঘাড়ে ফেলে বৌকে পাঠাচ্ছে শাশুড়ীর সেবা করতে। শুয়ে থাকা বেড়ালটার গায়ে এক বাড়ি বসাল মা। কেবল খাওয়া, ইঁদুর মারবার নাম নেই।

বেশী কথা বাড়ালো না পরমেশ। বৌকে সাকুস্তরো ক'রে রবিবার সকালে বের হয়ে পড়ল সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে। দুদিন আগেই মেমসাহেবের সঙ্গে কথা ব'লে এসেছে পরমেশ। আয়া নেই ব'লে কষ্ট হচ্ছে বেবীর? ইস্, আগে জানেনি, তার বাড়ীতে রয়েছে মেয়ে। ঘাড় চুলকে মুখ নীচু ক'রেছে, বউ আর কি। ভীষণ বাচ্চা ভালবাসে। খুশী হয়ে একমাস বাচ্চা দেখবে সে।

আভাকে দেখে খুব পছন্দ হ'ল অলকার। বিপদে পড়েছিল, সিনেমা, বেড়ানো, ফাংশান, সব বন্ধ। বেলা দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সলিড প্রোগ্রাম ছকে ফেলল অলকা। পরমেশ এবং আভা যে কত অদ্ভুত রকমের ভাল সেই ফিরিস্তি প্রায় রোজই শুনতে লাগলেন সনৎ রায়। পনেরো দিনের মধ্যেই পরমেশের এফিসিয়েন্সিতে বিশ্বাস জন্মালো, অ্যাকাউন্ট সেকশনে ক্লার্ক হয়ে প্রমোশন পেল সে। সমস্ত অফিস তাজ্জব বনলো। পিয়ন থেকে ক্লার্ক! মিটিমিটি হাসলো নীল-কণ্ঠ: —কিরে, বলেছিলুম না অন্য উপায় চাই।

—তোমারি বুদ্ধিতে দাদা। গদগদ হয়ে নীলকণ্ঠের পায়ের ধুলো নিল পরমেশ। খাওয়ালো বন্ধুদের দানাদার নিমকি।

তারপর থেকে অনেক ম্যাজিক দেখালো পরমেশ। প্রাইভেটে পড়ে পাশ করল আই-এ, বি-এ। তরতর করে ছুটেছিল সে। জপ করছিল একমাত্র—অন্য উপায়। আভা ঘরে ফিরেছে একমাস পরেই, কিন্তু পরমেশ মেম-সাহেবের দরবারে হাজিরা দিতে ভোলেনি একদিনও। ডালিয়ার কাটিং, অ্যালসে-শিয়ানের বাচ্চা, সিলভার-মুন উল, ঢাকাই শাড়ী, ল্যাংড়া আম, গঙ্গার ইলিশ। একেবারে
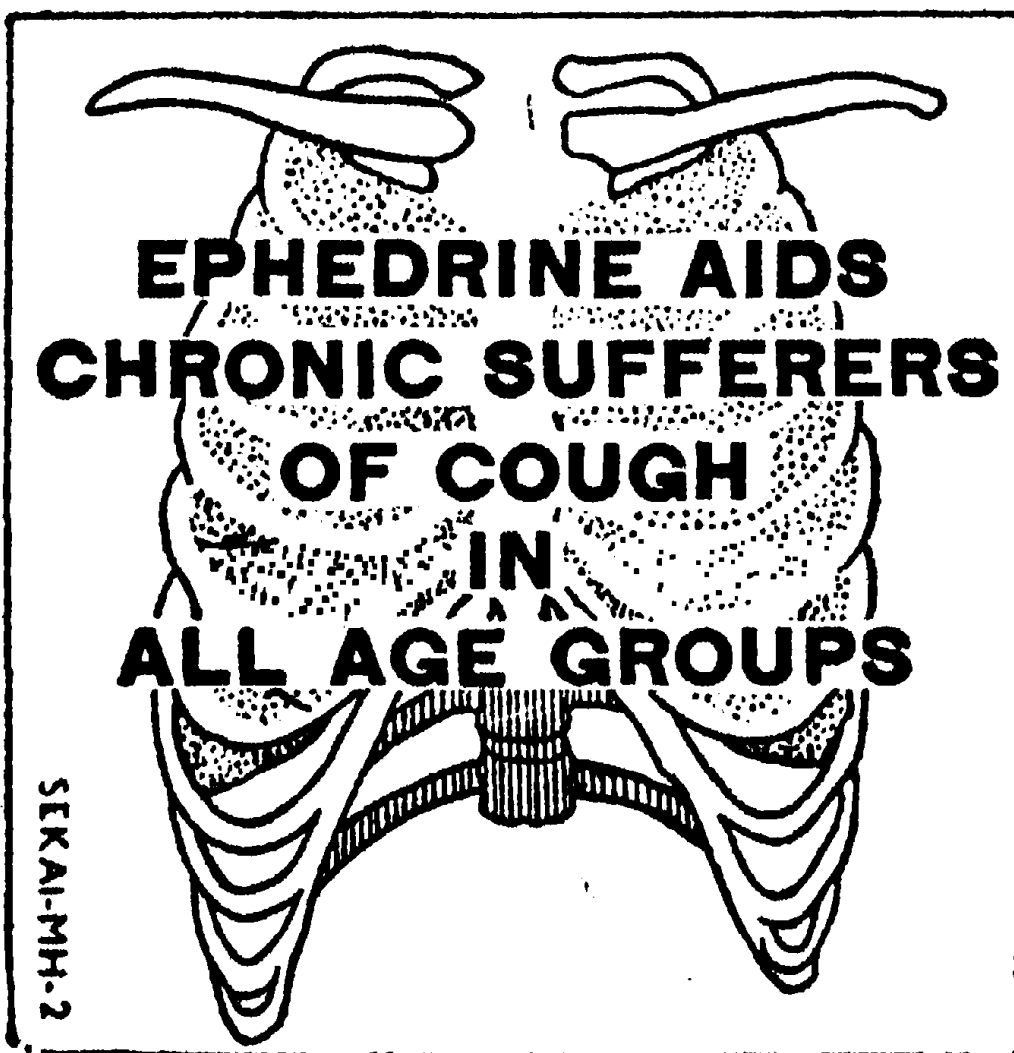
অভিভূত হ'ল অলকা। এত গুণ একটা মানুষের! তারপর এল উনিশ-শো চল্লিশ সাল। মস্ত বড় হয়ে গেল কোম্পানী। যুদ্ধ মানুষকে না খাইয়ে, অখাদ্য খাইয়ে মারল, মারল বোমা ফেলে আবার রাশি রাশি টাকাও দিল। বাঁশ, মাটি, পাথর, ইট সবার বদলে ছাপানো টাকার পাহাড় জমল। সনৎ রায়ের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল সেই টাকা—উচ্ছৃঙ্খলতা অমিতাচারের আগুন। সৎ, সুস্থ, গৃহসুখী স্বামী আর রইল না সনৎ রায়। ডিকান্টারে টলটলে পানীয়, সুন্দরী অভিজাত সঙ্গিনী—সব, সব ব্যবস্থা করছে পরমেশ। অ্যাকাউনট্যান্ট হয়ে গেল সে. সুট-টাই-জুতো। বড়সাহেবের খরচ যাচ্ছে কোম্পানীর এক্সপ্যানসন খাতে, কিছু যাচ্ছে পরমেশের ব্যাগে। যাদবপুরে জমি কেনা হ'ল তার। জীবন্ত মন্ত্র, অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান দিয়েছে নীলকণ্ঠ। অন্য উপায়! সুন্দরী চতুরা কত মেয়ে আছে, তারাও খোঁজ করছে পরমেশকে। যুদ্ধের আঘাতে ভাঙন লেগেছে পরিবারের। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে পৃথিবীর রং-বদল দেখছে। ওদেরও চোখে-মনে প্রচণ্ড নেশা, লোভের টান। টাকা, গাড়ী, বাড়ীর হাতছানি।

গত বছর অফিসে যোগ দিয়েছে অজিত রায়, সনৎ রায়ের বড়ছেলে। ওকে তিন বছরের দেখেছে পরমেশ। কতদিন স্কুলে নিয়ে গিয়েছে প্যান্টের বেল্ট কষে। অজিত প্রসন্ন নয় পুরানো কর্মচারীদের প্রতি। তারা কোম্পানীর আগের ইতিহাস জানে, তাতে মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে অফিসের। ভ্রূ-কুঁচকে তাকালো পরমেশের দিকেও। অনেক সরিয়েছে অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পরমেশ মৃদু হাসল। সরিয়েছে, না সরালে হ'ত কি ক'রে তিনতলা বাড়ী, আভার গায়ের গয়না। ও তো তবু বাড়ী সোনা বানিয়েছে কাগজের টাকাকে। তোমার বাবা, তিনি? তিনি যে লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে দিলেন মেয়ে আর মদের জলে, তার হিসাব তো আছে পরমেশের কাছে। আর তুমি! তুমি শিল্পপতি ছাব্বিশ বছরের ছেলে, বারশো টাকা মাসে ভ্রু ক'রে কেমন করে ওড়াও তিন হাজার টাকা একটি দিনের পার্টিতে! আচ্ছা, দেখা যাবে!

দেখা গেল। অজিতের ডাকাতে হ'ল অ্যাকাউন্ট্যান্টকে। অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে, অডিটর ধরবে, ইনকাম ট্যাক্সে অসুবিধা, বাবা বিরক্ত হচ্ছেন। বহান্ন বছরের চশমা পরা চোখে একটু সময় স্থির হয়ে অজিতের দিকে তাকাল পরমেশ।

হকিন্‌সন- পার্টিসন্‌ ছিল না পার্টিতে?

ছিল, ছিল, ওদের জন্যই তো—

ঠিক আছে। হকিন্‌সন্‌ পার্টিসনের কোলাবরেশনে যে 'স্কুটার' তৈরী করবার নতুন স্কীম হচ্ছে, সেই খাতে ঢুকিয়ে দেব খরচটা।

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ দে। কি আশ্চর্য! দাঁড়িয়ে কেন! বসুন। বাড়ীর সবাই কেমন আছে?

বাড়ীর সবাই? ছেলে মেয়ে বউ? মানে মেয়ে, মানে স্বপ্না! চলনে বলনে আধুনিক-তমা, বাইশ বছরের মেয়ে। স্বপ্না চুল চুড়ো ক'রে বাঁধে, ঈষৎ ফাঁক করা পুরু ঠোঁট, লো-লো, হাই-হাই স্টাইলে পরা শাড়ী, অঙ্গ-বিন্যাসের বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। আডা মাঝে-মাঝে মেয়েকে কিছু বলতে চায়, থামিয়ে দেয় পরমেশ। আডাকে দিয়ে সুরু, দাঁড়ি টানবে স্বপ্না।

...প্রেমে পড়েছে?...

স্বপ্নার জন্মদিন। কর্মচারীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাওয়া অমায়িকতার লক্ষণ, অজিত রায় এল। অনেকবার, বহুবার পরমেশের বাড়ীতে এল, স্বপ্না গেল তার সঙ্গে বেড়াতে।

মারা গেলেন বুড়ো ম্যানেজার হরিদাস গাঙ্গুলী। তাঁর চেয়ারের মাসিক তনখা সাতশ শো টাকা। সেল্‌স ম্যানেজার অনন্ত সমাদ্দার বারে বারে যাচ্ছে বড়সাহেবের ঘরে। হবে না, স্বপ্নাকে দিয়ে কাজ হবে না। ওর রং কালো, এক বছরের পুরানো মেয়ে ও। স্বপ্নাকে দেখে আর বিহ্বল হয় না অজিত। কে, কে পারবে পরমেশকে ম্যানেজারের এয়ারকণ্ডিশনড্‌ ঘরের চেয়ারে বসিয়ে দিতে? ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারদিকে চাইল পরমেশ। অন্য উপায় চাই।

বেলা মিত্র, রিমি সেন, বকুল নন্দী—সব চেনাজানা মেয়ে। রীফ্‌লেস ব্যারিস্টার মিঃ রে। মেমসাহেব বউ পালিয়েছে স্কট-ল্যাণ্ডে। মেয়ে আইভি লরেটোতে পড়ে গোলাপী রং, কালো চুল, কালো চোখের অপ্সরী। বীণায় ঝঙ্কারে ইংরেজী বলে, নাচতে জানে শরীর মুচড়িয়ে। ওষ্ঠ-অধর রসালো হয় আঙুর চোয়ানো রসে। স্বরাজ দাসের টেবিলে অফুরান হুইস্কি, আইভির চোখের সামনে রতনে-মানিকে ঝলমল ভবিষ্যৎ দুলালো পরমেশ। দেখা গেল আইভির কোমর জড়িয়ে অজিত নামছে তার 'অ্যাম্বাসাডার' হতে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে স্বপ্না। প্রেমে পড়েছে? বোকা হলেই এমন হয়। আজকালের দিনে এমন করে জড়িয়ে পড়তে যায় কোন মেয়ে? ভ্যানিটি ব্যাগ বোঝাই ক'রে ক্রিম বেরিয়ে আসে। ওকে ভাল একটা বিয়ে দিতে হবে। ব্যস! কিন্তু দেরী আছে তার। আজকে নতুন ম্যানেজারের কল্যাণে ভোজ হচ্ছে অফিসে, সবাই খুশী।

লিফটের কাছে যেতে যেতে থামলেন দে সাহেব। বুড়ো পিয়ন নীলকণ্ঠ ঘোলাটে চোখ মেলে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। একটু চোখ টিপলেন, হাসির ভঙ্গীতে নড়লো ঠোঁট। লিফ্‌ট নেমে গিয়েছে। নীলকণ্ঠের কোলে পড়ে আছে ছোট ক'রে ভাঁজকরা একটি একশ টাকার নোট।

রয়াল এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির পুষ্প প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ফুল।

সড়ক সৌধ কাণাগলি

আরবোরিকালচার! কলকাতা শহরে বসে এই ইংরিজি কথাটা আজ সবাই উচ্চারণ করতে লজ্জা পাবেন। তবু কথাটা কিভাবে যেন চলে আসছে। কাগজ-পত্তরে হুট্ বলতে দেখা যায়। মানে বড় ভীষণ! গাছপালা আর ফুলে শহর-সাজানোর বিজ্ঞান! শহরে ফুল শ্মশানঘাট, নষ্টপাড়া আর মালির কোঁচড় ছাড়া কোথাও পাবেন না আপনি। আর পাবেন বিয়ে-সাদি মজা-মচ্ছবে। ফুল নিয়ে পদ্য লিখলে আধুনিক কবিকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। মিলের জন্যেও তো আর ভুল-এর সঙ্গে ফুল-এর দরকার নেই। সুতরাং ফুল কেন, ফলারই যথেষ্ট। আর সত্যিই তো ফলারে যেদেশে টান পড়েছে সেখানে ফুলের কথা বাতুল ছাড়া কেই বা মনে আনে?

এবছর কিন্তু ফুলের হিসেব ভারি উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। ইডেন গার্ডেনে বর্ষার কদম, পৌষের মাঝপর্যন্ত সজাগ ছিলো। এখন কেশর-মুক্ত সবুজ বল সারা-গাছ ছড়িয়ে আছে। বকুল কি বারোমাসের? শরতের শিউলি তো দেখছি সব ঋতুতেই ফুটে ফুটে ক্লান্ত। মনে হয়, কামিনী আর হাসনুহানা এবছর শীতেই প্রথম ফুটতে দেখলাম।

শীতকালের মরশুমি ফুল দেখতে সেদিন গিয়ে পড়েছিলাম রয়াল এগ্রিহর্টি-কালচার বাগানে। পরদিন সে-বাগানে 'পুষ্প-প্রদর্শনী' হবার কথা। গোলাপ, ডালিয়া আর গ্লাডিয়োলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমা-বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। শনিবার তিনটের প্রদর্শনী। নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাগানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তরুণ বসু। প্রদর্শনীর সময় ফুলের চেয়ে মানুষের সংখ্যা এতো বেশি হয় যে, ফুলের কাছে আর পৌঁছুতে পারা যায় না। সুতরাং, আগেভাগে কাজ সেরে আসি ভেবে শুক্রবার বিকেল নাগাদ গিয়ে পৌঁছে দেখি, ফুলের চিহ্নমাত্র নেই। ফুল অর্থাৎ নিমন্ত্রিত ফুলের কথাই বলছি। পরদিন শনিবার। শহরের সবাই অকাল-বৃষ্টির কথা জানেন, তবু তারই মধ্যে প্রতিশ্রুত প্রদর্শনী হয়েছিল, নমো-নমো করে পুজো হবার মতন।

কিন্তু সে-প্রদর্শনীর কথা বলছি না। বলছি, যে বাগানে ফুল ফুটে থাকার কথা সে-বাগানে এবছর যেন মড়ক লেগেছে। ফি-বছরই শীতকালে আলিপুরের বাগান ফুলে থৈ-থৈ করে। মরশুমি ফুলের বিচিত্র রঙে রঙিন হতে শহর-কলকাতার লোক ভেঙে পড়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে, সবুজ মাঠে পা ছড়িয়ে বসে শীতের নির্জন অলস মধ্যাহ্ন উপভোগ করতে কেউ আসেনি এবার। ধারাবাহিক ফুলের বেড-গুলো শূন্য। শূন্য মানে, সবুজ লতা-গুল্ম আছে, কিন্তু নিষ্ফুল সবুজে কার মন বসে? ওদিকে বড়িশায় যেতে গিয়ে সেদিন ব্রেইল-স্কুলের অন্ধ-বাগানে উজ্জ্বল ফুলের সমারোহ দেখে মনে হলো, আমরা যেন চারিদিকেই এক চমৎকার ঠাট্টা সাজিয়ে বসে আছি। রাইটার্স বিল্ডিংসের ছাদে ফুলের চাষ, মাটির টবে লাউ আর মুলো, বাড়ির চূড়োয় নবান্ন, ছাঁচতলায় বন-মহোৎসব!

অথচ 'ফুলের লোক্যাল'গুলো ঠিক তেমনি আছে। হাওড়া-ব্রিজ-এপ্রোচ মল্লিক-ঘাটে সন্ধ্যেবেলা গাঁদাফুলের পাহাড় জমে ওঠে। ফি রোববার হাতিবাগান বাজারে দল-ছুট্ লঙ্কা বেচে সেই পয়সায় আধ-ডজন ডালিয়ার চারা কিনতে হাজার হাজার ছোট-ছেলেকে দেখেছি আমি। তাদের মনে ফুলের পিপাসা আজো বজায় আছে, যেমন আছে প্রতি ঘরেই আলমারিবন্দী শূন্য ফুলদানি।

এতোদিনেও বিদেশি ফুলের বাংলা সমর্থক ও সম-ধ্বনিময় নাম দেওয়া হলো না। বোগেনভিলিয়া কি বাগানবিলাসে সার্থক নয় কিংবা পয়েন্সিটিসিয়া প্রান্তসীমায়? কারনেশন, ডায়ান্সাস, ফ্লক্স, সুইট সুলতান, স্ন্যাপ-ড্রাগন, হোলি হক্—রদবদল করেই না খেলাচ্ছলে, মন্দ কি? তাছাড়া, বিজ্ঞানের নানান ক্ষেত্রে 'হাইব্রিডাইজেশান' এতো দ্রুত হচ্ছে, একসময় আমরা অকূল পাথারে পড়বো। শিবপুরের বাগান দূরে অস্তু, ছোটোখাটো কোনো বাগানে গেলেই গাছের গায়ে খোদাই-করা ল্যাটিন নাম কাদের জন্যে সাঁটা রয়েছে বুঝতে পারি না। অন্তত বাংলাতে সে গাছের স্থানীয় নামটা থাকলে কার ক্ষতি হতো? শুনেছিলুম কেন, দেখেওছি আলিপুরের বাগানে গোলাপজাম আর জাম-রুল হাইব্রিড করিয়ে বিচিত্র ফল পাওয়া গেছে, জামের সুগন্ধি আর রঙ জামরুলের আকৃতি-প্রকৃতি দুটোই পালটে দিয়েছে। শুধিয়েছিলেন, কি নাম রাখা যায় বলুন তো এই নতুন ফলের? গামরুল রাখুন না? গামরুল! অদ্ভুত শোনাচ্ছে। প্রথম-প্রথম কিছুটা অসুবিধে তো হবেই—সময়ে ঠিক হবে। কেন হাসজারুর পপুলারিটি ভুলে যাচ্ছেন?

—রূপচাঁদ পক্ষী

বিজ্ঞানের কথা

শুভংকর
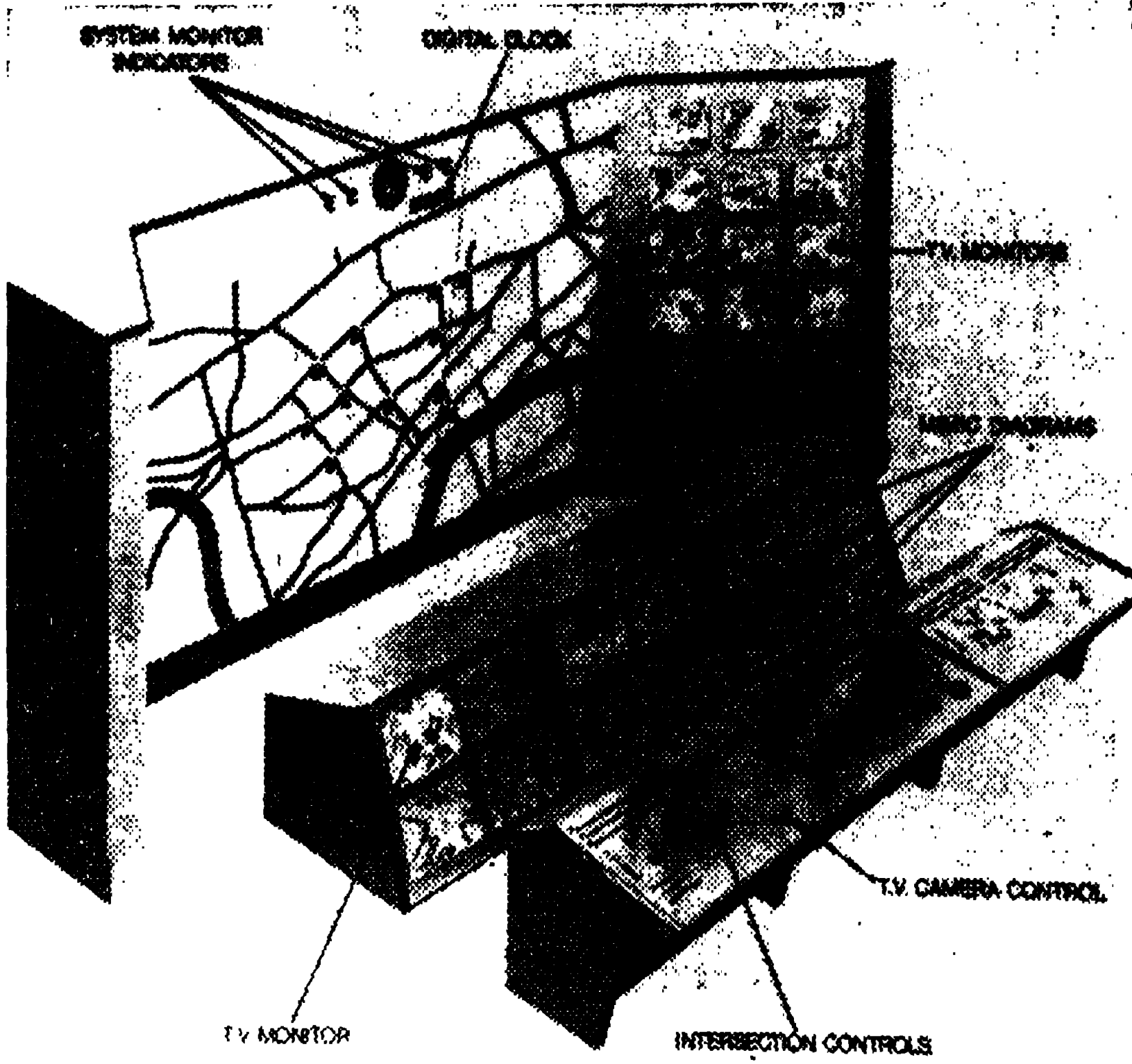
সর্বকর্ম-পটিয়সী কম্পিউটার

দিনের দিন কম্পিউটার সর্বকর্ম-পটিয়সী হয়ে উঠছে। আর কিছু দিনের মধ্যেই হয়ত দেখা যাবে, কম্পিউটার মানুষের মত প্রবন্ধ রচনা করছে এবং তা পড়ে শোনাচ্ছে পত্রিকার সম্পাদককে।

আমরা জানি, কম্পিউটারে সাধারণত আগে থেকে কাজের নির্দেশ জমিয়ে রাখা হয়। কম্পিউটার সম্পর্কে সর্বশেষ এক খবরে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি কম্পিউটার তৈরী করেছে যাতে আগে থেকে কোন নির্দেশ দেবার প্রয়োজন হয় না। কোন প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হলে কম্পিউটারটি মুহূর্তের মধ্যে তার শতাধিক উত্তর জানায়, অবশ্য সব উত্তরই সঠিক নয়।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, প্রশ্ন করা হলে কম্পিউটার থেকে তার সম্ভাব্য সমস্ত উত্তরই বেরিয়ে আসে। তারপর কম্পিউটারের অপর একটি অংশে প্রশ্নটির সঙ্গে এই সমস্ত উত্তর মেলানো হয় এবং এভাবে সঠিক উত্তর বা সমাধানটি বাছাই হয়ে যায়।

সম্প্রতি রাশিয়ান ও আমেরিকান কম্পিউটারের মধ্যে দাবা খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবস্থা করেছেন মস্কো ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। ব্যবস্থা অনুযায়ী এক সঙ্গে চারটি ম্যাচ খেলা হচ্ছে।

এক হাজার বা ততোধিক শব্দ ভান্ডারে রয়েছে (সাধারণত মানুষের শব্দভান্ডার এর চেয়ে সমৃদ্ধ নয়) এরূপ কম্পিউটারের সাহায্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। এরকম একটি বাক্যবাগীশ কম্পিউটার নিউইয়র্কে স্টক এক্সচেঞ্জে লেন-দেনের খবর বলে দিচ্ছে আগ্রহী ব্যক্তিদের।

সম্প্রতি বৃটেনের লন্ডন শহরে কম্পিউটারের সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এক বছরের মধ্যে এই পরিকল্পনা ছয় বর্গ-মাইল এলাকা জুড়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে। এই এলাকার মধ্যে কয়েকটি সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ প্রধান রাস্তা আছে। এই পরিকল্পনা চালু হলে যানবাহনের গতি যেমন বাড়বে তেমনি যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও সহজ হয়ে উঠবে।

অনন্য গণিত-প্রতিভা রামানুজন

(২)

আমাদের দেশের শিক্ষার পরিবেশ এমনই যে, কোন ছাত্রছাত্রীর কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি বা আগ্রহ থাকলেও তাকে সে বিষয়ে আরও উৎকর্ষ লাভের পথ কদাচিৎ দেখান হয় বা উৎসাহ দেওয়া হয়। মাস্টারমশাইরা পাঠ্য বিষয়ের বাইরে কোন কিছু ছাত্রছাত্রীরা জানতে চাইলে সে বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা এড়িয়ে যান। একারণে কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে কোন অসাধারণত্ব বা বিশেষ প্রতিভা থাকলেও তাঁরা সহজে তা উপলব্ধি করতে পারেন না, দু-একজন পাকা জহুরী। রামানুজনের ক্ষেত্রেও এই ঔদাসীন্যের ব্যতিক্রম হয় নি। তবে এক বিষয়ে রামানুজন ছিলেন বিশেষ সৌভাগ্যবান। তাঁর সহপাঠী ও বন্ধুরা (যাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে বড়) অংকে রামানুজনের অদ্ভুত দক্ষতা দেখে যেমন অবাক হয়ে যেত, তেমনি তাঁর অংকের নেশা পূরণের জন্যে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করত। গণিতে রামানুজনের অসাধারণ প্রতিভা তারা যেন কিছুটা উপলব্ধি করতে পারত।

গণিতে 'সর্বোত্তম সত্য' কি তা জানার জন্যে রামানুজনের একটা প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। সহপাঠীদের কাছে এ প্রশ্ন তিনি প্রায়ই উত্থাপন করতেন এবং উঁচু ক্লাশের বন্ধুদেরও মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, 'পিথাগোরাস-সূত্র' হচ্ছে গণিতে সবচেয়ে বড় সত্য। আবার কেউ কেউ বলত, স্টক-শেয়ার হচ্ছে সর্বোত্তম সত্য। এ-সব উত্তরে রামানুজনের মন কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারত না, তাঁর মন চাইত সর্বোত্তম সত্যকে খুঁজে বার করতেই হবে। এই অনুসন্ধিৎসার আগ্রহে রামানুজনের অংকের নেশা আরও প্রবল হয়ে উঠল। এই আরও জানার তাগিদে তিনি একের পর এক অংকের বই শেষ করতে লাগলেন। কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে অংকের বই ছিল প্রচুর। তাঁর কলেজের বন্ধুরা তিনি যা বই চাইতেন তা-ই তাকে এনে দিত। এ সব বই শুধু আদ্যোপান্ত পড়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, কারও কোন সাহায্য না নিয়েই বই-এর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিজে কষে বার করতেন।

রামানুজন যখন মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই স্বল্প বয়সেই সে সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে। যখন সে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, তখন ত্রিকোণমিতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে থাকে। তার পাশের বাড়ীর একজন বি-এ ক্লাশের ছাত্র লোনীর ত্রিকোণমিতির দ্বিতীয় ভাগের একটা বই তাকে এনে দেয়। কয়েক দিন পরে রামানুজনের কাছে এসে সে জানতে পারে, চতুর্থ শ্রেণীর এই মেধাবী ছাত্রটি বি-এ ক্লাশের বই শুধু পড়েই শেষ করে নি, তার প্রতিটি অংক সে নিজে নিজেই কষে ফেলেছে! রামানুজনের এই অসাধারণ গণিত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এর পর থেকে গণিতের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে সে রামানুজনের কাছে প্রায়ই ছুটে আসত। শুধু এই বি-এ ক্লাশের ছাত্রটি নয়, উঁচু ক্লাশের আরও অনেক ছাত্র এই একই উদ্দেশ্যে তার কাছে আসত। কিন্তু তাঁর মা-বাবা বাড়ীর বার হওয়া পছন্দ করতেন না বলে রামানুজন রাস্তার ধারের একটি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় রামানুজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার উদ্ভাবিত সাইন ও কোসাইন-এর সূত্রগুলি নিজে নিজেই কষে বার করেন। পরে যখন তিনি জানতে

পারলেন এই সূত্রগুলি ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, তখন তাঁর অঙ্ক-কষা খাতার পাতা-গুলি ছিঁড়ে বাড়ীর ছাদে ছড়িয়ে দিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রামানুজন তখন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছেন। সে সময় এক দিন তার এক বন্ধু স্থানীয় সরকারী কলেজ থেকে কার রচিত 'বিশুদ্ধ গণিতের সংক্ষিপ্তসার' বইটি চেয়ে এনে রামানুজনকে দেয়। এই দিনটি রামানুজনের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মত এই দিনটিতে একটি নতুন জগতের দ্বার তাঁর কাছে খুলে যায়। এই জগতে প্রবেশ করে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। যে অনন্য গণিত-প্রতিভা এত দিন তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল, এই বইটির যাদু স্পর্শে তা যেন জেগে উঠল!

কার-এর বইটিতে গণিতের যে সমস্ত সূত্র ছিল রামানুজন তা বুদ্ধি খাটিয়ে প্রমাণ করার জন্যে মেতে উঠলেন। অন্য যে সব বই-এর সাহায্যে এই সূত্রগুলি প্রমাণ করা যায় তার কোনটিই রামানুজনের কাছে তখন ছিল না। তাই প্রত্যেকটি সূত্র তাঁর কাছে নিজস্ব গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

প্রথমে তিনি সংখ্যার বিচিত্র বর্গ (ম্যাজিক স্কোয়ার) তৈরীর কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। তারপর জ্যামিতির দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান একটি বর্গক্ষেত্র কিভাবে তৈরী করা যায় তার চেষ্টায় তিনি মনোনিবেশ করলেন। অর্থাৎ রামানুজন এমন একটি জ্যামিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে চাইলেন যার সাহায্যে একটি বৃত্ত ও ব্যাস নিয়ে শুরু করে এমন আয়তনের সরলরেখা বার করা যায় যার ওপর বর্গক্ষেত্র হবে বৃত্তের ক্ষেত্র-ফলের সমান। এভাবে তিনি ক্রমশ উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে লাগলেন। তাঁর শেষ পদ্ধতিটি এত উন্নত হয়েছিল যে, পৃথিবীর বৃত্তের আয়তনের সমান (যার ব্যাস হচ্ছে ৮০০০ মাইল) ধরে এমন একটি বর্গ-ক্ষেত্রের বাহু বার করা গেল যা হল পৃথিবীর বিষুব বৃত্তের প্রকৃত পরিধির (৭০৯০ মাইল) প্রায় কাছাকাছি। রামানু জনের উদ্ভাবিত ফলে ও প্রকৃত দৈর্ঘে তার-তম্য হয়েছিল মাত্র কয়েক ফিট।

জ্যামিতির মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কারের তেমন সুযোগ নেই দেখে রামানুজন এর পর বীজগণিতে মনোনিবেশ করলেন। এই বীজগণিতের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের উপযুক্ত পথ খুঁজে পেলেন। নাওয়া-খাওয়া-শোয়া ভুলে বীজ-গণিতের নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কারের সাধনায় তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। এ সময় তিনি গণিতের স্বপ্নও দেখতেন। রামানুজন বলতেন, জটিল গণিতিক সমস্যার সমাধান বার করতে না পেরে তিনি যখন চিন্তাকুল হতেন তখন দেবী নামাগিরি তাঁকে স্বপ্নে সে সমস্যা সমাধানের সংকেত দেখিয়ে দিতেন। রামানুজন সত্য সত্যই প্রায় প্রতিদিন বিছানা ছেড়ে উঠেই গণিতিক সমস্যার ফলা-ফল লিখতেন ও সেগুলি যাচাই করে দেখতেন। একটি বাঁধান নোট-বই-এ তিনি তাঁর এই সব ফলাফল লিখে রাখতেন এবং যাঁরা তাঁর গণিতের কাজে আগ্রহ প্রকাশ করতেন তাঁদের এই নোট বইটি দেখতে দিতেন। পরবর্তীকালে গণিতজ্ঞেরা এই নোট বই-এ রামানুজনের অনন্যসাধারণ গণিত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে-ছিলেন।

রসায়নের তৃতীয় শাখা

বহু কাল আগেই রসায়নকে দুটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হয়েছে—জৈব ও অজৈব রসায়ন। কার্বন বা অঙ্গারঘটিত পদার্থের রসায়নকে বলা হয় জৈব আর কার্বন-বিমুক্ত পদার্থের রসায়ন হচ্ছে অজৈব। ক্রমশ এই দুটি শাখার সীমারেখাটুকু লোপ পেতে শুরু করেছে। বর্তমানকালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে আলাদা-আলাদাভাবে বিশেষজ্ঞের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। এই শাখাগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানা সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে নতুন ফল প্রসব করছে, ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ধারার উদ্ভব ঘটাচ্ছে এবং বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ এক-একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

কোন জন্তুর গায়ে নাইলনের লোম বা সাংশ্লেষিক-রবার উৎপাদনকারী কোন গাছ কেউ কখনও দেখে নি। এই রবার আর অসংখ্য ধরনের পলিমারের উদ্ভব ঘটেছে জৈব-জগতের রসায়ন ও খনিজজগতের রসায়নের সন্ধিস্থানটিতে। এইভাবে রসায়নের তৃতীয় শাখা জৈব মৌল পদার্থের রসায়ন (অর্গানো-এলিমেন্ট কেমিস্ট্রি) জন্মলাভ করেছে। এই শাখার জনক হচ্ছেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রখ্যাত রসায়নবিজ্ঞানী আকাডেমিশিয়ান আলেকজান্দার নেসমিয়া-নোফ।

সাত বছরব্যাপী গবেষণার ফলে নেসমিয়ানোফ জৈব-ধাতব যৌগিক পদার্থ-গুলিকে সংশ্লেষীকরণের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আজ এই পদ্ধতি 'নেসমিয়ানোফ প্রক্রিয়া' নামে সুপরিচিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে আমরা রঞ্জকদ্রব্য উৎপাদনের জন্যে সহজলভ্য অ্যারোমেটিক অ্যামিনগুলি থেকে মধ্যস্থতাকারক ক্ষার (বেসিক ইন্টারমিডিয়েটস্) সংশ্লেষণ করতে পারি এবং আগে যেসব জৈব-ধাতব যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষণ করা যেত না, বিভিন্ন প্রকারের সেই সব পদার্থ এর সাহায্যে এখন পাওয়া যাচ্ছে।

অধ্যাপক নেসমিয়ানোফ এমন একটি যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষণ করেন, যেটা ধর্মের দিক থেকে কোন অংশে দুর্মূল্য প্রাকৃতিক কস্তুরীর চেয়ে কম নয়। তিনি 'এনান্ট' নামে এমন একটি নতুন তন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেটা নাইলন ও কেপ্রনের চেয়ে ভাল এবং খুব উচ্চগতিসম্পন্ন বিমানের চাকার টায়ার তৈরীর কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

নেসমিয়ানোফ প্রবর্তিত গবেষণাধারা ইতিমধ্যেই রসায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, লোহার এক অনন্যসাধারণ রকমের স্থায়ী ও নতুন জৈব-যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর লোহ পরমাণুগুলি দুটি হাইড্রোকার্বন আঙটির মধ্যে ধরা রয়েছে। এ থেকে এখন শত শত যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষণ করা হয়েছে। রক্তাল্পতা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কার্যকরী ওষুধ, কেপ্রনের কাপড় রঙ করার রঞ্জকদ্রব্য, নিম্ন-মানের গ্যাসোলিনকে উন্নত করে তোলার শক্তিশালী রাসায়নিক এজেন্ট ইত্যাদি হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি।

জীবনের সর্বব্যাপিতা

ভি. কুপ্রেভিচ

(বিয়েলোরুশ বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি মিঃ ভি কুপ্রেভিচের এই আলোচনাটি থেকে অনেকগুলি নতুন চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়)।

জীবন সম্পর্কে যা আমরা জানি, তা আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতাসম্ভূত। আমরা কোন অপার্থিব জীব দেখিনি কিংবা তাদের সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য তথ্য আমাদের কাছে নেই।

পৃথিবীর বাইরে জীবন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে পৃথিবীর বাইরে জীবরূপ সম্পর্কে উল্কাসমূহ যেসব প্রমাণ রেখেছে, সবার আগে সেগুলি বিবেচনা করতে হবে। প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর শিলার সঙ্গে এইসব 'আন্তরীক্ষ অতিথি'র বহু মিল রয়েছে। অধিকন্তু, কোন কোন উল্কা-শিলায়, বিশেষ করে কোন্দ্রাইটিসে, রয়েছে নিউ-ক্লেইক এসিডের বা তাদের যৌগিক নিউ-ক্লিওটাইডিসের অনুরূপ জটিল জৈব পলিমার। কোন্দ্রাইটিস এমন সব জিনিস এনেছে যেগুলির সঙ্গে আকারে, আকৃতিতে ও গঠনে কোন কোন ছত্রাকের দগ্ধ রেণুর মিল রয়েছে। এইসব জৈব অন্তর্নিবেশ খনিজ টুকরোর মধ্যে কিভাবে স্থানলাভ করেছে? অনুমান করা যেতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের প্রবেশের সময় সেখানে ছড়ানো পার্থিব জৈব বস্তুসমূহ উল্কার মধ্যে আটকা পড়েছিল। কিন্তু ঘটনা হল যে, উল্কার

অতিগভীরে জৈবিক অন্তর্নিবেশ দেখা যাচ্ছে।

আর একটি অনুমান হল যে, কিছু কিছু উল্কা পৃথিবীর বাইরে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিক্ষিপ্ত পার্থিব শিলার টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়: আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই মত সম্ভবপর হওয়া দূরে থাক একেবারেই নীরস। সম্ভাবনা এই যে, উল্কাসমূহের জন্ম হয়েছিল সম্ভবত মহাকাশে অ্যাস্ট্রয়েড বলয়ের অভ্যন্তরে বিপুল পিণ্ড-সমূহের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে। সবশেষে আর একটি অনুমান হল যে, মহাজাগতিক বিকীরণ ও অন্যান্য কারণের দরুণ উল্কা-সমূহের মধ্যেই অজৈব উপাদান থেকে দৈবক্রমে জৈব পদার্থসমূহ সংশ্লেষিত হয়েছে। কোন মাইক্রোলজিস্ট বা মাইক্রো-বায়োলজিস্টই বিশ্বাস করবেন না যে উল্কাসমূহে এরূপ জটিল পলিমার সৃষ্টি বা জীবনের বিস্ময়কর প্রত্যাবৃত্তি আকস্মিক ঘটনামাত্র।

মনে হয় উত্তর হচ্ছে : ধাঁধাঁসৃষ্টিকারী এইসব জৈব অন্তর্নিবেশ এসেছিল মহাকাশ থেকে। ল্যাবরেটরিতে আজ পর্যন্ত এগুলির কাছাকাছি কোন কিছুই তৈরি হয়নি। রেণু-সদৃশ বস্তুর ব্যাপারে বলা যায় যে, পৃথিবীর উপরিতলে এগুলি পাওয়া গেলে জীবাশ্ম মাইক্রো-অর্গানিজম্-এ আর একটি নতুন জাতি সংযোজিত হবে।

এক কথায় বলা যায় : উল্কা থেকে এই প্রমাণ মেলে যে, জটিল পলিমার এবং পৃথিবীর কোন কোন বিদ্যুৎকেন্দ্রজাতীয় যৌগিক পর্যন্ত মহাকাশের কোন স্থানে সংশ্লেষিত হচ্ছে।

অন্যান্য গ্রহে জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

চাঁদ

লুনা—৯ যেসব আলোকচিত্র পাঠিয়েছে, তা থেকে চান্দ্র উপত্যকার পাঠোদ্ধার করা যায়। একে শুকনো এবং সূক্ষ্ম বালি বা ধূলির কিছুটা নরম জমির মত দেখায়। চন্দ্রপৃষ্ঠে সমানভাবে যেসব 'পাত্র' বিক্ষিপ্ত রয়েছে তার কারণ বেপরোয়া উল্কাপাত হতে পারে না। তাহলে এই 'পাত্রগুলি' এত সমানভাবে ছড়ানো থাকত না।

এরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, চাঁদের আভ্যন্তরীণ বা উপরের স্তর থেকে কিছু গ্যাস পদার্থের উৎক্ষেপণের ফলে এগুলির উৎপত্তি হয়েছিল। সম্ভবত এটা ছিল জলীয় বাষ্প। খুবই সম্ভব যে অনতিকাল আগেও চাঁদের সূর্যালোকিত দিকে এই প্রক্রিয়া সক্রিয় ছিল, আমাদের কালে এরূপ ঘটলে নিয়মিত চন্দ্রপৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করে এই স্থান নির্ণয় করা কঠিন হত না। টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা উল্কা আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেননি। চান্দ্রশিলা গলে যাবার ফলে যে-জলের উৎপত্তি হয়েছিল, তার পরিমাণ সম্ভবত কয়েক নিযুত ঘন কিলোমিটার। এর কিছু অংশ পাথর গঠনের কাজে লেগেছে, একাংশ জলাশয় সৃষ্টি করেছে বা ভূতলে প্রবেশ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে চাঁদ একেবারে জলশূন্য হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও আজও কিছু পরিমাণ জল থেকে থাকতে পারে।

আর জীবনের সঙ্গে জলের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। আমি বলতে চাই যে, পৃথিবীর কিছু কিছু যেসব ক্ষুদ্র জীব আবহমণ্ডলে বা অত্যন্ত জৈব পদার্থের মধ্যে বাড়তে পারে না, চাঁদে হয়ত সেগুলি প্রচুর দেখা যাবে। অবশ্য এর সম্ভাবনা বাস্তবিকই কম। বরং বেশি সম্ভবপর বিষয় হল জীবাণু-জীবন চাঁদে এসেছিল মহাকাশের কোন স্থান থেকে।

অবশ্য চান্দ্রশিলার নমুনাদি মাইক্রো-বায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণের জন্য না পাওয়া পর্যন্ত এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া যাবে না।

মঙ্গলগ্রহ

মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ পৃথিবীর চেয়ে অনেক কঠোর এবং সেখানে পৃথিবীর মত জীবের (তর্কের খাতিরেও) বসতি যুক্তি-যুক্ত বলে মনে হয় না। অন্যদিকে, পৃথিবী ছাড়া অন্য পরিবেশ জীবনের অনুকূল নয় এই ধারণাও ভুল। এপর্যন্ত আমাদের জ্ঞান হল : আমাদের চারপাশের জীবরূপ পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে চমৎকারভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। জীবন সর্বব্যাপী : শীতল মেরুবলয়ে, তপ্ত গাইসারে, তীব্র সালফিউ-রিক এসিডের মধ্যে, ইউরেনিয়াম আকরে, বহু নীচে প্রাপ্ত তৈলে, বরফাচ্ছাদিত পর্বত-শিখরে এবং মহাসাগরের অতলতলে। এমন তাপমাত্রা এখনও পাওয়া যায়নি যা জীবন্ত-রেণু, কোন কোন সামান্য জীব ও এমনকি পশুর টিস্যুকে মেরে ফেলতে পারে।

দেখা গেছে, কার্বন অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইডের আবহাওয়ার বাই-সরষের বীজ অঙ্কুরিত হয়। একই পরিবেশে শশা, চাল ও শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং এগুলি শুধু বাড়ে না, শূন্যাঙ্কের নীচে তাপমাত্রায়ও ক্লোরোফিল উৎপাদন করে।

তাহলে মঙ্গলগ্রহে কোন অন্তত আদিম জীবন থাকতে পারে না? আর অতি-বিকশিত জীবনই নয় কেন? সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির করেসপণ্ডিং সদস্য আই এস শক্লোভ্স্কি-র এই অনুমানের সঙ্গে একমত যে, মঙ্গলগ্রহের চন্দ্রসমূহ, অন্তত একটি, কৃত্রিমভাবে জাত। আর এক কথায় বলা যায়, আমি উচ্চ সংস্কৃতিবান বুদ্ধিমান মঙ্গলবাসীর অস্তিত্ব এবং তাঁদের সৃষ্ট চমৎকার সেচ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করি। মেরিনার—২ কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র এ-সিদ্ধান্ত প্রমাণ না করলেও, খণ্ডন করে না।

আমরা যদি মেনে নিই যে, মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহসমূহ ও 'খাতসমূহ' বুদ্ধিমান জীবেরা তৈরি করেছে, তাহলে এ-কথা বিশ্বাস করাও কঠিন যে, তারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা আজও করেনি। একটা সন্দেহ জাগে : যারা এই উপগ্রহ ও সেচ-ব্যবস্থা নির্মাণ করেছিল, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এটা কি সম্ভব নয়? এরূপ তর্ক করা যায় যে, এর মত উচ্চ সভ্যতা ধ্বংস হওয়া কঠিন। অতিসূক্ষ্ম তর্ক, তাহলেও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মঙ্গলপৃষ্ঠে অনেক-গুলি গহ্বর মঙ্গলে ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী অ্যাস্ট্রয়েড বলয় থেকে নিবিড় মহা-জাগতিক বৃষ্টির প্রমাণ। যে বিপর্যয় অ্যাস্ট্রয়েডসমূহের জন্ম দিয়েছিল, তাই হয়ত মঙ্গলগ্রহের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

আমি একটি অনুমান উপস্থিত করতে চাই যে, আজও মঙ্গলগ্রহে জীবের বসতি রয়েছে। এর একটি ভাল প্রমাণ মঙ্গলগ্রহের মানচিত্রে অকস্মাৎ উক্রাইনের আয়তনের একটি কালো অঞ্চল—লাওকুন নট-এর আবির্ভাব।

মনে হয় কৃষ্ণ বা নীলাভ ধূসর এলাকা-গুলি উদ্ভিদ-আচ্ছাদন ছাড়া কিছু নয়। সেখানকার গাছপালা হয়ত পৃথিবীর সম-গোত্রীয়। খুবই সম্ভব যে, এসব ফসলের চাষ এককালে মঙ্গলবাসীরা করেছিল। এগুলি শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ নয়।

এটাও সম্ভব যে, মঙ্গলগ্রহের সভ্যতার উত্তরপুরুষেরা আজও বেঁচে আছে, কিন্তু লুপ্ত বা বিনষ্ট বিদ্যুৎ বা অন্যান্য সংস্থা পুনরুদ্ধারে অক্ষম।

অন্যান্য গ্রহ

শুক্রগ্রহকেও জীবনের লালনভূমি বলে অনুমান করা যেতে পারে। এর পৃষ্ঠ মেঘের পুরু আচ্ছাদনে লুক্কায়িত এবং এর আবহ-মণ্ডল, উপত্যকা ও শিলা সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রমাণাদি পরস্পরবিরোধী। এমনকি এই গ্রহের দিনের দৈর্ঘ্যও প্রমাণিত হয়নি। এই দৈর্ঘ্য ২২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট হতে পারে।

শক্তিশালী আবহমণ্ডল, অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা ও ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক হয়ত বহু জৈব যৌগিক উৎপাদন করে থাকবে।

বৃহস্পতি ও তার অনেকগুলি চাঁদে কোন-না-কোনপ্রকারের জীবরূপের সম্ভাবনা আমি বাতিল করে দিচ্ছি না। জীবনের অনন্যসাধারণ নমনীয়তা ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অবর্ণনীয় ক্ষমতার কথা মনে রাখতে হবে।

শনি সম্পর্কে দু'-একটি কথা বলছি। এর বিশাল বলয়গুলি আয়তনের দিক থেকে খাস গ্রহ অপেক্ষাও অনেক বড়। এই গ্রহে মানুষ থাকলে সে নিশ্চয় অধিকতর সৌর-আলোক ও তাপ পাবার জন্য এইসব বলয় তৈরি করে থাকবে। শনি বলয়সমূহ সম্ভবত গাছপালার উদ্দীপক। এই গ্রহে কোন জীব থেকে থাকলে এইসব বিশাল বলয় থেকে প্রাপ্ত তাদের উপকারসমূহের মূল্যায়ন করা কঠিন নয়। সত্যি সত্যিই, এমন কোন কষ্ট নেই জীবন যা জয় করতে পারে না।

সাদার্ণ এভিনিউ বিড়লা আকাদমি অব আর্ট এন্ড কালচারের নবনির্মিত ভবন।

বিড়লা আকাদমি অব আর্ট অ্যাণ্ড কালচার

শিল্প ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং ব্যাপকভাবে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উৎসাহী গবেষকদের প্রেরণের উদ্দেশ্যে বিড়লা আকাদমি অফ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার নামে একটি নতুন সংস্থার এই শহরে জন্ম হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং ৯ জানুয়ারী বিড়লা আকাদমি অফ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

দক্ষিণ কলকাতা সাদার্ণ এভিনুয়ের ওপর রবীন্দ্র সরোবরকে সামনে রেখে বিড়লা শিল্প ও কলা আকাদমির দশতল ভবনটির উদ্বোধনকালে ডঃ করণ সিং বলেন, আমাদের মত দরিদ্র দেশে কৃষ্টিচর্চা বিলাসিতা; বরং কৃষিচর্চায় আমাদের অধিক মনোনিবেশ প্রয়োজন। কিন্তু শুধু অন্ন তো মানুষকে বাঁচাবে না। সেদিক থেকে শিল্পচর্চার প্রয়োজন ব্যাপক।

শ্রীঘনশ্যামদাসজী বিড়লা বলেন, ভারত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশ, বহু বিপ্লবের জন্মক্ষেত্র। দেশগঠনের জন্য দেশের অতীত ও তার কালজয়ী শিল্প আমাদের জানা প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে এখানে একটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারী ও একটি সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ স্থাপন করা হয়েছে। 'বিড়লা স্বর সঙ্গম' নামে এই সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ওস্তাদ নাসির আমিনুদ্দীন ডাগর।

উল্লেখযোগ্য যে, আকাদমি ইতিমধ্যেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্রগুচ্ছ সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া, মহাভারতের পারসিক অনুবাদ 'রাজনামা', প্রাচীন জৈন পাণ্ডুলিপি 'কল্পসূত্র', মহাবীরের জীবন অবলম্বনে তালপাতায় লেখা ও আঁকা অতিপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি, কালীঘাট, বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পট, প্রাচীন কাংড়া, মুঘল বুন্দি, বাসোলি, মঙ্গোলিয়ন, পারসিক ও কিষাণগড় শিল্পের নানা পরিচয় এই আকাদমিতে সংগৃহীত হয়েছে। আচার্য নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অতিআধুনিক সর্বভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকর্ম স্থাপনার একটি প্রকল্পও আকাদমির আছে।

ভাস্কর্য হিসাবে যেসব অংশ এই আকাদমিতে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোণারকের সুরসুন্দরী থেকে শুরু করে কুষাণ যুগের শিল্পকর্ম পর্যন্ত প্রদর্শিত হচ্ছে। টেরাকোটা, পট এবং মন্দিরের ভগ্নবিশেষ স্থাপনার মধ্যেও আকাদমি সংযত শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

—সাংবাদিক

দক্ষিণ কলকাতায় স্থাপিত 'বিড়লা আকাদমি অফ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার' ভবনে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোনারকের 'সুরসুন্দরী'র মূর্তি।

একটি শিকার প্রতীক্ষায়

বিশ্বনাথ বসু

একটি ছায়া-ঘেরা বিরাট আমবাগান। বাগানের এক কিনারে একটি মজা খাল। খালের ওপারেই ধানক্ষেত। পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহ। ধানের দানা তখনও কিছুটা নরম ও মিষ্টি। এই ক্ষেতে প্রতিদিন ভোর রাত্রে শুয়োরের পাল নামে। একটি ফাঁকা ঝাড়ওয়ালা আমগাছের গোড়া থেকে প্রায় আট-দশ হাত দূরে শুয়োর ওঠা-নামার রাস্তা। অপরাহ্নের পর্যবেক্ষণে গাছটিকে নির্দিষ্ট করে শিকারী ফিরে এলেন ক্যাম্পে।

শীতের শেষ রাত্রি। দশজন সহকারী শিকারীসহ কালীপদ নাথ নিঃশব্দ পদে প্রবেশ করলেন আমবাগানে। সহকারীরা সবাই নামী সর্দার। কোপের হাতে (তীক্ষ্ণ-ধার অস্ত্রের ব্যবহারে) সবাই ওস্তাদ। কালীবাবু দু'জনকে নির্দিষ্ট গাছের ডালে বসিয়ে দিলেন। বাকি সবাই রইল জঙ্গলের প্রথম প্রবেশমুখে আবছা অন্ধকারে অন্য একটি বিরাট ঝাঁকড়া আমগাছের আড়ালে।

শীতকাল ও শুকনোর সময়। কালীপদ-বাবু অভ্যাসমত গরম ওভারকোট ও ব্রীচেস্ পরেছেন, মাথায় টুপি ও হাতে গুলীভরা দোনলা বন্দুকটি। শুষ্ক খড়ের একটা গোল বাণ্ডিল তৈরি করে এনেছিলেন সঙ্গে। আমগাছের গোড়ায় মাটিতে তার উপরই আরাম করে বসলেন শিকারী।

রাত শেষ হওয়ার আগেই শুয়োরের পাল নামলো ধানক্ষেতে। 'ঘোঁৎ' 'ঘোঁৎ' শব্দ করে ধানক্ষেত চষে বেড়াতে লাগলো তারা। ভোর-রাতের কুয়াশায় দৃষ্টি চলে না—সবই অস্পষ্ট, আবছা দেখা যাচ্ছে—একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল শুকর মধ্যে মধ্যে ক্ষেতের কিনারা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। তার উঁচু পিঠ ধানগাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। ঐটিই হচ্ছে দলের রক্ষক। রক্ষক দাঁতাল শুকররা ঐভাবে চরার সময় দলের পার্শ্ব-লাইন পাহারা দিয়ে বেড়ায়।

শুকরের পালটি প্রথম রাতে এই পথেই চরতে বেরিয়েছিল। ফেরার পথে সফর এলাকার এইটাই তাদের শেষ মাঠ। ভোরের আলো ফোটার পূর্বেই স্বভাব অনুযায়ী একই পথে তারা ডেরায় ফিরবে। কালীপদ নাথ নিঃশব্দে বসে আছেন। আট-দশ হাত দূরের পথটি শিকারী দিনের বেলাতেই দেখে গিয়েছেন। গুলী ছোঁড়ার জন্য এখুনি তাঁর হাত নিস্‌পিস্ করছে। তবু উপযুক্ত সময় ও সুযোগের জন্য ধৈর্য রক্ষা করা জাত-শিকারীর ধর্ম। দাঁতালটার উপরই কালীপদবাবুর প্রধান লক্ষ্য। পথে নামলে সেটিসহ মোট দু'-তিনটি তো গুলীতে পড়বেই।

কুয়াশায় ঢাকা আবছা অন্ধকারের নিস্তব্ধ পরিবেশ। শিশিরভেজা বৃক্ষপত্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে-আসা শৃগালের কলরব প্রমাণ দিলে রজনীর শেষ প্রহর অতিক্রান্তপ্রায়।

কালীপদ নাথের ওভারকোটের কলার ও টুপির মধ্যবর্তী ঘাড়ের কিছুটা অংশ খোলা ছিল। হঠাৎ পেছন দিক থেকে কয়েকবার মৃদু 'হুঁৎ' 'হুঁৎ' শব্দ কানে এলো এবং শিকারী তাঁর ঘাড়ের উপরোক্ত খোলা অংশে ঈষৎ গরম স্টীমের মত ভেজা তাপ অনুভব করলেন। মনে হোল কেউ যেন একটু গরম ও কোমল পাখীর পালক দিয়ে পেছন দিক থেকে মৃদুভাবে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আচমকা শিকারী পেছনে তাকিয়ে দেখেন একটি বাঘ পেছনে অতিনিকটেই দাঁড়িয়ে। চমকে উঠে বন্দুক ঘোরাতেই বাঘটিও মুহূর্তে ছিটকে পিছু হটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই সময়ে সামান্য নড়াচড়ার শব্দে শুকরের পাল দৌড়ে ধানক্ষেতের গন্ডীরে প্রবেশ করল। ব্যাপার কি দেখতে এসে পালের রক্ষক দাঁতালটি আর পালাতে চায় না। 'ঘোঁৎ' 'ঘোঁৎ' শব্দে তর্জন করতে করতে সে শিকারীর দিকে এগিয়ে এলো। কিছুটা আসে আবার দাঁড়িয়ে সম্মুখের পা মাটিতে ঠুকে আস্ফালন করতে থাকে। সন্দেহ যেন আর কাটতে চায় না। একটু আড় হয়, আবার ঘুরে দাঁড়ায় সে। নিকটে এগিয়ে আসায় এবার চেহারাটা একটু স্পষ্টতর হয়েছে। দ্বিতীয়বার ঘুরে দাঁড়াতেই শিকারী অব্যর্থ নিশানায় বন্দুকের চোক্ড ব্যারেলে জার্মান রোটারী বুলেট দ্বারা দাঁতালটির পাঁজরে আঘাত করলেন। বড় মোক্ষম জমাট মার এই বুলেটের। শুকরটি জায়গায় পড়ে একটু ছটফট করে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধানক্ষেতের মধ্যে শুকরের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে আতঙ্কে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। বিহ্বল অবস্থায় ওদের একটি শিকারীর বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ায় সেটিও নিহত হোল।

ঠিক এই সময় জঙ্গলের পেছন দিক থেকে বাঘের বিকট গর্জন ও ঘ্যাংড়ানীর শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে সহকারী গ্রাম্য-শিকারীদের "খবরদার, হুঁশিয়ার, পাকড়ে মারো, চেপে ধরো" প্রভৃতি ভাষার চীৎকার শোনা গেল। ব্যাপার কি? কালীপদ নাথ নির্ভীক ও দায়িত্বশীল শিকারী। নিহত শুকর ফেলে রেখে উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি ছুটলেন নির্দিষ্ট দিকে। পৌঁছে দেখেন তাঁরই সহযাত্রীরা একটি বেশ বড় সাইজের চিতাবাঘকে নিজেদের হস্তস্থিত অস্ত্রে গেঁথে বডি-ওয়েট দিয়ে মাটির সঙ্গে ঠেসে রেখেছে। জানোয়ারটি প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছে এবং যন্ত্রণায় ঘ্যাংড়াচ্ছে ও বাঁচবার জন্য তখনও মাঝে মাঝে ঝট্‌কা মারছে।

ঘটনাটি যতটা দেখা ও বোঝা গেল, তার যথাযথ বর্ণনা আমি পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি—

ধানক্ষেতে যে প্রতি ভোর রাতে শুয়োরের পাল নামে, বাঘের বোধহয় সে-সন্ধান জানা ছিল এবং কয়েকদিন ধরেই বিশেষ মতলব নিয়ে আমবাগানে আনা-গোনা করছিল। ভেবেছিল, ভোর রাতে পথের ধারে গিয়ে ওৎ পেতে থাকলে পালের যদি কোন কমবয়সী বাচ্চা চরতে চরতে নাগালের মধ্যে এসে যায়, তবে তাকে নিয়ে পালাবে। কিন্তু পালের রক্ষক দাঁতাল শুয়োরটির জন্য ভয়ও আছে। যা-কিছু করণীয় তার নজর এড়িয়ে করতে হবে। নইলে হুলস্থূল হবে।

আজও বাঘটি এসেছিল এবং শিকারের মনে এক-পা দু'-পা করে মজা খালের দিকে এগিয়েও গিয়েছিল। আক্রমণের জন্য সুবিধাজনক ঘাঁটি নির্বাচনের বিচার-বিশ্লেষণে সব শিকারীদের মধ্যে হয়ত মিল আছে। তাই শিকারী কালীপদ নাথ যে স্পট্‌টি ঠিক করে অবস্থান করছেন, শিকারী বাঘও উপযুক্ত মনে করে ওৎ পাতবার উদ্দেশ্যে সেই স্থানটির দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

বাঘ ভাবে—"ধানক্ষেত তো সামনে, শুয়োরের পালেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, স্থানটাও আমার অচেনা নয়, তবে আম-গাছটির আড়ালে আবছা অন্ধকারে ঘোর রঙের কিম্ভূৎকিমাকার ঐ অদ্ভূত নিশ্চল বিশাল মূর্তিটি কি?" দীর্ঘদেহী কালীপদ নাথকে গরম ওভারকোট ও টুপি পরলে সত্যই দৈত্যের মত দেখায়। ওটি যে মানুষ বুঝতে না পেরে বাঘ অসীম কৌতূহল নিয়ে ধীরে ধীরে পেছন দিক থেকে মূর্তিটির সমীপবর্তী হোল। কিন্তু অন্য দিনের চাইতে শুয়োরের পাল আজ যেন একটু বেশী নিকটে এসে যাচ্ছে এবং অসতর্কও হচ্ছে। বাঘের মনোযোগ পুনরায় ধানক্ষেতের দিকে নিবদ্ধ হোল এবং একটু বসে সে সতর্ক ও স্থির দৃষ্টিতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। মুস্কিল হয়েছে—পালের গোদা দাঁতালটি যেন আজ বেশী ঘন ঘন চক্কর মারছে। কাজেই দলটি রাস্তায় না নামা পর্যন্ত বোধহয় সুযোগ পাওয়া যাবে না, এবং চেষ্টা করতে যাওয়াও উচিত হবে না। কাজেই গোঁয়ার্তুমির ঝোঁক সংযত করে বাঘ

আবার মূর্তিটির দিকে দৃষ্টি ফেরালে এবং নিঃশব্দে এগিয়ে গেল।

না; মূর্তিটি নিশ্চল এবং রঙটাও যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের অদেখা ও অচেনা। বাঘ ঘ্রাণে সন্দেহ ভঞ্জন করতে চায়। এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঘের ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বায়ু অনুকূলে না থাকলে নিশ্চল ও নিঃশব্দ অন্য প্রাণীর উপস্থিতি বোঝা তার পক্ষে কঠিন। তবে বাঘ অত্যন্ত সতর্ক ও সন্দিগ্ধপরায়ণ বলে তার পরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটু পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতা তার দৃষ্টি এড়ায় না।

বহুদিন পূর্বে শোনা এই দেশীয় একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—

বন-বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন বিদেশী অফিসার তাঁর আর্দালীসহ জঙ্গল পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছেন। আগাছাশূন্য ফাঁকা শালবনের মধ্য দিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন—দূরে তাঁরই বিপরীত দিক দিয়ে একটি প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘ সম্মুখবর্তী সংকীর্ণ বনপথ ধরে এগিয়ে আসছে। সংশ্লিষ্ট জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ নেই। বিদেশী সাহসী সাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন, অগ্রসরমান বাঘটির চলার ভঙ্গীতে কোন উত্তেজনা বা অস্বাভাবিকতা নেই। নিশ্চিন্ত ও ধীর পদক্ষেপে সর্পিল বনপথ ধরে সে এগচ্ছে।

এই অবস্থায় ঝটপট গাছে চড়া বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার চেষ্টা তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াবে না। সাহেবটির পাঁচ-সাত হাত পেছনে আর্দালীটি ছিল। অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে স্বাধীন বনজন্তুর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করাও ভদ্রলোকটির একটি বিশেষ ধরনের শখ ছিল। সর্বদা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে চলাফেরা করার অভ্যাসও তাঁর নেই এবং তিনি তা পছন্দও করেন না।

তাই, কৌতূহলী সাহেব স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা না করে অতি সন্তর্পণে রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে একটি মোটা শালগাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। তাঁর ইশারায় আর্দালীটিও কিছুটা পেছনে তারই নিকটবর্তী অন্য একটি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলো। ভয়ে আর্দালীটির বুক দুরু দুরু কাঁপছে। এতো নিকট দিয়ে জঙ্গলের একটি হিংস্র রক্তলোলুপ বাঘ হেঁটে যাবে এবং মাত্র কয়েক হাত দূরে বসে তাই দেখতে হবে, এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থার কথা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি। একাকী হলে এই পরিস্থিতিতে যেটুকু সময় হাতে ছিল, তার মধ্যেই সে সহজে একটি গাছে উঠে যেতে পারতো। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে খোদ বড়কর্তা সঙ্গে রয়েছেন। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, তাই করা ছাড়া উপায়ই বা কি আছে? পাগলা সাহেবের পাল্লায় পড়ে কি বিপদই না জানি আজ ঘটে।

বাঘটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। বায়ুর গতিও তার সহমুখী, বাঘের বিরাট ধামার মত মাথাটি ঈষৎ ঝোলান। এটি তার নিশ্চিন্ততার ভাব। কিন্তু তীব্র তেজসম্পন্ন দুটি চক্ষুর কঠোরদৃষ্টি যেন সম্মুখের দিকেই নিবদ্ধ। সাহেবের অবস্থান থেকে কয়েক পা দূরে এসে বাঘ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সম্মুখে পথের ধুলোয় সদ্য গ্রথিত সাহেবের জুতোর দাগ হয়ত বাঘের নজরে পড়েছে। সামান্য একটু ঘাড় ঘুরিয়ে বাঘ সাহেবের দিকে তাকাল। বাঘের লেজের অগ্রভাগে এবার একটু মৃদু কম্পন—যেন একটু কৌতূহল ও উত্তেজনার ইঙ্গিত। বাঘ একদৃষ্টে তাকিয়ে। দুঃসাহসী সাহেবও অকম্পিত অচঞ্চল নেত্রে স্থাণুর মত বসে। কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বাঘটি আর একবার আড়চোখে সাহেবকে দেখে নিলে এবং ওটাও গাছ-পাথর জাতীয় কোন একটি অচেতন পদার্থ মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। চতুর্দিকের আরণ্যক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই মুহূর্তের এই দৃশ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর। প্রাণী-দরদী এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় সাহেব তৃপ্ত ও আনন্দিত। কিন্তু তখনও নিশ্চল ও সতর্ক। কারণ, অগ্রসরমান হিংস্র মাংসাশী জানোয়ারটি তখনও মাত্র কয়েক গজ দূরে এবং ঐদিকেই উপবিষ্ট আর্দালীর বৃক্ষটিকে তখনও অতিক্রম করে যায়নি।

সাহেবের আর্দালীটি বিস্ফারিত নেত্রে সবকিছুই দেখছে, ভয়ে সে আড়ষ্ট, ভাবছে —আজ আর কোনরকমেই রক্ষা নেই। প্যান্ট-কোট পরা শাদা চামড়ার সাহেবকে হয়ত সমীহ করে কিছু না বলতে পারে। কিন্তু 'এতনা বড়া শের—হামকো ছোড়েগে নেহি। উও জরুর হামারা জান্ লেঙ্গে—ইসিওয়াস্তে শেব ইধারই আতা হায়।'

সাহেব ভাবছেন—'আমার এতদিনকার পুরোন আর্দালী, আমার নির্দেশ মত ঠিক-ভাবেই বসে থাকবে।'

আর্দালীর মনে ইতিমধ্যে আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজন ও উপায়ের চিন্তা তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুত বইছে। বাঘটি কয়েক পা এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়াল এবং আর্দালীর গাছটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

ঐরূপ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যে লোকটির নার্ভ ফেল করলো এবং সে প্রাণভয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠে পালাতে গেল। চক্ষের নিমেষে 'গাঁক্' করে একটি গভীর গর্জনসহ বাঘটি গাছের গোড়ায় লাফিয়ে পড়ে একটি প্রচণ্ড থাবার আঘাতে লোকটিকে মাটিতে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

মানুষখেকো না হলেও বাঘ অনেক সময় তার গমনপথে অপ্রত্যাশিতভাবে কোন হঠাৎসৃষ্ট আলোড়নের সম্মুখীন হয়ে আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে আক্রমণ করে বসে। এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

উদ্বিগ্ন সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দেখেন—তাঁর পৃষ্ঠপ্রদর্শনকামী আর্দালীর পৃষ্ঠদেশে বাঘের থাবার মারাত্মক ক্ষত। বিভাগীয় দায়িত্বে অবিলম্বে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোল।

এবার আবার সেই জামালপুরের ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক।

চিতাবাঘটি পেছন দিকে কালীপদ নাথের অতিনিকটে দাঁড়িয়ে। ঘ্রাণে সন্দেহ ভঞ্জন করতে চায়। পুরু ওভারকোটে ঢাকা পৃষ্ঠদেশ থেকে শুরু করে যখন সে শিকারীর ঘাড়ের উন্মুক্ত অংশের ঘ্রাণ নিচ্ছে, তখন বাঘের নাসিকা-নিঃসৃত উষ্ণ নিশ্বাসের হাওয়ায় শিকারী তাঁর গলার পেছনের ত্বকে একটু মৃদু স্পর্শ অনুভব করলেন। শীতের রাতের জমাট ঠান্ডার মধ্যে ঐরূপ অস্বাভাবিক উষ্ণ স্পর্শে তিনি চমকে উঠলেন। কিছু একটা সন্দেহ করে তিনি তন্মুহূর্তে পেছন দিকে তাকিয়েই দেখেন বাঘ—গলাটা একটু লম্বা করে, মুখটি বাড়িয়ে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি অবস্থা আর কি! কি অকল্পনীয় ভয়াবহ পরিস্থিতি। যন্ত্রচালিতের মত কালীপদ নাথের হস্তস্থিত দৃঢ়বদ্ধ গুলীভরা বন্দুকের নল বাঘটির দিকে উদ্যত হতেই চক্ষের নিমেষে জানোয়ারটি যেন কতকটা হতভম্বের মত লাফিয়ে পেছনে সরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেশ-বিদেশের বিখ্যাত শিকারীদের বহু শিকার-কাহিনী ও আরণ্যক ঘটনার বিষয় জানি এবং পড়েছিও। তার মধ্যে দু-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া কোথাও শিকারীকে নিজের অজ্ঞাতে এইরূপ অভাবনীয় অবস্থার সম্মুখীন হোতে দেখিনি।

মালয়ের জঙ্গলে শিকার-কাহিনীর কোন একটি ঘটনায় দেখেছিলাম যে, একজন শিকারে সাহায্যকারী 'লোকাল গাইড' যখন অরণ্য-সংলগ্ন কোন একটি নদীর বালুচরে বসে বিশ্রাম করছিল, তখন পেছনের জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে ধীরে ও সন্তর্পণে লোকটির অজানিতে তার পশ্চাদ্ভাগে অতি নিকট পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয় এবং লোকটিকে শুঁকে কোন রহস্যজনক কারণে নাকি পুনরায় জঙ্গলে ফিরে যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঘটি তার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল কিনা আমার স্মরণ নেই। তবে লোকটি নিজেকে বাওয়ালী বা বাঘের গুণীন বলে জাহির করতো এবং এই ঘটনার পর লোকালয়ে ফিরে সে ব্যাপারটিকে তার স্বীয় অলৌকিক মন্ত্রশক্তির অকাট্য প্রমাণ বলে প্রচার করতে থাকে। কৌতূহলী প্রশ্নকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে সে সত্যই জঙ্গলের কিনারা থেকে তার উপবেশনস্থল পর্যন্ত একটি প্রকাণ্ড বাঘের আসা-যাওয়ার সদ্যগ্রথিত ও আবিকৃত পায়ের দাগ প্রত্যক্ষ করায়।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বন-বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি কনজারভেটর মিঃ এইচ হাকিমুদ্দিন কে-বি একজন অতি অভিজ্ঞ ও দুঃসাহসী শিকারী ছিলেন। তাঁর লিখিত 'বিগ গেম এ্যাডভেঞ্চার' নামক পুস্তকে তিনি একটি নরখাদক বাঘ শিকার প্রসঙ্গে তাঁর একদিনকার অতিরোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকদের নিকট অভাবনীয়ই মনে হবে।

শিকারী ঐদিন প্রবল বর্ষা-বাদলের মধ্যে পত্রশাখায় তৈরি একটি কৃত্রিম সংকীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে নরখাদক বাঘটিকে শিকারের উদ্দেশ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। অত্যধিক ঠান্ডায় অসুস্থতা বোধ করায় ক্যাম্পে ফেরার জন্য তিনি স্থান ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, বাঘটি কখন ইতিমধ্যে পেছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শিকারীর পৃষ্ঠদেশ এবং পত্রবেষ্টনী থেকে অনধিক দু' ফুটের মধ্যে এসে দু'বার ঘোরাঘুরি করে পুনরায় ফিরে গিয়েছে— বর্ষাভেজা নরম মাটিতে সদ্যগ্রথিত বাঘের পায়ের দাগই তার প্রমাণ। এই দৃশ্য দেখার পর রোমাঞ্চিত দেহে শিকারী তীক্ষ্ন ও সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করেও বাঘটির আর কোন হদিস পেলেন না। এই পরিস্থিতি শিকারীকে আরো বিস্মিত ও বিহ্বল করেছিল এই চিন্তায় যে, বাঘটি কখন, কিভাবে তাঁর বসবার স্থানটি লক্ষ্য করে তারই খোঁজে অতটা নিকট পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল। শিকারী তাঁর মাথার টুপির উপর দিয়ে মুড়ি দিয়ে একটি সবুজ রঙের ওয়াটারপ্রুফ জড়িয়ে বসেছিলেন। বর্ষার জলে ভিজে ওয়াটারপ্রুফের সবুজ রঙ অধিকতর গাঢ় হয়ে আশপাশের পাতার রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছিল এবং বাতাসও বাঘের দিক থেকে শিকারীর দিকে বইছিল। সুতরাং ঐরূপ প্রবল বর্ষা ও হাওয়ার মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ বাঘটি বোধহয় নিশ্চল ও নিঃশব্দভাবে উপবিষ্ট শিকারীকে চিনতে পারেনি এবং বায়ু অনুকূলে না থাকায় তার গন্ধও সে পায়নি।

ঘটনাগুলি পাঠকদের নিকট বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, বাঘ অত্যন্ত কৌতূহলপ্রবণ স্বল্প ঘ্রাণশক্তি-সম্পন্ন প্রাণী। বাতাসে মিশ্রিত প্রত্যক্ষ গন্ধের আভাস নাকে এসে না পৌঁছুলে অন্য কোন প্রাণীর উপস্থিতি বোঝা তার পক্ষে সত্যই কঠিন। বায়ু অনুকূলে না থাকলে একজন নিশ্চল, নিঃশব্দ ও স্থাণুবৎ অবস্থানরত দুঃসাহসী মানুষ বাঘের হাতে নিরাপদ বলা যেতে পারে। আমার উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তবে এই স্বল্পপরিসর রচনার মধ্যে তার সুযোগ কম। উপসংহারে শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে, মালয় ও উত্তরপ্রদেশের জঙ্গলে এবং জামালপুরের আমবাগানে বাঘের পূর্বোক্তরূপ আচরণ বিস্ময়কর ও বিরল ঘটনা হলেও নিশ্চিতই তা অলৌকিক মন্ত্রশক্তির ফলাফল নয়।

কালীপদ নাথের উদ্যত বন্দুকের সম্মুখ থেকে ভয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেও বাঘের কিন্তু তখনও দ্বিধা কাটেনি। আড়ালে বসে সে পরিস্থিতিটা একটু অনুধাবন করে শুধু বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। ঠিক এই সময় হঠাৎ রাতের জঙ্গল কাঁপিয়ে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে পর পর দুটি বন্দুকের আওয়াজ হলো। পূর্ব থেকেই বিস্ময় ও বিহ্বলাবিষ্ট বাঘ ঐ শব্দে চমকে উঠে আরো একটু নিরাপদ দূরত্বে পিছু হটে একটি বৃহৎ আমগাছের তলার অন্ধকারের দিকে সরে এলো, এবং গাছের গোড়ার দিকে পেছন ফিরে নিবিষ্ট মনে বসলো—ভাবখানা এমনই, যেন গভীর অভিনিবেশসহকারে সে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে দেখছে। সফরে বেরিয়ে সারারাত ঘুরেও হয়ত আজ তার কোন খাবার জোটেনি। এদিকে ভোরও তো হয়ে এলো। একটু পরেই তো লোকজন চলাচল শুরু করবে। শুয়োরের পালের হুড়োহুড়ির লোভনীয় শব্দ তখনও তার কানে আসছে। এখুনিই ঠিক সাহসে কুলোচ্ছে না। নইলে আর একবার ধানক্ষেতের দিকে গিয়ে সে চেষ্টা করে দেখতো।

কালীপদবাবুর সহযাত্রী গ্রাম্য-শিকারীরা নিঃশব্দে তাদের পূর্বনির্দিষ্ট আমগাছের গোড়ায় জড়ো হয়ে বসে আছে। ওদিক থেকে বন্দুকের শব্দ ও শুয়োরের পালের ছুটোছুটির হিড়িক শুনে তারা চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং দৃঢ় মুষ্টিতে নিজ নিজ অস্ত্র বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। তাড়া-খাওয়া শুয়োরের পাল তো তাদের প্রতিদিনের নির্দিষ্ট পথেই ছুটে পালাবে। সেই পথ আগলেই তারা প্ল্যানমাফিক বসে আছে। দু'চারটিকে তো কোপের মাথায় নিতেই হবে।

কুয়াশাচ্ছন্ন আবছা অন্ধকারের জঙ্গল-পথ বেয়ে একটি জানোয়ার যেন ধীরে ধীরে মৃদু পদক্ষেপে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। আঙুলের টিপের খোঁচায় নির্বাক শিকারীরা পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সেইদিকে। জানোয়ারটি ধানক্ষেতের দিক থেকেই এলো এবং অদূরে আমগাছের নীচে পেছন ফিরে বসলো। পরক্ষণেই কি ভেবে আরো পিছিয়ে এসে পুনরায় সেইভাবে বসলো। ব্যাঘ্র-প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝবেন এটা তার দ্বিধাগ্রস্ত ও চঞ্চল মানসিক অবস্থার প্রমাণ। এবার পরিষ্কার দেখা গেল, জানোয়ারটি অন্য কিছুই নয়, একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। কি বিপদ! অন্ধকারে বরাহ আবির্ভাবের প্রত্যাশায় থেকে শেষকালে ব্যাঘ্রদর্শন। শিকারীদের দুর্ভাবনা হলো এই মনে করে যে, ওদিকে ওস্তাদ হয়তো এর জোড়ার দ্বিতীয় বাঘটির উপর গুলি করেছেন। কিন্তু, এদিকে এটিকেও এই-ভাবে কোলের ধারে নিয়ে বসে থাকা অস্বস্তিকর, এবং তা কোনদিক দিয়ে নিরাপদও নয়।

বাঘটি একেবারে শিকারীদের উদ্যত নাগালের মধ্যে এসে বসেছে। অথচ সে বিন্দুমাত্র আভাস পায়নি যে, তারই পেছনে অতিনিকটে মানুষ বসে। বলা যায় না— এতো নিকটে বসে আচমকা কোনো সাড়ায় ঘাবড়ে গিয়ে হঠাৎ সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শিকারীদের উপরও লাফিয়ে পড়তে পারে। এটা অবশ্য তার সেই সময়কার মেজাজের উপর নির্ভর করে।

সাধারণত সবারই ধারণা যে, বন্দুকের শব্দ শুনলে বাঘ ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কখন কখন অন্যরূপ ফলাফল ঘটাও অসম্ভব নয়।

একবার উড়িষ্যায় শিকার প্রোগ্রামে গিয়ে টিগারপাড়ার ফরেস্ট বাংলোতে বসে উড়িষ্যার বিখ্যাত শিকারী মিঃ জেনার নিকট এই বিষয়ে একটি কৌতূহলজনক ঘটনার গল্প শুনেছিলাম।

কোন একটি নেটিভ এস্টেটের রাজার ছেলে তাঁর এক অতিথি-বন্ধুকে নিয়ে অপরাহ্নে বাঘের জল-খাবার স্থানে হানা দেবার উদ্দেশ্যে অরণ্যমধ্যস্থ একটি বৃক্ষ-মঞ্চে এসে বসেছেন। এই মঞ্চটি রাজাদের শিকার খেলার জন্য স্থায়ীভাবে তৈরী ছিল। স্থানীয় লোকেরা তা জানতো। হয়ত বা মঞ্চটি সম্বন্ধে ঐস্থানে এসে প্রাত্যহিক জলপানে অভ্যস্ত বনের বাঘেদেরও জানা ছিল।

রাজকুমার সঙ্গীসহ মঞ্চে আরোহণের একটু পরেই শিকারের পোষাকে সজ্জিত হয়ে রাইফেল হাতে মহারাজাও সেখানে এসে উপস্থিত। তাঁরও আজ শিকারের সখ হয়েছে। অথচ তিনি জানতেন না যে, তাঁর পুত্রও আজ শিকারে বেরিয়েছে এবং উক্ত বৃক্ষমঞ্চেই অপেক্ষা করছে। রাজা-রাজড়ার শিকার-সখ দু'এক ঘণ্টার ব্যাপার মাত্র। যাই হোক, মহারাজা তাঁর পুত্রকে বন্ধুসহ মঞ্চে উপবিষ্ট দেখে মুচকি হেসে বললেন—'ওহো, তোমরা বসেছ আজ? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ফিরে যাচ্ছি। তবে তোমরা ঐ গাছে না বসে অন্য গাছে বসো।' এই বলে রাজা ফিরে গেলেন।

রাজা তো বলে গেলেন, কিন্তু রাজকুমার পড়লেন মুসকিলে। এখন অন্য গাছে মাচা তৈরীর সময় নেই এবং লোক-জনও সঙ্গে নেই। অথচ পিতৃ উপদেশ, নির্দেশ তুল্য। অমান্য করার সাহস নেই, এবং তা উচিতও নয়। অগত্যা রাজকুমার বন্ধুসহ নিকটবর্তী অন্য একটি বৃক্ষের সুবিধাজনক শাখায় গিয়ে স্থান নিলেন, মঞ্চ তৈরী আর সম্ভব হোল না।

সূর্য অস্তগামী। পাখীরা বাসায় ফিরছে। নিশাচরেরা সফরে বেরুচ্ছে। একটি শম্বর হরিণ সতর্ক পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জল খেয়ে গেল। এক দল বানর অদূরে একটি গাছের তলায় বসে আছে। আঁধার ঘনিয়ে আসছে, এবার বিশ্রাম নিতে হবে। কাজেই বানর পরিবারের দিনের বেলাকার প্রকৃতিগত চঞ্চলতা একটু স্তিমিত। দূরে জঙ্গলের মধ্যে শম্বর হরিণটির ডাক শোনা গেল। রাজকুমার শিকারে অভিজ্ঞ। হরিণের এই ডাকের অর্থ তিনি বোঝেন—অতিথি-বন্ধুটিকে সতর্ক করলেন। অতিথির মর্যাদা আগে। তাই বন্ধুটির হাতে রাইফেল— তিনিই গুলি ছুঁড়বেন।

রুদ্ধ নিশ্বাসে দুই বন্ধু অপেক্ষা করছেন। হঠাৎ অদূরের সেই বানর পরিবারের চৌকিদার বানরটি বৃক্ষের উচ্চ-শাখা থেকে সাড়া দিলে—'খ্যাঁক' 'খ্যাঁক' 'খ্যাঁক'। সঙ্গে সঙ্গে ছোট বড়সহ পরিবারের সকল সভ্য ও সভ্যারা আতঙ্কে হন্তদন্ত হয়ে গাছের ঊর্ধ্বশাখায়

উঠে গেল। শিকারী দু'জন গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে। পরক্ষণেই সেই গাছেরই পার্শ্ববর্তী একটি ঝোপের আড়াল থেকে বনের মহারাজার বিরাট মাথাটি দৃষ্টিগোচর হোল—স্থির দৃষ্টিতে জলের ঘাটের দিকে তাকিয়ে। ঊর্ধ্বশাখায় বানর পরিবারের দলবদ্ধ সোর-গোল ও নাচুনী ঝাকুনী চলেছে সমানে। বাঘটি ধীরে সংযতভাবে কয়েকপা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে ও বুঝে নিলে সব ঠিক আছে কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঘাটে নেমে চক্-চক্ করে জলপান করতে সুরু করলে। জলপান সবে সুরু হয়েছে এমন সময় বনের চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বজ্র-নির্ঘোষে বন্ধুটির রাইফেল গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে একটি হৃদস্পন্দন স্তব্ধকারী হুঙ্কার ছেড়ে বাঘটি দুরন্ত বেগে ছুটে গিয়ে একটি দীর্ঘ লাফে উপরে উঠে রাজ-পরিবারের জন্য তৈরী পূর্বোক্ত অস্থায়ী বৃক্ষমঞ্চটি বিধ্বস্ত করে দিয়ে বিপরীত দিক থেকে জঙ্গলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্য গাছের ডালে বসে এই অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাজপুত্র ও তাঁর বন্ধু তো বিস্ময়ে হতবাক। আমিও তাই বলছিলাম—বাঘের মেজাজ ও খেয়াল বোঝা সত্যিই দুষ্কর।

কৌতূহলী পাঠকদের মনোযোগ আমি পুনরায় জামালপুরের আমবাগানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই যেখানে শীতের শেষ রাতে চিতাবাঘটি পেছন ফিরে বিহ্বল অবস্থায় বসে আছে।

ওর মতিগতি যখন রহস্যজনক তখন মাটিতে অতিনিকটে বিপজ্জনক দূরত্বে বসে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শিকারীদের মধ্যে নিঃশব্দে আক্রমণের ইঙ্গিত চালাচালি হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সকলে দলবদ্ধ-ভাবে একযোগে পেছন থেকে বিদ্যুতগতিতে বাঘের উপর স্ব স্ব অস্ত্রের মোক্ষম আঘাত হানলো। লম্বা ও শক্ত বাটযুক্ত অস্ত্রাদি হাতে থাকায় বাঘের মারাত্মক দাঁত ও নখের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে তাকে চেপে রাখা শিকারী-দের পক্ষে অসম্ভব হল না। ঘোনা, বল্লম প্রভৃতি আঁকড়াহীন অস্ত্রে গভীর আঘাত হানা যায় সত্য—কিন্তু তার দ্বারা শক্তিশালী জানোয়ারকে আটকে রাখা কঠিন হয়।

পেছনে প্রতীক্ষারত গ্রাম্য শিকারী দলের ঐ সময় মাতব্বর ছিলেন ননীগোপাল মুখার্জি। অতিসাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি তিনি। অধিকাংশ দুঃসাহসিক অভিযানে তিনিই ছিলেন কালীপদ নাথের সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই শিকারীর হাতে ছিল একটি মজবুত তীক্ষ্ণধার 'ঝগড়া' (লোহার তৈরী আলযুক্ত একজাতীয় দেশীয় অস্ত্র)। মুখার্জি মশায় বলশালী বাহুর জোরে অস্ত্র-খানি পেছন দিক থেকে বাঘের দেহে আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। 'ঝগড়া' 'রাকসা', বীরবাঁধা, কাতারা প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতের পর ছাড়িয়ে যাওয়া মুস্কিল—আল বা আঁকড়ায় টেনে রাখে।

শিকারী দলের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রের আঘাতে ভূতলশায়ী অবস্থায় ধস্তাধস্তি করেও ব্যাঘ্রপুঙ্গব নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারলো না, এবং শীতের ভোর রাত্রে শূকর শিকারের লোভে আমবাগানে এসে এইরূপ মর্মান্তিকভাবে সে নিজে বেঘোরে প্রাণ হারালো। অন্য দিকে এক যাত্রায় দুই ফল নিয়ে তারই হত্যাকারী শিকারীরা উৎফুল্ল হৃদয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল।

এটি ছিল প্রায় সাড়ে আট ফুট লম্বা একটি চিতাজাতীয় বাঘিনী। একই স্থানে একই প্রতীক্ষায় বাঘিনীটি ছিল কালীপদ নাথের অলক্ষ্য শিকারসঙ্গিনী।

রাতের অন্ধকারে হত্যা ও আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সমর্থ হয়েও বাঘিনীটি অনুকূল সুযোগের মধ্যেও শিকারীর দেহের উপর বিন্দুমাত্র আঘাত ও আক্রমণ হানেনি—এই কথা ভেবে তার প্রাণহীন দেহটির দিকে তাকিয়ে একটু মমতা ও কৃতজ্ঞতাবোধে সবার অলক্ষ্যে কালীপদবাবুর মনটি যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

(ক) ঘড়ি কে এবং কত সালে তৈরি করেন? (খ) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সমস্ত উইকেট-জুটির রানের বিশ্ব-রেকর্ড কি কি? (গ) পৃথিবীতে টেস্ট ক্রিকেটে কে সর্বাপেক্ষা কম খেলায় সহস্র রান ও শত উইকেট লাভ করেছেন?

শুভেন্দু মজুমদার
ও
চঞ্চল মজুমদার
কলকাতা-৫০

●

ক) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হাসপাতাল কোথায় কে স্থাপন করেন? (খ) কে প্রথম পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করেন? গ) ভারতের কোন্ নদীর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী?

প্রাণেশ, মণিমালা ও চিত্রা সরকার,
আলিপুর, কলিকাতা-২৭।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে শিক্ষিতের হার কত? স্ত্রী-সংখ্যার হার কত? গড় আয়ু কত? এবং সর্বোচ্চ গড় উচ্চতা জানতে চাই।

আশীষকুমার সিংহ
পাটনা-৪

উত্তর

২১ সংখ্যায় প্রকাশিত কেকা রায় প্রমুখের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, 'বর্ণ-পরিচয়' রচিত হবার আগে টোল বা আশ্রমের গুরুমশাইরা মুখে মুখে বর্ণ পরিচয় করিয়ে দিতেন। লেখার প্রয়োজন হলে তাঁরা তালপাতায় লিখে শিক্ষা দিতেন।

সমীর ভট্টাচার্য
বেলুড়, হাওড়া

●

২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত মণ্টু দত্ত ও রতন দত্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, হাওয়াই দ্বীপবাসীরা গীটার আবিষ্কার করেন।

অঞ্জন ভট্টাচার্য
কলিকাতা-২৯

●

২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত নির্মল চৌধুরী ও সুলেখা সান্যালের (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে পৃথিবীতে প্রায় আড়াই লক্ষ রকম গাছ আছে।

৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত সদানন্দ চট্টো-পাধ্যায় (ক) প্রশ্নের প্রদীপকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রদত্ত যে উত্তর ১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, সুবীর সেনগুপ্ত ২৩ সংখ্যায় জানান যে, ছাপাখানা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু এই উত্তরও সঠিক নয়। কারণ ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে জন গুটেনবার্গ (জার্মানী) কর্তৃক ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়।

মীনা মুখোপাধ্যায়
বর্ধমান

●

২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তি সুরের (ক) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ম্যাডাম কুরী ইংরাজী ১৮৯৯ সালে রেডিয়ম আবিষ্কার করেন।

শাশ্বত পাল
কলিকাতা ৩২

●

২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত রত্না ও দেবাশিস ঘোষের (গ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সি সি সি পি পুরো কথাটি হলো 'সোইউজ সোভেটস্কিখ্ সোৎসিয়ালিসটি-চেসকিফ রেসপুবলিক'। ইংরাজীতে সি সি সি পি-কে ইউ এস এস আর বলা হয়।

বরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
মজঃফরপুর

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ
৩য় খণ্ড

অমৃত

৩৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 27th January, 1967. শুক্রবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৭৩ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠিপত্র

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে

অমৃতের (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা) "প্রেক্ষাগৃহে" শীর্ষক 'আজকের কথা' পড়লাম। আলোচনায় নান্দীকর চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আমারই একটি পূর্ব চিঠির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমার বয়স কম এবং অভিজ্ঞতাও অল্প। তবু আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু উপলব্ধি করি, সেটুকু দিয়েই তথ্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করি।

চলচ্চিত্র-জগৎ সম্বন্ধে আলোচনাটি আজকের দিনের একটা আশু প্রয়োজন। কারণ, সাহিত্য যেমন মানুষের জীবনের পরিপোষক এবং জীবন-দর্পণ, চলচ্চিত্রও তেমনি একটি ধারক। যেটা সর্বসাধারণের জীবনের একটা বিরাট অংশকে অধিকার করে থাকে, সেই আলোচনার পৃষ্ঠা কেবল বিগত যুগের বিগত চলচ্চিত্রসমূহের নাম দিয়ে ভরালেই হয় না। আর "অতীত স্মৃতির স্বপনে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলেও..." চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নান্দীকর সেই পথই অবলম্বন করেছেন। তাই আজ কবিগুরুর কথাটাই মনে পড়ছে।

"অতীত স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।"

'অতীত' যে দেশের ঐতিহ্য বহন করে, এটা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছি আর আজও তার গন্ধ থাকবে হাতে, তা ভাবলে তো চলবে না। আজ কি করছি আর ভবিষ্যতেই বা কি করব, সেটাই হবে সর্বপ্রথম চিন্তনীয় বিষয়। বহুযুগের ওপার হতে লেখক যে-সমস্ত চলচ্চিত্রের নাম আলোচনার পাতায় তুলে ধরেছেন, সেগুলো যে এককালে বাংলার বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা গৌরবেরই কথা, কিন্তু তাই বলে যে সেইসব চিত্র আজকের চলচ্চিত্রের দায়-দায়িত্ব বহন করবে, এ-কথা স্বীকার করা যায় না। যা হয়ে গেছে, তার জন্যে শুধু গৌরবটুকুই পড়ে থাকবে, বর্তমানে চলচ্চিত্রের মধ্যভাগেও তার অবদান কি কিছু থাকবে ?

নন্দীকর তাঁর সমালোচনার একস্থানে আমাকে প্রশ্ন করেছেন "পবিত্র মনোভাব অর্থে তিনি কি বলতে চাইছেন, পরিচালককে ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে সংযতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির হতে হবে ?" দেখুন, কাকেও যুধিষ্ঠির কিংবা সীতা-সাবিত্রী হতে আমি বলিনি। আমার বিশ্বাস, স্থির-মস্তিষ্কে যদি তিনি আমার কথাটা বিচার করতেন, তবে উপযুক্ত উত্তর তিনি তাঁর নিজের কাছেই পেতেন, মিথ্যা যুধিষ্ঠিরের দোহাই দিয়ে তিনি আমাকে এইভাবে দোষারোপ করতে পারতেন না। 'পবিত্র মনোভাব' বলতেই যে ধার্মিক হতে হবে—এ-কথার কোন অর্থ আছে কি ? জটা-বল্কল ধারণ করলেই যেমন সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, তেমনই পরিচালনার খাতায় নাম খোদাই করলেই পরিচালক হওয়া যায় না। তার জন্য চাই যোগ্যতা। দুটো পয়সার লোভে যেমন-তেমন করে চোখে নেশা ধরিয়ে চিত্র সৃষ্টি করলেই সে-চিত্র বরণীয় হয় না। কিংবা মানুষের মনকে চলচ্চিত্রের সাহায্যে দিনের পর দিন কু-প্রবৃত্তির প্রতি টেনে নিয়ে গেলে সে-চিত্র সার্থকতা লাভ করে না। কৃতকর্মের মধ্যে আন্তরিকতা আর মানব প্রীতির অভাব ঘটলে সে কর্ম প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে না। দিনের পর দিন মানুষের জীবনে যে অবনতির বিষ ছড়িয়ে পড়ছে, তার পিছনে এই চলচ্চিত্র-জগতের কি কোন ভূমিকাই নেই ? আশা করি লেখক তাঁর বুদ্ধি দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেবেন, আর যদি নিতান্তই অস্বীকার করেন, তবে আমার আর কিছু বলার নেই। এখানে নান্দীকরকে একটা প্রশ্ন করব, তিনি আজকের দিনের কয়টি শিশু-চিত্রের হিসাব দিতে পারেন এবং সেই হিসেবে ছোটদের স্বার্থের প্রতি অবিচার করা হয় না কি ?

সমালোচনার আর এক স্থানে তিনি জানতে চেয়েছেন যে, বর্তমান যুগের ছবিকে 'কদাকার' ও 'আদর্শভ্রষ্ট' বলার কারণ কি ? 'চিঠিপত্র' বিভাগের এই স্বল্প পরিসরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। বারান্তরে আলোচনা করার আগ্রহ রইল।
রইল।

শেষে এক স্থানে তিনি লিখেছেন, "ইংরাজীতে একটি প্রবচন আছে : একটি কুকুরকে মন্দ বলে জাহির কর এবং তাকে ফাঁসিতে লটকে দাও। বর্তমান বাংলা ছবি সম্পর্কে নিউ আলিপুরের পত্রলেখক সমান কাজই করছেন।" দেখুন, কুকুরকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া একটা অমানুষী ব্যাপার এবং বিচারের একটা প্রহসনও বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সম্বন্ধে নান্দীকরের এ-কথাটা খাটল না। কারণ, আমি অমানুষও নই, আর বিচারের নামে বিচারের প্রহসন করার পক্ষপাতিও নই। আর যদি জোর করে বলেন, তবে বলব, যে অমানুষ, সে কোনদিন মানুষের হয়ে মানুষের দরবারে নালিশ জানায় না। তবে অনেক সময় দেখা যায়, অপরের শুভ প্রচেষ্টায় সে হস্তক্ষেপ করে।

আমেরিকার চলচ্চিত্র-প্রযোজক সংস্থা দশ-ধারা সংবলিত যে-নতুন সেন্সারবিধি প্রবর্তনে আগ্রহী হয়েছেন, আমার চিঠির শেষে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও সেই সমস্ত বিধি দাবী করব। চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সেই সমস্ত বিধির কতকগুলি হল :

(১) মনুষ্যজীবনের মৌলিক মর্যাদা ও মূল্যকে সমর্থন ও সম্মান জানাতে হবে।

(২) অশোভন ও অযথাভাবে মনুষ্য-শরীরকে অনাবৃত দেখানো চলবে না।

(৩) অবৈধ যৌন-সম্পর্ক সমর্থন করা চলবে না।

(৪) সাধারণ শোভনতার মানদণ্ডকে লঙ্ঘন করে ঘনিষ্ঠ যৌনদৃশ্য দেখানো চলবে না। যৌনসম্পর্কিত বিপথগমনের দৃশ্যাদি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংযত ও সতর্ক হতে হবে।

(৫) অশ্লীল সংলাপ, ভঙ্গি বা আচরণ দেখানো চলবে না। (অমৃত, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, পৃঃ ২৭৬)।

ইত্যাদি নিয়মগুলি আজ যদি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, তবেই সমালোচকের অতীত স্মৃতির স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠবে। নচেৎ আমরা যে-আঁধারে সেই আঁধারেই পড়ে থাকব সকল দেশের দুয়ারের আবর্জনা হয়ে।

বিদ্যুৎ মল্লিক
নিউ আলিপুর।

আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রসঙ্গে

গত ২রা এবং ৯ই ডিসেম্বরের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীরবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "আপেক্ষিকতত্ত্ব প্রসঙ্গে" আলোচনাটি বিশেষ ভাল লাগল। বিজ্ঞানে বিমুখ যে-কোন ব্যক্তিও ঐ প্রবন্ধখানা বিশেষভাবে উপভোগ করতে পারবেন। বিজ্ঞানের কতগুলি জটিল ও দুরূহ জিনিস এত সহজ এবং প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেওয়ার অপূর্ব ক্ষমতা ও কৌশল সত্যি সুপ্রশংসার দাবী রাখে।

প্রসঙ্গত, গত ৯ই ডিসেম্বরের প্রকাশনে একটা অংশের উপর শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ৪৬২ পৃষ্ঠার সপ্তম অনুচ্ছেদের শুরুতে লেখা হয়েছে "বস্তুর বেগ দিয়ে যদি আলোকের বেগকে (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) ভাগ করা যায়......" আমার প্রশ্ন, উক্ত স্থলে বস্তুর বেগকে আলোকের বেগ দিয়ে ভাগ করতে হবে না কি ? তা না হলে শেষ অবধি সংকোচনসূচক (ইনডেক্স অব কনট্রাকশান) একটা কাল্পনিক রাশি (ইমাজিনারি কোয়ানটিটি) হয়ে যাবে। কারণ, বস্তুর বেগ দিয়ে আলোকের বেগকে ভাগ করলে সব সময়েই একের অধিক একটা পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাবে।

অনুপলাল ব্রহ্মচারী,
রিজিওন্যাল ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজী,
জামসেদপুর।

অমৃত

সম্পাদকীয়

সাধারণতন্ত্র দিবস

ভারতের সর্বত্র ২৬ জানুয়ারী দিনটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা উদযাপিত হচ্ছে। স্বাধীন হবার আগে এই দিনটিকে পালন করা হত স্বাধীনতার সংকল্পগ্রহণের দিবস হিসেবে। এখন পালিত হয় সাধারণতন্ত্র দিবসরূপে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী ভারতের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। ভারত রূপান্তরিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে। তারপর ১৭ বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু পরিবর্তন এসেছে ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য ঠিক আছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য চলছে জাতীয় কর্মোদ্যোগ। ২৬ জানুয়ারী সেই সংকল্প পুনর্বার স্মরণ করার দিন।

সাধারণতন্ত্র হিসেবে ভারতকে ঘোষণার পরই গৃহীত হয় পরিকল্পিত উপায়ে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রস্তাব। তিনটি পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা এখন চতুর্থ পরিকল্পনার কাজে হাত দিতে চলেছি। রাষ্ট্রকাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের মাধ্যমে। নতুন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংযুক্ত মাদ্রাজ ভেঙে অন্ধ্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজ, সংযুক্ত বোম্বাই ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট। পাঞ্জাবকে ভেঙে করা হয়েছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। নাগাল্যান্ড পেয়েছে রাজ্যের মর্যাদা। অতি সম্প্রতি আসামকে ফেডারেল রাজ্য হিসাবে পুনর্গঠনের সুপারিশও গৃহীত হয়েছে। ভারতের সংবিধানের এই নতুন পরীক্ষাগুলি তার শক্তি ও গতিশীলতারই লক্ষণ। লিখিত সংবিধান হওয়া সত্ত্বেও সমাজের প্রয়োজনে, সময়ের প্রয়োজনে ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনে কোনো উদ্বেগ প্রকাশের কারণ দেখি না। গণতন্ত্রে জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অভিমতই অগ্রাধিকার লাভ করে। ভারতের গণতন্ত্রে তারই পরীক্ষা চলছে। সেদিক থেকে আফ্রো-এশীয় ভূখণ্ডে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক গণতন্ত্র একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেই সর্বত্র সমাদৃত।

এ বৎসর ভারতের চতুর্থ গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রাপ্তবয়স্কের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ২৯ কোটিরও বেশি নরনারী এই সাধারণ নির্বাচনে যোগ দেবেন। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত বৃহৎসংখ্যক নির্বাচকের মতগ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই। ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও নানাবিধ আর্থিক সংকট সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার স্থায়িত্ব ও পরিপক্বতা রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত। অতি সম্প্রতি গোয়া দমন ও দিউতে জনমত গ্রহণের দ্বারা যেভাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পদ্ধতি ঠিক করা হয়েছিল সেটাও ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তিরই লক্ষণ। শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ ও ব্যালটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনের এমন সুশৃংখল দৃষ্টান্ত নতুন স্বাধীন অনেক দেশেই আজ অনুপস্থিত। ভারত সেদিক থেকে গণতান্ত্রিক পরীক্ষার এক অননুকরণীয় পথনির্দেশ করছে।

সাধারণতন্ত্র জনসাধারণের শান্তি ও সম্প্রীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য উচ্চারণের সময়ে আমরা প্রত্যেকেই সুখী, সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আজ নানাকারণে ভারতের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত। আমাদের শান্তিনীতি রাষ্ট্রসংঘের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই নীতি কার্যকর করার জন্য ভারত নানাদেশে নিজের সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছে। কিন্তু আমাদের সীমান্তে শত্রুর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ। নানা অছিলায় ভারতের ভিতরে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য এই শত্রুশক্তি সর্বদা ষড়যন্ত্র করছে। আজকের সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের এই বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত হতে হবে। কারণ, দেশের সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন তার সার্বভৌম শক্তিকে অটুট রাখা। এই সতর্কতায় শিথিলতা দেখালে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

প্রতিটি সাধারণতন্ত্র দিবসেই আমরা লাভ-ক্ষতির পর্যালোচনা করি। ভারতের সামনে এখন প্রধান সমস্যা হল অর্থনীতিতে স্বনির্ভরশীলতা অর্জন। সামাজিক বৈষম্য দূর করে সুস্থ সবল গণতন্ত্রের বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন স্বনির্ভরশীলতা। গঠনের যুগে কৃচ্ছ্রতা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, এই কৃচ্ছ্রতাসাধনের ব্যাপারেও যেন সমাজে কোনো তারতম্য করা না হয়। সমৃদ্ধির ভাগ যেমন সমভাবে বণ্টন করা হবে, কৃচ্ছ্রতার ভাগও সকলের জন্য সমান সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলেই এই কঠোর পরীক্ষার কাজ আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো। ভারতীয় গণতন্ত্রের লক্ষ্য তাই। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী যে সংবিধান অনুযায়ী ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে সেই সংবিধানের প্রতিশ্রুতি আমরা শত বাধাবিপদ সত্ত্বেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ভারতকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলবো। সাধারণতন্ত্র দিবসে এই হল জাতির সংকল্প।

বিচিত্র চরিত্র

ক্লীনমুন
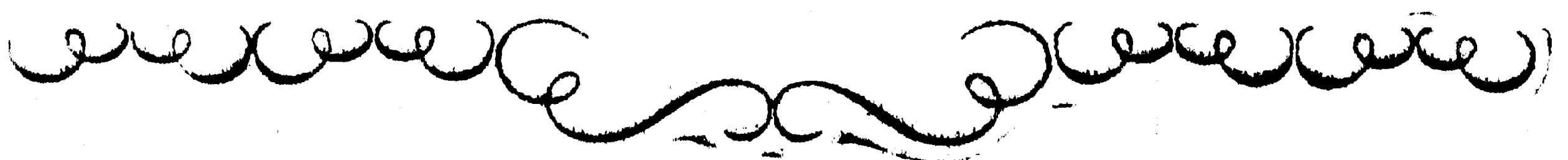
নির্মলচন্দ্র

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১ম পর্ব)

একখানা চিঠি।

শ্রদ্ধেয় গ্র্যান্ড-পা অথবা প্রিয় মহাশয়
(যো তুমহারা পসন্দ),

অমৃত বলিয়া সাপ্তাহিক কাগজে বিচিত্র চরিত্র নামের পাগড়ী মাথায় চড়াইয়া পুরনো দিনের মানুষগুলোর যে সপিণ্ডীকরণ বাহির করিতেছ, তাহা পড়িয়াই তোমাকে পত্র লিখিতেছি। তিল-মধু-সহযোগে পিণ্ড নামক দ্রব্যটি ব্যাড লাগিল না, গুডই লাগিল। ইনটেরেশনে গলদ পাইলাম না।

বলি, আমাকে মনে পড়িতেছে তো? "হেভেনে যে বাতি জ্বালিয়া দেয়, সে হইল গ্র্যান্ড-সন অর্থাৎ নাতি। কথিত আছে—নাতি স্বর্গে দেয় বাতি। তোমার জন্য তাহা আমি পারিব না, কারণ আমি তোমা হইতে বয়সে অনেক বড়। আমার নাম শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তোমার এক্সপেণ্ডিচার (Expenditure) মানে ব্যয় অর্থাৎ বেই বা বেয়াই 'অলওয়েজ কাউবয় অর্থাৎ নিত্য-গোপাল—বিচিত্র চরিত্রের 'সোনার তলোয়ার' আমাকে ক্রেজার মংকি বলিয়া ডাকিত। তোমার বাবার চেয়ে বয়সে পঁচিশ তিরিশ বছরের বড় ভাইপো 'বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় যিনি তোমার পরমসমাদরের বড়দা হইতেন, তিনি আমার বাবার বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদা হইতেন এবং আমাকে বলিতেন—'হারামজাদ—বজ্-জা-ত।'

এখন মনে পড়িয়াছে তো? না পড়িলে শালা বলিয়া গালি দিব—কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হইব না। আমার উপর তুমি প্লিজড ছিলে না। বোধহয় এখনও রাগ পড়ে নাই। না হইলে মেমারির গোরস্তানে যাহাকে জ্যান্তে পুতিয়াছ, তাহার কবরটা খুঁড়িয়া তুমি নিশ্চয় এতদিন আর্কলজিক্যাল ফাইণ্ড হিসাবে ক্লীন মুনকে আবিষ্কার করিয়া সর্বজনসমক্ষে নিশ্চয় তুলিয়া ধরিতে।"

ক্লীন মুন—নির্মলচন্দ্র। এ-বিচিত্র অনুবাদ ওই নির্মলেরই। আমি সম্পর্কে তার ঠাকুরদা। খুব ফ্যালনা সম্পর্ক নয়। খুব কাছেরও নয়। নির্মলের ঠাকুরদা বরদাবাবুর বাবা আমার ঠাকুরদার আপন ভাগ্নে। অর্থাৎ পিসতুতো ভাই। বাবা বরদাবাবু থেকে পঁচিশ বছরের ছোট হয়েও তাঁর কাকা হতেন। সেই হিসেবে বরদাবাবু আমার দাদা হতেন। সম্পর্কটা এই। কিন্তু এর সঙ্গে আরও কিছু ছিল। আমার পিতামহ দীন-দয়ালবাবু এবং তাঁর দাদা—দুই ভাই—তাঁদের ভাগ্নেদের জমি জেরাত দিয়ে বাড়ীর জায়গা দিয়ে গ্রামেই বাস করিয়েছিলেন। কিন্তু নির্মলের ঠাকুরদা বরদাকান্তবাবু সেকালের কৌলীন্য মূলধনে বা বীর্য বলে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী এক অতিপ্রাচীন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের উত্তরাধিকারিণী কন্যাকে বিবাহ করে সেখানে জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ককে কোনদিন তিনি ভুলতে পারেননি বা শুকিয়ে নীরস ও কঠিন করেও তোলেননি। আমি তাঁকে 'বড়দা' বলতাম। স্পষ্ট মনেও রয়েছে আমার। প্রতি বছরই একবার করে তিনি আসতেন। সঙ্গে কোন ছেলে আসত। বেশী আসত সুধীর ভাইপো অর্থাৎ বড়দা বরদাবাবুর ছোট ছেলে। বড় ছেলে ইন্দ্রবাবু ছিলেন সেকালের নাম-করা ডাক্তার। বড়দা আমাকে বলতেন—সোনাভাইটি। এবং তাঁর মিষ্ট রসনায় শব্দটি সত্যকারের খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসত। গল্প বলতেন অনেক। সেবার তাঁর সঙ্গে এল তাঁর বড় পৌত্র ওই নির্মল। আমার বাবা তখনও বেঁচে। সুতরাং আমার বয়স আট বছরের নিচে। বাবা যখন মারা গিছলেন, তখন আমার বয়স আট বছর তিন মাস। নির্মলের বয়স তখন ষোল-সতের বছর।

বড়দা সকালবেলাতেই আমাদের বৈঠকখানা বাড়ীতে এসে ডাকলেন—কই গো খুড়ো কই। বাবজীবন!

ডাকলেন আমার বাবাকে। ভাইপো হলেও বয়সে তিনিই ছিলেন বাবার খুড়োর বয়সী; বয়সে পুত্রের বয়সী এই ভাইপোটিকে বাবাজীবন বলে সম্বোধন করতেন।

বাবা সমাদর করে আহ্বান করলেন—আরে আরে ভাইপো, কখন এলে বাবা? রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তো তোমার গাড়ী পৌঁছয়নি, আমি তো খবর নিয়েছিলাম।

বড়দা বড়দা ঘরে ঢুকলেন একমুখ হাসি নিয়ে—এই রাত্রির শেষ প্রহরে গো। তিন-পহরের শেয়ালগুলো ডাকছে তখন গাঁয়ে ঢুকেছি। মাঝপথে গাড়ীর লিঘে ভাঙল বাবা। কপালের দুঃখের কথা বল কেন? শেষ পাশের গাঁয়ের একখানা গাড়ী নিয়ে সেই খোলা গাড়ীতে চেপে গাঁ ঢুকেছি। ভাগ্যে কেউ দেখেনি, দেখলে পরে জমিদারী মানমর্যাদা মাটি হত। তারপরে? তোমাদের সব ভাল?—কই সোনাভাইটি কই?

আমার বয়স তখন বছর-সাতেক হবে। বড়দার সাড়া পেয়ে পাশের পড়বার ঘর থেকে ছুটে এসেছি—বড়দা!

—এই যে। আয় আয় আয় বলে দুই হাতে ধরে বুকে তুলে নিলেন। বড়দার কতকগুলি বিচিত্র প্রশ্ন ছিল। তুমি ভাল আছ? তোমার চুল ভাল আছে? নাক? কান?

প্রশ্নগুলি করেই ডাকলেন—নিমু! নিমু রে! তারপর বাবাকে বললেন—বাবাজীবন এবার নাতিকে নিয়ে এসেছি।

পনের-ষোল বছরের হাল্কা-পল্কা এবং একালে যাকে বলে শার্প চেহারা, সেই শার্প অর্থাৎ ধারালো অথচ মিষ্টি চেহারার একটি তরুণ এসে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল।

বাবা বললেন—বাঃ এ যে চমৎকার চেহারা নাতির।

—ওই পর্যন্তই। নইলে শ্যামা বড়া পাজী, যাকে বলে রামবদমাস। দেখনা, দাঁড়িয়ে রইল দেখনা। যেন সিরাজদ্দৌলা। নবাবের নাতি। আমি মা রাজার ছেলে প্রণাম নাহি জানি—কেমন করে করব প্রণাম শেখিয়ে দাও মা তুমি। বলি হাাঁরে হারামী পেনাম করতে হয় জান না?

সপ্রতিভ নির্মল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—জানি।

—তবে? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?

—দেখছি।

—দেখছ? কি দেখছ?

—যাকে প্রণাম করব। আগে দর্শন, তবে প্রণাম। কাকে প্রণাম করছি দেখতে হবে তো! বলে প্রণাম করলে বাবাকে। বাবা তাকে আশীর্বাদ করলেন।

বড়দা বললেন—একে প্রণাম কর, আমার সোনাভাইটিকে।

—এই ন্যাড়াটাকে?

—হাাঁরে। বাচ্চাটা কার দেখতে এলে? তোর বাবার ঠাকুরদার। তোর এই ঠাকুরদার বড়ো ওই হরিদাসবাবু, তাঁর বাচ্চা। তুলসী-পাতার ছোট বড় আছে নাকি?

—তা নেই। তা বেশ করছি প্রণাম।

হেঁট হয়ে নমস্কার করলে নির্মল। কিন্তু বড়দা তাতেও ছাড়লেন না, নাতিকে দিয়ে আমার পা ছুঁইয়ে প্রণাম করিয়ে ছাড়লেন। এবং আমাকে বললেন, সোনা-ভাইটি এ হল তোমার নাতি। বুঝেছ! তুমি হলে ওর দাদু ঠাকুরদাদা।

নির্মল বললে—হ্যাঁ ঠাকুরদাদা পাড়ার কাদা বাগবাজারের দই। এস তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই। এস বাবু এস।

ততক্ষণে ঠাকুরদাদাদের গৌরবে পুলকিত হয়ে এবং ওই ষোল-সতের বছরের ছিপছিপে দীপ্তিমান তরুণটির রূপমাধুর্যে বাক-চাতুর্যে মোহিত হয়ে প্রায় আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। আমি তার হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে। বাইরে বাগানে একটা বেদী ছিল, সেই বেদীর উপরে বসে গান ধরে দিলে মিহি সুরে—ঠাকুরদাদা পেয়ারা খা-য়। কাঁচা খায় ডাঁসা খায়, পাকা পেলে আরও চায়। ঠা—কুর—দা-দা পেয়ারা—। খা। বলে গালে একটি মৃদু চপেটাঘাত করে অত্যন্ত মিষ্টিমুখে গাল দিয়ে উঠল।—শা-লা। আমার ঠাকুরদাদা, কই একটা পয়সা দে দেখি? ঠাকুরদাদা মারাতে এসেছ? উট-ভটগুলির মধ্যে এক-একটা অশ্লীল গালাগাল ছিল। সেগুলি প্রয়োগের এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যে, অশ্লীল বলে লজ্জায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম; রাগ করতে সময় বা সুযোগ পাইনি। চীৎকার করতেও ভয় পেয়েছিলাম।

তাছাড়া রাগ হতে হতে তাতে জল ঢেলেছে নির্মল, বলেছে—দাদু আমার কি ভাল ছেলে! বাঃ বাঃ! দেখি দেখি তোমার আঙুলগুলি তো খুব সুন্দর। চোখদুটিও খাসা ঢলঢলে। বা-বা-বা! তোমার বোন আছে, ঠাকুরদাদা—বড় বোন হওয়া চাই, থাকলে আমি তাকে বিয়ে করব, কেমন? তোমাকে শালা বলে ডাকব। তুমিও আমাকে শালা বলবে। কেমন? ভাল হবে না?

আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাগ করতে পারিনি। এরপর দিনকয়েক নির্মল আর আমাদের বৈঠকখানায় আসেনি; বড়দা একলাই আসতেন বাবার কাছে। নির্মল আমাদের গ্রামের সমবয়সী ছেলেদের দলের মধ্যে তখন প্রবেশ করে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। এবং তার বোলচালের দৌলতে একটি সহজ স্থান করে নিয়ে মেতে গেছে। শুধু মাতেনি, মাতিয়েও তুলেছে।

সেকাল অর্থাৎ এখন থেকে ষাট বছর আগে, এবং রাঢ় দেশ। তন্ত্রপ্রধান দেশ। জমিদারপ্রধান দেশ। তখন নেশার একরকম রাজত্ব। ছেলেরা তামাক খেতে ধরত সাত-আট বছরে। গাঁজা যারা ধরত, তারা চোদ্দ-পনেরতেই দীক্ষা নিত। তার উপরে অর্থাৎ ভরাভাদরে যারা সাঁতারের প্রয়াসী, তারা ষোল-বছরেই ঝাঁপ দিত। গার্জেনদের বলার কিছু ছিল না। কারণ, ষোল বছর হলেই আমাদের দেশে পুত্রের সঙ্গে মিত্রসম আচরণের বিধি শাস্ত্রনির্দিষ্ট। তবে তখন সবে বাধানিষেধ চলু হতে শুরু করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বাতাস তখন মৃদু-মন্দ বেগে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

নির্মল তখন কত কি ধরেছিল, তা জানতাম না, তবে যা ধরেছিল, তা যে অনেক কিছু, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের তারামায়ের বাগানে রামজী সাধু থাকতেন,
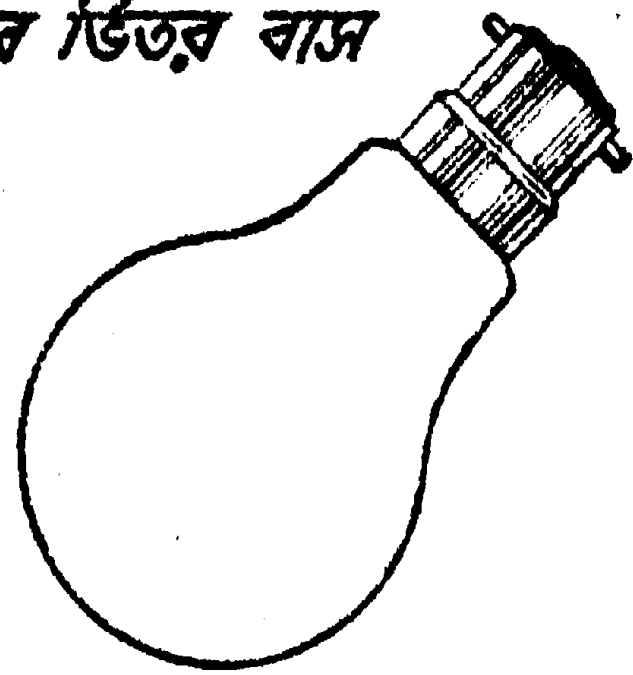
তাঁর ওখানে গিয়ে তারা সিদ্ধি খেতো এ-কথা সকলে জানতো। এবং বলতো—শুধু সিদ্ধি না, গাঁজা মদ সব।

যাই ধরে থাক নির্মল কয়েকদিন পর সেদিন আমাদের বৈঠকখানায় এসেছিল বিকেল বেলা। বোধ করি তার নিজের ঠাকুরদা অর্থাৎ বরদা বড়দার সন্ধানে এসে-ছিল। কিন্তু বড়দা তখন বাবার সঙ্গে বেড়াতে চলে গেছেন। আমি বাগানে ঘুর-ছিলাম। নির্মল আসতেই আমি স্থির হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল কিন্তু লজ্জায় কেমন বাধছিল। নির্মল আমাদের অনন্ত চাকরের সঙ্গে কথা বলে চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল।

—ঠাকুরদা!

বেশ মনে আছে আমি হেসেছিলাম। সত্যকার আনন্দের হাসি।

—এঁঃ! একবারে চাবাল (চোওয়াল) ফেড়ে বত্রিশপাটি মেলে দিলি!

কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে পরবর্তী জীবনে এমনি কথা বলতে শুনেছি। সেই হিসেবেই মনে হচ্ছে এই কথাগুলোই সে বলছিল। তারপর কাছে এগিয়ে এসে বলেছিল—ভাল আছ?

—হ্যাঁ।

—চুল ভাল আছে? তার ঠাকুরদার প্রশ্ন, এগুলি সে তার কাছ থেকেই কপি করেছিল।

—হ্যাঁ

—কান? নাক? চোখ? দাঁত—

—হ্যাঁ।

—দাঁতে পোকা লাগেনি?

—না।

হঠাৎ এবার প্রশ্ন করে বসল—...... ভাল আছে? লজ্জা কি? ...... ভাল আছে তোমার? একটি অশ্লীল প্রত্যঙ্গের নাম করলে।

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম, বয়স তখন সাত। কিন্তু নির্মল লজ্জা পায়নি। ওই শব্দটিকে আশ্রয় করে এক ঝুড়ি অশ্লীল গালিগালাজের ব্যবহার করে আমাকে কাঁদিয়ে সে সেদিন চলে গিয়েছিল। আজও পর্যন্ত, যে-ঘটনা ক'টি বললাম, এর স্মৃতি আমার মনে অত্যন্ত স্পষ্ট চেহারা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এতটুকু ম্লান হয়নি। পরবর্তীকালে নির্মলকে যখন যখন এ-কথা বলেছিলাম, তখন নির্মল অম্লান মুখে বলেছে—গ্র্যান্ড-পা আজও সেই ট্রিক চালাই আমি। ছেট ছেলে যাদের বাড়ী বা বাপের ওপর চটে যাই—তাদের ঠিক এই কথাগুলোই বলি। বুঝেছ, ওই শব্দটাতে তুমি যখন লজ্জা পেলে—কর্ণমূল রেড হয়ে উঠল—লজ্জাবতী লতার মত নোয়ালে তখনই আন্ডারস্ট্যান্ড করলাম যে হয়েছে—ফ্রুট অব দি ফর্বিডন ট্রিতে দাঁত বসিয়েছে। বাস্ আর কি চাই। তখন প্রাণ ভরে খিস্তি বাক্য প্রয়োগ করেছি, কারণ আর সে কাউকে বলে দিতে পারবে না যে নির্মল আমাকে এইসব বাক্য বললে। বড়জোর একটি বাক্য। —'অসভ্য'। মাস্টার-মশায় অসভ্য কথা বলছে। দেখ মা, দাদা অসভ্য কথা বলছে। রাত্রে বাপকে মায়ের চুমো খেতে দেখলে সকালে ফিস-ফিস করে সকলকে বলে বেড়াবে জানিস ভাই—"কাল রাত্রে বাবা, মায়ের-ঠোঁটে অসভ্য খেলে।"

যাক; ছেলেবেলায় সেই প্রথম আলাপের কথা থেকে ঝাঁপ খেয়ে অনেক পরে চলে এসেছি। ক্রমবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রথম অর্থাৎ সেবারের কথাটাই বলে শেষ করি, কারণ সেইটেই হল 'নির্মল চন্দ্র' বা 'ক্লীন মুনের' যে স্ট্যাচুটি আমার জীবনের মনলোকের স্মৃতির যাদুঘরে অসংখ্য মানুষের স্ট্যাচুর সঙ্গে খাড়া করে রাখা আছে তার পাদপীঠ।

সেদিন এই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই গ্রাম্য ব্রাহ্মণ জমিদার সন্তানটি আমাকে এমন একটি কুৎসিৎ বাক্য বলেছিল যে তার প্রতি চিত্ত আমার যত বিমুখ এবং ভয়ার্ত হয়েছিল ঠিক ততখানিই বোধও আকৃষ্টও হয়েছিল। কারণ বাল্যকালের স্বভাবধর্মে কুৎসিতের প্রতি কদর্যতার প্রতি যত তার আতঙ্ক ও আশঙ্কা, গোপনে গোপনে তার প্রতি ততখানি বা তার থেকেও বেশী তার আকর্ষণ।

• • •

এরপর আমার বয়স ২৬।২৭: তখন আবার নির্মলের সঙ্গে দেখা হল। এর মধ্যে আর নির্মল আমাদের গ্রামে আসে নি। আমার বিয়েতে নির্মলের জ্যাঠামশাই আমার ইন্দ্র ভাইপো—সাধারণের কাছে যিনি ইন্দ্র-বাবু ডাক্তার—তিনিই ছিলেন আমাদের তরফের কর্মকর্তা। আমার বাবা যখন মারা গিছলেন, আমার তখন বয়স ছিল আট বছর তিন মাস। এরপর আমার বাবার মামা আমাদের বাড়ীর বিষয় আশয় দেখতেন এবং আমাদের অভিভাবক হয়েছিলেন। বছর কয়েক পর তিনি মারা গেলেন, তখন আমার বয়স চৌদ্দ। এর বছর দুই আড়াই পর আমার বিয়ে হয়ে গেল একরকম অকস্মাৎ। আমার বোনের বিয়ের জন্য আমারও বিয়ে হল। আমার বোনের সঙ্গে নারানের বিয়ে হল এবং পরিবর্তে আমার বিয়ে হল নারানের বোনের সঙ্গে। সে সময় আমাদের বিষয় আশয় দেখত, নায়েব গমস্তায়, এবং বুঝে নিতেন আমার মা-পিসীমা। পুরুষ অভিভাবক নেই। অভিভাবক আমার পিসীমা, তিনি পড়তে জানেন লিখতে জানেন না। বিয়ের সময় পুরুষ অভিভাবক হলেন বড়দা বরদাদা'র বড় ছেলে ইন্দ্রবাবু ডাক্তার। ইন্দ্রবাবু তখন সরকারি চাকরী থেকে রিটায়ার করে লাভপুরে প্র্যাকটিস করছেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার এবং আন্তরিক মমত্বের আকর্ষণেই ইন্দ্রভাইপো এগিয়ে এসে সব কাজের ভার নিয়েছিলেন, তাঁর গ্রাম তাঁর বাড়ী থেকে কুটুম্বও এসেছিল। সুধীর ভাইপোও এসেছিল। কিন্তু নির্মল আসে নি।

নির্মল তখন কাশিমবাজারের মহারাজা প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের শিল্পপ্রচেষ্টার মধ্যে একজন উৎসাহী কর্মী। মহারাজার উইভীং বা ট্যানারী বা ঐরকম কোন একটি প্রতিষ্ঠানে ভাল মাইনেতে কাজ করে, ছুটী ছিল না বলে আসে নি। অন্ততঃ সেই অজুহাত দেখিয়ে নির্মল একখানা পত্র আমাকে লিখেছিল—

"গ্র্যান্ড-পা, লাকি ব্রাদার ইন ল' লাকি চ্যাপহে তুমি: এই সতের বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেল। আমাদেরও হয় নি হে। কনগ্র্যাচুলেশন! দেখ ছুটী পেলাম না বলে গেলাম না। তার উপর জ্যাঠা আছে। খুড়োর নেফ্যুউ কোনরকমে হওয়া যায় কিন্তু জ্যাঠার নেফ্যুউ সে অসহ্য ব্যাপার। তার উপর যাকে বিয়ে করছ সে হল চারুদার কন্যে আমার ভাইঝি। না থাক কোন রক্তের সম্পর্ক। এ পাতানো সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের বাবা। মাইরী খুব উৎসাহের সঙ্গে বিয়েটা করে ফেলবে। ভয় পেয়ো না—"

এরপর কয়েকটা অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতা ছিল। যার চলত সেকালে অর্থাৎ ১৯১৫।১৬ সালে একেবারে বাতিল হয় নি। তবে আমার জীবন থেকে বাতিল হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণরূপে, কারণ তখন আমার জীবনে দেশপ্রেম ও দেশসেবার দীক্ষা হয়ে গেছে। বৈষ্ণবেরা যেমন 'কাটা' শব্দ শুনে শিউরে ওঠে কানে আঙুল দেয় মুখে আনে না; কারণ কাটলে রক্ত পড়ে; হরি হরি বলে চিত্ত শুদ্ধ করে নেয়; নির্মলের চিঠিখানা পড়ে সেদিন আমার মনে তেমনি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এবং সেই শৈশবের ক'খানা ইটের উপর আরও ক'খানা ইট গাথা হয়েছিল সেদিন। সে ইট ক'খানা গাথনীর মশলার মধ্যে প্রেম বা মধুর কিছু একেবারেই ছিল না।

এরপর নির্মলের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হল আরও দশ বারো বছর পর। ১৯২৬।২৭ সালে।

দেশসেবার পালার প্রথম পর্ব শেষ করে

তখন আমি অসহায়ভাবে মামাশ্বশুরদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছি এবং তাঁরাও আমাকে সেকালের দস্তুরমত ওয়েস্ট কোট নেকটাই এবং ফেল্ট হ্যাটসহ স্যুট পরিয়ে কয়লার আপিসে কাজ শেখাচ্ছেন। কাঠের পার্টিশনের বেড়া দেওয়া খুপরীর মধ্যে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে সেদিন আমি কাজ করছি এমন সময় স্যুইংডোরে টোকা মেরে খোনা গলায় কেউ বললে—

—হ্যালো,—আই অ্যাম কামিং ইন—ইউ সি।

বিরক্ত হয়েই বললাম—হু ইউ প্লিজ?

নির্মল ঘরে ঢুকে বললে—আই এ্যাম ইয়োর ব্রাদার ইন ল, ইয়োর সেকেন্ড ওয়াইফস এল্ডার ব্রাদার, ইউ ক্যান কল মি ইওর শালা—। কুলীনের ছেলে শাস্ত্র: তোমার সঙ্গে আমার একটা বোনের দ্বিতীয়পক্ষের বিয়ে দিতে রাজী আছি। যদিও তেমন কোন বোন আমার নেই!

সবিস্ময়ে বললাম—নির্মল!

নির্মল অত্যন্ত মৃদুস্বরে কতকগুলো অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে গেল অবলীলাক্রমে। সবশেষে বললে—হ্যাঁ। রাগ হলেও চীৎকার করে বা রব তুলে প্রতিবাদ করতে পারলাম না। শুনে লোকে যে হেসে আরও কোলাহল করবে, এবং অপ্রস্তুত যে আমিই হব।

(ক্রমশঃ)

‘শেষ রোমান্টিক’॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

শুকনো গোলাপের অসীম শূন্যতা
বিরাজে শান্তির মহিম আঙিনায়,
কারা যে আসে যায়, ফুলের নামে জব্দে?
স্মৃতির হাহাকার খোঁপায় শোভা পায়।

(২)

এত যে যাদুঘরে মৃতের উৎসব
এত যে আসা যাওয়া, প্রেমের গান গাওয়া;
রোদ্রে এসো তুমি দেখবে যদি খেলা
রক্তে ভেসে যায় দক্ষিণের হাওয়া।

(৩)

বুদ্ধবিরতির এই কী সমারোহ
বোবারা কথা বলে, বধির শোনে?
বিবাহে মুছে যাবে বুকের শত্রুতা,
তাই কি বিধবার চোখের কোণে
যে জল জমে, আজ বাজারে ব্যাপারীরা
তাকেই হাঁক পাড়ে, ‘আসল মুক্তা’!

(৪)

মায়াবিনী! তোরা ছিঁড়ে ফেল এই মুখোস,
স্বস্তি যাক রসাতলে! বোবাদের চিৎকার
বধিরের ঘন ঘন মাথা নাড়া বন্ধ কর!
এই কী তোদের অবাক প্রেমের ঘর?

কবে ফুলগুলি রেখে গেছে ঘরভর্তি অন্ধকার,
এখন দ্বিপ্রহর।

পশমের উত্তাপ॥

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

পশমের উত্তাপ একদিন আমাদের ঢেকেছিল
কিন্তু সে কথা বহুদূরে আগে।
এখন দশ হাজার মাইলের অন্ধকারে
সে তাপের কোনো আলো নেই।
প্রেম ও তুমি অনেক দূরে সরে গেছ
আমি তবু মনে করি।
কিন্তু অনুভবংকরি এক ধরনের সূর্য
আমাদের দেহের মধ্যে হিম ঝিঁধিয়ে গেছে।
আছে শুধু ‘এখন’ ও ‘এখানে’
আর তোমার জন্য বাঁচিয়ে রাখা মন।

সুভাষ বাণী

...নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে-সাধনা, বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয়. কিন্তু আমার মনে হয়, এ-সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চা'ক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে। সুতরাং আত্মবিকাশের সত্য পথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে।

●

Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্ত-ভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে।

●

বিদেশী আমলাতন্ত্রের অধীনতাকে মানিয়া লওয়া আমার নীতিতে অসম্ভব। জনসেবার প্রথম প্রয়োজন সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব।

●

সবচেয়ে বড় দান হৃদয় দান। এটি দিলে দেবার আর কিছু বাকি থাকে না' যাকে এই দান করা হয়, তার কি কম সৌভাগ্য। তার মত সৌভাগ্যবান বা সুখী আর কে আছে? কিন্তু যে ঐ দান ফিরিয়ে না দিতে পারে, তার মত -- আর কে আছে? ফল কি? ফল--উভয়ের শান্তি।

●

শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও জড়িত হয়ে রয়েছে। সেটি হলো হরফ সমস্যা। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দু' ধরনের হরফ চলে। একটি হলো সংস্কৃত (অথবা নাগরী) হরফ, অন্যটি হলো আরবী (অথবা ফারসী) হরফ। জাতীয় কার্যাবলী ও সম্মেলনসমূহে এযাবৎ আমরা দু' ধরনেরই হরফ ব্যবহার করে এসেছি। এ-প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, কয়েকটি প্রদেশে এমন কয়েক ধরনের হরফ প্রচলিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যা সংস্কৃত হরফেরই রকমফের। মূল হরফ দুটিই; এবং সর্বপ্রকার জাতীয় কার্যাবলী ও সম্মেলনে আমাদের এই দু' ধরনের হরফই ব্যবহার করতে হয়।

ল্যাটিন হরফের প্রবর্তন করে এখন এই হরফ-সমস্যা সমাধানের একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ল্যাটিন হরফের সমর্থক। আধুনিক যুগে আমরা বাস করছি এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই আমাদের চলতে হবে। এ-কারণে, ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক ল্যাটিন হরফটা আমাদের শিখে নেওয়া দরকার। দেশের সমস্ত স্থানে যদি আমরা ল্যাটিন হরফে লেখার ব্যবস্থা করতে পারি, আমাদের সমস্যার তাহলে সমাধান হবে।

মানুষ লালবাহাদুর

তুষারকান্তি ঘোষ

২রা অক্টোবর বললেই মনে পড়ে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। কিন্তু ২রা অক্টোবর আর একজন বিখ্যাত লোকেরও জন্মদিন। তাঁর নাম লালবাহাদুর—আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, মহাত্মা গান্ধীরই ভাবশিষ্য।

বারাণসী জেলার মোগলসরাইয়ের একটি গ্রামে ১৯০৪ সালে লালবাহাদুরের জন্ম। বাবার নাম সারদাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব আর মা'র নাম রামদুলারী দেবী।

সারদাপ্রসাদ ছিলেন সেকালের রেল-স্কুলের একজন সাধারণ শিক্ষক। সামান্য বেতন, কিন্তু মানুষটি খাঁটি। সেই খাঁটি মানুষটিরই আদর্শ ছেলে লালবাহাদুর, যাঁর মতো সৎ ও মহৎ মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে সেই সাদাসিধে মহৎ মানুষটির সান্নিধ্যে আসবার আমার সুযোগ হয়েছিল অনেকদিন আগেই এবং তারপর আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম।

প্রথমেই একটি কথা বলে রাখা দরকার। শুধুমাত্র ভালো লোক বলেই যে লাল-বাহাদুর অত বড়ো হয়েছিলেন তা নয়, বড়ো হবার সমস্ত যোগ্যতাই তাঁর ছিল এবং যে কোনো অবস্থার সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারতেন। এত গুণের অধিকারী হলেও অহংকারের লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। বিনয়-নম্রতায় ও ভদ্রতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আর তাঁর মতো নির্লোভ মানুষও নিতান্তই দুর্লভ। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। কামরাজ পরিকল্পনায় নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে লালবাহাদুর নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কিছু উপার্জন তো প্রয়োজন। খবরের কাগজে লিখে তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকায়ও তিনি বেশ কয়েকটি লেখা দিয়েছিলেন। সেই রচনাগুলির নিশ্চয়ই বিশেষ মূল্য ছিল এবং সেইজন্যই লেখক লালবাহাদুরকে বর্ধিত হারে দক্ষিণা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সবিনয়ে তিনি সেই বর্ধিত হার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

নির্লোভ অতি সাধারণ পরিবার পরিবেশেই যে লালবাহাদুরের জন্ম। রামদুলারী দেবী ঘরসংসার দেখতেন—একাই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। স্বামী হলেন মাস্টারজী, তনখা অল্প, কয়েকটি মাত্র টাকা। একবেলার খরচও চলে না তাতে।...... রামদুলারীর তাতে কোনো অভিযোগ নেই। মোটা ডালরুটিতেই খুশি। সবাই খুশি।

সেই দারিদ্র্যের মধ্যেই তো ছোট থেকে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন লালবাহাদুর। দারিদ্র্য সত্ত্বেও লেখাপড়ায় ছিল তাঁর অফুরন্ত অনুরাগ। বছরের পর বছর তিনি ফার্স্ট হয়ে উপরের ক্লাসে উঠতেন।

কিন্তু দেশে তখন নতুন ঢেউ এসেছে। সেই ঢেউ-এর স্পর্শ তরুণ লালবাহাদুরের হৃদয়কেও স্পর্শ করেছে। তিনি অনুভব করলেন স্বাধীনতার জন্য এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করছিলেন, বড়োরা সবাই খবরের কাগজ পড়েন—সবাই মিলে দেশের কথা আলোচনা করেন। লালবাহাদুর বেশ মন দিয়েই শুনতেন সেইসব কথা। কোথায় এক বাংলা মুলুক আছে। সেখানকার একদল জোয়ান ছেলে আংরেজদের ওপর যখন তখন জোর চড়াও হচ্ছে, সুযোগ পেলেই বোমা মারে, গুলি ছোঁড়ে এবং খুন-জখম করে বিদেশী শাসকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে। লালবাহাদুর সেসব খবর শোনেন আর নতুন প্রত্যাশায় তাঁর মন ভরে ওঠে।

শুধু বাংলাদেশে নয়, ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেই আন্দোলন; বড়ো বড়ো লোক আছেন তার মধ্যে; —লালবাহাদুরের সবটুকু মন সেই লড়নে-ওয়ালাদের ঘিরে থাকে।

এমন সময় গান্ধীজী ডাক দিলেন। বললেন, তোমরা সবাই বেরিয়ে এস। সেই ডাক শহরে ও গ্রামে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। লালবাহাদুরের কানেও পৌঁছুল। কিন্তু মনে তাঁর দ্বন্দ্ব দেখা দিল—দুই মা, দুই মা আশাভরা চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। এক মা গর্ভধারিণী, আর এক মা দেশজননী। অনেক ভাবনাচিন্তার পর দ্বন্দ্ব দূর হল। গর্ভধারিণী পথ আটকে দাঁড়ালেন না, চুপ করে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। ছোট্ট ছেলেটি বিদ্যালয় ছেড়ে চলে এলেন স্বাধীনতার যুদ্ধে। প্রথম কারাবরণ করলেন ১৯২১ সালে। কিছুদিন

আজকের ভারত

একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রা।

রাজনৈতিক বিক্ষোভ, হিংসাত্মক আন্দোলন, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারার পুনরভ্যুত্থান, ছাত্র অশান্তি, অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যসংকট প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ঝড়ের গতিতে সাধারণতন্ত্রী ভারতের একটি বছর অতিক্রান্ত হল। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বের এই বৃহত্তম সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রটিকে স্বাধীনতার পর গত বিশ বছরে কখনও এমন সংকটের আবর্তে পড়তে হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা, ঐসব সংকট ও সমস্যা সঙ্গে নিয়েই সাধারণতন্ত্রী ভারতের অষ্টাদশ বর্ষ শুরু হচ্ছে।

আমাদের রাষ্ট্রপতি

বিগত বর্ষের শুরুতে ভারতের কোটি কোটি মানুষকে সবচেয়ে কঠিন আঘাত পেতে হয় তাদের প্রাণের মানুষ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে। তাঁর অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে ভারত পাকিস্তানের অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করে ঐ সৈনিক-শাসিত দেশটির ক্ষমতার দর্প চূর্ণ করে। ঐক্য চেতনায়, জাতীয় শ্লাঘায়, আত্মবিশ্বাসে নিমেষ মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সারা দেশ। কিন্তু সেই জয় ও আনন্দের দিনে অকস্মাৎ ১৯৬৬ সালের ১১ই জানুয়ারী তাসখন্দে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন শাস্ত্রীজী। পরদিন ব্যথাহত ভারতে তাঁর নশ্বর দেহ বহন করে আনেন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন।

সেই দুঃখ ও বেদনার দিনে রাষ্ট্রতরণীর নতুন কর্ণধার হন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। বিগত সাধারণতন্ত্র দিবসের দুইদিন আগে, ১৯৬৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী তিনি প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। তারপর থেকে গত এক বছরে এই দেশকে বারবার যে-বিপর্যয়কর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংকট আর প্রাকৃতিক

আমাদের প্রধানমন্ত্রী

দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়েছে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না।

শ্রীমতী গান্ধী যেদিন প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন, সেইদিনই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ হোমি ভাবা সুইজারল্যান্ডে এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ভারতের এই ক্ষতি অপূরণীয়। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ভারতের আর এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃতী

সন্তান ডঃ রাধাবিনোদ পালের লোকান্তর। প্রজ্ঞা মনীষা ও ন্যায়বিচারের জন্য দেশ-বিদেশে সম্মানিত এই মহান আইনবিদ গত ১০ই জানুয়ারী পরিণত বয়সে পরলোক-গমন করেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু দেশের সঙ্গে ভারতের নতুন করে হৃদ্য-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, বহু পুরাতন মিত্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য আরও নিকট ও নিবিড় হয়েছে। পাক-ভারত সংঘর্ষকালে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ পাকিস্তানের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণ সমর্থন জানান। কিন্তু অনতিবিলম্বে ইন্দো-নেশিয়ার জনগণের এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে, যার ফলে ডঃ সুকর্ণ কোনরকমে তাঁর গদীতে বহাল থাকলেও, তাঁর সব সহকর্মী ধৃত, অভিযুক্ত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং ইন্দোনেশিয়া সরকারেরও নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। এখন ইন্দোনেশিয়া ভারতের নিকট বন্ধু। ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়নে ভারত দশ কোটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছে। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক ভারত সফর করে যান ও তাঁর আমন্ত্রণে ক'দিন আগে ভারতের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী এম সি চাগলা ইন্দোনেশিয়া ঘুরে আসেন। উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন রাষ্ট্রীয় অতিথিরূপে কাম্বোডিয়ায় যাওয়ার পর ঐ দেশটির সঙ্গেও ভারতের সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়েছে। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর বরাবরই ভারতের মিত্রদেশ, তাদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী আরও নিবিড় হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ সিংহল, নেপাল, বর্মা, আফগানিস্তানের সঙ্গেও ভারতের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্রমোন্নতির পথে। কিন্তু দুই বৈরী প্রতিবেশী চীন ও পাকিস্তানের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাসখন্দ ঘোষণার শর্ত অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান তাদের সৈন্যবাহিনী ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্টের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু অন্য কোনদিক থেকে পাক-ভারত সম্পর্কে উন্নতি হয়নি, কারণ, কাশ্মীর-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পাকিস্তান রাজী নয়, আর ভারতের পক্ষেও অতি সঙ্গত কারণে পাকিস্তানের ঐ আলোচনার শর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাহলেও বাণিজ্য, যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কয়েক দফা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হয়ে গেছে এবং বিরোধমুক্ত ব্যাপারগুলিতে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রয়াস সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু চীন-ভারত সম্পর্ক ১৯৬৩ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কূটনৈতিক নোট বিনিময়ের মধ্যেই সীমিত আছে। অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি সকল দেশের সঙ্গেই চীনের এখন তিক্ত সম্পর্ক। সুতরাং ভারতের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই। চীনের আচরণে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একমাত্র তার শর্ত সম্পূর্ণ মেনে নিয়েই তার সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

১৯৬৬ সালের ২১শে অক্টোবর থেকে ২৪শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে তিন জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়া, মিশর ও ভারতের শীর্ষ নেতৃ-সম্মেলন হয়। সম্মে-লনের শেষে এক যুক্ত-বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ জোট-নিরপেক্ষ নীতিতে অবিচল আস্থা প্রকাশ করেন ও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ভারতের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া প্রমুখ পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিরও সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। রোডে-শিয়ায় শ্বেতাঙ্গ শাসন কায়েম হওয়ার বিরুদ্ধে ভারত আফ্রিকার দেশগুলির মতোই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং রোডেশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সংযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছেদ করেছে। একটু বিলম্বে হলেও, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমা-বর্ষণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং শান্তি-পূর্ণ উপায়ে ভিয়েৎনাম সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভিয়েৎনামে মার্কিন কার্যকলাপ সমর্থনের জন্য ভারতের উপর কম চাপ দেওয়া হয়নি, অন্তত একটা মেডিক্যাল ইউনিট পাঠিয়েও ভারতকে প্রতীক সমর্থন জানাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ভারতকে সে-প্রস্তাবে সম্মত করা সম্ভব হয়নি বলেই বোধহয় খাদ্যসংকটক্লিষ্ট ভারতে প্রতিশ্রুত মার্কিন খাদ্য আসা অকস্মাৎ বন্ধ হয়েছে।

অনাবৃষ্টির জন্য গত বছর ভারতে ফসল ভাল হয়নি। এবারও ফসলের অবস্থা ভাল নয়, ইতিমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে বাঙলা, বিহার ও কেরলের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। গত বছর জানুয়ারী মাসে কেরলে দারুণ খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। গম ভোজনে অনভ্যস্ত ঐ রাজ্যটিতে হঠাৎ চালের সর-বরাহ কমে যাওয়ায় কেরলবাসীদের প্রায় উপবাসে কটি দিন অতিবাহিত করতে হয়। শ্রীমতী গান্ধী তখন সবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কেরলবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে তিনি নিজের রেশন বরাদ্দ কেরলকে দান করেন এবং মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে স্পেশাল ট্রেনে চাল পাঠিয়ে কেরলের অবস্থা আয়ত্তে আনেন। আবার উড়িষ্যা থেকে অতিরিক্ত চাল বাইরে চলে যাওয়ায় ঐ রাজ্যটিরও কয়েকটি খরা অঞ্চলে তীব্র খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। উড়িষ্যার অবস্থা পর্য-বেক্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সেখানে যান। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের দাবীতে গত বছর মার্চ মাসে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়। বাঙলার খাদ্যসংকট এখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, বিধিবদ্ধ রেশন অঞ্চলগুলিতে ন্যূনতম রেশন সরবরাহও সম্ভব হচ্ছে না। অক্টো-বর-নভেম্বর থেকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের কতকগুলি স্থানে তীব্র খাদ্য-সংকট শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন সরবরাহের অনিশ্চয়তা অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ভারতকে জরুরী সাহায্য পাঠাতে শুরু করলে আমেরিকার মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, প্রেসিডেণ্ট জনসন নয় লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে পাঠাতে সম্মতি দেন। তারপর, ২০শে জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট জনসনের "ম্যাচিং এড"-এর শর্ত ভারত মেনে নেওয়ায় মার্কিন সরকার তাঁদের পূর্ব-প্রতিশ্রুত খাদ্য সাহায্য ভারতে পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। 'ম্যাচিং এড'-এর শর্ত হল, অন্যান্য উন্নত দেশ মিলিতভাবে ভারতকে যে-পরিমাণ খাদ্য দেবে, আমেরিকাও সেই পরিমাণ খাদ্য ভারতে পাঠাবে। এই বছরের খাদ্য-ঘাটতি পূরণ করতে জুন মাসের মধ্যে ১৮ লক্ষ টন মার্কিন খাদ্য ভারতে আসবে, তারপর আগামী চার বছর ভারত বছরে ১৯০ লক্ষ টন হারে খাদ্যশস্য বহির্বিশ্ব থেকে আনবে।

ইতিমধ্যে দেশের উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং পণ্যমূল্য দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে। '৫২-'৫৩ সালের মূল্যমান ১০০ পয়েণ্ট ছিল এই হিসাবে '৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সামগ্রিক মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩৫ পয়েণ্ট; অর্থাৎ দশ বছরে মূল্যমান ৩৫ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে দশ মাসের মধ্যে মূল্যমান বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৯০ পয়েণ্ট, গত এক বছরে শুধু খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫ পয়েণ্ট।

খাদ্যাভাব ও উৎপাদন হ্রাসজনিত সংকটকে আরও জটিল করেছে, বিদেশী ঋণের বোঝাও বিদেশী পুঁজির আধিপত্য। ১৯৪৮ সালে এ-দেশে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ২৫৫·৮ কোটি টাকা, '৬২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৩৫·৫ কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব মতে '৬৩-'৬৫ সালে আরও ৯০·৩৫ কোটি টাকার বিদেশী পুঁজি ভারতে অনুপ্রবেশের অনুমতি পেয়েছে। দুটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে, বিদেশী পুঁজি কিভাবে বাড়ছে এদেশে। '৪৮ সালে বাগিচা-শিল্পে ও পেট্রোল-শিল্পে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭·২ ও ২০৪·০ কোটি টাকা, '৬২ সালে ঐ দুই শিল্পে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ১১০·৩ ও ১৫৪·০ কোটি টাকা। এই পুঁজি বৃদ্ধির জন্য বিদেশী নিয়োগকারী-দের ঘর থেকে টাকা দিতে হয় না, কারণ ১৯৪৮—৬০ সালের হিসাবে দেখা যায়, ঐ সময়ে ভারতে প্রতি বছর বিদেশী পুঁজি এসেছে গড়ে ২০·৮ কোটি টাকা আর বিদেশী ঋণের সুদ ও মুনাফা বাবদ ভারতকে ঐ সময়ে প্রতি বছর দিতে হয়েছে গড়ে ২৬·১ কোটি টাকা।

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকার দামও বিশেষভাবে হ্রাস পায়। সরকারী হিসাবে এক ডলার সমান পৌনে পাঁচ টাকা থাকলেও, বে-সরকারী বাজারে এক ডলারের দাম হয় দশ টাকা। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার তুলনায় পণ্য রপ্তানির সামর্থ্য কম হওয়াই টাকার বিনিময়-মূল্য
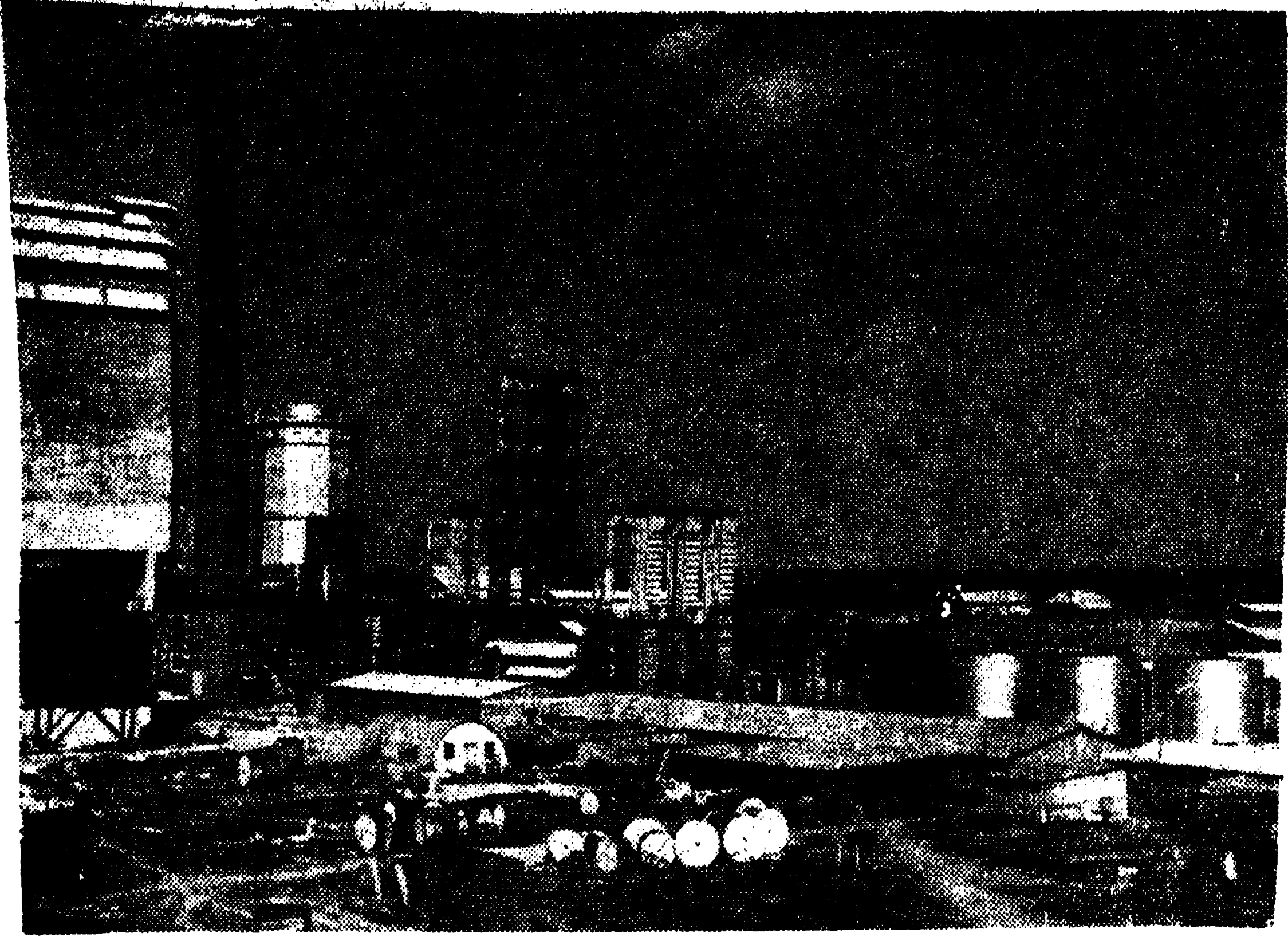
দুর্গাপুরে কোক্-ওভেন প্লান্ট

হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ। এই অবস্থার প্রতিকারে গত ৬-৬-৬৬ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেন। শ্রীমতী ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এইটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্ত। কিন্তু এর কোন উল্লেখযোগ্য সুফল এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তার কারণ, টাকার দাম কমানোর পরেও তার পাউন্ড ও ডলারের তুলনায় বে-সরকারী আনুপাতিক মূল্য সরকারী আনুপাতিক মূল্যের চেয়ে কম থেকে গেছে। সেজন্য বিদেশ থেকে বেশী টাকা আগের মতো এখনও গোপন পথে ভারতে আসছে, বা হুন্ডির মাধ্যমে লেনদেন হচ্ছে, যার ফলে বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ থেকে যথাপূর্ব বঞ্চিত থাকছে ভারত সরকার। ডলারের বে-সরকারী মূল্য যদি দশ টাকাই থাকে, তবে সোজাপথে এক ডলার জমা দিয়ে সাত টাকা লোকে নেবে কোন্ গরজে? তারপর উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ায় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির আশাও পূরণ হয়নি। অথচ এই মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর থেকেই যাবতীয় পণ্যের মূল্য দুর্নিবার গতিতে বেড়ে চলেছে। আর যেসব শিল্পকে বিদেশ থেকে কাঁচামাল এনে দেশের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়, টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য হ্রাস পাওয়ায় তাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

খাদ্যাভাব, শিল্পসংকট ও পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি অনিবার্যভাবে ভারতের সমাজজীবনে নানা অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। দেশজোড়া খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র-অশান্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের পুনরভ্যুত্থান প্রয়াস যে বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত সমাজের অভিব্যক্তি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কমাস আগে সংক্রামক রোগের মতো কেরল থেকে কাশ্মীর, আমেদাবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছাত্র-অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে, ছাত্র বহিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তবুও ছাত্র-বিক্ষোভ বন্ধ হয়নি। ছাত্র-বিক্ষোভের জন্য কলকাতার দুটি সরকারী কলেজে মাসের পর মাস পড়ানো বন্ধ রাখতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির অভ্যুত্থান-প্রয়াসে ভারতের সমাজ-জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা আরও বেশী বিঘ্নিত হয়েছে। গোহত্যা বন্ধের দাবীতে গত ৭ই নভেম্বর নয়াদিল্লীর রাজপথে কয়েক লক্ষ ত্রিশূলধারী নগ্ন সাধু যে-তাণ্ডব শুরু করে, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ব ঘটনা। এর জন্য বিদেশে ভারতের সম্মান যে কতখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা কল্পনা করা যায় না, স্বদেশেও এর প্রতিক্রিয়া কম হয়নি। গোহত্যা আন্দোলনের ফলেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দকে বিদায় নিতে হয়। এখনও তার জের মেটেনি, এখানে ওখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী গোহত্যা বন্ধের দাবীতে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন, আর নিরক্ষর ভারতবাসীর অন্ধ কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্যে আশঙ্কাজনকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে পুনরভ্যুত্থানবাদী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি।

কিন্তু জাতির পক্ষে সবচেয়ে বেশী বিপদের কারণ হল জাতীয় সংহতি-বিরোধী তৎপরতা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ। গোয়া কুক্ষিগত করার জন্য মহারাষ্ট্রবাদীদের আন্দোলন, মহীশূর-মহারাষ্ট্র সীমান্ত বিরোধ, ইস্পাত কারখানার দাবীতে অন্ধ্র-বাসীদের হিংসাত্মক আন্দোলন ও জাতীয় সম্পত্তি বিনাশ, সন্ত ফতে সিং-এর স্বতন্ত্র পাঞ্জাব ও মাস্টার তারা সিং-এর স্বতন্ত্র শিখস্থানের দাবী, বৈরী নাগাদের বিচ্ছিন্নতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম, মিজোদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী ভারতের অখণ্ডতা ও এক-জাতি চিন্তার প্রতি এক-একটি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। কেন্দ্রীয় সরকার বহু ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঐসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে সুফল পেয়েছেন। বহু ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান হয়েছে। অন্ধ্রের আঞ্চলিক দাবী বা শিখ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ়তা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি প্রশংসনীয় মহারাষ্ট্র বা মহারাষ্ট্রবাদী গোয়ানদের দাবী না মেনে নিয়ে গোয়ার জনগণের উপরে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। আমরা আশা করব, জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এইভাবে প্রয়োজনে অতি কঠোর ও ক্ষেত্র-বিশেষে সহনশীল নীতি অনুসৃত হবে।

আত্মচরিতে সমাজচিত্র

দূর অতীতের ভারত আজও অন্ধকারে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

মনীষী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আত্মকথায় স্বভাবতই নিজ নিজ দেশের সমকালীন সমাজ-রূপের বিশ্লেষণ ঘটে থাকে। অতীত সমাজের দর্পণ হিসাবে অনুরূপ এক একখানি আত্মজীবনী দেশে দেশেই অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত। শুধুমাত্র সমকালীন সমাজ-চিত্র ও চরিত্রকে অনুধাবনের উপায় হিসাবেই যে এর গুরুত্ব তা' নয়, বিভিন্ন যুগে রচিত বিভিন্ন আত্মকাহিনীর ভেতর দিয়ে এক একটি দেশের সমাজ-জীবনের তথা সভ্যতার বিবর্তন-ধারা ধরা পড়ে। আত্মচরিতের মতো দিনলিপি বা রোজনামচা এবং জার্নাল ও স্মৃতিচারণা জাতীয় রচনায়ও মনীষীদের আত্মকথা বিধৃত থাকে। সেইসব রচনার মধ্যে দিয়েও ভবিষ্যৎ কালের পাঠকদের কাছে অতীত সমাজের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতীয় সমাজবিবর্তন ও ভারতীয় সভ্যতাবিকাশের ধারা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে যে সব অন্তরায় রয়েছে তার মধ্যে আত্মজীবনীর অভাব অন্যতম এবং তা' একান্তভাবেই অনুভূত। বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য আত্মচরিতকারের সন্ধান পাওয়া যায় না যাঁর আত্মকথার আলোয় আমরা তৎকালীন ভারতীয় সমাজ-রূপ সম্বন্ধে সঠিক একটা ধারণা করতে পারি। এ বিষয়ে স্মৃতি-শ্রুতির ওপর আমরা যতই নির্ভর করি না কেন তাকে কখনো সমাজ-বিশ্লেষণের যথার্থ বৈজ্ঞানিক উপায় বলে অভিহিত করা যাবে না। তা' হলেও ইতিহাসের গতিপথে স্মৃতি-শ্রুতিও অনেকখানি সহায়ক, এ-সবেরও নিশ্চয়ই যথেষ্ট মূল্য আছে যদিও তার ওপর কখনো পুরোপুরি নির্ভর করা চলে না।

প্রকৃত ইতিহাস ও আত্মচরিতের মতো প্রত্যক্ষ দলিলের অভাবেই দূর অতীতের ভারত আজও আমাদের কাছে অনেকাংশেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আত্মজীবনীর অভাব কেন, তা' নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

হাজার হাজার বছরের হিন্দু-ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রাচীন যুগের ভারতীয়দের মন স্বভাবতই ছিল বৈরাগ্যপ্রবণ ও ইহলৌকিক প্রত্যাশায় বহুলাংশ বিমুখ। তাঁরা অভ্যুদয় বা সুখ-সম্পদ কখনো কামনা করেন নি, এ-কথা সত্য নয়, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে কোনো চরমমূল্য যে তাঁরা দেননি তা' স্বীকার করতেই হবে। হয়তো তাঁরা মনে করতেন, আত্মঘোষণায় বা আত্মকথা-কীর্তনে মানুষের অহংবোধ প্রশ্রয় পায়। প্রাচীন হিন্দু মনীষীদের আত্মপ্রচার-বিমুখতার সেটাই হয়তো মূল কারণ এবং সেজন্যেই হয়তো গীতার পরে সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সাহিত্যে তেমন কোনো আত্মকথনগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

আমরা যে কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি ও মহাকবিদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না তা' অবশ্যই আমাদের দুর্ভাগ্য। আত্মপরিচয় ঘোষণা দূরে থাকুক, এদেশের অনেক কবি নিজ নিজ রচনাকে শ্রেষ্ঠতর কবির রচনার মধ্যে 'প্রক্ষেপ' করে গেছেন। এরূপ আত্ম-বিলুপ্তির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। তবে এর ফলে এঁদের জীবনবৃত্তান্ত যে শুধুমাত্র কুহেলিকাময় এবং কিংবদন্তী-নির্ভরই হয়ে আছে তাই নয়, ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে ও সমাজসূত্রের সন্ধানে নানারূপ বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে এই জন্যে। পূর্বোক্ত কবিদের মধ্যে কে-আগে কে-পরে এবং কে কার কতটা আগে বা কতটা পরে আজো পর্যন্ত তা' যথার্থভাবে মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে। একই নামের একাধিক কবি একই সময়ে কাব্যরচনায় ব্যাপৃত থাকতে পারেন কিংবা পরপরও তাঁদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। সে যুগে কবিদের আত্মপরিচয় গোপন রাখার রীতি প্রচলিত থাকায় একাধিক কবির রচনা একই কবির নামে চলে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। বহুক্ষেত্রেই তেমন ঘটেছে বলে সাহিত্য-সমালোচকগণ যে অনুমান করে আসছেন তা' অমূলক না হবারই কথা। মহাকবি বেদব্যাস থেকে শুরু করে কালিদাস, ভাস, ভবভূতি এমনকি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর চণ্ডীদাস পর্যন্ত অনেক কবিকে নিয়েই অনুরূপ প্রশ্ন উঠেছে যার যথার্থ মীমাংসায় আসা খুব সহজসাধ্য নয়। এঁদের অনেকের বেলায় আবার জীবন-কাল নির্ণয় করা এক দুরূহ সমস্যা। এ বিষয়ে মহাকবি ভাসের দৃষ্টান্ত সবিশেষ উল্লেখ্য। অনেকের ধারণা তিনি কালিদাসের পরবর্তী কবি, কিন্তু বহু ঐতিহাসিকের মতে ভাস শকুন্তলার কবি কালিদাসের বহু পূর্ববর্তী এবং সম্ভবত তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের কবি-সম্রাট। আসলে ভাস ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি-নাট্যকার। কেউ কেউ বলেন, তিনি তেরখানি অমূল্য নাটকের রচয়িতা, অন্যদের মতে তিনি 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ' প্রভৃতি দশখানি নাটক ভারত-বর্ষকে উপহার দিয়ে গেছেন।

পূর্বোক্ত সমস্ত কবি ও প্রাচীন ভারতের অন্যান্য কৃতী লেখকই নিজ নিজ কালের সমাজ-প্রতিবেশের আভাস তাঁদের আপন আপন গ্রন্থাদিতে রেখে গিয়েছেন। কালিদাসের 'মেঘদূতে' তো প্রায় সারা ভারতের ভৌগোলিক পরিচয় ও বিশ্ব-মানবের হৃদয়-তত্ত্ব অতি বিস্ময়করভাবে লিপিবদ্ধ, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এঁদের যথাযথ জীবনী ও জীবন-কাল না পাওয়ায় ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ধারা নির্ধারণে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতা প্রথম থেকেই অনুভূত হয়ে আসছে।

প্রাচীন ভারতে আত্মচরিত রচনার কথা তো একরূপ জানাই যায় না, এমনকি ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে সেকালে কেউ কোনো মহৎ মানুষের জীবনচরিত রচনা করেছেন, তেমন নজীরেরও কোনো সন্ধান মেলে না। কাজেই সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় দূর অতীতের ভারত-সমাজচিত্র উপলব্ধি করার মতো সত্যনিষ্ঠ তেমন কোনো অবলম্বন নেই —এ বিষয়ে প্রাচীন কবিদের রচিত গ্রন্থাদি ছাড়া নানা পৌরাণিক কাহিনী, কিংবদন্তী ও অনুমানের ওপরে নির্ভর করেই আমাদের এগুতে হয়। কিন্তু এসব কখনো যথার্থ ইতিহাস রচনার এবং সমাজ-বিবর্তনমূলক গবেষণার উপযুক্ত মালমশলা বলে গণ্য হতে পারে না।

এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতের অনেক কবি বা মনীষী আপন আপন প্রতিভা বা বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ভবভূতির সেই প্রসিদ্ধ উক্তি 'জন্মিলে জন্মিতে পারে মম সমতুল, নিরবধি কাল আছে বসুধা বিপুল' (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মানুষ যাতে সুন্দরভাবে, সার্থকভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ করতে পারে সেজন্যেই সমাজের উৎপত্তি। আর এই সমাজ যাতে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে পারে তার জন্যেই যত আচার-পদ্ধতি, বিধি-বিধান ও শাসনব্যবস্থা। কিন্তু সেই সামাজিক মানুষই তার অন্তর-বাহিরের নতুন দাবীতে অতীতের বিধি-বিধানকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্যে একসময়ে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। বিগতকালের প্রয়োজনীয় আইনকানুন তার কাছে যে তখন লোহার শিকল হয়ে ওঠে। সেই লোহার শিকলকে ছিন্ন করা কি সহজ? এগিয়ে চলতে গিয়ে তাইতো বারে বারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে মানুষের দেহমন এবং যুগ-সাহিত্যে তার ছাপ পড়ে। যুগের সাহিত্য-রথীরা মানবমনের সেই রক্তাক্ত কাহিনীরই যে রূপকার! এমনিভাবে যুগে যুগে সমাজ-রূপের যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় বিশেষভাবে সমকালীন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও রাজনীতিক প্রভৃতির আত্মকথায়।

তবে আত্মচরিত বা আত্মজীবনী বলতে আজকের দিনে অর্থাৎ এই বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা যা বুঝে থাকি প্রাচীন ভারতে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল বলেই মনে করা যায় না। শুধু প্রাচীন ভারতের কথাই বা বলি কেন, পাশ্চাত্য জগতেও এ সম্বন্ধে তেমন কোনো সুস্পষ্ট ধারণা বোধহয় ছিল না। অনেকেরই ধারণা ইংরেজি 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটির বাংলা তর্জমা আত্মচরিত বা আত্মজীবনী। এসম্পর্কে এটুকুই শুধু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উনবিংশ শতকের শেষ দশকেই সর্বপ্রথম ঐ 'অটোবায়োগ্রাফি' শব্দটি ইংরেজী ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তার আগের কোনো ইংরেজী অভিধানে এই শব্দটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

সে যাই হোক, আত্মচরিতমূলক রচনার একান্ত অভাব থাকলেও সুপ্রাচীন ভারতীয় সমাজের একটি সুনির্দিষ্ট পশ্চাদপটের সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদ থেকে। উপনিষদ ভারতের ব্রহ্মবিদ্যাশাস্ত্র। এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও উপলব্ধির জন্যে তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রথমেই মানুষ গড়ার কথা, খাঁটি গৃহস্থ তৈরী করার কথা বলা হয়েছে। কারণ তা' হলেই তাদের পক্ষে সহজ সুন্দরভাবে জীবনকে ভোগ করা সম্ভব হবে। এবং সার্থক সেই দুর্লভ মানবজীবনেই তাদেরকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, কারণ অন্য কোনো জীবনে সেই মহাজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। ভালোভাবে বাঁচতে না শিখলে, পুরোপুরি সম্পূর্ণ মানুষ হতে না পারলে এবং ধনজন ও বিদ্যাবুদ্ধিমণ্ডিত হয়ে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী না হলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা কী করে সম্ভব হবে? তারই জন্যে জীবনভোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে। তবে ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থের মাঝখানের সেই ভোগ-জীবনটুকু স্বল্পকালীন এবং সেই জীবনটুকুও দেহকে সুস্থ রেখে আর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ও সক্ষম রেখে এমনভাবে অতিবাহিত করতে হবে যাতে উপলব্ধি সহজসাধ্য হতে পারে। সুখ কামনা করা অন্যায় নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বরং ভিক্ষান্নে দিন কাটানোর বিরুদ্ধতা করে সুখের জন্যেই দেবতার কাছে, বরুণদেবের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত সুখে সমস্ত চিত্তদৈন্য দূর হয়ে গেলে নির্ভয়ে সত্য প্রচার করা যাবে এবং ন্যায় ও ধর্মের কথা বলা যাবে। এজন্যে অন্নকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। তবে এও মনে রাখতে হবে অন্নই সব নয়—তাকে উত্তরণ করে রয়েছে পরম জ্ঞান ও পরম সত্যলাভের আনন্দ। অন্ন থেকেই সেই আনন্দ-জগতে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই শিক্ষা মহাপুরুষ ও দেশের মহান কবিকুলের কাছ থেকে যুগ যুগ ধরে আমরা পেয়ে আসছি।

তবে একথা ঠিক যে, কবি ও রাষ্ট্রনায়কদের আত্মজীবনী বা সত্যনিষ্ঠ জীবন-চরিতের অভাবে প্রাচীন ভারতের কত তথ্য যে একালের তথা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। প্রকৃতপক্ষে যথাযথ ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষা করে হিন্দুযুগের পূর্ণাঙ্গ ভারত-ইতিহাস অনুধাবনের কোনো সুযোগই নেই। শেষের দিকে বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণনা এ বিষয়ে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। হিউয়েন-সাঙ, ফা হিয়ান প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণ নিজেদের ভ্রমণ-কাহিনীতে সেকালের ভারতীয় সমাজ-জীবনের ও রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। সে-সবই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ বর্ণনা এবং সে-সকল কাহিনী বাস্তবিকই ভারতের অতীত যুগ-জীবনের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। প্রাচীন চীন জাতির মধ্যে যে ঐতিহাসিক চেতনা ছিল, ভারতের প্রাচীন কবি বা মনীষীদের মধ্যে তার একান্ত অসদ্ভাব লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য এ-কথা সত্য যে যাঁরা স্বভাবতই বৈরাগ্যপ্রবণ, জীবন যাঁদের দৃষ্টিতে 'নলিনীদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল' তাঁদের মধ্যে সাধারণত যেমন জাতীয় ইতিহাস রচনা করে স্বদেশ ও স্বজাতিকে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা দিবার প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তেমনি আত্মচরিত প্রণয়ন করে স্বমহিমা কীর্তনেরও প্রেরণা জাগে না। সেকালের ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর অভাবের জন্যে তখনকার ভারতীয়দের ঐ বৈরাগ্যপ্রবণ মনোভাবই একান্তভাবে দায়ী।

এ বিষয়ে মুসলমানদের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। সে জাতির মধ্যে জিগীষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল। তাদের স্বজাতিবাৎসল্যও প্রচণ্ড, তাই মুসলমানদের মধ্যে আত্মজীবনী রচনার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য ঐস্লামিক দেশের কথা এখানে আলোচ্য নয়, কিন্তু এদেশ সম্বন্ধেই বলা যায় যে, মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের পর সম্রাট বাবর থেকে শুরু করে জাহাঙ্গীর, ঔরংজেব প্রভৃতি অনেক বাদশাহই আত্মচরিত প্রণয়ন করে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন। তুজুক-ই-বাবরী (সম্রাট বাবরের আত্মকথা), তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি (জাহাঙ্গীরের আত্মকথা) প্রভৃতি আত্মজীবনীগুলি অত্যন্ত সুলিখিত এবং এসব গ্রন্থ থেকে তৎকালীন শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এদের বক্তব্যে গুরুত্ব রয়েছে বলেই এসব বই ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। হুমায়ুন নিজে তাঁর বহুবিড়ম্বিত জীবনে আত্মকাহিনী লিখবার অবকাশ পাননি। কিন্তু তৈমুরলঙের ষষ্ঠ বংশধর হিসেবে তৈমুরের লেখা 'তারিখ-ই-তৈমুরিয়া' নামক ডায়েরীখানাকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রেখে হুমায়ুন খুব গৌরব অনুভব করতেন। তাছাড়া হুমায়ুন-ভগ্নী গুলবদন বেগম 'হুমায়ুননামা' রচনা করে হুমায়ুনের শাসন ও তাঁর কালের কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এসব ছাড়াও 'আকবরনামা', 'পাদশাহনামা' প্রভৃতি অনেক জীবনীগ্রন্থ এবং ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ, হকিন্স, স্যার টমাস রো, ওলন্দাজ পেলসায়ার্ত, ইতালীয় মানুচি, ফরাসী বার্ণিয়ার টেভার্নিয়ার প্রভৃতির ভ্রমণকাহিনীও ভারতের মুঘল যুগকে এবং বিশেষভাবে সমকালীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ ও চরিত্রকে জানবার ও বুঝবার পক্ষে যথার্থ উপাদান। তবে তার মধ্যে আত্মচরিত যে বিশেষ মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি মুঘল জেনানা-মহলেও আত্মকথা লেখবার একটা অনুপ্রেরণা দেখা দিয়েছিল। জাহানারা বেগমের মনোগ্রাহী আত্মচরিতখানা তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

বাবর প্রমুখ বাদশাহদের আত্মজীবনী ঐতিহাসিকদের চোখে মুসলিম-শাসিত ভারত-ইতিহাসের মূল্যায়নে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত। হিন্দুযুগে ভারতের কোনো সম্রাট আত্মচরিত রচনার কথা কোনোদিন হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের মতো নৃপতি যদি তাঁদের আপন আপন অভিজ্ঞতা ও সমাজ-পরিবেশের কথা লিপিবদ্ধ করে যেতেন তবে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে তা জ্ঞানের আকর হতো। দূর অতীতের হিন্দু শাসকদের কথা না-হয় বাদই দিলাম, এমনকি লেখাই যাঁদের পেশা এবং লেখনীই যাঁদের জীবনের একমাত্র নির্ভর সেই কবি-মনীষীরাও নিজেদের সম্বন্ধে তেমন কিছু লিখে যাননি, যা জেনে বিস্মিত হতে হয়। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে শুধুমাত্র শূদ্রক, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রমুখ কয়েকজন কবি অতি সামান্য এবং কবি বাণভট্ট কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে স্ব স্ব জীবনকথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। বাণভট্টের আত্মকথা পাঠ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এবং তা থেকেই আমরা তাঁর কালকে খানিকটা আস্বাদন করতে পারি ও সেকালের সমাজজীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারি।

এক হিসেবে গীতাকে আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ রূপে গণ্য করা চলে, এবং তা' যে মূলত শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথন সে বিষয়ে এপর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি। সেই বিচারে ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য স্বর্ণ-ভাণ্ডারে গীতাই প্রথম আত্মকাহিনী এবং সেই পটভূমিকা থেকেই আমরা ভারতীয় সমাজবিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ শুরু করছি।

ভাসান

পরেশ সাহা
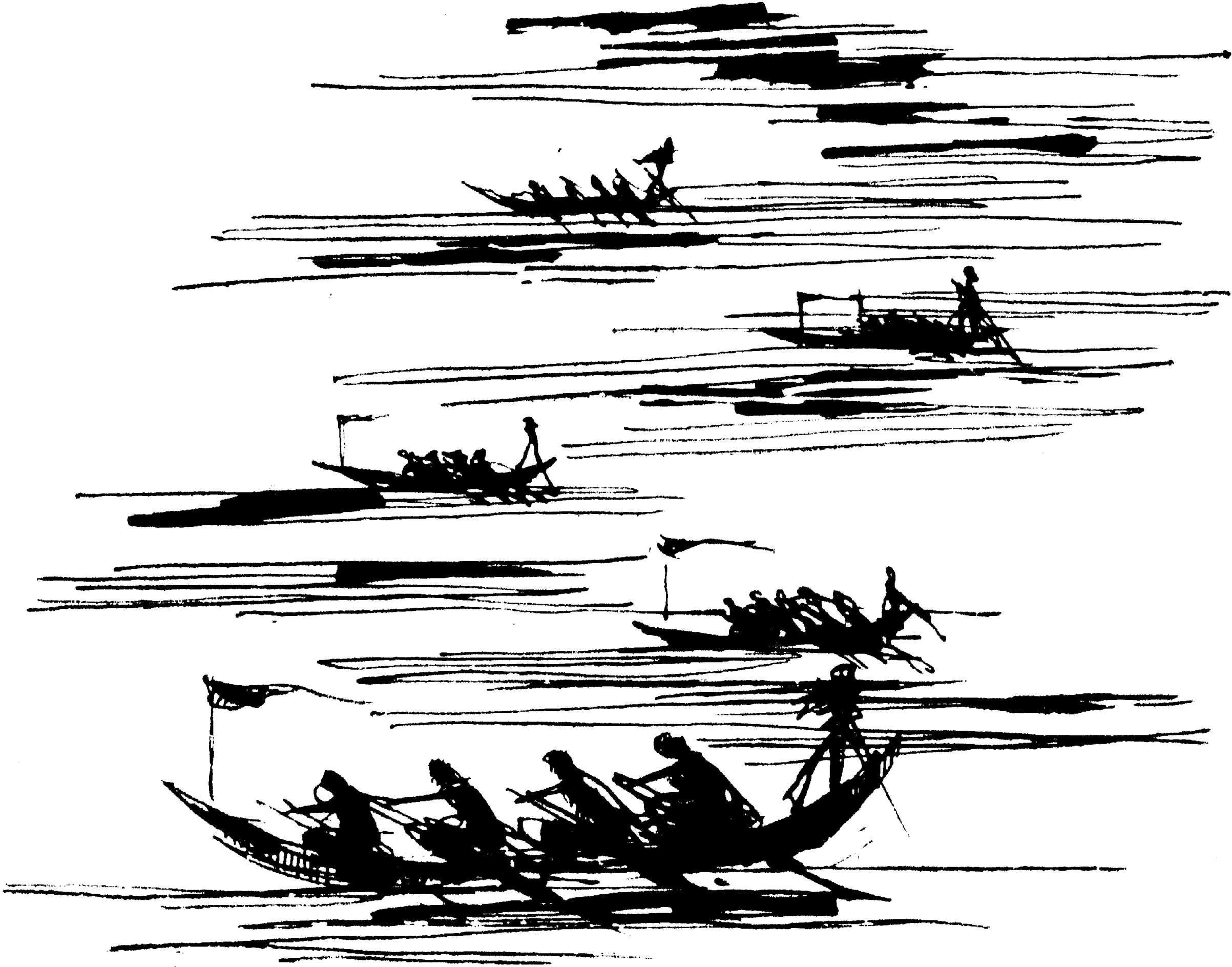
নদীর নাম ধলেশ্বরী।

ধলেশ্বরীর কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটি গ্রাম। পীর পাঁচনগর।

পীর পাঁচনগরে এখন কোন পীর সাহেবের দরগা নেই। শ'খানেক ঘর যা আছে, তার সবই তপশিলীদের। তবুও গ্রামের নাম পীর পাঁচনগর।

গ্রামের নাম নিয়ে অধিবাসীদের মনে কোন খট্‌কা নেই। তাদের কাছে ধলেশ্বরী যেমন, পীর পাঁচনগরও তেমনই। এ নাম ছাড়া যেন এ গ্রামকে মানায় না। এ গ্রামের লোকদের তাই ধারণা।

এদের অধিকাংশই চাষবাস করে। কেউ কেউ আবার 'কেড়াইয়া' নৌকো বায়। গঞ্জে গিয়ে হাট-পাট করাও কারো কারো পেশা।

তবে, যে কাজই করুক, এদের ভাত আসে চাষ থেকে। যে বছর চাষ মারা যায়, এদের ঘরে সে বছর হা-ভাত।

এবার বুঝি তাই-ই হয়।

বৈশাখ গেল। জ্যৈষ্ঠ গেল। আষাঢ়ও যায় যায়। তবুও আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। এক ছিটে বৃষ্টি নেই।

পীর পাঁচনগরের মানুষদের প্রাণ ত্রাসে শুকিয়ে গেল।

সবার মুখেই এক কথা : ইবার মরণ লাগব। খ্যাতে হাল পইলো না। চাষ অইলো না। পোলাপান লইয় কি খাইয়া বাচুম?'

সকালে সভা বসে। সন্ধ্যায়ও তাই। কানু মোড়লের বাড়ীর হুঁকোর কলকে আর জুড়োয় না।

গাঁয়ের ভেতর কানু মোড়লের অবস্থা ভালো। বড় জোত আছে। দুখানা কেড়াইয়া নৌকো আছে। আছে গুটি ছয়েক গরু।

বিপদে আপদে পীর পাঁচনগরের লোকেরা এসে কানু মোড়লের দাওয়ায় ভীড় জমায়।

এবারও তাই জমিয়েছিল।

কিন্তু কারো মুখে কথা নেই। সবার মুখেই ভীতি। চোখে উদ্বেগ। কপালে চিন্তার রেখা।

প্রথম কথা বলল পাঁচু মন্ডল। হুঁকোয় সুখটানটা শেষ করে সে বললো, 'ইবার তয় কি অইব কান্দা? দ্যাবতা গোঁসা কইরা যদি জল না দ্যান, আমরা বাঁচি ক্যামনে কও।'

'হ। আমরা বাঁচি কি কইরা?' পাঁচু মন্ডলের কথার সঙ্গে কথা টানল অশ্বিনী সরকার। চওড়া টাকে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললো, 'খ্যাতখ্যান শ্মশানগো মোড়ল! একেবারে খাঁ খাঁ করে। তার দিকে আর চায়ন যায় না।'

কার্তিক সরদার এর সঙ্গে আরও একটি দীর্ঘশ্বাস যোগ করলো, 'ইবার মরণই লাগবো। হক্কলেরি মরণ লাগবো। যা খাইয়া জীবনরক্ষা, হেই দানাই যদি না পাইলাম, প্রাণ রাখুম কি দিয়া?'

কানু মোড়লের দাওয়ায় একটা থমথমে ভাব। মোটা মোটা দীর্ঘশ্বাস। মাঝে মাঝে দু'একটি কথার কান্না। পীর পাঁচনগরের অনেকগুলি পাকা মাথা কানু মোড়লের পাকা দাওয়ায় যেন মাথা ঠুকছে।

এমন সময় একটা গানের সুর ভেসে এলো বাতাসে। এক ঝাঁক গলা এক সঙ্গে গান গাইছে।

কানু মোড়ল বলল, 'গান? ই আঁদনে গান কিসের? ই দিনে গান আসে কি

কইরা?' মোড়লের গলায় যেন একটা-কড়া ঝাঁঝ।

অশ্বিনী সরকার বলল, 'ছ্যামড়া-ছেমোড়িরা বুঝি ম্যাঘা রাজার বরণ বাইর করচে। হেই গান।'

'অ।'

বলতে বলতে হাসলো মোড়ল। তার চড়া সুর খাদে নামলো।

বলল, 'তা গাউক। তা গাউক। ম্যাঘের গান গাউক। তা শুইনা দ্যাবতার যদি দয়া হয়। দক্কিন থিকা এই পীর পাঁচনগরের উপর যদি উইড়া আসে।'

গান এবার আরও কাছে এসেছে। একেবারে কাছে। দাওয়ায় বসে সবাই গায়কদের কলরব, পায়ের শব্দ সবই শুনেছে।

গায়কদল কানু মোড়লের বাড়ীতেই ঢুকল।

ধুলট ম্যাঘা, তুলট ম্যাঘা
তোমরা সবাই নামো,
আলিয়া ম্যাঘা, কালিয়া ম্যাঘা
তোমরা সবাই ঘামো।'

পীর পাঁচনগরের একদল ছেলে মেয়ে। দলের মাথায় যে মেয়েটি, ওর গলাই বাঁশীর মতো বাজছে।

কানু মোড়ল কার্তিক সর্দারকে বললো, 'মাইয়াডি কার হে কেতো? খুব টনটইন্যা মাইয়া তো!'

মোড়লের কথায় একটু হাসলো কার্তিক। বললো, 'ক্যান, আপনি চিনেন না? ও-তো চাম্পা, বিপিন খুড়ার মাইয়া। আপনার মাখনো তো—'

কার্তিক সর্দার বলতে বলতে হঠাৎ কথার রাশ টেনে ধরলো।

কানু মোড়ল তার দিকে একবার চেয়েই চম্পার দিকে চোখ ফিরালো। চম্পাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

দুই

কানু মোড়ল মিছে কথা বলেনি। বিপিন মণ্ডলের মেয়ে চম্পা সত্যি টনটনে মেয়ে। কতোই বা বয়েস হবে তার? তেরো চৌদ্দ? বড় জোর পনেরো। পনেরোর বেশী কিছুতেই নয়।

কিন্তু এ বয়সেই সে পাকা পাকা কথা বলে। গান গায় পাকা গায়কের মতো। আর তার দস্যিপণায় বিব্রত হয়নি, পাড়ায় এমনি ঘর খুব কমই আছে।

মা বকে। এ-কথা সে-কথা বলে।

শুনে চম্পা খিল্‌খিল্ ক'রে হাসে। বলে, 'ইস্, আবার রাগ করে দ্যাখো না। করলেই অইলো রাগ। ক্যান্, আমি কি করচি? কার বাড়া ভাতে ছাই দিচি?'

'তুই ফুল আনচ নাই? রাইমণিগো গাছ থিকা ফুল আনচ নাই? চুরি কইরা পদ্ম আনচ নাই?'

'ওঃ, হেই কথা?' বলতে বলতে চম্পা হাসে।

বলে, 'পদ্ম আনলে আবার চুরি অয় নাকি? জিগাও গিয়া দশজনারে। কি কয়, শোন গিয়া।'

'দশজনারে কি জিগামু? পরের বস্তুতে হাত দিলেই চুরি অয়। হ্যা ফুলই হউক, আর অন্য সামিগ্রীই হউক।' বলে মা গজগজ করতে করতে কাজে চলে যায়।

চম্পা কিন্তু দাঁড়ায় না।

মা আড়ালে যেতেই সে চুপচাপ দাঁড়ায়। এ-দিক সে-দিক তাকায়। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়েই একসময় সে ছুটে পালায়।

কানু মোড়লের পুত্র মাখনচন্দ্র তখন শীতলার বিলে ছিপ ফেলেছে। মাছ ধরছে। কিন্তু মাছের দিকে তার চোখ নেই। তার দৃষ্টি চড়াই পাখীর মতো এ-দিক সে-দিক উড়ে পড়ছে। কাকে যেন খুঁজছে।

এমন সময় চম্পা গিয়ে হাজির।

'মাখমদা!'

'চাম্পা?'

হঠাৎ চমকে উঠেই মাখনচন্দ্রের দৃষ্টিটা চম্পার মুখের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাসছে। মিটিমিটি হাসছে মাখনচন্দ্র। তার মুখের হাসি চোখের তারায় গিয়ে জ্বলছে। চোখের কালো তারা দুটি চকচক।

চম্পা আস্তে আস্তে বলে, 'মাছ পাইলা?'

'না-রে, মাছ পাইলাম কৈ? মাছের যে শালা আইজ কি অইলো, সুমুন্দির পুতেরা একটা ঠোক্কর পর্যন্ত দিল না।'

'আর দিবও না।'

'ক্যান্, ই কথা কইলি ক্যান্?'

'তুমি কি আর মাছ মারবার আহো?'

'তাইলে?'

মাখনচন্দ্রের দুটি বিস্ময়-ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল চম্পা। কি বলতে গিয়েও যেন বলল না। থামল। একবার ঢোক গিলে কথা ঘুরিয়ে নিল।

বলল, 'না থাউক।'

'থাকবো ক্যান্? থাকবো ক্যান্? কি কবি ক'।'

একমুখ দুষ্টু হাসি হেসে চম্পা বলল, 'না, কমু না।'

'ক' না!'—বলে মাখনচন্দ্র চম্পার একটা হাত ধরে জোরে চাপ দিল।

বলল, 'কবি না? কবি না? তর কয়ন লাগব। ক'—ক'। ভাল চাস ত ক'।'

চম্পা আড়োসড়ো হয়ে বলল, 'উঃ, উঃ লাগে, লাগে। ছাড়ো। ছাইড়া দ্যাও আমারে।'

'তাইলে ক'।'

'কই, কই। কমু, কমু। ঠিক কমু।'

'ক'।' বলে মাখনচন্দ্র চম্পার হাতটা ছেড়ে দিল।

চম্পা হাতটা ক'বার ঝোঁকে, ক'বার দেখে বলল, 'ইস্, হাতটা যেন গুড়া অইয়া গাচে। রক্ত জইমা আচে। কি হাতগো তোমার? য্যান বাঘ-ভল্লুকের থাবা।'

মাখনচন্দ্র মাথা নেড়ে বললো, 'তা হউক, তা হউক। থাবা বাঘেরই হউক, আর ভল্লুকেরই হউক—তাতে তর কি? তুই যে কথা কইচিলি, হেই কথা ক'। আসল কথা ক'।'

চম্পা একবার চোখ বুজে, একটু হেসে বললো, 'উঁহু, কমু না।'

'তাইলে—' বলেই মাখনচন্দ্র আবার চম্পার দিকে এগিয়ে এলো।

তরাসে একটু দূরে গিয়ে চম্পা বলল, 'কই, কই। কমু, কমু।'

মাখনচন্দ্র বলল, 'ক'।'

চম্পা দু'বার ঢোক গিলে, বারকয়েক চোখ দু'টিকে পিট্‌পিট্ করে হঠাৎ বলে উঠলো, 'মাখনদা, মাখনদা, দ্যাখো, দ্যাখো, মাছ আইচে। 'টোন' ডুবাইয়া ফ্যালাইচে। নিল, নিল, তোমার ছিপ টাইনা নিল।'

মাখনচন্দ্র হকচকিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল সব মিথ্যে। ছিপের 'টোন' জলে ভাসছে। কোথাও মাছের নাম-গন্ধও নেই।

'তবে রে মিথ্যুক—' বলে ফিরে তাকিয়ে মাখনচন্দ্র চম্পার ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

মুখে একটা যন্ত্রণার ভাব দেখিয়ে চম্পা বললো, 'ওরে বাপরে, গেলাম, গেলাম।'

'ক', তবে ক'। কি কইচিলি ক'।'

'কমু, কমু। হাত ছাড়ো। তাইলে কমু।'

মাখনচন্দ্র হাসল।

হেসে বলল, 'না, না। ছাড়ুম না। তুই মিথ্যা কস, তরে ছাড়ুম না।'

'কমু, কমু। ইবার সাচা কথা কমু। আগে ছাইড়া দ্যাও।'

মাখনচন্দ্র হাত ছাড়লো না। তবে হাতের মুঠিটা একটু আলগা করে বলল, 'ক', কি কইচিলি ক'।'

'এই কইচিলাম কি, কইচিলাম কি—' বলতে বলতে চম্পা দু'বার ঢোক গিলল। একবার মাখনচন্দ্রের চোখে চোখে তাকাল।

তারপর বলল, 'কইচিলাম কি, কইচিলাম কি, তুমি মাছ ধরবার আসো না, তুমি আসো—'

মাখনচন্দ্র চম্পার হাতে আবার একটু চাপ দিয়ে বলল, 'ক'। ক্যান্ আসি ক'।'

চোখ দু'টি বুজিয়ে, মুখে দুষ্টুমিভরা মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে চম্পা বলল, 'কমু? কমু? সাচা কথাডা কমু?'

'ক'।'

'তুমি আসো আমার লিগা।' বলে চম্পা ছুটে পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু পারলো না। তার হাত তখনও মাখনচন্দ্রের হাতে। মাখনচন্দ্র সেই হাতে আলতো একটু চাপ দিয়ে চম্পাকে আরও কাছে টেনে নিল।

তিন

চম্পা যেন কি করেছে মাখনচন্দ্রকে। সারাদিন সে তার কথা ভাবে। তার নাম দিয়ে গান বানায়। সে গান গায়।

'ওলো, চম্পা কলি
আমি অলি
তর রূপেতে মুগ্ধ,
আমারে চাস?
দিব আমায়
হৃদয়খানা শুদ্ধ।'

গান গাইতে গাইতে মাখনচন্দ্রের দু'-চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে।

কোন কোনদিন চম্পাকে বলেই ফেলে সে, 'আমার ই কি অইলো চাম্পা?'

চম্পা জল নিতে ঘাটে এসেছিল। কাঁখের কলসীটা মাটিতে নামিয়ে সে উত্তর দিল, 'কি মাখনদা?'

'তুই আমারে কি গুণ করচস্?'

মাখনচন্দ্রের কথায় হাসে চম্পা। হেসে বলে, 'ক্যান্? ই কথা কও ক্যান্ আমি তোমারে কি করুম?'

চম্পার চোখে চোখ রেখে মাখনচন্দ্র বলে, 'তুই আমারে পাগল করচস্ চাম্পা, তর লিগা আমি পাগল অইয়া গেচি।' বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস মাখনচন্দ্রের বুককে উজাড় করে দিয়ে বাতাসে উড়ে গেল।

চম্পা বলল, 'ধ্যেৎ, তুমি পাগল অইবা ক্যান্? কি অইচে তোমার? যেমুন ছিলা তুমি তেমুনেই আচো।'

'না নাই। আমি আর আগের মতন নাই। আমার চক্ষে ঘুম নাই। আমার নাওয়া-খাওয়া নাই।' বলতে বলতে মাখনচন্দ্রের চোখ থেকে ক'ফোঁটা জল গাড়িয়ে পড়লো। একটু থেমে, একটু ভেবে সে আবার বললো, 'তুই আমার পর অইয়া গেলি চাম্পা?'

মাখনচন্দ্রের চোখের দিকে চোখ তুলতে গিয়ে চম্পার চোখ থেকে দর্‌দর্ ক'রে জল গাড়িয়ে পড়ল।

বলল, 'পর? আমি তোমার পর অমু ক্যান্ মাখমদা?'

'তুই আমারে ডাকচ না। আগের মতন কথা কস না।'

চোখে জল নিয়েও হাসল চম্পা।

বলল, 'আমি কি আর আগের মতন আচি মাখমদা? এহন আমি বড় হই নাই? আমার বয়স হয় নাই? এহন কি আর আমি আগের মতন তোমার কাছে আইবার পারি?'

'কিন্তু তরে ছাইড়া যে আমি থাকবার পারি না চাম্পা। তরে না দেখলে যে আমি চক্ষে আন্ধার দেখি।'

মাখনচন্দ্রের চোখের দিকে আবার চোখ তুলল চম্পা। তার চোখের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'তাইলে আর আমারে দূরে রাখচো ক্যান্, একেবারে তোমার কইরা লও না।'

'নিমু, নিমু। ভাল মাস-দিন আহুক, তখন নিমু। তরে কাছে না নিলে যে আমি বাচুম না চাম্পা!'

মাখনচন্দ্রের কথায় চম্পার দু'চোখ ভরে আবার জল এল।

ধলেশ্বরীর ও-পাড়েই বড় গঞ্জ। উৎসব-পরবে গঞ্জে মেলা হয়। মাখনচন্দ্রও সে মেলায় যায়।

কিন্তু মেলায় গিয়েও চম্পার কথাটা প্রথমেই মনে আসে মাখনচন্দ্রের।

আহা, চম্পাকে নিয়ে যদি সে মেলায় আসতে পারতো।

পীর পাঁচনগর থেকে সুনামগঞ্জ তো আর বেশী দূরের পথ নয়।

পীর পাঁচনগরের পাশে একটি খাল। সে খাল গিয়ে পড়েছে ধলেশ্বরীতে। এই ধলেশ্বরী পাড়ি দিলেই সুনামগঞ্জ।

চম্পা আসতে চাইলে মাখনচন্দ্র অনায়াসেই তাকে মেলায় নিয়ে আসতে পারত।

কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। চম্পা এখন বড় হয়েছে। মেলায় সে আসবে না। তার মা তাকে আসতে দেবে না।

তবুও মেলায় এসে প্রথমেই চম্পার জন্যে চুড়ি কেনে মাখনচন্দ্র। রং-বেরং-এর রেশমী চুড়ি। চম্পার সুডৌল দু'টি হাতে সে চুড়ি কি চমৎকার মানাবে।

নিজের মনেই যেন চম্পার হাত দু'টি একবার দেখে নেয় মাখনচন্দ্র। তার চোখের দু'টি কালো তারা খুশীতে চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

চুড়ির পরে মালা। মুক্তোর মালা। দেখে-দেখে, বেছে-বেছে মাখনচন্দ্র একটি মুক্তোর মালাও কেনে।

আহা, এ মালায় চম্পাকে কি সুন্দর দেখাবে! মালা পরে' চম্পা যখন কথা কইবে, মালার মুক্তোগুলি তখন তার বুকের উপর নাচবে। ঝিলমিল করবে। তার সঙ্গে ঝিল-মিল করবে খুশীতে উপচে পড়া চম্পার ডাগর ডাগর দু'টি চোখ।

মাখনচন্দ্রের মনে যেন একটা খুশীর তরঙ্গ বয়ে যায়।

মেলা থেকে বেলাবেলিই ফেরে সে। পীর পাঁচনগরের খালের ধারেই চম্পাদের বাড়ী। খালে নাও পড়তেই মাখনচন্দ্র গানে টান দেয়।

চম্পা যেন এ গানের অপেক্ষাতেই ছিল। গান শুনে দৌড়ে দুয়ারে এসে সে ডাকে 'মাখনদা'!

নাও থেকেই মাখনচন্দ্র জবাব দেয়, 'চাম্পা'।

'মেলা থিকা আইলা নাকি?'

'হ।'

'আমার লিগা কিছু আন নাই?'

নাওটা চম্পাদের ঘাটে ভিড়াতে ভিড়াতে মাখনচন্দ্র বলে, 'আনচি, আনচি। আলতা কাঁটা চুড়ি আনচি। মুক্তাফলের মালা আনচি। আর আনচি কাঁচপোকার টিপ। দেখবি?'

'হ।'

'তাইলে নাওয়ে আয়।'

'না। তুমি আসো। মা বাড়ীতে নাই।'

'তাই নাকি?'—বলে 'নাও' থেকে লাফিয়ে নামলো মাখনচন্দ্র।

নলি বাঁশের বেড়ায় গড়া ঘর চম্পাদের। বারান্দাও নলি বাঁশের আঠন দিয়ে জাফরি কাটা।

মাখনচন্দ্র সেই বারান্দায় গেল।

চম্পা বলল, 'তোমার লিগা কিছু আনো নাই?'

'আনচি। তা-ও আনচি। তল্লা বাঁশের বাঁশি আনচি। আমি বাজামু। তুই শুনবি।'

'বাজাইবা?'

'ধ্যেৎ, এখন বাজায় নাকি? লোকে কইব কি?'

একটু থেমে মাখনচন্দ্র আবার বলল, 'ইবার চউখ দুইডা বুজা দেখি।'

'ক্যান?'

'এমনি।'

চম্পা চোখ বুজলে মাখনচন্দ্র তার গলায় মুক্তার মালাটি পরিয়ে দিল।

চোখ খুলে চম্পা বলল, 'কি সুন্দর মালাগো! ই মালা আমি পরুম না। রাইখা দিমু।'

মাখনচন্দ্র বলল, 'ক্যান্, রাখবি ক্যান্। আমি কি রাখবার লিগা কিনা আনচি?'

মাখনচন্দ্রের চোখের দিকে চোখ তুলে চম্পা বলল, 'ভাল মাস, ভাল দিনে তুমি যখন আমায় ঘরে নিবা, তখন আমি ই মালা পরুম। এখন পইরা লাভ কি? কে দেখব ই মালা?' বলতে বলতে চম্পার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে গেল।

মাখনচন্দ্রের চোখদুটিও এখন যেন অনেকটা সজল।

চার

শাওনের শেষে মনসা পুজো। পুজোর পরে ভাসান। এই ভাসানের সঙ্গে সুনাম-গঞ্জে বাইচ হয়। নৌকো বাইচ। দেশ-বিদেশের নাও এসে এ বাইচে যোগ দেয়।

এবারও বাইচ হবে। হাটে হাটে ঢেঁড়া পড়েছে। মাখনচন্দ্রের এখন ফুরসৎ কম।

সে এখন নাও নিয়ে ব্যস্ত। নাওয়ের গায়ে সে গাব দিয়েছে। আঠা মেখেছে। গঞ্জ থেকে বড় একটি নিশান এনেছে। লাল

রং-এর। তার গায়ে সাদা কাপড়ে পীর পাঁচনগরের নাম লেখা।

এতো ব্যস্ততার মধ্যেও চম্পার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় মাখনচন্দ্রের।

চম্পা গাল ফুলিয়ে বলে, 'নাও-এর লগে পিরিত করচো, নাও লইয়া থাকো গিয়া। আমারে কি দরকার? আমি তোমার কে?'

চম্পার ডান হাতটি জড়িয়ে ধরে মাখনচন্দ্র।

বলে, 'ছিঃ ছিঃ, অমন কথা কইস না চম্পা, অমন কইরা কইস না। তুই আমার কে তা কি তরে নতুন কইরা কওন লাগবো?'

চম্পা ভারি গলায় বলে, 'যাও, ই সব তোমার মুখের কথা। তুমি গান বানাও। ই-ও তোমার বানাইনা কথা। নাইলে, হাঁত উঁতে ঘুইরা ব্যাড়াই, মুখখান তোমার দেখি না। মনের টান থাকলে কাম ছাইড়াও আইতা একবার।' বলতে বলতে চম্পার দুটি চোখ ছলছল করে ওঠে।

মাখনচন্দ্র তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'চাম্পা, তুই কানচস্?'

চোখের জল মুছতে মুছতে চম্পা বলে, 'না, না। কান্দুম ক্যান? কান্দুম ক্যান? কোন্ দুঃখে কান্দুম? কি দুঃখু আমার?'

চম্পার চোখ থেকে আবার ঝরঝরিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

মাখনচন্দ্র তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বলে, 'আসুম, আসুম। কথা দিলাম আসাম'। বাইচ আমার চুলায় যাউক। তর কাছে আসুম।'

এবার চম্পা হেসে ফেলে।

বলে, 'কি কও? বাইচ ছাড়বা? আমার লিগা বাইচ ছাড়বা?'

মাখনচন্দ্র বললো, 'ছাড়ুমনা তয় কি? বাইচের লিগা কি তরে হারামু?' বলতে বলতে মাখনচন্দ্রের দু' চোখে জল টলটল করে ওঠে।

চম্পা বলে, 'বাইচের লিগা তোমার কত নাম। দশজনে তোমার নাম কয়। ভাল কয়। তুমি বাইচ ছাড়বা না। আমি তোমায় বাইচ ছাড়বার দিমু না। কও, কথা দাও, বাইচ তুমি ছাড়বা না?'

'তুই গোঁসা করবি না?'

'না।'

একটু থেমে চম্পা আবার বলে, 'তুমি বাইচও করবা, আমার কাছেও আসবা। তোমায় একটি দিন না দেখলে আমার ভাল লাগে না যে।'

চম্পার কথায় মখনচন্দ্র হেসে ফেলল। বললো, 'আইছা, আইচ্ছা। বাইচও দিমু, তর কাছেও আসুম। তর কথা রাখুম।'

'সাচা কথা কইচো।'

চম্পার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মাখনচন্দ্র বলল, 'হ, হ। সাচা কথা।'

আনন্দে চম্পার ডাগর ডাগর চোখের দুটি পাতা যেন বুজে আসে।

আজ বাইচ।

সকাল থেকেই মাখনচন্দ্রের একদণ্ড ফুরসৎ নেই। তবু এরই মধ্যে একবার সে খালের ধারের বট গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। এখানেই চম্পা রোজ জল নিতে আসে।

বেলা হয়েছে। সূর্যটা পূবের আকাশে অনেকখানি উঠেছে। সারা পীর পাঁচনগর যেন রোদের সোনায় স্নান করছে।

দূরে থেকেই মাখনচন্দ্র দেখলো, একটি টিয়ে রংয়ের শাড়ী পরে চম্পা জল নিতে আসছে।

তার বুকটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল।

দূর থেকেই সে ডাকল, 'চম্পা!'

চম্পা দৌড়ে এল বটগাছটার নীচে।

বলল, 'মাখনদা'।

'আইজ যামু। সুনামগঞ্জে বাইচ দিবার যামু।'

'যাইবা?'

বলতে গিয়ে চম্পার দু'চোখ দিয়ে যেন একটা খুশীর আলো ঠিকরে বেরুল।

মাখনচন্দ্র বলল, 'হ, যামু। যামু না ক্যান্? বাইচ জিতে তর লিগা মেডল নিয়া আসুম না?'

'মেডল আনবা?'

'হ, হ। আনুম, আনুম। মেডল আইনা তর গলায় পরামু।'

চম্পা একটা নকল বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলে, 'যাও, তুমি খালি মসকরা কর।'

'ধ্যাৎ, মসকরা করুম ক্যান? মসকরা করুম ক্যান্? সুনামগঞ্জে আইজ বাইচ দিবার যামু, আইজ মসকরা করুম কেই লিগা?'

একটু থেমে মাখনচন্দ্র আবার বলল, 'তর নাম লইয়া নাওয়ে নিশান উড়াইচি চম্পা, বাইচ জিতলে তরই জিৎ। মেডল ত তরই।'

চম্পার মুখে হঠাৎ যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়েছে। তার ডাগর ডাগর দুটি চোখ যেন ছল ছল করে উঠছে। ভীরু পাখীর মতো সে মাখনচন্দ্রের আরও একটু কাছে এসে দাঁড়াল।

বললো, 'আমার যে ডর লাগে মাখমদা?'

'দূর ছাই। ডর কিরে? বাইচ দিবার যামু, হেইতে ডর কি? ই কি চর দখলের কাইজা? বাইচ, বাইচ। হেইতে আবার ডর কি?'

চম্পার তবুও ভয় গেল না। কয়েক ফোঁটা জল তবু তার চোখ থেকে টসটস করে ঝরে পড়ল।

বলল, 'আমার মাথা খাও, কাইজা-কাটিতে যাইবা না কও। মেডল না অয় না পাইবা। কি অইবো আমার মেডল দিয়া? আমার মুক্তার মালা আচে না? হেই যে মেলাত থিকা কিনা আনচিলা? হেই মালা গলায় পরমু। তুমি দেইখা সুখ পাইবা।'

চম্পার কথায় খুশী হয় মাখনচন্দ্র। তার হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে বলে, 'না, কাইজা করুম ক্যান্? কাইজা করুম ক্যান্? বাইচ দিমু মর্দের নাগাল। জলের উপর দিয়া নাও উড়াইয়া নিমু। কোন হুমুন্দির পো-ই আমার নাওয়ের লাগদু পাইব না। তর কাইজা অইবো ক্যান্?'

একটু থেমে মাখনচন্দ্র আবার বলে, 'তুই ডরাইস্ না চম্পা। বাইচ জিতা মেডল নিয়া আসুম। পীর পাঁচনগরের মান রাখুম। দশজনে আমার নাম কইবো। বাইচে আবার ডর কিরে? ফি বছর অাইচেনা বাইচ? কোথায় কোন্ কাইজা অইচে?'

চম্পা বলল, 'তা না হউক, আমার তবুও ডর করে।'

একটু থেমে, একবার ভেবে চম্পা আবার বলল, 'তুমি না ফিরন, তক আমি পাগলি ছিগলি হমু। কথা দাও, ফিরন কালে ইহান দিয়া সারি গাইয়া যাইবা। ঘরে বইহা আমি তা শুনুম। বুকেডা আমার শেতল অইবো।'

মাখনচন্দ্র হেসে বলল, 'শুধু সারি গামু ক্যান? তগো বাড়ীতে নামুম। তরে ডাইকা তুলুম। গলায় তর মেডল ঝুলাইয়া দিমু।'

'ধ্যেৎ, নায়ে কতো লোক থাকবে, তোমার সরম অইবো না?'

'না।'

'তুমি কি গো? অ্যাতো মাইনষের কাছে তোমার সরম অয় না?'

'না।' বলে মাখনচন্দ্র চম্পার গালে আস্তে একটা টোকা দিল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'নিজের জিনিষের কাছে আসুম, তয় সরম কি? আমি ত আর পরের সামিগ্রিতে হাত দেই নাই? তয় সরম করুম ক্যান্?'

চম্পা বলল, 'তা হউক। আমার কিন্তু সরম করে।'

'দুই-চাইর দিন। আগে তরে ঘরে নেই, তখন দেখবি আমার নাগাল তরও সরম গ্যাচে।' বলে মাখনচন্দ্র ফিরতি পথে এগিয়ে গেল। সেখান থেকেই মুখ ঘুরিয়ে আবার বলল, 'তুই ভাবিস না চাম্পা, বাইচ সাইরা তাড়াতাড়িই আমি আসুম। তর লিগা মেডল নিয়া আসুম। তর গলায় মেডল দিমু কিন্তু।'

মাখনচন্দ্র এবার দৌড়ে গাছের আড়াল হয়ে গেল। চম্পা তখনও বট গাছটার নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁচ

বাইচ শুরু হলো বিকেলে। দুপুর থেকেই নাও আসছিল। এ-খাল সে-খাল দিয়ে। এ-দেশ সে-দেশ থেকে। সারিগান আর টিকারার শব্দে সুনামগঞ্জের ধলেশ্বরী মুখর।

মাখনচন্দ্রের নাও-ও ধলেশ্বরীতে পড়লো। বড়ো সুন্দর সাজে আজ সেজেছে মাখনচন্দ্র। কুঁচিয়ে কাপড় পরেছে। জামা দিয়েছে গায়। সাবানে ফুলানো বাবরীটা বেঁধে রেখেছে লাল শালুর ফিতে দিয়ে। পায়ে বাঁধা ঘুঙুর।

সেই ঘুঙুরের তালে তালে গান গাইছে মাখনচন্দ্র। কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে।

আর তারই সঙ্গে তাল দিয়ে নাওয়ের দু'পাশ থেকে বৈঠা পড়ছে জলে।

বৈঠা নয় যেন ঝাঁক ঝাঁক সাপের জিভ। ধলেশ্বরীর ছন্দ দুলিয়ে চলেছে।

মাখনচন্দ্র গান ধরেছে :

'গন্ গন্ গন্ করে সোনার গাঁও
মাঝিরে
কোন্ বা দ্যাশে বাইয়া যাও নাও।
আমি নাকোরি ব্যাসন
তরে থইলা দিমরে
অবলার ঘাটে লাগাও নাও।
মাঝিরে, কোন্ বা দ্যাশে বাইয়া
যাও নাও।'

গান চলেছে। বাইছালরা তাল ঠুকছে বৈঠা দিয়ে। মাঝে মাঝে মুখে বলছে, 'আহা, বেশ, বেশ, বেশ।' মাখনচন্দ্রের নাও সুনামগঞ্জের গা ঘেঁষে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

সবার মুখেই মাখনচন্দ্রের প্রশংসা।

বাইচ শুরু হল আরও পরে। ধলেশ্বরীর উপর দিয়ে এক ঝাঁক নৌকো যেন পাখীর ঝাঁকের মতো উড়ে চলল। কিন্তু হঠাৎ সোরগোল।

সোরগোল উঠছে মাঝ ধলেশ্বরী থেকে। মাখনচন্দ্রের নাও এগিয়ে চলছিল। মালাকটেকের কলিমুদ্দিন নাও দিয়ে তার মুখ আটকে দিল।

আয় যায় কোথায়!

বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলো মাখনচন্দ্র : 'পাজি, বদমাইস।'

'মুখ সামলাইয়া কথা কইস, মাখনা।'

'মুখ সামলাইয়া কথা কম। তবেরে শালা—' বলে মাখনচন্দ্র একটি ধারালো সড়কি কলিমুদ্দিনের পেটে বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো কলিমুদ্দিনের পেট থেকে। দু'হাতে তা চেপে ধরতে গিয়ে কলিমুদ্দিন নদীতে গড়িয়ে পড়ল।

সোরগোল পড়ল দু নায়ে।

দু নায়েরই বাইছালরা বৈঠা নিয়ে উঠল। তুবড়ীর মতো মুখে ছুটলো অকথ্য গালিগালাজ। দু নায়েই মারামারি। দাপাদাপি। চীৎকার। তারই মধ্যে এক সুযোগে মাখনচন্দ্র ধলেশ্বরীতে লাফিয়ে পড়ল।

বেলা গড়িয়ে রাত হয়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চম্পা এরই মধ্যে ক'বার খাল ধারটা ঘুরে গেছে।

যাবার আগে মাখনচন্দ্র বলেছিল, 'আসুম, আসুম। বাইচ জিতাই তর কাছে আসুম। তর গলায় মেডিল পরাইয়া দিমু।'

কিন্তু রাতেও কি বাইচ হয়? রাত তো মেলাই হলো। এখনও কি সুনামগঞ্জের বাইচ শেষ হয়নি?

প্রশ্নটি চম্পার বুকে খচ করে বিঁধে যায়। সে অনেক দূরে তাকায়।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। বেশী দূরে দৃষ্টি যায় না। তবুও সে খালের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

কোন কিছুর শব্দ হলেই সে কান পেতে শোনে।

নাওয়ের শব্দ না? গানের শব্দ না?

সে ঢেউয়ের দোলা তাকে অনেকটা দূরে ঠেলে নেয়। সে অনেকটা পথ দৌড়ে যায়।

'মাখমদা......মাখমদা'......। চম্পার ডাক দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে আবার ফিরে আসে। তার বুকে ধাক্কা দেয়। নিজের ডাক নিজের কাছেই যেন ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

বেদনায় চোখে জল নামে চম্পার। একটা ব্যথা যেন তার বুকের পাশটাকে কুটকুট করে কাটছে। বুকটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

গভীর হতাশায় চম্পা ঘরে ফেরে। কিন্তু ঘরেও তার মন টেকে না। ছটফট করে। জ্বলে।

মা বলে, 'আবাগীর রকম দেইখা মরি। যে আসবার আসবো অনে। আইস্যা ডাকবো অনে। নে, নে ঘুম আয়।' বলে মা আবার পাশ ফিরে শোয়।

কিন্তু চম্পার চোখে ঘুম নেই। চোখের জলে ঘুম ডুবে গেছে। সে জল ঠেলে ঘুম উঠবে না। ঘুম আসবে না।

চম্পা বিছানাতেই বসে থাকে। রাত বাড়ছে। শন্ শন্ করে বাতাস বইছে। ডাল-পালাগুলি এলিয়ে পড়ছে গাছের ঘরের চালে। খট্ খট্ একটা আওয়াজ করছে।

'চম্পা!'

বেড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মাখনচন্দ্র। ধলেশ্বরী সাঁতরে সে পাড়ে উঠেছিল। পালিয়েছিল একটা ঝোপের আড়ালে। তারপর রাতের অন্ধকারে সে অনেকটা পথ হেঁটেছে। হেঁটে চম্পাদের বাড়ী এসেছে।

বেড়ার পাশের বাতাবী গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মাখনচন্দ্র আবার ডাক দিল, 'চাম্পা!'

প্রথম ডাকে চমকে উঠেছিল চম্পা। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল, এ-ও বুঝি গাছেরই শব্দ। গাছের ডাল ঘরের চালে লেগে আওয়াজ করছে। সেই আওয়াজই তার কানে নিজের নামের মতো বাজল।

কিন্তু এবারের ডাকে চম্পা ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। ঘরের খিল খুলল। দৌড়ে এল বাইরে।

বাতাবী গাছটার নীচে মাখনচন্দ্র দাঁড়িয়ে। চম্পা ছুটে গিয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'মাখমদা! মাখমদা! আইচো? আইচো? মেডিল আনো নাই? মেডিল?'

মাখনচন্দ্রের চোখে জল। কাপড়-চোপড় ভিজে ছপ্ ছপ্।

সেই ভিজে বুকেই চম্পার মাথাটা চেপে ধরে সে বলল, 'মেডিল গাঙের জলে বাসাইয়া দিয়া আইচি চাম্পা, লগে লগে তরেও।'

'কও কি? কি অইচে তোমার?' চোখের জল মুছতে মুছতে মাখনচন্দ্র বল, 'প্রতিমা ডুবাইয়া আইচি চাম্পা। আমি খুন করচি।'

আহত পাখীর মতো দাপিয়ে উঠে চাম্পা বলল, 'খুন করচো? মানুষ মারচো? হায়, হায়, তুমি ই কাম করবার গেলা ক্যান্? ই কাম তুমি করলা ক্যান?'

চম্পার কথায় নিজের কপালে বার কয়েক চাপড় মারল মাখনচন্দ্র।

বলল, 'আমি করি নাই। আমি করি নাই। আমার কপালে করাইচে। পোড়া কপালে।'

একটু থেমে, চম্পার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে মাখনচন্দ্র আবার বলল, 'তরে লইয়া ঘর বান্ধন বুঝি ভগমান আমার কপালে ল্যাকে নাই। তাই আমারে দিয়া খুন করাইল চম্পা। তর কাছ থিকা সরাইয়া দিল।'

'না, না। আমি মানুম না। আমি মানুম না। কপালের ল্যাকা মানুম না। তোমার কাছ থিকা আমি সরুম না। তোমার কাছ থিকা সরলে যে আমি বাচুম না মাখমদা।' একটা দুরন্ত আবেগে হঠাৎ জ্বলে উঠেই চম্পা যেন আবার ছাই হয়ে গেলো।

মাখনচন্দ্র বলল, 'ছিঃ, পাগলামি করচ ক্যান্, পাগলামি করচ ক্যান্? তুই মরবি ক্যান্? তর কতো রূপ—'

'রূপে আমি আগুনে জ্বালাইয়া দিমু।'

'তর চউখ কত সুন্দর।'

'যে চউখে তোমারে দেখমু না, কাঁদি কিন্দাইয়া হ্যা চউখ আমি আন্দা কইরা ফ্যালামু।' বলে চম্পা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গাছের ডালে কি একটা পাখী যেন পাখা ঝাড়ছে। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে। দূরে আরও ক'টি পাখীর পাখা ঝাপটানি শোনা গেল।

রাত আর বেশী নেই।

মাখনচন্দ্র বলল, 'রাইত সাফ অইয়া আইচে। এখনই আমার যায়ন লাগবে। তুই ঘরে যা চাম্পা, আমার কথা তুই ভুইলা যাইস।'

'কি কইলা? কি কইলা? ভুইলা যামু? তোমারে আমি ভুইলা যামু? পিরিত আমার জলের দাগ কিনা, হাত লাগাইয়া মুইছা ফ্যালামু? হ্যা তুমি পারো মাখমদা', আমি পারি না।' বলতে বলতে চম্পা অভিমানে থরথর করে কেঁপে উঠল।

মাখনচন্দ্র তার গালে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আমিও পারি না। আমিও পারি না। বুক থিকা তর নাম মুইছা ফ্যালাইবার পারি না।' বলতে বলতে মাখনচন্দ্রের দু'চোখ দিয়ে দর-দরিয়ে জল নেমে এল।

এক হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে সে বলল, 'তবুও আমার পারন লাগব চাম্পা, তর মুখ চাইয়া পারন লাগব।'

চম্পা বলল, 'আমার মুখের মাথায় শলা, সুখের মুখে আগুন।' বলতে বলতে চম্পা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মাখনচন্দ্র বলল, 'ই জনমে অইলো না, আর জনমে আমরা ঘর বান্দুম। তরে লইয়া ঘর বান্দুম। ম্যাইনষের ম্যালে নয়, পইখ পাখালির লগে। হ্যা দিন—'

চম্পা প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বাধা দিল। বলল, 'আর জনম আমার চুলায় যাউক। আর জনমে য্যান তোমার লগে আমার দ্যাখা নয় অয়। তোমার পিরিতের আগুনে য্যান্ জ্বইলা পুইড়া না মরি।'

এবার চম্পার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল মাখনচন্দ্র। দূরে গেল।

দূরে গিয়ে বলল, 'রাইত নাই। আমি ই বার যাই চাম্পা।'

চম্পা আবার এগিয়ে এল। মাখন-চন্দ্রের বুকে মাথা রেখে বলল, 'যাইবা? কৈ যাইবা? কোহানে যাইবা?'

'যে দিকে চউখ যায়।'

'আমারেও নিয়া লও। তুমি যেথানে থাকবা, হ্যা জায়গা আমার বিন্দাবন। ছিক্ষেত্তর। আমারেও লইয়া লও।'

'না।'

'না? না ক্যান্?'

চম্পার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মাখনচন্দ্র বলল, 'হ্যা কথা তরে কইবার পারুম না।'

'কইবার পারব না?'

'না।'

'না? না-তো আমার কাছে আইচিলা ক্যান্? আমায় তয় ভুলইলা ক্যান্?'

"আমার যে ডর লাগে মাখনদা"

নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মাখনচন্দ্র বলল, 'কপাল, সবই আমার পোড়া কপাল। ই ভাঙ্গা কপালে কোন কিছু জোড়া লাগে না। ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা যায়।'

পাখী ডাকছে। ভোর হ'ল। আর দেরী করা যায় না।

চম্পার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মাখনচন্দ্র। মাঠের উপর দিয়ে জোরে ছুটল।

চম্পা প্রায় চীৎকার করে ডাকল, 'মাখমদা!' দূর থেকেই মাখনচন্দ্র উত্তর উত্তর দিল, 'আমি গেলাম পারচ ত তুই আমায় ভুইলা যাইস চম্পা।'

মাখনচন্দ্রের সে কথায় খোলা মাঠ যেন হা হা ক'রে উঠল। দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হলো। তারপর সে ধ্বনি যখন চম্পার কানে এসে বাজল, চম্পা তখন সেই বাতাবী গাছটার নীচে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

পাঠকের বৈঠক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্বপ্ন দিয়ে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

কেউ যদি এসে বলে বসে যে, "আমি অনন্তের একটি ক্ষুদ্র কণামাত্র", তাহলে তখন তাকে প্রশ্ন করতে হয়—"এ-সংবাদ এতটা নিশ্চিত হয়ে জানলে কি করে?" কিন্তু বক্তার নাম যদি কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং হয়, তাহলে আর কোনো প্রশ্নই উঠবে না। তিনি পারাসেলসাসের একটি অংশের মতই আকৃতিবিশিষ্ট। তার তাঁর রচনাও সেই ধারাশ্রয়ী। সম্মোহনকরণের আর্ট তাঁর করায়ত্ত এবং সেই মন্ত্রবলে তিনি তাঁর কালের ব্যাধিগ্রস্ত অনেক মানুষের রোগ নিরাময় করেছেন। সুতরাং তাঁর কথা আমাদের মেনে নিতে হবে। অনন্তের সঙ্গে আমাদের কোনো কালে পরিচয় ঘটেনি, তেমনই অচেতন বস্তুর মুখোমুখি এসেও পড়িনি কোনোদিন। কিন্তু অনন্তের সঙ্গে ইয়ুং-এর সাক্ষাৎকার প্রায় প্রাত্যহিক। তিনি অচেতনের কাছ থেকে শুধু যে বাণী লাভ করেন তা নয়, অতিসহজেই তার মর্মোদ্ধার করতেও পারেন।

ইয়ুং তাঁর জীবনের কাহিনী বলে গেছেন তাঁর শেষতম গ্রন্থে, এই গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর দু' বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের বক্তব্যবস্তু কিন্তু অচেতনের (unconscious) সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, আর এই অচেতনই তাঁর কাছে অনন্ত (infinite)।

এই বিচিত্র জীবনের কথা শুনতে আমাদের কান খাড়া করে থাকতে হবে, তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি কোনো কারণে আমরা যুক্তির মধ্যে অর্থ সন্ধান করতে যাই, তাহলে কিন্তু সব আনন্দ অন্তর্হিত হবে।

ইয়ুং-এর সঙ্গে যখন অচেতন জগতের অন্ধকারময় গভীরে আমরা অবতরণ করব, তখন বিনা লণ্ঠনেই সেই অতলে পথ চিনে চলার শক্তি আমাদের অর্জন করতে হবে। দান্তে যখন নরকের নিম্নতম স্তরে গিয়েছিলেন, তখন ত' তাঁর হাতে লণ্ঠন ছিল না। তিনি ভার্জিলকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। অচেতন জগতের এই অন্ধকারের অতলে স্বচ্ছন্দ বিচার করতে চাই পথপ্রদর্শক গুরুর নির্দেশ, তাঁর হাত ধরে পথ চলতে হবে। ইয়ুং-এর সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে সেই মানুষের পরিচয় আছে যিনি আসল রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর এই গোপন রহস্য যেহেতু হেঁয়ালি-ভরা সেই হেতু তিনিও আমাদের সঙ্গে হেঁয়ালি-ভরা ভাষায় কথা বলেছেন।
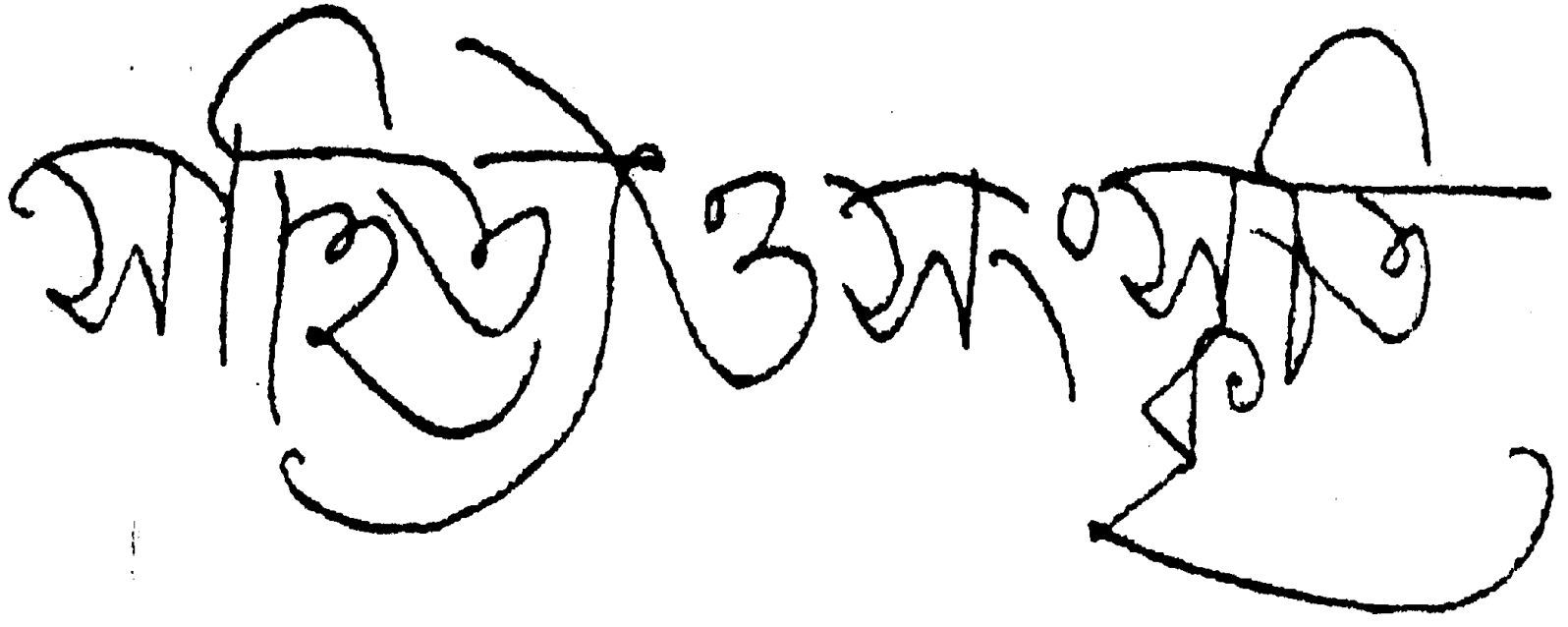
অতি সামান্যতম বস্তুও তাঁর কাছে একটা কঠিন প্রশ্নের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। আমরা যদি পরমান্ন ভক্ষণ করি, তখন প্রশ্ন করি না আমি পরমান্ন গ্রহণ করছি না পরমান্ন আমাকে ভক্ষণ করছে। আমরা যখন বালুবেলায় বা পর্বতপৃষ্ঠের কোনো প্রস্তর পাথরের ওপর বসি, তখন অন্তত নিশ্চিত ভাবেই আমরা জানি যে, হয় বালুবেলায় নয় পাথরের ওপর বসে আছি। কিন্তু নয় বছরের বালক ইয়ুং জানতেন যে পৃথিবীটা আমরা যতটা সমতল ভাবি, তা নয়, আসলে ভীষণ উঁচু-নীচু। বাড়িতে বাগানে বসে তিনি সবিস্ময়ে ভাবছেন:—

> "Am I the one who is sitting on the stone, or am I the stone on which he is sitting?

আমরা যদি এই প্রশ্ন করি তাহলে সবাই আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করবে। কিন্তু যে-নিজেই পুরুষ হাজার হাজার মানসিক ব্যাধি নিরাময় করেছেন, তিনি স্বয়ং যে একটা 'মেনট্যাল কেস' এ-কথা বলার স্পর্ধা কার?

কোন বস্তু হেঁয়ালি বা কি দিয়ে হেঁয়ালি গড়ে ওঠে, সেই বিষয়ে আমাদের ধোঁয়াটে ধারণা থাকতে পারে, তথাকথিত স্বাভাবিক, কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান পুরুষ কিন্তু ইয়ুং-এর চোখে মনে হয়—

> "Optimistic tadpoles who bask in a puddle in the sun in the shallowest of waters, crowding together and amiably wriggling their tails, totally unaware that the next morning the puddle will have dried up and left them stranded."

ইয়ুং কিন্তু ডোবা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তা ত্যাগ করে চলে আসতে পারেন কারণ, তাঁর অচেতন মন ঠিক উপযুক্ত সময়েই তাঁকে সতর্ক করে দিতে পারে। যখন তিনি শিশু মাত্র তখন এই অচেতন মন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। পরিণত বার্ধক্যে তিনি এই চেতাবাণী স্মরণ করেছেন আর সেই স্মৃতিচারণের মধ্যে আছে ফেলে-আসা অতীতের প্রতি মমত্ববোধ। তিনি বলছেন—

> "Who spoke to me then? Who talked of problems far beyond my knowledge? Who brought the above and below together and laid the foundation for everything that was to fill the second half of my life with stormiest passions? Who brought the alien guest who came both from above and from below?"

এই উক্তি আমাদের সেই ভোজের মন্ত্র-সম্পর্কিত উক্তিকেই দুরূহতর করে তোলে। আমরা যদি কোনো অতিথিকে আমন্ত্রণ করি "একেবারে ওপরে এবং নীচে দু'দিক থেকেই", তাহলে কিভাবে যে তাঁদের আপ্যায়ন করব, তা ভেবে পাব না। কাকে চা দেব, না, কফি দেব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোও সহজ হবে না।

এমন এক অভ্যাগত যিনি বেশ কিম্ভূতকিমাকার, তাঁকে নিয়ে আমাদের মনে একটা অলৌকিক ভাব জাগ্রত হবে এবং স্বস্থ থাকা যাবে না। কিন্তু ইয়ুং-এর মন রীতিমত অলৌকিক, বিশেষ করে, তিনি যেভাবে শুধু 'অপরের' নয় 'অহং'-এর রহস্যও সমাধান করেন তার দ্বারাই এর উদ্ভব ঘটে।

উপনিষদ বলে, অহং যেন দুটি পাখি, গাছের ডালে বসে একজন ফল ভক্ষণ করে, আর অপর পাখি নীরবে শুধু সেই খাওয়া দেখে যায়। আমরাও জানি, আমাদের সকলেরই সত্তাকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু যেহেতু আমরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাণী নই বলেই কে যে কি, তা স্থির করতে পারি না।

ইয়ুং-এর তৃতীয় নয়ন আছে, তিনি শুধু দুজনের মুখ দেখতে পান তা নয়, তাদের পরিচ্ছদের প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত তাঁর চোখে পড়ে। এমনকি যখন স্কুলের ছাত্র ছিলেন, তখনও পারতেন কে যে কি, তা নির্ণয় করতে—

> "Then to my intense confusion, it occurred to me that I was actually two different persons One of them was the schoolboy who could not grasp algebra and was far from sure of himself; the other was important a high authority, a man not to be trifled with ... The other was an old man who lived in the 18th Century, wore buckled shoes and a white wig and went driving in a fly with high, concave rear wheels between which the box was suspended on springs and leather straps"

আমাদের মনে অবশ্য এই ভ্রম যেন না হয় যে, 'অপর' ব্যক্তি সর্বদাই বকলসআঁটা জুতো ও মাথায় পরচুলা-পরা প্রৌঢ়, সেই অপরজন পৌরিজিনের ড্রেন পাইপ কিংবা

ধৃতি পরেও আসতে পারেন। আর তিনি যে শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীরই মানুষ হবেন, তারও কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

তিনি যে শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীরই মানুষ হবেন এমন কোনো কথা নেই, এক এক সময় ইয়ুং বলেছেন তিনি যেন সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ, যেকালে মানুষ এ্যালকেমি বা কিমিয়াবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই কারণেই কিমিয়াবিদ্যার প্রতি ইয়ুং-এর আকর্ষণও প্রবল। কিন্তু শুধু সপ্তদশ শতাব্দী কেন? খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীতেই বা কি দোষ! কিন্তু এক বা অপরের ব্যক্তি, পরিচয় বা আকৃতি হোক না কেন, একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য নিরূপণে ইয়ুং-এর কোনোরকম অসুবিধা নেই, তিনি বলছেন—

> "The play and counterplay between personalities No 1 and No. 2 which has run through my life has nothing to do with a split or dislocation in the ordinary medical sense."

কিন্তু ইয়ুং আমাদের প্রতি হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে যদিও দু' নম্বর ব্যক্তি একটি বিমূর্ত রূপ, তথাপি খুব সামান্য সংখ্যক মানুষই এই দ্বিতীয় সত্তাকে দেখতে পায়—

> "Most people's conscious understanding is not sufficient to realise that he is also what they are."

আমাদের উপলব্ধি কিন্তু একটা স্বচ্ছ নয়। কিন্তু একটা সীমারেখা আছে যার পর আমাদের সংশয়টুকু আর রোধ করা যায় না। তিনি যখন বলেন যে, তাঁর দুটি সত্তা তার একটি বালকবয়সী, অপরটি বৃদ্ধ। তিনি যদি বলতেন যে, তিনি হলেন যব আর অপর সত্তা কুইন অব সেবা। কারণ, আর যাই হোক, ইয়ুং যা বলেন তার অর্থ তিনি ভালোই জানেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন ইয়ুং-এর মুখনিঃসৃত এইসব কথা শুনবে তখন একটা অবিশ্বাস্য অলৌকিক মনোভুবনের ছবি এমনই ফুটে উঠবে যে আমাদের সীমারেখার বাইরে। ইয়ুং-এর জনৈক রোগী মাথার ওপর একটি বুলেট বাণের বেলায় রেখেছিল যখন ঘুম ভাঙল তখন মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা যেন সেই বুলেট মাথা ভেদ করে চলে গেছে। ইয়ুং-এর বাড়ির কাছে একটি ছেলে জলে ডুবে যাচ্ছে, তার ঠিক সেই মুহূর্তেই ট্রেনে বসে দূরদেশে যাওয়ার পথে ইয়ুং-এর মনে একটা মজ্জমান বালকের মূর্তি ভেসে উঠল। মৃত্যুকে তিনি ভয়ংকর নেকড়ে বাঘের মত দেখলেন স্বপ্নের ভেতর, পরদিন প্রভাতে জানলেন যে, তাঁর জননীর মৃত্যু ঘটেছে।

কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং রচিত Memories, Dreams, Reflections নামক বিখ্যাত গ্রন্থটির আরো বিবরণ পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করার বাসনা রইল।

—অভয়ঙ্কর

ভারতীয় সাহিত্য

বাণভট্ট প্রসঙ্গে আলোচনা ॥

ভারতীয় বিদ্যাভবনের ২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাণভট্টের উপর একটি ধারাবাহিক আলোচনা সভা সম্প্রতি বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রী আর পি কাঙলে 'সাহিত্যিক বাণভট্ট প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ্য ভাষণ দেন। তিনি বলেন—'তাঁর সাহিত্য প্রতিভা নির্ণয় করতে হলে সংস্কৃতের সঙ্গে গভীর পরিচয় অপরিহার্য।' অধ্যাপক শ্রীজি সি ঝালা বলেন, 'বাণভট্টের কবিতা জীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। তাঁর কবি-মনীষার ব্যাপ্তি এবং ঐশ্বর্য অতুলনীয়।' ডঃ পি এস সানে বাণভট্টের বহু বিচিত্র জীবন-অনুভূতির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর রচনায় তাঁর ব্যক্তি জীবনের অনেক পরিচয় স্পষ্ট। তিনিই সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্য-রোমান্স রচয়িতা।

একটি কবিতা গ্রন্থ ॥

যে সমস্ত তরুণ ভারতীয় কবি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী এ কে রামানুজম নিঃসন্দেহে অন্যতম। সম্প্রতি 'দি স্ট্রাইডার' নামে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তাঁর একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবি বর্তমানে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর আলোচ্য গ্রন্থটি ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রধানত ইংরেজি ভাষায় যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁদের কাছে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

রামানুজমের কবিতার বিশেষত্ব হল চিত্রকল্প রচনায়। কোনও একটি ঘটনা বা চিত্রকেও তিনি বিভিন্ন রূপে রঙে সাজিয়ে পরিবেশন করেন। 'স্টিল লাইফ' কবিতাটিতে তাঁর এই কবি প্রতিভার সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে বলা যেতে পারে।

অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'দি ফল', 'আওয়ার মেমোরি অ্যান্ড আনাদার' 'ডিউ অব গ্রেস' অন্যতম।

দিল্লীর গোধূলি ॥

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আহম্মদ আলির গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো জেনে যে কোনও সাহিত্যরসিকই বিশেষ উৎসাহবোধ করবেন। এই উপন্যাসটির পটভূমি হচ্ছে দিল্লীর মুসলমান জীবন। লেখকের কলমের গুণে উপন্যাসটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে দিল্লীর সাধারণ মুসলমানের কিভাবে জীবনযাত্রা করত তার সুন্দর এবং নিখুঁত বর্ণনার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোনও গ্রন্থে ফুটে উঠেছে কিনা, সন্দেহ।

এই গ্রন্থে এমন কিছু ঘটনা আছে যা কোনও কোনও বিদেশী পাঠকের কাছে অস্বাভাবিক এবং অসত্য মনে হতে পারে। তবু, লেখক নিপুণ ও সাবলীল ভাবে বর্ণনা করেছেন, যা পাঠ করলে মন এক অপরিচিত রোমাঞ্চে ভরে ওঠে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করবে আশা করি।

একটি সাহিত্য অনুষ্ঠান ॥

নাগপুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠান 'বৈঠকী'র উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় একটি বিশেষ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূলতঃ নাগপুরে অনুষ্ঠিত বিগত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সমাগত সাহিত্যিকদের আহ্বান জানান হয়। এতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জরাসন্ধ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্বপন-বুড়ো, সুকুমার ঘোষ, সুমথনাথ ঘোষ, উমা রায়, মহাশ্বেতা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই সাহিত্য শিল্প ক্ষেত্রে স্বকীয় উপলব্ধির বর্ণনা দেন। অনুষ্ঠান শেষে কয়েকটি সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

বিদেশী সাহিত্য

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কবিতা ॥

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কবিতা সম্পর্কে যাঁরা কিছুমাত্র খবরা-খবর রাখেন তাঁরা জানেন যে সেখানে কবির সংখ্যা চিরকালই হতাশাজনক। উপন্যাস ছোটগল্পের শাখাটিই এতোকাল এখানকার লেখকদের সাহিত্য রচনায় বেশী পরিমাণ উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। তবে কোন শক্তিমান কবি যে একেবারে ছিলেন না তা নয়। যেমন কেনেথ ম্যাকেঞ্জি। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার নিঃসন্দেহে ইনি একজন শক্তিমান কবি। এ প্রসঙ্গে তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবি উলফ ফেয়ারব্রীজের নামও অনেকে করে থাকেন। কবি ফেয়ারব্রীজ বয়সে তরুণ, ১৯৫০ সালে পরলোকগত হওয়ায় ম্যাকেঞ্জির আর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এঁরা দুজনেই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ত্রিরিশ ও চল্লিশ দশকের কবি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার গোড়ার কবি কে। বর্তমান দশকের অন্যতম কবি ও সমালোচক র‍্যাণ্ডলফ স্টোর মন্তব্য থেকে জানা যায় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম কবি হচ্ছেন জন বয়েল ওরেইলি (১৮৪৪-১৮৯০)। এঁর

নাম কখনো কখনো দুয়েকটি আমেরিকান কবিতার সংকলনে অত্যন্ত অবহেলিত কোণে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ওরেইলির অধিকাংশ কবিতাই হচ্ছে দেশাত্মবোধক ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বর্ণনায় সমৃদ্ধ। রেইলির পরে তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে ম্যাকোঞ্জ এবং ফেয়াররীজ ছাড়া দীর্ঘকাল আর কোন কবির নাম পাওয়া যায়নি, (পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়া, অক্টোবর, ১৯৬৬ সংখ্যা)।" ১৯৫৩ সালে 'দি উইনথ্রপ রিভিয়ু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন জেফরি বোল্টন এবং হ্যারি হেসেলিন। তাতে যে দুজনের কাব্যপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাঁরা হলেন অলিভ পেল এবং ডেভিড হাচিসন। তবে তাঁরা খুব উল্লেখযোগ্য কবি নন। ডরোথি হেওয়েট এবং কেনেথ ম্যাকেঞ্জি তখন ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলসে—এবং সে সময় বেশ কিছুকাল তাঁরা কবিতা লেখা থেকে বিরত ছিলেন।

১৯৬১ সালে পরিস্থিতির আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল। ষাটের দশকে তাই পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় কবির কোন সমস্যা আর রইল না। এখন কবিতা নিয়ে একটি আন্দোলন সেখানকার তরুণ কবিসমাজকে উদ্দীপিত করেছে। মার্ভ লিলি, গ্রিফিথ ওয়াটকিন্স, পিটার জেফরি, গ্লোরিয়া মেল্টজার, পিটার লিলি, র‍্যান্ডলফ স্টো প্রভৃতি শক্তিমান কবি বর্তমান পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার অগ্রদূতের ভূমিকাকে সফল করেছেন। পার্কে, রেস্তোরাঁয় কবিতার আসর, জনসাধারণের জন্য থিয়েটার মঞ্চে 'পাবলিক রিসাইটাল'-এর অনুষ্ঠান এখন সেখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবে, কবিতা পাঠের আসর জনপ্রিয় হলেও কবিতা গ্রন্থের প্রকাশনা আশানুরূপ বাড়ছে না। প্রকাশকের অভাবে অনেক তরুণ কবিই এখন সেহাহার জাতীয় পুস্তিকায় নিজেদের কবিতা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র কবিতার পত্রিকা বলতে এখন 'পোয়েট্রি অস্ট্রেলিয়া।' তরুণ কবি সমাজের সমগ্র কাব্য আন্দোলন এখন এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সমকালীন কবিরা যে তাঁদের কাব্য আন্দোলনকে ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কবি-সমস্যাকে এখন সফলপ্রসূ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যে যাচ্ছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রেখট্ সংগ্রহাগার ॥

বার্লিনের বহুদিনকার পুরোনো পাড়া চসইস্ট্রাসে প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার বারটোল্ট ব্রেখট-এর বাসভবনটি আজ একটি গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি 'ব্রেখট আরকাইভ' নামে সুপরিচিত। গত পাঁচ বছরের অনলস উদ্যম একে একটি সার্থক সংগ্রহাগার রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

ব্রেখটের ব্যক্তিগত নথিপত্র, পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বিভিন্ন সময়ে লেখা নাটকের খসড়া, ইত্যাদি জনসাধারণের জন্য এখানে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। আমৃত্যু ব্রেখট যে ঘরটিতে থাকতেন সেটিও জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তাঁর লেখার টেবিল, সবচেয়ে প্রিয় সেই 'রকিং চেয়ার' এবং অবসর বিনোদনের আরাম কেদারাটিও এখানে আছে।

ব্রেখটের সম্পূর্ণ সাহিত্য-সংগ্রহের মূল পাণ্ডুলিপি ২০০০টি মোড়কে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অধিকাংশই টাইপ করা এবং কোথাও কোথাও ব্রেখটের নিজের হাতে ভুল সংশোধন করা। দুঃখের বিষয় বিশ্ববিশ্রুত তাঁর 'থ্রি পেনি অপেরা' এবং 'দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি সিটি অব মেহাগিনি' নাটক দুটির মূল পাণ্ডুলিপি খোয়া গেছে।

ব্রেখট সংগ্রহাগারের উদ্যোক্তারা গবেষণাকারীদের সুবিধার জন্য ব্রেখটের নিজস্ব পাণ্ডুলিপি ও সমগ্র সংগ্রহের একটি নির্দেশিকাও প্রণয়ন করেছেন। বর্তমানে তাঁরা একটি 'কমপ্লিট ব্রেখট এডিশন' প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ব্রেখটের বিধবা পত্নী অধ্যাপিকা হেলেন ওয়েগেল হচ্ছেন এই সংগ্রহাগারের অন্যতম উদ্যোক্তা।

ব্রেখটের 'রিফিউজিস কনভারসেশনস' এবং হাজারখানেক দুষ্প্রাপ্য কবিতাও সংগ্রহ করেছেন এঁরা। 'ওয়র্কস অন দি থিয়েটার' (৭ কপি), 'ওয়র্কস অন লিটারেচার' (২ কপি) এবং 'পলিটিক্যাল ওয়ার্কস' প্রভৃতি সংগৃহীত গ্রন্থগুলি সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত জার্মান ভাষাবিদ হের ওয়র্নার হেকট। 'টুরানডট' নামক অসম্পূর্ণ ও কাব্যাকারে লিখিত কাহিনীও উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ব্রেখটের ব্যক্তিগত দিনলিপি, সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে লেখা নানা রকমের মন্তব্য ইত্যাদি অনেক কিছুই এই সংস্থার উদ্যোগে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে মোট ৯৫৪ জন জ্ঞানী অতিথি ব্রেখট সংগ্রহাগারটি পরিদর্শন করে গেছেন। পৃথিবীর ৫৩টি শহরে গত দশ বছরে ব্রেখটের নাটকের ১৪৯৬টি প্রযোজনা হয়েছে।

পরলোকে সোভিয়েট ঔপন্যাসিক ॥

প্রখ্যাত সোভিয়েত ঔপন্যাসিক য়ুরী ঘেরম্যান গত ১৬ই জানুয়ারী লেনিনগ্রাদ শহরে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। গলার কর্কটজনিত রোগে তাঁর মৃত্যু হয় বলেই অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তাঁর প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। বলা-বাহুল্য গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উচ্চ লেখক-মহলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেরই উপজীব্য হচ্ছে মানুষ। যুদ্ধের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাঁর উপন্যাসগুলিতে যুদ্ধ নয় শান্তির ঘোষণাই প্রধান স্থান নিয়েছে।

বিগত যুদ্ধের সময় ঘেরম্যান ছিলেন 'তাসের' সংবাদদাতা।

নতুন বই

নতুন চিন্তা-নতুন জগৎ

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেচে যে, সেইখান থেকে পথ করে আর এগিয়ে চলতে পারছে না। তাই এ-যুগের লেখকরা কেউ ফিরে গেছেন অতীতের ঐতিহাসিক রোমান্স রোমন্থনে, কেউ নিছক আদিরসে, কেউ বা সেই চিরন্তন ত্রিভুজের কাহিনীতেই মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন। সামগ্রিকভাবে কিন্তু অবস্থা এমন হতাশাময় নয়। মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন লেখকের আবির্ভাব হয়, যাঁদের চিন্তার পার্থক্য, গতানুগতিকতামুক্ত বিষয়বস্তু, নতুন রীতির প্রকাশভঙ্গী অতি সহজেই পাঠকচিত্ত আকৃষ্ট করে। এঁদের রচনায় আছে নতুন চিন্তার পরিচয়, নতুন আশার ইঙ্গিত।

সম্প্রতি আমাদের হাতে একই লেখকের দুখানি উপন্যাস এসেছে, 'ভোর' এবং 'যত দ্বার তত অরণ্য', লেখকের নাম লোকনাথ ভট্টাচার্য। লোকনাথ ভট্টাচার্য সুপণ্ডিত এবং তাঁর কবিখ্যাতি সর্বজনবিদিত। উপন্যাসের রাজ্যে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। লোকনাথ ভট্টাচার্য বিদেশের সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত, স্বয়ং অনেকদিন বিদেশে কাটিয়েছেন, তাই তাঁর রচনা গতানুগতিকতামুক্ত, স্বচ্ছন্দ এবং চমকপ্রদ। জীবনযন্ত্রণা কথাটি অতি ব্যবহারে মলিন, তথাপি এই কথাটির সাহায্য নিয়েই বলা যায় যে, লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস দুটির মধ্যে বর্তমান যুগের জীবনযন্ত্রণা অশেষ ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দুটি কাহিনীই নাগরিক জীবনের। ঘটনাস্থল দিল্লী। উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের গল্প, অর্থাৎ সকলেই প্রায় এক থেকে দু হাজার টাকা বেতন সীমায় সীমিত। এদের বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা কম, একটা নতুন ধারার জীবনযাত্রার মধ্যে অতিশয় আকস্মিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা এই আধুনিক গোলকধাঁধায় চোখবাঁধা কলুর বলদের মত ঘূর্ণায়মান। বর্তমানকালের জীবনের সুখের মধ্যেও যে অসুখ, প্রেম এবং অপ্রেম, ঐশ্বর্যলিপ্সা এবং রাতারাতি সাহেবী কেতাদোরস্তদের সঙ্গে সমানভাবে তাল দিতে যাওয়া সবকিছুই একই-সঙ্গে এ-যুগের ওপরতলার মানুষকে পাক খাওয়াচ্ছে। লোকনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাস দুটির পাত্র-পাত্রীও সেই সমাজের আবর্তে জড়িয়ে আছে। এই ঘটনা তাই একটি

আলোচ্য গ্রন্থটি সে জাতের নয়। নিতান্ত সাধারণ অর্থে একটি সরস ও উপভোগ্য ভ্রমণ কাহিনী।

বহুপরিচিত ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের অন্যতম দেবক্ষেত্র জগন্নাথ দেবের পুরী। সেখানে বেড়াতে গিয়ে লেখক সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে পুরীকে যেভাবে দেখেছেন—তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্য, তাকে তেমনি ভাবেই বর্ণনা করেছেন বইটিতে। অত্যন্ত ঘরোয়া স্টাইলে। তাই পড়তে গিয়ে কোথাও অযথা হোঁচট খেতে হয় না, কিংবা তথ্য ভারাক্রান্ত মনে হয় না। প্রসংগতঃ তীর্থস্থানের ও দেবালয়ের ঐতিহাসিক ও লৌকিক কাহিনী এবং পৌরাণিক ব্যাখ্যা বইটিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করেছে। ভাষা স্বচ্ছ। ছাপা ঝরঝরে।

সমুদ্র সৈকতে (ভ্রমণ)—হরিপদ ভারতী। বেংগল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা : ১২। মূল্য ছয় টাকা।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

বেংগলি লিটারেচার পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশের সংগে সংগেই আমরা উদ্যোক্তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যখন শুধু ভারতের অন্য ভাষা-ভাষীদের কাছেই নয় সারা দুনিয়াতে আগ্রহ দেখা যায় তখন এ স্বরূপ তুলে ধরবার প্রশংসনীয় উদ্যম বেংগলী লিটারেচারই একরকম প্রথম ব্যাপকভাবে শুরু করেন। সম্প্রতি এই পত্রিকাটির তৃতীয় সংখ্যা বেরিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যাটি বিভিন্ন দিক দিয়েই অভিনবত্বের দাবী রাখে। কেননা এ সংখ্যায় বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের সংগে অবাঙালী ভারতীয় এবং বহু বিদেশী কবির রচনাও স্থান পেয়েছে। যাঁদের রচনায় এ সংখ্যা সমৃদ্ধ তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সুনীল গংগোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, প্রসূন বসু, মৃণাল দত্ত, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, শঙ্কর রায়, পার্থ রাহা প্রমুখ আরো অনেকে এবং এভতুশেংকো, এডোরজন, র্যুমাদিন, ওয়ার্টকিন্স, মেল্টংসার, অজ্ঞেয় ও এজিকিয়েল উল্লেখযোগ্য। গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ব্রহ্মচারী বুদ্ধ, দিলীপ মালাকার, ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে। অনুবাদগুলি বেশ স্বচ্ছ। ছাপা, বাঁধাই ভালো।

বেংগলি লিটারেচর (৩য় সংখ্যা) সম্পাদক : আশিস সান্যাল, ৫৩, বিধান পল্লী, কলকাতা—৩২, দাম : দু টাকা।

●

খুব দুঃখের হলেও স্বীকার করতে হয় যে, বাংলা দেশে শুধুমাত্র গল্পের কাগজ নেহাতই কম। সেদিক থেকে মিহির আচার্য সম্পাদিত গল্পপত্রিকা 'শুকসারী' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এই কাগজটির শীতসংখ্যা। এ সংখ্যায় লিখেছেন সমরেশ দাশগুপ্ত, সুবোধ ভট্টাচার্য, বাণিক রায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, আমাদেব, রবীন্দ্র গুহ, মলয় দাশগুপ্ত, শংকর বন্দোপাধ্যায়, উৎপল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

শুকসারী (৩য় বর্ষ : শীতসংখ্যা) সম্পাদক : মিহির আচার্য, ১৭২।৩৫ কেদার সরকুলার রোড, কলকাতা : ১৪, দাম : এক টাকা।

অবক্ষয়ের কাহিনী

অনেকের মতে আজকের কাল অবক্ষয়ের কাল। সমাজের মধ্যে অনেক বিষাক্ত বাষ্প ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। জীবিকার সন্ধানে মানুষ সততা, ন্যায় প্রভৃতিকে ভুলে যেতে বসেছে। স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা যেখানে সম্ভব হয় না, সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে মরিয়া এবং তখন যে কোন পথ বেছে নেয় জীবিকার জন্য। তা সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। এমনি করে আমাদের সমাজে আজ এক অন্ধকার জগতের সৃষ্টি হয়েছে—যেখানে চলেছে নারী, মদ, রক্ত, প্রতারণা, আরও কত কিছুর ব্যবসা। সেখানে কালো টাকার পাহাড়ে বসে কেউ মজা লুটছে, কেউ বা ব্যবসার উপকরণ হয়ে কেবল দিনে রাতে শোষিত হচ্ছে। জীবনে বড় হবার সাধ ধুলোর সংগে মিশিয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক কালের বহু উপন্যাসের পটভূমি এই জগত, এই সমস্যা এবং চরিত্র সেই সব আণ্ডারগ্রাউণ্ডের ডেলিংকুয়েন্টরা। আলোচ্য উপন্যাসটিতেও লেখক সেই সমস্যা ও চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেছেন এবং সেই অন্ধকার জগতের একটা ছবি আঁকার প্রয়াস পেয়েছেন। আর্থিক বিপর্যয়ের চাপে কীভাবে আজকের সমাজের নিষ্পাপ কিশোরীরা স্বার্থান্ধ মানুষের কুচক্রে পড়ে তিলে তিলে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে এবং ধ্বংস হচ্ছে দরদী দৃষ্টি নিয়ে লেখক সেগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে তারা পাপে আকণ্ঠ মগ্ন হয়েও তার থেকে কেমন করে পুণ্যের ফুল ফোটাচ্ছে তারও একটা ইংগিত তুলে ধরেছেন—কমলাক্ষা, রণধীর, দলার, হেনাদি, কৌসীদি প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে।

দুশ চার পৃষ্ঠার এই 'নিশিরাগ' উপন্যাসটি মোটামুটি উতরে গিয়েছে বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে লেখকের মনে সমস্যার থেকে আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন—যেন খানিকটা জোর করেই। তা না হলে লেখাটি আরও বলিষ্ঠ হতে পারতো।

নিশিরাগ (উপন্যাস) নিমাইকুমার ঘোষ। সাহিত্য কেন্দ্র, এ—১৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ-১২। মূল্য—সাড়ে চার টাকা।

ভারতপথিক ফরস্টার

অনন্য রায়

এ বছর জানুয়ারী মাসে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ই এম ফরস্টার উননব্বই বছরে পদার্পণ করলেন। আজকের দিনে দীর্ঘজীবী সাহিত্যিক যাঁরা বর্তমান আছেন তাঁদের মধ্যে ফরস্টার নিশ্চিতভাবেই প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, তাঁর বিষয়ে কৌতূহল যেন এখন একটু নিষ্প্রভ। অথচ আমাদের কাছে অন্তত ঔদাসীন্যের চেয়ে আগ্রহই ফরস্টারের প্রাপ্য ছিল।

কেননা, ফরস্টারের প্রধান সাহিত্য-কীর্তি হল 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' নামে উপন্যাসখানি, আর এতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও মমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা সত্যিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অভিনন্দনযোগ্য। বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ সালে, কিন্তু সেই তেতাল্লিশ বছর আগেই ফরস্টার এই বইতে অকুণ্ঠভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য, এবং অবিলম্বে তা উদ্‌যাপিত হওয়া দরকার।

বলাই বাহুল্য, সেকালে একজন খাঁটি ইংরেজের কাছ থেকে এ ধরনের ঘোষণা প্রায় অভাবিতই ছিল। বরং কিপলিং প্রভৃতির কৃপায় আমরা ইংরেজ লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাম্রাজ্যবাদী রূপটাই তখন বেশি করে দেখতে পেতাম। কাজেই 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' বেরোবার পর আমরা অবাক হয়ে গেলাম, আন্তরিক সদ্ভাবাপন্ন ইংরেজ ভদ্রব্যক্তিও যে থাকতে পারেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম, এবং তা আমাদের দাবির ন্যায্যতাকেই আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করল।

কিন্তু ফরস্টারের পক্ষে তাঁর এই ভারতপ্রেম খুব সুখকর হয়ে ওঠেনি। সেদিনের শাসকমহল তো বটেই বুদ্ধিজীবী ইংরেজ, যাঁরা প্রকাশ্যে বা গোপনে অনেকেই ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের স্বপক্ষে, তাঁরা ফরস্টারের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। আর তার ফলে বহুদিন পর্যন্ত তাঁকে নীরবে কর্তাব্যক্তিদের অবহেলা সইতে হয়েছিল।

অবশ্য ফরস্টারের গুণগ্রাহী পাঠকও যে কম ছিল তা নয়। সাধারণ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন পাঠকদের অনেকেই বইটির চরিত্র-সৃষ্টি ও জীবন-অন্বেষণের সততায় মুগ্ধ হলেন, এবং লেখককে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলে স্বীকার করে নিলেন।

আর ঐ সততার ব্যাপারটি ফরস্টারের ক্ষেত্রে একেবারে সব থেকে গোড়ার কথা। ফরস্টার এমন ধরনের লেখক নন যে প্রথম আবির্ভাবেই তিনি পাঠকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যখন ফরস্টার ইস্কুলের ছাত্র তখন থেকেই ছিল তাঁর লেখক হবার ইচ্ছে। আর তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর লেখাপড়ার অভ্যাস। বি-এ পাশ করার আগেই অনেক বইপত্র পড়ে ফরস্টার রীতিমত তৈরি হয়ে কলম ধরলেন লেখক হবার জন্যে। কয়েকটি ছোটো গল্প ও প্রবন্ধ বেরোল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, একটু নামও হল, কিন্তু তেমন কিছু নয়। পড়াশোনার পাট শেষ হবার পর ফরস্টার তাই ভালো করে সাহিত্যচর্চার জন্যে ইতালিতে চলে গেলেন। কিন্তু বছর তিনেক সেখানে বাস করার পর ফিরে এলেন স্বদেশে। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হল তিনখানি উপন্যাস। সেগুলি হল হয়ার এঞ্জেলস ফিয়ার টু ট্রেড, এ রুম উইথ এ ভিউ, এবং দি লংগেস্ট জার্নি। এর বছর তিনেক পর প্রকাশিত হল চতুর্থ উপন্যাস, হাওয়ার্ডস এণ্ড। এগুলোর মধ্যে শেষের উপন্যাসটিই কিছুটা দাগ কাটল, অন্য-

ই. এম ফরস্টার

গুলিতে গতানুগতিকতাই প্রবল। তবে ইতিমধ্যে ফরস্টার যে সাহিত্যখ্যাতি একেবারেই পাননি তা নয়। সাহিত্যিক হিসাবে আদর-যত্নও তিনি যথেষ্ট পেতে লাগলেন। কিন্তু ফরস্টার নিজের মনে বুঝতে পারছিলেন, তাঁর যা দেবার তা তিনি এখনো দিতে পারেন নি। আর সেইজন্যেই তিনি ভেতরে ভেতরে অস্থির, অতৃপ্ত, অশান্ত।

এই সময়ে ফরস্টার তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ডিকিনসনের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন (১৯১২)। তারপর কিছুকাল এদেশে থেকে তিনি ১৯১৩ সালে স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। এবং তখন থেকেই সংকল্প করেন যে ভারতবর্ষের উপর তিনি একখানি উপন্যাস লিখবেন, আর সেই বইটিই হবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এর জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষে থাকতেই। এদেশের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির বিষয়ে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে লক্ষ্য করতেন, এবং প্রতিদিন ডায়রীর আকারে লিখে রাখতেন। এই তথ্য ও মন্তব্যগুলিই পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রস্তাবিত উপন্যাসের কাঁচামাল। কিন্তু এই উপাদানকে কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর দিয়ে সুগ্রথিত করে তোলার জন্যে তাঁকে অনেক নিস্ফলা বছরের কাঁটা ক্ষেত পার হয়ে আসতে হয়েছিল। তাঁর শেষ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে, এবং তার পরেই বেরোয় 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' (১৯২৪)। এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে তথ্যধর্মী গদ্য রচনা অনেক বেরিয়েছে বটে, কিন্তু উপন্যাস আর একটিও লেখা হয়নি। অত্যন্ত ধৈর্য আর যত্নের সঙ্গে ফরস্টার তৈরি হচ্ছিলেন তাঁর মহত্তম উপন্যাসখানির জন্যে। তারপর ১৯২১ সালে রচনা যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে তখন তিনি আবার এলেন ভারতদর্শনে। উদ্দেশ্য হল, বাস্তবের সঙ্গে উপন্যাসের কোনো ফারাক আছে কিনা তাই যাচাই করে দেখা। এসে অবশ্য ভালো হল। ফরস্টার ঐ সময়কার জাতীয় আন্দোলনের রূপ প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখে ভারতবর্ষকে যে অবিলম্বে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে আরো স্থিরনিশ্চয় হলেন।

'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হবার পর ফরস্টার একাধিক সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। কিন্তু তারপর থেকে উপন্যাস আর একখানিও লেখেন নি। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ফরস্টার সম্প্রতি যা জানিয়েছেন তাও তাঁর অপরিসীম সাহিত্যিক সততারই পরিচয়। তিনি বলেছেন—'আমার মনে হয় একটা কারণ হল, সারা পৃথিবীরই সামাজিক জীবনের ধরণধারণ এখন বড্ড বেশি পাল্টে গেছে। আমি অভ্যস্ত ছিলাম পুরনো ধাঁচের পৃথিবীর বিষয়ে লিখতে। সেকালের ঘর-বাড়ি, পারিবারিক সম্পর্ক এবং অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রাই ছিল আমার বিষয়বস্তু। সে সবই এখন বদলে গেছে। আজ আমি নতুন পৃথিবীটার স্বরূপ কী তা চিন্তার ভেতর দিয়ে বুঝতে পারি বটে, কিন্তু তাকে উপন্যাসের আকারে গেঁথে তুলতে পারি নে।'

ফরস্টার ১৯৪৫ সালে এবং ১৯৫৩ আরো দুবার ভারতভ্রমণে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বদেশে এবং বিদেশে অনেক সরকারী ও বেসরকারী খেতাবেও সম্মানিত হয়েছেন। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলেও ফরস্টারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি কিন্তু আজো পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি বাংলা অনুবাদে। প্রায় তিরিশ বছর আগে বইটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আমলে সেকালের পরিচয় পত্রিকায় 'ভারত পথে' নামে ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু বইয়ের আকারে তা প্রকাশিত হয়েছে বলে শোনা যায় নি। অথচ বইটি ভারতের বিষয়েই লেখা।

হাসিমুখ ছিল পূর্ণিমার—পলকে কঠিন, গম্ভীর। হাসির লেশমাত্র আর মুখে নেই। বলে, এ আমায় যে নতুন দায়ে ফেলছিস তাপস। মত আমার কবে ছিল না শুনি? কর্তব্য একের পর এক ঘাড়ে চেপে পড়ল। ঘাড়ে আপনাআপনি পড়ে নি, গুরুজনেরা সযত্নে এনে চাপিয়েছেন : পূর্নি আদর্শ মেয়ে, পূর্নি দেবী, পূর্নি দশভুজা জগজ্জননী। ঘাড় ভেঙে জগজ্জননী কবন্ধ হয়ে পড়লেও কোন লজ্জায় তখন 'না' বলবেন! সকলের উপর সব কর্তব্য চুকেবুকে গেছে, নিজের উপরে কোন কর্তব্য আছে কিনা বেকার অবস্থায় পড়ে এতদিনে সেই খোঁজটা করছি।

বলেই চট করে কথা ঘুরিয়ে নেয় : বাবার প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের কিছু টাকা এখনো ব্যাঙ্কে আছে, কাশীবাসে সে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

শেষ বয়সের সম্বল ফেলে যাবেন কেন? খরচা আমি মাসে মাসে পাঠাব—কিন্তু আলটপকা হিসাবের বাইরেও কত রোগ পীড়ে বিপদআপদ ঘটতে পারে। ঐ টাকায় দরকার মতো বিপদ কাটাবেন, পরে আমি পূরণ করে দেবো।

পুনশ্চ ভিন্ন এক কথা : কাশীতে মা গয়নাগাঁটিগুলোও নিয়ে যাচ্ছেন?

কোন্ গয়না?

বুঝে উঠতে পারে না তাপস।

পূর্ণিমা বলে, বিয়ের সময় আমি পরব, মা সেইজন্য গয়না গড়াতেন। তোর ভাতের সময় নেকলেশটা কেড়েকুড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু মাসে মাসে টাকা জমিয়ে এক একখানা করে বরাবরই তো গয়না গড়ানোর কথা।

সে বোধহয় হয়ে ওঠেনি। বড়লোকের শখের গয়না নয় গেরস্তঘরে দশ রকম খরচা থেকে কাটকুট করে টাকা বাঁচানো। তুই নারাজ বলে ওদিকেও তাই চাড় হয় নি।

পূর্ণিমা খিলখিল করে হেসে ওঠে : মা আমার জন্যে গয়না গড়িয়ে রাখবেন, বাবা প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের টাকায় বিয়ের যৌতুক যোগাবেন—জানি রে ভাই, সেসব ঝোঁক অনেককাল কেটে গেছে। কিছুই নেই, তবে আর ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হবে কেন? ঘটকমশায়কে তবে বলিস সাদামাটা বর একটা—দুটো হাত দুটো পা দুটো চোখ দুটো কান ঠিক ঠিক আছে, এইগুলো পরখ করে নিলেই হবে।

দরোয়ান একটা কার্ড এনে শিশিরের টেবিলে দিল। বলে, গাড়ি থেকে নেমে গেটের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আসতে পায়েন কিনা, জিজ্ঞাসা করলেন।

নাম পড়ে দেখে : ডক্টর তাপস সরকার এম-বি, বি-এস। বলে, ভুল করছ—আমার কাছে নয়। রোগপীড়ে নেই, ডাক্তার কোন কাজে আসবে! চিনিও না এ ডাক্তারকে।

দরোয়ান বলে, শিশিরকুমার ধর—পুরো নামই তো বলে দিলেন। এ আপিসে শিশিরবাবু আর কে আছে বলুন।

শিশির অবাক হল : উনি এর মধ্যে কোথায় আসবেন! আমিই তবে যাচ্ছি।

ঝকঝকে মোটরের পাশে তাপস। ডাক্তার অপূর্ব রায়ের গাড়ি—যদ্দিন না নিজের হচ্ছে, শিশির এই গাড়ি নিয়ে কলে বেরোয়। কাজকর্ম এমনিভাবে চলতে থাকলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একটা নিজস্ব গাড়ি কিনতে খুব বেশি দেরি হবে না।

তাপস বলে, নমস্কার! পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি নেবো না। এখন যদি অসুবিধা হয়, অন্য সময়ও আসতে পারি।

শিশির তটস্থ হয়ে বলে, সে কী কথা! অসুবিধা কেন হবে?

নিরিবিলি একটা জায়গায় বসতে হবে। আপত্তি না থাকলে গাড়ির ভিতরেই বসা চলে।

শিশির বলে, বেশ তো, বেশ তো!

দু-জনে গাড়ির ভিতরে গেল। সামনের সিটের ড্রাইভারকে তাপস বলে, তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও একটুখানি।

কী না জানি ব্যাপার! এমন গুপ্তকথা, ড্রাইভার অবধি সরিয়ে দিচ্ছে অথচ ডাক্তারটিকে চেনেই না শিশির—কোন কালে দেখেনি। কৌতূহল গলা পর্যন্ত উঠেছে, দড়াম করে আওয়াজ দিয়ে ফেটে না বেরোয়।

আয়োজন পরিপূর্ণ করে নিয়ে তাপস বলল, এই অফিসের পূর্ণিমা সরকার আমার বোন।

পূর্ণিমার ভাই আছে, ভাই-ভাজ সেদিন সিনেমায় গিয়েছিল—আবছা মতন একটু দেখেও ছিল শিশির। কিন্তু ঝকঝকে গাড়িতে স্মার্ট পোশাকে উজ্জ্বল মূর্তি এই ছোকরা ডাক্তারের বোন হার্মান কোম্পানিতে কেরানিগিরি করে এবং থাকে গলির ভিতর অতি-পুরানো লঝঝড় একটা বাড়িতে—বিশ্বাস হওয়া কিছু কঠিন বটে। প্রশ্ন করে কেমন বোন আপনার?

সহোদরা। দুই বোন আর এক ভাই আমরা।

শিশির বলে, বৃষ্টির দলার মধ্যে রাত্রিবেলা সেদিন আপনাদের বাড়ি থেকে এসেছি। বাবা আর পূর্ণিমা দেবী সেখানে থাকেন। আপনার আলাদা বাসা বুঝি?

তাপস বলে, ঠিক তেমনটা না হলেও প্রাকটিশের খাতিরে ভিন্ন পাড়ায় না থেকে তো উপায় নেই। দেখুন, খুলেই বলছি, কিছু মনে করবেন না। ঐ যে গেলেন আপনি—তাই নিয়ে বিষম কাণ্ড। গোঁড়া প্রাচীন পরিবার আমরা। পর্দা-ঢাকা রিক্সা থেকে দুজনে নেমে পড়লেন—সেই আমরা কাল হয়েছে। বাবা দারুণ চটেছেন।

শিশির বলে, সেটা তখনই আমি টের পেয়েছিলাম। প্রণাম করতে গেলাম, ঝটকা মেরে পা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘর থেকে বেরিয়েই শেষ হল না—একেবারে কলকাতা থেকেই বেরুচ্ছেন। ছোড়দির কাছে থাকবেন না, মুখ দেখবেন না আর ছোড়দির। কাশীবাস করবেন।

দুঃখে বেদনায় শিশিরের মুখ কালিবর্ণ হল। বলে, দোষ কিন্তু আমার একেবারেই নয়। আমি যেতে চাই নি আপনাদের বাড়ি। বেলগাছিয়ায় থাকি, সেখানে যাওয়ার উপায় ছিল না, তা এসপ্লানেডের গুমটিতে থাকব আমি বলেছিলাম। ছাড়লেন না কিছুতে। রিক্সার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছি—হাত ধরে টেনে তুলে নিলেন। দোষ পূর্ণিমা দেবীর।

ছোড়দির দোষ? না, হতে পারে না—

তাপস সজোরে প্রতিবাদ করে উঠল : ছোড়দি দোষ করে না। রিক্সায় জায়গা রয়েছে, জলকাদা ভেঙে আপনি কষ্ট করে যাচ্ছেন—সেইটেই আরও দোষের ব্যাপার হত। ছোড়দি ঠিক কাজ করেছে।

সুর নামিয়ে তারপর তাপস বলে, দোষ বাবার। কিন্তু হলে হবে কি—তাঁর দিকটাও ভেবে দেখুন। বনেদি বংশ আমাদের, গ্রামের অর্ধেকটা জুড়ে সেকেলে অট্টালিকা। মেয়েদের জন্য পাঁচিলে-ঘেরা আলাদা একটা মহল—বাইরে থেকে [illegible] মানুষ দেখাত। আত্মীয়জন ছাড়া কোন পুরুষ সে মহলে ঢুকতে পেত না। বাবাও শৈশবে এর কিছু কিছু দেখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ে দায়ে পড়ে দশটা-পাঁচটা অফিস করে—চোখ-কান বুঁজে বাবা তা-ও সয়ে আসছেন। কিন্তু ঐ ব্যাপারে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন।

শিশির লজ্জায় মরে গিয়ে বলে, পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমারও এমনধারা চলাফেরার অভ্যাস নেই। কিন্তু পূর্ণিমা দেবী একটা কিছু নিয়ে জেদ করলে বাধা দেওয়া ক্ষমতায় কুলায় না। বিশ্বাস করুন, রিক্সার মধ্যে দেহ গুটিয়ে বোধহয় অর্ধেকখানা করে ফেলেছিলাম। গা বাঁচিয়ে কোনরকমে পাশে বসে এসেছি। সে এক বিষম শাস্তি।

বলার ভঙ্গিতে তাপসের হাসি পেয়ে যায়। হাসি চেপে সে বলে, কিছুমাত্র দরকার ছিল না শিশিরবাবু। পুরুষের গায়ে গা ঠেকলে ইজ্জত যাবে, মেয়েদের ইজ্জত এত ঠুনকো নয় আজকাল। সে ছিল সেকালে—ইজ্জত মাপার ফিতেটা বিশ্রী রকম লম্বা ছিল। ফিতে একালে আমরা বিস্তর ছাঁটাই করে নিয়েছি—নইলে কাজকর্ম চলা অসম্ভব। কিন্তু মুশকিল হল বাবা সেকেলে ফিতেয় মাপতে গিয়ে নিজে কষ্ট পান, সংসারে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসেন।

শিশির অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, আমি নিমিত্তের ভাগী। আমার দিক দিয়ে যদি কিছু করণীয় থাকে—

আছে, নিশ্চয়ই আছে—

লুফে নিয়ে তাপস বলে, আছে বলেই তো আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কে কে আছেন আপনার বলুন।

শিশির বলে—ঠিক যে কথাগুলো একদিন পূর্ণিমাকে সে বলেছিল : কেউ নেই, একা আমি। মা ছিলেন, তিনি চলে গেছেন। গড়িয়ার কাছে এক কলোনী গড়ে মামা চিঠি দিয়েছিলেন—দেশভুঁই ছেড়ে সেখানে এসে দেখি, মালিকপক্ষ কলোনি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। মামা-মামি নিরুদ্দেশ।

তাপস বলে, পরশু রাত্রে ছোড়দির সঙ্গে আপনাকে সিনেমায় দেখলাম। আমরাও গিয়েছিলাম সেদিন।

কৈফিয়তের ভাবে শিশির তাড়াতাড়ি বলে, ঐ একদিন শুধু। পূর্ণিমা দেবী রেস্তোঁরায় নিয়ে খুব খাইয়েছিলেন, আমার পক্ষেও একটা-কিছু করা উচিত- সিনেমার টিকিট কেটে আমিই নিয়ে গেলাম।

ছোড়দি পছন্দ করে আপনাকে। এমন মেলামেশা সে অন্য আরো করে না।

শিশির বলে, পছন্দ কিনা জানিনে, তবে দয়া করেন। পাড়াগাঁ থেকে নিঃসহায় এসেছি—দয়ার পাত্র আমি। জো পেয়ে সেকসনের বড়বাবু পাঁচটা মানুষের খাটুনি আমায় দিয়ে খাটাচ্ছিল। ফাইলের গাদার মধ্য থেকে উনি আমায় টেনেটুনে উদ্ধার করেন। ওঁরই সাহসে সাহস পেয়ে গেছি—নইলে ফাইলের গাদার মধ্যে হয়তো কবর হয়ে যেত আমার।

একটুখানি ভেবে নিয়ে তাপস বলে উঠল, গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হয়ে যায় আপনি যদি এক কাজ করেন।

বলুন, বলুন—

বিয়ের প্রস্তাব করুন আপনি ছোড়দির কাছে—।

শিশির অবাক হয়ে বলে, বিয়ে—কার সঙ্গে?

কী আশ্চর্য! অন্যের জন্য আপনাকে ওকালতি করতে বলব কেন?

শিশির সঙ্গে সঙ্গে কেটে দেয় : মাপ করবেন, আমি পারব না।

তাপস বলে, কিসে অযোগ্য আমার ছোড়দি?

উনি অযোগ্য, তাই কি বললাম এতক্ষণ ধরে? ঠিক উল্টো। সে যাই হোক, আমি পারব না।

বিরক্ত হয়ে তাপস বলে, কি কারণটা আছে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তবে? সেই জন্যেই তো বলতে গেলাম।

শিশির বলে, সাধ্যের মধ্যে থাকা তো চাই! যদি এখন বলেন, চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে দাও—

ছোড়দি আর বাঘ বুঝি এক জিনিস হল—

শিশির বলে, বাঘের চেয়ে বেশি ভয়ই ওঁকে। উনি না হলে সেদিন ঐ অবস্থার মধ্যে কেউ আমায় রিক্সায় তুলতে পারত না। তারই জন্যে যত বিভ্রাট।

সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে ছোড়দি যদি রাজি হয়ে যায়। ভাবী স্বামীর সঙ্গে [illegible] বললে সেটা তেমন দোষের হয় না। বাবার কাশীবাস একেবারে বাতিল না হলেও কন্যা সম্প্রদান করে মনে শান্তি নিয়ে তিনি যেতে পারবেন।

শিশির তবু দোমনা। বলে, আপনি তবে বলে দেখুন। কথা দিচ্ছি, যে মুহূর্তে বলবেন, হেটমুণ্ডে বরাসনে গিয়ে বসে পড়ব।

আপনাকে দেখেই বাবা আগুন হয়ে বাড়ি ছেড়ে গেছেন। এর উপরে আমি যদি প্রস্তাব করতে যাই, ছোড়দি ভাববে কলঙ্কটা সত্যি বুঝেই সামাল দেওয়ার চেষ্টায় আছি। জানি তো তাকে—বিষম অভিমানী, আরো সে বিগড়ে যাবে। ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন শিশিরবাবু, ছোটভাই হয়ে আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে কিনা।

শিশির ভাবছে। উৎসাহ দিয়ে তাপস বলে, বলেই দেখুন না। হাঁ কিম্বা না—যা হোক একটা বলবে। খেয়ে ফেলবে না তো!

আচ্ছা, দেখি—

দেখাদেখি নয়, খুব তাড়াতাড়ি। পারেন তো আজই। অঘ্রানের আর পাঁচটা দিন আছে, তারপরে অকাল পড়বে। বাবাও এই মাসের মধ্যে রওনা হয়ে পড়ছেন।

হাত-ঘড়ি দেখল শিশির, দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে শেষ হবার কথা, সেখানে আধঘণ্টা হতে চলেছে। গাড়ির দরজা খুলে নমস্কার সেরে তাড়াতাড়ি সে নেমে পড়ল।

তাপস পিছন থেকে বলল, কাল সকালে আপনার মেসে গিয়ে সব শুনব।

সেদিন অফিসের ছুটির মুখে শিশিরের টেবিলে পূর্ণিমা এসে সহজভাবে বলল : চলুন—

বাড়িতে ওদের তো তুলকালাম লেগেছে। ভাই এসে একরকম বলে গেল। তোমেরও নিশ্চয় কথা আছে। কি বলবে কে জানে?

রাস্তায় নেমে পূর্ণিমা শিশিরকে বলে, ঘর-ঘর করছিলেন—দিচ্ছি এইবারে ঘর, জিনিসপত্তোর নিয়ে চলে আসুন।

আকাশ থেকে চাঁদ নামিয়ে এনে যেন হাতে তুলে দিচ্ছে, শিশিরের তেমনি উল্লাস।

পূর্ণিমা বলে, নিচের তলায় কিন্তু—

চার দেয়াল আর মাথায় এক চিলতে ছাত আছে তো বটে! তার বেশি কে চায়?

পূর্ণিমা কথা শেষ করে : ঘর মোটমাট দেড়খানা—বারান্ডার একদিক ঘিরে আধখানা ঘর হয়েছে।

শুধু ঐ আধখানা ঘর হলেও আমার চলে যাবে। চলুন এক্ষুণি বায়না দিয়ে আসি। বেহাত হয়ে না যায়।

বেহাত হবে না, বায়নাও লাগবে না। পরশু, রাত্রে যেখানে থেকে এসেছিলেন সেই বাড়ি—

তিক্ত হাসি হাসল পূর্ণিমা। বলে, সবাই ছেড়ে গেছে—একলা প্রাণী আমি সেখানে। একা না বোকা। আমার নিজের গরজেই আপনাকে ডাকছি।

শিশির সবিস্ময়ে বলে, আর কেউ থাকবেন না?

কাকে আর পাচ্ছি! পেলে আপনাকেই বা বলতে যাব কেন? ছাতের উপর যে ঘরে এখন থাকি সেখানেই আমি থাকব। বাইরের ঘরটা নিয়ে আপনি থাকবেন। বড়োর লোকের দরকারই বা কি? তাতে ঝামেলা বাড়ে।

হতভম্ব হয়ে যায় শিশির। জওয়ানী মেয়ে আহ্বান করছে যুবাপুরুষকে এক বাড়িতে থাকবার জন্য। মেস করে থাকা আর কি—যেমন বেলেঘাটায় আছে ওরা সব। তবে এই মেসের মেম্বার সর্বসাকুল্যে দুটি—দুয়ের উপরে তিন হলে নাকি ঝামেলা বাড়বে। ঘর পাওয়া শিশিরের জরুরি প্রয়োজন, এক কথায় 'না' বলে কেটে দিতে পারছে না। কিন্তু এই উৎকট অবস্থাটা পূর্ণিমার কিছুতে মাথায় আসে না, এই বা কেমন!

অবশেষে শিশির বলে, এক বাড়িতে শুধুমাত্র দুজনের থাকা—সেটা কি ভাল হবে?

ভ্রু কুঞ্চিত করে পূর্ণিমা বলে, মন্দটা কিসের?

পুরুষ হয়ে রমণীর কাছে কত আর স্পষ্ট করে বলা যায়! আমতা-আমতা করে শিশির বলে, বিপদ কত রকম ঘটতে পারে—

পারেই তো। তাই বুঝেই তো আপনাকে চাচ্ছি। ধরুন, আমার অসুখ করেছে—আপনি ডাক্তারের কাছে ছুটবেন। আপনার অসুখ করলে আমি ছুটব। কিম্বা ধরুন আগুন লেগেছে, একজনে বাড়ি আগলে আছি, অন্যজন বেরিয়েছি ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করতে—

পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত, কোথায় লাগে আমাদের সরকারি পঞ্চবার্ষিকীগুলো!

শিশির কিছু বিরক্ত হয়ে বলে শুধু আমি বাইরের বিপদের কথাই বলছিনে—

এইবারে বুঝেছি—

শিশিরের দিকে তাকিয়ে পড়ে পূর্ণিমা খিল খিল করে হেসে উঠল : বিপদ আপনিই যদি ঘটিয়ে বসেন—এই তো! যতই ভয় দেখান, ভয় আমি পাব না। বিপদ ঘটলে যেটুকু কিসমৎ লাগে, তা আপনার নেই। তাহলে সেই নির্জন নিশিরাত্রে বিজ্ঞানর ভিতরে বিপদ না-ই হোক, বিপদের সিগনাল একটু-আধটু পাওয়া যেত নিশ্চয়। হাত-পা ভেঙে কোণ নিয়ে আপনি বসে রইলেন, আমার তো কষ্টই হচ্ছিল আপনার অবস্থা দেখে।

ব্যস, হয়ে গেল। এ-রমণী পাগল না ক্ষ্যাপা—এতবড় সাংঘাতিক জিনিসটা হাসি-ঠাট্টার ঢঙে উড়িয়ে দিল কেমন। শিশির বলে, বিপদ না-ই ঘটালাম, লোকনিন্দা বলে জিনিস আছে সেটা তো মানেন।

পূর্ণিমা বলে, আমি গ্রাহ্য করিনে। যেদিন থেকে ঘরবাড়ির বাইরে রুজি-রোজগারে বেরুলাম, লোকনিন্দা গায়ের গয়না করে নিয়েছি। গয়না পরে বেড়াতে মজা পাই। নটবরবাবুর চোখের উপর আপনার হাত ধরে ফরফর করে বেরুনো আপনাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া—এ-সমস্ত তো গরব করে সেই গায়ের গয়না দেখানো।

থামল পূর্ণিমা। নিঃশব্দে কিছু পথ গিয়ে আবার বলে আমার মতন বাইরে বাইরে যারা কাজ করে মেয়েঅলা সাচ্চা তারা—তামা-তুলসী ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। যে-বাবা যোগাড়-যন্তর করে আমায় বাইরে বের করে দিয়েছিলেন তিনি অবধি না। বিশ্বাসই যখন হারিয়েছি বিচার পাবার প্রত্যাশা নেই তবে আর কিসের পরোয়া? কেউটে কেন্নো কার কোন লোকের পায়ের কাছে কুকুর-কান্না কেঁদে আত্ম-অবমাননা করব?

কথায় কথায় বাস-স্টপে এসে পড়েছে। একটু দূরে একটা গাছের তলে দুজনে দাঁড়াল। পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, দিনমানে অফিসের ভিতর পুরুষের সঙ্গে বসে কাজ করি, কাজের ফাঁকে গল্পগুজব হাসি-মস্করা চালাই, ক্যান্টিনে পাশাপাশি বসে চা খাই—এই অবধি দিব্যি সয়ে গেছে। কিন্তু এই দিনমানের জায়গায় রাত্রিবেলা হলে, এই অফিসের জায়গায় ঘরবাড়ি হলে অমনি বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! হয় যাদের, মেয়েকে তারা দেয়ালের ঘেরে বসিয়ে অচ্ছুৎ করে রাখুক। রোজগারের টাকা খাবার লোভে মেয়েকে যেন বাড়ির বাইরে না পাঠায়। কিন্তু আপনার শেষ কথা এখনো তো শুনতে পেলাম না। ঘর না নেবেন তো বলুন—আমি অন্য দোসর দেখি।

শিশির বলে, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

বলুন—

আমতা আমতা করছে শিশির, হেসে উঠেছে : ধরুন, ধরুন—

হেসে পূর্ণিমা বলে বলে ফেলুন না! ধরেই নেবো, পড়তে দেবো না—

মুখ লাল করে কোন গতিকে শিশির বলে ফেলল, বিয়ে হয়ে গেলে কেমন হয়?

বিয়ে? সচকিত হয়ে পূর্ণিমা তাকিয়ে পড়ে।

মরিয়া হয়ে শিশির বলে, বাবা-মা কাশী চলে যাচ্ছেন—এই বিয়ে হলে তাঁদের আর ক্ষোভের কারণ থাকবে না, সম্প্রদানই করবেন হয়তো আপনার বাবা। অফিসে নটবরবাবুদেরও মুখ বন্ধ। এক বাড়ি কেন এক ঘরে দুজনে থেকেও তখন কথা উঠবে না। বিয়ে হলে সব সমস্যার সমাধান একসঙ্গে।

ভ্রু কুঞ্চিত করে পূর্ণিমা বলে সে তো বটেই। কিন্তু বাবা-মা কাশী চলে যাচ্ছেন—এত খবর আপনি কার কাছ থেকে শুনলেন? আমি তো বলিনি।

তাপসের কথা অতএব আর চেপে রাখা গেল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনে পূর্ণিমা বলে বাইরের ঘটক না ডেকে ঘটকালিতে নিজেই নেমে পড়েছে। তুখোড় ঘটক—কাজে গাফিলতি নেই, এরই মধ্যে এতখানি এগিয়ে ফেলেছে। চতুরও বটে—বাবার কাছ থেকে নাম পেয়ে গেছে বোধহয়, খুঁজে খুঁজে এসে পাকড়াও করল।

বলতে বলতে পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল : কাল সকালে মেসে গিয়ে তাপসকে বলে দেবেন, বাবা-মা নির্বিঘ্নে কাশী চলে যান। আমি রাজি নই।

বাস এসে পড়েছে, মানুষজন নামছে। এক-পা সেইদিকে গিয়ে পূর্ণিমা মুখ ফিরিয়ে বলল, তাপস চলে গেলে আমার কাছে একবার যাবেন—যে-বাড়িতে আপনি থেকে এসেছিলেন। কাল আমরা অফিসে যাব না—আপনি না আমিও না। বাড়ি চিনতে পারবেন তো?

খুব খুব। কী ভাবেন আমায়!

পূর্ণিমা দ্রুত গিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

(ক্রমশ)

দেশে বিদেশে

গোয়ার রায়

গোয়ার জনসাধারণ অপ্রত্যাশিত রায় দিয়েছেন। এই রকম একটা ধারণা চালু হয়েছিল যে, গোয়ার অধিকাংশ মানুষ গোয়াকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবীর সমর্থক।

এই ধারণা হওয়ার কারণও ছিল। গোয়াকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এই দাবীতে ১৯৬৩ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মহারাষ্ট্র গোমন্তবাদী দল গোয়া বিধানসভার ২৮টি আসনের মধ্যে ১৬টি দখল করেছিল। অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে কোন স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে না পারায় গোয়ার কংগ্রেস সেই নির্বাচনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। গোয়াবাসীদের রায় মহারাষ্ট্রের অনুকূলে যাবে, একথা অনুমান করার আরও কারণ ছিল। গোয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু ও কোঙ্কনী ভাষাভাষী। রোম্যান ক্যাথলিক খৃশ্চানরা সেখানে সংখ্যালঘু। কোঙ্কনী ভাষা মারাঠী ভাষার খুব কাছাকাছি; মারাঠীরই একটা কথ্য রূপ বলা যেতে পারে। অনুমান করা হয়েছিল যে, সাধারণভাবে কোঙ্কনীভাষী ও হিন্দুধর্মাবলম্বী গোয়াবাসীরা মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী গোয়াবাসীরা অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে।

কিন্তু গোয়ার অধিবাসীদের রায় এইসব অনুমানই মিথ্যা করে দিয়েছে; ৩৪ হাজারেরও বেশী ভোটের ব্যবধানে তাঁরা স্থির করেছেন যে, গোয়া এখন যেমন আছে তেমনি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হিসাবেই থাকবে। মহারাষ্ট্র গোমন্তবাদী দলের পক্ষে, এই দলের নেতা শ্রীপুরুষোত্তম বান্দোদকারের নেতৃত্বে পরিচালিত গোয়ার সরকারের পক্ষে এবং মহারাষ্ট্রের মধ্য থেকে যাঁরা "সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র" আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁদের পক্ষে এই ভোটের রায় একটা বড় রকমের পরাজয়।

অথচ, ভোটের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে ভারত সরকার যে আদৌ রাজী হলেন সেটা প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রীয় নেতাদেরই পীড়াপীড়ির ফল। ১৯৪৬ সালে আসামের শ্রীহট্ট জেলায় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে গণভোট গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা বাদ দিলে ভারতবর্ষে আর কখনও আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্ন ভোটের দ্বারা স্থির করা হয়নি। ১৯৬১ সালে গোয়া, দমন ও দিউ পর্তুগীজ শাসন থেকে মুক্ত হবার পর ভারত সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন সেই নীতিতে অটুট থাকলে আজ সেখানকার সাংবিধানিক মর্যাদা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠার কারণ ছিল না। কেননা, সে সময় বলা হয়েছিল যে, গোয়া, দমন ও দিউ আপাততঃ দশ বৎসরকাল সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকবে এবং তারপর স্থির করা যাবে, এই অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা কি হবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন যে, দীর্ঘ পরশাসন থেকে মুক্তিলাভের পর মনঃস্থির করার জন্য গোয়ার অধিবাসীদের কিছুটা সময় দেওয়া দরকার।

কিন্তু, ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গোয়ার মহারাষ্ট্রভুক্তির আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠতে থাকল। এর আগে অনিচ্ছুক ভারত সরকারের উপর চাপ দিয়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে ভেঙে দু'টুকরো করতে এবং নিজেদের জন্য একটি পৃথক মহারাষ্ট্র রাজ্য আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। তখন থেকেই মহারাষ্ট্রে একটা উগ্র মারাঠীয়ানার হাওয়া বইছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই হাওয়ায় পাল তুলে নৌকা ভাসাতে কসুর করেন নি। মহীশূরের বেলগাঁও এলাকাটি মারাঠীভাষী, ঐ এলাকাটি মহারাষ্ট্রকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং গোয়াকে অবিলম্বে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—এই দুই দাবী মহারাষ্ট্র সরকারের সমর্থন লাভ করল। শ্রীযশোবন্ত চাবন নয়াদিল্লীতে মন্ত্রী হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রে মহারাষ্ট্র নতুন জোরালো মুখপাত্র লাভ করল। বিরোধী দলগুলিও দক্ষিণ ও বাম কম্যুনিস্ট, এস এস পি, কৃষক ও শ্রমিক দল, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি এই দুই দাবীর ভিত্তিতে "সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র সমিতি" গঠন করলেন।

এদিকে, মহীশূরও গোয়ার উপর পাল্টা দাবী জানাতে আরম্ভ করল। মহারাষ্ট্রের কতকগুলি সীমানা অঞ্চল কানাড়ী-ভাষী, এই কারণ দেখিয়ে মহীশূর সেসব অঞ্চলের উপরও দাবী করল।

যতই দিন যেতে লাগল ততই মহারাষ্ট্রে মারাঠীয়ানার খ্যাপামি বাড়তে লাগল। শিবসেনা নামে এক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে উঠল। এই শিবসেনারা মহারাষ্ট্র থেকে "অ-মারাঠী খেদাও" আন্দোলন আরম্ভ করল। তাদের নেকনজর বিশেষভাবে পড়ল বোম্বাই শহরের কর্নাটী ভোজনালয়গুলির উপর।

এই পরিস্থিতির মধ্যে শ্রী এস কে পাতিল পরামর্শ দিলেন যে গোয়া কোথায় যাবে সেটা গোয়ার জনসাধারণের ভোট নিয়ে স্থির করা হোক। তখন প্রশ্ন উঠল, গোয়াবাসীদের সামনে কি কি বিকল্প প্রস্তাব রাখা হবে। মহীশূর থেকে দাবী তোলা হল যে, গোয়ার মানুষ মহীশূরের সঙ্গে যুক্ত রাজী আছেন কিনা সে বিষয়েও তাঁদের মত নেওয়া হোক। কিন্তু মহীশূরের এই দাবী ভারত সরকার মানলেন না। ঘোষণা করা হল যে, শুধু কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে থাকতে চান, না, মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চান, এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর গোয়ার ভোটদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে।

দমন এবং দিউ সম্পর্কে স্থির হল যে, এই দুটি অঞ্চলের অধিবাসীদের গুজরাট-ভুক্তি অথবা কেন্দ্রীয় শাসন, এই দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলা হবে।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই গোয়া, দমন ও দিউয়ে ভোট গ্রহণ করা হল। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা বড় রকমের ঝুঁকি ছিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে একটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল—অর্থাৎ হিন্দুরা একদিকে, খৃশ্চানরা অন্যদিকে ভোট দেবে এবং অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচার সাম্প্রদায়িক ধারায় চলবে।

কিন্তু গোয়ার ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, এই আশংকা মিথ্যা হয়ে গেছে। অনেক হিন্দুপ্রধান এলাকায় যেমন গোয়ার মহারাষ্ট্রভুক্তির বিপক্ষে অধিকাংশ ভোট দেওয়া হয়েছে তেমনি অনেক খৃশ্চান-প্রধান এলাকায় অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অধিকাংশ ভোট পড়েছে। স্পষ্টতঃই এই অঞ্চলের হিন্দুদের বৃহদংশও অন্ততঃ আরও কিছুকাল তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী।

একটি অভিমত এই যে, মহারাষ্ট্র সরকারের ও গুজরাট সরকারের মাদক বর্জন নীতির প্রতিক্রিয়াতেই গোয়া, দমন ও দিউয়ে ভোটের এই অপ্রত্যাশিত ফল হয়েছে। মদ্যপানের রেওয়াজ এই অঞ্চলগুলিতে বহুল-প্রচলিত। স্বভাবতঃই সেখানকার মানুষের আশংকা এই যে, গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁরাও এই রাজ্যগুলির মাদক বর্জন আইনের আওতার মধ্যে এসে যাবেন। দমন ও দিউয়ের এই আশংকা দূর করার জন্য গুজরাট সরকার আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, দমন ও দিউ গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হলে আপাততঃ গুজরাটের মাদক বর্জন আইন সেখানে চালু করা হবে না। কিন্তু তাতেও কাজ হয় নি। গোয়া, দমন ও দিউ কেন্দ্রীয় শাসনেই থাকবে বলে গণতান্ত্রিক অভিমত দিয়েছে এবং ভারত সরকার এই অভিমত মেনে নিয়েছেন।

এই অভিমতের পিছনে কারণ যাই থাকুক না কেন, এই রায়ের মধ্য দিয়ে গোয়াবাসীরা উগ্র মারাঠীয়ানাকেও প্রত্যাখ্যান করলেন। গোয়াকে মহারাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করার জন্য মারাঠী নেতারা অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে, বৃহৎ মারাঠার ডাকে গোয়াবাসীরা সাড়া দেবেন। কিন্তু তাঁরা সাড়া দেন নি; সম্ভবতঃ কট্টর মারাঠিয়ানার প্রকাশ তাঁদের ভীত করে তুলেছে।

এর থেকে "সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্র"ওয়ালারা কিছু শিক্ষালাভ করবেন?

গুরুগোবিন্দ সিংহের তিন-শততম জন্ম-বার্ষিকী : সারা ভারতে শিখ ধর্মের মহা-গুরুর স্মৃতি উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী বেতার-ভাষণে বলেন, "ইতিহাসের এমন একটি স্তরে—যখন আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন, আসুন গুরু-গোবিন্দ সিংহের উদ্দীপ্ত বাণী ও কর্ম-জীবন থেকে আমরা প্রেরণা আহরণ করি।... আজ থেকে তিনশ বছর আগে পাটনায় যে শিশুর জন্ম হয়েছিল তিনি আজ এক অমর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব।...তিনি সকল মানুষের মধ্যে সমতা ও ধর্মের মধ্যে ঐক্যের বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। গুরু-গোবিন্দ সিংহ কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না। তিনি সকল মানুষের নেতা।"

ভারতের বাইরের খবর

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদেশী হস্তক্ষেপ : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএম সি চাগলা ইন্দোনেশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে সফর করতে গিয়েছেন। জাকার্তায় ২১শে জানুয়ারী তারিখে উভয় রাষ্ট্রের পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী যে যুক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছেন তাতে ভিয়েৎনামের সংঘর্ষ সম্প্রসারণে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। তাসখন্দ চুক্তির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ পথে ভারত ও পাকিস্তানের অমীমাংসিত সমস্যাবলীর সমাধান হবে বলে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মালিক আশা প্রকাশ করেন। তাঁদের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। তাঁরা জোট-নিরপেক্ষতার নীতিতে তাঁদের আস্থা পুনঃ-ঘোষণা করেন। ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানকে কোনও সামরিক সাহায্য করবে না এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে।

●

ভিয়েৎনামী সমাচার : লণ্ডনে ১৯ জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে, ভিয়েৎকং গেরিলারা সত্যমুক্ত শান্তি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত হয়েছে। তবে এই আলোচনা জাতীয় মুক্তিফৌজের (এন-এল-এফ) সঙ্গে সরাসরি আমেরিকার সঙ্গেই হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে নগুয়েন হিউ মত প্রকাশ করেছেন। এর আগে ১৭ জানুয়ারী সায়গন থেকে খবর এসেছিল যে, দক্ষিণ-ভিয়েৎনামী সরকার পক্ষ থেকে উত্তর ভিয়েৎ-নামের কাছে ভিয়েৎনামী নববর্ষের যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নোবেল পুরস্কার ভূষিত লেখক জন স্টাইনবেকের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। ভিয়েৎকং-দের কাছ থেকে অধিকার করে নেওয়া কোনও অস্ত্র যেন ভিয়েৎনামে যুদ্ধরত মার্কিনী সেনারা ব্যবহার না করে, এই মর্মে এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, সম্প্রতি ভিয়েৎ-কং গেরিলাবাহিনীর একটি দল নিজে-দের রাইফেল ফেটেই নিহত হয়েছে। তাদের হাতে এই ধরণের আত্মঘাতী অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

●

চীনের গৃহযুদ্ধ : অক্সফোর্ডের অধ্যাপক, ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিউ ট্রেভর-রোপার ১৯ জানুয়ারী লণ্ডনে বলেছেন, মাও সে তুং হয় মারা গেছেন, অথবা আসন্ন মৃত্যুর মধ্যে উপনীত হয়েছেন—সেই কারণেই বর্তমানে ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টায় চীনের বিভিন্ন নেতা পরস্পরের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে লড়াই জুড়ে দিয়েছে। মোট কথা মাও যে চীনের উপর সর্বাত্মক অধিকার কায়েম করে-ছেন একথা সত্য নয়।

হংকং-এ ১৯ জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে, লাল রক্ষীদের একটি দল কুং-ফুৎসের (কনফুসিয়াস) জন্মস্থানে হানা দিয়ে আগুন লাগিয়ে এই "প্রাচীন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মনেতা"র সমাধিচিহ্নকে নাশ করেছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে চীনের আপামর জনসাধারণ এই দার্শনিক মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আপাততঃ সর্বশেষ শিকার হলেন বিশ্ববরেণ্য মহামানব কুং-ফুৎসে।

গুরুগোবিন্দ সিং

●

রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়া : মস্কো ২০ জানু-য়ারী,—আজ প্রাভদা পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই চীনের উদ্দেশ্য। এতে ইন্দো-নেশিয়ার শোচনীয় পরিণতির জন্য চীনকেই দায়ী করা হয়েছে।

রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের প্রধান মার্শাল নিকোলাই ক্রুলভ আজ চীন-সোভিয়েট সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেছেন। আর, ব্রেজনেভ, কোসিগিন এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগোর্নি গত ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী বেসরকারীভাবে পোল্যান্ড সফরে গিয়েছেন। বর্তমান বিশ্ব কমিউনিস্ট পরি-স্থিতি পর্যালোচনাই সম্ভবতঃ তাঁদের এই মৈত্রী সফরের উদ্দেশ্য।

●

পাকিস্তানকে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সাহায্য করবে : করাচী ১৭ জানুয়ারীর খবর, পাকিস্তানের বর্তমান খাদ্যসংকট ত্রাণের জন্য আগামী চৈতালী ফসলের আগে অবাধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০০,০০০ টন এবং চীন ২৫০০০০ টন খাদ্য সম্ভার সাহায্য করবে।

আমার জীবন
মধু বসু

(৪৮)

'গিরিবালা'র শুটিং ধীরে ধীরে এগাতে লাগল, নায়িকা ইন্দ্রাণী বম্বে থেকে ফিরে এসে যথারীতি শুটিং করতে লাগল।

এদিকে সাধনাও ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। ডিসেম্বর মাসে ডাক্তাররা বললেন : এইবার রোগিণীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন। তবে এখন বেশ কিছুদিন এঁকে সাবধানে থাকতে হবে। খাওয়া-দাওয়া এবং নার্সিং-এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে, কোনরকম এদিক-ওদিক হলে চলবে না।

ডিসেম্বর মাসে সাধনাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে গ্রেট ইস্টার্নেই তুললাম। প্রায় পাঁচ মাস একনাগাড়ে বিছানায় শুয়ে থেকে তার তখন এমন অবস্থা যে সামান্য চলাফেরা করবারও শক্তি নেই। মনে আছে মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে ময়দানে ইডেন গার্ডেনে—সেখানে ওকে ধরে ধরে চলাফেরা করাতাম। ক্রমে ক্রমে সে গায়ে জোর পেল এবং ভগবানের দয়ায় সে নবজীবন লাভ করে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল।

এদিকে ডিসেম্বর মাসে 'গিরিবালা'-র শুটিংও শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ছবি একবার বন্ধ হলে আর কি তেমন সুষ্ঠু ভাবে শেষ হয়? অনেক রকম বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে শেষ করতে হোয়েছিল। যদিও কলকাতায় দাঙ্গার সে-রকম বীভৎসতা কমে এসেছিল কিন্তু উত্তেজনা এবং ভয় তখনও লোকের মনে বেশ ভালভাবেই ছিল। এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের এলাকায় যেতে রীতিমত ভয় করত। এই-জন্যে আমার ইউনিটের কয়েকজন লোককে অদল-বদল করতে হয়েছিল নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। তাতে খানিকটা কাজের অসুবিধা হয়েছিল।

নায়িকা ইন্দ্রাণী ও তার মা তাদের কাজ শেষ করে দিল্লীতে অর্থাৎ তাদের দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য তারা কাজে আশানুরূপ মনঃসংযোগ করতে পারেনি, এবং আমি যতটা আশা করেছিলাম ততটা ভাল কাজ তার কাছ থেকে পাইনি। যাই হোক ছবি শেষ করে তারা ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ দিল্লী চলে গেল আর আমিও 'গিরিবালা'র সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

সেই সময় হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ নলিনীরঞ্জন সরকার গ্রেট ইস্টার্নে লাঞ্চ খেতে এলেই প্রায়ই আমাদের স্যুইটে আসতেন। অনেক দিন থেকেই সাধনাদের পরিবারের সঙ্গে নলিনীবাবুর ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় ছিল। ২।১ দিন আমরাও তাঁকে আমাদের 'স্যুইটে' লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

তিনি প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন : কেন যে তোমরা এত খরচ করে হোটেলে পড়ে আছ এর কোনো মানেই হয় না। হোটেলে আছ অথচ নিজেদের চাকর-বাবুর্চি দিয়ে রান্না করছ, খাচ্ছ। আর হোটেলে পুরো বিল দিচ্ছ—এ-ধরনের হোটেলে থাকার কোনো যুক্তিই নেই।

আমি বললাম : হোটেলের খাওয়া খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। এদের রান্না আর ভাল লাগে না। তাছাড়া আমরা দুজনেই 'বাংলা রান্না' খেতেই বেশী ভালবাসি।

তিনি বললেন : বেশ তো বাংলা রান্না ভালবাস তো একটা ফ্ল্যাট নাও না—সেখানে অনেক কম খরচে নিজের মনের মত অনেক ভাল খাবার খেতে পারবে।

আমি বললাম : আগে স্টিফেন কোর্টে আমি যে ফ্ল্যাটটায় ছিলাম তার ভাড়া দিতাম ৩৫০ টাকা, কিন্তু যখন বম্বে থেকে ফিরে এলাম, তখন দেখলাম সে-ফ্ল্যাটটার ভাড়াও যেমন বেড়েছে তেমনি যে ভদ্রলোক এখন সেখানে রয়েছেন তাঁকে সেলামীও দিতে হয়েছে প্রচুর টাকা। অত টাকা সেলামী দেবার ক্ষমতা আমার নেই, সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে হোটেলে আছি।

এই কথা শুনে নলিনীবাবু বললেন : আচ্ছা, আমি একটা প্রস্তাব করছি। নিউ আলিপুরে হিন্দুস্থান ল্যাণ্ড ডেভেলাপ-মেণ্ট-এর তরফ থেকে অনেকখানি জমি আমরা নিয়েছি। আমি সেখানে খানিকটা জমি নিয়ে তোমাদের জন্যে একটা বাড়ী তৈরি করে দিচ্ছি। আমার মনে হয় খান-পাঁচেক ঘর হলেই তোমাদের যথেষ্ট। নীচে খাবার-ঘর, বসবার-ঘর, অফিস ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর ওপরে দুখানা শোবার-ঘর থাকবে।

আমি বললাম : বাড়ী করতে যে বলছেন, সে কি আর আমাদের দ্বারা

সম্ভব? আমি তো বরাবরই দিন আনি, দিন খাই। আমার সঞ্চয় কোথায় যে, জমি কিনব, বাড়ী করব?

বাধা দিয়ে তিনি বললেন: তা আমি জানি। আমার প্রস্তাবটা আগে ভাল করে শোনই না। জমি কিনে বাড়ী করে দেবে হিন্দুস্থান—তোমাদের প্ল্যান অনুযায়ী। তোমার দিক থেকে হোটেলে যে-টাকাটা মাসে মাসে দিচ্ছ সেইটাই দিও।

এ-কথায় আমি বললাম: আজ আমি একটা ভাল কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি, ভাল টাকাও পেয়েছি, তাই হোটেলে এতবড় একটা স্যুইট নিয়ে রয়েছি। কিন্তু জানেন তো আমার বাঁধাধরা একটা রোজগার নেই যার ওপর ভরসা করে আপনাকে বলতে পারি যে, মাসে মাসে আপনাকে এই টাকা আমি দিতে পারি। ধরুন, এখন হাতে যে-টাকা আছে তা ফুরিয়ে গেল, এবং পরবর্তী কণ্ট্রাক্ট হতেও বেশ কিছু দেরী হল, এ-অবস্থায় তো মাসে মাসে চুক্তি অনুযায়ী টাকা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তিনি হেসে বললেন: বেশ তো, তোমাদের জন্যে আমি একটা স্পেশাল ক্লজ করব, যখন যেমন পারবে, তখন তেমন দেবে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। আর এজন্যে কোন অতিরিক্ত সুদ বা টাকা দিতে হবে না।

আমি বললাম: বেশ, আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। এরপর যখন দেখা হবে, তখন আপনাকে বলব।

বিশেষ গ্রন্থ সংখ্যা

অমৃতের ১০ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যাটি সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিশেষ গ্রন্থ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যায় থাকবে দেশ বিদেশের বইয়ের খবর, বাঙলাদেশে বইয়ের বাজার, গ্রন্থাগার, অনুবাদ, এবং গ্রন্থ সংক্রান্ত অন্যান্য নিবন্ধ।

লিখবেন ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী সুধীরচন্দ্র সরকার, জানকীনাথ বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নকুল চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতায় চৌরঙ্গী প্লেসে যখন ছিলাম, তখন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে একেবারে শহরের মাঝখানে থাকা। বম্বেতে যখন ছিলাম, তখন সবথেকে অভিজাত পল্লী 'মেরিন ড্রাইভ'-এ ছিলাম। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে আবার রইলাম স্টিফেন কোর্টে। তখনকার আলিপুরের সঙ্গে এখনকার আলিপুরের অনেক তফাৎ। তখন আলিপুরে এমন বসতি গড়ে ওঠেনি—চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। তেমন লোকজন বাড়ী-ঘর কিছুই নেই। সুতরাং ওই তেপান্তরের মাঠে গিয়ে থাকতে একেবারেই মন চাইল না। এ একেবারে শহরের বাইরে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের থেকে দূরে। কাছাকাছি কোন ক্লাবও নেই যে, দু-দণ্ড গিয়ে সময় কাটাব।

সুতরাং এরপর যখন নলিনীবাবু আমাদের 'স্যুইটে' এলেন, তখন তাঁকে বললাম: আপনি আমাদের যে-সুযোগ ও সুবিধা দেবেন বলেছেন, এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, হয়ত এরকম সুযোগ-সুবিধা জীবনে আর কোনদিনই পাব না, কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম যে, একেবারে শহর থেকে দূরে সেই 'ধারধাড়া গোবিন্দপুরে' গিয়ে থাকাটা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে ওইরকম পরিবেশে। আমাদের যারা খুব অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাদের অনেকেরই গাড়ী নেই। ফলে এদের সঙ্গে যোগাযোগটাও কমে যাবে। তাছাড়া আমাদের ইচ্ছে আছে, আবার আমাদের সেই মঞ্চ-প্রতিষ্ঠান সি এ পি-কে জাগিয়ে তুলে স্টেজ-শো করব। 'আলিবাবা'র মত সি এ পি-র শিল্পীদের দিয়ে আর একখানি ফিল্ম করবার ইচ্ছা আছে। অত দূরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সংস্রব থেকে বিচ্যুত হয়ে এ-ধরনের কাজ সম্ভব হবে না মিঃ সরকার।

নলিনীবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন মাত্র। যাবার সময় বলে গেলেন: আজ তুমি বলছ সম্ভব হবে না, অতদূরে শহর থেকে, ধারধাড়া গোবিন্দপুর ইত্যাদি, কিন্তু এই আলিপুরই একদিন এমন আকার নেবে যে, তখন মাথা খুঁড়লেও এক কাঠা জমিও পাওয়া যাবে না। খুব ভুল করলে তোমরা। এখনও আমার কথা শোন তোমরা যে-ধরনের কাজ কর, অর্থাৎ তোমাদের যা পেশা, তাতে যদি একখানা বাড়ী থাকে মাথা গোঁজবার তাহলে ভবিষ্যতে অনেক ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে মর্মে মর্মে নলিনীবাবুর সেই কথাগুলি উপলব্ধি করছি।

'গিরিবালা'র সম্পাদনা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ শেষ হল। আমি একটি ছবির সম্পূর্ণ প্রিণ্ট নিয়ে বম্বে গেলাম আমার প্রোডিউসারকে দেখাবার জন্যে। আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে, গিরিবালার প্রধান আকর্ষণ ছিল সংগীত এবং গানগুলি। কলকাতায় দাঙ্গার জন্য শুটিং-এর সময় বাধা না পড়লে ছবি আরো অনেক ভাল হতে পারত।

যাই হোক, ছবি দেখে প্রোডিউসারের মোটামুটি ভালই লাগল। এবং বোম্বায়ের রয়্যাল অপেরা হাউসে রিলিজের ব্যবস্থা হতে থাকে।

এল এপ্রিল মাস। 'গিরিবালা'র দরুণ যা টাকা-কড়ি পেয়েছিলাম, তা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগল। এই সময় আমি একটা ফ্ল্যাটের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। বরাতগুণে বিনা সেলামীতে এবং স্থানকাল বিবেচনা করে মোটামুটি ন্যায্যমূল্যে পেয়েও গেলাম একটা। আমাদের বিশেষ বন্ধু, কলকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এল আর প্যাটেল সপরিবারে ইংলণ্ড যাচ্ছিলেন বেড়াতে। সেই সময় ৩নং থিয়েটার রোডে তাঁর সুসজ্জিত ফ্ল্যাটটি আমায় দিয়ে গেলেন মাসিক মাত্র ৫০০ টাকা ভাড়ায়। ফ্ল্যাটটি বেশ বড়, তিনখানা শোবার ঘর, খাবার ঘর বসবার ঘর, দক্ষিণে খোলা বারান্দা ইত্যাদি। মিঃ প্যাটেলের ভাড়া দেবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু যেহেতু তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য বিলেত যাচ্ছেন, আর আমি একটা ফ্ল্যাট খুঁজছি এটা তিনি জানতে পেরে আমাকেই সেটা দিয়ে যান।

এই ফ্ল্যাটের নীচে থাকতেন মিঃ সুশীল দে, আই-সি-এস। এই সুশীলের কথা আমি আগেই বলেছি—১৯৩৮ সালে যখন সি এ পি সম্প্রদায়কে নিয়ে ঢাকা সফর করতে যাই, সে সময় সুশীল ছিল ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং আমাদের প্রচুর সাহায্য করেছিল।

যাই হোক, মে মাসে আমরা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাট তুলে দিয়ে ৩নং থিয়েটার রোডে মিঃ প্যাটেলের ফ্ল্যাটে উঠে গেলাম।

([illegible])

হঠাৎ দেখা চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও সুস্মিতা সান্যাল

প্রেক্ষাগৃহ

আজকের কথা :

চলচ্চিত্রে প্রমোদকর :

ভারত ইউনিয়ন যে গরীব দেশ, এখানে যে খাদ্যের অভাব, কৃষিকার্যের জন্যে সারের অভাব এবং আরও নানা রকমের অভাব আছে, সেকথা আমাদের ভারত সরকার সারা পৃথিবীর কাছে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন। সেই গরীব দেশের বাসিন্দাদের একমাত্র সস্তা দরের প্রমোদ-মাধ্যম হচ্ছে—সিনেমা। উদরপূর্তির যেখানে অসুবিধা সেইখানেই যে মনের স্ফূর্তির বিশেষ প্রয়োজন, এই তথ্যটি কারুর না জানবার কথা নয়। শুধু পরিশ্রমের পর অবসাদ বিনোদনের জন্যে নয়, নিত্যকারের [illegible] অনটনের কঠিন পীড়ন থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই হাড়ভাঙা খাটুনির স্বল্প রোজগারের অনেকখানি অংশই নিরক্ষর মেহনতী মানুষ ব্যয় করে নানাবিধ উত্তেজক পানীয়ের ওপর। কিন্তু যে কল-কারখানার কাছে সিনেমা হাউস আছে, তার শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই রূঢ় বাস্তব ভোলবার জন্যে উত্তেজক পানীয়ের আশ্রয় না নিয়ে সিনেমা হাউসে ছবি দেখে ঘন্টা তিনেক কাটিয়েই মানসিক পরিতৃপ্তি বোধ করেন। এতে শুধু যে অর্থেরই সাশ্রয় হয়, তাই নয়, মাদকীয় উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শারীরিক গ্লানি এবং অনিবার্য সাংসারিক অশান্তির হাত থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। এছাড়া চলচ্চিত্র দেখার আর একটি পরোক্ষ উপকার আছে। চলচ্চিত্র প্রধানত প্রমোদ-মাধ্যম হলেও এর ভিতর থেকে কিছু-না-কিছু শিক্ষণীয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। একখানি অত্যন্ত সস্তা-ধরনের হাসি-নাচ-গানে ভরপুর হিন্দী ছবি সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। একজন নিরক্ষর সাধারণ দর্শক মাত্র আনন্দ পেতেই ছবি দেখতে যান বটে, কিন্তু ছবির কাহিনী ঠিক চিনি-দিয়ে-মোড়া কুইনিন বড়ির মতোই তাঁকে তাঁর অজ্ঞাতসারেই ন্যায়-অন্যায়, পাপপুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষিত করে তোলে। এবং এই শিক্ষার যে একটি সুদূরপ্রসারী ফল আছে, একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই দরিদ্র দেশের স্বল্পবিত্ত জন-সাধারণের এই সুলভতম প্রমোদ-মাধ্যম—সিনেমার—ওপরে আমাদের রাজ্যসরকার-গুলি প্রমোদকরের গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছেন নিজেদের রাজস্ববৃদ্ধির তাগিদে। জনকল্যাণ ও গঠনমূলক শাসনকার্য পরি-চালনার জন্যে যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন আছে, একথা অনস্বীকার্য। তাই বলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের উপর কোনোরকম কর ধার্য করা যেমন কোনোমতেই সমর্থনীয় নয়, ঠিক তেমনই দরিদ্রের চিত্ত-বিনোদনের একমাত্র সুলভতম মাধ্যম সিনেমার ওপরেও প্রমোদকর বসানোকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বিশেষ করে দরিদ্র ও সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শকেরা যে মূল্যে ছবি দেখে থাকেন, তার ওপর প্রমোদকর ধার্য করা নিতান্ত অযৌক্তিক। অথচ দেখি, টিকিটের আসল দাম যখন এক টাকা, তখন বিভিন্ন রাজ্য সরকার তার ওপর প্রমোদকর আদায় করেন ২৫ পয়সা থেকে ৪০ পয়সা পর্যন্ত। এই প্রমোদকরের বিরুদ্ধে প্রতিটি রাজ্যবাসীই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন এই কর প্রবর্তনের গোড়ার দিন ১৯২২ সাল থেকেই। কিন্তু প্রতিবাদের ফলে প্রতিটি রাজ্যসরকারই এই কর বৃদ্ধি করে চলেছেন কয়েক বছর অন্তরই।

আমাদের ভারত জনকল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। তাহলে জনগণের সুলভতম প্রমোদ-মাধ্যমের ওপর করধার্য করা রাজস্ব বৃদ্ধির শেষতম উপায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অথচ চেকোশ্লোভেকিয়ার মতো একটি ছোট্ট রাজ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ওপর প্রমোদ-কর ধার্য করা ত হয়ই না, উল্টে সিনেমা-শিল্পকে সাহায্যকল্পে প্রতিটি টিকিটের দামের এক-তৃতীয়াংশ সাহায্য স্বরূপে দেওয়া হয়ে থাকে। সাধারণ লোক যাতে বেশী করে চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ লাভ করে, তারই জন্যে এই সাহায্যের ব্যবস্থা। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার-গুলি ভারতীয় এবং আঞ্চলিক চলচ্চিত্র-শিল্পের সাহায্যের জন্যে নাকি সদাই উন্মুখ। তাঁরা যে যথার্থই সিনেমাশিল্পের উন্নতি চান, তার প্রমাণস্বরূপ তাঁরা চেকো-শ্লোভেকিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দর্শক-সাধারণের প্রীতিভাজন হোন না কেন?

—নান্দীকর

কলকাতা

'হঠাৎ দেখা' চিত্রের শুভমুক্তি

শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্সের কৌতুক-চিত্র 'হঠাৎ দেখা' বর্তমান সপ্তাহের ২৭ জানুয়ারী থেকে রাধা, পূর্ণ, আলোছায়া ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। তীর্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন তরুণ পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সুমিত্রা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, রেণুকা রায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। এস বি ফিল্মস পরিবেশিত এ চিত্রের সুরকার শ্যামল মিত্র।

মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্র 'ছুটি'

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত পূর্ণিমা পিকচার্সের 'ছুটি' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। বিমল কর রচিত 'খড়কুটো' অবলম্বনে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য বিধৃত। প্রধান তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবাগত মৃণাল মুখোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন অভিনেত্রী পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী। নেপাল দত্ত প্রযোজিত এ ছবিটি মিনার, বিজলী, ছবিঘর প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

পীযূষ বসু পরিচালিত 'অসামাজিক'

কে. ডি. পিকচার্সের নতুন ছবি 'অসামাজিক'-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক পীযূষ বসু। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় এ ছবির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে গৃহীত হচ্ছে। নির্মীয়মান এ চিত্রের চরিত্রলিপিতে রয়েছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

খেয়া চিত্রে ভানু ব্যানার্জি।
ফটো : অমৃত

সরকার প্রোডাকসন্সের 'অজানা শপথ'

সলিল সেন পরিচালিত সরকার প্রোডাকসন্সের 'অজানা শপথ' চিত্রটির দৃশ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হতে চলেছে। পরিচালক শ্রীসেনের 'সন্ন্যাসী' নাটকটি অবলম্বনে এটির চিত্রকাহিনী রচিত। প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী ও নবাগত নায়ক সোমেন চক্রবর্তী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকৃত এই চিত্র পরিবেশনার ভার নিয়েছেন শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স।

বোম্বাই

রাত আন্ধেরী থি

সরগম চিত্রের 'রাত আন্ধেরী থি' পরিচালনা করছেন শিবকুমার। সম্প্রতি বম্বের জেনা ব্রীজে এ চিত্রের একটি লোমহর্ষক দৃশ্য হেলিকপ্টারে গৃহীত হয়েছে। ছবির মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন ফিরোজ খান, ললিতা চ্যাটার্জী, শেখ মুখতার, মোহন চুটি, বিপিন গুপ্ত, জীবনকলা ও হেলেন। উষা খান্না ছবিটির সুরকার।

তুম মেরে হো

পরিচালক নরেন্দ্রকুমার তাঁর নতুন ছবি 'তুম মেরে হো'র চিত্রগ্রহণ মোহন স্টুডিওয় আরম্ভ করেছেন। কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সঞ্জীবকুমার, কল্পনা, জগদীপ, সুন্দর, জনি হুইস্কী, হেলেন ও নবাগতা সুষমা। সংগীত-পরিচালনায় রয়েছেন উষা খান্না।

আমনে সামনে

সুরজ প্রকাশ পরিচালিত 'আমনে সামনে'র বহির্দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কলামন্দির, সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর ও আরে মিল্ক কলোনী প্রভৃতি অঞ্চলে গৃহীত হল। সাইট এণ্ড মুভিজের এই রঙিন চিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন। শশিকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, প্রেম চোপরা, রাজেন্দ্রনাথ, মদনপুরী, কমল কাপুর প্রভৃতি শিল্পীগণ। সংগীত-পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

বহু বেগম

পরিচালক এম সাদিক তাঁর রঙিন চিত্র 'বহু বেগম'-র সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ শেষ করেছেন। বর্তমানে ছবিটির সম্পাদনার কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অশোককুমার, মীনাকুমারী, প্রদীপকুমার, জনি ওয়াকার, নাজ, সাপ্রু, লীলা মিশ্র, ললিতা পাওয়ার ও হেলেন। সংগীত-পরিচালক রোশন ছবিটির সংগীতকার।

মঞ্চাভিনয়

মুকুর-নাট্যসংস্থার 'থানা থেকে আসছি'

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' শুধু যে বহু নাট্য-সম্প্রদায় দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, তাই নয়; এই সাসপেন্সধর্মী নাটকটি চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছিল। জে বি প্রিসলে রচিত কাহিনীকে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বাংলায় এমন সুন্দরভাবে রূপান্তরিত করেছেন যে, 'থানা থেকে আসছি'কে একটি মৌলিক নাটক বলেই ভ্রম হয়। যে-ব্যবহারকে আপাতদৃষ্টিতে একটি ছোট্ট অবিচার বলে মনে হয়, তাই সময় সময় স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রাকে কি অভাবনীয়ভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে, সেই কথাই তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকটির মাধ্যমে। বৃহত্তরভাবে দেখতে গেলে এই নাটকটি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে—বর্তমানের সামাজিক অব্যবস্থার দোষে সমাজের নীচেরতলার জনসাধারণকে যে অবিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার প্রতি।

নবগঠিত 'মুকুর'-নাট্যসংস্থার শিল্পীবৃন্দ পরিচালক প্রশান্ত ভট্টাচার্যের

নির্দেশে বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রোচিত নাট্য-নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রথম অভিনয়রজনীসুলভ দ্বিধাগ্রস্তভাব প্রথম প্রথম কোনো কোনো শিল্পীকে অধিকার করলেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। ইনস্পেক্টার তিনকড়ি হালদার তাপস সেন, শীলার পাণিপ্রার্থী অমিয় বসু, আধুনিকা শীলা এবং পরিবারের কর্তা ও গৃহিণীর ভূমিকায় যথাক্রমে বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ নন্দী, দীপা হালদার, প্রত্যধানন্দ ভট্টাচার্য (পরিচালক) ও সবিতা মুখোপাধ্যায়—প্রত্যেকেরই অভিনয় প্রশংসা-যোগ্য। থিয়েটার সেন্টারের স্বল্পায়তন মঞ্চে একটি বহিরাগত সম্প্রদায়ের পক্ষে যতখানি সুষ্ঠু উপস্থাপনা সম্ভব, তা করতে শিল্প-নির্দেশক পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থ হয়েছেন।

'মুকুর'-সংস্থার 'থানা থেকে আসছি' দেখে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দ একটি সচরাচর অনাস্বাদিত তৃপ্তি অনুভব করবেন।

শিল্পদল-এর পরবর্তী নিবেদন 'মুক্তধারা':

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' একটি দুরূহ রূপক নাটক। শিল্পদলের সভ্যরা এই নাটক নিয়ে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আসছে ২৭-এ জানুয়ারী

নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট' মঞ্চে অনিলবরণ দত্তের 'স্বীকৃতি' অভিনয় করেন। সামগ্রিক অভিনয়ের মধ্যে প্রতিটি শিল্পীর দক্ষতা ধরা পড়েছে। এই নাটকের কৃতী শিল্পীরা হলেন সুশান্ত সান্যাল, শিবদাস মুখার্জী, প্রদ্যোৎকুমার বসাক, অনিল ঘোষদস্তিদার, অমিয়কুমার মুখার্জী, সরোজকুমার দে, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র। নাটকটি সার্থকতার সংগে পরিচালনা করেন সুশান্ত সান্যাল।

হেয়ালী

'হেয়ালী'র শিল্পীরা এবার মঞ্চস্থ করলেন সুনীল দত্তের 'দোলা' এবং বিমল রায়ের 'অভিনয়'। সংঘবদ্ধ অভিনয়গুণে নাটকটি সবারই স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। নাট্যনির্দেশনায় জগন্নাথ ভট্টাচার্য নতুনতর দৃষ্টিভংগীর পরিচয় রাখতে পেরেছেন। ভালো অভিনয়ের জন্য যাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন তাঁরা হোলেন যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিমল রায়, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস কুণ্ডু চৌধুরী, প্রণব চক্রবর্তী, বিজন বসু, শঙ্কর আড্ডি ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৌর কর্মী সংঘ (টালিগঞ্জ)

টালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে গত ১৫ই জানুয়ারী কলকাতা পৌর কর্মী সংঘের প্রযোজনায় বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে 'পাহাড়ী ফুল' নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। সুঅভিনয় করেন কালীকৃষ্ণ দত্ত, সৌরেন মুখোপাধ্যায়, কিরণ দত্ত, চণ্ডী কুণ্ডু, বেলা রায়, শাশ্বতী রায়, ভৈরব ঘোষ, সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে প্রভৃতি।

রূপশিল্পী গোষ্ঠী

বহরমপুরের 'রূপশিল্পী গোষ্ঠী' সম্প্রতি 'কান্দী সংস্কৃতি সম্মেলনে' শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। নাট্যরূপ দেন অতীন্দ্র মজুমদার। এই নাট্যপ্রযোজনাটি উচ্চাংগের হয় এবং সব মহলেই বেশ খানিকটা আন্দোলন জাগাতে পেরেছে। রামু মুখোপাধ্যায় 'গফুর' চরিত্রের যন্ত্রণা, ক্ষোভ অপূর্ব সুন্দরভাবে মঞ্চে তুলে ধরতে পেরেছেন। 'আমিনা'র ভূমিকায় মায়া দাশের অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। অন্যান্য চরিত্রে সাথর্ক অভিনয় করেন প্রভাত চৌধুরী, কমল দাশ, দ্বারিক মল্লিক, অনিলকুমার দত্ত, বীরেন সিংহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভাংশু চক্রবর্তী প্রভৃতি।

কল্লোল গোষ্ঠী

দুর্গাপুরের 'কল্লোল গোষ্ঠী'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি স্থানীয় শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে বাদল সরকারের 'বড়পিসীমা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন নমিতা দাস, অর্পনা মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ভট্টাচার্য।

তিনটি একাংকিকা

সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে 'সি-এল-টি'র শিশু শিল্পীরা তিনটি একাংক নাটকের অভিনয় করে নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। নাটক তিনটির নাম 'পুটুরাণী', 'লাল নেকড়ে', 'নকল রাজা'। সত্যি, শিশু শিল্পীদের দরদী অভিনয় এই তিনটি নাটকেই সবুজ প্রাণের স্পর্শ দিয়েছিল। কাকলি দাস, কাকলি চ্যাটার্জি, শুক্লা, সুপ্রিয়া, দীপা, পিংকু, দেবযানী ও ইন্দ্রাণীর অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছে।

"ষোড়শী"

ঘুঘুডাঙ্গা পি এণ্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'স্টার' রংগমঞ্চে 'ষোড়শী' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেছেন সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য। 'জীবানন্দ' ও 'এককড়ি'র ভূমিকায় যথাক্রমে যুগল দত্ত ও অশোক ভট্টাচার্য অসাধারণ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দেন। অন্যান্য চরিত্রগুলোও সুঅভিনীত।

মিলনতীর্থ

বাঁকুড়ার প্রগতিশীল নাট্যসংস্থা 'মিলনতীর্থ' সম্প্রতি বীরু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যরূপায়িত রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' মঞ্চস্থ করলেন। সঙ্গে বিমল রায়ের 'অভিনয়' নাটকও পরিবেশিত হয়। দুটি নাটকই দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। দুটি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সুখরঞ্জন দত্তরায়, মঙ্গল দুবে, অশোক ভট্টাচার্য, হীরালাল গুহ, মীরা চ্যাটার্জী, ইলা ঘোষ, সুহাস মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, পীযুষ দত্ত।

জীবনের বালুচরে

কালচারাল সেমিনারের বহু অভিনীত জনপ্রিয় নাটক "জীবনের বালুচরে" গত ১১ই জানুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে আবার মঞ্চস্থ হলো। এই গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দের 'জীবনের বালুচরে' মঞ্চরূপায়ণ নতুন চিন্তামূলক নাট্যপ্রয়াসের গভীরতাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। নাটকের একেবারে শেষে রামু তার মূকাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের নিঃসীম যন্ত্রণাকে প্রকাশ করলো আর সমগ্র জীবনের আনন্দ আর বেদনাকে একই সঙ্গে

আত্মসাৎ করে যেন এই জীবনটারই একটা জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে রইলো। অভিনয়াংশে সমর মুখোপাধ্যায়ের 'লল্টু', দীপক রায়ের 'কেষ্টা' এবং রমেশ সরকারের 'জীবন' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

"সম্রাটের মৃত্যু"

মেখলীগঞ্জে 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবে'র শিল্পীরা কিছুদিন আগে শচীন ভট্টাচার্যের 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন রবি বর্ধন। এই নাটকটি পর পর দু' রাত্রি অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন বিদ্যুৎ পাল, সুনীল রায়, সমর বোস, দ্বিজেন চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, দেবব্রত দত্ত, বাপি মিত্র।

।। গান্ধারের নাট্যানুষ্ঠান ।।

আগামী বৃহস্পতিবার ২রা ফিব্রুয়ারী কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'গান্ধার' তাঁদের বহুল প্রশংসিত নাটক সমারসেট মমের "দি লেটারের" ছায়া অবলম্বনে রচিত "দশটি বছর" নাটকটি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে সন্ধ্যা ৭টায় পুনরভিনয়ের আয়োজন করেছেন।

বাণীরূপা

কিছুদিন আগে 'বাণীরূপা'র শিল্পীবৃন্দ 'আবর্ত' ও 'ঝড়ের' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেছেন রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। দুটি নাটকের অভিনয়ে শিল্পীদের আন্তরিক নিষ্ঠা অভিনন্দযোগ্য। সুঅভিনয় করেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, বাচ্চা ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী, ব্রহ্মানন্দ বিশ্বাস, সুরজিত সাহা, দীপক গুহ, হারাধন ব্যানার্জী, প্রদ্যোত গাঙ্গুলী, কালো লাহিড়ী, বেলা রায় ও নাট্যনির্দেশক বাবলু দাশগুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

সায়ান্স ফিকশ্যন সিনে ক্লাব:

এস এফ সিনে ক্লাবের এক বছর পূর্ণ হল। দ্বিতীয় বছরের প্রথম ছবি জুলে-ভের্ণের 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' প্রদর্শিত হল গেল রবিবার প্যারাডাইস সিনেমায়। ক্লাবে এখনও কিছু সদস্য নেওয়া হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা সম্পাদক অদ্রীশ বর্ধনের সঙ্গে ৯৭।১, সারপেনটাইন লেনস্থ দপ্তরে (ফোনঃ ৩৪-৭২৭৪) যোগাযোগ করতে পারেন। ক্লাবের পরবর্তী প্রদর্শনী হবে ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭-তে ব্রাসেলস-এ পুরস্কৃত 'ফ্যাবুলাস ওয়ার্ল্ড অফ জুলভের্ণ'।
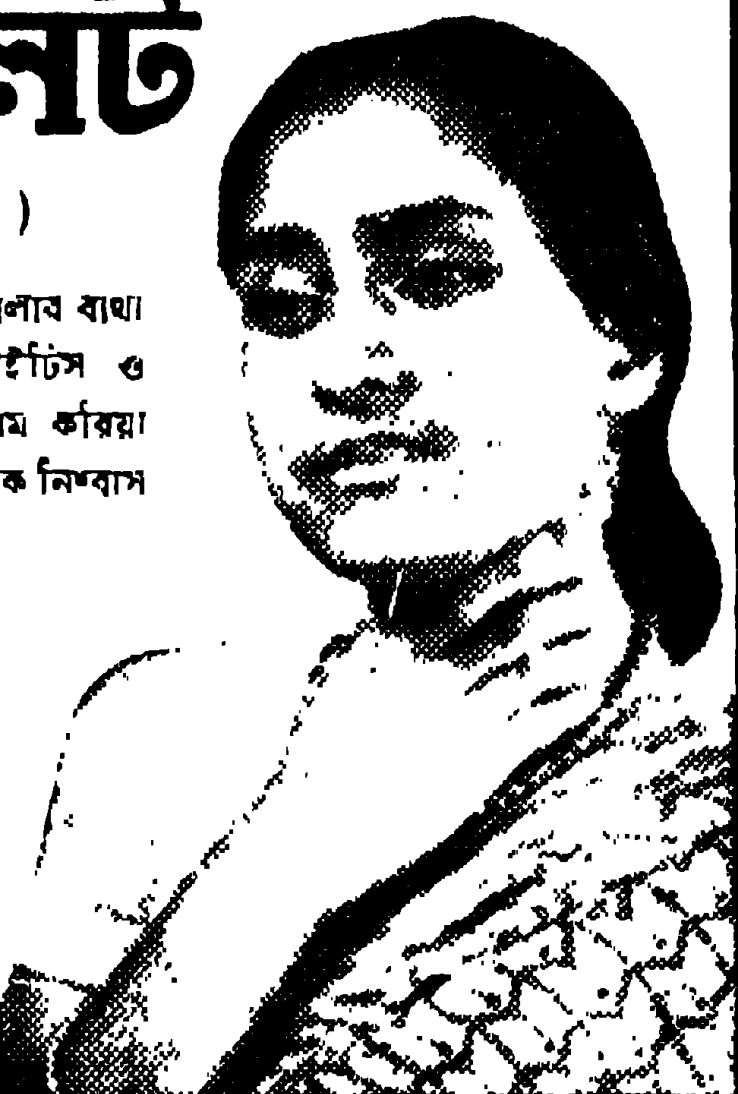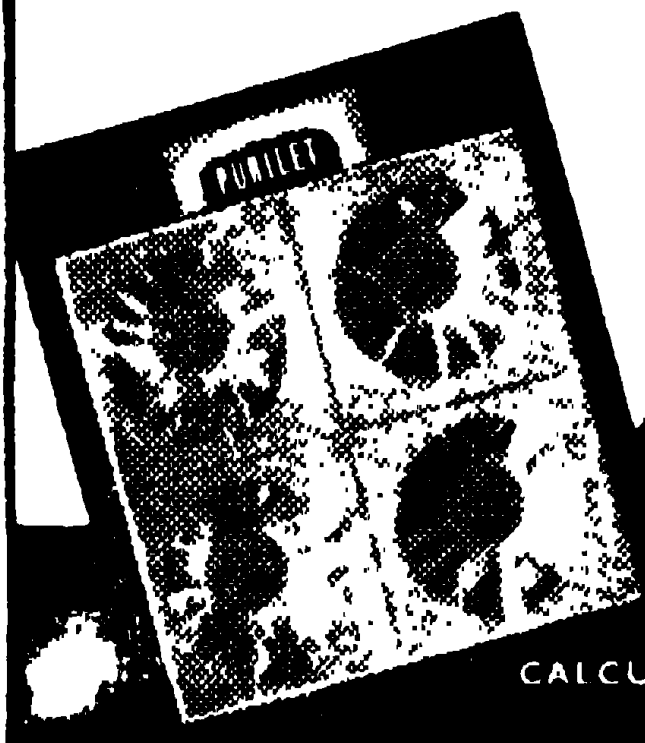
পল টেলার-এর আধুনিক নৃত্যসম্প্রদায়:

আমেরিকার বিখ্যাত নর্তক পল টেলার ও তাঁর নৃত্য-সম্প্রদায় আসছে ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় রবীন্দ্রসদনে আধুনিক নৃত্যকলা প্রদর্শন করবেন। মার্থা গ্রেহাম, জোস লিমন, ডোরিস হামফ্রে, অ্যান্টনী টিউডর, মার্গারেট ক্লাসকে প্রভৃতির কাছ থেকে একক ও ব্যালে নৃত্য শিক্ষা করবার পরে তিনি তাঁর প্রতিভাগুণে এক-জন সেরা নর্তক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন এবং ১৯৬১, ৬২, ৬৫ ও ৬৬ সালে আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম নর্তক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। মার্থা গ্রাহাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি প্রথমে দূরপ্রাচ্য ভ্রমণে আসেন ১৯৫৫ নভেম্বর। এরপরেও তিনি কয়েক-বার নিজের দল নিয়ে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটির উদ্যোগে পল টেলারের এই নৃত্য আসরটি বসছে।

ইয়ংস কর্ণার-এর বিচিত্রানুষ্ঠান:

গেল ২১-এ জানুয়ারী কালীঘাট পার্কে ইয়ংস কর্ণার-এর উদ্যোগে এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেল। সমগ্র পার্কটি ঘিরে এক প্রকান্ড মন্ডপের মধ্যে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার দর্শকের আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের প্রধানতম আকর্ষণ ছিলেন বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা গায়ক মহম্মদ রফি এবং নৃত্যকুশলা মধুমতী। এঁদের সঙ্গে ছিলেন মুকেশ, মান্না, পুরুষোত্তম, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, আরতি মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, মনোহর দীপক, জহর রায়, জনি হুইস্কি, সুশীল দাস, বালসারা, হিমাংশু বিশ্বাস প্রভৃতি। সাধারণ সম্পাদক টুলু মুখোপাধ্যায় এই বিরাট অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থাপনার জন্যে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করছেন।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির চলচ্চিত্র প্রদর্শনী:

২৬-এ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার সকালে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি জগদ্বিখ্যাত 'বীটল' চতুষ্টয় অভিনীত 'এ হার্ড ডেজ নাইট'টির প্রদর্শনী ব্যবস্থা করেছেন। এর সঙ্গে ছিল ডিউক অব এলিংটন-এর বাদ্য-সম্পর্কিত একটি ছোট ছবি।

ষষ্ঠবার্ষিকী উৎসব এবং পুরস্কার বিতরণী সভা:

সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশন (ইন্ডিয়া) শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট সেন্টারের ষষ্ঠ বার্ষিকী উৎসব এবং পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন আর জি কর, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ রায়। সভাপতির ভাষণে ডাঃ রায় বলেন যে, আজকের এই অবস্থায় দেশের প্রতিটি মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং হোম নার্সিং শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের এস প্রাথমিক চিকিৎসা এবং নার্সিং শিক্ষা শুধু যে অপরের উপকারে লাগে তাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেরও

বর্ণালী বসন্ত যেন এই উজবেক নৃত্য-বাহিনীর প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি ভঙ্গিমায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

প্রায় ৬০ জনের এই নৃত্যদলে প্রথম সারির নর্তক, নর্তকীরা আছেন এবং উজবেক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের যাঁরা সর্বাগ্রগণ্য তাঁরাও এই দলে রয়েছেন।

উজবেক রিপাব্লিকের নৃত্য ও সংগীত শিল্প-বিদ্যালয় থেকে এ'রা অধিকাংশই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রনো নিজামোভা, রাওসান শারিপোভা, ভ্যালেন্তিনা রোমানেভা, ডি, করিমভা, তামারা ইউনুসেভা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের এই দল স্বভাবতঃই বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দর্শকমন অনায়াসেই জয় করতে পারেন। উজবেকের পুরাতন নৃত্যধারার সংগে আধুনিক ভাবধারার মিশ্রণে এই অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বর্ণবিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে এই দল বুখারা, তুখানা, তাসখন্দ, আন্দিযান, ভিগুর, কাকান্দ প্রভৃতি অঞ্চলের নৃত্য পরিবেশন করবেন।

গত বসন্তে এই দল আফ্রিকার দেশ-গুলিতে ঘুরে এসেছেন। লিবিয়া, সুদান, মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব রিপাব্লিক যেখানেই তাঁরা গেছেন সেখানেই তাঁরা দর্শকমন জয় করেছেন।

গানের জলসা

বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্স

আধুনিক সংগীতের আসর দিয়ে বালিগঞ্জ মিউজিক কনফারেন্স শুরু হয়েছিল। আলোকে-পুষ্পে সুসজ্জিত সংগীতাসরের সৌন্দর্য শ্রোতাদের মনকে এক লহমায় উৎসবের আনন্দে ভরিয়ে দিতে পেরেছে। আধুনিক সংগীতের আসর অলঙ্কৃত করেছিলেন জনপ্রিয় শিল্পীগোষ্ঠী—সর্বশ্রী হেমন্ত মুখার্জি, মান্না দে, চিন্ময় চ্যাটার্জি, নির্মলেন্দু চৌধুরী, ভি বালসারা, আরতি মুখার্জি, নির্মলা মিশ্র এবং আরো অনেকে।

দ্বিতীয় দিন থেকে রাগসংগীতের আসর। শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই আসর উদ্বোধন করলেন এবং তাঁর ভাষণে ঐ সংস্থার উদ্যোক্তৃবৃন্দকে তাঁদের নানাবিধ জনকল্যাণকর কর্মে ব্রতী হওয়ার উদ্যমকে অভিনন্দিত করলেন। সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅনিল মৈত্র ৫০০০, হাজার টাকার একটি চেক দেশের কাজে দান করার জন্য শ্রীঘোষের হস্তে অর্পণ করেছেন।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশী

তরুণ সরোদী আমজেদ আলি খাঁ বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে 'বেহাগ' বাজালেন। শঙ্কর ঘোষের সুযোগ্য তবলাসঙ্গতে ও আমজেদ আলির বাজনায় প্রতিভার উপযুক্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত ছিল।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর বহুশ্রুত 'মারুবেহাগ' তাঁর নিজস্ব মাধুর্যেই পরিবেশিত হয়েছে।

ওস্তাদ আমীর খাঁ শ্যামল বসুর তবলাসঙ্গতে গাইলেন শুদ্ধকল্যাণ মালকোষ, আভোগী। বিলম্বিত দ্রুত স্বরলোকের রাগরূপায়ণে এবং শ্রুতিশুদ্ধতায় তাঁর উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মান সুরক্ষিত।

যাদুকর তবলিয়া শান্তাপ্রসাদের তবলাসঙ্গতে কথকনৃত্যের প্রামাণ্য রীতি বিস্তারে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন বিখ্যাত কথকশিল্পী রোশনকুমারী, তবে আরো কিছু যেন পাবার ছিল এই পরিণত-প্রতিভাময়ীর কাছে।

সর্বশেষ শিল্পী ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর প্রাণকাড়া সেতারে পরিবেশিত 'ঝংকার' রাগ গমকের ঐশ্বর্যে, মীড়ের ব্যবহারে ও ঝালার গতিচাঞ্চল্যে জাগরণক্লিষ্ট শ্রোতাদের মনকে আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিলেন। এর সঙ্গে শান্তাপ্রসাদের তবলাসঙ্গতে উপযুক্ত 'মজা' এনে দিয়েছে।

কন্যা কৃষ্ণা হাঙ্গলের সহায়তায় শ্রীমতী গাঙ্গুবাঈ-এর 'প্রভাতী-ভৈরবী' মর্দানা তানের দাপটে ও ঘরানার উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য উপভোগ্য হয়েছিল। এই বয়সেও তার 'ফুৎকারের' শক্তিমত্তা শিল্পীর নিষ্ঠা ও রেওয়াজের উজ্জ্বল স্বাক্ষরবাহী।

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজের বিশাল পক্ষপুটে জগৎখ্যাত, ভারত-খ্যাত শিল্পী থেকে সুরু করে মাঝারী, ছোট স্থানীয় সকল শিল্পীই স্থান পেয়েছেন। সুবিস্তৃত ব্যানারে শিল্পী-তালিকার সংখ্যা যে কোনো সংগীত-রসিকের পক্ষেই লোভের বস্তু ছিল।

অজানা প্রতিভাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা এঁদের যে একেবারে বিফল হয়নি এম আর গৌতমের অনুষ্ঠান তার প্রমাণ। ইনি পরিবেশন করেছিলেন 'বেহাগড়া'। পাতলা জোয়ারীর, মধুর কণ্ঠে দাপট কিছু কম থাকলেও সুরসমৃদ্ধ, মনোলোভা। শিল্পীর গাইবার আনন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত সুরোচ্ছলতা আকর্ষণীয়। মূলত আগ্রা ঘরানার হলেও অন্যান্য ঘরানার সমন্বয়ে তিনি নিজস্ব একটি 'গায়কী' তৈরী করেছেন—যা তাঁর স্বধর্মেরই অনুকূল। শ্রোতাদের আগ্রহে আরো একদিন এঁর অনুষ্ঠান যোজনা হয়েছিল। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর পুত্র ও শিষ্য দুই

ইন্দ্রাণী রহমান

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

আসরে যথাক্রমে রাগেশ্রী ও 'দরবারী-কানাড়া' পরিবেশন করেছেন। মুনোয়ার খাঁর তানকর্তব, মজাদার তেহাই ও বিস্তার উপযুক্ত শিক্ষাকে ঘোষণা করেছে। প্রসূন ব্যানার্জি স্বভাবোচিত আন্তরিকতায় 'দরবারী-কানাড়া' গেয়েছেন।

সুধীর ব্যানার্জির 'দরবারী' রাগে চমক বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত।

মানস চক্রবর্তী (সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর পুত্র) পরিবেশিত "দরবারী"তে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব ছিল না। কিন্তু "দরবারী কানাড়া"র ধৈবতের প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়। আরোহণের ধৈবত 'দরবারী কানাড়া' অঙ্গে পরিবেশিত। কিন্তু অবরোহণের ধৈবত—আড়ানার ধৈবতের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। উপযুক্ত গুরু ও পিতার তালিমপ্রাপ্ত এই তরুণ শিল্পীর রাগ-নিষ্ঠার অভাব বেদনাদায়ক। তাছাড়া বহু স্থানে সুর-সঙ্গতির অভাব সুপরিলক্ষিত।

"দরবারী কানাড়া"র ভাব, সাহিত্য ও আঙ্গিককে সুসমৃদ্ধ ও সুপরিকল্পিত সমন্বয়ে আনন্দ দিতে পেরেছিল যে যুগল শিল্পী তাঁরা হলেন কুমার মুখার্জি রবি কিচলু। 'রঙ্গিলা' ঘরানার রীতি ধ্রুপদ অঙ্গের অস্থায়ী, বিস্তার বোলতান "দরবারী কানাড়া"র যথাযোগ্য রূপকে সুপরিস্ফুট করেছে। চাঁদ খাঁর পুত্র ও ওসমান খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাসির আমেদকে বহুদিন বাদে সংগীতাসরে দেখা গেল। দুদিনের অনুষ্ঠানে ইনি পরিবেশন করলেন "যোগকোষ", "মালকোষ"—"বেহাগ বসন্ত"। আগের যুগের তান-বাদীর চাঞ্চল্য শান্ত, কণ্ঠ-সৌন্দর্য ও অনস্বীকার্য। কিন্তু বিস্ময় সীমা ছাড়াল যখন দেখা গেল চাঁদ খাঁর পুত্র ও ওসমান খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'বেহাগ' ও 'মারুবেহাগে'র পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করে দিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। তাছাড়া উপরোক্ত রাগগুলির শুধুমাত্র আস্থায়ী অঙ্গ পরিবেশিত—এবং অন্তরাবর্জিত। (ঘোষণানুযায়ী "নন্দ-

কোষে'র তারাণাও ত শোনা গেল না? কেন? মীরা মুখার্জির "শুদ্ধকল্যাণ" সংগীত। এবং পূর্বখ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ কাননের "মারবা" ও "গোরখকল্যাণ" শিল্পীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবেশিত। মালবিকা কাননের "বাগেশ্রী" সুরেলা কণ্ঠ ও রাগ-বিস্তারে মনোগ্রাহী।

যন্ত্র-সঙ্গীতের আসরে উদীয়মান প্রতিভা সুব্রত রায়চৌধুরীর 'দেশ'—শ্রোতাদের প্রশংসা আকর্ষণ করেছে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদ পরিচ্ছন্ন। কল্যাণী রায়ের "রামকেলী" তাঁর বাজনার মান বজায় রেখেছে। বহুদিন বাদে (এবছর বোধহয় প্রথম) প্রথম শ্রেণীর মহিলাযন্ত্রী শিশিরকণা রায়চৌধুরীর বেহালাবাদন, শোনা গেল। এমন উচ্চমানের বিরল শিল্পী অন্যান্য অনুষ্ঠান কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি এবার। এটা পরিতাপের বিষয়। রাধিকামোহন মৈত্রের "দেশ" ঘরানানুযায়ী। বাহাদুর খাঁর সরোদে "বসন্ত" বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

শ্রীলেখা মুখার্জি ও লিপিকা গুপ্ত কথক ও ভারত-নাট্যমে তাঁদের কীতি অবিকৃত রেখেছেন। উড়িষ্যার বিজয়লক্ষ্মী পরিবেশিত ওড়িষী-নৃত্য নৃত্যের আসরের এক চিত্তগ্রাহী আকর্ষণ।

কন্ঠ-সঙ্গীতে তারাপদ চক্রবর্তী, সুনন্দা পট্টনায়ক, যন্ত্র-সংগীতে পণ্ডিত রবিশংকর, নিখিল ব্যানার্জি তাঁদের সুনাম অব্যাহত রেখেছেন।

ম্যাক্সমুলার ভবনে ইন্দ্রাণী রহমান

প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য নৃত্যের প্রাণ—এ সত্য নতুন করে অনুভব করলাম ১৯ ডিসেম্বর হিন্দী হাই স্কুলে ম্যাক্সমুলার ভবন আয়োজিত শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমানের নৃত্যানুষ্ঠানে। প্রায় দশটি অনুষ্ঠান তাঁর সেদিনের নৃত্য-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকাংশ বিষয়বস্তুই ভারত-নাট্যমের আঙ্গিক ভিত্তিতে পরিবেশিত। অন্ধ্রের কুচিপুরী এবং ওড়িষী নৃত্য কিছু অনুষ্ঠানও পরিবেশন তালিকায় ছিল।

একক বিচারে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান গীতি-কবিতার আবেগ ও অনুভবে ঐশ্বর্যপূর্ণ আবার সামগ্রিক বিচারে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের বিশাল পট-ভূমিকায় পরিব্যাপ্ত। বিভিন্ন তালে ছন্দায়িত পদক্ষেপ, দেহ-সৌন্দর্যের কাব্যরূপ, মুখ-ভাব ও মুদ্রার সনিপুণ রূপান্তর—বিদেশী সমালোচকের উক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে

"She was dancing not only with her hands and feet but with her heart."

অন্তরের অতল ভাবের উদ্দীপন না ঘটলে অভিনয়, নৃত্য ও দেহভঙ্গীর এমন অনুরণন সম্ভব নয়। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে 'পদ্মকন্যা'। বিভিন্ন তালে সূক্ষ্ম পদক্ষেপ এবং নেত্র, গ্রীবা ও মুদ্রার ভাববাঞ্জনায় নৃত্যের ভাববস্তু আত্মনিবেদনের ছন্দে বিকশিত। লয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শেষে দ্রুততম তালের পদক্ষেপ ও বিদ্যুৎগতি দেহ-সঞ্চালনে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁচেছে। ভারত-নাট্যমের আঙ্গিক—ঐতিহ্য এবং ভাবানুভূতি অক্ষুণ্ণ রেখেও শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও পরিশীলিত শিল্পবোধ-সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করেছে।

শ্রীমতী ইন্দ্রাণীর শিল্পীসত্তার উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে ওড়িষী নৃত্যে। শিল্পরসিক সমাজে এ বস্তু তাঁরই অবদান। অখ্যাত দেবদাসী পল্লী থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে এ নৃত্যকে উদ্ধার করে তিনি পৃথিবীর রসজ্ঞমহলে উপহার দেন।

আমেরিকার লোকসংগীত-গায়ক বিল ক্রফট :

ইউ-এস-আই-এস আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গেল ২৮-এ ডিসেম্বর আমেরিকার বিশিষ্ট লোকসংগীত গায়ক বিল ক্রফট্ সমবেত সুধিবৃন্দকে বিভিন্ন লোক-[illegible]

বিল ক্রফট্

ল্যাণ্ডের বাসিন্দা বত্রিশ বছর বয়স্ক বিল ক্রফট্ পেন্সিলভেনিয়ার অ্যালেঘেনি কলেজ-এর স্নাতক। তিনি সাত সপ্তাহের জন্যে ভারতভ্রমণে এসেছেন আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের টুর-প্রোগ্রাম অনুযায়ী। লোকসংগীত যাকে বলে, তাই তিনি গেয়ে-ছিলেন সেদিন ব্যাঞ্জো এবং ১২-তারবিশিষ্ট গীটারসহযোগে। শ্রোতৃবৃন্দের সংগে একাত্ম হয়ে যেতে তাঁর বেশীক্ষণ লাগেনি। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে তিনি গেয়েছিলেন : (১) হোয়েন আই ফার্স্ট কেম টু দ্য ল্যাণ্ড, (২) ওহ্, কিসেস উইণ্ড, (৩) ইফ ইউ ফাইণ্ড মি অ্যাট দি ব্যাক অব দি বাস (নিগ্রো গান), (৪) উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে (প্রতিবাদের গান) এবং আরও অনেকগুলি। আমাদের যশস্বী লোকসংগীত গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিবেশন করেছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রীইরাণীর হাত থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়ের পুরস্কার 'ডি' মেলো' ট্রফি গ্রহণ করছেন।

খেলাধূলা

দর্শক

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষ
তৃতীয় টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ৪০৪ **রান** (বোরদে ১২৫, ইঞ্জিনীয়ার ১০৯, সুর্তী নটআউট ৫০ এবং পাতৌদি ৪০ রান। গিবস ৮৭ রানে ৩, সোবার্স ৬৯ রানে ২ এবং হল ৬৮ রানে ২ উইকেট)

ও ৩২৩ রান (ওয়াদেকার ৬৭, সুব্রহ্মণ্যম ৬১, হনুমন্ত সিং ৫০ এবং বোরদে ৪৯ রান। গিবস ৯৬ রানে ৪, গ্রিফিথ ৬১ রানে ৪ এবং হল ৬৭ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪০৬ **রান** (সোবার্স ৯৫, কানহাই ৭৭, হাণ্ট ৪৯ এবং বাইনো ৪৮ রান। চন্দ্রশেখর ১৩০ রানে ৪, সুর্তী ৬৮ রানে ৩ এবং প্রসন্ন ১১৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২৭০ রান (৭ উইকেটে। সোবার্স নটআউট ৭৪ এবং গ্রিফিথ নটআউট ৪০ রান। বেদী ৮১ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ১০৬ রানে ৩ উইকেট)

প্রথম দিন (জানুয়ারী ১৩):
ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেট খুইয়ে ২৭৮ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন বোরদে (৭২ রান) এবং সুব্রহ্মণ্যম (১১ রান)।

দ্বিতীয় দিন (জানুয়ারী ১৪):
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৪০৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৯৫ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন হাণ্ট (৪৫ রান) এবং বাইনো (৪২ রান)।

তৃতীয় দিন (জানুয়ারী ১৫):
ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ৯ উইকেটে ৪০৫ রান সংগ্রহ করে। খেলায় অপরাজিত থাকেন সোবার্স (৯৫ রান) এবং গিবস (০)।

চতুর্থ দিন (জানুয়ারী ১৭):
ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪০৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ৯ উইকেট খুইয়ে ৩০৩ রান সংগ্রহ করে।

পঞ্চম দিন (জানুয়ারী ১৮):
ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৩ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের ৭ উইকেট খুইয়ে ২৭০ রান সংগ্রহ করে। সোবার্স (৭৪ রান) এবং গ্রিফিথ (৪০ রান) অপরাজিত থাকেন।

মাদ্রাজের চীপক মাঠে আয়োজিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলাটি প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অমীমাংসিত থেকে গেছে। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতবর্ষের ১৯৬৬-৬৭ সালের টেস্ট সিরিজের চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়াল : ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২ এবং খেলা ড্র ১। এই নিয়ে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে অনুষ্ঠিত পাঁচটি টেস্ট সিরিজের মোট ২৩টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ১২ এবং খেলা ড্র ১১। অপর দিকে ভারতবর্ষের জয়ের ঘর শূন্য। অথচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৮টা টেস্ট খেলায় টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত দেশ পাকিস্তানের জয় ৩ এবং 'রাবার' জয় ১ (১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে ২-১ খেলায়)।

মাদ্রাজের চীপক মাঠে প্রথম সরকারী টেস্ট খেলা—ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের ১৯৩৪ সালে। এই খেলায় ডি আর জার্ডিনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দল ২০২ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল। ভারতবর্ষের অধিনায়ক ছিলেন সি কে নাইডু। এই চীপক মাঠেই ১৯৫১-৫২ সালের টেস্ট সিরিজের ৫ম টেস্টে ভারতবর্ষ এক ইনিংস এবং ৮ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছিল। মাদ্রাজে এই নিয়ে ভারতবর্ষ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে ৩টি টেস্ট খেলা হল। খেলার ফলাফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয় ২ এবং খেলা ড্র ১। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৪৮-৪৯ সালের চতুর্থ টেস্টে এক ইনিংস ও ১৯৩ রানে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের চতুর্থ টেস্টে ২৯৫ রানে জয়ী হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালের তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র। মাদ্রাজ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নিজস্ব মাঠ এই চীপক। ভারতবর্ষের অপর কোন রাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশনের নিজস্ব মাঠ নেই।

ভারতবর্ষ টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে। ভারতবর্ষের খেলার সূচনা খুবই ভাল হয়েছিল। প্রথম উইকেটের জুটিতে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং দিলীপ সরদেশাই ১২৯ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে ভারতীয় প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন। পূর্ব রেকর্ড ছিল—৯৯ রান (পঙ্কজ রায় এবং নরী কন্ট্রাক্টর, কানপুর, ১৯৫৮)। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের কোন উইকেট না পড়ে ১২৫ রান দাঁড়ায়। খেলায় অপরাজিত ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার (৯৪ রান) এবং সরদেশাই (২৬ রান)। ইঞ্জিনীয়ার মাত্র ৬ রানের জন্যে লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করার দুর্লভ সম্মান হাতছাড়া করেন। লাঞ্চের পর মাত্র ২০ রানের বিনিময়ে ভারতবর্ষের তিনটে উইকেট (সরদেশাই ২৮, ওয়াদেকর ০ এবং ইঞ্জিনীয়ার ১০৯ রান) পড়ে যায়। বারটি টেস্ট খেলে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করেন। ইঞ্জিনীয়ার

অজিত ওয়াদেকার

ভি সুব্রহ্মণ্যম

বিষেণ সিং বেদী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের আক্রমণকে ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। ১৫৯ মিনিটের খেলায় তাঁর ১০৯ রান উঠেছিল। বাউণ্ডারী করেছিলেন ১৮টা। শত রান করতে তাঁর ১৪৩ মিনিট সময় লাগে। তাঁর শত রানে ছিল ১৭টা বাউণ্ডারী। চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২৩০ (৩ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন বোরদে (৪৯ রান) এবং পাতৌদি (৩৫ রান)। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে পাতৌদি (৪০ রান) এবং বোরদে দলের ৯৪ রান তুলেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তাদের সুনাম অনুযায়ী ফিল্ডিং করে নি। তিনটে 'ক্যাচ' ধরা পড়ে নি। দলের ৭৩ রানের মাথায় হান্টের হাত থেকে ছাড়া পান ইঞ্জি-নীয়ার (তাঁর রান তখন ৫৭), পাতৌদির (২৭ রান) 'ক্যাচ' ফেলেন হল এবং চা-পানের পর বোরদের (৫৩ রান) ক্যাচ নষ্ট করেন ডেভিস।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের পাঁচ উইকেট পড়ে ২৭৮ রান ওঠে। এই দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন বোরদে (৭২ রান) এবং সুব্রহ্মণ্যম (১১ রান)।

দ্বিতীয় দিনে ৪০৪ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভারত-বর্ষের প্রথম ইনিংস ৫৭০ মিনিট স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ তাদের বাকী ৫ উইকেটে ১২৬ রান সংগ্রহ করে ২০০ মিনিট খেলে। ৭ম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং সুর্তি ৮৫ রান তুলেছিলেন। বোরদে দলের অতিসঙ্কটকালে খেলতে নেমে দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেন। তিনি ৩৩৫ মিনিটে তাঁর ১২৫ রান সংগ্রহ করেন; বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ১৪টা। ২৮০ মিনিটে সেঞ্চুরী (বাউণ্ডারী ১০) পূর্ণ হয়। টেস্ট খেলায় বোরদের এইটি পঞ্চম সেঞ্চুরী—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় এবং বর্তমান সিরিজে দ্বিতীয়। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৩৬৬ (৬ উইকেটে)। অপরাজিত ছিলেন বোরদে (১১৯ রান) এবং সুর্তি (২৮ রান)। চা-পানের আধ ঘণ্টা আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের সূচনায় দৃঢ়তার খুবই অভাব ছিল। প্রথম উইকেটের জুটি হান্ট এবং বাইনেকে অনেকক্ষণ দুর্ভাবনায় কাটাতে হয়। দলের মাত্র ৬৬ রানের মাথায় সুব্রহ্মণ্যমের অক্ষমতায় হান্ট ক্যাচ আউট থেকে রক্ষা পান। তখন হান্টের ৩৪ রান। দ্বিতীয় দিনের দেড় ঘণ্টার খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন উইকেট না পড়ে ৯৫ রান ওঠে। খেলায় অপরাজিত থাকেন হান্ট (৪৫ রান) এবং বাইনো (৪২ রান)।

তৃতীয় দিনের প্রথম আধ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২১ রানের বিনিময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনটে উইকেট পড়ে যায়। চন্দ্রশেখর দুটো এবং প্রসন্ন একটা উইকেট পান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তখন ১১৫ রান। খেলার গতি ভারতবর্ষের অনুকূলে। কিন্তু দলের ১২২ রানের মাথায় কানহাইয়ের সহজ 'ক্যাচ' সরদেশাই ফেলে দিলে কানহাই তাঁর নিজস্ব ১২ রানের মাথায় যে নতুন জীবন পান তাতেই খেলার মোড় ঘুরে যায়। এই কানহাই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ৭৭ রানই করেন নি ৪র্থ উইকেটের জুটিতে লয়েডের সহযোগিতায় ৭৯ রান এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে নার্সের সহযোগিতায় দলের ৫২ রান যোগ করে খেলার ভিত সুদৃঢ় করেন। ২৪৬ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে। লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯৪ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। কানহাই তখন ৫১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। কানহাই তাঁর ৭৭ রানে ৯টা বাউণ্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউণ্ডারী করেন। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষ অল্প রানের ব্যবধানে তিনটে উইকেট পায়—২৪৬ রানের মাথায় ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং ২৫১ রানের মাথায় ৭ম উইকেট। চা-পানের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান দাঁড়ায় ৩১৪ (৭ উইকেটে)। উইকেটে তখন ছিলেন সোবার্স (৩৬ রান) এবং গ্রিফিথ (২৬ রান)। ৮ম উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং গ্রিফিথ (২৭ রান) দলের ৭৩ রান তুলেছিলেন; দলের ৩২৪ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। দলের এই সঙ্কটকালে হল জুটি বাঁধেন সোবার্সের সঙ্গে। ৯ম উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং হল (৩১) ঝড়ের গতিতে ৬৭ মিনিটের খেলায় দলের ৮০ রান যোগ করলে ভারত-বর্ষের প্রথম ইনিংসের সমান ৪০৪ রান দাঁড়ায়। দলের ৪০৪ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (হল) পড়ে। সোবার্সের সঙ্গে শেষ খেলোয়াড় গিবস জুটি বাঁধেন। এই সময় সোবার্সের ছিল ৯৪ রান। সোবার্স এক রান সংগ্রহ করলে দলের রান দাঁড়ায় ৪০৫— ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে মাত্র এক রান বেশী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই ৪০৫ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়; উইকেটে অপরাজিত থাকেন সোবার্স (৯৫) এবং গিবস (০)।
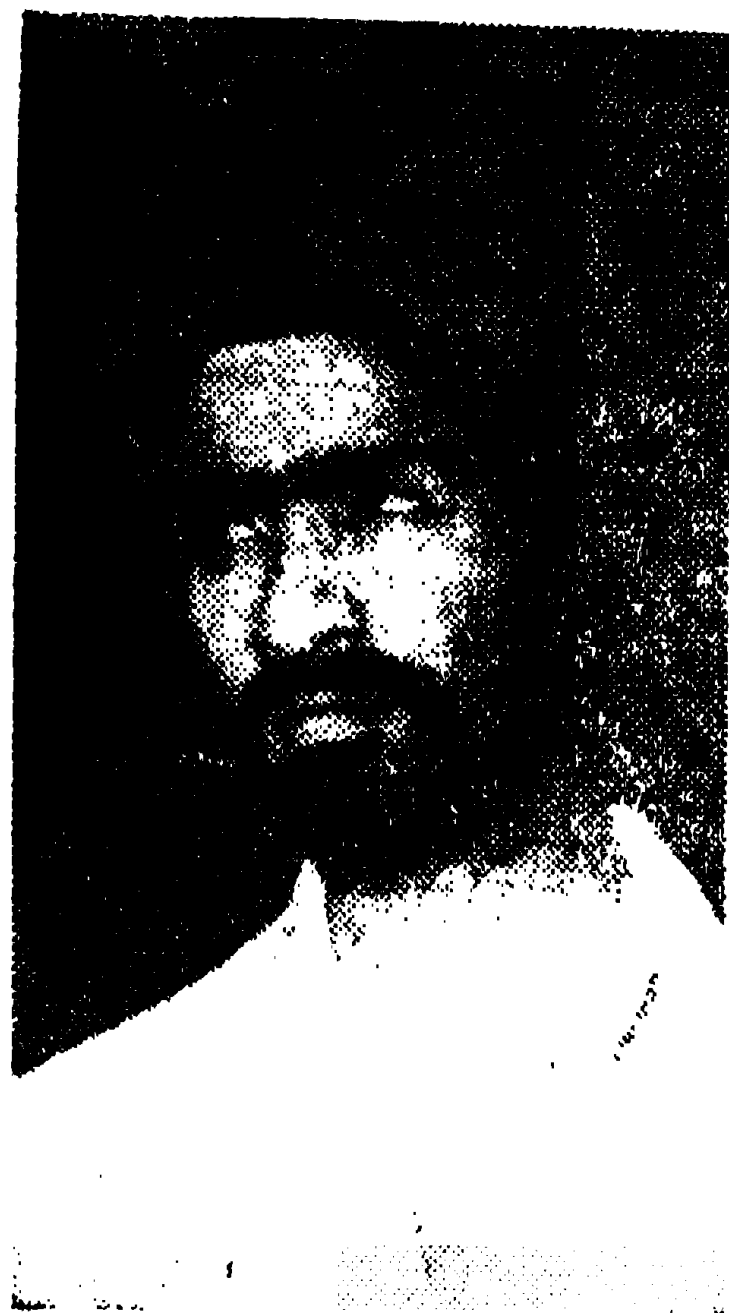
চতুর্থ দিনের খেলার প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস ৪০৬ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র দুই রানে অগ্রগামী হয়। তৃতীয় দিনের ৪০৫ রানের (৯ উইকেটে) সঙ্গে গিবস এই দিন মাত্র এক রান যোগ করেন। চতুর্থ দিনের খেলার সূচনায় চন্দ্র-শেখরের প্রথম ওভারের প্রথম বলে গিবস এক রান সংগ্রহ করে স্থান পরিবর্তন করেন। ফলে চন্দ্রশেখরের বলের সম্মুখীন হন সোবার্স। সোবার্সের তখন ৯৫ রান। সেঞ্চুরী পূর্ণ করতে আর মাত্র পাঁচ রান দরকার। চীপক মাঠের ত্রিশ হাজার দর্শক সোবার্সের সেঞ্চুরীর অপেক্ষায় উদগ্রীব

হয়ে আছেন। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হল না। চন্দ্রশেখরের এই প্রথম ওভারের শেষ বল কাট করতে গিয়ে উইকেটকিপার ইঞ্জিনীয়ারের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হন। সোবার্স উজ্জ্বল হাসি মুখে ক্রিজ ছেড়ে যান। দর্শকদের সে কি আক্ষেপ! কিন্তু দলের পরিত্রাতার ভূমিকায় সোবার্সের অবদান যে অনেকগুণে বেশী! মাঠের চার পাশ থেকে দর্শকরা ফুলের মালা হাতে সোবার্সকে ধাওয়া করলেন। কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে সোবার্স তাঁদের এড়িয়ে গেলেন। এক অদ্ভুত খেলোয়াড় এই সোবার্স। দলের তিনি একাই একশ। দলের ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ার পর তিনি খেলতে নেমেছিলেন। তখন দলের সঙ্গীন অবস্থা—৬টা উইকেট পড়ে দলের ২৬৬ রান। এই অবস্থায় খেলতে নেমে সোবার্স ব্যক্তিগত ৯৫ রানই করেন নি, ৮ম উইকেটের জুটিতে তিনি এবং গ্রিফিথ (১৭ রান) ৭২ মিনিটে [illegible] এবং ৯ম উইকেটের জুটিতে [illegible] (১২ রান) সঙ্গে [illegible] ৬৬ মিনিটে দলের ৬০ রান সংগ্রহ করে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। দলের সংকটকালে যোগ্য দলপতি হিসাবে তিনি দুই খেলায় গ্রিফিথ এবং [illegible] কঠিন দায়িত্বে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সোবার্সের ব্যক্তিগত ৯৫ রান উঠেছিল ১৭৫ মিনিটে। তাঁর এই ৯৫ রানে ছিল ১০টা বাউণ্ডারী এবং দুটো ওভার বাউণ্ডারী।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ চিত্তাকর্ষক খেলায় দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ৩০৩ রান সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু খেলার সূচনাতেই বিপর্যয় ঘটে। কোন রান ওঠার আগেই প্রথম উইকেট (সরদেশাই) পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ইঞ্জিনীয়ার এবং ওয়াদেকার দ্রুততার সঙ্গে আক্রমণাত্মক খেলে দলের ৪৫ রান তুলেছিলেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১০২ (২ উইকেটে)—অপরাজিত ছিলেন ওয়াদেকার (৬৩ রান) এবং বোরদে (১০ রান)। লাঞ্চের কিছু পর ওয়াদেকার ৯৮ মিনিট খেলে ব্যক্তিগত ৬৭ রান করে আউট হন। তাঁর এই ৬৭ রানে ছিল ১২টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারী। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং বোরদে দলের ৬২ রান তুলেছিলেন। এই তৃতীয় উইকেট জুটির খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এর পর বোরদে এবং হনুমন্ত সিংয়ের ৫ম উইকেট জুটির খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ৫ম উইকেট জুটি ৭৬ মিনিটে অতি মূল্যবান ৬৫ রান সংগ্রহ করেছিল। বোরদে ১৫৮ মিনিট খেলে তাঁর ৪৯ রানের মাথায় আউট হন। গিবসের বলে তিনি যে সট করেন তা শেষ পর্যন্ত যে তাঁর বিপদ ডেকে আনবে এমন কেউ ভাবতেই পারেন নি। কিন্তু লাশেড় বিদ্যুৎগতিতে ছুটে মাটিতে ঝাঁপিয়ে

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

পড়ে মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরের বলটি ধরে ফেলেন। খুবই শক্ত ক্যাচ। ক্যাচ ধরার এমন নজির সচরাচর চোখে পড়ে না। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২০৯ (৫ উইকেটে)। খেলায় তখন অপরাজিত ছিলেন হনুমন্ত সিং (৪৭ রান) এবং সুব্রহ্মণ্যম (৮ রান)। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে হনুমন্ত সিং (৫০) এবং সুব্রহ্মণ্যম ৫৩ রান তুলেছিলেন। সুব্রহ্মণ্যম সহজ হাতে খেলেছিলেন। ৫০ মিনিটে তিনি তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করেন। তাঁর এই ৫০ রানে ছিল ১০টা বাউণ্ডারী এবং একটা ওভার বাউণ্ডারী। সুব্রহ্মণ্যম তাঁর ৬১ রানের মাথায় গ্রিফিথের বল মেরে নার্সের হাতে 'ক্যাচ' দিয়ে আউট হন। চতুর্থ দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন প্রসন্ন (১৪ রান) এবং চন্দ্রশেখর (০)। দলের রান দাঁড়ায় ৯ উইকেট পড়ে ৩০৩।

রুসি সুরতী

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২২ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষ পূর্ব দিনের ৩০৩ রানের (৯ উইকেটে) সঙ্গে ২০ রান যোগ করে। সোবার্স ভারতবর্ষের ৩২৩ রানের মাথায় প্রসন্নর 'ক্যাচ' নিলে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। বেলা ১১টা ৫ মিনিটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের হাতে ২৮৫ মিনিট খেলার সময় ছিল এবং তাদের খেলায় জয়লাভের জন্যে ৩২২ রানের প্রয়োজন ছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলা দেখে এক সময়ে মনে হয়েছিল জয়লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে। রান সংখ্যাও এক সময়ে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফেলে ছুটে ছিল—কোন উইকেট না পড়ে ৫১ মিনিটে ৫০ রান এবং এক ঘন্টায় ৬২ রান। কিন্তু বেদী এবং প্রসন্ন খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের উইকেট পড়তে থাকে এবং রানের গতিও হ্রাস পায়। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় ৮২ (২ উইকেটে)। উইকেটে তখন অপরাজিত কানহাই এবং বুচার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৩০ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ১৩১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। সোবার্স দলের ১৩৯ রানের মাথায় বেদীর বলে 'ক্যাচ' তুলে সুরতির দোষে নতুন জীবন পান। এই সময়ে সোবার্সের মাত্র ৬ রান ছিল। বেদীর পরের ওভারেও সোবার্স 'ক্যাচ' তুলে হনুমন্তের অক্ষমতায় রক্ষা পান। দলের ১৯৩ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়লে সোবার্সের সঙ্গে ৮ম উইকেটের জুটি বাঁধেন গ্রিফিথ। চা-পানের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৭ রান (৭ উইকেটে) দাঁড়ায়। খেলায় অপরাজিত থাকেন সোবার্স (৩৭ রান) এবং গ্রিফিথ (৪ রান)। তখনও ফাঁড়া কাটে নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না; তখন তাদের খেলা ড্র রাখার সম্ভাবনাই বড় হয়ে দাঁড়ায়, শেষ পর্যন্ত ৮ম উইকেটের জুটি সোবার্স এবং গ্রিফিথ সার্থক পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে দলের মুখ রক্ষা করেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে তাঁরা ৭৭ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে যান। খেলার শেষে দলের রান দাঁড়ায় ২৭০ (৭ উইকেটে)—জয়লাভের লক্ষ্য থেকে ৫২ রান কম। সোবার্স ১৫৪ মিনিটে তাঁর ৭৪ রান সংগ্রহ করেন। বাউণ্ডারী ৯টা এবং ওভার বাউণ্ডারী ১টা। অপরদিকে গ্রিফিথ তাঁর ৯০ মিনিটের খেলায় ৪০ রান (৮টা বাউণ্ডারী) করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসে বেদী ৮১ রানে ৪টে এবং প্রসন্ন ১০৬ রানে ৩টে উইকেট

পান। ভারতীয় দল এই ইনিংসের খেলায় একাধিক 'ক্যাচ' নষ্ট না করলে খেলার ফলাফল ভারতবর্ষের অনুকূলেই যেত।

ছয়ের ছড়াছড়ি

ভারতবর্ষের পক্ষে (৩) : পাতৌদি, ওয়াদেকার এবং সুব্রহ্মণ্যম (প্রত্যেকে একটি করে)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে (৭) : সোবার্স ৩টি কানহাই ২, হল ১ এবং লয়েড ১

ব্যাটিং-বোলিংয়ের গড়পড়তা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন—খেলা ৩, ইনিংস ৫, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৫ এবং মোট রান ৩৪২ (গড় ১১৪·০)।

ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (খেলা ১, ইনিংস ২, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১০৯, মোট রান ১৩৩ এবং গড় ৬৬·৫। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন চান্দু বোরদে—খেলা ৩, ইনিংস ৬, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১২৫ এবং মোট রান ৩৪৬ (গড় ৫৭·৬)। বোরদে উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৩৪৬) সংগ্রহ করেছেন। বোলিংয়ে উভয় দলের পক্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যান্স গিবস—৩৯৭ রানে ১৮ উইকেটে (গড় ২২·০)। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন বি এস চন্দ্রশেখর—৫১৩ রানে ১৮ উইকেট (২৮·৫)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন গিবস এবং চন্দ্রশেখর (১৮টি করে)। অল রাউণ্ডার সোবার্স উভয় দলের পক্ষে বোলিংয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন—৩৫০ রানে ১৪ উইকেট (গড় ২৫·০)।

সেঞ্চুরী রান

ভারতবর্ষের পক্ষে—৩টি

চান্দু বোরদে (২টি): ১২১ রান (বোম্বাই) এবং ১২৫ রান (মাদ্রাজ)

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (১টি): ১০৯ রান (মাদ্রাজ)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ১টি

কনরাড হান্ট (১টি): ১০১ রান (বোম্বাই)

নীরজারঞ্জন : খেলোয়াড় ও মানুষ

অজয় বসু

'আমার দীর্ঘজীবনে আমি বহুজনের সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু রায়ের মতো ভদ্র ও জাত স্পোর্টসম্যানের সান্নিধ্য পাবার সুযোগ ঘটেছে খুব কমই। রায়কে কাছে পাওয়াকে আমি ভাগ্য বলেই মনে করি।' —কথাগুলি স্বহস্তে লিখেছিলেন অধ্যক্ষ কোয়েল্যাণ্ড তাঁরই এক ছাত্র শ্রীনীরজারঞ্জন রায় সম্পর্কে।

এই শতাব্দীর দু দশকের গোড়ার দিকের কথা। অধ্যক্ষ কোয়েল্যাণ্ড তখন মালব্যজীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার। আর নীরজারঞ্জন সেখানকারই ছাত্র। অধ্যয়ন শেষ হবার মুখে অধ্যক্ষ কোয়েল্যাণ্ড ছাত্রকে ডেকে বল্লেন, এই নাও আমার উপহার। শিষ্যরা গুরু-দক্ষিণা দেয়। তোমার বেলায় কিন্তু গুরুকেই কিছু দিতে হলো। নীরজারঞ্জন লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবু কুণ্ঠা ঝেড়ে শেষ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে নিয়ে কোয়েল্যাণ্ডের সার্টিফিকেটটি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন।

অনেকদিনের কথা; কতো জিনিস হারিয়ে গিয়েছে। কতো স্মৃতি আবছা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু বছর চল্লিশ পর অধ্যক্ষ কোয়েল্যাণ্ডের উপলব্ধির স্পষ্ট স্বাক্ষর নীরজারঞ্জনের গৃহকোণে আজও জ্বলজ্বল করছে। নীরজারঞ্জন আজ নেই। কিন্তু অধ্যক্ষ কোয়েল্যাণ্ডের নিজের হাতে লেখা ওই ক'টি ছত্র রয়েছে আমাদের এবং উত্তরকালকে বোঝাতে যে নীরজারঞ্জন কে ছিলেন, কেমন ছিলেন।

আমার কাছে অবশ্য এ স্বাক্ষ্য প্রমাণের কোনো দরকারই ছিল না। তাঁর উত্তরজীবনে কিছুদিন তাঁকে কাছে পাওয়ার সুযোগ থেকে ভাগ্য আমায় ফাঁকিতে ফেলেনি। তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কল্যাণে আমিও অধ্যক্ষ কোয়েল্যাণ্ডের ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই যে এমন মানুষ, এমন স্পোর্টসম্যান সত্যিই দুর্লভ!

'জাত-খেলোয়াড়' বা 'স্পোর্টসম্যান' শব্দটিকে আজকাল কতো দরাজ মেজাজেই না ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কি মূল্যের বিনিময়ে যে ওই সংজ্ঞাটিকে খেলোয়াড়েরা কিনতে পারেন তা বোধহয় সর্বক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা হয় না। বিচার বিশ্লেষণে আন্তরিকতা থাকলে হুট্ বলতে জাত খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞান সকলকে বিলিয়ে দেওয়া যেতো না। নিরপেক্ষ ও আন্তরিক বিচারপদ্ধতির দর্পণের সামনে নীরজারঞ্জনকে দাঁড় করিয়েই ওঁর সম্বন্ধে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি।

নীরজারঞ্জন রায়

বিচারে ভুল করেছি কি? পাঠক মিলিয়ে নিন। দুটি দৃষ্টান্ত রাখছি।

বাংলার ক্রিকেটের জনক অধ্যক্ষ সারদারঞ্জনের ভ্রাতুষ্পুত্র, দিক্‌পাল অ্যাথলিট অধ্যাপক মুক্তিদারঞ্জনের পুত্র এবং ক্রিকেটে আর এক মহারথী অধ্যাপক শৈলজারঞ্জনের অনুজ নীরজারঞ্জন তখন কাশী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাঠে ক্রিকেটেই হাত পাকাচ্ছেন। ঋতু বদলে ফুটবলে পা দিতেও আপত্তি নেই। কিন্তু হকির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই। তবু একদিন এক সর্ব-ভারতীয় হকি প্রতিযোগিতায় হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাঁর ডাক পড়লো।

নীরজারঞ্জন শুনেই অবাক! না, না, হকি আমি খেলতে পারি না। জানি না।

ছাত্র, অধ্যাপক কেউই তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। করবে কি করেই বা! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্রিকেট আর ফুটবল মাঠে যে ছেলে মুকুটবিহীন সম্রাট সে হকি খেলে না! তা কি হতে পারে? কেউই মানতে রাজী নয়। উপরোধ, অনুরোধ, শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকদের হুমকি। অগত্যা গোয়ালিয়রে গোল্ড কাপের মাঠে স্টিক হাতে নীরজারঞ্জনকে নামতে হলো। খেললেন রাইট উইংয়ে।

কেমন খেললেন? চোখে দেখি নি। কিন্তু জানি যে মাত্র দুদিনের (প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের) খেলা দেখেই সংগঠকেরা প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের প্রাপ্য সোনার মেডেলটি তাঁর দিকেই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হকি খেলতেন না, তবু এক সর্ব-ভারতীয় আসরে সেরা হকি খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়া তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব হয়েছিল? উত্তর খুবই সহজ—নীরজারঞ্জন অসম্ভবকে সম্ভবপর করেছিলেন সহজাত প্রতিভার গুণে। প্রতিভা প্রতিভাত হওয়ার রীতি সত্যিই কি বিচিত্র!

কিন্তু সে কাহিনীর ইতি এখানেই নয়। আরও আছে।

সংগঠকেরা সোনার মেডেল দিতে হাত বাড়ালেন কিন্তু নীরজারঞ্জন তা নিতে পারলেন না। বল্লেন, ও পুরস্কার আমি নিতে পারবো না। এ কি করে হয়! আগের দু বছর ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং যে সম্মান পেয়েছিলেন সেই সম্মানে আমি ভাগ বসাতে যাবো? কোন্ গুণে, কোন্ মুখে? ওই আসনে আমি বসলে ওঁদের মর্যাদাহানি হবে যে। ও আমি নিতে পারবো না, যেহেতু আমি হকি খেলি না।

জেদী মানুষ। কিছুতেই হাত পেতে নিজে পদক নিলেন না। তবে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সেই পদকটি নিয়েছিলেন। স্মারক হিসেবে আজও তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় জমা রয়েছে। মূল্যবান সংগ্রহ। খেলোয়াড়োচিত আচরণে ও ধর্মে প্রেরণা দিতে ওই পদক এবং পদক অর্জন ও প্রত্যাখ্যানের কাহিনীটিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে ছাত্রদের সামনে রাখা হয়েছে।

নীরজারঞ্জন আজ নেই। কিন্তু বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস হল—জিমন্যাসিয়ামে এই পদকের স্বর্ণস্বাক্ষরেই তাঁর স্মৃতি ধরে রাখা আছে। আরও আছে। যুবক নীরজারঞ্জনের একটি আলোকচিত্র। খালি গা, পেশীবহুল। ছবির নীচেকার লিপিতথ্য: কোমর চব্বিশ ইঞ্চি বুক সাড়ে সাঁইত্রিশ ইঞ্চি। একজন স্পোর্টসম্যানের শরীর এমনই হওয়া উচিত। এই সুঠাম শরীর যাঁর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র—ক্রিকেট ফুটবল হকি দলের অধিনায়ক নীরজারঞ্জন দাস।

কিন্তু কথায় কথায় খেই হারিয়ে যাচ্ছে। তাই ফিরে আসি নীরজারঞ্জনের খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের প্রসঙ্গে। সেবার ফুটবল লীগের বি ডিভিশনে তাঁর দল স্পোর্টিং ইউনিয়নের দুরবস্থা। শেষ খেলায় জিততে না পারলে অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা দায়। শেষ খেলা কুমারটুলীর সঙ্গে। লড়তে হবে, নীরজারঞ্জনেরা আগের দিন থেকেই মনে মনে তৈরী হচ্ছেন। হঠাৎ কানে এলো, কর্মকর্তারা ওপক্ষের হাতেপায়ে ধরছেন দুটি পয়েন্টের জন্যে। শুনেই মারমুখো ছুটলেন কুমারটুলী পাড়ায়। সমকালীন খেলোয়াড় যাঁরা ছিলেন কুমারটুলীতে তাঁদের বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে এলেন, কাল যদি দয়া করে আমাদের দু পয়েন্ট ভিক্ষে দাও তো আমার সঙ্গে তোমাদের জন্মের মতো আড়ি হয়ে যাবে। আমার মরা মুখ দেখবে। খেলে, তোমাদের হারিয়ে যদি বাঁচতে পারি বাঁচবো। নইলে বেঁচে থাকার অধিকার হারাবো। দুয়ের মধ্যে সন্ধি চলে না।

হায়! এই মানুষগুলো কোথায় গেল! কোন্ পাপে, কার পাপে বাংলাদেশের ক্রীড়ামহল তাঁদের হারালো! ওঁদের হারিয়ে, ক্রীড়া প্রশাসনিক কাঠামোর সদর দরজা ওঁদের জন্যে সর্বক্ষণ খিল দিয়ে এঁটে রেখে বাংলাদেশ কি পেয়েছে? ওঠানামা ব্যবস্থা-বর্জিত লীগ, পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির বেসাতি এবং চরিত্রহননের অবাধ আয়োজন! এ ছাড়া আর বেশি কিই বা? অথচ এমন হবার কথা ছিল না। যে মাটিতে নীরজারঞ্জনদের মতো খেলোয়াড় ও মানুষ জন্মায় সেই মাটি গায়ে মেখে ক্রীড়া প্রশাসন স্বধর্ম ও চরিত্র হারায় কেন?

কত বড় ক্রিকেটার ছিলেন নীরজারঞ্জন তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই জানেন। ক্রিকেটে ইংরাজী ঘরানার আধিপত্য ভাঙতে সেই প্রথম মহাযুদ্ধকালে নিজেদের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে কজন বাঙালী তরুণ এগিয়ে এসেছিলেন নীরজারঞ্জন তাঁদের দলেও বিশিষ্টতম। 'আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ' এই আপ্তবাক্যে ছিল তাঁর নিটোল প্রত্যয়। তাই নীরজারঞ্জনের হাতে ব্যাট হয়ে উঠেছিল হাতিয়ার। শাণিত, তীক্ষ্ণ আয়ুধ। এমন খুনে ব্যাট, এমন আক্রমণাত্মক মেজাজের দাপট বাংলাদেশ তাঁর আগে এবং পরেও কখনো দেখেনি। ষাট-সত্তর মিনিটে সেঞ্চুরী হাঁকানো তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এলোপাতাড়ি ব্যাট হাঁকানো নয়। সুনিয়ন্ত্রিত, সুচিন্তিত, বিজ্ঞানসম্মত, সুবিন্যস্ত পথে ব্যাটকে চালিয়ে নেওয়া। পরিভাষায় যাকে বলে 'অরগ্যানাইজড হ্যামারিং' নীরজারঞ্জনের মহিমা ছিল তাতেই সপ্রকাশ। কাট্ ও হুক সটে যেমন তেমনই ফিল্ডসম্যানের মাথার ওপর দিয়ে বল পাঠাতেও তেমন। এসব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ওস্তাদদের ওস্তাদ। প্রত্যক্ষদর্শী বিশেষজ্ঞদের মতে, নীরজারঞ্জনের ব্যাট কাট্ মারার সময় বেয়াড়া ঘোড়াকে চাবুক হাঁকিয়ে সায়েস্তা করার মেজাজে ফুঁসিয়ে উঠতো। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট গতি ধরে ব্যাট শুধু বলটিকে ঠেলে দিয়েই ক্ষান্ত হোতো না, পিটিয়ে তার বিষদাঁতগুলি গুঁড়িয়ে দিতো। বাহুর ওপরাংশের কাজ আগে শুরু হোতো, কাজটি সেরে তুলতো শেষ সময়ের কব্জির ঝাঁকানি। আর সেই কাট ও হুক সটের বৈচিত্র্যও বা কতো! সময়ের, দেহের ভারসাম্যের এবং প্রয়োগরীতির সামান্য হেরফের ঘটিয়ে একটি মারকে বহুমারের আঙ্গিকে সাজাতেন। নিত্য নব সৃষ্টির আনন্দে মাততো তাঁর ব্যাট। মারের বল তো অনেকেই মারতে পারেন। কিন্তু যে বলের প্রাপ্য মার নয় সেই বলকে মারের উপযোগী করে নিতে পারেন যাঁরা তাঁরা অনন্যসাধারণ। নীরজারঞ্জনও তাই। সাধে কি আর গুণী ক্রিকেটার কার্তিক বসু বলেছেন, নীরজারঞ্জন ক্রিকেটের স্বর্ণ-রাজ্যের বাসিন্দা! মনে রাখা দরকার যে এই কার্তিক বসু ডন ব্র্যাডম্যান, ওয়ালি হ্যামণ্ড, চার্লস ম্যাকারটনি, জ্যাক হবস থেকে শুরু করে সোবার্স, কানহাই পর্যন্ত ক্রিকেট-দুনিয়ার বহু রথীমহারথীকে দেখেছেন। ক্রিকেটে তাঁর বৈদগ্ধ সর্বস্বীকৃত। পুঁথিগত এবং প্রয়োগবিদ্যায় তিনি নিজে পণ্ডিত। এবং মুক্তহস্তে ক্রিকেটবিষয়ক সার্টিফিকেট বিতরণে তিনি রীতিমতো কৃপণ। তাই কার্তিক বসুর উপলব্ধি ও সোচ্চার অভিমতের মূল্য আমার কাছে, উত্তরকালের কাছে এবং ইতিহাসের কাছেও মস্তো।

আফশোষের কথা, নীরজারঞ্জন দীর্ঘদিন খেলার সুযোগ পান নি। ছাত্রজীবনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ও বিদ্যাসাগর কলেজের পক্ষে বড়জোর চার বছর। তারপরই এনজিনিয়ারিং পড়তে চলে যান মালবাজারের বিদ্যানিকেতনে। সেখানে থাকতে থাকতেই মাঝে মাঝে বাছাই বেঙ্গলী স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করতে আসতেন কলকাতায়। যেমন এসেছিলেন ১৯২৫-২৬ সালে আর্থার গিলিগ্যান পরিচালিত এম সি সির বিপক্ষে সম্মিলিত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয়দের পক্ষে খেলতে। যেদিন আসতেন সেদিন এই একটি খেলোয়াড়কে দেখতেই মাঠ ভরে উঠতো। হকি মাঠে স্টিকের খোঁচায় যেদিন চোখে মারাত্মক আঘাত পেয়ে নীরজারঞ্জন খেলা ছেড়ে দিলেন সেদিন কলকাতার ক্রিকেট অনুরাগীদের কি আক্ষেপ। সোচ্চার আর্তনাদ তাঁদের, নীরজা থাকবেন না, মাঠে যাবো কোন্ টানে! সব মিলিয়ে বছর দশেক খেলেছিলেন কিনা সন্দেহ। তবু দশ বছরের ফসল সোনা হয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের মনের কোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে। খেলা ছেড়ে দেবার অনেক পরে কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ তাঁকে জোর করে একদিন ইডেনে টেনে এনেছিল। উপলক্ষ্য জার্ডিনের এম সি সির বিপক্ষে ভারতীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দলের খেলা। নেতৃত্বভার তাঁরই ওপর। সেদিন পুরানো দিনকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে নীরজারঞ্জন শুরু করেছিলেন সাবেকী ঢংয়ে, ফাস্ট বোলার নিকল্সের বলে চার, চার, আবার চার—পরপর তিনটি বাউণ্ডারী মেরে। কিন্তু ভাল জিনিস মেয়াদ বড়ই সংক্ষিপ্ত। আরও তিন রান পরই গরুর গাড়ী চাপা! ওপ্রান্তে শিষ্য কার্তিক। গুরুশিষ্যে ডাকাডাকির ফাঁকে বোঝাবুঝিতে কোথায় তালগোল পাকিয়ে গেল। নীরজারঞ্জন হলেন রান আউট। খতম। হ্যাঁ, খতমই বটে! সেইখানেই ইতি। আর তিনি ব্যাট ছোন নি।

যেমন ব্যাটিংয়ে, তেমনি উইকেট রক্ষণে। দু বিভাগেই পাকা হাত। সেই হাতকে বোলাররা ভয় করতেন। ব্যাটসম্যানেরাও সমীহ জানাতেন। নীরজা পেছনে থাকতে কোনো ব্যাটসম্যানই প্লান্স করতে সাহস পেতেন না। কেতাবী ঢংয়ের গ্লান্সের পর বল ক্যাচ হয়ে নীরজারঞ্জনের দস্তানায় আটকা পড়তো। পা বাড়িয়ে ফরোয়ার্ড খেলার ঝুঁকি নিতে গিয়ে ক্যালকাটা ক্লাবের অ্যালেক হোসী যে কতোবার ঠকেছেন নীরজারঞ্জনের হাতে তার

ঠিকঠিকানা নেই! বিশ্ববিশ্রুত অলরাউন্ডার অস্ট্রেলীয় ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেন্ট সস্নেহে নীরজারঞ্জনের নামকরণ করেছিলেন 'লাইটনিং'—বিদ্যুৎ। তড়িৎ তৎপরতা যাঁর বাছাই দলে তাঁকে পেলেই ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেন্টের পাক ধরানো, ছোবল তোলা বলের বিষও বাড়তো। মুক্তকণ্ঠে ট্যারেন্ট ঘোষণা করেছিলেন, নীরজা ইংলন্ডের যে কোনো কাউন্টি ক্লাবের মাঠ আলো করে দাঁড়াতে পারে শুধু উইকেট-রক্ষণে দক্ষতার মূলধনে। তাঁর কালে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে ক্রিকেট খেলার দল ছিল না। টেস্ট ম্যাচের আয়োজন অনেক পরের ঘটনা। এ জাতীয় খেলার ব্যবস্থা তাঁর যৌবনে ঘটলে নীরজারঞ্জন বিনা প্রতি-দ্বন্দ্বিতাতেই ভারতীয় দলে ঢুকতে পারতেন, একথা সে আমলের ক্রিকেটবিশেষজ্ঞরা চিরদিনই বলে এসেছেন। আজও বলবেন তাঁরা যাঁরা এখনও সাক্ষ্য দিতে সশরীরে আমাদের মাঝে রয়েছেন।

একজোড়া ঈগল চক্ষু ও তেমনি হালকা পদযুগল। নিয়মিত ব্যায়ামে গড়া চওড়া ছাতি ও সুগঠিত বাহুযুগল নিয়ে নীরজা-রঞ্জন সহজাত প্রতিভার সঙ্গে সাধনার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তা ছাড়া মনের মূলধন বাড়াতে ভয়ের ভূতকে ঠেঙিয়ে বিদেয় করতে সুযোগ পেলেই বেপরোয়া হতে চেয়েছেন। তাঁর অসমসাহসের সব কাহিনী একালের নিরিখে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হওয়াই কঠিন। তাই সব কাহিনীর উল্লেখে সঙ্কোচ জাগে। তবু ইতিহাসের মর্যাদা রাখতে এক-আধটি ঘটনা না বল্লেই নয়।

মধ্য কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে স্পোর্টিং ইউনিয়ন-বালীগঞ্জের খেলা সেদিন। নীরজারঞ্জনের ডান হাতের একটি আঙুল পেকে ফুলে উঠেছে। যাকে বলে আঙুলহাড়া। কাজেই সেদিন তাঁর খেলার কথা নেই। মাঠে এসেছেন খেলা দেখতে। খেলবেন না তাই আসতে দেরীও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এসেই নীরজারঞ্জনের চক্ষু স্থির। ষাট রানও বোর্ডে ওঠেনি স্পোর্টিং ইউনিয়নের ছ'জন ব্যাটসম্যান তাঁবুতে ফিরে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে আছেন। কার্তিক, গণেশ, সবাই আউট।

দেখে গরগর করে উঠলেন নীরজারঞ্জন, কি খেলিস তোরা? সাহেবগুলোর কাছে মাথা হেঁট করে দিলি সবাই! বলতে বলতে রাগে ফুলতে ফুলতে ফোলা আঙুলটির ওপর নিজের পাটিকে সজোরে চেপে ধরলেন। চাপ পড়ে আঙুলহাড়াটি ফেটে গেল। পুঁজ, রক্তের গড়াগড়ি। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, কিন্তু নীরজারঞ্জনের ভ্রুক্ষেপ নেই। ক্ষতস্থানে ন্যাকড়া জড়িয়ে ব্যাট হাতে নেমে পড়লেন মাঠে। তারপর কি হলো? যা স্বাভাবিক তাই ঘটতে লাগলো। নীরজারঞ্জনের ব্যাট মাঠের ঘাসে ঘাসে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। ঊর্ধ্বগতি বল-গুলি মহাআক্রোশে মার্কাস স্কোয়ারের আশপাশের কাঁচাবাড়ীর ছাদের খোলা-গুলিকে দিলো গুঁড়িয়ে। চারের পর চার, ছয়ের পর ছক্কা। বালীগঞ্জের দুঁধে বোলার হেন্ডার, অ্যাশ, ব্রাউন এতোক্ষণ মহানন্দে তাল ঠুকছিলেন। নীরজারঞ্জনের সংহার-মূর্তির সামনে পড়ে এবার তাঁদের জারিজুরি ফুরিয়ে গেল। আট নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে মাঠে নেমে নীরজারঞ্জন সেঞ্চুরী করলেন সাতষট্টি মিনিটে। মারের মতো ওষুধ সত্যিই নেই! মারতে মারতে নিজের অসুখের কথাও স্বচ্ছন্দে ভুলে যাওয়া যায়! যে মারমুখী মেজাজের তাড়ায় আঙুল-হাড়ার যন্ত্রণাও সেদিন ল্যাজ গুটিয়ে ছুটেছিল সেই মেজাজের ভিত্তি কিন্তু ফাস্ট বোলার প্রিয়কান্তি সেনের বলে খালি হাতে, খালি পায়ে অনুশীলনের ফলশ্রুতি। আর প্যাড, দস্তানা তো অনেক পরের অঙ্গসজ্জা। নীরজারঞ্জনদের আমলে অনেকে ওগুলো থেকে মুক্তি পেলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন।

আর একদিনের কথা। ঘটনাস্থল বারাণসী। সেদিনও নীরদারঞ্জনের সামনে ছিল মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার অগ্নিপরীক্ষা। নিখাদ মূলধন হাতে ছিল তাই সে পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন।

আলোয়ারের মহারাজার দল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলতে এসেছে। ছেলেদের খেলা দেখতে স্বয়ং মালব্যজীও রয়েছেন মাঠে। কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মায় নীরদারঞ্জনও প্রথম ইনিংসে ভারত-বিখ্যাত বোলার আজিম খাঁর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র বত্রিশে, তার মধ্যে একা নীরজারঞ্জনের দশ। মালব্যজী আঘাত পেলেন। সেই আঘাত চরমে উঠলো মধ্যাহ্নভোজনের টেবিলে যখন আজিম খাঁ ঠাট্টার ছলে মহারাজকে বল্লেন, তবু তো বত্রিশ করেছে। এতো রান করতে পারবে তা আমি ভাবি নি কিন্তু! ক্রিকেটে এ এক অশালীন মন্তব্য। মালব্যজী বল্লেন, রায়, এর কোনো জবাব তোমার জানা নেই? আছে স্যার, নীরজারঞ্জন বল্লেন, দ্বিতীয় ইনিংসে আমি সেঞ্চুরী করবো।

যেমন কথা তেমনি কাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে একঘণ্টাও কাটেনি, নীরজারঞ্জন রান করলেন ৯৬। তারপর মাথার পোকাটিকে সজোরে নাড়া দিতে মাঠশুদ্ধু ছাত্ররা বায়না ধরলো, ছক্কা মারো, ওভার-বাউন্ডারীতে সেঞ্চুরী করো। আবদার শুনে নীরজারঞ্জন আর স্থির থাকতে পারলেন না, ছক্কাই হাঁকাতে গেলেন, কিন্তু ঠিকে ভুল হলো। ক্যাচ উঠলো সীমানার ধারে। সেঞ্চুরীর দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফিরতে হলো নীরজারঞ্জনকে। সেঞ্চুরী হয়নি, মালব্যজীর সামনে যাবার সাহসও ছিল না। তাঁবুতে ফিরে গা ঢাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু মালব্যজীই ডেকে পাঠালেন। কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন, সেঞ্চুরীর চেয়ে কম কিছু করো নি, তুমি মুখ রেখেছো দলের, বিশ্ববিদ্যালয়ের। তোমাকে আজ থেকে আমি রায়সাহেব বলে ডাকবো!

মালব্যজীর আদরের রায়সাহেব সাহেব হতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু মানুষ হয়ে উঠেছিলেন নিশ্চয়ই। খাঁটি মানুষ।

ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং পাশ করার পর বড় বড় চাকুরীর অফার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেছে। কিন্তু বন্ধুদের দরকার বেশি জেনে তেমন তেমন চাকুরী নিজে না নিয়ে তাঁদের পাইয়ে দিয়েছেন। চাকুরীর লোভ তাঁর কোনোদিনই ছিল না। পরিণত বয়সে, অবসর নেওয়ার মুখে নীতিগত প্রশ্নে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ফোরম্যানের পদটি ছেড়ে আসতে তাঁর কণামাত্র সঙ্কোচ হয়নি। বয়স হলো। রক্ত-কণায় উষ্ণতার আমেজ মিইয়ে আসছে। তবুও নীতির প্রশ্নে তিনি একনিষ্ঠ। নীতি নিয়ে ষাটের কাছাকাছি এবং এপারে এসেও ভিলাইয়ে, পুরুলিয়ায় লড়েছেন ও কাজে ইস্তফা দিয়েছেন। ব্যক্তিত্ব ছিল, চরিত্র ছিল বলেই নীতি বিসর্জনে ছিল তাঁর প্রবল অনীহা। একদিকে তাঁর অনমনীয়তা, অন্যদিকে ছেলেদের সঙ্গে ছেলেমানুষের মতো মেলামেশার দৃষ্টান্ত দেখে কে না বুঝেছে যে সুস্থতায়, সারল্যে গড়া এই মানুষটির একমাত্র ও পরম সম্পত্তি হলো বেগবান প্রাণ? যে প্রাণ সমাজের অভিপ্রেত ও মহনীয়।

ছেষট্টি বছরে নীরজারঞ্জন ছুটি নিলেন। বিদায় লগ্নটি মনে রাখার মতো। মাদ্রাজে টেস্ট খেলা দেখতে গিয়েছিলেন দেখা আর হলো কই! খেলা শুরু হওয়ার মুখেই (১৩ই জানুয়ারী সকালে) সবশেষ! খেলা খেলা করেই জীবন কাটালেন। খেলার টানেই তাঁকে জীবন দিতে হলো। একটি জীবনে খেলার কি অসামান্য প্রভাব! বন্ধন কি নিবিড়। খেলার-জীবনে মিল পরমাশ্চর্য! এক খেলোয়াড়ের জীবনাবসানের এর চেয়ে রোমান্টিক আর কোনো চিত্র কি আমরা কল্পনায় আনতে পারি?

নীরজারঞ্জনের খেলা আমি দেখিনি। তাঁর খেলা আমার কাছে শ্রুতি। কিন্তু মানুষটিকে আমি দেখেছি। সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। এবং যতোই তাঁর কথা মনে পড়বে ততোই বাংলাদেশের ক্রীড়াব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার আফশোষ বাড়বে। সোনার বাংলার মাঠে ময়দানে সোনার ফসল ফলাতে পারতো যদি নীরজারঞ্জনের মতো চরিত্রবান খেলোয়াড়দের, প্রাণবান খাঁটি মানুষদের হাতে ক্রীড়া প্রশাসনের ভার তুলে দেওয়া যেতো। কিন্তু তা আর হলো কই! হলো না বলেই আমাদের ক্রীড়াজীবনে প্রশাসনের চেয়ে অপশাসনের ব্যবস্থার বদলে অব্যবস্থার অবক্ষয় বাড়লো। খেলা নয় মেলা এবং ছেলেখেলার বোঝা হয়ে উঠলো আরও ভারী। নকল খেলা খেলতে গিয়ে বাংলাদেশ চরিত্রের মূল্যটুকুও অস্বীকার করতে চাইলো।

কেন এমন হলো? একি শুধু ভাগ্যের অভিশাপ? না, নিজেদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি?

নগর পারে রূপনগর

[উপন্যাস]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

।। একচল্লিশ ।।

ঘটনার আয়নায় সর্বদা দুর্যোগ চেনা যায় না।

শমী সময়-মত স্কুলে গেছল, সময়-মত ফেরেনি. বিকেল গিয়ে সংধ্যা পেরিয়ে রাত গড়াতে চলেছিল—এটা একটা ঘটনা। আর জ্যোতিরাণী ছটফট করছিলেন, আর বিভাস বার তিনবার করে ছুটে ছুটে খবর করতে বেরিয়েছিলেন। শমী ফিরল কিনা খবর নেবার জন্য ঘরে এসে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন. এও ঘটনার ফল। কিন্তু শমী ফেরার পর সেই রাতেই দুর্যোগের যে চেহারা জ্যোতিরাণীর মনের তলায় ছায়াপাত করে গেল. তার সংগে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

এই ছায়া বিভাস দত্তকে নিয়েই।

জ্যোতিরাণী স্কুল থেকে ফিরেছিলেন যখন বিভাস দত্ত তখন বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। পাশের ঘরে শমীকে না দেখে জ্যোতিরাণী ধরে নিয়েছিলেন ও-ধারের ফ্ল্যাটের সমবয়সী অবাঙালী মেয়েটার সংগে গল্পে মেতেছে। চা জল-খাবার করে ওকে ডাকতে গিয়ে শোনেন ওখানে নেই। বিভাস দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছেন, শমীকে দেখছি না. ও-ধারের ফ্ল্যাটেও নেই বলল, স্কুল থেকে ফেরেনি?

গত চার পাঁচ দিন ধরে স্কুল থেকে ফিরে জ্যোতিরাণী তাঁকে এইভাবে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে দেখছেন। সাধারণত সকালে লেখেন, দুপুরেও খানিক্ষণ লিখে বেরোন. বিকেলে শমীর বাস আসার আগে বাড়ি ফেরেন, সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আবার লেখা। এক-কালে নিজের পছন্দ-মত এটাসেটা রাঁধতেন জ্যোতিরাণী। সেটা কোনরকম নিয়মের মধ্যে ছিল না। এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ঝামেলা সামান্যই। দুটো ইলেকট্রিক হিটারে চটপট কাজ চুকে যায়। তবু বিভাস দত্ত লোক রাখতে চেয়েছিলেন। জ্যোতিরাণী বলেছেন দরকার নেই। তিনি অবকাশ চান না। অবকাশ নেইও। রান্না ছাড়া শমীকে দুবেলা পড়ানো আছে। স্কুলের খাতা-পত্রও নিয়ে আসতে হয়। বিড়ম্বনায় পড়েন রাত দশটার পরে। সময়টা তখন আর একজনের দখলে। তাঁর লেখা পড়তে হয়, লেখা শুনতে হয়, লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হয়. আর তারও পরে নিভৃতের বিরামে এক ভীরু-চঞ্চল প্রত্যাশার দোসরের ভূমিকায় নিজেকে সঁপে দিতে হয়। দ্বিতীয় জীবনে সব থেকে অমোঘ অবাঞ্ছিত অধ্যায় এটাই।

কিন্তু গত চার পাঁচ দিন ধরে এর ব্যতিক্রম দেখছিলেন। লেখা বন্ধ. বাইরে বেরুনো সাময়িক ছেদ পড়েছে, আলোচনার অবকাশ কম, আর ক'দিনের নিভৃতের বিরামও বিঘ্নশূন্য। পড়ায় অখন্ড মনোযোগ। শিয়রের কাছে মোটা মোটা বই খান-কতক। কি বই জ্যোতিরাণী উল্টে দেখেননি, তবে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জিজ্ঞাসার আগ্রহটুকুও না দেখালে [illegible] খারাপ হয়, তাই। বিভাস দত্ত হাসি মুখে জানিয়েছিলেন. দিন-কতক এখন কলম ধরবেন না, ভালো করে কতগুলো বিষয়ে আগে পড়াশুনো করে নেবেন।

শমী স্কুল থেকে ফিরেছে কিনা প্রশ্নটা কানে গেলেও নিবিষ্টতায় ছেদ পড়েনি। বই না সরিয়ে জবাব দিয়েছেন, দেখিনি তো।

স্কুল থেকে ফেরার পরে তাঁর থেকেও বইয়ের প্রতি মনোযোগটা নতুন ঠেকেছিল জ্যোতিরাণীর। সেটা অখুশির কারণ নয় একটুকুও। এই মনোযোগের আড়াল পান যদি. উল্টে স্বস্তি। চা জল-খাবার খেতে খেতেও বইয়ের পাতা উল্টেছেন।

কিন্তু বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে মেয়েটার দেখা নেই। এ-রকম একদিনও হয় না, হয়নি। ঘরে ফিরে বারান্দায় এসেছেন, রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। রীতিমত উতলা হয়েছেন শেষে। ঘরে এসে বলেছেন, মেয়েটা এখনো ফিরছে না কি ব্যাপার? স্কুল তো ছুটি হয়েছে দু' ঘন্টারও আগে, কি হল একটু খোঁজ করা দরকার না?

বই সরিয়ে বিভাস দত্ত তাকিয়েছেন তাঁর দিকে, বিকেল পেরুতে চলল অথচ এখনো ফিরল না বলে চিন্তিতও হয়েছেন। কিন্তু উঠে খোঁজ-খবর করার সে-রকম আগ্রহ দেখা গেল না। বলেছেন, স্কুলেরই কোনো ব্যাপারে মেতে আছে নিশ্চয়, নইলে যাবে আর কোথায়। বাসেই তো আসবে, ভাবনা কি—

একটু বিরক্ত হয়েই জ্যোতিরাণী আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবতে চেষ্টা করেছেন হয়ত স্কুলের কোনো উৎসব আছে যার জন্য দেরি। কিন্তু দিনের আলোয় টান ধরার পরেও বাস আসছে না দেখে আর স্থির থাকা গেল না।

ঘরে ফিরে দেখেন, ও-পাশে নিশ্চিন্তে পড়াশুনা চলছে। চুপচাপ অপেক্ষা করেছেন একটু, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছেন। মিনিট পনেরর মধ্যেই ফিরেছেন। বিবর্ণ মুখ।—বই রেখে উঠবে এখন একটু?

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নন বিভাস দত্ত। বই ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে বসেছেন।

—ওদের স্কুলে এইমাত্র ফোন করে এলাম, সেখানে এক দারোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। স্কুল ঠিক সময়েই ছুটি হয়েছে মেয়েদের সব বাড়ি পেঁছে দিয়ে স্কুল-বাসের ড্রাইভারও বহুক্ষণ আগে বাড়ি চলে গেছে।

বিভাস দত্ত বিমূঢ়, তাহলে শমী কোথায় গেল?

উত্তেজনায় দুশ্চিন্তায় জ্যোতিরাণী বলে উঠেছেন, সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে কাজ হবে না এক্ষুনি বেরিয়ে খোঁজ করতে হবে?

বিভাস দত্ত জামা-কাপড় বদলে আর চাদরটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও বেরুনোর তাড়াটা জ্যোতি-রাণীর চোখে মন্থর ঠেকেছিল। তিনি যেন ঠেলে মানুষটাকে ঘর থেকে বার করেছেন। যতবার ঘুরে ঘুরে এসেছেন ততোবার ওই মুখ বিবর্ণ পাংশু দেখেছেন। এসে খোঁজ নিয়েছেন শমী ফিরল কিনা, তারপর আবার ছুটে বেরিয়েছেন। শেষবার ফিরেছেন যখন, রাত মন্দ নয়। শ্রান্ত অবসন্ন ভগ্নোদ্যম। টলতে টলতে বিছানায় এসে বসেছেন, বড় বড় গোটা কয়েক দম নিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন, সব থানায় থানায়, হাসপাতালে আর ওদের স্কুলের—

—ফিরেছে।

বিভাস দত্ত থমকে তাকিয়েছেন। জ্যোতিরাণী মূর্তির মত শয্যার একপ্রান্তে বসেছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

—কে ফিরেছে? শমী ফিরেছে? কোথায় ছিল? ডাকো ওকে—

—এই মাত্র ঘুমোলো।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন বিভাস দত্ত. সমস্ত মুখে কালচে ছাপ, হাঁপাচ্ছেন। কোথায় ছিল সমস্ত দিন? ঘুমুতে হবে না, এক্ষুনি ডাকো ওকে—

নিজেকে সংযত করতে সময় লাগল একটু জ্যোতিরাণীর। বললেন, ওর দোষ নেই, স্কুল থেকে সিতু ওকে ধরে নিয়ে গেছল। ওর শরীর ভালো না, এখন ডাক। ঠিক হবে না—

বিভাস দত্ত কি শুনেছেন খেয়াল করলেন না হয়ত। আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে গেলেন, আমি জানতে চাই ও কি বলে—

শেষ করতে পারলেন না। ধুপ করে শয্যায় বসে পড়লেন আবার। কাঁপছেন অল্প অল্প। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। গায়ে জড়ানো চাদরটাও টেনে খুলতে সময় লাগছে। জামা গায়েই শুয়ে পড়লেন, তারপর দম নিতে চেষ্টা করে ইশারায় পাখাটা দেখালেন।

ঘাবড়ে গিয়ে জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি পাখা খুলে দিলেন অথচ পাখার গরম আর নেই এখন। কাছে এগিয়ে এলেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যায়।

—কি হল?

জবাব পেলেন না। কষ্ট বাড়ছে। পাখা চলছে তবু, বাতাসের অভাব যেন। ইশারায় বালিশ উঁচু করে দিতে বললেন। জ্যোতি-রাণী আর একটা বালিশ মাথার নীচে গুঁজে দিলেন। খানিক বাদে জল চেয়ে খেলেন। কিন্তু ছটফটানি কমছে না। জ্যোতিরাণী পাশে বসলেন, বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। ভয়ই পেয়েছেন তিনি। মাস কয়েক আগের আর এক দুপুরের দৃশ্য মনে পড়ল, তিনি মিসেস দত্ত হবার আগের। যে সাক্ষাতের ফলে এই একজনের জীবনে আসতে হয়েছে তাঁকে। ভোর রাতে যে বীভৎস স্বপ্ন দেখার পর দুপুরে না এসে পারেন নি। উত্তেজনার মুখে সেদিনও এমনি কাঁপতে দেখেছিলেন, এমনি ঘাম দেখেছিলেন, শেষে এমনি শ্বাসকষ্ট দেখেছিলেন। আজ সবই আরো বেশি দেখছেন।

বিভাস দত্ত এক সময়ে বললেন, শরীরটা ক'দিন ধরে খারাপ যাচ্ছে, হঠাৎ শমীর ব্যাপারটার এই ধকলে...মাস কয়েক আগেও মাঝেসাজে এ-রকম হত, তখনো হার্টের ব্যাপার বলে সন্দেহ হয়নি... ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক চট করে হল না। সুস্থ-স্বাভাবিক বোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন। বিকেলেও চোখ-মুখ এমন কালচে শুকনো দেখেননি। ওষুধ কবে এনে রাখা হয়েছে জানেন না। নিজেই চেয়ে খেলেন। কিন্তু তার পরেও থেকে-থেকে চাপা ছটফটানি একেবারে গেল না।

বিভাস দত্তর পরিচিত ডাক্তার কাছে থাকেন না। জ্যোতিরাণী অন্য ডাক্তার ডাকার কথা বললেন। কিন্তু ডাকবেন কাকে? বাড়িতে ফোন নেই, কাউকে চেনেনও না। এ-অবস্থায় ছেড়ে ফোন করার জন্য বাইরেও বেরুতে পারছেন না। অগত্যা জ্যোতিরাণী পাশের ফ্ল্যাটের অবাঙালী ভাড়াটের শরণাপন্ন হলেন। সেই ভদ্রলোক নিজে বেরিয়ে পাড়ার এক ডাক্তার ধরে নিয়ে এলেন। রাত তখন কম নয়।

ডাক্তারের কাছে বিভাস দত্ত গত পাঁচ-ছ' দিনের অসুস্থতার যে ফিরিস্তি দিলেন, জ্যোতিরাণীও সেটা এই প্রথম শুনলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট তখন থেকেই অল্প অল্প শুরু হয়েছে। হার্টের দিকে কি-রকম অস্বস্তি। সেটা অনেক আগে থেকেই ছিল, তবে বেশি নয়। দিন পাঁচেক আগে হঠাৎ একটু অসুস্থ বোধ করার দরুন ওমুক ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন ডায়বেটিসের উপসর্গ থেকে হার্টের গোলযোগ দেখা দেয় অনেক সময়, সেই সন্দেহই করেছেন। দিন কতক সম্পূর্ণ বিশ্রামে থেকে এবং ওষুধ খেয়ে শ্বাসকষ্ট কমলে হার্টের প্লেন এক্স-রে আর ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ করাবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রোগী পরীক্ষা করে এই ডাক্তার আগের ডাক্তারের প্রেসকৃপশনের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করলেন আর একটু সুস্থ বোধ করলেই অন্য নির্দেশগুলো যথাযথ পালন করতে বললেন। যাবার মুখে বারান্দায় জ্যোতিরাণীকে বলে গেলেন, হার্ট একটু বেশিই ড্যামেজ মনে হচ্ছে—এক্স-রে কার্ডিওগ্রাফ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করানো দরকার।

পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ভদ্রলোকটিই ওষুধ এনে দিলেন। তারও বেশ খানিকক্ষণ বাদে কিছুটা স্বাভাবিক বোধ করলেন বিভাস দত্ত।

জ্যোতিরাণী বললেন, পাঁচ-ছ'দিন ধরে এসবটা টের পাচ্ছ, আমাকে কিছু বলোনি তো?

—ভাবনার মধ্যে না ফেলে নিজেই সামলে নিতে পারব ভেবেছিলাম।

জ্যোতিরাণী আর কিছু বলেন নি, বলতে পারেননি। নিজে সামলে নেবার এই চেষ্টাটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছেন এখন। নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই পাঁচ-ছ' দিন আগে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ আনার কথা জানাননি। নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই দিন-রাত শয্যার আশ্রয়ে বই পড়ে কাটছিল। আর নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই শমী বাড়ি ফিরছে না দেখেও চট করে নড়তে চাননি। জ্যোতিরাণীর তাড়ায় নড়তে হয়েছে, কষ্টটা উত্তেজনা আর ছোটাছুটির ধকল গেছে। তার পরেও নিঃশব্দেই সামলাতে চেয়েছেন। কিন্তু পারা গেল না।

রাত বাড়ছে। বিভাস দত্ত ঘুমুচ্ছেন। ওষুধ খাওয়ার পর ঘুম একটু বেশি হবে ডাক্তার বলেই গেছলেন। জ্যোতিরাণী শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুমন্ত মানুষটাকে

দেখছেন। শ্রান্ত ফ্যাকাসে মুখ দেখছেন। শমী বাড়ি ফেরার পর যে ধাক্কা খেয়েছেন ভিতরে ভিতরে তার দুর্বহ ক্ষয় চলেছে। সত্তার ক্ষয়। তার ওপর এই অঘটনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা ভাবছেন না তিনি। এই মানুষের প্রতিও অভিযোগ নেই। তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছে মানুষটা শয্যা ছেড়ে নড়তে চাননি. তিনি ঠেলে পাঠিয়েছেন। অভিযোগের বদলে মায়া হয়েছে তাঁর। সংগোপনে নিজেকে রক্ষা করার তাগিদে যে মানুষ অস্থির তাঁকে এই বিপর্যয়ের মুখে টেনে এনেছে সিক্তু। সব ছাড়িয়ে এই সত্যটাই বড় হয়ে উঠেছে। সত্তাক্ষয়ী সত্য শুধু এটুকুই।

দিন কয়েকের মধ্যেই জ্যোতিরাণী এক্স-রে আর কার্ডিওগ্রাফ করাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরদিনই একজন বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল। তিনিও একই কথা বলেছেন। এক্স-রে কার্ডিওগ্রাফ ছাড়াও ব্লাড কোলেস্টরাল না কি করাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিভাস দত্ত গা করছেন না খুব। বলছেন, হবে, যাক কটা দিন।

কেন বলছেন জ্যোতিরাণী বুঝতে পারেন। সবই খরচার ব্যাপার। এরই মধ্যে চুপচাপ দুই একখানা চিঠিও লিখতে দেখেছেন। কি চিঠি বা কাকে চিঠি, জানেন না। অনুমান করতে পারেন। প্রকাশকদের কাছে টাকার তাগিদে চিঠি সম্ভবত। জনা দুই প্রকাশক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। মনে হয় টাকাও কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। কিন্তু মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরার মত টাকা নয় বলে ধারণা। জ্যোতিরাণী ভাবতে চান না কিছু, তবু মনে পড়ে শোকার্ত অহংকারে ছ'মাসও হয়নি এই মানুষ শমীর নামে তিন হাজার টাকা আটকে রেখেছেন। জ্যোতিরাণী ভাবতে চান না, তবু মনে পড়ে জীবনের কটা ধাপ আগে এই দুটো হাত দিয়েই লক্ষ লক্ষ টাকা নাড়া-চাড়া করেছেন। আশ্চর্য!

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হল একটু। এসেই জানালেন, পরদিনই এক্স-রে হবে, আর যা-কিছু করা দরকার তাও দু'চারদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে. তিনি ব্যবস্থা করে এসেছেন।

বিভাস দত্তর সংকোচ বিরক্তির আকার নিয়েছে। —কালই কি দরকার. কটা দিন সবুর করলে হত না?

মুখের দিকে চেয়েই জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আমার কাছে যা আছে তাতেই হবে।

মুখ বুজেই একটা যন্ত্রণা সামলেছেন বিভাস দত্ত। জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করেছেন। কিন্তু আপত্তি শোনার জন্য অপেক্ষা না করে কাজের অছিলায় সরে এসেছেন। এতবড় চিকিৎসা করার মত উদ্বৃত্ত টাকা তাঁর হাতে থাকার কথা নয়। গয়নার খবর রাখে না বলেই পরিত্রাণ, সামনে দাঁড়িয়ে জেরায় পড়তে চান না।

এক্স-রেতে দেখা গেল হার্ট ডায়েলেটেড —বেশ মাত্রায় জখম। দীর্ঘদিনের টানা বিশ্রাম নির্দেশ। ওষুধ-পত্র আর আনুষঙ্গিক খাওয়া-দাওয়ার চার্টও ছোট নয়। ডাক্তারের কাছে অনুনয় করে সমস্ত দিনে-রাতে মাত্র দু' তিন ঘণ্টা করে লেখার অনুমতি আদায় করেছেন বিভাস দত্ত। পরে বরং জ্যোতিরাণীই বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, সেরে গেলে তো সবই চলতে পারবে, এত ব্যস্ত হবার দরকার কি।

বিভাস দত্ত জবাব দেননি। এই ভাগ্যটার ওপরই বোধকরি সব দেশে বেশি অভিমান তাঁর। শেষে বলেছেন, তুমি বিশ্বাস করো, হার্টের এইরকম ব্যাপার আমি জানতুম না।

জ্যোতিরাণী বাইরে স্থির, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুহূর্তের জন্য অস্থির আলোড়ন একটা। অর্থাৎ, জানলে নিজের জীবনে এভাবে তাঁকে টেনে আনতেন না। পরক্ষণে হাসতে চেষ্টা করেছেন।—তুমিও বিশ্বাস করো এ নিয়ে আমি কিছু ভাবছি না।

তার একটু বাদেই বিভাস দত্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণী আবার সেই অসহায় ঘুমন্ত মূর্তি দেখেছেন। কেন তিনি অমন আলোড়ন অনুভব করে ছিলেন সেটা নিজেরও অগোচর নয়। এই জীবনে তাঁকে টানা হয়েছে বটে. কিন্তু কতটা আসতে পেরেছেন তিনিই শুধু জানেন। তিনি মিসেস দত্ত হয়েছেন এটা বাস্তব সত্য, অনুভবের সত্য নয়। এ কি মিথ্যাচার? তাই যদি হয়, এতবড় মিথ্যের বোঝা তিনি বইবেন কি করে। সত্য হোক না হোক, মিথ্যেটাকেও অস্বীকার করতে চান জ্যোতিরাণী। তাঁকে দয়া করতে বলা হয়েছিল, রক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তিনি তাই করেছেন রণাঙ্গনের সেই নার্সের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছেন। তিনি। হিম-শীতে মুমূর্ষু সৈনিকের দেহে যে তাপ ছড়াতে চেষ্টা করেছিল। তাঁরও সেই ভূমিকা।

কিন্তু বড় কঠিন ভূমিকা।

মুমূর্ষু সৈনিকের জ্ঞান ছিল না, বিচার ছিল না, দাবি ছিল না। এই আহত মানুষের সঙ্গে তাঁর এইখানেই তফাৎ। দিন গেছে. মাস গেছে, বছর ঘুরেছে। চিকিৎসায় আর বিশ্রামে বিভাস দত্তর শরীর কিছু ফিরেছে, কিন্তু স্নায়ুর পীড়ন বেড়েছে। আত্মাভিমানে আঁচড় পড়েই চলেছে। তিন ঘণ্টার জায়গায় এখন দশ ঘণ্টা লিখতে চান। বাধা দিলে বিরক্ত হন, বলেন, কিছু যদি হয়ই তো এমন কি ক্ষতি? আর কতকাল এভাবে টানবে?

জ্যোতিরাণী সহজভাবেই বলেন. চলে তো যাচ্ছে—

—কি-ভাবে কেমন করে চলছে আমি জানি না?

এই গোছের বিরক্তির মুখেই গভীর আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তাঁকে কাছে টেনে এনেছিলেন একদিন। জিজ্ঞাসা করেছেন, কতবড় অবস্থার মধ্যে ছিলে একদিন, আর কি অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ—একথা সত্যি তোমার মনে হয় না? সত্যি না?

জবাব দিতে সময় লেগেছে একটু। জ্যোতিরাণী বলেছেন, টাকার সুখ আগেও বড় করে দেখিনি এখনো দেখি না। তুমি বড় করে দেখতে সুরু করেছ বলে আমার অসুবিধে হচ্ছে।

তখনকার মত নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন বিভাস দত্ত। বিশ্বাসও করেছেন। কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই যোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে আবার। বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন নি। শুধু অর্থ রোজগারের বাস্তব নয়। এক সামগ্রিক ব্যর্থতার ছায়া দেখেছেন তিনি। সেটা ঠেকাবার জন্যে এত যোঝাযুঝি, সেই কারণে অসহায় আক্রোশ। লেখা বাড়িয়েছেন, কিন্তু তার ফল তেমন আসছে না। তাঁর লেখার প্রতি পাঠকের অনুরাগ তিলমাত্র কমেছে এটা তিনি বিশ্বাস করতে চান না। প্রকাশকদের নিস্পৃহতার প্রতি মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ তিনি। বলেন, খেলো সুখের বাতাস এসেছে, শস্তার চটকদার জিনিস ছেপে দাঁও মারার লোভ ওদের।

সমালোচকের বিরূপ সমালোচনা চোখে পড়লে ফুঁসে ওঠেন, স্নায়ু ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। শ্রুতিকটু মন্তব্য করে বসেন এক-একসময়। লেখার প্রসঙ্গ জ্যোতিরাণী সন্তর্পণে পরিহার করে চলতে চান সেটা টের পেলে আত্মাভিমানে অস্থিরই হয়ে ওঠেন। লেখার কদর কেন গেছে, কেন বিরূপ সমালোচনা, জ্যোতিরাণী ভালো করেই অনুভব করতে পারেন। প্রতিটি লেখায় এই স্নায়ু আর এই ক্ষোভের ছাপ পড়ছে। নিজের ব্যক্তি-জীবনের ন্যায্য প্রাপ্তির ঘোষণা প্রতি ছত্রে উকিঝুঁকি দেয়। স্বামী-স্ত্রীর বিরোধকে স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বেষের দিকে টেনে আনার ঝোঁক। হিন্দু বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অনুরাগের প্রতি তাঁর অবিরাম কটাক্ষ আর অকরুণ আঘাত।

জ্যোতিরাণী অনেকসময় বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, অনেকসময় বলেছেন, এসব

নিয়ে গবেষণা না করে সাদাসিধে গল্প লেখো না?

সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমানে ঘা পড়েছে। তর্ক তুলেছেন, নিজের মতটাকে লেখার মতই অকরুণ করে তুলতে চেয়েছেন। শেষে রাগ করে লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর তেমনি মানসিক অস্থিরতার মুখে একদিন বলেই ফেলেছেন, পাঁচটা খেলো বইয়ের মত কাটতি না দেখে আমার লেখার ওপর তোমারও আস্থা গেছে তাহলে...।

সেই থেকে পারতপক্ষে জ্যোতিরাণী আর বলেন না কিছু। কিন্তু না বলাব ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হতে থাকে অনুভব করতে পারেন। ক্ষোভের থেকেও বিভাস দত্তর হৃত-মর্যাদার যাতনা বেশি। আজকাল বাইরে বেরুচ্ছেন একটু-আধটু। কিন্তু খুব খুশিমনে ফেরেন না। কিছুদিন আগের ঘটনা। বাইরে থেকে ফেরার পর থমথমে মুখ। তারপর ক'টা দিন এক চাপা ছটফটানি লক্ষ্য করেছেন জ্যোতি-রাণী। খেদ গোপন রাখতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। এই কলকাতায় মস্ত একটা সাহিত্য অধিবেশন হয়ে গেল। অধিবেশন না বলে উৎসব বলা যেতে পারে। জ্যোতিরাণী কাগজ পড়ার অবকাশ কম পান বলেই খবর রাখেন না। সেই উৎসবে বিভাস দত্তর সম্মানের আসন মেলেনি, সাদর আহ্বানও না। কর্ম-কর্তারা ডাকে একখানা আনুষ্ঠানিক ছাপা আমন্ত্রণ পাঠিয়েই খালাস। এই অবজ্ঞা অপমানের নামান্তর। বুকের মধ্যখানে এসে লেগেছে।

আঘাতটা ব্যক্ত করে ফেলার পর ক্ষোভ আর যাতনা বাড়তেই দেখেছেন জ্যোতিরাণী। রাগের কথা সংকল্পের কথা পরিতাপের কথা শুনেছেন। আর বুকের তলায় জমাট-বাঁধা কান্নার স্তূপ দেখেছেন। এই মানুষকে তিনি সুস্থ জীবনের আলোয় ফেরাবেন কি করে জানেন না। তিনি শুধু অসহায় বোধ করেছেন।

ওদিকে শমীর মধ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে অনুভব করতে পারেন। এখন নয়, সেই এক রাতের পর থেকেই। অপরিণত, হাসিখুশি সরল মনের ওপর লোলুপতার এক বীভৎস থাবা পড়েছে। রাতারাতি তার ভিতরের দৃষ্টি সজাগ হয়েছে, বাইরে তাই আগের তুলনায় ঠাণ্ডা। সামনে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। মাসিকে কাছে পেলে আগের মতই খুশি হয়, পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্যের প্রত্যাশায় দশবার করে এ-ঘরে উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু সে-রকম আনন্দের মুহূর্তেও একটা নাম আর তাকে উচ্চারণ করতে শোনেননি। সাদা-মাটা-ভাবে গেল বছর সিতু আই-এসসি পাশ করেছিল, তখনো জ্যোতিরাণী ছাপা রেজাল্ট বুক না এনে পড়েননি। শমীর সামনেই সেটা উল্টে দেখছিলেন মনে পড়ে। তখনো ও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, সিতুদার কি হল। পরে নিজে দেখেছে কিনা তাও জানেন না।

অবকাশ নেই বললেই চলে। শমীকে পড়ানো, দুবেলার অল্প-স্বল্প রান্না, স্কুল, বিভাস দত্তর ওষুধ-পত্র-পথ্য জোগানো, আর তাঁর হতাশার নানা প্রতিক্রিয়ার জের সামলানোর ফাঁকে বিরাম নেই। তবু জ্যোতি-রাণীর মনে হয়, তিনি থেমে আছেন। তিনি যেন ভবিতব্যের এক অমোঘ গহ্বরে প্রবেশ করেছেন। তার কোনো একটা ধাপে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরো কিছু বাকি। হয়ত অনেক বাকি।

তাঁর এই আপাত-শান্ত দিন যাপনের মধ্যে অকস্মাৎ স্নায়ুগুলো সব কেঁপে ওঠার মতই ঘটনা একটা। এর সঙ্গে নিজের ভবি-তব্যের যোগ নেই। এই মাশুল আর একজন দিল।

স্কুল থেকে ফিরে দোতলায় ওঠার আগেই দুচোখ কপালে তুলে শমী ছুটে এসে জানালো, মাসি, মিত্রা মাসি মারা গেছে! কালী জেঠু তাকে নিয়ে এসেছিল।

জ্যোতিরাণী বিমূঢ় হঠাৎ। ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে শেষ সিঁড়ি থেকে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন।

রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন তারপর। দুপুরে ও-ঘরে কাকু ঘুমুচ্ছিল আর শমী পাশের ঘরে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে কাকুর নাম ধরে কাকে ডাকতে শুনে রেলিং-এ এসে দেখে ট্রাকের মত ছোট একটা খোলা গাড়িতে মিত্রামাসি শোয়া, গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা—দেখলেই বোঝা যায় মরে গেছে। আর তার পাশে শুধু কালী জেঠু, আর কেউ নেই। ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল মাসি কোথায়, স্কুলে শুনে বলল, ফিরলে বলিস আমি এসেছিলাম। গাড়ি থেকে কালী জেঠু নামেওনি, তক্ষুনি চলে গেল। কালী জেঠুর একটুও মন খারাপ মনে হয়নি শমীর, বলল, হাসি-হাসি মুখেই কথা কইল তারপর চলে গেল।

জ্যোতিরাণী তেমনি বিমূঢ়, নির্বাক। মিত্রাদি তাঁর অনেক নিয়েছে, তাঁর সত্তাসুদ্ধ কাটা-ছেঁড়া করেছে। তবু এ-রকম একটা খবর কানে আসবে কখনো কল্পনাও করেননি। সব থেকে আশ্চর্য কালীদার তার মৃতদেহ এখানে নিয়ে আসা। কি দেখাতে এনেছিলেন তিনি? কেন এনেছিলেন—শেষ দেখে জ্যোতিরাণী সান্ত্বনা পেতে পারেন ভেবে? ...মিত্রাদিকে ট্রাকের মত খোলা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দেহ ছাই করার জন্য পাশে শুধু কালীদা, আর কেউ না। শুরুতে কালীদা আর শেষ-যাত্রায় কালীদা।

গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে আত্মস্থ হলেন একটু। ঘরে পা দেওয়া মাত্র বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছ? কালীদা আবার তাকে এখানে আনতে গেল কেন...।

জবাব দেবার নেই কিছু। জ্যোতিরাণী নিজেই জানেন না কেন। খানিক চুপ করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একবার শ্মশানে যাব?

—তুমি? না।

চিন্তার অবকাশ না দেবার মত করেই বললেন বিভাস দত্ত। আপত্তি না করলেও জ্যোতিরাণী যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

নিঃশব্দে স্মৃতি মুছে মুছে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু স্মৃতি মোছে না মরে? রাতের বিনিদ্র শয্যায় তারা ভিড় করে এসেছে।......মিত্রাদি প্রভুজীধাম বীথি, আর সব মেয়েরা। মিত্রাদি আর কালীদা, মিত্রাদি আর তিনি নিজে, মিত্রাদি আর বীথি, মিত্রাদি আর ত্রি-কোণ রাস্তার দালানের কজন...মিত্রাদি মিত্রাদি মিত্রাদি...কি হয়েছিল মিত্রাদির? হঠাৎ তাঁর কপালে এই শাস্তি কেন? বিয়ে নাকচের আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে ডাইভোর্সের নোটিস পেয়ে তিনি ধরে নিয়েছিলেন ওই ত্রিকোণ রাস্তার দালানে মিত্রাদির পাকাপাকি অধি-ষ্ঠানের সূচনা ওটা। তিনি ঠিক ধরে নেন নি, কালীদার মুখে বিভাস দত্ত এই গোছের আভাস পেয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন। জ্যোতিরাণী অবিশ্বাস করেন নি, কারণ তিনি বাড়ি ছাড়ার পর থেকে মিত্রাদির এই আশার কথা শুনে এসেছেন। কিন্তু সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল?

পরদিন বিকেলে ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মুখে রক্ত উঠল এক-ঝলক। ঘরে কালীদা বসে খুশি মেজাজে শমীর সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁকে দেখে হাসিমুখে ডাকলেন, এসো, এত দেরিতে ছুটি কেন তোমার?

জ্যোতিরাণী কি-যে করবেন ভেবে পেলেন না। পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে হল। মৃদু প্রশ্ন করলেন, কতক্ষণ এসেছেন?

—অনেকক্ষণ। প্রথমে বিভাসকে এক-হাত নিয়েছি, বাইরে কি কব্জ দেখিয়ে ও পালাতে এখন শমীকে নিয়ে পড়েছি!... বিভাসের শরীর তো যাচ্ছেতাই খারাপ হয়েছে দেখলাম, চেনা যায় না। ভালোমত চিকিৎসা-টিকিৎসা করাচ্ছে?

এই সাক্ষাতের ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করে জ্যোতিরাণী সামান্য মাথা নাড়লেন। ডাইভোর্সের নোটিস পাওয়ার পর এই প্রথম দেখা কালীদার সঙ্গে। মুখ দেখে বা স্বাভাবিক কথা-বার্তা শুনে মনে হবে জ্যোতিরাণী বরাবরই মিসেস দত্ত, আর দিন-কতক অনুপস্থিতির পর তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। এই আসার পিছনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু কালীদা যা পারছেন জ্যোতিরাণী তা পারছেন না। সহজ হবার চেষ্টা করতেও বিসদৃশ লাগছে তাঁর।

—মিত্রাদির কি হয়েছিল?

—বলব'খন, তুমি মুখহাতে জল দিয়ে এসো।

জ্যোতিরাণী চলে এলেন। মুখ-হাতে জল দেবার তাড়ায় নয়, একটু আড়াল দরকার। একটু প্রস্তুতি দরকার। কালীদা হাসতে পারছেন, সহজ হতে পারছেন অন্য কারণে। তিনি গৌরবিমলবাবু নন। জ্যোতিরাণী মিসেস দত্ত হবার ফলে খুশি যদি কেউ হয়ে থাকেন, এই একজনই হতে পারেন। কালো নোট-বইয়ে তাঁর শকুনি-

স্মৃতি ভোলবার নয়। সব থেকে বড় আক্রোশ তাঁর যেখানে বাস করেন সেই বাড়ির মালিকের উপর। ওই একজনের সব-কিছু ধূলিসাৎ দেখার আশায় বসে আছেন কালীদা, বুক ভাঙতে দেখার আশায় বসে আছেন।

তবু বিভাস দত্তর স্ত্রী হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ানোর বিড়ম্বনা কম নয়।...কাল মিত্রাদি মারা গেছে, কালীদা কালও এসেছিলেন। আজও এলেন আবার। কিন্তু কেন?

একটু সময় নিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকলেন। কালীদা হাত বাড়ালেন, এসো, চায়ের কথাই ভাবছিলাম।

পেয়ালা হাতে নিয়ে পর পর গোটা-কয়েক চুমুক দিলেন। সহজ হাসিমুখের তলায় শ্রান্তির ছাপ লক্ষ্য করলেন জ্যোতিরাণী। চুলে তেল পড়েনি বোধহয় কয়েকদিন। শমী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে কালীদা বললেন, মেয়েটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। বোসো...

বসলেন।

চায়ের পেয়ালা রেখে তাঁর দিকে ফিরলেন।—তোমাকেও তো বেশ শুকনো শুকনো দেখছি, শরীর ভালো তো?

—হ্যাঁ।

সহজ বাক্যালাপের সুরে কালীদা বললেন, তুমি আগের স্কুল ছেড়েছ শুনেছিলাম, অন্য স্কুলে ঢুকেছ শুনেছি কিনা মনে নেই। আর মিত্রাকে নিয়ে অত ধকলের পর খেয়ালও ছিল না।...হাসপাতালে চোখ বোজার আগে দু'তিনবার তোমার নাম করেছিল, বোধহয় দেখতে চেয়েছিল, তাই যাবার সময়ে কোন্ মূর্তিতে গেল একবার দেখিয়ে যাই ভাবলাম।

নিজের অগোচরে জ্যোতিরাণী উদ্‌গ্রীব। কথার সুর শান্ত, নিস্পৃহ।—খবর দিলেন না কেন?

—হ্যাঃ। অর্থাৎ খবর দেওয়ার প্রসঙ্গ বিবেচনা যোগ্যও ভাবেন নি। বললেন, তাছাড়া মারা যাবার আগেই সতের ঝামেলা, মারা যাবার পর তো কথাই নেই। পুলিসের টানা-হেঁচড়া, পোস্ট-মর্টেম। সকালে মরেছে, বডি পেতে পেতে বিকেল—

মুহূর্তের মধ্যে ভিতরে বুঝি তোলপাড় হয়ে গেল জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদি কেমন, মিত্রাদি তাঁর কোন্ স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে আর কত ক্ষতি করেছে, কয়েক নিমেষের জন্যে তাও যেন ভুলে গেলেন জ্যোতিরাণী। — কেন? মিত্রাদির কি হয়েছিল?

—হয়নি কিছু, পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে গলার এই জায়গাটা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। আঙুলে দিয়ে নিজের কণ্ঠনলীর কাছটা দেখালেন কালীদা।

জ্যোতিরাণী শিউরে উঠলেন। অস্ফুট আর্তনাদের মত একটা শব্দ বেরুলো গলা দিয়ে। স্তব্ধ খানিকক্ষণ। পরক্ষণে মনে পড়ল কি।...মিত্রাদির আশা ছিল ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির খালি জায়গা দখল করবে, বাড়ির আর অঢেল ঐশ্বর্যের কর্ত্রী হবে। আত্মহত্যা করল কেন, বাড়ি আর ঐশ্বর্যের মালিক তাকে বিয়ে করতে রাজি হল না শেষ পর্যন্ত—সেই দুঃখে? কিন্তু কালীদার দিকে চেয়ে সেই রকমও মনে হল না, ওই সহজতার আড়ালে দু'চোখ চক চক করছে একটু, আর মুখ-খানাও অকরুণ দেখাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না।—এ-রকম করল কেন? কি হয়েছিল?

শুনলেন কেন, আর কি হয়েছিল।

দিন চারেক আগে সন্ধ্যার পর মিত্রাদি ত্রিকোণ রাস্তার বাড়ির দোতলায় উঠেছিল। বাড়ির মালিক ঘরে ছিলেন। খুশি মুখেই দোতলায় উঠেছিল মিত্রাদি। দুজনে এক-সঙ্গে রাতের কোনো ফাংশনে যাওয়ার কথা ছিল বোধহয়। কালীদা তখন নিজের ঘরেই ছিলেন। একটু বাদে সেদিনের খবরের কাগজটা শুধু শামুকে দিয়ে কর্তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কর্তার যদি দেখার দরকার হয় বা আর কেউ যদি দেখে। কাগজের প্রথম পাতার কোণের দিকের একটা খবরে লাল পেন্সিলে গোল করে দাগ দেওয়া ছিল।

হঠাৎ মেয়ে-গলার কানের পর্দা-ছেঁড়া চিৎকারে বাড়ির সকলে চমকে উঠেছিল। কেবল না-না-না-না আর্তনাদ একটা। বুকে অস্ত্র-বেধা প্রাণীর শেষ আর্তনাদের মত। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মত। সিতু মেঘনা শামু ভোলা ছুটে এসেছিল, কালীদাও বেরিয়ে এসেছিলেন। রাস্তায়ও লোক দাঁড়িয়ে গেছল।

...ঘরের মধ্যে বাড়ির মালিক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, আর মিত্রাদি শর-বেঁধা পশুর মতই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর কেবল সেই আর্তনাদ, না-না-না-না! খবরের কাগজটা তার পাশে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কালীদাই প্রথম ঘরে ঢুকেছেন। মিত্রাদিকে মাটি থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁকে দেখে মিত্রাদির হুঁস ফিরেছে, চোখের পলকে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেছে। আর তারপরেও বাড়ির মানুষগুলোর সম্বিত ফিরতে সময় লেগেছে।

বিবর্ণ-পাংশু বাড়ির মালিক শিবেশ্বর চাটুজ্যে কালীদাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হয়েছে, কাগজ দেখেই ওরকম করল কেন? কি খবর বেরিয়েছে?

মাটি থেকে কাগজটা তুলে কালীদা লাল দাগ দেওয়া অংশটুকু তাঁকে দেখিয়েছেন।

ছোট খবর। ওমুক নামের দার্জিলিঙ-বাসিনী কুড়ি একুশ বছরের সুশ্রী এক বাঙালী ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেখানকার দুজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং এখানকার এক-জোড়া আধ-বয়সী হাতুড়ে দম্পতী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। নির্বিঘ্নে সংকট ত্রাণের আশ্বাস দিয়ে মেয়েটিকে ওই দম্পতীটির বাড়িতে এনে তোলা হয়েছিল। বিপদ উদ্ধারের স্থলে নৃশংস প্রচেষ্টার ফলে এই শোচনীয় মৃত্যু। জেরায় প্রকাশ, ওই প্রচেষ্টার আগে মেয়েটির হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রাণান্ত যাতনা কল্পনাসাপেক্ষ। মেয়েটির মৃতদেহ সরকারী হেপাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

পড়ার পরেও প্রায় দুর্বোধ্য ঠেকেছিল শিবেশ্বর চাটুজ্জের কাছে। কালীদা জানিয়েছেন, মেয়েটি মৈত্রেয়ীর।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিত্রাদি নিজের গলায় ছুরি চালিয়েছিল পরদিন সকালে। তার আধ ঘণ্টার মধ্যে চাকরের টেলিফোন পেয়ে কালীদা গেছেন। আয়নার সামনে মেঝেতে পড়েছিল মিত্রাদি। ঘর রক্তে ভাসছিল। সেখান থেকে হাসপাতাল। ডাক্তার বলেছে আত্মহত্যার এমন আসুরিক চেষ্টার নজির কমই দেখা যায়। হাসপাতালে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা বেঁচেছিল মিত্রাদি। কথা বলতে পারেনি, কিন্তু অনেকসময় জ্ঞান ছিল। যতবার খেয়াল হয়েছে কালীদা পাশে বসে আছে, ততোবার তাঁর দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় করেছে। আর শেষের দিকে বারকয়েক জ্যোতিরাণীর নাম করেছে।

স্তব্ধ, নির্বাক খানিকক্ষণ। সর্বাঙ্গ সিরসির করছে জ্যোতিরাণীর। কালীদার দিকে চোখ পড়তে সচকিত একটু। কালীদা তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর দু'চোখ আগের থেকেও বেশি চকচক করছে এখন। ঠোঁটের ফাঁকে আর গালের ভাঁজে ধারালো ছুরির ফলার মতই এক টুকরো হাসি।

বললেন, তোমার আর যত লোকের যত ক্ষতি মিত্রা করেছে তার সবটা না হোক কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে,... কি বলো?

(ক্রমশঃ)

হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছর ইংরেজি নববর্ষ একটি বিশেষ আহ্বান বহন করে আনে ভারতের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী ও গবেষকদের কাছে। সে আহ্বান ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের। এবছর (১৯৬৭) বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম বার্ষিক অধিবেশনের আহ্বান জানিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিপূর্বে আরও দুবার হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে। প্রথমবার অধিবেশন হয় ১৯৩৬ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৪ সালে। কিন্তু সে দুটি অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমাদের হয়নি। তাই আমাদের কাছে হায়দ্রাবাদে এবারের অধিবেশনে যোগদানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণ একদিকে যেমন ভারতীয় ও বিদেশী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হবার ও তাঁদের বক্তব্য শোনার, অপর দিকে তেমনি ইতিপূর্বে অদেখা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর দেখারও।

কলকাতা থেকে আমরা একটা বড় দল তেসরা জানুয়ারী সকালে উপনীত হলাম একদা ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী রাজন্য নিজামের রাজধানী ও বর্তমানে স্বাধীন ভারতের নবগঠিত অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ শহরে। অবশ্য আমরা নেমেছিলুম সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে। তার আগের দিন কলকাতা থেকে আর একটি বড় দল বিশেষ ট্রেনযোগে সেখানে উপস্থিত হন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রায় দু হাজার প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয় এবং মূল অধিবেশন আয়োজিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুরম্য 'ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন'-এ।

তেসরা জানুয়ারী অপরাহ্নে ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনের সুসজ্জিত মণ্ডপে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় দু হাজার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। ১৩ বছর আগে তাঁর পিতা স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও এই ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেনেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪১তম অধিবেশনের উদ্বোধন করেছিলেন। এবারের অধিবেশনের সূচনা হয় বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সঙ্গে এবং তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ডি এস রেড্ডি সমবেত প্রতিনিধি ও বিদেশাগত বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশ এখন উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বে উপনীত হয়েছে—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পর্বে। বর্তমানে আমরা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য জোগাবার জন্যে কৃষিগত বিপ্লব এবং শিল্প গড়ে তোলার জন্যে দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহারের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নতুন কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ, উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার এবং সার ও কীটঘ্ন দ্রব্যের সাহায্যে কৃষির বৈজ্ঞানিকীকরণ। এই বিপ্লবের ধারক-বাহক হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা—তাঁদের হাতেই রয়েছে প্রগতি ও ধ্বংসের চাবিকাঠি। ভারতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজ্ঞানীদের সরকার ও জনগণের সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে হবে। শিক্ষাদাতা ও উদ্ভাবকরূপে তাঁদের ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম সারিতে দাঁড়াতে হবে। অর্থনীতির চাবি রয়েছে যাঁদের হাতে তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারিগরী জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যে আমরা পরনির্ভর হতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য হল, আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে সর্ববিধ বৈদেশিক সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। গত ২০ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করছেন। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদেশের বহু বিজ্ঞানী উন্নততর সুযোগের আশায় বিদেশে চলে যাচ্ছেন এবং তাঁদের অনেকে আর এদেশে ফিরছেন না। এ ঘটনা বাস্তবিকই দুঃখের ও দুর্ভাবনার বিষয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তা করা প্রয়োজন। স্বদেশী হওয়াই হল আজ বিজ্ঞানীদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ—সে চ্যালেঞ্জ তাঁদের গ্রহণ করা উচিত। এই বলে তিনি উপসংহার করেন, বিজ্ঞানের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক ও মেধা যে সামাজিক অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্য, এই বোধ জাগাতে না পারলে প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না।

এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি। মূল সভাপতির ভাষণে তিনি এবার প্রচলিত রীতির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এতদিন প্রচলিত রীতি ছিল, মূল সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলার পর নিজস্ব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শেষাদ্রি এবার সে রীতি অনুসরণ না করে তাঁর ভাষণে 'বিজ্ঞান ও জাতীয় কল্যাণ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

প্রারম্ভে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে এই কংগ্রেসকে যাতে গড়ে তোলা যায় তার উপায় অবলম্বন করা উচিত। বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান উন্নয়ন ও জাতীয় কল্যাণে সেসবের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনাই আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং সেইসঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এরপর তিনি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞানের মেধাগত ও সাংস্কৃতিক মূল্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুজগৎ, বিজ্ঞান ও সমাজ এবং এদেশের বিজ্ঞান-নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা ও অণুজগতের সূক্ষ্মতা থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার চিন্তায় নেমে আসতে হবে। এখানে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ-সংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এ সমস্তই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং তার সমাধানকল্পে আমাদের সম্পদ ও দৃষ্টি আশু নিয়োগ করা প্রয়োজন। ফলিত বিজ্ঞানের ওপরই এসবের সমাধান নির্ভর করে এবং এবিষয়ে সাফল্য অর্জিত হলে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং তখনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-গবেষণা ও কৃষ্টির পথ প্রশস্ত হতে পারে। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় জীবনে ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণার এত প্রয়োজন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও এবিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে জাতীয় কল্যাণই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপসংহারে অধ্যাপক শেষাদ্রি বলেন, একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে শুধু অর্থ ও উপকরণ থাকলেই সত্যিকারের বিজ্ঞান-গবেষণা সার্থক হতে পারে না। এগুলির প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু আসল প্রয়োজন মানবিক উপাদান। অধ্যাপক শেষাদ্রি তাঁর ভাষণে কল্যাণরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিকা সম্পর্কে এভাবে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন সেবিষয়ে
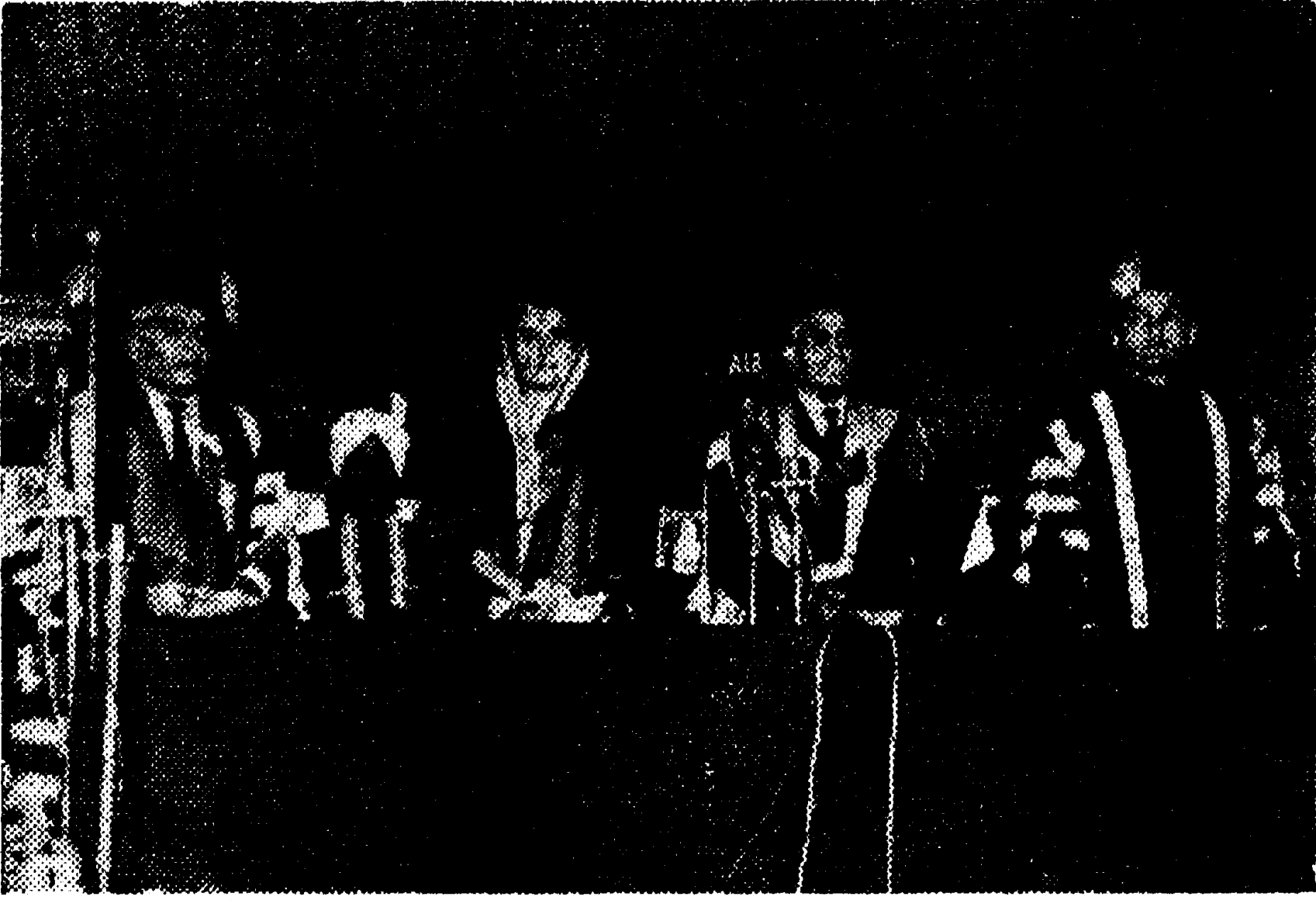
বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডঃ ডি এস রেড্ডি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মূল-সভাপতি অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রি এবং প্রো-চ্যান্সেলার নবাব মুক্কারাম।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা পরে এক আলোচনায় মিলিত হন।

উদ্বোধন-দিনে মূল সভাপতির ভাষণের পর আর কোনো অনুষ্ঠানসূচী ছিল না। দ্বিতীয় দিন সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞান-পুস্তকের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীজগন-মোহন রেড্ডি। গত বছর চণ্ডীগড় অধিবেশনের তুলনায় এবারের এই প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে এবং বিজ্ঞানের পাঠ্য ও অন্যবিধ পুস্তক প্রকাশনায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আরও অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমরা যেমন আনন্দিত হয়েছি তেমনি আশান্বিতও হয়েছি।

প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর দ্বিতীয় দিন থেকে বিভিন্ন শাখা-সভাপতিদের অভি-ভাষণে, বিশেষ বক্তৃতা, গবেষণা নিবন্ধ পাঠ, আলোচনাচক্র ইত্যাদি শুরু হয় এবং ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক এফ সি অডিল্যাক আলোচনা করেন 'র‍্যানডাম ফ্র্যাগমেনটেশন' সম্পর্কে, উদ্ভিদবিজ্ঞানের সভাপতি অধ্যাপক আর এন টাণ্ডন বলেন, 'ছত্রাকজাত পুষ্টির কয়েকটি দিক', শারীর-তত্ত্ব শাখার সভাপতি ডঃ সুশীলরঞ্জন মৈত্র বলেন, 'কর্ম-শারীরতত্ত্ব—পশ্চাৎপদ ও উপ-যোগিতা', মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক এইচ সি গাঙ্গুলী আলোচনা করেন 'মানসিক স্বাস্থ্য শিল্প' বিষয়ে, যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিমান ও মহাকাশযানের চালনা পদ্ধতি', সংখ্যায়ন বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক ভি এস হুজুরবাজার বলেন, 'সম্ভাব্যতা বণ্টনের অভেদক', রসায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক আর সি মেহ্রোত্রা আলোচনা করেন 'অ্যালকোক্সাইডস অ্যাণ্ড অ্যালফিন-অ্যালকোক্সাইডস্ অফ মেটালস অ্যাণ্ড মেটালয়েডস', ভূতত্ত্ব ও ভূবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক আর এল সিং বলেন, 'মরফোমেট্রিক অ্যানালিসিস অফ টেরেন', প্রাণীবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সেলস ইন টাইম অ্যাণ্ড ডিফারেনসিয়েশন', গণিত শাখার সভাপতি অধ্যাপক ইউ এন সিং আলোচনা করেন 'জেনারেলাইজড ফাংকশন, জেনারেলাইজড ফোরিয়ার ট্রান্সফরম অ্যাণ্ড দেয়ার অ্যাপলি-কেসন', কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক বিশ্বনাথ সাহু বলেন, 'ভারতকে ক্ষুধা থেকে রক্ষায় কৃষি-বিজ্ঞানীর সুযোগ-সুবিধা', ভেষজ ও পশুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চৌধুরী আলোচনা করেন 'অক্যালট পরজীবী ও মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া' এবং নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডঃ অচ্যুতকুমার মিত্র বলেন, 'খাদ্য-বিপ্লবের সংগঠক এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায়' সম্পর্কে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের যোগদান ও অংশ-গ্রহণ হচ্ছে একটি প্রধান অংগ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশ্বের বারোটি রাষ্ট্র থেকে সর্বসমেত ২৭ জন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। আফগানিস্থান থেকে এসে-ছিলেন ডঃ মহম্মদ নূরী এবং মিঃ মহম্মদ আজম জেয়ার; সিংহল থেকে ডঃ ডি ভি ডবলু আবেগুণবর্ধন এবং মিঃ পি এ জে রত্নশ্রী; ডেনমার্ক থেকে অধ্যাপক বার্নার্ড পেটারস; ফ্রান্স থেকে ডঃ পি লেপিনস; জার্মান সাধারণতন্ত্র থেকে ডঃ জর্জ মেন্স-চারস, অধ্যাপক এইচ জে হোরভাথ এবং ডঃ পল গ্রেগস; হাঙ্গেরী থেকে অধ্যাপক আরতুর হর্ণ এবং অধ্যাপক ইস্তভান কোভাকস; জাপান থেকে ডঃ শোজিরো উয়েভ, মালয়েশিয়া থেকে ডঃ জে এ বুল-অকস, পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক ক্ষিয়েলেভ-সকি; যুক্তরাজ্য থেকে ডঃ জে এস ফরেস্ট এবং অধ্যাপক এম বি উইলকিনস; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডঃ জোশেফ মায়ার, ডঃ শ্রীমতী মারিয়া মায়ার, ডঃ ওয়েস্টন অ্যাণ্ডারসন এবং অধ্যাপক আর দে রোডিন এবং সোভিয়েত রাশিয়া থেকে এসেছিলেন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী আকাদেমিশিয়ান এ এম প্রখোরফ, আকাদেমিশিয়ান পি এন ফেডোসিয়েরোফ, আকাদেমিশিয়ান ভি এম গলুশকোভ, আকাদেমিশিয়ান এ এস সাদিকোফ, আকাদেমিশিয়ান এম এম শিয়ে-মিয়াকিন, ডঃ এস জি কোর্ণিয়েয়েফ এবং মিঃ ভি আই তকাচেনকো। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীও প্রতি বছর বিশেষ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এবছর চন্দ্রকলা হোরা স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন ডঃ বি এস ভীমাচার, তাঁর বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে মৎস্য গবেষণার উন্নয়ন'। মূল সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রি একটি লোক-রঞ্জন বক্তৃতা দেন 'প্রকৃতিজ দ্রব্যের রসায়নে কয়েকটি মূল্যবান উন্নতি' সম্পর্কে। ডঃ বিষ্ণু-পদ মুখোপাধ্যায় এবার চতুর্থ বার্ষিক বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক-বক্তৃতায় 'বিজ্ঞান ও ক্যান্সার সমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানী ডঃ নীলরতন ধর 'বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতাটি যেমন তথ্যের দিক থেকে তেমনি প্রাঞ্জলতা ও সরসতায় সকলকে মুগ্ধ করে। অধ্যাপক আর কে শাকসেনা চতুর্থ বার্ষিক মুন্দকর স্মারক বক্তৃতা দেন। এ বছর যে সব আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে 'বিজ্ঞান ও সামাজিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক' এবং দ্বিতীয়টি 'ভূগর্ভের উপরের স্তর প্রকল্প' বিষয়ে। শেষোক্ত আলোচনাটি ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা, ভূতত্ত্ব সমিতি, ভারতীয় ভূপদার্থিক ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং বহিরাগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও এতে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন।

অঙ্গনা

প্রমীলা

নতুন দিনের স্বপ্ন

অন্ধকার দ্রুত অপসৃয়মান। আলোকাভাস স্পষ্ট। আলো-আঁধারির মিলনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। পাখির কাকলীতে বনানী মুখর। তাদের কণ্ঠে নতুন দিনের বন্দনা-গান। পত্র-পুষ্পের সুরভিতে চতুর্দিক আমোদিত। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খরব নতুন দিন ঘোষণা করলো। সমবেত সামন্তোত্র নিস্তব্ধতার বুক চিরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে নতুন দিনের ছাড়পত্রের কথা জানিয়ে ফিরতে লাগলো। মুহূর্তমধ্যে দিগ্বিদিক জুড়ে প্রাণের প্রবাহ উত্তাল হয়ে উঠলো। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করার সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতি যেন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছে। সবাই নিজের নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য ব্যস্ত। কোথাও কোন উদ্বেগ বা ক্লান্তির চিহ্ন নেই। একটা অদ্ভুত ছন্দোবদ্ধ দ্রুততার মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। নারী-পুরুষ পরস্পরের উপর সমান নির্ভরশীল। কেউ কারো শক্তিকে খাটো করে দেখছে না বা পরস্পর পরস্পরের ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টাও করছে না। বিভেদ-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাই সকলের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে অসম্পূর্ণ দেশগঠনের বিরাট কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ করছে। সংকীর্ণতা বা ক্ষুদ্রতা তাদের স্পর্শও করতে পারছে না। বিরাটের মহান বোধে সবাই উদ্বুদ্ধ। সকলেই এক মন এক প্রাণ। কোন বিভেদ তো দূরের কথা, পারস্পারিক ত্রুটি সংশোধনে সবাই আগ্রহশীল।

ভাবতে বেশ ভালো লাগলো সমস্ত দৃশ্যটা। এক মুহূর্তে এরকম পট পরিবর্তনে সবাই উৎসাহিত এবং উল্লসিত। অনবরত প্রদেশে প্রদেশে বিরাট ব্যবধান এবং নানা বিরোধের কথা শুনে শুনে কানটা পচে গিয়েছিল, এরকম একটা বিরাট পরিবর্তন মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না। অপ্রত্যাশিতের এই হঠাৎ আগমনে চারদিকে তাই সাড়া পড়ে গিয়েছে। নতুন যুগের ভোরে তাই সর্বত্র বিরাট কর্মোন্মাদনা। কেউ ফাঁকি দিতে চায় না এবং ফাঁকি দিয়ে ফাঁকে পড়তে চায় না। যার যেটুকু করার, সে সেটুকু করে যাচ্ছে। কবে যেন শুনেছিলাম জাতীয় জীবনের এই সংকটমুহূর্তে নারীশক্তির অগ্রগামী ভূমিকা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো সবকিছু দেখেশুনে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রেরণা এবং নেতৃত্ব নারীশক্তির বিরাট অভ্যুদয়ের ফল। সন্তানকে নিয়ে সমাজের আর মাথাব্যথা নেই। আন্দোলনের নামে উচ্ছৃংখলতা কবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছাত্র পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, শিক্ষক ছাত্রদের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গভীর মনোযোগী। কৃষক, শ্রমিক দেশের ও দশের প্রগতির জন্য আপ্রাণ প্রয়াসে নতুন সমাজ গড়ে তুলছে। আর এই সমাজের শীর্ষে রয়েছেন মা—যিনি সবাইকার প্রেরণা।

বেহালা বিমানবন্দরে অল ইন্ডিয়া এয়ারোমডেলারস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত অষ্টাদশ মডেল বিমান প্রদর্শনীতে জনৈকা প্রদর্শিকাকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

মহিলা রাষ্ট্রদূত

ভারতে অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত ডঃ জোহানা নেস্টর সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন।

স্মরণীয়া

বিশ্বের প্রথম এয়ার হোস্টেস। বিশ্বে এ-ও এক অনন্য সম্মান। এই দুর্লভ সম্মান লাভ করে অমর হয়ে রয়েছেন এলেন চার্চ মার্শাল। দেশ-জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে আজ তাঁর স্থান। তিনি সকল কালের এবং সকলের। আগত এবং অনাগত কালের সকল এয়ার হোস্টেসই তাঁকে কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবেন। ১৯৩০ সালের কথা। প্রথম এয়ার হোস্টেসরূপে এলেন যাত্রা করলেন তিন ইঞ্জিনওয়ালা এক বোয়িং বিমানে। যাত্রী ছিল এগারজন। বিমানটির বহন-ক্ষমতাও অবশ্য এর বেশি ছিল না। এয়ার লাইনের প্রথম স্টুয়ার্ডেস হিসেবে তিনি বিশ শতকের মেয়েদের ক্ষেত্রে এক নতুন কর্মক্ষেত্রের উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিবেশে তিনি ছিলেন মূর্তিমতী করুণা। হাজার হাজার সৈনিকের সেবা-শুশ্রূষায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেন। তাঁর একনিষ্ঠ সেবায় অনেক মৃতকল্প সৈনিক সেদিন মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছে। সেখানে তাঁর ভূমিকা ছিল নার্সের। নার্স হিসেবে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সেবা-নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা দেখে বারবার মনে পড়ে গিয়েছিল আর এক মহিয়সী নারীর কথা—তিনি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলও এমনি মহনীয় ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধে আহত এবং মৃতপ্রায় সৈনিকদের নবজীবন দান করেছিলেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এই সেবাপরায়ণতার জন্য ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সার্থক উত্তরসূরী এলেন। আবার শান্তির সময়েও নার্সিং-ইনস্ট্রাক্টর এবং হসপিটাল এডমিনিস্ট্রেটররূপে তিনি মহনীয় ভূমিকার অধিকারী। এক্ষেত্রে তাঁর দান আরও স্মরণীয় এবং তিনি আরও বরণীয়া। অসংখ্য তরুণীকে তিনি সেবা-ব্রতের এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তাদের জীবন ও জীবিকার এমন সুন্দর সমন্বয় এলেনের জীবনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

১৯০৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই মহিয়সী নারীর জন্ম। জীবনের যাত্রাপথে নিজের কর্মদক্ষতা, দক্ষতা, কল্পনা এবং আন্তরিকতার সমন্বয়ে সমস্ত বিপত্তিকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন। ১৯৬৫ সালের ২৭ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরার্থে উৎসর্গীকৃত একটি জীবনের সমাপ্তি ঘটে। জীবনের বন্ধুর পথ অতিক্রমে এবং সেবার ক্ষেত্রে তিনি যে মহনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং আদর্শ স্থাপন করেছেন, তা যুগ থেকে যুগান্তরে সকলকে মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে এবং সুগভীর জীবনবোধ ও অক্লান্ত আত্মোৎসর্গ ব্রতে অনুপ্রাণিত করবে। সারা বিশ্বের নার্স ও স্টুয়ার্ডদের মধ্যে তাঁর আদর্শ অম্লান ও ভাস্বর হয়ে থকবে।

তাঁর স্বার্থগন্ধহীন সেবাদর্শের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটি ব্রোঞ্জ স্মৃতিফলক উৎসর্গ করা হয়েছে। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য এটি বিভিন্ন এয়ার-লাইনসকে উপহার দেওয়া হয়। এই স্মৃতিফলক এলেনকে বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'হিউম্যানেটেরিয়ান, ওয়ার হিরোইন অ্যান্ড অ্যাভিয়েশন পাইওনীয়র'। স্মৃতিফলকে তাঁর কর্মময় জীবন সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, তাতে তাঁর মহৎ আন্তরিকতা এবং অপরাজেয় মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বর্তমানে স্মৃতি-ফলকটি বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমান-ঘাঁটির ট্রেনিং-সেন্টারে রাখা আছে নতুনদের এলেনের মহৎ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত এবং অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় এয়ারলাইন্সকেও এই স্মৃতিফলকটি একবার পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য দেশের সঙ্গে এটা আমাদের পরম গৌরবের কথা।

ইউনাইটেড এয়ার-লাইন্সের উদ্যোগে প্রবর্তিত এই স্মৃতিফলক যদি এলেনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হয়, তবেই তা সার্থক বলে বিবেচিত হবে। আগত এবং অনাগত কালের এই বিশেষ বৃত্তিধারী-দের ওপরই তা নির্ভর করে।

সংবাদ

অবিভক্ত বাংলার এক সময়কার স্বনাম-ধন্যা রাজনৈতিক কর্মী বরিশালের শ্রীমনোরমা বসুকে পাকিস্তান সরকার গত নভেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে 'মাসীমা' নামে পরিচিতা শ্রীমতী বসু মুক্তি পেয়েই ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বড় বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেন।

• • •

বালসেবিকা শিক্ষণ-প্রকল্পের ছাত্রীবৃন্দ সম্প্রতি তিনদিনব্যাপী শিশু শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীমতী বেলা দে এবং পশ্চিমবঙ্গ শিশু-কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ উদ্বোধনী সভায় ভাষণ দেন। প্রদর্শনীটি অভিভাবক ও শিশু উভয়ের পক্ষেই মনোজ্ঞ হয়েছিল। প্রদর্শনীর আর একটি আকর্ষণ ছিল বাল-সেবিকাদের পরিচালিত ক্যান্টিন।

• • •

অন্ধ ভিখারী গোঁসাইদাস মল্লিকের ছোট্ট মেয়ে অনিতা এবার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। দেশপ্রিয়নগর নবীন পল্লীর অশীতিপর এই মানুষটির দু'চোখ থেকে আলো সরে গেছে আজ বহুদিন। অভাবের চাপে এই অন্ধ বৃদ্ধটি একান্ত দিশাহারা। মেয়ে কখনো বা ছেলের হাত ধরে তিনি ভিক্ষেয় বেরোন। কোনদিন কিছু জোটে, কোনদিন তা-ও না। দীর্ঘদিন ভাতের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার অনশনে বৃদ্ধ বেদনায় ভেঙে পড়েন। শত দুঃখের মধ্যেও বৃদ্ধ খুশি। অনিতা না খেয়ে, না পরে বাপের হাত ধরে ভিক্ষা করে কৃতী ছাত্রীর পরিচয় দিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কঠোর সাধনার এ এক মহান দৃষ্টান্ত।

• • •

সম্প্রতি আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্রীমতী ঈপ্সিতা চক্রবর্তীর একক চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিক-জীবনের বিভিন্ন দিক-সম্বলিত ষাটটি ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। শহরের ঘাট-জগৎ, সার্কাস প্রমোদ-গৃহ, নাচের মজলিস, রেস্তোরা চিত্র-প্রদর্শনী, বস্তি, শহরতলীর সংসার ইত্যাদি বিষয় হলো তাঁর ছবির উপজীব্য। শ্রীমতী চক্রবর্তীর শিল্পশিক্ষার গোড়াপত্তন হয় কানাডায় এবং দেশে ফিরে তিনি সত্যেন সেনগুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন।
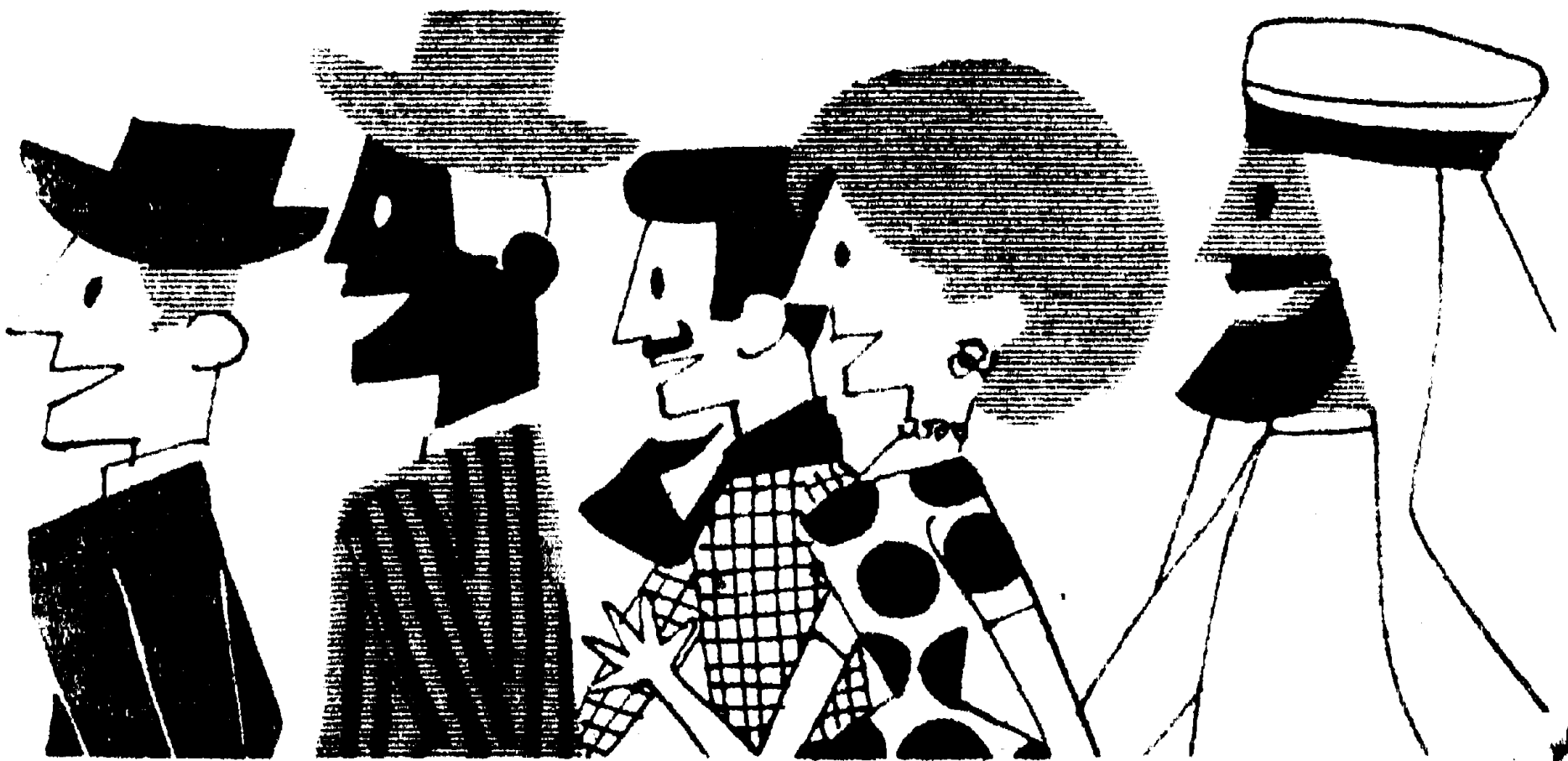
সমুদ্র সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ

ভূপতি চৌধুরী

কলকাতার লোক সমুদ্র দেখার কথা মনে করলে—প্রথমেই ভাবে পুরীর সমুদ্রের কথা। একটা রাত ট্রেনে কাটিয়ে পরের দিন প্রভাতেই সমুদ্রদর্শন। আজকাল অবশ্য বাংলার উপকূলে দীঘার সমুদ্রতীর বহু-বিজ্ঞাপিত; গত কয়েক বছরে দীঘা ভ্রমণ-বিলাসীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবে যাতায়াতের ব্যবস্থা এখনও খুব আরামপ্রদ নয়। সকালে কলকাতা থেকে খড়্গপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে ৮০ মাইল পথ বাসে চড়ে সন্ধ্যা নাগাদ যখন দীঘা পৌঁছান যায় তখন শরীরে আর ধকল থাকে না। অথচ বাংলাদেশের দুটি জেলার কিছু অংশ সমুদ্র অর্থাৎ বঙ্গোপ-সাগরের তীরে। দীঘা মেদিনীপুর জেলায় কিন্তু ২৪ পরগণার কিছু অংশ সমুদ্রের ছোঁয়াচ পেয়েছে এবং এই অংশ কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরেও নয়, যাবার পথও মোটামুটি ভালোই। ম্যাপ ঘাঁটলে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের তীর কলকাতা থেকে ৭০ কি ৭৫ মাইলের মধ্যে। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে প্রচুর লোক সাগরে স্নান করতে যায়। সেই সময় একটা সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কলকাতা থেকে স্টীমারযোগে সাগরে যাওয়া সময়সাপেক্ষ। অনেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত ট্রেনে বা বাসে গিয়ে তারপর স্টীম লঞ্চে চড়ে সাগরদ্বীপে যায়। আবার কেউ কেউ আরও একটু এগিয়ে নামখানা পর্যন্ত বাসে গিয়ে তারপর লঞ্চে চড়ে সাগরদ্বীপে পৌঁছায়। সাগরদ্বীপে যাবার এই হল প্রশস্ত উপায়। সাগরে স্নান করতে যাবার এইসব ব্যবস্থা কিন্তু সাময়িক। সাগরদ্বীপে যাবার জন্য এত হাঙ্গামা না করে সরাসরিভাবে সাগরসৈকতে যাওয়া কিন্তু বিশেষ দুরূহ নয়। মকরসংক্রান্তিতে সাগরদ্বীপে স্নান করা না হলেও সাগর-দর্শন করার সহজসাধ্য উপায় নির্ধারণ করা কিছু শক্ত নয়।

কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু, সরকারী পূর্ত বিভাগের রাস্তা সম্পর্কিত প্রধান নির্মাণবিদ্ শ্রীসুধীরকুমার নাহার সাহায্যে একটা রাস্তার ম্যাপ যোগাড় করে ফেললেন। দেখা গেল—কলকাতা থেকে ফ্রেজারগঞ্জ-দূরত্ব মাত্র ৭২ মাইল একেবারে সমুদ্রের উপর। এক রবিবার বেরিয়ে পড়লাম কয়েকজন বন্ধু মিলে।

অনুপস্থিত সভ্যদের সম্বন্ধে উদ্দেশ্য করে সিগারেটের বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা চলে—তোমরা কী হারাচ্ছ তা তোমরা জান না।

ছুটির দিন হলেও পথের ভিড় যথেষ্ট টালিগঞ্জ, নিউ আলিপুর, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, বাঁড়ুষা পর্যন্ত পথ বেশ যানবাহনবহুল। ঠাকুরপুকুর পার হবার পর পথের জনতা ও যানবাহুল্য অনেকটা কমে এল। পথের দুধারে জমি—বেশ নীচু—কিছু জলাজমি কিছু চাষের জমি। যতই অগ্রসর হওয়া গেল ততই নজরে এল নানা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। জলাজমি ও চাষের জমি ভরাট করে কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। জলাজমি ভরাট করে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হক, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু চাষের জমির ওপর কারখানা স্থাপন দেশের খাদ্য উৎপাদন সমস্যা আরও জটিল করে তুলবে। কারখানা স্থাপনের জন্য যদি চাষের জমির একান্ত প্রয়োজন হয় তবে কাছাকাছি অন্য অকেজো জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে চাষের ব্যবস্থা করে তবে চাষের জমি কারখানার জন্য দেওয়া যেতে পারে। জমি ব্যতীত খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয় একথা মনে রাখার সময় এসেছে। জাতীয় সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন কিন্তু বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এ অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ সরবরাহের লোহার স্তম্ভগুলি সহজেই নজরে আসে। সুতরাং কারখানা স্থাপনের পক্ষে এ ব্যবস্থা যে অনুকূল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মধ্যে মধ্যে দু' একজনের সখের বাগানের অস্তিত্বও নজরে পড়ল কিন্তু সেগুলি যে খুব বেশীদিন চারপাশের কলকারখানার চাপে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে তা মনে হয় না। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে এ ধরনের অনেক উদ্যান ছিল এখন আর তাদের অস্তিত্ব নেই।

পথে আমতলার হাট—বেশ গঞ্জ জায়গা। সাপ্তাহিক হাটে প্রচুর শাকসব্জী, বীজ, চারা প্রভৃতি আসে এবং নরীদের [illegible]

ডায়মণ্ডহারবারের [illegible]
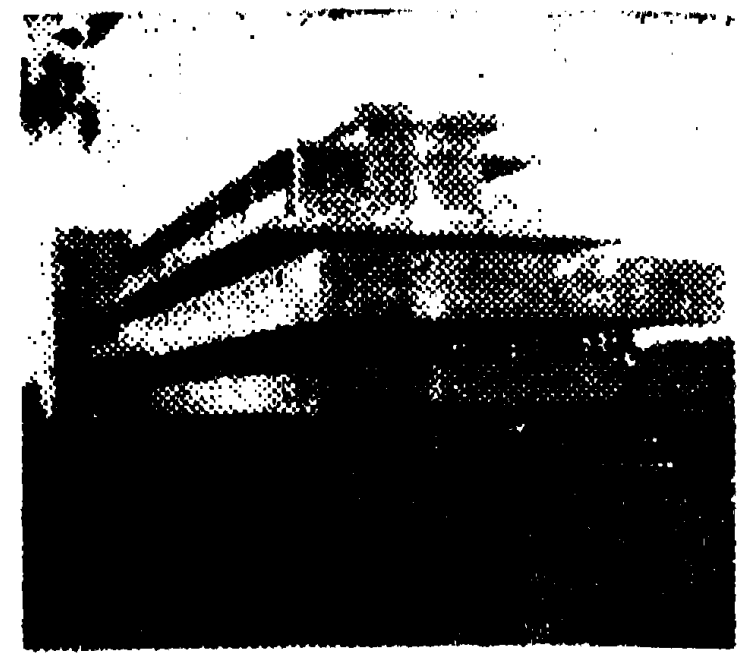
কলকাতার বাজারে সেগুলি চালান যায়।

আর কিছুদূর অগ্রসর হলে ফতেপুর ২২ মাইল। এখান থেকে একটি পথ ফলতায় গেছে। ফলতায় আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের উদ্যান বাটিকা বিখ্যাত। পথের মোড়ে বাড়ী ও বসতির ঘনসন্নিবেশ। মনে হয় এ স্থান বেশ জনসমৃদ্ধ।

এরপর উল্লেখযোগ্য গ্রাম—সরিষা। বেশ বড় গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী বলেই মনে হল। এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক বিদ্যালয়ের গৃহগুলি পথ থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথে বাস চলাচল প্রচুর [illegible] প্রত্যেকটি বাসই যাত্রীতে পরিপূর্ণ। লরীর সংখ্যাও নগণ্য নয় তবে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

ডায়মণ্ডহারবার শহরের প্রবেশমুখে পথটি দ্বিধাবিভক্ত; পুরানো পথটি [illegible] আগেকার দিনের বিখ্যাত [illegible] দিকে গেছে। নতুন প্রশস্ত পথ [illegible] কংক্রীটের সেতুর ওপর দিয়ে [illegible] দিকে বাঁধের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কংক্রীটের সেতুটি নতুন এবং বেশ প্রশস্ত। পুরানো দিনের লোহার সেতুটি [illegible] একটি গাড়ী যাবার মতো চওড়া [illegible] অতিক্রম করে [illegible] অভিমুখে চলে গেছে। পথের বাঁদিকে একটি সরু রাস্তা রেলস্টেশনে পৌঁছেছে। পথ থেকেই রেলস্টেশনের একটা আভাস

ফ্রেজারগঞ্জের বাঁধ।

ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ডায়মণ্ডহারবার শহরটির জনসংখ্যা ও পাকা বাড়ীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলেও রেলস্টেশনটির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল না। হয়ত ডায়মণ্ডহারবারের যাত্রীরা রেলের টিকিট না কেটে কিংবা বাসে বেশী যাতায়াত করেন বলে রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশনের উন্নতিকল্পে অর্থব্যয় অনর্থক মনে করেন। বাস্তার মোড় পার হলেই দু পাশে দোকানের সারি—ফলে রাস্তাটি মোটর চলাচলের পক্ষে একটু অপ্রশস্ত মনে হয়।

এক ঘণ্টার ওপর গাড়ীতে একটানা বসে থাকায় সকলেই একটু অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তার ওপর রাস্তার ডানদিকে দেখা গেল কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সুসজ্জিত খাবারের দোকান—গরম গরম কচুরি ভাজা হচ্ছে এবং বেশ চকচকে থালার ওপর খুব সুন্দরভাবে জিলাপী সাজান রয়েছে। এছাড়া কলকাতা থেকে নির্বাসিত সন্দেশ, রসগোল্লা ও লেডিকেনিও কাঁচের শো-কেসে শোভা পাচ্ছে। এমন অবস্থায় গাড়ী থামিয়ে একটু পা ছাড়িয়ে নেবার ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

বলাবাহুল্য দোকানে কচুরি, জিলাপীর সঙ্গে চা-পানেরও ব্যবস্থা ছিল। তাড়াহুড়োর কোনো কারণ নেই, একটা দিন শহরের বাইরে বেড়াতে আসা হয়েছে—ধীরেসুস্থে চলাফেরা করার জন্য। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে আবার সেখানকার বিশ্রামের সময় না হয় পথেই কিছুটা অতিবাহিত করা গেল। প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট সময় দোকানের আতিথ্যে কাটিয়ে আবার যাত্রাপথে অগ্রসর হওয়া গেল।

পথে দেখা গেল বাংলা সরকার ভ্রমণবিলাসীদের জন্য একটা বিরাট বাড়ী তৈরি করছেন। বাড়িটি চারতলা, একতলাটি সম্পূর্ণ মোটরগাড়ী রাখবার জন্য, দোতলায় চা-খাবার ব্যবস্থা, এ তলাটি নদীর বাস্তার সমান উঁচু, ফলে এখান থেকে নদীর দৃশ্য ভালভাবে উপভোগ করা যায়। তিনতলা ও চারতলায় থাকবার ব্যবস্থা, প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে বারান্দা। বাড়িটি সম্পূর্ণ হলে ভ্রমণবিলাসীদের একটা বিরাট অভাব দূরীভূত হবে।

বাজার শেষ হবার পর রাস্তা বেশ চওড়া—পশ্চিম ধার কিছুটা বাঁধান, সেখানে নিরাপদে হাঁটা যেতে পারে। এখানে নদী এত চওড়া যে ওপার প্রায় নীলাভ রেখা বলে মনে হয়। দু একটা চলমান জাহাজও নদীবক্ষে দেখা যায়। জাহাজে চড়বার জন্য যাত্রীদের সুবিধা হবে বলে একটা ছোটখাট জেটিও আছে তবে উৎসব সময় সে ঘাটটি খুব কার্যকর বলে মনে হল না। পথ ও নদী কিছুটা সমান্তরালভাবে চলে, পথের মোড় পূর্বদিকে ঘুরে গেছে। পথের দুধারে মাঝে মাঝে গ্রামের কুটির নজরে পড়ে, গ্রামগুলি খুব বেশি ঘনবসতি বলে মনে হল না। ফটিকগঞ্জ, কুল্পী, করঞ্জলি প্রভৃতি গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিসম্পন্ন। নদীর পাড় আর নজরে পড়ে না, খালি ধানের ক্ষেত। যেতে যেতে লক্ষ্য করা গেল পথের দুধারে কিছুটা দর্শকের ভিড়, একটু কিছুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল যে এ পথ দিয়ে আজ "প্রাদেশিক সাইকেল প্রতিযোগিতা" হবে। অল্প একটু পরেই মোটরসাইকেল আরোহী পাইলটের দর্শন পাওয়া গেল। আর প্রায় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হলেন প্রতিযোগীদের দল, এঁরা সংখ্যায় প্রায় বারোজন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এঁরা অদৃশ্য হলেন। রাস্তার দর্শকের ভিড়ও ক্রমশঃ পাতলা হয়ে এল।
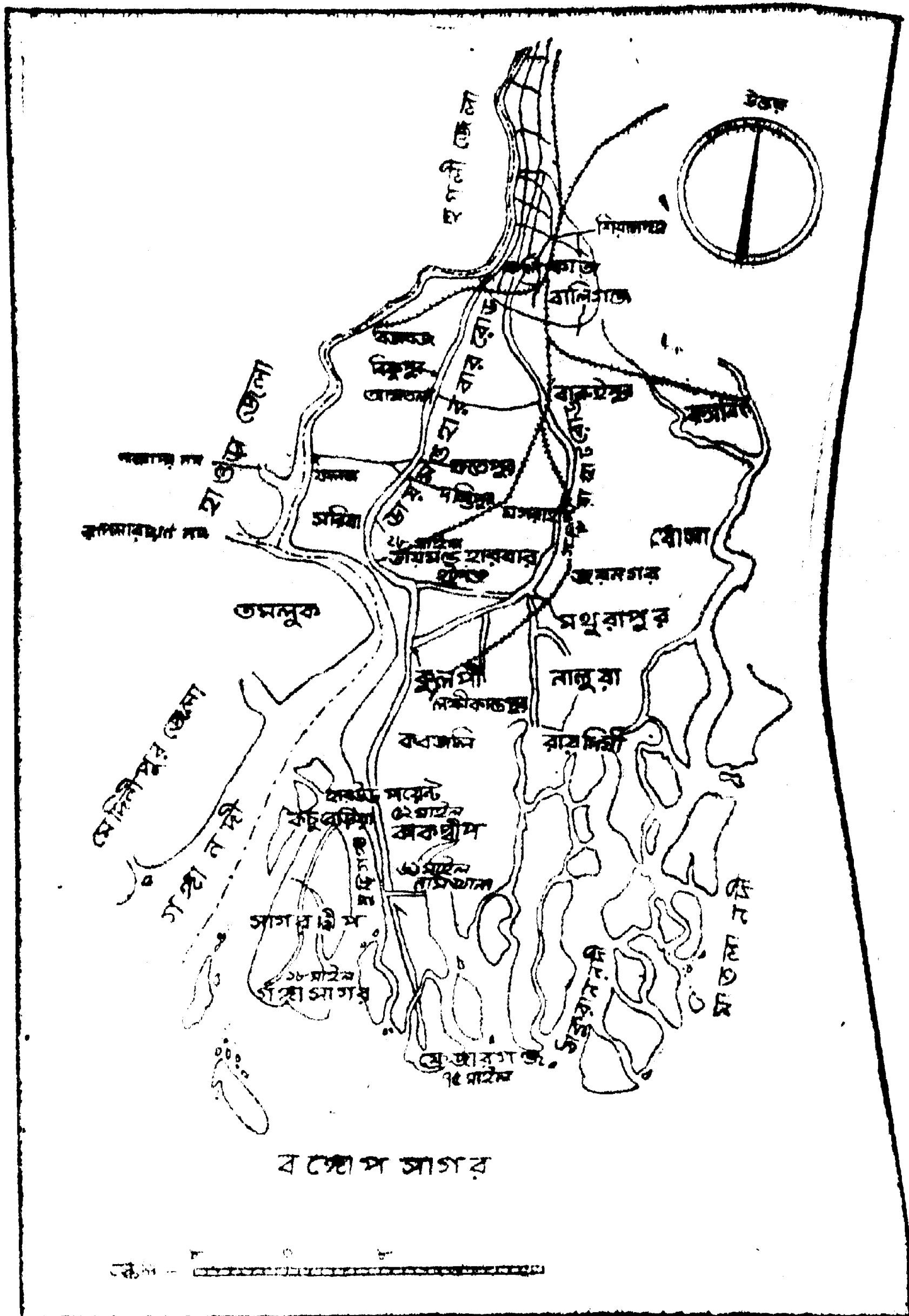
রাস্তার দু পারে ক্ষেত, মনে হয় এবার ভালই হয়েছে। অন্ততঃ চলমান গাড়ীর জানলা থেকে সবুজ রঙের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। ঘণ্টাখানেক চলার পর কাকদ্বীপ এসে গেল। কাকদ্বীপের কাছে পথ অপ্রশস্ত। দুধারে দোকান ও বাজার অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। রাস্তা থেকে গঙ্গার তীর কিছুটা দূরে। এক সময় বারুইপুর থেকে একটি রেললাইন কাকদ্বীপ পর্যন্ত আসার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সে লাইনটি লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। যুদ্ধ বহুদিন শেষ হয়েছে তারপর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই রেললাইনের বাকী অংশ শেষ হবার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কাকদ্বীপ পর্যন্ত রেললাইন এলে সাগরদ্বীপে যাওয়া সাধারণের পক্ষে অনেক সুগম হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাকদ্বীপ সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী আছে—গঙ্গাদেবী ভগীরথকে এখানে শ্বেতকাকরূপে দেখা দিয়েছিলেন। এরপর গঙ্গাদেবীকে আর পথ দেখাতে হয়নি, তিনি এখান থেকে শতমুখী হয়ে সাগরে পড়েন। কিংবদন্তীর সঙ্গে সত্যকারের অবস্থার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সাগরে পড়বার আগে গঙ্গা নদী অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছেন। আজকাল যাকে আমরা খাঁড়ি বলি সেগুলিও যে নদীর শাখা বা উপশাখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাকদ্বীপের প্রধান রাস্তার ধারেই
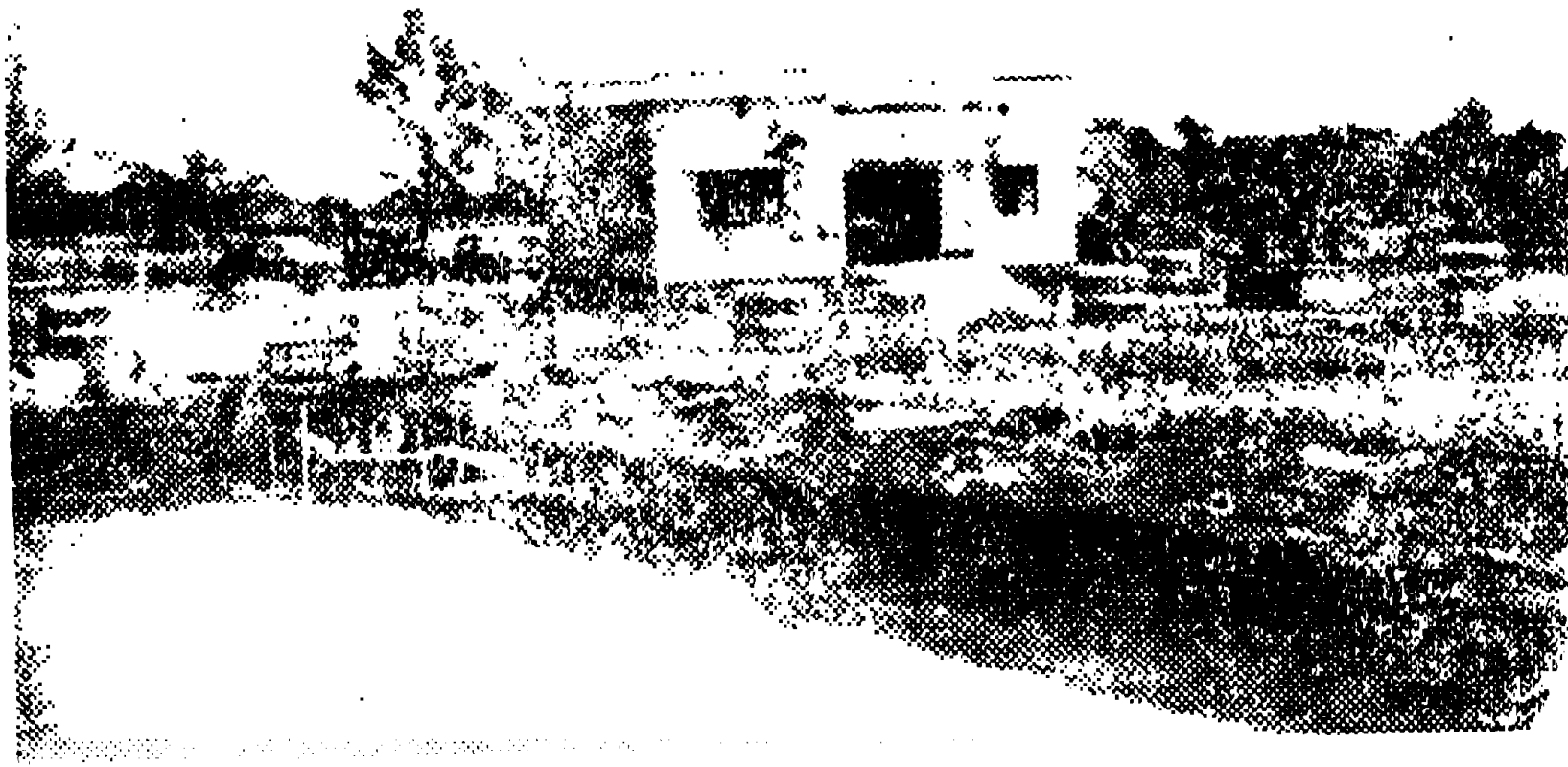
নামখানায় পূর্তবিভাগের পরিদর্শনগৃহ

একটি খাড়ি আছে। সেই খাড়ির উপরের একটি অপ্রশস্ত সেতু ধরে একটি শাখাপথ নদীর ধার পর্যন্ত চলে গেছে। সেইখানেই পারঘাটা—লঞ্চে ও নৌকাতে চড়ে সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়াতে যাওয়া যায়। কচুবেড়িয়া থেকে সাগরস্নানের স্থানটি প্রায় আঠার মাইল। মোটর চলার পথ। কাকদ্বীপের পারঘাটার কাছে হারউড পয়েন্ট। এখানে একটি জেটী করে সেখান থেকে সামুদ্রিক মাছ চালান দেবার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল কলকাতার মাছের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার জন্য। কিন্তু যে কারণেই হোক সে পরিকল্পনাটি আর রূপ-পরিগ্রহ করেনি। কলকাতার মাছের বাজারে দামের আগুন ধু ধু করেই জ্বলছে।

কাকদ্বীপে না থেমে আরও নয় মাইল স্থলপথে এগিয়ে যাওয়া যায় নামখানা পর্যন্ত। পথ অপ্রশস্ত হলেও অমসৃণ নয়। পথের উপরিভাগ আলকাতরা রঞ্জিত। অল্প সময়ের মধ্যেই নামখানার ঘাটের গোড়ায় পৌঁছান গেল। বামে পূর্ত বিভাগের পরিদর্শন গৃহ। বেশ উঁচু প্লাথের উপর একতলা বাড়ী। তিনটি ঘর, দুটি শোবার জন্য আর একটি বসবার ও খাবার ঘর। সামনে বেশ একটি বারান্দা। বাড়ীটি মন্দ নয় তবে এর প্রবেশের তোরণটি বিশেষ সুন্দর নয়। আমাদের পরিদর্শন গৃহগুলি এখনও বিশেষ উন্নতস্তরে হয়ে উঠতে পারেনি। পরিদর্শন-গৃহটির প্রাঙ্গণে কিছুটা উদ্যান রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পক্ষে ব্যবস্থা যথেষ্ট বটে কিন্তু এটিকে আকর্ষণীয় বা উপভোগ্য করার ব্যবস্থার উন্নতির প্রচুর অবকাশ রয়েছে হয়ত সরকারী আইনে এই বাবদ খরচ করার অনেক বাধা আছে। তবে শোনা গেল আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এ অঞ্চলে পরিদর্শনে এলে এখানে বিশ্রাম করতে ভালবাসেন সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে এই পরিদর্শন গৃহটির প্রাঙ্গণ ও তদানুসঙ্গিক ব্যবস্থার উন্নতি হয়ত দুরূহ হবে না।

গাড়ীগুলি গ্যারেজে রেখে দলের সভ্যেরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও চা-পানের পর নদীর ঘাটে অপেক্ষমান মোটরলঞ্চে আরোহণ করলেন। নামখানার এই নদীর ওপর কোনো সেতু নেই। ফলে যাত্রীদের ওপারে যেতে হলে নৌকায় পারাপার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শোনা গেল গাড়ী পারাপার করার জন্য একটি অস্থায়ী রকমের ব্যবস্থা আছে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সে ব্যবস্থা ঠিকমতো চালু করার বন্দোবস্ত নেই। নদীর অপর পারে দেবীনগর, রাজনগর শিবরামপুর, শিবপুর, ও ফ্রেজারগঞ্জের মধ্যে কয়েকটি সরু সরু খাড়ি আছে এবং সেগুলির ওপর কাজ চলার মতো সেতু আছে যার উপর দিয়ে বাস যাতায়াত করে। বাসগুলি অবশ্য খুব সুদৃশ্য নয় এবং বসবার ব্যবস্থাও যথেষ্ট আরামপ্রদ নয়—পথের দৈর্ঘ্য মাত্র দশ মাইল, সময় লাগে প্রায় ঘণ্টাখানেক।

নামখানার খাড়ির ওপর সেতু নির্মাণের বিপক্ষের যুক্তি হল—এ পথে যানবাহন চলাচল যথেষ্ট নয় এবং খাড়িটির নাব্যতা বজায় রেখে সেতু নির্মাণ ব্যয়সাধ্য। সেতু নির্মাণের পক্ষের যুক্তি হল—সেতু হলেই যান-চলাচল বৃদ্ধি পাবে এবং এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রতীরে যাওয়াও অনেক সুসাধ্য হবে। একথা নিশ্চয় ফ্রেজারগঞ্জকে সুগম্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য সেতু নির্মাণ অপরিহার্য।

এখন এ আলোচনা স্থগিত রেখে মোটরলঞ্চের কথায় আসা যাক। মোটরলঞ্চের ব্যবস্থা লাহামহাশয়ের। লঞ্চটি বেশ সুন্দর। উপরের ডেকে বসার ব্যবস্থা, খোলের ভিতর একটি কেবিন। বসবার ও খাবার ঘর। লঞ্চের মোটর নূতন এবং বেশ শক্তিশালী। সারেঙসাহেব ডেকের উঁচু পাটাতনে বসে চালনা করছেন। নামখানা খাড়ি বেয়ে প্রায় মাইল দেড়েক আসার পর আসল নদীতে এসে পড়া গেল, এটিও গঙ্গানদীর অংশ নাম মুড়িগঙ্গা। এখানে নদী এত চওড়া যে অপর পার একটা নীলাভ রেখার মতো দেখায়। নদী চওড়া হলেও স্টীমার বা লঞ্চের চলার পথ সোজা নয়। ভাসমান বয়ার সাহায্যে স্টীমারের গতিপথের নির্দেশ দেওয়া আছে। সে পথ কখনও নদীর মধ্যভাগে, কখনও নদীর বাম তীর ঘেঁসে আবার কখনও দক্ষিণ তটের সান্নিধ্যে। এর ফলে পথের দূরত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। নদীর ওপর সুন্দর হাওয়া বইছে, রৌদ্রের তাপ শীতকাল বলে অসহনীয় নয় বরং প্রীতিপ্রদই বলা যেতে পারে। নদীর দুই তীরের দৃশ্য পরিবর্তন-শীল ও রমণীয়।

কিছুক্ষণ কাটবার পর দেখা গেল—নদীর দক্ষিণতট খুব নিকটে সারেঙসাহেব
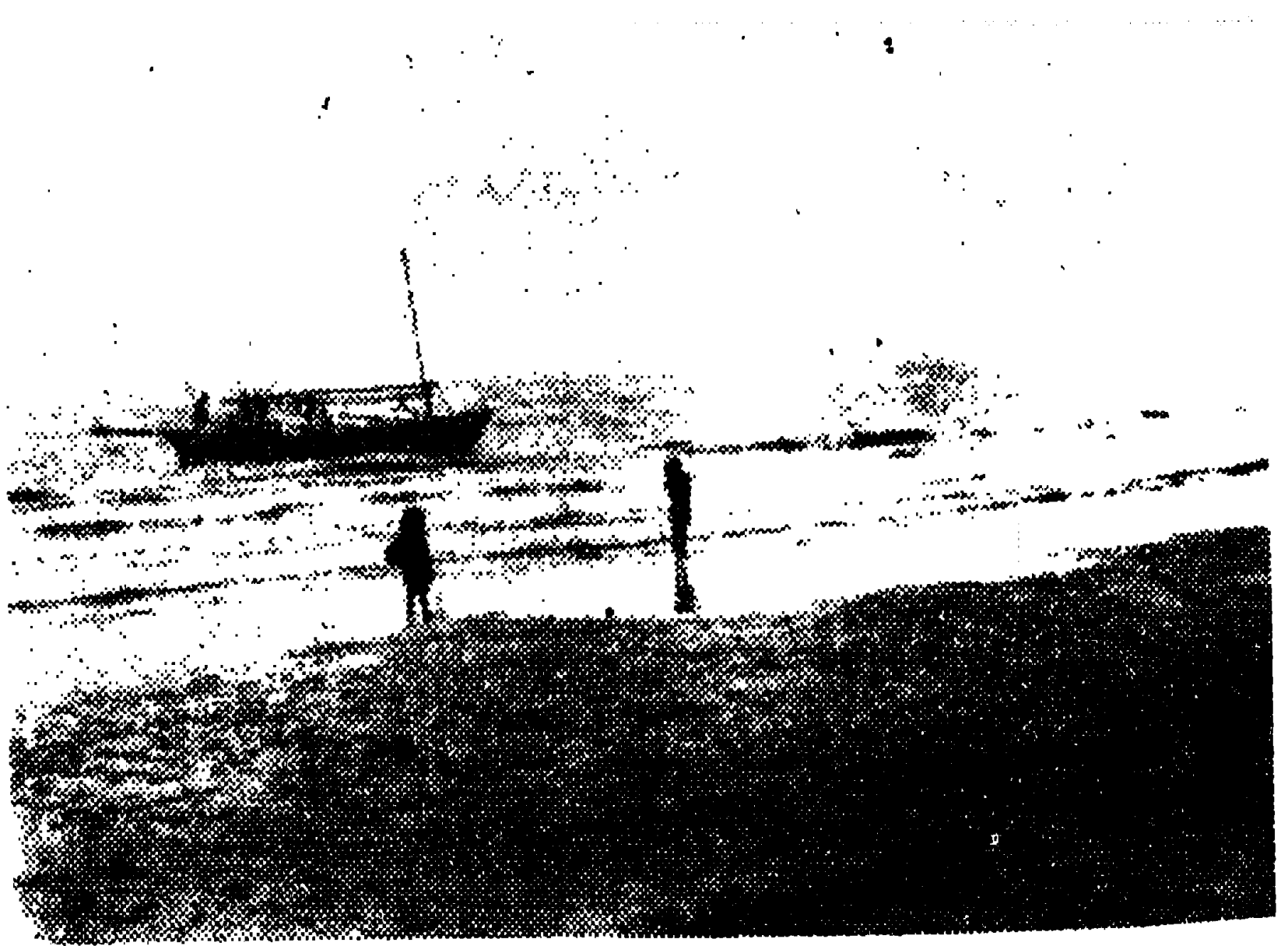
ফ্রেজারগঞ্জে সমুদ্রতট

বললেন—ওটা নদীর তীর নয়, একটা 'মরা' চর। চরটি নতুন নয়, সেখানে বসতি আছে এবং চাষবাসও হচ্ছে। চাষী যারা এখানে বাস করে আসল স্থলভূমির সংগে তাদের যোগাযোগ নৌকা। শোনা গেল, এই দ্বীপে হরিণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। হরিণের পাল অনেক সময় ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে। বন্ধু বিনয় রায় বললেন—হরিণের উৎপাতের প্রতিকার, বাঘ ছেড়ে দেওয়া; অঞ্চলটা সুন্দরবন এলাকা কাজেই বাঘ এখানে দুর্লভ নয়।

লঞ্চ চলেছে বারো থেকে পনের নট বেগে। এক নট ঘণ্টার হিসাবে ১·১৫ মাইল। এই জাতীয় লঞ্চের পক্ষে এ গতিবেগ যথেষ্ট দ্রুত। সামনে নদীটি দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে, ডানদিকের শাখা বড় জাহাজ চলাচলের পথ। দূরে একটি জাহাজের চিমনি ও কালো ধোঁয়া দেখা গেল। সারেঙ-সাহেব বললেন—আগে ঐ পথ দিয়েই লঞ্চ যেত, বর্তমানে বাঁদিকের নদীর স্রোত বেশ গভীর হওয়ায় লঞ্চ এই পথেই যাতায়াত করে, ফলে ফ্রেজারগঞ্জ যাওয়ার পথ কিছুটা কমে গেছে।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকায় সকলেরই চক্ষে একটা ঘুমের আবেশ এসেছিল, বিনয়বাবু সেই আবেশ অতিক্রম করার জন্য ক্যামেরা বার করে ছবি তোলা শুরু করে দিলেন। সকলেই আবার উৎসাহভরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ছবি তোলা ব্যাপারটায় সকলেই কিছুটা উৎসাহী। শিল্পী চারু রায় ক্যামেরাটা একবার হাতে নিয়ে তার লেন্সের পরিচয় [illegible] বললেন—ভালো। চারুবাবু শুধু শিল্পী নন একসময়ে চলচ্চিত্রেও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চারুবাবুর উক্তিতে উৎসাহিত হয়ে বিনয়বাবু ও কালিকানন্দ (সিংহ) ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা শুরু করে দিলেন। আবার গল্পগুজবে বৈঠক মুখরিত হয়ে উঠল। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। আমাদের চমক ভাঙিয়ে সারেঙসাহেব জানিয়ে দিলেন—সামনেই ফ্রেজারগঞ্জ দেখা যাচ্ছে।

সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এমনকি সুধীরবাবুও (মৌচাক সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকার)। দূরে একটা চরের মতো স্থলরেখা, তার মধ্যে তাল ও নারিকেল গাছের চূড়া, নদীতে একটা জাহাজও দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু সেটি সঞ্চরমান না গতিহীন তা সঠিক বোঝা গেল না।

যাই হোক এইবার মাটিতে নামতে পারা যাবে জেনে মনটা অকস্মাৎ খুশিতে ভরে উঠল। মনে ভাবলাম—কী আশ্চর্য এই মাটির টান, পৃথিবীর বুক ছেড়ে আকাশেই ওড়ো বা স্থল ছেড়ে জলে বিচরণ কর আবার মাটিতে পা দিলে তবেই যেন মনটা স্থির হয়। মাধ্যাকর্ষণ শুধু বস্তুতে নয়, মনেও।

সারেঙসাহেব জানিয়ে দিলেন—অদূরে ডানদিকে সাগরদ্বীপ যেখানে গঙ্গাসাগর মেলা হয়। কিন্তু আমরা সেদিকে না গিয়ে একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম—লঞ্চ থেকে জমিতে নামতে হলে খাঁড়ির তীরই উপযুক্ত। উপসাগরের তীর বড় অগভীর সুতরাং লঞ্চ কিনারে যেতে পারে না জলে নেমে অনেকটা হাঁটতে হবে। খাঁড়ির তীরে অতটা হাঙ্গাম নেই। লঞ্চ প্রায় তীরের কাছেই ভিড়তে পারল, পাটাতন বিছিয়ে দেওয়া হল। আমরা ধীরে ধীরে তীরে নেমে এলাম। তীরে মাটিমেশানো বালি অত্যন্ত অপরিষ্কার। পুরীর সমুদ্রতীরের সংগে তুলনা করে অত্যন্ত হতাশ হলাম, তখন মনকে প্রবোধ দিলাম—এটা খাঁড়ির তীর, আসল সমুদ্রতীর নিশ্চয়ই অন্যরকম।

খাঁড়ির তীরে প্রচুর নৌকা বাঁধা রয়েছে—এদের প্রধান কাজ হল মাছ ধরা। তীরে শুঁটকি মাছ তৈরী করার ব্যবস্থা দেখা গেল, তাছাড়া শুকনো মাছ গুঁড়িয়ে মুরগীর খাবার তৈরী করার আড়ৎও দেখা গেল। সুধীরবাবু ও চারুবাবু লঞ্চ থেকে নামলেন না। আর সকলে ফ্রেজারগঞ্জের মাটিতে নেমে হাঁটতে শুরু করলেন। কিছুদূরে অগ্রসর হতেই দেখা গেল—কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সুগঠিত ও শ্রেণীবদ্ধ কুটির। সেগুলির সামনের বিজ্ঞাপন-ফলক থেকে জানা গেল এই কুটিরগুলি বাংলা সরকারের "মৎস্য বিভাগের" গবেষণাগার। কুটিরগুলির প্রাঙ্গণে একটি জীপগাড়িও দেখা গেল কিন্তু কুটিরগুলির বারান্দায় ও ঘরে এমন কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলল না, যিনি এখানকার 'মৎস্যগবেষণা' সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞানদান করতে পারেন। অবশ্য 'মৎস্যতত্ত্ব' গভীর জলের রহস্য, সুতরাং সে-তত্ত্ব আমাদের অনধিগম্যই থেকে গেল। বিনয় রায়ের হাতে শুধু ক্যামেরা নয়, একটি ট্রানজিস্টার রেডিও ছিল। আকাশবাণী কলকাতার রেডিওতরংগে তখন একটি যন্ত্রসংগীতের সুর ধ্বনিত হচ্ছিল—হঠাৎ দেখা গেল স্থানীয় ছেলেদের একটি ছোট দল সেই সুরতরংগের স্রোতে মুগ্ধ হয়ে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। কালিকানন্দ বিনয় রায়ের হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে তার একটি ছবি তুলে নিলেন।

পূর্বদিকে আর একটু অগ্রসর হতেই গাছপালা দিয়ে ঘেরা একটি পল্লীর সীমারেখা চোখে পড়ল। চলার পথ সরু, তবে পাকা। পথ যে খুব আঁকাবাঁকা তা-ও নয়। পথের সীমানা থেকে বেশ কিছু জমি ছেড়ে কয়েকটি কুটির—হতশ্রী নয় বরং বর্ধিষ্ণু বলেই মনে হল। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ না করে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া স্থির হল। পথিমধ্যে দেখা গেল, একটি টিউবওয়েল এবং আরও আশ্চর্যের কথা, সেই টিউবওয়েলের পাম্পের হাতলটি ওঠানামা করায় জল পাওয়া গেল। দুধারে চাষের ক্ষেত, মাথার ওপর সূর্যের তাপ বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। বাস-স্ট্যাণ্ড তখনও বেশ কিছুটা দূরে, সুতরাং সেদিকে আর অগ্রসর না হয়ে দক্ষিণ দিকের একটা বাঁধের দিকে যাওয়া স্থির হল। রাস্তা থেকে বাঁধের আভাস একটা বিরাট আকারের ইংগিত বহন করে। বাঁধের পূর্বদিকে বাংলো ধরনের কয়েকটি বাড়ি। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল—এগুলি বাংলা সরকারের সেচ-বিভাগের কর্মচারীদের জন্য। বাঁধের ওপর সারি সারি নারিকেল ও তাল গাছ, এগুলি সরকারী কৃষি বা বন-বিভাগ থেকে রোপণ করা হয়েছে। পাকা রাস্তা ত্যাগ করে মাঠের আলের ওপর দিয়ে বাঁধের ওপরে এসে দাঁড়ান হল। বাঁধটি এখন নির্মিত হচ্ছে। সমুদ্রের নোনাজলের আক্রমণ থেকে চাষের ক্ষেতগুলিকে রক্ষা করার জন্য এই ব্যবস্থা। কি কারণে জানি না, এদিকে গাছপালা একটু কম, তার মধ্যে একটি বিরাট কাঁঠাল-গাছ ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই ছায়ায় একটি তরুণ দম্পতি বিশ্রাম করছেন। তরুণের হাতে ক্যামেরা, তরুণীর হাতে টিফিনের ব্যাগ। তাঁরাও যে আমাদের মতো ফ্রেজারগঞ্জ ভ্রমণে এসেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে ঔৎসুক্য থাকলেও তরুণ দম্পতির বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা অনুচিত বিবেচনায় আমরা অন্য পথে চলা শুরু করলাম।

বাঁধ থেকে নামতে গিয়ে নজরে পড়ল সমুদ্রতীরের এঁটেল মাটির স্তর, এই মাটি কেটে বাঁধ তৈরী হচ্ছে। এই এঁটেল মাটির স্তর দেখে মনটা তৎক্ষণাৎ নৈরাশ্যে ভরে গেল—এ কী সমুদ্রতীর? সমুদ্রকে সে-স্থানে ত্যাগ করে কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখা গেল বালুকারাশি। এই এঁটেল মাটির ওপরেই সমুদ্রের বালির স্তর জমেছে। পুরীর তীরের মতো না হলেও, একেবারে নৈরাশ্যজনক নয়। বাঁধের ওপর [illegible] পাওয়া গেল নানা রকমের। [illegible] প্রথমে মনটা হতাশ হয়েছিল, [illegible] সংগে [illegible] ভারী হবার পর সে ভাব অনেকটা কেটে গেল। তার পরে, অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সমুদ্রের জলে ঢেউ আছে, [illegible] ছোট ছোট।

বাঁধের নীচে এঁটেল মাটির স্তর দেখে প্রথমে মনটা দমে গিয়েছিল, সমুদ্রের বালুতটে কিছুক্ষণ বিচরণ করার পর সে-ভাব অনেকটা উল্লসিত হয়ে উঠল। এই ফ্রেজারগঞ্জ, বাংলার সমুদ্রসৈকত কলকাতা-বাসীদের আশাভরসা। ভেবে দেখলাম এঁটেল মাটির স্তরটি থাকায় বাঁধ তৈরীর কাজ অনেকটা সহজ হয়েছে। বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে এই মাটির স্তরের ওপর বালির আস্তরণ পড়ে সুন্দর বেড়াবার জায়গা তৈরি হবে এবং সেরকম বালুবেলা নির্মিত হওয়া বিশেষ সময়সাপেক্ষ নয়।

সূর্যের তাপ ক্রমশ বেশ প্রখর হয়ে উঠল। তখন দুপুর একটা বেজে গেছে। একবার দূরে সমুদ্রের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করা হল—হাওয়া উঠলে জলের ঢেউ কতটা উত্তাল হয়ে উঠবে? তারপর সে-মোহভঙ্গ করে লঞ্চে ফিরে মধ্যাহ্নভোজে রত হওয়া গেল। জলের হাওয়ায় সকলেরই ক্ষুধাগ্নি বেশ প্রবল—আহারের স্বাদ অমৃতোপম। জাহামহাশয়ের ব্যবস্থা অনিন্দনীয়।

আহারান্তে বিশ্রাম। জলের ওপরে ভাসমান লঞ্চের এঞ্জিনের শব্দে একটা সুন্দর

ঘুমপাড়ানি ছন্দ। নিদ্রার আবেশে চোখ বুজে এল। মধ্যে মধ্যে চোখ খুলে দেখি দু'পাশের দৃশ্য—পড়ন্ত রোদ্রের আলোয় নদীর দুই তীর অপরূপ মনে হতে লাগল। নামখানার মোহনায় জাহাজের পথনির্দেশক চিহ্ন—যাবার পথে এটি নজরে আসেনি। নামখানা খাড়িতে প্রকান্ড এক ভাউনে নৌকা পাল-তুলে আমাদের গতিপথে দাঁড়িয়েছে—আমাদের সারথি বারংবার হর্ন বাজালেও ভাউনে নৌক তার গতিরেখার পরিবর্তন করতে পারলে না দেখে অগত্যা আমাদের লঞ্চেরই গতিবেগ মন্দীভূত করে পাশ কাটিয়ে যাবার আয়োজন করতে হল। নদীর ঘাটে এসে যখন পৌঁছান গেল, তখন সূর্যের আলোর শেষরশ্মি গাছের শাখার চূড়ায় স্তিমিতপ্রায়। বহুক্ষণ লঞ্চে বসে শরীরে কেমন যেন একটা অবসাদ এসেছিল। মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘাট থেকে পরিদর্শন-গৃহের বারান্দায় উঠেই হুকুম হোল—'চা'।

চেয়ারগুলো টেনে বারান্দায় বসার ব্যবস্থা করতে করতে কে যেন বললে—এখন চেষ্টা করলে ভাল মাছ পাওয়া যেতে পারে। শুধু চারুবাবু বা সুধীরবাবু নয়, প্রায় সকলেই দেখা গেল এ-ব্যাপারে সমান উৎসাহী। ঘাটের কাছেই মাছের বাজার। সেখানে লোক ছুটল এবং বেশ কিছু ভেটকি ও চাঁদা মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে এল। মাছগুলি বেশ তাজা এবং আকারেও নিন্দনীয় নয়। তবে মূল্য কলকাতার তুলনায় এমন কিছু সস্তা নয় কিন্তু তাহলে কি হবে, এ যে একেবারে সদ্য তোলা, সুতরাং অতি সুস্বাদু। শূন্য হাতে যে ফেরা হল না এতেই আনন্দ।

এবার তাগাদা ফিরে চলার। নামখানার ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার যেন হঠাৎ নেমে এল। বড় যেন গভীর ও নিরন্ধ্র। রাত্রে পথের দূরত্ব যেন বেড়ে যায়, ফিরতে সময় বেশী লাগবে ইত্যাদি নানারকমের আলোচনা চলতে লাগল। অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে গাড়ি চালান হল। পথের অন্ধকার, বাস ও লরীর হেডলাইট বাঁচিয়ে কলকাতায় ফিরতে তিনঘণ্টার ওপর সময় লাগল।

কলকাতায় ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও মনে হতে লাগল আরও কিছুক্ষণ যদি ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্রতীরে কাটাতে পারতাম।

জানাতে পারেন

(প্রশ্ন)

রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' কবিতার দ্বাদশ ছত্রে সঞ্চয়িতায় আছে 'আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা পরে'। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত কাব্য মঞ্জুষায় এই ছত্রটিতে আছে 'সিঁথির সীমার পরে'। এর মধ্যে কোন্‌টি রবীন্দ্রনাথ লিখিত?

দীপা চক্রবর্তী
গৌহাটি-১১

●

(ক) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় রেল-স্টেশন কোন্‌টি?

(খ) সিনেমা কে আবিষ্কার করেন এবং কোন্ সময়?

মমি মজুমদার
সাকচী, জামসেদপুর

●

(ক) টেস্টে কোন্ কোন্ বোলার শত উইকেট লাভ করেছেন?

(খ) সোবার্সের ব্যাটিং ও বোলিং অ্যাভারেজ কি?

(গ) বিলিয়ার্ড খেলার প্রবর্তক কে? খেলার পদ্ধতি কি? উইলসন জোন্স-এর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

সুশান্ত বসু, রূপময় রায়, গোপাল বসু
বেলিয়াঘাটা

●

(ক) স্বপ্ন দেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?

(খ) ডঃ কালিদাস নাগ ১৯৩০ সালে বুয়েনস আয়ার্সে ইন্টারন্যাশনাল পি-ই-এন কংগ্রেস-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। পি-ই-এন সম্পূর্ণ কথাটি কি?

এস আমেদ ও এম ডি মন্ডল
হুগলী

(উত্তর)

'অমৃত'র ২৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রণাম হালদারের (ক)নং প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিলাতে ছিলেন। এরপর ১৮৮৭ সাল হতে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত ইউরোপে বাস করেন। তৃতীয়বার বিদেশে যান ১৯১২ সালে। প্রথমে যান ইংল্যান্ড, সেখান থেকে চিকাগো এবং হারবার্ড। চতুর্থবার বিদেশ যাত্রা করেন মে মাসে, ১৯১৬ সাল। জাপান এবং আমেরিকা ভ্রমণ করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে।

পঞ্চমবার বিদেশে গমন করেন ১৯২০ সালের মে মাসে। ফ্রান্সে বেরগ'স, সিলভাঁ, লেভি প্রমুখ গুণীজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হল্যান্ড, হেগ, লিডেন হয়ে আমেরিকায় যান। পুনরায় ইংল্যান্ড হয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশে গমন করেন।

১৯২৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে চীনের আমন্ত্রণে চীনে যান। সেখান থেকে জাপান এবং পেরুতে। ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টম-বার বিদেশযাত্রা করেন। রোমাঁ রোলাঁর আমন্ত্রণে সুইজারল্যান্ডে যান। তারপর নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, বার্লিন, চেকোস্লাভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশর হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯২৭ সালে নবমবার বিদেশযাত্রা করে মালয়, জাভা, বালী, শ্যামদেশ ভ্রমণ করেন।

১৯২৯ সালে কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশে যান। ভ্যাঙ্কুবার, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর, জাপান ও ইন্দোচীন পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অক্সফোর্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, রাশিয়া এবং আমেরিকায় গমন করেন। ১৯৩২ সাল। বয়স ৭১ বৎসর। আমন্ত্রিত হয়ে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ করেন। এই তাঁর শেষ বিদেশযাত্রা।

সুমন্ত্র দত্তরায়, কলিকাতা-৩৩

বিগত ৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত সৈয়দ জাহির হোসেন মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘকায় ব্যক্তির উচ্চতা ৯ ফুট ৩ ইঞ্চি। এঁরা হলেন—একজনের নাম মাকনফ্, জাতিতে রুশ, অপরজন ইংরেজ—নাম জন মিডলটন।

(খ) প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জানাই যে, বর্তমানে ময়ূর সিংহাসন আছে পারস্য দেশে।

(গ) পুরীর মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন উড়িষ্যার রাজা অনন্তবর্মা, শেষ করেন তাঁর প্রপৌত্র অনঙ্গ ভীমদেব।

ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত নির্মলকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, প্যারাসুট আবিষ্কার করেন এস লে নরমাদ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। ইনি ফরাসী দেশের অধিবাসী ছিলেন।

আর এক প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, শর্টহ্যান্ড বা রেখাঙ্কন বিদ্যা অতি প্রাচীন-কাল থেকে মিশরে, গ্রীসে ও রোমে প্রচলিত। ১৫৫ খৃঃ পূঃ প্রচলিত বর্ণ-মালার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক ব্যবহারের লিপি পাওয়া যায় মিশর দেশে। এটা কোনো বল্কলবিশেষের উপর লেখা ছিল। রোমান প্রণালী সিসিরোর জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস (Tyro) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। আধুনিক রেখাঙ্কন ১৭ শ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয়। যদিও এর অনেক আগে ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ টিমথি ব্রাইট প্রভৃতি অনেকেই প্রচলন করার চেষ্টা করেন। আধুনিক ইংরাজী রেখা-ঙ্কনের প্রবর্তক জন উইলস (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) 'আর্ট অফ স্টেনোগ্রাফী' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর পর অনেকেই অনেক পরিবর্তন করেন—১৬৩০ খৃষ্টাব্দে টমাস শেলটন, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ম্যাসন্, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে টমাস গার্নী প্রভৃতি। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আইস্যাক পিট-ম্যান এটি বিশেষ নিয়মে প্রচারিত করেন।

দিলীপকুমার পাত্র
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

আশ্রয়

প্রসূন বসু

ডাক্তারবাবু বলে গেলেন।

আমাকে নাকি আরও ছ' মাস একই-রকমভাবে শুয়ে থাকতে হবে।

কেমন নির্লিপ্তভাবে কথা ক'টা বললেন ডাক্তার, কমপক্ষে আরও ছ' মাস তো এভাবে থাকতেই হবে। মাঝখানে একবার অবশ্য প্লাস্টার চেঞ্জ করে দিয়ে যাবো।

মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিগ্যেস করলেন, ঠিক হবে তো? বলেই মা চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন।

চেষ্টা তো করছি। দেখা যাক্। গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন ডাক্তার সান্যাল। তারপর বেরিয়ে গেলেন। বাবা ডাক্তারের পিছু পিছু গেলেন।

আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত রাখলেন মা। তারপর ভিজে ভিজে কণ্ঠে বললেন, এবার নিশ্চয় তুই ঠিক হয়ে উঠবি। তারপর কেমন আগের মতো হেঁটে চলে বেড়াবি। কি মজা হবে তখন! ব'লে মা হাসলেন।

আমি মার দিকে তাকালাম। মা চুপ করে গেলেন। বুঝতে পারলেন, এসব যে স্রেফ সান্ত্বনার কথা আর বানানো হাসি আমি তা ধরে ফেলেছি। আমার চোখে চোখ রাখতে পারলেন না মা। উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তোর লেবুর রসটা করে আনি।

বেচারা মা! মার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হ'তে লাগল। আমার জন্যে ভাবনায় দিনে দিনে কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছেন। ধবধবে ফর্সা রঙও দিনে দিনে কেমন কালো হয়ে যাচ্ছে। এই দেড় বছরে মার বয়স যেন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। কেমন যেন বুড়ী-বুড়ী লাগে মাকে।

ঠিক দেড় বছর হতে চলল। বুক পর্যন্ত প্লাস্টারে মুড়ে একরকমভাবে আমি শুয়ে আছি। এমনকি একদিনের জন্যে পাশ ফিরবারও কোন ক্ষমতা হয়নি আমার।

ছ' মাস কেটেছে হাসপাতালে। আর বাড়ীতে এভাবে হলো এক বছর।

হাসপাতাল সত্যিই আমার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। হাসপাতাল ছেড়ে আসার সময় আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল। কেমন যেন কান্না-কান্না পাচ্ছিল।

মা বাবাকে ডেকে বললেন, দেখো মেয়ের কাণ্ড! হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ীই যেতে চায় না। তবে ও হাসপাতালেই থাকুক।

বাবা একটু হাসলেন। তারপর আমার চুলের মাঝে হাত দিয়ে বললেন পাগলী? বাবা একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কম কথা বলেন। বাবা চিন্তাগ্রস্ত কিনা তা বাইরে থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না। তবে, আমরা বুঝি। বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লে অনবরত পায়চারি করেন। সেদিনও হাস-পাতালে বাবা কেবল পায়চারি করছিলেন। আমি বুঝেছিলাম, বাবা মনে-মনে আমার সম্পর্কে চিন্তা করছেন।

আমি যেদিন প্রথম হাসপাতালে আসি সেদিন আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। আমার ভীষণ ভয়-ভয় করছিল। বাড়ী থেকে আসার সময় আমি মার গলা জড়িয়ে খুব কেঁদেছিলুম। মা আমাকে দুই হাত দিয়ে বুকের মাঝে খুব জোরে ধরে রেখে-ছিলেন। আমার ইচ্ছে করছিল, সারা জীবনটা এইভাবে মার বুকে কাটিয়ে দিই।

খুব বড়ো অপারেশন নাকি আমার! আমাকে কেউ বলেনি। তবে, আমি কথায়-বার্তায় বুঝে ফেলেছিলাম। তাছাড়া, আমার ছোটবোন মিলিও আমাকে বলে দিয়েছিল। মিলি আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। ছেলে-মানুষ। অতোসতো বোঝে না। আমাকে খবরটা জানানো দরকার তার মনে হয়েছিল। তাই জানিয়েছিল। আমার ঘরে ঢুকে চোখ বিস্ফারিত করে বলেছিল মিলি, জানিস, ছোড়দি, তোর পায়ে অনেকটা কাটা হবে। ব'লে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করার জন্যে মিলি আমার দিকে তাকিয়েছিল। আগেই আমি কানাঘুসোয় কিছুটা বুঝেছিলাম। মিলির কথায় একেবারে নিশ্চিত হলাম। সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন আনচান করে উঠল। আরও কিছু হয়তো বলার ইচ্ছে ছিল মিলির। কিন্তু আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

উঃ, অপারেশনের কথা মনে পড়লে আমার এখনও শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আগের রাত থেকে নানারকম প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেল। শেভিং ড্রেসিং আরো কতো কী! আমার অবস্থা ঠিক বলির পাঁঠার মতো। বলির আগে পাঁঠাকে যেমন গলায় জল লেপে, সিঁদুর ঘসে, ভালোভাবে খাইয়ে নানারকম পরিচর্যা করা হয়, ঠিক সেইরকম পরিচর্যা যেন আমার করা হতে লাগল। নার্সরা অবশ্য আমাকে অভয় দিতে লাগল, ভয় নেই। আজকাল অপারেশন কিস্‌সু না। কিন্তু, আমার মনে হ'তে লাগল, এগুলো ওদের মুখস্ত বুলি। আওড়াতেই হবে।

প্রস্তুতিটাই ভয়াবহ। তারপর অবশ্য সত্যিই কিস্‌সু না। অপারেশন থিয়েটারে শুইয়ে আমাকে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হলো। উপরের বিরাট লাইটের দিকে তাকিয়ে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে

গেলাম। আমার মনে হতে লাগল ঠিক যেন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে আমি দাঁড়িয়েছি।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারছিলাম না। বারবার আমার চোখের সামনে মা আর অরুণের মুখটা ভেসে উঠছিল। আস্তে আস্তে সে মুখগুলো কোথায় ভেসে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর হঠাৎ আমি টের পেলাম, আমার নাকে কি একটা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। তারপর আমার আর কোন খেয়াল নেই। আমার যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখলাম গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। আর অবাক হয়ে দেখলাম, প্রায় নাক পর্যন্ত শরীরটাকে প্লাস্টারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বুঝলাম, আমার অপারেশন হয়ে গিয়েছে। আমি অস্ফুট স্বরে ডাকলাম, মা।

একটা অপরিচিত মুখ আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ভয় নেই। ঘুমোও। বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আমি আবার অস্ফুটস্বরে বললাম, জল খাবো। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল আমার।

ঘুমোও। পরে দেবো। বলে মেয়েটি আবার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মেয়েটির সংগে পরে আমার খুব ভাব হয়েছিল। গভীর বন্ধুত্বও বলা যেতে পারে। ডাক্তাররা আমাদের নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করতো। মেয়েটি মাদ্রাজী। নাম কমলা। এতো সুন্দর বাংলা বলে যে কেউ বলে না দিলে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে ও মাদ্রাজী। সে বছর সবেমাত্র পাশ করেছে কমলা। সুন্দর চেহারা। রং কালো। তবে নাক, চোখ, ঠোঁট সব যেন খোদাই করে বসানো। রং কালো হওয়ার জন্য বোধহয় ওকে আরও বেশি সুন্দর লাগতো। কেমন একটা বন্যসৌন্দর্য ওর সমস্ত শরীরের মাঝে জড়িয়ে ছিলো। যে কোন ছেলের চোখ পড়লেই থমকে দাঁড়িয়ে যাবে।

হাসপাতালের প্রায় সব ডাক্তাররাই ওর উপর নজর দিতো। মাঝে মাঝে বিরক্ত করতো। কমলা আমার কাছে প্রায়ই নালিশ করতো, জানিস, ছেলেগুলো ভারি হ্যাংলা। মাঝে মাঝে ঘেন্না ধরিয়ে দেয়। আমাদের সম্পর্ক তখন 'আপনি', 'তুমি' থেকে 'তুই' পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি হাসতাম। আর হাসতে হাসতে বলতাম, আমিই হ্যাংলাভাবে তাকিয়ে থাকি। আর ছেলেরা তো দূর ছাই।

যাঃ! বলে ছেলেমানুষী অভিমান করে কমলা উঠে পড়তো।

হাসপাতালকে সত্যিই যেন আমি বাড়ী বানিয়ে তুলেছিলাম। ডাক্তার, নার্স যখন-তখন এসে আমার সংগে আড্ডা জমাতো। নার্সদের সংগেই অবশ্য আমার ভাব ছিলো বেশি। তাদের নিজেদের মধ্যে কোন গোলমাল হলেই তারা আমাকে মধ্যস্থ মানতো। এবং আমিও বেশ মোড়লের মতো তাদের গোলমাল মিটিয়ে দিতাম।

মা রোজই নিত্যনতুন খাবার করে নিয়ে আসতেন। মা পিছু ফিরতে না ফিরতেই সবাই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিতো। আমাকেও সামান্য একটু ভাগ দিতো অবশ্য। আমার বেশ মজা লাগতো।

ডাক্তার সান্যাল প্রায় রোজই দেখতে আসতেন। এমনকি ছুটির দিনেও একবার না একবার দেখে যেতেনই। অতোবড়ো নামকরা সার্জন। রাসভারী লোক। হাউস সার্জন, নার্স, ভয়ে সব তটস্থ থাকতো। ধারেকাছেও কেউ টুঁ শব্দ করতো না।

কিন্তু আমার কাছে এসে ভদ্রলোক একেবারে অন্যমানুষ হয়ে যেতেন। হাসি, ঠাট্টা, মজার-মজার কথা বলতেন। ওঁর একটা অভ্যাস ছিলো মাথায় হাত ঘষে চুল খারাপ করে দেওয়া। মাঝে মাঝে আমি প্রতিবাদ করতাম, আপনি ভারি দুষ্টু।

ভীষণ শব্দ করে হো হো করে হেসে উঠতেন ডাক্তার। হাসি দেখে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতো। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারতো না কিছু।

বলতো। অবশ্য ডাক্তার সান্যাল চলে গেলে। কমলাই টিপ্পনি কাটতো বেশি, আমরা জোরে কথা বললেই বকুনি। আর নিজের বেলা!

আমি বলতাম, হিংসে, না কেমন?

কমলা জিভ বের করে দুই হাত কানে দিতো, তোর মাথা খারাপ?

আমি বলতাম, বাঘ না ভাল্লুক?

কমলা বলতো, ভাল্লুক। তারপর ডাক্তার সান্যালের মুখের ভাবটা নকল করে দেখাতো। আমরা দুজনেই হেসে উঠতাম।

কমলার সংগে আমার বন্ধুত্বটা দিনে দিনে আরও গভীর হয়ে উঠছিল। কমলা তার সুখ দুঃখের সব কথা আমাকে বলতো। কমলার বাবা নেই। মা এক স্কুলের টিচার। কমলাই বড়ো। আর সব ভাইবোনরা ছোট ছোট। ওরা দু' ভাই, দু' বোন। কমলার উপর খুব বেশি নির্ভর করেন ওর মা। কমলা নার্সিং পাশ করে যাওয়াতে ওর মার অনেকটা সুরাহা হয়েছে। কমলা প্রায়ই এসে আমাকে ওর বাড়ীর গল্প করতো। আর বলতো জানিস, মাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না।

কমলার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে-মনে কান্না আসতো। ব্যথাতুর চোখে আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ও চোখ ফিরিয়ে নিতো।

আমিও কমলাকে সব কথা বলতাম। অরুণের সংগে আমার ভালবাসার কথা আমি কমলাকে বলেছিলাম। তারপর একদিন অরুণ আমাকে দেখতে এলে কমলার সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। অরুণ এমন ভাবে কমলার দিকে তাকিয়ে ছিলো যে আমার ভীষণ লজ্জা করছিল।

অরুণ চলে যেতে কমলা বলল, বেশ সুন্দর ছেলে পাকড়াও করেছিস তো?

আমি হাসলাম, কেন তোর কি নজর পড়েছে নাকি?

যাঃ, তুই ভয়ানক ফাজিল। বলে কমলা উঠতে যাচ্ছিল।

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম, তুই আরও অনেক ভালো পাকড়াও করতে পারিস। তোকে দেখেই সবাই পাগল হয়ে যাবে।

ঐ পর্যন্তই। বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাত ছাড়িয়ে কমলা উঠে গেল। আমি বুঝলাম, ওর কোথায় একটা ব্যথা আছে। না জেনে সেই ব্যথার জায়গায় বোধহয় আমি আঘাত দিয়ে ফেললাম।

কমলার জন্যে সেদিন খুব বেদনা বোধ করেছিলাম। সারারাত্রি বারবার ওর কথা, ওর পরিবারের কথা আমার মনে হচ্ছিল।

পরের দিন কমলাকে সেকথা বলতে ও ভীষণ হেসেছিল। এবং আমার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে বলেছিল, একজনও তাহলে আমার জন্যে ভাবে।

কিন্তু আশ্চর্য!, সেই কমলাও আমার সংগে শেষ পর্যন্ত কোন সম্পর্ক রাখলো না। ওর ঐ আন্তরিকতা, ঐ বন্ধুত্বের ভাব হাসপাতালের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

আমি আসার দিন ওর হাত ধরে বলে এসেছিলাম, কালই যাবি।

ও হেসেছিল, কাল না হোক, যাবো।

কিন্তু আসেনি। এক বছর হতে চললো একদিনও আসেনি। প্রথম-প্রথম ও না আসাতে আমার নানারকম আশংকা, ভাবনা হতো। পরে যখন জানলাম ভালো আছে, তখন অভিমান হতো। এখন আর কোন কিছুই হয় না। ওর জন্যে কোন অনুভূতিই আমার নেই। এখন বুঝি ওর সমস্ত আন্তরিকতাটাই অভিনয়। নার্সদের বুঝি সবসময় ঐরকম অভিনয়ই করতে হয়। মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হয়। রুগীরা যাকে যতো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে সেই ততো ভালো নার্স। সেদিক থেকে ভালো নার্স হওয়ার নিপুণ অভিনয় ক্ষমতা কমলার আছে।

মাস তিনেক আগে অরুণের সংগে নাকি একদিন দেখা হয়েছিল। অরুণ এসে বললো আমাকে সেকথা।

আমি জিগ্যেস করলাম, কি বললো?

তোমার কথা জিগ্যেস করলে। আর... ...। বলে চুপ করে অরুণ আড়চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

আমার মনটা হঠাৎ কেমন ছোট হয়ে গেল। আমি সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করলাম, আর, আর কি?

অরুণ আমার কথাকে ভ্রূক্ষেপ না করে পা নাচাতে-নাচাতে বলল, জোর করে আমাকে কোয়ালিটিতে ধরে নিয়ে গেল।

আমার মনটা তৎক্ষণাৎ বিশ্রী, কদর্য হয়ে উঠল। আমার মনের মধ্যে নানারকম সন্দেহ উঁকি মারতে লাগল। অরুণ কি তাহলে গোপনে কমলার সংগে দেখা করে। না হলে অরুণের সংগে কি সম্পর্ক তার যে জোর করে কোয়ালিটিতে ধরে নিয়ে যায়। আর অরুণওবা যায় কেন? অরুণও কি মনে মনে......?

আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার সেই মুহূর্তে অরুণের দিকে তাকাতে ঘৃণা লাগল। আমি চোখ ঘুরিয়ে নিলাম।

অরুণ বোধহয় কিছু বুঝল। চেয়ার ছেড়ে আমার পাশে এসে বসল। তারপর আমার মাথায় হাত রেখে বলল, কি হলো, কমলার সংগে রেস্টুরেন্টে গিয়েছি শুনেই রাগ হয়ে গেল! অতো হিংসে কেন?

অরুণের সংগে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করল না। আমি চুপ করে থাকলাম।

অরুণ তখন আমার মনের অবস্থা আন্দাজ করে আমার মুখটা অরুণের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, ভয় নেই বাবা ভয় নেই। কমলা একা ছিলো না। সংগে এক ডাক্তার ভদ্রলোক ছিলেন।

ডাক্তার ভদ্রলোক? কি নাম বলতো? আমি জানতে চাইলাম।

কি জানি, ডাক্তার চ্যাটার্জী না ওরকম কি যেন বলল। খুব লম্বা-চওড়া। ফর্সা। অরুণ মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে ভদ্রলোককে বোঝাতে চাইলো। সহসা রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি আসার কিছু-দিন আগে ভদ্রলোক ঐ হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সদ্য বিলেত থেকে এফ, আর, সি, এস, হয়ে ফিরেছেন। কমলা সত্যি সত্যি খুব ভালো পাকড়াও করেছে। মনে-মনে তৃপ্তিবোধ করলাম। আমার চোখে-মুখেও বোধকরি সেই ভাবটা ফুটে উঠল।

অরুণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাব্বা! বাঁচা গেল। কি ঝামেলায় না পড়েছিলাম।

আমার দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হলো। আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, কমলার
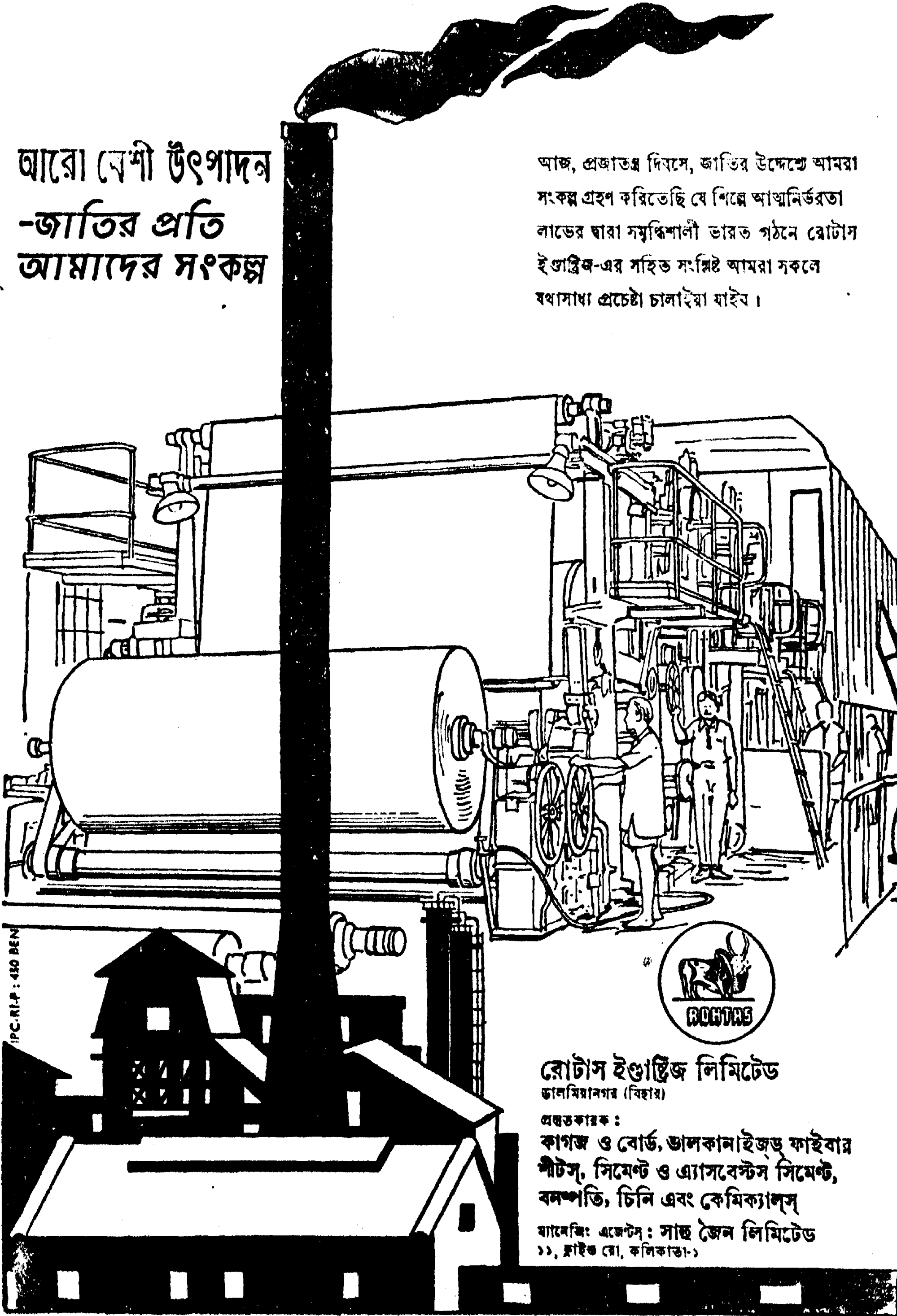
প্রতি তোমার বেশ দুর্বলতা আছে। সেকথা স্বীকার করাই ভালো।

অরুণ প্রতিবাদ করে উঠল, কখনো নয়।

তোমাদের ছেলেদের এই দোষ, সত্যি কথা স্বীকার করতে চাও না কেন বল তো? আমি বললাম।

যত সব বাজে কথা। তোমাদের মেয়েদের মন ভয়ানক ছোট। অরুণ রেগে গিয়েছিল। অরুণকে রাগাতে আমার ভারী ভাল লাগে।

অরুণ হয়ত আরও কিছু বলত। মা এসে পড়াতে ও চুপ করে গেল। মা আমার পাশে এসে বসলেন। বললেন, কি, দুজনে ঝগড়া হচ্ছিল। অরুণ ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। ভৎর্সনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। মা চোখ ফেরাতেই আমি অরুণকে জিভ ভেংচে দিলাম।

অরুণ কিছু বলতে না পেরে অসহায়ের মত মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। অরুণের অবস্থা দেখে আমি মনে-মনে খুব মজা পেতে লাগলাম। অরুণ আর বসতে পারল না। আসছি, বলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অন্য একদিনের কথা। ড্রেসিং টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই আমি কেমন যেন আঁৎকে উঠলাম। একটা বীভৎস মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এ মূর্তি যে আমারই একথা ভাবতে কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল আমার। আমার প্রতিটি শিরায়-শিরায় যেন নিজের প্রতি একটা ঘৃণা বইতে সুরু করল।

এর আগেও তো মাঝে-মাঝে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজের চোখ পড়েছে! নিজের প্রতিমূর্তিও দেখেছি অনেকবার। কই, এমন বীভৎস তো নিজেকে মনে হয়নি কোনদিন! আমার ইচ্ছে করতে লাগল কোন একটা শক্ত পদার্থ দিয়ে আমি সামনের আয়নাটা চুরমার করে দিই। আমার প্রতিমূর্তিই আমার চোখের সামনে খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙে-ভেঙে পড়ুক।

নিজের প্রতি ধিক্কারে মুহূর্তের মধ্যে মনটা কেমন যেন বিষিয়ে উঠল আমার। ঘৃণায় আমার সমস্ত মুখ যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। আমি ঘন-ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। কেমন যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা বিষাদ জমে উঠল আমার মনের কোণে।

অসম্ভব! অরুণ আমাকে ভালবাসে না। বাসতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। এখনও যে অরুণ প্রায় রোজই আসে, কথা বলে, হাসে, আমার পাশে বসে, মাথায় হাত রাখে। মাঝে-মাঝে আমার হাতে ঈষৎ চাপ দেয়, এ সবই করুণা। আমাকে করুণা করে অরুণ? আমার জন্যে তার মায়া হয়। ভাবতেই নিজেকে কেমন যেন অসহায় লাগতে লাগল আমার। মনে হতে লাগল, আমার চোখের সামনে আমারই অস্তিত্ব আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অস্তিত্বের অবলুপ্তির শব্দ যেন আমি শুনতে পাচ্ছি।

সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম আমি। মনে-মনে ছটফট করতে লাগলাম। মাথাটা কেমন যেন অসহ্য ভারি-ভারি ঠেকতে লাগল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মিলি আমার ঘরে ঢুকল। মিলির দিকে আমি অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমার চোখের সামনে দিনে-দিনে কেমন ধাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে মিলি। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। দেহের প্রতিটি রেখায়-রেখায় যৌবনের রঙ ধরেছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান করছিল মিলি। আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের ফিগার লক্ষ্য করছিল। এমনভাবে শাড়ী পড়েছে যে ওর দেহের প্রতিটি অংশ ফুটে-ফুটে উঠছে। কেন জানি না, আমার সেই মুহূর্তে মিলিকে অসহ্য মনে হল। আমার মনে হল, ও যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদ্রূপ করছে।

আমি দাঁতে-দাঁত চেপে ডাকলাম, মিলি!

মিলি ঘুরে দাঁড়াল, কি?

কেমন যেন একটা শাসনের মনোভাব আমার মধ্যে জেগে উঠল। আমি বললাম, কি বিশ্রী করে শাড়ী পরা শিখেছিস!

মিলি তার স্বভাবসুলভ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে উঠল, শুয়ে-শুয়ে তুই একদম ব্যাকডেটেড হয়ে উঠেছিস মেজদি। মডার্ণ স্টাইল তুই কিচ্ছু জানিস না। বলে মিলি শাড়ীর আঁচলটা টেনে এনে বুকের মাঝে গুঁজে দিল।

মিলির মন্তব্যে প্রথমটা আমি চমকে গেলাম। পরমুহূর্তেই কেউটে সাপের মত কিরকম যেন রাগে ফুঁসে উঠলাম আমি। ক্রুদ্ধ চোখে মিলির দিকে তাকালাম। মিলি নিজের সজ্জা নিয়েই ব্যস্ত। আমার কোন ভাবভাব লক্ষ্য করবার মত তার অবসর ছিল না।

এবার আমি বেশ জোর গলায় ডাকলাম, মিলি! রাগে তখনই আমি হাঁপাচ্ছি।

মিলি ঘুরে দাঁড়াল।

আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, হারামজাদী।

মিলি দুম করে আমার খাটের ওপর বসে পড়ল। তারপর চোখে-মুখে একটা বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে বলল, তুই দিনে-দিনে এমন হিংসুটে হচ্ছিস কেন বল তো?

মিলির মন্তব্য আমাকে জ্ঞানহারা করে তুলল। আমি প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম, দূর হ, বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।

আমার চেঁচানি শুনে মা ছুটে এলেন। আমি তখনও খুব জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। মা আমার পাশে বসেই আমার মাথায় হাত রাখলেন, কি হয়েছে মিলি?

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

মিলি অবাক হয়ে গেল আমার কাণ্ড দেখে। কেমন যেন মিইয়ে গেল। আমার জন্যে বোধহয় ওর দুঃখ হল। আমার কাছে এসে বলল, তুই কষ্ট পেয়েছিস, মেজদি? আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না। কান্নায় আমার সমস্ত কণ্ঠস্বরটা বুজে গেল।

মিলি কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মা আমার চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, অত কাঁদে না লক্ষ্মীটি! শরীর খারাপ হবে। বলতে-বলতে আঁচল দিয়ে মা আমার চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি চুপ করলাম। মা বেরিয়ে গেলেন।

আস্তে আস্তে আমি যেন আবার আমার মধ্যে ফিরে এলাম। বিশ্রী লাগতে লাগলো। সত্যি, দিনে দিনে আমার মনটা কিরকম ছোট হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই মনে মনে ওকে আমি হিংসে করছিলাম। আমার ছোটবোন, যাকে আমি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবাসতাম, তার প্রতি গোপনে গোপনে কি জঘন্য মনোবৃত্তি আমার গড়ে উঠেছে! আমার ইচ্ছে হতে লাগল মিলিকে কাছে ডেকে এক্ষুনি আমি ক্ষমা চেয়ে নিই। কিন্তু, কি জানি, পারলাম না। লজ্জায় আমার যেন মরে যেতে ইচ্ছে করল।

মাত্র এই দেড় বছর। এর মধ্যেই আস্তে আস্তে আমি কতো বদলে গেছি। আমার নরম স্বভাবের জন্য যারা এককালে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো, তারা এখনকার আমাকে জানলে ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

আগের আমিকে আমি নিজেও বোধহয় চিনতে পারবো না। মিলিকে কি ভালোই না আমি বাসতাম। একটার পর একটা শাড়ী বের করে ওকে পরাতাম। আর কতোরকম সাজেই না ওকে সাজাতাম। সিনেমা বা কোন ফাংশনে গেলে আমি নিজের হাতে সাজিয়ে নিয়ে যেতাম মিলিকে। কতোদিন পথের মাঝে ওর শাড়ী খুলে গেছে। আর ও ড্যাবডাবা চোখে জিভ কেটে বলেছে, মেজদি, কি করবো।

আমি রাস্তার পাশে সরিয়ে এনে ওকে আবার শাড়ী পরিয়ে দিয়েছি। রাস্তার লোকেরা মুখ টিপে-টিপে হেসেছে।

তারপর শাড়ী পরে একদম বেরোতে চাইতো না মিলি। কিন্তু শাড়ী পরলে ওকে ভারি মিষ্টি লাগতো। আমিই মাঝে মাঝে জোর করে ওকে শাড়ী পরিয়ে নিয়ে যেতাম। মিলি আমার চেয়ে চার বছরের ছোট। এই পৌষে ষোলোয় পা দিয়েছে।

চার বছরের ছোট হলে কি হবে! মিলি ছিলো আমার সর্বক্ষণের সংগী। আমি যেখানে যেতাম, ওকে সংগে করে নিয়ে যেতাম। এমনকি অরুণের সংগে দেখা করতে গেলেও অধিকাংশ দিন আমি ওকে সংগে করে নিয়ে গিয়েছি।

অরুণের সংগে দেখা করার মধ্যে অবশ্য আমার কোন গোপনতা ছিলো না। বাড়ীর সবাই জানতো। আর সহজে স্বীকার করেও নিয়েছিল আমাদের সম্পর্ক। মিলিকে

আমার সংগে নিয়ে যাওয়া নিয়ে অরুণ ঠাট্টা করতো। বলতো, নিজে তো গোল্লায় গেছো। ছোটটাকে আবার এ পথে টানছো কেন?

আমি হেসে জবাব দিতাম, ভয় নেই, তোমার মতো গোল্লায় দেওয়া ছেলেরা ওর কাছে খুব পাত্তা পাবে না।

তাই নাকি? ব'লে বিজ্ঞজনোচিতভাবে অরুণ চোখ বিস্ফারিত করতো।

আমি হো হো করে হেসে উঠতাম।

যদিও বয়সে অনেক ছোট, তবুও মিলির সংগে আমার যতো মনের কথা হতো। মিলিই যেন ছিলো আমার একমাত্র বোদ্ধা শ্রোতা।

আমরা একসংগে শুতাম। অত রাত্রেও শুয়ে-শুয়ে দুজনে কতো কথাই না হতো! কতোদিন মা এসে বকে যেতেন, কি, এখনও তোরা কলকল করছিস? নে, ঘুমিয়ে পড়।

মা চলে গেলেই আমরা দুজনে গলা জড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠতাম। অরুণের সংগে আমার সম্পর্ককে মিলি খুব ভালো চোখে দেখতো। তাছাড়া অরুণকেও খুব পছন্দ হতো মিলির। প্রায় শালীর সম্পর্ক নিয়েই সে অরুণের সংগে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতো। অরুণও খুব উপভোগ করতো।

সুন্দর কথা বলতে পারতো মিলি। এতো গুছিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলতো যে সবাই তারিফ করতো ওর কথাকে। অরুণকে কতোদিন না নাজেহাল করেছে মিলি। লজ্জায় অরুণের মুখ লাল হয়ে উঠেছে! আর কি মজাই না লাগতো আমার তখন!

তারপর অরুণ যেদিন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করলো আমি রাজি হতে পারলাম না। অরুণকে বললাম, এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

অরুণ তখন ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ভালো চাকরি পেয়েছে। বাড়ীর অবস্থা ভালো। কোন রকম অসুবিধাই ছিলো না তার দিক থেকে।

কিন্তু তখন আমার পায়ের ব্যথাটা আস্তে-আস্তে বেশ বেড়ে উঠেছে। হাঁটতে বেশ কষ্ট হয় আমার। ডাক্তাররা বোন-টি, বি ব'লে সন্দেহ করছেন। আট মাস পরে বি, এ পরীক্ষা। কি জানি আমার সন্দেহ হচ্ছিল, আমার বোধহয় পরীক্ষা দেওয়া হবে না। কি হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনটা দিনে দিনে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে উঠছিল।

অরুণ সত্যিই আমাকে ভালবাসতো। আমার অসুখ সম্পর্কেও বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তাই বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাইছিলো।

অরুণ আবার বিয়ের কথা তুলতে চাইলো। আমি বললাম, আমাকে ক'দিন সময় দাও। আমি কথা বলব।

অরুণ উত্তপ্ত হয়ে উঠল, এতে সময়ের কি আছে?

অরুণের কথা বলার ঢং আমার খুব খারাপ লাগল। আমি বললাম, সে তুমি বুঝবে না।

আমি বুঝব না?

না। বলে আমি উঠে পড়লাম।

সেদিন রাতে আমি মিলিকে সব কথা বললাম। মিলি চুপ করে শুনল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে জিগ্যেস করলাম। কিরে, কোন কথা বলছিস না?

মিলি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, মেজদি, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ব'লে সে পাশ ফিরে শুলো।

বুঝলাম, আমার আচরণ মিলির পছন্দ হয়নি। ছেলেমানুষ! মনে মনে হাসলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই ডাক্তাররা আমার বোন-টি বি সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন। এবং ডাক্তার সান্যাল অপারেশন করতে রাজি হলেন।

আমাকে কিছু না বলা হলেও আমি সবই বুঝলাম। তারপর মিলি তো একদিন আমাকে নিশ্চিত করে দিলো। অপারেশনের গুরুত্ব মিলি তখনও ঠিক বুঝতে পারেনি।

অরুণকে কেন আমি এড়িয়ে গেছি, তা সে বুঝল। কিন্তু ও-প্রসংগে কোন কথাই তুলল না আমার কাছে। আমি মনে মনে এই ভেবে স্বস্তি পেলাম যে অরুণের প্রতি আমি কোন অন্যায় করিনি।

মিলির প্রতি ঐরকম ব্যবহারের জন্যে আমার মনটা কেমন যেন খচখচ করতে লাগল। নিজেকে বারবার অপরাধী মনে হতে লাগল। সত্যি দিনে দিনে আমার মনটা কিরকম ছোট, নিচ হয়ে উঠেছে। মিলিকে পর্যন্ত আমি হিংসে করতে সুরু করেছি? অরুণের সংগে মিলির বেশি মেলামেশাকেও আমি বোধহয় সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করেছি! ধিক্কারে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করল। মিলি কি সব বুঝতে পেরেছে?

আমার মনে হলো, হ্যাঁ, সবই বুঝেছে মিলি। আর বুঝেছে ব'লেই মনে মনে আমাকে করুণা করেছে। করুণা করেই শেষ পর্যন্ত আমার সংগে কথা কাটাকাটি না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মিলির স্বভাব তো তা নয়! অন্যায় হ'লে সে মুখের ওপর বলে দেয়। বিশেষ করে আমাকে সত্যি কথা মুখের উপর বলতে তো একটুও দ্বিধা করে না! তবে? তবে, মিলি আমাকে করুণা করে? আমার অসহায় অবস্থা দেখে মিলির মায়া হয়?

ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় মিলির চোখের দৃষ্টি আমার মনে পড়লো। সে দৃষ্টি দিয়ে মিলি যেন আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাইলো, বেচারা! তোর জন্যে মায়া হয় মেজদি!

নিজেকে আমার কেমন যেন অসহায় মনে হ'তে লাগল। সত্যিই, একথা তো আগে আমি এমনভাবে ভাবিনি। আমি আজ যেন এক নতুন সত্য আবিষ্কার করেছি।

সকলের করুণার উপর আমি বেঁচে আছি। আমার অস্তিত্ব আস্তে আস্তে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এভাবে এখন আমার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়ঃ। অরুণ আমাকে করুণা করে। আর সে করুণা ক'রেই আমাকে এখনও সান্ত্বনার কথা শোনায়। আর মিলি? সেও শেষ পর্যন্ত আমাকে করুণা করে।

মা? বাবা? সবাই আমাকে করুণা করেন? মনে মনে আমার জন্যে সকলের মায়া হয়? কি জানি আমার মনে হলো, ঠিকই, মা-বাবাও আমাকে করুণা করেন।

সেই মুহূর্তেই গত মাসে আমার জন্মদিনের উৎসবের কথা মনে পড়লো। গত ফাল্গুনে আমি কুড়ি বছরে পা দিয়েছি। খুব ঘটা করে জন্মদিন পালন করলেন মা। কই, অতো ঘটা করে আমার কেন, এ-বাড়ীর কারোর জন্মদিন তো কোনদিন পালিত হয়নি? সেদিনের নিমন্ত্রিত সকলের মুখগুলো যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কতো লোকই না এসেছিল। সবাই আমার ঘরে ঢুকে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ঠিক সেরে উঠবে এবার। সেই সান্ত্বনার বাক্য দিয়ে মনে মনে কি বোঝাতে চাইছিল তারা আমাকে? তারা কি আমাকে করুণা করছিল? মনে মনে আমার জন্যে মায়া হচ্ছিল তাদের?

নিশ্চয়। নিশ্চয় সবাই করুণা করেছে আমাকে। মনে মনে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করেছে, বেচারা!

অসম্ভব। এভাবে কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। সকলের করুণার প্রার্থী হয়ে কোন মানুষের বাঁচার কোন মানে হয় না।

এর চেয়ে কেউ যদি আমার কাছে না আসে, আমার সংগে কথা না বলে, এমনকি মনে মনে আমাকে ঘৃণা করে, সে অনেকগুণ ভালো। তবু করুণা? অসহ্য।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মনটা যেন কেমন বিষিয়ে উঠল। সকলের প্রতি কিরকম যেন একটা ঘৃণা আমার জেগে উঠল। মন বিদ্রোহ করতে চাইলো। কেন, কেন তোমরা আমাকে এভাবে অপমান করছো? আমাকে অপমানের অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে? কারোর কোন করুণা স্বীকার করতে আমি কিছুতেই রাজি নই।

মনে মনে হাঁপাতে লাগলাম আমি। দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম।

আর সেই মুহূর্তে আবার আয়নার দিকে চোখ পড়লো আমার। আমার প্লাস্টারে মোড়া বীভৎস মূর্তিটা আমার সামনে স্পষ্টভাবে ভাসছে। একটা মৃত মানুষের প্রতিচ্ছবি যেন আমি আমার মধ্যে দেখতে পেলাম।

না, আমি আমার এ মূর্তি দেখতে চাই না। আমি সহ্য করতে পারছি না এ-দৃশ্য। বেডসাইড টেবিলে রাখা ওষুধের শিশিটা আমি শক্ত হাতে ছুঁড়ে মারলাম আয়নার গায়ে। প্রচণ্ড একটা শব্দ করে আয়নাটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়লো। আর আমি হেসে উঠলাম হো হো করে।

পাশের ঘর থেকে মা-বাবা-মিলি-অরুণ সবাই ছুটে এলো।

ড্রেসিং টেবিলের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলো সবাই। আমি তখনও হাসছি।

মা আমার পাশে বসে পড়লেন। বাবা পায়চারি করতে লাগলেন। অরুণ আর মিলি পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

মা আমার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য! কেউ কোন কথা বলল না। ওদের নিশ্চল মনোভাবই আমাকে আরও বেপরোয়া করে তুলতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, বেরিয়ে যাও তোমরা। তোমাদের কাউকে আমি চাই না।

মা যেন কি চোখের ইসারা করলেন। বাবা, মিলি, অরুণ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। মা একলা কেবল আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি চোখ বন্ধ করলাম।

মা আস্তে আস্তে বললেন, ঘুমোও. সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার কথা বলতে ভালো লাগছিল না। আমি চুপ করে রইলাম। আর কি জানি আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। আমার মনে হলো, সবাই আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মনে মনে বললাম, উঠুক। ওরা আমার কে? ওরা আমার কেউ নয়। ওদের কারোর আমি মুখও দেখতে চাই না।

মা উঠে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আমার ভীষণ ঘুম-ঘুম পেতে লাগল। চোখের পাতা দুটো যেন জোর করেই বুজে আসতে চাইলো।

আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে থেকে সমস্ত রং যেন মুছে যেতে লাগল। একটা গাঢ় অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলল চারদিক। আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। চারদিক চোখ ঘুরিয়ে আমি যতোই দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম, ততোই যেন সবকিছু অস্পষ্ট ঠেকতে লাগল। কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। ক্রমশঃ ভয়ে যেন আমি পাথর হয়ে যেতে লাগলাম। জলের মধ্যে জোর করে কেউ চুবিয়ে ধরলে যেরকম অবস্থা হয় আমার অবস্থা ঠিক সেইরকম মনে হলো। অসহায়তা যেন আমাকে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল।

হঠাৎ সেই ভয়ংকর অন্ধকারের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম অরুণ আর মিলি দুজনে আমার দিকে ছুটে আসছে। দুটো ধারালো অস্ত্র দুজনের হাতে। অন্ধকারের মধ্যেও যেন চিকচিক করছে। কি ভয়াল চেহারা অরুণের আর মিলির। দুজনের চোখে-মুখে রাগ আর ঘৃণা যেন ফুটে বেরোচ্ছে।

হ্যাঁ, ঐতো! ঐতো ঠিকই। ওদের পিছনে বাবা। বাবার হাতে আমাদের বাইরের ঘরে টাঙানো পুরনো দিনের সেই বন্দুকটা। বন্দুকের ভিতর গুলি ভরতে-ভরতে বাবা ছুটে আসছেন। মা? না, মাকে তো কোথাও আমি দেখতে পাচ্ছি না। মা তবে কোথায়?

এরা, এরা আমাকে এমনভাবে তাড়া করছে কেন? আমি কোথায় পালাবো? কেমন করে পালাবো? আমার শরীরটা অসম্ভব ভারি। আমি নিজে যেন কিছুতে টানতে পারছি না। একটু আড়ালে সরে যেতে লাগলাম আমি। ওরা যাতে সহজে দেখতে না পায় আমাকে। খুঁজে বার করতে না পারে।

হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম ওরা সবাই মিলে চিৎকার করছে, কোথায়? কোথায় পালালো? নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো ওকে। ভেবেছে কি? আমাদের সবাইএর জীবনগুলো শেষ করে দিলো! বলতে বলতে ওরা চারদিক খুঁজতে লাগল।

এরা আমাকে এমনভাবে তাড়া করছে কেন?

আমি আরও, আরও কিছুটা পাশে সরে গেলাম। কিন্তু আমি পালাতে পারছি না কেন? কি হয়েছে আমার? আমার শরীর এতো ভারি কেন।

আমি বুঝতে পারলাম, ওরা এখনই আমাকে ধরে ফেলবে। পালাবার কোন উপায় নেই আমার। ওরা কিছুতেই আমাকে বাঁচতে দেবে না।

কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। বাঁচার আমার দারুণ ইচ্ছে। ওরা কেন আমাকে এভাবে মেরে ফেলতে চায়? আমাকে ওরা ছেড়ে দিক। কারো কাছে থাকবো না। একা একা বাঁচবো।

না। ওরা ছাড়বে না আমাকে। চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাবা, মিলি, অরুণ।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, মা। মা-ই একমাত্র আমাকে এখন ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। মাই একমাত্র আমাকে বাঁচাতে পারেন।

আমি চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলাম, মা কোথায় আছেন, কিন্তু কই, মাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না; মাকে পাওয়ার জন্যে আমার মন আকুল হয়ে উঠল।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম, অনেক দূরে থেকে মা হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছেন। আর আমার নাম ধরে ডাকছেন—মিনি, শিগগির, শিগগির পালিয়ে আয়।

আমিও প্রাণপণে, গলায় যতোটা জোর আনা সম্ভব, চেঁচিয়ে উঠলাম, মা, মা, আমাকে বাঁচাও। হঠাৎ আমি অবাক হয়ে দেখলাম, চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল।

ভয়ঙ্কর অন্ধকারটা কোথায় সরে গেল। অরুণ, মিলি, বাবা? সব আস্তে আস্তে কোথায় পালিয়ে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

হঠাৎ আমার মাথায় কে হাত রাখল। আমি চোখ খুললাম। দেখলাম, মা। আমি দুই হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর মার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না মা। মাও দুই হাত দিয়ে আমাকে তাঁর বুকের মাঝে জড়িয়ে নিলেন।

আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমার প্লাস্টার-করা শরীরটা খাটের এক পাশে ঝুলে পড়েছে। সমস্ত শরীরটাকে মা আমার খাটের মাঝে তুলে আনলেন। আর তখন আমি মার মুখের দিকে তাকিয়ে একদম অবাক হয়ে গেলাম। মার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

আহ্, কি শান্তি, এই তো আমি বেঁচে আছি। মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, মাগো, দেখো, এবার আমি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠব।

সড়ক সৌধ কাণাগলি

দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেলো ঈশান কোণ। ছড়ানো-ছিটোনো মেঘ হলো এককাট্টা, এক লাইন। মুখে কুটিল সম্ভ্রম, হাতে মুঠিখোলা কাগজ, জিভে ঝল্‌সে উঠছে—'স্যর, আমাদেরটা দিয়ে যাবেন।' 'মানে?' 'মানে, ফি-বছরই তো দেন।' 'ফি-বছর দিই?' অবাক হলুম। 'জীবনে এদিক মাড়াই না, হয়তো বছর তিনেক বাদে হঠাৎ ঘুরতে-ঘুরতে দুপুরের লেক-এ এসে পড়েছি—।' 'একই কথা হলো স্যর আমরা ক্লাশের কথা বলছি।' 'বটে?' কোন্‌ ক্লাশে পড়ি, জিজ্ঞেস করতে ভরসা হলো না। বললুম, দেশলাইকাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটে আগুন দিতে দিতে যেন মোটেই কঠিন নয়, এভাবে—'তা বেশতো, দেরী আছে, দেবোখন।' নাছোড়, এঁটুলির মতন, বেঁধোকে আধা-বাঁকে ঘিরে শাসায়, 'দিয়ে দিলেই ভালো করতেন।'

দুপুরে তালগাছের চুড়োর ওপর গোদা-চিল কিংবা গাছ-বসানো অদূরে রাস্তার খোঁড়-তুলে-যাওয়া লাল অটোমোবিলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক! মনে কিন্তু ঐ—'দিয়ে দিলেই ভালো করতেন।' যদি না দিই এবং প্রায় আসি কিংবা পুজোর অাগে ভুলেও এদিক না মাড়াই—তাহলে? আমার হয়ে আর কাউকে দিতে হবে। অন্ততঃ আমাদের ক্লাশের হাত থেকে তো পেলো।

বান্ধবী বিরক্ত হচ্ছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ওখান থেকে তখনই উঠি। আমার তখন জেদ চেপেছে—ঘন্টায় কতোজন চাঁদা আদায় করতে আসে দেখে কর্মব্যস্ত দিনে-রাতের ১৫ ঘন্টা×১ মাস হিসেবে একটা সংখ্যাতত্ত্ব খাড়া করে তুলবো। বেশিক্ষণ বসতে হলো না। তালগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুটো হাফ্‌-ন্যাংটো বাচ্চা দাঁড়িয়েছিলো। তারা পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। 'কি চাই?' 'দিদি-মণি, আমাদের পুজোর চাঁদাটা দেবেন।' 'কি পুজো?' শুধোই। 'কি পুজো জানেন না?' অবিশ্বাসের হাসি হাসে। 'কি করে জানবো বলো, আমরা যে খৃষ্টান!' দেখি, যদি ধর্ম ছেড়ে রেহাই পাওয়া যায়— বান্ধবী হাসে। 'আর উনি?' 'উনিও।' 'ধ্যাৎ!'—ভাবলো, রঙ্গ করছি। তাই রঙ্গ করেই বললুম, 'উনি খৃষ্টান নন, হিন্দু—চাঁদা দিলে ওঁর পক্ষে দেয়াই ভালো।' 'একটা দশ নয়াপয়সাই দিন তাহলে।' 'আর বিল লিখতে হবে না, ঠিক আছে।'

পাক্কা এক ঘন্টা বসে আমার একটা মোটামুটি হিসেব তৈরি হলো : গড়ে প্রতি চার মিনিট অন্তর আক্রান্ত হয়ে ১৫ ঘন্টায় ২২৫ বার, মাসে দাঁড়ালো ৬৭৫০ বার—সরস্বতী পুজোর আগ পর্যন্ত। এছাড়াও, পাড়া-বেপাড়া সংঘ-সাংঘ আছে। কমপক্ষে দশটি তাগাদায় মুঠি ফাঁক করতে গেলে পকেট ফাঁকা হয়ে যাবে। দিতেই হবে—না দিলে ঐ কথা—দিয়ে দিলেই ভালো করতেন, কিন্তু! সত্যিই দিয়ে দিলে ভালো করতুম, কিন্তু দেবো কোত্থেকে?

আমাদের হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী। ভৌগিয়াস সবাই পুজো নেন না! এক সামাজিক বন্ধু খুব খেদ করে বলে-ছিলেন, চাঁদার জ্বালায় কলকাতার বাস তুলতে হবে দেখছি। পালিয়ে যাবো দূরে পাড়াগাঁয়ে। পাড়াগাঁয় কি আর ঝঞ্ঝাট নেই আছে? সেখানেও আপোগন্ড। তা সত্যি—তাহলে কি করা যায় বলো তো, বৌদ্ধ হয়ে যাবো? নয়তো খৃষ্টান। ওদের এতো পুজো-আচ্চা নেই। এতো চাঁদার বহর নেই।

সত্যি শহরে এই সর্বজনীন পুজোর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি মোটেই হাল্কা সমস্যা নয়। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, কিভাবে এই চাঁদা আদায় হয়। সাধারণত পাড়ার গলির দুটো মুন্ডু থাকে। বছর দু-তিন আগেও দু-মুন্ডে দুটো পুজো হতো। এখন সেই মুন্ড ভেঙে বিশ-বাইশ। বিশ-বাইশে কমসে-কম বিশ-বাইশ ক্যাপ্টেন। আশা করছি, আগামী বছরে এটার সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। কে বা কারা এদের ছত্রাকার সংঘে ছড়িয়ে দিচ্ছে জানি না। নেতা হবার বাসনা? হবেও বা। কেন না, এই নির্বাচনের বছরে শহরে রেকর্ড-সংখ্যক সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী-পুজোই হয়েছে! গত বছরেও এই সংখ্যা নিছক হাতে গুনে বলা যেতো। নির্বাচন যাঁরা করছেন তাঁদের ব্যক্তিগত ও পার্টিগত স্বার্থ আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের আছে কি? তাদের খেয়ে-পরে বাড়ি ভাড়া দিয়ে বেঁচে থাকার ওপর বছরে বাহান্নটি খাঁড়ার ঘা। দিতে না পারলেও ঘটি-বাটি বেচে দিতে হবে—এবম্প্রকার জুলুম। আপনাকে পাড়ায় বাস করতে হবে তো? কি করবেন? ধার-কর্জ করেও চাঁদাটি দিয়ে দিতে হবে সর্বাগ্রে, নচেৎ আপনার ভালো হবে না। যেন কতোই ভালো আছেন!

আমরা যে-অঞ্চলে বাস করি তার নাম উল্টোডিঙি। অঞ্চলটির এমনিতেই যথেষ্ট নামডাক। কিছুদিন আগে পর্যন্তও রেল-লাইনের ওধারে, এখন যেখানে সল্টলেক, সেখানে নরবলি হতো। রিক্লামেসনের সময় শর আর হোগলা বনের মাঝখানে ছোটো-খাটো কালীমন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গেছে একথাও শুনেছি। পুজারী ডাকাতদল। গল্পকাহিনীর সত্যমিথ্যা যাচাই করতে যাইনি, আজ পর্যন্ত এ-অঞ্চলের মিলিটারি দেখে সবরকম গল্পই মেনে নিয়েছি।

নিজের চোখেই দেখছি তিন-চার বর্গ-মাইল ক্ষেত্রফল জুড়ে কতোরকম মজাই না ছড়িয়ে আছে! কতো নানাধরনের কাজকর্ম। সত্যিকারের আজগুবি ব্যাপার যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা উল্টোডিঙিতেই আছে। চপ-কীর্তন থেকে শুরু করে মেঠো যাত্রা—কি নেই? যেখানে বালি সুগ্রীবকে পরাজিত করছে অনায়াসে—উল্টোডিঙির উল্টো-রামায়ণ! এ যেন এক স্বাধীন রাজ্য—খাস পশ্চিমবাংলার অধীন নয়।

সেখানে পুজো-পার্বণ উপলক্ষে চাঁদার ব্যাপারটা এবার কল্পনা করুন। তর্কের খাতিরেই ধরলুম, বাইরে যাবো না, অর্থাৎ যেখানে প্রতি চার মিনিট অন্তর চাঁদা চাইতে আসে সে-স্থান আপাতত পরিত্যাগ করলো। কিন্তু এ সামান্য উল্টোডিঙি জুড়েই ছোটোবড়ো পাঁচশতাধিক পুজো হয়। যে কোনো পুজোর কথাই বলছি, মায় শেতলা-পুজো পর্যন্ত—সার্বজনীন শেতলা পুজো! হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের মতন ছোটোখাটো ইন্ডাস্ট্রির ভিড় বলেই ফ্লোটিং টাকা আছে, ফলে এ-অঞ্চল সাধারণভাবে নমো নমো করে কোনো কাজই করতে শেখে নি। মাছ ধরতে বসেই এরা বড়ো মাছ ধরে! একদিকে উড়ো-টাকা, অন্যদিকে হাতের-কাজ-জানা শিক্ষা-সমাজহীন সম্প্রদায়। হাতে দুপয়সা এলেই কাজ ছেড়ে মজলিসে মাতে। পুরোনো কাজ ফিরে পাওয়া সহজ নয়। সুতরাং এ ধরনের শাখা-ব্যবসার ছাড়া গতি কি তাদের? পুজো-পার্বণ প্রভৃতি নানান উপলক্ষের জোয়ারে পড়ে এ-অঞ্চলের যাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত নাগরিক তাঁদের প্রাণ যায়-যায়। সুতরাং ঘর-বার দুটোই তাঁদের কাছে সমান ভয়ঙ্কর!

গোটা কলকাতার চেহারা এরই ইতর-বিশেষ। মধ্যবিত্তের জীবনে আমোদ-প্রমোদ বলে আমরা এইসব পুজো-আচ্চা আর কীর্তন-জলসায় সায় দিয়ে এসেছি দীর্ঘদিন। এখন সত্যিকার ভেবে দেখার সময় এসেছে, আমোদ-প্রমোদের নামে কি জিনিস চলছে বাজারে? যা চলছে তাতে সেই অপকর্মের ছবিটিই চোখের ওপর ভেসে আসছে, গাছের ডালে বসে সেই গাছেরই সেই ডাল কেটে ফেলা! গল্পের কালিদাস আর সত্যের কালিদাসে বহুৎ তফাৎ।

—রূপচাঁদপক্ষী

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

পেটের মধ্যে যে কতরকম যন্ত্রপাতি থাকে, আমার মনে হয় তা কেবলমাত্র ভগবানই জানেন। আর সেইসব যন্ত্রপাতি যে কতভাবে নষ্ট হয় এবং কিভাবে মেরামত করতে হয় তা ভগবানও নিশ্চয় ঠিকমত জানেন না। এটা অবশ্য আমার ধারণা। এই ধারণার কারণ হল এই যে, মেরামত করার ব্যাপারটা যদি ভগবানের জানা থাকত, তাহলে এতদিনে নিশ্চয় ভগবান অন্তত একজন সন্ন্যাসীকে খবরটা স্বপ্নে জানিয়ে দিতেন এবং সেই সন্ন্যাসী এতদিনে নিশ্চয় পঞ্জিকা মারফত তা আমাদের জানাতে দ্বিধা করতেন না। ঠিক সেই কারণেই আমার পেটের পুরনো ব্যথা যখন জেগে ওঠে দুপুরে আর রাত্রে খাবার পর, তখন আমি সে ব্যথা কোনোক্রমে সহ্য করি, কিন্তু ডাক্তারের কাছে আর যাই না, যে অসুখ ভগবানের পক্ষেও সারানো সম্ভব নয় সে অসুখের জন্য একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

অবশ্য ডাক্তারের কাছে একেবারেই যে যাইনি সে কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমাদের পাড়ায় অরবিন্দবাবু থাকেন, তাঁর একমাত্র কাজ মনে হয় রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। আমার পেটের ব্যথার খবর তিনি পাওয়ামাত্র ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন ডাক্তারের অধীনে আমি আছি। আমি কোনো ডাক্তারেরই অধীনে নেই শুনে তিনি আমাকে জোর করে ধর্মতলা স্ট্রীটের একজন নামকরা দক্ষিণ ভারতীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাবতীয় অসুখের নাকি তিনি একজন নিদারুণ স্পেশালিস্ট। এই নিদারুণ স্পেশালিস্টের কাছেই গিয়েছি—একবারই মাত্র। এরপর অরবিন্দবাবুর কাতর অনুরোধেও আমি তাঁর কাছে বা আর কারো কাছেই যাইনি। আমি এখন ভগবানের উপরই নির্ভর করে আছি বলতে গেলে।

এবার আমি নিদারুণ স্পেশালিস্টের কথা বলি। তাঁর বসবার ঘরে অন্তত কুড়িজন রোগী বসে। কেউ পুরনো মাসিকপত্র কিংবা সাপ্তাহিকপত্র পড়ছেন, আর ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। আমরা যেতেই একটা কাগজে আমার নাম লিখে দিলাম। অরবিন্দবাবু বললেন, আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।, কারণ টেলিফোনে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি। অরবিন্দবাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

নিদারুণ স্পেশালিস্টের কাছে যাবার জন্য সত্যি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখলাম, রোগা, কালো, একটু লম্বা গোছের—বছর পঞ্চাশ বছরের এক ব্যক্তি। অত্যন্ত গম্ভীর। আমি তাঁকে দেখে একটু মৃদু হাসলাম,কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তরে যেন আরো গম্ভীর হলেন বলে মনে হল। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?

আমি ব্যাপার বললাম। সকালে মাথা ধরে প্রায়ই সেটাও এই সুযোগে বলে দিলাম। রাস্তায় প্রায়ই চলতে চলতে বমি হয়ে যায়। তাছাড়া খাবার পর দুপুরে এবং রাত্রে বেশ পেট ব্যথা করে।

তিনি বললেন, আপনি কি ওষুধ খেয়েছেন?

বললাম, কোনো ওষুধই খাইনি।
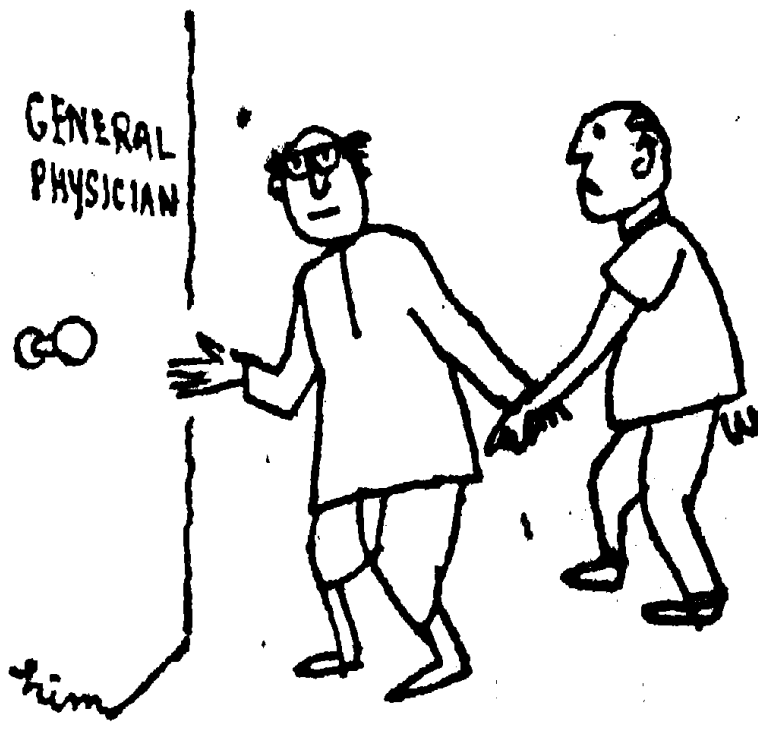
—কোনো ওষুধই খাননি? কতদিন হ
এমনি অবস্থা চলছে?

বললাম, বহুদিন। বোধহয় বছর তিনেক হবে।

—অন্যায়, অন্যায় করেছেন। বহুদি
আগেই কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচি
ছিল আপনার। পেটের ব্যাপারে একটু
অবহেলা করা উচিত নয়।

তারপর তিনি আমাকে পরীক্ষা করলেন
বুক পেট পিঠ পা সবই দেখলেন অত্যন্
যত্নের সঙ্গে। সেই সঙ্গে তিনি নানারক
প্রশ্নও করতে লাগলেন। আমি উত্তর দি
তাতেই তিনি বলেন, স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ!! আ
অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। আমা
বয়স, অসুখের বিবরণ এ সমস্তই তাঁর কা
স্ট্রেঞ্জ হওয়াতে আমি ধরে নিলাম এটা তা
মুদ্রা দোষ।

যাই হক, তিনি বহুক্ষণ ভেবে ভে
একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন। তাতে প্র
ছটি ওষুধ, কোনটা কখন কিভাবে খেতে হ
লিখে দিলেন। এরকম দু সপ্তাহ খাবার প
ভাল করে পরীক্ষা টরীক্ষা করবেন বললেন
তারপর বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

আমি তাঁর ফী দিতে যাবার সময় হঠা
সেই নিদারুণ স্পেশালিস্ট বললেন, না—ন
ওর দরকার হবে না। বলে জোর করেই ফী
আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপ
বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

স্ট্রেঞ্জ তিনি বলবেন কি, আমিই ব
ফেলেছিলাম আর কি কথাটা। কখনো কো
স্পেশালিস্ট ফী ফেরত দিয়ে দেন বলে আ
শুনিনি কখনো। তাছাড়া, আমি একেবারে
অপরিচিত।

স্পেশালিস্ট আমার হতভম্ব ভাব দে
বললেন, এতে হতভম্ব হবার কিছু নেই
আমি নিজেই অসুস্থ। অসুখের সম
লক্ষণ আপনার মত। একমাত্র পার্থক্য এই
আমি দুশোরকম ওষুধ খেয়েছি, অ
আপনি একরকমও খাননি!

আমি বহুদিন ধরে একজন
খুঁজছি যাঁর অসুখ ঠিক আমার অসুখে
সঙ্গে মিলে যায়। আমি যে ওষুধ আপনা
লিখে দিলাম, সেটা আপনি নিয়মিত খে
দেখুন। যদি সেরে ওঠেন, তাহলে আমা
জানাবেন।

—আর আমি যদি সেরে না উঠি?

—তাহলে আর এক সেট ওষুধ দে
সেরে উঠতেই হবে আপনাকে মশাই, সে
উঠতেই হবে। বলে অত্যন্ত আন্তরিকভ
আমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলেন। ত
চোখ দিয়ে যেন দু ফোঁটা জলও পড়ল ব
মনে হল।

তারপর আর কি! আমি প্রেসক্রিপশ
খানা ছিঁড়ে ফেললাম। অবশ্য বাইরে বেরি
এসে। শুনলাম অরবিন্দবাবু নাকি আ
জন্য এখন একজন নিউরোলজিস্টের খো
করছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১-ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৬ষ্ঠ বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

অমৃত

৩৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 3rd February, 1967. শুক্রবার, ২০শে মাঘ, ১৩৭৩ **40 Paise**

সূচীপত্র

চিঠিপত্র

বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে

আপনাদের ৬ই মাঘের অভয়ঙ্করের **'বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র'** প্রবন্ধটি পাঠ করে একটি কথাই শুধু মাত্র মনে আসে যে এই বীরসন্তানের জীবনের সঠিক চিত্রটি আমরা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে আজও পর্যন্ত সক্ষম হয়েছি কিনা? এই ভারতীয় বীরনেতাকে বুঝতে হোলে—ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের সমস্ত পুরনো পাতাগুলি তুলে ধরতে হয়। গত ২৩শে জানুয়ারী আমরা পালন করলাম আমাদের প্রিয় ও মহান নেতার জন্মদিন। আমরা স্মরণ করলাম আমাদের প্রিয় নেতাকে। এবং এতেই আমাদের যেন ইতি-কর্তব্য সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এই মহান জননায়কের জীবনআলেখ্য সমস্ত জীবন ধরে পাঠ করলেও তার কোনদিন শেষ হবে না। যে ইতিহাস সুভাষচন্দ্র রচনা করেছেন তাঁর জীবনদর্শনের মাধ্যমে তার ইতিবৃত্ত কোনদিনই কোন কালেই শেষ হবে না। তাঁর গোটা জীবনটাকে আমাদের আজকার জীবনের পাথেয় হিসাবে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে—আমরা ফিরে পাব না আমাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে। এই বিপ্লবী নেতার জীবনই তাঁর বাণী। রক্ত-সিক্ত পথে মাতৃভূমির মুক্তির বেদীমূলে যে মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন জীবনযোদ্ধা হৃদয়ের তপ্ত রক্তধারায় জীবনকে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন—আমাদের প্রিয় সুভাষ তাঁদের অন্যতম। এই মহান নেতা ও মহান পুরুষ কোনদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন রফা কোনদিন করেননি বা করতে চাননি।

এই নিয়েই সুভাষের সঙ্গে ভারতের অন্য নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। এবং সুভাষ যে নীতি বেছে নিয়েছিলেন ভারত স্বাধীন করবার জন্য—তার স্বীকৃতি ও স্বাক্ষর আমরা সর্বক্ষেত্রেই পাচ্ছি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা—সে যেভাবেই হোক না কেন—যে কোন নীতির মাধ্যমেই আসুক না কেন? আজাদ হিন্দ ফৌজের সেই মহান নেতার উদাত্ত বাণী আমরা আজও ভুলতে পারি না এবং দেশবাসী তা কোন দিনই ভুলবে না

!'give me blood and I will give you freedom".

যে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব এই মহান মানবটি আমাদের দেশের স্বাধীনতা কল্পে গ্রহণ করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত আত্মাহুতি পর্যন্ত দিয়ে গেছেন তার ঠিকমত উপলব্ধি আমরা আজও করে উঠতে পারিনি। এ আমাদের বিশেষ লজ্জার কথা। আমাদের একমাত্র ও একান্ত কর্তব্য হবে আমাদের এই প্রিয় মহান নেতাকে আমাদের মধ্যে সব সময়ে জাগিয়ে রাখা। এই মহান নেতার আদর্শই হবে আমাদের জীবনপথের এক-মাত্র পাথেয়। এবং এই সর্বত্যাগী মানুষটির জীবনআলেখ্যই হবে আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১

একটি গল্প প্রসঙ্গে

অমৃতের ৩৫শ সংখ্যায় "এশিয়ার গল্প" স্তম্ভে ইন্দোনেশিয়ার গল্প "একফোঁটা বৃষ্টি" জাগ্রত শিল্পী মনের পরিচয় দিল। বিদেশী এই লেখক পিটার ডি সিলভা কতখানি নামি লেখক তা জানি না, তবে তাঁর এই গল্পটি যে একটি রসবোধ জাগ্রত করল, তা অবশ্য স্বীকার্য। এই ধরণের গল্প প্রচারের জন্য একাধারে লেখক এবং অমৃতের সম্পাদককে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তবে "এক ফোটা বৃষ্টি" গল্পটির এক স্থানের একটি লাইন আমার মনঃপূত হল না। লেখক তাঁর গল্পের নায়িকার মাধ্যমে তাঁর একটি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, "সন্তান-হীনা মেয়েরা বন্ধু-বান্ধব ছাড়াই বাঁচতে শেখে।" কথাটি কি ঠিক? আমার তো মনে হয়, যে নারী সন্তানহীনা তিনি আরও চান পারিপার্শ্বিকের সহযোগিতা। এছাড়া প্রায় সময়ই দেখা যায়, সন্তানহীনা নারী অপরের সন্তানকে নিজের করে নিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। 'নিজের' অর্থে, তিনি চান তাঁর হৃদয়ের সকল মাতৃস্নেহ সেই সন্তানের ওপর ছড়িয়ে দিতে। আমার এ ধারণা কি ভুল?

শিখা মল্লিক
নিউ-আলিপুর

মৃত্যুনীল মাদক ঃ আফিং

অমৃত পত্রিকার ৩৭ সংখ্যায় বন-বিহারী মোদকের 'মৃত্যুনীল মাদক ঃ আফিং' সম্পর্কিত আলোচনাটি পড়ে বেশ প্রীত হলাম। লেখক সুন্দরভাবে আফিংয়ের ব্যবহার, উৎপাদন এবং অন্য সকল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন। আফিংয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এতে সুপরিস্ফুট হয়েছে। আফিং একটা মস্ত বড় নেশা। মদ এবং গাঁজার কথা ছেড়ে দিলে এমন বহুল উপায়ে ব্যবহৃত নেশা বড় একটা দেখা যায় না। তিনভাবে এই নেশা করা যায়। লেখক নির্দেশিত এবং সাধারণে প্রচলিত এই প্রথাগুলি হলো গলাধঃকরণ, ইঞ্জেকশন এবং ধূমপান। মদ এবং গাঁজার সাহায্যে এত বিবিধ উপায়ে নেশা করা যায় কিনা সেটা অবশ্য আমার জানা নেই। গলাধঃকরণ এবং ইঞ্জেকশনের কথা ছেড়ে দিলে আফিং ধূমপান হিসাবে ব্যবহারের পন্থাও দ্বিবিধ ঃ সাধারণভাবে এবং চণ্ডুরূপে। সবচেয়ে মজার কথা অনেকের জানা নেই যে, আফিংয়ের নেশা থেকেই গুলিখোর কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। দেশে দেশে এই নেশা যে কি প্রচন্ড সর্বনাশ ডেকে এনেছে সেকথা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু নেশার জিনিষ আফিং আজও সমানে রাজত্ব করে চলেছে। বিশেষভাবে আমাদের মত দেশের পক্ষে এই বস্তুটি প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আহরণ করে নিয়ে আসে। তাই 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' করতে গিয়ে কিছুই করা হয় নি। আফিং যেমন প্রচলিত ছিল তেমনি রয়েছে। চোরাকারবারীদের দৌরাত্মে বরং দিনে দিনে এই জিনিষটির প্রসার ঘটছে। কিন্তু আফিং শুধুমাত্র নেশার বস্তু নয়। এ আবার ওষুধ তৈরীর ব্যাপারে একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে। বৈদ্য-কবিরাজ-হেকিম থেকে শুরু করে অ্যালোপ্যাথি ওষুধপত্রের জন্য আফিংয়ের প্রয়োজন হয়। একমাত্র গাজীপুরের আফিং তৈরীর কার-খানাটিতে আফিং ছাড়া আফিংজাত প্রায় নয় রকম ওষুধ তৈরী হয়। সুতরাং আফিংকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। ইরাণে আফিং চাষ নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে এই চাষ এবং সব রকম ব্যবস্থা সরকার নিয়ন্ত্রিত। নানা কাজের বস্তু আফিং বহাল থাকুক কিন্তু সামাজিক ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

অনিল চক্রবর্তী
কলকাতা-৩১

অমৃত

সম্পাদকীয়

আমরা কোনদিকে যাব?

আর অল্পদিন পরেই আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণতন্ত্র দিবসের সংকল্প ও উৎসব আড়ম্বরের মধ্যে এই সত্যই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারতের গণতন্ত্র এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। একটি দরিদ্র, উন্নয়নশীল এবং বিশাল জনসমষ্টি অধ্যুষিত দেশে গণতন্ত্র কার্যকর করা খুবই দুরূহ। অন্য অনেক দেশে গণতন্ত্র মধ্যপথে পরিত্যক্ত হয়েছে। তার স্থান দখল করেছে একনায়কতন্ত্র। জনসাধারণের ইচ্ছাকে পদদলিত করে একটি গোষ্ঠীর ইচ্ছায় দেশ চালিত হলে তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না। ভারতবর্ষ, তার শত দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ সত্ত্বেও, সেই পথে যায় নি। তার মূলমন্ত্র গণতন্ত্র, তার শক্তির উৎস জনগণ। এই সত্য আমাদের পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন।

রাষ্ট্রপতি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মর্মাহত। চতুর্দিকে এমন একটা অবস্থা আজ বিরাজমান যে, আইন ও শৃংখলা বানচাল করে গণতন্ত্রের কাঠামোকেই দুর্বল করে দেবার চেষ্টা চলছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কোনো অভিযোগের প্রতিকার হবে না, ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাই কার্যোদ্ধার করা যায়, এই ধারণা যদি জনসাধারণের মনে জন্মে তাহলে দেশে অরাজকতার পথই প্রশস্ত হবে। আজ দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আমরণ অনশন, আত্মাহুতি, অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট, স্কুল-কলেজ বন্ধ ইত্যাদি লেগেই আছে। এই লক্ষণগুলি অত্যন্ত খারাপ। রাষ্ট্রপতি এর জন্য গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শুধু জনসাধারণই যে এর জন্য দায়ী তা নয়। যাঁরা দেশ চালান, আইন তৈরী করেন তাঁদের মধ্যেও অনুরূপ শৃংখলাহীনতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মারামারি দেখে রাষ্ট্রপতি মর্মাহত।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায়, এমনকি সর্বোচ্চ সংসদ সভায় পর্যন্ত সদস্যরা সংযম হারিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসিত কলহে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যেও কলহ এবং জাতিভেদপ্রথা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ক্ষুদ্র স্বার্থ ইত্যাদির বিষ প্রবেশ করেছে। শিক্ষাজগতেও ঢুকেছে শৃঙ্খলাহীনতা ও শিক্ষার প্রতি বিরাগ। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কোনো দেশেই গণতন্ত্র তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না। ভারতের পক্ষে তো তা আরও কঠিন। কারণ, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের প্রধানতম সমস্যা—দারিদ্র্য।

আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে অজন্মা ও অনাবৃষ্টির দরুণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দেশে (বছরে এক কোটি লোক বাড়ছে) মানুষের মুখে খাদ্য জোগানোই সবচেয়ে বড় কাজ। এই কাজেও আমরা পরনির্ভরশীল। এই ঘাটতি কতটা প্রাকৃতিক কারণে এবং কতটা আমাদের অযোগ্যতা ও অসততার জন্য তা তলিয়ে দেখার সময় এসেছে। কারণ, অপরের কাছে হাত পাতলে প্রত্যক্ষই হোক কিংবা পরোক্ষই হোক তার কিছু কথা শুনতেই হবে। এর জন্য দাতার চেয়ে গ্রহীতার দীনতাই দায়ী। যাঁরা জাতীয় মর্যাদার কথা তুলে অন্যদেশের উদ্দেশ্যকে ভর্ৎসনা করেন তাঁদের বোঝা উচিত আজকের এই অবস্থার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। যাঁরা শাসনকর্মে নিযুক্ত তাঁরা এবং যাঁরা অনশন, আত্মাহুতি ও হিংসাত্মক বিক্ষোভ চালিয়ে দেশ অচল করে দিতে চাইছেন তাঁরাও। রাষ্ট্রপতির ভাষণে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলেরই আজ সতর্কভাবে চলা উচিত। একথা আজ স্বীকৃত যে, গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। ভারতবর্ষ অত্যন্ত বিচক্ষণভাবেই এই পথ গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের সম্মতি ও আনুগত্য ভিন্ন গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। আমরা কুড়ি বছর গণতন্ত্র চালিয়ে কি এতই ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যে, একে সম্মান দিতে আমরা আজ কুণ্ঠিত? হিংসাত্মক পথে সমাজের কোনো সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। ইতিহাসেই তার নজীর আছে। কিন্তু জনসাধারণের অভিযোগ না মিটিয়ে আরামকেদারায় বসে গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রাখলেই গণতন্ত্র চিরজীবী হয় না।

রাষ্ট্রপতি এই সত্য কথাগুলি দেশবাসীকে শুনিয়েছেন। হয়তো অনেকের কাছে এই সত্য কথাগুলি খুবই অস্বস্তিকর মনে হবে। কিন্তু দেশে যে-অভাব আছে, দুর্নীতি আছে এবং উচ্ছৃংখল মনোভাব জীইয়ে রাখার মতো দুষ্টশক্তি আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং আজ সকলেরই আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনার সময় এসেছে, যদি আমরা এই গণতন্ত্রকে শক্তমাটিতে কলুষমুক্তভাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই। আমাদের বহু প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র বিদায় নিয়েছে। বহুদেশে চলছে রক্তপাত, ষড়যন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতাদখলের চেষ্টা। চারিদিকের এই হতাশার মধ্যে ভারত তার গণতান্ত্রিক পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। ২৫ কোটি লোক এবারেও নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। এই বিপুল জনশক্তি ও জনতার সম্মতিকে যদি আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা নতুন শক্তিতে দেশবাসীকে দেবে প্রেরণা। এই দায়িত্ব যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বিচিত্র চরিত্র

নির্মলচন্দ্র

(ক্লীনমুন)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(২য় পর্ব)

নির্মল আমার অবস্থা অনুমান করে একাই হেসে কাঠের ঘেরাদেওয়া খুপরীটার বাতাস উতলা ও চঞ্চল করে তুলেছিল। আমি অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সে নিজে আসন পরিগ্রহ করে আমারই আসনখানা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল — বস। Sit down — you faultless donkey.

বসেছিলাম এবং চমকেও উঠেছিলাম সম্বোধন শুনে। সে বলেছিল—ডোন্ট বি এ্যাংরি গ্র্যান্ডপা, মাই ডিয়ার শালা এন্ড ফল্টলেস ডাংকি। তারপর ডট-ডট-ডট। অর্থাৎ অশ্রাব্য গালাগাল। বললে—এটা তুমি কি করলে বলত? লেখাপড়ায় ইতি করলে; পুলিশের খাতায় নাম লেখালে এতে তোমার হলটা কি? অবশেষে শালা তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে ধান ভানতে আসা ছাড়া গতি রইল না? হে মা কালী, হে খোদাতালা, ও গড। এ করলে কি তুমি? ডট-ডট! সেই জন্যে তোমার নাম দিয়েছি ফল্টলেস ডাংকি। একেবারে দোষশূন্য-গাধা!

এতক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলাম, তা না হয় মানলাম এবং স্বীকার করে নিলাম নামটা। কিন্তু তুমি? মুর্শিদাবাদ থেকে কবে এলে?

—হোয়াট? ব্যাটল অব প্লাসি হয়েছিল সেভেন্টিন ফিফটি সেভেনে। তারপর হিস্ট্রি অব বেংগলে আর একটি সাল—যে সালে ক্লীন মুন, মুর্শিদাবাদের আকাশে পারমেনেন্ট অমাবস্যা কায়েম করে দিয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে এসেছে ক্যালকাটা—দ্যাট ইজ নাইন্টিন হান্ড্রেড এ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর। ইউ শালা, ফল্টলেস ডংকি, ইউ ডোন্ট নো ইট?

—তুমি কলকাতায় রয়েছ?

—ইয়েস!

—মহারাজা নন্দীর চাকরী ছেড়ে দিয়েছ?

—ইয়েস। তবে ছেড়ে দিই নি, ছাড়িয়ে দিয়েছে।

—ছাড়িয়ে দিয়েছে? কেন?

—ব্যবসা ফেল, পড়ো-পড়ো। রেড ল্যাম্প জ্বালবার জো করে তুলেছিলাম আমরা মানে, মহারাজার স্নেহাস্পদ বিশ্বস্ত কর্মীবৃন্দ। অডিটারেরা বললে—ডে লাইটে থেফট নয়, রবারি; লুট, যা বলবে তাই। অগত্যা মহারাজা ডেকে বললেন—দেখ রে আমি তোদের দায়ী করতে চাইনে, কেস করতে চাইনে, তবে তোরা সব নিজে থেকে ব্যবসাগুলোর শোলডার থেকে নেমে রেহাই দিয়ে চলে যা। আমার যা গেছে তা যাক—

কথার মাঝখানে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম কত গেছে?

—তবে, থাউজ্যান্ডস এ্যান্ড থাউজ্যান্ডস, সো মেনি থাউজ্যান্ড অব রুপীজ! মে বি ওয়ান ল্যাক। মে বি টু ল্যাকস।

নিষ্ঠুর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি কত পেয়েছ তার মধ্যে থেকে?

টেবিলের বনাতের উপর দৃষ্টি রেখে কথা বলছিল নির্মল, কথাটা শুনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সে নড়ল না, শুধু চোখের তারা দুটো ঠিক ভুরুর নিচে প্রায় যেন ঠেকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। সে কি ধারালো হাসি। এবং তাতে কি অপার কৌতুক তার।

সেইভাবে চোখে চোখ রেখে বললে—থ্যাংক য়ু মাইডিয়ার ডট-ডট শালা! য়ু আর নো লংগার এ ফল্টলেস ডাংকি! চাট্ ছুড়তে শিখেছে। এ্যাঁ!

তারপর হেসে বলেছিল—পেয়েছি বৈকি কিছু। নেবে?

* * *

নির্মল পায় নি কিছু শুধু বদনামের ভাগীই হয়েছিল, একথাটা পরে জেনেছি, কিন্তু সেদিন জানতাম না। সেদিন সে-কথা নির্মল বলেও নি। বলেছিল—যা পেয়েছি পুঁতে রেখেছি। কি করব? ব্যাংকে রাখলে ধরে ফেলবে। কারবার করলেও তাই! ঠিক বলবে—এই দেখ সেই টাকা। বন্ধুদের বিশ্বাস করিনে। বুঝেছ! আমার-সেই বজ্জাত ওয়াইফটা ছেলেপুলে ফেলে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পালাল। কপাল হতভাগীর, থাকলে তাকেই দিতাম। তা দেখ না, মতিভ্রম দেখ না, মাগীর—
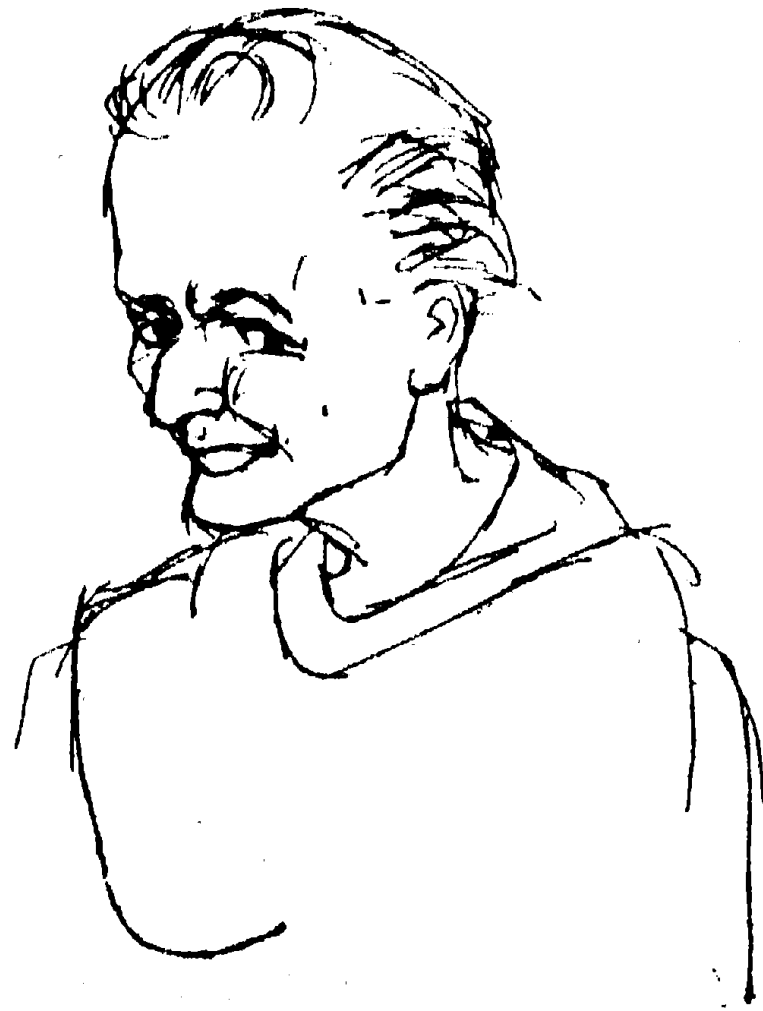
চমকে উঠলাম, বললাম কি বলছ নির্মল?

—কি বলছি? তুমি শোন নি? নট হার্ড?

—না।

—আরে খোদা, সে মাগী বত্রিশ বছর বয়সে পাঁচটা ছেলের মা হয়ে—

—নির্মল চুপ কর তুমি। নির্মল—

—কেন চুপ করব। এই বয়সে সব ফেলে মাগী পালাল, ওই সূর্যিঠাকুরের বেটা, ধর্মঠাকুর—যাকে তোমরা যম-টম কি বল যে গো, তার সঙ্গে।

এতক্ষণে হঠাৎ মিনিট খানেকের জন্যে গম্ভীর হয়ে বললে—হঠাৎ মরে গেল। হার্ট ফেল করলে।

আরও মিনিটখানের চুপ করে থেকে অকস্মাৎ আবার শীতের মেঘলা আকাশের মেঘ কাটিয়ে রোদ ওঠার মত নির্মল আবার পূর্বের নির্মল হয়ে উঠল। বললে—যা মেরেছি, তা কি বের করতে আছে? সে ব্রাইডগ্রুমই নয়, ক্লীন মুন। (অর্থাৎ সে পাত্রই নয় নির্মলচন্দ্র!) শেষ মহারাজা ডেকে বললেন—দেখ, ব্যবসার লোকসানের জন্যে তোর দায় যাই হোক, সে থাক। কিন্তু তুই তিনবার আমার কাছে টাকা নিয়েছিস, দুবার মাতৃশ্রাদ্ধ বলে, একবার পিতৃশ্রাদ্ধ বলে—অথচ বাপ তোর মরেছে অনেককাল আগে, আর মা তোর একজনই ছিলেন, কোন সৎমা ছিলেন না, আমি জানি। এর জন্যে তোকে বলছি, তুই চলে যা। বাস্ লজ্জায় ওয়ান হ্যান্ড লং টাং (একহাত জিভ) বের করে ফাদার মাদার (বাপরে-মারে) করতে করতে চলে এসেছি কলকাতায়।

—কি করছ।

—ঠিকেতে কয়েকটা কোম্পানীর এ্যাকাউন্টসের খাতা তৈরী করে দি অডিটের জন্যে। এ্যান্ড তার সঙ্গে ইনকাম-ট্যাক্স প্রুফ হিসেব বানিয়ে দি! তার সঙ্গে টী মার্কেটে গোডাউনের ঝরতি-পড়তি ডাস্ট কুড়িয়ে কেনা-বেচা করি। সেটা কিছু নয়, সাইড বিজিনেস বলতে পার। ওই সন্ধ্যের স্পিরিটের দামটা, বিড়ি-সিগারেটের দামটা হয় আর কি। সন্ধ্যেবেলা জপতপ করি তো, তান্ত্রিক সন্তান! স্পিরিট না হলে স্পিরিচুয়াল ব্যাপার হয় কি করে? এ্যাঁ।

সেদিন সাত নং সোয়ালো লেন থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম দুজনে। অবশ্য আমি ইচ্ছে করে তার সঙ্গে বের হই নি, সেই আমার স্কন্ধ পরিত্যাগ করে নি। মনে পড়ছে সোয়ালো লেন থেকে রাধাবাজার ধরে লালবাজার স্ট্রীটে পড়বার পথে একটা দেশী-বিলিতী দুই রকমই মদের দোকান ছিল।

অর্থাৎ দু রকমই পাওয়া যেত, অবশ্য মাঝখানে একটা পার্টিশন ছিল এবং সেখানে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা ছিল, খুচরো খাইয়ে খদ্দেররা এখানে বসে খেতে পেত। সেই দোকানের সামনে এসে ক্লীন মুন আমাকে বলেছিল—কিপিং মানে সামথিং খসিয়ে ফেল গ্র্যান্ডপা। আমি তোমার গ্র্যান্ডসন, স্বর্গে বাতি দেব, গোল্ডেন মুনের মত হাত পেতেছি. আজকের সন্ধ্যের ইস্পিরিটের বৈবাহিকটা, মানে খরচাটা বা এক্সপেন্ডিচারটা তোমাকেই দিতে হয় ব্রাদার-ইন-ল। বেশী নয়, স্রেফ এক পাঁট দশরথাত্মজের মানে রামের বা রমের দাম। হাতে তুড়ি দিয়ে বললে—মেক হেস্ট। জলদি করো ম্যান। প্লি—জ! এক পাঁট রামের দাম।

সেটা তখন কত ছিল তা জানি না, তবে খুব বেশী ছিল না, অর্থাৎ আড়াই টাকার মধ্যেই ছিল বোধহয়।

আমি স্যুট পরে থাকলেও বাড়ীতে খদ্দর পরতাম এবং তকলী কাটতাম, সুতরাং আমার রাজী হওয়ার কথা নয়, রাজী হই নি, একথা সহজেই বুঝবেন সকলে কিন্তু ক্লীন মুন বলেছিল—তা হলে এই দেখ—।

—কি?

সে বের করেছিল ছোট্ট একটা দু আউন্সের শিশি। তাতে তখনও খানিকটা মদ, যা নাকি খাঁটি দেশজাত, তাই ছিল। নির্মল বলেছিল—মাইরী বলছি, এইটুকু তোমার গায়ে ছিটিয়ে দেব, বাস তারপর যা হয় হবে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

সে বলেছিল—ডট-ডট-ডট, মাইরী তুমি তখন সাত-আট বছরের, তখন তোমাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি, ঠাকুরদা বলেছি, আজও বলছি, তুমি ফাদার-ইন-ল'র আফিসে এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছ শুনে কত আনন্দে এতখানা বুক করে ছুটে এসেছি, আর তুমি তিনটে টাকা খরচ করে মাল খাওয়াবে না আমাকে?

—নির্মল।

—বেশী চালাকি কর না মাইরি। তা যদি কর, তাহলে এই টুকুতেই দুজনের গায়ে গন্ধ ছুটিয়ে 'চকার-বকার' করে তোমাকে নিয়ে লালবাজার থানার হাজতে গিয়ে ঢুকব। বুঝেছ!

আমাকে সেদিন সত্যই কয়েকটা টাকা খসাতে হয়েছিল, আত্মরক্ষার বা টাকাকটা না-দেওয়ার মধ্যে যে আদর্শরক্ষার সংগ্রাম তাতে জয়লাভের কোন পথ না পেয়ে একান্ত-ভাবে পরাজিতের মত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল এবং বলতে হয়েছিল, 'দোহাই ধর্ম', আমাকে রেহাই দাও।'

আজ মনে নেই, রেহাই পেয়ে, হন-হন করে ট্রাম রাস্তার দিকে অগ্রসর হবার সময় তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম কিনা! কারণ, সেদিন ওইটুকুতে কয়েকটা টাকার বিনিময়ে রক্ষা পেলেও এর পর ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্তেই যে আমার ওই ঠাকুরদাদাত্বের অপরাধে দণ্ড দেবার জন্য অশনিগর্ভ মেঘের মত চমকে-চমকে উঠে ইসারা দিয়ে শাসাচ্ছিল। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত সে মেঘের বিস্তারের মধ্যে তো এতটুকু ফাঁক ছিল না। পালাব কোথায়? ওর বা আমার মৃত্যু ভিন্ন তো এই ঠাকুরদাদাত্বের অপরাধ থেকে আমার রেহাই সেদিন দেখতে পাই নি।

পাব কি? সেই দিনই ঘণ্টা খানেক পরে মামাশ্বশুরদের বাসায় বা তাঁদের কোম্পানীর মেসে নিজের ঘরে বসে লিখ-ছিলাম, তখন নাটক লিখতাম, কবিতা লিখতাম, হঠাৎ লেখা আপনা থেকে থেমে গেল। নির্মলের কণ্ঠস্বর কানে এল। ওই মেসে তার এক খুড়ো থাকত; তার ঘরে এসেছিল সে। বা ওই খুড়োই তাকে সঙ্গে করে বাসায় এনেছিল। দুজনের দেখা হয়েছিল ওই দোকানে।

নির্মল আমাকে গান শুনিয়ে গিয়েছিল—
They call me a monkey — a very
clever monkey—
Very pet grandson of an old
donkey an old faultless monkey.

ট্রালা-ট্রালা-ট্রালা ট্রালা—
তারপরই রামপ্রসাদীতে ঝেড়েছিল দু

কলি—ঠিক মনে নেই, তবে, মোটামুটি কামনা জানিয়েছিল মায়ের কাছে, মা এই ঠাকুরদাদার নাতি করো তাহলে সন্ধ্যের ভাবনাটা আর থাকবে না।

* * *

ব্যাস, ওই দিনই। ওই একদিনই। এর পর আর নির্মল কোন দিন এ জবরদস্তি, নির্মলের ভাষায় shoulder climbing-trick স্কন্ধারোহণ কসরত আমাকে দেখায় নি।

তবে মধ্যে মধ্যে এর-ওর কাছে শুনতাম সে খোঁজ নেয়, আমি নারীপল্লীতে যাই-আসি কি না। অথবা ব্যবসা-বাজারের ফ্যাশন পানধর্মে দীক্ষাটীক্ষা নিয়েছি কিনা। মধ্যে মধ্যে শুনতাম অসভ্য অশ্লীল গালি-গালাজ দিয়েছে। দেওয়ার কারণটা ছিল, আমার হিতাকাঙ্ক্ষা। আমি আমার স্বভাব-ধর্মেই হোক আর আমার কোষ্ঠীতে অঙ্কিত জন্মকুণ্ডলীর অনুরূপ অদৃশ্যলোকে অঙ্কিত রাশিচক্রটির বিশেষ ঘরে, বিশেষ গ্রহটির অবস্থান হেতুই হোক, ঝগড়া আমি করতাম আমার মামাশ্বশুরদের সঙ্গে। সেই কারণে সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষা করেই আমাকে গালগাল করত।

কানে এসেছিল, বলেছে, কপালে ওর সইবে না। তিনপুরুষ হয়ে গেছে অনেক দিন। কেনারাম কেনে, রাজারাম রাজগী করে, তার বেটা বেচারাম বেচে। আমরা বাওয়া খাস নবাবী এলাকার লোক, অনেক নবাব দেখলাম, আমীর দেখলাম। সব শালারা ওই এক জহান্নমে গেছে, ও-ও যাবে। রাবিশ কোথাকার। আর ওই যে স্বদেশী ঘানির পিওর মাস্টার্ড অয়েলের টেস্ট যে পেয়েছে না, তাকে ঘুরে-ফিরে ঘানি ঘোরাতেই হবে। "ঘোর-ঘোর আমার ঘানি।"
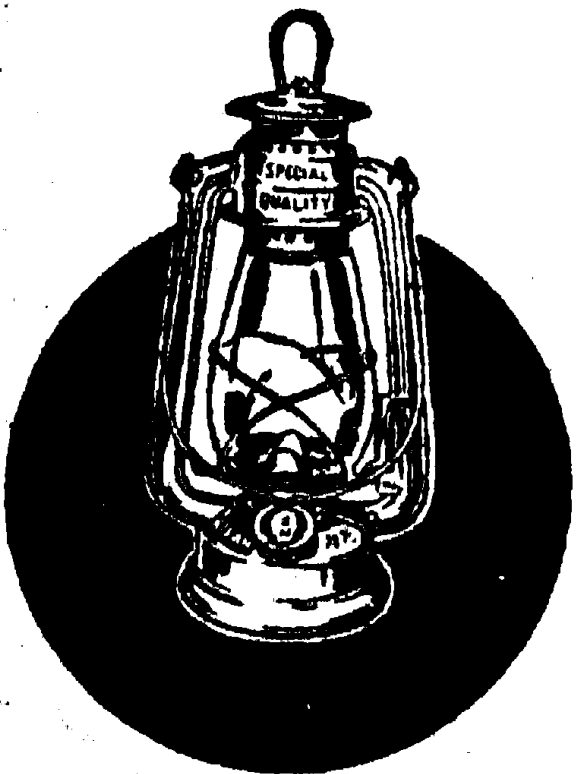
আমি শুধু চক্ষু মুদে কেবল টানি,
কেবল টানি।

শ্লা, ভদ্দরলোক চারুদার মেয়েটো কষ্ট পাবে হে, নইলে কে গেরাহ্যি করত। দি রাম মানে মেড়া, চন্দ্র মানে মুন, ম্যাডামুন হে! অতঃপর ডট-ডট-ডট! অর্থাৎ গালাগালি। এবং সে ঠিক শ্রাব্য নয়। এবং সে গালাগাল কাকে তাও নির্ণয় করা শক্ত। সে আমাকে হতে পারে, ঈশ্বরকে হতে পারে, বা পৃথিবীর যে কেউকে হতে পারে!

সেই নির্মল!

পত্র লিখেছে। তার পত্রের আরম্ভটুকু দিয়েই শুরু করেছি; পত্রখানা বেশ দীর্ঘ। পত্রখানা অবিকল নয়। কারণ, নির্মলের পত্র, যে-পত্র আমার মত বয়সে ছোট এক ঠাকুরদা বা এই ধরনের কাউকে লেখা, তা অবিকল অবিকৃতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে চরিত্র-বৈচিত্র্যের শত-সহস্র দাবীতেও প্রকাশ করা যায় না। এবং গুরুচণ্ডালী হবে বলে খানিকটা কলমও চালিয়েছি। যে কোন পাঠক ধরতে পারবেন ওই "বিচিত্র চরিত্র নামের পাগড়ী পরাইয়া" শব্দগুলি আমার। আরও আছে, বেশ কতকগুলোই আছে। পিণ্ডীকরণ কথাটা তার কিন্তু 'তিল মধু সহযোগে উপাদেয়' শব্দগুলো আমি বসিয়েছি; নির্মল লিখেছিল—'ফার্স্ট ক্লাস পিণ্ডিকরণ চটকেছ'। থাক। এখন নির্মলের আসল কথা বলি। নির্মল নিজের পিণ্ডীর জন্যে ব্যস্ত নয়।

সে লিখেছে, দেখ গ্র্যান্ডপা, ক্ষ্যাপা বাউল থেকে শুরু করে 'রাধাখুড়ো' (রাধাদা) বিলিতি মাস্টার পর্যন্ত পড়ে বেশ লাগছিল হে। পুরনো লোকগুলোকে মনে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল এ্যালবাম দেখছি। হঠাৎ বিলিতী মাস্টারের পর তোমার 'মলি' পড়ে মেজাজ আমার খারাপ হয়ে গেল হে। নারীচরিত্র অবশ্য পুরুষের কাছে উপাদেয় বটে, মৌমাছি ও ভ্রমরের কাছে ফুলের মধুর মত, ডেয়ো পিঁপড়ের কাছে গুড়ের মত, চাতকের কাছে ফটিকজলের মত; তার থেকেও ভাল উপমা কাঁচপোকার কাছে তেলা-পোকার মত। এর আগেও তুমি নারী-চরিত্রের পরিচয় দিয়েছ, কালো বউ পড়ে সারারাত্রি ঘুমোই নি। ভেবেছিলাম, কালো বউ কে বলতো? আমি তো ওদের ওখানকার বহুজনকে চিনি! বয়স হিসেব করে দেখে-ছিলাম, মনে হয়েছিল কালো বউ আমার বউয়ের বয়সীই হবে। অর্থাৎ কপালে থাকলে আমার বউই হতে পারত।

এমন ভাবনার রসায়ন আমাকে খানিকটা চঞ্চল করে তুলেছিল হে। রীতিমত এক্স-সাইটিং ব্যাপার! কিন্তু তোমার মলি পড়ে আমি-আমি-আমি। কি বলব?

হয়েছে। আরব্য উপন্যাস নিশ্চয় পড়েছ? তাতে একটা গল্প আছে,—এক আমীরজাদা, একখানা তসবীর, অবশ্যই তা এক তরুণীর দেখে ক্ষেপে গেল। এবং বেরিয়ে পড়ল তার সন্ধানে। হল না। হল না, গ্র্যান্ডপা। হল না। কি করে তোমাকে বোঝাই আমার অবস্থা! মাদার কালী, ফাদার শিবো হে! (এসবগুলি নির্মলের অরিজিন্যাল, আদি ও অকৃত্রিম)। সে কাল হলে একসিপ খেয়ে নিয়ে দেখতাম। মাথা শরীর চন-চন না করলে ওসব বেদবাণী আসবে কেন? কিন্তু আর তো সিপ করবার উপায় নেই গ্র্যান্ডপা! বয়স প্রায় ৮০র ধাক্কা। ছানি পড়েছিল চোখে, কাটিয়েছি। দাঁতগুলো তুলে দু-দু পাটি বাঁধিয়ে ফেলেছি। রাত্রিবেলা যখন খুলে টেবিলের উপর রাখি, তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখে চমকে উঠি; মাথা চন-চন করে ওঠে। সিপের দরকারই হয় না। এবং তখনই সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতে বাঁ হাতের কব্জি ধরে নাড়ী দেখি। ভল্যুম কত?

প্রেসার বাড়ে! ভয় হয় গ্র্যান্ডপা। সুতরাং সিপ করবার তো উপায় নেই। করলে এক নিমিষে। বুঝেছ, হয়তো শূন্য-মণ্ডলে ঘুরে বেড়াব।

হয়েছে গ্র্যান্ডপা। হয়েছে। ইউরেকা। পেয়েছি।

পরশুরাম আমার প্রিয় লেখক, প্রিয়তম লেখক। ইউ আর নট। গাল দিয়ে লিখতাম। কিন্তু তুমি গ্র্যান্ডপা তুলসী পাতা, ছোট হলেও মাথায় করতে হবে। আমার ফাদারের ফাদার, গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান বরদাকান্তবাবু বলে গেছেন হে। তোমাকে এখন গাল দিতে গেলে পাপের ভয় হয়। থাক গে। যা পেয়েছি তা বলি শোন।

পেয়েছি 'ভুশুণ্ডীর মাঠ'। এবং সেই পেত্নীকে। যে ঝম্বা একগাছা ঝাঁটা হাতে ভুশুণ্ডীর মাঠের ঝরে পড়া পাতা ঝাঁট দিয়ে বেড়ায়।

শিবুর মত আমারও মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে কাকে জান? একজন সর্ব-নাশীকে। বুঝেছ? মলির কথা পড়ে তাকে মনে পড়েছে। তাই তোমাকে এত ঘটা করে চিঠি লিখছি।

গ্র্যান্ডপা, এ মেয়ে তোমার চোখে দেখা নয়, আমি লিখে তার কথা কতটা বলতে পারব? কতটা তাকে তোমার কাছে স্পষ্ট করতে পারব তা জানি না। তবে তোমাকে তাকে মলির চেয়েও উত্তমা করে আঁকতে হবে।

আদার ওয়াইজ। নাঃ খারাপ কথা বলব না গ্র্যান্ডপা। খারাপ কথা মনেও পড়ছে না, তবে তার আগে একটা কথা বলে নি। 'মলি' বড় ভাল মেয়ে।

এখন শোন।

ধর তার নাম 'কাজলরেখা'।

নামটা বড় কাব্যময় হওয়ার জন্যে অবাস্তব অবাস্তব ঠেকছে? না? তা ঠেকুক। বল্লেই তো নিয়েছি নামটা আমার দেওয়া। এখন তার ডাকনামটা বলি—টুনু।

সে এক নাচওয়ালী মেয়ে। সেকালে বলতাম খ্যামটাউলী।

(ক্রমশঃ)

শীতের কুয়াশায় ফুলের মেলায়

তারাপদ পাল
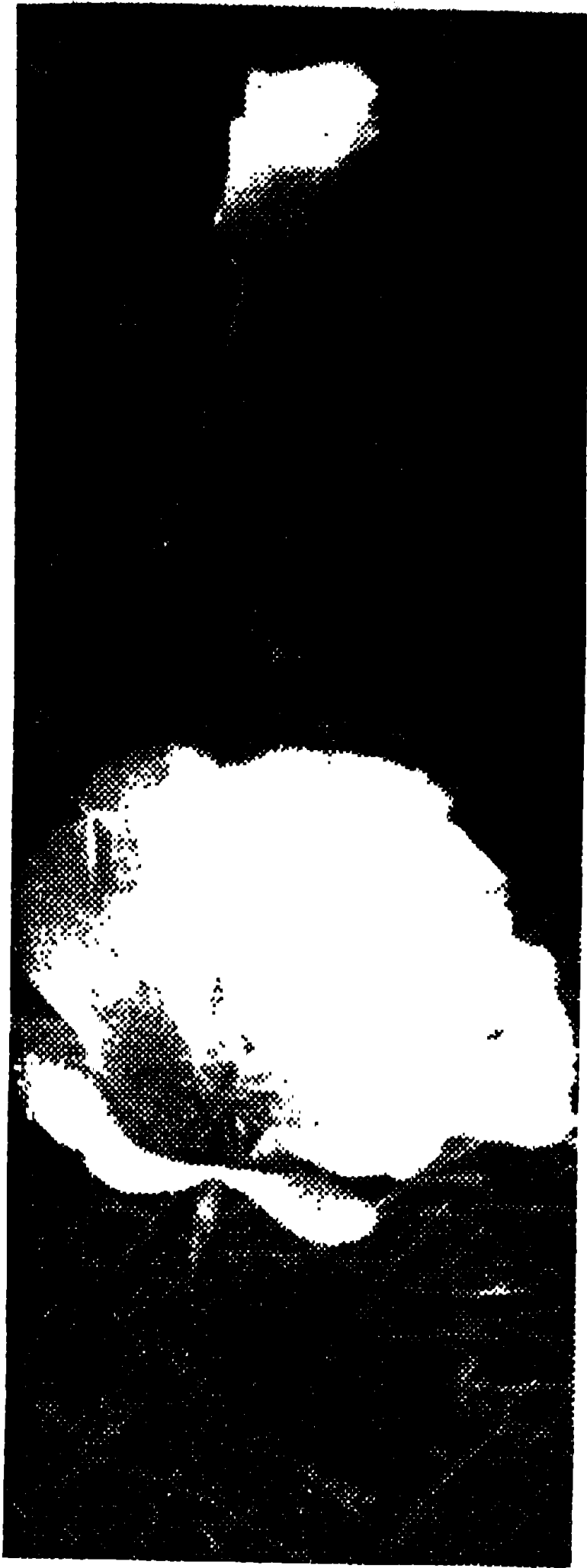
: এত যে ফুল দেখছেন, এদের মধ্যে স্বদেশীয় বলে দাবী করার মতো কেউ নেই!

—কথাটা শুনে প্রায় চমকে উঠেছিলাম। বলেন কি? এত ফুল, এত নাম—কিন্তু এরা কেউ আমাদের দেশের নয়? তা' হলে এই শীতের মরশুমে ফুলের মেলায় এত যে উল্লাস-আনন্দ সবই ভিন দেশের দান! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে কথাটা খুবই সত্যি। আমাদের দেশে যত ফুল দেখি—প্রায় জন্মের পর থেকেই দেখে আসছি—তারা সকলেই ভারতের বাইরে, এমন কি এশিয়ার বাইরের কোন না কোন দেশ থেকে আগত। কে, কবে, কি ভাবে এসেছিল সেও বিরাট কাহিনী, বিশাল ইতিহাস—যার প্রায় সবটাই অন্ধকারে ঢাকা। সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তা নিয়ে মাথা ঘামান গবেষকরা। শীতের কুয়াশায় আমরা বরং কিছুক্ষণ ফুলের মেলায় বেড়িয়ে আসি।

শহরের মানুষ আমরা। ফুল দেখি ফুলের দোকানে। সেখান থেকে কিনে (অবশ্য সামর্থ্য থাকলে) সাজাই ড্রইংরুমে। কচিৎ কখনো কারো বাড়িতে দেখা যায়। ফুলের গাছ, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে টবে! ফুলের বাগান?—দেখতে গেলে ছুটতে হয় চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, হরটি-কালচারাল গার্ডেন কিংবা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। ভাগ্য ভাল হলে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে শহরের কোন সৌখিন গৃহস্বামীর কেয়ারী করা ফুলের বাগান। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সাধারণ মানুষের সামর্থ্য কোথায় ঘরে ঘরে ফুলের বাগান করার, সময়ইবা কোথায়? তবুও ফুল দেখলে, হাতে করে নিতে পারলে আনন্দ না হয় কার? তাইতো প্রিয়জনের সংগে মিলনের সময় উপহার দিই ফুল। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই ফুল দিয়ে। পুজা-পার্বন, বিয়ের উৎসব কোনটাই চলে না ফুল ছাড়া। আবার মৃত্যুর পরেও শবদেহে সাজিয়ে দেওয়া হয় ফুল। মানুষের জীবনে ফুলের
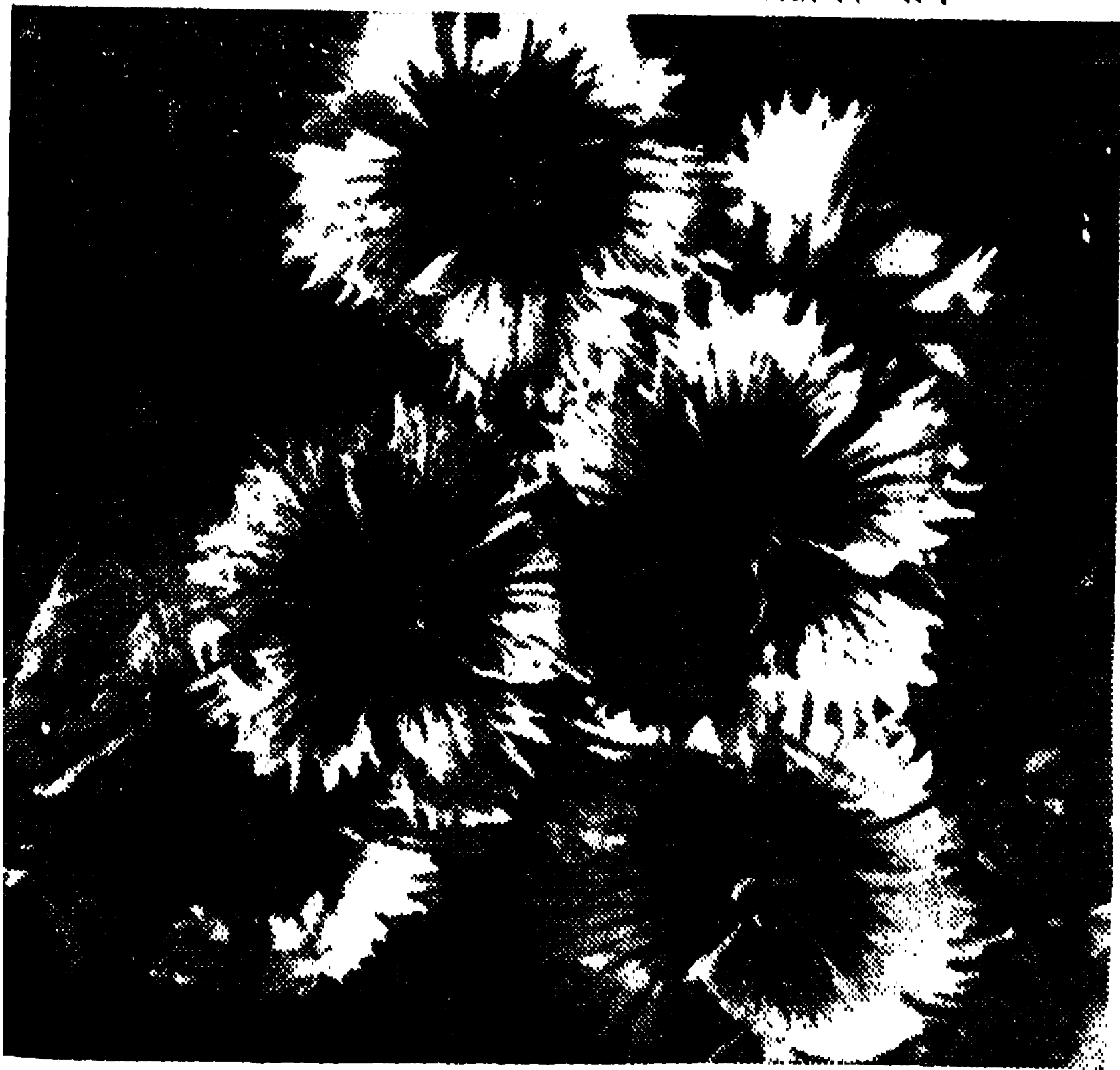
ক্রায়নথাস

স্থান বিশিষ্ট, স্মরণীয়! আনন্দের দিনে, বেদনার ক্ষণে—ফুলই আমাদের সব থেকে কাছের জিনিস। আজকাল সাধারণ মানুষ অবশ্য সে ভাবে আর ভাবতে পারে না। কিন্তু মনের কথা যেন ফুলেই প্রকাশ করতে চাই আমরা—আজও। কখনো কখনো জীবন ও মনের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহার করি ফুলকে।

ফুল সারা বছরই ফোটে। সব ফুল নয়। ঋতু ভেদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের সমারোহ ঘটে। সাধারণত বসন্ত কালকে আমরা আমাদের দেশের ফুলের সময় বলে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বসন্ত অপেক্ষা শীতেই সর্বাধিক ফুল দেখা যায়। নানা রঙের নানা জাতের নানা নামের। আজকাল ফুলের মরশুম বলতে শীতকালকেই বোঝায়। এ সময়ের ফুলকে তাই আমরা আদর করে বলি মরশুমি ফুল। এরা শীতেই ফোটে। শীতের সঙ্গে সঙ্গে এরাও বিদায় নেয়—একটি বছরের জন্য।

*

কৃষ্ণকলি (দক্ষিণ আমেরিকার ফুল), কুন্দ, বেল, জুঁই, গোলাপ, গাঁদা অতসী, পলাশ, মন্দার; বক কাঞ্চন অশোক—এরা তো আমাদের বহু পরিচিত ফুল। নামে, রূপে, গন্ধে। এরা কি আমাদের কাছে ভিন-দেশী? আজ আর তা ভাবা যায় না। চাই-ও না ভাবতে। এরা আমাদের কাছে দেশীয় হয়ে গেছে। থাকবেও। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা—এরা? এরাও তো আজ আমাদের দেশীয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে আমাদের মন-প্রাণ ও রুচির সঙ্গে এরা একাত্ম হয়ে গেছে। এরা আবার আমাদের সামাজিক কৌলীন্যের মাপকাঠিও বটে।

শীতের ফুল এতেই শেষ নয়।

আরও আছে। অজস্র আছে। কত তাদের নাম—চেনাঅচেনায় মেশানো। ফুলগুলো বহু চেনা। কিন্তু সবার নামগুলো ঠিক ঠিক চেনা নয়। একে বিদেশী, তায় খটমটে। সময় লাগবে খানিকটা, তারপর সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

সীজন ফুল বলতেই যাদের কথা মনে পড়ে, যাদের ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে তাদের মধ্যে—ডোম্বারা, স্কলজিয়া (ক্যালিফর্ণিয়ান পপি, ক্যালিফর্ণিয়ার ফুল), আসটার, ফ্লক্স, নাসটেসীয়াম, ভারবেনা, পিটোনীয়া, ডায়েনথাস, কারণেসান, অ্যানটারহেনাম, লাক্সবার, ক্লার্কিয়া, সলভিয়া (বা জিফসোফালিয়া,)—এমনি আরও কত নামের ফুল রয়েছে। এ-ছাড়াও আছে আরও কত রকমের 'রেয়ার' ফুল। যেমন—সিনেরেরিয়া, সোলেমান • জেসমিনয়েডিজ, কার্ণেসান, ডেসার্ট-পী বা ক্লায়েনথাস, প্যানজি, ট্যাবেবুইয়া, মুসেন্ডা ফিলিপিকা প্রভৃতি। আরও আছে, ব্রাউনিয়া, আমহার্টসিয়া ইত্যাদি। আর আছে 'ক্যামেলিয়া'—(রবীন্দ্রনাথের ক্যামেলিয়া ও সাঁওতাল যুবতীর কথা মনে পড়ে গেল)।

*

আমাদের এখানে যেমন কুন্দ, দার্জিলিং-এ তেমনি সোলেনাম জেসমিন-য়েডিজ। এরা দুজনেই লতাগাছের ফুল। বোটানিক্যাল গার্ডেনের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কুন্দ ফুলের ঝোপ চোখে পড়ল। ছোট ছোট সাদা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে। কুঁড়ি দেখে জুঁই-এর কথা মনে পড়ে যায়। সুগন্ধি ফুল কুন্দ। কিন্তু এখানে সোলেনাম জেসমিনয়েডিজকে দেখবো ঠিক আশা করিনি। একে এখানে বিশেষ দেখা যায় না। প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এর বাসস্থান দার্জিলিং—তা থেকেই বোঝা যায় যে, এ শীতের ফুল। বোটানিকসের নার্সারিতে দেখলাম একটি সোলেনামকে যত্নের সঙ্গে লালন করছেন। ফুলও এসেছে তাতে। সাদা রঙের ছোট ছোট ফুল।

ফিলিপাইন থেকে আগত এদেশের দুষ্প্রাপ্য অতিথি মুসেন্ডা ফিলিপিকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে ফুটতে সুরু করে। আর শেষ শীতে ঝরে যায়। ঐ সময়ে কমলা রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরে ওঠে গাছ। এর সঙ্গে আছে গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকার লাল মুসেন্ডা।

অস্ট্রেলিয়ার 'ডেসার্ট-পী' বা 'ক্লায়েন-থাস'ও দুষ্প্রাপ্য ফুল। লাল রঙের বড় বড় ফুল হয়। ফুলের তলার অংশটা সিঁদুরে রঙের—খানিকটা ভোজালির মতো দেখতে। গাছ ফুল মিলিয়ে কতকটা আভিজাত্যিক চেহারা বলা যায়।

বিদেশী ফুলের মধ্যে সর্বাধিক অ্যারিসটোক্র্যাট হলো কার্নেসান। জার্মানীতে এ ফুল জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে। এও দুষ্প্রাপ্য।

ক্রিশমাসের সময় ফুলে ফুলে ভরে ওঠে ট্যাবেবুইয়া রোজিয়া। বড় বড় গাছ। এর নিবাস দক্ষিণ আমেরিকা।

এ-সময়ের মরশুমি ফুলের মধ্যে সব থেকে বিলাসী ও স্পর্শকাতুরে হলো

ক্যামেলিয়া

কাঞ্চন

সিনেরেরিয়া। এ ফুল সকলে করতে পারে না। তাপমাত্রার তারতম্য হলেই বেচারী কাতর হয়ে পড়ে। কিন্তু ফুল একবার ফুটলে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। শীতে এরা বহাল তবিয়তে থাকে। কিন্তু একটু গরম লাগলেই, তাপ পেলেই ব্যস্। অমনি নেতিয়ে পড়ে পাতা। তাই খুব যত্নে চাষ ও লালন করতে হয় সিনেরেরিয়াকে। দুষ্প্রাপ্য এই ফুল

পিটোনিয়া

দেখার সৌভাগ্য হলো বোটানিক্যাল গার্ডেনের নার্সারীতে।

এখানে আর একটা শীতের দুষ্প্রাপ্য মরশুমি ফুল দেখলাম—'নাগলিঙ্গম'। এর অপর নাম 'শিবলিঙ্গম' ও 'অনন্তশয্যা'। লাল আবরণের মাঝখানে সাদা ফুল। দেখলে মনে হয় অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন বিষ্ণু। যেমন রূপ তেমনি তার গন্ধ।

সবথেকে আকর্ষণীয় হয়েছে গাঁদা আর ডালিয়া। সংখ্যায় প্রচুর, আকৃতিতেও বিরাট। এত বড় আকারের ডালিয়া ও গাঁদা সচরাচর চোখে পড়ে না।

প্রসঙ্গত ডালিয়া সম্পর্কে জানা গেল : অধ্যাপক অ্যানড্রিয়াস ডাল নামে জনৈক সুইডেনবাসীর নামে এর নাম হয়েছে 'ডালিয়া'। সম্ভবত আমেরিকাতে ডালিয়ার চাষ বিস্তৃতি লাভ করে এবং লাভজনক কৃষি বলে বিবেচিত হয়। সেখান থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে হল্যাণ্ডে ডালিয়া চাষ উল্লেখ্য কৃষিতে পরিণত হয়েছে বলে শোনা গেল।

যে গোলাপ নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অন্ত থাকে না, তা হলো মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসী। ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়াতেও এদের পূর্বপুরুষদের দেখতে পাওয়া যায়।

আর এক রকমের ফুল আছে লতায় হয়। নাম তার 'সুইট-পী'। খুব সুগন্ধি। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ফোটে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুকিয়ে যায়।

শীতের মরশুমে সাধারণত লাল আর হলুদ রঙের ফুলেরই আধিক্য দেখা যায়।

সবথেকে কম দেখা যায় গাঢ় নীল রঙের ফুল। সাদা রঙের ফুলও দেখা যায় বটে, তবে খুব কম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাদার সঙ্গে অন্যান্য রঙও মিশে থাকে। তবে রঙবাহারে শীতের ফুলকে হার মানানো খুবই কষ্টকর। সূর্যের সাতটা রঙ তো থাকেই। আর তার সঙ্গে চোখে পড়ে ঐ সাতটি রঙের মিশ্রিত বিভিন্ন রূপ। একই ফুলের মধ্যে আবার বহু রঙের ছোপও দৃষ্টি এড়ায় না। আবার কোথাও একই রঙের গাঢ় ও হালকার ছোপ মনোরমা হয়ে ওঠে। একই ফুলের কত রকম ভিন্ন ভিন্ন রঙ্ দেখা যায়।

এই সময় যে সব রঙের প্রাধান্য দেখা যায় তার মধ্যে : লাল, হলুদ, বেগুনি, গোলাপি, কমলা, ইঁটে রঙ, সিঁদুরে রঙ, মেরুন, নীল, সাদা, গাঢ় লাল, কালোর ছোপ দেওয়া গাঢ় লাল—এমনি কত।

এই সব ফুলের বীজ সাধারণত বিদেশ থেকে আনাতে হয়। এখানে বীজ তৈরী ও তার সংরক্ষণ তেমন সুবিধাজনক হয় না। তার জন্য প্রতি বছর বহু টাকা ব্যয় হয়। তার সঙ্গে ফুলের চাষ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচও আছে।

এই সব বীজ আগে ইউরোপ থেকেই বেশির ভাগ আনানো হতো। এখনো বেশির ভাগ আসে আমেরিকা থেকে।

এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে শীতের দেশের, নানা রকম ফুলের নমুনার সঙ্গে পরিচয় হয়। সহজ প্রাপ্যের সঙ্গে দুষ্প্রাপ্য অনেক ফুলও দেখা যায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে এলে।

লক্ষণীয় : এই সময়ের যেগুলিকে আমরা মরশুমি ফুল বলি তাদের প্রায় সকলেরই রূপ ও বর্ণ থাকলেও গন্ধ নেই একদম। এবং আমাদের যত উচ্ছ্বাস-আবেগ সবই এই বিদেশী ফুলদেরই নিয়ে। এর জন্য বিদেশের প্রতি আমাদের মোহ দায়ী, না সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ? বলা একটু কঠিন, অন্তত চিন্তাসাপেক্ষ। তবে সৌন্দর্য-বোধ যে এর প্রায় অনেকটা জুড়ে রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর সেই জন্যেই একটা কথা উল্লেখ করা বোধ হয় আমাদের খুব ভুল হবে না যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় অনেক রকমের দেশী ও জংলি ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছর ফুলের খাতে যে পরিমাণ অর্থ আমাদের ব্যয় হয় (যার সবটাই প্রায় বিদেশী ফুলের জন্য) তার থেকে ঐ সব নামহীন অখ্যাত দেশী ফুলের জন্য কিছু ব্যয় করা যায় না কি? কেবল অবহেলা করে তাদের দূরে সরিয়ে না রেখে উপযুক্ত কৃষি ব্যবস্থার সাহায্যে তাদের সামাজিক মর্যাদা দিলে বোধ হয় কোন ভুল হবে না। বরং এই ফুলের মেলায় আমাদের নিজস্ব ভূমিকা গৌরবেরই বিষয় হয়ে থাকবে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের অভাবের দিকে সচেতন দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। তা হলো ফুল ও ফুল চাষ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বই-এর প্রকাশ। এ বিষয়ে ইংরাজীতে ফুলের ইতিহাসও আমাদের তেমন জানা নেই। সে সম্পর্কেও কিছু বই লেখার প্রয়োজন আছে।

*

মনের আনন্দে ফুলের মেলায় বেড়াতে বেড়াতে থমকে যেতে হলো।

সুসেন্তা ফিলিপিকা

কারা যেন ফুল ছিঁড়েছে। শুধু ফুল নয় ফুলের গাছও। এটা খুবই দুঃখের কথা। গাছে ফুলের যে সৌন্দর্য, তা গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে আর তেমনটি থাকে না। একটি ফুলের জন্যে যে পরিশ্রম যে প্রতীক্ষা তাকে এমনি করে আঘাত দিলে কার না লাগে! কিন্তু এক এক সময় এক এক মানুষের রুচি এমন বিকৃত হয়ে ওঠে যে, সাজান জিনিসকে তছনছ না করে যেন তৃপ্তি পায় না। যে ফুল দেখতে আরও হাজার হাজার দর্শক আসছে তা ছিঁড়ে নেওয়া বা নষ্ট করা কী কোন সুরুচির পরিচয়? যে ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে সুন্দর করে, সুযোগ পেলেই তাকে ছিঁড়ে নেওয়া কেন? এতটুকুও কি লোভ সম্বরণ করতে পারি না আমরা? জানি না, ফুলের আকর্ষণী শক্তির এ-ও আর এক ধরণের পরিচয় কিনা!

ডালিয়া

আত্মচরিতে সমাজচিত্র (২)

শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা | দক্ষিণারঞ্জন বসু

গীতায় ভারত-রূপ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা সুদীর্ঘকাল ধরেই সর্বত্র স্বীকৃত। এই গীতাকে আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা বলে মেনে নিই তাহলে মহাভারতের সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের প্রতিচ্ছবি আমাদের কাছে অনেকখানি স্পষ্ট ও সত্য হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গীতাকথন মহর্ষি বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতেরই একটি অংশ, তার ভীষ্ম পর্বের বর্ণনা থেকে গৃহীত। সেরূপ বিচারে মহাভারতেরই প্রাচীনতার সমতুল গীতার প্রাচীনত্ব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দিয়েই আমরা মহাভারতের কাল নির্ণয় করতে পারি। তখনকার যুগে দিনক্ষণ নির্ধারণের একালের মত সুব্যবস্থা ছিল না। তাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময় নিয়ে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের মতামত আলোচনায় মোটামুটি এরূপ একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খৃষ্টজন্মের আড়াই হাজার বছরেরও কিছু বেশী আগে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ঐ ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তা থেকেই ধরে নেওয়া চলে যে, গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা থেকে আমরা আনুমানিক সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারি।

ভক্তজনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অষ্টম অবতারই হোন আর বিংশ অবতারই হোন তা' আমাদের আলোচ্য নয়, তিনি এখানে বিচার্য সেকালের অতুলনীয় কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদ এক মহাজ্ঞানী ঐতিহাসিক পুরুষরূপে এবং ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম আত্মচরিতকার হিসাবে। অতুলনীয় জ্ঞান-বৈভব ও ধর্মাধর্মের অসামান্য বিশ্লেষণের আধার বলেই পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি প্রধান প্রধান ভাষায় এ পর্যন্ত গীতার তিন হাজারের মত পৃথক পৃথক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, শুধুমাত্র হিন্দু জনসাধারণের কাছেই নয়, অমূল্য ভাবসম্পদে পূর্ণ এক উদার সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতা সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের জ্ঞানী মহলেই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

তত্ত্বপিপাসু খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষই যে গীতার গুরুত্ব স্বীকার করে আসছেন নির্দ্বিধায় তা বলা যেতে পারে। মোগল সম্রাট শাহজাহানের দার্শনিক পুত্র দারাশিকো গীতাকে স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস'রূপে বর্ণনা করে বলেছেন যে, গীতায় পরমপুরুষের কথা বিবৃত এবং সেখানে পরমসত্য লাভের সুগম পথ প্রদর্শিত। প্রায় দু'শ বছর আগে ইংরেজ মনীষী চার্লস উইলকিন্স গীতার যে ইংরেজী অনুবাদ করেন তার ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং বৃটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। ভূমিকায় হেস্টিংস সাহেব গীতাকে বিশ্ব-সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব বিস্ময় বলেই ক্ষান্ত হন নি, 'গীতাধর্মের অনুশীলনে মনুষ্য-সমাজ শান্তিধামের অধিবাসী হবে' বলেও মন্তব্য করেছেন। এর পরে আর অন্য কারো মতামতের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে গীতা কীভাবে পরমপুরুষের আত্মকথা এবং কী সেই সব কথা যার মাধ্যমে আমরা সেই সুপ্রাচীন ভারত-সমাজের রূপ অনুধাবন করতে পারি এখানে সে সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

গীতাকে শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে এই জন্যে যে, গীতায় বর্ণিত অধিকাংশ শ্লোকই তাঁর শ্রীমুখ-নিসৃত বাণী। চলতি গীতাসমূহের মোট শ্লোক-সংখ্যা সাতশ'। কিন্তু নানা সূত্রের বিচারে এরূপ স্থির হয়েছে যে, মূলত গীতার শ্লোক-সংখ্যা ছিল সাতশ' পঁয়তাল্লিশ এবং তার মধ্যে ছয়শ' কুড়িটিই হল শ্রীকৃষ্ণকথিত বাণী। গীতাকে তাই শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা বললে নিশ্চয়ই ভুল বলা হয় না।

কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে জ্ঞাতি ও স্বজন বিনাশের আশংকায় বিচলিত সখা অর্জুন যখন নিরুদ্যম এবং পুরোপুরি যুদ্ধ-নিবৃত্ত হবার জন্যে ব্যগ্র সেই সময় ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বহু অমূল্য উপদেশ দিয়ে উদ্দীপ্ত করেছিলেন এবং শেষে আপন বিশ্বরূপ দেখিয়ে তাঁর মোহজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। সে সব উপদেশ থেকেই নিষ্কাম কর্মযোগের শিক্ষা পেয়েছিলেন অর্জুন এবং আত্মার যে মৃত্যু নেই ও অন্যায়কারী আত্মীয় হননের দায় যে ন্যায়-যোদ্ধাকে বইতে হয় না, বরং ন্যায়ের ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে তেমন যুদ্ধ করে যাওয়াই যে প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি সবিশেষ হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হয়েছিলেন।

ধর্মযুদ্ধ-বিজয়ের যে গৌরব পাণ্ডব-পক্ষ অর্জন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তার মূলে ছিল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের এই পরম জ্ঞানোদয়। গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের নানা বাণী থেকে এমনিভাবেই আমরা সে সময়কার ভারতীয় সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধের পরিচয় পাই এবং সেই সুপ্রাচীন হিন্দুসমাজ যে অবতারবাদে গভীর আস্থা পোষণ করতো তার এক প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন ঘটনাটি।

স্বভাবজ গুণের ভিত্তিতে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ ব্যবস্থা। মহাভারতের যুগে যে তেমনি ব্যবস্থাই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল গীতায় তার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। গুণানুযায়ী কর্মবিভাগ করে দিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন বলে গীতায় নিজমুখে ঘোষণা করেছেন। জন্মগতভাবে নয়, স্বভাবসিদ্ধ কর্মে আত্মনিয়োগের দ্বারাই যে সে-যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের শ্রেণী নির্ধারিত হতো, এ ঘোষণাই তার প্রমাণ। সাড়ে চার হাজার বছর আগে ভারতীয় জনসমাজ যে এমনিভাবে গুণগত ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত ছিল, আজকের দিনে তা ভাবতেও অবাক লাগে।

আরো আশ্চর্যের বিষয়, ধর্মাধর্ম বিশ্লেষণের মতো করেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ খাদ্যাখাদ্য বিচারধারা নির্ধারণ করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে প্রকৃতিভেদে খাদ্য নির্ণীত হয়ে থাকে বা খাদ্য-বিচারে কী করে মানুষের প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় দেখা যায়, সাত্ত্বিক লোকেরা সুসার ও সুরুচিকর খাদ্য গ্রহণ করেন, রাজসিক শ্রেণীর প্রিয় খাদ্য টক ঝাল ও অতি উষ্ণ রুক্ষ খাদ্য এবং তামসিকেরা শুকনো বাসী ও দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট খেয়েই খুশি। এ থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, একালের মতোই তখনকার দিনেও খাওয়ার ব্যাপারে নানা রুচিরই মানুষ ছিল।

প্রকৃতি ভেদে আহারের কথা যেমনি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ঠিক তেমনি দান-ধ্যান-যজ্ঞাদির ব্যাপারেও তিনি পার্থক্য আরোপ করেছেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় আলোচনায় দেখা যাবে যে সেখানে তিন প্রকারের জ্ঞান, কর্ম, কর্তা প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে এবং সুখেরও তিনটি অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা চির-সত্য রূপেই প্রতিভাত যদিও সে-যুগের পরিবেশ দৃষ্টেই তিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখের অমনি বিশ্লেষণ করে-ছিলেন।

সাধনার ক্ষেত্রেও রুচিবৈচিত্র্যকে শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর কালেও এই দেশে নানা পূজা-পদ্ধতি ও সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিভেদে মানুষ পূজানুষ্ঠান করে থাকে—সাত্ত্বিক লোকদের দেবতা অর্চনা, রাজসিকদের যক্ষরক্ষাদি বন্দনা এবং তামসিকদের ভূতপ্রেত পূজার রীতিকে মেনে নিয়েই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যেভাবে এবং যে-পথেই উপাসনা করা হোক না কেন তা যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই উপাসনা, সে কথাই

গীতায় বলা হয়েছে এবং ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারেও নানা মত ও পথের স্বাধীনতা এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার সঙ্গে অধিকার-ভেদ স্বীকৃত হয়েছে।

এমনিভাবেই নানাদিক থেকে গীতায় প্রাচীন ভারতের সমাজ-রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এক-এক বিশ্বাসের মানুষ এক-একভাবে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে বিভিন্ন ভাষ্যকারের মতানুযায়ী গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণ-কথার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে।

বিভিন্ন শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন সেখানেই তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে অভিহিত করেছেন। পরিষ্কারভাবেই তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই সব কিছু। একস্থানে অর্জুনকে বলেছেন, 'আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ,......আমিই সৃষ্টিকর্তা, স্থিতিকর্তা ও লয়কর্তা; আমিই অবিনাশী বীজ।' চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টভাষায় তিনি বলেছেন, 'আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মমায়ায় আবির্ভূত হই।' এরপরের সুবিখ্যাত শ্লোকেই রয়েছে, পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি ঘটলে ও অধর্মের অভ্যুত্থান সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁকে দুষ্টের দমনে ও সাধু রক্ষায় আত্মপ্রকাশ করতে হয়।

এসবই অবতারবাদের কথা। কিন্তু গীতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার শংকরাচার্য অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর গীতা ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের ও মায়াবাদভিত্তিক। হিন্দুভারত সাধারণ-ভাবে ঈশ্বরের অবতারবাদে গভীর আস্থা-শীল বলেই রামানুজ প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে সমগ্র হিন্দুজাতি গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত উপদেশকে ঈশ্বরের নির্দেশ বলে হাজার হাজার বছর ধরে মনে করে আসছে।

বিশেষ করে গীতার দশম অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সেনানীগণের মধ্যে নিজেকে স্কন্দ বা কার্তিকেয় বলে অভিহিত করেছেন, অন্যত্র প্রজা সৃষ্টির কারণস্বরূপ নিজেকে কাম বা কন্দর্প বলে ঘোষণা করেছেন। পার্বতী-মহেশ্বরের মিলনে তারকাসুর নিধনে ও স্বর্গোদ্ধারে যেমন কার্তিকেয়র জন্ম তেমন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে মহতের সৃষ্টি হয়ে থাকে মহামিলনের ফলে। শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কাম-বর্জনের কথা বলেন নি, কারণ সৃষ্টি ও সমাজ রক্ষার জন্যে কামের প্রয়োজন আছে এবং সেইজন্যেই ঈশ্বর যে শুধুমাত্র পুরুষ নন, তিনি স্ত্রী দেবতাও, সে কথাও তিনি গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলেছেন। 'আমি সর্বজীবের সংহারক, ভাবী প্রাণীদের আমি উৎপত্তিকারণ এবং নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা-রূপে সপ্ত স্ত্রী-দেবতা।' সর্বব্যাপী সর্ব-শক্তিমান সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে ভারতীয় জনসাধারণের জন্যে যে নির্দেশাবলী দিয়ে গিয়েছেন অনন্তকাল ধরে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

কিন্তু কী তাঁর মূল নির্দেশ? 'মামনুস্মর যুধ্যচ।' অর্থাৎ 'আমাকে ধ্যান কর আর যুদ্ধ করে যাও।' সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে যাওয়াই তো নিষ্কাম ধর্ম। সেই নিষ্কাম ধর্মেরই মূল প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ এবং গীতারূপ আত্মকথাই তাঁর প্রচার যন্ত্র। সেই আত্মকথায় জীবনাচরণ-পদ্ধতির যে নির্দেশনামা রয়েছে অনেকাংশে সেই সুপ্রাচীন জীবনধারাই আজও পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে ভারতীয় হিন্দু-সমাজে এবং নিঃসন্দেহই বলা যায় যে আরো বহু বহুকাল ধরে ঐ একই পুরনো ধারা এ দেশের সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করতে থাকবে।

বেদে অবতারবাদ ব্যক্ত না হলেও মহা-ভারতের যুগ থেকে ভক্তিধর্মের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গীতায় বর্ণিত অবতারত্বে মানুষের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে থাকে। আর এ ধারণা বা বিশ্বাস থেকেই হিন্দুসমাজে এমন একটা বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে যে মানুষের দেবত্ব লাভের পথকে সুগম করে দেবার জন্যেই স্বয়ং ভগবান মানুষ রূপে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। এ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনোরূপ তর্ক না তুলে নির্বিবাদেই বলা যায় যে, অবতারবাদে এরূপ আস্থাকে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় জাতিই সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজের পক্ষে কল্যাণের বলেই মনে করে আসছে। এবং এই কারণেই প্রধান প্রধান প্রায় সব ধর্মবিশ্বাসেই এর প্রশ্রয়ও লক্ষ্য করা যায়।

সে যাই হোক নিষ্কাম কর্মসাধনাই গীতার মূল কথা যদিও যুগে যুগে ভারত-মনীষীরা বিভিন্নভাবে গীতার ব্যাখ্যা করে এসেছেন। শংকরাচার্য বা রামানুজের পরে আমরা এ সম্পর্কে শংকরপন্থী মহা-পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ ভাষ্য-কারদের স্মরণ করতে পারি। তবে আধুনিক ভারতের তিন মহানায়ক শ্রীঅরবিন্দ, তিলক মহারাজ এবং মহাত্মা গান্ধী পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গীতার যে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাষ্য রচনা করেছেন তার প্রত্যেকটিই অভিনব এবং একালের মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সর্বজনহিতে অনাসক্ত হয়ে কর্মসাধনাই গীতার মূল বাণী এবং তাকে অবলম্বন করেই শ্রীঅরবিন্দ সর্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে কর্মমুখে জ্ঞানের মাধ্যমে ভক্তিবাদকেই মোক্ষলাভের পরমপথ বলে অভিহিত করেছেন তাঁর গীতাভাষ্যে। তাকেই তিনি বলেছেন আত্মসমর্পণ-যোগ। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমযোগের বর্ণনা রয়েছে। তাকে ভিত্তি করেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গীতাদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ মতে জীব ও জগৎ ক্ষর-পুরুষ আর কূটস্থা প্রকৃতি অক্ষর-পুরুষ এবং এই দুইয়ের অতীত যে ঈশ্বর তিনিই পুরু-ষোত্তম। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'শাস্ত্রে পরমাত্মাই পুরু-ষোত্তম নামে বর্ণিত এবং সেই পরমাত্মা এই বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত।'

তিলক মহারাজ এবং মহাত্মা গান্ধী উভয়েই গীতা ব্যাখ্যায় কর্মযোগের পথকে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু কারাবাসকালে রচিত তিলকের 'গীতা-রহস্য' এবং গান্ধীজীর গীতাভাষ্যে 'অনাসক্তিযোগ' সম্পূর্ণ পৃথক ভাবধারায় বিশ্লেষিত। তিলকের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ মোহগ্রস্ত মহাকর্মী বীর অর্জুনকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে কর্ম থেকে কখনো দূরে থাকা সম্ভব নয় এবং কর্তব্য ত্যাগ সঙ্গতও নয়, আর জ্ঞানভিত্তিক ভক্তিমূলক কর্মসাধনাই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ পথ। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে শ্রীভগবান তাই অর্জুনকে বলছেন, 'সদা অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য করে যাও। অনাসক্ত কর্ম সম্পন্ন মানুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়।' নিষ্কাম কর্ম যোগের মাধ্যমে মুক্তিলাভের উপায় এভাবে

গীতায় বর্ণিত হয়েছে। তারপরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে জ্ঞানযোগের সাহায্যে ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে ও সর্বদা সর্বজনের কল্যাণে রত থেকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেও যে মোক্ষলাভ ঘটে তার কথা বলা হয়েছে। মোক্ষ অর্জুনে ভক্তিযোগের প্রশস্ত পথের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীভগবান একাদশ অধ্যায়ের চতুর্পঞ্চাশৎ শ্লোকে। সেখানে তিনি বলেছেন যে শুধু-মাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই ঈশ্বরলাভ ও ঈশ্বরে বিলীন হওয়া সম্ভব। এই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের সমন্বিত পথকেই বাল-গঙ্গাধর তিলক মুক্তির সেরা পথরূপে বেছে নিয়েছিলেন।

গান্ধীভাষ্যেও এই কর্মযোগই সমর্থিত, তবে অহিংসার ঋষি মহাত্মা গান্ধী কুরু-ক্ষেত্রের সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে মেনে নিতে পারেননি, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন একটি রূপক রূপে। কী সেই রূপক? তাঁর মতে হৃদয়ক্ষেত্রই আসলে কুরুক্ষেত্র। মানবদেহ সেখানে রথ, অর্জুন রথী, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব-স্বরূপে এবং মন তার লাগাম। সেই হৃদয়ক্ষেত্রে দৈবী প্রবৃত্তি ও আসুরী প্রবৃত্তির অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় দুই পক্ষের সমাবেশ ঘটে। এই ন্যায় বা দৈবী পক্ষই পাণ্ডব পক্ষ এবং অন্যায় বা আসুরী পক্ষই কুরুপক্ষ। হৃদয়স্থ এই ন্যায়-অন্যায় বোধের সংগ্রামকেই গান্ধীজী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন এবং গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সারমর্মকে গ্রহণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'সেবাই জীবনের লক্ষ্য, ভোগ নয়'—সুতরাং মোক্ষের প্রকৃষ্ট পথ যে কর্মযোগ, জীবনকে সেবাযজ্ঞময় করে তোলার মধ্যেই তার প্রকাশ। অনাসক্ত সেবাকর্মের যোগসাধনায় জনগণকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী 'অনাসক্তিযোগ' নামে এই অভিনব গীতা-ভাষ্য রচনা করেছেন।

মোক্ষলাভের আরেকটি পথ রাজযোগ এবং সে পথের নির্দেশ রয়েছে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ শ্লোকে। তাতে বলা হয়েছে যে বাহ্য বিষয় থেকে মন সরিয়ে ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রেখে নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করে এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমে ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মুনি কালাতি-পাত করেন তিনিও জীবন্মুক্ত।

কিন্তু এ হলো জনসমাজ ও গৃহস্থ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মুনিঋষিদের তপঃ-সাধনার ব্যাপার। তাই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ, তিলক মহারাজ ও মহাত্মা গান্ধীর গীতাভাষ্যে রাজযোগ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা নেই।

যাই হোক, এসবই হলো বিভিন্ন গীতা-ভাষ্যের কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আত্মকথা এই গীতার আলোয় আমরা যদি মূল মহা-ভারতকে বিশ্লেষণ করি তাহলে মহা-ভারতীয় যুগের ভারতসমাজের রূপ আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে উক্ত অর্জুনের যে প্রশ্ন থেকে শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-কথন শুরু এবং যে কারণ দেখিয়ে গাণ্ডীবধারী তৃতীয় পাণ্ডব ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকার্ত হয়ে রথে বসে পড়ছিলেন সেই শ্লোক কয়টির মধ্যেই তখনকার একটা সমাজকাঠামো আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যুদ্ধে নিবৃত্ত হবার জন্যে সারথি কৃষ্ণকে বিপক্ষের দিকে সঙ্কেত করে অর্জুন বলছেন, 'যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয়জনিত অপরাধ ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখছেন না, কিন্তু হে জনার্দন, বংশনাশের দোষ বুঝতে পেরেও আমরা কেন এই পাপ কাজে নিবৃত্ত থাকবো না?' এরপরেই অর্জুন বলেছেন, 'কুলনাশে অনুষ্ঠাতার অভাবে চিরাচরিত কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে সমগ্র কুলকে অনাচার ও অধর্মে অভিভূত হতে হয়।' কী পরিণতি ঘটে তার? সে বর্ণনাও পাই আমরা অর্জুন মুখে। তিনি বলেছেন, 'অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুললক্ষ্মীরা দুষ্টা হয়ে যায় এবং তখনই বর্ণসংকর সৃষ্টি হয়।'

আপন অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞান থেকেই যে অর্জুন এসব কথা তাঁর সখা-সারথিকে বলে থাকবেন এবং 'কুলনাশকরূপে নিরন্তর নরকবাসে'র ভয়ে সংগ্রাম-বিমুখ হয়ে থাকবেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্জুনের প্রশ্ন এবং তাঁর নিষ্ক্রিয়ভাবের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে দেবস্বভাব ও অসুর-স্বভাব মানুষের সৃষ্টির কথা বলেছেন। এই উভয় শ্রেণীর মানুষেরই বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে গীতায় এবং এই উভয় শ্রেণীর মানুষের কার্যকলাপের ও চরিত্রের পরিচয়ও রয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে পঞ্চ-পাণ্ডব ছাড়াও ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ ও গান্ধারী প্রমুখ সজ্জনের যেমন অভাব ছিল না মহা-ভারতীয় যুগের ভারতবর্ষে তেমনি শকুনি, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি-সহ দুর্যোধনাদি ক্রূরকর্মা ও আসুরপ্রকৃতির দুর্জনও ছিল দেশের সর্বত্র। একালের মতো সেকালেও ভারতে চৌর্যবৃত্তি ও দস্যুতা ছিল, বর্ণসংকর ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনানুযায়ী তখনও দেশে এমন সব লোক ছিল যারা মনে করতো 'এই জগৎ সত্যশূন্য ও ধর্মাধর্মের ব্যবস্থা-হীন' এবং যাদের কাছে 'কাম ভোগই ছিল জীবনের পরম পুরুষার্থ'... আর যারা 'কাম-ক্রোধের অধীন হয়ে বিষয়ভোগের জন্যে আমৃত্যু অসদুপায়ে অর্থসম্পদ সংগ্রহে সচেষ্ট থাকতো।' তখনো সমাজে বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই বহু-বিবাহের প্রচলন ছিল; সেকালেও পাশা বা জুয়াখেলার রেওয়াজ ছিল; সহমরণও যেমন চলতো, অনেক নারী আবার বৈধব্য-জীবনও যাপন করতো।

গীতায় তৎকালীন সামাজিক উদারতার আরেকটি দৃষ্টান্তের দিকে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। নীচকুলোদ্ভব, পতিত বা স্ত্রীলোক বলেই তারা উপেক্ষণীয় এবং তাদের উদ্ধারপথ নেই, একথা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যায়ের চারটি (৩০-৩৩) শ্লোকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, নিতান্ত দুরাচারও যদি অনন্য মনে ঈশ্বরের ভজনা করে তা' হলে তাকে সাধু বলেই গণ্য করতে হবে, কারণ তার মধ্যে সাধু সংকল্প দেখা দিয়েছে। সেও শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে চিরশান্তি লাভ করবে। তারপরেই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যারা নীচ কুলোদ্ভব কিংবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র তারাও ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এ থেকেই বুঝা যায়, সে যুগে গুণগতভাবে ভারতে সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস থাকলেও কোনো শ্রেণীর মানুষকেই উপেক্ষা করা হতো না। এমনিভাবেই সবদিক থেকে গীতার বিচারে মহাভারতীয় যুগের ভারত-সমাজের বিশ্লেষণ করা চলে।

আর জ্ঞাতিবিরোধ? সেও তো চিরন্তন। লোভ এবং অবিশ্বাসের ফলেই তার সৃষ্টি। আর তারই পরিণতি যত সব যুদ্ধবিগ্রহ। ভূ-ভার হরণই যদি সব যুদ্ধের লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ অনুপ্রাণিত কুরুক্ষেত্র-সমর তবে জ্ঞাতি-বিরোধ ও যুদ্ধের এক চূড়ান্ত রূপ। গীতার শিক্ষাও তাই শাশ্বত।

পানের দোকানের আয়নায়॥

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আশ্চর্যতম কথা আমার ঘুণ-ধরা জীবনের : ভাষা যে হারিয়ে ফেলেছি একদিন, অনেক দিন, তা ভেবে আর আশ্চর্যও হই না। প্রাণের যাদুমন্ত্রে আর কিছুকেই, কাউকেই, না পেরে ছুঁতে, নিজেকে ছোঁওয়াতে, অবাধ্য আক্রোশে আমার চারিপাশে কেবলি বস্তুপিণ্ড জড়ো হয়, যার অন্যতম এ-অধম—বিনয়টাও শুধু লোক-দেখানো, উদ্ধত — স্বয়ং।

ফিটফাট কোট-প্যাণ্টে, মুখে খই-ফোটা কাফকা-কামুতে, অসভ্য সভ্যতার ধোপে দুরন্ত আমি এক দুরন্ত গোঁয়ার গাধা, বাচাল—ঝকঝকে চকচকে, অপূর্ব অমানুষ। কিছুই বুঝিনি।

সেদিনকার ঘটনাটা তাই ভারী অদ্ভুত, রেস্তোরাঁয়। কাঁটা-চামচের পালা শেষ ক'রে বিল চুকিয়ে বকশিস দিয়ে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ নজরে পড়ে মেয়েটাকে, সাত-আট বছরের, কোণের টেবিলে। কেন, কোন অপরিচয়ের জগত হ'তে তার মা-বাবা এসেছে এখানে টাকা ওড়াতে, অপাপবিদ্ধ তাকেও এনেছে নিয়ে — কোন বিছেয় কামড়েছে তাদের! টেবিলটায়, ঘরের কারুকার্যে-কার্পেটে, তারা একখানি অসমান, বেমানান ছবি—এত কর্কশ, এত অপটু, বেসামাল।

তবু কী উল্লাস ছোট্ট মেয়েটার, গোগ্রাসে গিলছে, দুহাত দিয়ে মুরগীর ঠ্যাং ছিঁড়ছে। ঘরের অবরুদ্ধ বাষ্প সে হো-হো হেসে বার ক'রে দেয় হঠাৎ-হঠাৎ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে, পথে, পরে অনন্ত গগনে। চোখে তার কোথাকার কোন ধানখেত আন্দোলিত, ম্লান মাটির দূর-দুরান্ত ঘাসের — পবিত্রতার সে-দুটি যুঁই ফুল।

দাঁড়িয়ে পড়ি, কী-একটা বিদ্যুতে চিড়িং ক'রে ওঠে আমার অগম গহনের শিরা—ন'ড়ে-চ'ড়ে ওঠে সর্বত্রের খণ্ড খণ্ড বস্তুপিণ্ড, শুনি রক্ত-সঞ্চালন। ইচ্ছে হয়, ছুটে যাই ঐ নামহীনার কাছে, জড়িয়ে ধরি তার ছোট মুখটাকে — চিবুকটাকে, চুমুতে ভরাই নাক-গাল-কপাল, বলি : মা আমার, দেবী আমার, কতদিন মা ব'লে ডাকি নি তোমায়!

বলা বাহুল্য, বলিনি কিছুই, নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি আবার অসভ্য সভ্যতার রাস্তায়, পানের দোকানের আয়নায় দেখে ভাল লাগে, মুখের মুখোশটা ঠিক আছে। শুধু, মাঝে মাঝে, নিজেরি মনে- মনে সেই মা ব'লে ডাকার রেশটা এখনো অস্ফুটে বাজে, যদিও এ-মুহূর্তে মিলিয়ে এল ব'লে।

সাঁকো পার হলে॥

শান্তনু দাস

পরিচিত মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি...মৃদু শোনা যায়,
কখনো বাতাসে নড়ে মানতের দু-একটা খই...
কখনো আলসে ঘিরে কিছু ওড়ে শালিখ চড়ুই...
রসিকতা করে,
স্মৃতি খুঁটে খায়,
সময় এমনি ক'রে কোথায় মিলায় প্রিয়তমা
পায়ে পায়ে অন্যতম বাঁকে :

আমরা কখন যেন একে একে সাঁকো পার হ'য়ে
বিবর্ণ পথের ধারে ধূসরিত দেহে
আটচালা খুঁজি, সীমানা পেরিয়ে ভাঙা স্বরে
বেসুরো আওয়াজ ছুঁড়ে মারি
'কে আছো বন্ধ ঘরে, শেষ হল রাঙতার দিন
এখনো ভগ্নহাতে কড়া নাড়ি...জীর্ণ সাকিন
অথর্ব প্রহরে' :

দূরে আরও দূরে...
মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি মৃদু শোনা যায়
কখনো বাতাসে নড়ে মানতের দু-একটা খই
কখনো আলসে গায়ে কিছু ওড়ে শালিখ চড়ুই,
রসিকতা করে।
স্মৃতি ফোটে বিবর্ণ মাচায়।

বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রেড ইন্ডিয়ানদের দেবতাপ্রায় ডাক্তার স্যালভেটর এবং সী-ডেভিলের মধ্যে আশ্চর্য সংযোগের বিস্ময়কর কাহিনী আর স্যানিয়ার্ড জুবিটার সী-ডেভিল ধরবার প্রাণান্তকর প্রয়াস সমস্ত পাঠকমনকে স্তব্ধ করে রাখে। এ-কাহিনী শুধু সমুদ্রে ব্যাপ্ত নয়, এর পরিধি স্থলেও ছড়িয়ে আছে। সী-ডেভিল ইকথিয়েনডোরের রহস্য উন্মোচন ঘটবার পরও পাঠককে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়। গল্প মাত্র নয়, সমুদ্র সম্পর্কে বহু তথ্য এবং বিজ্ঞানের সংবাদ নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

'সমুদ্র শয়তান' হল 'দি অ্যামফিবিয়ানে'র বাংলা অনুবাদ। শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন নিজেও মৌলিক 'সায়ান্স ফিকশ্যান' রচনায় সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থখানি অনুবাদ করে বাংলাদেশের পাঠকসমাজ থেকে তিনি সাধুবাদ পাবেন। অনূদিত গ্রন্থখানি পড়বার সময় কোথাও থমকে দাঁড়াতে হবে না। মনে হবে বইখানি যেন মূলে বাংলাতে লেখা।

সমুদ্র শয়তান (আলেকজান্ডার বিলায়েভ রচিত দি অ্যামফিবিয়ানের অনুবাদ)—অদ্রীশ বর্ধন। অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস্‌। ৭৭-১, সারপেনটাইন লেন। কলকাতা—১৪। দাম চার টাকা।

একটি ব্যর্থ রচনা

'ঝরাপাতা' চারটি আখ্যানের সংকলন। একের সঙ্গে অন্যের কোন সম্পর্ক নেই। কেবল ঐ চারটি আখ্যানের সঙ্গে ক্ষীণ এক যোগসূত্র রেখেছেন কাহিনীর বক্তা—'সত্যযুগে'র রিপোর্টার নবীন। এ জাতীয় রচনাকে ঠিক কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়—তা বেশ চিন্তার বিষয়। না গল্প, না ডায়েরী, না কোন রিপোর্টাজ্‌ স্টোরী। কিছুটা ডায়েরী ধরণের বোধহয় বলা যায়, গল্পের উপকরণ আছে খুব সামান্য।

কাহিনীর বক্তা বা লেখক নিজেকে রিপোর্টার বলে পরিচয় দিলেও—কাহিনীর কোথাও রিপোর্টারের ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায় নি।

দার্জিলিং গিয়ে তিনি মুখুজ্জে গিন্নীর দাম্পত্য জীবনের যে পরিচয় ও সম্পর্ক জেনে লিপিবদ্ধ করেছেন, কিংবা ব্যারাকপুরের নটরাজদার যে কাহিনী তুলে ধরেছেন, কিংবা পুরীতে গিয়ে যে চিত্রতারকার কথা জেনেছেন, কিংবা আমতার নিকটবর্তী ভাতেঘরিতে যে হেডমাস্টার ও হেডমিসট্রেসের গল্প শুনিয়েছেন—সেগুলির জন্য বক্তা বা লেখক রিপোর্টার না হলেও চলতো। রিপোর্টারের ভূমিকায় অংশ নিয়ে লেখক পাঠকদের অতিরিক্ত কিছুই দিতে পারেন নি। এমন কি ঐ চারটি কাহিনীর মধ্যে কোন নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য কিছুই নেই। লেখার আঙ্গিক ও ভাষাও তেমন সুখপাঠ্য নয়। পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরে যায়।

ঝরাপাতা—শ্রীযোগীলাল হালদার, রামলাল পাবলিশিং হাউস; ১০৪বি, দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড; কলি—১৫। দাম—তিন টাকা।

ইতিহাসের পথ

শ্রীযুক্ত প্রেমময় দাশগুপ্ত বর্তমানে কটক প্রবাসী। তিনি অশেষ শ্রমসহকারে বৈদিক সাহিত্য, প্রাচীন লোকস্মৃতি, প্রাচীন অব্দাদি, বৈদিক তথ্যাদি, শিলালেখ, হিন্দু-পুরাণ স্মৃতি, বৌদ্ধ স্মৃতি, জৈন স্মৃতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমপঞ্জী রচনা করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ ও 'বিম্বিসার অশোক' ক্রমপঞ্জী তিনি যে আশ্চর্য অধ্যবসায় সহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন তা বিস্ময়কর। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ মেগাস্থেনিসের ভারত বিবরণের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্দেশ ও তার সঙ্গে বৃহত্তর যুগভিত্তিক পৌরাণিক কাল নির্দেশের ঐক্য সন্ধান করেছেন। সেই সূত্রে পৌরাণিক পঞ্জী ও ভারত বিবরণানুসারে চন্দ্রগুপ্তের সিংহনারোহণ তারিখ নির্ণয় করেছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মহাপদ্মনন্দের অভিষেক তারিখ। যুগবাদ ধাঁধার সমাধান প্রচেষ্টা আছে এই গ্রন্থে। বৈদিক যজ্ঞ-প্রথার সূচনা বা বৈবস্বত মনু থেকে পূর্যাক পর্যন্ত হিসাব করে তার বিধিসঙ্গত বিশ্লেষণ এবং যুক্তিসহকারে পরিবেশন বড় সহজ কর্ম নয়। শ্রীযুক্ত প্রেমময় দাশগুপ্ত সেই কর্ম করেছেন আশ্চর্য নিষ্ঠাসহকারে এবং সেই কারণে তিনি আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ তারিখ ও বিম্বিসার ও অশোক ক্রমপঞ্জী :
(ইতিহাস প্রসঙ্গ)—শ্রীপ্রেমময় দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক — সাহিত্য ভবন। দেওয়ান বাজার কটক-১। দাম—কুড়ি টাকা মাত্র।

●

প্রাপ্তি স্বীকার

শতাব্দী শেষের কবিতা (প্রথম খণ্ড)—পশ্চিমবঙ্গ লেখক সমবায় সংস্থা। এস বি গড়াই রোড, আসানসোল। বর্ধমান। মূল্য দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তিন চোখ সোনালী চাঁদ (কাব্যগ্রন্থ)—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দাম দু টাকা।

●

শুকনো বকুল (কাব্যগ্রন্থ)—নিত্যগোপাল সামন্ত। ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা-৯। মূল্য দু টাকা।

●

একাদশী (কাব্যগ্রন্থ)—সঞ্জীব চৌধুরী। মূল্য এক টাকা।

সড়ক সৌধ কানাগলি

রূপচাঁদপক্ষী

মনে পড়ছে, বছর পাঁচ-ছয় আগে সিংভূমের বনবাদাড়ে ঘুরতে-ঘুরতে একটা ও'রাও-গান শুনেছিলুম যার মানে, এক শোভা আরেক শোভাকে সহ্য করে না, একজন এলে অন্যজন সরে দাঁড়ায়, তাই ও যখন বনের মধ্যে এসে ঢুকলো—এতো যে গাছ-গাছালি, পাতাপত্তর, নীল-হলুদ ফুল-ফল সব তুচ্ছ হয়ে গেলো, যেমন মাদার ফুটলে বনের পাখিও বন ছেড়ে পালায়।

সত্যিমিথ্যা যাচাই করা হয়নি তেমন করে। সাধারণভাবে তো মনেই হয়, বসন্তের বিপুল উৎসবে পাখিদের তামাসা নিছক ছোটোখাটো হবে না। সিংভূমের পার্বত্য অঞ্চলে শোনা সেই ছোট্ট গানটির কথা আজ বিশেষভাবেই মনে পড়ছে। মনে পড়ার কারণ—অকাল-বসন্তের হঠাৎ হাওয়া। সেই হাওয়া এসে বলছে, এবারের মতো আর বায়না নেই, পালা ফুরোলো, দাঁড়-দড়া গোছগাছ করো, পাতানো সংসার গুটোও, চলো। শহরে-পার্কে আর কানাগলির ল্যাম্প-পোস্টে হেলান-দেওয়া শিমুল-মাদরে ফুল এসেছে। ফুল এলে বনের পাখি বন ছেড়ে পালায়, তাই নাকি নিয়ম! সে-নিয়ম বনে-বাদাড়ে কতোটা খাটে জানি না, কিন্তু আমাদের শহরে কলকাতায় খাটে। এখানের ছোটো-বড়ো দীঘি আর জলাশয় খাঁ খাঁ করে—শুকনো পাতার মতন রঙীন পালক ইতস্তত উড়ে বেড়ায়। পাতার মতন হাওয়ার টানে জলের প্রান্তে জমা হয়। জলে পাখি যেন আকাশ কাঁধে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছে এখন। বসন্ত এসেছে, রঙীন মাদার-শিমুল-পলাশ তেপলতের কাল হয়েছে শুরু।

আর হয়তো সপ্তাহ দুয়েক। ওদিকে বরফ গলতে শুরু করবে। এদিকে চঞ্চল হয়ে উঠবে পরদেশী পাখির দল। পরবাস তো নয়-নয় করেও মাসকয়েক হলো। এবার ভালোয়-ভালোয় গাত্রোৎপাটন করলেই হয়।

এই শেষের দিকটায় চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটু মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—ওরা কতদূর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শীতের দেশের পাখি—তাপের ছিটেফোঁটা লাগলেই ফোসকা পড়বে, ফোসকা মানে মৃত্যু। কেউ বা সুদূর সাই-বেরিয়া থেকে আসছে বছরের পর বছর, একই জায়গায় শীতের কয়েকদিনের দেশ-ভ্রমণ তাদের। অধিকাংশই নানাজাতের টিল—প্রকৃতি এক, আকৃতিতে ইতর-বিশেষ, বাচ্চা হাঁসের মতন দেখতে। চিড়িয়াখানার অতো-গুলো ঝিল থই-থই, পাড়েও গাদাগাদি করে বসে রোদ পোহাচ্ছে। চিৎকারে কান পাতা যায় না। কিছু কিছু আবার ডল-ভর্তি বসে। তেমন-তেমন ডালের নিচের দিক নখে আঁচড়ে ঝুলছে চালতাবাদুড় আর কলা-বাদুড়ের দল গাছ-পাঠার মতন।

চিড়িয়াখানা বাদ দিলে কলকাতার মধ্যে ঢাকুরিয়া আর বেলেঘাটার জলাশয়—এমনকি গঙ্গাতেও সারবন্দী সাঁতার দেয় এই পর-দেশী পাখির ঝাঁক। এ সময় গঙ্গায় সী-গালও কিছু ভেসে আসে সাগরের মোহনা ছাড়িয়ে। কলকাতার কাছাকাছি বিল-বাঁওড়ে এই টিল বা এক শ্রেণীর বুনো-হাঁস শিকার করতে উইক-এন্ড-এ দৌড়োয় শিকার-পাগল মানুষ। খাড়বাড়ির জলা, ভাঙড়, বাদু, ঘাসখালির চড়ায় পরদেশী পাখির সংসারে হাহাকার পড়ে যায় তখন।

ছোটোবেলায় শুনতুম। এ-পাখির গায়ে হাত দিও না, ধরো না—সংসারে আগুন লেগে যাবে। কোন্ পাখি ছিলো তারা? শহরে বুঝি তাদের দেখা যায় না? নাম ছিলো, ছাতার। হয়তো স্থানীয় নাম। মহা ঝগড়ুটে পাখি। সর্বদাই ঝগড়া বা কোঁদলে রত। ভাবভঙ্গি আর সতেজ গলা শুনে এমনটাই বোধ হতো। ঝগড়া করতে-করতে একেবারে বেহুঁশ, তখন মুঠো করে ধর... ব্যস্। সবাই বলতো, ও-পাখির গায়ে হ... দিও না, সংসারে আগুন লেগে যা... সম্ভবত অমন গলা সেকালের শান্তি... একান্নবর্তী পরিবারে সবাইকে সন্ত্রস্ত ক... তুলতো। দু-চার বছর আগেও দেখেছি, ম... পড়ে। আজকাল একেবারেই দেখি না। ... দেখি না, আতাচোরা, গাঙশালিখ, প্যাঁচা, মাছরাঙা। শহর যতো ভেঙে নতুন হ... এরা ততোই দূরে সরে যাচ্ছে। আজক... বাঁশের খাঁচায় বাবু-শালিখই বা পো... ক'জন? দুমাসে একবার গলি দিয়ে খাঁচা ভর্তি হরেক পাখির পাখিঅলা দেখতে ক... পায়? উত্তর কলকাতার গলি-উপগলিতে ... এক-আধবার তাদের দর্শন পেলেও পাও... যেতে পারে। সবারই জন্যে হাট বসে। হাটে চড়া দামের পাখি বাড়িতে আনলে আর মু... তোলে না, দানাপানি নেয় না—আত্মহত্যা মতন ভাব করে মরেই যায়। দিশি পাখি আর সে কদর নেই। শুধু চিৎপুরের কোনো কোনো বারান্দার কোণে টিয়া-চন্দনা-মদ... একাকী দাঁড়ে বসে ছোলা আর কাঁচালঙ্ক... খায় এখনো।

কিন্তু কলকাতার পাখি বলতে সঠিক বোঝায়—চিরকালের কাক। মধ্যসুন্দর ল্যাম্প-ব্ল্যাক, তীক্ষ্ণ নাসা, উঁকি-বক্তা এবং রাজনীতিহীন। নাবিকের বান্ধব সী-গাল্ হত্যা করা আইন-বিরুদ্ধ। দোষী সাব্যস্ত হলে মোটারকম জরিমানা, এমনকি জেলবাস পর্যন্ত ঘটতে পারে। আমার বহুকালের বাসনা, শহর-বান্ধব কাক-রক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। বস্তুত কাকের চেয়ে বড়ো কর্পোরেশন আর নেই। একা কাক বা একা কর্পোরেশন দুজনের আলাদা ভূমিকা আমরা স্বীকার করবো না। বরং উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবো। তামাসার কথা নয়, অন্তত কর্পোরেশনেরই উচিত—এমন কোনো উপায় খুঁজে বের করা যাতে কাকের সর্বোচ্চ হারে বংশবৃদ্ধি ঘটে। কাক টাটকার ভক্ত নয়, কাক আপনার শরিকের ভাগ বসাতে আসবে না—আস্তাকুঁড় স্ফীত হলেই তার যথেষ্ট।

অনেক সময় দেখেছি, একটি কাকের পায়ে দড়ি বেঁধে বড় রাস্তা দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে একদল ছেলে যাচ্ছে—পেছনের দলের সামনে এই মর্মান্তিক খেলা! এই নির্দোষ এবং উপকারী পাখির বদলে ধরা যাক, একটি সবুজ অকর্মা টিয়ার এমন অবস্থা। অমনি সবাই হায়-হায় করে উঠবে—ধর্, বেঁধে আন—চিৎকার যাবে শোনা। কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর নেই—কাকের সঙ্গে টিয়ার পার্থক্য কি এখানেই যে টিয়া মূল্যবান এবং কাক বিনামূল্যে বিক্রীত? নাকি রঙে? কন্ঠস্বরে? সত্যিই কোনো সদুত্তর নেই।

মনোজ বসু

[উপন্যাস]

।। পঁচিশ ।।

বাড়ি কেন চিনবে না শিশির? ঠিক দশটায় গিয়ে হাজির—অন্যদিন যে সময়ে অফিসে হাজিরা দেয়। পূর্ণিমা সাজগোজ করে তৈরি। অপেক্ষা করছিল শিশিরের জন্য। বারান্ডায় পা দিতেই বলে, চলুন—

অতএব চলল। মাঝে একবার জিজ্ঞাসা করে, অফিস করবেন না কাল যে বলেছিলেন?

ঘাড় দুলিয়ে পূর্ণিমা বলে, তাই। আপনি করবেন না, আমিও না।

আর কোন কথা থাকতে পারে না। চলেছে নিঃশব্দে। ট্রামে-বাসে বিষম ভিড়। ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সি পেয়ে গেল। পাশাপাশি বসেছে।

থাকতে না পেরে শিশির প্রশ্ন করে ঃ চলেছি কোথায়?

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে। বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত। তাই ঠিক করলাম।

কাল যে বললেন, রাজি নন। আপনার ভাই ডাক্তার সরকার এসেছিলেন, তাঁকে তাই বলে দিয়েছি। বাবা-মা কাশী চলে যাচ্ছেন, ডাক্তার সরকার তাঁদের আটকাতে যাবেন না।

পূর্ণিমা বলে, ঠিকই বলেছেন। বাবা আমায় সম্প্রদান করবেন, তেমন বিয়ের রাজি নই। আছি আমি স্বৈরিণী উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে—দোষ ক্ষমা করে মহত্ত্ব দেখানোর সুযোগ ও'দের দেবো না।

নিরীহ কণ্ঠে শিশির বলে, সম্প্রদান কে করবেন তবে?

একফোটা শিশুর মতন প্রশ্ন। ওদের পাড়াগাঁয়ে এ জিনিস চালু নয়, মানি। কিন্তু কলেজে পড়ে এতগুলো পাশ করেছে—পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন বই-ই পড়েনি? খবরের কাগজও না?

পূর্ণিমা বলে, আমি পুতুল না গ্রামোফোন না সেলাইয়ের কল যে একজনে আমাকে দান করে দেবেন, অন্যে হাত পেতে নিয়ে নেবে? একটা বয়স থাকে হয়তো মেয়েরা যখন পুতুলেরই মতো। আমিও ছিলাম—

পুরানো কথা মনে এসে হসি-হাসি মুখ হয়ে ওঠে। বলে, এইরকম ট্যাক্সি চড়িয়ে বাবা আমায় গড়ের মাঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন পছন্দ করানোর জন্য। সকাল থেকে খেটে-খুটে দেহটাকে নিদারুণ রকম সাজিয়েছি। পছন্দ করতে এলো তিন যুবা পুরুষ—বুক ঢিবঢিব করছে আমার, কালীঘাটে মা-কালীর উদ্দেশে মনে মনে মাথা কুটছি ঃ পছন্দ করিয়ে দাও মা জননী। পছন্দও করল তারা—হায় আমার কপাল! পরের দিন জানতে পেলাম কনে-পছন্দ নয়, চাকরির জন্যে পছন্দ। কিন্তু সেদিন যা হতে পারত, আজকে তা আর হয় না, সে দিনকাল অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। ভাবুন দিকি আমি এই আধবুড়ি মানুষটা ঘোমটা-মোড়া পুত্তলিকা হয়ে আপনার সঙ্গে অপরিচয়ের ভান করে পিঁড়ির উপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি পিতৃদেব কখন আপনার হাতে সম্প্রদান করে দেবেন সেই অপেক্ষায়। ভাবতেই তো হাসি পেয়ে যায়।

পূর্ণিমা সত্যি সত্যি হাসে। হাসি থামিয়ে তারপর বলে, আমাদের বিয়ের সম্প্রদানে কর্তাব্যক্তিদের লাগবে না। আমাকে সম্প্রদান আমি নিজে করব, আপনাকে আপনি করবেন—যদি নিতান্তই সম্প্রদান কথাটা এর মধ্যে নিয়ে আসতে চান।

শিশির বলে, কেউ থাকবে না—শুধু আপনি আর আমি?

থাকবে তিনজন সাক্ষি। আজকে নয়। আজ শুধু নোটিশ দিয়ে আসব। বিয়ে একমাস পরে, তিনটে বন্ধু তার মধ্যে বলে-কয়ে রাখবেন। সাক্ষির ভারটা আপনার উপর।

এমনি বিয়ের কথা শিশির একেবারে শোনে নি তা নয়। পাড়াগাঁয়ে থেকেও কানে গিয়েছে। সেখানে এ জিনিস চালু নয়, বিয়ে বলেই মানে না কেউ—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রংতামাসা করে। অদৃষ্ট বশে তাই আজ নিজের উপর হতে চলল। ট্যাক্সি রাস্তার মোড়ে লাল আলোর নিষেধে এক এক সময় থেমে পড়ছে। দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ে সাঁ করে দৌড় দিলে কেমন হয় তখন? হয় নিশ্চয় ভালো—কিন্তু পাশটিতে বসে প্রাণ খুলে নিশ্বাসটি নিতে পারছে না, সে মানুষ দৌড় দিয়ে পালাবে! সুন্দরবনের ময়াল সাপ, শোনা যায়, দৃষ্টি দিয়ে টানে—জঙ্গলের জীব সম্মোহিত হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কবলের মধ্যে পড়ে, সাপ লেজের পাকে জড়িয়ে ফেলে ধীরে সুস্থে গ্রাস করে তারপর। শিশিরের অবিকল সেই অবস্থা।

প্রশ্ন করে, বিয়ে হতে যাচ্ছে—কোন জাত আমি, কি বৃত্তান্ত, সে খবর অবধি নিলেন না।

পূর্ণিমা হেসে বলে, নেয় নি বুঝি তাপস? কী রকম আনাড়ি ঘটক, বুঝে দেখুন। যা করছে—ওই ডাক্তারিই করুক গে তবে। ঘটকালি করা তার কর্ম নয়। আবার দেখা হলে তাপসকে বলে দেবেন। আমিও বলব।

আগের কথাটা শিশির ফলাও করে যাচ্ছে ঃ ধর উপাধি কত জাতের হয়। সুবর্ণবণিকের হয়, কায়েতের হয়, মাহিষ্যের হয়। শুধু 'ধর' শুনে জাত বোঝা যায় না।

তাই বুঝি! তবে রেজেস্ট্রি বিয়ের মজা হল, মন্ত্র পড়তে হয় না—কুল-শীল গাঁই-গোত্র কোন কিছুই দরকারে আসে না। তবু জেনে রাখা উচিত বই কি। বলুন না, আপনার কোন জাত। এখন না হলেও তাড়া কিছু নেই, সঠিক মনে না থাকলে ভেবেচিন্তে পরে এক সময় বলবেন।

শিশির বেজার মুখে বলে, জাত-গোত্র কুলশীল না হয় বাতিল, কিন্তু অবস্থা কার কেমন, সে খোঁজটুকুই বা নেওয়া হল কই? বিয়ে যেমনই হোক, বিয়ে অন্তে নিত্য দু-বেলা ভাত-ডাল-তরকারি লাগবে—বাতাস খেয়ে থাকা যাবে না।

পূর্ণিমা বলে, সে আর কতটুকু ব্যাপার! আপনি চাকরি করেন—আপনার

মাইনে আমার জানা। আমার মাইনে না-ও যদি জানা থাকে, এক অফিসের ভিতর জেনে নিতে আটকাবে না। এক পক্ষ একতরফা খাইয়ে যাবে, আমাদের সে ব্যাপার নয়—আপনি যদি আমায় খাওয়ান, আমিও আপনাকে খাওয়াব। মাইনে দুটো যোগ করে নিলেই সঠিক অবস্থা বেরিয়ে পড়বে। নিয়েছিও তাই—রাজার হালে দুজনের চলে যাবে। এর বাইরে ধরুন পাকিস্তান থেকে হুণ্ডি করে আপনি এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে এসেছেন, কিম্বা ধরুন আপাদমস্তক ঢেকে দেবার মতন গয়না গড়ানো আছে আমার জন্য—আরো ভাল, সেগুলো আমাদের উপরি লাভ।

শিশির আবার বলে, স্বভাবচরিত্রের খোঁজ নেওয়া—সে-ও কি বাহুল্য?

ঘাড় নেড়ে পূর্ণিমা সায় দেয়ঃ ঠিক তাই—

বলে, দিদির বিয়ের সময় পূর্ণ মুখুজ্জে বলে খুব করিতকর্মা একজন প্রতিবেশী বাবার সঙ্গে পাত্র আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলেন। পাত্রের বয়স জিজ্ঞাসা করতে বললেন বাবা, পূর্ণ জেঠা তখন জবাব দিলেনঃ কী দরকার? জানাই তো আছে চব্বিশ-পঁচিশ। চুল পেকে দাঁত পড়ে গেলেও বিয়ে না হওয়া অবধি পাত্রের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ পাত্রীর বয়স উনিশ-কুড়ি পেরোয় না। সবাই জানে একথা। বয়সের বেলা যা স্বভাবচরিত্রের ব্যাপারেও ঠিক তাই। জবাব আগে থেকে জানাঃ দেবোপম আদর্শ চরিত্র। জিজ্ঞাসাটা বাহুল্য।

ট্যাক্সি ময়দানের পাশ দিয়ে চলেছে। পূর্ণিমা আবার বলে, মেনে নেওয়া গেল তাই—কী যায় আসে! মাঠের মতন মস্তবড় জীবন আমাদের সামনে। আজকের দেবোপম চরিত্র কোন একদিন আসুরিক হয়ে উঠবে না, কে গ্যারাণ্টি দিতে পারে? হচ্ছেই তো আকছার। কিন্তু সিভিল ম্যারেজের মজাটা হল ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ফাটাফাটির গরজ নেই। যেদিন না পোষাবে, চতুর্দিকে পথ খোলা রয়েছে—বিয়ের ইস্তফা দিয়ে নিজ নিজ পথে বেরিয়ে পড়ব।

ভয়ের ভঙ্গি করে শিশির বলে, ওরে বাবা, এ যে পদ্মপত্রের জল। টলমল টলমল—বেসামাল হলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে।

ঠিক সেই জন্যেই এ ওকে সম্মান করে ভয় করে সতর্ক হয়ে চলবে। রেজেস্ট্রি বিয়ের আসল জোরটা এইখানে।

মোটের উপর কোন রকমে দমানো গেল না। আকারে ইঙ্গিতে শিশির অনেক রকম ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু এ মেয়ে ধনুর্ভঙ্গ-পণ নিয়ে যাচ্ছে, নোটিশ আজকেই এবং এক মাস পরে উভয়ে স্বামী-স্ত্রী। ইতিমধ্যে ভূমিকম্প জলস্তম্ভ মন্বন্তর কিম্বা এ্যাটম-বোমা প্রাসাদাৎ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে আলাদা কথা, নতুবা এই ব্যবস্থার নড়চড় নেই।

এদিকে যখন পাকাপাকি, মাসান্তে শেষ পর্বের চিন্তাই জরুরি এবারে। তিন সাক্ষির আবশ্যক, তিনের এক হল ধরুন অমিতাভ—

আপনার নাগপুরের মামার তো পাত্তা নেই, মেস ছাড়বার জোর তাগিদ এদিকে। উপস্থিত ত্যাগ করে কদ্দিন এমন ঘুমিয়ে থাকা যায় বলুন। মেয়ের অবশ্য অনটন নেই, এ সম্বন্ধ গেলেও ঢের ঢের নতুন সম্বন্ধ এসে যাবে। কিন্তু ঘর বেহাত হলে তারপরে মৌলালির কর্পোরেশন ডিপোয় পাইপের মধ্যে বসবাস ছাড়া তো উপায় দেখি নে। তা-ও হবে না, জন চারেক সেখানে জবর-দখল করে আছে দেখে এসেছি। তারা জায়গা ছাড়বে না।

এমনি সব বলে অমিতাভকে রাজি করাবে। নাগপুরের মাতুল-কন্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, রাজি হবে বলেই মনে হয়। চোখের উপর দিয়ে শ্রীপতিবাবু ভাগ্নির বর গেঁথে ফেলছেন—ভাইঝিকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি একটা মোচড় দিয়ে রাখল। অন্যের অসুবিধা ঘটাবার জন্য মানুষ মাত্রেই এটুকু ঝঞ্চাট নিয়ে থাকে। ঝঞ্চাট কী-ই বা এমন—নাগপুরে হয়তো লেখেই নি এখনো চিঠি। খুব সম্ভব মামাই নেই সেখানে এবং মাতুল-কন্যাও ভাঁওতা। শিশিরের উপর তার প্রভাবটা দেখানোর জন্যেই কাল্পনিক এক কনে খাড়া করে দিল। স্বভাবে অতিশয় স্ফূর্তিবাজ—আজব বিয়েয় সাক্ষির সই দিতে মহানন্দে সে ছুটে যাবে।

পয়লা সাক্ষি অতএব অমিতাভ। আর দুই নম্বরে তবে শ্রীপতিবাবুই বা নয় কেন? চার তারিখ রাবড়ি খাইয়েছেন—মোট মূল্য চার মুদ্রার নিচেই। ঋণ কাঁধে রাখা উচিত নয়—মাঝের এই কুড়িটা দিনে শ্রীপতিবাবুকে ক্ষেপে ক্ষেপে খাইয়ে শোধ দেওয়া যাক। তার উপরে সেই দিনের দিন সাংঘাতিক একপ্রস্থ খানাপিনা তো আছেই। ভাগ্নি গছানোর কোনরকম আশা নেই—হেন ক্ষেত্রে খাইয়ে মানুষ শ্রীপতি বেহিসাবি ক্রোধ পোষণ করে এমন একটি উত্তম ভোজ বাতিল করে দেবেন, এমন তো মনে হয় না। শিশিরের দুই নম্বর সাক্ষি মেসের ঐ শ্রীপতিবাবু।

তৃতীয় সাক্ষি—সেকশনের বড়বাবু নটবর রাজি হলে কেমনটা হয়? ঘাড় নাড়ছেন কেন শুনে?—ভবসংসারে হেন কর্ম নেই যথোচিত কৌশল ও তম্বির প্রয়োগে যা সিদ্ধ হয় না। বড়বাবু লোকটাকে চটিয়ে রাখা উচিত হবে না—ভাল করতে না পারুক, মন্দ করবার ক্ষমতা ঈশ্বর কমবেশি সকলকে দিয়েছেন। লোকটার উপরওয়ালার কাছে আনাগোনা—ফাঁক বুঝে যখন তখন শিশিরের নামে কান ভাঙাবে। গাঁ-অঞ্চলের প্যাটোয়ারি খেলা একটুকু দেখিয়ে দাও হে শিশির—নটবর অবধি সাক্ষি হয়ে মনের সুখে সই দিয়ে আসবেন।

অফিস অন্তে নটবর বেরুচ্ছেন। শিশির তক্কে তক্কে ছিল, পিছন ধরল। বলে, আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কেন?

কথা বলতে বলতে যাবো—

প্রীত হয়ে নটবর বলেন, তা বলো কথা—

কিছু আমতা-আমতা করে, স্বয়ং বিয়ের পাত্র হয়ে যে ধরনে বলা স্বাভাবিক, শিশির

বলল, আপনার নাতনিটি বড়ই সু—ইয়ে সুলক্ষণা।

'সুন্দরী' 'সুশ্রী' ইত্যাদি বলবার জন্য ঠোঁটের আগায় 'সু—' অবধি এসে গিয়েছিল —কিন্তু গজদন্তী উৎকট-কালো কন্যাকে সুন্দরী বললে বিদ্রূপ ভেবে নিতে পারেন, সেই ভয়ে সামলে নিয়ে নির্দোষ বিশেষণ 'সুলক্ষণা' প্রয়োগ করে। বলে, ভারি সুলক্ষণা মেয়ে। আমার বেশ ভাল লেগেছে। আপনার প্রস্তাবে রাজি আমি। ষোলআনার উপর আঠারোআনা রাজি। আর জানেন তো, আমার অভিভাবক নিজেই আমি—কারো কাছে হাত কচলে 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করে মত চাইতে হবে না।

নটবর বলেন, বাড়িতে চলো ভায়া। এক কাপ চা খেয়ে আসবে। বড়বউমাকে সুখবরটা দেবো, বড্ড খুশি হবে। আজকেও জিজ্ঞাসা করছিল, কি হল? বললাম, উতলা হলে চলে রে বেটি! লাখ কথার কম বিয়ে হয় না—কিন্তু লাখ কি, তুমি যে ভায়া এক কুড়ি কথাও পুরতে দিলে না।

কয়েক পা গিয়ে শিশির সকাতরে বলে, শুভকর্মটা এই মাসের মধ্যে ঘটিয়ে দিন দাদু। জায়গা নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। একটা মেস আশ্রয় করে ছিলাম, থাকতে দিচ্ছে না। নতুন করে আবার মেস না খুঁজে ঘর দেখে নেওয়া যায় তাহলে। আমি আর কি দেখব, কলকাতার ক'টা মানুষকেই বা জানি। ঘরের ভার আপনিই তো নিয়ে নিয়েছেন।

নটবর বলেন, ঘর হবে, সেজন্যে ভাবনা নেই। যদ্দিন না হচ্ছে, আমার বাইরের ঘরের চেয়ার-টেয়ার সরিয়ে তক্তাপোষ পেতে দেবো ওখানে। নাতনি আর নাতজামাইকে তো ফুটপাথে নামিয়ে দেওয়া যাবে না—

ঘরের সম্বন্ধে অভয় দিয়ে উচ্চহাসি হেসে নটবর বলেন, সবুর সইছে না যে ভায়া! শুভস্য শীঘ্রং, হয়ে গেলেই অবশ্য ভালো। কিন্তু পৌষ মাস পড়ে গেল, এ মাসে কেমন করে হবে?

আমাদের ওসব নেই দাদু। পৌষ মাস বলে আটকায় না।

পাশাপাশি যাচ্ছিলেন, নটবর তাকিয়ে পড়লেন শিশিরের দিকে : তোমাদের আটকায় না মানে?

শিশির জিভ কাটে : আপনাকে বলা হয় নি বুঝি? আমি ভেবেছি, জানেন আপনি সব। চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম, তার মধ্যে সবই তো দিতে হয়।

বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, সে দরখাস্ত আসা অবধি নামতে যাবে কেন? কে তুমি, কোন জাত?

বাঙালি, দেখতেই পাচ্ছেন। কায়স্থও বটে। ধর্মে—আমি নই, আমার ঠাকুরদা পাদরির ধাপ্পায় পড়ে খৃস্টান হয়েছিলেন।

মিনিট খানেক নটবর স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। একটি কথাও না বলে আবার চলতে শুরু করলেন। ঠাকুরদাদার যে তিল পরিমাণ দোষ ছিল না, এবং তারা নামে-মাত্র খৃস্টান, সেই জিনিস সবিস্তারে বোঝাতে বোঝাতে শিশির সঙ্গে চলেছে।

সে নাকি বড় ঘড়েল পাদরি। কাউকে সাহেবি ফার্মের চাকরিতে ঢোকাবে, কারো ছেলেকে বিলেত পাঠাবে, কারো জন্যে মেম-বউ জুটিয়ে দেবে—এমনি সব লোভ দেখিয়ে পাড়াশুদ্ধ ভজিয়ে ফেলল। কাজ সমাধা করেই পাদরি সাহেব গ্রাম ছেড়ে পিঠটান। থাকলে শিষ্যগণ সাহেবের পিঠের চামড়া খুলে নিত ঠিক। পাদরি তো পালিয়ে বাঁচল, এরা তখন কি করে—পুকুরপাড়ে দোচালা বাংলাঘর তুলে মটকার উপরে কাকতাড়ুয়ার চেহারার একটা ক্রশ বসিয়ে দিল। ঝড়বাদলে সে ক্রশ কতবার খসে খসে পড়ে, ছুতোর ডেকে পেরেক ঠুকে আবার এঁটে দিয়ে আসতে হয়।

হেসে হেসে রসিকতা করছে : সে ঘর চার্চ না গরুর গোয়াল, বলে না দিলে কারও ধরবার উপায় নেই। তেমনি আমরা—মানুষগুলোও। নামের সঙ্গে একটা লরেন্স কি স্টিফেন কি টমাস জুড়ে দিইনি, স্রেফ সাদামাটা শিশির—শিশিরকুমার ধর। না বলে দিলে কে বুঝবে রবিবার সকালে চার্চে গিয়ে বসি। আপনি পূজ্যপাদ মানুষ, ডেপুটি-ম্যানেজার হাতে ধরে আপনার জিম্মায় দিয়েছেন, আপনার কাছে গোপন করা চলে না। যা জানলেন আপনার মধ্যে রাখুন, অন্যকে বলবার কি গরজ?

ঘাড় নেড়ে নটবর বলেন, সে হয় না। ছাতনাতলায় শালগ্রাম-শিলা আসবেন, ভটচাজ্জি-পুরুত মন্তোর পড়াবেন, এ'দের সকলের জাতিপাত করে এই বয়সে পাপের ভাগী হবো না আমি।

শিশির বলে, শালগ্রাম আর পুরুত-বামুন না-ই বা এলেন। আখচার হচ্ছে এরকম বিয়ে।

কঠোর স্বরে নটবর বললেন, আমাদের হয় না।

শিশির সকাতরে বলে, আপনি রাগ করলেন দাদু। কিন্তু আমার দোষটা কি বলুন। কম্মটা করে বসেছেন বাবাও নয়, আমার ঠাকুরদাদা। পাদরি সাহেব ধোঁকা দিয়ে করাল। সেই ঠাকুরদাদা বেঁচেও নেই যে দুটো চারটে কড়া কথা শোনাব।

নটবর বলেন, রাগ কেন করব, আর কড়া কথাই বা ঠাকুরদাদাকে কেন শোনাতে হবে। যার যেমন অভিরুচি। খৃস্টান তো মন্দ কিছু নয়—এতাবৎ যারা হার্মান কোম্পানির চূড়োয় বসে গেছে, সবগুলোই খৃস্টান। কিন্তু এত বড় জিনিসটা সকলের কাছে চেপে যাবো, ব্রাহ্মণ নেই নারায়ণ নেই বিয়ে হয়ে যাবে—এমন কর্ম আমার দ্বারা হবে না। আজ না হোক, দুদিন পরে জানাজানি হবে—কনের বাপ আমার ছেলেই তখন কলঙ্ক দিয়ে বলবে, এমন অঘটন কেন ঘটালে বাবা, পান খেতে কত টাকা দিয়েছিল?

কথাবার্তার ইতি করে নটবর জোরে জোরে চললেন—তাঁর বয়সে গতিবেগ যতখানি বাড়ানো সম্ভব। শিশিরও নাছোড়বান্দা—সঙ্গ ছাড়ে না, সে-ও দ্রুত চলেছে। বলে, বড্ড আশা করেছিলাম আমি দাদু—

নটবর বলেন, আশা ছাড়ো। তোমার নিজের সমাজে কিম্বা যারা এসব মানে না তাদের মধ্যে খোঁজখবর নাও, জুটে যাবে ঠিক। চাকরি জুটিয়েছ আর বউ জোটাতে পারবে না, এ কি একটা কথার কথা হল?

বউ যবে জুটুক পরোয়া করিনে দাদু। ঘরের গরজ বড্ড জরুরি।

রূঢ় হয়ে নটবর বললেন, অন্যায় অনুরোধ তোমার। তা ছাড়া পাত্রী আমার মেয়ে নয়—নাতনি। আসল গার্জেন আমি নই, আমার বড়ছেলে আর বড়বউমা। তাদের কাছে সব কথা খুলে বলব। বলতে বাধ্য। তুমি এসো এবারে।

শিশির অতএব সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। নটবর হনহন করে চললেন। একলা হয়ে শিশির খলখল করে হাসে ঃ বেড়ে হয়েছে—সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। নাতনির কবল থেকে ত্রাণ পাওয়া গেল, সেকশনের বড়বাবুরও চটে থাকবার কারণ রইল না। হায় বৃদ্ধ, এত তোমার চতুরালির কথা শোনা যায়, সামান্য একখানা পাটোয়ারি প্যাঁচেই ধরাশায়ী হলে! কপালগুণে যার আগমন হচ্ছে কারো নাতনি ভাইঝি ভাগনি বোন তার ধারেকাছে দাঁড়াতে পারে না। চেহারায় খানিকটা দুর্গা-প্রতিমা বই কি—এবং দুর্গাঠাকরুনের মতোই সিংহি চড়ে বেড়ানোর শক্তি রাখে। পুরোদস্তুর সংসার চালিয়েছে, তার উপর ভাইকে ডাক্তারি পড়িয়েছে। নির্ভরযোগ্য বউ, সন্দেহ নেই—বিয়ের পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হাত-পা ছেড়ে অহোরাত্র বিছানায় গড়ালেও ঠিক ঠিক সময়ে মুখবিবরে অন্ন এসে পৌঁছবে। কিঞ্চিৎ মিলিটারি ভাবাপন্ন—সেটা ভালই। কলকাতা শহর নিতান্তই বিদেশ-বিভুঁই শিশিরের কাছে, এ হেন জায়গায় একটি বহুদর্শী উগ্রচণ্ডা গার্জেন চোখে চোখে রাখছে, ভাল বই সেটা মন্দ হল কিসে?

নটবরের গমন-পথের দিকে চেয়ে শিশির এই সমস্ত ভাবছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে মোড় ঘুরলেন তিনি। কিন্তু এতেই শেষ হল না, আরও আছে দাদু। আমাদের বিয়ের সাক্ষি হয়ে সই দিতে হবে—তৃতীয় সাক্ষি তুমি। ছাড়াছাড়ি নেই।

দিন তিনেক পরে শিশির আবার নটবরকে ধরেছে ঃ বড্ড বিপদে পড়েছিলাম দাদু। বিপদ কাটল বোধহয় কোনরকমে।

ঘর পেয়ে গেছ?

বিরস মুখে শিশির বলে, পেলাম। কিন্তু খালি ঘর দেয় না, ঘরণীও নিতে হচ্ছে।

কে সেটি?

সবিশেষ শুনে নটবর বলেন, তোমায় চালাক ছেলে ভেবেছিলাম—তুমিই শেষটা বড়শি গিললে হে?

বড়শি গিলেই তো ডাঙা পাচ্ছি। নইলে ভেসে ভেসে বেড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না! আপনার বড়শিও তো গিলতে চেয়েছিলাম, আপনি সরিয়ে নিলেন।

নটবর বলেন, তোমার সব কথা বলেছ ওদের কাছে?

ওদের বলে কিছু তো নেই দাদু, একা ঐ একজন। বলেছি তাকে, বিয়েয় সেজন্য দেবতা-ব্রাহ্মণের ঝঞ্ঝাট নেই—

এইবারে আবদারের সুরে শিশির বলে, কলকাতা শহরে আপনিই আমার গার্জেন—ডেপুটি-ম্যানেজার হাতে ধরে দিয়েছিলেন। যেতে হবে বিয়ের সময়। সাক্ষি হবেন। বিয়ে যদি আপনাদের ঘরের মতন হত, ধরে আপনাকে আবৃত্তিকে বসাতাম। তারই অনুকল্প।

বড্ড কাতর হয়ে বলছে, কৌতূহলও আছে নটবরের। তবু রাজি হতে পারেন না। ব্রাহ্মণ নেই, শালগ্রাম শিলা নেই—বিয়ে বলেই তো মনে করি নে আমরা। এর মধ্যে যাব কি করে? লোকে কি বলবে?

নাছোড়বান্দার হাত এড়াতে অবশেষে স্তোক দিতে হয় ঃ চুকেবুকে যাক ভালয়-ভালয়, একদিন তোমাদের বাসায় গিয়ে দেখে আসব। এখন গেলে জিনিষটা খুব চাউর হয়ে পড়বে। কিছু না হোক, বয়সটা আমার বিবেচনা করবে তো! লোকে বলবে, নাটুবাবু শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছে। সে হয় না। বরঞ্চ ভবতোষকে নিয়ে যেও, তাকে আমি বলে দিচ্ছি।

ভবতোষ বেশী বলাবলির পরোয়া করে না। ঘোরতর উৎসাহী। বলে, আলবৎ থাকব। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী দুই-ই আমি—দুটো সই দেবো দু তরফে। দু-বার খাব।

নটবরকে একান্তে নিয়ে বলে, আপনি যাবেন না—আমিও যদি না যাই, প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট পাবেন কোথা।

অতএব কনে নিয়ে যারা এগিয়েছিল, সবগুলো উমেদারকে মোটামুটি কাটান দেওয়া গেল—একটি কেবল বাদ। কুসুমডাঙার বেলা ভিন্ন পদ্ধতি। সুনীলকান্তিকে কিছু বলা হবে না, সইয়ে-সইয়ে ধীরে-সুস্থে প্রকাশ পাবে। আগে হয়তো কোন কোন রবিবারে হেলা করে যায় নি, ইদানীং এমন হল, রবিবার তো বটেই খুচরো এক বেলা-আধ বেলা ছুটি-ছাটাতেও কুসুমডাঙা গিয়ে পড়ে। ভাবখানা, মন পড়ে আছে সেখানে, দেহটাই কাজের গতিকে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। খালি হাতে কখনো যায় না—কোন দিন বাচ্চাদের জামা খেলনা, কোনদিন বা সংসারের জন্য মাছ সন্দেশ কমলালেবু। একদিন শাড়ি নিয়ে গেল দু-খানা ঃ আপনার একটা বড়দি, আপনার ননদের একটা।

মমতা বলে, কী মুশকিল! যখনই আসবে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসবে তুমি—

তাঁবেদার হনুমান—গন্ধমাদন আমি বইব না তো কে বইবে!

মমতা বলে, কোনটা কার শাড়ি, বলে দাও ভাই।

নকল-রেশমের শাড়ি, আজকাল যা সব বেরুচ্ছে। একটা ঘি-রঙের খোল টকটকে লালপাড়, আর একটা ঝলমলে ময়ূরকণ্ঠী। ঝলমলে শাড়িটা মমতার হাতে দিয়ে শিশির বলে, এইটে আপনার বড়দি, আর এটা অন্য জনের।

আবদারের সুরে বলে, পরে আসুন না বড়দি। মানায় কেমন দেখি।

মমতা সেই শাড়ি ননদের গায়ের উপর ছুঁড়ে দেয় ঃ পরে এসো ঠাকুরঝি, শিশির দেখবে।

ননদ-ভাজে কলহ এবার। ঊর্মি বলে, শাড়ি তো তোমার বউদি, তুমি পরবে।

তাই বটে, আধবুড়ো মাগি, আমার জন্য এই জেল্লা শাড়ি! যখন বয়স ছিল তখনই বড় দিয়েছে! জিজ্ঞাসা কর না তোমার বড়দাকে—

ঊর্মি বলে, বড়দা তো দেয় নি—তাকে কি জিজ্ঞাসা করব, সে কি বলবে? যে মানুষ দিয়েছে সেই তো বলে দিল কোনটা কার।

মিথ্যেবাদী সে মানুষ। মনে এক মুখে আর, তার কথা কানে নিতে আছে!

শিশিরের বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে। খাঁটি সত্যিটা আচমকা কেমন বেরিয়ে পড়ল মমতার মুখে।

অবশেষে মমতা ননদের সঙ্গে সন্ধি করে নিল ঃ বেশ, আমারই শাড়ি। মেনে নিলাম তাই। আমার শাড়ি পরো না কোন দিন? পরতে বলছি, পরে এসো। একটি কথাও আর নয়, খবরদার!

এই ধমকটির জন্যেই ঊর্মি যেন দেরী করছিল, এবারে হাসতে হাসতে শাড়ি হাতে ঘরে ঢুকে গেল। এবং পরে বেরুল অনতিপরেই। সাজগোজের পর ঊর্মিকে মন্দ দেখাচ্ছে না তো! বিনি সজ্জার মেয়ে তাকিয়ে দেখতে নেই, চোখ বুঁজে আসবে। সাজগোজ সমেত ওদের রূপের হিসাব।

মমতা এখনও রেহাই দেবে না, বলে, নতুন কাপড় পরে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয় ঠাকুরঝি—

ঢপ করে বউদির পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে ঊর্মি চলে যাচ্ছিল, মমতা শিশিরকে দেখিয়ে বলে, গুরুজন তো আরও একটি দাঁড়িয়ে। সে কোন দোষ করল?

লজ্জায় পড়ে সে গুরুজনকেও অগত্যা প্রণাম করতে হয়।

মমতা কলকণ্ঠে বলে, এক জায়গায় দুটিকে বেশ দেখাচ্ছে গো!

(ক্রমশ)

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রজাতন্ত্রদিবসে দিল্লীতে আগত শিল্পীদের নৃত্য দর্শন করছেন। একজন রাজস্থানী শিল্পী রাজস্থানী লোকনৃত্য প্রদর্শন করছেন।

দেশে বিদেশে

বৃদ্ধের বচন

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সপ্তদশ বার্ষিকীর প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অভিভাষণ উপলব্ধ সত্য থেকে প্রচারিত একটি আবেদন যা কেবল আমরা আমাদের বিনাশের বিনিময়েই উপেক্ষা করতে পারি।

আগামী সাধারণ নির্বাচনের পরেই ডঃ রাধাকৃষ্ণনের কার্যকাল শেষ হচ্ছে, এবং তিনি আর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকতে অভিলাষী নন। একটি বিদায়ের সুর তাই তাঁর ভাষণে পরিব্যাপ্ত। বিদায়ের এই সুরেই তাঁর কথাগুলিকে মন্ত্রোচ্চারণের গাম্ভীর্য দান করেছে। অনুষ্ঠান নয়, আরো বেশি কিছু—বিশ্বাস, নীতিবোধ, উপলব্ধি যা-ই বলুন—এর মধ্যে প্রতিফলিত। এই কথাগুলি তাই আমাদের উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত করবে।

"জনগণের কাছ থেকে যে স্নেহ ও ভালোবাসা আমি পেয়েছি তা আমার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী।" এই কথা বলে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন। বলা যায় এই ভাষণ সেই স্নেহ ও ভালোবাসারই প্রত্যুত্তর, যেখানে কৃতজ্ঞতা ও মমত্ববোধ শাসনের রূপ নিয়েছে।

এই বিশাল ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের এই বিশ্বাস, নীতিবোধ ও উপলব্ধি কোন সত্যকে উদ্ঘাটিত করছে? যে সত্যকে উদ্ঘাটিত করছে তা অন্তত উৎসবের আনন্দের মুহূর্তে আমাদের না শুনতে হলেই ভালো হত। কেননা আমাদের ঐ সত্য চিত্রটি শুধু লজ্জাকর নয়, গ্লানিকর। এই গ্লানি যতদিন না আমরা দূর করতে পারছি, ততদিন আমরা যত উঁচুতেই আমাদের পতাকা ওড়াই সেটা পরিহাসের মতই মনে হবে।

বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতি এক এক করে এই অভিযোগগুলি আমাদের রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন। এ একটা দীর্ঘ ফিরিস্তি, একটা মারাত্মক তালিকা।

এক। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আমরা থাকি বটে, কিন্তু আমরা আজও একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে পারিনি। অত্যন্ত সামান্য স্বার্থের কারণে, ক্ষুদ্র আঞ্চলিক সুবিধা আদায়ের জন্যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করতে পিছপা হই না।

দুই। আমরা আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে অন্যের চাইতে বেশি সম্মানের অধিকারী বলে মনে করেছি, এবং অধিকাংশকে তাদের আত্মোন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি। নীতি ও বর্ণের ক্ষেত্রে, শিক্ষা, বাসস্থান ও জীবিকার ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈষম্য আমাদের চিরস্থায়ী লজ্জা। এর দ্বারা জাতীয় সংহতি আসতে পারে না।

তিন। বিধানসভাগুলিতে কোন কোন সদস্যের উচ্ছৃংখল আচরণ, দলাদলি, জাতি-বিরোধ ও রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধ অনেক রাজ্যকে পঙ্গু করে ফেলেছে। আমৃত্যু অনশনের সংকল্প, আত্মবিনাশের হুমকি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ইত্যাদি যে রকম প্রকট হয়ে উঠেছে, তাতে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ভারতের স্থায়িত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

চার। সমস্যা প্রতিকারের জন্যে আমরা যে-সব পথ ধরে এগোচ্ছি তা আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের সামনে একটা খারাপ

দৃষ্টান্ত হাজির করছে। মূল্যবোধ সম্পর্কে আমরা শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মতের সঙ্গে যারা একমত নয়, তাদের আমরা ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। গত ৭ নভেম্বর দিল্লীতে ও নববর্ষের দিন কলকাতায় যে কান্ড ঘটেছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, সভ্য আচরণ করতে আমরা এখনো শিখিনি।

পাঁচ। এই ধারণা আজ ক্রমেই বদ্ধমূল হচ্ছে যে, হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়ে কোন পরিবর্তন আনা যায় না। আরও দুশ্চিন্তার কথা, এই ধারণা ভেঙে দেবার জন্যে কিছুই করা হচ্ছে না। এর দ্বারা আমরা কেবল বিপ্লবকেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলছি।

ছয়। জনজীবনের প্রতিটি দিকেই আজ সততার অভাব দেখা দিয়েছে। কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে সরকারের সমস্ত স্তরের লোকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। এটা ভালো কথা নয়।

সাত। গত বছরটি স্বাধীনতার পরবর্তী কালে সবচেয়ে দুর্বৎসর ছিল। শতাব্দীর প্রচন্ডতম খরা ঐ বছর আমাদের স্পর্শ করেছিল। কিন্তু অমাদের দুর্ভোগের জন্যে কেবল প্রকৃতিকে দায়ী করলে ভুল হবে। ঐ বিপদের মুহূর্তে যে ব্যাপক প্রশাসনিক অক্ষমতা ও বিচ্যুতির পরিচয় আমরা পেয়েছি তাকে ক্ষমা করা যায় না।

আট। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, যা তাঁদের থাকা উচিত। তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও বাঁচার তাগিদ নিয়েই ব্যস্ত।

এর পর ডঃ রাধাকৃষ্ণন যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং সেই ভয়াবহ সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে পূর্ণ আত্মিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমান ভারতের বিরুদ্ধে এইগুলি হচ্ছে তাঁর বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ। এই-ই হচ্ছে আজকের ভারতের সত্যরূপ। ভারতেরই রাষ্ট্রপতির চোখে দেখা। বিদেশী সাংবাদিকের কলমের বিবরণ এ নয়। এই অভিযোগগুলি কি আমরা দূর করব? আমাদের উত্তরের ওপর আমাদের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। উৎসবের কালে এই কথাগুলি বলে বৃদ্ধ রাষ্ট্রপতি সেটাই আমাদের মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এটা কেবল সাময়িক সতর্কবাণী নয়। আর কিছুদিনের মধ্যেই নতুন সরকার নির্বাচিত হয়ে আগামী পাঁচ বছরের জন্যে ক্ষমতায় আসবেন। সেদিক থেকে তাঁর ভাষণ আগামী দিনের কর্তব্যের আহ্বানও বটে।

সফল মিত্রতা

ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৬৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার পর থেকে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্কে যে অনুকূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তাকে ঘনিষ্ঠতর করে তোলার জন্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা সম্প্রতি জাকার্তায় গিয়েছিলেন।

তাঁর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিকের সঙ্গে তাঁর যে যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে, তাতে দু' দেশের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং শক্তির দ্বারা বিরোধের মীমাংসার নীতির নিন্দা করা হয়েছে। বন্ধুত্বের পরিচয় হিসেবে দু'দেশ আগের মত সমর-শিক্ষার্থী বিনিময়েরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কিন্তু জাকার্তা আলোচনায় সন্তুষ্ট হবার মত আরেকটি বিশেষ কারণ ভারতের আছে। ঐ আলোচনায় ইন্দোনেশিয়া কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের নীতির প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিল বলে শ্রীচাগলা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি এই আশ্বাস নিয়েও ফিরে এসেছেন যে, ইন্দোনেশিয়া পাকিস্থানকে আর সামরিক সাহায্য দেবে না।

খবরে দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া সেই আলোচনার সূত্র ধরে রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে পূর্ববর্তী জাকার্তা সরকারের সম্পাদিত অস্ত্র চুক্তিটি বাতিল করেছে। চুক্তি অনুসারে ইতিমধ্যেই যেসব সাহায্য দেওয়া হয়েছিল তার কিছু কিছু ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

মিশ্র অর্থনীতিতে আয়নীতি

সমাজতন্ত্রের কল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে ব্যক্তিগত আয়ের পার্থক্য হ্রাস করা দরকার এবং এই আয়ের একটা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা স্থির করে দেওয়া দরকার—একথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের পরিকল্পনাকাররা কিছুকাল যাবৎ সেই দিক দিয়ে চিন্তাও করছিলেন।

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত একটি পর্যালোচনাকারী দল ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে রিপোর্ট দেন যে, 'জাতীয় ন্যূনতম আয়ের' মাত্রা হওয়া উচিত ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে মাসিক মাথাপিছু ২০ টাকা অর্থাৎ পাঁচজন লোককে এক-একটি পরিবার, এই হিসাবে পরিবারপিছু মাসিক ১০০ টাকা। পর্যালোচনাকারী দলের মতে, শহরাঞ্চলে এই ন্যূনতম আয়ের পরিমাণ হওয়া উচিত পরিবারপিছু মাসিক ১২৫ টাকা। বলা হয় যে, ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এই ন্যূনতম আয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়ার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। শহরাঞ্চলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার নীতি
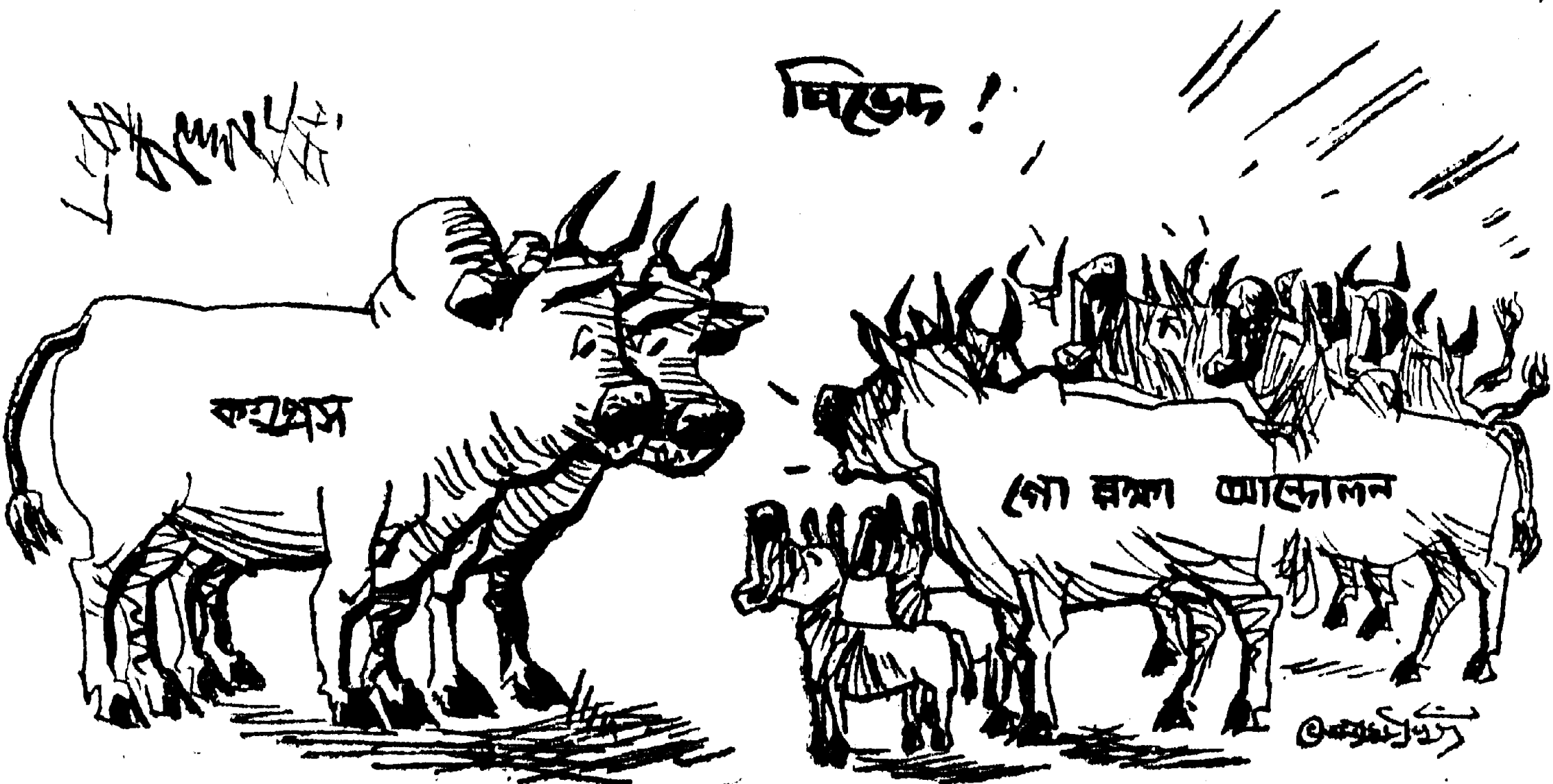
মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুদিবস ৩০ জানুয়ারী দেশের সর্বত্র শহীদ দিবসরূপে পালিত হয়।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা স্থির করে দেওয়ার অর্থাৎ, অন্য কথায়, ধনী ও নির্ধনের ব্যক্তিগত আয়ের বৈষম্য হ্রাস করার এই নীতি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত। ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আজও আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ সারাজীবন অনাহারের সীমানায় কাটাতে বাধ্য হয়। তাদের জন্য অন্ততঃ মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা আমরা কবে করে দিতে পারব তার কোন আশ্বাস না দিতে পারলে আমাদের এই পরিকল্পনা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথাটা সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনেই উঠেছে। ধনী ও দরিদ্রের উপার্জনের বিরাট পার্থক্য থাকলে সামাজিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের প্রয়োজনে আজকের দিনে কষ্ট স্বীকার করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অপরিমিত আয় অপরিমিত ভোগকে ডেকে আনবে—যার পরিণাম মুদ্রাস্ফীতি। এই দুই কারণেই ব্যক্তিগত আয়ের উচ্চতম সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা উঠেছে।

কিন্তু সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যার ফলে সমগ্র বিষয়টিতে একটি নতুন চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

রিপোর্টটি দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত একদল বিশেষজ্ঞ। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে গঠিত এই দলের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ বি কে মদন। এই বিশেষজ্ঞদের বিবেচ্য বিষয় ছিল, জাতীয় ভিত্তিতে আয় ও মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে কি ধরনের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

এই বিশেষজ্ঞ দল পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, 'ব্যক্তিগত আয়ের জাতীয় উচ্চতম ও নিম্নতম সীমা বেঁধে দেওয়াই একটা নীতি হতে পারে না। কেননা, বিশেষ করে, আমাদের মত একটা মিশ্র অর্থনীতিতে এই নীতি সরাসরি কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয় সে বিষয়ে রিপোর্টে অনেক বিশদ যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

নিম্নতম আয় বেঁধে দেওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'যদিও সামাজিক ন্যায়বিচারের দিক থেকে জাতীয় নিম্নতম আয় স্থির করে দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় তথাপি এই নীতি কার্যে পরিণত করতে গিয়ে কতকগুলি প্রকৃত সমস্যা দেখা দেবে।' প্রত্যেকের জন্য অন্ততঃ একটা নিম্নতম আয়ের ব্যবস্থা করতে হলে সরকারী অর্থ-ব্যয়ে প্রত্যেকের কাছে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির নিম্নতম সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে এবং ট্যাকস ধার্য করে ধনীর আয় সরিয়ে এনে দরিদ্রের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে এখন বেকারী, আধা-বেকারী এত বেশী, আয় এত কম যে, নিম্নতম আয়ের পরিমাণটা যদি কম করেও বাঁধা হয় তাহলেও প্রশাসনিক, ট্যাকস সংক্রান্ত ও নিয়ন্ত্রণ-মূলক ব্যবসায়ের দ্বারা সেই আয় কার্যকর করা সম্ভব নয়। প্রধানতঃ, লগ্নী, কর্ম-সংস্থান ও উৎপাদনশীলতার হার বাড়িয়েই নিম্নতম আয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। অতএব শুধুমাত্র নিম্নতম আয়ের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য একটা সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দিলে কোন সুবিধা হবে না।

উচ্চতম আয়ের সীমা নির্ধারিত করে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের আপত্তি হচ্ছে, সরাসরি আয়ের একটা সীমা বেঁধে দিতে হলে সম্পত্তি সংগ্রহের অধিকারও অস্বীকার করতে হয়। এটা সম্ভব নয়। একমাত্র সম্ভব একটা নির্দিষ্ট সীমার উপর আয়ে শতকরা একশত ভাগ ট্যাক্স ধার্য করে সে আয় মুছে দেওয়া। সেই অর্থে ধরলে আয়ের একটা উচ্চসীমা এখনও চালু আছে। কেননা, আয়কর, সম্পত্তিকর ও উত্তরাধিকারকর মিলে কোনও কোনও স্তরে আয়ের চেয়ে বেশী ট্যাক্স দিত হয়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, এই ট্যাক্স আদায় করা কঠিন হয়। এই স্তরে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার প্রলোভন খুবই বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আয়ের উচ্চতম সীমা বেঁধে দিলে যাদের বেশী টাকা উপার্জন করার যোগ্যতা আছে তাঁদের বিদেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

অতএব, বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, অধিক আয়ের উপর অধিক হারে ট্যাক্স ধার্য করে, অপচয় বন্ধ করে, চাহিদা বৃদ্ধির প্রবণতা বন্ধ করে উচ্চ আয়ের উপর পরোক্ষ লাগাম টানতে হবে, তার বেশী কিছু করা যাবে না।

সংবাদ প্রসঙ্গ

যে-সপ্তাহে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন দিয়ে শুরু সেই সপ্তাহেই প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন—এই দুই বিশেষ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বাংলার নগরে পল্লীতে নানা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধি দেশবাসীর মনে ব্যাপকভাবে সঞ্চারের প্রয়োজন বর্তমানেও অনুভূত হয়েছে : 'সমাজ-সেবা বিভাগের প্রধান লক্ষ্য হল গরীবদের কাজ কর্মে সাহায্য করা—কেবল দয়ার দান দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হবে না।...ভিক্ষুকের মানসিকতা আমাদের রাতারাতি বদল হবে না। তার জন্য ধৈর্য চাই।'

আর ২৫শে জানুয়ারী, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন এবং মানবতন্ত্রী চিন্তানায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মদিন।

সাধারণতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন জাতির উদ্দেশে বাণী দিয়েছেন : 'জনসাধারণ সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে মূলতঃ ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে, চাপ দিয়ে কিংবা হুমকি দিয়ে দাবি আদায়ের অন্যায় ফন্দীর কাছে যেন নতি স্বীকার করতে না হয়। হিংসাত্মক কাজ, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনশন প্রভৃতির আশ্রয় না নিলে কোনো অভিযোগের প্রতিকার সম্ভব নয়—এই মনোভাবের প্রশ্রয় দিলে বিপ্লব এড়ানো যাবে না।'

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশের ৯৬ জন বিশিষ্ট জনসেবক, শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, লেখক, সংগীতশিল্পী, ক্রীড়াবিদকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। রবিশংকর, আলী আকবর খাঁ, মিহির সেন এবং অশোককুমার সরকার—বাংলাদেশের এই চারজন পদ্মভূষণ পেয়েছেন। আর পদ্মশ্রী পেয়েছেন সমাজকর্মী প্রিয়রঞ্জন সেন, ইছাপুর রাইফেল কারখানার জেনারেল ম্যানেজার কিরণচন্দ্র ব্যানার্জি এবং প্রযোজক শশধর মুখার্জি। মস্কো, কায়রো, ত্রিপোলি, সানা, বেলগ্রেড, লণ্ডন এবং বিশ্বের আরও নানাস্থান থেকে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানগণ ভারতকে অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছেন।

* * *

আসামে বেআইনী 'পাক অনুপ্রবেশকারী : ২২ জানুয়ারী ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন দিল্লীতে বলেন যে, আসামের মুসলিম জনসংখ্যা গত দশ বছরে শতকরা ৩৮—৫৬ ভাগ বেড়ে গেছে। সেন্সার কমিশনারের এই তথ্যের যাথার্থ্য যাচাই করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, এই জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ পাক অনুপ্রবেশকারী রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অতএব তিনজন সদস্যের এক কমিটির দ্বারা সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিটি বাসিন্দার পরিচয় নেওয়া হোক। এই অনুসন্ধানে যারা পাকিস্তানীদের আশ্রয় দেবে তাদেরও শাস্তি দেবার জন্য আইন প্রণয়নের কথা তিনি বলেন।

* * *

শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্তির উৎসসন্ধান : ২৩ জানুয়ারী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহের শিক্ষাদপ্তরের সচিবদের যে বৈঠক শুরু হয় তার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষাগ্রহণের সময় ত্বরান্বিত করা, শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করা এবং সারাভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সংহতি সাধনের পন্থা পর্যালোচনা করা। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব শ্রীপ্রেম কৃপাল আক্ষেপ ক'রে বলেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনা যতোবার সংশোধন করা হচ্ছে ততো বারেই শিক্ষাখাতে বরাদ্দ খানিকটা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে। সর্বশেষ বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ১০৪৯ কোটি টাকা। অথচ চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম দু-বছরের জন্য মোট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ২০০ কোটি টাকা। এই হারে বরাদ্দ চললে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও টিকবে না। তিনি ছাত্র বিক্ষোভ সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, এইভাবে অবাধে ছাত্র বিক্ষোভ চলতে থাকলে দেশের সম্মুখে গভীর সংকট আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এই বিক্ষোভ প্রশমনের জন্য তৎপর হতে হবে। সমাধানের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে সমাজ সেবার কাজে প্রয়োগের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। তিনি কলেজ ও স্কুলসমূহের শিক্ষকদের বর্ধিত হারে বেতন দেওয়ার সুপারিশকে আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে কাজে পরিণত করার জন্য চাপ দিয়েছেন।

এরপরই পশ্চিম বাংলার ২৪ তারিখের এক খবরে জানা গেছে যে, রাজ্যের ৫২০০০ মাধ্যমিক শিক্ষককে গত এপ্রিল মাস থেকে বর্ধিত হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য ডি-পি-আই রাজ্যের জেলা-পরিদর্শকদের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন।

* * *

ধর্মঘটের অবসান : চুয়াল্লিশ দিন ধর্মঘটের পর গত ২৪ জানুয়ারী কলকাতা শহরের পথে আবার ট্রাম চলেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের চলাফেরার সুযোগ আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর আগে ১৯৫৮-তে ৪২ দিন এবং ১৯৬৬-এ ৮৪ দিন ধরে কলকাতার ট্রামকর্মীরা ধর্মঘট চালিয়েছিলেন।

* * *

শহর কলকাতা : সম্প্রতি দুজন বিদেশী পর্যটক হাওড়া পুলের ওপর ফোটো তুলতে গিয়ে বেশ বিপত্তি বাধিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজন প্রতিবাদ করাতে বিদেশীদের একজন রিভলবার বার করে ফাঁকায় এক রাউণ্ড গুলী চালান, তাতেই গোলমাল ঘোরালো দাঁড়ায়।

কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট মহানগরীর পূর্ব ও দক্ষিণ কিয়দংশ নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন এখবর ২৫ জানুয়ারী প্রকাশ হয়েছে। এই পরিকল্পনাতে বেলেঘাটা থেকে ২৪ পরগণার গড়িয়া অবধি প্রায় দশ মাইল লম্বা ১৫০ ফুট চওড়া একটি রাস্তা বানানোর কথাও আছে। সুসমাচার খবর তাতে সন্দেহ কি!

বাজারে আমিষের দর বেড়ে গেলেও কর্পোরেশনের দৌলতে নাগরিকরা জলের মধ্যে নির্গলিত কীট-পতঙ্গের আরক পান করছেন এবং নিখর্চায়! তবে কর্পোরেশন জলকমিটির কর্তাব্যক্তিরা এই সংবাদ অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্য পলতার ট্যাঙ্কে পাহাড়-প্রমাণ পলি পড়েছে, এতে তাঁদের টনক নড়েছে। ট্যাঙ্ককে পলি-পাশমুক্ত করার জন্য একহাজার কর্মীকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

নিরাটিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের আগের রাতে বিরাট এক চোরাই গাঁজার আখড়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ মণ গাঁজা আবগারী বিভাগ বাজেয়াপ্ত করেছে। এই গাঁজার নগদ মূল্য ৫১২৮০০০ টাকা মাত্র!

পাকিস্তানের মসনদ : জানুয়ারি মাসের গোড়াতে যখন এবডো প্রত্যাহার করা হয়, তখন অনেকেই আশা করেছিলেন যে শাস্তিমুক্ত ৭২ জন রাজনৈতিক ধুরন্ধর পাক-প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ-কে বেকায়দায় ফেলবেন। এমনও হতে পারে যে আয়ুব খাঁকে তাঁর পূর্ব-পূর্ব রাষ্ট্রপ্রধানদের মতোই বিদায় গ্রহণে বাধ্য করা হবে। কিন্তু এখনও অবধি সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বস্তুতঃ, একমাত্র মিয়া মমতাজ দৌলতানা ছাড়া বাহাত্তর জনের এই দলের সকলেরই বাহাত্তুরে দশা। অতএব আয়ুব কোনওক্রমে দৌলতানাকে মন্ত্রিসভায় টেনে নিতে পারলেই নসীবে তাঁর দৌলত বজায় থাকবে। এদিকে করাচীর পুলিশ গত ২২ জানুয়ারী হায়দ্রাবাদে (সিন্ধু) রসুল বক্স তালপুরকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করেছে। আয়ুব আপন আয়ু আরও সুরক্ষিত করার জন্য দুঁদে রাজনৈতিক ভুট্টোকে আবার মন্ত্রিসভায় টানবার জন্য

হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম

অশোককুমার সরকার

রবিশঙ্কর

আলি আকবর খাঁ

তৎপর হয়েছেন। কিন্তু ভুট্টো শিং নাড়ছেন। এমনকি তিনি পূর্ব-পাকিস্তানে গত নভেম্বরে সফর ক'রে তরুণ দলের মন জয়ের জন্য ভারতের অনুকূল কথাবার্তাও মুখে উচ্চারণ করেছেন। তারপর করাচীস্থ ভারতের হাইকমিশনের দপ্তরেও যাতায়াত করেছেন। উদ্দেশ্য 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন দল বানিয়ে নেতা হওয়া। ভুট্টো বাহ্যতঃ 'মুখে হরি' বললেও তলে তলে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন তার প্রমাণ বৈদেশিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর বিষোদ্গার! ভুট্টোর মহিমা বোঝা ভার। আয়ুব খাঁও পূর্বপাকিস্তানে নিজের অনুকূলে মত ঘোরাবার জন্য গত ২০শে জানুয়ারী কুড়িজন আওয়ামী লীগপন্থী রাজনৈতিক প্রধানকে জেল থেকে খালাস করে দিয়েছেন। জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগেই গত ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে এ'দের বন্দী করা হয়েছিল। মোটকথা আয়ুব খাঁর মসনদের তলায় ভূমিকম্প শুরু হয়েছে এটা তিনি টের পেয়েছেন।

মাও-এর দ্বিতীয় মহালম্ফ : বিরোধীদের দমনের জন্য মাও সে-তুং সেনাবাহিনী তলব করেছেন। এখন পরস্পর-বিরোধী দুই সেনাদলের সংগ্রামে উত্তর-পশ্চিম চীনের মাটি রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। টোকিওর ২৭ জানুয়ারীর সর্বশেষ খবরে জানা গেছে যে, মেসিনগান, মর্টার, হাতবোমা এই লড়াইতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিংকিয়াং প্রদেশের শি-হো-জুতে ইতিমধ্যেই শতাধিক প্রাণহানি ঘটেছে। তিব্বতেও এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে পিকিং টোকিও, হংকং এবং মস্কো থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে চীন যে গৃহযুদ্ধের কবলে পড়েছে তাতে কোনো সংশয় নেই।

*　　*　　*

পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার : মস্কোতে ২৭ জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সরকার মহাকাশে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ক'রে এক নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। সাড়ে তিন বছর আগে এই তিনটি রাষ্ট্রই পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা আংশিক ভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এবার মহাকাশে সম্পূর্ণভাবে এই পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হল। এরপর, গতবারের মতো একশ'টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে অনুমোদন স্বাক্ষর দেবেন। শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশের ব্যবহার সম্পর্কে এটিই বোধহয় প্রথম আন্তর্জাতিক আইনকানুনসম্বলিত দলিল।

*　　*　　*

ভিয়েৎনাম সমাচার : ওয়াশিংটনে ২৬ জানুয়ারী তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, ভিয়েৎকং জাতীয় মুক্তিফৌজের সঙ্গে মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যেই যোগাযোগ করা হয়েছে। এই যোগাযোগে শান্তি প্রস্তাবের কোনও সম্বন্ধই নেই।

আর বন্-এ ২৭ জানুয়ারী বিশ্ব কাউন্সিল অব চার্চেস-এর সভাপতি রেভারেন্ড মার্টিন নিয়েমোলার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বোমা-ফেলা বন্ধ করে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে সেনাবাহিনী অপসারণের প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে উত্তর ভিয়েৎকং শান্তি সম্পর্কে আলোচনায় নামতে রাজী আছে।

হংকং-এর খবরে বলা হয়েছে যে, ২১, ২২ এবং ২৫শে জানুয়ারীতে আমেরিকান বিমান মিন্ বিন, থান হোয়া এবং নাম দিন-এ বোমাবর্ষণ করেছে।

*　　*　　*

লেনিনের সমাধিভবনে চীনাদের অপকীর্তি : মস্কো ২৭ জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ যে গতকাল রেডস্কোয়ারে লেনিনের সমাধিভবনের সম্মুখে, সেখানকার নিয়মাবলী লঙ্ঘন ক'রে একদল চীনা রীতিমত হল্লা-হুজ্জৎ জুড়ে দেয়। লেনিন ভবন দর্শনার্থীদের গায়ে ধাক্কা মেরে তারা ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয় এবং সোভিয়েৎ-বিরোধী জিগির দিতে থাকে। তাদের এই অশোভন আচরণে স্থানীয় নাগরিকেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল এই, চীনাদের সঙ্গে চৈনিক দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও ছিলেন, কিন্তু তাদের কাজে বাধা দেন নি। এরপর সোভিয়েত বৈদেশিক দপ্তর চীনা দূতাবাসের কাছে এই মর্মে এক লিপি পেশ করেছেন যে, ভবিষ্যতে সোভিয়েৎ ভূখণ্ডে যে সকল চীনা নাগরিক আসবেন তাঁরা যেন সৌজন্য বজায় রেখে চলেন। এদিকে দূতাবাসের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

অধিকন্তু

হিমানীশ গোস্বামী

কাজে গিয়েছিলাম নাগপুরে। আশা ছিল কাজ দু দিনেই হয়ে যাবে, আর ওখানে তরুণ, মদন ও সুপ্রিয় রয়েছে তাদের সঙ্গে দিন দুয়েক বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে। কিন্তু কপালটাই খারাপ আমার। আমি নাগপুরে পেৌছে দেখি ওদের কেউ নেই। তরুণ বদলি হয়ে গেছে বোম্বাইতে, মদনের বাড়ি থেকে জরুরী টেলিগ্রাম আসায় সে চলে গেছে, আর সুপ্রিয় একটা স্কুটারে চড়তে গিয়ে একটা সাইকেল রিক্সাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে একটা নালায় পড়ে, তারপর থেকে সে হাসপাতালেই রয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা না করেছি তা নয়, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা আদেশ করেছেন সুপ্রিয় যেন একটিও কথা না বলে।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল। আমার কপালটাই এমনি। যাদের সঙ্গে দেখা হবেই বলে মনে হয়, তাদের সঙ্গেই দেখি শেষ পর্যন্ত দেখা হয় না, আর যাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবে না বলে মনে হয়, কখনো প্রায় যাদের দেখতে পাব ভাবি নি তাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যায়। আমাদের পাড়ার ব্রজরাজবাবুর সঙ্গে যেমন আমার বছরে একবারও দেখা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ আমরা একই রাস্তায় থাকি, একই পাড়ায় অফিস করতে যাই, আমাদের একই বাজার। অথচ সেবারে সেই কোথায় ইন্দোরের পথে এক ডাক-বাংলোয় দেখা হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু কেবল কি একবার। পাটনায় গিয়েছি গত বছর। ওখানকার একটা বাজারে ঢুকেছি, দেখি ব্রজবাজবাবু। এ সব ঘটনা আমাকে আশ্চর্য করে দেয়। কেননা, কেবল যে ব্রজরাজবাবুর সঙ্গে এমনভাবে দেখা হয়ে যায় তা ত নয়। প্রিয়তোষের সঙ্গেও আমার অন্তত তিনবার দেখা হয়েছে—কোলকাতার বাইরে। অথচ কোলকাতায় সেও থাকে, আমিও থাকি—হঠাৎ দেখা এখানে একবারও হয় নি ওর সঙ্গে। তারপর ধরা যাক রাজেনের কথা। থাকে ভুবনেশ্বরে। বছরে কোলকাতায় আসে দু-একবার। কিন্তু এ যাবৎ কোলকাতার পথে তার সঙ্গে কতবার যে দেখা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই। এ সমস্ত দেখে আমার মনে হয় আমাদের শরীরের মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু অদৃশ্য শক্তি আছে যার ফলে আমরা নিজেদের অজান্তেই পরস্পরের নিকটবর্তী হই। যাঁরা স্পিরিচুয়ালিজমে বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন...।

কিন্তু তাঁরা যা বলেন তা বিশদ করে বলবার প্রয়োজন দেখি না। অল্প কথায় বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের শরীরের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে সেই আত্মাটির অনেক গুণ। দেহে আত্মা থাকে, কিন্তু কখনো-কখনো আত্মাটি দেহ ছেড়েও পরিভ্রমণ করতে পারে। অনেকটা ঘুড়ি ওড়ানোর মত। একটা সূক্ষ্ম সুত্রের যোগাযোগ থাকে ঘুড়ির ক্ষেত্রে, আত্মার ক্ষেত্রে সেই সুত্রটি থাকে বটে, কিন্তু সেটাকে দেখা যায় না।

নইলে, নাগপুরে সার্কাস দেখতে গিয়ে আমার সীট থেকে ফুট সাতেক সামনে তারুকে যে দেখতে পেলাম তার আর কোনো অর্থ আমি তো করতে পারি না। তারুকে আমি পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। বিরাট একটা গোঁফ রয়েছে বটে, কিন্তু তাকে চেনা যায় ঠিকই। এই সেই তারু—আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। মাথায় একটু ছিট ছিল। বছর পাঁচেক আগে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাড়ীতে চিঠি লিখে যায়, আমি চললাম— জীবনে উন্নতি যদি কখনো করতে পারি তবেই ফিরব, নচেৎ নয়। তারপর তাকে কত খোঁজা হয়েছে, পাওয়া যায় নি। আমিও যেখানে গিয়েছি তারুকে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথাও, কোথাও তাকে পাই নি।
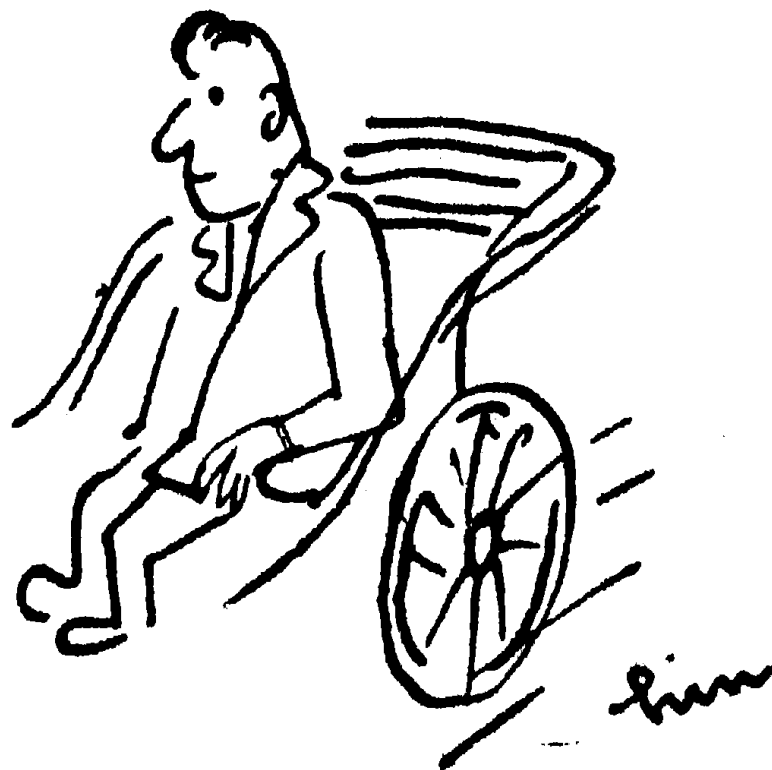
আমি তারুকে দেখতে পেয়ে বাঘের খেলা দেখতে ভুলে গেলাম। একটু ফিস-ফিস করে বললাম, তারু...তারু...। কথাটা শুনতে পেল বলে মনে হল না। আমার পকেটে কয়েকটা চীনে বাদাম ছিল, আমি তা থেকে একটা নিয়ে তার মাথায় ছুঁড়ে মারতে গেলাম, কিন্তু সেটা তার মাথায় না গেলে আমার সামনের সিটে বসা একটি ভদ্রমহিলার খোঁপায় লেগে সেটা আটকে রইল। ভদ্রমহিলা আমার দিকে এমন করে তাকালেন যে, দেখে ভয় হল। আমার পাশের এক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এমনভাবে যে, আমার দ্বিতীয় চীনে বাদাম ছুঁড়তে সাহস হল না। তারপর খানিক সময় যাবার পর যখন একটা মেয়ে তারের উপর সাইকেল নিয়ে অদ্ভুত খেলা দেখাচ্ছে তখন আমি দ্বিতীয় চীনে বাদামটি ছুঁড়ে মারলাম তারুর দিকে। মার আমার কি যে দুর্ভাগ্য, সেটা গিয়ে লাগল একজন টেকোর মাথায়, আর তৎক্ষণাৎ টেকোটি আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন। এবারে পাশের লোকটি আমাকে বললেন আপনার মতলব কি বলুন তো? আমি বললাম, আমি ঐ লোকটিকে চিনি, তাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভদ্রলোক বললেন, তা অমন চীনে বাদাম না ছুঁড়ে আমাকে বললেই পারতেন। বলে ভদ্রলোক এক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকে তাঁর লাঠিটি দিয়ে তারুর পিঠে এক খোঁচা মারলেন। তারু আপন মনে খেলা দেখছিল, খোঁচা খেয়ে চুঃ বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। আর আমিও বুঝতে পারলাম তখনি যে লোকটিকে তারু বলে মনে হয়েছিল কিন্তু সে তারু নয়।

এর পর যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারত, যে সমস্ত তর্কাতর্কি হাতাহাতি হতে পারত, তার কিছুই হল না, কেননা, আমি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই মুহূর্তে সার্কাস থেকে হুড়মুড় করে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা রিক্সায় উঠে পড়েছিলাম। তবে বলা যায় না, হয়ত তর্কাতর্কি হাতাহাতি হয়েছিল আমার পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে—হলে খুব আশ্চর্য হব না, কারণ ভদ্রলোকের খোঁচা দেবার ক্ষমতা ছিল সত্যিই অসাধারণ।

আমার জীবন
মধু বসু

(৪৯)

৩নং থিয়েটার রোডে আমরা উঠে এলাম মে মাসে।

কিছু দিনের মধ্যেই সাধনা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। সুস্থ হয়েই সে ধরে বসল যে, সে এভাবে চুপচাপ বসে না থেকে একটা 'শো' করতে চায়। তখন তার একলা চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে কোন কাজের ভেতর লিপ্ত থাকাটা আমিও অনেক বাঞ্ছনীয় মনে করে বন্ধুবর হরেন ঘোষকে ডাকলাম। হরেনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হল যে, হরেন সাধনার 'শো'র বন্দোবস্ত করে দেবে—ইতিমধ্যে কিছু দিন রিহার্সাল হোক। রিহার্সাল সম্পূর্ণ হলে হরেন হাউস-এর বন্দোবস্ত করবে।

শিল্পীদের এবং বাদ্যযন্ত্রীদের খবর দেওয়া হল। পুরোদমে রিহার্সাল শুরু হল ঐ থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটেই। কিন্তু কয়েক দিন রিহার্সাল চলবার পর দেখা গেল সাধনার মতিগতি আবার সেই পুরনো ধারায় ফিরে গেছে। আবার সে নিজের খেয়াল-খুশি মত স্বাধীন জীবন যাপন করবার চেষ্টা করল। আমি তাকে নিষেধ করলেও সে শুনত না, ফলে তার সঙ্গে আমার খিটিমিটি লেগেই থাকত।

এদিকে রিহার্সালও ঠিক মত হত না—শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীরা এসে এসে ফিরে যেত। এই নিয়েই আমার সঙ্গে শুরু হল মনোমালিন্য। সাধনার ধারণা জন্মেছিল যে, স্বাধীনভাবে থাকলে সে অনেক ভাল কাজ করতে পারবে। আর তার এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল তার স্তাবকেরা। যতদিন সাধনা অসুস্থ ছিল ততদিন এই স্তাবকের দল বিশেষ তার কাছে ঘেঁষে নি—এখন সে সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্তাবকদের ভিড় আবার বাড়তে লাগল।

একদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল।

টুকলু তখন আমাদের সঙ্গে থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটেই থাকত। ওখানে তখন থাকবার জায়গা ছিল যথেষ্ট, সুতরাং টুকলুর থাকার কোন অসুবিধাই ছিল না।

সাধনা সেদিন আগেই লাঞ্চ খেয়ে নিয়েছে। আমি আর টুকলু বসে লাঞ্চ খাচ্ছি। এমন সময় দেখলাম যে, সাধনা তার হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার এই যাওয়ার ব্যাপারে আমাকে সে আগে ঘুণাক্ষরেও জানায় নি। আমি তখন টুকলুকে বললাম : দেখ তো টুকলু সাধনা কোথায় যাচ্ছে।

টুকলু বেরিয়ে এসে দেখে সাধনা ইতিমধ্যে ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠতে যাচ্ছে। টুকলু তাকে বাধা দিতে গেলে সাধনা বেশ রেগে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল এবং অপমানও করল। এই চেঁচামেচিতে রাস্তায় বেশ ভিড় জমে গেল। টুকলু আর কিছু না বলে ফিরে এসে আমাকে সব ব্যাপারটা বলল। সাধনা চলে গেল।

এটা হল ১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাসে। দাঙ্গার উত্তেজনা তখনও বেশ রয়েছে, কলকাতার লোকের জীবনযাত্রা তখন স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে নি।

যাই হোক, সাধনা চলে গেল—কিন্তু গেল কোথায়? হাতে তো বিশেষ তার টাকা-কড়িও ছিল না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জানা-শোনা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, আত্মীয়স্বজনদের কাছে ফোন করে খবর নিতে লাগলাম। সমস্ত বড় বড় হোটেলগুলোয় খবর নিতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও তার কোন খবরই পেলাম না : শেষে রেলওয়ে স্টেশন, পুলিশ, হাসপাতাল সব জায়গাতেই খোঁজ করতে লাগলাম—কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধানই পেলাম না। এই সময় জ্ঞানাঙ্কুর আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত্রি গভীর হয়ে এল—তার কোন হদিশই পেলাম না। মানুষটা কি উধাও হয়ে গেল। একটা দারুণ নিরাশায় মন ও মেজাজ দুই-ই ভেঙে পড়ল।

সমস্ত রাতটা তো এইভাবেই কাটল। পর দিন সকাল বেলায় আমাদের এক বন্ধুর স্ত্রী আমায় টেলিফোনে জানাল যে, সাধনা গিয়ে উঠেছে গ্র্যান্ড হোটেলে আজ সকালে। আগের দিন রাতে সে এই বন্ধুর ফ্ল্যাটেই ছিল। যতবার বন্ধুর স্ত্রী আমাকে ফোনে জানাতে গেছেন ততবারই সাধনা বাধা দিয়েছে এমন কি একথাও বলেছে যে, ফোন করে আমাকে জানালেই সে যেখানে খুশি চলে যাবে। শেষে এখন সে গ্র্যান্ডে চলে যাওয়ায় আমাকে ফোন করছে।

কথাটা শুনে প্রথমটা আমি অবাক হলাম। গ্র্যান্ডে থাকার মত তার হাতে টাকা কোথায়? পরে খোঁজ করে জানতে পারলাম যে, বম্বেতে তার একটা জাগুয়ার গাড়ী ছিল—খুব দামী গাড়ী সেখানা। সেইটা জলের দরে বিক্রি করেছে আমাদের এক বন্ধুর মাধ্যমে মাত্র ৬।৭ হাজার টাকায়। যেটার দাম খুব কমপক্ষে ২৫০০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। আর যিনি কিনলেন তিনিও আবার আমাদেরই এক বন্ধু। সেই টাকাটা ওর হাতে ছিল এবং সেইটাই সম্বল করে সাধনা গিয়ে উঠেছে গ্র্যান্ডে।

তার কিছু দিন পরে আমাদের সেই বন্ধুটি এসে সাধনার বাকী জিনিসপত্র নিয়ে গেল এমন কি সাধনা রেডিওগ্রামটিও চেয়ে পাঠাল।

সাধনা যে রকম অমিতব্যয়ী তাতে ঐকটা টাকা আর কতদিন? শিগগীরই সে সব টাকা শেষ হয়ে গেল, এমন কি রেডিও-গ্রামটিও বিক্রি করে দিয়েছিল।

এই সব ব্যাপারে আমার মনটা এমনই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, আর আমি সাধনার কোন রকম খোঁজ-খবর রাখার দরকার মনে করি নি। দেখলাম সে যখন আমার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চায় না—তখন আমিও তার সমস্ত ব্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলাম।

এর পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল।

সাধনা চলে যাবার পর আমি আর টুকলু থাকি সেই বিরাট ফ্ল্যাটে। হেম সোম প্রায়ই আসত। একদিন সে আমাকে বলল : মধু, এভাবে চুপচাপ মন-মরা হয়ে বসে না থেকে একটা কাজ করবে! কিছু পয়সাও পাবে আর একটা কাজে লেগে থাকলেও মনটাও অনেকটা ভাল থাকবে।

আমি বললাম : কাজটা কি শুনি?

হেম, সোম বললে : হিন্দীতে আলি-বাবার গ্রামোফোন রেকর্ড কর। আমি বললাম : হিন্দীতে অনুবাদ করবে কে? আর্টিস্ট কোথায়?

হেম বলল : আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমার হাতে ভাল লোক আছে যে খুব ভাল হিন্দীতে অনুবাদ করে দেবে। আর্টিস্ট পাওয়া যাবে। রাধারাণীকে নাও—তার গানের গলা চমৎকার আর হিন্দীও ভাল বলে। সে মর্জিনা করবে, আর তুমি কর আবদাল্লা। টুকলু রয়েছে সে করবে মুস্তাফা। কলকাতায় অনেক হিন্দী বলার আর্টিস্ট আছে, সুতরাং বাকী চরিত্রগুলো জোগাড় করা কিছু শক্ত হবে না।

হেমের এ প্রস্তাবটা আমার ভালই লাগল। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

শুরু হয়ে গেল কাজ। গানগুলো বাংলার ছকেই অনুবাদ করা হল এবং সুর সব বাংলার মতই রাখা হল। কিছুদিন রিহার্সালের পর পুজোর আগেই রেকর্ডিং হয়ে গেল। দেখা গেল রেকর্ডগুলি বেশ ভালই হয়েছে এবং পরে রেকর্ডগুলির বেশ

চাহিদা হয়েছিল। আমিও রয়্যালটি হিসেবে বেশ ভাল টাকাই পেয়েছিলাম।

আগেই বলেছি আমার ফ্ল্যাটের নীচে থাকতেন সুশীল দে আই-সি-এস। এইখানে স্বনামধন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর স্ত্রী এলেন রায় এসে কিছুদিন রইলেন সুশীলের অতিথি হিসাবে। এইখানেই শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে। কত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হত শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্গে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযুক্ত রায় তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বলে যেতেন। কখনও রাশিয়ার কথা, কখনও অন্য দেশের কথা—আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনতাম তাঁর সেই কাহিনী। এত সুন্দর ছিল তাঁদের ব্যবহার এবং কথাবার্তা যে, তাঁদের এই অল্প দিনের সান্নিধ্য আমার মনে গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল।

এই সময় সুধীন, (কবি সুধীন দত্ত) ও তার স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্ত প্রায়ই আসত আমার ফ্ল্যাটে। রাজেশ্বরী যদিও অবাঙ্গালী ছিল তবু সে ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্রী এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার দখল অসাধারণ। প্রায়ই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শোনাত। আমি তাকে কতকগুলি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখিয়ে ছিলাম।

এই সময় একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেটা হবে জুলাই-এর শেষ কিম্বা আগস্টের গোড়ার দিকে।

কলকাতায় দাঙ্গার উত্তেজনা আবার কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। হরেন ঘোষকে বললাম আমার ফ্ল্যাটে চলে আসতে। আমার ঘর তো খালিই পড়ে আছে। ধর্মতলায় সব সময় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আপিস করে কি লাভ?

হরেন হেসে বললে : আরে আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। আমাকে সবাই চেনে, এতদিন ধরে আমি এখানে রয়েছি—আমার কিছু হবে না।

আমি বললাম : কি দরকার এ রকম প্রাণ হাতে করে ওখানে থাকার। আমার ফ্ল্যাটে ত যথেষ্ট জায়গা আছে, এখানেই তোর আপিস কর। টেলিফোনও আছে, কোন অসুবিধা হবে না। হরেনকে অনেক কষ্টে রাজী করালাম, তবে সে বললে : আমার কতকগুলো জরুরী টেলিগ্রাম আসবার কথা আছে, সেগুলো আসুক আর তাছাড়া আমি এখন দিল্লী যাচ্ছি। ফিরে এসে তোর এখানেই আপিসটা করব।

হরেন দিল্লী চলে গেল। দিল্লী থেকে ফিরে এসে বললে : আমি কয়েক দিনের মধ্যেই তোর ফ্ল্যাটে আমার আপিস ঘর করব। লোকজনদের সব বলে দিচ্ছি যে, এখন থেকে সব খোঁজ-খবর তোর ওখানেই করবার জন্যে।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ কথা। এর ২।৪ দিন পরেই খবর পেলাম দুর্বৃত্তের দল কি নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করেছে তারই ম্যাডান স্ট্রীটের অফিস ঘরে। এ খবর আপনারা অনেকেই জানেন। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করতে আমি অপারগ। হরেনের মৃত্যুতে আমি হারালাম একজন সত্যিকার দরদী বন্ধুকে—আর আমাদের মঞ্চজগৎ হারাল একজন কৃতী ইম্প্রেসারিওকে।

এর কয়েক দিন পরেই এল ১৫ই আগস্ট। ভারত পেল তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ এক বছর ধরে সারা ভারতে যে হত্যার তাণ্ডবলীলা চলেছিল আজ সেই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভাই-ভাই বলে উভয়ে উভয়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

সেপ্টেম্বর মাস নাগাত আমার এক বন্ধু অলক মিত্র (যিনি এখন মাহিন্দ্র এণ্ড মাহিন্দ্র কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এবং তার স্ত্রী মীরা (বুলু) তাদের মেয়েকে নিয়ে বম্বে থেকে বদলী হয়ে কলকাতায় এল। প্রথমটা কোন ফ্ল্যাট না পেয়ে আমার ফ্ল্যাটেই এসে উঠল। বুলুর বাবা মিঃ এস কে দত্তর সঙ্গে ছিল আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। চমৎকার দিল-খোলা মানুষ ছিলেন এই মিঃ দত্ত। যতদিন অলক আর বুলু আমার ফ্ল্যাটে ছিল তিনি রোজই আসতেন এবং খুব গল্পগুজব হত।

তারপর অক্টোবর মাসে আমার থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাটের ছ' মাসের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। মিঃ এল আর প্যাটেল ও তাঁর স্ত্রী ফিরে এলেন ইংলণ্ড থেকে, আমিও আবার এসে উঠলাম গ্রেট ইস্টার্ণের সেই পুরনো 'সুইটে'। কালীদা এ সময় প্রায় রোজই আসতেন। আর কেউ না বুঝুক তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাতে আমার মনটা খুবই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। এখন আমার প্রয়োজন সান্ত্বনা এবং শান্তি। তাই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন আমার মনটাকে ভুলিয়ে রাখবার। এই সময় তাঁর অনেক ভক্ত ও শিষ্যরাও আসতেন। তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হল। তার মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের বাংলা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী খাদ্য দপ্তরের রেশনিং বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা। ও'র ওপর চিনির বরাদ্দ বণ্টনের ভার ছিল।

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে কালীদা একদিন আমাকে বললেন : জানেন মধুবাবু ছেলেটি কি বোকা?

আমি অবাক হয়ে বললাম : না-না, কি বলছেন কালীদা? আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো। আমার মনে হয় ইনি অসাধারণ বুদ্ধিমান।

কালীদা হেসে বললেন : বোকা ছাড়া কি! নিজের স্বার্থ বলে কিছু বুঝল না। চিনির বরাদ্দ বণ্টনের ভার ছিল এর হাতে যদি সকলের কাছে সামান্য কিছু-কিছু করেও কমিশন খেত, তাহলেও লক্ষ-লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারত। আর বেশ আরামে থাকতে পারত। তা নয়, চাকরীতে কিনা ইস্তফা দিয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন : ঠিক কথাই বলেছেন কালীদা, সে সময় এই গ্রেট ইস্টার্ণেই লাঞ্চ আর ডিনারের ঠেলায় আমার প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। পানীয়ের তো কথাই নেই সকাল থেকেই চলত বিয়ার, তারপর রাতে তো উৎকৃষ্ট দামী বিলাতী সুরা তো ছিলই। সকলের কাছে কমিশন খেলে লক্ষ কেন কোটি টাকা কামাতে পারতুম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন তো কালীদাকে; তাহলে কি আমি ও'র দেখা পেতাম? তাঁর স্নেহ, ভালবাসা আজ আমার মনে যা শান্তি দিয়েছে তা কি কোনদিন পেতাম?

কালীদা সঙ্গে-সঙ্গে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে অন্য আলোচনার অবতারণা করলেন।

ছোট বেলায় বাবার কাছে শুনেছি যে, টাকা মানুষের প্রয়োজন বটে, কিন্তু তা শান্তি দেয় না বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর ও অমানুষ। বাবা ইচ্ছে করলে বহু টাকা উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কামনা করেন নি—তাই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শান্তি পেয়েছেন। আর আজ একজনকে দেখলাম নিজের চোখে।

কালীদার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হত—কখনও সিনেমার গল্প হত, কখনও টুকলুর সরস কৌতুক, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সময়টা বেশ কেটে যেত। এক-একদিন কালীদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনেক রাত্রি হয়ে যেত। কালীদা এখানেই ডিনার খেয়ে শুয়ে থাকতেন। কালীদার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার একটা উপকার হয়েছিল—আমি আমার নিজেকে অন্ততঃ কিছুটা চিনতে শিখলাম, বুঝতে শিখলাম।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল।

১৯৪৮ সাল প্রায় শেষ হতে চলল। 'গিরিবালা'র দরুণ পাওয়া টাকা প্রায় শেষ হয়ে এল। গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে অত বড় 'সুইটের' খরচ চালান মুস্কিল হয়ে পড়ল। তখন ঠিক করলাম যে, 'সুইটে' থাকা আর সম্ভব নয়, ঠিক করলাম 'সুইট' ছেড়ে দিয়ে

একটা ছোট ঘরে উঠে যাব। এই নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় সুধীন দত্ত ও রাজেশ্বরীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল।

এই আলোচনায় অনেকেই উপস্থিত ছিল, বিশেষ করে আমার দাদার ও মেজদার এক বিশেষ বন্ধুর মেয়ে অমিতা (ডাক নাম বুলু)। বুলু বিয়ে করেছিল অতীন বিশ্বাসকে। এরা থাকত কারনানি এস্টেটের একটা দুখানা ঘরযুক্ত ফ্ল্যাটে। এরা প্রায়ই আসত আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি 'সুইট' ছেড়ে দিয়ে সেই হোটেলরই একটা ঘর উঠে যাচ্ছি শুনে বুলু বললে : মধুদা, মিথ্যেমিথ্যা আর হোটেল কেন? অনেক বছর তো হোটেলেই কাটালে। হোটেলে থাক, অথচ হোটেলের খাবার খাও না, নিজের লোক দিয়ে আলাদা রান্না করে খাও। খামখা টাকাগুলো জলে দিচ্ছ। তার চেয়ে আমাদের কারনানী এস্টেটে চল, সেখানে তোমাকে একটা দুখানা ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট ঠিক করে দিচ্ছি—মাসিক ভাড়া মাত্র ২৭৫্। সস্তাই বলতে হবে, তার ওপর দক্ষিণ খোলা। তোমার নিজের রাঁধবার লোক আছে—চামান, আসগর সকলকে রেখে যা খরচা হবে, তাতে হোটেলের থেকে প্রায় অর্ধেক হবে।

আমি তাকে বললাম : সে তো ঠিকই। খরচও কম হবে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী আবার করে খেতেও পারব। তবে কি জান — একটা কথা ভুলে যাচ্ছ— There is a difference between Karnani Estate & Great Eastern Hotel!

তাতে সে বলে উঠল : Difference তো শুধু নামেই।

আমি হেসে বললাম : নামেরই তো দাম! সেটটাই সব, সব!

সুধীন এতক্ষণ আমাদের কথা শুনেছিল আর হাসছিল। সে বলে উঠল : তুমি তো দেখছি তোমার name-sake মধুসূদনের মত কথা বললে।

আমি বললাম : মধুসূদন মানে মাইকেল মধুসূদন?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মাইকেল মধুসূদন। তাহলে শোন বলি। বলে সুধীন বলতে শুরু করলে : মাইকেল যখন বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে কলকাতায় ফিরে এল তখন সে উঠল গিয়ে একেবারে স্পেন্সারস হোটেলে। এদিকে মাইকেল দেশে ফিরে আসছে শুনে বিদ্যাসাগরমশাই আমহার্স্ট স্ট্রীটে সুন্দর একটি বাড়ী ভাড়া করলেন। তাঁর পছন্দমত আসবাবপত্র দিয়ে সাজালেন। দুদিন পরে হেনরিয়েটা আসবে, ছেলেমেয়েরা আসবে, বেশ আরামেই থাকতে পারবে তারা।

বিদ্যাসাগরমশাই গেলেন স্পেনসার্স হোটেলে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে, সেখানে তিনি মাইকেলকে এই প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব শুনে মাইকেল বললেন, Vid (বিদ্যাসাগরকে তিনি Vid বলে ডাকতেন), তুমি আমার জন্যে যা করেছ তা আমি জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। তোমার সাহায্য না পেলে ব্যারিস্টারী পাশও করতে পারতাম না, আর হয়ত ফিরেও আসতে পারতাম না, কিন্তু তোমার এ প্রস্তাবে আমি মত দিতে পারলাম না।

—কেন এতে তোমার আপত্তিটা কিসের? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগরমশাই।

সুধীন বলে চলল : তাতে মাইকেল কি বলেছিল জান? মাইকেল বললে : সবই বুঝি Vid, সব জানি—তুমি যা বললে তা বর্ণে-বর্ণে সত্যি। আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে অনেক কম খরচায় থাকতে পারব। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার-অ্যাট-ল, তার একটা প্রেস্টিজ আছে তো। কোথায় স্পেনসার্স হোটেলে থাকা আর কোথায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ী। লোকে কি বলবে? তুমিও তো ঠিক সেই রকমই বললে মধু। কোথায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল, আর কোথায় কারনানী এস্টেট। শুধু লোকে কি বলবে বললি—বলেছ There is a difference! মানে, মনে-মনে তোমারও আছে সেই আত্মাভিমান, যাকে বলে false idea of prestige.

আমি সুধীনকে বললাম : তুমি যাই বল না কেন সুধীন! হতে পারে এ আমার false idea of prestige. তবু—

সুধীন বাধা দিয়ে বললে : থাক, যেতে দাও ওসব কথা; We all have certain amount of false prestige; let's have some drinks. গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে থাকলেই তুমি শান্তি পাবে, সুতরাং তুমি এখানেই থাক।

কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। এরই দশ বছর পরে ১৯৫৮ সালে তখন আমি Astoria Hotel এ থাকি—সেখানে এমন একটি ঘটনা হল, যে অন্ততঃ দুটো ঘরওয়ালা একটি ফ্ল্যাটে remove করার প্রয়োজন হল। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু দুটো ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট পাওয়া ত দূরের কথা, একটা ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট পাওয়াও অসম্ভব হল। যা হক শেষ পর্যন্ত আসতে হল একটা ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে সেই কারনানী এস্টেটে তাও অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রিয় বন্ধুবর শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের চেষ্টায় এবং সহায়তায়। এ বিষয় পরে বলব।

হ্যাঁ যা বলছিলাম—আমি 'সুইট' ছেড়ে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলরই একটা বড় ঘরে remove করলাম ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা ঃ

পর পর দু'হপ্তায় দু'টি বাঙলা হাসির ছবির মুক্তিলাভ, এ ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না। প্রথমে আমরা দেখলুম রুদ্রাণী ফিল্মসএর "৮০-তে আসিও না" এবং পরে শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স-এর "হঠাৎ দেখা"। স্বাভাবিকভাবেই পাঠকেরা জানতে চাইবেন, কোন্ হাসির ছবিটি কি রকম, কোন্‌টি বেশী ভালো ইত্যাদি। তাঁদের অবগতির জন্যে আমরা জানাচ্ছি, দু'টিই হাসির ছবি এবং দু'টিই ভালো ছবি; তবে দু'টি দু'রকমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দু'টির কাহিনী রচিত। "হঠাৎ দেখা"কে বলতে পারা যায়, আজকের দিনে যে-কোনও শহুরে ধনী-সন্তানের জীবনের হ'লে হ'তে পারে প্রেম-ধর্মী চিত্র; আর "৮০-তে আসিও না" হচ্ছে যে-কোনও বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তির অন্তর্বাসনাকে সফল হ'তে দেখার রঙীন স্বপ্নময় চিত্র। বয়স ও রুচি অনুসারে লোকের ভালো লাগা, না-লাগার তারতম্য ঘটে, একথা যদি মনে রাখা যায়, তা'হলে ছবি দু'খানির মধ্যে কোন্ পাঠকের কোন্‌টি বেশী ভালো লাগবে, তা' আমাদের পরবর্তী সমালোচনা থেকেই তাঁরা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন।

(১) ৮০-তে আসিও না (বাঙলা):— রুদ্রাণী ফিল্মস-এর নিবেদন: ৩,২৬৩-৫০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা ঃ শিবপদ চট্টোপাধ্যায় ও শান্তা গাঙ্গুলী; চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা ঃ শ্রীজয়দ্রথ; কাহিনী ঃ গৌর শী (যযাতির স্বপ্ন); সঙ্গীতপরিচালনা ঃ গোপেন মল্লিক; গীতরচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ ঃ দীনেন গুপ্ত; শব্দানুলেখন ঃ বাণী দত্ত, অনিল তালুকদার, শিশির চট্টোপাধ্যায়, ইন্দু অধিকারী, সোমেন চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা ঃ সুনীল সরকার; সম্পাদনা ঃ কমল গাঙ্গুলী; নেপথ্য কণ্ঠদান ঃ মান্না দে ও রুমা গুহ-ঠাকুরতা; রূপায়ণ ঃ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মনোজ চক্রবর্তী, জহর রায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, অমর মল্লিক, মণি শ্রীমানি, প্রীতি মজুমদার, গৌরী শী, রুমা গুহঠাকুরতা, রেণুকা রায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শান্তা গাঙ্গুলী প্রভৃতি। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাঃ লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ২০-এ জানুয়ারী থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

মানুষ যখন বার্ধক্য ও জরা পীড়িত হয়ে কাজের বার হয়ে যায়, তখন অতীতে তার যে-দাপটই থাকুক না কেন বা ভাগ্য ও পুরুষকারের সহযোগিতায় সে যত প্রতিষ্ঠাই
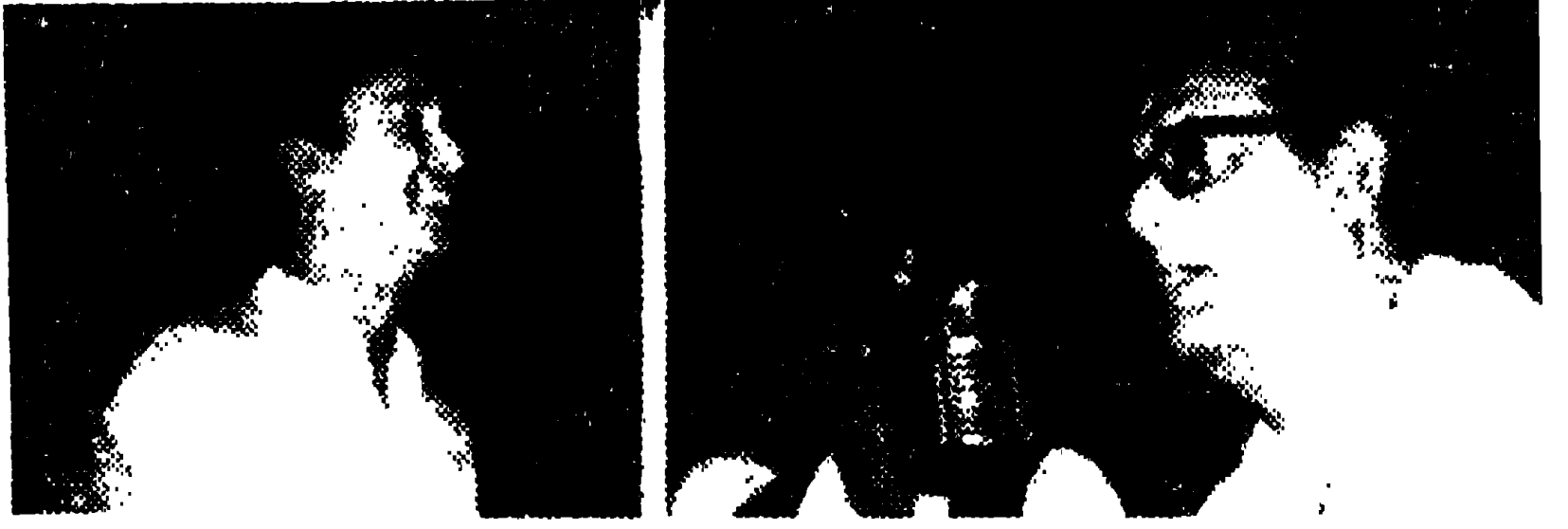
প্রিয়া সিনেমায় সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আয়োজিত দুঃস্থ চলচ্চিত্রকর্মী এবং কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা এবং অরূপ গুহঠাকুরতা। ফটো ঃ অমৃত

লাভ ক'রে থাকুক না কেন, বাড়ীর সকলেই তাকে তখন একটি অনবশ্যক আবর্জনা ব'লে জ্ঞান করতে থাকে। অবাঞ্ছিত জীবনের গ্লানি মনের মধ্যে যতই চেপে বসে, ততই অতীতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ ক'রে বৃদ্ধ তার যৌবনোচ্ছল দিনগুলিকে মনশ্চক্ষে দেখে, আর কামনা করতে থাকে—সেই নানা রঙের দিনগুলিকে যদি কোনো গতিকে ফিরিয়ে পেতুম। বৃদ্ধ সদানন্দও তার পঙ্গু অসহায় অবস্থার মাঝে এমনই চিন্তা করত এবং একদিন স্বপ্নযোগে এক পুকুরে ডুব দিয়ে তার অতীত যৌবনের দিন ফিরিয়ে পেল। রাতারাতি পুকুরটি হয়ে উঠল বিখ্যাত; হৈ-চৈ প'ড়ে গেল দেশে দেশে। বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ত সবাই ডুবতে চায় ঐ পুকুরে। একদিকে সরকারী পুলিশ প্রহরা, অন্যদিকে কালোবাজারী মুনাফাখোরের দল। এরই ফাঁকে অগণন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আপ্রাণ প্রচেষ্টা যৌবন ফিরিয়ে পাবার জন্যে ঐ পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়া। যৌবনপ্রাপ্তির পরে সদানন্দর নিজের সংসারের পরিস্থিতি এবং যৌবন-দায়িনী পুষ্করিণীকে ঘিরে দেশের পরিস্থিতি—এই উভয় বিষয়কে বিবৃত করা হয়েছে বহু ঘটনার মাধ্যমে হাসির হুল্লোড়ে দর্শকদের বারংবার ভাসিয়ে দিয়ে।

অটুট যৌবনের অধিকারী হ'তে পৃথিবীতে কে না চায়? কাজেই হারানো যৌবন লাভের জন্যে বহুজনের ছটফটানি এবং তাই নিয়ে নানারকমের হাস্যোদ্রেককারী ঘটনা দেখতে ছেলেবুড়ো সকলেরই ভালো লাগবে ব'লে মনে হয়। মাত্র স্বপ্ন থেকে বাস্তবে আসার সময়ে কাহিনীকে আরও একটু চড়া পর্দায় বাঁধতে পারলে আরও ভালো হ'ত। আর কোনো কোনো জায়গায় ঘটনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করবারও অবসর ছিল। কাহিনীর আরম্ভভাগে, যেখানে জরাজীর্ণ সদানন্দ বাড়ীর প্রায় সকলেরই উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র, সেখানে হাস্যরসের চেয়ে কারুণ্যই বেশী এবং কাহিনীচিত্রণের মধ্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীটিই প্রকট। কিন্তু তার পরেই কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে কাহিনী হয়ে উঠেছে হাস্যরসের প্রস্রবণ। আবার কাহিনী যখন বাস্তবে ফিরে আসে, তখন আবার সেই দীর্ঘশ্বাস এবং তারই সঙ্গে হয়ত কিছুটা আশার প্রলেপ।

অভিনয়ে বৃদ্ধ ও যুবক সদানন্দ বেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বচনে ও ভঙ্গীতে যে আশ্চর্য প্রাণোন্মাদী অভিনয় করেছেন, ছবির সাফল্যের মূলে তার অবদান বড়ো অল্প নয়। তাঁর পরেই মনে আসে, সদানন্দর অনুগত ভৃত্য, বদনচন্দ্র মহান্তের ভূমিকায় জহর রায়ের চাতুর্যপূর্ণ অভিনয়ের কথা। গৃহভৃত্যরূপে গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে তাঁর করণীয় বিশেষ কিছুই ছিল না; কিন্তু মনিবকে কায়দা ক'রে ট্রেন থেকে নামাবার পর থেকে সদানন্দের স্ত্রী সরোজিনীকে 'রাম-গুলতি'তে চাপিয়ে পুকুরে ফেলা এবং পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা প্রভৃতি দৃশ্যে তিনি তাঁর স্বাভাবিক নাট্যনৈপুণ্য প্রকাশের প্রভূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

ঝাণ্টিপাহাড়ীর বাংলোর বাসিন্দা রাধেশের ভূমিকায় তরুণকুমার সেই বেয়াড়া বেমক্কা মোটর চালনা—এই মোটরচালনা থেকেই প্রকৃতপক্ষে প্রেক্ষাগৃহে হাসির বান ডাকতে শুরু করে—থেকে আরম্ভ ক'রে বৈজ্ঞানিকের কাছে 'জলে'র প্রত্যক্ষ ফল জাহির করবার জন্যে জরাজীর্ণ কুকুর নিয়ে যাওয়া এবং তারই অধিকারভুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত পুকুরের স্বত্বমিত্ব হারানোর দরুণ উদ্ভ্রান্ত হওয়া প্রতিটি দৃশ্যেই তাঁর সাবলীল অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। পুলিশের দলপতি হিসেবে রবি ঘোষের অভিনয়ে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীর সঙ্গে মিলেছে ক্যামেরা-চাতুর্যের ফলে তাঁর অস্বাভাবিকভাবে খর্ব হয়ে যাওয়া—কাজেই দর্শকদের হাসির খোরাক যথেষ্ট মিলেছে এতে। সদানন্দের স্ত্রী সরোজিনী বেশে রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক; এমনকি, যৌবন ফিরিয়ে পাবার পরে পুলিশের নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ ক'রে স্বামীর সঙ্গে মোটরযোগে পলায়নের সময়ে গান গাইবার ক্ষণে তাঁর সঙ্কোচবোধটুকুও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ছবির অপরাপর ভূমিকা মাত্র পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে হ'লেও তার প্রায় প্রত্যেকটিই সুঅভিনীত। এদের মধ্যে কমল মিত্র (দেবেশ), অসিতবরণ (রমেশ), গৌর শী (রাসায়নিক), গঙ্গাপদ বসু (পুলিশ অফিসার), অমর মল্লিক (পুলিশ অফিসার), মনোজ চক্রবর্তী (বিভূতি), রেণুকা রায় (বড়বৌ মনোরমা), শান্তা গাঙ্গুলী (ছোট-বৌ নিরুপমা), সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় (রেখা), মাঃ তপন (ছোট নাতি), মণি শ্রীমানি (নুটু), প্রীতি মজুমদার (চারু) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাসির ছবিতে কলাকৌশলের দিকটা নজরেই পড়ে না; তবুও ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে। পরিবেশ সৃষ্টিতে

নিত্যানন্দ দত্ত পরিচালিত হঠাৎ দেখা চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও সুমিতা সান্যাল। ফটো : অমৃত

ঘটনা উপযোগী ক্যামেরা সন্নিবেশ ক'রে দীনেন গুপ্ত যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির গান দুখানির সুর, গাওয়া ও প্রয়োগ সুষ্ঠু। সদানন্দ-সরোজিনীর জুড়ী-গানে সরোজিনীর মুখে নজরুলী গজল সুর সুন্দর শুনিয়েছে। আবহসংগীতের পরিমিত প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

রুদ্রাণী ফিল্মস-এর "৪০-তে আসিও না" একটি অনাস্বাদিতপূর্ব হাসির ছবি। ছবিটি দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে হাসিতে ফেটে পড়বার যোগাড় হয় এবং ছবি দেখার পরে জীবনযৌবনের অনিত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করে অন্তরের অন্তস্থলে একটি করুণ অনুভূতি জাগে।

●

হঠাৎ দেখা (বাঙলা) : শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৯৮৩·৬০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; **প্রযোজনা :** শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স; **চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :** নিত্যানন্দ দত্ত; **কাহিনী :** তীর্থ চট্টোপাধ্যায়; **সংগীত-পরিচালনা :** শ্যামল মিত্র; **গীতরচনা :** পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; **চিত্রগ্রহণ :** শৈলজা চট্টোপাধ্যায়; **শব্দানুলেখন :** নৃপেন পাল; অতুল চট্টোপাধ্যায়, সুজিত সরকার এবং ইন্দু অধিকারী; **সংগীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজনা :** শ্যামসুন্দর ঘোষ; **শিল্প-নির্দেশনা :** বংশী চন্দ্রগুপ্ত; **সম্পাদনা :** দুলাল দত্ত; **নেপথ্য কণ্ঠদান :** সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু ও শ্যামল মিত্র; **রূপায়ণ :** সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্য সান্যাল, শিশির বটব্যাল, ভানু ঘোষ, সন্ধ্যা রায়, সুমিতা সান্যাল, রেণুকা রায়, গীতালি রায় প্রভৃতি; এস বি ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল ২৭-এ জানুয়ারী থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"হঠাৎ দেখা"র নায়ক গৌতম চৌধুরীর মতো ছেলে কলকাতা শহরে নিশ্চয়ই দু-পাঁচজন আছে বৈকি, যদিও এমন নায়ক আজকালকার বোম্বে মার্কা হিন্দী ছবিতে হামেশাই দেখা যায়। চিকনচাকন চটক-সুন্দরী দেখলেই হ'ল; অমনই গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ভাব করা চাই-ই। 'নমস্কার ? কোনদিকে যাচ্ছেন ? আসুন না, পৌঁছে দিচ্ছি', থেকেই এই গায়ে-পড়ার শুরু। জবাবে মেয়েটা 'ধন্যবাদ, তার দরকার হবে না' বলতে পারে কিংবা ছোট্ট একটি কথা 'স্টুট !' বলেও আপ্যায়িত করতে পারে। কিন্তু যুবকটি এতেই নিরাশ হয়ে পড়ে না। মেয়েটি কোন কলেজের কোন ইয়ারে কি কি সাবজেক্ট পড়ে এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল, ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা আর আর কোথায় তার গতিবিধি তার কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা ইত্যাদি গোছের রাজ্যের খবর সংগ্রহ করবার পরে সে কি কি উপায়ে মেয়েটির কাছাকাছি হবে এবং অবশেষে ভাব জমাবে, মনে মনে তার একটি ছক প্রস্তুত করে। এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শেষপর্যন্ত মেয়েটি ছেলেটির জালে পড়েছে প্রারম্ভিক বিরূপতা সত্ত্বেও।—ঠিক এমনটিই ঘটেছিল স্কুল-মাস্টার রতন চট্টোপাধ্যায়ের বিদুষী কন্যা শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে। প্রথমে কড়া কথা শোনালেও শেষ অবধি সে ধনীর দুলাল গৌতম চৌধুরীর প্রেমে পড়েছিল। অবশ্য এ-ব্যাপারে গৌতম তার দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী পিয়ালী এবং বন্ধু লাট্টু ওরফে নটবর বসুর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু প্রেমের বন্ধনকে বিবাহবন্ধনে পরিণত করতে গৌতম ও শিবানী, দুজনেই গলদঘর্ম হয়ে গিয়েছিল। তার এক এবং অদ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গৌতমের বাবা শিল্পপতি ইন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও জেদি লোক। ছেলে বাবার সামনে কথা বলতে গিয়ে নাভিশ্বাস না হয়ে পারে না; তার বান্ধবী শিবানীও তথৈবচ। অতএব এই ধরেভদ্র প্রেম ও তার বিবাহ-পরিণতি নিয়ে 'হঠাৎ দেখা'য় বহু হাস্যকর হাল্কা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং ছবিটি সমগ্রভাবে হয়ে উঠেছে একটি হাল্কা রোমান্টিক কমেডি চিত্র। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তরুণ-তরুণীর প্রেমের হাসি ছবি হলেও 'হঠাৎ দেখা' একটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন চিত্র; এর কোনোখানে এতটুকুও অশ্লীলতার নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

অভিনয়ে মাত করে দিয়েছেন নায়ক গৌতমের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ছবির প্রতিটি সিচুয়েশনে তিনি এমন স্বাভাবিকভাবে চলেছেন ফিরেছেন, কথা কয়েছেন, নীরব ইঙ্গিত করেছেন যে, বাংলার বর্তমান চিত্রজগতে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সিরিওকমিক অভিনেতা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর পাশে আছেন লাট্টু বোসরূপী অনুপকুমার; তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে খানিকটা পরে পরেই হাসির ঢেউ তুলে চলেছেন। জবরদস্ত ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ভারিক্কি চালের গুরুগম্ভীর অভিনয় ক'রে গেছেন একেবারে শেষভাগে নায়ক-নায়িকার অহেতুক ভীতিজনিত মজা উপ-ভোগের নিদর্শন স্বরূপ প্রাণখোলা হাসির অংশটুকু ছাড়া। নায়িকার মামা ঘনশ্যাম হালদার বেশে জহর রায়ের নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ অল্পই ছিল। বরং পাড়ার বিখ্যাত মোশান-মাস্টার অভিনেতা রূপে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় চাণক্যের ভূমিকার কিছু অংশ আবৃত্তি করে তাঁর

অভিনয়শক্তির নতুন পরিচয় প্রদান করেছেন। ব্যর্থপাণিগ্রহণপ্রার্থী অনন্তের ভূমিকায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য চরিত্রটিকে অত্যন্ত সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন। বাড়ীর বয় দীননাথ বেশে অমূল্য সান্যাল মন্দ নয়। নায়িকা শিবানীর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় বেশ একটি সপ্রতিভ ভাব দ্বারা চরিত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। পিয়ালীরূপে স্মিতা সান্যাল শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমকেই সম্ভব করেন নি, নিজেকেও লাটুর সঙ্গে জড়িয়েছেন প্রেমের আদান-প্রদানকে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত করে। এ-ছাড়া গীতালি রায় (নায়কের ব্যর্থ প্রণয়িনী শুভংকরী), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (রতন চট্টোঃ), রেণুকা রায় (শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়), ভানু ঘোষ (রিহার্সালের চন্দ্রগুপ্ত), শিশির বটব্যাল (ধূর্জটী) প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি বিশেষ মান রক্ষিত হয়েছে। বহির্দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্য—উভয় স্থলেই চিত্রগ্রহণে যথেষ্ট কৃতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। বহির্দৃশ্যের শব্দানুলেখন কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ। প্রতিটি গানই সুন্দর সুরযোজিত ও সংগীত; তবে প্রতিটিই যে সুপ্রযুক্ত, তা বলা যায় না। 'মন চেয়েছে যারে' এবং 'ওই নীল আকাশের মোহনায়' গান দুখানির জনপ্রিয়তা অর্জনের সম্ভাবনা প্রচুর। ছবির শিল্পনির্দেশনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মডার্ণ রোমান্টিক হাল্কা হাসির ছবি হিসেবে শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স-এর "হঠাৎ দেখা" তরুণ-তরুণীদের প্রচুর খুশী করবে।

—নান্দীকর

কলকাতা

ভোজপুরী চিত্র 'হমার সংসার':

আজ শুক্রবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের কংসার ফিল্মস-এর প্রথম ছবি 'হমার সংসার' (ভোজপুরী) নিউ সিনেমা, বসুশ্রী, বীণা, লোটাস, খান্না, গণেশ, পার্কশো হাউস এবং অন্যত্র মুক্তিলাভ করছে। নাজির হোসেন প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ভোজপুরী ছবিখানি উত্তরপ্রদেশে প্রমোদকরমুক্ত হয়েছে। এতে অংশ গ্রহণ করেছেন অসীমকুমার, লিলি চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, হেলেন, মধুমতী, পদ্মা ও স্বয়ং নাজির হোসেন। মজরু সুলতানপুরী রচিত গানে সুর যোজনা করেছেন শ্যাম শর্মা।

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'নলদময়ন্তী'

ধর্মমূলক ছবি 'নলদময়ন্তী'র চিত্রগ্রহণ বর্তমানে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় শুরু করেছেন সম্পাদক-পরিচালক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। নল এবং দময়ন্তী-র চরিত্রে রূপদান করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অসীমকুমার। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন গঙ্গাপদ বসু, কালীপদ চক্রবর্তী, রবীন মুখোপাধ্যায় ও দিপীকা দাশ। সুরসৃষ্টি করেছেন সংগীত-পরিচালক কালীপদ সেন।

আফসানা চিত্রে হেলেন

অলিম্পিক পিকচার্স-এর 'ছোটা ভাই':

'রামের সুমতি' অবলম্বনে অলিম্পিক পিকচার্স-এর 'ছোটা ভাই' আসচে শুক্রবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। কে পি আত্মা পরিচালিত এই ছবিখানিতে অভিনয় করেছেন নতুন, রেহমান, মহেশকুমার, ললিতা পাওয়ার, জাগীরদার, নাজির হোসেন, রণধীর ও লতা সিংহ।

ক্রান্তিকার গোষ্ঠীর 'জালিয়ানওয়ালা বাগ'

নতুন পরিচালক-গোষ্ঠী ক্রান্তিকার দেশাত্মবোধক চিত্র 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'-এর চিত্ররূপ সম্প্রতি শুরু করেছেন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়। প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন নিরঞ্জন রায়, সমর দত্ত, পংকজ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ এবং সুজাতা দেবী। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অপরেশ লাহিড়ী।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'মেহজুর'

পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর পটভূমিকায় হিন্দী ছবি 'মেহজুর'র চিত্রগ্রহণ টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওয় আরম্ভ করেছেন। ছবির অধিকাংশ শিল্পী কাশ্মীরবাসী। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন রুতর রায় এবং বলরাজ সাহনী-পুত্র পরীক্ষিৎ

মৃণাল চক্রবর্তী পরিচালিত তিন অধ্যায় চিত্রে অজয় গাঙ্গুলী ও ছন্দা দেবী

সাহনী। এই রঙিন ছবিটির আলোকচিত্র-শিল্পী হলেন অজয় মিত্র।

দীপক পিকচার্সের 'ভক্তের ভগবান'

প্রবীণ পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায় দীপক পিকচার্সের নতুন ছবি 'ভক্তের ভগবান'র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। চরিত্র চিত্রণে রয়েছেন তন্দ্রা বর্মণ, রবীন মজুমদার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, জহর রায়, রেণুকা রায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সোনালী রায়।

বোম্বাই

'বুঁদ যো বন গয়ি মোতি'র নায়িকা মুমতাজ

প্রযোজক-পরিচালক ভি. শান্তারাম তাঁর সমাপ্তপ্রায় ছবি 'বুঁদ যো বন গয়ি মোতি'র পূর্ব-নায়িকা রাজশ্রীর (শান্তারাম-কন্যা) পরিবর্তে নতুন নায়িকা মুমতাজকে মনোনীত করেছেন। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন জীতেন্দ্র, ললিতা পাওয়ার, নানা পালসিকর, সুরেন্দ্র এবং নবাগতা বৈশাখী। এ ছবির সংগীত-পরিচালক হলেন নবাগত সতীশ ভাটিয়া।

রাজেন্দ্রকুমার-শর্মিলা অভিনীত 'গোল্ড মেডেল'

রাজেন্দ্রকুমার-শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত প্রথম রঙিন ছবিটির নাম হল 'গোল্ড মেডেল।' ছবিটি ৭০ মিলিমিটারে গৃহীত হবে। পার্শ্ব চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বলরাজ সাহনী এবং দেবকুমার। শংকর-জয়কিষণ সুরেকৃত এছবির পরিচালক হলেন সি, ভি, শ্রীধর। ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে হংকং, ব্যাংকক এবং বেরুট অঞ্চলে।

বৈজয়ন্তীমালা রাজেন্দ্রকুমার-মালা সিনহা অভিনীত আগামী ছবি

ভেনাস পিকচার্সের আগামী নতুন রঙিন ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রে সম্প্রতি মনোনীত হয়েছেন বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্র-কুমার এবং মালা সিনহা। জনপ্রিয় তামিল ছবি 'পালাম পালামাম'র অবলম্বনে এই হিন্দী ছবিটির চিত্রনাট্য গৃহীত হয়েছে। এস, কৃষ্ণমূর্তি প্রযোজিত এ ছবিটি পরি-চালনা করছেন সি, ভি, শ্রীধর। নৌশাদ ছবিটির সুরকার।

প্রযোজক প্রেমজীর নতুন ছবি

প্রযোজক প্রেমজী তাঁর নতুন ছবির (নামকরণ সম্পূর্ণ হয়নি) চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন মেহেবুব স্টুডিওয়। ছবিটি পরি-চালনা করছেন রাজ খোসলা। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন সুনীল দত্ত ও আশা পারেখ। সংগীত-পরিচালনা করছেন মদনমোহন।

স্টুডিও থেকে বলছি

বিয়ের লগ্ন শেষ রাতে। বর আসছে ধানবাদ থেকে। দীনেশবাবুর মেয়ে মালার আজ বিয়ে। কোন কিছুতেই ত্রুটি নেই। সকাল থেকেই সানাইয়ের সুর আর উলুর শব্দে এক এক করে উৎসবের সিঁড়ি-ভাঙ্গা চলছে। আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনায় এবং হাল্কা হাসির উচ্ছ্বাসে বিয়ের হাট যেন উবছে পড়ছে। বড়রা সবাই ব্যস্ত। শুধু মালার বয়েসী মেয়েরা নানান হাসি-ঠাট্টায় রঙে রসান চাপিয়েছে। ওরা যেন আজ রঙিন নেশায় মত্ত। যেন বেসামাল।

নববধূর মনে আজ কত ভাবনা। বধূ-বেশে মালা বসে বসে সেই ভয় এবং ভাবনার টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলোকে মনে মনে ভাঙছে আর গড়ছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার কজ্জল মাখা দুটি চোখে সেই ভাবনার ছায়া পড়েছে। ভয় এবং কৌতূহল মেশানো এই কনে-মুখের ছবি বড় রোমান্টিক বলে মনে হয়। চিরদিন এই একই ছবির প্রদর্শনী দেখেও পুরনো হয় না। প্রতিবারই নতুন নতুন মনে হয়।

দেখতে দেখতে নিমন্ত্রিত অতিথিরা শুভ-বিবাহের মঞ্চে এসে জড়ো হলেন। নানান উপহারে শুভদিন স্মরণীয় হতে চলল। বিয়ের লগ্ন শেষ রাতে পড়ায় খাওয়া-দাওয়ার পালা শুরু হয়ে যায় সন্ধ্যে থেকে। দীনেশবাবু করজোড়ে অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। পাশের বাড়ির উকিল ভবেশ চ্যাটার্জীর ছেলে আর ভাগ্নে অশোক এবং গোপাল পরিবেশনে যোগ দিয়েছে। ভবেশ-বাবু আর ইলা দেবী মধুপুরে থাকায় এ বিয়েতে উপস্থিত হতে পারেননি।

পায়ে পায়ে রাত অনেক গড়িয়ে গেছে। শুভলগ্নের আর দেরী নেই। কিন্তু ধানবাদ থেকে বর এসে এখনো পৌঁছয়নি। অথচ বধূবরণের সময় বয়ে যায়। এই সমূহবিপদে দীনেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। একদল গাড়ি নিয়ে চলে গেল বরের সন্ধানে। অন্যদল মনে মনে প্রমাদ গণলেন। কেউ কেউ বললেন, মেয়েটা বোধহয় লগ্নভ্রষ্টা হল। মাঝপথে সানাই গেল থেমে। দীনেশবাবুর স্ত্রী অপর্ণাদেবী মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

অথচ আর দেরী করা চলে না। একটা উপায় না করলে মালার জীবন বিফলে যায়। অপর্ণাদেবী অশোকের কাছে ছুটে এলেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। বাবার অবর্তমানে মালাকে বিয়ে করতে সাহস পায় না অশোক। কিন্তু সবাই মিলে অশোককে অনুরোধ জানালো। মালার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অশোক শেষ পর্যন্ত এবিয়েতে রাজী হয়ে যায়। সানাই আবার বেজে ওঠে। শুভলগ্নে বধূ-বরণ হল। অশোকের সঙ্গে মালার বিয়ে হয়ে গেল।

বিবাহ-বিভ্রাটের ঘটনাটা এখানেই শেষ হল না। বরং শুরু হল বলা যায়। ভবেশ-

অসীম ব্যানার্জি পরিচালিত **বিবাহ বিভ্রাট** চিত্রের নায়িকা লিলি চক্রবর্তী। ফটো : অমৃত

বাবু যথাসময়ে ফিরে এসে এ বিয়ে ভেঙে দিতে চাইলেন। তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। বরং স্পষ্ট করে দীনেশবাবুকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে অশোকের আবার বিয়ে দেবেন। বেচারা দীনেশবাবু আবার বিপদে পড়লেন। বিয়ের হাট অবেলায় ভেঙে গেল।

পাশাপাশি দুই বাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হল। এমনকি মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। ফলে অশোকের সঙ্গে মালার যোগাযোগটাও বিচ্ছিন্ন হল। শত চেষ্টা করেও ভবেশবাবুর মন পাওয়া গেল না। তিনি আপন সিদ্ধান্তে অটল। ইলাদেবীও তাঁর মৎ পাল্টাতে পারলেন না। দেখতে দেখতে সময় পেরিয়ে যায়। অশোক আবার কলেজে যেতে শুরু করে।

মালা যেন কেমন হয়ে গেছে। কনে-মুখের সেই আধোলজ্জা, আধোভাবনা মেশানো রাঙা মুখখানি দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেছে। কাজলমাখা সেই চোখে কখন বিরহের ছায়া পড়েছে। মালা তাই স্তব্ধ। নিশ্চুপ। কান্না তখন তার সাথী। অশ্রু দিয়ে লেখা তার জীবন। মাঝে মাঝে ও-বাড়ির দিকে তাকিয়ে মালা শুধু নীরবে ভাবে আর ভাবে—কেন তার এমন ভাগ্য হল!

মেয়ের মতিগতি দেখে দীনেশবাবু আর অপর্ণা দেবী স্তব্ধ হয়ে যান। সবই ভাগ্য! তা নইলে এমন কেন হবে। তবুও এঁরা চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি। নতুন করে আবার পাত্র খুঁজছেন। মেয়ের মন হাল্কা করার জন্য গানের মাস্টারমশাই প্রশান্তবাবুকে এঁরা নিযুক্ত করেছেন। মালা গান শিখছে। হয়তো নিজেকে ভুলে থাকার জন্য মালার এই পরিবর্তন।

অশোকের কিন্তু মালার এই পরিবর্তনটা ভাল লাগে না। প্রশান্তর কাছে মালার গান শেখা তার মোটেও পছন্দ নয়। তাছাড়া মালাকে সঙ্গে নিয়ে প্রশান্ত সিনেমায় যায়, রেস্টুরেণ্টে বসে এও তার ইচ্ছে নয়। শত হলেও মালা তো তার বিবাহিত স্ত্রী। অশোক তাই মনে মনে জ্বলতে থাকে। গোপালের সঙ্গে পরামর্শ করে।

এরমধ্যে একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে অশোকের সঙ্গে পূর্ব সহপাঠিনী অঞ্জনার দেখা হয়ে যায়। মালাকে দেখবার জনাই ইচ্ছে করে অশোক অঞ্জনার সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করে। যেন তার কাছে আর মালার প্রয়োজন নেই। অঞ্জনাই এখন তার সব। কিন্তু এ ব্যাপারে মালা মোটও ক্রুদ্ধ হল না। বরং মজা পেল। কারণ অঞ্জনা মালারই মাসতুতো বোন। ফলে অশোক শুধু লজ্জাই পেল।

শেষপর্যন্ত মালাকে উদ্ধার করার জন্য অশোক প্রশান্তবাবুর কাছে গান শেখার অছিলায় ছুটে আসে। কথায় কথায় অশোক জানতে পারে অঞ্জনা প্রশান্তরই স্ত্রী, মালার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সব ব্যাপারটা শুনে প্রশান্ত নিজেই দীনেশবাবু এবং ভবেশবাবুর কাছে গিয়ে অশোক-মালার সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনে।

ভবেশবাবু মালাকে পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করলেন। বিবাহ-বিভ্রাটের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই মিষ্টিমধুর কাহিনীটির নাম 'বিবাহ বিভ্রাট'। বর্তমানে এটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে। কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে অভিনয় করছেন, অশোক-অনুপকুমার, মালা-লিলি চক্রবর্তী, গোপাল-রবি ঘোষ, প্রশান্ত-অজয় গাঙ্গুলী, অঞ্জনা-লতিকা দাশগুপ্তা, দীনেশবাবু—গঙ্গাপদ বসু, অপর্ণা দেবী—ভগবতী দেবী, ভবেশবাবু—উৎপল দত্ত ও ইলা দেবী—রেণুকা রায়।

মঞ্চাভিনয়

মুকুর

নাট্যানুরাগীর কাছে 'মুকুরে'র নাম নতুন নয়। 'অর্কেস্ট্রা' ও 'কামধেনু কবচে'র সফল প্রযোজনার মধ্য দিয়ে এই সংস্থার শিল্পীদের নাট্যানুশীলনে নিষ্ঠা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি 'থিয়েটার সেন্টারে' এ'রা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি' মঞ্চস্থ করলেন। মাত্র সাতটি চরিত্র সম্বলিত এই নাটকের সার্থক প্রযোজনায় শিল্পীগোষ্ঠীর যে সংঘবদ্ধ অভিনয় নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়, 'মুকুর' শিল্পী-গোষ্ঠীর অভিনয় ধারায় তার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে। জানা গেল এ'রা নাটকটির নিয়মিত অভিনয়ের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

কালিন্দী

সম্প্রতি 'কালিন্দী' নাটকটি 'বিশ্বরূপা'য় পরিবেশন করলেন কোটস ক্যালকাটা রিক্রিয়েশনের শিল্পীবৃন্দ। নাটকটির সামগ্রিক অভিনয় প্রায় সবারই স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সমীর দাস 'অহীন' চরিত্রের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। ধীরেন মিত্র ও হীরেনেন্দু গুপ্ত 'ইন্দ্র রায়' ও 'রামেশ্বরে'র ভূমিকায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য কৃতী শিল্পীরা হোলেন শক্তি সোম, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র দে, নারায়ণ পাল, মণীন্দ্র বোস।

দুর্গাপুর শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র

সম্প্রতি 'দুর্গাপুর শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রে' বাদল সরকারের 'বড়ো পিসীমা' অভিনীত হয়। নাটকটি প্রাণবন্ত অভিনয় গুণে সবার কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সুজনী

সম্প্রতি 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে' পাইকপাড়ার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সুজনী'র শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প 'ছুটি' ও 'মাল্যদানে'র নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। নাট্যরূপ দেন শ্রীমতী শান্তি সেনগুপ্তা। পরিচালনা করেন পরিমল সেনগুপ্ত।

সলিল সেন পরিচালিত **অজানা শপথ** চিত্রের সেটে মাধবী মুখার্জি ও দিলীপ রায়।
ফটো : অমৃত

পঞ্চদীপ অ্যাথলেটিক ক্লাব

'পঞ্চদীপ এ্যাথলেটিক ক্লাবে'র সদস্যারা একাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' ও বলাই ভট্টাচার্যের 'মহাকাল' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। নাটক দুটি পরিচালনা করেন তপনেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। সুঅভিনয় যাঁরা করেন তাঁরা হোলেন গুরুপদ ঘোষ, দিলীপ নন্দী, উমাশংকর চক্রবর্তী, বাবলু ভৌমিক, রণজিৎ দত্ত, ভুজঙ্গমোহন ঘোড়ই।

উত্তরপাড়ায় মুক্ত অঙ্গন

কলকাতা শহর থেকে দূরে আরো একটি 'মুক্ত অঙ্গন' উদ্বোধনের লগ্ন আসন্ন। হুগলী জেলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা 'দেবদারু' পরীক্ষামূলকভাবে এই মঞ্চের উদ্বোধনে ব্রতী হয়েছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে প্রথম অভিনয় পরিবেশিত হবে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীবৃন্দ সেদিন পরিবেশন করবেন নৃত্য-নাটক 'মহুয়া'। প্রথম পর্যায়ে এই মঞ্চে অভিনয় করবে 'লোকভারতী', 'আনন্দম', 'কৌশিকী' 'আরতী', 'মৌচাক', 'খাদি ও ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ কমিশন অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব, কালচারাল ফ্রিডম সেণ্টার, 'দেবদারু'!' প্রতি রবিবার একটি করে নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হবে।

'উপগ্রহ'

ধুবুলিয়া জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং প্রমোদ বিভাগের শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি শচীন বিশ্বাসের 'উপগ্রহ' নাটক মঞ্চস্থ করেন যক্ষ্মা আরোগ্য নিকেতন মঞ্চে। এই নাটকের কৃতী শিল্পীরা হোলেন বিভূতিভূষণ সাহা, যোগমায়া বিশ্বাস, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ পাড়ে, আশুতোষ পাল। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস।

'বিপ্রদাস'

কো'ডাগাও রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পী-বৃন্দ সম্প্রতি 'বিপ্রদাস' নাটকটি অভিনয় করেছেন। 'বিপ্রদাস' চরিত্রে পরিচালক

মুকুল বিশ্বাসের সুন্দর অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। শিবুজদাসের ভূমিকায় ডাঃ রনেণ সেনও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন—সলিল চৌধুরী, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত পাল, বীথিকা সেনগুপ্ত, চন্দন রায়, দীপ্তি সাহা, রত্না ধর, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সারথীর নাট্যোৎসব

দক্ষিণের প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা সারথী শিল্পীগোষ্ঠী তাঁদের বর্ষপূর্তি উৎসবে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন আগামী ১১, ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে। এ'রা পুরোনো দিনের তিনটি বিখ্যাত নাটক মঞ্চস্থ করছেন। প্রথম দিন রসরাজের **কৃপণের ধন**, দ্বিতীয় দিন গিরীশচন্দ্রের **বিল্বমঙ্গল** ও শেষ দিন ক্ষীরোদপ্রসাদের **চির-নতুন আলিবাবা** নাটক তিনটি অভিনয় করবেন।

যুব সংহতি

'যুব সংহতি'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'ঝর্ণা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। সামগ্রিক নাট্য-প্রযোজনায় বেশ কিছু সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বলে মনে হোল। প্রতিটি শিল্পীর চরিত্র-চিত্রণে বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে।

সুরেন পাল 'জোসেফ' চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার অপূর্ব অভিনয় দিয়ে। 'মঙ্গলে'র ভূমিকায় দুলাল দত্ত সার্থক চরিত্রাভিনেতার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করতে পেরেছেন। 'সোনেলাল' রূপী মদন সেনের অভিনয় কোথাও কোথাও জড়তায় পর্যবসিত হয়েছে। রীতা হালদারের অভিনয়ে প্রতি মুহূর্তে প্রকট হয়ে উঠেছে অতি-নাটকীয়তা। 'বুলবুল' চরিত্রে ঝর্ণা বসু প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন—সুবোধ গোস্বামী, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথী বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রায়, রমেশ পাঠক, জগত বরা, সন্তোষ দত্ত। নাটকটি পরিচালনা করেন জানকী দাস। রবীন দাসের আলোকসম্পাত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

তিনটি একাঙ্ক নাটক

সম্প্রতি তিনটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় পরিবেশনের আয়োজন করে বহুবাজার স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা নাট্যানুরাগীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। প্রথমে অভিনীত হয় অচেনা শিল্পী মহলের 'জগদম্বা ভোজনালয়' ও 'বাস্তবের দু ঘণ্টা'। নাটক দুটির রচয়িতা ও নির্দেশক হলেন তাপস দাস। তৃতীয় নাটক 'বিদিশা' মঞ্চস্থ করেন 'নাট্য আনন্দম।' তিনটি নাটকের কৃতী শিল্পীরা হোলেন স্বপন সেন, স্বপন লাহা, তপন দত্ত, রণজিৎ দত্ত, পঞ্চানন চ্যাটার্জি, প্রফুল্ল মুখার্জী, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, লালু মুখার্জী, কমলেশ দাস, মিহির দত্ত, তপন বোস, সুনীল দাস ও তাপস দাস।

দিলীপ নাগ পরিচালিত **বধূবরণ** চিত্রে রাখী বিশ্বাস ও গীতা দত্ত

ডিব্রুগড় নিউ থিয়েটার গ্রুপ

ডিব্রুগড় নিউ থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীরা সম্প্রতি 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করলেন ইণ্ডিয়া ক্লাব রঙ্গমঞ্চে। নাট্য-নির্দেশনায় উন্নত ধরণের শিল্পাঙ্গিকের পরিচয় দেন গোপালরঞ্জন সেনগুপ্ত। এই নাটকের কৃতী শিল্পীরা হোলেন জয়া মজুমদার, নীতি চক্রবর্তী, ত্রিগুণা দাস, শেলী দত্তগুপ্তা, ডলি মিত্র, দীপক চক্রবর্তী, রামচন্দ্র মিত্র, প্রতিমা দাশগুপ্তা, রঞ্জিত দেব, চন্দন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ রায়, পূর্ণিমা দাশগুপ্তা, শেফালী মিত্র, অসিত দত্ত এবং পরিচালক গোপালরঞ্জন সেনগুপ্ত।

বিবিধ সংবাদ

'চিত্র সংগঠনে'র 'পান্না'

এক অসম সাহসিক বালকের বিচিত্র সুন্দর কাহিনী অবলম্বন করে নবগঠিত 'চিত্র সংগঠন' সংস্থা যে ছবিটি প্রথম পরি-বেশন করছেন, তার নাম 'পান্না।' চমকপ্রদ এ কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে বাংলাদেশের শুশুনিয়া গ্রামে, জঙ্গলে, শালতোড়ার পাহাড়ে, শালবতী নদীর খাড়ীতে। সেখানে দীর্ঘ সময়, বহু অর্থব্যয় এবং বহু আয়াস স্বীকার করে ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এ ছবির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন প্রতিভাধর নবাগত বালক অভিনেতা শ্রীমান রামপ্রসাদ।

এই বিচিত্র সুন্দর কাহিনীর একটি বিশেষ চরিত্রে রূপারোপ করেছেন শম্ভু মিত্র। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পঙ্কজ মিত্র, অর্ধেন্দু মুখোঃ, শিখা ভট্টাচার্য, আরতি কুণ্ডু, বলাই গুপ্ত, দেবতোষ ঘোষ; মণি শ্রীমানী, নিভাননী দেবী প্রভৃতি।

অমিত মৈত্রের নির্দেশনায় এ ছবির চিত্র গ্রহণ করেছেন বিশু চক্রবর্তী, সঙ্গীত পরি-

চালনা করেছেন ভি বালসারা এবং শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেছেন সুনীল সরকার। চিত্র পরিবেশন করছেন ডি লাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ। ছবিটি এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়।

চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে এক সপ্তাহ ধরে একটি চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। আলোচ্য উৎসবে নিম্নোল্লিখিত চলচ্চিত্রগুলি প্রদর্শিত হবে : 'এ ব্লন্ড ইন লাভ' (মিলোস ফোরমান), 'ইফ এ থাউজ্যান্ড ক্ল্যারিনেট্‌স' (ইয়ান রোহাচ্‌ ও ভ্যাদিমির স্ভিতাচেক), 'লেমনেড জো' (অলড্রিখ লিপ্‌স্কি), 'ভার্টিগো' (কারেল কাখিনা), 'সেন্ট এলিজাবেথ স্কোয়ার', (ভাদিমির বাহ্‌না), 'ক্রাইম ইন দি গার্লস স্কুল' (ইভো নোভাক, ল্যাডিস্লাভ রাইখম্যান ও ইরি মেঞ্জেল) এবং 'এ জেস্টার্স টেল' (কারেল জেম্যান)। এ ছাড়াও ইরি এওকা প্রমুখ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-কারীদের স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে। এই উৎসব ব্যাপারে সিনে ক্লাব কলকাতার চেক দূতাবাস ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ-এর প্রভূত সহযোগিতা লাভ করেছেন।

একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৫ জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে উইমেন্স কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়। নৃত্যগীত এবং অভিনয়ে অনুষ্ঠানটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। কলেজের ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নৃত্যনাট্য ও পরশুরামের 'কচি সংসদ' পরিবেশন করেন। বিশেষ করে সঙ্গীতে অতসী মৈত্র, মীনাক্ষি ঘোষ; নৃত্যে ঋতুরাজের ভূমিকায় বুলবুল মিত্র (ঘটক), নটীর ভূমিকায় মঞ্জু কর, ঝুমকলতার ভূমিকায় সুতপা দাশগুপ্ত; অভিনয়ে আরতি দত্ত, শীলা ভট্টাচার্য, সুনন্দা চক্রবর্তী ও রীনা বসু পারদর্শিতা দেখান।

হবি রীদম অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান

উত্তর কলকাতার অপেশাদার বাদ্য-সংস্থা হবি রীদম অর্কেস্ট্রার পঞ্চম বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্প্রতি মহাজাতি সদনে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিনব আসরে স্থানীয় যশস্বী শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। মুকুল দাস কয়েকটি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দেন। এছাড়া হিমাংশু বিশ্বাস, ভি বালসারা, দীলিপ রায়, বটুক নন্দী এবং হবি রীদমের শিল্পীবৃন্দের পরিবেশনা প্রশংসনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীঅরূপ গাইন।

বিশ বছর আগে

সম্প্রতি স্টারে এন আর এম ওয়ার্কস রিক্রিয়েশন ইউনিট প্রথম বার্ষিক মিলন উৎসবে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' অভিনয় করেন। পরিচালনা করেন অনিল ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেন অর্ণব চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, সুতপা ভট্টাচার্য, শেফালি বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ মল্লিক প্রভৃতি। তাঁদের মধ্যে আঙ্গিক, বাচনিক অভিব্যক্তিক অভিনয়ে দুঃখহরণের চরিত্রে প্রকৃতি ঘোষ নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি স্বর্ণ পদক দেবার অঙ্গীকার করেন। স্ত্রী ভূমিকায় বিপাশা গোস্বামী মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

মিউজিক লাভার্স

মিউজিক লাভার্স পরিবেশিত এক প্রভাতী অনুষ্ঠান প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও এক স্বপ্নময় সুরেলা আসর রচনা করেছিল। অনুষ্ঠান সুরু হ'লো শ্রীকুমার মুখার্জি ও রবি কিচলুর 'রাম-কেলী' নিয়ে। আগ্রা ঘরানার ধ্রুপদী আঙ্গিকে পরিবেশিত আলাপ সুরবিস্তার ও আস্থায়ী ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছে। কুমার মুখার্জি ইঙ্গিতে এবং গমক ও সাপাটের মালা গেঁথে রবি কিচলু রাগকে অলংকৃত করেছেন। ফৈয়াজ খানের সুবিখ্যাত "উন সঙ্গে লাগে"-র মুখটি অতীতের আনন্দময় স্মৃতিতে তৎকালীন শ্রোতাদের মনকে ভরিয়ে দিয়েছিল।

আমজেদ আলি খাঁর 'গুর্জরী-টোড়ী' কানাই দত্তের সুযোগ্য তবলা-সঙ্গতে রসোত্তীর্ণ।

সর্বশেষ শিল্পী শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক "শুদ্ধসারং" রাগে তাঁর উচ্চগ্রামী কণ্ঠ-সৌন্দর্যে ও শ্রুতির গভীর শুদ্ধতায় আনন্দলোক রচনা করেছিলেন।

শ্যামল বসুর তবলা-সঙ্গত শিল্পীর মেজাজ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

নিখিল ভারত যদুভট্ট সংগীত সম্মেলন

মেদিনীপুর ১৬ই জানুয়ারী—গত ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর হলে নিখিল ভারত যদুভট্ট সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী অঞ্জলি খান। দুদিনের অনুষ্ঠানে যাঁরা শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন ও তাঁদের তৃপ্তি দিতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন, শ্রীমতী প্রগতি বর্মণ, (আনন্দকল্যাণ রাগে খেয়াল ও ঠুংরী), বাহাদুর খাঁ (বসন্ত মুখারী রাগে সরোদ ও ঠুংরী), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতারে ললিত রাগ ও ঠুংরী), ভাটিয়া রাগে বাসবরাজ রাজগুরুর (খেয়াল, ঠুংরী ও ভজন), মহম্মদ দবীর খাঁ, (দরবারী কানাড়া রাগে ধামার ও ভজন), বিশ্বনাথ বসু (তবলা) দীপ্তি রায় (সেতারে কৌশিক কানাড়া পঞ্চমসে পিলু), শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহা (সেতারে বেহাগ ও পঞ্চমসে জিলহা), কত্থক-নৃত্যে পূরবী মুখার্জি, অন্ধ যুবক শ্রীসলিল দাস কেদারা রাগে খেয়াল ও ইমন রাগে কাওসার আলির খেয়াল সকলকে খুশী করতে পেরেছে। এছাড়া যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা রায়, মল্লিকা দত্ত, অলকা ঘোষ, লতিকা সরকার, বন্দনা মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি ভকত, সওকত আলি, রমেন মিশ্র, রামনাথ সিক্কা, সচ্চিত বসু, বিরু চক্রবর্তী, লিয়াকত আলি, আসলাম আলি।

নিউ এম্পায়ারে অনুষ্ঠিত দক্ষিণীর বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠানের একটি দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

গানের জলসা

ডোভার লেন সয়ারি স্বল্প পরিসরের মধ্যেও এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে দিকপাল শিল্পীদের উপস্থিত করায় এঁদের কার্পণ্য ছিল না। দু-একটি নবাগতকেও দেখা গেছে।
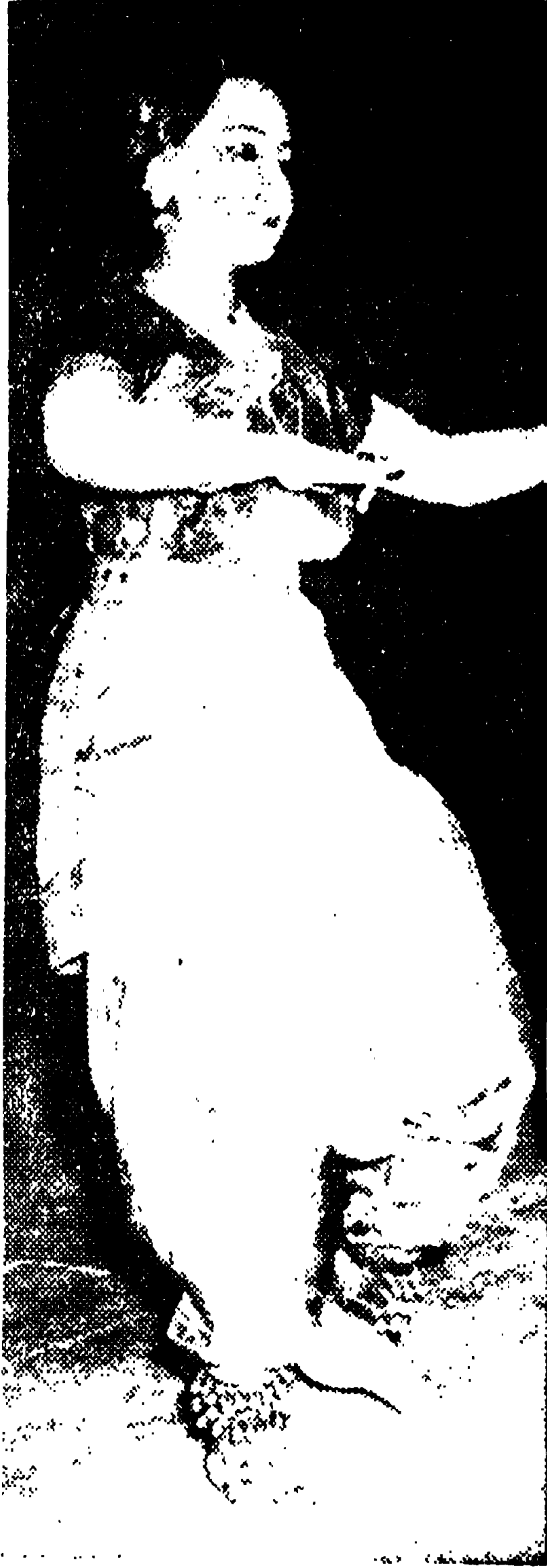
প্রথম রাতে যন্ত্রসংগীতের আসরে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার ছিল উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ইনি বাজালেন 'হেমললিত।' বয়সে নবীন হলেও রেওয়াজ ও অনুসন্ধানী মনের সম্মেলনজাত পরিণত প্রতিভার পূর্ণ ফসল এ'র অনুষ্ঠানে পাওয়া গেল। আলাউদ্দিন ঘরানার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী এই শিল্পী যন্ত্রসঙ্গীতের অন্যান্য ঘরানার মিলনসাধন করে এমন এক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন যা শোনামাত্রই মন টানে। শিল্পীর মেজাজও এই রকম আসরের উপযোগী। সুকঠিন চক্রধারছন্দী দীর্ঘ তেহাই ও জটিল লয়কারী এ'র বাজনাকে পাণ্ডিত্যের গৌরবী করেছে নিশ্চয়। কিন্তু সহজ আবেগের দিকে যদি আর একটু নজর দিতেন,—তবে আরো সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী হয়ে উঠত এ'র বাজনা।

●

তরুণ সরোদী আমজেদ আলি খাঁ বাজালেন 'চন্দ্রধ্বনি।' অনেকটা কোষিধ্বনি' মত এই রাগ মধ্যমকে কেন্দ্র করে কোমল নিখাদের অকৃপণ প্রয়োগে—অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এ'র বিস্তারভঙ্গী ও বাজের লালিত্য আলি আকবরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীভি জি যোগ ও শিবকুমার শর্মার দ্বৈত বেহালা ও সন্তুরবাদন শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে।

শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী তাঁর স্বভাবানুগ গাম্ভীর্য ও ধীরবিস্তারী মেজাজে আলাপ ও গতের সকল অঙ্গই পূর্ণ পরিসরে রচনা করেছেন। তবে যথাযথ মাইক নিয়ন্ত্রণের অভাবে অমন সুরেলা বাজনাতেও কাঠিন্য অনুভূত হয়েছে। বেহালার সুর স্বভাবতই উচ্চগ্রামী। এই যন্ত্র পরিবেশনকালে মাইককে কিছু নম্র হতে হয়, অন্যথায় রসহানি ঘটে।

যন্ত্রসঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই সম্মেলনের শেষ আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার। বিলাসখানি টোড়িতে আলাপ বাজিয়ে ধামারে ঐ রাগেই গৎ বাজিয়ে দ্বিতীয় রাগ 'আহির ভৈরো' দিয়ে ইনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন। নিজস্ব মাধুর্যে ধ্রুপদী পদ্ধতিতে বিলাসখানির বিষণ্ণ গাম্ভীর্য যেমন মূর্ত হয়েছিল—তেমনই মর্যাদামণ্ডিত ধামার তালের গৎ। কিষণ মহারাজের মত তবলচির সঙ্গতে এই তালের পুরুষোচিত ওজস্ ও দীপ্তি এক বিশেষ আকর্ষণীয় পরিবেশ রচনা করেছিল। নানা ছন্দের পরিক্রমার পর পণ্ডিতজীর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে গতে ফেরার 'মজা'—মনে রাখবার মত। এই দৃপ্ত অনুষ্ঠানের পর আহির ভৈরোর সজল করুণ মাধুর্যে প্রত্যাবর্তন করে তিনি 'মধুরেন সমাপয়েৎ' করলেন।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে প্রথম রাতে শ্রীমতী মালবিকা কানন গাইলেন 'ছায়ানট' ও ঠুংরী। সীমিত পরিসরের মধ্যেও সুরেলা কণ্ঠ, রাগনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার গুণে প্রসাদগুণসম্পন্ন হয়েছে এ'র গান। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে এ'র ঠুংরী।

নবাগতা গৌরী মুখার্জির 'মারুবেহাগ' ও 'যোগ'—পরিচ্ছন্ন সুরসমৃদ্ধ। তান-কর্তবেও রেওয়াজের পরিচয় মেলে। তবে অনুষ্ঠানের দৈর্ঘ্য কিছু কমালে ভাল হতো।

বহুদিন বাদে শ্রীমতী মানিক বর্মার অনুষ্ঠান শোনবার সুযোগ হলো। সহজ ও অনাড়ম্বর গায়নরীতি, স্বরস্পষ্টতা ও মধুর কণ্ঠ এ'র অনুষ্ঠানকে চিত্তগ্রাহী করেছে। ইনি গাইলেন 'যোগকোষ' ও 'সাহানা'।'

বেগম আখতার কণ্ঠসঙ্গীতের আসরের এক বিশেষ আকর্ষণ। যোগিয়া ও ভৈরবী

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত উইমেন্স কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বসন্ত নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য।
ফটো : অমৃত

যুগযাত্রী-র (বেহালা) বার্ষিক শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীঅমরেন্দ্রলাল দাশ। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ-কে সংগীত পরিবেশন করতে দেখা যাচ্ছে। ফটো : অমৃত

ঠুংরীর আবেশ এমন মুগ্ধতা সৃষ্টি করল যে শ্রোতারা এঁকে ছাড়তেই চায় না। সব-শুদ্ধ ইনি প্রায় ৮টি গান গেয়েছেন, যেমন রসসমৃদ্ধ তেমনই প্রাণবন্ত।

শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক কিছু সংগীতরসিকের বিশেষ অনুরোধে গাইলেন 'নীলমাধব।' এ রাগ ইনি এবছর সদারং সম্মেলনেও গেয়েছেন। কিন্তু এবারের পরিবেশনায় তানবৈচিত্র্য ও বিস্তারের কারুকার্য ও বৈচিত্র্যাধিক্যর সঙ্গে শিল্পীর উচ্চগ্রামী কণ্ঠের আবেগ ও দরদ মিশে যেন উজ্জ্বলতর সৌন্দর্যে বিকশিত। শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে 'কিরবাণী' রাগে একটি ভজন গেয়ে ইনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন।

নৃত্যের আসরে ছিল শ্রীমতী রীতা দেবীর 'ভারতনাট্যম' ও 'কুচিপুরী' এবং দয়মন্তী যোশীর কথকনৃত্য।

এডুকেশন কর্নারের উদ্যোগে ব্যালে নৃত্য

সম্প্রতি এডুকেশন কর্নারের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে তিন দিনব্যাপী ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা নাট্যবস্তুর অংশ বিশেষ, শিশুদের নৃত্যগীতও এই সংস্থার অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উপভোগ্য অনুষ্ঠানের হোতা শ্রীমতী বীণা মুখার্জি কলাশিল্পের একটি দিকের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার শুধু উজ্জ্বল নজীরই রেখে গেলেন না, শিশু শিল্পীদের আত্মবিকাশের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুতির দিকে অঙ্গুলি সংকেতও করছেন। এ উদ্যম বিশেষভাবেই স্মরণীয়।

শিশু-সম্প্রদায় হলো প্রকৃতি-দুলাল-দুলালী। সেই কারণেই এঁদের প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বললেও অত্যুক্তি হয় না। হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা এদের স্বতঃস্ফূর্তই শুধু নয়, প্রাণোচ্ছল সৌন্দর্যে ভরপুর। শিশুচরিত্রের এই স্বাভাবিক—গুণগুলির শিল্পোচিত প্রয়োগকুশলতায় শ্রীমতী মুখার্জি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'স্লিপিং বিউটি', 'পি-কক', 'সিয়ামিজ ব্যালে'র পরিকল্পনার অভিনবত্ব, সাবলীল নৃত্যগীত ও প্রকাশভঙ্গী সুচিন্তিত এবং কল্পনাসমৃদ্ধ। টেপ-রেকর্ডবদ্ধ এঁদের সংগীতগুচ্ছও বিষয়-বস্তুকে সুন্দর অভিব্যঞ্জনা দিতে পেরেছে।

নৃত্য ও মূকাভিনয়ের সঙ্গে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন শ্রীমতী সঞ্চয়িতা রায়, শর্মিষ্ঠা দাস, নিবেদিতা ঘোষ। মঞ্চে আবির্ভাব মাত্রেই এঁরা দর্শকবৃন্দের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায় তিন দিনের অনুষ্ঠানই দর্শকদের খুসী করতে পেরেছে।

পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন

পার্ক ইউনিয়ন ক্লাব আয়োজিত পার্ক সার্কাস সংগীত সম্মেলন সুরু হচ্ছে ১লা ফেব্রুয়ারী। ৪ঠা অবধি এই সংগীত সম্মেলনের শিল্পীরা হলেন, কণ্ঠসংগীতে ওস্তাদ আমীর খাঁ, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, এ কানন, সুনন্দা পট্টনায়ক ও বিমান পাঠক। যন্ত্রসংগীতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি জি যোগ, আমজেদ আলি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। নৃত্যে সংগীতা ব্যানার্জি ও ভারতী পুরকায়স্থের দ্বৈত কথক নৃত্য—বুলবুল লাহিড়ী, শ্রীলেখা ব্যানার্জি, ভারত-নাট্যমে কুমারী সরোজা দেবী ও সম্প্রদায়। এছাড়াও কিংশুক গোষ্ঠী কর্তৃক 'শ্যামা' নৃত্যাভিনয় প্রথমদিনের আকর্ষণ।

১লা ফেব্রুয়ারী সম্মেলন উদ্বোধন করবেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি যথাক্রমে শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি ও অশোক সেন এম-পি।

ইয়ংস্ কর্নার আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক টুলু মুখার্জি এবং নৃত্যরতা বোম্বের মধুমতী। ফটো : অমৃত
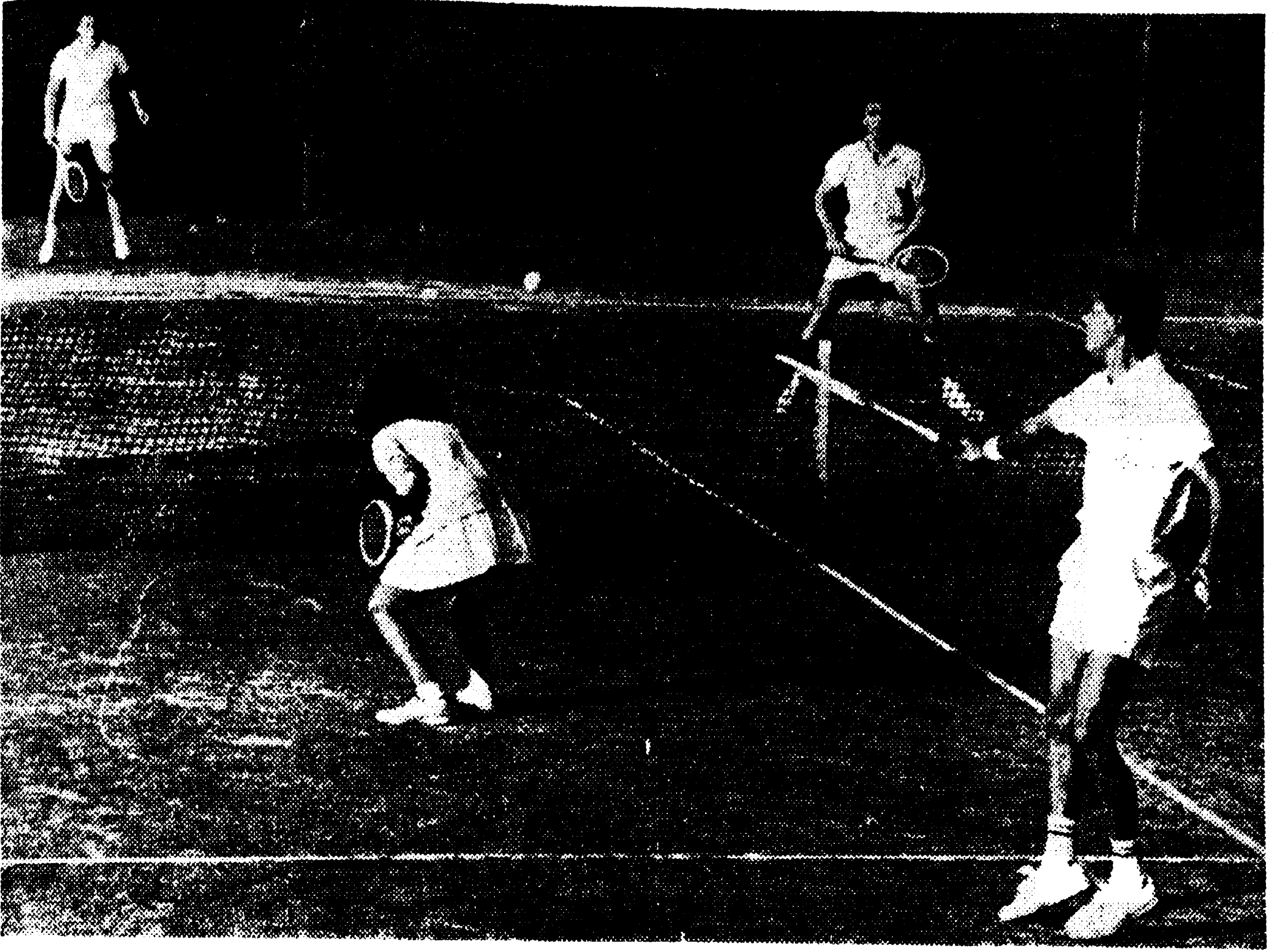
কলকাতার সাউথ ক্লাবের লনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মিক্সড ডাবলস ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য : নেটের ওপারে খেলছেন কুমারী ইভানভ এবং মেত্রেভেলি এবং সামনে কুমারী রিতা সুরাইয়া এবং মুবারক আলি। ফটো : অমৃত

খেলাধূলা

দর্শক

এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা

কলকাতার ঐতিহাসিক সাউথ ক্লাব নে আয়োজিত একাদশ এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের ভাগ্যে কান খেতাব জুটেনি। ভারতবর্ষ মাত্র রুষদের ডাবলস এবং মিশরের সহ-যাগিতায় মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে ঠেছিল। শারীরিক অক্ষমতার কারণে রতবর্ষের প্রখ্যাত খেলোয়াড় রমানাথন ক্ষান প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি। ক্ষানের উপর্যুপরি তিনবার পুরুষদের ঙ্গলস খেতাব জয়লাভের পর গতবারের তিযোগিতায় তাঁকে পরাজিত করে সেই ঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন জয়দীপ খার্জি। সুতরাং পুরুষদের সিঙ্গলসে রতবর্ষের উপর্যুপরি চার বছরের ধান্যের আজ অবসান হল। আলোচ্য ছরের চারটি অনুষ্ঠানেই বিদেশী লেয়াড়রা জয়ী হয়েছেন—রাশিয়া য়েছে ৩টি খেতাব (পুরুষ ও মহিলাদের ঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস) এবং ব্রেজিল টি (পুরুষদের ডাবলস)। মহিলাদের ঙ্গলস ফাইনালে উঠেছিলেন রাশিয়ারই জন খেলোয়াড়। পুরুষদের ডাবলসে শিয়ান জুটি সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত লেছিলেন। সুতরাং সদ্য সমাপ্ত এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতায় রাশিয়াই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। গতবারের এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র রাশিয়ার কুমারী তিউ সুমে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব জয় করে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছিলেন।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় মাত্র দুজন খেলোয়াড়—রাশিয়ার আলেকজান্দার মেত্রেভেলী (সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস) এবং কুমারী ইভানভ (সিঙ্গলস ও মিক্সড ডাবলস) দুটি করে অনুষ্ঠানের ফাইনালে উঠেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মেত্রেভেলী দুটি এবং ইভানভ একটি খেতাব জয়ী হন। মেত্রেভেলী গতবারের প্রতিযোগিতায় মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়েছিলেন (কুমারী তিউ সুমের সহযোগিতায়)।

একাদশ এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় একাধিক অপ্রত্যাশিত ফলাফল এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় ১নং বাছাই এবং গতবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান জয়দীপ মুখার্জি সেমি-ফাইনালে পরাজিত হন ৪ নং বাছাই খেলোয়াড় রাশিয়ার মেত্রেভেলীর কাছে, ২নং বাছাই এবং এ বছরের ভারতীয় জাতীয় চ্যাম্পিয়ান প্রেমজিৎ লাল কোয়ার্টার ফাইনালে এবং ৩নং বাছাই ব্রেজিলের টমাস কক সেমি-ফাইনালে পরাজিত হন ৭নং বাছাই সংযুক্ত আরবের ইসমাইল এল সাফির কাছে। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে উঠেছিলেন ৪নং বাছাই মেত্রেভেলী এবং ৭নং বাছাই সাফি। মহিলাদের সিঙ্গলসের শীর্ষস্থানীয়া বাছাই খেলোয়াড়রা বাছাই তালিকার প্রস্তুতকারক পন্ডিত ব্যক্তিদের মুখ রক্ষা করেন। সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন বাছাই তালিকার প্রথম চারজন এবং ফাইনালে খেলেছিলেন ১নং বাছাই কুমারী ইভানভ এবং ২নং বাছাই শ্রীমতী আবজানডেজ—দুজনেই রাশিয়ার খেলোয়াড়। পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে উঠেছিলেন ১নং, ২নং, ৫নং এবং ৬নং বাছাই জুটি। ফাইনালে ১নং বাছাই জুটি টমাস কক এবং এডিসন ম্যান্ডারিনো (ব্রেজিল) জয়ী হন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: ৪নং বাছাই আলেকজান্দার মেত্রেভেলি (রাশিয়া) ৬-৩, ৮-৬ ও ৬-৪ গেমে ৭নং বাছাই এল সাফিকে (সংযুক্ত আরব) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ২নং বাছাই শ্রীমতী আবজানডেজ (রাশিয়া) ৬-৪ ও
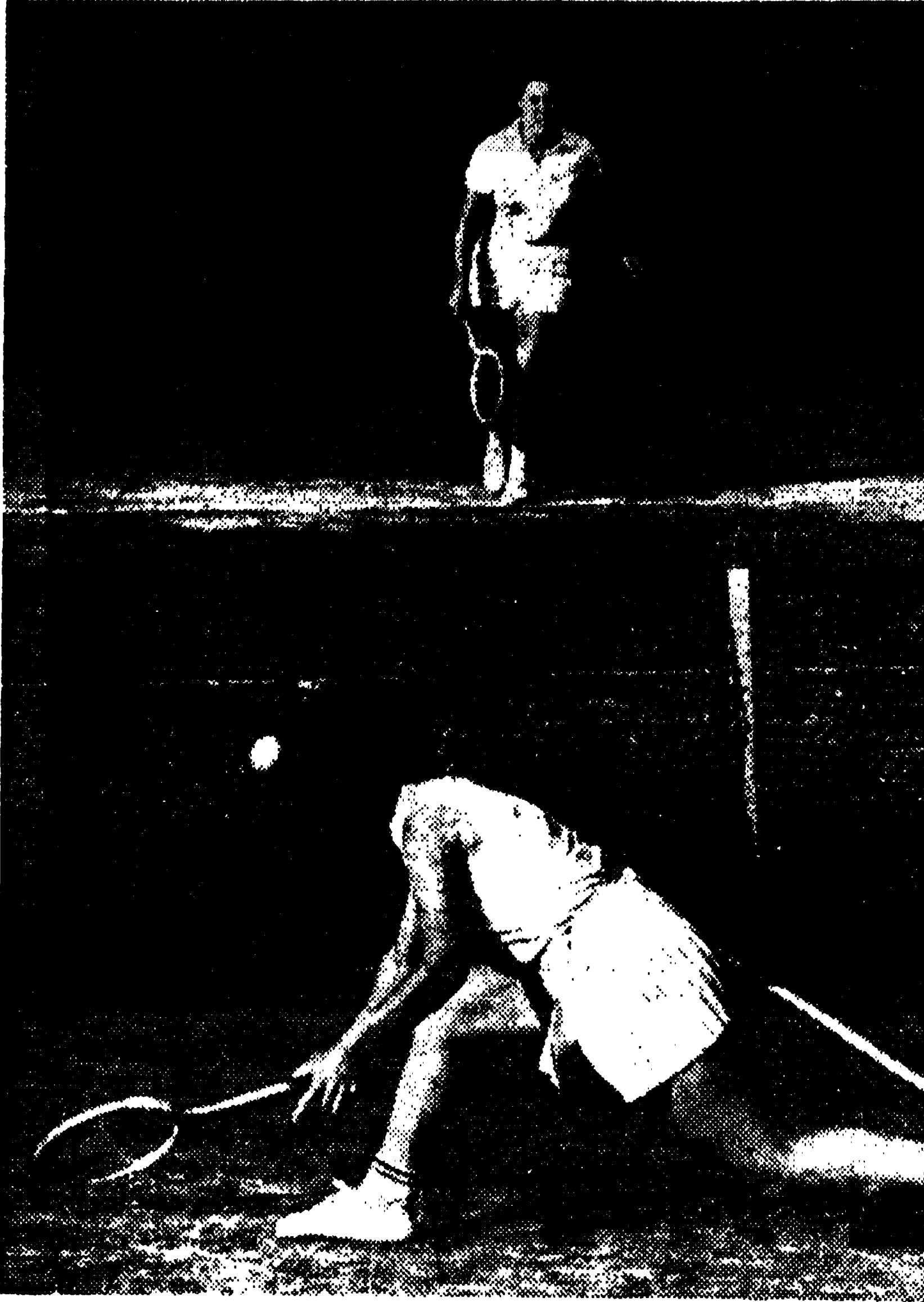
কলকাতার সাউথ ক্লাবের লনে আয়োজিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলার দৃশ্য : নেটের ওপারে কুমারী ইভানভ এবং সামনে শ্রীমতী আবজানডেজ। ফটো : অমৃত

৬-০ গেমে ১নং বাছাই কুমারী ইভানভকে (রাশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : ১নং বাছাই জুটি টমাস কক এবং এডিসন ম্যাণ্ডারিনো (ব্রেজিল) ৬-৪, ৭-৫ ও ৮-৬ গেমে ২নং বাছাই জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : আলেকজান্দার মেত্রেভেলি এবং কুমারী ইভানভ (রাশিয়া) ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে মুবারক আলি (সংযুক্ত আরব) এবং কুমারী রিতা সুরাইয়াকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

নাগপুরে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে **ওসমানিয়া ১৭২ রানে গত বছরের বিজয়ী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে।** ওসমানিয়ার পক্ষে এই প্রথম ট্রফি জয়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে মাত্র এই পাঁচটি দল ফাইনালে জয়লাভের পুরস্কার রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে : বোম্বাই ২১ বার, পাঞ্জাব ৪ বার, মহীশূর ৩ বার, দিল্লী ২ বার, পুণা ১ বার এবং ওসমানিয়া ১ বার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল মাত্র একবার (১৯৬৫) ফাইনালে খেলেছিল।

সেমি-ফাইনাল

১৯৬৬-৬৭ সালের প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ী বোম্বাই প্রথম ইনিংসে বেশী রান করার সূত্রে পূর্বাঞ্চল বিজয়ী কলকাতাকে পরাজিত করেছিল। অপর দিকের সেমিফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ী ওসমানিয়া ৩৪২ রানে উত্তরাঞ্চল বিজয়ী দিল্লীকে পরাজিত করে ফাইনালে শক্তিশালী বোম্বাই দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

ফাইনাল খেলা

শক্তিশালী বোম্বাই দলের বিপক্ষে ওসমানিয়ার জয়লাভের মূলে ছিল মমতাজ (১৬১ রানে ১২ উইকেট) এবং নৌসেরের (১১৯ রানে ৫ উইকেট) মারাত্মক বোলিং। এ'দের বোলিংয়ের মুখে বোম্বাই দল বেশী রান সংগ্রহ করতে পারে নি—মাত্র ১২২ রানের মাথায় বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ওসমানিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৬৩ রানে অগ্রগামী হয়।

ওসমানিয়া : ২৮৫ রান (আবিদ ৬২, মমতাজ নট আউট ৪৬, জয়ন্তীলাল ৪৮ এবং কৃষ্ণমূর্তি ৪৩ রান। খান্ডালওয়ালা ৬৬ রানে ৪ এবং সম্পৎ ৬৪ রানে ৪ উইকেট)।

ও ৩১৪ রান (নাগেশ ১৫৪, জয়ন্তীলাল ৫১ এবং কৃষ্ণমূর্তি ৪১ রান। খান্ডালওয়ালা ১০১ রানে ৪ এবং শেঠী ৫৬ রানে ৩ উইকেট)।

বোম্বাই : ১২২ রান (নাগদেব ২৩ রান। মমতাজ ৩৪ রানে ৬ এবং নৌসীর ৪৮ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৩০৫ রান (শেঠী ৫৭, নাগদেব ৪৮ এবং সম্পৎ ৭১ রান। মমতাজ ১২৭ রানে ৬ ও নৌসীর ৭১ রানে ২ উইকেট)।

প্রথম দিনের খেলায় ওসমানিয়া প্রথম ব্যাট করে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২০১ রান সংগ্রহ করে। পর দিনে ওসমানিয়ার বাকী ৩ উইকেটে ৮৪ রান উঠেছিল। ওসমানিয়ার প্রথম ইনিংস ২৮৫ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনেই বোম্বাইকে প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ১২২ রানের মাথায় নামিয়ে দিয়ে ওসমানিয়া ১৬৩ রানে অগ্রগামী হয়। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা মোটেই সুবিধার হয় নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৯ রান সংগ্রহ করেছিল। শেষ পর্যন্ত নাগেশ, জয়ন্তীলাল এবং কৃষ্ণমূর্তির দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণ তৃতীয় দিনের খেলায় ওসমানিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫৬ রান (৬ উইকেটে) দাঁড়ায়। চতুর্থ উইকেটের জুটি নাগেশ এবং জয়ন্তীলাল দলের ১১৯ রান এবং ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি নাগেশ এবং কৃষ্ণমূর্তি দলের ১১১ রান তুলে দিয়েছিলেন। নাগেশ ১৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন। এই সময়ে হিসাবে দেখা গেল ওসমানিয়া ৪১৯ রানে অগ্রগামী, হাতে জমা ৪টে উইকেট। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ২৪ মিনিট আগে ৩১৪ রানের মাথায় ওসমানিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে বোম্বাই দলের ৪৭৮ রানের প্রয়োজন হয়। চতুর্থ দিনের খেলার বাকী সময়ে বোম্বাই ৫ উইকেট খুইয়ে ২০৩ রান সংগ্রহ করলে খেলার গতি ওসমানিয়া দলের অনুকূলে এসে যায়। তখনও বোম্বাই ২৭৪ রানের পিছনে এবং হাতে জমা ৫ উইকেট।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর খেলা মাত্র আধ ঘন্টা স্থায়ী ছিল। বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০৫ রানের মাথায় শেষ হলে ওসমানিয়া ১৭২ রানে জয়ী হয়।
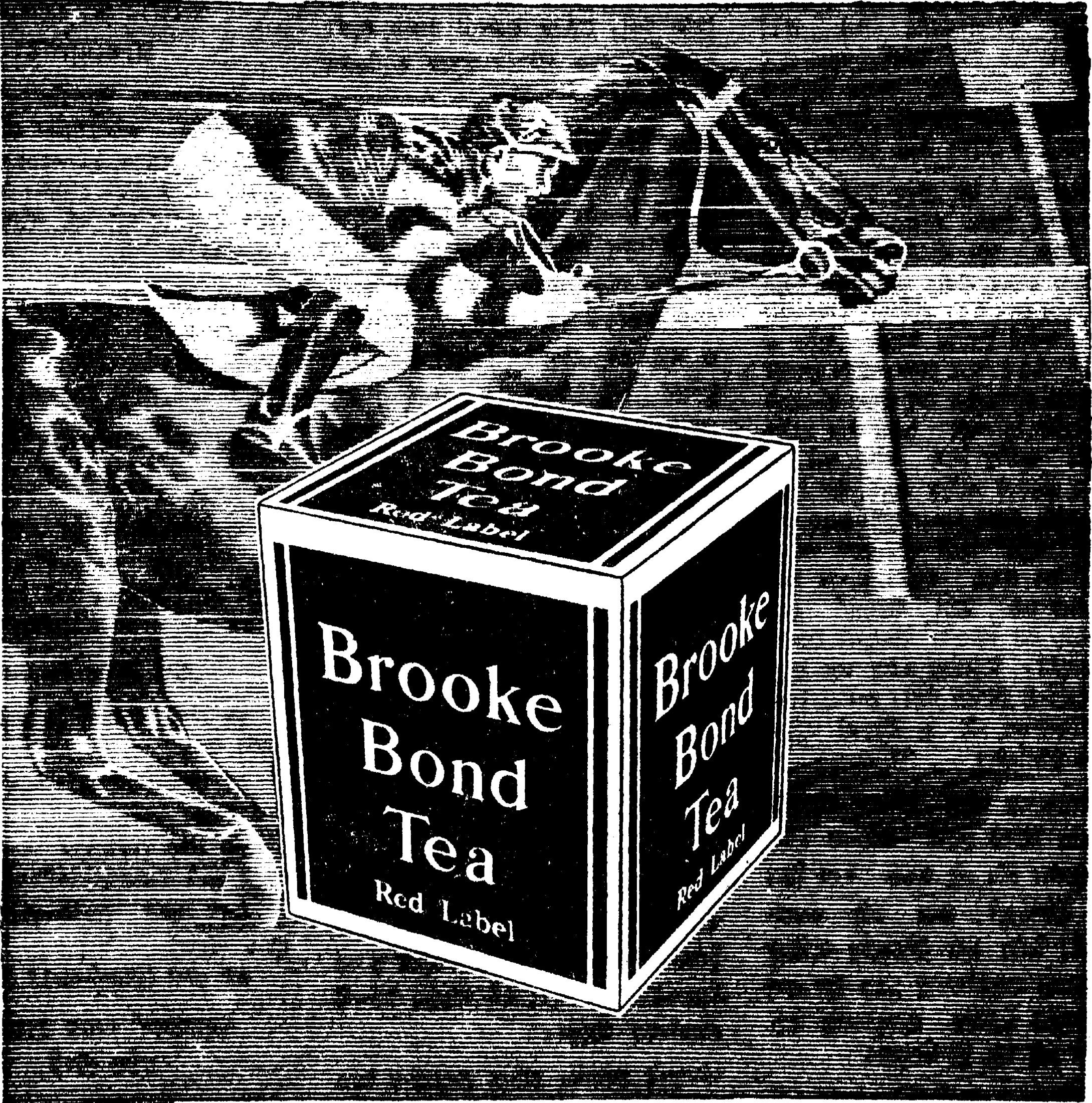
ভিজি ট্রফি

নাগপুরে আয়োজিত আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০ রান বেশী করার সূত্রে দক্ষিণাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে ভিজি ট্রফি জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে।

পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিনের খেলায় ৪ উইকেট খুইয়ে ৩১৬ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে ৪৮৩ রানের মাথায় পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এইদিনে পশ্চিমাঞ্চল দল ৩ ঘণ্টার খেলায় তাদের বাকি ৬ উইকেটে ১৬৭ রান যোগ করে। খেলার বাকি সময়ে দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের দু উইকেটের বিনিময়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করেছিল। তৃতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দল আরও ৫ উইকেট খুইয়ে ২৯৬ রান যোগ করে। খেলার শেষে রান দাঁড়ায় ৪০০ (৭ উইকেটে)। চতুর্থ দিনে দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ৪৭৩ রানের মাথায় শেষ হয়। মাত্র ১০ রানে অগ্রগামী হয়ে পশ্চিমাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৯ রান তুলে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি সময়ে দক্ষিণাঞ্চল দল ২ উইকেট খুইয়ে ৭৫ রান তুলেছিল।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রথম ইনিংসে জয়ন্তীলাল ৪০০ মিনিট খেলে ব্যক্তিগত ২১৮ রান করেন। তাঁর এই ২১৮ রানে ছিল ২৬টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। তিনি ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে কনক সিংয়ের সহযোগিতায় ১২৫ রান এবং ৫ম উইকেটের জুটিতে রাজকুমারের সহযোগিতায় ৯২ রান তুলেছিলেন।

পশ্চিমাঞ্চল দল : ৪৮৩ রান (নায়েক ৯৮, কীর্তনে ৯৭ এবং সি চাবন ৮৮ রান। মমতাজ ১৩২ রানে ৪ এবং শ্রীনিবাস ৯০ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৩৯ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চাবন ৬৩, গাভাসকর ১১১ এবং কীর্তনে ৫৩ রান)

দক্ষিণাঞ্চল দল: ৪৭৩ **রান** (জয়ন্তীলাল ২১৮, কনক সিং ৪৫ এবং নাগভূষণ ৪০ রান)

ও ৭৫ রান (২ উইকেটে)

ডুরান্ড কাপ

১৯৬৬ সালের সর্বভারতীয় ডুরাণ্ড কাপে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গুর্খা ব্রিগেড ২—০ গোলে শিখ রেজিমেণ্টাল দলকে (মীরাট) পরাজিত করে ডুরান্ড কাপ জয়ী হয়েছে। গুর্খা দলের এই দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলা এবং প্রথম ডুরান্ড কাপ জয়। অপরদিকে শিখ রেজিমেণ্টাল সেণ্টার দলের প্রথম ফাইনাল খেলা। গুর্খা দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড রায়ত খেলার দুই অর্ধে গোল দেন। খেলায় জয়লাভ করতে গুর্খা দলকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

বাংলার তিন বিখ্যাত দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। গত তিনবার (১৯৬৩—৬৫) এবং মোট ৬ বারের ডুরান্ড কাপ বিজয়ী মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে ০—২ গোলে গুর্খা ব্রিগেড দলের কাছে পরাজিত হয়। ১৯৬৬ সালের লীগ ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৩য় রাউণ্ডে ই এম ই সেণ্টার (সেকেন্দ্রাবাদ) ১—০ গোলে পরাজিত করে। ইস্টবেঙ্গল ৪ বার ডুরান্ড কাপ পেয়েছে। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম ডুরান্ড কাপ জয়ী (১৯৪০ সালে) মহমেডান স্পোর্টিং কোয়ার্টার ফাইনালে গুর্খা ব্রিগেড দলের কাছে শোচনীয়ভাবে ০—৪ গোলে পরাজিত হয়। সুতরাং ১৯৬৬ সালের ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়েও ফাইনাল পর্যন্ত উঠতে পারেনি।

রাষ্ট্রীয় খেতাব

ভারতের সপ্তদশ সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি দেশের যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত করেছেন তাঁদের মধ্যে এই পাঁচজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদও আছেন:

পদ্মভূষণ খেতাব: টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান এবং সাঁতারু মিহির সেন।

পদ্মশ্রী খেতাব: ক্রিকেট খেলোয়াড় পাতৌদির নবাব এবং দুই হকি খেলোয়াড় শংকর লক্ষ্মণ ও পৃথিপাল সিং।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

আসানসোলের ইস্টার্ণ রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত ত্রয়োদশ জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল ৫৩ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে উপর্যুপরি তিনবার দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রেলওয়ে (১৪ পয়েণ্ট) এবং তৃতীয় স্থান বাংলা (১২ পয়েন্ট)। এগারটি খেতাবের মধ্যে সার্ভিসেস দল একাই ১০টি খেতাব পায়। অপর খেতাবটি (ওয়েল্টার ওয়েট) পায় মহারাষ্ট্র। গতবার সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে দল যুগ্মভাবে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

বিজয়ওয়াদায় আয়োজিত ঊনবিংশতিতম জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে বর্ধমান চ্যালেঞ্জ শীল্ড জয়ী হয়েছে। ১৯৫৬ সাল থেকে রেলওয়ে দল এই শীল্ড জয় করে এসেছিল।

'ভারতশ্রী' খেতাব: দীর্ঘদেহ বিভাগে টি কে মাথাই (সার্ভিসেস), খর্বদেহ বিভাগে সত্য পাল (রেলওয়ে) এবং মাঝারি-দেহ বিভাগে রবীন গোস্বামী (রেলওয়ে)।

ভারতবর্ষ বনাম পূর্ব জার্মাণী হকি টেস্ট

ভারতবর্ষ বনাম পূর্ব জার্মাণীর হকি টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষ ২-১ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়েছে। টেস্ট সিরিজের ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট খেলা মীমাংসিত থাকে।

টেস্ট খেলার ফলাফল

১ম টেস্ট (বোম্বাই): ভারতবর্ষ ৩-০ গোলে জয়ী

২য় টেস্ট (নাগপুর): পূর্ব জার্মাণী ১-০ গোলে জয়ী

৩য় টেস্ট (ভিলাই): ভারতবর্ষ ১-০ গোলে জয়ী

৪র্থ টেস্ট (ভাটিণ্ডা): খেলা ড্র (১-১ গোলে)

৫ম টেস্ট (গোয়ালিয়র): গোলশূন্যে ড্র

ভারতবর্ষ বনাম হল্যাণ্ড হকি টেস্ট

ইউরোপের হকি খেলার আসরে হল্যাণ্ডের বিশেষ খ্যাতি আছে। ভারত সফরে হল্যাণ্ডের এক হকিদল সম্প্রতি ভারতবর্ষের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে এবং খেলার ফলাফল ড্র (গোলশূন্য) রেখে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ভারতবর্ষ বনাম সিংহল

মহিলাদের হকি টেস্ট

ভারতবর্ষ বনাম সিংহলের হকি টেস্ট সিরিজে (মহিলাদের) ভারতবর্ষ ৫-০ খেলায় সিংহলকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষ দিল্লীর প্রথম টেস্টে ৩-০ গোলে, জলন্ধরের দ্বিতীয় টেস্টে ৫-০ গোলে, গোয়ালিয়রের তৃতীয় টেস্টে ৩-০ গোলে, খান্দোয়ার চতুর্থ টেস্টে ৫-১ গোলে এবং রাইপুরের পঞ্চম টেস্টে ৪-০ গোলে জয়ী হয়।

বিদেশ সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আগামী গ্রীষ্মকালে ইংল্যান্ড এবং পূর্ব আফ্রিকা সফরের উদ্দেশ্যে ষোলজন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠন করা হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিপক্ষে ১৯৬৬-৬৭ সালের সদ্য-সমাপ্ত টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের যে ষোলজন খেলোয়াড় টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন তাঁদের থেকে জয়সীমা, বেগ এবং দুরানীকে বাদ দিয়ে সুব্রত গুহ (বাংলা), রমেশ সাকসেনা (বিহার) এবং সদানন্দ মোহলকে (মহারাষ্ট্র) দলভুক্ত করা হয়েছে। এই তিনজন খেলোয়াড় ভারতবর্ষের পক্ষে এখনও টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

পাতৌদির নবাব (অধিনায়ক), ফারুক ইঞ্জিনীয়ার, বি কে কুন্দরন, চান্দু বোরদে, বি এস চন্দ্রশেখর, হনুমন্ত সিং, দিলীপ সরদেশাই, ই এ এস প্রসন্ন, ভি সুব্রহ্মণ্যম, রুসি সুর্তি, এস ভেঙ্কটরাঘবন, অজিত ওয়াদেকার, বিষেণ সিং বেদী, সুব্রত গুহ, রমেশ সাকসেনা এবং সদানন্দ মোহল।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম খেলা সুরু হচ্ছে ৩রা মে, ওরস্টার-শায়ার কাউন্টি দলের বিপক্ষে। সফরের শেষ খেলা আরম্ভ হবে ১৩ই জুলাই, ইংল্যান্ডের সংগে তৃতীয় বা শেষ টেস্ট।

টেস্ট খেলার তারিখ

প্রথম টেস্ট: জুন ৮—১৩, লিডস

দ্বিতীয় টেস্ট: জুন ২২—২৭, লর্ডস

তৃতীয় টেস্ট: জুলাই ১৩—১৮, বার্মিংহাম

এবারের এশীয় টেনিস

অজয় বসু

এবারের এশীয় টেনিসে এশিয়ার কোনো ক্রীড়াবিদ শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারেন নি। পুরুষ বা মহিলা, একক বা জুটি প্রতিযোগিতায়, কোনো বিভাগেই নয়। সিংগলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস যাঁরা জয় করেছেন তাঁরা হয় ইউরোপের, আর না হয় দক্ষিণ মার্কিন অঞ্চলের প্রতিনিধি।

সুবিখ্যাত ভারতীয় রমানাথন কৃষ্ণাণ আসরে ছিলেন না। মনে হয় যে একা তাঁর অনুপস্থিতির জন্যেই এবারের অনুষ্ঠানে এশীয় প্রতিনিধিদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পেছনের দিকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। কৃষ্ণাণের অনুপস্থিতিতে যাঁদের ওপর এশীয় টেনিসের মান ধরে রাখার দায়িত্ব পড়েছিল তাঁরা কেউই নিজেদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি।

ভারতীয় তথা এশীয় টেনিসের মানের পরিপ্রেক্ষিতে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেম-জিতলালকে অসংকোচে কৃষ্ণাণের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী বলে ধরে নেওয়া যায়। ডেভিস কাপ এবং জাতীয় লন টেনিসের সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানের পর আশা করা গিয়েছিল যে জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিতলালেরা এশীয় টেনিসের আসরে বড়সড় ভূমিকা নিতে পারবেন। কিন্তু সে আশা সার্থক করে তোলায় তাঁদের কেউই তেমন উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারেন নি।

জয়দীপ হারলেন রুশ তরুণ মিত্রে-ভেলের কাছে। প্রেমজিত সংযুক্ত আরবের উঠতি খেলোয়াড় এল সফির হাতে। জয়দীপ গতবারের এশীয় চ্যাম্পিয়ন। রমানাথন কৃষ্ণাণকে হারিয়ে তিনি এই স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। কিন্তু পুরো একটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চ্যাম্পিয়ন সংজ্ঞা তাঁকে খোয়াতে হলো।

রুশ তরুণ মিত্রেভেলিকে এর আগেও আমরা দেখেছি। আগের অনুপাতে তাঁর ব্যক্তি-গত ক্রীড়ামানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, সন্দেহ নেই। তবুও বলা যেতে পারে যে তাঁর হাতে জয়দীপের হারের নজীর কেমন যেন অপ্রত্যাশিত। ডেভিস কাপ প্রতি-যোগিতায় পশ্চিম জার্মানী, ব্রেজিল ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, পরপর তিনটি খেলায় আরও লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে জয়দীপ যে লড়িয়ে মনো-ভাবের পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন, সাউথ ক্লাবের লনে মিত্রেভেলের মোকাবিলায় জয়দীপ সেই দৃঢ়তায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারেন নি।
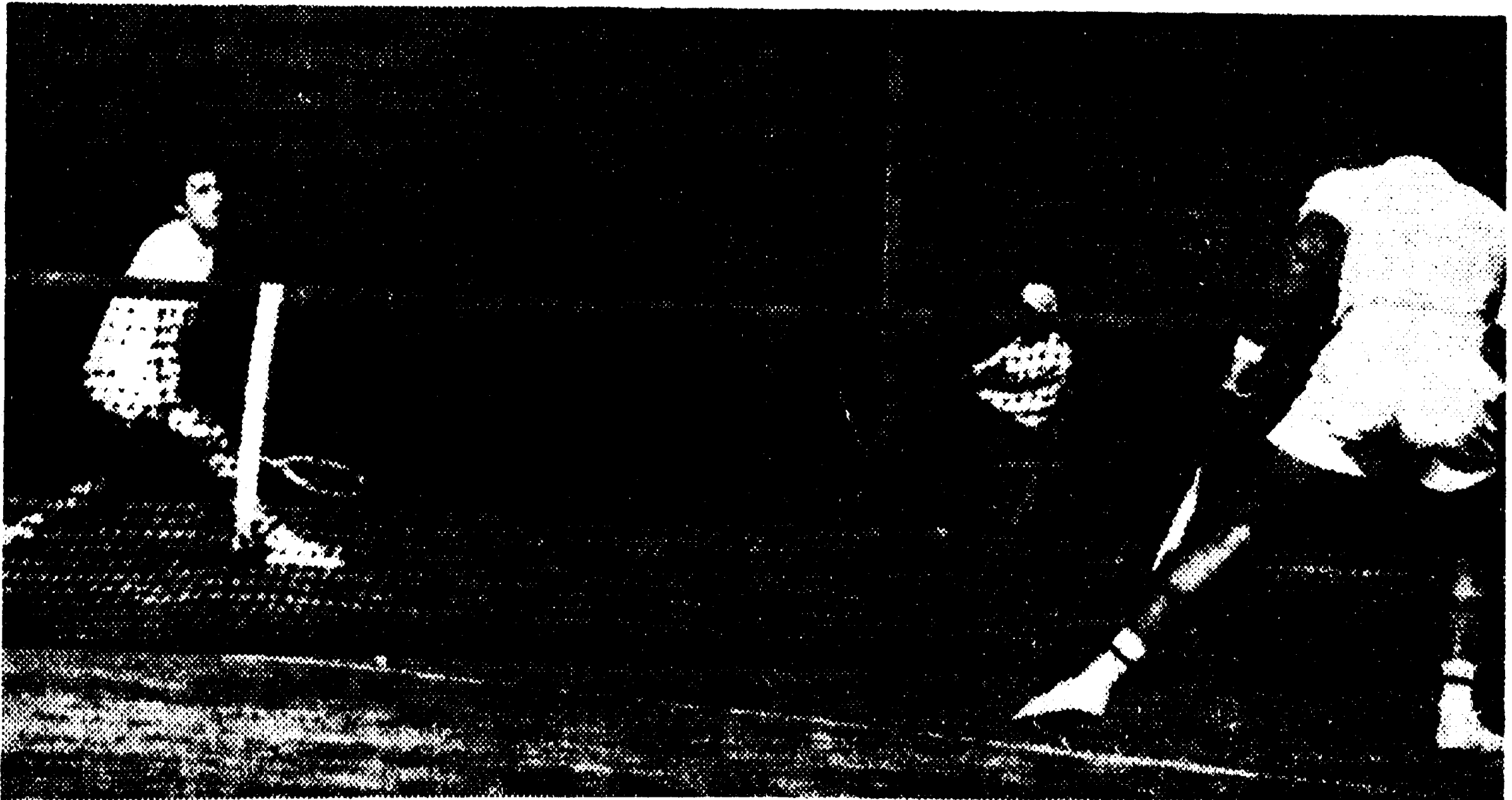
কলকাতার সাউথ ক্লাবের লনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার আলেকজান্দার মেত্রেভেলি বনাম সংযুক্ত আরবের এল সফির (ছবির ডানদিকে) সিংগলস ফাইনাল খেলার একটি দৃশ্য। ফটো : অমৃত

মিত্রেভেলি বনাম জয়দীপের খেলার মীমাংসা পাঁচ সেটে হলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন যে মিত্রেভেলি জিতেছেন কতো সহজেই। এতো সহজে যে তিনি জিতবেন তা ছিল অনেকেরই কাছে অপ্রত্যাশিত। জয়দীপের এই শিথিলতার হেতু কি? একটানা দীর্ঘদিন বড় বড় প্রতিযোগিতায় খেলার চাপে কি ক্লান্তিবোধ করছিলেন? হয়তো তাই। হয়তো আরও অন্য কারণও থাকতে পারে। তবে কারণ যাই থাক না কেন, সাফল্যের ধারবাহিক ধারা যদি তিনি না ধরে রাখতে পারেন তাহলে তাঁর সুনামে আঁচড় পড়বেই। খেলোয়াড়-জীবনের মধ্যাহ্নে কৃষ্ণাণের মধ্যে সাফল্যের ধারাবাহিকতার যে দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি সে দৃষ্টান্ত জয়দীপের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গেল না। আরও বলা যেতে পারে যে এক খেলোয়াড়ের কৌলীন্য যাচাইয়ে সবচেয়ে জোরদার মাপকাঠি হলো সাফল্যের এই ধারাবাহিকতাই।

নতুন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন প্রেমজিতলালের হারের নজীর আরও শোচনীয়। তিনি হারলেন উঠতি আরবী তরুণ এল সফির কাছে। দ্বি-পাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফয়সালা হলো মাত্র তিন সেটেই। বাড়তী দু-এক সেট পর্যন্ত খেলাটিকে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা প্রেমজিতের ছিল না। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে প্রেমজিতের বিপক্ষে এল সফি সত্যিকারের উঁচু মানের খেলা খেলেছেন। এমন খেলা খেলতে পারলে এল সফি আরও নামী খেলোয়াড়দের হারাতে পারবেন। তবে এ উপলব্ধিও খাঁটি যে নিজের পরিকল্পনা মতো খেলার সর্ববিধ সুযোগ সুবিধে প্রেমজিত নিজেই সেদিন এল সফিকে উপহার দিয়েছিলেন।

সেই সুযোগ সদ্ব্যবহার করে এল সফি প্রেমজিতের ঠুনকো প্রতিদ্বন্দ্বিতার অস্তিত্বকে উড়ো ঝড়ের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে দেন। কিন্তু ব্রেজিলের টমাস কখ আর রাশিয়ার মিত্রেভেলির মতো চিন্তাশীল প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেদিন এল সফিকে তাঁর মনোমতো পথে বিচরণ করার সুবিধে দেন নি সেদিন শত চেষ্টা করেও এল সফি দুহাতে র‍্যাকেট বাগিয়ে ধরেও সাউথ ক্লাবের লনে কাল বৈশাখীর ঝড় তুলতে পারেন নি। কখের সঙ্গে খেলায় সফি যদিও কোনোক্রমে জিততে পেরেছেন, কিন্তু ফাইনালে মিত্রেভেলি তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেন নি।

সিঙ্গলস ফাইনালে মিত্রেভেলি বনাম এল সফির প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমে উঠতে না পারলেও খেলাটি সবদিক থেকেই শিক্ষাপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

আক্রমণাত্মক মেজাজ রীতিমতো চড়া পর্দায় বেঁধে রেখে কেউ যদি সর্বক্ষণই গায়ের জোর ফলাতে চান তাহলে বিচক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর কি হাল করতে পারেন —এই ফাইনালে মিত্রেভেলি সেই কথাটিই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এল সফি নিজের চোখে তা দেখেও দেখতে চান নি এইটেই আশ্চর্য।

বিশ্বের উঠতি খেলোয়াড়দের অগ্রগণ্য হিসেবে এল সফির সুনাম আছে। তাঁর সার্ভিসে এবং ব্যাকহ্যান্ড মারে রীতিমতো জোর আছে। দু হাতে র‍্যাকেট ধরে মাঝে মাঝে তিনি এমন জোরে ব্যাক হ্যাণ্ডে ড্রাইভ করেছেন যে দেখে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী-দেরই নয়, সেই সঙ্গে দর্শকদেরও ভয় পেতে হয়েছে। কিন্তু জোরের সঙ্গে যদি প্রয়োগ-রীতির সার্থক সমন্বয় না ঘটে তাহলে র‍্যাকেটের ধাক্কায় বলগুলি হয় কোর্টের বাইরে ঠিকরে পড়তে অথবা জালে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। এই প্রয়োগবিদ্যা অধিগত করায় যে সংযমের প্রয়োজন সেই সংযমে এল সফি এখনও ধাতস্থ হতে পারেন নি। তাই যতোই কেন না তাঁর সম্ভাবনা থাকুক তাঁকে এক কাঁচা খেলোয়াড় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর যদি তাঁর আচরণে সেই সংযমের প্রতিফলন না ঘটে তাহলে এল সফি চিরদিনের মতো কাঁচাই থেকে যাবেন।

তাই ক্রীড়ারীতির বিন্যাসে তিনি অবিন্যস্ত ও বেপরোয়া। তাঁর এই বেপরোয়া ভাবকে বাগ মানাতে মিত্রেভেলি 'বুদ্ধি করে পাকা ঘুঁটির চাল চেলেছিলেন সর্বক্ষণ। সফি দ্রুতলয়ে ছুটতে চাইছিলেন। কিন্তু মিত্রেভেলি তাঁর আব্দারে কান পাতেন নি। খেলার নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে সর্বক্ষণ সংরক্ষিত রেখে বলের গতিবিধিতে মন্থর মেজাজের আমেজ জাগালেন। অর্থাৎ সফি যা চাইছিলেন ঠিক তার উলটো পথটি ধরলেন মিত্রেভেলি। তাঁর পরিকল্পনায় সুচিন্তিত এবং নিশ্ছিদ্রপ্রায়। সফি খেলার সময় বিশেষ চিন্তা করেন না। কাজেই মিত্রেভেলির পাতা ফাঁদে সফিকে জড়িয়ে পড়তেই হলো।

খোলা মাঠের খেলায় সাফল্য লাভ করা যেমন শারীরিক সক্ষমতাসাপেক্ষ তেমনি তা বুদ্ধিভিত্তিক। যে খেলোয়াড়ের শরীর মজবুত এবং যাঁর মনও সক্রিয় তিনিই যথার্থ উপযুক্ত। কিন্তু মাঠে নেমে যাঁরা মস্তিষ্কের ধার ধারেন না, গায়ে অপরিসীম শক্তি এবং মারের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও তাঁরা বুদ্ধিমান প্রতিদ্বন্দ্বীকে বশে আনতে পারেন না। সফি বনাম প্রেমজিতের খেলার দিনে দুজনের কেউই সমজে বুজে খেলার চেষ্টা করেন নি। যতো জোরে পারা যায় ততো জোরেই তাঁরা র‍্যাকেট ছুঁড়েছেন। সফির র‍্যাকেটের দাপট অনেক বেশি। কাজেই সেদিন তাঁর পক্ষে প্রেমজিতকে ছেলে-মানুষের মতো হারাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধেয় ভুগতে হয় নি। মারে জোর এবং নিয়ন্ত্রণ দুই দরকার। শারীরিক সক্ষমতার মতো মস্তিষ্কের নির্দেশও প্রয়োজন। এসব কথা যদি এল সফি, প্রেমজিতেরা না বুঝতে চান তাহলে তাঁদের ভবিষ্যৎ ঘিরে আশা রাখারও তাগিদ আমরা অনুভব করতে চাইবো না।

নতুন এশীয় চ্যাম্পিয়ন আলেকজান্ডার মিত্রেভেলিকে অভিনন্দন জানাবার কালে আমাদের তাঁর পরিশীলিত মেজাজ ও সুবিন্যস্ত ক্রীড়ারীতির যাথার্থ স্বীকার করতেই হবে। মিত্রেভেলি খুব চটকদার নন কিন্তু উপযুক্ত খেলোয়াড়। তাঁর খেলায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে মিত্রেভেলি যদি আন্তর্জাতিক টেনিসে আরও এগিয়ে যান তাহলে কলকাতার প্রত্যক্ষদর্শীরা নিশ্চয়ই অবাক হবেন না।

মিত্রেভেলি কুমারী ইভানভের সঙ্গে জুটি বেঁধে মিক্সড ডাবলস ফাইনালও জয় করেছেন। কুমারী ইভানভ দস্তুরমতো সিরিয়াস ধরণের খেলোয়াড়। মিক্সড ডাবলস ফাইনালের বাকী তিনজন খেলোয়াড় সময় সময় স্বাভাবিক আনন্দে শিথিল হতে চাইলেও ইভানভ এক মুহূর্তের জন্যে মুচকি হাসি হেসেছিলেন কিনা সন্দেহ। খেলার সময় হাসতে তাঁর মানা। যাকে বলে চড়া ধাত, তাই।

এই ধাতের জন্যে তিনি মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে স্বদেশীয়া শ্রীমতী আবজানদাজের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেরেছেন। লাইন্সম্যানদের দু-একটি সিদ্ধান্ত যেই মনোমতো হোলো না অমনি ক্ষেপে উঠলেন ইভানভ। তারপর ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় সেটটি ছেড়ে দিলেন। ফলে এশীয় টেনিসের মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালটি একেবারে প্রহসনে পরিণত হলো।

লাইন্সম্যানদের ভুলচুক ঘটলে যাঁরা নিজেদের মেজাজ হারিয়ে ফেলেন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইভানভ সেদিন নিজের সঙ্গে শত্রুতা পাকিয়ে-ছিলেন। নইলে হয়তো মহিলা বিভাগের সিঙ্গলস ফাইনালটি পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালের চেয়ে উপভোগ্য হতে পারতো।

পুরুষদের ডাবলসে ব্রেজিলীয় জুটি কখ ও ম্যান্ডারিনো ভারতীয় জুটি জয়দীপ-প্রেমজিতকে হারালেন তিন সেটে। মাস দুয়েক ভারত বিহারের ফলে কখের খেলার ধার কিছুটা কমলেও ম্যান্ডারিনোর সহযোগিতায় ভারতীয় জুটিকে সহজে হারাতে কখের অসুবিধে হয় নি। এ থেকেই বোঝা যেতে পারে যে, ভারতীয় জুটির সামর্থ ছিল কতো স্বল্প।

সব মিলিয়ে বলতে চাই যে এবারের এশীয় টেনিস তেমন জমে উঠতে পারি নি। টেনিস অনুরাগীরা তা বুঝে নিয়েছিলেন বলে এক আধদিন ছাড়া অনুষ্ঠান কেন্দ্রে তেমন ভীড়ও জমান নি। কৃষ্ণাণ হাজির থাকলে হয়তো এমনটি হোতো না।

শকুন্তলা দেবী গণিতে এক আশ্চর্য প্রতিভা। মাত্র ছ' বছর বয়সে তিনি গণিতে পারদর্শিতার পরিচয় দেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের সামনে। ১৯৫০ সালে লণ্ডনে টেলিভিসনে গণিতের নানা দুরূহ সমস্যার সমাধান করে দেন। সম্প্রতি কলকাতার ত্যাগরাজ হলে উপস্থিত দর্শকদেরও তিনি অভিভূত করে দেন গণিতের জটিল প্রশ্নাদির উত্তর কুশলতায়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ডঃ সি আর রাও শকুন্তলাকে 'গণিতের রাণী' বলে অভিহিত করেন।

চাইলেন না, সব জটিলতার উর্ধ্বে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন বরাবর। বিপদে পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে তাঁরা আরও সহস্র বিপদ বাধিয়ে বসে থাকেন। সহজে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায়ই আর থাকে না। নিজের সঙ্গে আরও দশজনকে জড়িয়ে ফেলেন। স্বখাতসলিলে ডুবে মরার এমন ভাল উদাহরণ বুঝি আর হয় না। তিনি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। আর একটু বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন হলে অবস্থা নিশ্চয়ই এতটা শোচনীয় হতো না। সহজেই হয়তো নিষ্কৃতি পেয়ে যেতেন। কিন্তু চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে শেষে এমন জড়িয়ে পড়লেন যে, হালে পানি পান না। নাকানি-চোবানি খেয়ে মরেন। তাই সব সময় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করাই ভাল। তাতে যেমন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার ক্ষমতা জন্মে তেমনি অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হয়।

এতগুলি কথা অবশ্য প্রাত্যাহিক জীবন সম্পর্কেই বলা হলো। কোন জটিল তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার সাংসারিক ব্যাপার-গুলিকে আমরা সবাই এড়িয়ে যেতে চাই-- এ নিয়ে মাথাব্যথা করার গরজ কারো বড় একটা দেখা যায় না। এসবকে নেহাৎ ঝামেলা বলে উড়িয়ে দেবার জন্য অনেকেই প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। কিন্তু অবস্থার পটপরিবর্তন ঘটে যখন দায়িত্ব নিজের কাঁধে এসে পড়ে, তখন আর কিছুতেই সামঞ্জস্য করা সম্ভব হয় না। অল্পেই মেজাজ খিচড়ে যায়—খিটিমিটি সর্বদা লেগেই থাকে। কিছুতেই প্রতিবাদ সহ্য করা যায় না। নিজে সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে গিয়েও ব্যর্থ হতে হয়। ব্যর্থতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভবও হয় না। রাগে দুঃখে তখন দিশাহারা অবস্থা। সবকিছু বিরক্তিকর মনে হয়—সংসার অসার হয়ে যায়। ভাঙন তখন অপ্রতিরোধ্য। যদি ঠেকা দেয়া যায় তো ভাল, না হলে নিরুপায়। অথচ এমন একটা বিসদৃশ অবস্থাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যেতো যদি আগে থেকে পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা সম্ভব হতো।

পুরাতনের ডাক

পুরাতনের প্রতি মোহ কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমন একটা মমত্ব-বোধ এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে, ছাড়াতে গিয়েও ছাড়ান যায় না। বরং পাকে-পাকে ফেরে-ফেরে জড়িয়ে পড়তে হয়। 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে' কবির এই বিখ্যাত উক্তি পুরাতনের প্রতি মমত্ববোধ সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। এই অনুভূতি বেশ তীব্রতার সঙ্গেই আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। আমরা সবাই সেই তাড়না অনুভব করি। এ থেকে কারও রেহাই নেই। অনেক সময় এই তাড়না এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, সুযোগ পেলে আবার আমরা পুরাতনের বন্ধনে ধরা দেই। এসময় বর্তমানকে মুহূর্তে অতীতে রূপান্তরিত করতে একটুও আটকায় না বা কোথাও বাধে না। 'যেতে নাহি দিব' বলে বর্তমান যতই টানাটানি করুক সে রকম সুযোগ এসে গেলে অতীতের বুকে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন অতটা চিন্তা-ভাবনার অবসর থাকে না। অতীতের মোহাঞ্জন দুচোখ ভরে তখন রঙীন স্বপ্নের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে। সেই পরিবেশ, সেই বন্ধু-বান্ধব, হাসি-ঠাট্টা, গালগল্প সব যেন মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে স্মৃতির চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে। হাসি-আনন্দের একটা উচ্ছল স্রোত মনকে টানতে-টানতে

শ্রীমতী সিন্থিয়া

ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। সব কিছু ভুলিয়ে দেবার এই মাধুর্যেই অতীত এত মধুর, এমন সুখকর। তাই পিছুটান এর প্রবল। সিন্থিয়া হাটনও হয়ত এই পিছুটান অনুভব করেছিলেন। শুধু পিছুটান নয়। এর সঙ্গে আরও কিছু ছিল। বন্ধুত্বের আহ্বান এবং আনুগত্যের শপথ, এসব কিছু মিলে সিন্থিয়াকে টানতো। সিন্থিয়ার পক্ষে এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি। তাই বছর ছয়েক আগে ছেড়ে যাওয়া চাকুরীতে তিনি নতুন করে ফিরে এসেছেন। চাকুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি তো আছেই।

সিন্থিয়া ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার চীফ এয়ার হোস্টেস। ১৯৬০ সালে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি ফিরে যান নিজের দেশ—অস্ট্রেলিয়ায়। মনে হয়ত আরও কোন স্বপ্ন ছিল—রঙীন আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ত ওঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। দেশের সে আন্তরিক আহ্বানে সিন্থিয়া ছুটে গিয়েছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মায়ের কোলে। অভ্যর্থনাও যে সেখানে কম জুটেছিল তা নয়। দেশ ওঁকে সাদরেই গ্রহণ করেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি সেক্রেটারী হিসেবে বেশ সুনামের সঙ্গেই কাজ করছিলেন। কিন্তু পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না কিছুতেই। এয়ার ইন্ডিয়ার মোহ ওকে পেয়ে বসেছিল। তাই মাত্র মাস পনেরো আগে যখন তিনি সুযোগ পেলেন আবার ফিরে এলেন নিজের পুরনো কর্মস্থলে। এয়ার ইন্ডিয়ার মেলবোর্ণ অফিসে সিন্থিয়া যোগদান করলেন রিসেপসনিস্ট হয়ে। পুরনো জায়গায় নতুন প্রাণের জোয়ারে তিনি এখন কাজ করছেন।

সম্প্রতি বোম্বে ঘুরে গেলেন সিন্থিয়া। একটি ট্রেণিং কোর্সে যোগদান করতে এসেছিলেন পুরনো এবং নতুন কর্মস্থলের মূল কেন্দ্রে। বোম্বে আসতে পেরে তিনি খুব খুশী। এক সাক্ষাৎকারে সিন্থিয়া বললেন যে, তিনি বম্বে আসতে পেরে খুব সুখী এবং এয়ার ইন্ডিয়ার নতুন পদে তিনি অধিকতর আনন্দিত। তাঁর মতে গত ছ' বছরে এই শহরের বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নি। এই শহর তাঁকে পূর্বের মতই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। শহরের লোকসংখ্যা যা কিছু বেড়েছে। আপাততঃ সিন্থিয়া মেলবোর্ণ অফিসেই কাজ করবেন। কারণ ওঁর আত্মীয়-পরিজন সব ওখানেই রয়েছেন। মেলবোর্ণের একটে ছোট্ট গ্রাম্য শহরে তিনি থাকেন। এই জায়গাটি তাঁর মতে 'লাভলি সিটি'।

নতুন চাকুরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে সিন্থিয়া হেসে বললেন যে, এই চাকুরী পেয়ে তাঁর বেশ লাভ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ানদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল মেটানোই এখন তাঁর বড় কাজ। এ কাজটা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পছন্দসই। ছুটির দিনে অনেক অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু তাঁর বাড়ীতে আসেন শুধু ভারতবর্ষের ভাত-তরকারির স্বাদ নিতে। এ কাজ না পেলে তাঁর পক্ষে বন্ধুত্বের এমন অভ্যর্থনা সম্ভব হত না।

দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শংকরের আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। চিত্রে যে বালিকাটি পুরস্কার গ্রহণ করছে তার নাম যোগিনী পারেখ (৭)।

সস্তায় সুখাদ্য

খাদ্য নিয়ে নতুন কিছু বলা বাহুল্যমাত্র। এ সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বলার মত জিনিস যথেষ্ট আছে। আমাদের বর্তমান এবং আগামী দিনের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রনেতাদের সতর্কবাণী উচ্চারিত হবার পর এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে বই কমে নি। সেজন্য খাদ্যই আজকের দিনে সর্বাধিক আলোচিত প্রসঙ্গ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে কোন আলোচনা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। অবশ্যই তা যদি আমাদের সমস্যা-উত্তরণে সাহায্য করে। অন্ধকারে আলোক-দিশারী এ রকম আলোচনা বা আলোচনা-গ্রন্থের প্রয়োজন আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'সস্তায় সুখাদ্য ও বিকল্প খাদ্যের ব্যবহার' সে রকমই একখানা বই। এই বইটি শুধু সময়োপযোগী তাই নয়, এর আবেদন আরও ব্যাপক। সস্তায় সুখাদ্য পরিবেশন শুধু লেখকের উদ্দেশ্য নয় সেই সঙ্গে বিকল্প খাদ্যের কথাও বলা হয়েছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লেখক অনেক জাতের রান্নার কথা বলেছেন। সেদ্ধ, ভাজা, পোড়া, সেঁকা এবং ঝলসানো কোন কিছুই তিনি বাদ দেন নি। রান্না এবং খাবার ব্যাপারে বইটিতে তাই নতুনত্ব যথেষ্ট। মিষ্টান্ন, সুরুয়া বা সুপ, মাংস, মাছ, জেলী, জ্যাম ফল ও সব্জি সংরক্ষণ পদ্ধতি, স্কোয়াশ তৈরীর প্রণালী, জারক এবং পাঁউরুটি তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিকল্প খাদ্য সোয়াবিন সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। পরিশেষে কয়েকটি ছোট-বড় কাজের বাড়ীর খাদ্য তালিকা ও আর্থিক হিসাব গ্রন্থটিকে আরও মূল্যবান করেছে।

আজকের জটিল খাদ্য পরিস্থিতির দিনে এ রকম একখানা সার্বিক পুস্তক মূল্যবান উপহার সন্দেহ নেই। এ জন্যই বইখানার সমাদর। পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রণ-প্রমাদ সম্পর্কে যত্ন নেওয়া বাঞ্ছনীয়। **সস্তায় সুখাদ্য ও বিকল্প খাদ্যের ব্যবহার : শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। গ্লোব বুক এজেন্সী, ৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম—১-৭৫।**

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

খ্যাতনামা ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্টলার এ-বছর (১৯৬৬) পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিতে সুইডিশ আকাদেমি অধ্যাপক কাস্টলারকে এই সম্মাননায় ভূষিত করেছেন, সেটি বিজ্ঞানের ভাষায় 'অপটিক্যাল পাম্পিং মেথড' নামে সুপরিচিত।

পরমাণুসমূহের মধ্যে অনুরণন পর্যবেক্ষণের জন্যে আলোকশক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এই বিষয়টির ধারণা বোধগম্য করে তোলা খুবই কঠিন। আমরা এখানে এই পদ্ধতির মূল কথা সাধারণভাবে আলোচনা করব।

অধ্যাপক কাস্টলার উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি অণু-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সূক্ষ্মভাবে উন্মোচনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে আমরা জানি, তার কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস (যা প্রোটন নিউট্রন দিয়ে গঠিত) এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন স্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকে। যখন কোনো ইলেকট্রন এক শক্তি-স্তর থেকে অন্য স্তরে চলে যায়, তখন বিকিরণরূপে তা নির্গত বা শোষিত হয় এবং বর্ণালী সৃষ্টি করে। এই বিকিরণ পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করেই বর্ণালিতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে শক্তি-স্তরগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে, সেগুলি পর্যবেক্ষণে বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয়। যখন কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র পরমাণুর স্বাভাবিক শক্তি স্তরগুলিকে বহুসংখ্যক সূক্ষ্মতর স্তরে ভেঙে দেয়, তখন এই অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই ধরনের একটা বিশেষ ঘটনা হচ্ছে, যখন কোনো পরমাণুর আভ্যন্তরীণ চৌম্বক ক্ষেত্র তার স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সূক্ষ্মতর গঠন সৃষ্টি করে। এর ফলে অতি কাছাকাছি শক্তি-স্তরের উদ্ভব হয়। এই কাছাকাছি শক্তি-স্তরগুলির পরিবৃত্তির দরুণ যে কম্পাঙ্কগুলি সৃষ্টি হয়, সেগুলি বর্ণালির মাইক্রোওয়েভ অংশে পড়ে। কিন্তু এই বিকীর্ণ শক্তি এতই ক্ষীণ যে, তা সহজে ধরা যায় না। এক্ষেত্রে শোষণ-পদ্ধতিও বিশেষ কার্যকর হয় না, কারণ বিভিন্ন স্তরে পরমাণুর সংখ্যা একই থাকে। এজন্যে যদি পরমাণুসমূহের মধ্য দিয়ে আলোক-শক্তি সঞ্চালিত করা হয়, তাহলে বিকিরণ ও শোষণ পরস্পরের সমতা আনবে এবং লব্ধ ফল হবে নগণ্য। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে অধ্যাপক কাস্টলার ১৯৫০ সালে তাঁর 'অপটিক্যাল পাম্পিং' পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

তাঁর এই পদ্ধতিতে উপযুক্ত কম্পাঙ্কের বৃত্ত-সমবর্তিত আলোকের দ্বারা বাষ্পীভূত পরমাণুসমূহকে আলোকিত করা হয়। এর ফলে প্রাথমিক অবস্থার ঘন-সন্নিবিষ্ট কোনো একটি স্তরের কিছুসংখ্যক পরমাণু আলোক-শক্তি শোষণ করে একটি উত্তেজিত

অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্টলার

অবস্থায় লাফ দেয়। স্বতঃ-বিকিরণের মাধ্যমে যখন তারা আবার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসে, তখন প্রাথমিক অবস্থার একটি উচ্চতর স্তরে তারা সাধারণত হাজির হয়, এভাবে প্রক্রিয়াটি যতই এগিয়ে চলে, ততই 'পাম্পের' কার্যক্রমের মতো পরমাণুগুলির একটা বড় অংশ প্রাথমিক অবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। পরমাণু-সমষ্টির মধ্যে এভাবে যথেষ্ট তারতম্য অর্জিত হওয়ায় তাদের পরিবৃত্তি থেকে পরিমাপযোগ্য ফল লাভ করা যায়। সঞ্চালিত বা বিকীর্ণ আলোকের সমবর্তন-অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই ফল পাওয়া যায়।

অধ্যাপক কাস্টলারের অপটিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতি পরমাণু-বিজ্ঞান গবেষণার বহুতর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে এবং এর যন্ত্রপাতি দামে যেমন সস্তা, তেমনি সহজে তৈরী করাও যায়। অধ্যাপক কাস্টলার ও প্যারিসে তাঁর সহকর্মীরা পারদ ও সোডিয়ামের বর্ণালি পর্যবেক্ষণসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। সারা বিশ্বের বহু গবেষণাগারে এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই পদ্ধতির প্রয়োগে যেসব অনুসন্ধান চলছে, কেবল সে সম্পর্কেই বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রেও

বিজ্ঞানের কথা

শুভংকর

অপটিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। পারমাণবিক ঘড়ি হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। তবে কাস্টলার-পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হচ্ছে মেসার ও লেসারের ক্ষেত্রে।

অধ্যাপক কাস্টলারকে যদিও এককভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁর কাজের সূচনা হয় সহকর্মী ডঃ জাঁ ব্রসেলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন সম্পাদিত গবেষণায়, তাই তাঁকে পুরস্কার দেবার সময় সুইডিশ আকাদেমি ডঃ ব্রসেলের কথা বিবেচনা না করায় অধ্যাপক কাস্টলার দুঃখিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের দুজনকে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। এই মন্তব্য থেকে তাঁর বিজ্ঞানীসুলভ উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বর্তমানে প্যারিসে 'একোল নর্মেল সুপিরিওর' বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তিনি ফরাসী বিজ্ঞান আকাদমি থেকে গ্র্যান্ড প্রিকস্ এবং মার্কিন অপটিক্যাল সোসাইটি থেকে মীস্ পদক লাভ করেছেন, লোভেন, পিসা এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেছে। বিদেশের একাধিক বিজ্ঞান আকাদমি ও সোসাইটির সদস্যপদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। অধ্যাপক কাস্টলারের বর্তমান বয়স ৬৪ বছর।

রুদ্রসাগরে অগ্নিনির্বাপণে ভারতীয় পদ্ধতির সাফল্য

কিছুদিন আগে আসামে রুদ্রসাগরের তৈলকূপে অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় নানা বিপদাশংকা দেখা দিয়েছিল। এই আগুন শীঘ্রই নিভিয়ে ফেলার জন্যে বিশেষজ্ঞদের অভিমত চাওয়া হয়েছিল, রুশ বিশেষজ্ঞরা ডিনামাইট প্রয়োগ করে আগুন নেভাবার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাতে আগুন আপাতত নিভলেও, পরে তা আরও ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিল। তাই রুশ বিশেষজ্ঞদের অভিমতের বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ দমকলবাহিনীর অধিকর্তা শ্রী এস সি চ্যাটার্জি উঁচু জলের চাপের সাহায্যে আগুন নেভানোর পরিকল্পনা পেশ করেন। মহড়ায় ভারতীয় পদ্ধতি সফল হয় এবং রুশ বিশেষজ্ঞরা তার কার্যকারিতা মেনে নেন। এই ভারতীয় পদ্ধতিতে রুদ্রসাগর তৈলকূপের আগুন সম্প্রতি নির্বাপিত হয়েছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অনুমান, উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থার অভাব হয়তো এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছে। তাঁদের মতে, মাটির তলায় পাইপ বসানোর সময় যখন তা তৈলস্তরে আসে, তখন কতকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। যেমন, ব্লো-আউট প্রিভেন্টার লাগানো, অর্থাৎ এমন কতকগুলি ভাল্ব বসানো, যাতে গ্যাস, তেল ও ক্রুডকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে পাইপ-লাইনের সাহায্যে খনি থেকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ-

নের আশঙ্কা, এসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে নেওয়া হয়নি। এছাড়া স্থিতীয় বিদ্যুৎপ্রবাহ অথবা সংঘর্ষ হওয়ার দরুণ বা কূপের দাহ্য পদার্থপূর্ণ মুখের কাছে কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংযোগের দরুনও অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রতিদিন ১০ লক্ষ ঘন-মিটার গ্যাস, হাইড্রোকার্বন ও তেল পুড়ে গেছে এবং আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ দৈনিক ৩ লক্ষ টাকার মতো।

অনন্য গণিত-প্রতিভা রামানুজন

(৩)

১৯০৩ সালে ষোল বছর বয়সে রামানুজন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং ইংরেজি ও গণিত সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার দরুন সুব্রহ্মনম বৃত্তি পান। এরপরে তিনি কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে এফ এ (ইন্টারমিডিয়েট) ক্লাশে ভর্তি হন। কলেজে প্রবেশ করার পর তিনি গণিতে এত মনপ্রাণ ঢেলে দেন যে, ক্লাশে কি পড়ানো হচ্ছে সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই থাকত না। ইংরেজি, ইতিহাস বা শরীরতত্ত্ব যে কোনো বিষয়ের ক্লাশ হোক না কেন, সব ক্লাশেই তিনি সারাক্ষণ কোনো গাণিতিক অনুসন্ধানে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন। গণিতের প্রতি এই অত্যধিক মনোনিবেশের ফলে অন্যান্য বিষয়ে তাঁর স্বভাবতই অমনোযোগ পড়ে। এর দরুন তিনি পরবর্তী ক্লাশে উত্তীর্ণ হতে পারেন না এবং তাঁর বৃত্তি রদ হয়ে যায়। এতে লজ্জায় দুঃখে তিনি বাড়ির কাউকে না জানিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে চলে যান। প্রায় দু মাস সেখানকার নানা জায়গায় ঘুরে তিনি কুম্ভকোনমে ফিরে আসেন এবং কলেজে আবার যোগ দেন। কিন্তু দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে ক্লাশে উপস্থিতির প্রয়োজনীয় পার্সেন্টেজ তাঁর রইল না এবং সেকারণে ১৯০৫ সালে তিনি এফ এ পরীক্ষা দিতে পারলেন না। এক বছর পরে তিনি মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পা কলেজে ভর্তি হলেন, কিন্তু এবারও বিধি বাম। কিছুকাল পরে অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে তাঁকে আবার কুম্ভকোনমে ফিরে আসতে হল। ১৯০৭ সালে তিনি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে এফ এ পরীক্ষা দিলেন কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলেন না। এরপর ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তাঁর কোনো নির্দিষ্ট কাজকর্ম ছিল না। অবশ্য গণিত চর্চা তিনি কখনও ছাড়েন নি। নিজস্ব ধারায় পূর্বের মতোই তিনি গণিতচর্চা করে যেতেন এবং আর একটি নোটবই-এ তার ফলাফল লিখে রাখতেন।

১৯০৯ সালে রামানুজন শ্রীমতী জানকী দেবীকে বিবাহ করেন। এবার জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হল। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান যিনি, শিক্ষাজীবন যাঁর উজ্জ্বল নয় এবং যাঁর কোনো মুরুব্বী নেই তাঁর পক্ষে জীবিকার্জনের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। একটা উপযুক্ত জীবিকা পাবার আশায় ১৯১০ সালে তিনি দক্ষিণ আর্কট জেলার সব-ডিভিশন শহর তিরুকোলারে ভারতীয় গণিত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীভি রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যান। শ্রীআয়ার তখন সেখানকার ডেপুটি কালেক্টর। তাঁর ডিভিশানের কোনো মিউনিসিপাল বা তালুক অফিসে কেরানীর কাজ দেবার জন্যে রামানুজন তাঁকে অনুরোধ জানালেন। শ্রীআয়ার নিজেও ছিলেন একজন গণিত-বিশেষজ্ঞ। রামানুজনের নোটবই দেখে তিনি উপলব্ধি করলেন, এই প্রতিভাধর তরুণটিকে তালুক অফিসে সামান্য কেরানীর কাজে বসিয়ে দিলে তাঁর গণিতপ্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি একটি পরিচয়-পত্র লিখে রামানুজনকে কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপি ভি শিশু আয়ারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামানুজন যখন কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে এফ এ ক্লাশের ছাত্র ছিলেন তখন থেকে শ্রীশিশু আয়ার তাঁকে জানতেন। কারণ তিনি তখন সে কলেজের গণিত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় রামানুজন কয়েক মাসের জন্যে মাদ্রাজের অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল অফিসে একটা অস্থায়ী চাকরি পেলেন। এই চাকরির মেয়াদ শেষ হবার পর রামানুজন প্রাইভেট টিউশানি করে কয়েক মাস জীবিকা অর্জন করেন। এই অস্থায়ী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে শ্রীশিশু আয়ার একটা সুপারিশপত্র দিয়ে রামানুজনকে মাদ্রাজের ৮০ মাইল উত্তরে নেলোর শহরের কালেক্টর দেওয়ান বাহাদুর আর রামচন্দ্র রাও-এর কাছে পাঠালেন।

শ্রীরাও ইতিপূর্বেই রামানুজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নোটবইও দেখেছিলেন। শ্রীরাও নিজেও গণিত অনুরাগী ছিলেন। রামানুজনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের এক মনোজ্ঞ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন : কয়েক বছর আগে আমার এক ভাইপো এসে আমাকে বললো, ‘একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তিনি কেবল গণিতের কথা বলছেন। আমি তো তাঁর কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আপনি একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখুন, তিনি যেসব কথা বলছেন তার মধ্যে কোনো সারবস্তু আছে কিনা। গণিতবিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান থাকায় আমি ভদ্রলোককে ডেকে আনতে বললুম। একজন ক্ষীণাকৃতি যুবক, যাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন নয় ও দাড়ি-গোঁফও কামানো নয়, কিন্তু চোখ দুটি প্রখর উজ্জ্বল, একটা জীর্ণ নোটবই হাতে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলুম চরম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটছে। রামানুজন বললেন, একটা চাকরির আশায় তিনি কুম্ভকোনম ছেড়ে মাদ্রাজে চলে এসেছেন যাতে অবসর সময়ে এখানে ইচ্ছামতো গণিতচর্চা করতে পারেন। নোটবইটি খুলে তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি গাণিতিক ফলাফল আমাকে বোঝাতে লাগলেন। তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হল এবিষয়ে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু গণিতে আমার যা জ্ঞান তা দিয়ে বিচার করতে পারলুম না তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সত্যই কিছু সারবস্তু আছে কিনা। তাই আমি তাঁকে বললুম কয়েক দিন পরে এসে আবার দেখা করতে। রামানুজন আবার এলেন। গণিতের জটিল বিষয়ে আমার জ্ঞানের অভাব বোধহয় উপলব্ধি করে তিনি এবার তাঁর অপেক্ষাকৃত সরল কয়েকটি ফলাফল দেখালেন। গণিত বিষয়ে তাঁর এই আবিষ্কারগুলি দেখে আমি উপলব্ধি করতে পারলুম রামানুজন সত্যই একজন অনন্য গণিতপ্রতিভা। তিনি ক্রমশ তাঁর জটিলতার গাণিতিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রামানুজনের প্রতিভা সম্পর্কে আমার আর কোনো দ্বিধা রইলো না। আমি জানতে চাইলুম, আমার কাছে তিনি কি চান। রামানুজন বললেন, তিনি যৎসামান্য একটা জীবিকা চান যাতে স্বচ্ছন্দ মনে গণিত বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন। আমার মনে হল, রামানুজনের মতো একজন অনন্য গণিত-প্রতিভাকে একটা মফস্বল শহরে সামান্য এক কাজে সময় নষ্ট করতে দিলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে। আমি তাঁকে মাদ্রাজে ফিরে যেতে বললুম এবং প্রতিশ্রুতি দিলুম যতদিন না তাঁর জন্যে একটা উপযুক্ত জীবিকার ব্যবস্থা করতে পাচ্ছি ততদিন আমিই প্রতি মাসে তাঁর জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করব। তখন আশ্বস্ত মনে রামানুজন মাদ্রাজে ফিরে গেলেন।

হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছিলেন বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী লেনিন ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আলেকজাণ্ডার মিখাইলোভিচ প্রখোরভ। সম্প্রতি তিনি কলকাতা ঘুরে গেছেন।

পল্টুকে গলির মোড়ে সতর্ক পাহারা-দার করে মোতায়েন রাখা হয়েছিল।

ভালোভাবেই কর্তব্য পালন করেছে পল্টু। খেলার মাঠে ও নিয়মিত দর্শক, সেজন্য ফুটবলের গোল হলে যেভাবে লম্ফ প্রদান করতে অভ্যস্ত সেরকম দুটি লাফেই পাঁচির থেকে বাড়ীর উঠানে এসে সরবে ঘোষণা করে দিলে—"এসে পড়েছে, ও ঠাম্মা বড় রাস্তায় এসে গেছে, এবার গাড়ী গলিতে ঢুকবে।"

তার মানে সরু গলিতে বড় গাড়ীটা ঢোকবার কসরৎ শেষ হবার মধ্যেই তোমাদের অপ্রস্তুতিটুকু মেরামত করে নাও।

বাইরের বৈঠকখানার সাজসজ্জা আগেই, শেষ হয়ে গিয়েছিল। তক্তপোষের ময়লা ঢাকনাটা তুলে ফেলে তোষক পেতে ধোপার বাড়ীর পাটভাঙ্গা সাদা চাঁদর ও তাকিয়া দিয়ে জমিদারী আভিজাত্য আনার চেষ্টা করেছেন এ বাড়ীর বড়ছেলে পল্টুর বাবা মহীতোষবাবু। দুটো পুরানো স্প্রিংভাঙ্গা সোফাও আছে এ ঘরে। তারও বহুকাল পরে মিস্ত্রীর হাতের স্পর্শে নবযৌবন লাভ করেছে। দরজায় নতুন ছিটের পরদা দিয়ে নিভৃত হবার সুযোগ করাও হয়েছে। পাশের ঘরে প্রথম আলাপ আপ্যায়নের পর আহারের বন্দোবস্ত, সেইখানেই খবরদারি করছিলেন এ বাড়ীর সর্বময়ী জাঁদরেল গৃহিণী মনোরমা দেবী। একপাশে খাটকে সরিয়ে ময়লা চাঁদর বালিশের ওপর একখানা বাহারে মণিপুরী বেডকভার পাতছিলেন। ছোকরা চাকরটা ঘর মুছছিল, এর আগে একবার মুছেছে—মনোরমার পছন্দই হয়নি।

পল্টুর চিৎকার কানে আসতেই আরো শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"এই ছোঁড়া, হাত চালাতে পারছ না, এখনও বারান্দাটা বাকী পড়ে রইলো। সকাল থেকে টিকটিক করছি, খেয়ে ঘুমিয়ে কথা গেরাহ্যি করার সময় আছে বাবুর।"

আরও অনেক বকুনী চলত চাকরটার ওপর, কিন্তু এখন নেহাৎ সময় সংক্ষেপ বলে বচনপটুতায় ইস্তফা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুতে যেতেই ঘরমোছা বালতিটা পা লেগে উল্টে গেল। মোটা শরীর নিয়ে আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন মনোরমা। অন্য সময় হলে কি হত বলা যায় না, কুরু-ক্ষেত্র পর্ব আরম্ভ হত হয়ত—এখন আর চেঁচানো চলে না। কর্কশকণ্ঠ যথাসম্ভব চেপে "হতভাগা, পঞ্চাশদিন বলেছি পায়ের কাছে বালতি রাখবি না, রাখবি না—হল তো? কাজ ওমনি করলেই হয় না, চোখ কান খুলে রাখতে হয়। নাও এখন শীগ্গির জলটা থুপে তুলে নিয়ে ঘরটা শুকনো করে মুছে নাও।"

নাতনীর ময়লা ডুরে শাড়ীটা ছেড়ে চওড়া লালপাড় তাঁতের শাড়ীটা পরার জন্য মনোরমা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলেন।

জয়ন্তকে ইতিমধ্যে বাইরের ঘরে এনে বসানো হয়েছে। নতুন করে সারানো একটা সোফাতেই বসেছে জয়ন্ত, আর একটাতে পল্টু, তক্তপোশের ওপর মহীতোষবাবু নিজেই আসীন হয়েছেন।

নীলিমা মুখোপাধ্যায়

ভালবাসায় ভোলা

"অনেকদিন তো বিদেশে রইলে জয়ন্ত। চেহারা কিন্তু তোমার বিশেষ বদলায়নি। রং আরও পরিষ্কার হয়েছে বটে কিন্তু রোগা হয়ে গেছ।"

"শরীর ভাল করার চেষ্টা করতে তো ওদেশে যাইনি কাকাবাবু," একটু যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটল জয়ন্তর ঠোঁটে, "প্রতিপত্তি আর অর্থের পিছনে ছুটতে গিয়েই তো জীবনের মূল্যবান পাঁচটা বছর খরচ হয়ে গেল। ও জিনিসদুটি থাকলে তো পাঁচ বছর আগেই রক থেকে আপনাদের এই ঘরে উঠতে পারতুম।"

হেঁ হেঁ করে দেঁতো হাসি হেসে অপমানটা হজম করতে হল মহীতোষবাবুকে।

সুপর্ণা তাঁর মা মরা আদরের একমাত্র মেয়ে। শুধু তাঁর নয়, তিনভায়ের মধ্যে আর কারোরই কন্যালাভ হয়নি। সেই সুপর্ণার নীরব কঠিন মুখ পাঁচ বছর ধরে ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে আছে এই সংসারের মানুষদের দিকে।

যৌতুকের জোর না থাকলেও বিদ্যা, বুদ্ধি ও রূপের জোরে ও মেয়ে যে মস্তঘরে পড়বে এই আশাই তো সুপর্ণার যখন বার বছর বয়স হয়েছে তখন থেকেই বাবা, ঠাকুমা, দাদু, কাকারা মনে মনে পোষণ করে রেখেছিলেন।

তাই চালচুলোহীন বিধবা মায়ের ছেলে জয়ন্ত শুধু বিদ্যামাত্র মূলধন নিয়ে যখন এ বাড়ীর রকে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তার মনের প্রার্থনা নিবেদন করেছিল তখন রাগের চোটে তাকে এঁরা মেরে বসেননি এই যথেষ্ট।

"সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে ফূর্তি করার আগে বিধবা মাকে ভায়েদের সংসার থেকে উদ্ধার করে আনো—বুঝলে হে ডেঁপো ছোকরা।" মহীতোষবাবু রাগ চেপে উপদেশ দিয়েছিলেন।

মেজকাকা অনুতোষ বলেছিলেন, "সুপর্ণা তোমায় কোন দুঃখে বিয়ে করতে যাবে বাপু?"

"আজ্ঞে, আমি ভাল করেই জানি সুপর্ণার আপত্তি হবে না।"

এবার রঙ্গমঞ্চে মনোরমা দেবীর আবির্ভাব ঘটেছিল—সেই মনোরমা যাঁর মুখের বিষকে ভয় করে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই।

"ও...লব করেছেন বাবু—লব। মরি মরি—পেছনে নেই ইন্দি ভজনে গোবিন্দি। মুরোদের গলায় দড়ি দিয়ে ছোঁড়া চাঁদ ধরতে গেছে। আমার লক্ষ্মীপ্রতিমার মত নাতনীকে তোমার মত অগামড়ার হাতে দেব কেন হ্যা? ও মেয়ে রাজার ঘর আলো করবে।"

কথা জোগায়নি জয়ন্তর মুখে, উত্তরে কিছু বলতে পারেনি সে,—থরথর করে কেঁপেছিল শুধু। আর কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা 'লক্ষ্মীপ্রতিমে'টিও অবরুদ্ধ কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

বাস, নাটকের সেইখানেই শেষ। 'আস্পদ্দাওলা' ছেলেটা সেই যে চলে গেল তো গেলই, কেউ তাকে আর দেখতে পেল না। আর যার রাজরাণী হবার কথা সে মুখের হাসি মুছে ফেলে মনমরা চেহারার একটা নীরব চলন্ত পুতুল হয়ে খালি নিজের পড়াশুনা নিয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। তার সাজে শোভা রইল না, চোখের কাল তারায় কোনও ভাষা রইল না—মুখের রেখা ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল।

রাজকুমারের সন্ধান আনতে অভিভাবকরা ত্রুটি করেননি একটুও, কিন্তু ফুলের মত কোমল মেয়েটা নিজের 'বিয়ে করব না' সংকল্পে কি করে যে এত কঠিন হতে পারল তার কোনও হদিশ করতে পারলেন না বাপ কাকারা। কোনও পাত্রপক্ষের সামনে ওকে উপস্থিত করা গেল না। অনুনয়, বিনয়, আদর অবশেষে তিরস্কার সব কিছুই ব্যর্থ হল।

যে ঠাম্মার চিৎকারে ঝড়ীতে কাক, চিল বসতে পায় না তিনি পর্যন্ত কাঁদ কাঁদ মুখে বললেন, "সুপু, লক্ষ্মী সোনা দিদি আমার, নিজের পায়ে নিজে এমন করে কুড়ুল মারিসনি ভাই। আমার গঙ্গাজলের নাতীকে এ বাড়ীতে আসতে বলেছি তার সামনে একবার বেরো। বিলেত থেকে মস্ত পাশ করে বড় চাকরী করছে—হীরের টুকরো ছেলে। চেহারাও রাজপুত্রের মত।"

"আমার ওতে লোভ নেই ঠাম্মা। আমি তো চাকরী করে স্বাধীনভাবে থাকবো বলেই দিয়েছি তোমায়। তোমার গঙ্গাজলের নাতীর সঙ্গে তুমিই সাগরের জল পাতাও গে।"

শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে হয়েছে। ক্রমে ক্রমে সংসারের পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক। সুপর্ণার উকিল দাদু পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়েছেন, বাবা মহীতোষবাবুর পেন্সন হয়ে গেছে। আয় কমে গিয়ে মধ্যবিত্ত থেকে নীচের দিকে নেমেছে সংসার। সুপর্ণা একটা স্কুলে চাকরী জুটিয়েছে। এবার অর্ডিনারী বি-এস-সি পাশ ভাই পল্টু যদি কিছু করতে পারে তো মহীতোষবাবু একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন। অন্য দুই ভায়ের কাছে পোজিশান ক্রমেই খারাপ হচ্ছে তাঁর।

ঠিক এমন সময় চিঠিখানা পল্টুর নামেই এল। একটা নামকরা ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার জে রায়চৌধুরী পল্টু অর্থাৎ মনতোষ রায়কে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের অফিসে চারশো টাকা মাইনের একটি চাকরীর জন্য লোক খোঁজা হচ্ছে, যদি ইচ্ছা করেন তো মনতোষ রায় অমুক তারিখে ইনটারভিউতে উপস্থিত হতে পারেন।

এ চাকরীর জন্য পল্টু আবার কবে দরখাস্ত করল? আকাশ থেকে চাঁদ পড়া কি একেই বলে! এ যেন দরজা ঠেলে মা-লক্ষ্মী ঘরে ঢুকতে চাইছেন।

নির্দিষ্ট দিনে বন্ধুর কাছে স্যুট ধার করে অঙ্গে চাপিয়ে কম্পিতবক্ষে রওনা হল পল্টু। ঠাম্মা সেদিন খিটখিটানি থামিয়ে সারাক্ষণ ঠাকুরঘরে মাথা কুটতে লাগলেন। এর পরে বীরদর্পে শুধু যে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নিয়ে বাড়ী ঢুকল পল্টু তা নয়—তার সঙ্গে যে সংবাদ বহন করে নিয়ে এল তা শুনে সকলে বাক্যহারা হয়ে গেলেন। জে রায়চৌধুরী আর কেউ নয়—জয়ন্ত।

আশ্চর্য! বেঁটে বেগুনগাছ একেবারে তালগাছ হয়ে গেছে। আর অপমানের প্রতিশোধ কি চাকরী দেওয়া। কি যে করবেন সবাই কিছুই ভেবে পেলেন না। মেয়ের মুখের দিকে বারে বারে চাইতে লাগলেন—সে মুখ অপরিবর্তিত।

শুধু সেদিন রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সুপর্ণা ভাইকে কাছে ডেকে চাপা তীব্রস্বরে বলল, 'তোর লজ্জা করছে না পল্টু? ওর চাকর হয়ে কাজ করতে অপমান হবে না তোর, মনের গ্লানি কাটাতে পারবি? সুযোগ পেয়ে ও যদি তোকে একদিন কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়?'

বকবাজ, চখোড়, বাচাল ছেলে পল্টু তখন ভড়কে গিয়ে চট করে উত্তর দিতে পারেনি।

কিন্তু না—এতটুকুও খারাপ ব্যবহার করেনি জয়ন্ত—ভদ্র সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করেছে মহীতোষবাবুর ছেলে পল্টুর সঙ্গে। আর আশ্চর্য, একদিনের জন্যে সুপর্ণার প্রসঙ্গ তোলেনি। অথচ পল্টু জেনেছে ওর মা মারা গেছেন, ও এখনও বিয়ে করেনি, একটা ফ্ল্যাট নিয়ে একেবারে একলা আছে।

তারপর একটু একটু করে পল্টুই ঘনিষ্টতা করেছে। তিনমাস পরে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে সাদরে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করে আনতে পেরেছে। পাঁচ বছর আগে রাজরাণী করার আগ্রহে যে মেয়েকে বৈরাগী করেছিল তাকে এবার নতুন সম্ভাবনায় তার আকাঙ্ক্ষিত জগতে প্রতিষ্ঠাতা দেখার আগ্রহে দুলছে সুপর্ণার অভিভাবকবৃন্দের মন। মেয়ের সহিষ্ণু প্রতীক্ষা দীর্ঘ অন্ধকারের অধ্যায় পার হয়ে এবার বুঝি আলোর জগতে পোঁছল।

ঠাম্মা এসে আদর করে নাতনীর হাত ধরলেন, "আমাদের হার হয়েছে সুপু, তোরই জিত। পার্বতীর মত তোর তপস্যার জোর। নে, এবার একখানা ভাল কাপড় পরে মুখটা পরিষ্কার করে ফ্যাল। কতদিন পরে মনের মানুষ আসছে তোর।'

কিন্তু অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়েটা এতটুকুও সজ্জা করল না মুখে এতটুকু হাসি ফোটাল না। তেমনি কঠিন হয়ে বসে রইল।

অগত্যা মনোরমাই আগে দর্শন দিলেন। লালপাড় তাঁতের শাড়ী পরে মুখে মোলায়েম হাসি টেনে বাইরের ঘরে ঢুকলেন। বেশী ভূমিকা করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, গোড়াতেই স্বীকার করলেন—'আমাদের সব দোষ ক্ষমা করেছ তো জয়ন্ত? তোমার জিনিস তুমি বাহুবলে উদ্ধার করে নাও ভাই। তোমার বাহাদুরীকে হাজার সেলাম।'

'কথাটা বাহুবল হবে না ঠাম্মা, অর্থবল বলুন,' হাসিমুখে উঠে এসে প্রণাম করল জয়ন্ত, 'আপনার নাতনীকে পেতে হলে অর্থবলে বলীয়ান হওয়া যে একান্ত দরকার তা আগে বুঝতে পারিনি।'

যে ব্যক্তি এবাড়ীর বেকার ছেলেকে চাকরী দিয়ে সংসারকে সচ্ছল করেছে, একমাত্র মেয়েকে সুখ, সৌভাগ্য শান্তি দিতে চলেছে তার সব খোঁচাই সহ্য করতে হয়। মনোরমা দেবীর কৃতার্থ হওয়া বিগলিত হাসিমুখ দেখে কে বলবে যে ইনি লোককে দশকথা শুনিয়ে দেওয়ার মত সুখ আর কিছুতে পান না।

'সব গুণের আগে আমার নাতনীকে গুণে করেছ এই তো তোমার পরম গুণ ভাই। আমাদেরই চোখের দোষ হয়েছিল তাই হীরে চিনতে পারিনি। নাও, অনেকক্ষণ এসেছ, একটু চা খাও এবার। খাওয়ার তো দেরী আছে।'

নাতনীকে চা দিয়ে এঘরে হাজির করার জন্য ছটফট করছিলেন মনোরমা। তাঁর চোখের ইঙ্গিতে মহীতোষবাবু, পল্টু সব চটপট উধাও হয়ে গেল। কিন্তু না, চা নিয়ে এল না সুপর্ণা, কারোর অনুরোধে সলজ্জ কম্পিতপদে ঢুকল না ঘরে। সোজা এসে

...যদি তোকে একদিন কুকুরের মত তাড়িয়ে দেয়?

বসল জয়ন্তর মুখোমুখি, এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখে চোখে, জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা।

'কেমন আছ পর্ণা?' পুরোনো নামে ডাকতে জয়ন্তর গলা যেন কেঁপে গেল।

'তোমার মত ভাল নয় বুঝতেই তো পারছ জয়ন্ত। দূরে থেকে টেক্কা হতে পারিনি। ঊর্ধ্বগতি নয়, অধোগতি হয়েছে। অনেক যোগ্যতা অর্জন করে তুমি তো বিচারকের আসনে বসেছ, আর আমরা আছি আসামীর কাঠগড়ায়। ভাল আছি কেমন করে বলব।'

দপদপে মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল জয়ন্ত। ধীরে বলল, বাঃ সুন্দর। মনে কেমন আছ জানি না সুপর্ণা আত্মাভিমানের আলোয় মুখ কিন্তু তোমার চমৎকার উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তুমি যখন আগে অভিমান করতে, নাকের পাটা ফুলত, ঠোঁট ফুলত, চোখভরে জল আসত। সেই ছলছলে টসটসে মুখ ধ্যান করেছি পাঁচ বছর ধরে। বেশী বদলাওনি তুমি, খালি জলের বদলে আগুন এসেছে তোমার মুখে চোখে, এও ভারী সুন্দর লাগছে আমার, অনেকদিন পরে কাছাকাছি এসে তোমায় নতুনভাবে দেখছি। আজ পল্টুর নিমন্ত্রণ রক্ষা সার্থক হয়েছে।'

'কিন্তু তুমি কেন এলে জয়ন্ত? আলো হয়ে পতঙ্গ মনে করলে এই দুঃখী সংসারকে? পাঁচ বছর আগে তোমার অপমানের জ্বালা আমার সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিয়াছিল, আজ আবার দাতার ছদ্মবেশে তুমি যে প্রতিশোধ নিতে এলে তা আমি কেমন করে সহ্য করব। মনে হচ্ছে বাবা, ঠাম্মা, পল্টু সবাই তোমার অবজ্ঞার কশাঘাত পিঠ পেতে নেবার জন্য সার দিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছে, যেমন করে তুমি রকে দাঁড়িয়েছিলে পাঁচ বছর আগে। আমি সেদিন তোমার প্রিয়া হয়ে যে দাহতে পুড়েছি, আজ আবার মেয়ে হয়ে সেই যন্ত্রণা আমায় নতুন করে বিঁধছে। আমি কি করব জয়ন্ত? আমি তোমাকেও ভুলতে পারি না, আমার প্রিয় পরিজনকেও অপমান, অসম্মানের পাঁকে ডুবিয়ে দিতে পারছি না। আমার কর্তব্য তুমিই বলে দাও।' চোখ ছাপিয়ে জল পড়ল সুপর্ণার। আস্তে উঠে পাশে এল জয়ন্ত।

'অস্বীকার করি না সুপর্ণা, পাঁচ বছর ধরে ভেবেছি কি করে প্রতিশোধ নেব তাদের ওপর যারা তোমাকে আমার কাছে আসতে দিল না। ভেবেছি শুধু তোমাকেই ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষান্ত হবো না। টুকরো করে এদের অহঙ্কারকে ধুলোয় মিশিয়ে দেব। এদের ছেলেকে নিজের কর্মচারী করেছি, এরপর জামাই হয়ে এ সংসারকে আমার অন্নদাস করব। এদের প্রতিটি মুখের গ্রাস যেন আমার দয়ার দান হয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কি হবে জিতে যদি তোমার প্রসন্নমুখ না দেখলাম। আমার সাধনার সিদ্ধি তো তুমিই—তুমিই আমার বিজয় বৈজয়ন্তী—তুমি আমায় আদেশ কর আমি ওই বাইরের রকে দাঁড়িয়ে মহীতোষবাবুর পায়ে ধরে তোমাকে ভিক্ষা করে নিয়ে যাই। রাণীর মত সিংহাসনে বসার জন্য তোমার জন্ম। তোমায় দয়া দেখিয়ে নিয়ে যাব এত কি সাধ্য আমার।' থরথর করে কাঁপতে লাগল জয়ন্তর কণ্ঠস্বর। আর সুপর্ণা! অহঙ্কারী, জেদী, একগুঁয়ে মেয়েটা জয়ন্তর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে রইল তো রইলই দুহাত দিয়ে তাকে তুলতে পারল না জয়ন্ত।

জানোয়ার-নামা

রথীন্দ্রনাথ রায়

সতেরশো অষ্টাশী খ্রীষ্টাব্দ। ফকির খয়েরুদ্দিন এক কিসসা লিখে চলেছেন—সে কিসসা যেমন মর্মান্তিক তেমনি বীভৎস। আওরংজীবের মৃত্যুর পর থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরেছে—মাটি কাঁপছে। বোধহয় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। খয়েরুদ্দিন আর ভাবতে পারেন না। হাত কাঁপে, চোখের কোণে জমে ওঠে জল। লালকিল্লার ছবি ঝাপসা হয়ে ওঠে। কলম থেমে যায়। চোখের জল মুছে আবার লিখে চলেন তাঁর স্মৃতি-কাহিনী। হাজার পৃষ্ঠার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে সেই পাণ্ডুলিপি।

তৈমুর বংশের চরমতম লাঞ্ছনার দিন-গুলি খয়েরুদ্দিনের স্মৃতিকাহিনীতে রূপ পায়। নির্মমতর দিন থেকে নির্মমতম দিনের ঘটনাগুলি অভ্রান্ত রেখায় ফুটে ওঠে। নসীবকে ধিক্কার দেয় খয়েরুদ্দিন। পোড়া চোখে তার এসবও দেখতে হচ্ছে! দোজখের দিকে চলেছে বাদশা শাজাহানের তৈরি-করা শাহজানাবাদ। লালকিল্লা তাজা খুনে লাল হয়ে যাচ্ছে, চাঁদনী চকের জৌলুস নিভে আসছে। বাদশাহী হারেমের ঔরতের ইজ্জৎ ধুলোয় লুটোচ্ছে! অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাস পড়ে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট আন্ডারসন ব্রাদার্সের মুন্সী ফকির খয়েরুদ্দিনের। মাঝে মাঝে তাঁর মুঘলিয়া দোস্ত বুড়ো তমেজুদ্দিন আসে। খয়েরুদ্দিন তাঁর কিসসা শোনান, আর দুই দোস্তে চোখের জল মোছেন।

খয়েরুদ্দিন বলেন— মানুষের চরিত্রই হলো নসীব। তামাম দুনিয়ারই যখন এই হাল, তখন তৈমুরশাহী বংশেও এর ব্যতিক্রম হবে কেন?

হ্যাঁ, খয়েরুদ্দিনের কথাই ঠিক—নসীবের খেল আসমানের আড়াল থেকে হয় না, চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিই রূপান্তরিত হয় নির্মম নিয়তিরূপে। বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের চরিত্র ছিল যেমন দুর্বল, তেমনি অসংগতিতে ভরা। অথচ বিচার-বুদ্ধির কোনো অভাব ছিল না, অভাব ছিল তাকে কর্মরূপ দেওয়ার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তার। জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছর কেটেছে নিতান্ত অবজ্ঞাত অবস্থায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে তাঁর আফিমের প্রতি আসক্তি—এই কর্মনাশা নেশায় পঙ্গু হয়ে পড়ে তাঁর মানসিক শক্তি। কর্মশক্তিকে অবসন্ন করলেও আফিম তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। নিয়মিত কোরানপাঠ, শাস্ত্রচর্চা ও গজল রচনা চলত। দান-খয়রাতেও ছিলেন মুক্ত-হস্ত। অবশ্য বুড়ো বয়সেও হারেমের বৈচিত্র্য বেড়েই চলেছিল। খয়েরুদ্দিন বলতেন, হিন্দুস্তানের সর্বনাশ হলো ঔরতে আর আফিমে।

বাদশা যতই দুর্বল হোন না কেন, একথা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হয়নি যে, একমাত্র মহাদজী সিন্ধিয়াই তাঁর বুদ্ধি ও বাহুবল দিয়ে এই ঘুনধরা সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। সিন্ধিয়া সদয় থাকলেই শেষ ক'দিন তিনি শান্তিতে কাটাতে পারবেন। ইংরেজ রেসিডেন্টরাও বাদশাহের এই পক্ষপাতিত্বের কথা জানতেন। আবার অযোধ্যার নবাবের মতো ইংরেজদের হাতের পুতুল হওয়ারও ইচ্ছা ছিল না তাঁর। এলাহাবাদের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু বুঝেও কোনো লাভ হয়নি। খয়েরুদ্দিন বলেন, বাদশার কানে মন্ত্র দিয়েছিল দুই শয়তান—নাজীর মনজুর আলি খোজা ও ফুলুকিমণ্ডীর রামরতন মুদী। খয়েরুদ্দিন মিথ্যা বলেনি। মহা-দজীর অনুপস্থিতির সুযোগে মনজুর আলি ও রামরতনের চক্রান্তই বাদশাহী ইজ্জৎ ভূলুণ্ঠিত করেছিল।

কিন্তু খোজা মনজুর আলি ও রামরতন মুদীর চেয়েও বড়ো শত্রু ছিল বাদশার পরিবারের মধ্যে। এই সব জ্ঞাতিশত্রুরা বাদশার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করছিল। এরজন্য বাদশার দায়িত্বও কম ছিল না। মহম্মদ শাহের বংশধরদের সিংহাসনচ্যুত করে দ্বিতীয় আলমগীরের বংশধর মসনদ অধিকার করেছিলেন। ভূতপূর্ব বাদশা মহম্মদ শাহের শেষ উত্তরাধিকারীকে অন্ধ করে হত্যা করা হয়ে-ছিল—তাঁদের পরিজনকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল বাদশাহী বন্দীশালা 'শলাতিন'-এ! দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে তাঁদের বন্দী-জীবনের দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল।

খয়েরুদ্দিন বলেছিলেন— শাহাজাদা আকবর নতুন বাদশা বিদর বখতের কাছে তাঁর পরিবারের মোটা-ভাত-কাপড়ের জন্য করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন। বিদর বখত এর স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন, 'হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য আমারই পূর্বপুরুষের। গত তিরিশ বছর তোমার বাবা ছিলেন সম্রাট। তখন আমাদেরও কি কম দুঃখ দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল? কিন্তু আমরা তা নীরবে সহ্য করেছি। চাকা ঘুরেছে—এবার তামাম হিন্দুস্তানের মালিক আমিই।'—

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাহ আলমের ধন-সঞ্চয় স্পৃহা যেমন বেড়ে চলল, তেমনি বাড়লো বগর্পণ্য। লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার ফলে বাংলা মুলুক থেকে প্রচুর অর্থাগম হতে লাগলো, তাছাড়া পাথরগড়ের ও ঘউসগড়ের লুণ্ঠিত সম্পদ থেকেও তাঁর দৌলতখানার শ্রীবৃদ্ধি হলো। অথচ তাঁর বন্দী পরিজনের কাছে এর এক কানাকড়িও পৌঁছল না। এমন কি নিত্য-ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যও সবসময়ে ঠিকমতো পৌঁছায়নি। খয়েরুদ্দিনের ভাষায় এই সব রাজবন্দীরা চিড়িয়াখানার ক্ষুধিত জানো-য়ারের মতো দিন কাটাতেন। তাঁরা যে কোনো রাজদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দিতে রাজি ছিলেন। সিংহাসনের বিনিময়ে যে কোনো মূল্য দিতেও ছিলেন তাঁরা সম্মত। শলাতিনের জেনানা-মহলে এই অসন্তোষের তীব্রতর রূপ দেখা দিয়েছিল। বাদশা মহম্মদ শাহের প্রধান বেগম সর্বজন-সম্মানিতা মালিক-ই-জমানি লালকিল্লার বাইরে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে বাস করতেন। তিনি তাঁর সপত্নী-পুত্র আহম্মদ শাহের পক্ষ সমর্থন করতেন। তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি যে, শাহ আলমের পিতা আহ্‌মদ শাহের চক্ষু উৎপাটিত করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন। মালিক-ই-জমানির এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন মহম্মদ শাহের আর এক বেগম সাহিবা মহল। সাহিবা মহলের মেয়ে হজরত মহলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল সুবিখ্যাত আহম্মদ শাহ্ আবদালির।

চারিত্রিক দুর্বলতা ও পারিবারিক কলহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ। ঘউসগড়ের রোহিলা সর্দার গোলাম কাদের ও মুঘলিয়া নেতা ইসমাইল বেগ হমদানির সংযুক্ত আক্রমণকে সম্পূর্ণ-ভাবে দমন করেছিলেন সিন্ধিয়া। কিন্তু নানাকারণে মহাদজী সিন্ধিয়া বিব্রত ছিলেন। এর মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটও ছিল অন্যতম কারণ। দক্ষিণী ফৌজ দিল্লী যেতে রাজি হয়নি, তাদের অনেক দিনের বেতন বাকি পড়েছিল। তাছাড়া পুণার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও তেমন সাড়া মেলেনি। আগ্রা যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের পর গোলাম বগদের সমস্ত নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে সিন্ধিয়ার সেনানায়ক রাণা খাঁর সম্মুখে এক প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। রাণা খাঁকে মথুরা গিয়ে নতুন নৌকো সংগ্রহ করে দোয়াব পার হতে হয়েছিল। সম্মুখে প্রবল বর্ষা—প্রকৃতির এই বিরূপতার বিরুদ্ধে স্বভাবতই তাঁর পদক্ষেপ হয়েছিল বিলম্বিত।

—ঠিক এই সুযোগ নিয়ে রোহিলা শয়তান গোলাম আলি দিল্লী শহরের সর্বেসর্বা হয়ে বসেছিল। গোলামের গোলাম হয়েছিল বাদশার বাদশা। এই আড়াই মাসে গোটা দিল্লী শহর হয়ে উঠে-ছিল দোজখ—চোখে না দেখলে তা অনুমান করা যায় না। নাদিরশাহী অত্যাচারে দিল্লীর রাস্তায় যখন খুনের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, তখনো এমন দুরবস্থা ঘটেনি।— মুন্সী খয়েরুদ্দিন একদিন বল-ছিলেন তমেজুদ্দিনকে।

●

গভীর রাত্রি। দিল্লীর অনতিদূরে রোহিলা সর্দার গোলাম বগদেরের ছাউনি পড়েছে। তাঁবুর বাইরে তিনি অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। তাঁবুর আলো এক-একবার তাঁর মুখে এসে পড়ছিল। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে ডান হাত দিয়ে দাড়ি মুচড়ে নিচ্ছিলেন। সামনেই ছায়া পড়ল—একজন রোহিলা ফৌজের সঙ্গে এলেন নাজীর মনজুর আলি ও রামরতন মুদী।

—আসুন নাজীর সাহেব, আসুন শেঠজী—আপনাদের জন্যেই আমি তিন ঘড়ি নাগাদ শুধু পায়চারি করেই হন্দ হচ্ছি।—

—আসতে একটু দেরিই হলো। উপায় ছিল না। কিন্তু সবুরে মেওয়া ফলে। এবার মেওয়া যেমন-তেমন নয়, একেবারে বেগম-মহলের। চলুন তাঁবুর ভেতর যাওয়া যাক। বাইরে থেকে কথা বলা নিরাপদ নয়।— মনজুর আলির নিম্নকণ্ঠের আওয়াজে সতর্কতার ইঙ্গিত।

রোহিলা সর্দারের তাঁবুতে প্রবেশ করার পর আলোতে তিনজনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। গোলাম কাদেরের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না—চেহারায় আফগান রুক্ষতা, লালচে দাড়ি, চোখের তারা কটা—নীচে চরিত্রহীনতার মসিচিহ্ন।

—কী খবর জনাব আলি!—

—বহুৎ জরুরি খবর। সবচেয়ে জরুরি খবর আছে মালিক-ই-জমানির। তিনি আপনাকে বারো লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। বেগম সাহেবা বলে পাঠিয়েছেন, তার বদলে বিদর বখ্‌তকে বাদশাহী তক্‌তে বসাতে হবে। এর পেছনে বেগম সাহিবা মহলও আছেন।— মনজুর আলি বলেন।

—আলবৎ! অপদার্থ শাহ্‌ আলমকে সরিয়ে বিদর বখ্‌তকেই বসানোই সমীচীন। হিন্দুস্তানের বাদশা ঔরং আফিম আর গজল নিয়েই ব্যস্ত।—

—আর একটা বাজে লোক জুটেছে ঐ সৈয়দ ইন্‌শা আল্লা। লোকটা নাকি গজল লেখে। সব সময় বাদশার কাছে বাংলা মুলুকের ঐ বেওকুফকে বসে থাকতে দেখি।

—আসল কথা হলো, বাদশার বিন্দুমাত্র মনোবল নেই, নিজে থেকে কোনো কাজের ঝুঁকি নিতে পারেন না। তাই কথায় কথায় সিন্ধিয়ার নাম।—

গোলাম কাদেরের কথায় খোজা মনজুর আলি জ্বলে উঠলেন, ওই মারাঠী নেতা তাঁর দুচোখের বিষ। সরকারের ওপর মারাঠী নিয়ন্ত্রণ সরানোর জন্য তিনি ক্ষমতালিপ্সু উদ্ধত আফগানকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান। সিন্ধিয়ার নাম শুনেই মনজুর আলি উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন—ও তো সামান্য পাটেল ছিল, পেশোয়া সরকারের খিদমদগার। আর এখন হয়েছে বাদশার বাদশা। শাহ্‌ আলম তো ওর নোকর। বুরবক গিধরড়।—

দুজনের মেজাজই চড়ছে। মাঝে মাঝে শরাব চলছে। সিন্ধিয়ার ওপর গোলাম কাদেরেরও রাগ কম নয়। প্রায় এগার বছর আগের রোহিলা দুর্গ ঘউসগড়ের পতনের অপমান ভুলতে পারেননি তিনি। বাদশাহী ফৌজের বহুমুখী আক্রমণে সেদিন ঘউসগড়ের সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছিল। গোলাম কাদেরের পিতা জাবিত খাঁ পরিবার ও দুর্গ ফেলে শিখদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুর্গের নারী ও শিশুদের বন্দী করে আগ্রায় পাঠানো হয়। রোহিলাদের ইজ্জৎ সেদিন ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়েছিল। গোলাম কাদেরকেও বন্দী করা হয়েছিল। জীবনের এই চরম লাঞ্ছনার দিনে খোজা মনজুর আলিই তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

রামরতন কিন্তু এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। তার বিশাল মেদবহুল দেহ ও বিরাট মাংসল মুখে দুটো ছোট ছোট চোখ মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। সামান্য মুদিখানার মালিক—লোটা-কম্বল নিয়ে ফুলকিমণ্ডীতে খুড়তুতো ভাই রামলগিনের ডেরায় উঠেছিল। সেও আজ বিশ বছর আগের কথা। নাজীর মনজুর আলির ডান হাত হওয়ার পর সে এখন তামাম শাজাহানাবাদের শেঠজী। রাজধানীর এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে দু পয়সা কামাই করবে, এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার ছিল না।

নাজীর সাহেব আর রামরতন বিদায় নিল। বিদায়ের সময় রামরতন তার হাতের ছোট বাক্স গোলাম কাদেরের হাতে দিয়ে বলল—হুজুর, মালিক-ই-জমানির এই ইনাম। গোলামের কথা যেন মনে থাকে।

—শেঠজী, আজ থেকে আপনি আমার দোস্ত।— গোলাম কাদের খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে রামরতনকে আলিঙ্গন করেন। শেঠজীর মাংসল মুখে ছোট ছোট দুটো চোখ নতুন শিকারের সন্ধান পেয়ে চকচক করে ওঠে।

শাহ্‌ আলমের কানে তখনো নাজীর ও রোহিলা সর্দারের চক্রান্তের কথা এসে পৌঁছয়নি। বাদশার এখন কাব্যচর্চার অবকাশ। তাঁর পাশেই বসে আছেন মীর্জা মহম্মদ রফিক সৌদা ও সৈয়দ ইন্‌শা আল্লা খান। বাদ্‌শা স্বরচিত গজলে 'আফ্‌তাব' নাম নিয়েছিলেন। তিনজনের মুসায়রা খুব জমে উঠেছে। পূর্বদিকে যমুনার জলে সূর্যাস্তের রং। ধীরে ধীরে সেই রং কালো হয়ে আসে। বাদ্‌শা ভাবমুগ্ধ হয়ে স্বরচিত গজল আবৃত্তি করেন—

দুর্দিনে আফ্‌তাব যদি অন্ধকারে ছায়।
সুদিনে প্রকাশ হবে আল্লার কৃপায়।।

বাদশার আবৃত্তি শেষ না হতেই মনজুর আলি এসে এক জরুরী চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি পড়েই তাঁর মুখ গম্ভীর হলো। বলাবাহুল্য সেদিনের সভা ভঙ্গ হলো।

●

খবর এসেছে রোহিলা সর্দার তাঁর ফৌজ নিয়ে অপেক্ষা করছেন যমুনার পূর্ব পারে। এদিকে সিন্ধিয়ার দুই প্রতিনিধি শাহ নিজামুদ্দিন ও লাদোজী দেশমুখের কর্তৃত্ব ক্রমাগত শিথিল হয়ে পড়ছে— বেতনহীন সৈন্যদলের নিত্য বিক্ষোভ জনসাধারণের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। গোলাম কাদের যখন শাহ্‌ দরায় হাজির হলেন, তখন নিজামুদ্দিনের টনক নড়লো। রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা না করেই যমুনা পার হয়ে সৈন্যদলকে আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ফরাসী সেনানায়ক পরিচালিত রোহিলা ফৌজের হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় হলো। বেগতিক দেখে বাদশা তাঁর বান্দা তর্মাকনকে পাঠালেন গোলাম কাদেরের কাছে। এই খবর শুনে সিন্ধিয়ার দুই প্রতিনিধি দিল্লী থেকে সেই রাত্রিতেই পালালেন। অরাজক দিল্লীর জনতা ও নেতৃত্বহীন সৈন্যদলের হাতে নিজামুদ্দিন ও দেশমুখের যাবতীয় ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো।

দিল্লী ফটক ও তুর্কমান ফটকের মাঝখানে শাহ নিজামুদ্দিনের উদ্যানবেষ্টিত বিরাট হাবেলি দখল করে গোলাম কাদেরের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। মনজুর আলিকে একদিন স্পষ্টই বললেন—কই নাজীর সাহেব, বাদশার সঙ্গে ফয়শালা কবে হচ্ছে?

—বাদশাকে আমি জানিয়েছি। কাল দুজনে যাব।—

—শুধু গেলেই হবে না। আমার আগের দুপুরুষ ছিলেন মীর বকশি। ও পদ আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য।—

নাজীর কিছু চিন্তিত হয়ে বললেন—আচ্ছা।

নাজীরের মধ্যস্থতায় বাদশার সঙ্গে রোহিলা সর্দারের শলা-পরামর্শ হলো। গোলাম কাদের পেলেন মীর বকশির পদ, তার সঙ্গে পেলেন জমকালো বাদশাহী উপাধি— আমীর-উল-উমরা রৌশনুদ্দৌলা বাহাদুর।

মুন্সি খয়েরুদ্দিন বলেছেন—সেদিন গোলাম কাদের অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন—চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছিল মাতাল লুচ্চার চোখ। আর হিন্দুস্তানের অসহায় বাদশার হাত কাঁপছিল।—

—নতুন মীর বকশি কী নজরানা দিলেন? জিজ্ঞেস করলেন তমেজুদ্দিন।

—এক মোহরও নয়।— বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন খয়েরুদ্দিন।

—ইসমাইল বেগ গোলাম কাদেরের সঙ্গে যোগ দিলেন কেমন করে?

—ইসমাইল বেগ আগ্রার কাছে শোচনীয় পরাজয়ের পর এক নেংটি পরে রোহিলা সর্দারের তাঁবুতে দেখা করেন। তারপর থেকেই আফগান-মুঘলিয়া মহব্বৎ জমে ওঠে। লালকেল্লার দেয়াল দুর্ভেদ্য, তার ওপর লাল পল্টন তো ছিলই। কিন্তু থাকলে কি হবে নাজীরের বিশ্বাসঘাতকতায় সর্বনাশ হলো। বাদশাকে সে বুঝতে দেয়নি, অথচ তলে তলে রোহিলা সর্দারের সঙ্গে যোগসাজস রেখেছে। আসল কথা কি জানো—সবই নসিবের খেল্‌।—

ক্ষমতা হাতে পেয়েই রোহিলা সর্দারের লোভ, লালসা ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। গোলাম কাদেরের পিতামহ নাজিবুদ্দৌলা দশ বছর ছিলেন মীর বকশি। পিতা জাবিত খান শাহ আলমের বিরাগভাজন হন। ফলে বাদশাহী ফৌজের হাতে রোহিলা দুর্গ পাথরগড় ও ঘউসগড় বিধ্বস্ত হয়। এবার সুযোগ এসেছে জাবিত খাঁয়ের পুত্র গোলাম কাদেরের। নিজামুদ্দিনের হাবেলিতে বসে ভাবছিলেন গোলাম কাদের—হ্যাঁ, তৈমুর বংশের ওপর প্রতিহিংসা নিতে হবে, দুনিয়ার সেরা প্রতিহিংসা! গতকাল আফগান ফৌজের সামনে যে কথা বলেছিলেন, সেকথা আবার আজ মনে হলো। এ হলো আল্লার প্রত্যাদেশ—তিনি হলেন সেই পরমশক্তিশালী খোদাতালার চাবুক—'কহ্‌র-ই-খুদা'। হ্যাঁ তৈমুর বংশের ইজ্জৎ ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। মদ্যপান ও উত্তেজনায় গোলাম কাদেরের সে রাতে ভালো ঘুম হলো না।

গোলাম কাদের ও ইসমাইল বেগ কোরান স্পর্শ করে শাহ্‌ আলমের আনুগত্য স্বীকার করলেন। [illegible]

দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাদশাহ ওদের বাধা দিতে নিষেধ করলেন। দু' হাজার আফগান প্রাসাদ দখল করে বাদশাহী ফৌজকে বিনা বাধায় তাড়িয়ে দিল। গোলাম কাদের বাদশাহকে সেইদিনই চোখ রাঙিয়ে ইতর ভাষায় গালাগাল করেছিলেন। বাদশাহ আর তাঁর পুত্রগণকে সলাতিনে বন্দী করা হয়েছিল। গোলাম কাদের ও ইসমাইল বেগ দেওয়ান-ই-খাস ও হায়াৎ বক্স বাগিচা দখল করে সেদিন সারারাত বেপরোয়া স্ফূর্তি চালিয়েছিলেন। খয়েরুদ্দিন বলেছেন—তাদের হৈ-হুল্লোড় ও কর্ণবিদারী চিৎকারে বাদশাহী হারেমের বুকফাটা কান্নার শব্দ ডুবে গিয়েছিল। পরের দিন সকালে প্রাক্তন সম্রাট আহম্মদ শাহের পুত্র বিদর বখ্‌তকে দেওয়ান-ই-খাসে সিংহাসনে বসানো হলো। এ তো শয়তানীর আরম্ভ মাত্র, এর পরের আড়াই মাসের দিল্লীনামাকে জানোয়ারনামা বললেও বেশি বলা হয় না।— মুঘলিয়া দোস্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিলেন মুন্সি খয়েরুদ্দিন।

●

বাদশাহী বন্দীশালা—সলাতিন। বাদশাহী দৌলতখানার অপরিমিত সঞ্চয়ের কথা কে না জানে। হতভাগ্য বাদশাকে কড়া রোদে বসিয়ে রাখা হয়েছে—সারাদিন খাওয়া হয়নি, পোশাক পরিবর্তন করা হয়নি—ঘামে ভিজে উঠেছে ময়লা পোশাক। আফগান বয়সাদের নিয়ে তাঁকে ঘিরে বসে আছেন গোলাম কাদের। কখনো ভয় দেখাচ্ছেন, কখনো টিপ্পনী কাটছেন। একবার বাদশার গলা জড়িয়ে ধরে তামাকের ধোঁয়া বাদশার মুখে নিক্ষেপ করেন রোহিলা সর্দার গোলাম কাদের। বয়সারা সব হেসে তারিফ করে—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!

শাহ্ আলমের পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা লাগিয়ে গোলাম কাদের বলেন—

—চুপ করে আছিস যে বুড়ো শয়তান, কথা বল। তোর বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষ যে তামাম দুনিয়া লুট করে দৌলতখানা বানিয়েছে, সেগুলো কোথায় রেখেছিস হারামজাদা?

—আমার যা কিছু ছিল সবই তো খাজাঞ্চীখানা থেকেই লুট করেছ। আমি কি পেটের মধ্যে রেখেছি।— তিক্ততার সঙ্গে জবাব দেন শাহ্ আলম।

—প্রয়োজন হলে তোর পেট চিরেও দেখতে হতে পারে।— দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেন গোলাম কাদের।

উদ্ধত রোহিলা যুবক চিৎকার করে বলে ওঠেন—তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে আমাকে একটা সূঁচ এনে দিতে পারে!—

তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালিত হলো। গোলাম কাদের শাহ্ আলমের দুচোখ সূঁচ ফুটিয়ে অন্ধ করে দিলেন। চোখের দুই তারা ভেদ করে বেরিয়ে এলো তৈমুর বংশের চরম রক্ত-লাঞ্ছনা।

পরদিন। শাহ আলমের দুচোখ দিয়ে তখনো রক্ত ঝরছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দৈহিক [illegible]

...নটা হবে। গোলাম কাদেরের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকলেন কান্দাহারি খান ও রজব আলি। কান্দাহারি খান গোলাম কাদেরের দুষ্কর্মের ডান হাত। রজব আলি একজন চিত্রকর—বাদশাহী ভাতা পান, আর ওঁদের মর্জিমতো তসবির আঁকেন।

গোলাম কাদের এক ধাক্কায় বাদশাকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ছোরা দিয়ে তাঁর একটি চোখ উপড়ে নিলেন, আর একটি চোখ তুলে নিলেন কান্দাহারি খান। উদ্ধত রোহিলার চোখে-মুখে খুনের নেশা। আধমরা শাহ আলমের দাড়ি ধরে সজোরে টান দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—বেইমান শয়তানের সাজা, ঘউসগড়ের অত্যাচারের প্রতিশোধ। রজব আলি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে—

—কিন্তু জনাব—রজব আলির অর্ধসমাপ্ত কথাগুলো কেঁপে উঠছিল।

—কিন্তু নেই, যেভাবে আছি, সেইভাবে তসবির আঁকো।—

রজব আলি মুঘলিয়ার জীবনে এমন পরীক্ষা যে আসবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তসবির আঁকতে হলো। আধমরা বাদশার বুকে হাঁটু গেড়ে গোলাম কাদের ছোরা দিয়ে তাঁর চোখ উপড়ে তুলছে—মুখে তার ক্রুর উল্লাসের পৈশাচিক হাসি।

খয়েরুদ্দিন বলেছেন—সে তসবির আমি দেখেছি। মথুরায় সিন্ধিয়ার হাতে সে ছবি দিয়েছিলেন রাণা খান। গোলাম কাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল মানুষের দেহে বসানো রক্তলোলুপ জানোয়ারের মুখ।—

গোলাম কাদেরের এবারের লক্ষ্য জেনানা-মহল। বাঁদি ও খোজাদের ওপর শুরু হলো অকথ্য নির্যাতন। কিল্লার ভেতর কোথায় ধন-দৌলত পোঁতা আছে—খোজা ও বাঁদিদের মুখ থেকে রোহিলা সর্দার কবুল করিয়ে নিতে চায়। উত্তর না পেয়ে তাদের মধ্যে অনেককে খুনও করা হয়েছিল। শাহজাদা ও শাহজাদীরাও অমানুষিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি। খাদ্য পানীয়ের অভাবে বহু শিশু ও দুজন প্রাক্তন বেগমের মৃত্যু হয়েছিল। খয়েরুদ্দিন বলেছেন, দুদিনে একুশজন শাহজাদা শাহজাদীর মৃত্যু হয়েছিল, বাদ বাকি সকলে আধমরা অবস্থায় বেঁচে ছিলেন।

গোলাম কাদেরকে এই নিষ্ঠুর কাজে উৎসাহিত করেছিলেন মালিক-ই-জমানি ও নাজীর মনজুর খাঁ। এবার মালিক-ই-জমানি গোলাম কাদেরকে বললেন—এবার আমাকে প্রাসাদ ছেড়ে দাও, আমি তো বারো লক্ষ টাকার বেশিই তোমাকে দিয়েছি।—

—প্রাসাদের ধন-দৌলত তো আমারি বাপ-দাদার বিষয় সম্পত্তি থেকে লুট করে আনা। আপনার ব্যক্তিগত সঞ্চয় না পেলে আমার কাছে আপনার দেনা শোধ হবে না।—রোহিলা সর্দারের কণ্ঠে কঠিন ব্যঙ্গের সুর।

মালিক-ই-জমানি ও সাহিবা মহলকে আফগান ফৌজরা জোর করে তাঁদের প্রাসাদ থেকে এক বস্ত্রে তাড়িয়ে দিল। তাঁদের

খাদ্য পানীয় না দিয়ে সারাদিন গম্বুজের উঁচু চত্বরে দাঁড় করে রাখা হলো। নদীর ধারে জনসাধারণ ভীড় করে দেখতে এলো তাঁদের এই শোচনীয় পরিণতি। এই সুযোগে গুপ্তধনের লোভে তাঁদের প্রাসাদ খোঁড়া হলো। এবার মনজুর আলির পালা।

—বাঁদিরা পর্যন্ত হীরে-জহরৎ, মণি-মুক্তোর গুপ্তস্থানের সন্ধান দিল, আর উল্লুক, তুমি এতকাল নাজীর ছিলে, কানাকড়িরও খোঁজ দিতে পারলে না।— ক্রুদ্ধ রোহিলা সর্দার নাজীরের দিকে চেয়ে চিৎকার করে ওঠেন—

—তোমাকে ঘউসগড়ে বাঁচিয়েছিলাম, মীর বকশি করেছি। তোমার আফগান বদমায়েসেরা অনবরত লুটপাট চালাচ্ছে। আবার কি চাও—

—তুমি ভুল করেছো, জানতে না যে বাচ্চা সাপকে রেহাই দিতে নেই। বেয়াদব, বেতমীজ। কান্দাহারি খান জোর কোড়া লাগাও।—

প্রভুর আদেশে তৎক্ষণাৎ পালিত হয়। নাজীরকে সাত লাখ টাকা জরিমানা করা হলো। তাঁকে কোড়া লাগিয়ে পায়খানার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো। সেইদিনই নাজীরের হাবেলি লুণ্ঠিত হলো।

পারিষদবেষ্টিত গোলাম কাদের বসে আছেন। শাহ আলমের উত্তরাধিকারী শাহজাদা আকবর শাহকে ডাকা হলো। গোলাম কাদের তো মদে চুর। শাহজাদাকেও জোর করে মদ গেলানো হলো।

—দাঁড়িয়ে আছিস যে, নাচ ব্যাটা নাচ,—জড়িতকণ্ঠে বলেন রোহিলা সর্দার। শাহজাদা ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন, নাচতে গিয়ে তাঁর অনভ্যস্ত পা দুটো জড়িয়ে যাচ্ছিল—যেমন তেমনভাবে তিনি পা ফেলছিলেন। সভাকক্ষে হাসির জোয়ার বয়ে গেল।

—তোরা যদি নাচুনী ও তবলাওয়ালীর জাত না হতিস, তাহলে কি তোদের আজ এই হাল হয়!— গোলাম কাদেরের জড়িতকণ্ঠে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা। খানিক থেমে তাঁর আফগান সহচরদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমাদের আমি হুকুম করছি যে, খুবসুরৎ সব শাহজাদীদের তাদের ডেরা থেকে জোর করে টেনে এনে বে-ইজ্জৎ করো। তাতে নিশ্চয়ই একদল তাজা জোয়ান মরদের পয়দা হবে—হাঃ-হাঃ-হাঃ। সভাকক্ষে কুৎসিত হাসির হুল্লোড় ওঠে।

মহম্মদ শাহ ও শাহ আলমের বেগমকে গোলাম কাদেরের আদেশে জনসাধারণের সামনে বে-আব্রু করা হয়েছিল। খয়েরুদ্দিন বলেছেন—দুজন শাহাজাদীর রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে রোহিলা শয়তান রাত্রিতে মোতি-মহলে তাঁদের ধরে এনেছিল। সাকরেদদের সামনে উলঙ্গ করে তাঁদের যেভাবে বে-ইজ্জৎ করা হয়েছিল, তা কোনো মানুষ ভাবতে পারে না।

বাঁদিরা বকশিসের লোভে বা অত্যাচারের ভয়ে বাদশাহী গুপ্ত দৌলতখানা দেখিয়ে দিয়েছিল। কোনো কোনো জিনিস বংশানুক্রমিকভাবে মাটির মধ্যে থাকতে থাকতে সম্পূর্ণ বিবর্ণ হয়ে গিয়ে-

ছিল। সোনা, রুপো ও মুক্তোখচিত এমন কতকগুলো বস্ত্রালংকার পাওয়া গিয়েছিল, যা দিল্লীর শ্রেষ্ঠ মণিকারেরা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। জামি মসজিদের একটি গম্বুজের ভেতরের দিকের ছাদের সোনার পাতগুলি বিক্রি করা হয়েছিল। মনিয়ার সিং গোলাম কাদেরকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন পবিত্র মসজিদের দৌলত অপহরণ করার জন্য দিল্লী শহর তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। —এই নিষেধে ফল হয়েছিল।

লুটের মাল দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি হবে, এই চুক্তিনামাতেই ইসমাইল বেগ যোগ দিয়েছিল গোলাম কাদেরের সঙ্গে। কিন্তু লালকিল্লার মালিক হয়ে আফগান তরুণের মাথা গিয়েছিল বিগড়ে। বহু অনুরোধ জানিয়েও ইসমাইল বেগ চল্লিশ হাজারের বেশি টাকা পাননি। আফগান ও মুঘলিয়া ফৌজের মারামারি ছিল দিল্লী রাজপথের প্রাত্যহিক ঘটনা। দিল্লী থেকে লোক পালাতে শুরু করল। সৌদা ও ইনশা—এযুগের দুজন বড়ো উর্দু কবি লক্ষ্ণৌ গিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় লাভ করলেন। দিল্লী শহরের এই শোচনীয় অরাজকতার মুহূর্তে মারাঠী সাহায্য এলো—সিন্ধিয়া তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রানা খানকে পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন ইসমাইল বেগ। বারো দিন পর জিবা দাদা বকশির নেতৃত্বে আর একদল সৈন্য রওনা হলো দিল্লীর দিকে। মারাঠী ফৌজ পুব দিক থেকে নদী পার হয়ে ক্রমাগত শস্য লুন্ঠন শুরু করলো—দিল্লীতে খাদ্যের ঘাটতি পড়লো, দেখা দিল হাহাকার।

●

দশই অকটোবর। গোলাম কাদের তখনো লালকিল্লায়। কিন্তু পাশা উল্টে গেছে এবার তাঁর হারের পালা। তাঁর অনাহারী ফৌজের মধ্যেও দেখা দিয়েছে অশান্তির আগুন। সেদিন ছিল মহরম। একজন রোহিলা সৈন্যের অসাবধানতায় হঠাৎ একটি বারুদের বিস্ফোরণ ঘটলো, গোটা দিল্লী শহর উঠলো কেঁপে। গোলাম কাদেরের মনটাও বোধহয় সেই সঙ্গে কেঁপে উঠেছিল। খানিকটা আত্মগতভাবেই তিনি বলে উঠলেন—এখন কিল্লাও আমাকে ঠাঁই দিতে নারাজ। —মুনসি খয়েরুদ্দিন বলেন—সারাজীবনে রোহিলা শয়তানটা বোধহয় ঐ একদিন সাচ্চা কথাই বলেছিল—বোধহয় নসিবই ওকে বলিয়েছিল।

গোলাম কাদের জানতে পেরেছিল যে তাঁর বাদশাহীর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। তাই সলিমগড় থেকে ঘউসগড়ে জলপথে আগে থেকেই লুটের মাল পাঠাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মারাঠী, শিখ ও গুর্জরেরা তার অধিকাংশই পথে লুট করেছিল। গোলাম কাদেরের এ খবর জানতে বাকি ছিল না। তাই আর দেরি না করে বাদ বাকি লুটের মাল নিয়ে সেইদিনই লালকিল্লা ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় শাহ আলমের কয়েকজন ছেলে ও বিদর বখতকেও বন্দী করে নিয়ে গেলেন।
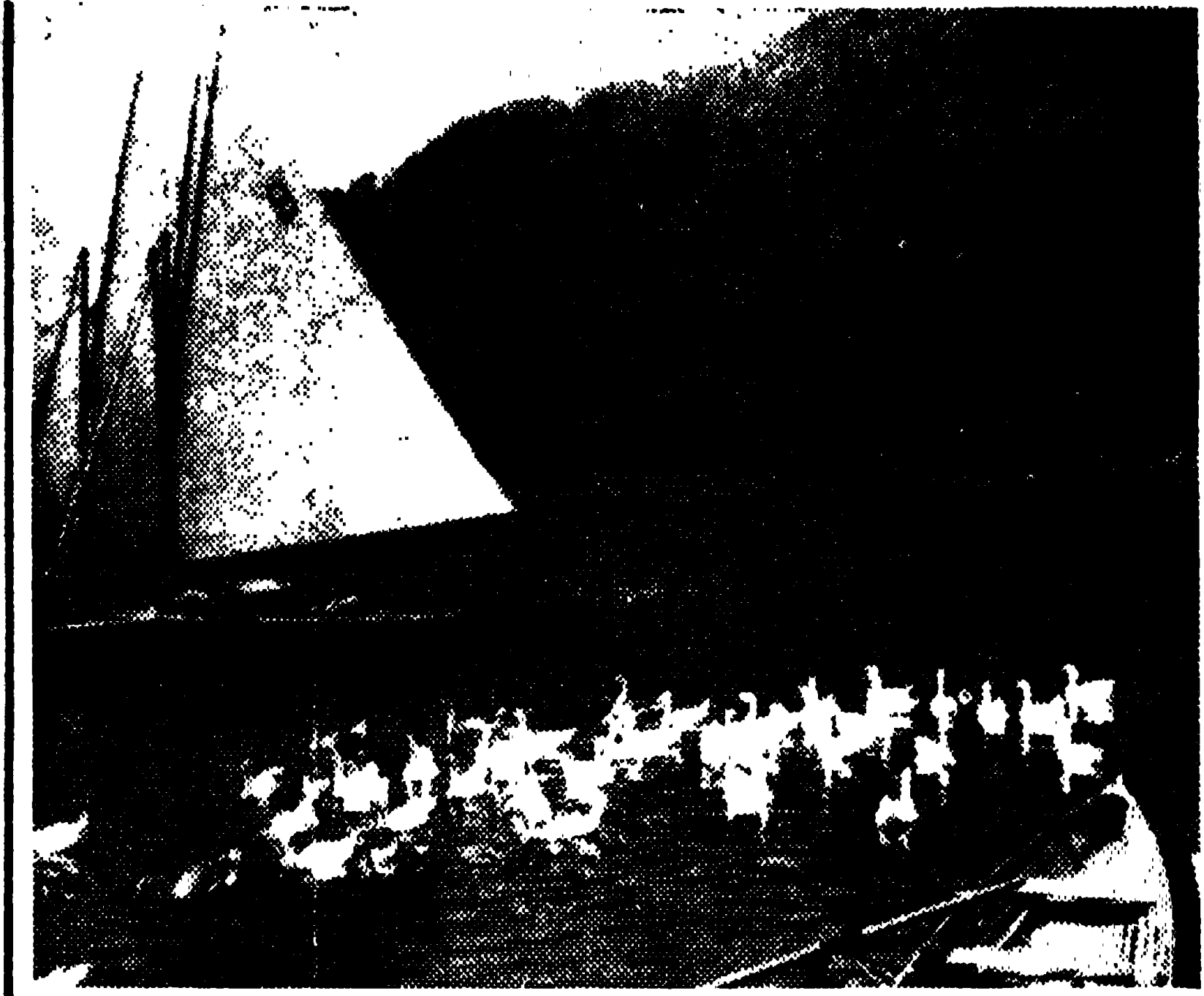
নৈনীতাল লেকে   ফটো : প্রফুল্ল মিত্র

আধমরা শাহ আলমকেও শেষ লাথি মারতে ভুললেন না।

মারাঠা সৈন্য চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। দু' মাস বাদে গোলাম কাদের যখন মিরাট দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে, তখন চারপাশে শক্তিশালী মারাঠা প্রতিরোধ। দুর্গ মধ্যে মানুষ ও পশুর লাশের পচা গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়েছে। মনিয়ার সিংকে রেখে গোলাম কাদের পাঁচশো অশ্বারোহী নিয়ে চললেন শেষ আশ্রয় ঘউসগড়ের দিকে। কিছুদূরে গিয়ে জিবাদাদার সৈন্যদের হাতে অর্ধেক আফগানের মৃত্যু হলো। রাত্রির নিকষ কালো অন্ধকার—অনুচরদের কে কোথায় ছিটকে পড়লো তার ঠিকানা রইলো না। তীব্রবেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে এক গর্তে তার পা পড়ে খোঁড়া হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে গোলাম কাদের হেঁটেই চললেন। এইভাবে প্রায় চল্লিশ মাইল চলার পর বনৌলি গ্রামে গিয়ে ভোর হলো। সেখানে এক ব্রাহ্মণের কাছে একটি ঘোড়া ও একজন সঙ্গী চাইলেন। খয়েরুদ্দিন বলেছেন—সম্ভবত ব্রাহ্মণ রোহিলা-অত্যাচারের ভুক্তভোগী। সে মারাঠীদের খবর দিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিল।

রানা খানের প্রথম কাজই হলো অন্ধ বাদশার সঙ্গে দেখা করা ও বাদশা পরিবারের সকলকে মুক্তি দেওয়া। শুক্রবারে জামি মসজিদের মঞ্চ থেকে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নামে আবার খুত্বা পড়া হলো। দিল্লী শহরের উপর উড়লো সিন্ধিয়ার পতাকা—তেরো বছর একইভাবে সে পতাকা উড়েছিল।

গোলাম কাদের ও তাঁর অনুচরদের বন্দী করে পাঠানো হলো মথুরায়। সিন্ধিয়ার উদ্দেশ্য ছিল গোলাম কাদেরকে ভালো করে খাইয়ে পরিয়ে তাঁর মুখ দিয়ে লুটের মালের খবরাখবর আদায় করা। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। সেদিন সিন্ধিয়া একটি চিঠি পড়ছিলেন, চিঠিখানি স্বয়ং সম্রাটের। চিঠি পড়ে সিন্ধিয়া একটু চিন্তিত হলেন। মীর মুন্সি খালিব আলিকে ডেকে পাঠালেন। —আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি—জরুরী দরকার। দিল্লী থেকে সম্রাট চিঠি পাঠিয়েছেন। পড়ুন: —মহাদজীর প্রশস্ত ললাটে একটি কুঞ্চনের রেখা দেখা দিল। —"যদি আপনি রোহিলার চোখ দুটো উপড়ে আমার কাছে না দেন, তা হলে সিংহাসন ছেড়ে ফকিরের বেশে মক্কায় যাব। সকলের সামনে আপনাকে বে-ইজ্জৎ হতে হবে।" —চিঠির শেষ অংশটুকু জোরে পড়লেন খালিব আলি।

—বাদশার হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে। আপনি হাকিম আকমল হেকিমকে নিয়ে গোলাম কাদেরের চোখ, কান কেটে একটি ঝুড়িতে ভর্তি করে সম্রাটের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

আদেশ পালিত হতে দেরি হলো না। মথুরা থেকে বারো মাইল দূরে পথের পাশে একটি জঙ্গলে বিদ্রোহীর দন্ড হলো। শুধু যে চোখ উপড়ে ফেলে নাক কান কাটা হলো তাই নয়, তার হাত-পা কেটে মেরে ফেলা হলো। শুধু দেহটাকে ঝুলিয়ে রাখা হলো একটি গাছের ডালে।

ঝুড়িটি যখন শাহ্ আলমের কাছে পেঁছলো, তখন অন্ধ সম্রাট ঝুড়ির ভিতরে হাতড়ে হাতড়ে সেই বীভৎস জিনিসগুলি পরখ করলেন। একটি নিশ্চিন্ততা ও পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়লো, বোধহয় চকিতে ফুটে উঠলো একটি হাসির রেখা।

গোলাম কাদেরের মৃতদেহ জনসাধারণকে দেখানোর জন্য দিল্লীতে পাঠানো হবে, এই মোটামুটি ঠিক ছিল। কিন্তু এর

মধ্যে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। সেদিন সিন্ধিয়া দিল্লীর নতুন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করছেন, এমন সময় সিপাহী রামকিষণ সিং ও মুঘলিয়া আফজল বেগ হাঁফাতে হাঁফাতে এলো।

সিন্ধিয়া বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো, হাঁফাচ্ছো যে!

—সর্দারজী, —বরম পিশাচ, বরম পিশাচ—রামকিষণ আর কিছু বলতে পারে না, শুধু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। এক লোটা জল খেয়ে তবে সে সুস্থ হয়।

—কি খবর আফজল বেগ—কৌতূহলী সিন্ধিয়া জিজ্ঞাসা করেন।

—আল্লা, কসুর মাফ করো মেহেরবান—জিভ কেটে দাঁড়িয়ে থাকে আফজল বেগ মুঘলিয়া।

—হুজুর, সেই রোহিলা ডাকুর ধড়টা পায়ের দিকে গাছের ডালে বেঁধে মুণ্ডহীন গর্দানের দিকটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এক মস্ত বড় কালো কুকুর তার চোখের কোণে সাদা চক্র কোথা থেকে এসে বসে থাকত। ঘাড় দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লে সে তাই চেটে চেটে খেতো। পাথরের ঢিল মেরে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেও সে আবার ফিরে আসতো। হুজুর একদম বরম পিশাচ—এইটুকু কথা বলেই রামকিষণ কাঁপতে থাকে।

—আজ ঐ পথ দিয়ে আসার সময় দেখি লাশটার কোনো চিহ্ন নেই, সেই বীভৎস কুত্তারও কোনো পাত্তা নেই। আফজল বেগ চারদিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে।

খয়েরুদ্দিন বলেছেন—রোহিলা ডাকু শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রি করেছিল। কুত্তার বেশে সেই দোজখের শয়তানই তার সাকরেদের লাশ নিয়ে গেছে। দু' বছর পর মথুরায় সিন্ধিয়ার ডেরায় বসে তাঁর স্মৃতি-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছিলেন মুঘলিয়া দোস্ত ওমেজুদ্দিনকে।

—এ কিস্‌সা দিল্লীনামা নয়, জানোয়ার-নামা। তাই জানোয়ারের লাশ নিয়েছে জানোয়ারেই।

সূর্যাস্তের আভায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে আণ্ডারসন ব্রাদার্সের মুন্সি ফকির খয়েরুদ্দিনের বলিকুঞ্চিত মুখ।

ঋণং কৃত্বা

সুধীরকুমার করণ

ঋণ ক'রে ঘি খাওয়া এবং ঋণ ক'রে পাঠাগার বাড়ানো নাকি দোষণীয় নয়, ভাষার কোষাগার বাড়ানো তো নয়-ই। বরং সব ভাষাই চিরকাল ধ'রে এই রীতিতে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। যে-সব ভাষা ঋণ করতে পারেনি, তাদের গড়ন, আর যাই হোক, বাড়বাড়ন্ত নয়।

জাহাজ-বোঝাই ঋণাত্মক গোধূমে আমাদের পরিশোধ্য কিন্তু শব্দ-ঋণ পরিশোধ্য নয়। আলো-বাতাসের ঋণ যদি পরিশোধ করতে না হয়, তাহলে শব্দ-ঋণ-ও তাই। আলো-বাতাসের মত স্বাভাবিকরূপে শব্দ-সম্ভার আমাদের প্রাপ্য নয় বলেই বোধহয় অনেকে এ-ধরনের ঋণগ্রহণ করতে অনাগ্রহী কিংবা ঘোরতর ভাষাপ্রেমের ফলে, নোতুন ক'রে তাঁরা আর ঋণ বরদাস্ত করতে রাজী নন। ইংরাজী ভাষার কাছে বাঙলা ভাষার ঋণ যেমন কম নয়, তেমনি, বাঙলা ভাষার কাছে এবং ভারতীয় ভাষাবর্গের কাছে ইংরাজী ভাষার ঋণও অনেক। ঋণে-ঋণে ঋণক্ষয়। সাবধানের মার নেই ব'লে, লাট, লম্ফ, লণ্ঠন, আপিস, গেলাস, বেঞ্চি, চেয়ার, ইস্কুল, মেম, হাসপাতালের আসল চেহারায় বাঙলা-রঙ লাগিয়ে আমরা আত্মস্থ করেছি। এসব যদি কেউ এখন ফিরিয়ে দিতে বলেন কিংবা এর পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ আমদানি করার কথা বলেন, তাহলে তাঁর কথায় আমরা কান দেব না। তাহলে তো, পেন, পেন্সিল, স্কুল, কলেজ, সিনেমা-থিয়েটার, শার্ট-কোট এবং আরও কত-কি দিয়ে কসুর হয়ে যেতে হয়!

ভারতীয় অর্থের কথা আপাতত না-হয় বাদ দেওয়া গেল ,কিন্তু ওরা-ও যখন কম-পক্ষে এক হাজার ভারতীয় শব্দ 'লুট' করেছে, আমরাও না-হয় কয়েক শো নিলুম। ঋণ মনে করলে যদি ঋণী মনে হয়, তাহলে বলা যাক—হরণ; অপহরণের চেয়ে তার মর্যাদা বেশী।

কিন্তু এহ বাহ্য। ইংরাজী ভাষার কোষাগারও কালে-কালে ধাপে-ধাপে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। আমরা যে-সব ইংরাজী শব্দকে জাত-ইংরেজ বলে জানি, এবং যে-শব্দগুলি সাধারণত আমাদের কাছে পরিচিত, সে-গুলির আদ্যিকালের কথায় অন্য ইতিহাস। তার অনেকগুলিই অন্-ইংরেজ। অথচ আমাদের কাছে সহজে তাদের জাত-পাতের কথা ভাঙতে চায়নি, পাছে লোকে কিছু বলে। আর, সাধারণ-ইংরেজী-জানা লোকের কাছে পরিচিত নয় কিংবা অল্প-পরিচিত, এমন সংখ্যাহীন শব্দ, উপবাক্য, সুভাষিতাবলি প্রভৃতি, গ্রীক এবং ল্যাটিন থেকে, যত পারে তত ওরা গ্রহণ করেছে।

শব্দ-ঋণের জন্য ইংরাজী ভাষা মুখ্যত ল্যাটিন এবং গ্রীকের কাছে চিরঋণী। তারপরেই ফরাসী ও জার্মানীর কাছে। ওরা বলবে, এসব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে পাওয়া।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মের কোলাকুলি হয় এবং উপহারস্বরূপ—চার্চ, অ্যাপস্‌ল, বিশপ, মংক, মনাস্টারী, ক্যাথিড্রাল, অ্যাবট, ডিসাইপ্‌ল্, নান্, পোপ, পিলগ্রিম, স্কুল, হোলি, ইস্টার প্রভৃতি পেয়ে যায়। না-পেলে ওদের ধর্মকর্ম অচল হয়ে যেত। খৃষ্টান ধর্ম আছে, হেল্ নেই, ডেভিল নেই, এমন হতেই পারে না। অতএব ওরাও গুটিগুটি করে হেঁটে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসে গেল ওখানে। প্রাচীন ইংরাজীতে ডেভিল ছিলেন 'ডেওফল', পুরোপুরি ডেভিল হন পরবর্তী কালে। চার্চ-এর পুরোনো উচ্চারণ ছিল—'কিকিরা', যার জন্ম গ্রীসে, 'কুরিয়াকোন' নামক শব্দভূমিতে।

নবম শতাব্দীতে, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দেশের সমুদ্র উপকূল থেকে ভাইকিংস বা জলদস্যুরা দলে দলে সাগরিকা ইংল্যাণ্ডের পাণিগ্রহণ করতে ছুটে এল। অনেকে ফিরে গেল, অনেকে সাগরিকার অঙ্গস্পর্শ করে, আর নড়ে বসতে চাইল না। এমনিতেই অবশ্য স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ভাষার সঙ্গে ইংরাজীর এবং স্ক্যাণ্ডি-নেভীয়দের সঙ্গে ইংরাজদের অর্থাৎ তৎকালীন অ্যাংলো-স্যাক্‌সনদের নানা বিষয়ে মিল ছিল; পাশাপাশি এসে যাওয়ার ফলে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়লো। অবশ্য এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ভাইকিংস্‌রা আসবার আগে অ্যাংলো-স্যাক্‌সনদের পা ছিল না, চামড়া ছিল না, ঘাড়ও ছিল না। তা নয়, ছিল সবই, তবে ভাইকিংদের শব্দগুলি ওদের পছন্দসই হল বেশী। আমরা যেমন বাত না বলে 'হাওয়া' বলি, রাঙা না বলে 'লাল', উদ্যান না বলে 'বাগান', সহস্র না বলে 'হাজার', কটি না বলে 'কোমর', কোমল না বলে 'নরম' বলি, তেমনি ওরা অনায়াসে নিজেদের শব্দগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে, ভাইকিংদের লেগ্, নেক্, স্কিন নিয়ে চেহারা ফিরিয়ে নিল। হাতে নিল নাইফ, মাথার ওপর স্কাই। এছাড়া আমাদের অতি-পরিচিত উইন্‌ডো, ডার্ট, ব্যাগ, কেক্, ফগ, রং, লো, অড, লুজ, ফ্ল্যাট এবং ক্রিয়াবাচক গেট, গিভ, কল, ওয়াণ্ট, টেক, ড্র্যাগ এবং আরও কত—সবই ওরা হাত পেতে, নিঃসঙ্কোচে নিল। এমনকি শুনে হাসি পেতে পারে—স্মাইলও ওদের নিজস্ব নয়, পরের কাছে ধার-করা।

স্কিল তো ছিলই না। এ-সবই স্ক্যাণ্ডি-নেভীয়। দে, দেম, দেয়ারও তাদের নয়, ওরা বলতো, হিয়ে, হিম, হিয়েরা।

একাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল থেকে নরম্যানরা এসে রাজা হয়ে বসে। ফলে রাজভাষার আভিজাত্য গ্রহণ করার জন্য সে-কি কাড়াকাড়ি! উপরতলার ইংরাজরা তো পোষাকী ভাষা হিসাবে ফরাসী নিলই, তাছাড়া জনগণের আটপৌরে ভাষাতেও তার সে কি প্রভাব! দেশটা যেন ফরাসী দেশ হতে চাইল, এমনকি নরম্যান আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরেও ফরাসী ভাষার প্রভাব যেন আরো বৃদ্ধি পেল। একেবারে আন-কোরা ফরাসী শব্দের আভিজাত্যে ইংল্যাণ্ড-কার রূপের বাহার কি তখন! রাজতন্ত্র ও ইংরাজী ভাষা একসঙ্গে জমজমাট।

পুরোনো কিং কুইন, লর্ড-লেডী, নাইটরা টিকে থাকলো টিমটিম করে—বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল সভ্যেরা ডিউক, প্রিন্স, কাউণ্ট, পিয়ার এবং ব্যারন। দেখা দিল গভর্নমেণ্ট, কাউন্সিল, চ্যান্সেলার, স্টেট নেশান, পিপ্‌ল এবং কান্‌ট্রি। জাজ, কোর্ট, জাস্টিস, এটর্ণিতে ছয়লাপ। এ-সবের আগে দণ্ড, অপরাধ, কারাগারহীন স্বর্গরাজ্য ছিল না ইংল্যাণ্ড; কিন্তু সেই প্রথম দেখা দিল ক্রাইম, সঙ্গে সঙ্গে পানিশমেণ্ট এবং ন্যায়-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রিজ্‌ন।

চার্চ সংক্রান্ত বেশ কিছু নতুন শব্দকে আদর ক'রে ঘরে তোলা হল। রিলিজিয়ন, সার্ভিস, সেভিয়ার, ভার্জিন, সেণ্ট, রেলিক, অ্যাবি, ক্লার্জি, প্রেয়ার এবং আরো কিছু শব্দ।

যুদ্ধ করতে গিয়ে পাওয়া গেল, আর-মার, ব্যাট্‌ল, ক্যাস্‌ল আর টাউন। এবং চিরকালের মত খুচরো লড়াই নয়, পেয়ে গেল 'ওয়ার'।

কে না জানে ফরাসীরা শিল্পরসিক এবং ফ্যাসানদুরস্ত। ইংরাজদের শিক্ষাগুরু এদিক দিয়ে ওরাই। ফ্যাসান এবং আর্ট ওরাই শেখালো। আগে ওদের না ছিল ফ্যাসান, না ছিল ড্রেস, কস্টুম, অ্যাপারেল। আর্ট, কালার, পেইণ্ট, মিউজিক, পোয়েম, রোমান্স-তো ছিলই না। সবচেয়ে অবাক কথা 'বিউটি'ও ছিল না।

কি ছিল তাহলে? ক্রুয়েলটি? মার্সি? ওবিডিয়েন্স? কার্টসি? চ্যারিটি?—না,—ও-সবও ফরাসী থেকে গৃহীত।

ইংরেজদের 'হাউসে'র কাছে এসে 'ম্যানর' আর 'প্যালেস' বললে—আমার দেখ। ম্যান এবং মেড-এর পরিবর্তে এল 'বাট্‌লার' এবং 'সার্ভেণ্ট'।

অর্থাৎ কিনা, ফরাসী-আনার আভি-জাত্যের কাছে ইংরেজী-আনার প্রায় অচল অবস্থা। শুধু কি তাই, ইংল্যাণ্ডের গ্রামে-প্রান্তরে যে-সব অক্‌স, কাফ, শিপ, সোয়াইন নেহাৎ গেঁয়োর মত দিনাতিপাত করছিল, নর্ম্যান লর্ডদের খানার টেবিলে এসে তাদের নাম-ই বদলে গেল। জীবিত অবস্থায় ওরা নামে ছিল ইংরেজ,—দেহরক্ষা করার পর হল, বিফ্‌ ভিল, মটন, এবং পর্ক। মোরগ-কে রামপক্ষী নাম দিয়ে জাত রক্ষা করার মত ব্যাপার।

এরপর ইংল্যাণ্ডের নবজন্ম : রেনেশাঁ। এ-সময়টাতে নোতুন করে ল্যাটিনের দিকে হাত বাড়াতে হল। এবং ঝাঁকে ঝাঁকে ল্যাটিন শব্দ উড়ে এসে ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে ডানা গুটিয়ে বসে গেল ইংল্যাণ্ডের ভাষা-ভূমিতে। পনেরশ পঞ্চাশ থেকে ষোলশ' পঞ্চাশ—এই এক শতাব্দীতে গোটা ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাসাছাড়া ল্যাটিন শব্দের ডানার শব্দ। অনেক আগে থেকেই ওখানে বিরাট এক ঝাঁক, বাসা বেঁধে গুছিয়ে বসেছিল, পরে যারা এল, তারা তাই সহজেই একাত্ম হয়ে গেল।

সি এল বারবার-এর কথা বাঙলা ক'রে বলতে হয় : আগে ল্যাটিন শব্দের নদী বয়ে এসেছিল; রেনেশাঁর সময় তার বন্যা। অর্থাৎ 'ভরানদীতে এল বান'।

ইংরাজী বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য, শিল্প, অলংকারশাস্ত্র তখন ল্যাটিন শব্দে ভরপুর। তার মধ্যে কিছু শব্দ সরা-সরি গ্রীক ভাষার, অসংখ্য শব্দ সরাসরি ল্যাটিন ভাষার এবং কিছু শব্দ ল্যাটিনের মাধ্যমে গ্রীক ভাষার।

গ্রীক থেকে সরাসরি এল প্যাথস, ফ্রেজ এবং রাফ্‌সডি। ল্যাটিনের রাজ্য ঘুরে এল, —ড্রামা, আয়রনি, ক্লাইম্যাক্স, রিদম্‌ এবং ট্রফি। ফরাসী রাজ্য ঘুরে এল, ওড, এলিজি এবং সিন্‌ (দৃশ্য)।

ল্যাটিনরাজ্য ঘুরে আরও এল, ইলেক-ট্রিসিটি, এনার্জি, কষ্টিক এবং সিলিণ্ডার। সরাসরি এল,—জিনিয়াস, স্পেশিস্‌, সেরে-বেলাম, স্পেশিমেন, অ্যাপারেটাস, ফোকাস এবং লেন্‌স্‌।

এমনিভাবে ইংরেজী হল তিলোত্তমা এবং বিশ্ববিজয়িনী। এরপর উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম যেদিক থেকে পারলো হাতড়ে নিয়ে এল শব্দ। অঙ্গসজ্জার বিরাম নেই যেন। তিলোত্তমার দিকে যারই দৃষ্টি পড়ে, তারই বিস্ময়।

আধুনিককালের ভাষার মধ্যে সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোনদেশের ভাষাকেই বাদ দেবার পক্ষপাত দেখায় নি, ইংরাজী তিলোত্তমা।

শুধু ভারতীয় শব্দই সহস্রাধিক।

ল্যাটিন-দুহিতা ইতালীর থেকে এল, অপেরা, সনেট, ফ্রেস্‌কো, রিলিফ, কার্নিভ্যাল, স্কোয়াড্রন, প্যারাপেট, ব্যাণ্ডিট এবং ট্র্যাফিক্‌।

স্পেন দিল, কার্গো, শেরী, আর্মাডা, প্যারেড, গিটার স্পেড্‌ (তাসের)। অ্যামেরিকা থেকে 'মশ্‌কুইটো' এবং পট্যাটো এসেছিল স্পেন। তা'ও ইংরাজী-তিলোত্তমা ছাড়ে নি। মশ্‌কুইটো আসলে অ্যামেরিকার না ভারতের সে বিষয়ে অবশ্য তর্ক উঠতে পারে। স্পেনের লোকেরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপের অধিবাসীদের বলতো ক্যানিব্যাল। নরমাংসে ওদের প্রীতি ছিল বলে শেষপর্যন্ত ক্যারিব্যাল বা ক্যানি-ব্যাল-এর অর্থ হয় নরমাংসভোজী। ক্যানি-ব্যাল-ও স্পেন থেকে আমদানী-করা।

পোর্তুগীজদের মাধ্যমে অ্যামেরিকা থেকে এল, মোলাশেস, কোকোনাট, ফ্লেমিংগো, ভিটামিন, পেনিসিলিন, নাইলন, টেলি-ভিসান ট্রানজিস্‌টার-ও ওদের নিজস্ব নয়।

মালয় দিয়েছে ব্যাম্‌বু; ওয়েস্টইণ্ডিজ দিয়েছে 'মেইজ', টম্যাটো দিল মেক্‌সিকো। কফি গেছে তুরস্ক থেকে। 'টি' চীন থেকে মালয়ের 'কাটি'র মধ্য দিয়ে। রাশিয়া থেকে গেছে স্পুট্‌নিক এবং ল্যুনিক। আফ্রিকা থেকে অ্যাপারথিড্‌।

ইংরাজী তিলোত্তমা দিনে দিনে আরও উত্তমা হয়ে উঠুক। ভাষার মধ্যে কথা বাড়ালে ক্ষতি নেই, কিন্তু শুধু কথায় যে কথা বাড়ে, তা'তে ক্ষতি আছে। ওরা ভাষা বাড়াচ্ছে। আমরা ভাষা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি।

প্রদর্শনী পরিচয়

সম্প্রতি কলকাতার শীতকালীন বার্ষিক প্রদর্শনীগুলির মধ্যে তিনটি বড় প্রদর্শনী হয়ে গেল। এগুলি আকারে বৃহৎ তবে প্রকারে এদের মধ্যে আগের বছরের থেকে কাজের গুণগত পার্থক্য খুব বেশী চোখে পড়েনি। আধুনিক শিল্পকলা যে এক ধরনের অ্যাকাডেমিজমের বাঁধাপথে আটকা পড়ে রয়েছে তারই বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন পুনরায় প্রত্যক্ষ করা গেল। এই প্রদর্শনীগুলির প্রায় সব কয়টিই অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ও আর্টিস্ট্রি হাউসে আয়োজিত হয়েছিল। অন্যান্য গ্যালারীগুলির কর্ম-তৎপরতা ততটা চোখে পড়ল না।

বছরের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনীর মাসাবধি অনুষ্ঠান হল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। অ্যাকডেমির এই ৩১শ তম প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করলেন শিল্পী যামিনী রায়। প্রদর্শনী ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৬ থেকে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৭ পর্যন্ত খোলা ছিল। বহু শিল্পনিদর্শনের ভেতর থেকে তিনশ চব্বিশটি চিত্র ও ভাস্কর্য বাছাই করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা সহজ নয়। তারপর প্রায় বারোজন শিল্পীদের পুরস্কার দেবার জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নির্বাচন; সেও এক দুরূহ ব্যাপার। এই প্রদর্শনীর আধুনিক রীতির বিভাগে মাদ্রাজ ও কাশ্মীরের শিল্পীদের কাজের মধ্যে রং ও ডিজাইনের বৈচিত্র্য ও ঔজ্জ্বল্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। বংশী পরিসু, কিশোরী কাউল, মধুসূদন রাও জিকে, পান্ডিত, অ্যান্টনি ডস, রেডেপ্পা নাইডু, পরমশিবম, ভি রাজেন্দ্রন, এস ডি বাসদেব, শান্তারাজ প্রভৃতি শিল্পীদের বিভিন্ন ডিজাইন ও বিচিত্র রঙের সজ্জা নিয়ে পরীক্ষা বিশেষ লক্ষ্য করার মত।

ভিখারী — সুকুমার চ্যাটার্জি

স্নানের ঘাট — বন্দনা সেনগুপ্ত

তবে দুঃখের বিষয় পানিকরের করকোষ্ঠীর নকশা নিয়ে পরীক্ষা যথেষ্ট উৎসাহিত করতে পারেনি। আমেদাবাদের রামনিক ভাবসা ও কলকাতার সুনীল দাসের আলপনা ও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডিজাইন নিয়ে ক্যানভাস দুটির মেজাজের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার মত। হেব্বারের কাজ এবারে বেশ একটু নিষ্প্রভ। শিল্পী সুনীলমাধবের বৃটিশ ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর অনুপ্রেরণায় করা দুটি গ্রাফিকধর্মী কাজ বেশ জোরালো লাগল। গণেশ হালোই, অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, রঞ্জন রুদ্র, পরিতোষ সেন, নীরোদ মজুমদার প্রভৃতি আপন-আপন বৈশিষ্ট্যময় ছবি পরিবেশন করেছেন।

ভারতীয় রীতির ছবিগুলির মধ্যে ক্ষিতীশ মজুমদারের কাজ একটু নিষ্প্রভ। ইন্দ্র দুগারের কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য, এ এস পানওয়ার, রঞ্জন দাস প্রভৃতি কয়েকজনের বেশ কুশলী হাতের কাজ দেখা গেল। জ্যোতিপ্রিয় দাশগুপ্তের ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুসরণে দীপলক্ষ্মী বেশ পরিচ্ছন্ন কাজ।

কম্পোজিশন — সমরেশ চৌধুরী

প্রথাগত শিল্পের বিভাগে বিশেষ উচ্চমানের কাজ দেখা গেল না, অতুল বসু একটি পুরোনো প্রতিকৃতি দিয়েছেন, টুকু নন্দীর দুখানি ছবি উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে বিনীতকুমার রায়ের একটি অ্যাবস্ট্র্যাক্টধর্মী কাজ, নরেন্দ্রনাথ পালের 'অহল্যা', সুরেন দে'র 'মোরগ' এবং সুবল সাহার 'কসমিক ওয়ার্ল্ড' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রদোষ দাশগুপ্তের প্রসাধনরতা রমণীমূর্তিতে গ্যাস্টন ল্যাকসেজের মত স্ফীত নারীদেহে কিশোরীর মুখ বিশেষ রসানুভূতি আনতে একান্তই অক্ষম হয়েছে।

* * *

সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিভাগে এবার প্রায় পাঁচশতের অধিক শিল্পকর্ম রাখা হয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠ ও বিমূর্ত রীতির কাজ এবারেও প্রায় আগের বারেরই মতন। ফিগারেটিভ কাজের মান এবারেও বিশেষ উন্নত মনে হল না। অরবিন্দ বেনেগলের একটি প্রতিকৃতি, অলোক ভট্টাচার্যের কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্য এবং অশোককুমার বিশ্বাসের রেল ইয়ার্ডের কয়েকটি ছবি একটু অন্য মেজাজের। আধুনিক পদ্ধতিতে অরূপ মুখার্জির দুখানি ছবি সুন্দর হয়েছে। তাছাড়া অশোক বিশ্বাস, স্বপ্নেন্দু ভৌমিক, স্বপনেশ চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জি প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় পদ্ধতির বিভাগে ফ্রেস্কো ও মুরালের কয়েকটি নমুনা, ও মিনিয়েচারের কাজ বরাবরকার মত। গ্রাফিক ও স্কেচের মধ্যে চোখে লাগার মত কাজ কম। জল রং বিভাগে অশোক দত্ত, বরেন বসু, অশোক বিশ্বাস, কুণাল কর, সুমিতা দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন। ভাস্কর্য বিভাগে কাঠ, প্লাস্টার ও পোড়া মাটির অ্যাবস্ট্র্যাক্ট গঠনের সংখ্যা বেশী। কমা-

শিল্পাল ও কারুকলা বিভাগের কাজে গত-বারের মানই অক্ষুন্ন আছে।

* * *

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসের যে বাৎসরিক প্রদর্শনী আর্টিস্ট্রি হাউসে ৭ থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত হয়ে গেল সেটির নির্বাচন একান্তভাবে পাঁচ মিশালী। প্রথাগত নব্য-ভারতীয় রীতি ও প্রথাগত অ্যাকাডেমিক তৈলচিত্র এই উভয় মাধ্যমের আঁকা ছবিই অত্যন্ত সাধারণ স্তরের। অন্যান্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত অনেক ছবির সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া গেল। জলরঙের কাজের মধ্যে বঙ্কিম ব্যানার্জি, অশোক বিশ্বাস, সুব্রত সেন, নীতিশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন ও তেলরং-এর কাজে হরিলাল, ত্রিদিবচন্দ্র কর, পূর্ণিমা রায়, প্রভাত গাঙ্গুলী ও অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর কয়েকটি কাজ চলনসই। প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রশান্ত রায়ের আঁকা 'পিলগ্রিমস ইটার্ণাল' বলে জলরঙের একটি প্যানেল। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের আঙ্গিক নিয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি বোধহয় বর্তমানে একমাত্র প্রশান্ত রায়ের কাজের মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে গোপেন রায় ও রবীন্দ্র পালের কাজগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

* * *

৭ই জানুয়ারী আর্টিস্ট্রি হাউসের দক্ষিণের ঘরে শিশুশিল্পী সাত্যকি সেনের যে একক চিত্রপ্রদর্শনী 'চিত্রাংশু'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সেটি শিশুশিল্প হিসেবে বিশেষ উল্লেখনীয় হয়েছে। ছোটছেলের চোখ কতদিকে খোলা থাকে এই প্রদর্শনী থেকে বড়রা সেটা আন্দাজ করতে পারতেন। গৃহপালিত জীবজন্তু, পাখি, ক্রিকেট খেলা, স্কুলের ছুটির ঘণ্টা, সার্কাসের ক্লাউন, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন থেকে মহাকাশচারীর কাল্পনিক চেহারা ইত্যাদি কিছুই সাত্যকি বাদ দেয়নি। মানুষ আঁকার দিকেই সাত্যকির ঝোঁক বেশী এবং অনেকগুলি

যুদ্ধক্ষেত্র　　সাত্যকি সেন
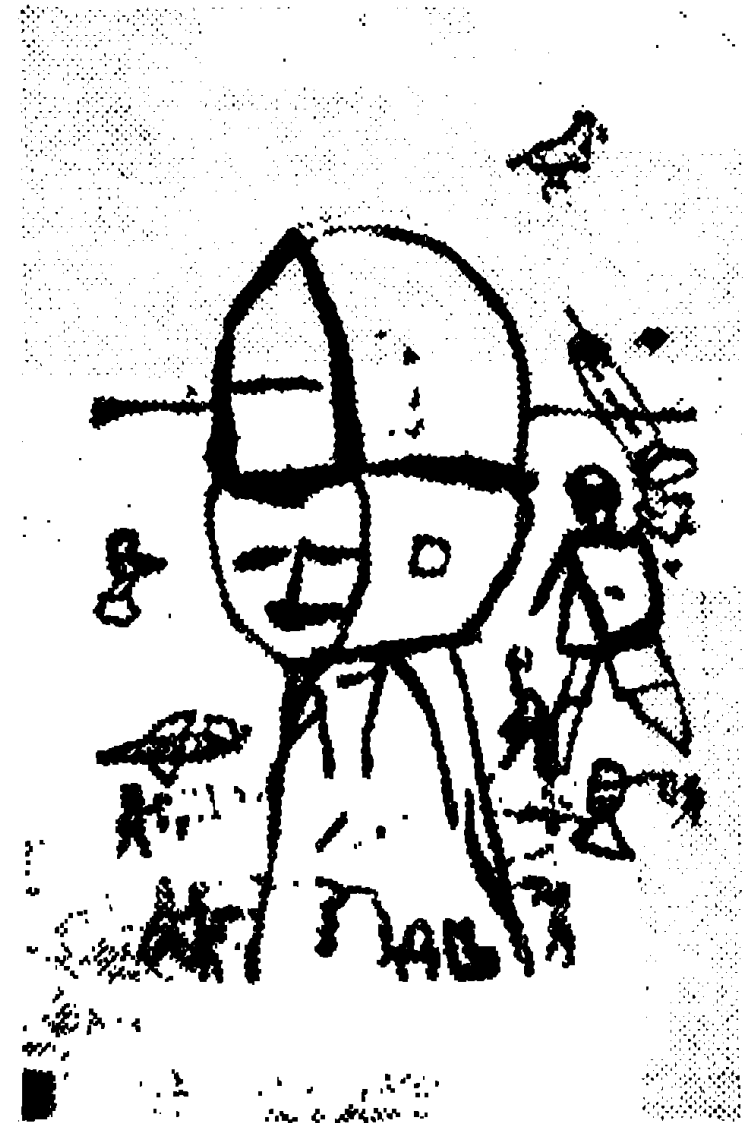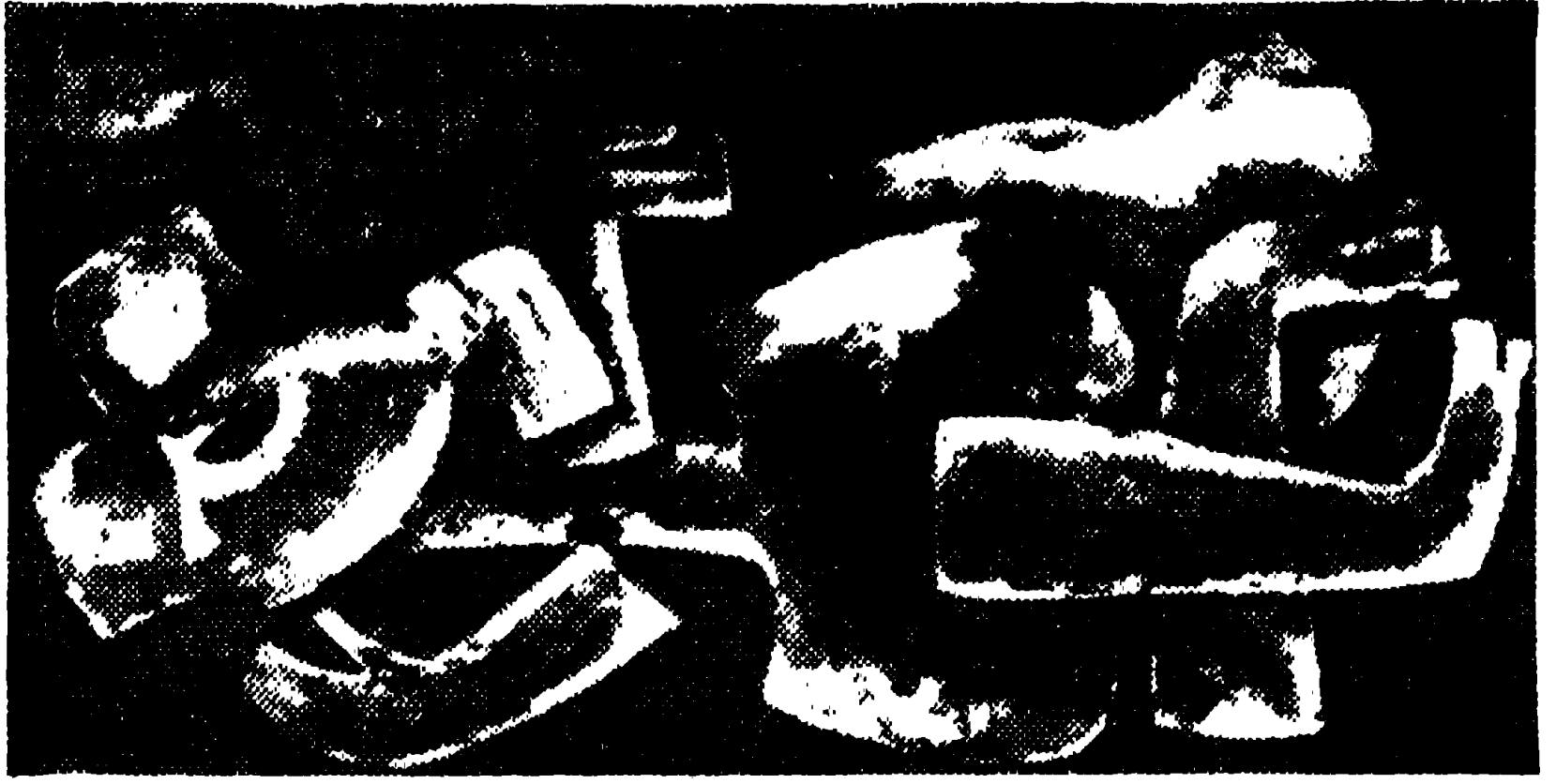
বিউটি ডিসমেম্বারড　　অমরেন্দ্র চৌধুরী

মনুষ্যমূর্তি নিয়ে একটি সুশৃঙ্খল ডিজাইন তৈরী করার ব্যাপারেও তার একটা সহজাত পটুত্ব লক্ষ্য করা গেল। তার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা যদি রক্ষা করতে পারে ত সাত্যকি বড় হয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি করতে সমর্থ হবে।

• • •

ইতিপূর্বে আর্টিস্ট্রি হাউসে আরো দুটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছিল ৩০শে এবং ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৬। এর মধ্যে 'পেন্টার্স' শিল্পী গোষ্ঠীর প্রথম প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন নিতাই ঘোষ, পার্থ ভট্টাচার্য ও ব্রজগোপাল এই তিনজন তরুণ শিল্পী। এঁরা এক গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও এঁদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে ভিন্ন ধরনের। নিতাই ঘোষ প্রথা-গত রীতিতে কতকগুলি ঝরেঝরে জলরঙের কাজ উপস্থিত করেছিলেন। নিসর্গ দৃশ্য ও শহরতলীর ছবিই তার মধ্যে প্রধান। তার মধ্যে বাগবাজারের বস্তি, দীঘার সৈকত ও রেলওয়ে সিগন্যাল দৃশ্যমান জগতের প্রতি-ফলন হিসেবে সুন্দর কাজ হয়েছে। অপর দুজনের কাজের মধ্যে আধুনিক নন-ফিগরেটিভ তৈলচিত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকাশ দেখা গেল।

আর্টিস্ট্রি হাউসের মাঝের ঘরে পাটনা সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর ভট্টা-চার্যের একত্রে যে চল্লিশখানির মত ক্যানভাসের প্রদর্শনী হল তার মধ্যে ইউরোপের এক্সপ্রেসানিস্টিক ধাঁচের কাজের ভারতীয় সেন্টিমেন্টাল অনুসরণের আভাসটাই প্রধান মনে হল। শ্রীচট্টো-পাধ্যায়ের কাজের মধ্যে আধা অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পোজিশনের প্রাধান্য বেশী—নীল, সবুজ ও হলুদ রং তাঁর বেশী প্রিয় বলে মনে হয়। অন্যজন কম্পোজিশনের মধ্যে একটু বেশী বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করেছেন এবং লাল, নীল, গোলাপী ও বিভিন্ন মাত্রার ধূসরতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখলাম। স্থানে স্থানে 'ফভ' গোষ্ঠীর কাজের কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক অনুসরণ আছে। তাঁর 'তিন মৌলানা', 'পূর্ণিমা', 'বেহালাবাদক' প্রভৃতি ছবি ও শ্রীচ্যাটার্জির 'নির্বাক কুমারী' 'অন্ধ রাজা' প্রভৃতি কাজগুলি ভাল লাগল।

৮ই জানুয়ারী পি-২৩৯।২, পূর্ণদাস রোডে এস সি দাশ ও সমরেশ চৌধুরীর একটি যৌথ চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রদর্শনী হয়েছিল। প্রথমোক্ত জন কলেজের ছাত্র এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্তমানে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের স্টুডিওর পরিচালক। প্রদর্শনীটি এঁরা এত তাড়াতাড়ি না করলেই ভাল করতেন। কারণ শ্রীদাসের শিল্পশিক্ষা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী-দের কাছে মাঝে মাঝে শিক্ষালাভ করে থাকেন। শ্রীচৌধুরীর করা একটি মুখমণ্ডল ভাল হয়েছিল।

* * *

১২ জানুয়ারী লর্ড সিনহা রোডের একটি ফ্ল্যাটে শিল্পী সুনীলমাধব সেনের হাল আমলের পঁচিশ ত্রিশখানি ছবি এক ঘরোয়া পরিবেশে প্রদর্শন করা হয়। কোন কোন গৃহস্বামী আজকাল তাঁদের বাড়িতে কোন শিল্পীর ছবির প্রদর্শনী করা একটা সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন এটা সুখের কথা। আর ছবি যখন ঘরেই টাঙ্গাতে হবে তখন ঘরোয়া পরিবেশে তাকে দেখা ক্রেতাদের পক্ষেও ভাল। এবারকার

HELP US TO PUT HIM AT HOME

প্রাচীরপত্র　　সলিল চ্যাটার্জি

মনোক্রোমাটিক ছোট-বড় মাঝারি মাপের ছবিগুলি একটু অন্য ধরনের। একটি ঘোর লাল রঙের সুকৌশল ব্যবহারে বিভিন্ন টোনের জমি তৈরী করে তার ওপর তুলির বাঁটের সাহায্যে গ্রাফিক ডিজাইনের ধরনে কতকগুলি কাজ বেশ ভাল লাগল। ফর্ম হিসেবে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাগৈতিহাসিক শীলমোহর বা ভিত্তিচিত্র কি বাংলার পোড়ামাটির কাজ প্রভৃতি শিল্প-বস্তুর ভেতর থেকে কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন। মাছ, মুখ, ধানক্ষেত, মেয়ে, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি কতকগুলি ছবির মধ্যে তাঁর হাল্কা মেজাজের কাজ ভালই লাগল।

* * *

১৬ই জানুয়ারী অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তরুণ শিল্পী মানবেন্দ্র বড়ুয়া ও এক প্রবীণ শিল্পী কিরণ সিংহের চিত্র-প্রদর্শনী হল। শ্রীবড়ুয়ার কাজে বৈচিত্র্যের সন্ধান যত মেলে গভীরত্বের সন্ধান সেই পরিমাণে কম। তেল রং, জলরং, টেম্পেরা ও ড্রয়িং নিয়ে প্রায় খান পঁচিশ ছবি ছিল। গামুলি নিসর্গ দৃশ্য থেকে আধুনিক আধা অ্যাবস্ট্রাক্টধর্মী প্রায় সব রকম রীতিরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন নয়নগোচর হল কিন্তু মনোযোগ দেবার মত তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া গেল না। নাগা ভগ্নী দুজনের ছবিটি মন্দ হয়নি।

কিরণ সিংহ শান্তিনিকেতনে বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর ও নন্দলাল বসুর কাছে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিকোলাস রোয়েরিখের বাসস্থানের কাছে কুলু উপত্যকায় একটি ছোট বাড়ি বানিয়ে বাস করছেন। রোয়েরিখের সান্নিধ্যে তাঁর ছবির মধ্যে রোয়েরিখের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। বর্তমান কুড়ি-পঁচিশখানি ক্যানভাসে তিনি এই রীতি নিয়েই আরো একটু গভীরতার সন্ধান করছেন বলে মনে হল। হিমালয়-বাসীদের জীবনের আধ্যাত্মিক ও রোমান্টিক দিকটির প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশী দেখলাম। তুষারমণ্ডিত চূড়ার কতকগুলি ছবি বিশেষভাবে মনোমুগ্ধকর হয়েছিল।

* * *

কার্টুনিস্ট হিসেবে খ্যাত ডি জি কুলকার্ণি তাঁর ১৯ খানি আধা ফিগারেটিভ ক্যানভ্যাস ১৬ থেকে ২৩ শে জানুয়ারী পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে প্রদর্শিত করলেন। তাঁর কোন কোন ছবিতেও ব্যঙ্গচিত্রের আমেজ লক্ষ্য করা গেল। ডি জির রং বেশ নিম্নগ্রামের এবং অতিমাত্রায় ধূসর ঘেঁসা খুব একটা তৃপ্তিদায়ক নয়। শাগালের মত ফ্যান্টাসির দিকেও তাঁর কিছুটা ঝোঁক আছে। অবহেলিত মানবের প্রতি সেন্টিমেন্টাল দরদেরও আভাস আছে। একটু রহস্য আনবার চেষ্টা বা কখনো চটক দেবার ভাবটাই বেশী।

* * *

অ্যাসোসিয়েশন অব ফটোগ্রাফারস এবারে তাঁদের ৮ম স্যালোঁ ফটোগ্রাফির প্রদর্শনী অ্যাকাডেমিতে ১৮ থেকে ২৯ জানুয়ারী পর্যন্ত খোলা রাখেন। ৩৮টি দেশের ১৩২ খানি ছবি এখানে দেখানো হয়। পাশ্চাত্য দেশের ছবির মধ্যে আধুনিক বিভিন্ন টেকনিকের প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেল। তবে সাবেকী ফটোগ্রাফির আ... কম নয়, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, অ... চিলি, হাঙ্গেরী প্রভৃতি কয়েকটি দে... ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

• • •

১৯ থেকে ২৭শে জানুয়ারী কেম... গ্যালারীতে শিল্পী সনৎ করের ২৪ খ... ক্যানভ্যাসের প্রদর্শনী এই মরশু... প্রদর্শনীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ই... পূর্বে কন্টেম্পরারী শিল্পীগোষ্ঠীর দল... প্রদর্শনীতে আর্টিস্ট্রি হাউসে যে ছবিগ... তাঁর দেখা গিয়েছিল তাতে যথে... উৎসাহিত হওয়া যায়নি। কিন্তু এই এক... প্রদর্শনীতে শ্রীকর আমাদের আশাভঙ্গে... ক্ষতিপূরণ করেছেন এবং কিছু উপরি... দিয়েছেন। শ্রীকর বরাবরই মানুষ ও... প্রাকৃতিক জগতের সংযোগে কতকগু... সুন্দর ডিজাইন উপস্থিত করতেন। বর্ত... প্রদর্শনী তাঁর পূর্বরীতির পূর্ণ... পরিণতির দিকে এগিয়েছে। তাঁর ক্যা... ভ্যাসের রঙের ঔজ্জ্বল্য এসেছে এবং চাকচি... পরিহার করা হয়েছে। ডিজাইন ও... টেক্সচারকে ছবির সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যে... মুখ চেয়ে বেশী প্রকট হতে দেওয়া হয়নি... টোনের পরিবর্তন সূক্ষ্ম এবং রঙের হারম... মনোরম। তাঁর ময়ূর, প্রেমিক, পরাজি... দুজনে প্রভৃতি ছবিগুলি অ্যাবস্ট্রাক্টধর্ম... হলেও পূর্ণ অ্যাবস্ট্র্যাকশনের প... দুর্বোধ্যতা পরিহার করতে সমর্থ হয়েছে... অনেক ছবির মধ্যে একটা নিম্নগ্রামে... আলাপের সুর মনকে আকৃষ্ট করে।

—চিত্ররসি...

জানাতে পারেন

প্রশ্ন

(ক) 'হরার কমিকস্' কি?

(খ) মঙ্গলগ্রহকে লাল রঙের দেখায় কেন?

দিলীপকুমার পাত্র
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

●

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রসায়নাগার কোন্‌টি এবং কোথায় অবস্থিত?

সোমনাথ ভট্টাচার্য
শিলং

(উত্তর)

২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত মন্টু দত্ত ও রতন দত্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, রবিনসন ক্রুশোর লেখক হচ্ছেন ড্যানিয়েল ডি ডিফো। বইটির প্রথম ভাগ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় ভাগ এই বৎসরেই আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

জয়ন্তকুমার সিংহ
মজঃফরপুর

●

২২ সংখ্যায় প্রকাশিত বাবুল দাশ ও বাচ্চুর 'ক' প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, রিসার্চ ডিজাইন ও স্ট্যাণ্ডার্ড অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর জেনারেল হলেন শ্রীকে, সি. সুদ এবং মাদ্রাজের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাকটরীর জেনারেল ম্যানেজার ও চীফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়র হলেন শ্রীআই, হাইডারি ও শ্রীরাজাগোপালন।

কল্যাণ নিয়োগী
আসানসোল.

●

১২ সংখ্যায় প্রকাশিত কমল সেনরায়ের প্রশ্নের উত্তরে অশোককুমার ঘোষ জানিয়েছেন যে, ভারতের সবচেয়ে বড় জেলা ভিজাগাপট্টম। কিন্তু উত্তরটি ঠিক নয়। ভারতের সবচেয়ে বড় জেলা মিজো পাহাড়।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত অনুপ রায়-চৌধুরীর (খ) প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ভারতে ফুটবলের শ্রেষ্ঠ মাঠ কটকের বারবা... স্টেডিয়াম, ক্রিকেটের ইডেনগার্ডেন্স এ... টেনিসের ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব কোর্ট।

প্রদীপ সরকা...
শ্যামসুন্দর ঘো...
গৌতম চক্রবর্তী, রৌরকেল্লা।

●

এম-আই-জি সুপারসনিক ফাইটা... বোম্বার ২৪ এবং ১১১এ স্যুইং-উই... ফাইটার সুপারসোনিক জেট বোম্বারে... আবিষ্কর্তা যথাক্রমে ডবলু ই ডব... পের্কার (রাশিয়া) এবং সোয়েন্ট উই... (রাশিয়া)।

দিলীপ মুখোপাধ্যা...
রামপুরহাট, বীরভূ...

●

২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত অসিত মুখার্জী... প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স এ পর্যন্ত ৫২টি টেস্টে (৮৫ ইনিংস) অংশগ্রহ... করে ১৭টি সেঞ্চুরী করেছেন।

প্রদীপ সাহা
কলকাতা—৩১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।